নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

দ্বিতীয় খণ্ড

ক - ণ

পুরাণকোষ

(মহাভারত-রামায়ণ-মুখ্য পুরাণ)

দ্বিতীয় খণ্ড
(ক - ণ)

সম্পাদক
নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

সহকারী সম্পাদক
সুচেতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রধান সহায়ক
ঐত্রেয়ী সরকার

সাহিত্য সংসদ

PURĀṆAKOṢA, VOL-II
(An Encyclopedic Dictionary of
Mahābhārata, Rāmāyaṇa and Purāṇa-s)
by Nrisinha Prasad Bhaduri

ISBN : 978-81-7955-286-5 (Vol. II)
978-81-7955-274-2 (Set)

প্রচ্ছদ : চন্দন বসু

প্রথম প্রকাশ : মে ২০১৮

নেতাজি ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ এবং
উচ্চশিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর
যৌথ প্রয়াস

প্রকাশক : দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক : এ.পি. প্রিন্টার্স, ৮/১ গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, কলকাতা ৭০০ ০৬৭

₹ 1150.00

উৎসর্গ

এই পুরাণ-যজ্ঞের অগ্নিসমিন্ধনী
আমার প্রিয়পত্নী
সুষমার
জন্য

কৃতজ্ঞতা

ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পুরাণ-কোষ গ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত যে চতুর্থ খণ্ড পর্যন্ত প্রসারিত হবে—এই চলমানতায় তিনিও কিন্তু অন্যতম পথিক।

সূচি

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রকাশকের কথা

পুরাণকোষ-এর প্রথম খণ্ড (অ-ঔ) প্রকাশের পর ভালো সাড়া পড়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যে বইটির পুনর্মুদ্রণই তার প্রমাণ। আমরা আগেই বলেছি এই আয়তনের বইয়ের কাজ শুধু পরিশ্রমসাধ্যই নয় সময়সাপেক্ষও বটে। তবুও সব অন্তরায় অতিক্রম করে দু-বছরের কম সময়েই *পুরাণকোষ*-এর দ্বিতীয় খণ্ড (ক-ণ) প্রকাশিত হল। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর কাছে এর জন্য আমরা সর্বাধিক কৃতজ্ঞ। বাকি খণ্ডগুলির জন্যও তাঁর আকুল ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কোথাও বিরতি নেই। চূড়ান্ত অবস্থায় খণ্ডগুলিকে প্রকাশযোগ্য করে তুলতে তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা এখনও কাজ করে চলেছেন। সহযোগীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য সহকারী সম্পাদক সুচেতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নাম। তাঁর দক্ষতা ও কর্মোদ্যম বইটির প্রকাশকে দ্রুততর করেছে। এর জন্য তিনি অবশ্যই প্রশংসার দাবি করতে পারেন।

চূড়ান্ত পর্যায়ে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়ে *পুরাণকোষ* পাঠকের দরবারে পৌঁছোবার আগে বাইশ বছরের বিপুল এক কর্মযজ্ঞ রয়েছে আমাদের চোখের অন্তরালে। এখন তার পরিণত দশা ক্রমশ সমাপ্তির মুখে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই লক্ষ্যে আর এক ধাপ এগিয়ে গেলাম। রোপিত বীজ থেকে মহিরুহ আজ ফলবতী। অপেক্ষা সম্পূর্ণ হতে আর সম্ভবত খুব বেশি দেরি নেই। আশা করব হয়তো আর বছর তিনেক।

দেবজ্যোতি দত্ত

মে ২০১৮
কলকাতা

অয়মারম্ভঃ

মহাভারত-পুরাণ-কোষের দ্বিতীয় খণ্ডের গ্রন্থন্যাস হওয়া-মাত্রেই আমরা এটা বলতে পারি যে, আমরা এ কোষকাণ্ডের মধ্যপদে এসে পৌঁছেছি। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডেও যে স্বীকারোক্তি করা উচিত ছিল, দ্বিতীয় খণ্ডেও সেটা করবো, এমনকী চতুর্থ খণ্ডেও সেই একই কথা বলবো। সেটা হল—হলফ করে এটা কখনোই বিজ্ঞাপিত করা যাবে না যে, আমরা সকল বিদ্বান এবং অবিদ্বান মানুষের মনোভীষ্ট অনুসারে সকল 'এনট্রি'-গুলি এখানে সন্নিবেশ করতে পেরেছি। ভিন্নরুচি বিদ্বান-পণ্ডিতের ততোধিক ভিন্ন পৌরাণিক অন্বেষণ থাকতে পারে। কেউ মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণের চরিত্র-নাম খুঁজতে পারেন 'যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে', আবার কেউ বা পৌরাণিক আরও ক্ষুদ্র দেশনাম খুঁজতে পারেন এই বিম্বিসার-অশোকের দেশে। কেউ অন্বেষণ করবেন দার্শনিক তত্ত্ব, কেউ বা যজ্ঞের উপকরণ।

এমতাবস্থায় এই পুরাণকোষের সম্পাদকের অবস্থা হয় বিষম-পশুযুক্ত রথের সারথির মতো—হাতি-ঘোড়া, উষ্ট্র-অশ্বতরদের যদি একই রথ টানতে দেওয়া হয় এবং সে রথকেও যদি যথাসম্ভব গতিসাম্য বজায় রেখে চালাতে হয় তাহলে সারথির যে অবস্থা হয়, আমার মতো সম্পাদকের অবস্থাও সেইরকম। আমরা বলবো-পুরাণ কোষের দ্বিতীয় খণ্ডে ক-চ-টয়ের মতো ত্রিবর্গের অনুসন্ধানে জোর দেওয়ার ফলেই আমাদের মুক্তিমার্গ ব্যাহত হয়েছে এ যাত্রায়, কিন্তু তাতেই এই গ্রন্থ হাজার পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে গেছে, যদিও এই বৃহত্ত্বের জন্য অবশ্যই দায়ী মহতো মহীয়ান্ কৃষ্ণের মতো পুরুষোত্তম কিংবা গান্ধারী-কুন্তীর মতো মহাভারতী রমণীরা। তাঁরা এখানে একেবারে জুড়ে বসেছেন বটে, কিন্তু তাই বলে ক্ষুদ্র বলে অবহেলা করতে পারিনি চৌষট্টি কলাকেও—সেখানে চুরি করার ক্ষমতাও যে একটা কলা বিশেষ, সেটা তো গবেষণা করে বার করতে হয়েছে।

এইরকম করেই চলেছি সমস্ত পৌরাণিক পরিসর থেকে তিল-তিল সমাহরণ করে, তবু কিছুতেই বলতে পারছিনা সাঙ্গ হয়েছে ত্রিবর্গের কাজ, পাঠকের অন্বেষ্টব্য অনেক বিষয়ই তবু বাকী রয়ে গেল ভবিষ্যৎ পূরণের আকাঙ্ক্ষায়। আমরা হয়তো স্বকপোল-কল্পিত, দৃষ্টিতেই পাঠকের অনুমান-খণ্ড তৈরি করেছি, তাতে 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ'—এই নিয়মে ধোঁয়া দেখেই অগ্নির অনুমান হয় বটে, কিন্তু মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণের বিষয়-বৈচিত্র্য এমনই যে, যখন ধোঁয়া নেই বলে আগুনও নেই ভাবছি, সেখানেও দেখতে পাই

এক-একটি শব্দ-বিষয় ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো। সেখানে কিন্তু রীতিমত গবেষণা করেই আমাদের শব্দভেদ করতে হয়েছে।

উড়িষ্যার গজপতিবংশীয়দের মধ্যে বিখ্যাত পুরুষোত্তমদেব কিছু কোষগ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে একাক্ষর কোষও আছে। তিনি অসামান্য একটি কথা বলেছিলেন—এই ভারতবর্ষে কত কাব্য, কত সাহিত্য—বিশেষত সেখানে ব্যবহৃত শব্দরাশির বৈচিত্র্য এমনই যে, আমরা কোনো দিনই বুঝতে পারবো না—কোথায়, কখন, কে কোন শব্দটাকে অন্তর্ভেদ করে দর্শন করেছে—ক্ব কদা কেন কিং দৃষ্টাম্ / ইতি কো বেদিতুং ক্ষমঃ।

পুরুষোত্তমদেবের এই একটা কথাই-সমস্ত সন্দেহগ্রন্থি ভেদ করে দেয়। শব্দ-লেখা নয়, শব্দ-দর্শন। বেদের মন্ত্রগুলি সম্বন্ধে বলা হয়—বেদ অপৌরুষেয়, বেদের মন্ত্র কেউ লেখেনি, বেদের মন্ত্র ঋষিরা দর্শন করেছেন—দর্শনাৎ ঋষয়ো বভূবুঃ। আমরা মনে করি—ঋষি না হলে কবি-মহাকবি হওয়া যায় না, কবিরাও শব্দ দর্শন করেন। পুরুষোত্তম সেটাই বলেছেন—কোন কবি কোথায় কখন যে শব্দকায় দর্শন করে কোন বিচিত্রার্থে কাব্যমধ্যে প্রয়োগ করেন তা বোঝা বড়ো মুশকিল। মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণের শব্দরাশি এমনই যে, আমরা যারা 'উপাসিতগুরুঃ, তারা যেভাবে এই শব্দরাশির বিচার করে কোষে উপনিবদ্ধ করলাম, তা ছাড়াও অন্য বিদ্বান মানুষেরা আছেন, তাঁদের দৃষ্ট শব্দগুলি হয়তো এখানে বাদ পড়ে গেল, আমরা সেই একান্ত ভয় নিয়েই এই দ্বিতীয়খণ্ডের ত্রিবর্গ-সন্ধান করলাম।

এ বিষয়ে আমার অবশ্য একটা মহাকাব্যিক আশ্বাসন আছে, যেটা আমাদের সংস্কৃত রসশাস্ত্রের এক আলঙ্কারিক বলেছিলেন। তাঁর নাম অপ্যয্য দীক্ষিত। আসলে আমাদের এই গ্রন্থে এটা কখনোই সম্ভব হবে না যে, মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণের সমস্ত শব্দরাশির অন্তর্ভাব ঘটাতে পারবো এখানে, কিন্তু যথাসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলি আমরা যেহেতু গণনা করেছি এখানে, তাই সেই গুরুত্বের একটা মর্য্যাদা তো আছেই। এখানেই অপ্যয্য দীক্ষিতের কথা আসে। তিনি চিত্রসীমাংসা বলে একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ লিখেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় খুব ঘটা করে গ্রন্থ আরম্ভ করেও গ্রন্থটা তিনি পুরোপুরি শেষ করতে পারেননি। আধাআধি লিখে গ্রন্থ শেষ করার পর তিনি বুঝিয়ে দিলেন—পুরোটা পেরে না উঠলেও যে অর্ধেকটা তিনি লিখেছেন তার মূল্য কম নয়। এই প্রসঙ্গে একটা উপমা ব্যবহার করে তিনি বললেন—হ্যাঁ, চিত্রমীমাংসা অর্ধেকটা লেখা হলেও এ লেখা অত্যন্ত শাঁসাল এবং সকলকেই এটা আনন্দ দেবে। সত্যি বলতে—সূর্যের রথের সারথি অরুণের ঊরুদেশ নেই বলে 'অনূরু' অরুণদেবের সম্মান কিছু কম নয়। আর চন্দ্রশেখর শিবের মাথায় চাঁদখানি অর্ধেকের কম হলেও শিবের মাথায় আছে বলেই তার মহিমা এতটুকুও কম নয়—অনূরুরিব ঘর্মাংসোরর্দ্ধেন্দুরিব ধূর্জটেঃ।

আমাদের আশ্বস্ত হবার জায়গা এটাই। আমরা পৌরাণিক গ্রন্থগুলির মধ্যে যে-সব ব্যক্তি-নাম, দেশ-নাম কিংবা তত্ত্বগ্রন্থি নিয়ে আলোচনা-গবেষণা করেছি, সেগুলির মধ্যে পুরাণ-পূর্ণচন্দ্রের শ্রুতিজ্যোৎস্না প্রকাশিত হয়েছে বলেই চন্দ্রমৌলি শিবের অর্ধেন্দুর মতো এই গ্রন্থ প্রশংসনীয় হয়ে উঠবে আপনাদের কাছে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই সকলের কাছে। এই গ্রন্থ তৈরি হবার পিছনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর উদার সাহায্য করেছে আমাকে। বিভাগীয় মন্ত্রী মাননীয় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রশংসা-প্রসন্ন দৃষ্টি ছাড়া এই গ্রন্থের মধ্যসীমায় আমরা পৌঁছোতে পারতাম না। অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁকে। আমার কৃতজ্ঞতার দ্বিতীয় স্থান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান মাননীয় উপাচার্য সুরঞ্জন দাস। পাঁকের মধ্যেও যদি পদ্মফুল জন্মায় তবে পঙ্কদিগ্ধ জল তাকে পুষ্টি দিয়ে বড়ো করে তোলে বটে, কিন্তু পদ্মপুষ্পের সম্যক পরিস্ফুটনের জন্য সূর্যকরস্পর্শের প্রয়োজন হয়, সেই করস্পর্শ দিয়েছেন সুরঞ্জন দাস—কমলকলির দল একটি একটি করে ফুটে উঠেছে তাঁর জন্য।

যার সর্বাশ্লেষী প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়া এই গ্রন্থের আবরণ-ভঙ্গ হত না, সে আমার ছাত্রী সুচেতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত—বিষয়-বিরচনা থেকে এই গ্রন্থের কায়-নির্মাণে যেমন তার পর্যবেক্ষণ ছিল, তেমনই আমার আর এক ছাত্রী ঐত্রেয়ী সরকার, আমার এই প্রকল্পের অন্যতরা সহায়িকা, তাকে সমান অধ্যবসায়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজটাও সুচেতাই করেছে। দুজনেই আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করুক। এই গ্রন্থের পরোক্ষ সহায়কদের মধ্যে আছে আমার পুত্র অনির্বাণ, দ্বিতীয় যার নাম প্রথম খণ্ডেই আসা উচিত ছিল, সে আমার পুত্রসম সৌরভ কুমার ঘোষ। এই গ্রন্থের গ্রন্থনায় এক জটিল পরিস্থিতির সমাধান করে দিয়েছিল আমার পুত্রবধূর এই সরলহৃদয় দাদাটি—সৌরভের প্রতি আশীর্বাদ। আর যাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে নিতান্ত অন্যায় হবে—তিনি এই গ্রন্থের বর্ণসংস্থাপক সুবীর কুমার সরকার। সম্পূর্ণ গ্রন্থটির সযত্ন অক্ষরন্যাস তো বটেই, তারপর প্রুফ দেখা এবং সম্পাদনার সময়ে বারংবার ছোটো-বড়ো পরিবর্তন-পরিমার্জনার কাজও সম্পন্ন করেছেন নিরলস পরিশ্রমে, ধৈর্য্য সহকারে। আমার কৃতজ্ঞতার শেষ পাত্র হলেন এই গ্রন্থের প্রকাশক দেবজ্যোতি দত্ত। আমার ব্যাপারে এবং আমার এই গ্রন্থের ব্যাপারে তাঁর ধৈর্য্য পর্বতোপম স্থির। তিনি আমার বন্ধু, অতএব কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোটো করছিনা তাঁকে।

পরিশেষে জানাই—এই বিরাট চলমান গ্রন্থপ্রক্রিয়ার মধ্যে আমাদের ভুলত্রুটি কিছু থেকেই যাবে। কঠিনহৃদয় পাঠক যাঁরা আছেন, তাঁরা সেগুলি কিছুতেই ক্ষমা করবেন না বলেই পুরাতন স্মার্তকর্মের শেষে যজমান যেভাবে—'যদসাঙ্গং কৃত কর্ম জানতা বাপ্যজানতা'—বলে হরিস্মরণ করে

দোষমুক্ত হতেন, আমিও সেই কারণে আত্মনিবেদন করছি আমার পরমারাধ্য প্রাণারাম পুরুষ কৃষ্ণের চরণে। যিনি নিজে আপন লীলাবশে মনুষ্যমূর্তি ধারণ করে ধর্মার্থকামাদি ত্রিবর্গের সেবা করেছেন, সেই কৃষ্ণ আমাদের গ্রন্থস্থিত ত্রিবর্গ ক-চ-টয়ের মধ্যে উজ্জ্বলভাবে জয়যুক্ত হোন—

ত্রিবর্গঃ সেবিতো যেন লীলাবিগ্রহধারিণা।
ক-চ-টেষু মদীয়েষু স কৃষ্ণঃ জয়তেতরাম্॥

এপ্রিল ২০১৮ — নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী
কলকাতা

সংক্ষিপ্ত রূপ

- উর্ধ্বকমা (’) – এই গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে লুপ্ত ‘অ’ কারের পরিবর্তে উর্ধ্বকমা ব্যবহৃত হয়েছে।
- বিশেষ চিহ্ন – যেসব জায়গায় খণ্ডিত শ্লোকপংক্তি উদ্ধার করা হয়েছে—যেমন ধরা যাক, মহাভারতের আদিপর্বের ২৮ অধ্যায় থেকে একটি পংক্তি অথবা একটি শ্লোক এবং শান্তিপর্বের ১০৩ অধ্যায় থেকে একটি পংক্তি বা একটি শ্লোক—এসব ক্ষেত্রে পরপর *চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। পরে তথ্য সূত্র দেওয়া হয়েছে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে।
- (মহর্ষি) – *Maharishi Institute of Management*
- মহা (গীতাপ্রেস) – গোরখপুর: গীতাপ্রেস থেকে প্রকাশিত *মহাভারত*।
- মহা (নির্ণয়সাগর প্রেস) – বম্বে: নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে প্রকাশিত *মহাভারত*।
- মহা (হরি) – হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত *মহাভারত*।
- মহা (Critical Ed.) – *Mahabharatam,* Bhandarkar Oriental Research Institute.
- মহা (k) – *Mahabharatam,* Pandit Ramchandrashastri Kinjawadekar.
- AGI – *The Ancient Geography of India,* Alexander Cunningham.
- AIHT – *Ancient Indian Historical Tradition,* F.E. Pargiter.
- AIT – *Ancient Indian Tribes,* B.C. Law.
- Annals of BORI – *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute.*
- EAIG – *Encyclopedia of Ancient Indian Geography,* Subodh Kapoor.
- GAMI – *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India,* D.C. Sircar.
- GD – *The Geographical Dictionary,* N.N. Bhattachryya.
- GDAMI – *The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India,* N.L. Dey.
- GEAMI – *The Geographical Encyclopedia of Ancient and Medieval India,* K.D. Bajpai.
- GESMUP – *Geographical and Economic Studies in the Mahabharata: Upayana Parva,* Moti Chandra.
- GM – *Geography of the Mahabharata,* Bhagwan Singh Suryavanshi.
- GP – *Geography of the Puranas,* S.M. Ali.
- GRI – *Geography of the Rigvedic India,* M.L. Bhargava.
- HGM – *Historical Geography of Madhya Pradesh,* P.K. Bhattacharyya.
- HPAI – *History of Pilgrimage in Ancient India,* Samarendra Narayan Arya.

- IKP – *India as Known to Panini,* V.S. Agrawala.
- JASB – *Journal of the Asiatic Society of Bengal.*
- JRAS – *Journal of the Royal Asiatic Society of* Great Britain and Ireland
- KW – *Kurukshetra War,* P. Sensharma
- PHAI – *Political History of Ancient India,* H.C. Raychaudhuri.
- TAI – *Tribes in Ancient India,* B.C. Law.
- TIM – *Tribes in the Mahabharata,* K.C. Mishra.

পুরাণকোষ
(মহাভারত-রামায়ণ-মুখ্য পুরাণ)

ক

ক 'ক' শব্দটি স্রষ্টা বা প্রজাপতি শব্দের দ্যোতক। যিনি প্রজা সৃষ্টি করেন, তিনিই 'ক'। ঋগ্বেদের টীকাকার সায়নাচার্য 'ক' শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন—

কশব্দাভিধেয়ঃ প্রজাপতির্দেবতা।

স্রষ্টা বা প্রজাপতিকে 'ক' বলার কারণ ব্যাখ্যা করে সায়নাচার্য বলেছেন—

সৃষ্ট্যর্থং কাময়ত ইতি কঃ।

'কম্' ধাতুর অর্থ ইচ্ছা করা বা অভিলাষ করা। তাঁর অভিলাষ থেকেই জগৎ সৃষ্টি হয়, তিনিই সৃষ্টির মূল কারণস্বরূপ—এই অর্থেই পরম পুরুষ 'ক' নামে কীর্তিত। 'ক' শব্দের অন্য একটি অর্থ হতে পারে জল। এক্ষেত্রেও জীবজগৎ সৃষ্টির প্রক্রিয়া 'ক' শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কারণ জল জীব সৃষ্টির আদি কারণ স্বরূপ এবং সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর পঞ্চভূতের মধ্যে জলকেই প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন এবং এই জলও হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে একাত্মক, সে কথা মনুসংহিতার শ্লোকে স্পষ্ট প্রমাণ হয়—

সো'ভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু সমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ॥

[মনু সংহিতা ১.৮-৯]

মহাভারত এবং পুরাণে এই সর্বলোক পিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে একাধিকবার 'ক' নামে সম্বোধন করা হয়েছে। বায়ু পুরাণের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, তিনি ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ে জানেন বলেই তাঁকে 'ক' বলা হয়। এখানে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বলতে মূলত জগৎসৃষ্টি এবং সৃষ্টির মূল কারণগুলির কথাই বোঝানো হয়েছে—

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিজ্ঞানাদেকত্বাচ্চ স কঃ স্মৃতঃ।

অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির রহস্য জানেন বলেই তাঁকে 'ক' বলা হয়। স্রষ্টা বা প্রজাপতি অর্থে দক্ষ এবং কশ্যপকেও 'ক' নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

[ঋগ্বেদ (Maxmuller) ১০.১২১.১ (সায়নাচার্য টীকা দ্র.); মহা (k) ১.১.৩২; (হরি) ১.১.৩২; বায়ু পু. ৪.৪৩; ভাগবত পু. ৩.১২.৫১; ৯.১০.১০; ৮.৫.৩৯; ৬.৬.৩৪]

□ 'ক' শব্দের তৃতীয় অর্থ সুখ। ঔপনিষদিক ভাবনায় এই সুখ এবং ব্রহ্ম সমার্থক। উপনিষদে 'ক' এবং 'খ' (আকাশ)-কে একাত্মক রূপে কল্পনা করা হয়েছে। 'খ' অর্থাৎ আকাশের মধ্যে যে বিস্তার সেই ভূমাই যে সুখ—নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্—এই জন্য 'ক' এবং 'খ'কে একাকার বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে উপনিষদে। যিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন, তাঁর হৃদয়াকাশে ত্রিগুণাতীত এক সুখ বা আনন্দ জন্মগ্রহণ করে। ঔপনিষদিক ভাবনায় সেই নির্গুণ সুখ, ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দই হল ব্রহ্ম।

[ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪.১০.৫ (শাঙ্করভাষ্য দ্র.)]

□ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের অন্যতম 'ক'। জগৎ সৃষ্টির মূলে যে পরম পুরুষ, ভগবান বিষ্ণুকে তাঁর সঙ্গে একাত্মক রূপে কল্পনা করা হয় বলে তাঁর এই নাম। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ, শত-সহস্র বৎসর-এর সাধনার পর যে ভক্ত তাঁকে লাভ করেন, তাঁর হৃদয়ে তিনিই ত্রিগুণাতীত আনন্দরূপে অধিষ্ঠান করেন বলেও তাঁর নাম 'ক'—

কশব্দঃ সুখবাচকঃ, তেন স্তূয়ত ইতি কঃ (শাঙ্করভাষ্য)।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৯১; (হরি) ১৩.১২৭.৯১; Viṣṇusahasranāma (Adyar). p. 321]

কংস১ ভোজ বংশীয় উগ্রসেনের জ্যেষ্ঠপুত্র কংস। মথুরার রাজা। দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিক্ষণে বিষ্ণু

তাঁর নবম অবতারে কৃষ্ণ নামে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে কংসকে হত্যা করেন।

[মহা (k) ১.২.৮২; ৫.৬৮.৪; ১২.৩৩৯.৯০; (হরি) ১.২.৮৪; ৫.৬৬.১৫; ১২.৩২৫.৮৬; বায়ু পু. ৯৮.১০০; ব্রহ্ম পু. ১৫.৫৮; কূর্ম পু. ২.২৪.৬৭]

□ মহাভারতে অংশাবতরণ পর্বে বলা হয়েছে যে, দানব কালনেমি দ্বাপর যুগে কংস রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.৬৭; (হরি) ১.৬২.৬৮; বিষ্ণু পু. ৫.১.২২; ভাগবত পু. ১০.৫১.৪২]

□ কংসের জন্ম বৃত্তান্তটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। কংস লোকমুখে উগ্রসেনের একান্ত আত্মজ বলেই পরিচিত, পুরাণগুলিতে প্রাপ্ত যদু-বৃষ্ণি-কুকুর-অন্ধকদের বংশলতিকাতেও তাঁকে উগ্রসেনের জ্যেষ্ঠ পুত্রই বলা হয়েছে। কিন্তু কংসের জীবন বিশদে যে পুরাণগুলিতে আলোচিত হয়েছে, বিশেষত ভাগবত পুরাণ, হরিবংশের মতো পুরাণগুলিতে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী কংস উগ্রসেনের আপন ঔরসজাত পুত্র নন, ক্ষেত্রজ পুত্র। কিন্তু উগ্রসেনের আপন ঔরসজাত পুত্রদের থেকে তিনি জ্যেষ্ঠ।

মহারাজ উগ্রসেনের স্ত্রী যাঁকে একমাত্র পদ্মপুরাণেই পদ্মাবতী নামে অভিহিত করা হয়েছে—তিনি একবার অন্যান্য অন্তঃপুর-বাসিনীদের নিয়ে পর্বতের শোভা দেখার জন্য কৌতূহলী হয়ে সুযামুন পর্বতের উপত্যকায় বেড়াতে গিয়েছিলেন—

প্রেক্ষিতুং সহিতা স্ত্রীভির্গতা বৈ সা কুতুহলাৎ।

সুযামুন পর্বত যমুনা নদীর তীরবর্তী কোনো ক্ষুদ্র পর্বত ছাড়া আর কিছুই নয়, কেন না এই নামে কোনো পাহাড়ের নাম আমরা শুনিনি। যাই হোক, মথুরাপুরীর অন্তর্গৃহের অবরোধ থেকে মুক্তি পেয়ে উগ্রসেনের গৃহিণী পরমানন্দে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। একবার পাহাড়ে উঠছিলেন, একবার নদীর তীর বেয়ে উচ্ছলভাবে ছুটে যাচ্ছিলেন, কখনো বা পর্বতকন্দরে বসে বসে প্রাকৃতিক শোভা দেখছিলেন—

চচার নগশৃঙ্গেষু কন্দরেষু নদীষু চ।

প্রাকৃতিক পরিবেশও ছিল বড়ো মধুর। এই অবস্থায় তিনি মহারাজ উগ্রসেনের কথা ভাবছিলেন, তাঁকে কাছে পেতে চাইছিলেন—

স্ত্রীধর্মম্ অভিরোচয়ৎ।

ঠিক এই মুহূর্তে, মহারাজ উগ্রসেন নয়, আরও একটি মানুষকে সেই সুযামুন পর্বতের উদ্ধত ভূমিতে রথ থেকে অবতরণ করতে দেখছি। হরিবংশ পুরাণের কথক ঠাকুর আমাদের পৌরাণিক কল্পনাপুষ্ট করে এই পুরুষটিকে 'দানব' বলে ডেকেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সৌভপতি বলে চিহ্নিত করে এই পুরুষটির মনুষ্য-পরিচয়ও আচ্ছন্ন করেননি—

অথ সৌভপতিঃ শ্রীমান্ দ্রুমিলো নাম দানবঃ।

সৌভপতি দ্রুমিল। সেই রথচারী পুরুষের নাম। হরিবংশের কথক ঠাকুর যতই বলুন, দ্রুমিল দানব বিমানে চড়ে মনোরথগতিতে এসে নামলেন সেই পর্বতের শিখরে, আসলে ভূগোল জানলেই আর কোনো দানবের গোল থাকবে না এই কাহিনীর মধ্যে। বস্তুত সৌভপুর বলে একটা জায়গা আছে যেখানে শাল্বরা থাকতেন। মহাভারতে এক শাল্ব রাজার সঙ্গে ভীষ্মের এবং অন্য এক শাল্ব রাজার সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ হয়েছিল। এই শাল্ব রাজারাই সৌভদেশে থাকতেন। শাল্ব শব্দটা একটি মানুষের নামমাত্র নয়, এটি একটি জাতির নাম, যাঁদের রাজধানী ছিল সৌভপুর।

পারজিটার লিখেছেন—শাল্ব-রাজারা থাকতেন রাজস্থানের আবু পাহাড়ের কাছাকাছি। অন্যেরা বলেন শাল্বরা যমুনা থেকে সিন্ধু নদীর তীর পর্যন্ত মোটামুটি ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচীন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিতে অবশ্য যমুনা নদীর তীরেই শাল্বদের নিবাস নির্ণীত হয়েছে। সে যাই হোক, যমুনাপারের দেশই হোক আর রাজস্থানের কোনো জায়গার মানুষই হোন সৌভপতি দ্রুমিল যমুনা নদী বা হরিবংশ কথিত সুযামুন পর্বতের থেকে বহু দূরে কোথাও থাকতেন না। অন্যদিকে মৎস্যদেশে আলোয়ার বা আবু-পাহাড়ের কাছাকাছি যেহেতু মগধরাজ জরাসন্ধের আত্মীয়-পরিজনেরাই রাজত্ব করতেন, তাই আমাদের দৃঢ় অনুমান এই সৌভপতি জরাসন্ধেরই অনুগত কেউ। রাজা বলে তাঁকে প্রথমে ডাকা হয়নি, কারণ তিনি রাজা ছিলেন না। আমাদের এই অনুমান আরও সুদৃঢ় হবে, যখন মহাভারতের অন্যত্র আমরা জরাসন্ধের সঙ্গে শাল্ব রাজার প্রগাঢ় বন্ধুত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতে শাল্বকেই সৌভপতি বলা হয়েছে কাজেই হরিবংশে যে

সৌভপতি দ্রুমিলকে এক্ষুনি সুযামুন পর্বতে এসে পৌঁছতে দেখলাম, তিনি অবশ্যই শাল্বরাজের লোক ওরফে জরাসন্ধের লোক আর দ্রুমিলের ঔরসজাত পুত্র কংসও পরবর্তীকালে জরাসন্ধের একান্ত ঘনিষ্ঠ অনুগামীরূপেই পরিচিত হবেন।

পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী দানব দ্রুমিল একচারিণী উগ্রসেন-পত্নীকে পর্বতের শোভা-বিবর্তের মধ্যগত অবস্থায় নিরীক্ষণ করে রূপমুগ্ধ হলেন এবং তিনি নাকি ধ্যানযোগে জানতে পারলেন যে, রমণী উগ্রসেনের পত্নী। সৌভপতি তখন উগ্রসেনের রূপ ধরে সকামা সেই রমণীর সঙ্গে সুরত-ক্রীড়ায় মত্ত হলেন। উগ্রসেনের পত্নী প্রথমে কিছুই নাকি বোঝেননি, তারপর দানব দেহের অতিরিক্ত ভারে তিনি সচেতন হন এবং সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, ইনি তাঁর স্বামী উগ্রসেন নন। উগ্রসেনের পত্নী সক্রোধে বলে উঠলেন—তুই কে? এমন করে আমার স্বামীর রূপ ধারণ করে আমার সতীত্ব নষ্ট করলি? আমার আত্মীয়-স্বজন এখন আমাকে কীই বা না বলবে এবং সেইসব নিন্দাবাদ শুনে কীভাবেই বা আমি বেঁচে থাকব—

কিং মা' বক্ষ্যন্তি রুষিতা বান্ধবাঃ কুলপাংসনীম্?

সৌভপতি অনেকক্ষণ কটু কথা শুনলেন, তারপর এক সময় ধৈর্য্য হারিয়ে বলে উঠলেন—দেখ রমণী! অনেকক্ষণ তুমি বিজ্ঞের মতো কথা বলছ—মূঢ়ে পণ্ডিতমানিনি। আমি সৌভপতি দ্রুমিল, সামান্য লোক নই। দেবতা-দানবদের সঙ্গে একটু ব্যভিচার করলে তোমার মতো মানুষের এমন কিছু দোষ হয়ে যায় না। তুমি যে আমাকে বড়ো মুখ করে জিজ্ঞাসা করলে—কস্য ত্বং—তুই কার ছেলে, এর থেকেই তোমার ছেলের নাম হবে কংস।

অবশ্য উগ্রসেন-পত্নীও দ্রুমিলকে সহজে মুক্তি দিলেন না। ঘোষণা করলেন যে, দ্রুমিলের ঔরসে যে পুত্র সন্তানটি তাঁর গর্ভে জন্ম নেবে সে মাতৃস্নেহ কিছু মাত্র লাভ করবে না। ভবিষ্যতে যদু-বৃষ্ণি বংশ জাত এক পুরুষ সেই সন্তান অর্থাৎ কংসকে হত্যা করবে।

হরিবংশে অন্যত্র উগ্রসেনের নয় ছেলের তালিকা দেবার সময় কংসের নাম করে আলাদাভাবে বলেছেন—কংসস্তু পূর্বজঃ। এখন এই 'পূর্বজ' মানে সবার আগে জন্মানো জ্যেষ্ঠ পুত্রও যেমন হতে পারে তেমনই হতে পারে—কংস অন্য সময়ে অন্যভাবে আগে জন্মেছিলেন। দাম্পত্য সরসতার ফল তিনি নন, তিনি উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্রমাত্র। কংসের নিজের মুখ দিয়েই এ কথা পরে বেরিয়েছে—

ক্ষেত্রজো'হং সুতস্তস্য উগ্রসেনস্য হস্তিপ।

সেকালের দিনে পত্নীগর্ভজাত এইরকম ক্ষেত্রজ পুত্রকে ত্যাগ করার রীতি ছিল না। বরং সে পুত্রকে সাদরে মানুষ করার মধ্যেই বংশের সম্মান ছিল। কিন্তু কংস বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে সেইসব দুর্লক্ষণ প্রকাশ পেতে আরম্ভ করল, যা একজন বড়ো বংশের ছেলেকে মানায় না। অত্যাচার এবং রাজ্যকামিতা তাঁকে পেয়ে বসল। আমাদের ধারণা, তাঁর জন্মদাতা সৌভপতির সঙ্গে কংসের যোগাযোগ নাই থাক, কিন্তু মগধরাজ জরাসন্ধের সঙ্গে তাঁর দৃঢ় যোগাযোগ ছিল। হয়তো কংসের আনুক্রমিক দুর্ব্যবহারে তাঁর মাতা-পিতাও তাঁর প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁরা সাময়িকভাবে তাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। কংস নিজেই এক সময় এ কথা বলেছেন—আমি নিজের ক্ষমতায় বড়ো হয়েছি, বাপ-মা আমাকে কোনো সুযোগ দেননি, তাঁরা আমায় ত্যাগ করেছেন—

মাতৃপিতৃভ্যাং সন্ত্যক্তঃ স্থাপিতঃ স্বেন তেজসা।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.২৪;
হরিবংশ পু. ২.২৮.৫৭-১০৩, ১১৬;
২.২৮.১০৪-১০৮; মৎস্য পু. ৪৪.৭৪]

□ কংসের পাঁচটি অনুজা ভগিনী ছিলেন। তাঁদের নাম কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শূরভূ এবং রাষ্ট্রপালিকা, কংসের জ্ঞাতি শূর বংশীয় বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সঙ্গে এঁদের বিবাহ হয়েছিল।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.২৫; বিষ্ণু পু. ৪.১৪.৫]

□ উগ্রসেনের ভাইয়ের নাম দেবক। এই দেবকের সাতটি কন্যা সন্তান, তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠা দেবকী। দেবকী এবং তাঁর অপর ছয়টি বোনের সঙ্গে বিবাহ হয় শূর বংশীয় বসুদেবের। কংসের মৃত্যুর কারণ রূপে কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল এই বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে।

[বায়ু পু. ৯৬.১৪৮; বিষ্ণু পু. ৪.১৪৫]

□ সম্ভবত কংসের জন্মের মধ্যে এই অনৈতিক ইতিহাসের কারণেই উগ্রসেনের সঙ্গে কংসের

সম্পর্ক কখনোই মধুর হয়ে ওঠেনি। তাঁদের পারস্পরিক তিক্ততার সম্পূর্ণ সুযোগ নেন মগধরাজ জরাসন্ধ। কংসের সঙ্গে তিনি আত্মসম্পর্ক গড়ে তোলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। জরাসন্ধের দুটি মেয়ে ছিল। তাঁদের নাম অস্তি আর প্রাপ্তি। জরাসন্ধ দুই কন্যাকেই সম্প্রদান করলেন কংসের হাতে। এভাবে মগধরাজ মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে জামাতা কংসের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলেন।

জরাসন্ধের শক্তিতে বলীয়ান কংস নিজের জ্ঞাতিদের উপর উৎপীড়নে মনোযোগী হলেন। কংসের অত্যাচারে যাদবরা মথুরা-শূরসেন অঞ্চল ত্যাগ করে কুরুপঞ্চাল, কেকয়, বিদর্ভ, কোশল প্রভৃতি স্থানে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন।

কংস জরাসন্ধের সাহায্যে নিজ পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসন থেকে হঠিয়ে দিয়ে নিজে মথুরার সিংহাসন দখল করেন। এর মধ্যে যে জরাসন্ধের সাহায্য বহুল পরিমাণে ছিল, তার প্রমাণ আছে মহাভারতের সভাপর্বে, যেখানে জরাসন্ধবধের পরিকল্পনা করার সময় বাসুদেব কৃষ্ণ নিজ মুখে যুধিষ্ঠিরকে জানিয়েছেন—বার্হদ্রথ কুলে জাত জরাসন্ধের দুই মেয়ে অস্তি এবং প্রাপ্তিকে বিয়ে করে শ্বশুরের বলে বলীয়ান হয়ে কংস আমাদের যাদবকুলের আত্মীয়-জ্ঞাতিদের দলিত পিষ্ট করে ছেড়েছিল—

বলেন তেন স্বজ্ঞাতীন্ অভিভূয় বৃথামতিঃ।

পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসন-চ্যুত করেই কংস নিশ্চিন্ত থাকেননি। তিনি তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। ইতিহাসের প্রমাণে এটাই সত্য যে, যাদবদের রাজ্য ছিল প্রধানত সংঘনির্ভর অলিগার্কি-গোছের। অন্ধক, কুকুর, বৃষ্ণি, শৈনেয়— এইভাবে অন্তত আঠারটা সংঘের কথা আমরা কৃষ্ণের মুখে পরবর্তীকালে শুনব। উগ্রসেন যদি কারাগারের বাইরে থাকেন, তবে যদি তিনি যদু-বৃষ্ণি-সংঘের সকলকে একত্রিত করে কংসের বিরুদ্ধে প্রত্যাক্রমণ রচনা করেন, তবে যে স্বনিযুক্ত মথুরাধিপতি কংসের সমূহ বিপদ হবে, সে কথা কংস খুব ভাল করেই জানতেন।

যাদবদের প্রতি জরাসন্ধের শত্রুতা চরমে পৌঁছোয়, যখন মথুরার অধিপতি উগ্রসেন কারাগারে বন্দি হলেন। জরাসন্ধের 'এজেন্ট' হিসেবে তাঁরই ক্ষেত্রজ পুত্র কংস খুব ভালভাবে কাজ করতে আরম্ভ করলেন মথুরা-শূরসেনের ভূখণ্ডে। আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা—যাদবরা যেহেতু বিভিন্ন সংঘমুখ্যকে নিয়ে একটি গোষ্ঠীতন্ত্র চালাতেন, তাই বিভিন্ন সংঘমুখ্যর মধ্যে যেসব অন্তর্বিবাদ ছিল, সেই বিবাদের সুযোগ নিয়েই জরাসন্ধ মথুরায় নিজের প্রতিনিধি কংসকে স্থাপন করতে পেরেছিলেন। কংসের চরিত্রে স্বৈরতন্ত্রের বীজ প্রথম থেকেই প্রোথিত ছিল। জরাসন্ধের আশ্রয় এবং প্রশ্রয়ে তা ক্রমেই বিকশিত হতে থাকে। সংঘমুখ্যদের মতামতের কোনো গুরুত্বই কংসের কাছে ছিল না। বলা যেতে পারে এর ফলে কংসের শাসনকালে মথুরায় একধরনের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিছুকালের জন্য।

যদু বংশের বিভিন্ন সংঘ অন্ধক, কুকুর, বৃষ্ণি, পৃশ্নি, ভোজ, শিনি, সাত্বত—সব সংঘের মুখ্যরাই সাময়িকভাবে কংসের প্রাধান্য মেনে নিয়েছিলেন, অবশ্য স্বেচ্ছায় এঁরা সকলে কংসের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁরা জরাসন্ধ-ভীতিতেই সকলে প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেটা বোঝা যায়। তবে মৌখিকভাবে কংসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও সিংহাসনচ্যুত রাজা উগ্রসেনের প্রতি সহানুভূতি তাঁদের সকলেরই ছিল। একই সঙ্গে কংসের অত্যাচার থেকে মুক্তির ইচ্ছাও ছিল প্রবল। ফলে গোপনে কংসের বিরুদ্ধে তাঁরা একত্রিত হতে শুরু করেছিলেন। আর সেই কংসবিরোধী জোটের অন্যতম প্রধান হয়ে উঠলেন কৃষ্ণের পিতা এবং দেবকীর স্বামী শূর বসুদেব।

[মহা (k) ২.১৪.৩০-৩১; ৫.১২৮.৩৭-৩৮;
(হরি) ২.১৪.৩০-৩১; ৫.১২৯.৩৭-৩৮;
ভাগবত পু. ১০.৮২.২২]

□ পূর্বেই উগ্রসেনের ভাই দেবকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দেবকের কনিষ্ঠা কন্যা দেবকী। দেবকী এবং তাঁর অপর ছয়টি বোনকে দেবক একত্রে বসুদেবের হাতে সম্প্রদান করেছিলেন। কংসের পিতৃব্যের জামাতা বসুদেব, যিনি আবার কংস বিরোধী গোষ্ঠীর প্রধান নেতাও বটে, বসুদেবের প্রতি দেবকের এই প্রীতির আড়ালে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়। দেবকের

পরিবারের সঙ্গে বসুদেবের বিবাহ সম্বন্ধস্থাপন হয়তো বা উগ্রসেন-পুত্র কংসের বিরুদ্ধে বঞ্চিত পিতৃব্যের কৌশলী পদক্ষেপ।

[বায়ু পু. ৯৬.২৮-২৯]

□ দেশে নতুন রাজা রাজত্বভার গ্রহণ করলে সর্বকালে এবং সর্বদেশে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, কংস রাজা হবার পর যাদব সংঘমুখ্যদের মধ্যেও সেই প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। সাধারণত ক্ষমতার পালা বদল হলে উচ্চশ্রেণীর মানুষের একাংশ রাজনৈতিক ক্ষমতার কাছাকাছি থেকে রাজা বা নেতার পক্ষপাতী হয়ে পড়েন, আর অন্যাংশ এই নেতৃত্বের বিরোধিতা করতে থাকেন। কংস রাজা হবার পর যাদব সংঘমুখ্যদের অনেকেই তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ভোজ-বৃষ্ণিমুখ্যদের রাজসভায় বক্তৃতা দেবার সময় কংস রাজোচিতভাবে বলেছিলেন—এই মহান যদুকুল যখন নিজের মর্য্যাদা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল—ব্যাবর্তমানং সুমহৎ—তখন আপনাদের মতো কীর্তিমান লোকেরাই এই যদুবংশকে আপন মর্য্যাদায় স্থাপন করেছিলেন, ঠিক যেমন পাহাড়ের দৃঢ়তায় ধৃত হয় এই ধরাতল—

ধৃতঃ যদুকুলং ধীরের্ভূতলং পর্বতৈরিব।

সন্দেহ নেই—কংসের বলা ওই যদুকুলের মর্য্যাদাভ্রংশের সময়টি অবশ্যই কংসের পূর্বঘটিত বলেই কংস মনে করেন। তিনি নিশ্চয় মনে করেন—তাঁর সময়েই যদুবংশের চরম প্রতিষ্ঠা এবং সম্মান সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু যাঁরা মর্য্যাদা পুনঃস্থাপনে সাহায্য করেছেন কংসকে, তাঁরা অনেকেই কংসের মন যুগিয়ে চলেন। কংস নিজেই সেকথা সগর্বে উচ্চারণ করে বলেছেন—আপনারা সকলেই আপন আপন স্থানে অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি এবং আপনারা প্রত্যেকেই আমার মনের অনুকূল আচরণ করেন—

এবং ভবৎসু যুক্তেষু মম চিত্তানুবর্তিষু।

কংসের মনের অনুকূল আচরণ যাঁরা করেছেন, তাঁদের মধ্যে এমন সব নাম আমরা পাচ্ছি, যাঁদের নাম শুনলে আমাদের কিছুটা আশ্চর্যই লাগবে। কংস এই সভায় কৃষ্ণপিতা বসুদেবকে খুব কষে গালাগালি দিয়েছিলেন। তাতে বুঝি, তিনি তাঁর অনুকূল ছিলেন না। কিন্তু কৃতবর্মা, ভূরিশ্রবা যাঁদের নাম আমরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় আবার শুনতে পাব, কিংবা অক্রূর, যাঁকে ভবিষ্যতে অনেক সময়েই কৃষ্ণের বিপক্ষভূমিতে দেখতে পাব, অথবা দারুক, সত্যক—ভবিষ্যতে যাঁদের কৃষ্ণের সহমর্মিতার স্থানে দেখতে পাব—এঁদের সকলকে কিন্তু এখন কংসের অনুকূল ভূমিকায় দেখতে পাচ্ছি। তার মানে কংস রাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের বলেই হোক, বুদ্ধিতেই হোক অথবা মগধরাজ জরাসন্ধের ভয় দেখিয়েই হোক—এঁদের সবাইকে তিনি নিজের অনুকূলে টানতে পেরেছিলেন। তবে এই আপাত আনুগত্য কংসকে শাসক রূপে দায়িত্বশীল করার পরিবর্তে আরও বেপরোয়া করে তোলে। কংসের অত্যাচারে তাঁর স্বজাতি অর্থাৎ ভোজবৃদ্ধরা পরবর্তীকালে যাদব কৃষ্ণ ও বলরামের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হন। কৃষ্ণ কৌশলে কংসের একান্ত অনুগত ও ঘনিষ্ঠ সভাসদ অক্রূরকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসেন। এক্ষেত্রেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে কৃষ্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছিলেন আহুককন্যা অর্থাৎ উগ্রসেনের কন্যা সুতনুকে অক্রূরের হাতে সম্প্রদানের মধ্যে দিয়ে।

[মহা (k) ২.১৪.৩২-৩৩; (হরি) ২.১৪.৩২-৩৩]

□ তবে কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে কংসের প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের প্রসঙ্গে আলোচনা করার আগে পূর্বকথা বর্ণনা করা প্রয়োজন।

প্রাথমিকভাবে কংস বেশিরভাগ যাদব গোষ্ঠী বা সংঘমুখ্যর সমর্থন আদায় করে নিলেও ক্ষমতার লোভে অথবা ক্ষমতার চূড়ায় বসে তিনি নিজেকে আর নিজের বশে রাখতে পারেননি। এর ফলে মথুরাবাসীর ওপরে নেমে এসেছে অত্যাচার আর অবিচারের বোঝা।

ধর্মের রক্ষার কারণে ঈশ্বর যখন অবতার গ্রহণ করেন, তার পূর্বে প্রায় নিয়মমাফিক পৃথিবীমাতাকে আমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় বিষ্ণু-নারায়ণের কাছে পৌঁছতে দেখব। তিনি অত্যাচারী রাজার অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে ঈশ্বরকে অবতার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। ঈশ্বর দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্য তখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে অত্যাচারীকে বধ করেন এবং পৃথিবীকে পাপমুক্ত করেন। সেই ধারায় কংসের দমনের জন্য ভগবান বিষ্ণু কৃষ্ণ রূপে

ভবিষ্যতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়ার ঘোষণা করলেন।

অবশ্য বহুপূর্বেই কৃষ্ণের আবির্ভাবের কথা দেবর্ষি নারদ কংসের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। দেবর্ষি স্বয়ং কংসকে দেবতাদের এক মন্ত্রণা সভার কথা বলেন-যেখানে মথুরার রাজাকে বধের উদ্দেশ্যে তাঁরই কনিষ্ঠা ভগিনী দেবকীর গর্ভজাত অষ্টম সন্তানটি কংসের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠবে—এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। নারদ কংসকে প্রাণরক্ষার্থে দেবকী গর্ভ উচ্ছেদের পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু হরিবংশ পুরাণে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, আত্মাভিমানী কংস অট্টহাস্যে দেবর্ষির সাবধানবাণীকে পরিহাস করেন। আসলে আত্ম অহঙ্কারে মগ্ন কংস কল্পনাও করতে পারেননি যে, সমগ্র পৃথিবীতে এমন কোনো পুরুষ আছেন, যিনি তাঁকে পরাজিত করতে সমর্থ।

[হরিবংশ পু. ২.১.১-২৫; বিষ্ণু পু. ৫.১.৬৬]

□ এদিকে দেবকীর সঙ্গে শূর বসুদেবের বিবাহ সম্পন্ন হল। কংস দেবকীর বিবাহের পর পতিগৃহে গমনের সময় নিজ হাতে রথচালনা করে নববিবাহিত দম্পতিকে এগিয়ে দিতে লাগলেন। সমস্ত মথুরা নগরী উৎসবে মুখরিত হয়ে উঠলো। ঠিক সেই মুহূর্তেই আকাশ কাঁপানো দৈববাণী শোনা গেল। যেন কালের কণ্ঠ ধ্বনিত হল কংসের প্রতি। উচ্চারিত হল আকাশ-বাণী—'তুমি যাঁকে সানন্দে পতিগৃহে নিয়ে চলেছো তাঁর অষ্টম গর্ভই তোমাকে বধ করবে—

পথি প্রগ্রহিণং কংসমাভাষ্যাহাশরীরবাক্।
অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসে'বুধ॥

নারদের সাবধানবাণী কংস স্মরণ করলেন। তৎক্ষণাৎ খড়্গ হাতে দেবকীর কেশপাশ টেনে ধরলেন তাঁকে হত্যা করার জন্য। ভোজ বংশের কলঙ্ক পাপাচারী কংসের এহেন আচরণে কেউই বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। ভাগবত পুরাণবর্ণিত এ কাহিনীর ধারা বিশ্লেষণ করলে সন্দেহ জাগে, দেবক-কন্যা দেবকীর প্রতি কংসের স্নেহ প্রদর্শন কতটা স্বাভাবিক ছিল! নাকি নারদের সাবধানবাণীর কথা স্মরণ করেই কংস দেবকীকে বিশেষভাবে নজরে রাখতে চেয়েছিলেন যাতে করে বোনের আসন্ন অষ্টম গর্ভজাত সন্তানটিকে সহজেই বিনাশ করা যায়! সেজন্যই দেবকীর প্রতি কংসের এই ছদ্ম স্নেহ প্রদর্শন। সম্ভাবনা একেবারে অমূলক হয়তো নয়। কারণ জন্মগতভাবে যে সন্তান পিতা-মাতার কাছে অভিপ্রেত নয়, যাঁর জন্ম ইতিহাস কলঙ্কিত, শ্বশুরালয়ের প্রতিপত্তি যাঁর প্রতিষ্ঠার মূল কারণ—তাঁর স্বভাবে খানিক নিরাপত্তাহীনতা এবং হীনমন্যতার বীজ থাকতেই পারে। কংসের ক্ষেত্রেও এ যুক্তি অস্বীকার করা যায় না। পাশাপাশি একথাও সত্য যে, জনপ্রিয়তা নয়, জরাসন্ধ-ভীতিই যে তাঁর প্রতিপত্তির অন্যতম কারণ—একথা কংসের চেয়ে অধিক আর কেউ অনুভব করত না। মনে রাখতে হবে কংস ক্ষমতার লোভে পিতা উগ্রসেনকে বন্দি করেছেন। এরকম একজন ব্যক্তির পক্ষে বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা বসুদেবের সঙ্গে দেবকীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন কখনোই সহজে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ফলে সম্ভাব্য যে কোনো ষড়যন্ত্র সমূলে উৎখাত করার প্রয়োজনীয়তা কংসের ছিল।

যাই হোক, নববধূর প্রাণ সংশয় উপস্থিত দেখে বসুদেব কংসের এই আচরণের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি উপস্থাপন করতে শুরু করলেন। বসুদেবের যুক্তির কাছে কংস অসহায় হলেন বটে, তবে দেবকীর প্রতি তাঁর আচরণ পরিবর্তিত হল না। তখন বসুদেব উপস্থিত সংকটের হাত থেকে দেবকীকে রক্ষা করার জন্য কংসের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন যে, দেবকীর গর্ভজাত প্রতিটি পুত্র সন্তানকেই জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই মথুরার রাজা কংসের হাতে অর্পণ করা হবে। বসুদেবের কথা শুনে কংস তখনকার মত ভগিনীহত্যা থেকে নিবৃত্ত হলেন।

[ভাগবত পু. ১০.১.২৭-৫৫; বিষ্ণু পু. ৫.১.৪-১১; ব্রহ্মবৈবর্ত পু. (শ্রীকৃষ্ণজন্ম) ৮.১.৩৩]

□ মনে করা হয়, এ ঘটনার পরপরই কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। তবে ভাগবত পুরাণ ও হরিবংশ উভয় গ্রন্থই কিন্তু অন্য কথা বলে। হরিবংশে সরাসরি বলা হয়েছে যে, দেবকী ও বসুদেবকে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছিল স্বগৃহেই। সেখানে গুপ্ত রক্ষকরা শূরদম্পতির উপর সবসময় নজর রাখতেন। এমনকী কংস নাকি তাঁর পত্নীদেরও গর্ভবতী দেবকীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে পাঠিয়েছিলেন। সমস্ত গৃহটিকে নিরাপত্তার কঠোর আবরণে আবৃত করেছিলেন কংস। ভাগবত পুরাণে যদিও সরাসরি বসুদেব ও দেবকীর

গৃহবন্দি থাকার কথা উচ্চারণ করা হয়নি। তবে বলা হয়েছে যে, প্রথম পুত্র জন্মের পর বসুদেব নিজ শিশুটিকে কংসের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। দেবকীর অষ্টম গর্ভ থেকে প্রাণ সংশয় ছিল, প্রথম গর্ভ থেকে নয়—একথা ভেবে কংস বসুদেবকে আদেশ করেছিলেন তাঁকে নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে। বসুদেব মনে সংশয় নিয়ে ফিরেও যান। এ তথ্যই প্রমাণ করে যে, কংস প্রাথমিকভাবে দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে নিক্ষেপ করেননি। বরং তাঁদের নজরবন্দি করে রাখা হয়েছিল। তাঁদের শিকলে বেঁধে কারাগারে পাঠানো হয় দেবকীর প্রথম সন্তান জন্মের পর কংসের সঙ্গে দেবর্ষি নারদের সাক্ষাতে। দেবর্ষি আবারও কংসকে তাঁর প্রাণসংশয়ের বিষয়ে সতর্ক করে পৃথিবীর ভারভূত দৈত্য বিনাশে দেবতাদের পরিকল্পনার কথা বলেন। মুহূর্তেই কংসের মনোভাব বদলে যায়। বোনের প্রতি স্নেহবশতঃই হোক বা অন্যান্য সংঘপতিদের মধ্যে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্যই হোক কংস ইতিপূর্বে দেবকীর প্রথম সন্তানটিকে হত্যা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু এবার কংস দেবকীর গর্ভে স্বয়ং বিষ্ণুর আবির্ভাবের ভয়ে তাঁর প্রতিটি পুত্র সন্তানকেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে ভাগবত পুরাণে গর্ভবতী দেবকীকে দেখার পর কংসের একটি দীর্ঘ স্বগতোক্তি বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে কংস একবার ভাবছেন পূর্ণগর্ভা স্ত্রীলোকের গর্ভচ্ছেদ কোনোভাবেই বীরোচিত কর্ম নয়। আবার পর মুহূর্তেই দেবকীর গর্ভে ভগবান শ্রীহরির আবির্ভাবের আশঙ্কায় চিন্তিত হয়ে পড়ছেন। এই মানবিক টানাপোড়েন কংস-চরিত্রের মনুষ্যোচিত চেহারাটি আরও স্পষ্ট করে তোলে।

[হরিবংশ পু. ২.২.১-৮;
ভাগবত পু. ১০.১.৫৬-৬৬; ১০.২.১৯-২১]

একটি করে দেবকীর পুত্র জন্মায় আর বসুদেব তাকে দিয়ে আসেন কংসের হাতে। কংস তাঁকে পাষাণে আছড়ে মারেন, বসুদেব দেখেন, অথবা শব্দ পান, অথবা উপলব্ধি করেন এই নৃশংস হত্যা। সামগ্রিকভাবেই কংসের অত্যাচার আরও বেড়ে গেল, কারণ তাঁর নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসছে। দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তাঁকে হত্যা করবে—এই দৈববাণী মিথ্যে করে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন কংস।

□ দেবকীর সপ্তম গর্ভের সন্তানটির সম্বন্ধে সমস্ত পুরাণেই প্রচুর অলৌকিকতা আছে। সপ্তম গর্ভের সম্ভাবনা-মাত্রই পরম ঈশ্বর বিষ্ণু যোগমায়া দেবীকে আদেশ করেন—দেবকীর সপ্তম গর্ভটি আকর্ষণ করে বসুদেবের জ্যেষ্ঠা পত্নী পুরু-ভরত বংশের মেয়ে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করতে—

তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়।

ভগবান স্বয়ং যোগমায়াকেও নির্দেশ দিলেন বসুদেবের পরম বন্ধু নন্দপত্নী যশোমতীর উদরে প্রবেশ করতে।

যোগমায়া মহাবিষ্ণুর আদেশমতো দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ করে পৌরবী রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করলেন। কংসের অনুচরেরা, যারা বসুদেব-দেবকীকে পাহারা দিচ্ছিল, তারা দেবকীর পূর্বদৃষ্ট গর্ভলক্ষণ নিশ্চিহ্ন হতে দেখে কংসের কাছে গিয়ে খবর দিল—দেবকীর গর্ভ নষ্ট হয়ে গেছে—

অহো বিস্রংসিতো গর্ভ ইতি পৌরা বিচুক্রুসুঃ।

গর্ভ আকর্ষণ করে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করা হয়েছিল বলে রোহিণীর পুত্রের অন্য নাম সঙ্কর্ষণ। বৃন্দাবনে অবশ্য তাঁর ডাক নাম চালু হল বলদেব, বলভদ্র ইত্যাদি সংজ্ঞায়।

[ভাগবত পু. ১০.২.৬-১৩; বিষ্ণু পু. ৫.১.৭২-৭৬]

□ দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীহরির আবির্ভাবের পর যেন দৈববলেই কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন বসুদেব। সদ্যোজাত পুত্রটিকে রাতের অন্ধকারে বন্ধু নন্দগোপের পত্নী যশোদার সূতিকাগারে রেখে এলেন তিনি। পরিবর্তে যশোদার কন্যাসন্তানটি দেবকীর ক্রোড়ে এসে পৌঁছোল। দেবকীর অষ্টম সন্তানের জন্ম সংবাদ পেয়ে কংস প্রতিবারের মত এবারও অসহায় বোনের সামনেই তাঁর শিশু সন্তানটিকে কেড়ে নিলেন। শিশুটি কন্যা, ফলে কংসের তাঁর থেকে কোনো মৃত্যুভয় নেই—একথা দেবকী বারবার কংসকে বোঝাতে চাইলেন। কিন্তু কংসের মন তাতে কিছুমাত্র আর্দ্র হল না। গর্ভজলে স্নাতা কন্যাটিকে সজোরে নিক্ষেপ করলেন সামনে একটি পাথরের উপর। ঠিক সেই মুহূর্তেই কংসের হাত থেকে আকাশে উত্থিত হয়ে কন্যাটি ভাসমান অবস্থায় অষ্টভুজা এক দেবীর রূপ ধারণ করলেন। দেবী অট্টহাস্য করে কংসের উদ্দেশে বলে উঠলেন—পূর্বজন্মের মতই এজন্মেও তিনি বিষ্ণুর বধ্য।

কংসবধের জন্য বিষ্ণু ইতিমধ্যেই অন্যত্র জন্মগ্রহণ করেছেন। দেবী ভগবতী দেবকী ও বসুদেবকে মুক্তি দানের কথা বলে কংসের সম্মুখ থেকে বিদায় নিলেন। কংসকে পরামর্শ দিলেন অযথা শিশু ও স্বজনদের হত্যা না করার।

[ভাগবত পু. ১০.৪.১-১৩;
হরিবংশ পু. ২.৪.২৮-৪৬;
বিষ্ণু পু. ৪.১৫.১৪-১৮; ৫.৩.১-২৯;
ব্রহ্মবৈবর্ত পু. (শ্রীকৃষ্ণজন্ম) ৮.১০১-১২৬]

□ ভাগবত পুরাণে দেখা যায় এ ঘটনার পরেই বিস্মিত কংস দেবকী ও বসুদেবকে বন্ধনমুক্ত করে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। নিজের কৃতকার্যের জন্য কংস লজ্জিত এবং পারলৌকিক দুগর্তির কথা ভেবে শঙ্কিতও বটে। কংস দেবগণের মিথ্যাচারে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন কারণ পূর্ববর্তী দৈববাণীর যথার্থতা নিয়ে তিনি তখনও সন্দিহান। কংস এ সময়ে দেবকী ও বসুদেবকে সন্তান হারানোর যন্ত্রণা থেকে খানিক মুক্তি দেওয়ারও চেষ্টা করেছিলেন নানা দার্শনিক যুক্তি উত্থাপন করে। তাঁকে একথাও বলতে শোনা যায় যে, দৈবের বিধানকে পুরুষকারে বৃথা লঙ্ঘন করার চেষ্টা করছেন তিনি। দেবকী ও বসুদেব ক্ষমাপ্রার্থী কংসের আকুল আর্তিতে সাড়া দিলেন। কংস আপন অহংবুদ্ধির কারণেই এমন অনর্থ ঘটিয়েছেন একথাও বসুদেবকে মেনে নিতে দেখা যায়। *[ভাগবত পু. ১০.৪.১৫-২৮;*
হরিবংশ পু. ২.৪.৪৯-৬৩; বিষ্ণু পু. ৫.৪.১-১৭]

□ দেবী ভগবতীর কথার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা কংসের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যে দৈবিক ভ্রম কৃষ্ণের জন্ম বিষয়ে দেবীর কথায় সৃষ্টি হয়েছিল তা কংসকে আরও বিভ্রান্ত করে দেয়। সেই বিভ্রান্তি নিয়েই কংস আবার বন্ধু ও অনুগামীদের সঙ্গে পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করতে বসলেন। প্রলম্ব, কেশী এবং চাণূর প্রমুখ মন্ত্রীদের নিয়ে মন্ত্রণা সভা আয়োজিত হল। তাঁরা প্রস্তাব করলেন সমগ্র মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে দশদিন বা দশদিনের অধিক বয়স্ক শিশুদের হত্যা করা হোক। মন্ত্রীরা কংসের পরাক্রমের প্রশংসা করে দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মথুরাপতির ক্ষমতার কথা বারংবার উচ্চারণ করলেন। স্বয়ং ইন্দ্রও নাকি কংসের পরাক্রমের সামনে অসহায়।

[ভাগবত পু. ১০.৪.২৯-৪৬]

□ ভগবান বিষ্ণুর আবির্ভাব সংবাদ পেয়েও অদৃষ্টের উপর নির্ভর করার ব্যক্তি কংস নন। কৃষ্ণ-বলরাম ব্রজধামে বাল্যকালে যতবার কংসের আশ্রিত রাক্ষসদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন—তা সে কথাই প্রমাণ করে। সেই ধারাতেই কখনো কংস তাঁর নিজের ধাত্রী মাতা পূতনা রাক্ষসীকে পাঠান শিশু কৃষ্ণকে বিষাক্ত স্তনদুগ্ধ পান করিয়ে হত্যা করতে।

[হরিবংশ পু. ২.৬.২২-৩৪; ভাগবত পু. ১০.৬.২-১৪;
ব্রহ্মবৈবর্ত পু. (শ্রীকৃষ্ণজন্ম) ১০.৯-৪০]

□ কৃষ্ণকর্তৃক পূতনাবধের পর কংসের প্ররোচনায় একে একে বকাসুর, অঘাসুর এবং অরিষ্টাসুর, কেশীদানব কৃষ্ণকে বধ করার জন্য ব্রজভূমিতে যান এবং তাঁরা প্রত্যেকেই কৃষ্ণের ঐশ্বরিকতায় নিহত হন।

[ভাগবত পু. ১০.১১.৪৬-৫১; ১০.১২.১৪-৩২;
হরিবংশ পু. ২.২১.১-২২;
ভাগবত পু. ১০.৩৬.১-১৬; ১০.৩৭.১-৯;]

□ এসব ঘটনার পর দেবর্ষি নারদ কংসের সামনে এসে ঘোষণা করলেন যে, কৃষ্ণ ও বলরামই যথাক্রমে দেবকীর বহুকথিত সেই অষ্টম ও সপ্তম সন্তান। ব্রজবাসী এই দুই গোপ বালকই কংসের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠবেন। এছাড়াও দেবর্ষি কৃষ্ণের জন্মকথাও কংসের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে, কৃষ্ণের জন্মকথা সবিস্তারে শোনার পর কংস নাকি ক্রোধে বসুদেবের শিরচ্ছেদের জন্য শাণিত খড়্গ হাতে তুলে নিয়েছিলেন। এ কাজ থেকে নারদই তাঁকে নিবৃত্ত করেন। তবে কংস তৎক্ষণাৎ বসুদেব ও দেবকীকে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। তবে হরিবংশে বসুদেব-দেবকীর কারারুদ্ধ হওয়া সম্পর্কে কোনো কথা বলা হয়নি। সেখানে বরং কংসকে দেখা যায় চিরশত্রুতার জন্য বসুদেবের সমালোচনা করতে। সভার মধ্যেই কংস সরাসরি বসুদেবকে বলেন যে, মথুরার সিংহাসন দখলের স্বপ্ন তাঁর স্বপ্নই থেকে যাবে। কংসের পর কংস-পুত্রই মথুরার সিংহাসন লাভ করবেন। *[ভাগবত পু. ১০.৩৬.১৭-১৯;*
হরিবংশ পু. ২.২২.৪৮-৮৪; বিষ্ণু পু. ৫.১৫.৫]

□ ভাগবত পুরাণের অলৌকিক দৃষ্টিতে না দেখে কংসের জীবনকে যদি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে

দেখা যায়, তাহলে হরিবংশের বর্ণনাই সবচেয়ে বিশ্বস্ত। এখানে দেখছি—কংস যখন সভার মধ্যে সমস্ত জ্ঞাতিদের উপস্থিতিতে বসুদেবকে তাঁর আচরণের জন্য সমালোচনা করছেন, সেইসময় অন্ধক নামে একজন পুরুষ তার প্রতিবাদ করেন। কংসকে যথেষ্ট সমীহ করে চললেও অন্ধকের পক্ষে তাঁর সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিল না। কংসের কার্যকলাপের জন্য সম্পূর্ণ যদুবংশ নিন্দিত হয়ে উঠেছে, এ কথা অন্ধকের মুখেই প্রথমবার শোনা যায়। তিনি বারবার উগ্রসেনকেও দুষেছেন এমন এক কুপুত্রের পিতা হওয়ার জন্য। রাজা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো গুণ কংসের নেই উপরন্তু সে স্বজনঘাতী এবং অহংকারী—এই হল অন্ধকের মত। তিনি সদর্পে নিজ সন্তানের জীবন রক্ষার্থে বসুদেবের নেওয়া কৌশলকে সমর্থন করেন। অন্ধকের মতে, কংসের কারণেই যদুবংশের মূল ছিন্ন হয়েছে। এবার কৃষ্ণ জ্ঞাতি-বন্ধুদের সাহায্যে সেই ছিন্নমূল যদুবংশকে পুনরায় সুস্থিত করবেন—

ছিন্নমূলো হ্যয়ং বংশো যদূনাং ত্বৎকৃতে কৃতঃ।
কৃষ্ণো জ্ঞাতীন্ সমানায্য স সন্ধানং করিষ্যতি॥

অন্ধকের কথা থেকে যাদবদের অন্তবর্তী রাজনৈতিক সমীকরণ স্পষ্ট হয়ে যায়। কংস-পক্ষীয় এবং কংস-বিরোধী গোষ্ঠীর সম্পর্ক এবার প্রত্যক্ষ একটা অবস্থানে পৌঁছোয়।

তবে এত বিরোধের পরও অন্ধক কংসকে অনুরোধ করেন যাতে তিনি বসুদেবকে সঙ্গে নিয়ে গোকুলে কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। স্বভাবতই এই সৎ পরামর্শ কংসের কাছে গ্রহণীয় হয়নি। *[হরিবংশ পু. ২.৩.১-৪০]*

□ হরিবংশ পুরাণ থেকে জানা যায় যে কৃষ্ণের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা লক্ষ্য করে একদিন কংস গভীর রাতে এক মন্ত্রণাসভা আহ্বান করলেন। এই সময়েই তিনি ঘোষণা করলেন যে, এই দুই ভাইকে বধ করার জন্য একটি ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন করা হোক। সেখানে কংসের অনুগত চাণূর, মুষ্টিক প্রভৃতি মল্লযোদ্ধারা বালক কৃষ্ণ ও বলরামকে বধ করবেন। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে কৃষ্ণ-বলরামের বধের পরিবর্তে কংস চাণূর ও মুষ্টিককে রাজ্যভাগ দেওয়ার প্রলোভন দিয়েছিলেন। অবশ্য প্রত্যক্ষ মল্লযুদ্ধের আগে মদমত্ত হস্তী কুবলয়াপীড়কে প্রস্তুত রাখা হবে তাঁদের নিষ্পেষণ করার জন্য—একথাও তিনি জানিয়েছেন। *[ভাগবত পু. ১০.৩৬.২১-২৬; হরিবংশ পু. ২.২২.১-১৩; বিষ্ণু পু. ৫.১৫.৬-১০; ব্রহ্মবৈবর্ত পু. (শ্রীকৃষ্ণজন্ম) ৫.৪.৬-৭]*

□ এরপরই কংসকে অক্রূরের শরণাপন্ন হতে দেখা যায়। অক্রূর মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে যথেষ্ট প্রভাবশালী এক ব্যক্তি। যদুকুলের অন্যতম জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধিও বটে। এখানে কংস প্রায় অনুরোধের স্বরে অক্রূরকে বলেন ব্রজে গিয়ে নন্দগোপের দুই পুত্র কৃষ্ণ ও বলরামকে সসম্মানে মথুরায় নিয়ে আসতে। তারপর কংস কৃষ্ণের কাছ থেকে তাঁর মৃত্যুভয় এবং তাঁদের বিনাশ করতে নিজের পরিকল্পনা বিশদে অক্রূরের কাছে বর্ণনা করলেন। কংস তাঁকে বলেন যে, কৃষ্ণ ও বলরাম নিহত হলে তিনি বসুদেব এবং বসুদেবপন্থীদের তো বটেই তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরোধী বৃষ্ণি, ভোজ ও দশার্হদের পরাজিত করবেন। এরপরই কংসকে তাঁর রক্ষাকবচস্বরূপ গুরু, হিতোপদেষ্টা এবং শ্বশুর মগধরাজ জরাসন্ধের নাম উচ্চারণ করতে দেখা যাচ্ছে। জরাসন্ধের আশ্রয়ে অসুরদের সাহায্যে কংস কুরুসহ সমস্ত প্রভাবশালী রাজবংশকে ধ্বংস করতে চান। এই বিরাট পরিকল্পনার প্রথম ধাপই যেন কৃষ্ণ-বলরাম নিধন। অক্রূর কংসের যুক্তিকে সমর্থন করে তাঁর পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করতে সম্মত হলেন। *[ভাগবত পু. ১০.৩৬.২৭-৪০; হরিবংশ পু. ২.২২.৮৫-৯৮; বিষ্ণু পু. ৫.১৫.১১-২৪]*

□ কংসের কথা শুনে অক্রূর গোকুলে দ্রুত এসে পৌঁছালেন। কংসের পরিকল্পনার কথা তিনি কৃষ্ণ ও বলরামের কাছে ব্যক্ত করলেন। তাঁরা আনন্দের সঙ্গে পরদিনই প্রচুর উপহারসহ মথুরার উদ্দেশে রওনা হবেন বলে স্থির করলেন। ব্রজবাসীরা কংস-দূত অক্রূরকে তাঁর দৌত্যের জন্য অভিশাপ দিতে লাগলেন কিন্তু রাম-কৃষ্ণ প্রসন্নচিত্তেই তাঁর সঙ্গে মথুরার দিকে প্রস্থান করলেন। *[ভাগবত পু. ১০.৩৯.১-৫৭; হরিবংশ পু. ২.২৬.১-৭১]*

□ হরিবংশে বলা হয়েছে মথুরায় পৌঁছেই কৃষ্ণ-বলরাম অক্রূরের অনুমতি নিয়েই পরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন। সেখানে কংসের অস্ত্রশালায় প্রবেশ করে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও যে ধনুক তুলতে পারবেন

না—এমন একটি ধনুক অনায়াসেই ভেঙে ফেললেন কৃষ্ণ। কংস এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই বুঝলেন এই কাজ তাঁর মৃত্যুদূত সেই গোপবালকেরই কর্ম। ভাবা মাত্রই কংস তড়িঘড়ি উপস্থিত হলেন সেই প্রেক্ষাগৃহে, যেখানে মল্লযুদ্ধের আয়োজন করা হয়েছে। যুদ্ধের আয়োজনে যেন বিন্দুমাত্র খুঁত না থাকে, সে বিষয়ে কংস স্বয়ং প্রচুর আদেশ-উপদেশ দেন। এইখানে কংসকে খানিক কালতাড়িত চরিত্র বলে মনে হয়, যিনি নিজের মৃত্যুর প্রেক্ষাপট সযত্নে নিজের হাতেই রচনায় ব্যস্ত।

[হরিবংশ পু. ২.২৮.৩-১৬; ভাগবত পু. ১০.৪৩.১৫-৩০]

□ এরপর কংস তাঁর সবচেয়ে কৌশলী দুই মুষ্টিযোদ্ধা চাণূর ও মুষ্টিকের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁদের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে তাঁদের কৃষ্ণ ও বলরামকে মল্লভূমিতে বিনাশ করার আদেশ দেন কংস। তাঁদের বয়স বা যুদ্ধশিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতা কোনো কিছুই যেন এ বিষয়ে বাধা না হয়ে ওঠে—এই ছিল দুই মল্লযোদ্ধার প্রতি কংসের নির্দেশ। মথুরানগরীকে যেকোনো প্রকারে যাদব শূন্য করাই তখন কংসের একমাত্র লক্ষ্য। *[হরিবংশ পু. ২.২৮.১৭-৩৭]*

□ যথাসময়ে রঙ্গশালায় মল্লযুদ্ধ উপভোগ করতে সমবেত হলেন মথুরার অধিবাসীরা। রঙ্গশালার মধ্যভাগে কংসের জন্য বিশেষ অধিবেশন-স্থান নির্মাণ করা হয়েছিল। খানিক পরেই কুবলয়াপীড় নামে হাতিটিকে রঙ্গশালার দ্বারে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়ে মথুরাপতি কংস প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর পরনে বিশেষ পদ্ধতিতে নির্মিত শুভ বস্ত্র, মাথার উপর শুভ্রবর্ণ চামর এবং মাথায় শ্বেত বর্ণের মুকুট শোভা পাচ্ছে। কংস উপস্থিত হতেই সমবেত জনতা তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

মল্লযোদ্ধারা একে একে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করল। কৃষ্ণ ও বলরাম গোপালক বেশে সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁরা যখন দ্রুতবেগে রঙ্গশালার দ্বারে এসে পৌঁছোলেন, তখনই কংসের পরিকল্পনানুযায়ী মাহুত কুবলয়াপীড়কে নিয়ে তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়ালেন। মদমত্ত কুবলয়াপীড় তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ-বলরামকে হত্যা করার চেষ্টা করে। কংসের পরিকল্পনা অনুধাবন করে কৃষ্ণ স্মিতহাস্যে বলে উঠলেন—কংস মৃত্যুকে তরান্বিত করতে চেষ্টা করছেন। তারপর কৃষ্ণ একাই বিশলাকায় কুবলয়াপীড়কে হত্যা করেন। কৃষ্ণ-বলরামের বিক্রম দেখে এবং জনসাধারণের উল্লাসধ্বনি শুনে কংস ক্রমশ বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। *[হরিবংশ পু. ২.২৯.১-৪৩; ভাগবত পু. ১০.৪২.৩৩-৩৮; ১০.৪৩.১-১৬; বিষ্ণু পু. ৫.২০.২৪-২৭]*

□ কুবলয়াপীড়বধের পর কৃষ্ণ-বলরাম মূল মল্লভূমিতে প্রবেশ করলেন। সেখানে একে একে চাণূর, মুষ্টিক, কূট ও শল প্রভৃতি কংসের অনুচরেরা তাঁদের হাতে বিনাশ লাভ করলেন। অবশিষ্ট মল্লযোদ্ধারা মৃত্যুভয়ে রঙ্গভূমি ছেড়ে পালাল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় মথুরাপতি তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ-বলরামকে নগর থেকে বহিষ্কৃত করে নন্দগোপকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। বসুদেব এবং উগ্রসেনকেও সত্বর বধ করার আদেশ দেওয়া হল। কংস অহংকার প্রদর্শন করে বলে ওঠেন—গোপগণ অনুনয়ের পথ ছেড়ে বিপরীত পথে বিপদ সৃষ্টি করছে। সুতরাং এঁদের বিনাশ করাই শ্রেয়। কংসের এই অহংকারী ঘোষণা শুনে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ তীব্র বেগে তাঁর সিংহাসনের কাছে গিয়ে পৌঁছালেন। কংসের মনে হল যেন তিনি সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন। আত্মরক্ষার তাগিদে তিনিও অসি-চর্ম ধারণ করলেন। কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গেই কংসের চুলের মুঠি ধরে তাঁকে উচ্চ সিংহাসন থেকে মাটিতে ফেলে দিলেন। স্খলিত-মুকুট বিস্মিত কংসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন কৃষ্ণ। সমবেত জনগণের মধ্যে দিয়েই তিনি কংসের দেহ এগিয়ে নিয়ে চললেন। কঙ্ক, ন্যগ্রোধ প্রভৃতি কংসের অনুজরা একযোগে কৃষ্ণকে আক্রমণ করতে ছুটে এলেন। বলরাম সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের সকলকে হত্যা করলেন। এভাবেই কংস সকল অনুজসহ নিহত হলেন।

প্রায় বিনা প্রতিরোধে কংসের এই মৃত্যু খানিকটা অলৌকিক হয়ে ওঠে যেন। কিন্তু কংসের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কেউই কংসবধের সময় বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করেননি দেখেই বোঝা যায় যে, কংস এবং তাঁর কয়েকজন মুষ্টিমেয় অনুচর ছাড়া সকলেই বোধ হয় তাঁর বিনাশ কামনা করেছিলেন। কৃষ্ণকে বলা যায় কংস-বিরোধী গোষ্ঠীর সেই অধিনায়ক নেতা; তিনি এমনই এক

পরাক্রমশালী রাজনৈতিক শক্তি, যিনি কংসের মত দুরাত্মার হাত থেকে মথুরা তথা সমগ্র শূরসেন ভূমিকে উদ্ধার করেছিলেন। তবে কংসের দিক থেকে বিনা প্রতিরোধে অস্ত্রাঘাতহীন এই মৃত্যুকে হরিবংশ পুরাণে কংসের অ-বীরোচিত মৃত্যু বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ২.৬২.৭-৮; (হরি) ২.৫৯.৬-৮;
বিষ্ণু পু. ৫.২০.৫১-৭৮;
ভাগবত পু. ১০.৪৪.৩২-৩৮, ৪০-৪১;
হরিবংশ পু. ২.৩০.১-৮৭;
ব্রহ্ম পু. ১৯৩.১৮-১৯, ৬৮-৭৫]

□ কংসের মধ্যমভ্রাতার নাম সুনামা। ইনিও শূরসেন অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। কৃষ্ণ-বলরাম এই সুনামাকে যুদ্ধে বধ করেন।

[মহা (k) ৭.১১.৬-৭; (হরি) ৭.৯.৭-৮]

□ কংসবধের সঙ্গে সঙ্গেই এই দুরাচারী মথুরাপতির পাপমুক্তির লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভগবৎ-স্বরূপ কৃষ্ণকে শত্রুজ্ঞানে ভাবনা করার ফলে কংস তাঁর আহার-বিহার, কথালাপ, নিদ্রা-জাগরণ অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে কৃষ্ণর চিন্তা করতেন। তার অর্থ—কংস শত্রুজ্ঞানে আহার-পান, কথন, বিচরণ, নিদ্রা-জাগরণে নিরন্তর ভগবানের কথাই চিন্তা করতেন। ঈশ্বর চিন্তার এই নিরন্তরতার কারণেই কৃষ্ণের হাতে নিহত কংস মুক্তি লাভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কংসের পূর্বে রাবণ, হিরণ্যাক্ষ, কুম্ভকর্ণ ও হিরণ্যকশিপু এবং পরবর্তীকালে শিশুপাল ও দন্তবক্র ভগবানকে শত্রুজ্ঞানে নিরন্তর চিন্তা করার জন্যই মৃত্যুর পর মুক্তিলাভ করেছিলেন।

[ভাগবত পু. ৭.১.২৯; ১০,৪৪, ৬৯;
বিষ্ণু পু. ৫.২০.৬৯]

□ কংসবধের পর দেবতারা আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন। অন্যদিকে কংসপত্নীদের প্রবল শোকের মধ্যেও কংসের দুরাচারী স্বভাব এবং কৃষ্ণ-বাক্য অবজ্ঞা করার কথা তাঁদের মুখেই বারবার উচ্চারণ হতে দেখা যায়। কংসপত্নীদের বিলাপ থেকেও কংস সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানা যায়। যেমন—কংস একবার জরাসন্ধের সৈন্যদের পরাজিত করে বিমূঢ় করেছিলেন, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও কংসকে ধনুর্যুদ্ধে পরাজিত করতে পারেননি ইত্যাদি। নেহাত কালপ্রেরিত হয়ে ভগবান বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের কাছে কংসের বিনাশ ঘটেছে—এই হল তাঁদের অভিমত। লক্ষণীয়, এই বিলাপ যখন চলছে তখন আশেপাশে যদুবৃষ্ণি সংঘের কোনো সংঘমুখ্য, সৈন্য-সামন্ত কেউ উপস্থিত নেই। তাঁরা তখন সস্ত্রীক বসুদেব আর উগ্রসেন রাজাকে কারামুক্ত করে মথুরার রাজনৈতিক পালাবদল ত্বরান্বিত করতে ব্যস্ত। বসুদেবের ভবনে মথুরার রাজসিংহাসনে কাকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে—তা নিয়ে জরুরী বৈঠক চলছে কৃষ্ণ-বলরামকে কেন্দ্র করে। মথুরার দীর্ঘদিনের শাসকের দেহ পড়ে রয়েছে রঙ্গভূমিতে—একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায়। এই অবস্থায় যাঁকে আমরা রঙ্গালয়ে করতে দেখছি, তিনি কংসের মাতা, উগ্রসেনের পত্নী। একদিন দ্রুমিলের ধর্ষণের ফলে একেবারেই অবাঞ্ছিত এই পুত্রটিকে তিনি গর্ভে ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবু কংস তো তাঁর শরীর থেকেই জাত, কলঙ্কের ফলে জন্ম হলেও কংস তাঁর পুত্র। কংসের শবের সামনে বসে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন কংসের মাতা। মৃত পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করে কাতরস্বরে বিলাপ করে চলেছেন তিনি। কংসের জীবনের যাবতীয় দোষ-অপরাধের কথাও স্মরণ করেছেন এইসময়।

এমন সময়, প্রায় সম্পূর্ণ রাত্রি যখন কেটে গিয়েছে বিলাপ করতে করতেই তখন উগ্রসেন এসে উপস্থিত হয়েছেন রঙ্গভূমিতে। অত্যন্ত করুণ অবস্থা তাঁর এখন। বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভের পর, শত্রুর মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করা উচিত না পুত্রশোকে কাতর হওয়া উচিত—তাই স্থির করতে পারছেন না তিনি। কংস তাঁর ক্ষেত্রজ পুত্র, তবুও পুত্র তো বটেই। পুত্র হিসেবে স্বীকৃতি তিনি নিজেই কংসকে দিয়েছেন। ফলে পুত্রশোক আজ তাঁকেও গ্রাস করেছে। এদিকে কংসের মাতা কিন্তু উগ্রসেনের মানসিক অবস্থাটা বিচার করেননি। তিনি উগ্রসেনকে খানিকটা আঘাত করেই—সত্যিই তো, কৃষ্ণের হাতে কংসবধের যারা প্রত্যাশী ছিলেন উগ্রসেনও তো তাঁদের মধ্যে একজন—তাই একটু খোঁচা দিয়েই কংসের মা স্বামীকে বললেন—বীরপুরুষই রাজ্য ভোগ করে আমার ছেলেও না হয় তাই করেছে। কিন্তু আজ আমরা পরাজিত হয়েছি বলেই কি রাজা কংসের অন্ত্যেষ্টিটুকুও হবে না? তুমি না হয় সেই কৃষ্ণকেই গিয়ে বলো যে, যত শত্রুতা আছে মরণেই তা শেষ

হয়ে যায়। মৃত শত্রুরও তো অন্ত্যেষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয়। মৃতের কী অপরাধ আছে—মৃতঃ কিমপরাধ্যতে? অতএব যাও সেই কৃষ্ণের কাছে কংসের সৎকার হোক অন্তত—

গচ্ছ বিজ্ঞাপ্যতাং কৃষ্ণ কংস সৎকার কারণাৎ।

এই মুহূর্তে কিন্তু পিতা উগ্রসেনও শোকে ভেঙে পড়েছেন। এমনকী কৃষ্ণের কাছে কংসের সৎকারের অনুমতি প্রার্থনা করার সময়ে উগ্রসেন পুত্রের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন সকলের কাছে, পুত্রের প্রেতকার্য সম্পন্ন করে সপরিবারে বানপ্রস্থে যাবার সিদ্ধান্তও নিয়েছেন। অবশ্য যদু-বৃষ্ণি গোষ্ঠীর সংঘপ্রধানরা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে নিবৃত্ত করেছেন। তবু লক্ষণীয় যে, কংস একসময় নিজেই বলেছিলেন, তিনি পিতা-মাতার কাঙ্ক্ষিত সন্তান নন। দ্রুমিলের ঔরসজাত কংস ভোজ বংশের প্রধান উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। আজীবন পিতা-মাতার অবহেলা কংসের নিত্য প্রাপ্য ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পর পিতা-মাতার কাছে কাঙ্ক্ষিত নিম্নগামী স্নেহটুকু খানিক অলৌকিকভাবেই জুটেছে কংসের কপালে।

[ভাগবত পু. ১০.৪৪.৪৩-৫০; হরিবংশ পু. ২.৩১.১-৫৯; বিষ্ণু পু. ৫.২১.৭-১০]

□ কংসের মৃত্যুর পরপরই মথুরানগরীতে কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে যাদবদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কংস-বিরোধী বসুদেবকে সেখানে ভোজরাজের মৃত্যুর জন্য বিলাপও করতে দেখা যায়। কৃষ্ণও অনুতাপবাচক কথা বলে সমস্ত প্রজাকুল ও জ্ঞাতিদের ক্রমাগত সান্ত্বনা দিতে থাকেন। সে সময় উগ্রসেন সভায় উপস্থিত হয়ে সভয়ে কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন-কংসের পালিত প্রজা, সেনাবাহিনী, ধন, পার্ষদ ইত্যাদির অধিকার গ্রহণ করতে। কংসের বিনাশের পর কৃষ্ণই যাদবদের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন হয়ে উঠেছেন। বৃদ্ধ উগ্রসেন সেই মহাক্ষমতাশালী যাদববীরের কাছে মৃত সন্তানের শ্রাদ্ধকার্য করার অনুমতি চাইছেন। কৃষ্ণ কংসের জন্য রাজোচিত সৎকারকার্যের আয়োজন করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি বৃদ্ধ উগ্রসেনের হাতেই মথুরার শাসনভার তুলে দেন। প্রত্যর্পিত রাজমুকুট মাথায় পরে উগ্রসেন কংসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধান করেন। *[হরিবংশ পু. ২.৩২.১-৬৪]*

□ কংসবধের পর তাঁর পত্নী অস্তি, যিনি জরাসন্ধের কন্যাও বটে, পিতাকে কৃষ্ণ বিনাশে প্ররোচিত করেন। জরাসন্ধ যেকোনো সময় মথুরা আক্রমণ করতে পারেন—এমন আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় যাদবরা কৌশলে ধন-সম্পত্তি-পরিবার পরিজনসহ ধীরে ধীরে মথুরা ত্যাগ করেন। যাদবদের আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত করে অচিরেই তেইশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে জরাসন্ধ মথুরা অবরোধ করেন।

[মহা (k) ২.১৪.৪৬; (হরি) ২.১৪.৪৬; ভাগবত পু. ১০.৫০.১-৪]

□ কংস ব্যতীত জরাসন্ধের অপর অনুগতদের মধ্যে চেদিরাজ শিশুপাল একজন। সেক্ষেত্রে কংসবধের ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে কৌশলে প্রভাব বিস্তার করার যে স্বপ্ন মগধরাজ জরাসন্ধ দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন কৃষ্ণের কারণেই বিফল হয়েছে। এখন প্রভাবশালী জরাসন্ধ-অনুগামীদের মধ্যে অবশিষ্ট রইলেন একমাত্র শিশুপাল।

[মহা (k) ২.৪১.১১; (হরি) ২.৪০.১১]

□ মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বে বলা হয়েছে যে, কংস মৃত্যুর পর বিশ্বেদেবগণের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। সম্ভবত কৃষ্ণের হাতে মৃত্যুর ফলে কংসের মোক্ষলাভ বোঝাতেই স্বর্গলোকে তাঁর দেবত্বলাভের অবতারণা করা হয়েছে।

[মহা (k) ১৮.৫.১৬; (হরি) ১৮.৫.১৬]

কংস২ বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভজাত এক দানব। ইনি হিরণ্যকশিপুর ভাগিনেয়।

[পদ্ম পু. (আনন্দাশ্রম) সৃষ্টি ৬.৫৯]

□ কংস দানব চৈত্র ও বৈশাখ মাসে সূর্যের রথে অবস্থান করেন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৩.৩]*

কংসকর পর্বত এটি একটি পর্বত-তীর্থ। এই পর্বতটি অগ্নিমান পর্বতের সম্মুখে বরুণনামক কুণ্ডের তীরে অবস্থিত—

পুরস্তাদগ্নিমালস্য কুন্তকং বারুণাহ্বয়ম্।
তস্য তীরে গিরিশ্রেষ্ঠো নাম্না কংসকরঃ স্মৃতঃ॥

এখানে জল-দেবতা বরুণ নিত্য বর্তমান থাকেন। এই কংসকর পর্বতে বরুণদেবের পূজো এবং বরুণকুণ্ডে স্নান করলে বরুণলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

□ কংসকর পর্বতের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে আধুনিক ভৌগোলিকরা কোন মন্তব্য করেননি। তবে কালিকা পুরাণে বলা হয়েছে যে, লৌহিত্য

অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের তীরে এই পর্বতটি অবস্থিত এবং ধনপতি কুবের এখানে বাস করেন। অর্থাৎ কৈলাস, অলকাপুরী থেকেও কংসকর পর্বতের দূরত্ব খুব বেশী নয় বলেই মনে হয়। তাছাড়া 'কংসকর' নামটি থেকেও মনে হয় যে, এই স্থানটি ধাতব খনিজ দ্রব্যের আকর ছিল।

[কালিকা পু. ৭৯.১১-১৪]

কংসবতী *[দ্র. কংসাবতী]*

কংসা উগ্রসেনের কন্যা। ভাগবত পুরাণে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী, বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবভাগের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দেবভাগের ঔরসে তাঁর গর্ভে চিত্রকেতু এবং বৃহদ্বল নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। *[ভাগবত পু. ৯.২৪.২৫, ৪০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৩৪; মৎস্য পু. ৪৪.৭৫; বিষ্ণু পু. ৪.১৪.৫]*

কংসাবতী উগ্রসেনের কন্যা। কোনো কোনো পুরাণে তাঁকে কংসবতী নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবশ্রবার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দেবশ্রবার ঔরসে কংসাবতীর গর্ভে সুবীর এবং ইষুমান নামে দুই পুত্রসন্তান হয়। তবে একমাত্র ভাগবত পুরাণ ছাড়া অন্য কোনো পুরাণে কংসাবতীর বিবাহ বা সন্তানলাভের কথা বিশদে আলোচিত হয়নি। *[ভাগবত পু. ৯.২৪.২৫, ৪১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৩৪; মৎস্য পু. ৪৪.৭৫; বিষ্ণু পু. ৪.১৪.৫]*

ককুৎস্থ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। তবে রাজা হিসেবে ককুৎস্থ এতটাই বিখ্যাত ছিলেন যে, তাঁর পরবর্তী সময়ের ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজারা প্রায় সকলেই এমনকী ভগবান বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রও ককুৎস্থের উত্তরপুরুষ হিসেবে অসংখ্যবার কাকুৎস্থ নামে সম্বোধিত হয়েছেন।

তবে মহাকাব্য এবং পুরাণগুলিতে ককুৎস্থ রাজার জন্ম পরিচয় বিষয়ে পৃথক পৃথক তথ্য মেলে। রামায়ণ অনুসারে ককুৎস্থ ছিলেন ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ভগীরথের পুত্র এবং রঘুর পিতা। আবার মহাভারতে বর্ণিত কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা শশাদের পুত্র তথা অনেনার পিতা ছিলেন ককুৎস্থ। বেশিরভাগ পুরাণগুলিতেও এই মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। *[রামায়ণ ১.৭০.৩৯; মহা (k) ৩.২০২.২; (হরি) ৩.১৭২.২; বায়ু পু. ৮৮.২৪-২৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.২৫; বিষ্ণু পু. ৪.২.৯-১১]*

□ বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবত পুরাণ থেকে জানা যাচ্ছে যে, শশাদের পুত্রের জন্মকালীন নাম ককুৎস্থ ছিল না। তাঁর নাম ছিল পুরঞ্জয়। ত্রেতাযুগে একসময় দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। অসুররাজ আড়ীবকের পরাক্রমে দেবসেনা বার বার পরাজয়ের সম্মুখীন হতে লাগল। তখন দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। ভগবান বিষ্ণু তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বললেন—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজর্ষি শশাদের পুরঞ্জয় নামে এক পুত্র আছেন। আমি সেই পুরঞ্জয়ের দেহে অবস্থান করব, পুরঞ্জয়ের কারণেই তোমরা যুদ্ধে জয়লাভ করবে। নারায়ণের কথা শুনে দেবতারা ইক্ষ্বাকুবংশীয় পুরঞ্জয়ের কাছে গেলেন এবং দেবাসুর যুদ্ধে সহায়তা প্রার্থনা করলেন। পুরঞ্জয় তাঁদের বললেন—আমি যুদ্ধ করতেই পারি কিন্তু শর্ত এই যে, অন্য কোনো রথ বা বাহন নয়, শুধুমাত্র দেবরাজ ইন্দ্রের স্কন্ধে আরোহণ করেই আমি যুদ্ধযাত্রা করব। একথা শুনে দেবরাজ ইন্দ্র পুরঞ্জয়ের বাহন বৃষের রূপ ধারণ করলেন। সেই বৃষের ককুদে আরোহণ করে যুদ্ধযাত্রা করলেন পুরঞ্জয় রাজা। দেবতারাও অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। পুরঞ্জয় রাজা যুদ্ধযাত্রার সময়ে বৃষরূপধারী ইন্দ্রের ককুদে আরোহণ করেছিলেন বলে তাঁর নামই হয়ে গেল ককুৎস্থ—

যতশ্চ বৃষভককুৎস্থেন রাজ্ঞা
নিসূদিতমসুরবলম্ ততশ্চাসৌ
ককুৎস্থসংজ্ঞামবাপ।

[বিষ্ণু ৪.২.৯-১২; ভাগবত পু. ৯.৬.১১-২০]

□ মৎস্য পুরাণে ককুৎস্থের পরিচয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। মৎস্য পুরাণ মতে ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি। বিকুক্ষির পনেরো জন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ককুৎস্থ। ককুৎস্থের পুত্রের নাম মৎস্য পুরাণ মতে সুযোধন।

[মৎস্য পু. ১২.২০]

ককুদ যদু-বৃষ্ণি বংশীয় সত্যকের পুত্র। সত্যকের ঔরসে জনৈকা কাশীরাজকন্যার গর্ভে যে কয়টি পুত্রসন্তানের জন্ম হয় তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ককুদ। বৃষ্টি নামে তাঁর এক পুত্রসন্তান হয়।

[বায়ু পু. ৯৬.১১৫-১১৬]

□ তবে বায়ু পুরাণে প্রাপ্ত এই পাঠের যাথার্থ্য বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। বায়ু পুরাণে প্রাপ্ত পাঠ

অনুসারে ককুদের অন্য তিন ভাই ছিলেন—ভজমান, শমী এবং কম্বলবর্হিঃ। বেশিরভাগ পুরাণ মতে এই তিনজনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন কুকুর। যাঁর নামে যদু-বৃষ্ণি বংশের একটি ধারা কুকুরবংশ নামে খ্যাত হয়। এই চারভাই বৃষ্ণি বংশীয় অন্ধকের পুত্র—বেশিরভাগ পুরাণে এঁদের এই পরিচয় ধৃত হয়েছে। ফলে বায়ু পুরাণে প্রাপ্ত পাঠটি ভ্রান্ত কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

[দ্র. কুকুর]

ককুদা দক্ষপ্রজাপতির ঔরসে বীরিণীর গর্ভে যে ষাটটি কন্যাসন্তানের জন্ম হয়, ককুদা তাঁদের মধ্যে একজন। ককুদার পুত্রের নাম শকট।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ১৪.১১-১৩]

ককুদি ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে দক্ষপুত্র মেরুসাবর্ণি বা রোহিত মনুর কালে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন মরীচি বা মরীচিগর্ভ তার মধ্যে অন্যতম প্রধান গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ককুদি।

[বায়ু পু. ১০০.৬২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৫৮]

ককুদ্মান পর্বত শাল্মলদ্বীপের সাতটি বর্ষ পর্বতের সপ্তম পর্বতটি হল ককুদ্মান পর্বত।

[গরুড় পু. ১.৫৬.৬]

ককুদ্মী কুশস্থলী নগরের অধিপতি রেবতের পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ককুদ্মী। রেবতের পুত্র বলে তিনি রৈবত ককুদ্মী নামেও খ্যাত।

[দ্র. রৈবত ককুদ্মী]

ককুপাদ পাতালের দ্বিতীয়তল বা সুতলে বসবাসকারী একজন দৈত্য। বায়ু পুরাণে ইনি কুকুপাদ নামেও চিহ্নিত হয়েছেন।

[বায়ু পু. ৫০.২২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.২৩]

ককুভ১ ভাগবত পুরাণে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী ভারতবর্ষে অবস্থিত অন্যতম পর্বত। তবে এই পর্বতের আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য কোনো কোনো পণ্ডিত এই পর্বতকে বর্তমান উড়িষ্যায় অবস্থিত বলে উল্লেখ করেছেন।

[ভাগবত পু. ৯.১৯.১৬; John Gorrett, A Classical Dictionary of India, Madras: Higginbotham and Co. 1871; p. 299]

ককুভ২ শিব-মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। 'ক' শব্দের অর্থ হতে পারে সুখ বা আনন্দ। যিনি আনন্দ দান করেন, বা আনন্দ বিস্তার করেন, তিনিই ককুভ। মহাদেব স্বয়ং সমস্ত সুখের উৎস, মূর্তিমান আনন্দস্বরূপ, তাঁর উপস্থিতির কারণেই এই জগত সংসার আনন্দময় হয়ে ওঠে। শতসহস্র বৎসরের তপস্যার ফলে তাঁর ভক্তরা তাঁকে অন্তরে লাভ করেন এবং সেই ভক্তহৃদয়েও তিনি জ্ঞানরূপে, আনন্দরূপে বিরাজ করেন—এই অর্থে ককুভ মহাদেবের অন্যতম নাম।

'ক' শব্দের অন্য একটি অর্থ হল বায়ু। বায়ু যে পথে বিস্তার লাভ করে—এই অর্থে পণ্ডিতরা ককুভ শব্দের অর্থ করেছেন দিক্।

[অমরকোশ ১. (দিগ্‌বর্গ) ১]

তিনি সর্বব্যাপী, দশ দিকের প্রতিটি কোণেই তিনি বিরাজমান—এই অর্থেও মহাদেব ককুভ নামে খ্যাত—

ককুভঃ সর্বদিগ্‌রূপঃ।

[মহা (k) ১৩.১৭.১৩২; (হরি) ১৩.১৬.১৩১ (নীলকণ্ঠ কৃতটীকা)]

কক্ষ পদ্মপুরাণে উল্লিখিত ভারতবর্ষের একটি জনপদের নাম কক্ষ। সম্ভবত 'কচ্ছ' শব্দের পাঠান্তর। *[পদ্ম পু. (নবভারত) স্বর্গ. ৩.৪৫; পদ্ম পু. (আনন্দাশ্রম স্বর্গ ৬.৪৪]*

কক্ষক জনমেজয়ের সর্পসত্রে নাগরাজ বাসুকির বংশজাত যেসব নাগ ভস্মীভূত হয়েছিলেন, কক্ষক তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.৫৭.৬; (হরি) ১.৫২.৬]

কক্ষসেন১ পুরুবংশের প্রাচীন রাজা পরীক্ষিৎ (ইনি বিখ্যাত পুরুবংশীয় রাজা প্রথম পারীক্ষিত জনমেজয়ের পিতাও বটে)। রাজা পরীক্ষিতের পুত্রদের মধ্যে কক্ষসেন একজন। কক্ষসেন পুরুবংশীয় প্রাচীন রাজর্ষি জনমেজয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। *[মহা (k) ১.৯৪.৫৪; (হরি) ১.৮৯.৪৩]*

কক্ষসেন২ মহাভারতের সভাপর্বে আমরা কক্ষসেন নামে জনৈক প্রাচীন রাজর্ষির নামোল্লেখ পাই যিনি মৃত্যুর পর যমসভায় বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন। অনুশাসনপর্বে যে সব প্রাতঃস্মরণীয় রাজর্ষির নামকীর্তন করা হয়েছে কক্ষসেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে রাজর্ষি কক্ষসেনের কীর্তির কথা ছড়িয়ে আছে। অনুশাসনপর্বের একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, রাজর্ষি কক্ষসেন ঋষি বশিষ্ঠকে সর্বস্ব দান করে সেই দানের পুণ্যফলেই

স্বর্গলোক লাভ করেন। আশ্বমেধিক পর্বেও কক্ষসেনের দানধর্মের উল্লেখ পাই।

[মহা (k) ২.৮.১৮; ১৩.১৬৫.৫৯; ১৩.১৩৭.১৫; ১৪.৯১.৩৫; (হরি) ২.৮.১৮; ১৩.১৪৩.৫৬; ১৩.১১৫.১৫; ১৪.১১৪.৩৩]

কক্ষসেন৩ মহাভারতের বনপর্বে জনৈক কক্ষসেন মুনির উল্লেখ পাই। পশ্চিমে অসিত নামক পর্বত শীর্ষে তাঁর পবিত্র আশ্রম অবস্থিত ছিল।

[মহা (k) ৩.৮৯.১২; (হরি) ৩.৭৪.১২]

কক্ষসেন৪ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক জনৈক রাজা। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সভায় তাঁর উপস্থিতির উল্লেখ আছে।

[মহা (k) ২.৪.২২; (হরি) ২.৪.১০নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র. খণ্ড ৫; পৃ. ২৬]

কক্ষেয়ু পুরুর তৃতীয় পুত্র রৌদ্রাশ্বের ঔরসে অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কক্ষেয়ু একজন। [মহা (k) ১.৯৪.১০; (হরি) ১.৮১.১০]

□ মহাভারতের অনুশাসন পর্বে যেসব প্রাতঃস্মরণীয় রাজাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কক্ষেয়ু তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ১৩.১৬৫.৫৬; (হরি) ১৩.১৪৩.৫৪]

□ বায়ু পুরাণ মতে পুরুর বংশধারায় সংযাতির পুত্র রৌদ্রাশ্বের ঔরসে অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কক্ষেয়ু একজন।

[বায়ু পু. ৯৯.১২৪]

□ বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে পুরুর বংশধারায় অহংযাতি-র পুত্র রৌদ্রাশ্ব। রৌদ্রাশ্বের পুত্র কক্ষেয়ু। [বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১]

□ মৎস্য পুরাণে অবশ্য ভিন্ন মত পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে, পুরুর বংশধারায় ভদ্রাশ্বের ঔরসে ধৃতা নামে একজন অপ্সরার গর্ভজাত পুত্র কক্ষেয়ু। [মৎস্য পু. ৪৯.৫]

বিভিন্ন পুরাণের বিভিন্ন উল্লেখ একত্র করলে এই তথ্য কক্ষেয়ুর সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয় যে, মিশ্রকেশীই হোন অথবা ঘৃতাচী, তিনি কোনো একজন অপ্সরার গর্ভেই জন্মেছেন এবং তিনি পুরুবংশের পরম্পরাতেই জন্মেছিলেন।

কঙ্ক১ জনৈক প্রাচীন রাজর্ষি। মহাভারতের আদিপর্বের সূচনায় সঞ্জয় পুত্রশোকার্ত ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বহু প্রাচীন রাজর্ষির নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করার পর কালের নিয়মে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গেই রাজর্ষি কঙ্কের নামও উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.১.২৩৩; (হরি) ১.১.১৯৪]

কঙ্ক২ মহাভারতে বৃষ্ণিবংশীয় জনৈক মহারথী কঙ্কের নাম আছে। মহাভারতের সভাপর্বে বৃষ্ণিবংশীয় সাত বিশিষ্ট মহারথীর মধ্যে কঙ্কের নাম উল্লিখিত হয়েছে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতেও তাঁকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে আমরা তাঁকে উপস্থিত থাকতে দেখি।

[মহা (k) ১.১৮৬.১৯; ২.১৪.৫৯; ২.৩৪.১৫; (হরি) ১.১৭৯.১৯; ২.১৪.৫৭; ২.৩৩.১৫]

□ মহাভারতে এই বৃষ্ণিবংশীয় মহারথী কঙ্কের পিতৃপরিচয় উল্লিখিত না হলেও পুরাণের বিবরণ থেকে তা উদ্ধার করা যায়। ভাগবত পুরাণে বৃষ্ণিবংশীয় শূরের পুত্র হিসেবে জনৈক কঙ্কের নাম উল্লিখিত হয়েছে। ইনি বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কঙ্কের পত্নীর নাম ছিল কর্ণিকা। কঙ্কের ঔরসে কর্ণিকার গর্ভে ঋতধামা ও জয় নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.২৭-২৯, ৪৪]

কঙ্ক৩ বনবাসের শেষে পাণ্ডবরা যখন অজ্ঞাতবাসের পরিকল্পনা করতে লাগলেন, তখন অজ্ঞাতবাসের উপযুক্ত স্থান হিসেবে তাঁরা মৎস্যরাজ বিরাটের রাজ্যটাকেই আশ্রয় হিসেবে নির্বাচন করলেন। এইসময় যুধিষ্ঠির বললেন—আমি কঙ্ক নামক ব্রাহ্মণ সেজে বিরাট রাজার সভাসদ হব। আমি দ্যূতক্রীড়া পছন্দ করি, বিরাটরাজাও দ্যূতপ্রিয়। ফলে আমি রাজাকে উপযুক্ত অনুচর ও সভাসদ হিসেবে সন্তুষ্ট রাখতে পারব—

সভাস্তারো ভবিষ্যামি তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
কঙ্কো নাম দ্বিজো ভূত্বা মতাক্ষঃ প্রিয়দেবিনঃ॥

[মহা (k) ৪.১.২২-২৬; (হরি) ৪.১.২২-২৬]

□ সেই মতো যুধিষ্ঠির পাশা হাতে বিরাট রাজার সভায় উপস্থিত হলেন। বিরাটরাজের কাছে যুধিষ্ঠির নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন—আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, আমার নাম কঙ্ক, আগে আমি ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা যুধিষ্ঠিরের সখা ছিলাম, এখন নিরাশ্রয় হয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য আপনার আশ্রয়ে এসেছি। আমি দ্যূতক্রীড়ায় নিপুণ, এটাই আমার প্রধান বিশেষত্ব।

দ্যূতপ্রিয় রাজা বিরাট যুধিষ্ঠিরের আকৃতি ও আচরণে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়েছিলেন,

যুধিষ্ঠিরের পরিচয় পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে সাদরে তাঁকে আশ্রয় দিলেন। অজ্ঞাতবাসের এক বছর বিরাটরাজের রাজধানীতে যুধিষ্ঠির কঙ্ক নামেই পরিচিত ছিলেন। *[দ্র. যুধিষ্ঠির]*

[মহা (k) ৪.৭. অধ্যায়; (হরি) ৪.৬ অধ্যায়]

কঙ্ক$_{৪}$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা ক্রোধবশার গর্ভজাত কন্যা ছিলেন সুরসা। এই সুরসার গর্ভে কঙ্ক পক্ষীদের জন্ম হয় বলে মহাভারতে উল্লেখ আছে। কঙ্ক পক্ষী বলতে আভিধানিক অর্থে বক বা সারস জাতীয় পাখি বোঝায় (heron)।

[মহা (k) ১.৬৬.৬৯; (হরি) ১.৬১.৭৩]

কঙ্ক$_{৫}$ উগ্রসেনের অন্যতম পুত্র, কংসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কংসবধের পর কঙ্ক প্রভৃতি কংসের ভাইরা ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য কৃষ্ণ এবং বলরামকে আক্রমণ করেন। এই সময় বলরামের হাতে কঙ্কের মৃত্যু হয়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৩৩; ভাগবত পু. ৪.২৪.২৪; ১০.৪৪.৪০-৪১]

কঙ্ক$_{৬}$ পৌরাণিক শাল্মলী দ্বীপে অবস্থিত একটি পর্বত। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৯.৩৯; গরুড় পু. ১.৫৬.৬; বায়ু পু. ৪২.৫০; ৪৯.৩৬; বিষ্ণু পু. ২.৪.২৭]*

কঙ্ক$_{৭}$ পৌরাণিক কুশদ্বীপের অন্তর্গত একটি পর্বত।

[মৎস্য পু. ১২২.৫৭]

কঙ্ক$_{৮}$ জনৈক ঋষি। গয়াসুরের দেহের উপর ব্রহ্মা যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন কঙ্ক। *[বায়ু পু. ১০৬.৩৬]*

কঙ্ক$_{৯}$ বায়ু পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, পঞ্চম দ্বাপরে যখন মহর্ষি সবিতা ব্যাস হবেন, সেই সময় ভগবান শিব কঙ্ক নামে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন। তাঁর চারটি ধর্মাত্মা পুত্র হবে। এঁদের নাম—সন (সনক), সনন্দন, ঋভু এবং সনৎকুমার। *[বায়ু পু. ২৩.১২৯]*

কঙ্ক$_{১০}$ পক্ষীরাজ সম্পাতির বংশধারায় প্রলোলুপের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন কঙ্ক। একবার কঙ্ক কৈলাস পর্বতে গিয়েছিলেন। সেখানে কুবেরের অনুচর বিদ্যুৎরূপ নামক রাক্ষস পত্নীর সঙ্গে বিহার করছিলেন। কঙ্ককে দেখে সেই মত্ত রাক্ষস ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে কৈলাস ছেড়ে চলে যেতে বললেন। কিন্তু পর্বত তো কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, যে কেউ যখন খুশি সেখানে যেতে আসতে পারে—এই যুক্তিতে কঙ্ক কৈলাস ছেড়ে যেতে রাজি হলেন না। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বিদ্যুৎরূপ কঙ্ককে হত্যা করেন। *[মার্কণ্ডেয় পু. ২.৩-৯]*

কঙ্ক$_{১১}$ মহাভারত এবং পুরাণে কঙ্ক নামে একটি জনপদ তথা জনজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের সভাপর্ব থেকে জানা যায় যে, কঙ্কদেশের অধিবাসীরা উপঢৌকন নিয়ে যুধিষ্ঠরের রাজসূয় যজ্ঞে এসেছিলেন। মহাভারতে চীন, শক এবং অন্যান্য পার্বত্য জনজাতির সঙ্গে কঙ্কদের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে চীন, শবর, কঙ্ক প্রভৃতি জাতিকে বর্বর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সম্ভবত সেই কারণেই সভাপর্বে দেখা যাচ্ছে যে, এরা উপঢৌকন নিয়ে রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হলেও রাজপ্রাসাদে এদের প্রবেশাধিকার ছিল না—

বলিমাদায় বিবিধং দ্বারি তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ।

[মহা (k) ২.৫১.৩০; ১২.৬৫.১৩; (হরি) ২.৪৯.২৭; ১২.৬৩.১৩]

□ পুরাণে উল্লেখ আছে যে, চন্দ্রবংশীয় রাজা ভরত দৌষ্যন্তি এই কঙ্কদের পরাজিত করেছিলেন। *[ভাগবত পু. ৯.২০.৩০]*

□ চৈনিক ঐতিহাসিক Chang Kein এর মন্তব্য উদ্ধার করে পণ্ডিত Moti Chandra বলেছেন যে, মধ্য এশিয়ার ফরঘানার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত Sogdiana (সমরখন্দ)। অঞ্চলে এই প্রাচীন কঙ্ক উপজাতির বাস ছিল। চীনারা এই জাতিটিকে Kangku নামে চিহ্নিত করেন। কঙ্কদের বাসস্থানের ঘন ঘন পরিবর্তন থেকে মনে হয় যে, এরা যাযাবর জাতি ছিল। পণ্ডিত Chang Kein-এর মতে মধ্য এশিয়ায় এরা কুষাণদের পূর্বপুরুষ Yue chi জাতির রাজনৈতিক প্রভাবাধীন ছিল। পরবর্তী সময়ে এরা ক্রমশ ভারতবর্ষের মধ্যে বসতি বিস্তার করতে থাকে। বর্তমান পঞ্জাবে শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী জাটদের মধ্যে Kang নামে একটি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব এখনও বর্তমান। এরা নিজেদের আদি বাসস্থান হিসেবে উল্লেখ করে মধ্য প্রাচ্যের গজনীর নাম। ফলে মনে হয় সমরখন্দ অঞ্চল থেকে এই কঙ্ক উপজাতির লোকেরা সরতে সরতে ক্রমশ পঞ্জাবের সমভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

[GESMUP (Moti Chandra) P. 20, 23, 71-72; TIM (Mishra), P. 87]

কঙ্কণ দ্বাপর যুগের শেষপ্রান্তে ভগবান শিব স্বয়ং মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হন এবং ধর্মোপদেশ বিতরণের মাধ্যমে কলিযুগের কুপ্রভাব থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। স্কন্দ পুরাণে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী, শ্বেতকল্পে দ্বাপর যুগের শেষপ্রান্তে ভগবান শিব যে যোগী রূপে মর্ত্যে আবির্ভূত হবেন, তাঁর সেই যোগী-রূপ কঙ্কণ নামে খ্যাত হবে।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৪০.২১১-২১২,২১৭]

কঙ্কণা স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.১৬; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র. শ্লোক সংখ্যা ১৬ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮-)]

কঙ্কমুদ্গ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে যে সব শ্রুতর্ষিদের নাম উল্লিখিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.১০]

কঙ্কা উগ্রসেনের কন্যা। ভাগবত পুরাণে বর্ণিত আছে যে, বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনকের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং তাঁর গর্ভে সত্যজিৎ এবং পুরুজিৎ নামে দুই পুত্র হয়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৩৪; মৎস্য পু. ৪৪.৭৬; ভাগবত পু. ৯.২৪.২৫, ৪১]

কঙ্কাদ্রিতীর্থ কঙ্কাদ্রিতীর্থে ভগবান হরি নিত্য বিরাজমান, ব্রহ্মা ও কেশব মোক্ষলাভের জন্য এই তীর্থে উপাসনা করেন।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/অরুণাচল) ২.৫১]

কঙ্কুকর্ণী অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর-বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। কঙ্কুকর্ণী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ১৭৯.৩১]

কচ দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র। মহর্ষি অঙ্গিরার তিনি পৌত্র এবং নিজেও যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী ছিলেন। মহাভারতে এবং প্রধানত মৎস্যপুরাণে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছ থেঁকে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষার জন দেবতাদের প্রয়াস এবং সেই উপলক্ষে বৃহস্পতিপুত্র কচের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

এই তিন ভুবনের আধিপত্য কার হাতে থাকবে—এই নিয়ে দেবতা এবং অসুরদের বিবাদ চিরকালের। প্রায়ই তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ লাগত। অসুররা অনেক সময়েই বাহুবলে বলীয়ান হয়ে দেবতাদের পরাস্ত করে স্বর্গরাজ্য অধিকার করার চেষ্টা করতেন। পৌরাণিক ভাবনায় এই চিরশত্রু দেবতা আর অসুররা পরস্পরের বৈমাত্রেয় ভাইও বটে। উভয়েই প্রজাপতি কশ্যপের সন্তান, শুধু এঁদের মা আলাদা। সম্ভবত সেই জন্যই ঐশ্বর্য্য সম্পদ আর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য এঁদের বিবাদও চিরকালীন—

ঐশ্বর্য্যং প্রতি সংঘর্ষস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।

যাই হোক, দেবতাদের পুরোহিত তথা রাজনীতির পরামর্শদাতা ছিলেন আঙ্গিরস বৃহস্পতি, আর অসুরদের পুরোহিত, আচার্য তথা মন্ত্রণাদাতা ছিলেন ভার্গব শুক্রাচার্য। একসময় শুক্রাচার্য স্বয়ং ভগবান শিবকে তপস্যায় তুষ্ট করে সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করলেন। সঞ্জীবনী বিদ্যা—অর্থাৎ যে বিদ্যার প্রভাবে মৃত ব্যক্তিকে আবারও জীবনদান করা যায়। শুক্রাচার্য দৈত্যগুরু, ফলে এই অসাধারণ বিদ্যার সুফল পুরোমাত্রায় পেতে লাগলেন অসুররাই। দেবতা আর অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ লাগলে দেবতারা যেসব অসুরদের বধ করতেন, শুক্রাচার্য নিজের এই বিদ্যার প্রভাবে সেই মৃত অসুরদের বাঁচিয়ে তুলতেন। তারা আবার জীবিত, সুস্থ হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। অন্যদিকে অসুররা দেবতাদের যেসব সৈন্যদের বধ করতেন, দেবতাদের পক্ষে তাঁদের আবার বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব ছিল না। কারণ দেবগুরু বৃহস্পতির এই সঞ্জীবনী বিদ্যা জানা ছিল না—

অসুরাস্তু নিজঘ্নুর্যান্ সুরান্ সমরমূর্দ্ধনি।
ন তান্ সঞ্জীবয়ামাস বৃহস্পতিরুদারধীঃ।।
ন হি বেদ স তাং বিদ্যাং যাং কাব্যো বেত্তি বীর্য্যবান্।
সঞ্জীবনী ততো দেবা বিষাদমগমন্ পরম্।।

দেবতারা বুঝলেন মহাবিপদ। এরকম চলতে থাকলে দেবতাদের সৈন্য ক্রমশ ক্ষয় পেতে থাকবে, আর অসুররা ক্রমে ক্রমে অজেয় হয়ে উঠবেন। এ অবস্থায় এমন একজন লোক চাই যে শুক্রাচার্যের কাছ থেকে সেই সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখে আসতে পারবে। অনেক ভেবেচিন্তে দেবতারা বৃহস্পতির পুত্র কচের শরণাপন্ন হলেন। দেবতারা কচের কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন—'গুরুপুত্র! আমরা সদা-সর্বদাই আপনাদের সেবা করার চেষ্টা করি। কাজেই সেই কথা ভেবে আপনিও যদি আমাদের একটা উপকার করে দেন।' কচ শোনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতেই দেবতারা বললেন—

দৈত্যগুরু শুক্র সঞ্জীবনী বিদ্যা জানেন। এই বিদ্যাবলে তিনি বার বার অসুর-দানবদের বাঁচিয়ে তোলেন, কিন্তু দৈত্য-দানব ছাড়া আর কাউকে তিনি বাঁচান না—

রক্ষতে দানবাংস্তত্র ন স রক্ষত্যদানবান্।

আপনাকে এই বিদ্যা শিখে আসতে হবে শুক্রাচার্যের কাছ থেকে। তারপর যদি যুদ্ধ জিতি, তাহলে যুদ্ধজিত দ্রব্যের ভাগও আপনাকে দেব—

শুক্রে তামাহর ক্ষিপ্রং ভাগভাঙ্ নো ভবিষ্যসি।

দেবতারা কচকে বললেন—অসুরদের রাজা বৃষপর্বার রাজ্যেই পাবেন শুক্রাচার্যকে। আপনার বয়স কম, তাই আপনি তাঁকে সম্যক আরাধনা করলে আপনাকে তিনি এই বিদ্যা শেখাতে পারেন—

তমারাধয়িতুং শক্তো ভবান্ পূর্ববয়াঃ কবিম্।

বৃহস্পতির ছেলে কচের বয়স কম, প্রথম তারুণ্যের ঔজ্জ্বল্য তাঁর সারা শরীরে দীপ্যমান। এই বয়সে যেমন বিদ্যাশিক্ষার অধিকার ক্ষিপ্র হয়, তেমনই এই বয়সের আরও যেসব সুবিধা আছে, সে কথাও আকারে-ইঙ্গিতে জানাতে ভুললেন না দেবতারা। তাঁরা কচকে বললেন—শুক্রাচার্যের একটি কন্যা আছে। তাঁর নাম দেবযানী। শুক্রাচার্য তাঁকে বড়োই ভালোবাসেন। সেই কন্যাটিকে আপনি যে-ভাবে তুষ্ট করতে পারবেন, অন্য কেউ তা পারবে না—

ত্বমারাধয়িতুং শক্তো নান্যঃ কশ্চন বিদ্যতে।

আপনার স্বাভাবিক ঔদার্য্য এবং কোমলতার গুণে সেই দেবযানীকে যদি একবার তুষ্ট করতে পারেন, তাহলে শুক্রাচার্যের কাছ থেকে সঞ্জীবনী-বিদ্যা লাভের কোনো অসুবিধেই হবে না আপনার—

দেবযান্যাং হি তুষ্টায়াং বিদ্যাং তাং প্রাপ্সসি ধ্রুবম্।

দেবযানীকে তুষ্ট করার জন্য যে-সব গুণের কথা দেবতারা বলেছিলেন, তার মধ্যে উত্তম স্বভাব, উদারতা, কোমলতা যেমন ছিল, তেমনই আরও দুটি গুণের কথাও অত্যন্ত অর্থপূর্ণভাবে ইঙ্গিত করেছিলেন দেবতারা—আচার এবং সংযম। প্রথমোক্ত গুণগুলি যদি দেবযানীকে তুষ্ট করার কাজে লাগে, তাহলে আচার এবং সংযমের কথাটা বৃথা। কিন্তু দেবতাদের উদ্দেশ্য আরও গভীরে। অর্থাৎ তরুণ বয়সের মাধুর্য্য-ওজঃ প্রসাদ গুণে যেমন দেবযানী তুষ্ট হবেন (এবং তিনি তুষ্ট হলেই শুক্রাচার্যের বিদ্যা সংক্রমিত হবে), তেমনই ইন্দ্রিয় সংযম এবং আচার রক্ষিত না হলে বৃহস্পতি পুত্র কচ যদি চিরকালের মতো দেবযানীর প্রেমবশীভূত হন, তাহলে শুক্রাচার্যের আয়ত্ত মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা হয় দেবতাদের কাছে আসবে না, নয়তো আসতে দেরি হবে। অতএব কচকে বড়ো বুদ্ধি করে চলতে হবে।

দেবতাদের অনুরোধ, তাঁদের আশা এবং উদ্দেশ্যের কথা সব বুঝে কচ খুব শীঘ্রই উপস্থিত হলেন অসুররাজ বৃষপর্বার রাজ্যে, যেখানে শুক্রাচার্য আছেন, আছেন দেবযানী। কচ শুক্রাচার্যের সামনে দাঁড়িয়ে সুনম্র ভাষায় পরিচয় দিয়ে বললেন—আমি মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র, দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র। আমার নাম কচ, দয়া করে আপনার শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করুন আমাকে—

নাম্না কচ ইতি খ্যাতং শিষ্যং গৃহ্নাতু মাং ভবান্।

কচ শুক্রাচার্যকে জানালেন যে, তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য ইন্দ্রিয়-মন সংযত করে যত বছর ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হয় তাও তিনি করবেন। হয়তো ইঙ্গিতটা এই যে, শিষ্যত্ব গ্রহণ করে একেবারে ঘরে থাকার সুবাদে তাঁর সুন্দরী কন্যাটির দিকে তিনি হাত বাড়াবার চেষ্টা করবেন না।

সেকালের দিনে বিদ্বান মানুষরা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শত্রুতা বা মিত্রতার বিচার তেমন করতেন না। শত্রুপক্ষের গুরুও উপযুক্ত ছাত্রকে যথোপযুক্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করতেন না। শুধু তাই নয়, হাজার শত্রুতা থাকলেও শত্রু-গুরুর বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধেও এঁরা ছিলেন অসম্ভব শ্রদ্ধাশীল। সেই পরিশীলনের জায়গা থেকেই দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য দেবগুরুর পুত্র কচকে সানন্দে শিষ্য রূপে গ্রহণ করলেন। শুক্রাচার্য বললেন—তোমার প্রার্থনা আমি মেনে নিলাম কচ। তুমি মহামতি বৃহস্পতির পুত্র এবং সেই কারণেই আমার কাছে তুমি কম সম্মাননীয় নও। তাছাড়া তোমাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করলে বৃহস্পতিও তুষ্ট হবেন আশা করি। তাই তোমাকে আমি শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করলাম—

অর্চয়িষ্যে' হমর্চ্যং ত্বাম্ অর্চিতো'স্তু বৃহস্পতিঃ।

শুক্রাচার্যের সানন্দে অভিনন্দনে তৃপ্ত হয়ে কচ

আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে লাগলেন। কচ আগেও শুনেছিলেন এবং এখন দুদিন গুরুগৃহে থেকে আরও বুঝতে পারলেন যে, শুক্রাচার্য মাতৃহীনা কন্যাটিকে বড়ো ভালোবাসেন এবং যেভাবেই হোক দেবযানী তুষ্ট হলেই তিনি পরম তুষ্টি লাভ করেন। কচ এই সুযোগ ছাড়লেন না, দেবকার্য সাধনের জন্য সঞ্জীবনী মন্ত্র তাঁকে শিখতেই হবে। গুরুকে তুষ্ট করে।

দেবযানী যুবতী এবং সুন্দরী। স্বভাবে তিনি একটু আমোদী বটে। নাচ-গান-বাজনা, এ-সব আমোদ তাঁর ভালো লাগে। কচ এই ভালোলাগার সন্ধানটুকু জেনে প্রতিদিন দেবযানীকে গান শোনাতেন, কোনো দিন বা দেখাতেন নন্দনবনের মুক্তাঙ্গনে শিখে আসা স্বর্গীয় নৃত্য—

গায়ন্ নৃত্যন্ বাদয়ংশ্চ দেবযানীমতোষয়ৎ।

নিশ্চিন্ত অবসরে তিনি দেবযানীর জন্য ফুল তুলে আনতেন, নিয়ে আসতেন গাছের ফল। তাছাড়া দেবযানী যখন যা বলবেন, তা করবার জন্য যেন উন্মুখ হয়ে আছেন কচ। সব কাজ তাঁকে বলতেও হয় না, ইঙ্গিতেই বুঝে নেন। কচকে এমন অভ্যাস হয়ে গেল দেবযানীর যে তাঁকে ছাড়া এক মুহূর্তও তাঁর চলে না। অসুরগুরুর কন্যা বলে দেবযানীর গর্ব-অভিমান ভালোই ছিল। দেশের রাজা বৃষপর্বার মেয়েকেও তিনি তেমন আমল দেন না। সেই দেবযানী কচের ঐকান্তিক সেবা-ব্যবহারে এতটাই তুষ্ট হয়েছেন যে, তিনি নিজে তাঁর অভিমান-মঞ্চ থেকে নীচে নেমে এসে কচকেও যেন সন্তুষ্ট করতে চান আপন মাধুর্য্যের প্রলেপন দিয়ে।

দেবযানীর শত-তোষণ বিধান ছাড়াও কচের তো কাজ আরও আছে। তাঁর তো গুরুসেবাও আছে। আছে গুরুর কাছে শিক্ষা নেবার কাজ, আছে ব্রহ্মচর্যের নিয়ম-ব্রত। এত সব করেও দ্বিপ্রহরের আগেই তাঁকে গোষ্ঠে যেতে হয় শুক্রাচার্যের গোরুগুলি চরিয়ে আনার জন্য। কচের এই পরিব্যাপ্ত কর্মরাশির মধ্যে দেবযানী অপেক্ষা করে থাকেন তাঁর জন্য। সূর্য-ডোবা সন্ধ্যায় কোনো দিন কচের সঙ্গ পেলে দেবযানীও গান শোনান তাঁকে। পিতার শিষ্যকে পরিচর্যা করার উপায় থাকে না গুরুপুত্রীর। কিন্তু অতি-অভিমানিনী রমণীও যখন প্রেমে পড়ে, তখন প্রেয়্যজনের মতো সেবা না করতে পারলেও গান শুনিয়েও তুষ্টি বিধান করা যায় প্রিয়জনের। দেবযানী তাই করেন। কচকে একান্তে ডেকে এনে নির্জন রহস্যে গান শোনান তাঁকে—

গায়ন্তী চ ললন্তী চ রহঃ পর্য্যচরত্তথা।

এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। দেবযানী দিনে দিনে কচের সান্নিধ্যে এসে মানসিকভাবেও তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। দৈত্য-দানবদের সন্দেহ হল আস্তে আস্তে। হাজার গুরুত্ব দিলেও যে দেবযানীর নাগাল পাওয়া যায় না, সেই দেবযানী স্বর্গ থেকে আসা এক দেবপ্রতিম যুবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন দেখে দৈত্য-দানবরা কচের ওপরে নজরে রাখতে আরম্ভ করল। তারা বুঝল—যে সঞ্জীবনী বিদ্যা তাঁদের গুরুর অধিগত, সেই বিদ্যা এই যুবকের মাধ্যমে সংক্রমিত হবে দেবলোকে। শত্রুরাজ্যে এই বিদ্যার সংক্রমণ সহ্য করতে না পেরে দৈত্য-দানবেরা এবার কচকেই হত্যা করার উপায় খুঁজতে লাগল। কেননা গুরু শুক্রাচার্যকে তাদের এ-কথা বলবার সাহস নেই যে, এ আমাদের শত্রু, অতএব একে আপনার বিদ্যা দেওয়া চলবে না। তখনকার দিনে রাজনৈতিক প্রভাবে গুরু আচার্য অথবা শিক্ষক নিজের মত এবং সিদ্ধান্ত পালটাতেন না। অতএব অসুর-দানবেরা নিশ্চুপে কচকে হত্যা করার অভিসন্ধি করল।

সেদিন কচ শুক্রাচার্যের গোরুগুলিকে চরাতে নিয়ে গেছেন বনে। অসুর-দানবেরা তক্কে-তক্কে থাকল এবং এক সময় কচকে মেরে তার শরীরটাকে খণ্ড খণ্ড করে কুকুর দিয়ে খাইয়ে দিল। কচের এমন কোনো চিহ্নই রইল না যাতে শুক্রাচার্য কিছু বুঝতে পারেন। সেদিন বিচরণভূমি থেকে গোরুগুলি ফিরে এল আপন অভ্যাসবশে, কিন্তু তাদের সঙ্গে কচ ফিরলেন না। দেবযানী চিন্তিত হলেন। প্রতিদিন কচ ফিরে আসলে এই সময়ে বিশ্রান্ত অবসরে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় দেবযানীর আজ গোরুগুলির সঙ্গে কচকে না দেখে দেবযানী পিতার কাছে গিয়ে শঙ্কিত কণ্ঠে বললেন—পিতা! আপনার সায়ংকালীন হোম শেষ হয়ে গেছে, দিবসের শেষে অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য। আপনার গোরুগুলিও সব ফিরে এসেছে, কিন্তু কচ আসেনি, তাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না—কচস্তাত ন দৃশ্যতে।

কচের ব্যাপারে অসুর-দানবদের অনীহা এবং অসহিষ্ণুতার কথা বোধহয় দেবযানী বুঝতে পেরেছিলেন। ঠিক সেই জন্যই অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে শুক্রাচার্যকে বলছেন—কচকে কেউ মেরে ফেলেছে, অন্য কারণেও তার মৃত্যু হতে পারে হয়তো। কিন্তু যা কিছুই হোক পিতা! কচকে ছাড়া আমি বাঁচব না, সে কথা সত্যি জেনে রাখুন—

তং বিনা ন চ জীবেয়মিতি সত্যং ব্রবীমি তে।

শুক্রাচার্য কন্যা-অন্তঃপ্রাণ। দেবযানীর সকরুণ কথা শুনে তিনি বললেন—এই এখুনি সঞ্জীবনী বিদ্যার শক্তিতে কচকে আহ্বান জানাব আমি। সে নিশ্চয় ফিরে আসবে।

শুক্রাচার্য মন্ত্র উচ্চারণ করে কচকে আহ্বান করলেন। অমনই সমস্ত পশুর উদর চিরে—ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা শরীরাণি—বেরিয়ে এলেন কচ। প্রফুল্ল মনে উপস্থিত হলেন গুরুর সামনে, দেবযানীর সামনে। দেবযানীর উদ্‌গত ভাব দেখে গুরু শুক্রাচার্য ইচ্ছে করেই বোধহয় চলে গেলেন সেখান থেকে। দেবযানী সাদরে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এত দেরি করলে কেন, কচ! কোথায় ছিলে এতক্ষণ! কচ বললেন— কল্যাণী! আমি গুরুর আদেশ মতো সমিধ, কুশ, ফুল এবং যজ্ঞের কাঠ সংগ্রহ করে পরিশ্রান্ত হয়ে এক বটবৃক্ষের ছায়ায় বসেছি। আমাকে দেখে গোরুগুলিও সেই ছায়ায় এসে দাঁড়িয়ে রোমন্থন করছিল। এমন সময় কতগুলি অসুর এসে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। আমি যেই বললাম— আমি দেবগুরু বৃহস্পতির ছেলে কচ—সঙ্গে সঙ্গে তারা আমাকে মেরে, আমার দেহ খণ্ড খণ্ড করে কুকুরদের খাইয়ে দিল। তারপর ভার্গব শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করলেন এবং আমিও প্রাণ পেয়ে কোনো রকমে তোমার কাছে এসে পৌঁছেছি—

ত্বৎসমীপমিহায়াতঃ কথঞ্চিৎ প্রাপ্তজীবিতঃ।

দৈত্য-দানবেরা কচের পরিচয় এবং উদ্দেশ্য জেনে যাওয়ায় তাঁর বিপদ বাড়ল। শুক্রাচার্যের আশ্রম ছেড়ে বাইরে কোথাও দূরে গেলেই দৈত্য-দানবেরা তাঁকে মেরে ফেলার উপায় খুঁজতে লাগল। এইরকম একদিন দেবযানী কচকে ফুল আনতে পাঠালেন—পুষ্পাণ্যাহর মে দ্বিজ। ফুল আনতে গিয়ে কচের আবার বিপদ ঘটল। দানবেরা আবার তাঁকে মেরে-কেটে খণ্ড খণ্ড করে সমুদ্রের জলে মিশিয়ে দিল। কচের দেরি দেখে দেবযানী আবার পিতার কাছে তাঁর আশঙ্কা নিবেদন করলেন। আবারও সঞ্জীবনী-মন্ত্রে অসুরগুরু শুক্রাচার্য ফিরিয়ে আনলেন কচকে।

বার বার কৌশল ব্যর্থ হচ্ছে দেখে অসুরেরা এবার অদ্ভুত এক উপায় সৃষ্টি করল। শুক্রাচার্যের ওপরেও তাদের ক্ষোভ কম নয়। অতএব কচের সঙ্গে তাঁকেও একটু পরোক্ষ শিক্ষা দেবার জন্য তারা এবার এক মোক্ষম উপায় স্থির করল। মহামতি শুক্রাচার্যের একটু সুরাপানের অভ্যাস ছিল। বস্তুত সেকালের দিনের বৈদিক বিধান অনুযায়ী ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরাপান বিহিত ছিল না। কিন্তু সুরাপানের ব্যক্তিগত অভ্যাসটুকুও ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দতা এবং স্বাধীনতার উপচার।

এই সুযোগটাই অসুর-দানবেরা নিল। তারা কচকে মেরে পুড়িয়ে সেই ভস্মচূর্ণ মিশিয়ে দিল শুক্রাচার্যের সুরায়। শুক্রাচার্য পরমানন্দে সুরার সঙ্গে কচ-ভস্মও পান করে ফেললেন—

অপিবৎ সুরয়া সার্ধং কচভস্ম ভৃগূদ্বহঃ।

আবার সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল, ধেনুরা ফিরে শুক্রাচার্যের আশ্রমে, কিন্তু তাদের রাখাল ফিরে এল না। দেবযানীর সাজসজ্জার বেলা বয়ে গেল। ধেনু চরাতে যাবার আগে কচকে তিনি বলে দিয়েছিলেন তাঁর প্রসাধনের ফুল নিয়ে আসতে। কিন্তু তাঁর মালঞ্চের এই মালাকর তো কখনো এমন বিলম্ব করে না। দেবযানী চিন্তায় পড়লেন। আবারও তিনি পিতার কাছে গিয়ে কেঁদে বললেন—আমার চিরন্তন আজ্ঞাবহ কচ ফুল আনতে গেছে সেই কখন। সে এখনও ফিরে এল না—

পুষ্পাহারঃ প্রেষণকৃৎ কচস্তাত ন দৃশ্যতে।

নিশ্চয়ই আবারও তাকে কেউ মেরে ফেলেছে। আমি আবারও বলছি পিতা—কচ ফিরে না এলে আমি কিন্তু বাঁচব না—

তং বিনা ন চ জীবেয়ং কচং সত্যং ব্রবীমি তে।

শুক্রাচার্য একবারের জন্যও ভাবেননি যে, তারই উদরের মধ্যে সুরার সঙ্গে সহাবস্থিতি হয়েছে কচের। তিনি দেবযানীর কাকুতি-মিনতি শুনেই সঞ্জীবনী-মন্ত্রে আহ্বান করেছেন কচকে। কিন্তু বারংবার দেবযানীর অত্যাগ্রহে তিনি একটু বিরক্তও হয়েছেন বটে। দেবযানীকে তিনি বলেছেন—দেখ, কচকে বাঁচিয়ে রাখাটা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমি সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করে বার বার তাঁকে জীবনে ফিরিয়ে আনছি, কিন্তু

অসুরেরা বার বার তাঁকে মেরে ফেলছে। অতএব এই মৃত্যুর জন্য তোমার মতো রমণীর আর শোক করা শোভা পায় না। মানুষ মরণশীল, অতএব কচেরও সেই গতি হয়েছে। আমি বার বার তাঁকে কী করে বাঁচাব বল—

অশক্যো'সৌ জীবয়িতুং দ্বিজাতিঃ/
সঞ্জীবিতো বধ্যতে চৈব ভূয়ঃ।

দেবযানী নম্রস্বভাবা তপস্বিনী নন। তিনি অসুরগুরু শুক্রাচার্যের অভিমানিনী কন্যা। পিতার কথা শেষ হতেই সাভিমানে তিনি বলে উঠলেন—যাঁর পিতামহ হলেন ঋষিবৃদ্ধ অঙ্গিরা, যাঁর পিতা মহাতপস্বী বৃহস্পতি, সেই কচের জন্য আমার কোনো কষ্ট হবে না, তাঁর জন্য আমি কাঁদব না—এ কেমন করে হয়, পিতা—

কথং ন শোচেয়মহং ন রুদ্যাম্?

কচ ব্রহ্মচারী তপস্বী, যে কর্মের কথা আমি উচ্চারণ করলেই সে উদ্যোগী হয়ে সেই কর্ম করে দিত। সেই কচ যদি মরে গিয়ে থাকে পিতা, তবে আমি তার পথেই যাব। বিদ্বান এবং সুন্দর সেই কচকে আমি ভালোবাসি, পিতা—

প্রিয়ো হি মে তাত কচো' ভিরূপঃ।

দেবযানীর করুণ ক্রন্দনে শুক্রাচার্য বিগলিত হয়ে আবারও সমন্ত্রক আহ্বানে উচ্চারণ করলেন কচের নাম।

বিদ্যার প্রভাবে কচ শুক্রাচার্যের উদরের মধ্যেই সঞ্জীবিত হয়ে সংজ্ঞা লাভ করলেন; কিন্তু গুরুর উদারের মধ্যে আছেন বলে ভীতও হলেন একটু। আস্তে আস্তে তিনি গুরুর উদ্দেশে বললেন—"আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হোন, গুরুদেব। লোকে যেভাবে পুত্রের প্রতি সমাদর প্রকাশ করে, আপনিও আমাকে সেইভাবেই ভাবুন গুরুদেব।" কচের কথা শুনে শুক্রাচার্য অবাক হয়ে বললেন—তুমি কীভাবে কোন পথে আমার উদরের মধ্যে প্রবেশ করলে, কচ? যদি তেমন কাণ্ড ঘটে থাকে, তবে সমস্ত অসুরদের আমি ধ্বংস করে ফেলব এক লহমায়। আসলে শুক্রাচার্য অসুরদের ওপর একটু বিরক্ত হয়েই ছিলেন। তিনি নিজে যাঁকে সানুগ্রহে শিষ্যত্বে বরণ করেছেন, অসুরেরা তাঁকে বার বার মেরে ফেলছে, এই অতিক্রম তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। দেবযানীর কাছেও তিনি এ ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে—

অসুরেরা নিশ্চয়ই আমাকে তেমন পছন্দ করে না। নইলে বার বার কেন আমার এই নিরপরাধ শিষ্যটিকে হত্যা করছে।

শুক্রাচার্যের এই পুঞ্জিত ক্ষোভ এখন আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিল। উদরস্থ কচের কথা শুনে তিনি বললেন—তুমি ঠিক করে বল তো কী করে তুমি আমার উদরে এসে স্থান নিয়েছ। যদি জানতে পারি, তাহলে সমস্ত অসুরদের ধ্বংস করে এখনই আমি দেবপক্ষে যোগ দেব—

অস্মিন্ মুহূর্তে হ্যসুরান্ বিনাশ্য/গচ্ছামি দেবানহমদ্য বিপ্র। কচ অত্যন্ত ভদ্র সভ্য জন। কীভাবে অসুররা তাঁকে মেরে, দগ্ধ ভস্মচূর্ণ গুরুর পানীয় সুরার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে, সে-কথা আনুপূর্বিক জানালেন তিনি। জানানোর অসুবিধেও হল না, কেননা এই অপমৃত্যুতেও তাঁর তপস্যার শক্তি নষ্ট হয়নি এবং সেই জন্যই স্মৃতিশক্তিও অটুট আছে তাঁর।

কচের মুখে সব সংবাদ শুনে শুক্রাচার্য দেবযানীকে বললেন—কাকে তুমি বেশি চাও, বল? হয় কচ, নয় আমি? কেননা কচকে তুমি যদি সাকার দেখতে চাও, তবে আমার উদর-বিদারণ ব্যতীত তা সম্ভব নয়। দেবযানী বললেন—আমি কচের মৃত্যুও চাই না, তোমার মৃত্যুও চাই না। তোমাদের যে কোনো একজনের মৃত্যুই আমার কাছে অগ্নিসমান। কচের মৃত্যু হলে আমার জীবনের সমস্ত সুখই চলে যাবে, আর তোমার মৃত্যু হলেও আমি বাঁচব না—

কচস্য নাশে মম শর্ম নাস্তি/
তবোপঘাতে জীবিতুং নাস্মি শক্তা।

দেবযানীর অবস্থা দেখে শুক্রাচার্যের মাথায় নতুন বুদ্ধি খেলে গেল। কচের চেষ্টা, তপস্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনে শুক্রাচার্য পূর্বাহ্ণেই সন্তুষ্ট ছিলেন। বিশেষত দেবযানীর প্রতি কচের আনুগত্যে শুক্রাচার্য এতদিনে মা-হারা দেবযানীর মুখে খুশির আপ্লুতি লক্ষ্য করেছেন। কাজেই দেবযানীর সুখের জন্যও বটে, আবার শিষ্যের বিনয়-শিক্ষা এবং বিদ্যা-শিক্ষার চূড়ান্ত চেষ্টার নিরিখে শুক্রাচার্য এই অসম্ভব মুহূর্তটাকেই বেছে নিলেন কচকে সঞ্জীবনী বিদ্যা দানের পরম মুহূর্ত হিসেবে।

শুক্রাচার্য বললেন—তুমি তোমার চেষ্টা এবং তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করেছ কচ। আমার কন্যা দেবযানীও তোমাকে দেখতে চায়। সব কিছু ভেবে

আমি এখনই তোমাকে এই সঞ্জীবনীবিদ্যা শিখিয়ে দিচ্ছি। আমি আমার বিদ্যার প্রভাবে তোমাকে বাঁচিয়ে তুলব। আমার উদর থেকে তুমি প্রকট হয়ে উঠবে আবার, আর সেই কারণেই তুমি আমার পুত্রবৎ। তবে হ্যাঁ, আমার উদরে থেকেই তুমি যে সঞ্জীবনীবিদ্যা লাভ করবে, সেই বিদ্যা প্রয়োগ করে আমাকেও তুমি আবার বাঁচিয়ে তুলবে। দেখ, গুরুর কাছ থেকে বিদ্যা গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না যেন। ধর্মের দিকে যেন তোমার দৃষ্টি থাকে—

সমীক্ষেথা ধর্মবতীমবেক্ষাং/
গুরোঃ সকাশাৎ প্রাপ্য বিদ্যাং সবিদ্যঃ।

শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। আবরক তুষার অপসৃত হয়ে গেলে পূর্ণিমার চাঁদ যেমন বেরিয়ে আসে শুক্রাচার্যের উদর ভেদ করে তেমনই বেরিয়ে এলেন অভিরূপ কচ। তিনি দেখলেন—

অধ্যাত্মজ্ঞান-পুঞ্জ যেন মূর্তিমান হয়ে পড়ে আছে শুক্রাচার্যের মৃত শরীর অবলম্বন করে। যে পরম বিশ্বাসে শত্রুগুরুর পুত্রকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেছিলেন শুক্রাচার্য, ঠিক সেই বিশ্বাসের প্রতিদান দিয়েই কচ সঞ্জীবনী বিদ্যার প্রথম প্রয়োগ করলেন মৃত গুরুর ওপর। শুক্রাচার্য এক মুহূর্তে সঞ্জীবিত হলেন। কচ গুরুকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন—আপনার মতো মহান ব্যক্তি, যিনি বিদ্যাহীন এই শিষ্যের কর্ণে অমৃতের মতো বিদ্যামন্ত্র সিঞ্চন করেছেন, তাঁকে আমি নিজের পিতা-মাতা বলে মনে করি। বিদ্যাদানের এই উপকার স্মরণ করলে কোনোদিন গুরুর অনিষ্ট করার কথা ভাবতেও পারি না আমি—

তং মন্যে'হং পিতরং মাতরঞ্চ/
তস্মৈ ন দ্রুহ্যে কৃতমস্য জানন্।

সুরাপানের ফলে শিষ্যের অমন বিপর্যয় দেখে শুক্রাচার্য সেদিন থেকে সুরাপান ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং শুক্রাচার্যের দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মণদের সুরাপান সেই অবধি নিষিদ্ধ হয়ে গেল। সেই নিষেধ জারি করলেন স্বয়ং শুক্রাচার্য। সঙ্গে সঙ্গে দৈত্য-দানবদের উদ্দেশেও তিনি শাসন জারি করলেন, যাতে ভবিষ্যতে আর কচকে বিরক্ত করার সাহস না পায়। কচ সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করেছেন, শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্য তাঁর সিদ্ধ হয়েছে। শুক্রাচার্যও কচকে অনুমতি দিয়েছেন স্বর্গে ফিরে যেতে। কচও যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে কচের যাত্রাপথে দেবযানী এসে দাঁড়িয়েছেন এবার। দেবযানী বলেছেন—শুধু বলেননি, একেবারে গুরুপুত্রীর অভিমানমঞ্চ থেকে নীচে নেমে এসে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে বলেছেন—ঋষি আঙ্গিরার পৌত্র তুমি। তোমার চরিত্র, আভিজাত্য, সংযম এবং চেষ্টালব্ধ বিদ্যায় আজকে তোমাকে একেবারে জাজ্জ্বল্যমান দেখাচ্ছে—

ভ্রাজসে বিদ্যয়া চৈব তপসা চ দমেন চ।

তোমার পিতামহ মহর্ষি অঙ্গিরা যেমন আমার পিতার মাননীয় ব্যক্তি, তেমনই পিতা বৃহস্পতিও আমার পূজনীয়।

কচের পরিবারের সঙ্গে আত্মসম্বন্ধ স্থাপন করে যে গৌরব লাভ করলেন দেবযানী, এবারে সেই গৌরবকে মধুরতায় পরিণত করে তিনি বললেন—তুমি যখন ব্রত-নিয়ম-সংযমে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলে, তখন আমি তোমার যথাসাধ্য পরিচর্যা করেছি। আজ তোমার বিদ্যা শেষ হয়েছে এবং তোমার ওপরে আমার অনুরাগের ধারাটি সেইরকমই প্রবহমান। এই অনুরাগ তুমি ব্যর্থ করে দিতে পার না। বরঞ্চ মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণ করে শাস্ত্রসম্মতভাবে তুমি আমার পাণিগ্রহণ কর—

গৃহাণ পাণিং বিধিবন্মম মন্ত্রপুরস্কৃতম্।

দেবযানীর এই সানুরাগ আত্মনিবেদনের জন্য কচ মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। সত্যিই প্রস্তুত ছিলেন না। গুরুর কাছে বিদ্যা-শিক্ষা করাটাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সেই বিদ্যাশিক্ষায় উপকরণ হিসেবে যা যা প্রয়োজন—গুরুর সেবা করা, সমিদাহরণ, দেবযানীর তুষ্টি-বিধান, তাঁর মালা গাঁথার ফুল তুলে আনা, তাঁকে গান শোনানো— যা কিছু প্রয়োজন সব করেছেন কচ। কচ বললেন—তুমি আমার গুরু শুক্রাচার্যের প্রাণের চেয়েও প্রিয়তরা কন্যা। কিন্তু আমার গুরু যেমন আমার কাছে পূজনীয় এবং মাননীয়, গুরুপুত্রী বলে তুমিও আমার কাছে সেইরকম, কাজেই তোমাকে বিয়ে করার অনুরোধ এমন করে কোরো না—

দেবযানী তথৈব ত্বং নৈবং মা বক্তুমর্হসি।

দেবযানীর সর্বনাশ হয়ে গেছে। গুরুপুত্রীর মর্য্যাদাময়ী সত্তার সঙ্গে ভালোবাসার আত্মনিবেদনের সংস্কার দেবযানীর অন্তর-গভীরে যে মিশ্রক্রিয়া তৈরি করেছিল, তাতে দেবযানী

নিজের কাছেও নিজে খুব স্পষ্ট ছিলেন না, কচের কাছে তো নয়ই। কচের কথায় দেবযানী বলেছিলেন—তুমিও আমার পূজনীয় এবং माननীয় বটে। কিন্তু অসুরেরা বারংবার যখন তোমাকে মেরে ফেলছিল, তখন থেকেই বুঝতে পারছিলাম আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। তুমি কি আজকে সে-কথা একবারও স্মরণ করবে না—

তদা প্রভৃতি যা প্রীতিস্তাং ত্বমদ্য স্মরস্ব মে।

আমার পিতার শিষ্য বলেই হয়তো তোমার সঙ্গে মিশেছে বন্ধুর মতো, কিন্তু সেই সৌহার্দ্য কখন অনুরাগে পরিণত হয়েছে। সৌহার্দ্য এবং অনুরাগ আমার মধ্যে নিষ্ঠার জন্ম দিয়েছে, আমার তো আর কোনো অপরাধ নেই। এমন তন্নিষ্ঠ ভক্তজনকে আজকে তুমি এইভাবে ফেলে যেতে পার না—

ন মামর্হসি ধর্মজ্ঞ ত্যক্তুং ভক্তাম্ অনাগসম্।

অনুরাগের মধ্যে নম্র অঙ্গীকরণ থাকলেও দেবযানীর কথা বলার ভঙ্গিতে কি কোনো আদেশের সুর ছিল? কেননা কচ বলেছেন— যে বিষয়ে আদেশ করা উচিত নয়, তুমি আমাকে সেই বিষয়ে আদেশ কোরো না, দেবযানী। তুমি আমার কাছে গুরুর চেয়েও বেশি, তুমি ধর্মত আমার ভগিনী। কাজেই অমন করে বোলো না—

ভগিনী ধর্মতো মে ত্বং মৈবং বোচঃ সুমধ্যমে।

কচ দেবযানীকে তর্কযুক্তিকে শান্ত করে বিদায় চেয়ে বললেন—এতদিন তোমাদের ঘরে থেকেছি, কোনো কষ্টই হয়নি আমার। এখন এতটা পথ যেতে হবে, পথে যেন আমার মঙ্গল হয়, সেই প্রার্থনা কর তুমি—শিবমাসংশ মে পথি। আর কোনো দিন কর্মহীন অবসরে কথাপ্রসঙ্গে যদি আমার কথা মনে পড়ে, তবে ধর্মের অবিরোধে আমাকে স্মরণ কোরো। অর্থাৎ প্রেমিক হিসেবে নয়, ধর্মের নিয়মে ভ্রাতৃবৎ, বন্ধুবৎ স্মরণ কোরো আমাকে—

অবিরোধেন ধর্মস্য স্মর্তব্যো'স্মি কথান্তরে।

চরম অপমানিত বোধ করলেন দেবযানী। গুরুপুত্রীর অন্তর্গত সত্তা সাভিমানে বলে উঠল—কচ! তোমার কাছে পাণিগ্রহণের প্রার্থনা করেছিলাম। সেটা তুমি প্রত্যাখ্যান করলে, তাহলে জেনে রেখ—তোমার শেখা সঞ্জীবনী বিদ্যাও কোনো দিন ফলবতী হবে না। এই আমার অভিশাপ। তিনি বললেন—তোমার কোনো দোষে আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিনি। তুমি বিনা দোষে আমাকে অভিশাপ দিলে। তুমি যেহেতু অন্যায়ভাবে আমাকে অভিশাপ দিলে তাই আমিও বলছি—কোনো দিন কোনো ঋষিপুত্র ব্রাহ্মণ তোমার পাণিগ্রহণ করবেন না। আর তুমি যে বললে—আমার বিদ্যা ব্যর্থ হবে, তার উত্তরে বলি—আমার তাতে কোনো ক্ষতি নেই, আমি এই বিদ্যা আমার ছাত্রদের শেখাব, তারাই এ বিদ্যার-প্রয়োগ ঘটাবে—

অধ্যাপয়িষ্যমি তু যং তস্য বিদ্যা ফলিষ্যতি।

দুজনেই শাপ-শাপান্ত করে নিজেদের অনুরাগ-বাসনায় জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু শাপ-শাপান্তের পূর্ব মুহূর্তে বিদায় বেলায় কচ ও দেবযানী একসঙ্গে যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন একান্তে, তারই ফলে স্মরণ-মননের এক কাব্যিক পটভূমি তৈরি হল, যাতে ঋদ্ধ হল রবীন্দ্রনাথের বিদায়-অভিশাপ। *[মহা (k) ১.৭৬-৭৭ অধ্যায়; (হরি) ১.৬৪.২-৭৭; ১.৬৫ অধ্যায়]*

□ শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে দেখতে যেসব ঋষি-মহর্ষি কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিলেন বৃহস্পতিপুত্র কচ তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১২.৪৭.৯; ১৩.২৬.৮; (হরি) ১২.৪৬.৯; ১৩.২৭.৮]

কচগ্রহ একধরনের শস্ত্র, যা হাতে রেখেই শত্রুর বিপন্নতা তৈরি করা যেত। এই শস্ত্রটি একটি লম্বা লাঠির মতো বস্তু, যার আগায় আঠার মতো কিছু লাগিয়ে রাখা হয়। তারপর নিকটে আসা শত্রুর মাথার চুলের ওপর আঠালো লাঠিটি লাগিয়ে দিয়ে তার চুল (কচ) টেনে ধরে শত্রুকে রথ-অশ্ব কিংবা হাতির পিঠ থেকে ফেলে দেওয়া হত কচগ্রহ নিক্ষেপ করে। দুর্যোধন উদ্যোগ-পর্বে সেনাবিভাগ করার সময় কচগ্রহ নিক্ষেপকারীদের একটি দলই তৈরি করেছিলেন—

সকচগ্রহবিক্ষেপাঃ সতৈলগুড়বালুকাঃ।

নীলকণ্ঠ এই শ্লোকের টীকায় লিখেছেন—এটা একটা আঠা-লাগানো দণ্ড যা দিয়ে শত্রুর কেশ-আকর্ষণ করে মাটিতে ফেলে দেওয়া যায়—

কচগ্রহবিক্ষেপঃ কচেষু গৃহীত্বা
যেন শত্রুর্বিক্ষিপ্যতে
তাদৃশ কলবিঙ্ক-গ্রহতুল্যশ্চিক্কণ-
দ্রব্যাঙ্কিতাগ্রো দণ্ডবিশেষঃ।

[মহা (k) ৫.১৫৫.৫; (হরি) ৫.১৪৪.৫]

কচ্ছ কচ্ছ শব্দের অর্থ অনূপ-দেশ, অর্থাৎ জলপ্রায় দেশ। সমুদ্র কিংবা নদীর প্রান্তদেশ—

জলপ্রায়মনূপং স্যাৎ পুংসি কচ্ছস্তথাবিধঃ॥

[অমরকোষ ২. (ভূমিবর্গ) ১০;

শব্দকল্পদ্রুম খণ্ড ২, পৃ. ৬]

অমরকোষের ক্ষীরস্বামীকৃত টীকায় 'কচ্ছ' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—

কষন্তি আপো যং স কচ্ছঃ।

সংস্কৃত 'কষ্' ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা, শোষণ করা বা টেনে নেওয়া। সমুদ্র তীরবর্তী এই অঞ্চলের মাটি খুব বেশি পরিমাণে জল শোষণ করে বলেই হয়তো এই জলপ্রায় ভূভাগের নাম কচ্ছ। কোষগ্রন্থ শব্দকল্পদ্রুমে একটি প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধার করে 'কচ্ছ' সম্পর্কে বলা হয়েছে—

সিন্ধূনাং সরসাঞ্চ প্রান্তভাগঃ।

লক্ষণীয়, কচ্ছের 'রণ' অঞ্চলটি স্পষ্টই সিন্ধু প্রভৃতি নদীগুলির নিম্নপ্রবাহ অর্থাৎ মোহনা অঞ্চলেই বটে।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে এই অঞ্চলটিকে যেমন কচ্ছ নামে উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনই মরুকচ্ছ নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ এই স্থানটিকে নীচু এবং লবণাক্ত অঞ্চল বলে বর্ণনা করেছেন, যে বর্ণনা অবশ্যই বর্তমান 'কচ্ছ'-এর অন্তর্গত 'রণ্' (Rann of kutch) অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলে যায়। বস্তুত এই কচ্ছের 'রণ্' অঞ্চলটি একটি এমন লবণাক্ত জলপ্রায় ভূমি যা শুষ্ক ঋতুতে বালুকাময় ঊষর প্রান্তরের মতো, আবার বর্ষাকালে জলমগ্ন হয়ে যায়। এমন প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে এখানে গাছপালা বা কৃষির সম্ভাবনাও বিশেষ তৈরি হয়নি। এই অঞ্চলটি লবণাক্ত এবং কর্দমাক্ত হলেও এবং তা সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হলেও মরুভূমি বলা যেতে পারে। এই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই এই অঞ্চলটির নাম 'রণ্' (Rann)। প্রসঙ্গত পণ্ডিতদের মতে এই 'রণ' শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'ইরিন' শব্দ থেকে। 'ইরিণ' বলতে ক্ষারমৃত্তিকা যুক্ত ঊষর প্রান্তর বোঝায়। মনু সংহিতায় একটি শ্লোকে লবণাক্ত ঊষর ভূমিতে শস্য বপন করলে যেমন ফল লাভ হয় না—এই কথা প্রসঙ্গে লবণাক্ত প্রান্তরের পর্যায়শব্দ হিসেবে 'ইরিণ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে—

যথেরিণে বীজমুপ্তা ন বপ্তা লভতে ফলম্।

[মনুসংহিতা ৩.১৪২]

এই 'ইরিণ' বা 'রণ্' শব্দ থেকে যেমন এ অঞ্চলের মৃত্তিকার শ্রেণীচরিত্র স্পষ্ট বোঝা যায়, ঠিক তেমনই বরাহমিহিরের দ্বারা উল্লিখিত 'মরুকচ্ছ' শব্দটিও স্থানটির ভৌগোলিক চরিত্র স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করে।

[বৃহৎসংহিতা ১৪.১৬, ২৩; ৪.২২;

EAIG (Kapoor) pp. 323-324;

GD (N.N. Bhattacharyya) p. 162]

□ মহাভারতের ভীষ্মপর্বে কচ্ছকে একটি জনপদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পদ্ম পুরাণেও এটি জনপদ হিসেবেই উল্লিখিত।

[মহা (k) ৬.৯.৫৬; (হরি) ৬.৯.৫৬;

পদ্ম পু. (মহর্ষি) স্বর্গ. ৩.৫২]

□ এই জনপদের আরেক নাম কচ্ছিকা (kachika)। *[GP (Ali) p.146]*

□ উল্লেখ্য, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিস্তার সম্পর্কে পাণিনির সম্যক ধারণা ছিল। অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে তিনি কচ্ছ জনপদটির নাম উল্লেখ করেছেন—

কচ্ছাদিভ্যশ্চ *[৪.২.১৩৩]* এবং কচ্ছাগ্নিবক্ত্রবর্তোত্তর পদাৎ *[৪.২.১২৬]*

□ কোটিশ্বর নামে বিখ্যাত তীর্থটি কচ্ছের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।

কচ্ছনীর বিষ্ণু পুরাণে এঁকে কচ্ছবীর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইনি একজন নাগ। বৈশাখ মাসে ইনি সূর্যরথে অবস্থান করেন বলে উল্লেখ আছে।

[বিষ্ণু পু. ২.১০.৫; ভাগবত পু. ১২.১১.৩৪]

কচ্ছপ১ একজন নাগ। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন।

[বায়ু পু. ৬৯.৭৩]

কচ্ছপ২ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্রদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৬.৬৯;

বায়ু পু. ৯১.৯৭; বিষ্ণু পু. ৪.৭.১৭]

কচ্ছপ৩ কুবেরের রাজসভায় পদ্ম, শঙ্খ, মকর ইত্যাদি আট প্রকার মহানিধি আছে। কচ্ছপ ওই আটটি নিধির মধ্যে অন্যতম। *[দ্র. নিধি]*

[বায়ু পু. ৪১.১০]

কচ্ছপী নারদের বীণা। নারদ নৃত্য এবং গীতে কুশল ছিলেন। গান্ধর্ব বিদ্যায় তাঁকে পারদর্শী বলা

হয়েছে। সদা সর্বদা তিনি যে বীণাটি বহন করতেন সেটির নাম কচ্ছপী—

কচ্ছপীং সুখশব্দাং তাং গৃহ্য বীণাং মনোরমাম্।

[মহা (k) ৯.৫৪.১৯; (হরি) ৯.৫০.১৮]

কচ্ছবীর *[দ্র. কচ্ছনীর]*

কজ্জল পর্বত কালিকা পুরাণ মতে, "চিত্রকূটাত্তু পূর্ব্বস্যাং কজ্জলাচল উত্তমঃ।"

অর্থাৎ চিত্রকূটের পূর্বদিকে কজ্জল নামে একটি উত্তম পর্বত আছে। এই পর্বতে বিদ্যাধর প্রভৃতি বহু দেবতার বাস। কজ্জল পর্বতে আরোহণ করলে স্বর্গে গমন করা যায়। এই পুণ্যফলদায়ক পর্বত তীর্থের পূর্বদিকে 'শুভ' নামে আরেকটি পর্বত রয়েছে। *[কালিকা পু. ৭৯.১৪৩-১৪৫]*

কটায়নী পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, কটায়নী সেই গোত্রগুলির মধ্যে একটি। মহর্ষি ভৃগুর বংশ পরম্পরায় বা শিষ্য পরম্পরায় কটায়নী নামে একজন ঋষি ছিলেন, তিনিই এই বংশ বা গোত্রের প্রবর্তক। *[মৎস্য পু. ১৯৫.৩৩]*

কটাহ ভারতবর্ষ নয়টি দ্বীপে বিভক্ত। এই দ্বীপগুলি সাগরে পরিবৃত এবং এরা পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এই নয়টি দ্বীপের মধ্যে একটি হল কটাহ।

[বামন পু. ১৩.৮-১০; গরুড় পু. ১.৫৫.৪-৫]

কটীমুখ *[দ্র. কুটীমুখ]*

কটুমুখী অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। কটুমুখী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৭৯.২৯]*

কট্য পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, কট্য সেই গোত্রের অন্যতম। ঋষি অঙ্গিরা থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এরাও আঙ্গিরস বলে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ১৯৬.৪৬]*

কঠ১ মহাভারতে উল্লিখিত জনৈক প্রাচীন ঋষি। মহর্ষি স্থূলকেশের কন্যা প্রমদ্বরা সর্প দংশনে প্রাণ ত্যাগ করলে যেসব ঋষি স্থূলকেশকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিলেন, কঠ তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.৮.২৫; (হরি) ১.৮.২৪]

□ মহাভারতের শান্তিপর্বে উপরিচর বসুর অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়েছে যে, মহর্ষি কঠ এই যজ্ঞের একজন পুরোহিত ছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সভায় আমরা কঠকে উপস্থিত থাকতে দেখি।

[মহা (k) ১২.৩৩৬.৯; ২.৪.১৮; (হরি) ১২.৩২২.৯; ২.৪.১০নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র. খণ্ড ৫; পৃ. ২৬]

কঠ২ পুরাণে ঋষি বশিষ্ঠের গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি কঠের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ঋষি বশিষ্ঠ থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এঁরা বাশিষ্ঠি নামেও পরিচিত। *[মৎস্য পু. ২০০.৩]*

কঠ৩ মহর্ষি কঠ যজুর্বেদের অন্যতম ঋষি। তাঁর নামে কাঠক সংহিতা, কঠোপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। রামায়ণে রামচন্দ্র যজুর্বেদের কাঠকশাখার বেদ অধ্যয়নকারীদের কথা উল্লেখ করেছেন ভিক্ষাজীবী বেদপাঠকারী ব্রাহ্মণ হিসেবে। *[রামায়ণ ২.৩২.১৮]*

কঠাক্ষর মার্কণ্ডেয় পুরাণে অপরান্ত দেশের অন্তর্গত যে ছোটো ছোটো জনপদগুলির তালিকা দেওয়া হয়েছে, কঠাক্ষর তার মধ্যে অন্যতম। অবশ্য অন্যান্য পুরাণগুলির পাঠ তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করে পণ্ডিত D.C. Sircar এই কঠাক্ষরকে কারস্কর-এর পাঠান্তর বলে মনে করেছেন। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.৪৯-৫০; GAMI (Sircar) p. 41]*

কঠেশ্বরতীর্থ নর্মদার তীরে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। পুরাণে বলা হয়েছে, সূর্যের উত্তরায়ণের সময় এই তীর্থে স্নান করলে মহাপুণ্য হয়।

[মৎস্য পু. ১৯১.৬৩-৬৪]

কণকাবতী স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসেবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.৮; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র. শ্লোকসংখ্যা ৮ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

কণাদেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। পুরাকালে মহর্ষি কণাদ এইখানে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৯২]

কণিক মহাভারতের আদিপর্বে পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে যখন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন, তখন অর্জুন-ভীমের মতো যোদ্ধারা নানান যুদ্ধ করে রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে নিলেন এবং এই ঘটনায় পাণ্ডবদের প্রভাব-প্রতিপত্তি-সম্মান অনেকটাই বেড়ে গেল। পাণ্ডবদের এই রাজনৈতিক লাভে

ধৃতরাষ্ট্রের মন বিষিয়ে গেল। দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় যখন আর তাঁর ঘুম আসছে না রাত্রিতে, তখন অনেক ভেবে চিন্তে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর মন্ত্রিসভার এক কুটিলবুদ্ধি মন্ত্রীকে খবর দিলেন। এই মন্ত্রীর নাম কণিক। মহাভারতের কবি কণিকের প্রথম বিশেষণ দিয়েছেন 'মন্ত্রজ্ঞ' অর্থাৎ যে বিষয়ে তাঁর মত চাইছেন ধৃতরাষ্ট্র, সেই রাজনীতির মন্ত্রণায় তাঁর জুড়ি নেই। কণিকের দ্বিতীয় বিশেষণ—'রাজশাস্ত্রার্থবিত্তমম্'। এখানে 'রাজশাস্ত্র' শব্দের অর্থ নীলকণ্ঠ করেছেন 'দণ্ডনীতিশাস্ত্র' আর সিদ্ধান্তবাগীশ করেছেন 'নীতিশাস্ত্র।' বস্তুত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা 'সায়েন্স অফ গভর্নমেন্ট' বলতে যে সব শব্দ প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হত, তার মধ্যে অন্যতম শব্দগুলি হল রাজধর্ম, দণ্ডনীতি এবং রাজশাস্ত্র। কণিকের প্রসঙ্গে রাজশাস্ত্র কথাটা মহাভারতের কবিই প্রথম ব্যবহার করেছেন বটে, তবে পরবর্তীকালে 'নীতিপ্রকাশিকা' নামে যে গ্রন্থটি ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নের নামে চিহ্নিত হয়েছে, তার মধ্যেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অর্থে 'রাজশাস্ত্র' শব্দটিই প্রযুক্ত হয়েছে। আর আছেন অশ্বঘোষ। তিনি কালিদাসের পূর্ববর্তী নাট্যকার। নিজকৃত বুদ্ধচরিত কাব্যে শুক্র-বৃহস্পতির লেখা রাজনীতি-বিজ্ঞানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অশ্বঘোষও 'রাজশাস্ত্র' কথাটিই প্রয়োগ করেছেন।

[মহা (k) ১.১৪০.২; ১২.৫৮.৩ (রাজশাস্ত্র-প্রণেতারঃ);
(হরি) ১.১৩৫.২; ১২.৫৭.৩;
নীতিপ্রকাশিকা (Gustav Oppert) ১.২২;
বুদ্ধচরিত ১.৪১]

তার মানে, রাষ্ট্রের পালন-পোষণ-সমৃদ্ধি এবং রাজ্যবিস্তারের নীতি-যুক্তির ক্ষেত্রে কণিক একেবারে বিশেষজ্ঞ মানুষ। কণিক রাজশাস্ত্র জানেন তথা অর্থশাস্ত্রও জানেন। নতুন ভূখণ্ড লাভ এবং তার পালনের উপায়ই অর্থশাস্ত্র। কণিক সেটাও ভাল জানেন, সেইজন্য 'রাজশাস্ত্রার্থবিত্তমঃ।' কণিক মানুষটিকে শুধুমাত্র ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম মন্ত্রী বলে পরিচয় দিলে ভুল বলা হবে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতির তাত্ত্বিকতা নিয়ে যদি কোনো বিচার করা যায়, তাহলে বলতে হবে—কণিক হলেন ভরদ্বাজ গোষ্ঠীর তাত্ত্বিক।

পুরাকালে যাঁরা রাষ্ট্রনীতি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বৃহস্পতি হলেন অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরদ্বাজ। তিনি বৃহস্পতি-নীতি যেমন শিখেছিলেন তেমনই রাজনীতির বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ভাবনাও যথেষ্ট মূল্যবান ছিল, তাঁর বলা রাজনীতি-বিজ্ঞান ভরদ্বাজনীতি বলে প্রচারিত অর্থাৎ ভরদ্বাজনীতি বার্হস্পত্য-নীতির একটি শাখা হলেও তার মধ্যে ভরদ্বাজের নিজস্ব অবদানও আছে। কণিক ভরদ্বাজ-নীতিই অনুসরণ করতেন, যদিও রাজনীতির ভাবনায় তাঁরও নিজস্ব অবদান আছে। তবে ভরদ্বাজ-নীতির বহুলাংশ তাঁর শাস্ত্রে পুনঃকথিত হওয়ায় কণিককে অনেকেই কণিক ভরদ্বাজ বলে ডাকেন অর্থাৎ কণিক ভরদ্বাজ 'স্কুলের' তাত্ত্বিক।

এখানে পরিষ্কারভাবে জানানো দরকার যে, মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্ম যেখানে যুধিষ্ঠিরকে ভারদ্বাজ এবং সৌবীর দেশের রাজা শত্রুঞ্জয়ের কথোপকথন উল্লেখ করেছেন, সেখানে মহাভারতের কতকগুলি সংস্করণে যেমন শুধুই ভারদ্বাজ আর শত্রুঞ্জয়ের কথা বলা হয়েছে—

ভারদ্বাজস্য সংবাদং রাজ্ঞঃ শত্রুঞ্জয়স্য চ।

তেমনই মহাভারতের Critical Edition এ এই 'ভারদ্বাজ' শব্দটাকে কণিকের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেখানে নামটাও কণিক নয়; কণিক এখানে 'কণিঙ্ক'। তাঁর সঙ্গে কথোপকথন হচ্ছে শত্রুন্তপ রাজার, অর্থাৎ রাজা এখানে শত্রুঞ্জয় নন—

রাজা শত্রুন্তপো নাম সৌবীরাণাং মহারথঃ।
কণিঙ্কমুপসঙ্গম্য প্রপ্রচ্ছার্থ-বিনিশ্চয়ম্॥

এই যে কণিঙ্ক ভারদ্বাজ—তাঁর এই আদ্য নাম 'কনিঙ্ক' কিন্তু মধ্বাচার্যের মতো বৈষ্ণব দার্শনিকের সমর্থন পেয়েছে 'মহাভারততাৎপর্য্য-নির্ণয় নামক গ্রন্থে। মধ্বাচার্য এই কণিঙ্ককে অসুরস্বভাব ব্রাহ্মণ বলে নির্ণয় করেছেন এবং এই কণিঙ্কের গুরু হলেন শুক্রাচার্য এবং মহাভারত-খ্যাত দুর্যোধনের মাতুল শকুনির গুরুও নাকি এই কণিঙ্ক—

নাম্না কণিঙ্ক ইতি চাসুরকো দ্বিজো'ভূঃ
শিষ্যঃ সুরেতরগুরোঃ শকুনের্গুরুঃ সঃ।

মধ্বাচার্য কিন্তু এই কণিঙ্ককে মহাভারতের আদিপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের সেই 'রাজাশাস্ত্রার্থবিত্তম' কণিকের সঙ্গে একাত্মক বলেই বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, তাঁর সুযোগ্য শিষ্য শকুনির কথা শুনেই কণিঙ্ক গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্রদের কুৎসিৎ রাজনীতির উপদেশ দেন।

লক্ষণীয়, মধ্বাচার্যের লেখায় কিন্তু কোথাও কোথাও কণিঙ্কের পরিবর্তে কলিঙ্গ পাঠও আছে।

[মহা (k) ১.১৪০.২-৪; ১২.১৪০.৩;
(হরি) ১.১৩৫.২-৪; ১২.১৩৬.৩;
মহাভারত (Critical Edition) ১২.১৩৮.৪;
মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়, ১৯.২, পৃ. ৪৮৭;
See also the transliterated Edition by Harshala Rajesh (London) in www.mahabharatatatparyanirnaya.com]

জতুগৃহে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার ভয়ংকর কল্পনা মহাভারতের পাঠককে যেহেতু অসহায় পাণ্ডবদের ওপরে পূর্বাহ্নেই সমব্যথী করে তোলে, তাই কণিকের মত শুনে আমরা কষ্ট পাই। ভাবতে থাকি—এই নির্দয়, এতই কঠিন কি রাজার হৃদয় হওয়া উচিত! কিন্তু, ভবিষ্যতে যুদ্ধপর্বের শেষে যখন ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতির তত্ত্ব শোনাচ্ছেন, তখন দেখা যাবে, রাজনীতিতে দয়া-মায়া-স্নেহের কোনো স্থান নেই। শুধু তাই নয়, রাজ্য এবং ধনলাভের প্রক্রিয়ার মধ্যে ধর্ম বা ন্যায়-নীতির ভাবনাটা এতটাই অন্যরকম, যা কণিক-নীতির অন্যতর প্রস্তাব কণিঙ্কের কথার সঙ্গেও মেলে এবং মহাভারতের শান্তিপর্বে সেটা প্রায় একই রকম।

শান্তিপর্বে সৌবীররাজ শত্রুজয় (শত্রুন্তপ) কণিক (কণিঙ্ক) ভারদ্বাজকে অর্থবিনিশ্চয় প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—কী করে অলব্ধ বস্তুর লাভ ঘটবে, লব্ধ বস্তুকে কী করে রক্ষা করতে হবে ইত্যাদি। এই অর্থ-সম্পত্তিলাভের উপায় জানাতে গিয়ে ভারদ্বাজ কিন্তু খুব কড়ারকমের দণ্ডনীতির উপদেশ দিয়েছেন—যা এককথায় হৃদয়হীন এবং নৃশংস এবং যা সাধারণ ধর্ম এবং নৈতিকতার ধার ধারে না। এই হৃদয়হীনতা বা নৃশংসতা কৌটিল্যের সঙ্গেও মিলবে বটে, কিন্তু কৌটিল্যের সঙ্গে মেকিয়াভেলি, ভারদ্বাজ বা কণিকের তফাৎ আছে। যেকোনো উপায়েই রাজা অর্থলাভের চেষ্টা করুন, কিন্তু কৌটিল্যের মতে সেই রাজাও ধর্মশাসনের ঊর্ধ্বে নন।

[মহা (k) ১২.১৪০ অধ্যায়; ১২.১৪২.২;
(হরি) ১২.১৩৬ অধ্যায়; ১২.১৩৮.২]

□ কণিক জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শদাতা মন্ত্রী। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে নিজের বাড়িতে ডেকে এনে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে সরলভাবে তাঁর কাছে নিজের অন্তর উদ্ঘাটিত করলেন। বললেন—বামুন-ঠাকুর! বড়ো কষ্টে আছি আমি। আমারই ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডবদের শক্তি-বুদ্ধির কথা সকলেই এক সুরে গেয়ে বেড়াচ্ছে। তারা এখন বিখ্যাত মানুষ। এদের এই বাড়বৃদ্ধি দেখে আমার কিন্তু মনে বড়ো অসূয়া জন্মাচ্ছে—

উৎসক্তাঃ পাণ্ডবা নিত্যং তেভ্যো' সূয়ে দ্বিজোত্তম।

কণিক বললেন—মহারাজ! আপনি পরামর্শ চাইছেন, সে পরামর্শ আমি নিশ্চয় দেব। রাজনীতির সমস্ত রহস্যই আপনাকে জানাব। কিন্তু মহারাজ! রাজনীতিশাস্ত্রের উপদেশ মোটেই মধুর নয়। বরঞ্চ তীক্ষ্ণ। অতএব সেই তীক্ষ্ণতার কথা শুনে আপনি যেন আমার ওপর আবার অসূয়া করবেন না। যদি বলেন—স্বভাব-কোমল ব্রাহ্মণ হয়েও এমন তীক্ষ্ণ উপদেশ শোনালে দোষ তো তাকে দেবই, তাহলে জানাই—আমি আপনাকে যা বলব তা আমার ব্যক্তিগত কোনো মত নয়। রাজনীতি শাস্ত্রের যা নির্দেশ, তাই আপনাকে জানাব এবং সে নির্দেশ দাঁড়িয়ে আছে রাজনীতির দর্শনের ওপর। সে দর্শনাটাই তীক্ষ্ণ—

উবাচ বচনং তীক্ষ্ণং রাজশাস্ত্রার্থদর্শনম্।

অতএব আপনি যেন আমার গুণে আবার দোষ আবিষ্কার না করেন—

ন মে'ভ্যসূয়া কর্তব্যা।

কণিক ধৃতরাষ্ট্রকে যা বলেছেন, তা মহামতি মেকিয়াভেলির উপদেশের থেকে কম কিছু নয়। কণিক অনেক উপদেশ দিয়েছেন। তার মধ্যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের দুশ্চিন্তার সঙ্গে যেগুলো মেলে, সেগুলোই শুধু উল্লেখ করলে এইরকম দাঁড়ায়। কণিক বললেন—দেখুন মহারাজ! আপনি যাকে শত্রু বলে মনে করছেন, বিশেষত যদি সে আপনার কোনো অপকার করে থাকে, তবে তাকে মেরে ফেলাটাই সবচেয়ে ভাল—

বধমেব প্রশংসন্তি শত্রূণাম্ অপকারিনাম্।

শত্রু যদি পরাক্রমশালী হয় তবে ফাঁক খুঁজতে হবে—কখন তার বিপদ আসে এবং সেই 'বিপদের' সময়ে আক্রমণ করে তাকে মেরে ফেলতে হবে। তখন যেন ভাই-বন্ধু এসব বিচার করতে যাবেন না। আবার শত্রু যদি রাজ্যের মধ্যেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে, সে যদি আবার তার মধ্যে যুদ্ধনিপুণ হয়, তবে তাকে নিজের রাজ্যের মধ্যে না রেখে নির্বাসন দেওয়াটাই উচিত। কারণ সে যে কোনো সময় বিপদ ঘটাবে।

কণিক উপমা দিয়ে বললেন—সামান্য একটু আগুন থেকেই একটা গোটা বন পুড়ে যায়, মহারাজ। কাঠের মতো দাহ্য বস্তুর সামান্য একটু আশ্রয় পেলেই এতটুকু আগুন এত বড়ো বন পুড়িয়ে দেবে। আরও একটা কথা বলি—শত্রুকে কাতর দেখে তার ওপর আবার মায়া-মমতা করতে যাবেন না। ওসব সময় একেবারে অন্ধ হয়ে থাকবেন, যেন কিছুই দেখতে পাননি, বিপদে পড়লে শত্রু অনেক কান্নাকাটি করবে, তখন এমন ভাব করবেন, যেন কিছুই শুনতে পাননি—

অন্ধঃ স্যাৎ অন্ধবেলায়াং বাধির্যমপি চাশ্রয়েৎ।

ওসব শরণাগত-টরণাগত বুঝি না, সোজা মেরে ফেলুন।

রাজার সব সময়েই শত্রুবধের শক্তি-সামর্থ্য থাকে না, তার নিজের এমন অবস্থা থাকতেই পারে যাতে প্রবলের সঙ্গে তিনি পেরে উঠছেন না। সে অবস্থায় কণিকের উপদেশ হল—প্রবল শত্রু যদি আপনাকে আক্রমণ করে, তবে কোনো ভাবনা না করে ঘাস-পাতার মতো শুয়ে পড়বেন মহারাজ। কিন্তু আপনি সদা সতর্ক থাকবেন হরিণের মতো কানটি খাড়া করে। শত্রুকে মিষ্টি কথায় ভোলাবেন, দরকার হলে এটা-ওটা ভালরকম প্রণামী-উপঢৌকনও দেবেন। তারপর যখন দেখবেন, সে ঠান্ডা হয়েছে, তখন সুযোগ পেলেই আঘাত হানবেন তার ওপর। সব সময় মনে রাখবেন—মৃত শত্রুর কাছে আপনার কোনো ভয় নেই। যে ভাবেই হোক, শত্রু মরলেই আপনি নিশ্চিন্ত—

নিরুদ্বিগ্নো হি ভবতি ন হতাজ্জায়তে ভয়ম্।

শরণাগত হয়েছে বলে তাকে দয়া করতে হবে—এসব বড়ো বড়ো কথা আমার রাজনীতিতে নেই মহারাজ—

দয়া না তস্মিন্ কর্তব্যা শরণাগত ইত্যুত।

কণিক বোধহয় পাণ্ডবদের দিকে ইঙ্গিত করেই কথাটা বললেন। বস্তুত রাজ্যলাভের ক্ষেত্রে ভাই কিংবা ভাইয়ের ছেলেরা হলেন সহজ শত্রু, কারণ তাদেরও রাজ্য পাওয়ার হক থাকে। বিশেষত পিতার মৃত্যুর পর পাণ্ডবরা এখন ধৃতরাষ্ট্রের শরণাগত। কিন্তু কণিকের মতে তাঁদেরও শত্রুর মতোই মনে করা উচিত। কণিক বললেন—দেখুন মহারাজ! রাজনীতিতে দয়া-মায়ার কোনো স্থান নেই। আমি শত্রুর মূলোচ্ছেদে বিশ্বাসী। প্রথমে শত্রুর মূল, তারপর তার সহায়, তারপর শত্রুপক্ষের সবাইকে এমনকী শত্রুর ওপরে যারা ভরসা করে আছে, তাদেরও মেরে ফেলা দরকার। মুখে এমন একটা ভাব বজায় রাখুন যাতে কেউ কিচ্ছুটি বুঝতে না পারে। বাইরে আপনি ঋষি-মুনির ভাব দেখিয়ে যজ্ঞ করুন, গেরুয়া কাপড় পরুন, এমনকি জটাও পাকাতে পারেন চুলে, দরকারে মৃগচর্মও পরিধান করুন, মহারাজ! এগুলোতে বেশ সুবিধে হয়। লোকে ধার্মিক বলে আপনাকে বিশ্বাস করুন এবং সেই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে আপনি সময়মতো বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ুন শত্রুর ওপর—

লোকান্ বিশ্বাসয়িত্বৈব ততো লুম্পেদ্ যথা বৃকঃ।

কণিকের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ-চক্ষুও বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠছে। তিনি কথা বলার ফাঁক খুঁজছেন, কিন্তু পাচ্ছেন না। কণিকও সেটা বুঝলেন, কিন্তু তাই বলে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে কথা বলার সুযোগ দিলেন না মোটেই। বরঞ্চ তাঁর অন্তরের গভীর কথাটি কেড়ে নিয়ে বললেন—মহারাজ! একজন রাজা তো আর বসে বসে আঙুল চোষার জন্য রাজা হয় না, সে ফল চায়, রাজ্যের সমৃদ্ধি চায়, নিজে রাজা হিসেবে গদিতে থাকতে চায়, সমস্ত মানুষই তাই চায়, মহারাজ! আর তার জন্যই যত চেষ্টা—

ফলার্থোঽয়ং সমারম্ভঃ লোকে পুংসাং বিপশ্চিতাম্।

সাধারণের অবস্থাই দেখুন না। গাছ থেকে ফল খাবে; তো লোকে গাছের ডাল টেনে টেনে নুইয়ে নিজের সামনে আনবে, তারপর পাকা ফলটি তুলে নেবে টুক করে—

আনম্য ফলিনীং শাখাং পক্বং পক্বং প্রশাতয়েৎ।

গাছের শাখাটি যদি ভাবে—আমাকে আদর করার জন্য কাছে নিয়ে যাচ্ছে, তো ভুল ভাবছে। সেইরকম জটা-চীর ধারণ করে আদরের ভাব করুন, মহারাজ কিন্তু ফলটি তুলে নিতে হবে। আপনার সময় যতক্ষণ পরিপক্ক না হচ্ছে, ততক্ষণ আপনি মাটির কলসির মতো শত্রুকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে বেড়ান, মহারাজ—

বহেদমিত্রং স্কন্ধেন যাবৎ কালস্য পর্যয়ঃ।

কিন্তু সময় যখন আসবে, তখন পাথরের ওপর কলসি যেমন আছাড় মেরে ভাঙে, তেমন করেই শত্রুকে আছাড় মারবেন—

ততঃ প্রত্যাগতে কালে ভিন্দ্যাদ্ ঘটমিবাশ্মনি।

সময় এসে গেলে আর কোনো মায়া-দয়া নেই। তখন সে ডাক ছেড়ে কাঁদুক, হাত জোড় করুক আর—শরণাগতই হোক, তাকে সোজা মেরে ফেলুন—

অমিত্রো ন বিমোক্তব্যঃ কৃপণং বহ্বপি ব্রুবন্।

এইভাবে কখনো ভাল কথা বলে, কখনো কিছু দিয়ে, কখনো বন্ধুজনের সঙ্গে তার ভেদ সৃষ্টি করে এবং সর্বশেষ উপায়ে তাকে মেরে ফেলে নিজের কাজটি গুছোতে হবে, মহারাজ! শত্রু-শাতনের নির্দিষ্ট উপায়গুলি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কণিক ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন—সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড—এই চারটে উপায়ের প্রয়োগ করে শত্রুকে একেবারে উচ্ছেদ করে ছাড়তে হবে—

সার্বোপায়ৈঃ প্রশাতয়েৎ।

প্রাচীন রাজনীতিশাস্ত্রে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—এই চারটি উপায় যথেষ্ট বিখ্যাত শব্দ। সাম মানে মধুর-সান্ত্বনা বাক্যে শত্রুর মন জয় করা। সামে কাজ না হলে দান অর্থাৎ খানিকটা ছেড়ে দেওয়া। সে যেমন নিজকৃত পূর্বশর্ত ছেড়ে দেওয়াও হতে পারে, ধন-সম্পত্তি দানও হতে পারে আবার খানিকটা ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়াও হতে পারে। এই নীতির বশবর্তী হয়েই ভারত এক সময় পাকিস্তানকে বেরুবাড়ি অঞ্চল ছেড়ে দিয়েছিল, আবার সেদিন তিন বিঘা অঞ্চল মুক্ত করে দিল বাংলাদেশের কাছে। দান-নীতিতে কাজ না হলে ভেদ সৃষ্টি করতে হয়। গুপ্তচর বা বিশ্বস্ত পুরুষের সাহায্যে রাজার সঙ্গে মন্ত্রীর, মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রীর, রাজার সঙ্গে প্রজার, প্রজার সঙ্গে মন্ত্রীর—এইভাবে নানা কথায় শত্রুরাজ্যের একের সঙ্গে অপরের মতভেদ তৈরি করে রাজ্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলা বাধিয়ে দিতে হবে। সাম, দান, ভেদ—এই তিন উপায়ই বিফল হয়ে গেলে তখন দণ্ডের ব্যবস্থা অর্থাৎ আক্রমণ। সেজন্য অবশ্য নিজেকে আগে থেকেই তৈরি করতে হবে। সাম, দান, ভেদের প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ের মধ্যেই শত্রুরাজ্য আক্রমণ করার মতো শক্তি সঞ্চয় করে নিতে হবে।

ধৃতরাষ্ট্র যে এই চারটি মোক্ষম উপায়ের কথা জানেন না, তা মোটেই নয়। তিনি এতদিন সিংহাসনে বসে রাজ্য চালাচ্ছেন, বিশেষত অন্ধত্বের দরুন তাঁর বাস্তববোধ কিছু কম হলেও তাত্ত্বিকতার ক্ষেত্রে তিনি কিছু কম পোক্ত নন। কিন্তু তিনি যা জানেন, অথবা রাজনীতি শাস্ত্রেও যা বলে, তা হল—সাম-দান ইত্যাদির ক্রমিক প্রয়োগ। অর্থাৎ প্রথমটায় কাজ না হলে দ্বিতীয়টা অথবা দ্বিতীয় উপায় সফল না হলে তৃতীয়টার প্রয়োগ। কিন্তু একই সঙ্গে চারটি উপায়ের প্রয়োগ—এ তো বড়ো সাংঘাতিক কথা। ধৃতরাষ্ট্র তাই লজ্জা না করে বলেই ফেললেন—বামুন ঠাকুর! সাম, দান, ভেদ, দণ্ডের মাধ্যমে কীভাবে শত্রু দমন করতে পারি, সেটা একটু পরিষ্কার করে বলুন তো—

তন্মে ব্রূহি যথাতথম্।

কণিক বললেন—দেখুন মহারাজ! এ জিনিস বোঝাতে গেলে আপনাকে একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হবে। আপনি বরং আমার কাছে একটা গল্প শুনুন। গল্পের মধ্যে কল্পনা আছে অবশ্যই, কিন্তু সেই কল্পনা শুধু গল্প বলার জন্যই। নইলে আসল রাজনীতির বিবরণ বা যথার্থতা এইরকমই। শুনুন তাহলে—এক বনে একটি শেয়াল থাকত। শেয়ালটি নীতিশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র দুইই খুব ভালো জানত। এ গল্প তার সম্বন্ধে—

জম্বুকস্য মহারাজ নীতিশাস্ত্রার্থদর্শিনম্।

এই শৃগাল অবশ্যই রাজনৈতিক নেতার প্রতীক। অর্থদর্শী মানেই নিজের লাভ, নিজের সমৃদ্ধি তথা প্রতিপত্তি বিস্তারের উপায় যার জানা আছে। স্বার্থলাভের উপায়জ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শৃগালের বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা—

কৃতপ্রজ্ঞঃ শৃগালঃ স্বার্থপণ্ডিতঃ।

এই সব মিলেই একজন সার্থক রাজনীতিবিদের জীবন-চর্যা চলে।

কণিক বলে চললেন—এই বনবাসী শেয়ালের চারজন বন্ধু। এক বন্ধু বাঘ, দ্বিতীয় বন্ধু একটি ইঁদুর, তৃতীয় জন একটি নেকড়ে আর চতুর্থ বন্ধু হল একটি বেজি। চারজনকে নিয়ে শেয়াল ভালই আছে, ঠিক যেমন একজন ধূর্ত রাজা তাঁর চারপাশে প্রবল, দুর্বল এবং নিজের সমান শক্তিসম্পন্ন রাজাদের সঙ্গে নিয়েই চলেন।

একদিন হল কী, সেই বনের মধ্যে একটি বিশাল এবং বলিষ্ঠ হরিণ দেখা গেল। নধরকান্তি হরিণটিকে দেখে সকলেরই মাংস খাবার লোভ হল বটে, কিন্তু শেয়াল অন্তত মুখে কিছু বলল না। বাঘ যেহেতু এই পাঁচ জনের মধ্যে অসীম শক্তিধর, অতএব সে কারও তোয়াক্কা না করেই দু-একবার

হরিণটিকে ধরার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সে ব্যর্থ হয়েছে। বাঘই যেখানে পারেনি সেখানে অন্যেরা তো কোন ছাড়।

হরিণটিকে মাঝে-মাঝেই দেখা যাচ্ছে, তাকে দেখে খাবার লোভও হচ্ছে, অথচ তাকে ধরা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় পাঁচ-জনের মন্ত্রণাসভা বসল আর মন্ত্রণাসভায়—কে না জানে, সবার আগে শেয়ালই কথা বলবে। কারণ তার বুদ্ধি বেশি। শেয়াল বলল—দেখ ভাই বাঘ! তুমি এই হরিণটাকে মারবার জন্য বার বার চেষ্টা করেছ—

অসকৃদ্ যতিতো হ্যেষ হন্তুং ব্যাঘ্র বনে ত্বয়া।

কিন্তু হরিণটা যেমন জোয়ান, যেমন বেগবান, তেমনই তার বুদ্ধি। তুমি তাই পারনি ধরতে। কিন্তু হরিণটা আমাদের চাইই চাই। তোমরা আমার বুদ্ধি শোনো। হরিণটা যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তখন আমাদের এই ইঁদুর-বন্ধু নিঃশব্দে গিয়ে ওর চারখানা পায়ের গোড়ালির মাংস টুকিয়ে টুকিয়ে খেয়ে নেবে। পরের দিন দেখবে—ওর আর দৌড়বার অত ক্ষমতা থাকবে না। এরপর যে শক্তি এবং বেগে হরিণ দৌড়বে, তাতে আমাদের বাঘ-মশায়ের কোনো অসুবিধেই হবে না হরিণটাকে ধরতে। একবার ধরা পড়লে আমরা তখন সকলে মিলে প্রেমানন্দে হরিণটাকে খাব—

ততো বৈ ভক্ষয়িষ্যামঃ সর্বে মুদিতমানসাঃ।

শেয়ালের বুদ্ধি সকলের বেশ পছন্দ হল। নির্দিষ্ট কর্তব্য অনুসারে ইঁদুর সময় বুঝে ঘুমন্ত হরিণের পায়ে এমন মৃদু-তীক্ষ্ণ কামড় লাগাল যে হরিণ বুঝতেও পারল না যে, তার চারখানি পা-ই ভীষণ রকমের কমজোরি হয়ে গেল। বাঘের কোনো অসুবিধেই হল না পরের দিন। সে সাবহেলে দু-চার লাফেই ধরে ফেলল হরিণটিকে—

মূষিকাভক্ষিতৈঃ পাদৈর্মৃগং ব্যাঘ্রো'বধীত্তদা।

হরিণটির বিশাল করুণ দেহখানি নিথর হয়ে যেতেই—

অচেষ্টমানস্তু ভূমৌ মৃগকলেবরম্—

শেয়াল এবার চার বন্ধুকে বলল—এই হরিণটাকে আমি দেখে রাখছি। তোমার কোনো চিন্তা নেই। তোমরা নদীতে গিয়ে ভালো করে স্নান-টান করে এসো। তারপর শান্তিতে মাংস ভোজন করা যাবে—

স্নাত্বাগচ্ছত ভদ্রং বো রক্ষামীত্যাহ জম্বুকঃ।

মহাভারতের কবি স্বকণ্ঠে বলেননি বটে, তবে বেশ বোঝা যায়—এ পর্যন্ত গল্প যতটুকু এগিয়েছে, তা হল সাম এবং দানের পরিসর। অর্থাৎ শেয়াল প্রথম দিকে যে মন্ত্রণা দিয়েছে, যেভাবে দুর্বলতর শক্তি ইঁদুরকে সে কাজে লাগিয়ে সকলের বিশ্বাস উৎপাদন করেছে, তার মধ্যে শেয়ালের মধুর ব্যবহার, সকলের জন্য ভাবনা দেখানো তো আছেই, উপরন্তু বন্ধুদের স্নান করে ফিরে না আসা পর্যন্ত মৃত পশুটিকে আগলে রাখার ভার নিয়ে সে তার বদান্যতা এবং দানের প্রবৃত্তিও ফুটিয়ে তুলেছে। সোজা কথায় এখানে সাম-দানের প্রয়োগ ঘটল প্রায় একই সঙ্গে, অবশ্য এটা কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয় নয়, বিষয়টি একটি মৃত পশুর আহার-সংক্রান্ত, কাজেই সাম এবং দানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান তত নেই। কিন্তু বিষয়টা রাষ্ট্রিক না হলেও রাজনৈতিক বটে। কাজেই রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান কিছু বাড়লেও বাড়তে পারে বটে, কিন্তু তাই বলে যুগপৎ সাম-দানের প্রয়োগ হতে পারবে না—তা মোটেই নয়। বরঞ্চ প্রাচীন রাজনীতির বিশেষজ্ঞরা সাম-দানের প্রক্রিয়াটি খুব তাড়াতাড়ি মিটিয়ে নিতে বলেন, কারণ তাতে পরবর্তী উপায় দুটি নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কণিকের বলা উপাখ্যান অনুযায়ী বাঘ খুব তাড়াতাড়িই নদীতে স্নান করে এল। পাঁচজনের মধ্যে সেই সবচেয়ে বলশালী, অতএব মাংসের ভাগটাও তার সবচেয়ে বেশি চাই বলেই হয়তো সে সবার আগে স্নান করে ফিরল—

অথাজগাম পূর্বন্তু স্নাত্বা ব্যাঘ্রো মহাবলঃ।

কিন্তু এইবার শুরু হল প্রাজ্ঞ শৃগালের আসল খেলা। সম্পূর্ণ হরিণটাকেই সে একা আত্মসাৎ করতে চায়। অতএব পাঁচজনে স্নান করতে যেতেই যে সময়টুকু সে পেল, তার মধ্যেই শেয়াল তার ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলল। সে ভয়ঙ্কর রকমের চিন্তার ভাণ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল। বাঘ স্নান করে এসে শেয়ালের এই চিন্তাকুল অবসন্ন ভাব দেখে—চিন্তাকুলিতমানসম্ —নিজেই চিন্তাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কী এত ভাবছ, পণ্ডিত! আমাদের মধ্যে তুমিই হলে সবচেয়ে বুদ্ধিমান। সমস্যা হলে তোমার কাছে সমাধান নেই এমন তো হতেই পারে না—কাজেই চিন্তা কিসের?

কিং শোচসি মহাপ্রাজ্ঞ ত্বং নো বুদ্ধিমতাং বরঃ।

আজকে আমরা সবাই মিলে মহানন্দে মাংস খাব।

শেয়াল বলল—সে তো বেশ ভালই হত, ভাই! কিন্তু আমাদের ওই ইঁদুর-ভায়া এমন একটা কথা বলে গেল, যা তোমাকে বলতেও আমার সংকোচ হচ্ছে, অথচ না বলেও পারছি না। আমার এত চিন্তা তো সেই জন্যই। বাঘ বলল—আহা বলই না কী বলেছে। শেয়াল বলল—ওইটুকু পুঁচকে ইঁদুর! সে কি না এত বড়ো একটা কথা বলে গেল! শুনবে সে কথা? ইঁদুরটা এই একটু আগে এসে আমায় বলে গেল—ধিক্ তোমাদের বাঘ-মশাইকে, আর ধিক্ তার শক্তিকে? লজ্জা বলে যদি কোনো জিনিস থাকে ওই বাঘের? ওই হরিণটাকে মারল কে? আমি। আমি মেরেছি—

ধিগ্‌বলং মৃগরাজস্য ময়াদ্যায়ং মৃগো হতঃ।

ও তো কতবার চেষ্টা করেছে, পেরেছে? আমার শক্তির ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে যে, সে আজ গর্জন করে বলছে—মাংস খাবে। ছি ছি! লজ্জাও করে না? তুমি তাকে বলে দিও, পণ্ডিত—অমন মাংস আমি ছুঁয়েও দেখি না। আমি হরিণ মেরে দিয়েছি, এখন ও মাংস তোমার বাঘই খাক, অত গর্জন করার দরকার নেই—

গর্জমানস্য তস্যৈবমতো ভক্ষ্যং ন রোচতে।

শেয়াল তার প্রথম ভেদনীতি প্রয়োগ করল এবং সফল হল। সত্যিই তো হরিণ মারার ব্যাপারে ইঁদুরের অবদান আছে। আর বাঘের মতো প্রবল শক্তিশালীর পক্ষে ইঁদুরের এই সাহায্য গ্রহণ লজ্জারই বটে। বাঘ স্বীকারও করল সে কথা। তার নিজের শক্তির ব্যাপারে সে সর্বদাই সচেতন, একজন অতি প্রবল রাজার মতোই আত্মসচেতন। অথচ হরিণ মারার ব্যাপারে ক্ষুদ্র-ইঁদুরের সাহায্য সে নিয়েছে। বাঘ অতএব একটু সলজ্জেই শেয়ালকে বলল—ইঁদুর যখন এ কথা বলেই গেছে, তখন তুমি আমাকে সে কথা সময়-মতো জানিয়ে খুবই ভালো করেছ—

কালে হ্যস্মিন্ প্রবোধিতঃ।

তুমি আমাকে আমার আত্মসম্মান বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছ। তোমার ইঁদুরকে বলো—আর তার সাহায্যের দরকার হবে না। আমি আমার নিজের ক্ষমতাতেই বনের পশু মারতে পারব যথেষ্ট—

স্ববাহুবলমাশ্রিত্য হনিষ্যে'হং বনেচরান্—

এবং আমারও খাবার জুটবে, আমার মাংসের অভাব হবে না—খাদিষ্যে তত্র মাংসানি।

রাগের চেয়ে বাঘের অভিমান হল অনেক বেশি। ইঁদুরের কথায় তার মানে লেগেছে। সে আর বাক্য-ব্যয় না করে নিজের পুরুষকার প্রমাণ করার জন্য বনে চলে গেল—

ইত্যুক্ত্বা প্রস্থিতো বনম্।

এইবার স্নান করে পরিপাটি হয়ে শেয়ালের সামনে উপস্থিত হল ছোট্ট ইঁদুর। ইঁদুরকে শেয়াল এমনিই মেরে ফেলতে পারত, কিন্তু তাতে বন্ধুদের মধ্যে নানা কথা উঠবে। ইঁদুরের উপকারের প্রসঙ্গও আসবে। রাজনীতিকরা দুর্বল শত্রুকেও রাজনৈতিকভাবেই মোকাবিলা করে—সেটা দেখানোর জন্য ইঁদুরের ওপরেও ভেদনীতি প্রয়োগ করল শেয়াল।

শেয়াল বলল—দেখ ভাই ইঁদুর! তুমি এসে গেছ, ভালই হয়েছে। দেখ ভাই! একদিন মাংস খাওয়াটা খুব বড়ো কথা নয়। আমি চাই তোমার সর্বাঙ্গীণ সর্বকালীন মঙ্গল হোক এবং সেইজন্যই একটা কথা তোমায় না বলে পারছি না—

শৃণু মূষিক ভদ্রং তে নকুলো যদিহাব্রবীৎ।

ওই যে বেজি! হরিণ মারার ব্যাপারে সে কী করেছে? এতটুকু সাহায্যও তো করেনি। এদিকে সে কী বলছে জান? বলছে—ওই হরিণের মাংস আমি খাব না। ওতে বাঘের মুখ লেগেছে, ও মাংস বিষ হয়ে গেছে আমার কাছে—

মৃগমাংসং ন ভক্ষেয়ং গরমেতন্ন রোচতে।

আমি বরং নতুন অনুচ্ছিষ্ট মাংস খাব। আমি ওই ইঁদুরটাকে খেতে চাই, আপনি অনুমতি করুন—

তদ্ ভবান্ অনুমন্যতাম্।

শেয়াল বলল—আমি অনুমতি দিইনি। কিন্তু সে আমার কথা শুনবে বলে মনে হয় না। ইঁদুর শেয়ালের কথা শুনে ভয়ে লাফ দিয়ে গর্তে ঢুকে পড়ল। এর পরে উপস্থিত হল সেই নেকড়ে বাঘ। আমরা একে নেকড়ে বাঘ বলেছি বটে, তবে এ ঠিক নেকড়ে কি না সন্দেহ আছে। সংস্কৃতে আছে 'বৃক'। আমাদের ধারণা—বৈদিক যুগ থেকে যে 'বৃক' শব্দটি নেমে আসছে—সেই বৃক বলতে কুকুর-জাতীয় বন্য তথা হিংস্র প্রাণীকেই বোঝায়।

সেই 'বৃক' আসতেই শেয়াল বলল—দেখ ভাই। সামনে তোমার ভীষণ বিপদ। কী কারণে

জানি না, বাঘ তোমার ওপর ভীষণ রেগে গেছেন। এর ফল খুব ভাল হবে না বলেই মনে হচ্ছে। তিনি এইমাত্র আমায় বলে গেলেন—এই কেঁদোটাকে আমি দেখে নেব। তিনি আবার সস্ত্রীক আসছেন তোমার ওপর রাগ মেটানোর জন্য। এ কথা শোনার পর তোমার যা কর্তব্য মনে হয় করো—

সকলত্রস্তু-ইহায়াতি কুরুষ্ব যদনন্তরম্।

শেয়ালের কথা শুনে কেঁদো বাঘ আর এক মুহূর্তও সেখানে থাকা ঠিক মনে করল না। সেও পালাল।

এইবার স্নান-পরিপাটি সেরে উপস্থিত হল বেজি। শেয়াল জানে—বড়ো বড়ো শত্রুরা তার রাজনৈতিক বুদ্ধির কাছে পরাজিত হয়েছে। বেজি হল শেষ শত্রু এবং সে তার চেয়ে অনেক দুর্বল। অতএব আর কাল বিলম্ব নয়। এবার সে নিজেই ভয় দেখাবে। বেজিকে সে বলল—দেখ! ওই সব বাঘ, কেঁদো বাঘ—এদের সবাইকে আমি যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছি। তারা এখন আমার ত্রিসীমানার মধ্যে নেই। সব পালিয়েছে—

নির্জিতাস্তে'ন্যতো গতাঃ।

তোমার যদি ইচ্ছে হয় তো আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো এবং আমাকে জয় করে যত ইচ্ছে মাংস খাও—

মম দত্ত্বা নিযুদ্ধং ত্বং ভুঙ্ক্ষ্ব মাংসং যথেপ্সিতম্।

অর্থাৎ সময় বুঝে শেয়াল এখন দণ্ড প্রয়োগ করছে।

বেজি বুঝল সে শেয়ালের সঙ্গে পারবে না। অতএব যুদ্ধ না করেই সে বলল—বাঘ হল পশুদের রাজার সমান, তাকে তুমি হারিয়েছ, তারপর কেঁদো বাঘ, এমনকী ওই মহা-বুদ্ধিমান ইঁদুরটাকেও তুমি জয় করেছ। এরপর আমি আর তোমার সঙ্গে কোন মুখে যুদ্ধ করব। তুমি সবার চাইতে বড়ো বীর—

নির্জিতা যৎ ত্বয়া বীরা স্তস্মাদ্‌বীরতরো ভবান্।

—আমার ক্ষমতা নেই বাপু তোমার সঙ্গে লড়ব। এই কথা বলে বেজিও পালাল। রাজনৈতিক বুদ্ধিতে সাম-দান ইত্যাদি উপায়ের মাধ্যমে সামান্য শেয়াল সবাইকে ঠকিয়ে দিয়ে নিজে একা সেই মৃগমাংস ভক্ষণ করল।

শেয়াল-বাঘের গল্প বলে এবার কণিক ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—রাজনীতি করতে হলে এই শেয়ালের মতো ব্যবহার করতে হবে, মহারাজ! ভীরু লোকটাকে সরিয়ে দেবেন ভয় দেখিয়ে আর প্রবলতর শত্রুর কাছে হাত জোড় করবেন—

ভয়েন ভেদয়েদ্ ভীরুং শূরমঞ্জলিকর্মণা।

লুব্ধ-লোভী শত্রুকে ধন-সম্পত্তি কিছু ছেড়ে দেবেন। আর দুর্বলের ওপর বলপ্রকাশ করবেন। আরও একটা কথা—এই রাজনীতির ব্যাপারে ভাই-বন্ধু, বাপ-ছেলে, গুরু-গুরুবৎ কিচ্ছু নেই। এঁরা শত্রু হয়ে দাঁড়ালে এঁদের ছেড়ে দেবার কোনো প্রশ্ন নেই। মারতে হবে। উন্নতি করতে হলে এই নিয়ম জানবেন—

রিপুস্থানেষু বর্তন্তো হন্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা।

এত ক্রূর নৃশংস রাজনীতির প্রয়োগ করতে গিয়ে মানুষের মধ্যে যদি ভাবের এবং আচরণের বিকার ঘটে, অতএব সে ব্যাপারেও সাবধান করে দিলেন কণিক। বললেন—দেখুন মহারাজ! অন্তরে আপনার হাজার রাগ থাকুক, বাইরে সেটা প্রকাশ করবেন না। সব সময় কথা বলবেন হেসে। একজনের ওপর রাগ থাকলেও এমনভাবে তাকে গালাগালি দেবেন না যাতে তার গৌরব নষ্ট হয়—

ক্রুদ্ধো'প্যক্রুদ্ধরূপঃ স্যাৎ স্মিতপূর্বাভিভাষিতা।

মনে রাখবেন—প্রহার করার সময়েও হাসতে হবে।

কণিক আরও অনেক উপদেশ দিয়েছেন ধৃতরাষ্ট্রকে এবং এই সমস্ত উপদেশকেই 'ম্যাকিয়াভেলিয়ান' তো বলা যায়ই, বরং আর বলা যায়, সেগুলি নির্মম, নৃশংস এবং ক্রূর। ধৃতরাষ্ট্র সব শুনলেন এবং শোনার পরে যে খুব খুশি হয়ে উঠলেন, তা নয়। কণিক বলেছিলেন—পাণ্ডবরা আপনার পরম আত্মীয় হলেও তারা আপনার ছেলেদের থেকে বেশি বলবান। কাজেই ছেলেদের সঙ্গে মিলে আপনি এমন উপায় বার করুন, যাতে পাণ্ডবদের কাছ থেকে আপনার কোনো ভয় না থাকে—

যথা ভয়ং ন পাণ্ডুভ্যস্তথা কুরু নরাধিপ।

[মহা (k) ১.১৪০ অধ্যায়; (হরি) ১.১৩৫ অধ্যায়]

□ মহাভারতে কণিঙ্ক-ভারদ্বাজের নীতিতে আরো কিছু অন্যরকম উপদেশ আছে, যেগুলি নীতি-উপদেশ হলেও, সেগুলি বেশ তীক্ষ্ণ এবং সেই উপদেশের অনেকগুলি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়, যদিও অর্জুন তখন যুদ্ধবিষণ্ণ যুধিষ্ঠিরকে রাজকর্মে উদ্যোগী

করার জন্যই কথাগুলি বলেছিলেন। এইরকম একটি নীতিবাক্য হল—মৎস্যঘাতী পুরুষ যেমন বঁড়শী দিয়ে মাছের গলায় না বিঁধিয়ে মাছ ধরতে পারে না, তেমনই দারুণ এবং তীক্ষ্ণ কর্ম না করে অর্থাৎ শত্রুকে বধ না করে কখনোই বিপুল সম্পদ লাভ করা যায় না।

কণিঙ্ক ভারদ্বাজের আর একটি অসামান্য উপদেশ হল—যে কাজের শেষ দেখতে পাবে না, অর্থাৎ যেখানে পার পাবে না, সেখানে পার হওয়ার চেষ্টাই করবে না, অর্থাৎ সেখানে কাজই আরম্ভ করবে না। যে জিনিস অন্য লোক আবারও হরণ করবে, সে বস্তু হরণ করার চেষ্টা করবে না, যে শত্রুর মূল উৎপাটন করতে পারবে না, সে শত্রুকে উপদ্রব করার চেষ্টা কোরো না এবং আপন শক্তিবলে যে শত্রুর মাথা কেটে ফেলতে পারবে না, তাকে প্রহার করতেও যেও না।

ন তত্তরেদ্‌যস্য ন পারমুত্তরেৎ
ন তদ্ধরেদ্ যৎ পুনরাহরেৎ পরঃ।
ন তৎ খনেদ্ যস্য মূলমুদ্ধরেৎ
ন তং হন্যাদ্ যস্য শিরো ন পাতয়েৎ॥

[মহা (k) ১২.১৪০ অধ্যায়; (হরি) ১২.১৩৬ অধ্যায়; পঠিতব্য : Niccolo Machiavelli, The Prince, New York, The Modern Library, 1940]

কণিকনীতি *[দ্র. কণিক]*

কণিশ ভগবান শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম। *[দ্র. কপিল, ৭]*

কন্টকার মৎস্য পুরাণে এই জনপদ তথা জনজাতিটির উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের উত্তরে অবস্থিত জনপদগুলির সঙ্গে কন্টকারের নাম উল্লিখিত হয়েছে। লক্ষণীয়, বৃহৎ সংহিতায় উত্তরের জনপদগুলির নামের যে তালিকা পাওয়া যায় সেখানে কণ্ঠধান নামে একটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এই কণ্ঠধান এবং পুরাণে উল্লিখিত কন্টকারকে অভিন্ন বলে মনে করেছেন অনেক পণ্ডিত।

[মৎস্য পু. ১১৪.৪২; বৃহৎ সংহিতা ১৪.২৬]

কন্টকিনী স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.১৬; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র. শ্লোক সংখ্যা ১৬ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

কণ্ঠকাল একজন ঋষি। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে একজন শ্রুতর্ষি হিসেবে তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.৫]

কণ্ঠধান *[দ্র. কন্টকার]*

কণ্ডরীক মহাভারতের শান্তিপর্বে একটি শ্লোকে কণ্ডরীক এবং ব্রহ্মদত্তের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে—

কণ্ডরীকো'থ রাজা চ ব্রহ্মদত্তঃ প্রতাপবান্।

পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ এই শ্লোকের অনুবাদ করতে গিয়ে ব্রহ্মদত্তকে কণ্ডরীকগোত্রীয় বলেছেন। 'কণ্ডরীক বংশীয় রাজা ব্রহ্মদত্ত'—এমন অনুবাদও পাওয়া যায়। তবে মহাভারতের শ্লোক থেকে কণ্ডরীক এবং ব্রহ্মদত্তের মধ্যে কী সম্পর্ক ছিল—তা নিয়ে সংশয় তৈরি হলেও মহাভারতের খিল হরিবংশ এবং মৎস্য পুরাণের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কণ্ডরীক ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং দক্ষিণ পঞ্চালের রাজর্ষি ব্রহ্মদত্তের অন্যতম মন্ত্রী।

পুরাণে বর্ণিত কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—মহর্ষি কৌশিকের সাতটি অনাচারী, দুষ্টবুদ্ধি পুত্র ছিল। তবে এই কৌশিক স্বয়ং কৌশিক বিশ্বামিত্র নাকি বিশ্বামিত্র বংশীয় অন্য কোন ঋষি—পুরাণে তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। ওই সাত ঋষিপুত্র মহর্ষি গার্গ্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। একদিন গুরুর আদেশে সাত ঋষিপুত্র গুরুর কপিলা গাভী ও তার বাছুরটিকে চরাবার জন্য বনে নিয়ে গিয়েছিলেন। পথে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে তাঁরা কপিলা গাভীটিকেই কেটে রান্না করে খাবার পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু গোহত্যা করা পাপ—একথা ভেবে সাত ভাইয়ের মধ্যে দু-জন একাজে সম্মত হলেন না। তখন আর এক ভাই পরামর্শ দিলেন—গোরুটিকে পিতৃগণের শ্রাদ্ধের জন্য বলি দেওয়া হোক। তাহলে আর অধর্ম হবে না। এমন পরিকল্পনা করে তাঁরা সেই কপিলা গাভীটিকে পিতৃগণের উদ্দেশে সমর্পণ করলেন। এরপর আশ্রমে ফিরে তারা গুরুকে বললেন—গোরুটি বাঘের হাতে নিহত হয়েছে, আমরা বাছুরটিকে ফিরিয়ে এনেছি।

সরল ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিথ্যাচার করার পাপে পরজন্মে সাত ভাই ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করলেন। কিন্তু পিতৃগণের অর্চনা করার পুণ্যে তাঁরা জাতিস্মর হলেন, পূর্বজন্মের পাপ স্মরণ করে তাঁরা পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন।

ফলে, পরজন্মে তাঁরা জাতিস্মর মৃগ রূপে জন্মগ্রহণ করলেন, তার পরের জন্মে তাঁরা মানস-সরোবরে চক্রবাক এবং তারপরের জন্মে হংসরূপে জন্মালেন। এই সময়ে একদিন পুরুবংশীয় রাজা বিভ্রাজকে দেখে একটি হাঁস মনে মনে ভাবল—আমি যদি এমন রাজা হতাম! আরও দুটি হাঁস সেই ভাবনার কথা শুনে বলল—আমরা তাহলে তোমার মন্ত্রী হতাম। এই ভাবনার ফলস্বরূপ সপ্তম জন্মে একজন হংস রাজর্ষি ব্রহ্মদত্ত হলেন এবং আর দুই হংস, যাঁরা মন্ত্রী হবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁরা কণ্ডরীক এবং বাভ্রব্য পাঞ্চাল—দুই মন্ত্রী রূপে জন্ম নিলেন।

সাত ভাইয়ের মধ্যে তিনজন যোগভ্রষ্ট হলেন দেখে বাকি চার ভাই খুব দুঃখিত হলেন। ব্রহ্মদত্তের কালেই তাঁরা চার সহোদর ব্রাহ্মণ হিসেবে জন্ম নিলেন ব্রহ্মদত্তের রাজধানী কাম্পিল্য নগরীতে। অল্প বয়সেই তাঁরা সংসার ত্যাগ করে তপস্যা করতে গেলেন যাবার আগে পিতাকে বলে গেলেন কণ্ডরীক প্রভৃতির মুক্তির উপায়।

কণ্ডরীকের সম্পর্কে হরিবংশ পুরাণে বলা হয়েছে যে, ইনি সামবেদ এবং যজুর্বেদে পারদর্শী ছিলেন।

একদিন রাজা ব্রহ্মদত্ত, কণ্ডরীক এবং পাঞ্চাল বাভ্রব্য একত্রে নগরের রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এই সময় সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁদের শোনালেন চার পুত্রের কাছ থেকে শোনা সেই শ্লোক—যে সাতজন প্রথমে দশার্ণ দেশে ব্যাধ হয়ে, পরে কালঞ্জর পর্বতে মৃগ হয়ে, শরদ্বীপে চক্রবাক হয়ে, অবশেষে মানস সরোবরে হংস হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে চারজন মুক্তির পথে প্রস্থান করেছে। তোমরা অবসন্ন হয়ে আছ কেন?

সপ্ত ব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ।
চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে॥
তে'ভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
প্রস্থিতা দীর্ঘমধ্বানং যূয়ং কীমবসীদথ॥

একথা শুনেই ব্রহ্মদত্ত, কণ্ডরীক ও পাঞ্চালের পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ল। তাঁর রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে তপস্যার জন্য বনে গমন করলেন।

[মহা (k) ১২.৩৪২.১০৫-১০৬; (হরি) ১২.৩২৮.২৯০-২৯১; হরিবংশ পু. ১.২১-২৪ অধ্যায়; মৎস্য পু. ২০-২১ অধ্যায়]

কণ্ডু একজন বেদবিদ মহর্ষি। গোমতী নদীর তীরে তাঁর আশ্রম ছিল। সেখানে তিনি সুদীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করেন। কণ্ডুর তপস্যায় ভীত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য প্রম্লোচা নামে এক অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। প্রম্লোচার অপরূপ সৌন্দর্য্য মহর্ষি কণ্ডুকে একান্ত মোহিত করল। তিনি তপস্যা ত্যাগ করে অপ্সরা প্রম্লোচার সঙ্গে মন্দর পর্বতে বহুকাল বিহার করলেন। এরপর একসময় অপ্সরা প্রম্লোচা স্বর্গে যাবার অনুমতি চাইলে মুগ্ধ ঋষি তাঁকে যাবার অনুমতি দিলেন না। এইভাবে মহর্ষির অনুরোধে অপ্সরা প্রম্লোচা বহুবছর তাঁর সঙ্গে অতিবাহিত করলেন। কিন্তু কোনো সময়েই মুনি অপ্সরাকে স্বর্গে ফিরে যাবার অনুমতি দিতেন না, প্রম্লোচাও ঋষির বিনা অনুমতিতে তাঁর আশ্রম ত্যাগ করতে পারলেন না। অবশেষে একদিন সন্ধ্যায় মহর্ষি কুটীরের বাইরে আসার চেষ্টা করতেই অপ্সরা তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ঋষি কিন্তু ব্যস্তভাবে বললেন—দিন শেষ হল। সন্ধ্যা উপাসনার সময় হয়েছে। অতএব এখনই না গেলে নয়। অপ্সরা তখন ঋষিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—একদিন মাত্র নয়, তপস্যা ও সন্ধ্যা উপাসনা না করেই ঋষি বহুশত বৎসর কাটিয়েছেন। একথা শুনে ঋষি কণ্ডু প্রম্লোচাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি কতদিন তোমার সঙ্গে আনন্দ করলাম? অপ্সরা বললেন—নয়শত সাতাশী বৎসর ছয় মাস তিন দিন। একথা শুনে ঋষির মোহভঙ্গ হল। অপ্সরার প্রতি আসক্তিতে তাঁর সুদীর্ঘকালের তপস্যা নষ্ট হল ভেবে প্রথমে তিনি অনুতাপ করলেন, পরে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রম্লোচাকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করে আশ্রম থেকে বিতাড়িত করলেন। স্বর্গে ফিরে যাবার কালে প্রম্লোচা কণ্ডু ঋষির আহিত গর্ভ স্বেদবিন্দু রূপে বৃক্ষপত্রের ওপর ত্যাগ করলেন। বৃক্ষগণ সযত্নে সেই গর্ভ প্রতিপালন করল এবং তা থেকে মারিষা নামে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হল।

মহর্ষি কণ্ডু এরপর একাগ্রচিত্তে শ্রীহরি বিষ্ণুর আরাধনা আরম্ভ করলেন এবং শেষে ভগবান বিষ্ণুর নামাঙ্কিত পুরুষোত্তম ধামে গিয়ে কঠোর তপস্যা করে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

[বিষ্ণু পু. ১.১৫.১১-৫৯; গরুড় পু. ১.২৩০.৪১; ব্রহ্ম পু. ১৭৮.৬-১৯৩]

□ মহর্ষি কণ্ডুর একটি পুত্রসন্তান ছিল বলে রামায়ণে উল্লেখ আছে। ঋষিপুত্র মাত্র দশ বছর বয়সে দেহত্যাগ করলে পুত্রশোকে কাতর মহর্ষি যে অরণ্যে তাঁর আশ্রম অবস্থিত ছিল, সেই অরণ্যকেই অভিশাপ দিলেন। ঋষির অভিশাপে সেই অরণ্য বৃক্ষ, পশুপক্ষীহীন মরুপ্রায় অঞ্চলে পরিণত হল। হনুমান প্রভৃতি বানরগণ সীতার সন্ধান করতে করতে সেইস্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। *[রামায়ণ ৪.৪৮.৮-১৫]*

কণ্ডূতি স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসেবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.১৪; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র. খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮]

কণ্ব১ ঋগ্বেদে এবং অন্যান্য গ্রন্থে এঁকে ঘোরপুত্র বা 'ঘৌর' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ঘোর পুত্র কণ্ব ঋগ্বেদের বহু সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। মহাভারতে এই ঘোর ঋষি সরাসরি অঙ্গিরার পুত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদেও আমরা মহর্ষি ঘোরের উল্লেখ পাই অঙ্গিরার বংশজাত বা 'আঙ্গিরস' হিসেবেই। সুতরাং বেদে উল্লিখিত ঘোরপুত্র কণ্বকেও 'আঙ্গিরস' হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। পুরাণেও এই ঘোরপুত্র কণ্বকেই সম্ভবত অঙ্গিরার বংশজাত বৈদিক ঋষি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। শুক্লযজুর্বেদের প্রবক্তা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতম শিষ্যও ছিলেন তিনি। ঋগ্বেদে মহর্ষি প্রস্কণ্বকে এই ঘোরপুত্র কণ্বের পুত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। *[দ্র. ঘোর]*

[ঋগ্বেদ ১.৩৬-৪৯ সূক্ত; বৃহদ্দেবতা ৬ অধ্যায়; মহা (k) ১৩.৮৫.১৩১; (হরি) ১৩.৭৪.১২৯; ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩.১৭.৬; বায়ু পু. ৫৯.১০০; ৬১.২৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১০৯; ১.৩৫.২৮]

কণ্ব২ বৈদিক গ্রন্থে একাধিক মহর্ষি কণ্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁদের প্রত্যেকের পরিচয় বেদে পৃথক পৃথক ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই আমরা একজন কণ্বকে পাচ্ছি যাঁকে নার্ষদ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। *[ঋগ্বেদ ১.১১৭.৮]*

অথর্ব বেদেও আমরা এই নার্ষদ কণ্বের নামোল্লেখ পাই। *[অথর্ববেদ ৪.১৯.২]*

তৈত্তিরীয় সংহিতায় আমরা জনৈক কণ্ব ঋষির উল্লেখ পাচ্ছি যাঁকে শ্রায়স কণ্ব নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। *[তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫.৪.৭.৫]*

কণ্ব৩ ঋগ্বেদে আমরা আরও একজন কণ্ব ঋষির উল্লেখ পাই যাঁকে মহর্ষি মেধাতিথির পিতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের একাধিক সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন মহর্ষি মেধাতিথি, যাঁকে কণ্বের পুত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পণ্ডিত Pargiter এই কণ্বকে চন্দ্রবংশীয় অজমীঢ়ের পুত্র কণ্বের সঙ্গে একাত্মক বলে মনে করেছেন। *[ঋগ্বেদ ১.১২-২৩ সূক্ত; AIHT (Pargiter) p. 225-227]*

□ পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী চন্দ্রবংশীয় রাজর্ষি অজমীঢ়ের ঔরসে কেশিনীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র ছিলেন কণ্ব। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। পুরাণ মতে, অজমীঢ়ের বংশের এই ধারাটি ক্ষত্রিয়বৃত্তি ত্যাগ করে এবং তপস্যার ফলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। কণ্ব এবং তাঁর বংশধররা কাণ্বায়ন দ্বিজ নামে খ্যাত ছিলেন।

বিষ্ণু পুরাণ এবং ভাগবত পুরাণে কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণকুলের উৎপত্তি সম্পর্কে কিছু ভিন্ন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। অজমীঢ়ের পুত্র কণ্ব শকুন্তলার পুত্র ভরতের উত্তরপুরুষ। কিন্তু ভাগবত এবং বিষ্ণু পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী কাণ্বায়ন দ্বিজকুলের প্রতিষ্ঠাতা কণ্ব ভরতের কিছু পূর্ববর্তীকালের। পুরুবংশীয় রাজা রন্তিনারের পুত্র অপ্রতিরথ। অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব। অপ্রতিরথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তংসুর পৌত্র ছিলেন দুষ্যন্ত। সুতরাং দুষ্যন্তর আমলে কণ্বের জীবিত থাকা কিছুই অসম্ভব নয়। ভাগবত পুরাণ কাণ্বায়ন দ্বিজকুলের প্রবর্তক এই কণ্বকেই স্পষ্টভাবে শকুন্তলার পালক পিতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বিষ্ণু পুরাণে শকুন্তলার পিতৃত্ব অবশ্য এই কণ্বের উপর স্পষ্টভাবে আরোপিত হয়নি। বরং বিষ্ণু পুরাণে একই অধ্যায়ে দুটি পৃথক শ্লোকে অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব এবং অজমীঢ়ের পুত্র কণ্ব-দুজনকেই কাণ্বায়ন দ্বিজকুলের প্রবর্তক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কাণ্বায়ন দ্বিজকুলের প্রবর্তক কণ্বের উপর শকুন্তলার পিতৃত্ব আরোপ করতে গিয়েই এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। শকুন্তলার কাহিনী মহাভারতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে মহর্ষি কণ্বের পরিচয় দিতে গিয়ে স্পষ্টই তাঁকে কাশ্যপ অর্থাৎ কশ্যপ বংশীয় বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মহাভারতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, শকুন্তলার পালক পিতা

ব্রহ্মচারী ছিলেন। ফলে বেদে ও পুরাণে মেধাতিথিকে যে কণ্বের ঔরসপুত্র বলা হচ্ছে, তিনি এবং কাশ্যপ কণ্ব একই ব্যক্তি নন বলেই মনে হয়। *[দ্র. কণ্ব$_4$]*

[বায়ু পু. ৯৯.১৬৯-১৭০; মৎস্য পু. ৪৯.৪৭; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.২, ১০; ভাগবত পু. ৯.২০.৬-১২]

□ রামায়ণ এবং মহাভারতের বিবরণে অবশ্য মেধাতিথিকে কণ্বের পুত্র বলা হয়নি, বরং কণ্বকেই মেধাতিথির পুত্র বলা হয়েছে—

কণ্বো মেধাতিথেঃ পুত্রঃ।

তাঁকে পূর্বদেশবাসী ঋষিদের মধ্যে অন্যতম বলা হয়েছে। রামচন্দ্রের রাজ্যভিষেকের সময় অযোধ্যার রাজসভায় আমরা তাঁর উপস্থিতির উল্লেখ পাই। মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লেখ আছে যে, তিনি রাজা উপরিচর বসুর অশ্বমেধ যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেছিলেন। মহাভারতের একাধিক শ্লোকে এই কণ্বকে বর্হিষদ (অর্থাৎ যিনি বর্হি বা কুশের আসনে শয়ন করেন) বলা হয়েছে। শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে দেখতে যে সব ঋষি-মহর্ষি উপস্থিত হয়েছিলেন মেধাতিথির পুত্র কণ্ব তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *[রামায়ণ ৭.১.২; মহা (k) ১২.২০৮.২৭; ১২.৩৩৬.৯; ১৩.২৬.৭; ১৩.১৫০.৩১; ১৩.১৬৫.৩৮; (হরি) ১২.২০২.২৭; ১২.৩২২.৯; ১৩.২৭.৭; ১৩.১২৮.৩০; ১৩.১৪৩.৩৬]*

□ অজমীঢ়ের বংশধর মহর্ষি কণ্বকেও 'আঙ্গিরস' বলা যেতে পারে। চন্দ্রবংশীয় রাজা ভরত দৌষ্যন্তি নিজের পুত্রদের প্রজাপালনের অযোগ্য বলে বিবেচনা করে অঙ্গিরাবংশীয় ভরদ্বাজ ভুমন্যুকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। মহর্ষি অঙ্গিরার বংশধারার সঙ্গে এই সময় থেকে চন্দ্রবংশীয় রাজ পরিবারের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সুতরাং অজমীঢ়কেও এই সূত্র থেকে 'আঙ্গিরস' বলা যেতে পারে। মৎস্য পুরাণে অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যেসব গোত্র প্রবর্তক ঋষির নাম উল্লিখিত আছে, তাঁদের মধ্যে অজমীঢ় অন্যতম। সূর্য ও চন্দ্র বংশীয় বহু রাজর্ষি পরবর্তীকালে ঋষিত্ব লাভ করেছেন। অজমীঢ়ও হয়তো সেই ধারার অন্যতম নাম। সেক্ষেত্রে আজমীঢ় কণ্বকেও 'আঙ্গিরস' হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। পণ্ডিত Pargiter এই দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার করে 'ঘোরপুত্র কণ্ব' এবং 'আজমীঢ় কণ্ব'—দুজনকেই অঙ্গিরার বংশের দুটি ধারা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। *[মৎস্য পু. ১৯৬.৪৭; AIHT (Pargiter) p. 225-227]*

কণ্ব$_4$ পুরুবংশীয় অপ্রতিরথের পুত্র। *[দ্র. কণ্ব$_3$]*

কণ্ব$_5$ কশ্যপবংশীয় জনৈক ঋষি। মহাভারতে এবং পরবর্তী সময়ের সংস্কৃত সাহিত্যে মহর্ষি কণ্বের নাম বিখ্যাত হয়ে আছে শকুন্তলার পালক পিতা হিসেবে। মেধাতিথির পিতা মহর্ষি কণ্ব (কণ্ব$_3$) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলেছি যে, পুরাণে তাঁকে শকুন্তলার পালক পিতা হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও তা সমর্থনযোগ্য নয়। তার কারণ মহর্ষি কণ্ব সম্পর্কে মহাভারতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, তিনি কাশ্যপ অর্থাৎ কশ্যপবংশীয় ছিলেন এবং তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন। ফলে মেধাতিথির পিতা কণ্ব এবং শকুন্তলার পালক পিতা একই ব্যক্তি হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের এই মতের সপক্ষে আরও জোরাল প্রমাণ পাই মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে যেখানে মালিনী নদী তীরস্থ আশ্রমবাসী কুলপতি মহর্ষি কণ্বকে স্পষ্টই 'কাশ্যপ' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে—

এষ খলু কাশ্যপস্য
কুলপতেরনুমালিনীতীরমাশ্রমো দৃশ্যতে।

মালিনী নদীর তীরে তাঁর পবিত্র তপোবন। একসময় এই তপোবনের নিকটবর্তী গভীর বনে মহর্ষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। তাঁর তপস্যায় ভীত দেবরাজ ইন্দ্র অপ্সরা মেনকাকে পাঠালেন বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্য। মেনকার সৌন্দর্য্য বিশ্বামিত্রকে মুগ্ধ করল, তাঁর তপস্যা ভঙ্গ হল। বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হল মালিনী তীরে। সদ্যোজাত সেই কন্যাকে ত্যাগ করে মেনকা ফিরে গেলেন স্বর্গে। এদিকে বনের মধ্যে সেই পরিত্যক্ত শিশুকন্যাকে মাংসাশী জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল বনের পাখিরা। পরম মমতায় অতি যত্নে আগলে রাখল সেই কন্যাটিকে। পরদিন মহর্ষি কণ্ব স্নান করতে গিয়ে সেই পরিত্যক্ত শিশুকন্যাকে উদ্ধার করেন এবং তাঁকে আশ্রমে নিয়ে এসে নিজের কন্যাসন্তান রূপে প্রতিপালন করতে লাগলেন। পরিত্যক্ত অবস্থায় বনের পাখিরা একে রক্ষা করেছিল বলে মহর্ষি কণ্ব কন্যার নাম রাখলেন শকুন্তলা—

নির্জনে তু বনে যস্মাচ্ছকুন্তৈঃ পরিবারিতা।
শকুন্তলেতি নামাস্যাঃ কৃতঞ্চাপি ততোময়া॥

মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতিতে চন্দ্রবংশীয় রাজা দুষ্যন্ত তপোবনে এসে শকুন্তলাকে দেখেন এবং তাঁর রূপে মুগ্ধ হন। শকুন্তলা দুষ্যন্তের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন মহর্ষি কণ্বের কন্যা বলে। দুষ্যন্ত জানতেন যে, মহর্ষি কণ্ব ব্রহ্মচারী। তাই কৌতূহলী হয়ে তিনি শকুন্তলার জন্ম পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। শকুন্তলা পিতা কণ্বের মুখে যেমন শুনেছিলেন, সেই কাহিনীই শোনালেন দুষ্যন্তকে। শকুন্তলা ক্ষত্রিয়ের কন্যা একথা জানতে পেরে দুষ্যন্ত তাঁকে পত্নীরূপে লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শকুন্তলা নিজেও দুষ্যন্তকে দেখে মুগ্ধ হয়ে ছিলেন। তবু বললেন—মহারাজ, পিতা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, তিনি এসে আমাকে আপনার হাতে সম্প্রদান করবেন। কিন্তু দুষ্যন্ত অপেক্ষা করতে সম্মত হলেন না। তখনই গান্ধর্ব বিবাহের প্রস্তাব দিলেন এবং শকুন্তলার সঙ্গে সঙ্গত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। শকুন্তলা অনেক চেষ্টা করেও দুষ্যন্তকে বারণ করতে পারলেন না। তখন বললেন—আপনি যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমার গর্ভে আপনার যে পুত্র হবে, আপনি তাকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন এবং আপনার পরে সেই পুত্রই রাজ্যলাভ করবে, তাহলেই আমি গান্ধর্ব বিবাহে সম্মত হব। শকুন্তলার প্রতি আসক্ত রাজা দুষ্যন্ত কোনো বিবেচনা না করেই প্রতিজ্ঞা করলেন। এরপর শকুন্তলার সঙ্গে সহবাসের পর শকুন্তলাকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার আশ্বাস দিয়ে দুষ্যন্ত তপোবন ছেড়ে চলে গেলেন।

গোটা ঘটনাটাই কণ্বের অনুপস্থিতিতে সংঘটিত হলেও তপোবলে তিনি সবই জানতে পারলেন। শকুন্তলা পিতার অনুমতির অপেক্ষা না করেই দুষ্যন্তকে পতিত্বে বরণ করেছেন জেনেও ঋষি ক্রুদ্ধ হলেন না। যথাসময়ে কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলার পুত্র সর্বদমন ভরতের জন্ম হল। শকুন্তলার পুত্র সর্বদমনের ছয় বছর বয়স হলে কণ্ব শকুন্তলা ও সর্বদমনকে হস্তিনাপুরে দুষ্যন্তের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। *[দ্র. শকুন্তলা]*

[মহা (k) ১.৭০.৩১; ১.৭১-৭৩ অধ্যায়; ১.৭৪.১-১৩; (হরি) ১.৮৪.৩১; ১.৮৫-৮৭ অধ্যায়; ১.৮৮.১-১৩]

□ পরবর্তী সময়ে দুষ্যন্তের পুত্র ভরত মাতামহ কণ্বকে পৌরহিত্যে বরণ করেন। কণ্ব ভরতের বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন এবং ভরত তাঁকে দক্ষিণা হিসেবে বহু স্বর্ণমুদ্রা দান করেছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ১.৭৪.১২৬-১৩০; ১২.২৯.৪৯; (হরি) ১.৮৯.১-৬; ১২.২৯.৪৭]

কণ্ব৬ মহাভারতে এবং পুরাণে যুধিষ্ঠির তথা কৃষ্ণের সমসাময়িক জনৈক মহর্ষি কণ্বের নাম উল্লিখিত হয়েছে। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় এঁকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে হস্তিনাপুরের রাজসভায় যখন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণ প্রভৃতি প্রবীণরা দুর্যোধনকে জ্ঞাতিচ্ছেদী যুদ্ধ বন্ধ করে পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়ে দিতে উপদেশ দেন। সেই সময় পরশুরাম, মহর্ষি কণ্ব প্রভৃতি বিশিষ্ট ঋষিও উপস্থিত ছিলেন। মহর্ষি কণ্ব দীর্ঘ উপাখ্যান শুনিয়েছেন ভগবান বিষ্ণুর শক্তি বোঝাবার জন্য। ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার চেষ্টা কুরুবংশকেই ধ্বংস করবে—একথাও বারবার বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য দুর্যোধন মহর্ষি কণ্বের এই উপদেশে কর্ণপাত করলেন না।

[মহা (k) ৫.৯৭-১০৫ অধ্যায়; (হরি) ৫.৯০-৯৮ অধ্যায়]

□ মহাভারতে উদ্যোগপর্বেই প্রথম এঁর উপস্থিতির উল্লেখ থাকলেও পুরাণে উল্লেখ আছে যে, ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে মহর্ষি কণ্ব উপস্থিত ছিলেন। শান্তিপর্বের সূচনায় হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যভিষেকের সময়ও কণ্বকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

[মহা (k) ১২.১.৪; (হরি) ১২.১.৪; ভাগবত পু. ১০.৭৪.৭; বিষ্ণু পু. ৫.৩৭.৬]

কণ্ব৭ মহাভারতের মৌষল পর্বে জনৈক মহর্ষি কণ্বকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যায়। একবার মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ এসেছিলেন দ্বারকায়। সারণ প্রভৃতি বৃষ্ণিবীররা সাম্বকে স্ত্রীলোক সাজিয়ে এই ঋষিদের সঙ্গে পরিহাস করার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন—ইনি বভ্রুর স্ত্রী, সন্তানসম্ভবা। আপনারা বলতে পারেন ইনি পুত্রসন্তান প্রসব করবেন না কন্যা? বৃষ্ণিবংশীয়দের এই পরিহাসে ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র,

কণ্ব ও নারদ শাপ দিয়েছিলেন—কৃষ্ণের পুত্র এই সাম্ব একটি মুষল প্রসব করবে, আর সেই মুষলের কারণেই যদুবংশ ধ্বংস হবে।

[মহা (k) ১৬.১.১৫-১৯; (হরি) ১৬.১.১৮-২২]

□ মহাভারতে এই মহর্ষি কণ্বের জন্ম পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। ইনি অজমীঢ় বংশীয় মহর্ষি কণ্বের কোনও বংশধর হতে পারেন। তবে ছান্দোগ্য উপনিষদে মহর্ষি ঘোর আঙ্গিরসকে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের গুরু বলা হয়েছে। সেই হিসেবে ইনি এবং ঘোরপুত্র মহর্ষি কণ্ব অভিন্ন ব্যক্তি হওয়াও অসম্ভব নয়। *[দ্র. কণ্ব১]*

কণ্ব৮ গয়াসুরের দেহের উপরে ব্রহ্মা যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, সেই যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন কণ্ব।

[বায়ু পু. ১০৬.৩৫; ১০৮.৪২]

কণ্ব৯ কলিযুগে মগধে রাজত্বকারী শুঙ্গবংশীয় রাজা দেবভূতি শুঙ্গের মন্ত্রী ছিলেন কণ্ব। এই কণ্ব দেবভূতি শুঙ্গকে হত্যা করে রাজা হয়ে বসেন এবং তাঁর থেকেই কণ্ব রাজবংশের সূচনা হয়।

[ভাগবত পু. ১২.১.১৯; মৎস্য পু. ২৭২.৩৬; বিষ্ণু পু. ৪.২৪.১২]

কণ্বভদ্র শিব পুরাণ মতে মহাদেবের অনুচরেরা কয়েকটি গণে বিভক্ত। সেই গণগুলির মধ্যে একটি গণের গণপতি হলেন কণ্বভদ্র।

[শিব পু. (সনৎ) ৪৮.৪২]

কণ্বাশ্রম মহাভারতে শত সহস্র ঋষি-মহর্ষির নাম উচ্চারিত হয়েছে। মহর্ষি কণ্ব তার মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট একটি নাম। অন্যান্য ঋষিদের তুলনায় তাঁর নাম আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে ইনি পুরুবংশীয় রাজর্ষি ভরতের জননী শকুন্তলার পালক পিতা। শকুন্তলা, ভরতের জন্মস্থান হিসেবে এবং মহর্ষি কণ্বের মাহাত্ম্যের কারণে তাঁর আশ্রম তীর্থ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের অবস্থান বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে মহাভারতের প্রতি শ্লোকে যদি সুনিপুণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিবেশ করা যায়, তবে এই ধারণাটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মহর্ষি কণ্বের আশ্রম একাধিক বার স্থানান্তরিত হয়েছিল।

মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের প্রথম অবস্থান পাই মালিনী নদীর তীরে। এই আশ্রমের নিকটবর্তী কোনো স্থানে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম। কণ্বের পালিতা কন্যা শকুন্তলার সঙ্গে এই আশ্রমেই দুষ্যন্তের প্রথম সাক্ষাৎ। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভরত এখানেই জন্মগ্রহণ করেন। মালিনী নদীতীরের এই আশ্রমের উল্লেখ আমরা সর্বপ্রথম পাই প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থ শতপথ ব্রাহ্মণে। এখানে কণ্বের আশ্রমটি 'নাড়পিত' নামে চিহ্নিত হয়েছে। লক্ষণীয় 'নাড়' শব্দের অর্থ বিচালি বা খড়। মহর্ষি কণ্বের কুটীর খড়-বিচালিতে ছাওয়া বলে হয়তো এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থে 'নাড়পিত' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পণ্ডিতরা অযোধ্যার পঞ্চাশ মাইল উত্তরে প্রবাহিত ঘাঘর বা ঘর্ঘরা নদীকে প্রাচীন মালিনী মনে করেন। সরযূর উপনদী চুকাকেও মালিনী বলে চিহ্নিত করেছেন অনেকে। সুতরাং শকুন্তলার জন্মভূমি কণ্বাশ্রম অযোধ্যার কাছেই কোথাও অবস্থিত ছিল বলে মনে হয়। *[দ্র. মালিনী৭]*

[মহা (k) ১.৭২.৯; ১.৭৪.১-২; (হরি) ১.৮০.১০; ১.৮১.১-২; GDAMI (Dey) p. 122. p. 89]

পরবর্তী সময়ে দুষ্যন্তের পুত্র রাজর্ষি ভরত কণ্বকে তাঁর পুরোহিত পদে বরণ করেন। রাজা ভরত সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অশ্বমেধ প্রভৃতি বহু মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যমুনার তীরে, গঙ্গার তীরে এবং সরস্বতী নদীর তীরে ভরতের এই যজ্ঞগুলি অনুষ্ঠিত হয়। ফলে ভরতের রাজত্বকালে মহর্ষি কণ্বের আশ্রম একাধিক বার স্থানান্তরিত হয়েছিল, এ কথাও নিঃসন্দেহে বোঝা যায়। গঙ্গা, যমুনা অথবা সরস্বতীর তীরে যেখানে দীর্ঘসময় ধরে কণ্ব যজ্ঞ করছিলেন, মালিনী তীরের মতোই সেই স্থানগুলিও পরবর্তী সময়ে কণ্বাশ্রম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে।

বনপর্বে তীর্থবর্ণনা প্রসঙ্গে পুষ্করতীর্থ, সরস্বতী নদী প্রভৃতির সঙ্গে প্রত্যেকবার একটি করে কণ্বাশ্রম তীর্থেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। লক্ষণীয় এই কণ্বাশ্রম তীর্থকে প্রদক্ষিণ করে যযাতিপতন নামক তীর্থে যেতে বলা হয়েছে। শিবি, অষ্টক প্রভৃতি যযাতির দৌহিত্রেরা নৈমিষারণ্যে বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছিলেন, সেই স্থানেই স্বর্গ থেকে যযাতি পতিত হয়েছিলেন বলে বর্ণিত আছে। পণ্ডিতরা বর্তমান উত্তরপ্রদেশে, গোমতী নদীর তীরে নৈমিষারণ্যের অবস্থান নির্দেশ করে

থাকেন। এই অঞ্চলেই মহর্ষির কণ্বেরও তপোবন ছিল বলে মনে হয়।

[মহা (k) ১. ; ৩.৮২.৪৫-৪৬; (হরি) ১.৮৯.৪-৭; অগ্নি পু. ১০৯.১০; Uttarpradesh District Gazetters, vol. 4, p. 263]

□ দিল্লী থেকে কিছুদূরে উত্তরাখণ্ডের কোটদ্বার অঞ্চলে এখনও কণ্বাশ্রম নামে একটি স্থান এখনও আছে।

[Land and People of Indian States and Union Territories, Gopal. K. Bhargava and SC Bhatt; Delhi, Kalpaz Publication 2006, p. 234]

□ মহাভারতের বনপর্বে পৌঁছে কণ্বাশ্রমের নাম একটি পবিত্র তীর্থের মর্যাদায় উচ্চারিত হয়েছে—

কণ্বাশ্রমং ততো গচ্ছেৎ শ্রীজুষ্টং লোকপূজিতম্॥
ধর্মারণ্যং হি তৎ পুণ্যমাদ্যঞ্চ ভরতর্ষভ।

অগস্ত্য সরোবর থেকে এই তীর্থে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

[মহা (k) ৩.৮২.৪৫-৪৭; (হরি) ৩.৬৭.৬৬-৬৭]

□ অগ্নিপুরাণ মতে, এই তীর্থটি পুষ্করের অন্তর্গত। *[অগ্নি পু. ১০৯.৯]*

□ কণ্বাশ্রমতীর্থের আধুনিক অবস্থান নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। N.L. Dey এই তীর্থের একাধিক অবস্থানের কথা বলেছেন। অযোধ্যা এবং শাহারানপুরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত মালিনী নদীর তীরে শকুন্তলার পালক পিতা ঋষি কণ্বের একটি আশ্রম ছিল। এটিই কণ্বাশ্রমতীর্থ নামে পরিচিত বলে মনে হয়। হরিদ্বার থেকে এর দূরত্ব প্রায় তিরিশ মাইল। আবার রাজপুতানার অন্তর্গত কোটার চার মাইল দক্ষিণ-পূর্বে চম্বল নদীর তীরে এই তীর্থটি অবস্থিত ছিল বলেও একটি মত প্রচলিত রয়েছে। এই কণ্বাশ্রম তীর্থটি ধর্মারণ্য নামেও পরিচিত যেমনটা মহাভারতেই আছে—

ধর্মারণ্যং হি তৎ পুণ্যম্।

স্মরণীয়, কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকেও মহর্ষি কণ্বের আশ্রমকে ধর্মারণ্য নামে চিহ্নিত করা হয়েছে—

ধর্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ।

[মহা. (পূর্বে উল্লিখিত); অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ (kale) ১.৩০; GDAMI (Dey) p. 89]

কত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বংশজাত একজন ঋষি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১১৮]

কতক একটি পার্বত্য উপজাতি। কল্কি এই জাতিকে পরাস্ত করেছিলেন বলে পুরাণে উল্লেখ আছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩১.৮৪]

কথক স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচর, যোদ্ধাদের মধ্যে একজন। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৬৭; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

কথন ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে, পাতালের দ্বিতীয় তল অর্থাৎ সুতলে বসবাসকারী একজন অসুরবীর।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.২২]

কথাজব বাস্কলের শিষ্যদের মধ্যে কথাজব একজন। বাস্কলের কাছ থেকে কথাজব সংহিতা অধ্যয়ন করেছিলেন। *[বিষ্ণু পু. ৩.৪.২৫]*

কদম্বা স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রতের বংশধারায় দুর্গম নামে এক প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। তাঁর অনেকগুলি স্ত্রী ছিল। দুর্গম রাজার এই পত্নীদের মধ্যে একজন ছিলেন কদম্বা।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৭৫.৪৫]

কদলী১ একটি পবিত্র নদী। *[মৎস্য পু. ২২.৫২]*

কদলী২ একজন অপ্সরা। একসময় ইন্দ্র, শিবের মতো মহান যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা নিয়ে মহাদেবের আরাধনা শুরু করেন। এই শিবপূজার সময় দেবলোকের যে সব অপ্সরা পূজাস্থলে উপস্থিত ছিলেন কদলী তাদের মধ্যে একজন। *[পদ্ম পু. (মহর্ষি) ৩.১১]*

কদ্বশঙ্কু উগ্রসেনের অন্যতম পুত্র, কংসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। *[বায়ু পু. ৯৬.১৩২]*

কদ্রুক কুকুর জাতীয় প্রাণীদের জন্মদাত্রী সরমার অন্যতম পুত্র দুল্লোল। এই দুল্লোল-এর সন্তানদের বিভিন্নগণে ভাগ করা হয়। লক্ষণীয়, প্রত্যেকটি গণের নামই প্রকৃতপক্ষে এক একটি রং। সম্ভবত কুকুরের গায়ের রং অনুযায়ী তাদের বিভিন্নগণে ভাগ করা হয়েছিল। এর মধ্যে একটি গণ কদ্রুক। কদ্রুবর্ণ বলতে পিঙ্গলবর্ণ বোঝায়। পিঙ্গল বা পাঁশুটে রং-এর কুকুররাই সম্ভবত এইগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৪৪৩]

কদ্রূ প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, কশ্যপ প্রজাপতির

অন্যতম পত্নী। অনন্ত, বাসুকি, কালিয় প্রভৃতি নাগের জন্মদাত্রী ছিলেন কদ্রু।

[ভাগবত পু. ৫.২৪.৮; ৬.৬.২১-২২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩১; মৎস্য পু. ৬.২.৩৮; ১৪৬.১৯.২২; বায়ু পু. ৬৬.৫৫; ৬৯.৯৪; বিষ্ণু পু. ১.১৫.১২৫]

□ মূলত সর্পমাতা হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও মহাভারতের বিবরণে দুই সপত্নী কদ্রু ও বিনতা তাঁদের সম্পর্কের জটিলতার কারণেই উল্লেখযোগ্য চরিত্র হয়ে উঠেছেন। কদ্রু এবং বিনতা সর্বদাই পরস্পর রেষারেষি করে চলতেন। একবার কশ্যপ প্রজাপতি তাঁদের সেবায় তুষ্ট হয়ে দুজনকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। কদ্রু সমান বলবান সহস্র সর্প পুত্রলাভের বর চাইলেন। বিনতা বললেন—আমার দুটি পুত্র হোক যারা শুধু কদ্রুর পুত্রদের থেকেই নয় সকলের থেকেই বলবানও তেজস্বী হবে। কশ্যপ তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী বর দিলেন। এই বর প্রার্থনার ঘটনা থেকেই কদ্রু-বিনতার সম্পর্কের ছবিটি আমাদের সামনে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যথাসময়ে কদ্রু এক হাজারটি ডিম্ব প্রসব করলেন। বিনতাও দুটি ডিম্ব প্রসব করলেন। এরপর দেখতে দেখতে পাঁচশো বছর কেটে গেল। পাঁচশো বছর পর কদ্রুর ডিম্বগুলি থেকে সহস্র সর্পপুত্রের জন্ম হল। কিন্তু বিনতার ডিম্ব দুটি অবিকৃত অবস্থায় পড়ে রইল। এতদিন পরেও পুত্রের জন্ম হল না দেখে বিনতা কতকটা দুঃখিত হয়ে এবং কতকটা কদ্রুর পুত্রলাভে ঈর্ষান্বিত হয়ে একটি ডিম ভেঙে ফেললেন। ফলে বিনতার জ্যেষ্ঠপুত্র অরুণ অপরিণত দেহ নিয়েই জন্মগ্রহণ করলেন। কদ্রুর প্রতি বিনতার ঈর্ষাই তাঁর বিকলাঙ্গ হবার কারণ—তাই ক্ষোভে দুঃখে অরুণ মাতাকে শাপ দিলেন—তুমি সর্বদা যে কদ্রুর সঙ্গে স্পর্ধা করে থাক, পাঁচশো বছর তুমি সেই কদ্রুর দাসী হয়ে থাকবে।

[মহা (k) ১.১৬.৬-১৯; (হরি) ১.১২.৬-১৯]

□ এরপর একদিন কদ্রু এবং বিনতার মধ্যে তর্ক আরম্ভ হল। কদ্রু বিনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন—উচ্চৈঃশ্রবার গায়ের রং কি? বিনতা বললেন—উচ্চৈঃশ্রবা শ্বেতবর্ণ, কদ্রু বললেন উচ্চৈঃশ্রবার দেহ শ্বেতবর্ণ এবং পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ। তখন বিনতাই তর্ক জুড়লেন—তা কখনোই হতে পারে না। আচ্ছা বেশ, এসো এবিষয়ে পণ রাখা থাক। তখন কদ্রু সুযোগ পেয়ে বললেন—বেশ, যদি উচ্চৈঃশ্রবা শ্বেতবর্ণ হয় তা হলে আমি তোমার দাসী হয়ে থাকব, আর যদি তার লেজ কৃষ্ণবর্ণ হয় তা হলে তুমি আমার দাসী হয়ে থাকবে। বিনতা তাতেই সম্মত হলেন।

এদিকে কদ্রু গিয়ে তাঁর সর্প পুত্রদের বললেন—তোরা উচ্চৈঃশ্রবার লেজের উপর এমনভাবে ঝুলতে থাক, যাতে উচ্চৈঃশ্রবার লেজটিকে কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। কদ্রুর পুত্রদের একাংশ মায়ের এই আদেশ মানতে সম্মত হলেন না। তখন কদ্রু তাঁর সেই পুত্রদের শাপ দিলেন—তোরা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে পুড়ে মরবি।

কদ্রুর বাকি পুত্ররা অবশ্য মায়ের আদেশ যথাযথভাবেই পালন করলেন। ফলে বিনতা হেরে গেলেন। এরপর থেকে পাঁচশো বছর বিনতা কদ্রুর দাসী হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.২০-২২ অধ্যায়; ১.২৩.১-৪; (হরি) ১.১৬-১৮ অধ্যায়; ১.১৯.১-৪]

□ নাগমাতা কদ্রু ব্রহ্মার সভায় অবস্থান করতেন বলে মহাভারতের সভাপর্বে উল্লেখ আছে। *[মহা (k) ২.১১.৩৯; (হরি) ২.১১.৩৯]*

□ ব্রহ্ম পুরাণে কদ্রু ও বিনতার সম্পর্কে একটি কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কদ্রু ও বিনতা যখন গর্ভবতী হলেন, তখন স্বামী কশ্যপ তাঁদের দু-জনকে সর্বদা সদাচার পালন করতে এবং শান্ত ও সংযমী জীবন যাপন করতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু কদ্রু-বিনতা দু-জনেই অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাবের ছিলেন, তাই তাঁরা কশ্যপের উপদেশে গুরুত্ব দিলেন না। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁরা প্রতিদিন আশ্রম থেকে বেরিয়ে গঙ্গা তীরের তপোবনে যেতেন এবং সেখানকার ঋষিদের যজ্ঞ সামগ্রী তছনছ করে দিতেন। কদ্রু-বিনতার উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে ঋষিরা একদিন শাপ দিলেন—তোমরা যখন সর্বদাই অপমার্গে অবস্থান কর অর্থাৎ ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ কর, তখন তোমরা আপগা অর্থাৎ নদী হও—

অপমার্গস্থিতে যস্মাদাপগে হি ভবিষ্যথঃ।

ঋষিদের শাপে কদ্রু ও বিনতা কদ্রু নদী ও সুপর্ণা নদী নামে দুটি জলধারায় পরিণত হলেন। এদিকে কশ্যপ ফিরে এসে পত্নীদের অবস্থা জানতে পেরে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। পত্নীদের

শাপমুক্তির জন্য বালখিল্য ঋষিদের পরামর্শে কশ্যপ গৌতমী গঙ্গায় স্নান করে মহাদেবের আরাধনা করতে লাগলেন। মহাদেবের কৃপায় কদ্রু এবং বিনতা শাপমুক্ত হলেন।

এই ঘটনার পর থেকে বিনতা চঞ্চলতা ত্যাগ করলেন। কিন্তু কদ্রুর স্বভাবে বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল না। গর্ভবতী কদ্রু ও বিনতার সীমন্তোন্নয়ন অনুষ্ঠানে কশ্যপের আশ্রমে আমন্ত্রিত ঋষিদের কদ্রু বক্রদৃষ্টিতে উপহাস করলেন। তা দেখে ঋষিরা ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন—যে চক্ষু দ্বারা তুমি আমাদের উপহাস করলে, তোমার সেই চোখ নষ্ট হোক। ঋষিদের শাপে কদ্রু কানা হলেন—

কাণাভবত্ততঃ কদ্রূঃ সর্পমাতেতি যোচ্যতে।

লক্ষণীয়, মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যে আমরা সর্পমাতা মনসাকে একচক্ষু রূপেই দেখতে পাই। চাঁদ সদাগর মনসাকে সম্বোধনই করলেন—'চেঙমুড়ী কানী' বলে, পুরাণে সর্পমাতার একচক্ষু হবার যে কাহিনী আমরা পাই, মনসাও সেই কাহিনীর ধারা বেয়েই একচক্ষুরূপে কল্পিত হয়েছেন কিনা—এ বিষয়ে ভাবনার যথেষ্ট অবকাশ থাকছে। *[ব্রহ্ম পু. ১০০ অধ্যায়]*

কন্মোর মহাভারতের অনুশাসনপর্বে যেসব প্রাতঃস্মরণীয় রাজর্ষির নাম উল্লিখিত হয়েছে রাজর্ষি কন্মোর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মহাভারতের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে অবশ্য 'কন্মোর'-এর পরিবর্তে 'কশ্মীর' নাম পাওয়া যায়।

[মহা (k) ১৩.১৬৫.৫৩; (হরি) ১৩.১৪৩.৫০]

কনক১ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের একটি নাম। কনক শব্দের অর্থ স্বর্ণ বা সোনা। সোনা নিজের ঔজ্জ্বল্যের কারণেই অন্যান্য সমস্ত ধাতুর চেয়ে মূল্যবান, মানুষের অত্যন্ত প্রিয়। ঠিক তেমনই ঈশ্বর আমাদের সকলের অত্যন্ত প্রিয়। জগৎ সংসারে যা কিছু আমাদের কাঙ্ক্ষিত, যা কিছু প্রিয় সমস্ত কিছুকেই আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ বলে মনে করি। অতএব সোনার মতোই মূল্যবান এবং প্রিয় বলে মহাদেবও কনক নামে কীর্তিত হন—

কনকঃ স্বর্ণাদিপ্রিয়বস্তুরূপঃ।

তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সকলের প্রিয়, মূল্যবান এবং দুর্লভ কারণ বহু তপস্যাতেও তাঁকে লাভ করা সম্ভব হয় না—এই তিনটি বিষয়ে সোনার শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই মহাদেবকে কনক নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১৭.৯৩; (হরি) ১৩.১৬.৯৩]

কনক২ দানবরাজ বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.২০]

কনক৩ যদুর পুত্র সহস্রজিতের বংশধারায় হৈহয় বংশে দুর্মদের পুত্র ছিলেন কনক। তবে কনকের পিতা দুর্মদের নাম বিভিন্ন পুরাণের পাঠে পরিবর্তিত হয়েছে। মৎস্য পুরাণ এবং অন্য কয়েকটি পুরাণের পাঠ অনুযায়ী কনকের পিতার নাম দুর্মদের পরিবর্তে দুর্দম। কনকের চার পুত্র—কৃতবীর্য্য, কার্তিবীর্য্য, (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে কৃতাগ্নি) কৃতবর্ম এবং কৃত। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃতবীর্য্য বিখ্যাত রাজা কার্তবীর্য্যার্জুনের পিতা।

[বায়ু পু. ৯৪.৭-৯; মৎস্য পু. ৪৩.১২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৯.৮]

কনক৪ যদুবংশীয় হৃদিকের অন্যতম পুত্র।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৪১]

কনক৫ শিনি বংশীয় বৃহদুক্থের কন্যা বৃহতী সুনয় নামে এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। সুনয়ের ঔরসে বৃহতীর গর্ভে জাত পুত্র সন্তানদের মধ্যে একজন ছিলেন কনক। বায়ু পুরাণে অবশ্য কনকের পরিবর্তে কুমুদ নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[বায়ু পু. ৯৬.২৪৬-২৪৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.২৫৬]

কনক৬ কলিযুগে রাজত্বকারী অন্যতম রাজবংশ। কলিযুগে এঁরা স্ত্রীরাজ্য এবং মূষিক নামক জনপদে রাজত্ব করতেন বলে জানা যায়।

[বিষ্ণু পু. ৪.২৪.১৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৯৯; বায়ু পু. ৯৯.৩৮৭]

কনক৭ স্বর্ণ বা সোনার পর্য্যায় শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সৃষ্টির আদিতে যখন ব্রহ্মার দেহ থেকে প্রজাপতিরা জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময় ব্রহ্মার রক্ত থেকে কনক সৃষ্টি হয় বলে পুরাণে উল্লেখ আছে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১.৬০]*

কনক৮ কৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। তন্তিজ এবং তন্তিপাল নামে তাঁর দুই পুত্র হয়। *[বায়ু পু. ৯৬.১৮৯]*

কনকধ্বজ *[দ্র. কনকাঙ্গদ]*

কনকনন্দা এই নদীতীর্থটি গয়ায় মুণ্ডপৃষ্ঠ তীর্থের উত্তরে অবস্থিত।

[অগ্নি পু.১১৫.৪৪; নারদ পু.২.৪৪.৬২]

কনকনন্দা তীর্থে স্নান করলে নিষ্পাপ হয়ে দেব-পিতৃ ও মনুষ্য ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই তীর্থে শ্রাদ্ধকার্য পুণ্যদায়ক।

[কূর্ম পু. ২.৩৬.৩৯-৪১]

কনকপর্বত *[দ্র. মেরু১]*

কনকপীঠ প্রজাপতি পুলহের ঔরসে ক্ষমার গর্ভজাত অন্যতম পুত্র কনকপীঠ। কনকপীঠের ঔরসে তাঁর পত্নী যশোধরার গর্ভজাত পুত্র সহিষ্ণু ও কামদেব।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১১.৩১, ৩৫]

কনকবিন্দু ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লিখিত একজন বানরবীর। অগ্নির ঔরসে কনকবিন্দুর পত্নীর গর্ভজাত ক্ষেত্রজ পুত্র হলেন নল।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২২৯-২৩০]

কনকাক্ষ স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অনুচর যোদ্ধাদের মধ্যে একজন। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৭৪; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

কনকাঙ্গদ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের একজন। ধৃতরাষ্ট্রের এই পুত্রই পরবর্তীকালে কনকধ্বজ নামেও প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন বলে মনে হয়। অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় ইনিও উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের নবম দিনে কনকধ্বজ প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের সাত পুত্র ভীমসেনের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.১০৫; ১.১১৭.১৪; ১.১৮৬.৩; ৬.৯৬.২৭; (হরি) ১.৬২.১০৬; ১.১১১.১৩; ১.১৭৯.৩; ৬.৯২.২৭]

কনকাপীড় স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অন্যতম অনুচর যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৬৬; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

কনকায়ু ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের একজন।

[মহা (k) ১.৬৭.৯৯; (হরি) ১.৬২.১০১]

☐ দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় জনৈক ধার্তরাষ্ট্র করকায়ুর নাম পাওয়া যাচ্ছে। এই করকায়ু এবং কনকায়ু সম্ভবত একই ব্যক্তি।

[মহা (k) ১.১৮৬.২; (হরি) ১.১৭৯.২]

কনকেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। ভগবান শিব এই তীর্থে কনকেশ্বর নামে পূজিত হন।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ১০৪]

কনকোদ্ভব বায়ু পুরাণ মতে কুকুরবংশীয় ভজমানের বংশধারায় হৃদিকের পুত্রদের মধ্যে অন্যতম কনকোদ্ভব। *[বায়ু পু. ৯৬.১৪০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৪১]*

কনখল গঙ্গার উচ্ছল পার্বত্য প্রবাহের তীরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র জনপদ কনখল। মূলত গঙ্গার সৌন্দর্য্যের কারণেই কালিদাস পূর্বমেঘে এই স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন—

তস্মাদ্ গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজবতীর্ণাং।
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপান পঙ্ক্তিম্।

[মেঘদূত (kale) ১.৫০]

মহাভারত পুরাণে গঙ্গাতীরে অবস্থিত এই স্থানটি মূলত পবিত্র তীর্থ হিসেবেই বর্ণিত হয়েছে। মহাভারতের বনপর্বে বলা হয়েছে এইস্থানে পুরু নামে একটি পর্বত আছে। চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ পুরূরবা এখানে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবত কনখলের নিকটবর্তী কোনস্থানেই পুরূরবার জন্ম হয়েছিল—

সনৎকুমারঃ কৌরব্য পুণ্যং কনখলং তথা।
পর্বতশ্চ পুরুর্নাম যত্র জাতঃ পুরূরবা॥

[মহা (k) ৩.৯০.২২; (হরি) ৩.৭৫.২২]

তবে বিভিন্ন পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী কনখল তীর্থের মূল গুরুত্ব এই যে, এইস্থানে রাজা প্রাচেতস দক্ষ এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। শিবের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন বলে দক্ষ সেই যজ্ঞে শিবকে আমন্ত্রণ জানালেন না। শিবের আদেশে বীরভদ্র নামে শিবের এক অনুচর গিয়ে সেই দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন।

[লিঙ্গ পু. ১.১০০.৭; কূর্ম পু. ২.৩৬.১০; বামন পু. ৪.১৮; বরাহ পু. ১৫২.১৪০]

☐ কনখল দক্ষিণ মানস তীর্থের উত্তরে অবস্থিত। মহাভারতের বনপর্বে শক্রাবর্ত্ত তীর্থ থেকে এখানে যেতে বলা হয়েছে। কনখলতীর্থে স্নান করে তিনরাত্রি বসবাস করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় এবং স্বর্গলাভ হয়। বনপর্বের অন্য একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, গঙ্গানদী সর্বত্রই কুরুক্ষেত্রের সমান পবিত্র হলেও কনখল তীর্থে এর পবিত্রতা

বিশেষ ধরনের। শ্রাদ্ধকার্যের জন্য এটি অত্যন্ত পবিত্র। *[মহা (k) ৩.৮৪.২৯-৩০; ৩.৮৫.৮৮; ১৩.২৫.১৩; (হরি) ৩.৬৯.২৯-৩০; ৩.৭০.৮৮; ১৩.২৬.১৩; মৎস্য পু. ১৮৬.১০; ১৯২.১১; বায়ু পু. ৮৩.২১; ১১১.৭]*

□ কনখল তীর্থে মহাত্মা গরুড় এক কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এইখানে এক যোগিনীরও বাস যিনি শিব ও যোগীগণের সঙ্গে ক্রীড়া করেন। এই তীর্থ দর্শনে রুদ্রলোক প্রাপ্তি হয়।

[মৎস্য পু. ১৯৩.৬৯-৭১]

□ হরিদ্বারের পূর্বে গঙ্গা ও নীলধারা নদীর সঙ্গমে অবস্থিত একটি ছোটো গ্রামের নামও কনখল। এটি হরিদ্বার সংলগ্ন পাঁচটি পবিত্র তীর্থস্থলের মধ্যে অন্যতম। তবে এটি রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে অবস্থিত—এরকম একটি ধারণাও প্রচলিত রয়েছে। তবে গঙ্গা নদীর তীরবর্তী হওয়ার কারণেই দ্বিতীয় ধারণাটি সম্ভবত ঠিক নয়।

[Lise Mckean; Divine Enterprise; USA; University of Chicago Press; 1996, p. 63; GDAMI (N.L. Dey) p. 88; EAIG (Kapoor) p. 341]

কনখলা গঙ্গানদীর অপর নাম। চন্দ্রবংশীয় রাজা সুদর্শন ভূমি বিদারণ করে কনখলা নামে প্রসিদ্ধ গঙ্গাদেবীকে খাণ্ডবীপুরে প্রবাহিত করেছিলেন, খাণ্ডবীপুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কনখলা সীতা নামক নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

[কালিকা পু. ৮৯.৫১-৫২]

কনিষ্ক *[দ্র. কণিক]*

কনিষ্ঠ১ ত্রয়োদশ মন্বন্তরে দেবতাদের যে পাঁচটি গণ প্রসিদ্ধ হয়েছিল, কনিষ্ঠ তার মধ্যে একটি গণ।

[বায়ু পু. ১০০.১১১-১১২; বিষ্ণু পু. ৩.২.৪১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.১০৬, ১০৮]

কনিষ্ঠ২ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের একটি। কনিষ্ঠ, অর্থাৎ বয়সে সবার ছোটো। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, যিনি আদিপুরুষ, জগৎস্রষ্টা তাঁকে 'কনিষ্ঠ' নামে সম্বোধন করার কারণ কি? এর উত্তর খুঁজতে হবে পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে। যখন স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল দৈত্যরাজ বলির পদানত, যখন ইন্দ্রকে স্থানচ্যুত করে বলি স্বয়ং স্বর্গের সিংহাসন অধিকার করে বসেছেন, তখন বলির অধীনতা থেকে ত্রিলোককে মুক্ত করার জন্য ভগবান বিষ্ণু কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে অদিতির গর্ভে বামন রূপে অবতীর্ণ হলেন। সেই বামনরূপধারী বিষ্ণু বলির যজ্ঞসভায় ত্রিবিক্রম মূর্তি ধারণ করে দুই পদক্ষেপে ত্রিলোক ব্যাপ্ত করলেন, বলিকে আবদ্ধ করলেন। এই বামন রূপধারী বিষ্ণু দেবমাতা অদিতির কনিষ্ঠ পুত্র, দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে ইনিই সকলের চেয়ে ছোটো। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই ত্রিদেব সর্বদাই পরব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মক রূপে কল্পিত হন। তিনজনই অভিন্ন সত্তা—এই ভাবনা থেকে কখনো বা ভগবান বিষ্ণুর নাম মহাদেবের উপর কখনো বা মহাদেবের নাম বিষ্ণুর উপর আরোপিত হয়। সেই ভাবনা থেকেই মহাদেবকেও বামন অবতার স্বরূপ হিসেবে কল্পনা করে কনিষ্ঠ নামে কীর্তিত করা হয়েছে। টীকাকার নীলকণ্ঠও এই দৃষ্টিকোণ থেকেই কনিষ্ঠ শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছেন—

কনিষ্ঠঃ অদিতিপুত্রাণাং মধ্যে যঃ
কনিষ্ঠো বামনরূপী বিষ্ণুস্তদ্রূপঃ।

[মহা (k) ১৩.১৭.১৩৩; (হরি) ১৩.১৬.১৩২]

কনিষ্ঠ৩ মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে, ভবিষ্যৎ ভৌত্য মনুর কালে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন, কনিষ্ঠ তার মধ্যে একটি গণ। *[মার্কণ্ডেয় পু. ১০০.২৯]*

কনীয়ক কুকুরবংশীয় ভজমানের বংশধারায় হৃদিকের পুত্রদের মধ্যে একজন কনীয়ক।

[মৎস্য পু. ৪৪.৮২]

কন্দরসেন ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লিখিত একজন বানরবীর। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৩৪]*

কন্দরা স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.৯; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোকসংখ্যা ৯ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

কন্দর্প মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, কল্পগুলির মধ্যে অষ্টম কল্পের নাম কন্দর্প।

[মৎস্য পু. ২৯০.৪]

কন্দলী মহর্ষি দুর্বাসার পত্নী। *[দ্র. দুর্বাসা]*

কন্ধর পক্ষীরাজ সম্পাতির বংশধারায় প্রলোলুপের দুই পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন কন্ধর। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কঙ্ক বিদ্যুৎরূপ নামে এক রাক্ষসের হাতে নিহত হলে *[দ্র. কঙ্ক১০]* সেই খবর পেয়ে কন্ধর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বিদ্যুৎরূপ রাক্ষসকে হত্যা করবেন বলে

প্রতিজ্ঞা করলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হলে কন্ধর বিদ্যুৎরূপ রাক্ষসের সামনে উপস্থিত হয়ে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আমন্ত্রণ জানালেন। বিদ্যুৎরূপ কন্ধরকে আক্রমণ করলে কন্ধর ও বিদ্যুৎরূপের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের পর বিদ্যুৎরূপ রাক্ষস কন্ধরের হাতে নিহত হন। রাক্ষসের পত্নী মদনিকা কন্ধরকে স্বামীরূপে বরণ করলেন এবং পক্ষীরূপ ধারণ করে কন্ধরের সঙ্গে কাল কাটাতে লাগলেন। কন্ধরের ঔরসে মদনিকার গর্ভে তার্ক্ষী নামে এক সুন্দরী পক্ষিণী জন্মগ্রহণ করে।

[মার্কণ্ডেয় পু. ২.৩, ১০-৩১]

কন্যক১ রজতনাভ নামক যক্ষের ঔরসে, অনুহ্রাদ দৈত্যের কন্যা ভদ্রার গর্ভজাত পুত্র মণিভদ্র।

পুণ্যজনীর গর্ভে মণিভদ্রের যেসব পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল, তাঁদের মধ্যে কন্যক একজন।

[বায়ু পু. ৬৯.১৫৪]

কন্যক২ পুরাণে কশ্যপের গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, কন্যক সেই গোত্রপ্রবর্তক ঋষিদের মধ্যে একজন। কন্যক এবং তাঁর বংশধররা মহর্ষি কশ্যপের বংশপরম্পরায় বা শিষ্য পরম্পরায় কাশ্যপ নামে অভিহিত হন।

[মৎস্য পু. ১৯৯.৩]

কন্যকা ভাগবত পুরাণ অনুসারে দেবী শক্তির একটি রূপ, যাকে কুমারীরূপও বলা যেতে পারে।

[ভাগবত পু. ১০.২.১২]

কন্যকাগুণ একটি জনপদ। এই জনপদে বসবাসকারীরাও কন্যকাগুণ নামে পরিচিত।

[মহা (k) ৬.৯.৫২; (হরি) ৬.৯.৫২]

কন্যাকূপতীর্থ গঙ্গানদীর নিকটবর্তী একটি তীর্থ। এটি বলাকাতীর্থ সংলগ্ন একটি স্থান পিতৃতর্পণের জন্য কন্যাকূপ তীর্থ একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র। এর আরেক নাম কন্যাহ্রদ তীর্থ।

[মহা (k) ১৩.২৫.১৯; (হরি) ১৩.২৬.১৯]

□ অনেকে মনে করেন যে, কন্যাকূপ ও কন্যাতীর্থ একই। এটি কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র জলাশয় বিশেষ।

[Kritya Kalpataru, Gaekwad's Oriental Series; Ed: Hans Bakker; Oriental Institute; 1942 p. 98]

কন্যাতীর্থ১ কৌশিকী নদীর নিকটবর্তী একটি তীর্থ। এই তীর্থ দর্শনে প্রজাপতি মনুর কৃপা লাভ হয়। এখানে দান-ধ্যান অত্যন্ত পুণ্যফলদায়ক। এটি কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত। সম্ভবত এরই আরেক নাম কন্যাকূপ বা কন্যাহ্রদ।

[মহা (k) ৩.৮৪.১৩৭-১৩৯; ৩.৮৩.১১২; (হরি) ৩.৬৯.১৩৭-১৩৯; ৩.৬৮.১১২; পদ্ম পু. (নবভারত) স্বর্গ ১৩.১]

□ পণ্ডিতরা মনে করেন যে, বর্তমান কুরুক্ষেত্র জেলার ৪৯ কিমি. দূরে অবস্থিত নৈমিষকুঞ্জ তীর্থটিরই আরেক নাম কন্যাতীর্থ। *[দ্র. কন্যাকূপ]*

[GDAMI (N.L. Dey) p. 90]

কন্যাতীর্থ২ নর্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এখানে ভগবান শিবের আরাধনা করলে বিশেষ পুণ্য অর্জন হয়।

[মৎস্য পু. ১৯৩.৭৬-৭৮; কূর্ম পু. ২.৪০.১৫-১৬]

কন্যাতীর্থ৩ মলয় পর্বতে কাবেরী নদীর তীরবর্তী একটি তীর্থ। বলরাম তীর্থভ্রমণ কালে এখানে এসেছিলেন এবং কন্যারূপী দুর্গা দেবীর দর্শন পেয়েছিলেন। *[ভাগবত পু. ১০.৭৯.১৭]*

□ এটি সম্ভবত পশ্চিমঘাট পর্বতের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। আবার অনেকে মনে করেন যে, কন্যাকুমারিকারই আরেক নাম কন্যাতীর্থ।

[Studies in the Geography of Ancient and Medieval India; D.C. Sircar; Delhi; Motilal Banarsidass; 1971/ p. 244]

কন্যাশ্রমতীর্থ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত সরস্বতী নদীর তীরবর্তী একটি তীর্থক্ষেত্র। যথাবিধি নিয়মানুসারে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে এখানে বাস করলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়। *[মহা (k) ৩.৮৩.১৮৯-১৯০; (হরি) ৩.৬৮.১৮৯-১৯০; পদ্ম পু. (নবভারত) স্বর্গখণ্ড ১২.৮০;]*

কন্যাহ্রদতীর্থ *[দ্র. কন্যাকূপতীর্থ]*

কপট১ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দনুর গর্ভজাত একজন দানব।

[মহা (k) ১.৬৫.২৬; (হরি) ১.৬০.২৫]

কপট২ রামায়ণে উল্লিখিত জনৈক বিশিষ্ট রাক্ষস। লঙ্কার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে হনুমান যখন কুম্ভকর্ণ-ইন্দ্রজিৎদের গৃহ-সৌন্দর্য্য দর্শন করছিলেন সেইসময় হনুমান এই রাক্ষস-প্রধান কপটের সজ্জিত গৃহ দর্শন করেন।

[রামায়ণ ৫.৬.২৪]

কপর্দী শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের একটি। টীকাকার নীলকণ্ঠ ব্যাকরণগত দিক থেকে

শব্দটিকে অসাধারণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। 'ক' শব্দের অর্থ হল জল। স্বর্গ থেকে সেই জলময়ী গঙ্গা যখন অবতীর্ণ হচ্ছিলেন, সেই পতনশীল গঙ্গার জলধারাকে মহাদেব জটাজুটের মাধ্যমে প্রথমে পান করেছিলেন। তারপর ভগীরথের প্রার্থনায় সেই জটা থেকে গঙ্গাকে বহির্গমনের সামর্থ্য দেন। 'ক' শব্দের সঙ্গে এই পান করা (পা ধাতু) এবং দান করা (দা ধাতু) ব্যবহার করে টীকাকার নীলকণ্ঠ মহাদেবের জটাজুটের একতম পর্যায় শব্দ নির্ণয় করেছেন 'কপর্দ'। অর্থাৎ নীলকণ্ঠের মতে একমাত্র মহাদেবের জটাকেই কপর্দ বলা যেতে পারে। সেই কপর্দের অধিকারী যিনি, তিনি কপর্দী মহাদেব। ব্যাকরণগত ভাবে ঋত্ ধাতুর সঙ্গে 'কপ' (কং জলং পীবতীতি) এই রূপটি যে অসাধারণ ব্যাকরণগত প্রক্রিয়ায় সিদ্ধ করা হয়েছে, তা অনুসন্ধিৎসু নিপুণ পাঠক দেখে নিতে পারেন। *[মহা (k) ১৩.১৭.৪৬; (হরি) ১৩.১৬.৪৬ নীলকণ্ঠ কৃত টীকা দ্রষ্টব্য]*

কপর্দীচিন্তমণিতীর্থ প্রভাসক্ষেত্রের অন্তর্গত পবিত্র তীর্থ। চিত্রপথা নদীর তীরে এই তীর্থের অবস্থান। কপর্দী অর্থাৎ ভগবান শিব স্বয়ং এই তীর্থে বিরাজ করেন বলে কথিত আছে।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র) ১৪১.১-২]

কপর্দীশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত অন্যতম পবিত্র তীর্থ। ভগবান শিব এই তীর্থে কপর্দীশ্বর নামে লিঙ্গরূপে পূজিত হন।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ১১৯; কূর্ম পু. ১.৩১.১২; ১.৩২.৪-১১; ১.৩২.২৮-৪৯; পদ্ম পু. (আনন্দাশ্রম) স্বর্গ ৩৫.১]

কপর্দেয় পুরাণে অত্রি মুনির বংশজাত যেসব বংশপ্রবর্তক ঋষিদের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি কপর্দেয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মহর্ষি অত্রির বংশ অথবা শিষ্য পরম্পরায় কপর্দেয় এবং তাঁর বংশধররা আত্রেয় নামে পরিচিত।

[মৎস্য পু. ১৯৮.১০]

কপাল১ একাদশ রুদ্রের অন্যতম। *[বায়ু পু. ৬৬.৭০]*

কপাল২ আভিধানিক অর্থে 'কপাল' বলতে মাটির পাত্র বা 'শরা' বোঝানো হয়। মনুসংহিতায় সন্ন্যাসীর হাতে যে মাটির ভিক্ষাপাত্র থাকে তাকে 'কপাল' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[মনু সংহিতা ৬.৪৪]

হাতে মৃন্ময় ভিক্ষাপাত্র ধারণ করেন বলেই শিব মহাদেব কপালবান্ নামে খ্যাত। *[দ্র. কপালবান্]*

বৈদিক কালে এই ধরণের মাটির পাত্র বা 'শরা'র উপরে দেবতার আহুতি হিসেবে পিঠে জাতীয় 'পুরোডাশ' রাখার পরে বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা সেগুলির সংস্কার করা হত এবং সেটাকে আহুতিযোগ্য করে নেওয়া হত। এইখানে আটটি মৃৎপাত্রের মধ্যে রেখে পুরোডাশের এই সংস্কার পদ্ধতি বর্ণনা করার সময়ে এক একটি মৃৎপাত্রকে কপাল নামে সংজ্ঞিত করা হয়েছে পাণিনির সূত্রে *[৪.২.১৬]*, তার প্রমাণ আছে—

অষ্টসু কপালেষু সংস্কৃতঃ অষ্টকপালঃ পুরোডাশঃ।

কপাল৩ *[দ্র. যজ্ঞায়ুধ]*

কপালবান্ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। 'কপাল' শব্দের অর্থ করোটি। দশভুজ মহাদেব একহাতে নর-করোটি ধারণ করেন বলে তিনি 'কপালবান্' নামে খ্যাত। টীকাকার নীলকণ্ঠ কপালবান্ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

ব্রহ্মণঃ শিরশ্ছিত্বা তৎকপালং ধারয়তীত্যর্থঃ।

পুরাণে বর্ণিত আছে যে, সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং শিব-মহাদেব আবির্ভূত হলেন। মহাদেবকে তখন দিগম্বর, বৃষবাহন এবং জগতের সংহারকর্তা বলে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা উপহাস করলেন। এই কারণে ব্রহ্মা এবং শিবের মধ্যে তুমুল কলহ আরম্ভ হল। শেষে একসময় ক্রোধে অন্ধ হয়ে শিব ব্রহ্মার শিরচ্ছেদ করলেন। ফলে ব্রহ্মহত্যার পাপ তাঁকে গ্রাস করল। ব্রহ্মার ছিন্ন মুণ্ডটি শিবের হাতের সঙ্গেই যেন ব্রহ্মহত্যার প্রমাণ হিসেবেই আটকে থাকল, অনেক চেষ্টা করেও শিব সেটিকে নিজের হাত থেকে ছাড়াতে পারলেন না। ব্রহ্মহত্যা দোষে দুষ্ট শিব নানা তীর্থে ভ্রমণ করতে লাগলেন কিন্তু যমুনা সরস্বতীর মত পুণ্যসলিলা নদী তাঁকে স্নানের জল দান করতে অস্বীকার করল, নানা তীর্থে ভ্রমণ করেও শিব সেই ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি পেলেন না। শেষে একসময় শিব কুরুজাঙ্গলে এসে নারায়ণের দর্শন পেলেন। চতুর্ভুজ নারায়ণের স্তব করার পরই তিনি ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হলেন, নরকপালটিও তাঁর হাত থেকে এই স্থানে খসে পড়ল। ফলে এইস্থানের নাম হল কপালমোচনতীর্থ। ব্রহ্মার শিরচ্ছেদ করার ফলে

ব্রহ্মহত্যাদোষযুক্ত মহাদেব নরকপালধারী হয়েছিলেন বলেই তিনি কপালবান্ নামে খ্যাত।

কপাল শব্দের অন্য একটি অর্থ হতে পারে মাটির শরা, বা মাটির তৈরি ভিক্ষাপাত্র বা যজ্ঞপাত্র। মহাদেব দেবী-অন্নপূর্ণার দ্বারে মাটির শরা বা ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়িয়েছিলেন বলেও তাঁকে কপালবান্ বলা হয়। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর ভারতকৌমুদী টীকায় কপালবান্ নামটিকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন—কপালবান্ অন্নপূর্ণান্তিকে ভিক্ষাকালে ভিক্ষাপাত্রবান্।

[মহা (k) ১৩.১৭.৪৩; (হরি) ১৩.১৬.৪৩; স্কন্দ পু. (কাশী) ১.৩১ অধ্যায়; বামন পু. ২-৩]

কপালভুবনেশ্বরী দেবীভাগবত পুরাণ অনুসারে দেবী ভুবনেশ্বরীর অবতারদের মধ্যে কপালভুবনেশ্বরী দেবী অন্যতম।

[দেবীভাগবত পু. ১২.১১.১০৬]

কপালমোচন কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত সরস্বতী নদীর কাছে অবস্থিত একটি তীর্থ। মহাভারতের বনপর্বে একে সর্বপাপনাশী একটি তীর্থস্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারত মতে ঔশনস তীর্থেরই আরেক নাম কপালমোচন। এই নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে শল্য পর্বে একটি কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়—

পুরাকালে রামচন্দ্রের হাতে নিহত এক রাক্ষসের ছিন্ন মাথাটি মহোদরমুনির জঙ্ঘায় আটকে গিয়ে তাঁকে আহত করে। যন্ত্রণায় কাতর মহোদর ঋষি বহু পবিত্র স্থানে গিয়েও রাক্ষসের ছিন্ন মস্তকটি থেকে মুক্তি না পেয়ে অবশেষে অন্যান্য ঋষিদের পরামর্শে সরস্বতী নদীর তীরবর্তী ঔশনস তীর্থে আসেন। শেষ পর্যন্ত এই তীর্থে স্নান করার পর মহোদর ছিন্ন মস্তকের সংযোগ থেকে মুক্তি পান। মহোদর ঋষির মুখে এই মুক্তির কাহিনী শুনে অন্যান্য ঋষিরা একত্রে ঔশনস তীর্থের নামকরণ করেন কপালমোচন—অর্থাৎ নরক-পালের বন্ধন থেকে মুক্তি হয়েছে যেখানে—

তে শ্রুত্বা বচনং তস্য ততস্তীর্থস্য মানদ।
কপালমোচনামিতি নাম চক্রুঃ সমাগতাঃ॥

মহোদর ঋষি এখানেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। বলরাম তীর্থ ভ্রমণকালে কপালমোচনে আসেন এবং ব্রাহ্মণদের প্রচুর দান-ধ্যান করেন। এই তীর্থে শুক্রাচার্য ও রুষদগু ঋষির আশ্রম ছিল। ঋষি বিশ্বামিত্র ও আর্ষ্টিষেণ এখানে তপস্যা করেছিলেন। বিশ্বামিত্র কপালমোচনেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।

[মহা (k) ৩.৮৩.১৩৭; ৯.৩৯.৪-২৬; (হরি) ৩.৬৮.১৩৮; ৯.৩৭.৪-২৩]

□ অন্য একটি কাহিনী সূত্রে একটি পুরাণে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির আদিতে ভগবান শিব ও প্রজাপতি ব্রহ্মার আবির্ভাবের পর ব্রহ্মা, মহাদেবের দিগম্বর, বৃষবাহন রূপ দেখে তাঁকে নিয়ে উপহাস করেন। এরপর শিব ও ব্রহ্মার মধ্যে প্রবল বাগ্-বিতণ্ডা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ক্রুদ্ধ মহাদেব, ব্রহ্মার মস্তকছেদন করেন। ব্রহ্মহত্যার পাপের প্রমাণ চিহ্ন স্বরূপ মহাদেবের হাতের সঙ্গেই ব্রহ্মার কাটা মুণ্ডটি লেগে থাকে। কোনো ভাবেই শিব সেটিকে হাত থেকে মুক্ত করতে পারছিলেন না। তিনি বহু তীর্থ ভ্রমণ করেন, কিন্তু যমুনা ও সরস্বতীর মতো পবিত্র নদীগুলি শিবকে ব্রহ্মহত্যার পাপের জন্য স্নানের জল দিতে অস্বীকার করে। অবশেষে কুরুজাঙ্গলের একটি স্থানে এসে মহাদেব নারায়ণের দর্শন পান এবং নারায়ণের স্তব করেই শিব, ব্রহ্মার ছিন্ন মস্তকটি থেকে মুক্তি পান। কুরুজাঙ্গলে সরস্বতী নদীর তীরে যে স্থানটিতে মহাদেব ছিন্ন মস্তকটি থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, সেই স্থানটিই কপালমোচন তীর্থ নামে বিখ্যাত হয়।

[স্কন্দ পু. (কাশী) ১.৩১ অধ্যায়; বামন পু. ২-৩]

□ কপালমোচনে দেবী সতী শুদ্ধি নামে পূজিতা হন। *[মৎস্য পু. ১৩.৪৮]*

□ পুরাণভেদে কপালমোচন তীর্থের অবস্থান সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। যেমন—বরাহ পুরাণ ও নারদীয় পুরাণ মতে মহাদেব যে স্থানে ব্রহ্মার ছিন্ন মস্তক থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, সেই স্থানটি যথাক্রমে বারাণসী অথবা হরিদ্বার অথবা অবন্তীতে অবস্থিত। একইভাবে পদ্ম পুরাণেও হরিদ্বারের কাছে একটি একই নামের তীর্থস্থানের কথা বলা হয়েছে।

[বরাহ পু. ৯৭.২০-২৪; নারদ পু. (মহর্ষি) ২.৭৮.৬; পদ্ম পু. (মহর্ষি) স্বর্গ. ১২৯.২৮]

□ এই অবস্থানগত পার্থক্যের বিষয়ে একটি ধারণা করা যায় যে, হয়তো এ যুগের মতো সে যুগেও বিখ্যাত কোনো স্থানের নামে অপর জায়গায় নামকরণের রীতি প্রচলিত ছিল। হয়তো

সেই রীতি অনুসারেই কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত কপালমোচন তীর্থের নামানুসারেই অবন্তী বা বারাণসীর একটি স্থানেরও একই নামকরণ করা হয়েছে। পণ্ডিত কানিংহ্যাম অবশ্য সরস্বতী নদীর পূর্বে সাধোরা (Sadhora) নামে একটি স্থানের ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে কপালমোচন তীর্থটির অবস্থিতি নির্ধারণ করেছেন।

[EAIG (kapoor) p. 346]

কপালিনী$_{১}$ ভদ্রকালীর অষ্টযোগিনীর মধ্যে অন্যতম যোগিনী। *[কালিকা পু. ৬১.৩৯]*

কপালিনী$_{২}$ অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর-বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। কপালিনী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন।

[বিষ্ণুধর্মোত্তর পু. ১.২২৬.১৫]

কপালিনী$_{৩}$ গরুড় পুরাণ অনুসারে নবমীব্রতের সময় যেসব দেবী পূজিত হন, তাঁদের মধ্যে কপালিনী অন্যতম। *[গরুড় পু. ১.১৩৫.৫]*

কপালিনী$_{৪}$ দেবী ভগবতীর একটি শক্তি।

[লিঙ্গ পু. ২.২৭.২১৬;
স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৬২.৫৬]

কপালী$_{১}$ অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর-বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। কপালী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৭৯.১৬]*

কপালী$_{২}$ স্কন্দ পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, কপালী একজন দেবী। ঘটোৎকচের পুত্র বর্বরীকের মৃত্যুর সময় যুদ্ধক্ষেত্রে যে যে দেবীরা উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন কপালী।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৬৬.৫৩]

কপালীশা *[দ্র. একবীরা$_{১}$]*

কপালেশ্বরতীর্থ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পুণ্যতীর্থ। পরম ভক্তিভরে এই তীর্থ দর্শন করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ২০.১৬-১৭]

কপি মন্বন্তরের সংখ্যাক্রমে চতুর্থ তামস মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের অন্যতম একজন ঋষির নাম। কেবলমাত্র মৎস্য পুরাণেই কপি নামটি পাওয়া যায় এবং তা অকপি নামক এক স্বজাতীয় ঋষির সঙ্গে। মৎস্যপুরাণে তামস মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের যে নাম পাওয়া যায় তা অন্যান্য পুরাণের থেকে অনেকাংশেই আলাদা। বিশেষত কপি এবং অকপির নামের ক্ষেত্রে তা অনেক বেশি উল্লেখ্য। *[দ্র. অকপি]*

[মৎস্য পু. ৯.১৫]

কপিঞ্জল$_{১}$ নাগশৈলের কাছে অবস্থিত একটি পবিত্র পর্বত। কপিঞ্জল ও নাগশৈলের মধ্যবর্তী স্থানে প্রায় দুশো যোজন বিস্তৃত এক বিরাট অঞ্চল রয়েছে। এই অঞ্চলটিতে দ্রাক্ষা, কন্দলী, বদরী ইত্যাদি বনভূমি দেখা যায়। কিন্নররা এখানে নিত্যই ভ্রমণ করে। একাধিক নদী নাগশৈল পেরিয়ে কপিঞ্জল পর্বতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

[বায়ু পু. ৩৮.৬৬-৭০; ৪২.৬৭]

□ পণ্ডিত S.M.Ali-র মতে তিয়েনশান পর্বতের পশ্চিমে অবস্থিত কুরামিন (kuramin) পর্বতমালাটিই প্রাচীন কপিঞ্জল পর্বত। কুরামিন পর্বতমালাটি বর্তমান তাজিকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। *[GP (Ali) p. 79;*
The World Today Series (2012);
M.W. Shoemaker; Lanham;
Stryker-Post Publications 1970; p. 272]

কপিঞ্জল$_{২}$ বশিষ্ঠ বংশীয় একজন ঋষি। ইনি বশিষ্ঠ ও অপ্সরা ঘৃতাচীর পুত্র।

[মৎস্য পু. ২০০.৮; লিঙ্গ পু. ১.৬৩.৮৯]

কপিঞ্জল$_{৩}$ একজন গন্ধর্ব রাজা। করঞ্জপর্বতে অবস্থিত এক গন্ধর্বনগরীর অধিপতি।

[বায়ু পু. ৩৯.৫২]

কপিঞ্জল$_{৪}$ নর্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে বসবাসকারী জনৈক শুকের চার সুপুত্রের মধ্যে একজন।

[পদ্ম পু. (নবভারত) ভূমিখণ্ড ৮৫.৩০-৩২]

কপিঞ্জল$_{৫}$ চাতক, তিতির ও চড়াই জাতীয় পক্ষীদের সাধারণত কপিঞ্জল বলা হয়। ত্রিশিরাকে, ইন্দ্র তাঁর বজ্র দ্বারা হত্যা করার পর এক ছুতোরকে দিয়ে মৃতদেহটির মস্তকচ্ছেদ করালে, সেই মৃতদেহের মুখ থেকে কপিঞ্জল পাখি নির্গত হয়েছিল।

[মহা (k) ৫.৯.৪০; (হরি) ৫.৯.৩৯]

কপিঞ্জলী একটি পবিত্র নদী।

[মহা (k) ৬.৯.২৬; (হরি) ৬.৯.২৬]

কপিথক ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে, কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত একজন নাগ ছিলেন কপিথক। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৬]*

কপিভূ পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে সব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি কপিভূর বংশ তার মধ্যে অন্যতম। মহর্ষি

কপিভূ আঙ্গিরসবংশীয় অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৬.৪৮]*

কপিমুখ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা পরাশর মুনির নামে কয়েকটি বংশধারা প্রচলিত ছিল। সেই বংশধারায় অনেকগুলি সন্তানকে নিয়ে এক-একটি বর্গ রচিত হয়েছিল। যাঁদের গৌর-পরাশর, নীল-পরাশর, কৃষ্ণ-পরাশর, শ্বেত-পরাশর, শ্যাম-পরাশর এবং ধূম্র-পরাশর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরাশরের যে সন্তানেরা কৃষ্ণ-পরাশর নামে অভিহিত তাঁদের মধ্যে কপিমুখ হলেন একজন। *[মৎস্য পু. ২০১.৩৫]*

কপিল১ প্রাচীন এবং অতিপ্রাচীন গ্রন্থগুলিকে যদি ঐতিহাসিকতার উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে কপিলের নাম পাওয়া যাচ্ছে ঋগ্‌বেদের মতো প্রাচীনতম গ্রন্থে। সেখানে দশম মণ্ডলের একটি ঋক্‌মন্ত্রে বলা হয়েছে—

দশানামেকং কপিলং সমানং তং
হিন্বন্তি ক্রতবে পার্যায়।
গর্ভং মাতা সুধিতং বক্ষণাস্ববেনন্তং
তুষয়ন্তী বিভর্তি।

এই মন্ত্রের মধ্যে 'কপিল' বলে যে শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে, তার মধ্যে সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তা কপিলের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে বলে পণ্ডিতেরা কেউই মনে করেন না। যদি শব্দার্থের বিচার করা যায়, তাহলে কপিল শব্দের অর্থ এখানে কপিল বর্ণ, ইংরেজিতে যাকে বলে tawny colour এবং তাতে সম্পূর্ণ মন্ত্রটির অর্থ দাঁড়ায়—দশজনের মধ্যে সর্বাঙ্গে বর্ণধারী একজন আছেন, তাঁকে ক্রতু (যজ্ঞ) সাধন করার জন্য প্রেরণ করা হল, মাতা সন্তুষ্ট হয়ে জলের মধ্যে গর্ভাধান করলেন।

এই ঋক্‌মন্ত্রের অগ্র পশ্চাৎ খুব একটা বোঝা যায় না। কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে কপিল শব্দ উচ্চারিত হওয়ায় প্রসিদ্ধ বেদটীকাকার সায়নাচার্য লিখলেন —দশজনের মধ্যে যে একজন—এই কথার অর্থ দশজনের মধ্যে যিনি প্রধান। আমাদের প্রাচীন ধারায় কপিল নামে যে প্রসিদ্ধ ঋষি আছেন তাঁকে ক্রতু-সাধনের জন্য প্রেরণ করা হল—

একং মুখ্যং কপিলম্, এতন্নামানং প্রসিদ্ধং ঋষিম্।

সায়নাচার্য ঋগ্‌বেদের সময়কালেই কপিলের অবস্থান বা অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও পণ্ডিতেরা বলেছেন—বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৬.৪.১৫), মৈত্রী উপনিষদ (৬.৩০) অথর্বশিরস (৫) এবং গর্ভোপনিষদেও (১) ওই একই কপিলবর্ণ বোঝাতেই কপিল শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে তাঁদের মতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মতো প্রাচীন উপনিষদেই প্রথম ঋষি হিসেবে কপিলের নাম উল্লিখিত হয় এবং এই প্রথম বর্ণ বা পাঁশুটে রঙ (কপিল) অর্থে ব্যবহৃত কপিল শব্দটি কপিল নামে এক ঋষির সঙ্গে যুক্ত হল। এই উপনিষদেই প্রথম সাংখ্য শব্দটিরও উল্লেখ থাকায় দর্শন হিসেবে সাংখ্যের সঙ্গে কপিলের যোগ তাৎপর্য্যময় হয়ে ওঠে।

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্বাঃ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানং চ পশ্যেৎ॥

পণ্ডিতেরা অবশ্য মনে করেন যে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অন্যান্য শ্লোকে *[৪.১২.৬.১-২; ৬.১৮; ৩.৪]* সৃষ্টির আরম্ভে যে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে, কপিল ঋষিও তার সঙ্গে একাত্মক। কপিলের সঙ্গে হিরণ্যগর্ভের একাত্মতা এবং অন্য একটি পৃথক শ্লোকে সেই পরম অদ্বয়-তত্ত্ববোধের কারণ বোঝাবার জন্য সাংখ্যযোগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লিখিত হওয়ায় আমরা নিশ্চয়ই সরাসরি কপিল মহর্ষির সঙ্গে আদি সাংখ্যপ্রবক্তার একাত্মতার কথা বলতে পারি না, এমন কথা যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না। কেননা তাহলে এক শ্লোকে সৃষ্টির আদিতে কপিলের সৃষ্টির কথা বলার পরেই (ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে) অন্য শ্লোকে যখন সৃষ্টির আদিতে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তির কথা আসে (হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বম্) তখন কপিল এবং হিরণ্যগর্ভ যে একই তত্ত্ব বা একই ভাবনা এমন কথাও বলা চলে না। একটি শ্লোকে কপিলের নাম এবং অন্য তিন-চারটি শ্লোকে হিরণ্যগর্ভ অথবা রুদ্রের নাম উল্লেখ করে যদি কপিলের সঙ্গে হিরণ্যগর্ভ অথবা রুদ্রের একাত্মতা প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহলে একটি শ্লোকে কপিলের নাম এবং অন্য শ্লোকে সাংখ্য-যোগের উল্লেখই বা কেন এই বিশেষ দর্শন এবং তার স্রষ্টা ঋষির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করবে না? বিশেষত ভারতবর্ষের দার্শনিক পরম্পরার কথা মনে রাখলে সাংখ্য-দর্শনের সঙ্গে কপিলের সাহচর্য্য ঘটেছে ঐতিহ্যগতভাবেই। মহাভারতের মোক্ষধর্মে সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তা

আচার্য হিসেবে যে কপিলের নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে, তার পরম্পরা আগে থেকে তৈরি না হয়ে থাকলে মোক্ষধর্মপর্বে কপিল এত স্পষ্ট করে সাংখ্য-দর্শনের প্রথম আচার্য হিসেবে পরিগণিত হতেন না—

* যমাহুঃ কপিলং সাংখ্যাঃ পরমর্ষিং প্রজাপতিম্।
* কপিলং প্রাহুরাচার্য্যাঃ সাংখ্যনিশ্চিতনিশ্চয়াঃ।

[ঋগ্‌বেদ ১০.২৭.১৬, সায়নাচার্য-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য; Larson & Bhattacharya, Encyclopedia of Indian Philosophies, vol. 4, p. 109; বৃহদারণ্যক উপনিষদ (জগদীশ শাস্ত্রী), ৬.৪.১৫; মিত্রায়ণী উপনিষদ ৬.৩০; গর্ভোপনিষদ ১-২; অথর্বশিরস্ উপনিষদ ৫; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৫.২; ৩.৪; ৪.১২; ৬.১-২; ৬.১৮; মহা (k) ১২.২১৮.৯; ১২.৩৩৯.৬৮; (হরি) ১২.২১৫.৯; ১২.৩২৫.৬৬]

□ মহাভারতের শান্তিপর্বে কপিলকে একদিকে পরম ঋষি (পরমর্ষি) বলার সঙ্গে সঙ্গে কপিলকেই সাংখ্যদর্শনের প্রধান প্রবক্তা বলে যেমন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় চিহ্নিত করা হয়েছে, তেমনই যোগশাস্ত্রের প্রতীক হিরণ্যগর্ভের তত্ত্ববেত্তা পুরুষ হিসেবেও কপিলকে চরম সম্মান জানানো হয়েছে—

সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে।
হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বেত্তা নান্যঃ কদাচন॥

যোগদর্শনকে সাংখ্যদর্শনের সমানতন্ত্র বলা হয় বলেই 'সাংখ্য-যোগ' কথাটা একত্রে যুগ্মভাবে উচ্চারিত হয় এবং এখানে 'হিরণ্যগর্ভের তত্ত্ব কপিল ঋষির মতো কেউ জানতেন না'—এইকথা বলায় পূর্বোক্ত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে কপিলের একাত্মতা একদিকে যেমন যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে তেমনই সাংখ্যদর্শনের সবচেয়ে প্রাচীন প্রবক্তা হিসেবে কপিল সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

আসলে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ অথবা মহাভারত ছাড়াও আরও যেসব প্রাচীন গ্রন্থে কপিল-মুনির উল্লেখ আছে, সে-সব জায়গায় সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে কপিলের সংযোগ প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে গবেষকরা যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, সেখানে প্রধানতম সমস্যাই হল ঈশ্বরতত্ত্ব, যা কপিলমুনির নামে আরোপিত সাংখ্যসূত্রেও প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ বলে কথিত আছে। আরও বড়ো সমস্যাটি ঈশ্বরকৃষ্ণের মাধ্যমেই প্রধানত এক বিশিষ্ট এবং নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করেছে এবং সেখানে ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখেছেন—

এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়ে
চানুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ
বহুধা কৃতং তন্ত্রম্॥

ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখেছেন—এই পবিত্র এবং সমস্ত দর্শনের অগ্রজাত সাংখ্যতত্ত্ব মুনি অর্থাৎ কপিল তাঁর প্রিয় শিষ্য আসুরিকে কৃপানুকম্পাবশত দান করেছিলেন আর আসুরিও সেই সাংখ্যজ্ঞান দান করেছিলেন আচার্য পঞ্চশিখকে—যে পঞ্চশিখ এই সাংখ্যতন্ত্রকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

এখানে লক্ষণীয়, সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ যে ক্রমে এবং যে ভাবনায় সাংখ্যদার্শনিকদের গুরুপরম্পরা নির্ণয় করেছেন, মহাভারতের শান্তিপর্বের এক জায়গায় প্রায় সেইভাবেই সাংখ্য-দার্শনিকদের পরম্পরা উচ্চারিত হয়েছে। আমাদের মনে হয়, মহাভারতে উল্লিখিত পরাম্পরার ঘোষণাটা অনেক বেশি প্রাচীন এবং স্থূল, প্রায় অপরিশীলিত। আর সেজন্যই এটাও সম্ভব যে, কারিকাসাংখ্যের প্রবক্তা ঈশ্বরকৃষ্ণ মহাভারতের বক্তব্য থেকেই তাঁর লেখনী পরিশীলিত করেছেন। মহাভারতের এইখানে প্রসিদ্ধ সাংখ্যাচার্য পরমর্ষি কপিলের প্রশিষ্য পঞ্চশিখের পরিচয় দেবার সময় ভীষ্মের মুখে মিথিলার ব্রহ্মর্ষি রাজা জনক জনদেব এবং আচার্য পঞ্চশিখের সংবাদ উচ্চারিত হয়েছে। সংবাদের আরম্ভেই সাংখ্যবাদী তিন আচার্যের প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে—মিথিলার জনক জনদেবের সভায় পৃথক পৃথক ধর্মতত্ত্ব-জানা বিভিন্নপন্থী দার্শনিকেরা অন্তত একশোজন আচার্য বাস করতেন। জনক জনদেব নিজে আত্মতত্ত্ব এবং ব্রহ্মবিষয়িণী আলোচনা পছন্দ করলেও অন্যান্য দর্শনের আচার্যদের কথা শুনতে চাইতেন। সেই সূত্রেই সাংখ্যাচার্য পঞ্চশিখের জনকসভায় আগমন।

পঞ্চশিখের প্রথম পরিচয় তিনি কপিলা নামে এক ব্রাহ্মণীর পুত্র, সেই জন্য তাঁর নাম কাপিলেয় পঞ্চশিখ। তিনি সমস্ত সন্ন্যাসধর্ম এবং সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব জানেন। তাঁর প্রথম পরিচয় এটাই যে, সাংখ্য দার্শনিকেরা যাঁকে পরমর্ষি এবং প্রজাপতি কপিল বলে জানেন, সেই কপিলই পঞ্চশিখরূপে যেন এই পৃথিবীতে এসে তাঁর

জ্ঞানালোকে জগৎকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। এই পঞ্চশিখ আবার সাংখ্যাচার্য আসুরির প্রথম শিষ্য। আসুরি মহাপণ্ডিত এবং জ্ঞানী। একদিন তিনি আপন তপোবনের মধ্যে বসে আছেন, সেই সাংখ্যবাদী মুনিরা তাঁকে সাংখ্যীয় পুরুষ এবং সাংখ্যের অব্যক্ত তত্ত্ব উপদেশ দিতে চলেন। এই আসুরির শিষ্য ছিলেন পঞ্চশিখ, যাঁকে কপিলা নামে পতি পুত্রবতী এক ব্রাহ্মণী আপন স্তনদুগ্ধে পরিপুষ্ট করেছিলেন, সেইজন্য পঞ্চশিখকে কাপিলেয় বলা হয়—

* যত্র পঞ্চশিখো নাম কাপিলেয়ো মহামুনিঃ।
* যমাহু কপিলং সাংখ্যাঃ পরমর্ষিং প্রজাপতিম্।
স মন্যে তেন রূপেণ বিস্মাপয়তি হি স্বয়ম্॥
আসুরেঃ প্রথমং শিষ্যং যমাহুশ্চিরজীবিনম্।
* তস্য পঞ্চশিখঃ শিষ্যো মানুষ্যা পয়সা ভৃতঃ।
ব্রাহ্মণী কপিলা নাম কাচিদাসীৎ কুটুম্বিনী॥
তস্যা পুত্রত্বমাগম্য স্ত্রিয়াঃ স পিবতি স্তনৌ।
ততঃ স কাপিলেয়ত্বং লোভবুদ্ধিঞ্চ নৈষ্ঠিকীম্॥
এতন্মে ভগবানাহ কাপিলেয়স্য সম্ভবম্।
তস্য তৎ কাপিলেয়ত্বং সর্ববিত্ত্বমনুত্তমম্॥

[মহা (k) ১২.২১৮.৩-১৬; ১২.৩৪৯.৬৫;
(হরি) ১২.২১৫.৩-১৬; ১২.৩৩৩.৬৪]

□ সাংখ্যাচার্য পঞ্চশিখের এই 'কাপিলেয়ত্ব' আচার্য আসুরির ব্রাহ্মণী পত্নী কপিলার সূত্রেই হয়েছিল, নাকি সাংখ্যদর্শনের প্রথম প্রবক্তা কপিল প্রবর্তিত 'কপিলা' বিদ্যা অর্থাৎ কপিল-সম্বন্ধিনী সাংখ্যবিদ্যার কারণেই হয়েছিল— এটা গবেষণার তর্ক বটে, কিন্তু দেখার বিষয় এটাই যে, মহাভারতে জনক জনদেবের সঙ্গে সাংখ্যাচার্য পঞ্চশিখের যে সাংখ্যবিচার চলেছিল, সেই সাংখ্যবিদ্যার মধ্যে বৈদান্তিক ব্রহ্মবিদ্যার কথাই অবশেষে এসে গেছে।

ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকার শ্লোকে সাংখ্য দর্শনকে 'পবিত্র' বলেছেন, মহাভারত-পুরাণও তাই মনে করে। এমনকী সমস্ত দর্শনের মধ্যে এটি 'অগ্র' বা প্রথমজাত সবচেয়ে পুরাতন দর্শন, সেটাও কিন্তু মহাভারত-পুরাণ-সম্মত—

জ্ঞানং মহদ্ যদ্ধি মহৎসু রাজন্
বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে।
যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে
সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র॥
যচ্চেতিহাসেষু মহৎসু দৃষ্টং
যচ্চার্থশাস্ত্রে নৃপশিষ্টজুষ্টে
জ্ঞানঞ্চ লোকে যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ
সাংখ্যাগতং তচ্চ মহন্ মহাত্মন্॥

কিন্তু সাংখ্যকারিকার কৌমুদীভাষ্যে যখন ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর দর্শনের প্রথম প্রবক্তা হিসেবে কপিল-মুনির নাম উল্লেখ করালেন, তখন এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে যে, ঈশ্বরকৃষ্ণ যেহেতু ঈশ্বরতত্ত্বকে প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ বলেছেন, অতএব কপিলমুনিও সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি।

আমাদের বক্তব্য হল—কপিল-মুনি যদি সাংখ্যদর্শনের আদি-প্রবক্তা হন (যাঁকে সমানতন্ত্র যোগদর্শনে 'আদিবিদ্বান' বলে সম্বোধন করা হয়েছে) এবং বেদ-উপনিষদ তথা মহাভারত, পুরাণগুলিকে যদি আমরা সাংখ্যদর্শনের বিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের বলে অন্তর্ভুক্ত করি, তাহলে এই সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরও যেমন অস্বীকৃত নন, তেমনই কপিলমুনিকেও আদি সাংখ্যের প্রবক্তা হিসেবে নিরীশ্বরবাদী বলা যায় না। খুব সাধারণ যুক্তিতেও যদি বলি—উপনিষদগুলিতে নিরাকার এবং সাকার উভয়বিধ ব্রহ্ম সম্বন্ধেই বহুতর উক্তি আছে; তাঁকে ঈশ্বর বলে না মানলেও তিনি যে পরম শক্তিমান, বিভু, নিত্য, সর্বকারণ-কারণ চরম তত্ত্ব, এ তো উপনিষদে অতি সাধারণ কথা, আর শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ তো ব্রহ্মকে সশক্তিক এবং জ্ঞান-ক্রিয়াযুক্ত ঈশ্বর-স্বরূপেই মানে। আমরা সাধারণ যুক্তিতে বলি—ব্রহ্মবাদী উপনিষদগুলি এবং প্রায় ঈশ্বরবাদী শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কপিল মুনির নাম যে সম্ভ্রম নিয়ে উচ্চারিত হয়েছে, তাতে সেই কপিল মুনির পক্ষে নিরীশ্বরবাদী হওয়া সম্ভব নয়।

পণ্ডিতজনের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা কপিলমুনিকে নিরীশ্বরবাদী বলে প্রমাণ করার জন্য বহুতর যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। অধ্যাপক বিধুভূষণ ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ স্বকীয় গ্রন্থে সাংখ্যদর্শনের পশ্চাৎপট পর্যবেক্ষণ করার সময় কপিল নিরীশ্বরবাদী ছিলেন কিনা সে বিষয়ে প্রথমে পূর্বপক্ষের যুক্তি আলোচনা করার পর কপিলকে নিরীশ্বরবাদী হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি যে বিশদ আলোচনা করেছেন, তার মধ্যে এক ধরনের বিপরীত প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। সাংখ্যদর্শন যেহেতু

নিরীশ্বরবাদী দর্শন হিসেবে চিহ্নিত এবং ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকাই যেহেতু সাংখ্যদর্শনের সর্বাপেক্ষা পরিচিত গ্রন্থ, অতএব প্রাচীন বেদ-উপনিষদ অথবা মহাভারতের প্রমাণগুলির বিচার না করে শ্রীভট্টাচার্য কপিল-সাংখ্যকে নিরীশ্বরবাদী প্রমাণ করার জন্য ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকাকেই প্রধান উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন—'সুতরাং আমরা বলিতে চাই কপিল সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী শাস্ত্র। বিজ্ঞানভিক্ষু ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত কপিল সাংখ্যের মূল আকররূপে স্বীকৃত সাংখ্যকারিকায় বর্ণিত সাংখ্যসিদ্ধান্ত হইতে একটি নূতন সাংখ্যমতের আলোচনাই করিয়াছেন। সুতরাং বিজ্ঞানভিক্ষুর সেশ্বরবাদ স্থাপনের যুক্তির দ্বারা কাপিল সাংখ্যোর সেশ্বরবাদিত্ব সমর্থিত হয় না। *[বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, সাংখ্যদর্শনের বিবরণ, (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা ১৯৮৪) পৃ. ৯০-১৩১]*

□ আমাদের বক্তব্য হল—বিজ্ঞানভিক্ষুর সেশ্বরবাদ স্থাপনের যুক্তি থেকে যেমন কাপিল-সাংখ্যের সেশ্বরবাদ সমর্থন করা যায় না, তেমনই ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার যুক্তিগুলি থেকেও কাপিল-সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদিতা প্রমাণিত হয় না। কেননা, প্রাচীনতর গ্রন্থগুলিতে যেখানে-যেখানে কপিলের নাম পাওয়া যায়, সেই সেই গ্রন্থগুলিতে প্রাপ্ত সাংখ্যদর্শনের বৈশিষ্ট্য বিচার করলে সাংখ্যদর্শনকে সম্পূর্ণ নিরীশ্বরবাদী দর্শন বলে মনে হয় না, অতএব সেই-সেই গ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত কপিলকেই বা কীভাবে নিরীশ্বরবাদী বলে চিহ্নিত করা যায়!

একথা মনে রাখা দরকার, ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকাতে অথবা বিজ্ঞানভিক্ষুর সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে অথবা অন্য কোথাও যেখানেই সাংখ্যদর্শনের যেসব আকর গ্রন্থ কপিলমুনির নামে আরোপিত হয়েছে, তার কোনোটাকেই গবেষকেরা কপিল মুনির লেখা বলে মেনে নিতে পারেন নি। সাংখ্যসূত্র এবং তত্ত্বসমাসসূত্র নামে যে দুটি গ্রন্থ কপিলের নামে চলে, সেই দুটি গ্রন্থই কপিলের লেখা নয় বলে পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন। এমনকী কপিল লিখিত যে ষষ্ঠিতন্ত্রের কথা ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর আকর-গ্রন্থ হিসেবে সম্ভ্রম সহকারে উল্লেখ করেছেন, সেই গ্রন্থটিও সাংখ্যদর্শনের বিভিন্ন আচার্যের নামে আরোপিত হয়েছে। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার চীনা সংস্করণ হিসেবে পরিচিত সুবর্ণসপ্ততিতেই ষষ্ঠিতন্ত্র পঞ্চশিখের লেখা বলে চিহ্নিত হয়েছে। জয়মঙ্গলা টীকাতেও এটি পঞ্চশিখের নাম আরোপিত। আর বাচস্পতি মিশ্রের লেখায় ষষ্ঠিতন্ত্র যোগদর্শনের গ্রন্থ এবং সেটি সাংখ্যাচার্য বার্ষগণ্যের নামে আরোপিত।

[Larson & Bhattacharya, Encyclopedia of Indian Philosophies, vol-4, p. 315-328]

□ ফলত ষষ্ঠিতন্ত্রকেও আদিবিদ্বান কপিলেরই লেখা বলে চিহ্নিত করা কঠিন। আধুনিক গবেষণার সমস্ত সিদ্ধান্ত থেকেই আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, কপিল সাংখ্যদর্শনের আদি প্রবক্তা বলেই সাংখ্যদর্শনের সমস্ত আকর গ্রন্থগুলিতেই তাঁর নাম নিতান্ত গৌরববোধেই আরোপিত হয়েছে, তা সেশ্বরবাদী সাংখ্যতেই হোক অথবা নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যে। কিন্তু বস্তুত কপিল সেশ্বরবাদী না নিরীশ্বরবাদী তা বোধহয় প্রমাণই করা যায় না। বিশেষত সাংখ্যদর্শনের প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়, যা বেদ-উপনিষদ এবং মহাভারত-পুরাণের মধ্যে বিধৃত আছে, তার মধ্যে যতটুকু কপিলের ভাবনা পাওয়া যায়, তাতে কপিল-সাংখ্যকে নিরীশ্বরবাদী প্রমাণ করা খুব কঠিন, কেননা দর্শন হিসেবে সাংখ্যদর্শন সেখানে সম্পূর্ণ আকৃতিই লাভ করেনি। অতএব সাংখ্যদর্শনের প্রাথমিক অবস্থায় ঈশ্বর কতটা স্বীকৃত অথবা সেটি কোনো তত্ত্বের মধ্যেই পড়ে কিনা, তা বুঝতে হলে বেদ-উপনিষদ এবং মহাভারত-পুরাণে বর্ণিত সাংখ্যতত্ত্বগুলিতে ঈশ্বরের স্বরূপ আমাদের বিচার করতে হবে এবং সেই বিচারের অবশেষেই কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে স্থির করতে পারব যে, কপিল, অন্তত কপিল তো বটেই এবং তাঁর শিষ্য এবং প্রশিষ্য আসুরি এবং পঞ্চশিখও সর্বগতভাবে সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব আলোচনার পরে সর্বপ্রধান শক্তি হিসেবে অন্যতর যে শক্তিকে মেনে নিচ্ছেন তিনি অবশ্যই ঈশ্বর। বেদ-উপনিষদে ব্যাখ্যাত সৃষ্টির উৎপত্তির ইতিহাস সংক্রান্ত বক্তব্যগুলিকে—যেগুলির কোনো কোনো স্থলে ঈশ্বরের সর্বময় স্বীকৃতি স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা হয়েছে অথবা এমন এক বিশেষণবর্জিত পরম শক্তির অস্তিত্ব

প্রাচীন আকর গ্রন্থগুলিতে স্বীকৃত হয়েছে, যাকে ঠিক ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব বলে চিহ্নিত না করতে পারলেও সমস্ত কিছুর উপরেই এই তত্ত্বের স্বীকৃতিকে স্বীকার করে নিতে হবে। সে তত্ত্বটির বর্ণনা কখনও সাংখ্যের অব্যক্ত প্রকৃতি, কখনো নিষ্ক্রিয় সাক্ষী-চৈতন্য স্বরূপ পুরুষ, কখনো জীবাত্মারূপী পুরুষের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত বলে অবশ্যই মনে হবে, অন্তত মহাভারত পুরাণে কপিলোক্ত সাংখ্যদর্শন এইরকমই এবং সেখানে ঈশ্বর স্বীকার করার জন্য সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের পরে যিনি 'ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতিঃ' সেই 'অসঙ্গ' পুরুষ, তিনি মহাভারত-পুরাণের সাংখ্যতত্ত্বে প্রায় ব্রহ্মস্বরূপ।

মহাভারতে সাংখ্যীয় পঞ্চবিংশতিতম পুরুষতত্ত্বের সঙ্গে অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের ভাবনা মিশে যাওয়ায় ষড়বিংশ-সংখ্যক পরব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে পৃথক এবং সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠা করে পঞ্চবিংশ তত্ত্বটিকে পরমাত্মারই প্রকৃতি-কবলিত অংশ হিসেবে স্থাপন করার চেষ্টা চলেছে। এইখানে মহাভারতের পরবর্তী শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠ লিখেছেন—প্রকৃতির বিকারসম্পন্ন জীবাত্মা, যিনি বুধ্যমান অবস্থায় আত্মবোধের চেষ্টা করলে নিজেকে চিনতেও পারেন আবার নাও পারেন। এই অবস্থায় তিনি অস্মাদিভাব দ্বারা সংসৃষ্ট হয়ে 'আমি অমুকের পুত্র, আমি ব্রাহ্মণ এবং বিদ্বান' ইত্যাদি ভেবে ষড়বিংশরূপ পরম তত্ত্ব 'কেবল'—জ্ঞান স্বরূপকেও বোঝেন না, পঞ্চবিংশ জীবাত্মা যে সর্বত্রই একই রকম, সেটাও বোঝেন না, (অর্থাৎ নিজের স্বরূপও বোঝেন না), আবার চতুর্বিংশ প্রকৃতির স্বরূপও বোঝেন না। প্রকৃতির কার্যে দৃষ্টি আপাত হওয়ায় পঞ্চবিংশ জীবাত্মা তখন নিজেকে পরমাত্মা থেকে ভিন্ন এক পৃথক সত্তা হিসেবে ভাবেন। কিন্তু এই বুধ্যমান জীবাত্মা যখন বুঝতে পারেন যে, প্রকৃতির আশ্রিত হয়েই আমি এই গুণবিকার লাভ করেছি, তখন তিনি প্রকৃতিকে জয় করে 'প্রকৃতিমান' হন অর্থাৎ প্রকৃতিজয়ী হন—

তদা প্রকৃতিমানেষু ভবত্যব্যক্তলোচনঃ।

এই অবস্থায় শুদ্ধব্রহ্মবিষয়িনী দ্বৈতবোধহীন নির্দ্বৈতা শুদ্ধসাত্ত্বিকী বুদ্ধি জাগ্রত হয়। এই পরাবিদ্যা জাগ্রত হলেই এই পরমবোধ সম্পন্ন হয় যে, জীবাত্মা প্রকৃতপক্ষে ষড়বিংশ তত্ত্ব-পরমাত্মা বা পরব্রহ্মই এবং তখনই সৃষ্টি-প্রলয়কারিনী অথবা জন্ম-মরণধর্মিনী প্রকৃতিকে তিনি ত্যাগ করেন। জীবাত্মা প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ এবং তিনি তখন গুণযুক্তা এবং অচেতনা প্রকৃতিকে জানতে পারেন, তখন তিনি প্রকৃতির স্বরূপ জেনে মুক্ত হয়ে কৈবল্য লাভ করেন। জীবাত্মা নিত্যমুক্ত পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে মুক্ত হন এবং আত্মস্বরূপ লাভ করেন, তিনি তখন তত্ত্বভিন্ন, অজর অমর, পরব্রহ্ম হয়ে যান—

ষড়্‌বিংশো রাজশার্দূল তথা বুদ্ধত্বমাব্রজেৎ।
ততস্ত্যজতি সো'ব্যক্তং সর্গপ্রলয়ধর্মি বৈ॥
নির্গুণঃ প্রকৃতিং বেদ গুণযুক্তামচেতনাম্।
ততঃ কেবলধর্মাসৌ ভবত্যব্যক্তদর্শনাৎ॥
কেবলেন সমাগম্য বিমুক্তো আত্মানিমাপ্লুয়াৎ।
এতত্তু তত্ত্বমিত্যাহুর্নিস্তত্ত্বমজরামরম্॥

এই পর্যন্ত বলেই মহাভারত তার নিজের বৈদান্তিক অভিসন্ধিতে ফিরে এসে বলছে—পঞ্চবিংশ এই জীবাত্মা কখনোই নীর এবং ক্ষীরের মত একেবারে মিশে গিয়ে নতুন কোনো তত্ত্ব হিসেবে তত্ত্ববান হন না। ইনি চৈতন্যস্বরূপ এবং জ্ঞানী বলেই প্রকৃতিসংযোগের সময়েও তিল এবং তণ্ডুলের মত তত্ত্বভিন্নই থাকেন এবং জ্ঞানোদয় হলে পরে খুব শীঘ্রই প্রকৃতির আবেদন ত্যাগ করেন এবং তখনই বুদ্ধস্বভাব পরব্রহ্মের একাত্মতা তাঁর মধ্যে প্রকাশ পায়। জীবাত্মা তখন এই ভাবনা করেন যে, আমি পরব্রহ্ম, চিরজ্ঞানময়, আমি তাই অজর এবং অমর, ক্ষয়রহিত। এই 'কেবল' জ্ঞানের মাধ্যমেই জীবাত্মা পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের তুল্যতা লাভ করেন।

মহাভারতে ব্রহ্মস্বরূপ এই ষড়্‌বিংশ তত্ত্বের সঙ্গে পঞ্চবিংশ জীবাত্মার একাত্মতা স্থাপন করার মধ্যে অদ্বয়ব্রহ্মবাদের যে বৈদান্তিকতা আছে, মহাভারত সেটাকে তৎকালীন ধারণায় সাংখ্যসম্মত মনে করে বলেই তার নিজস্ব সাংখ্যভাবনা উপস্থিত করেছে এবং মহাভারতের কপিল কিন্তু এইরকম সাংখ্যদর্শনেরই প্রবক্তা।

[মহা (k) ১২.৩০১.১০৮-১০৯; ১২.৩০২.৩৯-৪১; ১২.৩০৮.৯-১৬; (হরি) ১২.২৯৪.১০৭-১০৮; ১২.২৯৫.৩৯-৪১; ১২.৩০০.৯-১৬]

□ হয়তো কপিল সেশ্বর সাংখ্যের প্রবক্তা বলেই কপিল ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম অংশাবতার হিসেবে কল্পিত হয়েছেন। ভগবদ্‌গীতার বিভূতি

যোগে তিনি ভগবানের বিভূতি হিসেবে সিদ্ধ যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়েছেন—

সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।

ভাগবত পুরাণে ভগবদ্গীতার সূত্র ধরেই তিনি 'সিদ্ধেশ' অথবা সিদ্ধ মহাপুরুষদের অধীশ্বর এক সাংখ্যাচার্য—

অয়ং সিদ্ধগণাধীশঃ সাংখ্যাচার্যৈঃ সুসম্মতঃ।
লোকে কপিল ইত্যাখ্যাং গন্তা তে কীর্তিবর্ধনঃ॥

মহামুনি কপিল সাংখ্যের প্রথম আচার্য হিসেবে প্রথিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে সাংখ্যের সমানতন্ত্র যোগশাস্ত্রের প্রধানতম সিদ্ধ বলেই ভাবনা করা হয়েছে অনেক জায়গায়। এমনও বলা হয়েছে যে, পৃথু, যিনি এই পৃথিবীর প্রথম রাজা এবং যাঁর নামেই 'পৃথ্বী' অথবা পৃথিবী শব্দটি, সেই পৃথু রাজা হবার পর যখন পৃথিবীকে গোরু হিসেবে কল্পনা করে পৃথিবী দোহন করেছিলেন, তখন তাঁকে সহায়তা করার জন্য বিদ্যাধর দেবতারা কপিল মুনিকে গোবৎস হিসেবে কল্পনা করে আকাশের পাত্রে অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধি দোহন করেছিলেন— পৃথুর যজ্ঞকর্মে কপিলের আগমন এইভাবেই সার্থক হয়েছিল—

প্রকল্প্য বৎসং কপিলং সিদ্ধাঃ সংকল্পনাময়ীম্।
সিদ্ধিং নভসি বিদ্যাঞ্চ যে চ বিদ্যাধরাদয়ঃ।

[ভগবদ্গীতা ১০.২৬; ভাগবত পু. ৩.২৪.১৯; ৬.১৫.১২-১৩; ৪.১৮.১৯; ৪.১৯.৬]

□ ভাগবত পুরাণে কপিল ভগবান বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। স্বায়ম্ভুব মনুর তিন কন্যা আকূতি, দেবহূতি এবং প্রসুতির মধ্যে দেবহূতির বিবাহ হয়েছিল কর্দম প্রজাপতির সঙ্গে। দেবহূতি এবং কর্দম প্রজাপতির জীবন সফল করে স্বয়ং ভগবান এই ঋষিদম্পতির পুত্রত্ব গ্রহণ করেছিলেন ধর্ম এবং জ্ঞান উপদেশ করার জন্য। এই ধর্ম এবং জ্ঞান অবশ্যই সাংখ্যদর্শনের জ্ঞান, যা কপিলের মাধ্যমেই প্রচারিত হয়েছে এবং এই জ্ঞান কপিল তাঁর শিষ্য আসুরিকে প্রথম দান করেছিলেন—

* পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্॥
* ধর্মজ্ঞানোপদেশার্থং ভগবান্ পুত্রতাং গতঃ।

[ভাগবত পু. ১.৩.১০; ৮.১.৫-৬; ২.৭.৩]

□ আপন গুণবতী কন্যা দেবহূতিকে স্ত্রীরূপে স্বীকার করার জন্য স্বায়ম্ভুব মনু যখন কর্দম ঋষিকে অনুরোধ করলেন, তখন কর্দম ঋষি প্রাথমিকভাবে সম্মত হলেন, কিন্তু তারপরেই প্রজাপতি কর্দম স্বায়ম্ভুব মনুকে সানুনয়ে বললেন যে, তিনি দেবহূতির সন্তানোৎপত্তির কাল পর্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে থাকবেন, কিন্তু তারপর তিনি ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করার জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে চলে যাবেন। মনু প্রজাপতি কর্দমের সাধনেচ্ছার সঙ্গে তাঁর গার্হস্থ্যের অনুষঙ্গ মেনে নিলেন এবং শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী কন্যা দেবহূতিকে প্রজাপতি কর্দমের হাতে তুলে দিলেন বৈবাহিক সম্বন্ধের জন্য।

কর্দম দেবহূতিকে বিবাহ করে আনার পর ধার্মিক স্বামীর কাছে দেবহূতিই একদিন রতিসম্ভোগের ভাবনা প্রকাশ করলেন। হয়তো বা সেটা গৃহস্থধর্মের তাড়নায় সন্তানলাভের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য, নয়তো বা সেটা নিছক রতিসম্ভোগের কারণেই। অন্তত শেষেরটা যে বৈবাহিক অধিকার সেটা প্রজাপতি কর্দমও বুঝলেন। কর্দম প্রজাপতি প্রিয়া দেবহূতির প্রিয়সাধনের জন্য যোগাসনে বসলেন এবং সমস্ত কামনাপূরক একটি দিব্য বিমান লাভ করলেন। সেই বিমানে সমস্ত ভোগ্য বস্তু যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য রাখা ছিল। ঋষি কর্দম দেবহূতির সঙ্গে সর্বাভীষ্টপ্রদ সেই বিমানে আরোহণ করলেন। পরস্পরের অভীষ্ট রতিসম্ভোগের মধ্যে কর্দম প্রজাপতি যোগবলে নিজেকে নয় ভাগে বিভক্ত করে দেবহূতির গর্ভে বীর্য্যাধান করলেন। তাতে নয়জন সুন্দরী কন্যার জন্ম দিলেন দেবহূতি।

কন্যাজন্মের পর কর্দম প্রজাপতি দেবহূতিকে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে চাইলেন। দেবহূতি কর্দমের কথা মেনে নিয়েও তাঁর কাছে একটি পুত্রসন্তান চাইলেন। দেবহূতির তর্ক-যুক্তি এবং বিনয় ভাবনাতে কর্দম ঋষির হৃদয় করুণার্দ্র হল এবং তিনি বললেন—অক্ষর-ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান নারায়ণ তোমার গর্ভে প্রবেশ করবেন। তুমি ব্রতধারণ করে যথোচিত তপস্যায় নিমগ্ন হও। কর্দমের উপদেশ অনুসারে দেবহূতি ইন্দ্রিয়দমন এবং তপস্যার মাধ্যমে কূটস্থ ভগবানের আরাধনা করতে লাগলেন। তারপর একসময় ভগবান মধুসূদন কাষ্ঠে যেমন অগ্নি অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত থাকেন সেইভাবে কর্দম ঋষির বীর্য্য আশ্রয় করে দেবহূতির পুত্ররূপে প্রকটিত হলেন। কপিল

ভগবানের অংশ দেবহূতির পুত্রত্ব স্বীকার করলেন।

এই সময় ভগবান ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা ইত্যাদি ঋষিদের নিয়ে কর্দমের আশ্রমে আবির্ভূত হলেন এবং দেবহূতির গর্ভে ভগবানের শক্ত্যাবেশ-অবতার কপিলরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, সে কথা জানালেন। নিজগৃহে স্বয়ং ভগবান অংশরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন জেনে কর্দম ঋষি নির্জনে কপিলদেবের সঙ্গে দেখা করলেন। কর্দম তাঁর স্তব করে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি চাইলেন। কর্দম ঋষি অরণ্যে চলে গেলে দেবহূতি পুত্র কপিলের কাছে ভগবত্তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করলেন।

'দেবহূতিকে তাঁর পুত্র কপিলই তত্ত্বোপদেশ করবেন'—ভগবান ব্রহ্মার এই কথা স্মরণ করে দেবহূতি আত্ম-অনাত্মবিবেক এবং প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করলেন। কপিলদেব এই সময়ে প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্বজ্ঞানের জন্য মহত্তত্ত্বাদির উৎশক্তি বর্ণনা করে সাংখ্য-যোগের নিগূঢ় তত্ত্ব শোনালেন। সম্পূর্ণ নয় অধ্যায় জুড়ে কপিল দেবহূতিকে সাংখ্য-যোগের সমস্ত তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন বটে, কিন্তু ভাগবত পুরাণে কপিলের মুখোদ্‌গীর্ণ সাংখ্যযোগের মর্মে ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা এইখানে কপিলোপদেশের মধ্যেই ভক্তিদর্শনের সেই সারকথাটা আছে যে, শুদ্ধ ভগবৎপ্রেমী মানুষকে পঞ্চবিধা মুক্তির মধ্যে সাযুজ্য, সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য এবং সারূপ্য ইত্যাদি যদি ভগবানও দিতে চান, তবু তিনি সে মুক্তি তিনি গ্রহণ করেন না, তিনি ভগবানের সেবাই প্রার্থনা করেন।

সাংখ্য-যোগ দর্শনের প্রবক্তা কপিলের মুখে ভগবান শ্রীহরি এবং তাঁর ভক্তির মাহাত্ম্যকথা প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে মিলবে না বটে, কিন্তু এতে আমাদের মূল প্রতিপাদ্যটা ঠিক থাকে এবং সেটা হল ঈশ্বরাবতার কপিলদেব কিন্তু নিরীশ্বরবাদী নন, অন্তত মহাভারত-পুরাণ থেকে সেটা প্রমাণ করা দুষ্কর।

[ভাগবত পু. ৩.২৩ অধ্যায় থেকে ৩.৩৩ অধ্যায়]

কপিল$_2$ মহাভারতের বনপর্বে এবং পদ্মপুরাণে জনৈক নাগরাজ কপিলের নাম উল্লিখিত হয়েছে। গঙ্গাদ্বার অর্থাৎ হরিদ্বারের কাছে এই নাগরাজ কপিলের মাহাত্ম্য বিজড়িত একটি তীর্থ আছে। স্থানটি নাগতীর্থ নামে পরিচিত। তবে মহাভারতে এই নাগরাজ কপিলের পরিচয় জানা যায় না। কপিল নামক এই নাগের বিস্তারিত পরিচয় মেলে পুরাণে। পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কপিল একজন। পাতালের তৃতীয় তল অর্থাৎ বিতলে তাঁর সুরম্য প্রাসাদ ছিল বলেও বর্ণিত হয়েছে।

[মহা (k) ৩.৮৪.৩২; (হরি) ৩.৬৯.৩২;
বায়ু পু. ৫০.২৯; ৬৯.৭৩.২১৯;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.৩০; ২.৭.৩৬;
পদ্ম পু. (আনন্দাশ্রম) স্বর্গ. ২৮.৩৩]

কপিল$_3$ প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত অন্যতম দানব। দৈত্যরাজ বলি যখন স্বর্গলোক আক্রমণ করেছিলেন, সেই সময় যে-সব অসুরবীর বলির পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন, কপিল তাঁদের মধ্যে একজন।

[ভাগবত পু. ৬.৬.৩০; ৮.১০.২১;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.৫; বিষ্ণু পু. ১.২১.৪]

কপিল$_4$ প্রিয়ব্রতের পুত্র জ্যোতিষ্মান ছিলেন পৌরাণিক কুশদ্বীপের অধিপতি, জ্যোতিষ্মানের সাত পুত্র সন্তানের মধ্যে কপিল একজন। কপিল জ্যোতিষ্মানের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন বলে পুরাণে উল্লেখ আছে। জ্যোতিষ্মান কুশদ্বীপকে সাতটি বর্ষ বা ভূখণ্ডে বিভক্ত করে তাঁর সাত পুত্রকে সাতটি বর্ষের রাজপদে অভিষিক্ত করেন। কপিল যে বর্ষে রাজা হয়েছিলেন, কপিলের নামেই কুশদ্বীপের সেই ভূখণ্ডটি কপিলবর্ষ নামে খ্যাত হয়েছিল।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.২৮-৩০;
বিষ্ণু পু. ২.৪.৩৭; বায়ু পু. ৩৩.২৪]

কপিল$_5$ একজন যক্ষ। প্রচেতা নামে এক যক্ষের ঔরসে গন্ধর্বকন্যা সুযশার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কপিল একজন। *[বায়ু পু. ৬৯.১২]*

□ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ থেকে জানা যায় রাক্ষসী কেশিনী এই কপিল নামক যক্ষের কন্যা ছিলেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৪৬]

কপিল$_6$ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী বানরকুল ছিল পুলহ প্রজাপতির সন্তান। কপিল এই পুলহবংশীয় বানরবীরদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৩৩]

কপিল$_7$ বায়ুপুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কৃষ্ণপিতা বসুদেবের সুগন্ধি নামে এক পত্নীর উল্লেখ পাওয়া

যায়। মৎস্য পুরাণে সুগন্ধির পরিবর্তে সুতনু পাঠ ধৃত হয়েছে। বসুদেবের পত্নী সুগন্ধি বা সুতনুর গর্ভে কপিল নামে এক পুত্র সন্তান জন্মেছিল বলে জানা যায়। তবে ইনি অল্পবয়সেই সংসার ত্যাগ করে বনে গমন করেন। *[বায়ু পু. ৯৬.১৮২-১৮৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৮৫-১৮৬; মৎস্য পু. ৪৬.২১]*

কপিল$_{৮}$ মৎস্যপুরাণ মতে অজমীঢ়ের ঔরসে নীলিনীর গর্ভজাত পুত্র নীল ছিলেন পঞ্চাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। নীলের বংশে রাজা ভদ্রাশ্বের পাঁচ পুত্র সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন কপিল। ভদ্রাশ্বের এই পাঁচ পুত্র সন্তানের দ্বারা সুরক্ষিত জনপদই পঞ্চাল নামে খ্যাত ছিল। *[মৎস্য পু. ৫০.৩]*

কপিল$_{৯}$ মহী নামক দানবের পুত্র, একজন পাতাল নিবাসী দানব। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু যখন স্বর্গলোক আক্রমণ করার জন্য যুদ্ধযাত্রা করলেন, সেই সময় দৈত্যসেনার পদভারে পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল বলে পুরাণে উল্লেখ আছে। সেই সময় পাতালবাসী যেসব দানব কম্পিত হয়েছিলেন, কপিল তাঁদের মধ্যে একজন।
[হরিবংশ পু. ৩.৪৬.৭৫; মৎস্য পু. ১৬৩.৯০]

কপিল$_{১০}$ প্রজাপতি বিক্রান্তের ঔরসে যেসব বিশিষ্ট গন্ধর্বের জন্ম হয়েছিল, কপিল তাঁদের মধ্যে একজন। ইনি তপস্বী ছিলেন বলে পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। *[বায়ু পু. ৬৯.২৬]*

কপিল$_{১১}$ অষ্টম দ্বাপরে যখন মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্যাস হবেন, সেই সময় তাঁর যে চারজন শিষ্য মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করবেন কপিল তাঁদের মধ্যে একজন। *[বায়ু পু. ২৩.১৪১]*

কপিল$_{১২}$ ভাগবত পুরাণ মতে পৌরাণিক কুশদ্বীপের সাতটি প্রধান পর্বত বা কুলপর্বতের মধ্যে কপিল অন্যতম। *[ভাগবত পু. ৫.২০.১৫]*

কপিল$_{১৩}$ পুরাণ মতে জম্বুদ্বীপের সাতটি প্রধান পর্বত বা কুলপর্বতের মধ্যে কপিল অন্যতম একটি পর্বত। জম্বুদ্বীপে অবস্থিত শীতোদ সরোবরের (বিষ্ণু পুরাণ মতে অসিতোদ সরোবরের) পশ্চিমে এবং মহাভদ্র সরোবরের উত্তরে এই পর্বত অবস্থিত। *[ভাগবত পু. ৫.১৬.২৬; বায়ু পু. ৩৬.২৭, ৩১; ৪২.৫০; বিষ্ণু পু. ২.২.২৭]*

কপিল$_{১৪}$ একটি বিশিষ্ট হস্তী। ঐরাবত হস্তীর বংশে তাঁর জন্ম হয়। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৩৫; বায়ু পু. ৬৯.২১৯]*

কপিল$_{১৫}$ ভারতবর্ষের অধিবাসীরা যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিলেন—পৌরাণিক শাল্মলীদ্বীপের অধিবাসীরাও ঠিক তেমনই চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিলেন বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। এই চারটি বর্ণের নাম—কপিল, অরুণ, পীত এবং কৃষ্ণ। চতুর্বর্ণের ক্রম অনুসারে কপিল নামক বর্ণটি ভারতের ব্রাহ্মণ বর্ণের সমার্থক ছিল বলে মনে হয়। *[বিষ্ণু পু. ২.৪.৩০-৩১]*

কপিল$_{১৬}$ একজন যক্ষ। বামন পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী ঋষি পরশুরাম কুরুক্ষেত্রে মুঞ্জবট নামে যে তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই তীর্থ কুরুক্ষেত্রের দ্বার স্বরূপ। কপিল নামে এক যক্ষ ছিলেন সেই দ্বারের রক্ষক। কপিলের পত্নীর নাম উলূখলমেখলা। তিনিও স্বামীর মতোই কুরুক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত থাকতেন। *[বামন পু. ৩৪.৩৮-৪৬]*

কপিল$_{১৭}$ শিব-মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। শিবসহস্রনাম স্তোত্রের একটি শ্লোকে কপিল, কণিশ এবং শুক্ল—এই তিনটি নাম একত্রে উচ্চারিত হয়েছে। (মহাভারতের বেশির ভাগ সংস্করণে কপিলের ঠিক পরে 'কপিশ' পাঠ ধৃত হলেও হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত 'কণিশ' পাঠটিকেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়)। টীকাকার নীলকণ্ঠ এই তিনটিকে বর্ণবাচী শব্দ বলেছেন—কপিলঃ কণিশঃ শুক্লঃ ইতি ত্রয়োপি বর্ণবাচিনস্তদ্বান্। কপিল বর্ণ মানে পিঙ্গলবর্ণ বা রক্তবর্ণ। 'কণিশ' শব্দের অর্থ হল 'কণযুক্ত' ধান্যাদির শীর্ষদেশ। স্বভাবতই এগুলি পীতবর্ণ। আর শুক্ল হল শোভন শ্বেতবর্ণ। তবে এই তিনটি বর্ণের মাধ্যমে মহাদেবের নামকীর্তন শুধুমাত্র বর্ণের মাত্রা বহন করে না। মহাভারতে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর—এই তিনটি যুগের মাহাত্ম্য এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে প্রথমে সত্য যুগে সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভগবান বিষ্ণু সে সময় শুক্লবর্ণ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ক্রমে ত্রেতাযুগ এল। ত্রেতাযুগে ধর্ম একপাদ হ্রাস পেল। ভগবান বিষ্ণু সে যুগে রক্তবর্ণ হলেন। তারপর দ্বাপরযুগে সনাতন ধর্ম আরও একপাদ হ্রাস পেল। সে যুগে ভগবান হলেন পীতবর্ণ। আর কলিযুগে ধর্ম যখন ত্রিপাদ হ্রাস পেয়ে একপাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকবে—সে যুগে

ভগবান কৃষ্ণ বর্ণ মূর্তিতে আবির্ভূত হবেন—একথাও মহাভারতে এবং পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। ভাগবত পুরাণের একটি শ্লোকে যুগে যুগে ভগবানের এই রূপ পরিবর্তনের বিষয়টি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতো'নুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।

[ভাগবত পু. ১০.৮.১৩]

□ ভগবান বিষ্ণু এবং শিবকে অভিন্ন সত্তা রূপে কল্পনা করে যুগে যুগে ভগবানের এই বিভিন্ন বর্ণযুক্ত রূপ ধারণের ভাবনাটি ভগবান শিবের উপরেও আরোপিত হয়েছে। কপিল, কণিশ এবং শুক্ল—এই তিন বর্ণের মাধ্যমে মহাদেবকে তিনটি যুগের অধীশ্বর বলে ভাবনা করা হয়েছে।

[মহা (k) ৩.১৪৯.১২-৩৫; ১৩.১৭.৯৮; (হরি) ৩.১২৩.১২-৩৫; ১৩.১৬.৯৮]

কপিল$_{১৮}$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামস্তোত্রে ভগবান বিষ্ণুকে যখন কপিল নামে সম্বোধন করা হয়েছে—সেখানে অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য বিষ্ণুর অবতার-ভাবনার মধ্যে প্রবেশ না করে বড়বানলের মধ্যস্থিত অগ্নিবর্ণের সঙ্গে বিষ্ণুর তুলনা করেছেন—

বড়বানলস্য কপিলো বর্ণ ইতি তদ্রূপী কপিলঃ।

ত্রেতা যুগে তিনি কপিল বা রক্তবর্ণ রূপে মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলেও তিনি কপিল নামে খ্যাত।

কিন্তু সর্বগত ব্রহ্মের দ্বৈত ভাবনায় কপিলের প্রসঙ্গে অবতারের প্রসঙ্গটিও চলে আসে। ভাগবত পুরাণে বিষ্ণুর যুগাবতার, পুরুষাবতার ইত্যাদির বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বিষ্ণুর চব্বিশটি অবতার স্বরূপের কথা বলা হয়েছে। জগৎ সৃষ্টির কাল থেকে পর পর অবতার বর্ণনা করার সময়ে ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কপিল ভগবান বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। তিনি আসুরি নামক ঋষির কাছে কালপর্য্যায়ে বিনষ্টপ্রায় সাংখ্য দর্শনশাস্ত্র বর্ণনা করেছিলেন। যে সাংখ্যশাস্ত্রের চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অবতারণা প্রায় সমস্ত আস্তিক দর্শনকে প্রভাবিত করেছে, তার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন কপিল—

পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্॥

[ভাগবত পু. ১.৩.১০]

ভগবদ্গীতায় বিভূতি যোগেও বিষ্ণুর অবতার স্বরূপ কপিলকে অন্যতম বিভূতি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে—

সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ। *[ভগবদ্গীতা ১০.২৬; মহা (k) ১৩.১৪৯.১০৯; (হরি) ১৩.১২৭.১০৯]*

কপিলকর্ণিক বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, পৌরাণিক কেতুমালবর্ষের অন্তর্গত জনপদগুলির মধ্যে কপিলকর্ণিক একটি। *[বায়ু পু. ৪৪.১১]*

কপিলকেদার কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি তীর্থ। এখানে তপস্যা করলে অন্তর্ধান শক্তি লাভ করা যায়, এমন কথা মহাভারতে বলা হয়েছে।

[মহা (k) ৩.৮৩.৭৪; (হরি) ৩.৬৮.৭৪]

কপিলধারা *[দ্র. কপিলাতীর্থ$_{৩}$]*

কপিলা$_{১}$ দক্ষের কন্যা, প্রজাপতি কশ্যপের পত্নী। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে, অমৃত, ব্রাহ্মণ, গোরু এবং বহু গন্ধর্ব ও অপ্সরা কপিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। *[মহা (k) ১.৬৫.১২; ১.৬৫.৫২; (হরি) ১.৬০.১২; ১.৬০.৫৩]*

কপিলা$_{২}$ আসুরি নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁর আশ্রমে বসবাসকারিণী জনৈক পতিপুত্রবতী ব্রাহ্মণী ছিলেন। তাঁর নাম কপিলা। আসুরির অন্যতম শিষ্য তথা সাংখ্যদর্শনের বিশিষ্ট ঋষি পঞ্চশিখকে কপিলা আপন স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়ে পুত্রস্নেহে প্রতিপালন করেন। এই কারণেই মহর্ষি পঞ্চশিখ কাপিলেয় নামেও বিখ্যাত। *[দ্র. পঞ্চশিখ]*

[মহা (k) ১২.২১৮.১৫; (হরি) ১২.২১৫.১৫]

কপিলা$_{৩}$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে খশার গর্ভজাত কন্যা। ইনি কাপিলেয় রাক্ষসগণের জন্মদাত্রী ছিলেন। *[বায়ু পু. ৬৯.১৭০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৩৮]*

কপিলা$_{৪}$ দেবী শক্তির একটি রূপ। দেবী শক্তি মহালিঙ্গতীর্থে কপিলা নামে পূজিত হন বলে মৎস্য পুরাণে বর্ণিত আছে। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে যুদ্ধের আগে দেবী দুর্গার আরাধনা করার সময় অর্জুন দেবীকে কপিলা নামে সম্বোধন করেছেন। *[মহা (k) ৬.২৩.৪; (হরি) ৬.২৩.৪; মৎস্য পু. ১৩.৩৩]*

কপিলা$_{৫}$ কপিলা, অর্থাৎ কপিল বর্ণ গাভী। তবে মহাভারতে বর্ণিত কাহিনীতে গোমাতা সুরভিকেও কপিলা বলা হয়েছে। মহাভারতে বর্ণিত কাহিনী থেকে জানা যায়, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার আদেশে প্রজাপতি দক্ষ মনুষ্য সৃষ্টি করতে

লাগলেন। তাদের জীবন ধারণের উপায় বা পুষ্টিকর খাদ্যের কোনো ব্যবস্থা তখনও করা হয়নি। দক্ষের সৃষ্ট প্রজারা এই সমস্যার কথা নিবেদন করলেন দক্ষের কাছে। সব শুনে দক্ষ মানুষের প্রাণধারণের উপযোগী কোনো বস্তু সৃষ্টির অভিলাষে অমৃত পান করলেন। অমৃত পানের পর দক্ষের উদ্‌গার থেকে এক অপূর্ব সুগন্ধ সৃষ্টি হল। সেই সুগন্ধ থেকেই জন্ম নিলেন গোমাতা সুরভি। তাঁর দুধ অমৃতের মতোই মানবের প্রাণধারণে সহায়ক হয়ে উঠল। একদিন মহাদেব মর্ত্যলোকে বিচরণ করছিলেন, এমন সময় সুরভির এক বৎস (বাছুর) মাতৃদুগ্ধ পান করে ফেনা উদ্‌গার করল। সেই ফেনা গিয়ে পড়ল মহাদেবের জটাজুটে। মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে সুরভি, সেই গোবৎস এবং অন্যান্য গাভীদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তাঁর তৃতীয় নেত্র থেকে নির্গত তেজে গাভীদের গাত্রবর্ণ পরিবর্তিত হল এবং তা কপিলবর্ণ ধারণ করল। ক্রুদ্ধ মহাদেবকে শান্ত করতে এগিয়ে এলেন দক্ষ। মহাদেবকে বোঝালেন যে গো-দুগ্ধ অমৃতের তুল্য, আর গোবৎসের মুখ থেকে নির্গত ফেনা মহাদেবের জটায় ভুলক্রমে পতিত হলেও তা কখনোই কোনো উচ্ছিষ্ট দ্রব্যের মতো ঘৃণ্য বস্তু নয়। দক্ষ সুরভি এবং সমস্ত কপিলবর্ণা গাভীদের এবং একটি ষণ্ড উপহার রূপে তুলে দিলেন মহাদেবের হাতে। মহাদেব প্রসন্ন হলেন এবং কপিলবর্ণযুক্ত গাভীরা তাঁর দ্বারা রক্ষিত হয় বলেই পরম পবিত্র বলে আখ্যাত হয়। মহাভারতে ও পুরাণে বহুবার কপিলা গাভী দান করাকে মহাপুণ্যফলদায়ক বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। *[দ্র. সুরভি]*

[মহা (k) ১৩.৭৭ অধ্যায়; (হরি) ১৩.৬২ অধ্যায়; মৎস্য পু. ১৯১.৭২; বিষ্ণু পু. ৬.৮.৫২]

□ ঋগ্বেদে আমরা বিচিত্রবর্ণযুক্তা গোমাতা পৃশ্নির নাম উল্লিখিত হতে দেখি। ঋগ্বেদে তাঁকে স্পষ্টভাবেই রুদ্রের পত্নী এবং দেবগণের মাতা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদে বর্ণিত পৃশ্নি থেকেই মহাভারতে কপিলার কাহিনীর উৎপত্তি কিনা তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

কপিলাতীর্থ২ মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত একটি পবিত্র তীর্থ। তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনা করার সময় এখানে বলা হয়েছে যে, নিয়ম-আচার অনুযায়ী এই তীর্থে স্নান, পিতৃপূজা ও দেবপূজা করলে কপিলাগোদানের ফল পাওয়া যায়—

কপিলাতীর্থমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ পিতৃন্ স্বান্ দৈবতান্যপি॥

[মহা (k) ৩.৮৩.৪৭-৪৮; (হরি) ৩.৬৮.৪৭-৪৮]

□ পদ্ম পুরাণে এই তীর্থের নাম পাওয়া যায়।

[পদ্ম পু. (নবভারত) স্বর্গ. ১২.৪৮]

□ বামন পুরাণে অবশ্য সরাসরি কপিলাতীর্থকে একটি হ্রদ তীর্থ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই তীর্থে কপিল-বর্ণ শোভিত শরীর মহাদেবের বাস—

তত্রস্থিতং মহাদেবং কপিলং বপুরাশ্রিতম্।

কপিলাতীর্থবাসী মানুষরা কপিলবপু মহাদেবের দর্শনে মোক্ষলাভ করে।

[বামন পু. ৩৫.২৪-২৫]

পণ্ডিত S.N. Arya-র মতে, মহারাষ্ট্রের অমরাবতী জেলার তিওয়ারখেড় (Tiwarkheda) এর চল্লিশ মাইল দক্ষিণে ঘুইখেত (Ghuikheta) গ্রামটিই প্রাচীনকালে কপিলাতীর্থ নামে পরিচিত ছিল। *[HPAI (S.N. Arya) p. 33]*

কপিলাতীর্থ৩ ব্রহ্মপুরাণে কপিলাতীর্থকে কাপিলতীর্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তীর্থটি বিরজাক্ষেত্রের অন্তর্গত অষ্টতীর্থের মধ্যে অন্যতম। কপিলাতীর্থে ভগবান বিষ্ণু অবস্থান করেন। *[ব্রহ্ম পু. ৪২.৬]*

□ বিরজাক্ষেত্র অর্থে বর্তমান উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত বৈতরণী নদী সংলগ্ন একটি অঞ্চলকে বোঝায়। ফলে কপিলাতীর্থ বা কাপিলতীর্থ এই অঞ্চলেই অবস্থিত বলেই ধারণা করা যায়।

[GDAMI (Dey) p.38]

কপিলাতীর্থ৪ কূর্মপুরাণে বলা হয়েছে যে, নর্মদানদীর দক্ষিণদিকে কপিলা নামে এক পবিত্র নদী প্রবাহিতা। ভগবান শিব এখানে সর্বদা বিরাজ করেন। এটি একটি অত্যন্ত পবিত্র নদী-তীর্থ এবং এই নদীটি সরলা ও অর্জুনবৃক্ষে আচ্ছাদিতা—

দক্ষিণে নর্মদাকূলে কপিলাখ্যা মহানদী।
সরলার্জুনসংচ্ছন্না নাতিদূরে ব্যবস্থিতা॥

[কূর্ম পু. ২.৩৮.২৪-২৫, ২৮]

□ এই পবিত্র নদী-তীর্থের উল্লেখ মৎস্য পুরাণেও পাওয়া যায়।

[মৎস্য পু. ১৮৬.৪০; ১৯০.১০; ১৯১.৭১; ১৯৩.৪-১২]

□ পণ্ডিত N.L. Dey-এর মতে, নর্মদা নদীর উৎসমুখের কাছে একটি জলধারার অস্তিত্ব রয়েছে যা প্রায় সত্তর ফুট উচ্চতা থেকে নর্মদা নদীতেই পতিত হয়েছে। এই জলপ্রপাতটির নামই কপিলধারা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নর্মদানদী সংলগ্ন অঞ্চলে কপিলা নামে কোনো অঞ্চলের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে N.L. Dey-র ধারণাটিই সঠিক বলে মনে হয়। অর্থাৎ কূর্ম পুরাণ উল্লিখিত কপিলা নদী ও কপিলধারা জলপ্রপাত একই। *[GDAMI (Dey) p. 90]*

কপিলাতীর্থ$_8$ গৌতমীগঙ্গা অর্থাৎ গোদাবরী নদীর দক্ষিণ তীরে অন্য একটি কপিলা তীর্থ অবস্থিত। এটিও একটি নদীতীর্থ। এই তীর্থ আঙ্গিরস, আদিত্য ও সৈংহিকেয় নামেও বিখ্যাত—

কপিলাতীর্থমাখ্যাতং তদেবাঙ্গিরসং স্মৃতম্।
তদেবাদিত্যমাখ্যাতং সৈংহিকেয়ং তদুচ্যতে॥

ব্রহ্ম পুরাণে বলা হয়েছে যে, গোদাবরীর দক্ষিণ দিকে আদিত্যগণের প্রদত্ত ভূমি সিংহীরূপ ধারণ করে জনসংহার শুরু করলে অনোন্যপায় অঙ্গিরাগণ সেই ভূমি আদিত্যগণকে ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করেন। একবার প্রদত্ত ভূমি পুনর্গ্রহণ পাপ বলে বিবেচিত হওয়ায় আদিত্যগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে সমাধানসূত্ররূপে একটি গাভীর পরিবর্তে ভূমিটি অঙ্গিরাগণের কাছ থেকে ক্রয় করেন। যে স্থানে এই কপিলা অর্থাৎ গাভীর বিনিময় ঘটেছিল, সেখান থেকেই কপিলা নদীর উৎপত্তি। *[ব্রহ্ম পু. ১৫৫.১-১১]*

□ পণ্ডিত N.L. Dey জানিয়েছেন যে, মহারাষ্ট্রের নাসিকের চব্বিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কপিলমুনির আশ্রমটিই কপিলাতীর্থ। *[GDAMI (Dey) p. 90]*

কপিলাতীর্থ$_5$ অগ্নি সৃষ্টিকারী পবিত্র নদীগুলির মধ্যে একটি। *[মহা (k) ৩.২২২.২৫; ৬.৯.২৮; (হরি) ৩.১৮৫.২৪; ৬.৯.২৮]*

□ গয়ার বিখ্যাত বটবৃক্ষের পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী। অমাবস্যা তিথিতে কপিলেশ মহাদেব এই নদীতীর্থে অবস্থান করেন। কপিলা নদী শ্রাদ্ধকার্যের জন্য অত্যন্ত শুভ।

[বায়ু পু. ১০৮.৫৭]

তবে আধুনিক গয়ায় এই নদী-তীর্থের সঠিক অবস্থান এখনও পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি।

কপিলাতীর্থ$_6$ নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত একটি তীর্থ। ওই তীর্থে স্নান করলে গো-দানের ফল লাভ হয়। কূর্ম্ম পুরাণে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মঙ্গলবার যুক্ত চতুর্থী, নবমী কিংবা অমাবস্যায় যত্ন সহকারে মহাদেবকে স্নান করাবেন তিনি রূপবান ও সৌভাগ্যশালী হবেন।

[কূর্ম্ম পু. ২.৩৯.৯০-৯৬]

কপিলাতীর্থ$_7$ প্রভাসক্ষেত্রের নিকটবর্তী অর্বুদাচলে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। স্কন্দ পুরাণের প্রভাসখণ্ডে এই তীর্থের মাহাত্ম্য বিশদে বর্ণিত হয়েছে। *[স্কন্দ পু. (প্রভাস/অর্বুদ) ২৯ অধ্যায়]*

কপিলাবট হরিদ্বারের নিকটে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। মহাভারতের বনপর্বে কনখল তীর্থ থেকে কপিলাবট তীর্থে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই তীর্থ দর্শনে সহস্র গোদানের ফল পাওয়া যায়।

[মহা (k) ৩.৮৪.৩১; (হরি) ৩.৬৯.৩১]

কপিলাশ্ব কুবলাশ্ব বা কুবলয়াশ্বের পুত্রদের মধ্যে একজন কপিলাশ্ব। ধুন্ধু-দানবকে যখন কুবলাশ্ব বধ করতে গিয়েছিলেন, তখন কপিলাশ্ব তাঁর পিতাকে সহায়তা করেন। কুবলাশ্বের একুশ হাজার পুত্রের মধ্যে যে তিনজন পুত্র ধুন্ধুকে বধ করার পরেও জীবিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কপিলাশ্বের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, কুবলাশ্বের তিন পুত্র। আর তাঁদের মধ্যে কপিলাশ্ব অন্যতম।

[মহা (k) ৩.২০৪.৪০; (হরি) ৩.১৭৩.৩৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.৬৩; বায়ু পু. ৮৮.৬১; বিষ্ণু পু. ৪.২.৪২; ভাগবত পু. ৯.৬.২৪; মৎস্য পু. ১২.৩৪]

□ মহাভারতের শান্তিপর্বে সেই সব প্রাচীন রাজর্ষিদের নাম উল্লিখিত হয়েছে, যাঁরা রাজ্যশাসন করার পর অন্তিমকালে স্বর্গলাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে কপিলাশ্ব একজন।

[মহা (k) ১২.২২৭.৫১; (হরি) ১২.২২৫.৫১]

কপিলেশ$_1$ গয়াক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। *[বায়ু পু. ১০৮.৫৭]*

কপিলেশ$_2$ *[দ্র. কপিলেশ্বরতীর্থ$_1$]*

কপিলেশ্বরতীর্থ$_1$ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। ভগবান শিব এই তীর্থে কপিলেশ্বর বা কপিলেশ নামে লিঙ্গরূপে পূজিত হন। কথিত আছে কপিল মুনি এই তীর্থে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। *[স্কন্দ পু. (কাশী) ১.৩৩.১৫৮; কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৫৭, ১০৭]*

কপিলেশ্বরতীর্থ২ নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত অন্যতম পবিত্র তীর্থ।

[পদ্ম পু. (আনন্দাশ্রম) ভূমি ৮৫.২৬]

কপিলেশ্বরতীর্থ৩ প্রভাসক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। ভগবান শিব এই তীর্থে কপিলেশ্বর নামে লিঙ্গ রূপে পূজিত হন। কথিত আছে, কপিল নামে এক রাজা এই ক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নামানুসারেই এই ক্ষেত্র কপিলেশ্বর তীর্থ নামে খ্যাত হয়।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র) ৫.৩.১-৫; ৫৪.১-৯]

কপিলোম একজন রাক্ষস। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে খশার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কপিলোম একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. ২.৭.১৩৪; বায়ু পু. ৬৯.১৬৬]

কপিশা১ ক্রোধার দ্বাদশ কন্যার মধ্যে অন্যতম এবং ঋষি পুলহের পত্নী কপিশা। কপিশা থেকে কুষ্মাণ্ড পিশাচগণ জন্মগ্রহণ করেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৭২, ২৭৪; বায়ু পু. ৬৯.২০৫, ২৫৭]

কপিশা২ রামায়ণ ও মহাভারতে প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ না থাকলেও কপিশা একটি বিখ্যাত জনস্থান। কারণ পাণিনি এই কপিশাকেই কপিশী বলেছেন।

পণ্ডিত আর. জি. ভাণ্ডারকর উত্তর আফগানিস্তানকে কপিশা বলে চিহ্নিত করেছেন, যা কাবুল নদীর উত্তর দিকে অবস্থিত।

[অষ্টাধ্যায়ী, ৪.২.৯৯; GDAMI (Dey) p. 91]

□ অধ্যাপক লাসেন কপিশাকে গুরবদ নদীর তীরে অবস্থিত একটি উপত্যকা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। *[JASB, 1839, p. 146]*

□ পণ্ডিত র‍্যাপসনের মতে কপিশা পূর্বে গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই প্রসঙ্গে র‍্যাপসন বলেছেন যে—

Of the history of these Çaka satrapies inscriptions and coins give us a few details.

An inscription affords the bare mention of a satrap of Kāpiśa, the capital of Gandhāra, a district which, as we know from coins, had passed from the family of Euthydemus (Apollodotus) into the power of Eucratides.

[E.J. Rapson, Ancient India, p.141]

কপিষ্ঠল পুরাণে মহর্ষি বশিষ্ঠের গোত্রভুক্ত যেসব বংশপ্রবর্তক ঋষির নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি কপিষ্ঠল তাঁদের মধ্যে একজন। বশিষ্ঠ ঋষি থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এরা বাশিষ্ঠী বলে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ২০০.৩]*

□ মহর্ষি কপিষ্ঠল কৃষ্ণযজুর্বেদীয় কঠ সংহিতার প্রবক্তা হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

[দ্র. Kapiṣṭhala-Kaṭhaka-Saṃhitā, ed. by Raghu Vira, Lahore, 1932]

কপিস্কন্ধ স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অনুচর যোদ্ধাদের মধ্যে একজন। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৫৭; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

কপীতর পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার বংশজাত যেসব বংশপ্রবর্তক ঋষির নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি কপীতর তাঁদের মধ্যে একজন। অঙ্গিরা ঋষি থেকে বংশ পরম্পরায় বা শিষ্য পরম্পরায় এঁরাও আঙ্গিরস নামে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ১৯৬.২৫]*

কপোতরোমা১ ভোজবংশীয় রাজা ঔশীনর শিবির পুত্র কপোতরোমা। গায়ের রোমগুলি কপোতের মতো ধূসরবর্ণ হওয়ায় সম্ভবত তাঁর এই নামকরণটি সার্থক হয়েছে।

[মহা (k) ৩.১৯৭.২৮; (হরি) ৩.১৬৭.২৫]

□ যেসব রাজা মৃত্যুর পর ধর্মরাজ যমের সভায় বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কপোতরোমা একজন।

[মহা (k) ২.৮.১৭; (হরি) ২.৮.১৭]

কপোতরোমা২ পাণ্ডব-কৌরবদের সমসাময়িক জনৈক রাজা। তবে তিনি কোন দেশের রাজা ছিলেন, মহাভারতে তাঁর কোনো উল্লেখ মেলে না। কলিঙ্গদেশের রাজা চিত্রাঙ্গদের কন্যার স্বয়ংবর সভায় যেসব রাজারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কপোতরোমাও একজন বলে শান্তিপর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১২.৪.৬; (হরি) ১২.৪.৬]

কপোতরোমা৩ ভাগবত পুরাণমতে, যদুবংশজাত বিলোমার পুত্র এবং অনুর পিতা কপোতরোমা।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.২০]

□ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে যে, কপোতরোমা বৃষ্ণির পুত্র এবং বিলোমার পিতা।

বিষ্ণু পুরাণে কপোতরোমার পিতার নাম

হিসাবে 'বৃষ্ণি'র পরিবর্তে 'ধৃষ্ট' এই নামের উল্লেখ আছে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১১৭; বিষ্ণু পু. ৪.১৪.৪]*

□ মৎস্য পুরাণ অনুসারে কপোতরোমা ধৃতি-র পুত্র এবং তৈত্তিরির পিতা। *[মৎস্য পু. ৪৪.৬২]*

□ বায়ু পুরাণে অনুসারে বৃষ্টি-র পুত্র কপোতরোমা। তিনি রেবতের পিতা।

[বায়ু পু. ৯৬.১১৬]

কবক ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লিখিত একজন বানর বীর।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৪২]

কবচী ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের একজন। কুরুক্ষেত্রের দুর্যোধনের আদেশে কর্ণকে রক্ষা করার জন্য কবচী প্রভৃতি ধার্তরাষ্ট্ররা ভীমসেনকে আক্রমণ করেছিলেন। ভীমসেনের হাতে তিনি নিহত হন।

[মহা (k) ১.৬৭.১০৩; ১.১১৭.১১; ৮.৫১.৭; ৮.৮৪.২; (হরি) ১.৬২.১০৪; ১.১১১.১১; ৮.৩৯.৭; ৮.৬২.২]

কবট ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লিখিত একজন বানর বীর।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৩৮]

কবন্ধ১ রামায়ণে উল্লিখিত একজন রাক্ষস। 'কবন্ধ' শব্দের অর্থ মস্তকহীন দেহ। সম্ভবত রাক্ষসটির এরূপ দেহাকৃতিই তার এই নামের কারণ।

জটায়ুর মৃত্যুর পর দুঃখিত মনে বনে বনে সীতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন রাম ও লক্ষ্মণ। তখনই জঙ্গলের মধ্যে এক বিকট ঝড়ের মতো শব্দ হল। সেই শব্দের কারণ খুঁজতে গিয়ে রাম ও লক্ষ্মণ দেখতে পেলেন এক ভয়ঙ্কর দর্শন রাক্ষসকে। বিশাল তার আকৃতি। মাথা বা ঘাড় কিছুই নেই; বুকের উপর একটিমাত্র ভীষণ চোখ, প্রকাণ্ড ও শক্তিশালী দুটি হাত। ধারালো রোমে-ঢাকা তার প্রকাণ্ড দেহটি নীলবর্ণ। এরই নাম কবন্ধ। এই কবন্ধ এতই বিশালদেহী যে একে পূর্ণরূপে দেখার জন্য রাম-লক্ষ্মণকে একক্রোশ দূরে গিয়ে দাঁড়াতে হল। কবন্ধ তখন ভয়ঙ্কর গর্জন করতে করতে তার যোজন বিস্তৃত হাত দিয়ে ভালুক-সিংহ-হরিণ-পাখি ধরে খাচ্ছিল।

[রামায়ণ ৩.৬৯.২৪-৩৪]

বিশাল হাত বাড়িয়ে কবন্ধ রাম-লক্ষ্মণকে চেপে ধরে বন্দি করে ফেলল। দুই মহাবীর ভাইয়ের কাছে খড়্গ, ধনুর্বাণ থাকা সত্ত্বেও ভয়ানক পীড়নে তাঁদের শরীর অবশ হয়ে গেল। রামকে লক্ষ্মণ বললেন তাঁকে ত্যাগ করে নিজেকে রক্ষা করতে; যাতে তিনি সীতাকে উদ্ধার করতে পারেন, পিতৃ-পিতামহের রাজ্যও আবার লাভ করতে পারেন। তখনই কবন্ধ প্রথম কথা বলে উঠল। বলল—'তোমরা কারা? এখানে কেন এসেছ, যেখানে আমি ক্ষুধার্ত হয়ে অপেক্ষা করছি?' —এই কথা শুনে রামও ভীত ও অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁরও মনে হল, সীতাকে উদ্ধার করার আগেই বোধহয় এই বিকটদর্শন রাক্ষসের হাতে তাঁর মৃত্যু হবে।

[রামায়ণ ৩.৬৯.৩৫-৫০]

□ লক্ষ্মণ তখন রামকে বললেন—'যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য আনা পশুর মতো নিশ্চেষ্টভাবে মরে যাওয়া খুবই নিন্দনীয় ব্যাপার। আসুন, আমরা এই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের দুই হাত আমাদের অসি দিয়ে কেটে ফেলি।' লক্ষ্মণের এই কথা শুনে রেগে গিয়ে কবন্ধ দুজনকেই খেতে উদ্যত হল। আর দেরি না করে রাম-লক্ষ্মণ তাকে তরবারি নিয়ে আক্রমণ করলেন—রাম কবন্ধের ডান হাত আর লক্ষ্মণ তার বাঁ হাত কেটে ফেললেন। ভয়ঙ্কর গর্জনে আকাশ-পৃথিবী কাঁপিয়ে কবন্ধ রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেল। তখন সেই ছিন্নবাহু রাক্ষস বিনীতভাবে রাম-লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করল—'তোমরা কারা?' লক্ষ্মণ নিজের ও রামের পরিচয় দিয়ে কবন্ধের এই রকম অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় জানতে পেরে কবন্ধের মন খুশিতে ভরে গেল। ইন্দ্রের কথা মনে পড়ল তার। সে বলল—ঔদ্ধত্যের কারণে সে কীভাবে এই বিকৃত রূপ পেয়েছিল—তারই কাহিনী। *[রামায়ণ ৩.৭০.১-১৯]*

সে একসময় একজন রূপবান বলশালী এবং বীর পুরুষ ছিল। কিন্তু এইরকম ভীষণ রূপ ধরে সে ঋষিদের ভয় দেখাত। স্থূলশিরা—নামের এক ঋষিকে এইভাবেই সে ভয় দেখিয়েছিল। তাতে অত্যন্ত রেগে গিয়ে ঋষি তাকে অভিশাপ দেন যে, তার এই রূপই স্থায়ী হবে। কবন্ধ বহু প্রার্থনায় ঋষিকে সন্তুষ্ট করে নিজের পরিত্রাণের পথ জানতে চাইল। ঋষি বললেন—'যখন রাম তোমার বাহু দুটি কেটে ফেলে তোমায় দাহ করবেন—তখন তুমি তোমার রূপ ফিরে পাবে'—

তদা ত্বং প্রাপ্স্যসে রূপং স্বমেব বিপুলং শুভম্॥

কবন্ধ এও জানাল যে, সে দনুর পুত্র, ব্রহ্মাকে দীর্ঘ তপস্যায় তুষ্ট করে সে দীর্ঘ আয়ুর বর পেয়েছিল। দীর্ঘায়ুর বর পেয়ে তাঁর মনে হল, ইন্দ্রও আর তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না। সুতরাং কবন্ধ যুদ্ধে আহত করে ইন্দ্রকে। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের দেহ প্রকাণ্ড করে শতপর্ব বজ্রের দ্বারা তার জানু দুটি ভেঙে দিলেন, মাথাটি দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। কবন্ধ এই অবস্থায় নিজের মৃত্যুই কামনা করল; কিন্তু ব্রহ্মার বরে তার আয়ু দীর্ঘ বলে ইন্দ্র তাকে হত্যা করলেন না। বরং এই অবস্থাতেও বেঁচে থাকার উপায় করে দিলেন এবং বর দিলেন—'রাম-লক্ষ্মণ যখন তোমার হাত দুটি কেটে ফেলবেন তখনই তোমার মুক্তি হবে।' এই বলে কবন্ধ রামকে তার সংস্কার করতে বলল। রাম তাকে রাবণের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল—এই অবস্থায় তার দিব্যজ্ঞান নেই। দাহ সংস্কার হয়ে গেলেই তার দিব্যজ্ঞান ফিরে আসবে—তখন সে রামকে উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারবে। *[রামায়ণ ৩.৭১.১-৬, ৭, ৮-৩৪]*

রাম ও লক্ষ্মণ পাহাড়ের গুহার মধ্যে কবন্ধের বিধিমত সংস্কার করলেন। তখন সেই চিতা থেকে উঠে এল কবন্ধের অন্য এক মূর্তি। তার পরণে নির্মল বস্ত্র, দিব্য মাল্য; তার রূপ অপূর্ব সুন্দর। উঠে এসে কবন্ধ একটি হংসযুক্ত আকাশযানে উঠল, তার প্রভায় দশদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কবন্ধ তখন আকাশ থেকে রামকে বলল, মানুষ মাত্রেই এই ছটি উপায়েই পরিস্থিতির বিচার করে থাকে—সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়। রামকে কবন্ধ পরামর্শ দিল সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার। বলল—'সুগ্রীবও এখন অসুবিধায় আছেন, তাঁকে তাঁর দাদা বালী নির্বাসিত করেছেন। ঋষ্যমূক পর্বতে চারজন বানর-সহ সুগ্রীব বাস করছেন। ঋষ্যমূক-বাসী সেই সশস্ত্র বানরের সঙ্গে আপনি অগ্নিসাক্ষী করে বন্ধুত্ব করুন। তিনিই আপনাকে সাহায্য করবেন, সীতার সন্ধানও করবে তাঁর অনুগত বানরেরা। আপনার স্ত্রী যেখানেই থাক, তাঁরাই তাঁকে খুঁজে বার করবেন।' *[রামায়ণ ৩.৭২.১-২৬]*

এই বলে, কবন্ধ পম্পা সরোবর এবং ঋষ্যমূক পর্বতের নিখুঁত বিস্তৃত বর্ণনা দিল, গুহার পথে ঋষ্যমূকে পৌঁছবার পথও বলে দিল। তারপর রাম ও লক্ষ্মণের অনুমতি নিয়ে, আরও একবার সুগ্রীবের সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্ব করার পরামর্শ দিয়ে—দিব্যদেহী কবন্ধ স্বর্গে চলে গেল।

[রামায়ণ ৩.৭৩.১-৪৬; মহা (k) ৩.২৭৯.২৮-৪৮; (হরি) ৩.২৩৩.২৮-৪৮]

পরে, হনুমানের প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মণ তাঁকে এই ঘটনার কথা সংক্ষেপে বলেছিলেন।

[রামায়ণ ৪.৪.১৫, ১৬]

□ রামের হাতে কবন্ধ বধের ঘটনাটি ভাগবত পুরাণেও উল্লিখিত হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৯.১০.১২]

কবন্ধ২ বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী কবন্ধ পাতালে বসবাসকারী একজন দৈত্যের নাম। পাতালের প্রথম তল অর্থাৎ অতলে (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে তত্বলে) কবন্ধের সুরম্য বাসভবন অবস্থিত ছিল বলে জানা যায়।

[বায়ু পু. ৫০.১৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.১৬]

কবন্ধ৩ অথর্ববেদের অন্যতম ঋষি। অথর্ববেদের প্রবক্তা সুমন্তু কবন্ধ ঋষিকে অথর্ববেদ শিক্ষা দেন। কবন্ধ অথর্ববেদ সংহিতাকে দুই ভাগে ভাগ করে নিজের দুই শিষ্য পথ্য এবং বেদস্পর্শকে অধ্যয়ন করিয়েছিলেন। বিষ্ণু পুরাণে কবন্ধের শিষ্যের নাম বেদস্পর্শের পরিবর্তে দেবদর্শ বলে উল্লিখিত হয়েছে। *[বায়ু পু. ৬১.৫০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.৫৬; বিষ্ণু পু. ৩.৬.১০]*

কবষ একজন প্রখ্যাত প্রাচীন বৈদিক ঋষি। রামচন্দ্র যখন রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করে অযোধ্যায় ফিরে এলেন, তখন রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সময় যে সমস্ত ঋষিরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কবষ অন্যতম। রামায়ণে বলা হয়েছে যে, ভারতের পশ্চিমদিকে যেসব ঋষিরা বাস করতন, কবষ তাঁদের মধ্যে একজন। *[রামায়ণ ৭.১.৪]*

□ মহাভারতেও পশ্চিমদেশবাসী ঋষিদের মধ্যে কবষের উল্লেখ আছে। কিন্তু হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে কবষের পরিবর্তে 'করুষ' এই নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। সম্ভবত এটি ভ্রান্ত পাঠ।

[মহা (k) ১২.২০৮.৩০; (হরি) ১২.২০২.৩০]

□ ইলূষ নামে এক ঋষির ঔরসে জনৈকা দাসীর গর্ভজাত পুত্র কবষ যে ভারতবর্ষের পশ্চিমদিকেই বাস করতেন সেকথা ঋগ্‌বেদ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে বামদেব, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি বৈদিক

ব্রাহ্মণ ঋষিরা সরস্বতী নদীর তীরে যজ্ঞ করেছিলেন। ইলূষপুত্র কবষও সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে দেখে বিশ্বামিত্র ইত্যাদি বৈদিক ব্রাহ্মণ ঋষিরা তিরস্কার করে বললেন—আমাদের মধ্যে এই অব্রাহ্মণ কী ভাবে দীক্ষা গ্রহণ করল? অব্রাহ্মণ ও দাসীপুত্র হওয়ার অপরাধে বামদেব, বিশ্বামিত্র প্রমুখ ঋষিরা কবষকে ওই যজ্ঞে অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করেন। এমনকী কবষ যাতে সরস্বতী নদীর জল পান করতে না পারেন, সেই কারণে তাঁকে জলহীন দেশে বিতাড়িত করেন। তখন পিপাসার্ত হয়ে কবষ 'অপোনপ্‌ত্রীয়' সূক্ত উচ্চারণ করেন। কবষের মুখ থেকে ওই সূক্ত উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী নদী স্বয়ং আবির্ভূতা হয়ে তাঁর চারপাশে প্রবাহিত হতে শুরু করলেন। তখন বামদেব, গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র প্রমুখ ঋষিরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন। কবষ ঋষির ক্রোধ শান্ত করার জন্য তাঁরা কবষকে প্রণাম করে যজ্ঞে অধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত করলেন এবং বললেন— যেহেতু সরস্বতী আপনাকে অনুগমন করেছে, তাই আপনিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

কবষ ঋষি যে সূক্ত উচ্চারণ করায় সরস্বতী আবির্ভূতা হন, সেই সূক্তের স্রষ্টা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হিসাবে কবষ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

বস্তুত সরস্বতী নদী ভারতের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ফলত কবষ-ঋষিকে ভারতের পশ্চিম দেশে অবস্থিত সরস্বতীনদীর তীরভূমিতে বাস করা এক মহান ঋষি বলেই মনে হয়।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (Haug) ২.১৯, পৃ. ৩৯; ঋগ্বেদ ৭.১৮.১২; রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র, ২য় খণ্ড, ২.৮.১, পৃ. ১১২-১১৩; Vedic Index, Vol. I by Macdonell and Keith, p. 143]

কবি১ কবি-শব্দের প্রধান অর্থ সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর। ভগবদ্‌গীতায় পরব্রহ্মস্বরূপ 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকেই কবি বলা হয়েছে এবং শঙ্করাচার্য টীকায় লিখেছেন—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানকে যিনি দেখতে পান, সেই ক্রান্তদর্শী সর্বজ্ঞকেই কবি বলা হয়—

কবিং ক্রান্তদর্শিনং সর্বজ্ঞম্।

ভগবদ্‌গীতার যে শ্লোকে কবি-শব্দের মধ্যে ঈশ্বরীয় সর্বজ্ঞত্বের ভাবনা ধরা পড়েছে—

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্/
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ—

ঠিক সেই ভাবনাতেই মহাভারতে ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের অন্যতম নাম হল কবি এবং সেখানে তাঁর পূর্ব নামগুলি পরব্রহ্মের নামান্তর—

সর্বগঃ সর্ববিদ্‌ভানু বিষ্বক্‌সেনো জনার্দনঃ।
বেদো বেদবিদভ্যঙ্গো বেদাঙ্গো বেদবিৎ কবিঃ॥

অবধারিতভাবে বিষ্ণুসহস্রনামের অন্তর্গত এই শ্লোকের টীকায় শঙ্করাচার্য ঈশোপনিষদের মধ্য থেকে পরব্রহ্মের বিশেষক 'কবি' এবং 'মনীষী' শব্দ দুটির উল্লেখ করেছেন—

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতো'র্থান্
বিদধ্যাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

আর অর্থ করার সময় ঈশোপনিষদের টীকায় শঙ্কর কবি-শব্দের অর্থ করেছেন—ক্রান্তদর্শী এবং সর্বদৃক্ অর্থাৎ সর্বদ্রষ্টা বলে, আর বিষ্ণুসহস্রনামে কবি শব্দের টীকায় তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে পংক্তি উদ্ধার করে লিখেছেন—তাঁর মতো সর্বদ্রষ্টা আর কেউ নেই বলেই তাঁর সংজ্ঞা হল ক্রান্তদর্শী কবি—

ক্রান্তদর্শী কবিঃ সর্বদৃক্ নান্যো'তো'স্তি দ্রষ্টা।

[ভগবদ্‌গীতা ৮.৯; মহা (k) ১৩.১৪৯.২৭; (হরি) ১৩.১২৭.২৭; ঈশোপনিষদ (দুর্গাচরণ) ১.৮; বৃহদারণ্যক উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ৩.৭.২৩]

কবি২ পরম ঈশ্বরের এই সর্বজ্ঞতা এবং সর্বদৃষ্টির নিরিখেই যিনি কাব্য নির্মাণ করেন সেই স্রষ্টা কবির ওপরেও বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের স্বভাব আরোপিত হয়েছে। কবির বাক্য-নির্মিতিই হল কাব্য। কবি তাঁর আশ্চর্য এবং অলৌকিক প্রতিভার মাধ্যমে গদ্য-পদ্য-কাব্য রচনা করে সহৃদয় মানুষের মধ্যে যে চিত্ত-চমৎকার সৃষ্টি করেন, সেটাও সার্বিক দৃষ্টি এবং সর্বজ্ঞতা ছাড়া সম্ভব হয় না। হয়তো সেই কারণে অগ্নিপুরাণের এই শ্লোক-বাক্যটি সমস্ত রসশাস্ত্রবোদ্ধা আলঙ্কারিকেরা মেনে নিয়েছেন। অগ্নি পুরাণ বলেছে—অনন্তপার এই কাব্যসংসারে কবিই হলেন সে স্রষ্টা প্রজাপতি। এই বিপুল বিশ্ব যেমন যেমনভাবে তাঁর কাছে আস্বাদনের যোগ্য হয়ে ওঠে, ঠিক তেমন তেমনভাবেই সেটা তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে ওঠে—

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।
যথা বৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পবিবর্ততে॥

এই কবিত্বের সংজ্ঞার মধ্যেই সেই ঈশ্বরীয় দৃষ্টির মাহাত্ম্য যেমন আছে, তেমনই আছে বর্ণনার। একটি প্রচলিত কথা আছে যে, দর্শন করার শক্তি আছে বলেই ঋষিদের ঋষি বলা হয়—দর্শনাৎ ঋষয়ো বভূবুঃ। কিন্তু কবিদের দর্শন করার শক্তি আছে বলেই তাঁরা যেমন দ্রষ্টা হিসেবে ঋষির গুণটুকু পেয়েছেন, তেমনই সাধারণ্যের চেয়ে অধিক দেখতে পাওয়া দ্রষ্টৃ-গুণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বস্তুবর্ণনের গুণ। এখানে তাঁরা ঋষিদেরও ছাপিয়ে গেছেন—

দর্শনাদ্ বর্ণনাচ্চৈব রূঢ়া লোকে কবিশ্রুতিঃ।

এই শ্লোকটি প্রাচীন যে আলঙ্কারিক লিখেছেন, তিনি মহাকবির অলৌকিক সর্বদর্শিতার কথা মাথায় রেখেই কবিকে ঋষির চেয়েও বড়ো করে দেখিয়ে বলেছেন যে আদিকবি বাল্মীকি ঋষিই ছিলেন, তাঁর সর্বদর্শিতা বা দূরদর্শিতা এবং কল্পনাশক্তির কোনো অভাব ছিল না, কিন্তু সেই ঋষিজনোচিত সর্বত্রগামী দর্শনকে যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি বর্ণনার বিষয়বস্তু করে তুললেন, ততক্ষণ কিন্তু তিনি কবি হননি। আলঙ্কারিকের এই অসামান্য বক্তব্যটি অধ্যাপক কৃষ্ণমূর্তির অনুবাদে এইরকম—

It has been remarked that no non-sage can be deservingly called poet; and a sage will be worth his name only by virtue of his vision. By vision we mean that insight into Truth about all the manifold materials in the world and their various aspects. One can win the distinction of 'poet' in the sciences if he possesses this vision of Truth. But in everyday speech the world accords that title to him alone who possesses both vision and imaginative description. Thus though Vālmikī was highly gifted with enduring and clear vision, he was not hailed as a poet by people until he embodied it is a descriptive work.'

[অগ্নি পু. ৩৩৯.১০-১১; K. Krishnamoorthy, Essays in Sanskrit Criticism, (Dharwar : Karnatak University, 1964) pp. 179-180]

কবি$_3$ মহাভারতে বলা হয়েছে—ব্রহ্মার হৃদয় ভেদ করে জন্মেছিলেন মহর্ষি ভৃগু। সেই ভৃগুর পুত্রের নাম কবি। তিনি শুক্রাচার্যের পিতা—

ভৃগোঃ পুত্রঃ কবির্বিদ্বান্ শুক্রঃ কবিসুতো গ্রহঃ।

ভৃগুর পুত্র কবি, কবির পুত্র কাব্য উশনা শুক্রাচার্যকে নিয়ে অনেক সময়েই একটা বিভ্রান্তি তৈরি হয় এবং সেই বিভ্রান্তি আরও বাড়ে এই কারণে যে, কাব্য শুক্রাচার্যকেও অনেক সময়েই কবি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সমস্যা মাথায় রেখেই মহাভারতে কচ-দেবযানীর উপাখ্যানের মধ্যে অসুরগুরু উশনা শুক্রাচার্যকে পরিষ্কার কবিপুত্র উশনা শুক্র বলা হল—

আদিষ্টং কবিপুত্রেণ শুক্রেনোশনসা স্বয়ম্।

—এখানে নীলকণ্ঠ টীকায় বললেন—ভৃগুর পুত্রের নাম কবি। তাঁর পুত্র কাব্য শুক্রাচার্য। তাঁকে উপচারে পিতা কবির নামে কবি বলেও ডাকা হয়—

ভৃগোঃ পুত্রঃ কবিস্তৎপুত্রঃ শুক্রঃ কাব্যঃ।
স কবিরিত্যপি উপচারাদুচ্যতে।

[মহা (k) ১.৬৬.৪২; ১.৭৬.২২; (হরি) ১.৬১.৪১-৪২; ১.৬৪.২২, নীলকণ্ঠ-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য; ভাগবত পু. ৪.১.৪৫]

□ মহাভারতেরই অন্যত্র একথা বলা হয়েছে—ব্রহ্মা যখন মানসী প্রজা সৃষ্টির উল্লাসে অগ্নিতে আপন বীর্য্য আহুতি দিয়েছিলেন, সেখান থেকেই ভৃগু, অঙ্গিরা, কবি ইত্যাদি ঋষির জন্ম হয়েছিল। কবির পুত্রেরাও সংখ্যায় আট জন এবং তাঁরা আবার 'বারুণ' নামেও খ্যাত ছিলেন, কেননা বরুণদেব এঁদের পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। কবির সেই বরুণ-পুত্রদের নাম হল—কবি, কাব্য, ধৃষ্ণু, বুদ্ধিমান শুক্রাচার্য, ভৃগু, বিরজা, কাশী এবং উগ্র—

ব্রহ্মণস্তু কবেঃ পুত্রা বারুণাস্তে'প্যুদাহৃতাঃ।
অষ্টৌ প্রসবজৈ যুক্তা গুণৈ ব্রহ্মবিদঃ শুভাঃ॥
কবিঃ কাব্যশ্চ ধৃষ্ণুশ্চ বুদ্ধিমানুশনাস্তথা।
ভৃগুশ্চ বিরজাশ্চৈব কাশী চোগ্রশ্চ ধর্মবিৎ॥

এই শ্লোকের মধ্যে 'কবেঃ পুত্রাঃ' কথাটির সাধারণ অর্থ 'কবির পুত্রেরা' হলেও, এখানে 'কবি' শব্দটি ব্রহ্মারই বিশেষণ বলে মনে হয়। হয়তো স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা বলেই তাঁকে কবি বলা হয়েছে। আর বরুণদেব হয়তো ব্রহ্মার পুত্র কবিকেও পুত্রত্বে বরণ করেছেন আবার কবির

পুত্র উশনা শুক্রাচার্যকেও পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এইরকমটা না হলে কবি এবং কাব্য উশনার সঙ্গে একত্রে ভৃগুও কবিপুত্র হতে পারেন না। এই আট কবিপুত্র বা ব্রহ্মার পুত্রেরা আট প্রজাপতি; তাঁদের গুণ জগদ্‌ব্যাপ্ত।

[মহা (k) ১৩.৮৫.১০৬; ১৩.৮৫.১৩২-১৩৪; (হরি) ১৩.৭৪.১০৪; ১৩.৭৪.১৩০-১৩২]

কবি$_{8}$ কৃষ্ণের ঔরসে কালিন্দীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কবি একজন।

[ভাগবত পু. ১০.৬১.১৪; ১০.৯০.৩৪]

কবি$_{৫}$ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং যজ্ঞরূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন। বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী অবতীর্ণ হন দক্ষিণা রূপে। মূর্তিমান যজ্ঞ এবং দক্ষিণা-দুজনেই এসময় স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে আকূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে যজ্ঞ দক্ষিণাকেই পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। যজ্ঞের ঔরসে দক্ষিণার গর্ভে যে পুত্রসন্তানরা জন্মগ্রহণ করেন, কবি তাঁদের মধ্যে একজন। বস্তুত পুরাণে যজ্ঞ এবং দক্ষিণা মনুষ্যরূপে কল্পিত হলেও এঁরা বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানেরই রূপক। সেক্ষেত্রে যজ্ঞে যিনি মন্ত্রোচ্চারণ করেন সেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বা কবিও রূপকার্থেই যজ্ঞের পুত্র হিসেবে কল্পিত হয়েছেন বলে মনে হয়। *[ভাগবত পু. ৪.১.৬-৮]*

কবি$_{৬}$ সায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত। প্রিয়ব্রতের ঔরসে তাঁর পত্নী বর্হিষ্মতীর গর্ভে দশ পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। এই দশ পুত্রসন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন কবি। প্রিয়ব্রতের অন্যান্য পুত্ররা প্রজাসৃষ্টি, প্রজাপালন এবং রাজ্যস্থাপনের কাজে নিযুক্ত হলেও কবি সংসার ত্যাগ করে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

[ভাগবত পু. ৫.১.২৫-২৬]

কবি$_{৭}$ প্রিয়ব্রতের পুত্র অগ্নীধ্রের বংশধারায় ভগবান ঋষভদেবের ঔরসে জয়ন্তীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে 'কবি' একজন। ঋষভদেবের পুত্র কবি সংসার ধর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে পরমেশ্বরের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। ঋষভদেবের নয়জন অধ্যাত্মবাদী পুত্র, যাদের একত্রে নবযোগেন্দ্র বলা হয়, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন কবি। কোনো একসময় এই কবি রাজর্ষি নিমিকে ভগবান বিষ্ণুর স্বরূপ তথা ভাগবত ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন বলে ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৫.৪.১১; ১১.২.২১-৪৩]

কবি$_{৮}$ ভগবান বিবস্বান্ সূর্যের পুত্র শ্রাদ্ধদেব, ইনি বৈবস্বত মনু নামেও প্রসিদ্ধ। বৈবস্বত মনুর ঔরসে শ্রদ্ধার গর্ভে যে দশ পুত্রসন্তানের জন্ম হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবি।

[ভাগবত পু. ৯.১.১২]

□ ভাগবত পুরাণে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী বৈবস্বত মনুর পুত্র কবিও সংসারে নিরাসক্ত হয়ে পরব্রহ্মের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং খুব অল্প বয়সেই সিদ্ধিলাভ করে তিনি পরব্রহ্মে লীন হয়ে যান। *[ভাগবত পু. ৯.২.১৫]*

কবি$_{৯}$ ভাগবত পুরাণ মতে, কুরুবংশীয় রাজা ভরত নিজের পুত্রদের যখন সিংহাসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলে মনে করলেন না, তখন তিনি মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র বিতথ কে দত্তক নিলেন। ভরতের এই দত্তক পুত্রটি বিতথ এবং মন্যু (মতান্তরে ভূমন্যু) নামেও খ্যাত। এই মন্যুর পুত্রদের মধ্যে গর্গ একজন। এই গর্গ জন্মগত ভাবে ক্ষত্রিয় হলেও ক্ষত্রিয় বৃত্তি ত্যাগ করে তপস্যা, ঈশ্বরের আরাধনায় মনোনিবেশ করেন। এর ফলে গর্গ এবং তাঁর বংশধররা ব্রাহ্মণ বা বলা ভালো ক্ষত্রোপেত দ্বিজ হিসেবে পরিচিতি পান। গর্গের বংশধারায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন দূরিতক্ষয়। এই দূরিতক্ষয়ের তিন পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন কবি। *[ভাগবত পু. ৯.২১.১৯]*

□ মৎস্য পুরাণে কুরু-ভরত বংশের যে বংশলতিকা আমরা পাই সেখানে গর্গের বংশধারায় জাত তথা কবির পিতার নাম দুরিতক্ষয়ের পরিবর্তে উরুক্ষব। উরুক্ষবের ঔরসে বিশালার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবি। *[মৎস্য পু. ৪৯.৩৯]*

কবি$_{১০}$ চতুর্দশ মন্বন্তরের অধিপতি ভৌত্য মনু জনৈক কবির পুত্র ছিলেন বলে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৫১]*

কবি$_{১১}$ দ্বাদশ মন্বন্তরে, যখন রুদ্রসাবর্ণি মনু মন্বন্তরাধিপতি হবেন, সে সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন সুতার তার মধ্যে একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে কবি অন্যতম। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৮৭]*

কবি$_{১২}$ চতুর্থ মন্বন্তরে যখন তামস মনু মন্বন্তরাধিপতি ছিলেন, সে সময় যাঁরা সপ্তর্ষি হয়েছিলেন মহর্ষি কবি তাঁদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ৯.১৫]*

কবি$_{১৩}$ মৎস্য পুরাণে একটি উপাখ্যানের মুখ্য চরিত্র

ছিলেন কৌশিক নামে জনৈক ঋষির সাতপুত্র। এই সাতজন ঋষি পুত্রের মধ্যে কোনো একজনের নাম ছিল কবি। একসময় সাত ঋষিপুত্র গোহত্যার মতো ভয়ঙ্কর পাপ কাজ করে ফেলেন এবং সেই পাপে এঁদের পরবর্তী সাত জন্মে নীচ কুলে অথবা মনুষ্যেতর প্রাণীকুলে জন্মগ্রহণ করতে হয়।

[মৎস্য পু. ২০.৩]

কবি$_{১৪}$ ত্রয়োবিংশতিতম দ্বাপরে যখন মহর্ষি তৃণবিন্দু বেদবিভাগকারী ব্যাস হবেন, সেই সময় ভগবান শিব শ্বেত নাম গ্রহণ করে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন। এই শ্বেতের চার পুত্রসন্তানের মধ্যে কবি একজন। *[বায়ু পু. ২৩.২০৫]*

কবি$_{১৫}$ কবিশব্দের মধ্যে যেহেতু সর্বদর্শিতা, ঈশ্বরীয় গুণ নিহিত থাকে, সেই ভাবনা থেকে পরমেশ্বর ভগবান থেকে শুরু করে পরম অভিজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ মানুষকে মহাকাব্য-পুরাণে কবি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে বহুবার। ভাগবত পুরাণে লোকপিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা কবি নামে সম্বোধিত হয়েছেন। রামায়ণে মহর্ষি অগস্ত্য রাবণবধের ঠিক আগে রামকে যে শত্রুনাশক আদিত্যহৃদয় মন্ত্র শুনিয়েছিলেন, সেই মন্ত্রে সূর্য দেবতাকেও কবি নামে সম্বোধন করা হয়েছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে যে শিবসহস্রনাম এবং বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্র বর্ণিত হয়েছে, সেখানেও কবি ভগবান শিব এবং বিষ্ণুর অন্যতম নাম হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। বৈদিক কাল থেকে যজ্ঞীয় অগ্নিও 'কবি' নামে সম্বোধিত হয়ে আসছেন। অগ্নি-স্বরূপতায় এবং পরমজ্ঞানীদের থেকেও যিনি জ্ঞানী এই ভাবনায় ভগবান শিবও কবি নামে সম্বোধিত হয়েছেন।

মহাভারতে তৎকালীন সময়ের পরম জ্ঞানী বিচক্ষণ কুরু-রাজসভার মন্ত্রী ব্যাসপুত্র বিদুরকেও কবি নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৬.৯.৩৪; রামায়ণ ৬.১০৬.১৪;
মহা (k) ১৩.১৪৯.২৭; ১৩.১৫৩.৮; ২.৫৮.১৫;
(হরি) ১৩.১২৭.২৭; ১৩.১৩১.৮; ২.৫৫.১৫;
ব্রহ্ম পু. ৮২.২; কূর্ম পু. ২.৫.২৩]

কবি$_{১৬}$ ঋগবেদের মধ্যে অনেকগুলি সূক্তের দেবতা হলেন 'বিশ্বেদেবাঃ'। 'বিশ্বেদেবাঃ' মানে সর্ব-দেবতা—বিশ্বেদেবাঃ সর্বে দেবাঃ। অর্থাৎ সমস্ত দেবতাই। প্রথম দিকে বৈদিকেরা যে তেত্রিশ জন দেবতার কথা বলতেন, তাঁদেরই 'বিশ্বেদেবা' বলা হত। পরবর্তী পর্যায়ে দ্বাদশ আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণও 'বিশ্বেদেবা'র পরিধিতে প্রবেশ করেন। ফলে বিশ্বেদেবগণের দেবতা সংখ্যা বেড়ে যায়। অবশেষে বিশ্বেদেবগণ বৈদিককালেই পিতৃগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান এবং তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ মেলে মহাভারতে। এখানে বলা হয়েছে যে বিশ্বেদেবগণ সবসময়েই পিতৃগণের সঙ্গে থাকেন—

অত্র বিশ্বে সদা দেবা পিতৃভিঃ সার্ধমাসতে।

[মহা (k) ৫.১০৯.৩; (হরি) ৫.১০১.৩]

□ পিতৃগণের সঙ্গে বিশ্বেদেবগণও আমাদের সামনে আবির্ভূত হন, এমনও প্রার্থনা করা হয়েছে—

বিশ্বেদেবাশ্চ যে নিত্যং পিতৃভিঃ সহ গোচরাঃ।

[মহা (k) ১৩.৯১.২৪; (হরি) ১৩.৭৮.২৪]

□ বিশ্বেদেবগণের মধ্যে পিতৃগণ মিশে যাওয়ায় মহাভারতের কালেই বিশ্বেদেবগণের অন্তর্গত দেবতাদের নাম পালটে যায় এবং সংখ্যাও একেক জায়গায় এক এক রকম। মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে বিশ্বেদেবগণের যে সব নাম আছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কবি।

[মহা (k) ১৩.৯১.৩৬; (হরি) ১৩.৭৮.৩৬]

□ বিশ্বেদেবগণের সঙ্গে পিতৃগণ মিশে যাবার ফলেই 'কবি' নামে পিতৃলোকের সম্পূর্ণ একটি গণের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে পুরাণগুলিতে। এই কবি বা কাব্য নামক পিতৃগণকে কখনো কবির ঔরসে স্বধার গর্ভজাত পুত্র বলা হয়েছে কখনো বা তাঁদের উশীর নামক অগ্নির ঔরসে স্বধার পুত্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বস্তুত দক্ষকন্যা স্বধা পিতৃগণের জননী হিসেবেই বিখ্যাত, অগ্নিকেও বৈদিক যুগ থেকেই 'কবি' নামে সম্বোধন করা হয়ে আসছে। সেক্ষেত্রে এই 'কবি' বা কাব্য পিতৃগণকে অগ্নি এবং স্বধার সন্তান বললেও ভুল হয় না। পুরাণ মতে, এই পিতৃগণের 'গো' নামে এক মানসী কন্যা ছিল, যিনি শুক্রাচার্যের পত্নী।

[বায়ু পু. ৭৩.৩৫-৩৬;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১০.৮৫]

কবি$_{১৭}$ ষষ্ঠ মন্বন্তরের অধিপতি চাক্ষুষ মনুর ঔরসে নড়্বলার গর্ভজাত দশ পুত্রসন্তানের মধ্যে কবি অন্যতম। *[অগ্নি ১৮.৯;*
বিষ্ণু পু. ১.১৩.৪-৫; ব্রহ্ম পু. ২.১৮]

কবি$_{১৮}$ মথুরার রাজা কংস যে ধনুর্যজ্ঞে কৃষ্ণ-

বলরামকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সেই যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন কবি।

[ব্রহ্মবৈবর্ত পু. (শ্রীকৃষ্ণজন্ম) ৬৪.৪৬-৫৪]

কব্য১ পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশে দেয় আহুতি দ্রব্য, শ্রাদ্ধান্ন। মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পরিষ্কার এ-কথা বলা হয়েছে যে, হোমকর্মে আহুতিযোগ্য বস্তু যেটা দেবতারা ভক্ষণ করেন, তার নাম হব্য। আর কব্য হল শ্রাদ্ধ কিংবা যে কোনো পিতৃকর্মে আহুতিযোগ্য দ্রব্য—সেটা পিতৃপুরুষেরা গ্রহণ করেন।

যস্যাস্যেন যদশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিম্ভূতমধিকং ততঃ॥

বায়ু পুরাণ বলেছে—দেবতারা হব্য গ্রহণ করেন আর পিতৃপুরুষেরা গ্রহণ করেন কব্য।

[মনুসংহিতা, ১.৯৪-৯৫; বায়ু পু. ৯৭.২৭]

অমরকোষে কব্য-শব্দের অর্থ হব্য-শব্দের সঙ্গেই যুক্ত করা হয়েছে এবং আহুতিযোগ্য বস্তুগুলির কিঞ্চিৎ উল্লেখও করা হয়েছে। হব্য এবং কব্যের বস্তু হল—পৃষদাজ্য। দই আর আজ্য অর্থাৎ গলে যাওয়া ঘি একত্রে মেলালে তাকে পৃষদাজ্য বলে 'পৃষাতক'-ও বলে। আর একটা খাদ্য পরমান্ন কিংবা পায়স। অমরকোষ বলতে চায়—পৃষদাজ্য বা সদধি-আজ্য (দই সহ গলে যাওয়া ঘি) হল হব্য, যা দেবোদ্দেশে আহুতি দিতে হয়। আর পরমান্ন কিংবা পায়স হল কব্য, যা পিতৃশ্রাদ্ধ কিংবা পিতৃকার্যে উৎসর্গ করতে হয়—

পৃষদাজ্যং সদধ্যাজ্যে পরমান্নং তু পায়সম্।
হব্যকব্যে দৈবপিত্র্যে অন্নে পাত্রং স্রুবাদিকম্॥

[অমরকোষ ২ (ব্রহ্মবর্গ) ২৪, পৃ. ১৭১]

মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণে বহুবার পিতৃ-কর্মের উদ্দেশে কব্য প্রদানের উল্লেখ আছে।

[দ্র. হব্য]

কব্য২ অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের মধ্যে অন্যতম।

[বায়ু পু. ৫২.৬৬; দেবী ভাগবত পু. ১১.১৫.২৮]

কব্য৩ পুরাণে মহাভারতে পাঁচ বৎসর পূর্ণ সময়কালকে অনেক সময়ই যুগ বলা হয়েছে। বায়ু পুরাণ মতে সংবৎসরাদি পঞ্চাব্দ কব্য নামে প্রসিদ্ধ—

সংবৎসরাস্তু বৈ কব্যা পঞ্চাব্দা যে দ্বিজৈঃ স্মৃতাঃ।

[বায়ু পু. ৫০.২০২; ৩১.৪৯; ৫২.৬৭]

কব্য৪ গরুড় পুরাণ অনুসারে নবম মনু দক্ষ সাবর্ণির কালে বারুণীর বংশে জাত মেধাতিথি প্রভৃতি যে সপ্তর্ষি ছিলেন কব্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[গরুড় পু. ১.৮৭.৩৬]

কব্যাদ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লিখিত অন্যতম পিতৃগণ। যজ্ঞের সময় এই 'কব্যাদ' পিতৃগণের নামেও আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭২.২৬]*

কমঠ১ ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত কম্বোজ দেশের রাজা। *[মহা (k) ২.৪.২২; (হরি) ২.৪.১০নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ৫; পৃ. ২৬]*

কমঠ২ একজন ঋষি। মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে কঠোর তপস্যার দ্বারা যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন মহর্ষি কমঠ তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১২.২৯৬.১৪; (হরি) ১২.২৮৯.১৪]

কমণ্ডলু বহু প্রাচীনকাল থেকেই জল সংরক্ষণের উপযুক্ত পাত্র হিসেবে কমণ্ডলুর ব্যবহার চলে আসছে। তবে মহাকাব্য-পুরাণ এবং অন্যান্য গ্রন্থে কমণ্ডলু ব্যবহারের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, কমণ্ডলু ঠিক গৃহস্থালীর দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য বাসনপত্রের মধ্যে পড়ে না। কোষগ্রন্থ অমরকোষের টীকাকার মহেশ্বর কমণ্ডলু শব্দটিকে টীকায় ব্রতপরায়ণের ব্যবহার্য্য বলেই উল্লেখ করেছেন—

কমণ্ডলুঃ কুণ্ডী দ্বে ব্রতিনাং জলপাত্রস্য (অমরকোষ ২. ব্রহ্মবর্গ. ৪৬) কমণ্ডলু সাধারণত ব্যবহার করতেন ব্রতপরায়ণ সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীরা। সংযতচিত্ত, ব্রত-ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের উল্লেখ হওয়া মাত্র মহাকাব্য এবং পুরাণে তাঁকে 'কমণ্ডলুধর' বলে বর্ণনা করা হয়। নির্লোভ, সংসারে অনাসক্ত যোগী-সন্ন্যাসীর মূর্তি এবং কমণ্ডলু—এই দুইয়ের উল্লেখ একত্রে হওয়াটাই যেন স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে অতি প্রাচীন কাল থেকে।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যে উল্লিখিত হয়েছে, যে-সব ছাত্ররা গুরুর কাছে থেকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করে বিদ্যাশিক্ষা করতেন তাঁদের চেনা যেত তাঁদের প্রথাগত পরিচ্ছদ থেকে। তাঁদের পরনে মৃগচর্ম বা অজিন, হাতে কমণ্ডলু—কমণ্ডলুপাণি ছাত্র। পতঞ্জলির এই উল্লেখ থেকেই স্পষ্ট যে, সেকালের দিনে ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থীর দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম অঙ্গ ছিল কমণ্ডলু।

[মহাভাষ্য (keilhorn) ৪.১.৭১ (Vol. 2, p. 227); ১.৪.৮৪ (Vol. 1; p. 347)]

মহাকাব্যে পুরাণে তপস্বী সন্ন্যাসীর বেশভূষার বর্ণনা দিতে গিয়েও সবসময় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁদের হাতে থাকত কমণ্ডলু। রামায়ণে দেখি, সীতাহরণের জন্য রাবণ যখন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে দাঁড়ালেন সীতার কুটীরদ্বারে, তখন তাঁর বেশভূষার অঙ্গ হিসেবে বা বলা ভাল ছদ্মবেশের অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে কমণ্ডলু—

তদাসাদ্য দশগ্রীবঃ ক্ষিপ্রমন্তরমাস্থিতঃ।
অভিচক্রাম বৈদেহীং পরিব্রাজকরূপধৃক্॥
শ্লক্ষ্ণকাষায়সংবীতঃ শিখীচ্ছত্রী উপানহী।
বামে চাংসে'বসজ্যাথ শুভে যষ্টিকমণ্ডলূ॥

[রামায়ণ ৩.৪৬.২-৩]

□ মহাভারতে কুরু-রাজকুমাররা যখন দ্রোণাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিজেদের শিক্ষালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাসে বাস করছিলেন, তখনও সেই ছাত্রাবস্থায় রাজকুমারদের হাতে কমণ্ডলু দেখতে পাই। দ্রোণ প্রতিদিন শিষ্যদের কমণ্ডলু ভরে আশ্রমের প্রয়োজনীয় জল আনতে বলতেন। এটা আবাসিক ছাত্রদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে পড়ত। ছাত্রদের এই কাজের ফাঁকে নিজের পুত্রকে কিছুটা বেশি শিক্ষা দেবার ইচ্ছাতেও দ্রোণ এই আদেশ দিতেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে সব রাজকুমারের হাতে কমণ্ডলু তুলে দিলেও দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামাকে দিতেন একটি কলসি—যাতে জল ভরতে সময় কম লাগে, অশ্বত্থামা দ্রুত ফিরে এসে কিছু অতিরিক্ত শিক্ষালাভের অবসর পান। এই ঘটনাটুকু থেকে কমণ্ডলু এবং কলসের আকৃতিগত পার্থক্যটা বেশ বোঝা যায়। কলসের মুখ বড়ো কিন্তু কমণ্ডলুর মুখ হত আকারে ছোটো, তাতে জল ভরতে সময়ও লাগত অনেক বেশি। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ খুব স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

কমণ্ডলুং সূক্ষ্মমুখত্বাৎ বিলম্বেণ পূরণীয়ম্।

[মহা (k) ১.১৩২.১৬; (হরি) ১.১২৮.২৫]

□ তবে কমণ্ডলু মূলত সন্ন্যাসীর ব্যবহার্য্য বলে চিহ্নিত হয়ে গেলেও 'কমণ্ডলু' শব্দটি কিন্তু জলধারণকারী পাত্রের সাধারণ অর্থই বহন করে। 'ক' মানে জল। সংস্কৃত 'মণ্ড্' ধাতুর অর্থ বেষ্টন করা বা ব্যাপ্ত করা বা আবৃত করা। যা জল দ্বারা মণ্ডিত হয়—তারই নাম কমণ্ডলু। সেক্ষেত্রে কমণ্ডলু বলতে যে কোনো জলপূর্ণ পাত্রই বোঝাতে পারে। তবে প্রয়োগের বিশিষ্টতায় এবং কমণ্ডলুর আকৃতির বিশিষ্টতার কারণেই কমণ্ডলু নামটি একটি বিশেষ আকৃতির জলপাত্রের পর্যায়শব্দ হয়ে উঠেছে। কমণ্ডলু কী দিয়ে তৈরি হত—এ সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়। তবে ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত কাহিনীতে কমণ্ডলুর উৎপত্তির যে বর্ণনা আছে তা থেকে কমণ্ডলুকে মূলত মৃৎপাত্র বলেই মনে হয়। ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, শিব-পার্বতীর বিবাহ সভায় পার্বতীর অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখে ব্রহ্মা মোহিত হলেন এবং তাঁর তেজ স্খলিত হল। লজ্জিত হয়ে ব্রহ্মা বিবাহসভা ত্যাগ করলেন। ব্রহ্মার শুদ্ধিকরণের জন্য ভগবান শিব পঞ্চভূতের অন্যতম ভূমি (ক্ষিতি) এবং জল (অপ)-এর সার সংগ্রহ করে তা থেকে তৈরি করলেন কমণ্ডলু এবং এক ত্রিলোকপাবনী বারি ধারা—

পাপিনাং পাপমোক্ষায় ভূমিরাপো ভবিষ্যতি।
তয়োশ্চ সারসর্বস্বমাহরিষ্যামি পাবনম্।
এবং নিশ্চিত্য ভগবাংস্তয়োঃ সারং সমাহরৎ॥
ভূমিং কমণ্ডলুং কৃত্বা তত্রাপঃ সন্নিবেশ্য চ।
পাবমান্যাদিভিঃ সূক্তৈরভিমন্ত্র্য চ যত্নতঃ॥

ভগবান শিব সেই জলপূর্ণ কমণ্ডলু তুলে দিলেন ব্রহ্মার হাতে। পুরাণের এই বিবরণ অনুযায়ী কমণ্ডলুকে মৃৎপাত্র বলেই মনে হয়।

[ব্রহ্ম পু. ৭২.২৪-২৬]

□ মৎস্য পুরাণের সূচনায় বৈবস্বত মনুর সঙ্গে মৎস্য অবতারের প্রথম সাক্ষাতের যে বিবরণ আছে, সেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, নদীতে ক্ষুদ্র মৎস্যটি পেয়ে বৈবস্বত মনু তাকে সযত্নে রক্ষা করলেন 'করকোদরে'। 'করক' মানে মাটির পাত্র। রাজর্ষি মনুর হাতের মাটির পাত্রটিকে আমাদের কমণ্ডলু বলেই মনে হয়।

[মৎস্য পু. ১.১৬]

মহাভারতে অমৃতমন্থনের যে বিবরণ আছে, সেখানে বলা হয়েছে যে সমুদ্রমন্থনের পর সমুদ্র থেকে ধন্বন্তরি উঠে এলেন অমৃত নিয়ে। তাঁর হাতে অমৃতপূর্ণ শ্বেত কমণ্ডলু—

শ্বেতং কমণ্ডলুং বিভ্রদমৃতং যত্র তিষ্ঠতি।

[মহা (k) ১.১৮.৩৮; (হরি) ১.১৪.৪০]

□ তবে পরবর্তী সময়ে ধাতু নির্মিত দ্রব্যের ব্যবহার বাড়তে থাকার সঙ্গে সঙ্গে ধাতু নির্মিত কমণ্ডলুও নির্মিত হতে শুরু করেছিল। তামা,

পিতল, এমনকী সোনার তৈরি কমণ্ডলুরও উল্লেখ পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে গিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য্য দেখে ঈর্ষায় কাতর দুর্যোধন পিতা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, যুধিষ্ঠিরের পুরোহিত ব্রাহ্মণরা ইন্দ্রপ্রস্থের যজ্ঞসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন সোনার তৈরি কমণ্ডলু হাতে—

কমণ্ডলূনুপাদায় জাতরূপময়ান্ শুভান্।

[মহা (k) ২.৪৯.২৫; (হরি) ২.৪৭.২৫]

কমণ্ডলুধর শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। শিব-মহাদেবের যে দশভুজ মূর্তি কল্পনা করা হয়, সেই মূর্তির দশ হাত অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতির দ্বারা সজ্জিত। এই দশভুজের একটিতে কমণ্ডলু ধারণ করেন বলেই মহাদেব কমণ্ডলুধর নামে খ্যাত। ব্রহ্মপুরাণে একটি কাহিনীর উল্লেখ পাই, যেখানে মহাদেবকে কমণ্ডলুর স্রষ্টা বলা হয়েছে। ব্রহ্মার শুদ্ধিকরণের জন্য শিব ভূমির সারবস্তু থেকে কমণ্ডলু সৃষ্টি করেন এবং বিশ্বের সমস্ত জলরাশির সারস্বরূপা যে পবিত্র জলধারা, তার দ্বারা কমণ্ডলু পূর্ণ করে ব্রহ্মাকে দান করেছিলেন। সেক্ষেত্রে পঞ্চভূতের অন্যতম ক্ষিতি বা ভূমি এবং অপ বা জলকে একত্রে হস্তে ধারণ করেন বলেও মহাদেবকে কমণ্ডলুধর বলা যেতে পারে।

[মহা (k) ১৩.১৭.৪৩; (হরি) ১৩.১৬.৪৩]

কমলা১ স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.৯; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোকসংখ্যা ৯ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

কমলা২ *[দ্র. লক্ষ্মী]*

কমলা৩ একজন অপ্সরা। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষ কন্যা মুনির গর্ভজাত কন্যাদের একজন কমলা। মুনির কন্যা বলে কমলা মৌনেয় নামেও খ্যাত হয়েছিলেন। *[বায়ু পু. ৬৯.৭]*

কমলা৪ পুরাণ মতে দেবী ভগবতীর অপর নাম।

[মৎস্য পু. ৬০.৩৭; পদ্ম পু. (সৃষ্টি) ২২.১২৫]

কমলা৫ পদ্মপুরাণ অনুসারে হিরণ্যকশিপুর পত্নী কমলা। কমলার গর্ভে হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[পদ্ম পু. (ভূমি) ৫.৩১]

কমলাক্ষ১ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষে যোগদানকারী জনৈক যোদ্ধা। দুর্যোধনের অনুরোধে শকুনি অর্জুনকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে দুর্যোধন কৌরবপক্ষীয় যে সব যোদ্ধাকে শকুনির সহায়তার জন্য তাঁর সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন, কমলাক্ষ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ৭.১৫৬.১২৩; (হরি) ৭.১৩৬.১১৯]

কমলাক্ষ২ তারকাসুরের দ্বিতীয় পুত্র ময়দানব অসুরদের জন্য যে ত্রিপুর নির্মাণ করেছিলেন তার মধ্যে যেটি স্বর্ণময় পুরী, তার অধিপতি ছিলেন কমলাক্ষ। তবে মহাভারতের কর্ণপর্বে তাঁকে রৌপ্যময় পুরীর অধিপতি বলা হয়েছে।

[মহা (k) ৭.২০২.৬৫; ৮.৩৩.৫, ২২; (হরি) ৭.১৭০.৫৮; ৮.২৭.৫, ২৪]

কমলাক্ষ৩ জনৈক দানব। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যে সব অসুররা পালিয়ে গিয়ে সমুদ্র তলে আশ্রয় নিয়েছিলেন কমলাক্ষ তাঁদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ৬১.৪]*

কমলাক্ষ৪ একটি পবিত্র তীর্থ। দেবী শক্তি এই তীর্থে মহোৎপলা নামে পূজিত হন। *[মৎস্য পু. ১৩.৩৪]*

কমলাক্ষী স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.৬; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোকসংখ্যা ৬ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

কমলাপতি একজন ঋষি। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে, ইনি শ্রুতর্ষিদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.৬]

কমলাভয়া ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে মৌনেয় অপ্সরাদের নামের যে তালিকা পাওয়া যায়, সেখানে কমলাভয়া নামে একজন অপ্সরার উল্লেখ মেলে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১০]

কমলালয় মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে যে, 'কমলালয়' নামক তীর্থে দেবী ভগবতী কমলা নামে বিরাজমানা। *[মৎস্য পু. ১৩.৩২]*

কম্প জনৈক বৃষ্ণিবংশীয় রাজকুমার। মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বে উল্লেখ আছে যে, মৃত্যুর পর তাঁর আত্মা বিশ্বেদেবগণের মধ্যে লীন হয়ে গিয়েছিল।

[মহা (k) ১৮.৫.১৬; (হরি) ১৮.৫.১৬ ('কঙ্ক' পাঠ ধৃত হয়েছে)]

কম্পন১ একজন রাক্ষস। কুম্ভকর্ণের দুই পুত্র কুম্ভ এবং নিকুম্ভ যখন বানরদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, তখন রাক্ষসরাজ রাবণ কুম্ভ ও নিকুম্ভের রক্ষক হিসেবে যে চারজন রাক্ষসকে

নিযুক্ত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কম্পন অন্যতম।

যুদ্ধক্ষেত্রে কম্পন অঙ্গদকে গদা দিয়ে আঘাত করেছিলেন। তখন ক্রুদ্ধ অঙ্গদের প্রত্যাঘাতে কম্পনের মৃত্যু হয়।

[রামায়ণ ৬.৭৫.৪৭; ৬.৭৬.১-৩]

কম্পন২ যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভায় যেসব রাজারা উপস্থিত থাকতেন তাঁদের মধ্যে কম্পন ছিলেন অন্যতম।

[মহা (k) ২.৪.২২; (হরি) ২.৩.১০নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র. পৃ. ২৬]

কম্পন৩ একজন যক্ষ। তিনি খশার কন্যা কেশিনীর গর্ভে কতকগুলি যক্ষ-রাক্ষস উৎপাদন করেছিলেন। *[বায়ু পু. ৬৯.১৭৭]*

কম্পনা১ একটি নদী-তীর্থ। এই তীর্থ দর্শনে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় এবং স্বর্গলোক লাভ হয়।

[মহা (k) ৩.৮৪.১১৬; ৬.৯.২৫; (হরি) ৩.৬৯.১১৭; ৬.৯.২৫]

□ অনেকে মনে করেন যে, মহাভারতের কম্পনা নদীটি বর্তমানে কাবুলের পূর্ব অংশ দিয়ে প্রবাহিত। এমনকি এই ধারণাও করা হয় যে, এই অঞ্চলে প্রবাহিত কাবুল নদীরই প্রাচীন নাম কম্পনা।

[Dr. Raj Kumar; History of the Chamar Dynasty (From 6th century A.D. to 12th century A.D.); Delhi; Kalpaz Publications; 2008; p. 808]

কম্পনা২ অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। কম্পনা সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৭৯.২৫]*

কম্পিনী অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। কম্পিনী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ১৭৯.২৪]

কম্বল১ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত নাগ। মহাভারতে আস্তীকপর্বে সর্পনাম কথনের সময় তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে। উদ্যোগপর্বে নারদ মাতলিকে ভোগবতী নগরীর বর্ণনা শুনিয়েছেন এবং সেখানে বসবাসকারী প্রধান প্রধান কাদ্রবেয় নাগদের নামও উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গেও কম্বলের নাম উচ্চারিত হয়েছে। আমরা বিভিন্ন পুরাণেও প্রধান নাগ হিসেবে কম্বলের নামোল্লেখ পাই। ভাগবত পুরাণ মতে, দেব-দানব-গন্ধর্ব-নাগদের মধ্যে যাঁরা আশ্বিন মাসকে ধারণ করে থাকেন কম্বল নাগ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বিষ্ণুপুরাণে এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে অবশ্য মাঘ মাসের ধারক হিসেবে কম্বল নাগের নামোল্লেখ আছে। বায়ু পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ তাঁকে পাতালের দ্বিতীয় তল অর্থাৎ সুতল লোকের অধিবাসী বলে উল্লেখ করেছে। মৎস্য পুরাণ মতে প্রয়াগের নিকটবর্তী প্রতিষ্ঠানপুরী থেকে বাসুকি হ্রদ পর্যন্ত যে পবিত্র ক্ষেত্র তা প্রজাপতিক্ষেত্র নামে পরিচিত। কম্বল প্রভৃতি বহু প্রধান নাগ এই স্থানে বসবাস করেন। এর মধ্যে বিশেষ করে যমুনানদীর তীরবর্তী অঞ্চল কম্বল নাগের বাসভূমি বলে চিহ্নিত হয়েছে। মহাভারতেও এই একই তথ্য পাওয়া যায়। তীর্থযাত্রাপর্বে এই স্থানটিকে একটি পবিত্র তীর্থ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাদেব ত্রিপুর দহনের সময় যুদ্ধ যাত্রার জন্য এক অভিনব রথ নির্মাণ করতে আদেশ দেন। সমস্ত দেবতা গন্ধর্ব নাগ মিলে সেই রথ নির্মাণ করেছিলেন। কম্বল নাগ ও অশ্বতর নাগ এই রথকে চারদিক থেকে বেষ্টন করেছিলেন। মহাভারতের সভাপর্বে নারদের মুখে বরুণের সভার যে বিবরণ পাওয়া যায়, সেখানে উপস্থিত বিশিষ্ট নাগ সদস্যদের নামের তালিকায় কম্বল নাগেরও নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

[মহা (k) ১.৩৫.১০; ২.৯.৯; ৩.৮৫.৭৬; ৫.১০৩.৯; (হরি) ১.৩০.১০; ২.৯.৯; ৩.৭০.৭৬; ৫.৯৬.৯; মৎস্য পু. ৬.৩৯; ১০৪.৫; ১০৬.২৭; ১১০.৮; ১৩৩.২০; বায়ু পু. ৫০.২৩;৬৯.৭০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.২৩; ১.২৩.২১; ২.৭.৩৩; ভাগবত পু. ৫.২৪.৩১; ১২.১১.৪৩; বিষ্ণু পু. ১.২১.২১; ২.১০.১৬; পদ্ম পু. স্বর্গ. ১৯.১৪৯]

□ বিষ্ণু পুরাণ থেকে জানা যায় যে, ব্রহ্মার মুখ থেকে সৃষ্ট এই পুরাণ দধীচি, ভৃগু, পুরুকুৎস প্রমুখ মহর্ষির দ্বারা মর্ত্যলোকে প্রচারিত হয়, ক্রমে নর্মদা এই পুরাণ শিক্ষা করেন, নর্মদার কাছ থেকে নাগবংশীয় ধৃতরাষ্ট্র ও পূরণ এই পুরাণ শিক্ষা করেন, তাঁদের থেকে নাগরাজ বাসুকি, বাসুকির কাছ থেকে বৎস এই পুরাণ কথা শোনেন, বৎস

অশ্বতরকে এই পুরাণ শোনান, অশ্বতরর কাছ থেকে কম্বল নাগ এই পুরাণ শোনেন এবং এলাপত্রকে শোনান। *[বিষ্ণু পু. ৬.৮.৪১-৪৬]*

কম্বল২ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে প্রচেতার গর্ভে যেসব যক্ষদের জন্ম হয় কম্বল তাঁদের মধ্যে একজন। *[বায়ু পু. ৬৯.১২]*

কম্বল৩ কেতুমাল বর্ষের অন্তর্গত সাতটি বর্ষ পর্বতের মধ্যে একটি। *[বায়ু পু. ৪৪.৪]*

কম্বল৪ কুশদ্বীপের অন্তর্গত সাতটি বর্ষ পর্বতের মধ্যে একটি। *[মহা (k) ৬.১২.১৩; (হরি) ৬.১২.১৩]*

কম্বল৫ একটি তীর্থ। মহাভারতে প্রয়াগ, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পবিত্র স্থানগুলির সঙ্গে একত্রে এর নাম উচ্চারিত হয়েছে। *[মহা (k) ৩.৮৫.৭৬; (হরি) ৩.৭০.৭৬]*

কম্বলবর্হিষ১ ভাগবত পুরাণ ও বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে বৃষ্ণি-বংশীয় অন্ধকের চার পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে কম্বলবর্হিষ একজন।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.১৯; বিষ্ণু পু. ৪.১৪.৩]

□ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে সত্যকের ঔরসে জনৈক কাশীরাজকন্যার গর্ভে চারটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন—কুকুর, ভজমান, শুচি ও কম্বলবর্হিষ। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১১৬]*

□ বায়ু পুরাণে আবার বলা হয়েছে যে, সত্যক ও জনৈক কাশীরাজকন্যার পুত্ররা হলেন ককুদ, ভজমান, শমী ও কম্বলবর্হিষ।

সম্ভবত এখানে 'কুকুর'—এই নামটির পরিবর্তে 'ককুদ' এবং 'শুচি' এই নামটির পরিবর্তে 'শমী' নামটির উল্লিখিত হয়েছে। *[বায়ু পু. ৯৬.১১৫]*

□ মৎস্য পুরাণ মতে কঙ্কের কন্যার গর্ভজাত পুত্ররা হলেন কুকুর, ভজমান, শশী ও কম্বলবর্হিষ।

সম্ভবতঃ শুচি-র পরিবর্তে শশী নামটি উল্লিখিত হয়েছে। *[মৎস্য পু. ৪৪.৬১]*

কম্বলবর্হিষ২ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে বৃষ্ণিবংশীয় হৃদিকের পুত্র দেববাহু (বায়ু ও মৎস্য পুরাণ মতে দেবার্হ)।

কম্বলবর্হিষ এই দেববাহু (অন্যমতে দেবার্হ)-র পুত্র এবং অসমৌজার (মৎস্য পুরাণ মতে অসমঞ্জা) পিতা। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৪২; বায়ু পু. ৯৬.১৪০; মৎস্য পু. ৪৪.৮৩]*

কম্বলবর্হিষ৩ বৃষ্ণিবংশীয় ক্রোষ্টুর বংশধারায় মরুত্তের পুত্র এবং রুক্সকবচের পিতা হলেন কম্বলবর্হিব (বায়ু পুরাণ মতে কম্বলবর্হি)।

[মৎস্য পু. ৪৪.২৫; বায়ু পু. ৯৫.২৪]

কম্বলা পৌরাণিক কেতুমাল বর্ষের মধ্যে দিয়ে যেসব নদী প্রবাহিত হয়েছে, সেই নদীগুলির মধ্যে কম্বলা অন্যতম। *[বায়ু পু. ৪৪.১৭]*

কম্বলাশ্বতরাক্ষতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ১০২]

কম্বলাশ্বতরতীর্থ প্রয়াগক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করলে এবং জলপান করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তিলাভ করা যায়।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ১৪৩]

কম্বু ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে রৈবত মনুর পুত্রদের মধ্যে কম্বু একজন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৬৪]*

কম্বুগ্রীব মদ্রদেশের রাজা সুধন্বার পুত্র কম্বুগ্রীব। সিংহলের রাজা চন্দ্রসেন তাঁর কন্যা মন্দোদরীর সঙ্গে কম্বুগ্রীবের বিবাহ স্থির করেন। কিন্তু মন্দোদরী এই বিবাহ করতে সম্মত হননি।

[দেবীভাগবত পু. ৫.১৭.১১-১৪]

কম্বোজ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমদিকে বসবাসকারী একটি জনজাতি তথা একটি সমৃদ্ধ জনপদ। এই জনপদটি ষোড়শ মহাজনপদগুলির মধ্যে অন্যতম। মনুর মতে, কম্বোজরা নিজ কর্মদোষে ক্ষত্রিয় বর্ণচ্যুত হয়ে শূদ্রত্ব লাভ করে। পুরাণের কথা অনুযায়ী রাজা সগর কর্তৃক কম্বোজরা জাতিচ্যুত হয়েছিল। সগরের পিতার নাম বাহু। তালজঙ্ঘ হৈহয়, কাম্বোজ, শক, যবন, পারদ এবং পহ্লবরা সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণ করে বাহুর রাজ্য দখল করেছিল। রাজ্যচ্যুত বাহু অরণ্যে অতিদুর্দশায় মারা যান। তার অন্তঃসত্ত্বা পত্নী যাদবী স্বামীর সঙ্গে সহমরণের ইচ্ছায় গর্ভজাত সন্তানটিকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভৃগুপুত্র ঔর্ব, যাদবীর প্রাণরক্ষা করে তাঁকে নিজের আশ্রমে আশ্রয় দেন। এই যাদবীর গর্ভের সন্তানটিরই নাম সগর। মহাবীর সগর পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হৈহয়, কাম্বোজ প্রভৃতি জাতিগুলিকে পদানত করেন। ভীত জনজাতিগুলি তখন ঋষি বশিষ্ঠের কাছে আশ্রয় নেয়। বশিষ্ঠেরই অনুরোধে সগর তাদের জীবনদান করেন, কিন্তু প্রতিশোধ পূরণের জন্য যবন ও কাম্বোজদের মস্তক মুণ্ডন করে তাদের ধর্মনাশ করেন। এভাবেই তারা সকলে সগরের প্রতিহিংসাবশতই কুলোচিত ধর্ম থেকে পতিত হন—

শকা যবনকাম্বোজাঃ পহ্লবাঃ পারদৈঃ সহ।
কলিস্পর্শা মাহিষিকা দার্বাশ্চোলাঃ ঘসাস্তথা॥
সর্বে তে ক্ষত্রিয়গণা ধর্মস্তেষাং নিরাকৃতঃ।

□ মহাভারতেও কম্বোজ দেশীয়দের ক্রূর এবং ম্লেচ্ছজাতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, এরা ব্রাহ্মণ সংস্পর্শহীন ছিল। তাতে বোঝা যায় কম্বোজ জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে সম্ভবত ব্রাহ্মণরা বাস করতেন না। অবশ্য বৈদিকধর্ম থেকে চ্যুত কোনো জনজাতির নৈকট্যে ব্রাহ্মণদের বাস না করাই খুব স্বাভাবিক।

[মনু সংহিতা ১০.৪৪; মহা (k) ১.৬৭.৩২; ৩.১৮৮.৩৬; ১৩.৩৩.২১; (হরি) ১.৬২.৩২; ৩.১৫৯.৩৫; ১৩.৩২.২২; বায়ু পু. ৮৮.১২২-১৪৩; বিষ্ণু পু. ৪.৩.১৫-২১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৪৯; ২.৪৮.২২, ৪৪; ৬৩.১২০, ১৩৪, ১৩৮]

□ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রাক্কালে দ্রুপদ, পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের জন্য যেসব দেশে দূত প্রেরণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে কম্বোজ অন্যতম। কিন্তু ঘটনাচক্রে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কম্বোজদেশীয় এক অক্ষৌহিণী সৈন্যকে কৌরবপক্ষে যোগদান করতে দেখা যায়।

[মহা (k) ৫.৪.১৮; ৫.১৬০.১০৩; ৫.১৬১.২১; ৭.৪.৫; ৭.২০.৭; ৭.১১৩.৬০; ৭.১১৯.১৬; ৮.৭০.৪; ৯.১.২৭; ৫.১৯.২২; (হরি) ৫.৪.১৮; ৫.১৪৯.১০৩; ৫.১৫০.২১; ৭.৪.৫; ৭.১৮.১০; ৭.৯৭.৫৯; ৭.১০৩.১২; ৮.৬৪.৬; ৯.১.২৫; ৫.১৯.২১]

□ কালযবন যখন বাসুদেব কৃষ্ণকে আক্রমণ করেছিলেন, তখন যে সমস্ত উপজাতিরা কৃষ্ণের বিরুদ্ধে কালযবনকে সহায়তা করেছিল, তাদের মধ্যে কম্বোজরা অন্যতম। কৃষ্ণ কম্বোজদের পরাজিত করেছিলেন।

[মহা (k) ৭.১১.১৭; (হরি) ৭.৯.১৭]

□ মহাভারত, পুরাণ তথা অনান্য প্রাচীন সাহিত্যগ্রন্থে কম্বোজদেশীয় অশ্বের কথা পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং বাণভট্টের হর্ষচরিতেও বারবার কম্বোজদেশীয় অশ্বের কথা উচ্চারিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বহু যোদ্ধাকে বিচিত্র বর্ণের উৎকৃষ্ট মানের কম্বোজদেশীয় অশ্ব ব্যবহার করতে দেখা গেছে। দ্রোণপর্বে নকুল, ধৃষ্টকেতু প্রমুখের রথে কম্বোজদেশীয় অশ্ব সংযুক্ত ছিল—এমন উল্লেখ পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের সময় শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট উচ্চমানের কম্বোজদেশীয় অশ্ব উপহার পেয়েছিলেন। বাসুদেব কৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরস্থিত নরকাসুরের প্রাসাদ থেকে বহুসংখ্যক কম্বোজদেশীয় অশ্ব উদ্ধার করে দ্বারকায় নিয়ে এসেছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ২.৫৩.৫; ৬.১৭.২৬; ৭.২৩.২২, ৪২; ৭.৯২.২৬-২৭; (হরি) ২.৫১.৫; ৬.১৭.২৭; ৭.২১.২২, ৩৯; ৭.৭৯.২৬-২৭; বিষ্ণু পু. ৫.২৯.৩২]

□ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পণ্ডিতরা মনে করেন প্রাচীনকালে কম্বোজদেশ থেকে বহুল পরিমাণে উৎকৃষ্ট জাতের ঘোড়া ভারতবর্ষে আমদানি করা হত। বাণিজ্য এবং যুদ্ধকার্য—উভয় প্রয়োজনেই এদের ব্যবহার করা হত। কৌটিল্য কম্বোজ থেকে অশ্ব আমদানির কথা অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন। বাণভট্টের রচনা থেকে জানা যায় যে, সম্রাট হর্ষবর্ধনের পশুশালাটি কম্বোজদেশীয় অশ্বে পরিপূর্ণ ছিল। কালিদাসের রঘুবংশেও কম্বোজদেশীয় অশ্বকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজাতির ঘোড়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতে যুদ্ধেও প্রচুর পরিমাণে কম্বোজীয় অশ্বের উপস্থিতি লক্ষণীয়। পাশাপাশি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সৌজন্য-উপহার স্বরূপ পাওয়া কম্বোজদেশীয় অশ্বগুলিও সেই সময়ের বাণিজ্যিক তথা অর্থনৈতিক গুরুত্ব প্রমাণ করে। পণ্ডিত N.L. Dey-এর মতে বর্তমান আফগানিস্তানের উত্তরাংশটিই প্রাচীন কম্বোজদেশ। আর প্রাচীন কম্বোজজাতির মানুষরা হলেন স্বল্প-যাযাবর (Seminomadic) ইরানী বা পারসিক জাতিগোষ্ঠীর লোক। এরাই মধ্য এশিয়া ও বৃহত্তর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল। পারস্যের সম্রাট দ্বিতীয় সাইরাস (Cyrus) কম্বোজদেশ দখল করেছিলেন বলে জানা যায়। সাইরাসের দ্বারা বিজিত অঞ্চলগুলির মানচিত্র দেখলে বোঝা যায় যে, তিনি কম্বোজদেশ অর্থে কাবুল উপত্যকা সংলগ্ন অঞ্চল জয় করেছিলেন। এই অঞ্চলে আজও খুবই উৎকৃষ্টমানের অশ্ব পাওয়া যায়। সেকালে কম্বোজের ঘোড়া এবং সেখানকার ঘোড়সওয়াররা এতই বিখ্যাত ছিল

যে, সম্পূর্ণ জাতিটিই অশ্বক (Ashvaka) বা অশ্মক নামে পরিচিত ছিল।

[Bonnic Hendricks, Horse Breeding, Oklahama: University of Oklahama Press, 2007; p. 9; Kaushik Roy, Hinduism and the Ethics of Warfare in South Asia, U.S.A, Cambridge University Press, 2012;) ৯.১৫]

□ মহাকাব্য, পুরাণে একাধিক কম্বোজদেশীয় রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন সুদক্ষিণ। ইনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। আবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি কৌরবদের পক্ষ নিয়ে এক বিরাট কম্বোজ সেনাদলকে নেতৃত্বও দিয়েছিলেন। সুদক্ষিণ এতই পরাক্রমশালী ছিলেন যে, স্বয়ং ভীষ্ম তাঁকে ইন্দ্রের সমতুল্য বীর বলে উল্লেখ করেছেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভাতেও সুদক্ষিণের উপস্থিতি চোখে পড়ে। ইনি যুদ্ধে সহদেবপুত্র শ্রুতকর্মার হাতে নিহত হন।

[মহা (k) ৫.১৬৬.১-৩; ৬.১৬.১৫; ৬.৪৫.৬৮; ৭.২৩.৪২; ১.১৮৬.১৫; (হরি) ১.১৫৫.১-৩; ৬.১৬.১৫; ৬.৪৫.৬৮; ৭.২১.২২; ১.১৭৯.১৫]

□ এছাড়াও শ্রুতায়ু নামে আর এক কম্বোজদেশীয় নৃপতির নামও জানা যায়। ইনি কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধ করেছিলেন এবং অর্জুনের হাতেই নিহত হন।

[মহা (k) ৭.৯১.৩৭; (হরি) ৭.৭৮.৩৭]

□ মহাভারতে কম্বোজদের 'দুর্বারণ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে—

এতে দুর্বারণা নাম কম্বোজা যদি তে শ্রুতাঃ॥

অর্থাৎ এঁদের যুদ্ধে প্রতিরোধ করা খুবই কঠিন। এঁরা বাহুযুদ্ধে অত্যন্ত নিপুণ মহাভারতে এঁদের বীর, শিক্ষিত, ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী, সংঘবদ্ধ ও পরস্পরের হিতকামী বলা হয়েছে—

শূরাশ্চ কৃতবিদ্যাশ্চ ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতাঃ।
সংহতাশ্চ ভৃশং হ্যেতে অন্যোন্যস্য হিতৈষিণঃ॥

স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, কম্বোজ জনজাতিকে যতই ম্লেচ্ছ বা আর্য সংস্কৃতিচ্যুত বলে সমালোচনা করা হোক, এঁদের অবশ্যই একটি নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। মহাভারতকারের বর্ণনা অন্ততঃ সেই প্রমাণ বহন করে। ফলে কম্বোজদের কখনোই বর্বর বা যুদ্ধবাজ জাতি বলে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এঁরা ভাড়াটে সৈন্য (Mercenary) ছিলেন বলেও মনে হয় না, কারণ সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের তৎকালীন অন্যান্য যেসব জনজাতি বিভিন্ন যুদ্ধে ভাড়াটে সৈন্যের ভূমিকা পালন করত, তাদের মতোই এঁদেরও কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষেই যুদ্ধ করতে দেখা স্বাভাবিক ছিল।

[মহা (k) ৭.১১২.৪২-৪৩, ৪৮; ১২.১০১.৫; (হরি) ৭.৯৬.৪২-৪৩, ৪৮; ১২.৯৮.৫]

□ যদু বৃষ্ণি বংশীয় মহারথী সাত্যকি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কম্বোজ যোদ্ধাদের এক বিরাট অংশের সংহার করেছিলেন। সাত্যকিও কম্বোজদের মুণ্ডিত মস্তক বলে বর্ণনা করেছিলেন—

প্রতিজ্ঞাং পালয়িষ্যামি কাম্বোজানেব মাং বহ।
অদ্যৈষাং কদনং কৃত্বা ক্ষিপ্রং (প্রিয়ং)
যাস্যামি পাণ্ডবম্॥
অদ্য দ্রক্ষ্যন্তি মে বীর্য্যং কৌরবাঃ সসুযোধনাঃ।
মুণ্ডানীকে হতে সূত সর্বসৈন্যে নিরাকৃতে॥

কম্বোজ দেশীয়দের অনেককেই অর্জুনও সংহার করেছিলেন।

[মহা (k) ৭.১১৯.২০, ২৭-২৮; ৭.১১৯.৫২; ৭.১২০.৯; ৭.১২১.১৩; ৮.৫৬.১০৭; ৮.৮৮.১৭; (হরি) ৭.১০৩.১২, ২২-২৩; ৭.১০৪.১; ৭.১০৪.৯; ৭.১০৫.১৩; ৮.৪২.১১৬; ৮.৬৫.১৬]

□ কর্ণ একবার কম্বোজদের হারিয়ে তাঁদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন।

[মহা (k) ৮.৯.৩৩; (হরি) ৮.৬.১৮]

□ রাজসূয় যজ্ঞের সময় কম্বোজের অধিপতি, যুধিষ্ঠিরকে শুধুমাত্র উৎকৃষ্টমানের প্রচুর অশ্ব উপহার দিয়েছিলেন, তা নয়—তাঁকে উপহার স্বরূপ মেষলোম, মূষিকলোম ও বিড়াললোম নির্মিত এবং স্বর্ণখচিত বহুমূল্য পট্টবস্ত্র, একশো উট এবং দাসী-স্ত্রীও দিয়েছিলেন। মূল্যবান বেশ কিছু পশুচর্মও কাম্বোজরাজ দান করেন যুধিষ্ঠিরকে।

[মহা (k) ২.৪৯.২০; ২.৫১.৩; (হরি) ২.৪৭.১৯; ২.৪৯.৩; ভাগবত পু. ১০.৭৫.১২]

□ কম্বোজরা আসলে আফগানিস্তানের উত্তরাংশে বসবাসকারী একটি ইন্দো-আর্যগোষ্ঠীভূত জনজাতি। মতান্তরে এরা পূর্ব আফগানিস্তানে বাস করতো। ঘোড়সওয়ার কম্বোজদের অশ্মক (Asvakan) নামে ডাকা হত। পণ্ডিতরা মনে করেন এই 'অশ্মক' শব্দটি

থেকেই 'আফগান' শব্দের উৎপত্তি। পণ্ডিত N.L. Dey-এর মতে, কম্বোজদের রাজধানীর নাম ছিল দ্বারকা। তবে এই দ্বারকা গুজরাটের অন্তর্গত বাসুদেব কৃষ্ণের কর্মভূমিটি নয়।

হিন্দুকুশ পর্বতে বসবাসকারী শিয়াপোষ (Shiaposh) নামে উপজাতিটিকে অনেকে কম্বোজদের বংশধর বলে মনে করেন। গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ান এদের আসাকিনোই (Assakenoi) নামে উল্লেখ করেছে। সম্রাট অশোকের ধৌলি ও গিরনার লিপিতে কম্বোজদের কাম্বোচা (Kambocha) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাচীন পারস্যলিপিতে এদের কাম্বুজ্জা (kambujja) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে একদল পণ্ডিত প্রাচীন কম্বোজ দেশ তিব্বতের অন্তর্গত ছিল বলে ধারণা করেন। স্মিথ অবশ্য মনে করেন যে, কম্বোজ দেশটি তিব্বত অথবা হিন্দুকুশ পর্বত উভয়েরই কোনো এক প্রান্তে অবস্থিত হয়ে থাকতে পারে।

[EAIG (Kapoor) p. 336-337; GDAMI (Dey) p. 87]

□ S.M. Ali আবার বিষয়টিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে আফগানিস্তানের পূর্বে কুনার (Kunar) নদী অববাহিকায় কম্বোজরা বাস করতো। তবে এটি কখনোই তাদের আদি বাসস্থান নয়, বরং উপনিবেশ (Colony)। তিনি বলেছেন কম্বোজদের আদি বাসস্থান ছিল কামদেশ (Kamadesa) বা কাফিরস্তান (Kafiristan)। *[GP (Ali) p. 143]*

কয়াধু জম্ভাসুরের কন্যা এবং হিরণ্যকশিপুর ভার্য্যা। কয়াধুর গর্ভে হিরণ্যকশিপুর সংহ্রাদ, অনুহ্রাদ, হ্রাদ ও প্রহ্রাদ নামে চারটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। 'র' এবং 'ল'-এর অভেদ-কল্পনায় হিরণ্যকশিপুর পুত্র নামগুলি যথাক্রমে সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদ এবং প্রহ্লাদ নামেও উচ্চারিত হয়।

[ভাগবত পু. ৬.১৮.১২-১৩]

□ হিরণ্যকশিপু যখন অতুল বলশালী হবার মানসে তপস্যা করার জন্য মন্দর পর্বতে গমন করেন, তখন হিরণ্যকশিপুর অনুপস্থিতির সুযোগে দেবতারা দৈত্যদের আক্রমণ করেন। তাঁরা দৈত্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর গৃহে লুণ্ঠন করেন।

যুদ্ধের উদ্যোগের কথা শুনে অন্যান্য অসুর দলপতিরা প্রাণভয়ে পলায়ন করে। দেবরাজ ইন্দ্র হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধুকে বন্দি করে নিয়ে যান। সেই সময় কয়াধু গর্ভবতী ছিলেন। দেবর্ষি নারদ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং ইন্দ্রকে বাধা দিয়ে বলেন যে, কয়াধু পরস্ত্রী এবং নিরপরাধিনী। ইন্দ্রকে তিরস্কার করে নারদ একথাও বলেন, বিশেষত কয়াধু এখন গর্ভবতী। এ অবস্থায় তাঁকে বন্দি করা, অপহরণ করা বা যে কোনো রকম অত্যাচার করাই অনুচিত।

ইন্দ্র নারদকে জানান যে, কয়াধুর গর্ভে দৈত্যকুলের সন্তান রয়েছে, যে দেবতাদের পরম শত্রু। তিনি আর দেবতাদের শত্রু-বৃদ্ধি হতে দেবেন না। তাই যতদিন না সেই সন্তান প্রসব হচ্ছে এবং তাকে হত্যা করা হচ্ছে, ততদিন কয়াধু ইন্দ্রের গৃহেই থাকবেন।

ইন্দ্রের কথা শুনে নারদ তাঁকে বললেন—এই ভাবী সন্তান নিষ্পাপ, মহৎ ব্যক্তি এবং ভগবান শ্রীহরির একান্ত ভক্ত, মহাভাগবত। ইনি শ্রী অনন্তদেবের অনুচর এবং মহাবলবান। তাই আপনি গর্ভস্থ সন্তানটিকে হত্যা করতে পারবেন না। দেবর্ষির কথায় ইন্দ্র কয়াধুকে মুক্তি দিয়ে স্বর্গে প্রস্থান করেন। তখন নারদ মুনি কয়াধুকে তাঁর আশ্রমে আশ্রয় দেন। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ফিরে আসা পর্যন্ত কয়াধু সেখানেই ছিলেন। নারদ মুনির আশ্রমে থাকাকালীন কয়াধু তাঁর কাছ থেকে নানান ভাগবতী শিক্ষালাভ করেন। বৈষ্ণব দার্শনিকরা মনে করেন যে, কয়াধু গর্ভাবস্থায় যখন নারদের উপদেশ শোনেন, তখনই প্রহ্লাদের একপ্রকার দীক্ষা হয়ে যায়।

তবে প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তি যখন হিরণ্যকশিপুর ক্রোধের কারণ হয়ে ওঠে এবং তিনি নানাভাবে প্রহ্লাদকে অত্যাচার এমনকী বধ করার চেষ্টা পর্যন্ত করতে থাকেন, সেই সময় এই কনিষ্ঠ পুত্রটির দুর্দশা দেখে কয়াধুর মানসিক অবস্থা কী হয়েছিল—এ সংবাদ পুরাণকারেরা অনুচ্চারিতই রেখেছেন। *[ভাগবত পু. ৭.৭. অধ্যায়]*

করক ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত একটি জনপদ। *[মহা (k) ৬.৯.৬০; (হরি) ৬.৯.৬০]*

করকর্ষ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানকারী জনৈক চেদিদেশীয় যোদ্ধা। চেদিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শরভের সঙ্গে ইনি পাণ্ডবশিবিরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্ভবত ইনি শরভের সেনাপতি

ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সপ্তম দিনে কৃপাচার্যের বাণে চেকিতান আহত ও মূর্ছিত হয়ে পড়লে করকর্ষ তাঁকে রথে তুলে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

[মহা (k) ৫.৫০.৪৭; ৬.৮৪.৩২-৩৩; (হরি) ৫.৫০.৪৭; ৬.৮১.৩২-৩৩]

করকাক্ষ *[দ্র. করকাশ]*

করকায়ু *[দ্র. কানকায়ু]*

করকাশ জনৈক কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধা। মহাভারতের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে ইনি করকাক্ষ নামে চিহ্নিত হয়েছেন। দোণাচার্য যে গরুড় ব্যূহ নির্মাণ করেছিলেন তার গ্রীবাদেশে যে সব মহারথ যোদ্ধা অবস্থান করছিলেন তাঁদের মধ্যে করকাশ একজন।

[মহা (k) ৭.২০.৬; (হরি) ৭.১৮.৬]

করজ ধর্মের ঔরসে বিশ্বার পুত্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন করজ। বিশ্বার পুত্র বলে করজ বিশ্বদেব বলে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। *[মৎস্য পু. ২০৩.১৩]*

করঞ্জনিলয়া করঞ্জবৃক্ষ অর্থাৎ করমচা গাছ। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, বৃক্ষগণের মাতা এই করঞ্জবৃক্ষে বাস করেন বলেই তাঁকে করঞ্জনিলয়া বলা হয়। তাঁর পূজা করলে পুত্রকামনাকারী ব্যক্তিরা পুত্রলাভ করেন।

[মহা (k) ৩.২৩০.৩৫-৩৬; (হরি) ৩.১৯২.৩৫-৩৬]

করঞ্জমঞ্চম পৌরাণিক কেতুমালবর্ষের অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান জনপদগুলির মধ্যে করঞ্জমঞ্চম একটি। *[বায়ু পু. ৪৪.১৩]*

করট দক্ষিণ ভারতের একটি জনপদ তথা জনজাতির নাম। *[মহা (k) ৬.৯.৬৩; (হরি) ৬.৯.৬৩]*

করতোয়া১ বৃহত্তর বঙ্গদেশ বা বর্তমান বাংলাদেশের একটি নদী। মহাকাব্য ও পুরাণে পবিত্র নদীরূপে খ্যাত।

□ নারদ, যুধিষ্ঠিরের কাছে বরুণদেবের সভা বর্ণনাকালে বলেছিলেন যে, করতোয়া নদী সেখানে অবস্থান করে উপযুক্ত দেহ ধারণ পূর্বক অর্থাৎ দেবীমূর্তি ধারণ করে বরুণদেবের উপাসনা করেন। *[মহা (k) ২.৯.২২; (হরি) ২.৯.২২]*

□ ঋষি পুলস্ত্য তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনাকালে তীর্থযাত্রী দেবব্রত ভীষ্মকে জানিয়েছিলেন যে, স্বয়ং ব্রহ্মার বিধান অনুযায়ী করতোয়া নদীর তীর্থে গিয়ে তিন রাত্রি উপবাস করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়—

করতোয়াং সমাসাদ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি প্রজাপতিকৃতো বিধিঃ॥

[মহা (k) ৩.৮৫.৩; (হরি) ৩.৭০.৩]

□ ভীষ্মপর্বে করতোয়াকে একটি পবিত্র নদী রূপে উল্লেখ করা হয়েছে, যার জল ভারতবর্ষের আর্য ও ম্লেচ্ছ জাতির লোকেরা পান করে। অর্থাৎ করতোয়া নদীর তীরবাসী মানুষদের মধ্যে আর্য এবং আর্যেতর জনজাতি উভয়েই ছিলেন।

[মহা (k) ৬.৯.৩৫; ১৩.১৬৫.২০; (হরি) ৬.৯.৩৫; ১৩.১৪৩.২০]

□ মহাভারতের এক স্থানে করতোয়াকে কুরঙ্গ দেশের নদী—'করতোয়াং কুরঙ্গে চ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[মহা (k) ১৩.২৫.১২; (হরি) ১৩.২৬.১২]*

□ পণ্ডিত করতোয়া R.C. Majumdar করতোয়া নদী এবং তার তীরে অবস্থিত কুরঙ্গ নামক জনপদ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত রংপুর জায়গাটিরই প্রাচীন নাম কুরঙ্গ। আর করতোয়া নদী যে রংপুর অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত, কিংবা এখনও প্রবাহিত হয়—এবিষয়ে পণ্ডিত মহলে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

[R.C. Majumdar, The History of Bengal, Vol. 1, Dacca: The University of Dacca, 1943, p. 5, 24, 429]

□ অমরকোষে বর্ণিত হয়েছে যে, গৌরীর বিবাহকালে সম্প্রদানের জল মহাদেবের হস্তাঙ্গুলির মধ্য দিয়ে নিঃসৃত হয়ে করতোয়া নদীর উৎপত্তি হয়েছে। 'কর' শব্দের অর্থ করতল এবং 'তোয়' শব্দের অর্থ জল, মহাদেবের করতল থেকে নির্গত 'তোয়' বা জল থেকে এই নদীর সৃষ্টি বলেই এর নাম করতোয়া।

□ করতোয়া, সদানীরা নামেও পরিচিত। এই নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে অমরকোষে উল্লিখিত একটি শ্লোকের অবতারণা করা যায়—

প্রথমং কর্কটে দেবী ত্র্যহং গঙ্গা রজস্বলা।
সর্বা রক্তবহা নদ্যঃ করতোয়াম্বুবাহিনী॥

[অমরকোষ, মহেশ্বর কৃত টীকা]

এ থেকে বোঝা যায় প্রথম শ্রাবণে গঙ্গা এবং সমস্ত নদী যখন রক্তবাহী রজস্বলা হয়ে ওঠে, সে সময়ও করতোয়া নদী জলই বহন করে। সদা জলবহনকারী বলেই এর নাম সদানীরা।

[অমরকোষ. ১.(বারিবর্গ).৩৩]

☐ করতোয়ার আরেক নাম বহুরোকা। বহুরোকা শব্দটির অর্থ ছিদ্রবহুল বা অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত। কালিকা পুরাণ মতে, আসামের কামরূপ অঞ্চলের সুরস পর্বত থেকে করতোয়ার উৎপত্তি। সম্ভবত ভূগর্ভস্থ জলের মাধ্যমে সুরস পর্বতে সৃষ্ট বহুছিদ্র দিয়েই করতোয়া নদী প্রবাহিত হয়। সে কারণেই এর নাম বহুরোকা। এই নদীতে স্নান করে মহাবৃষ ও মাহেশ্বরী দেবীর অর্চনা করলে পাপমুক্ত হওয়া যায়। *[কালিকা পু. ৭৮.৭-১০]*

☐ কালিকা পুরাণ মতে, পবিত্র কামরূপ পীঠের ঠিক পশ্চাৎ ভাগেই করতোয়া নদী প্রবাহিত। এই নদী প্রস্থে এক যোজন এবং দৈর্ঘ্যে ত্রিশ যোজন বিস্তৃত। *[কালিকা পু. ৫১.৬৫]*

☐ কালিকা পুরাণে করতোয়ার জলে অর্চনা করাকে বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ ও পুষ্কর ক্ষেত্রে পূজা করার চেয়েও অধিক পুণ্যদানকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[কালিকা পু. ৫৮.৩৭]*

☐ আধুনিক ভৌগোলিক দৃষ্টিতে করতোয়া ব্রহ্মপুত্রের একটি উপনদী। এটি অসম রাজ্যের কামরূপ জেলার পশ্চিম সীমা নির্ধারণকারী একটি নদী। ফুলঝাড় নামে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে করতোয়ার উৎপত্তি। এরপর কিছুদূর প্রবাহিত হয়ে এটি বাংলাদেশের রংপুর জেলায় প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশের দিনাজপুর ও বগুড়া জেলাতেও করতোয়া প্রবাহিত।

[EAIG (Kapoor) p. 353; GDAMI (Dey) p. 93]

করতোয়া₂ বিন্ধ্যপাদ পর্বত থেকে নির্গত একটি নদী। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.২৫]*

☐ বায়ু পুরাণ মতে, ঋক্ষপাদ পর্বত থেকে এই নদীর উৎপত্তি। *[বায়ু পু. ৪৫.১০০]*

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঋক্ষ পর্বত, বিন্ধ্য পর্বত শ্রেণীরই একটি অংশ। তবে বিন্ধ্য পর্বত থেকে নিঃসৃত এই করতোয়া নদীটির আধুনিক প্রবাহ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

করবীরাক্ষ একজন রাক্ষস। রামায়ণে রাবণরাজার বৈমাত্রের ভাই খর-এর সেনাপতি। রামচন্দ্রকে হত্যা করার জন্য খর যে বারো জন সেনাপতিকে নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম করবীরাক্ষ। *[রামায়ণ ৩.২৩.৩২]*

☐ করবীরাক্ষ ও অন্যান্য রাক্ষস সেনাপতিরা রামচন্দ্রকে আক্রমণ করলে রামচন্দ্র সুবর্ণ ও বজ্রমণি দিয়ে অলঙ্কৃত বাণের দ্বারা তাদের বধ করেন। *[রামায়ণ ৩.২৬.২৭-২৮]*

করন্ধম₁ মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাজর্ষি ইক্ষ্বাকুর বংশধারায় খনীনেত্রের পুত্র করন্ধম। তবে পুরাণগুলিতে করন্ধমকে বৈবস্বত মনুর পুত্র নাভাগের বংশধারায় জাত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য পুরাণগুলিতেও তাঁর পিতার নাম (খনীনেত্র) অপরিবর্তিতই আছে।

[মহা (k) ১৪.৪.৯; (হরি) ১৪.৪.৯; ভাগবত পু. ৯.২.২৫-২৬; বায়ু পু. ৮৬.৭; বিষ্ণু পু. ৪.১.১৬]

☐ মহাভারতে একাধিক শ্লোকে প্রাচীন এই রাজর্ষির পরিচয় দিতে গিয়ে যে তথ্যটি বার বার পরিবেশিত হয়েছে, তা হল ইনি বিখ্যাত রাজর্ষি মরুত্তের পিতামহ—

করন্ধমস্য পৌত্রস্তু মরুত্তো'বিক্ষিতঃ সুতঃ।

[মহা (k) ১৩.১৩৭.১৬; (হরি) ১৩.১০৫.১৬]

☐ মহাভারতে বর্ণিত কাহিনী থেকে জানা যায় রাজা করন্ধমের প্রকৃত নাম করন্ধম ছিল না। তাঁর নাম ছিল সুবর্চা। সুবর্চার পিতা রাজা খনীনেত্র বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা ছিলেন বলে প্রজারা তাঁকে মোটেই পছন্দ করতেন না। শেষপর্যন্ত রাজা খনীনেত্রের অত্যাচার চরমে উঠলে একসময় প্রজারাই তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করলেন এবং তাঁর পুত্র সুবর্চাকে সিংহাসনে স্থাপন করলেন।

সুবর্চা প্রজাদের প্রতি পিতার অত্যাচার দেখেছিলেন, তার পরিণামে যে তাঁর পিতাকে রাজ্যচ্যুত হতে হল—তাও তাঁর নিজের চোখে দেখা। ফলে সিংহাসনে আরোহণ করার সময় থেকেই তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে প্রজাদের কল্যাণ করা, তাঁদের সন্তানের মতো প্রতিপালন করাই হবে তাঁর জীবনের ব্রত। রাজা সুবর্চা সেই মতো ন্যায় অনুসারে প্রজাপালন করতে লাগলেন। প্রজারাও তাঁর মতো প্রজাবৎসল রাজাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। একসময় রাজা সুবর্চার রাজকোষে অর্থাভাব দেখা দিল। অস্ত্রশস্ত্র বাহন প্রভৃতি অন্যান্য সম্পদও এর ফলে হ্রাস পেতে শুরু করল। এই সুযোগে সুবর্চার অধীনস্থ সামন্তরাজারা বিদ্রোহ করে বসলেন, সুবর্চাকে বধ করার চেষ্টাও করলেন তাঁরা। কিন্তু সুবর্চার মতো

প্রজারঞ্জক রাজাকে বধ করা সহজ ছিল না। ফলে সামন্তদের চেষ্টাও বিফল হল।

সামন্তদের রাজদ্রোহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে সহায় সম্বলহীন অথচ ধার্মিক ন্যায়পরায়ণ রাজা সুবর্চা নিজের হাত অগ্নিতে দগ্ধ করলেন। সেই অগ্নিদগ্ধ হাত থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী বিশাল এক সৈন্যবাহিনী আবির্ভূত হল। সেই বাহিনীর সহায়তায় রাজা সুবর্চা তাঁর দুষ্ট সামন্তরাজাদের দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিকে জয় করে নিজের অধীনে আনতেও সমর্থ হয়েছিলেন।

সংস্কৃত 'ধম্' ধাতুর অর্থ আগুন জ্বালানো বা অগ্নিসংযোগ করা। রাজা সুবর্চা তাঁর কর বা হস্ত ধমন করেছিলেন বা আগুনে দগ্ধ করেছিলেন বলেই তাঁর নাম হল করন্ধম—

যদা তু পরমামার্তিং গতা'সৌ সপুরো নৃপঃ।
ততঃ প্রদধ্মৌ স করং প্রাদুরাসীত্ততো বলম্।।
ততস্তানজয়ৎ সর্বান্ প্রতিসীমান্নরাধিপান্।
এতস্মাৎ কারণাদ্রাজন্ বিশ্রুতঃ স করন্ধমঃ।।

[মহা (k) ১৪.৪.৭-১৬; (হরি) ১৪.৪.৭-১৬]

□ মহর্ষি অঙ্গিরা এই করন্ধম রাজার পুরোহিত ছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ১৪.৫.৮; (হরি) ১৪.৫.৮]

□ করন্ধমের পুত্রকে মহাভারত এবং পুরাণে কারন্ধম অবিক্ষিৎ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই অবিক্ষিতের পুত্র রাজর্ষি মরুত্ত।

[মহা (k) ১৪.৪.১৭-২২; (হরি) ১৪.৪.১৭-২২]

□ মার্কণ্ডেয় পুরাণে রাজা করন্ধম সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, করন্ধমের পিতা খনীনেত্র দীর্ঘকাল অপুত্রক ছিলেন। পুত্রলাভের জন্য তিনি গোমতী নদীর তীরে বসে দীর্ঘকাল দেবরাজ ইন্দ্রের উপাসনা করলেন। খনীনেত্রের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে এক ধর্মজ্ঞ, ধর্মপরায়ণ, পরাক্রমশালী পুত্রলাভের বর দিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের বরে রাজা খনীনেত্রের যে পুত্র হল, খনীনেত্র তাঁর নাম রাখলেন বলাশ্ব।

পিতার মৃত্যুর পর বলাশ্ব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞাতি আত্মীয়স্বজনরা উঠে পড়ে লাগলেন বলাশ্বকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য। এই আত্মীয়গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দিলেন শত্রু রাজারাও। এঁদের সঙ্গে বলাশ্বের ঘোর যুদ্ধ হল। বলাশ্ব পরাজিত হলেন। তাঁর সাম্রাজ্য প্রায় সমস্তটাই শত্রুদের হস্তগত হল, বাকি রইল শুধু রাজধানীটুকু। পরাজিত রাজা বলাশ্ব রাজধানীতেই অবস্থান করেছিলেন, এ অবস্থায় শত্রুরা তাঁর রাজপুরী অবরোধ করল। বলাশ্ব রাজা তখন যুদ্ধে পরাস্ত, সহায় সম্বলহীন। রাজপুরী রক্ষা করতে পারে—এতটুকু সৈন্যবল পর্যন্ত তাঁর নেই। শত্রুদের আচরণ দেখে রাগে দুঃখে বলাশ্ব দু-হাতে মুখ ঢেকে ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন। সেই উষ্ণ শ্বাস তাঁর দুই হাতের তালু স্পর্শ করলে তা থেকেই সে সময় শত সহস্র পরাক্রমশালী সৈন্য সৃষ্টি হল। রাজা বলাশ্বের দ্বারা সৃষ্ট সেই বাহিনীতে সম্পূর্ণ নগরী ব্যাপ্ত হল। শেষ পর্যন্ত সেই সৈন্যবাহিনীই শত্রুদের পরাস্ত করে রাজার হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ এই কাহিনী প্রসঙ্গে বলাশ্ব রাজার 'করন্ধম' নামকরণটিকে একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ব্যাখ্যা করেছে যে, সংস্কৃতে 'ধম্' ধাতুর অর্থ যেমন প্রজ্বলন করা হয়, তেমনই এই ধাতুর অর্থ কম্পিত করাও হয়। রাজা বলাশ্বের ক্রোধকম্পিত করদ্বয় থেকে সৈন্যবাহিনীর উৎপত্তি হয়েছিল বলেই পরবর্তী সময়ে তিনি 'করন্ধম' নামে খ্যাত হন—

যথা পূর্বং মহাভাগ মহাভাগ্যো নরেশ্বরঃ।।
ধুতয়োঃ করয়োর্জজ্ঞে যতস্তস্যারিদাহদম্।
বলং করন্ধমস্তস্মাৎ স বলাশেবা'ভিধীয়তে।।

[মার্কণ্ডেয় পু. ১২১.৭-২৩]

□ মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাজা বীর্য্যচন্দ্রের কন্যা বীরা ছিলেন করন্ধমের পত্নী। তবে মহাভারতে বা অন্যান্য পুরাণগুলিতে অবশ্য করন্ধমের পত্নীর নাম উল্লিখিত হয়নি।

[মার্কণ্ডেয় পু. ১২২.১-২]

□ মহাভারতের সভাপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, পুরাকালের যেসব ন্যায়পরায়ণ মহান রাজর্ষি মৃত্যুর পর যমসভায় বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন, করন্ধম তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ২.৮.১৬; (হরি) ২.৮.১৬]

করন্ধম২ যযাতির পুত্র তুর্বসুর বংশধারায় রাজা ত্রৈশাম্বের পুত্র করন্ধম। লক্ষণীয়, পুরাণগুলিতে প্রাপ্ত বংশলতিকা অনুযায়ী এই করন্ধমের পুত্র ছিলেন তুর্বসু বংশীয় রাজা মরুত্ত। সম্ভবত প্রাচীন রাজর্ষি করন্ধম এবং তাঁর পৌত্র রাজর্ষি মরুত্তের নাম স্মরণ করেই তুর্বসু বংশীয় এই দুই রাজার

নামকরণ করা হয়েছিল। তবে বিভিন্ন পুরাণে করন্ধমের পিতার নামের ক্ষেত্রে একাধিক পাঠান্তর দেখা যায়। বিষ্ণুপুরাণ এবং বায়ুপুরাণে করন্ধমের পিতাকে ত্রৈশাম্ব নামে উল্লেখ করা হলেও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে তাঁর নাম ত্রিশানু। আবার ভাগবত পুরাণে করন্ধমের পিতা ত্রিভানু নামে চিহ্নিত হয়েছেন। মৎস্য পুরাণে আবার করন্ধমের পিতাকে ত্রিসারি নামে চিহ্নিত করেছে। মৎস্য পুরাণ মতে, রাজা করন্ধমের পুত্রের নাম ভরত।

[মৎস পু. ৪৮.২; বিষ্ণু পু. ৯৯.২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.২; ভাগবত পু. ৯.২৩.১৬-১৭; বিষ্ণু পু. ৪.১৬.২]

করব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে যেসব বানরবীরদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৩৪]

করবাট পৌরাণিক কেতুমালবর্ষের অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান জনপদগুলির মধ্যে করবাট একটি।

[বায়ু পু. ৪৪.১২]

করবীর১ কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত একজন সর্প। মহাভারতের আস্তীকপর্বে সর্পনামকথনের সময় এবং নারদের মুখে ভোগবতীপুরী বর্ণনার সময় তাঁর নাম উল্লিখিত আছে।

[মহা (k) ১.৩৫.১২; ৫.১০৩.১৪; (হরি) ১.৩০.১২; ৫.৯৬.১৪]

করবীর২ দ্বারকার পশ্চিমে সুকক্ষ নামক পর্বত অবস্থিত। সুকক্ষ পর্বতকে চারটি সুন্দর অরণ্য চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। এর মধ্যে করবীর একটি অন্যতম বনাঞ্চল।

[মহা (গীতা প্রেস) ২.৩৮.২৯ নং শ্লোকের উত্তর দাক্ষিণাত্য অধিক পাঠ দ্রষ্টব্য (পৃ. ৮১৩)]

করবীর৩ করবীরপুর একটি দেশ।

□ মহাভারতে বলা হয়েছে, করবীরপুরে বিশালানদী রয়েছে। এই নদী অত্যন্ত পবিত্র। এখানে স্নান ও তর্পণ করা পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত।

[মহা (k) ১৩.২৫.৪৪; (হরি) ১৩.২৬.৪৪]

□ বলরাম ও কৃষ্ণের পিসেমশাই দমঘোষ জরাসন্ধের আক্রমণের হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করার জন্য করবীরপুর রাজ্যে চলে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। করবীরপুরের শাসকের নাম শৃগাল। বাসুদেব কৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় বুঝতে না পেরে শৃগাল তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ হারান। এরপর দয়াপরবশ হয়ে শ্রীকৃষ্ণই শৃগালের পাটরানীর পুত্রকে করবীরপুরের রাজা রূপে অভিষিক্ত করেন।

[হরিবংশ পু. ২.৪৩.৮৫; ২.৪৪.১-৫৯]

□ সতী দেবী এই করবীর তীর্থে মহালক্ষ্মীরূপে পূজিতা। *[মৎস্য পু. ১৩.৪১]*

□ এছাড়াও মৎস্য পুরাণের অপর একটি শ্লোকে করবীরপুরকে একটি পবিত্র তীর্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অনন্ত ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ এই তীর্থে যেন অবশ্যই শ্রাদ্ধ প্রদান করেন বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। *[মৎস্য পু. ২২.৭৬]*

□ কালিকাপুরাণেও করবীরপুরের উল্লেখ একাধিকবার পাওয়া যায়।

[কালিকা পু. ৪৮.৭১; ৭৭;৭৮]

□ পণ্ডিতদের মতে, বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্গত কোলাপুর শহরটিরই প্রাচীন নাম ছিল করবীর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোলাপুরে এখনও বিখ্যাত মহালক্ষ্মী মন্দিরটি দেখা যায়। ঐতিহাসিকভাবেও কোলাপুর শহরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একাদশ শতাব্দীতে কোলাপুর শিলহার (Silahara) রাজবংশের রাজধানী ছিল। অনেকে আবার মনে করেন রাজা ব্রহ্মভট্টের রাজধানী ছিল করবীরপুর।

[EAIG (kapoor) p. 353; GDAMI (Dey) p. 93]

করবীর৪ ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে, মেরু পর্বতের দক্ষিণদিকে করবীর নামে একটি পর্বত রয়েছে; যেটি পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে বিস্তৃত।

[ভাগবত পু. ৫.১৬.২৭]

করবীরকতীর্থ১ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ দর্শন করলে মানুষ মুক্তিলাভ করে।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৭০]

করবীরকতীর্থ২ বরাহ পুরাণে যে কুব্জাম্রক ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে, সেই কুব্জাম্রক ক্ষেত্রের অন্তর্গত পবিত্র তীর্থগুলির মধ্যে করবীরকতীর্থ অন্যতম। ভগবান বিষ্ণু এই তীর্থে অবস্থান করেন।

[বরাহ পু. ১২৬.৪৮-৫১]

করভ জরাসন্ধের অনুগামী জনৈক রাজা।

[মহা (k) ২.১৪.১৩; (হরি) ২.১.১৩]

করভঞ্জক কিরাত জাতি অধ্যুষিত উত্তর ভারতের একটি জনপদ। *[মহা (k) ৬.৯.৬৯; (হরি) ৬.৯.৬৯]*

করভাজন জম্বুদ্বীপের অধিপতি তথা অগ্নীধ্রের বংশধর রাজা ঋষভদেবের পুত্রদের মধ্যে করভাজন একজন। ভাগবত ধর্মের উপদেশক হিসেবেও ভাগবত পুরাণে তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে। *[ভাগবত পু. ৫.৪.১১; ১১.২.২১]*

করভেশ্বরতীর্থ একটি প্রখ্যাত শৈবতীর্থের নাম। পুণ্যার্থীরা এই তীর্থে এসে মহেশ্বরকে দর্শন করলে কুযোনি প্রাপ্ত হয় না।

পুরাকালে শিব দেবতাদের সঙ্গে এই বনে বহুকাল খেলা করেছিলেন। খেলতে খেলতে একসময় তিনি করভত্ব-প্রাপ্ত হন—অর্থাৎ হাতির শিশুর রূপ ধারণ করেন। দেবতারা শিবকে খুঁজে না পেয়ে ব্রহ্মাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মা ধ্যানযোগে জানতে পারেন—শিব গুপ্ত অবস্থায় আছেন। তখন অন্য দেবতারা এবং ব্রহ্মাও গেলেন শিবপুত্র গণেশের কাছে। তাঁকে মোদক বা মিষ্টি লাড্ডুর লোভ দেখিয়ে দেবতারা জানতে চাইলেন, শিব কোথায় আছেন। গণেশ শিবের হস্তীশিশুর রূপধারণের কথা বলে দিলেন। দেবতারা শিবকে খুঁজে বার করে বেষ্টন করলেন। শিব তখন ছোট্ট একটি হাতি বা করভের রূপ পরিত্যাগ করে এক দিব্য লিঙ্গ উৎপাদন করলেন। এই অতি পবিত্র শিবলিঙ্গটিই করভেশ্বর নামে পূজিত হন। এই শিবলিঙ্গকে স্নান করিয়ে পূজা করলে সকল যজ্ঞের ফললাভ হয়।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ২৮.৬-১৮]

করমোদা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে ঋক্ষবান পর্বত থেকে যেসব নদীগুলির উৎপত্তি হয়েছে, সেই নদীগুলির মধ্যে করমোদা অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৩০; মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.২২]

পণ্ডিত D.C. Sircar পুরাণগুলির পাঠ তুলনামূলক ভাবে পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, এই করমোদাকে বায়ু এবং বামন পুরাণে করতোয়া নামেও চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে ঋক্ষপর্বতের এই করমোদা নদীটির সঙ্গে বঙ্গদেশের করতোয়ার সম্পর্ক নেই। পণ্ডিত Sircar একে শোণ নদীর পাশ দিয়ে বর্তমানে কর্মনাশা নামে যে নদীটি প্রবাহিত, তার সঙ্গে একাত্মক বলে মন্তব্য করেছেন। শোণ নদীর মতো এই নদীটিও গঙ্গার অন্যতম উপনদী। *[GAMI (Sircar) p. 55; বায়ু পু. ৪৫.১০০; বামন পু. ১৩.২৬]*

করন্ত১ অগস্ত্য বংশীয় একজন ঋষি বলে মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে। *[মৎস্য পু. ২০২.১]*

করন্ত২ লিঙ্গ পুরাণ মতে যদুবংশের অধস্তন পুরুষ দৃঢ়রথের পুত্র শকুনি, শকুনির পুত্র করন্ত। করন্তের পুত্রের নাম দেবরাত। *[দ্র. করন্তক২]*

[লিঙ্গ পু. (Nagar) ১.৬৮.৪৫]

করন্ত৩ মহাভারতে মহারাজ অম্বরীষের ব্রাহ্মণেরা যে বহুল অন্নপান লাভ করতেন, সেখানে বহুতর স্বাদু খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে করন্তের উল্লেখ রয়েছে—

করম্ভান্ পৃথুমৃদ্বীকা/অন্নানি সুকৃতানি চ।

সিদ্ধান্তবাগীশ করন্ত শব্দের অর্থ করেছেন 'দধিছাতু', অর্থাৎ দধিমিশ্রিত সক্তু। কিন্তু করন্ত শব্দের এই অর্থ সম্ভবত পরবর্তীকালে প্রচলিত হয়েছে। মহাভারত যেহেতু বৈদিক যাগ-যজ্ঞের উত্তরাধিকার বহন করে এবং অম্বরীষের যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের খাদ্য-হিসেবেই যেহেতু করন্ত-শব্দের উল্লেখ হয়েছে, তাতে মনে হয় বৈদিক কালে বহুল ব্যবহৃত করন্তের কথাই এখানে বলা হয়েছে। বিশেষত মহাভারতের শান্তিপর্বে শরশয়ান ভীষ্ম যখন কৃষ্ণের স্তব করছেন, সেই ভীষ্মের স্তবরাজের মধ্যে কৃষ্ণকে 'দশার্ধহবিরাত্মকম্' বলে সম্বোধন করেছেন। 'দশার্ধ' মানে দশের অর্ধেক, অর্থাৎ কীনা পাঁচ। তাহলে দাঁড়ায় পাঁচ প্রকারের হব্য, পঞ্চহবি। এই পাঁচ প্রকার হব্য বা হবনীয় বস্তু টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে—ধানা, করন্ত, পরিবাপ, পুরোডাশ এবং পয়ঃ অর্থাৎ দুধ।

[মহা (k) ৭.৬৪.৭; ১২.৪৭.৪৩; (হরি) ৭.৫৬.৭; ১২.৪৬.৪৩; দ্র. নীলকণ্ঠকৃত ভারত ভাবদীপ টীকা]

লক্ষণীয় বিষয় হল, যে পাঁচটি খাদ্যের কথা বলা হল, এগুলি বৈদিক হবনীয় দ্রব্য হিসেবেই প্রচলিত ছিল। খোদ ঋগ্‌বেদেই করন্ত অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য হিসেবে গণ্য হয়েছে। পূষন্-সূর্যের রুচিতে করন্ত এতই প্রিয় যে, মন্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে—যিনি পূষাকে করন্তের ভোক্তা বলে স্তব করেন, তাঁকে আর অন্য দেবতার স্তব করতে হয় না—

য এনমাদিদেশতি করম্ভাদিতি পূষণম্।

[ঋগ্‌বেদ ৬.৫৬.১; ৬.৫৭.২; ১.১৮৭.১০; ৮.৯১.২]

করন্ত যে পাঁচটি হবনীয় দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান দেবভোগ্য বস্তু, তার প্রমাণ মেলে যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতায়। সেখানে ধানা, করন্ত, সক্তু, পরিবাপ, পয়ঃ এবং দধির মধ্যে

করম্ভই একমাত্র নয়, এই সবগুলিই পবিত্র সোমের রূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বাজসনেয়ী সংহিতাতেই অন্যত্র করম্ভ বলতে ঠিক কী প্রকার খাদ্যদ্রব্য বোঝায়, তা জানানোর জন্য টীকাকার মহীধর বলেছেন—এটি যবময় হবি—

যবময়ো হবির্বিশেষঃ করম্ভঃ।

[শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতা (Weber) ১৯.২১; ২০.২৯; ৩.৪৪; দ্র. মহীধরকৃত বেদদীপ টীকা]

বস্তুত পণ্ডিতজনেরা ধানা-শব্দের সঙ্গে করম্ভের একটা যোগ স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন—Fried barley cooked with butter was called Dhana the powder of Dhana, again fried with butter was called karambha.

[Jogiraj Basu, India in the Age of the Brahmanas, p. 58]

বৈদিক পরম্পরায় সুখাদ্য হিসেবে গৃহীত 'করম্ভ' পুরাণগুলিতেও প্রাথমিক সম্মান লাভ করেছে শ্রাদ্ধক্রিয়ায় পিতৃলোকের উদ্দেশে দাতব্য ধা়া, করম্ভের উল্লেখের মধ্য দিয়ে। অত্যন্ত সুখাদ্যের তালিকায় ধানা এবং করম্ভ উল্লিখিত হয়েছে ঘৃত, শর্করা, মধুপর্ক এবং পয়ঃপায়সের সঙ্গে—

ভক্ষ্যান্ ধানাঃ করম্ভাংশ্চ পিষ্টকান্ ঘৃতশর্করাঃ।

কিন্তু পরবর্তী কালে করম্ভ কিন্তু নিন্দিত খাদ্য হিসেবে গণ্য হতে থাকে এবং সেটি পলাণ্ডু (পিঁয়াজ), লশূন (রসুন), গৃঞ্জন (গাজর) ইত্যাদির সঙ্গে শ্রাদ্ধ-বর্জ্য বস্তুগুলির সঙ্গে একত্রে উল্লিখিত হতে থাকে। সম্ভবত ভাজা যবের গন্ধ তত ভাল নয় বলেই পিঁয়াজ, রশুন, হিঙ্—ইত্যাদি সঙ্গে করম্ভও 'পূতিসৌরভ্য' অর্থাৎ খারাপ গন্ধের খাবার বলে গণ্য হয়েছে। বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ভাগবত পুরাণের 'পূতিসৌরভ্য' করম্ভকে 'হীনানি রসগন্ধতঃ' অর্থাৎ স্বাদ এবং গন্ধের ব্যাপারে হীন, খারাপ—এমন সাধারণ মাত্রায় বর্জ্য খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। *[বায়ু পু. ৮০.৪২-৪৩; ৭৮.১২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৪.২২-২৫; ভাগবত পু. ৩.৪৫]*

করম্ভ এবং পিঁয়াজ-রসূনের রস-গন্ধের হীনতা বা মিশ্রগন্ধের কারণে এই বস্তুগুলির হেয়তা বোঝানোর জন্য পুরাণে একটি ক্ষুদ্র আখ্যানও আছে। বলা হয়েছে—পুরাকালে দেবাসুর যুদ্ধের সময় দেবতারে হাতে পরাজিত দানবেন্দ্র বলির দেহে যে ক্ষতসৃষ্টি হয়েছিল, সেই ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্তবিন্দু থেকেই নাকি করম্ভ, পিঁয়াজ, রশুন, গাজর ইত্যাদি বস্তুর উৎপত্তি হয় এবং সেইজন্যই এগুলি শ্রাদ্ধকার্যে বর্জনীয়। *[বায়ু পু.৭৮.১২-১৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৪.২২-২৫]*

করম্ভ৪ একজন দানব। কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দনুর গর্ভজাত পুত্র ছিলেন করম্ভ এবং রম্ভ। এই দুই ভাই দানবদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। করম্ভ এবং রম্ভের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। তাই পুত্রলাভের জন্য তাঁরা পঞ্চনদের জল আশ্রয় করে বহু বছর ধরে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। ইন্দ্র সেই তপস্যার কথা জানতে পেরে কুমীরের রূপ ধারণ করে করম্ভকে হত্যা করলেন। *[দেবীভাগবত পু. ৫.২.১৭-২২; বামন পু. ১৭.৪৩-৪৬]*

করম্ভ৫ *[দ্র. করম্ভি]*

করম্ভক১ যদু-বৃষ্ণি বংশধারায় হৃদিকের পুত্রদের মধ্যে একজন করম্ভক। *[মৎস্য পু. ৪৪.৮২]*

করম্ভক২ যদু-বৃষ্ণি বংশধারায় শকুনির পুত্র করম্ভক এবং তাঁর পুত্র দেবরাত। মৎস্য পুরাণে করম্ভককে করম্ভ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[বায়ু পু. ৯৫.৪৩; মৎস্য পু. ৪৪.৪২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭০.৪৪; লিঙ্গ পু. ১.৬৮.৪৫]

করম্ভক৩ *[দ্র. করম্ভি]*

করম্ভব পৌরাণিক কেতুমালবর্ষের অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান জনপদগুলির মধ্যে করম্ভব একটি।

[বায়ু পু. ৪৪.১১]

করম্ভবালুকা পুরাণে উল্লিখিত একটি নরকের নাম। *[বায়ু পু. ৫৬.৭৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৮.৮৪]*

করম্ভা কলিঙ্গ রাজকন্যা। পুরুবংশীয় রাজা অক্রোধনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। অক্রোধনের ঔরসে করম্ভার গর্ভে রাজা দেবাতিথির জন্ম হয়। *[মহা (k) ১.৯৫.২২; (হরি) ১.৯০.২৮]*

করম্ভি বিষ্ণু পুরাণ মতে, যদুপুত্র ক্রোষ্টুর বংশধারায় শকুনির পুত্র এবং দেবরাতের পিতা করম্ভি (ভাগবত পুরাণ মতে করম্ভি)। কূর্ম পুরাণে অবশ্য শকুনির পুত্রের নাম করম্ভ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।

[বিষ্ণু পু. ৪.১২.১৬; ভাগবত পু. ৯.২৪.৫; কূর্ম পু. ১.২৪.২৮-২৯]

□ ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু পুরাণে করম্ভির পরিবর্তে করম্ভক নামটি উল্লিখিত হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭০.৪৪; বায়ু পু. ৯৫.৪৩]

করেরোমা প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন নাগ-পুরুষ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৭]

করস্থালী শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ করস্থালী নামের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন—

করাবেব স্থাণোঃ ভোজনভাজনং
তদস্যাস্তীতি করস্থালী।

আমরা ভোজনপাত্র বোঝাতে যে 'থালা' শব্দটা ব্যবহার করি, তার উৎপত্তি সংস্কৃত 'স্থাল' শব্দ থেকে। 'স্থাল' বলতে মোটামুটি মৃৎপাত্রই বোঝানো হয়। যাঁর সেটুকু সম্বল পর্যন্ত নেই, করতলই যাঁর ভিক্ষাপাত্র এবং ভোজনপাত্রের কাজ করে, তিনি করস্থালী। কিংবা যাঁর হাতে স্থাল অর্থাৎ মাটির ভিক্ষাপাত্র আছে সেই ভিখারীকে করস্থালী বলা যেতে পারে। যোগীশ্বর মহাদেবকে আমরা যে মূর্তিতে কল্পনা করি, তা নিঃসম্বল ভিখারীর রূপ—

'শ্মশানে মশানে ফেরে', অন্ন-বস্ত্রের কোনো সংস্থান নেই, ভিক্ষামাত্র সম্বল করে তিনি জীবনধারণ করেন। ভিক্ষাপাত্র হাতে বিচরণকারী সেই 'ভিখারী' মহাদেবই করস্থালী নামে সম্বোধিত হন। *[মহা (k) ১৩.১৭.১৩০; (হরি) ১৩.১৬.১২৯]*

করহাটক দক্ষিণ ভারতে বসবাসকারী একটি জনজাতি তথা জনপদ। দিগ্বিজয়কালে সহদেব এদের পরাজিত করেছিলেন। করহাটকরা সহদেবকে কর দানের মাধ্যমে পাণ্ডবদের বশ্যতা স্বীকার করেন।

[মহা (k) ২.৩১.৭০; (হরি) ২.৩০.৬৮]

□ কোলাপুরের ৪০ মাইল উত্তরে মুম্বইয়ের সাতারা জেলায় কৃষ্ণ ও কোয়েলা নদীর সঙ্গমে অবস্থিত করহদ নামক স্থানটিই প্রাচীন করহাটক, এটি শিলাহর রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। কল্যাণের রাজা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে করহাটকের শিলাহর বংশীয় রাজকন্যা চন্দ্রলেখার বিবাহ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে কারষ্ট্র দেশের রাজধানী ছিল করহাটক। করহাটক শব্দটির অর্থ হাতি বিক্রির বাজার।

[The Indian Encyclopedia; Ed: Subodh Kapoor; New Delhi; Genesis publishing Pvt. Ltd. 2002; p. 350; TIM (K.C. Mishra); p. 83]

করাল একজন রাক্ষস-প্রধানের নাম। সীতার সন্ধানে হনুমান যখন লঙ্কায় রাক্ষসদের গৃহে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি করালের গৃহেও গিয়েছিলেন। পরে হনুমান এঁর গৃহেও আগুন লাগিয়ে দেন।

[রামায়ণ ৫.৬.২৬; ৫.৫৪.১৪]

করালদন্ত একজন ঋষি। মহাভারতের সভাপর্ব থেকে জানা যায় যে, যেসব ঋষি-মহর্ষি ইন্দ্রের সভায় বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন, করালদন্ত তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ২.৭.১৪; (হরি) ২.৭.১৪]*

করালা$_1$ কালিকা পুরাণ অনুসারে দেবী কালীর অষ্টযোগিনীর মধ্যে একজন করালা।

[কালিকা পু. ৬১.৯৩]

করালা$_2$ দেবী তীক্ষ্ণকান্তার ছয়জন যোগিনীর একজন হলেন করালা। *[কালিকা পু. ৮০.৪৬]*

করালিনী$_1$ অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। করালিনী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ১৭৯.১৭]

করালী$_1$ অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। করালী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৭৯.১৪]*

করালী$_2$ *[দ্র. দুর্গা]*

করিতয়$_1$ একটি পশ্চিম ভারতীয় জনজাতি। এঁদের অবস্থান সম্পর্কে এখনও কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৬১]

করিতয়$_2$ *[দ্র. তুরসিত]*

করীতি একটি প্রাচীন উত্তর ভারতীয় জনপদ।

[মহা (k) ৬.৯.৪৪; (হরি) ৬.৯.৪৪]

করীরাশি একজন কৌশিক বংশীয় ঋষি।

[মৎস্য পু. ১৯৮.২০]

করীষক একটি উত্তর ভারতীয় জনপদ।

[মহা (k) ৬.৯.৫৫; (হরি) ৬.৯.৫৫]

করীষাশ পুরাণে ঋষি বিশ্বামিত্রের গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, করীষাশ সেই প্রবরের অন্যতম।

ঋষি বিশ্বামিত্র থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এঁরা কৌশিক নামে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ১৯৮.৪]*

করীষিণী মহাভারতে ভীষ্মপর্বে উল্লিখিত একটি পবিত্র নদী। আর্য ও ম্লেচ্ছ উভয় জাতীয় লোকেরা এই নদীর জল পান করেন। অর্থাৎ কিনা সমস্ত

সাধারণ মানুষের কাছেই এই নদী জীবন ধারণের উপায়। তবে এই ভীষ্ম পর্বেরই অন্যত্র একটি শ্লোকে করীষিণী নদীর উল্লেখ আবার পাওয়া যায়। এই দুটি একই নদী নাকি ভিন্ন সে বিষয়ে খুব যে আলোচনার অবকাশ আছে, তা মনে হয় না।

[মহা (k) ৬.৯.১৭, ২৩; (হরি) ৬.৯.১৭, ২৩]

□ পণ্ডিতদের মতে উত্তরপ্রদেশের বাগপত (Baghpat) অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত করিষণ নদীটিই প্রাচীন করীষিণী। *[GM (Suryavanshi) p. 134]*

□ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উত্তর ভারতীয় জনপদ করীষক ও করীষিণী নদীর মধ্যে বিপুল ধ্বনিগত সাদৃশ্য থেকে মনে হয় এদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ থাকতে পারে। *[দ্র. করীষক]*

করূষ১ বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রের মধ্যে অন্যতম। এই করূষ থেকেই কারূষ নামে ক্ষত্রিয় জাতির উদ্ভব। রাজা করূষ বহু পুত্র লাভ করেছিলেন। বায়ু পুরাণে করূষের সহস্র পুত্রের কথা বলা হয়েছে। এরা সম্ভবত করূষের শাসনাধীন প্রজা, কারণ সেকালে প্রজাদেরও পুত্র বলে উল্লেখ করার রীতি প্রচলিত ছিল।

[মহা (k) ১.৭৫.১৬; (হরি) ১.৬৩.১৯; মৎস্য পু. ১১.৪১; ১২, ২৪; বিষ্ণু পু. ৩.১.৩৪; ৪.১.১৪; বায়ু পু. ৬৪.৩০; ৮৫.৪; ৮৬.২; ভাগবত পু. ৯.১.১২; ২.১.৬; ব্রহ্ম পু. ৭.২; শিব পু. (ধর্ম) ৬০.২; কূর্ম পু. ১.২০.৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৮.৩১; ২.১.৬]

করূষ২ ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন জনজাতি তথা দেশ। রামায়ণে মলদ ও করূষ দেশের নির্মাণ কীভাবে হল সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, বৃত্রবধের পর ইন্দ্রকে যখন ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শ করলো, তখন তাঁর শরীরে একদিকে মলিনতা অন্যদিকে বিরামহীন ক্ষুধার সৃষ্টি হল। রামায়ণের তিনজন প্রাচীন টীকাকার 'করূষ' শব্দের অর্থ 'ক্ষুধা' বলেই নির্ণয় করেছেন। গোবিন্দরাজ লিখেছেন—বৃত্রবধের পর ইন্দ্রের শরীর অশুচি হল (মলদ), আর সেই অশুচিতার ফলেই তাঁর ক্ষুধা বা বুভুক্ষা তৈরি হল। এই বুভুক্ষাই করূষ বা কারূষ—তিলক টীকায়—'কারূষম্ ক্ষুৎ'। পরবর্তী শ্লোকে ইন্দ্রকে যখন 'নিষ্করূষঃ' বলা হয় তখন রামায়ণ শিরোমণি টীকায় অর্থ বলা হয়েছে—

নিষ্করূষঃ নির্গতক্ষুৎকঃ।

অর্থাৎ এখানে অনিয়মিত এবং অসংযত ক্ষুধাও অঙ্গমালিন্যের প্রতিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

[রামায়ণ (মুধোলকর) ১.২৪.১৮-২৩]

□ নামকরণের এই ব্যাখ্যা রামায়ণের কবির কাছ থেকে পাওয়া গেলেও একটা প্রশ্ন এক্ষেত্রে উঠতে পারে যে, করূষের অর্থ যদি ক্ষুধাই হয়, তাহলে করূষ নামে এই জাতির লোকেদের কোনো বিশেষ ধরনের খাদ্যাভ্যাসের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে কিনা! এক্ষেত্রে করূষরাজ দন্তবক্রের কথাও মনে রাখতে হবে। কারূষবংশীয় বৃদ্ধশর্মা ও যাদবী বসুদেবের বোন শ্রুতদেবীর পুত্র ছিলেন দন্তবক্র। দন্তবক্রকে ভাগবত পুরাণে অসুর বা দৈত্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দন্তবক্র অত্যন্ত হিংস্র স্বভাবের ছিলেন।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.৩৭]

এ থেকে মনে হয়, খাদ্যাভ্যাস নয়, হিংস্র স্বভাব ও যুদ্ধ প্রবণতার জন্যই এঁদের এইরকম নামকরণ। কারূষরা যে যুদ্ধপ্রবণ জাতি এবিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডব ও কৌরব উভয়পক্ষেই কারূষ জাতির বিভিন্ন শাখাকে যুদ্ধ করতে দেখা যায়। তাতে মনে হয়, সম্ভবত এরা ভাড়াটে সৈন্য বা Mercenary জাতি ছিল।

□ কারূষদের আদি পুরুষ বৈবস্বত মনুর পুত্র করূষ, তাঁর থেকেই এই ক্ষত্রিয় জাতির উদ্ভব। কারূষ জাতি উত্তরাপথ অর্থাৎ উত্তর ভারতের রক্ষাকারী। ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে— কারূষরা ধর্মানুরাগী এবং ব্রাহ্মণকুলের কল্যাণকারী বলেও পরিচিত—

করূষান্মানবাদাসন্ কারূষাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ।
উত্তরাপথগোপ্তারো ব্রহ্মণ্যা ধর্মবৎসলাঃ॥

[মহা (k) ১.৭৫.১৬; (হরি) ১.৬৩.১৯; ভাগবত পু. ৯.১.১২; ৯.২.১৬; মৎস্য পু. ১১.৪১; ১২.২৪; বিষ্ণু পু. ৩.১.৩৪; ৪.১.১৪; বায়ু পু. ৬৪.৩০; ৮৫.৪; ৮৬.২; ব্রহ্ম পু. ৭.২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৮.৩১; কূর্ম পু. ১.২০.৪; শিব পু. (ধর্ম) ৬০.২]

□ কারূষ জাতির কথা মহাভারত ও পুরাণে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। মহাভারতে চেদি ও কাশীর সঙ্গে একত্রে করূষের নাম উল্লিখিত হতে দেখা যায়। যেমন—উদ্যোগপর্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে কাশী, করূষ ও চেদির

সৈন্যদের কথা পরপর বলা হয়েছে। ভীষ্ম পর্বেও এই একই আবৃত্তি দেখা যায়। তাতে মনে হয়, চেদি ও কাশীর সঙ্গে করূষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

[মহা (k) ৫.১৯৬.২; ৬.৪৭.৪; ৬.৯.৪০; (হরি) ৫.১৮৬.২; ৬.৪৭.৪; ৬.৯.৪০]

□ এই আলোচনা প্রসঙ্গেই কারূষরাজ দন্তবক্রের সঙ্গে মগধরাজ জরাসন্ধের বন্ধুত্বের কথা বলা যেতে পারে। আবার অন্যদিকে কৃষ্ণপিতা বসুদেবের বংশসূত্রে বসুদেবের এক বোন যেমন শিশুপালের জননী, তেমনই আর এক বোন দন্তবক্রের জননী। শিশুপালের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রেও দন্তবক্র, জরাসন্ধের একান্ত অনুরাগী এবং প্রায় শিষ্যতুল্য ছিলেন—

তমেব চ মহারাজ শিষ্যবৎ সমুপস্থিতঃ।
বক্রঃ করূষাধিপতির্মায়াযোধী মহাবলঃ॥

[মহা (k) ২.১৪.১১; (হরি) ২.১৪.১১]

জরাসন্ধের বন্ধুত্ব-সূত্রেই চেদির অধিপতি শিশুপালের সঙ্গে করূষরাজ দন্তবক্রের গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। সভাপর্বের একটি শ্লোকে শিশুপাল, ভীষ্মের কাছে দন্তবক্রের বীরত্বের প্রশংসাও করেছেন। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, বাসুদেব কৃষ্ণবিরোধী জরাসন্ধকেন্দ্রিক যে জোট (coalition) গড়ে উঠেছিল, তার অন্যতম অংশীদার ছিলেন করূষরাজ দন্তবক্র এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন সমগ্র করূষ দেশ ও জাতি। একে কৃষ্ণের প্রতি কারূষদের স্ব-জ্ঞাতিশত্রুতা বলেও ব্যাখ্যা করা যায় কারণ দন্তবক্র ছিলেন তাঁর মা শ্রুতদেবীর সূত্রে কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই। *[মহা (k) ২.৪৩.১৯; (হরি) ২.৪৩.১৯; বিষ্ণু পু. ৪.১৪.১১]*

□ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময়ে একে একে জরাসন্ধ এবং শিশুপালের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার প্রতিশোধ নেবার জন্য শাল্ব, দন্তবক্র প্রভৃতি শিশুপাল এবং জরাসন্ধের মিত্রপক্ষীয় এবং আত্মীয় রাজারা দ্বারকা নগরী অবরোধ করেন। এই সময় কৃষ্ণের হাতে করূষ দেশের রাজা দন্তবক্রের মৃত্যু হয়। মৎস্য পুরাণে প্রাপ্ত শ্লোক থেকে জানা যায় যে, কৃষ্ণ তাঁর পুত্র সুচন্দ্রকে দত্তক দিয়েছিলেন নিঃসন্তান করূষরাজকে। এই করূষরাজ কখনোই দন্তবক্র হতে পারেন না কারণ দন্তবক্র এবং কৃষ্ণের মধ্যে যে চরম শত্রুতা ছিল, সেই শত্রুতার আবহে পুত্রসন্তান দত্তক দেবার মতো ঘটনা ঘটা প্রায় অসম্ভব। মনে হয় মৃত্যুকালে দন্তবক্র রাজা নিঃসন্তান ছিলেন। যুদ্ধে দন্তবক্রকে বধ করার পরবর্তী সময়ে হয়তো সন্তানহীন করূষরাজ বৃদ্ধশর্মাকেই একটি বংশরক্ষক পুত্র দত্তক দিয়েছিলেন কৃষ্ণ। এর ফলে করূষ দেশে কৃষ্ণের আধিপত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে হয়। মহাভারতেও কৃষ্ণ কর্তৃক করূষ দেশ জয় করার সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে।

[মহা (k) ৭.১১.১৫; (হরি) ৭.৯.১৫; ভাগবত পু. ১০.৭৮.১-১৩; ২.৭.৭৪; ৩.৩.১১; ৭.১.১৭; মৎস্য পু. ৪৬.২৫]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কারূষ জাতি অংশগ্রহণ করেছিল। তবে সম্ভবত এরা একাধিক শাখায় বিভক্ত ছিল। কারণ মহাভারতে কোনো শ্লোকে যেমন এদের পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে, তেমনই কৌরবপক্ষের মধ্যেও এদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে দেখা যাচ্ছে করূষদেশের চোদ্দ হাজার সৈন্য ভীষ্মের হাতে প্রাণত্যাগ করছে। তাহলে বলাই যায় যে, অতএব এই শাখাটি পাণ্ডবদের হয়ে যুদ্ধ করেছিল। আবার অন্যদিকে ভীষ্ম পর্বেরই অন্য একটি শ্লোকে বলা হচ্ছে যে, কুরুক্ষেত্রে মহাবীর ভীষ্ম রচিত গরুড়ব্যূহ নামক সৈন্য সংস্থানের একেবারে বাঁদিকে অবস্থান করছে কারূষ সৈন্য। অতএব কারূষদের এই শাখাটি অবশ্যই কৌরবপক্ষে যোগদান করেছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণে বহুবার যুদ্ধবীর সৈন্য হিসেবে কারূষ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বায়ু পুরাণে অবশ্য কারূষ নামে দক্ষিণ ভারতীয় একটি জনজাতির কথাও বলা হয়েছে। সম্ভবত এরাও মূল কারূষের একটি শাখা।

[মহা (k) ৫.১৯৬.২; ৬.৪৭.৪; ৬.৫৪.৮; ৬.৫৬.১৪; ৬.৯৩.৩৯-৪০; ৬.১০৬.১৮; ৬.১১৬.৭৫; ৮.৫৪.১৬; ৬.৫৬.৯; ৭.২১.২৩; ৭.২১.২৯; ৮.১২.১৯; ৮.৪৭.১৭; (হরি) ৫.১৮৬.২; ৬.৪৭.৪; ৬.৫৪.৮; ৬.৫৯.১২৯; ৬.৯৩.৩৯-৪০; ৬.১০২.১৯; ৬.১১২.৭৪; ৮.৪১.১৬; ৬.৫৬.৯; ৭.১৯.২৩; ৭.১৯.২৫; ৮.৯.১৯; ৮.৩৬.১৭; মৎস্য পু. ১১৪.৪৮; বিষ্ণু পু. ২.৩.১৭; বায়ু পু. ৪৫.১৩২]

□ মহাভারত থেকে জানা যায় যে, কর্ণ করূষদেশ জয়ের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। হয়তো বা সেই শত্রুতাবশতই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখনই কর্ণের পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখনই

কারূষ সৈন্যদের দেখা গেছে প্রবল উৎসাহে কর্ণকে আক্রমণ করতে।

[মহা (k) ৮.৩০.২৩; ৫.৬২.৫; ৮.৪৯.৩৪
(হরি) ৮.২৪.২৭; ৫.৬১.৫; ৮.৩৭.৩৪]

□ একাধিক পুরাণ মতে, কারূষরা বিন্ধ্য পর্বতে বসবাসকারী একটি জাতি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৬৩;
মৎস্য পু. ১১৪.৫২]

□ বায়ু পুরাণ মতে গঙ্গার দক্ষিণতট থেকে বিন্ধ্যপর্বতের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত অঞ্চলই করূষ দেশ। সম্ভবত এটি বিন্ধ্যপর্বত-সংলগ্ন মহারাষ্ট্রের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলকেই বোঝাচ্ছে। এই করূষদেশের অন্তর্গত সুপ্রতীক নামক বনে প্রচুর হাতি পাওয়া যেত বলে ধারণা করা হয়।

উত্তরা তস্য বিন্ধ্যস্য গঙ্গয়া দক্ষিণঞ্চ যৎ।
গঙ্গোদ্‌ভেদাৎ করূষেভ্যঃ সুপ্রতীকস্য তদ্‌বনম্॥

সুপ্রতীক বলতে হাতিদেরই একটি প্রজাতি বোঝায়। *[বায়ু পু. ৬৯.২৩৯]*

□ পণ্ডিতদের মধ্যে করূষদেশের আধুনিক অবস্থান বিষয়ে নানা রকম মত প্রচলিত আছে। আসলে করূষজাতিকে পর্যটনশীল এক যাযাবর জাতি বললে খুব একটা অন্যায় হবে না। কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাসভূমির পরিবর্তিত অবস্থান দেখলে অনুমান করা যায় এই জাতিটির দেশান্তর গ্রহণ বা migration এর ঘটনা বার বার ঘটেছে। পণ্ডিত B.C. Law এই migration তত্ত্বটির সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, রামায়ণের সূত্র অনুযায়ী বিচার করলে সে সময়ে কারূষ জাতীয়রা আধুনিক বিহারের শাহবাদ অঞ্চলে বাস করতো। শাহবাদের দক্ষিণাংশ, যা শোণ নদী ও কর্মনাশা তীর্থের মাঝে অবস্থিত, তা করূষদেশ নামেই পরিচিত। এমনকি বিহারের বক্সার জেলা বা প্রাচীন ভেদ-গর্ভপুরীও করূষের অন্তর্গত—একথাও মনে করা হয়। আবার ভাগবতে একটি শ্লোকে করূষাধিপতিকে পৌণ্ড্রক (করূষাধিপতেঃ পৌণ্ড্রকস্য) বলা হয়েছে। যা থেকে মনে হয় পুণ্ড্রদেশের রাজা পৌণ্ড্রক যদি করূষদের অধিপতি হন, তবে অবশ্যই করূষ জাতীয়রা পুণ্ড্রদেশ অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে বাস করেছিল। B.C. Law এর থেকে ধারণা করেছেন যে, সে সময়ে পুণ্ড্রদেশই করূষ নামে পরিচিত ছিল। অন্যদিকে অনান্য পুরাণে করূষদের বিন্ধ্যপর্বতে বসবাসকারীও বলা হচ্ছে। আবার মৎস্য পুরাণ এবং বায়ু পুরাণে কারূষদের দক্ষিণ ভারতে বসবাসকারী উপজাতি বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এখন B.C. Law এর migration তত্ত্ব মেনে নিলে বলতে হয়, করূষরা বিহার থেকে মধ্যপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ থেকে আরও দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে গিয়ে বিন্ধ্যপর্বত সংলগ্ন অঞ্চলে, এমনকি সুপ্রতীক বন অর্থাৎ সম্ভবত বিন্ধ্যপর্বত সংলগ্ন বর্তমান মহারাষ্ট্রের একটি অংশে বাস করেছিল। এরপর তারা বিন্ধ্য পর্বত পেরিয়ে বা নর্মদা অববাহিকা পার হয়ে আরো দক্ষিণে অর্থাৎ দক্ষিণাপথের দিকে চলে যায়। অবশ্য করূষদের migration তত্ত্বটির বিচারে বা migration প্রবণতার (trend) দিক থেকে উত্তরবঙ্গ বা পুণ্ড্রদেশে করূষদের উপস্থিতি একটু খাপছাড়া ঠেকে। আর মহাভারতের সূত্রেও আমরা কারূষজাতির বিভিন্ন শাখার অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছি। সমস্ত সূত্রগুলি একসঙ্গে বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে, করূষরা জোটবদ্ধ ভাবে দেশান্তরিত হয়নি। এরা সম্ভবত একাধিক শাখায় বিভক্ত হয়ে অন্য দেশে ভাড়াটে সৈন্যের কাজ করেছে। সে কারণেই প্রায় কাছাকাছি সময়েই একাধিক স্থানে একাধিক কারূষ জাতির অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কারূষরা সম্ভবত Mercenary বা ভাড়াটে সৈন্য জাতীয় আঞ্চলিক উপজাতি ছিল। এ ধরণের উপজাতির পক্ষে একাধিক শাখায় একাধিকবার বিভক্ত হওয়া তাদের অস্তিত্বরক্ষার স্বার্থেই খুব একটা অস্বাভাবিক নয়।

[ভাগবত পু. ১০.৬৬ অধ্যায়;
AIT (Law) p. 87-89]

করেণুমতী চেদিরাজ শিশুপালের কন্যা এবং ধৃষ্টকেতুর ভগিনী। মাদ্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র তথা চতুর্থ পাণ্ডব নকুল তাঁকে ভার্যারূপে গ্রহণ করেন এবং তিনি করেণুমতীর গর্ভে 'নিরমিত্র' নামে একটি পুত্র উৎপাদন করেন।

[মহা (k) ১.৯৫.৭৯; (হরি) ১.৯০.১০৫;
ভাগবত পু. ৯.২২.৩২; মৎস্য পু. ৫০.৫৫]

□ মহাভারতের কবি বলেছেন যে, করেণুমতী অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। তিনি ছিলেন নীলোৎপলের মত শ্যামবর্ণা। পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পর পরীক্ষিতের রাজ্যে সুভদ্রার

সঙ্গে তিনি একত্রে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। *[মহা (k) ১৫.২৫.১৪; ১৭.১.২৮; (হরি) ১৫.২৮.১৪; ১৭.১.৩০]*

কর্ক গয়াসুরের দেহের উপর ব্রহ্মা এক যজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞে যাঁরা পৌরোহিত্য করেন কর্ক তাঁদের মধ্যে একজন। *[বায়ু পু. ১০৬.৩৭]*

কর্কখণ্ড একটি প্রাচীন পূর্বভারতীয় জনপদ। কর্ণ দিগ্বিজয়কালে এই জনপদটি অধিকার করেছিলেন। *[মহা (k) ৩.২৫৪.৮; (হরি) ৩.২১০ অধ্যায় ১৪ শ্লোক নং পরবর্তী পাদটীকা দ্র.]*

কর্কর কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত একজন নাগ। মহাভারতের আস্তীকপর্বে সর্পনাম কথনের সময় এর নামও কথিত হয়েছে। *[মহা (k) ১.৩৫.১৬; (হরি) ১.৩০.১৬]*

কর্কি আপস্তম্ব নামে পুরাণ প্রসিদ্ধ ঋষির ঔরসে অক্ষসূত্রার গর্ভজাত পুত্রের নাম কর্কি। *[ব্রহ্ম পু. ১৩০.২-৩]*

কর্কোটক প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভারতের আস্তীক পর্বে সর্পনাম কথনের সময় কদ্রুপুত্রদের নামের তালিকায় কর্কোটকের নাম উল্লিখিত হয়েছে। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে দেখা যাচ্ছে যে, নারদ মাতলির কাছে পাতালে অবস্থিত সুরম্য ভোগবতীপুরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে সেখানে বসবাসকারী যেসব প্রধান নাগের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যেও কর্কোটক অন্যতম। *[মহা (k) ১.৩৫.৮; ৫.১০৩.১২; (হরি) ১.৩০.৮; ৫.৯৬.১২]*

□ পুরাণগুলিতেও কদ্রু পুত্রদের নামের তালিকায় কর্কোটকের উল্লেখ পাওয়া যায়। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৪; মৎস্য পু. ৬.৩৯; বিষ্ণু পু. ১.২১.২২]*

□ মহাভারতের সভাপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, যেসব বিশিষ্ট নাগ জলাধিপতি বরুণের সভায় বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন, কর্কোটক নাগ তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ২.৯.৯; (হরি) ২.৯.৯]*

□ মহাভারতে এবং পুরাণগুলিতে একাধিক ঘটনায় কাদ্রবেয় নাগ কর্কোটককে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। অর্জুনের জন্মের পর শতশৃঙ্গ পর্বতে দেবতা-ঋষি-নাগ-গন্ধর্বরা মিলে অর্জুনের জন্মোৎসব পালন করেছিলেন। এই উৎসবে আমরা কর্কোটক নাগকেও যোগ দিতে দেখি। *[মহা (k) ১.১২৩.৭১; (হরি) ১.১১৭.৭৫]*

□ মহাভারতের বনপর্বে বর্ণিত নলোপাখ্যানে আমরা কর্কোটক নাগকে একটি ছোটো অথচ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখতে পাই। কলির প্রভাবে দ্যূতক্রীড়ায় সর্বস্বান্ত নল রাজা পত্নী দময়ন্তীকে ত্যাগ করে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে দেখলেন, দাবানলে বন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। ভয়াবহ সেই আগুনের মধ্য থেকে নল শুনতে পেলেন এক করুণ আর্তনাদ। প্রাণভয়ে ভীত কোনো একজন নলরাজার নাম ধরে বার বার ডাকছিল। শব্দ অনুসরণ করে সেই ভয়াবহ দাবাগ্নির মধ্য থেকে নল এক বিশাল আকৃতির নাগকে উদ্ধার করে আনলেন। দাবানল থেকে নল যে নাগের প্রাণরক্ষা করলেন, তিনিই কর্কোটক নাগ। কৃতজ্ঞ কর্কোটক নাগও নিজের প্রাণরক্ষার প্রতিদানে নল রাজার উপকার করতে চাইলেন। নল সেসময় যেভাবে নিরাশ্রয় দিশাহীনভাবে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তা দেখে কর্কোটক নাগ খুব দুঃখ পেলেন। তিনিই অশ্ববিদ্যা বিশারদ রাজা নলকে অযোধ্যায় ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়ে সারথির ভূমিকায় নিযুক্ত হবার পরামর্শ দেন। এ অবস্থায় নল রাজাকে যাতে কেউ চিনতে না পারে—তার জন্য কর্কোটক নাগই দংশন করে নল রাজার রূপ বিকৃত করে দেন। সঙ্গে আশ্বাস দেন—কর্কোটকের তীব্র বিষে নল রাজার কোনো ক্ষতি হবে না। বরং নল রাজাকে আশ্রয় করে আছে যে কলি, সেই এই বিষে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হতে থাকবে। কলির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নল যখন আবার পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবেন এবং স্বত রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবেন—সেসময় যাতে তিনি তাঁর নিজের রূপ-সৌন্দর্য্য আবার ফিরে পান, সে উপায়ও করে দিলেন কর্কোটক। রাজ্যচ্যুত বিপদগ্রস্ত নলরাজাকে বিপন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে কর্কোটকের যে অসামান্য ভূমিকা ছিল, সেটাই তাঁকে খ্যাতির স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। *[মহা (k) ৩.৬৬.৪-২৬; (হরি) ৩.৫৪.৪-২৬]*

□ ত্রিপুরদহনের সময় ত্রিপুর-সংহর্তা ভগবান শিবের জন্য দেবতা-গন্ধর্ব-নাগ সকলে মিলে এক অভূতপূর্ব রথ নির্মাণ করেছিলেন। সেই রথের

অশ্বগুলির কেশবন্ধনের জন্য যে রজ্জু ব্যবহৃত হয়েছিল কর্কোটক নাগ সেই রজ্জুর ভূমিকা পালন করেন। *[মহা (k) ৮.৩৪.২৯; (হরি) ৮.২৮.৩২]*

☐ শেষনাগের অবতার বলরাম যখন প্রভাসক্ষেত্রে যোগবলে দেহত্যাগ করলেন, সে সময় তাঁর মুখ থেকে এক সহস্রফণাযুক্ত বিশাল নাগ নির্গত হয়ে প্রভাসক্ষেত্রে সমুদ্রের জলে প্রবেশ করেছিল। সেই নাগকে স্বাগত জানাবার জন্য যেসব বিশিষ্ট নাগ প্রভাসক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিলেন, কর্কোটক নাগ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ১৬.৪.১৫; (হরি) ১৬.৪.১৫]

☐ পুরাণগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে যে, কর্কোটক নাগ পৌষ মাসে সূর্যের রথে অবস্থান করেন।

[মৎস্য পু. ১২৬.১৮; ভাগবত পু. ১২.১১.৪২; বায়ু পু. ৫২.১৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৩.১৭]

☐ কর্কোটক নাগ আমাদের ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন নাগ জনজাতিরই একজন গোষ্ঠীপতি ছিলেন, তা আমরা বুঝতে পারি। পুরাণে রাজা কার্তবীর্য্যার্জুনের পরাক্রমের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, রাজা কার্তবীর্য্যার্জুন কর্কোটক নাগ এবং তার সঙ্গে আরও বহু সংখ্যক নাগকে পরাস্ত করে, তাদের উৎখাত করে সেই ভূমিতে নিজ রাজধানী মাহিষ্মতী নগরী স্থাপন করেছিলেন। আমরা অনুমান করতে পারি, নর্মদা নদীর তীরে যে স্থানটি মাহিষ্মতীপুরী নামে খ্যাত ছিল, সেই স্থান নাগরাজ কর্কোটক তথা নাগ জনজাতির আদি বাসভূমি। ঠিক যেমন রাজধানী হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠা করার জন্য কুরুবংশীয় রাজারা সেখানকার আদি বাসিন্দা নাগদের উচ্ছেদ করেছিলেন, একই ভাবে হৈহয় রাজা কার্তবীর্য্যার্জুনও নাগদের উৎখাত করে রাজধানী মাহিষ্মতী নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।

[বায়ু পু. ৯৪.২৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৯.২৬; মৎস্য পু. ৪৩.২৯]

☐ মহাভারতের কর্ণপর্বে কর্কোটক শব্দটি একটি জনজাতির নাম হিসেবেই উল্লিখিত হয়েছে। মহাভারতের কর্ণপর্বে বিভিন্ন হীন জনজাতির নামের তালিকায় কর্কোটকের নামও উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ৮.৪৪.৪৩; (হরি) ৮.৩৪.১০২]

কর্কোটকেশ্বরতীর্থ১ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। নাগরাজ কর্কোটক এই স্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে কথিত আছে। তাঁর নামানুসারেই এই তীর্থে ভগবান শিব পূজিত হন কর্কোটকেশ্বর নামে।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৭১]

কর্কোটকেশ্বরতীর্থ২ নর্মদার তীরে অবস্থিত অন্যতম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। *[মৎস্য পু. ১৯১.৩৬]*

কর্কোটেশ্বরতীর্থ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এই তীর্থ দর্শনে মানুষ দারিদ্র্যজনিত কষ্টের থেকে মুক্তি লাভ করে এবং সকল প্রকার ভয় দূর হয়।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ২০.১৪-১৫]

কর্ণ১ 'অধিরথসূতপুত্র, রাধাগর্ভজাত'— জীবদ্দশায় লোকসমাজে এইটাই ছিল তাঁর পরিচয়। প্রকৃত পরিচয় লুকিয়েছিল অন্তরালে, জানতেন মাত্রই গুটিকয়েক লোক। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁর রথের চাকা বসে গেছে মাটিতে আর কৃষ্ণ অর্জুনকে প্ররোচিত করছেন এ অবস্থাতেই কর্ণকে বধ করার জন্য—তখনও কিন্তু অর্জুন কিংবা পাণ্ডবদের কেউই ঘুণাক্ষরেও জানতেন না—যে ব্যক্তির দিকে অর্জুনের অমোঘ বাণ সেদিন নির্গত হল, তিনি রাধেয় নন, সূতপুত্র তো ননই—তিনি কুন্তীর কানীনপুত্র, কৌন্তেয়, সূর্যদেবতার ঔরসজাত পুত্র।

কর্ণের জন্মকথা থেকেও বোধ করি এই সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যখন যুদ্ধ শেষে শবদাহ সম্পন্ন হয়েছে, শ্রাদ্ধ তর্পণ চলছে এবং ঠিক সেই সময় পুত্রশোকে আকুল কুন্তীর স্বীকারোক্তি রাধেয় কর্ণের কৌন্তেয়রূপে প্রায় পুনর্জন্ম ঘটিয়ে দিল। শব সনাক্তকরণ চলছে, চলছে দাহকার্য, তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন বিজয়ী পাণ্ডবদের জননী কুন্তী। আপনজনদের শবদেহ তাঁকেও কিছু কম কাতর করছে না, কিন্তু আপন গর্ভজাত যে জ্যেষ্ঠ পুত্রটির পরিচয় জীবদ্দশায় কাউকে জানতেও দেননি, তাঁর শোকে কুন্তী আজ আকুল। মুখে তখনও পর্যন্ত প্রকাশ না করলেও অন্তরে শোকে মৃতপ্রায় হয়ে গেছেন—কর্ণমাতা কুন্তী।

আঠার দিনের পুরনো শবগুলির বেশির ভাগকেই প্রায় চেনাও যাচ্ছে না। যুধিষ্ঠির মহারথীদের সনাক্ত করার চেষ্টা করছেন সারথীদের সহায়তায়। কিন্তু কর্ণের মা ঠিক লক্ষ্য করেছেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের তিন বিধবা পত্নীকে—যাঁরা আজ স্বামী-পুত্র হারিয়ে কাতর হয়ে কর্ণের শব ঘিরে বিলাপ করছিলেন এতক্ষণ।

দাহকার্য শেষ হয়েছে, তাঁরা গঙ্গায় নামছেন তর্পণ করতে। পাণ্ডবজননী কুন্তী আর থাকতে পারলেন না; তাঁর সুদীর্ঘকালের নীরবতা ভঙ্গ করে তাঁর ভিতর থেকে কর্ণের মা শোকে-দুঃখে আর্তনাদ করে উঠলেন হঠাৎ করে। কথাটা আজ বলতেই হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই হঠাৎ করেই বলতে হবে—অতএব হঠাৎই কুন্তী তাঁর পাঁচ ছেলে এবং বিশেষত যুধিষ্ঠিরের কাছে ব্যাকুল স্বরে বললেন—বাছারা! সেই যে, সেই মহাবীর, হাজারো রথী-মহারথীর থেকে শ্রেষ্ঠ যে মহাবীর— অর্জুন যাকে যুদ্ধে মেরে ফেলল, তার জন্যে গঙ্গায় একটু জল দে তোরা—

কুরুধ্বম্ উদকং তস্য।

—সে তোদের বড়ো ভাই। যাকে তোরা এতকাল সারথির ছেলে, সূতপুত্র বলে জানতিস, রাধেয় বলে জানতিস, অথচ সমস্ত সৈন্য-সামন্তের ভিড়েও যাকে সূর্যের মতো তেজস্বী বলে মনে হত—তার জন্যে একটু জল দে তোরা, সে তোদের বড়ো ভাই। যে তোদের সবার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, দুর্যোধনের যুদ্ধ-নায়কদের মধ্যে যে সব সময় জ্বলজ্বল করত, যার মতো বীর বোধহয় পৃথিবীতে কেউ ছিল না, যে নাকি নিজের প্রাণের চেয়েও যশকে বড়ো বলে মনে করত, যুদ্ধে যে পালাতে জানে না—সেই কর্ণের জন্য গঙ্গায় এক অঞ্জলি জল দে তোরা, সে তোদের বড়ো ভাই—

কুরুধ্বম্ উদকং তস্য ভ্রাতুরক্লিষ্টকর্মণঃ।

দেবদেব ভাস্করের ঔরসে আমারই গর্ভে সে তোদের আগে জন্মেছিল, সহজাত কবচ-কুণ্ডল নিয়ে সূর্যের মতো তেজস্বী সেই ছেলে আমারই কোল আলো করে এসেছিল—তোরা জন্মানোর অনেক আগে—

স হি বঃ পূর্বজো ভ্রাতা ভাস্করান্ময্যজায়ত।

পাণ্ডবরা তাঁদের ঘটনাবহুল জীবনে বহুবার চমকে গেছেন। বারণাবতে জতুগৃহের কৌশলে চমকেছিলেন, দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণের আকস্মিকতায় চমকেছিলেন, অরণ্যবাসের সময় দুর্বাসা মুনিকে দেখে চমকেছিলেন, বিরাটপর্বে দুর্যোধনের হঠাৎ আক্রমণেও চমকেছিলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে কুন্তী যা বললেন, এর জন্য কোনো পাণ্ডবই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। মায়ের যে কথা এক সময়ে তাঁদের চরম সুখ দিতে পারত, সেই কর্ণের কথা শুনে পাণ্ডবেরা যেন আকুল হয়ে পড়লেন। যে যুধিষ্ঠির সারা যুদ্ধপর্বেও স্থির থেকে গেলেন, তাঁরও চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, আক্রোশে তাঁর নিঃশ্বাস পড়তে লাগল সাপের মত—নিঃশ্বসন্নিব পন্নগঃ। ক্ষুব্ধ যুধিষ্ঠির মাকে বললেন—সেই বিরাট মানুষটি, যাঁর শরাঘাত একমাত্র অর্জুন ছাড়া আর কেউ সইতে পারত না, যাঁর প্রতাপে আমরা সব সময় ত্রস্ত ছিলাম, সেই তোমার দেবপ্রতিম পুত্রকে এতকাল আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখলে কেমন করে? তুমি যেন তোমার কাপড়ের আঁচল দিয়ে আগুন ঢেকে রাখতে চেয়েছ—

তমগ্নিমিব বস্ত্রেণ কথং ছাদিতবত্যসি।

তাই কি হয়, সে আগুন তোমার লজ্জাবস্ত্র ফুটো করে এখন আমাদেরই পোড়াচ্ছে। যুধিষ্ঠির বললেন—আমরা যেমন অর্জুনের বাহুবল আশ্রয় করেছি, তেমনি সমস্ত কুরুকুল আশ্রয় নিয়েছিল কর্ণের বাহুছত্রের অন্তরালে। সমস্ত রাজাদের মধ্যে, সমস্ত শক্তিমান বীরদের মধ্যে যার নাম একমাত্র অর্জুনের সঙ্গে করতে হয়, সে নাকি আমাদের বড়ো ভাই, সে নাকি তোমার প্রথম ছেলে? ওহ্! এমন করেও কথা চেপে রাখতে পার তুমি। তোমার মন্ত্রগুপ্তির জন্য আজ যে সবাই আমরা মরলাম—

অহো ভবত্যা মন্ত্রস্য গ্রহণেন বয়ং হতাঃ।

যুধিষ্ঠির মনে সত্যিই দুঃখ পেয়েছেন। যে কর্ণের শক্তিসামর্থ্য পাণ্ডবরা শ্রদ্ধা করতেন মনে মনে এবং শক্তি আছে বলেই যাঁর কথাগুলি বেশি করে মনে লাগত, সেই কর্ণ তাঁদের ভাই! এই আবিষ্কারের আকস্মিকতা এতটাই যে, কর্ণ পাণ্ডবদের দলে থাকলে কতটা সুবিধে হত তাঁদের, তারও একটা ছোট্ট অঙ্ক কষে নিয়েছেন যুধিষ্ঠির। তিনি বলেছেন—কর্ণ পাশে থাকলে কোনো জিনিস পাণ্ডবদের না-পাওয়া থাকত না, চাই কি সে জিনিস স্বর্গেই থাকুক না কেন—

নেহ স্ম কিঞ্চিদ্ অপ্রাপ্যং ভবেদপি দিবি স্থিতম্।

এমনকী কৌরবদের সঙ্গে এই সংঘাতও হয়তো এড়ানো যেত কর্ণ পাশে থাকলে। এই ঐহিক লাভের কথা ছেড়ে দিলেও যেটা সবচেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে যুধিষ্ঠিরের কাছে, সেটা হল একটি উপযুক্ত দাদা না পাওয়ার দুঃখ। পিতা না থাকায় তিনিই ছিলেন পাণ্ডবদের পুরুষ অভিভাবক। কিন্তু

অতিরিক্ত ধর্মপ্রবণতার জন্যই হোক কিংবা তাঁর নরম স্বভাবের জন্য—অনেক সিদ্ধান্তই তাঁকে নিতে হয়েছে, যা বেশিরভাগ সময়েই অভিভাবকোচিত হয়নি, প্রাণপ্রিয় ভাইদেরও তা মনঃপূত হয়নি। কর্ণের মৃত্যুর পর আজকে যুধিষ্ঠিরকে তাই নিশ্চয় ভাবতে হয়েছে যে, কর্ণ যদি মাথার ওপরে দাদা হয়ে থাকতেন, তা হলে তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে সকলকেই মাথা নত করতে হত। ভীম, অর্জুন—প্রত্যেককে। তা ছাড়া দ্যূতক্রীড়া, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, বনবাস—এসব আদৌ ঘটত কিনা সন্দেহ। কর্ণের মৃত্যুতে নয়, সময়-মতো তাঁকে দাদা হিসেবে না পেয়ে যুধিষ্ঠির যে এতদিন কত বড়ো একজন অভিভাবক হারিয়েছেন, এই গ্লানিতেই তিনি জননী কুন্তীকে ক্ষমা করতে পারছেন না, খালি বলছেন—মাগো! তোমার মন্ত্রগুপ্তির জন্যই আজ আমাদের সকলের এমন সর্বনাশ—

পীড়িতাঃ স্মঃ সবান্ধবাঃ।

তবু মৃত্যু বোধহয় মানুষের বয়স কমিয়ে দেয়। বিশেষত সারা জীবন ধরে অনেক ব্যবহারই এমনকী দুর্ব্যবহারও এমন সরল শিশুর মতো করেছেন কর্ণ যে, আজকে এই অন্তিম মুহূর্তে যুধিষ্ঠির তাঁকে স্নেহ করতে শুরু করেছেন। মাকে বলছেন—অন্য কারও মৃত্যুতে, এমনকী অভিমন্যুর মৃত্যুতেও আমার যত দুঃখ হয়নি তার থেকে শতগুণ বেশি দুঃখ হচ্ছে কর্ণের কথা মনে করে—

ততঃ শতগুণং দুঃখমিদং মাম্ অস্পৃশদ্ ভৃশম্।

যুধিষ্ঠির এবার সসম্ভ্রমে কর্ণের তিন পত্নীকে ডেকে আনলেন নিজের কাছে—এঁদের ওপরেই জননী কুন্তীর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এতক্ষণ। তারপর তাঁদেরই সঙ্গে গঙ্গার জলে নেমে বড়ো দাদার প্রেততর্পণ করলেন। কর্ণের সারা জীবনের পাণ্ডববিদ্বেষ যুধিষ্ঠিরের ভালবাসায় আর গঙ্গার জলে ধুয়ে গেল।

[মহা (k) ১১.২৭.৬-৩০; ১২.৬.২-১১;
(হরি) ১১.২৭.৬-২৬; ১২.৬.২-১০]

□ আমরা জন্মবৃত্তান্তের পরিবর্তে কর্ণের অন্তিম সংস্কার থেকে তাঁর জীবনকথা লিখতে শুরু করলাম তার কারণ—কর্ণের মতো জন্মকালেই জননীর দ্বারা পরিত্যক্ত শিশুরা যেন অনিশ্চয়তা সঙ্গে নিয়েই জন্মায়। যে পেটিকার মধ্যে রেখে কর্ণকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন কুন্তী, সেই পেটিকার মধ্যেই তো সদ্যজাত শিশুটির মৃত্যু হতে পারত! সেদিক থেকে দেখলে মনে হয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণের মৃত্যু তো ঘটনামাত্র, কর্ণ এমনিতেই যেন মারা যাবার জন্যই জন্মেছিলেন। পরিত্যক্ত সন্তান হিসেবে একটা অপূর্ণতা আর অনিশ্চয়তা সারা জীবন বয়ে বেরিয়েছেন কর্ণ। সেই অপূর্ণতা পূর্ণতায় পর্যবসিত হয়েছে তাঁর অন্ত্যেষ্টির সময়, জনসমক্ষে কুন্তীর স্বীকারোক্তিতে। আমরা সেই পূর্ণতাকে সামনে রেখেই কর্ণের জীবনকথা আলোচনা করতে চাই। ঠিক যেমনভাবে অসীম মমতায় লিখেছেন মহাভারতের মহাকবি। কর্ণের ওপর জনক-জননীর অধিকার ছিলনা বলেই মহাকবি নিঃশেষে তাঁর ভার নিয়েছেন, সমস্ত জীবন ধরে তাঁকে দিয়ে এমন সব কাজকর্ম করিয়েছেন যাতে জননীর হৃদয় আরও তাপিত হয়, যেন জননী তাঁর কুমারীত্বের বিলাপ অশ্রুর অক্ষরে স্মরণ করেন। কুন্তী কর্ণকে ভুলতে পারেননি কোনোদিন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কুন্তীকে নিঃশব্দে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছেন কর্ণ; আজ মহাভারতের আদিপর্ব থেকে সৌপ্তিক পর্ব পর্যন্ত দশপর্বের গর্ভদশা শেষ করে স্ত্রী-পর্বের শেষ অধ্যায়ে পৌঁছে কুন্তী কর্ণের মাতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। আজ তিনি স্বামী পাণ্ডুর কাছে দায়মুক্ত সম্পূর্ণ এক স্ত্রী, সমস্ত পাণ্ডবদের কাছে আজ তিনি সম্পূর্ণ মা। সবাই, এমনকী ছেলেরাও সব জেনে গেল—এই শাস্তিই যেন কুন্তীকে আজ শান্তি দিয়েছে।

□ আমরা কর্ণের জন্মকথায় ফিরে আসি। কুন্তীর এই কানীন পুত্রটির জন্ম হয়েছিল অশ্বনদীর তীরে অবস্থিত রাজা কুন্তিভোজের রাজ অন্তঃপুরে। কর্ণের জন্মবৃত্তান্তে পৌঁছাতে হলে আমাদের তাকাতে হবে সেই দিনটির দিকে যেদিন রাজা কুন্তিভোজের প্রাসাদে অতিথি হয়ে এলেন কোপন স্বভাব ঋষি দুর্বাসা। কুন্তিভোজকে তিনি বললেন—তোমার ঘরেই কিছুকাল ভিক্ষে করব রাজা। অর্থাৎ কিনা তোমার বাড়িতে থেকেই কিছুদিন খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম করব। সঙ্গে শর্ত দিলেন—রাজা কিংবা তাঁর অনুচরেরা মুনির কোনো কাজে ঝামেলা করতে পারবেন না। দুর্বাসা বললেন—আমি যেমন খুশি যখন খুশি আসব, যখন খুশি বাইরে বেরোবো—

যথাকামঞ্চ গচ্ছেয়মাগচ্ছেয়ং তথৈব চ।

কিন্তু আমার শোওয়া-বসার ব্যাপারে কোনো অসুবিধে হলে চলবে না। রাজা কুন্তিভোজ ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে বললেন—কোনো চিন্তা নেই মহর্ষি। আমার একটি কন্যা আছে। সে এমনভাবেই আপনার সেবা করবে যাতে আপনার অসন্তোষের কারণ তো ঘটবেই না, বরং আপনি পরম সন্তুষ্ট হবেন। কুন্তী পিতার আদেশে দুর্বাসার সেবাযত্নের গুরুদায়িত্ব তুলে নিলেন নিজের মাথায়। হাসিমুখে সে দায়িত্ব পালনও করলেন সম্পূর্ণ একটি বছর। দুর্বাসা পরম সন্তুষ্ট হলেন। তিনি ইচ্ছামতো বর প্রার্থনা করতে বললেন কুন্তীকে। কুন্তী বিনীতভাবে বললেন—আমার সেবায় আপনি তুষ্ট হয়েছেন, সন্তুষ্ট হয়েছেন আমার পিতা—আমার আর অন্য কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। দুর্বাসা তখন বললেন—বেশ। তবে একটা মন্ত্র দেব তোমায়। এই মন্ত্রে যে দেবতাকেই তুমি ডাকবে, সেই দেবতাই তোমার বশীভূত হবেন, তাঁর সঙ্গে থাকতেও পারবে তুমি—

তেন তেন বশো ভদ্রে স্থাতব্যং তে ভবিষ্যতি।

সেই দেবতা অকামই হোন বা সকাম—তোমার বশে তাঁকে থাকতেই হবে—

অকামো বা সকামো বা স সমেষ্যতি তে বশে।

কুন্তীকে মন্ত্রশিক্ষা দিয়ে চলে গেলেন দুর্বাসা।

কুন্তীর বুঝি তখন বয়ঃসন্ধির কাল। বালিকাসুলভ মনের চপলতা তখনও তাঁর মন থেকে যায়নি, আবার যৌবনের অনুসন্ধিৎসাও জেগে উঠেছে। কুন্তী জানতেন যে, দুর্বাসা যে মন্ত্র দিয়েছেন তা বশীকরণের মন্ত্র, আর তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দেবতার ঔরসে পুত্রলাভ। যৌবন-সন্ধিতে স্থিত এক যুবতীর কৌতূহলে মনিদত্ত মন্ত্র পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন কুন্তী—

মন্ত্রগ্রামবলং তস্য জ্ঞাস্যে নাতিচিরাদিতি।

মন্ত্রের কথা এমন করে চিন্তা করতে করতেই কুন্তী রজস্বলা হলেন—তাঁর লজ্জা হল—কন্যাভাবে রজস্বলা। রাজপ্রাসাদের বিরাট ঘরে পালঙ্কের ওপর শুয়ে ছিলেন কুন্তী। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল সকালবেলার রাঙা সূর্য, একটুও চোখে লাগে না। নিমেষে তাঁর মন প্রাণ এবং দৃষ্টি একসঙ্গে নিবদ্ধ হল প্রভাতসূর্যের দিকে, তাঁর চোখের পাতা পড়ছিল না—

ন চাতপ্যত রূপেণ ভানোঃ সন্ধ্যাগতস্য সা।

কী যে হল প্রাতঃসন্ধ্যার মায়ায় কুন্তী বুকে হাত দিয়ে সূর্যকে কাছে ডাকলেন দুর্বাসার মন্ত্রে।

অমনি সূর্য দ্বিধা হলেন। তাঁর এক ভাগ যেমনটি পৃথিবীকে আলো দিচ্ছিল, তেমনি দিতে থাকল। আরেক ভাগ পুরুষরূপের সঙ্গে সূর্যের কিরণ মেখে মাথায় আলোর মুকুট পরে যেন দূর থেকে ডাক-পাওয়া প্রেমিকের মতো ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছলেন কুন্তীর কাছে—

ত্বরমাণো দিবাকরঃ।

হাসতে হাসতেই যেন মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে দিয়ে সূর্য বললেন—তোমার বশীকরণের ডাক শুনে তোমার বশ হতে এসেছি রানি। নাকি অবশ হতে?

আগতো' স্মি বশং ভদ্রে তব মন্ত্রবলাৎকৃতঃ।

বল এখন কী করব?

কুন্তী এবার ভয় পেলেন। যৌবনের অনুসন্ধিৎসার সঙ্গেই যে ভয় মেশানো থাকে। কুন্তী বললেন—না গো, তুমি যেখান থেকে এসেছিলে সেখানে চলে যাও—

গম্যতাং ভগবংস্তত্র যত এবাগতো হ্যসি।

শুধু কৌতূহলে, শুধুই কৌতূহলে তোমাকে একবারের তরে কাছে ডেকেছিলাম—কৌতূহলাৎ সমাহূতঃ। তাই বলে এমন করতে হয়? তুমি চলে যাও লক্ষ্মীটি—প্রসীদ ভগবন্নিতি। সূর্যের সংলাপে এবারে একটু কাঠিন্য জুড়ে গেল যেন। তিনি বললেন—আমি চলে যাব ঠিকই, তবে তুমি যেভাবে বলছ, এটা ঠিক হচ্ছে না সুন্দরী। তুমি আমায় কাছে ডাকলে, অথচ এখন আমার প্রাপ্যটুকু না দিয়েই ফিরিয়ে দিচ্ছ সেটি হবে না। তা ছাড়া তোমার অভিসন্ধি আমার জানা আছে। তুমি চেয়েছিলে—সূর্যের থেকে একটি পুত্র, শৌর্য্যে বীর্য্যে তুলনাহীন এক পুত্র। তা বেশ তো, ছেলে চেয়েছ, ছেলে পাবে, কিন্তু তার আগে তো তোমার নিজেকে নিঃশেষে আমার কাছে ছেড়ে দিতে হবে সুন্দরী—

সা ত্বয়া আত্মপ্রদানং বৈ কুরুষ্ব গজগামিনি।

সত্যি কথা বলতে কি, তোমার সঙ্গে সঙ্গম সেরে, তবেই আমি যাব—

ত্বয়া সঙ্গম্য সুস্মিতে।

কুন্তী অনেক কাকুতি মিনতি করলেন, কিন্তু কুন্তীর রূপ দেখেই হোক কিংবা দুর্বাসার মন্ত্রবলে—সূর্য তখন এতই বিবশ যে, বারেবারেই তিনি এক কথা বলতে থাকলেন—নিজেকে তুমি

আমার কাছে ছেড়ে দাও কন্যে—'আত্মপ্রদানং কুরু কুন্তি কন্যে', নইলে তোমার বাবাকে এবং তোমার সেই মন্ত্রদাতা মুনিকে—দুজনকেই ভস্ম করব আমি—ব্রাহ্মণং পিতরঞ্চ তে।

সূর্য এবার কুমারী কুন্তীকে যৌবনের রসবিলাস সম্বন্ধেও উপদেশ দিলেন কিছু। কুন্তী বুঝলেন মিলন অবশ্যম্ভাবী, পুত্র-জন্মও অবশ্যম্ভাবী। এবারে বুঝি ভাবী পুত্রটির জন্যই তাঁর মায়া হল। সমাজের নিয়মকানুন যা, তাতে যে ছেলেটিকে বিসর্জন দিতেই হবে, এ ব্যাপারেও তিনি তখনই নিশ্চিত। এবারে যে সন্তানটি তাঁকে প্রথম মাতৃত্বের আস্বাদ দেবে সেই অনাগত শিশু-জীবনের রক্ষা কল্পনায় কুন্তী সূর্যকে বললেন—তুমি যখন একান্তই মানবে না তবে হোক সেই মিলন—অস্তু মে সঙ্গমো দেব। কিন্তু সে যদি জন্মাবেই তাহলে তার জীবনরক্ষার বর্ম দাও তাকে। সে যেন বেঁচে থাকে। সূর্য বললেন—তাই হবে। সূর্যের তেজে অথবা মিলনে কুন্তী যেন এবার বিহ্বল হয়ে পড়লেন—ততঃ সা বিহ্বলেবাসীৎ। মিলন সেরে সূর্য বললেন—আসি তাহলে এবার। সূর্য নাকি বিনা স্পর্শেই তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। অথচ আমরা দেখছি, মিলনশ্রান্তা কুন্তী বিছানায় শুয়ে আছেন বিবশা লতার মতো—ভজ্যমানা লতেব। কুন্তীর সাদর মন্ত্রাহ্বানের মধ্যে সামান্য সাময়িক অনাদর মিশ্রিত থাকলেও সূর্য প্রেমিকের মতো অভীপ্সিত পুত্র জন্মানোর আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় নিলে কুন্তী ভারী লজ্জা পেলেন, বারবার যাচনা করলেন—যাচমানা সলজ্জা—ঠিক তোমার মতোই যেন ছেলে হয়, তোমার মতোই রূপ, তোমার মতো শক্তি, তোমারই মত গুণ—

ত্বদীয়রূপসত্ত্বৌজা ধর্মযুক্তো ভবেৎ স চ।

কুন্তীর গর্ভদশা আরম্ভ হল। তিনি কেবলই লুকিয়ে বেড়াতে লাগলেন, যাতে কেউ টের না পায়। জানলেন শুধু কুন্তীর বিশ্বস্ত একজন ধাত্রী—সব কথা কুন্তীর কাছ থেকে জানার পর কুন্তীকে তিনি রক্ষা করতে লাগলেন সযত্নে, তাঁকে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে দিতেন তেমন ভাবেই যাতে কুন্তীর গর্ভাবস্থা অন্য কেউ টের না পায়। তারপর যথাসময়ে কুন্তীর ছেলে হল। সোনার রঙের বর্মপরা, সূর্যের সোনার কুণ্ডল কানে নিয়েই কর্ণ জন্মালেন। ছেলেকে দেখতে হয়েছে ঠিক সূর্য দেবতার মতোই, কাঁধ যেন এখনই বেশ চওড়া, চোখ দুটি যেন সিংহের মতোই একটু কটা। পিতার মতোই চেহারা হয়েছে পুত্রের—দেখে কুন্তী বড়ো খুশি হলেন—

যথা অস্য পিতরং তথা।

কর্ণের জন্মকালীন বিবরণেই বোঝা যায়, অসামান্য সুপুরুষ ছিলেন তিনি, দেবতার তেজ আর পরাক্রম ছিল তাঁর সর্বাঙ্গে। যদিও এক মুহূর্তে পুত্রমুখ দেখার সুখানুভূতি মিলিয়ে গেল কুন্তীর মুখ থেকে। ধাত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে একটি বড়ো পেটিকায় সদ্যোজাত শিশুটিকে শুইয়ে দিলেন কুন্তী। জলে ভাসিয়ে দিতে হবে শিশুটিকে, তবু পেটিকাটিকে প্রস্তুত করার সময় সব রকম ব্যবস্থা নিলেন কুন্তী যাতে জল ঢুকে শিশুটির মৃত্যু না হয়। পেটিকার ভিতরে যেখানে সেখানে লাগিয়ে দেওয়া হল মধু—যদি কখনো একটু যায় শিশুটির মুখে। গভীর স্নেহে আরও একবার পুত্রের মুখ দেখে পেটিকার ঢাকনা বন্ধ করলেন কুন্তী। তারপর সেটিকে ভাসিয়ে দিলেন রাজ অন্তঃপুরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া অশ্বনদীর জলে।

নদীর জল কুন্তীর মনের সঙ্গে তাল দিয়ে চলল না। তরঙ্গে তরঙ্গে পেটিকা যতই দূরে যেতে থাকল, কন্যাকালে পুত্রজন্মের অন্যায় জেনেও কুন্তী ততই কাঁদতে থাকলেন, কারণ যে রমণী একবার পুত্রমুখ দেখেছে সে কন্যা হোক, সধবা হোক আর বিধবা—সে শুধু জননীর পরিচয় দিতে ভালোবাসে। কিন্তু চিরকালের সমাজ যেহেতু কন্যা-জননীর হৃদয় বোঝে না, তাই অশ্বনদীর নির্জন তীরে দাঁড়িয়ে কুন্তীকে জননীর আশীর্বাদ জানাতে হয়—বাছা আমার! জন্মলগ্নেই তোকে জলে ভাসিয়ে দিলাম, জলের দেবতা তোকে বাঁচিয়ে রাখেন যেন—

পাতু ত্বং বরুণো রাজা সলিলে সলিলেশ্বর।

সর্বগামী প্রাণশক্তি বায়ু যেন তোকে নিঃশ্বাস দেয়। যে আমার কন্যাকালে মাতৃত্বের আস্বাদ দিল, তোর সেই পিতা যেন তোকে সব জায়গায় বাঁচিয়ে রাখেন। আমার কোলে ছেলে দিয়েও তোর বাবাই আজ ধন্য—তিনি আকাশ থেকে সব সময় তাঁর কিরণের চোখে দেখতে পাবেন তোকে। তুই যেখানেই থাকিস বাছা! আমি তোকে ঠিক চিনব, ওই কবচ কুণ্ডল দেখে ঠিক চিনব। অশ্বনদীর ধারায় শায়িত কর্ণের পেটিকাখানি যতই নজরের বাইরে যেতে থাকল, মাতৃত্বের দায় ততই বিদ্ধ

করতে থাকল কুন্তীকে। তিনি হাহাকার করে বলতে থাকলেন—ধন্য সেই রমণী, যে তোকে পুত্র বলে কোলে তুলে নেবে। ধন্য সেই জননী, তৃষ্ণার ব্যগ্রতায় যার স্তনের দুধ খাবি তুই—

যস্যাস্ত্বং তৃষিতঃ পুত্রঃ স্তনং পাস্যসি দেবজ।

জানি না কে সেই ভাগ্যবতী রমণী, যে তোকে ছেলে বলে কোলে তুলে নেবে। শিশু বয়সেই এই টানা টানা চোখ, এই প্রশস্ত ললাট, এই চুল কোনো জননীর পুত্র-কল্পনায় ছিল কি? অথচ সেই ভাগ্যবতী তোকে লালন করবে—পুত্রত্বে কল্পয়িষ্যতি। কুন্তীর মধ্যে যে জননী ছিল, সে বারবার ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠল সেইসব রমণীদের প্রতি, যারা ধূলায় ধূসর এই শিশুটিকে হামাগুড়ি দিতে দেখবে—ভূমৌ সংসর্পমাণকম্। কুন্তী বললেন—ধন্য তারা, যারা তোর ব্যাকুল হাসি-ভরা শিশুমুখের আধো আধো কথা শুনতে পাবে, ধন্য তারা, যারা তোকে আস্তে আস্তে যুবকে পরিণত হতে দেখবে। রাজভবনে ফিরে এলেন কুন্তী। আর প্রথম জাত কৌন্তেয় ভেসে চললেন অশ্বনদী পার হয়ে চর্মণ্বতী নদী, চর্মণ্বতী পেরিয়ে যমুনা, যমুনা থেকে গঙ্গায়।

ভাসতে ভাসতে পেটিকা এসে পৌঁছাল অঙ্গরাজ্যের রাজধানী চম্পানগরীতে। অঙ্গরাজ্য তখন হস্তিনাপুরের অন্তর্গত। তার মানে কুন্তী নববধূ হয়ে ঢোকার আগেই কুন্তীর ছেলে এসে পৌঁছালেন হস্তিনাপুরের রাজ্যসীমায়।

ধৃতরাষ্ট্রের বন্ধু সূত অধিরথ সস্ত্রীক এসেছিলেন গঙ্গাস্নানে। অধিরথের স্ত্রী কিন্তু সুন্দরী, দারুণ সুন্দরী—রূপেণাসদৃশী ভুবি। তাঁর নাম রাধা। যাগ-যজ্ঞ, তীর্থ, কবচ—অনেক সাধ্যসাধনা করেও রাধার ছেলে হয় না। সেই রাধা গঙ্গায় স্নান করতে নেমে দেখেন, একখানি পেটিকা ভেসে আসছে ঢেউয়ের টানে, একেবারে তাঁর কাছেই। পেটিকাটি স্নান করার সঙ্গীদের দিয়ে ধরালেন তিনি, তারপর একেবারে জানালেন স্বামী অধিরথকে, কেন না পেটিকার মধ্যে কী আছে কেউ জানে না—ভাল জিনিস যেমন থাকতে পারে, মন্দ কিছুও তেমনি থাকতে পারে। স্বয়ং অধিরথ এসে জল থেকে তুললেন পেটিকাটি, তারপর একটি যন্ত্র দিয়ে খুলে ফেললেন পেটিকার ঢাকনা। দেখলেন পেটিকার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে শিশু—অপশ্যত্তত্র বালকম্। অধিরথ নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না—নতুন সূর্যের মতো গায়ের রঙ, সোনার বর্ম-পরা, সোনার কুণ্ডল-পরা দিব্য শিশু। ছেলেটিকে কোলে নিতেই এতদিনের রুদ্ধ বাৎসল্য যেন মুখর করে তুলল অধিরথকে। অধিরথ বললেন— জন্মে অবধি এমন অদ্ভুত কাণ্ড দেখিনি, পুত্রহীনকে পুত্র দিয়েছেন ভগবান। তিনি আজ মুখ তুলে চেয়েছেন। সূত অধিরথ এবার পুত্রকে তুলে দিলেন স্নেহাতুরা জননী রাধার কোলে। সূতপিতা আর সূতজননী পরম আদরে পুত্রকে লালন পালন করতে থাকলেন। ব্রাহ্মণেরা ছেলের গায়ে জন্ম থেকেই সোনার বর্ম আর কুণ্ডল দেখে অধিরথের ছেলের নামকরণ করলেন বসুষেণ। বসু মানে সোনা, সোনার ছেলে। *[মহা (k) ১.৬৭.১৩৭-১৫০; ৩.৩০৩-৩০৮ অধ্যায়; ৩.৩০৯.১-১৩; ১.৬৩.৯৮; (হরি) ১.৬২.১৩০-১৪০; ৩.২৫৭-২৬২ অধ্যায়; ৩.২৬৩.১-১৩; ১.৫৮.১৩৭; ভাগবত পু. ৯.২৩.১৩-১৪; বিষ্ণু পু. ৪.১৪.১০]*

□ প্রথমজাত পুত্রের জন্য যে মঙ্গল শঙ্খ কুন্তিভোজের অন্তঃপুরে বাজার কথা ছিল তা শেষপর্যন্ত বাজল সূত অধিরথের ঘরে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সম্পূর্ণ মহাভারত জুড়ে যে মানুষটি কর্ণ নামে বিখ্যাত হয়ে রইলেন, তাঁর জন্মকালীন নাম কিন্তু কর্ণ ছিল না। তিনি আসলে পরিচিত ছিলেন বসুষেণ নামে। মহাভারত জানিয়েছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঠিক আগে যখন আপন পুত্র অর্জুনের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য ইন্দ্র তাঁর কাছে তাঁর কবচ ও কুণ্ডল চাইলেন, সেই সময় নিজের শরীরের সঙ্গে জন্ম থেকে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত কবচ আর কুণ্ডল বসুষেণ নিজের হাতে কেটে তুলে দিয়েছিলেন ইন্দ্রের হাতে। আর এইভাবে কবচ কুণ্ডল দান করার পরেই তিনি বৈকর্তন এবং কর্ণ নামে বিখ্যাত হন—

পুরা নাম চ তস্যাসীদ্বসুষেণ ইতি ক্ষিতৌ।
ততো বৈকর্তনঃ কর্ণঃ কর্মণা তেন সো'ভবৎ॥
আমুক্তকবচো বীরো যস্তু জজ্ঞে মহাযশাঃ।
স কর্ণ ইতি বিখ্যাতঃ পৃথায়া প্রথমঃ সুতঃ॥

[মহা (k) ১.৬৭.১৪৫-১৪৭; (হরি) ১.৬২.১৪৮-১৪৯]

□ কুন্তীর এই প্রথম পুত্রটি যে সূত অধিরথের ঘরে গিয়ে পৌঁছাল, রাধেয় বলেই লোকে তাকে চিনল, পিতা অধিরথ তাঁর বসুষেণ নামকরণ

করলেন—এসব খবর কিন্তু কুন্তী খুব সাবধানে, বিশ্বস্ত গুপ্তচরদের মাধ্যমে সংগ্রহ করলেন—

চারেণ বিদিতশ্চাসীৎ পৃথয়া দিব্যবর্মভৃৎ।

আসলে ভাসিয়ে দেবার সময় কুন্তী যতই মনে মনে ভেবে থাকুন—এই দিব্য কবচ কুণ্ডল দেখেই আমি পরে তাকে চিনে নেব—সেকথা তাঁর মাতৃহৃদয়কে প্রবোধ দিতে পারেনি। ফলে ভাসিয়ে দেবার পর সেই ছেলে বেঁচে রইল কী না, রইলেও কার ঘরে, কেমন করে সে গিয়ে পৌঁছাল, কী নাম হল সে ছেলের—এসব খুঁটিনাটী সংবাদের পিছনে তাঁর মাতৃহৃদয়ই কুন্তীকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে।

[মহা (k) ৩.৩০৯.১৫; (হরি) ৩.২৬৩.১৫]

□ বসুষেণ, আপাতত কর্ণকে আমরা বসুষেণ বলেই ডাকব—কিন্তু মহাভারতে প্রাপ্ত বিবরণ থেকে এই বসুষেণের কর্ণ এবং বৈকর্তন নাম ছাড়াও আরও একটি নামের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। তা হল বৃষ। বৃষ ধর্মের প্রতিরূপ। বসুষেণ কর্ণ নাকি শৈশব থেকেই বিক্রমশালী, ধার্মিক এবং সত্যবাদী ছিলেন বলে তাঁর নাম বৃষ হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তী সময়ে কর্ণের যে চরিত্র আমরা দেখব তার সঙ্গে অনেকসময়ই এই 'বৃষ' নামের সাদৃশ্য বা সার্থকতা খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবু মহাভারতের কবি যেন কুন্তীর এই কানীন পুত্রটির প্রতি অসীম মায়া থেকেই কুন্তীর প্রথাসিদ্ধ জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠিরের ধর্ম চিহ্নটুকু কুন্তীর প্রকৃত জ্যেষ্ঠপুত্রের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন।

[মহা (k) ৩.৩০৯.১৪; (হরি) ৩.২৬৩.১৪]

□ মহাভারতের বনপর্বে এক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে যে, যে কৃষ্ণের হাতে নিহত হবার পর নরকাসুরের আত্মা নাকি কর্ণের দেহে প্রবেশ করেছিল। সেই কারণেই কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণসখা অর্জুনের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। তবে আমরা কর্ণের জীবনকথার যত গভীরে যাব ততই স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাবে নরকাসুরের আত্মার খবরটা সত্য হোক বা না-ই হোক, কর্ণের অর্জুন তথা পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষের জন্য তাঁর নিজের জীবনের জটিলতাই অনেকাংশে দায়ী।

[মহা (k) ৩.২৫২.৩৮; (হরি) ৩.২০৯.৪৮-৪৯]

□ মহাভারতের বিবরণ থেকে কর্ণ অত্যন্ত সুপুরুষ, রূপবান ছিলেন বলে জানা যায়। জন্ম বৃত্তান্তেই বার বার উল্লিখিত হয়েছে যে, আপন পিতা সূর্যদেবতার মতোই ছিল তাঁর আকৃতি। শান্তিপর্বে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে যুধিষ্ঠির উল্লেখ করেছেন যে কর্ণের চরণ দুটি ছিল হুবহু কুন্তীর মতো। এছাড়াও মহাভারতে একাধিক শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে যে কর্ণের গাত্রবর্ণ ছিল তপ্তকাঞ্চনের মতো, তাঁর দেহে এক দিব্য প্রভা লক্ষ্য করা যেত। পদ্মপলাশের মতো বিশাল দুটি চোখ, উন্নত ললাট, সুন্দর কেশরাশি, দীর্ঘ দৃঢ় আকৃতি, বিশাল বক্ষ, বিশাল স্কন্ধ মহাবীর বসুষেণ আক্ষরিক অর্থেই 'প্রবীরঃ প্রিয়দর্শনঃ'। মহাভারতের উল্লেখ অনুযায়ী কর্ণ লম্বায় অষ্টরত্নি প্রমাণ, অর্থাৎ সাত হাত। মহাভারতের যেসব শ্লোকে কর্ণের দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে তার কয়েকটি আমরা উল্লেখ করব—

* নিষ্টপ্তহেমবপুষং জ্বলনার্কসমপ্রভম্।
* পদ্মায়তবিশালাক্ষং পদ্মতাম্রদলোজ্জ্বলম্।
  সুললাটং সুকেশান্তং . . .॥
* দীপ্তি কান্তিদ্যুতিগুণৈঃ সূর্যেন্দুজ্বলনোপমঃ।
  প্রাংশুঃ কনকতালাভঃ সিংহসংহননো যুবা॥
* অষ্টরত্নির্মহাবাহুর্ব্যূঢ়োরস্কঃ সুদুর্জয়ঃ।
  অভিমানী চ শূরশ্চ প্রবীরঃ প্রিয়দর্শনঃ॥
* কুন্ত্যা হি সদৃশৌ পাদৌ কর্ণস্যেতি মতির্মম।

[মহা (k) ৮.৯৪.৩৩; ৩.৩০৭.১৯; ১.১৩৬.৪-৫;
৮.৭২.২৭; ৮.৩৪.১৫৭; ১২.১.৪২;
(হরি) ৮.৬৮.৩৩; ৩.২৬২.১৮; ১.১৩১.৪-৫;
৮.৫৩.৩০; ১২.১.৪২]

□ এখানে একটা খবর দেওয়া খুব জরুরি বলে মনে হয় আমাদের—মহাভারতের সম্পূর্ণ উপাখ্যানে চোখ রাখলে দেখব, বসুষেণ অর্থাৎ কর্ণ কিন্তু তাঁর গর্ভধারিণী জননীর শুধুমাত্র চরণ যুগলের সাদৃশ্য নিয়ে জন্মাননি। আরও একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মেছেন—কিংবা বলা ভাল গর্ভধারিণী জননীর সঙ্গে তাঁর জীবনের এই একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। কুন্তী জন্মেছিলেন যদু-বৃষ্ণি কুলের শূরের ঔরসে, তাঁর নাম ছিল পৃথা। কিন্তু পিতা তাঁকে দত্তক দিলেন নিঃসন্তান কুন্তিভোজের ঘরে, সেখানে কুন্তী নামে প্রতিপালিত হলেন তিনি। কিন্তু কুন্তিভোজের ঘরে কুন্তীর পদার্পণের ঠিক পর পরই নিঃসন্তান কুন্তিভোজ পুত্রমুখ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করলেন। জন্ম নিলেন পাণ্ডবদের মাতুল পুরুজিৎ এবং আরও অন্তত দশটি পুত্র। এদিকে কুন্তী ভাসিয়ে দেবার পর কর্ণ

ভেসে এসে নিঃসন্তান অধিরথের ঘর আলো করলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিশেষত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিবরণ দেখে বেশ বোঝা যায় যে, কর্ণকে কোলে পাওয়ার পর নিঃসন্তান অধিরথ আর রাধার ঘরেও নতুন অতিথি এসেছে এবং এরাও সংখ্যায় একাধিক।

পুপোষ চৈনং বিধিবদ্‌বৃধে স চ বীর্য্যবান্।
ততঃ প্রভৃতি চাপ্যন্যে প্রাভবন্নৌরসাঃ সুতাঃ॥

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণের একাধিক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমরা অংশ নিতে দেখি।

[মহা (k) ৩.৩০৯.১২; (হরি) ৩.২৬৩.১২]

□ সারা জীবন অন্যের কাছ থেকে, বিশেষ করে আপন ছোটো ভাই পাণ্ডবদের কাছ থেকে 'সূতপুত্র' 'সূতপুত্র' সম্বোধনটা এমনভাবেই শুনে এসেছেন কর্ণ, যেন 'সূত' হয়ে জন্মানোটা একটা বিরাট বড়ো অপরাধ। এমনকী পাণ্ডবরা এত উদারমনস্ক বীরপুরুষ হওয়া সত্ত্বেও সারাজীবন একজন বিপন্ন বীরপুরষকে 'সূতপুত্র', 'সূতপুত্র' বলে সম্বোধন করে গেলেন। আমাদের জিজ্ঞাসা—পাণ্ডবেরা কি কখনো পেছন ফিরে নিজেদের মূল বংশপরম্পরা লক্ষ্য করেছেন? জাতিতত্ত্বের পুরোধা হিসেবে যদি মনু মহারাজের নাম করি তা হলে বলব— একটি ক্ষত্রিয় বীরপুরুষ যখন ব্রাহ্মণীর গলায় মালা দিয়ে তার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করবে, তবে সেই পুত্রটি হবে জাতিতে সূত—

ক্ষত্রিয়াদ্ বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।

সেই সূতের ছেলে হল সূতপুত্র। যদি এই দিক দিয়ে দেখি, তাহলে পাণ্ডবেরাও সমূহ বিপদে পড়বেন। পাণ্ডব-কৌরব এবং ভারতবর্ষের আরও অনেক গৌরবোজ্জ্বল বংশের মূল হলেন যযাতি রাজা। মহামতি শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী এই ক্ষত্রিয়পুরুষের প্রেমে পড়েছিলেন। স্বয়ং যযাতি নিজে ক্ষত্রিয় হওয়ার কারণে ব্রাহ্মণকন্যাকে অনেক বারণও করেছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণীর প্রেম তাতে নিরুদ্ধ হয়নি। তাহলে দেবযানীর গর্ভে যযাতির ছেলেরা সব সূত এবং তার ছেলেরা সব সূতপুত্র। আপনারা বলবেন—পাণ্ডবেরা তো আর সোজাসুজি দেবযানীর গর্ভজাত সন্তানদের বংশধর নন, তাঁরা এসেছেন শর্মিষ্ঠায় বংশলতায়। আমরা বলি, তাহলে তো আরও বিপদ, শর্মিষ্ঠা তো দানবরাজ বৃষপর্বার মেয়ে। ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণীর সংকর জন্মের তবু সংজ্ঞা আছে কিন্তু ক্ষত্রিয় এবং দানবীর ধারায়, যাঁদের জন্ম, তাঁরা যে কী, তা শাস্ত্রকারেরাও বলেননি।

প্রাচীন পুরাণগুলি বলেছে—যাঁর নাম থেকে এই বসুন্ধরার নাম হয়েছে পৃথিবী, সেই পৃথু যেদিন জন্মালেন সেইদিনই পিতামহ ব্রহ্মা সোমযজ্ঞের ভূমিতে সূত এবং মাগধদের সৃষ্টি করলেন। সূত এবং মাগধদের মুনিরা অনুরোধ করেছিলেন মহামতি পৃথুর স্তব করতে। সেই যে স্তব আরম্ভ হল, তারপর থেকে সূত এবং মাগধেরা চিহ্নিত হয়ে গেলেন বিভিন্ন রাজার স্তাবক হিসেবে। পুরাতন রাজাদের কীর্তিখ্যাতি স্মৃতিতে ধরে রাখতেন বলেই সূতেরা হলেন পৌরাণিক—

সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তাঃ।

প্রাচীন সমাজে মুনি-ঋষিদের কাছে পর্যন্ত সূতদের যথেষ্ট সম্মান ছিল—কারণ বিভিন্ন পুরাণবক্তারা সবাই সূত। কিন্তু সূতেরা যেমন পৌরাণিক, তেমনি ব্যক্তিরাজার স্তাবকও বটে—বন্দিনস্তু অমলপ্রজ্ঞাঃ। বছরের পর বছর রাজবংশ স্মৃতিতে ধারণ করে, আর দিনের পর দিন পরিপোষক রাজার বন্দনা করেই বোধহয় সূতেরা জনসমাজে হেয় হয়ে গিয়েছিলেন। এই স্তাবকতার কারণেই হয়তো স্বাধীনচেতা ক্ষত্রিয়পুরুষেরা সময়ে অসময়ে তাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত করতেন, যদিও কারণ উপস্থিত না হলে এই আঘাত তাঁরা করতেন না; যেমন কর্ণের পালক পিতা সূত অধিরথই ছিলেন কুরুকুলপতি ধৃতরাষ্ট্রের বন্ধু। অথচ প্রতিযোগিতার কারণেই হোক কিংবা বিষম নজরের জন্যই হোক, পাণ্ডবেরা অধিরথের পুত্রকে 'সূতপুত্র' বলে না ডেকে পারতেন না। আসল কথা এখানে ডাকবার কারণও ঘটেছে এবং আবার অধিরথ হয়তো এককালে কুরুবংশের স্তাবকও ছিলেন।

মৎস্যপুরাণের এক জায়গায় দেখছি ঋষিরা কর্ণের সূতপুত্র সম্বোধনের অন্য কোনো গূঢ় রহস্য আছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা পৌরাণিককে বললেন—আমরা পুরু বংশের কীর্তিকাহিনী পরে শুনব। তার চেয়ে কর্ণকে লোকে সূতপুত্র বলে কেন, সেইটা আগে শোনান।

পৌরাণিক সংক্ষেপে বললেন—অঙ্গদেশের রাজা বৃহদ্‌বাহুর পুত্র বৃহন্মনা কিন্তু রাজা ছিলেন, মানে অবশ্যই ক্ষত্রিয়। এই বৃহন্মনার দুই স্ত্রী—দুজনেই শৈব্যরাজার মেয়ে। প্রথমা স্ত্রী যশোমতীর গর্ভে জন্মালেন জয়দ্রথ বলে এক ছেলে আর দ্বিতীয়া স্ত্রী সত্যার গর্ভে আসেন বিজয়। বিজয়ের ছেলে বৃহৎ, তাঁর ছেলে বৃহদ্রথ, তাঁর ছেলে সত্যকর্মা এবং তাঁর ছেলে হলেন অধিরথ। পুরাণকার প্রায় কিছুই না ভেঙে বললেন—এই অধিরথ সূত নামে বিখ্যাত হন—সূতশ্চাধিরথঃ স্মৃতঃ। যাঁর পূর্বপুরুষেরা রাজা ছিলেন তাঁদের ঘরের ছেলে হঠাৎ সূত বলে পরিচিত হলেন কেন—তার দুটো কারণ হতে পারে, যদিও পৌরাণিক সে কারণ স্বকণ্ঠে কিছু বলেননি। এক কারণ হতে পারে—রাজবংশের ছেলে হলেও এই রাজারা হয়তো ছিলেন সামন্ত রাজা। সেই বংশের ছেলে হঠাৎ করে আপন খেয়ালে কবিওয়ালা হয়ে উঠল। সে কুরুবংশের কীর্তিগাথা গাইতে গাইতে সেই বংশের গায়েন হয়ে গেল; অধিরথকে সূত বলেই লোকে চিনল। আর এক কারণ হতে পারে—মনুর নিয়ম অনুসারে অধিরথের পিতা, অবশ্যই ক্ষত্রিয় ছিলেন, সত্যকর্মা বুঝি ব্রাহ্মণ-রমণীর প্রেমে পাগল হয়ে তাঁকে বিয়ে করে ফেলেন। লোকেরা, বান্ধণেরা বন্ধুরা—বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি—এই নিয়মে এমন বিয়েতে সায় দিলেন না মোটেই; অতএব অধিরথ সূত বলেই পরিচিত হলেন—সূতশ্চাধিরথঃ স্মৃতঃ। আমাদের ধারণা, অধিরথের পিতার এই কুল অতিক্রম করে বিবাহের রটনা এবং ঘটনা—দুইই অধিরথের মর্য্যাদার পরিপন্থী হওয়ায় সময় বুঝে পাণ্ডবরা কর্ণকে 'সূতপুত্র' বলে আঘাত করতে ছাড়েননি। মৎস্য পুরাণ বলেছে—শুধুমাত্র সূত অধিরথ কর্ণকে পালন করেছিলেন বলেই কর্ণ 'সূতপুত্র', আর কোনো কারণ নেই—তেন কর্ণস্তু সূতজঃ।

[মৎস্য পু. ৪৮.১০৪-১০৭]

□ কর্ণের এবং তাঁর পালক পিতার 'সূত' পরিচয় নিয়ে আলোচনার পর আমরা আবার কর্ণের জীবনকথায় ফিরে যাব, কিন্তু তার আগে আরও একবার কুন্তীকে নিয়ে আমাদের দু-চারকথা বলতে হবে। কর্ণ অধিরথের ঘরে গিয়ে ওঠার কিছুকাল পর হস্তিনাপুরের মহারাজা পাণ্ডুকে স্বয়ংবরে বরণ করেছেন কুন্তী, পাণ্ডুর রাজমহিষী হয়ে তিনি এলেন হস্তিনায়। তার কিছুকাল পর কিমিন্দম মুনির অভিশাপের কারণেই হোক বা অন্য যে কোনো কারণে, পাণ্ডু যখন জানতে পারলেন যে তিনি নিজে পুত্র উৎপাদনে অক্ষম—তখন শতশৃঙ্গ পর্বতে সেই বনবাসের সময়ও কুন্তী যদি পাণ্ডুকে কর্ণের জন্মকথাটা বলে দিতেন, তাতে কোনো অসুবিধা হত না। তখনকার দিনের আন্দাজে পাণ্ডু ছিলেন যথেষ্ট উদারমনস্ক। কিন্তু কলঙ্কের কথা বলতে যেন কুন্তীরই রুচিতে বেঁধেছে। তখনকার শিথিল সমাজে কন্যা-অবস্থায় পুত্র জন্মানোটা কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয়। কুন্তীর শাশুড়ি সত্যবতী স্বয়ংই কন্যা-অবস্থায় ব্যাসদেবের জন্ম দিয়েছিলেন।

পাণ্ডু যখন মুনির শাপে প্রজনন-ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন, তখন তিনি কুন্তীকে নিয়োগপ্রথায় প্রস্তুত হওয়ার আগে অদ্ভুত একটা সুযোগ দিলেন। পাণ্ডু বললেন—দেখ কুন্তী! এটা আমাদের আপদ কাল, অন্যভাবে ছেলেপুলে হয় কিনা সেটা আমাদের ভাবতে হবে—

অপত্যোৎপাদনে যত্নম্ আপদি ত্বং সমর্থয়।

এবারে পাণ্ডু মস্ত একটা সুযোগ দিলেন। বললেন—কুন্তী! আমাদের সমাজে বারো রকমের ছেলে স্বীকৃত—সোজাসুজি বিয়ে করা বৌয়ের ছেলে—সে তো ভালই। তা না হলে নিয়োগজাত পুত্র, স্ত্রীর কুমারী অবস্থায় জাত পুত্র—এরকম বারো রকমের ছেলে আছে। এর মধ্যে যে কোনো একরকমের ছেলে থাকলেই—

সর্বেষামেব পুত্রাণাং যদ্যেকো'পি ভবেৎ সুতঃ।

—তা হলেই মনুর কথায় আমি নিজেকে পুত্রবান মনে করতাম। এত বড়ো সুযোগ সত্ত্বেও কুন্তী কিন্তু কর্ণের কথা বললেন না। মহাভারতের রুক্ষ টীকাকার নীলকণ্ঠ পর্যন্ত পাণ্ডুর 'বক্তব্য' বুঝে লিখলেন—ইস্! পাণ্ডু যে বারো রকম ছেলের তালিকা দিলেন তাতে অন্তত দুভাবে কর্ণের পুত্রত্ব সিদ্ধি হয়—

কর্ণাদিসদৃশস্য কানীনস্যাপি অত্রৈব অন্তর্ভাবঃ।

—কিন্তু তবু কুন্তী কিচ্ছুটি বললেন না। এমন নয় যে, কুন্তী কর্ণের খবর রাখতেন না। তিনি কর্ণের খবর আগেই পেয়েছেন সে-কথাও আমরা জানিয়েছি।

কর্ণকে নিজের জীবনে, সমাজের চোখে, এমনকী হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করার এত বড়ো সুযোগ পেয়েও কুন্তী যখন তার জন্মকথা প্রকাশ করলেন না, তখন শেষ পর্যন্ত পাণ্ডু নিয়োগপ্রথার আশ্রয় নিলেন পুত্র উৎপাদনের জন্য। কিন্তু শেষপর্যন্ত পাণ্ডুর বংশরক্ষার জন্য পাণ্ডুর অনুনয় বিনয়ে তাঁকে সম্মত হতে হল—এবং শেষ পর্যন্ত দুর্বাসার কাছ থেকে পাওয়া দেব-বশীকরণের মন্ত্রের কথাও তিনি পাণ্ডুকে জানাতে পারলেন নির্দ্বিধায়। কিন্তু মাতৃত্বের যে হাহাকার সেই প্রথম যৌবনের কাল থেকে তিনি বয়ে বেরিয়েছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত—তার সবটুকুকে একত্রিত করে যদি একটি বার উচ্চারণ করতেন যে দুর্বাসার দেওয়া সেই মন্ত্র তিনি কৌতূহলী হয়ে প্রয়োগ করেছেন সেই সময় আর তার ফল এখন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে অধিরথের আঙিনায়—তাহলে বুঝি কর্ণের জীবনটাই অন্যরকম হত, কিংবা মহাভারত মহাকাব্যের পটভূমিই তৈরি হত কী না সন্দেহ।

[মহা (k) ১.১২০.৩১-৩৭; (হরি) ১.১১৪.৩২-৩৮]

☐ যাই হোক, কুন্তী সামাজিক প্রথায় স্বীকৃত তিনটি পুত্রলাভ করলেন, পাণ্ডু এবং সপত্নী মাদ্রীর মৃত্যুর পর দুই মাদ্রীনন্দনও আশ্রয় পেলেন তাঁর স্নেহছায়ায়। আমরা এখন সেই সময়টিতে এসে উপনীত হয়েছি, যখন হস্তিনাপুরে পাণ্ডব-কৌরব রাজকুমারদের শিক্ষারম্ভের সময় উপস্থিত। আচার্যশ্রেষ্ঠ দ্রোণ তাঁদের শিক্ষাগুরু পদে বৃত হয়েছেন পিতামহ ভীষ্মের দ্বারা। ঠিক এইসময় আমরা 'রাধেয়' কর্ণের প্রতিপালনের ছোট্ট একটা খবর পাচ্ছি। সূত অধিরথ আপন বংশে সূতের গ্লানি ভোগ করছিলেন বলেই দৈবে পাওয়া ছেলেটিকে তিনি ক্ষত্রিয়ের মর্য্যাদায় মানুষ করেছিলেন। তার উপর যে ছেলে জন্মেইছে সোনার কবচ-কুণ্ডল পরে—তাকে সূত জাতীয়দের সাধারণী বৃত্তির মধ্যে ফেলার কথাও অধিরথের মনে আসেনি, দিব্যজন্মা এই শিশুটির প্রতি অধিরথের মনে কিছু সম্ভ্রমও থেকে থাকবে। ছেলে যেই একটু বড়ো হল, অধিরথ তার অস্ত্রশিক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগী হলেন। হস্তিনাপুরের রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং তাঁর বন্ধু—ধৃতরাষ্ট্রস্য বৈ সখা—অধিরথ সেই ভরসায় পুত্র বসুষেণকে পাঠিয়ে দিলেন হস্তিনায়। কুরুরাজ কুমারদের আচার্য দ্রোণের কাছে সে সময় দেশ-বিদেশ থেকে শিক্ষার্থী আসছেন অস্ত্রশিক্ষার পাঠ নিতে। সেই বিদ্যালয়েই শিক্ষার্থী হিসেবে যোগ দিলেন বসুষেণ-কর্ণও। অবশ্য দ্রোণাচার্য হস্তিনায় আসার অনেক আগে থেকেই বসুষেণ হস্তিনাপুরে এসেছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। কুরুরাজকুমাররা যখন কৃপাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষার পাঠ নিচ্ছেন, সে সময়েও কর্ণ ছিলেন তাঁদের সহাধ্যায়ী। পরে দ্রোণ যখন শিক্ষার ভার নিলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়ে থেকে কর্ণও পাঠ নিতে লাগলেন দ্রোণাচার্যের বিদ্যালয়ে। আর এই সময়েই তাঁর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধনের গভীর সখ্যের সূত্রপাত—

তত্রোপসদনং চক্রে দ্রোণস্যেষ্বস্ত্রকর্মণি।
সখ্যং দুর্যোধনেনৈবমগমৎ স চ বীর্যবান্॥

ভালই চলছিল, দ্রোণাচার্যের কাছে ক্রমান্বয়ে অস্ত্রবিদ্যার সমস্ত পাঠ তিনি ভালোই রপ্ত করেছিলেন—

চকারাঙ্গিরসঃ শ্রেষ্ঠাৎ ধনুর্বেদং গুরোস্তদা।

কিন্তু বাদ সাধল কর্ণের উচ্চাভিলাষ। কর্ণের জীবনকথা যেমনটি মহাভারতে আছে তাতে বেশ বোঝা যায় রঙ্গভূমিতে অস্ত্রশিক্ষার প্রদর্শনীর দিনেই যে কর্ণের সঙ্গে দুর্যোধনের প্রথম পরিচয় হল আর সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্গরাজ্যে কর্ণের অভিষেকের পরই তা প্রগাঢ় বন্ধুত্বের রূপ পেল—এমনটা কখনোই নয়। দ্রোণের বিদ্যালয়ে কর্ণ যতদিন ছিলেন, ততদিনেই দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট গাঢ় মৈত্রীসম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। শান্তিপর্বে পরলোকগত কর্ণের জীবনকথা স্মরণ করতে গিয়ে নারদমুনি স্পষ্টই জানিয়েছেন— দুর্যোধনের সঙ্গে যে কর্ণের এত বন্ধুত্ব হল তার কারণ কর্ণের পাণ্ডববিদ্বেষ। পাণ্ডব ভাইদের দেখে, তাঁরা যে তাঁরই আপন ছোটো ভাই তা যদিও কর্ণ তখনও জানতেন না, তবু কর্ণ ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছিলেন। ভীমের বাহুবল, ধনুর্বিদ্যায় অর্জুনের অপরিসীম অধ্যবসায় আর দক্ষতা আর যুধিষ্ঠিরের ঠাণ্ডা মাথার বুদ্ধি দেখে মনে মনে কর্ণ জ্বলে পুড়ে মরছিলেন। এদিকে দুর্যোধনও পাণ্ডবদের দেখতে পারেন না— জ্ঞাতিশত্রুতার কারণে। মূলত এই পাণ্ডববিদ্বেষের জায়গা থেকেই কর্ণের সঙ্গে দুর্যোধনের সখ্য প্রগাঢ়তর হয়ে উঠল। আর

অন্যদিকে কর্ণের সঙ্গে দুর্যোধনের গভীর সখ্যের কারণেই পাণ্ডবদের মনে তাঁর প্রতি একটা সাধারণ বিদ্বেষ তৈরি হয়ে গেল খুব স্বাভাবিকভাবেই। তাঁদের ধারণা হতে লাগল—নীচকুলে জন্মেছে এমন বীর্যবান পুরুষ যদি খারাপ সংসর্গে অর্থাৎ দুর্যোধনের প্রশ্রয়ে মাথায় ওঠে—

বীর্যাধিকো নীচকুলো দুঃসঙ্গেন সমেধিতঃ।

—তাহলে সে কাউকে সম্মান করতে শেখেনা, রাষ্ট্রেরও সমূহ ক্ষতি করে। এভাবেই ধীরে ধীরে আপন ছোটো ভাইদের সঙ্গে কর্ণের জন্মের মতো শত্রুতা তৈরি হয়ে গেল।

তবে কর্ণের পাণ্ডব বিদ্বেষ কিংবা আরও ভাল করে বলতে গেলে অর্জুন-বিদ্বেষের কারণটা কিন্তু আরও গভীরে। কর্ণ দেখছিলেন, দ্রোণাচার্যের শিক্ষালয়ে সেরা ছাত্র হয়ে উঠেছেন অর্জুন। কর্ণ ক্রমে ক্রমে বুঝতেও পারছিলেন যে, প্রতিযোগিতায় তিনি কোনোভাবেই অর্জুনের সঙ্গে পেরে উঠছেন না, ধনুর্বিদ্যায় দক্ষতার যে পর্যায়ে অর্জুন নিজেকে নিয়ে গিয়েছেন, সেখানে পৌঁছানোও তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না কোনোভাবেই। রণক্ষেত্রে কৌশলের অভাব থাকলে প্রতিযোগীপুরুষ যেমন মারণাস্ত্রের ওপর শেষ ভরসা করে, তেমনি অর্জুনের যুদ্ধকৌশলে, পারদর্শিতায় কর্ণ একসময় হতাশ বোধ করতে আরম্ভ করলেন এবং বিশ্বাসও করতে শুরু করলেন যে ধনুর্বেদে অর্জুনই সবার সেরা—

সর্বথাধিকমালক্ষ্য ধনুর্বেদে ধনঞ্জয়ঃ।

কর্ণ অর্জুনকে অতিক্রম করার উপায় খুঁজতে লাগলেন। একদিন যখন পাণ্ডব, কৌরব, কেউ কাছেপিঠে নেই, গুরুপুত্র অশ্বত্থামা পর্যন্ত পিতার কুটিরে অনুপস্থিত, তখন কর্ণ একা চুপি চুপি এসে পৌঁছলেন দ্রোণাচার্যের কাছে। অর্জুনের ওপর হৃদয়-ভরা প্রতিস্পর্ধা নিয়ে একান্তে দ্রোণকে বললেন—গুরুদেব! আমাকে ব্রহ্মাস্ত্র ছোঁড়বার উপায় শিখিয়ে দিন, শিখিয়ে দিন ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়ে তার সম্বরণের উপায়। গুরুদেব! আমি ব্রহ্মাস্ত্র ছোঁড়বার কায়দা শিখতে চাই একটা কারণেই— আমি যাতে অর্জুনের সঙ্গে সমানে সমানে যুদ্ধ করতে পারি—

অর্জুনেন সমং চাহং যুধ্যেয়মিতি মে মতিঃ।

অর্জুন নিশ্চয়ই দ্রোণাচার্যের কাছে পূর্বেই ব্রহ্মাস্ত্রের পাঠ পেয়ে গিয়েছিলেন। কর্ণ নিজেও কম যোদ্ধা নন, অতএব যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কর্ণকে ব্রহ্মাস্ত্রের বিদ্যা দেননি গুরু অথচ অর্জুনকে দিয়েছেন—এই বিষমদর্শিতা গুরুর মনে কিছু ক্রিয়া করতে পারে এই ভেবেই কর্ণ বললেন—ঠাকুর! সমস্ত শিষ্যদের প্রতি আপনার সম-দৃষ্টি (ভাবটা এই যে, সমদৃষ্টি যদি নাই থাকে তো সেটাই হওয়া দরকার)। এমনকী আপনপুত্র এবং শিষ্যের মধ্যেও আপনি ভেদ করেন না—

সমঃ শিষ্যেষু বঃ স্নেহঃ পুত্রে চৈব তথা ধ্রুবম্।

আপনার এই সমদর্শিতার পরেও কেউ যেন আমাকে না বলে, কর্ণ দ্রোণাচার্যের ছাত্র বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিদ্যে হয়নি তার। দ্রোণাচার্য সব শুনলেন, কিন্তু শুনলে হবে কি, প্রথম হওয়া ছাত্র যদি নিপুণ এবং বিনয়ী দুইই হয়, তবে তার ওপরে শিক্ষকের পক্ষপাত থাকবেই। মহাভারতের কবি পরিষ্কার জানিয়েছেন যে, গুরুমাত্রেই সমদর্শী হওয়া উচিত, কিন্তু সবার উপরে তিনি মানুষ। মনুষ্যধর্মে পক্ষপাত এসেই যায়। এইজন্য কর্ণের কথা শুনলেও দেখা যাচ্ছে দ্রোণাচার্যের অর্জুনের ওপর পক্ষপাত রয়েই গেছে,—সাপেক্ষঃ ফাল্গুনং প্রতি। তার ওপরে এতদিনের অস্ত্রশিক্ষার দৌলতে কর্ণকেও তিনি চিনেছেন। কর্ণের প্রতিযোগী মনোভাব, হিংসা, অহঙ্কার এবং সবার ওপরে দুর্যোধনের সঙ্গে তার ওঠা-বসা—কিছুই গুরুমশায়ের নজর এড়ায়নি। তিনি জানেন—শুধুমাত্র প্রতিস্পর্ধার জন্যই যে মারণাস্ত্র কামনা করে, তার হাতে সে অস্ত্র বিনা কারণে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সামনাসামনি কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করতে হলে এ কথা বলা যায় না যে, বাপু হে তুমি বড়ো দুরাত্মা, তোমাকে আমি ব্রহ্মাস্ত্রের বিদ্যা শেখাব না। কিন্তু মনে মনে তিনি কর্ণের দুরাত্মতার কথা বুঝে—

দৌরাত্ম্যঞ্চৈব কর্ণস্য বিদিত্বা তমুবাচ হ।

—দ্রোণ বললেন—ব্রহ্মাস্ত্র! ব্রহ্মাস্ত্র জানার অধিকার আছে ব্রাহ্মণের, আর জানতে পারেন সচ্চরিত্র ব্রতচারী ক্ষত্রিয়, এমনকী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীও ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করতে পারেন, কিন্তু আর কেউ নয়—

নান্যো বিদ্যাৎ কথঞ্চন।

বস্তুত দৈব অস্ত্র লাভ করার জন্য যে নিষ্কাম উদাসীনতা দরকার, সেটা কর্ণের ছিল না বলেই দ্রোণ কর্ণকে এমন এক যুক্তিতে পরিহার

করলেন, যেখানে কর্ণ একেবারেই নাচার। তিনি ব্রাহ্মণ নন, ক্ষত্রিয় নন, সূতজন্মা রাধেয় বলেই তিনি পরিচিত।

আসল কথা, যেখানে অর্জুনও আছেন এবং কর্ণও আছেন, সেখানে অর্জুনকে অতিক্রম করে যে কিছু পাওয়া যাবে না, এটা কর্ণ জানতেন। তাই দ্রোণের এই প্রত্যাখ্যানের জন্য তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন বলেই দেখা যাচ্ছে যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে গুরু দ্রোণকে বিদায় জানিয়ে—আমন্ত্র্য প্রতিপূজ্য চ—কাউকে না বলে হঠাৎ করে গিয়ে পৌঁছলেন মহেন্দ্র পর্বতে। মহেন্দ্রপর্বতে আছেন পরশুরাম, ক্ষত্রিয়দের তিনি কেবলমাত্র একুশবারের শত্রু নয়, চিরকালের শত্রু। তাঁর কাছে—'আমি সচ্চরিত্র ক্ষত্রিয়' বলেও লাভ নেই। কাজেই মহেন্দ্র পর্বতে উপস্থিত হয়ে পরশুরামের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে কর্ণ বললেন—আমি ভার্গব গোত্রের ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণো ভার্গবো'স্মি। ভারদ্বাজ নয়, কাশ্যপ নয়, একেবারে ভার্গব। পরশুরাম নিজেই যে ভৃগুবংশীয় ভার্গব। এতদিন পর আরও একটি ভার্গব ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে বিদ্যা শিখতে আসায় পরশুরাম ভারী খুশি হয়ে কর্ণকে রীতিমত স্বাগত জানালেন—

স উক্তঃ স্বাগতঞ্চেতি প্রীতিমাংশ্চাভবৎ ভৃশম্।

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ কর্ণকে, শৈশবে গোত্রহারা কর্ণকে বুঝি বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন—কর্ণ যে নিজেকে ভার্গব বলে পরিচয় দিলেন, তার কারণ তিনি ভাবলেন—গুরু তো পিতার সমান হয়, অতএব ভার্গব পরশুরামকে তিনি যখন গুরু বলে ফেলেছেন, সেখানে নিজেকে ভার্গব বলে পরিচয় দিলে ক্ষতি কী! আমরা কিন্তু এই মুহূর্তে কর্ণের ওপরে নীলকণ্ঠের এই মায়া ভাল চোখে দেখছি না। দেখছি না এইজন্যে যে, কর্ণ চরিত্রের শেষ পর্যন্ত গেলে আমাদেরও মায়াই হবে; কিন্তু এই মুহূর্তে যে পরশুরামের কাছে নিজেকে ভার্গব বলে পরিচয় দিলেন তার একমাত্র কারণ সেই মারণাস্ত্র লাভের আশা, যা তাঁকে অর্জুনের সমকক্ষ করে তুলবে।

[মহা (k) ১.১৩২.১১-১২; ৩.৩০৯.১৬-২০; ১২.২.৫-১৪; (হরি) ১.১২৮.২০-২১; ৩.২৬৩.১৬-২০; ১২.২.৫-১৪]

□ যাই হোক মহেন্দ্র পর্বতে কর্ণ অস্ত্রশিক্ষা করতে থাকলেন পরশুরামের কাছে। সেখানে থাকতে থাকতে অনেক দেবতা, গন্ধর্ব, রাক্ষস এবং অনেক অতিমানুষ লোকের সঙ্গে কর্ণের বন্ধুত্বও হয়ে গেল। এরই মধ্যে ঘটল এক অঘটন। দিনরাত মুক্ততরবারি আর ধনুক-বাণ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে যেখানে সেখানে লক্ষ্যভেদ অনুশীলন করার ফলে নিজের অজ্ঞাতেই তিনি এক ব্রাহ্মণের হোমধেনু মেরে ফেললেন। ব্রাহ্মণ রেগে শাপ দিলেন—যার কথা মনে করে তুই দিনরাত এই অস্ত্রাভ্যাস করে যাচ্ছিস, তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে তোর রথের চাকা বসে যাবে মাটিতে—

যুধ্যতস্তেন তে পাপ ভূমিশ্চক্রং গ্রসিষ্যতি।

কর্ণ অনেক অনুনয় বিনয় করলেন, অনেক টাকা-পয়সা, গোরু, ধনরত্ন দিতে চাইলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হলেন না। অধোমুখে ভীতমনে কর্ণ এসে পৌঁছলেন গুরুর আশ্রমে, কিন্তু কিচ্ছুটি বললেন না।

কর্ণের বাহুবীর্য্যে, কৌশলে, গুরুসেবায় পরশুরাম কিন্তু সম্পূর্ণ খুশি হয়েছিলেন। খুশির উপহার হিসেবে তিনি কর্ণকে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করার কৌশল এবং সে অস্ত্র সংবরণ করার নিয়ম—সবই শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ব্রহ্মাস্ত্র জেনে বারবার তিনি সে অভ্যাস রপ্ত করছেন এবং যেন আরও মন দিয়ে ধনুর্বিদ্যা অধিগত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কপাল যদি মন্দ হয় তবে জেনেও সে জানা কাজে আসে না। সেদিন উপবাসক্লিষ্ট পরশুরাম আশ্রমের কাছেই এক জায়গায় কর্ণের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমিয়ে আছেন গুরু—এই সময়ে কাঁকড়াবিছে ধরনের একটি কীট কর্ণের ঊরুভেদ করে রক্ত খেতে লাগল। গুরুর ঘুম ভেঙে যাবে বলে কর্ণ একটুও নড়লেন না। অসহ্য বেদনা ভোগ করেও কর্ণ অপেক্ষা করতে লাগলেন—কখন গুরুর ঘুম ভাঙবে সেই সময়ের জন্য। তিনি গুরুকে একটুও নাড়ালেন না, একটু ব্যথার ভাব দেখালেন না, শুধু বীরের ধৈর্য্যে গুরুর মাথাটি নিশ্চল ঊরুতে ধারণ করে রইলেন—

অকম্পয়ন্ অব্যথয়ন্ ধারয়ামাস ভার্গবম্।

রক্তের ধারা বয়ে গিয়ে এবার পরশুরামের গায়ে লাগল। ঘুম ভেঙে সচকিত মনে তিনি

বললেন—রক্ত গায়ে লেগে আমি অশুচি হলাম, বল কী হয়েছে, ঠিক ঠিক বল। কর্ণ বললেন, সব বললেন। পরশুরাম বললেন—দেখ বাপু! ব্রাহ্মণের ধৈর্য্য-সহ্য কতটুকু সব আমার জানা আছে, এই দারুণ কীটের দংশন কোনো ব্রাহ্মণ সন্তান সইতে পারবে না, এই সহ্যশক্তি ক্ষত্রিয়ের মানায়, সত্যি করে বল তুমি কে? আমতা আমতা করে সানুনয়ে কর্ণ বললেন—আমার জন্ম হয়েছে সেই ঘরে, যে ঘরের ক্ষত্রিয় পুরুষ এক ব্রাহ্মণীর পাণিগ্রহণ করেছিল—আমি সূত জাতির ছেলে—

ব্রহ্মক্ষত্রান্তরে জাতং সূতং মাং বিদ্ধি ভার্গব।

আমাকে লোকে রাধেয় কর্ণ—রাধার ছেলে বলে ডাকে।

সত্যি বলতে কি অস্ত্রের লোভেই আমি মিথ্যে কথা বলেছি—

প্রসাদং কুরু মে ব্রহ্মন্ অস্ত্রলুব্ধস্য ভার্গব।

আমি জানি, গুরু হলেন পিতার মতো, সেইজন্যে আপনার গোত্রেই আমি নিজের পরিচয় দিয়েছি।

টীকাকার নীলকণ্ঠ আগেই কর্ণের এই যুক্তি দেখিয়ে কর্ণের ওপর মায়া দেখিয়েছেন, কিন্তু আসলে কর্ণ ছলনাই করতে চেয়েছিলেন। বিপদে পড়লে যেহেতু যুক্তি মাথা থেকে বেরয়, তাই এখন তিনি বলছেন—আপনি আমার পিতার মতো, তাই আপনার গোত্রেই প্রথম পরিচয় দিয়েছি। গুরুর গোত্রে শিষ্যের পরিচয় অবশ্য শাস্ত্রসম্মত, কিন্তু সে গোত্র পরম্পরায় নেমে আসে গুরুর কাছে দীক্ষিত হবার পর অথবা বহুকাল শিষ্যত্বসিদ্ধির পর, শিষ্য হবার আগেই নয়। যাই হোক আপন পরিচয় দিয়ে কর্ণ ভয় পেয়েছেন, তিনি কাঁপছিলেন। শিষ্যের অতদূর ধৈর্য্যে, গুরুসেবার নিশ্চল বৃত্তিতেও পরশুরামের মায়া হল না। তিনি মারণাস্ত্রলুব্ধ শিষ্যের মিথ্যা পরিচয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—শুধুমাত্র অস্ত্রের লোভে তুই যেহেতু আমায় সঙ্গে মিথ্যা আচরণ করেছিস, তাই তোর বিনাশকালে কিংবা অসম্ভব সংকটের মুহূর্তে ব্রহ্মাস্ত্র ছোড়বার কৌশল তোর মাথায় আসবে না—

ন তে মূঢ় ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিভাস্যতি।

তা ছাড়া এক্ষুনি তুই আমার সামনে থেকে দূর হ, কারণ মিথ্যের কোনো জায়গা নেই আমার আশ্রমে—

গচ্ছেদানীং ন তে স্থানম্ অনৃতস্যেহ বিদ্যতে।

তবে হ্যাঁ, অত ধৈর্য্য ধরে, অত যন্ত্রণা সহ্য করে কর্ণ যে গুরুর ঘুমের ব্যাঘাত করেননি, তাতে পরশুরাম একটু খুশি হলেন বইকি! তিনি বললেন—হ্যাঁ! তোমার এইটুকু হবে যে, যুদ্ধে অন্য কোনো ক্ষত্রিয় পুরুষ তোমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। বাস্, এইটুকুই। এর বেশি কর্ণ তাঁর সারা শিক্ষাজীবন ধরে এতগুলি গুরুর কাছে চেয়েছেন, কিন্তু পাননি। যাও বা গুরু পরশুরামের কাছে গোত্র ভাঁড়িয়ে পাওয়া গেল, সেই মারণাস্ত্রের ব্যবহার-ক্ষমতা তাঁর নিজেরই প্রবঞ্চনায় নিজের কাছে হারিয়ে গেল।

মহেন্দ্র পর্বত থেকে ফিরে এসে কর্ণ প্রথম দেখা করলেন দুর্যোধনের সঙ্গে এবং তাঁর কাছে ফের তিনি মিথ্যে কথা বললেন। বললেন—সমস্ত অস্ত্রের কৌশল আমি শিখে ফিরেছি, বন্ধু—

দুর্যোধনম্ উপাগম্য কৃতাস্ত্রোঽস্মি ইতি চাব্রবীৎ।

স্বয়ং পরশুরামের সমস্ত অস্ত্রের কৌশল-শেখা কর্ণ দুর্যোধনের কাছে আরও প্রিয়তর হয়ে উঠলেন। দুজনের মিলনে দুজনেরই খুব আহ্লাদ হল—দুর্যোধনেন সহিতো মুমুদে . . .। কর্ণ ফিরে এসে সেই লোকটার সঙ্গে পুনরায় জুটে গেলেন যার সঙ্গে অর্জুনের বৈরিতা আছে, যার সঙ্গে পাণ্ডবদের শত্রুতা আছে। হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে তখন অস্ত্রপরীক্ষার দিন গণনা চলছিল। যাঁরা ভাবেন অস্ত্রপরীক্ষার দিনে হঠাৎ কর্ণ এসে অর্জুনের প্রতিযোগী হয়ে রঙ্গস্থলে ধূমকেতুর মত উদয় হলেন, তাঁরা আমাদের পূর্বকথাগুলি ভেবে দেখবেন। আমাদের বিশ্বাস—রঙ্গস্থলে কর্ণের আসাটা পূর্ব-পরিকল্পিত এবং সেটি দুর্যোধনের সঙ্গেই কল্পিত। কর্ণের মনে দ্রোণ-গুরুর ব্যাপারে কিছু কাঁটাও ছিল এবং তাঁর ভাবটা এই— প্রতিযোগিতা যখন হচ্ছে, সেখানে অর্জুন তাঁর অস্ত্রকৌশল দেখিয়ে জনতার ধন্যধ্বনি তুলবেনই, ঠিক সেই মুহূর্তে দ্রোণের চরম-শিক্ষাটি না পেয়েও যদি অর্জুনের রণ-রস একটু খাটো করে দিতে পারেন সবার সামনে তাই বা মন্দ কী? পাঠক কিন্তু মনে রাখবেন কর্ণ পরশুরামের কাছ থেকে সোজা দুর্যোধনের কাছে এসেছিলেন; পিতা অধিরথের কাছেও যাননি, মা রাধার সঙ্গেও দেখা করেননি। সুদূরে চম্পায় বসে অধিরথ হয়তো কেবল এইটুকু শুনেছেন যে, কর্ণ ভালোয় ভালোয়

হস্তিনাপুরে পৌঁছেছেন। অধিরথ এও শুনে থাকবেন যে, হস্তিনাপুরে রাজপুত্রদের অস্ত্রপরীক্ষার দিন এগিয়ে আসছে। তিনি প্রিয় পুত্রের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য এবং অস্ত্র পরীক্ষার দিন কর্ণ যাতে প্ররোচিত না হন সেই জন্যই হয়তো বা রওনা দিয়েছিলেন হস্তিনার পথে।

অবশেষে সেই দিন এল। স্বয়ং দ্রোণ অস্ত্র পরীক্ষার শুভক্ষণ ঘোষণা করলেন। প্রথমে ভীম এবং দুর্যোধন যথেষ্ট গদাযুদ্ধের কসরত দেখালেন। কৃত্রিম যুদ্ধ শেষে আসল যুদ্ধে পরিণত না হয়, সেই ভয়ে দুজনকে শেষ পর্যন্ত নিবৃত্ত হবার আদেশ দিলেন দ্রোণ—

কৃত যোগ্যৌ উভৌ অপি।

এবার ডাকলেন অর্জুনকে। শুধু ডাকা নয়, তাঁর ডাকার মধ্যে গুরুর সমস্ত প্রশ্রয় মেশানো ছিল, অর্জুনের মধ্যে তিনি আপন প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি বললেন—বাজনদারেরা! বাজনা থামাও, কথা শোনো—যে আমার ছেলের থেকেও প্রিয়, যে সমস্ত অস্ত্রের কৌশল জানে, সেই অর্জুন এবার এসো সামনে। অর্জুন এলেন, দৃপ্ত ভঙ্গিতে ধনুকবাণ হাতে নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঢাক-ঢোল, কাঁসি একসঙ্গে বেজে উঠল। সমবেত জনতার আবেগে, অর্জুনের মহান উপস্থিতিতে কুরুপিতা ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত অর্জুনের প্রশংসায় মেতে উঠলেন। বললেন—বিদুর! আজকে সত্যিই আমরা সুরক্ষিত বোধ করছি। আনন্দাশ্রুতে জননী কুন্তীর বুক ভেসে গেল—

অস্রৈঃ ক্লিন্নমুরো'ভবৎ।

অর্জুন এবার অস্ত্রকৌশল দেখাতে থাকলেন। কখনো তিনি বাণমুখে আগুন সৃষ্টি করছেন, কখনো জল, কখনো ঝড়। কখনো তাঁকে রথের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, কখনো অন্তর্হিত, কখন তাঁকে লম্বা দেখাচ্ছে, কখনো বা হ্রস্ব—সবই অর্জুন দেখাচ্ছেন বাণের গতি-চাতুরিতে। যত অদ্ভুত বাণের খেলা দেখা যাচ্ছে, বাজনদারেরা ততই উৎসাহে বাজনা বাজাচ্ছিল। তারপর অস্ত্রপরীক্ষার রঙ্গ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কমে এসেছে জনতার কোলাহল, বাজনদারের বাজনা—

মন্দীভূতে সমাজে চ বাদিত্রস্য চ নিস্বনে।

এমন সময় রঙ্গদ্বার থেকে এক বিরাট শব্দ শোনা গেল, বজ্রের মতো তার আওয়াজ, মেঘধ্বনির মতো তার গাম্ভীর্য্য। সবাই একযোগে রঙ্গদ্বারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। সোনার কবচ-কুণ্ডলের শোভায় দীপ্তিমান হয়ে সূর্যের আলো-মাখা কর্ণ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন, তাঁর হাঁটা-চলায় যেন পাহাড়ের গাম্ভীর্য্য ফুটে উঠেছে—পাদচারীব পর্বতঃ। আমাদের ধারণা কর্ণ খুব দূরে কোথাও ছিলেন না, মনে মনে পণও ছিল—যাব না রঙ্গভূমিতে, দর্শক হিসেবেও না। কিন্তু অর্জুনের ধনুক-টঙ্কারে, জনতার জয়ধ্বনিতে আর মুহুর্মুহু যুদ্ধ-বাজনা তীব্রতর হওয়ায় তিনি আর থাকতে পারেননি। অর্জুনের প্রতি তাঁর আক্রোশই রঙ্গশেষের বেলায় তাঁকে টেনে আনল রঙ্গভূমিতে।

রঙ্গভূমির মাঝখানে, যেখানটা অর্জুন দাঁড়িয়েছিলেন, একেবারে সেইখানটা এসে কর্ণ চারিদিকটা দেখে একবার ঠাহর করে নিলেন। দ্রোণ আর কৃপকে একটা প্রণাম জানালেন অত্যন্ত অনাদরে, অবহেলায়—

প্রণামং দ্রোণকৃপয়োর্নাত্যাদৃতমিবাকরোৎ।

ভাবটা এই—তোরা আমায় শেখালি না, কিন্তু আমি সব শিখেই এসেছি। বড়ো ভাই ছোটো ভাইকে চিনল না—ভ্রাতা ভ্রাতরমজ্ঞাতম্—সবার সামনে অর্জুনকে উদ্দেশ করে কর্ণ বললেন—অর্জুন! এক একটা বাণ চালানোর মধ্যে যেন কত কায়দা আছে এমন একটা বিশেষ ভাব দেখিয়ে যে তুমি ধনুক-বাণের কেতা দেখিয়েছ, সে সবই আমি আবার করে দেখাব—

করিষ্যে পশ্যতাং নৃণাং।

—তুমি নিজেকে নিয়ে অত বিস্ময়ের ভাব জাগিয়ে তুলো না। যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত বস্তুর মত জনতা একেবারে লাফ দিয়ে উঠল—ছেলেটা বলে কী, অর্জুনের মতো করবে! দ্রোণও অনুমতি দিলেন—একজনকে তিনি সম্পূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন, আর একজনকে শুধু জাতের লঘুতায় বঞ্চিত করেছেন, তাঁকে ছাড়াই সে কতটা শিখল, এই কৌতূহল থেকেই তিনি কর্ণকে অনুমতি দিলেন। সত্যি, কর্ণ সব করে দেখালেন, যা যা অর্জুন করেছিলেন—

যৎ কৃতং তত্র পার্থেন তচ্চকার মহাবলঃ।

একশো ভাইয়ের সঙ্গে একযোগে দুর্যোধন সবার সামনে জড়িয়ে ধরলেন কর্ণকে। বললেন—দারুণ করেছ বন্ধু! তুমি আমার কুরুরাজ্যে যা ইচ্ছে ভোগ কর। কর্ণ

বললেন—আমি শুধু তোমার বন্ধুত্ব চাই, আর এখনই অর্জুনের সঙ্গে সোজাসুজি লড়তে চাই। সেও ক্ষমতা দেখাক, আমিও দেখাব। দুর্যোধন বললেন—তুমি বন্ধুর মুখ উজ্জ্বল কর, শত্রুদের উপযুক্ত শিক্ষা দাও তুমি—

দুহৃদাং কুরু সর্বেষাং মূর্ধ্নি পাদম্ অরিন্দম।

পাণ্ডবদের ওপর সাধারণ শত্রুতায় দুর্যোধন এবং কর্ণ আবার একসঙ্গে হাত মেলালেন।

অর্জুন খুব অপমানিত বোধ করলেন। তাঁর লজ্জাও হল রাগও হল। তিনি বললেন—না ডাকতেও যারা রবাহূত আসে, না কথা বললেও যারা কথা বলে, তুমি তাদেরই মতো, কর্ণ! কর্ণ বললেন—রঙ্গস্থল সবার, সর্বসাধারণের, তোমার এতে বলার কী আছে অর্জুন—কিমত্র তব ফাল্গুন। যাঁরা বলবান, তাঁরা শক্তির পেছনে ধাওয়া করেন। তা ছাড়া তোমার এত বড়ো বড়ো কথা বলার তো কিছু নেই, বাণের মুখে কথা বল, আমি জবাব দিচ্ছি। আজকে তোমার গুরুর সামনেই তোমার মাথাটা গলা থেকে খসিয়ে দেব আমি—

গুরোঃ সমক্ষং যাবৎ তে হরাম্যদ্য শিরঃ শরৈঃ।

বেশ বোঝা যায় অর্জুনের ওপর কর্ণের যত রাগ, তাঁর গুরু দ্রোণের ওপরেও ঠিক ততখানি। ফাঁকে ফোকরে, দ্রোণকেও তিনি বক্রোক্তি করতে ছাড়ছেন না। অর্জুন দ্রোণের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রস্তুত হলেন যুদ্ধের জন্য। কর্ণও প্রস্তুত। দুই মহাবীরের 'চ্যালেঞ্জে' সমস্ত রঙ্গস্থলের সমর্থকেরা দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। কর্ণের পাশে পাশে থাকলেন ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা—

ধার্তারাষ্ট্রাঃ যতঃ কর্ণঃ।

আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ—এঁরা দাঁড়ালেন অর্জুনের দিকে। রঙ্গস্থলের সমাজ দ্বিধা হল, এমনকী রমণীরা পর্যন্ত দুই বীরের সমর্থনে দ্বিধা হলেন। কিন্তু দ্বিধাভিন্ন রমণীকুলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন জননী অজ্ঞান হয়ে গেলেন। শেষে বিদুর, যিনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে রঙ্গস্থলের বিবরণ শোনাচ্ছিলেন, তিনি কোনোরকমে দাসীদের ডেকে চন্দন জলের ছিটায় কুন্তীকে বিপদমুক্ত করলেন। কিন্তু জ্ঞান ফিরেও সেই পরস্পর-স্পর্ধী দুই পুত্রকে দেখে কুন্তী যে কী করবেন কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। তিনি চেঁচিয়ে বলতে পারতেন—ওরে কর্ণও আমার ছেলে, তোরা কেউ যুদ্ধ করিস না। তাতে লোকলজ্জা, কন্যাগর্ভের কথা সর্বসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ত। যদি বা এত কথা তিনি নিজমুখে নাও বলতেন, ত্রিকালজ্ঞ মুনি-ঋষিরা তাঁকে ছাড়তেন না। স্বয়ং ব্যাস এই অস্ত্রপরীক্ষার দিনে মঞ্চে বসে ছিলেন। কুন্তীর সংকট মুহূর্তে তিনি সব বলে দিতেন, তাতে জ্বালা আরও বাড়ত, কমত না। কিন্তু পুত্র পরিচয়ের সম্মান যে দিতে পারে না, তাকেও অসম্মানের জ্বালা বইতে হয়, আরেকভাবে। অনিবার্য যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য তখন কৃপের মুখে নির্মম প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হয়, তাতেও কুন্তীর জ্বালা বাড়ে, কমে না। কৃপ বললেন—ইনি পৃথার পুত্র, পাণ্ডব অর্জুন, ইনি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। তোমার কোন বংশে জন্ম, মাতৃকুল, পিতৃকুল সব বল। সেগুলো জেনেই ইনি যুদ্ধ করবেন তোমার সঙ্গে, কারণ রাজপুত্রেরা কুলমানহীন সাধারণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন না। আসলে দুয়ে দুয়ে যখন দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, তখন এই নিয়ম, প্রত্যেককে আপন আপন কুলপরিচয় দিয়ে যুদ্ধে নামতে হয়। কৃপ কর্ণের কুলপরিচয় জিজ্ঞাসা করে চরম অপমান করলেন কর্ণকে। কর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এত বড়ো বীর যে এক মুহূর্তে চুপটি করে গেলেন তাতে মহাভারতের কবির মনে আঘাত লেগেছে। তিনি বলছেন, কৃপের প্রশ্ন শুনে কর্ণের মুখটি লজ্জায় অবনত হল। অর্জুনের সঙ্গে প্রতিস্পর্ধী কর্ণের মুখটি লাগছিল সদ্য ফোটা পদ্মের মত। এই মুহূর্তে সেই ফুল্ল পদ্মের ওপর কৃপের প্রশ্ন যেন বর্ষার জল ঢেলে দিল—

বভৌ বর্ষাম্বুবিক্লিন্নং পদ্মমাগলিতং যথা।

এগিয়ে এলেন দুর্যোধন। এই অপমানের দিনে দুর্যোধন সত্যিই বন্ধুর কাজ করলেন। তিনি বললেন, আচার্য! তিন রকমের রাজা হয়—যিনি সৎকুলে জাত, যিনি বীর এবং যিনি সৈন্য-পরিচালনা করতে পারেন। তবু যদি রাজা নয় বলে অর্জুনের যুদ্ধে শুচিবাই থাকে, তবে এই মুহূর্তে কর্ণকে আমি অঙ্গরাজ্যের রাজা করে দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে ফুল, খই, মুকুট, সোনার পিঁড়ি, সব এসে গেল। মন্ত্রবিদ ব্রাহ্মণেরা অভিষেকমন্ত্র পড়লেন। জয়শব্দ উচ্চারণ করলেন কৌরবেরা। যবনী রমণীরা কর্ণের মাথার ওপর ছাতা ধরে চামর ঢুলাতে লাগল—

সচ্ছত্রবালব্যজনো জয়শব্দোত্তরেণ চ।

কর্ণ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

দুর্যোধনকে তিনি বললেন—রাজ্য দিয়েছ তুমি, এর উত্তরে আমি কীই বা দিতে পারি তোমায়। দুর্যোধন বললেন—কিছু নয়, শুধু তোমার বন্ধুত্ব চাই। দুই পাণ্ডববিরোধী মহাবীর পরস্পর আলিঙ্গন করলেন।

তবু যুদ্ধ হত, অর্জুন-কর্ণে তবু একটা যুদ্ধ তখনই লাগত। কিন্তু সেই মুহূর্তে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলেন বৃদ্ধপ্রায় এক মানুষ, পথক্লেশে এবং তাড়াতাড়িতে তাঁর উত্তরীয়বাস লুটোচ্ছে ভুঁয়ে। ঘেমে নেয়ে লাঠিতে ভর করে প্রবেশ করলেন কর্ণের পিতা সূত অধিরথ। তাঁকে দেখা মাত্র ধনুক ত্যাগ করে কর্ণ তাঁর অভিষেকের জল-ধোয়া মাথাটি লুটিয়ে দিলেন অধিরথের পায়ে—

কর্ণো'ভিষেকার্দ্রশিরাঃ শিরসা সমবন্দত।

এতগুলি প্রণম্য লোকের সামনে পুত্রের এমন সগর্ব প্রণাম পেয়ে অধিরথের যেন কেমন লজ্জা করতে লাগল। নিজের কাপড়ের খুঁটি দিয়ে নিজের পা দুখানি ঢেকে তিনি বললেন—থাক্ বাবা! থাক্ থাক্। অঙ্গরাজ্যের অভিষেকে আর্দ্র-শির কর্ণের মাথায় পিতৃতীর্থের আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

অসহিষ্ণু মধ্যম পাণ্ডব এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার সূত অধিরথকে দেখে তাঁর কথায় ধার এলে গেল। ভীম বললেন—ওরে সারথির বেটা, তুই না রাজপুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করবি বলছিলি। তুই বরং যা, ধনুক ছেড়ে তাড়াতাড়ি ঘোড়ার লাগাম ধর হাতে—

কুলস্য সদৃশস্তূর্ণং প্রতোদো গৃহ্যতাং ত্বয়া।

এ আবার অঙ্গরাজ্যের রাজা হয়েছে, তোর কি সে যোগ্যতা আছে? এইসব কাদা-ছোঁড়া কথার উত্তরে কর্ণের বিকল্প আছে শুধু দীর্ঘশ্বাস, আর আছে পিতৃকল্প সূর্যের দিকে তাকানো। আবার প্রতিবাদ করলেন দুর্যোধন। বললেন—এসব বাজে কথা বোলো না ভীম। ক্ষত্রিয়ের বলই সব; বলবান পুরুষ আর নদীর উৎস খুঁজতে যেয়ো না, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে। এই বিশ্বামিত্র, দ্রোণ, কৃপ—এঁদেরও জন্মবিন্দুতে রহস্য আছে। আর ভীম! তোমাদের পাঁচভায়ের জন্ম কেমন করে হয়েছে তাও আমি জানি—

ভবতাঞ্চ যথা জন্ম তদপ্যাগমিতং ময়া।

তা ছাড়া চেয়ে দেখ, এই যাঁর চেহারা, সোনার বর্ম আর সোনার কুণ্ডল যাঁর জন্ম থেকে গায়ে আঁটা, সূর্যের মতো উজ্জ্বল গায়ের রং—এইরকম মানুষের জন্ম কি নীচকুলে হতে পারে, হরিণীর পেটে কি বাপু বাঘ জন্মায়—

কথমাদিত্যসংকাশং মৃগী ব্যাঘ্রং জনিষ্যতি।

দুর্যোধন বললেন—আরে! শুধু অঙ্গরাজ্য নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই রাজা হবার উপযুক্ত আমাদের কর্ণ। তা ছাড়া কারও যদি আমার কথাবার্তা ভালো না লাগে, সে এস না বাপু, যুদ্ধ করবে।

আবার যুদ্ধ হয় হয়। রঙ্গস্থলের লোকেরা, দর্শকেরা হাহাকার করে উঠল। কিন্তু ওই সময়ে সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত গেল। কাজেই শুধুমাত্র আলোর অভাবে সে যাত্রা আর কিছু হল না। অস্ত্র-পরীক্ষার দিনে সবচেয়ে বড়ো লাভ হল দুর্যোধনের। সব শিখে এসেছি বললেও কর্ণেরও একটা পরীক্ষা প্রয়োজন ছিল। ব্রহ্মাস্ত্র পর্যন্ত নাই যাক, যতটুকু দেখেছেন, তাতেই দুর্যোধন দারুণ খুশি। তিনি হাতে ধরে আগে আগে নিয়ে চললেন তাঁকে এবং তাঁর একশো ভাই মশাল জ্বালিয়ে কর্ণের জয়ধ্বনি দিয়ে মিছিল করে চলল—

দীপিকাগ্নিকৃতালোক স্তস্মাদ্ রঙ্গাদ্ বিনির্যযৌ।

পাণ্ডবরাও ভীষ্ম-দ্রোণদের সঙ্গে বেরিয়ে নিজের নিজের ঘরে গেলেন। সমাজের লোকেরা কেউ অর্জুনের প্রশংসা করতে লাগল, কেউ বা কর্ণের, এমনকী কেউ কেউ দুর্যোনেরও প্রশংসা করতে লাগল। পাণ্ডবভাইদের মধ্যে যুদ্ধবলে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ যুধিষ্ঠিরের ধারণা হল যে, কর্ণের মতো বীর বুঝি আর দুনিয়ায় নেই। কিন্তু দুর্যোধনের লাভ, পাণ্ডবদের ক্ষতি, আচার্যদের অপমান—এ সব কিছু অতিক্রম করে অতি অদ্ভুত এক চাপা আনন্দ রঙ্গস্থলে বসে-থাকা এক রমণীকে আপ্লুত করে দিল। যেখানে পাণ্ডব-জননী কুন্তী অন্যান্য কুলবতীদের সঙ্গে তাঁদের মতো করেই কথা-বার্তা বলতে বলতে ঘরে ফিরছিলেন, সেখানে তাঁরই মধ্যে এক কুমারী-জননী হৃদয়-ভরা চাপা আবেগে ভেসে যাচ্ছিলেন। যাঁকে নাম ধরে ডাকতে পারেননি, লোকলজ্জায় যাঁকে জননীর প্রথম বাৎসল্য থেকে বঞ্চিত করেছেন, তাঁর সেই ছেলে আজ রাজা হয়েছে। কুমারী-গর্ভের মতো এ আনন্দও যে অপ্রকাশ্য—আনন্দ প্রকাশিত হলে পূর্বের লজ্জাও প্রকাশিত হবে, তাই চাপা আনন্দ—

পুত্রম্ অঙ্গেশ্বরং স্নেহাচ্ছন্না প্রীতিরজায়ত।

রঙ্গভূমিতে সেদিনের অনুষ্ঠান শেষ হল, কর্ণ অঙ্গরাজ্যে রাজা হলেন এবং অর্জুনের সঙ্গে তাঁর চিরশত্রুতা তৈরি হয়ে গেল—এই সমস্ত ঘটনার মাঝে একটা কথা না বললেই নয়। সেদিন রঙ্গভূমিতে এসে কর্ণ যত তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই কৃপ আর দ্রোণাচার্যকে প্রণাম করে থাকুন, মহাভারতের কাহিনী পরম্পরায় তাঁকে কিন্তু খুব স্পষ্টভাবেই তিনজন গুরুর শিষ্য বলা হয়েছে। এই গুরুদের প্রতি তাঁর মনোভাব কিংবা গুরুদের থেকে তাঁর প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি যেমনই ঘটে থাকুক না কেন, কর্ণের জীবনকথা বর্ণনা করতে গিয়ে মহাভারত স্পষ্টই জানিয়েছে যে কর্ণ কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য এবং পরশুরাম—এই তিনজনের কাছ থেকে অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেছিলেন—

দ্রোণাৎ কৃপাচ্চ রামাচ্চ সো'স্ত্রগ্রামং চতুর্বিধম্।

[মহা (k) ১২.২.১৫-২৯; ১২.৩.১-৩৩; ৩.৩০৯.১৮; ১.১৩৫.২৬-৩২; ১.১৩৬-১৩৭ অধ্যায়; (হরি) ১২.২.১৫-২৯; ১২.৩.১-৩৩; ৩.২৬৩.১৮; ১.১৩০.২৬-৩২; ১.১৩১-১৩২ অধ্যায়]

□ কর্ণের প্রথাগত ছাত্রজীবন শেষ হয়েছে। তিনি এখন বড়ো হয়েছেন। বয়স যেমন কালের নিয়মমতো বেড়েছে, তার পাশাপাশি তাঁর বয়স আরও অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছে তাঁর জন্মের রহস্য, আরও অনেক বেশি বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে তাঁর জন্মরহস্যের পরম্পরায় জমে ওঠা অপমান। অস্ত্রশিক্ষার 'স্ট্রাগল' তাঁর বয়স বাড়িয়ে তুলেছে, বয়স বাড়িয়েছে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদের পরতন্ত্রতা। লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল—অঙ্গরাজ্যের রাজমুকুট মাথায় পড়ে দুর্যোধনের বন্ধুত্ব আর উপকারের ঋণে কর্ণ বাঁধা পড়লেন ঠিকই, ঋণের বোঝা বহনও করলেন সারা জীবন, কিন্তু পিতা অধিরথকে সঙ্গে নিয়ে অঙ্গদেশের সিংহাসন দখল করার জন্য তড়িঘড়ি রওনা তিনি দিলেন না। বরং দুর্যোধনের উপকারের প্রতিদানস্বরূপ তাঁর কাছে নিজের প্রতিদিনের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতেই কর্ণ অনেক বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দ্রোণ যখন গুরুদক্ষিণা হিসেবে দ্রুপদ পাঞ্চালকে বন্দি করে আনার আদেশ দিলেন, তখন সে যুদ্ধে কর্ণের অংশ নেবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ গুরু হিসেবে দ্রোণকে ত্যাগ করেছিলেন কর্ণ নিজে, গুরুদক্ষিণা দেবার দায়বদ্ধতা কখনোই তাঁর ছিল না। তৎসত্ত্বেও কর্ণ গেলেন, শুধুমাত্র দুর্যোধনের সঙ্গে যাবার জন্যই গেলেন। কিন্তু অর্জুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে এইখানে তাঁর প্রথম হার হল। সেই হার থেকে জন্ম নিল ক্রোধ আর তার ফল দাঁড়াল এই যে কর্ণ হস্তিনাপুরের রাজবাড়ির দৈনন্দিন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেন। দুর্যোধন প্রতিনিয়ত চিন্তা করছেন কী করে জ্ঞাতিভাই পাণ্ডবদের শায়েস্তা করা যায়। দুর্যোধনের সঙ্গে থাকতে থাকতে পাণ্ডবদের শাস্তিচিন্তা কর্ণেরও একান্ত আপন কর্তব্য বলে মনে হতে লাগল। আগুনে ঘি পড়ল যখন অস্ত্রপরীক্ষার দিন থেকে প্রায় এক বছর পরেই যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজের পদে অভিষেক করলেন স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র। শুধু যুবরাজ হলেও হত, রাজ্য পাওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই যুধিষ্ঠির আপন গুণে পিতা-পিতামহের কীর্তি ম্লান করে দিলেন। অন্যদিকে গুরু দ্রোণ গদগদ হয়ে অর্জুনকে দিয়ে দিলেন ব্রহ্মশির অস্ত্র, যা তিনি তাঁর গুরুর কাছে পরম্পরাক্রমে পেয়েছিলেন। কৌরবদের আরও রাগ হল এইজন্যে যে, যুধিষ্ঠিরের প্রতিনিধি হয়ে অর্জুন এমন কতগুলি রাজ্য জয় করে এলেন, যা তাঁর বাবাও পারেননি—

ন শশাক বশে কর্তুং যং পাণ্ডুরপি বীর্যবান্।

সবাই যখন ধন্য ধন্য করতে আরম্ভ করল, তখন দুর্যোধনের অন্তঃকক্ষে যে সামান্য কজন পাণ্ডবদের জতুগৃহে পুড়িয়ে মারবার বুদ্ধি করলেন, তার মধ্যে একজন হলেন কর্ণ—

দুঃশাসনশ্চ কর্ণশ্চ দুষ্টং মন্ত্রম্ অমন্ত্রয়ন্।

এ কথা অবশ্য মানতে হবে যে, কৌরবদের এই সব হীন চক্রান্ত কর্ণ ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতেন না। কিন্তু পরতন্ত্রতা এবং অধমর্ণতার এই এক দায় যে, অনীপ্সিত হলেও তিনি আস্তে আস্তে রাজবাড়ির কূট চক্রান্তগুলির মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠলেন। বারণাবতে জতুগৃহের আগুন পাণ্ডবদের গায়ে আঁচ লাগাতে পারল না, কিন্তু এই আগুনের পথ ধরে আরেক আগুন উলটে এসে লাগল হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে। এতে দুর্যোধনেরা যতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেন কর্ণ। ব্যক্তিগতভাবে কর্ণ।

[মহা (k) ১.১৩৮.৫-২৩; ১.১৪১.১; (হরি) ১.১৩৩.৫-২৩; ১.১৩৬.১]

□ জতুগৃহের আগুন থেকে রক্ষা পেয়ে পাণ্ডবরা এখন কুন্তীকে সঙ্গে নিয়ে বনে বনে ঘুরছেন, ছদ্মবেশে আশ্রয় নিচ্ছেন এগ্রামে, সেগ্রামে—এই অবসরে কর্ণের জীবনকথা সম্পর্কে আরও দুচার কথা বলা প্রয়োজন। কর্ণ যদিও হস্তিনাপুরের রাজপরিবারের রাজনীতিতে জড়িয়ে গেলেন পাকাপাকিভাবে, হস্তিনাপুরের রাজনীতির পরিসরের বাইরে গিয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র কোনো প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টাও করলেন না কখনো—তৎসত্ত্বেও কিছু ঘটনা ঘটল যা তাঁর উচ্চাভিলাষের আগুনকে শান্ত করল খানিকটা, 'সূতপুত্র' কর্ণকে ধনুর্ধর কর্ণ, পরাক্রমশালী যোদ্ধা কর্ণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিল অনেকখানি। মহাভারতের আদিপর্বে মূল কাহিনীর পরম্পরায় এ ঘটনাগুলির উল্লেখ মেলে না। সেখানে জতুগৃহের ষড়যন্ত্রের পর কর্ণকে আমরা সোজা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে উপস্থিত থাকতে দেখছি। কিন্তু শান্তিপর্বে পরলোকগত কর্ণের জীবনস্মৃতি চারণ করতে গিয়ে অনেক ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে। সেগুলিই এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন যাতে কর্ণের জীবনকথার সব কয়টি অধ্যায় সম্পূর্ণ হয়।

পাণ্ডবরা তখন সম্ভবত জতুগৃহ থেকে পালিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই সময় কলিঙ্গ দেশের রাজা চিত্রাঙ্গদ তাঁর কন্যার স্বয়ংবরের আয়োজন করলেন। কলিঙ্গের রাজধানী রাজপুরে এই স্বয়ংবর উপলক্ষ্যে নানাদেশের রাজা এবং রাজপুত্ররা সমবেত হলেন। দুর্যোধনও কর্ণকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ংবরে যোগ দিলেন। যথাসময়ে অনিন্দ্যসুন্দরী কলিঙ্গ রাজকন্যা তাঁর ধাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হলেন। তারপর ধাত্রী একে একে উপস্থিত রাজা আর রাজপুত্রদের পরিচয় দিতে লাগলেন আর রাজকন্যা একে একে তাঁদের অতিক্রম করে চলতে লাগলেন উপযুক্ত বরলাভের আশায়। এভাবেই রাজকন্যা যখন একসময় দুর্যোধনকেও অতিক্রম করে গেলেন, তখন দুর্যোধনের আর সহ্য হল না। তিনি কলিঙ্গ রাজকন্যাকে সভাস্থল থেকে হরণ করে বিবাহ করবেন বলে স্থির করলেন। এই কাজ সুসম্পন্ন করার গুরুদায়িত্ব নিলেন কর্ণ। উপস্থিত সমস্ত রাজা-রাজপুত্রদের একা পরাস্ত করে দুর্যোধনের কন্যাহরণের পথ প্রশস্ত করে দিলেন তিনি।

কলিঙ্গ রাজকন্যার স্বয়ংবরে কর্ণের পরাক্রমের কথা ক্রমে মগধরাজ জরাসন্ধের কানেও গিয়ে পৌঁছাল। তিনি কর্ণকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। কর্ণ এবং জরাসন্ধের মধ্যে দীর্ঘ দ্বন্দ্বযুদ্ধ হল, তারপর অবশ্য কর্ণই জয়লাভ করলেন। মহাভারতের কবি জানিয়েছেন, ঠিক যেভাবে পরবর্তী সময়ে ভীমসেন জরা রাক্ষসীর দ্বারা সংযোজিত জরাসন্ধের দেহ দু-ভাগ করে দিয়ে তাঁকে বধ করেছিলেন, অনুরূপ চেষ্টা প্রথমে কর্ণই নাকি করেছিলেন জরাসন্ধের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময়। মৃত্যু আসন্ন দেখে মগধরাজ জরাসন্ধ দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিজের পরাজয় স্বীকার করে নেন—

বাহুকণ্টকযুদ্ধেন তস্য কর্ণো'থ যুধ্যতঃ।
বিভেদ সন্ধিং দেহস্য জরয়াশ্লেষিতস্য হি॥
স বিকারং শরীরস্য দৃষ্ট্বা নৃপতিরাত্মনঃ।
প্রীতো'স্মীত্যব্রবীৎ কর্ণং বৈরমুৎসৃজ্য দূরতঃ॥

পরাজয় স্বীকার করে জরাসন্ধ কর্ণের বীরত্বের প্রচুর প্রশংসা তো করলেনই, উপরন্তু তাঁর সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করে নিজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মালিনী নগরীর আধিপত্যও দান করলেন কর্ণকে—

প্রীত্যা দদৌ স কর্ণায় মালিনীং নগরীমথ।

মোটামুটি ভাবে এই ঘটনার পর থেকে ক্ষত্রিয় সমাজে যোদ্ধা হিসেবে কর্ণের সমাদর অনেকখানি বেড়ে যায়। *[মহা (k) ১২.৪.২-২১; ১২.৫.১-৭; (হরি) ১২.৪.২-২১; ১২.৫.১-৭]*

□ এরপর কর্ণকে আবার দেখতে পাব পাঞ্চালী-দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায়। দ্রুপদ রাজার বড়ো ইচ্ছে ছিল পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ হোক। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে যে কঠিন লক্ষ্যভেদের পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, সেটিও দ্রুপদ মূলত অর্জুনের ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শিতার কথা মাথায় রেখেই নির্মাণ করিয়েছিলেন, কিন্তু বারণাবতে জতুগৃহ দহনের কথা এবং সেই ঘটনায় পাণ্ডবদের মৃত্যুর কথা এমনভাবেই ছড়িয়ে পড়েছিল যে দ্রুপদও কিছুটা সংশয়ের মধ্যে ছিলেন। যাই হোক, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় নানা দেশ থেকে বড়ো বড়ো রাজা, রাজপুত্ররা এলেন, ভাইদের নিয়ে এলেন দুর্যোধন, এলেন কর্ণও। স্বয়ম্বরা দ্রৌপদী যখন বরমাল্য নিয়ে অপেক্ষা করছেন রাজসভায়, তখন পাঞ্চাল রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণিপ্রার্থী বড়ো বড়ো রাজাদের নাম ডাকতে থাকলেন জোরে জোরে। তার আগেই তিনি ঘোষণা করেছেন—যে

ওই যন্ত্রস্থিত মৎস্যচক্ষু ভেদ করতে পারবে, সেই হবে দ্রৌপদীর স্বামী। ধৃষ্টদ্যুম্নের বলার মধ্যে একটু প্যাঁচ ছিল। তিনি বলেছেন—এই মহান কাজ যে করতে পারবে, সেই কুলীন, রূপবান এবং বীর্য্যবান পুরুষই দ্রৌপদীর স্বামী হবে—

কুলেন রূপেণ বলেন যুক্তঃ।
তস্যাদ্য ভার্যা ভগিনী মমেয়ম্।

হয়তো এ-কথা শুনে কর্ণের মনে একটু খটকা লেগেছিল—আবার সেই কুলের কথা! হয়তো ভাবলেন—সাজানো বক্তৃতার মধ্যে কুলের কথাটা অভ্যাসবশেই এসেছে নিশ্চয়। কিন্তু একী! বড়ো বড়ো রাজাদের নাম ডাকার সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন তো দুর্যোধন, দুঃশাসন, এমনকী বিকর্ণ, দুর্বিষহ, দুর্মুখ নামে ধৃতরাষ্ট্রের অকর্মা ছেলেগুলিরও নাম করলেন। এমনকী ধৃতরাষ্ট্রের যে ছেলেগুলির নাম বলা গেল না, ধৃষ্টদ্যুম্ন তাদেরও কারক-বিভক্তি ঠিক করে কর্তৃপদে ব্যবহার করলেন। আর কর্ণের কথা বলতে গিয়ে বললেন—ওঁদের সঙ্গে এসেছেন কর্ণও—

কর্ণেন সহিত বীরাস্তদর্থং সমুপাগতাঃ।

মহাভারতের কবি সমস্ত ধনুক-তোলা রাজাদের মধ্যে হাহাকার আর্তস্বর তুলে দিয়ে বলেছেন—রূপে, ক্ষমতায়, কুলগর্বে, টাকা-পয়সা, যৌবনে যারা বলীয়ান,—

রূপেণ বীর্যেণ কুলেন চৈব শীলেন
বিত্তেন চ যৌবনেন।

—তারা তো প্রথম থেকেই একসঙ্গে কৃষ্ণাকে পাবার জন্য লাফিয়ে উঠেছিলেন লক্ষ্যভেদ করতে; কিন্তু তাঁরা যে সবাই একে একে ধনুক তুলতে গিয়ে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছেন —বিচেষ্টমানা ধরণীতলস্থাঃ। কর্ণ এতক্ষণ বংশবাগীশ রাজাদের ক্ষমতা দেখছিলেন। কর্ণের প্রতি মমতায় ব্যাস অন্তত তাই বলেছেন—

সর্বান্ নৃপাংস্তান্ প্রসমীক্ষ্য কর্ণ।

—সমস্ত রাজাদের চেষ্টা-চরিত্র দেখে, ধনুর্ধারী বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ এবার এগিয়ে গেলেন ধনুকের কাছে—

ধনুর্ধরাণাং প্রবরো জগাম।

না, অন্যান্য তথাকথিত বীরদের মতো দ্রুপদের রাখা ধনুক তুলতে গিয়ে কর্ণের গলার হারটি খসে পড়েনি, শিথিল হয়নি হাতের কাঁকন—

বিস্রস্তহারাঙ্গদচক্রবালম্।

কর্ণ ধনুক তুললেন এক মুহূর্তে, উদ্যত ধনুকে গুণ পরালেন সঙ্গে সঙ্গে এবং তাতে লক্ষ্যভেদী বাণ জুড়লেন চোখের নিমেষে। এই তৎপরতা দেখেও যাঁরা ভাবলেন কর্ণ লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে জিতে নিতে পারবেন না, তাঁরা হচ্ছেন সেই আহাম্মকেরা, যাঁরা পূর্বে ধনুক তোলার চেষ্টা কর মাটিতে বসে পড়েছেন। কিন্তু ধনুকের রীতিনিয়ম যাঁরা জানেন, সেই পাণ্ডবেরা কিন্তু ব্রহ্মচারীর মতো বসে থেকেও কর্ণকে দেখে সবিষাদে নিশ্চিত হলেন যে, আর দ্রৌপদীকে পাওয়া হল না, কর্ণ তাঁকে লক্ষ্যভেদ করে এই নিয়ে নিল বলে। আর দ্রৌপদী, যিনি এতক্ষণ বরমাল্য হাতে মজা দেখছিলেন, স্বয়ম্বরের শর্ত অনুযায়ী লক্ষ্যভেদ করলেই যাঁর বরমাল্য হাতে এগিয়ে আসার কথা, সেই দ্রৌপদী নিশ্চয় ভাবছিলেন—এ পুরুষটি যেন ধনুক তুলতেই না পারে। কিন্তু এবার! লোকে যে এই মানুষটাকে সূতপুত্র বলে জানে, শেষে অলৌকিক আগুন থেকে জন্ম নিয়ে সারথি জাতের গলায় মালা! সমস্ত সভাকক্ষ উচ্চকিত করে দ্রৌপদী রীতিমতো চেঁচিয়ে বললেন—আমি কিন্তু সূতপুত্রকে বরণ করব না—

নাহং বরয়ামি সূতম্।

কর্ণ মনে মনে প্রচণ্ড রেগে গেলেন, সামনে হয়তো তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে তাঁর চিরপরিচিত বিকল্প সূর্যের দিকে তাকালেন—

সামর্ষহাসং প্রসমীক্ষ্য সূর্যম্।

—ছুড়ে ফেলে দিলেন ধনুকটি। যোগ্য ব্যক্তিকে অহেতুক ছুতোয় দ্রৌপদী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলেই কর্ণের রাগ হয়েছে এবং সেই কারণেই তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছেন তিনি। বস্তুত কর্ণের মনস্তত্ত্ব-গঠনে দুটি নারীর অবদান সাংঘাতিক। কর্ণের জীবনে যে বিকারগুলি ঘটেছে, যে আচরণগুলি তাঁর জীবনে পরস্পরবিরোধী—সেই বিকার এবং স্বতোবিরোধিতার মূলে আছে দুটি নারীর ভূমিকা—এবং সে দুটিই প্রত্যাখ্যানের কাহিনী। এই দুই নারীর প্রথমটি কুন্তী, দ্বিতীয়জন দ্রৌপদী। প্রথমজন অতি শৈশবে জন্মলগ্নেই কর্ণের প্রতি তাঁর পুত্র-সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। দ্বিতীয়জন যৌবনে যোগ্য-পুরুষের যোগ্যতা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যদি বা কুন্তীর দিক থেকে পুত্রত্ব-অস্বীকারের পরেও সূতজননীর

স্নেহপ্রলেপে সে জ্বালা কিছুটা কমেছিল, যৌবনোদ্দীপ্ত বীরপুরুষের পৌরুষ অস্বীকার করে সে জ্বালা চতুর্গুণ বাড়িয়ে তুললেন এমন এক রমণী, যিনি একমাত্র পুরষকারের দ্বারা লক্ষ্যভেদ মাত্রেই যে কোনো পুরুষের দ্বারা জিতা হবেন বলে পূর্বাহ্ণেই স্বীকৃতা। উন্মুক্ত সভাস্থলে দ্রৌপদীর এই অপমান কর্ণ কোনোদিন ভোলেননি এবং ভোলেননি বলেই এ অপমান কর্ণের মনের গভীরে এমন এক কূট অন্তঃক্রিয়া করেছিল, যা থেকে দ্রৌপদী কোনোদিন রেহাই পান নি, পরস্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও নয়।

[মহা (k) ১.১৮৬.৪; ১.১৮৭.২১-২৩;
(হরি) ১.১৭৯.৪; ১.১৮০.২১-২৩]

□ মহাভারতে কর্ণের বৈবাহিক জীবন সংক্রান্ত আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তবে বোধকরি আবারও সূতপুত্র হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হবার ভয়েই কর্ণ স্বয়ংবর সভায় কোনো রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে আর যাবার চেষ্টা করেননি। সংকুচিত বোধ করেছেন কর্ণ আর এই সংকোচ খুব স্বাভাবিক সংকোচই বটে। তবু হয়তো কর্ণের পিতা-মাতাও পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হলেন, হয়তো বা দুর্যোধনের বিয়ের পর কর্মহীন কোনো অবকাশে তাঁর নিজেরও মন ব্যাকুল হল। পরবর্তী কালে কৃষ্ণের সঙ্গে আলাপচারিতার সয় কর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে, কত যত্ন করে তাঁর পিতা অধিরথ তিনজন সূতজাতীয়া সুন্দরীর সঙ্গে কর্ণের বিবাহ দিয়েছিলেন—

ভার্যাশ্চোঢ়া মমপ্রাপ্তে যৌবনে তৎ পরিগ্রহাৎ।

এই বিবাহের ফলে কর্ণ বেশ কয়েকটি পুত্র সন্তানের পিতাও হলেন পরবর্তীকালে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণের পুত্র বৃষষেণ, ভানুসেন, সুষেণ প্রভৃতিকে কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করতে দেখা যায়। এঁদের প্রত্যেকেই অবশ্য পাণ্ডবদের হাতে প্রাণ হারান। তবে কর্ণের পত্নীদের নাম সম্পর্কে মহাভারত একেবারেই নীরব। স্ত্রীপর্বে যখন কুরুক্ষেত্রে কর্ণ এবং তাঁর পুত্রদের শবদেহ ঘিরে বসে কর্ণের পত্নীরা বিলাপ করছিলেন, সেসময় গান্ধারী এঁদের মধ্যে একজনকে সুষেণমাতা আর একজনকে বৃষসেনের মাতা বলে উল্লেখ করেছেন মাত্র।

[মহা (k) ৫.১৪১.১০-১১; ১১.২১.৭-১৪;
(হরি) ৫.১৩২.১০-১১; ১১.২১.৭-১৪]

□ আমরা আবার মূল মহাকাব্যের ঘটনা পরম্পরায় ফিরে আসি। বারণাবতের অগ্নিকাণ্ডের ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেল এবং উলটে পাণ্ডবেরা বেঁচে ফিরে উপহারের মতন পেলেন দ্রৌপদীকে— এই ঘটনা কৌরবশিবিরে দারুণ প্রতিক্রিয়া তৈরি করল। দ্রুপদের রাজসভায় দ্রৌপদীর বিয়েকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের সঙ্গে কর্ণের যুদ্ধ হয়েছিল বটে, কিন্তু কর্ণ তখন অর্জুনকে চিনতে পারেননি। সন্দেহ হয়েছিল অবশ্য; কর্ণ বলেও ফেলেছিলেন —ব্রাহ্মণ! যুদ্ধে তোমার নৈপুণ্য দেখে আমি তুষ্ট হয়েছি—

তুষ্যামি তে বিপ্রমুখ্য।

—কিন্তু সত্যি বলতে কি সাক্ষাৎ ইন্দ্র ছাড়া কিংবা অর্জুন ছাড়া আমার সঙ্গে এমনিতর এতক্ষণ যুদ্ধ করবে, এ হতেই পারে না। তুমি কি বাপু পরশুরাম না সাক্ষাৎ হরিহর? অর্জুন তখন মিথ্যে কথা বলেছিলেন। যুদ্ধ থামানোর জন্যই হোক, কিংবা নববধূর বিস্মিত, স্ফুরিত মুখখানি দেখার জন্যই হোক, অর্জুন বলেছিলেন—আমি পরশুরামও নই, অন্য কেউই নই; আমি ব্রাহ্মণ। আজকে তোমাকে যুদ্ধে জয় করব বলেই এখানে উপস্থিত, তুমি ক্ষান্ত হও আজ—বীর স্থিরো ভব। অর্জুনের মধ্যে প্রচুর ব্রাহ্মতেজ আছে, এইরকম একটা বিচারেই কর্ণ সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষান্তি দিলেন—

ব্রাহ্মং তেজস্তদাযজ্যং মন্যমানো মহারথঃ।

কিন্তু আজকে যখন চর এসে কৌরবশিবিরে খবর দিল যে, দ্রৌপদীকে অর্জুনই জিতে নিয়েছেন এবং ভীম, অর্জুন সকলেই ব্রাহ্মণের বেশ ধরে সবাইকে বোকা বানিয়েছেন, তখন কৌরবপক্ষে নিজেদের মধ্যে যেন ধিক্কার উঠল। একে তো জতুগৃহের আগুন থেকে বেঁচেছে পাণ্ডবেরা, তার মধ্যে আবার অর্জুন জিতে নিল দ্রৌপদীর মত সুন্দরীকে—এত সব ভেবে দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি—সবাই মাথা নিচু করে বসেছিলেন। দুঃশাসনের লজ্জা একটু কম। তিনি যেন কর্ণকে তাঁর পুরনো সংলাপ স্মরণ করিয়ে দিয়েই চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগলেন—যদি ব্রাহ্মণের বেশ ধরে না থাকত তা হলে আর পেতে হত না দ্রৌপদীকে। ভাবটা এই—আমাদের কর্ণ তা হলে দিত ঠাণ্ডা করে

ওই অর্জুনটাকে। দুঃশাসন বললেন—সবই কপাল, দাদা! সবই কপাল—

দৈবঞ্চ পরমং মন্যে।

—নইলে একটা লোকও সেদিন অর্জুনকে চিনতে পারল না!

পাণ্ডবদের এমন সফলতায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও বড়ো খুশি হলেন না। বিদুরের সামনে মিথ্যে আনন্দ দেখিয়ে দুর্যোধনকে তিনি বললেন—তোমাদের যা ইচ্ছে, আমি তাই করব—

যচ্চ ত্বং মন্যসে প্রাপ্তং তদ্ ব্রবীহি সুযোধন।

এই অবস্থায় কী করা যায়, এমন প্রস্তাবে স্বাভাবিকভাবে দুর্যোধনই প্রথমে বলবেন। তিনি অনেকগুলি প্রস্তাব দিলেন। বললেন—আমরা এবার ওদের মধ্যে পারস্পরিক ভেদ তৈরি করব। ভালো গুপ্তচর দিয়ে এমন কৌশল করা যেতে পারে যাতে সৎমা মাদ্রীর ছেলেদুটো কুন্তীর ছেলে তিনটেকে বিষ নজরে দেখে। দ্বিতীয়ত, এমন করা যেতে পারে যে, দ্রুপদ, দ্রুপদের ছেলে ধৃষ্টদ্যুম্ন, এমনকী দ্রুপদের মন্ত্রীদের পর্যন্ত টাকা পয়সা খাইয়ে এমন করব যাতে যুধিষ্ঠিরকে তাঁরা ত্যাগই করে বসবেন, কিংবা যুধিষ্ঠিরের কানের কাছে সদা-সর্বদা গুপ্তচররা বলবে—হস্তিনাপুর অতি বাজে জায়গা, তোমরা বাপু এখানেই থাকো। তৃতীয়ত, আর একটা উপায় হতে পারে যে, অত্যন্ত বিশ্বস্ত গুপ্তচর গিয়ে নববধূ দ্রৌপদীর মনে বহুস্বামিতার দোষ জাগিয়ে তুলবে। এটা করা খুব কঠিন হবে না, কারণ দ্রৌপদী সে কষ্ট নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে—বহুত্বাৎ সুকরং হি তৎ— তারপর স্বামীতে স্বামীতে ঝগড়া-ঝাঁটি লাগিয়ে দিয়ে গুপ্তচর কেটে পড়বে। চতুর্থ উপায়, ছদ্মবেশে সেই রকম কিছু মানুষ গিয়ে ভীমকে মেরে ফেলুক, আর ভীম মারা গেলে ওই অর্জুনটা আমাদের কর্ণের কড়ে আঙুলের যোগ্যও নয়—রাধেয়স্য ন পাদভাক্ ('পাদভাক্' মানে নীলকণ্ঠ বলছেন, কর্ণের এক চতুর্থাংশের সমানও হবে না)। দুর্যোধন বললেন—অথবা আরেক কাজ করা যেতে পারে, সুন্দরী কতকগুলি স্ত্রীলোক পাঠান। তারা গিয়ে এক একটি পাণ্ডবকে ধরবে আর রঙ্গ-রসে মজিয়ে দেবে, তখন দ্রৌপদীই ওদের ওপর রাগ করে ভেগে যাবে—

অথবা দর্শনীয়াভিঃ প্রমদাভির্বিলোভ্যতাম্।

আর এটাও আপনার ভালো না লাগলে কর্ণকে পাঠান পাণ্ডবদের নিয়ে আসতে। তারপর নিয়ে আসার পথে গুপ্তঘাতক দিয়ে রাস্তাতেই পাণ্ডবদের বধ করার ব্যবস্থা করুন। এতগুলো প্রস্তাব দিলাম, আপনি যেটা ইচ্ছে করুন। একেবারে সব কথার শেষে দুর্যোধন বললেন—কর্ণ, কী বলো, উপায়গুলো দারুণ না?

দুর্যোধন প্রভৃতির এতসব ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা—আদপেই কর্ণের পছন্দ হয়নি। দ্রৌপদীকে তিনি নিজে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, আর আজ জানতে পারলেন, সেদিন যাঁকে দেখে ব্রাহ্মণ ভেবে যুদ্ধ ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন, তিনি আর কেউ নন, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুন এবং সেই অর্জুন তথা পঞ্চপাণ্ডবই এখন দ্রৌপদীর স্বামী—তখন কর্ণের মনে ক্রোধ, ঈর্ষা দুইই জন্ম নিল। তবু ছদ্মবেশী ঘাতক দিয়ে পাণ্ডবদের খুন করানোর প্রস্তাব তাঁর পছন্দ নয়। এ ধরনের ষড়যন্ত্র তাঁর পৌরুষে আঘাত করে। তাই কর্ণ দুর্যোধনের প্রত্যেকটি প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেছেন এ সময়।

কর্ণ বললেন—তোমার কথা আমার একটুও ঠিক মনে হচ্ছে না, দুর্যোধন! পাণ্ডবদের বধ করার জন্য অনেক কূট কৌশল, অনেক সূক্ষ্ম উপায় আগেও তোমার মাথা থেকে বেরিয়েছে, কিছুই হয়নি, তুমি কিছুই করতে পারনি। পাণ্ডবেরা যখন শিশুটি ছিল, ডানা-না-গজানো পাখির মতো, তখন এখানে থাকা সত্ত্বেও তুমি তাদের কিছুই করতে পারনি। এখন তারা হাতের বাইরে, বিদেশে। তারপরে দ্রুপদ রাজার সহায়তায় তাদের শ্রীবৃদ্ধিও ঘটেছে। এখন কি আর তাদের কৌশল করে কাত করা যায়? তারপর দ্রৌপদীর কথাটা তুমি কী বললে? যেখানে পাঁচ ভাই মিলে একটি বউ বিয়ে করেছে, তাদের মধ্যে কখনো বিরোধ বাধে? বউদের জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়াঝাটি হবে না বলেই তো একটা বউ, সেখানে কখনো ঝগড়া বাধে—

একস্যাং যে রতাঃ পত্ন্যাং ন ভিদ্যন্তে পরস্পরম্।

তার ওপরে আর একটা ব্যাপার কী জান? দ্রৌপদী যখন পাণ্ডবদের বরণ করেছেন, তখন তাঁদের খারাপ অবস্থা, দীন ব্রহ্মচারী বেশ—এসব দেখেশুনে মনে মনে তাঁদের দীনাবস্থা মেনে নিয়েই বরণ করেছেন, সেই দ্রৌপদীর মন ভাঙানো অত সহজ হবে না জেনো। দ্রৌপদীর দৃঢ়তা কতখানি কর্ণ তা সত্যিই জানেন। উন্মুক্ত

সভাস্থলে তাঁর নিজের প্রতি যে অপমান-বাক্য বর্ষিত হয়েছিল তাতেও যেমন দৃঢ়তা ফুটে উঠেছিল দ্রৌপদীর, কর্ণ মনে করেন, সেই দৃঢ়তাতেই ওই মেয়ে সমস্ত রাজা-মহারাজা ত্যাগ করে অর্জুনকে অর্জুন না জেনেই, পাণ্ডবদের দীনতার সঙ্গেই বরণ করেছে। ওই মেয়ের মানসিক অবস্থায় বদল আনা কি অত সহজ? এইবার কর্ণের মনে ভেসে উঠল সেই অপমান, সূতপুত্র বলে তাকে বিয়ে না করার অপমান। দ্রৌপদীর সমস্ত দৃঢ়তা জেনেও তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল তাঁরই খাবার গ্রাস, পাণ্ডবেরা সবাই মিলে যেন চেটেপুটে খাচ্ছে। এতে যেন দ্রৌপদীরই কাম-অভিলাষ পরিতৃপ্ত হচ্ছে। কর্ণ বললেন— জানো দুর্যোধন! মেয়েদের এক স্বামী থাকা সত্ত্বেও সব সময় তাদের ইচ্ছে করে আরও পুরুষমানুষ তাকে ভোগ করুক—

ঈপ্সিতশ্চ গুণঃ স্ত্রীণাম্ একস্যা বহুভর্তৃতা।

সেখানে রমণীকুলের পরম বাঞ্ছিত এই বহুপুরুষের ভোগ একেবারে আইন মেনেই পাচ্ছে দ্রৌপদী—এই রমণীর মন কি আর ভাঙানো যায়—

ন সা ভেদয়িতুং ক্ষমা।

কর্ণ দুর্যোধন এবং ধৃতরাষ্ট্রের সামনে সরাসরি কৌরব-পাণ্ডবের যুদ্ধের প্রস্তাব রেখেছেন। আমরা আগেই জানিয়েছি যে, কলিঙ্গ দেশে আর জরাসন্ধের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর ধনুর্ধর-বীর হিসেবে কর্ণের প্রতিষ্ঠা যথেষ্টই ঘটেছিল আর সেই সূত্রেই হস্তিনাপুরের রাজসভাতেও তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি, মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে। সেই প্রতিপত্তির জোরেই তিনি সোজাসুজি প্রস্তাব রাখছেন—পাণ্ডবদের শিকড় এখনও দৃঢ় হয়নি, সহায় বৃদ্ধি পেলেও দ্রুত সৈন্য-সামন্ত একত্রিত করা এখনই তাঁদের পক্ষে সহজ হবে না—এই অবস্থাটাই হচ্ছে তাঁদের আক্রমণ করার পক্ষে উৎকৃষ্ট সময়। কর্ণের মনোভাব যখন এতখানি দুঃসাহসিক, সেসময় ভীষ্ম-দ্রোণ সস্ত্রীক পাণ্ডবদের সাদরে হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব দিচ্ছেন—এ আর কর্ণের সহ্য হয়নি। তিনি রাজসভার মধ্যে সোজাসুজিই ভীষ্ম আর দ্রোণকে রাজার দুষ্ট মন্ত্রী বলে চিহ্নিত করেছেন এবং পরিষ্কার বলেছেন—মহারাজ! আপনার দুষ্ট মন্ত্রীদের থেকে আপনি সাবধান থাকবেন এবং আপনার মন্ত্রণাদাতাদের মধ্যে যারা দুষ্ট নয়, তাঁদেরও আপনি চিনে নিন—

দুষ্টানাঞ্চৈব বোদ্ধব্যম্ অদুষ্টানাঞ্চ ভাষিতম্।

কর্ণ যে ভীষ্ম-দ্রোণের মতো প্রবীণদের সামনেই তাঁদের উদ্দেশে এত বড়ো কটূক্তি করতে পারলেন, তা থেকে যেমন এটা প্রমাণিত হয় যে দুর্যোধনের প্রশ্রয়ে এবং সাহচর্য্যে কর্ণের চরিত্রে কতখানি দুষ্ট, অবিনীত স্বভাবের প্রবেশ ঘটেছে তেমনই এটাও প্রমাণিত হয় যে, কুরু রাজসভায় তখন যে দুটি গোষ্ঠী বা শিবির সক্রিয় ছিল—অর্থাৎ ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুর গোষ্ঠী এবং তার বিপক্ষে দুর্যোধন গোষ্ঠী—কর্ণ এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীর অত্যন্ত প্রভাবশালী অঙ্গ হয়ে উঠেছেন। না হলে কুরুকুলের বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মকে রাজদরবারে বসে কটূক্তি করার স্পর্ধা তাঁর হত না।

[মহা (k) ১.২০১.৪-২০; ১.২০২.১-২৫; ১.২০৪.১৩-২৮; (হরি) ১.১৯৪.৪-২০; ১.১৯৫.১-২৫; ১.১৯৭.১৩-২৮]

□ যাইহোক, আপাতত ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের প্রস্তাবে সায় দিলেন না, কুরুবৃদ্ধদের সিদ্ধান্ত মেনে দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবদের সাদরে ফিরিয়েও আনলেন হস্তিনায়। এর কিছুকাল পর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে নববধূ দ্রৌপদীকে নিয়ে পাণ্ডবরা গিয়ে নতুন বসতি স্থাপন করলেন খাণ্ডবপ্রস্থে। কৃষ্ণের সহায়তায় এবং পাণ্ডবদের অধ্যবসায়ের পরিণামে খাণ্ডবপ্রস্থ ইন্দ্রপ্রস্থের রূপ লাভ করল। নতুন রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থ আর্যাবর্তের অন্যতম সমৃদ্ধ নগরী হয়ে উঠল অচিরেই। তা দেখে ধৃতরাষ্ট্র ঈর্ষান্বিত হলেন, ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে যেতে লাগলেন দুর্যোধন—সেই ঈর্ষা কতকটা কর্ণের মনেও ক্রিয়া করতে লাগল তো বটেই।

[মহা (k) ১.২০৬.১-২৬; ১.২০৭.১-৫২; (হরি) ১.১৯৯.১-৬৫; ১.২০০.১-৬৫]

□ ঈর্ষা, অসন্তোষ ক্রমে বাড়ল। তার পিছনে কারণও অবশ্য অনেক। পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিষ্ঠিত হবার পর যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করার পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু পাণ্ডবদের প্রধান সহায় তথা প্রধান পরামর্শদাতা কৃষ্ণ পরিষ্কারভাবে, রীতিমতে তথ্য দিয়ে বোঝালেন যে, আর্যাবর্তের অন্যতম একচ্ছত্র সম্রাট, মগধরাজ জরাসন্ধ যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন যুধিষ্ঠিরের পক্ষে রাজসূয় যজ্ঞ করা সম্ভবই হবে না। কৃষ্ণেরই

পরিকল্পনা মতো কৃষ্ণ, ভীম এবং অর্জুন ছদ্মবেশে মগধে গেলেন, সেখানে ভীম দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করলেন জরাসন্ধকে। এরপর রাজসূয় যজ্ঞের আগে পাণ্ডবদের দিগ্বিজয় আরম্ভ হল। পূর্বদিক জয় করতে বের হলেন ভীম। পূর্বদিকের রাজ্যগুলি একে একে অতিক্রম করে একসময় ভীম অঙ্গদেশও আক্রমণ করলেন। তবে হ্যাঁ, ভীমের চতুরঙ্গ বাহিনী আর ভীমের বাহুবলের কাছে কর্ণ একেবারে নতমস্তকে হার স্বীকার করে নিলেন—এমনটা আমরা মনে করি না। তবে জরাসন্ধকে যিনি হত্যা করেছেন এবং সেই সুবাদে মোটামুটি সমগ্র পূর্ব ভারত যাঁর বশীভূত হয়ে রয়েছে, সেই ভীমের আধিপত্য তখনকার মতো স্বীকার না করে কর্ণের কোনো উপায়ও ছিল না। সে যাই হোক, ভারতবর্ষের সমস্ত রাজমণ্ডল যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে একযোগে ইন্দ্রপ্রস্থের সভাপ্রাঙ্গনে বশ্যভাবে উপস্থিত হওয়ায় দুর্যোধনের মনে ঈর্ষার ভাব বৃদ্ধি পেল। সেই সঙ্গে কর্ণেরও।

রাজসূয় যজ্ঞের মূল পর্বে চরম সম্মান দেবার জন্য পিতামহ ভীষ্ম কৃষ্ণকে মনোনীত করেছেন। এঘটনা সদ্যপ্রয়াত জরাসন্ধের একদা দক্ষিণহস্ত শিশুপালের আর সহ্য হল না। চেদিরাজ শিশুপাল প্রচণ্ড গালাগালি দিলেন ভীষ্মকে, এমনকী যুধিষ্ঠিরকেও। শিশুপালের মত এইরকম—নাম করা মানুষকে সম্মান যদি জানাতেই হয়, তা হলে আরও অনেকেই ছিলেন, যাঁদের মধ্যে যে কোনো একজনকে বেছে নিতে পারতেন যুধিষ্ঠির। এই আরও অনেকের মধ্যে কারা কারা থাকতে পারতেন, তার একটা লম্বা তালিকাও দিয়েছেন শিশুপাল এবং সেই তালিকায় কর্ণের নামও এসেছে। শিশুপাল অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে কর্ণের নাম স্মরণ করে বলেছেন—দেবরাজ ইন্দ্রের মতো যাঁর ক্ষমতা, পরাক্রম, ধনুক চালনায় যিনি অসাধারণ, যিনি অঙ্গ-বঙ্গের অধীশ্বর, সেই কর্ণকে আপনি সম্মান জানাতে পারতেন ভীষ্ম—

> অয়ঞ্চ সর্বরাজ্ঞাং যো বলশ্লাঘী মহারথঃ।
> জামদগ্ন্যস্য দয়িতঃ শিষ্যো বিপ্রস্য ধীমতঃ॥
> যেনাত্মবলমাস্থায় রাজানো যুধি নির্জিতাঃ।
> তঞ্চ কর্ণমতিক্রম্য কথং কৃষ্ণঃ ত্বয়ার্চিতঃ॥

[মহা (k) ২.৩৭.১৫-১৬; (হরি) ২.৩৬.১৫-১৬]

□ শিশুপালের কথা থেকে অন্তত একটা বিষয় পরিষ্কার হয়। তা হল—সূতপুত্রের পরিচয় অতিক্রম করে ভারতবর্ষের অন্যতম সম্মানিত বীরপুরুষদের মধ্যে একজন হয়ে উঠেছেন কর্ণ। পাশাপাশি এখবরও পাওয়া যাচ্ছে যে, তিনি শুধুমাত্র অঙ্গ কিংবা চম্পা কিংবা জরাসন্ধের দেওয়া মালিনী নগরীর অধীশ্বর নন, বঙ্গদেশও তাঁরই সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছে। কিন্তু হলে কী হয়, কর্ণ কিন্তু হস্তিনাপুরের রাজনীতির সঙ্গেই আষ্ঠে পৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছেন। আপন রাজ্যে আপন স্বতন্ত্র পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হবার কোনো আগ্রহই তাঁর নেই। ফলে হস্তিনাপুরের যুবরাজ দুর্যোধন যখন যুধিষ্ঠিরের সম্মান আর ইন্দ্রপ্রস্থের কারিগরি দেখে জ্বলে গেলেন তখন সেই ঈর্ষার অন্যতম ভাগীদার হলেন কর্ণ। এই ক্রোধ আর ঈর্ষার পিছনে কারণ মূলত দুটি—যুধিষ্ঠিররা রাজ্যও পেল আবার ওরাই দ্রৌপদীকেও পেয়েছে—

> তৈর্লব্ধা দ্রৌপদী ভার্যা দ্রুপদশ্চ সুতৈঃ সহ।

পাণ্ডবদের রাজ্যলাভের ব্যাপারটা কিংবা তাদের সমৃদ্ধি নিয়ে কর্ণ ততকিছু ভাবেন না। কিন্তু যে দ্রৌপদীকে তাঁরই লাভ করার কথা ছিল, সেই দ্রৌপদীকেও পাণ্ডবরাই লাভ করেছেন—এ দুঃখ কর্ণ আজও ভুলতে পারেন না।

আমরা জানি, কুরুসভায় পাশাখেলার চক্রান্ত যখন হয়েছিল, তখন সেই চক্রান্তের মূল পর্বে অন্তত কর্ণ দুর্যোধনের সঙ্গে ছিলেন না। এই পুরো চক্রান্তটাই ছিল শকুনি এবং দুর্যোধনের মস্তিষ্ক প্রসূত, যার প্রধান সহায়ক ছিলেন স্বয়ং রাজা ধৃতরাষ্ট্র। কিন্তু সব কিছুর পর সেই পাশাখেলা যখন সত্যিই আরম্ভ হল, তখন কিন্তু কর্ণও আসরে বসে গেলেন এবং এর পেছনে গূঢ় মনস্তাত্ত্বিক কারণ কিন্তু দ্রৌপদী, যদি দ্রৌপদীকে হেনস্থা করা যায় কোনো রকমে।

[মহা (k) ২.৬৫.৪৪; (হরি) ২.৬২.৩৪]

□ অবশেষে সেই চরম লাঞ্ছনার মুহূর্তটি এগিয়ে এল। শকুনির সঙ্গে পাশাখেলায় মহারাজ যুধিষ্ঠির সর্বস্ব হেরে গেলেন। হেরে গেলেন একে একে প্রাণপ্রিয় ভাইদের বাজি রেখে। শেষ পর্যন্ত বাজি রেখে হারলেন নিজেকেও। যুধিষ্ঠিরের তখন একরকম উন্মত্ত অবস্থা। জুয়াখেলার সময় জুয়াড়ি যেমন ভাবে—পরের দানটা নিশ্চয় জিতব, সেই প্রত্যাশায় যুধিষ্ঠিরও একে একে সর্বস্ব, এমনকী নিজেকে পর্যন্ত বাজি রেখেছেন। অন্তঃপুরচারিণী কৃষ্ণা-পাঞ্চালীর কথা বা তাঁকে পণ

রাখার কথা কিন্তু এ পর্যন্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের মনেও ছিল না। কিন্তু যাঁরা যুধিষ্ঠিরকে সর্বস্বান্ত করার চক্রান্ত করেই পাশা খেলতে বসেছেন, তাঁরা তো কিছুই ভোলেন না, কৃষ্ণা-পঞ্চালীর কথাও তাঁরা ঠিকই মনে রেখেছেন। এ অবস্থায় যুধিষ্ঠির যখন নিজেকে শুদ্ধ পণ রেখে হেরে গিয়েছেন—তখন শকুনিই যুধিষ্ঠিরকে বললেন—নিজেকে বাজি রেখে হেরে যাওয়াটা বড়ো কষ্টকর ব্যাপার মহারাজ! তাছাড়া তুমি তো এখনও পুরোপুরি সর্বস্বান্ত হওনি, এখনও পাঞ্চালী-দ্রৌপদী অবশিষ্ট আছেন। উন্মত্ত যুধিষ্ঠির অমনি কৃষ্ণা-দ্রৌপদীকে পণ রাখবেন বলে স্থির করে ফেললেন। যুধিষ্ঠিরও অনেকটা পণ্য বস্তুর গুণগান করার মতো করেই কৃষ্ণা-দ্রৌপদীর গুণগান করতে করতে বললেন—অতুলনীয়া সেই দ্রৌপদীকে আমি পণ রাখলাম।

কৌরবরা মাত্রা ছাড়া অসভ্যতা করার সুযোগ অতটা নাও পেতে পারতেন হয়তো। কিন্তু এই মুহূর্তে 'দ্রৌপদী' নামক পণ্যের গুণগান করে সে সুযোগটা যুধিষ্ঠিরই একরকম হাতে করে তুলে দিয়েছেন কৌরবদের হাতে।

ঠিক এমনি একটা দিনের জন্যে অনেকদিন অপেক্ষা করে আছেন কর্ণ। প্রমত্ত যুধিষ্ঠিরের এই নগ্ন বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সভাক্ষেত্রে যখন ধিক্কারের গুঞ্জন উঠল, তখন সবচেয়ে খুশি হলেন দুটি লোক—এক জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র যিনি কেবলই জিজ্ঞেস করছিলেন—শকুনি এই বাজিটা জিতেছে তো, জিতেছে তো? দ্বিতীয় হলেন কর্ণ। এই মুহূর্তে দ্রৌপদীর এই বর্ণনা শুনে যিনি সজোরে প্রতিহিংসার হাসি হেসে উঠলেন, তিনি কর্ণ, অর্থাৎ কর্ণ হাসছেন, তাঁর সঙ্গে দুঃশাসন এবং অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা হাসছেন—

জহাস কর্ণোঽতিভৃশং সহ দুঃশাসনাদিভিঃ।

আজকে তিনি হেসে উঠেছেন এইজন্যে যে, দ্রৌপদী, অর্জুনের জেতা দ্রৌপদী, পঞ্চপাণ্ডবের ঘরণী দ্রৌপদী আজ দুর্যোধন-শকুনির কৌশলে তাঁদের হাতের মুঠোয়। পঞ্চপাণ্ডবের উপভুক্তা দ্রৌপদী যেমনটি কর্ণের কল্পনায় ছিল, সেই দ্রৌপদীকে আজ তিনি সবার সামনে নগ্ন দেখতে চান। তিনি আগ বাড়িয়ে হেসে উঠলেন, সবার চাইতে জোরে—অতিভৃশম্।

শকুনি দ্রৌপদীর বাজি জিতবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধনের আদেশ হল সভায় দ্রৌপদীকে নিয়ে আসবার জন্য। যে নিয়ে আসতে গেল দ্রৌপদীকে সেও কিন্তু এক সারথি জাতের লোক, সূতপুত্র। বারবার সে দ্রৌপদীর কাছে যাচ্ছে, দুর্যোধনের কাছে দ্রৌপদীর বক্তব্য পৌঁছে দিচ্ছে—এই পৌনঃপুনিকতায় দুর্যোধনের রাগ হল। তিনি দুঃশাসনকে বললেন, আসলে সূতপুত্র এই সারথির বেটা, ভীমকে দেখে ভয় পাচ্ছে, যাও তো, তুমি যাও তো ধরে নিয়ে এসো দ্রৌপদীকে—

স্বয়ং প্রগৃহ্যানয় যাজ্ঞসেনীম্।

এই যে সময়টা, সূতজাতীয় প্রাতিকামীর দ্রৌপদীর কাছে যাওয়া আসা এবং তার প্রতি 'সূতপুত্র' বলে দুর্যোধনের গালাগালি—এই সময়টা কর্ণ চুপ করেই ছিলেন, একটা কথাও বলেননি। কারণটা জলের মতো স্পষ্ট। সূতপুত্রের পর্বটা চুকলে দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীকে অকথ্য গালাগালি দিতে দিতে উন্মুক্ত রাজসভায় নিয়ে এল, অসাহায়া দ্রৌপদী যখন পাশার বাজিতে বাঁধা অসহায় পাণ্ডবদের দিকে জ্বলন্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করছেন, তখন দ্রৌপদীর সেই অসহায় অবস্থাটা বুঝেই তাঁকে এক ঝটকা দিয়ে দুঃশাসন সশব্দে হেসে বলল—তুই হলি আমাদের দাসী। সেকালের দিনে 'দাসী' মানে শুধু কাজকর্মের লোক বুঝত না, দাসী ছিল সময়ে অসময়ে, অবসরে পুরুষের ভোগ্যা। দুঃশাসনের এই কথাটা কর্ণের মনে এক অদ্ভুত বিকৃত আনন্দ জাগিয়ে তুলল। দুঃশাসনের 'দাসী' সম্বোধন মাত্রেই কর্ণ দারুণ খুশি হয়ে তাকে যেন ধন্যবাদ জানালেন শব্দটার জন্য, হেসে উঠলেন দুঃশাসনের মতোই সজোরে—

কর্ণস্তু তদ্ বাক্যমতীব হৃষ্টঃ
সম্পূজয়ামাস হসন্ সশব্দম্।

দ্রৌপদীকে সবার সামনে দুঃশাসন টানা-হেঁচড়া করছে, তাঁর উত্তমাঙ্গের উত্তরীয় বাস খসে পড়ে গেছে, তবু রেহাই নেই। পাণ্ডবপক্ষের ভীম খেপে উঠে দাদা যুধিষ্ঠিরকেই গালাগালি দিতে থাকলেন। কুরু-বৃদ্ধেরা কিছুই বলতে পারছেন না। এই অবস্থায় কৌরবপক্ষের একজনই এই ঘটনার নিন্দা করা আরম্ভ করলেন। তিনি দুর্যোধনের ভাই বিকর্ণ। বিকর্ণ দ্রৌপদীকে পণ রাখার বৈধতা নিয়ে আইনসঙ্গতভাবে লড়াই আরম্ভ করলেন। যেখানে ছোটোভাই হিসেবে

বিকর্ণ ন্যায়সঙ্গতভাবে দুর্যোধনের বিরোধিতা আরম্ভ করেছেন, সেখানে দুর্যোধনের পক্ষে প্রতিবাদ করে জেতা মুশকিল। ঠিক এই অবস্থায় সভার হাল ধরলেন কর্ণ। কর্ণ এই মুহূর্তে ন্যায়-অন্যায় বোঝেন না। বিকর্ণের কথা শুনে কর্ণের ভীষণ রাগ হল—ক্রোধমূর্ছিতঃ। রাগে বিকর্ণের হাতে একটা ঝাঁকাড় দিয়ে কর্ণ বিকর্ণকে তিরস্কার করতে থাকলেন।

কর্ণ বললেন—বিকর্ণ! অস্বীকার করি না এ সভায় অনেক বিকার দেখা যাচ্ছে—

দৃশ্যতে বিকর্ণেহ বৈকৃতানি বহূন্যপি।

অর্থাৎ কর্ণ জানেন কুলবধূ দ্রৌপদীকে টানা-হ্যাঁচড়া করাটা একটা বিকার। কিন্তু তাঁর মতে দ্রৌপদী নিজেই এই বিকারের কারণ। কর্ণ বললেন—দুটি কাঠে ঘষা লেগে যে আগুন জন্মায়, সে আগুন যেমন ওই কাঠকেই পুড়িয়ে দেয়, তেমনি এই বিকারই ওই মহিলাকে শায়েস্তা করবে। কর্ণ বললেন—তা ছাড়া তোমার এত সোহাগ কিসের, বিকর্ণ? কই যাঁদের বউ এই দ্রৌপদী, তাঁরা তো দ্রৌপদীর ডাক শুনেও একটি কথাও বলছেন না—

এতে ন কিঞ্চিদপ্যাহুশ্চোদিতা হ্যপি কৃষ্ণয়া।

তাঁরা তো মনে করছেন, দ্রৌপদীকে আমরা জিতেইছি। তুমি বাপু বিকর্ণ! বাচ্চা ছেলে, বাচ্চা ছেলের মতো থাক, ছোটো মুখে বড়োদের মতো কথা বলার দরকারটা কী তোমার—বালঃ স্থবিরভাষিতম্। তুমি দুর্যোধনের থেকে অনেক ছোটো, ধর্মাধর্মের তুমি বোঝটা কী হে! শুধু শুধু তখন থেকে বক বক করে বাজিতে জেতা দ্রৌপদীকে না-জেতা বলে যাচ্ছ? কর্ণ বিকর্ণকে শুধুমাত্র ধমক-ধামক দিয়ে বসিয়ে দেননি পুরোপুরি। সভাস্থ লোক যেটাকে বীরপুরুষের মানসিক বিকার বলে মনে করতে পারে, সেটা যে আসলে দ্রৌপদীরই বিকার এবং সুস্থ সমাজের দিকে তাকিয়ে সে বিকার যে শান্ত করা একান্ত প্রয়োজন, সেটা বোঝাতেই যেন কর্ণ বিকর্ণকে শাসন করে কুরু-বৃদ্ধদের বোঝাতে চাইলেন।

কর্ণ বললেন—বিকর্ণ! এটা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে যে, যুধিষ্ঠির সর্বস্ব বাজি রেখে হেরেছেন। তা হলে এই দ্রৌপদী কি সেই সর্বস্বের বাইরে? কর্ণ জানেন দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের জীবন-সর্বস্ব ধন, কিন্তু সেই দ্রৌপদী এখন অক্ষের হিসেবে পণ রাখা সর্বস্বের অভ্যন্তরা। তা ছাড়া—কর্ণ বলে চললেন—তা ছাড়া বাজির কথায় দ্রৌপদীর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে সমস্ত পাণ্ডবের মৌনতায় সে বাজি সমর্থিত হয়েছে, এখন তুমি বলছ দ্রৌপদীকে আমরা জিতিনি! কর্ণ এবার আসল বিকারের কথায় এলেন। বিকর্ণকে তিনি বললেন—অবশ্য হ্যাঁ, তুমি যদি বল একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভায় টেনে এনে বড়ো অধর্ম হয়ে গেছে, তা হলেও কিন্তু আমার উত্তর আছে। তুমি তো জান, দৈববিহিত নিয়ম অনুসারে একটি স্ত্রীলোকের একটিই স্বামী থাকে। এই দ্রৌপদীর স্বামী তো একটা নয়, পাঁচটা। তবে এই মেয়ে বেশ্যা ছাড়া কী—বন্ধকীতি বিনিশ্চিতা। এইরকম একটা বেশ্যা মেয়েকে উন্মুক্ত সভায় এনেছি দেখে আশ্চর্য হওয়ারও কিছুই নেই। তা ছাড়া কোনও বেশ্যা এক কাপড়ে এখানে এসেছে না উলঙ্গ হয়ে এসেছে, তাতেও মাথা খারাপ করার কিছুই নেই—

একাম্বরধরত্বং বাপ্যথ বাপি বিবস্ত্রতা।

বিকর্ণ তুমি জেনে রেখ, আমরা পাশার চালে সবাইকে জিতেছি—ধনরত্ন জিতেছি, একটি একটি করে সমস্ত পাণ্ডবদের জিতেছি, এই দ্রৌপদীকেও জিতেছি। কর্ণের মনের ভাব—সব এখন আমাদের, আমরা এদের নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করব।

যা ইচ্ছে তাই করব—এই তাগিদেই কর্ণ দুঃশাসনকে বললেন—দেখ ভাই এই বিকর্ণ ছেলেটা বেশ বড়ো বড়ো কথা বলছে—বিকর্ণ প্রাজ্ঞবাদিকঃ। তুমি ওর কথায় কান দিয়ো না। বরঞ্চ এক কাজ কর তো, তুমি এই সমস্ত পাণ্ডবদের আর দ্রৌপদীর কাপড়-চোপড় খুলে নিয়ে এসো তো। কর্ণের এই আদেশের নিরিখে অধিকতর অপমানের আশঙ্কায় পাণ্ডবেরা নিজেরাই নিজেদের উত্তরীয় বসনগুলি নামিয়ে দিলেন মেঝেতে। বস্তুত বীরপুরুষের পক্ষে এই ছিল যথেষ্ট অপমান। কিন্তু দ্রৌপদীর উত্তরীয় তো টানাটানিতে আগেই খসে পড়েছে এবার একবস্ত্রতার জায়গায় তাঁর বিবস্ত্রতা কাম্য হয়ে উঠেছে কর্ণের। অন্তত দুঃশাসনের কাছে কর্ণের আদেশের মর্ম ছিল তাই। পাণ্ডবদের চাইতেও কুলস্ত্রীকে অপমান করতে বেশি ভাল লাগছিল

বলেই দুঃশাসন দ্রৌপদীর পরিধানের বসন ধরে টান দিলেন—

দ্রৌপদ্যা বসনং বলাৎ . . . ব্যাপাক্রষ্টুং প্রচক্রমে।

সবাই জানেন, কর্ণের এই আদেশ শেষ পর্যন্ত কার্যকরী করা যায়নি। অলৌকিকভাবেই হোক কিংবা লৌকিক কারণেই হোক, দ্রৌপদীর কাপড় টানার ব্যাপারটা দুঃশাসনের হাতের বাইরে চলে গেল। সুযোগ বুঝে বিদুর আবার গালাগালি দেওয়া আরম্ভ করলেন। কর্ণও যেন একটু থতমত খেয়ে গেলেন এবং যা চেয়েছিলেন তা করা গেল না বলে থতমত করেই দুঃশাসনকে আবার বললেন—ঠিক আছে, এখন তুমি এই দাসীটাকে বাড়ির ভেতরে কোথাও রেখে এসো তো—

কর্ণো দুঃশাসনং ত্বাহ কৃষ্ণাং দাসীং গৃহান্ নয়।

মহাভারতের কাহিনী পর্যায়ে এপর্যন্ত যে বিবরণ আমরা পেলাম, তা থেকে এটা বেশ পরিষ্কার যে, দ্যূতসভায় দ্রৌপদীকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হল, সেই চিত্রনাট্যের মূল পাত্র বা সেই লাঞ্ছনার মূল হোতা নিঃসন্দেহে কর্ণ। দুর্যোধন, দুঃশাসনরা এই বর্বরতায় কর্ণের সহযোগী মাত্র। দ্রৌপদী নিজের সম্মান রক্ষা করতে ব্যস্ত, আর কর্ণ ব্যস্ত হয়েছেন যে কোনো মূল্যে তা নষ্ট করতে। কুরুবৃদ্ধেরা এই সভায় মৌন, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বাধা তো দেনইনি বরং এই বর্বরতা তিনি পরোক্ষভাবে খানিক উপভোগই করেছেন। সভার কিংবা দ্রৌপদীর মর্য্যাদারক্ষার চেষ্টা করেছিলেন একমাত্র বিদুর কিন্তু স্বয়ং সিংহাসনে আসীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রই যেখানে পরোক্ষে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, সেখানে বিদুরকে উপেক্ষা করতেও কর্ণের সময় লাগেনি, এমনকী যেসব কুরুবৃদ্ধেরা মৌনতার কৌশলে দ্রৌপদীর পক্ষ নিয়েছেন, তাঁদেরও একহাত নিলেন কর্ণ। কর্ণ বললেন—এ সভায় তিনজন আছেন যারা সবল এবং ধর্ম উল্লঙ্ঘন করতে সমর্থ। এঁরা হলেন ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুর। এঁরা এঁদের প্রভু ধৃতরাষ্ট্রকেই দুষ্টতম বলে জানেন, অথচ তাঁর বাড়বাড়ন্ত হোক, এটাও চান, নিজেরাও কোনো পাপাচরণ করেন না—

যে স্বামিনং দুষ্টতমং বদন্তি বাঞ্ছন্তি
বৃদ্ধিং ন চ বিক্ষিপন্তি।

ভাবটা এই যে, ভীষ্ম দ্রোণ এবং বিদুর এই তিনজনই রাজনির্ভর ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও, এঁদের কিছু স্বত্ব আছে, কিন্তু দাস, পুত্র এবং স্ত্রীলোক এদের কোনো স্বাতন্ত্র্যই নেই। ঠিক যেমন এই মুহূর্তে দ্রৌপদীর কোনো স্বাতন্ত্র্যই থাকতে পারে না, কারণ তিনি দাসের পত্নী। যে মুহূর্তে পাণ্ডবেরা শকুনির পাশার চালে জিত হয়েছেন, সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁরা দাস, আর স্ত্রীলোকে সত্তা যেহেতু একান্ত ভাবেই পতিনির্ভর, অতএব দাসের স্ত্রী দাসী। দাসের সত্তা এবং দাসের ধন যেহেতু প্রভুর অধীন তা হলে দাসের স্ত্রীতেও প্রভুরই অধিকার—

দাসস্য পত্নী অধনস্য ভদ্রে
হীনেশ্বরা দাসধনঞ্চ সর্বম্।

এটা বোঝা যাচ্ছে কর্ণের ওকালতি বুদ্ধি সাংঘাতিক। কর্ণ কিন্তু দ্রৌপদীর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। সেই সভাগৃহে প্রবেশ করার মুহূর্ত থেকে দ্রৌপদী যে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন অর্থাৎ যুধিষ্ঠির যদি নিজেকে আগে বাজি রেখে হেরে থাকেন, তা হলে দ্রৌপদীকে আর তিনি বাজি রাখতে পারেন কিনা, এই প্রশ্নে কুরুবৃদ্ধেরা বিমূঢ় বোধ করছিলেন। কর্ণের বক্তব্য—অত কূট-কচালির দরকার কী? পাণ্ডবেরা বাজির চালে সবাই দাস, আর সেকালে স্ত্রীলোকের যেহেতু স্ব-অধীনতা ছিল না—ন স্ত্রীস্বাতন্ত্র্যমর্হতি—সেই নিয়মে দাসের স্ত্রীও আপাতত কৌরবদের অধীন। তা ছাড়া স্বয়ং ধর্মরাজ তাঁর জন্ম, পরাক্রম এবং পৌরুষ মাথার মধ্যে না রেখে আপন স্ত্রীকে দ্যূতমুখে সমর্পণ করেছেন—এর থেকে বড়ো 'পয়েন্ট' আর কী হতে পারে। কর্ণের ওকালতি এতটাই মোটা দাগের ছিল যে, স্বয়ং ক্রোধ-কষায়িত ভীমও এক সময় যুধিষ্ঠিরকে বললেন—আমি এই সূতের ব্যাটাকে দোষ দিই না—

নাহং কুপ্যে সূতপুত্রস্য রাজন্।

—সত্যিই তো আপনার জন্যেই আমরা দাস হয়ে গেছি, আজ অন্তত যদি পাঞ্চালী কৃষ্ণাকে আপনি বাজি না ধরতেন, তা হলে কি এই শত্রুরা আমাদের এত কথা বলতে পারে?

দ্রৌপদীর স্বাতন্ত্র্যহীনতা এবং দাসীত্ব প্রমাণ করেও কিন্তু কর্ণ ক্ষান্ত হলেন না। সঙ্গে সঙ্গেই দ্রৌপদীকে উদ্দেশ করে কর্ণ বলছেন—এখন থেকে পাণ্ডবরা কেউ আর তোমার প্রভু নয়, কৌরবেরাই তোমার প্রভু। তুমি বরং এঁদের মধ্যে নতুন কোনো স্বামী বেছে নাও—

অন্যং বৃণীষ্ব পতিমাশু ভাবিনি।

কর্ণ বলেছিলেন—স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর যে কামসংক্রান্ত ব্যাপার তা বাইরে কখনো আলোচনার বিষয় হতে পারে না, কিন্তু দাসীভাবে সব কথাই চলে, আর সবচেয়ে বড়ো কথা ওই গোটা পাঁচেক স্বামীর রতি-বন্ধনের চেয়ে, অগুন্তি পুরুষের রতিসাহচর্য্য লাভ করা যায় যাতে, এমন দাসীত্বই তোমার ভাল—

পরিমিত-পতিকাদ্ দারভাবাদ্

অনন্তপতিকং দাস্যমেব তবাস্তু ইতি।

কর্ণের এত কৌরবানুকূল ওকালতির পরে দুর্যোধন আর স্থির থাকেন কী করে? বিশেষত দুঃশাসনের অপচেষ্টা ব্যাহত হওয়ার নিরিখে দুর্যোধন এবার নিজেরই কাপড় তুলে ফেললেন ঊরু থেকে। দেখাতে থাকলেন দ্রৌপদীকে, আর বিকট কোন মর্ষকামিতায় হাসতে থাকলেন কর্ণ।

না, শেষ পর্যন্ত দৈহিকভাবে কিছুই করা গেল না দ্রৌপদীকে। উপরন্তু কৌরবসভায় নানা দুর্লক্ষণ দেখা দিতে থাকল; ভীমের ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হল, গান্ধারী এবং বিদুর পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রকে প্রকৃতিস্থ করতে সফল হলেন। ধৃতরাষ্ট্রের বরে দ্রৌপদীই, স্বামীদের একে একে দাসত্ব থেকে মুক্ত করলেন। সভাস্থলে কেউ আনন্দে, কেউ মুক্তিতে এবং কেউ বা নিরানন্দে—প্রত্যেকেই নিশ্চুপ হয়ে ছিলেন, কিন্তু কর্ণ দ্রৌপদীকে দেখে দ্বিতীয়বার মুগ্ধ হলেন। এই বিপরীত রঙ্গস্থলে বিপরীতধর্মী মানুষের কাছে ততোধিক বিপ্রতীপ আচরণে লাঞ্ছিতা হওয়া সত্ত্বেও দ্রৌপদী যে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েননি এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরই ধৈর্য্যে, বিদগ্ধতায় এবং তাঁরই অপমানের মূল্যে পাণ্ডবেরা যে আবার সব ফিরে পাওয়ার আশ্বাস পেলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে, এতে কর্ণ দ্বিতীয়বার মুগ্ধ হলেন। মহাভারতের কবি তাঁর এই লেখনীর পরিসরটুকু এমনভাবেই সাজিয়ে রেখেছেন যাতে মনে হবে কর্ণ বুঝি তখনই টিপ্পনী কাটছেন দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে। কিন্তু আমরা জানি এটি সেই মুগ্ধতা, যা তাঁকে পাঞ্চালরাজ্যের স্বয়ম্বর সভায় প্রথম মুগ্ধ করেছিল। কর্ণ বললেন—এমন কোনোদিন শুনিনি বাপু! মানুষের মধ্যে রূপবতী রমণীর কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু এমনটি কোনোদিন শুনিনি—

যা নঃশ্রুতা মনুষ্যেষু স্ত্রিয়ো রূপেণ সম্মতাঃ।

তাসামেতাদৃশং কর্ম ন কস্যাশ্চন শুশ্রুম॥

হ্যাঁ কর্ণের গলার সুর এখন অবশ্যই খুব নরম। পাণ্ডবেরা প্রত্যেকেই এখন দ্রৌপদীর কল্যাণে দাসত্বের দায় থেকে মুক্ত। কর্ণ সেদিকটাতেও একটু ইঙ্গিত করে দ্রৌপদীর প্রশংসায় যেন পাণ্ডবদের লজ্জা দিতে থাকলেন। কর্ণ বললেন—হ্যাঁ, পাণ্ডব, কৌরব —সকলকেই যেন রাগে পেয়ে বসেছিল, সেখানে শান্তি নিয়ে এসেছে শান্তির প্রতিমূর্তি দ্রৌপদী—কৃষ্ণা শান্তিরিহাভবৎ। জলে ডুবে যাচ্ছিল যেন পাণ্ডবেরা সবাই, যেখানে পাঞ্চালী কৃষ্ণা যেন নৌকো হয়ে সমস্ত পাণ্ডবদের পারে এনে তুলল—

পাঞ্চালী পাণ্ডুপুত্রানাং নৌরেষা পারগাভবৎ।

বাস্তবিক পক্ষে দ্রৌপদীর সম্বন্ধে কর্ণের ধারণাটা যদি এমন মুগ্ধতারই হয়, তা হলে সে মুগ্ধতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ক্ষণেকের তরে। বিশেষত চূড়ান্ত অপমানের পর এই কথাগুলি সামান্য প্রলেপের কাজ করতে পারে—এটা ভাবাও কর্ণের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু মজা হল, যে নারকীয় অপমান শুধুমাত্র কথায় আর ভঙ্গিতে সম্পন্ন করেছিলেন কর্ণ, কোনো প্রলেপ, কোনো গৌরবই সেই কথা-ক্ষত পূরণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তার ওপরে এখন একটা ভয়ও ধরেছিল। কৌরবদের পক্ষে প্রথমবার পাশাখেলাটা যদি ঈর্ষা কিংবা জ্ঞাতি-শ্রীকাতরতার ফল হয়, তবে দ্বিতীয়বার পাশাখেলাটা ছিল তাঁদের জীবনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। এই কারণে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আবার অর্ধেক পথ থেকেই—ততো ব্যধ্বগতং পার্থং—দ্বিতীয়বার পাশা খেলার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। পাণ্ডবেরা সভা ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে দুঃশাসন তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন দুর্যোধনের কাছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধনের ঘরে যে 'মিটিং' বসেছে তাতে দেখছি এবার কর্ণও আছেন দুঃশাসন এবং শকুনির সঙ্গে। চারজনই যুক্তি করে বুঝেছেন—এবারে পাণ্ডবেরা ছাড়বেন না। ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁরা সভয়ে জানিয়েছেন যে, অর্জুন যেভাবে বিনা কারণে গাণ্ডীব তুলে নিচ্ছে হাতে আর ভীম যেভাবে এমনি-এমনিই গদা ঘোরাচ্ছে, তাতে এবার কিছুতেই তারা ছেড়ে

দেবে না—ন ক্ষংস্যন্তে। তা ছাড়া দ্রৌপদীকে যেভাবে অপমান করা হয়েছে তাতে কিছুতেই পাণ্ডবেরা বসে থাকবে না এবার—

দ্রৌপদ্যাশ্চ পরিক্লেশং কস্তেষাং ক্ষন্তুমর্হতি।

পুত্র, শ্যালক এব কর্ণের কথার সারবত্তা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বুঝেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবদের ডেকে পাঠিয়েছেন বনবাসের পণ রেখে পাশা খেলার জন্য। কুরুবৃদ্ধেরা ধৃতরাষ্ট্রকে বারণ করেছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র কোনো যুক্তি মানেননি, কোনো প্রতিযুক্তিও দেননি। কিন্তু গান্ধারী বারণ করার পর ধৃতরাষ্ট্র একটাই কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—আমি কুরুকুলের সর্বনাশ কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারব না—

অন্তঃ কামং কুলস্যাস্তু ন শক্নোমি নিবারিতুম্।

কুরুকুলের সর্বনাশের ব্যাপারে দুর্যোধনের যতখানি দোষ আছে, কর্ণের দোষ তার চেয়ে কিছু কম নয়। পরে, অনেক পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-শেষে শ্মশানভূমিতে দাঁড়িয়ে ধর্মদর্শিনী গান্ধারী কৌরবদের ন্যায়-অন্যায়ের একটা পর্যালোচনা করেছিলেন। গান্ধারী বলেছিলেন—মূল অপরাধটা অবশ্যই দুর্যোধন এবং শকুনির কিন্তু তাতে সব সময় ইন্ধন জুগিয়ে গেছে কর্ণ আর দুঃশাসন—

কর্ণদুঃশাসনাভ্যাঞ্চ বৃত্তো'য়ং কুরুসংক্ষয়ঃ।

এই যে কৌরবসভায় দ্রৌপদীর চরম লাঞ্ছনা রূপায়িত হল তার কারণ যতখানি দুর্যোধন, তার চেয়ে বেশি, অনেক বেশি হলেন কর্ণ। দুর্যোধন দ্রৌপদীকে রাজসভায় নিয়ে আসবার হুকুমটি দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু রাজসভায় তাঁকে নিয়ে আসবার পর কতটা নোংরামি করা যায়, তার সম্পূর্ণ শিল্পী ছিলেন কর্ণ। সেকথা সঞ্জয়ের মুখেও আমরা শুনতে পাব। পাণ্ডবরা বনে চলে গেলে ধৃতরাষ্ট্র যখন মনে মনে ভয় পাচ্ছেন, তখন সঞ্জয় অন্য সমস্ত কথা বাদ দিয়ে দ্রৌপদীর জঘন্য লাঞ্ছনার কথা তুলেছেন। ধিক্কার দিয়েছেন দুর্যোধনের সহায় কর্ণকে, যিনি মুখে আনা যায় না এমন কথা বলেছেন দ্রৌপদীকে—

দুর্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ কটুকান্যভ্যভাষতাম্।

ধৃতরাষ্ট্র নিজেও স্বীকার করে নিয়েছেন যে, কর্ণের আদেশে দ্রৌপদীর যে বস্ত্রহরণ সম্ভব হয়েছিল—সে ঘটনায় তৎকালীন সমাজমুখ্য ব্রাহ্মণরা অসম্ভব ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন—

ব্রাহ্মণাঃ কুপিতাশ্চাসন্ দ্রৌপদ্যাঃ পরিকর্ষণে।

মূলত দ্রৌপদী অপমানের কারণেই কুরুসভা থেকে বেরিয়ে বনবাসের পথে যাবার আগে অর্জুন কর্ণবধের ভীষণ প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করলেন।

[মহা (k) ২.৬৭.৩০-৪৫; ২.৬৮.১-৫৩; ২.৭০.১-১৮; ২.৭১.১-১৫; ২.৭১.২০-৩৬; ২.৭২.১-৪; ২.৭৪.৪-৬; ২.৭৭.৩২; (হরি) ২.৬৪.৩০-৪৫; ২.৬৫.১-৫০; ২.৬৭.১-১৮; ২.৬৮.১-১৪; ২.৬৮.২০-৩৬; ২.৬৯.১-৪; ২.৭১.৪-৬; ২.৭৪.৩২]

□ পাণ্ডবরা বনে যাবার পর দ্যূতসভার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বভাবতই প্রজাদের মধ্যে একটা অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। সেই অসন্তোষ কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়—প্রধানত দুর্যোধন, কর্ণ আর শকুনির বিরুদ্ধে। কারণ প্রজাসাধারণ ততদিনে বেশ ভালভাবেই বুঝে গিয়েছে যে, হস্তিনাপুরের রাজা ধৃতরাষ্ট্র হলেও তাঁর শাসনযন্ত্রের প্রকৃত যন্ত্রী হলেন দুর্যোধন, শকুনি এবং কর্ণ, হস্তিনাপুরের পুরবাসী ব্রাহ্মণেরা দলে দলে চলে যেতে লাগলেন যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে—

অপেত্য রাষ্ট্রাদ্ বসতাস্তু তেষাম্/
ঋষিঃ পুরোনো'তিথিরাজগাম।

জিনিসটা কৌরবদের পক্ষে ভাল হচ্ছিল না। সমস্ত বনগুলিতে পাণ্ডবদের ধনুষ্টংকার আর ব্রাহ্মণদের ওঙ্কারনাদ একসঙ্গে মিশে যেতে লাগল—

জ্যাঘোষশ্চৈব পার্থানাং ব্রহ্মঘোষশ্চ ধীমতাম্।

এতটাই জটিল হয়ে উঠল পরিস্থিতি যে স্বয়ং বেদব্যাস এবং তাঁর অনুরোধে মহর্ষি মৈত্রেয় এলেন দুর্যোধনকে শাসন করতে কিন্তু দুর্যোধন তাঁদের সঙ্গে এমনই দুর্ব্যবহার করলেন যে, মহর্ষি মৈত্রেয় শাপ দিলেন দুর্যোধনকে।

কিন্তু লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল—হস্তিনাপুরের রাজপরিবারের এমন গুরুতর পরিস্থিতিতেও কর্ণের বিন্দুমাত্র হেলদোল নেই, তাঁর কিছুই এসে যায় না। পাঠক-সাধারণের অনেকেই ভাবেন যে, কর্ণ যা করেছেন বন্ধু দুর্যোধনের প্রীতির জন্য করেছেন এবং এই কারণেই কর্ণকে মহাভারতের একটি করুণ চরিত্রে রূপান্তরিত করতে কোনো অসুবিধে হয় না। হ্যাঁ কর্ণ করুণ চরিত্র বটেই কিন্তু এই মুহূর্তে এটাও মনে রাখতে হবে যে, দুর্যোধনের সঙ্গে কর্ণের যে বন্ধুত্ব

ঘটেছিল, সেটাও কিন্তু শুধুমাত্র বন্ধুত্বের জন্য নয়, সেটা যে কোনো ভাবে অর্জুনকে শায়েস্তা করার জন্য। এরপর দুর্যোধনের কাঁধে ভর রেখে তিনি নিজের বৃদ্ধিবাসনা চরিতার্থ করেছেন কিন্তু তার পরিণামে হস্তিনাপুরের বা সেখানকার কুরুরাজবংশের ভাল-মন্দ কী হল তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজনই কর্ণ অনুভব করেননি। কর্ণ পাশার আসরে বসে সমস্ত কুরুবৃদ্ধদের অপমান করলেন। ঘরের ছেলে দুর্যোধনের পক্ষে এই অপমান করাটা লৌকিকতা কিংব চক্ষুলজ্জায় বাধত, কিন্তু কর্ণের সেই দায় নেই, কাজেই দুর্যোধন নিজের মতো করে যেটাকে কুরুকুলপতিদের মুখোশ বলে মনে করেন, সে মুখোশ খুলে দিতে কর্ণের একটুও বাধে না, কারণ কর্ণ কুরুদের কেউ নন। আবার এই অপমান করার মধ্যেও যে সীমা অসীমের দ্বন্দ্ব আছে, সেটাও কর্ণ বোঝেন দুর্যোধনের দৌলতেই। কাকে কতটা অপমান করতে হবে অর্থাৎ দুর্যোধন কাকে কতটা অপমান করতে চান, সেটা দুর্যোধনই এত প্রকট করে ফেলেন যে, কর্ণের পক্ষে কোনো অসুবিধেই হয় না সে দায় বহন করার। এই যে বিদুর ফিরে এলেন বনবাসী পাণ্ডবদের কাছ থেকে, আর দুর্যোধন একেবারে মুষড়ে পড়লেন তার কারণ কী? দুর্যোধন যেখানে নিজেই বলেন যে, এই বিদুরটা হল পাণ্ডবদের বন্ধু, পাণ্ডবদের হিতকামী, তখন কর্ণ আরও বেশি বোঝেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর—এদের সবাইকে যেখানে দুর্যোধন স্বয়ংই পাণ্ডবপক্ষপাতী ঘরের শত্রু বলে মনে করছেন, সেখানে শুধুমাত্র পাণ্ডব-বিদ্বেষের নিরিখেই কর্ণ যে এই মানুষগুলির ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন, তাতে আশ্চর্য কী? কিন্তু কর্ণের যেহেতু কোনো সীমাবদ্ধতার দায় নেই, তাই একদিকে তিনি যেমন দুর্যোধনের মানসিকতার মই বেয়ে কুরুসভায় কেউকেটা হয়ে উঠছিলেন, তেমনি অন্যদিকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর—এঁদের সবার বড়ো অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। *[দ্র. দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র]*

□ যাইহোক, এই মুহূর্তে পাণ্ডবদের বনবাসে পাঠিয়েও কর্ণের অন্তরে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা পাণ্ডববিদ্বেষের আঁচ কিছু কমেনি। পাণ্ডবদের বনবাসের পরপরই তিনি অসহায় বনবাসী পাণ্ডবদের উপর পূর্ণ শক্তিতে আক্রমণ হানার কথা বলেছিলেন, যদিও সে প্রস্তাব মহামতি বেদব্যাসের কারণে সফল হয়নি, কর্ণ তাতে কিছুমাত্র দমে গেলেন না। পাণ্ডবদের অপমান করার কোনো নতুন সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। সুযোগ আবার এল যখন এক ব্রাহ্মণ বনে বনে ঘোরা পাণ্ডবদের দুরবস্থার কথা এসে শোনালেন ধৃতরাষ্ট্রকে। সেই মুহূর্তে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় দুর্যোধনও ছিলেন না, কর্ণও ছিলেন না, ছিলেন একমাত্র শকুনি। শকুনি প্রথমেই এসে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন কর্ণকে—

অবোধয়ৎ কর্ণমুপেত্য সর্বম্।

পাণ্ডবেরা বিপাকে কষ্ট পাচ্ছেন শুনে কর্ণ খুব খুশি হলেন এবং মনের হর্ষ বাড়ানোর জন্য তিনি দুর্যোধনকে এক নতুন প্রস্তাব দিলেন। শকুনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন বটে কিন্তু সমস্ত 'প্ল্যানটা' যে তাঁরই সেটা বেশ বোঝা যায়। কর্ণ বললেন—মহারাজ দুর্যোধন! এই সমস্ত বসুন্ধরা এখন তোমার হাতের মুঠোয়, সামন্ত রাজারা তোমার আদেশের প্রতীক্ষা করছে সব সময়। ধন-সম্পদ, প্রাচুর্য্য-প্রতিপত্তি যাই তোমার থাকুক, সেগুলি দেখে যদি পাণ্ডবদের কষ্টই না লাগল তা হলে সে সম্পদের মানে কী? তোমার অগাধ সম্পত্তি আছে, তাদের কিচ্ছু নেই—এই অবস্থাটা, এই বাড়বাড়ন্ত তাদের দেখানো দরকার। সত্যি বলতে কি, রাজ্যপাট, ধনসম্পত্তি—এসব থেকে কিছুই সুখ নেই, যদি না তোমার বাড়বাড়ন্ত দেখে বনবাসী এবং দুর্বিপাকগ্রস্ত পাণ্ডবদের চোখ না টাটায়।

কর্ণ বললেন—তুমি এক কাজ কর। পাণ্ডবেরা দ্বৈতবনে যেখানে কুটির বেঁধে রয়েছে, সেইখানেই যাওয়া যাক। তুমি যাবে দারুণ দামি পোশাক পরে, সঙ্গে থাকবে টাকা-পয়সা দাসদাসী। এই অবস্থায় গাছের বাকল-পরা অর্জুন তোমাকে দেখলে, তোমার কী আনন্দই না হবে—

কিং নু তস্য সুখং ন স্যাৎ।

কুরুবাড়ির বউরা সব ঘটা করে সেজেগুজে বাকল-পরা দ্রৌপদীর সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াবে। রাজসভার মধ্যে বেচারা দ্রৌপদীর যা অপমান হয়েছিল, সুসজ্জিতা কৌরবস্ত্রীদের দেখলে সে দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলবে। ভাববে, পাণ্ডবদের বিয়ে করে কী হল আমার—

সা চ নির্বিদ্যতাং পুনঃ।

সেই অর্জুন, সেই দ্রৌপদী। কী উপায়ে, কী কৌশলে অর্জুন কষ্ট পান, দ্রৌপদী কষ্ট পান কর্ণের

কেবল সেই চিন্তা। কর্ণের সুবিধে, তাঁর এই পাণ্ডব নিপীড়নের বাসনা দুর্যোধনের সঙ্গে মিলে যায়। বস্তুত এগুলি সবই কর্ণের মনের ইচ্ছে এবং এই ইচ্ছেগুলি তিনি চাপিয়ে দিয়েছেন দুর্যোধনের ওপর। দুর্যোধন এই কথাগুলি আগে একটুও ভাবেননি, এই মুহূর্তে কর্ণ এত সব বলায়, তাঁরও মনে হল—আরে তাই তো, এভাবে তো পাণ্ডবদের খানিকটা হেনস্থা করা যেতে পারে। সুপ্ত অভিলাষে সুড়সুড়ি লাগার সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধনের মনে হয়—এইরকম একটা দারুণ বুদ্ধি তো আমার মাথাতেই আসা উচিত ছিল। অতএব নিজের অপ্রস্তুত ভাব ঢাকতে বেশি সপ্রতিভ হয়ে দুর্যোধন বলেন—ভাই কর্ণ তুমি যা বলেছ, এসব তো আমার মনেও ছিল, কিন্তু নেহাত পিতা ধৃতরাষ্ট্র সেখানে যেতে অনুমতি দেবেন না বলেই যেতে পারছি না। নইলে আমার কি আর ইচ্ছে করে না যে পাণ্ডবদের একটু মেজাজ দেখিয়ে আসি, গাছের বাকল-পরা দ্রৌপদীকে প্রাচুর্য্য দেখিয়ে আসতে আমারই কি ইচ্ছে করে না—

দ্রৌপদীং কর্ণ পশ্যেয়ং কাষায়বসনাং বনে।

কিন্তু কী উপায়ে সেখানে যাব সেইটাই তো ভেবে পাচ্ছি না। তোমরা যদি একটা উপায় বার করতে!

পরদিন সকালবেলায় উঠেই কর্ণ চলে এলেন দুর্যোধনের কাছে। প্রসঙ্গত বলা ভালো, দুর্যোধনের রাজকার্যে কর্ণ এতটাই গুছিয়ে বসেছিলেন যে, তাঁর রাজ্যে কোথায় কী ঘটছে সবই তিনি জানেন। সকালবেলায়—এসেই তিনি বললেন—উপায় পাওয়া গেছে। দ্বৈতবনে যেখানে পাণ্ডবেরা থাকে, সেখানেই রয়েছে হস্তিনাপুরের খাস প্রজা গয়লাদের বাড়ি-ঘর। রাজবাড়ির গোরুবাছুরদের পালন করে তারাই। সে গয়লারাও বহুদিন ধরে তোমাকে যেতে বলছে—ত্বৎপ্রতীক্ষা নরাধিপ। আমরা সেই অছিলায় দ্বৈতবনে যাব, পাণ্ডবদেরও মুখোমুখি হব। শকুনিও কর্ণকে সমর্থন করলেন। দুর্যোধন বললেন—বেশ, আমি কালকে যখন রাজসভায় ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্য কুরুবৃদ্ধদের সঙ্গে বসে থাকব তখন তোমরা এই পরিকল্পনা জানাবে। আমি সেই মুহূর্তে যা করার করব।

কর্ণ-শকুনি অত কাঁচা লোক নন। তাঁরা ইতিমধ্যেই দ্বৈতবনের এক গোয়ালাকে প্রস্তুত করে এনেছেন, যার প্রসঙ্গ তুলে কর্ণ গলা মিলিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—ঘোষপল্লীতে একবার যাওয়া দরকার (যেন দ্বৈতবন তাঁরা চেনেন না), গরুবাছুরদের গণনা করে তাদের গায়ে ছাপ মারারও দরকার—

স্মরণে সময়ঃ প্রাপ্তো বৎসানামপি চাংকনম্।

তা ছাড়া দুর্যোধন যদি যান তো একটু মৃগয়াও হতে পারে, আপনি অনুমতি দিন মহারাজ। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে খবর ছিল যে, অর্জুন দেবতাদের তুষ্ট করে অনেক অস্ত্রশস্ত্রও লাভ করেছে, সেখানে ঘোষপল্লীতে গিয়ে যদি কৌরবেরা আবার পাণ্ডবদের বিনা কারণে খোঁচায়, এটা তিনি চাইছিলেন না। শকুনিও অনেক বোঝালেন বটে, তবে নিতান্ত অনিচ্ছায় ধৃতরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিলেন। কর্ণ, দুঃশাসন এবং শকুনিকে সঙ্গে নিয়ে দুর্যোধন চললেন দ্বৈতবনে পাণ্ডবদের কাছে ক্ষমতা ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি প্রকাশ করার জন্য। সঙ্গে থাকল সৈন্য-সামন্ত, রথ, হস্তী। সমস্ত কুলবধূরা সেজেগুজে চলল। গাড়ি-ঘোড়া, দোকান-পাট, বেশ্যা-দাসী সবাই চলল দুর্যোধনের সঙ্গে। দ্বৈতবনে বিশাল ব্যবস্থা হল থাকা-খাওয়া, নাচ-গানের। ঘোষপল্লীতে প্রাথমিক কাজকর্ম সেরেই মৃগয়া চলল কিছুদিন। তারপরেই দুর্যোধন আদেশ দিলেন—দ্বৈতবনের যে সরোবরের একধারে পাণ্ডবেরা রয়েছেন তারই আরেক ধারে বেশ কিছু বাড়ি বানিয়ে ফেলতে। কারিগরেরা চলল বটে বাগানবড়ি বানাতে, কিন্তু সে জায়গা আগেই এসে দখল করেছিলেন— গন্ধর্ব চিত্রসেন। একজনকে দেখাতে এসে আরেকজনের সঙ্গে গণ্ডগোল বেধে গেল। রীতিমতো যুদ্ধ, তুমুল যুদ্ধ। পাণ্ডবেরা পরপারেই রয়েছেন, তাঁদের সামনেই যুদ্ধ হচ্ছে, কাজেই দুর্যোধনের তরফে এটা দারুণ 'প্রেস্টিজে'র ব্যাপার। প্রধান প্রধান সৈনিকদের দিয়ে কিছু হল না, অতএব 'প্রেস্টিজ' বাঁচাতে যুদ্ধ করতে এলেন কর্ণ। প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। কর্ণ অনেক গন্ধর্বদের মেরে ফেললেন বটে কিন্তু গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন মায়াযুদ্ধ জানেন। দুর্যোধন, দুঃশাসনেরা সবাই কর্ণের ভরসাতেই যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, চিত্রসেন এমন যুদ্ধ করলেন যে, কর্ণ দেখলেন রণক্ষেত্রে তিনি প্রায় একা। গন্ধর্বরাও বুঝেছে যে, কর্ণই আসল যুদ্ধবাজ, তারা সবাই মিলে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করল। কেউ কর্ণের

রথ ভাঙে, কেউ ধ্বজা কেটে দেয়, কেউ রথের চাকা নিয়ে পালায়, কেউ বা রথের ঘোড়া মারে, কেউ বা শুধুই বাণ মেরে যাচ্ছে কর্ণের গায়ে। শেষে সমস্ত গন্ধর্বরা মিলে কর্ণকে এমন ব্যতিব্যস্ত করে তুলল যে, কর্ণ রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে দুর্যোধনের ভাই বিকর্ণের রথে চড়ে পালাতে বাধ্য হলেন। সেই সুযোগে দুর্যোধন চিত্রসেনের হাতে সস্ত্রীক ভাইদের সঙ্গে বন্দি হলেন এবং তাঁকে মুক্ত হতে হল ভীম এবং অর্জুনের মধ্যস্থতায়। এর থেকে বড়ো অপমান দুর্যোধনের আর কী-ই বা হতে পারে। গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন দুর্যোধনের সমস্ত পূর্ব-পরিকল্পনার কথাও বলে দিলেন পাণ্ডবদের।

দুর্যোধন লজ্জায় মাথা নিচু করে হস্তিনাপুরের দিকে চললেন, নিজের ওপর অশ্রদ্ধায় তাঁর মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল। এরই মধ্যে কর্ণ এসে উপস্থিত হলেন দুর্যোধনের কাছে। অতি আহ্লাদে আটখানা হয়ে কর্ণ বললেন—বাঃ! তোমরা যে গন্ধর্বদের জিতে আবার ফিরে চলেছ, এটা দেখে খুবই ভাল লাগছে। আমাকে তো তোমরা দেখেছ, গন্ধর্বরা কী করল। সবাই মিলে এমন আমার পেছনে লাগল—

অহং ত্বভিদ্রুতঃ সর্বৈঃ গন্ধর্বৈঃ পশ্যতস্তব।

—যে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলাম— ব্যপযাতো'ভিপীড়িতঃ। যেখানে আমারই এই অবস্থা, সেখানে ভাইদের সঙ্গে করে তুমি যে যুদ্ধ জিতে ফিরেছ, এটা তুমি ছাড়া আর কেউ পারত না। দুর্যোধন বেশ বুঝলেন যে তাঁর বন্দি হবার কিংবা পাণ্ডবদের মধ্যস্থতায় তাঁর ছাড়া পাবার কোনো খবরই কর্ণ জানেন না। বেশ বিব্রত এবং গম্ভীর ভাবে তাই সমস্ত বৃত্তান্ত তিনি খুলে বললেন কর্ণকে। ভীম-অর্জুনের মধ্যস্থতায় কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পারার ঘটনায় দুর্যোধন এতদূর হতাশ হয়ে পড়েছেন যে, এই মুহূর্তে তিনি প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করার সংকল্পও করে ফেলেছেন। এমনকী নিজের অবর্তমানে ছোটো ভাই দুঃশাসনই যে যুবরাজ হবেন, তাও স্থির করে ফেলেছেন। কর্ণ অনেকক্ষণ ধরে দুর্যোধনের বিলাপ, আত্মধিক্কার, হতাশার কথা শুনলেন, দুর্যোধনের তিনি এতকালের বন্ধু, কী করে তাঁর অপমান ঘোচাতে হবে তা কর্ণের থেকে বেশি ভালো আর কেই বা জানে। পাশাপাশি স্মরণে রাখা দরকার যে, কর্ণের ওকালতি-বুদ্ধি খুব পরিষ্কার। ভীম, অর্জুন এবং স্বয়ং যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের প্রতি যে উদাসীনতা দেখিয়েছেন, ততোধিক উদাসীনতা ঢেলে দুর্যোধনের সামনে নিজের যুক্তি রাখলেন কর্ণ। কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন—এমন বোকার মতো কষ্ট পাচ্ছ যে কী বলব—বালিশ্যাৎ প্রাকৃতাবিব। পাণ্ডবেরা তাদের কর্তব্য করেছে, করাই উচিত। কারণ তারা তোমার রাজ্যের অন্তেবাসী প্রজা, তো প্রজা রাজাকে বাঁচাবে না? তা ছাড়া জনপদবাসী সাধারণ মানুষেরা সৈনিকদের সাহায্য করবে, রাজার কাজে সহায়তা করবে—এই নিয়ম। পাণ্ডবেরাও তোমার জনপদবাসী। অতএব সাহায্য করেছে, তাতে হয়েছেটা কী? পাণ্ডবেরা অনেককাল আগেই তোমার দাসে পরিণত হয়েছে— প্রেষ্যতাং পূর্বমাগতাঃ—আমি তো মনে করি তুমি যে সময়ে গন্ধর্বদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করেছ, সেই সময়েই পাণ্ডবদের উচিত ছিল তোমার সেনাবাহিনীর পেছনে এসে যোগ দেওয়া—

স্বসেনয়া সম্প্রয়ান্তং নানুযান্তি স্ম পৃষ্ঠতঃ।

—কারণ সেটাই ছিল তাদের কর্তব্য। কর্ণের কথায় দুর্যোধনের মনে নিশ্চয়ই কাজ হচ্ছিল, তবুও তিনি ওপরে ওপরে ভীষণ অবসন্ন ভাব দেখাচ্ছিলেন। এবারে যখন শকুনিও কর্ণের সমস্ত কথা সমর্থন করলেন—সম্যগ্ উক্তং হি কর্ণেন—এবং দুর্যোধনকে খুব একচোট বকা লাগালেন তখনই কর্ণের কাজ সাঙ্গ হল। দুর্যোধন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে হস্তিনায় ফিরে এলেন।

[মহা (k) ৩.২৩৭.১-২৩; ৩.২৩৮.১-২৪; ৩.২৩৯.১-২৯; ৩.২৪১.১১-৩২; ৩.২৪৭-২৫২ অধ্যায়; (হরি) ৩.২০০.১-২২; ৩.২০১.১-২৪; ৩.২০২.১-২৯; ৩.২০৪.১১-৩২; ৩.২০৮.১-৮০; ৩.২০৯.১-৭৮]

□ তবে গন্ধর্বদের হাতে দুর্যোধনের বন্দি হওয়ার ঘটনার রেশ এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল না। এর একাধিক প্রতিক্রিয়া হল। একদিকে কর্ণ—তিনি ভাবলেন যে তাঁর এই পরাজয়টা নিতান্তই আপাতিক এবং অর্জুন যে গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করেছে, সেটাও কোনোক্রমে হয়ে গেছে। দুর্যোধনকে তিনি বুঝিয়েছেন—তুমি অর্জুনের বিক্রম দেখে ভয় পেয়ো না, তেরো বছর বাদে যদি যুদ্ধ হয়, তবে অর্জুনকে আমি প্রাণে মারব—একথা নিশ্চয় জেনো—

সত্যং তে প্রতিজানামি বধিষ্যামি রণে'র্জুনম্।

দুর্যোধন তো এই কথা বিশ্বাস করতেই চান। যার ওপরে ভরসা করে তিনি এগোচ্ছেন, সে একটা যুদ্ধে হেরে গেলে তার একটা প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হয় বটে। কিন্তু ভরসা করার মতো বশংবদ বীরপুরুষ যদি বিকল্পে না থাকে, তবে তাকেই আবার ভরসা করতে হয়, ভাবতে হয়—পরের বার কর্ণ নিশ্চয় দেখে নেবে অর্জুনকে—

এবমাশা দৃঢ়া তস্য ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্মতেঃ।

কিন্তু নিরপেক্ষ জনেরা ছাড়বেন কেন? যারা একের পর এক অন্যায় করেছে, তারা যখন হেরে যায়, তখন নিরপেক্ষ জনেরা তো কটূক্তি করবেনই। কাজেই কর্ণ, দুর্যোধন এঁরা যখন যখন লজ্জার মাথা খেয়ে হস্তিনায় ফিরলেন, তখন ভীষ্ম বললেন—দ্যাখো দুর্যোধন, আগেই তোমাকে দ্বৈত বনে যেতে বারণ করেছিলাম। এখন শত্রুর হাতে বন্দি হয়ে কেমন লাগল? লজ্জা করল না তোমার যখন পাণ্ডুপুত্রেরা এসে তোমাদের বাঁচাল? আর এই যে সূতপুত্র কর্ণ, সে তো পালিয়েই গেল ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে—

ক্রোশতস্তব রাজেন্দ্র সসৈন্যস্য নৃপাত্মজ।
সূতপুত্রো'পযাদ্ ভীতঃ . . .॥

এই তো অবস্থা, তুমি অর্জুনের ক্ষমতাও দেখলে, কর্ণের ক্ষমতাও দেখলে, এত যে কর্ণ কর্ণ করো, সেই কর্ণ অর্জুনের পায়ের নখেরও যোগ্য নয়—

ন চাপি পাদভাক্ কর্ণঃ পাণ্ডবানাং নৃপোত্তম।

ভীষ্ম বললেন—আমি সারকথা বলি দুর্যোধন, তুমি সন্ধি করো পাণ্ডবদের সঙ্গে, তাতেই তোমার মঙ্গল হবে। দুর্যোধন এতক্ষণ ভীষ্মের তিরস্কার চুপ করে শুনছিলেন, এখন সন্ধির কথা শুনেই অবজ্ঞার হাসি হেসে কোনো সৌজন্য না দেখিয়েই সভা ছেড়ে চলে গেলেন।

কুরু পরিবারের জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তিটির প্রতি কনিষ্ঠের যদি এমন ব্যবহার হয়, তাহলে বাইরের লোক হিসেবে কর্ণ তো ভীষ্মকে অপমান করার ব্যাপারে প্রশ্রয় পেয়েই যান। উচ্চাভিলাষী কর্ণ সদ্য তিরস্কৃত দুর্যোধনের দুর্বলতায় ঘা দিয়ে বললেন—এই ভীষ্ম আমাদের একদম দেখতে পারেন না, সবসময় পাণ্ডবদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এই বৃদ্ধ তোমাকেও দেখতে পারেন না, আমাকেও দেখতে পারেন না—

ত্বদ্ দ্বেষাচ্চ মহাবাহো মমাপি দ্বেষ্টুমর্হতি।

লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল—কর্ণ কিন্তু এখানে নিজেকেও দুর্যোধনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে কথা বলছেন। ভাবটা এমন যে তিনি যে এত ক্ষোভ, এত ক্রোধ প্রকাশ করছেন, তা যত না নিজের অপমানের কারণে, তার থেকে অনেক বেশি দুর্যোধনের অপমান সহ্য করতে না পেরে। কর্ণ রাগে গজগজ করে চললেন—আমাকে তাও যা বলে বলুকগে, কিন্তু সবসময় এই পাণ্ডবদের প্রশংসা আর তোমার নিন্দা—এ আর আমি সইতে পারছি না—ন মৃষ্যামীহ ভারত।

কর্ণ এবার আসল কথায় এলেন—তুমি শুধু একবার বলো দুর্যোধন। সমস্ত পৃথিবী তোমাকে আমি জিতে এনে দিতে পারি। যে সমস্ত রাজ্য পাণ্ডবরা একসময় জিতেছিল, সেসব আমি চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে একাই জিতে আনব।

সত্যি কথা বলতে কি ভীষ্মের প্রতিকূল ব্যবহারে কর্ণ যে আজ হঠাৎ খেপে উঠলেন, তা মোটেই নয়; ভীষ্ম একটা উপলক্ষ মাত্র। আসল কথা তিনি নিজে যে গন্ধর্বদের হাতে প্রচণ্ড পিটুনি খেয়ে এলেন এবং তিনি থাকতেও দুর্যোধনকে যে অর্জুনের সহায়তায় মুক্তি পেতে হল, এর একটা প্রতিপূরক ব্যবহার করতে চাইছিলেন কর্ণ। এতে যেমন দুর্যোধনের ক্ষোভও একটু প্রশমিত করা যাবে তেমনি দিগ্বিজয়ের সূত্রে বেশ কয়েকটা রাজ্য জিতে এলে দুর্যোধন তাঁর ওপর হৃত বিশ্বাস ফিরে পাবেন। বিশেষত যুদ্ধবিদ্যায় তিনি যে কারও চাইতে কম নন, এটা যদি অর্জুন বাদে অন্য রাজাদের ওপর দিয়ে পরীক্ষা হয়ে যায়, তার চাইতে সুবিধেজনক আর কী আছে! কিন্তু এই দিগ্বিজয়ের কথাটা হঠাৎ করে পাড়তে কর্ণের অসুবিধে হচ্ছিল। দুর্যোধনের সামনে ভীষ্ম তাই যেদিন কর্ণকে কিঞ্চিৎ খাটো করলেন, ওমনি কর্ণ দিগ্‌বিজয়ের কথাটা পেড়ে ফেললেন এবং সেইসঙ্গে কুরুবৃদ্ধ পিতামহকেও যথেচ্ছ গালাগালি করে নিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, যে মানুষ দুর্যোধনের দাক্ষিণ্যে এত দূর এসেছেন, তাঁরই মুখে আপন পিতামহের কুৎসা শুনেও দুর্যোধন তাঁকে কিছুই বললেন না। 'ভীষ্ম কুরুকুলের অধম', 'ভীষ্ম দুর্বুদ্ধি'—এ-কথা যদি সত্যও হত, তবু কর্ণের মুখে এ-কথা শুনে দুর্যোধনের প্রতিবাদ করা উচিত ছিল, তা তো তিনি করলেনই না বরং উল্টে বললেন—ধন্য হলাম

বন্ধু, ধন্য আমি! তোমার মতো মহাবল পুরুষ যে সব সময় আমার হিত চিন্তা করছে, তাতে আজ আমার জন্ম সফল হল—

হিতেষু বর্ত্ততে নিত্যং সফলং জন্ম চাদ্য মে।

যাও বীর, তুমি বিশ্বভুবন জয় করে ফিরে এসো। পাণ্ডবরা যে দিগ্বিজয় করে খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল, সেই দিগ্বিজয় কর্ণ করতে যাচ্ছেন দুর্যোধনের প্রতিনিধি হয়ে—এই গর্বেই দুর্যোধনের বুক ফুলে উঠল।ভীষ্মের অপমান তাঁর মাথাতেই ঢুকল না। বিশ্বজয়ের জন্য কর্ণ জয়রথে উঠলেন এবং অন্য কোনো দেশে, কোনো রাজ্যে অর্জুনের মতো ধনুর্ধারী বীর দ্বিতীয় না থাকার ফলে কর্ণ দিগ্বিজয় করে ফিরেও এলেন। মহাভারতের কয়েকটি সংস্করণে কর্ণের এই দিগ্বিজয়ের বিশদ বিবরণ সম্পূর্ণ একটি অধ্যায় হিসেবে ধৃত হলেও পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ নিজের সম্পাদিত সংস্করণে এই বিবরণটিকে মূল গ্রন্থে স্থান দেননি। তবে পাদটীকায় অতিরিক্ত পাঠ হিসেবে সম্পূর্ণ অধ্যায়টি তুলে দিয়েছেন। যাই হোক, এই দিগ্বিজয়ের বিবরণে চোখ রাখলে দেখা যাবে যে, কর্ণের এই দিগ্বিজয়ের ঘটনাক্রমও খানিকটা পাণ্ডব বিদ্বেষের দ্বারা চালিত হয়েছে। হস্তিনাপুর থেকে যাত্রা করে কর্ণের প্রথম লক্ষ্যই হল দ্রুপদের দেশ পঞ্চাল। সেই দ্রুপদ, যাকে দুর্যোধন-কর্ণরা মিলে যুবা বয়সে একবার জয় করতে গিয়ে শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হন। অথচ কর্ণের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুন অনায়াসে দ্রুপদকে বন্দি করে আনেন। সেই দ্রুপদ, যাঁর কন্যা দ্রৌপদী সূতপুত্র কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন স্বয়ংবরসভায় আর শেষপর্যন্ত দ্রুপদ কন্যাদান করেছেন কী না কর্ণেরই চিরশত্রু পাণ্ডবদের। দ্রৌপদীর চরম অপমান করেও দ্রুপদের প্রতি কর্ণের বিদ্বেষের আঁচ কমেনি। ফলে হস্তিনাপুর থেকে রওনা হয়ে প্রথমেই তিনি পঞ্চাল আক্রমণ করলেন, পঞ্চাল জয় করে দ্রুপদের কাছ থেকে রীতিমতো কর আদায়ও করলেন—

ততঃ কর্ণো মহেষ্বাসো বলেন মহতা বৃতঃ।
দ্রুপদস্য পুরং রম্যং রুরোধ ভরতর্ষভ॥
যুদ্ধেন মহতা চৈনং চক্রে বীরং বশানুগম্।
সুবর্ণং রজতঞ্চাপি রত্নানি বিবিধানি চ॥
করঞ্চ দাপয়ামাস দ্রুপদং নৃপসত্তম।
তং বিনির্জ্জিত্য রাজেন্দ্র রাজানস্তস্য যে'নুগাঃ॥

দ্রুপদ আর তাঁর অনুগত, মিত্র রাজাদের জয় করে কর্ণের রথ ছুটল উত্তর দিকে। অর্জুন, তাঁর চিরশত্রু অর্জুন—একবার নয়, দু-দুবার উত্তরদিক জয় করেছেন—সেই ঈর্যাই কর্ণকে উত্তরে ছুটিয়ে নিয়ে গেল প্রথমে। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত, হিমালয়ের পার্বত্য বীর জনজাতিগুলি, নেপাল প্রভৃতি জয় করে কর্ণ যাত্রা করলেন পূর্বে। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-মিথিলা জয় করে মগধ, কর্কদেশে বিজয়পতাকা উড়িয়ে কর্ণ এলেন বৎস দেশে। এবার লক্ষ্য দক্ষিণদিক। সেখানে মার্তিকাবত, কেরল জয় করে, বিদর্ভদেশে রুক্মীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করে, পাণ্ড্য প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের জনপদগুলিকে বশীভূত করার পর কর্ণ গেলেন অবন্তীদেশে। চেদি, অবন্তী জয় করে সেখান থেকে পশ্চিমে যাত্রা করলেন কর্ণ। এবং পশ্চিমদিকেও বেশ কয়েকটি বর্বর-ম্লেচ্ছ যবন দেশ জয় করে কর্ণ ফিরে এলেন হস্তিনায়। কর্ণের দিগ্বিজয়ের এই শেষ পর্যায়টিতে লক্ষণীয় বিষয় দুটি। প্রথমত, অবন্তীদেশে কর্ণ যুদ্ধ করেননি। অবন্তীর রাজারা আগেও জরাসন্ধপন্থী ছিলেন এবং এখনও দুর্যোধনের মিত্রপক্ষ। অতএব সেখানে যে মিষ্ট কথায় কাজ হয়ে যাবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁদের সম্পূর্ণ বিপরীতপক্ষ তথা পাণ্ডবদের মিত্রপক্ষ দ্বারকার বৃষ্ণিদের সঙ্গেও কিন্তু কর্ণ যুদ্ধ করেননি—

আবন্ত্যাংশ্চ বশে কৃত্বা সাম্না চ ভরতর্ষভ।
বৃষ্ণিভিঃ সহ সঙ্গম্য পশ্চিমামপি নির্জয়ৎ॥

কর্ণ হয়তো জানতেন না যে, পাণ্ডবদের মতোই তাঁরও আপন মাতুলালয় এদেশ, বসুদেব তাঁর আপন মামা। তবে কর্ণের প্রকৃতি আমরা যেমন দেখছি, তাতে বৃষ্ণিসৈন্য, যুদ্ধে অজেয় বলে যাদের খ্যাতি বিশ্বজোড়া এবং কৃষ্ণের মতো ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ যেদেশের রণনীতি নির্ধারণ করবেন—সেদেশে অকারণ যুদ্ধ করে নিজের দিগ্বিজয়ের খেতাবে পরাজয়ের কালি লাগতে না দেবার জন্যও তাঁর এমন সিদ্ধান্ত হতে পারে, অন্তত অস্বাভাবিক কিছু নয়।

[মহা (k) ৩.২৫৩-২৫৪ অধ্যায়; (হরি) ৩.২১০.১-১৪; ৩.২১০.১৪নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, খণ্ড ১০, পৃ. ২১২২-২১২৪]

□ দিগ্বিজয়ী কর্ণ রাশি রাশি সম্পদ নিয়ে হস্তিনায় ফিরলেন। কর্ণের সাফল্যে গর্বিত

দুর্যোধন, গদগদ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর ভাই-বন্ধুদের নিয়ে আরতি করে কর্ণকে নামিয়ে আনলেন জয়রথ থেকে এবং সবার সামনে কর্ণকে মাথায় তুলে দিয়ে বললেন—যে সুখ আমি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ—কারও কাছ থেকে পাইনি, আজ তুমি কর্ণ সেই সুখ দিলে—

যন্ন ভীষ্মান্ন চ দ্রোণাৎ . . . ত্বত্তঃ প্রাপ্তং
ময়া হি তৎ।

কর্ণ বুঝলেন, তাঁর বুদ্ধি কাজে লেগেছে, দুর্যোধন তাঁর পুরনো দুঃখ ভুলে গেছেন। আজ তিনি ভীষ্ম দ্রোণের থেকেও বড়ো 'হিরো'। দুর্যোধন বললেন—বেশি কথা কী, তোমার জন্যই আজ আমরা অনাথ নই। বেশ বিশ্বাস হচ্ছে, তোমার শক্তির তুলনায় পাণ্ডবদের শক্তি কিছুই নয়—

ন হি তে পাণ্ডবাঃ সর্বে কলার্মহন্তি ষোড়শীম্।

কর্ণ তো এইটাই চেয়েছিলেন, এমন একটা ব্যাপার করা যাতে দুর্যোধন আবার বিশ্বাস করবেন যে, অর্জুনকে তিনি ছাড়া আর কেউই জয় করতে পারবেন না। দুর্যোধন বিশ্বাস করেছেন। কর্ণ আজ সফল এবং এতটাই সফল যে কর্ণকে দুর্যোধন রণবিজেতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মর্য্যাদায় ভূষিত করে বললেন—যাও তুমি আজ দেখা কর পিতা ধৃতরাষ্ট্র, জননী গান্ধারীর সঙ্গে, ঠিক যেমন পুরন্দর ইন্দ্র যুদ্ধ জয় করে এসে দেখা করেন দেবমাতা অদিতির সঙ্গে। কর্ণও বাধ্য ছেলের মতো—পুত্রবচ্চ নরব্যাঘ্র—ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর পাদবন্দনা করলেন। যিনি এতকাল বাইরের লোক ছিলেন সেই কর্ণ আজ দিগ্বিজয়ের পর কৌরবকুলে ঘরের ছেলে হয়ে গেলেন। দুর্যোধন আর শকুনি ভাবলেন, কর্ণ বুঝি পাণ্ডবদের জয় করেই ফেলেছেন, শুধু একটা খেলা-খেলা যুদ্ধের অপেক্ষা—

জানতে নির্জিতান্ পার্থান্ কর্ণেন যুধি ভারত।

দুর্যোধন দেখলেন, দিগ্বিজয়ও হয়ে গেল, ভেট হিসেবে টাকাপয়সাও অনেক এসেছে, এখন যুধিষ্ঠিরের মতো একটা রাজসূয়যজ্ঞ করলেই দুর্যোধনের ভাবমূর্তি একেবারে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সময় বুঝে দুর্যোধন তাঁর রাজসূয়ের বাসনা জানালেন কর্ণকে। দুর্যোধন বললেন—পাণ্ডবদের রাজসূয় দেখা অবধি আমার বড়ো সাধ হয় কর্ণ যে, রাজসূয়যজ্ঞ করব। তুমিই সে ব্যবস্থা কর—তাং সম্পাদয় সূতজ। কর্ণ বললেন—এ আর বেশি কথা কী? সমস্ত ধরণী তোমার বশগত। এখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলে ব্রাহ্মণদের ডাকিয়ে রাজসূয় করলেই হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য! একই বংশের দুই জ্ঞাতি পুরুষ রাজসূয়যজ্ঞ করতে পারে না, সে নিয়ম নেই। যুধিষ্ঠির বেঁচে থাকতে—জীবমানে যুধিষ্ঠিরে— দুর্যোধনের পক্ষে দ্বিতীয়বার রাজসূয় করা সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণেরা অনেক ভেবে চিন্তে রাজসূয়ের সমতুল্য বৈষ্ণবযজ্ঞ করার অনুমতি দিলেন। দুর্যোধন ভাবলেন—তাই সই, হাজারো লোকজন তো যজ্ঞের আড়ম্বর দেখে দুর্যোধনের ধন্যধ্বনি দেবে, তাই সই। তা বৈষ্ণবযজ্ঞে ভীষ্ম, দ্রোণ, সবাই সক্রিয় ভূমিকা নিলেন। তাঁরা ভাবলেন ছেলের বুঝি সুমতি হয়েছে, ধম্ম-কম্ম করছে। কর্ণের বিজয়-ঘোষে দুর্যোধনের উদার যজ্ঞপুণ্যের মহিমায় মণ্ডিত হয়ে বৈষ্ণবযজ্ঞ জনগণের মনে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ের স্মরণ ঘটাল। কেউ বা ভালো বলল কেউ বা মন্দ। তুলনা-প্রতিতুলনার দ্বন্দ্বশেষে দুর্যোধনের বৈষ্ণবযজ্ঞ যেদিন সমাপ্ত হল সেদিন পরম আহ্লাদিত মনে জনগণের শেষ স্তুতি-চন্দনের চূর্ণ গায়ে মেখে তিনি এসে বসলেন নিজের ঘরে আপন গোষ্ঠীর মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ দাঁড়িয়ে উঠে ঘোষণা করলেন—ঘোষণা করলেন এইজন্যে যে, তিনি আজকের কৌরবগোষ্ঠীতে সবচেয়ে বড়ো 'হিরো' হওয়া সত্ত্বেও বুঝেছেন, দুর্যোধনের বৈষ্ণবযজ্ঞের উন্মাদনা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ের স্মৃতিলোপ ঘটাতে পারেনি; বুঝেছেন—তাঁর আপন দিগ্বিজয় পাণ্ডবদের বলবীর্য্য ম্লান করে দিতে পারেনি; বুঝেছেন—দিগ্বিজয় এবং বৈষ্ণবযজ্ঞের সমাপ্তির পরেও অর্জুন এখনও জীবিত। তাই কর্ণ ঘোষণা করলেন—আজকের যজ্ঞ শেষ হল বটে। কিন্তু দারুণ যুদ্ধে পাণ্ডবেরা সবাই মারা যাবার পর যেদিন তুমি রাজসূয়যজ্ঞ করবে—

হতেষু যুধি পার্থেষু রাজসূয়ে তথা ত্বয়া।

—সেদিন আবার আমি তোমার উপযুক্ত সৎকার করব। দুর্যোধন জড়িয়ে ধরলেন কর্ণকে। মনে মনে কল্পনা করলেন কেমন করে নিহত পাণ্ডবদের মৃত্যুক্ষেত্রে রাজসূয়ের উদ্বোধন করবেন তিনি। দুর্যোধন বললেন—কবে সেদিন আসবে যেদিন পাণ্ডবদের মৃত্যুর পথে যাত্রা

করিয়ে আমি রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করব? সমস্ত উত্তেজনা একসঙ্গে জড়ো করে কর্ণ জবাব দিলেন—তবে আমার কথা শোন দুর্যোধন। যতদিন আমি অর্জুনকে না মারতে পারি, ততদিন আমি নিজে নিজের পা ধোব না, খাব না মাংস, পালন করব 'অসুরব্রত', আর এই ব্রতের নিয়ম হিসেবে আজ থেকে কেউ যদি এসে আমার কাছে কিছু চায়, আমি না বলব না। কর্ণ এমনি এক নিশ্চয়তায় অর্জুন বধের প্রতিজ্ঞা করলেন যে দুর্যোধন পুনরায় বিশ্বাস করলেন—পাণ্ডবেরা মরেই গেছে—

বিজিতাংশ্চাপ্যমন্যন্ত পাণ্ডবান্ ধৃতরাষ্ট্রজাঃ।

কর্ণ মদ, মাংস ত্যাগ করে মলিন হয়ে, দানের পুণ্যে অর্জুনবধের প্রতিজ্ঞা করলেন। যাঁরা ভাবেন কর্ণ সারাজীবন দান-ধ্যান করে 'দাতা কর্ণ' হয়েছেন, তাঁরা মনে রাখবেন পাণ্ডবদের বনবাসপর্বের যখন আর এক বৎসর আটমাস মাত্র বাকি, তখন থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত কর্ণ তাঁর দানের ব্রত পালন করেছিলেন। নিখুঁত হিসেব করে দেখলে এই সময়ের অঙ্ক খুব বেশি দিনের নয়, যদিও কর্ণের 'দাতা' সুনামটিও সময়ের হিসেব ধরে আসেনি, এসেছে নিজের মৃত্যু তুচ্ছ করে আপন অঙ্গ-জাত কবচ-কুণ্ডল দানের ফলে। মহাভারতের অন্যত্র যেখানে কর্ণের গৌরব শোনা যাচ্ছে করুণ সুরে, সেখানে অবশ্য বলা আছে যে, মধ্যদিনে দেব দিবাকরের পূজা সমাপন করার পর কর্ণ কোনো ব্রাহ্মণ প্রার্থীকে ফেরাতেন না। কিন্তু সে-কথা আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করলে বিপদ বাড়ে। তাতে বৈষ্ণবযজ্ঞের অন্তে দুর্যোধনের কাছে পুনরায় দানব্রত গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করার অর্থ থাকে না। বিশেষত দুর্যোধনের রাজবাড়িতে কর্ণের দৈনন্দিন জীবনের যে চিত্র আঁকা আছে তাতেও কোনো দানের কথা কোনোদিন পাওয়া যায় না। যাই হোক, কর্ণ প্রথম থেকেই দান করুন কিংবা তাঁর প্রতিজ্ঞারম্ভের পর, সে-কথা অকিঞ্চিৎকর, বস্তুত এই দানের কাহিনী থেকেই কর্ণের জীবনে অতি কারুণ্যের স্পর্শ লেগেছে, নইলে এতদিন কৌরব সভায় বৃদ্ধ সজ্জনের চোখের ওপর যে ব্যবহার তিনি করে যাচ্ছিলেন তাতে তাঁর জন্মলগ্নের অনিশ্চয়তা থেকে পাঠকের হৃদয়ে যে করুণা জন্ম নিয়েছিল তা প্রায় ধুয়ে মুখে যাচ্ছিল। কিন্তু দুর্যোধনের বৈষ্ণবযজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ যে অর্জুনবধের প্রতিজ্ঞা নিলেন, সেদিন থেকেই কর্ণের জীবনে আরেক অধ্যায় আরম্ভ হল—করুণ অধ্যায়। দুর্যোধনের বৈষ্ণবযজ্ঞ সমাপনের পর যে দানব্রত গ্রহণ করলেন কর্ণ, সেই ব্রত থেকেই তাঁর যত ক্ষয়-ক্ষতি আরম্ভ হয়, যদিও এই ক্ষয়স্থানগুলি যশের গৌরবে মাঝেমাঝেই ভাস্বর।

[মহা (k) ৩.২৫৫-২৫৭ অধ্যায়; (হরি) ৩.২১০.১৫-৩৭; ৩.২১১.১-২৬; ৩.২১২.১-২৫]

□ কর্ণ খুব দান করে চলেছেন। দিনের পর দিন তাঁর দানের পুণ্য বেড়েই চলেছে। এদিকে পাণ্ডবদের বনবাস বারো বছর হয়ে তেরো বছরে পড়ি পড়ি। বনবাসের দিন যত শেষ হয়ে আসছে, পাণ্ডব-কৌরব দুই পক্ষই মানসিকভাবে ততই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই প্রস্তুতির ছায়া পড়েছিল দেবলোকেও। ইন্দ্র, সূর্য—এঁরা কীরকম দেবতা জানি না, তবে মহাভারতের পটভূমিতে এই দেবতাদের সঙ্গে মর্ত্যলোকের ঘনিষ্ঠতা যথেষ্ট ছিল বলেই মর্ত্য-নারীর গর্ভে উৎপন্ন আপন আপন পুত্রের জন্য দেবসমাজেও কিঞ্চিৎ চিন্তাভাবনা দেখা দিল। অর্জুনকে বাঁচানোর জন্য স্বয়ং দেবরাজের মনোবাসনা টের পেয়ে গেলেন দেব দিবাকর। ভগবান সূর্য বুঝলেন, কর্ণের দানব্রতের সুযোগ নিয়ে ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপ ধরে হরণ করবেন তাঁর সহজাত কবচ এবং কুণ্ডল, যা থাকলে কর্ণের মৃত্যু নেই। দেবরাজের অভিপ্রায় জেনে সূর্য নিজেই ব্রাহ্মণের রূপ ধরে দেখা দিলেন কর্ণের স্বপ্ন-শয়নে। সূর্য বললেন—তোমার ভালোর জন্য বলছি বাছা। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তোমার কাছে আসবেন কবচ এবং কুণ্ডল যাচনা করার জন্য। তিনি জানেন যে, দানের সময় তুমি কাউকে ফেরাও না—ন প্রত্যাখ্যাসি কস্যচিৎ। কিন্তু তুমি যেন বাপু ইন্দ্রকে তোমার কবচ আর কুণ্ডল দিয়ে দিয়ো না। তুমি তোমার সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্ট করবে ইন্দ্রকে কবচ আর কুণ্ডলের ব্যাপারে বিমুখ করতে কিংবা তাঁর দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে।

নিজের ঘরের লোক বলে সূর্য ইন্দ্রের স্বভাব জানেন। সূর্য ভাবলেন ইন্দ্রের ঈপ্সিত বস্তুগুলি যদি পর পর সাজিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে হয়তো বা তিনি তাঁর উদ্দেশ্য থেকে সরে যেতেও পারেন। সূর্য বললেন—ইন্দ্র যখন ভিক্ষে চাইবেন, তুমি

তখন হিরে-জহরতের লোভ দেখাবে, লোভ দেখাবে মদমত্ত যুবতী কামিনীদের। তা ছাড়া ঋগ্‌বেদের প্রথম সারির দেবতা তিনি, গোরু-ঘোড়াও তাঁর ঈঙ্গিত হতে পারে, তুমি সেগুলোও একবার বলে দেখো—

রত্নৈঃ স্ত্রীভিস্তথা গোভির্ধনৈ-র্বহুবিধৈরপি।

আসল কথা কী জান, তোমার এই কবচ আর কুণ্ডল যদি একবার দিয়ে দাও, তা হলেই তোমার পরমায়ু শেষ। যতদিন ও দুটি তোমার সঙ্গে আছে, ততদিন তুমিও আছ। ও দুটি হারালে যুদ্ধক্ষেত্রে আর তুমি শত্রুর অবধ্য থাকবে না। তাই বলি, যদি বাঁচতে চাও কর্ণ, তা হলে অমৃতের ভাণ্ড থেকে উঠে-আসা ওই কবচ আর কুণ্ডলটি তোমার বাঁচিয়ে রাখতেই হবে—

তস্মাদ্ রক্ষ্যং ত্বয়া কর্ণ জীবিতং চেৎ প্রিয়ং তব!

সূর্য ব্রাহ্মণের বেশে দেখা দিয়েছিলেন কর্ণের স্বপ্নশয্যায়। যে মানুষ সারাজীবন কলঙ্ক বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, তিনি এক ব্রাহ্মণবেশীর মুখে তাঁর জীবনের দাম শুনে ভারী পুলকিত হলেন। তাঁর বেঁচে থাকার জন্য, শুধু তাঁর বেঁচে থাকার জন্য এমন মমত্বময় দুশ্চিন্তা তিনি কারও মধ্যে দেখেননি, এমনকী তাঁর মায়ের মধ্যেও নয়, যিনি তাঁকে জন্ম দিয়ে ভুলে গেছেন। এই মমত্বটুকুর জন্য কর্ণ সব দিতে পারেন। বিশ্বসংসারের বিচিত্র বন্ধনের রূপ দেখে ব্যক্তি-মানুষের যেমন ক্বচিৎ এমন কল্পনা আসে যে, এই মুহূর্তে আমি মরে যেতে পারি, ঠিক তেমনি এই মুহূর্তে তাঁরই জীবনের জন্য এক ব্রাহ্মণবেশীর এত ভাবনা জেনে কর্ণেরও বুঝি মনে হল—এই মমতার বিকল্পে আমি মরতেও পারি। কিন্তু তার আগে জেনে নেওয়া দরকার কে এই ব্রাহ্মণবেশী। কর্ণ বললেন—কে আপনি ব্রাহ্মণ, আমার ওপর এত মমতা দেখাচ্ছেন—

দর্শয়ন্ সৌহৃদং পরম্।

সূর্য বলতে পারলেন না—আমি তোমার বাবা। তিনি তাঁর দেবলোকের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রেখে, যেন ভক্তের কাছে ভগবান এসেছেন, এমনি এক অবগুণ্ঠনে কর্ণকে জানালেন— আমি সহস্রাংশু সূর্য। তোমার ওপর করুণাবশত এতক্ষণ যা বলেছি তুমি তাই কোরো।

প্রতিদিন সহস্র মানুষের বৈদিক স্তুতিবাদে যিনি দেবতার পদবী লাভ করেছেন, সেই সূর্যের পক্ষেও বোঝা সম্ভব নয় তাঁর আপন সন্তানের যাতনা কতখানি। যিনি শৈশব থেকেই পিতৃমাতৃপরিচয়হীন, সূতপুত্র বলে সর্বত্র লাঞ্ছিত তাঁর কাছে মরণের থেকে যশই বেশি প্রার্থনীয়। এতদিন কুরুকুলের রাজবাড়িতে আপন শক্তি এবং প্রতিভায় তিনি যা পেয়েছেন, তা তাঁর প্রাপ্য, কিন্তু প্রার্থনীয় নয়। বরঞ্চ রাজবাড়ির রাজনীতির কলুষতায় যশের বদলে তাঁর কলঙ্ক জুটেছে। আজ তিনি যশ চান, কারণ যশই হল সেই দুগ্ধশুভ্র বস্তু, যা তাঁর জন্মের গ্লানি, জীবনের সব লাঞ্ছনা সমস্ত কিছু ধুয়ে মুছে দিতে পারে। কর্ণ মরণের ভয় তুচ্ছ করে সূর্যকে বললেন—আপনি আমার ভালোর জন্য যা বলেছেন, তা আমি বুঝি। কিন্তু আমি যদি সত্যি আপনার প্রীতিভাজন হই, তা হলে আমার দাননিষ্ঠায় আপনি আমায় বাধা দেবেন না—

ন নিবার্য্যো ব্রতাদ্ অস্মাদ্ অহং যদ্যস্মি তে প্রিয়ঃ।

আজকে যদি পাণ্ডবদের কারণে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ব্রাহ্মণের বেশ ধরে স্বয়ং আসেন আমার দুয়োরে—

হিতার্থং পাণ্ডুপুত্রাণাং খেচরোত্তম ভিক্ষিতুম্।

—তা হলে আমি কবচ এবং কুণ্ডল দুটিই দেব, অবশ্য দেব। আমাকে যে দিতেই হবে।

কর্ণ তাঁর শিক্ষার শুরু থেকে দিগ্বিজয় পর্যন্ত যা করে এসেছেন, তা কীর্তির জন্যই করে এসেছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর; যে পথে তিনি এতকাল চলছিলেন তাতে কীর্তি আসে না, আসেনি, বরং অকীর্তি এসেছে। আজ সব শুধরে নেবার দিন। দ্বিতীয়ত অর্জুন। ক্ষমতায়, বুদ্ধিতে, সম্মানে সব ব্যাপারে অর্জুন তাঁর চেয়ে খাটো হোক, এই তো চেয়েছিলেন কর্ণ। আজ যখন পুত্রের প্রাণের জন্য অর্জুনের পিতা নিজের স্বরূপ ভাঁড়িয়ে তাঁর কাছ থেকেই তাঁর জীবন ভিক্ষে চাইবেন, তখন কর্ণ ভাববেন—আমি সব ছলনা জেনেও আমার দেহরক্ষার বর্ম আমার নিজের হাতেই ভিক্ষে দিচ্ছি, নইলে দেবাসুর কারও সাধ্য ছিল না, আমার এই কবচ-কুণ্ডল কোনোভাবে ছিন্ন করতে পারে আমার দেহ থেকে। কর্ণ জানেন, তাঁর অস্ত্রশিক্ষার কৌশল একদিন ব্যর্থ হতে পারে, যার আশ্রয়ে আজ তাঁর এত বাড়বাড়ন্ত, সেই দৃঢ়মূল কৌরবকুলও একদিন ঝড়ে-পড়া গাছের মতো উৎপাটিত হতে পারে, এমনকী কৌরবের রাজনীতিতে তাঁর

আজকের যে সুস্থিরতা, সে সুস্থিরতাও নষ্ট হতে পারে যে কোনোদিন। কিন্তু শিশুকাল থেকে যে অর্জুনবধের লক্ষ্যে তিনি এগিয়ে চলেছেন, সেই অর্জুনের প্রাণের জন্য যদি দেবতাদের রাজা কর্ণের প্রাণ ভিক্ষা চান ভিক্ষুকের মতো, তা হলে কর্ণ তা দেবেন। কারণ, কর্ণ জানেন, এই দানের সুযোগে তাঁর কীর্তি ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বময়, যা তাঁর জন্ম-কুৎসার ধূলিধূসর অক্ষয় জীবনের চেয়ে অনেক বেশি অক্ষয়। কর্ণ তাই সোজাসুজি সূর্যকে জানালেন—যুদ্ধে আমি জীবন আহুতি দেব, যতটা সম্ভব ঝুঁকি নেব—

হুত্বা শরীরং সংগ্রামে কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্।

—কিন্তু এই উত্তমর্ণের ভূমিকায় যশ আমার চাই—যশঃ প্রাপ্স্যামি কেবলম্।

যে পিতা আপন প্রাণ বাচাঁনোর উপায় বলে দিতে এসেছেন পুত্রকে, সে পুত্র যদি বাঁচার কৌশলকে মরণের কৌশলে রূপান্তরিত করার বায়না করে, তবে পিতার হৃদয় কেঁপে ওঠে। তেমনি কেঁপে উঠেই সূর্য বললেন—না বাছা না, নিজের প্রতি এত অবিচার কোরো না—

মাহিত্যং কর্ণ কার্ষী স্ত্বম্।

সূর্য একবারও বলেননি, তিনি কর্ণের পিতা। তবু তিনি এমন করতে আরম্ভ করলেন যে, তাঁর গুপ্ত পিতৃসত্তা মাত্রাহীন স্নেহে দ্রবীভূত করল তাঁর ভাষা, যে ভাষা অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করল তাঁর পিতৃত্বের প্রতি। সূর্য বললেন—না বাছা না, শুধু নিজেরই নয়, তোমার বন্ধুজন, তোমার নিজের স্ত্রীপুত্র এবং সবার ওপরে তোমার পিতামাতার এমন সর্বনাশ তুমি কোরো না বাছা—

পুত্রাণামথ ভার্য্যাণামথ মাতুরথো পিতুঃ।

তুমি যশ চাইছ, বেশ কথা, কিন্তু সেটা জীবনের বিনিময়ে কেন বাবা! সূর্য বলতে চাইলেন—কর্ণ তুমি এখন সামাজিক সম্পর্কহীন একটি ব্যক্তিমাত্র নও। তুমি কারো পুত্র, কারো পিতা, কারো বা স্বামী। আর এইসব স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্ক তোমার সঙ্গে ততক্ষণই, যতক্ষণ তুমি বেঁচে আছ—

জীবতাং কুরুতে কার্যং পিতা মাতা সুতাস্তথা।

তা ছাড়া যে যশ তুমি এত করে চাইছ, তুমি নিজে মরে গেলে সে যশের স্বাদ তুমি কী পাবে? ভস্মীভূত মৃত ব্যক্তি যশের কী খবর পায়? গতপ্রাণ ব্যক্তির গলায় মালা পরালে, সে যেমন তার কিছুই টের পায় না, মৃত ব্যক্তির কাছে যশও সেইরকম—

কীর্ত্তিশ্চ জীবতঃ সাধ্বী পুরুষস্য মহাদ্যুতে।

সূর্যের ভাবে ভাষায় তাঁর আপন পিতৃত্ব বড়ো বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিল। সূর্য বললেন দেবলোকে তোমাকে নিয়ে একটা খেলা চলছে, সে খেলায় যেন তুমি বলি হয়ো না। কিন্তু সামান্য এই নির্বিকার, নির্মোহ ভাষ্য দেবার পরমুহূর্তেই সূর্যের মুখ দিয়ে ঝরে পড়ল চিরন্তন পিতার অভ্যাস। সূর্য বললেন—আমি বার বার বলছি কবচ আর কুণ্ডল—এই দুটি জিনিস তুমি যেন দিয়ো না। ওই কবচ আর কুণ্ডল দুটি তোমার শরীরে যেমনটি আছে, তেমনটি, থাকলে কেমন সুন্দরই না দেখতে লাগে তোমায়—

শোভসে কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ রুচিরাভ্যাং মহাদ্যুতে।

বিশাখা নক্ষত্রের দুই ভাস্বর তারার মাঝখানে চাঁদ যেমনটি, সহজাত ভাস্বর কুণ্ডল দুটির মাঝখানে তোমার মুখখানিও লাগে ঠিক তেমন চাঁদের মতো—বিশাখয়োর্মধ্যগতঃ শশীব।

সব ছেড়ে শেষে ছেলেকে দেখতে কত সুন্দর দেখাবে এই মোহ-ভাবনায় যিনি মগ্ন, তিনি যে যশের চেয়ে পুত্রের জীবন বেশি আকাঙ্ক্ষা করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী? সূর্য যখন বুঝলেন কর্ণ কিছুতেই শুনবেন না, তখন তিনি কর্ণকে অর্জুনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। এই সুচিরকাঙ্ক্ষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যই যে তাঁর বেঁচে থাকা দরকার, এই কথাটা কর্ণকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন সূর্যদেব। বললেন—তুমি না অর্জুনের সঙ্গে লড়তে চাও—নিত্যং স্পর্ধসে সব্যসাচিনা, সেক্ষেত্রে তোমার দেহে যদি এই কবচ কুণ্ডল থাকে তাহলে অর্জুনও কোনোদিন তোমাকে পরাস্ত করতে পারবে না।

সূর্যদেব অনেক বোঝালেন, এবং অবশেষে নিজে বোধকরি তার থেকেও বেশি ভালোভাবে বুঝলেন যে, তাঁর এই পুত্রটি নিজের সিদ্ধান্তে একেবারে অটল। সূর্য যখন বোঝালেন যে এই কবচ কুণ্ডলের অলৌকিকতায় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের সমকক্ষ হবেন—এই কথাটাও তাঁর সদা-জাগ্রত পৌরুষে আঘাত করল যেন। সূর্যকে একেবারে স্তব্ধ করে দিয়ে কর্ণ বললেন—অর্জুনের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষার ব্যাপারে আমার এই কবচ আর কুণ্ডলের যে কার্যকারিতা, সে-কথা

নিয়ে আপনি ভাববেন না। আপনি তো জানেন অস্ত্রবল আমার কম নেই। পরশুরাম এবং দ্রোণাচার্যের মতো গুরুর কাছে আমি অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেছি, কাজেই অর্জুনকে আমি পরাস্ত করবই—

বিজেষ্যামি রণের্জুনম্।

তবে হ্যাঁ! আপনি আর বাদ সাধবেন না। ইন্দ্র এসে যদি আমার কাছে ভিক্ষে চান, তা হলে আমি তাঁকে ফেরাব না, জীবন দিতে হলেও, না। আপনি অনুমতি করুন।

সূর্য বুঝলেন, কর্ণ কথা শোনার লোক নন। তিনি বললেন অগত্যা, তুমি কবচ এবং কুণ্ডল হারাবে বুঝতে পারছি। তবু তুমি এক কাজ কোরো। ও দুটি দেওয়ার ব্যাপারে একটা শর্ত আরোপ কোরো। তুমি বলবে—দিয়ে দেব আপনাকে কবচ-কুণ্ডল, কিন্তু তার বদলে আপনি দিন আমায় সেই অমোঘ শক্তি, যা ব্যর্থ হবে না আমার শত্রুর ওপর। এই বিনিময়ের আদেশ দিয়ে স্বপ্ন-সূর্য আর দাঁড়ালেন না। সহসাই স্বপ্ন ভেঙে গেল কর্ণের। সূর্যপূজার কালে কর্ণ যাচাই করে বুঝলেন সূর্যই এসেছিলেন তাঁর কাছে।

তারপর একদিন যখন কর্ণের দানভূমি থেকে একে একে ব্রাহ্মণেরা দান নিয়ে ফিরে গেছেন, সেই সময়ে কর্ণের দুয়ারে গুরুগম্ভীর এক শব্দ শোনা গেল—ভিক্ষাং দেহি। এই গলার স্বর কোনো রুক্ষ-জীর্ণ, উপবাস-ক্লিষ্ট ব্রাহ্মণের হতে পারে না। কর্ণ ঠিক চিনেছেন, ইনি ইন্দ্র—ব্রাহ্মণবেশী। প্রখর সূর্যের সহস্র কিরণ এতক্ষণ যেন আশীর্বাদের মতো বর্ষিত হচ্ছিল কর্ণের মাথার ওপর, হঠাৎই সে সূর্যের গতি অবরুদ্ধ হল, দলে দলে মেঘ এসে সূর্যের সদা জাগ্রত সহস্র চক্ষু ঢেকে দিল যেন। দেবকুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সূর্যের চোখের সামনে তাঁরই পুত্রের সর্বনাশ করতে স্বয়ং দেবরাজেরও বাধোবাধো ঠেকে। তাই বুঝি তাঁরই আদেশে অনন্ত মেঘের সারি সূর্যকে ঠিক আড়াল করে রাখল কর্ণের চোখ থেকে। দেবরাজ হাঁকলেন—ভিক্ষাং দেহি। কর্ণ ব্রাহ্মণবেশীকে বললেন—স্বাগত দ্বিজরাজ, আপনাকে প্রণাম।

কর্ণ চিনতে পেরেছেন যে, ভিক্ষাপ্রার্থী স্বয়ং ইন্দ্র, আবার সূর্যদেবের কথাও তাঁর স্মরণে আছে। তিনি তাই প্রার্থী ব্রাহ্মণের বেশধারী ইন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন—বলুন ব্রাহ্মণ কী চাই আপনার, কীই বা আমি দিতে পারি, সোনায় মুড়ে দেওয়া যুবতী রমণী নেবেন—হিরণ্যকণ্ঠীঃ প্রমদাঃ—অথবা গ্রাম দিতে পারি, জনপদ দিতে পারি। ইন্দ্র বললেন—ওসব সুন্দরী স্ত্রী, গ্রাম, জনপদ, আরও যেসব ভালো ভালো জিনিসের নাম তুমি করছ, ওসব অন্যদের দিয়ো, আমি ওসব চাই না বাপু। কর্ণ তবু তাঁর ঋদ্ধির সূচী মাথায় রেখে একবার গজ-বাজি, একবার গোধন, একবার স্ত্রীলোক, একবার গোটা রাজ্য দিতে চাইলেন। কিন্তু দেবরাজ তাতে ভুললেন না, তিনি চান কর্ণের গায়ের সঙ্গে লেগে থাকা কবচ এবং কুণ্ডল, যা তাঁকে নিজেরই নিজের দেহ থেকে কেটে দিতে হবে—

এতদ্ উৎকৃত্য মে দেহি।

মহাভারতের ভিখারি ইন্দ্র একেবারেই লজ্জাহীন। তিনি সবকিছু প্রথমেই নস্যাৎ করে কবচ-কুণ্ডল চান এবং বলেন এই মুহূর্তেই চাই সেটা। খোঁটা দিয়ে বলেন—তুমি না দানের ব্রত নিয়েছ—যদি সত্যব্রতো ভবান্। কর্ণ আরও একবার চেষ্টা করেন কিন্তু ওসব মনভুলানি কথায় দেবরাজ ভুললেন না, কবচ-কুণ্ডল তাঁর চাইই চাই। কর্ণ এবার হেসেই ফেললেন। বললেন—আমি সবই জানি দেবরাজ, কেনই বা এই ব্রাহ্মণবেশ আর কেনই বা এই প্রার্থনা। আপনি দেবরাজ, আপনাকে বর দেওয়া কি আমার সাজে? কোথায় আপনিই আমাকে বর দেবেন, তা না আপনিই বসেছেন প্রার্থীর আসনে। তা ছাড়া আপনি তো জানেন, এই কবচ-কুণ্ডল দিলে আমি মৃত্যুর মুখে পড়ব এবং তাতে আপনাকে নিয়ে লোকে হাসবে। তার চেয়ে বিনিময়ের পথে আসুন, আপনি কিছু দিন, আমিও ব্রাহ্মণবেশীকে কবচ-কুণ্ডল দিচ্ছি, নইলে কিছুতেই দেব না—ন দদ্যামহমন্যথা। ইন্দ্র বললেন—আমি এখানে আসবার পথেই বুঝেছি, সূর্যদেব সব বলে দিয়েছেন তোমাকে। তা বেশ, তুমি বাপু আমার নিজের হাতিয়ার বজ্রটা ছেড়ে দিয়ে আর যা চাও তাই দেব।

কর্ণ সূর্যের কথামতো এবার সেই অমোঘ শক্তি চাইলেন। ইন্দ্র বললেন—শক্তি নিচ্ছ নাও, কিন্তু এ শক্তি তোমার ঈপ্সিত একজন প্রধান শত্রুকে বধ করা মাত্রই আমার হাতে ফিরে যাবে, তুমি কিন্তু

দ্বিতীয়বার এটি ব্যবহার করতে পারবে না। কর্ণ বললেন—আমি একজনকেই মারতে চাই, একমেবাহম্ ইচ্ছামি রিপূং হন্তুং মহাহবে—দ্বিতীয়বার ব্যবহারের আমার প্রয়োজনই নেই। ইন্দ্র বললেন—একজনকে তো মারতে চাচ্ছ, কিন্তু যে একজনের কথা তুমি ভাবছ, তাকে রক্ষা করছেন স্বয়ং বাসুদেব কৃষ্ণ। কাজেই কী যে হবে, তা কে জানে! কর্ণ ইন্দ্রের কথা উড়িয়ে দিয়ে বললেন—সে যা ইচ্ছে হোক ভাবনা নেই, আমাকে একবীরঘাতিনী সেই শক্তি দিন, আমি আমার কবচ-কুণ্ডল কেটে দিচ্ছি।

কর্ণ আরও বললেন—ও ভালো কথা। আমি কবচ-কুণ্ডল গা থেকে কেটে দেব আপনাকে, কিন্তু তাতে যেন কোনো বীভৎসতা না আসে শরীরে, কাটা-ঘা দগদগে হয়ে না থাকে। ইন্দ্র বললেন—না বাপু কিচ্ছু হবে না। তুমি যেমনটি সুন্দর আছ তেমনি সুন্দর থাকবে। ঠিক তোমার পিতা সূর্যদেবের গায়ের যেমন রং, যেমন তাঁর তেজ—

যাদৃশন্তে পিতুর্বর্ণস্তেজশ্চ বদতাং বর।

—ঠিক তেমনিই হবে তোমার শরীর।

কর্ণ আপন হাতের তরবারিতে নির্বিকারে নিজের দেহ থেকে তাঁর শরীররক্ষার দৈববর্ম কেটে রক্তমাখা অবস্থাতেই দিলেন দেবরাজের হাতে। কান থেকে কুণ্ডল দুটি ছিন্ন করে দিয়ে নাম নিলেন কর্ণ, প্রদদৌ কুণ্ডলে তে কর্ণাৎ তস্মাৎ কর্মণা তেন কর্ণঃ। এমন দানের মহিমায় স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি ঝরল, শঙ্খ-দুন্দুভি বাজল আর মহাভারতের কবি সিদ্ধান্ত দিলেন —স্বর্গের দেবতা ইন্দ্র ভুঁয়ে পা রেখে কর্ণের সঙ্গে বঞ্চনা করা সত্ত্বেও, কর্ণ যেহেতু তাঁকেই কৃতার্থ করেছেন তাই কর্ণের যশের পথ প্রশস্ত করে দিলেন স্বয়ং ইন্দ্র—

ততঃ শক্রঃ প্রহসন্ বঞ্চয়িত্বা,
কর্ণং লোকো যশসা যোজয়িত্বা।

আসলে কর্ণের প্রতি শিশুকাল থেকে যে বঞ্চনা চলছিল, কর্ণের সত্যব্রত এবং তাঁর আত্মদানের মাধ্যমে সে বঞ্চনার চূড়ান্ত সাধন করে তাঁকে যশ উপহার দিলেন মহাভারতের কবি। এক চূড়ান্ত বঞ্চনার জীবনে কবির হৃদয় যশ ছাড়া আর কীই বা উপহার দিতে পারে। অবশ্য কর্ণের যশোবিস্তারে আমরা পুলকিত হচ্ছি বটে, কিন্তু এই যশের কিছু বাস্তব প্রতিক্রিয়া ঘটল। সমকালে ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম—কবচকুণ্ডল আছে, না খোয়া গেছে? খোয়া গেলে যাঁদের খুশি হওয়ার কথা, যেমন পাণ্ডবেরা, তাঁরা বনে বসে এই খবর পলেন যে, কর্ণের জীবনরক্ষার কবচ-কুণ্ডল হরণ করেছেন দেবরাজ; তাঁরা দারুণ খুশি হলেন। আর যাদের মুষড়ে পড়ার কথা, যেমন কৌরবেরা, তাঁরা একেবারেই ভেঙে পড়লেন, কেউ কেউ এমনও ভাবলেন যে, হয়ে গেল, আর সম্ভব নয়—

দীনাঃ সর্বে ভগ্নদর্পা ইবাসন্।

[মহা (k) ৩.৩০০.১-৩৯; ৩.৩০১-৩০২ অধ্যায়;
৩.৩০৯.২৩-২৫; ৩.৩১০.১-৪২;
(হরি) ৩.২৫৪.১-৩৪; ৩.২৫৫-২৫৬ অধ্যায়;
৩.২৬৩.২৩-২৫; ৩.২৬৪.১-৪১]

□ কর্ণের কবচ-কুণ্ডল দানের মাহাত্ম্যে আমরা আপাতত কিঞ্চিৎ আপ্লুত বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে, যিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ বীর তিনি সাময়িকভাবে ধর্মে-কর্মে মন দিলেও তার মৌলিক চরিত্র একেবারে পালটে যায় না। দেবালয়ে দেবমূর্তির সামনে দাঁড়ালে অতি ক্রূর মানুষেরও যেমন চক্ষুদুটি শিবায়িত হয়, তেমনি এই দানব্রতের সত্যরক্ষার তাগিদে কর্ণের চূড়ান্ত দানও কর্ণকে খানিকটা গম্ভীরতা দিল বটে, কিন্তু এতে তাঁর মূল স্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হল না। হবেই বা কেন? রাজসভার রাজনীতিও রয়েছে, দুর্যোধনও রয়েছেন, পরম শত্রু অর্জুনেরাও বেঁচে আছেন। বরঞ্চ রাজসভায় 'টেনশন' এখন অনেক বেশি। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস শেষ হয়ে আসছে, অথচ গুপ্তচরেরা এ বন, সে বন তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসে খবর দিল যে পাণ্ডবদের কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। দুর্যোধন যদি বা চরদের কথা শুনে, তাদের নিষ্ঠা সত্ত্বেও অসহায়তার কথা বুঝে বিমনা হয়ে পড়ছিলেন, কিন্তু এই অবস্থাতেও কর্ণ দমে যাবার পাত্র নন। তেরো বছর পরে পাণ্ডবেরা ফিরে এসে আবার রাজ্য চাইবে এবং তা পেয়েও যেতে পারে—এ যেন কর্ণেরই দুশ্চিন্তা। তাঁর ধারণা, আরও ভালো করে খোঁজা দরকার পাণ্ডবদের। পাঠানো দরকার আরও ধূর্ত গুপ্তচর, যারা নদীর তীর থেকে আরম্ভ করে পর্বতের গুহা, সব একেবারে চষে ফেলবে। কর্ণের মতো যে দুর্যোধনের যুবগোষ্ঠী সম্পূর্ণ মেনে নেবে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু

ভীষ্ম দ্রোণেরা পাণ্ডবদের ফিরিয়ে আনার পক্ষেই রায় দিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে নতুন একটা ঘটনা ঘটল।

দুর্যোধনের চরেরা পাণ্ডবদের খবর দেবার সঙ্গে সঙ্গে 'সুখবর' মনে করে আরও একটা খবর দিয়েছিল। তারা বলেছিল বিরাটরাজার প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতি কীচক কোনো এক গন্ধর্বের হাতে মারা গেছে। এই কীচক যেহেতু দুর্যোধনের বন্ধুরাজ্য ত্রিগর্তদেশের রাজাকে বারবার যুদ্ধে নাকাল করেছে, তাই কীচক মারা যেতে বিরাটরাজার ওপর প্রতিশোধ নেওয়াটা এখন সুবিধেজনক। কাজেই ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ যখন পাণ্ডবদের প্রত্যাবর্তনের তর্কে নানা মতামত ব্যক্ত করছেন, তখন ত্রিগর্তের রাজা স্বয়ং সে-কথাগুলি চাপা দিয়ে বিরাটরাজ্য আক্রমণের প্রস্তাব দিলেন। কীচকহীন অসহায় বিরাটরাজাকে আক্রমণ করে কী পরিমাণ ধন-রত্ন, অশ্ব-গজ, গোধন পাওয়া যেতে পারে, সেই সম্ভাবনার কথাই ত্রিগর্তরাজ তুলে ধরলেন। মতামত চাইলেন দুর্যোধন প্রভৃতি ভাইদের এবং কর্ণের—

কৌরবানাঞ্চ সর্বেষাং কর্ণস্য চ মহাত্মনঃ।

প্রস্তাবের অনুকূলেও যিনি প্রথম কথা বললেন, তিনি কর্ণ। নতুন এক যুদ্ধোদ্যোগের হঠাৎ সুযোগ আসায় কর্ণ পাণ্ডবদের বিষয়ে তাঁর দৃঢ় মত পালটালেন। বললেন—সেই ভালো, বিরাটরাজ্য আক্রমণ করে ভালোমন্দ ধনরত্ন আহরণ করাই ভালো। পাণ্ডবদের কথা পরে ভাবা যাবে, অথবা এখন অর্থহীন, বলহীন, সহায়হীন পাণ্ডবদের কথা ভেবেই বা আমাদের কী হবে—

কিঞ্চ নঃ পাণ্ডবৈঃ কার্যং হীনার্থবলপৌরুষৈঃ।

কর্ণের কথা শোনা মাত্রই দুর্যোধন বিরাটরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার আদেশ দিলেন—

বৈকর্তনস্য কর্ণস্য . . . বাক্যম্ আদায় তস্য তৎ।

কর্ণ জানতেন, এটা পাণ্ডবদের ব্যাপার নয় বলেই অন্তত বিরাটরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতি বৃদ্ধদের অমত হবে না এবং সেইজন্যই এই বিষয়ে তিনি তাঁদের মত চেয়েওছেন। একটা গোটা রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হবে—সেই সিদ্ধান্তটা কিন্তু শুধুমাত্র কর্ণের সমর্থনবাক্যেই 'পাস' হয়ে গেল। ত্রিগর্তরাজ প্রথমে বিরাটরাজ্য আক্রমণ করলেন কিন্তু সে যুদ্ধে ছদ্মবেশী চারজন পাণ্ডব এমন যুদ্ধ করলেন যে তাঁর যুদ্ধবাসনা ঘুচে গেল। কিন্তু তিনি যেতে না যেতেই কৌরবেরা সবাই মিলে আক্রমণ করলেন বিরাটরাজ্য। বিরাটের প্রায় অজ্ঞাতেই কুমার উত্তরের সঙ্গে রণক্ষেত্রে চলে গেলেন বৃহন্নলাবেশী অর্জুন। অর্জুনকে স্পষ্ট চিনে স্বয়ং দ্রোণাচার্য কৌরবদের উন্মাদনায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে নানা দুর্লক্ষণ দেখে আজ তিনি অর্জুনের হাতে হার একেবারে অবধারিত মনে করলেন।

কিন্তু এইখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। কুরু-পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কৃপ —এইসব বৃদ্ধদের সম্বন্ধে সকলের সামনেই অনেক অপমানজনক কটূক্তি করেছেন কর্ণ। বারংবার অপমানে এই বৃদ্ধেরা যেমন একদিকে নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছিলেন, অন্যদিকে কর্ণের সম্বন্ধে তাঁদের অসন্তোষও বাড়ছিল। কর্ণ মনে করেন, এই বৃদ্ধেরা আসলে পাণ্ডবদের পক্ষপাতী। ধৃতরাষ্ট্রের অন্ন খাওয়া সত্ত্বেও এঁরা যে তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে দুর্যোধনের সকল ক্রিয়াকলাপের নির্বিচারে প্রশংসা করেন না— এটা তাঁর মনে লাগে। নিরপেক্ষ বিচার, নীতি, যুক্তি—এগুলিও যে কখনো কাউকে পাণ্ডবদের পক্ষপাতী করে তুলতে পারে—এটা কর্ণের মাথায় আসে না। ফলে কর্ণ বারংবার বৃদ্ধদের অপমান করেছেন এবং খোদ কুরুসভাতেই এই ঘটনা বার বার হওয়ায় কুরুবৃদ্ধদের অসন্তোষ এখন প্রগাঢ় হয়েছে। কর্ণের কবচ-কুণ্ডল খোয়া যাবার পর থেকে এখন আর সে অসন্তোষ তাঁরা চেপেও রাখেন না। তাঁরা ভাবেন—কর্ণের প্রতিপত্তি দিন দিনই বেড়ে চলেছে স্বয়ং দুর্যোধনের অবাধ প্রশ্রয়ে। তাঁদের যখন এমনিও সম্মান নেই, অমনিও নয়, তখন তাঁরাই বা সুযোগ পেলে এই পুরুষটিকে ছেড়ে দেবেন কেন? বিরাটরাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে উন্মুক্ত মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে গুরু দ্রোণ যখন মহাদেবের বর-পাওয়া, স্বর্গ-ফেরত অর্জুন সম্বন্ধে তাঁর আপন শঙ্কার কথা ব্যক্ত করলেন, তখন আবারও একবার অপমানের ভাষা বেরিয়ে এল কর্ণের মুখ থেকে। কর্ণ বললেন— অর্জুনের ওপর আপনার এত সোহাগ যে, সব সময় আমাদের খাটো করে দেখেন—

সদা ভবান্ ফাল্গুনস্য গুণৈরস্মান্ বিকত্থসে।

আরে! আমার সামনে কিংবা দুর্যোধনের সামনে অর্জুন পুরোপুরি দাঁড়াতেই পারবে না।

দুর্যোধন কিন্তু এইসব শৌর্য্যবীর্য্যের তুলনায় না গিয়ে কর্ণের কথার ধূয়া ধরে বললেন—দেখ বাপু! এ যদি অর্জুন হয়, তা হলে আমার পোয়া বারো। অজ্ঞাতবাসের সময় শেষ হয়নি। আবার বনে পাঠাব পাণ্ডবদের। আচার্য দ্রোণকে উদ্দেশ করে ভীষ্ম, কৃপ সবাইকে শুনিয়ে দুর্যোধন বললেন—আচার্য! আমি আর কর্ণ আগে বার বার বলেছি—ময়া কর্ণেন চাসকৃৎ—যে অজ্ঞাত -বাসের সময় পাণ্ডবদের খোঁজ পেলে তাদের আবার বনে যেতে হবে। তা ছাড়া এই সময়ে যুদ্ধ করতে যেই আসুন, বিরাটরাজা, কি অর্জুন, যুদ্ধ তো আমাদের করতেই হবে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, এঁদের এত ত্রস্ত দেখাচ্ছে কেন? আপনারা খেয়াল রাখবেন যুদ্ধ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই আমাদের। দুর্যোধনের এইটুকু প্রশ্রয়েই কর্ণ সরাসরি দ্রোণকে উপহাস করতে আরম্ভ করলেন। বললেন—বন্ধু ওই আচার্য দ্রোণকে বাদ দিয়ে যুদ্ধের নীতি-নিয়ম ঠিক কর। তুমি এঁদের তো জান। এঁদের সবারই অর্জুনের ওপর বড়ো বেশি সোহাগ, আর সেইজন্যেই আমাদের তখন থেকে ভয় দেখাচ্ছেন—

জানাতি হি মতং তেষামতস্ত্রাসয়তীহ নঃ।

কীরকম সোহাগ বোঝ যে, অর্জুন সামনে আসতে না আসতেই তার প্রশংসা আরম্ভ হয়ে গেল। যেখানে শত্রুপক্ষের ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি ডাক শুনেই—হ্রেষিতং হ্যুপশৃণ্বানে—আচার্যগুরুর সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমাদের সৈন্যদের মনোবল না ভেঙে যায়, সেই ব্যবস্থাটা আগে কর, দুর্যোধন।

কর্ণের বক্রোক্তিতে মনে হল—দ্রোণাচার্য যেন সাধারণ সৈনিকের চেয়েও খারাপ। তাঁর যে ব্যক্তিগতভাবে উপযুক্ত শিষ্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে পারে, এটা তিনি বোঝেন না। কর্ণ সোজাসুজি দ্রোণকে অভিযুক্ত করে বললেন—এঁরা সবাই, বিশেষত এই আচার্য দ্রোণ, চিরটাকাল পাণ্ডবদের হয়ে গান গেয়ে গেলেন। এঁদের আপন-পর বোধ বলতে কিচ্ছুটি নেই, নইলে, ঘোড়ার ডাক শুনে কেউ শত্রুর প্রশংসায় মেতে ওঠে! আরে, এই যে সব দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বলে দ্রোণ মন্তব্য করছেন, এর সঙ্গে অর্জুনের সম্পর্ক কী, তাকে প্রশংসা করারই বা কী আছে? আসল কথা এই—যে সব দুর্লক্ষণের কথা তখন থেকে বলে যাচ্ছেন দ্রোণ, এর মূলে আছে ওদের ওপর সোহাগ আর আমাদের ওপর জন্মের রাগ—

অন্যত্র কামাদ্ দ্বেষাদ্ বা রোষাদ্ বাস্মাসু কেবলম্।

এই মুহূর্তে দ্রোণের ওপর কর্ণের এত রাগ হয়েছে যে, তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে দ্রোণকে কথা শোনালেন, যদিও তাঁর সামনে আছেন দুর্যোধন। কর্ণ বললেন—দুর্যোধন! এই আচার্যদের বড়ো মায়ার শরীর, এঁদের হিংসাবৃত্তি বলতে কিচ্ছুটি নেই। কাজেই তোমার সামনে যখন ভয় এসে উপস্থিত হবে, তখন অন্তত এই সমস্ত প্রাজ্ঞ-পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে যুদ্ধনীতি ঠিক কোরো না—

নৈতে মহাভয়ে প্রাপ্তে সংপ্রষ্টব্যাঃ কদাচন।

কর্ণ এবার ঘুরিয়ে দ্রোণাচার্যকে গালাগালিই দিতে আরম্ভ করলেন। তাঁর মতে দ্রোণের মতো লোকের যুদ্ধক্ষেত্রে কথা বলাই শোভা পায় না। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হওয়ার দরুন দ্রোণাচার্যকে এবার সেইসব কথা শুনতে হল, যা তাঁকে এ পর্যন্ত কেউ বলেনি। কর্ণ বললেন—দুর্যোধন! এসব লোকের পণ্ডিতি কথা কোথায় মানায় জান? বড়ো বড়ো লোকের বড়ো বড়ো বাড়িতে, যেখানে অলসে আড্ডা চলে। সভাস্থলে, যেখানে বড়ো বড়ো কূট তর্ক হচ্ছে, নিদেনপক্ষে ধনীদের বাগানবাড়িতে, যেখানে রসের আলোচনা চলছে, সেখানে এই দ্রোণের মতো পণ্ডিত লোকের কথা বললে মানায়—

কথা বিচিত্রাঃ কুর্বানাঃ পণ্ডিতাস্তত্র শোভনাঃ।

অথবা জনসমাজে যদি অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখাতে হয়, এই বামুনগুলোকে মানায় সেখানে। যজ্ঞ, অস্ত্রশিক্ষা, সন্ধি করার নিপুণতা—এসব ব্যাপারে এই বামুন-পণ্ডিতেরা খুব উপযুক্ত। তা ছাড়া পরের দোষ বার করতে দাও, মনুষ্য চরিত্রে কোথায় স্খলন ঘটন, সেটা বার করতে দাও, কোন বামুন কার বাড়িতে ভাত খেয়ে নিজের অন্নদোষ ঘটাল, সেটা বার করতে দাও—এই সব পণ্ডিত খুব পারবে—

পরেষাং বিবরজ্ঞানে মনুষ্যচরিতেষু চ।

অন্নসংস্কারদোষেষু পণ্ডিতাস্তত্র শোভনাঃ।

কর্ণের শেষ প্রস্তাব ছিল দ্রোণের মতো লোককে সোজা উপেক্ষা করে—পণ্ডিতান্ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা—নিজের মত চাপানো। ব্যাপারটা পুরানো।

কর্ণ দুর্যোধনের মনস্তত্ত্ব বোঝেন। যে দ্রোণাচার্য আপন সরসতায় অর্জুনের প্রশংসা করে ফেলেছেন, তাঁকে এই মুহূর্তে গালাগালি দিয়ে নিজের মত, সে মত যত উদ্ধতই হোক, চাপিয়ে দিতে যে কর্ণের অসুবিধে হবে না, সে তিনি ভালোই জানেন এবং জানেন বলেই কর্ণ নিজের মতটা কী সুকৌশলে উপস্থাপন করলেন দেখুন। কর্ণ বললেন—আরে! আমাদের সেনারা সব ভিতুর মতো দাঁড়িয়ে আছে কেন—

ভীতান্ সন্ত্রস্তান্ ইব লক্ষয়ে।

আরে অর্জুনই আসুক আর বিরাটই আসুক—সমুদ্রের ঢেউ এসে যেমন তীরভূমিতে আটকে যায়—তারাও তেমনি আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়াবে; আমি একা তাদের সামাল দেব—

অহম্ আবারয়িষ্যামি বেলেব মকরালয়ম্।

সাপের বিষ যেমন ব্যর্থ হয় না, আমার বাণও তেমনি ব্যর্থ হবার নয়, সব সুতীক্ষ্ণ শরগুলি একেবারে ঘিরে ধরবে অর্জুনকে। এই তেরো বছর ধরে অর্জুন নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে আছে। আমাকে সে মারবারও চেষ্টা করবে প্রচুর। শুনেছি বটে যে তিনি ভুবনের সেরা বীর, কিন্তু আমিও তো কিছু কম যাই না—

অহঞ্চাপি নরশ্রেষ্ঠাদ্ অর্জুনান্নাবরঃ ক্বচিৎ।

এদিক ওদিক থেকে আমার বাণ যখন অজস্রধারায় চলবে, আর শকুনের পাখার মতো শন্ শন্ শব্দ হবে, তখন অর্জুনের বোধ হবে যেন আকাশ ভরে গেছে জোনাকের আলোতে। আরে যুদ্ধে আমার সামনে দাঁড়াবে এমন পুরুষ এখনও স্বর্গে-মর্ত্যে জন্মায়নি। আজকে আমি অর্জুনকে মেরে দুর্যোধনকে যে কথা দিয়েছিলাম, সেই কথা রাখব এবং ঋণমুক্ত হব।

দুর্যোধনের প্রতি বশ্যতায় কর্ণ এখন নিজেকে এত বড়ো ভাবছেন যে, অর্জুনের মতো মহাবীরকে তিনি ভাবছেন গরুড়ের কাছে সাপের মতো, প্রবল বারিবর্ষণের মুখে জ্বলন্ত অগ্নির মতো। নিজের বুক বাজিয়ে কর্ণ বলছেন—আমি সেই পরশুরামের শিষ্য। তাঁর শিক্ষা, আর আমার ক্ষমতা—এই দুটোর জোরে আমি অর্জুন কেন, অর্জুনের বাবাকেও ঠাণ্ডা করে দিতে পারি—যুধ্যেয়মপি বাসবম্। অর্জুনের কপিধ্বজ রথের মাথায়-বসা কপিটি আজকে কাঁদতে কাঁদতে কাটা পড়বে, অর্জুনকে আজ আমি রথ থেকে মাটিতে ফেলে ছাড়ব—

বীভৎসুং পাতয়ন্ রথাৎ।

কৌরবেরা দেখুক আজকে, কেমন করে সেই অর্জুন তার ভাঙা রথ থেকে নেমে অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম চেষ্টায় শুধু আহত সাপের মত ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ে—

নিঃশ্বসন্তং যথা নাগমদ্য পশ্যন্তু কৌরবাঃ।

কর্ণ যা বললেন এতক্ষণ, তা নিজেদের সৈন্যদলের মনোবল উত্তেজিত করতে যতখানি, তার চেয়ে অনেক বেশি আপন অহমিকা প্রকাশ করতে; বিশেষত অর্জুন যেখানে প্রতিপক্ষ, সেখানে এইরকম একটা কাল্পনিক মাহাত্ম্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে কর্ণের ভালো লাগে। কিন্তু তাঁর এই উত্তেজনা বা অহমিকা অন্যেরা কতদিন সহ্য করবেন? আগেই বলেছি, সেই পাশাখেলার আসর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ক্রমাগত অপমানিত হতে হতে এখন আর বৃদ্ধেরা কর্ণের সব কথাবার্তা চুপ করে মেনে নিতে পারছেন না। অতএব কর্ণের এই মৌখিক আড়ম্বরের উত্তরে কৃপাচার্য আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বস্তুত কৃপাচার্যের কথাই ছিল কর্ণের বিরুদ্ধে বৃদ্ধদের প্রথম সংহত প্রতিবাদ। কৃপ বললেন—এই যে রাধামায়ের ছেলে কর্ণ! কূটযুদ্ধে তোমার যে খুব বুদ্ধি খেলে সে আমরা বেশ বুঝি। (কৃপ কপট পাশা খেলার দিকে ইঙ্গিত করলেন)। তবে এই ক্রূর যুদ্ধের মূলও তুমি বোঝ না, পরিণামও বোঝ না। তোমার শকুনি মামারা শাস্ত্রমতে যেসব কপট যুদ্ধ করেন, সে কপটতা আরও অনেক রকমে করা যায়; তবে কী জান, ভদ্রলোকেরা ওই ধরনের যুদ্ধকে বড়োই জঘন্য মনে করেন। কোথায় যুদ্ধ করছি, তা বুঝলাম না, কোন সময়ে যুদ্ধ করছি, তা বুঝলাম না, যুদ্ধ করলেই হল? দেশ-কাল বুঝে যুদ্ধ করলেই তবে না জয় আসে, নইলে উলটো ফল হবে যে।

কৃপ কর্ণের আত্মম্ভরি বক্তৃতা অনেকক্ষণ শুনেছেন। এবার তাই তিনি একটা তুলনা-প্রতিতুলনার জায়গায় এসে বলতে থাকলেন—দেখ কর্ণ! তুমি বেশি সাহস দেখিয়ো না—

কর্ণ মা সাহসং কৃথাঃ।

একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারবে যে,

আমরা গুষ্টি-শুদ্ধ একা অর্জুনের সঙ্গে নাও এঁটে উঠতে পারি—

পরিচিন্ত্য তু পার্থেন সন্নিপাতো ন নঃ ক্ষমঃ।

অর্জুন একসময় একাই সমগ্র কুরুদেশ রক্ষা করেছে, একাই খাণ্ডব বন পুড়িয়েছে, একাই সুভদ্রাকে হরণ করে কৃষ্ণকে পর্যন্ত দ্বৈরথে আহ্বান জানিয়েছে এবং একাই তুষ্ট করেছে কিরাতরূপী মহাদেবকে। তারপরেও একটু ভেবে দেখ। অর্জুন একাই সম্পূর্ণ জয়দ্রথের বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে অপহৃতা দ্রৌপদীকে ফিরিয়ে এনেছে। বেশি দূরে নয়, এই বনেই। সমগ্র উত্তর দিকটা অর্জুন একাই দিগ্বিজয়ে জিতে এসেছিল। কৃপাচার্য এই কথাটা বলেই ভাবলেন কর্ণ হয়তো এবারে উত্তর দিতে পারেন যে, দিগ্বিজয় তো তিনিও করেছেন। তাই কৃপাচার্য এবার কর্ণকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন—কর্ণ! গন্ধর্ব চিত্রসেনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তুমি পালিয়ে বেঁচেছিলে, সেই চিত্রসেনের সঙ্গে অর্জুন কিন্তু একাই লড়ে গেছেন। তাঁর সেনাবাহিনীকেও অর্জুন একাই পর্যুদস্ত করেছিলেন অথচ সেই সেনাবাহিনীই তোমার রথ ভেঙে, ঘোড়া মেরে, তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে তাড়িয়ে ছেড়েছিল।

দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা কৃপের কথাও এতক্ষণ শুনেছেন, কর্ণের কথাও শুনেছেন। এই অশ্বত্থামাকে আগে আমরা দুর্যোধনের যুবগোষ্ঠীতে কর্ণ, দুঃশাসনের সঙ্গে অনেকবার নানা আলোচনায় অংশ নিতে দেখেছি। কিন্তু পাশাখেলায় পাণ্ডবদের সস্ত্রীক চরম অপমানের পর অশ্বত্থামা বোধহয় দুর্যোধন এবং কর্ণের সব যুক্তি মেনে নিতে পারছিলেন না। বিশেষ করে তাঁর বাবা দ্রোণাচার্য কর্ণের কাছে বারবার যেভাবে অপমানিত হচ্ছিলেন, তাতে মাঝে মাঝেই অশ্বত্থামার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছিল। অশ্বত্থামা নিজে বড়ো মাপের বীর, কর্ণও তাই। কিন্তু যে কর্ণ তাঁর পিতাকে অপমান করছেন বারংবার, যে কর্ণ সর্বজনবন্দিত আচার্যগুরুকে অভিযুক্ত করছেন বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে, তাঁর সঙ্গে অশ্বত্থামা থাকেন কী করে? তিনি তাই কর্ণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। অশ্বত্থামা বললেন—তোমার লজ্জা জিনিসটা বড়ো কম, কর্ণ! যুদ্ধবীরেরা অনেক যুদ্ধ জিতে পরের ধন নিজের নগরে নিয়ে গিয়েও এত বকবক করে না, আর এখানে তো তুমি এখনও বিরাটরাজার গোরুগুলিও জিতে আনোনি, তাঁর রাজ্যের সীমাও পেরোওনি, হস্তিনাপুরেও এখনো ফিরে যাওনি, অথচ কী হামবড়াইটাই না তখন থেকে করে যাচ্ছ! দেখ, আগুন মেলা বকবক না করেও শরীর পুড়িয়ে দেয়, সূর্যদেব বিনা বাক্যেই তাপ দান করেন। এঁরা যখন বিনা কথায়, নিশ্চুপে এত বড়ো বড়ো কাজ করে ফেলতে পারছেন, সেখানে তুমি কিন্তু বকেই যাচ্ছ, অথচ তুমি এখনও কিছুই করনি। বীর পুরুষেরা ন্যায় অনুসারে, সারা পৃথিবী জয় করে এসে গুণহীন গুরুকেও সৎকার করার চেষ্টা করে, আর তোমরা অন্যায় পাশাখেলায় পাণ্ডবদের জয় করেছ, তাতেও হয়নি, এখন আবার গুরুকেও নিন্দা করছ। পাশাখেলার বাজিতে রাজ্যসম্পদ জয় করে কোনো ভদ্র ক্ষত্রিয় কি সন্তুষ্ট থাকতে পারে? আর তেমনি হয়েছে এই নচ্ছার নির্লজ্জ ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেগুলো, যারা নাকি ব্যাধের মতো শঠতায় শুধু ফাঁদ পাতার জন্য বসে আছে—

নিকৃত্যা বঞ্চনাযোগৈশ্চরন্ বৈতংসিকো যথা।

পিতৃনিন্দায় অশ্বত্থামা এতই রেগে গেছেন যে, মাতুল কৃপাচার্যের কথার সূত্র ধরে তিনি কর্ণকে 'চ্যালেঞ্জ' জানিয়ে বললেন—একটা, মাত্র একটা যুদ্ধের কথা বলতো, যেখানে অর্জুনকে তুমি একা জয় করেছ—

কতমদ্ দ্বৈরথং যুদ্ধং যত্রাজৈষীদ্ ধনঞ্জয়ম্।

ওই নকুল, সহদেব—যাদের তুমি একরত্তি পোঁছ না, সেই তাদেরই বা তুমি কী করতে পেরেছ, কী করতে পেরেছ ভীমকে, কিংবা যুধিষ্ঠিরকে? খুব তো দিগ্বিজয় করেছ বলে বড়াই করে বেড়াও, বলতে পারবে, অর্জুনেরা থাকতে কবে তুমি যুদ্ধ করে তাঁদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ জয় করেছ—

ইন্দ্রপ্রস্থং ত্বয়া কস্মিন্ সংগ্রামে বিজিতং পুরা?

এই যে পঞ্চস্বামীর সোহাগিনী কৃষ্ণা, তাঁকেও কোনোদিন ক্ষাত্রবীর্যে যুদ্ধজয় করে জিতে আনতে পেরেছ? স্বয়ম্বর সভার পর যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতেও জেতনি, অন্য কোনো যুদ্ধও জেতনি। মাঝখান থেকে কুলবধূকে রজস্বলা অবস্থায় এক কাপড়ে রাজসভায় টেনে এনে ন্যায়-ধর্মের মূলটাই দিয়েছ উপড়ে। বেটা সারথির জাত! বদমাশ—দুষ্টকর্মন্—তুই কি ভেবেছিস দ্রৌপদীর সঙ্গে ওই জঘন্য ব্যবহারের পরেও

অর্জুন তোকে ছেড়ে দেবে? তুই যে পণ্ডিতের মতো বড়ো বড়ো কথা বলে যাচ্ছিস—

ত্বং পুনঃ পণ্ডিতো ভূত্বা বাচং বক্তুমিহেচ্ছসি।

—তোর সঙ্গে কি অর্জুনের তুলনা? দেবতা, মানুষ, গন্ধর্ব—এমন কেউ নেই যাকে অর্জুন ডরায়। দ্রোণ, কৃপ যে এতক্ষণ অর্জুনের প্রশংসা করেছেন, ঠিক করেছেন। সে তোর থেকে অনেক বড়ো যোদ্ধা—

ত্বত্তো বিশিষ্টো বীর্যেণ।

সত্যি কথা বলতে কি, অর্জুনের মতো এত বড়ো যোদ্ধা আর কে আছে—

কো'র্জুনেন সমঃ পুমান্?

কর্ণের আত্মম্ভরিতার কারণে দুর্যোধনের ঘনিষ্ঠবৃত্ত আর কুরুরাজসভার আচার্যগোষ্ঠীর মধ্যে এই যে কলহ আরম্ভ হল, তা যে কুরুরাজসভার রাজনীতিতে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে—যেখানে ঐক্যের একান্ত প্রয়োজন—সেখানে বড়োসড়ো ফাটল ধরিয়ে দিতে যাচ্ছে, তা সবথেকে বেশি ভালো বুঝলেন কুরুপিতামহ ভীষ্ম। সামনে এসে পড়েছেন বৃহন্নলা বেশধারী অর্জুন, তিনি বা আচার্য দ্রোণ যুদ্ধের পক্ষে থাকুন বা বিপক্ষে—যুদ্ধ এখন করতেই হবে। কারণ বিরাট রাজার গোসম্পদ ছাড়াবার জন্য অর্জুনই যুদ্ধ করবেন। এ অবস্থায় বৃদ্ধ ভীষ্মই হাত জোড় করে, অনুনয় করে আচার্যগোষ্ঠীকে শান্ত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। এই যুদ্ধে রণনীতি স্থির করার ভার কিন্তু ভীষ্মের ওপর ছিল। ভীষ্ম বেশ বুদ্ধি করেই এবং বোধ হয় ইচ্ছে করেই এমন নীতি স্থির করলেন, যাতে কর্ণকেই সবথেকে বেশি বার অর্জুনের মুখোমুখি হতে হয়। ভীষ্ম বললেন—দ্রোণ থাকুন সেনাবাহিনীর মধ্যভাগে, অশ্বত্থামা বামদিকে আর কৃপ ডান পাশে। সামনে থাকুন কর্ণ আর আমি সবার শেষে থেকে চারদিক রক্ষা করব। ভীষ্ম দুর্যোধনকে আদেশ দিলেন দ্রুত গোসম্পদ নিয়ে পলায়ন করতে। সেই মতো দুর্যোধন বিরাটরাজার গোধন হরণ করে পালাচ্ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে অর্জুন প্রথমে দুর্যোধনের পিছু নিলে সমস্ত কৌরববাহিনী একযোগে এসে পড়লেন অর্জুনের সামনে। প্রথমে কয়েকজন মধ্যমান বীরের মান হরণ করার পরেই অর্জুনের সঙ্গে কর্ণের যুদ্ধ আরম্ভ হল। কর্ণ প্রথমে যেভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করেছিলেন এবং অর্জুনের রথ আর তাঁর সারথি উত্তরের যে অবস্থা করেছিলেন, তাতে অর্জুনকে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে হচ্ছিল। কর্ণ এবং অর্জুন দুজনেই এমন সমানে সমানে যুদ্ধ করছিলেন যে, মহাভারতের কবিকে প্রশংসা করে বলতে হয়েছে—কেউ কম যান না। সমস্ত ধনুর্ধরদের মধ্যে ইনিও উত্তম, উনিও উত্তম। দুজনেই মহাবল, দুইজনেই সমস্ত শত্রুর পক্ষে বিপজ্জনক—

তাবুত্তমৌ সর্বধনুর্ধরাণাং

মহাবলৌ সর্বসপত্নসাহৌ।

কৌরবেরা সবাই মিলে কর্ণ এবং অর্জুনের এই আশ্চর্য যুদ্ধ দেখছিলেন।

কৌরবেরা যে দেখছিলেন, তার কারণও আছে। আমাদের ধারণা, কৌরবদের একাংশ, যাঁরা কর্ণের ওপর ভরসা রাখেন, তাঁরা দেখছিলেন যে, কর্ণ কতটা হারেন, কারণ তাঁরা জানতেন তেরো বছরের যুদ্ধ-উপবাসী অর্জুন সেদিন ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। অর্জুন এবং কর্ণ—দুজনেই সেদিন অপূর্ব যুদ্ধ করেছিলেন, এতটাই অপূর্ব যে, কবির বাণীতে নতুন ছন্দ লেগেছে, ভাষা হয়ে উঠেছে দীপ্তিময়ী। যুদ্ধক্ষেত্রে যতবারই অর্জুনের কেরামতি বানচাল করে দিয়েছেন কর্ণ, ততবারই তিনি কৌরবদের অসংখ্য হাততালি কুড়িয়েছেন—

ততস্তু অভূদ্ বৈ তলতালশব্দঃ।

কিন্তু অর্জুন এ সুযোগ পাননি। তবু সেদিনকার যুদ্ধে দুজনেই ছিলেন এত উজ্জ্বল, এত ভাস্বর যে, হাজারো বাণবর্ষার মধ্যে দুজনকে দেখাচ্ছিল যেন বৃষ্টির আকাশে চাঁদ আর সূর্যের উদয় হয়েছে—

রথে বিলগ্নাবিব চন্দ্রসূর্যৌ,

ঘনান্তরেণানুদদর্শ লোকঃ।

কিন্তু হায়, শেষমেশ এই দ্বৈরথ যুদ্ধের ফল কর্ণের কপালদোষে এবং অর্জুনের হাতযশে—কর্ণের অনুকূলে যায়নি। হাতে, গলায়, উরুতে, মাথায় বিভিন্ন রকমের চোট-আঘাত নিয়ে কর্ণকে কোনোক্রমে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে হল। কিন্তু কবি লিখলেন—বনের মধ্যে এক হাতি যেমন আরেক হাতির কাছে হেরে গিয়ে সাময়িকভাবে পালায়, তেমনি অর্জুনের বাণের আঘাতে কর্ণকেও যুদ্ধ থেকে পালাতে হল। কর্ণ তবু আবার ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু সেটা এমন একটা সময়ে যখন

ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন সবাই প্রায় অর্জুনের হাতে পর্যুদস্ত। সমস্ত আঘাতের ওপর অর্জুনের বাণ কর্ণের দুই কানে গিয়ে লাগল। তাঁর রথ, অশ্ব, সারথি সব গেল। কর্ণ আবার দৌড়লেন নতুন সাজানো রথের জন্য।

এতক্ষণ সবার সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণ একজন মাত্র ছিলেন। এবার একক সংগ্রাম আরম্ভ হল। কৃপাচার্য এবং দ্রোণাচার্য দুজনেই হেরে গেলে প্রচুর বাগাড়ম্বরের পর আবার অর্জুনের সঙ্গে কর্ণের যুদ্ধ আরম্ভ হল। মনে রাখা দরকার এই বিরাট-যুদ্ধে প্রথম থেকেই বেশির ভাগ যুদ্ধটা করতে হয়েছে কর্ণকে, তাঁকেই সইতে হয়েছে প্রথম সমরাঘাতগুলি। কাজেই তৃতীয়বার যুদ্ধে এসে তাঁকে অর্জুনের কাছে শুনতেই হল যে, তিনি যুদ্ধ থেকে পালিয়েছিলেন, কিংবা তাঁর ভাই মারা পড়েছে এই যুদ্ধে। তবু আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল এবং স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্ত মহাবীরকে বিরথ অবস্থায় অর্জুনের বাণে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তে হয়েছে, তাঁকে আবারও পালাতে হয়েছে। তেরো বছর পর কর্ণ-জয়ের আনন্দে হাসি ফুটেছে অর্জুনের মুখে।

[মহা (k) ৪.৩০.১-২৭; ৪.৩৯.১-১৭; ৪.৪৬.২১-৩৩; ৪.৪৭-৫২ অধ্যায়; ৪.৫৪.৫, ১৮, ১৯-৩৬; ৪.৫৫.৫২-৫৩; ৪.৫৮.১৬-২১; ৪.৫৯.১-২৭; (হরি) ৪.২৮.১-২৮; ৪.৩৬.৩-১৭; ৪.৪১.২০-২৯; ৪.৪২-৪৭ অধ্যায়; ৪.৪৯.৫, ১৮, ১৯-২৩; ৪.৫০.১৯-২০; ৪.৫৪.১৬-২১; ৪.৫৫.১-২৭]

□ পাণ্ডবদের বনবাসের বার বছর এবং অজ্ঞাতবাসের এক বছর—মোট তেরোটি বছর কেটে গেল। পাণ্ডব-কৌরব উভয় শিবিরেই যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে আবার তারই মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সন্ধির চেষ্টাও চলছে পাণ্ডবদের পক্ষ থেকে। পাণ্ডবরা প্রথমে দ্রুপদের পুরোহিতকে পাঠিয়েছেন হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়ে। সেই পুরোহিতের কথার মধ্যে পাণ্ডবদের অপমানের গ্লানি মিশেছিল, পাণ্ডবদের শক্তিমত্তার কথাও তিনি হয়তো একটু স্পষ্টভাবেই বলেছেন—কিন্তু কুরুসভায় সেই পুরোহিতের দৌত্যের উত্তরও পিতামহ ভীষ্ম উচিত রকমই দিচ্ছিলেন। কিন্তু পাছে ভীষ্ম বেশি কথা বলে রাজসভায় রাজ্য ফেরত দেবার প্রস্তাবটাকেই ধৃতরাষ্ট্রের দ্বারা সমর্থিত বলে প্রতিষ্ঠা করে দেন—বোধকরি সেই ভয়ে এবং খানিকটা স্বভাবের বশেই কর্ণ ভীষ্মকে বিশেষ কিছু বলতেই দিলেন না। বৃদ্ধেরা কেউ নন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র নন এমনকী স্বয়ং দুর্যোধনও নন, কুরুসভায় কর্ণের আজ এমনই প্রতিপত্তি, দুর্যোধনের মদতে তিনি এতটাই পুষ্ট যে তিনি নিজেই জোর গলায় 'দুর্যোধনের' মত জানিয়ে দিচ্ছেন দূতকে।

কর্ণ বললেন—বার বার এক কথা বলে পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে চাই না—কিং তেন ভাষিতেন পুনঃপুনঃ। কর্ণের ধারণা, দুর্যোধনের মতোই কর্ণের ধারণা যে, অজ্ঞাতবাসের আগেই অর্জুনকে দেখা গেছে সেই বিরাট যুদ্ধের আসরে। আসলে ওই যুদ্ধে অর্জুনের কাছে হেরে যাওয়ায় কর্ণের সমস্ত অহমিকা যেহেতু মলিন হয়ে গিয়েছিল, তাই কর্ণ কিন্তু ক্ষত্রোচিত ক্ষমতার বদলে আবার কপটতার দিকে মন দিচ্ছিলেন। কর্ণ বললেন—সবাই জানে যে, শকুনির পাশার দানে কী শর্ত ছিল। অজ্ঞাতবাসের সময় তাদের দেখা গেলে আবার তাদের বনে যেতে হবে—এইটেই কথা। এই সত্য প্রতিজ্ঞার বাইরে এসে পাণ্ডবেরা যদি বিরাটরাজা আর দ্রুপদরাজার ওপর নির্ভর করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে আমাদের, তাহলে মনে রেখ, সেই ভয়ে ভীত নয় দুর্যোধন। ভয় দেখালে দুর্যোধন একের চার ভাগ কেন, এক পা জমিও ছাড়বেন না—

দুর্যোধনো ভয়োদ্বিগ্নো ন দদ্যাৎ পাদমন্ততঃ।

হ্যাঁ যদি ন্যায়ের কথা বলো তা হলে অতি বড়ো শত্রুকেও আমাদের দুর্যোধন সমস্ত পৃথিবী দিয়ে দিতে পারেন এবং সেটা পাণ্ডবদেরও দেবেন, যদি তারা প্রতিজ্ঞাটি ঠিক ঠিক মতো পালন করে। হ্যাঁ, আবার বারো বছরের বনবাস শেষ হোক, তারপর তারা নির্ভয়ে আমাদের দুর্যোধনের কোলে এসে বসুক। কিন্তু তা না করে যদি অন্যায়ভাবে বোকার মত দাবি চালায় পাণ্ডবেরা, তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে আমার কথা যেন স্মরণে থাকে—স্মরিষ্যন্তি বচো মম।

আবার সেই দম্ভ। দর্পী কর্ণের কথাগুলি শুনলেন? সাধে কি আর গান্ধারী মাতা সবার শেষে বলেছিলেন যে ভারত যুদ্ধের অনুক্ত কর্তা ছিলেন কর্ণ। কর্ণ যেভাবে যুক্তি সাজিয়ে, ইন্ধন জুগিয়ে দুর্যোধনকে অশুভ পথে প্ররোচিত

করলেন, তাতে সাময়িকভাবে যে কোনো ঠাণ্ডা মানুষও প্ররোচিত বোধ করবেন, সেখানে দুর্যোধন শত জটিলতায় দীর্ণ। এর ওপরে আছে সেই দম্ভ, যার ওপর দুর্যোধন বার বার ভরসা করে আশাহত হন, আবারও ভরসা করেন, কেননা কর্ণ ছাড়া আর কোনো শক্তিশালী বীরই তাঁরই মতো করে তাঁরই ছন্দে, তাঁর কথা ভাবেন না। কিন্তু কথার মাঝখানে স্তব্ধ হওয়া ভীষ্ম কর্ণকে ছাড়বেন কেন। কর্ণের মুখরতায়, দাম্ভিকতায় আহত ভীষ্ম বেশ রেগেই বললেন—ওরে রাধার বেটা! মেলা বকবক কোরো না, তোমার নিজের কাজকর্ম একটু স্মরণ কর তাহলেই হবে। তুমি একা নও, আমরা ছ-জন মহারথ যোদ্ধা ছিলাম বিরাটরাজ্যে গোধন হরণের সময়। আমাদের ছ-জনকেই অর্জুন একা হারিয়ে দিয়েছিল। তুমি যে তার সঙ্গে যুদ্ধ করেও বার বার বেঁচে গেছ, তার থেকেই বুঝি কী কর্ম তুমি করেছ—

বহুশো জীয়মানস্য কর্ম দৃষ্টং তবৈব তৎ।

—অর্থাৎ পালিয়ে বেঁচেছ। তোমার কথা শুনে যদি এখন এই ব্রাহ্মণের মুখে পাণ্ডবদের সন্ধির প্রস্তাব মেনে না নিই, তা হলে যুদ্ধক্ষেত্রে শুয়ে শুয়ে আবার আমাদের মাটি খেতে হবে। যেমনটি আগের যুদ্ধে মূর্চ্ছিত হয়ে খেয়েছিলাম—

ধ্রুবং যুধি হতাস্তেন ভক্ষয়িষ্যাম পাংশুকান্।

ভীষ্মের রাগ দেখে মহামতি ধৃতরাষ্ট্র একটু ভয়ই পেলেন, একটু তিরস্কারও করলেন কর্ণকে। পরে সঞ্জয়ের কাছে মন খুলেই বললেন যে, 'আমাদের পক্ষে এই দুর্যোধন আর কর্ণ ছাড়া আর কেউই নেই, যারা পাণ্ডবদের এত বিদ্বেষ করে। নিরপেক্ষতার মুহূর্তে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের বিশেষণ দিয়েছেন পাপমতি, মন্দবুদ্ধি আর কর্ণের বিশেষণ দিয়েছেন ক্ষুদ্রচেতা—

অন্যত্র পাপাদ্ বিষমান্মন্দবুদ্ধে-দুর্যোধনাৎ
ক্ষুদ্রতরাচ্চ কর্ণাৎ।

সত্যি দুর্যোধনের অসমদর্শিতার সঙ্গে সঙ্গে কী এক পরশ্রীকাতরতা কর্ণকে পেয়ে বসেছিল যে, অতবড়ো উদার দাতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অতি বিশ্বস্তজনের চিত্তভূমিতেও ক্ষুদ্রচেতার পদবি লাভ করেছেন তিনি। যাই হোক, ভীষ্মের তিরস্কার সেদিন যথেষ্ট দীর্ঘই ছিল, অনেক কথা শুনিয়েছেন তিনি কর্ণকে। সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধনকেও।

ভীষ্ম বলেছিলেন—বার বার বলছি দুর্যোধন, কৃষ্ণ আর অর্জুনকে যুদ্ধে যদি এক রথে আসতে দেখ, তা হলে কৌরবদের সমূহ বিপদ। এটা মনে রেখ, সমগ্র কৌরবকুল তোমারই সিদ্ধান্তেরই প্রতীক্ষা করে কিন্তু তুমি নিজে চালিত হও তিন জনের বুদ্ধিতে। তাদের মধ্যে একজন হল ওই পরশুরামের অভিশপ্ত শিষ্য, বেজাতে জন্মানো সূতপুত্র কর্ণ—

রামেণ চৈব শপ্তস্য কর্ণস্য ভরতর্ষভ।
দুর্জাতেঃ সূতপুত্রস্য . . .।

দ্বিতীয় শকুনি, তৃতীয় দুঃশাসন। দুর্যোধনের বুদ্ধিদাতাদের তালিকায় প্রথম নাম কর্ণের। কুরুবৃদ্ধেরা যে তাঁর ওপর সন্তুষ্ট নন, তা তাঁদের আরোপিত বিশেষণগুলি থেকেই বোঝা যায়। কর্ণ 'দুর্জাতি', কর্ণ 'সূতপুত্র'—এইসব বিশেষণ কর্ণের গা-সওয়া, কিন্তু যাঁর ক্ষমতা এবং অস্ত্রবলের ওপর দুর্যোধন সমধিক ভরসা করেন, সেই অস্ত্রবিদ্যাও যে গুরু পরশুরামের অভিশাপে কার্যকালে কাজে লাগবে না সেই কথাটা দুর্যোধনকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ফলে কর্ণের রাগ আরও বেড়ে গেল। তিনি অবশ্য সুচতুরভাবে ওই শাপ-টাপের প্রসঙ্গে গেলেন না। উলটে শক্তিমান পুরুষের জাতি নিয়ে যে কোনো আলোচনা ভদ্র সমাজে বিগর্হিত, সেই দিকটা দিয়ে চেপে ধরলেন ভীষ্মকে।

কর্ণ বললেন—যা বলেছেন, বলেছেন। কিন্তু আপনি আর দ্বিতীয়বার এসব বাজে কথা বলবেন না, পিতামহ! আমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করি এবং সেই ধর্ম থেকে আমি একচুলও নড়ি না। তা ছাড়া, আর কী খারাপটা আপনি দেখেছেন আমার মধ্যে, যাতে করে আমাকে এমন করে গালাগালি দিতে পারেন আপনি—

কিঞ্চান্যন্ ময়ি দুর্বৃত্তং যেন মাং পরিগর্হসে।

কই, আমার মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা তো কোনো অন্যায় আচরণ দেখতে পায় না। আর আমিও কোনোদিন তাদের বিরুদ্ধে কাজ করিনি। অর্থাৎ তুমি তা করছো। এই কথাটা ভীষ্মের দিকেই অঙ্গুলি সংকেত করে বলা। কর্ণ বলতে চান—ভীষ্ম কৌরবদের যথেষ্ট দোষ দেখতে পান, যা কর্ণ পান না। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরাও ভীষ্মকে খুব একটা আপনার বলে মনে করেন না, অথচ তিনি ঠাকুরদাদাগিরি করে নাতিদের দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। প্রায় এতটা বলার পর কর্ণ উদ্ধত হয়ে বললেন—যা বলেছি, বেশ করেছি। হ্যাঁ, আমি

পাণ্ডবদের একা শেষ করে ছাড়ব। কর্ণ স্পষ্টতই বলতে চাইলেন—আপনি কে? মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের যা প্রিয়, আমি তাই করেছি, তাই করি, আর কাজ করি দুর্যোধনের, রাজ্যের ভার যাঁর ওপরে, আপনি কে—

রাজ্ঞো হি ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্বং কার্যং প্রিয়ং ময়া।
তথা দুর্যোধনস্যাপি স হি রাজ্যে সমাহিতঃ।

এই অপমান ভীষ্মের সহ্য হবার নয়। এতদিন ধরে যিনি এই বিশাল কুরুকুলের সমস্ত তন্তুগুলি রক্ষা করে এসেছেন, তিনি ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধনের প্রিয় বোঝেন না, বোঝে এই কুরুদের আশ্রয়পুষ্ট কর্ণ। অথবা আশ্রয়পুষ্টের এই স্বভাব, সে শ্রেয় বোঝে না, প্রেয় বোঝে, পরিণামে হিতকারিতা বোঝে না, বিষয়ের আপাতরম্যতা বোঝে। কিন্তু ভীষ্ম যদি এখন সেই সব তর্ক তোলেন, তা হলে স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের তা মোটেই বুদ্ধিগোচর হবে না—হবে না যে, তা বিদুরের বিরাট বক্তৃতা শেষেই বোঝা গেছে। ভীষ্ম তাই সে ধার দিয়ে গেলেনই না, তিনি বাস্তবতার কথা তুললেন। তিনি কর্ণের সেই আত্মম্ভরিতার কথাটা উদ্ধার করে নিলেন, তাঁর সমস্ত বাক্যগুলি থেকে। ভীষ্ম জানেন, যুদ্ধ যখন লাগবে, তখন সেই বাস্তবতার নিরিখেই কর্ণের কথার উত্তর দেওয়াটা ভালো। ভীষ্ম বললেন—প্রায় প্রতিদিনই একবার এই কর্ণ হামবড়াই করে বলবে—আমি একাই পাণ্ডবদের শেষ করে দেব—হন্তাহং পাণ্ডবানিতি। আরে পাণ্ডবদের তুলনায় এই কর্ণটা একের ষোলো ভাগও নয়—

নায়ং কলাপি সম্পূর্ণা পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।

মিথ্যা বাগাড়ম্বর অনেক শুনেছি, ওসব ফালতু কথার কোনো মূল্য নেই—

এতান্যস্য মৃষোক্তানি বহূনি ভরতর্ষভ।

ভীষ্মের কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সমর্থন করলেন দ্রোণাচার্য, কারণ তিনিই কর্ণের কটু অপমানের পূর্বভোগী। দ্রোণাচার্য ধৃতরাষ্ট্রকে সাবধান করে দিলেন এবং বললেন—খবরদার এইসব উচ্চাভিলাষীর কথা শুনে আপনি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন না—

ন কামম্ অর্থলিপ্সূনাং বচনং কর্তুমর্হসি।

মহাভারতের কবি আর কিছুতেই কর্ণকে সমব্যথা দেখাতে পারছেন না। কবির ধারণা, ধৃতরাষ্ট্র যখন ভীষ্ম, দ্রোণের মত মানুষের সার কথা শুনলেন না, ভদ্রতা করে তাঁদের কথার জবাবও দিলেন না, উলটে কর্ণের প্রতিই যখন ধৃতরাষ্ট্রের গূঢ় সমর্থন রয়ে গেল, তখন কুরুকুলের সাধারণ জনেরা নিজের জীবনের আশা বিসর্জন দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের সমস্ত কথা শুনলেন, পাণ্ডবদের প্রতিজ্ঞানিষ্ঠা শুনে তাঁর যে একটু ভয় ভয়ও করছিল না, তা নয়, কিন্তু তাঁকে আপন মতে প্রতিষ্ঠিত করতে দুর্যোধনই ছিলেন যথেষ্ট। ভীষ্ম যেহেতু কর্ণের বীরত্ব নিয়ে কটু সমালোচনা করেছেন, তাই দুর্যোধন সবার সামনেই পুনরায় তাঁকে কাল্পনিক পাণ্ডবহন্তার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তুলনা দিয়ে বললেন, কর্ণ আপন শক্তিমত্তায় ওই ভীষ্ম, দ্রোণ কি কৃপের থেকে কোনো অংশে কম নয়, বরঞ্চ ভীষ্মের গুরু পরশুরামও নাকি তাঁকে সমযোদ্ধার আসন দিয়েছেন—

অনুজ্ঞাতশ্চ রামেণ মৎসমো'সীতি ভারত।

হ্যাঁ, ইন্দ্রদেবের প্রবঞ্চনায় এবং কর্ণের দানশূরতায় কবচ-কুণ্ডলটি খোয়া গেছে বটে, কিন্তু মজুত আছে কর্ণের কাছে সেই ইন্দ্রের দেওয়া এক-বীরঘাতিনী শক্তি—যে শক্তি থেকে অর্জুনের কিছুতেই নিস্তার নেই—

কস্মাদ্ জীবেদ্ ধনঞ্জয়ঃ।

দুর্যোধন কর্ণের শক্তি দেখিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—আপনি একটুও চিন্তা করবেন না মহারাজ, পাকা ফলের মতো জয় আমাদের হাতের মুঠোয়—ফলং পাণৌ ইবাহিতম্।

আমরা আগেই বলেছি মহাভারতের কবি আস্তে আস্তে তাঁর সমস্ত সমব্যথিতা উঠিয়ে নিচ্ছেন কর্ণের ওপর থেকে। যে শক্তি, যে রণনিপুণতা নিয়ে জন্মেছিলেন কর্ণ, সেই শক্তি শুধু অন্যায় বুদ্ধির মোসাহেবি করে এখন একেবারে একা হয়ে গেছে। সহনশীলতা এবং পাত্রাপাত্র বোধ—দুটিই কর্ণের মধ্যে না থাকাতে তিনি শেষ পর্যন্ত কৌরবকুলের ধ্বংসসাধকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান বলে চিহ্নিত হয়েছেন। এমনকী স্থিতিশীল প্রকৃতিস্থ অবস্থায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত মনে করেন—দুর্যোধন আমার সুবোধ বালক, আসল কাজটা করছে ওই কর্ণ। দুর্যোধনকে তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন—দেখ বাপু তুমি তো নিজে ইচ্ছে করে কিছু করো না, ওই কর্ণ তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেয়—

ন ত্বং করোসি কামেন কর্ণঃ কারয়িতা তব।

দুর্যোধনের গোষ্ঠীতে কর্ণের এই প্রযোজক কর্তার ভূমিকা, এটা খানিকটা সত্যও বটে। কর্ণ নিজে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা—এইসব বড়ো মাপের মানুষদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র যখন সবার চাপে পড়ে দুর্যোধনের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করলেন, তখন দুর্যোধন পরিষ্কার সেই একাকিত্বের দায়িত্ব নিয়েছেন। অর্থাৎ যুদ্ধ যদি লাগে এবং ভীষ্ম দ্রোণ, কৃপ, কেউ যদি যুদ্ধ নাও করেন, তবু তিনি যুদ্ধ করবেন, শুধু তাঁর সঙ্গী হবেন কর্ণ। তিনি বলেছেন—আমি কারও ওপর কোনো ভরসা রাখছি না, শুধু আমি আর কর্ণ—

অহঞ্চ তাত কর্ণশ্চ।

—এ দুজনে মিলেই আমরা যুদ্ধ করব। যুদ্ধটা যদি যজ্ঞের মতো চেহারা নেয়, তাহলে সেই রণযজ্ঞের পশুবলি হবেন যুধিষ্ঠির, আর সেই যজ্ঞের পুরোহিত হবেন কর্ণ আর দুর্যোধন—

অহঞ্চতাত কর্ণশ্চ রণযজ্ঞং বিতত্য বৈ।
যুধিষ্ঠিরং পশুং কৃত্বা দীক্ষিতৌ পুরুষর্ষভৌ।

রণযজ্ঞে পাণ্ডব-প্রতিনিধি যুধিষ্ঠিরকে বলি দেওয়ার জন্য দুর্যোধন কারও ওপর নির্ভর করেননি, প্রধানত কর্ণের ওপর ছাড়া। কুরুসভায় তখন পাণ্ডব-কৌরবের ক্ষমতা-অক্ষমতা যাচাই চলছে দিন রাত। কে কাকে মারতে পারবে। কার শক্তি কত—এ সব তুলনা, প্রতিতুলনা চলছে। সেই অবস্থায় কর্ণ তাঁর স্বাভাবিক নিয়মে আবারও বলে ফেললেন—পাণ্ডবদের দণ্ড দেওয়ার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। হ্যাঁ, আমি গুরু পরশুরামের কাছে মিথ্যা কথা বলে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিলাম বটে, গুরুও আমাকে অভিশাপ দিয়েছেন যে, আমার অন্তকালে সেইসব মরণাস্ত্র আমার স্মৃতিগোচর হবে না। কিন্তু তবু বলছি, সে সব অস্ত্রের শেষমেশ এখনও যা আমার মাথায় আছে, তাতেই ওই পাণ্ডবদের অন্তকাল এসে যাবে—

তস্মাৎ সমর্থো'স্মি মমৈব ভারঃ।

কর্ণ গুরুর কথাটা তুললেন এই জন্যে যে, বার বার পরশুরামের অভিশাপের কথাটা বলে তাঁকে একটু খাটো করে দেখার একটা প্রবৃত্তি ভীষ্ম-দ্রোণের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল। অতএব ভীষ্ম-দ্রোণের মুখ ভোঁতা করে দিয়ে বললেন—আরে! পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য—আপনারা এত কষ্ট করবেন কেন? আপনারা বুড়ো মানুষ, আপনারা মেজাজে বসে থাকুন ওই দুর্যোধনের পাশটিতে। পাণ্ডবদের ব্যাপারে আপনাদের কারও কোনো চিন্তা নেই, ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন—

পার্থান্ হনিষ্যামি মমৈষ ভারঃ।

আর কত! আর কত সহ্য করতে পারেন ভীষ্ম! ভীষ্ম বললেন—তোমার সময় হয়ে এসেছে বাছা! যথেষ্ট বড়ো বড়ো কথা শুনেছি—

কিং কত্থসে কালপরীতবুদ্ধে।

—আর নয়। ওই যে ইন্দ্রের দেওয়া ওই শক্তিটার ওপর অত ভরসা করছো তুমি, ভাবছো একবার ব্যবহার করেই অর্জুনকে শেষ করবে তুমি। আরে, যুদ্ধক্ষেত্রে যখন বাসুদেব কৃষ্ণের চক্র চলবে, তখন ইন্দ্রের শক্তি গুঁড়িয়ে যাবে—

চক্রাহতাং দ্রক্ষ্যসি কেশবেন।

ওই যে সাপের মুখওয়ালা বাণটা, যেটাকে তুমি প্রতিদিন মালা-টালা দিয়ে পুজো কর, তোমার সঙ্গে ওটারও আর চিহ্ন থাকবে না অর্জুনের বাণে। এটা মনে রেখ অর্জুনকে রক্ষা করছেন স্বয়ং বাসুদেব, তোমাদের মতো বিরাট যোদ্ধাকে ওপারে পাঠাতে যাঁর সময় লাগবে না একটুও—

যঃ ত্বাদৃশানাঞ্চ বলীয়সাঞ্চ হন্তা
রিপূণাং তুমুলে প্রগাঢ়ে।

কর্ণের রাগ হল সাংঘাতিক, অথচ প্রথমে স্বীকারও করে নিলেন কৃষ্ণের বলবত্তার কথাটা। বললেন—হ্যাঁ, স্বীকার করলাম কৃষ্ণ খুব বড়ো মানুষ, কিন্তু তাই বলে আমিও যা বলেছি তাও এমন কিছু বাজে কথা নয়। শুনে রাখুন পিতামহ! এই আমি অস্ত্র ফেলে দিলাম, আপনি বেঁচে থাকতে এই সভাতেও আমি আসব না, এবং যে যুদ্ধে আপনি আছেন, সে যুদ্ধেও নয়। কিন্তু আমি কী করতে পারি, আর পারি না, তা সবাই দেখবে আপনি গতায়ু হলে—

ত্বয়ি প্রশান্তে তু মম প্রভাবং দ্রক্ষ্যন্তি
সর্বে ভুবি ভূমিপালাঃ।

এই বলে কর্ণ কুরুসভা ত্যাগ করে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে নিজের বাড়ি চলে গেলেন। দুর্যোধন ভীষ্মকে খানিকটা বকাবকি করলেন এবং পরিষ্কার তাঁকে জানালেন—পিতামহ! আপনি কিংবা দ্রোণের ওপর নির্ভর করে আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না, পঞ্চপাণ্ডবদের শেষ করতে আমি, কর্ণ আর দুঃশাসনই যথেষ্ট—

অহং বৈকর্ত্তনঃ কর্ণো ভ্রাতা দুঃশাসনশ্চ মে।

এ কথাগুলি সবই কর্ণের কথা। কর্ণ চলে গেলে, কর্ণের কথা বলেই ভীষ্মকে অস্বস্তিতে ফেলে দিলেন স্বয়ং দুর্যোধন। দুর্যোধন কর্ণের পুরনো কথাটাও ফিরিয়ে দিলেন। বললেন—অস্ত্রে, ক্ষমতায়, সৈন্যবলে আমরাও পাণ্ডবদের থেকে কম যাই না, তবু খালি আপনি পাণ্ডবদের জয় দেখতে পান সব জায়গায়, কেন? আমরা কি এতই ফেলনা—

পিতামহ বিজানীষে পার্থেষু বিজয়ং কথম্।

বললাম তো পাণ্ডবদের শায়েস্তা করতে, আমি, কর্ণ আর দুঃশাসনই যথেষ্ট, আপনাদেরও কাউকে প্রয়োজন নেই—

পাণ্ডবান সমরে পঞ্চ হনিষ্যামি শিতৈঃ শরৈঃ।

কর্ণ-দুর্যোধনের পারস্পরিক পৃষ্ঠকণ্ডূয়ন আর বন্ধুত্ব যত গাঢ় হয়েছে, দেখা যাচ্ছে দুর্যোধনের সঙ্গে কুরুসভার বৃদ্ধদের অর্থাৎ ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুরদের মানসিক দূরত্বও ঠিক ততটাই বেড়ে গিয়েছে।

[মহা (k) ৫.২১.৮-২১; ৫.৪৯.১-৪৮;
৫.৫৫-৫৮ অধ্যায়; ৫.৬২.১-১৮; ৫.৬৩.১-১১;
(হরি) ৫.২১.৮-২১; ৫.৪৯.১-৪৮;
৫.৫৫-৫৭ অধ্যায়; ৫.৬১.১-১৮; ৫.৬২.১-১১]

□ এই টানাপোড়েনের মাঝে আসন্ন মহাযুদ্ধের আগে শান্তির শেষ চেষ্টা করতে স্বয়ং কৃষ্ণ এলেন হস্তিনায়। প্রাক্‌যুদ্ধ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এটাই বোধহয় কুরুরাজসভার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কৃষ্ণের শান্তি প্রস্তাবের দিনে সভায় কর্ণের উল্লেখ তেমন মেলে না। বরং কর্ণের ভরসায় দুর্যোধন যুদ্ধজয়ের ব্যাপারে এতটাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন যে, শান্তির সমস্ত প্রস্তাব তিনি সদম্ভ ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। কুরুবৃদ্ধদের উপদেশ, মহারানী গান্ধারীর উপদেশ সবই বিফলে গেল। দুর্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থ ফিরিয়ে দিলেন না, পাঁচটা গ্রামও নয় এমনকী বিনা যুদ্ধে সূচের আগায় যতটুকু মাটি ওঠে, তাও তিনি পাণ্ডবদের দিতে রাজি নন। কুরুরাজসভায় দুর্যোধনের এই সদম্ভ উক্তির পিছনে যে কর্ণের বাহুবলই প্রধান ভরসা—তা কৃষ্ণের মতো ধুরন্ধর রাজনীতিকের বুঝতে বিশেষ সময় লাগেনি। দুর্যোধনের যুদ্ধের সিদ্ধান্ত তিনি শুনেছেন, পাণ্ডবজননী, নিজের আপন পিসী কুন্তী তাঁর পুত্রদের দ্রৌপদীর অপমান আর নিজেদের সারাজীবনের বঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে উদ্বুদ্ধ করছেন—তাও তিনি শুনেছেন। কৃষ্ণ ভালো করে লক্ষ্যও করে থাকবেন কুন্তীর শব্দচয়ন—কুরুরাজসভায় দ্রৌপদীর অপমান এবং আরও অনেক অন্যায় আচরণের কথা কুন্তী বলেছেন, তার প্রতিকার চেয়েছেন কিন্তু কৌরবপক্ষের কারও নাম তিনি একটি বারের জন্যও মুখে আনেননি। কী করে মুখে আনেন কুন্তী! আনলে যে কর্ণের নামও এসে পড়বে—তাঁর আপন গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম। বুদ্ধিমান কৃষ্ণ কুন্তীর দ্বিধা সঠিকভাবেই বুঝেছেন। তাই শান্তিপ্রস্তাব ব্যর্থ হবার পর হস্তিনাপুর ছেড়ে যাবার সময় হঠাৎ এসে কর্ণকে তুলে নিয়েছেন নিজের রথে। নিয়ে এসেছেন নগরের বাইরে, একান্তে। সেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে কর্ণের গভীর আলোচনা হল, তাও অনেকক্ষণ ধরে—

মন্ত্রয়ামাস চ তদা কর্ণেন সুচিরং সহ।

কৃষ্ণের বলাটা ছিল অদ্ভুত। নরমে, গরমে, স্তুতিবাদে, সব রকমভাবে কৃষ্ণ কর্ণকে দুর্যোধনের থেকে বিযুক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তার থেকেও বড়ো কথা, যে কথাটা আজ পর্যন্ত তাঁকে কেউ বলেনি, সে-কথাটা কৃষ্ণ বললেন কী করে! কৃষ্ণ বললেন—কর্ণ! তুমি বিদ্বান এবং বিচক্ষণ মানুষ। সনাতন ধর্ম, বেদবাদ, ধর্মশাস্ত্র সবই তুমি জান এবং জান বলেই এখন যা বলছি, তা নিজের সঙ্গে মেলাতে তোমার অসুবিধে হবে না। কৃষ্ণ বললেন জান তো কর্ণ! শাস্ত্রকারেরা বলেছেন—পুরুষ যে মেয়েকে বিয়ে করে, সেই মেয়ের যদি অবিবাহিতা কুমারী অবস্থায় কোনো পুত্র থেকে থাকে তাহলে বিবাহিত পুরুষটি সেই পুত্রেরও পিতা হয় অর্থাৎ একই স্ত্রীলোকের কুমারী এবং বিবাহিত অবস্থায় যতগুলি পুত্রই জন্মাক, সবগুলিরই পিতা হবেন পাণিগ্রহণকারী পুরুষটি। এই নিয়মে কর্ণ তুমি কিন্তু মহারাজ পাণ্ডুরই ছেলে—

পাণ্ডোঃ পুত্রো'সি ধর্মতঃ।

—কারণ তুমি তোমার জননী কুন্তীর কুমারী কালের পুত্র।

কর্ণ একটুও চমকালেন না। সারা জীবন যাঁকে জন্মের লাঞ্ছনা ভোগ করে সূতজাতির কলঙ্ক-পঙ্কে তিলক রচনা করে জীবনের পথে চলতে

হয়েছে, তাকে আগেই সব জানতে হয়। গ্লানির মধ্যে যে সন্তানকে চলতে হয়, সে সন্তান নিজেই তার জন্ম রহস্য ভেদ করে। কর্ণও তাই সব জানতেন, সব জেনেও পাথর-প্রতিমার মতো স্থির হয়ে কেবলই সংসারের কূটবুদ্ধি যাচাই করতে লাগলেন। ভাবটা এই—আমি ছাড়া অন্যেও তা হলে কেউ জানে এ রহস্য, তবে এতকাল ধরে সূতপুত্রের গালাগালিটা কেমন ন্যাকামো! যাই হোক কৃষ্ণ বলতে থাকলেন—নিয়ম অনুসারে কর্ণ তোমারই কিন্তু রাজা হওয়ার কথা—এহি রাজা ভবিষ্যসি। তা ছাড়া তোমার 'ফ্যামিলি-প্রেস্টিজ' কিছু কম নয়। তোমার পিতৃকুলে আছেন পাণ্ডবেরা, মাতৃকুলে আছি আমরা, বৃষ্ণিবংশের পুরুষেরা। তুমি ভাই আজকে আমার সঙ্গে চল, তোমাকে তোমার পাঁচ ভাই সবার বড়ো দাদা বলে জানুক—

অভিজানন্তু কৌন্তেয়ং পূর্বজাতং যুধিষ্ঠিরাৎ।

কর্ণ যদি ভাবেন এমনি উটকো গিয়ে পাণ্ডবদের ভাই ভাই করলে কেউ যদি ব্যঙ্গ-বক্রোক্তি করে কৃষ্ণ তাই শত-শতাংশ কথা দিয়ে বললেন—আরে, সবাই তোমার পায়ে পড়ে যাবে, পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই তাদের ছেলেপুলেরা, এমনকী আমরাও তোমার পায়ে পড়ে থাকব—

পাদৌ তব গ্রহীষ্যন্তি সর্বে চান্ধক-বৃষ্ণয়ঃ।

উত্তেজনার আতিশয্যে কৃষ্ণ প্রস্তাব দিলেন—যে রাজারা আজকে পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরা বরঞ্চ তোমার অভিষেকের জোগাড় করুন, মাঙ্গলিক বিধান করুন রাজকন্যারা, আর দিনের ষষ্ঠভাগে যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে প্রেমনত নয়নের দীর্ঘচ্ছায়াময় পল্লবের মতো তখন তিন ভুবনের সেরা সুন্দরী দ্রৌপদী এসে দেখা করুন তোমার সঙ্গে—

ষষ্ঠে ত্বাং চ তথা কালে দ্রৌপদী উপগমিষ্যাতি।

কৃষ্ণ জানেন—দ্রৌপদীর ওপর কর্ণের লোভ ছিল। পরবর্ত্তীকালে দ্রৌপদীর ওপর যত আক্রোশ দেখা গেছে কর্ণের, সেও দ্রৌপদীকে না পাওয়ার কারণেই। তবু যদি কর্ণের মনে এমন ভাবনা আসে যে—এতকাল তাকে পেলুম না, আর এখন এই মাঝ বয়সে এসে, যখন প্রেম প্রায়ই দাম্পত্য অভ্যাসে রূপান্তরিত হয়, এখন সেই প্রথম যৌবনের স্বপ্ন দেখানো—এতে কি যন্ত্রণা কিছু কমে, যন্ত্রণা আরও বাড়ে। কৃষ্ণ তাই কথা পরিবর্তন করে বললেন—তা হলে কী বল, ধৌম্য পুরোহিত অভিষেকের মন্ত্র পড়ুন, আমরাও সবাই অভিষেকের জোগাড় করি। তোমার যুবরাজ হবেন যুধিষ্ঠির, তোমার পাশে দাঁড়িয়ে চামর দোলাবেন তিনি। তোমার মাথায় রাজচ্ছত্র ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন মহাবলী ভীমসেন, তোমার সাদা ঘোড়ার রথ চালাবেন স্বয়ং অর্জুন, আর আমরা সবাই থাকব তোমার অনুগামী হয়ে। সবার শেষে কৃষ্ণ বললেন—তুমি রাজা হও, নিজের রাজ্যপাট সামলাও আর তৃপ্ত করো জননী কুন্তীর পুত্রস্নেহাতুর হৃদয়খানি—

প্রশাধি রাজ্যং কৌন্তেয় কুন্তীঞ্চ প্রতিনন্দয়।

—দূর হোক সমস্ত শত্রুতা, ভাই ভাই মিলে যাক।

খট করে কর্ণের কানে বাজল— 'কৌন্তেয়'। এতকাল তো কেউ তাঁকে কুন্তীর ছেলে বলে ডাকেনি, সবাই বলেছে রাধেয়—রাধার ছেলে। সারা জীবন লাঞ্ছনা সয়ে আজকে যদি হঠাৎ কুন্তীর ওপর সোহাগে মা মা বলে ডেকে ওঠেন কর্ণ, তবে সে আদিখ্যেতা বুঝি তাঁর নিজেরই সইবে না। কর্ণ বললেন—আজকে তুমি ভালোবেসে, আপন সখার মতো আমার ভালো চেয়ে যা কিছু বললে, সে সব আমি জানি—সর্বঞ্চৈব অভিজানামি। আমি জানি, আমি পাণ্ডুর ছেলে—

পাণ্ডোঃ পুত্রো'স্মি ধর্মতঃ।

আমি জানি আমার জননী কুন্তীর কুমারী কালের গর্ভে ভগবান ভাস্করের ঔরসে আমার জন্ম। আমি জানি, হ্যাঁ জানি যে, সূর্যদেবের কথামতোই আমার জননী আমাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন—

আদিত্যবচনাচ্চৈব জাতং মাং সা ব্যসর্জয়ৎ।

কিন্তু আমার মা কী ভেবে আমাকে বিসর্জন দিলেন—

যথা ন কুশলং তথা?

কাজেই ধর্মত পাণ্ডুর ছেলে হওয়া সত্ত্বেও, মায়ের প্রথম ছেলে হওয়া সত্ত্বেও, আমি যদি মায়ের প্রথম সন্তানকামী হৃদয় থেকে মুছে যাই,—কুন্ত্যা ত্বহম্ অপাকীর্ণঃ—সেখানে আজ হঠাৎ তাঁকেই মা মা বলে সোহাগ দেখানো আদিখ্যেতা নয় কি?

কর্ণ বললেন—সূত অধিরথ আমাকে এনে

জননী রাধার হাতে দিয়েছিলেন। আমাকে দেখামাত্র সূতজননীর-স্নেহস্তন্য আপনি ঝরে পড়েছিল—সদ্যঃ ক্ষীরমবাতরৎ। তিনিই শৈশব অবস্থায় আমার মূত্র পুরিষ পরিষ্কার করে মানুষ করেছেন—

সা মে মূত্র পুরীষঞ্চ প্রতিজাগ্রহ মাধব।

সব বুঝে-সুঝে আজকে হঠাৎ আমি তাঁর ঋণ মুক্ত হয়ে চলে যাই কী করে? তা ছাড়া সেই যে সূত অধিরথ, তাঁকেই তো আমি পিতা বলে জানি। তিনি পিতার মতো জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন সব করিয়েছেন, যৌবনে মেয়ে খুঁজে খুঁজে বিয়ে দিয়েছেন। সেই বিবাহিতা স্ত্রীদের গর্ভে আমার তো ছেলে-পিলেও আছে। আমার সেই পরিণীতা স্ত্রীদের আমি ভালোবাসি, কৃষ্ণ—

তাসু মে হৃদয়ং কৃষ্ণ সঞ্জাতং কামবন্ধনম্।

কর্ণের ভাবটা এই যে, এতকালের বিয়ে-করা বউ যাঁরা, যাঁরা এতদিন যৌবনের ভোগ, সুখ, আনন্দ—সব দিয়েছেন হঠাৎ তাঁদেরকে নীচে ঠেলে বড়ো ঘরের সুন্দরী বউ দ্রৌপদীকে যদি আজকে বড়ো আপনার বলে মনে করি, তা হলে আমিও আমি থাকি না। সারথির ঘরে আমি লালিত, সারথির ঘরে আমার বিয়ে, সারথির ঘরের নীতি-নিয়ম আমার মজ্জায় মজ্জায়। কাজেই আজ আর ফিরে যাবার পথ নেই।

কর্ণ-চরিত্রের পক্ষে এই সময়টা হল একদিকে ভীষণ সঙ্কটপূর্ণ অন্যদিকে সঙ্কট মোচনের এক চূড়ান্ত বিন্দু। মহাভারতের কবি এতদিন তাঁকে জন্মের লাঞ্ছনায় ভুগিয়ে, দুর্যোধনের মতো দুঃসঙ্গে পুষ্ট করে, লোভ, হিংসা, ঈর্ষা আর অহমিকায় বর্ধিত করে সমস্ত নীতি-পরায়ণ মানুষদের কাছ থেকে একেবারে একাকিত্বে এনে ফেলেছেন। মিথলজিস্টদের ভাষায় একে 'হেরোইক আইসোলেশন্' বলব কিনা জানি না, তবে 'আইসোলেশন' তো বটেই। এই 'আইসোলেশনে'র বড়ো প্রয়োজন ছিল কর্ণের চূড়ান্ত মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। হিংসা-প্রতিহিংসার অন্তরে কর্ণ যে কতবড়ো মানুষ, সেটা বুঝি প্রতিতুলনায় প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এতদিন কর্ণের গায়ে শত কালিমা লেপন করা হয়েছে। ঠিক এই অংশে এসে মহাভারতের কবি তাঁর কবি-হৃদয়ের সমস্ত সম্মান উজাড় করে দিয়েছেন কর্ণের জন্য। সত্যি কথা বলতে কি কৃষ্ণের কথায় প্রণয় ছিল, সৌহার্দ্য ছিল, সান্ত্বনাও ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল কিছু প্যাঁচও। ইঙ্গিতজ্ঞ কর্ণ সে প্যাঁচ বুঝেছেন এবং সেইখানেই তাঁর মাহাত্ম্য। অনেক কথার মাঝে কৃষ্ণ বলেছিলেন— তোমায় আমরা সবাই মিলে রাজার আসনে বসাব, যুধিষ্ঠির হবেন তোমার যুবরাজ—

যুবরাজস্তু তে রাজা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।

কর্ণ বললেন—আমার এই ছোটো সংসারের মোহগণ্ডী পেরিয়ে আমার আর ফিরে যাবার উপায় নেই কৃষ্ণ। আমি চাই, তুমিও আমার এই জন্মের রহস্য এতকাল পরে আর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সামনে প্রকাশ কোরো না। তাঁকে যতটুকু জানি, তাতে সেই ধর্মভীরু মহাত্মা যদি জানতে পারেন যে, আমিই কুন্তীর বড়ো ছেলে, তা হলে কিছুতেই তিনি আর রাজা হবেন না। আর আমার দিক থেকে বিপদ হল, আমি রাজা হলে কখনোই যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করতে পারব না, রাজা তো তিনি হবেনই না। আমি রাজা হলে এই সমৃদ্ধ সম্পূর্ণ রাজ্য আমাকে তুলে দিতে হবে দুর্যোধনের হাতে—

স্ফীতং দুর্যোধনায় এব সম্প্রদদ্যামরিন্দম।

তাই বলি যুধিষ্ঠির রাজা আছেন, তিনিই রাজা থাকুন।

কুরুক্ষেত্রের যে যুদ্ধ ঘটতে যাচ্ছে কর্ণ তার ফল জানেন। কর্ণ জানেন যে, সে যুদ্ধে জয়ী হবে পাণ্ডবপক্ষই। জীবন মৃত্যুর সন্ধিলগ্নে দাঁড়িয়ে কর্ণ আজ কৃষ্ণের কাছে স্বীকার করেছেন—আমি এতকাল পাণ্ডবদের যে জঘন্য কটু কথা শুনিয়েছি, তা সবই দুর্যোধনকে তুষ্ট করার জন্য এবং সে জন্য আমার অনুতাপও আছে—

প্রিয়ার্থং ধার্তরাষ্ট্রস্য তেন তপ্যে হ্যকর্মণা।

কর্ণ বললেন—যে যুদ্ধ হতে যাচ্ছে, সে যুদ্ধ হবেই। এ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াটাই আমার আনন্দ। তুমি যাও, কৃষ্ণ! সমস্ত রহস্য যা তুমি জান, চেপে রাখ নিজের মধ্যে। নিয়ে এসো কুন্তীপুত্র অর্জুনকে, যার সঙ্গে যুদ্ধ হবে আমার—

সমুপানয় কৌন্তেয়ং যুদ্ধায় মম কেশব।

কৃষ্ণ যেন এবার একটু শাসনের সুরে কথা বললেন। যুদ্ধের সময়ে পঞ্চপাণ্ডব যে তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণতর হবেন এবং সে তীক্ষ্ণতা থেকে যে রক্ষা নেই কর্ণের, রক্ষা নেই কুরুকুলের কারও—সে কথাটাও বুঝিয়ে দিলেন বেশ করে। কর্ণ একটুও

ভয় পেলেন না, উলটে রীতিমতো জ্যোতিষ-চর্চা করে বুঝিয়ে দিলেন—জয় হবে পাণ্ডবদেরই, কৌরবদের নয়। কর্ণ দুঃস্বপ্নে দেখেছেন একে একে কৌরবের সব সেনাপতি অর্জুনের গাণ্ডীবের আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে। এই স্বপ্ন কর্ণ সত্য বলেই মনে করেন। তিনি একদিকে স্বীকার করেন যে, ভারত যুদ্ধের নিমিত্ত কারণ তিনি নিজে, দুঃশাসন এবং শকুনি এবং অন্য দিকে মরণের মুখে ঝাঁপ দিয়ে কৃষ্ণকে বলেন— অন্তকালে আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে স্বর্গভূমিতে—

অথ বা সঙ্গমঃ কৃষ্ণ স্বর্গে নো ভবিতা ধ্রুবম্।

কৃষ্ণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া আর কীই বা করতে পারতেন কর্ণ? পাণ্ডবদের এত অপমান তিনি সারাজীবন ধরে করেছেন, আজ সেই পাণ্ডবদের কাছ থেকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার সম্মান লাভ করার মধ্যেও কর্ণের লজ্জা, অপরাধবোধ কাজ করছে। আর দ্রৌপদী! দ্যূতসভায় যাকে 'বেশ্যা' বলে অপমান করেছেন নির্দ্বিধায়, আজ শত প্রলোভনেও সেই বিদগ্ধা সতী নারীর সামনে স্বামী হিসেবে তিনি দাঁড়াবেন কোন লজ্জায়? এমনকী ভাসুর হিসেবেও দ্রৌপদীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মুখ নেই কর্ণের। বেঁচে থেকে এমন বিপ্রতীপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার থেকে দুর্যোধনের পক্ষে থেকে যুদ্ধ করে মরণই অনেক বেশি শ্রেয় মনে হয়েছে কর্ণের কাছে। তবু জ্যেষ্ঠভ্রাতার একটা কর্তব্য করতেই হল। কর্ণ জানেন, তাঁর পরিচয় জানতে পারলে যুধিষ্ঠির বা অন্য কোনো পাণ্ডব তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বা তাঁকে হত্যা করতে সম্মত হবেন না। তাই নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্য কর্ণ বারংবার অনুরোধ করেছেন কৃষ্ণকে। হয়তো সারাজীবন যে অর্জুনের প্রতি শুধু বিদ্বেষই পোষণ করে এসেছেন, সেই ছোটো ভাইটির হাতে কর্ণ আজ মরতেই চান। *[মহা (k) ৫.১৩৯-১৪৩ অধ্যায়; (হরি) ৫.১৩১-১৩৪ অধ্যায়]*

□ কৃষ্ণ ফিরে গেলেন উপপ্লব্যে। কিন্তু এদিকে এক নতুন বিপদ হল। কুন্তী এই কিছুক্ষণ আগেও কৃষ্ণের মাধ্যমে ছেলেদের কাছে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালনের আদেশ পাঠিয়েছেন, নিজের এবং নিজের পুত্রদের সারাজীবনের বঞ্চনা আর দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিকার দাবি করেছেন সক্রোধে। কিন্তু শান্তিপ্রস্তাব ব্যর্থ হবার পর যুদ্ধ যে সত্যিই নিশ্চিত তা যখন কুন্তী বিদুরের মুখে শুনলেন, তখন কিন্তু খবরটাকে ক্ষত্রিয়জননীর মতো করে সগৌরবে প্রিয় সংবাদ বলে বরণ করে নিতে পারলেন না। কুন্তীর চোখের সামনে বোধ করি অস্ত্রপরীক্ষার দিনে সেই রঙ্গভূমির সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের ছবিটুকু ভেসে উঠল। কিন্তু আজ তো রঙ্গভূমি নয়, সত্যিকারের যুদ্ধ, মরণপণ যুদ্ধ, অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধে দুই পক্ষে রয়েছে 'চিরশত্রু' কুন্তীরই আপন গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র আর কনিষ্ঠপুত্র— কর্ণ আর অর্জুন। সেই কতদিন আগে যে ছেলেকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন সে আজ দুর্যোধনের অন্যতম বল-ভরসা, দ্রৌপদীর অপমানের অন্যতম হোতা। ভাবতে ভাবতে কুন্তীর নিঃশ্বাস দৃঢ়তর হল, দুঃখ গভীরতর। কুন্তী কর্ণের পাণ্ডববিদ্বেষের ভিতরের কারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না, তাঁর মনে হয় বোধ হয় দুর্যোধনের সঙ্গে সুর মেলাতে গিয়েই তার এই পাণ্ডববিদ্বেষ। এতদিন পাণ্ডবদের প্রতি অন্যায় আচরণ, দ্রৌপদীর অপমান—সব কিছুতে অংশ নিয়েছেন কর্ণ, আর আজ তো যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি পাণ্ডববধের ভাবনা নিয়েই নামবেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বড়ো ভাই কর্ণ তাঁর ছোটো ভাইদের বধ করার বাসনায় ঝাঁপিয়ে পড়ছেন—এমন একটা দৃশ্য কল্পনা করেও কুন্তীর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল।

কুন্তী ঠিক করে ফেললেন। তিনি কর্ণের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। সব গুছিয়ে বলবেন তাঁকে। মায়ের মুখ চেয়ে, ভাইদের হিতের দিকে তাকিয়ে সে নিশ্চয় আমার কথা শুনবে—

কস্মান্ন কুর্যাদ্ বচনং পশ্যন্ ভ্রাতৃহিতং তথা।

মনে মনে সব ঠিক করে কুন্তী যখন কর্ণের কাছে পৌঁছালেন তখন দুপুর গড়িয়েছে। কর্ণ নিষ্ঠাভরে বেদমন্ত্রে স্তুতি করছেন সূর্যের। সূর্যের তাপ বড়ো প্রখর আজ, সেই প্রখর তাপ মাথায় নিয়ে কুন্তী এসেছেন কর্ণের সঙ্গে দেখা করতে। কুন্তী কর্ণের পূজা শেষ হবার অপেক্ষা করতে লাগলেন। এদিকে পূজা শেষ হতেই কর্ণ সবিস্ময়ে দেখলেন—সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর মা, রাধা নন, গর্ভধারিণী জননী—কুন্তী। কর্ণ জানেন নিজের মায়ের পরিচয়। যে মা একদিন তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন, তিনি নিজে আসবেন কোনো একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে—এ তাঁর অনেক

দিনের চাওয়া। কর্ণের মা আজ এসেছেন। কর্ণ 'মা' বলে ছুটে গেলেন না, বহুদিনের চাপা অভিমান উগরে দিলেন শুষ্ক সম্ভাষণে—

আমি 'অধিরথসূতপুত্র, রাধাগর্ভজাত'।

আমার প্রণাম গ্রহণ করুন ভদ্রে—

রাধেয়ো'হম্ আধিরথিঃ কর্ণস্ত্বাম্ অভিবাদয়ে।

বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্য—

ব্রুহি কিং করবাণি তে।

একেবারে 'অফিসিয়াল' কথা, এতটাই শুষ্ক এই সম্ভাষণ যে কুন্তী আর কোনো ভণিতা করার সময়ই পেলেন না। যতসব কথা বলবেন ভেবে ঠিক করে এসেছিলেন, তার কিছুই বলা হল না। একেবারে গোড়াতেই তিনি বলে ফেললেন— না বাছা! তুমি রাধার ছেলে নও, কুন্তীর ছেলে। অধিরথ তোমার পিতা নন, তুমি সূতপুত্র নও, আমারই কানীনপুত্র। কুন্তিভোজ রাজার ঘরে যখন আমি ছিলাম, তখন জন্মেছিলে তুমি, তোমার পিতা স্বয়ং সূর্যদেব। কুন্তী বেশ তাড়াহুড়ো করেই বলে ফেললেন—বাছা! তুই আমার ছেলে, অথচ আজ নিজের ভাইদেরই তুই চিনিস না! ভাইদের ছেড়ে যে মোহে তুই দুর্যোধনের সেবা করছিস, সে ঠিক হচ্ছে না বাছা। বাপ-মাকে সন্তুষ্ট করা ছেলের কাজ। তুই বাবা ফিরে আয় পাণ্ডবের ঘরে। যে বিপুল সম্পত্তি একদিন অর্জুন দিগ্বিজয়ে জিতে এনেছিল, সে সম্পত্তি এখন ছলনার গ্রাসে দুর্যোধনের ঘরে। তুই সম্পত্তি ফিরিয়ে এনে ভাইদের সঙ্গে ভোগ কর। পৃথিবী আজ দেখুক, দুই বিরোধী গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ দুই বীর কর্ণ আর অর্জুন আজ এক জায়গায়। ঠিক যেমনটি যাদবদের ঘরে বলরাম আর কৃষ্ণ, তেমনি আমাদের ঘরে কর্ণ আর অর্জুন—

কর্ণার্জুনৌ বৈ ভবেতাং যথা রামজনার্দনৌ।

তুই আমার সবার বড়ো ছেলে, সমস্ত গুণে গুণী। এতকাল যে সূতপুত্র বলে তোকে ধিক্কার করেছে লোকে, দূরে যাক সেই শব্দ—তুই পার্থ। পৃথার ছেলে—

সূতপুত্রেতি মা শব্দঃ পার্থস্ত্বমসি বীর্যবান্।

কুন্তীর কথার উত্তরে একেবারে শুষ্ক, ঈষৎ রুক্ষস্বরেই কর্ণ বললেন—আপনার এসব কথা একেবারেই গ্রহণ করতে পারছি না আমি—ন চৈতৎ শ্রদ্দধে বাক্যম্।

আপনার কথা মতো কাজ করলে ধর্ম তো হবেই না, উলটে অধর্ম হবে আমার। আপনি জন্মলগ্নেই আমাকে ত্যাগ করে যে পাপ করেছিলেন, তার জন্যই আজকে আমি নিজেকে ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিতে পারি না। আপনি সেদিন আমাকে বিসর্জন দিয়ে সমস্ত দুর্নামের ভাগী করেছেন আমাকে—

অপাকীর্ণো'স্মি যন্মাতস্তদ্ যশঃ কীর্তিনাশনম্।

আমি ক্ষত্রিয় হয়ে জন্মেছিলাম, তৎসত্ত্বেও শুধুমাত্র আপনার কারণেই আমি কোনো ক্ষত্রিয়ের সংস্কার লাভ করতে পারিনি। আপনি ছাড়া অতি বড়ো কোনো শত্রুও আমার এত বড়ো ক্ষতি করত না—

ত্বৎকৃতে কিন্নু পাপীয়ঃ শত্রুঃ কুর্যান্ সমাহিতম্।

যে সময়ে সত্যিই আমার আপনাকে প্রয়োজন ছিল, সে সময়ে আপনি কিছুই করেননি আর আজ শুধুমাত্র নিজের স্বার্থে, নিজের প্রয়োজনে আপনি আমার প্রতি অপত্য স্নেহ দেখাতে এসেছেন—

সা মাং সম্বোধয়সি অদ্য কেবলাত্মহিতৈষিণী।

কুন্তী ভাবতেও পারেননি, এতটা ফিরে পাবেন। তিনি ভেবেছিলেন—কর্ণকে বুঝিয়ে বলে, পুত্রের কর্তব্য স্মরণ করালেই সে তাঁর শূন্য বুকে ফিরে আসবে। কিন্তু জন্ম-না-জানা পুত্রের দুঃখটা যে কী, তা তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। কর্ণ কিন্তু থামলেন না, তিনি বলে চললেন—অর্জুন আর কৃষ্ণ একজায়গায় হলে কে না ভয় পায়? কিন্তু আজকে যদি আমি গিয়ে অর্জুন-কৃষ্ণের গোষ্ঠীতে যোগ দিই, তাহলে তো লোকে আমাকেও ভিতু ভাববে। তা ছাড়া এতকাল পরে হঠাৎ যদি জানা যায় যে পাণ্ডবরা আমার ভাই, আর আমিও যদি তাদের ভাই বলে জড়িয়ে ধরি, তাও আবার এই মহাযুদ্ধের ঠিক আগে—যে যুদ্ধে পাণ্ডবদের প্রতিপক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে নামছে মূলত আমারই ভরসায়—তখন ক্ষত্রিয়-সুধীজনেরা আমাকে বলবে কী—

অভ্রাতা বিদিতঃ পূর্বং যুদ্ধকালে প্রকাশিতঃ।
পাণ্ডবান্ যদি গচ্ছামি কিং মাং ক্ষত্রং বদিষ্যতি॥

কর্ণের কথার মধ্যে আরও একটা অংশ আছে, সেটা হল বাস্তবতার কথা। তাঁর কথা হল—পাণ্ডবপক্ষে গেলে আজ আর নতুন করে তাঁর কী লাভ হবে? একথা তিনি সেদিন কৃষ্ণকেও বলেছিলেন, আজ কুন্তীকেও বললেন। কর্ণ কৃষ্ণকে বলেছিলেন— ধৃতরাষ্ট্রের কুলে দুর্যোধনের ছত্র-ছায়ায় থেকে এই তেরোটা বছর

আমি রাজার মতো নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগের সুখই পেয়েছি—

ময়া ত্রয়োদশ সমা ভুক্তং রাজ্যম্ অকণ্টকম্।

—সেই দুর্যোধন যখন এই যুদ্ধে আমার ওপরেই ভরসা করছে, তখন তাঁকে আমি বঞ্চনা করতে পারি না—অনৃতং নোৎসহে কর্তুম্। আজকে কর্ণ কুন্তীকে একই কথা বললেন— ধৃতরাষ্ট্রে ছেলেরা আমাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছে, যে সম্মান কেউ দেয়নি সেই সম্মান দিয়েছে, আমার কোনো ইচ্ছেই তারা না পূরিয়ে রাখেনি—

সর্বকামৈঃ সংবিভক্তঃ পূজিতশ্চ যথাসুখম্।

সেই ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা, যারা এখন আমার ওপর ভরসা করে যুদ্ধে নেমেছে, তাদের আমি ফেরাব কী করে? এ হয় না, হতে পারে না। বরঞ্চ সময় এসেছে, যতটা তারা করেছে, তার কিছুটা ফিরিয়ে দেবার।

কর্ণ বললেন—যুদ্ধ আমাকে করতেই হবে। আপনার কথাগুলি খুব যথার্থ, খুব মিষ্টি বাণীর মতো শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু আপনি যা বলছেন তা আমি কিছুতেই করব না—

ন করোম্যদ্য তে বচঃ।

কর্ণের জেদ চেপে গেল। কৃষ্ণও তাঁকে একই কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাঁর বলার ভঙ্গির জন্যই হোক কিংবা তিনি অন্য লোক বলেই হোক, কর্ণ তাঁর সঙ্গে অতি মধুর ব্যবহার করেছিলেন। আলোচনা চলেছিল সৌহার্দ্যের সূত্র ধরে। কিন্তু এতদিন পরে নিজের মাকে সামনে পেয়েও তাঁকে তিনি ভালোবাসতে পারলেন না। উলটে ফেটে পড়লেন ক্রোধে। ক্রোধের কারণও বুঝি ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, কুন্তী যে এখনও কর্ণের কাছে উপস্থিত হয়েছেন, সেও যে জননীর মমতা-রসে, তা নয়। এখানেও তাঁর স্বার্থবুদ্ধি কিছু ছিল। তা ছাড়া একেবারে জন্মলগ্নেই যে ছেলেকে বিসর্জন দিয়েছেন, তার প্রতি মমত্বও তাঁর সেইভাবে জন্মায়নি, যা দিন-প্রতিদিনের অভ্যাসে, ব্যবহারে জন্মায়। এখানে তাঁর শুধু এই স্বার্থবোধ কাজ করছে যে, কৌরবপক্ষের সাধারণ অন্য কারো পক্ষে ভীম-অর্জুনদের মারাই সম্ভব নয়। ভীষ্ম এবং দ্রোণ, পুত্র কিংবা শিষ্য-স্নেহের কারণে খানিকটা হাত গুটিয়ে থাকবেন। যদিও তাঁদের হত্যা করার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু কর্ণের তো সে সব বালাই নেই, সে সুযোগ পেলেই অর্জুন কিংবা ভীমকে হত্যা করবে, বিশেষত অর্জুনের সঙ্গে তাঁর চিরকালের প্রতিযোগিতা। এই অবস্থায় আপন পাঁচ পুত্রকে খানিকটা বিপন্মুক্ত করতেই কর্ণের কাছে কুন্তীর আসা। এই স্বার্থবুদ্ধি অতি কূটস্থ হলেও কুন্তীর অন্তরে তা ছিল এবং কর্ণ বুঝি তা বুঝতেও পেরেছিলেন। কর্ণ হাজার হলেও বীর, হাজার হলেও দাতা, অতএব এতকাল পরে ফিরে-পাওয়া মাকে তিনি খালি হাতে ফিরে যেতে দেননি। বললেন—তোমার এই চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে না। আমি কথা দিচ্ছি, অর্জুন ছাড়া যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব—এদের কাউকেই আমি মারব না, অসহ্য হলেও না। কিন্তু অর্জুনকে হয় আমি মারব, নইলে তার মতো বীরের হাতে মৃত্যুবরণ করে যশের ভাগী হব। তবে হ্যাঁ তোমার পাঁচ ছেলে, পাঁচটাই থাকল—হয় অর্জুন থাকবে না, আমি থাকব। নয়তো আমি থাকব না, অর্জুন থাকবে—নিরর্জুনা সকর্ণা বা সার্জুনা বা হতে ময়ি।

এই এতক্ষণে বোধহয় কুন্তীর স্বার্থবুদ্ধি কিছুটা লুপ্ত হল। আপন পুত্রের পরুষ-পৌরুষ বাক্যে এবার হয়তো তিনি খানিকটা বুঝলেন যে, শুধু বাক্য দিয়ে জননীত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সারা জীবন লাঞ্ছিত পুত্রের অভিমান বুঝে এবারে তাঁর বুক ভেঙে কান্না এল। ভাবী যুদ্ধফল প্রত্যক্ষ করে তিনি দুঃখে কাঁপতে থাকলেন—কুন্তী দুঃখাৎ প্রবেপতী। মনে মনে পুত্রস্থানে অর্জুন-কর্ণের ব্যক্তি পরিবর্তন করে কর্ণকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—সবই আমার কপাল—দৈবন্তু বলবত্তরম্। চার ভাইয়ের জীবন সম্বন্ধে অভয় পেলাম তোর কাছে, এখন তোদের দুজনের মধ্যে কে থাকে, কে জানে! তোর ভালো হোক বাবা, তোর মঙ্গল হোক। মাতা-পুত্রের একবার মাত্র আলিঙ্গনের পর দুজনে দুজনের পথ ধরলেন। যুদ্ধের ভেরী বেজে উঠল।

[মহা (k) ৫.১৪৪-১৪৬ অধ্যায়;
(হরি) ৫.১৩৫-১৩৬ অধ্যায়]

□ কর্ণ-কুন্তী সমাগম সংবাদ কেউ জানল না। যুদ্ধের সাজ-সাজ রবে পাণ্ডব-কৌরব সকলেই ব্যস্ত। এরই মধ্যে পিতামহ ভীষ্ম সেনাপতির পদে বৃত হলেন। কিন্তু সেনাপতি হলে হবে কী, কুরুপক্ষে ভীষ্ম আর কর্ণের পুরনো ঝগড়াটা মোটেই মেটেনি। ভীষ্ম কিছুতেই কর্ণের সঙ্গে এক রণক্ষেত্রে যুদ্ধ

করতে রাজি ছিলেন না। তাঁর স্পষ্ট মত ছিল—হয় কর্ণ আগে যুদ্ধ করুন, নয়তো আমি—

কর্ণো বা যুধ্যতাং পূর্বমহং বা পৃথিবীপতে।

এরই মধ্যে একদিন কুরুকুলের রাজবাড়িতে বসে সমস্ত যোদ্ধারা কৌরবকুলের প্রধান যোদ্ধাদের বলাবল নির্ধারণ করেছিলেন। সেনাপতি হিসেবে এ ক্ষেত্রে ভীষ্মকেই প্রশ্ন করে মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। ভীষ্ম হিসেব-নিকেশ ভালোই করেছিলেন। প্রতিপক্ষের সৈন্য কে কত ক্ষয় করতে পারে, এই নিয়মে কৌরবপক্ষের প্রধান পুরুষদের কাউকে 'রথ', কাউকে 'অতিরথ', কাউকে বা 'মহারথ' বলে চিহ্নিত করেছিলেন ভীষ্ম। ক্রম অনুসারে ভীষ্ম দুর্যোধনের দুটি নাম-না-জানা ভাইকেও 'রথ' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু কর্ণের কথা উঠতেই ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন তবে, তোমার যে পরাণের বন্ধু কর্ণ—সখা তে দয়িতো নিত্যং, সে কিন্তু 'রথ'ও নয়, 'অতিরথ'ও নয়। সে তোমাকে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সব সময় উসকে দিচ্ছে বটে, কিন্তু আসলে ও মানুষটা বাক্যি দেয় বেশি এবং তার স্বভাবও অত্যন্ত নীচ। এই বৈকর্তন কর্ণ তোমাকে চালনা করে। তোমার বুদ্ধিদাতা মন্ত্রীও সে বটে। কিন্তু মনে রেখ সে 'রথ'ও নয়, 'অতিরথ'ও নয়—

এষ নৈব রথঃ কর্ণো ন চাপ্যতিরথো রণে।

ভীষ্ম যেটা ইঙ্গিত করলেন, সেটা তাঁর নিজের ভাষায়—কবচ আর কুণ্ডল হারানোর ফলে কর্ণের অর্ধেক শক্তি গেছে কমে। তার ওপরে আছে পরশুরামের অভিশাপ, হোম-ধেনু-হারানো সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপ—সময়কালে কোনো দিব্যাস্ত্র তাঁর স্মৃতিতে আসবে না। ফলে কর্ণ শুধু 'অর্ধরথ' ছাড়া আর কিছুই নয়। মহামতি দ্রোণ কর্ণের কাছে অপমানিত হয়েছিলেন পূর্বে। তিনি ভীষ্মের কথা সম্পূর্ণ সমর্থন করে উদাহরণ দিয়ে বললেন—যা বলেছেন ভীষ্ম। প্রত্যেক যুদ্ধেই এর হুঙ্কার শোনা যাবে—ওই নাকি সবাইকে শেষ করে দেবে, কিন্তু প্রত্যেকটা বড়ো যুদ্ধ থেকে ও সরে পড়েছে—

রণে রণে'ভিমানী চ বিমুখশ্চাপি দৃশ্যতে।

কাজেই ভীষ্ম যে বলেছেন—'অর্ধরথ'—ঠিকই বলেছেন তিনি। ভীষ্ম-দ্রোণের কথা থেকে বোঝা যায় যে, যুদ্ধের মুখে সেনাপ্রধানদের অন্তঃকলহ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং এর জন্য দায়ী কর্ণ নিজে। রাগের চোটে চোখদুটি বড়ো করে কর্ণ ভীষ্মকে বলতে লাগলেন যেন ঘোড়ার ওপর চাবুক কষাচ্ছেন—তুদন্ বাগ্‌ভিঃ প্রতোদবৎ। কর্ণ বললেন—যথেষ্ট হয়েছে পিতামহ, যথেষ্ট। আমি নিজের মনে আছি, আপনি যখন তখন, আমাকে যে এইভাবে পদে পদে অপমান করছেন, এটা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত এবং আমার ওপর রাগে—

সদা দ্বেষাদ্ এবমেব পদে পদে।

শুধু দুর্যোধনের মুখ চেয়ে আমি এতকাল সব ক্ষমা করেছি কিন্তু আর নয়। আরে! আপনি আমাকে কাপুরুষ, খারাপ লোক, কত কিছুই না বলছেন, কিন্তু আমি বলছি—আপনি কোন মহারথ? আপনিই 'অর্ধরথ'—ভবান্ অর্ধরথো মহ্যম্—অন্তত আমার কাছে তাই। সবাই বলে গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম মিথ্যা কথা বলেন না, কিন্তু আমার মতে আপনার প্রতিটি ব্যবহার মিথ্যাচার, কেননা চিরটা কাল আপনি কুরুকুলের বিরোধিতা করে গেলেন, কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র বুঝলেন না। নইলে, এই যুদ্ধের সময় কি কেউ কারও হীনতা প্রমাণ করে, কিংবা কেউ কি এমনভাবে মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করে? আরে, বয়েসের ভার আর পাকা চুল দেখে—ন হায়নৈ র্ন পলিতৈঃ—রথ, মহারথ ঠিক হয় না, ওসব ঠিক হয় ক্ষমতায়, আপন ক্ষমতায়। ব্যক্তিগত রাগ আর ব্যক্তিগত মোহে, আপনি আপনার যেমন ইচ্ছে—কাউকে রথ সাজাচ্ছেন, কাউকে মহারথ সাজাচ্ছেন, যা ইচ্ছে তাই বকে যাচ্ছেন তখন থেকে।

ভীষ্মকে অনেকক্ষণ গালমন্দ করার পর কর্ণ দেখলেন, বলাটা বৃথা যাচ্ছে। তিনি তখন দুর্যোধনকে বলতে লাগলেন—দেখ দুর্যোধন, এই দুষ্ট ভীষ্মকে ত্যাগ কর এখুনি—

ত্যজ্যতাং দুষ্টভাবো'য়ম্।

—তোমার যত সমস্যা, সেই সব সমস্যার মূলে এই ভীষ্ম। নইলে এ সময়ে কেউ এভাবে সামনাসামনি মনোবল ভেঙে দেয়? ভীষ্ম রথ, অতিরথ, মহারথ যোদ্ধা সম্পর্কে কতখানি জ্ঞান রাখেন বা তাঁর বক্তব্যের মূল্যই বা কতখানি—সে বিষয়েও প্রশ্ন তুলে দিলেন কর্ণ—

রথানাং ক্ব চ বিজ্ঞানং ক্ব চ ভীষ্মো'ল্পচেতনঃ।

শেষ পর্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণ ঘোষণা করলেন—

আমি বলে দিচ্ছি দুর্যোধন, কিছুতেই আমি ভীষ্মের সেনাপতিত্বে যুদ্ধ করব না। আমি যুদ্ধ করে মরব আর তার সম্পূর্ণ 'ক্রেডিট' হজম করবেন সেনাপতি ভীষ্ম—

যশো ভীষ্মং গমিষ্যতি।

—তা হবে না। এই ভীষ্ম বেঁচে থাকতে যুদ্ধই করব না আমি ভীষ্ম নিহত হলে, তারপর আমি যুদ্ধে নামব।

[মহা (k) ৫.১৬৮.৩-৪২; (হরি) ৫.১৫৭.৩-৪২]

□ দুর্যোধন কিছুতেই ভীষ্ম আর কর্ণের এই চাপান-উতোর থামাতে পারেন না। কিন্তু ক্ষতিটা বাস্তবে তাঁরই হল। বস্তুত ভীষ্ম যদি পাণ্ডবদের গায়ে হাত না দিয়েও শুধুই অসংখ্য সৈন্য মেরে যেতেন, তাহলেও সেই অবসরে কর্ণ পঞ্চপাণ্ডবের বিপদ ঘটাতে পারতেন অনেকটাই। কিন্তু তা আর সম্ভব হল না।

যাই হোক, যুদ্ধের আগে আরও একবার কর্ণকে সদর্পে নিজের বীরত্বের কথা ঘোষণা করতে দেখা যাচ্ছে। দুর্যোধন কৌরবপক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের জিজ্ঞাসা করেছেন যে সম্পূর্ণ পাণ্ডবসেনা ধ্বংস করতে তাঁদের কতটা সময় লাগতে পারে। ভীষ্ম-দ্রোণের মতো অতিরথ প্রবীণ যোদ্ধা একমাস সময় লাগবে বলে মন্তব্য করলেও কর্ণ সদম্ভে জানিয়েছেন যে, মাত্র পাঁচ দিনেই তিনি সম্পূর্ণ পাণ্ডবসেনা ধ্বংস করতে পারেন। এই সময়ে ভীষ্ম কর্ণকে একপ্রস্থ তিরস্কার করেছেন। আসলে কর্ণ যে মুহূর্তে বললেন যে পাণ্ডবসেনা ধ্বংস করার জন্য তাঁর মাত্র পাঁচটি দিনই যথেষ্ট, তখন বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম একেবারে সকৌতুকে অট্টহাস্য করে উঠেছেন, যেন ভারী হাসির কথা। তারপর হাসতে হাসতেই ভীষ্ম বললেন—ওহে রাধেয়, যতক্ষণ না যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণ-আর অর্জুনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে, ততক্ষণ এসব বড়ো বড়ো কথা বলে নাও। স্বভাবতই কর্ণ রাগে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন। *[মহা (k) ৫.১৯৩.১৯-২২; (হরি) ৫.১৮৩.১৯-২২]*

□ অবশেষে সেই দিনের নিশি প্রভাত হল, যেদিন থেকে ভয়াবহ যুদ্ধের ফলে সম্পূর্ণ কুরুক্ষেত্রে মৃত্যুর হাহাকার যেন প্রলয়ের অন্ধকার বয়ে আনবে। দুপক্ষের সেনানায়করা কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে ব্যূহরচনা করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। দ্বিধাগ্রস্ত অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের ভগবদ্গীতার উপদেশও সাঙ্গ হল। যুদ্ধ আরম্ভ হয় হয়, এই সময় যুধিষ্ঠির রথ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে বিপক্ষের বৃদ্ধদের কাছে আশীর্বাদ চাইতে গেলেন। যুদ্ধজয়ের আশীর্বাদ নিলেন একে একে পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ আর কৃপের কাছ থেকে। সব শেষে শল্য। তিনি যুধিষ্ঠিরের বিমাতা মাদ্রীর বড়ো ভাই, পাণ্ডবদের মাতুল। পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতেই তিনি কুরুক্ষেত্রের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন কিন্তু দুর্যোধনের ছলনায় একরকম বাধ্য হয়েই কৌরবশিবিরে যোগ দিয়েছেন। যুধিষ্ঠির জানেন, সারথি হিসেবে শল্য অদ্বিতীয়। কর্ণ আর অর্জুনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ যখন লাগবে, তখন শল্যই কর্ণের সারথি হবেন—এ খবরও হয়তো যুধিষ্ঠিরের জানা ছিল। তাই মাতুল শল্যকে তিনি অনুরোধ করলেন—বিপক্ষে থেকে অন্তত কর্ণের মনোবল কিছু কমানোর প্রয়াস যেন তিনি করেন। শল্য আশ্বাস দিলেন—তিনি অবশ্যই কর্ণকে মানসিক ভাবে হীনবল করার চেষ্টা করবেন।

এদিকে ভীষ্মের অধিনায়কত্বে যেসব যোদ্ধা সমবেত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে যে কর্ণের ঠাঁই হয়নি, সেখবর কৃষ্ণের কানে পৌঁছেছে। কৃষ্ণ শেষবারের মতো কর্ণকে পাণ্ডবশিবিরে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এমন প্রস্তাবও রেখেছেন কৃষ্ণ যে, ভীষ্মের পতন পর্যন্তই না হয় কর্ণ পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করুন, তারপর না হয় কৌরব শিবিরে যোগ দিয়ে দুর্যোধনের বন্ধুত্বের ঋণশোধ করবেন। একাজ অবশ্য কর্ণের পক্ষে বাস্তবেই অসম্ভব। পাণ্ডব শিবিরে আজ আর যাওয়া সম্ভব নয়। দফায় দফায় দুই শিবিরে থেকে যুদ্ধ করা তো আরও অসম্ভব। কর্ণ তাই কৃষ্ণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন—না ভাই, বেঁচে থাকতে দুর্যোধনের অনিষ্ট করা আমার দ্বারা হবে না—

ন বিপ্রিয়ং করিষ্যামি ধার্তরাষ্ট্রস্য কেশব।
ত্যক্তপ্রাণং হি মাং বিদ্ধি দুর্যোধনহিতৈষণম্॥

[মহা (k) ৬.৪৩.৮৮-৯২; (হরি) ৬.৪৩.৮৪-৮৮]

□ যুদ্ধ আরম্ভ হল এবং সেনাপতি হিসেবে ভীষ্ম যুদ্ধ করলেন পুরো দশদিন। দশম দিন সূর্যাস্তের আগে অর্জুনের বাণে জর্জরিত ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হলেন। কর্ণ হয়তো এমন দিনটির অপেক্ষাতেই ছিলেন কারণ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলে তাঁর জীবন-মরণ—সবই তো বৃথা। তবু

ভীষ্মের পতনের সংবাদ পেয়ে দুঃখও পেলেন বোধ হয়। মৃত্যুশয্যায় শয়ান ভীষ্মের কাছে উপস্থিত হলেন কর্ণ। অত গালাগালি দিয়েছিলেন, তাই কর্ণের মনে আছে সংকোচ, সাশ্রুমুখে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের পায়ে এসে পড়লেন। বললেন—আমি রাধেয় কর্ণ, আপনার চোখের শত্রু। কথাটা শোনামাত্রই পক্বকেশ বৃদ্ধ, কুটিল বলিরেখায় আবৃত চক্ষুদুটি উঁচু করে একখানা হাতেই কর্ণকে জড়িয়ে ধরলেন—জড়িয়ে ধরলেন আপন পুত্রের মতো—

পিতেব পুত্রং গাঙ্গেয়ঃ পরিরভ্যৈকপাণিনা।

বললেন—এস বাবা, এস। চিরটা কাল তুমি আমার সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে প্রতিস্পর্ধিতা করে গেলে। এখন যদি এই মরণের সময়েও তুমি না আসতে আমার কাছে, ভালো হত না তোমার। ভীষ্ম এবার স্পষ্ট করে বললেন—আমি জানি, তুমি কুন্তীর ছেলে, সূর্যের তেজে তোমার জন্ম। তুমি রাধা কিংবা অধিরথ কারওই ছেলে নও। আমি এ সব কথা ব্যাসের মুখে শুনেছি। সত্যি কথা বলতে কী আমি কোনোদিন তোমার ওপর বিদ্বেষ পোষণ করিনি—

ন চ দ্বেষোঽস্তি মে তাত।

কিন্তু তবু যে আমি তোমার মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, তার কারণ হল—তুমি যে সব সময় পাণ্ডবদের নিন্দা করতে, এটা আমার সহ্য হত না ব্যাপারটা কী হয়েছে জান—গুণী মানুষদের ওপর সব সময় যে তোমার একটা বিদ্বেষ আছে, এক ধরনের ঈর্ষা আছে, এর কারণ হল, স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক নিয়মে তোমার জন্ম হয়নি—জাতোঽসি ধর্মলোপেন। এর ওপরে তুমি যাকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছ সে নীচ লোক। এই সব কারণেই কুরুসভার নানা জায়গায় তোমাকে আমি বিস্তর বাজে কথা বলেছি—

রুক্ষং শ্রাবিতঃ কুরুসংসদি।

একমাত্র এই বৃদ্ধ মানুষটি, যিনি চিরকাল কর্ণকে গালমন্দ করে এসেছেন, তিনিই কিন্তু কর্ণচরিত্রের আসল মনস্তত্ত্বটি ধরতে পেরেছেন। সমাজের নিয়মের বাইরে কুমারী গর্ভে যার জন্ম হয়, সেই মানুষ যদি আবার স্বার্থপরায়ণ অহঙ্কারী বন্ধুর সাহচর্যে শিশুকাল থেকে বেড়ে ওঠে, তবে তার মধ্যে নানান জটিলতা আসবে, পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মে জাত উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে সে সহ্য করতে পারবে না—এটা মেনে নিতেই হবে। এদিক দিয়ে ভীষ্মের বিশ্লেষণ অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। কর্ণের বুদ্ধি-বিপর্যয়ের কারণ বলেই ভীষ্ম কিন্তু স্বীকার করলেন—আমি জানি, আমি জানি তুমি কতটা ক্ষমতা রাখ। তোমার মতো শক্তিমান পুরুষ দেবলোকেই বা কটা আছে? কিন্তু আসলে কী জান, এই বিরাট কুলের পিতামহ হিসেবে এসব কথা আমার বলার উপায় ছিল না, বললে—পাণ্ডবেরা আমাকে ভুল বুঝত, ভুল বুঝত কৌরবেরাও, কুলভেদ গভীরতর হত। বস্তুত অস্ত্রচালনায় তুমি অর্জুন, কি কৃষ্ণের সমকক্ষ। এই স্বল্প-পরিসর জীবনে তুমি কতগুলো বড়ো যুদ্ধ একা জিতেছ, সেও আমি জানি। আমি বলি কি কর্ণ, তুমি আপন ভাইদের সঙ্গে আর বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যে যেয়ো না। আমি মরেছি, আমার সঙ্গে সঙ্গেই এই যুদ্ধ শেষ হোক, তুমি ফিরে যাও ভাইদের কাছে।

এতদিন যাকে শত্রু বলে জেনে এসেছেন, তাঁর কাছে আপন জীবনের একটা ব্যাখ্যা পেয়ে, মরণোন্মুখ বীরের কাছে আপন অস্ত্র-নৈপুণ্যের জয়ঘোষ শুনে কর্ণ বড়ো খুশি হলেন বটে, কিন্তু সত্যিই তো, তাঁর কি আর ফিরে যাবার উপায় আছে? খুব অল্প কথায় কর্ণ তাই তাঁর পুরনো যুক্তি প্রকাশ করলেন ভীষ্মের কাছে—সেই জন্মমাত্রেই কুন্তীমাতার পুত্রত্যাগের কথা, সূত পিতা-মাতার স্নেহমমতার কথা এবং সর্বশেষে এতকাল দুর্যোধনের খেয়ে-পরে, ভোগ করে, এই মুহূর্তে তাঁকে ত্যাগ করে কৃতজ্ঞতা ভঙ্গের কথা। কর্ণ তা পারেন না। সত্যপ্রতিজ্ঞ বীরের যুক্তি সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম বুঝলেন কর্ণ যেহেতু ভীষ্মকে অকথ্য গালাগাল দিয়েছিলেন, আজ তাই তাঁর কাছেই অনুমতি চাইতে এসেছেন—

অনুজানীহি মাং তাত যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ম্।

ভীষ্ম অনুমতি দিলেন এবং দুজনেই বুঝলেন যে, সমস্ত পুরুষকার, সমস্ত শৌর্য্য-বীর্য্যের ওপরেও আরও এক শক্তি মানুষের অন্তর্গত ললাটের রেখায় চিহ্নিত থাকে—তার নাম দৈব। কর্ণের পুরুষকার কর্ণের স্বায়ত্ব থাকা সত্ত্বেও, এই দৈববলেই তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু। দুইই পরেচ্ছায় সম্পন্ন—জন্ম, কুন্তী-সূর্যের আপন সম্ভোগ-বাসনার চরিতার্থতায়। মৃত্যু, দুর্যোধনের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে, তাঁরই কেটে যাওয়া পথ ধরে। অথচ কর্ণ দৈব মানেন না।

□ কর্ণ এবার সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে যোগ দিলেন ভীষ্মের শরশয্যার পর। যুদ্ধ করলেন দ্রোণাচার্যের সেনাপতিত্বে পাঁচদিন আর নিজের সেনাপতিত্বে দু-দিন, মোট সাতদিন। মহাভারতের দ্রোণপর্ব এবং কর্ণপর্বে এই সাতদিনের যুদ্ধের যে বিশদ বিবরণ আছে, তাতে অসংখ্যবার কর্ণের উল্লেখ পাওয়া যাবে। তবে গোড়াতেই যেটা বলা দরকার, তা হল দশম দিনের পর যুদ্ধে অংশ নেবার সময় কর্ণ কিন্তু অসামান্য বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। ভীষ্মের শরশয্যার পর কৌরবপক্ষের সমস্ত রাজপুরুষেরা এবং কৌরবেরা সবাই কিন্তু কর্ণকেই একমাত্র ভীষ্মের সমান বলে মনে করেছিলেন। এমনকী সেনাপতি হিসেবে দ্রোণের কথাও কারও মনে আসেনি। উন্মুক্ত রণক্ষেত্রে প্রত্যেক রাজপুরুষই তখন 'কর্ণ' 'কর্ণ' বলে ডাকছিলেন কারণ ভীষ্মের নৌকো ডুবে যাবার পর কর্ণই ছিলেন রণ-সাগর পাড়ি দেবার ভেলা। তা ছাড়া, অনেকেই এটা ভাবছিলেন যে, দশদিন এই মহাযুদ্ধে কিছুই না করায় কর্ণ শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে অনেক 'ফিট' আছেন, অতএব ভীষ্মের পর তিনিই একমাত্র লোক যাঁকে সেনাপতিত্বে বরণ করা যেতে পারে। কৌরবদের সেই বিপন্ন মুহূর্তে শরশয্যায় শায়িত স্বয়ং ভীষ্ম পর্যন্ত কর্ণকে কৌরববন্ধুদের আশ্রয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। উপমা দিয়ে বলেছেন, সমস্ত নদীর কাছে কর্ণ যেন সমুদ্রের মতো, সমস্ত আলোর মধ্যে কর্ণ যেন সূর্যের মতো অবলম্বন—

জ্যোতিষামিব ভাস্করঃ।

কিন্তু বললে হবে কী, কর্ণ কিন্তু এতদিনে বাস্তব অবস্থাটা বেশ বুঝতে পারছেন, বিশেষত ভীষ্মের পতনের পর তাঁর এই উপলব্ধি গভীরতর হয়েছে। হ্যাঁ, একদিকে তিনি তাঁর স্বভাবমতই বলে যাচ্ছিলেন যে, পাণ্ডবযোদ্ধাদের তিনি রণক্ষেত্রে হত্যা করবেন। কিন্তু অন্যদিকে সম্পূর্ণ বাস্তববোধে কর্ণ স্বীকার করেছিলেন যে, ভীষ্ম ছাড়া কৌরবযোদ্ধাদের মধ্যে আর কেউই তেমন নেই যে রণক্ষেত্রে অর্জুনের বাণ রোধ করতে পারে—

কো হ্যর্জুনং যোধয়িতুং ত্বদন্যঃ।

কর্ণ বুঝতে পেরেছেন যে, ভীষ্মহীন কৌরবসৈন্যকে এবং স্বয়ং কৌরবদেরও অর্জুন একেবারে ছারখার করে দেবেন—

ধার্তরাষ্ট্রান্ প্রধক্ষ্যন্তি তথা বাণাঃ কিরীটিনঃ।

তবু কর্ণের মতো ক্ষত্রিয় বীর যে যুদ্ধে পিছুপা হবেন না, এ তো সবাই জানে। তার ওপরে কৌরবশিবিরে সমস্ত যোদ্ধারা যেখানে 'কর্ণ' 'কর্ণ' বলে তারস্বরে চিৎকার করছেন, সেখানে কর্ণের মতো মহাবীর যে অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে সোজাই উপস্থিত হবেন, এতেও আশ্চর্য নেই কিছু। কর্ণের ব্যাপারে অনুগত রাজাদের উচ্চকিত আহ্বান শুনে দুর্যোধনই বা কী করেন! আমাদের ধারণা, দুর্যোধনের মধ্যে এই বোধ সম্পূর্ণ ছিল যে, ভীষ্মের পরে দ্রোণকেই সেনাপতি করা উচিত। কিন্তু সবাই এমন 'কর্ণ', 'কর্ণ' বলে চেঁচাচ্ছে যে তিনি শেষ পর্যন্ত কর্ণের ওপরেই ছেড়ে দিলেন সেনাপতি চয়নের ভার। কর্ণ বন্ধুর মন বোঝেন, উপযুক্ত বাস্তববোধও তাঁর আছে। তিনি বললেন— দুর্যোধন! তোমার পক্ষে অনেকেই আছেন যাঁরা সেনাপতি হবার উপযুক্ত, কিন্তু যেহেতু তাঁরা সবাই সমান মাপের যোদ্ধা, তাই একজনকে সেনাপতি করলে আরেকজন মনে মনে আহত হবেন এবং মনেপ্রাণে তোমার জন্য যুদ্ধ করবেন না—

শেষা বিমনসো ব্যক্তং ন যোৎস্যন্তি হিতাস্তব।

কিন্তু দেখ, এঁদের সবার মধ্যে সবচেয়ে গুণী মানুষ এবং গুরুজন হলেন দ্রোণ। অস্ত্রবিদ্যায় তিনি সবারই প্রায় গুরুস্থানীয়, তাঁকে সেনাপতি করলে কারওই কিছু বলার থাকে না। অতএব আচার্য দ্রোণকেই সেনাপতি করা উচিত।

বাস্তব অবস্থার বিচারে দেখা যেত দ্রোণকে বাদ দিয়ে কর্ণকে সেনাপতি করলে, দ্রোণ অবশ্যই আহত হতেন এবং তাঁর অহংবোধেও লাগত। কাজেই এক্ষেত্রে কর্ণের বুদ্ধি-কৌশল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আচার্যের সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে কর্ণ বারবার পাণ্ডবদের পর্যুদস্ত করেছেন। অবশ্য শুধুই পর্যুদস্ত করেছেন বললে যুদ্ধের মূল কথাটাই নষ্ট হয়ে যায়। কেননা, দ্রোণপর্বের যুদ্ধে কর্ণ তো শুধুই জেতেননি অনেকবার পরাস্তও হয়েছেন, তাও অর্জুনের কাছে নয়, ভীমের কাছেই। জেতার মুহূর্তে ভীম নেচে কুঁদে কর্ণকে অনেক গালাগালি দিয়েছেন, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেও অন্যান্য পাণ্ডবদের ব্যাপারে কর্ণের সাধারণ নীতি ছিল 'ডিফেনসিভ্'। ব্যাসের ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে সেটা দাঁড়ায়—

মৃদুপূর্বঞ্চ রাধেয়ো দৃঢ়পূর্বঞ্চ পাণ্ডবঃ।

বেশি 'ডিফেনসিভ্' যুদ্ধ করতে গেলে কখনো বা পরপক্ষের হাতে নাকালও হতে হয়, কর্ণ তা হয়েছেন, এমনকী তাঁকে পালাতেও হয়েছে। আবার কখনো বা একটু শিক্ষা দেওয়ার তাগিদে যখন ভীমের মতো বিরাট যোদ্ধাকে বিরথ এবং নিরস্ত্র করে দেন কর্ণ তখন অন্য এক অনভূতি তৈরি হয়। কর্ণ বলেন—ভীম! তুমি হলে গিয়ে লোভী মানুষ—ঔদরিক। যেখানে ভালো খাবার দাবার আছে, ভালো ভালো পানীয় আছে—

যত্র ভোজ্যং বহুবিধং ভক্ষ্যং পেয়ঞ্চ পাণ্ডব।

—সেইখানেই তুমি আদর্শ লোক, এই যুদ্ধক্ষেত্র তোমার উপযুক্ত নয়। কর্ণ এখানেই শেষ করলেন না, খোঁচা দিয়ে বললেন—তুমি আরেক কাজ করতে পার, ভীম! তুমি বনে চলে যাও। সেখানে যুদ্ধটুদ্ধর ঝামেলা নেই, বেশ ভালো থাকবে মুনিদের মতো, তুমি বনে চলে যাও—

বনং গচ্ছ বৃকোদর।

এসব কটূক্তি, খোঁচা যুদ্ধক্ষেত্রে সব সময় চলে। কিন্তু সুযোগ পেলে এবং না পেলেও ভীম যাঁকে 'সূতপুত্র' ছাড়া ডাকতেন না, সেই ভীমের প্রতি এই মুহূর্তে কর্ণের কটূক্তিগুলি কিন্তু প্রচ্ছন্ন মমতাও বহন করে, যদিও এ মমতা সাক্ষী-সাবুদ দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। লক্ষণীয়, কর্ণ যে সাতদিন যুদ্ধ করেছেন, তার মধ্যে কিন্তু শুধু ভীম নয়, যুধিষ্ঠির, নকুল-সহদেব সকলেই তাঁর হাতে পরাস্ত, আহত হয়েছেন। কিন্তু কর্ণ তাঁদের প্রচণ্ড আঘাত করেননি, হত্যা করার তো প্রশ্নই ওঠে না। শুধুই কি মা কুন্তীকে কথা দিয়েছেন বলে? নাকি জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে ছোটো ভাইদের মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যিই স্নেহ জন্মাচ্ছে মনে? মনে পড়ে যাচ্ছে কী যে, দুর্যোধনের প্রতি অন্ধ সমর্থন দিতে গিয়ে এঁদের কতো বিদ্বেষই না করেছেন, কতো অন্যায় করেছেন এঁদের সঙ্গে। অর্জুনবধের কথা কর্ণ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বলেছেন কিন্তু তা কতটা নিজের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত দম্ভ বজায় রাখতে আর কতটাই বা আন্তরিকভাবে—সে সন্দেহও থেকেই যায়।

তবে যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণ অন্যায় আচরণও কিছু কম করেননি। অন্যায় কেন, গুরুতর এবং জঘন্য অপরাধই বলতে হবে। কারণ, কুরুপাণ্ডবদের উপযুক্ত বংশধর অর্জুনপুত্র অভিমন্যুকে নিরস্ত্র একলা পেয়ে অন্যায় ভাবে বধ করার ক্ষেত্রে কর্ণের বিশাল ভূমিকা ছিল। তবে অভিমন্যুবধের পর অর্জুন যখন জয়দ্রথ বধের ভীষণ প্রতিজ্ঞা করছেন, তখন কর্ণের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হয়, এই মহাযুদ্ধে অর্জুনের পরাক্রম দেখে তিনিও বেশ ভীত-সন্ত্রস্ত। অর্জুনের ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনে দুর্যোধন বেশ চিন্তিত হয়ে কর্ণের কাছে এসেছেন। কিন্তু চিরটা কাল যে কর্ণ পুরুষকারের জয়গান গেয়েছেন, আজ দুর্যোধনকে আশ্বাস দেবার সময় সেই কর্ণই দৈবের কথা বলছেন। কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন বটে যে, কোনো চিন্তা কোরো না, কাল আমরা সর্বশক্তি দিয়ে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তবে সেই সঙ্গে একথাটাও জুড়ে দিলেন যে, তবে কি জানো যুদ্ধে জয়-পরাজয় সবই দৈবের হাতে—

অদ্য যোৎস্যে'র্জুনমহং পৌরুষং স্বং ব্যপাশ্রিতঃ।
ত্বদর্থং পুরুষব্যাঘ্র জয়ো দৈবে প্রতিষ্ঠিতঃ॥

সত্যিই চতুর্দশ দিনের যুদ্ধে অর্জুন এমনই বীরত্ব দেখালেন যে, কারোর পক্ষেই কিছু করা সম্ভব ছিল না। যেটুকু আশা ছিল যে, হয়তো বা সূর্যাস্তের মধ্যে লক্ষ্যপূরণ নাও হতে পারে, কৃষ্ণের মায়ায় তাও দূর হল। জয়দ্রথবধ সুসম্পন্ন হল যথাসময়ে। জয়দ্রথবধের ঘটনায় দুর্যোধন যেমন দুঃখও পেলেন, তেমনি ক্রুদ্ধও হলেন। প্রধান সেনাপতি দ্রোণকে পাণ্ডবপক্ষপাতী বলতেও ছাড়লেন না। কিন্তু আজ আশ্চর্যভাবে কর্ণ দুর্যোধনের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছেন না। বরং উলটো সুরেই বলছেন—দুর্যোধন! আচার্যকে সন্দেহ করাটা মোটে উচিত হচ্ছে না। তিনি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, আর এটাও তো ঠিক যে অর্জুন সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর! আমার কি মনে হয় জানো—এ সবই বিধির বিধান। তাই আমরা এত করেও জয়দ্রথকে রক্ষা করতে পারলাম না। যে কথা সারাজীবন ঘৃণাভরে অস্বীকার করেছেন, কোনো দিনের জন্য কখনো স্বীকার করেননি যে অর্জুন শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর—সেকথা আজ কর্ণ সোচ্চারে স্বীকার করছেন! এর কারণ হতাশা নাকি অর্জুনের পরাক্রম দেখে খানিক ভয়ও পেয়েছেন? বোঝা যায় না। তবে কর্ণ বোধহয় জীবন প্রথমবার এমন জোরগলায় অর্জুনের প্রশংসা করেছেন। তাঁর কথায় জোর ছিল এতটাই যে দুর্যোধন পর্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছেন। দুর্যোধনকে ভীত হতে দেখে বোধহয় সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই কর্ণ আবার তাঁর পুরোনো আস্ফালনে ফিরে গেছেন। ইন্দ্রের দেওয়া শক্তি অস্ত্র

দিয়ে তিনি অর্জুনকে বধ করবেন, এমনকী স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও এসে রক্ষা করতে পারবেন না—এসব বলে চলেছেন—

পরিত্রাতুমিহ প্রাপ্তো যদি পার্থং পুরন্দরঃ।
তমপ্যাশু পরাজিত্য ততো হন্তাস্মি পাণ্ডবম্॥
সর্বেষামেব পার্থানাং ফাল্গুনো বলবত্তরঃ।
তস্যামোঘাং বিমোক্ষ্যামি শক্তিং শক্রবিনির্মিতাম্॥

কর্ণ দুর্যোধনকে আশ্বাস দিচ্ছেন—আমি বেঁচে থাকতে তোমার কোনো চিন্তা নেই। অর্জুনকে আমি মারবই। তারপর বাকি পাণ্ডবরা হয় ভয় পেয়ে তোমার বশ্যতা স্বীকার করবে, নয়তো আবার বনে চলে যাবে। কিংবা শুধু পাণ্ডব কেন, এই যুদ্ধে আমি পাঞ্চাল, কেকয়, বৃষ্ণি সকলকেই বধ করব।

যেখানে বিভিন্ন ব্যূহ-প্রতিব্যূহ সাজিয়ে, নিজে প্রচণ্ড যুদ্ধ করেও দ্রোণাচার্য পাণ্ডবদের কিছু করতে পারছেন না, সেখানে কর্ণের এই দম্ভোক্তি যে দ্রোণাচার্য এবং তাঁর প্রিয়জনদের ক্রুদ্ধ করে তুলবে, এতে আশ্চর্য কী! বিশেষত দ্রোণের শ্যালক বয়োবৃদ্ধ কৃপাচার্য এবং দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, যিনি নিজে কর্ণের কথা শুনে প্রায় হাততালি দিয়ে উঠলেন। বললেন—দারুণ বলেছ, কর্ণ, দারুণ, দারুণ—শোভনং শোভনং কর্ণ—বুঝতে পারছি দুর্যোধন আর অনাথ নয়। তবে হ্যাঁ কথা দিয়ে যদি পৃথিবী জয় হয়ে যেত, তা হলে তো ভালোই হত—বচসা যদি সিধ্যতি এই দুর্যোধনের সামনে তোমার এমনিধারা বচন-গর্জন অনেক শুনেছি কিন্তু তোমার বিক্রমও কোথাও দেখিনি কিংবা এই বচনের ফলও কিছু হয়নি। কৃপাচার্য আবার সেই পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে তুললেন, কারণ রাগটা তাঁর রয়েই গেছে। কৃপ বললেন—এমন তো নয় যে, অর্জুনের সঙ্গে তোমার কোনোদিন সামনাসামনি যুদ্ধ হয়নি। যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে সবগুলোতেই তুমি হেরেছ। তুমি একা অর্জুনকেই সামলাতে পার না, সেখানে ভাবছ কৃষ্ণসহায় সমস্ত পাণ্ডবদের তুমি মারবে।

কৃপাচার্যের উপহাস-তিরস্কারের উত্তর আবার কর্ণ দিয়েছেন তাঁর পুরোনো মেজাজে। বয়োবৃদ্ধের প্রতি কদর্য গালিগালাজ এমনকী জিভ টেনে ছিঁড়ে নেবার হুমকি পর্যন্ত। অশ্বত্থামা তো এসব দেখে এতই ক্রুদ্ধ হলেন যে তখনই কর্ণের মাথা কাটতে এলেন তরবারি হাতে। দুর্যোধন হয়তো আজ মনে মনে বুঝতেও পারছেন যে তাঁর নিজের বাহিনীর সেনাপতিদের মধ্যে এমন একতার অভাব তাঁর পক্ষেই ক্ষতিকারক হচ্ছে আর এসবের জন্য কর্ণই অনেকাংশে দায়ী। ফলে এই যুদ্ধের মাঝে সকলের ঝগড়া থামাতে দুর্যোধনকে রীতিমতো নাকাল হতে হয়েছে।

যাই হোক কর্ণের কপালে দুর্দৈব তখনও বাকি ছিল। যে একবীরঘাতিনী শক্তির ভরসায় অর্জুনবধের কথা বলছিলেন তা প্রয়োগ করতে হল ঘটোৎকচের ওপর। কারণ ঘটোৎকচ একাই এমন যুদ্ধ করলেন যে সমস্ত কৌরব রথী-মহারথীরাই তাঁর হাতে পরাস্ত হলেন, সৈন্যদের মধ্যে ত্রাহি-ত্রাহি রব উঠল। একরকম বাধ্য হয়েই সেই শক্তি অস্ত্রটি দিয়ে কর্ণ ঘটোৎকচকে বধ করলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে এর পরের ঘটনা স্বয়ং দ্রোণাচার্যের মৃত্যু। পিতার মৃত্যুর শোকে অশ্বত্থামাকে একটা দুপুরের মধ্যে এক অক্ষৌহিণী পাণ্ডবসৈন্য বধ করতে দেখেও কিন্তু দুর্যোধন কর্ণকেই সেনাপতিত্বে বরণ করেছেন। তাঁর আজীবন বিশ্বস্ত কর্ণ। তার মুখের কথা শুনেই সম্মুখ সমরে পাণ্ডববধ, নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ—আরও কত কী স্বপ্ন দেখেছেন দুর্যোধন। আজ ভীষ্ম-দ্রোণের পতনের পর সেই স্বপ্নপূরণের ভার বাস্তবেই কর্ণের হাতে এসে পড়ল। যুদ্ধের আগে কর্ণ এতটাই আস্ফালন করেছিলেন যে, ভীষ্মের বদলে তিনি দিন দশেক কুরু সৈন্য রক্ষা করতে পারলেই বুঝি সেই আস্ফালনের মানরক্ষা হত। অথচ এহেন গুরুভার কাঁধে নিয়ে কর্ণ যুদ্ধ করলেন মাত্র দুদিন। কর্ণকে সেনাপতিত্বে বরণ করার সময় দুর্যোধন বড়ো মুখ করে বলেছিলেন যে, ভীষ্ম কিংবা দ্রোণের ওপর আমার কোনোদিনই আস্থা ছিল না। একে তো তাঁরা বৃদ্ধ, তার ওপরে অর্জুনের ওপর তাঁদের পরিষ্কার পক্ষপাত ছিল—

বৃদ্ধৌ হি তৌ মহেষ্বাসৌ সাপেক্ষৌ চ ধনঞ্জয়ে।

কর্ণ বরাবরের পাণ্ডব বিদ্বেষী, তাই তাঁর প্রতি দুর্যোধনের অগাধ আস্থা। এসব বলে বহু প্রশংসা করে সেনাপতির আসনে দুর্যোধন কর্ণকে বসিয়েছেন। যুদ্ধের ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় পর্যন্ত দুর্যোধনের কর্ণের প্রতি এই বিপুল ভরসার কথা শোনাতে গিয়ে একটু বক্রোক্তিই করেছেন ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে—আপনার ছেলে দুর্যোধন মনে মনে এই আশা করে আশ্বস্ত হয়েছেন যে,

ভীষ্ম গেছে, দ্রোণ গেছে তো কী হয়েছে, একা কর্ণই তাঁর জন্য পাণ্ডবদের বধ করবেন—

হতে ভীষ্মে চ দ্রোণে চ কর্ণ জেষ্যতি পাণ্ডবান্।

সেই কর্ণ মাত্র দুদিন যুদ্ধ করে অসহায়ের মতো অর্জুনের হাতে প্রাণ দিলেন।

কর্ণ এমনই ভাগ্যহত যে, সারা জীবন যে আত্মম্ভরিতা আর অকারণ দম্ভ-এর উপর ভর দিয়ে তিনি দুর্যোধনের বিশ্বাসপাত্র হয়ে উঠেছেন, বকলমে হস্তিনাপুরের রাজ্যপাটে কর্তৃত্ব করেছেন—সেই আত্মম্ভরিতা, দম্ভ, কোনো কিছুই যুদ্ধের মুহূর্তে তাঁর কাজে লাগল না, আজকে তাঁর দেবদত্ত কবচ-কুণ্ডল নেই, ইন্দ্রের দেওয়া অমোঘ শক্তি নেই, মাথার উপর সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো ঝুলে রয়েছে গুরু পরশুরাম আর হোমধেনু হারানো ব্রাহ্মণের অভিশাপ—এত কিছু বিরুদ্ধতা নিয়েও কর্ণ মনে ক্ষীণ আশা রেখেছেন যে, তিনি অর্জুনকে পরাস্ত করবেন। এই অভিমানই কর্ণকে চিরকাল স্থান, কাল, পাত্র ভুলিয়েছে, এই আত্মম্ভরিতার বলেই তিনি কৌরবদের সেনাপতি হয়ে বসেছেন আজ। কিন্তু দুর্যোধনের এত বিশ্বাস, এত দম্ভ সত্ত্বেও কর্ণ কিন্তু সেই বিশ্বাস-ভরসা রক্ষা করতে পারেননি। নিজের সেনাপতিত্বের প্রথম দিনে দুর্যোধনের প্রাণপ্রিয় দুঃশাসনকে কর্ণ বাঁচাতে পারেননি। বাঁচাতে পারেননি নিজের প্রিয় পুত্রকেও। অনেক যুদ্ধ, অনেক লোকক্ষয় হল, কর্ণ অনেক যুদ্ধ করলেন। কিন্তু দুর্যোধনের বিশ্বাসের দাম তিনি দিতে পারলেন না। আত্মবিশ্বাসও রাখতে পারলেন না। তার ওপর অর্জুনের সঙ্গে শেষ এবং চরম যুদ্ধের আগে তিনি আরও একটা ভুল করে ফেললেন মদ্ররাজ শল্যকে নিজের রথের সারথি নির্বাচন করে। শল্য নিঃসন্দেহে খুব ভালো সারথি ছিলেন, কিন্তু দুর্যোধনের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে কৌরবপক্ষে যোগ দেবার পরপরই তিনি কিন্তু যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, কর্ণের সারথ্য করার সময় তিনি কর্ণের মনোবল ভেঙে দেবেন। তাই হল, দুর্যোধনের মাধ্যমে কর্ণ শল্যকে সারথি পেলেন বটে। কিন্তু সারাটা কর্ণপর্ব জুড়ে কর্ণের চরম সমাপতন পর্যন্ত শল্য কেবলই কর্ণের কাছে অর্জুনের প্রশংসা করে গেছেন, আর ক্রমাগতই কর্ণের মনঃসংযোগ নষ্ট হয়েছে। যুদ্ধকালে, কিংবা রথস্থ বীরকে যদি ক্রমাগতই ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়, তবে অল্পসত্ত্ব ব্যক্তির পতন ঘটে, আর মহাসত্ত্ব ব্যক্তি, তিনি যতই যুদ্ধক্ষম হোন না কেন, তাঁর মনঃসংযোগ ব্যাহত হয়। প্রথম প্রথম যখন শল্য বলে যেতেন, তখন কর্ণ উদাসীনভাবে খানিকটা ধরে খানিকটা ছেড়ে দিয়ে শল্যকে বলতেন—ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন চলুন দেখি। কিন্তু শেষে তাঁর ধৈর্য্য চলে গেল এবং শল্যকে তাঁর দেশ তুলে, ব্যক্তিত্ব তুলে অশ্লীল কথা বলে মাথা গরম করতে লাগলেন কর্ণ। মনঃসংযোগ ক্রমেই নষ্ট হতে লাগল। বাইরে যতই তিনি অস্বীকার করুন না কেন, তাঁর অন্তরে নিশ্চয় এক অজানা, অনামা আশঙ্কা ছায়া ফেলতে লাগল।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে কর্ণের সেনাপতিত্বকালে তাঁর ন্যায়নীতির দিকটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। দেখুন, সারা জীবন ধরে যিনি দুর্যোধনের দুঃশাসনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কত শত অন্যায় আচরণ করেছেন, পাণ্ডবদের প্রতি অসহ্য অত্যাচার করেছেন, তাঁদের প্রিয়তমা কুলবধূকে পর্যন্ত আপন বিকার থেকে রেহাই দেননি, সেই কর্ণ কিন্তু নিজের সেনাপতিত্বকালে কোনো অন্যায় করেননি, এমনকী সামান্য নীতিভঙ্গও নয়। অর্জুনের খাণ্ডবদহনের কালে যে সাপটি প্রতিশোধস্পৃহায় এসে কর্ণের তূণে আশ্রয় করেছিল, সেই সর্পমুখ বাণ কর্ণ অর্জুনের বিরুদ্ধে ছুঁড়েছিলেন নিজের অজান্তে—

ন চাপি তং বুবুধে সূতপুত্রঃ।

সেই সর্পবাণে অর্জুনের রেহাই ছিল না, তিনি বাঁচলেন শুধু কৃষ্ণের সারথ্যকৌশলে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর সাপ আবার এসে কর্ণের তূণে প্রবেশ করতে চাইল এবং কর্ণকে সে অনুরোধ করল দেখেশুনে যাতে তাকে ঠিকমত অর্জুনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়, কারণ ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারলে এই সর্পমুখ বাণ থেকে অর্জুনের রেহাই নেই। কিন্তু কর্ণ রাজি হননি, তার সেই চিরাচরিত বলদর্পিতাই কিন্তু এখানে তাঁর গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্ণ বললেন— অন্যের শক্তি আশ্রয় করে কর্ণ কোনোদিন কারও ওপরে জয়ী হতে চায় না—

ন নাম কর্ণো'দ্য রণে পরস্য বলং
সমাস্থায় জয়ং বুভুষেৎ।

একশোটা অর্জুনকে মেরে ফেলতে পারলেও কর্ণ কোনোদিন এক শর দুবার ধনুকে যোজনা করে না। অবশেষে সেই অন্তিম মুহূর্ত। হোমধেনু

হারানো সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপ সত্য করে জীবনের শেষ লগ্নে কর্ণের রথের চাকা বসে গেল মাটিতে। অর্জুন কর্ণের উদ্দেশে শরযোজনা করেছেন গাণ্ডীবে, রথের চাকা তোলার চেষ্টা করতে করতে নিরস্ত্র কর্ণ অর্জুনকে ধর্মের কথা বলে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, অস্ত্রহীন ব্যক্তির ওপর শর যোজনা করতে বারণ করেছিলেন। এই সময় উত্তরটা অর্জুন দিলেন না, দিলেন স্বয়ং কৃষ্ণ। কর্ণ মুখ ফসকে বলেছিলেন—দৈববশে এই মুহূর্তে আমার রথের চাকা আটকে গেছে মাটিতে। অন্তত এই সময়টাতে তুমি বাণের অভিসন্ধি ত্যাগ কর অর্জুন। 'দৈব', কর্ণের মুখে 'দৈব'—কথাটা মহাভারতের কবির কানে লেগেছে তৎক্ষণাৎ স্বয়ং পুরুষোত্তম কৃষ্ণের মুখ দিয়ে মহাকবি বলিয়েছেন—বদমাশ লোকেরা যখন বিপদে পড়ে, তখনই দৈবের দোষ দেয়, নিজের বদমায়েশির কথা মনে করে না—

প্রায়েন নীচা ব্যসনে নিমগ্না নিন্দন্তি
দৈবং কুকৃতং ন তু স্বম্।

অর্থাৎ কবি বলছেন—না দৈব নয়, যিনি দৈবকে এতকাল ঘৃণা করে এসেছেন, তাঁর মৃত্যুর জন্য দৈব দায়ী হবে কেন, তার মৃত্যুর জন্য তিনি নিজেই দায়ী। তিনি কর্ণের অসহায় মৃত্যুর সমস্ত মানুষোচিত কারণগুলি একে একে কৃষ্ণের মুখে আবার স্মরণ করেছেন। কৃষ্ণ বলেছেন—যেদিন একটি মাত্র কাপড় পরা দ্রৌপদীকে তুমি আর দুর্যোধনের দল সবাই মিলে কুরুসভায় নিয়ে এসেছিলে সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যেদিন পাশাখেলায় অজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে অক্ষশৌণ্ড শকুনি জিতে নিল, সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল—ক্ব তে ধর্মস্তদা গতঃ?

যেদিন তোমার মত অনুসারে দুর্যোধন ভীমকে বিষ খাইয়েছিল—

আচরত্তন্মতে রাজা ক্ব তে ধর্ম স্তদা গতঃ।

—সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? তেরো বচ্ছর বনবাসে কাটিয়ে যেদিন পাণ্ডবেরা এসে তাঁদের রাজ্য-ভাগ চেয়েছিলেন এবং তোমরা এক টুকরো জমি দাওনি সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যেদিন বারণাবতের জতুগৃহে সমস্ত পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার মতলব করেছিলে, সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যেদিন রজস্বলা পাণ্ডববধূকে দুঃশাসনের হাতে ছেড়ে দিয়ে তুমি হাঃ হাঃ করে হেসেছিলে, সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল কর্ণ—

সভায়াং প্রাহসঃ কর্ণ ক্ব তে ধর্ম স্তদা গতঃ?

যেদিন সমস্ত নারীসমাজের মধ্যে থেকে টেনে এনে গজগামিনী কৃষ্ণাকে তুমি বলেছিলে—পাণ্ডবদের হয়ে গেছে দ্রৌপদী, তুমি অন্য কোনো স্বামী খুঁজে নাও, সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল, কর্ণ? রাজ্যের লোভে যেদিন শকুনি পাশাখেলায় পাণ্ডবদের হারিয়েছিল, সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যেদিন সমস্ত মহারথীরা একসঙ্গে মিলে একটি বাচ্চা ছেলে অভিমন্যুকে বধ করেছিলে, সেদিন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল, কর্ণ? এত শত সব ঘটনার মধ্যে যদি তুমি এতকাল ধর্মানুষ্ঠান না করে থাক, তা হলে এখন আর 'ধর্ম' 'ধর্ম' করে গলার তালু শুকিয়ে কী হবে—কিং সর্বথা তালুবিশোষণেন? আর এখন এই মুহূর্তে যদি তুমি খুব ধর্মপরায়ণও হয়ে ওঠ, তবু এখন আর তোমার রক্ষা নেই।

দেখা যাচ্ছে, সারা জীবন ধরে দুর্যোধন যত অপকর্ম করেছেন, তার সবকিছুরই দায় এসেছে কর্ণের ওপর। কৃষ্ণের আক্ষেপোক্তি শুনে এই প্রথম এবং এই শেষবারের মতো কর্ণের মাথাটা লজ্জায় নত হয়ে গেল, এক পংক্তি উত্তর পর্যন্ত তাঁর মুখে জোগাল না—

লজ্জয়াবনতো ভূত্বা নোত্তরং কিঞ্চিদুক্তবান্।

মহাভারতের কবি বলতে চাইলেন—দৈব নয়, এতগুলি স্বকৃত অন্যায়ের জন্যই কর্ণ আজ এত অসহায়। তিনি যা করেছেন এবং করেননি, তা সবই তিনি চুকিয়ে দিয়েছেন নিজের অসহায় মৃত্যু দিয়ে। কর্ণের মতো মহান যোদ্ধা কিন্তু বীরের মতো যুদ্ধ করতে করতে মারা গেলেন না, মাটিতে নিরস্ত্র, অবস্থায় দাঁড়িয়ে রথের চাকা তোলার চেষ্টা করতে করতে অর্জুনের নিক্ষিপ্ত অঞ্জলিক অস্ত্রের আঘাতে কর্ণের ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে। কৌরব শিবিরে জয়ের আশাও শেষ হয়ে গেল কর্ণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে।

□ কর্ণের জীবনের অন্যায়গুলি মহাভারতের কবি যেমন মেনে নেননি, তেমনই আজীবন বঞ্চিত কর্ণের প্রতি মায়াও তাঁর কিছু কম নেই। কর্ণের মৃত্যুর পরেও কর্ণের বীরত্ব কিংবা যোদ্ধা হিসেবে তাঁকে যথাযথ মর্য্যাদা দেবার ক্ষেত্রে মহাকবির মমত্ব বা দায়িত্ববোধের কোনো অভাব

ছিল না। মহাভারতের শল্যপর্বে দুর্যোধন বধের পর যখন পাণ্ডবরা শিবিরে ফিরে চলেছেন, সে সময় কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—অর্জুন! তোমার গাণ্ডীব ধনুক আর অক্ষয় তূণ দুটি নিয়ে তুমি এই রথ থেকে নেমে যাও। তারপর আমিও রথ থেকে নামব। কৃষ্ণের কথামতো অর্জুন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রথ থেকে নামলেন। তারপর কৃষ্ণ রথের ঘোড়াগুলিকে মুক্ত করে দিয়ে রথ থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে কপিধ্বজ রথের ধ্বজায় অবস্থিত অলৌকিক বানর অন্তর্ধান করল, তারপর রথটি যেন এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হল। ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের বলেছেন যে, যুদ্ধের আঠারদিনে দ্রোণ এবং কর্ণের নিক্ষিপ্ত নানা দিব্য অস্ত্রের প্রভাবে রথটি প্রায় দগ্ধ হয়েই ছিল। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং সেই রথে অবস্থান করছিলেন বলেই রথটি এখনও পর্যন্ত ঠিক ছিল, ধ্বংস হয়নি। আজ অর্জুন কৃতকার্য হয়েছেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়েছে দেখে কৃষ্ণ রথটিকে আজ ত্যাগ করলেন, রথটিও তাই দিব্যাস্ত্রের প্রচণ্ড আঘাতে আজ ধ্বংস হল। লক্ষণীয়, অর্জুনের কপিধ্বজ রথ ধ্বংস হবার কারণ হিসেবে যে দুজন মহারথ যোদ্ধার নাম কবি আমাদের একত্রে জানালেন, তাঁদের একজন কিন্তু পাণ্ডবদের আচার্য দ্রোণ আর অপরজন কিন্তু কর্ণ—

স দগ্ধো দ্রোণকর্ণাভ্যাং দিব্যৈরস্ত্রৈর্মহারথঃ।

আমরা পাঠককে জানাতে চাই—কর্ণের বীরত্বকে দ্রোণাচার্যের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে যে মর্যাদা কবি দিলেন, তা কিন্তু শুধুমাত্র কর্ণের প্রতি তাঁর কবিজনোচিত মমত্ববোধ—তা নয়। বস্তুত অর্জুনের কাছে বারংবার পরাস্ত হলেও কিংবা বারংবার ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও কর্ণ যে সে সময়ের অত্যন্ত বিখ্যাত এবং পরাক্রমশালী যোদ্ধা ছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। নানা জটিলতায়, নানা বঞ্চনায় নানা পাপকর্মের সমন্বয়ে যে কর্ণকে আমরা মহাভারত মহাকাব্য থেকে চিনতে পারি, তিনি একদিকে যেমন একজন ভাগ্যহত, বঞ্চিত মানুষ অন্যদিকে মহাকাব্যের অন্যতম প্রতিনায়কও বটে। মহাভারতের কর্ণকে বোধ করি খুব সংক্ষেপে একটাই পরিচয়ে সংজ্ঞিত করা চলে—তিনি কৌন্তেয় হয়েও কৌন্তেয় নন, পাণ্ডব হয়েও পাণ্ডব নন, নায়কোচিত ব্যক্তিত্বযুক্ত হয়েও নায়ক নন, আবার পুরোপুরি প্রতিনায়কও হয়তো নন—তিনি শুধুমাত্রই রাধেয়। রাধেয় বসুষেণ, কর্ণ।

কর্ণ২ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের মধ্যে কর্ণ একজন।

[মহা (k) ১.৬৭.৯৫; ১.১১৭.৩; (হরি) ১.৬২.৯৭; ১.১১১.৩]

☐ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ষষ্ঠ দিনে কর্ণ প্রভৃতি দশজন ধার্তরাষ্ট্র ভীমসেনকে আক্রমণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ৬.৭৭.৮; (হরি) ৬.৭৪.৭১]

কর্ণ৩ পুরুবংশীয় রাজা দুষ্যন্তকে তুর্বসু বংশের নিঃসন্তান রাজা মরুত্ত দত্তক নিয়েছিলেন। দুষ্যন্তের যে পুত্র পৌত্ররা তুর্বসুর বংশধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কর্ণ। দুষ্যন্তের পুত্র বরূথ; এই বরূথের পৌত্র তথা অণ্ডীরের পুত্র ছিলেন কর্ণ।

[মৎস্য পু. ৪৮.৪-৫]

কর্ণক অত্রিবংশীয় একজন ঋষি। পুরাণে তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হিসেবে।

[মৎস্য পু. ১৪৫.১০৮]

কর্ণজিহ্ব পুরাণে মহর্ষি অত্রির গোত্রভুক্ত যেসব বংশপ্রবর্তক ঋষিদের উল্লেখ পাওয়া যায়, মহর্ষি কর্ণজিহ্ব তাঁদের মধ্যে একজন। মহর্ষি কর্ণজিহ্ব এবং তাঁর বংশধররা মহর্ষি অত্রি থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় আত্রেয় নামে পরিচিত।

[মৎস্য পু. ১৯৭.৩]

কর্ণদা একটি পৌরাণিক (mythical) নদী। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, কর্ণদা কীকট দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী। এই নদীতে শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করলে পিতৃগণ স্বর্গলাভ করেন।

[বৃহদ্ধর্ম পু. (মধ্য) ২৬.২২]

কর্ণনির্বাক একজন ঋষি। মহাভারতে শান্তিপর্বে এঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে বানপ্রস্থ ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে। বানপ্রস্থ অবলম্বনের মাধ্যমে যাঁরা স্বর্গলাভ করেছিলেন কর্ণনির্বাক তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ১২.২৪৩.১৮; (হরি) ১২.২৪১.১৮]

কর্ণপ্রাবরণ *[দ্র. কুথপ্রাবরণ]*

কর্ণপ্রাবরণা স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.২৫; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ২৫ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৯)]

কর্ণবিট্‌কুণ্ড এক প্রকার নরক। যে ব্যক্তি কোনো বধিরকে দেখে উপহাস করে, সেই ব্যক্তি কর্ণবিট্‌কুণ্ডে পতিত হয়। কর্ণবিট্‌কুণ্ডে সেই ব্যক্তিকে একশো বছর পর্যন্ত কর্ণমল ভক্ষণ করতে হয়। *[দেবী ভাগবত পু. ৯.৩২.১০; ৯.৩৩.৩৩-৩৪; ৯.৩৭.২১]*

কর্ণবেধ ষোড়শ সংস্কারের অন্তর্গত এও একটা সংস্কার। সোজা অর্থ কানের লতিতে ফুটো করা। খেয়াল করে দেখবেন—এখন মাথা ন্যাড়া করা, কান ফুটো করা—সবই হয় পৈতের সময় কিন্তু পূর্বকালে এগুলি সবই করতে হত পৈতের আগে। গৃহ্যসূত্রগুলি প্রায়ই এই কর্ণবেধের কথা উল্লেখ করেননি, তার কারণটাও পরিষ্কার। আসলে কান ফুটো করার মূল উদ্দেশ্য ছিল শরীরের অলংকরণ। প্রাথমিকভাবে এটি কোনো ধর্মীয় সংস্কারের অঙ্গ ছিল না। পরবর্তী স্মৃতিগুলিতে কর্ণবেধ ভালোভাবে স্থান করে নিয়েছে বলেই বলতে পারি, প্রাচীনেরা একেবারে রুক্ষ-শুষ্ক ছিলেন না। কানে দুল পরে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে তাঁদের কিছু আকর্ষণ ছিলই, নইলে, এটা সংস্কারে পরিণত হয় কী করে! তবে সেকালের প্রধান বৈদ্য সুশ্রুত কিন্তু খুব বাচ্চা অবস্থাতেই কান ফুটো করে দেবার পক্ষপাতী। তাঁর মতে এতে অলংকরণের সুবিধে রইলই, উপরন্তু তাঁর মতে অল্প বয়সে কানের লতির ওপরে শাঁখের মতো জায়গাটায় ফুটো করে দিলে নাকি 'হাইড্রোসিল' বা 'হার্নিয়া'র মতো অন্ত্রবৃদ্ধির অসুখ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে—

শঙ্খোপরি চ কর্ণান্তে ত্যক্ত্বা যত্নেন সেবনীম্।
ব্যত্যাসাদ্‌বা শিরাং বিধ্যেদ্ অন্ত্রবৃদ্ধিনিবৃত্তয়ে॥

প্রামাণিক গৃহ্য সূত্রগুলির কোনোটিতেই কর্ণবেধকে সংস্কার হিসেবে গ্রহণ করা না হলেও পারস্কর গৃহ্যসূত্রের প্রথমকাণ্ডের শেষে 'পিতা শিশুর নামকরণ করছেন'—এমন একটি বাক্যের শেষে পারস্কর গৃহ্যসূত্রের টীকাকার গদাধর প্রথম কাণ্ডের সপ্তদর্শী কণ্ডিকার পর সংস্কারগুলির 'পদার্থক্রম' হিসেবে পরপর কতগুলি সংস্কারের পদ্ধতি উল্লেখ করে 'কর্ণবেধ' প্রসঙ্গে এসেছেন। সেখানে তিনি প্রথমেই বললেন—অথ কর্ণভেদঃ। তত্র যাজ্ঞিকা পঠন্তি—অর্থাৎ 'এবার কর্ণবেধের কথা। এ ব্যাপারে যাজ্ঞিকেরা এইরকম বলেন'। সেই প্রাচীন যাজ্ঞিকদের মত হল—জন্মের পর তিন মাস বা পঞ্চম মাসে কর্ণভেদ অনুষ্ঠানের সময় বাচ্চার ডান কানের কাছে 'ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা' এই মন্ত্র পড়তে হবে, আর বাঁ কানের কাছে,

'বক্ষ্যন্তীবেদা গণীগন্তি কণম্'।

মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে। তারপর কর্ণভেদ। হরিহর হেমাদ্রির চতুবর্গচিন্তামণি থেকে ব্যাসের বচন উদ্ধার করে বলেছেন প্রথম, সপ্তম, অষ্টম, দশম অথবা দ্বাদশতম মাসে কর্ণবেধ অনুষ্ঠান শুভপ্রদ হয়। তিনি হেমাদ্রি থেকেই দেবলবচন উদ্ধার করে কর্ণবেধে কোন জাতির পক্ষে কোন ধাতুর সূচ ব্যবহার করতে হবে সেটা জানিয়ে বলেছেন—রাজপুত্রের কর্ণবেধ করতে হবে সোনার সূচ দিয়ে এবং সেটা হাতের মধ্যমার মাপ মতো লম্বা হবে। ওই একই প্রকারের রুপোর সূচ ব্যবহার হবে ব্রাহ্মণ অর বৈশ্যের বেলায়। আর শূদ্রের সূচ হবে লোহার তৈরি। লক্ষণীয়, শূদ্রের উপনয়ন হবে না ঠিকই, কিন্তু তার কর্ণভেদ অনুষ্ঠান কিন্তু হবে।

[সুশ্রুত সংহিতা (Jadavji Trikamji), চিকিৎসা স্থান ১৯.২৪; পারস্কর গৃহ্যসূত্র (Benares, 1895) পৃ. ২৩৯]

কর্ণবেষ্ট যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক একজন রাজা। মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত অংশাবতরণ পর্ব থেকে জানা যায় যে, দ্বাপর যুগে ক্রোধবশ অসুরদের অংশে যেসব রাজা মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, রাজা কর্ণবেষ্ট তাঁদের মধ্যে একজন। মহাভারতের উদ্যোগপর্বের সূচনায় পাণ্ডবরা নিজেদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য যেসব রাজাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কর্ণবেষ্টও ছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.৬০; ৫.৪.১৫; (হরি) ১.৬২.৬১; ৫.৪.১৫]

কর্ণমোটী অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। কর্ণমোটী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ১৭৯.১৫]

কর্ণশ্রবা পাণ্ডবরা দ্বৈতবনে বসবাস করার জন্য উপস্থিত হলে সেই বনে বসবাসকারী যেসব

বিশিষ্ট তপস্বী ব্রাহ্মণ তাঁদের স্বাগত জানিয়েছিলেন কর্ণশ্রবা তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৩.২৬.২৩; (হরি) ৩.২৩.২৩]

কর্ণাটক দক্ষিণ ভারতের একটি জনপদ। এর একটি অংশ দক্ষিণ কর্ণাটক রূপে পরিচিত। এর আরেক নাম কর্ণাট। *[মহা (k) ৬.৯.৫৯; (হরি) ৬.৯.৫৯; ভাগবত পু. ৫.৬.৭]*

□ পুরাণ অনুসারে রাজা দুষ্মন্তের চার প্রপৌত্রের নাম হল—পাণ্ড্য, কেরল, চোল ও কর্ণ। *[মৎস্য পু. ৪৮.৪-৫]*

লক্ষণীয় যে, দুষ্মন্তের প্রায় প্রতিটি প্রপৌত্রের নামেই কোনো না কোনো প্রাচীন জনপদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন—পাণ্ড্যদেশ, কেরল বা চোল ইত্যাদি। সেই সূত্রে ধারণা করতে পারি যে, হয়তো বা দুষ্মন্তের প্রপৌত্র কর্ণের নামানুসারেই কর্ণাট দেশটির নামকরণ হয়ে থাকতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আধুনিক কর্ণাটক রাজ্য আর প্রাচীন কর্ণাট বা কর্ণাটক কিন্তু এক নয়। বর্তমান তামিলনাড়ু রাজ্যের অন্তর্গত রামনাথপুরম্ ও কর্ণাটক রাজ্যের শ্রীরঙ্গপত্তম্ শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রাচীন কর্ণাট জনপদটির অবস্থান ছিল বলে মনে করা হয়। কর্ণাটেরই আরেক নাম কুন্তলদেশ।

□ পণ্ডিতরা মনে করেন যে, মাইসোর, কুর্গ এবং চেদেড় (Ceded) জেলাগুলি কর্ণাটের অন্তর্গত ছিল। *[GDAMI (Dey) p. 94]*

কর্ণান্ত গরুড় পুরাণ অনুসারে স্বারোচিষ মনুর পুত্রদের মধ্যে কর্ণান্ত একজন।

[গরুড় পু. ১.৮৭.৫]

কর্ণিকা[১] একজন বিশিষ্ট অপ্সরা। অর্জুনের জন্মোৎসবে যেসব অপ্সরা নৃত্য-গীত পরিবেশন করেছিলেন কর্ণিকা তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.১২৩.৬৪; (হরি) ১.১১৭.৬৮]

কর্ণিকা[২] বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কঙ্কের পত্নী। কঙ্কের ঔরসে কর্ণিকার গর্ভে ঋতধামা এবং জয় নামে দুই পুত্র হয়। *[ভাগবত পু. ৯.২৪.৪৪]*

কর্ণিকার পক্ষীরাজ জটায়ুর পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন কর্ণিকার। *[মৎস্য পু. ৬.৩৬]*

কর্ণিকারমহাস্রগ্বী শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের একটি। 'স্রক্' শব্দটি সংস্কৃত 'সৃজ্' ধাতু থেকে আসছে। 'সৃজ্' ধাতুর সঙ্গে 'ক্বিপ' প্রত্যয় করলে নিষ্পন্ন রূপটি হয় 'স্রজ্', একবচনে 'স্রক্'। যা শোভাবর্ধন করে শোভা সৃজন করে এই অর্থে স্রক্ শব্দের একটি অর্থ হল মালা। কর্ণিকার শব্দের অর্থ কনকচাঁপা ফুল। মহাদেব কণ্ঠে সুন্দর কনকচম্পা পুষ্পের মালা ধারণ করেন; তাঁকে সেই কনকচম্পা নির্মিত পুষ্পমালাধারী মূর্তিতে কল্পনা করে কর্ণিকারমহাস্রগ্বী নামে কীর্তিত করা হয়। টীকাকার নীলকণ্ঠ এই দৃষ্টিকোণ থেকেই মহাদেবের এই নামের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন—

কর্ণিকারপুষ্পময়ী মহতী স্রক্ মালা
তদ্বান্ কর্ণিকারমহাস্রগ্বী।

[মহা (k) ১৩.১৭.১৩৭; (হরি) ১৩.১৬.১৩৬]

□ কর্ণিকার ফুলের অগ্নিবর্ণ আভা মহাদেবের অগ্নিস্বরূপতার প্রতীক—এ ভাবনাও করেন অনেকে। তবে কর্ণিকার বা কনকচাঁপা ফুল যে মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয় তার উল্লেখ পাই মহাভারতে। সুমেরু পর্বতের উত্তরে কর্ণিকার ফুলের এক বন আছে, এবং মহাভারতে উল্লেখ পাই যে, মহাদেব সেই বনে দেবী পার্বতীর সঙ্গে বিহার করেন এবং চরণ পর্যন্ত লম্বিত কর্ণিকার ফুলের মালা পরিধান করেন। আর সেই মালার দীপ্তি আর মহাদেবের উজ্জ্বল গাত্রবর্ণের সমন্বয়ে যেন সূর্যের মতো আলোকছটা সৃষ্টি করে—

পার্শ্বে তস্যোত্তরে দিব্যং সর্বর্তুকুসুমৈশ্চিতম্।
কর্ণিকারবনং রম্যং শিলাজালসমুদ্গতম্॥
তত্র সাক্ষাৎ পশুপতির্দিব্যৈর্ভূতৈঃ সমাবৃতঃ।
উমাসহায়ো ভগবান্ রমতে ভূতভাবনঃ॥
কর্ণিকারময়ীং মালাং বিভ্রৎ-পাদাবলম্বিনীম্।
ত্রিভির্নেত্রৈঃ কৃতোদ্যোতস্ত্রিভিঃ
সূর্যৈরিবোদিতৈঃ॥

[মহা (k) ৬.৬.২৪-২৬; (হরি) ৬.৬.২৪-২৬]

□ কনকচাঁপা ফুল মহাদেবের প্রিয় বলেই মহাদেবের পূজাবিধিতেও এই ফুল দিয়ে পূজা করার কথা বলা হয়েছে।

কর্ণীর কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত একজন নাগ। *[বায়ু পু. ৬৯.৬৯]*

কর্তৃণ পুরাণে ঋষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে ঋষি বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, কর্তৃণ সেই গোত্রের অন্যতম। ঋষি অঙ্গিরার বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এঁরাও আঙ্গিরস বলে পরিচিত।

[মৎস্য পু. ১৯৬.৩৯]

কর্ত্রী কালিকা পুরাণ অনুসারে দেবী কালীর অষ্ট যোগিনীর মধ্যে একজন কর্ত্রী।

[কালিকা পু. ৬১.৯২]

কর্দম১ ভারতীয় আর্য সভ্যতার প্রথম বিকাশের সময় যাঁরা বংশবৃদ্ধি করে বিভিন্ন মনুষ্য প্রজাতি তৈরি করেছিলেন, তাঁদের প্রজাপতি বলা হয়। কর্দম এমনই এক প্রজাপতির নাম। মহাভারতের শান্তিপর্বে ব্রহ্মা, স্থাণু, মনু, দক্ষ ইত্যাদি একুশ জন প্রজাপতির মধ্যে কর্দমের নামও কীর্তিত হয়েছে—

এক বিংশতিরুৎপন্নাস্তে প্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ।

প্রজাপতি ঋষিদের সংখ্যা এবং নাম নিয়ে অনেক মতবিরোধ, এমনকী স্ববিরোধও আছে। ব্রহ্মার সেই বিখ্যাত মানস-পুত্রেরা-যাঁদের সংখ্যা সাত ছিল, সেই তালিকায় ভৃগু, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্যরাও কখনো অন্য নামে আবর্তিত হয়েছেন একই গ্রন্থের মধ্যে—মহাভারতে কিংবা পুরাণে। সেই তালিকায় কর্দম কখনো স্থান পেয়েছেন, আবার কখনো তাঁকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে অন্য প্রজাপতিদের জন্য। রামায়ণে যে তালিকা পাওয়া যায়, তার প্রথমে আছেন প্রজাপতি কর্দম—

কর্দমঃ প্রথমস্তেষাং বিকৃতস্তদনন্তরঃ।

আমরা মহাভারতে ব্রহ্মার সভায় যেসব মুনি-ঋষিদের অবস্থান দেখেছি, সেখানে বলা হয়েছে বিশিষ্ট প্রজাপতি ঋষিরাও সেখানে ছিলেন—প্রজানাং পতয়ঃ প্রভুম্। এই প্রজাপতিদের মধ্যে দক্ষ, প্রচেতা, পুলহ, মরীচি প্রভৃতির সঙ্গে কর্দম ঋষিও আছেন একই পংক্তিতে—

পুলস্ত্যশ্চ ক্রতুশ্চৈব প্রহ্লাদঃ কর্দমস্তথা।

মহাভারতে কর্দম ঋষি প্রজাপতি হিসেবেই বেশি উল্লিখিত কিন্তু যেটা আশ্চর্যের বিষয়, সেটা হল—ভাগবত পুরাণে তিনি পরমর্ষি কপিলের পিতা হিসেবেই বিখ্যাত হয়েছেন, কিন্তু মহাভারতে কর্দম ঋষিকে কপিলের পিতা হিসেবে কোথাওই দেখতে পাই না। একটি সূত্রে দেখি কর্দমের পুত্র অনঙ্গ। মহাভারতে একটি স্থানে একজন কর্দমকে দেখতে পাই যার পূর্বপুরুষ ভগবন্নারায়ণের সৃষ্ট বিরজা (বিরজস্)। এখানে দেখা যাচ্ছে, ভগবান বিষ্ণুও একজন প্রজাপতি। একসময় দেবতারা তাঁকে এসে বললেন যে, এই সমস্ত মানবকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষটি কে, আপনি জানান আমাদের। তাতে ভগবান বিষ্ণু তাঁর মানসপুত্র হিসেবে তৈজস্ বিরজা-কে উৎপন্ন করলেন—

তৈজসং বৈ বিরজসং সো'সৃজন্মানসং সুতম্।

বিরজাঃ বা বিরজস্ শব্দের তাৎপর্যে, উপনিষদ বুঝিয়েছে জন্মরহিত অজ আত্মাকেই এবং একই সঙ্গে তাঁকে 'মহান্' বলায় সাংখ্যদর্শনোক্ত 'মহান্' শব্দের অর্থ প্রকৃতির প্রথম প্রকট রূপ ব্রহ্মাকেও বোঝাতে পারে—

বিরজঃ পর আকাশাদ্ অজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ।

এই বিরজা কিন্তু এই পৃথিবীর ওপর প্রভুত্ব করতে রাজী হলেন না। সন্ন্যাস এবং বৈরাগ্যের দিকেই তাঁর মন সমাহিত হল। এই বিরজার পুত্র হলেন কীর্তিমান্। তিনিও এমন মানুষ হলেন যে, পঞ্চেন্দ্রিয় জয় করে বৈরাগ্যের সিদ্ধিটাকেই বড়ো বলে মনে করলেন। সেই কীর্তিমানের পুত্র ছিলেন কর্দম, তিনিও গভীর তপস্যাতেই আত্মনিয়োগ করলেন, যদিও তাঁর যে পুত্রটি হল, সেই পুত্রের নাম অনঙ্গ, তিনি রাজনীতি-দণ্ডনীতিতে অভিজ্ঞ, তিনি প্রজারক্ষার জন্য রাজা হলেন—

কীর্তিমান্ তস্য পুত্রো'ভূৎ সো'পি
পঞ্চাতিগো'ভবৎ।
কর্দমস্তস্য তু সুতঃ সো'প্যতপ্যন্মহত্তপঃ॥
প্রজাপতেঃ কর্দমস্য ত্বনঙ্গো নাম বৈ সুতঃ।
প্রজারক্ষয়িতা সাধুর্দণ্ডনীতিবিশারদঃ॥

লক্ষণীয়, মহাভারতের রাজধর্ম সূত্রাধ্যায়ে কর্দম এখানে প্রজাপতি হলেও, তিনি কিন্তু এক রাজার জন্মদাতা, যার নাম অনঙ্গ। পুরাণোক্ত পরমর্ষি কপিলের পিতা কর্দমের সঙ্গে এই প্রজাপতি কর্দম কীভাবে অভিন্ন হতে পারেন। নাকি এই মহাতপা মহর্ষির ওপরেই পরমর্ষির কপিলের জন্মদাতার গৌরব আরোপিত হয়েছে ভাগবত পুরাণে।

[রামায়ণ ২.১১.১৮-১৯;
মহা (k) ১২.৩৩৪.৩৫-৩৭; ১২.৫৮.৮৭-৯১;
(হরি) ১২.৩২০.৩৫-৩৭; ১২.৫৮.৮৭-৯১;
বৃহদারণ্যক উপনিষদ (দুর্গাচরণ), ৪.৪.২০, পৃ. ১২৬৫]

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও এক রাজার পিতা হিসেবে কর্দম প্রজাপতির নাম পাচ্ছি। এখানে বিরজা বা বিরজস্-ও এক প্রজাপতি, কিন্তু তাঁর ছেলের নাম সুধন্বা। মহাভারতের মতো তিনি কীর্তিমান নন। কিন্তু বিরজার অন্য এক পুত্রের নাম কেতুমান্। আবার কর্দমকেও এখানে সুধন্বার পুত্র বলে বলা হচ্ছে না। তিনি যেন পৃথক এক patriarch বা প্রজাপতি এবং তাঁর পুত্রের নাম শঙ্খপদ, যাঁকে তিনি রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করেছিলেন দক্ষিণ দিকে। কর্দম প্রজাপতির মেয়ের নাম কাম্যা।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.১৭-২০]

পুরাণগুলিতে অনেক সময়েই কর্দম-ঋষিকে প্রজাপতি বলে উল্লেখ করছে বটে, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁকে পুলহের ঔরসে তাঁর ক্ষমা-নাম্নী স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র বলে বলা হচ্ছে। কর্দমের স্ত্রীর নাম শ্রুতি, পুত্রের নাম শঙ্খপদ এবং মেয়ের নাম কাম্যা। বহুল তপস্যা এবং জ্ঞানের দ্বারাই কর্দম প্রজাপতি ঋষি তথা দেবর্ষি-পদবাচ্য হয়েছেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১১.২৩, ৩১-৩২; ১.৩২.৯৯; ১.৩৫.৯৪; ২.৮.১৮; ২.১০.৯৩; বায়ু পু. ৩.৩; ২৮.১৯, ২৫-২৯; ৩৩.৭; ৩৮.৭; ৫৯.৯১; ৬১.৮৪; ৬৫.৫৩; মৎস্য পু. ১৪৫.৯৩; ১৯৯.১৬; বিষ্ণু পু. ১.১০.১০-১১]

ভাগবত পুরাণের মতে ব্রহ্মা তাঁর মানস পুত্র কর্দম ঋষিকে বংশবৃদ্ধিকর সন্তান উৎপাদন করার আদেশ দিলে কর্দম সরস্বতী নদীর তীরে বসে তপস্যা আরম্ভ করেন। তপস্যায় তুষ্ট ভগবান বিষ্ণুর কাছে তিনি অনুরূপা স্ত্রী প্রার্থনা করেন—এমন স্ত্রী যিনি তাঁর ধর্মসহায় হবেন। ভগবান বিষ্ণু বলেন—স্বয়ং মনু তাঁর কন্যা দেবহূতির জন্য অনুরূপ স্বামী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে আগামী পরশু আসবেন তোমার কাছে। তুমি তাঁর মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ কোরো। তুমি তাঁর গর্ভে নয়টি কন্যার জন্ম দেবে, পর্যায়ক্রমে সেই কন্যারা পুনরায় বহুতর ঋষিদের ঔরসে বহু পুত্র উৎপাদন করবে। ভগবান বিষ্ণু শেষে বললেন—তারপর আমিও আমার আপন অংশকলায় তোমার বীর্য্যসহ দেবহূতির গর্ভমধ্যে প্রবেশ করবো এবং তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে প্রকৃতি-পুরুষ-ঈশ্বর সম্বন্ধে এক মহান তত্ত্বগ্রন্থ রচনা করবো—

সহাহং স্বাংশকলয়া ত্বদ্‌বীর্য্যেণ মহামুনে।
তব ক্ষেত্রে দেবহূত্যাং প্রণেষ্যে তত্ত্বসংহিতাম্॥

যেমন বলেছিলেন ভগবান বিষ্ণু, ঠিক সেইভাবেই মনু তাঁর স্ত্রী শতরূপা এবং কন্যা দেবহূতিকে নিয়ে কর্দম ঋষির আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। পরস্পরের কুশল বিনিময়ের পর মনু-মহারাজ কন্যা দেবহূতির প্রসঙ্গ তুলে বললেন—আমার এই কন্যা প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদের ভগিনী। এর নাম দেবহূতি। দেবর্ষি নারদের মুখে আপনার চরিত্র, পাণ্ডিত্য এবং গুণের কথা শুনে সে আপনাকেই পতি হিসেবে বরণ করেছে। আমি তাই সশ্রদ্ধভাবে এই কন্যাকে আপনার কাছে পৌঁছে দিতে এসেছি। আর আমি এটাও শুনেছি যে আপনি নিজেও বিবাহ-বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। অতএব আমার এই কন্যাকে আপনি আপনার গার্হস্থ্য জীবনের সহায় হিসেবে গ্রহণ করুন।

কর্দম ঋষি মনুর প্রার্থনা স্বীকার করে নিলেন সানন্দে এবং দেবহূতির চরিত্র এবং রূপগুণের প্রশংসা করে বললেন—আপনার মেয়ের শরীর-লাবণ্য এবং অঙ্গকান্তিতে স্বর্ণালংকারের শোভা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আমি এও জানি যে, আপনার মেয়ে একসময় আপনার প্রাসাদের উপরিতলে দাঁড়িয়ে কন্দুক-ক্রীড়া করছিলেন এবং কন্দুকের দিকেই তাঁর সমস্ত নজর ছিল। এই অবস্থায় তাঁর পায়ে নূপুর বেজে চলছিল, সেই শিঞ্জিনী-মুখর চরণ দুটি দেখে গন্ধর্ব বিশ্বাবসু এতই মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন যে, তিনি বিমান থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। তবে এই রূপের চাইতেও আপনার কন্যার আরও বড়ো পরিচয়—তিনি আপনার মেয়ে এবং তিনি প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদের ভগিনী।

কর্দম ঋষি দেবহূতিকে বিবাহ করার সম্মতি জানানোর পর বললেন—কিন্তু যে কাল পর্যন্ত ইনি আমার তেজ ধারণ করে গর্ভবতী না হন, সেই কাল পর্যন্ত আমি তাঁর সঙ্গে থাকবো, তারপর আমি আবার ভগবান বিষ্ণুর আরাধনায় আত্মনিয়োগ করবো। মনু কর্দমের তপস্বী-চরিত্র অঙ্গীকার করে নিয়েই দেবহূতিকে কর্দমের হাতে কন্যা-সম্প্রদান করলেন, যৌতুক হিসেবে দিলেন অনেক বসন, ভূষণ এবং বহুতর গার্হস্থ্যের উপকরণ। তারপর কন্যা দেবহূতি এবং জামাতা কর্দম ঋষির কাছে বিদায় নিয়ে মনু এবং শতরূপা নিজেদের ঘরে ফিরে গেলেন।

[ভাগবত পু. ৩.২১.৬-৮, ২৫-৩২, ৩৫-৩৭; ৩.২২.৮-২৫]

বিবাহের পর দেবহূতি স্বামী কর্দমের সার্থক সহধর্মচারিণী হয়ে উঠলেন। কামনা, কপটতা, লোভ, দ্বেষ, অহঙ্কার, ধর্ম-নিষিদ্ধ অভিনিবেষ ত্যাগ করে বিশ্বাস, শুচিতা, স্বামীর গৌরব, সৌহার্দ্য এবং মধুর ভাষণে কর্দম ঋষিকে তিনি এতটাই সেবা করলেন যে, একসময় তিনি সন্তুষ্ট হয়ে দেবহূতির প্রচুর প্রশংসা করলেন এবং জানালেন যে, স্বামীর সেবা করেই তিনি সিদ্ধিলাভ

করেছেন। স্বামীর একান্ত সন্তুষ্টির কথা জেনে দেবহূতি এবার সন্তান লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন কর্দমের কাছে। ঋষি কর্দম তাঁর ইচ্ছা পূরণ করার জন্য রমণোচিত বিলাসের ভাবনায় যোগবলে একটি দিব্য বিমান সৃষ্টি করলেন। সেই বিমানে সমস্ত ভোগের উপকরণ একত্র উপস্থিত ছিল। এমন একটা উপভোগ্য বিমান-গৃহ দেখেও দেবহূতি মনে মনে দুঃখ পেতে থাকলেন। তাঁর শরীর পূর্ব তপস্যা এবং সেবাবৃত্তিতে শীর্ণ। তাঁর শরীরটি পরিষ্কার করে স্নানানুলেপনে সজ্জিত করে দেবে, এমন কোনো পরিচারিকাও সেখানে নেই।

কর্দম ঋষি দেবহূতির মনের কথা বুঝে তাঁকে সম্মুখস্থ বিন্দু-সরোবরের জলে ডুব দিয়ে আসতে বললেন। বিন্দু-সরোবর সরস্বতী-নদীর জলে পরিব্যাপ্ত সরোবর। কর্দম ঋষির তপস্যায় ভগবান বিষ্ণু যখন পরম তুষ্ট হলেন, তখন তাঁর আনন্দাশ্রু ঝরে পড়েছিল কর্দমের তপস্যা-স্থলে, তাঁর আশ্রমে—

যস্মিন্ ভগবতো নেত্রান্ন্যপতন্ অশ্রুবিন্দবঃ।

সেই সানন্দ নেত্র-জল সরস্বতীর জলে মিশে তৈরি হয়েছিল বিন্দু-সরোবর। কর্দম ঋষির নির্দেশে সেই বিন্দু-সরোবরে ডুব দিয়ে আসতে জলে নামলেন দেবহূতি। তাঁর মাথার চুলে জটা পাকিয়ে গেছে, সারা গায়ে জমেছে নোংরা এবং তা এতটাই পুরু হয়ে উঠেছে যে, তাঁর স্তন-যুগল পর্যন্ত বিবর্ণ হয়ে গেছে—

অঙ্গঞ্চ মলপঙ্কেন সংছন্নং শবলস্তনম্।

এমনই চেহারা নিয়ে সরস্বতীর জলব্যাপ্ত বিন্দু-সরোবরে স্নান করতে নামলেন দেবহূতি। আর তখনই সেই আশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটল। দেবহূতি দেখলেন—সেই জলের মধ্যে একটা আস্ত বাড়ি। সেখানে অনেক অল্পবয়সী মেয়েরা রয়েছে, যারা সঙ্গে সঙ্গে দেবহূতিকে খুব ভাল করে স্নান করিয়ে দিল, পরিয়ে দিল মহার্ঘ্য বসন, সর্বাঙ্গীন অলঙ্কার, এমনকী রমণ-পূর্বকালীন উত্তেজনার জন্য সুস্বাদু আসবও পান করতে দিল দেবহূতিকে। দেবহূতি জল থেকে উঠে মহর্ষি কর্দমের সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করলেন।

বেশ কিছুদিন সেই দিব্য বিমানে নানা দেশ পরিভ্রমণের মধ্যেই নানান বিশ্রম্ভ-ভাবনার মধ্যে মহর্ষি কর্দম এবং দেবহূতির মিলন হল। মহর্ষি কর্দম যোগসিদ্ধ ঋষি, তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। তাঁর সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—তিনি আপন শরীরকে নয় ভাবে কল্পনা করে দেবহূতিকে নিষিক্ত করলেন। দেবহূতি অনেকগুলি কন্যা-সন্তান প্রসব করলেন। এই কন্যাদের নাম যথাক্রমে কলা, অনসূয়া, শ্রদ্ধা, হবির্ভূ, গতি, ক্রিয়া, খ্যাতি, অরূন্ধতী এবং শান্তি।

[ভাগবত পু. ৩.২১.৩৫-৩৮; ৩.২৩.২-৪৮; ৩.২৪.২১-২৪]

□ নয়টি কন্যার জন্ম হবার পর ঋষি কর্দম সংসার ত্যাগ করে ভগবানের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করবেন বলে মনস্থির করলেন। স্বভাবতই তাঁর পত্নী দেবদূতিও স্বামীর বৈরাগ্য-ভাবনাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করলেন না। কন্যাদের বৈবাহিক চিন্তাতেও তিনি আকুল হলেন না এতটুকুও। স্বামী কর্দমকে তিনি বললেন—আমাদের মেয়েরা বিবাহযোগ্য হলে তারা নিজেরাই নিজেদের অনুরূপ স্বামী খুঁজে নেবে, তাতে চিন্তার কিছু দেখি না—

ব্রহ্মন্ দুহিতৃভিস্তুভ্যং বিমৃগ্যাঃ পতয়ঃ সমাঃ।

কিন্তু আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে আমার দুঃখ যাবে কোথায়? আমি এতদিন গার্হস্থ্য ভোগের মধ্যেই জীবন কাটালাম আপনার সঙ্গে। আপনার বৈরাগ্য-ভাবনাও আমি তেমন করে বুঝিনি। আমি এটা জানি যে, অসৎ লোকের সংসর্গে থাকলে সেই সংসর্গ যেমন সংসার-বন্ধনের কারণ হয়, তেমনই সেই সংসর্গই যদি আপনার সাধুবৃত্তি মানুষের সঙ্গে হয়, তাহলে তা সংসার-নিবৃত্তির কারণ হয়ে ওঠে। অথচ কী নিষ্ঠুর এই বঞ্চনা যে, আপনার মতো মানুষকে স্বামী হিসেবে পেয়েও আমি মুক্তিলাভের কোনো চেষ্টা করিনি। দেবহূতির এই সংসার-বৈরাগ্য কর্দম ঋষি সানন্দে সমর্থন করে বলেছেন—তুমি নিজেকে ভাগ্যহীন ভাবছো কেন? অক্ষর-পুরুষ, পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ ভগবান শীঘ্রই তোমার গর্ভে প্রবেশ করবেন। তুমি নিয়ম-ব্রত পালন করে ভগবানের আরাধনা করো; যিনি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবেন, তিনিই তোমার সমস্ত ধর্ম-সংশয় মোচন করে তোমার সংসার-মুক্তির পথ বলে দেবেন।

দেবহুতি কর্দম ঋষির নির্দেশ মেনে নিজেকে ভগবদারাধনায় নিযুক্ত করলেন। এইভাবে বেশ কিছু কাল যেতেই ভগবান শ্রীহরি মহর্ষি কর্দমের তেজ আশ্রয় করে দেবহূতির গর্ভে প্রবেশ করলেন

এবং ভগবান বিষ্ণুর অংশে জন্মালেন পরমর্ষি কপিল। এরই মধ্যে স্বয়ং ব্রহ্মা মরীচি, পুলহ, ক্রতু এইসব পুত্রদের নিয়ে কর্দমের আশ্রমে এলেন এবং কর্দমকে আশীর্বাদ জানিয়ে তাঁর মেয়েগুলিকে যাচনা করলেন মরীচি ইত্যাদি ঋষিদের জন্য আর দেবহূতিকে সম্বোধন করে বললেন—তোমার এই পুত্রের কেশরাজি হবে সোনার মতো হিরণ্যবর্ণ, বহু-সুলক্ষণ তোমার এই পুত্র সিদ্ধ মহাপুরুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন এবং সমস্ত সাংখ্য-দার্শনিকেরা তাঁরই মত গ্রহণ করবেন—তাঁর নাম হবে কপিল—

অয়ং সিদ্ধগণাধীশঃ সাংখ্যাচার্যৈঃ সুসম্মতঃ।
লোকে কপিল ইত্যাখ্যাং গন্তা তে কীর্তিবর্ধনঃ॥

ভগবান ব্রহ্মা চলে গেলে কর্দমের ইচ্ছানুসারে দেবহূতি এবং কর্দম তাঁর নয় মেয়েকে বিবাহ দিলেন ব্রহ্মার পুত্রদের সঙ্গে। কন্যা কলাকে দিলেন মরীচির হাতে, অনসূয়াকে অত্রির হাতে; শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবাহ হল অঙ্গিরার, হবির্ভূ মহামুনি পুলস্ত্যের স্ত্রী হলেন। পুলহ পেলেন গতিকে, ক্রতু পেলেন ক্রিয়াকে, খ্যাতির সঙ্গে বিয়ে হল ভৃগুর, অরুন্ধতীর সঙ্গে বশিষ্ঠের, আর অথর্বা ঋষির সঙ্গে বিয়ে হল শান্তির।

[ভাগবত পু. ৩.২৩.৪৯-৫৭; ৩.২৪.১-২৬]

□ কর্দম-দেবহূতির মেয়েরা পিতার অনুমতি নিয়ে ঋষি-স্বামীদের আশ্রমে চলে গেলেন। তারপর কর্দমঋষি পুত্র কপিলের সামনে গেলেন নির্জন আশ্রমে। পুত্র হলেও তিনি যা করলেন, সেটা ভগবৎ-স্বরূপ-বোধে ভক্তের স্তব। কর্দম বললেন—যতি-মুনিরা ভক্তির পথে থেকে যাঁর পাদপদ্ম দর্শন করে পরম আনন্দ লাভ করেন, সেই ভগবান আজ আমার ঘরে এসেছেন, যদিও আমরা অতি দীন-হীন এবং নগণ্য। আপনি ভক্ত-বৎসল এবং ভক্তের ইচ্ছাপূরণ করার ব্যাপারে আপনার অকরণীয় কিছুই নেই। আপনি সাংখ্য-জ্ঞান উপদেশ করার জন্যই আমাদের ঘরে এসে জন্মেছেন। যদিও আপনি প্রাকৃত রূপের ঊর্ধ্বে, তবু অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপেও চতুর্ভুজ ইত্যাদি নানা রূপে ভক্তদের আনন্দ বিধান করেন। ছয় প্রকার ঐশ্বর্য্যের অধিকারী আপনি কপিল-রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, আমি আপনার শরণাপন্ন হলাম। ভগবান কপিল বললেন—বৈদিক এবং লৌকিক কৃত্যে আমার কথাই প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য হয়। আমিই আপনাকে বলেছিলাম আপনার পুত্র হয়ে জন্মাবো। সেই কথাটাকে সত্য করার জন্যই আমি আপনার পুত্র হয়ে জন্মেছি।

ভগবৎ-স্বরূপ কপিল আরও বললেন—আপনি যখন সংসার-বৈরাগ্যের কারণে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে চাইছেন, তখন আমি আপনাকে অনুমতি দিচ্ছি, আপনি স্বেচ্ছায় যেতে পারেন যেখানে আপনার মন চায়। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করে আপনি যদি মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতত্ত্ব-লাভের ইচ্ছে করে থাকেন, তাহলে আপনি আমাকেই ভজনা করবেন। আমি আমার মা দেবহূতিকেও অধ্যাত্ম-বিষয়ে জ্ঞানদান করবো, তাতে তিনি সংসার-ভয় থেকেও মুক্ত হবেন এবং পরম আনন্দ লাভ করবেন। কপিলের কথা শুনে ঋষি কর্দম ভগবদবতার-স্বরূপ কপিলকে প্রদক্ষিণ করে সানন্দে বনগমন করলেন এবং ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে অব্যভিচারিণী ভক্তিবলে আপন অভীষ্ট লাভ করলেন। স্থিতধী মুনির সমস্ত প্রজ্ঞায় সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সমস্ত ভূতবর্গকে অনুভব করলেন মহর্ষি কর্দম।

[ভাগবত পু. ৩.২৪.২৫-৪৭]

কর্দম২ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভারতে আস্তীকপর্বে সর্পনাম কথনের সময় তাঁর নামও উল্লিখিত হয়েছে। *[মহা (k) ১.৩৫.১৬; (হরি) ১.৩০.১৬]*

কর্দমাল *[দ্র. কর্দমিল]*

কর্দমিল সমঙ্গা নদীর নিকটে অবস্থিত একটি তীর্থ। এটি ভরতরাজার তীর্থরূপে খ্যাত, কারণ এখানেই তিনি রাজপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তীর্থটি শ্রাদ্ধকার্যের জন্য উৎকৃষ্ট। একে কর্দমাল তীর্থও বলা হয়। *[মহা (k) ৩.১৩৫.১; (হরি) ১.১০১.১; মৎস্য পু. ২২.৭৭]*

□ বায়ু পুরাণ মতে, কর্দমাল তীর্থটি গয়ায় মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্বতের কাছে গয়াসুরের নাভিস্থলের উপর অবস্থিত—

কর্দমালে গয়ানাভৌ মুণ্ডপৃষ্ঠসমীপতঃ।

এখানে ফল্গুচণ্ডী, শ্মশানাক্ষী, মঙ্গলা প্রভৃতির পূজা করা হয়।

[বায়ু পু. ১১২.৫৭-৫৮; অগ্নি পু. ১১৬.১৩]

কর্মজিৎ কুরুবংশীয় বৃহৎসেনের পুত্র কর্মজিৎ এবং কর্মজিতের পুত্র সুতঞ্জয়। *[ভাগবত পু. ৯.২২.৪৭]*

কর্মবতী যদু-বৃষ্ণি বংশীয় মথুরাধিপতি উগ্রসেনের কন্যাসন্তানদের মধ্যে অন্যতম।

[বায়ু পু. ৯৬.১৩৩]

কর্মশ্রেষ্ঠ পুলহ ঋষির ঔরসে গতির গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন কর্মশ্রেষ্ঠ।

[ভাগবত পু. ৪.১.৩৭]

কর্মার বায়ু পুরাণ মতে একজন বিশিষ্ট নাগ যিনি পাতালের পঞ্চম তল অর্থাৎ মহাতলে বসবাস করতেন। *[বায়ু পু. ৫০.৩৬]*

কর্মী দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের অন্যতম পুত্র।

[মহা (k) ১.৬৫.৩৭; (হরি) ১.৬০.৩৭]

কর্ম্মণ প্রজাপতি পুলহের ঔরসে দক্ষকন্যা ক্ষমার গর্ভজাত পুত্রদের অন্যতম কর্ম্মণ। অর্থবীর ও সহিষ্ণু নামে কর্ম্মণের দুজন ভ্রাতা ছিলেন।

[গরুড় পু. ১.৫.১৩-১৪]

কলবিঙ্ক একটি পবিত্র তীর্থ। এখানকার সুপ্রচুর জলরাশিতে স্নান করলে পুণ্যলাভ হয়।

[মহা (k) ১৩.২৫.৪৩; (হরি) ১৩.২৬.৪৩]

কলশ *[দ্র. কলশপোতক]*

কলশপোতক কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত নাগ। মহাভারতের আস্তীক পর্বে সর্পনাম-কথনের সময় তাঁর নাম এককভাবে উল্লিখিত হয়েছে। উদ্যোগপর্বে মাতলির কাছে ভোগবতী নগরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে নারদ সেখানে বসবাসকারী যেসব বিশিষ্ট কাদ্রবেয় নাগের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে কলশ এবং পোতক নামে দুই পৃথক নাগের নামোল্লেখ আছে যাঁরা একত্রে 'কলশপোতকৌ'—এইভাবে উল্লিখিত হয়েছেন। *[মহা (k) ১.৩৫.৭; ৫.১০৩.১১; (হরি) ১.৩০.৭; ৫.৯৬.১১]*

কলশীকণ্ঠ পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, কলশীকণ্ঠ সেই গোত্রের অন্যতম। ঋষি অঙ্গিরা থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এরাও আঙ্গিরস বলে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ১৯৬.২৭]*

কলশেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রখ্যাত তীর্থ। কলশ থেকে উত্থিত এই শিবলিঙ্গ মৃত্যুভয় দূর করে।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৯৯; পদ্ম পু. (আনন্দাশ্রম) স্বর্গ ৩৭.৭]

কলস একজন নাগ। পাতালের প্রথম তল বা 'অতলে' তাঁর বাসস্থান। *[বায়ু পু. ৫০.১৮]*

কলসীতীর্থ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি উপতীর্থ। এই তীর্থ দর্শনে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

[মহা (k) ৩.৮৩.৮০; (হরি) ৩.৬৮.৮০; পদ্ম পু. (নবভারত). স্বর্গ. ১২.৮০]

□ হরিয়ানার কৈথাল-কার্নাল সড়কের কাছে অবস্থিত দেবীগ্রহ গ্রামের ২ কিমি দূরে অবস্থিত একটি জলাশয় বিশেষ।

[Journal of Haryana Studies (Vol-21); Kurukshetra University; 1989; p. 37]

কলসোদর তারকাসুরকে বধ করার সময় যে সব অনুচর যোদ্ধা স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন কলসোদর তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৭২; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র., খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

কলা১ ইংরেজিতে যাকে আমরা fine arts, বা arts বলি, তারই নাম কলা, যেটাকে বাংলা ভাষাতেও কলা ছাড়া অন্য নামে অভিহিত করলে কলাবিদ্যার, অর্থ থাকে না। যাই হোক, পরবর্তী কালে চৌষট্টি কলা বলে যে প্রবাদটি বিখ্যাত হয়েছে, তার মূল কথাটা যেহেতু কলা, সেটা মহাভারতে নৃত্য-গীত অর্থেই প্রাথমিকভাবে ব্যবহার হয়েছে। গাণ্ডীবধন্বা অর্জুন যখন বৃহন্নলার পরিচয়ে বিরাটগৃহে প্রবেশ করলেন, তখন অর্জুন নিজের প্রসঙ্গে বলেছিলেন—আমি গাইতে পারি, নাচতে পারি, বাদ্য বাজাতে পারি, নৃত্য-গীত আমার ভালো আসে। আপনি আপনার কন্যাকে তুলে দিন আমার হাতে, আমি তাকে নৃত্য-গীতে শিক্ষিত করে তুলবো। বিরাট রাজা অর্জুনকে এই দৃষ্টিতেই দেখলেন এবং সেই দেখার মধ্যে নৃত্য-গীতের উল্লেখ ছাড়াও আর যেটায় অর্জুন বিশিষ্ট বলে তাঁর মনে হল, সেটা হল বিভিন্ন কলা—

বৃহন্নলাং তামভিবীক্ষ্য মৎস্যরাট্
কলাসু নৃত্যেষু তথৈব বাদিতে।

[মহা (k) ৪.১১.১১; (হরি) ৪.১০.১১]

নৃত্য-গীত-বাদ্যের কুশলতাই যে কলা শব্দটির প্রথম অভিপ্রেত ছিল, সেটা রামায়ণেও আমরা পাই। কিন্তু রামায়ণের সব সংস্করণে সেটা নেই, কিন্তু Gorresio সাহেবের প্রথম গৌড়ীয় সংস্করণ এবং অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত গৌড়ীয় সংস্করণে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে ভোলানোর জন্য যেসব বারাঙ্গনা পাঠানো হয়েছিল তাঁদের প্রথম ঈপ্সিত

গুণ ছিল—তাঁরা যেন কলা জানেন বেশ্যা রমণীদের মতোই—

মুনিবেশ-প্রতিচ্ছন্নাস্তত্র গচ্ছন্তু যোষিতঃ।
উপায়জ্ঞাঃ কলাজ্ঞাশ্চ বৈশিকে পরিনিষ্ঠিতাঃ॥

এখানে কলাজ্ঞানের বিষয়টা অনেকটাই নৃত্য-গীতের মতো পরিচিত কলাজ্ঞানের নির্দেশ করছে এবং একই পংক্তিতে 'বৈশিক' কথাটা থাকায় এটাও পরিষ্কার হয় যে, নৃত্য-গীত-বাদ্যের মতো কলা বিদ্যা সেকালে বেশ্যা-রমণীদেরই বিশেষজ্ঞতার বিষয় ছিল। একই সঙ্গে অবশ্য এটাও বলতে হবে যে, রাজা বা রাজপুত্রদেরও কিন্তু নৃত্য-গীতের কলা শিক্ষা দেওয়া হত। অন্যান্য বিষয় শেখার বহুল পরিশ্রমের মধ্যে নৃত্য-গীত-বাদ্যের কলাজ্ঞানও যে রাজপুত্রদের পক্ষে জরুরী সেটা রামায়ণে পাওয়া যাবে—যখন রাজা দশরথ মাতুল গৃহে গমনোন্মুখ পুত্র ভরতকে উপদেশ দেবার সময়ে বলছেন—এই সময়ে একটা মুহূর্তও যাতে বৃথা না যায় সেই দিকে নজর রাখবে। তুমি নৃত্য এবং সঙ্গীত শাস্ত্র শেখার সঙ্গে সঙ্গে নানা শিল্পকলাও ভালোভাবে শিখবে—

গন্ধর্ববিদ্যাসু তথা পারগো ভব পুত্রক॥
নানা শিল্পকলাজ্ঞশ্চ ভবেরপি পরন্তপ।
ক্ষণমপ্যাসিতং তাত বৃথৈব ন হিতং তব॥

এই শ্লোকে নৃত্য-গীত-বাদ্যের দ্যোতক গান্ধর্ববিদ্যার পরেই নানা শিল্পকলা শিক্ষার পরামর্শ এটাই স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় যে, কলা-শিক্ষা শুধুমাত্র নৃত্য-গীত-বাদ্যের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, কলা বলতে আরও নানান শিল্পকলা বোঝাত যার সংখ্যা পরে চৌষট্টি প্রকারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

[Ramayana: Poema Indiano DI VALMICI, ed. Gaspare Gorresio, Vol. 1, Paris, 1843, 1.9.5; 1.79.21-22; রামায়ণ, অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত, কলকাতা: মেট্রোপোলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ১৯৩১, ১.৯.৫; ১.৭৯.২১-২২]

রামায়ণে নানা শিল্পকলার উচ্চারণটা শুধুমাত্র গৌড়ীয় সংস্করণে উল্লিখিত হলেও এটা স্বীকার করতে হবে কলাবিদ্যা প্রথমত নৃত্য-গীত-বাদ্যের দ্যোতক সংজ্ঞা হলেও মনুষ্য জীবনের নানান ব্যবহারে পরিচিত বিদ্যা ছাড়াও যা কিছুই জীবনের মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তোলে—সেটা যেমন কামকলাও হতে পারে, তেমনই কেশবিন্যাস থেকে আরম্ভ করে সুন্দর করে একটি পান সাজাও হতে পারে, এমনকী সাক্ষ্য প্রমাণ না রেখে অসামান্য একটা চুরি করার মতো বিদ্যাও হতে পারে—এই রকম সব রকম শিল্পই কিন্তু 'কলা' বলে চিহ্নিত হয়েছে। এই রকম কলা-শিক্ষার খুব সাধারণ পরিচিত সংখ্যা হল চৌষট্টি কলা, যদিও অনেক ক্ষেত্রে এই সংখ্যা কখনো বাহাত্তর, কখনো চুরাশি, কখনো বা সেই সংখ্যা একশও ছাড়িয়ে গেছে।

আমরা কালিকা পুরাণের একটি কাহিনীতে চতুঃষট্টি কলার জন্ম কীভাবে হয়েছিল, তার একটা অর্বাচীন বিবরণ পাই। সেখানে বলা হচ্ছে—ব্রহ্মার মন থেকে মন্মথ কামদেবের সৃষ্টি হবার পরে সমস্ত জগৎ এবং প্রাণীবর্গের ওপর তাঁর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হল। সেই প্রভাব পরীক্ষার জন্য মন্মথ স্বয়ং ব্রহ্মা এবং তাঁর মানসকন্যা সন্ধ্যাকেই প্রথমে বেছে নিলেন। শুধু ব্রহ্মা নন, তাঁর নিকটস্থ অন্যান্য মুনি-ঋষিদেরও কোনো বিকার হয় কিনা সেটা দেখে নিতে চাইলেন কামদেব। তিনি দেখলেন তাঁর কুসুম শরপ্রহারে সকলেই মোহিত হয়েছেন। ব্রহ্মার শরীরের মধ্যে নানা বিকার এবং সাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হল, আর সন্ধ্যার শরীরে একদিকে যেমন হাব-ভাব দেখা দিল, তেমনই উৎপন্ন হল চতুঃষট্টি কলা—

তদৈব হ্যূনপঞ্চাশদ্ ভাবা জাতাঃ শরীরতঃ।
বিব্বোকাদ্যাস্তথা হাবাশ্চতুষষ্টিকলাস্তথা॥

[কালিকা পু. ২.১৪-২৯]

কালিকা পুরাণ অর্বাচীন পুরাণ বলেই একথা বলতে হচ্ছে যে, চতুষষ্টি কলার জন্ম যেভাবেই হয়ে থাকুক, সেটাও এক অর্বাচীন বিবরণ, কেননা কলা-সংখ্যা নৃত্যগীতাদির সংকীর্ণ পরিসর ছেড়ে অনেক দূরে এতটাই বিস্তৃত হয়েছিল যে, মহাভারতের কালেই নৃত্যগীতের কলা থেকে চতুঃষষ্টি কলা পৃথক স্থান লাভ করেছিল। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে যেখানে দীর্ঘায়ু হওয়ার জন্য কর্তব্য-অকর্তব্য নির্দেশ করা হচ্ছে, সেখানে অকর্তব্যের অনুশাসন দেবার পরেই রাজাদের যে-সব শাস্ত্র শিখতে বলা হচ্ছে তার মধ্যে যুক্তিশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্রের পরেই নৃত্য-গীত-বাদ্যের গান্ধর্বশাস্ত্র শিখতে বলা হচ্ছে এবং তারপরেই কলা শিক্ষা করতে বলা হচ্ছে—

গান্ধর্বশাস্ত্রঞ্চ কলাঃ পরিজ্ঞেয়া নরাধিপ।

লক্ষণীয়, এখানে কলার সংখ্যা বলা হল না

বটে, কিন্তু কলা শব্দ বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে। কিন্তু মহাভারত যে কলার সংখ্যা চৌষট্টি বলেই জানত, তার প্রথম প্রমাণ মেলে মহাভারতের সভাপর্বে, যখন যুধিষ্ঠির পাশাখেলার বাজি রাখছেন শকুনির সামনে। যুধিষ্ঠির তাঁর দ্বিতীয় দানের বাজি ধরার সময় বলেছেন—আমি শত শত দাসী দেবো তোমাকে, যারা অসামান্য সুন্দরী, সালঙ্কারা, হেমমণিবিভূষিতা, আর তারা নৃত্যগীত ছাড়াও 'চৌষট্টি কলার ব্যাপারটাও খুব ভালো জানে—

মণীন্ হেম চ বিভ্রত্যশ্চতুষষ্টিবিশারদাঃ।।
অনুসেবাঞ্চরন্তীমাঃ কুশলা নৃত্য সামসু।

এখানে নৃত্য-সাম অর্থাৎ নৃত্য-গীতের পাশে কিন্তু 'কলা' শব্দটা উচ্চারণও করলেন না যুধিষ্ঠির এবং 'চতুঃষষ্টি' সংখ্যাটা শুনেই নীলকণ্ঠ টীকাতে বললেন—

চতুঃষষ্টিষু কলাসু বিশারদাঃ।

পুনরায় সেই অনুশাসন পর্বে গর্গমুনি সগর্বে জানিয়েছেন—আমার চৌষট্টিটি কলার পূর্ণ জ্ঞান আছে—কলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চৌষট্টিটা—

চতুঃষষ্ট্যঙ্গম্ অদদৎ কলাজ্ঞানং মমাদ্ভুতম্।

এখানে কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলা হল যে কলাশাস্ত্রর চৌষট্টিটি অঙ্গ আছে, যদিও সেই চৌষট্টি অঙ্গ কী কী, তা মহাভারতে কোথাও পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি।

[মহা (k) ১৩.১০৪.১৪৯; ১৩.১৮.৩৮; ২.৬১.৯-১০; (হরি) ১৩.৯১.১৪৭; ১৩.১৬.৩৮; ২.৫৮.৯-১০]

মহাভারতে যুধিষ্ঠির যেখানে চতুঃষষ্টিকলা-বিশারদ দাসীদের কথা বলেছেন, সেখানেই টীকাকার নীলকণ্ঠ ভাগবত পুরাণের টীকাকার শ্রীধর স্বামীর নামোচ্চরণ করে বলেছেন যে, চতুঃষষ্টি কলার নামগুলি শ্রীধর স্বামী তাঁর টাকায় জানিয়েছেন। ভাগবত পুরাণের সেই শ্লোকটিতে দেখা যাচ্ছে যে, ভগবৎপ্রতিম কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতায় চৌষট্টি কলার জ্ঞান আহরণ করেছেন সান্দীপনি মুনির কাছে—

সকৃন্নিগদমাত্রেণ তৌ সঞ্জগৃহতুর্নৃপ।
অহোরাত্রৈশ্চতুষষ্ট্যা সংযক্তৌ তাবতীঃ কলাঃ।।

[ভাগবত পু. ১০.৪৫.৩৫]

ভাগবত পুরাণের এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী, বল্লভাচার্য, জীব গোস্বামী—এঁরা সকলেই চৌষট্টিটি কলার তালিকা দিয়েছেন। শ্রীধর লিখেছেন যে, তিনি একটি তন্ত্রশাস্ত্র থেকে তালিকাভুক্ত কলাগুলির নাম করছেন, কিন্তু এখানে আমরা বাৎস্যায়ন-লিখিত কামশাস্ত্রের জয়মঙ্গলা টীকায় চতুঃষষ্টি কলার যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেটাকেই প্রাধান্য দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বলে ভাবি, কেননা অনেকেই মনে করেন যে, চৌষট্টি কলা কামশাস্ত্রেরই অঙ্গ। সূত্রকার বাৎস্যায়ন নিজেই তাঁর সূত্রগন্থে চৌষট্টি কলাকে 'চাতুঃষষ্টিক যোগ' বলে চিহ্নিত করার পর চতুঃষষ্টি কলার একটা মূল তালিকা দিয়ে বলেছেন—এই চৌষট্টি অঙ্গের বিদ্যা কামসূত্রের অবয়ব—

ইতি চতুঃষষ্টিরঙ্গবিদ্যাঃ কামসূত্রস্যাবয়বিন্যঃ।

দ্বিতীয় কথা হল—চৌষট্টিটি কলা যদি নিজের মতো করেও কলা পদবী ধারণ করে থাকে, তবুও এগুলিকে প্রধানত কামকলার অঙ্গ বলেই প্রাচীন জৈন দার্শনিকরাও মতামত দিয়েছেন। জৈনগ্রন্থ প্রশ্নব্যাকরণ-সূত্রের টীকাকার অভয়দেব তাঁর টীকায় লিখেছেন—আলিঙ্গন ইত্যাদি আটটি কামকলার প্রত্যেকটিকে আবার আটটা আটটা ভাগ করে চৌষট্টিটি মহিলাগুণের কথা কামসূত্রকার বাৎস্যায়নই চিহ্নিত করেছেন—

আলিঙ্গনাদীনাম্ অষ্টানাং কামকর্মণাং
প্রত্যেকং অষ্টভেদত্বেন
চতুঃষষ্টি মহিলাগুণা বাৎস্যায়ন-প্রসিদ্ধাঃ।

অতএব চৌষট্টি কলার অন্তর্ভুক্ত চৌষট্টিটি কলার নাম আমরা বাৎস্যায়নের কামসূত্র থেকেই দেবো, কেননা বাৎস্যায়নই প্রথম এই চৌষট্টি কলার নামকরণ করেছেন এবং সেই নামগুলির সঙ্গে ভাগবত পুরাণের টীকাকার শ্রীধরস্বামী, বল্লভাচার্য এবং জীবগোস্বামী-কৃত তালিকা-নামের সামান্যই পার্থক্য আছে।

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী), ১০.৪৫.৩৫ শ্লোকের ওপর শ্রীধরস্বামী, জীবগোস্বামী এবং বল্লভাচার্যের টীকা দ্রষ্টব্য; কামসূত্রম্ (পঞ্চানন তর্করত্ন), ৩.১৪-১৬, পৃ. ৬১-৬৪; প্রশ্নব্যাকরণ-সূত্র, পৃ. ৩২১, ৪৫৮; প্রশ্নব্যাকরণসূত্রম্ (জিনাগমগ্রন্থমালা), পৃ. ১৪৮]

চতুঃষষ্টি কলার নামগুলি ভাগবত পুরাণের শ্রীধর টীকায় (১০.৪৫.৩৫) এবং কামসূত্র যেভাবে উল্লেখ করেছে, সেগুলি হল—

১. গীত, অর্থাৎ গান। রামায়ণ-মহাভারতে গীতের প্রকরণ যতটুকুই আছে তাতে গীত-

সঙ্গীতের পূর্ণ একটা রূপ অবশ্যই ফুটে ওঠে। এর পর কামসূত্রে যখন চতুঃষষ্ঠি কলার মধ্যে প্রথমেই গীতের নাম করা হল, তখন জয়মঙ্গলা টীকায় যশোধর চার প্রকারের গীতের কথা উল্লেখ করলেন খুব সাধারণভাবে। তার প্রথমটি হল স্বরগ, অর্থাৎ স্বরগ্রামই এখানে প্রধান, দ্বিতীয় পদগ, অর্থাৎ গানের পদে সুরের আরোপ, তৃতীয় লয়গ, অর্থাৎ গানের ধ্রুপদী কৌশল এবং চতুর্থ হল চেতো'বধানগ, অর্থাৎ এমন গান যাতে গায়ক এবং শোতার চিত্তসংবাদ তৈরি হয়—

স্বরগং পদগঞ্চৈব তথা লয়গমেব চ।
চেতো'বধানগং চৈব গেয়ং জ্ঞেয়ং চতুর্বিধম্॥

[কামসূত্র (নির্ণয়সাগর প্রেস), ৩.১, পৃ. ৩৪]

২. বাদ্য, অর্থাৎ বাজনা। রামায়ণ-মহাভারত এবং পুরাণে যেসব বাদ্যের উল্লেখ হয়েছে, সেগুলির মধ্যে প্রধান হল—শঙ্খ, ভেরী, বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, পণব, আনক, গোমুখ, ঝল্লীযক (ঝালা), আতোদ্য (musical instruments), সুষির (Hollow-wind instruments : যেমন বাঁশী, শিঙা, শঙ্খ), ঘন (কাঁসি), তূর্য মুরজ (মর্দল, মাদল), পটহ, তন্ত্রী (রুদ্রবীণা) ইত্যাদি। শতাঙ্গ বলে আরও একটি বাদ্য ছিল, যেটা নখ, অঙ্গুলী, দণ্ড, ধনু, ধনুর জ্যা, মুখ ইত্যাদি নানা উপায়ে বাজানো হত বলে তূর্যকে শতাঙ্গও বলা হত—

* শঙ্খানকমৃদঙ্গাংশ্চ প্রবাদ্যন্তি সহস্রশঃ।
বীণা-পণব-বেণূনাং স্বনশ্চাতিমনোরমঃ॥
* শতাঙ্গানি চ তূর্য্যাণি বাদকাঃ সমবাদয়ন্।
* ততো ঘনং সসুষিরং মুরজানকভূষিতম্।
তন্ত্রীস্বরগণৈর্বিদ্বান্ আতোদ্যানন্ববাদয়ন্॥

[মহা (k) ১২.৫৩.৪; ১.১৮৮.২৪;
(হরি) ১২.৫২.৪-৫; ১.১৮১.২৩;
হরিবংশ পু. ২.৯৩.২২; ২.৮৯.৫২]

বাদ্যধ্বনির ব্যাপারে মহাভারতের সমচেয়ে সূক্ষ্ম কথাটা কিন্তু এই যে, ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার ইত্যাদি সাতটি স্বর কিন্তু সুর এবং তা পটহাদি বাদ্যধ্বনির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ বাদ্যধ্বনিতেও 'সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি' এই সাত স্বর প্রযোজ্য হবে—

এষ সপ্তবিধঃ প্রোক্তো গুণ আকাশসম্ভবঃ।
ঐশ্বর্যেন তু সর্বত্র স্থিতো'পি পটহাদিষু॥

[মহা (k) ১২.১৮৪.৪১; (হরি) ১২.১৭৮.৪০]

৩. নৃত্য: প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্যসভ্যতায় এবং সংস্কৃতিতে যে চৌষট্টি কলার প্রচলন ঘটেছিল, নৃত্য তার মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি কলা। সংস্কৃত 'নৃৎ' ধাতু থেকে নৃত্যের উৎপত্তি। 'নৃৎ' ধাতু বলতে একরকম শারীরিক অঙ্গভঙ্গী বোঝায়। সেক্ষেত্রে নৃত্য বলতে বোঝাবে শারীরিক অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা ভাব এবং রসের প্রকাশ। ভগবান দেবাদিদেব শিবকে এই কলার আদিস্রষ্টা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পাণিনির ব্যাকরণের একটি টীকায় একটি অপূর্ব শ্লোক উল্লিখিত হয়েছে—

নৃত্তাবসানে নটরাজরাজো ননাদ
ঢক্কাং নবপঞ্চবারম্।
উদ্ধর্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধা
নেতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্॥

কথিত আছে যে, তাণ্ডব নৃত্যের অবসানে ভগবান শিবের এই ঢক্কানিনাদ থেকেই সব কয়টি স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ সৃষ্টি হয়েছে। নটরাজকে নৃত্যের আদিগুরু হিসেবে কল্পনা করেই পরবর্তীকালে শিল্পে নটরাজ মহাকালের মূর্তি কল্পিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, নৃত্যের বিচিত্র ভঙ্গীরও বিকাশ হয়েছে অপরূপ এই ভাবনা থেকেই।

মহাভারতের যুগে গানের সঙ্গে বাদ্য এবং নৃত্যের সমাবেশ থাকত। আবার গান ছাড়াও নৃত্য এবং বাদ্যের অনুশীলন দেখা যায়—

* বীণানাং বল্লকীনাং চ নূপুরাণাং চ শিঞ্জিতৈঃ।

[মহা (k) ১৩.৬৯.২৬; (হরি) ১৩.৬৪.২৬]

□ মহাভারতে অনেকগুলি শ্লোকে নৃত্যের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু তার শ্রেণী রূপ বা কোনো পদ্ধতির কথা সেখানে আলোচিত হয়নি। মহাভারতে নৃত্যগীতের উল্লেখ সংক্রান্ত দু-একটি শ্লোক আমরা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি—

* ননৃতু নর্তকাশ্চৈব জগুর্গীতানি গায়কাঃ।
* নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ ভাবৈশ্চ বিবিধৈরপি।

[মহা (k) ১.২১৯.৪; (হরি) ১.২১২.৪]

□ এরমধ্যে সভাপর্বে একটি শ্লোক পাওয়া যায়—নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ ভাবৈশ্চ বিবিধৈরপি —এই শ্লোকটিতে যেভাবে বিবিধ ভাব সহ নৃত্যের দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে আনন্দদানের কথা বলা হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায় যে নাট্যশাস্ত্রে যে বিবিধ রস এবং ভাবের উল্লেখ আছে, সেগুলি পূর্বাহ্নেই রামায়ণ এবং মহাভারতের কালে নৃত্য-

গীতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। মহাভারতের সভাপর্বে—

নৃত্য-গীতং চ হাস্যং লাস্যং চ সর্বশঃ।

এই শ্লোকটির মধ্যে যে হাস্য, লাস্য, কটাক্ষ, অঙ্গহার এবং মুদ্রার সমাবেশ দেখা যায়—সেগুলির সমাবেশই নৃত্যের রূপ এবং মাধুর্য্যকে পরিস্ফুট করে। ফলে মহাভারতের কবি উল্লেখ না করলেও আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে রচিত ভরতের নাট্যশাস্ত্র এবং অন্যান্য নৃত্যকলাবিষয়ক গ্রন্থে গীত, বাদ্য, নৃত্য এবং অভিনয়ের প্রসঙ্গে বিভিন্ন নৃত্যের লক্ষণ, অঙ্গহার, রসবিকল্প, ভাবব্যঞ্জনা, অভিনয়ের উপাঙ্গবিধান, হস্তাভিনয়, সংযুক্ত এবং অসংযুত হস্ত, নৃত্য সমাশ্রয় হস্ত ইত্যাদি নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে রামায়ণ-মহাভারতের যুগে সেগুলির ব্যবহার প্রচলিত ছিল যথেষ্টই। মহাভারতের বহু শ্লোকে নৃত্যগীতের উল্লেখ থাকলেও কতকগুলি অংশের কথা একেবারে উল্লেখ না করলেই নয়। যেমন বৃহস্পতিপুত্র কচ নৃত্য, গীত ও বাদ্য দ্বারা প্রাপ্তযৌবনা দেবযানীর মন হরণ করেছিলেন। দেবযানীও নৃত্যপরায়ণা ছিলেন। তিনি নির্জন স্থানে কচের কাছে গান শিক্ষা করতেন, গান করতেন বা তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতেন। পাঞ্চালরাজের সভায় নৃত্য ও গীতের বিশেষ সমাদর ছিল। খাণ্ডবদাহ-পর্যায়ে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন তাঁদের বন্ধু-বান্ধব ও পুরনারীদের নিয়ে যমুনায় জলবিহারের সময় যমুনার তীরে খাণ্ডববনে পান-ভোজন, নৃত্য গীত প্রভৃতি করেছিলেন। বনপর্বে অর্জুন অমরাবতীতে উপনীত হলে গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন। তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বরা বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে গান করতে লাগলেন, আর ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরারা নৃত্য করলেন। অর্জুন পাঁচ বছর অমরাবতীতে অতিবাহিত করেছিলেন। ইন্দ্রের আদেশে বিশ্বাবসুর পুত্র চিত্রসেন তাঁকে নৃত্য, গীত ও বাদ্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জুন বৃহন্নলা এই ছদ্মনাম নিয়ে নপুংসক সাজে বিরাটরাজের কন্যা উত্তরা ও রাজপুরনারীদের নৃত্য, গীত ও বীণাদি বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। বৃহন্নলাবেশী অর্জুনের প্রসঙ্গে মহাভারতকার বিরাটপর্বে উল্লেখ করেছেন,

স তত্র রাজানমমিত্রহাব্রবীদ্
বৃহন্নলা'হং নরদেব নর্তকী॥

* * * *

নৃত্যামি গায়ামি চ বাদয়াম্যহং
প্রনর্তনে কৌশলনৈপুণং মম।
তদুত্তরায়ৈ প্রদিশস্ব নর্তনে।
ভবামি দেব্যা নরদেব নর্তকী॥

বিরাট—

দদামি তে হন্ত বরং বৃহন্নলে
সুতাং হি মে নর্তয় যাশ্চ তাদৃশী॥

* * * *

স শিক্ষয়ামাস চ গীতবাদিতং
সুতাং বিরাটস্য ধনঞ্জয়ঃ প্রভুঃ।
সখীশ্চ তস্য পরিচারিকা শুভাঃ
প্রেয়শ্চ তাসাং স বভুব পাণ্ডবঃ॥

বৃহন্নলা—

নৃত্যং বা যদি বা গীতং বাদিত্রং বা পৃথগ্বিধম্।
তৎ করিষ্যামি ভদ্রং তে সারথ্যং তু কৃতো মম॥

এ থেকে বোঝা যায়, মহাভারতের যুগে পুরুষদের মতো নারীদের ও এমন কি অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরচারিণীদের পক্ষেও সঙ্গীত তথা নৃত্য, গীত ও বাদ্য নিষিদ্ধ ছিল না। তাছাড়া সামন্তরাজা ও সম্রাটদের দরবারে চারুশিল্প ও শিল্পীদের বিশেষ সম্মান ও সমাদর ছিল।

পুরাণগুলির মধ্যে হরিবংশ পুরাণে হল্লীসকনৃত্য এবং ভাগবতপুরাণে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের রাসনৃত্য-এর উল্লেখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গাথা-গানের উল্লেখও হরিবংশ-পুরাণে পাওয়া যায়।

[মহা (k) ১.৭৬.২৪; ৩.৪৩.২৯-৩১; ৩.৪৪.৬-১১; ৪.১১.৮-১১; (হরি) ১.৬৪.২৪; ৩.৩৮.২৯-৩১; ৩.৩৮.৩৮-৪৯; ৪.১০.৮-১১; হরিবংশ পু. ২.২০.১৫-৩৫; ২.৮৯.৬৮]

৪. আলেখ্য। অর্থাৎ ছবি আঁকা, চিত্রকর্ম। আলেখ্য শব্দে 'র' এবং 'ল'-এর অভেদ ভাবনা করলে শব্দটা 'আরেখ্য' হয়ে ওঠে। তাতে বোঝা যায়—যা 'রেখা' বা 'রেখ-কর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, সেটাই আলেখ্য। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর একটি শ্লোকে আলেখ্য কর্মের ছয়টি অঙ্গের উল্লেখ করেছেন—

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবন্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥

চিত্রকর্মের ছটি অঙ্গ হল রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব-যোজনা, লাবণ্য-যোজনা, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ।

ক) রূপভঙ্গ হল একটি চিত্রের মধ্যে মানবশরীর এবং প্রধানত সুখের বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সুখের ভাব-ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা।

খ) প্রমাণ হল—জীবন্ত এবং নির্জীব জগতের আকার-পরিমাপ সঠিকভাবে চিত্রায়িত করা।

গ) ভাব-যোজনা হল-ছবিতে জীবন্ত প্রাণীর শরীরাবয়ব এবং মুখের মধ্যে ফুটে ওঠা অনুভূতিগুলি রেখার মাধ্যমে সুখের মধ্যেই পরিস্ফুট করা।

ঘ) লাবণ্য-যোজনার মধ্যে সেই বস্তুটিই কিন্তু প্রধান যাকে আমরা লাবণ্য বলছি। ব্যঞ্জনের মধ্যে লবণ না দিলে যেমন আস্বাদন আসে না, তেমনই লাবণ্য হল সেই প্রতীয়মান ব্যঞ্জনা যা ছবির মধ্যে মুখ, শরীর এবং অন্যান্য অবয়বের মধ্যে ভাবের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হয়।

ঙ) সাদৃশ্য হল বাস্তব প্রাণী-অপ্রাণী স্থাবর জঙ্গমের সঙ্গে চিত্রার্পিত বস্তুর সমানভাব সম্পন্ন করা।

চ) বর্ণিকাভঙ্গ হল চিত্রের মধ্যে বিভিন্ন রঙের ব্যবহার, তুলির টানে রঙের বৈচিত্র্য তৈরি করা।

[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস) ১.৩.১৬, পৃ. ৩০]

আলেখ্য বা চিত্রের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার সময় বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ লিখেছে—চিত্রের মধ্যে এই সমস্ত জীব-জগতের অনুকরণ ঘটে, ঠিক যেমনটা হয় সজীব নৃত্ত-কলার মধ্যেও—

যথা নৃত্তে তথা চিত্রে ত্রৈলোক্যানুকৃতিঃ স্মৃতা।

বিষ্ণুধর্মোত্তরের এই শ্লোকে খুব অবহিতভাবে 'নৃত্ত' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে 'নৃত্য' নয়। শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত রত্নাকরে বলা হয়েছে—চার প্রকারের অভিনয় বর্জন করে যেখানে আঙ্গিক অভিনয়ের অন্তর্গত অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ এবং উপাঙ্গগুলির গাত্রবিক্ষেপমাত্র প্রকট করা হয়, সেটাকেই 'নৃত্ত' বলে—

গাত্রবিক্ষেপমাত্রন্তু সর্বাভিনয়বর্জিতম্।
আঙ্গিকোক্তপ্রকারেণ নৃত্তং নৃত্তবিদো বিদুঃ।।

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ 'নৃত্তের এই সংজ্ঞা মনে রেখেই বলেছে—মনুষ্য শরীরের দৃষ্টি, ভাব এবং তার হস্তপদাদি অঙ্গ, উপাঙ্গের যত কথা নৃত্তের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, সেগুলি সবই চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—

স এব চিত্রে বিজ্ঞেয়া নৃত্তং চিত্রং পরং মতম্।

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের তৃতীয় খণ্ডে 'চিত্রসূত্রী' নামে কতগুলি অধ্যায় আছে, যেখানে দেবতাদের মুখ-শরীর কেমন হবে, তার নানান বর্ণনার সঙ্গে চিত্রে তাঁদের গায়ের রঙ কেমন হবে সব বলা আছে। এইভাবে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ থেকে বিভিন্ন প্রকার স্ত্রীলোকের মুখে কেমন ভাব থাকবে, কেমন করে সোনারুপো দিয়ে রঙ তৈরি করতে হবে, কোন রঙ কত দিন থাকবে, দেবতাদের আসন, শয়ন, বেশ কেমন হবে, চিত্রে শৃঙ্গারাদি রস কীভাবে অভিব্যক্ত হবে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ছবি কীভাবে আঁকতে হবে—এই সমস্ত কিছু অত্যন্ত সুচারুভাবে বর্ণিত হয়েছে!

[বিষ্ণুধর্মোত্তর পু. (Nag Publishers), ৩.৩৫.৫; ৩.৩৫.৭; সঙ্গীতরত্নাকর (Adyar Library), ৪র্থ খণ্ড, ৭.২৭-২৮, পৃ.১২; The Vishundharmottara, Pt 3, Ed. & Trans by Stella Kramrisch, Calcutta University, 1928: এই গ্রন্থে চিত্র বা আলেখ্যকর্মের ব্যাপারে সমস্ত প্রয়োজনীয় অংশ 'চিত্রসূত্রী থেকে বাছাই করে তার অনুবাদ করে দিয়েছেন stella kramrisch]

আলেখ্য-কর্ম কলা হিসেবে বহুকাল আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এটা অবশ্যই ঠিক যে, সুদূর সেই বৈদিক কালে কেউ একজন চিত্রাঙ্কন করছেন, এমন উদাহরণ আমরা ঋগ্‌বেদ কিংবা অথর্ববেদেও পাইনি কখনো, কিন্তু প্রাণীর অবয়ব সৃষ্টির আগে রূপস্রষ্টা বিধাতা মনে মনে যে একটা চিত্রভাবনা করতেন, সেটা কালিদাসের মতো কবির একটা মন্তব্য থেকে বোঝা যায়। শকুন্তলার অলোকসামান্য রূপের বিশ্লেষণ করে নায়ক দুষ্যন্ত বলেছেন—বিধাতা আগে শকুন্তলার চিত্র তৈরি করে নিয়ে তারপর সেই চিত্রে প্রাণ-যোজনা করেছেন। অথবা অনন্ত রূপ একত্র সংগ্রহ করে তারপর মনে-মনেই এঁকে তৈরি করেছেন—

চিত্রে নিবেশ্য বিনিবেশিতসত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।

আগে যে মনে মনে রূপ-ভাবনার ব্যাপার—এটাই কিন্তু আলেখ্য কর্ম বা চিত্রাঙ্কনের মূল ভাব। এই রূপদান করার ব্যাপারটাকেই যদি চিত্রাঙ্কনের মৌল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করি,

তাহলে বেদের মধ্যে সেই প্রথম রূপকারকে দেখতে পাব ত্বষ্টার মধ্যে মনুষ্যশরীরের রূপকার হিসেবে ত্বষ্টার নাম করে বলা হয়েছে—তিনিই এই বিশ্বজগতের অশেষ প্রাণী-কুলের রূপ তৈরি করেন—

ত্বষ্টা রূপাণি হি প্রভুঃ/পশূন্ বিশ্বান্ সমানজে।

আবার একটি রমণী গর্ভবতী হলে তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকে মনুষ্যের অবয়বে রূপদান করার জন্য ত্বষ্টার কাজেই প্রার্থনা করা হত—

ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু।

হয়তো এই কারণেই তৈত্তিরীয় সংহিতাতে ত্বষ্টাকে সমস্ত পশুর এবং স্ত্রী-পুরুষের 'রূপকার', 'রূপপতি' বলা হয়েছে—

ত্বষ্টা পশূনাং মিথুনানাং রূপকৃৎ রূপপতিঃ।

অবশ্যই এই 'রূপকার' কথাটা চিত্র-ভাবনা বা আলেখ্যকর্মের আদিরূপ। তিনি 'রূপকৃৎ' সমস্ত জীব-জগতের অবয়ব-সংস্থান রক্তমাংস ভরিয়ে ফুটিয়ে তুলছেন তিনি।

[ঋগ্‌বেদ, ১.১৮৮.৯; ১০.১৮৫.১; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম) ২.৫.৭.৪; পৃ. ৫৮৭]

রূপকারের সঙ্গে চিত্রকারের যে কোনো পার্থক্য নেই, তা বোঝা যায় মহাভারতের তিলোত্তমার কাহিনীতে। সুন্দ-উপসুন্দের মৃত্যু ঘটানোর জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকেই আদেশ দিয়েছিলেন এক অপ্রতিম নারীশরীর তৈরি করতে। বিশ্বকর্মা তখন যা কিছু সুন্দর আছে এই পৃথিবীতে, তার সব কিছু থেকে এক তিল এক তিল করে তুলে এনে যে নারীশরীরটি তৈরি করলেন, প্রজাপতি তার নাম দিলেন তিলোত্তমা

তিলং তিলং সমানীয় রত্নানাং যৎ বিনির্মিতা।
তিলোত্তমেতি যত্তস্যা নাম চক্রে পিতামহঃ॥
সা প্রযত্নেন মহতা নির্মিতা বিশ্বকর্মণা।
ত্রিষু লোকেষু নারীনাং রূপেণাপ্রতিমা'ভবৎ॥

তিল তিল করে রূপ দিয়ে যেমন তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়, সেইভাবে তুলিকার বর্ণচ্ছেদে তিল তিল করে গড়ে ওঠে চিত্র, যেমনটি কালিদাস বর্ণনা করেছেন পার্বতীর যৌবনোদ্ভেদী শরীর একেবারেই চিত্রের কল্পনায়—

উন্মীলিতং তুলিকয়েব চিত্রম্।

মহাভারত যে এই চিত্রকর্ম বা আলেখ্য-কর্মের কথা সবিশেষ জানত, তার পরিচয় মিলবে একটি উপমালঙ্কারের ব্যঞ্জনায়। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণ যখন শান্তির বার্তা নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় উপস্থিত হয়েছেন। তখন ভীষ্ম সোচ্চারে দুর্যোধনকে বলেছেন পাণ্ডবদের রাজ্যার্ধ ফিরিয়ে দিতে। দ্রোণাচার্য ভীষ্মের মতে মত দিয়েছেন, তারপর বিদুর ভীষ্মের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছেন—আপনি এই কুরুবংশকে রক্ষা করুন দুর্যোধনের হাত থেকে। আপনি অনেক আগে ধৃতরাষ্ট্র এবং আমাকে এই রাষ্ট্রে স্থাপন করেছিলেন ঠিক সেইভাবে, যেভাবে একজন চিত্রকর তাঁর আলেখ্য নির্মাণ করেন—

মাঞ্চৈব ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পূর্বমেব মহাদ্যুতে।
চিত্রকার ইবালেখ্যং কৃত্বা স্থাপিতবানসি॥

মহাভারতে কালে চিত্রকর্মের নিপুণ কৌশল যে উদ্ভাবিত হয়ে গিয়েছিল, সেটা কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্রের কবিকণ্ঠাভরণ নামক একটি গ্রন্থ থেকে প্রমাণ হয়। ক্ষেমেন্দ্র নিজের পরিচয় দিয়েছেন ব্যাসদাস বলে এবং ব্যাসের নাম করে তিনি চিত্রকর্ম সম্বন্ধে একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁর কবিকণ্ঠাভরণ-গ্রন্থে। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, শ্লোকটিকে ব্যাসের শ্লোক—বলায় যথা ভগবতো ব্যাসস্য—শ্লোকটি মহাভারতেরই কোনো স্থান থেকে গ্রহণ করেছেন ক্ষেমেন্দ্র এবং ব্যাসকৃত এই শ্লোকটিই হেমচন্দ্র তাঁর 'কাব্যানুশাসন' গ্রন্থের টীকায় উদ্ধৃত করেছেন। শ্লোকটিতে বলা হচ্ছে—চিত্রকর্ম-বিশারদ শিল্পীরা তাঁদের রঙ-তুলির মাধ্যমে চিত্রের সমতলের ওপরেই উচ্চাবচ গভীরতার এমন মায়া ফুটিয়ে তুলতে পারেন, যেখানে বাস্তবে যা নেই তাও সত্যিই আছে বলে মনে হবে—

অতথ্যান্যপি তথ্যানি দর্শয়ন্তি বিচক্ষণাঃ।
সমে নিম্নোন্নতানীব চিত্রকর্মবিদো জনাঃ॥

এখানে গবেষক লিখেছেন—

The masters of the technique of painting create the illusion of heights and depths on an even surface and present as reality what really does not exist. This is the import of the verse and describes one of the greatest technical triumphs in the art of painting, the presentation of the third dimension, the mastery of chiaroscuro, *nimnonnata* and

varṇachhāyā achieved by the threefold *vartanā.*

[Kavikaṇṭhabharana. In Minor Works of Kṣemendra, Ed. E.V.V. Raghavacharya, (Hyderabad:Osmania University, 1961), verse no. 55, P. 81; হেমচন্দ্র-কৃত কাব্যানুশাসনম্ (কাব্যমালা), পৃ. ৭; C.Sivaramamurti, The painter in Ancient India, (Delhi:Abhinav Publication, 1978,) Pp. 4-5]

আমাদের আদিকাব্য রামায়ণে চিত্রাঙ্কন বা আলেখ্যকর্ম একটা শিল্প হিসেবে এতটাই বিদগ্ধজনের প্রিয় বিষয় হিসেবে চিহ্নিত ছিল যে, ঐশ্বর্য্যশালী রুচিবান মানুষের ঘরে রীতিমত পৃথক একটি চিত্রগৃহ থাকত। হনুমান সীতার অন্বেষণে লঙ্কায় প্রবেশ করার পর রাবণের যে সব বড়ো বড়ো সজ্জিত গৃহ দেখেছিলেন, তার মধ্যে যেমন লতাগৃহ, ক্রীড়াগৃহ, এমনকী রাজাদের দিবাকালীন বিহার-গৃহ ছিল, তেমনই ছিল বিভিন্ন চিত্রপটে সুসজ্জিত চিত্রগৃহ—

* লতাগৃহাণি চিত্রাণি চিত্রশালাগৃহাণি চ।

* চিত্রশালাশ্চ বিচিতা ভূয়ঃ ক্রীড়াগৃহাণি চ॥

রামায়ণের কালে নাগরিক জীবনে যে শৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল, তাতে চিত্রাঙ্কন এক বিশেষ নর্মকলার মধ্যে পরিগণিত হয়েছিল, সেটা দুটি পৃথক মন্তব্য থেকে বোঝা যায়। প্রথমত সীতাহরণের উদ্যোগে রাবণ যখন মায়াবী মারীচের কাছে সোনার হরিণ সাজার প্রস্তাব দিলেন, তখন সেই মায়াহরিণের কথাটা চিত্রাকারে বর্ণনা করে রাবণ বলেছিলেন— তোমার সম্পূর্ণ গা-টা হবে সোনার মতো, তার ওপরে রুপোর রঙের বিন্দুচিত্র করা থাকবে—

সৌবর্ণস্ত্বং মৃগো ভূত্বা চিত্রো রজতবিন্দুভিঃ।

চিত্রাঙ্কনের বোধ থেকেই রাবণ যেমন মারীচের কাছে হরিণের চিত্ররূপ কল্পনা করছেন, তা থেকেও একজন চিত্রকরের হাতে চিত্র কেমন হতে পারে, তা আদিকবি বাল্মীকির কাব্যিক ভাষা থেকে বোঝা যায়। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাবণের পূর্বজীবনের ঘটনা বর্ণনার সময় দেবতাদের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধের বিবরণ দেওয়া হচ্ছিল। সেখানে যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রচ্ছিন্ন সেনাদের মৃতদেহ, রথবাহন হাতি-ঘোড়া যেভাবে পড়ে ছিল, সেটাকে আঁকলে পরে সজীব-নির্জীবের নিথর চিত্র যেমনটা হয়, সেই চিত্রকর্মের মতো লাগছিল রণভূমি—এই কথাটা চিত্রকর্মের রস-সামগ্রী প্রমাণ করে দেয়। অর্থাৎ চিত্র নির্মাণের মধ্যে যে শৃঙ্গার-বীর-করুণ ইত্যাদি রসের অভিব্যক্তি ঘটতে পারে, তা এই রণক্ষেত্রকে চিত্র বলে চিহ্নিত করার মুহূর্তেই স্পষ্ট হয়ে পড়ে—

চিত্রকর্ম ইবাভাতি সর্বেষাং রণসংপ্লবঃ।

এতে বোঝা যায়—রামায়ণের কালে শিল্পকলা হিসেবে আলেখ্য বা চিত্রাঙ্কন নাগরিক বৃত্তির মধ্যে পরিগণিত ছিল। বিশেষত চিত্রকর্মে নিপুণ 'চিত্রজ্ঞ' ব্যক্তি গুণী মানুষ হিসেবে রাজা রামচন্দ্রের সভায় আহ্বান লাভ করেছেন, সেটাও কিন্তু এই বিশেষ কলাবিদ্যার সম্প্রসারণ সূচনা করে রামায়ণের কালে—

চিত্রজ্ঞান্ বৃত্তসূত্রজ্ঞান্ গীত-নৃত্য-বিশারদান্।
এতান্ সর্বান্ সমাহূয় গাতারৌ সমবেশয়ৎ॥

[রামায়ণ, ৫.৬.৩৬; ৫.১২.১৩; ৩.৩৬.১৮; ৩.৪০.১৭;৭.৩৩.৪১; ৭.১০৭.৯; (মুধোলকর), ৭.২৮.৪১; ৭.৯৪.৯]

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের আর একটি জায়গায় ভক্তিচিত্র বলে একটি শব্দ আছে, যার অর্থ খানিক জ্যামিতিক রেখা বিভাগের মাধ্যমে চিত্রাঙ্কন করা। হাতির গায়ে ডোরা কেটে যেভাবে চিত্রিত করা হয়, সেটাকে ভক্তিচিত্র বলেই কালিদাস তাঁর মেঘদূতে লিখেছেন—

ভক্তিচ্ছেদৈরির বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য।

আর রামায়ণে কুবেরের কাছ থেকে পাওয়া রাবণের পুষ্পকরথে স্বয়ং ব্রহ্মা নাকি আশ্চর্য ধরনের ভক্তিচিত্র অঙ্কন করে দিয়েছিলেন—

দেবোপবাহ্যমক্ষয্যং সদাদৃষ্টিমনঃসুখম্।
বহ্বাশ্চর্যং ভক্তিচিত্রং ব্রহ্মণা পরিনির্মিতম্॥

[রামায়ণ (পঞ্চানন তর্করত্ন), ৭.১৫.৩৮; (মুধোলকর), ৭.১৫.৩৮]

আলেখ্যকর্ম অথবা চিত্রাঙ্কন 'কলা' হিসেবে কতটা গ্রাহ্য হয়ে উঠেছিল, তা বৌদ্ধযুগ, মৌর্যযুগ এবং গুপ্তযুগের চিত্রকলার উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে। এমনিতে চিত্রকর্ম সেকালের প্রাচীনদের, রুচিশীল নাগরিকদের বিলাস-কলার মধ্যে পড়ত। জনপ্রিয়তার জায়গায় চিত্রকর্ম যেখানে অসাধারণ চিত্রকরদের জন্ম দিয়েছিল,

তেমনই কলা হিসেবে সেটা ব্যক্তিস্তরে চলে এসেছিল এবং সেটা এতটাই যে, চিত্রকর্ম নাগরিক-বৃত্তির অন্যতম অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গীত-বাদ্য-নৃত্য ইত্যাদির সঙ্গে চিত্রকর্ম এবং এবং লিপিকর্ম (অক্ষর) গণিকাবৃত্তির মধ্যে এসে থাকলেও নাগরিক-বৃত্তিতে বড়ো ঘরের মেয়েরা নিজেদের গায়ে, হাতে, কপালে এমনকী স্তনের ওপরেও যে কালাগুরু কিংবা কুঙ্কুম-চন্দন-অগুরুর মিশ্রন দিয়ে চিত্রকর্ম রচনা করতেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় সংস্কৃত ধ্রুপদী কাব্যগুলিতে। এই বিশেষ ধরনের চিত্রকর্মকে 'পত্রলেখা' বা 'পত্রভঙ্গ' বলে নামকরণ করা হয়েছে।

পত্রলেখার চিত্রকর্ম রাজকীয় জীবনে এতটাই প্রচলিত ছিল যে, ইক্ষ্বাকু-কুলের রাজা রঘুর সঙ্গে ইন্দ্রের যখন যুদ্ধ হচ্ছে, তখন কালিদাস লিখেছেন—দেবরাজের যে বাহুটিতে ইন্দ্রাণী শচীর শরীরস্থিত পত্ররচনার আলিম্পন থাকার কথা, সেই বাহুতে রঘু তাঁর তীক্ষ্ণ বাণচিহ্ন এঁকে দিলেন—

ভুজে শচীপত্রবিশেষ-কাঙ্ক্ষিতে
স্বনাম-চিহ্নং নিচখান সায়কম্।

অন্যত্র কালিদাসের রঘুবংশেই রামচন্দ্রের পুত্র কুশের ছেলে অতিথি যে ভাবে অঙ্গরাগ করছেন, সেখানে পুরুষ মানুষরাও যে, নিজ দেহে পত্রচিত্র অঙ্কন করতেন, এই তথ্যটাও মেলে। কালিদাস এখানে পত্রলেখা চিত্রের উপাদান নির্দেশ করে লিখেছেন—মৃগনাভি কস্তূরীর সুগন্ধ চন্দন-পঙ্কে মিশিয়ে অঙ্গরাগ করার পর তার পরে গোরোচনার বিন্যাসে আপন দেহে পত্র রচনা করলেন কুশপুত্র অতিথি—

চন্দনেনাঙ্গরাগঞ্চ মৃগনাভিসুগন্ধিনা।
সমাপয্য ততশ্চক্রুঃ পত্রং বিন্যস্তরোচনম্॥

পত্রভঙ্গ-রচনার চিত্রকর্ম যতই স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষ বলে মনে হোক, এই ব্যক্তিগত সজ্জার চিত্রকলা স্ত্রীলোকেরই প্রধান বিলাস ছিল, সে কথা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। বিশেষত রমণীর স্তনযুগলের ওপর মনোহর পত্রভঙ্গ প্রাচীন শৃঙ্গার-বিলাসের অন্যতম অঙ্গ ছিল। বাণভট্টের কাদম্বরীতে রাজা তারাপীড় তাঁর রানীর স্তনমণ্ডলে পত্রভঙ্গ না দেখে তাঁর মনঃকষ্টের আশঙ্কা করছেন—

কিমিতি চ হরিণ ইব হরিণ-লাঞ্ছনে ন লিখিতঃ
কৃষ্ণাগুরুপত্রভঙ্গঃ পয়োধরভারে।

[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (Kangle) ২.২৭.২৮, পৃ. ৮২; রঘুবংশ (Nandargikar), ৩.৫৫; ১৭.২৪; কাদম্বরী (Kale), পৃ. ১০৩]

৫. বিশেষকচ্ছেদ্য। এর অর্থ হল—গাছের পাতা মুড়িয়ে নানা রকম আকৃতি তৈরি করে কপালের ওপর সজ্জা তৈরি করা। চুলের ওপরেও এই পত্রসজ্জা তৈরি করা যায়। "Trimming of leaves etc., to represent various figures for the purpose of wearing on the forehead." আবার এমনও হতে পারে যেমনটা কামসূত্রের টীকাকার যশোধর এবং ভাগবত পুরাণের টীকাকার বংশীধর তাঁর ভাবার্থদীপিকা প্রকাশ টীকায় লিখেছেন—অর্থাৎ কপালে যেখানে যেখানে তিলক-রচনা করতে হবে, সেখানে সেখানে ভূর্জ প্রভৃতি পত্রচ্ছেদ ব্যবহার করতে হবে। বিলাসিনী রমণীদের এই পত্র ব্যবহার করাটা পছন্দ ছিল বলেই এখানে 'বিশেষক' শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। কামসূত্রের টীকাকার মূল কলাটিকে বিশেষকচ্ছেদ্য না বলে সোজাসুজি 'পত্রচ্ছেদ্য' বলতে চেয়েছেন—পত্রচ্ছেদ্যমিতি বক্তব্যম্।

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী), ১০.৪৫.৩৫, বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮২; The kalas, p.25; কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), পৃ. ৩০]

৬. তণ্ডুল-কুসুম-বলি বিকার। অর্থাৎ পুজোর জন্য বড়ো কাঁসার থালায় নানা আকৃতিতে আতপ চাল সাজানো বিচিত্রবর্ণ পুষ্পের সমাহার তৈরি করা। "Arrangement of ricegrains and flowers (of different colours) in different ways for the purpose of worship." গবেষকের এই ইংরেজী অনুবাদের পিছনে আছে ভাগবত পুরাণের টীকাকার বংশীধরের টীকার অনুপ্রেরণা। তিনি অবশ্য এর সঙ্গে সুতোয় বাঁধা মালা রাখারও পক্ষপাতী। যদিও বংশীধর এখানেও কামসূত্রের টীকাকার যশোধরের কাছে ঋণী। এখনও 'শ্রী' কিংবা স্বস্তিক-চিহ্নে সাজানো বরণডালা তণ্ডুল-কুসুম-বলির স্মৃতি বহন করে।

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী), ১০.৪৫.৩৫; বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য এবং কামসূত্র (বিদ্যা বিলাস প্রেস), পৃ. ৩০; The kalas, p. 26]

৭. পুষ্পাস্তরণ। কামসূত্রের টীকাকার এই কলার সহজ নাম দিয়েছেন পুষ্পশয়ন। এখনকার ভাষায় ফুলশয্যা। বিচিত্রবর্ণের ফুল এবং মালা দিয়ে ঠাকুরঘর সাজানো, মণ্ডপ-গৃহ সাজানো, অথবা বিলাস-গৃহ সাজানো এবং শয্যা সাজানোর ব্যাপারটাও একটা কলার মধ্যে পড়ে। ভাগবত পুরাণের টীকাকার বংশীধর এটাকে সোজাসুজি ফুলশয্যা বলেছেন— পুষ্পাদিভিঃ শয্যাদিরচনম্। "covering or decorating a house or room with flowers." *[তদেব]*

৮. দশন-বসনাঙ্গরাগ। রাগ অর্থ রঙ। অঙ্গরাগ মানে অঙ্গ-রাঙানো, আরও পরিষ্কার করে বলা যায়—অঙ্গমার্জনা এবং সেই অঙ্গ সাজিয়ে তোলা। দাঁত মেজে পরিষ্কার করে তারপর তাতে রঙ লাগানোটা সেকালের বিলাসিনী রমণীদের ঈপ্সিত ছিল—এমন একটা অর্থেই এই কলার নাম দশনাঙ্গরাগ। আর বসন রাঙানো বা রাঙা বসনও যেহেতু অঙ্গসজ্জার মধ্যে পড়ে তাই বসনাঙ্গরাগও একটা কলা। "Applying colours to the teeth body and clothes." শেষে বলা যায়—দাঁতে রঙ লাগানোর কথাটা শব্দের অভিধাবৃত্তিতে 'ডিকশনারি মিনিং' বলে মনে হলেও এটা কোনো ঈপ্সিত, বৃত্তি হতে পারে না, কলা তো নয়ই। সেইজন্য এই সমাসবদ্ধ পদটিতে 'রাগ' শব্দটা পৃথকভাবে তিনটি শব্দের যুক্ত করাই ভালো, দ্বন্দ্বসমাসের ব্যাসবাক্যের নিয়মও তাই। তাহলে দাঁড়ায় দশন-রাগ, বসন-রাগ এবং অঙ্গ-রাগ। এই তিনটির মধ্যে শরীর চিত্রিত করার জন্য অঙ্গরাগ এবং বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত বসন তো নাগরক-বৃত্তির অন্তর্গত ছিল। সেখানে দশন-রাগ অবশ্যই ভালো করে দাঁত মেজে পরিষ্কার করা—যেটা কামসূত্রের টীকাকার ইঙ্গিত করে বলেছেন—বিলাসিনী রমণীদের কাছে দন্তমার্জনার সংস্কারটুকু অত্যন্ত প্রিয় বলেই দশন-রাগ শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে—

বিলাসিনীনাং দশনাদি-সংস্কারস্য
অত্যন্তাভীষ্টত্বাদ্ ইতি।

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ১০.৪৫.৩৫; কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩১; বংশীধর-কৃত ভাবার্থপ্রকাশ টীকা, পৃ. ৫৮২; The kalas, p. 26]

৯. মণিভূমিকাকর্ম। অর্থাৎ মরকতাদি মণি-রত্ন দিয়ে ঘরের পাকা মেঝে তৈরি করা—

মণিভূমিকাবৎ কুট্টিমভূমি-স্তস্যা
মরকতাদিভেদেন করণম্।

একজন গবেষক অবশ্য বলেছেন—এটা পুতুল তৈরি করার মতো একটা কাজও হতে পারে—"Construction of floors with gems; mosaic work. The scholiast explains this word as 'the making of dolls'." *[তদেব]*

১০. শয়ন রচনা। সাধারণ অর্থ "making of beds." কিন্তু কামসূত্রের টীকাকার যশোধর এবং ভাগবত পুরাণের টীকাকার বংশীধরের মতো ভাবানুষঙ্গ থাকা দরকার। যেমন তিনি শয়ন-পূর্বকালে প্রেম-ভালোবাসায় অনুরাগগ্রস্ত কিনা, নাকি তাঁর মধ্যে বিরাগী-বিরক্তের ভাব আছে, নাকি অনুরাগও নয়, বিরাগও নয়, তিনি একপ্রকার মধ্যস্থ ভাবে আছেন—সেই সব ভাব বুঝে নিয়ে অনুরূপভাবে শয্যা তৈরি করাটাই কলা হিসেবে শয়নরচনার তাৎপর্য্য তৈরি করে। এমনকী পুরুষ-রমণী যেই হোন তিনি শয্যাগ্রহণের পূর্বে কী ধরনের খাবার খেয়েছেন, তার মধ্যে থেকেও অনুরক্ত-বিরক্ত এবং মধ্যস্থভাবের বিচার সম্পন্ন করে অনুরূপ শয়ন রচনা করাটাই একটা কলা—

শয়নীয়স্য কালাপেক্ষয়া রক্ত-বিরক্ত-মধ্যস্থাভিপ্রায়াদ্ আহার-পরিণতি বশাচ্চ রচনম্। *[তদেব]*

১১. উদকবাদ্য। এটাকে আধুনিক কালের জলতরঙ্গ বাদ্য বলা উচিত। কামসূত্রের টীকাকার এখানে যে সামান্য ভ্রান্তিবিলাস ঘটিয়েছেন, সেটা ভেঙ্কটসুব্বাইয়ার মতো প্রবীণ গবেষকও নির্বিচারে গ্রহণ করে লিখে ফেলেছেন যে, উদক বাদ্য হল—Playing on water so as to produce the sound of a 'muraja' (drum), etc.

যশোধর লিখেছেন—জলের মধ্যে মুরজ ইত্যাদি বাদ্যের ধ্বনি তোলার নাম উদকবাদ্য। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, জলের মধ্যে হাত-পা কিংবা অন্য কিছুর সাহায্যে মুরজাদি বাদ্যের স্থূল কিছু ধ্বনি তৈরি হতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মধ্বনি তাতে আসে না। কিন্তু এটাও ঘটনা যে, ভারতবর্ষে কাচের আবিষ্কার হয়ে গেছে অন্তত আড়াই হাজার

বছর আছে। উত্তর-প্রদেশের বাস্তি অঞ্চলে এবং তক্ষশিলায় কাঁচের মালার বীজ এবং শঙ্কুর আকারে কাচের পাত্রও পাওয়া গেছে। আমরা বিশ্বাস করি, খ্রীষ্টপূর্ব কালে বিভিন্ন প্রকারের কাচের পাত্র তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যেগুলিতে বিষম পরিমাণে জল রেখে কাঠের কাঠি দিয়ে বাজানো হত। এই বিশ্বাসের কথাটা কামসূত্রের টীকাকার না বললেও ভাগবত পুরাণের টীকাকার বংশীধর পরিষ্কার করে বলেছেন—জলপূর্ণ পাত্রে মুরজধ্বনির মতো নানা প্রকার তাল সমন্বিত মধুর ধ্বনির উদ্ভাবন করাটাই উদকবাদ্য—

উদকপূরিতপাত্রে মুরজাদিবন্
মধুর-নানাতাল-সমুপস্থাপনম্।
[তদেব]

১২. উদকঘাত। যশোধর এবং বংশীধর দুজনেই বলেছেন—স্নান করার সময় হাতে জল নিয়ে বা নদী-পুকুরের জল দিয়েই অন্যতরভাবে আঘাত করাটাই উদকক্রীড়ার অন্তর্গত কলা। ভাগবতের অন্য টীকাকার জীবগোস্বামী 'উদকঘাত'কে জলস্তম্ভন বলে উল্লেখ করছেন। আর ভেঙ্কটসুব্বাইয়া বৌদ্ধগ্রন্থ ধম্মপদ এবং বিনয় পিটক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এটাকে সাধারণ জলক্রীড়াই বলতে চেয়েছেন—

Striking others (in jalakrīdā) with handfuls of water. Compare 'udakakīlā', Dhammapada 307, 'udake hāsadhamme pacittiyam', Vinaya, IV. 112 and 'udakaharshanam', Vyut. 261-68. Jīvagosvāmin explains this of water). Cp. VII. 28.

যন্ত্রের মধ্যে জল পুরে অপরকে আঘাত করাটাও ক্রীড়াকলার মধ্যে পড়ে—

হস্তযন্ত্রমুক্তৈরুদকৈ স্তাড়নং,
তদুভয়ং জলক্রীড়াঙ্গম্।

আধুনিক দৃষ্টিতে যন্ত্রমুক্ত এই উদকঘাত পিচকারি-খেলার সঙ্গে একাত্মক বলে মনে হয়। আমরা অবশ্য সপ্তম খ্রিষ্টাব্দের প্রথমভাগে লিখিত রাজা হর্ষবর্ধনের লেখা রত্নাবলী নাটকে দেখেছি যে, নাগরিকাবৃত্তি-সম্পন্না রমণীরা নিজ নিজ শৃঙ্গক (পিচকারি) যন্ত্র হাতে নাগরক পুরুষদের ওপর জলপ্রহার করছেন এবং তাতে নাগরক পুরুষদের রতি-কৌতূহল বেড়ে উঠছে—

মধুমত্ত-কামিনীজন-স্বয়ংগ্রাহ-গৃহীত-শৃঙ্গক-জলপ্রহার-নৃত্যন্নাগরজন-জনিত কৌতূহলস্য।
[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ১০.৪৫.৩৫, জীবগোস্বামী-কৃত টীকা এবং বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮২; কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা, পৃ. ৩১; Ratnavali of shri Harsha, (ed. Ashokanath Bhattacharya, Calcutta:Modern Book Agency, 1939) p. 26; The kalas, p. 26]

১৩. চিত্রযোগ (চিত্রাশ্চ যোগাঃ)। এই শব্দের বিশেষ অর্থ হল—নানা প্রকার ওষধি, মাদকাদির মাধ্যমে অথবা নানা প্রকার তান্ত্রিকী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনভীষ্ট ব্যক্তিকে দুর্বল করে দেওয়া, চুলে পাক ধরিয়ে অল্প বয়সেই বৃদ্ধ করে তোলা, পাগল বানিয়ে দেওয়া—Causing others, by means of drugs, medicine, invocations, etc., to become weak, prematurely greyhaired, mad, etc. কামসূত্রের টীকাকার যশোধর এটাই বলেছেন—

নানাপ্রকার-দৌর্ভাগ্যেকেন্দ্রিয়
পলিতীকরণাদয়ঃ।

উক্ত প্রক্রিয়াগুলির কোনোটাই কোনো সদুপায় নয় বলেই এগুলিকে 'কলা' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে কেন, সেই প্রশ্ন এখানে আসে। এখানে উত্তর এটাই যে, কলা প্রধানত নাগরক-বৃত্তির অঙ্গ। এখানে প্রেম, ভালোবাসা, রতির অনুষঙ্গ ছাড়াও যেন-তেন-প্রকারে নিজের উচ্চাভিলাষ সিদ্ধ করাটাও ঐশ্বর্য্যশালী নাগর জনের প্রয়োজন হয়ে ওঠে। ঈর্ষা এবং অসূয়া বৃদ্ধিকামী রাজা, মন্ত্রী এবং পদস্থদের পীড়িত করে বলেই অন্যের ক্ষতি করে নিজের উন্নতি সাধন করাটাও একটা 'আর্ট' হয়ে ওঠে। সেই দৃষ্টিতেই 'চিত্রযোগে'র ব্যবহারও একটা কলা, যেমনটা যশোধর লিখছেন কামসূত্রের টীকায়—

ঈর্ষ্যয়া পরাভিসন্ধানার্থাঃ।
[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩১; The kalas, p.27; ভাগবত পু. ১০, ৪৫, ৩৫ বংশীধর-কৃত টীকা, পৃ. ৫৮২]

১৪. মাল্যগ্রথন বিকল্প। বিচিত্র ফুল দিয়ে বিভিন্ন রকমের মালা গাঁথা। এই মালা গাঁথার বিকল্পোপায়গুলি শেখাটা দেবতাকুলের পুজোর জন্যও যেমন প্রয়োজন, তেমনই

প্রয়োজন নিজেকে অথবা পরকে সাজানোর জন্যও—

মাল্যানাং পুষ্পমালাদীনাং দেবতা
পূজনার্থানাং নেপথ্যর্থানাং গ্রথনবিকল্পাঃ।

[তদেব]

১৫. শেখরাপীড়যোজনা। এটা মালা গাঁথার কৌশলের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হতে পারত। কিন্তু মাথার ওপর ফুলের মালা পড়া পৃথক একটা কলা এইজন্যই যে, সেটা করতে গেলে খোপা কিংবা চুলের মধ্যে কাঁটা ব্যবহার করতে হয়, প্রাচীনকালে এই চুলের কাঁটা তৈরি হতে কাঠের কাঠি বা কাষ্ঠিকা দিয়ে। পুরুষের পক্ষে শেখরাপীড় কিন্তু মাথায় পাগড়ি বাঁধার ব্যাপারও হতে পারে।

[তদেব]

১৬. নেপথ্য-প্রয়োগ। নয়নের কাছে পথ্য অর্থাৎ যেটা দেখতে ভালো লাগে এমন সাজগোজ করাটাকেই নেপথ্য বলে। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর এবং ভাগবত পুরাণের টীকাকার বংশীধর একই কথা জানিয়ে বলেছেন—দেশ এবং কাল অনুযায়ী বস্ত্র, মাল্য এবং আভরণ যোজনা করে দেহশোভা সৃষ্টি করার কলাটাই নেপথ্য-প্রয়োগ—

দেশ-কালাপেক্ষয়া বস্ত্রমাল্যাভরণাদিভিঃ
শোভার্থং শরীরস্য মণ্ডনাকারাঃ।

[তদেব]

১৭. কর্ণ পত্রভঙ্গ। হাতির দাঁত, শঙ্খ ইত্যাদি থেকে তৈরি আভূষণ দিয়ে কর্ণশোভা তৈরি করা।

[তদেব]

১৮. গন্ধযুক্তি। বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি বা Perfume গায়ে লাগানো বা বেশ-বাসে লাগানো।

[তদেব]

১৯. ভূষণযোজনা। শরীরের নানা জায়গায় সঠিকভাবে অলঙ্কার পরা। টীকাকারেরা বলেছেন—এই অলঙ্কার যোজনা দুরকমের হতে পারে—সংযোজ্য এবং অসংযোজ্য। সংযোজ্য হল সেই অলঙ্কারগুলি, যেগুলি খুলেও রাখা যায়, আবার অন্য জায়গা থেকে নিয়েও পরা যায়; কণ্ঠহার, মণি, মুক্তা, প্রবাল ইত্যাদি হল শরীরের যথার্থ জায়গায় যুক্ত করার মতো সংযোজ্য অলঙ্কার। আর অসংযোজ্য অলঙ্কার হল সেইগুলি, যেগুলি আর শরীর থেকে খোলার প্রয়োজন হয় না, যেমন কটক-কুণ্ডলাদি অর্থাৎ হাতের বালা, কানের দুল ইত্যাদি। এই অলঙ্কার-যোজনাও কিন্তু নেপথ্য-রচনা বা সাজসজ্জারই অঙ্গ। *[তদেব]*

২০. ঐন্দ্রজাল যোগ। ইন্দ্রজাল-বিদ্যার শিক্ষা। একে 'মেসমারিজম্'-ও বলা যায়। ইন্দ্রজালের মাধ্যমে অন্যের কাছে নিজেকে দেবতা বলে প্রতিপন্ন করা। বিপক্ষীয় সৈন্যসামন্তের সামনে এমন মায়া তৈরি করা, যাতে তারা বিস্ময়-স্তব্ধ হয়ে পড়তে পারে বা ভয় পেতে পারে। রামায়ণ মহাকাব্য ইন্দ্রজিৎ রামচন্দ্র এবং তাঁর সেনাবাহিনীর সামনে যেভাবে মায়া সীতাকে বধ করার প্রতীতি ঘটিয়েছিলেন, সেটা ইন্দ্রজাল বিদ্যার একটা প্রয়োগ-প্রকার বলা যেতে পারে।

[ভগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী), ১০.৪৫.৩৫, বংশীধর-কৃত ভাবার্থপ্রকাশ টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৩; কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩১; রামায়ণ, ৬.৮১.৩-১৫; The kalas, p. 27]

২১. কৌচুমারযোগ। কুচুমার একজন কামশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত, যাঁর কথা বাৎস্যায়ন স্বয়ং কামসূত্রে উল্লেখ করেছেন এবং তা করেছেন কামশাস্ত্রের অন্তর্গত একটি বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হিসেবে। বস্তুত বাৎস্যায়নের পূর্বে কামশাস্ত্র-বিষয়ক একমাত্র আচার্য ছিলেন বাভ্রব্য। বাভ্রব্যের পর এবং কামশাস্ত্রকার বাৎস্যায়নের পূর্বে সমগ্র কামশাস্ত্রের উপদেষ্টা আচার্য আর একজনও ছিলেন না, কিন্তু কামশাস্ত্রের একদেশ বিষয়ে অভিজ্ঞ পূর্বাচার্যরা যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নাম বাৎস্যায়ন প্রথম অধ্যায়েই উল্লেখ করেছেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে। ঠিক এইখানেই বাৎস্যায়ন লিখেছেন—

বাভ্রব্য-কৃত কামশাস্ত্রের বেশ্যাসম্বন্ধী বিষয় নিয়ে আচার্য দত্তক যেমন একটি বিশেষ গ্রন্থ লিখেছেন, ভার্যাধিকরণের বিষয়ে যেমন লিখেছেন গোনর্দীয়, তেমনই রতিসৌভাগ্য-বৃদ্ধিকর ঔপনিষদিক বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন আচার্য কুচুমার— কুচুমারঃ ঔপনিষদিকমিতি। বস্তুত আচার্য কুচুমারের এই 'ঔপনিষদিক' অধিকরণ জানাটাই কৌচুমার-যোগ।

বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে বলা হয়েছে—মেয়েরা যে পুরুষকে সুদৃষ্টিতে দেখে, তারই নাম সুভগ। রূপ, গুণ, বয়স এবং অর্থব্যয়ের ক্ষমতা

যার বেশি সেই পুরুষ সুভগ। কিন্তু এগুলি যার নেই, তাকে কতগুলি মুষ্টিযোগ শিখে নিতে হয় সৌভাগ্যপুষ্টির জন্য। এই সৌভাগ্যসাধক বা সুভগকারক বস্তুগুলির জ্ঞানই কামশাস্ত্রে 'ঔপনিষদিক' নামে খ্যাত। সুভগকারক বস্তুর মধ্যে যেমন নানা ভেষজ বস্তু গায়ে, মুখে, চোখে মাখার রূপবর্ধক অনুলেপন আছে, তেমনই রতিশক্তিবর্ধক নানান খাদ্য-পানীয়ও আছে যা আচার্য কুচুমারের নির্দেশিত 'ঔপনিষকের' মধ্যে পড়ে। কৌচুমার-যোগ আসলে কুচুমার-কথিত এই 'ঔপনিষদিক' জ্ঞান, যাকে কামশাস্ত্রকার বাৎস্যায়নও যেমন কলা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তেমনই ভাগবত পুরাণের শ্রীধরস্বামী কৃত টীকাতেও সেটি কলা।

[কামসূত্র (মুম্বই : নির্ণয়সাগর প্রেস), ৭.১; পৃ. ৬, ৩৬৫-৩৬৭; ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী), ১০-৪৫.৩৫, শ্রীধরস্বামী এবং বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য]

২২. হস্তলাঘব। অর্থাৎ সামান্যতম সময় নষ্ট না করে খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারার ক্ষমতা—সেটা যেমন হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে বার করার ব্যাপারেও কাজে লাগে, তেমনই মানুষকে বিস্মিত করার ব্যাপারেও কাজে লাগে। সেইজন্যই এটা কলা হয়ে ওঠে—

সর্বকর্মসু লঘুহস্ততা কালাতিপাত-নিরাসার্থং
দ্রব্যহানিষু বা লাঘবং ক্রীড়ার্থং বিস্মাপনার্থঞ্চ।

লঘুহস্ততা বা হস্তলাঘব গদাবিদ্যা এবং ধনুর্বিদ্যার অন্যতম শিক্ষিতব্য বিষয়। ধনুকে শর যোজনা করে শর মোচন করার ক্ষেত্রে শীঘ্রতাও একটা কলা হিসেবে চিহ্নিত হয় বলে সেটাও 'হস্তলাঘব হিসেবেই বার বার উল্লেখ করা হয়েছে মহাভারতে, কখনো বা 'লঘুহস্ততা' বলেও—

* তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম বীভৎসোর্হস্তলাঘবম্।
বিমুক্তং বহুভিঃ যোধৈঃ শস্ত্রবৃষ্টিং দুরাসদাম্॥

* হস্তলাঘবমস্ত্রেষু দর্শয়ন্তৌ মহাবলৌ।
অন্যোন্যং সমবিদ্ধেতাং শরৈস্তৌ
দ্রোণসাত্যকী॥

* আচার্যো লঘুহস্তত্বাদ্ অভেদ্যকবচাবৃতঃ।
উপলভ্য রণে ক্রীড়েদ্ যথা শকুনিনা শিশুঃ॥

পণ্ডিতেরা অনেকেই অবশ্য 'হস্তলাঘব' শব্দটিকে হাতের কারসাজি, কৌশল কিংবা চুরি করা অর্থেই গ্রহণ করেছেন। ভেঙ্কটসুব্বাইয়া লিখেছেন—Readiness of hand *i.e.*, quickness in doing all things, according to Yasodhara and Böhtlingk. The scholiast, however, interprets this as 'stealing things, even when persons are present'.

[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), পৃ. ৩১, যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য; মহা (k) ৬.১০২.১৬-১৭; ৭.৯৮.৩৫-৩৬; ৭.১১১.২৪; (হরি) ৬.৯৮.১৬-১৭; ৭.৮৫.৩৫; ৭.৯৫.২৪; The kalas, p. 27]

২৩. বিচিত্রশাক-যূষ-ভক্ষ্যবিকারক্রিয়া। অন্যত্র 'চিত্রশাকাপূপ-ভক্ষ্য-বিকারক্রিয়া। এই কলার প্রধান অর্থ বিচিত্র প্রকার ভক্ষ্য-ভোজ্য রান্না করার শৈলী এবং অবশ্যই লেহ্য-পেয় প্রস্তুত করার শৈলীও—

Preparation of various vegetables, soups and condiments. কামসূত্রের টীকাকার বেশ বিস্তারিতভাবে বলেছেন— আহার চার রকমের হয়—ভোজ্য, ভক্ষ্য, লেহ্য, পেয়। ভোজ্য: ভোজ্য হল—ভাত-রুটির সঙ্গে নানা প্রকারের ব্যঞ্জন। এর মধ্যে নানা-প্রকার ব্যঞ্জন রন্ধন করার জ্ঞান। দেশকালভেদে সেই জ্ঞান সবটা লাভ করা সম্ভব নয় বলেই বিচিত্র ব্যঞ্জন-প্রকারের প্রথম ব্যঞ্জন শুধু 'শাক' শব্দ ব্যবহার করেছেন। শাক আবার দশ রকমের—বৃক্ষের মূল, গাছের পাতা (সাধারণত যাকে আমরা 'শাক' বলি), করীর (অর্থাৎ বাঁশের কোঁড়, অঙ্কুর মাত্র), অগ্র অর্থাৎ গাছের আগাটুকু, গাছের ফল, কাণ্ড, প্ররূঢ়ক, (গাছের ওপরে যা গজিয়েছে), কিংবা 'নালবীজাঙ্কুরাস্থি-মজ্জাদি'। গাছের ছাল গাছের ফুল, এবং গাছের কাঁটা—

মূল-পত্র-করীরাগ্র-ফল-কাণ্ড-প্ররূঢ়কম্।
ত্বক্-পুষ্পং কন্টকঞ্চেতি শাকং দশবিধং স্মৃতম্॥

ভক্ষ্য: ভক্ষ্য বস্তুর মধ্যে আছে শুকনো গুড়, চিনি, মিছরি ইত্যাদি এবং এই ধরনের মিষ্টি দিয়ে তৈরি করা খাদ্য। ভগবদ্‌গীতার টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখেছেন—পিঠে কিংবা মিষ্টদ্রব্য, যেগুলি দাঁত দিয়ে ভেঙে ভেঙে খেতে হয় সেটাই ভক্ষ্য—

যদ্ দন্তৈ রবখণ্ড্য অবখণ্ড্য ভক্ষ্যতে
অপূপাদি তদ্ ভক্ষ্যম্।

পেয়:—পেয় বস্তু দুরকমের। এক প্রকার হল, আগুনে ফুটিয়ে তৈরি করতে হয়, অন্যটি আগুন ছাড়াই প্রস্তুত করতে হয়। আগুনে যেটা তৈরি করতে হয়, সেটাকেই যূষ বলে। সেটা আবার

আমিষ-নিরামিষ দুরকমের। যেমন মুগ, মাষ ইত্যাদি ডালের যূষ হল নিরামিষ। আবার মাংসের যে যূষ হয় সেটা আমিষ যূষ।

লেহ্য: যেগুলি লেহন করে খেতে হয়, যেমন গুড়, মধুর-অম্ল-লবন ইত্যাদি মিশ্রিত বস্তু, আচার। ভগবদ্‌গীতার টীকাকার শ্রীধরস্বামী লিখেছেন— দ্রবীভূত গুড়, আচার ইত্যাদি বস্তু, যা জিহ্বার উপরে নিক্ষেপ করে রসাস্বাদন করার পর গিলে নিতে হয় সেগুলি লেহ্য—

যজ্জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসাস্বাদেন
ক্রমশো নিগীর্য্যতে দ্রবীভূতং তল্লেহ্যম্।

ভোজ্য-ভক্ষ্য-পেয়-লেহ্যাদি ক্রমে চার রকমের এই অন্নপান তৈরি করাটা একটা কলার মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ উৎকৃষ্ট রন্ধন শৈলী এবং অন্যান্য খাদ্য প্রস্তুত করা ক্ষমতাই আসলে এক ধরনের কলা।

[কামসূত্র (মুম্বই:নির্ণয় সাগর প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা, পৃ. ৩৬; ভগবদ্‌গীতা, ১৫.১৪, শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা দ্রষ্টব্য পৃ; The kalas, p. 28]

২৪. পানকরস-রাগাসবযোজনা। 'পানক' বস্তুটা কোনো অম্লমধুর পেয় বস্তু, যার সঙ্গে লবণও থাকে প্রয়োজন মত, হয়তো সেই পানক রসই এখনকার দিনে 'পানা' বলে পরিচিত— আমপানা, বেলপানা ইত্যাদি। পানকরস কথাটা রসশাস্ত্রে স্থায়ী ভাবের সঙ্গে বিভাবানুভাব-ব্যাভিচারী ভাবের সংযোগে রস ওঠার সঙ্গে উপমিত হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত এটাকে, 'ষাড়ব রস বলেছেন, অর্থাৎ কটু-অম্ল-মধুর-কষায় ইত্যাদি ষড়রসের মিশ্রণ। কিন্তু মম্মটভট্ট রচিত কাব্যপ্রকাশে এই 'ষাড়ব রসকে' 'পানক'রসই বলা হয়েছে এবং এবং তার উপাদান বলার সময় গুড়, মরীচ, কর্পূর ইত্যাদি নানা প্রকার উপাদান জানানোর পর টীকাকারেরা বলেছেন— পানকরসে পৃথক পৃথক উপাদানগুলির পৃথক পৃথক স্বাদ থাকলেও সব মিলিয়ে যেমন অন্যতর এক আস্বাদন-চমৎকার তৈরি করে, রসের আস্বাদনও সেইরকম স্থায়ীভাব,বিভাবাদিভাবের মিশ্রণে অন্যতর এক পৃথগাস্বাদন। ফলত লবণ এবং অম্ল-মধুর ইত্যাদি বস্তু নানা মশলা সহযোগে যখন অন্যতর পৃথক এক আস্বাদন তৈরি করে, সেই চমৎকার পেয় বস্তুটিই পানকরস—যেটা প্রস্তুত করার কৌশলটি কলা হিসেবে চিহ্নিত। মহাভারতে দেখা যাবে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর ধৃতরাষ্ট্র যখন যুধিষ্ঠির দত্ত রাজকীয় সুখে কাল কাটাচ্ছেন, তখন তাঁর খাদ্য-তালিকার মধ্যে মৎস্য-মাংসের সঙ্গে মৈরেয় মদ্য এবং পানকরসও আছে অন্যতর বিচিত্র ভক্ষ্য-দ্রব্য তো আছেই—

মৈরেয়-মৎস্যমাংসানি পানকানি মধূনি চ।
চিত্রান্ ভক্ষ্যবিকারাংশ্চ চক্রুস্তস্য যথা পুরা।।

[নাট্যশাস্ত্র (রামকৃষ্ণ কবি), খণ্ড-১.৬.৩১, পৃ. ২৮৭; কাব্যপ্রকাশ (কালবিকর), ৪.২৬, পৃ. ৯৩; মহা (k) ১৫.১.২১; (হরি) ১৫.১.২১]

এখানে পানকরসের সঙ্গে 'রাগ' কথাটার একটা একটা সাধারণ সম্বন্ধ আছে। পূর্বে 'বিচিত্রশাকযূষ . . .' কলা সম্বন্ধে কামসূত্রের টীকাকার যশোধর তাঁর টীকায় লিখেছিলেন যে, পেয় বস্তু দুভাবে তৈরি হতে পারে— অগ্নিনিষ্পাদ্য এবং অনগ্নিনিষ্পাদ্য আগুনে ফুটিয়ে যেগুলি তৈরি হয় না, সেই অনগ্নিনিষ্পাদ্য। পেয় আবার দুরকমের—দ্রাবিত এবং অদ্রাবিত। সেখানে দ্রাবিত মানেই জল ইত্যাদি দ্রবের সংযোগে গুড়-তেঁতুল-লবণ ইত্যাদি বস্তুর মিশ্রণে তৈরি পানকরস। আর অদ্রাবিত হল জলের সংযোগ ছাড়া বিভিন্ন ওষধির সঙ্গে তাল, মোচা ইত্যাদি ফল মিশিয়ে তৈরি কোনো আস্বাদ্য বস্তু। এই বস্তুটার সঙ্গেই 'রাগ' কথাটির অর্থযোগ আছে। সাধারণ অর্থে 'রাগ' মানে লেহ্য—

রাগো লেহ্যম্। রাগগ্রহণং লেহ্যং সূচয়তি।

এই ধরনের লেহ্যবস্তুর মধ্যেও কিন্তু ঈষৎ দ্রবতা আছে যেটা যশোধর তাঁর টীকায় একটি শ্লোক উল্লেখ করে বলেছেন—রাগবিধানজ্ঞ ব্যক্তিরা জানিয়েছেন যে, লেহনযোগ্য নানাবিধ চূর্ণের সঙ্গে লবন, অম্ল, কটু, মধুর ইত্যাদি সহযোগে আচার জাতীয় লেহ্য বস্তু তৈরি করার শিক্ষাটাও একটা কলা—

রাগো রাগবিধানজ্ঞৈ র্লেহ্যশ্চূর্ণো দ্রবঃ স্মৃতঃ।
লবণাম্লকটুস্বাদ ঈষন্মধুরসংযুতঃ।।

লক্ষণীয়, মহাভারতে অত্যন্ত সুখে থাকা ধৃতরাষ্ট্রের খাদ্যতালিকায় মৈরেয় মদ্য এবং পানকরসের আগে আরও যে সব খাদ্যের কথা বলা হয়েছে সেখানে—'রাগখাণ্ডবিক' বলে একটি শব্দ পাওয়া যাবে। রাগখাণ্ডবিক শব্দের অর্থ হল—যাঁরা বহু বস্তু মিশ্রিত করে একটি

লেহনযোগ্য খাদ্য বানাতে পারেন। টীকাকার নীলকণ্ঠ এখানে রাগখাণ্ডব শব্দের অর্থ জানিয়ে বলেছেন—পিপুল, শুঠী, চিনি ইত্যাদির সঙ্গে মুগডালে যূষ যুক্ত করা খাবার। সেই খাবার যাঁরা তৈরি করতে পারেন তাঁরাই রাগখাণ্ডবিক—

আরালিকাঃ সূপকারা রাগখাণ্ডবিকাস্তথা।
'রাগখাণ্ডব' তৈরি করাটা নিশ্চয়
একটা কলার মধ্যে পড়ে।

পানকরস, রাগপ্রস্তুতির পর আসব-যোজনার প্রসঙ্গ আসছে। আসব অবশ্যই মদ্য। আসব বা মদ্যের ক্ষেত্রেও একটা প্রস্তুতির ব্যাপার আছে এবং হয়তো সেইজন্যই ভাগবত পুরাণের টীকাকার 'আসব' তৈরির পর্যায় শব্দটাই বলেছেন 'সন্ধান'—সন্ধানমেকা কলা। টীকাকার যশোধর আবার লিখেছেন—আসব শব্দটায় 'সন্ধান' বোঝায়। তাঁর মতে অনগ্নিসম্পাদ্য পানীয়মাত্রেই তার নাম 'সন্ধান' অর্থাৎ যেটা এটা-ওটা মিশিয়ে বানাতে হয়, এমনকী সন্ধান শব্দের একটা অর্থ আচারও বটে; চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—'মৃৎপাত্রে সন্ধানাদি নিল ভরি'। যশোধর বলতে চাইছেন— 'অভিষব' ইত্যাদি অর্থাৎ ছাঁকনিতে ছেঁকে মৌল আকর থেকে মদ্যের যে প্রস্তুতিকরণ সেটাই হল সন্ধান, বা মদ্যসন্ধান, লৌকিক ভাষায় মদ চোঁয়ানো। এই মদ্য প্রস্তুত করার পদ্ধতিও একটা কলা। বিশেষত মদ্য সজ্জীকরণের সময় মদ্যকে মৃদু, মধ্যম এবং তীক্ষ্ণ করে তোলার ক্ষমতা তো একটা শৈলী বা কলাই বটে—

আসব-গ্রহণেন সন্ধানমুপলক্ষয়তি,
তন্মৃদু-মধ্য-তীক্ষ্ণ-সন্ধান-যোজনাৎ
তথাবিধমেব সম্প্যাদ্যতে।

[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য পৃ. ৩২; ভাগবত পুরাণ (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী), ১০.৪৫.৩৫; বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৩; মহা (k) ১৫.১.১৯; (হরি) ১৫.১.১৯]

২৫. সূচীবানকর্ম। অন্য একটি পাঠে সূচীয়বায়কর্ম। 'বান' শব্দের অর্থ বন্ধন, ছুঁচ-সুতো দিয়ে যে সীবনকর্ম করা হয় সেটাই সূচীবানকর্ম অর্থাৎ সেলাইয়ের কাজ। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর বলেছেন—সেলাইয়ের কাজ তিন রকমের—সীবন, ঊতন এবং বিরচন। জামা-কাপড় থেকে আরম্ভ বুকের কাঁচুলি সেলাই করা এই সীবনকর্মের মধ্যে পড়ে। ঊতন সম্ভবত ছুঁচসুতো দিয়ে কাপড় মেরামতি করা বা 'রিফু' করার কাজ। আর বিরচন হল কম্বল কিংবা আস্তরণ তৈরি করা। সোজা কথায় পরতে পরতে কাপড় ফেলে যেভাবে কাঁথা তৈরি করে, সেইভাবে হস্তীপৃষ্ঠের ওপর পুরু আস্তরণ কিংবা শীতনিবারণের জন্য কাঁথা, শাল ইত্যাদি তৈরি করাটাও বিরচন-কর্মের মধ্যে পড়ে। ভেঙ্কটসুব্বাইয়া লিখেছেন—'Sewing, weaving, knitting, plaiting'

[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), পৃ. ৩২ যশোধরকৃত টীকা দ্রষ্টব্য; ভাগবত পু. ১০.৪৫.৩৫ শ্রীধরস্বামী-কৃত এবং বংশী টীকা দ্রষ্টব্য, The kalas, p. 28]

২৬. সূত্রক্রীড়া। হাতে সুতো নিয়ে বিভিন্ন রকমভাবে সুতো বার করে নানা ধরনের 'ফিগার' তৈরি করার কাজ। আবার জীব গোস্বামী ভাগবত পুরাণের টীকায় যেরকম লিখেছেন—এটা সুতো দিয়ে পুতুল নাচানোর খেলাও হতে পারে—

সূত্রসঞ্চালনেন পুত্তলিকাদিচালনম্।

ভেঙ্কটসুব্বাইয়া লিখেচেন—

Playing with strings, *i.e.,* holding a string in the fingers and making it assume the outline of a house, temple, etc. Cp. I. 77. Jīvagosvāmin interprets this term as 'making' figures move by pulling threads.' *[তদেব। ভাগবত পু. ১০.৪৫.৩৫; জীবগোস্বামী-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৭]*

২৭. বীণা-ডমরুকবাদ্য। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর লিখেছেন—এই বাদ্যশিক্ষাগুলি পূর্বে বলা কলানাম 'বাদিত্রে'র মধ্যে ধরা তন্ত্রীবাদ্য হিসেবে বলা হলেও বীণা এবং তালবাদ্য হিসেবে অত্যন্ত কঠিন ডমরুর প্রাধান্য সূচনার জন্য পুনরায় এই দুটির নাম করা হয়েছে। অনেকে বলেছেন—এখানে সোজাসুজি বীণা-ডমরুর কথা বলা হচ্ছে না, বরঞ্চ কণ্ঠ, মুখ গাল ইত্যাদি ব্যবহার করে বীণা-ডমরুর মতো শব্দ বার করার কৌশলকেই বীণা-ডমরুক বলা হয়েছে। এখানে 'ডমরুক' শব্দে যে 'ক' প্রত্যয়, সেটা একরকম কৃত্রিমতার দ্যোতক বলেই বীণা-ডমরুর শব্দ কণ্ঠ-মুখ-গাল দিয়ে এই কৃত্রিম শব্দ বার করার প্রসঙ্গ আসছে। *[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস) পৃ. ৩২; যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য; কামসূত্র (পঞ্চানন তর্করত্ন) ৩.১৬, পৃ. ৪৯]*

২৮. প্রহেলিকা। যশোধর তাঁর টীকায় বলেছেন—মানুষের মধ্যে প্রচলিত লোকঠকানো কবিতা-চাতুর্য্য। সেটা নিয়ে দুই-তিনজনে প্রতিযোগিতার খেলাও করতে পারে, আবার সাধারণ-বিনোদনের জন্য খেলা হিসেবেও প্রহেলিকার ব্যবহার হয়। প্রহেলিকার সংজ্ঞা হিসেবে সবচেয়ে তাৎপর্যময় কথাগুলি লিখেছেন ভাগবত পুরাণের টীকাকার বংশীধর। তিনি লিখেছেন—কবিতার মধ্যে বক্তব্য মূল অর্থ গোপন করে অন্য যে কোনো একটা অর্থ প্রকাশ করে তোলার পর মনে হয় শ্লোকের বাহ্য অর্থের মধ্যে কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি আছে, কিন্তু সেই অসঙ্গতি দূর করার জন্য শব্দের অন্য অপ্রচলিত অর্থ যুক্ত করলেই একটা যোগ্য সমাধান তৈরি হয়—

ব্যক্তীকৃত্য কমপ্যর্থং স্বরূপার্থস্য গোপনাৎ।
যত্র বাহ্যর্থসম্বন্ধং কথ্যতে সা প্রহেলিকা॥

প্রহেলিকা সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ, ইংরেজিতে এগুলিকে riddle verse বা puzzle verse বলা যেতে পারে। পণ্ডিতেরা কেউ কেউ এই ধরনের কবিতাকে সমস্যাপূরণ শ্লোক, কিংবা প্রশ্নোত্তর শ্লোকও বলেছেন। টীকাকার বংশীধর অনেকগুলি প্রহেলিকা শ্লোক উল্লেখ করে প্রহেলিকার কলাকৌশল ব্যক্ত করেছেন। যেমন—

বনে জাতা বনে ত্যক্তা বনে তিষ্ঠতি নিত্যশঃ।
পণ্যস্ত্রী ন তু সা বেশ্যা যো জানাতি স পণ্ডিতঃ॥

সাধারণ বাহ্য অর্থে এর মানে দাঁড়ায়—বনে জন্মেছে আবার বনেই তাকে ত্যাগ করা হয়েছে অথচ বনেই থাকে, একে পণ্যস্ত্রী বলা যায়, অথচ এ বেশ্যা নয়। একথা যে বুঝবে সে পণ্ডিত।

এই শ্লোকের সমাধান হল—বন অর্থাৎ অরণ্যের কাঠ থেকে এর জন্ম, কিন্তু তারপর সে কাঠ ফেলে রাখা হয়েছে জলে এবং তদবধি সে জলেই থাকে—কেননা 'বন' শব্দের একটা অর্থ জল। *[ঋগ্বেদ ১.৫৪.১]*

এ আবার পণ্যস্ত্রী অর্থাৎ দ্রব্য কিংবা মূল্য দিয়ে যাকে ভোগ করতে হয়, অথচ এ বেশ্যা নয়। এই প্রহেলিকা ছদ্মকথার শেষে আমরা বুঝি এটা নৌকা। অন্য একটি প্রহেলিকা—

কৃষ্ণমুখী ন মার্জারী দ্বিজিহ্বা ন চ সর্পিণী।
পঞ্চভর্ত্রী ন পাঞ্চালী যো জানাতি স পণ্ডিতঃ॥

লিখিত শব্দছদ্মে এর মানে দাঁড়ায়— মুখখানা কালো অথচ কালো বেড়াল নয়, সাপের মতো চেরা দুটো জিব, অথচ সাপ নয়। স্বামী পাঁচ জন, অথচ এ পাঞ্চালী দ্রৌপদী নয়। তবে কিনা যে জানে এটা, সে পণ্ডিত।

এখানে আসলে কলম বা লেখনীর কথা বলা হচ্ছে। কলমের মুখ কালিতে কালো, মুখ-জিব চেরা, 'দ্বিজিহ্ব', একখানি লেখনী কিন্তু পাঁচজনে সেটা ব্যবহার করে।

প্রহেলিকা বস্তুত সংস্কৃত চিত্রকাব্যের অন্তর্গত একটি কলা মহাভারতে পাণ্ডবদের যখন জতুগৃহে পুড়িয়ে মারবার জন্য বারণাবতে পাঠানো হল তখন মহামতি বিদুর কিন্তু প্রহেলিকার মাধ্যমেই যুধিষ্ঠিরকে দুর্যোধনের পরিকল্পনা জানিয়ে ঘরে আগুন লাগানোর সংকেত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন— লোহা ছাড়াও শরীর নাশ করার মতো অস্ত্র আছে। এটা যে জানে, শত্রু তাদের কিছু করতে পারে না। শুকনো বনে যে আগুন ধরে যায়, সেই আগুন অন্য শুকনো বনে গিয়ে লাগে। কিন্তু গর্তবাসী ইঁদুরকে সে আগুন কিছু করতে পারে না।

বিদুরের এই কথাগুলো প্রহেলিকা। যুধিষ্ঠির সেটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই জতুগৃহে নিজেরাই আগুন লাগিয়ে দিয়ে সুরঙ্গ-পথে পালিয়ে যান।

অগ্নি পুরাণে চিত্রকাব্যের সংজ্ঞা দেবার পর বলা হয়েছে—গোষ্ঠীর মধ্যে কথা বলর সময় কুতূহলোদ্দীপক বাক্যবন্ধের ব্যবহারকে চিত্রকাব্য বলে। এই চিত্রকাব্য সাতপ্রকার, তার মধ্যে প্রহেলিকা একটি। প্রহেলিকার মূল অর্থ গোপনে থাকে—

* প্রশ্নঃপ্রহেলিকা গুপ্তং চ্যুতদত্তে তথোভয়ম্।
সমস্যা সপ্ত তদ্ভেদা নানার্থস্যানুযোগতঃ॥
* দ্বয়োরপ্যর্থগুহ্যমানশব্দা প্রহেলিকা।

আলঙ্কারিক দণ্ডী প্রহেলিকাকে কলা হিসেবেই ব্যবহার করে বলেছেন—খেলার আমোদ কিংবা গোষ্ঠীপ্রমোদের সময় অন্য মানুষকে বিমোহিত করার জন্য প্রহেলিকার ব্যবহার হয়। দণ্ডীর মতে প্রহেলিকা ষোলো প্রকার—

* ক্রীড়াগোষ্ঠীবিনোদেষু তজ্জ্ঞৈরাকীর্ণমন্ত্রণে।
পরব্যামোহনে চাপি সোপযোগা প্রহেলিকা॥

* এতাঃ ষোড়শ নির্দিষ্টাঃ
পূর্বাচার্য্যৈঃ প্রহেলিকার।

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ১০.৪৫.৩৫, বংশীধরকৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৩; কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য পৃ. ৩২; মহা (k) ১.১৪৫.২১-২৭; (হরি) ১.১৪৯.২২-২৭; অগ্নি পু. (পঞ্চানন), ৩৪৩.২১-২৫; কাব্যাদর্শ (প্রেমচন্দ্র), ৩.৯৭.১০৬]

২৯. প্রতিমালা। এটা হল সেকালের অন্তাক্ষরী খেলা। গোষ্ঠী-বিনোদনের সময় উচ্চারিত কবিতা-পুষ্প পর পর অন্যের মুখে মালার মতো গ্রথিত হতে থাকে, অথচ এর মধ্যে যেন একটা প্রতিযোগিতার ভাবও আছে, হয়তো সেই কারণেই এই কলার নাম প্রতিমালা। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর প্রতিমালার সংজ্ঞা দিয়ে একটি শ্লোক উদ্ধার করে বলেছেন—প্রতিটি সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করার পর শেষে যে অন্তিম অক্ষর-বর্ণ আসবে, সেটার সূত্র ধরেই অন্য একজন অন্য একটি সংস্কৃত শ্লোক বলবে। এইভাবেই একটি শ্লোকের সঙ্গে অন্য একটি শ্লোকের সন্ধির জায়গাটা হল 'অন্ত্যাক্ষর'। এই অন্ত্যাক্ষরিকা থেকেই শ্লোকমালার জন্ম যার নাম প্রতিমালা—

যস্য অন্ত্যাক্ষরিকেতি প্রতীতিঃ সা
ক্রীড়ার্থা বাদার্থা চ, যথোক্তম্—
প্রতিশ্লোকং ক্রমাদ্ যত সন্ধায়াক্ষরমন্তিমম্।
পঠেতাং শ্লোকসন্যোন্যং প্রতিমালেতি সোচ্যতে॥

[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩২]

৩০. দুর্বাচকযোগ। কতগুলি শব্দই হোক অথবা শব্দার্থই হোক, শব্দগুলি যদি এমনভাবে শ্লোকমধ্যে ন্যস্ত হয় যে, সেই শব্দগুলি কিছুতেই সঠিক উচ্চারণ করা যায় না, উচ্চারিত হলেও বিরক্তিকর লাগে, সেটাকেই দুর্বাচক বলে। কিন্তু এইরকম দুর্বাচক শব্দরাশি, যা অন্যে উচ্চারণই করতে পারবে না, সেই শব্দের উচ্চারণ অভ্যাস করে লোকের সামনে বলতে পারাটা অবশ্যই একটা কলাকৌশল বলে গণ্য হতে পারে। বিশেষত এই দুর্বাচক শ্লোকগুলি বলাটা যেমন বিনোদন-চমৎকার হিসেবে গণ্য হতে পারে, তেমনই এরকম দুর্বাচক শ্লোক ব্যবহার করার প্রতিযোগিতাও করা যায়। দণ্ডীর কাব্যাদর্শের তৃতীয় অধ্যায়ে এইরকম দুর্বাচক শ্লোক এবং অর্থের দিক থেকেও অবোধ্য দুর্বাচকতা আছে, এররকম শ্লোক বহুলভাবে উদাহৃত হয়েছে এবং সেরকম অনেক শ্লোককেই তিনি শব্দালঙ্কারের মধ্যে গণনা করেছেন। ফলত দুর্বাচক যোগকে কলা হিসেবে গণ্য করতেই হয়।

[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩২-৩৩; কাব্যাদর্শ (প্রেমচন্দ্র), ৩.৪৭-৮৭]

৩১. পুস্তকবাচন। নাটক-কাব্য বা পুরাণে বর্ণিত শ্লোকরাশি নির্দিষ্ট শৃঙ্গার-বীর-করুণ ইত্যাদি রসের ভাব অনুযায়ী মধুর স্বরে গান করার কৌশলই পুস্তক-বাচন কলা—

পুস্তকস্থানাং কাব্যানাং
শৃঙ্গারাদি-রসানুকূল-গীতস্বরেণ বাচনম্।

বঙ্গভাষায় এই কলার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হল বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'মহিষাসুরমর্দিনী'।

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী), ১০.৪৫.৩৫, বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৩]

৩২. নাটকাখ্যায়িকা-দর্শন। সাধারণভাবে এই কলার অর্থ হল—নাটকের অভিনয় এবং অ্যাখ্যায়িকা নিপুণভাবে বর্ণনা করার ক্ষমতা। আখ্যায়িকার কথা পৃথকভাবে ধরলে বুঝতে হবে নাটক-আখ্যায়িকা-কাব্য পাঠ করার পর সেগুলি অন্য কারও কাছে বলার ক্ষমতা। আবার এই কলাবর্গের এমনও অর্থ হতে পারে যে, যিনি প্রাচীন নাটকের শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জন করেছেন অর্থাৎ নাটকের অন্তর্গত নান্দী-প্রস্তাবনা, প্রবেশক-বিষ্কম্ভক, ভরতবাক্য ইত্যাদি পরিভাষার জ্ঞান যাঁর আছে। কিংবা নাটকের প্রকারগুলি—নাটক, প্রকরণ, ভষণ, ব্যায়োগ ইত্যাদির প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জনও এই একই কলার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে, ঠিক যেমন কথা এবং আখ্যায়িকা-রচনা করার শাস্ত্রীয় জ্ঞানও এখানে অপেক্ষিত। ভাগবত পুরাণের টীকাকার বংশীধর অবশ্য এই কথা-আখ্যায়িকার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৩; ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী), ১০.৪৫.৩৫; বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৩-৫৮৪]

৩৩. কাব্যসমস্যাপূরণ। সমস্যা মানেই সংক্ষেপ এবং সংক্ষেপে একটা জটিল বিষয়ের অবতারণা করা। কাব্যের ক্ষেত্রে সমস্যা-পূরণের প্রশ্নটা একটু

অন্যরকম। সংস্কৃত কাব্য কিংবা বাংলা কাব্য অথবা যে কোনো ভারতীয় ভাষাতেই এই সমস্যাপূরণের ব্যাপারটা কলা হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে। সেকালের দিনে রাজা-মহারাজাদের রাজসভায় কিংবা ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিদের নিজস্ব গোষ্ঠীতে কবি-পণ্ডিতেরা অনেকেই থাকতেন, যাঁদের কবিপ্রতিভা পরীক্ষা করার জন্য তাঁদের উদ্দেশে কবিতার একটি পংক্তি ছুড়ে দেওয়া হত এবং সেই পংক্তিটি অবশ্যই সমস্যামূলক। সেই সমস্যার পংক্তিটি সমাধান করার জন্য অনুরূপ কতগুলি কাব্যপংক্তি যুক্ত করাটাই আসলে কাব্যসমস্যাপূরণ—যেটাকে বংশীধর বলেছেন—

পূরণসাকাঙ্ক্ষা কবিশক্তিপরীক্ষার্থম্
অপূর্ণতয়ৈর পঠ্যমানা সমস্যা।

বাংলাভাষায় এর একটা নমুনা হল—এক সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নাকি তাঁর সভার কবিপণ্ডিতদের উদ্দেশে সমস্যা দিয়ে বলেছিলেন—

'বরশি গিলিছে যেন চাঁদে'।

মাছ ধরার জন্য বাঁকানো লোহার বঁড়শি চাঁদ গিলে আছে—এটা এক বিষম সমস্যাই বটে। কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবিরা এই কাব্যসমস্যা পূরণ করতে পারেননি। শোনা যায়—স্বভাবকবি দাশরথি রায় তাঁর অসম্ভব উপস্থিত বুদ্ধিতে বালক কৃষ্ণের মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলার কাহিনী মিশিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের মুখখানিকে চাঁদের উপমানে গ্রহণ করে যশোমতী মায়ের উদাহরণ দিয়ে সমস্যাপূরণ করে দিলেন এইভাবে—

একদিন শ্রীহরি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি
ভূমিতে পড়িয়া বড়ো কাঁদে।
রাণী অঙ্গুলী হেলায়ে ধীরে মৃত্তিকা বাহির করে
বরশি গিলিছে যেন চাঁদে।।

সংস্কৃত এই ধরনের সমস্যাপূরণ সেকালে চিত্র কাব্যসাহিত্যের অন্তর্গত একটি কলা ছিল, যা বিনোদন এবং প্রতিযোগিতার জন্য বহুলভাবে ব্যবহার হয়েছে। যেমন ধরা যাক, সমস্যা দেওয়া হল—আকাশে যেন শত শত চাঁদ—

'শতচন্দ্রং নভস্তলম্'।

সপ্রতিভ কবি এখানে মথুরা-নগরীতে কংসের অনুচর চানূর-মল্লের সঙ্গে কৃষ্ণের মল্লযুদ্ধের সময় চানূরের ওপর কৃষ্ণের আঘাত প্রকট করে বললেন—দামোদর কৃষ্ণের করাঘাতে চানূর মল্লের চিত্ত এমন বিকল হয়ে গেল যে, সে আকাশে শত শত চাঁদের উদয় দেখতে পেল; আসলে সে চিত্তের বিহ্বলতায় শত শত কৃষ্ণকে আক্রমণরত দেখতে পেল—

দামোদর-করাঘাত-বিহ্বলীকৃত-চেতসা।
দৃষ্টং চানূরমল্লেন শতচন্দ্রং নভস্তলম্।।

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী), ১০.৪৫.৩৫, বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৪; কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৩]

৩৪. পট্টিকাবেত্রবাণ-বিকল্প। ভেঙ্কটসুব্বাইয়া এটার অনুবাদ করেছেন— Making of different things (e.d., cots and seats) from canes and reed. অর্থাৎ বেত দিয়ে খাট বানানো বেত্রাসন বানানোর কৌশল। এখানে 'বাণ' শব্দ বেত্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বেত্র-বাণের অর্থ দাঁড়ায় বেত্রখণ্ড বা বেত্রখণ্ড যেটা বুনন করে খাট-চেয়ার বানানোর কৌশল। বান অর্থ বন্ধন করা। খাট-চেয়ার বেত দিয়ে ফুল-লতা-পাতার 'ডিজাইন' তোলার কলাও বোঝায়। ভাগবত পুরাণের টীকাকার বংশীধর ধরণিকোষ থেকে উদ্ধার করে পট্টিকা শব্দের বিকল্প অর্থ করেছেন ছুরিকা—

'পট্টিকা ছুরিকা-সন্দ্যোঃ ইতি ধরণিঃ'।

তাতে এই কলার অর্থ দাঁড়ায়—ছুরি, বেত্রদণ্ড এবং বাণের যথাক্রমে ঊর্ধ্ব, অধঃ এবং তির্যকভাবে প্রহার করার কৌশল—

কেচিত্তু ছুরিকা-বেত্র-বাণানাং প্রহরণে বিবিধকল্পনা ঊর্ধ্বাধস্তির্যগাদিপ্রকারেণ প্রহরণ মিত্যাহুঃ।

[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৩; ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ১০.৪৫.৩৫; বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৪; The kalas, p. 29]

৩৫. তর্কুকর্ম। লক্ষণীয়, ভেঙ্কটসুব্বাইয়া এখানে পাঠ ধরেছেন—তক্ষ কর্মাণি এবং তার ব্যাখ্যা করে বলেছেন—Cutting i.e., working in gold, steel, wood, etc, of 'apadravyas.' ঘটনা হচ্ছে, এই পাঠ সম্ভবত ঠিক নয়। কেননা 'তক্ষকর্ম' বলতে প্রধানত ছুতোরের কাজ বোঝায় এবং সেটা এর পরেই পৃথকভাবে কলানাম হিসেবে বলা হয়েছে—

তক্ষণম্। অতএব কামসূত্রের টীকাকার যেভাবে 'তর্কুকর্ম' বলে যে পাঠটি ধরেছেন, সেটা একদিক থেকে ঠিক। তিনি টীকায় লিখেছেন—

কুন্দকর্মাণ্যপদ্রব্যার্থানি। এই টীকার অর্থ করে পঞ্চানন তর্করত্ন লিখেছেন—'টেকো' ও কুন্দযন্ত্রে সূত্র প্রস্তুত ও কোঁদান,—পালিশ করা।

কুন্দযন্ত্র আসলে খোদাই করার যন্ত্র। তাতে সোনা-রুপো ইত্যাদি নানা জিনিস খোদাই করার কর্মকৌশলকেই তর্কুকর্ম বলতে চায় যশোধরের জয়মঙ্গলা টীকা। আমাদের কাছে অবশ্য এই অর্থ খুব গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা 'তর্কু' শব্দের অর্থ সুতো কাটার 'কল'— 'সূর্তকর্তনযন্ত্র যাকে কথ্য বাংলায় বলে টেকো, তর্কুচালক যন্ত্র হল চরকা। সেই 'তর্কু' সুতো কাটার কলের কথাটা যখন বলাই হচ্ছে এবং 'টেকো' কথাটা যেহেতু 'তর্কু' থেকেই এসেছে, সেখানে কেন হঠাৎ কন্দুযন্ত্রের প্রসঙ্গ আসবে! অতএব তর্কুকর্ম বলতে আমরা সুতো তৈরি করা, সুতো কাটা, সুতোর ওপর পালিস দিয়ে সুতোর গোছ বানানোর শিল্পকলাই বুঝবো।

অবশেষে ভাগবত পুরাণের টীকাকার বংশীধরের বক্তব্য জানাই। তিনি 'তর্কু'-শব্দটাকে নিতান্ত বিসদৃশ ভেবে তর্কুকর্মের জায়গায় পাঠ ধরেছেন 'তর্ককর্ম'। তর্ক করা কিংবা তর্কশাস্ত্রীয় যুক্তিতে অন্য প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার ক্ষমতাটা অবশ্যই একটা কলামার্গের সূচনা করে এবং এই পাঠে কামসূত্রের সাহেব বিশ্লেষক Sir Richard Burton-ও বেশ অভিভূত হয়ে ইংরেজিতে লিখেছেন যে, তর্ককর্ম হল— drawing inferences, reasoning or infering— কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে বলি— ন্যায়শাস্ত্র বা তর্ককর্ম তেমন সহজগম্যা কোনো বিদ্যা নয়, যেখানে এই বিষয়ে কলা-বিশেষজ্ঞতা চরিতার্থ হতে পারে। আর যদি বলা যায়—

'যত্র যত্র ধূম স্তত্র তত্র বহ্নিঃ'

অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধোঁয়া আছে, সেখানে সেখানে আগুন আছে, অথবা যদি ব্যতিরেক বুদ্ধিতে এমনও বলা যায় যে, যেখানে যেখানে আগুন থাকবে না, সেখানে সেখানে ধোঁয়াও থাকবে না—

যদি বহ্নির্ন স্যাত্তর্হি ধূমো'পি ন স্যাৎ— তাহলেও বলবো যে, ন্যায়শাস্ত্রের এই সামান্য ব্যাপ্যব্যাপক-সম্পর্কের অন্বয়-ব্যতিরেক জ্ঞান-টুকুই কিন্তু তর্ককর্মও নয়, তর্কশাস্ত্রও নয়, ন্যায়শাস্ত্র তো নয়ই। ফলে এই রকম তর্কশাস্ত্র জানলে বড়ো জোর এইটুকু বাচনশৈলী তৈরি হবে যে, যদি ওর মা থাকে, তাহলে বাবাও একটা থাকবে। বস্তুত এইরকম তর্কযুক্তির বুদ্ধি যে কোনো নাগরিক বৃত্তিসম্পন্ন মানুষেরাই চর্চার মধ্যে থাকে, তার জন্য তর্কশাস্ত্রের গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। বিশেষত চৌষট্টি কলার মধ্যে পর পর যেসব প্রসঙ্গ আসছে, সেখানে তর্ককর্মের অনুপ্রবেশটা অস্বাভাবিক লাগে বলেই 'তর্কুকর্ম' পাঠই আমাদের কাছে শ্রেয়।

[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৩; ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী), ১০.৪৫.৩৫; বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৪; কামসূত্র (পঞ্চানন তর্করত্ন), ১.৩.১৬, পৃ. ৫০; Kama Sutra by Richard Burton (text), 1.3; The kalas, p. 29]

৩৬. তক্ষণ। সোজা কথায় ছুতোরের কাজ, Carpentry.

৩৭. বাস্তুবিদ্যা। বাস্তুবিদ্যা বলতে সাধারণত গৃহনির্মাণের পদ্ধতি বোঝালেও ভারতবর্ষের প্রাচীনকালে বাস্তুশাস্ত্র শিল্পকলার অন্যতম অভিজ্ঞান হিসেবে পরিচিত ছিল। রামায়ণে অযোধ্যানগরীর যে বিবরণ আছে, তাতে এটা বোঝা যায় যে, একটি সুদৃশ্য এবং সুগঠিত নগরের পরিকল্পনা ছাড়াও বড়ো বড়ো অট্টালিকা থেকে আরম্ভ করে ছোটো-বড়ো সুবিভক্ত পথের পরিকল্পনা, উদ্যান-আম্রকানন, আয়ুধাগার সহ নগরের গভীর পরিখা পর্যন্ত তৈরি করাটা রামায়ণী বাস্তুবিদ্যার প্রশস্তি সূচনা করে।

[রামায়ণ, ১.৫.৬-১৫]

লক্ষণীয় বাস্তুবিদ্যার শৈলীতে তিন প্রকারের গৃহের যে ভাবনা পাওয়া যায়, সেখানে হর্ম্য এবং বিমান একত্রে উল্লিখিত হয়েছে রামায়ণে। সবচেয়ে বড়ো কথা, পরিকল্পনার কতখানি বোধ থাকলে সমান আয়তন এবং সমান উচ্চতা-বিশিষ্ট হর্ম্য গৃহ ছাড়াও সপ্ততলবিশিষ্ট 'বিমানে'র (সপ্ততল গৃহকেই বিমান বলা হয়) বাস্তুনির্মাণ দেখা যায় অযোধ্যায় এবং লঙ্কাপুরীতে—

* হর্ম্যৈর্বিমানৈঃ প্রাসাদৈরবেক্ষ্যাথ যথাযথম্।
* হর্ম্য-প্রাসাদ-সংবাধং স্ত্রীসহস্রনিষেবিতম্।

* হর্ম্য-প্রাসাদ-সংবাধাং নানাপণ্যবিভূষিতাম্।
দ্রক্ষ্যসে ত্বং পুরীং
লঙ্কামাকুলাং মৈথেলীকৃতে॥
* প্রাসাদৈশ্চ বিমানৈশ্চ লঙ্কা পরমশোভিতা।

[রামায়ণ (পঞ্চানন) ৩.৫৭.১৮; রামায়ণ (Lahore Ed.), ৩.৬১.৭; ৩.৪১.২২; ৬.১৫.২২]

মহাভারতে ময়দানব-নির্মিত পাণ্ডবদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ সেকালের বাস্তুবিদ্যার অন্যতম নিদর্শন বলে গণ্য হতে পারে। ময় দানবকে সেকালের বাস্তুবিদ্যার অন্যতম পণ্ডিত বলা হয়। তিনি দেবতা-দানব-ঋষিদের ব্যবহারযোগ্য মণিমুক্তা এবং সোনা কৈলাস পর্বত এবং বিন্দুসর থেকে নিয়ে এসে সব দিকে দশ হাজার হাত জায়গা জুড়ে ইন্দ্রপ্রস্থের সভা নির্মাণ করেছিলেন। ময়দানবের তৈরি এই রাজসভার বড়ো বিস্ময় ছিল একটি সরোবর। এই সরোবরের জলের তলদেশ পর্যন্ত এমন মণিরত্ন খচিত ছিল, বিশেষত তার আশ্চর্য স্ফটিকময় সোপান এমন এক সমতলের ভ্রান্তি তৈরি করত যে, বুদ্ধিমান রাজারাও অনেক সময় জলে পড়ে যেতেন না বুঝে। ময়দানবের মতো বিশালবুদ্ধি বাস্তুকার বলেই ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভা তিনি চোদ্দ মাসে শেষ করে দিতে পেরেছিলেন—

ঈদৃশীং তাং সভাং কৃত্বা মাসৈঃ পরিচতুর্দশৈঃ।
নিষ্ঠিতাং ধর্মরাজায় ময়ো রাজন্ ন্যবেদয়ৎ॥

[মহা (k) ২.৩.৩-৩৭; ২.৩.৩-৩৬]

মহাভারতে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে অংশ নেবার জন্য রাজা-রাজরারা যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন, তাদের জন্য দ্রুপদ রাজা বেশ কিছু গৃহ নির্মাণ করেছিলেন এবং সম্ভবত দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের জন্য নতুন একটি সভাগৃহও তৈরি হয়েছিল। সভামণ্ডপটি মাঝখানে, তার চার পাশে অট্টালিকা, তার বাইরে প্রাচীর এবং পরিখা, দ্বারে দ্বারে তোরণ, ওপরে বিচিত্র চন্দ্রাতপের আবরণ। এখানকার বাস্তুশিল্পের প্রকরণে দেখা যাচ্ছে যে, কৈলাসপর্বতের শৃঙ্গতুল্য উচ্চ এবং শুভ্রবর্ণ বহুতর প্রাসাদ এখানে ছিল, তার মধ্যে বহুতর বেদি ছিল মণিনির্মিত, সোনার ঝালর দেওয়া বস্ত্রে সেই বেদিগুলি আবৃত ছিল। উর্ধ্বারোহণের সোপানগুলিতে সুগন্ধি মালা। প্রাসাদের ভিত্তি হংসের মতো শুভ্র। প্রাসাদের প্রকোষ্ঠগুলিতে ছিল আসন, শয্যা এবং পরিচ্ছদ। সপ্ততল অট্টালিকা অর্থাৎ 'বিমান'-গৃহের খবরও এখানে পাওয়া যাচ্ছে—রাজারা সেখানে ছিলেন—

তত্র নানাপ্রকারেষু বিমানেষু স্বলংকৃতাঃ।
স্পর্ধমানাস্তদান্যোন্যং নিষেদুঃ সর্বপার্থিবাঃ॥

মহাভারতের সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ দেখে দুর্যোধন যখন বিষণ্ণ হলেন, তখন পাণ্ডবদের সঙ্গে পাশাখেলার উদ্যোগ শুরু হল। তখন সেই পাশাখেলার জন্যই ধৃতরাষ্ট্র একটি সভাগৃহ নির্মাণ করার আদেশ দিলেন। সেই সভাগৃহের পরিকল্পিত রূপ ছিল এইরকম—সহস্র স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এই সভা, স্তম্ভগুলি সুবর্ণ এবং বৈদূর্য্যমণিখচিত, একশটি দ্বারে স্পটিকের তোরণ। সম্পূর্ণ সভার আয়তন এক ক্রোশ দৈর্ঘ্যে এবং বিস্তারে। সুদক্ষ শিল্পীরা বিভিন্ন জায়গা থেকে নির্মাণদ্রব্য সংগ্রহ করে অল্প সময়ের মধ্যেই সভানির্মাণের কাজ শেষ করে দিলেন—

সহস্রস্তম্ভাং হেম-বৈদূর্য্যচিত্রাং
শতদ্বারাং তোরণ-স্ফাটিকাখ্যাম্।
সভামগ্র্যাং ক্রোশমাত্রায়তাং মে
তদ্বিস্তারামাশু কুর্বন্তু যুক্তাঃ॥

[মহা (k) ১.১৮৫.১৭-২৩; ২.৪৯.৪৭-৪৯; ২.৫৬.১৬-১৮; (হরি) ১.১৭৮.১৭-২৩; ২.৪৭.৪২-৪৪; ২.৫৪.১৬-১৭ উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, খণ্ড ৫, পৃ. ৪৫৮]

পুরাণগুলির মধ্যে অগ্নি পুরাণ, গরুড় পুরাণ, মৎস্য পুরাণ এবং বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে প্রাচীন বাস্তুবিদ্যার উজ্জ্বল বিবরণ দেওয়া আছে। মৎস্য পুরাণে বাস্তুবিদ্যা বর্ণনা করার সময় বাস্তুশাস্ত্রের উপদেশক আচার্য হিসেবে আঠেরো জন বিশেষজ্ঞের নাম করা হয়েছে। তাঁরা যথাক্রমে— ভৃগুমুনি, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বকর্মা, ময়দানব, নারদ, নগ্নজিৎ, বিশালাক্ষ শিব, পুরন্দর, ব্রহ্মা, কুমার কার্তিকেয়, নন্দীশ্বর, শৌনক, গর্গ, বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, শুক্রাচার্য এবং বৃহস্পতি।

পুরাণের মধ্যে অগ্নিপুরাণ এবং গরুড় পুরাণে বেশ বিস্তারিতভাবে বাস্তুশাস্ত্রের আলোচনা আছে। সাধারণত গৃহনির্মাণ থেকে আরম্ভ করে প্রাসাদ, অট্টালিকা, মন্দির, বিশেষ বিশেষ দেবতার মন্দির কোনটা কতখানি জায়গা নিয়ে তৈরি তার বিস্তারিত আলোচনা ছাড়াও বাস্তু-পরীক্ষার পদ্ধতি এবং বিভিন্ন দিক অনুসারে বিভিন্ন নির্মাণ কলারও

বিবরণ এই গ্রন্থগুলিতে আছে। বাস্তুবিদ্যার কলাপদবী এইখানেই যে, ভারতীয় স্থাপত্য এই কলার ওপরেই নির্ভর করে আছে। দেবতা-দানব-মানুষ, এমনকী পশুপক্ষীর স্থাপনা পর্যন্ত বাস্তু নির্মাণ কলার মধ্যে এসে পড়ে।

[মৎস্য পু. ২৫২ অধ্যায়-২৫৭ অধ্যায়; অগ্নি পু. ১০০ অধ্যায়-১০৬ অধ্যায়; গরুড় পু. ১.৪৬ অধ্যায়-৪৭ অধ্যায়; বিষ্ণুধর্মোত্তর পু. খণ্ড-৩, অধ্যায় ৮৭]

৩৮. রূপ্যরত্নপরীক্ষা। এটাকে 'সুবর্ণরত্নরূপ্য-পরীক্ষা' বলে গ্রহণ করেছেন ভাগবত পুরাণের টীকাকার বংশীধর। কামসূত্রের টীকাকার এই কলাটিকে নিজের সময় অনুযায়ী বিচার করে রূপ্যপরীক্ষা বলতে তৎকালীন দিনের মুদ্রামান 'দীনার'-এর মধ্যে রুপোর ভাগ পরীক্ষা করার ক্ষমতা বুঝিয়েছেন। কিন্তু এখানে বংশীধর সঠিকভাবেই লিখেছেন—সোনা-রুপো এবং রত্নের গুণ, দোষ এবং মূল্য বোঝাটাই এখানে বেশি জরুরী। যেমন সোনার রঙ যদি এগারো ভাগের কম থাকে, তবে সে সোনা গ্রাহ্য হওয়া উচিত নয়, আবার ষোলো ভাগ সোনার রঙ আছে, তার ওপরেও যদি বেশি রঙ চড়ানো থাকে তবে সে সোনাও গ্রাহ্য নয়। রুপোও তেমনই কাঁসার সঙ্গবর্জিত হলেই গ্রাহ্য হবে, না হলে নয়।

রত্নের ক্ষেত্রে পঞ্চ ভেদ। বজ্রমণি, মুক্তা, মানিক্য, নীল এবং মরকত—এই পাঁচটি রত্ন, আর গোমেদ, পুষ্পরাগ, বৈদূর্য্য, প্রবাল এই চারটি উপরত্নের ভেদ। এদের মধ্যে বজ্রমণি এবং মুক্তা হল সাদা, মাণিক্য হল লাল, নীল তো নীলই, আর মরকতের রঙ হল সবুজ, সাদা এবং হলুদ এই তিন রকম। এই সব রত্ন শুদ্ধ সঠিক, নাকি দোষযুক্ত কিনা—সে সব বুঝে নেওয়াটাই এখানে কলার তাৎপর্য্য বহন করে।

[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৩; ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ১০.৪৫.৩৫, বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৪]

৩৯. ধাতুবাদ—এটা আসলে 'The combination, purification, precipitation of minerals'. সোজা কথায় ধাতুজ্ঞান। মাটি, প্রস্তর এবং অন্যান্য রসবস্তুর পাতন, শোধন এবং একটার সঙ্গে অন্য একটি ধাতুর মিলিয়ে দেবার জ্ঞান—

স হি মৃৎপ্রস্তর-রসধাতূনাং গৈরিকাভ্র-পারদাদিরূপাণাং পাতন-শোধন-মেলনাদিজ্ঞান হেতুরর্থার্থঃ। *[তদেব, The kalas, p. 29]*

৪০. মণিরাগাকরজ্ঞান। এটা হল— 'knowledge of the processes of dying crystals and precious stones, and of the location and working of mines.' কামসূত্রের জয়মঙ্গলা টীকার বলা হয়েছে—অর্থ উপার্জন করার জন্যই হোক অথবা অলংকরণ-শোভার জন্যই হোক স্ফটিক-মণিগুলিকে অন্য রঙ দিয়ে রঞ্জিত করার একটা বিজ্ঞান ছিল। আবার এটাও হতে পারে যে, পদ্মরাগ ইত্যাদি মণির আকর-স্থানগুলি সম্বন্ধে যে জ্ঞান, সেটাই প্রয়োজন।

[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৪-৩৫; The kalas, p. 29]

৪১. বৃক্ষায়ুর্বেদ। বাস্তুবিদ্যার মতো এটাও এক বৃহৎ কলা-বিজ্ঞান। মানুষের শরীরের স্থিতাবস্থা রাখার জন্য এবং রোগ-নিরাময়ের জন্য এবং রোগ-নিরাময়ের জন্য যেরকম আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা-শাস্ত্র তৈরি হয়েছিল, ঠিক তেমনই বৃক্ষরোপন থেকে আরম্ভ করে বৃক্ষের পুষ্টি, বৃক্ষের প্রকারভেদ অনুযায়ী সেগুলির অনুরূপ স্থান-ব্যবস্থা করা—এই সব বিষয় নিয়ে বৃক্ষায়ুর্বেদ তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীকালে বৃক্ষায়ুর্বেদের বিষয় বেশ কিছু উচ্চমানের গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল বৃহৎসংহিতার একটি অধ্যায়, আর পূর্ণ গ্রন্থগুলি হল—কৃষিপরাশর, অভিলষিতার্থ-চিন্তামণি, চক্রপাণি মিশ্রের বিশ্ববল্লভ, সুরপালের বৃক্ষায়ুর্বেদ এবং উপবনবিনোদ নামে একটি গ্রন্থ। ভাগবতপুরাণে বংশীধরের টীকায় বৃক্ষের আকৃতি-প্রকৃতি এবং বৃদ্ধির নিরিখে মানুষের মতোই তারা যে কফ-বাত-পিত্তের চিকিৎসাধীন, সেকথা উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে।

[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস) যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৫; বৃহৎসংহিতা (রামকৃষ্ণ ভাট), ১ম খণ্ড, ৫৫ অধ্যায়, পৃ. ৫২৬-৫৩৭; ভাগবত পু. ১০.৪৫.৩৫, বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৪]

৪২. মেষ-কুক্কুট-লাবক-যুদ্ধবিধি। ভেড়ার লড়াই, মুরগীর লড়াই এবং লাবক (লাওয়া) পক্ষীর লড়াই। বিনোদনের জন্যই হোক আর বাজি ধরে অর্থ উপার্জন করাই হোক, তার জন্য মেষ-মোরগ-লাবক ইত্যাদি পশু-পক্ষীকে লড়াই করার

প্রশিক্ষণ দেওয়াটাও একটা কলার মধ্যে পড়ে। এই লড়াই শেখানোর চারটি অঙ্গ হল—উপস্থান, অনুস্থান, প্রস্থান এবং পুরস্থান। এই কলায় বিশেষজ্ঞ দুজন মানুষ নিজেদের প্রশিক্ষণ দেওয়া মেষ এবং কুক্কুটকে প্রথমে যেভাবে যুদ্ধে নিয়োজিত করেন সেটাই উপস্থান, তারপর পরস্পরকে ধাওয়া করিয়ে লড়াই করার কাজটাই অনুস্থান, এবারে লড়াই করে প্রশিক্ষিত প্রাণী দুটি একটু পিছিয়ে এসে আবার মনঃসংযোগ করবে, এটা প্রস্থান, অবশেষে পুনর্বার ঘোর যুদ্ধ করার জন্য সামনাসামনি পশু-পক্ষীকে এগিয়ে দেওয়াটাই পুরস্থান। চতুরঙ্গ যুদ্ধের এই প্রশিক্ষণ দেওয়াটা অবশ্যই একটি কলা।

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ১০.৪৫.৩৫, বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৪; কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৫]

৪৩. শুক-সারিকা-প্রলাপন। অর্থাৎ গৃহপালিত শুক এবং সারিকাদি পক্ষীকে মানুষী ভাষা উচ্চারণ করতে শেখানো। এই ধরনের পাখিদের প্রেমিক-প্রেমিকারা দৌত্যকর্মেও নিয়োগ করতেন। কিন্তু সেটার জন্যও প্রশিক্ষণ দেবার কৌশল আয়ত্ত করতে হয়, সেটাই কলা। কামশাস্ত্রের টীকাকার যশোধর লিখেছেন— শুক-সারিকাদের মানুষের ভাষা শেখালে তারা সুন্দর করে সুভাষিত উচ্চারণ করে এবং তাদের দিয়ে খবরও পাঠানো যায়—

শুক-সারিকা হি মানুষভাষয়া প্রলাপিতঃ সুভাষিতং পঠন্তি সন্দেশঞ্চ কথয়ন্তি।

[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৫]

৪৪. উৎসাদন-সংবাহন। কেশমর্দনের কৌশল। এই সূত্রের টীকায় যশোধর লিখেছেন —মর্দন দুরকমের হয়—পায়ের মাধ্যমে মর্দন এবং হাতের মাধ্যমে মর্দন। পায়ের মাধ্যমে যে মর্দন করা হয় তাকেই বলে উৎসাদন। আর হাত দিয়ে মাথার চুলে তেল দেওয়া বা মাথা টেপার কাজ কেশমর্দন। এ ছাড়া অন্য সমস্ত অঙ্গমর্দনের কাজটাই হল সংবাহন। লক্ষণীয়, মহাভারত-রামায়ণ কিংবা পুরাণে অতিথি বাড়িতে এলে অথবা পূজনীয় ব্যক্তিত্বকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানানোর সময়েও পাদসংবাহনের প্রসঙ্গ এসেছে, তবে এসব ক্ষেত্রে পাদসংবাহন বলতে পদমর্দন বা পা টেপা বোঝায় না, বরঞ্চ অতিথি এলে পা ধোয়ার জল দেওয়া, কাপড় দিয়ে পা মুছিয়ে দেওয়া এবং তারপর যথাস্থানে বসিয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করা পর্যন্ত পাদসংবাহন-ক্রিয়া। এখানে অবশ্য উৎসাদন ক্রিয়ার মধ্যে যে পাদমর্দনের কথা বলেছেন যশোধর, তাতে অনেকেই এটাকে পা দিয়ে পিঠ চুলকোনোর কথা ভেবেছেন, কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে আমাদের মনে অন্যের দেহের অধমাঙ্গে পা টিপে দেওয়া বা কোমড় টিপে দেওয়াটাই উৎসাদন বলে কল্পনা করা যায়। তাতে দেহের উত্তমাঙ্গে মাথা টেপা থেকে আরম্ভ করে চুলে তেল দিয়ে স্নানের ব্যবস্থা করাটাও কেশ-মর্দনের মধ্যে পড়ে।

[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৫]

৪৫. অক্ষর-মুষ্টিকা। 'মুষ্' ধাতুর অর্থ গোপন করা, চুরি করা। ফলে অক্ষর-মুষ্টিকা মানে অক্ষর গোপন। এটা লেখ্য ক্ষেত্রে যেমন অক্ষর-বর্ণের সাংকেতিক বিন্যাস হতে পারে, তেমনই অঙ্গুলী-সংকেতের মাধ্যমে ওষ্ঠ-সংকোচন-প্রসারণ করে অক্ষর-বর্ণের আভাসও হতে পারে। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর অক্ষর-মুষ্টিকা নামের কলাটিকে দুভাগে ভাগ করেছেন—একটি সাভাসা অর্থাৎ অক্ষর গোপন করার পরেও তার উচ্চাণের আভাস থেকে বোঝার মতো। যশোধর জনৈক আচার্য রবিগুপ্তের লেখা উদ্ধার করে বলেছেন—ধরা যাক—একটি শ্লোকের প্রথম পংক্তি এইরকম—

মেবৃমিকসিংকতুবৃধকুংমী
মৃধসবাংসুশকনিধকআব্যাঃ।

এখানে প্রথম পংক্তিতে মেষ, বৃষ, মিথুন, কন্যা, সিংহ ইত্যাদি বারোটি রাশির আভাস পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে লগ্ন (মূ-মূর্তি) থেকে দ্বিতীয়ে ধন, তৃতীয় স্থান থেকে ভাই-বোনের বিচার, চতুর্থে বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি এই রকম করে আয়-ব্যয় পর্যন্ত একাদশ-দ্বাদশ স্থানের বিচার এই অক্ষর গোপনের মধ্যে ধরা আছে, অথচ শব্দের একাংশের আভাস এখানে দেওয়া আছে বলেই এটির সংকেত তৈরি হয় সাভাস অক্ষর-মুদ্রায়।

যশোধর দ্বিতীয় প্রকারের অক্ষর-মুষ্টিকাকে বলেছেন 'নিরাভাসা' অর্থাৎ সেখানে অক্ষর এমনভাবেই ন্যস্ত হয়, যেটা বুদ্ধিমান এবং বিষয়াভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ বুঝতেই

পারবেন না। মহাভারতের জতুগৃহপর্বে দুর্যোধনের পরিকল্পনার কথা বিদুর এমন সাংকেতিকভাবেই ম্লেচ্ছ-শব্দে যুধিষ্ঠিরের কাছে বুঝিয়েছিলেন যে, সেটা যুধিষ্ঠির ছাড়া অন্য কেউই বুঝতে পারেননি এবং যুধিষ্ঠির বিদুরের বিশেষ অনুগত বলেই হয়তো ধরতে পেরেছিলেন এই ভাষা। সেই যশোধর লিখেছেন যে, নিরাভাস অক্ষর-মুষ্টিকার প্রয়োগ হয় গুহ্য বস্তু সংকেতিক করার জন্য—গুহ্যবস্তুমন্ত্রণার্থম্। আর ভাগবতের টীকাকার বংশীধরও এখানে উদাহরণ দিয়েছেন অনেক।

[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৫ ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী), ১০.৪৫.৩৫, বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৫]

৪৬. ম্লেচ্ছিত-বিকল্প। ভেঙ্কটসুব্বাইয়া এর অর্থ করেছেন—Varieties of cipher languages i.e., languages which are unintelligible to all except the initiated.

যশোধর টীকায় লিখেছেন—সাধু শব্দ ব্যবহার করেও অক্ষর-বিন্যাসের কৌশলে কথ্য বস্তুকে অস্পষ্ট করে দেওয়া। গূঢ় বস্তু অপরকে বোঝানোর জন্যই কলার ব্যবহার। আমরা অবশ্য মনে করি—সেকালে সংস্কৃতভাষাভাষী লোকের মধ্যে একান্ত জনকে নির্দেশ দেবার জন্য যখন প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহার করা হত, সেটাও যেমন ম্লেছিত-বিকল্প, তেমনই এক প্রদেশের ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে অন্য অবোধ্য প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহারে গূঢ় বস্তুর মন্ত্রণা করাটাও ম্লেচ্ছিত-বিকল্প। মহাভারতের জতুগৃহপর্বে বিদুরের ম্লেচ্ছভাষার মন্ত্রণাটুকু এই বিষয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

[ভাগবত পু. ১০-৪৫.৩৫, বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৫; The kalas, p. 30]

৪৭. দেশ-ভাষা-বিজ্ঞান। এখানে কামসূত্রের টীকাকার যশোধর এবং ভাগবত পুরাণের টীকাকার বংশীধর দুজনেই প্রায় একই রকম মন্তব্য করে বলেছেন—অপ্রকাশ্য বস্তু জ্ঞাপন করার জন্য অর্থাৎ সকলের মধ্যে সর্বজনবিদিত ভাষাতে কথা বলার সময় এমন কোনো গোপন অপ্রকাশ্য কথা যদি বিশেষ কাউকে জানাতে হয়, তাহলে তাঁর প্রাদেশিক মাতৃভাষাটি ব্যবহার করার জন্য যে অন্য ভাষার জ্ঞান দরকার হয়, সেই ভাষাজ্ঞানও কলার মধ্যে পড়ে। আবার দু-চারটি প্রাদেশিক ভাষার জ্ঞান আছে, এই অবস্থায় কোনো অপ্রকাশ্য কথা যদি সংস্কৃতে উচ্চারণ করা যায় সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির সামনে, তাহলে সেটা তিনিই মাত্র জানতে পারলেন, আর কেউ নয়—এটা সম্ভব হয়, বহুভাষা বা দেশ-ভাষার জ্ঞান থাকলে।

[তদেব]

৪৮. পুষ্পশকটিকা। ভেঙ্কটসুব্বাইয়া খুব সরল অর্থ করে বলেছেন—Cart of flowers; i.e. making carts, horses, elephants, palanquins, etc, of flowers (to send love-letters in). কিন্তু ভাগবত পুরাণ এবং কামসূত্রের টীকাকারেরা এটাকে পাত্রে রাখা ফুলের সংখ্যা এবং পুষ্পের বর্ণকে বাজি রেখে শুভাশুভ নির্ণয়ের একটা উপায় হিসেবে পুষ্পশকটিকার তাৎপর্য্য নির্ণয় করেছেন। ভাগবত পুরাণের টীকাকার এই কলার নামটাই বলেছেন পুষ্পশকটিকা-নিমিত্তজ্ঞান। আমরা অবশ্য কলাজ্ঞান হিসেবে বেঙ্কটসুব্বাইয়ার অর্থটাকেই ঠিক মনে করি। বিশেষত 'নিমিত্তজ্ঞান' বলে অন্য একটি কলার কথা ঠিক এর পরেই আসবে।

[তদেব]

৪৯. নিমিত্তজ্ঞান। শাস্ত্রকথিত শুভাশুভের নিমিত্তজ্ঞান বা লক্ষণজ্ঞান। স্বয়ং বরাহমিহির তাঁর বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে শুভাশুভের নিমিত্ত নিয়ে অনেকগুলি অধ্যায় ব্যয় করেছেন। এই নিমিত্তশাস্ত্রের একটা আচার্য-পরম্পরার নামও করেছেন বরাহমিহির। পাখির বিচিত্র বিভিন্ন ডাক থেকে আরম্ভ করে নারী-পুরুষের নানান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব কিছু এই নিমিত্ত শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বৃহৎসংহিতার মধ্যে অন্তত ১০/১১টি অধ্যায় জুড়ে এই নানা নিমিত্তের বর্ণনা তৎকালীন মানুষের বিশ্বাস যেমন প্রকট করে তোলে, তেমনই এই নিমিত্তের জ্ঞান একটি মানুষের কলাবোধেরও পরিচায়ক ছিল।

[তদেব; বৃহৎসংহিতা (রামকৃষ্ণ ভাট), ২য় খণ্ড, ৮৬-৯৭ অধ্যায়]

৫০. যন্ত্রমাতৃকা। বেঙ্কটসুব্বাইয়া লিখেছেন—যন্ত্রমাতৃকা হল—Construction of machines for locomotion, water and war purposes. তিনি অবশ্য কামসূত্রের টীকা থেকেই যন্ত্রমাতৃকার ভাবনা পেয়েছেন। যশোধর তাঁর টীকায় লিখেছেন—

সজীবানাং নির্জীবানাং যন্ত্রাণাং যানোদক-সংগ্রামার্থং ঘটনাশাস্ত্রং বিশ্বকর্মোক্তম্।

[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৫; ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী), ১০.৪৫.৩৫, বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৫; The kalas, p. 30]

৫১. ধারণমাতৃকা। পূর্বশ্রুত ঘটনা, কাহিনী, তত্ত্ব বা পূর্বশ্রুত গ্রন্থ স্মরণে রাখার বিজ্ঞান। টীকাকারেরা তাই বলেছেন—

শ্রুতস্য গ্রন্থস্য ধারণার্থং শাস্ত্রম্।

সাধারণভাবে এটাই দাঁড়ায় যে, যা শোনা হল, যা পড়া হল, সেটা স্মৃতিতে রাখা বা মাথায় রাখাটাকেই পারিভাষিক ভাষায় ধারণ বলে। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রেও তাই বলেছেন—শুশ্রূষা-শ্রবণ-গ্রহণ এবং ধারণ এটাই প্রক্রিয়ার পরম্পরা। ভাগবতের টীকাকার বংশীধর একটি প্রবাদপ্রতিম শ্লোক উদ্ধার করে ধারণের বিষয় নির্দেশ করেছেন কতগুলি। তার মধ্যে প্রথম হল বস্তু। অর্থাৎ যে কোনো বস্তুর আসল চেহারাটা, তার স্বরূপ কী, সেটা মাথায় রাখাটা ধারণের একটা অঙ্গ। অমর সিংহের শব্দকোষের উল্লেখ না করলেও বৈদিক শব্দকোষ যাস্কের নিরুক্ত-গ্রন্থের উল্লেখ করে বংশীধর বুঝিয়ে দিয়েছেন, নিঘণ্টু, অমরকোষ ইত্যাদি কোষগ্রন্থের শব্দরাশি স্মরণে রাখাটাও ধারণেও দ্বিতীয় অঙ্গ। তৃতীয় হল জাগতিক দ্রব্যের লক্ষণ মাথায় রাখা। সাধারণত এটা গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়ামূলক তর্কের মাধ্যমে সর্বাঙ্গীনভাবে ধারণ করতে হয় বলেই লক্ষণ নির্ণায়ক তর্কপ্রক্রিয়াটাই ধারণের চতুর্থ বিষয়। আর ধারণের পঞ্চম বিষয় হল কেতু। কেতু মানে চিহ্ন অর্থাৎ চিহ্নাত্মক শাস্ত্র। যেমন ধরা যাক পাণিনি ব্যাকরণ। অ+অ, কিংবা অ+আ মিলে কোথায় দীর্ঘ 'আ' হবে, কিংবা ই+ই, কিংবা ঈ+ই মিলে কোথায় দীর্ঘ 'ঈ' হবে এসব তো পাণিনি কতগুলি সূত্র 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' অথবা 'অদেঙ্ গুণঃ'— এইসব সূত্র-চিহ্নের মাধ্যমেই নির্দেশ করেছেন। ফলে শব্দ কীভাবে তৈরি হচ্ছে তার জন্য এই এই চিহ্নাত্মক শাস্ত্রও মাথায় রাখতে হবে। আরও সোজা করে বললে এটাই বলতে হবে যে, পুংলিঙ্গবাচক অকারান্ত অনেক শব্দের সঙ্গে 'আ' কিংবা 'ঈ' যোগ করলেই সেটা স্ত্রীলিঙ্গ হয়, অতএব নদ-নদী, বালক-বালিকা—এগুলি তো শুধু 'ঈ' কিংবা 'আ'-এর চিহ্ন থেকেই বুঝতে পারি। অতএব এটা ধারণের পঞ্চম অঙ্গ—

বস্তু কোষস্তথা দ্রব্যং লক্ষণং কেতুরের চ।
ইত্যেতে ধারণা-দেশাঃ পঞ্চাঙ্গ-রুচিরং বপুঃ॥

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ১০.৪৫.৩৫, বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৫; কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৫; কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (Kangle), ১ম খণ্ড, ১.৫.৫ পৃ. ৬]

৫২. সংপাঠ্য। ভাগবত পুরাণের টীকাকার এখানে 'সংবাচ্য' এবং 'সম্পাদ্য'—এই দুটি পাঠ ধরেছেন। কিন্তু অর্থ বোঝানোর সময় পুরাণের টীকাকার বংশীধর এবং কামসূত্রের টীকাকার যশোধর একই কথায় জানিয়েছেন—এই কলাজ্ঞানের প্রক্রিয়া হল—এখানে একজন একটি-দুটি বা পাঁচটি গ্রন্থিত শ্লোক পড়ছে এবং অন্যজন, যে আগে সেই শ্লোক কোনো দিন শোনেনি, সেও পূর্বজনের শ্লোকপাঠের পরেই সেগুলি তার সঙ্গেই পুনরাবৃত্তি করতে পারছে—

তত্র পূর্বধারিতমেকো গ্রন্থং পঠতি। দ্বিতীয়স্তমেব অশ্রুতপূর্বং তেন সহ তত্রৈব পঠতি।

যশোধর লিখেছেন—একসঙ্গে বসে এটা খেলা বা বিনোদনের উপায় হিসেবেও গ্রহণ করা যেতে পারে। কিংবা বাজি ধরে বিবাদ করার জন্যও।

[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৫; ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী), ১০.৪৫.৩৫, বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৫]

৫৩. মানসী। এটা একটা অদ্ভুত কলাবিষয়। ভাগবত এবং কামসূত্রের টীকাকারেরা এই বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে আরও জটিল করে ফেলেছেন। বরঞ্চ ভেঙ্কটসুব্বাইয়া এটা খুব পরিষ্কারভাবে লিখেছেন—

Another game; one person writes a 'sloka' with 'anuswāra' and 'visarga' as they are but with crosses in place of other letters. The other player has to write the correct letters in place of the crosses.

অর্থাৎ শ্লোকের অভিজ্ঞাপক দীর্ঘ-হ্রস্ব স্বরের চিহ্ন বসিয়ে, কোথাও কোথাও একটি বা দুটি বর্ণ বসিয়ে, অনুস্বার-বিসর্গের চিহ্ন দেবার পর শ্লোকটি পূরণ করতে বলা। আবার হতে পারে গোলাকার পদ্মদলের মতো খোপ কেটে পদ্ম

গর্ভের কেন্দ্রে মাঝখানে লেখা হল 'অ'। অন্যজন পাপড়ির মতো এক-একটি খোপে শব্দ তৈরি করল—অগজঃ, অহীন, অহস্তঃ, অলয়ঃ, অপশ্যৎ, অরয়ঃ, অবন্দ্যঃ ইত্যাদি। এখানে খোপ বাড়ালে খেলাটা আরও মজাদার হবে। ভাগবত পুরাণের টীকাকার এটা খুব বিশদে আলোচনা করেছেন।

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী), ১০.৪৫.৩৫, বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৫-৫৮৬; The kalas, p. 31]

৫৪. কাব্যক্রিয়া। কবিতা লেখার শৈলী। তখনকার দিনে যেমনটা প্রচলিত ছিল, সেই সংস্কৃত, প্রাকৃত কিংবা অপভ্রংশ ভাষায় সাধারণ কাব্য-কবিতা লেখার ক্ষমতা। বস্তুত সাধারণ মানুষ, যারা প্রজ্ঞা-প্রতিভার অভাবে কবি হয়ে উঠতে পারেননি, তাঁরাও শুধুমাত্র কলাভিজ্ঞ হিসেবে পরিচিতি লাভের জন্য সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে প্রাকৃত ভাষা মিশিয়ে কিংবা সংস্কৃত অপভ্রংশের মিশ্রণেও নানান কবিতা রচনা করতে পারেন। ভাগবত পুরাণের টীকাকার বংশীধর নানান উদাহরণ দিয়ে কাব্যক্রিয়া নামক কলার বৈশিষ্ট্য প্রকট করেছেন।

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী), ১০.৪৫.৩৫, বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৬]

৫৫. অভিধান-কোষ-ছন্দোবিজ্ঞান। কামসূত্রের টীকাকার এখানে একটি অভিধান-কোষের নাম জানিয়ে বলেছেন— 'উৎপলমালাদিঃ'। উৎপলমালা অবশ্যই একটি প্রাচীন কোষগ্রন্থ, যার উল্লেখ বাল্মীকি রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের টীকাকারেরা করেছেন। ভাগবত পুরাণের টীকাকার অবশ্য 'উৎপলমালা' শব্দের সঙ্গে 'আদি' পদটি দেখেই অন্তত তিরিশটি অভিধান-কোষের নাম দিয়ে বলেছেন যে, কলাভিজ্ঞ মানুষ হবার জন্য এইসব অভিধান-কোষভুক্ত শব্দরাশির জ্ঞান প্রয়োজন।

কামসূত্রের টীকাকার যশোধর 'ছন্দোজ্ঞান'-কে পৃথক একটি কলা হিসেবে সংখ্যাত করেছেন, কিন্তু বংশীধর অভিধান-কোষের সঙ্গেই ছন্দোজ্ঞানের উল্লেখ করেছেন। ছন্দোজ্ঞানী হিসেবে প্রথমে বৈদিক ছন্দোসূত্রের লেখক পিঙ্গলের নাম করলেও ধ্রুপদী সংস্কৃতের কথা মাথায় রেখে ভাগবত পুরাণের টীকাকার ছন্দকে দুই ভাগে ভাগ করে বলেছেন—ছন্দ দুরকমের। একটা মাত্রাছন্দ বা মাত্রাবৃত্ত যেমন আর্যা-ছন্দ। আর দ্বিতীয় হল বর্ণছন্দ, যার আরম্ভ 'শ্রী' ছন্দ থেকে।

[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৫; ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী), ১০.৪৫.৩৫, বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৬; The Rāmayana of Vālmiki. Ed. by Robert P. Goldman, Vol. 4 : kiskindhā-kanda, (Delhi Motilal Banarsidass, 2007) p. 21]

৫৬. ক্রিয়াকল্প। এই কলার আসল অর্থ হল কাব্য সৃষ্টি করার শৈলী, যেখানে অলঙ্কার, রীতি এবং গুণের প্রয়োগে কাব্য-সৃষ্টি হয়। ভাগবত পুরাণের টীকাকার বংশীধর বাগ্‌ভট্টের কাব্যালংকার গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন—শব্দার্থের সাধু সন্দর্ভের মধ্যে যেখানে মাধুর্য, ওজঃ, প্রসাদ ইত্যাদি গুণের প্রয়োগ ঘটবে, বিভিন্ন কাব্য-অলংকারের ভূষণ প্রযুক্ত হবে, যার মধ্যে বৈদর্ভী-পাঞ্চালী ইত্যাদি কাব্যরীতি এবং শৃঙ্গার-বীর ইত্যাদি রসের সুপ্রয়োগ ঘটবে—

সেই কাব্যালংকারের কলাজ্ঞানই ক্রিয়াকল্প—
সাধুশব্দার্থসন্দর্ভং গুণালঙ্কারভূষিতম্।
স্ফুটরীতি-রসোপেতং কাব্যং কুর্বীত কীর্তয়ে॥

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী), ১০.৪৫.৩৫, বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৬]

৫৭. ছলিতক যোগ। ভেঙ্কটসুব্বাইয়া লিখেছেন—Processes of deception, i.e. disguising the person and voice so as not to be recognised or so as to pass for another. কামসূত্র এবং ভাগবতের দুই টীকাকারই একই ভাবে একটি প্রচলিত শ্লোক উদ্ধার করে ছলিতকের সংজ্ঞা নির্বারণ করে বলেছেন—নিজের চেহারা লুকিয়ে অন্যের চেহারায় নিজেকে প্রকট করা, অন্যকে বঞ্চনা করার জন্য দেবতা, দানব, মানুষ ইত্যাদি বিভিন্ন বেশে বা ছদ্মরূপে নিজেকে প্রকাশ করাটাই ছলিতক-কলা—

যদ্ রূপমন্যরূপেণ সম্প্রকাশ্য হি বঞ্চনম্।
দেবেতরপ্রয়োগাভ্যাং জ্ঞেয়ং তচ্ছলিতং তথা॥

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী), ১০.৪৫.৩৫, বংশীয়-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৬; কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৫, The kalas, p. 31]

৫৮. বস্ত্রগোপন। ভেঙ্কটসুব্বাইয়া লিখেছেন —Hiding of dresses; deception as to dress; i.e, wearing a short cloth so that it may not appear short, etc. সাধারণ অর্থে বস্ত্রের খণ্ড দিয়ে শরীরের অপ্রকাশ্য স্থান সংবরণ করা বা আবৃত রাখা, যাতে হাওয়াতেও সেটা অসংবৃত না হয়। আবার এটার অর্থ এমনও হতে পারে যে, ছোটো কাপড় পরা সত্ত্বেও যেন মনে হয় বেশ বড়ো কাপড় পরা হয়েছে, এমনভাবেই কাপড় পরা। আবার অনেক বড়ো কাপড় পরেও বস্ত্রগোপনের কৌশলে স্বল্পবাসের পরিধান মনে হওয়া। বস্ত্রগোপনের কলা-মাহাত্ম্য বোধহয় এইখানেই—

ত্রুটিতস্য অত্রুটিতস্যেব পরিবর্ধনম্।

মহতো বস্ত্রস্য সংবরণাদিনা অল্পীকরণম্। ইতি গোপনানি।

[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৬; The kalas, p. 31]

৫৯. দ্যূতবিশেষ। বিভিন্ন রকমের দ্যূতক্রীড়া বা পাশাখেলা। টীকাকারো সজীব এবং নির্জীব ভেদে দুরকমের পাশাখেলার কথা বলেছেন। পণ বা বাজি রেখে পাশাখেলা সেটা সজীব। আর শুদ্ধ বিনোদনের জন্য যে পাশাখেলা সেটা নির্জীব। টীকাকারেরা নির্জীব দ্যূতের পক্ষেই কথা বলেছেন। চতুরঙ্গ বা চার ফোঁটার দান দিয়ে গুটি চালিয়ে বা সারি চালিয়ে যেমন দ্যূতক্রীড়া হত, তেমনই অষ্টাপদ নামের 'বোর্ডে' চতুরঙ্গ সৈন্য নিয়ে পাশাখেলার রেওয়াজও সেকালে ছিল।

[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৬; ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী), ১০.৪৫.৩৫; বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৬]

৬০. আকর্ষ-ক্রীড়া। এটাকে কামসূত্রের টীকাকার এক রকমের পাশাখেলা বলেছেন। আর বলেছেন 'দ্যূত বিশেষে'র কলার কথা বলার পরে আবার এই পাশাখেলার ব্যাপারটা উল্লেখ করা হয়েছে খানিক সমাদরের জায়গা থেকে। শৃঙ্গারোৎসুক নায়ক-নায়িকারাও অনেক সময় আমোদের জন্য পাশা খেলতেন, হয়তো আকর্ষক্রীড়া সেই ধরনের পাশাখেলা—

সশৃঙ্গারত্বাদ্ দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাদ্ বা।

তবে 'আকর্ষ' শব্দের মধ্যে যে ব্যঞ্জনা আছে, তাতে ভাগবত পুরাণের টীকাকার বংশীধরের যুক্তি অনেক সার্থক মনে হয়। তিনি বলেছেন—কাঠের পুতুল ইত্যাদি যখন দূর থেকে টেনে এনে খেলা দেখাতে হয় অথবা কাষ্ঠপুত্তলিকা চালনা করতে হয়, সেটাকেই আকর্ষ ক্রীড়া বলে। বংশীধর বলেছেন—হতে পারে এটা পুতুল-নাচ—যেখানে আকাশে অর্থাৎ ওপর দিকে ডোর তৈরি করে বিভিন্ন সুতোর সাহায্যে আকর্ষণের ক্রীড়া চলে। আর পাশাখেলাটা তো একটা অর্থ বটেই আকর্ষ-ক্রীড়ার। *[তদেব]*

৬১. বালক্রীড়নক। বাচ্চাদের জন্য খেলনা। 'বল'-জাতীয় জিনিস যাকে 'কন্দুক' বলা হত। আর ছিল বীটা, যাকে এখনকার ভাষায় ডাংগুলি বা 'টিক্-ডাং' বলে। আর পুতুল তো আছেই। এইসব খেলাও এক প্রকার কলার মধ্যে পড়ে। *[তদেব]*

৬৩. বৈনয়িকী। আচার-শিক্ষা, বিনয়-শিক্ষা। যে বিদ্যা মানুষকে বিনয়, আচার এবং ব্যবহার শেখায়। একই সঙ্গে এটা হস্তী-অশ্বের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের ক্ষমতাও হতে পারে। *[তদেব]*

৬২. বৈজয়িকী। যে বিদ্যা রাজা-রাজড়াদের বিজয়ের প্রযোজনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই বিদ্যা দুই প্রকার—দৈবী এবং মানুষী। দৈবী অবশ্যই রাজা-রাজড়াদের যুদ্ধে অপরাজিত থাকার মঙ্গলক্রিয়া বা মঙ্গলাচার। আর মানুষী হল যুদ্ধ জয় করার সাংগ্রামিক কৌশল। *[তদেব]*

৬৪. ব্যায়ামিকী। মৃগয়া ইত্যাদি ব্যায়াম প্রয়োগ করার প্রায়োগিক শিক্ষা। এই ব্যায়ামের মধ্যে সাঁতার শেখা থেকে আরম্ভ করে মল্লযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ শেখার কৌশল-শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত।

[কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস), যশোধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৬; ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী), বংশীধর-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৬; The kalas, pp. 31-32]

কলা২ বিভীষণের জ্যেষ্ঠা কন্যা। সীতাদেবীকে রামচন্দ্রের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বিভীষণ, রাবণের কাছে অনুরোধ জানান। কিন্তু রাবণ যে বিভীষণের কথা অগ্রাহ্য করেছিলেন—সে কথা বিভীষণের মেয়ে কলা তাঁর মাতা সরমার নির্দেশে সীতাকে জানান। *[রামায়ণ ৫.৩৭.৯-১১]*

কলা৩ কর্দম ঋষির কন্যা এবং মরীচির পত্নী কলা। মরীচির ঔরসে কলার কশ্যপ এবং পূর্ণিমা নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

[ভাগবত পু. ৩.২৪.২২; ৪.১.১৩]

কলা$_{৪}$ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে কলা ঋ-বর্ণের দেবীশক্তির মধ্যে একজন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.৪৪.৫৭]*

কলা$_{৫}$ দেবী-ভাগবত পুরাণ অনুসারে চন্দ্রভাগাতটে দেবী ভগবতী 'কলা' নামে বিরাজমানা।

[দেবীভাগবত পু. ৭.৩০.৭৯]

কলা$_{৬}$ কালিকা পুরাণ অনুসারে প্রজাপতি দক্ষের পঞ্চম কন্যা এবং প্রজাপতি কশ্যপের পত্নী। কশ্যপের ঔরসে কলার গর্ভে বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা এবং ক্রোধশত্রু নামে চারজন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। *[কালিকা পু. ৩৪.৬১-৬৩]*

কলা$_{৭}$ দেবী সরস্বতীর অষ্টশক্তির অন্যতম হলেন কলা। *[গরুড় পু. ১.৭.৯]*

কলা$_{৮}$ সময়ের একটি পরিমাপ একক। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হয়েছে যে, মহাকালের আসনে যে পদ্মফুল রয়েছে তার ষোলটি দলের মধ্যে নিমেষ, মুহূর্ত, কাষ্ঠা, ইত্যাদি যে ষোলটি শক্তি নিহিত আছে, তাদের মধ্যে অন্যতম কলা। মহাকাল বলতে পৌরাণিকরা সময়চক্রকেই বুঝিয়েছেন। কলা-কাষ্ঠা ইত্যাদি এক-একটি সময়ের পরিমাপ বা 'ইউনিট'। রূপক অর্থে কমল-দলের মধ্যে নিহিত মহাকালের শক্তি হিসেবে সময়ের পরিমাপগুলি বর্ণিত হয়েছে বলে মনে হয়। পুরাণ অনুসারে ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা হয় এবং ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত হয়। পণ্ডিত গিরীন্দ্রশেখর বসু আধুনিক কাল-গণনা পদ্ধতি অনুসারে যে কালবিভাগ করেছেন, সেই কালবিভাগ অনুযায়ী—

৩০ কাষ্ঠা = ১ কলা = ৯৬ সেকেন্ড
৩০ কলা = ১ মুহূর্ত = ৪৮ মিনিট।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.৩২.১৪; মৎস্য পু. ১৪২.৪; শিব পু. (বায়বীয়/পূর্ব) ৬.৪; স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৩৯.৪৬-৪৭; গিরীন্দ্রশেখর বসু : পুরাণপ্রবেশ, পৃষ্ঠা : ২৬-২৭]

কলা$_{৯}$ স্কন্দ-কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কলা দেবী অন্যতম। *[মহা (k) ৯.৪৫.১৫; (হরি) ৯.৪২.১৫]*

কলা$_{১০}$ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে যে, দক্ষ প্রজাপতি এবং প্রসূতির কন্যাদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন কলা। তিনি রুদ্রের পত্নী।

[ব্রহ্মবৈবর্ত পু. (ব্রহ্ম) ৯.১৩]

কলা$_{১১}$ দেবী পার্বতীর সহস্রনামের মধ্যে একটি।

[কূর্ম পু. ১.১২.৭০]

কলা$_{১২}$ অগ্নিপুরাণ অনুসারে কলা একজন দেবী। বিষ্ণু ইত্যাদি আদি-দেবতাদের পূজার সময় এই কলাদেবীরও পূজার্চনা করা হয়।

[অগ্নি পু. ২১.২৪]

কলা$_{১৩}$ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, স্কন্দ-কার্তিকেয় যখন মাতা পার্বতীর প্রাসাদে উপস্থিত হন, তখন যেসব অপ্সরারা নৃত্য পরিবেশন করছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন কলা। *[ব্রহ্মবৈবর্ত পু. (গণেশ) ১৬.৪০]*

কলা$_{১৪}$ সূর্যের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম।

[মহা (k) ৩.৩.২০; (হরি) ৩.৩.২০]

কলা$_{১৫}$ শিব-মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। কলা সময় গণনার অন্যতম একক। প্রাচীন সময় গণনার হিসাব অনুযায়ী, সময় গণনার ন্যূনতম একক ছিল নিমেষ। আধুনিক গণিতের হিসেবে এক কলা মানে প্রায় ৯৬ সেকেণ্ড।

শিবসহস্রনাম স্তোত্রে কলা, কাষ্ঠা প্রভৃতি সময় গণনার এই এককগুলিকে মহাদেবের নাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কারণ মহাদেব মহাকাল স্বরূপ, সময় স্বরূপ। আমরা যাকে সময় বলি, বাস্তবে তার আদিও নেই, অন্তও নেই—তা অসীম অনন্ত। সেই অসীম অনন্ত সময়কে আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুসারে গাণিতিক নিয়মের মাধ্যমে কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত প্রভৃতি নানা এককের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছি আমাদের সুবিধার্থে। ভগবান শিব যেমন আদি-অন্তহীন গণনার অসাধ্য মহাকালের স্বরূপ তেমনই তিনি আমাদের গণনা-সাধ্য সময়ের এককগুলিরও স্বরূপ। এই ভাবনা থেকেই সময় গণনার অন্যতম একক কলা ভগবান শিবের অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৭.১৪২; (হরি) ১৩.১৬.১৪১]

কলাপ$_{১}$ মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা প্রবাহীর (অন্যান্য পুরাণে প্রাধার) গর্ভে সত্ত্বন্, সত্ত্বাত্মক ইত্যাদি নামে যে দেবগন্ধর্বরা জন্মলাভ করেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন কলাপ। দেবগন্ধর্বরা দেবসভায় গান গাইতেন, নিশ্চয় কলাপ তাঁদের মধ্যেও অন্যতম ছিলেন। *[বায়ু পু. ৬৮.৩৮]*

কলাপক মহর্ষি কশ্যপের বংশধারায় দানবদের সৃষ্টি-কথা বলতে বলতে জনৈকা 'প্রবাহী'-র নাম উল্লিখিত হয়েছে বায়ুপুরাণে। তিনি দক্ষকন্যা কী না তা বোঝা যায় না, কশ্যপের স্ত্রী হিসেবেও তাঁর নাম পাওয়া যায় না অন্য কোথাও। কিন্তু বলা হয়েছে—কোনো এক যজ্ঞকালে প্রবাহীর গর্ভে

দশজন উত্তম 'গায়ন' অর্থাৎ দেবগন্ধর্বের জন্ম হয়—

প্রবাহী অজনয়ৎ পুত্রান্ যজ্ঞে বৈ গায়নোত্তমান্।

সেই দশজনের একজন হলেন কলাপক।

[বায়ু পু. ৬৮.৩৭-৩৮]

কলাপগ্রাম হিমালয়ের পার্বত্যভূমিতে বদরিকাশ্রমের কাছাকাছি একটি বিখ্যাত স্থান। পুরাণে দেখা যাচ্ছে—হিমালয়ের সানুদেশে স্কন্দ কার্তিকেয়ের একটি ক্রীড়াভূমি আছে। তার নাম পাণ্ডুশিলা। পাণ্ডুশিলার পার্বত্য অঞ্চলের পাশেই পুব দিকে যেখানে মুনি-ঋষিদের সিদ্ধাবাস, সেই জায়গাটার নাম কলাপগ্রাম। কলাপগ্রামের সবচেয়ে প্রাচীন পৌরাণিক ইতিহাস হল—মর্ত্য রাজা বুধ-পুত্র পুরূরবার আকর্ষণে স্বর্গসুন্দরী উর্বশী মর্ত্যে নেমে এসে যখন তাঁকে পতিত্বে বরণ করলেন, তখন পুরূরবা অন্তত চৌষট্টি বছর একত্রে বাস করেছিলেন তাঁর সঙ্গে। এই সম্পূর্ণ সময় ধরে পুরূরবা যেসব সুন্দর সুন্দর জায়গায় উর্বশীর সঙ্গে ভ্রমণ-রমণে কাল কাটিয়েছেন, সেই সব জায়গায় মধ্যে স্বর্গীয় চৈত্ররথ বন, অলকাপুরী কিংবা নন্দন বন যেমন ছিল, তেমনই মর্ত্যভূমিতে ছিল বিশালা নগরী, গন্ধমাদন গিরির পাদদেশ, উত্তরকুরু দেশ এবং কলাপ-গ্রাম। যেসব রমণ-বসতির সঙ্গে কলাপ-গ্রামের নাম করা হল, তাতে রমণীয় নিসর্গ স্থান হিসেবে যে কলাপগ্রাম বিখ্যাত ছিল সেটা বোঝা যায়।

অন্যদিকে বায়ু পুরাণ যেহেতু এই স্থানকে 'সিদ্ধাবাস' বলে চিহ্নিত করেছে, তাতে বুঝি এই স্থানটি মুনি-ঋষিদের তপস্যার স্থল ছিল। সেটা আরো ভাল করে বোঝা যায় মহাভারতের একটি ঘটনা থেকে। মহাভারতে 'অবতার-লীলা-বীজ' কৃষ্ণ যখন লীলা-সংবরণ করেছেন, তখন কৃষ্ণের প্রিয়া মহিষীদের মধ্যে রুক্মিণী-জাম্ববতীরা স্বামীর অনুগমনের ইচ্ছায় অগ্নিপ্রবেশ করেছেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা সত্যভামা আরও কয়েকজন কৃষ্ণভার্য্যাদের সঙ্গে তপস্যা করার জন্য বনে প্রবেশ করেন। কোথায় কোন বনে সত্যভামারা প্রবেশ করলেন, সেটা মহাভারতের সব সংস্করণে নেই। কিন্তু মহাভারতের পরিশুদ্ধ সংস্করণ এবং হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ একটি অতিরিক্ত পাঠ স্বীকার করে দেখিয়েছেন যে, সত্যভামা এবং তাঁর সহগামিনী কৃষ্ণভার্য্যারা ফল-মূল আহারের ব্রত ধারণ করে ভগবান শ্রীহরির একান্ত ধ্যান-মানসে হিমালয়ের কিছু অঞ্চল অতিক্রম করে কলাপগ্রামে এসে পৌঁছোলেন—

ফলমূলাদিভোজিন্যো হরিধ্যানৈকতৎপরাঃ।

হিমবন্তমতিক্রম্য কলাপ-গ্রামমাবিশন্॥

[বায়ু পু. ৪১.৪১-৪৩; ৯১.১-৮; মহা (Critical ed.) ১৬.৮.৭২ শ্লোকের পর পাদটীকা দ্রষ্টব্য; (হরি) ১৬.৭.৮৫ শ্লোকের পর পাদটীকা দ্রষ্টব্য; (পঞ্চানন তর্করত্ন) ১৬.৭.৭৪-৭৫]

□ ষোড়শ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে কোনো সময়ে লেখা কল্কি-পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী সূর্যবংশের তৎকালীন শেষ রাজা মরু এবং চন্দ্রবংশের অধস্তন দেবাপি (ভীষ্ম-পিতা শান্তনুর বড়ো ভাই) একসময় কলাপগ্রামে তপস্যা করছিলেন। সেই সময় অবতার-প্রমাণ ভগবান কল্কি কলাপ-গ্রামে তাঁদের তপস্যারত দেখে তাঁদের দুজনেরই পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। মরু জানান যে, তিনি ব্যাসের মুখে কল্কি-অবতাদের সম্ভাবনা শুনেই কলাপ-গ্রামে তপস্যা আরম্ভ করেছেন। কল্কি একইভাবে দেবাপিকেও তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিজের পূর্বপুরুষদের পরিচয় দেবার পর এটাও জানান যে, তিনি ছোটো ভাই শান্তনুর হাতে রাজ্য দিয়ে কল্কি ভগবানের সঙ্গে দেখা করার মানসেই কলাপগ্রামে এসে তপস্যা করছেন—

কলাপগ্রামমাসাদ্য ত্বাং দিদৃক্ষুরিহাগতঃ।

কল্কি ভগবান মরু এবং দেবাপির কথা শুনে তাঁদের খুব প্রশংসা করলেন এবং তাঁদের বললেন—আমার ম্লেচ্ছ-নিধন কার্য শেষ হলে মরু আবার অযোধ্যা-নগরীতে সূর্যবংশের প্রাচীন প্রতিষ্ঠা ফিরিয়ে আনবেন, আর দেবাপি হস্তিনাপুরীতে প্রতিষ্ঠিত হবেন পুনরায়। ভাগবত পুরাণে অবশ্য কলাপগ্রামে অবস্থিত দেবাপির তপস্যার সংবাদটুকুই শুধু মেলে।

[কল্কি পু. (সরস্বতীভবন গ্রন্থমালা) ১৮.১-২৫; ভাগবত পু. ৯.২২.১৭]

□ বিষ্ণু পুরাণে উল্লেখ আছে যে, মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু এক সময় কলাপ-গ্রাম বা 'কলাপোপবনে' থাকার সময় উপযুক্ত পুত্রসন্তান লাভের ভাগবতী গাথা শুনেছিলেন। *[বিষ্ণু পু. ৩.১৬.১৭-২০]*

□ আধুনিক ভৌগোলিক বিবরণেও দেখা যাবে যে, কলাপ-গ্রাম হিমালয়ের পার্বত্যভূমিতে অলকানন্দা নদীর শাখা সরস্বতী নদীর উৎসমুখের

নিকটে অবস্থিত। এ বিষয়ে Capt Raper-এর ভ্রমণ-বিবরণে যেটুকু পাওয়া যায়, সেটাই আমাদের কাছে কলাপ-গ্রামের আধুনিক ভৌগোলিক রূপ হিসেবে গ্রাহ্য হওয়া উচিত। Capt. F.V. Raper এক সময় ভাগীরথী-গঙ্গার উৎস সন্ধান করতে বেরিয়েছিলেন এবং ১৮০৮ সালের সেই বিরাট ভ্রমণ-বৃত্তান্ত Asiatic Researches-এর একাদশ খণ্ডে বেরিয়েছিল। সেখানে কলাপ-গ্রামের অবস্থিতি নিয়ে তিনি লিখেছেন—

This morning we made an excursion, with a view to explore the northern extremity of the valley, and to proceed in the direction of the river, to the point whence the stream emerges from the depths of snow, which over-lay and conceal its currents. At the distance of two and a half furlongs, we passed the town the temple of *Bhadri Nát'ha;* whence, proceeding by the road, centrically placed between the river and the mountain, we crossed several small streams, issuing from the hills, and formed by the melting of the snow upon the summits. Some of these water courses exhibit a very grand and pleasing appearance; falling from one ledge to another, on the scarped rock, in successive cascades. The one called *IndraDhárá* is the most considerable; its track being perceptible to the beds of snow, whence it derives its source. Its distance from *Bhadri-Nát'h* is one mile two furlongs; and three quarters of a mile beyond it, on the opposite side of the *Alacanandá,* is a large town, called *Mánah,* situated at the foot of a mountain, which, by an inclination to the N.W. bounds the valley in its N.E. direction. The hill is composed of rock, and covered with large loose fragments, which seem to threaten destruction to the houses placed at the foot of it. It is called *Calapa Gram;* and, as every rock in this neighbourhood is sanctified by some holy traditions this place is distinguished as the residence of *Surya-Vansi* and *Chandra-Vansi,*the patriarchs of the two races of *Rájpúts.* From hence we proceeded along the banks of the *Alacanandá,* in the direction of W. N. W. The breadth of the current is here considerably decreased, not exceeding eighteen or twenty feet; the stream shallow, and moderately rapid. At the distance of four furlonge, we crossed the river, over a bed of snow, and mounted on the opposite bank, whence we descended into another valley, in which we continued our route, for two or three miles, passing over several deep beds of snow, collected in the cavities of water courses and ravines. The north faces of the mountains, to the south of the river, were completely covered with snow, from the summit to the base; and the bleak aspect of the country, with the sharp piercing wind, gave the appearance and sensation of the depth of winter, in a much northern latitude. When the surface of the mountains was partially disclosed, the soil was of a hard solid rock; and excepting at the base, not a vestdige of verdure or vegetation was to be seen. The breadth of the valley is about five or six hundred yards; a small space of it is laid out in field, but the sides of the mountains are too steep and abrupt to carry the cultivation beyond the low ground, and are accessible only to th sheep and goats, that are seen browzing, a short distance up the slope. At twelve o'clock, we reached the extremity of our journey, opposite to a water-fall called *Barsù Dhará.* It is

formed in the cleft of a high mountain, to the N. of the river; and falls from the summit, upon a projecting ledge, about two hundred feet high, where it divides into two streams, which descend in drifting showers of spray, upon a bed of snow, where the particles immediately become congealed. The small quantity that dissolves, undermines the bed; whence it issues, in a small stream, about two hundred paces below. This place forms the boundary of the pilgrim's devotions; some few come hither for the purpose of being sprinkled by this holy shower bath.

From this spot, the direction of the *Alacanandá* is perceptible to the S.W. extremity of the valley, distant about one mile; but its current is entirely concealed, under immense heaps of snow, which have most probably been accumulating for ages, in its channel. Beyond this point, travellers have not dared to venture; and, although the *Sástras* mention a place called *Alacapúra**, whene the river derives its source and name, the position or existence of it is as much obscured in doubt and fable, as every other part of their mythological history.

Having now attained the limits prescribed for Lieut. Werb's inquiries in this direction, we commenced our return, and proceeded by the road which leads to the town of *Mánah.* In an hour and a half we arrived at *Calápa Grám,* the beauties of which were not perceptible from the opposite side of the river. From the summit of this hill, a large stream, called the Saraswati Nadi, appears to force a passage, through a rocky cavern whence it descends, with irresitable violence, in a solid compact body, disclosed to the height of forty or fifty feet.

[Captain F. B. Raper, 'Narrative of a Survey for the purpose of discovering the Sources of the Ganges'. In Asiatic Researches, vol. II (1812), pp. 522-524]

কলাবতী ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, দ্রুমিল নামে কান্যকুব্জ দেশে এক গোপরাজা ছিলেন। কলাবতী তাঁর পত্নী ছিলেন। পুত্র উৎপাদনে অক্ষম দ্রুমিলের নির্দেশেই কলাবতী কশ্যপবংশীয় জনৈক মুনির কাছে পুত্র প্রার্থনা করেন।

কিন্তু কলাবতী গোপ-জাতীয়া শূদ্রা রমণী ছিলেন বলে মুনি তাতে অসম্মত হন এবং দ্রুমিলকে ভর্ৎসনা করেন। এইসময় অপ্সরা মেনকাকে দেখে মুনির চিত্তে চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়। তাঁর বীর্য্য স্খলিত হলে কলাবতী তা পান করেন এবং তাঁর গর্ভাধান সম্পূর্ণ হয়। পত্নী গর্ভবতী জেনে দ্রুমিল এতই আনন্দিত হলেন যে রাজ্য, অর্থ, হাতি, ঘোড়া সবকিছু ব্রাহ্মণদের দান করে দিলেন। তিনি কলাবতীকে ব্রাহ্মণদের আশ্রয়ে রেখে নিজে চলে গেলেন বদরিকাশ্রমে তপস্যা করতে। তপস্যা করতে করতেই একসময় দ্রুমিল প্রাণ ত্যাগ করলেন। এই শোকে কলাবতীও অগ্নি কুণ্ডে প্রবেশ করতে যান। এইসময় এক ব্রাহ্মণ তাঁর প্রাণ রক্ষা করেন। যথাসময়ে কলাবতী একটি পুত্রের জন্ম দেন। এই পুত্রের নাম—নারদ।

[দ্র. দ্রুমিল১]

[ব্রহ্মবৈবর্ত পু. (ব্রহ্মখণ্ড) ২০ অধ্যায়]

কলি১ শিবসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত মহাদেবের অন্যতম নাম। শিবসহস্রনামস্তোত্রে মোট দুবার 'কলি' শব্দটি মহাদেবের নাম হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। 'কলি' শব্দের অর্থ কলহ বা যুদ্ধ। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের 'কলি' নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

কলিস্তৎকার্যভূতঃ কামক্রোধলোভাদিরূপঃ।

উপনিষদের ভাবনায় ভগবান শিব সর্বব্যাপী পরব্রহ্মস্বরূপ। এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড তাঁর দ্বারাই ব্যাপ্ত হয়ে আছে, এ জগতে জীব-জড়, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্ত বস্তুতেই তাঁর অধিষ্ঠান। এই ভাবনা অনুসারে একথাও বলা যায় যে এ জগতে যা কিছু

শুভ, যা কিছু সুন্দর তার মধ্যে যেমন তাঁর বিভূতি আছে, ঠিক তেমনি যা কিছু অশুভ তার মধ্যেও তিনি আছেন। প্রসঙ্গত মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে দেবী দুর্গার সর্বব্যাপী ব্রহ্মস্বরূপতার ভাবনা থেকে বলা হয়েছে যে, দেবী পুণ্যবান্, সদাচার ব্যক্তির গৃহে সম্পদের দেবী লক্ষ্মী রূপে বিরাজ করেন, তিনিই আবার পাপীদের গৃহে বিরাজ করেন অলক্ষ্মী রূপে—

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।

অনুরূপ ব্রহ্মস্বরূপতার ভাবনা থেকে বলা যায়, ভগবান শিবও একদিকে যেমন যা কিছু সত্য, সুন্দর, শুভ তার মধ্যে অধিষ্ঠান করেন তেমনই কলি বা কলহের মধ্যে, কাম-ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ষড়্‌রিপুর মধ্যেও তাঁর অধিষ্ঠান। তাই তিনি 'কলি' নামেও সম্বোধিত হন।

শিবসহস্রনামস্তোত্রে যেখানে দ্বিতীয়বার মহাদেবকে কলি নামে সম্বোধন করা হয়েছে, সেখানে এই নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে নীলকণ্ঠ বলেছেন—

অন্যোন্যং দেবাসুরাদীনাং বৈরকর্তা।

জগৎস্রষ্টারূপে মহাদেব দেবতা এবং অসুরকুল উভয়কুলেরই স্রষ্টা। আদিকাল থেকে উভয়ের মধ্যে যে কলহ বা দ্বন্দ্ব চলে আসছে তারও সৃষ্টি কর্তা তিনিই। কখনো কখনো তাঁরই বরে বলীয়ান হয়ে অসুররা দেবতাদের পরাস্ত করে স্বর্গরাজ্য অধিকার করে নেয়, আবার দেবতাদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তিনিই স্বয়ং সেই অসুরদের দমন করতে উদ্যত হন। এই ভাবনা থেকে তিনি দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে যে নিরন্তর 'কলি' বা কলহ—তার কারণস্বরূপ—সেই কারণেও কলি ভগবান শিবের অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৭.৭৯, ৯৪; (হরি) ১৩.১৬.৭৯, ৯৪]

কলি২ সংস্কৃত 'কল্' ধাতু থেকে উৎপন্ন 'কলি' শব্দের একাধিক আভিধানিক অর্থ হতে পারে। 'কলি' বলতে শত্রু বোঝায়, আবার 'কলি' বলতে কলহ-বিবাদও বোঝায়। সাধারণভাবে লোকমুখে 'ঘোর কলি' শব্দটা কলিযুগ অর্থে ব্যবহৃত হলেও মহাকাব্য এবং পুরাণগুলিতে কলির প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে কলহ, অধর্ম এবং অনাচারের মূর্তিমান অধীশ্বর হিসেবে। যে যুগে তাঁর আধিপত্য বিস্তৃত হয়—সেটিই কলিযুগ।

পুরাণে এই কলির জন্মকথা বর্ণিত হয়েছে, এমনকী কলির পত্নী-পুত্র প্রভৃতিরও বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, প্রকৃতপক্ষে অধর্ম-পাপ-কলহকে ব্যক্তি রূপে চিত্রিত করে তার স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্যটাই মানুষের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন পুরাণকাররা। বায়ু পুরাণে এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী 'কলি'র জন্ম দেবকুলেই—এক হিসেবে এঁকে অধর্মের অধিষ্ঠাতৃ 'দেবতা'ই বলা চলে। জলাধিপতি তথা অন্যতম প্রাচীন বৈদিক দেবতা বরুণের ঔরসে, সামুদ্রীর গর্ভে কলি'র জন্ম। কলির পত্নীর নাম সুরা। কলির ঔরসে সুরার গর্ভজাত পুত্র মদ। স্পষ্টভাবেই যেন সুরাপানে মত্ত মানুষজনের বিকারে, মানবমনের অহংকারে কলির অধিষ্ঠান সূচিত হয়ে যায় এই পৌরাণিক বিবরণ থেকে। পুরাণ মতে কলির অন্যান্য পত্নীদের নাম যথাক্রমে ত্বাষ্ট্রী-হিংসা এবং নিকৃতি। এঁদের মধ্যে হিংসা ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মার কন্যা বলে ত্বাষ্ট্রী নামে পরিচিত। হিংসা এবং নিকৃতি শব্দদুটি কলিরই বৈশিষ্ট্য বহন করে। হিংসা শব্দের দ্বারা যেমন নিরীহ প্রাণীর প্রতি নৃশংসতা বোঝায়, তেমনই নিকৃতি নিন্দা, শঠতা, অপকার, বঞ্চনা প্রভৃতি নীচকর্মের দ্যোতক। তাই এঁরা অধর্মের প্রতীক 'কলি'র পত্নীরূপে পরিচিত।

ভাগবত পুরাণে অবশ্য কলিকে ক্রোধ এবং হিংসার পুত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী, ব্রহ্মার পুত্র অধর্ম, অধর্মের পত্নী মৃষা। এঁদের পুত্র-কন্যা দম্ভ এবং মায়া। অধর্মের পত্নী নির্ঋতি এঁদের পালন করেন। এরপর দম্ভের ঔরসে মায়ার গর্ভে লোভ এবং নিকৃতির জন্ম। লোভের ঔরসে নিকৃতির গর্ভে জন্ম নেন ক্রোধ এবং হিংসা। ক্রোধ এবং হিংসা থেকে জন্ম হয় কলি এবং দুরুক্তি অর্থাৎ কটুকথার। কলির ঔরসে দুরুক্তির গর্ভজাত যমজ পুত্রকন্যারা হলেন যথাক্রমে ভয় এবং মৃত্যু। এরপর ভয় এবং মৃত্যু থেকে উৎপত্তি হল যাতনা এবং নিরয়-এর। স্পষ্টই বোঝা যায় ভাগবত পুরাণ মানব চরিত্রের সমস্ত দোষ এবং তার চরম যন্ত্রণাদায়ক পরিণামগুলিকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করে এক বংশতালিকা নির্মাণ করেছে। 'কলি' সেই দোষ বা অনাচারেরই অঙ্গ।

বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কলির জয়

এবং বিজয় নামেও দুই পুত্রসন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। কলির ঔরসে নিকৃতির গর্ভে চার রাক্ষসপুত্রের জন্ম হয়। এরা আকারেও অতি ভীষণ। এদের নাম যথাক্রমে নাক, বিঘ্ন, সন্ধম এবং বিধম। এদের মধ্যে বিঘ্ন মস্তকহীন, নাক শরীরহীন, সন্ধম এক হস্ত এবং বিধম একপাদ বিশিষ্ট।

[ভাগবত পু. ৪.৮.২-৫; বায়ু পু. ৮৪.৬-১১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫৯.৬-১০]

□ মহাভারতে একাধিক ঘটনায় ব্যক্তি হিসেবে কলির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে মহাভারতের অন্যতম প্রধান প্রতিনায়ক চরিত্র দুর্যোধনকে কলির অংশে জাত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতে অন্যত্রও বেশ কয়েকবার বিষয়টি উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

[মহা (k) ১.৬৭.৮৭; ৫.১৩৩.৩০; ১১.৮.৩০; ১৫.৩১.১০; (হরি) ১.৬২.৮৯; ৫.১২৪.২৯; ১১.৮.৩০; ১৫.৩৪.১০]

□ মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত নলোপাখ্যানে ব্যক্তি হিসেবে কলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় উপস্থিত। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে—বিদর্ভের রাজকন্যা দময়ন্তীর রূপ-গুণের কথা সে সময়ে সম্পূর্ণ পৃথিবীতে তো বটেই, দেবলোকেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে দময়ন্তীর পিতা বিদর্ভরাজ ভীম যখন দময়ন্তীর স্বয়ংবর আয়োজন করলেন, তখন দেশ-বিদেশের রাজা-মহারাজারা যেমন সেই স্বয়ংবরে যোগ দিতে এলেন, তেমনই ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণের মতো বিশিষ্ট দেবতারাও সেই স্বয়ংবরে অংশগ্রহণ করলেন। কিন্তু দময়ন্তী গোড়া থেকেই নিষধরাজ নলের অনুরাগিণী ছিলেন, ফলে তিনি স্বয়ংবরে তাঁরই গলায় বরমাল্য দিলেন। দেবতারাও আনন্দিত মনে তা মেনে নিলেন। এরপর নল-দময়ন্তীর বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবার পর দেবতারা যখন স্বর্গলোকে ফিরে চলেছেন, তখন পথে কলি আর দ্বাপরের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল। দেবতারা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা কোথায় চলেছ? কলি বললেন—আমরা দময়ন্তীর স্বয়ংবরে যোগ দিতে যাচ্ছি। আমার ইচ্ছা, আমিই দময়ন্তীকে বিবাহ করব—

ততোʼব্রবীৎ কলিঃ শক্রং দময়ন্ত্যাঃ স্বয়ম্বরম্।
গত্বা হি বরয়িষ্যে তাং মনো হি মম তাং গতম্॥

কলির কথা শুনে ইন্দ্র হেসে বললেন—সে স্বয়ংবর তো সুসম্পন্ন হয়েছে। দময়ন্তী নিষধরাজ নলকে স্বামীরূপে বরণ করেছেন। আমরা তো বিবাহ অনুষ্ঠান থেকেই ফিরছি। কলি এ খবর শুনে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন। ভাবটা এমন দেখালেন, যেন দেবতাদের ফেলে একজন মানুষের গলায় মালা দিয়ে দময়ন্তী ভীষণ অপরাধ করেছেন আর সেজন্য নল-দময়ন্তী দুজনেরই গুরুতর শাস্তি প্রাপ্য—

দেবানাং মানুষং মধ্যে যৎ সা পতিমবিন্দত।
তত্র তস্যা ভবেন্ন্যায্যং বিপুলং দণ্ডধারণম্॥

কিন্তু কলির কথায় দেবতারাও স্পষ্ট বুঝলেন, দময়ন্তীকে না পেয়েই কলির এই ক্রোধ। দেবতারা কলিকে বোঝালেন যে, আমাদের অনুমতি নিয়েই এই বিবাহ হয়েছে। আমরা তাতে অত্যন্ত আনন্দিতও হয়েছি। উপরন্তু নল সর্বগুণসম্পন্ন, ন্যায়পরায়ণ রাজা, সর্বদাই তাঁর ধর্মে মতি। এমন ব্যক্তি শুধু যে দময়ন্তীর উপযুক্ত বর তাই নয়, মানুষ হিসেবেও অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। কখনোই তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করা কলির উচিত নয়। বরং তা করলে কলিরই ক্ষতি হবে। কিন্তু কলি সে সব কথায় কান দিলেন না, বরং দেবতারা চলে যেতেই তিনি দ্বাপরকে বললেন—দময়ন্তীকে আমি পেলাম না আর নল রাজা পেলেন—এমনটা ভেবেও আমার ভয়ানক ক্রোধ হচ্ছে। আমি যে কোনো উপায়ে নলকে দময়ন্তীর থেকে আলাদা করতে চাই। তুমি পাশা খেলার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য কর—

ততো গতেষু দেবেষু কলির্দ্বাপরমব্রবীৎ।
ভ্রংশয়িষ্যামি তং রাজ্যান্ন ভৈম্যাসহ রংস্যতে।
ত্বমপ্যক্ষান্ সমাবিশ্য সাহায্যং কর্তুমর্হসি॥

[মহা (k) ৩.৫৮.৫-১৪; (হরি) ৩.৪৮.৬-১৪]

□ কলি অনেক খুঁজে নলের সামান্য দোষ আবিষ্কার করে তাঁর দেহে প্রবেশ করলেন। তারপর কলির প্ররোচনায় নল রাজার রাজ্যলোভী ভাই পুষ্কর এসে নল রাজাকে দ্যূতক্রীড়ার আহ্বান জানালেন। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে পুষ্কর যখন নলের সভায় যাচ্ছেন, তখন কলি তাঁর পিছন পিছন একটা বৃষ বা যণ্ডের রূপ ধারণ করে চলতে লাগলেন। পুরাণের ভাবনায় বৃষ ধর্মের প্রতিরূপ। অর্থাৎ মূর্তিমান অধর্ম যেন ধর্মের ছদ্মবেশ ধরে চলতে লাগলেন পুষ্করের পিছনে—

অক্ষদ্যূতে নলং জেতা ভবান্ হি সহিতো ময়া।
নিষধান্ প্রতিপদ্যস্ব জিত্বা রাজ্যং নলং নৃপম্॥

এবমুক্তস্তু কলিনা পুষ্করো নলসভ্যয়াৎ।
কলিশ্চৈব বৃষো ভূত্বা তং বৈ পুষ্করমন্বয়াৎ॥

যথারীতি কলি এবং দ্বাপরের যৌথ সহায়তায় পুষ্কর জয়লাভ করলেন, নল রাজ্য হারালেন। দময়ন্তীর সঙ্গেও তাঁর বিচ্ছেদ ঘটল। কলির প্রভাবে নলের দুরবস্থার কথা মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত নলোপাখ্যান পর্বে বেশ কয়েকটি অধ্যায় জুড়ে বর্ণিত হয়েছে। অবশেষে অযোধ্যার ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ঋতুপর্ণের কাছ থেকে অক্ষবিদ্যা শিক্ষা করে নল কলির প্রভাব থেকে মুক্ত হন। তাঁর রাজ্য ও পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন পত্নী দময়ন্তীর সঙ্গেও তাঁর পুনর্মিলন ঘটে। *[দ্র. নল$_{১}$, দময়ন্তী]*

[মহা (k) ৩.৫৯.১-১৮; (হরি) ৩.৪৯.১-১৮]

☐ ভাগবত পুরাণের কাহিনীতে রাজা পরীক্ষিতের সঙ্গে যখন কলির সাক্ষাৎ হচ্ছে, পুরাণ মতে সেটা কলিযুগের সূচনাকাল। ধীরে ধীরে কলির আধিপত্যই বিস্তৃত হচ্ছে সর্বত্র।

মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন হস্তিনাপুরের রাজা। পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণ করেছেন, ভগবান কৃষ্ণও যথাসাধ্য যথামতি ভূভারহরণ করে ধর্ম এবং জ্ঞানকে সঙ্গে করে স্বধামে চলে গেছেন। এমনই কোনো এক সময়ে পরীক্ষিৎ একটি দুঃসংবাদ পেলেন। তিনি শুনলেন—তাঁর সাম্রাজ্যচক্রে কলি, অধর্মের প্রতিমূর্তি কলি, প্রবেশ করেছে। খবর শুনেই তিনি ধনুক-বাণ হাতে করে সদলবলে রওনা হলেন কলিকে দমন করতে। পথে যেতে যেতে পরীক্ষিৎ একটি ষাঁড় বা বৃষকে দেখতে পেলেন, যার তিনখানি পাই ভেঙে গিয়েছে, একটি মাত্র পায়ে ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে কোনোরকমে। আবারও উল্লেখ্য, বৃষ ধর্মের প্রতিরূপ। তাঁর চারটি পদ সেই ধর্মের প্রতিষ্ঠার প্রতীক। সেই বৃষের যখন তিনটি পা ভেঙে যায় এবং একটি মাত্র পা অবশিষ্ট থাকে তখন তা সমকালীন সময়ে অধর্ম-অনাচারের প্রভাব বৃদ্ধিরই সূচনা করে। সেই অধর্মের যুগে শূদ্র রাজার মূর্তি ধারণ করেছেন কলি এবং গাভীরূপধারী পৃথিবী আর ধর্মরূপধারী বৃষকে প্রহারও করছেন মধ্যে মধ্যে। পৃথিবী এবং ধর্মের একটা কথোপকথন আছে এই পর্যায়ে এবং তাদের মুখে পৃথিবীর দুরবস্থার কথা শুনে পরীক্ষিৎ রাজা এতটাই দুঃখ পেলেন যে, তিনি তখনই খড়্গ হাতে কলিকে বধ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু কলি সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষিতের পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রাণভিক্ষা করলেন। পাণ্ডবকুলের একমাত্র বংশধর শরণাগতকে বধ করতে পারলেন না, সংস্কারে বাধল।

তিনি কলিকে বললেন—বেরিয়ে যাও আমার রাজ্য থেকে। যেখানে যজ্ঞনিপুণ ব্রাহ্মণেরা সবসময় যজ্ঞ করে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর সংবাহন করছেন—

ব্রহ্মাবর্তে যত্র যজন্তি যজ্ঞৈ
যজ্ঞেশ্বরং যজ্ঞ বিতান বিজ্ঞাঃ।

যেখানে থাকতে গেলে ধর্ম আর সত্যই একমাত্র সম্বল—সেই ব্রহ্মাবর্তে তোমার স্থান হবে না। তুমি বেরিয়ে যাও আমার রাজ্য থেকে।

বিপন্ন কলি বলল—আমি যাব কোথায়? যেখানেই যাব সেখানেই তো আপনি খড়্গ-হাতে ছুটবেন, কারণ সব তো আপনারই রাজ্য। পাঠককে আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, কলি কিন্তু এই মুহূর্তে পৃথিবী বলতে ভারতবর্ষকেই বোঝাচ্ছেন। যাই হোক, কলি অনেক কাকুতি-মিনতি করে পরীক্ষিৎকে বললেন—আপনিই বরং আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট করে দিন, যেখানে আপনি থাকতে বলবেন, আমি সেখানেই থাকব। শরণাগত কলিকে পরীক্ষিৎ বললেন—ঠিক চারটি জায়গায় তোমার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আমি করতে পারি—একটি হল দ্যূতক্রীড়ার আসর, দ্বিতীয় পানশালা, তৃতীয় গণিকালয় আর সবশেষে বৃথা প্রাণিহত্যার জায়গাগুলি। কলি ভাবল—আমার যা পরিবার, তাতে এটুকু জায়গায় আমার কুলোবে কেন? সে আরও একটু স্থান ভিক্ষা করল। পরীক্ষিৎ তখন সোনা-দানা-টাকাপয়সায় কলির স্থান নির্দিষ্ট করলেন। ভাগবত পুরাণের বিবরণে পরীক্ষিতের মুখে যে এই সর্বশেষ আদেশটি শোনা গেল, তার ফলে দ্যূতক্রীড়া অর্থাৎ পাশাখেলা, পানশালা, গণিকালয়ের সঙ্গে বিপুল অর্থের সম্পর্কটাই যেন স্বীকৃতি পায়।

[ভাগবত পু. ১.১৭.১-৪৫]

☐ এই একপাদ মাত্র ধর্মবিশিষ্ট কলিযুগের একটা বর্ণনা মহাভারতে পাওয়া যায়—

পাদেনৈকেন কৌন্তেয় ধর্মঃ কলিযুগে স্থিতঃ।

মহাভারতের বনপর্বে হনুমান ভীমের কাছে কলিযুগের লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে

বলেছেন—কলিযুগে বেদবিহিত আচার, ধর্মকর্ম, যজ্ঞ—সবকিছুই বিলুপ্ত হবে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়, নানা ধরনের রোগ, আলস্য-ক্রোধ প্রভৃতি দোষ, অত্যাচারী রাজার রাজত্ব, অনাহার, দারিদ্র্য প্রভৃতি দেখা দেবে। এমনকী এই যুগে যাঁরা ধর্মাচরণ করবেন, তাঁরাও সেই ধর্মাচরণের ফল লাভ করবেন না।

মহাভারতের বনপর্বে আরও একবার মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের মুখে কলিযুগের বিবরণ শোনা যায়। মার্কণ্ডেয়ের দীর্ঘ বর্ণনায় হনুমানের কথারই পুনরুক্তি এবং বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে মার্কণ্ডেয়ের মুখে শুধু কলিযুগের ভয়াবহতাই নয়, কলির অবসানে সত্যযুগের সূচনা এবং ভগবান বিষ্ণুর কল্কী অবতার গ্রহণের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

[মহা (k) ৩.১৪৯.৩৩-৩৯; ৩.১৯০.৯-৯০; (হরি) ৩.১২৩.৩৪-৩৯; ৩.১৬১.৯-৮৯]

□ পৌরাণিক বিবরণ অনুযায়ী, পাণ্ডবদের পৌত্র রাজা পরীক্ষিতের সময়কাল থেকেই কলিযুগের সূচনা। পণ্ডিত গিরীন্দ্রশেখর বসুর মতে, আনুমানিক ১৪১৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করেন। সেক্ষেত্রে ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দ পরবর্তী কোনো সময় থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কলিযুগের সূচনা ঘটেছিল বলে ধরে নিতে হবে।

[গিরীন্দ্রশেখর বসু, পুরাণপ্রবেশ পৃ. ২১৭]

কলি৩ অক্ষক্রীড়া বা পাশাখেলার সময় ঘুঁটি নাড়াচাড়ার জন্য দান ফেলা হত, আর যে বস্তুর সাহায্যে সেই দান ফেলা হত সেটিকে আকার আকৃতির দিক থেকে না হলেও প্রয়োগের দিক থেকে এখনকার দিনের 'লুডো'র ছক্কার সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই পাশায় দান ফেলার বস্তুটির চারদিকে চারটি সংখ্যা অঙ্কিত থাকত। এই চারটি সংখ্যার নামের সঙ্গে আমাদের পৌরাণিক ভাবনার চতুর্যুগের নামকরণ গত সাদৃশ্য আছে, এমনকী প্রকৃতিগত সাদৃশ্যও আছে খানিকটা। চার সংখ্যক দানটি হল সর্বশ্রেষ্ঠ দান বা কৃত দান। এর নামকরণও হয়েছে চতুষ্পাদ ধর্ম যুক্ত সত্যযুগ বা কৃত যুগের নামে। ত্রেতা যুগ বা ত্রিপাদ ধর্মের যুগের নামে নামঙ্কিত দানটিও তিন সংখ্যক, দ্বাপর হল দুই এবং 'কলি' বা কলি দান হল এক সংখ্যক। পাশাখেলার নিয়মে 'কৃত' দান মানেই জয়। আর কলিদান মানেই হার, মহাভারতের টীকায় নীলকণ্ঠ বলেছেন—কলিপাতে জয়ো নাস্তি, কলির সংখ্যায় দান পড়লে কোনোদিন জয় হবে না। কলিপ্রবিষ্ট নলরাজা যে দ্যূতক্রীড়া করেছিলেন, তাঁরও সর্বনাশ হয়েছিল এই কলিদানে। বেদের আমল থেকেই এই কৃতদানের জয়-জয়কার আর কলিদানের হাহাকার শুনতে পাওয়া যাবে।

সেক্ষেত্রে যুগের বিচারে কলি যেমন অনাচারের দ্যোতক, পাশাখেলার ক্ষেত্রে পরাজয়ের দ্যোতক। ফলে 'কলি' শব্দ আর দুর্ভাগ্য, পরাজয় এগুলি একরকম সমার্থক শব্দ হয়ে গিয়েছে। মহাভারতের বিরাট পর্বে কুরুসেনার সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধের ঠিক আগে অশ্বত্থামার সঙ্গে কর্ণের যে কলহ বা বাদবিতণ্ডা হতে দেখা যায়, সেখানে অশ্বত্থামা কর্ণকে বলছেন—অর্জুন কিন্তু তোমাদের জুয়াড়ী শকুনি মামার মতো পাশা খেলেন না, আর তাঁর হাত থেকে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর কোনো দানই পড়ে না। অশ্বত্থামার বক্তব্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ যা বলছেন তা থেকে 'কলি' বলতে যে একবিন্দু যুক্ত দান বোঝায় তাও যেমন স্পষ্ট হয়, ঠিক তেমনই 'কলি' যে দুর্ভাগ্য বা পরাজয়ের সূচনা করে তাও স্পষ্ট হয়, নীলকণ্ঠ বলছেন— অর্জুনের তীক্ষ্ণধার বাণগুলিকে অশ্বত্থামা 'কলি'দানের সঙ্গে তুলনা করেছেন যা মূর্তিমান দুর্ভাগ্য বা পরাজয়ের মতো কৌরবপক্ষের ওপর বর্ষিত হবে।

[মহা (k) ৪.৫০.২৪; (হরি) ৪.৪৫.২৪; (নীলকণ্ঠকৃত টীকা দ্রষ্টব্য)]

কলিঙ্গ১ পূর্বভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জনপদ। অবশ্য শুধুমাত্র পূর্ব না বলে একে দক্ষিণপূর্বের জনপদও বলা যেতে পারে। কারণ ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে কলিঙ্গ দাক্ষিণাত্যের জনপদও বটে। পুরাণে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী, যযাতির পুত্র অনুর বংশধারায় রাজা বলির ক্ষেত্রজ পুত্ররা ছিলেন যথাক্রমে—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম। রাজা বলি তাঁর পাঁচ পুত্রকে পাঁচটি পৃথক রাজ্যে রাজা করেন। কলিঙ্গ যে ভূখণ্ডে রাজা হলেন, সেই রাজ্যটিই কলিঙ্গ নামে খ্যাত। *[মৎস্য পু. ৪৮.২৫; বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.১৮.১৩-১৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.২৮; বায়ু পু. ৯৯.২৮]*

□ কলিঙ্গকে উৎকল থেকে ভিন্ন বলেন অনেকে, আবার কলিঙ্গ এবং উৎকলকে অনেক পণ্ডিত অভিন্নও বলেছেন। ফলে পণ্ডিত N.L.

Dey যেমন বর্তমান উড়িষ্যার দক্ষিণপ্রান্তে কলিঙ্গের অবস্থান নির্ণয় করেছেন, তেমনই কলিঙ্গ নগরী বলতে যে ভুবনেশ্বরকে বোঝাত, একথাও অস্বীকার করেন নি। তবে K.C. Mishra-র গবেষণা থেকে কলিঙ্গদের এই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পণ্ডিত Cunningham-এর মত উদ্ধার করে মিশ্র জানাচ্ছেন—কলিঙ্গ প্রথমে বর্তমান উড়িষ্যার বৈতরণী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। মহাভারতের বনপর্বেও কলিঙ্গের নাম উল্লেখ করার সময় তাকে বৈতরণী নদীতীরের দেশ বলা হয়েছে। তবে পরবর্তী সময়ে কলিঙ্গের মানুষজন আরও বেশ খানিকটা দক্ষিণে মহানদীর তীরে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। সেক্ষেত্রে ভুবনেশ্বরকে কলিঙ্গদের প্রাচীন রাজধানী মনে করা যেতে পারে। মহানদীর তীরে উড়িষ্যার দক্ষিণে কলিঙ্গদের যে বসতি স্থাপিত হয়, তার বর্তমান নাম তেলেঙ্গানা। পণ্ডিতদের মতে, 'ত্রিকলিঙ্গ' শব্দটি থেকে তেলেঙ্গানা শব্দের উৎপত্তি। *[মহা (k) ৩.১১৪.৪; (হরি) ৩.৯৫.৪; GDAMI (Dey) p. 85; TIM (Misra) p. 89-90]*

বলি রাজার পুত্রের নামানুসারে কলিঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার কাহিনীটি পুরাণে প্রাপ্ত হলেও কলিঙ্গ জনপদের প্রাচীনতম উল্লেখ মেলে বৌধায়ন ধর্মসূত্রে, যেখানে কলিঙ্গের অধিবাসীদের বৈদিক সংস্কারহীন বর্ণসংকর জাতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের জনপদগুলিতে আর্যায়ণ ঘটেছে অনেক পরে, সুতরাং সূত্র সাহিত্যের যুগে এই জনপদগুলির সম্পর্কে আর্যদের মনে হীন ভাবনা থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তবে আশ্চর্য এই যে, মহাভারতের কর্ণপর্বে কর্ণ নিজেও কলিঙ্গের নিন্দা করেছেন এবং সেই দেশকে বৈদিক সংস্কারহীন এবং হীন জনজাতির দেশ বলে বর্ণনা করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হল, কর্ণের পরম বন্ধু দুর্যোধন কলিঙ্গের রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। সেই আত্মীয়তার সুবাদে কলিঙ্গের সেনা কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধনের পক্ষও অবলম্বন করেন। তৎসত্ত্বেও কর্ণের মুখে কলিঙ্গের হীন জনজাতি হিসেবে উল্লেখ একটু অবাক করার মতোই বটে। অবশ্য একথা বলার কিছু পরেই কর্ণ নিজেই বলছেন যে, কলিঙ্গ দেশেও সজ্জন বেদবিৎ পণ্ডিতরা বসবাস করেন। তবে সে দেশের সাধারণ মানুষকে কর্ণ এখানেও হীন বলেই উল্লেখ করেছেন। মনে হয় আর্যায়ণ সম্পূর্ণ ভাবে ঘটে যাবার পরেও কলিঙ্গদেশের আদি বসবাসকারীদের সম্পর্কে আর্যদের মনে হীন ধারণা যথেষ্টই ছিল। কর্ণের উক্তি থেকেই তার প্রমাণ মেলে। *[দ্র. দুর্যোধন]*

[মহা (k) ৮.৪৪.৪৩; ৮.৪৫.২৪; ৬.৫৩.৩৭-৪০; ৬.৫৪.১-১৬; (হরি) ৮.৩৪.১০২, ১২০-১২১; ৬.৫৩.৩৭-৪০; ৬.৫৪.১-১৬; বৌধায়ন ধর্মসূত্র ১.১.৩০]

কলিঙ্গ২ যযাতির পুত্র অনুর বংশধারায় রাজাবলির ক্ষেত্রজ পুত্রদের মধ্যে অন্যতম। *[দ্র. কলিঙ্গ১]*

কলিঙ্গ৩ ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম মন্ত্রী কণিককে কোথাও কোথাও কলিঙ্গ নামেও উল্লিখিত হতে দেখা যায়। *[দ্র. কণিক]*

কলিবন একটি পশ্চিম ভারতীয় জনজাতি তথা জাতিনামে পরিচিত জনপদ। এঁদের অবস্থান সম্পর্কে এখনও কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৬০]

কলিল অষ্টবসুর মধ্যে সোম অন্যতম বসু। সোমের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে একজন কলিল।

[বায়ু পু. ৬৬.২৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.২৩]

কল্কি (কল্কী) ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।

কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে।

বঙ্গদেশের কবি তথা গীতগোবিন্দের স্রষ্টা জয়দেব ভগবান বিষ্ণুর কলিযুগের অবতারের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এভাবেই। পৌরাণিক ভাবনায় কলিযুগের অন্তিম পর্যায়ে ভগবান বিষ্ণু কল্কি রূপে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন। ইনি বিষ্ণুর দশম অবতার। মহাভারতের বনপর্বে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় নানা বিষয়ে উপদেশ দিতে দিতে ভাবী কলিযুগের এক দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে কলিযুগের অন্তিম পর্যায়ের পৃথিবীর যে বর্ণনা আছে তা পাপে, অনাচারে পরিপূর্ণ, ম্লেচ্ছজাতির শাসনাধীন, চতুর্বর্ণের মানুষের আচার-ব্যবহার-বৃত্তি কোনো কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না সে যুগে। সৃষ্টির বা বলা ভালো মন্বন্তরের অন্ত অর্থাৎ প্রলয় দেখা দেবে এবং সেই প্রলয়ের আগে সৃষ্টি ধ্বংসের সংকেত হিসেবে নানা দুর্লক্ষণ দেখা যাবে। তারপর এক ভয়াবহ মহামারীতে কলিযুগের অবসান হবে। কলিযুগের এই অবসান এবং পুনরায় সত্যযুগের সূচনার কালে 'সম্ভল'

নামক গ্রামে বিষ্ণুযশা নামে এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবেন স্বয়ং বিষ্ণু। বিষ্ণুযশার এই পুত্রেরই নাম কল্কি—

কল্কী বিষ্ণুযশা নাম দ্বিজঃ কালপ্রচোদিতঃ॥
উৎপৎস্যতে মহাবীর্য্যো মহাবুদ্ধি পরাক্রমঃ।
সম্ভূত সম্ভলগ্রামে ব্রাহ্মণাবসথে শুভে॥

মহাভারতের বিবরণ অনুযায়ী সেই নতুন সত্যযুগের সূচনাকালে এই কল্কিই অস্ত্র-শস্ত্র সৈন্যবল সংগঠিত করে ব্রাহ্মণের রাজত্ব এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি রাজচক্রবর্তীরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে পৃথিবীতে আবার শান্তি, সুশাসন এবং সমৃদ্ধির পরিবেশ তৈরি হবে। বিধর্মী ম্লেচ্ছ এবং পাপাচরণকারী দস্যুদের তিনি সংহার করবেন এবং অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে দক্ষিণাস্বরূপ সসাগরা পৃথিবী দান করবেন ব্রাহ্মণদের। এইভাবে সুদীর্ঘ রাজত্বকালে পাপ অনাচার নির্মূল করার পর পৃথিবীতে সুশাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে কল্কি বৃদ্ধবয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন।

[মহা (k) ৩.১৯০.৯০-৯৭; ৩.১৯১.১-৭; (হরি) ৩.১৬১.৮৮-১০৩]

☐ মহাভারতে বিষ্ণুর এই দশমাবতার কল্কির যে জীবনবৃত্তান্ত পাওয়া যায় তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। পুরাণগুলিতেও কল্কির জীবন এবং কীর্তির কথা সংক্ষেপেই বর্ণিত হয়েছে। তবে পুরাণগুলিতে কিছু কিছু নতুন তথ্য খুব স্বাভাবিকভাবেই পাওয়া যায়। যেমন, বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, কল্কি এবং তাঁর পিতা বিষ্ণুযশা পরাশরবংশীয় ব্রাহ্মণ। কল্কির রাজত্বকালে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর পৌরোহিত্য করবেন—এমন উল্লেখও পাওয়া যায়। ভাগবত পুরাণ উল্লেখ করেছে যে, রাজর্ষি তথা ভগবান বিষ্ণুর অবতার কল্কির অশ্বের নাম হবে দেবদত্ত। বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কল্কির ম্লেচ্ছদেশবিজয়ের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণও পাওয়া যায়। সেখানে বিন্ধ্যপর্বত তথা সম্পূর্ণ দাক্ষিণাত্য, গান্ধার প্রভৃতি উত্তরের জনপদসমূহ ছাড়াও পারদ, পহ্লব, শক, তুষার, যবন, বর্বর, পুলিন্দ, দরদ, অন্ধক, কিরাত প্রভৃতি জনজাতি কলিযুগের অন্তে কল্কির পদানত হবে বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

[ভাগবত পু. ১২.২.১৮-২৩; বিষ্ণু পু. ৪.২৪.২০-৩০; বায়ু পু. ৯৮.১০৪-১১৭; মৎস্য পু. ৪৭.২৪৮-২৬২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৩.১০৪-১২৪]

☐ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন উপপুরাণ কল্কিপুরাণে ভগবান বিষ্ণুর দশম অবতার কল্কির জন্ম এবং জীবন কাহিনী বিশদে বর্ণিত হয়েছে। তবে সেই অর্বাচীন পুরাণে বর্ণিত বৃহৎ কাহিনীর গ্রহণযোগ্যতা অপেক্ষাকৃত কম বলেই তা আমরা এই কোষে বিশদে উল্লেখ করলাম না।

[দ্র. কল্কিপুরাণ, সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র বেলুড়মঠ থেকে প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৭]

কল্প১ সৃষ্টির আরম্ভ থেকে স্থিতিকাল এক কল্প, ব্রহ্মার একদিন। *[দ্র. যুগ]*

কল্প২ ষড়ঙ্গ বেদাঙ্গের অন্তর্গত একটি বেদাঙ্গ। বেদের যাজ্ঞিক কর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কল্পজ্ঞানের গভীর প্রয়োজনীয়তার নিরিখে অন্যান্য বেদাঙ্গগুলির সঙ্গে 'কল্প'কেও ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্মক করে দেখা হয়েছে পুরাণে।

[বিষ্ণু পু. ৫.১.৩৬-৩৭]

☐ যে বিদ্যা বা শাস্ত্রের দ্বারা বৈদিক যজ্ঞ কল্পিত হয় বা সমর্থিত হয় তাকে বলে কল্প। এটি বেদোক্ত যজ্ঞগুলির প্রয়োগ-বিজ্ঞান।

'অবা কল্পেষু নঃ পুমস্তমাংসি সোম যোধ্যা'।

[ঋগ্‌বেদ ৯.৯.৭]

—এই মন্ত্রে স্পষ্টতই যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যাপারে কল্পের কথা বলা হচ্ছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে বৈদিক যজ্ঞের বিচিত্র ভাবনাগুলি কাহিনী সহকারে বিবৃত করা হয়েছে, কিন্তু কল্পসূত্রে সেগুলি প্রয়োগ-ভাবনায় সূত্রাকারে গ্রথিত। কল্পসূত্রগুলি প্রধানত চার রকমের—শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র এবং শুল্বসূত্র। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে যে সব শ্রৌত যাগযজ্ঞ বিহিত হয়েছে, সেই যাগযজ্ঞের বিধি-নিয়ম যেখানে সূত্রাকারে বলা আছে, সেগুলি হল শ্রৌতসূত্র। আর যেখানে গৃহস্থের পালনীয় সাংস্কারিক কর্তব্যগুলি নির্দেশ করা আছে, সেগুলি হল গৃহ্যসূত্র। পালনীয় ধর্ম সম্বন্ধে যেখানে সূত্রাকার বিবরণ আছে, সেগুলি ধর্মসূত্র। আর শুল্ব মানে হল পরিমাপ করার রজ্জুখণ্ড বা দড়ি। এগুলো দিয়ে যজ্ঞবেদির পরিমাপ আকার নির্ধারণ করা হত। সেই জ্যামিতিক বিবরণ নিয়েই শুল্বসূত্র তৈরি হয়েছে। ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদের ভাগ অনুযায়ী প্রত্যেকটি বেদের সঙ্গে যুক্ত শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র এবং ধর্মসূত্র আছে। যেমন ঋগ্‌বেদের সঙ্গে যুক্ত আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র;

সামবেদের সঙ্গে যুক্ত লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র; কৃষ্ণযজুর্বেদের সঙ্গে যুক্ত বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র এবং আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র; শুক্লযজুর্বেদের সঙ্গে যুক্ত কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র এবং অথর্ববেদের সঙ্গে যুক্ত বৈতান শ্রৌতসূত্র।

আমরা শুধু শ্রৌতসূত্রের উদাহরণ দিলাম সামান্যাকারে। এইভাবে প্রত্যেকটি বেদের সঙ্গে যুক্ত গৃহ্যসূত্র এবং ধর্মসূত্রেরও সম্ভার আছে। তবে শুল্বসূত্র বেশি পাওয়া যায় না। শুক্ল যজুর্বেদের কাত্যায়ন শুল্বসূত্রই শুধু মুদ্রিত গ্রন্থ হিসেবে পাওয়া যায়।

[দ্র. যোগীরাজ বসু, বেদের পরিচয়, পৃ. ৮৬-৮৮]

কল্প৩ দানবরাজ বিপ্রচিত্তির ঔরসে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ভগ্নী সিংহিকার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কল্প একজন। বিপ্রচিত্তির পুত্র কল্প সম্পর্কে হিরণ্যকশিপুর ভাগীনেয় ছিলেন।

[মৎস্য পু. ৬.২৬]

কল্প৪ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবর ঔরসে ভ্রমীর গর্ভজাত দুই পুত্র সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন কল্প।

[ভাগবত পু. ৪.১০.১]

কল্পতীর্থ নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত একটি তীর্থ। ওই তীর্থে স্নান করলে মানুষ সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্ত হয়। *[কূর্ম পু. ২.৪০.২৩]*

কল্পবর্ষ যদুবংশীয় বসুদেবের ঔরসে উপদেবার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.৫১]

কল্মাষ১ কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত একজন নাগ। মহাভারতের আস্তীকপর্বে সর্পনাম কথনের সময় তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.৩৫.৭; (হরি) ১.৩০.৭]

কল্মাষ২ কল্মাষবর্ণ অর্থাৎ কর্বুরবর্ণ পাঁশুটে গোছের রং। মহাভারতের সভাপর্বে বর্ণিত হয়েছে যে রাজসূয় যজ্ঞের আগে উত্তর দিক জয় করতে গিয়ে অর্জুন মানস সরোবর অতিক্রম করে গন্ধর্বদেশ জয় করেন এবং কর হিসেবে গন্ধর্বদের কাছ থেকে বিচিত্র কল্মাষবর্ণ বিশিষ্ট উন্নত শ্রেণীর অশ্ব লাভ করেন।

[মহা (k) ২.২৮.৬; (হরি) ২.২৭.৬]

কল্মাষপাদ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সুদাসের পুত্র সৌদাস বা মিত্রসহ। তিনিই পরবর্তীকালে 'কল্মাষপাদ' নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে যে, রাজা সৌদাস একদিন মৃগয়া করতে করতে দেখেন, দুটি রাক্ষস বাঘের রূপ ধারণ করে হরিণ শিকার করছে। বনের সমস্ত হরিণ ভক্ষণ করার পরও সেই রাক্ষস দুটির ক্ষুধা মিটল না। এদিকে মৃগয়া করতে এসে একটিও হরিণ দেখতে না পেয়ে সৌদাস ক্রুদ্ধ হয়ে একটি রাক্ষসকে বধ করলেন। এই সময় দ্বিতীয় রাক্ষসটি তার সহচরের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে বলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এর কিছুকাল পরে, একসময় রাজা সৌদাস অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। বশিষ্ঠ মুনি সেই যজ্ঞের হোতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। এইসময় সেই রাক্ষস উপস্থিত হল। যজ্ঞের শেষে সে মহর্ষি বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করে সৌদাসের কাছে আমিষ আহার ভোজন করতে চাইল। রাজাও মহর্ষির ইচ্ছানুসারে পাচকদের রন্ধন করতে আদেশ দিলেন। ইতোমধ্যে সেই রাক্ষসই আবার পাচকের বেশ ধারণ করে বশিষ্ঠের জন্য নরমাংস রন্ধন করল। রাজা সৌদাস সেই আমিষ অন্ন বশিষ্ঠকে পরিবেশন করলেন।

খাদ্যে নরমাংস আছে বুঝতে পেরে মহর্ষি বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে অভিশাপ দিলেন যে, আমাকে যে অখাদ্য তুমি দিয়েছ, তা তোমারই খাদ্য হবে। তখন সৌদাসও নিজের ত্রুটি বুঝতে না পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে হাতে জল নিয়ে বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ দিতে প্রবৃত্ত হলেন। সৌদাসের পত্নী মদয়ন্তী তাঁকে এই পাপকার্য থেকে নিবৃত্ত করলেন। পত্নীর কথা শুনে রাজা ক্রোধ সংবরণ করলেন এবং সেই জল নিজের চরণেই ফেলে দিলেন। রাজার চরণে সেই জল পতিত হওয়ায় তাঁর পদদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল। সেই থেকে রাজা সৌদাস 'কল্মাষপাদ' নামে প্রসিদ্ধ হলেন।

এদিকে বশিষ্ঠও তখন সমস্ত ঘটনা জানতে পেরে রাজাকে বললেন যে, বারো বছর অতিক্রান্ত হলেই তিনি শাপমুক্ত হবেন। কিন্তু শাপমুক্ত হওয়ার পর তাঁর বারো বছরের অভিশপ্ত জীবনের কোনো ঘটনাই মনে থাকবে না। সৌদাস দীর্ঘ বারো বছর শাপ ভোগ করার পর আবার সুষ্ঠুভাবে রাজ্যশাসন করতে থাকেন।

[রামায়ণ ৭.৭৯ অধ্যায়]

□ রামায়ণের অপর একটি অংশে উল্লিখিত হয়েছে যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রঘুর পুত্র কল্মাষপাদ। তিনি অভিশাপের কারণে প্রবৃদ্ধ

নামক রাক্ষস হয়েছিলেন। শঙ্খণ নামে কল্মাষপাদের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

[রামায়ণ ১.৭০.৩৯-৪০]

□ মহাভারতে আবার উল্লিখিত হয়েছে যে, রাজা কল্মাষপাদ একদিন মৃগয়া করতে বনে যান। সারাদিন শিকার করার পর তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়েন। বন থেকে ফেরার সময় একটি সংকীর্ণ পথ দিয়ে তিনি চলতে লাগলেন। কিন্তু পথটি এতই সংকীর্ণ ছিল যে, একই সময়ে একের অধিক ব্যক্তি সেই স্থান অতিক্রম করতে পারতেন না। এমন সময় কল্মাষপাদের বিপরীত দিক থেকে ঋষি বশিষ্ঠর জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্তি আসতে লাগলেন। তাঁরা দুজনেই দুজনকে সরে যেতে বললেন। কিন্তু কেউ নিজ নিজ স্থান থেকে সরে গেলেন না। তখন কল্মাষপাদ চাবুক দিয়ে শক্তি কে আঘাত করলেন। শক্তিও ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে অভিশাপ দিয়ে বললেন যে, তপস্বীকে যখন তুই রাক্ষসের মতো আঘাত করলি, তখন আজ থেকেই তুই নরমাংসভোজী রাক্ষসে পরিণত হবি।

কল্মাষপাদকে যজমান করা নিয়ে আবার ঋষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে শত্রুতা ছিল। শক্তি ও কল্মাষপাদ যখন বিবাদ করছিলেন, তখন সেইস্থানে বিশ্বামিত্র উপস্থিত হন। কিন্তু বিশ্বামিত্র অদৃশ্য থেকে তাঁদের দুজনকেই অতিক্রম করেন এবং কিঙ্কর নামে এক রাক্ষসকে কল্মাষপাদের শরীরে প্রবেশ করার আদেশ দেন। সেই রাক্ষস কল্মাষপাদের দেহে প্রবেশ করলে রাজার বিচার-বুদ্ধি লোপ পেতে থাকে। এইসময় এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ কল্মাষপাদকে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে মাংসযুক্ত অন্ন ভোজন করতে চাইলেন। কল্মাষপাদ ব্রাহ্মণকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে নিজের প্রাসাদে ফিরে এলেন। যাওয়ার সময় রাজা ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণকে বললেন—আমি ফিরে এসে আপনার অভীষ্ট অন্নদান করব। কিন্তু গৃহে ফিরে রাজা সে-সব কথা ভুলে গেলেন। ব্রাহ্মণের কথা যখন তাঁর মনে পড়ল তখন মধ্যরাত্রি। সেই সময়েই কল্মাষপাদ পাচককে মাংসযুক্ত অন্নরন্ধন করতে আদেশ করলেন। কিন্তু পাচক কোথাও মাংস না পাওয়ায় রাজা নরমাংস রন্ধন করতেই আদেশ দিলেন। কল্মাষপাদের আদেশানুসারে ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণকে নরমাংসযুক্ত অন্নই নিবেদন করা হল। এদিকে যোগবলে ব্রাহ্মণ সমস্ত ঘটনা জানতে পেরে রাজাকে অভিশাপ দিয়ে বলেন যে, আমাকে যখন এই অখাদ্য অন্ন রাজা দিয়েছে তখন তাঁরও এই অন্নে লোভ হবে। পূর্বেই কিঙ্কর নামক রাক্ষস রাজাকে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন, এখন ব্রাহ্মণের অভিশাপে রাজা এক ভয়ানক রাক্ষসে পরিণত হলেন। কল্মাষপাদ তাঁর পত্নী মদয়ন্তীর সঙ্গে বনে বনে বিচরণ করতে লাগলেন। একদিন শক্তি কে তিনি বনের মধ্যে দেখতে পেয়ে বললেন যে, তোমার অভিশাপেই আমার এই অবস্থা। অতএব তোমাকে দিয়েই নরমাংস ভক্ষণ করা শুরু করব। এই কথা বলে কল্মাষপাদ শক্তি কে ভক্ষণ করে ফেললেন। এইসময় বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠমুনির প্রতি বিদ্বেষবশত সেই রাক্ষসকে বশিষ্ঠের অন্যান্য পুত্রদেরকেও ভক্ষণ করার জন্য প্ররোচিত করলেন। কল্মাষপাদ শক্তি র অনান্য ভ্রাতাদেরও ভক্ষণ করলেন।

কল্মাষপাদ যখন বনের মধ্যে খাদ্যের সন্ধান করছেন, তখন এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী সেই বনে পুত্র উৎপাদনের জন্য এসেছিলেন। রাজাকে দেখেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ভীত হয়ে পালাতে শুরু করলেন। কিন্তু রাজা ব্রাহ্মণকে ধরে ফেললেন। ব্রাহ্মণী রাজাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কল্মাষপাদ তাঁর কোনো কথা না শুনে ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করলেন। পতির মৃত্যুতে শোকার্ত ও ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণী কল্মাষপাদকে অভিশাপ দিয়ে বললেন যে, তিনি যেমন পুত্র-সুখ থেকে বঞ্চিত হলেন এবং তাঁর সামনেই ব্রাহ্মণকে রাজা হত্যা করলেন, ঠিক তেমন পুত্র উৎপাদনে অভিলাষী হয়ে রাজা তার পত্নীর সঙ্গে মিলিত হলেই প্রাণত্যাগ করবেন। আর যে বশিষ্ঠ মুনির পুত্রদের রাজা হত্যা করেছেন, সেই বশিষ্ঠ মুনি থেকেই কল্মাষপাদের পুত্র লাভ হবে।

এদিকে কল্মাষপাদ বিচরণ করতে করতে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। শক্তির পত্নী অদৃশ্যন্তী সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। রাজা কল্মাষপাদ অদৃশ্যন্তীর দিকে ধেয়ে আসতে লাগলেন। অদৃশ্যন্তীও ভয় পেলেন। এইসময় বশিষ্ঠ মুনি কল্মাষপাদকে নিবৃত্ত করেন। ঋষি বশিষ্ঠ পূর্বের সব ঘটনা তপোবলে জানতে পেরে কল্মাষপাদকে শাপমুক্ত করেন। শক্তির অভিশাপে তিনি বারো বছর শাপগ্রস্ত ছিলেন। চৈতন্য লাভ করে কল্মাষপাদ, বশিষ্ঠকে প্রণাম করলে, বশিষ্ঠ তাঁকে ব্রাহ্মণের অপমান করতে বারণ করেন এবং রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করতে বলেন। কিন্তু

পুত্রাভিলাষী রাজা তাঁর পত্নী মদয়ন্তীর সঙ্গে রমণে প্রবৃত্ত হলে মদয়ন্তী তাঁকে ব্রাহ্মণীর অভিশাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। নিজ কার্যের জন্য অনুতপ্ত হন কল্মাষপাদ। তিনি নিয়োগ প্রথায় পুত্রলাভের জন্য বশিষ্ঠ-মুনির শরণাপন্ন হন। বশিষ্ঠের ঔরসে মদয়ন্তীর গর্ভে অশ্মক নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

[মহা (k) ১.১৭৬-১৭৭ অধ্যায়; ১.১৮২ অধ্যায়; (হরি) ১.১৬৯-১৭০ অধ্যায়; ১.১৭৫ অধ্যায়; বায়ু পু. ২.১১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২.১০]

☐ বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কল্মাষপাদ বা মিত্রসহকে সুদাসের পুত্র এবং ঋতুপর্ণের পৌত্র বলা হলেও বিষ্ণু ও মৎস্য পুরাণে তাঁকে ঋতুপর্ণের পুত্র বলা হয়েছে।

[বায়ু পু. ৮৮.১৭৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১৭৬; বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.৪.৫৭; মৎস্য পু. ১২.৪৬]

কল্যাণী$_{১}$ দেবী ভগবতী মলয়গিরি (মৎস্য পুরাণ মতে মলয়াচল) নামক স্থানে দেবী কল্যাণী নামে প্রসিদ্ধা।

[দেবীভাগবত পু. ৭.৩০.৬৬; মৎস্য পু. ১৩.৩৬]

কল্যাণী$_{২}$ বসন্ত রাগের পত্নীদের মধ্যে অন্যতমা কল্যাণী। *[বৃহদ্ধর্ম পু. (মধ্য) ১৪.৩৬]*

কল্যাণী$_{৩}$ কূর্ম পুরাণ অনুসারে দেবী পার্বতীর অপর নাম কল্যাণী। *[কূর্ম পু. ১.১২.১৪৩]*

কল্যাণী$_{৪}$ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে স্কন্দ-কার্তিকেয়র পত্নী দেবসেনার অপর নাম কল্যাণী।

[ব্রহ্মবৈবর্ত পু. (প্রকৃতি) ৪৩.৬২]

কল্যাণী$_{৫}$ মৎস্য পুরাণ অনুসারে ধর নামে এক বসুর পত্নী কল্যাণী। তাঁর গর্ভে ধরের দ্রবিণ, হব্যবাহ, প্রাণ, রমণ এবং শিশির নামে পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। *[মৎস্য পু. ৫.২৪]*

কল্যাণী$_{৬}$ অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। সেই মাতৃকারা অন্ধকাসুরকে বধ করার পর মহাদেবকেই ভক্ষণ করতে উদ্যত হয়। সেই সময় নৃসিংহদেব ওই মাতৃকাদের বধ করতে আরও এক দল মাতৃকার সৃষ্টি করেন। তাঁদের মধ্যে কল্যাণী একজন।

[মৎস্য পু. ১৭৯.৬৯]

কল্যাণী$_{৭}$ স্কন্দ-কার্তিকেয়র অভিষেকের সময় তাঁর যে সব মাতৃকা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কল্যাণী একজন। *[মহা (k) ৯.৪৬.২; (হরি) ৯.৪২.২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; পৃ. ৪৭৮]*

কল্যাণী$_{৮}$ স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে যে, কার্তিক মাসে যে সব প্রধান দেব-দেবীকে আহুতি দিয়ে হোম করা হয়, কল্যাণী তাঁদের মধ্যে একজন।

[স্কন্দ পু. (বিষ্ণুখণ্ড/কার্ত্তিক) ১২.১০০]

কল্যাণী$_{৯}$ স্কন্দ পুরাণ অনুসারে বল ও অতিবল নামক দৈত্যকে দেবী ভগবতী সংহার করার পর দেবতারা যে যে নামে দেবীর স্তব করেন, তাঁদের মধ্যে কল্যাণী অন্যতম।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস খণ্ড/প্রভাসক্ষেত্র) ১১৯.২২]

কল্যাণী$_{১০}$ স্কন্দ পুরাণ মতে দেবী ভগবতীর চৌষট্টিজন যোগিনী আছেন। তাঁদের মধ্যে কল্যাণী একজন।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস খণ্ড/প্রভাসক্ষেত্র) ১১৯.৬১]

কল্যাণী$_{১১}$ গায়ত্রী দেবীর সহস্রনামের মধ্যে একটি।

[দেবীভাগবত পু. ১২.৬.৩০]

কল্লোলকেশ্বরতীর্থ নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত একটি তীর্থ। কথিত আছে যে, পুণ্যদিনে ওই তীর্থে গঙ্গা দেবী স্বয়ং অবতীর্ণা হয়ে থাকেন।

শাস্ত্র মতে ওই তীর্থে স্নান ও দান করলে সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্তি লাভ হয়, এবং ব্রহ্মলোকে বাস করার সৌভাগ্য প্রাপ্তি ঘটে।

[কূর্ম পু. ২.৩৯.৮৫]

কল্লোলিনী প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে রাগ-রাগিণীদের মূর্তরূপ কল্পিত হত। কখনো কখনো রাগ-রাগিণীর উপর স্বামী-স্ত্রীর রূপকও আরোপিত হত। বিভাস রাগও প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রের একটি সুপরিচিত রাগ। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বিভাস রাগের পত্নীদের যাঁরা দাসী ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন বলে কল্লোলিনীকে কল্পনা করা হয়েছে।

[বৃহদ্ধর্ম পু. ২.১৪.৪২]

কশেরক একজন যক্ষ। মহাভারতের সভাপর্ব থেকে জানা যায় যে, কশেরক কুবেরের সভায় অবস্থান করতেন। *[মহা (k) ২.১০.১৫; (হরি) ২.১০.১৫]*

কশেরু$_{১}$ পুরাণে ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের যে নয়টি প্রধান বর্ষ বা বিভাগের নাম উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে কশেরু একটি।

[মৎস্য পু. ১১৪.৮; বায়ু পু. ৪৫.৭৯; বিষ্ণু পু. ২.৩.৬]

কশেরু$_{২}$ একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ। নিমির বংশধারায় কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ যখন যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, সেইসময় যজ্ঞের হবির জন্য নির্দিষ্ট গাভীটিকে একটি বাঘ হত্যা করে। যজ্ঞের গাভী নিহত হওয়ায় কেশীধ্বজ যাঁদের

কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান জানতে চেয়েছিলেন, কশেরু তাঁদের মধ্যে একজন। *[বিষ্ণু পু. ৬.৬.১৫]*

কশ্যপেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত তীর্থ।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৭৫]

কশ্মীর *[দ্র. কশ্মোর]*

কশ্যপ১ সৃষ্টির আদিপর্যায়ের অন্যতম কিংবা বলা ভালো সর্বাধিক বিখ্যাত প্রজাপতি বা 'প্যাট্রিয়ার্ক' ঋষি হলেন মহর্ষি কশ্যপ। মহাকাব্য-পুরাণের ভাবনায় তিনি দেব-দানব-মানব-সর্প-পশু-পক্ষী—এককথায় প্রায় সম্পূর্ণ জীবকুলের স্রষ্টা বা পিতা হিসেবে স্বীকৃত।

পৌরাণিক আদি প্রজাপতি ঋষিরা সকলেই বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এঁদের নাম বেদে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রম প্রজাপতি কশ্যপ। ঋগ্‌বেদ মন্ত্রে একবার কি দুবার মাত্র কশ্যপের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদে নবম মণ্ডলের শেষ দুটি সূক্তের তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। এই দুটি সূক্তে মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে সোম বা সোমলতার উদ্দেশে।

[ঋগ্‌বেদ ৯.১১৩ এবং ১১৪ সূক্ত]

□ তবে ঋগ্‌বেদ পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে কশ্যপের নাম অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে চর্চিত হয়েছে। ঋগ্‌বেদ পরবর্তী বৈদিক গ্রন্থগুলিতে কশ্যপের নাম উল্লিখিতও হয়েছে অসংখ্য বার। লক্ষণীয় বিষয় হল, সামবেদেই প্রথমবার খুব স্পষ্টভাবে কশ্যপকে মরীচির পুত্র বা মারীচ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবার বামদেবের সঙ্গেও একাত্মকভাবে ভাবনা করা হয়েছে কশ্যপকে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে যে, মহর্ষি কশ্যপ ভৌবন বিশ্বকর্মার ঐন্দ্র মহাভিষেক সম্পন্ন করেছিলেন। উপনিষদগুলিতে এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে কশ্যপের নাম একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি হিসেবে। *[সামবেদ (মহর্ষি) ১.১.৯.১০; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (Haug) ৮.২১; ৭.২৭; শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩.৭.১.১৫; বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২.২.৬; জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ৪.৩.১]*

□ ঋগ্‌বেদ বা সামবেদের তুলনায় অথর্ববেদে মহর্ষি কশ্যপের নাম অনেক বেশি সংখ্যায় উল্লিখিত হতে দেখা যায়। অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে মহর্ষি কশ্যপকে ওষধি বিষয়ে জ্ঞানী বলে উল্লেখ করা হয়েছে—কশ্যপস্য চক্ষুরসি...। সায়নাচার্য এই মন্ত্রের টীকা রচনা করতে গিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন—হে ওষধিসমূহ! তোমরা মহর্ষি কশ্যপের চক্ষুস্বরূপ—হে ওষধে! ত্বং কশ্যপস্য মহর্ষেঃ চক্ষুরসি। অথর্ববেদের অন্য একটি মন্ত্রের সায়নাচার্য কৃত টীকায় 'কশ্যপ' নামের একটি অন্যতর অর্থ বর্ণিত হয়েছে। সায়নাচার্য তৈত্তিরীয় আরণ্যক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, জগতের মধ্যে দূর-নিকট-স্থূল-সূক্ষ্ম প্রভৃতি ভেদ থাকলেও সেই সমস্ত কিছু মিলিয়ে সম্পূর্ণ জগতকে যিনি সম্যকভাবে দেখতে পান, তিনিই কশ্যপ—

> যৌ চ যুবাং কশ্যপম্ দূরসূক্ষ্মাদি ভেদভিন্নস্যাপি
> কৃৎস্নস্য জগতো দ্রষ্টারম্। 'কশ্যপঃ পশ্যকো
> ভবতি। যৎ সর্বং পরিপশ্যতীতি সৌক্ষ্ম্যাৎ
> ইতি হি তৈত্তিরীয়কম্।
> কশ্যপাখ্যং মহর্ষিম্অবথঃ রক্ষথঃ।

[অথর্ববেদ ৪.২০.৭; ৪.২৯.৩ (সায়নাচার্যকৃত টীকাদ্রষ্টব্য); তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১.৮.৮]

□ তবে ঋগ্বৈদিক যুগ থেকেই প্রজাপতি ঋষি হিসেবে পরিচিত হলেও সমস্ত প্রাণীকুলের জনক এই কশ্যপের প্রকৃত স্বরূপ কী—তাও সুপ্রাচীন কাল থেকে আলোচনার বিষয়। শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রজাপতি কশ্যপ প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে কূর্মরূপ ধারণ করেছিলেন এবং সেইরূপ থেকেই বিভিন্ন প্রাণীদের জন্ম হয়। কূর্ম রূপধারী কশ্যপের দ্বারা সৃষ্ট এই সন্তান বা প্রজারাও কূর্ম বা কশ্যপ নামে পরিচিত। বস্তুত 'কূর্ম' বলতে শুধুমাত্র কচ্ছপ বোঝায় না। কূর্ম শব্দের উৎপত্তি 'কর্ম' অর্থ বোধক 'কৃ' ধাতু থেকে। যিনি কর্ম করেন, তিনি কূর্ম। প্রজাসৃষ্টির মতো বৃহৎ কর্ম সম্পাদন করলেন বলেই কশ্যপও কূর্ম নামে খ্যাত—

> স যৎ কূর্মো নাম। এতদ্বৈ রূপং ধৃত্বা
> প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। যদসৃজত
> অকরোত্তৎ। যদকরোত্তস্মৎ কূর্মঃ। কশ্যপো
> বৈ কূর্মঃ। তস্মাদাহু সর্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপাঃ ইতি।

তবে শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত কূর্মরূপ ধারণের ঘটনায় অনেক পণ্ডিত আমাদের জীবসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় যে বিবর্তনবাদ চর্চিত হয়, তার প্রাচীন উল্লেখ খুঁজে পেয়েছেন। পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল জলে। তারপর জল এবং স্থল

উভয়স্থানে বসবাসে সক্ষম উভচর প্রাণীদের আবির্ভাব। এই উভচর প্রাণীদের থেকেই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একে একে স্থলে বসবাসকারী অন্যান্য প্রাণীদের উৎপত্তি। পণ্ডিতদের একাংশের মত, প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের দ্বারা জীবকুলের পিতা কশ্যপকে কূর্মরূপে ভাবনা করার মধ্যে বিবর্তনবাদেরই বীজ লুকিয়ে আছে প্রকৃতপক্ষে। বস্তুত কশ্যপ এবং কচ্ছপ শব্দের মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্যও আছে। সেক্ষেত্রে স্থলচর জীবকুলের আদি পিতা কশ্যপ বা কচ্ছপ আদিম উভচর প্রাণীর প্রতীক বলেই পণ্ডিতদের একাংশের ধারণা। পণ্ডিতজনের দ্বিতীয় মতটি প্রজাপতি কশ্যপকে সূর্যের সঙ্গে একাত্মক করে তোলে। কশ্যপ বা কচ্ছপ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিরুক্তকার যাস্ক বলছেন—কচ্ছপো'প্যকূপার উচ্যতে। এখন প্রশ্ন হল 'অকূপার' শব্দের অর্থ কী? যাস্ক বলছেন যেমন 'কচ্ছপ'কে অকূপার বলা হয়, তেমনই আদিত্য বা সূর্যও অকূপার—আদিত্যো'প্যকূপার উচ্যতে। অকূপার শব্দের অর্থ দীর্ঘ পথ অতিক্রমকারী—অকূপারো ভবতি দূরপার। নিরুক্তকার যেভাবে কচ্ছপ বা কশ্যপ এবং আদিত্যকে অভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করেছেন তার থেকেই কশ্যপের সূর্যস্বরূপতা মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। নিরুক্তকার যাস্ক বলছেন যে, 'কচ্ছ' শব্দ 'খচ্ছ' শব্দ থেকেও আসতে পারে। 'খচ্ছ' বলতে বোঝায়—যার শরীর আকাশকে আবৃত করে। সূর্যের কিরণ আকাশকে আবৃত করে, এই হিসেবে সূর্য বা আদিত্য হলেন কচ্ছ বা খচ্ছ বা কচ্ছপ বা কশ্যপ। সূর্য বা সূর্যালোক যে প্রাণসৃষ্টির অন্যতম কারণ, এ বিষয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। সেক্ষেত্রে প্রজাস্রষ্টা কশ্যপ সূর্য হতেই পারেন।

অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে কশ্যপ সূর্যরূপে বর্ণিত হয়েছেন, 'প্রজাপতেরাবৃতো ব্রহ্মণো বর্মণাহং কশ্যপস্য জ্যোতিষা বর্চসা চ।" —প্রজাপতির ব্রহ্মরূপী বর্মের দ্বারা এবং কশ্যপের জ্যোতি ও কিরণের দ্বারা আমি যেন আবৃত হই।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও কশ্যপ সূর্যরূপে বর্ণিতঃ

"কশ্যপঃ পশ্যকো ভবতি, যৎ
সর্বং পরিপশ্যতি।"

—কশ্যপ পশ্যক হন,—তিনি সব কিছু দেখে থাকেন। সমস্ত জগতের চক্ষু-স্বরূপ সকল কিছুর দ্রষ্টা সূর্য ছাড়া আর কে?

"তে সর্বে কশ্যপাজ্জ্যোতির্লভন্তে।"—তারা সকলেই কশ্যপের কাছ থেকে জ্যোতি বা তেজ লাভ করে থাকে।

এখানে কশ্যপ সূর্য ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আচার্য মহীধর উপরি-উদ্ধৃত অথর্ববেদীয় মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় ঐতরেয় আরণ্যকের মন্ত্রদুটি উদ্ধার করে প্রজাপতি এবং কশ্যপ যে সূর্য সেই তত্ত্বই প্রতিপাদন করেছেন। তাঁর মতে "প্রকাশ বৃষ্ট্যাদিনা প্রজানাং পালনাং প্রজাপতিঃ আদিত্যঃ। অথবা সম্বৎসরকালনির্বাহকত্বাৎ তস্য চ প্রজাপতিরূপত্বাৎ সূর্যপ্রজাপতিঃ।"

—অর্থাৎ প্রকাশ বৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা প্রজা পালনের জন্যই প্রজাপতি আদিত্য অথবা অথবা সংবৎসররূপ কাল পরিচালনার দ্বারা প্রজাপতিরূপ গ্রহণ করায় সূর্য প্রজাপতি।

প্রজাপতি বর্ম কথাটি তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় মহীধর বলেন, "বর্ম তনুত্রং তদ্‌রূপেণ 'সূর্যস্য তেজোময়েন স্বরূপেণ বেষ্টিতঃ।" দেহরক্ষাকারী-রূপে সূর্যের তেজোময় আকৃতির দ্বারা আবৃত বা বেষ্টিত।

সুতরাং মহীধরের মতে সূর্যের তেজোময় আবরণই সূর্যের বর্ম। কশ্যপ সম্বন্ধে মহীধর লিখেছেন, "কশ্যপঃ পশ্যকো ভবতি যৎ সর্বং পরিপশ্যতি ইতি শ্রুতেঃ কশ্যপঃ সূর্যস্য মূর্ত্যন্তরভূতঃ।"—কশ্যপ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অনুসারে কশ্যপ সূর্যের অন্যমূর্তি।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ৭.৫.১.৫; নিরুক্ত ৪.১৮; তৈত্তিরীয় আরণ্যক (আনন্দাশ্রম) ১.৮.৮; অথর্ববেদ ১.১৪.৪; ২.৩৩.৭; ৪.২০.৭; ৪.২৯.৩]

☐ বৈদিক ঋষি তথা আদি প্রজাপতি কশ্যপ সম্পর্কে মহাকাব্য এবং পুরাণগুলিতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ। মহাভারতে অবশ্য কশ্যপ প্রজাপতির মাতার নাম উল্লিখিত হয়নি। তবে ভাগবত পুরাণ মতে, কর্দমপ্রজাপতির কন্যা কলা মরীচির পত্নী ছিলেন। মরীচির ঔরসে কলার গর্ভে কশ্যপ প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। বায়ুপুরাণে কশ্যপের জন্ম সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ নতুন তথ্য পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে কশ্যপের যে কূর্মরূপের বর্ণনা

পাওয়া যায় এবং পণ্ডিতরা যাকে জীবসৃষ্টির প্রথম পর্যায়ের উভচর প্রাণীর প্রতীক মনে করেছেন, বায়ু পুরাণের কাহিনী সেই তত্ত্বেই ইন্ধন যোগায় কী না—এ বিষয়ে ভাবনার অবকাশ থাকছে। বায়ু পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, কশ্যপের পিতা প্রজাপতি মরীচি প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে জল বা 'অপ'কে কামনা করলেন। তারপর সুদীর্ঘকাল তিনি জলেই বসবাস করলেন। জলের মধ্যেই জন্ম নিলেন মরীচির পুত্র প্রজাপতি কশ্যপ এবং এই কশ্যপই পরবর্তীকালে সমস্ত প্রাণীজগত সৃষ্টি করলেন—

মরীচিরাপশ্চকমে অভিধ্যায়ন্ প্রজেপ্সয়া।
পুত্রঃ সর্বগুণোপেতঃ প্রজাবান্ সুরুচির্দিতি॥
সম্পূজ্যতে প্রশস্তায়াং মনসা ভাবিতা প্রভুঃ।
আহূতাশ্চ ততঃ সর্বা আপঃ সমবসৎ প্রভুঃ॥
তাসু প্রণিহিতাত্মানমেকঃ সো'জনয়ৎপ্রভুঃ।
পুত্রমপ্রতিমন্নাম্নারিষ্টনেমিঃ প্রজাপতিঃ॥

কশ্যপের এই জন্মবৃত্তান্তে জলজ প্রাণী থেকে উভচর এবং উভচর থেকে অন্য প্রাণীর উৎপত্তির আভাস মেলে। এই মারীচ অরিষ্টনেমিই পরবর্তীকালে কশ্যপ প্রজাপতি রূপে প্রসিদ্ধ হন। পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, এই কশ্যপ সূর্যের মতো জেসম্পন্ন, সূর্যের পিতা হিসেবেও পরে চিহ্নিত করা হবে কশ্যপকেই। সেক্ষেত্রে আদি প্রজাপতি কশ্যপের সূর্যস্বরূপতাও এই পুরাণের বিবরণ থেকেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

[ভাগবত পু. ৩.২৪.২২; ৪.১.১৩; বায়ু পু. ৬৫.১১০-১১৪; মহা (k) ১.৬৫.১০-১১; ১.৬৬.৩৪; (হরি) ১.৬০.১০-১১; ১.৬১.৩৪]

□ প্রজাপতি কশ্যপ প্রজাস্রষ্টা হিসেবে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে পুরাণে তাঁকে ব্রহ্মার সমতুল্য বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

কশ্যপঃ সবিতুর্বিদ্বাংস্তেন স ব্রহ্মণঃ সমঃ।

লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, কশ্যপ বলতে যে কোনো একক ব্যক্তিকে বোঝায় না তাও পুরাণেই স্পষ্টভাষায় উল্লিখিত হয়েছে। প্রতি মন্বন্তরে যখন প্রলয়ের পর আবার নতুন করে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন প্রজাসৃষ্টির জন্য স্বয়ং ব্রহ্মার অংশে কশ্যপ মর্ত্যে অবতীর্ণ হন—

মন্বন্তরেষু সর্বেষু ব্রহ্মণো'ংশেন জায়তে।

[বায়ু পু. ৬৫.১১৪]

□ যাই হোক, আমরা জীবকুলের পিতা মহর্ষি কশ্যপের জীবনবৃত্তান্তে ফিরে আসি। প্রজাপতি দক্ষ নিজের তেরোটি কন্যার সঙ্গে কশ্যপের বিবাহ দেন। মহাভারতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কশ্যপের এই পত্নীরা হলেন যথাক্রমে— অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রাধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি এবং কদ্রু। পুরাণগুলিতে কশ্যপের পত্নীর সংখ্যা তেরো হলেও বিভিন্ন পুরাণে নামের তালিকায় যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। কশ্যপের এই বিবাহ প্রসঙ্গে বায়ু পুরাণে একটি নতুন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, যার থেকে 'কশ্যপ' নামেরও একটি নতুনতর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বায়ু পুরাণের উল্লেখ অনুযায়ী, মরীচির পুত্র অরিষ্টনেমিকে প্রথমে দক্ষ প্রজাপতি কন্যা দান করতে সম্মতই হননি। বিবাহে ইচ্ছুক কশ্যপ দক্ষপ্রজাপতির দ্বারা প্রত্যাখ্যাত এবং খুব কঠিন ভাবে তিরস্কৃত হয়েছিলেন। এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ এবং দুঃখিত হয়ে প্রজাপতি অরিষ্টনেমি 'কশ্য' বা মদ পান করেছিলেন। 'কশ্য' পান করেছিলেন বলেই তাঁর নাম হল কশ্যপ—

কন্যানিমিত্তমিত্যুক্তে দক্ষেণ কুপিতাঃ প্রজাঃ।
অপিবৎ স তদা কশ্যং কশ্যং মদ্যমিহোচ্যতে॥
কশ্যং মদ্যং স্মৃতং বিপ্রৈঃ কশ্যপানাত্তু কশ্যপঃ।
করোতি নাম যদ্বাচ বাচং ক্রূরমুদাহৃতম্॥
দক্ষাভিশপ্তঃ কুপিতঃ কশ্যপস্তেন সো'ভবৎ।
তস্মাচ্চ কশ্যপেনোক্তো ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা॥

[বায়ু পু. ৬৫.১১৫-১১৭]

□ যাই হোক, শেষপর্যন্ত দক্ষপ্রজাপতির তেরোটি কন্যার সঙ্গে প্রজাপতি কশ্যপের বিবাহ সুসম্পন্ন হল। কশ্যপের পত্নীদের থেকে জীবকুলের উদ্ভব হল, বিভিন্ন পুরাণ এবং মহাভারতের বিবরণ অনুযায়ী কশ্যপের বিভিন্ন পত্নীদের থেকে উৎপন্ন সন্তানদের তালিকাটি এরকম—

• কশ্যপের পত্নী অদিতি দ্বাদশ আদিত্য তথা দেবকুলের মাতা। ধাতা, মিত্র, অর্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পুষ্প, সবিতা, ত্বষ্টা এবং বিষ্ণু (বামনরূপধারী উপেন্দ্র) এই বারোজন প্রধান দেবতা অদিতির পুত্র।

• মহাভারতে দক্ষকন্যা দিতির একমাত্র পুত্র হিসেবে হিরণ্যকশিপুর নাম উল্লিখিত হয়েছে। তবে পুরাণগুলিতে দিতির হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু নামে দুই পুত্র এবং সিংহিকা নামে এক কন্যা সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। দিতির পুত্ররা অসুরকুলের অধিপতি এবং দৈত্য নামে

পরিচিত। এছাড়াও রামায়ণ এবং পুরাণগুলিতে উনপঞ্চাশ জন মরুৎ দেবতাকে দিতির সন্তান বলা হয়েছে। *[দ্র. মরুৎ, দিতি]*

• মহাভারতে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী দক্ষকন্যা দনু কশ্যপের ঔরসে চল্লিশটি পুত্রসন্তান লাভ করেন। দনুর পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিপ্রচিত্তি। দনুর পুত্ররাও অসুরকুলের অধীশ্বর ছিলেন। দনুর পুত্র বলে তাঁরা দানব নামে পরিচিত। দনুর পুত্রদের মধ্যে, বিপ্রচিত্তি, শম্বর, নমুচি, অসিলোমা, কেশী, স্বর্ভানু (রাহু), বৃষপর্বা, অশ্বগ্রীব, নিকুম্ভ প্রমুখরা দানব হিসেবে যথেষ্ট বিখ্যাত। মহাকাব্য-পুরাণে এঁদের নিয়ে নানা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তবে মহাভারত এবং পুরাণগুলিতে দনুর বাকি পুত্রদের নামের যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে বেশ পার্থক্যও আছে। পুরাণমতে দনুর জ্যেষ্ঠপুত্র বিপ্রচিত্তি দিতির কন্যা সিংহিকাকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের থেকে সৈংহিকেয় অসুরদের জন্ম হয়। তবে মহাভারতে বেশ স্পষ্টভাবেই সিংহিকাকে দক্ষের কন্যা তথা কশ্যপের পত্নী বলা হয়েছে। *[দ্র. সিংহিকা]*

• মহাভারত মতে কশ্যপের পত্নী দক্ষকন্যা সিংহিকার চার পুত্র। তাদের নাম রাহু, সুচন্দ্র, চন্দ্রহন্তা এবং চন্দ্রপ্রমর্দন।

• দক্ষকন্যা ক্রোধা ক্রোধবশ অসুরকুলের জননী। কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে ক্রোধার গর্ভে ক্রূরকর্মা, অরিমর্দন প্রভৃতি অসুর পুত্রের জন্ম হয়। এছাড়াও পুরাণগুলিতে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী ক্রোধা বা ক্রোধবশা নয়টি কন্যা সন্তানের জন্ম দান করেন যাঁরা পরবর্তীকালে পুলহ প্রজাপতির পত্নী হন এবং বিভিন্ন প্রজাপতির পশুপক্ষীর জন্মদান করেন।

[দ্র. ক্রোধা, ক্রোধবশা]

• দক্ষকন্যা দনায়ূও কশ্যপের ঔরসে অসুরজাতীয় পুত্র লাভ করেন। তাঁর চার পুত্রের নাম মহাভারত মতে বিক্ষর, বল, বীর এবং বৃত্র। দনায়ু পুরাণগুলিতে দনায়ুষা নামেও চিহ্নিত হয়েছেন। পুরাণে তাঁর পুত্রদের নামের যে তালিকা পাওয়া যায় সেটিও মহাভারত থেকে যথেষ্ট ভিন্ন। *[দ্র. দনায়ু, দনায়ুষা]*

• দক্ষকন্যা কালা বা কালকা কশ্যপের ঔরসে কালকেয় অসুরদের পুত্ররূপে লাভ করেন।

• দক্ষকন্যা বিনতা পক্ষীকুলের জন্মদাত্রী। কশ্যপের ঔরসে তাঁর গর্ভে পক্ষীরাজ গরুড় এবং সূর্যের সারথি অরুণ জন্মগ্রহণ করেন। বিনতার পুত্রদের মধ্যে অরিষ্টনেমির নামও উল্লিখিত হয়েছে। লক্ষণীয় অরিষ্টনেমি স্বয়ং প্রজাপতি কশ্যপের অপর নাম, আবার কশ্যপের পুত্র বৈনতেয় গরুড়ের নাম হিসেবেও অরিষ্টনেমি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

[দ্র. বিনতা, অরিষ্টনেমি, অরুণ, গরুড়]

• কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রূর গর্ভে নাগ বা সর্পকুলের উৎপত্তি হয়। কদ্রূর পুত্রদের সংখ্যা গণনা করা যায় না। তবে সর্পকুলের অধীশ্বর শেষ বা অনন্ত নাগ, বাসুকি, তক্ষক প্রমুখের পৌরাণিক গুরুত্ব অপরিসীম।

• দক্ষকন্যা মুনি গন্ধর্বকুলের জননী। মহাভারতে মুনির পুত্রদের নামের তালিকা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু পুরাণে প্রাপ্ত তালিকা থেকে জানা যায় যে, নৃত্যগীত বিশারদ গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু, চিত্রসেন, উগ্রসেন, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি গন্ধর্বরা সকলেই মুনির সন্তান অর্থাৎ কীনা মৌনেয় গন্ধর্ব ছিলেন।

• দক্ষকন্যা প্রাধার গর্ভজাত সন্তানরাও গন্ধর্ব, প্রাধার কন্যাসন্তানরা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট অপ্সরা।

[দ্র. প্রাধা]

• কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা কপিলার সন্তানদের তালিকাটি প্রজাতিগতভাবে একটু বিচিত্র। কারণ মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে যে, অমৃত, ব্রাহ্মণ, গো অর্থাৎ গবাদি পশু এবং এক শ্রেণীর গন্ধর্ব এবং অপ্সরাও কপিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন—

অমৃতং ব্রাহ্মণা গাবো গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা।
অপত্যং কপিলায়াস্তু পুরাণে পরিকীর্তিতম্॥

• কশ্যপের পত্নীদের মধ্যে মহাভারতে বিশ্বার নাম উল্লিখিত হলেও তাঁর সন্তানদের সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। পুরাণগুলিতে অবশ্য কশ্যপের পত্নী হিসেবে বিশ্বার নাম পাওয়াও যায় না। বেশিরভাগ পুরাণ মতে বিশ্বা ধর্মের পত্নী এবং বিশ্বেদেবগণের মাতা।

• বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কশ্যপের পত্নী হিসেবে দক্ষকন্যা খশার নাম উল্লিখিত হয়েছে। ইনি যক্ষ, রাক্ষস এবং পিশাচকুলের জন্মদাত্রী।

[মহা (k) ১.৬৫.১২-৫৭; (হরি) ১.৬০.১২-৫৭; বায়ু পু. ৬৭.৪৩-১৩৫; ৬৮-৬৯ অধ্যায়; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬-৭ অধ্যায়]

□ কশ্যপের পত্নী এবং তাঁর সন্তানদের নামতালিকা তথা সন্তানদের জন্মবৃত্তান্ত ছাড়াও মহাভারতে অসংখ্যবার মহর্ষি কশ্যপের নাম উল্লিখিত হয়েছে। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায়।

মহাভারতের সভাপর্বে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ঋষি মহর্ষিদের মধ্যে প্রজাপতি কশ্যপের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ২.১১.১৮; (হরি) ২.১১.১৭]

□ বনবাসকালে পাণ্ডবরা যখন বনে উপস্থিত হলেন, সে সময় সেই বনে বসবাসকারী ঋষিদের মধ্য জনৈক কশ্যপও পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তবে ইনি প্রজাপতি কশ্যপ নন, নিশ্চিত ভাবেই কশ্যপবংশীয় অন্য কোনো ঋষি হবেন। *[মহা (k) ৩.১২.৫২; ৩.৮৫.১১৯; (হরি) ৩.১১.৫৩; ৩.৭০.১১৯]*

□ একুশবার সমগ্র পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করে দেবার পর পরশুরাম এই বিশাল হত্যার ঘটনা থেকে নিবৃত্ত হয়ে মানসিক শান্তিলাভ এবং দেবতাদের প্রসন্ন করার বাসনায় অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। স্বয়ং মহর্ষি কশ্যপ এই যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেন। ক্ষত্রিয়শূন্য সমগ্র পৃথিবীই তখন পরশুরামের অধীন, যজ্ঞ সমাপ্ত হবার পর পরশুরাম দক্ষিণা রূপে এই সমগ্র পৃথিবীই মহর্ষি কশ্যপকে দান করেন। এছাড়াও নিজের অর্জিত বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ এবং একটি সুবর্ণ নির্মিত বেদিও পরশুরাম কশ্যপকে দান করেছিলেন। পরশুরামের দান গ্রহণ করার পর কশ্যপ পরশুরামকে বললেন—যে ভূমি আপনি একবার আমাকে দান করেছেন, সে ভূমিতে আপনি আর বাস করতে পারেন না। অতএব আপনি এই দেশ ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করুন। কশ্যপের কথায় সম্মত হয়ে পরশুরাম সমুদ্রতীরে শূর্পারক দ্বীপে বসবাস করতে লাগলেন।

মহাভারতের বনপর্ব এবং শান্তিপর্বে এই ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ের কাহিনী দুটি কিছু পৃথক। বনপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, পরশুরাম সমগ্র পৃথিবী কশ্যপ প্রজাপতিকে দান করেছেন—একথা জানতে পেরে মূর্তিমতী দেবী পৃথিবী ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন—আমাকে কোনো একজন মানুষের হাতে দান করা অত্যন্ত অন্যায়। কিন্তু সে যা হোক, আপনার এই দান ব্যর্থ। আমি পাতালে প্রবেশ করলাম—

ন মাং মর্ত্ত্যায় ভগবন্ কস্মৈচিদ্দাতুমর্হসি।
প্রদানং মোঘমেতত্তে যাস্যাম্যেষা রসাতলম্॥

পৃথিবী ক্রুদ্ধ হয়েছেন জানতে পেরে মহর্ষি কশ্যপ তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য তপস্যায় বসলেন। কশ্যপের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে পৃথিবী আবার পাতাল থেকে উত্থিত হলেন।

মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী পরশুরাম যখন পরপর একুশবার সমগ্র ক্ষত্রিয় জাতিকে হত্যা করলেন, তখন ক্ষত্রিয়শূন্য পৃথিবীতে প্রজাপালন বা দুষ্টের দমনের কোনো উপায় না থাকায় পৃথিবীতে প্রবল অরাজকতা দেখা দিল। বিপর্যয় যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল তখন অরাজকতা সহ্য করতে না পেরে পৃথিবী ধীরে ধীরে রসাতলে প্রবেশ করতে লাগলেন। তা দেখে কশ্যপ নিজের উরুতে পৃথিবীকে ধারণ করলেন। কশ্যপ পৃথিবীকে আপন উরুতে ধারণ করলেন বলে পৃথিবী উর্বী নামে খ্যাত হলেন—

উরুণা ধারয়ামাস কশ্যপঃ পৃথিবীং ততঃ।
ধৃতা তেনোরুণা যেন তেনোর্বীতি মহী স্মৃতা॥

তখন মহর্ষি কশ্যপকে পৃথিবী এই অরাজকতা বন্ধ করতে অনুরোধ করলেন। পৃথিবী কশ্যপকে বললেন—আপনি অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়দের সন্ধান করে রাজপদে অভিষিক্ত করুন। কশ্যপ পৃথিবীর অনুরোধে অনুসন্ধান করে বিভিন্ন বংশের অবশিষ্ট ক্ষত্রিয় সন্তানদের উদ্ধার করে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। পৃথিবী থেকে অরাজকতা দূর হল।

[মহা (k) ৩.১১৪.১৮-২১; ৩.১১৭.১২-১৪; ১২.৪৯.৬৪-৮৮; (হরি) ৩.৯৫.১৮-২১; ৩.৯৮.১২-১৪; ১২.৪৮.৬৪-৮৮]

□ মহাভারতের অনুশাসনপর্বে কশ্যপের পৃথিবীকে ধারণ করা প্রসঙ্গে একটা নতুন কাহিনী পাওয়া যায়। পুরাকালে অঙ্গ নামে একজন ধর্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। সম্পূর্ণ পৃথিবীই তাঁর অধীনে ছিল। একসময়ে রাজা অঙ্গ এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করলেন এবং যজ্ঞ শেষ হবার পর দক্ষিণা হিসেবে সমস্ত পৃথিবীটাই ব্রাহ্মণদের হাতে তুলে দেবেন বলে স্থির করলেন। এতে দেবী পৃথিবী বড়ো বিষণ্ণ এবং বিরক্ত হয়ে ভাবলেন—রাজা যদি রাজ্যটাই ব্রাহ্মণদের দান করে দেন তাহলে পৃথিবীতে অব্যবস্থা

অবশ্যম্ভাবী। আমি ব্রহ্মার কন্যা, আমাকে এমন করে ব্রাহ্মণদের দান করার অধিকারই বা রাজা পেলেন কোথা থেকে? ভেবে চিন্তে ক্ষুব্ধ হয়ে দেবী পৃথিবী ভূলোক ত্যাগ করে ব্রহ্মলোকের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। দেবী ধরণী ত্যাগ করলে পৃথিবী ধীরে ধীরে নির্জীব হয়ে পড়তে লাগল, গাছপালা, পশু-পাখি সবকিছুই ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হতে লাগল। পৃথিবী ধ্বংস হতে চলেছে বুঝতে পেরে তাকে রক্ষা করার জন্য মহর্ষি কশ্যপ স্বয়ং পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করে তাকে ধারণ করলেন। জীবকুল রক্ষা পেল। দেবলোকের হিসাব অনুযায়ী একটানা প্রায় তিরিশ হাজার বছর কশ্যপ এভাবেই পৃথিবীকে ধারণ করেছিলেন। তারপর একসময় পৃথিবী ব্রহ্মলোক থেকে ফিরে এলেন। কশ্যপ তাঁকে আপন কন্যা বলে সম্বোধন করলেন এবং পৃথিবী নিজের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন আবার। এই ঘটনার পর পৃথিবী কশ্যপের কন্যা অর্থাৎ কাশ্যপী নামে পরিচিত হন—

অথাগম্য মহারাজ নমস্কৃত্য চ কশ্যপম্।
পৃথিবী কাশ্যপী জজ্ঞে সুতা তস্য মহাত্মনঃ॥

[মহা (k) ১৩.১৫৪.১-৮; (হরি) ১৩.১৩২.১-৮]

□ স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময়েও অন্যান্য ঋষি-মহর্ষিদের সঙ্গে কশ্যপ উপস্থিত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.১০, ২৩; (হরি) ৯.৪২.১০, ২২]

পুরাণগুলিতে কশ্যপবংশীয় একাধিক ঋষিকে বিখ্যাত মহর্ষি কশ্যপের নামানুসারেই 'কশ্যপ' নামে চিহ্নিত হতে দেখা যায়। এমনকী কশ্যপ বংশীয় একাধিক গোত্রপ্রবর্তক ঋষিও কশ্যপ নামে উল্লিখিত হয়েছেন। প্রজাপতি মরীচির বংশধর জনৈক পর্বসের ঔরসে পর্বসার গর্ভজাত একজন কশ্যপের অস্তিত্বও মেলে। এছাড়াও কশ্যপ এতটাই বিখ্যাত একজন প্যাট্রিয়ার্ক যে, ভবিষ্যৎ মন্বন্তরগুলিতেও তাঁর বংশধররাই প্রজাপতি ঋষির ভূমিকা পালন করবেন, এমন ভাবনাও রয়েছে পুরাণগুলিতে। *[মৎস্য পু. ১৯৯.১৬; বায়ু পু. ২৮.১৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১১২]*

কশ্যপ২ ভাবী সাবর্ণ মনুর কালে যেসব ঋষিরা সপ্তর্ষি হবেন, তাঁদের মধ্যে কশ্যপ একজন।

[মৎস্য পু. ৯.৩২]

কশ্যপ৩ বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ ত্রয়োদশ দ্বাপরে, ধর্মনারায়ণ যখন ব্যাস হবেন, তখন ভগবান রুদ্র বালি নামে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন। সেইসময় তাঁর যে চারটি পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদের মধ্যে কশ্যপ একজন।

[বায়ু পু. ২৩.১৬০]

কশ্যপ৪ বায়ু পুরাণ অনুসারে যোড়শ দ্বাপরে সঞ্জয় যখন বেদ বিভাগকারী ব্যাস হবেন, তখন ভগবান রুদ্র গোকর্ণ নামে অবতীর্ণ হবেন। সেইসময় তাঁর যে চারটি পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদের মধ্যে কশ্যপ একজন। *[বায়ু পু. ২৩.১৭৩]*

কশ্যপ৫ ভবিষ্যৎ চতুর্দশ মন্বন্তরের অধিপতি ভৌত্য মনুর পুত্রদের মধ্যে একজন। *[বায়ু পু. ১০০.১১৬]*

কশ্যপ৬ ভবিষ্যতে ত্রয়োদশ রৌচ্য মন্বন্তরে যাঁরা সপ্তর্ষি হবেন, তাঁদের মধ্যে কশ্যপ একজন।

[বায়ু পু. ১০০.১০৭]

কশ্যপ৭ স্বারোচিষ মন্বন্তরে যাঁরা সপ্তর্ষি হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন।

[বায়ু পু. ৬২.১৬; মৎস্য পু. ৯.৮]

কশ্যপ৮ অত্রিবংশীয় একজন ঋষি। ইনি সামবেদ সংহিতা প্রণয়ন করেছিলেন বলে বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। *[বায়ু পু. ৬১.৫৫]*

কশ্যপ৯ কশ্যপবংশীয় একজন ঋষি। ভবিষ্যতে ঋতসাবর্ণি মনুর কালে যাঁরা সপ্তর্ষি হবেন, তাঁদের মধ্যে কশ্যপ একজন। *[বায়ু পু. ১০০.৯৬]*

কশ্যপদতীর্থ একটি তীর্থ বলে, বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। *[বায়ু পু. ১০৯.১৮]*

কসেরুমান্ একজন যবন রাজা। মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি কৃষ্ণের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ৩.১২.৩২; (হরি) ৩.১১.৩২]

কহোড় একজন বিশিষ্ট ঋষি। ইনি মহর্ষি উদ্দালকের শিষ্য ছিলেন। কহোড়ের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে উদ্দালক তাঁকে শাস্ত্রজ্ঞান দান করেন এবং নিজের কন্যা সুজাতাকেও কহোড়ের হাতে সম্প্রদান করেন।

একদিন রাত্রে কহোড় বেদ পাঠ করছেন, এমন সময় তাঁর পত্নী সুজাতার গর্ভস্থ পুত্র পিতাকে বলতে লাগলেন—আমি আপনার অনুগ্রহে মাতৃগর্ভে থেকেই সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করেছি। আমার মনে হচ্ছে, আপনার এই পাঠ যেন সমীচীন হচ্ছে না। গর্ভস্থ শিশু পিতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করছে ভেবে কহোড় ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি গর্ভস্থ পুত্রকে শাপ দিলেন—তুমি যখন মাতৃগর্ভে থেকেই আমার নিন্দা করছ তখন তোমার শরীরের

আটটি স্থান বক্র হবে। কহোড়ের ঔরসে সুজাতার গর্ভজাত পুত্র পিতার শাপে বক্র দেহ নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম হয় অষ্টাবক্র।

মহর্ষি অষ্টাবক্র তখনও মাতৃগর্ভে, এই সময় একদিন সুজাতা স্বামী কহোড়কে বললেন— সন্তান পালনের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন হয় তা আমাদের নেই। অথচ আর কয়েকদিন পরেই আমাদের সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। আপনি তাকে পালন করার জন্য যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করুন। সুজাতার কথা শুনে কহোড় ধনলাভের আশায় রাজর্ষি জনকের সভায় গেলেন। জনকের সভায় বন্দী নামে এক তর্কবিদ্যা পারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কাছে যাঁরা তর্কে পরাজিত হত তাঁদের তিনি জলে ডুবিয়ে দিতেন। কহোড়ও বন্দীর কাছে পরাজিত হলেন এবং বন্দী তাঁকেও জলে ডুবিয়ে দিলেন। পরবর্তী সময়ে কহোড়ের পুত্র অষ্টাবক্র বন্দীকে তর্কে পরাজিত করে পিতা কহোড় এবং বন্দীর কাছে পরাজিত অন্যান্য ব্রাহ্মণদের জলাধিপতি বরুণের বাসভবন থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন।

পুত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে কহোড় অষ্টাবক্রের বক্রদেহকে পুনরায় সুস্থ করে দেন। কহোড়ের আদেশে অষ্টাবক্র উদ্দালকের আশ্রমের নিকটবর্তী নদীতে স্নান করেন। তার ফলেই কহোড়ের আশীর্বাদে তাঁর বক্র দেহ আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। নদীটি প্রসিদ্ধ হয় সমঙ্গা নামে। *[দ্র. অষ্টাবক্র]*

[মহা (k) ৩.১৩২.৭-১৫; ৩.১৩৪.৩১-৩৩; (হরি) ৩.১০৮.৭-১৫; ৩.১১০.৩৮-৪০]

কহ্বা কুকুরবংশীয় উগ্রসেনের কন্যাদের মধ্যে কহ্বা একজন। তিনি কংসের ভগিনী।

[বায়ু পু. ৯৬.১৩৩]

কাক১ একটি দক্ষিণ ভারতীয় জনপদ।

[মহা (k) ৬.৯.৬৪; (হরি) ৬.৯.৬৪]

☐ পণ্ডিতরা মনে করেন মধ্যপ্রদেশের সাঁচীর প্রাচীন নামই ছিল কাক। তবে কাক নামে এই অঞ্চলে একটি জনজাতির কথাও জানতে পারা যায়। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ শিলালিপিতে এই জাতির নাম পাওয়া যায়। এঁরা সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। *[Panchanana Raya, A Historical Review of Hindu India: 300 BC to 1200 A.D. p. 72; Devendra Handa, A.J. Shastri, Manmohan S.Kumar, Numismatic. Studies, Vol 1; 1996; p.60]*

কাক২ পুরাণে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী, পুরাকালে পর্বতগুলি পাখিদের মতোই পক্ষযুক্ত হত এবং সেই পক্ষ বা ডানার সাহায্যে তারা আকাশ পথে যথেচ্ছ বিচরণ করত। কিন্তু পর্বতরা এভাবে যথেচ্ছ উড়ে বেড়ানোর ফলে নানা অসুবিধা সৃষ্টি হত, দুর্ঘটনার আশঙ্কাও থাকত। তাই একসময় দেবরাজ ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে বজ্রের আঘাতে পর্বতদের পক্ষচ্ছেদন করেন। এই সময় দেবরাজ ইন্দ্রের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মৈনাক এবং আরও কয়েকটি পর্বত সমুদ্রের তলদেশে আত্মগোপন করে। কাক নামক পর্বতটিও সমুদ্রতলে অবস্থিত এমনই একটি পৌরাণিক পর্বত।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৭৬]

কাকজঙ্ঘিকা অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। কাকজঙ্ঘিকা সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ১৭৯.২৩]

কাকবর্ণ কলিযুগে মগধদেশে শিশুনাগবংশীয় যেসব রাজা রাজত্ব করেছিলেন কাকবর্ণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কাকবর্ণ শিশুনাগ বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা শিশুনাগের পুত্র ছিলেন। কাকবর্ণের পুত্র ক্ষেমধর্মা, মতান্তরে ক্ষেমধামা। মৎস্য পুরাণে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী কাকবর্ণ ছাব্বিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। আবার ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে কাকবর্ণ ছত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। *[ভাগবত পু. ১২.১.৫; মৎস্য পু. ২৭২.৬; বিষ্ণু পু. ৪.২৪.৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১২৯]*

কাকী কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা তাম্রার গর্ভজাত কন্যা কাকী। ইনি কাক এবং পেচক কুলের জন্মদাত্রী ছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৬.৫৭; (হরি) ১.৬১.৫৬-৫৭]

কাকেয়স্থ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা পরাশর মুনির নামে কয়েকটি বংশধারা প্রচলিত ছিল। সেই বংশধারায় অনেকগুলি সন্তানকে নিয়ে এক-একটি বর্গ রচিত হয়েছিল। যাঁদের গৌর-পরাশর, নীল-পরাশর, কৃষ্ণ-পরাশর, শ্বেত-পরাশর, শ্যাম-পরাশর এবং ধূম্র-পরাশর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরাশরের যে সন্তানেরা কৃষ্ণ-পরাশর নামে অভিহিত তাঁদের মধ্যে কাকেয়স্থ একজন। *[মৎস্য পু. ২০১.৩৫]*

কাক্ষীব বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, ঊনবিংশ দ্বাপরে যখন ভরদ্বাজ মুনি ব্যাস হবেন, তখন ভগবান শিব জটামালী নামে অবতীর্ণ হবেন। সেই সময় ভগবান রুদ্রের যে চারজন পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদের মধ্যে একজন কাক্ষীব।

[বায়ু পু. ২৩.১৮৭]

কাক্ষীবান্১ অনুবংশীয় রাজা বলি অপুত্রক ছিলেন বলে তিনি তাঁর রাজ্যে সমাগত ঋষি দীর্ঘতমাকে নিয়োগ প্রথায় পুত্রলাভের জন্য বরণ করেন। কিন্তু দীর্ঘতমা জন্ম থেকেই অন্ধ ছিলেন এবং বৃদ্ধও ছিলেন। বলিরাজার পত্নী সুদেষ্ণা, দীর্ঘতমাকে বৃদ্ধ ও অন্ধ জানতে পেরে এক শূদ্রা রমণীকে তাঁর কাছে প্রেরণ করেন। দীর্ঘতমার ঔরসে সেই শূদ্রা-রমণীর গর্ভজাত একাদশ পুত্রের মধ্যে কাক্ষীবান্ একজন। ঋগ্বেদ, তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে অবশ্য কাক্ষীবান্‌কে উশিজের পুত্র বলা হয়েছে। বস্তুতঃ উশিজ, কাক্ষীবানের পিতামহ ছিলেন। মহাভারত ও পুরাণে আমরা দেখেছি যে, প্রাচীন প্রথা অনুসারে পিতামহের নামে পৌত্রকে বা পিতার নামে পুত্রকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। এখানেও তাই কাক্ষীবান্‌কে উশিজের পৌত্র হলেও উশিজের পুত্র বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

[মহা (k) ১.১০৪.৪৭-৪৯; (হরি) ১.৯৮.৪৫-৪৭; ঋগ্বেদ ১.১৮.১; তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫.৬.৫.৩; পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ২৫.১৬.৩]

☐ ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, কাক্ষীবানের ভ্রাতা চাক্ষুষ। দীর্ঘতমার সঙ্গে কাক্ষীবান্ গিরিব্রজে গমন করেন। সেখানে তিনি তপস্যায় রত হন এবং ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। কাক্ষীবান্ এক সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.৭১, ৯৫, ৯৯; বায়ু পু. ৯৯.৭০, ৯৩, ৯৭]

☐ পুরাণ অনুসারে অঙ্গিরাবংশীয় মন্ত্রপ্রবর্তক ঋষিদের মধ্যে কাক্ষীবান্ অন্যতম।

[বায়ু পু. ৫৯.১০২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১১১; মৎস্য পু. ১৪৫.১০৫]

☐ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় যেসব ঋষিরা অবস্থান করতেন, তাঁদের মধ্যে কাক্ষীবান্ একজন বলে সভাপর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ২.৪.১৭; (হরি) ২.৪.৮ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র., পৃ. ২৬]

☐ দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় যেসব ঋষিরা অবস্থান করতেন, তাঁদের মধ্যে কাক্ষীবান্ একজন। *[মহা (k) ২.৭.১৮; (হরি) ২.৭.১৮]*

☐ শান্তিপর্বে বলা হয়েছে যে, যেসব ব্রহ্মর্ষিরা ত্রিভুবন সৃষ্টি করতে সমর্থ এবং পূর্বদিকে অবস্থান করছেন, তাঁদের মধ্যে কাক্ষীবান্ অন্যতম।

[মহা (k) ১২.২০৮.২৭; (হরি) ১২.২০২.২৬]

কাক্ষীবান্২ যেসব রাজর্ষিরা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কাক্ষীবান্ একজন।

[বায়ু পু. ৯১.১১৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৬.৮৮]

☐ ঋগ্বেদে উল্লিখিত হয়েছে যে, কাক্ষীবানের বৃচয়া নামে এক পত্নী ছিলেন। *[ঋগ্বেদ ১.৫১.১৩]*

কাক্ষীবান্৩ ভাগবত পুরাণ অনুসারে ভীষ্মের শরশয্যার সময় যেসব ব্রহ্মর্ষিরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কাক্ষীবান্ একজন।

[ভাগবত পু. ১.৯.৭]

কাক্ষীবান্৪ ঋষি পৌষ্যঞ্জির শিষ্যদের মধ্যে কাক্ষীবান্ একজন। বিষ্ণু পুরাণের কোনো কোনো পাঠে 'পৌষ্পিঞ্জি' নামটি ব্যবহৃত হলেও পণ্ডিত উইলসন এই নামটিকে ভ্রান্ত বলেছেন।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৩.৬.৬]

কাচল বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, পৌরাণিক কেতুমালবর্ষের অন্তর্ভুক্ত জনপদগুলির মধ্যে কাচল একটি। *[বায়ু পু. ৪৪.১৫]*

কাচ্ছীক একটি পশ্চিম ভারতীয় জনপদ। অবশ্যই আধুনিক গুজরাটের অন্তর্গত কচ্ছ অঞ্চল। সম্ভবত কাচ্ছীকেরই অপর নাম কাচ্ছীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রাচীন কাচ্ছীয় দেশটিও অপরান্ত অর্থাৎ পুরাকালের পশ্চিম ভারতের অন্তর্গত ছিল। ভৌগোলিক এবং ধ্বনিগত সাদৃশ্যের কারণে অনেকেই কাচ্ছিক এবং কাচ্ছীয়কে অভিন্ন বলে মনে করেন।

[মৎস্য পু. ১১৪.৫১; GP (S.M.Ali) p. 70, 146]

কাচ্ছীয় *[দ্র. কাচ্ছীক]*

কাঞ্চন১ তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে যখন দেবতারা তারকাসুরকে বধ করার জন্য স্কন্দ কার্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন, সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা তাঁদের কয়েকটি বিশিষ্ট অনুচর যোদ্ধাকে তারকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য অনুচররূপে স্কন্দকে দান করেন। সুমেরু পর্বত তাঁর যে চারজন বিশিষ্ট অনুচর স্কন্দকে দান করেছিলেন, কাঞ্চন তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৪৭-৪৮; (হরি) ৯.৪২.৪৫]

কাঞ্চন২ একজন যক্ষ। প্রচেতার ঔরসে সুযশানাম্নী অপ্সরার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন কাঞ্চন।

[বায়ু পু. ৬৯.১২]

কাঞ্চন৩ ভাগবত পুরাণ অনুসারে চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরূরবার ঔরসে উর্বশীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে বিজয় একজন। এই বিজয়ের পুত্র ভীম। কাঞ্চন, ভীমের পুত্র এবং হোত্রকের পিতা।

[ভাগবত পু. ৯.১৫.৩]

□ বিষ্ণু পুরাণে আবার বলা হয়েছে যে, পুরূরবার বংশধারায় অমাবসুর পুত্র ভীম। কাঞ্চন, ভীমের পুত্র ও সুহোত্রের পিতা। *[বিষ্ণু পু. ৪.৭.২]*

□ আবার ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু পুরাণে অমাবসুর পৌত্র ও ভীমের পুত্র হিসাবে 'কাঞ্চন'-এর পরিবর্তে 'কাঞ্চনপ্রভ' নামটি উল্লিখিত হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু পুরাণেও কাঞ্চন বা কাঞ্চনপ্রভর পুত্র হিসেবে সুহোত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৬.২৪; বায়ু পু. ৯১.৫৩]

কাঞ্চনকা একটি প্রাচীন পৌরাণিক নগরী। পুরাণে ভবিষ্যৎ রাজবংশ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, বিন্ধ্যশক্তি রাজার পুত্র বীর প্রবীর। এই প্রবীর কাঞ্চনকা নগরীতে ষাট বছর রাজত্ব করেছিলেন।

[বায়ু পু. ৯৯.৩৭১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৮৪]

□ পণ্ডিত Wilson -এর মতে, কাঞ্চি, কাঞ্চিপুরম্ এবং কাঞ্চনকা অভিন্ন। অর্থাৎ বর্তমান তামিলনাড়ু রাজ্যের অন্তর্গত কাঞ্চীপুরম্ জেলাই প্রাচীন কাঞ্চনক।

[বিষ্ণু পু. (Wilson) Vol. 4, p. 212]

কাঞ্চনচ্ছবি শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের একটি। 'ছবি' শব্দের একটি অর্থ হল প্রভা বা দ্যুতি। তিনি স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল কান্তিমান অপরূপ মূর্তি ধারণ করেন বলে মহাদেবের নাম কাঞ্চনচ্ছবি। মহাভারতের টীকাকার পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কাঞ্চনচ্ছবি শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

কাঞ্চনচ্ছবিরর্ধাঙ্গে কাঞ্চনবর্ণায়া উমায়াঃ স্থিতত্বাৎ।

হরিদাস কাঞ্চনছবি মহাদেবকে অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে কল্পনা করেছেন। ছবি অর্থে মূর্তি বা প্রতিকৃতি। তপ্তকাঞ্চনবর্ণা দেবী উমা পার্বতী তাঁর দেহের অর্ধাঙ্গ ব্যাপ্ত করে অবস্থান করেন, তাই শিব-মহেশ্বর কাঞ্চনচ্ছবি নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৯৩; (হরি) ১৩.১৬.৯৩]

কাঞ্চনপাদ পৌরাণিক মলয়দ্বীপের পর্বতগুলির মধ্যে কাঞ্চনপাদ একটি। *[বায়ু পু. ৪৮.২৪]*

কাঞ্চনপ্রভ *[দ্র. কাঞ্চন৩]*

কাঞ্চনাক্ষ স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচর একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৫৭; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

কাঞ্চনাক্ষী সরস্বতী নদীর সাতটি রূপের একটি রূপ। প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিরা নৈমিষারণ্যে জ্ঞানচর্চা করার সময় সরস্বতী নদীকে মনে মনে স্মরণ করে তাঁকে সেখানে আহ্বান করেন। দয়াময়ী, পবিত্র সরস্বতী নদী সেই ঋষিদের আহ্বানে নৈমিষারণ্যে কাঞ্চনাক্ষী নামে আবির্ভূতা হন—

আজগাম মহাভাগ তত্র পুণ্যা সরস্বতী।
নৈমিষে কাঞ্চনাক্ষী তু মুনীনাং সত্রযাজিনাম্॥

[মহা (k) ৯.৩৮.৪, ১৬-১৯; (হরি) ৯.৩৬.৪, ১৬-১৯]

□ প্রাচীন নৈমিষারণ্য বা নৈমিষার বন বর্তমান লক্ষ্ণৌয়ের পঁয়তাল্লিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। এই অঞ্চল দিয়েই কোনো এককালে সরস্বতী নদী, কাঞ্চনাক্ষী নামে প্রবাহিত হত হয়তো। *[দ্র. সরস্বতী]*

[GDAMI p. 135]

কাঞ্চী১ দক্ষিণ ভারতের একটি প্রাচীন জনপদ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় কাঞ্চীর সৈনিকরা কৌরবপক্ষে যোগদান করেছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ৫.১৬১.২১; ৫.১৬০.১০৩; ৮.১২.১৯; (হরি) ৫.১৫০.২১; ৫.১৪৯.১০৩; ৮.৯.১৯]

□ বিশ্বামিত্র যখন বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে হরণ করতে আসেন, তখন ক্রুদ্ধ নন্দিনীর দেহ নিঃসৃত বিভিন্ন পদার্থ থেকে বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীর সৃষ্টি হয়। এই সময় নন্দিনীর মূত্র থেকে কাঞ্চীদেশীয় সেনার উদ্ভব হয়েছিল বলে কথিত আছে।

[মহা (k) ১.১৭৫.৩৬; (হরি) ১.১৬৮.৩৮]

□ বলরাম তীর্থযাত্রাকালে কাঞ্চীপুরী দর্শন করে ছিলেন। *[ভাগবত পু. ১০.৭৯.১৩]*

□ বৃহৎসংহিতায় কাঞ্চী জনপদটির উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন জনপদ হিসেবে।

[বৃহৎ সংহিতা ১৪.১৫]

☐ কাঞ্চী আসলে আধুনিক তামিলনাড়ুর অন্তর্গত কাঞ্চীপুরম্ বা কাঞ্জিভরম্ শহর। এটি ভারতের সাতটি বিখ্যাত তীর্থ নগরীর মধ্যে অন্যতম। শহরটি বেগবতী নদীর তীরে অবস্থিত। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে কাঞ্চীর উল্লেখ পাওয়া যায়। শহরটির পশ্চিমাংশ শিব-কাঞ্চী ও পূর্বাংশটি বিষ্ণু-কাঞ্চী নামে পরিচিত। কাঞ্চীপুরম মন্দির নগরী হিসেবে পরিচিত। এখানকার কৈলাসনাথ, বৈকুণ্ঠ পেরুমল, মুকুটেশ্বর, মতঙ্গেশ্বর এবং কামাক্ষী মন্দির অত্যন্ত বিখ্যাত। পল্লববংশের শাসনকালে কাঞ্চীপুরম্ তাদের রাজধানী ছিল। সে সময় সমগ্র দক্ষিণ ভারতবর্ষের অন্যতম ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল কাঞ্চী।

[A History of India; Hermann Kulke and Dietmar Rothermund; New York; Routledge; 2004; p. 113; GD (N.N. Bhattacharyya) p. 169]

☐ চোলদের হাতে পল্লব বংশের পতনের পর তারা কাঞ্চী অধিকার করে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গ (Kulottumga) কুরুম্বর ভূমি নামে একটি বনভূমির উপর আধুনিক কাঞ্চীপুরম্ নগরীটি নির্মাণ করেছিলেন। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণে কাঞ্চীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

[GDAMI (N.L. Dey) p. 88; HPAI (Arya) p. 45]

কাঞ্চী২ পৌরাণিক কেতুমালবর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী। *[বায়ু পু. ৪৪.১৮]*

কাঞ্চী৩ ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী। *[বায়ু পু. ৪৩.২৫]*

কাট্য পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, কাট্য সেই গোত্রের অন্যতম। ঋষি অঙ্গিরা থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এরাও আঙ্গিরস বলে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ১৯৬.২৭]*

কাণ্ডশয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা পরাশর মুনির নামে কয়েকটি বংশধারা প্রচলিত ছিল। সেই বংশধারায় অনেকগুলি সন্তানকে নিয়ে এক-একটি বর্গ রচিত হয়েছিল। যাঁদের গৌর-পরাশর, নীল-পরাশর, কৃষ্ণ-পরাশর, শ্বেত-পরাশর, শ্যাম-পরাশর এবং ধূম্র-পরাশর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরাশরের যে সন্তানেরা গৌর-পরাশর নামে অভিহিত তাঁদের মধ্যে কাণ্ডশয় একজন। *[মৎস্য পু. ২০১.৩৩]*

কাণ্ব ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্যদের মধ্যে কাণ্ব একজন। *[বিষ্ণু পু. ৩.৫.২৯]*

কাত্যায়ন১ পুরাণে প্রজাপতি কশ্যপের প্রবরভুক্ত যে ঋষি বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, কাত্যায়ন সেই প্রবরের অন্যতম। প্রজাপতি কশ্যপ থেকে বংশ বা শিষ্যপরম্পরায় এঁরাও কাশ্যপ বলে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ১৯৯.৪]*

কাত্যায়ন২ পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার প্রবরভুক্ত যে ঋষি-বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, কাত্যায়ন সেই প্রবরের অন্যতম। মহর্ষি অঙ্গিরা থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এরাও আঙ্গিরস নামে পরিচিত। মৎস্য পুরাণের অন্যত্র ঋষি কাত্যায়নের নাম পাওয়া যায়।

[মৎস্য পু. ১৯৬.৩২; ১৯২.১০]

কাত্যায়ন৩ গয়াসুর যখন তাঁর পবিত্র দেহ যজ্ঞের জন্য অর্পণ করেন, তখন সেই যজ্ঞে পৌরোহিত্য কার্য করার জন্য যেসব ঋষিরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কাত্যায়ন অন্যতম।

[বায়ু পু. ১০৬.৩৭]

কাত্যায়ন৪ দশরথের অন্যতম ঋত্বিক বা পৌর্বকের নাম। রাম হরধনু ভঙ্গ করেছেন সুতরাং সীতাকে জনক তাঁরই হাতে তুলে দিতে চান—দূতেরা এই খবর নিয়ে আসার পরদিনই দশরথ মিথিলার উদ্দেশে যাত্রা করেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কাত্যায়নও দশরথের আগে আগে মিথিলায় গিয়েছিলেন। দশরথের মৃত্যুর পরদিন মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য প্রমুখ ব্রাহ্মণের সঙ্গে কাত্যায়নও বশিষ্ঠের কাছে গিয়েছিলেন। কাত্যায়ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা বশিষ্ঠকে পরামর্শ দেন, আজই কোনো একজন ইক্ষ্বাকুকুমারকে রাজপদে বরণ করা হোক। রামচন্দ্রের চোদ্দ বছরের বনবাস সমাপ্ত হবার পর তিনি অযোধ্যায় ফিরে এলে কাত্যায়ন অন্যান্য ঋষিদের সঙ্গে রামকে রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন। রামের রাজত্বকালে এক ব্রাহ্মণের বালকপুত্রের অকাল মৃত্যু হয়। রাম এই অকাল মৃত্যুর কারণ জানার জন্য যে আটজন ব্রাহ্মণকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, কাত্যায়ন তাঁদের অন্যতম।

[রামায়ণ ১.৭.৫; ১.৬৯.৩-৬; ২.৬৭.৩-৮; ৬.১৩০.৬০; ৭.৮৭.৪-৫]

কাত্যায়নী মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেবতাদের তেজে উদ্ভূতা দেবী চণ্ডীর যে রূপ এবং অবয়ব তৈরি হয়েছিল, বামন পুরাণে বর্ণিত দেবীর কাত্যায়নী-রূপের সঙ্গেও সেই দেবতেজের সম্পর্ক আছে। এখানেও নিমিত্ত সেই মহিষাসুর-বধ। মহিষাসুরের অত্যাচারে ক্লিষ্ট দেবতাদের একসময় ভয়ংকর কোপ তৈরি হল। তাঁরা নিরুপায় হয়ে ব্রহ্মাকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান বিষ্ণুর কাছে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁরা দেখলেন —হরি-হর দুজনেই একাসনে উপবিষ্ট। ভগবান বিষ্ণু দেবতাদের কাছে মহিষাসুরের অত্যাচারের খবর শুনে ভীষণ কুপিত হয়ে উঠলেন। তারপরেই কুপিত হয়ে উঠলেন ভগবান শঙ্কর, ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা। এবার সেই কুপিত দেবতাদের মুখমণ্ডল থেকে এক মহান সমৃদ্ধিসম্পন্ন তেজ নির্গত হল। সেই তেজ পুঞ্জীভূত হয়ে এসে পৌঁছোল মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে। সমস্ত দেবতেজ মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে এমনভাবেই একত্রিত হল যা দেখতে লাগছিল সুবৃহৎ পর্বতশৃঙ্গের মতো। মহর্ষি কাত্যায়ন সেই সম্মিলিত দেবতেজ আরও সমৃদ্ধ করে তুললেন নিজের তেজ দিয়ে। অর্থাৎ কাত্যায়ন মুনির আর্ষ তেজ দেবতেজের সঙ্গে মিলিত হয়ে উজ্জ্বল আকার ধারণ করল এবং সেখান থেকেই আবির্ভাব ঘটল দেবী কাত্যায়নীর—

তেনর্ষিসৃষ্টেন চ তেজসাবৃতং
জ্বলৎপ্রকাশার্ক-সহস্রতুল্যম্।
তস্মাচ্চ জাতা তরলায়তাক্ষী
কাত্যায়নী যোগবিশুদ্ধদেহা॥

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে যেমন বিশেষ বিশেষ দেবতার তেজে দেবী চণ্ডিকার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়ে উঠেছিল, বামনে পুরাণে দেবী কাত্যায়নীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও গড়ে উঠেছে সেইভাবেই। এখানে মহেশ্বর শিবের তেজে কাত্যায়নীর বদন-মণ্ডল, পাবক অগ্নির তেজে দেবীর তিনটি চক্ষু, যমের তেজে কাত্যায়নীর কেশকলাপ, ভগবান শ্রীহরির তেজে অষ্টাদশ ভুজ, চন্দ্রের তেজে তাঁর স্তনদ্বয়, ইন্দ্রের তেজে কটিদেশ, বরুণের তেজে উরু, জঙ্ঘা এবং নিতম্বদেশ, ব্রহ্মার তেজে পদদ্বয়, দিবাকর সূর্যের তেজে পদাঙ্গুলি, বাসবের তেজে করাঙ্গুলি— এইভাবে সকল দেবতার তেজে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধা সেই কাত্যায়নীর উৎপত্তি হল—

তচ্চাপি তেজোত্তমমুত্তমং মহন্
নাম্না পৃথিব্যামভবৎ প্রসিদ্ধা।
কাত্যায়নীত্যেব তদা বভৌ সা
নাম্না চ তেনৈব জগৎপ্রসিদ্ধা॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবতেজ-সম্ভবা চণ্ডী যেমন দেবতাদের কাছে অস্ত্রলাভ করে বলশালিনী হয়েছিলেন, বামন পুরাণে দেবী কাত্যায়নীও সেইভাবেই দেবতাদের সমস্ত অস্ত্রলাভ করে বিন্ধ্যপর্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। চণ্ডীর সঙ্গে মহিষাসুরের যুদ্ধে কেন্দ্রস্থান ছিল কিন্তু হিমালয়। আরও লক্ষণীয় ব্যাপার হল—কাত্যায়নী দেবী প্রথম যে দুই অসুরের মুখোমুখি হচ্ছেন, যে দুই অসুর মহিষাসুরের সেনাপতি হিসেবে কাজ করেছেন এখানে, সেই চণ্ড এবং মুণ্ড কিন্তু মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি। তারা যেভাবে চণ্ডিকার অপূর্ব রূপ-লাবণ্য দেখে শুম্ভ-নিশুম্ভ যে কোনো একজনের স্ত্রী হবার প্রস্তাব করেছিল, সেই চণ্ড-মুণ্ড বামন পুরাণে দেবী কাত্যায়নীকে মহিষাসুরের স্ত্রী হবার প্রস্তাব দিয়েছিল।

বামন পুরাণে দীর্ঘ দুই অধ্যায় জুড়ে মহিষাসুরের সঙ্গে দেবী কাত্যায়নীর যুদ্ধের বর্ণনা আছে, যার অবশেষে দেখা যাচ্ছে—দেবী মহিষাসুর-বধের পর সমস্ত দেবতাদের বিপন্মুক্তির আশ্বাস দিয়ে হরপাদমূলে প্রবেশ করছেন—

সংস্তূয়মানা সুরসিদ্ধসংঘৈঃ
কাত্যায়নী সা হরপাদমূলে।
ভূয়ো ভবিষ্যাম্যমরার্থমেবম্
উক্ত্বা সুরাংস্তান্ প্রবিবেশ দুর্গা॥

[বামন পু. ১৮-২১ অধ্যায়]

□ মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবতেজসম্ভবা চণ্ডী এবং বামন পুরাণের দেবতেজে নির্মিতা কাত্যায়নী—দুজনে একই শক্তিদেবতার পরিপূরক নাম। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের কাত্যায়নী কল্পে যে ধ্যান-দর্শন পাওয়া যায়, তাতে কাত্যায়নী দেবীর দক্ষিণ পদ সিংহপৃষ্ঠে স্থাপিত এবং বামপদের অগ্রভাগে তিনি মহিষাসুরকে বিদলিত করছেন—

সব্যপাদ-সরোজেনালঙ্কৃতোরুমৃগাধিপাম্।
বামপাদাগ্রদলিত-মহিষাসুরনির্ভরাম্॥

কাত্যায়নী দেবীর এই মহিষাসুরদলনী রূপের সঙ্গে দেবী দুর্গা চণ্ডিকার কোনো পার্থক্য নেই, শুধু বিশেষত্ব এখানে একটাই যেমনটি কালিকা পুরাণ বর্ণনা করে বলেছে— দেবতাদের সেই শরীর নির্গত তেজঃপুঞ্জকে মহর্ষি কাত্যায়ন দেবী-শরীরের রূপ দান করে তাঁকে কায়বতী করেছিলেন। কাত্যায়নের তেজ-সম্ভূত শরীরাবয়ব ধারণ করেই দেবী কাত্যায়নী পরে মহিষাসুরকে বধ করেন—

ইতি প্রকুপ্যতাং তেষাং শরীরেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্।
নিশ্চক্রমুশ্চ তেজাংসি শক্তিরূপানি তৎক্ষণাৎ॥
তত্তেজোভির্ধৃতবপুর্দেবী কাত্যায়নেন বৈ।
পশ্চাজ্জঘান মহিষং জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী॥

[বৃহৎ তন্ত্রসার (নবভারত ১ সংস্করণ), পৃ. ৪৮৮; কালিকা পু. ৬৩.৭৬-৭৭]

□ সপ্তশতী চণ্ডীতে শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করার পর দেবতারা যে স্তুতি করেছিলেন, সেখানে প্রথম শ্লোকেই বলা হল— অভীষ্টলাভের ফলে ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতারা ভবিষ্যতের অনেক আশা নিয়ে দেবী কাত্যায়নীকে তুষ্ট করলেন—

কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্টলাভাদ্
বিকাশিবক্ত্রাস্তু বিকাশিতাশাঃ।

এখানে টীকাকারেরা অনেকেই বলেছেন— শুম্ভ-নিশুম্ভমর্দিনী সেই কাত্যায়নী চণ্ডিকাকেই দেবতারা তুষ্ট করলেন স্তবে—কাত্যায়নীং চণ্ডিকাং তুষ্টুবুঃ। অর্থাৎ চণ্ডিকাই কাত্যায়নী। অন্যদিকে গৌড়দেশের টীকাকার গোপাল চক্রবর্তী চণ্ডিকা কাত্যায়নীর ওপর আর্ষ মাহাত্ম্য চাপিয়ে দিয়ে বলেছেন—কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল বলেই তিনি কাত্যায়নী— কাত্যায়নাশ্রমে প্রাদুর্ভূতত্বাৎ কাত্যায়নী। পণ্ডিতজনেরা অনেকেই মনে করেছেন যে, কাত্যায়ন ঋষি এবং তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত কাত্যায়নের পুত্র-শিষ্যের ধারায় পূজিত হতেন বলেই চণ্ডিকার নাম হয়ে গেছে কাত্যায়নী— Katyayani of the Katyayana Family.

[দুর্গাসপ্তশতী (Pargiter) ২য় খণ্ড, ১১.১, শান্তনবী টীকা, পৃ. ৫৭৮; শ্রীশ্রীচণ্ডী (পঞ্চানন) ১১.১, গোপাল চক্রবর্তী-কৃত টীকা, পৃ. ৩৯২; Collected works of R.G. Bhardarkar, vol. 4, p. 203]

□ দেবী কাত্যায়নীর সঙ্গে আমাদের পৌরাণিক কৃষ্ণেরও একটা যোগ আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা ভাগবত পুরাণের শ্রেষ্ঠ মর্মকথা যে মহারাস, সেই মহারাসের পটভূমিকার মধ্যে আমরা কৃষ্ণপ্রিয় গোপরমণীদের এক মাস ধরে কাত্যায়নীব্রত পালন করতে দেখি। ভাগবত বলেছে হেমন্তকালের প্রথম মাসে অর্থাৎ অঘ্রান মাসের প্রথমদিন থেকে তাঁরা হবিষ্য খেয়ে কাত্যায়নীর ব্রতার্চনা আরম্ভ করলেন। প্রতিদিন সূর্য উঠতেই গোপরমণীরা যমুনায় স্নান করে তীরে বসে কাত্যায়নী-দেবীর বালুকাময়ী প্রতিকৃতি বানাতেন। তারপর গন্ধ-মাল্য, ধূপ-দীপে চলত তাঁর অর্চনা। পূজোর সময় মন্ত্র পড়ে কাত্যায়নী দেবীর কাছে প্রার্থনা করে বলতেন, যাতে নন্দগোপের পুত্র কৃষ্ণ তাঁদের জীবনে স্বামী হিসেবে আসেন—

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।
চরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্॥
আপ্লুত্যাম্ভসি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতে'রুণে।
কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবীমনর্চ্চুর্নৃপ সৈকতীম্॥
গন্ধৈর্মাল্যৈঃ সুরভিভির্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ।
উচ্চাবচৈশ্চোপহারৈঃ প্রবালফলতণ্ডুলৈঃ॥
কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ॥

কৃষ্ণের জীবনে যে গোপরমণীরা রোমাঞ্চের ইতিহাস তৈরি করেছিলেন—এই হৈমন্তী কাত্যায়নী পূজার শেষ কল্পেই কৃষ্ণের বস্ত্রহরণ-লীলা এবং রাসরজনীতে মিলিত হবার প্রতিজ্ঞা—তাতে কাত্যায়নী দেবীর মর্য্যাদা বৈষ্ণব ক্রিয়া এবং আচারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। বিশেষত মহামায়া-স্বরূপিনী এবং কাত্যায়নী আবার যুক্ত হয়েছেন কৃষ্ণের বংশপরম্পরায় নেমে আসা তাঁর পৌত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে। আমরা হরিবংশে দেখছি—বাণাসুরের কন্যা উষাকে হরণ করার প্রক্রিয়ায় প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ বাণাসুরের কারাগারে বন্ধন লাভ করলেন। এই সময় অনিরুদ্ধ আর্যাস্তুতি পাঠ করেছিলেন এবং স্তুতির আরম্ভেই চণ্ডী, কাত্যায়নী এবং আর্য্যা দেবীকে একাকার করে দেন—

চণ্ডীং কাত্যায়নীং দেবীমার্য্যাং লোকনমস্কৃতাম্।
বরদাং কীর্তয়িষ্যামি নামভির্হরিসংস্তুতৈঃ॥

অনিরুদ্ধ তাঁর আর্য্যাস্তুতির শেষে কাত্যায়নীর রূপ বর্ণনা করে তাঁর স্তব করছেন ধ্যানমন্ত্রের উচ্চারণে। বলছেন—এই কাত্যায়নী দেবী

অষ্টাদশভুজা, তিনি দিব্য আভরণে ভূষিত, সুবর্ণ হারে তাঁর সর্বাঙ্গ শোভিত, মুকুটের আভায় তাঁর আভূষণও চমকিত হয়। হে কাত্যায়নী! যখন তোমার স্তুতি করি, তখন তুমি উত্তম বর প্রদান করো। অতএব হে বরদায়িনী! আমি তোমার স্তুতি করছি—

অষ্টাদশভুজা দেবী দিব্যাভরণভূষিতা।
হারশোভিতসর্বাঙ্গা মুকুটোজ্জ্বলভূষণা॥
কাত্যায়নী স্তুয়সে ত্বং বরমগ্র্যং প্রযচ্ছসি।
অতঃ স্তবীমি ত্বাং দেবীং বরদে বামলোচনে॥

পণ্ডিতদের মতে হরিবংশ মহাভারতের পরিশিষ্ট হিসেবে খ্রিষ্টীয় ২/৩ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হয়ে গেছে, ভাগবত পুরাণ অবশ্য আরও কয়েক শতাব্দী পর রচিত। কিন্তু যে গ্রন্থের রচনাকাল অবশ্যই রাজা হর্ষবর্ধনের সময়ে, সেই কাদম্বরী গ্রন্থে বাণভট্টের মতো পণ্ডিত কবি কাত্যায়নী দেবীর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে দুটি জায়গায় তাঁকে উপমান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কৃষ্ণগাত্র চণ্ডালকন্যার আলতা-রাঙা পা-দুটি বর্ণনা করার সময় বাণভট্ট লিখেছেন সদ্যোনিহত মহিষাসুরের রক্তে রঞ্জিত কাত্যায়নী দেবীর চরণযুগলের মতো দেখাচ্ছিল চণ্ডালকন্যার আলতা-মাখা পা-দুটি—অচির-মৃদিত-মহিষাসুর-রুধির-রক্ত-চরণামিব কাত্যায়নীম্। আবার কাদম্বরীর অন্য একটি জায়গায় যেখানে শবর-সৈন্যের বর্ণনা হচ্ছে—স্বভাবত নিষ্ঠুর শবর-সেনাপতি মাতঙ্গ যখন ক্রোধসূচক ভ্রূকুটি করত, তখন তার কপালে তিনটি ভয়ঙ্কর রেখাচিহ্ন এমনভাবে ফুটে উঠত যাতে মনে হত যেন অত্যন্ত ভক্তি সহকারে দেবীর আরাধনা করায় দেবী কাত্যায়নী 'এই মাতঙ্গ আমার লোক'—এটা জানাবার জন্যই মাতঙ্গের ভ্রূকুটি ললাটে আপন ত্রিশূলের চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন—

ক্রূরজাতিতয়া বদ্ধত্রিপতাকোদগ্র-ভ্রূকুটী-
করালে ললাটপট্টে প্রবলভক্ত্যারাধিতয়া
'মৎপরিগ্রহো'য়মিতি' কাত্যায়ন্যা
ত্রিশূলেনেবাঙ্কিতম্।

[ভাগবত পু. ১০.২২.১-৪; হরিবংশ ২.১২১.৩২-৩৪; কাদম্বরী (হরিদাস), পূর্বভাগ, (কলিকাতা, ১৮৭২ শকাব্দ (১৯৫০), ৪র্থ সংস্করণ) পৃ. ৩৪, ১০৪]

কানিনি শুক্ল-যজুর্বেদের অন্যতম একজন ঋষি কৃত। কৃতের শিষ্যদের মধ্যে একজন কানিনি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.৫৩]

কান্তা$_{১}$ গায়ত্রীর চতুর্বিংশতি শক্তির একটি।

[দেবী ভাগবত পু. ১২.২.২.]

কান্তা$_{২}$ কালিকাপুরাণ অনুসারে কান্তা নাম্নী নদীটি দুর্জয় পর্বতের পূর্বদিকে অবস্থিত। এই নদীটি উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ সাগরে গমন করেছে।

কালিকা পুরাণের অপর একটি পাঠে বলা হয়েছে যে, ঋষি বশিষ্ঠ সন্ধ্যাচল নামক স্থানে কান্তা নদীকে আহ্বান করেন। এই নদীতে স্নান করলে শিবলোক প্রাপ্ত হওয়ার সৌভাগ্য ঘটে বলে বলা হয়েছে। *[কালিকা পু. ৭৯.১৬৪; ৫১.৯০; ৭৯.১৭৫]*

কান্তা$_{৩}$ দেবী পার্বতীর সহস্রনামের মধ্যে একটি।

[কূর্ম পু. ১.১১.১২০]

কান্তা$_{৪}$ গায়ত্রী দেবীর সহস্রনামের মধ্যে একটি।

[দেবীভাগবত পু. ১২.৬.২৯]

কান্তা$_{৫}$ স্কন্দ পুরাণ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রধান ষোড়শ গোপী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কান্তা একজন।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র মাহাত্ম্য) ১১৮.১১]

কান্তারক একটি দক্ষিণ ভারতীয় জনপদ। দিগ্বিজয়কালে সহদেব এই জনপদটিকে জয় করেছিলেন।

[মহা (k) ৫২.৩১.১২; (হরি) ২.৩০.১৩]

পণ্ডিতরা মনে করেন যে, প্রাচীন ভোজকটপুর (বিদর্ভের একটি অংশ) এবং কোশলের পশ্চিম সীমানার মধ্যবর্তী কোনো স্থানে কান্তারক নামে জনপদটি অবস্থিত ছিল।

[Journal of Bihar Research Society vol. 19, 1933; p. 126]

কান্তি একটি উত্তর ভারতীয় জনপদ। সম্ভবত নৈকট্যের কারণেই কোশলের সঙ্গে একত্রে কান্তিরাজ্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে মহাভারতে —কান্তিকোশলাঃ।

[মহা (k) ৬.৯.৪০; (হরি) ৬.৯.৪০]

কান্তিমতী চন্দ্রের কন্যা। *[দ্র. চন্দ্র$_{১}$]*

[ব্রহ্ম পু. ২১৯.৭-১৭]

কান্যকুব্জ ভারতবর্ষের ইতিহাস ও মহাকাব্যে উল্লিখিত একটি বিখ্যাত জনপদ। পুরূরবার পুত্র অমাবসুর বংশধারায় কুশিকের পুত্র বিখ্যাত রাজা গাধি কান্যকুব্জ শাসন করেছিলেন। এই গাধি রাজার পুত্রই বিশ্বামিত্র, যিনি কান্যকুব্জ নগরীতেই

দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে একত্রে সোমরস পানের পর তাঁর ক্ষত্রিয় পরিচয় ত্যাগ করে নিজেকে ব্রাহ্মণ পরিচয়ে পরিচিত করেন—

কান্যকুব্জে'পিবৎ সোমমিন্দ্রেণ সহ কৌশিকঃ।
তত্র ক্ষত্রাদপাক্রামদ্ ব্রাহ্মণো'স্মীতি চাব্রবীৎ॥

[মহা (k) ১.১৭৫.৩; ৩.৮৭.১৭;
(হরি) ১.১৬৮.৩; ৩.৭২.১৭]

□ কান্যকুব্জের নামকরণ প্রসঙ্গে রামায়ণে একটি কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে। রাজা কুশিক মহোদয় নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর একশোটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। বায়ু একবার কামবশত এই কন্যাদের প্রার্থনা করেন। তাঁদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ক্রুদ্ধ বায়ু তাঁদের শরীর-সন্ধিগুলি চূর্ণ করে দেন। তাতে রাজকন্যারা কুব্জা হয়ে যান। কুশিক প্রতিষ্ঠিত মহোদয় নগরটিই এই একশোটি কুব্জাকন্যার কারণে কান্যকুব্জ নামে পরিচিত হয়। অর্থাৎ কন্যারা এখানে কুব্জা হয়ে গিয়েছিলেন, তাই কান্যকুব্জ।

[রামায়ণ ১.৩২.১১-২৭]

□ গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত কান্যকুব্জে অশ্বতীর্থ নামে একটি তীর্থ ছিল। কান্যকুব্জরাজ গাধি এবং তাঁর কন্যা সত্যবতী ও সত্যবতীর পাণিপ্রার্থী ঋচীক মুনির প্রসঙ্গ এখানে এসেছে। এই কান্যকুব্জেই ঋচীক ও সত্যবতীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। *[দ্র. অশ্বতীর্থ]*

[মহা (k) ৩.১১৫.২০-২৮; ৫.১১৯.৪; ১৩.৪.১৭;
(হরি) ৩.৯৬.২০-২৮; ৫.১১০.৪; ১৩.৩.৩৬]

□ দেবী সতী কান্যকুব্জে গৌরী নামে পূজিতা হন। *[মৎস্য পু. ১৩.২৯]*

□ পরশুরামের মাহিষ্মতীপুরী আক্রমণের সময় তাঁর বিপরীতে এবং কার্তবীর্য্যার্জুনের পক্ষে যে সমস্ত দেশের রাজারা যোগ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে কান্যকুব্জ অন্যতম। এই যুদ্ধে কান্যকুব্জের অধিপতি নিহত হয়েছিলেন বলেও জানা যায়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩৯.১১; ৪১.৩৯]

□ কান্যকুব্জ উত্তরপ্রদেশের কনৌজ শহর। পঞ্চম ও সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যথাক্রমে ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ্ এখানে এসেছিলেন। বৌদ্ধ যুগে কনৌজ দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী ছিল। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের পূর্বে এটি মৌখরি বংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল।

[GDAMI (N.L. Dey) p. 90]

□ বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিত গ্রন্থে কান্যকুব্জের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কাপালী শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। 'কপাল' শব্দের অর্থ মাটির শরা বা মাটির তৈরি ভিক্ষাপাত্র। যিনি কপাল ধারণ করেন, তিনি কাপালী। ভগবান শিবকে দীনদরিদ্র ভিক্ষুক রূপে কল্পনা করা হয় অনেক সময়েই। ভিক্ষুকের বেশে ভিক্ষাপাত্র হাতে দেবী অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন শিব —এই পৌরাণিক কাহিনীর কারণে কাপালী মহাদেবের অন্যতম একটি নাম।

কপাল শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হল আবরণ। টীকাকার নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা অনুসারে দ্যুলোক অর্থাৎ আকাশ বা স্বর্গলোক এবং পৃথিবী—এই দুইয়ের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড নির্মিত হয়। পৃথিবীর উপর আবরণের মত অবস্থান করছে আকাশ—আকাশ এবং পৃথিবীর সমন্বয়ে যে ব্রহ্মাণ্ডগোলক, নীলকণ্ঠ কপাল শব্দটিকে সেই ব্রহ্মাণ্ডের অণ্ডকটাহ বা আবরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। কটাহ মানে অর্ধবৃত্তাকার কড়াইয়ের মত আকৃতির বস্তু, অনেকটা ফাঁপা অর্ধগোলকের মত। প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী ভূলোক এবং দ্যুলোক এমনই দুটি কটাহ—যাদের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডগোলক নির্মিত হয়। এই ভাবনা থেকে কপাল শব্দের অর্থ দাঁড়ায় ভূলোক এবং দ্যুলোক এই দুই কটাহের সমন্বয়ে গঠিত ব্রহ্মাণ্ড। মহাদেবকে এই ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, পরমেশ্বর রূপে কল্পনা করে কাপালী নামে সম্বোধন করা হয়েছে—

কাপালী কপালাভ্যাং দ্যুপৃথিবীরূপাভ্যাং নির্বৃত্তং
কাপালং ব্রহ্মাণ্ডং তদস্যাস্তীতি কাপালী
ব্রহ্মাণ্ডাধীশঃ।

[মহা (k) ১৩.১৭.১০৩; (হরি) ১৩.১৬.১০৩]

কাপিলতীর্থ *[দ্র. কপিলাতীর্থ ২]*

কাপিলবর্ষ কুশদ্বীপের সাতটি বর্ষ বা ভূবিভাগের মধ্যে একটি। এটি কুশদ্বীপের হরিগিরি পর্বতের সঙ্গে সংলগ্ন কোনো অঞ্চল।

[মহা (k) ৬.১২.১৪; (হরি) ৬.১২.১৪]

কাপিলেয় দৈত্যদের একটি গণ বলে পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। দৈত্যরাজ কুম্ভের ঔরসে, খশার কন্যা কপিলার গর্ভজাত পুত্ররা কাপিলেয় দৈত্য নামে খ্যাত হয়েছে। *[বায়ু পু. ৬৯.১৭৭]*

কাপী ভারতবর্ষের একটি পবিত্র নদী। এর জল আর্য ও ম্লেচ্ছ উভয় জাতীয় মানুষেরা পান করেন।

অর্থাৎ এই নদীর তীরভূমিতে আর্য এবং আর্যেতর জনজাতিরাও স্বচ্ছন্দে বসবাস করত।

[মহা (k) ৬.৯.২৪; হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কর্তৃক পাঠে কাপী নদীর নাম পাওয়া যায় না]

কাপোতীবৃত্তি মহাভারতের শান্তিপর্বে গৃহস্থের চারটি বৃত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে—

গৃহস্থবৃত্তয়শ্চৈব চতস্রঃ কবিভিঃ স্মৃতাঃ।

এর মধ্যে প্রথমটি হল কুশূলধান্য, দ্বিতীয়টি কুম্ভধান্য, তৃতীয়টি অশ্বস্তনিক এবং চতুর্থটির নাম কাপোতী বৃত্তি।

কাপোতীবৃত্তি শব্দটা এসেছে কপোত শব্দ থেকে। কৃষক ক্ষেত থেকে ধান কেটে নিয়ে যাবার পর যে ধানগুলি মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে থাকে, সেগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে সংগ্রহ করাকে বলা হয় উঞ্ছবৃত্তি বা কাপোতীবৃত্তি। কপোত বা পায়রা যেমন একটি একটি করে শস্যকণা খুঁটে খুঁটে খায়, কাপোতীবৃত্তি আশ্রিত ব্যক্তি ঠিক তেমনি করে একটি একটি করে শস্যকণা সংগ্রহ করেন—

কাপোতিঃ কপোতবদেকৈকং কণকমাদত্তে স কাপোতিঃ। (নীলকণ্ঠ)

[মহা (k) ১২.২৪২.২-৩; ১৪.৯০.২৪নং শ্লোকের নীলকণ্ঠকৃত টীকা দ্র.; (হরি) ১২.২৪০.২-৩; ১৪.১১৩.২৪নং শ্লোকের নীলকণ্ঠকৃত টীকা দ্র.]

□ ব্যাসদেব এই চারটি বৃত্তিকে গৃহস্থের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলে উল্লেখ করেছেন। পত্নী পুত্র প্রভৃতিদের প্রতিপালনের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা গৃহস্থের কর্তব্য, তবে বিপন্নতার কালে লোভ সম্বরণ করে শুধুমাত্র জীবন ধারণের জন্য এই কাপোতীবৃত্তিও যে কিছু হেয় নয়, সেটা বোঝানোর জন্যই গৃহস্থের বৃত্তি হিসেবে কাপোতী বৃত্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। *[দ্র. কুশূলধান্য]*

কাবেরী১ দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান ও পবিত্র নদী। আদিকবির রামায়ণে দেখা যায়—সীতা হরণের পর সুগ্রীব তাঁর বীর বানর দলপতিদের যখন সীতার খোঁজে দক্ষিণদিকে যেতে বলেছিলেন, তখন তিনি তাঁদের কাবেরী নদী সংলগ্ন অঞ্চলে সীতার অনুসন্ধান করার নির্দেশ দেন। *[রামায়ণ ৪.৪১.১৪-১৫]*

□ সভাপর্বের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, বরুণদেবের সভায় যেসব নদী উপযুক্ত দেহ ধারণ করে তাঁর উপাসনা করেন, তাঁদের মধ্যে কাবেরী অন্যতম। এই নদীটিকে সব সময় অপ্সরারা ঘিরে থাকে। এখানে স্নান করলে সহস্র গো-দানের ফল পাওয়া যায়। *[মহা (k) ২.৯.২০; ৩.৮৪.২২; ৬.৯.২০; ১৩.১৬৫.২০, ২২; (হরি) ২.৯.২০; ৩.৭০.২২; ৬.৯.২০; ১৩.১৪৩.২০, ২২; বায়ু পু. ৭৭.২৮; ভাগবত পু. ১১.৫.৩৯]*

□ পুরাণে কাবেরী নদীকে নারীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। তিনি যুবনাশ্বের কন্যা এবং পিতার অভিশাপে কাবেরী নদী-রূপ লাভ করেন। বিখ্যাত জহ্নুমুনি যুবনাশ্ব-রাজার নদীরূপা কন্যা কাবেরীকে বিবাহ করেন। বায়ুপুরাণে এই প্রসঙ্গে জহ্নুকন্যা জাহ্নবী গঙ্গার কথা বলা হয়েছে এবং একই সঙ্গে নদীশ্রেষ্ঠা কাবেরীর মাহাত্ম্যও বলা হয়েছে। সম্ভবত গঙ্গা বা জাহ্নবীর পবিত্রতা কাবেরীর উপর আরোপিত হয়েছে বলেই, কাবেরীর আরেক নাম দক্ষিণের গঙ্গা। কাবেরী ও জহ্নুর এক পুত্র ছিল। তাঁর নাম সুহোত্র।

[বায়ু পু. ৯১.৫৭-৬০; হরিবংশ পু. ২৭.৯-১০; GD (N.N.Bhattacharyya) p. 178]

□ একবার প্রলয়কালে বালক রূপধারী শ্রীহরি, মার্কণ্ডেয় ঋষিকে তাঁর শরীরের মধ্যে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এভাবেই তিনি মার্কণ্ডেয়র প্রাণরক্ষা করেন। শ্রীহরির শরীরের মধ্যে ভ্রমণ করতে করতে মার্কণ্ডেয়, তাঁর উদরের ভিতর বহু নদীকে দেখতে পান। সেগুলির মধ্যে কাবেরীও একটি।

[মহা (k) ৩.১৮৮.১০৫; (হরি) ৩.১৫৯.১০৬]

□ কাবেরী নদী পবিত্র অগ্নির উৎপত্তিস্থল। হব্যবহনকারী অগ্নি ষোলোটি নদীকে কামনা করেছিলেন। তাদের মধ্যে কাবেরী অন্যতমা।

[মহা (k) ৩.২২২.২৫; (হরি) ৩.১৮৫.২৪; মৎস্য পু. ৫১.১৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১২.১৪; বায়ু পু. ২৯.১৩]

□ শ্রীহরি যখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে যুদ্ধে পরাজিত করেন, তখন হিরণ্যকশিপুর বিধ্বস্ত দেহ প্রচণ্ড আঘাত করে মাটি স্পর্শ করে। এই সময় তাঁর দেহের আঘাতে সমস্ত নদী ও পার্শ্ববর্তী জনপদগুলি কেঁপে উঠেছিল। সেই আঘাতে কাবেরী নদীও কেঁপে ওঠে।

[মৎস্য পু. ১৬৩.৬১]

□ কাবেরী নদীর পশ্চিমদিকের বিস্তৃত বনভূমি জনৈক বামন রাজা একসৃকের পুত্রের বন বলে বিখ্যাত। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৫৭]*

□ কাবেরী ও নর্মদা নদীর সঙ্গমস্থল কাবেরী-সঙ্গম নামে পরিচিত। এটি একটি পবিত্র তীর্থ। এখানে কুবের হাজার বছর মহাদেবের তপস্যা করে যক্ষাধিপতির পদ লাভ করেছিলেন। এই তীর্থের দর্শনে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। এর জল স্পর্শ করলেই স্বর্গলাভ হয়।

[দ্র. কাবেরী সঙ্গম]

[মৎস্য পু. ১৮৯.২-২০]

□ কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থল সহ্যাদ্রি পর্বত। অবশ্য পুরাণে এধারণাও পাওয়া যায় যে, লোমশ ঋষি তপঃপ্রভাবে কাবেরীকে স্বর্গ থেকে মর্তে নিয়ে এসেছিলেন। তীর্থ ভ্রমণের সময় স্বয়ং বলরাম এই পবিত্র নদী তীর্থটি দর্শন করেছিলেন।

[বায়ু পু. ১০৮.৭৯, ৪৫.১০৪;
ভাগবত পু. ৫.১৯.১৭; ১০.৭৯.১৪;
মৎস্য পু. ২২.২৭, ১১৪.২৯;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৩৫]

□ কর্নাটক রাজ্যে বিস্তৃত পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদ্রি পর্বতের তালাকাবেরী (Talakaveri) অংশটি থেকে কাবেরী নদীর উৎপত্তি। এরপর কাবেরী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে কর্নাটক ও তামিলনাড়ুর মধ্যে দিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।

[W. Francis; Gazetteer of South India Vol-2, New Delhi, Mittal Publication, p. 174]

□ টলেমি বর্ণিত খাবেরস (Khaberos) হল কাবেরী। পল্লব রাজারা কাবেরী নদী উপত্যকার এক বিরাট অংশে রাজত্ব করেছিলেন, তবে চোলদের উত্থানের মাধ্যমেই কাবেরী নদীর উপত্যকাভূমি অনেক বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে।

[GD (N.N. Bhattacharyya) p.178;
EAIG (Kapoor) p. 370]

কাবেরী২ পৌরাণিক ভদ্রাশ্ববর্ষের একটি পবিত্র নদী।

[বায়ু পু. ৪৩.২৬]

কাম১ শিবসহস্রনামস্তোত্রে উল্লিখিত মহাদেবের অন্যতম নাম। শিবসহস্রনামস্তোত্রে মোট দুবার ভগবান শিব কাম নামে সম্বোধিত হয়েছেন। সংস্কৃত 'কম্' ধাতু থেকে 'কাম' শব্দের উৎপত্তি। 'কম্' ধাতুর অর্থ ইচ্ছা করা, অভিলাষ করা বা কামনা করা। 'কম্' ধাতুর সঙ্গে 'অন্' প্রত্যয় করলে নিষ্পন্ন রূপটি হয় কাম। সেক্ষেত্রে কাম শব্দের অর্থ হতে পারে যে অভিলাষ করে বা ইচ্ছা করে। আবার যা কিছু অভীষ্ট, যা কিছু কামনার বিষয় বা মনোরথ—তাকেও কাম বলা যায়। বস্তুত এই দ্বিতীয় অর্থটিই ভগবান শিবের 'কাম' নামকরণের তাৎপর্য্য বহন করে। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের 'কাম' নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

কামঃ স্মরো'ভিলাষো বা তদ্রূপঃ।

অথবা কামঃ কাম্যমানঃ স্ত্র্যাদিবিষয়রূপঃ।

ভগবান শিব অসামান্য সুন্দর দর্শন বলেই তিনি স্বয়ংই কামস্বরূপ।

শাস্ত্রে পুরুষার্থ বলে একটা কথা আছে, পুরুষার্থ মানে পুরুষের প্রয়োজন বা মানুষের প্রয়োজন। প্রধানত চারটি প্রয়োজনের পিছনেই মানুষ ছুটে বেড়ায় এবং সেগুলি হল যথাক্রমে —ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—

ধর্মার্থকামমোক্ষাশ্চ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ।

এই চতুর্বিধ পুরুষার্থ বা প্রয়োজনের মধ্যে অন্যতম কাম। এই কাম মূলত জাগতিক কামনা বাসনার দ্যোতক, মানুষের মনে যে যে জাগতিক অভিলাষ জন্ম নেয় তার সমার্থক। ভগবান শিব সেই জাগতিক কামনার স্বরূপ, তাঁর কৃপাতেই মানুষের সমস্ত অভীষ্ট লাভ হয়—এই ভাবনা থেকে কাম মহাদেবের অন্যতম নাম, অথবা তিনি নিজেই তাঁর ভক্তের কাছে সবথেকে কাম্য, অভীষ্ট বা প্রিয় বস্তু, তাঁর কৃপা, তাঁর করুণা লাভ করেই ভক্তের সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, জীবন সার্থক হয়। এই ভাবনা থেকেও ভগবান শিব কাম নামে সম্বোধিত হন।

[মহা (k) ১৩.১৭.৪২, ৭০; (হরি) ১৩.১৬.৪২, ৭০]

কাম২ মানুষের মনের মধ্য ছয়টি শত্রু আছে, যাকে পারিভাষিক ভাষায় 'যড়্বর্গ' 'অরি-ষড়্বর্গ', অথবা ষড়-রিপু ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয়। সেই ছয় রিপুর নাম যথাক্রমে বললে প্রথম নামই হল কাম—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য।

ষড়রিপুর অন্তর্গত কাম প্রধানত যৌন কামনার সূচক, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিশদর্থে কাম সমস্ত ভোগ্য বস্তু লাভ করার মানসিকতাকেই বোঝায়। একেবারে যৌন কামনার অর্থে কামশব্দের প্রয়োগ মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণে বহুবার আছে নানান ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে; এমনকী কোনো সুন্দরী রমণীকে দেখামাত্রই পুরুষের কিংবা বলবান পুরুষকে দেখামাত্রই স্ত্রীলোকের ইন্দ্রিয় মথিত করা

কামের প্রাদুর্ভাবও বহুলভাবে বর্ণিত হয়েছে মহাকাব্য-পুরাণে এবং তা এমনভাবেই যেখানে একজন পুরুষ নির্দিষ্ট কোনো রমণীর সামনেই, কিংবা রমণীও পুরুষের সামনেই তা প্রকটভাবে ব্যক্ত করেছে।

মহাভারতে সম্বরণ-তপতীর উপাখ্যানে সম্বরণ যখন তপতীকে দেখে মুগ্ধ হলেন, তখন সামনাসামনি তপতীকে নিজের ইন্দ্রিয়বাসনার কথা জানিয়ে বললেন—সুন্দরী আমার! আজকে তোমার জন্যই সমস্ত কামনা আমাকে তীক্ষ্ণ শরে যেন বিদ্ধ করছে এবং তার শান্ত হবার কোনো সম্ভবনা দেখছি না। কাম যেন বিষসর্প, সে দংশন করেছে আমাকে—

* কামঃ কমলগর্ভাভে প্রতিবিধ্যন্ ন শাম্যতি।
দষ্টমেবমনাক্রন্দে ভদ্রে কামমহাহিনা॥

* কামঃ কমলপত্রাক্ষি প্রতিবিধ্যতি মাময়ম্।

এ যেমন এক রমণীর কাছে পুরুষের কামজল্পনা, তেমনই পুরুষের কাছেও রমণীর স্পষ্ট কামেচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে। হিড়িম্বা রাক্ষসী ভীমের কাছে এসে বলেছিলেন—দুরন্ত কামনা আমার মন এবং সমস্ত অঙ্গ নিপীড়িত করছে, আমি যেভাবে তোমাকে চাইছি, তুমিও সেভাবেই আমাকে চাইতে পারো—

কামোপহতচিত্তঙ্গীং ভজমানাং ভজস্ব মাম্।

হয়তো বা হিড়িম্বা রাক্ষসী বলেই শুধু ভীমের কাছে নয়, পাণ্ডবজননী কুন্তীর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ভীমের ব্যাপারে কামনা জানিয়ে বলেছিলেন—আর্যে, মেয়েদের যৌন-কামনার কষ্টটা কীরকম হতে পারে, তা অন্তত তুমি তো জানো, ভীমের জন্য আমার সেই কষ্ট হচ্ছে—

আর্যে জানাসি যদ্দুঃখামিহ স্ত্রীণামনঙ্গজম্।
তদিদং মামনুপ্রাপ্তং ভীমসেনকৃতং শুভে॥

একেবারে সামনাসামনি কামভাবের এই বর্ণনা রামায়ণেও প্রচুর আছে। অরণ্যকাণ্ডে সীতাহরণের পূর্বে রাক্ষসরাজ রাবণ সীতার শারীরিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করেছেন সামনাসামনি। সীতার স্তন-জঘনের বর্ণনাও সেখানে বাদ যায়নি এবং তারপরেই রাবণ নিজের উদগ্র কামনা প্রকাশ করেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। সীতাকে তিনি বলেছেন—কামনার বাণে আমার শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আছে, আমাকে তুমি প্রত্যাখ্যান করতে পারো না, কামনা করো আমাকে—

রক্ষ রাক্ষসভর্তারং কাময় স্বয়মাগতম্।
ন মন্মথশরাবিষ্টং প্রত্যাখ্যাতুং ত্বমর্হসি॥

এই ধরনের কামনা অনার্যবৃত্তি রাক্ষসরাজ রাবণেরই উপযুক্ত, কেননা শুধু সীতার ক্ষেত্রে যেমন পরস্ত্রীর প্রতি কামনা 'উদগ্র' বলে বিবেচিত হতে পারে, তেমনই এই কামনা বৈধ সম্পর্কগুলিও মলিন করে দিতে পারে, তেমন উদাহরণ রাবণই প্রকট করেছেন অপ্সরা রম্ভাকে সম্ভোগ করার প্রাক্‌কালে। রম্ভা কুবেরপুত্র নলকূবরের স্ত্রী বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন রাবণের কাছে। রাবণ কুবেরের ছোটো ভাই, সম্পর্কে রম্ভা তাঁর পুত্রবধূ হতে পারেন। রম্ভা এই পরিচয় দিলেও সেদিন সন্ধ্যাকালে প্রাকৃতিক শোভার উদ্দীপনে রাবণ কামনার বশীভূত ছিলেন ফলে রম্ভার সঙ্গে সম্ভোগে লিপ্ত হওয়ার পিছনে শারীরিক কামনা ছাড়া রাবণের আর কিছুই ছিল না—

*প্রবৃত্তায়াং রজন্যাঞ্চ চন্দ্রস্যোদয়নেন চ॥
রাবণঃ স মহাবীর্যঃ কামস্য বশমাগতঃ।
বিনিশ্বস্য বিনিশ্বস্য শশিনং সমবৈক্ষত॥

* কামভোগাভিসংরক্তো মৈথুনায়োপচক্রমে।

এখানে এটাও বলা দরকার যে, শারীরিক যৌনতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে 'কাম' সেখানে শুধুমাত্র অনার্য রাক্ষস-অসুর-দানবদেরই পদচারণা ঘটে এমন নয়, নিতান্ত আর্য পরিশীলনের মধ্যেও শারীরিক কামনার উদগ্র প্রকাশ ঘটতে পারে এমন উদাহরণ তো একপত্নীব্রত রামচন্দ্রকে দিয়েই দিয়েছেন বাল্মীকি। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দেখা যাচ্ছে—বর্ষারম্ভের কারণে সীতার অন্বেষণ করা যাচ্ছে না। এদিকে বানররাজ সুগ্রীব বালী-পত্নী তারার ভোগাধিকার লাভ করে রতি সুখে মত্ত হয়েছেন। এই অবস্থায় সীতাবিরহী রামচন্দ্র অপেক্ষা করতে লাগলেন। দীর্ঘ অপেক্ষার পর শরৎকাল এল। সমস্ত প্রকৃতি সুপ্রসন্ন হয়ে উঠল। এই সময়ে বিরহী রামচন্দ্র নিজেও যেমন সীতার সঙ্গ পাবার জন্য কামনায় দগ্ধ হচ্ছেন, তেমনই কামনার আধার দূরস্থানে থাকায় সীতাও কতখানি কষ্ট পেতে পারেন, সেটা অনুমান করে রামচন্দ্র বলছেন—শরৎকালের সমস্ত রূপ-সৌন্দর্য্য প্রকট হওয়ায় আমার প্রতি কামনা সীতাকে না জানি কত কষ্ট দিচ্ছে—

সুদূরং পীড়য়েৎ কামঃ শরদ্‌গুণ-নিরন্তরঃ।

—সীতার ইঙ্গিতে রামচন্দ্র নিজের কামনাই

এত প্রতীত করে ফেলেছেন যে, লক্ষ্মণের মতো রামবশংবদ পুরুষও রামচন্দ্রকে এই উদগ্র কামনার জন্য তিরস্কার করে বলেছেন—আর্য! তুমি কামের বশীভূত হয়ে অকারণে নিজের পৌরুষ নষ্ট কোরো না—

কিমার্য কামস্য বশঙ্গতেন
কিমাত্মপৌরুষ্য-পরাভবেন।

[মহা (k) ১.১৭২.৮-১১; ১.১.১৫২.২৮; ১.১৫৫.৫; (হরি) ১.১৬৫.৮-১১; ১.১৪৬.২৯; ১.১৪৯.৫; রামায়ণ ৩.৪৮.১৭; ৭.৩১.১২-১৩, ৪০-৪১; ৪.৩০.১৬]

□ রামায়ণ-মহাভারতের মতো পুরাণগুলিতেও প্রকট কামনার এমন উদাহরণ অনেক আছে এবং বিশিষ্ট এবং প্রতিবিশিষ্ট এইসব বড়ো মানুষের বিপ্রতীপে সাধারণ্যের কথা যখন আসে, তখন এই কামনার পরিশীলনের অভাব এতটাই উদগ্র হয়ে ওঠে, যেটা 'রিপু', হয়ে দাঁড়ায়। ষড় রিপুর অন্যতম রিপু হিসেবে সেই কারণেই 'কাম' মানসিক শত্রু হিসেবে গণ্য হয়। লক্ষণীয়, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে সাধারণ্যে ব্যবহৃত এই 'ষড় রিপু' কথাটি না বলে 'রিপু' শব্দের পর্যায় শব্দ 'শত্রু' কিংবা 'অরি' শব্দ ব্যবহার করে কামকে শত্রুষড়্‌বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং উন্নতিকামী রাজাদের উদ্দেশে সাবধান করে বলা হয়েছে—দিগ্‌বিজয়ী রাজারাও ষড়রিপুর বশীভূত হয়ে আত্মীয়-স্বজনসহ রাজ্য হারিয়েছেন, যেমন কামনার বশীভূত হয়ে ভোজরাজ দাণ্ডক্য অথবা বিদেহদেশের রাজা করাল—

তদ্‌বিরুদ্ধবৃত্তিরবশেন্দ্রিয়-
শ্চাতুরন্তো'পি রাজা সদ্যো বিনশ্যতি।
যথা দাণ্ডক্যো নাম ভোজঃ
কামাৎ . . . করালশ্চ বৈদেহঃ।

[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (kangle) ১ম খণ্ড, ১.৬.৪-৫, ১১-১২]

□ ষড় রিপু বা অরিষড়্‌বর্গের একতম হওয়া সত্ত্বেও কাম অধিকাংশ সময় অন্যতর এক প্রধান রিপু ক্রোধের সঙ্গে একই বন্ধনীতে এসেছে। মহাভারতে তো বটেই রামায়ণ-পুরাণেও কাম-ক্রোধের এই একত্র উচ্চারণ বহুলভাবে শোনা যায়। হয়তো বা এই কারণেই মহাভারতের এক জায়গায় বলা হয়েছে—ক্রোধকে কামের সহায় হিসেবেই সৃষ্টি করেছিলেন ভগবান, তাতে একই সঙ্গে মানুষ কাম এবং ক্রোধে আসক্ত হয়—

ক্রোধং কামস্য দেবেশঃ সহায়ং চাসৃজৎ প্রভুঃ।
অসজ্জন্ত প্রজাঃ সর্বাঃ কমক্রোধবশং গতাঃ॥

কামের বৃত্তি এক প্রকার, তার প্রতিক্রিয়াও ক্রোধের প্রকার থেকে অন্যরকম, সেখানে কাম এবং ক্রোধের একত্র উচ্চারণ প্রায়শই কেন দেখা যায়, তার দার্শনিক ব্যাখ্যা ভগবদ্‌গীতায় শ্লোকে বলা হয়েছে—

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ
ক্রোধো'ভিজায়তে।

—অর্থাৎ কিনা কাম থেকেই ক্রোধের জন্ম হয়। টীকাকার শঙ্করাচার্য এবং শ্রীধরস্বামী দুজনেই একবাক্যে বলেছেন—কাম কিংবা কামনা যদি কোনো ভাবে প্রতিহত হয়, তাহলেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়—

তস্মাৎ কামাৎ কুতশ্চিৎ
প্রতিহতাৎ ক্রোধো'ভিজায়তে।

অর্থাৎ যৌন কামই হোক অথবা অন্য কোনো কামনা—তাঁর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা তৈরি হলেই তখন ক্রোধের উৎপত্তি হয়।

[মহা (k) ১৩.৪০.১০-১১; (হরি) ১৩.৩৫.২৪-২৫; ভগবদ্‌গীতা ২.৬২ শঙ্করাচার্য এবং শ্রীধর স্বামী-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য]

□ কামভাব যেখানে যৌনতার রূপ নেয়, সেটাকে অনেক সময়েই অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণে 'কামাগ্নি' শব্দটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে সহস্রবার উচ্চারিত; এমনিতে কাম অগ্নির একটি নামও বটে—পৃথিবীতে অন্য কোনো দাহক বস্তুর সঙ্গে তীব্র কামাগ্নতার তুলনা হয় না বলেই অগ্নির এক নামই কাম, কিংবা কামের এক নামই হল অগ্নি—

ত্রিদিবে যস্য সদৃশো নাস্তি রূপেণ কশ্চন।
অতুলত্বাৎ কৃতো দেবৈর্নাম্না কামস্তু পাবকঃ॥

মহাভারতে মহারাজ যযাতির ওপর যখন শুক্রাচার্যের অভিশাপ নেমে এল, তখন তিনি জরার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য শুক্রাচার্যের মেয়ে এবং তাঁর নিজের স্ত্রীর নাম করে যযাতি বলেছিলেন—দেবযানীর যৌবন উপভোগ করে তৃপ্তি-শেষ ঘটেনি তাঁর, তিনি আরও ভোগ করতে চান। শুক্রাচার্য এই প্রার্থনা স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে জরামুক্তির উপায় বলে

দিলেন। যযাতি শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরুকে জরা দান করে বহুকাল বিশ্বাচী অপ্সরার সঙ্গসুখ উপভোগ করলেন। অবশেষে তিনি যখন কামোপভোগের প্রকৃত সত্যটুকু উপলব্ধি করলেন, তখনও কামকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করেই যযাতি সেই বাক্যটি বলেছেন যেটা মহাকাব্যিক প্রবাদগুলির অন্যতম। যযাতি বলেছেন— উপভোগ এবং আরও যৌন উপভোগ করে কাম কখনো শান্ত হয় না। আগুনে ঘি ঢাললে আগুন যেমন আরও বেশি তীব্র হয়, তেমনই বারংবার উপভোগও কামভোগের ইচ্ছাকে আরও তীব্রতর করে তোলে—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ততে॥

[মহা (k) ৩.২১৯.২৩; ১.৮৫.১২;
(হরি) ৩.১৮২.৩১; ১.৭৩.১২;
বায়ু পু. ৯৩.৯৫; ভাগবত পু. ১.২.৯-১০]

কাম৩ চার প্রকার পুরুষার্থের মধ্যে কাম অন্যতম। পুরুষার্থ মানে মানুষের প্রয়োজন। প্রধানত চার প্রয়োজনের পিছনে মানুষ ছুটে বেড়ায় এবং সেগুলি হল—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—

ধর্মার্থকামমোক্ষাশ্চ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ।

চতুর্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে অন্যতম হল কাম। এই চারটি পুরুষার্থকে চতুর্বর্গও বলে, এখানে তৃতীয় বর্গ হল কাম। পুরুষার্থ হিসেবে কামের যে উপযোগিতা আছে, সেটা কাম অবশ্যই পুরুষ-রমণীর যৌনতাবোধক কাম নয়। কাম শব্দটা সেখানে অনেকটাই বিশদর্থে ব্যবহৃত হয় এবং বিশদার্থিক বলেই সে কাম অন্য দুই পুরুষার্থ ধর্ম এবং কাম পুরুষার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়। ধর্ম এবং অর্থের সঙ্গে অসংপৃক্ত শারীরিক কামই যদি মানুষের পুরুষার্থ বা 'ultimate goal' হয়ে ওঠে, তাহলে সে কাম কিন্তু চতুবর্গের মধ্যে সবচেয়ে অধম হয়ে ওঠে। এখানে রামায়ণে রামপিতা দশরথের উদাহরণ দিতেও সংকুচিত হননি কবি। বলেছেন, অর্থধর্ম পরিত্যাগ করে কামের সেবা করলে, তার অবস্থা হয় দশরথের মতো—

অর্থধর্মৌ পরিত্যজ্য যঃ কামমনুবর্ততে।
এবমাপদ্যতে শীঘ্রং/রাজা দশরথো যথা॥

অন্যত্র রামায়ণেই বলা হয়েছে—ধর্মার্থ পরিত্যাগ করে যে কামের সেবা করে, সে গাছের ডালে ঘুমিয়ে থাকা মানুষের মতো ঘুমের ঘোরে হঠাৎ পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারে না—

হিত্বা ধর্মং তথার্থঞ্চ কামং যস্তু নিষেবতে।
স বৃক্ষাগ্রে যথা সুপ্তঃ/পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে॥

হয়তো এই কারণেই কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন পর্যন্ত 'কাম'কে চরম পুরুষার্থ হিসেবে না দেখে একসঙ্গে ধর্মার্থকামের প্রতি নমস্কার প্রণাম জানিয়েছেন—

ধর্মার্থকামেভ্যো নমঃ।

[রামায়ণ ২.৫৩.১৩; ৪.৩৮.২১-২২; ৪.৩৩.৫৫;
কামসূত্র (বিদ্যাবিলাস প্রেস); ১.১.১; পৃ. ২]

□ পুরুষার্থ হিসেবে কামের একটা ভূমিকা অবশ্যই আছে, তবে সে কাম কখনোই লালসা বা ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা নয়। উপভোগ এবং আরও উপভোগের দ্বারাও যেহেতু কামের তৃপ্তি হয় না, অতএব কামকে সবসময়েই ধর্ম বা অন্তর্জাত মানসিক শৃঙ্খলার সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। একটি গৃহস্থের জীবনে কামের স্থান ততটাই, যতটাতে আমাদের সংসারচক্রের গতি রুদ্ধ না হয়। তবু শুধু এক গৃহী ব্যক্তিরই সামান্য স্বাধীনতা আছে কামের ব্যবহারে, অন্য কারও নয়। পণ্ডিতেরা একে বলেছেন— 'biological motivating force'। কামের মাধ্যমে একটি মানুষ যেমন রতিসুখ তথা সন্তানসুখ লাভ করে, তেমনই কামই তাকে কর্মে প্রবৃত্ত করে।

ব্যাপারটা বৃহদারণ্যক উপনিষদ আরও ভালো করে বুঝিয়েছে। উপনিষদ বলেছে— এই যেমন লোকে বলে-সংসারী জীব সম্পূর্ণটাই কামময়। সেখানে বুঝতে হবে—সে যেমনটি কামনা করছে সেই অনুসারে তার সংকল্প তৈরি হচ্ছে—

স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি।

এখানে শংকরাচার্য অর্থ করেছেন—'ক্রতু' হচ্ছে অধ্যবসায়, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, যার তাড়নায় মানুষ কাজ করতে নামে। বৃহদারণ্যক আরও বলেছে—মানুষ যেমনটি সংকল্প করে, তেমন কর্মেই প্রবৃত্ত হয়, আর যে কর্মে প্রবৃত্ত হয় সেই কর্মের ফল সে লাভ করে—

যৎ-ক্রতুর্ভবতি, তৎকর্ম কুরুতে,
যৎ কর্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে।

বৃহদারণ্যকের এই পঙ্‌ক্তি থেকেই বোঝা যায় যে, কাম যদি শুধু ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে কোনো সংকল্পের মধ্যে শৃঙ্খলিত হয় তবে সেই

কামই কিন্তু তার পূর্বপুরুষার্থ 'অর্থ' এবং ধর্মকে করে নিয়ে আসতে পারে।

মহাভারতের যুদ্ধশেষে সমস্ত স্বজন হারিয়ে যুধিষ্ঠির যখন আর রাজা হতে চাইছেন না, তখন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন যুধিষ্ঠিরের বৈরাগ্যসূচক কথাবার্তার প্রতিরোধ করে বলছেন—

এত দুঃখ পেলাম, এত কষ্ট করলাম, আর তারপর এই অদ্ভুত তোমার মূঢ়তা—তুমি বলছ কিনা রাজ্য ছেড়ে চলে যাব! এতদিনে শত্রুবধ করে এই পৃথিবীর অধিকার লাভ করলাম, সেখানে সব ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবাটা যে একেবারেই বুদ্ধিহীনতা হবে। দেখো, ক্লীব মানুষেরা কি রাজ্য পায়? নাকি অলস লোকেরাই রাজ্য পায়—

ক্লীবস্য হি কুতো রাজ্যং দীর্ঘসূত্রস্য বা পুনঃ?

লক্ষ করে দেখুন, তৃতীয় পুরুষার্থ কামের কথা অর্জুন না উচ্চারণ করলেও তিনি যখন যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—ক্লীব অথবা আলস্যপরায়ণ মানুষের রাজ্যলাভ হয় না, অথবা যখন বলেছেন—নিশ্চেষ্ট (সর্বারম্ভান্ পরিত্যজ্য) ভিখারি রাজ্য নিয়ে কী করবে—তখনই কিন্তু তিনি সেই সংকল্পাত্মক অধ্যবসায়ের কথা বলে দিয়েছেন, যাকে বৃহদারণ্যক বলেছে ক্রতু, শংকর বলেছেন অধ্যবসায় এবং যার মূলে আছে সেই কাম।

[Y. Krishnan, 'The Meaning of the Puruṣārthas in The Mahabharata'. In Moral Dilemmas in the Mahabharata, (Ed. Bimal Krishna Matilal, Delhi) p. 59; বৃহদারণ্যক উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ৪.৪.৫; শঙ্করাচার্যের টীকা দ্রষ্টব্য; মহা (k) ১২.৮.৩-৯; (হরি) ১২.৮.৩-৯]

☐ বৃহদারণ্যক উপনিষদ যে 'ক্রতু' বা সংকল্পের কথা বলেছিল, সেই সংকল্পই বস্তুত মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে এবং সেই সংকল্পই কাম—কেননা এখানে বৃহদারণ্যক সেই বিরাট পুরুষকে, বলা উচিত সৃষ্টিকর্মে উদ্যত সেই পুরুষকে 'কামময়' বলে বর্ণনা করেছে এবং বলেছে—সেই কামময় পুরুষ যেভাবে কামনা বা সংকল্প করেন, সেইভাবেই তাঁর অধ্যবসায় তৈরি হয়—

অথ খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি,
স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি।

হয়তো এই কারণেই ভাগবত পুরাণে কামকে সংকল্পের পুত্র বলা হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত এই কাম যে, কর্মপ্রবৃত্তিমূলক সংকল্প, সেটা মহাভারত খুব পরিষ্কারভাবে জানিয়ে বলেছে—সনাতন সেই সংকল্পকেই 'কাম' নামে সম্বোধিত করা হয়, সেই কাম-সংকল্প থেকেই ভগবান রুদ্রের তেজোবীর্য অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল—

সনাতনো হি সংকল্প কাম ইত্যভিধীয়তে।
রুদ্রস্য তেজঃ প্রস্কন্নমগ্নৌ নিপতিতং চ যৎ॥

মহাভারত এই কামকে হৃদয়ের মধ্যে শায়িত এক হৃদ্‌বৃত্তি বলার সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানিয়েছে যে, মনুষ্য প্রকৃতির সনাতনতম বৃত্তি বলেই এই সংকল্পাত্মক কাম ভগবান রুদ্রের থেকেও বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো জগদীশ্বর যা প্রাণীমাত্রেই সকলের মধ্যে আছে এবং সমস্ত ভাবের মধ্যই আছে—

সংকল্পাভিরুচিঃ কামঃ সনাতনতমো'ভবৎ॥
জগৎপতিরনির্দেশ্যঃ সর্বগঃ সর্বভাবনঃ।
হৃচ্ছয়ঃ সর্বভূতানাং জ্যেষ্ঠো রুদ্রাদপি প্রভুঃ॥

টীকাকার নীলকণ্ঠ এই কামাত্মক সংকল্পকে প্রাণীজগতের অপত্য বিষয়ক অভিরুচি বলেছেন, যা প্রত্যেকটি প্রাণীরই সৃষ্টি বিষয়ক কর্মপ্রবৃত্তি তৈরি করে—হয়তো এটাকেই গবেষকেরা আধুনিক ভাষায় জানিয়েছেন—'The biological motivating force having a twofold purpose: preservation and perpetuation—যাকে অন্য ভাষায় বলে reproduction and sustenance—এটাই বস্তুত লোকযাত্রা। এতটাই পুরাতন এই সৃষ্টি সহায়ক কামবৃত্তি যে, তাকে ধর্মের সঙ্গে একই পংক্তিতে রেখে এই ধরণীর ধারণকারী বৃত্তি হিসেবে ভগবৎপ্রতিম সপ্ত ধরণীধরদের একজন বলে বর্ণনা করেছে মহাভারত—

ধর্মঃ কামশ্চ কালশ্চ বসুর্বাসুকিরেব চ।
অনন্তঃ কপিলশ্চৈব সপ্তৈতে ধরণীধরাঃ॥

[মহা (k) ১৩.৮৫.১১; ১৩.৮৫.১৬-১৭; ১৩.১৫০.৪১; (হরি) ১৩.৭৪.১১; ১৩.৭৪.১৬-১৭; ১৩.১২৮.৪০; ভাগবত পু. ৬.৬.১০]

☐ স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের হৃদিস্থিত যে বৃত্তি মানুষকে সংকল্পাত্মক কর্মে প্রবৃত্ত করে, যা সাহায্য করে লোকযাত্রার পরম্পরা সৃষ্টিতে— Preservation and perpetuation—সেটা যে

অন্যতম পুরুষার্থ হয়ে উঠবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মহাভারতে পাণ্ডব ভাইদের মধ্যে কুন্তীর পুত্র তিন ভাইকে তিনটি পুরুষার্থের প্রতীক বলে মানা হয়। যুধিষ্ঠির তো স্বয়ং ধর্মপুত্র, তিনি ধর্মের পক্ষে থাকবেন, ধর্মই সেখানে অন্বেষ্টব্য পুরুষার্থ। অর্জুন এখানে অর্থ-পুরুষার্থের প্রতীক, অন্যদিকে ভীম এখানে কাম-পুরুষার্থের কথা বলেন। লক্ষণীয়, ভীম কিন্তু কোনোভাবেই 'অনঙ্গ-বাণ-ব্রণ-খিন্ন-মানস', যৌনকামনাময় কোনো কামী পুরুষ নন, রামায়ণের দশরথ কিংবা সুগ্রীবের কামময়তার সঙ্গেও তাঁর জীবনযাত্রা মেলে না, ফলত তিনি যখন কামকে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ বলে চিহ্নিত করেন, তখন আমরা বুঝতে পারি কতটা বিশদ দৃষ্টিতে তিনি কামকে চতুবর্গের মধ্যে অন্যতম প্রধান পুরুষার্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছেন।

লক্ষণীয়, যুধিষ্ঠির যখন পাশাখেলায় হেরে বনবাসে দিন কাটাচ্ছেন, তখন সেই নিরুদ্যম নিরুৎসাহ জীবনের মধ্যে দ্রৌপদী একদিন তিরস্কার করলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির সেই তিরস্কার শুনেও আপন ধর্মপ্রাণতা প্রকাশ করলেন প্রতিতিরস্কারের মতো করে। এই অবস্থায় ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে জানালেন—একজন ক্ষত্রিয় রাজা রাজ্য হারিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেখানে ধর্ম-অর্থ-কাম কোনোটারই সিদ্ধি নেই—

ধর্মকামার্থহীনানাং কিং নো বস্তুং তপোবনে।

ভীমসেন ধর্ম এবং অর্থের কথা বলতে বলতে একটু একটু কাম-পুরুষার্থের প্রাথমিক প্রয়োজনের তাৎপর্য্য নির্ণয় করছেন। বললেন —ধর্ম, সরলতা, কিংবা পরাক্রম, এর কোনোটা দিয়েই দুর্যোধন আমাদের রাজ্য হরণ করেনি, রাজ্যহরণ করেছে দ্যূতক্রীড়ার ছলে। আর সেখানে তুমি প্রতিজ্ঞা-পালনের মতো ক্ষুদ্র একটা ধর্মের সঙ্গে সম্বদ্ধ হয়ে বৃহৎ পরিমাণ ধর্ম এবং কামের উৎপাদক যে রাজ্যধন, সেটাই পরিত্যাগ করেছো। তুমি ধর্ম ধর্ম করে যেভাবে ধর্মব্রতের ক্লেশ সহ্য করছো, সেটা অনেকটাই যেন নপুংসকের জীবন। ভীম কিন্তু রাজাদের একমাত্র অনুসন্ধেয় পুরুষার্থ অর্থের জয়গান করছেন না; তিনি বলছেন—যে লোক অত্যন্ত অর্থপরায়ণ হয়ে ধর্ম এবং কামের অনুষ্ঠান করে না, সেও যেমন নিন্দিত মানুষ, তেমনই যে লোক কামপরায়ণতাবশত ধর্ম এবং অর্থের অনুষ্ঠান করে না, তারও কোনো বন্ধু থাকে না, ধর্ম এবং অর্থই বস্তুত কাম-পুরুষার্থের সিদ্ধি ঘটায়—

প্রকৃতিঃ সা হি কামস্য পাবকস্যারণির্যথা।

ধর্ম এবং অর্থের সামঞ্জস্য দেখানোর পর ভীম এবার কাম-পুরুষার্থের সংজ্ঞা নির্ধারণ করছেন ঔপনিষদিক পরম্পরায়। ভীম বলছেন—এই কাম হল এক ধরনের চিত্তসংকল্প যার কোনো রূপ নেই, মূর্তি নেই। স্ত্রীলোক কিংবা অন্য কোনো কাম্য বস্তুর স্পর্শ লাভ হলে যে আনন্দ হয় অর্থলাভ হলে যে আনন্দ হয়, সেই সানন্দ চিত্তসংকল্পের নামই কাম—

দ্রব্যার্থস্পর্শসংযোগে যা প্রীতিরুপজায়তে।
স কামশ্চিত্তসংকল্পঃ শরীরং নাস্য দৃশ্যতে॥

কামকে ভীম দেখছেন অর্থের 'Outcome' বা ফল হিসেবে। তাঁর বক্তব্য—ধনার্থী লোক প্রচুর ধর্মের ইচ্ছা করে এবং কামার্থী লোক অর্থের ইচ্ছা করে এবং অর্থ লাভ হলে অর্থার্থী মানুষ কাম ছাড়া আর কিছু চায় না। তাতে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায় যে, অর্থ থেকে কাম হয়, কিন্তু কাম থেকে আর কাম হয় না, কেননা ফলেরই ভোগ হয়, তাই কামের ভোগ হয় বলে কাম কেবলই ফল-মাত্র। ঠিক যেমন কাঠে আগুন লাগালে ভস্ম হয়। কিন্তু ভস্ম থেকে আর ভস্ম হয় না, তেমনই অর্থ থেকে কাম হয় কিন্তু কাম থেকে আর কাম হয় না, কেননা কাম অর্থের ফল—

ন হি কামেন কামো'ন্যঃ সাধ্যতে ফলমেব তৎ।
উপযোগাৎ ফলস্যেব কাষ্ঠাদ্ ভস্মেব পণ্ডিতঃ॥

মহাভারতে ভীম কামের উপযোগিতা স্বীকার করছেন, পুরুষার্থ হিসেবেও তার প্রাথমিকতা স্বীকার করছেন, কিন্তু কামকে কখনোই তিনি অর্থ-ধর্ম থেকে বিযুক্ত করছেন না। তিনি আবারও বলছেন—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সঙ্গে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পর্শের মতো বিষয়ের সংযোগ হওয়ার পর মন এবং চিত্তের যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দের অভিলাষই কাম। সমস্ত কর্মের ফল এটাই—

ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ পঞ্চানাং মনসো হৃদয়স্য চ।
বিষয়ে বর্তমানানাং যা প্রীতিরুপজায়তে॥
স কাম ইতি মে বুদ্ধিঃ কর্মণাং ফলমুত্তমম্।

অর্থ এবং ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভীম কামোপভোগের একটা পৃথক সময় চিহ্নিত করে

বলেছেন—পূর্বাহ্নে ধর্মের, মধ্যাহ্নে অর্থের এবং অপরাহ্নে কামের সেবা করবে। এবার দিবসের বিভাগ ছেড়ে দিয়ে বয়সের বিভাগ করে ভীম বলেছেন—যৌবনে কামের সেবা করবে, প্রৌঢ় বয়সে ধনের এবং বার্ধক্যে ধর্মের সেবা করবে—

ধর্মং পূর্বে ধনং মধ্যে জঘন্যে কামমাচরেৎ।
অহন্যনুচরেদেবমেবমেষ শাস্ত্রকৃতো বিধিঃ॥
কামং পূর্বে ধনং মধ্যে জঘন্যে ধর্মমাচরেৎ।
বয়স্যনুচরেদেবমেষ শাস্ত্রকৃতো বিধিঃ॥

[মহা (k) ৩.৩৩.২-৪২; (হরি) ৩.২৯.২-৪১]

□ বনপর্বে এতক্ষণ যে কাম-বিষয়ক কথাগুলি ভীমের মুখে শোনা গেল, এই কথার মূলেও স্ত্রী-পুরুষের যৌনতার সংজ্ঞাটুকুই বেশি ছিল বলেই পুরুষার্থ হিসেবে অর্থ এবং ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভীমকে কথা বলতে হয়েছে। কাম যেখানে পুরুষার্থ হয়ে ওঠে সেখানে ওই চিত্তসংকল্পের সঙ্গে নানান কর্মের উৎসাহ এবং উদ্দীপনাই বড়ো হয়ে ওঠার কথা, এবং কাম থেকেই সেখানে অর্থ এবং ধর্মের প্রবৃত্তি হবার কথা। পুরুষার্থ-প্রয়োজন হিসেবে কামের এই ভূমিকার কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেই ভীমের মুখেই, কিন্তু সেটা একেবারে মহাভারতের শান্তিপর্বে।

এখানে শরশয়ান ভীষ্মের কাছে উপদেশ শোনার পর ঘরে এসে যুধিষ্ঠির তাঁর চার ভাই এবং বিদুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—ধর্ম, অর্থ এবং কামের মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ? স্বাভাবিক ভাবেই বিদুর ধর্মকে পুরুষার্থ হিসেবে প্রধান বলে চিহ্নিত করলেন এবং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এটা যুধিষ্ঠিরেরও মত, কেননা যুধিষ্ঠির বিদুরের দ্বিতীয় আত্মা। অর্জুন বললেন অর্থের পক্ষে, তিনি পূর্বেও অর্থ-পুরুষার্থের পক্ষে কথা বলেছেন। কিন্তু এবারে ভীমের বক্তব্য পূর্বের থেকে অনেক স্পষ্ট হল।

ভীম বললেন—কামনাহীন মানুষ, যার কোনো ইচ্ছে নেই, সংকল্প নেই, নির্বিকার, এমন মানুষ অর্থও লাভ করে না, ধর্মও লাভ করে না, কামনাহীন মানুষ কিছুই করে না—অতএব কামই ত্রিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ—

নাকামঃ কাময়ত্যর্থং নাকামো ধর্মমিচ্ছতি।
নাকামঃ কাময়ানো'স্তি তস্মাৎ
কামো বিশিষ্যতে॥

ভীম বলেছেন—এত যে বৈরাগী মুনি-ঋষিরা, তাঁরাও স্বর্গাদি কামনা করেই সংযত হয়ে ফল-মূল-পত্র ভক্ষণ করে তপস্যা করেন। আবার বিশেষ বিশেষ কামনা নিয়েই কেউ বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত পড়ছেন, কেউ স্বাধ্যায়-অধ্যয়ন করছেন, কিংবা যাগ-যজ্ঞ করছেন, দান-প্রতিগ্রহ করছেন—কিন্তু কামনাবশতই তো এসব কর্ম করছেন তাঁরা। অন্যদিকে যারা বণিক, কৃষক, গোপ, কারুশিল্পী অথবা নানান দেবকর্মে নিযুক্ত আছেন এমন লোক, তাঁরাও তো কামবশতই আপন আপন কর্মে প্রবৃত্ত হন। কাম তাই নানা প্রকার এবং সমস্ত বিষয়েই কাম ব্যাপ্ত হয়ে আছে। কামনা ছাড়া কোনো মানুষ আগে ছিল না, এখনও নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না, অতএব কামই ত্রিবর্গের সার এবং ধর্ম এবং অর্থ কামের ওপরেই নির্ভর করে—

কামো হি বিবিধাকারঃ সর্বং কামেন সন্ততম্।
নাস্তি নাসীন্নাভবিষ্যদ্ভূতং কামাত্মকাৎ পরম্।
এতৎ সারং মহারাজ ধর্মার্থাবত্র সংস্থিতৌ॥

ভীম কতগুলি অসাধারণ উপমা দিয়ে কামকে ত্রিবর্গীয় পুরুষার্থের মধ্যে কামের প্রথমতা এবং প্রধানতা, দুয়েরই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—ননী যেমন দুধের সার, তেমনই কামও ধর্ম এবং অর্থের সার। তিলের কল্ক অর্থাৎ তিল থেকে যেমন তেল বেশি ভালো, ঘোলের চাইতে যেমন ঘি বেশি ভালো, বৃক্ষকাষ্ঠ থেকে যেমন পুষ্প এবং ফল বেশি ভালো, তেমনই কামও ধর্ম এবং অর্থের চাইতে বেশি ভালো। কামই ধর্ম এবং অর্থের কারণ। ব্রাহ্মণেরা কোনো কামনা ছাড়াই ব্রাহ্মণদের উত্তম পান-ভোজনও দান করেন না, অর্থও দান করেন না। আর কামনা ছাড়া কোনো মানুষের কোনো চেষ্টা-প্রয়াসই লক্ষ্য করা যায় না। ফলত ধর্ম-অর্থ-কামের মধ্যে পুরুষার্থ হিসেবে কামই শ্রেষ্ঠ—

তস্মাৎ কামঃ প্রাক্ ত্রিবর্গস্য দৃষ্টঃ।

কামের সম্পূর্ণ প্রাধান্য মেনে নিলেও ভীম কিন্তু শেষ জায়গায় এই মতই প্রকাশ করেছেন যে, ধর্মার্থকাম—এই তিনটিকে সমান মূল্য দিতে হবে। যিনি শুধু একটি পুরুষার্থের সেবায়, অভিনিবিষ্ট হন, তিনি নির্বোধ মানুষ।

[মহা (k) ১২.১৬৭.২৯, ৩৩-৩৮;
(হরি) ১২.১৬২.২৯, ৩৩-৩৮]

কাম৪ কাম আমাদের প্রথম সৃষ্টির সমবয়সী। ঋগ্‌বেদ জানিয়েছে—যখন সেই নাসদীয় সময়

চলছিল, অর্থাৎ যখন 'যা নেই তাও ছিল না আবার যা আছে তাও ছিল না—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীম্'।

—তখন সর্বপ্রথমে কামের জন্ম হয় মনের বীজ হিসেবে—

কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি/
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।

এই মনোভব কামই কিন্তু অথর্ববেদে এক দেবতা হয়ে উঠেছেন এবং সেখানেও তিনি কিন্তু প্রথমজন্মা এক দেবতা যিনি সমস্ত দেবতাদের চাইতে বয়সে বড়ো—দেবতা, পিতৃগণ এবং মর্ত্যধর্মা মানুষ—কেউ তাঁর কাছাকাছি নেই, তিনি সকলের চাইতে বড়ো,অতএব তিনি মহান এবং বিশ্বকে ধ্বংস করতে পারেন—

কামো জজ্ঞে প্রথমে নৈনং দেবা
আপুঃ পিতরো ন মর্ত্যাঃ।
ততস্ত্বমসি জ্যায়ান্ বিশ্বহা মহাংস্তস্মৈ
তে কাম নম ইৎকৃণোমি॥

কামদেবতাকে এই আথর্বনিক মন্ত্রের মধ্যে শত্রুক্ষয়ের জন্য পাঠানো হচ্ছে, কিন্তু এই দেবতা ইচ্ছারূপী দেবতা এবং সবার চাইতে প্রথম বলেই ঋগ্‌বেদের সেই মনোভব দেবতার সঙ্গে এঁর কোনো তফাৎ আছে বলে আমরা মনেকরি না। বিশেষত সর্বপ্রকার কামনার সঙ্গে ইন্দ্রিয়বাসনার ব্যাপার যুক্ত হয়ে কামের যে রূপ তৈরি হয়েছে, তার একটা বড়ো প্রমাণ অথর্ববেদের অন্য দুটি মন্ত্র। এই মন্ত্র দুটি দুষ্ট এবং অদুষ্ট দান-গ্রহণ বা প্রতিগ্রহের দোষশান্তির জন্য মূলত প্রযুক্ত হলেও যুবক-যুবতীর বিবাহকালে এখনও পর্যন্ত উচ্চারিত হয়। মন্ত্রে বলা হচ্ছে—'কে একে কাকে দিয়েছিল? উত্তর আসছে—কাম কামকেই এটা দিয়েছিল। কামই এখানে দাতা এবং কামই প্রতিগ্রহিতা। দেবতারূপী কাম সমুদ্রের মতো নিরবধি বিশাল রূপ লাভ করেছিলেন—

ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ।
কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহিতা।
কামঃ সমুদ্রমাবিবেশ।
কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্ণামি কামৈতৎ তে।

অথর্ববেদের এই মন্ত্র—কামের দ্বারাই তোমাকে গ্রহণ করছি। যা গ্রহণ করেছি, তাও কামের জন্য—এই কামমন্ত্র যে কামরূপী এক দেবতাকেই নির্দেশ করে, তা প্রমাণ হয়ে যায় শতপথ ব্রাহ্মণের মতো এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে—যেখানে অথর্ববেদের এই মন্ত্রটাই উল্লেখ করে বলা হয়—এটা কাম নামে এক দেবতাকেই বোঝাচ্ছে—ইতি তদ্‌দেবতায়া অতিদিশতি।

পরবর্তীকালে আমরা যে কামদেবকে পুষ্পশরে অলংকৃত এক দেবতা হিসেবে দেখবো, তাঁর পুষ্পবাণ বিলাস কিন্তু সেই অথর্ববেদের কালেই আরম্ভ হয়েছে। অথর্ববেদের স্ত্রী-বশীকরণের একটি মন্ত্রে বলা হচ্ছে—উর্ধ্বমুখে যে ব্যথা দেয়, উত্তুদ নামের সেই দেবতা তোমাকে কামার্ত করুক, কেননা মদনবিকারে উদ্‌ব্যথিত হয়েও তুমি আমার সঙ্গে শোয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাওনি। অতএব কামের যে ভয়ংকর বাণ আছে, তা দিয়ে তোমার হৃদয় তাড়না করছি।

কামরূপ যে বাণ তার গোড়ায় আছে মনের পীড়া, তার আগায় আছে মর্মভেদী লৌহখণ্ড এবং সেটি ভোগবিষয়ক সংকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সেইরকম একটা বাণ দিয়েই কাম তোমার হৃদয়ে তাড়না করুক।

অথর্ব বেদের এই সূক্তে ছয়টি মন্ত্র আছে এবং সেই ছয়টি মন্ত্রই ইন্দ্রিয়-তাড়িত কামের বিষয়। অর্থাৎ পঞ্চশর কামদেব মনোভব দেবতা হিসেবে অথর্ববেদের মধ্যেই বিখ্যাত হয়ে গেছেন। ঋগ্‌বেদে সকলের অগ্রজন্মা যে মনসিজ কাম, সে কিন্তু প্রথম থেকেই এক দেবতার আকার-রূপ লাভ করেছিল, তার পরিপূর্ণতা এসেছে অথর্ববেদের কালে, ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি রচনার কালে, আর উপনিষদের সময়ে সেই কামদেব মানুষের সঙ্গে একাত্মক হয়ে তিনি 'কামময় এবায়ং পুরুষঃ'। *[ঋগ্‌বেদ ১০.১২৯.৪; অথর্ববেদ (Roht & Whitney) ৯.২.১৯, পৃ. ১৯৭; ৩.২৯.৭, পৃ. ৪৭; ৩.২৫.১-৬, পৃ. ৪৫; শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ৪.৩.৪.৩২]*

□ হৃদয়-শায়িত কামবৃত্তি এবং পুরুষার্থ ছাড়াও কামের আর যে একটা পরিচয় আছে, সেই পরিচয় দেবতার পরিচয়, তিনি কামদেব। পৌরাণিক পরিচয়ে কামদেব ধর্মের ঔরসে শ্রদ্ধার গর্ভজাত পুত্র। কামদেবের স্ত্রীর নাম রতি এবং রতির গর্ভে তাঁর পুত্রের নাম হল হর্ষ, যদিও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কামদেবের স্ত্রীর নাম সিদ্ধি বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁদের পুত্রের নাম হর্ষই। *[বায়ু পু. ১০.৩৪, ৩৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৯.৫৮, ৬২]*

□ ভাগবত পুরাণ অনুসারে কামের জন্ম হয়েছে ব্রহ্মার হৃদয় থেকে এবং ইন্দ্র এই মনোভব দেবতাকে নর-নারায়ণ ঋষিদের প্রলুব্ধ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। নর-নারায়ণ নামে ওই দুই ঋষিদের তপস্যার গাম্ভীর্যে ইন্দ্র এই ভয় পেয়েছিলেন যে, এই ঋষিরা শেষ পর্যন্ত তপস্যার বলে পরম দেবতাকে তুষ্ট করে তাঁর ইন্দ্রত্ব কেড়ে নেবেন। ইন্দ্র তাই কামদেবকে তাঁর সমস্ত অনুচর সহ নর-নারায়ণের তপোবিঘ্ন করার জন্য পাঠালেন। কামদেবও তাঁর সহচর বসন্ত ঋতু, মন্দ মন্দ সমীরণ এবং বহুতর সুন্দরী অপ্সরাদের দিয়ে নর-নারায়ণকে প্রলুব্ধ করার জন্য দুই ঋষির তপঃস্থান বদরিকাশ্রমে এসে পৌঁছোলেন।

কামদেব অবশ্য নর-নারায়ণ ঋষিদের তপস্যার শক্তি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। তিনি ব্যর্থ হলেন এবং তাঁর প্রেরিত অপ্সরারাই নর-নারায়ণের কাছে তাঁদের অক্ষমতা জানিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হল। দেখা গেল, নরনারায়ণই অন্যতর সুন্দরী অপ্সরা সৃষ্টি করে অপ্সরা উর্বশীকে দেবতাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

এই ঘটনার শেষাংশ একরকম না হলেও তারকাসুরকে বধ করার জন্য শিববীর্য-সমুৎপন্ন কার্তিকেয়কে লাভ করার জন্য ইন্দ্র যখন তপস্বিনী উমার সঙ্গে তপস্যারত শিবের মিলন ঘটাতে চাইলেন, তখন তিনি সেই কামদেবকেই অনুনয়-বিনয় করে শিবের তপস্যা ভঙ্গ করতে পাঠিয়েছিলেন। এখানে অবশ্য শিবের কোপানলে কামদেব ভস্মীভূত হয়ে অনঙ্গ হিসেবে পুনরাবির্ভূত হয়েছিলেন। তবে কামদেবের জীবন এই ঘটনাটি তাঁর অপর নাম মদনের জীবন-ঘটনা বলেই মদন শীর্ষক পঞ্জীতেই সেটা বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে। *[ভাগবত পু. ৩.১২.২৬; ১১.৪.৭-১৬; মৎস্য পু. ১৫৪.২০৭-২৩৭]*

□ দেবতা, দানব, মানব—সবার মনের মধ্যে যিনি ইন্দ্রিয়ের তাড়না জাগিয়ে দিতে পারেন, তার প্রথম উদাহরণটা পুরাণে যেভাবে পাওয়া যায়, তার প্রাচীন রূপটা শতপথ ব্রাহ্মণে আছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে—প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁর আত্মজা কন্যা—তিনি 'দৌঃ' হতে পারেন, 'ঊষা'ও হতে পারেন—সেই কন্যাকে তিনি কামনা করেছিলেন এবং তাঁকে চেয়েছিলেন মৈথুনের জন্য—

প্রজাপতি র্হ স্বাং দুহিতরম্ অভিদধ্যৌ।
দিবং বা ঊষসং বা মিথুন্যেনয়া
স্যামিতি তাং সম্বভূব।

প্রজাপতি ব্রহ্মার এই কামনাকে দেবতারা পাপের ভাবনাতে গ্রহণ করে ভগবান রুদ্রকে দিয়ে চরম শাস্তি দিয়েছিলেন প্রজাপতিকে। কিন্তু এই ঘটনার মধ্যে রূপকের রহস্য আছে, তা শতপথ ব্রাহ্মণেই পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। কারণ প্রজাপতি হলেন যজ্ঞ। আমরাও এই রহস্যব্যাখ্যায় যাবো না। বরঞ্চ শতপথ ব্রাহ্মণের এই ঘটনায় কামের যে ভূমিকা, যেটা স্পষ্ট করে বলা নেই শতপথে, সেটা মৎস্য পুরাণ খুব স্পষ্ট করে দিয়েছে, কিন্তু সেখানে রহস্য আরও বেড়েছে, কেননা প্রজাপতি ব্রহ্মার কামনার লক্ষ্য এখানে ঊষা নন, তিনি সরস্বতী। লোকসৃষ্টির পূর্বকালে তপস্যারত ব্রহ্মার দেহ ভেদ করে তাঁর শরীরার্ধ থেকে জন্ম নিলেন শতরূপা। তাঁর অন্য নামগুলি হল সাবিত্রী, সরস্বতী, গায়ত্রী কিংবা ব্রহ্মাণী।

নিজের দেহ থেকেই উদ্ভূতা আত্মজা কন্যার রূপ দেখে ভগবান ব্রহ্মা কামনায় আচ্ছন্ন হলেন এবং শতরূপা-সরস্বতীর রূপ দেখার জন্য তিনি এতই ব্যস্ত হলেন যে তাঁর চার দিকে পরিভ্রমণ করার সময় যে যে দিকে সরস্বতী যাচ্ছিলেন, সেই সেই দিকেই ব্রহ্মার এক-একটি মুখের সৃষ্টি হল, এমনকী শরীর-মধ্যস্থলেও একটি ঊর্ধ্বমুখ। ব্রহ্মা এই কন্যার সঙ্গে মিলন কামনা করে তাঁকে বিবাহ করলেন।

ব্রহ্মা কামার্দিত অবস্থায় কন্যা শতরূপা-সরস্বতীকে উপভোগ করেছেন—এই ঘটনার মধ্যে একটা দার্শনিক রূপক অবশ্যই আছে, যেটা পরের অধ্যায়ে বিবৃত করেছে মৎস্য পুরাণ। আসলে গায়ত্রী, ওঙ্কার-মিশ্রিত সাবিত্রী অথবা 'বাক্'-রূপা সরস্বতী ব্রহ্মার মুখে প্রথমোচ্চারিত শব্দ। তাই সরস্বতী তাঁর মুখজাতা বলেই তাঁর আত্মজা, মানে কন্যা। সেই কন্যার সঙ্গে ব্রহ্মার মিলনের 'ইনসেসচুয়াস' ঘটনাকে মৎস্য পুরাণ সার্থকভাবেই ব্যাখ্যা করে বলেছে—চতুর্বেদের অধিষ্ঠাতা হলেন চতুর্মুখ ব্রহ্মা। বেদ ব্রহ্মার অবয়ব এবং বেদোত্থ শব্দরাশিই সরস্বতী—ব্রহ্মা শব্দ-সরস্বতীর পার্শ্ব ত্যাগ করেন না, সরস্বতীও কোনো দিন ব্রহ্মাকে ত্যাগ করেন না। সরস্বতীর সঙ্গে

ব্রহ্মার অবিচ্ছেদ্য এই সম্পর্কটাকেই কামনা এবং মৈথুনের রূপকে দেখিয়েছে শতপথ ব্রাহ্মণ এবং পুরাণগুলি। এই ব্যাখ্যায় ব্রহ্মার কন্যাগমনের তাৎপর্য নির্দোষ প্রমাণিত হলেও সম্পূর্ণ ঘটনার মধ্যে যেহেতু কামের একটা ভূমিকা ছিল, তাই লোকব্যবহারের দৃষ্টিতে ব্রহ্মার মনের মধ্যে একটু লজ্জা হল, কামনার্দিত অবস্থায় কন্যাগমনের জন্য তিনি কামদেবকেই অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন—

বেদরাশিঃ স্মৃতো ব্রহ্মা সাবিত্রী তদধিষ্ঠিতা।
তস্মান্ন কশ্চিদ্দোষঃ স্যাৎ
সাবিত্রীগমনে বিভোঃ॥
তথাপি লজ্জাবনতঃ প্রজাপতিরভূৎ পুরা।
স্বসুতোপগমাদ্ ব্রহ্মা শশাপ কুসুমায়ুধম্॥

ব্রহ্মা কামদেবকে অভিশাপ দিয়ে বললেন —তুমি যেমন আমার দেহ-মন কামবাণে সংক্ষুভিত করেছো, অতএব তোমার এই দেহকেও ভগবান রুদ্র সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করবেন অচিরেই। কামদেব এই দারুণ অভিশাপ বাক্য শুনে ব্রহ্মাকে বললেন—এতে আমার কী দোষ বলুন, আপনি নিজেই তো আমাকে সৃষ্টি করে স্ত্রী-পুরুষের ইন্দ্রিয় ক্ষুব্ধ করার দায়িত্ব দিয়েছেন আমাকে। কাজেই এমন অভিশাপ দিলে তো মানবো না। আমার শরীর চাই। ব্রহ্মা তখন প্রসন্ন হয়ে বললেন— বৈবস্বত মনুর অধিকার-কালে আমারই সত্ত্বগুণ আশ্রয় করে যদুবংশে বলরামের জন্ম হবে। তাঁর যে ভাই হবেন, সেই কৃষ্ণের পুত্র হয়ে তুমি আবার দেহধারণ করবে। এখানে উল্লেখ্য কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নকেই কামদেবের অবতার বলা হয়।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১.৭.৪.১-৪, পৃ. ৭৩; মৎস্য পু. ৩.২৯-৪৩; ৪.৭-২১; পঠিতব্য : Catherine Benton, God of Desire, New York : State University of New York Press, 2006]

কামকটঙ্কটা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাক্ষস সেনাপতি মুরু দানবের কন্যা হলেন কামকটঙ্কটা। কৃষ্ণ দানব মুরুকে বধ করার পর কামকটঙ্কটা কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন। উভয়ের মধ্যে যখন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন দেবী কামাখ্যা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণকে বলেন যে, তিনি কামকটঙ্কটাকে অজেয় হবার বর দিয়েছেন। তাই কৃষ্ণ কোনোভাবেই তাঁকে পরাজিত করতে পারবেন না। নারায়ণস্বরূপ কৃষ্ণ কামকটঙ্কটাকে বধ করলে দেবী শক্তির বরদান মিথ্যা হয়ে যাবে বলেই তিনি কৃষ্ণকে যুদ্ধ বন্ধ করতে অনুরোধ করেন। একই সঙ্গে দেবী কামকটঙ্কটাকেও বলেন যে কৃষ্ণকে পরাজিত করতে পারে এ জগতে এমন কেউ নেই। তাছাড়া স্বয়ং নারায়ণস্বরূপ কৃষ্ণ মুরু দানবকে হত্যা করেছেন বলেই মুরু দানব তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে গমন করতে পেরেছেন। অতএব কামকটঙ্কটার কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ না করাই উচিত। দেবীর উপদেশে কামকটঙ্কটা যুদ্ধ বন্ধ করে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করেন। কৃষ্ণ তখন তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেন যে, কামকটঙ্কটা মধ্যম পাণ্ডব ভীমের পুত্র ঘটোৎকচের পত্নী হবেন।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৫৯.৩৫-৬৪]

□ এরপর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে ঘটোৎকচের সঙ্গে কামকটঙ্কটার সাক্ষাৎ ও বিবাহ হয়। ঘটোৎকচের ঔরসে কামকটঙ্কটার গর্ভজাত পুত্রের নাম বর্বরীক।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৬০.১-৬৮]

কামকেলী প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বসন্ত একটি বিখ্যাত রাগ। কখনো কখনো পুরাণে রাগগুলিকে পুরুষরূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং রাগিণীগুলি রাগগুলির পত্নী রূপে কল্পিত হয়েছে।

বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বলা হয়েছে যে, বসন্ত রাগের পত্নীদের মধ্যে কামকেলী একজন।

[বৃহদ্ধর্ম পু. (মধ্য) ১৪.৩৭]

কামকোষ্ণী কাবেরী নদীর তীরবর্তী একটি জনপদ। ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, বলরাম তীর্থভ্রমণ করার সময় 'কামকোষ্ণী' নামের এই জনপদটি দর্শন করেছিলেন।

[ভাগবত পু. ১০.৭৯.১৪]

কামগ ভবিষ্যতে, একাদশ মন্বন্তরে দেবতারা যে-সব গণে বিভক্ত হবেন, কামগ তার মধ্যে একটি গণ।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৯৪.১৭-১৮]

কামগম পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ একাদশ মন্বন্তরে ধর্মসাবর্ণি যখন মন্বন্তরাধিপতি হবেন, তখন দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন, তাঁদের মধ্যে কামগম একটি।

[ভাগবত পু. ৮.১৩.২৫; বিষ্ণু পু. ৩.২.২৮]

কামগিরি ভারতবর্ষের একটি পর্বত।

[ভাগবত পু. ৫.১৯.১৬]

□ অসমরাজ্যের গৌহাটির অন্তর্গত নীলাচল পাহাড়। এই পাহাড়ের উপর বিখ্যাত কামাখ্যা মন্দির অবস্থিত। এটি একান্ন পীঠের একটি। 'কামাখ্যা' শব্দটি থেকেই হয়তো কামগিরি নামটির উৎপত্তি। *[দ্র. পীঠ]*

[D.C. Sircar; The Sakta Pithas; Delhi; Motilal Banarsidass; 1973; p. 87]

কামচরী স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.২৩; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ২৩ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৯)]

কামচারিণী১ মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, দেবী ভগবতী মন্দর পর্বতে কামচারিণী নামে বিরাজমানা। *[মৎস্য পু. ১৩.২৮]*

কামচারিণী২ দেবীভাগবত পুরাণ অনুসারে মন্দার পর্বতে দেবী ভগবতী দেবী কামচারিণী নামে বিরাজমানা। *[দেবীভাগবত পু. ৭.৩০.৫৭]*

কামঠক জনমেজয়ের সর্পসত্রে যেসব ধৃতরাষ্ট্র বংশীয় নাগ ভস্মীভূত হয়েছিলেন কামঠক তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.৫৭.১৬; (হরি) ১.৫২.১৬]

কামতীর্থ নর্মদার দক্ষিণ কূলে অবস্থিত একটি তীর্থ। কথিত আছে, এইস্থানে কামদেব মহাদেবের অর্চনা করেছিলেন। মানুষ সেই স্থানে স্নান ও উপবাস করলে কামদেবরূপে রুদ্রলোকে বাস করার সৌভাগ্যলাভ করে।

[কূর্ম পু. ২.৩৯.৫৩-৫৪; গরুড় পু. (পূর্ব) ৮১.৯]

কামদা স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.২৭; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ২৭ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৯)]

কামদুঘ পিতৃগণ যেসব লোকে বাস করেন কামদুঘা তার মধ্যে একটি পিতৃলোক। *[মৎস্য পু. ১৫.১৯]*

কামদুঘা কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে সুরভির গর্ভজাত কন্যা রোহিণী। রোহিণীর কন্যাদের মধ্যে অন্যতমা কামদুঘা। ইনি গো এবং বৃষগণের মাতা। বায়ু পুরাণে উল্লেখ আছে যে কামদুঘা দুটি পুত্রের জন্মদান করেন। তবে পুত্রদের নাম পুরাণে উল্লিখিত হয়নি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.৭৪-৭৫; বায়ু পু. ৬৬.৭২]

কামনাশক শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের 'কামনাশক' নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

কামনাশকঃ স্মরস্য ভক্তকামপ্রদত্বেন
ইচ্ছায়া বা নাশকঃ।

মহাদেবের কাম নামকরণের অর্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি যে, 'কাম' বলতে মূলত মানুষের জাগতিক কামনা বাসনা বোঝায়। ভগবান শিব মানুষের সমস্ত অভীষ্টবস্তু স্বরূপ—তাই তিনি 'কাম' নামে সম্বোধিত হন। আবার স্বয়ং মহাদেবই তাঁর ভক্তকে জাগতিক কামনা বাসনা অতিক্রম করে আত্মজ্ঞানের পথে, মোক্ষের পথে নিয়ে যান। জাগতিক কামনা বাসনা নাশ করে ভক্ত হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানরূপে আত্মপ্রকাশ করেন বলে মহাদেব কামনাশক নামে খ্যাত।

আবার পুরাণে বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী ভগবান শিবের তপোভঙ্গে উদ্যত কামদেবকে তিনি আপন নেত্রবহ্নিতে ভস্মীভূত করেছিলেন—সেই ভাবনা থেকেও তিনি কামনাশক নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৫২; (হরি) ১৩.১৬.৫২]

কামন্দ জনৈক ঋষি। মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, ইনি রাজা আঙ্গরিষ্ঠকে রাজধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন।

[মহা (k) ১২.১২৩.১২-২৫; (হরি) ১২.১২০.১২-২৫]

কামন্দক *[দ্র. কামন্দ]*

কামরূপা অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। কামরূপা সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ১৭৯.২১]

কামলা মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, দেবী ভগবতী কমলালয়ে কামলা নামে বিরাজমানা।

[মৎস্য পু. ১৩.৩২]

কামলায়নিজ পুরাণে মহর্ষি অত্রির গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, কামলায়নিজ সেই গোত্রের অন্যতম। ঋষি অত্রি থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এরাও আত্রেয় বলে পরিচিত।

[মৎস্য পু. ১৯৮.১৩]

কামলী মহর্ষি জমদগ্নির পত্নী তথা পরশুরামের মাতা রেণুকা পুরাণে কামলী নামেও সম্বোধিত হয়েছেন। *[দ্র. রেণুকা]*

কামহানি শুক্ল-যজুর্বেদ শাখার একজন ঋষি লাঙ্গলি। লাঙ্গলির শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম কামহানি। লাঙ্গলি মুনির শিষ্য বলে কামহানি লাঙ্গল নামেও পরিচিত ছিলেন। *[বায়ু পু. ৬১.৪৩]*

কামা রাজা পৃথুশ্রবার কন্যা। পুরুবংশীয় রাজা অযুতনায়ীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। অযুতনায়ীর ঔরসে কামার গর্ভে অক্রোধন নামে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

[মহা (k) ১.৯৫.২১; (হরি) ১.৯০.২৭]

কামাক্ষী দেবী ভগবতী কামাক্ষী নামে গন্ধমাদনে বিরাজমানা বলে মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছেন। *[মৎস্য পু. ১৩.২৬]*

কামাখ্যা দেবীশক্তির ৫১টি পীঠের মধ্যে অন্যতম। বর্তমান অসমে কামগিরি পর্বতে দেবী শক্তি কামাখ্যা নামে অধিষ্ঠিতা। *[দ্র. পীঠ, কামগিরি]*

কামুকী দেবীভাগবত পুরাণ অনুসারে দেবী সতী গন্ধমাদন নামক তীর্থে দেবী কামুকী নামে বিরাজমানা। *[দেবীভাগবত পু. ৭.৩০.৫৬]*

কামেশ্বর১ বারাণসী ক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। ভগবান শিব এই তীর্থে কামেশ্বর নামে পূজিত হন। এখানে কামদেব অতি তীব্র তপস্যা করেছিলেন।

[কৃত্যকল্পতরু, (তীর্থবিবেচন কাণ্ড) পৃ. ৩৭, ৬৪; স্কন্দ পু. (গুরুমণ্ডল) ১.৩৩.১২২]

কামেশ্বর২ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থে ভগবান কামেশ্বর শিবের পূজা করলে স্বর্গলাভ হয় বলে স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে। *[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ২৫.৬]*

কামোদকতীর্থ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করে রতিপতি কামকে দর্শন করলে স্বর্গে দেবগন্ধর্বদের মতো শরীর লাভ করা যায়। *[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ৩১.৮৯]*

কামোদা ভদ্রাশ্ব ভূখণ্ড বা ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়ে যেসব নদীগুলি প্রবাহিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি। *[বায়ু পু. ৪৩.৩০]*

কাম্পিল্য১ দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী। এর পূর্বনাম কাম্পিল। দক্ষিণ পঞ্চাল রাজ্য সার্বভৌমত্ব লাভের পরই রাজা দ্রুপদ শাসিত এই জনপদটির রাজধানী রূপে কাম্পিল্য পরিচিত হয়। পুরাণে রাজা অজমীঢ়ের বংশধারায় কাম্পিল্য নামে এক শাসকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অবশ্য বায়ু পুরাণে সরাসরি বলা হয়েছে যে, অজমীঢ়ের বংশধারায় সুশান্তির পাঁচ পুত্রকে তিনি পাঁচটি জনপদের অধিকারী করেছিলেন। সুশান্তির পাঁচ পুত্রের মধ্যে একজনের নাম কাম্পিল্য এবং তাঁর পাঁচ পুত্র শাসিত পাঁচটি জনপদকেই একত্রে পঞ্চাল বলা হয়। ফলে ইঙ্গিত আরো সুস্পষ্ট হয় যে, কাম্পিল্য রাজার নামানুসারেই কাম্পিল্য নগরীর নামকরণ হয়েছে। প্রাচীন তৈত্তিরীয় সংহিতায় কাম্পিল্যবাসিনী নামে এক রাজমহিষীর উল্লেখ রয়েছে। সায়নাচার্য তাঁর টীকায় কাম্পিল্যকে একধরনের বস্ত্রবিশেষ এবং কাম্পিল্যবাসিনীকে সেই বস্ত্রে আচ্ছাদিত এক রমণী বলে উল্লেখ করেছেন। এই সূত্রে কাম্পিল্য নামক বস্ত্র থেকেই কাম্পিল্য নগরীর নাম উদ্ভূত হয়েছে কিনা সেটা ভেবে দেখা প্রয়োজন। কাম্পিল্য নগরটি গঙ্গানদীর তীরে মাকন্দী নামক জনপদের নিকটে অবস্থিত ছিল। কাম্পিল্যেই দ্রুপদতনয়া দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা আয়োজিত হয়েছিল। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে অংশ গ্রহণের জন্য পাণ্ডবরা দক্ষিণ পঞ্চালে আসেন। এই সূত্রে মহাভারতের আদিপর্বে একটি মনোরম নগরীর দীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়। সেটি সম্ভবত দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী কাম্পিল্য। কারণ রাজকন্যার স্বয়ম্বর রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হওয়াই খুব স্বাভাবিক।

[তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭.৪.১৯.১ সায়নাচার্য টীকা দ্র.; মহা (k) ১.১৩৮.৭৩; ১.১৬৯.১-২৩; (হরি) ১.১৩৩.৭৩; ১.১৭৮.১-২৩; ভাগবত পু. ৯.২১.৩২; বায়ু পু. ৯৯.১৯৬]

☐ অজমীঢ় বংশীয় রাজা ব্রহ্মদত্ত এই কাম্পিল্য নগরীতেই বাস করতেন। রামায়ণে কাম্পিল্যকে ইন্দ্রের অমরাবতীর মতো রমণীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[রামায়ণ ১.৩৩.১৯; মহা (k) ১২.১৩৯.৫; (হরি) ১২.১৩৫.৫; হরিবংশ পু. ১.২৩.১৬]*

☐ অজমীঢ় বংশীয় রাজা সমরও কাম্পিল্য নগরীতে রাজত্ব করেছিলেন।

[বায়ু পু. ৯৯.৭৬; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১৩]

☐ উত্তর প্রদেশের বদাউন ও ফারুকাবাদ অঞ্চলের মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত গঙ্গা তীরবর্তী কাম্পিল শহরটিই প্রাচীন কাম্পিল্য। পাণিনির রচনায় কাম্পিল্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে কাম্পিল্য একটি অতি পবিত্র

এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এই নগরীর এক অতি সমৃদ্ধ বর্ণনা বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ফারুকাবাদের অদূরে অবস্থিত কাম্পিল শহরে এখনো প্রাচীন কাম্পিল্য নগরীর ভগ্নাবশেষসমূহ দেখতে পাওয়া যায়।

[GM (Suryavanshi) p. 163; EAIG (Kapoor) p. 337-338; GDAMI (Dey) p. 88]

কাম্পিল্য₂ অজমীঢ় বংশীয় সুশান্তির পুত্র।

[দ্র. কাম্পিল্য₁]

[বায়ু পু. ৯৯.১৯৬]

কাম্পিল্য₃ অজমীঢ় বংশধারায় হর্যশ্বের পুত্র।

[দ্র. কাম্পিল্য₁]

[ভাগবত পু. ৯.২১.৩২]

কাম্বোজ পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি কাম্বোজের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি ভৃগুর বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৫.১৮]

কাম্যকবন মহাভারতে পাণ্ডবদের বনবাস পর্বের স্মৃতি বিজড়িত একটি বনাঞ্চল। কাম্যক বনের উল্লেখ মহাভারতে বহুবার পাওয়া যায়। পাণ্ডবরা একাধিকবার এই বনে যাতায়াত করেছিলেন তার উল্লেখ মহাভারতেই রয়েছে।

□ ধৃতরাষ্ট্রের দ্বারা অপমানিত ও বিতাড়িত বিদুর বনবাসী পাণ্ডবদের সন্ধানে কাম্যক বনে এসে পৌঁছেছিলেন। সেখানে তিনি যুধিষ্ঠির, ভীম প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বনবাসীর বেশে সেখানেই বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। তবে পরবর্তী সময়ে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মাধ্যমে বিদুরকে আবার হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

[মহা (k) ৩.৫.১-২২; (হরি) ৩.৬.৩-২২]

□ বামন পুরাণে বলা হয়েছে যে, সূর্যদেব কাম্যকবনে প্রকট রয়েছেন।

সমাশ্রিত্য বনং পুণ্যং সবিতা প্রকটঃ স্থিতঃ॥

ফলে এই বনে প্রবেশ করা মাত্রই পুণ্যলাভ হয়। *[বামন পু. ৪১.৩০-৩১]*

□ বামন পুরাণে পরিবেশিত এই তথ্যও মহাভারতের কাহিনী থেকেই জন্ম নিয়েছে। বনবাসের সঙ্গী বহু ঋষি মুনি ব্রাহ্মণের ভরণপোষণ কিভাবে হবে—এ বিষয়ে চিন্তিত যুধিষ্ঠির পুরোহিত ধৌম্যের পরামর্শে সূর্যের উপাসনা আরম্ভ করেন। যুধিষ্ঠিরের স্তবে তুষ্ট সূর্যদেব কাম্যক বনেই অবির্ভূত হন এবং তাঁর বরে যুধিষ্ঠিরের চিন্তা দূর হয়।

[মহা (k) ৩.৩ অধ্যায়; (হরি) ৩.৪. অধ্যায়]

□ কাম্যকবনে নরখাদক রাক্ষসরা একদা বাস করত—একথা বিদুর কাম্যকবন বর্ণনাকালে ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়েছিলেন। বিদুরের মুখ থেকেই আমরা জানতে পারি যে, বকরাক্ষসের ভাই কির্মীর কাম্যকবনকে শাসন করত। সে বকরাক্ষস হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ভীমকে কাম্যকবনে আক্রমণ করে। ভীষণ যুদ্ধের পর কির্মীরকে হত্যা করে ভীম এই বনকে নিরুপদ্রব স্থানে পরিণত করেছিলেন। এ সময় বিদুরের মুখ থেকেই জানা যায় যে, দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত পাণ্ডবরা তিনদিন-তিনরাত পথ অতিক্রম করে কাম্যকবনে গিয়েছিলেন। এই বর্ণনা থেকে হস্তিনাপুর থেকে কাম্যক বনের দূরত্ব এবং এর অবস্থান সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা হয়।

[মহা (k) ৩.১০.৩-৬৭; (হরি) ৩.১০.৪-৭২]

□ আবার বনপর্বেই আরেক জায়গায় পার্বত্য সমতলভূমির উপর অবস্থিত সরস্বতী তীরবর্তী কাম্যকবনকে মনোহর ও মুনিদের প্রিয় বলা হয়েছে।

কাম্যকং নাম দদৃশুর্বনং মুনিজনপ্রিয়ম্॥

[মহা (k) ৩.৫.৩; (হরি) ৩.৬.৩]

বর্ণনার এই বৈপরীত্য থেকে ধারণা করা যায় যে, ভীমের কির্মীরবধের পর কাম্যকবনে শান্তি ফিরেছিল। যার ফলে মুনিঋষিদের সেখানে আগমন ঘটাই স্বাভাবিক।

□ হস্তিনাপুরে দ্যূতসভায় যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এবং পাণ্ডবদের বনবাসে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছিল তখন বাসুদেব কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। পাণ্ডবপক্ষের এই ভাগ্যবিপর্যয়ের সংবাদে কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে কাম্যকবনে এসে মিলিত হন অন্যান্য পাণ্ডব সুহৃদদের সঙ্গে নিয়ে। তাঁদের সকলের একত্রে আগমনের ফলস্বরূপ কাম্যকবনে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালের ভারতযুদ্ধের বীজ রোপিত হয়েছিল এই সম্মেলনের মধ্যে দিয়েই। *[মহা (k) ৩.২২.৫৩; (হরি) ৩.১৯.৫৩]*

□ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের কাছ থেকে প্রতিস্মৃতি বিদ্যা লাভ করার পর যুধিষ্ঠির সহ অন্যান্য

পাণ্ডবরা দ্বৈতবন থেকে সরস্বতী নদীর তীরবর্তী কাম্যকবনে আবার গিয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.২.১৫৯; ৩.৩৬.৪১;
(হরি) ১.২.১৫৯; ৩.৩২.৪১]

□ পাণ্ডবরা একপর্যায়ে কাম্যকবনে একটানা পাঁচবছর বাস করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.৫০.১২; (হরি) ৩.৪২.১২]

□ অর্জুনের দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে অস্ত্রলাভের পর পাণ্ডবরা আবার একবার কাম্যকবনে ফিরে এসেছিলেন। এখানে কৃষ্ণ সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। মার্কণ্ডেয় মুনিও এইসময় কিছুদিন পাণ্ডবদের সঙ্গে বাস করেছিলেন।

[মহা (k) ১.২.১৮৮-১৯১; ৩.১৬৬. অধ্যায়;
(হরি) ১.২.১৮৯-১৯১; ৩.১৫৪. অধ্যায়]

□ পাণ্ডবদের বনবাসের শেষ পর্যায়ে যখন তাঁরা কাম্যকবনে বাস করছিলেন তখন একবার জয়দ্রথ, দ্রৌপদীকে হরণের চেষ্টা করেছিলেন। পরে পাণ্ডবদের হাতে পরাজিত হয়ে জয়দ্রথ পালিয়ে যান।

[মহা (k) ৩.২৬৪.১-২৬৫.২১;
(হরি) ৩.২২৩.১-২২৪.২১]

□ পণ্ডিত N.L. Dey-এর মতে থানেশ্বরের ছয় মাইল দক্ষিণ-পূর্বে কামোদা নামে একটি স্থান রয়েছে যেটি কাম্যকবনের আধুনিক অবস্থান হতে পারে। এমনকী এই কামোদা নামের স্থানটিতে দ্রৌপদী-কা-ভাণ্ডার (Draupadi-ka-bhandar) নামে একটি জায়গা আজও রয়েছে। কথিত যে, দ্রৌপদী বনবাসের সময় তাঁর অরণ্যবাসী স্বামীদের এবং অন্যান্য পরিজন ও অতিথিদের জন্য এই স্থানেই আহার প্রস্তুত করতেন। তবে স্পষ্টতই মথুরার অন্তর্গত কাম্যকবন আর মহাভারতে উল্লিখিত কাম্যকবন পৃথক।

[GDAMI (Dey) p. 88]

কাম্যা একজন বিশিষ্ট অপ্সরা। অর্জুনের জন্মোৎসবে যেসব অপ্সরা নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন, কাম্যা তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.১২৩.৬৪; (হরি) ১.১১৭.৬৭]

কায়নি পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, কায়নি সেই প্রবরের অন্যতম। ভৃগু ঋষি থেকে বংশ-পরম্পরায় বা শিষ্য পরম্পরায় এরাও ভার্গব বলে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ১৯৫.৩১]*

কায়ব্য জনৈক নিষাদ জাতীয় ব্যক্তি। মহাভারতের শান্তিপর্বে সম্পূর্ণ একটি অধ্যায় জুড়ে নিষাদ কায়ব্যের জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে।

মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্ম নীচকুলে জন্মগ্রহণকারী অথচ সদাচার ব্যক্তির পক্ষেও যে সিদ্ধিলাভ সম্ভব—সে প্রসঙ্গে উপদেশ দিতে গিয়ে কায়ব্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। কায়ব্যের জন্ম ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্যাধজাতীয়া স্ত্রীলোকের গর্ভে। ফলে ক্ষত্রিয় এবং নিষাদ উভয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে ছিল। পশুশিকার, দস্যুবৃত্তির মতো কাজও যেমন সে করত তেমনই সে বীর, বুদ্ধিমান, নীতিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণ তথা গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলও ছিল—

প্রহর্তা মতিমান শূরঃ শ্রুতবান্ সুনৃশংসবান্।
রক্ষন্নাশ্রমিণাং ধর্মং ব্রহ্মণ্যো গুরুপূজকঃ॥

নিজের এই চরিত্রের গুণে নিষাদ কায়ব্য যেমন বহুসংখ্যক দস্যুর অধিপতি হয়েছিল, তেমনই ন্যায়পরায়ণতার জন্যও তার খ্যাতি ছিল। কায়ব্যের গুণ এবং তাঁর নিয়ম-নীতি-মতাদর্শের কথা এ প্রসঙ্গে ভীষ্ম বিশদে আলোচনা করেছেন।

[মহা (k) ১২.১৩৫ অধ্যায়; (হরি) ১২.১৩১ অধ্যায়]

কায়শোধনতীর্থ সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থের নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে, শরীর বা কায় শুদ্ধ করার জন্য এটি উপযুক্ত স্থান। বনপর্বে বলা হয়েছে যে, কায়শোধন তীর্থে অবগাহন করলে শুদ্ধ শরীরে স্বর্গলাভ হয়।

[মহা (k) ৩.৮৩.৪২-৪৩; (হরি) ৩.৬৮.৪২-৪৩]

□ বামন পুরাণেও একথা বলা হয়েছে যে, এই তীর্থ দর্শনে বিশুদ্ধ দেহে মোক্ষলাভ হয়।

[বামন পু. ৩৫.১৭-২০]

কায়াবরোহণতীর্থ বারাণসী ক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৩৭]

মৎস্য পুরাণে মোট তিনবার এই তীর্থের নাম উল্লিখিত হয়েছে। মৎস্য পুরাণের একটি অধ্যায়ে এই ক্ষেত্রকে দেবীশক্তির মাহাত্ম্যধন্য শাক্ত পীঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দেবী শক্তি এই ক্ষেত্রে 'মাতা' নামে পূজিতা। ভগবান শিব এই ক্ষেত্রে মহাকাল নামে বিরাজমান। মৎস্য পুরাণ এই তীর্থটিকে শ্রাদ্ধ এবং দানধ্যানের জন্য উপযুক্ত

বলে বর্ণনা করেছে। এই ক্ষেত্রে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণ করলে পুণ্য লাভ হয়।

[মৎস্য পু. ১৩.৪৮; ২২.৩০; ১৮১.২৬]

কারকি পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে ঋষি বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় কারকি সেই প্রবরের অন্যতম।

অঙ্গিরা ঋষি থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এরাও আঙ্গিরস বলে পরিচিত।

[মৎস্য পু. ১৯৬.১৪]

কারন্ধম১ দক্ষিণ সমুদ্র সন্নিকটে অবস্থিত পাঁচটি নারী তীর্থের মধ্যে অন্যতম। অর্জুন বনবাসকালে কারন্ধম তীর্থে গমন করেছিলেন। তবে এই পবিত্র পাঁচটি নারীতীর্থই (অগস্ত্য তীর্থ, সৌভদ্রতীর্থ, পৌলমতীর্থ, কারন্ধমতীর্থ ও ভরদ্বাজতীর্থ) এক সময় ঋষিরা বর্জন করেছিলেন ভয়ঙ্কর জলজন্তুর উপদ্রবের কারণে। কুবেরপ্রিয়া বর্গা ও তাঁর চারজন সখী অভিশপ্ত হয়ে ভয়ঙ্কর জলজন্তু রূপে এই পাঁচটি তীর্থে বাস করতেন। অর্জুন তাঁদের উদ্ধার করে শাপমুক্ত করেন এবং তাঁরা তাঁদের প্রকৃত রূপ ফিরে পান। এইভাবেই অর্জুন জলচর জন্তুর উপদ্রব প্রশমন করে কারন্ধম সহ অন্য চারটি তীর্থকেও আবার গম্য করে তুলেছিলেন।

[মহা (k) ১.২১৬.৩-২১৭.২৩;
(হরি) ২.২০৯.৩-২১০.২৩]

□ এই তীর্থস্থলটির সুনির্দিষ্ট কোনো আধুনিক অবস্থান এখনো পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব হয়নি।

কারন্ধম২ *[দ্র. অবীক্ষিত]*

কারপবন সরস্বতী নদীর তীরবর্তী একটি তীর্থ। এখানে পর্কটীবন নামে একটি অরণ্য আছে, যেখান দিয়ে সরস্বতী নদী খরস্রোতে প্রবাহিত হয়। বলরাম কারপবন তীর্থ দর্শন করেছিলেন—

প্রভাবঞ্চ সরস্বত্যাঃ প্লক্ষপ্রস্রবণং বলঃ।
সংপ্রাপ্তঃ কারপবনং প্রবরং তীর্থমুত্তমম্॥

বলরাম এই তীর্থে অবগাহন করে পূর্বপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৫৪.১২-১৪; (হরি) ৯.৫০.১১-১৩]

কারস্কর একটি প্রাচীন জনজাতি। 'কার' শব্দের অর্থ শক্তি বা বল, পাণিনি বলেছেন—কারস্করো বৃক্ষঃ। কারস্কর বৃক্ষ হল নাক্স ভোমিকা (Nux Vomica) গাছ। প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে নাক্স ভোমিকা মূলতঃ রক্তচাপ বৃদ্ধির জন্য অথবা প্রকারান্তরে বলবর্ধনের জন্য ব্যবহার কর হত। সম্ভবত যাঁরা প্রাচীন কালে নাক্স ভোমিকা উৎপাদন করতেন, তাঁদেরই মহাকাব্য ও পুরাণে কারস্কর জাতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[দ্র. তুরম্বিত]*

[মহা (k) ২.৫০.২০; (হরি) ২.৪৮.১৬; অষ্টাধ্যায়ী ৬.১.১৫৬; Priya Vrat Sharma; Essentials of Ayurveda, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd, 1998, p. 90]

□ কারস্কর জাতিটিকে মহাভারতে ধর্মহীন বলে উল্লেখ করেছেন মহাবীর কর্ণ। এঁরা যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন বলেও জানা যায়।

[মহা (k) ৮.৪৪.৪৩; (হরি) ৮.৩৪.১০৬]

□ পুরাণে কারস্করকে নর্মদা তীরবর্তী দাক্ষিণাত্যের একটি জনপদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে স্থানটি শ্রাদ্ধকার্যের পক্ষে উপযুক্ত নয়। বায়ু পুরাণে কারস্কর দেশটিকে বর্জন করার কথা সরাসরি বলা হয়েছে। কারণ এই দেশটিতে পাপী মানুষদের বসবাস। তাই একে পাপভূমি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈদিক ব্রাহ্মণরাও সে দেশ পরিত্যাগ করেছেন।

[মৎস্য পু. ১১৪.৪৯; বায়ু পু. ৭৮.২৩, ৬৯]

□ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও কারস্করদেশকে পাপভূমি বলে পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অনুবাদে বর্তমান কর্ণাটকের অন্তর্গত কারকল (Karakal)-কেই প্রাচীন কারস্করদেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (Tagare) ২য় খণ্ড পৃ. ৫৪০;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৪.৩৩, ৮০]

□ তবে কারস্কর কারা বা তারা কোথায় বাস করতেন তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মত প্রচলিত আছে। অনেকে মনে করেন কারস্করেরা, আরট্ট জাতি তবে আধুনিক পণ্ডিতরা এই ধারণাটির সঙ্গে খুব একটা সহমত পোষণ করেন না। তাঁরা মনে করেন যে, কারস্কর যেহেতু একটি গাছের নাম সুতরাং যে জনজাতির মানুষরা বিশেষভাবে গাছটির চাষ করতো, তারাও কালক্রমে কারস্কর নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। এবার দেখে নেওয়া দরকার যে, পণ্ডিতরা কারস্কর জাতির বাসস্থান কোন কোন জায়গাকে চিহ্নিত করেছেন। পণ্ডিত N.L. Dey প্রমুখ দক্ষিণ ভারতের কারকল অঞ্চলটিতে কারস্করেরা বাস করতেন বলে উল্লেখ করেছেন। আবার যদি আরট্টদের সঙ্গে কারস্করদের একাত্ম করে দেখা

হয়, তবে বলতে হয় যে, কারস্করেরা বর্তমান পঞ্জাবের অন্তর্গত কোনো একটি স্থানে বসবাসকারী জনজাতি বিশেষ। আমরা জানি, পাণিনি, কৌটিল্যের সময়ে বৃহত্তর পঞ্জাব সমভূমি অঞ্চলে বহু বৃহৎ ও ক্ষুদ্র স্বাধীন জনজাতির বাস ছিল। আরট্ট বা কারস্কররাও তেমনই স্বাধীন জনগোষ্ঠী ছিল বলেই মনে হয়। কারস্কররাই সম্ভবত আধুনিক খোখর (Khokhar) জাতি। এঁরা মূলত বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত পঞ্জাব প্রদেশে ঝিলম ও চেনাব নদীর তীরে ঝঙ্গ (Jhang) এবং শাহপুর (Shahpur) জেলায় বাস করে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যদি কারস্কররা বৃহত্তর পাঞ্জাব প্রদেশের একটি স্বাধীন সম্প্রদায় হয়, তবে এঁদের নর্মদা নদীতীরে অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতে কীভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। একে আমরা দেশান্তর বা Migration-এর ফলাফল বলতে পারি। বৃহত্তর ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বৈদিক সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবৈদিক প্রাচীন জনজাতিগুলি তাদের পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই ভারতের পূর্ব ও দক্ষিণে দিকে দেশান্তরিত হতে বাধ্য হয়। বৈদিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল সরস্বতী-সিন্ধু ত্যাগ করে যতই গঙ্গানদী অভিমুখী হয় ততই কারস্করের মতো ক্ষুদ্র জনজাতিগুলি নর্মদা নদীর দিকে সরে যেতে থাকে। এভাবেই একসময় পঞ্জাবের সমভূমিতে বসবাসকারী কারস্করদের অস্তিত্ব দাক্ষিণাত্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

[H. A. Rose; A Glossary of the Tribes and Castes of the Panjab and North-West Frontier Province; vol-1, 3; New Delhi; Nirmal Publishers and Distributers; 1997; p. 50, 539; Buddha Prakash; Political Social Movements in Ancient Punjab; Delhi, Motilal Banarsidass; 1964; p. 220, 244, 251]

ভারত তত্ত্ববিদ মোতি চন্দ্র অবশ্য মনে করেন যে, বর্তমান পশ্চিম চীনের কাশগর (Kashgar) উপত্যকায় বসবাসকারী চিত্রালী (Chitrali) জনজাতিটির একটি অংশ কারস্করদের বংশধর।

[GESMUP (Moti Chandra) p. 47]

□ কারস্করদের বিভিন্ন স্থানে বাস করার তত্ত্বটি আরও বেশি জোরালো হয় যদি আমরা এই প্রত্যেকটি অঞ্চলে নাক্স ভোমিকা বা কারস্কর গাছের আবাদ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বৃহত্তর পঞ্জাব, মূলত পাকিস্তানের সিন্ধ্ ও চীনের সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চল, চীনদেশের দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্তে কারস্কর চাষ হত। নাক্সভোমিকা চাষ এইসব অঞ্চলে এখনো প্রচলিত আছে।

[UNODC-Bulletin on Narcotics, 1957; Issue 1-002; p. 102]

কারাবর মহাভারতে উল্লিখিত একটি নিম্নবর্গীয় চর্মকার জাতীয় সম্প্রদায়। অনুশাসনপর্বে কারাবরদের জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। মহাভারতকার বলেছেন— বৈদেহকের (বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত অস্পৃশ্য সন্তান) ঔরসে আয়োগবীর (শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে উৎপন্ন কন্যা সন্তান) গর্ভজাত সন্তানরা করাবর সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত হত। এরা মূলতঃ নিষাদ রমণীর গর্ভজাত—

আয়োগবীষু জায়ন্তে হীনবর্ণাস্তু তে ত্রয়ঃ।
ক্ষুদ্রো বৈদেহকাদন্ধ্রো বহির্গ্রামপ্রতিশয়ঃ ॥

কারাবরো নিষাদ্যান্তু চর্মকারঃ প্রসূয়তে। ঋষি মনুও কারাবরদের একই জন্ম পরিচয় দিয়েছেন। কারাবর সম্প্রদায়ের মানুষকে হীন ও জনপদের বাইরে বসবাসকারী বলা হয়েছে। মনু আরও বলেছেন যে, কারাবর স্ত্রীলোকেরা অন্ধ্র নামে অপর একটি নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের মানুষ প্রসব করে। *[মনুসংহিতা ১০.৩৫.৩৬; মহা (k) ১৩.৪৮.২৫-২৬; (হরি) ১৩.৪০.২৫-২৬]*

কারিষ কৌশিক গোত্রীয় একজন ঋষি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৬.৭১]

কারীরয় পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, কারীরয় সেই গোত্রের একজন ঋষি। অঙ্গিরা থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এরাও আঙ্গিরস বলে পরিচিত।

[মৎস্য পু. ১৯৬.২৭]

কারীষব পুরাণে কৌশিক-গোত্রীয় বিশ্বামিত্র মুনির গোত্রভুক্ত যে ঋষি-বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় কারীষব সেই প্রবরের অন্যতম। বিশ্বামিত্র ঋষি থেকে বংশ বা শিষ্য-পরম্পরায় এরাও কৌশিক বলে পরিচিত। *[বায়ু পু. ৯১.৯৯]*

কারীষি মহাভারতের অনুশাসনপর্বে বিশ্বামিত্রের যেসব পুত্রদের নাম উল্লিখিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কারীষি একজন।

[মহা (k) ১৩.৪.৫৫; (হরি) ১৩.৩.৭৪]

কারুকায়ণ পুরাণে কৌশিক-গোত্রীয় বিশ্বামিত্র মুনির গোত্রভুক্ত যে ঋষি-বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় কারুকায়ণ সেই গোত্র-প্রবরের অন্যতম। বিশ্বামিত্র ঋষি থেকে বংশ বা শিষ্য-পরম্পরায় এরাও কৌশিক বলে পরিচিত।

[মৎস্য পু. ১৯৮.৭]

কারুপথ একটি প্রাচীন জনপদ। কারুপথের আরেক নাম কারাপথ। রামায়ণে কারুপথ নগরীর উল্লেখ পাওয়া যায় উত্তরকাণ্ডে লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদের রাজ্যাভিষেক প্রসঙ্গে। লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গদকে কোন রাজ্যে অভিষিক্ত করা হবে, রামচন্দ্রের এ প্রশ্নের উত্তরে ভরত কারুপথের নামোল্লেখ করেন। ভরতের বর্ণনানুযায়ী কারুপথ নিরুপদ্রব এবং রমণীয় স্থান—

অয়ং কারুপথো দেশো রমণীয়ো নিরাময়ঃ॥

রামচন্দ্র ভরতের পরামর্শ অনুযায়ী কারুপথ দেশ জয় করেন এবং অঙ্গদকে সে দেশের শাসক হিসেবে অভিষিক্ত করেন। রামচন্দ্র কারুপথে অঙ্গদীয়া নামে একটি মনোরম ও সুরক্ষিত নগরী অঙ্গদের নামানুসারে নির্মাণ করেন। এই অঙ্গদীয়া পুরীই কারুপথ দেশের রাজধানী ছিল।

পুত্র অঙ্গদের নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করে তোলার জন্য লক্ষ্মণ কারুপথের অন্তর্গত অঙ্গদীয়া নগরীতে প্রায় এক বছর বাস করেছিলেন বলে রামায়ণে উল্লিখিত হয়েছে।

[রামায়ণ ৭.১১৫.১-১২; ৭.১০২.১-১২; বায়ু পু. ৮৮.১৮৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১৮৯]

□ প্রাচীন কারুপথের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান সম্ভবত বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত পঞ্জাব প্রদেশের মিয়াঁওয়ালি (Mianwali) জেলার কালাবাগ (Kalabagh)। সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত এই জনপদটি কারাবত নামেও পরিচিত। কালিদাসের রঘুবংশে কারুপথ বা কারাপথ দেশের কথা পাওয়া যায়।

অবশ্য পণ্ডিত তাভারনিয়ের কারাবত বলতে গজনীর ৩৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি স্থানকে চিহ্নিত করেন। তবে তাঁর ধারণা সম্ভবত সঠিক নয়। *[GDAMI (N.L. Dey) p. 97]*

কারুপর্বত ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন পৌরাণিক (Mythological) পর্বত। *[বায়ু পু. ৪৫.৯২]*

কারূষ *[দ্র. করূষ]*

কারোটক পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে ঋষি বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, কারোটক সেই গোত্রের অন্যতম ঋষি।

মহর্ষি অঙ্গিরা থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এরা আঙ্গিরস নামে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ১৯৬.৮]*

কার্ণাটী প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বসন্ত একটি বিখ্যাত রাগ। কখনো কখনো পুরাণে রাগগুলিকে পুরুষ রূপে কল্পনা করা হয়েছে। রাগিনীগুলি রাগগুলির পত্নী রূপে কল্পিত হয়েছে।

বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বলা হয়েছে যে, বসন্ত রাগের পত্নীদের মধ্যে কার্ণাটী একজন।

[বৃহদ্ধর্ম পু. ২.১৪.৩৬]

কার্তবীর্য্যার্জুন হৈহয়রাজ কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জুন। কৃতবীর্য্যের পুত্র বলেই এর আরেক নাম কার্তবীর্য্যার্জুন। ইনি হৈহয়দের রাজা। নর্মদাতীরের মাহিষ্মতী নগরী রাজা কার্তবীর্য্যার্জুনের রাজধানী ছিল। *[মহা (k) ১.২.১৭০; (হরি) ১.২.১৭১]*

□ রামায়ণে কার্তবীর্য্যার্জুনকে এক মহাবলশালী নৃপতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতে বলা হয়েছে যে, কার্তবীর্য্যার্জুন কঠোর তপস্যার গুণে সম্রাট বলে পরিচিত হন। সুষ্ঠ প্রজা প্রতিপালনের সৌজন্যে কার্তবীর্য্যার্জুন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি বলে বিবেচিত হয়েছেন। মহাভারতের বনপর্বে তাঁকে পৃথু, নহুষ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ রাজাদের সমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য সভাপর্বে বলা হয়েছে যে, অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিদের অবজ্ঞা করার কারণেই তাঁর পতন হয়েছিল।

[মহা (k) ২.১৫.১৫; ২.২২.১৪; ৩.৩.১১; (হরি) ২.১৫.১১; ২.২১.২৪; ৩.৩.১১]

□ মহাভারতের অনুশাসনপর্বে কার্তবীর্য্যার্জুন সম্পর্কে এক দীর্ঘ কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কার্তবীর্য্যার্জুন দশ সহস্র বৎসর ব্যাপী এক যজ্ঞ করেন। যার ফলে বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ দত্তাত্রেয় ঋষির আশীর্বাদ পান। কার্তবীর্য্যার্জুন দত্তাত্রেয় ঋষির কল্যাণে চারটি বিশেষ বরলাভ করেন। এই বরদানের প্রভাবে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র বাহুধারীরূপ এবং অন্যসময় দ্বিবাহু হওয়ার ক্ষমতা পান, একই সঙ্গে প্রার্থনা করেন সমগ্র পৃথিবী জয় করতে পারার শক্তি। তাঁর তৃতীয় বরটি ছিল ধর্মানুসারে রাজ্য প্রতিপালন সংক্রান্ত। এছাড়াও কার্তবীর্য্যার্জুন উদ্ধত না হয়ে ওঠার বরও প্রার্থনা করেছিলেন। দত্তাত্রেয় ঋষির কাছ থেকে পাওয়া চারটি বরদানে বলীয়ান হয়ে কার্তবীর্য্যার্জুন বীর্য্য

ও শৌর্য্যে নিজেকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করতে থাকেন। ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে ক্ষত্রিয় কার্তবীর্য্যার্জুন সম্মত ছিলেন না। তিনি ক্ষত্রিয়দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তখন বায়ু নানা পুরাকাহিনী বর্ণনা করে কার্তবীর্য্যার্জুনের ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করেন। তবে বায়ুদেবতার উপদেশ শোনার পরেও কার্তবীর্য্যার্জুনের চরিত্রে সংশোধন হয়নি—একথা তাঁর জীবন-কাহিনী থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়।

[মহা (k) ১৩.১৫২.৩-২৮; (হরি) ১৩.১৩০.৩-২৮; ভাগবত পু. ৯.১৫.১৭-১৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩০.৭৫; ২.৬৯.১০-১৪; বায়ু পু. ৯৪.১০-১৩]

□ মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের অনুগ্রহে কার্তবীর্য্যার্জুন একটি সোনার বিমান লাভ করেছিলেন। সেই বিমানটির বিচরণ ছিল সর্বত্র। হৈহয়রাজ বিমানটিতে আরোহণ করে যক্ষ ও ঋষিগণের উপর উৎপীড়ন করতেন। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ ঋষি এবং দেবতারা শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু ইন্দ্রের সঙ্গে মন্ত্রণা করে কার্তবীর্য্যার্জুনের বিনাশ পরিকল্পনা করেন।

বলশালী কার্তবীর্য্যার্জুন নিজের বাহুবল এবং অস্ত্রবলের দর্পে এমনই মত্ত ছিলেন যে, কোনো কারণ বা প্ররোচনা ছাড়াই যুদ্ধ করে অন্যদের কষ্ট দিতেন। একবার নিজ বিক্রম প্রদর্শনের জন্য বিনা প্ররোচনায় বাণ মেরে সমুদ্রকে উৎপীড়ন করছিলেন। সে সময় সমুদ্র তাঁর কাছ এহেন আচরণের কারণ জানতে চাইলে কার্তবীর্য্যার্জুন তার কাছে জানতে চান যে, তাঁর চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী কোনো ধনুর্ধরের পরিচয় সমুদ্রের জানা আছে কিনা। উত্তরে সমুদ্র তাঁর কাছে জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের কথা বলেন।

একদিন যুদ্ধপ্রাণ কার্তবীর্য্যার্জুন হঠাৎ এসে পৌঁছান জমদগ্নির আশ্রমে। জমদগ্নি-পত্নী রেণুকা তাঁর যথাযথ সৎকার করলেও হৈহয়রাজ তুষ্ট হলেন না। ক্রুদ্ধ কার্তবীর্য্যার্জুন আশ্রমের হোমধেনুর বৎসটিকে হরণ করলেন। আশ্রমের বৃক্ষগুলিকে নষ্ট করলেন। তারপর সেখানে এসে পৌঁছালেন পরশুরাম। জমদগ্নির মুখে কার্তবীর্য্যার্জুনের অনাচারের কথা জানতে পেরে তিনি হৈহয়রাজকে হত্যা করার ইচ্ছায় অগ্রসর হন। পরশুরাম ও কার্তবীর্য্যার্জুনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে পরশুরাম ভল্লদ্বারা তাঁর সহস্রটি বাহু ছেদন করে কার্তবীর্য্যার্জুনকে হত্যা করেন। কার্তবীর্য্যার্জুনের সহস্রবাহুর কথা একাধিকবার মহাভারতে পাওয়া যায়। সম্ভবত তাঁর বল-বিক্রমের বিরাট মাহাত্ম্য সূচনা করার জন্যই এ জাতীয় উপমার ব্যবহার।

ভাগবত পুরাণে কার্তবীর্য্যার্জুন নিধনের কাহিনীটি একটু ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, কার্তবীর্য্যার্জুন জমদগ্নির আশ্রমে যে ধ্বংসকার্য চালিয়ে ছিলেন, সে সংবাদ জানতে পেরে পরশুরাম কার্তবীর্য্যার্জুন অধিকৃত মাহিষ্মতী নগরীতে এসে তাঁকে হত্যা করেন।

[মহা (k) ৩.১১৫.১০-১৭; ৩.১১৬.১৯-২৪; (হরি) ৩.৯৬.১০-১৭; ৩.৯৭.১৯-২৪; ভাগবত পু. ৯.১৫.২৮-৩৫]

□ কার্তবীর্য্যার্জুনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পুত্ররা এবং অনুগত হৈহয় যোদ্ধারাও পরশুরামের হাতে ধ্বংস হয়।

কার্তবীর্য্যার্জুনের পতনের পর তাঁর সঙ্গী ক্ষত্রিয় যোদ্ধারা এতটাই ভীত হয়ে পড়েন যে, স্বজনদের মৃতদেহগুলি সৎকার না করেই তাঁরা পালিয়ে যান। এই পাপে সেই সব ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্মচ্যুত হয়ে শূদ্রে পরিণত হন। *[দ্র. পরশুরাম]*

[মহা (k) ১৪.২৯.১-২৬; (হরি) ১৪.৩৪.১-১৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.২৯-৩০ অধ্যায়; ২.২৬-২৯ অধ্যায়]

□ লঙ্কাধিপতি রাবণ একবার এই কার্তবীর্য্যার্জুনের হাতে পরাজিত এবং অপমানিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।মাহিষ্মতী নগরীর রাজা অগ্নিতুল্য প্রতাপশালী কার্তবীর্য্যার্জুন একদিন পুরস্ত্রীদের নিয়ে নর্মদা নদীতে জলক্রীড়া করতে গিয়েছিলেন। তাঁর অদূরেই রাবণ শিবপূজা করছিলেন। জলে ফুল ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি। এদিকে অর্জুন নিজের সহস্র বাহুর বল জানার জন্য ক্রীড়াচ্ছলে নর্মদার গতি স্তব্ধ করেন। ফলে নর্মদা তীর প্লাবিত করে প্রতিকূল স্রোতে বইতে লাগল, রাবণের দেওয়া পুষ্প-উপহার ভেসে গেল। রাবণের আদেশে সারণ এবং শুক নামে দুই রাক্ষস এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অর্জুনকে দেখতে পেলেন। ক্রুদ্ধ রাবণ অর্জুনের অমাত্যদের বধ করতে লাগলেন, কারণ তাঁরা অর্জুনকে যুদ্ধের সংবাদ দিতে রাজি হন নি। এই সংবাদ পেয়ে কার্তবীর্য্যাজুন রাবণের সৈন্যবাহিনীকে ভয়ঙ্কর আক্রমণ করলেন। তাঁর গদার আঘাতে প্রহস্ত আহত হলেন, অন্য রাক্ষসরাও পালাতে লাগল।

এরপর কার্তবীর্য্যার্জুনের বীরত্বে রাবণ পরাজিত ও বন্দি হলেন। বন্দি রাবণকে নিয়ে অর্জুন মাহিষ্মতীপুরীতে ফিরে এলেন।

[রামায়ণ ৭.৩৬.৬-১০; ৭.৩৭.১-৭৩; ভাগবত পু. ৯.১৫.২০-২২]

□ মহর্ষি পুলস্ত্য নিজের পৌত্র অর্থাৎ রাবণের এই পরাজয় এবং বন্দিদশার সংবাদ শুনে মাহিষ্মতীতে এলেন। কার্তবীর্য্যার্জুন সাদরে সসম্মানে তাঁকে বরণ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, ঋষির কোন প্রিয়কার্য তিনি করতে পারেন। পুলস্ত্য রাবণকে মুক্তি দেওয়ার অনুরোধ করায় কার্তবীর্য্যার্জুন সঙ্গে সঙ্গে বিনা বাক্যব্যয়ে রাবণকে মুক্তি দিলেন। তদুপরি অগ্নিসাক্ষী করে রাবণের সঙ্গে মিত্রতা করলেন। লজ্জিত রাবণ তাঁর অনুমতি নিয়ে ফিরে এলেন লঙ্কায়। *[রামায়ণ ৭.৩৮.১-২১]*

□ একবার সূর্যদেব ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে কার্তবীর্য্যার্জুনের সামনে আবির্ভূত হন। হৈহয়রাজের স্তুতিবাক্যে মুগ্ধ হয়ে আদিত্য তাঁকে অক্ষয় শর প্রদান করেন। কার্তবীর্য্যার্জুন সেই শর নিক্ষেপ করে চারদিক দগ্ধ করতে থাকেন। সে সময় ঋষি আপব জলের মধ্যে তপস্যা করছিলেন। তপস্যা শেষে তিনি ফিরে এসে দেখেন কার্তবীর্য্যার্জুনের অগ্নিময় বাণে তাঁর আশ্রমটি ধ্বংস হয়েছে। ক্রুদ্ধ আপব ঋষি কার্তবীর্য্যার্জুনকে কঠিন অভিশাপ দেন। *[মৎস্য পু. ৪৪.১-১৪]*

□ মহাভারতের অনুশাসনপর্বে কার্তিক মাস এবং শুক্লপক্ষে যাঁরা মাংস ভক্ষণ করতেন না সেইসব রাজাদের বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে। এইসব নৃপতিদের মধ্যে কার্তবীর্য্যার্জুনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

[মহা (k) ১৩.১১৫.৬৯; (হরি) ১৩.১০০.৯৮]

□ পরলোকগমনের পর কার্তবীর্য্যার্জুন যমরাজের সভায় আসীন হয়ে তাঁর উপাসনা করতেন বলে মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ২.৮.১১; (হরি) ২.৮.১১]

□ কার্তবীর্য্যার্জুন দীর্ঘ সময় রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর একশটি পরাক্রমশালী পুত্র ছিল। এঁদের মধ্যে শূর, শূরসেন, বৃষণ, মধুধ্বজ ও জয়ধ্বজ প্রধান। কার্তবীর্য্যার্জুনের এই পাঁচ পুত্রের মাধ্যমেই তালজঙ্ঘ, বীতিহোত্র, যদু, বৃষ্ণি প্রভৃতি জনজাতিগুলির সৃষ্টি হয়।

[বিষ্ণু পু. ৫.১১.৭; মৎস্য পু. ৪৩.৪৪-৫২]

কার্তস্বর মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত বলি-বাসব সংবাদে দৈত্যরাজ বলি অহংকারী ইন্দ্রকে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদির অনিত্যতা সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বহু প্রাচীন রাজর্ষির নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা একসময় পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। কালের নিয়মে তাঁরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন, সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছেন অন্য কোনো রাজা। এই প্রসঙ্গে রাজর্ষি কার্তস্বরের নামও উল্লেখ করেছেন বলি। অর্থাৎ কার্তস্বরের মতো বিখ্যাত রাজারও যদি মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে যে কোনো প্রাণীরই ঐশ্বর্য্যক্ষয় এবং মৃত্যু খুব স্বাভাবিক।

[মহা (k) ১২.২২৭.৫২; (হরি) ১২.২২৫.৫২]

কার্তা বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, সামবেদ সংহিতার প্রবর্তক ঋষিদের মধ্যে কার্তা একজন।

[বায়ু পু. ৬১.১৯১]

কার্তিবীর্য্য১ বায়ু পুরাণ অনুসারে হৈহয়ের বংশধারায় দুর্মদের পুত্র ছিলেন কনক। কনকের পুত্রদের মধ্যে কার্তিবীর্য্য একজন। *[বায়ু পু. ৯৪.৮]*

কার্ত্তিক১ দেবসেনাপতি স্কন্দ কার্ত্তিকেয়। তিনি শুধুমাত্র কার্তিকেয় নামেও বিখ্যাত। কৃত্তিকা হতে জাত এবং লালিত-পালিত বলেই এঁর নাম কার্ত্তিক বা কার্ত্তিকেয়।

পুরাকালে শিব-পার্বতীর বিবাহের অব্যবহিত কাল পরে মহাদেব উমা দেবীর সঙ্গে রমণকালে এক প্রবল তেজ উৎপাদন করেন। এই তেজ ধারণের শক্তি সকলের অতীত—একথা অনুধাবন করে প্রজাপতি ব্রহ্মা লোকহিতের উদ্দেশ্যে মহাদেবেরই শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা মহাদেবকে অনুরোধ করেন সস্ত্রীক তপঃশ্চরণের মাধ্যমে স্বয়ং উদ্ভূত তেজ ধারণ করতে। শিব সম্মত হলেন। পৃথিবী নিজে এই তেজধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মহাদেবের দেহজাত তেজোরাশি পৃথিবীর উপর নিক্ষিপ্ত হল। পৃথিবী দগ্ধ হচ্ছে দেখে ব্রহ্মার ইচ্ছায় অগ্নিদেব স্বয়ং সেই তেজোরাশি ধারণ করেন। এরপর অগ্নি বীর্য্য নিক্ষেপ করলেন গঙ্গা নদীতে। গঙ্গা সেই প্রবল তেজ সহ্য করতে না পেরে হিমালয়ের পার্শ্বে শরবনে গর্ভ নিক্ষেপ করেন। সেখান থেকে এক কুমারের জন্ম হয়। জন্মের পরেই কে তাঁকে স্তন্যপান করাবে—এই বিপন্নতায় ছয় কৃত্তিকা মাতা কার্ত্তিককে স্তন্যদুগ্ধ (ক্ষীর) পান করান। কৃত্তিকারা নিজপুত্রজ্ঞানে তাঁকে লালন করেন। ইনিই স্কন্দ কার্ত্তিকেয়।

ক্ষীরসম্ভাবনার্থায় কৃত্তিকাঃ সমযোজয়ন্॥
তাঃ ক্ষীরং জাত মাত্রস্য কৃত্বা সময়মুত্তমম্।
দদুঃ পুত্রো'য়মস্মাকং সর্বাসামিতি নিঃশ্চিতাঃ॥
ততস্তু দেবতাঃ সর্বাঃ কার্ত্তিকেয় ইতি ব্রুবন্।
পুত্রস্ত্রৈলোক্যবিখ্যাতো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥

[দ্র. স্কন্দ কার্ত্তিকেয়]

[রামায়ণ ১.৩৬-৩৭ অধ্যায় সম্পূর্ণ]

কার্ত্তিবয় কশ্যপবংশীয় একজন বংশপ্রবর্তক ঋষি।

[মৎস্য পু. ১৯৯.৫]

কার্দমায়ণি পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি কার্দমায়ণির বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি ভৃগুর বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৫.৪৩]

কার্পাসিক শূদ্রজাতি অধ্যুষিত একটি প্রাচীন দেশ। রাজসূয় যজ্ঞের সময় শূদ্ররা যুধিষ্ঠিরকে একলক্ষ রূপবতী দাসী উপহার দিয়েছিলেন। সেই দাসীদের গায়ের রং ছিল সোনার মতো, তাদের চেহারার গড়ন দোহারা, এদের সুন্দর দীর্ঘ কেশ এবং সারা শরীর সোনার গয়নায় অলংকৃত।

[মহা (k) ২.৫১.৭-৮; (হরি) ২.৪৯.৬-৭]

□ কার্পাসিক দেশের অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতামতের প্রচলন দেখা যায়। ভি. এস. আগরওয়ালার মতে, মধ্য এশিয়ার কারাপথ (Karapath)-ই হল প্রাচীন কার্পাসিক। পণ্ডিত মোতি চন্দ্র অবশ্য এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন চীনা সাহিত্যে উল্লিখিত কিপিন (Kipin) বা কাপিস (Kapisa) এবং কার্পাসিক একই জায়গা। তিনি পাণিনিকে উদ্ধৃত করে আরো বলেছেন যে, দক্ষিণ হিন্দুকুশ পর্বতমালার কাছে অবস্থিত কোহিস্তান (Kohsitan) বা কাফিরস্তানের অন্তর্গত ছিল কাপিস বা কাপাসিক নামে ভূ-ভাগটি। কার্পাসিকের রাজধানীর নাম কাপিসি (Kapisi)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য একটি খরোষ্ঠিলিপির পাঠোদ্ধারের মাধ্যমে পণ্ডিত Sten Konow বর্তমান কাবুলের ৫০ মাইল উত্তরে বেগরামে (Begram) প্রাচীন কাফিরস্তানের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছিলেন। সেদিক থেকে বিচার করলে কার্পাসিক দেশটিও সম্ভবত এই অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল বলে মনে হয়। আরেকটি বিষয়ের দিকেও আলোকপাত করা দরকার। সেটি হল কাফিরস্তানে প্রচলিত দাস প্রথা। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কার্পাসিক-দেশীয়রা উপহারস্বরূপ দাসী দান করেছিল. সেটা কাফিরস্থানে প্রচলিত দাস প্রথারই একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলে মনে হয়। আধুনিক কালেও দীর্ঘ সময় এই সব অঞ্চলে দাসরূপে নারী-পুরুষ কেনাবেচার চল ছিল। মহাভারতকারের কার্পাসিক দাসী সম্বন্ধীয় বক্তব্যের পক্ষে সেই যুক্তিও তুলে ধরা যায়।

[অষ্টাধ্যায়ী ৪.২.৯৯;
GESMUP Moti Chandra, p. 40-45]

কার্ষ্ণায়ন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা পরাশর মুনির নামে কয়েকটি বংশধারা প্রচলিত ছিল। সেই বংশধারায় অনেকগুলি সন্তানকে নিয়ে এক-একটি বর্গ রচিত হয়েছিল। যাঁদের গৌর-পরাশর, নীল-পরাশর, কৃষ্ণ-পরাশর, শ্বেত-পরাশর, শ্যাম-পরাশর এবং ধূম্র-পরাশর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরাশরের যে সন্তানেরা কৃষ্ণ-পরাশর নামে অভিহিত তাঁদের মধ্যে কার্ষ্ণায়ন একজন।

[মৎস্য পু. ২০১.৩৫]

কার্ষ্ণি১ একজন বিশিষ্ট দেবগন্ধর্ব। অর্জুনের জন্মোৎসবে তিনি উপস্থিত ছিলেন বলেন জানা যায়। *[মহা (k) ১.১২৩.৫৬; (হরি) ১.১১৭]*

কার্ষ্ণি২ কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নকে মহাভারতে একাধিকবার কার্ষ্ণি নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

[দ্র. প্রদ্যুম্ন]

কার্ষ্ণি৩ সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যুকেও বহুবার কার্ষ্ণি নামে সম্বোধন করা হয়েছে। হয়তো কৃষ্ণ তাঁকে পুত্রবৎ লালন-পালন করেছেন বলেই অভিমন্যু একভাবে কার্ষ্ণিই বটে। *[দ্র. অভিমন্যু]*

কার্ষ্ণি৪ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের পুত্র বলে শুকদেবকেও কার্ষ্ণি নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

[মহা (k) ১২.৩২৫.৪৫; (হরি) ১২.৩১৪.১০২]

কার্ষ্ণেয় রাক্ষসদের একটি গণ। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে খশার গর্ভজাত রাক্ষসী কন্যা কৃষ্ণা। কৃষ্ণার পুত্ররা কার্ষ্ণেয় রাক্ষস নামে খ্যাত।

[বায়ু পু. ৬৯.১৭২]

কাল ভগবান শিবের অন্যতম নাম। শিবসহস্রনামস্তোত্রে মোট চারবার ভগবান শিবকে 'কাল' নামে সম্বোধন করা হয়েছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ মহাদেবের 'কাল' নামটিকে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। 'কাল' শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'কল্' ধাতু থেকে।

'কল্' ধাতুর অর্থ গণনা করা। আমরা যাকে সময় বলি, বাস্তবে তার আদিও নেই অন্তও নেই, তা অসীম-অনন্ত। সেই অসীম অনন্ত সময়কে আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুসারে যতটা গণনা করা সম্ভব, ততটা গাণিতিক নিয়মের মাধ্যমে কলা-কাষ্ঠা মুহূর্ত প্রভৃতি নানা এককের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছি আমাদেরই সুবিধার্থে। গণনার মাধ্যমে সীমাবদ্ধ হওয়ায় সময়ের অপর নাম কাল। পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম নিজেও সময়ের মতোই অসীম অনন্ত। আদি-অন্তহীন, গণনার অসাধ্য যে মহাকাল, তার সঙ্গে যখন পরমপুরুষের অভিন্নসত্তা কল্পিত হয়, তখন সময় গণনার যে এককগুলি আমরা নির্ধারণ করেছি সেগুলিও তাঁরই স্বরূপ। এই ভাবনা থেকেই পরমেশ্বরস্বরূপ মহাদেব যেমন কাল নামে সম্বোধিত হন, তেমনই কলা, কাষ্ঠা, লব, মাত্রা, মুহূর্ত ইত্যাদিও তাঁর নাম হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। দিন, মাস, বৎসর কিংবা যুগ-মন্বন্তর-কল্পের স্বরূপ বলেও বর্ণনা করা হয়েছে তাঁকে। মহাদেবের 'কাল' নামটি একদিকে যেমন গণনার অতীত অনাদি-অনন্ত মহাকালস্বরূপতা জ্ঞাপন করে, তেমনই মানুষের গণনাসাধ্য মাস, বৎসর, শতাব্দীর মতো নির্দিষ্ট সময়কেও বোঝায়।

মানুষের সীমিত জীবনকালের ভাবনা থেকেই কাল শব্দের দ্বিতীয় অর্থ মৃত্যু বা বিনাশ। ভগবান শিবকে জগৎ সংহর্তা বা মৃত্যু রূপে কল্পনা করা হয়, প্রলয়কালে তিনি সমস্ত জীবজগৎকে গ্রাস করেন—এই ভাবনা থেকে মৃত্যুস্বরূপ ভগবান শিব কাল নামে সম্বোধিত হন—কালঃ মৃত্যুঃ সংবৎসরাদির্বা (নীলকণ্ঠ কৃতটীকা)।

টীকাকার নীলকণ্ঠ কাল শব্দের ভিন্ন একটি অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

কালঃ কলয়তি সর্বেষাং পুণ্যপাপাদিকং তত্তৎ
ফলপ্রদানার্থং সংখ্যাতীতি কালঃ চিত্রগুপ্তাত্মা।

'কাল' শব্দটি যে গণনা অর্থ বহন করে তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তিনি সমস্ত জীবের পাপ-পুণ্য কর্মের হিসাব রক্ষা করেন, তাদের পাপ পুণ্যের বিচার করে উচিত কর্মফল দান করেন—কর্ম ও কর্মফলের বিচার ও গণনায় রত বলেই ঈশ্বরপুরুষের একটি নাম কাল। এক্ষেত্রে পাপ-পুণ্যের বিচার কর্তা কাল বা যমের স্বরূপ হিসেবেও কল্পনা করা হয়েছে শিবকে। তিনি কর্ম, কর্মফল, জন্ম-মৃত্যু সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী ঈশ্বর বলেই তিনি কাল নামে খ্যাত।

কাল শব্দের অন্য একটি ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ বলছেন—

কালঃ কলানাং চতুঃষষ্টি সম্মিতানাং
নিবাসঃ কালঃ।

শাস্ত্রে নৃত্য-গীত প্রভৃতি যে চৌষট্টিটি কলার উল্লেখ আছে—মহাদেবকে তার অধীশ্বররূপে কল্পনা করা হয়েছে। এই চৌষট্টিটি কলার মধ্যে তিনি স্বয়ং অবস্থান করেন বলেও তাঁর নাম কাল।

*[মহা (k) ১৩.১৭.৪৮, ৭৫, ৭৬, ৯৪;
(হরি) ১৩.১৬.৪৮, ৭৫, ৭৬, ৯৪]*

কালক১ কলিযুগে যেসব রাজবংশ ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছিল কালক তাদের মধ্যে অন্যতম। এই রাজবংশের চব্বিশজন রাজা রাজত্ব করেন।

*[বায়ু পু. ৯৯.৩২৩;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৩৬]*

কালক২ একজন বিশিষ্ট দানব। রামায়ণে প্রাপ্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা কালকার গর্ভে কালকের জন্ম, অর্থাৎ তিনি কালকেয় দানব। তবে পুরাণ মতে, প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা দনায়ুষা বা অনায়ুষার গর্ভজাত পুত্র বিরক্ষ (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে বিজর)। কালক নামক দানব এই বিরক্ষের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। *[রামায়ণ ৩.১৪.১৬;
বায়ু পু. ৬৮.৩৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.৩৩]*

কালকক্ষ স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচর যোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

*[মহা (k) ৯.৪৫.৬৯; (হরি) ৯.৪২.৫২নং
শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]*

কালকণ্ঠ স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচর একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

*[মহা (k) ৯.৪৫.৬৯; (হরি) ৯.৪২.৫২নং
শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]*

কালকবৃক্ষীয় একজন মুনি। *[দ্র. ক্ষেমদর্শী]*

কালকা১ পুরাণ মতে কালকা ছিলেন বৈশ্বানরের কন্যা এবং কশ্যপ প্রজাপতির পত্নী। রামায়ণে কালকাকে দক্ষ প্রজাপতির কন্যা বলা হয়েছে। মহাভারতেও আমরা কালকার উল্লেখ পাই।

কালকার গর্ভজাত অসুররা কালকেয় নামে খ্যাত ছিল। *[মহা (k) ৩.১৭৩.৭; (হরি) ৩.১৪৪.৭; রামায়ণ ৩.১৪.১০-১১, ১৬; ভাগবত পু. ৬.৬.৩৩-৩৫; মৎস্য পু. ৬.২২; বিষ্ণু পু. ১.২১.৭-৯]*

☐ কালকা এবং পুলোমা দীর্ঘকাল ধরে কঠোর তপস্যা করেন। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁদের বর দিতে চাইলে তাঁরা নিজেদের পুত্রদের সুখ সাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করলেন। রাক্ষস, নাগ, দেবতারা যাতে তাঁদের পুত্রদের ক্ষতি করতে না পারে সেই বরও প্রার্থনা করলেন তাঁরা। সবশেষে তাঁরা তাঁদের পুত্ররা যাতে সুখে বসবাস করতে পারে এমন একটি সুন্দর আকাশচর নগর নির্মাণ করে দিতে অনুরোধ করলেন ব্রহ্মাকে। ব্রহ্মা একটি আশ্চর্য নগর নির্মাণ করলেন অসুরদের বসবাসের জন্য যা ধ্বংস করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না, যে নগরে বাস করলে রোগ বা শোক স্পর্শ করে না কখনো। তেমন একটি নগরে পুলোমা ও কালকা নিজের পুত্রদের প্রতিষ্ঠিত করলেন। সেই নগরীর নাম হল হিরণ্যপুর।

[মহা (k) ৩.১৭৩ অধ্যায়; (হরি) ৩.১৪৪ অধ্যায়]

কালকা২ *[দ্র. কালিকা]*

কালকাক্ষ একজন দৈত্য। ইনি গরুড়ের হাতে নিহত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ১২.১০৫.১২; (হরি) ১২.৯৮.১৩]

কালকাম একজন বিশ্বেদেব। ধর্মের ঔরসে দক্ষকন্যা বিশ্বার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম কালকাম। বিশ্বার নামানুসারে তাঁর পুত্ররা বিশ্বেদেব নামে প্রসিদ্ধ। *[মৎস্য পু. ২০৩.১৩]*

কালকার্মুক একজন রাক্ষস সেনাপতির নাম। খর যখন রামকে আক্রমণ করতে গেলেন, তখন বারো জন রাক্ষস প্রধান তাঁর সঙ্গে যাত্রা করেন। কালকার্মুক তাঁদের অন্যতম। খরের আদেশে ইনিও রামকে আক্রমণ করেন। রামের বাণে এঁরা সকলেই নিহত হন।

[রামায়ণ ৩.২৩, ৩২; ৩.২৬.২৭-২৯]

কালকীর্তি দ্বাপর যুগে জন্মগ্রহণকারী জনৈক পররাক্রমশালী রাজা। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে বলা হয়েছে যে, সুপর্ণ নামে এক শক্তিশালী অসুর দ্বাপরযুগে কালকীর্তি রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.৩৭; (হরি) ১.৬২.৩৭]

কালকূট১ একপ্রকার তীব্র বিষ। মহাকাব্য এবং পুরাণগুলিতে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী, সমুদ্রমন্থনের সময় এই বিষের উৎপত্তি ঘটেছিল, তবে সমুদ্র মন্থনের ঠিক কোন পর্যায়ে কালকূট বিষের উৎপত্তি হয়েছিল, সে বিষয়ে মহাভারতের এবং পুরাণগুলির বিবরণে বেশ একটু পার্থক্য দেখা যায়। মহাভারতে যেমন বর্ণিত হয়েছে যে, সুদীর্ঘকাল ধরে সমুদ্রমন্থন করার ফলে মন্দর পর্বতের ওষধিসমূহ এবং সমুদ্রের জলের মধ্যে মিশে থাকা নানা দ্রব্যসামগ্রীর মিশ্রণে উৎপন্ন হল কালকূট নামক বিষ। সেই বিষ শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করা মাত্র মানুষের মৃত্যু হতে লাগল। তখন সেই তীব্র বিষের হাত থেকে জীবকুলকে রক্ষা করার জন্য ভগবান শিব সেই বিষ পান করে তা নিজ কণ্ঠে ধারণ করলেন—

অতিনির্মথনাদেব কালকূটস্থথাপরঃ।
জগদাবৃত্য সহসা সধূমো'গ্নিরিব জ্বলন্॥
ত্রৈলোক্যং মোহিতং যস্য গন্ধমাঘ্রায় তদ্বিষম্।
প্রাগসল্লোকরক্ষার্থং ব্রহ্মণো বচনাচ্ছিবঃ॥
দধার ভগবান্ কণ্ঠে মন্ত্রমূর্তির্মহেশ্বরঃ।
তদা প্রভৃতি দেবস্তু নীলকণ্ঠ ইতি শ্রুতঃ॥

[মহা (k) ১.১৫.৪৩; (হরি) ১.১৪.৪৩]

☐ রামায়ণে সমুদ্রমন্থনের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যাচ্ছে যে সমুদ্রমন্থনের ফলে উৎপন্ন বিষের নাম কালকূট নয়, হলাহল। সমুদ্রমন্থনের সময় মন্থনরজ্জু হিসেবে নিযুক্ত বাসুকিনাগের ফণা থেকেই এই হলাহল বিষের উৎপত্তি—

অথ বর্ষসহস্রেণ যোক্ত্রসর্পশিরাংসি চ।
বমন্তো'তিবিষং তত্র দদংশুর্দশনৈঃ শিলাঃ॥
উৎপপাতাগ্নি সঙ্কাশং হালাহলমহাবিষম্।
তেন দগ্ধং জগৎ সর্বং সদেবাসুরমানুষম্॥

[রামায়ণ ১.৪৫.১৯-২০]

☐ পুরাণগুলিতেও সমুদ্রমন্থনের সময় কালকূট বিষের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। তবে সমুদ্রমন্থনের ঠিক কোন পর্যায়ে বা কীভাবে কালকূট বিষ উৎপন্ন হয়েছিল—এ বিষয়ে বিভিন্ন পুরাণগুলিতেও ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়।

[দ্র. অমৃতমন্থন]

☐ এই যে সমুদ্রমন্থনের সময়ে উৎপন্ন 'কালকূট' বা 'হলাহল' বিষের কথা মহাকাব্য-পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে—এটি ঠিক কী জাতীয় বিষ, বা এর উগ্রতাই

বা ঠিক কতখানি—এ বিষয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল জাগে। বৈজ্ঞানিকরা, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের Toxicologist রা এ বিষয়ে বিশদে গবেষণাও করেছেন। এই গবেষণার ফলাফল সমন্বিত যে সব গবেষণাপত্র আমরা পাই, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, রামায়ণে বাসুকি নাগের ফণা থেকে হলাহলের উৎপত্তির উল্লেখ থাকলেও গবেষকরা কিন্তু সমুদ্রমন্থন হতে জাত বিষকে সাপের বিষ বলে কখনোই মনে করছেন না। কালকূটকে তাঁরা উদ্ভিদজাত বিষাক্ত রসায়ন বলেই চিহ্নিত করছেন, আর এর স্বপক্ষে সব থেকে বড়ো প্রমাণ হিসেবে আমরা পাচ্ছি সুশ্রুত সংহিতার একটি অধ্যায়, যেখানে বিভিন্ন প্রকার বিষ এবং শরীরে বিষক্রিয়ার লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কালকূটকে খুব স্পষ্টভাবে কন্দজ বিষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

কন্দজানি তু তীক্ষ্ণানি তেষাং বক্ষ্যামি বিস্তরম্।

সুশ্রুত সংহিতায় শরীরে কালকূট বিষ প্রবেশ করলে গলায় নীল বর্ণ স্তম্ভ আকৃতি ফুটে ওঠে, আক্রান্ত ব্যক্তির স্পর্শজ্ঞান লোপ পায় এবং দুটি চোখ এবং মূত্র পীতবর্ণ ধারণ করে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে কালকূট বিষপানের ফলে মহাদেবের নীলকণ্ঠ হওয়ার ঘটনাকে শুধু পৌরাণিক কল্পনামাত্র নয়, প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রসম্মত বিষক্রিয়ার লক্ষণ হিসেবেই ব্যাখ্যা করা যায়।

আধুনিক গবেষকদের মতে, এই কালকূট হল Aconitum Ferox. একে আয়ুর্বেদের ভাষায় বৎসনাভও বলা হয় কিংবা বলা ভালো যে বৎসনাভ নামেই এর সমধিক পরিচিতি। তবে প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা ভালো যে, আধুনিক গবেষকরা কালকূট আর বৎসনাভকে অভিন্ন বলে মনে করলেও সুশ্রুত সংহিতায় কালকূট আর বৎসনাভের পৃথক পৃথক উল্লেখ পাওয়া যায়। যাই হোক, আধুনিক গবেষকদের ভাবনা অনুসরণ করে এই মুহূর্তে অন্তত আমরা কালকূট এবং বৎসনাভকে অভিন্ন ধরে নিয়েই আলোচনা করতে পারি। Aconitum প্রজাতির একাধিক উদ্ভিদের অস্তিত্বের কথা গবেষকরা আলোচনা করে থাকেন। সেক্ষেত্রে বৎসনাভ এবং কালকূট নামে প্রায় সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অথচ সামান্য পৃথক প্রজাতির দুটি কন্দজ বিষের অস্তিত্বের কথা প্রাচীনকালে জানা ছিল— এমনটাও অসম্ভব নয়। উপাদানগত ভাবে কালকূট আর বৎসনাভ প্রায় একই বস্তু। অতি প্রাচীন কাল থেকেই এই বিষের তীব্রতার কথা ভারতবর্ষে সুবিদিত। বিষাক্ত উদ্ভিজ্জ রসায়ন হিসেবে বৎসনাভের নাম ভারতবর্ষের গণ্ডী পার হয়ে পারস্য তথা মধ্যপ্রাচ্যেও ছড়িয়েছিল। এই বিষের তীব্রতা এতখানিই যে একে 'অতিবিষ' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে ভারতে। সুশ্রুত সংহিতায় যেমন বৎসনাভের উল্লেখ মেলে ঠিক তেমনই দশম শতাব্দীর পারস্য দেশীয় চিকিৎসাবিদ Alheroo (অলহেরু) তাঁর গ্রন্থে বৎসনাভের উল্লেখ করেছেন 'বিষ' হিসেবে। 'বৎসনাভ' শব্দটি সংস্কৃত থেকে হিন্দীতে যেমন 'বচ্ছনাগ' রূপ পেয়েছে তেমনি পারস্য দেশেও এর একটি ঈষৎ পরিবর্তিত নাম পাওয়া যাচ্ছে—'বচনগ্'।

Aconitum Ferox বা বৎসনাভ পার্বত্য প্রজাতির উদ্ভিদ। হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে মোটামুটি ২০০০ থেকে ৩৫০০ মিটার উচ্চতায় যেসব গাছপালার দেখা মেলে তার মধ্যে বৎসনাভ অন্যতম। বর্তমান কাশ্মীরের লে-লাদাখ অঞ্চল, গাড়ওয়াল হিমালয়, নেপাল, ভূটান, সিকিম এবং তিব্বতে এর দেখা মেলে। তিব্বতী চিকিৎসাশাস্ত্রে Aconitum ferox ছাড়াও এই প্রজাপতির আরও বহুসংখ্যক গাছপালার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিব্বতী চিকিৎসাশাস্ত্রে এর বহুল প্রয়োগ থেকেই স্পষ্ট যে, পার্বত্য অঞ্চলে এটি যথেষ্ট সহজলভ্য গাছ। পার্বত্য মৃত্তিকা তো বটেই এমনকী ঈষৎ পাথুরে জমিতেও এই গাছ অতি সহজে জন্মায়। ছোটো ছোটো গাছ উচ্চতায় এক মিটার কিংবা সামান্য বেশি, বর্ষাকালে এতে নীল রঙের ফুল ধরে। ফুলগুলি দেখতে অনেকটা টুপির মতো, হয়তো সেই জন্যই এর Monk's hood নামকরণ হয়ে থাকবে। যাই হোক কালকূট বা বৎসনাভ পার্বত্য উদ্ভিদ হওয়ায় আরও একটা বিষয় স্পষ্ট হয়। লক্ষণীয়, সমুদ্রমন্থনের সময় মন্থনদণ্ড হিসেবে মন্দর পর্বতের মতো সুউচ্চ পর্বত ব্যবহৃত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে পর্বতের দ্বারা অতিরিক্ত মন্থনের ফলে পর্বতজাত ওষধিসমূহ সমুদ্রের জলে মিশে যাওয়ায় কালকূট বিষের উৎপত্তি হয়েছিল—এই মহাভারতীয় যুক্তিটাই আমাদের কাছে সবথেকে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

তবে বৎসনাভ বা Aconitum ferox -এর

নাম বিষ হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও চিকিৎসাক্ষেত্রে এর প্রয়োগ কিছু কম নয়। বহু জটিল রোগের জীবনদায়ী ওষুধ হিসেবেও এর বহুল প্রয়োগ আয়ুর্বেদশাস্ত্রে দেখা যায়। কফ, সর্দি-কাশি, হাঁপানি, পাচনতন্ত্রের সমস্যা, হৃদরোগ বা হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা, চর্মরোগ, কুষ্ঠ, পক্ষাঘাত, মধুমেহ, বাতের ব্যথা, জ্বর প্রভৃতির অসুধ হিসেবে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এবং তিব্বতী চিকিৎসাশাস্ত্রে এর ব্যবহার বহুল প্রচলিত, তিব্বতী চিকিৎসাশাস্ত্রে এর নাম Sman-chen, তিব্বতী ভাষায় যার অর্থ মহৌষধ বা সর্বরোগনাশক। এই নামকরণ থেকেই বোঝা যায় ঔষধ হিসেবে তিব্বতী চিকিৎসকদের কাছে এর গুরুত্ব কতখানি ছিল। এটি অবসাদের মতো মানসিকরোগের চিকিৎসাতেও ব্যবহৃত হত।

Aconitum ferox বিষাক্ত হলেও সামান্য পরিমাণে ব্যবহারে খানিকটা মানসিক উত্তেজনা তৈরি করতে সক্ষম। ফলে মাদকদ্রব্য হিসেবেও এর ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষত তান্ত্রিক অঘোরীদের মধ্যে গাঁজা ইত্যাদির সঙ্গে ধূমপানের উপকরণ হিসেবে এটি যথেষ্ট প্রচলিত।

পরিশেষে এটাও উল্লেখ্য যে, অতি তীব্র বিষ থেকেই অমৃতের সন্ধান মেলে। বৎসনাভ বা কালকূটকে আমরা প্রাণহরণকারী তীব্র বিষ এবং জীবনদায়ী ঔষধ—দুই রূপেই দেখতে পাই। সেক্ষেত্রে সমুদ্রমন্থনে এই তীব্র বিষই মথিত হতে হতে অমৃতের সৃষ্টি করেছিল—এমন ভাবনারও অবকাশ থাকছে।

[পঠিতব্য: Aconitum Ferox, The Encyclopedia of Psycho-active Plants : Ethnopharmacology and its Applications, Ed. by Christion Patsch, Tarns. by John R. Baker, 2005, Park Street Press, Roclester, Vermunt) সুশ্রুত সংহিতা (কল্পস্থান) ২.১১.১৩]

□ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কালকূট বিষের ব্যবহার সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের তথ্য পাওয়া যায়, যার থেকে সেযুগের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার একটা নতুন দিক উন্মোচিত হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে শত্রুকে হত্যা করার নানাবিধ উপায়ের মধ্যে বিষপ্রয়োগে হত্যার উপায়ও আলোচিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে কালকূট বিষের প্রয়োগে বহু মানুষকে হত্যা করার একটি অভিনব উপায় লক্ষ্য করা যায়। সেখানে বলা হচ্ছে যে, শাল্মলী, বিদারী মূল, বৎসনাভ একসঙ্গে মিশিয়ে তা ছুঁচোর রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে তীরের ফলায় লাগানো হবে। সেই তীর দিয়ে প্রথমে একজনকে আঘাত করা হবে যার শরীরে বিষ প্রবেশ করার পর সে বিষের মূল বাহক হিসেবে কাজ করবে। সেই ব্যক্তি তারপর দশজন ব্যক্তিকে দংশন করবে এবং সেই দশজন প্রত্যেকে দশজনকে দংশন করে হত্যা করবে। আমরা গল্প-কথায় বিষবাহক পুরুষ বা বিষকন্যার যে উল্লেখ দেখি তার সঙ্গে এই পন্থার বেশ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও যুদ্ধে বিষাক্ত তীরের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কালকূট বৎসনাভের প্রয়োগ অতি প্রাচীন কাল থেকে দেখা যায়।

[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (kangle) ১৪.১.২৯]

কালকূট২ একটি প্রাচীন পর্বত। বানপ্রস্থ অবলম্বনের পর শতশৃঙ্গ পর্বতে যাবার পথে রাজা পাণ্ডু এই পর্বত অতিক্রম করেছিলেন।

[মহা (k) ১.১১৯.৪৮; (হরি) ১.১১৩.৪৮]

□ মগধরাজ জরাসন্ধকে কৌশলে দমন করার জন্য কৃষ্ণ, ভীম এবং অর্জুন যখন মগধের রাজধানী গিরিব্রজপুরের দিকে যাত্রা করেন, তখন যাত্রাপথে তাঁরা কালকূট পর্বত অতিক্রম করেছিলেন। সভাপর্বে তাঁদের এই যাত্রাপথের বর্ণনায় কুরুজাঙ্গল ও গণ্ডকীনদীর মাঝে কালকূট পর্বতের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পণ্ডিতরা মনে করেন যে, কুরুজাঙ্গল দেশ বলতে সরস্বতী ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তীস্থানে বর্তমান হরিয়ানা রাজ্যের একটি বিশাল ভূ-খণ্ডকে বোঝানো হত। আর গণ্ডকী নদীটি নেপালে উৎপন্ন হয়ে বর্তমান বিহারের সমভূমির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। ফলে কুরুজাঙ্গল ও গণ্ডকী নদীর অবস্থান বিচার করলে বলা যেতেই পারে যে হরিয়ানা এবং নেপাল ও বিহারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত গণ্ডকী নদীর মাঝামাঝি কোনো অঞ্চলেই কালকূট পর্বতের অবস্থান। *[মহা (k) ২.২০.২৬; (হরি) ২.১৯.২৬; Romila Thapar, The Past Before Us, USA: Harvard University, 2013, p. 176; Sharad Singh Negi, Himalayan Rivers, Lakes and Glaciers, New Delhi: Indus Publishing Company, 2004, p. 50]*

□ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে কুরুপক্ষের বিরাট সৈন্যদের একটি অংশ কালকূট পর্বতে অবস্থান করছিল।

[মহা (k) ৫.১৯.৩০; (হরি) ৫.১৯.৩০]

□ কালকূট পর্বতের সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কে ধারণা করতে গেলে কালকূটদেশ বলতে পণ্ডিতরা ঠিক কোন অঞ্চলকে বোঝান সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। পণ্ডিতরা মনে করেন যে, কালকূটদেশ বলতে কুমায়ুন হিমালয়ের অন্তর্গত একটি অঞ্চলকে বোঝানো হয়। এই পর্বতাধ্যুষিত অঞ্চলটি থেকেই শতদ্রু, যমুনা এবং গঙ্গা নদীর উৎপত্তি। কালকূট পর্বতও এই অঞ্চলেরই অন্তর্গত।

[S.C. Bajpai, Kinnaur in the Himalayas, New Delhi: Concept Publishing Company, 1981, p. 50]

কালকূট৩ হিমালয় সংলগ্ন একটি প্রাচীন পার্বত্য দেশ। দিগ্বিজয়ের সময় অর্জুন এই দেশটি জয় করেছিলেন। *[মহা (k) ২.২৬.৪; (হরি) ২.২৫.৪]*

□ পণ্ডিতরা মনে করেন যে, কালকূট দেশটি কুমায়ুন হিমালয়েরই অন্তর্গত একটি পার্বত্যভূমি।

[দ্র. কালকূট২]

কালকেয়১ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে কালার গর্ভজাত পুত্ররা কালকেয় অসুর নামে প্রসিদ্ধ। কোনো কোনো পুরাণে কালাকে কালকা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। কালকেয় অসুরগণ দেবকূট পর্বতে বসবাস করতেন। রামায়ণ থেকে জানা যায়, রাবণ কালকেয় অসুরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অশ্মনগরে উপস্থিত হয়ে কালকেয় অসুরগণকে বধ করেছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৫.৩৪-৩৫; (হরি) ১.৬০.৩৪-৩৫; মৎস্য পু. ৬.২৪; ১৭১.৫৯; বিষ্ণু পু. ১.২১.৯; বায়ু পু. ৪০.১৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৫৫; ৩.২৯.৭৬; রামায়ণ ৭.২৩.১৭]

□ মহাভারতে বর্ণিত আছে যে দক্ষকন্যা কালার গর্ভে কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে কালকেয় দানবরা জন্মগ্রহণ করেন। কালকেয়দের মধ্যে প্রধান চারজন অসুরবীর ছিলেন—বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা এবং ক্রোধশত্রু।

কালকেয়রা বৃত্রাসুরের অন্যতম অনুগামী ছিলেন। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করলে সেই যুদ্ধের শেষে জীবিত কালকেয়রা (মহাভারতে এদের কালেয় নামেও উল্লেখ করা হয়েছে) আত্মগোপন করল সমুদ্রের তলদেশে। দিনের বেলায় তারা লুকিয়ে থাকত, রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে এসে তারা আশ্রমবাসী তপস্বীদের হত্যা করত। মানুষ, দেবতা সকলেই এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তখন ভগবান বিষ্ণুর পরামর্শে দেবতারা কালকেয় দানবদের হাত থেকে ত্রাণ পাবার জন্য মহর্ষি অগস্ত্যের শরণাপন্ন হলেন। মহর্ষি অগস্ত্য দেবতাদের অনুরোধে সমুদ্রের জল শোষণ করলেন। সমুদ্র শুষ্ক হলে কালকেয়রা তাদের গোপন আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হল। দেবতারা সহজেই তাদের হত্যা করলেন।

[দ্র. অগস্ত্য]

[মহা (k) ৩.১০০.৩; ৩.১০১.২; ৩.১০২-১০৫ অধ্যায়; (হরি) ৩.৮৫.৩; ৩.৮৬.৩; ৩.৮৭-৮৯ অধ্যায়]

□ কালকেয় দানবদের জন্মদাত্রী দক্ষকন্যা কালকা বা কালা এবং পুলোম রাক্ষসদের মাতা পুলোমা একসময় কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মাকে তুষ্ট করেন। ব্রহ্মা তাঁদের বর দান করতে চাইলে তাঁরা বর চাইলেন যে, তাঁদের পুত্ররা দেবতা, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, নাগ এবং ঋষিদের অবধ্য হবে। এছাড়া তাঁদের বসবাসের জন্য শোক-রোগবিহীন, আকাশচারী একটি নগর নির্মাণের জন্যও তাঁরা ব্রহ্মাকে অনুরোধ করেন। ব্রহ্মা পুলোমা এবং কালকাকে অভীষ্ট বর দান করলেন। ব্রহ্মার বরে কালকেয়রা অজেয় এবং মৃত্যু ভয়হীন হল এবং ব্রহ্মার দ্বারা নির্মিত হিরণ্যপুরে সুখে বাস করতে লাগল। তাদের উপদ্রবে ক্রমে দেবতারা পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। এরপর একসময় অর্জুন দিব্যাস্ত্র লাভের জন্য স্বর্গলোকে গেলেন। সেই সময় অর্জুনের হাতে হিরণ্যপুরবাসী কালকেয় দানবরা নিহত হয়েছিল।

[মহা (k) ৩.১৭৩ অধ্যায়; (হরি) ৩.১৪৪ অধ্যায়]

কালকেয়২ *[দ্র. ক্রোধহন্তা১]*

কালকোটি নৈমিষারণ্যের অন্তর্গত বাহুদা নদীর তীরবর্তী একটি তীর্থক্ষেত্র। বনবাসের সময় পাণ্ডবরা এই তীর্থটি দর্শন করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.৯৫.৩; (হরি) ৩.৭৯.৩]

উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে লক্ষ্ণৌয়ের কাছে নিমসর নামে একটি জায়গা রয়েছে। পণ্ডিতরা মনে করেন যে, এই নিমসরই হল প্রাচীন নৈমিষারণ্য। সেই

সূত্র ধরে বলা যায় যে, কালকোটি তীর্থটিও এই নিমসরের কাছাকাছিই কোথাও অবস্থিত ছিল।

[GDAMI (Dey) p. 135]

কালঘট একজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ। ইনি জনমেজয়ের সর্পসত্রের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন।

[মহা (k) ১.৫৩.৮; (হরি) ১.৪৮.৮]

কালচক্র একজন বানরবীর বলে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৩৫]*

কালচক্ষু যযাতির বংশধারায় অনুর পুত্র কালচক্ষু।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৩]

কালঞ্জর একটি পবিত্র পর্বততীর্থ। মহাভারতের বনপর্বে একে জগদ্বিখ্যাত পর্বত বলা হয়েছে। কালঞ্জর পর্বতস্থিত দেবহ্রদে স্নান করলে পুণ্যলাভ হয়। এই পর্বততীর্থে মানুষ পূর্বপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করে। এখানে তর্পণ করলে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

[মহা (k) ৩.৮৫.৫৬-৫৭; ১৩.২৫.৩৫;
(হরি) ৩.৭০.৫৬-৫৭; ১৩.২৬.৩৫;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৩.১০০;
মৎস্য পু. ২২.২৪; বায়ু পু. ৭৭.৯৩]

□ বিখ্যাত অগস্ত্যপর্বত এবং হিরণ্যবিন্দু নামে মনোরম জায়গাটি কালঞ্জর পর্বতেই অবস্থিত—

হিরণ্যবিন্দুঃ কথিতো গিরৌ কালঞ্জরে মহান্।
আগস্ত্যপর্বতো রম্যো পুণ্যো গিরিবরঃ শিবঃ॥

[মহা (k) ৩.৮৭.২১; (হরি) ৩.৭২.২১]

□ পুরাণ মতে কালঞ্জর মেরু পর্বতের উত্তরদিকে অবস্থিত একটি গিরিশ্রেণী।

[বিষ্ণু পু. ২.২.৩০; ভাগবত পু. ৫.১৬.২৬]

□ দেবী সতী কালঞ্জর পর্বতে কালী নামে পূজিত হন। *[মৎস্য পু. ১৩.৩২]*

□ মহর্ষি কৌশিকের সাত পুত্র গো-হত্যা এবং গোমাংস ভক্ষণের পাপে পরজন্মে নিষ্ঠুর ব্যাধ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। জাতিস্মর এই সাত ব্যাধ সেই জন্মে অনশনব্রত পালন করে দেহত্যাগ করেন এবং পরবর্তী জন্মে কালঞ্জর পর্বতে জাতিস্মর মৃগ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। *[মৎস্য পু. ২০.১৫]*

□ বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, ভগবান শিব, শ্বেত নামে ত্রয়োবিংশতিতম দ্বাপরে জন্মগ্রহণ করে একটি পর্বতে কাল অতিবাহিত করবেন এবং সেই কারণেই পর্বতটির নাম হবে কালঞ্জর। এই পর্যায়েই তৃণবিন্দু, ব্যাসরূপে আবির্ভূত হবেন—

ব্যাসো ভবিষ্যতি ব্রহ্মা তদাহং ভবিতা পুনঃ।
শ্বেতো নাম মহাকায়ো মুনিপুত্রঃ সুধার্মিকঃ॥
তত্র কালং জায়ষ্যাম তদা গিরিবরোত্তমে।
তেন কালঞ্জরো নাম ভবিষ্যতি স পর্বতঃ॥

[বায়ু পু. ২৪.২০২-২০৩]

□ ব্রহ্ম পুরাণে বলা হয়েছে, যে স্থানে পুরুর আরাধনায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁর পিতা যযাতির অভিশপ্ত জরারূপ মোচন করেন, সেই স্থানটিই কালঞ্জর নামে পরিচিত। যযাতির অকাল জরার সূত্রেই এর কালঞ্জর নামকরণ—

ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং জরারোগবিনাশনম্।
অকালজজরাদীনাং স্মরণাদপি নাশনম্॥
তন্নাম্না চাপি বিখ্যাতং কালঞ্জরমুদাহৃতম্।

সেখানে যযাতি, নাহুষ, পৌর, শার্মিষ্ঠ ইত্যাদি নামে একশো আটটি তীর্থ অবস্থিত।

[ব্রহ্ম পু. ১৪৬ অধ্যায়]

□ পণ্ডিতরা মনে করেন যে, স্থান হিসেবে কালিঞ্জর ও কালঞ্জর একই জায়গা। ফলে কালঞ্জরের আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে একাধিক এবং পরস্পর বিরোধী মতামত পাওয়া যায়। বিষ্ণু পুরাণ ও ভাগবতের দেখানো পথে চিন্তা করলে কালঞ্জর পর্বতটি মেরু পর্বতের উত্তরে অবস্থিত হওয়ার কথা। এক্ষেত্রে মনে রাখা ভালো যে, পণ্ডিতরা প্রাচীন মেরু পর্বত বলতে পামীর পর্বতশ্রেণীকে বুঝিয়েছেন। সেদিক থেকে বিচার করলে কালঞ্জর, পামীরের কাছাকাছি অবস্থিত হওয়াই উচিত। তবে যেহেতু পুরাণ ও মহাকাব্যে বর্ণিত মেরু পর্বতের অবস্থানতত্ত্ব একটি বহুস্তর জটিল আলোচনার বিষয়, তাই পামীরের কাছে কালঞ্জরের অবস্থান খোঁজার চেষ্টা সম্ভবত সব অর্থে সঠিক হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পণ্ডিতদের একাংশ হিমালয় পর্বতশ্রেণীকেও মেরু পর্বতের একটি ভাগ বলে ধারণা করেন। সেই ধারণার ভিত্তিতে হিমালয় পর্বতশ্রেণীর অন্তর্গত দক্ষিণ কাশ্মীরের কালঞ্জর নামে অঞ্চলটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কলহনের রাজতরঙ্গিনীতে এই কালঞ্জর অঞ্চলটির নাম পাওয়া যায়। তবে দক্ষিণ কাশ্মীরের অন্তর্গত হলেও এর সুনির্দিষ্ট অবস্থান এখনো পর্যন্ত সন্ধান করা যায়নি।

[M.A. Stein, Rajtarangini Vol-3; Bombay, Education Society Press, 1900; p. 366]

□ এছাড়াও মহাভারতে অগস্ত্য পর্বতকে, কালঞ্জরেরই অংশ বলা হয়েছে। আমরা জানি, অগস্ত্যপর্বত বর্তমান বিন্ধ্য পর্বতেরই অংশবিশেষ। সেই সূত্রে কালঞ্জরও মধ্য-দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক। আবার পণ্ডিত N.L. Dey স্পষ্টই বলেছেন যে, বুন্দেলখণ্ডের বান্দা (Banda) জেলার অন্তর্গত বাদাউসা (Badausa) উপজেলায় কালঞ্জর বা কালিঞ্জরের অবস্থান। কালঞ্জর চান্দেল রাজাদের রাজধানী ছিল। চান্দেলরাজ চন্দ্রবর্মা কালঞ্জরের বিখ্যাত দুর্গটি নির্মাণ করেছিলেন। এখানে একাধিক রূপে শিব পূজিত হন।

[GDAMI (Dey) p. 84]

অবশ্য সমরেন্দ্র নারায়ণ আর্যের মতে, কালঞ্জর বা কালিঞ্জর নামে কোনো একটি তীর্থ নেই। বরং এই নামে ভারতবর্ষে বহু তীর্থস্থান আছে। বরাহ পুরাণের একটি শ্লোকের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কালঞ্জরকে মথুরার অন্তর্গত একটি তীর্থ বলে উল্লেখ করেছেন। আবার কূর্ম পুরাণে বলা হয়েছে যে, কালঞ্জর তীর্থটি বারাণসীতে অবস্থিত। *[বরাহ পু. ১৭৬.১৮; কূর্ম পু. ২.৩.৬; HPIA (Arya) p. 160]*

□ অবশেষে এটাই বলা ভালো যে, পৌরাণিক ভাবনায় কালঞ্জর অতি বিখ্যাত স্থান বলেই একাধিক কালঞ্জর তীর্থের অস্তিত্বের ধারণাটিই বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

কালতীর্থ কোশলের (দক্ষিণ অযোধ্যার) অন্তর্গত একটি তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করলে এগারোটি বৃষদানের ফল পাওয়া যায়।

[মহা (k) ৩.৮৫.১১; (হরি) ৩.৭০.১১]

কালতোয়ক ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি সমৃদ্ধ প্রাচীন জনপদ তথা সেখানে বসবাসকারী জনজাতি। ভীষ্মপর্বে এদের উল্লেখ আভীর জাতির সঙ্গে একই শ্লোকে পাওয়া যায়।

[মহা (k) ৬.৯.৪৭; (হরি) ৬.৯.৪৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৪৬; ২.৭৪.১৯৬; মৎস্য পু. ১১৪.৪০]

□ মণিধান্য বংশীয় রাজারা কালতোয়ক দেশ শাসন করতেন বলে জানা যায় বায়ু পুরাণ থেকে। *[বায়ু পু. ৯৯.৩৮৪]*

□ রবার্ট শেফারের মতে, সিন্ধু নদীর মোহনার কাছে পরিত্যক্ত কিছু নীচু জলাভূমি (Swamp) দেখা যায়। তিনি জানিয়েছেন, এগুলিই কালতোয়ক নামে পরিচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'কাল' কথার অর্থ হল শ্যামল এবং 'তোয়' অর্থ জল। ফলে নীচু এবং নীলাকাশ-প্রতিবিম্বিত কৃষ্ণ-নীল জলাভূমির নাম কালতোয়ক হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

[Robert Shafer, Ethnography of Ancient India, Wiesbaden Ottoharrassowitz, 1954; p. 67]

□ তবে পণ্ডিত S.M. Ali বলেছেন যে, পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশের কালাত (Kalat) অঞ্চলে এই কালতোয়ক জাতির বাস ছিল।

[GP (Ali) p. 141]

কালদ মহাভারতে ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত জম্বুখণ্ড বিনির্মাণ পর্বে প্রাচীন ভারতবর্ষের যেসব জনপদগুলির নাম উল্লিখিত হয়েছে, কালদ সেগুলির মধ্যে একটি। একে দক্ষিণ ভারতের জনপদ বলা হয়েছে।

[মহা (k) ৬.৯.৬৩; (হরি) ৬.৯.৬৩]

কালদংষ্ট্র একসময় দেবাসুর যুদ্ধে অসুররা পরাজিত হন। ইন্দ্রের আদেশে অগ্নিদেব পবনদেবের সহায়তায় পলায়নরত অসুরদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতে লাগলেন। প্রাণ বাঁচাবার জন্য কয়েকজন অসুরবীর আশ্রয় নিলেন সমুদ্রের তলদেশে। অগ্নির হাত থেকে বাঁচার জন্য যেসব দানব সমুদ্রতলে আশ্রয় নেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কালদংষ্ট্র।

[মৎস্য পু. ৬১.৪]

কালদন্তক জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বাসুকি বংশীয় যে সব নাগ নিহত হয়েছিলেন কালদন্তক তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ১.৫৭.৬; (হরি) ১.৫২.৬]*

কালনর যযাতি পুত্র অনুর বংশধারায় সভানরের পুত্র কালনর। কালনরের পুত্র সৃঞ্জয়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও বায়ু পুরাণে কালনরকে কালানল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৯.২৩.১; বায়ু পু. ৯৯.১৩-১৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৩; বিষ্ণু পু. ৪.১৮.১]

কালনাভ হিরণ্যাক্ষের ঔরসে রুষাভানুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম কালনাভ। মৎস্য পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, গরুড় পুরাণ, বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কালনাভকে বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম হিসাবে চিহ্নিত

করা হয়েছে। ভাগবত পুরাণে উল্লেখ আছে—দেবাসুরের যুদ্ধে কালনাভ যমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

[ভাগবত পু. ৭.২.১৮, ১৯; ৮.১০.২০, ২৯; বায়ু পু. ৬৭.৬৭; ৬৮.১৯; মৎস্য পু. ৬.২৭; বিষ্ণু পু. ১.২১.১১; ১.২১.৩; গরুড় পু. ১.৬.৫৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫.৩০; ২.৬.২০]

কালনিরূপণ প্রাচীনকালে যে পদ্ধতিতে সময় গণনা করা হত, পুরাণে তা বিশদে বর্ণিত হয়েছে। পুরাণে প্রাপ্ত হিসেব থেকে জানা যায় যে, সে যুগে সময় গণনার ন্যূনতম একক ছিল নিমেষ। ১৫ নিমেষে ১ কাষ্ঠা, ৩০ কাষ্ঠায় ১ কলা, ৩০ কলাতে ১ মুহূর্ত এবং ৩০ মুহূর্তে একটি সম্পূর্ণ দিন গণনা করা হত। চন্দ্রের গতি অনুসারে ১৫ দিনে শুক্ল এবং কৃষ্ণ দুটি পক্ষ, দুই পক্ষকালে ১ মাস। দুই মাসে ১ ঋতু। ৩টি ঋতুতে অর্থাৎ ৬ মাসে এক অয়ন (সূর্যের উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন), ২ অয়নে অর্থাৎ ১২ মাসে ১ বৎসর।

পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী লৌকিক মানের অর্থাৎ মানুষের গণনার ১ মাসে পিতৃগণের একটি সম্পূর্ণ দিন হয়। এর মধ্যে শুক্লপক্ষ পিতৃগণের রাত্রি এবং কৃষ্ণপক্ষ তাঁদের দিন। মানুষের গণনা অনুযায়ী ৩০ মাসে (আড়াই বছর) পিতৃগণের একমাস। মানুষের হিসেব অনুযায়ী ৩৬০ মাসে (৩০ বছরে) পিতৃগণের এক বছর। অর্থাৎ মানুষের গণনা অনুযায়ী একশো বছর পিতৃগণের হিসেবে ৩ বছরের সামান্য কিছু বেশি।

পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, লৌকিক এক বৎসর হল দেবতাদের একটি সম্পূর্ণ দিন। এর মধ্যে উত্তরায়ণ দেবতাদের দিন, দক্ষিণায়ন দেবতাদের রাত্রি। মানুষের হিসাব অনুযায়ী ৩০ বছরে দেবতাদের একমাস। মানুষের গণনায় ৩৬০ বছরে দেবতাদের এক বছর। অর্থাৎ এই হিসেব অনুযায়ী মানুষের ৩৬০০০ বছরে দেবতাদের শতবর্ষ এবং মানুষের ৩৬০০০০ বছরে দেবতাদের এক হাজার বছর হয়।

পণ্ডিত গিরীন্দ্রশেখর বসু সময়ের বর্তমান পরিমাপের এককগুলির সঙ্গে প্রাচীন সময় গণনার এই হিসেবটিকে তুলনামূলক ভাবে পর্যালোচনা করে কালের এককগুলির একটি গাণিতিক হিসাবের তালিকা তৈরি করেছেন। সেই তালিকাটি নীচে দেওয়া হল—

১ নিমেষ	= ২১৩ বা প্রায় ১/৫ সেকেন্ড
১৫ নিমেষ	= ১ কাষ্ঠা = ৩.২ সেকেন্ড
৩০ কাষ্ঠা	= ১ কলা = ৯৬ সেকেন্ড
৩০ কলা	= ১ মুহূর্ত = ৪৮ মিনিট
৩০ মুহূর্ত	= ১ অহোরাত্র
	= ২৪ ঘন্টা॥ বি।২।৮।৫৫॥
৩০ অহোরাত্র	= ২ পক্ষ = ১ মাস
৬ মাস	= ১ অয়ন
২ অয়ন	= দক্ষিণ ও উত্তর = ১ বর্ষ
দক্ষিণ অয়ন	= দেবরাত্রি
উত্তর অয়ন	= দেবদিন॥ বি।১।২।১০॥
৩০ অহোরাত্র	= ১ পিতৃ-অহোরাত্র
কৃষ্ণপক্ষ	= পিতৃদিন
শুক্লপক্ষ	= পিতৃরাত্রি
৩০ মানুষ মাস	= ১ পিতৃমাস
১২ মানুষ মাস	= ১ মানুষ বৎসর = ১ দেব-অহোরাত্র
৩৬০ মানুষ বৎসর	= ১ দেববৎসর।।ব্র।৬২।৮-১৬।।

[বায়ু পু. ৫০.১৬৯-১৭৮; মৎস্য পু. ১৪২.৪-১৫; বিষ্ণু পু. ১.৩.৭-১০]

□ পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই চারটি যুগের মোট কাল পরিমাণ হল ১২০০০ দিব্য বৎসর। বিষ্ণু পুরাণে সংক্ষেপে বর্ণিত হলেও মৎস্য পুরাণে বিশদে এই ১২০০০ দিব্য বৎসরের মধ্যে কোন যুগ কত বৎসর ধরে গণনা করা হত তার বিবরণ আছে। পণ্ডিত গিরীন্দ্রশেখর বসু এই চতুর্যুগেরও একটি হিসাব উল্লেখ করেছেন এবং মানুষের সময় গণনার সঙ্গে তার তুলনামূলক হিসাবও উল্লেখ করেছেন—

চতুর্যুগ	= ১২০০০ দিব্য বৎসর।বি১।২।১২।।	
সত্য সন্ধ্যা	= ৪০০	
সত্য যুগ	= ৪০০০	
সত্য সন্ধ্যাংশ	= ৪০০	
ত্রেতা সন্ধ্যা	= ৩০০	
ত্রেতা যুগ	= ৩০০০	
ত্রেতা সন্ধ্যাংশ	= ৩০০	১২০০০ দিব্য বৎসর
দ্বাপর সন্ধ্যা	= ২০০	
দ্বাপর যুগ	= ২০০০	
দ্বাপর সন্ধ্যাংশ	= ২০০	
কলি সন্ধ্যা	= ১০০	
কলি যুগ	= ১০০০	
কলি সন্ধ্যাংশ	= ১০০	
চতুর্যুগ	= ১২০০০	
দৈব বর্ষ	= ৪৩২০০০০	

মানব বৎসর	মানববর্ষ	পৈত্রবর্ষ	দৈববর্ষ
কৃত	১৭২৮০০০	৫৭৬০০	৪৮০০
ত্রেতা	১২৯৬০০০	৪৩২০০	৩৬০০
দ্বাপর	৮৬৪০০০	২৮৮০০	২৪০০
কলি	৪৩২০০০	১৪৪০০	১২০০
সমষ্টি	৪৩২০০০০	১৪৪০০০	১২০০০

[গিরীন্দ্রশেখর বসু, পুরাণ প্রবেশ পৃ. ২৬-২৮]

কালনেমি$_{1}$ বিরোচনের পুত্রদের মধ্যে কালনেমি একজন। কালনেমির চার পুত্র ছিল। তাঁরা হলেন—ব্রহ্মজিৎ, ক্ষত্রজিৎ, দেবান্তক ও নরান্তক।

[বায়ু পু. ৬৭.৭৬, ৮০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫.৩৯-৪০]

□ স্কন্দ পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, কালনেমি দৈত্যরাজ বলির সেনাপতি ছিলেন। দেবাসুর সংগ্রামের সময় কালনেমি তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে দেবতাদের আক্রমণ করেছিলেন। দেবতারা কেউই কালনেমিকে জয় করতে পারছিলেন না। নারদের পরামর্শে দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণুর সঙ্গে কালনেমির ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়। বিষ্ণুর শূলের আঘাতে কালনেমি অচৈতন্য হয়ে পড়েন। চেতনা লাভ করে কালনেমি বিষ্ণুকে দেখে বলেন যে, তিনি আর যুদ্ধ করবেন না, সংসারে তাঁর কোনো স্পৃহা নেই। কালনেমি ভগবান বিষ্ণুর কাছে জন্মান্তরে কৈবল্য প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু কালনেমিকে বধ করেন এবং তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করেন।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ১৩.৯০-৯৭; ১৪.৫-১২]

□ বামন পুরাণে আবার উল্লিখিত হয়েছে যে, পর্বতের মতো বিশাল আকৃতির কালনেমি দানবকে প্রথমে বিষ্ণুর বাহন গরুড় গদা দিয়ে প্রহার করেছিলেন। ভগবান বিষ্ণু তারপর চক্র দিয়ে কালনেমির হাত ও মাথা কেটে দিয়েছিলেন। এরপরেও কালনেমির কবন্ধ দেহ অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। অবশেষে গরুড়ের আঘাতে কালনেমি পতিত হন। *[বামন পু. ৭৩.৪৪-৫০]*

□ পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, কালনেমি পাতালের চতুর্থ তলে বসবাস করতেন।

[বায়ু পু. ৫০.৩১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.৩২]

□ মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত অংশাবতরণ পর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, কালনেমি দানব দ্বাপর যুগে উগ্রসেনের পুত্র কংস রূপে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.৬৮; (হরি) ১.৬২.৬৮]

□ পুরাণেও উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রাচীনকালে ভগবান বিষ্ণু যে কালনেমি দানবকে বধ করেছিলেন, সেই কালনেমিই পরবর্তীকালে কংস রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[ভাগবত পু. ১০.১.৬৮; ১০.৫১.৪২; বিষ্ণু পু. ৫.১.২২, ২৩, ৬৫; বায়ু পু. ৯৭.২২]

কালনেমি$_{2}$ 'কালনেমির লঙ্কাভাগ'—এই প্রবাদটি সারা ভারতেই বিখ্যাত হয়ে আছে। বাল্মিকীর রামায়ণে কালনেমির উল্লেখ না থাকলেও অধ্যাত্ম রামায়ণে এবং রামায়ণের কোনো কোনো আঞ্চলিক সংস্করণে বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতীয় রঙ্গনাথ রামায়ণে এবং ভাস্কর রামায়ণে কালনেমির উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনকি কৃত্তিবাসী রামায়ণেও কালনেমির কথা উল্লিখিত হয়েছে। ভবিষ্যতে নিজের লাভের বিষয়ে সুনিশ্চিত না হয়ে কোনো ব্যক্তি যদি অনেক কিছু পরিকল্পনা করে ফেলেন, তখন সেই ব্যক্তির ভাবনাকে 'কালনেমির লঙ্কাভাগ' —এর সঙ্গে তুলনা করা প্রাবাদিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

কালনেমি ছিলেন রাবণের মামা। রাবণ, হনুমানকে বধ করার জন্য কালনেমিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাবণের শক্তির আঘাতে অচেতন লক্ষ্মণের চৈতন্য ফিরিয়ে আনতে হনুমান যখন গন্ধমাদন পর্বতে গেলেন, তখন তপস্বীর ছদ্মবেশে কালনেমি সেই স্থানে আগেই পৌঁছে যান। হনুমানকে দেখামাত্রই কালনেমি নিজের অতিথিকে আপ্যায়ন করার মতোই ব্যবহার করতে লাগলেন। কালনেমির দেওয়া খাদ্য-পানীয় অবশ্য হনুমান প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি কাছেই একটি জলাশয়ে গেলেন স্নান করবার জন্য। হনুমান জলে নামতেই একটি কুমীর তাঁর পা কামড়ে ধরল। হনুমান কুমীরটিকে বধ করলেন। সেইসময় কুমীরের মৃতদেহ থেকে একজন অপ্সরা উঠে এলেন এবং হনুমানকে বললেন যে, দক্ষের অভিশাপেই তিনি কুমীর হয়েছিলেন। সেই অপ্সরা হনুমানকে সতর্ক করে বললেন যে, ওই তপস্বী আসলে রাবণের মামা কালনেমি।

ইতোমধ্যে কালনেমি ভাবতে লাগলেন যে, জলাশয়ের কুমীরের আক্রমণে নিশ্চয় হনুমান এতক্ষণে নিহত হয়েছেন।

কালনেমি মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে, হনুমানকে বধ করতে পারার জন্য রাবণ তাঁকে অর্ধেক লঙ্কার রাজা করবেন বলেছিলেন। কালনেমি ভাবলেন যে, সবাইকে পরাস্ত করে একাই লঙ্কার তিনি রাজত্ব করবেন। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হল না। কারণ হনুমান কালনেমিকে বধ করলেন।

মূল রামায়ণে এ কাহিনী না থাকলেও 'কালনেমির লঙ্কাভাগ'—প্রবাদটি এতটাই বিখ্যাত যে পণ্ডিত Wheeler এই কাহিনীটিকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন—

Kala-nemi is a Hindu Alnaschar. He counts upon the pleasure he shall enjoy when taking half the Raj, without considering that Hanuman may be still alive. To this day when a Hindu thinks of future profit without being sure that he will get it, he is often compared with Kala-nemi.

[Yashoda Devi, The History of Andhra Country: 1000 A.D. – 1500 A.D., p. 145-146; J.T. Wheeler, History of India from the earliest Ages, Vol. 2, p. 371-373]

কালপথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্রদের মধ্যে একজন।
[মহা (k) ১৩.৪.৫০; (হরি) ১৩.৩.৬৯]

কালপর্ণী অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। কালপর্ণী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন।
[মৎস্য পু. ১৭৯.২২]

কালপর্বত একটি অতিপ্রাচীন পর্বত। সীতাহরণের জন্য রাবণ মারীচ রাক্ষসের সাহায্য নেওয়ার উদ্দেশে তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে গোকর্ণ তীর্থে গিয়েছিলেন। লঙ্কা থেকে গোকর্ণ তীর্থে যাওয়ার পথে তিনি কালপর্বত পার হয়েছিলেন।
[মহা (k) ৩.২৭৭.৫৪; (হরি) ৩.২৩১.৫৪]

□ জয়দ্রথ বধের উদ্দেশে অর্জুন মহাদেবের পাশুপত অস্ত্র পাওয়ার জন্য গভীর ধ্যান করেছিলেন। ধ্যানরত অবস্থায় অর্জুন দিব্যতেজে মহাদেবের আবাসস্থলের দিকে মানসিকভাবে ধাবিত হন। তাঁর এই মানস ভ্রমণের সময় তিনি বহু পর্বত, জনপদ, নদী ইত্যাদি পার হয়েছিলেন। এ সময় তিনি মনে মনে কালপর্বত পার হন।
[মহা (k) ৭.৮০.৩১; (হরি) ৭.৭১.৩১]

কালপূজিত মহাভারতে ভগবান শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের এই নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

কালেন মৃত্যুনা পূজিতঃ কালপূজিতঃ।

'কাল' অর্থাৎ মৃত্যু, কিংবা মৃত্যুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা লোকসংহর্তা যমও কাল নামে সম্বোধিত হন। কিন্তু ভগবান রুদ্রশিব প্রলয়ের কারণস্বরূপ। যুগান্তে তিনিই প্রলয়ংকর রূপে সম্পূর্ণ সৃষ্টি গ্রাস করেন। সে সময় কাল বা মৃত্যুর অধিদেবতাও বিনষ্ট হন তাঁর দ্বারা। সুতরাং তিনি মৃত্যুর কাছেও মৃত্যুস্বরূপ, মহাকাল স্বরূপ, মৃত্যুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে তাঁর পূজা করেন —এই ভাবনা থেকে ভগবান শিব কালপূজিত নামে সম্বোধিত হন।
[মহা (k) ১৩.১৭.৯৪; (হরি) ১৩.১৬.৯৪]

কালপৃষ্ঠ$_1$ একজন বিশিষ্ট নাগ। মহাভারতের কর্ণপর্বে বর্ণিত হয়েছে, ত্রিপুর দহনের আগে মহাদেবের যুদ্ধযাত্রার জন্য দেবতারা এক অদ্ভুত সর্বদেবময় রথ নির্মাণ করেন। সেই রথের ঘোড়াগুলির কেশর বন্ধনের জন্য যেসব নাগকে রজ্জু হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল, কালপৃষ্ঠ তাঁদের মধ্যে একজন।
[মহা (k) ৮.৩৪.২৯; (হরি) ৮.২৮.৩২]

কালপৃষ্ঠ$_2$ *[দ্র. বৃক$_{10}$]*

কালবন্ধ দেবতা ও দানবদের মধ্যে যখন সংঘর্ষ হয়েছিল, তখন দানবরাজ মহিষাসুরের যাঁরা সেনাপতি ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনের নাম কালবন্ধ। *[দেবীভাগবত পু. ৫.৩.৪]*

কালবীর্য্য বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন কালবীর্য্য। ইনি হিরণ্যকশিপুর ভাগিনেয়।
[মৎস্য পু. ৬.২৫-২৬, ২৮]

কালবেগ$_1$ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বাসুকি বংশীয় যে সব নাগ নিহত হয়েছিলেন কালবেগ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *[মহা (k) ১.৫৭.৬; (হরি) ১.৫২.৬]*

কালবেগ$_2$ কূর্ম পুরাণ মতে শিবের অনুচররা যে-সব গণে বিভক্ত ছিলেন, কালবেগ তার মধ্যে একটি গণ। *[কূর্ম পু. ২.৩১.৮১-৮২]*

কালভবন একটি প্রেতগণ। করালক থেকে উৎপন্ন প্রেতগণগুলির মধ্যে একটি গণ।

[বায়ু পু. ৬৯.৪০]

কালমহী একটি প্রাচীন পবিত্র নদী। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে কালমহী নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বানররাজ সুগ্রীব তাঁর বানর সেনাপতিদের সীতার খোঁজে বহু নদী-জনপদে পাঠিয়েছিলেন। সেইসব নদীগুলির মধ্যে কালমহী একটি।

[রামায়ণ ৪.৪০.২২; মৎস্য পু. ১৬৩.৬৪]

□ কালমহী নদীর আধুনিক রূপ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোনো তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

কালমূর্তি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে যেসব বানরবীরের নাম উল্লিখিত হয়েছে, কালমূর্তি তাঁদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৩৩]

কালমেঘতীর্থ প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থে ভগবান শিব লিঙ্গ রূপে পূজিত হন। এই তীর্থের দক্ষিণে তপ্তোদকুণ্ড নামে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ এবং উষ্ণ জলাশয় অবস্থিত।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র) ৩৩১.১-২; ৩৩২.১]

কালযবন যদু-বৃষ্ণিদের কুলপুরোহিত গর্গ। এই গর্গের বংশধারায় গার্গ্য শৈশিরায়ণের পুত্র কালযবন। এক গোপকন্যার গর্ভে কালযবনের জন্ম। কোথাও কোথাও এই কন্যার নাম গোপালী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হরিবংশে যেখানে কৃষ্ণপিতা বসুদেবের স্ত্রী-পুত্রদের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, সেখানে অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে পৌরাণিক বললেন—ত্রিগর্তরাজের এক কন্যা ছিল। তাঁর স্বামী ছিলেন গর্গগোত্রীয় শৈশিরায়ণ। এই শৈশিরায়ণের বীর্যস্খলন হত না বলে এইরকম একটা প্রচার হল যে, তিনি নপুংসক। প্রচার শুনে তিনি এমন রেগে গেলেন যে তাঁর শরীর লোহার মতো কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল। নিজের পৌরুষ প্রমাণ করার জন্য তিনি একটি গোপকন্যার সঙ্গে সহবাস আরম্ভ করলেন। এই গোপালী গার্গ্য শৈশিরায়ণের তেজ গর্ভে ধারণ করে কালসবনের জন্ম দেন। কোনো এক অপুত্রক যবনরাজ এই শিশুকে মানুষ করেন। ফলে ভবিষ্যতে তাঁর নাম হয় কালযবন—

যবনস্য মহারাজ স কালযবনো' ভবৎ।

বিষ্ণুপুরাণ খুললে দেখা যাবে—গার্গ্য শৈশিরায়ণ ব্রাহ্মণ হলেও যাদব গোষ্ঠীর মধ্যেই বসবাস করতেন এবং যাদবদের মাঝখানেই এক গোচারণক্ষেত্রে দাঁড়ানো শৈশিরায়ণকে তাঁর শ্যালকরা নপুংসক বলে হাসিঠাট্টা করল,—

যদূনাং সন্নিধৌ সর্বে জহসু সর্বযাদবাঃ।

এই ঘটনায় গার্গ্য শৈশিরায়ণের ক্রোধ উদ্দীপিত হয় এবং তিনি এমন একটি পুত্রের জন্য তপশ্চরণ আরম্ভ করেন, যে পুত্র যাদবদের ভয় উৎপাদন করবে—

পুত্রমিচ্ছংস্তপস্তেপে যদুচক্রভয়াবহম্।

এই পুত্রই কালযবন। কালযবন কোনো আকস্মিক আবির্ভাব নন, তাঁর জন্মের মধ্যেই যাদব-বৃষ্ণিদের সঙ্গে শত্রুতার সম্বন্ধ আছে। গার্গ্য শৈশিরায়ণ তপস্যার জন্য দক্ষিণসমুদ্রতীরে চলে গিয়েছিলেন। মহাদেবের তপস্যার ফল তিনি কতটুকু পেলেন জানা নেই, কিন্তু একটা ঘটনা ঘটল যেটা যথেষ্টই লৌকিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। গার্গ্য ব্রাহ্মণ শৈশিরায়ণ যখন ইতস্তত দক্ষিণ-সমুদ্রতীরে অবস্থিত, তখন তাঁর সঙ্গে এক যবনরাজের দেখা হয়। তিনি অপুত্রক ছিলেন বলে গার্গ্য ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করেন নিয়োগ প্রথায় তাঁর মহিষীর গর্ভাধান করার জন্য—

সভাজয়ামাস চ তং যবনেশো হ্যনাত্মজঃ।

নিয়োগপ্রথা সে-কালের সমাজচল প্রথা। শৈশিরায়ণ যদুবংশীয়দের প্রতি তাঁর হিংসাটুকু নিশ্চয়ই প্রকট করেছিলেন যবনরাজের কাছে। ফলত তাঁর মহিষীর গর্ভাধান করবার সময় নিজের অন্তর্গত হিংসাটুকুও আধান করেছিলেন পুত্রের মধ্যে। যবনরাজের পত্নীর গর্ভে গার্গ্য শৈশিরায়ণের পুত্রটি জন্মাল, তার গায়ের রঙ ভ্রমরের মতো কালো—

তদ্‌যোষিৎসঙ্গমাচ্চাস্য পুত্রো'ভূদ্ অলিসন্নিভঃ।

এত কালো বলেই তার নামের প্রথমার্ধে 'কাল' সংজ্ঞায় চিহ্নিত, নচেৎ সংকর আর্যপুত্র হলেই তার নাম ভদ্রভাবে কৃষ্ণও হতে পারত, যেমনটি ব্যাসের হয়েছে। পুনশ্চ যবনপিতার নিয়োগজ পুত্র বলে সে কালযবন।

কালযবনের নামের মধ্যে যেহেতু 'যবন' শব্দটা আছে, তাই পণ্ডিতদের একাংশের মতে, কালযবন শব্দের অর্থ 'Black Greek', আবার এক পণ্ডিত বিকল্প দিয়ে বলেছেন 'Greek of Time', কৃষ্ণ যেহেতু কালচক্র, লোকচক্র, যুগচক্র ইত্যাদি আবর্তিত করেন, অতএব তিনি 'Black Greek', অথবা বিকল্প 'Greek of Time' এর

বিপরীত দিকে তাঁর স্থিতি। তবে এ জাতীয় বিশ্লেষণ খানিক কষ্টকল্পিত বলেই মনে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মহাভারতে যবনদের সঙ্গে কাম্বোজ, কিরাত, চীন ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর নাম একত্রে বারবার উচ্চারিত হওয়ায় আমরা মনে করি যবনেরা ভিন্‌দেশ থেকে আগত। অন্যতর জনগোষ্ঠীকে যেমন ম্লেচ্ছ বলা হত, তেমনই যবনও বলা হত।

মহাভারতে পাণ্ডব-কনিষ্ঠ সহদেব যে দিগ্বিজয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে দক্ষিণদেশ জয়ের জন্য তিনি নিযুক্ত হলেও দ্রাবিড়, পাণ্ড্য, কেরল দেশ জয় করার পর সহদেবকে আমরা যবনদেশে দূত পাঠাতে দেখেছি। অর্থাৎ তিনি যে-জায়গায় এসে পৌঁছেছেন যবনদেশ সেখান থেকে কিছু দূরে, যার জন্য নিজে না গিয়ে দূত পাঠানো—

দূতৈরেব বশং চক্রে . . . যবনানাং পুরং তথা।

আবার এর পরেই তিনি যেখানে গিয়ে পৌঁছচ্ছেন সে-জায়গাটা হল কচ্ছ দেশ—হয়তো এটাকে এখনকার দিনে আমরা 'রন্ অব কচ্ছ' বলে জানি। বস্তুত যবনদেশ বলে একটা স্থায়ী ঠিকানা আমাদের পক্ষে বার করা খুব কঠিন। কিন্তু এটা আমরা বলতেই পারি যে, কাম্বোজ, কিরাত, পুলিন্দ, চীন ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যবনদের নাম উচ্চারিত হওয়ায়, এরা হয়তো ভারতের পশ্চিম দিকে আরও পশ্চিমের আবাসিক ছিলেন—এ-কথা অনুমান করা যায়। আমরা যা বুঝেছি তাতে কালযবন কোনো Black Greek নন,—তিনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ আর্যাচারবিরহিত যবনের মতো বলেই কালযবন। *[দ্র. যবন]*

[হরিবংশ পু. ১.৩৫.১২-২২; ২.৫২.২৪-২৬; বিষ্ণু পু. ৫.২৩.১-৫]

□ গর্গ শৈশিরায়ণের পুত্র কালযবন আজন্ম মাথুরগণের অর্থাৎ মথুরাবাসীদের অবধ্য এবং মথুরা নগরীতেও তাঁকে মেরে ফেলা সম্ভব ছিলনা—

এবং গার্গস্য তনয়ঃ শ্রীমান্ রুদ্রবরোদ্ভবঃ।
মাথুরাণামবধ্যো'য়ং মথুবায়াং বিশেষত॥

[হরিবংশ ২.৫২.২৯]

□ হরিবংশ পুরাণে কালযবনের চরিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে কালযবনকে ধার্মিক এবং সুশাসক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইনি ত্রিবর্গ অর্থাৎ পদ, স্থান, বুদ্ধি কিংবা ধর্ম, অর্থ ও কাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ। বুদ্ধিমান এবং রাজনীতির সন্ধি ও বিগ্রহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। সপ্তবিধ কামজ ব্যসন অর্থাৎ মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, স্ত্রীলোকদের প্রতি আসক্তি, মদ্যপান এবং অকারণ মিথ্যা ভাষণে তিনি অভ্যস্ত নন। ফলে বলা যেতে পারে একজন সদ্‌গুণ সম্পন্ন রাজার চরিত্রে যেসব গুণাবলী বর্তমান থাকা প্রয়োজন সেগুলি সবই কালযবনের মধ্যে ছিল।

একই সঙ্গে কালযবন সুশিক্ষিত, ধর্মপরায়ণ, যুদ্ধে অত্যন্ত পারদর্শী এবং বলশালী। অর্থাৎ মহাকাব্যিক নায়ক বাসুদেব কৃষ্ণের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে স্থান পাওয়ার জন্য যেসব গুণ প্রয়োজন, সেগুলি সবই কালযবনের মধ্যে বর্তমান। *[হরিবংশ পু. ২.৫৩.১-৪]*

□ পৌরাণিক কাহিনীতে কালযবনের গুরুত্ব লুকিয়ে রয়েছে যদু-বৃষ্ণি বিশেষত বাসুদেব কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর শত্রুতার ইতিহাসের মধ্যে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কালযবনের জন্মের মধ্যেই যদু-বৃষ্ণি অর্থাৎ মথুরাবাসীদের সঙ্গে শত্রুতার বীজ লুকিয়ে আছে। কালযবনের ভাগ্যে সে সুযোগ ঘটে যায় শাল্বরাজ এবং মগধরাজ জরাসন্ধের সৌজন্যে। হরিবংশ পুরাণ থেকে জানা যাচ্ছে এবং ভাগবত পুরাণেও উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে যে, ইতিপূর্বে একাধিকবার জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করে কৃষ্ণ-বলরামকে বধ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কার্যসিদ্ধি হয়নি। ভাগবত পুরাণে যে হিসেব পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, এই আক্রমণের চেষ্টার সংখ্যাটা অন্তত সতেরো বার। এরপর যখন বিদর্ভরাজ ভীষ্মক রাজকন্যা রুক্মিণীর স্বয়ংবরের আয়োজন করলেন এবং কৃষ্ণের আকস্মিক বিদর্ভ সফরে বিনা যুদ্ধে বিনা উদ্যোগেই সেই স্বয়ংবর যখন একরকম ভেস্তে গেল—হরিবংশ পুরাণ মতে ঠিক সেই সময়ে জরাসন্ধ এবং তাঁর মিত্র রাজারা বিদর্ভেই রীতিমতো জরুরী বৈঠক ডেকে আবার একবার কৃষ্ণকে দমন করার উপায় খুঁজতে বসলেন, সেই সময়েই কালযবনের নাম উঠে আসছে। জরাসন্ধের বন্ধু কৃষ্ণের আরেক শত্রু শাল্বরাজ। তিনি সম্ভবত কালযবনের জন্মের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাঁর পরামর্শেই মগধরাজ জরাসন্ধ 'মথুরাবাসীর অবধ্য' কালযবনের

সাহায্যে কৃষ্ণের পতন ঘটানোর পরিকল্পনা করেন।

প্রাথমিকভাবে শাল্বরাজ যখন জরাসন্ধের সভায় বসে কালযবনের উদ্দেশে দূত পাঠাতে বললেন, তখন জরাসন্ধ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন—হায়! আমার এ কী অবস্থা হল। একটা সময় ছিল, তখন অন্য সব রাজারা শত্রু ভয়ে ভীত হলে আমার কাছে আশ্রয় নিতেন—

মাং সমাশ্রিত্য পূর্বস্মিন্ নৃপা নৃপভয়ার্দিতাঃ।

আর আজকে কী হয়েছে? আজকে রাজারা আমাকে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব করছেন, ঠিক যেমন রতিলোলুপ রমণী নিজের স্বামীর ওপর বিদ্বিষ্ট হয়ে অন্য পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে—

কন্যেব স্বপতিদ্বেষাদ্ অন্যং রতিপরায়ণা।

বোঝা যাচ্ছে, জরাসন্ধ কালযবনের ব্যাপারটা মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না। তিনি নিজেকে সমস্ত রাজকুলের স্বামী বলে মনে করেন, সেই তাঁকে অতিক্রম করে রাজারা এখন অন্য কারও নাম করছেন কৃষ্ণকে পর্যুদস্ত করার জন্য—এটা জরাসন্ধের কাছে স্বামী-দ্বেষিনী পুরষান্তরগামিনী রমণীর উদাহরণ বলে মনে হচ্ছে। তবু জরাসন্ধ সমবেত রাজাদের অভিমত মেনে নিতে বাধ্য হলেন, কারণ কংসের মৃত্যুর পর এতদিনেও তিনি কৃষ্ণকে শেষ করে দিতে পারেননি।

লক্ষণীয়, যবনাধিপতি কালযবনের কাছে দৌত্যকর্ম করার জন্য যিনি উপযুক্ত পাত্র বলে বিবেচিত হলেন, তিনি কিন্তু সেই শাল্বরাজ। তার মানে, শাল্বরাজের সঙ্গে যবনরাজের বন্ধুত্ব যেমন বেশি রাজ্যের ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণেও তাঁদের প্রতিবেশীই বলা চলে।

হরিবংশ পুরাণে জরাসন্ধ তথা তৎপক্ষীয় নৃপতিদের প্রতিনিধি রূপে শাল্বরাজার কালযবনের কাছে দৌত্যের একটি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। শাল্বরাজ তাঁর অলৌকিক সৌভ বিমানে চড়ে কালযবনের রাজসভায় এসে উপস্থিত হন।

শাল্বরাজ কালযবনের কাছে উপস্থিত হতে তিনি প্রচুর আদর-আপ্যায়ন করে তাঁর কুশল-প্রশ্ন করলেন। শাল্ব বললেন—আমি এই পাদ্য-অর্ঘ্যের যোগ্য নই। এ-সবই মগধরাজ জরাসন্ধের প্রাপ্য, কেন না আমি তাঁর দূত হয়ে এসেছি আপনার কাছে।

কালযবন জরাসন্ধের নাম যথেষ্টই জানেন এবং তাঁকে এতাবৎ কাল না দেখলেও তাঁর প্রতি কালযবন পরম শ্রদ্ধালু। শাল্ব তাঁর কাছে পৌঁছবার আগেই তাঁর কাছে খবর চলে এসেছে যে, জরাসন্ধের দূত হয়ে তাঁর কাছে আসছেন শাল্বরাজ। কালযবন জরাসন্ধের প্রতি সম্পূর্ণ বশ্যতা জানিয়ে বললেন—জানি, সব জানি কেন আপনি এসেছেন। আমার শুধু আশ্চর্য লাগছে যে, যাঁর বাহুবল আশ্রয় করে আমরা নিরুদ্বেগে দিন কাটাই, সেই জরাসন্ধের কাছে কোন কাজটা এমন অসাধ্য হয়ে উঠেছে, যার জন্য আপনাকে দূত করে পাঠিয়েছেন আমার কাছে—

কিমসাধ্যং ভবেদস্য যেনাসি প্রেষিতো ময়ি।

তিনি কী বলে পাঠিয়েছেন বলুন আমাকে। আমার পক্ষে একান্ত দুষ্কর হলেও সে কাজ আমি করব।

প্রত্যুত্তরে শাল্বরাজ সবিস্তারে কৃষ্ণের ক্রমিক শক্তিবৃদ্ধির কথা জানালেন। কংসের মৃত্যু থেকে আরম্ভ করে জরাসন্ধের সঙ্গে তাঁর বারংবার যুদ্ধ তথা গোমন্ত পর্বতের ঘটনা সব কিছু জানিয়ে শাল্বরাজ জরাসন্ধের অভীষ্টপূরণ করতে বললেন। যাদবদের সঙ্গে তাঁর বীজপ্রদ পিতার হিংসাবৃত্তিটুকুও স্মরণ করিয়ে দিতে ভুললেন না শাল্বরাজ। বললেন—তোমার মতো একটি পুত্রের জন্য তোমার পিতা গার্গ্য তপস্যায় বসেছিলেন। মহাদেবের বরে তুমি মথুরাবাসীদের অবধ্য। অতএব জরাসন্ধের ইচ্ছা পালন করে তুমি মথুরা আক্রমণ কর। সূর্যের কিরণে যেমন হিম গলে যায়, তোমার আক্রমণেও তেমনিই বিনাশ ঘটবে কৃষ্ণের—

যতস্ব রাজ্ঞাং বচনপ্রচোদিতো/
ব্রজস্ব যাত্রাং বিজয়ায় কেশবম্।

শাল্বরাজের কথা শুনে কালযবন অত্যন্ত খুশী হলেন। জরাসন্ধ সহ সমবেত রাজাদের প্রস্তাব তিনি মাথা পেতে নিলেন। তারপর তিথিনক্ষত্র দেখে ব্রাহ্মণদের দানধ্যান করে কালযবন মথুরা আক্রমণের দিন স্থির করে ফেললেন। কালযবন তিন কোটি ম্লেচ্ছ সৈন্য নিয়ে মথুরা অবরুদ্ধ করেন। *[হরিবংশ পু. ২.৫৩.৭-৫৪.৬; ভাগবত পু. ১০.৫০.৪৪; বিষ্ণু পু. ৫.২৩.৭-৮]*

□ কৃষ্ণের কাছে এই খবর পৌঁছতে দেরি হল না। সংবাদের পুষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঠিক করলেন—মথুরাপুরী ছাড়তে হবে চিরতরে। জরাসন্ধের আক্রমণের ভয়ে দু-একবার বাইরে গিয়ে আবার ফিরে আবার পালাবার চেয়ে নতুন একটা জায়গায় যাদবদের রাজধানী স্থাপন করতে হবে—এই সিদ্ধান্ত তিনি আগেই নিয়েছিলেন। এখন কালযবনের পরিকল্পনা এই সিদ্ধান্ত ত্বরান্বিত করল। *[ভাগবত পু. ১০.৫০.৪৫-৪৯; হরিবংশ পু. ২.৫৬.১-১৪]*

□ বাসুদেব কৃষ্ণ কূটনীতির কৌশলে কালযবনকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছেন। যদু-বৃষ্ণিদের একত্রে মথুরা ত্যাগের পূর্বে কৃষ্ণ একটি বিশেষ সভা আয়োজন করেন। মথুরা ছাড়বার আগে কালযবনকে ভয়ভীত করার জন্য কৃষ্ণ যে একটা ইঙ্গিতপূর্ণ কর্ম করেছিলেন, সেটাও তিনি সভায় জানালেন। কৃষ্ণ একটি দূত পাঠিয়েছিলেন কালযবনের কাছে এবং সেখানে একটা প্রতীকী আচরণ ছিল কৃষ্ণের। তিনি করেছিলেন কী—একটি মহাবিষধর কৃষ্ণসর্পকে একটি কলসির মধ্যে পুরে কলসির মুখ বন্ধ করে দূতের মাধ্যমে কালযবনের কাছে সেটা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ভাবটা এই—কৃষ্ণ হলেন এই কৃষ্ণসর্পের মতো, কখন কীভাবে কালযবন এই সাপের ছোবল খাবেন, তিনি তা জানেন না। কৃষ্ণের বাইরেটা দেখলে ওই বন্ধমুখ কলসের মতো নিরাতঙ্ক মনে হবে, কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধতায় কৃষ্ণ কিন্তু কালসাপের মতো—

কালসর্পসমঃ কৃষ্ণঃ . . . ভীষয়ামাস তং নৃপম্।

কৃষ্ণের এই 'মেসেজ'টা বুঝে নিতে কালযবনের দেরি হয়নি এবং তিনিও দমবার পাত্র নন। কৃষ্ণের অন্তর্নিহিত কৌশল এবং ভয় দেখানোর কুটিলতা বুঝে নিয়ে কালযবন কৃষ্ণপ্রেরিত সেই কলসিটির মধ্যেই অসংখ্য বিষ-পিঁপড়ে ঢুকিয়ে দিলেন এবং আবারও কলসির মুখ বন্ধ করে দিলেন—

পিপীলিকানাং চণ্ডানাং পূরয়ামাস তং ঘটম্।

পিঁপড়েগুলো অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কৃষ্ণ-প্রেরিত জ্যান্ত সাপটিকে কামড়ে অস্থির করে ফেলল এবং অবশেষে খেয়ে-খেয়ে ধুলো বানিয়ে ফেলল—

ভক্ষ্যমাণঃ কিলাঙ্গেষু ভস্মীভূতো' ভবত্তদা।

কালযবন কলসির মুখ খুলে দেখলেন, সর্প ধ্বংস হয়েছে। তিনি আবার কলসির মুখ বন্ধ করে পাঠিয়ে দিলেন কৃষ্ণের কাছে। বোঝাতে চাইলেন—কৃষ্ণ! তুমি যত বড়ো বিষধর কালসাপই হও না কেন, তুমি একা আমায় কিছু করতে পারবে না। আমার শত-সহস্র শক-তুষার-দরদ-পারদ-ম্লেচ্ছ সৈন্য পিলপিল করে পিঁপড়ের মতো ঢুকবে মথুরায়, তোমাকে ছারখার করে দেবে তারা। কালযবনের এই আচরণ থেকে তাঁকে অত্যন্ত কুশলী, বুদ্ধিমান, ইঙ্গিতজ্ঞ এবং সাহসী ব্যক্তি বলে মনে হয়। *[হরিবংশ পু. ২.৫৭.৩২-৩৭]*

□ কালযবনের উত্তরে বিচক্ষণ কৃষ্ণ বুঝেছিলেন এই দুর্ধর্ষ বুদ্ধিমান যোদ্ধা এবং তাঁর দক্ষ সৈন্যদলটির সঙ্গে সম্মুখ সমর ধ্বংসের নামান্তরমাত্র। সে কারণেই তিনি যদু-বৃষ্ণিদের নিয়ে দুর্গ নগরী দ্বারকায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বন্ধু-স্বজনদের সুরক্ষিত দ্বারকায় পৌঁছে দিয়ে কৃষ্ণ একা ফিরে এলেন মথুরায়। কালযবনকে কৌশলে ধ্বংস করাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য—

বৈরস্যান্তং বিধিৎসংস্তু বাসুদেবো মহাযশাঃ।

মথুরায় কৃষ্ণকে না দেখলে কালযবন দ্বারকার দিকেই অগ্রসর হবেন—সেটা ভেবেই নিজের জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে দ্বারকাবাসে নিশ্চিন্ত রেখে একা কৃষ্ণ আবারও ফিরে এলেন মথুরায়—

নিবেশ্য দ্বারকাং রাজন্ বৃষ্ণীন্ আশ্বাস্য চৈব হ।

কলসির মধ্যে অসংখ্য বিষ-পিঁপড়ে ঢুকিয়ে দিয়ে কৃষ্ণসর্পের অঙ্গ-ভস্ম কৃষ্ণের কাছে পাঠিয়ে কালযবন কৃষ্ণের প্রতি নিজের ভয়ঙ্কর সৈন্যবলের যে ইঙ্গিত পাঠিয়েছিলেন—বাহুল্যম্ উপবর্ণয়ন্—কৃষ্ণ তা মনে রেখেছিলেন। কৃষ্ণ একবারের তরেও তার সঙ্গে সম্মুখীন যুদ্ধের ভাবনা ভাবেননি। তিনি কালযবনের শক্তির প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাকে একা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে হত্যা করার বুদ্ধি করেছিলেন। কৃষ্ণ করলেন কী, তিনি একা এমনভাবে মথুরায় বিচরণ করতে লাগলেন যাতে মাঝে-মাঝেই তিনি কালযবনের দৃষ্টিপথে পতিত হন, যাতে কালযবন তাঁকে একা পেয়ে একাই তাঁর পিছনে ছোটেন—

প্রেক্ষাপূর্বঞ্চ কৃষ্ণো'পি নিশ্চকর্ষ মহাবলঃ।

যবনরাজ একটু হতভম্বই হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সসৈন্যে মথুরাপুরীতে ঢুকলেন, অথচ

কোনো প্রতিরোধ নেই, বৃষ্ণি-অন্ধক-যাদবদের যুদ্ধশক্তির এত কথা সে শুনেছেন অথচ তাঁরা কেউ তাকে বাধা দিচ্ছেন না, যে-কৃষ্ণের ভয়ে শাল্বরাজ জরাসন্ধের মতো বিশালশক্তি পুরুষের দৌত্যকর্ম করেছেন, সেই কৃষ্ণের তরফ থেকে কোনো উদ্যোগই নেই তাঁকে প্রতিরোধ করার—এ কোথায় এসে পৌঁছলেন তিনি। বিনা যুদ্ধেই কি তা হলে মথুরা তাঁর কবলীকৃত হল? কালযবন একটু বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। অথচ কৃষ্ণ-নামক বহুশ্রুত পুরুষটিকে তিনি মাঝে-মাঝেই দেখতে পাচ্ছেন চোখের সামনে। তিনি ভাবলেন—তা হলে এই কৃষ্ণকেই অন্তত শেষ করে দেওয়া যাক, কংস-জরাসন্ধের একতম শত্রু নিপাতিত হোক তাঁর হাতে। তিনি একসময় সুযোগ বুঝে কৃষ্ণের পিছু নিলেন এবং কৃষ্ণও তাঁকে আকর্ষণ করে নিয়ে চললেন দূরে, বেশ দূরে জনবসতি ছাড়িয়ে যেখানে মথুরা শহরের প্রত্যন্তভূমিতে পাহাড়গুলো আছে।

[হরিবংশ পু. ২.৫৭.৪০-৪২; ভাগবত পু. ১০.৫১.১-৮; বিষ্ণু পু. ৫.২৩.১৫-১৭]

□ এমনই একটি পার্বত্যগুহায় নিদ্রামগ্ন ছিলেন মুচুকুন্দ। পৌরাণিকেরা বলেছেন— কৃষ্ণের থেকেও অনেক প্রাচীনকালে ত্রেতাযুগীয় এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম মুচুকুন্দ। দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের এক বিরাট যুদ্ধে মুচুকুন্দ দেবতাদের সাহায্য করেন এবং দেবতারা সেখানে জয়ী হন। দেবতাদের সাহায্যকল্পে মুচুকুন্দের অসম্ভব প্রচেষ্টা এবং অবশেষে তাঁর সাফল্য দেবতাদের তুষ্ট করে। তাঁরা বর দিতে চাইলে ক্লান্ত-শ্রান্ত মুচুকুন্দ দেবতাদের বললেন—আমি ঘুমোতে চাই, নিশ্ছিদ্র ঘুম। যে আমাকে সেই সুখনিদ্রা থেকে জাগাবে, সে যেন আমার চোখের সামনে পড়ে ভস্ম হয়ে যায়—

প্রসুপ্তং বোধয়েদ্ যো মাং তং দহেয়মহং সুরাঃ।

দেবরাজ ইন্দ্র খুশি হয়ে বললেন—তাই হবে—এবমস্তু।

মুচুকুন্দ চলে গেলেন মথুরার প্রত্যন্তদেশে অবস্থিত পাহাড়ের এক গুহায়, যেখানে তিনি নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোতে পারেন। ঘুমে তাঁর চোখ ঢুলে এল। মুচুকুন্দ ঘুমিয়ে পড়লেন পাহাড়ের গুহায়। যুগের পর যুগ, বহুকাল এইভাবে চলে গেল। এদিকে কাহিনীর প্রেক্ষাপট পাল্টে গেল, তখন মথুরায় কালযবন এসে পৌঁছেছেন। কৃষ্ণকে নিজের সামনে দিয়ে স্পর্ধালুভাবে ছুটে যেতে দেখে কালযবন একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায় ছুটলেন তাঁর পিছন পিছন—

স জ্ঞাত্বা বাসুদেবং তং বাহুপ্রহরণো নৃপঃ।

দূরস্থিত হরিণ যেমন আপন মাংসে ব্যাধকে আকর্ষণ করে ছুটতে থাকে বনের ভিতর, কৃষ্ণও ঠিক সেইভাবেই কালযবনকে আকর্ষণ করে নিয়ে এলেন সেই গুহার মধ্যে, যেখানে ঘুমিয়েছিলেন ত্রেতাযুগের আত্মহারা মুচুকুন্দ। পর্বতগুহার মধ্যে অন্য কোনো আড়াল খুঁজে কৃষ্ণ লুকিয়ে রইলেন সেখানে। এদিকে কালযবন এসে পৌঁছলেন ছুটতে-ছুটতে। গুহার আলো-আঁধারে তাঁর ঠাহর হল না—কে শুয়ে আছে গুহাভিত্তি পাষাণের ওপর। তিনি মুচুকুন্দকেই কৃষ্ণ মনে করে সজোরে পদাঘাত করলেন মুচুকুন্দের শরীরে—

বাসুদেবং তু তং মত্বা ঘট্টয়ামাস পার্থিবম্।

ত্রেতাযুগের সুপ্ত আগুন যেন জ্বলে উঠল। মুচুকুন্দের ঘুম ভেঙে গেল এবং আকস্মিক পদাঘাতে তিনি বেশ কুপিতও হলেন। দেবতাদের আশীর্বাদী ক্রোধবহ্নি তাঁর চোখে উদ্দীপিত হল আপন ইচ্ছানুসারে। কালযবন মুহূর্তের মধ্যে মুচুকুন্দের নেত্রজন্মা বহ্নিতে ভস্মীভূত হলেন, যেন শুকনো গাছ বাজ পড়ে ছাই হয়ে গেল—

দদাহ পাবকস্তং তু শুষ্কং বৃক্ষমিবাশনিঃ।

[হরিবংশ পু. ২.৫৭.৪৩-৫৫; ভাগবত পু. ১০.৫১.৯-২৩; বিষ্ণু পু. ৫.২৩.১৮-২০]

□ এখানে কলযবনের মৃত্যুর প্রশ্নে পুরাতন পৌরাণিক কাহিনীর নায়ক মুচুকুন্দের সঙ্গে কৃষ্ণের যোগসূত্র রচনা করেছেন নারদ—যিনি স্বর্গ-মর্ত্যের যোগ-বাঁধন রচনা করেন চিরকাল; তিনি দেবর্ষি। কৃষ্ণ নারদের কাছেই শুনেছেন মুচুকুন্দের কথা, নারদই কালযবনকে বৃষ্ণি-অন্ধকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্‌যুক্ত করেন। নারদই কৃষ্ণকে মথুরায় থাকতে বলেছিলেন কালযবনের মথুরাযাত্রার পূর্বকাল পর্যন্ত এবং স্থানান্তরিত করতে বলেছিলেন তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে—

এতাবানিহ বাসশ্চ কথিতো নারদেন মে।

[বিষ্ণু পু. ৫.২৩.৬]

□ অন্য ঘটনার অন্তরে পৌরাণিক কাহিনী গেঁথে নেওয়ার ব্যাপারে নারদ বহু-বহু ব্যবহৃত পুরাণে ইতিহাসে। বস্তুত লৌকিকভাবে

কালযবনের হত্যা-কৌশল ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন। মহাদেবের বরে কালযবন মথুরাবাসীদের অবধ্য ছিলেন,—এই পুরাণোক্তির মধ্যে একটাই বাস্তব যুক্তি আছে যে, বৃষ্ণি-অন্ধকেরা যবনরাজ কালযবনকে নির্মূল করার শক্তি রাখতেন না। এমনও হতে পারে কালযবনের পিতা গার্গ্য শৈশিরায়ণ বৃষ্ণি-অন্ধকদের মধ্যেই বর্ধিত হয়েছিলেন বলে এবং গর্গেরা বৃষ্ণি-অন্ধকদের গুরুগোত্রীয় ছিলেন বলে কৃষ্ণ কিংবা অন্যান্য মথুরাবাসীরা তাঁর গায়ে হাত তুলতে চাননি। ঠিক সেই কারণেই কৃষ্ণ কালযবনকে নিরস্ত্র অবস্থায় প্রলুব্ধ করে এমন একটি গুহাস্থানে টেনে এনেছিলেন যেখানে তাঁকে আচমকা হত্যা করার জন্য আগে থেকেই একজন ঘাতক ঠিক করে রেখেছিলেন। এমন কথা বললে কৃষ্ণের পৌরাণিক তথা ভগবত্তার মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয় বলেই মুচুকুন্দের পৌরাণিক আবির্ভাব গ্রন্থিত হয়েছে বাস্তব ঘটনার মধ্যে।

আসলে কালযবনের ঘটনা এবং তাঁর হত্যার মধ্যে একটা অলৌকিকতা আছে। একটি ত্রেতাযুগের ঘুমন্ত মানুষ কলিযুগে জেগে উঠে আপন নেত্রজন্মা বহ্নিতে যবনরাজকে হত্যা করলেন—এ-কথা লৌকিকভাবে বিশ্বাস করতে বাধে। 'হরিবংশ', 'বিষ্ণুপুরাণ' কিংবা কোনও পুরাণেই কালযবন কালের প্রতিরূপ হিসেবে চিহ্নিত হননি। বরঞ্চ মুচুকুন্দকেই পূর্বকালের প্রতিরূপ বলা চলে। যেভাবে কৃষ্ণ কালযবনকে একা প্রলুব্ধ করে নিয়ে এসে পর্বতগুহার মধ্যে তার দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটালেন, সেখানে মুচুকুন্দই সেই হত্যার মাধ্যম, নাকি কৃষ্ণ নিজেই—এই চতুর প্রশ্নের উত্তর দিতে পৌরাণিকের অস্বস্তি হয়েছে। কিন্তু 'মহাভারত'-এ যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে, সেইসব ভয়ঙ্কর শত্রুশাতনের ক্ষেত্রে কৃষ্ণ সর্বত্র ন্যায়যুদ্ধের প্রস্তাব রেখেছেন, এ-কথা অতি বড় কৃষ্ণভক্তও বলবে না। অতএব যে চতুরতায় তিনি জরাসন্ধ, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধনকে ভবিষ্যতে হত্যা করাবেন সেই চতুরতাতেই রাজা মুচুকুন্দের মাধ্যমে তিনি কালযবনকে হত্যা করিয়েছেন— এই কথা সরলভাবে বোঝাই ভাল।

কালশম্বর *[দ্র. শম্বর]*

কালশিখ পুরাণে ঋষি বশিষ্ঠের গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, কালশিখ সেই গোত্রের অন্যতম। ঋষি বশিষ্ঠ থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এঁরাও বাশিষ্ঠ বলে পরিচিত হয়েছেন।

[মৎস্য পু. ২০০.৮]

কালশৈল *[দ্র. কালপর্বত]*

কালসঙ্কর্ষণী অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য ভগবান শিব নিজের দেহ থেকে যেসব মাতৃকা সৃষ্টি করলেন তাঁরা অন্ধকাসুর বধের পর ক্ষুধার্ত হয়ে সমস্ত সৃষ্টিকে গ্রাস করতে উদ্যত হলেন। তখন এই মাতৃকাদের দমন করার জন্য নৃসিংহদেব নিজের দেহ থেকে যেসব মাতৃকা সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কালসঙ্কর্ষণী একজন।

[মৎস্য পু. ১৭৯.৬৮]

কালসর্পি মহর্ষি কশ্যপের দ্বারা স্থাপিত একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করলে মহাপুণ্যফল লাভ হয়। *[কূর্ম পু. ২.৩৬.৩৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৩.৯৮; বায়ু পু. ৭৭.৮৭]*

কালসূত্র পুরাণে উল্লিখিত একটি নরকের নাম। বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, অধর্ম থেকে যেসব নরকের উৎপত্তি হয়েছিল, কালসূত্র সেই নরকগুলির মধ্যে তৃতীয়। এই নরকে একটি ভয়ানক বিষধর সর্প বাস করে বলে বায়ু পুরাণে ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কথিত হয়েছে।

পুরাণে বলা হয়েছে যে, যেসব পুরুষরা ব্রাহ্মণ, পিতৃগণ ও গুরুজনের অবমাননা করে, তাঁরা এই কালসূত্র নরকে পতিত হয়।

*[ভাগবত পু. ৫.২৬.৭, ১৪;
বায়ু পু. ১১০.৪২; ১০১.১৭৮;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.২.১৮১, ১৮৪; ৩.৩৩.৬০;
দেবী ভাগবত পু. ৮.২১.২৩; ৮.২২.১৬-১৭;
৯.৯.৩৯-৪২; ৯.১০.৮; ৯.৩২.১৯;
৯.৩৫.২-৩; বিষ্ণু পু. ১.৬.৪১; ২.৬.৪]*

কালা১ দেবী ভগবতী চন্দ্রভাগায় কালা নামে বিরাজিতা। *[মৎস্য পু. ১৩.৪৯]*

কালা২ দক্ষকন্যা কালা কশ্যপের পত্নী। ইনি কালকেয় অসুরগণ-এর মাতা। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, কশ্যপ-এর ঔরসে কালার গর্ভে বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা এবং ক্রোধশত্রু নামে চারজন কালকেয় রাক্ষসের জন্মদান করেন।

[মহা (k) ১.৬৫.১২, ৩৪; (হরি) ১.৬০.১২, ৩৪-৩৫; মৎস্য পু. ১৭১.২৯, ৫৯; বায়ু পু. ৬৬.৫৫]

কালানল *[দ্র. কালনর]*

কালাপ ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সভায় অবস্থানকারী একজন মুনি।

[মহা (k) ২.৪.১৮; (হরি) ২.৪.১০নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ৫, পৃ. ২৬]

কালাম্র সুমেরু পর্বতের পূর্বে ভদ্রাশ্ববর্ষে অবস্থিত একটি বিশাল বৃক্ষ। মহাভারতের বিবরণ অনুযায়ী, এই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বহুযোজন বিস্তৃত। এই বৃক্ষ সারা বছর ফুলে-ফলে পূর্ণ থাকে। হরিবংশ পুরাণে এই কালাম্রবৃক্ষ সংলগ্ন অঞ্চল কালাম্রদ্বীপ নামে চিহ্নিত হয়েছে।

[মহা (k) ৬.৭.১৪-১৫; (হরি) ৬.৭.১৪-১৫; হরিবংশ পু. ২.৯২.৪৯]

□ পণ্ডিত E.W. Hopkins এই কালাম্রকে একটি বিশালাকৃতি আমগাছ বলে বর্ণনা করেছেন। *[Edward Washburn Hopkins, Epic Mythology, p. 9]*

□ পুরাণে এই কালাম্রবৃক্ষ সম্পর্কে বলা হয়েছে—ভদ্রাশ্ববর্ষে ভদ্র নামে এক বিরাট শালবন আছে। সেখানেই এই কালাম্রবৃক্ষ দেখতে পাওয়া যায়। কালাম্রের রস পান করলে মানুষ জরাগ্রস্ত হয় না বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

[বায়ু পু. ৪৩.৬, ৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৫.৫৮, ৬১]

কালায়নি বাস্কলের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে কালায়নি একজন। বাস্কলের কাছে কালায়নি সংহিতা অধ্যয়ন করেছিলেন। *[বিষ্ণু পু. ৩.৪.২৬]*

কালি বায়ু পুরাণে যেসব মৌনেয় গন্ধর্বের নাম উল্লিখিত হয়েছে, কালি তাঁদের মধ্যে একজন।

[বায়ু পু. ৬৯.২]

কালিক১ তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে যখন দেবতারা তারকাসুরকে বধ করার জন্য স্কন্দ কার্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন, সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা তাঁদের কয়েকজন বিশিষ্ট অনুচর যোদ্ধাকে তারকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য অনুচররূপে স্কন্দকে দান করেন। পূষা তাঁর যে দুইজন বিশিষ্ট অনুচর স্কন্দকে দান করেছিলেন, কালিক তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৪৩-৪৪; (হরি) ৯.৪২.৪১]

কালিক২ শুক্ল-যজুর্বেদ শাখার অন্যতম এক ঋষি হিরণ্যনাভের শিষ্যদের মধ্যে একজন হলেন কালিক।

[বায়ু পু. ৬১.৪৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.৫১]

কালিক৩ ময়দানবের ঔরসে রম্ভার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন কালিক।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.২৯]

কালিক৪ একটি প্রাচীন জনজাতি। গঙ্গা নদীর দক্ষিণমুখী ধারাটি কালিক জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত।

পণ্ডিতরা মনে করেন যে, পুরাণ-বর্ণিত চক্ষু নদী হরিবর্ষ অর্থাৎ আধুনিক চীন দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত। সেই সূত্রে বলা যেতে পারে কালিক জনজাতি অধ্যুষিত দেশটি প্রাচীন চীন দেশের নিকটবর্তী অথবা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

[মৎস্য পু. ১২১.৪৫]

কালিকা১ দানব বৈশ্বানরের কন্যাদের মধ্যে কালিকা বা কালকা একজন। মারীচের ঔরসে কালিকার গর্ভে প্রায় ষাট হাজার দানব জন্মগ্রহণ করেন। কালিকার পুত্র বলে এরা 'কালকেয়-দানব' নামে খ্যাত হন। *[বায়ু পু. ৬৮.২৩, ২৫-২৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২৪, ২৫-২৭]*

কালিকা২ স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসেবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.১৪; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮]

কালিকা৩ মহাভারতে বর্ণিত একটি প্রাচীন নদী। এই নদীতে স্নান করে তিন রাত উপবাস পালন করলে পাপমুক্ত হওয়া যায়। মহাভারতে কালিকা নদীর নাম কৌশিকী ও অরুণা নদীর সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হতে দেখা যায়।

[মহা (k) ৩.৮৪.১৫৬; (হরি) ৩.৬৯.১৫৬]

□ মৎস্য পুরাণে কালিকা নদীকে পবিত্র পিতৃ-তীর্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[মৎস্য পু. ২২.৩৬]*

কালিকা৪ দেবী শক্তির একটি রূপ। মহাভারতের সভাপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ব্রহ্মার সভায় যেসব দেবীরা উপস্থিত থাকতেন, তাঁদের মধ্যে দেবী কালিকা একজন।

[মহা (k) ২.১১.৪০; (হরি) ২.১১.৩৮]

কালিকামুখ একজন রাক্ষস। সুমালীর ঔরসে কেতুমতীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম।

[রমায়ণ ৭.৫.৩৮-৩৯]

কালিকাশ্রম বিপাশা নদীর তীরবর্তী একটি তীর্থক্ষেত্র। এই তীর্থে গিয়ে বিপাশা নদীতে স্নান করলে মুক্তি লাভ হয়।

[মহা (k) ১৩.২৫.২৪; (হরি) ১৩.২৬.২৩]

কাশ্মীরে বিপাশা নদীর তীরে কালিকাশ্রম নামে একটি স্থান এখনও দেখা যায়।

[Mahesh Sharma, Puranic Texts from Kashmir; Vitasta and the River Ceremonial in Early Medieval India, Los Angeles: SAGE Publication, 2008; p. 135]

কালিঞ্জর *[দ্র. কালঞ্জর]*

কালিন্দ প্রজাপতি বিক্রান্তের ঔরসে যে অশ্বমুখ কিন্নর জাতির উৎপত্তি হয়, কালিন্দ তাদের মধ্যে একজন কিন্নর। *[বায়ু পু. ৬৯.৩২]*

কালিন্দী১ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা অসিতের দুই পত্নীর মধ্যে একজন। অসিত একসময় যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হিমালয়ে নির্বাসিত হন। অসিতের দুই স্ত্রীই তখন তাঁর সঙ্গেই ছিলেন এবং কালিন্দী গর্ভবতী ছিলেন। নির্বাসিত অবস্থায় অসিতের মৃত্যু হয়। তাঁর অপর এক পত্নী ঈর্ষাবশত কালিন্দীর গর্ভ বিনষ্ট করার জন্য তাঁকে বিষমিশ্রিত খাবার খাইয়ে দেন। তবু চ্যবনমুনির আশীর্বাদে কালিন্দীর এক তেজস্বী এবং সুদর্শন পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। গরল-সহ জন্মগ্রহণ করায় এই কালিন্দীপুত্র সগর নামে খ্যাত হন। *[রামায়ণ ১.৭০.১৫-৩৮]*

কালিন্দী২ সীতার সন্ধানে সুগ্রীব বানরদের চারিদিকে পাঠিয়েছিলেন। বিনত নামে এক বানরকে তিনি কয়েকটি নদীর নাম উল্লেখ করে সেখানেও খুঁজতে বলেন। কালিন্দী সেই নদীগুলির মধ্যে একটি। *[রামায়ণ ৪.৪০.২১]*

কালিন্দী৩ সূর্য ও সংজ্ঞার কন্যা যমুনার অপর নাম। ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, একদিন বাসুদেব-কৃষ্ণ ও অর্জুন যমুনা নদীতে স্নান করছিলেন। সেইসময় তাঁরা এক পরমা-সুন্দরী কন্যাকে যমুনার তীরে বিচরণ করতে দেখলেন। কৃষ্ণের আদেশে অর্জুন সেই রমণীকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সেই রমণী বললেন যে, তিনি কালিন্দী, দিবাকর-সূর্যের কন্যা, বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করার জন্যই তিনি তপস্যা করছিলেন।

কালিন্দীর কথা শুনে বাসুদেব-কৃষ্ণ নিজের রথে করে তাঁকে হস্তিনাপুরে নিয়ে গেলেন। পরে বাসুদেব-কৃষ্ণ দ্বারকায় গিয়ে কালিন্দীকে বিবাহ করেন। বস্তুত যমুনানদীরই অপর নাম কালিন্দী এবং ভাগবত পুরাণের এই উপাখ্যানে নদীরূপা যমুনার উপরেই কৃষ্ণের পত্নীত্ব আরোপিত হয়েছে। *[ভাগবত পু. ১০.৫৮.১৭-২৯]*

□ কালিন্দীর গর্ভে কৃষ্ণের দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন—শ্রুত, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও সোমক। *[ভাগবত পু. ১০.৬১.১৪]*

□ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর যেসব প্রধান ভার্য্যারা হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কালিন্দীর নাম উল্লেখযোগ্য। *[ভাগবত পু. ১০.৭১.৪৩; ১০.৮৩.১১]*

কালিয়১ কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কালিয় একজন। মহাভারতে আদিপর্বের অন্তর্গত আস্তীক পর্বে সর্পনাম কথনের সময় কালিয়-র নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.৩৫.৬; (হরি) ১.৩০.৬; বায়ু পু. ৬৯.৭২; ভাগবত পু. ৫.২৪.২৯]

□ মহাভারতে উদ্যোগপর্বে ভোগবতীপুরীতে দেবর্ষি নারদ, মাতলির কাছে যেসব নাগেদের নাম উল্লেখ করেছিলেন, কালিয় তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ৫.১০৩.৯; (হরি) ৫.৯৬.৯]*

□ হরিবংশ পুরাণ, ভাগবত পুরাণ ও বিষ্ণু পুরাণে কৃষ্ণের দ্বারা কালিয়-দমনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হরিবংশ পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, একদিন বালক কৃষ্ণ, গোপবালকদের সঙ্গে গোরু চরাতে চরাতে যমুনার তীরে এক নির্জন বনে এসে পড়লেন। যমুনার তীরের কাছাকাছি এক বিশাল হ্রদ দেখতে পেলেন কৃষ্ণ। এই হ্রদেই বাস করতেন নাগরাজ কালিয়। কৃষ্ণ জানতেন যে, একসময় কালিয় গরুড়ের ভয়ে সমুদ্র ত্যাগ করে এই হ্রদে বাস করতে শুরু করেন। সেইসময় থেকেই কালিয়-নাগের বিষে যমুনার জলও বিষাক্ত হয়ে যায়। কালিয়-নাগের বিষাক্ত বাতাসের ভয়ে কোনো জলচর প্রাণী বা কোনো পাখিও সেই হ্রদে বাস করতে পারতো না। কৃষ্ণ ভাবলেন এই নাগকে দমন করলে যমুনার জল বিষের প্রভাব মুক্ত হবে। আর গোকুল-ও যমুনার জলে উপকৃত হবে। কালিয়-হ্রদের আশেপাশে সাপেদের বাস ছিল। সেই কারণে একদিন কালিয়-দমনের জন্য কৃষ্ণ কদম গাছে চড়লেন এবং উঁচু শাখা থেকে ঝাঁপ দিলেন যমুনায়। কৃষ্ণকে দেখে কালিয় নাগ ক্রুদ্ধ হলেন। কালিয়-র গাত্রবর্ণ কালো কাজলের মতো। তাঁর পাঁচ-পাঁচটা মাথা। সেই পঞ্চমুখ থেকে বিষাক্ত ধোঁয়া বের করতে করতে কালিয় কৃষ্ণকে আক্রমণ করলেন।

ইতোমধ্যে অনান্য গোপবালকরা ভাবল, নাগরাজ কালিয়, কৃষ্ণকে ভক্ষণ করেছে। তারা নন্দগোপকে যমুনার তীরে ডেকে নিয়ে গেল। কালিয় হ্রদের তীরে যখন গোপরা হাহাকার করছেন, তখন তাঁরা দেখলেন যে, কালিয় নাগের মাথার ওপরে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন এবং পঞ্চ মস্তকের মধ্য মস্তকে দাঁড়িয়ে তিনি নৃত্য করছেন।

ভাগবত পুরাণে কালিয়র এই বিপত্তিকালে নাগপত্নীদের স্তব উল্লিখিত হয়েছে কৃষ্ণের উদ্দেশে। কালিয়ও তখন কৃষ্ণকে বললেন যে, অজ্ঞানতাবশতঃ আপনাকে আমি ক্রোধ দেখিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি আমাকে দমন করায় আমার সব বিষ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন আপনি আমার জীবন দান করুন।

তখন কৃষ্ণ, কালিয়কে যমুনা ত্যাগ করে সমুদ্রে গিয়ে বাস করার আদেশ দিলেন। কালিয়, [illegible] প্রণাম করে গোপদের সামনেই হ্রদ থেকে সাগরে চলে গেলেন। *[হরিবংশ পু. ২.১১-১২ অধ্যায়; ভাগবত পু. ১০.১৬ অধ্যায়; ১০.১৭.১-১২; বিষ্ণু পু. ৫.৭. অধ্যায়]*

□ বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, কালিয় পাতালের প্রথম তল অতলে বাস করতেন। *[বায়ু পু. ৫০.১৮]*

□ পুরাণগুলিতে কালিয়কে নাগ বা সর্প বলা হলেও, আসলে কালিয়কে নাগ জনজাতিরই একজন অধিপতি বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ এরা কোনো সরীসৃপজাতীয় প্রাণী নয়, সাপের 'টোটেম' ব্যবহারকারী প্রাচীন নাগ নামক জনজাতি।

সেক্ষেত্রে কালিয়দমনের মাধ্যমে কৃষ্ণ যমুনার জলকে সর্পবিষ থেকে মুক্ত করলেন—এ যুক্তি ঠিক গ্রাহ্য হয় না। মনে হয় বৃন্দাবনে যে নতুন জায়গায় ব্রজবাসীরা তাঁদের গ্রাম এবং গোচারণ ভূমি তৈরি করলেন—সেই স্থানটি এর আগে পর্যন্ত কালিয়-র অধীনস্থ নাগ জনজাতির বিচরণক্ষেত্র ছিল বা রাজত্ব ছিল। সেক্ষেত্রে বৃন্দাবনবাসীদের সুরক্ষা এবং গোসম্পদের নিরাপত্তার প্রয়োজনেই কালিয়নাগ এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের এই অঞ্চল থেকে সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। কৃষ্ণ তাই তাঁকে প্রাণে মারেননি শুধু সেই স্থান ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন। আরও বলেছেন—তুমি আজ থেকে এই বৃন্দাবনের গো-ব্রাহ্মণ এবং বৃন্দাবনবাসী প্রজাদের আর কোনো ক্ষতি করবে না—অদ্য প্রভৃতি গো-ব্রাহ্মণপুরোগাসু সর্বপ্রজাসু অপ্রমাদঃ কর্তব্যঃ।

এই গোব্রাহ্মণ হল আর্যসভ্যতার প্রতীক। সেক্ষেত্রে কৃষ্ণের দ্বারা কালিয়দমনের মাধ্যমে এই স্থানটি নাগজনজাতির প্রভাবমুক্ত হয় এবং এখানে আর্যসভ্যতার বিস্তার ঘটে—এমনটাই ধারণা করা যায়।

কালিয়২ রামের সভাসদদের অন্যতম। এঁরা সকলেই নানা কথোপকথনের মাধ্যমে রামের মনোরঞ্জন করতেন। *[রামায়ণ ৭.৫৩.২]*

কালী ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান শক্তিদেবতা, দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা। দেবতেজসম্ভূতা চণ্ডীর সঙ্গে কালী অভিন্না এবং তাঁর তেজ এবং শক্তির একাত্মিকা বলেই কালীর প্রথম উল্লেখ পাই ঋগ্‌বেদে, তবে নামত নয়। অগ্নিকে সেখানে 'সপ্তজিহ্বা' বলা হয়েছে—

বচ্যন্তাং তে বহ্নয়ঃ সপ্তজিহ্বা।

ঠিক যেমনটা শুক্লযজুর্বেদ কিংবা মহাভারতেও অগ্নির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি সপ্তজিহ্বা। শুক্লযজুর্বেদের এক কবিত্বময় মন্ত্রে বলা হচ্ছে—হে অগ্নি! তোমার সাতটি জিহ্বা, সাতজন তোমার ঋষি, আর সাতটি তোমার প্রিয়স্থান। আর মহাভারতে সপ্তজিহ্বা সপ্তমুখ নিয়ে ক্রূর লেলিহান অগ্নির কল্পনা—

* সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্তজিহ্বাঃ
সপ্ত ঋষয়ঃ সপ্ত ধাম প্রিয়ানি।

* সপ্ত জিহ্বাননাঃ ক্রূরো লেলিহানো বিসর্পতি।

[ঋগ্‌বেদ ২.৬.২; শুক্লযজুর্বেদ ১৭.৭৯; মহা (k) ১.২৩১.৫; (হরি) ১.১২৫.৫]

□ অগ্নির এই সপ্ত জিহ্বা কী, কীই বা তার প্রকার, এটা প্রথম পরিষ্কার হয়ে যায় মুণ্ডকোপনিষদের মতো প্রাচীন শ্রুতিগ্রন্থে। সেখানেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে পরম তেজ স্বরূপা এই সাতটি অগ্নিজিহ্বার একটির নাম হল কালী এবং অন্য একটি আবার করালীও বটে। আমরা অনেক সময়েই কালীকে একসঙ্গে কালী করালী বলেও বিশেষিত করি। মুণ্ডকোপনিষদ অগ্নির সপ্তজিহ্বার নাম করে বলেছে—

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা সা চ সুধূম্রবর্ণা।

স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচি চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ॥

অগ্নির সপ্তজিহ্বার অন্যতমা এই কালীকে মার্কণ্ডেয় পুরাণে একেবারে সোজাসুজি আমাদের পরিচিত শক্তিদেবতা কালীর সঙ্গে একাত্মক করে বলা হল—অগ্নির যে জিহ্বা কালনিষ্ঠাকরী কালী এবং সেই কালীই তো করালী, সধূম্রবর্ণা এবং স্ফুলিঙ্গিনী—

যা জিহ্বা ভবতঃ কালী কালনিষ্ঠাকরী প্রভো।
ভয়ান্নঃ পাহি পাপেভ্যে ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ॥
করালী নাম যা জিহ্বা মহাপ্রলয়কারণম্।
তথা নঃ পাহি পাপেভ্যো ঐহিকাচ্চ মহাভয়াৎ॥

অগ্নির দাহিকাশক্তি কালীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে মানুষের রোগ, ভয়, তাপ এবং পাপের দাহিকা হিসেবে। অনেকেই তাই কালীকে বেদ এবং উপনিষদের পরম্পরায় অগ্নির সারূপ্যেই কালীর উদ্ভব কল্পনা করেন।

[মুণ্ডকোপনিষদ (দুর্গাচরণ) ২.৪; মার্কণ্ডেয় পু. ৯৯.৫২-৫৩]

□ পণ্ডিতেরা অনেকেই আবার ঋগ্‌বেদের রাত্রিসূক্ত এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থের নির্ঋতির সমন্বয়ে কালীমায়ের মূর্তি কল্পনা করেন। তবে বৈদিক রাত্রিসূক্তের বিষয়বস্তু তাতে কৃষ্ণবর্ণ তামস অন্ধকারের সর্বব্যাপী আচ্ছন্নতা ছাড়া কালীমূর্তি বা কালীর দৈবী ভাবনার সঙ্গে আর কিছু মেলে না। কিন্তু এটাও আবার খুব সত্যি যে, মহাকালী রাত্রির মতোই কৃষ্ণবর্ণা, এবং রাত্রিসূক্তে রাত্রি যেহেতু ঊষাকে গ্রহণ করে আলোকের উদয় ঘটান, কালীও তেমনই অশিব-অমঙ্গল নাশ করে মানুষকে জ্ঞানের আলোর সন্ধান দেন। এটা তো সত্যিই একটা ভাববার বিষয় যে, সপ্তশতী চণ্ডীর মধ্যে সেই পরমা শক্তি পরমা প্রকৃতি—যাঁকে সৃষ্টির পূর্বকালে ঋগ্‌বেদ অন্ধকারের মধ্যে আরও গভীর এক অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করেছে, সেই তাঁকেই তো কালরাত্রি, মহারাত্রি এবং মোহরাত্রির সঙ্গে সমার্থক করে দিয়েছে—

কালরাত্রি র্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা।

রাত্রির সঙ্গে এই সম্পর্কের সূত্র ধরেই ঋগ্‌বেদের রাত্রি দেবতার সঙ্গে চণ্ডী-দুর্গা-কালীর অভিন্নতাবোধে চণ্ডীপাঠের আগে ঋগ্‌বেদের রাত্রিসূক্ত পড়তে হয়।

কালীর প্রাচীন সমান্তরাল খুঁজতে গিয়ে পণ্ডিতেরা শতপথ ব্রাহ্মণের নির্ঋতি দেবীর সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য-সারূপ্য পেয়েছেন কিছু। পণ্ডিতেরা কেউ কেউ বলেছেন—শতপথ ব্রাহ্মণের নির্ঋতি দেবী কৃষ্ণবর্ণা এবং ঘোরা। সে না হয় কালীও তেমনই কৃষ্ণবর্ণা এবং ঘোররূপা, কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থে নির্ঋতির আর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, যা কালীর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। কাজেই নির্ঋতিকে কালী-ভাবনার কোনো উৎসমূল হিসেবে কল্পনা করাটা বেশি কষ্টকল্পনা হয়ে যাবে। তার থেকে 'কালী কালী মহাকালী'-র সঙ্গে সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্বের দার্শনিক অভিযোজন অনেক বেশি সযৌক্তিক মনে হয়। সাংখ্যদর্শনের পুরুষ নির্গুণ, সাক্ষী, কেবল এবং চৈতন্যস্বরূপ—সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ—অর্থাৎ তিনি নিষ্ক্রিয় হলেও তাঁর চৈতন্য আছে, কিন্তু প্রকৃতি পুরুষের চেতনায় সচেতনা এবং তাঁর ক্রিয়াশীলতা আছে। ফলে চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষের সংসর্গে তিনি সৃষ্টিপ্রক্রিয়া শুরু করেন। সাংখ্যকারিকা এখানে অন্ধ-পঙ্গু-ন্যায়ের উল্লেখ করে বলেছে—অন্ধের কাঁধে পঙ্গু বসলে যেমন একের দেখা এবং অপরের পথ চলা দুটোই হয়ে যায়, তেমনই জড়া প্রকৃতি পুরুষাধিষ্ঠিতা হওয়ায় পুরুষ কর্তৃক দৃষ্ট হয়ে সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করে।

মহাকালীও চৈতন্যময় পুরুষ মহাকাল শিবের সংযোগে সৃষ্টিকর্মে নিরুতা। শিব-পুরুষ মূলত চৈতন্যস্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয় নির্গুণ বলে শবের মতো পড়ে থাকেন। আর প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা বলেই তিনি শিববক্ষে সমারূঢ়া। পণ্ডিতেরা এই সাংখ্যতত্ত্ব কিন্তু একটু অন্যরকম ভাবেও ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা বলেন কালীর মধ্যে একটা ভয়ঙ্করী রূপ আছে ফলে সৃষ্টির থেকেও ধ্বংসের সঙ্গে তাঁর সঙ্গতি তৈরি হয়। সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় নিযুক্তা শিব-শিবানীর চেয়েও সৃষ্টিবিনাশকারী মহাকাল রুদ্রের শক্তি রুদ্রাণীর সঙ্গে কালীর স্বভাব এবং গুণ-কর্ম বেশি সংশ্লিষ্ট মনে হয়। ফলে একদিকে যেমন কালী অশুভশক্তিনাশের প্রতীক, তেমনই তিনি সৃষ্টির নাশকালে সম্পূর্ণ রুদ্রাত্মিকা প্রকৃতি।

স্কন্দ পুরাণের একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে—প্রলয়কালে শিব কালীকে জগৎ ধ্বংস করার কথা দিলেও দেবী স্ত্রীজনোচিত স্নেহের কারণে প্রথমে তা করতে চাননি। শিব তখন হুংকার

করে কালীকে তিরস্কার করেন। দেবী কালী তখন ভয়ঙ্করী রূপ ধারণ করে মহারুদ্রের আবেশে মহারুদ্র-রূপ ধারণ করলেন। তাঁর বিশাল আকৃতিতে ত্রিভুবন ব্যাপৃত হল। দেবীর পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, কাঁধ বেয়ে সর্পের যজ্ঞোপবীত। তাঁর ঠোঁটের দুই কস চকচক করছে, তিনি ভীষণ গর্জন করছেন, মুখে তাঁর অট্টহাস্য, ঝড়ের মতো প্রচণ্ড নিঃশ্বাস পড়ছে—এই প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে তিনি জগদ্‌ধ্বংসের কাজে ব্যাপৃত হলেন।

[স্কন্দ (আবন্ত্য/রেবা) পু. ১৪.৩৩-৩৪]

□ পুরাণগুলির প্রমাণ মানলে কালী কিন্তু উমা-চণ্ডীর সঙ্গে প্রায় একাত্মক। কালিকা পুরাণে দেখা যায়—কালী হিমালয়েরই মেয়ে এবং তিনি হিমালয়ের স্ত্রী মেনার গর্ভজাত। যে কন্যা সন্তানটি জন্মাল, তার গায়ের রঙ কালো বলেই গিরিরাজ হিমালয় আদর করে তাঁর নাম দিলেন কালী। আত্মীয়-স্বজনেরা অবশ্য তাঁকে পার্বতী বলেই ডাকতে আরম্ভ করলেন—

তান্তু নীলোৎপলদলশ্যামাং হিমবতঃ সুতান্।
কালীতি নাম্না হিমবানাজুহাব কৃতে দিনে॥
বান্ধবৈস্তু সমস্তৈস্তন্নাম্না সা তু পার্বতী।
কালীতি চ তথা নাম্না কীর্তিতা গিরিনন্দিনী॥

আমাদের সাধারণ ধারণা এটাই যে হিমালয় এবং মেনার কন্যা পার্বতী-উমা। তাঁর গায়ের রঙও তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গী। কিন্তু অন্যান্য পুরাণেও এটা দেখছি যে হিমালয়ের কন্যাটি আদতে কৃষ্ণবর্ণা। বরাহ পুরাণে দেখা যায়—দক্ষকন্যা সতী অগ্নিতে দেহত্যাগ করে পরজন্মে যখন হিমালয় আর মেনার মেয়ে হয়ে জন্মালেন, তখন তিনি দুটি নামে পরিচিত হলেন। একটি উমা, দ্বিতীয় নাম কৃষ্ণা—

স্বশরীরাগ্নিনা দগ্ধা ততঃ শৈলসুতাভবৎ।
উমা নামেতি মহতী কৃষ্ণা চেত্যভিধানতঃ॥

এখানে কৃষ্ণা নামটি কালীর সমার্থক, যদিও কূর্ম পুরাণে কালীনামও নেই, কৃষ্ণার ইঙ্গিতও নেই। সেখানে হিমালয় নীলপদ্মের মতো শিশুকন্যার মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করে ভীত হওয়া মাত্রেই দেবী তাঁর আপন মূর্তি প্রকাশ করলেন। কিন্তু শরীরের বর্ণনায় দেবীর কালীরূপ ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে—নীলপদ্মের মতো তাঁর বর্ণ, নীল পদ্মের সুগন্ধ তাঁর শরীরে। দ্বিভুজ দ্বিনেত্র সেই মনুষ্য শরীরে, তাঁর কেশরাশিও কাল। ইনি কালী ছাড়া আর কে—

নীলোৎপলদলপ্রখ্যং নীলোৎপলসুগন্ধিচ।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং সৌম্যং নীলালকবিভূষণম্।

বামন পুরাণে আবার হিমালয়পত্নী মেনার তিনটি মেয়ে। সবার ছোট অবশ্য কালী, ঘন কাজলের মতো তাঁর গাত্রবর্ণ—

নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যা নীলেন্দীবরলোচনা।
রূপেণানুপমা কালী জঘন্যা মেনকাসুতা।

জন্মলগ্ন থেকেই হিমালয়ের মেয়ের গায়ের রঙ কালো এবং সেইজন্যই তাঁর নামও কালী—এটা অবশ্যই একটা পৌরাণিক মত। কিন্তু বামন পুরাণে হিমালয়-মেনার যে তিন মেয়ের খবর পাওয়া গেছে, সেখানে কালী ছাড়া আর দুই মেয়ে কিন্তু রাগিনী আর কুটিলা—একজন সন্ধ্যারাগ আর অন্যজন নদীরূপে পরিণত হলেন ব্রহ্মার শাপে, কিন্তু কালী তপস্যা করতে যাবার সময় জননী মেনা বিস্ময়সূচক 'উমা' 'উমা' বলে ডেকেছিলেন বলে তাঁর নাম হল উমা।

[কালিকা পু. ৪১.৪৭-৪৮; বরাহ পু. ২২.৫;
কূর্ম পু. ১.১২.১৯৮; বামন পু. ৫১.৪]

□ পৌরাণিকদের আর একটা মত হল—কৃষ্ণবর্ণা কালী হয়েই জন্মেছিলেন হিমালয়ের কন্যা কালী, কিন্তু গৌরী পার্বতী হয়ে ওঠার অন্যতর এক রহস্য আছে। অর্থাৎ কিনা তিনি প্রথমে কালী হলেন যেভাবে তারও একটা কাহিনী আছে আবার কালী থেকে গৌরী হওয়ারও একটা কাহিনী আছে। পুরাণগুলিতে শিব-পার্বতীর মিলন ঘটানোর জন্য তারকাসুরের যে কাহিনী ব্যবহৃত হয়েছে, সেটাই একটু অন্যরকম করে বর্ণনা করা হয়েছে পদ্ম পুরাণ এবং স্কন্দ পুরাণে।

তারকাসুরকে বধ করার জন্য একজন দুর্জয় সেনাপতি চাই যিনি জন্মাবেন শিবের তেজে। শিবের বীর্য্য ধারণ করার জন্য সেইরকম এক শক্তিরূপিণী নারী চাই। অতএব সেই মহাশক্তির জন্মও পরিকল্পনা করতে হল সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে। শিব-শিবানী বিয়ে হয়ে যাবার পর ভবিষ্যতে মহাশক্তি কালীর গায়ের রঙ নিয়ে মহাদেব কোনো সময় তাঁকে পরিহাস করবেন এবং সেই পরিহাসে কুপিত আপন গাত্রবর্ণ পরিবর্তনের জন্য তপস্যায় বসবেন।

এই পরিকল্পনা মাথায় নিয়েই ব্রহ্মা রাত্রিদেবীকে আদেশ দিলেন যাতে মেনার গর্ভে থাকার সময়েই তিনি যেন গিরিনন্দিনীর গায়ের রঙ আপন গাত্রবর্ণ

কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করে দেন। তারপর যখন মহাদেবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে তখন কোনো একদিন নির্জনে তিনি স্ত্রীকে কালী বলে উপহাস করবেন। সেই উপহাসের ভাষাটাও বেশ তীক্ষ্ণ। শিব বলেছিলেন—আমার এই ভস্ম-শুভ্র শরীরে তুমি যখন আলিঙ্গন করো, তোমাকে শ্বেতচন্দনের গাছে জড়ানো কৃষ্ণসর্পের মতো লাগে—

* গর্ভস্থানে'থ তাং মাতঃ স্বেন রূপেণ রঞ্জয়।
ততো রহসি সর্বস্তাং বিভ্রদানন্দপূর্বকম্॥
হাসয়িষ্যতি কালীতি ততঃ সা কুপিতা সতী।
প্রযাস্যতি তপঃ কর্তুং ততঃ সা তপসা যুতা॥
* শরীরে মম তন্বঙ্গি সিতে ভাস্যসিতদ্যুতিঃ।
ভুজঙ্গবাসিতা শুভ্রে সংশ্লিষ্টে চন্দনে তরৌ॥

কৃষ্ণবর্ণা কালী প্রিয়তম স্বামীর মুখে এহেন পরিহাস শুনে ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং নিজেকে নিযুক্ত করলেন কঠোর তপস্যায়। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা কালীকে বর দিলেন গৌরাঙ্গী হবার। তখন দেবী কালী তাঁর নীলোৎপলতুল্য কৃষ্ণ ত্বক পরিত্যাগ করে গৌরী হলেন—কৃষ্ণত্বক থেকে জন্মানোর ফলে তাঁর এক নাম হল কৌশিকী অথবা একানংশা।

স্কন্দ পুরাণের রেবাখণ্ডে, কালিকা পুরাণের অন্য একটি স্থলে এবং বামন পুরাণেরও অন্যত্র কালীই কিন্তু হিমালয় পুত্রী পার্বতীর মূল নাম। কেমন করে তিনি গৌরী হলেন বা কেন। তিনি তপস্যা করলেন—এই সব কাহিনী অন্তরালে যে পৌরাণিক রহস্যই থাকুক আমরা যে কালীকে চিনি, যে কালী বঙ্গদেশে পূজিতা হন, সেই কালী ইনি নন। ইনি হিমালয়-দুহিতা পার্বতীর অন্য নাম মাত্র।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/রেবা) ১৮.১৮-২০, ২৪-২৫; পদ্ম পু. (সৃষ্টি) ৪.৬২৫; ৪৪.১; বামন পু. ৫৪.২৩-২৪; শিব পু. (বায়বীয়) ১.২১.৩৩-৩৮, ৯৫-৯৬]

☐ বরঞ্চ সপ্তশতী চণ্ডীতে অন্তত দুবার যেভাবে কালীর আবির্ভাবের বর্ণনা আছে, সেই কালীর রূপ-চরিত্র আমাদের পূজিতা কালীর সঙ্গে বেশি মেলে। শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি চণ্ডমুণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধকালে দেবী কোপ-কষায়িত ভ্রূকুটি-কুটিল ললাট থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন যে কালী, তার বর্ণনা আছে মার্কণ্ডেয় পুরাণে—তাঁর ভ্রূকুটি কুটিল ললাট থেকে নির্গত হলেন করাল বদনা কালী, তাঁর হাতে বিচিত্র খট্বাঙ্গ, তাঁর গলায় নরমুণ্ডের মালা, তাঁর দেহমাংস শুষ্ক, বিশাল বিস্তৃত মুখে লোল জিহ্বা লকলক করছে, চক্ষু দুটি কোটরগত—ইনি ভীষণদর্শনা কালী—

ভ্রূকুটীকুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসি পাশিনী॥
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণের দুর্গাসপ্তশতীতে শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি চণ্ড এবং মুণ্ডকে হত্যা করে তাঁদের কর্তিত মুণ্ড দুটি হাতে নিয়ে সাট্টহাসে দেবী চণ্ডিকাকে উপহার দিয়েছিলেন। চণ্ডিকার ললাটফলক-নিঃসৃতা এই দেবী কালী চণ্ডীকে বলেছিলেন—এই যুদ্ধ-যজ্ঞের পশু-দুটির মস্তক তোমায় উপহার দিলাম। একথা শুনেই দেবী চণ্ডী বললেন—তুমি যখন চণ্ড আর মুণ্ডের মাথা দুটি নিয়ে আমাকে প্রীত করেছো, তাই আজ থেকে তোমার নাম হবে চামুণ্ডা—

শিরশ্চণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব চ।
প্রাহ প্রচণ্ডাট্টহাস-মিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাম্॥
ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ।
যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি॥
তবানীতৌ ততো দৃষ্ট্বা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ।
উবাচ কালীং কল্যাণীং ললিতং চণ্ডিকা বচঃ॥
যস্মাৎ চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি॥

এই কাহিনী থেকে এটা প্রমাণ হয় যে, কালী চণ্ডিকার সঙ্গে স্বরূপত অভিন্না এবং চামুণ্ডাও কালীর অপর নাম মাত্র। চণ্ড-মুণ্ড নিহত হবার পর রক্তবীজকে বধ করার সময় দেবী চণ্ডী এই কালীরই সাহায্য চেয়েছেন। রক্তবীজের গা থেকে সামান্য রক্ত পড়লেই সে রক্ত থেকে শত শত অসুর জন্মাচ্ছিল। এই অবস্থায় দেবী কালীকে বললেন—ওহে চামুণ্ডা! তুমি তোমার মুখব্যাদান করে নিয়ে রক্তবীজের রক্ত পান করো, তাহলেই আমি একে বধ করতে পারবো। চণ্ডীর কথা শুনে কালী রক্তবীজের রক্তপ্রসূত অসুরদেরও গ্রাস করলেন এবং দেবী চণ্ডী রক্তবীজের শরীরে শূল দিয়ে আঘাত করতেই দেবী মুখব্যাদান করে রক্তবীজের দেহ থেকে ক্ষরিত রক্ত পান করলেন। এইবার ক্ষীণরক্ত রক্তবীজকে শূলাঘাতেই বধ করলেন দেবী চণ্ডী—

* তান্ বিষণ্ণান্ সুরান্ দৃষ্টা চণ্ডিকা প্রাহ সত্বরা।
উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু॥
* ইত্যুক্তা সা ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্।
মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্॥
* জঘান রক্তবীজং তং চামুণ্ডাপীতশোণিতম্॥

কালিকা পুরাণের একটি বিবরণে আবার মাতঙ্গীর দেহকোশ থেকে কালিকার আবির্ভাব হয়। এই কোশ সমুদ্ভূতা কালী হিমাচল আশ্রয় করলেন এবং তার নাম আবার উগ্রতারাও বটে—

কালিকাখ্যাভবৎ সাপি হিমাচলকৃতাশ্রয়া।
তামুগ্রতারামৃষয়ো বদন্তীহ মনীষিণঃ॥

[মার্কণ্ডেয় পু. ৮৭.৬-৮; শ্রীশ্রীচণ্ডী (পঞ্চানন তর্করত্ন) ৭.৫-২৫; ৮.৫০-৬০; কালিকা পু. ৬১.৫৭-৫৮]

□ পুরাণগুলির মধ্য থেকে কালীর যতটুকু তথ্য পাওয়া গেল, তাতে কালী কখনো দেবী চণ্ডী, কখনো মাতঙ্গীর সঙ্গে অভিন্না, আবার সেই কালী কখনো উমা-পার্বতীর বদলে হিমালয়-মেনার দুহিতা। আবার পরমা শক্তির এই আত্মবিভাগের মধ্যেও অনেকে আছেন যাঁদের গাত্রবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ বলেই তাঁদের বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবে কালী বলে ডাকা হয়েছে—যেমন দেবীর কৃষ্ণবর্ণ চর্মকোশ থেকে উৎপন্না কালীর নাম কৌশিকী কালী। শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য দেবতাদের আর্ত প্রার্থনা শোনার পরেই দেবী অম্বিকার চর্মকোশ থেকে যে দেবীরূপের সৃষ্টি হল, তা একাধারে কৌশিকীও বটে, আবার তাঁকে কালী বা কালিকাও বলা হয়। তিনি হিমালয় পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিলেন—

শরীরকোষাদ্ যত্তস্যাঃ পার্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা।
কৌশিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে॥
তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া॥

এই কৌশিকী কালীর রূপও পূর্বোক্ত উগ্রতারার মতোই। কিন্তু চণ্ডী, মাতঙ্গী বা অম্বিকার শরীর থেকে উৎপন্না হননি অথবা তিনি কালীই ছিলেন, তারপর গৌরী হলেন—এইরকম তত্ত্ব এবং তথ্য ছাড়া পুরাণগুলিতে এমন পৃথক এক কালীর সত্তা কিন্তু স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, যেখানে আমাদের বঙ্গদেশে পরিচিত কালীকে আমরা একাত্মভাবে চিনে নিতে পারি। এই কালী 'নির্মাংসাস্থিভৈরবা'ও নন, কোটরাক্ষিও নন, কোনো চণ্ডী-অম্বিকার অংশভূতাও নন। তিনি স্বতন্ত্র পৃথক এক শক্তিদেবতা, যাঁর প্রথম রূপটি ধরা পড়ে মহাভারতের মতো প্রাচীন গ্রন্থেই। মহাভারতের বিরাট এবং ভীষ্মপর্বে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির-কৃত এবং অর্জুন-কৃত দুর্গাস্তব আছে। এখানে যুধিষ্ঠিত-কৃত দুর্গাস্তবের একটি পংক্তিতে কালীর একটা পৃথক স্পষ্ট রূপে খুঁজে পাই—এখানে কালী মহাকালী হয়ে উঠেছেন এবং তিনি মদ্য মাংসপ্রিয়া, সবসময় তাঁর অনুযাত্রিকতা করেন ভূতবর্গ এবং তিনি যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ান, তিনি কামচারিণী—

কালি কালি মহাকালি সীধুমাংসপশুপ্রিয়ে।
কৃতানুযাত্রা ভূতৈস্ত্বং বরদে কামচারিণি॥

অর্জুনস্তুতিতে কালীর রূপ-চরিত্র অত স্পষ্ট নয়, তবে কালী কিংবা মহাকালীর নামটি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে উচ্চারিত হয়েছে—

কুমারি কালি কাপালি কপিলে কৃষ্ণপিঙ্গলে।
ভদ্রকালি নমস্তুভ্যং মহাকালি নমো'স্তুতে॥

মহাভারতের এই দুটি দুর্গাস্তোত্রের এই কালী কিন্তু একেবারে ভয়ঙ্করী হয়ে সৌপ্তিক পর্বে—যেখানে সেনাপতি হিসেবে অশ্বত্থামা যখন দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে বধ করেছেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং শিখণ্ডীকে বধ করেছেন—তখন সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধদুর্মদ অশ্বত্থামার পাশে পাশে যে কালীকে দেখা গেল তাঁর মুখখানি লাল, চোখ দুটিও লাল, গলায় লাল ফুলের মালা, পরনে লাল কাপড় এবং তাঁর হাতে পাশ অস্ত্র। এই কালীকে ধ্বংসের প্রতীক কালরাত্রি বলা হচ্ছে এখানে। তিনি গান গাইতে গাইতে তাঁর পাশ অস্ত্র দিয়ে প্রস্থান-পলায়নরত মানুষ, অশ্ব এবং হস্তীদের বেঁধে আনছিলেন। যতক্ষণ অশ্বত্থামার আক্রমণ চলল, ততক্ষণ লোকজন অশ্বত্থামার পাশে পাশে সেই অপরূপা কন্যা কালীকে দেখল—

কালীং রক্তাস্যনয়নাং রক্তমাল্যানুলেপনাম্।
রক্তাম্বরধরামেকাং পাশহস্তাং কুটুম্বিনীম্॥
দদৃশুঃ কালরাত্রিং তে গায়মানামনিন্দিতাম্।
নরাশ্বকুঞ্জরান্ পাশৈর্বদ্ধা ঘোরৈঃ প্রতস্থুষীম্॥
যতঃ প্রভৃতি সংগ্রামঃ কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ।
ততঃ প্রভৃতি তাং কন্যামপশ্যন্ দ্রৌণিমেব চ॥

[শ্রীশ্রী চণ্ডী (পঞ্চানন তর্করত্ন) ৫.৪০-৪১; কালিকা পু. ৬১.৬৯-৭০, ৭৫-৮২; মহা (k) ৪.৬.১৭-১৮; ৬.২৩.৪-৫; ১০.৮.৬৫-৬৯; (হরি) ৪.৫নং অধ্যায়ের পর অতিরিক্ত শ্লোক দ্রষ্টব্য, খণ্ড ১২, পৃ. ৫৭; ৬.২৩.৪-৫; ১০.৯.৬৪-৬৮]

□ আমরা শুধু বলতে চাই মহাভারতে বর্ণিত এই কালীর পৃথক সত্তা এবং পৃথক রূপটি কিন্তু বঙ্গদেশীয় কালীর সঙ্গে অনেক বেশি মেলে। পণ্ডিতেরা জানিয়েছেন—বঙ্গদেশে কালীর যে রূপ-চরিত্র আমাদের কাছে নেমে এসেছে, তা তন্ত্রসারের রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের দৈবী ভাবনা। তিনি তাঁর ধ্যানমূর্তির ভাবনা থেকেই মৃন্ময়ী কালীমূর্তি তৈরি করে কালীপূজা করেন। পরে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সৌজন্যে কালীপূজা এবং আগমবাগীশের কালীমূর্তি জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাতে একথাও সপ্রমাণ হয় যে, কালীপূজার ইতিহাস দুর্গাপূজা বা চণ্ডীর আরাধনার মতো অত প্রাচীন নয়। বিশেষত এই বঙ্গদেশে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আগে কালীপূজার কোনো প্রসার-প্রতিষ্ঠা হয়নি। কালীপূজা নিয়ে গবেষণা করার সময় প্রখ্যাত অধ্যাপক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ স্বয়ং কালীমূর্তি গড়িয়া স্বয়ং পূজা করিতেন। আগমবাগীশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালার সাধক সমাজ অনেক দিন চলেন নাই; লোকে 'আগমবাগীশী' কাণ্ড বলিয়া তাঁহার পদ্ধতিকে উপেক্ষা করিত। . . . মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পর হইতে বাঙ্গালার কালীপূজা সাধারণভাবে অবলম্বিত হয়।'

বঙ্গদেশের প্রচলিত কালীপূজার যে খুব পুরাতন নয়, তার আরও একটা বড়ো প্রমাণ হল স্মার্ত রঘুনন্দনের বিধান। রঘুনন্দন সম্ভবত খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথিতযশা স্মৃতিশাস্ত্রকার। তিনি তাঁর স্বকৃত তিথিতত্ত্ব নামক গ্রন্থে অমাবস্যার রাত্রিতে বিভিন্ন শ্রাদ্ধের বিধান দিয়েছেন। অমাবস্যার রাত্রিতে ষষ্ঠীপূজার মতো লৌকিক পূজাও তিথিতত্ত্বে বিহিত হয়েছে, কিন্তু দুর্গাপূজার তেইশ/চব্বিশ দিন পরে দীপান্বিতার অমাবস্যায় কালীপূজার কোনো ব্যবস্থা দেননি স্মার্ত রঘুনন্দন। যিনি বহুল ক্ষেত্রে সমসাময়িক লৌকিক ব্রতের জন্যও তিথি নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তিনি কালীপূজার কোনো বিধানই দেননি, সেটা হতেই পারে না। দ্বিতীয়ত তাঁরই অন্য একটি গ্রন্থ কৃত্যতত্ত্বে রঘুনন্দন দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রিতে লক্ষ্মী এবং কুবেরের পূজার বিধান দিয়েছেন এবং এই দুই ধনদাতা দেবতার আশীর্বাদী রাত্রিটাকে তিনি সুখরাত্রি বলেও নামকরণ করেছেন, কিন্তু সেই দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রিতে কালীপূজার কোনো বিধানই তিনি দিলেন না। এতে বোঝা যায় যে, ষোড়শ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ভাগ থেকে শেষ ভাগ পর্যন্তও বঙ্গদেশে কালীপূজা প্রচলিতই ছিল না, জনপ্রিয়তা তো দূরের কথা।

পণ্ডিতপ্রবর শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন যে, কালীপূজার প্রথম বিধান পাওয়া যায় স্মার্ত কাশীনাথের লেখা 'কালীসপর্য্যাসবিধি' নামক গ্রন্থে। শশিভূষণের কথায়—'কাশীনাথ এই গ্রন্থে কালীপূজার পক্ষে যেভাবে যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই মনে হয়, কালীপূজা তখন পর্যন্ত বাঙলা দেশে সুগৃহীত ছিল না।' কাশীনাথ ১৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দে 'কালীসপর্য্যাসবিধি' রচনা করেন এবং অনেকেই মনে করেন কাশীনাথ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সমসাময়িক ছিলেন। হয়তো তন্ত্রসারের রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের ধ্যানমূর্তিকে কাশীনাথ স্মার্তবিধানে বঙ্গদেশে পূজাপার্বনের মধ্যে সুবিহিত করতে চেয়েছেন। কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক গবেষক 'নদীয়ার মহাজীবন' নামক গ্রন্থে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের জন্মসাল নির্ধারণ করেছেন ১৭১৬ খ্রিষ্টাব্দে। সেক্ষেত্রে কাশীনাথের পক্ষে যেমন তাঁর সমসাময়িকতা অনুমান করা যায়, তেমনই অনুমান করা যায় যে, কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু ছিলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। কৃষ্ণচন্দ্রের সৌজন্যেই আগমবাগীশের ধ্যানগম্য কালীমূর্তি বঙ্গদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

আগমবাগীশ তাঁর তন্ত্রসার গ্রন্থে সিদ্ধেশ্বর তন্ত্র থেকে কালীর যে ধ্যানমন্ত্র উদ্ধার করেছেন, তাতে কালীর রূপ এবং স্বভাব আগমবাগীশের কিছু পূর্বকাল থেকেই কালীর রূপকল্পনা বঙ্গদেশে চলছিল বলে মনে হয়। কিন্তু তন্ত্রসারে কালীতন্ত্র থেকে যে ধ্যানমন্ত্রটি উদ্ধার করা হয়েছে, সেটিই সবচেয়ে প্রচলিত ধ্যানমন্ত্র এবং কালীর এই ধ্যানমূর্তিই কিন্তু দক্ষিণাকালীর রূপ। দক্ষিণা কালী করালবদনা, তাঁর আকৃতি ভয়ঙ্কর। কেশ আলুলায়িত চতুর্ভুজা। গলায় নরমুণ্ডের মালা। তাঁর বামভাগের নীচের হাতটিতে সদ্যচ্ছিন্ন মুণ্ড, ওপরের হাতে খড়্গ। এই কালীমূর্তির দক্ষিণভাগে নীচের হাতটিতে অভয় মুদ্রা আর ওপরের হাত

বরদানের মুদ্রায় কল্পিত। তাঁর গায়ের রঙ প্রগাঢ় মেঘের মতো কালো, তিনি নগ্না দিগম্বরী। দেবীর গলায় মুণ্ডমালা, তা থেকে বিগলিত হচ্ছে রুধিরধারা যাতে তাঁর সর্বাঙ্গে অনুলেপন তৈরি করেছে। কর্ণে দুটি শবশিশু ভূষণরূপে বিরাজমান, তাতে দেবীর আকৃতি আরও ভয়ানক হয়ে উঠেছে। দন্তশ্রেণী ঘোররূপা। স্তনদ্বয় স্থূল এবং উন্নত। শবহস্তরাশি-নির্মিত কাঞ্চীদাম তাঁর কটিদেশের বেষ্টনী। এরই মধ্যে দেবী কালিকা কিন্তু হাস্যমুখী। ওষ্ঠপ্রান্ত থেকে বিগলিত রুধিরধারায় বদনমণ্ডল সমুজ্জ্বল। দেবীর শব্দ অতিশয় গম্ভীর। শ্মশানবাসিনী ত্রিনয়নী এই দেবীর তিনটি চোখ নবোদিত সূর্যের মতো উজ্জ্বল। দন্তশ্রেণী উন্নত এবং যেন বাইরে বেরিয়ে আসছে। কেশপাশ দক্ষিণব্যাপী এবং আলুলায়িত। মহাদেব এখানে শবরূপে পতিত আছেন, দেবী তদুপরি অবস্থিতা, তাঁর চতুর্দিকে শিবাকুলের ভয়ঙ্কর শব্দ। ইনি মহাকালের সঙ্গে বিপরীত রতিতে আসক্ত—দেবীর মুখপদ্ম সপ্রসন্ন এবং হাস্যযুক্ত—

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গ বামাধোর্ধ্বকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্ধ্বপাণিকাম্॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চিতাম্॥
কর্ণাবতংসতানীত শবযুগ্মভয়ানকাম্
ঘোরদ্রংষ্ট্রাং করালাস্যা পীনোন্নতপয়োধরাম্॥
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারা-বিস্ফুরিতাননাম্॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
বালার্কমণ্ডলাকার-লোচন-ত্রিতয়ান্বিতাম্॥
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি মুক্তালম্বিতচোচ্চয়াম্।
শবরূপ-মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্॥
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন-সরোরুহাম্।
এবং সন্তিয়েৎ কালীং সর্বকামসমৃদ্ধিদাম্॥

[তন্ত্রসার (নবভারত) পৃ. ৩৮৭-৩৮৮]

□ সর্বশেষে কালীর সম্বন্ধে এটাই বলতে চাই যে, মহাভারতের সৌপ্তিক পর্বে কালীর যে পৃথক সত্তা এবং যে ভয়ঙ্কর রূপ আমরা দেখেছি, সেই সত্তা এবং রূপ কিন্তু আগমবাগীশি কালীর মধ্যেও আছে, আর এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এটাই যে, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, যেটাকে অনেকেই বঙ্গদেশে লেখা পুরাণ বলে মনে করেন, সেই পুরাণে শিবের সম্মুখে সতী যে কালীমূর্তি ধারণ করেছিলেন, সেটাই আগমবাগীশি কালীর পূর্বরূপ কিনা, সেটা কালীমূর্তি-গবেষণার অন্যতম বিষয় হতে পারে। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বলা হচ্ছে—শিব দেখছেন এই অবস্থায় সেই শিবা সতী সোনার বর্ণ ত্যাগ করে ঘনকৃষ্ণ কাজলের মতো কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলেন। তাঁর সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত। তিনি পীনোন্নতপয়োধরা। তীব্র যৌবনমদে তিনি মহেশ্বরকে অগ্রাহ্য করেই এমন রূপ ধারণ করলেন যেখানে তিনি মুক্তকেশী, বিবস্ত্রা, চতুর্ভুজে তাঁর বীরত্বের ব্যঞ্জনা, দেহভারে পর্বত কম্পিত করেই যেন সতী দেবী পদ্মলোচনা শ্যামা হয়েছিলেন—

এবং শিবেক্ষ্যমানা সা ত্যক্ত্বা হৈমীং রুচিং সতী।
বভূব তৎক্ষণাদেব ধ্বান্তাঞ্জনচয়প্রভা।
লোমাঞ্চিত-সমগ্রাঙ্গী পীনোন্নত-পয়োধরা॥
তীব্র যৌবনমদেনাগণয়ন্তী মহেশ্বরম্।
মুক্তকেশা বিবস্ত্রা চ বীরবাহুচতুষ্টয়ী॥
দেহভারেণ তং শৈলং কম্পয়ন্তীব সর্বতঃ।
এবং ভূত্বা সতী দেবী শ্যামা কমললোচনা॥

[বৃহদ্ধর্ম পু. ২.৬.৬৭-৭১]

কালীতক পুরাণে উল্লিখিত ভারতবর্ষের অন্যতম জনপদ তথা জনজাতির নাম। *[দ্র. আনীকট]*

[বায়ু পু. ৪৫.১২৮]

কালেয়₁ মহর্ষি অত্রির বংশধারায় বংশপ্রবর্তক একজন ঋষি কালেয়। *[মৎস্য পু. ১৯৭.৯]*

কালেয়₂ ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, কালেয় বা কালকেয় দানবগণ পাতালের সর্বশেষ তল রসাতলে বাস করতেন। দেবাসুর সংগ্রামের সময় দানবরাজ বলির পক্ষে তাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন।

[ভাগবত পু. ৫.২৪.৩০; ৮.৭.১৪; ৮.১০.২২, ৩৪]

কালেহিকা স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.২৩; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ২৩ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৯)]

কালোদক একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থ ভ্রমণ করলে দীর্ঘ আয়ু লাভ হয়।

[মহা (k) ১২.১৫২.১৩; (হরি) ১৩.১৪৮.১৩]

□ সম্ভবত কাশ্মীরের নন্দ্‌কোল্ (Nundkol) হ্রদটিই প্রাচীন কালোদক। কাশ্মীর উপত্যকার হরমুখ্ (Haramukh) পর্বত শ্রেণীর পাদদেশে হ্রদটির অবস্থান।

[D.N. Dhar, Kashmir: a Kaleidoscopic View, New Delhi, Kanishka Publishers, 2005; p. 3]

কালোদককুণ্ড১ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পুণ্যতীর্থ। এই কুণ্ডে স্নান করলে মহাপাপ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৭৩]

□ মহাভারতের অনুশাসনপর্বেও সর্ব-পাপনাশক এবং পুণ্যফলদায়ক এই পবিত্র কুণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়।

[মহা (k) ১৩.২৫.৬০; (হরি) ১৩.২৬.৬০]

কালোদককুণ্ড২ বর্তমান কাশ্মীরে অবস্থিত একটি পবিত্র হ্রদ। নীলমত পুরাণে এই তীর্থের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[নীলমত পু. (মহর্ষি) ১২৯৪-১২৯৫]

কালোদর একটি প্রাচীন আর্যেতর জনজাতি, কালোদর জাতি অধ্যুষিত অঞ্চল দিয়ে হ্লাদিনী নদী প্রবাহিত। পুরাণে কেরল, ধীবর, নিষাদ ইত্যাদি জনজাতিগুলির সঙ্গে একত্রে কালোদকের উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যদিকে পৌরাণিক বর্ণনা অনুযায়ী হ্লাদিনী নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়েছে। দুটি তথ্যকে একত্রিত করলে ধারণা হয় যে, কালোদর সম্ভবত দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের একটি জনজাতি। *[বায়ু পু. ৪৭.৫২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৫৫]*

□ পণ্ডিত D.C. Sircar কালোদরকে পাঠভেদে কালঞ্জর, কালিন্দগতি এবং কলীদর নামে উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হল, পুরাণকার কালোদরদের বর্ণনা দিতে গিয়ে 'কালোদরান্ বিবর্ণাংশ্চ' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছেন। অলবিরুনীর মতে, বিবর্ণ অর্থাৎ রং-হীন আসলে কালোদরদের জন্য ব্যবহৃত একটি বিশেষণ। তাঁদের গায়ের রং এতটাই কালো যে কালোদরদের বিবর্ণ বা রং-হীন বলা হয়।

[দ্র. কালঞ্জর২]

[GAMI (Sircar) p. 71]

কাশ আয়ুর পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধারায় সুহোত্রের পুত্র কাশ এবং কাশের পুত্র কাশেয়। সুহোত্রকে বায়ু পুরাণে সুতহোত্র এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে শুনহোত্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কাশেয়কে বায়ু পুরাণে কাশয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[বায়ু পু. ৯২.৩, ৬; বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.৮.৫; ব্রহ্ম পু. ১১.৩৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৭.৪]

কাশার বাস্কলির শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম কাশার। বাস্কলি, বালখিল্য নামক যে সংহিতা সম্পাদন করেন, কাশার সেই সংহিতা অধ্যয়ন করেন।

[ভাগবত পু. ১২.৬.৫৯]

কাশি ভাগবত পুরাণ অনুসারে কাশ্যের পুত্র এবং রাষ্ট্রের পিতা কাশি। *[ভাগবত পু. ৯.১৭.৪]*

কাশিকা মৎস্য পুরাণ অনুসারে শুক্তিমান্ পর্বত থেকে উদ্ভূত নদীগুলির মধ্যে কাশিকা একটি।

[মৎস্য পু. ১১৪.৩২]

কাশিপ আয়ুর বংশধারায় কাশের পুত্র কাশিপ। কাশিপের দীর্ঘতমা নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বায়ু পুরাণে অবশ্য 'কাশিপ' নামটির পরিবর্তে 'কাশয়' নামটি উল্লিখিত হয়েছে। বিষ্ণু পুরাণে আবার 'কাশিপের' পরিবর্তে কাশিরাজ নামটি পাওয়া যায়। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৭.৭; ব্রহ্ম পু. ১১.৩৫; বায়ু পু. ৯২.৬; বিষ্ণু পু. ৪.৮.২]*

কাশী প্রাচীন ভারতের একটি সমৃদ্ধ জনপদ, তথা অন্যতম পবিত্র তীর্থ। কাশীর রাজধানী বারাণসী। পূর্বে কাশীরাজ্যের বিস্তার অনেক বেশি ছিল। কিন্তু আধুনিককালে ভৌগোলিক ভাবে বারাণসী ও কাশীকে সমার্থক হিসেবে বিচার করা হয়। স্মরণাতীতকাল থেকে কাশীর মাহাত্ম্য মহাকাব্য, পুরাণ ও ঐতিহাসিক গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। কাশীর অধিবাসীদের বহুবচনে কাশী নামেই উল্লেখ করা হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে কাশ্য নামে কাশীর এক রাজার কথা পাওয়া যায়। সম্ভবত এই কাশ্যের নামানুসারেই কাশী নামটির উৎপত্তি বলে মনে হয়। অথর্ববেদ, শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র, বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রে কাশীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

[অথর্ববেদ ৪.৭.১; শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র ১৬.২৯.৫; বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র ২১.১৩; শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩.৫.৪.১৯; মৎস্য পু. ১১৪.৩৫; বায়ু পু. ৪৫.১১০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৪১; ২.৭৪.২১৩]

□ উপনিষদে কাশী ও বিদেহকে অভিন্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে—কাশ্যো বা বৈদেহো।

সম্ভবত কাশী ও বিদেহ দেশের ভৌগোলিক নৈকট্যই এর কারণ।

[বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৩.৮.১৯৬.২]

□ শতপথ ব্রাহ্মণের মত প্রাচীন গ্রন্থে কাশীর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও অজাতশত্রুর কথা বলা হয়েছে। কাশীরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে শতানীক সত্রাজিৎ যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। অন্যদিকে অজাতশত্রু ছিলেন গর্গবংশীয় বালাকির শিষ্য। তিনি বালাকির কাছে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন এই কাশীতেই।

[শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩.৫.৪.২১-২২; বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২.১.১]

□ রামায়ণে দশরথের পুত্রলাভের আশায় অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রসঙ্গে প্রথম কাশীর নাম উল্লিখিত হতে দেখা যায়। দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে একজন ছিলেন কাশীরাজ। এরপর অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথ, কৈকেয়ীর কাছে তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে কাশীকে তাঁর অধীন বলে উল্লেখ করেছেন এবং তা শুনে মনে হয়, সেই সময় কাশীর উপর অযোধ্যার কিছু প্রভাব থেকে থাকতে পারে। আবার সীতা হরণের পর সুগ্রীব তাঁর বানর দলপতিদের যে সব জায়গায় সীতার অনুসন্ধান করতে বলেছিলেন, তার মধ্যে কাশীর নামও ছিল।

[রামায়ণ ১.১৩.২৩; ২.১০.৩৭; ৪.৪০.২২]

□ কাশীরাজ হর্য্যশ্বের পুত্রের নাম দিবোদাস। তিনি হৈহয়দের আক্রমণ থেকে নিজের রাজ্য রক্ষা করার জন্য ইন্দ্রের পরামর্শে বারাণসী নগরী নির্মাণ করান। গঙ্গার উত্তর তীরের উচ্চভূমিতে এবং গোমতীর দক্ষিণে স্থাপিত বারাণসী ইন্দ্রের অমরাবতীর মতোই সুন্দর—

গঙ্গায়া উত্তর কূলে বপ্রান্তে রাজসত্তম্॥
গোমত্যা দক্ষিণে কূলে শক্রস্যেবামরাবতীম্।

সম্ভবত বহিরাগত শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্যই দুইদিকে নদী-পরিবেষ্টিত এই উচ্চভূমিটিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল বারাণসী নগরী নির্মাণের জন্য। বারাণসী বা কাশীর সীমান্তবর্তী অঞ্চলের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে যে, এর উত্তরে কোশল, পূর্বে মগধ ও পশ্চিমে বৎস অবস্থিত। ঐতিহাসিকভাবেই এর মধ্যে একটি প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গেও কাশীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বা সহাবস্থান ছিল না। মহাকাব্যের কাল থেকে ষোড়শ মহাজনপদের সময় পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই রাজ্যগুলি বারবারই পরস্পরকে আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ করেছে। এক্ষেত্রে বিশেষত কাশী ও কোশলের সম্পর্কের কথা বলতে হয়। পণ্ডিত R.C. Roychowdhuri কাশীকে ষোড়শ মহাজনপদগুলির মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায় সবচেয়ে শক্তিমান বলে উল্লেখ করেছিলেন। সেই কারণেই একসময় কাশীর রাজধানী বারাণসীকে ভারতবর্ষের ক্ষমতার ভরকেন্দ্র বলে মনে করা হত। কিন্তু পরবর্তীকালে কোশলরা, কাশী অধিকার করে নেয়। কাশী-কোশলের দ্বন্দ বড়ো জটিল ও বহুমাত্রিক। এই দুটি রাজ্য মাঝে মাঝেই সংঘাতে জড়িয়ে পড়তো। তবে দুজনের লক্ষ্য ছিল উত্তর-মধ্য ভারতে আধিপত্য বিস্তার। এদের দ্বন্দময় সম্পর্কের জন্যই পুরাণ, মহাকাব্যে কাশী-কোশলের নাম বারবারই একসঙ্গে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। প্রাথমিকভাবে এই সংঘাতে কাশীর আধিপত্য থাকলেও, শেষ পর্যন্ত কোশলই জয়ী হয়েছিল। যার প্রমাণ কোশলের রাজা মহাকোশলের কাশী শাসন। মহাকোশলের পুত্র প্রসেনজিৎ কাশীরাজ্য জয় করেছিলেন। মহাকোশল, তাঁর জামাতা মগধরাজ বিম্বিসারকে বিবাহের যৌতুক হিসেবে কাশীগ্রাম উপহার দেন। শেষ পর্যন্ত বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু কাশী জয় করেন। বিদেহদের সঙ্গেও কাশীর একই ধরণের সম্পর্ক ছিল। ফলে শত্রু পরিবেষ্টিত হওয়ার কারণেই কৌশলগতভাবে সুবিধাজনক জায়গায় বারানসী নির্মিত হয়।

বারাণসী একটি অত্যন্ত কর্মব্যস্ত নগরী। সেখানে বহু অট্টালিকা, প্রাসাদ ও বিপণীর সমাহার। চারটি বর্ণের মানুষই বারাণসীতে বাস করতেন। হৈহয়রা বারাণসী আক্রমণ করলে দিবোদাসের সঙ্গে তাদের প্রবল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত ও বিধ্বস্ত দিবোদাস শেষ পর্যন্ত বারাণসী ছেড়ে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। সেখানেই ভরদ্বাজের কৃপায় দিবোদাস হৈহয়দের ধ্বংসকারী এক পুত্র সন্তান লাভ করেন যাঁর নাম প্রতর্দন। ইনি হৈহয়দের সংহার করে বারাণসীকে শত্রুমুক্ত করেছিলেন।

প্রতর্দন ছিলেন দিবোদাস ও যযাতিকন্যা মাধবীর সন্তান। মহর্ষি গালব মাধবীকে, দিবোদাসের হাতে সমর্পণ করেছিলেন সুলক্ষণ যুক্ত পুত্রসন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে। এর

পরিবর্তে দিবোদাস গালবকে দুশো শ্যামবর্ণ-বিশিষ্ট বিশেষ ধরণের অশ্ব দিয়েছিলেন।

[মহা (k) ৫.১১৭.১, ১৩.৩০.১০-৪৫; (হরি) ৫.১০৮.১, ১৩.২৯.১০-৪৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৫১; বায়ু পু. ৪৭.৪৮; PHAI (Roychoudhuri), p. 68, 75, 86, 136, 182, 186, 188, 206, 518, 528]

□ কাশী বা বারাণসী অবিমুক্ত ক্ষেত্র রূপে বিখ্যাত। কারণ মহাদেব এখানে সর্বদা বাস করেন, কাশীর ভৌগোলিক সীমা থেকে তিনি কখনো বিমুক্ত হন না—

নাহং বেশ্ম বিমোক্ষ্যামি অবিমুক্তং হি মে গৃহম্।
প্রহস্যৈনামথোবাচ অবিমুক্তং হি মে গৃহম্॥

অবশ্য কাশীকে অবিমুক্তক্ষেত্র বলার দার্শনিক ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। বলা হয় বারাণসীতে অবস্থিত মণিকর্ণিকা মহাশ্মশানে দেহত্যাগ করলে জীব জন্ম-মৃত্যুর নশ্বর শৃঙ্খল থেকে চিরতরে মুক্তি পায়। সেই কারণেই কাশীকে অবিমুক্তক্ষেত্র বলা হয়। তবে পুরাণে একটি কাহিনীর উল্লেখ করে বলা হয়েছে—পার্বতীর সঙ্গে বিবাহের পর মহাদেব, স্ত্রীর অনুরোধে বসবাসের জন্য একটি যোগ্য বাসভূমির সন্ধান শুরু করেন। বারাণসীকে মহাদেব স্বয়ং তাঁর বাসভূমিরূপে চিহ্নিত করেন এবং অনুচর ক্ষেমককে নির্দেশ দেন—নগরীটিকে জনশূন্য করে বাসের উপযোগী করে তুলতে। তখন কাশীতে ধন্বন্তরির পৌত্র দিবোদাসের রাজত্বকাল। ফলে মহাদেবের মনোমতো বারাণসীর পুনর্নির্মাণ করতে গেলে নগরীটিকে ধ্বংস করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। ক্ষেমক নানা কৌশলে মহাদেবের ইচ্ছা পূরণ করেন। এরপর শিব কাশীর পুনর্নির্মান করেন নিজের পছন্দ মত এবং সেখানে সস্ত্রীক বসবাস করতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল পর দেবী পার্বতী কাশীর প্রতি বিরূপ হয়ে অন্য স্থানে যেতে চাইলে, মহাদেব অসম্মত হন। তিনি পার্বতীকে তাঁর ইচ্ছামতো যেখানে খুশি যাওয়ার অধিকার দিলেও নিজে কাশী পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। মহাদেব সতত কাশীতে বাস করতে থাকেন। এই কারণেই কাশীর আরেক নাম অবিমুক্ত—

যতো ময়া ন মুক্তং তদবিমুক্তমিতি স্মৃতম্।

বরণা অথবা বরুণা ও অসি নদীর সংযোগ স্থলে অবস্থিত বারাণসী অবিমুক্ততত্ত্বের উৎসভূমি—

বরণায়াস্তথা চাস্যা মধ্যে বারাণসী পুরী।
তত্রৈব সংস্থিতং তত্ত্বং নিত্যমেবাবিমুক্তকম॥

পণ্ডিতদের মতে, বর্তমান বারাণাবতী নদীটিই প্রাচীন বরুণা। কাশীই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তীর্থ স্থান। এখানে আটটি বিখ্যাত তীর্থের অবস্থান—আম্রাতকেশ্বর, হরিশ্চন্দ্র, জপ্যেশ্বর, শ্রীপর্বত, মহালয়, চন্দ্রেশ্বর, ভৃগু এবং কেদার।

[বায়ু পু. ৯২.২৩-৫৭; ভাগবত পু. ১০.১৩.১৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৬.২৬-৬০; ৩.৪০.১৫, ৯১; কূর্ম পু. ১.৩০.১-৭৯; অগ্নি পু. ১১২ অধ্যায়; কালিকা পু. ৫১.৫৫-৫৮; লিঙ্গ পু. ১.৯২.অধ্যায়]

□ কৃষ্ণ একবার ক্রোধবশতঃ বারাণসী নগরী ধ্বংস করেছিলেন। করূষের রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেব নিজেকে স্বয়ং বাসুদেব কৃষ্ণ বলে ধারণা করতেন। তিনি কৃষ্ণের মতোই শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করতেন এবং শ্লাঘার সঙ্গে সর্বত্র বাসুদেব কৃষ্ণের মাহাত্ম্যে নিজের পরিচয় দিতেন। কৃষ্ণ স্বয়ং পৌণ্ড্রকের আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। পৌণ্ড্রকের সহায় ছিলেন কাশীর রাজা। তিনিও সসৈন্যে যুদ্ধে যোগ দেন। কৃষ্ণ যুদ্ধে পৌণ্ড্রককে বধ করেন এবং কাশীরাজের মস্তকচ্ছেদ করেন। এদিকে কাশীরাজের পুত্র সুদক্ষিণ পিতৃহত্যাকারীকে বধ করার পণ করে বসেন। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মহাদেবের আরাধনা শুরু করেন তিনি। মহাদেবের বরে সুদক্ষিণ এক ভয়ঙ্কর বহ্নিশিখাময়ী ধ্বংসকারী শক্তি (কৃত্যা) লাভ করেছিলেন। কৃষ্ণ বধের জন্য তিনি সেই কৃত্যাকে দ্বারকা নগরীতে পাঠান। কিন্তু কৃষ্ণ সুদর্শনচক্র দিয়ে তাকে নিবারণ করেন এবং তাকে দ্বারকার পরিবর্তে বারাণসীতে সুদক্ষিণের কাছে ফেরত পাঠান। কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র, তাকে অনুসরণ করে বারাণসীকে ধ্বংস করে। বারাণসীর প্রাসাদ অট্টালিকা, পুরদ্বার, অশ্ব, রথ, হস্তী সমস্ত ভস্মীভূত হয়।

[ভাগবত পু. ১০.৬৬ অধ্যায়; বিষ্ণু পু. ৫.৩৪ অধ্যায়]

□ পুরাণে চতুর্বেদকে মানবরূপে কল্পনা করা হয়। সেই মানবরূপী চতুর্বেদের ভ্রূ-যুগলে মায়াস্বরূপ কাশীর অবস্থান—

কাশীম্পশ্যদ্ভ্রমধ্যে মায়ামাধার সংস্থিতাম্॥

[বায়ু পু. ১০৪.৭৫]

□ মহাভারতে একাধিক কুরুবীরদের বিভিন্ন

রাজত্বের পর্যায়কালে কাশীরাজ্য জয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পাণ্ডু কাশী জয় করে কুরু-সাম্রাজ্যের যশ বিস্তার করেছিলেন। অন্যদিকে অর্জুনের জন্মের সময় দৈববাণী হয়েছিল যে তিনিও বহুদেশ অধিকার করে কুরু সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটাবেন। সেই দেশগুলোর মধ্যে কাশীর নাম পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনও কাশী জয় করেছিলেন।

[মহা (k) ১.১১৩.২৯; ১.১২৩.৪০; ৫.৫০.১৯; ৬.৯.৪২; (হরি) ১.১০৭.২৯; ১.১১৭.৪৪; ৫.৫০.২০; ৬.৯.৪২]

□ বাসুদেব কৃষ্ণও একবার কাশী অধিকার করেছিলেন। কর্ণও কাশীকে পদানত করে দুর্যোধনের জন্য সেখান থেকে কর আদায় করেন।

[মহা (k) ৭.১১.১৫; ৮.৮.১৯; (হরি) ৭.৯.১৫; ৮.৬.১৯]

□ ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্যের বিবাহের জন্য কাশীরাজের তিন কন্যা—অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে স্বয়ম্বর সভা থেকে হরণ করে হস্তিনাপুরে নিয়ে আসেন। অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিচিত্রবীর্যের হাতে অর্পণ করলে অম্বা এই বিবাহে আপত্তি জানান। কারণ তিনি ছিলেন শাল্বরাজের অনুরাগিনী। ভীষ্ম সে কথা জানতে পেরে অম্বাকে শাল্বরাজের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু শাল্বরাজ, অম্বার সতীত্বের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং তাঁকে গ্রহণ করতে রাজী হন না। নিঃসহায় অম্বা তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য ভীষ্মকে দায়ী মনে করে ভীষ্মবধের সঙ্কল্প করেন এবং কঠোর তপস্যা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত মহাদেবের বরে অম্বা পরবর্তী জন্মে শিখণ্ডীরূপে জন্মলাভ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল শিখণ্ডীর কারণে ভীষ্মের পতন। সেদিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, পরোক্ষে কাশী, হস্তিনাপুরের ভাগ্য বদলের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। হয়তো বা এই কন্যার কারণেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কাশীর রাজা পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করেছিলেন—ভগবদ্‌গীতায় কাশীরাজ এবং অম্বা-শিখণ্ডীর নাম উচ্চারিত হয়েছে একসঙ্গে—

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।

[১.১৭]

অবশ্য কাশীর সঙ্গে বরাবরই পাণ্ডবদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। কারণ যুদ্ধের আগে যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণের কাছে বিলাপ করতে করতে বলেছিলেন যে, পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য এবং কাশী পাণ্ডবদের বন্ধুরাজ্য—

কাশীভিশ্চেদিপাঞ্চালৈর্মৎস্যৈশ্চ মধুসূদন।

আচার্য দ্রোণ যুদ্ধে বিপুল পরিমাণে কাশীর সৈন্যদের সংহার করেছিলেন।

[মহা (k) ৫.৫৭.৩৩; ৫.৭২.১৪; ৬.১০৬.১৮; ৭.১২৫.৫৩; ৫.১৭৩.৯-১৮৮.২০; ৬.১৩.৬; ৬.৪৭.৪; ১৩.৪৪.৩৮; ১৩.১৬৮.২৬; (হরি) ৫.৫৭.৩৩; ৬৭.২২; ৬.১০২.১৯; ৭.১০৯.৭০; ৫.১৬২.৯-১৭৭.১৯; ৬.১৩.৬; ৬.৪৭.৪; ১৩.৩৭.৩৮; ১৩.১৪৬.২৬]

□ পুরাণে পৃথিবীব্যাপী এক সর্বাত্মক বিপর্যয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি ধ্বংস হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে, বিপর্যয়কালে অসহায় মানুষ বিশেষ কয়েকটি স্থানে আশ্রয় নেবে। সেই আশ্রয়স্থলগুলির মধ্যে কাশী অন্যতম। *[বায়ু পু. ৯৯.৪০২]*

□ কাশীর রাজা বৃষদর্ভ একজন দয়ালু ও মহান নৃপতি হিসেবে বিখ্যাত। নিজের শরীরের মাংসখণ্ড দানের পরিবর্তে তিনি এক অসহায় কপোতের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। কারণ আহত কপোতটি তাঁর কাছে আশ্রয় চেয়েছিল। অনুশাসন পর্বে ভীষ্ম, যুধিষ্ঠিরকে শরণাপন্নকে রক্ষা করার কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে বৃষদর্ভের কাহিনীটি উল্লেখ করেছিলেন। তবে এই কাহিনীটি রাজর্ষি উশীনর এবং তাঁর পুত্র শিবি সম্পর্কেই বেশি প্রচলিত।

[মহা (k) ১৩.৩২.৯-৩৪; (হরি) ৯.৩১.৯-৩৪]

□ যদু-বৃষ্ণিবংশীয় যুধাজিতের পৌত্র শ্বফল্ক এক বিচিত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি যেখানেই অবস্থান করতেন, সেখানেই কোনো ধরণের রোগ-জরা বা অনাবৃষ্টি দেখা যেতো না। একবার ইন্দ্রের কোপে কাশীরাজ্যে প্রবল অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। তখন কাশীরাজ শ্বফল্ককে কাশীতে নিয়ে আসেন এবং রাজ্যকে রক্ষা করেন। কৃতজ্ঞতাবশতঃ কাশীরাজ তাঁর কন্যা গান্দিনীর সঙ্গে শ্বফল্কের বিবাহ দেন। এই শ্বফল্ক ও গান্দিনীর সন্তানের নাম অক্রূর।

[বায়ু পু. ৯৬.১০১-১০৫; ভাগবত পু. ১০.৫৭.৩২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১০৪-১০৬]

□ বাসুদেব কৃষ্ণ ও বলরামের শিক্ষাগুরু সান্দীপনি ঋষি জন্মসূত্রে কাশীর মানুষ ছিলেন।

[বিষ্ণু পু. ৫.২১.১৯]

□ রাজা হরিশচন্দ্র নিঃসম্বল অবস্থায় স্ত্রী শৈব্যা বা পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে কাশীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই ঘটনার অসামান্য প্রাদেশিক বিস্তার আছে কাশীদাসী মহাভারতে। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৮.৩-৪]*

□ কাশী বা বারাণসী উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা তীরবর্তী একটি অন্যতম প্রাচীন জনপদ। অবশ্য এখন কাশী ও বারাণসীকে সমার্থক বলা হলেও, প্রাচীনকালে কাশীরাজ্য আয়তনে অনেক বড়ো ছিল। বারাণসী ছিল কাশীর রাজধানী তবে কালক্রমে হ্রাস পেতে পেতে এর বিস্তার বর্তমানে বারণসীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বৃহৎ সংহিতা, অষ্টাধ্যায়ী, মহাভাষ্য তথা বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে কাশীর নাম বহুবার নানা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহে কাশীর এক বিখ্যাত রাজা ব্রহ্মদত্তের নাম পাওয়া যায়। তাঁর বিবিধ কর্মকাণ্ডের বর্ণনাও পাওয়া যায় বহুলভাবে। বুদ্ধদেবের সমসাময়িককালে ইনি কাশী শাসন করেছিলেন বলে মনে করা হয়। সেই সূত্রে বোঝা যায় যে, এই ব্রহ্মদত্ত আর পুরাণে উল্লিখিত ব্রহ্মদত্ত এক ব্যক্তি নন।

কাশী শুধুমাত্র ধর্মাচরণের কেন্দ্ররূপেই বিখ্যাত নয়। প্রাচীনকালে বানিজ্য ও শিল্পের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুও ছিল। তক্ষশিলা ও শ্রাবস্তীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের সূত্র বজায় ছিল কাশীর জন্যই। *[EAIG (Kapoor) p. 365-366; PHAI (Raychaudhuri) p. 68, 75, 86, 136, 182, 186, 206, 518, 523]*

কাশীশ্বরতীর্থ সরস্বতী নদীর তীরবর্তী, কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত, কাশীনাথ অর্থাৎ মহাদেবের মাহাত্ম্য ধন্য একটি তীর্থ। এই তীর্থে অবগাহন করলে রোগমুক্ত হয়ে ব্রহ্মালোক প্রাপ্তি ঘটে—

কাশীশ্বরস্য তীর্থে চ স্নাত্বা ভরতসত্তম।
সর্বব্যাধিবিনির্মুক্তো ব্রহ্মালোকে মহীয়তে।।

[মহা (k) ৩.৮৩.৫৭; (হরি) ৩.৬৮.৫৭]

কাশেয় আয়ুর পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধারায় কাশের পুত্রের নাম কাশেয় এবং কাশেয়র পুত্র রাষ্ট্র। *[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম) ৪.৮.৭]*

কাশ্মীর একটি অতি প্রাচীন পার্বত্য জনপদ। বিতস্তা বা ঝিলম্ নদীর তীরে এর অবস্থান। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আবার কাশ্মীরকে সিন্ধুনদের তীরবর্তী জনপদ বলা হয়েছে। তবে যেহেতু বিতস্তা, সিন্ধুরই একটি উপনদী। তাই এ নিয়ে বিভ্রান্তির কোনো কারণ নেই। 'কাশ্মীর' নামটির সঙ্গে ঋষি কশ্যপের সরাসরি যোগাযোগ আছে বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। কথিত আছে যে, কশ্যপই কাশ্মীরে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পুরোধা পুরুষ। তাঁর নাম থেকেই 'কাশ্মীর' শব্দটির উৎপত্তি। কাশ্যপ > কাশনগর > কাশ্মীর। মহাভারতকারও কাশ্মীর ও কশ্যপ ঋষির সম্পর্কের একটা প্রাচীন ইঙ্গিত দিয়েছেন। বনপর্বের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কাশ্মীর মণ্ডলে কশ্যপ ও বৈদিক অগ্নির মধ্যে একটি কথোপকথন হয়েছিল। উত্তর দেশীয় মহর্ষিগণ ও ভরতবংশের প্রাচীন পুরুষ নহুষপুত্র যযাতির মধ্যেও একটি কথোপকথন হয়েছিল এই কাশ্মীরেই। মহাভারতে কাশ্মীরকে মহর্ষিদের বাসভূমি এক সর্বপুণ্যক্ষেত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

কাশ্মীরমণ্ডলঞ্চৈতৎ সর্বপুণ্যমরিন্দম।
মহর্ষিভিশ্চাধ্যুষিতং পশ্যেদং ভ্রাতৃভিঃ সহ॥
অত্রৌত্তরানাং সর্বেষামৃষীণাং নাহুষস্য চ।
অগ্নেশ্চৈবাত্র সংবাদঃ কাশ্যপস্য চ ভারত॥

এভাবেই মহাভারতের কবি কাশ্মীরের অস্তিত্বের সঙ্গে ঋষি কশ্যপের যোগসূত্র রচনা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কাশ্মীরে শ্রীনগরের কাছে হরি পর্বতে এখনো কাশ্যপ-আশ্রম নামে একটি স্থান রয়েছে।

[মহা (k) ৩.১৩০.১০-১১; (হরি) ৩.১০৭.১০-১১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৮৯; GDAMI (Dey) p. 96]

□ তবে 'কাশ্মীর' শব্দের আক্ষরিক অর্থ কুমকুম। জয়দেব গীতগোবিন্দর একটি শ্লোকে সখীদের কুমকুমচর্চিত সজ্জার বর্ণনা করতে গিয়ে 'কাশ্মীর' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন—কাশ্মীরমুদ্রিত মুরো . . . ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, অমরকোষে 'কাশ্মীর জন্ম' বলে একটি শব্দ পাওয়া যায়। টীকাকার শব্দটির অর্থগত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, কাশ্মীরে বিভিন্ন বর্ণের এগারো রকম কুমকুম পাওয়া যায়। পীতবর্ণ, হরিদ্রাভ বর্ণ বা রক্ত চন্দন বর্ণ সব রঙই তার মধ্যে আছে।

অবশ্য পণ্ডিতদের একাংশের মতে 'কাশ্মীর' শব্দের অর্থ জাফরান বা Saffron জাফরানের আঁতুড়ঘর প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন তুর্কিস্তান হলেও আরব ব্যবসায়ীদের হাত ধরে তা স্পেন, ইরান এবং কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

কাশ্মীরে এখন পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান জাফরান উৎপন্ন হয়। ফলে কাশ্মীরের সঙ্গে জাফরানের সম্পর্কের বিষয়টিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। *[অমর কোষ (মনুষ্যবর্গ) ১২৪; গীতগোবিন্দ ১.২৬; Susheela Raghavan, Handbook of Spices, Seasonings and Flavourings; CRC Press, New York, 2007; p. 161]*

□ মহাভারতে কাশ্মীরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দু-ধরনের তথ্য দেওয়া হয়েছে। সভাপর্বে বলা হয়েছে যে, কাশ্মীরে ক্ষত্রিয়দের বাস, যাঁরা রাজসূয় যজ্ঞের সময় যুধিষ্ঠিরকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। এভাবেই তাঁরা পাণ্ডবদের বশ্যতা স্বীকার করেন। ভীষ্ম পর্বে আবার কাশ্মীরকে ক্রূর ম্লেচ্ছ জাতীয়দের বাসভূমি বলা হচ্ছে। একটু গভীরে ভাবলে বুঝতে পারা যায় বর্তমান কাশ্মীর আর মহাকাব্যের কাশ্মীর মণ্ডলের ভৌগোলিক সীমারেখা এক ছিল না। সে সময় কাশ্মীর মণ্ডল বলতে সিন্ধু ও চেনাব নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলকে বোঝানো হত। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আর্যায়িত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের পাশাপাশি সম্ভবত পশ্চিমদিক থেকে আসা হিংস্র উপজাতিগুলিও বাস করত। সে কারণেই হয়তো মহাভারতে কাশ্মীর সম্পর্কে এ জাতীয় দ্বৈত বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। আবার মহাভারতেই কাশ্মীরকে তক্ষক নাগের দেশ বলা হয়েছে। 'নাগ' শব্দটি একটি রূপক মাত্র। এখানে অবশ্যই নাগ জনজাতির কথা বলা হচ্ছে। ফলে মহাকাব্যও কাশ্মীরে বিভিন্ন জনজাতির অস্তিত্বকে মান্যতা দিচ্ছে। *[মহা (k) ২.৫২.১৪; ৩.৮২.৯০-৯২; ২.৩৪.১২; ৩.৫১.২৬; ৬.৯.৫৩, ৬৩; (হরি) ২.৫০.১৪; ৩.৬৭.১০৮-১১০; ২.৩৩.১১; ৩.৪৩.২৬; ৬.৯.৫৩, ৬৩]*

□ কাশ্মীরের অধিবাসীরাও বহুবচনে তাঁদের বাসভূমির নামেই পরিচিত।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৫১]

□ কাশ্মীর উন্নত মানের অশ্বের প্রাপ্তিস্থান। বিরাট রাজার পত্নী সুদেষ্ণা, দ্রৌপদীর দেহ সৌষ্ঠবের প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁকে কাশ্মীরী ঘোটকীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন—

তেন তেনৈব রূপেণ কাশ্মীরীব তুরঙ্গমী॥

[মহা (k) ৪.৯.১১; (হরি) ৪.৮.১১]

□ ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বিচার করলে কাশ্মীরে উন্নত ধরনের অশ্বের যোগান কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। পার্শ্ববর্তী গান্ধার এবং মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতিগুলির ক্রমাগত বসতি স্থাপনের নিরিখে সে সব দেশের অশ্ব এই অঞ্চলে দেখা যেতেই পারে। এছাড়াও মনে রাখতে হবে, অশ্বশক্তিতে বলীয়ান আর্যজাতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে এই পথেই ভারতে প্রবেশ করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রবেশ পথের মধ্যে পড়েছিল কাশ্মীরমণ্ডল। আর্যায়ণের চিহ্ন স্বরূপ উন্নত মানের অশ্ব এই সব অঞ্চলে পাওয়া যেত হয়তো।

□ পরশুরাম কাশ্মীরের ক্ষত্রিয়দের নিধন করেছিলেন। দিগ্বিজয়কালে অর্জুনও কাশ্মীরের ক্ষত্রিয়দের পরাজিত করেন।

[মহা (k) ৪.৯.১১; ২.২৭.১৭; (হরি) ৪.৮.১১; ২.২৬.১৭]

□ দ্রোণ পর্বে বলা হয়েছে যে, কাশ্মীরে বসবাসকারী খশ, শক, ইত্যাদি জনগোষ্ঠীগুলি কালযবনের পক্ষ নিয়ে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত এদের পরাজিত করেছিলেন। *[মহা (k) ৭.১১.১৬; (হরি) ৭.৯.১৬]*

□ পুরাণে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে হীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র ও ম্লেচ্ছরা কাশ্মীর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বাস করবেন।

[ভাগবত পু. ১২.১.৩৯; বিষ্ণু পু. ২.২৪.১৮]

□ দেবী সতী কাশ্মীরে মেধা নামে পূজিতা হন।

[মৎস্য পু. ১৩.৪৭]

□ পুরাণে বলা হয়েছে যে, প্রলয়কালে বহু জনপদ ধ্বংস হয়ে গেলে মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়বে। তখন মুষ্টিমেয় যে কটি জনপদে মানুষ সুরক্ষিত আশ্রয় পাবে, সেগুলির মধ্যে কাশ্মীর অন্যতম। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.২১৩]*

□ প্রলয়কালে একবার বালকরূপী শ্রীহরি, মার্কণ্ডেয় ঋষিকে তাঁর উদরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। মার্কণ্ডেয় দেখেছিলেন শ্রীহরির উদরে বহু নদী ও জনপদ আশ্রয় নিয়েছে। এই জনপদগুলির মধ্যে কাশ্মীর একটি। এর অর্থ, জনপদ হিসেবে কাশ্মীর বহুকালই সুবিদিত। *[ব্রহ্ম পু. ৫৪.১২]*

□ এমনিতে বহু পৌরাণিক কাহিনীর পটভূমি এই কাশ্মীর। ধারণা করা হয় ভগবান বিষ্ণু এখানেই মৎস্য অবতার রূপে আবির্ভূত হন। কাশ্মীরে পীর পাঞ্জাল পর্বতশ্রেণীর পূর্বাংশে নৌবন্ধন তীর্থ নামে

একটি স্থান রয়েছে। কথিত আছে, যে, মৎস্য অবতারে বিষ্ণু প্রজাপতিরূপে মনুকে উদ্ধার করেন এবং একটি নৌকার মধ্যে করে সমগ্র জীবজগতের বীজকে এই নৌবন্ধন তীর্থে এনে রক্ষা করেন। নৌবন্ধন তীর্থটি যে শৃঙ্গে অবস্থিত তার পাদদেশে কোনসরনাগ (Konsarnag) বা বিষ্ণুপদ নামে একটি পবিত্র সরোবর আছে। লৌকিক বিশ্বাসে বলা হয়, বিষ্ণু স্বয়ং এই হ্রদে তাঁর পদচিহ্ন রেখেছিলেন। মনে করা হয় যে, বরাহ অবতারেও বিষ্ণু কাশ্মীরে বিতস্তা নদীর তীরে কাশ্মীরের বারামুলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে 'বরাহ' ও 'বারামুলা' শব্দদুটির ধ্বনিগত সাদৃশ্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং-এর বিবরণ, কলহনের রাজতরঙ্গিনী ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে কাশ্মীর সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়।

[EAIG (Kapoor) p. 360; GDAMI (Dey) p. 96; S. Sandhu, B.K. Raina, Places Names in Kashmir, New Delhi; Bharatiya Vidya Bhavan 2000, p. 164]

কাশ্য১ আয়ুর পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধারায় সুহোত্রের পুত্র কাশ্য। কাশ্যের পুত্র কাশি।

[ভাগবত পু. ৯.১৭.৩-৪]

কাশ্য২ অজমীঢ়ের বংশধারায় সেনজিতের পুত্র কাশ্য। *[ভাগবত পু. ৯.২১.২৩; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১১]*

কাশ্য৩ একজন ঋষি। যাঁরা ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যাঁরা ক্ষত্রিয় বৃত্তি ত্যাগ করে তপস্যার ফলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন, মহর্ষি কাশ্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৬.৮৭]

কাশ্যপতীর্থ *[দ্র. কালসর্পিতীর্থ]*

কাশ্যপদ্বীপ মহাভারতে জম্বুদ্বীপের একটি অংশ শশ বা খরগোশের আকৃতিতে কল্পনা করা হয়েছে। জম্বুদ্বীপের প্রান্তে দুটি দ্বীপ অবস্থান করছে। একটি শাকদ্বীপ অপরটি কাশ্যপদ্বীপ। মহাভারতকার কাশ্যপদ্বীপকে শশকাকৃতি জম্বুদ্বীপের একটি কান বলে উল্লেখ করেছেন। অপর কানটি হল শাকদ্বীপ—

কর্ণৌ তু শাকদ্বীপশ্চ কাশ্যপদ্বীপ এব চ॥

[মহা (k) ৬.৬.৫৫; (হরি) ৬.৬.৫৫]

□ পণ্ডিতদের একাংশের মতে, ভৃগুর বংশধর ভার্গবরা তাদের আদি বাসস্থান ছেড়ে পশ্চিম এশিয়ার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ভার্গবদের এই পশ্চিমমুখী পর্যটন বা migration টি কাসিতেস (kassites) জাতি কর্তৃক ব্যাবিলন অধিকারের সমসাময়িক বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। তাঁদের অনুমান, ভার্গবদের একটি শাখা কাসিতেস জাতি শাসিত ব্যাবিলনে বসবাস শুরু করেন। এই ব্যাবিলনই পৌরাণিক কাশ্যপদ্বীপ ছিল বলে মনে করা হয়। তবে এই তত্ত্বের অনেক বিরুদ্ধ মতও পাওয়া যায়।

[Ramchandra Narayan Dandekar, Shivram Dattatray Joshi; CASS Studies Vol-3; Poona; University Press Poona; 1976; p. 20; Dr. Liny Srinivasn, Desi Words Speak of the Past: Indo Aryans in the Ancient Near-East, Blooningtan: Author House, 2011, p 108]

কাশ্যপি পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, কাশ্যপি সেই গোত্রের একজন। মহর্ষি ভৃগু থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এঁরাও ভার্গব বলে পরিচিত।

[মৎস্য পু. ১৯৫.৩৭]

কাশ্যপেয় কশ্যপবংশীয় একজন বংশপ্রবর্তক ঋষি। যেসব ঋষিরা পুরাণ শ্রবণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কাশ্যপেয় একজন। *[বায়ু পু. ৭.১; মৎস্য পু. ১৯৯.৯]*

কাশ্যা১ কাশীরাজ সুপার্শ্বের কন্যা এবং বাসুদেব-কৃষ্ণের পুত্র সাম্ব-র পত্নী। কাশ্যার গর্ভে সাম্ব-র পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। *[মৎস্য পু. ৪৭.২৪]*

কাশ্যা২ ব্রহ্ম পুরাণে বলা হয়েছে যে, বৃষ্ণিবংশীয় রাজা আহুকের পত্নী কাশ্যা। কাশ্যার গর্ভে আহুকের দুই পুত্র দেবক ও উগ্রসেন জন্মগ্রহণ করেন। *[ব্রহ্ম পু. ১৫.৫৫]*

কাশ্যা৩ দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনের পত্নী কাশী রাজকন্যা কাশ্যা। ভীমসেনের ঔরসে কাশ্যার গর্ভজাত পুত্র হলেন সর্ববৃক। *[বায়ু পু. ৯৯.২৪৭]*

কাশ্যা৪ কুরুবংশীয় রাজা পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়ের পত্নী বপুষ্টমা কাশীর রাজকন্যা ছিলেন বলে তাঁকে কাশ্যা নামে অভিহিত করা হয়েছে। জনমেজয়ের দুই পুত্র চন্দ্রাপীড় ও সূর্যাপীড় কাশ্যা তথা বপুষ্টমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

পরবর্তীকালে চন্দ্রাপীড় রাজ্যশাসন করেন এবং সূর্যাপীড় মোক্ষ-ধর্মের পথ অবলম্বন করেন বলে হরিবংশ পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে।

[হরিবংশ পু. (ভবিষ্য) ১.,৩-৪]

কাষ্ঠা ভগবান শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে

একটি নাম। সময় গণনার অন্যতম একক কাষ্ঠা। সময় গণনার প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে সময় গণনার ন্যূনতম একক হল নিমেষ। পনেরো নিমেষে এক কাষ্ঠা। পণ্ডিতরা সময় গণনার আধুনিক পদ্ধতির সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে পর্যালোচনা করে নির্ণয় করেছেন যে, এক কাষ্ঠা মানে প্রায় ৩.২ সেকেন্ড সময়।

ভগবান শিব মহাকালস্বরূপ, আদি-অন্তহীন সময় স্বরূপ। সেই অসীম অনন্ত সময়কে আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুসারে গাণিতিক নিয়মের মাধ্যমে কলা-কাষ্ঠা মুহূর্ত প্রভৃতি নানা এককের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছি আমাদের সুবিধার্থে। মহাকালস্বরূপ ভগবান শিব আমাদের গণনাসাধ্য সময়ের এককগুলিরও স্বরূপ। এই ভাবনা থেকেই সময় গণনার অন্যতম একক কাষ্ঠা ভগবান শিবের অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৭.১৪২; (হরি) ১৩.১৬.১৪১]

কাষ্ঠাহারিণ পুরাণে মহর্ষি কশ্যপের গোত্রভুক্ত যে ঋষি বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, কাষ্ঠাহারিণ সেই গোত্রের অন্যতম। প্রজাপতি কশ্যপ থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এঁরাও কাশ্যপ বলে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ১৯৯.৯]*

কাসোরু পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে সব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি কাসোরুর বংশ তার মধ্যে একটি। ইনি আঙ্গিরার বংশজাত একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৬.৯]

কাহলি শিবসহস্রনামস্তোত্রে উল্লিখিত মহাদেবের অন্যতম নাম। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের কাহলি নামের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

কাহলা বাদ্যবিশেষস্তদ্বান্ কাহলিঃ
আর্যস্ত্বাদিঞ্ প্রত্যয়ঃ।

কাহল প্রাচীন ভারতের অন্যতম বাদ্যযন্ত্র। ভগবান শিবকে সঙ্গীতশাস্ত্রের অন্যতম প্রণেতা বলা হয়। তিনি নটরাজ, সঙ্গীতের তিনি আদিগুরু। সুতরাং মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের মতোই তিনি কাহল বাদন করেন বলে কাহলি মহাদেবের অন্যতম নাম।

তবে আধুনিক কালে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে কাহল খুব পরিচিত কোনো নাম নয়। কাহল ঠিক কী ধরনের বাদ্যযন্ত্র ছিল এ বিষয়েও একাধিক মতামত আছে। পাঠকের কৌতূহল নিরসনের জন্য জানাই যে, কোষগ্রন্থ শব্দকল্পদ্রুমে কাহলকে বিশালাকৃতি ঢাক বা 'ঢক্কা' বলা হয়েছে। ব্যাকরণগ্রন্থ সিদ্ধান্তকৌমুদীর টীকাকার একটি অপূর্ব সুন্দর শ্লোক উদ্ধার করেছেন—

নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো ননাদ
ঢক্কাং নবপঞ্চবারম্।

নটরাজের এই পঞ্চনবতি সংখ্যক ঢক্কাধ্বনি থেকেই সম্পূর্ণ বর্ণমালা এবং ব্যাকরণশাস্ত্রের উদ্ভব। শব্দকল্পদ্রুমের উল্লেখ অনুযায়ী, যদি কাহলকে ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বলে ধরে নিই, তাহলে ভগবান শিবের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে এর পৃথক তাৎপর্য্য তৈরি হয়।

তবে সঙ্গীত বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থগুলি কিন্তু কাহলকে ঢাক জাতীয় বাদ্য বলে বর্ণনা করছে না। সঙ্গীত রত্নাকরের মতো গ্রন্থে বাদ্যযন্ত্র বিষয়ক অধ্যায়ে কাহলকে শিঙ্গা বা শিঙা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কাহলের নাম উল্লিখিতও হয়েছে বেণু, শঙ্খ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে, যেগুলি মুখরন্ধ্রের সাহায্যে বা আরও সহজ করে বলতে গেলে ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয়। বস্তুত কাহল শব্দের অর্থ হল ধুতুরা ফুল। কাহল বাদ্যযন্ত্রটিও আকৃতিতে অনেকটা ধুতুরা ফুলের মতো বলেই তার নাম হিসেবে ধুতুরা ফুলের পর্যায়শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে। সঙ্গীত রত্নাকর থেকে জানা যায় যে, কাহল নামক বাদ্যযন্ত্রটি কাঠ দিয়ে কিংবা শিঙ্ দিয়ে তৈরি হত। এমনকী তামা, সোনা বা রূপো দিয়েও কাহল নির্মাণ করা হত। বাদ্যযন্ত্রটির দৈর্ঘ্য হত প্রায় আঠাশ আঙ্গুল কিংবা তিন হাত—

* শৃঙ্গজা দারবী বা স্যাৎ কাহলাকৃতিধারিণী।
অষ্টবিংশত্যঙ্গুলা চ দৈর্ঘ্যে মধুকরী শুভা॥
* তাম্রজা রাজতী যদ্বা কাঞ্চনী সুষিরান্তরা।
ধত্তূরকুসুমাকার বদনেন বিরাজিতা॥
হস্তত্রয়মিতা দৈর্ঘ্যে কাহলা বাদ্যতে জনৈঃ।

কাহল যেমন সঙ্গীতের সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসেবে পরিচিত ছিল, তেমনই এই ধরনের বাদ্যযন্ত্র রণবাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হত। মহাদেব সঙ্গীতগুরু নটরাজ রূপেও কাহল বাদ্যযন্ত্র ধারণ করেন আবার যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদমন কালেও কাহল বাদন করেন রণবাদ্য হিসেবে—এই দুই ভাবনা থেকেই তিনি কাহলি নামে খ্যাত।

*[মহা (k) ১৩.১৭.৬৬; (হরি) ১৩.১৬.৬৬;
সঙ্গীতরত্নাকর (আনন্দাশ্রম) ৬.৭৮৫-৭৯১]*

কিংজপ্যতীর্থ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। *[মহা (k) ৩.৮৩.৭৯; (হরি) ৩.৬৮.৭৯]*

☐ পদ্ম পুরাণে এই তীর্থের নাম অবশ্য কিংযজ্ঞ বলে উল্লিখিত রয়েছে।

[পদ্ম পু. (নবভারত). স্বর্গ. ১২.৮০]

কিংদত্ত একটি পবিত্র কূপ। মহাভারতের বনপর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই কূপের প্রস্থের সমান তিল উৎসর্গ করা হলে পিতৃঋণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এটি কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত ব্যাসস্থলীতে অবস্থিত।

[মহা (k) ৩.৮৩.৯৮; (হরি) ৩.৬৮.৯৮]

কিংদানতীর্থ মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত একটি তীর্থ। সরস্বতী নদীর তীরবর্তী কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত কিংদান-তীর্থে অবগাহন ও দান করলে প্রভূত পুণ্যলাভ হয়।

[মহা (k) ৩.৮৩.৭৮; (হরি) ৩.৬৮.৭৮; পদ্ম পু. (নবভারত). স্বর্গ খণ্ড ১২.৭৯]

☐ বামন পুরাণে কিংদানতীর্থকে কিংরূপ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। *[বামন পু. ৩৬.২৭]*

কিংদেব ভাগবত পুরাণে গন্ধর্ব, কিন্নর প্রমুখদের সঙ্গে কিংদেবদের নামও উল্লিখিত হয়েছে। টীকাকার শ্রীধরস্বামী তাঁর টীকায় উল্লেখ করেছেন যে—

কিংদেবাঃ ক্লমস্বেদদৌর্গন্ধ্যাদিরাহিত্যেন কিংদেবা মনুষ্যাবেতি সন্দেহাস্পদভূতা দ্বীপান্তরমনুষ্যাঃ।

'ক্লম' কথাটির অর্থ ক্লান্তি। 'স্বেদ' অর্থাৎ ঘর্ম। ক্লান্তি, দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম ইত্যাদি মনুষ্য ও অনান্য জীবের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। যে মনুষ্যের মধ্যে এই দুর্গন্ধাদি বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে না, তাঁদেরকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করে কল্পনা করা হয়। অর্থাৎ এঁরা দেবতাদের থেকে ঈষৎ নিকৃষ্ট কিন্তু মনুষ্যকুলের চেয়ে অনেকটাই উন্নত। এঁদেরকেই কিংদেব বলা হয়েছে। *[ভাগবত পু. ১১.১৪.৬]*

কিংযজ্ঞতীর্থ *[দ্র. কিংজপ্যতীর্থ]*

কিংরূপতীর্থ *[দ্র. কিংদানতীর্থ]*

কিঙ্কণ *[দ্র. কিঙ্কিণ]*

কিঙ্কর একটি রাক্ষসজাতি। ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাণের সময় ময়দানব কিঙ্করদের দ্বারা রক্ষিত প্রচুর ধন-সম্পদ তাঁদের থেকে গ্রহণ করেন। এই ধনরাশি ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সভাস্থল নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। *[মহা (k) ২.২.১৩২; (হরি) ২.৩.১৮]*

☐ ময়দানব, যুধিষ্ঠিরের জন্য এক অদ্ভুত প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। আট হাজার কিঙ্কর জাতীয় রাক্ষস সেই প্রাসাদটির সুরক্ষা বিধান করত এবং প্রয়োজনে এটিকে স্থানান্তরিত করার দায়িত্ব পালন করত।

[মহা (k) ২.৩.২৮, ৪৮.৯; (হরি) ২.৩.২৮, ৪৬.৮]

☐ আশ্বমেধিকপর্বে যুধিষ্ঠির শিবের উপাসনা করার সময় কিঙ্করদের উদ্দেশেও অর্ঘ্য দান করেছিলেন।

[মহা (k) ১৪.৬৫.৫; (হরি) ১৪.৮৩.৫]

কিঙ্কিণ যদুবংশীয় সাত্বতের পুত্র ভজমান। এই ভজমানের পুত্রদের মধ্যে কিঙ্কিণ অন্যতম।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.৭]

☐ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে কিঙ্কিণ ভজমানের পুত্র নন, তিনি তাঁর পৌত্র। তাঁর নামও এখানে কিঙ্কিণ নয়, তাঁর নাম কিঙ্কণ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.৪]

কিঙ্কিনীকাশ্রম একটি তীর্থ। এটি দর্শন করলে মৃত্যুর পর মানুষ অপ্সরা-গৃহে অবস্থান করে।

[মহা (k) ১৩.২৫.২৩; (হরি) ১৩.২৬.২২]

কিতব১ মহাভারতের সভাপর্বে কিতব নামে একটি জনজাতির উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এরা নানা মূল্যবান রত্ন, মেষ, গর্দভ, উট, ফল থেকে তৈরি মদ (ফলজং মধু), কম্বল প্রভৃতি উপঢৌকন নিয়ে এসেছিল বলে জানা যায়।

[মহা (k) ২.৫১.১২; (হরি) ২.৪৯.১০]

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এই কিতব জাতিকে আমরা কৌরবপক্ষে দেখতে পাই।

[মহা (k) ৬.১০৬.৭; ৬.১১৯.৮১; ৭.৭.১৬; (হরি) ৬.১০২.৮; ৬.১১৪.৮৪; ৭.৫.১৬]

মহাভারতে 'কিতব'দের দেওয়া উপঢৌকনের যে বিবরণ পাচ্ছি, তা থেকে তাদের বাসস্থানের চিত্রটি এইভাবেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেন সেটি একটি শুষ্ক মরুপ্রায় অঞ্চল। অথচ মহাভারতে এঁদের নাম করা হল আভীর প্রভৃতিদের সঙ্গে, যাঁরা বাস করেন সমুদ্রের কাছাকাছি। মহাভারতে স্পষ্টই বলা হচ্ছে যে, এঁরা সমুদ্রের কাছে বাস করেন এবং বৃষ্টির জল ও নদীর জলে যে শস্য উৎপাদিত হয় তার সাহায্যে জীবনধারণ করেন—

সমুদ্রনিষ্কুটে জাতাঃ পারে সিন্ধু চ মানবাঃ।
তে বৈরাসাঃ পারদাশ্চ আভীরাঃ কিতবৈঃ সহ॥

[মহা (k) ২.৫১.১২; (হরি) ২.৪৯.১০]

পণ্ডিতরা কিতবদের বাসভূমি নির্দেশ করেছেন বর্তমান বেলুচিস্তানের মাকরান্ অঞ্চলে, তবে শুধু

মাকরান্ অঞ্চলে নয়, বেলুচিস্তানের বেশ খানিকটা অংশ জুড়েই এই কিতবদের বসতি বিস্তৃত ছিল বলে মনে হয়। সমুদ্র থেকে বেশি দূরে নয়, অথচ পর্বত এবং শুষ্ক মরুপ্রায় অঞ্চলও রয়েছে—এই রকম ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এই অঞ্চলটির মূল বিশেষত্ব। বৃষ্টির ও নদীর জলের ভরসায় শস্য উৎপাদনের কথা বলতে বোধহয় সিন্ধুনদের তীরবর্তী বিক্ষিপ্ত প্লাবন সমভূমিকে বোঝানো হয়েছে যেখানে উৎপাদিত সামান্য শস্যে অতি কষ্টে এদের ভরণপোষণ চলত।

'কিতব' নামটিও কম বিশেষত্ব পূর্ণ নয়। প্রসঙ্গত 'কিতব' অর্থে ধূর্ত, অক্ষক্রীড়ায় পারদর্শী ব্যক্তি কিংবা যারা কথা দিয়েও কথা রাখে না, সেরকম মানুষ। মহাভারতে বহুবার শকুনিকে কিতব নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। কপট স্বভাব, দ্যূতক্রীড়ায় পারদর্শী শকুনির উপযুক্ত বিশেষণ 'কিতব'—এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে শকুনি এবং তাঁর পুত্র উলূককে কিতব, কৈতব্য বা কিতবেশ্বর বলার পিছনে 'কিতব' জাতির নিজস্ব ভৌগোলিক বিশেষত্বও একটা কারণ হতে পারে বলে পণ্ডিতরা মত প্রকাশ করেছেন। পণ্ডিতদের এই ধারণা যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ, তার কারণ, বেলুচিস্তান থেকে কান্দাহার বা গান্ধারের দূরত্ব খুব বেশি নয়। গান্ধাররাজ 'কিতব'দের উপর আধিপত্য করতেন বলেও হয়তো শকুনিকে 'কিতব' বলা হয়েছে।

কিতব শব্দটি ঋগ্বেদের কাল থেকেই 'জুয়াড়ি' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ঋগ্বেদের অক্ষসূক্তে *[ঋগ্বেদ ১০.৩৪]* একাধিকবার এই অর্থেই 'কিতব' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, এমন একটি নেতিবাচক শব্দ একটি জনজাতির উপর আরোপিত হবার কারণ কি। সেক্ষেত্রে বলা দরকার 'কিতব' শব্দের 'জুয়াড়ি' অর্থটিই বহুল প্রচলিত অর্থ হলেও এই শব্দটি শুধু এই একটি অর্থ মাত্র বহন করে না। 'কিতব' বলতে ধুতুরা ফুলের গাছ বোঝায়। অগ্নি পুরাণে আমরা ধুতুরা গাছের পর্যায় শব্দ হিসেবে 'কিতব' শব্দের উল্লেখ পাই—

ধুস্তূরঃ কিতবো ধূর্তঃ। *[অগ্নি পু. ৩৬৩.৩৭]*

কিতব শব্দের এই অর্থটিকেই গ্রহণ করার কারণ বেলুচিস্তানের প্রায় শুষ্ক জলবায়ু, যেখানে ধুতুরা প্রভৃতির ব্যাপক ফলন এখনও হয় বলে জানা যায়। বর্তমান আফগানিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চল ধুতুরা, আফিম প্রভৃতি চাষের উপযোগী অঞ্চল। কিতব জাতির বাসভূমিতে ধুতুরার ব্যাপক ফলনের সাক্ষ্যই হয়তো এরা নিজেদের নামের সঙ্গে বহন করছে। তার কারণ, অতি প্রাচীনকাল থেকেই ধুতুরা মূল্যবান ওষধি বৃক্ষ হিসেবে পরিচিত ছিল। ধুতুরার ব্যাপক ফলন কিতবদের বাসভূমির গুরুত্ব অনেকটাই বাড়িয়ে তুলেছে।

তবে পরবর্তী সময়ে এরা ধীরে ধীরে পূর্ব দিকে সরে আসতে থাকে বলে পণ্ডিতদের ধারণা। অন্যান্য জনজাতির রাজনৈতিক অভ্যুত্থান এবং শকুনির দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে গান্ধার বা বেলুচিস্তান অঞ্চলে এঁদের রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাস পাওয়া—এগুলোকেই মোটামুটি ভাবে এদের পূর্ব দিকে সরে আসার কারণ হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। মহাভারতের সভাপর্বে আমরা উলূক নামে একটি জাতির উল্লেখ পাই যাঁরা অর্জুনের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। পণ্ডিত Moti Chandra এই উলূকদের কুলুত এবং কিতবদের সঙ্গে অভিন্ন বলেই মনে করেছেন। হয়তো শকুনির পুত্র কৈতব্য উলূকের সঙ্গে নামসাদৃশ্যের কারণেই। পণ্ডিতরা বর্তমান হিমাচল প্রদেশের কুলু অঞ্চলটিকে প্রাচীন কুলুত জাতির বাসভূমি হিসেবে চিহ্নিত করেন। পণ্ডিত মোতি চন্দ্র আরও একটু দক্ষিণ পূর্বে পূর্ব রাজস্থানের Suket অঞ্চলটিকেও কিতবদের বাসভূমি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রসঙ্গত রাজস্থানে বসবাসকারী জাটদের মধ্যে কিতব নামে একটি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব এখনও আছে। এর থেকে ধারণা হয় যে, কিতবরা ক্রমশ পূর্ব দিকে সরে এসে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

[দ্র. উলূক এবং কুলুত]

[IKP (Agrawala), GESMUP (Moti Chandra), p. 55-56; Assar Muhammad Khan & Muhammad Aslam, Medicinal Plants of Baluchistan, Project on Introduction of Medicinal Herbs and Spices as crop. Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Qarshi Industries (Pvt.) Ltd., 2000; Balochistan Bibliography by Hamed Baloch, Sayad Hashmi Reference Library, 2006, Karachi, Pakistan]

কিতব২ *[দ্র. শকুনি]*

কিন্নর একটি জনজাতি। পণ্ডিতরা কিন্নরদের গন্ধর্ব জনজাতিরই একটি শাখা বলে মনে করেন। মহাভারতের সভাপর্বের একটি শ্লোকে সরাসরিই 'কিন্নরা নাম গন্ধর্বা' বা কিন্নর নামে গন্ধর্ব কথাটি পাওয়া যায়।

ব্যাকরণগত দিক থেকে 'কিম্' একটা জিজ্ঞাসাবাচক শব্দ হলেও অন্য শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এই শব্দ একটা প্রকৃতি-বিকার বা আকৃতি-বিকার সূচনা করে, তাই কিন্নর মানে দাঁড়ায় 'কুৎসিত নরঃ', অর্থাৎ কিনা 'কেমন যেন মানুষের মতো—কিন্নর। একই অর্থে কিন্নর বোঝাতে কিম্পুরুষ-শব্দটাও ব্যবহার হয়, যার সমাস ভাঙা হয় এই ভাবেই—কুৎসিতঃ পুরুষঃ।

মহাভারতে কিন্নর আর কিম্পুরুষদের উৎপত্তি নিয়ে একটু বিভ্রান্তি আসে। একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, বানর—এঁরা ব্রহ্মার মানসপুত্র পুলস্ত্যের ছেলে। আবার ব্রহ্মার অন্য পুত্র পুলহের ছেলে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে কিম্পুরুষদের। কিন্তু সমস্ত উপাদান থেকেই এটা প্রমাণিত যে কিন্নর এবং কিম্পুরুষ, একই প্রজাপতির মানুষ। মৎস্য-পুরাণে কিন্নর-প্রজাতি কশ্যপ মুনির ঔরসে দক্ষকন্যা অরিষ্টার গর্ভে জাত—

তথা কিন্নর-গন্ধর্বান্ অরিষ্টাজনয়দ্ বহূন্।

ভারতীয় ভাবনায় সাধারণভাবে গঙ্গা নদী উপত্যকার উত্তরে কৈলাস পর্বত, মানস সরোবর এবং তার উত্তরের অঞ্চল দেবভূমি রূপে বর্ণিত। যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, কিম্পুরুষ ইত্যাদি বিভিন্ন জনজাতির মানুষ সেই পবিত্র ক্ষেত্রের অধিবাসী। স্থান-মাহাত্ম্যের কারণেই এই সকল জনজাতি উপ-দেবতার (Semi-divine) আখ্যা পেয়েছে বলে পণ্ডিতদের ধারণা। একথাও মনে করা হয় যে, এই উপদেবতা শ্রেণির জনজাতিগুলিই পৌরাণিক উত্তরকুরুবাসীদের অপরসুরী। ভারতীয় মহাকাব্যকারেরা কিন্তু যাবতীয় মাহাত্ম্য বা দেবত্ব স্বীকার করে নিয়েও কিন্নর-কিম্পুরুষ ইত্যাদিকে হিমালয়বাসী জনজাতি বলে বাস্তবে চিহ্নিত করেছেন। *[মহা (k) ১.৬৬.৭; ২.১০.১৪; (হরি) ১.৬১.৭; ২.১০.১৪; মৎস্য পু. ৬.৪৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৭১; বঙ্গীয় শব্দকোষ (Vol-1) পৃ. ৬২৭; TIM(Mishra) পৃ. ২৪৭-৪৮]*

□ রামায়ণের আদিকাণ্ডে রামচন্দ্রের আবির্ভাবের পর মনুষ্যরূপী অবতারকে বন্দনা করার জন্য ব্রহ্মা দেবতাদের কিন্নরীদের গর্ভে ক্ষমতাশালী বানর-পুত্র উৎপাদনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ব্রহ্মার এই নির্দেশ আবারও 'কিন্নর' ও 'বানর' শব্দদুটির পৌরাণিক নৈকট্য প্রমাণ করে। *[রামায়ণ ১.১৭.৬]*

□ রাজা ভগীরথ যখন গঙ্গা নদীকে মর্ত্যে আনয়ন করেন সে সময় ভগীরথের প্রদর্শিত পথে গঙ্গা নদী যেমন গমন করেছিলেন, তেমনই গন্ধর্ব, দেবতা, দানব, যক্ষ ও কিন্নরগণও গঙ্গার অনুগমন করেন। এই মহাকাব্যিক ইঙ্গিতটির মধ্যে অবশ্যই গঙ্গা নদীর অববাহিকা জুড়ে আর্য সভ্যতা বিস্তারের ইতিহাসটি লুকিয়ে রয়েছে বলেই ধারণা হয়। লক্ষণীয় বিষয় হল কিন্নরগণও সেই সুপ্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত। *[রামায়ণ ১.৪৫.৩২]*

□ ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা স্বয়ং নিজ প্রতিবিম্ব হতে কিন্নর ও কিম্পুরুষগণের সৃষ্টি করেছিলেন। সে কারণেই তাঁরা ব্রহ্মার পরিত্যক্ত প্রতিবিম্বস্বরূপ দেহ গ্রহণ করে এবং পরস্পর মিথুনীভূত হয়ে উষাকালে পিতামহ ব্রহ্মার পরাক্রম ও মাহাত্ম্যবন্দনা করে থাকেন—

স কিন্নরান্ কিম্পুরুষান্ প্রত্যাত্ম্যেনাসৃজৎ প্রভুঃ।
মানয়ন্নাত্মনাত্মানমাত্মাভাসং বিলোকয়ন্॥
তে তু তজ্জগৃহূ রূপং ত্যক্তং যৎ পরমেষ্ঠিনা।
মিথুনীভূয় গায়ন্তস্তমেবোষসি কর্মভিঃ॥

[ভাগবত পু. ৩.২০.৪৪-৪৬]

□ বায়ু পুরাণে কিন্নরদের দুটি শাখার কথা পাওয়া যায়—অশ্বমুখ কিন্নর এবং নরমুখ কিন্নর। বিদ্যাধর বিক্রান্ত হতেই উভয় শাখার উৎপত্তি।

অশ্বমুখ কিন্নররা সাতটি গণে বিভক্ত। এঁরা হলেন সমুদ্রসেন, কালিন্দ, মহাবল, মহানেত্র, সুবর্ণঘোষ, সুগ্রীব ও মহাঘোষ।

অপরদিকে নরমুখ কিন্নরদের গণগুলি নিম্নরূপ—হরিষেণ, সুষেণ, বারিষেণ, রুদ্রদত্ত, ইন্দ্রদত্ত, চন্দ্রদ্রুম, মহাক্রম, বিন্দু ও বিন্দুসার। এঁরা চন্দ্রবংশীয় কিন্নর নামে পরিচিত। এঁরাই কিন্নরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নৃত্য ও গীত বিষয়ে এঁদের পারদর্শিতা সর্বাধিক। *[বায়ু পু. ৬৯.৩১-৩৭]*

□ কিন্নরগণ বিভিন্ন প্রকারের সুকুমার বৃত্তি বিশেষত নৃত্য-গীত ইত্যাদিতে পারদর্শী বলে

ধারণা করা হয়। গন্ধর্বরাও এই বিশেষ বৃত্তিগুলিতে পারদর্শী ছিলেন। কিন্নরগণ গন্ধর্বদেরই একটি শাখা হওয়ায় সুকুমার কলার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ স্থাপিত হওয়াও খুবই স্বাভাবিক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মহাভারতের সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসভার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে গীতবাদ্যনিপুণ, তাল, মান ও লয়ে অভিজ্ঞ কিন্নরগণ তুম্বুরুর অনুমতিক্রমে গন্ধর্বগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজসভায় সংগীত পরিবেশন করতেন—

গীতবাদিত্রকুশলাঃ সম্যক্তালবিশারদাঃ।
প্রমাণে'থ লয়স্থানে কিন্নরাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ॥
সঞ্চোদিতাস্তুম্বুরুণা গন্ধর্বসহিতাস্তদা।
গায়ন্তি দিব্যতানৈস্তে যথান্যায়ং মনস্বিনঃ॥

এভাবেই কিন্নরগণ সঙ্গীতের মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় এক স্বর্গীয় পরিবেশ তৈরি করতেন। *[মহা (k) ১.২২৮.২০; ২.৪.১৫-১৭; (হরি) ১.১২১.২০; ২.৪.১৫-১৭]*

□ অর্জুন দিগ্বিজয়ের সময় কৈলাস পর্বত অতিক্রম করে কিন্নরদেশ জয় করেছিলেন। সে সময় কিন্নররাজ দ্রুমের পুত্র দেশ শাসন করেছিলেন। অর্জুন তাঁকে পরাজিত করে কর গ্রহণ করেন। কিন্নরদেশ জয়ের পর অর্জুন যক্ষ অধ্যুষিত হাটক দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

[মহা (k) ২.২৮.১-২; (হরি) ২.২৭.১-২]

□ মহাকাব্য-পুরাণে কিন্নরদের বাসভূমি রূপে অসংখ্য জায়গার নাম পাওয়া যায়। রামায়ণে চিত্রকূট পর্বত, জনস্থান, পম্পা সরোবর, মহেন্দ্র পর্বত, লঙ্কানগরী সংলগ্ন অরিষ্ট পর্বত ও মন্দাকিনী নদীর তীরে কিন্নরদের বসবাসের কথা পাওয়া যায়।

মহাভারতে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে কিন্নরদের বসবাসের কথা বলা হয়েছে—মালিনী নদীর তীর, সরস্বতী নদীর তীরে সৌগন্ধকীবন তীর্থ, গন্ধমাদন ও মন্দর পর্বত।

তবে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, কিন্নরদের আবাসস্থল রূপে একাধিক স্থান-নাম পাওয়া গেলেও এঁদের প্রকৃত বাসভূমি হিমালয় পর্বত। একথা মহাভারতের বনপর্বের একটি শ্লোকে পাওয়া যায়—

কিরাতকিন্নরাবাসং শৈলং শিখরিণাং বরম্।।

বনপর্বে আবার কৈলাস পর্বতে কুবেরের একটি নগরীর কথা পাওয়া যায়। কুবেরের অনুগামী কিন্নরগণ সেই নগরীতে বাস করেন। তাঁরা সেখানে কুবের-আশ্রিত একটি সরোবরকে রক্ষা করেন। *[রামায়ণ ২.৯৩.১১; ২.৯৪.১১; ৩.৬৭.৬; ৪.১.৬১; ৫.১.৬; ৫.৫৬.৩৬; ৭.১১.৪২; মহা (k) ১.৭০.১৫; ৩.৮৪.৫; ৩.৯০.২০; ৩.১০৮.১০; ৩.১৩৯.১২; ৩.১৪৩.৬; ৩.১৪৬.১৫; ৩.১৫৩.৯; ৩.১৬২.১১; ৭.৮০.২৯; (হরি) ১.৮৪.১৫; ৩.৬৯.৫; ৩.৭৫.২০; ৩.৯১.১০; ৩.১১৫.১২; ৩.১২৭.৯; ৩.১৩৫.১১; ৩.১৪৩.৬; ৩.১৪৬.১৫; ৭.৭১.২৯; ভাগবত পু. ৩.৬.৯; মৎস্য পু. ১১৭.৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৫.২৮; (Sircar) p. 90]*

□ মহানীল পর্বতের উপরে অশ্ববক্ত্র কিন্নরদের পনেরোটি নগরী অবস্থিত। দেবসেন, মহাবাহু প্রমুখ কিন্নরাধিপতিগণ এই সব নগরী শাসন করেন।

বায়ু পুরাণে কিন্নর-শাসিত পনেরোটি নগরীর বিবরণ পাওয়া যায়। প্রতিটি নগরীই গুপ্তদ্বারযুক্ত এবং প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। নগরীগুলির অভ্যন্তরে অসংখ্য শক্তিশালী বিষধর সর্পের আবাস।

[বায়ু পু. ৩৯.৩২-৩৫]

□ মহাভারতের বনপর্বে পঞ্চনদক্ষেত্রের অন্তর্গত বড়বা তীর্থের কথা পাওয়া যায়। এই তীর্থে কিন্নরগণ বিষ্ণুকে তুষ্ট করার জন্য চরু পাক করে সাতটি মন্ত্রে তাঁর উপাসনা করেছিলেন। বিষ্ণু তুষ্ট হয়ে কিন্নরদের অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য এবং অন্যান্য বহুতর বর দান করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.৮২.১১১-১১৭; (হরি) ৩.৬৭.১১১-১১৭]

□ তারকাসুরের বিরুদ্ধে দেবতাদের সংগ্রামে কিন্নরগণও যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধ-বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, কিন্নররা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে শ্বেত পতাকা ধারণ করে তোমর অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৪৮.৯২]*

□ পুরাকালে শম্ভুপ্রিয়া উমা একবার এক শরবনে তপস্যা করছিলেন। তপস্যাকালে উমা স্থির করেছিলেন যে, কোনো পুরুষ সেই শরবনে প্রবেশ করলে তার নারীত্বপ্রাপ্তি ঘটবে। রাজা ইল এই নিয়ম সম্পর্কে কিছু না জেনেই শরবনে প্রবেশ করে স্ত্রীত্ব লাভ করেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের পরামর্শে রাজা ইলের অনুগামীরা মহেশ্বর ও

পার্বতীর স্তব করে ইলকে সংকটমুক্ত করতে চাইলেন। শিব এবং পার্বতী তাঁদের আরাধনায় তুষ্ট হয়ে বললেন যে, যদি রাজা ইল অশ্বমেধযজ্ঞ করে সেই যজ্ঞের ফল শিব ও পার্বতীকে অর্পণ করেন তবে বর্তমান সংকট থেকে রাজা রক্ষা পাবেন। ইল রাজা তাঁর পূর্বরূপ সম্পূর্ণ ফিরে না পেলেও কিম্পুরুষ হয়ে থাকতে পারবেন।

শিব ও পার্বতীর ইচ্ছানুসারে ইল কিম্পুরুষত্ব লাভ করেন। তিনি একমাস পুরুষ ও একমাস নারী রূপে কাল অতিবাহিত করতে লাগলেন।

এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। রাজা ইল যে 'কিম্পুরুষত্ব' প্রাপ্ত হলেন এক্ষেত্রে তাঁকে আক্ষরিক অর্থে কুরূপ বা নপুংসক বলে ধারণা করা সঠিক হবে না। বৃহত্তর চিন্তার ক্ষেত্রে 'কিম্পুরুষ' বলতে আর্য জনগোষ্ঠী তাঁদেরই চিহ্নিত করতেন যাঁদের শারীরিক গঠনগত বৈশিষ্ট্য আর্য জনজাতি সুলভ নয়। সেই কারণেই কিন্নর বা কিম্পুরুষদের অশ্বমুখ বিশিষ্ট বা বানর বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। নৃতত্ত্ব বিদ্যার নিরিখে আর্য জনজাতির সঙ্গে দৈহিক গঠনগত বৈসাদৃশ্যই যে প্রাচীনকালে যক্ষ, কিন্নর, কিম্পুরুষ বা বানর ইত্যাদি নামে চিহ্নিত হওয়ার মূল মাপকাঠি ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রাজা ইলের কাহিনীটিকেও এই যুক্তির আলোয় বিবেচনা করাই শ্রেয় বলে মনে হয়।

[মৎস্য পু. ১২.১-১০]

কিন্নরাশ্ব ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে কলিযুগে যাঁরা রাজা হবেন তাঁদের মধ্যে কিন্নরাশ্ব অন্যতম। এই কিন্নরাশ্ব, সুনক্ষত্রের পুত্র এবং অন্তরীক্ষের পিতা।

[মৎস্য পু. ২৭১.৮]

কিমিন্দম জনৈক মুনি। পাণ্ডু তাঁর দুই পত্নী কুন্তী এবং মাদ্রীকে সঙ্গে নিয়ে বনে বসবাস করেছিলেন। মৃগয়া, বিহার প্রভৃতি নানা বিলাসে তাঁর দিন কাটছিল। এমন সময় একদিন মৃগয়ায় গিয়ে পাণ্ডু এক মৈথুনরত হরিণ এবং হরিণীকে দেখতে পেলেন। এই হরিণ কোনো সাধারণ হরিণ নয়। ঋষিকুমার কিমিন্দমই হরিণের রূপ ধারণ করে নিজের হরিণীপত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। পাণ্ডু সেই অবস্থাতেই শরনিক্ষেপ করে কিমিন্দমকে বধ করেন। মৃত্যুর আগে কিমিন্দম পাণ্ডুকে অভিশাপ দিলেন—আমি পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষায় মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। তুমি এই অবস্থায় আমাকে বধ করে আমার সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করে দিলে। তোমার কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তুমিও মৈথুনে প্রবৃত্ত হওয়ামাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হবে। মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী কিমিন্দমের অভিশাপের ফলেই পাণ্ডু প্রজনন ক্ষমতা হারান। *[বি.দ্র. পাণ্ডু]*

[মহা (k) ১.১১৮.৫-৩৪; (হরি) ১.১১২.৫-৩৪]

কিম্পুনকতীর্থ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত শৈবতীর্থ। এই তীর্থে স্নান করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকেও মুক্ত হওয়া যায়।

ত্রেতাযুগে সুনেত্র নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম ছিল বিশ্বাবসু। একসময় মহর্ষি যবক্রীতের অভিশাপে বিশ্বাবসু নিজের পিতাকে হত্যা করেন। ব্রহ্মহত্যা এবং পিতৃহত্যার পাপে জর্জরিত বিশ্বাবসু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতে থাকেন এবং তীর্থে স্নান করে পাপমুক্ত হবার চেষ্টা করতে থাকেন। একসময় বিশ্বাবসু অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত কিম্পুনকতীর্থে স্নান করেন। তিনি তীর্থদর্শন এবং স্নান করার সঙ্গে সঙ্গেই দৈববাণী হয় যে, এই কিম্পুনকতীর্থে স্নান করার ফলেই তাঁর সব পাপ দূর হয়েছে। একথা শুনে প্রসন্ন বিশ্বাবসু ফিরে গেলেন নিজের আশ্রমে। সম্ভবত মহাভারতে মহর্ষি রৈভ্যের পুত্র অর্বাবসুর যে উপাখ্যান পাওয়া যায়, সেই কাহিনীটিই এখানে বিশ্বাবসুর উপর আরোপিত হয়েছে।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ৩১.৫৫-৬১]

কিম্পুনা মহাভারতে উল্লিখিত একটি নদী। বরুণদেবের সভায় যেসব নদী উপযুক্ত রূপধারণ করে তাঁর আরাধনা করে, সেগুলির মধ্যে কিম্পুনা নদী একটি। *[মহা (k) ২.৯.২০; (হরি) ২.৯.২০]*

☐ প্রলয়কালে বালকরূপী শ্রীহরি তাঁর উদরে ধারণ করে মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রাণরক্ষা করেন। হরির উদরের ভিতর মার্কণ্ডেয় বহু নদী ও জনপদকে আশ্রিত দেখেছিলেন। কিম্পুনা নদীও সেগুলির মধ্যে একটি।

[মহা (k) ৩.১৮৮.১০৫; (হরি) ৩.১৫৯.১০৬]

কিম্পুনা নদীর আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে মহাভারতে কাবেরী, গোদাবরী ইত্যাদি দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির সঙ্গে একত্রে এর নাম উচ্চারিত হওয়ায়, মনে হয় এটি দক্ষিণ ভারতেই প্রবাহিত হত।

কিন্তয় অঙ্গিরাবংশীয় একজন বংশপ্রবর্তক ঋষি।
[বায়ু পু. ৬৫.১০৭]

কিরাত হিমালয় পর্বত ও তৎসংলগ্ন তরাই অঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতি। অথর্ববেদে কিরাতদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে এদের পর্বতের সানুদেশে বসবাসকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিরাতদের সম্পর্কে এই একই কথা শুক্লযজুর্বেদ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও বলা হয়েছে—

গুহাভ্যঃ কিরাতং সানুভ্যো।

অবশ্য পুরাণে কিরাতদের কখনো পশ্চিম ভারতের, কখনো মধ্যভারতের আবার কখনো ভারতবর্ষের পূর্ব-প্রান্তের মানুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

মহাকাব্যে কিরাত জাতির সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ঋষি বিশ্বামিত্র একবার অসূয়াবশত ঋষি বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে জোর করে হরণের চেষ্টা করেন। নন্দিনীকে (রামায়ণের মতে শবলাকে) সঙ্গে যেতে বাধ্য করার জন্য বিশ্বামিত্রের সৈন্যরা তার বাছুরটির উপর অত্যাচার শুরু করে। সে সময় ক্রুদ্ধ নন্দিনীর দেহজাত বিভিন্ন পদার্থ থেকে বহু জনজাতির উদ্ভব হয়। এই সময়ই নন্দিনীর মূত্র থেকে কিরাত জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য রামায়ণ মতে, শবলার অর্থাৎ নন্দিনীর রোমকূপ থেকে কিরাতদের উদ্ভব। *[অথর্ববেদ ১০.৪.১৪;*
শুক্লযজুর্বেদ সংহিতা ৩০.১৬;
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.৪.১২.১; রামায়ণ ১.৫৫.৩;
মহা (k) ১.১৭৫.৩৮; ৩.৯০.২; ৬.৯.৫১, ৫৭;
(হরি) ১.১৬৮.৩৮; ৩.৭৫.২০; ৬.৯.৫১, ৫৭;
মৎস্য পু. ১১৪.১১.৩৫, ৫৬;
বায়ু পু. ৪৫.৮২.১২০, ১৩৬; ভাগবত পু. ২.৪.১৮;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.১২.৫১, ৬০, ৬৮;
বিষ্ণু পু. ২.৩.৮]

□ 'কিরাত' শব্দের অর্থ বনবাসী, এঁরা মূলতঃ শিকারী ম্লেচ্ছজাতি বিশেষ। সমগ্র ভারতভূমিতে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জনজাতির সংখ্যা নেহাত কম নয়। পণ্ডিতরা মনে করেন, প্রাথমিকভাবে হিমালয়, বিশেষত পূর্ব হিমালয়ে, কিরাত জাতির মানুষ বসবাস করত। তবে মহাকাব্য ও পুরাণে পূর্ব ভারত, মধ্য ও পশ্চিম ভারতেও এদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আরও গভীর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, শুধু নেপাল বা অসমেই নয়, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রেও কিরাতদের অস্তিত্ব রয়েছে। ফলে তিনি মনে করেন—'কিরাত' শব্দটি একটি মাত্র জনগোষ্ঠীর নাম নয়, তিনি কল্পনা করেছেন বৃহত্তর অর্থে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব মুক্ত একটি প্রান্তিক গোষ্ঠীর common name হচ্ছে কিরাত।

ধারণা করা হয় যে, কিরাতরা কখনোই ভারতবর্ষের বাইরে থেকে প্রদেশে imigrate করে আসেনি। আর্যায়ণের অনেক আগে থেকেই তারা এদেশে বাস করতেন। পশু বা মৎস্য শিকার এবং ফলমূল সংগ্রহই ছিল তাঁদের জীবিকা। পণ্ডিতরা অনেকে কিরাতদের আর্য-পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের আদি জনগোষ্ঠীর অংশ বা aboriginal বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণা, আর্য সভ্যতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যতই ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, ততই কিরাতরা তাঁদের পূর্ববর্তী অবস্থান ছেড়ে ছোটো ছোটো ভৌগোলিক অঞ্চলে (pocket) সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে একসময় কিরাতরা তাদের আদি বাসভূমি পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশেই শুধু নয়, গঙ্গানদী উপত্যকা তথা বর্তমান বঙ্গদেশেও বাস করতেন। কিন্তু আর্যায়ণের চাপেই সম্ভবত তাঁরা সরে যেতে বাধ্য হন হিমালয় পর্বতের দুর্গম অঞ্চলে বা গভীর বনভূমির প্রত্যন্তে। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ উত্তর-পূর্ব হিমালয়ের অন্তর্গত বর্তমান নেপালে বসবাসকারী কিরন্তী (মতান্তরে কিরাত) সম্প্রদায়। এই কিরন্তীরা খুব সম্ভবত প্রাচীন কিরাতদেরই বংশধর। যারা সংখ্যায় কম এবং প্রায় প্রান্তিক। হয়তো বা এই কিরন্তীদের পূর্বপুরুষরাই আর্যায়ণের আগে তিব্বত তথা পূর্ব ভারতের উত্তরাংশ তরাইয়ের একটি বিস্তীর্ণ অংশে বসবাস করত। পেশাগতভাবে শিকারী এ ধরনের বহু তথাকথিত 'বর্বর' জনজাতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। রাজস্থানের যোধপুরের কাছেও কিরাদূ (Kiradū) নামে একটি জনপদের সন্ধান পাওয়া যায়। এটিও সম্ভবত কিরাতদেরই বাসস্থান ছিল। ফলে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে—কিরাত একটি common name—এই ধারণাটিই আরও যুক্তিযুক্ত হয়ে ওঠে। বলাই যায় যে, প্রাথমিকভাবে পেশাগত বিচারে কিরাত বলতে পূর্ব হিমালয়ের

একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হলেও, আর্যসভ্যতা যত এগিয়েছে ততোই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী অনার্য ও জীবিকাগতভাবে শিকারী বহু জনজাতিই 'কিরাত' নামে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। আর্য সভ্যতার ধারক না হওয়ার কারণেই কিরাতরা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। সে কারণেই কিরাতদের মহাকাব্য বা পুরাণে প্রায়ই 'শূদ্র' বা 'হীন' বলা হয়েছে।

[Suniti Kumar Chatterjee; Kirāta-Jana Kṛti; Calcutta; The Asiatic Society, 1951, p. 29, 35; Dinesh Prasad Saklani, Ancient Communities of the Himalaya; New Delhi; Indus Publishing Co, 1998, p.79; G.P. Singh; Researches in to the History and Civilization of the Kirātas; New Delhi; Gyan Kunj, 2008, p. 86-87]

□ ধর্মশাস্ত্রকার মনু বলেছেন, কিরাতজাতি কর্মদোষে ক্ষাত্রধর্মচ্যুত হয়ে শূদ্রে পরিণত হয়েছে। মহাভারতও এই ধারণা সমর্থন করে। মহাভারতকার এমনও লিখেছেন, ব্রাহ্মণদের কোপেই কিরাত-ক্ষত্রিয়রা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। আবার ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে রাজা সগরকে কিরাতদের ক্ষত্রিয় পরিচয় নষ্ট করে বর্বর ম্লেচ্ছ জনজাতিতে পরিণত করার হোতা রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। হৈহয়দের দমন কালে অন্য যে সব বর্বর জনগোষ্ঠীকে পর্যুদস্ত করে সগর তাঁর স্বভাবিত সামাজিক শাস্তির মাধ্যমে তাদের হীন সম্প্রদায়ে পরিণত করেছিলেন, সেই জনজাতিগুলির মধ্যে কিরাত অন্যতম। সগরের কাছে পরাজিত হওয়ার পরই এরা পার্বত্যগুহা বা দুর্গম অরণ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। *[মনুসংহিতা ১০.৪৪; মহা (k) ১৩.৩৫.২৭; (হরি) ১৩.৩২.৭৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৪৮.২৩, ২৬, ৪৯]*

□ উপরের ঘটনাটি অবশ্য অনার্য কিরাতদের উপর আর্যায়ণের প্রচেষ্টা বলেও ভাবা যায়। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, যখন বৈদিক সাহিত্যে কোনো অনার্য জনজাতিকে ক্ষত্রিয় ধর্মচ্যুত বলা হয়, তবে বুঝতে হবে যে, আর্যায়ণের পূর্বে নিশ্চয়ই ওই জাতিটি আর্য সভ্যতা থেকে আলাদা, কিন্তু উন্নত কোনো পৃথক একটি সভ্যতার অংশ ছিল। নতুবা এদের ধর্মচ্যুত করে হীন প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন পড়ত না। ফলে এই ধরনের জাতিগুলিকে সরাসরি বর্বর বলে উল্লেখ করা ঠিক নয়। পণ্ডিত চট্টোপাধ্যায়ের যুক্তিটি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য, কারণ এর প্রমাণ পুরাণেই লুকিয়ে আছে। সেখানে কিরাত দেশকে একটি আর্য জনপদ বলা হয়েছে, যার মধ্যে দিয়ে গঙ্গা নদী প্রবাহিত। কিরাতদেশকে আর্য জনপদ বলে উল্লেখ করা এবং সে দেশের মধ্যে দিয়ে পবিত্র গঙ্গা নদীর প্রবাহিত হওয়াকে মান্যতা দেওয়া, আসলে কিরাতদের উন্নত অনার্য সভ্যতার ইতিহাস এবং জাতিটির শৌর্যের স্বীকৃতি। অবশ্য এ থেকে আর একটি ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, কিরাতরা গঙ্গানদী অববাহিকাতেও বাস করত।

[মৎস্য পু. ১২১.৪৯; বায়ু পু. ৪৭.৪৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৫০; Suniti Kumar Chatterjee; Kirāta-Jana Kṛti; Calcutta; The Asiatic Society; 1951, p. 28]

□ বনপর্বে একবার স্বয়ং মহাদেবকে ব্যাধ বা কিরাতরূপে আবির্ভূত হতে দেখা যায়। কিরাতরূপধারী মহাদেব, অর্জুনের শক্তি পরীক্ষা করতে তাঁর সঙ্গে দ্বৈরথে প্রবৃত্ত হন—

তততো'র্জুনঃ শরবর্ষং কিরাতে সমবাসৃজৎ।
তৎ প্রসন্নেন মনসা প্রতিজগ্রাহ শঙ্করঃ॥

অর্জুন এই সময় হিমালয় পর্বতে কঠিন তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। শেষ পর্যন্ত কিরাতরূপী ভগবান শিব, অর্জুনের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পাশুপত নামে মহাস্ত্র দান করেন।

এ থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়। প্রথমত, কিরাতরা হিমালয় পর্বতেরই অধিবাসী। দ্বিতীয়ত, শিবকে কিরাতরূপে কল্পনা করার মধ্যে দিয়ে আসলে মহাভারতের কবি কিরাতদের শৌর্য্য ও বীরত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যা প্রমাণ করে যে, আর্যরা পরবর্তীকালে কিরাতদের বাহুবল সম্পর্কে উচ্চধারণা পোষণ করতেন নতুবা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কিরাতদের বাহুবলের মহিমা বার বার উল্লেখ করা হত না।

[মহা (k) ১.২.১৫৯; ৩.৩৯.১-৮৪; ৩.৪০.১-২৮; ১৩.১৪.১৪১; (হরি) ১.২.১৫৯; ৩.৩৫.১-১১২; ১৩.১৩.১৪০; Suniti Kumar Chatterjee; Kirāta-Jana kṛti, Calcutta; The Asiatic Society; 1951, p. 30]

□ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রায় সাতশো কিরাতদেশীয় হাতির ব্যবহার দেখা যায়। পূর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় অর্জুনের কোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই কিরাত দেশের রাজা উপহার হিসেবে এই হাতিগুলি যুধিষ্ঠিরকে দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের মূল যুদ্ধে হিংস্র ও দুর্ধর্ষ কিরাত-বীরেরা বিশালকায় হাতিগুলিতে চড়ে পাণ্ডবদেরই আক্রমণ করেছিল। কারণ তারা দুর্যোধনের হিতৈষী। ততদিনে অঙ্গরাজ কর্ণ হিমালয়ের দুর্গমে বসবাসকারী কিরাতদের জয় করে দুর্যোধনের পক্ষে নিয়ে এসেছেন। দ্রোণপর্বে কিরাত যোদ্ধাদের বীরত্ব সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে তাঁদের অগ্নি-জাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সব দুধর্ষ বীরেরাই কিরাত দেশীয় বিশালকায় হস্তীগুলির প্রশিক্ষক—

এষামেতে মহামাত্রাঃ কিরাতা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
হস্তিশিক্ষাবিদশ্চৈব সর্বে চৈবাগ্নিযোনয়ঃ॥

এরপর কিরাতবীরদের বাহন বিশালকায় হস্তীগুলির বর্ণনা পাওয়া যায়। এরা দিগ্‌গজ অঞ্জনের বংশধর, সুশিক্ষিত এবং যুদ্ধে ঐরাবতের মতই বিধ্বংসী। এদের সুগঠিত দেহ জাম্বূনদের স্বর্ণ দিয়ে তৈরি অলঙ্কার ও বর্মে সজ্জিত—

যে ত্বেতে সুমহানাগা অঞ্জনস্য কুলোদ্ভবাঃ।
কর্কশাশ্চ বিনীতাশ্চ প্রভিন্নকরটামুখাঃ॥
জাম্বূনদনিভৈঃ সর্বে বর্মভিঃ সুবিভূষিতাঃ।
লব্ধলক্ষা রণে রাজন্ ঐরাবণসমা যুধি॥
উত্তরাৎ পর্বতাদেতে তীক্ষ্ণৈর্দস্যুভিরাস্থিতাঃ।
কর্কশৈঃ প্রবরৈর্যোধৈঃ কার্ষ্ণায়সতনুচ্ছদৈঃ॥

কিরাত যোদ্ধাদের মধ্যে কেউ গো-যোনি (নন্দিনীর দেহ থেকে উৎপন্ন হওয়ার ঘটনা স্মরণীয়), কেউ বা বানর-যোনি আবার কেউ বা মনুষ্য-যোনিজাত। এঁদের যুদ্ধ নৈপুণ্যের গভীরতা বোঝাতে তীক্ষ্ণ ও তীব্র বিষের উপমা ব্যবহৃত হয়েছে—

কিরাতৈশ্চ সমেষ্যামি বিষকল্পৈঃ প্রহারিভিঃ।

অবশ্য কিরাত যোদ্ধাদের একটি শাখাকে পাণ্ডবদের হয়ে যুদ্ধে অংশ নিতেও দেখা যায়। তবে পাণ্ডবদের সঙ্গে কিরাতদের শত্রুতার ইতিহাস বহু পুরোনো। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে (বর্তমান অসম) ভগদত্ত নামে এক বীর রাজা রাজত্ব করতেন। দিগ্বিজয়ের সময় অর্জুন এঁকে আক্রমণ করেছিলেন। সেই সময় অর্জুনের বিরুদ্ধে এবং ভগদত্তের হয়ে বহু জনজাতির সৈন্য যুদ্ধ করেছিল। এদের মধ্যে কিরাতরা অন্যতম। কুরুক্ষেত্রে ভগদত্তের নেতৃত্বে সেই কিরাত সৈন্যরাই আবার কৌরব পক্ষে যোগ দেন। অর্জুন প্রচুর সংখ্যায় এদের সংহার করেছিলেন এবং বৃষ্ণিবীর সাত্যকিকেও এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেখা যায়।

[মহা (k) ২.২৬.৯; ৫.১৯.১৫-১৬; ৫.১৯৫.৭; ৬.২০.১৩; ৬.৫০.৪৮; ৭.৪.৭; ৭.১১২.২৮-৩৬.৪৯; ৭.১১৯.৪৫; ৮.৭৩.২০; ১২.৬৫.১৩; (হরি) ২.২৫.৯; ৫.১৯.১৫-১৬; ৫.১৮৫.৭; ৬.২০.১৩; ৬.৫০.৪৮; ৭.৩.৩০; ৭.৯৬.২৮-৩৭, ৪৯; ৭.১০৩.৪০; ৮.৫৪.২০; ১২.৬৩.১৩]

□ দিগ্বিজয়কালে ভীমসেনও সাতজন কিরাত রাজাকে পরাস্ত করেন। তিনি বিদেহ দেশ থেকেই এঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। নকুলও দিগ্বিজয়ের সময়ে কিরাতদের পরাজিত করেন।

[মহা (k) ২.৩০.১৩; ৩২.১৭; (হরি) ২.২৯.১৩; হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে 'কিরাত' শব্দটি পাওয়া যায় না]

□ বহুপূর্বে দুষ্যন্তপুত্র ভরতও কিরাতদের জয় করেছিলেন। *[ভাগবত পু. ৯.২০.৩০]*

□ মহাভারত মতে, পুণ্ড্রদেশের রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেব কিরাতদেশও শাসন করতেন—

বঙ্গপুণ্ড্র কিরাতেষু রাজা বলসমন্বিতঃ।
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবেতি যো'সৌ
লোকে'তিবিশ্রুতঃ॥

[মহা (k) ২.১৪.২০; (হরি) ২.১৪.২০]

□ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় কিরাতদেশীয় বহু নৃপতি ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছিলেন। উপহার স্বরূপ সঙ্গে এনেছিলেন, চন্দন, অগুরু এবং অনান্য মূল্যবান কাঠ, চর্মদ্রব্য, মূল্যবান রত্ন, দ্রুতগামী পশু-পক্ষী এবং দশহাজার কিরাতজাতীয় দাস-দাসী। এই সব উপহার তাঁরা যুধিষ্ঠিরকে কর হিসেবে দিয়েছিলেন। এখানে কিরাতরাজাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কেও কিছু কথা বলা হয়েছে। এঁরা সকলেই চামড়ার পোশাক পরেছিলেন। হাতে ছিল ভয়ঙ্কর সব অস্ত্র। এদের গাত্রবর্ণ সোনার মতো। এঁরা স্বভাবগত-ভাবেই হিংস্র। তবে কিরাতরা মূলতঃ ফলমূলই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতেন—

ফলমূলাশনা যে চ কিরাতাশ্চর্মবাসসঃ।
ক্রূরশস্ত্রাঃ ক্রূরকৃতস্তাংশ্চ পশ্যাম্যহং প্রভো॥
চন্দনাগুরুকাষ্ঠানাং ভারান্ কালীয়কস্য চ।
চর্মরত্ন সুবর্ণানাং গন্ধানাঞ্চৈব রাশয়ঃ॥
কৈরাতকীনামযুতং দাসীনাঞ্চ বিশাংপতে।
আহৃত্য রমণীয়ার্থান্ দূরগান্ মৃগপক্ষিণঃ॥
নিচিতং পর্বতেভ্যশ্চ হিরণ্যং ভূরিবর্চসম্।
বলিঞ্চ কৃৎস্নমাদায় দ্বারি তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ॥

মহাভারতের এই শ্লোকগুলিকে ব্যাখ্যা করে পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, কিরাতদেশে প্রাকৃতিক ও বনজ সম্পদের প্রাচুর্য্য ছিল এবং এরা সেই সব সম্পদের সঠিক ব্যবহারও জানত।

[মহা (k) ২.৫২.৮-১৩; (হরি) ২.৫০.৮-১৩;
Suniti Kumar Chatterjee;
Kirāta-Jana kṛti; Calcutta;
The Asiatic Society; 1951, p. 35]

□ ভীষ্ম পর্বে বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র কিরাতদেশ নয়, প্রোষক, কলিঙ্গ, তোমর, হন্যমান ও করভঞ্জক দেশেও কিরাত জাতীয়রা বাস করেন—

প্রোষকাশ্চ কলিঙ্গাশ্চ কিরাতানাঞ্চ জাতয়ঃ।
তোমরা হন্যমানাশ্চ তথৈব করভঞ্জকাঃ॥

পদ্মপুরাণ অনুরূপভাবে উত্তর এবং পূর্বদেশগুলিতে উপরিউক্ত জনজাতির সঙ্গে কিরাতদের বাসস্থান নির্ণয় করেছে।

[মহা (k) ৬.৯.৬৯; (হরি) ৬.৯.৬৯;
পদ্ম পু. (স্বর্গ) ৩.৬৫-৬৬]

□ পুরাণে কলিযুগের এক ভাবী রাজা হিসেবে প্রমিতির নাম করা হয়েছে। এই প্রমিতি যে সকল তথাকথিত পাষণ্ড জনজাতিগুলির বিনাশ করবেন, তাদের মধ্যে কিরাত অন্যতম। *[বায়ু পু. ৫৮.৮৩]*

□ পুরাণে একথাও বলা হয়েছে যে, ভগবান বিষ্ণু কল্কি অবতারে আবির্ভূত হয়ে কিরাত নিধন করবেন। *[বায়ু পু. ৯৮.১০৮;*
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৩.১০৯; ৩.২৯.১৩১]

□ প্রকৃতপক্ষে কিরাতরা তিব্বতি-বার্মিজ ও মঙ্গোলিয়ান জনগোষ্ঠীর মানুষ। পণ্ডিত K.C. Mishra-র মতে, বর্তমান নেপালের পূর্বাংশে দুধ-কোশী ও কর্কী (karki) নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগে প্রাচীন কিরাতদেশ অবস্থিত ছিল। পূর্বে উল্লিখিত নেপালের কিরন্তী জনজাতিই কিরাতদের বংশধর। তবে কিরন্তী কোনো একক জনগোষ্ঠী নয়। খাম্বু (khambu), লিম্বু (Limbu), যক্ষ (Yakha), ডাঙ্কর (Dankar), হায়ু (Hayu), থামই (Thami) ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সমষ্টি হল কিরাত। কথাটা অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মতই দৃঢ় করে। *[TIM (Mishra), p. 98-99]*

□ পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সী গ্রন্থে কির্‌হাদাই (kirrhadai) বা কির্‌হাদিয়া Kirrhadia) নামে একটি জনজাতির কথা পাওয়া যায়। টলেমী বলেছেন, এই কির্‌হাদিয়াদের দেশ বলতে প্রাচীন ত্রিপুরাকে বোঝানো হত। পণ্ডিতদের ধারণা, এই কির্‌হাদিয়ারাই প্রাচীন কিরাত। প্লিনী এবং মেগাস্থিনিস এদের স্কাইরাইটস্ (Skyrites) নামে উল্লেখ করেছেন। মেগাস্থিনিসের মতে এরা যাযাবর জনজাতি।

কালিদাসের রঘুবংশেও কিরাতদের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিদাসের ধারণায় কিরাতরা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বদিকের বাসিন্দা।

আবার N.L. Dey সরাসরিই কিরাতদের তিব্বতের জনজাতি বলে মনে করেছেন।

[TAI (Law) p. 282-283;
EAIG (Kapoor) p. 380;
GDAMI (Dey) p. 100]

কির্ম্মীর১ একজন রাক্ষস। বক রাক্ষসের ভাই। মহাভারতের বনপর্বে বিদুরের কাছে ধৃতরাষ্ট্র কির্ম্মীর বধের উপাখ্যান শুনতে চেয়েছিলেন। বিদুর বলেন যে, পাণ্ডবরা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে হস্তিনাপুর থেকে প্রস্থান করে কাম্যকবনে গমন করেন। এই কাম্যকবনেই মধ্যরাত্রিতে নরমাংসভোজী রাক্ষসরা ঘুরে বেড়াত। সেই কারণে তপস্বী, রাখাল-বালক এমনকী পথিকরাও এই বনে আসত না। কিন্তু পাণ্ডবরা সেই সময়েই কাম্যকবনে প্রবেশ করলে ভয়ঙ্কর রূপধারী এক রাক্ষস তাঁদের পথ আটকে দাঁড়াল। রাক্ষসের ওই বিকট চেহারা দেখে দ্রৌপদী ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। যুধিষ্ঠির সেই বিশাল আকৃতির রাক্ষসকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে রাক্ষসটি বলল—আমি বকরাক্ষসের ভাই এবং কির্ম্মীর নামে পরিচিত। এই বনে যারা প্রবেশ করে, তাঁদের যুদ্ধে হারিয়ে আমি ভক্ষণ করি। এখন তোমরা আমার খাদ্য হয়ে এই বনে যখন এসেছ, তখন তোমাদের সবাইকে যুদ্ধে জয় করে ভক্ষণ করব।

যুধিষ্ঠির তখন কির্ম্মীরকে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন যে, শত্রুরা রাজ্য হরণ করায় তিনি ভীম-অর্জুন প্রভৃতিদের সঙ্গে এই বনে বাস করার ইচ্ছায় এসেছেন। যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে কির্ম্মীর বলল যে, ভীমকে বধ করার জন্য আমি পৃথিবীর সব জায়গায় ঘুরেছি। কিন্তু কোথাও ভীমকে পাচ্ছিলাম না। আজ ভাগ্যবশতঃ এঁকে সামনে পেয়েছি। মন্ত্রশক্তির বলে ব্রাহ্মণের রূপ ধরে ভীম একচক্রা নগরীর বনপ্রান্তে আমার প্রিয় ভাই বকরাক্ষসকে হত্যা করেছিল। এই ভীমই আমার পরম মিত্র হিড়িম্বকে বধ করে তার বোন হিড়িম্বাকে হরণ করেছিল। আজ সব শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করব আমি। ভীমের রক্ত দিয়ে বকের তর্পণ করব। ভীমকে বধ করে আমার ভাই এবং বন্ধুর কাছে ঋণমুক্ত হতে চাই আমি। কির্ম্মীর এই কথা বললে ভীম একটি প্রকাণ্ড গাছ উপড়ে নিয়ে কির্ম্মীরের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। দুজনের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। এরপর ভীম, কির্ম্মীরকে প্রচণ্ড বেগে ঘোরাতে থাকেন। কির্ম্মীরকে অবসন্ন হতে দেখে ভীম তাকে সবেগে ভূতলে নিক্ষেপ করলেন এবং কির্ম্মীরও প্রাণত্যাগ করে।

[মহা (k) ৩.১১.১-৬৭; (হরি) ৩.১০.১-৬৭]

কির্ম্মীর২ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে যেসব বিশিষ্ট নাগের নাম উল্লিখিত হয়েছে কির্ম্মীর তাঁদের মধ্যে একজন। পাতালের পঞ্চম তলে যেসব নাগেরা বসবাস করেন কির্ম্মীর তাঁদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.৩৭]

কিশোর১ একজন দানব, যিনি চন্দ্র এবং দেবতাদের তারকাময়-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৭৩.২১; ১৭৭.৭]

কিশোর২ দেবীভাগবত পুরাণে কিশোর নামে একজন দৈত্যের উল্লেখ আছে। এই কিশোরই দ্বাপর যুগে মল্লবীর মুষ্টিক নামে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণ তাকে বধ করেন।

[দেবীভাগবত পু. ৪.২২.৪৫]

কিষ্কিণ্ডী পৌরাণিক কেতুমাল বর্ষের অন্তর্ভুক্ত একটি জনপদ কিষ্কিণ্ডী। *[বায়ু পু. ৪৪.১৩]*

কিষ্কিন্ধ্যা ঋষ্যমূক পর্বতের কাছে অবস্থিত একটি প্রাচীন নগরী। রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকে একটি গুহাবিশেষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আমাদের মনে হয় কিষ্কিন্ধ্যার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত গুহাকেই এখানে কিষ্কিন্ধ্যা গুহা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই গুহার সামনেই সুগ্রীব ও বালীর দ্বৈরথ শুরু হয় এবং এখানেই বালীর অন্যমনস্কতার সুযোগে রামচন্দ্র তীর নিক্ষেপ করে তাঁকে বধ করেন—

ততঃ প্রীত মনাস্তেন বিশ্বস্তঃ স মহাকপিঃ।
কিষ্কিন্ধ্যাং রামসহিতো জগাম চ গুহাং তদা॥
ততো'গর্জদ্ধরিবরঃ সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ।
তেন নাদেন মহতা নির্জগাম হরীশ্বরঃ॥
অনুমান্য তদা তারাং সুগ্রীবেণ সমাগতঃ।
নিজঘান চ তত্রৈনং শরেণৈকেন রাঘব॥

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে আবার কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। বলা হয়েছে যে, গুহামধ্যে অবস্থিত এই নগরীটিতে বহু সুরম্য প্রাসাদ, সুন্দর বনভূমি ও স্ফটিক নির্মিত তোরণ ছিল। নগরীর সুরক্ষায় নিয়োজিত থাকত বহুসংখ্যক বীর বানর সৈন্য। সেখানে বসবাসকারী রমণীরা ছিল অতি সুন্দর। *[রামায়ণ ১.১.৬৭-৬৯; ৪.১১.২১, ২৪; ১২.১৩; ১৩.১২৯; ৪.৩৩.১-২০; মহা (k) ৩.২৮০.১৫, ৩৯; ২৮৩.৫.৭, ১৩; (হরি) ৩.২৩৪.১৫, ৩৯; ২৩৬.৫.৭; ১৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৪৭]*

□ রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে একে তপ্ত সোনার রঙের, বহুবিধ যন্ত্র ও ধ্বজায় ঢাকা নগরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

হরিবাগুরয়া ব্যাপ্তাং তদা কাঞ্চনভূষণাম।
প্রাপ্তাঃ স্ম ধ্বজযন্ত্রাঢ্যাং কিষ্কিন্ধ্যাং বালিনঃ পুরীম্॥

সুরক্ষার প্রয়োজনে কিষ্কিন্ধ্যার চারদিকে পরিখা কাটা হয়েছিল—

ততস্তে হরয়ঃ সর্বে প্রাকার-পরিখান্তরাম্।

এখানে অনেকগুলি সুরক্ষিত দুর্গও ছিল। এগুলিও খুব সম্ভবত কিষ্কিন্ধ্যার নিরাপত্তা ব্যবস্থারই অংশ অবশ্য পরবর্তী একটি শ্লোকে কিষ্কিন্ধ্যাকে অতিদুর্গম গিরিসঙ্কট বা 'মাউন্টেন পাস' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। হয়তো দুর্গম পার্বত্য অবস্থানের জন্যই রামায়ণের কবি কিষ্কিন্ধ্যাকে পার্বত্য গুহা বা কিষ্কিন্ধ্যা গিরিগহ্বর বলে উল্লেখ করেছেন।

[রামায়ণ ৪.১৪.৬; ১৯.১৫; ২৬.৪১; ৩১.১৬. ২৬-২৭; ৬.২৮.৩০]

□ দুন্দুভি রাক্ষসের ছেলে মায়াবীর সঙ্গে বানররাজ বালীর শত্রুতার সম্পর্ক ছিল। মায়াবী

একদিন কিষ্কিন্ধ্যা নগরী অর্থাৎ বালীর অধীনস্থ অঞ্চলে এসে বালীকেই যুদ্ধে আহ্বান করে।

[রামায়ণ ৪.৯.৩-৫; ১১.২১-২৭]

□ বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীব সসৈন্যে রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে প্রবেশ করেন। সেখানেই বানরাধিপতিরূপে সুগ্রীবের অভিষেক হয়। *[রামায়ণ ৪.২৬.১৮]*

□ প্রস্রবণ পর্বতটি কিষ্কিন্ধ্যার কাছেই অবস্থিত ছিল। সুগ্রীবের অভিষেকের পর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ এই পর্বতেই কিছু সময় কাটিয়ে ছিলেন।

[রামায়ণ ৪.২৬.১৮]

□ সহদেব দিগ্বিজয়কালে কিষ্কিন্ধ্যা গুহা আক্রমণ করেছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামে দুই বানরবীরের সপ্তাহব্যাপী ঘোর যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধে কোনো পক্ষই জয়লাভ করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত বানর বীরদ্বয় সহদেবের বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে প্রচুর ধনরত্ন দান করেন। এভাবেই তাঁরা যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। *[মহা (k) ২.৩১.১৭-১৮; (হরি) ২.৩০.১৭-১৮]*

□ রাবণবধের পর রামচন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যার যুবরাজ রূপে অঙ্গদকে অভিষিক্ত করেন।

[মহা (k) ৩.২৯১.৫৭; (হরি) ৩.২৪৫.৫৭]

□ বায়ু পুরাণে কিষ্কিন্ধ্যা গুহাকে মহাদেব ও পার্বতীর স্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[বায়ু পু. ৫৪.১১৬]

□ দেবী সতী কিষ্কিন্ধ্যায় তারা নামে পূজিতা।

[মৎস্য পু. ১৩.৪৬]

□ প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যা নগরীটি তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এই অঞ্চলটি বর্তমান কর্ণাটকের হাম্পি (Hampi) -র নিকটবর্তী। পণ্ডিতরা মনে করেন যে, তুঙ্গভদ্রা নদীরই প্রাচীন নাম পম্পা সরোবর।

[J.G. Knott; Beyond the Bitter Sea; California; Dockside Sailing Press; 2014; p. 208]

□ N.L. Dey-এর মতে, প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যা যেখানে অবস্থিত ছিল, সেটি বর্তমানে একটি বৃহদাকার পাহাড়ী ঢিবি বিশেষ। এটি সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন বন্য লতায় ঢাকা। ঢিবিটি বেলে পাথরে তৈরি হওয়ায় এর রঙ একটু সাদাটে ধরনের। সেই কারণে লোকমুখে প্রচলিত আছে যে, বানররাজ বালীর দেহভস্ম ও হাড় জমা হয়েই ঢিবিটিতে এই ধরনের রঙ তৈরি হয়েছে।

বর্তমানে কিষ্কিন্ধ্যা বলে যে অঞ্চলটিকে চিহ্নিত করা হয়, তার নাম অনগন্দী (Anagandi) এটি বেলারির নিকটে বিজয়নগর থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। *[GDAMI (Dey) p. 101]*

কিসত্ব একটি পৌরাণিক জনপদ বলে উল্লিখিত হয়েছে। *[বায়ু পু. ৪৫.১১০]*

কীকট১ একটি প্রাচীন জনপদ তথা জনজাতির নাম। কীকট জনজাতির উল্লেখ মেলে প্রধানত ঋগ্‌বেদে। মহাকাব্যে কিংবা পুরাণে কীকট খুব বহুল ব্যবহৃত জাতি নাম নয়। পুণে থেকে প্রকাশিত মহাভারতের পরিশোধিত সংস্করণে (Critical Edition) একবার মাত্র কীকট জনপদের নাম ধৃত হয়েছে হীন জনজাতি হিসেবে—

কারস্করান্ মহিষকান্ কলিঙ্গান্ কীকটাটবীন্।
কর্কোটকান্ বীরকাংশ্চ দুর্ধর্মাংশ্চ বিবর্জয়েৎ॥

মহাভারতের অন্যান্য সংস্করণে অবশ্য উক্ত শ্লোক থেকে কীকট নামটি বাদ পড়েছে।

পুরাণগুলির মধ্যে একমাত্র ভাগবত পুরাণেই কীকটদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাগবত পুরাণের সপ্তম স্কন্ধে অতিহীন জনজাতি হিসেবে কীকটদের নাম উল্লেখ করে অবশেষে জানানো হয়েছে যে, ভগবান বিষ্ণুর পাদস্পর্শে এই কীকটরা পাপমুক্ত হয়েছিল। ভাগবত পুরাণের প্রথম স্কন্ধে স্পষ্টই উল্লিখিত হয়েছে যে, কলিযুগে কীকটদেশে অজনপুত্র (বা অজিনসুত) বুদ্ধ আবির্ভূত হবেন—

বুদ্ধোনাম্নাজনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি।

[মহা (Critical ed.) ৮.৩০.৪৫; ভাগবত পু. ১.৩.২৪; ৭.১০.১৯]

□ পণ্ডিতরা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, বেদ পরবর্তীযুগে, মহাকাব্য-পুরাণে যে জনপদটি মগধ নামে বিখ্যাত হয়েছিল এবং মহাকাব্যের ঘটনাক্রম থেকে আরম্ভ করে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল, সেই স্থানটিই বেদমন্ত্রে কীকট নামে চিহ্নিত হয়েছে। পণ্ডিত D.C. Sircar-এর মত অনুযায়ী প্রাচীন কীকট দেশ বলতে মূলত মগধের উত্তরাংশ এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলকে বোঝানো হয়। বর্তমান বিহারের বৃহত্তর গয়া অঞ্চলে কীকট জনজাতির

আবাস। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী বর্তমান বিহারের উত্তরাংশ থেকে শুরু করে নেপাল পর্যন্ত অঞ্চলে একসময় বিখ্যাত লিচ্ছবি জনজাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর সেই লিচ্ছবি জনজাতিতেই ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব।

[GAMI (Sircar) p. 107]

□ তবে ঋগ্‌বৈদিক কাল থেকে কীকট জাতির প্রতি আর্যদের এমন হীন ভাবনার কারণ কী—এ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে। বৈদিকযুগে রচিত কোষগ্রন্থ নিরুক্তে যাস্ক কীকটদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বেদমন্ত্রে কীকটদের যে উল্লেখ পাওয়া যায় সেটিকে গ্রহণ করেছেন এবং তার ভিত্তিতেই কীকটদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে কীকটদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে—হে ইন্দ্র! কীকটদের মধ্যে যে গোসম্পদ আছে, তা দিয়ে ওদের কী লাভ হবে? ওরা সোমের সঙ্গে মিশ্রিত হবার উপযুক্ত দুগ্ধ উৎপাদন করে না, দুগ্ধ প্রদান করে যজ্ঞীয় পাত্রকে দীপ্তও করে না। ওই গোসম্পদ আমাদের কাছে এনে দাও, নীচ জাতীয়দের সম্পদ, প্রমগন্দের ধন আমাদের কাছে আনো—

কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবো নাশিরং
দুহ্রে ন তপন্তি ঘর্মম্।
আ নো ভর প্রমগন্দস্য বেদ
নৈচাশাখং মঘবন্রন্ধয়া নঃ।।

[ঋগ্‌বেদ ৩.৫৩.১৪]

নিরুক্তকার যাস্ক এবং ঋগ্বেদের টীকাকার সায়নাচার্য—দুজনেই এই মন্ত্রে উল্লিখিত কীকটদের অনার্য জনজাতি তথা কীকটদেশকে অনার্যজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বলে বর্ণনা করেছেন—

* কীকটেষু অনার্যনিবাসেষু জনপদেষু।

[সায়নাচার্য]

* কীকটো নাম দেশো'নার্যনিবাসঃ। *[নিরুক্ত]*

অর্থাৎ কীকটেরা বেদোক্ত সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত নন, তাই আর্যভাবনায় তাঁরা হীন। একথাও ঠিক যে ঋগ্‌বেদের কালে পূর্বভারতে, মগধ এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে আর্যায়ণ ঘটেনি। বৈদিক সভ্যতা তখনও উত্তর-পশ্চিম ভারতে, সিন্ধু এবং তার উপনদী সমূহ এবং সরস্বতী তীর সহ ভূমিতেই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে মাত্র। ফলে পূর্ব ভারতের অধিবাসীদের সম্পর্কে হীন ভাবনা পোষণ করা সে সময়কার আর্যদের পক্ষে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এখানে কৌতূহলের জন্ম দেয় 'প্রমগন্দ' নামটি। প্রমগন্দ কীকটদের অধিপতি। যাস্ক বলছেন— 'মগন্দ' বলতে সুদের কারবারি বোঝায়, যারা চড়া সুদে টাকা ধার দেয়, কিংবা 'মগন্দ' বলতে খুব আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর লোককেও বোঝানো হয়, যারা নিজেকে ছাড়া জগতের অন্য কারও সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ নিয়ে চিন্তা করে না, চিন্তা করার প্রয়োজনও অনুভব করে না। এই মগন্দের পুত্র প্রমগন্দ। সুতরাং তিনিও পিতা-পিতামহের পরম্পরায় হীন বৃত্তি এবং হীন ভাবনাই লাভ করেছেন বলা বাহুল্য। যে দেশের রাজার প্রকৃতিই এত হীন, সে দেশের প্রজা সম্পর্কেও সমকালীন মানুষজনের মনে খুব উচ্চ ধারণা না থাকাই স্বাভাবিক।

[নিরুক্ত (Sarup) ৬.৩২]

□ ঋগ্‌বেদে এবং নিরুক্তে কীকটদের সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা গবেষকদের মতামতকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিয়েছে। পণ্ডিত Zimmer যেমন বেদ এবং নিরুক্তের প্রমাণে কীকটদের অনার্যজাতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন, জার্মান পণ্ডিত Weber কিন্তু তেমনটি মনে করেন না। Weber-এর মতে কীকটদেশের লোকেরা মূল আর্য ভূখণ্ড ছেড়ে সেদেশে বসতি স্থাপন করেছিলেন ঠিকই, হয়তো বেদ-বর্ণিত আর্য-সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুতও হয়েছিলেন—কিন্তু আদতে তাঁরাও আর্যই ছিলেন। পরবর্তী সময়েও এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তুলনায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বেশি থাকায় আর্য গ্রন্থগুলিতে কীকটদেশের নাম কখনোই সাদরে উল্লিখিত হয়নি। পণ্ডিত B.C.Law কীকটদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে Weber-এর সঙ্গেই খানিক সহমত পোষণ করেছেন। Law অবশ্য কীকটদের মধ্যে মিশ্ররক্তের অর্থাৎ আর্য-অনার্য সংকরায়ণের বিষয়টিতেও গুরুত্ব দিয়েছেন যথেষ্ট।

*[Vedic Index, Vol.1, p. 159;
TAI (Law) p. 387]*

□ তবে লক্ষণীয়, এত নীচ জাতি হিসেবে কীকটদের কথা বারংবার উল্লিখিত হলেও বেদ পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষের মানচিত্রে রাজনৈতিক গুরুত্বের বিচারে 'মগধ', যাকে পণ্ডিতরা কীকটদেশের সঙ্গে অভিন্ন বলেই ধারণা

করেন—সেই মগধের নাম কিন্তু একেবারে প্রথম সারিতে উঠে এসেছে। পণ্ডিতদের ধারণা কীকটদের রাজা হিসেবে যে 'প্রমগন্দ' বা 'মগন্দ'-এর কথা বেদমন্ত্রে পাওয়া যায়—তার থেকেই মগধ শব্দটির উৎপত্তি এবং এটাও ঠিক যে, 'মগন্দ' আর 'মগধ' শব্দদুটির ধ্বনিগত সাদৃশ্যের কথা বিচার করলে সে সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

□ কীকটদের বৈদিক সংস্কারচ্যুত হওয়া বা তাঁর আদতে আর্য, না কী অনার্য—এসব আলোচনার মাঝেও প্রশ্ন একটা থেকেই যায়। লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, বেদমন্ত্র কীকটদের গোসম্পদ বিষয়ে উল্লেখ। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বিশ্বামিত্র দেবরাজ ইন্দ্রকে উদ্দেশ করে বললেন—কীকটদের গোসম্পদ দান করে কী লাভ? তারা তো যজ্ঞে বা সোমরসে মেশানোর উপযুক্ত দুগ্ধ উৎপাদন করে না, বরং সেই নীচ জাতীয় কীকট আর তাদের রাজা প্রমগন্দের সম্পদ, এখানে সম্পদ বলতে মূলত গোসম্পদই বোঝানো হচ্ছে—সেই সম্পদ তুমি এদেশে নিয়ে এসো। আমরা মেনে নিচ্ছি যে, বর্তমান উত্তর-পশ্চিম ভারত পঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি অঞ্চল অতি প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত গোপ্রজনন এবং দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য যথেষ্টই বিখ্যাত। কিন্তু প্রশ্ন হল, পূর্ব-ভারতের লোকগুলি না হয় আর্যদের বিচারে তেমন ভালো হয়, কিন্তু সেখানকার গোরুগুলি বা গোদুগ্ধ কী দোষ করল? কী এমন কারণ থাকতে পারে যার ফলে শুধুমাত্র সে দেশের মানুষকে গোপন করতে নিষেধ করেই তাঁরা ক্ষান্ত হচ্ছেন না, পারলে সেখানকার গো-সম্পদের পুরোটাই আর্যদের বাসভূমিতে তুলে আনতে চান? গবেষক-সমাজতত্ত্ববিদরা এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন এবং তাঁদের গবেষণা থেকে কীকটদের পরিচয় দিয়ে যে সংশয়গুলি তৈরি হয়েছে, তা অনেকটাই মিটে যাবে বলে মনে হয়।

গবেষকরা মহাভারতের Critical Edition-এ যেভাবে কীকট, কর্কোটকদের নাম একত্রে আলোচিত হয়েছে, সেখান থেকে তাঁদের ভাবনা শুরু করতে চান। 'কীকট' আর 'কর্কোটক' শব্দদুটির মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্যও অবশ্যই আছে, আর মহাভারতের প্রমাণে আমরা জানি যে, কর্কোটক মহাকাব্য পুরাণে কাদ্রবেয় নাগ হিসেবে প্রসিদ্ধ। এই নাগদের কশ্যপের বংশধর বলে চিহ্নিত করা হলেও এঁরা যে মূলত প্রাচীন অনার্য নাগ জনজাতি এবং কর্কোটক যে একজন নাগজাতীয় গোষ্ঠীপতি বা রাজা—তা বুঝে নিতে আমাদের কষ্ট হয় না। এখন একবার মহাকাব্য বর্ণিত মগধ দেশের বিবরণে চোখ রাখতে হবে আমাদের। কৃষ্ণ মগধের রাজধানী গিরিব্রজপুরের যে বর্ণনা দিচ্ছেন তাতে তৎকালীন ভারতের দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট মগধ রাজ জরাসন্ধের দুর্গের কথা যেমন আছে, ঠিক তেমনই আছে গিরিব্রজনগরের চারজন বিশিষ্ট নাগের বাসভূমির কথাও। যদিও কর্কোটক নাগের কথা মহাভারতের শ্লোকে নেই তবু কীকট দেশের অবস্থান এবং কর্কোটক শব্দের সঙ্গে তার একত্র উল্লেখের কথা পর্যালোচনা করে গবেষকরা মূলত এই সিদ্ধান্তেই আসতে চান যে প্রাচীন মগধে আর্য এবং অনার্য জাতির সহাবস্থানের ঘটনাটা খুব স্বাভাবিক ভাবেই ঘটেছিল, যার কারণে সেখানে বসবাসকারী আর্যরা খানিকটা নিন্দিতও হয়েছেন। তবুও বর্তমান বিহার প্রদেশের বাসিন্দা বলতে যেমন সাধারণ নাগরিকদের পাশাপাশি ছোটনাগপুর মালভূমির উপজাতিগুলিকেও বোঝায়, প্রাচীন কীকট বা মগধের বাসিন্দা বললেও কিন্তু এই উপজাতিগুলির কথা এসেই পড়বে এবং মহাভারতের কালেই নাগ জনজাতির নামে বা পরিচয়ে যেমনটি বোঝা যায়—ঐ অঞ্চলের আর্য শাসকের তুলনায় এঁদের প্রতিপত্তি কিন্তু কম ছিল না, বরং এই উপজাতীয় মানুষগুলি নিপুণ যোদ্ধা ছিলেন বলেই আর্য রাজার সঙ্গে তাঁদের সুসম্পর্কের ফলে মগধের রাজধানী গিরিব্রজপুরের বাড়তি সুরক্ষাও সুনিশ্চিত করা গেছে। (দ্র. গিরিব্রজপুর, মগধ) যাইহোক, গবেষকরা এই ভাবনা থেকে কীকটদের কোল, শবরের মতো উপজাতি হিসেবেই দেখতে চান। এদের 'মগন্দ' বা স্বার্থপর-আত্মকেন্দ্রিক বলার পিছনেও আর্যদের সঙ্গে এদের সংস্কৃতি বা জীবনশৈলীর পার্থক্যই প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে। আর্যদের ধারণায় ছোটনাগপুর মালভূমির এই উপজাতিগুলির জীবন শুধুমাত্র খাদ্য-পানীয় সংগ্রহ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যাগযজ্ঞ বা দেবতার উদ্দেশে সমর্পণ বা আহুতির ভাবনার কোনো অস্তিত্বই ছিল না এদের মধ্যে—

"What are the cows doing among the Kíkatas. They yeild no milk for oblations and they heat no fire." In the commentary it is explained that kíkata was a country inhabited by a people who were not were not Aryans, and the following lines are quoted from theBhágavata Purána (1, 3, 24). Then when the Kali age has begun, a person named Buddha, son of Anjana, will be born among the Kíkatas, in order to delude the Asuras. The commentator explains "that is in the District of Gayá." The Kíkatas therefore were people who lived in Magadha or Bihár. The Dravidian people who are said to have expelled them from a portion of the country, are always called Siviras in the Purános, and it is probable that the snake race, Cheros and Kols, to whom the antiquities are ascribed, were Kíkatas.

The Kíkatas according to the commentator Sáyana being destitute of faith say "what fruit will result from sacrifices, claims or oblations? Rather eat and drink, for there is no other world but this"—a doctrine modern Kols decidedly subscibe to.

কীকটদের ছোটনাগপুরের উপজাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে অভিন্ন করে দেখলে এদের গোসম্পদ দিয়ে কেন কোনো লাভ নেই—তাও বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়। পণ্ডিত G.S. Ghurye-এর কথায় এই ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়—কোল, সাঁওতাল, মুণ্ডারা কৃষিকাজে অর্থাৎ জমিতে লাঙল দেবার সময় বলদ বা মোষের ব্যবহার জানলেও গোরুর দুধ 'দোহন' করার বা গো-দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য খাদ্য তালিকায় রাখার অভ্যাস এদের নেই; অতীতেও ছিল না এবং বর্তমান কালেও নেই—

It has been observed of the Kols in general, that is of the Hos, the Mundas, the Bhumij and perhaps also the Santals, that they plough with cows as well as oxen, though as plough animals buffaloes are preferred. They generally did not, Perhaps even now rarely do, touch or use milk.

The Khonds further down south-east when reported upon about ninety years before were also said to have not milked their cows. In view of these practices it is interesting to note that Chotanagpur and that part of their country was sometimes known by the name of Kokera which Dalton thought to have had some connection with the word Kokpat which, as it is, or in the form Konpat, was used to denote the Mundas.

Here we should like to draw the attention of the reader to the Vedic word 'Kikata" which was applied to South Bihar. The connection in which the people of that region were referred to in the Anarya country called Kikata (modern south Bihar) there is no use of cows. May we conclude that the dislike for or prejudice against cow milk has been a cultural trait of south Bihar for over 3,000 years?

পণ্ডিত Ghurye-র ভাবনা আমাদের কাছে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়। মূলত গোসম্পদের উপর নির্ভরশীল আর্যদের চোখে এদেশের আদিবাসীদের খাদ্যভ্যাস এবং গো-দুগ্ধ ব্যবহার না করার প্রবণতা সেই বৈদিককালেই গড়ে উঠে থাকবে আর সেই কারণেই কীকটদের তাঁরা এমন জনজাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যারা গোসম্পদের ব্যবহার জানে না। তাই গো-দুগ্ধপ্রিয় ঋষির কাছে কীকটদের গোসম্পদও মূল আর্যজনবসতিতে নিয়ে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়ে থাকবে।

[Edward Tuite Dalton, Description Ethnology of Bengal, Calcutta: Office the Superintendent of Government Printing, 1872 pp. 165, 225; G.S. Ghurye, The Scheduled Tribes, Bombay: Popular Book Report, 1959, pp. 216-217]

কীকট$_{২}$ ঋষভদেবের নয় পুত্রের মধ্যে একজন।

[ভাগবত পু. ৫.৪.১০]

কীকট$_{৩}$ ধর্মের ঔরসে ককুদের গর্ভে সঙ্কট নামে পুত্রের জন্ম। এই সঙ্কটের পুত্রের নাম কীকট। কীকট থেকেই কীকট দেবতাগণের উৎপত্তি।

[ভাগবত পু. ৬.৬.৬]

কীচক$_{১}$ বিরাটরাজার সেনাপতি ও শ্যালক ছিলেন কীচক। তিনি ছিলেন সূত-পুত্র। মহাভারতে একাধিকবার সেকথা উল্লিখিত হয়েছে। সাধারণভাবে ক্ষত্রিয় পুরুষের সঙ্গে ব্রাহ্মণ কন্যার মিলনে এই 'সূত' জাতির উৎপত্তি। সূতরা রাজার সারথ্য করতেন বলে তাঁরা 'রথকার' নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে মহাভারতের যে পাঠ প্রচলিত আছে, সেখানে বলা হয়েছে যে, এই সূতদের অধিপতি ছিলেন কেকয়। অর্থাৎ কেকয় এখানে বিখ্যাত দেশ-নাম নয়, মানুষের নাম। প্রতিলোম জাতিত্বের কারণে সূতদের অধিপতিরা 'রাজা' উপাধি লাভ করতে পারতেন না। কেকয় সম্ভবতঃ মালবদেশের দুই কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা পত্নী মালবীর গর্ভে কীচক জন্মগ্রহণ করেছিলেন কেকয়ের কনিষ্ঠা পত্নী অর্থাৎ মালবীর অনুজার নামও ছিল মালবী। সম্ভবত মালবদেশের কন্যা বলেই তাঁদের মালবী নাম হয়েছে। কেকয়ের ঔরসে তাঁর কনিষ্ঠা পত্নী দ্বিতীয়া মালবীর গর্ভে চিত্রা নামে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই চিত্রাই পরবর্তীকালে সুদেষ্ণা নামে খ্যাত হন।

দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত মহাভারতের এই পাঠটিতে কীচকের বংশ পরিচয় সম্পর্কিত যে তথ্য পাওয়া যায়, মহাভারতের উত্তর ভারতীয় বা বঙ্গীয় সংস্করণে সেই তথ্যটি পাওয়া যায় না।

[মহা (গীতা প্রেস) দাক্ষিণাত্য অধিক পাঠ ৪.১৬ অধ্যায়; দ্বিতীয় খণ্ড; পৃ. ১৮৯৩]

☐ কেকয়ের কন্যা সুদেষ্ণার সঙ্গে মৎস্যদেশের রাজা বিরাটের বিবাহ হল। বৃদ্ধ বিরাটের তরুণী ভার্য্যা হয়ে সুদেষ্ণা এলেন। রসশাস্ত্রে 'শকার' বলে একটি চরিত্র আছে। যার অর্থ রাজার শ্যালক। তবে কীচক শুধুমাত্র রাজার শ্যালক হয়েই রইলেন না। সুদেষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে কীচকও প্রায় পাকাপাকিভাবে এসে বসলেন বিরাট-নগরে। কীচকের বাহুবল ছিল সাংঘাতিক, ফলে তাঁর বীরত্বও প্রশ্নাতীত। মহাভারতে সেকথার প্রমাণও পাওয়া যায় বহুবার। ত্রিগর্ত্তের রাজা সুশর্মা প্রভৃতিরা যে মৎস্যদেশ আক্রমণ করতে পারতেন না, তার একটা বড়ো কারণ কীচক। সেই কারণে এবং রাজশ্যালক হওয়ার সুবাদে, খুব শীঘ্রই কীচক রাজার সেনাপতির পদটি দখল করে বসলেন। আমরা জানি, পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসের কারণে মৎস্যদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীর ছদ্মবেশে বিরাটরাজার মহিষী সুদেষ্ণার পরিচারিকা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। একদিন কীচক সুদেষ্ণার গৃহে সৈরিন্ধ্রীকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং তাঁকে কামনা করতে লাগলেন।

কীচক দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে তাঁর রূপের স্তুতি করতে লাগলেন এবং সৈরিন্ধ্রীকে বললেন—আমার আর যেসব পত্নীরা আছেন, তাঁদের সকলকে আমি ত্যাগ করব। তারা সকলেই তোমার দাসী হয়ে থাকবে। আর আমিও তোমার দাস হয়ে থাকব—

ত্যজামি দারান্ মম যে পুরাতনা
ভবন্তু দাস্যস্তব চারুহাসিনি॥

কীচকের কথা শুনে দ্রৌপদী বললেন যে, আমি হীনবর্ণা সৈরিন্ধ্রী। রাজমহিষীর কেশসজ্জা ও পরিচর্য্যা করে থাকি। এইরকম একজন নীচ জাতির রমণী আপনার মতো সেনাপতি ও রাজ-শ্যালকের পক্ষে অনুপযুক্ত। উপরন্তু আমি পাঁচ-পাঁচজন গন্ধর্বের পত্নী। আমার গন্ধর্ব স্বামীরা আপনার এই দুঃসাহসের কথা জানতে পারলে আপনাকে হত্যা করবে।

কিন্তু সৈরিন্ধ্রীর কথায় কীচক কর্ণপাত করলেন না। তিনি বললেন আমি গন্ধর্বদের ভয় করি না। আর এইরকম শত-শত, হাজার-হাজার গন্ধর্ব যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে, তো অনায়াসে তাঁদের আমি বধ করব।

দ্রৌপদীও কীচককে বললেন যে, তিনি যদি কোনোরকম অন্যায় আচরণ করেন তাহলে নিশ্চিতভাবে গন্ধর্বরা কীচককেই বধ করবেন।

এইভাবে দ্রৌপদীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে কীচক তাঁর বোন সুদেষ্ণার কাছে গেলেন এবং বললেন—এমন কোন উপায় বের করো, যাতে সৈরিন্ধ্রী আমার প্রতি অনুরক্ত হয় এবং আমাকে ভজনা করে। আর তা সম্ভব হলে তবেই আমি প্রাণত্যাগ করব না।

কীচকের বিলাপ শুনে সুদেষ্ণার মনেও দয়া হল। আবার তিনি সৈরিন্ধ্রীর আশঙ্কার কথাও চিন্তা করতে লাগলেন। অবশেষে কীচকের কথা ভেবে তিনি একটি উপায় বের করলেন। কীচককে তিনি বললেন,—কোনো উৎসব উপলক্ষে তুমি ভোজনের ব্যবস্থা কর। তাতে যেমন হরিণ, শূকরের মাংস ও অনান্য ভাল ভাল ব্যঞ্জন রান্না করাবে, তেমন ভাল সুরার ব্যবস্থাও রাখবে। আমি সুরা আনতে সৈরিন্ধ্রীকে তোমার বাড়ি পাঠিয়ে দেব। তখন তুমি বিনা বাধায়, নির্জনে যা করার তাই কোরো। সুদেষ্ণার পরামর্শ অনুসারে কীচক খাদ্য ও পানীয়ের আয়োজন করলেন। সুদেষ্ণাকে খবর পাঠালেন। সুদেষ্ণাও সঙ্গে সঙ্গে সৈরিন্ধ্রীকে বললেন—সুরার বড়ো তিয়াস লেগেছে সৈরিন্ধ্রী, তুমি একবার কীচকের বাড়ি যাও, সেখান থেকে মদ নিয়ে এসো। কিন্তু সৈরিন্ধ্রী-দ্রৌপদী সেখানে যেতে চাইলেন না। কারণ তিনি কীচকের দুরভিসন্ধির কথা, রানীর উদ্দেশ্য সবই অনেক আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই সুদেষ্ণাকে দ্রৌপদী বললেন—আমি যাব না রানী। তুমি জানো তোমার ভাই কীরকম বেহায়া। আমাকে দেখলেই সে উলটোপালটা কথা বলবে আর অশোভন আচরণ করবে। তোমার তো আরও অনেক দাসী আছে। তুমি বরং অন্য কাউকে পাঠাও—

অন্যাং প্রেষয় ভদ্রং তে স হি মামবমংস্যতে॥

সুদেষ্ণা বললেন—আমি যখন তোমাকে সেখানে পাঠাচ্ছি, তখন কীচক তোমাকে অপমান করবে না, আর কোনো অসভ্যতাও করবে না। তোমার কোনো ভয় নেই। আর কোনো উপায় না দেখে সুদেষ্ণার কথায় ভরসা করে সৈরিন্ধ্রী কীচকের বাড়ি গেলেন। দুর্গতির আশঙ্কায় এবং ভয়ে তিনি সূর্যদেবকে স্মরণ করতে লাগলেন। সূর্যদেবতা দ্রৌপদীকে রক্ষা করার জন্য তাঁর সঙ্গে একটি অদৃশ্য রাক্ষসকে পাঠালেন।

দ্রৌপদী পানপাত্র হাতে নিয়ে কীচকের গৃহে প্রবেশ করতেই কীচক আবারও দ্রৌপদীর শারীরিক সৌন্দর্য্য নিয়ে স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করতে শুরু করলেন। তারপর মণি-রত্নের প্রলোভন দেখালেন কীচক। পরিশেষে বিছানা দেখিয়ে কীচক বললেন—এসবই তো তোমার জন্য, কোনো সঙ্কোচ না করে এসে বসো, আমার সঙ্গে সুরা পান করো—

অস্তি মে শয়নং দিব্যং ত্বদর্থমুপকল্পিতম্।
এহি তত্র ময়া সার্দ্ধং পিবস্ব মধুমাধবীম্॥

দ্রৌপদী বললেন যে, রানীর আদেশানুসারে তিনি এখানে এসেছেন। সুরার পিপাসায় তিনি কাতর, তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুরা নিয়ে তাকে ফিরতে হবে। এইসময় কীচক দ্রৌপদীর ডান হাতটি ধরে ফেললেন। কীচকের এই আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রৌপদী তাঁকে তিরস্কার করলেন। কিন্তু দুর্বিনীত কীচক জোর করে সৈরিন্ধ্রীকে স্পর্শ করতে গেলে দ্রৌপদীও সঙ্গে সঙ্গে কীচককে সজোরে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলেন। দ্রুত পায়ে দ্রৌপদী রাজসভার দিকেই যাচ্ছিলেন, এমন সময় কীচক সৈরিন্ধ্রীর কেশ আকর্ষণ করে বিরাট রাজা ও অনান্য সভাসদদের সামনেই তাঁকে মাটিতে আছড়ে ফেলে পদাঘাত করেন। দ্রৌপদীকে রক্ষা করার জন্য সূর্যদেব যে রাক্ষসটিকে নিযুক্ত করেছিলেন, সেই রাক্ষসটিও কীচককে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিল। আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন কীচক। সেইসময় রাজসভায় যুধিষ্ঠির এবং ভীম উপস্থিত ছিলেন। দ্রৌপদীকে অপমানিত হতে দেখে ভীম দাঁতে দাঁত ঘষতে শুরু করলেন। যুধিষ্ঠির বুঝলেন, দ্রৌপদীর অপমানে ভীম প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছেন। এখন ভীম যদি কীচককে বধ করতে যান, তাহলে এই অজ্ঞাতবাসের কালে তাঁদের সবাই চিনে ফেলবে, লোক জানাজানি হয়ে যাবে। তখন আবার বারোটা বছর বনে কাটাতে হবে। কোনো মতে ভীমকে আঙুলের খোঁচা দিয়ে ইঙ্গিত করলেন। যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিতে ভীম নিজেকে সংযত করলেন। এদিকে দ্রৌপদী ক্রোধে-অভিমানে ফেটে পড়লেন। তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়ল রাজা বিরাটের ওপর। একজন সূতজাতীয় লম্পট পুরুষ তাঁকে পদাঘাত করেছে—এই বিপরীত ব্যবহারের জন্য দ্রৌপদী-সৈরিন্ধ্রী বিরাট রাজাকে অনেক তিরস্কার করলেন। কিন্তু রাজা এসবের কিছুই জানতেন না। নিরপরাধা দ্রৌপদীর সঙ্গে কীচক যে অসভ্যতা করেছে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদও করলেন না, কীচককে শাস্তিও দিলেন না। অনান্য সভাসদরা খোঁজ-খবর করে পুরো ঘটনা যখন জানতে পারল, তখন তাঁরা কীচকের

নিন্দা করল এবং ততোধিক সৈরিন্ধ্রীর রূপের প্রশংসা করতে লাগল। যুধিষ্ঠির এবার অপমানিত বোধ করতে লাগলেন। তিনি বললেন—তুমি এবার সুদেষ্ণার ঘরে যাও সৈরিন্ধ্রী। তোমার গন্ধর্ব স্বামীরা উপযুক্ত সময়ে তোমার অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। রাজমহিষী সুদেষ্ণাও সমস্ত ঘটনা জানতে পারলেন। তিনি সৈরিন্ধ্রীকে বললেন—আমার আদেশে কীচকের বাড়ি গিয়ে তোমাকে যেভাবে হেনস্থা হতে হল, তুমি যদি চাও তাহলে আমিই রাজাকে বলে কীচকের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করব। সৈরিন্ধ্রী অবশ্য সুদেষ্ণাকে বারণ করলেন এবং বললেন যে—কীচক যাঁদের কাছে অপরাধ করেছে, তাঁরাই তাকে শাস্তি দেবে। এরপর দ্রৌপদী ভীমসেনের কাছে গেলেন।

নিদ্রিত ভীমকে জাগিয়ে তুলে দ্রৌপদী ভীমের কাছে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করলেন। দ্রৌপদী একথাও বললেন যে, কাল সূর্য ওঠার পরেও যদি সেই কীচক জীবিত থাকে তবে আমি বিষপান করে মৃত্যুবরণ করব, তবু তার কাছে ধরা দেব না। ভীম, দ্রৌপদীকে আশ্বস্ত করে বললেন যে, তিনি কীচককে বধ করবেন। ভীম ও দ্রৌপদী দুজনে মিলে কীচক-বধের পরিকল্পনা করলেন। ভীম স্থির করলেন যে, বিরাট রাজার নৃত্যশালায় দিনের বেলা নৃত্য-গীতের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, কিন্তু রাতের বেলা যে যার ঘরে চলে যায়। আর সেইস্থানে একটি সুসজ্জিত শয্যাও আছে। সেই শয্যায় তিনি লুকিয়ে অবস্থান করবেন। দ্রৌপদী রাত্রিবেলা কীচককে সেই নৃত্যশালায় মিলনের সঙ্কেত করবেন আর তখনই ভীম কীচক বধ করবেন।

পরের দিন সকালবেলা সৈরিন্ধ্রীকে কীচক পুনরায় বললেন যে, রাজসভায় কেউ তাঁর অন্যায়ের কোনো প্রতিবাদ করেননি। তার কারণ, বিরাট শুধু নামেই রাজা, কিন্তু বাস্তবে সেই সেনাপতি এবং সেই মৎস্যদেশের রাজা—

প্রবাদেন হি মৎস্যানাং রাজা নাম্নায়মুচ্যতে।
অহমেব হি মৎস্যানাং রাজা বৈ বাহিনীপতিঃ॥

কীচক বারবার তাঁর ক্ষমতার কথা সৈরিন্ধ্রীকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন। সেই সঙ্গে দাস-দাসী, স্বর্ণমুদ্রা ও প্রচুর উপহারের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে বশ করতে চাইলেন। দ্রৌপদীও পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে রাত্রিবেলা নৃত্যশালায় সাক্ষাতের জন্য কীচককে সঙ্কেত করলেন। কীচককে তিনি বললেন—তুমি আগে আমার কাছে শপথ করো যে, তোমার বন্ধুস্থানীয় বা ভাইয়েরা কেউ আমাদের মিলনের কথা জানতে পারবে না। কারণ আমার গন্ধর্ব স্বামীরা যদি জানতে পারেন সেই ভয়ে আমি ভীত হয়ে আছি। অন্ধকারে তুমি একা ওই নৃত্যশালায় আসলে গন্ধর্বরা কিছুই জানতে পারবেন না। অতএব আমাকে আগে কথা দাও, তারপর যেমন তুমি বলবে, ঠিক তেমনটাই হবে।

কীচকও সৈরিন্ধ্রীর কথায় সম্মত হয়ে চলে গেল। নৃত্যশালায় কীচককে মিলনের সঙ্কেত করে দ্রৌপদী পাকগৃহে ভীমসেনের কাছে এলেন। তিনি ভীমকে বললেন যে, আমার সঙ্কেত অনুসারে কীচক নৃত্যগৃহে একা যাবে, আর তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুষ্ট কীচককে বধ করবে। দ্রৌপদীর অপমানে ভীম ক্রুদ্ধ হয়েই ছিলেন। তিনি নৃত্যগৃহের শয্যায় লুকিয়েছিলেন। এইসময় কীচক সেখানে প্রবেশ করল। ভীমকে সৈরিন্ধ্রী ভেবে স্পর্শ করল। নিজের প্রশংসা করে কীচক বলতে লাগল যে, সব স্ত্রীলোকরা বলেন—তার মতো সুদর্শন পুরুষ আর নেই।

সঙ্গে সঙ্গে ভীমও বলে উঠলেন—আমিও এর আগে এইরকম পুরুষের স্পর্শ কখনো অনুভব করিনি। এইকথা বলে ভীম অট্টহাসি হাসতে লাগলেন।

এরপর কীচক ও ভীমসেনের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ হল। হাতি যেমন অন্য একটি হাতিকে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে এবং মাটিতে আছড়ে ফেলে, ঠিক তেমনভাবেই ভীম কীচককে তুলে ধরে, জোরে ঘুরিয়ে, মাটিতে ফেললেন। প্রবল সংঘর্ষে নৃত্যশালা যেন কাঁপতে লাগল। হিংস্র বাঘ মাংস ভক্ষণ করার জন্য মৃত মৃগকে যেভাবে ধরে নিয়ে যায়, কীচককে ভীমসেন ঠিক সেইভাবে ধরে নিয়ে গেলেন। ইতোমধ্যে কীচকের সমস্ত অঙ্গ ভীমসেনের প্রহারেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। তার ওপরে ভীম কীচকের গলা চেপে ধরায় কীচকের মৃত্যু হল। মহাভারতে বলা হয়েছে যে, মহাদেব ও গজাসুরের যুদ্ধে মহাদেব গজাসুরের যেরকম অবস্থা করেছিলেন, ঠিক তেমনি ভীমের প্রহারেও কীচকের সমগ্র শরীর দলা পাকিয়ে নির্জীব হয়ে পড়ে রইল। দ্রৌপদী সভারক্ষকদের ডেকে

বললেন যে, তাঁর গন্ধর্ব স্বামীরা অপমানের প্রতিশোধ নিতে কীচককে বধ করেছেন।

☐ কীচক বধ হওয়ায় মৎস্যদেশের অধিবাসীরা আলোচনা করতে লাগল যে রাজার প্রিয়, দুশ্চরিত্র ও প্রজাপীড়নকারী কীচককে গন্ধর্বরা হত্যা করে ভালোই করেছে। এদিকে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস তখন প্রায় শেষের মুখে। দুর্যোধনের গুপ্তচরেরা পাণ্ডবদের সন্ধান করে চলেছে। সেইসময় কর্ণ বলছেন যে, পাণ্ডবদের হয়তো হিংস্র-জন্তুরা ভক্ষণ করে ফেলেছে অথবা ভয়ঙ্কর কোনো বিপদ তাঁদের গ্রাস করেছে।

ঠিক সেই সময়ে দ্রোণাচার্য বলছেন, পাণ্ডবদের মতো বীরেরা কখনো বিনষ্ট হন না। এমনকী ভীষ্মও দ্রোণের এই কথাকে সমর্থন করেছেন। ভীষ্ম-দ্রোণ এই অনুমান করেছেন মহাবীর কীচকের মৃত্যুর নিরিখেই। তাঁরা বুঝেছেন যে, ভীম ছাড়া মহাবীর কীচকের এমন অপমৃত্যু সম্ভবই ছিল না। দ্রোণাচার্যের এই ভাবনা থেকে এটাই প্রতীত হয়, কীচকের দলাপাকানো দেহ বিরাট রাজার নৃত্যশালায় পাওয়া গেছে—এই সংবাদ শুনেই তাঁরা নিশ্চিত হন যে, পাণ্ডবরা সুরক্ষিত আছে। পরবর্তী কালে নাট্যকার ভাসের লেখা 'পঞ্চরাত্র' নাটকের সূত্রপাত ঘটেছে এই মৃত্যুর অনুমান থেকেই।

[মহা (k) ৪.১৪-২২ অধ্যায়;
(হরি) ৪.১৩-২০ অধ্যায়]

কীচক২ 'কীচক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল বাঁশ। পণ্ডিত V.S. Agrawala বলেছেন যে, 'কীচক' শব্দটি ভারতীয় শব্দ নয়। চীনা শব্দ 'Ki-chok' থেকে এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপারও এই মতটিকে সমর্থন করেছেন।

[Bharat Savitri, V.S. Agrawala, Vol. I; p. 154; Romila Thapar, The Penguin History of Early India, p. 255]

☐ মহাভারতের আদিপর্বে কীচক নামে একটি জনপদেরও উল্লেখ পাই। সেখানে বলা হয়েছে, পাণ্ডবরা যখন বারণাবত থেকে তপস্বীর বেশে একচক্রা নগরীর দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা মাঝখানে মৎস্য, ত্রিগর্ত, পঞ্চাল, কীচক প্রভৃতি জনপদগুলিকে অতিক্রম করেছিলেন।

সভাপর্বে উল্লিখিত সুমেরু ও মন্দর পর্বতের মাঝখানে শৈলোদা নদীর উভয়তীরে বাঁশগাছের ছায়াঘেরা অঞ্চলটিকেই কীচক দেশ বলে মনে হয়—

মেরুমন্দরয়োর্মধ্যে শৈলোদামভিতো নদীম্।
যে তে কীচকবেণূনাং ছায়াং রম্যামুপাসতে॥

আর ঠিক এই অঞ্চলেই যে একাধিক জনজাতির বসবাস ছিল—সেকথাও উল্লিখিত হয়েছে। K.C. Mishra আবার এই স্থানটিকে পামীর মালভূমি ও মেরু অঞ্চল বলে চিহ্নিত করেছেন। আসলে 'কীচক' শব্দটি বাঁশের প্রতিশব্দ হিসেবে চীনেই প্রথম গৃহীত হয়েছিল বলে মনে হয়। সেখান থেকেই সুমেরীয় জনজাতির মধ্যে শব্দটি প্রবেশ করে। আদিপর্বে মৎস্য, পঞ্চাল প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে একত্রে যে কীচকদেশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, তা থেকে মনে হয়, পামীর গ্রন্থি থেকে খস, কুলিন্দ প্রভৃতি জাতির মতো একটি জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে চলে এসে বসবাস শুরু করেছিল। তারাই কীচক জাতি নামে পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ হয়।

[মহা (k) ১.১৫৬.২; ২.৫২.২;
(হরি) ১.১৫০.২; ২.৫০.২;
TIM (K.C. Mishra) p. 99]

☐ পণ্ডিত J.F. Hewitt এর মতে, এই গোষ্ঠীটি বাঁশের তৈরি বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহার করত। সেই কারণেই তাদের নামই হয়ে গেল কীচক।

বস্তুত কীচক কোনো একক ব্যক্তিমাত্র নন। প্রথমতঃ এটি একটি জনপদের নাম। দ্বিতীয়তঃ আমরা একটি জাতি-গোষ্ঠীর নাম হিসেবেও কীচক শব্দটিকে পাই। এক্ষেত্রে আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ভারতের দাক্ষিণাত্যে মহাভারতের যে পাঠ প্রচলিত আছে, সেখানে সূত-জাতির অধিপতি কেকয় রাজের কথা বলা হয়েছে। তিনি বিরাট-মহিষী সুদেষ্ণা ও বিরাটের শ্যালক কীচকের পিতা। ইনি কীচক গোষ্ঠীরই একজন নেতা ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম কেকয় দেশে এসে বসতি স্থাপন করেন। কালক্রমে ওই স্থানের নামেই তিনি কেকয় নামে পরিচিত হন। সম্ভবতঃ কীচকও ওই গোষ্ঠী এবং স্থানের নামেই পরিচিত হন। আর সূত-গোষ্ঠীর অধিপতি কেকয়ের পুত্র বলেই হোক কিংবা নিজের বাহুবলের জোরেই হোক কীচক তাঁর গোষ্ঠীর অধিপতি হয়ে গেলেন। বিরাটরাজার শ্যালক হওয়ার সুবাদে রাজার সেনাপতির

পদটিও দখল করে বসলেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে, বিরাটরাজাকে সহায়তা করতে মৎস্যদেশে কীচক তাঁর স্বগোষ্ঠীর অনেক মানুষকেই সৈন্য হিসেবে বিরাট-রাজার সেনা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেন। কীচকের সেই অনুগামীরাই উপকীচক নামে খ্যাত হয়েছিল। তারা তাঁর ভাইও নয়, আত্মীয়ও নয়, অনুগামী-মাত্র।

□ আমরা এই উপকীচকদের উল্লেখ পাই বিরাটপর্বে কীচকের মৃত্যুর পর।

[J.F. Hewitt, History and chronology of the Myth Making age, p. 326; TIM (K.C. Mishra), p. 100]

কীটক মহাভারতে আদিপর্বের অন্তর্গত অংশাবতরণ পর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ক্রোধবশ নামে অসুরেরা পরবর্তীকালে বিভিন্ন শক্তিশালী রাজা রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কীটক তাঁদের মধ্যে একজন। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে কীটকের পরিবর্তে কীকট উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.৬৭.৬১; (হরি) ১.৬২.৬১]

কীর্তি১ যদু বংশধারায় হৈহয়ের পুত্র ধর্মতন্ত্র। কীর্তি এই ধর্মতন্ত্রের পুত্র এবং সংজ্ঞেয়-র পিতা। কূর্ম-পুরাণ অনুসারে কীর্তি ধর্মনেত্রের পুত্র এবং সঞ্জিতের পিতা।

[বায়ু পু. ৯৪.৫; কূর্ম পু. ১.২২.১৫]

কীর্তি২ প্রজাপতি দক্ষের কন্যা এবং ধর্মের পত্নী কীর্তি। পুরাণগুলিতে বলা হয়েছে যে, ধর্মের ঔরসে কীর্তির গর্ভে যশ নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

'কীর্তি' কথাটির অর্থ সৎকর্ম। ব্যক্তি তাঁর কীর্তির দ্বারা যে যশ অর্জন করে থাকেন সেই যশকে পুরাণগুলিতে মূর্তিমান দেবতা ও ধর্মের পুত্ররূপে কল্পনা করা হয়েছে।

[মহা (k) ১.৬৬.১৪; (হরি) ১.৬১.১৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৯.৫০, ৬২; ১.১৩.৮০; বিষ্ণু পু. ১.৭.২১; পদ্ম পু. (সৃষ্টি) ৩.১৮৩]

□ দেবী কীর্তি ব্রহ্মার সভায় বিরাজ করতেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ২.১১.৪২; (হরি) ২.১১.৪০]

কীর্তি৩ ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেবের ঔরসে পীবরীর গর্ভজাত কন্যার নাম কীর্তি। নীপবংশীয় বিভ্রাজের পুত্র অনূহ কীর্তিকে বিবাহ করেছিলেন এবং কীর্তির গর্ভে তাঁর ব্রহ্মদত্ত নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

[বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১২; দেবীভাগবত পু. ১.১৯.৪২-৪৩]

কীর্তি৪ ভাগবত পুরাণ অনুসারে বামন রূপধারী ভগবান বিষ্ণুর পত্নী কীর্তি। বৃহৎশ্লোক নামে তাঁদের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[ভাগবত পু. ৬.১৮.৮; বায়ু পু. ৩০.৭৩]

কীর্তি৫ দেবরাজ ইন্দ্র এবং শচীদেবীর পুত্র জয়ন্ত। জয়ন্তের পত্নীর নাম কীর্তি।

[মৎস্য পু. ২৩.২৫; ব্রহ্ম পু. ৯.১৬; অগ্নি পু. ২৭৪.৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৫.২৬; বায়ু পু. ৯০.২৫]

কীর্তি৬ ভাবী মন্বন্তরে দেবতারা যে তিনটি গণে বিভক্ত হবেন, তাদের মধ্যে সুতপগণ একটি। কীর্তি সুতপগণের অন্তর্ভুক্ত একজন দেবতা।

[বায়ু পু. ১০০.১৫]

কীর্তিধর্মা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানকারী জনৈক পাঞ্চাল যোদ্ধা।

[মহা (k) ৭.১৫৮.৩৯; (হরি) ৭.১৩৮.৩৭ (কীর্তিবর্মা পাঠ ধৃত হয়েছে)]

কীর্তিবর্মা *[দ্র. কীর্তিধর্মা]*

কীর্তিমতী১ ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেবের ঔরসে পীবরীর গর্ভজাত কন্যা কীর্তিমতী। তিনি অনূহের (বায়ু পুরাণ মতে সাত্ত্বগুহের) পত্নী এবং ব্রহ্মদত্তের মাতা।

কোনো কোনো পুরাণে কীর্তিমতী-র পরিবর্তে 'কীর্তি' এই নামটি উল্লিখিত হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৯৪; ২.১০.৮২; বায়ু পু. ৭০.৮৬; দেবীভাগবত পু. ১.১৯.৪১]

কীর্তিমতী২ দেবী ভগবতী একাম্রক নামক স্থানে কীর্তিমতী নামে বিরাজমানা।

[মৎস্য পু. ১৩.২৯; দেবীভাগবত পু. ৭.৩০.৫৯]

কীর্তিমান১ বিশ্বেদেবগণের একজন দেবতা।

ঋগ্‌বেদের মধ্যে অনেকগুলি সূক্তের দেবতা হলেন 'বিশ্বেদেবাঃ'। বৈদিক শব্দের প্রথম বিখ্যাত কোষকার যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে লিখেছেন— 'বিশ্বেদেবাঃ' মানে সর্ব-দেবতা—

বিশ্বেদেবাঃ সর্বে দেবাঃ।

অর্থাৎ সমস্ত দেবতাই। প্রথম দিকে বৈদিকেরা যে তেত্রিশ জন দেবতার কথা বলতেন, তাঁদেরই বিশ্বেদেবা বলা হত। পরবর্তী পর্যায়ে দ্বাদশ আদিত্য, রুদ্রগণ, বসুগণও বিশ্বেদেবার পরিধিতে

প্রবেশ করেন। ফলে বিশ্বেদেবগণের দেবতা সংখ্যা বেড়ে যায়। অবশেষে বিশ্বেদেবগণ বৈদিককালেই পিতৃগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান এবং তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ মেলে মহাভারতে। এখানে বলা হয়েছে যে বিশ্বেদেবগণ সবসময়েই পিতৃগণের সঙ্গে থাকেন—

অত্র বিশ্বে সদা দেবা পিতৃভিঃ সার্ধমাসতে।

[মহা (k) ৫.১০৯.৩; (হরি) ৫.১০১.৩]

□ পিতৃগণের সঙ্গে বিশ্বেদেবগণও আমাদের সামনে আবির্ভূত হন—

বিশ্বেদেবাশ্চ যে নিত্যং পিতৃভিঃ সহ গোচরাঃ।

[মহা (k) ১৩.৯১.২৪; (হরি) ১৩.৭৮.২৪]

□ বিশ্বেদেবগণের মধ্যে পিতৃগণ মিশে যাওয়ায় মহাভারতের কালেই বিশ্বেদেবগণের অন্তর্গত দেবতাদের নামের তালিকা পালটে যায় এবং সংখ্যাও একেক জায়গায় এক এক রকম। মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে বিশ্বেদেবগণের যেসব নাম আছে তার মধ্যে একটি নাম কীর্তিমান।

[মহা (k) ১৩.৯১.৩১; (হরি) ১৩.৭৮.৩১]

কীর্তিমান$_{২}$ কৃষ্ণপিতা বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভজাত প্রথম পুত্র। বসুদেব কংসের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, দেবকীর গর্ভজাত সমস্ত পুত্রগুলিই তিনি তাঁর হাতে তুলে দেবেন। প্রতিজ্ঞা শুনে কংস ভগিনী-বধ থেকে নিবৃত্ত হলেন। সময়কালে বসুদেবের প্রথম পুত্র জন্মাল। তাঁর নাম হল কীর্তিমান। পুত্র জন্মাতেই সত্যবদ্ধ বসুদেব প্রথমজ পুত্রকে তুলে দিলেন কংসের হাতে—

কীর্তিমন্তং প্রথমজং কংসায়ানকদুন্দুভিঃ।

কংস অবশ্য প্রথমে মায়াপরবশ হয়ে কীর্তিমানকে ছেড়ে দেন, কেননা দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান থেকেই তাঁর ভয় ছিল। কিন্তু অবশেষে কীর্তিমান কংসের হাতেই মারা যান।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.৫৪; ১০.১.৫৭-৬০; বিষ্ণু পু. ৪.১৫.১৩-১৪; বায়ু পু. ৯৬.১৭২-১৭৩; মৎস্য পু. ৪৬.১২-১৩]

কীর্তিমান$_{৩}$ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদের ঔরসে ধর্মের কন্যা সুনৃতার গর্ভে জাত চারজন পুত্রের মধ্যে একজন।

[বায়ু পু. ৬২.৭৫-৭৬; মৎস্য পু. ৪.৩৪-৩৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৮৭-৮৯]

কীর্তিমান$_{৪}$ মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে স্মৃতির গর্ভে জাত দুই পুত্রের একজন। কীর্তিমানের বিবাহ হয় ধেনুকার সঙ্গে। ধেনুকার গর্ভে কীর্তিমানের দুই পুত্রের নাম চরিষ্ণু (বরিষ্ঠ) এবং ধৃতিমান।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১১.১৮-২১; বায়ু পু. ২৮.১৫-১৭]

কীর্তিমান$_{৫}$ কৃষ্ণপিতা বসুদেবের জ্যেষ্ঠা পত্নী রোহিণীর গর্ভজাত পুত্র হলেন শঠ। শঠের অনেকগুলি পুত্রের মধ্যে একজনের নাম কীর্তিমান।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৬৪, ১৭০]

কীর্তিমান$_{৬}$ ভগবান নারায়ণের মানসপুত্র ছিলেন তপস্বী বিরজা। এই বিরজা মহাতপস্বী কীর্তিমানের পিতা ছিলেন। কীর্তিমান মহর্ষি কর্দম প্রজাপতির পিতা। *[মহা (k) ১২.৫৯.৯০; (হরি) ১২.৫৮.৯০]*

কীর্তিরথ নিমির বংশধারায় প্রতীন্ধকের পুত্র এবং দেবমীঢ়ের পিতা। *[রামায়ণ ১.৭১.৯-১০]*

□ বায়ু পুরাণ মতে কীর্তিরথ প্রতিত্বকের পুত্র (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে প্রতিম্বক) এবং দেবমীঢ়ের পিতা। *[বায়ু পু. ৮৯.১১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৪.১১-১২]*

কীর্তিরাজ ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমির বংশধারায় ধৃতির পুত্র এবং রোমবানের পিতা কীর্তিরাজ।

[বায়ু পু. ৮৯.১৩]

কীর্তিরাত ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমির বংশধারায় দেবমীঢ়ের পৌত্র মহীধ্রক। কীর্তিরাত, মহীধ্রকের পুত্র এবং মহারোমার পিতা। *[রামায়ণ ১.৭১.১১]*

□ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে, যে, কীর্তিরাত মহাধৃতির পুত্র। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৪.১৩]*

কুকুণ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে নারদ মাতলির কাছে পাতালের ভোগবতীপুরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে সেখানে বসবাসকারী যেসব প্রধান প্রধান নাগের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে কুকুণ একজন।

[মহা (k) ৫.১০৩.১০; (হরি) ৫.৯৬.১০]

কুকুপাদ$_{১}$ পাতালের দ্বিতীয় তল অর্থাৎ সুতলে বসবাসকারী একজন দৈত্য।

[বায়ু পু. ৫০.২২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.২৩]

কুকুপাদ$_{২}$ *[দ্র. ককুপাদ]*

কুকুর$_{১}$ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় যেসব মুনিরা বিরাজ করতেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কুকুর।

[মহা (k) ২.৪.১৮; (হরি) ২.৪.১০নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র., পৃ.২৬]

কুকুর$_২$ প্রাচীন ভারতের একটি জনজাতি। উত্তর ভারতেই এঁদের অবস্থিতি ছিল বলে মহাভারতে বলা হয়েছে। মহাভারতে কশ্যপ বংশীয় একজন নাগের নাম পাই, যার নাম কুকুর। সম্ভবতঃ এই কুকুরের নামেই তাঁর পরবর্তী বংশধরদের প্রত্যেককেই কুকুর বলা হয়েছে। ফলত তাঁরা কুকুর জাতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। হয়তো এইভাবে সম্পূর্ণ কুকুর-জাতি সরাসরি সম্পর্কিত হয় কশ্যপবংশীয় নাগ এবং তাঁর উত্তর পুরুষদের সঙ্গে।

□ বরাহমিহির 'বৃহৎসংহিতা'য় হস্তিনাপুরের আশেপাশে যেসব জনজাতির উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে কুকুর অন্যতম।

[মহা (k) ৬.৯.৪২; ৫.১০৩.১০;
(হরি) ৬.৯.৪২; ৫.৯৬.১০;
বৃহৎ সংহিতা ৫.৭১; ১৪.৪; ৩২.২২]

□ মেগাস্থিনিস বলেছেন যে, 'কুকুর-জাতি'-র অন্তর্ভুক্ত মানুষেরা পর্বত কন্দরে বাস করতেন এবং তাঁদের মাথাটিও ছিল কুকুরের মাথার মতো। এঁরা পশুর চামড়া পরিধান করতেন। এমনকী একজন অন্যজনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার জন্য পশুর মতো শব্দ করত। ধারালো নখই ছিল তাঁদের অস্ত্র, যা তাঁরা শিকারের কাজে ব্যবহার করতেন। যেহেতু কুকুর আমাদের কাছে একটি অত্যন্ত পরিচিত পশু, সম্ভবতঃ সেই কারণেই এই জাতির মানুষদের মেগাস্থিনিস কুকুর বলে চিহ্নিত করেছেন। আর্যেতর এই জনজাতির সম্বন্ধে লোকশ্রুতিই কিন্তু মেগাস্থিনিসের উপজীব্য হয়ে উঠেছে এখানে। ফলে তাঁর মন্তব্যের যাথার্থ্য চিন্তার অবসর তৈরি করে।

[GESMUP p. 46]

□ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় যেসব জনজাতি উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কুকুর-জাতি অন্যতম। তাঁরা যুধিষ্ঠিরকে কর হিসেবে প্রচুর ধনরত্ন দান করেন। এইখানেই কুকুর-অন্ধকদের সঙ্গে অন্যতর কোনো কুকুর জনজাতিকে আরও স্পষ্টভাবে পৃথক করা যায়। কারণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিত্রতাবশতঃ অন্ধক কুকুর বংশীয়রা যুধিষ্ঠিরকে কর প্রদান করেননি বলে মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে। মহাভারতে তার্ক্ষ্য, পহ্লব, বস্ত্রপ ইত্যাদি জাতির সঙ্গে একত্রে কুকুর জাতির নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ২.৫২.১৬; ২.৫২.৪৯;
(হরি) ২.৫০.১৫; ২.৫০.৪৭]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় কুকুর জাতির যোদ্ধারা কৌরব পক্ষের হয়ে যুদ্ধ করেন এবং বিকর্ণ, দুঃশাসন প্রমুখদের সঙ্গে ভীষ্মকে রক্ষা করেন। *[মহা (k) ৬.৫১.৭; (হরি) ৬.৫১.৭]*

□ পণ্ডিত মোতিচন্দ্র এই কুকুর-জাতিকে পাঞ্জাবের খোখর বা খোখুর জাতি বলে চিহ্নিত করেছেন। বর্তমানে জাঠ, রাজপুত ইত্যাদি জাতিগুলির সঙ্গে কুকুর জাতি একাত্ম হয়ে গেছে বলেই আমাদের মনে হয়। মোতিচন্দ্রের মতে এই জাতির বেশ কিছু মানুষ ঝিলম ও চেনাব (চন্দ্রভাগা) নদীর উপত্যকায় বসবাস করে। বিশেষতঃ শাহপুর জেলার জঙ্ঘ অঞ্চলেই এঁদের উপস্থিতি। আবার কিছু সংখ্যক মানুষকে লাহোরে শতদ্রুর নিম্ন উপত্যকায়ও বাস করতে দেখা যায়।

[GESMUP (Moti Chandra) p. 46]

□ বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, ম্লেচ্ছ দেশগুলির মধ্যে কুকুর একটি। যবন, কুলিক প্রভৃতি দেশের সঙ্গে কুকুর জনপদটির নাম এখানে একত্রে উল্লিখিত হয়েছে। *[মৎস্য পু. ১২১.৪৩]*

কুকুর$_৩$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে নারদ মাতলির কাছে পাতালের ভোগবতী পুরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে সেখানে বসবাসকারী যেসব প্রধান প্রধান নাগের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে কুকুর অন্যতম।

[মহা (k) ৫.১০৩.১০; (হরি) ৫.৯৬.১০]

কুকুর$_৪$ একজন প্রাচীন রাজর্ষি। যেসব রাজর্ষিদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়, কুকুর তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ১৩.১৬৫.৫৩; (হরি) ১৩.১৪৩.৫১]

কুকুর$_৫$ যদুবংশের একটি শাখা। পুরাণে উগ্রসেন এবং তাঁর পুত্রদের অর্থাৎ যদুবংশীয় প্রায় সকল বীর যোদ্ধাদেরকেই কুকুর বলা হয়েছে।

[মহা (k) ২.১৯.২৮; ৩.১৮৩.৩২;
(হরি) ২.১৮.২৬; ৩.১৫৪.৩২;
বায়ু পু. ৯৬.১৩৪; মৎস্য পু. ৪৪.৭৬]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধনকে শ্রীকৃষ্ণ এক অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি

দেন। সেই নারায়ণী সেনাদের মধ্যে কুকুরবংশীয় যোদ্ধারা ছিলেন অন্যতম। ভোজ ও অন্ধকবংশীয় যোদ্ধাদের সঙ্গে কুকুরবংশীয় যোদ্ধারাও কৃতবর্মাকে যুদ্ধে অনুসরণ করেন।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠটি ত্রুটিপূর্ণ। সেখানে ভোজ ও অন্ধকবংশীয় যোদ্ধাদের সঙ্গে কুকুরবংশীয় যোদ্ধাদের নাম উল্লিখিত হয়নি।

[মহা (k) ৫.১৯.১৭; (হরি) ৫.১৯.১৮]

☐ মহাভারতের মৌষল পর্বে দেখা যায় যে, যদুবংশের ধ্বংসের সময় অন্ধক ও কুকুর বংশীয়রা, পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং সেই যুদ্ধে তাঁদের প্রত্যেকের বিনাশ ঘটে। ভাগবত পুরাণেও যদুবংশ ধ্বংসের উল্লেখ পাওয়া যায়।

[মহা (k) ১৬.৩.৪২; (হরি) ১৬.৩.৪৬; ভাগবত পু. ১১.৩০.১৮]

কুকুর৬ ভাগবত পুরাণ মতে যদুবংশজাত অন্ধকের পুত্রদের মধ্যে কুকুর অন্যতম। বহ্নি নামে কুকুরের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.১৯]

☐ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে সত্যকের পুত্র (মৎস্য পুরাণ ও বিষ্ণু পুরাণ মতে অন্ধকের পুত্র) কুকুর। তিনি বৃষ্ণি (বিষ্ণু পুরাণ মতে ধৃষ্টি)-র পিতা। এই কুকুরের নাম অনুসারেই যদুবংশের শাখাটি কুকুর নামে চিহ্নিত হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১১৬; মৎস্য পু. ৪৪.৬১-৬২; বিষ্ণু পু. ৪.১৪.৩-৪]

কুকুর৭ একজন অসুর। দানবরাজ বলির অনুচর।

[মৎস্য পু. ২৪৫.৩২]

কুক্কুটধ্বজ কশ্যপের ঔরসে ভাসীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কুক্কুট বা মোরগও একটি বলে উল্লিখিত হয়েছে। কুমার কার্ত্তিকেয়র রথে কুক্কুট অঙ্কিত ধ্বজা ছিল।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৪৫৫; বায়ু পু. ৭২.৪৫]

কুক্কুটিকা স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.১৫; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ১৫ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

কুক্কুটী অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। কুক্কুটী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৭৯.১৭]*

কুক্কুটেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৯৮]

কুক্ষি১ অযোধ্যার রাজা ইক্ষ্বাকুর পুত্র এবং বিকুক্ষির পিতা। *[রামায়ণ ১.৭০.২২]*

কুক্ষি২ একজন দানব। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে বলা হয়েছে যে, দ্বাপরযুগে কুক্ষি নামের এই দানব 'পার্ব্বতীয়' নামে এক রাজা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুমেরু পর্বতের মতো গৌরবর্ণ ও বলবান ছিলেন। *[মহা (k) ১.৬৭.৫৭; (হরি) ১.৬২.৫৭]*

কুক্ষি৩ রৈভ্য মুনির পুত্র কুক্ষি। ত্রেতাযুগে প্রজাপতি বীরণ জগতের মঙ্গলের জন্য সত্ত্বগুণাশ্রিত যে সনাতন ধর্ম রৈভ্য মুনিকে দান করেন, সেই ধর্ম রৈভ্য মুনি তাঁর পুত্র কুক্ষিকে দান করেন।

[মহা (k) ১২.৩৪৮.৪৩; (হরি) ১২.৩৩২.৪৩]

কুক্ষি৪ ভাগবত পুরাণ মতে সামবেদজ্ঞ জৈমিনির শিষ্য সুকর্মার কাছ থেকে পৌষ্যঞ্জি সামবেদ শিক্ষা করেন। পৌষ্যঞ্জির পাঁচশত সামবেদজ্ঞ শিষ্যদের মধ্যে কুক্ষি অন্যতম। তিনি সামবেদের একশত শাখা অধ্যয়ন করেন। *[ভাগবত পু. ১২.৬.৭৮-৭৯]*

কুক্ষি৫ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে কর্দম প্রজাপতির কন্যা কুক্ষি। কিন্তু বিষ্ণু ও বায়ু পুরাণে কুক্ষি, প্রিয়ব্রতের কন্যা বলে উল্লিখিত হয়েছেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.৮; বিষ্ণু পু. ২.১.৫; বায়ু পু. ৩৩.৮]

কুক্ষিভীম দানবরাজ বলির পুত্রদের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ৬.১১]

কুক্ষিমিত্র যদু-বৃষ্ণি কুলজাত বসুদেবের ঔরসে মদিরার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কুক্ষিমিত্র একজন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৭১; বায়ু পু. ৯৬.১৬৯]*

কুক্ষেয়ু ভাগবত পুরাণ মতে পুরুর বংশধারায় রৌদ্রাশ্বের ঔরসে অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কুক্ষেয়ু একজন।

[ভাগবত পু. ৯.২০.৪]

কুখণ্ডিকা পিশাচী কপিশা কুষ্মাণ্ডী থেকে অসংখ্য পিশাচগণ ও কুষ্মাণ্ডগণের উৎপত্তি হয়।

কুখণ্ডিকা ওই কুষ্মাণ্ডগণের একটি।

[বায়ু পু. ৬৯.২৬৪]

কুচ বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, পৌরাণিক কেতুমাল বর্ষের জনপদগুলির মধ্যে কুচ একটি।

[বায়ু পু. ৪৪.১১]

কুচেল কলিযুগে মগধে বৃহদ্রথবংশীয় যেসব রাজারা রাজত্ব করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বসু একজন। বসুর পুত্রদের মধ্যে কুচেল একজন।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.১৯.৮১]

কুজ একজন দৈত্য বলেই ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। বাসুদেব-কৃষ্ণ কুজকে বধ করেছিলেন।

[ভাগবত পু. ২.৭.৩৪]

কুক্ষি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বংশধারায় বলির পুত্র কুক্ষি। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫.৪৩]*

কুঞ্জতীর্থ নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করলে মানুষ পুণ্যফল লাভ করে বলে মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে।

[মৎস্য পু. ১৯৪.৯-১০]

কুঞ্জর$_১$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত একজন নাগ। মহাভারতের আস্তীক পর্বে সর্পনাম কথনের সময় তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে। প্রভাসক্ষেত্রে যদুবংশ ধ্বংসের পর যখন শেষাবতার বলরাম যোগবলে দেহত্যাগ করলেন, তখন তাঁর মুখ থেকে এক সহস্র ফণাযুক্ত নাগ বেরিয়ে এসে সমুদ্রের জলে প্রবেশ করলেন। সেই নাগকে স্বাগত জানাতে যেসব বিশিষ্ট কাদ্রবেয় নাগ প্রভাসক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন কুঞ্জর তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.৩৫.১৫; ১৬.৪.১৫;
(হরি) ১.৩০.১৫; ১৬.৪.১৫]

কুঞ্জর$_২$ সৌবীর দেশের জনৈক রাজকুমার। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অন্যতম অনুচর।

[মহা (k) ৩.২৬৫.১০; (হরি) ৩.২২০.১০]

কুঞ্জর$_৩$ দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত একটি পর্বত। রামায়ণে এবং পুরাণে এই পর্বতের নাম উল্লেখ করা হয়েছে মহর্ষি অগস্ত্যের বাসভবন হিসেবে। রামায়ণে এই পর্বতশিখরে অবস্থিত মণি-রত্নখচিত অগস্ত্যের সুরম্য প্রাসাদের বর্ণনা পাওয়া যায়। রামায়ণে বলা হয়েছে স্বয়ং দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা অগস্ত্যের এই বাসভবন নির্মাণ করেছিলেন। নাগদের বাসভূমি ভোগবতীপুরীও নাকি এই পর্বতেই অবস্থিত। কুঞ্জর পর্বতের আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিতরা কোনো মত প্রকাশ করেননি। রামায়ণের বিবরণ থেকে অবশ্য এর অবস্থান সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। রামায়ণে সুগ্রীব অঙ্গদ প্রভৃতি বানরবীরদের দক্ষিণ দিকে সীতার সন্ধান করার ব্যাপারে পরামর্শ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—সমুদ্রতীরবর্তী মলয় পর্বত, মহেন্দ্রগিরি প্রভৃতির সঙ্গে সংলগ্নভাবেই কুঞ্জর পর্বত অবস্থিত। সেক্ষেত্রে বর্তমান ভারতের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত পূর্বঘাট পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত কোনো একটি পর্বতকেই কুঞ্জর পর্বত হিসেবে চিহ্নিত করা হত বলে মনে হয়।

[রামায়ণ ৪.৪১.৩৪-৩৮]

কুঞ্জর$_৪$ জনৈক বানরবীর। ইনি হনুমানের মাতামহ। হনুমানের মা অঞ্জনাকে রামায়ণে ও পুরাণে একাধিকবার কুঞ্জরের কন্যা বলা হয়েছে।

[রামায়ণ ৪.৬৬.১০;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২২৩, ২৩৩]

কুঞ্জর$_৫$ জনৈক অসুরবীর। পাতালের চতুর্থ তলে এঁর বাসভবন ছিল বলে উল্লেখ আছে। মৎস্য পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী ইনি তারকাসুরের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। কপালী প্রভৃতি রুদ্রগণের সঙ্গে ভয়াবহ যুদ্ধের পর তাঁদের হাতেই কুঞ্জরের মৃত্যু হয়।

[বায়ু পু. ৫০.৩১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.৩২;
মৎস্য পু. ১৪৮.৪২-৫০; ১৫৩.২৯-৩০, ৫১-৬৮]

কুঞ্জল স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অনুচর, একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে এঁকে কুঞ্চক নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[মহা (k) ৯.৪৫.৭৬; (হরি) ৯.৪২.৫২নং
শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

কুটক একটি দক্ষিণ ভারতীয় জনপদ। ঋষভদেব কুটক দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। সেদেশে কুটকাচল নামে একটি পর্বত অবস্থিত। *[ভাগবত পু. ৫.৬.৭]*

□ বর্তমান কর্ণাটক রাজ্যের অন্তর্গত গডক (Gadak) শহর। এটি ধারওয়ার (Dharwar) জেলার অন্তর্গত। *[GDAMI (Dey) p. 112]*

কুটকাচল কুটক দেশে অবস্থিত একটি পর্বতের নাম। এটি বর্তমানে কর্ণাটক রাজ্যের ধারওয়ার জেলার অন্তর্গত একটি উচ্চভূমি। *[দ্র. কুটক]*

[ভাগবত পু. ৫.৬.৭; GDAMI (Dey) p. 112]

কুটভী অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। কুটভী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৭৯.১৬]*

কুটীচক মহাভারতে এবং পুরাণে চতুরাশ্রমের অন্যতম সন্ন্যাস আশ্রমের চারটি পর্যায়ের মধ্যে

কুটীচক একটি। ভাগবত পুরাণের টীকাকার শ্রীধরস্বামী কুটীচক শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—সন্ন্যাস আশ্রমেও যাঁরা বেদবিহিত কর্ম পালন করেন তাঁরাই কুটীচক—

কুটীচকঃ স্বাশ্রমকর্মপ্রধানঃ।

মহাভারতে সন্ন্যাসী ভিক্ষুদের চারটি প্রকারের মধ্যে প্রথমে কুটীচকের নাম এসেছে তার পরে নাম এসেছে বহূদকের—

চতুর্বিধা ভিক্ষবস্তে কুটীচকবহূদকৌ।

টীকাকার নীলকণ্ঠ এই শ্লোকের টীকায় কুটীচক সন্ন্যাসীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

কুটীচক-বহূদকৌ ত্রিদণ্ডিনৌ একো
গৃহে বসতি অপরস্তীর্থান্যটতি।

কুটী শব্দটির অর্থ কুটীর বা পর্ণশালা। যে সন্ন্যাসী বৃদ্ধ বয়সে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে অক্ষম হয়ে কোনো একটি পুণ্যস্থানে পর্ণকুটীর নির্মাণ করে বসবাস করেন, দিনে বারো হাজার বার প্রণবমন্ত্র জপ করেন, দিনে একবার ভিক্ষায় বেড়িয়ে সামান্য ভিক্ষালব্ধ আহার্য্য নিয়ে পর্ণকুটীরে এসে তাই আহার করেন এবং অবশিষ্ট সময় কুটীরে বসে পরব্রহ্মের ধ্যান করেন—তিনিই কুটীচক। নীলকণ্ঠের টীকায় কুটীচক সন্ন্যাসীকে পর্ণকুটীরবাসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ভাগবত পুরাণের বংশীধরকৃত ভাবার্থ-দীপিকাপ্রকাশ টীকায় কুটীচক সন্ন্যাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপরোক্ত বিবরণটি পাওয়া যায়—

কুটীচক ইতি যস্তু যাত্রাদ্যশক্ত একস্মিন্নেব
তীর্থে বসন্ প্রত্যহং দ্বাদশসহস্রপ্রণবং জপন্
যথোক্তকালে ভৈক্ষমাহরন্ কুট্যাং
পর্ণশালায়াং চকাস্তি ব্রহ্মধ্যানেন স কুটীচকঃ।

[মহা (k) ১৩.১৪১.৮৯; (হরি) ১৩.১১৯.৮৮; নীলকণ্ঠকৃত টীকা দ্রষ্টব্য; ভাগবত পু. ৩.১২.৪৩; শ্রীধরস্বামী এবং বংশীধরকৃত টীকা দ্রষ্টব্য]

কুটীমুখ একজন যক্ষ এবং কুবেরের অনুচরদের মধ্যে একজন। ইনি কুবেরের সভায় বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ২.১০.৩৫; (হরি) ২.১০.৩২ (কটীমুখ পাঠ ধৃত হয়েছে)]

কুটুম্বিকা অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। কুটুম্বিকা সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ১৭৯.৩০]

কুটুম্বিকেশ্বর একটি ত্রিলোকবিখ্যাত শৈবতীর্থ। এখানে শিব কুটুম্বিকেশ্বর নামে পূজিত হন। এটি একটি সরোবরতীর্থ; যে মানুষ এই সরোবরতীরে নানারকম শাক এবং কন্দ উৎসর্গ করে, সে পরমাগতি লাভ করে।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ১০.১-৪]

কুঠর কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত একজন নাগ। মহাভারতে আস্তীক পর্বে সর্পনাম কথনের সময় এঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

তবে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের বিবরণে ধৃতরাষ্ট্র বংশীয় কুঠার নামে এক নাগের উল্লেখ পাই। ইনি সর্পসত্রে ভস্মীভূত হয়েছিলেন। এই কুঠর এবং কুঠার সম্ভবত একই ব্যক্তি। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে ইনি কুঠারমুখ নামে চিহ্নিত হয়েছেন।

[মহা (k) ১.৩৫.১৫; ১.৫৭.১৫; (হরি) ১.৩০.১৫; ১.৫২.১৬]

কুড়মলা একটি পৌরাণিক নদী বলে মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। *[মৎস্য পু. ২২.৪৬]*

কুণি১ যদুবংশীয় জয়-এর পুত্র এবং যুগন্ধরের পিতা কুণি। *[ভাগবত পু. ৯.২৪.১৪]*

☐ বিষ্ণু পুরাণে অবশ্য কুণি-র পরিবর্তে তূণি নামটি উল্লিখিত হয়েছে। বিষ্ণু পুরাণ মতে অসঙ্গের পুত্র এবং যুগন্ধরের পিতা তূণি।

[দ্র. তূণি]

[বিষ্ণু পু. ৪.১৪.১]

কুণি২ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে বশিষ্ঠের ঔরসে কপিঞ্জলী ঘৃতাচীর গর্ভে কুণি জন্মগ্রহণ করেন।

বায়ু পুরাণে আবার কুণি-র পরিবর্তে কুশীতিয় নামটি উল্লিখিত হয়েছে। উল্লেখ্য এই কুণি বা কুশীতিয়, ঋষি ইন্দ্রপ্রমতি নামে প্রসিদ্ধ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৯৭; বায়ু পু. ৭০.৮৮]

কুণি৩ ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে পঞ্চদশ দ্বাপরে আরুণি যখন ব্যাস হবেন, তখন মহাদেব বেদশিরা নামে অবতীর্ণ হবেন। সেইসময় তাঁর যে চারজন পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদের মধ্যে কুণি একজন।

[বায়ু পু. ২৩.১৬৯]

কুণি৪ গর্গ-বংশীয় একজন ঋষি। সম্ভবতঃ কুণি গর্গ-বংশ জাত ছিলেন বলে মহাভারতে তাঁকে কুণিগর্গ্য বলা হয়েছে।

সুভ্র নামে তাঁর একটি মানসকন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল।

[মহা (k) ৯.৫২.৩-৪; (হরি) ৯.৪৮.৩-৪]

কুণিগর্গ একজন ঋষি। ঋষি হিসেবে তিনি যত না বিখ্যাত, তার চেয়ে অনেক বিখ্যাত তাঁর কন্যা। তিনি বাল্যকাল থেকেই ব্রহ্মচারিণী ছিলেন, কিন্তু সামাজিক কারণে তাঁর ব্রহ্মচর্য্যের স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত থাকেনি। তিনি বৃদ্ধকাল পর্যন্ত তপস্যায় দিন কাটিয়েছেন। তিনি এত বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন যে, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পর্যন্ত পারতেন না। তপস্যার কৃচ্ছ্রতা এবং শরীরের জরা সইতে না পেরে তিনি শেষ পর্যন্ত জীবন বিসর্জন দিতে চান স্বেচ্ছামরণের পদ্ধতিতে। এই অবস্থায় দেবর্ষি নারদ তাঁকে বললেন—একজন স্ত্রীলোক হওয়া সত্ত্বেও তোমার যখন বিবাহ হয়নি তার মানে তুমি এখনও 'অসংস্কৃতা'—তোমার বৈবাহিক সংস্কার হয়নি। তাই কোনো উৎকৃষ্ট লোকে তোমার স্থান হবে না—

অসংস্কৃতায়াঃ কন্যায়াঃ কুতো লোকাস্তবানঘে।

শুধু এই বৈবাহিক সংস্কারের জন্য কুণিগর্গের অতিবৃদ্ধা এই 'কৌমারব্রহ্মচারিণী' কন্যা প্রাক্‌শৃঙ্গবান্ নামে এক ঋষিকুমারের সঙ্গে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হন। তবে মহাভারতের অন্যান্য প্রমাণে এটা বলাই যায়—এই সামাজিক প্রথার সংকীর্ণতা নারদের নাম করে চাপানো হয়েছে। কেননা আরও অনেক ব্রহ্মচারিণী রমণীর কথা পাওয়া যায়, যাঁরা বিবাহ না করেও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যে জীবন অতিবাহিত করেছেন।

প্রাক্‌শৃঙ্গবান্ ঋষি গালবের পুত্র ছিলেন। কুণিগর্গের কন্যা নিজের তপস্যার অর্ধপুণ্যফল দান করে যে কোনো ব্রাহ্মণকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে গালবি প্রাক্‌শৃঙ্গবান্ বললেন—শুধু বৈবাহিক সংস্কার দেবার জন্যই তিনি কুণিগর্গের কন্যার সঙ্গে একরাত্রি মাত্র বাস করবেন। গালবির সঙ্গে যখন তাঁর বিবাহ হল, তখন তপস্যার শক্তিতে যৌবনবতী হয়েই তিনি সেই বিবাহ করলেন। কিন্তু বিবাহের রাত্রি কেটে যাবার পরেই তিনি প্রাক্‌শৃঙ্গবান্ গালবিকে তাঁরই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে চলে যান এবং দেহত্যাগ করে স্বর্গে যান। প্রাক্‌শৃঙ্গবান্ কিন্তু পরের দিনই তপস্বিনীর রূপমুগ্ধ হয়ে তাঁর স্ত্রীর চলে যাওয়াটা আর সইতে পারলেন না। অবশেষে শোকে কাতর হয়ে তিনিও দেহত্যাগ করলেন। বলরাম সরস্বতী-তীর্থ ভ্রমণ করতে গিয়ে কুণিগর্গের কন্যার আশ্রম দর্শন করেন এবং এইখানেই নারদের কাছে শল্যের মৃত্যুর খবর পান।

[মহা (k) ৯.৫২.৩-২৫; (হরি) ৯.৪৮.২-২৫]

কুণিবাহু ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে পঞ্চদশ দ্বাপরে আরুণি যখন ব্যাস হবেন, তখন মহাদেব বেদশিরা নামে অবতীর্ণ হবেন। সেইসময় তাঁর যে চারজন পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদের মধ্যে কুণিবাহু একজন।

[বায়ু পু. ২৩.১৬৯]

কুণ্ড১ একজন বানরবীর।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৪১]

কুণ্ড২ একজন বিশিষ্ট নাগ। ইনি অর্জুনের জন্মোৎসবে উপস্থিত ছিলেন বলে মহাভারতে উল্লেখ আছে।

[মহা (k) ১.১২৩.৭১; (হরি) ১.১১৭.৭৫]

কুণ্ডক১ একজন শ্রুতর্ষি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.১০]

কুণ্ডক২ ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষুদ্রকের পুত্র কুণ্ডক এবং কুণ্ডকের পুত্র সুরথ। *[বিষ্ণু পু. ৪.২২.৩]*

কুণ্ডক৩ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের মধ্যে একজন। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের নামের যে-দুটি তালিকা পাওয়া যায়, সেখানে অবশ্য কুণ্ডকের নামোল্লেখ নেই। তবে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় ধৃতরাষ্ট্রের যেসব পুত্র উপস্থিত ছিলেন কুণ্ডক তাঁদের মধ্যে ছিলেন। মহাভারতের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে অবশ্য কুন্তজ নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.১৮৬.৩; (হরি) ১.১৭৭.৩]

কুণ্ডক৪ *[দ্র. ক্ষুদ্রক]*

কুণ্ডজ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.৬৭.১০৫; (হরি) ১.৬২.১০৭]

কুণ্ডজঠর একজন অত্রিবংশীয় ঋষি। ইনি পাণ্ডবদের তীর্থযাত্রার সময় তাঁদের সঙ্গী ছিলেন। জনমেজয়ের সর্পসত্রে নিযুক্ত যাজ্ঞিক সদস্য হিসেবেও কুণ্ডজঠরের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.৫৩.৮; ৩.৮৫.১১৯; (হরি) ১.৪৮.৮; ৩.৭০.১১৯]

কুণ্ডধার১ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের মধ্যে একজন। তবে আদিপর্বে

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রনামের যে দুটি তালিকা প্রদত্ত হয়েছে সেখানে এঁর নামোল্লেখ নেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অষ্টম দিনে ধৃতরাষ্ট্রের কয়েকটি পুত্র ভীমসেনকে আক্রমণ করেন। এখানে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র হিসেবে কুণ্ডধারের নাম প্রথমবার উল্লিখিত হতে দেখা যায়। ভীমসেনের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

[মহা (k) ৬.৮৮.১৫, ১৮, ২৩;
(হরি) ৬.৮৫.১৫, ১৮, ২৩]

কুণ্ডধার২ বরুণের সভায় যে সব বিশিষ্ট নাগ অবস্থান করেন কুণ্ডধার তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ২.৯.১০; (হরি) ২.৯.১০]

কুণ্ডধার৩ একপ্রকার জলপূর্ণ মেঘ। ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই তিনের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ—যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম তাঁকে জনৈক ব্রাহ্মণ ও কুণ্ডধার মেঘের উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন।

এক নির্ধন ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করার জন্য কিছু অর্থলাভ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। সেই ধার্মিক ব্রাহ্মণ অর্থলাভের আশায় কঠোর তপস্যা করলেন, বহু দেবতার পূজা করলেন, কিন্তু কোনোভাবেই ধনলাভ করতে পারলেন না। তখন ব্রাহ্মণ চিন্তা করলেন, যে দেবতাকে ভক্তরা আরাধনা করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেনি, এমন কোনো দেবতাকে আমি পূজা করব। তাহলে তিনি অল্পসময়ের মধ্যেই আমার প্রতি প্রসন্ন হবেন এবং আমাকে ধন দান করবেন। এই কথা ভেবে ব্রাহ্মণ কুণ্ডধার মেঘের আরাধনা করতে লাগলেন। কুণ্ডধার মেঘের উপদেশে ব্রাহ্মণ উপলব্ধি করলেন যে অর্থ নয় ধর্মই শ্রেষ্ঠ।

[মহা (k) ১২.২৭১ অধ্যায়; (হরি) ১২.২৬৫ অধ্যায়]

কুণ্ডপর্বত একটি পৌরাণিক পর্বত বলে মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। *[মৎস্য পু. ১০৮.৩২]*

কুণ্ডপায়ী মহর্ষি কশ্যপের পুত্র বৎসার। বৎসারের পুত্র নিধ্রুব। নিধ্রুবের ঔরসে চ্যবন ঋষির কন্যা সুমেধার গর্ভজাত পুত্ররা কুণ্ডপায়ী ঋষি নামে পরিচিত।

[বায়ু পু. ৭০.২৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৩১]

কুণ্ডভেদী ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.৬৭.১০৪; ১.১১৭.১২;
(হরি) ১.৬২.১০৬; ১.১১১.১২]

☐ মহাভারতে কৌরবপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ এই যোদ্ধাকে নিয়ে রীতিমতো জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। ভীষ্মপর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অষ্টম দিনের বিবরণে দেখা যায় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা ভীমসেনকে আক্রমণ করলে সেই সময়ই কুণ্ডভেদী ভীমসেনের হাতে নিহত হন। এরপর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে আবার আমরা চক্রব্যূহে অভিমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় একজন কুণ্ডভেদীর নামোল্লেখ পাই, যিনি অভিমন্যুর হাতে নিহত হন। তবে ইনি ধার্তরাষ্ট্র কুণ্ডভেদী কিনা, এবিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবে সুষেণ, বৃন্দারক, প্রতর্দন প্রভৃতি ধার্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হওয়ায় এঁকেও ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। এরপর জয়দ্রথবধের দিন অর্থাৎ যুদ্ধের চতুর্দশ দিনে একুশজন ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ভীমসেনকে আক্রমণ করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। ভীমসেনের হাতে এই সময় কুণ্ডভেদীর মৃত্যু হয়।

[মহা (k) ৬.৯৬.২৭; ৭.৩৭.২৫-৩০; ৭.১২৭.৩৩, ৬০;
(হরি) ৬.৯২.২৭; ৭.৩৪.২৫-৩০; ৭.১১০.৭, ১০২]

কুণ্ডল১ জনমেজয়ের সর্পসত্রে কৌরব্যবংশীয় যেসব নাগ ভস্মীভূত হয়েছিলেন কুণ্ডল তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ১.৫৭.১৩; (হরি) ১.৫২.১৩]*

কুণ্ডল২ প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি জনপদ। মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত জম্বুখণ্ড বিনির্মাণ পর্বে সঞ্জয় ভারতবর্ষের নদনদী ও জনপদসমূহের বিবরণ দিতে গিয়ে এই জনপদের নাম উল্লেখ করেছেন। এই জনপদের আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

[মহা (k) ৬.৯.৬৩; (হরি) ৬.৯.৬৩]

কুণ্ডলকূপ প্রভাসক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র কূপ। স্কন্দ পুরাণের প্রভাসখণ্ডের অন্তর্গত প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যে এই তীর্থের মাহাত্ম্য বিষয়ক উপাখ্যান বিশদে বর্ণিত হয়েছে।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র) ১৪৮.১-৫৩]

কুণ্ডলা বিন্ধ্যবান গন্ধর্বের কন্যা তথা পুষ্করমালী নামক গন্ধর্ববীরের পত্নী। ইনি গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসার বিশ্বস্ত সখী ছিলেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর কুণ্ডলা ইহজীবনের যাবতীয় সুখভোগ ত্যাগ করে দিব্য গতির দ্বারা তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করে কাটাতে লাগলেন। তবে সখী মদালসার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ ছিল। মদালসা পাতালকেতু নামক দানবের দ্বারা অপহৃত হলে

কুণ্ডলা সেই খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে মদালসার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মুক্তির উপায় চিন্তা করছিলেন। এইসময় রাজা শত্রুজিতের পুত্র ঋতধ্বজ-কুবলয়াশ্ব যজ্ঞ কর্মে বিঘ্ন উৎপাদনকারী দানবদের দমন করার জন্য গালব ঋষির আশ্রমে অবস্থান করছিলেন। পাতালকেতু গালবের আশ্রমে যজ্ঞে বাধা দিলে কুবলয়াশ্ব তাকে আটকানোর চেষ্টা করলেন। শেষে কুবলয়াশ্বের অস্ত্রে গুরুতর আহত পাতালকেতু পালিয়ে পাতালে নিজের বাসভবনে ফিরে চললেন। কুবলয়াশ্বও তাঁর পিছু নিয়ে পাতালে পৌঁছালে কুণ্ডলা ও অপহৃতা মদালসার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। কুণ্ডলা জানতে পারেন যে, কুবলয়াশ্বই পাতালকেতুকে বধ করেছেন। এটাও তিনি জানতে পারেন যে, কুবলয়াশ্ব ও মদালসা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। সব বুঝে কুণ্ডলাই তাঁদের বিবাহের আয়োজন করেন। কুবলয়াশ্ব মদালসাকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরতে উদ্যোগী হলে কুণ্ডলা স্নেহশীলা সখী এবং অভিভাবকের মতো কুবলয়াশ্বকে পত্নীর প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন। এরপর কুণ্ডলা তপস্যায় বাকি জীবন কাটাবার সঙ্কল্প নিয়ে তীর্থযাত্রা করলেন। *[মার্কণ্ডেয় পু. ২১.১৩-৭৯]*

কুণ্ডলী১ পক্ষীরাজ গরুড়ের পুত্রদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৫.১০১.৯; (হরি) ৫.৯৪.৯]

কুণ্ডলী২ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের মধ্যে একজন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অষ্টম দিনে ইনি ভীমসেনের হাতে নিহত হন।

[মহা (k) ৬.৯৬.২৪; (হরি) ৬.৯২.২৪]

কুণ্ডলী৩ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে একটি। বিষ্ণু সহস্রনামের টীকাকার শঙ্করাচার্য ভগবানের কুণ্ডলী নামটিকে সর্বপ্রথম অনন্ত বা শেষনাগের স্বরূপতা থেকে ব্যাখ্যা করেছেন— শেষরূপভাক্ কুণ্ডলী। বিশাল অনন্তনাগ কুণ্ডলাকারে অর্থাৎ কুণ্ডলী পাকিয়ে উপবেশন করেন বলে শেষ নাগস্বরূপ ভগবান বিষ্ণুকে কুণ্ডলী নামে সম্বোধন করা হয়েছে। কুণ্ডলী শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হল, যিনি কুণ্ডল ধারণ করেন। নারায়ণের যে দিব্য মূর্তি কল্পিত হয়, তার কর্ণ দুটি রত্নময় কুণ্ডল বেষ্টিত। দার্শনিকরা এই কুণ্ডলকে কখনও বা সহস্রকিরণময় সূর্যমণ্ডলের স্বরূপ বলে বর্ণনা করেছেন, কখনও বা সাংখ্য এবং যোগদর্শন কে ভগবান বিষ্ণুর দুই কানের কুণ্ডল বলে বর্ণনা করেছেন। সেই দীপ্তিমান কুণ্ডল ধারণ করেন বলেই ভগবান বিষ্ণু কুণ্ডলী নামে খ্যাত—

সহস্রাংশুমণ্ডলোপমকুণ্ডলধারণাদ্ বা যদ্বা সাংখ্য যোগাত্মকে কুণ্ডলে মকরাকারে অস্য স্ত ইতি কুণ্ডলী।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১১০; (হরি) ১৩.১২৭.১১০]

কুণ্ডলী৪ ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত জম্বুখণ্ড বিনির্মাণ পর্বে সঞ্জয় ভারতবর্ষের যেসব নদনদীর নাম উল্লেখ করেছেন কুণ্ডলী তার মধ্যে একটি।

[মহা (k) ৬.৯.২১; (হরি) ৬.৯.২১ (কুণ্ডলা পাঠ ধৃত হয়েছে)]

□ কুণ্ডলী নদীর কিছু পরেই ভীমা ইত্যাদি দক্ষিণ ভারতীয় নদীর নাম উল্লিখিত হওয়ায় কুণ্ডলী নামেও একটি দক্ষিণ ভারতীয় নদী ছিল বলেই ধারণা হয়। আধুনিক মহারাষ্ট্রে গোদাবরী উপত্যকায় গোদাবরীর উপনদী ভীমার উত্তরে কুণ্ডলী নামে এক ছোটো নদীর উল্লেখ পাই। পশ্চিম ঘাট পর্বত থেকে এই নদীর উৎপত্তি।

[Harsh K. Gupta, Disaster Management, Hyderabed, Universities Press Private Limited, 2003; p. 30; en.wikipedia.org/wiki/kundali-River]

কুণ্ডশায়ী ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ১.১১৭.১০; (হরি) ১.১১১.৯]

কুণ্ডারিকা স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.১৫; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ১৫ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

কুণ্ডাশী ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.১১৭.১৪; (হরি) ১.১১১.১৪]

কুণ্ডিক পুরুবংশীয় রাজা পারীক্ষিত জনমেজয়ের (প্রথম জনমেজয়) পুত্র ধৃতরাষ্ট্র। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এগারো পুত্র সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন কুণ্ডিক।

[মহা (k) ১.৯৪.৫৮; (হরি) ১.৮৯.৪৬]

কুণ্ডিকের বিন্ধ্য পর্বতে বসবাসকারী একটি জনজাতির নাম। হৈহয় জনজাতির একটি শাখা

কুণ্ডিকের। মৎস্য পুরাণে কুণ্ডিকের নাম থাকলেও অনান্য পুরাণে তুণ্ডিকের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। *[দ্র. তুণ্ডিকের]*

[মৎস্য পু. ৪৩.৪৯]

কুণ্ডিন মহর্ষি বশিষ্ঠের অন্যতম পুত্র।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১১৬]

মৎস্য পুরাণে বশিষ্ঠবংশীয় যেসব বংশপ্রবর্তক ঋষির নাম উল্লিখিত হয়েছে, কুণ্ডিন তাঁদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৪৫.১১০; ২০০.১৫; বায়ু পু. ৫৯.১০৬; ৭০.৯০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৯৯]*

কুণ্ডিন পুরু বংশীয় রাজা পারীক্ষিত জনমেজয়ের (প্রথম পারীক্ষিত জনমেজয়) পুত্র ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্রের এগারোটি পুত্র সন্তানের মধ্যে কুণ্ডিন একজন। *[মহা (k) ১.৯৪.৫৮; (হরি) ১.৮৯.৪৬]*

কুণ্ডিনপুর প্রাচীন বিদর্ভ দেশের রাজধানী। দময়ন্তীর পিতা রাজা ভীম কুণ্ডিনপুরে শাসক ছিলেন।

[মহা (k) ৩.৬০.১৯; ৩.৭৩.২, ২১; ৩.৭৭.২০; ৩.৭৮.১; (হরি) ৩.৫০.১৯; ৩.৬০.২, ২১; ৩.৬৩.২০; ৩.৬৪.১]

□ কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠা পত্নী রুক্মিণী বিদর্ভের রাজকুমারী ছিলেন। তাঁর পিতা রাজা ভীষ্মক। কৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণীহরণ প্রসঙ্গে মহাকাব্য ও পুরাণে একাধিকবার কুণ্ডিনপুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিদর্ভের রাজধানী কুণ্ডিনপুরেই রুক্মিণীর স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কৃষ্ণের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী জরাসন্ধের স্নেহধন্য শিশুপালের হাতে রুক্মিণীকে সমর্পণ করার যাবতীয় ব্যবস্থা প্রায় পাকা। ঠিক সেই সময়েই কৃষ্ণ কৌশলে রুক্মিণীকে হরণ করেন। রুক্মিণী হরণের পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রুক্মী ক্রোধবশতঃ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, কৃষ্ণকে যুদ্ধে পরাজিত না করলে তিনি নিজ রাজধানী কুণ্ডিনপুরে প্রবেশ করবেন না। রুক্মী কৃষ্ণের কাছে যুদ্ধে পরাজিত ও লজ্জিত হয়ে কুণ্ডিনপুরে প্রবেশ করতে পারেননি। নিজ রাজধানী ত্যাগ করে তিনি ভোজকটপুর নামে একটি নগর স্থাপন করে সেখানে রাজত্ব করেছিলেন।

[মহা (k) ৫.১৫৮.১৪-১৬; (হরি) ৫.১৪৭.১৪-১৬; ভাগবত পু. ১০.৫৩.৭, ১৫, ২১; ১০.৫৪.১৯-২১, ৫২; বিষ্ণু পু. ৫.২৬.১; হরিবংশ পু. ২.৫০ অধ্যায়; ২.৫৯-৬০ অধ্যায়]

□ বর্তমান মহারাষ্ট্রের নাগপুর প্রদেশের ওয়ার্ধা (Wardha) নদীর তীরবর্তী কুণ্ডিন্যপুর (Kundinyapura)। কুণ্ডিন্যপুর বেরারের অমরাবতী জেলার অন্তর্গত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কুণ্ডিন্যপুরে একটি ভবানীমন্দির রয়েছে। লৌকিক বিশ্বাসে মনে করা হয় যে, এই মন্দিরটি থেকেই বাসুদেব কৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন। সেই স্মৃতিতে এখনও ওই মন্দির এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে একটি বাৎসরিক মেলার আয়োজন করা হয়।

[দ্র. বিদর্ভ, রুক্মী]

[GAMI (Sircar) p. 188; GDAMI (Dey) p. 108]

কুণ্ডী শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি। কুণ্ড শব্দের অর্থ ঘট বা ওই জাতীয় জলপাত্র। ক্ষেত্র বিশেষে এটি কমণ্ডলু শব্দের দ্যোতক। যিনি কুণ্ড বা কমণ্ডলু ধারণ করেন তিনি কুণ্ডী। দশভুজ মহাদেব এক হাতে কমণ্ডলু ধারণ করেন বলে তিনি কমণ্ডলু নামে খ্যাত। একই কারণে তিনি কুণ্ডী নামেও খ্যাত। *[দ্র. কমণ্ডলুধর]*

[মহা (k) ১৩.১৭.১৩১; (হরি) ১৩.১৬.১৩০]

কুণ্ডীবিষ একটি প্রাচীন ভারতীয় জনজাতি তথা জনপদ। এরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডব ও কৌরব উভয় পক্ষেই যোগদান করেছিল। একদিকে কুণ্ডীবিষদের পিশাচ, দরদ, পুণ্ড্র ইত্যাদি জনজাতির পাশাপাশি পাণ্ডবদের তৈরি ক্রৌঞ্চব্যূহের দক্ষিণাংশে অবস্থান করতে দেখা যায়। অন্যদিকে, কারূষ, বিকুঞ্জ ও মুণ্ডদের সঙ্গে এঁদের কৌরবপক্ষের গরুড়ব্যূহের বামদিকে দেখা যাচ্ছে। তবে মহাভারতে এঁদের একবার কুণ্ডীবৃষ নামেও উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ৬.৫০.৫১; ৫৬.৯; (হরি) ৬.৫০.৫১; ৫৬.৯]

□ পণ্ডিতরা মনে করেন যে, মহাভারতের কালে কুণ্ডীবিষ জনজাতিটি পুণ্ড্রদেশ অর্থাৎ বৃহত্তর বঙ্গদেশের উত্তরাংশ এবং অসমে বাস করতো। শেফার সাহেব এদের মুণ্ড-জনজাতির শাখা বলে উল্লেখ করেছেন। মহাভারতের শ্লোকে একবার কুণ্ডীবিষের নাম পুণ্ড্রদের সঙ্গে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। আবার পরবর্তী একটি শ্লোকে মুণ্ড জনজাতির সঙ্গে একত্রে কুণ্ডীবিষদের কথা বলা হয়েছে। তাতে মনে হয় যে, পুণ্ড্রদেশের কাছাকাছি কুণ্ডীবিষদের অবস্থান এবং মুণ্ড জনজাতির সঙ্গে

এঁরা সম্পর্কিত, দুটি ধারণাই যুক্তিপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে, মূলতঃ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, নদিয়া, মালদা এবং পশ্চিম দিনাজপুরে মুণ্ডারা আজও বাস করে। বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরাংশেও এঁদের দেখা যায়। ফলে প্রাচীনকালে কুণ্ডীবিষদের সঙ্গে মুণ্ডা জনজাতির সংসর্গের ধারণাটি সঠিক বলেই মনে হয়। সেই সূত্রে কুণ্ডীবিষদের বৃহত্তর বঙ্গদেশে বসবাসের যুক্তিটিও আরও জোরালো হয়।

[Robert Shafer, Ethnography of Ancient India, Wiesbaden, ottohorrassowitz, 1954, p. 51; TIM p. 102; Jasodhara Bagchi, The Changing Status of Women in West Bengal (1970-2000); New Delhi, Sage Publications Ltd, 2005, p. 131]

কুণ্ডীবৃষ *[দ্র. কুণ্ডীবিষ]*

কুণ্ডীশ্বরলিঙ্গ প্রভাসক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। ভগবান শিব এই ক্ষেত্রে কুণ্ডীশ্বর নামে পূজিত হন।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র) ১৭৫.১-৫]

কুণ্ডেশ্বরতীর্থ$_১$ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। শিব-ধ্যানপরায়ণ হয়ে এই তীর্থ দর্শন করলে শিবদীক্ষার ফল পাওয়া যায়।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ৩১.৭]

কুণ্ডেশ্বরতীর্থ$_২$ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৬৮]

কুণ্ডেশ্বরী প্রভাসক্ষেত্রে শঙ্খোদক তীর্থ নামে একটি পবিত্র তীর্থ আছে। এই তীর্থে একটি পবিত্র কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন কুণ্ডেশ্বরী। দেবী কুণ্ডেশ্বরীকে দেবী শক্তিরই অন্যতম রূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

[দ্র. শঙ্খোদকতীর্থ]

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র) ১১৬.১-১০]

কুণ্ডোদ একটি পর্বত। যুধিষ্ঠিরের কাছে পূর্ব ভারতের বর্ণনা দিতে গিয়ে পুরোহিত ধৌম্য এই পর্বতের নাম উল্লেখ করেছেন। নিষধরাজ নলকে বনবাসকালে এই পর্বতই জল, ফলমূল ও আশ্রয় দান করেছিল বলে জানা যায়।

[মহা (k) ৩.৮৭.২৫; (হরি) ৩.৭২.২৫]

কুণ্ডোদর$_১$ চন্দ্রবংশীয় রাজা কুরুর পৌত্র পরীক্ষিত। এই পরীক্ষিতের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন জনমেজয়। এই জনমেজয় রাজার আট পুত্রসন্তানের মধ্যে ষষ্ঠ ছিলেন কুণ্ডোদর।

[মহা (k) ১.৯৪.৫৫; (হরি) ১.৮৯.৪৫]

কুণ্ডোদর$_২$ একজন বিশিষ্ট নাগ। মহাভারতের আস্তীকপর্বে সর্পনামকথনের সময় কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত যে বিশিষ্ট নাগদের নাম উল্লিখিত হয়েছে কুণ্ডোদর তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.৩৫.১৬; (হরি) ১.৩০.১৬]

কুণ্ডোদর$_৩$ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.৬৭.৯৭; (হরি) ১.৬২.৯৯]

কুৎস$_১$ পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যেসব ঋষি বংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি কুৎসের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি ভৃগুবংশীয়দের অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৫.২২; ১৯৬.৩৭]

কুৎস$_২$ চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র।

[ভাগবত পু. ৪.১৩.১৬]

কুথন কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা খশার গর্ভজাত একজন রাক্ষস পুত্র। *[বায়ু পু. ৬৯.১৬৫]*

কুথপ্রাবরণ *[দ্র. অপপ্রাবরণ]*

কুথুমি$_১$ ভবিষ্যৎ উনবিংশতিতম দ্বাপরে যখন মহর্ষি ভরদ্বাজ ব্যাস হবেন, সেই সময় ভগবান শিব জটামালী নাম গ্রহণ করে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন। তাঁর যে চারটি পুত্র সন্তান হবে, তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ হলেন কুথুমি। *[বায়ু পু. ২৩.১৮৭]*

কুথুমি$_২$ শুক্লযজুর্বেদের অন্যতম আচার্য হিরণ্যনাভ। হিরণ্যনাভর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মহর্ষি কুথুমি। কুথুমির তিনপুত্র—ঔরস, রসপাসর এবং ভাগবিত্তি। এঁরা কৌথুম নামে অভিহিত হন। মহর্ষি কুথুমি হিরণ্যনাভর কাছ থেকে যজুর্বেদ শিক্ষা করেছিলেন। তিনি এই তিন পুত্রকে সেই শিক্ষা দেন। *[বায়ু পু. ৬১.৩৬, ৩৮]*

কুনক *[দ্র. ক্ষুদ্রক]*

কুনদীক তারকাসুর বধের সময় যে-সব অনুচর যোদ্ধা স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন, কুনদীক তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৫৮; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

কুনাল বায়ু পুরাণ মতে, কলিযুগে রাজত্বকারী মৌর্যবংশীয় রাজর্ষি অশোকের পুত্র ছিলেন

কুনাল। ইনি আট বছর রাজত্ব করেছিলেন বলে পুরাণে উল্লেখ আছে। *[বায়ু পু. ৯৯.৩৩৩]*

কুনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সত্যধ্বজের পুত্র এবং অঞ্জনের পিতা কুনি। বিষ্ণু পুরাণের দাক্ষিণাত্য পাঠে 'কুনি'র পরিবর্তে 'কৃতি' নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়। *[বিষ্ণু পু. (নবভারত) ৪.৫.১৩; (কাঞ্চীপুরম্) ৪.৫.৩১]*

কুনিন্দ জরাসন্ধ পক্ষীয় এক বীর। জরাসন্ধ কর্তৃক মথুরা অবরোধের সময় ইনি নগরীর উত্তরদ্বার রুদ্ধ করে অবস্থান করছিলেন। এই কুনিন্দের অপর নাম কুলিন্দ।

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ১০.৫০.১১; ১০.৫২.১১]

কুনেত্রক ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে পঞ্চদশ দ্বাপরে আরুণি যখন ব্যাস হবেন, তখন মহাদেব বেদশিরা নামে অবতীর্ণ হবেন। সেইসময়ে তাঁর যে চারজন পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদের মধ্যে কুনেত্রক অন্যতম। *[বায়ু পু. ২৩.১৬৯]*

কুন্ত প্রাচীন ভারতে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত অন্যতম অস্ত্র। অতি প্রাচীনকাল থেকে এই অস্ত্র ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কুন্ত অস্ত্রটির সঙ্গে ভিন্দিপালের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে বলে অমরকোষের টীকাকার মন্তব্য করেছেন। *[দ্র. ভিন্দিপাল]*

শুক্রনীতিসার গ্রন্থে 'কুন্ত' নামক অস্ত্রটির বর্ণনা পাওয়া যায়। শুক্রনীতিসার মতে, 'কুন্ত' হল দশ হাত লম্বা একটি অস্ত্র যার অগ্রভাগে শঙ্কু আকৃতির তীক্ষ্ণফলা থাকে—

দশহস্তমিতঃ কুন্তঃ ফালাগ্রশঙ্কুবুধ্নকঃ।

তবে পণ্ডিত Dikshitar মন্তব্য করেছেন যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঁচ হাত লম্বা কুন্ত যেমন দেখা যেত, তেমনই এগার হাত লম্বা কুন্তও নির্মিত হত।

কুন্ত অস্ত্রটি দেখতে অনেকটা বর্শার মত। কোষগ্রন্থ অমরকোষের টীকাকার মহেশ্বর কুন্তকে বর্শা বা ভল্লের অনুরূপ অস্ত্র বলেই উল্লেখ করেছেন—

প্রাসঃ কুন্তঃ দ্বে ভালা ইতি খ্যাতস্য।

কুন্তের তীক্ষ্ণ ফলাটি লোহা দিয়ে তৈরি হত। মহাভারতে লৌহনির্মিত কুন্ত বা 'অয়স্কুন্ত' অস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর এর হাতল হত কাঠের তৈরি। বর্শার মতোই এই অস্ত্রও শত্রুকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হত।

মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে একাধিকবার কুন্ত অস্ত্রটির উল্লেখ মেলে। ভিন্দিপালের মতোই হয়তো কুন্তও প্রধানত পদাতিক সৈন্যরাই ব্যবহার করতেন। রথী-মহারথীদের হাতে এই অস্ত্র তেমন দেখা যায় না। *[মহা (k) ৮.১৯.৩৪; ৮.২১.১২; (হরি) ৮.১৪.৩৪; ৮.১৬.১৬; অমরকোষ ২. (ক্ষত্রিয়বর্গ) ৯৩; শুক্রনীতিসার ৪.৭.২১৫; V.R. Ramachandra Dikshitar, War in Ancient India, p. 112]*

কুন্তল১ একটি প্রাচীন জনপদ। উদ্যোগপর্বে দ্রাবিড় ও অন্ধ্রদেশের সঙ্গে একত্রে কুন্তল দেশের নাম উচ্চারিত হতে দেখা যায়। তা থেকে মনে হয়, এটি একটি দক্ষিণ ভারতীয় জনপদ। এরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডব ও কৌরব উভয় পক্ষেই যুদ্ধ করেছিল।

[মহা (k) ৫.১৪০.২৬; ৬.৯.৫৯; ৬.৫১.১২; (হরি) ৫.১৩১.২৬; ৬.৯.৫৯; ৬.৫১.১২; বায়ু পু. ৪৫.১২৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৫৯]

☐ কোনো কোনো পুরাণে কুন্তলকে মধ্যদেশীয় জনপদ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

[মৎস্য পু. ১১৪.৩৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৪১; বায়ু পু. ৪৫.১১০]

☐ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় কুন্তল দেশের রাজা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছিলেন।

[মহা (k) ২.৩৪.১১; (হরি) ২.৩৩.১১]

☐ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় পাণ্ডবপক্ষীয় রাজা পাণ্ড্য কৌরবপক্ষে যোগদানকারী কুন্তলদের সংহার করেছিলেন।

[মহা (k) ৮.২০.১০; (হরি) ৮.১৫.১০]

☐ আধুনিক পণ্ডিতদের বিশ্বাসে কুন্তলদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সংক্রান্ত ধারণা বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। চালুক্য রাজবংশের শাসনকালে উত্তরে নর্মদা নদী থেকে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত এবং পূর্বে গোদাবরী নদী ও পূর্বঘাট পর্বত থেকে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত ভূ-ভাগকে কুন্তলদেশ বলা হত। এর রাজধানী ছিল পর্যায়ক্রমে নাসিক ও কল্যাণ (মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত)। পরবর্তীকালে দক্ষিণ মহারাষ্ট্র কুন্তলদেশ নামে পরিচিত হয়। দণ্ডীর লেখা দশকুমারচরিত গ্রন্থে কুন্তলকে, বিদর্ভের অনুগত একটি জনপদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে দশম খ্রিস্টাব্দের

সাহিত্যে আবার বিদর্ভকে কুন্তলদেশের অন্তর্গত বলা হয়েছে। অবশ্য পরবর্তী শিলালিপিগুলিতে কর্ণাটককেই কুন্তলদেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাতবাহন বংশীয়রাও একসময় কুন্তলদেশ শাসন করেছিলেন। সে সময় কুন্তলের রাজধানী ছিল বৈজয়ন্তী। অন্য মতে আধুনিক কর্ণাটকের উত্তরাংশে অবস্থিত বনবাসী (Banavasi) নামে স্থানটিই কুন্তলের রাজধানী ছিল।

[GDAMI (Dey) p. 109; GD (N.N. Bhattacharyya) p. 198]

□ পণ্ডিত কানিংহামের মতে, কুন্তলদেশ বলতে বর্তমান উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলার 'চুনার'কেই বোঝানো হত। তাঁর মতে চুনারের প্রাচীন নাম কুন্তীল। তবে মাইসোর শিলালিপি অনুসারে প্রাচীন বম্বে প্রেসিডেন্সির দক্ষিণাংশ ও মাইসোরের উত্তরাংশও কুন্তলের অন্তর্গত ছিল। এক সময় নন্দবংশীয় রাজারা এই অঞ্চলটিতে রাজত্ব করতেন বলে মনে করা হয়।

[TAI (Law) p. 176-177; Cunningham, Report of Tours in the Gangetic Provinces from Badaon to Bihar in 1875-76 and 1877-78; Archeological Survey of India; 2000; p. 128]

কুন্তল২ মহাভারত ও পুরাণে অপর একটি কুন্তল দেশের নাম পাওয়া যায়। এই দেশটির নাম ভীষ্মপর্বে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের জনপদ ও জাতির নামের তালিকার মধ্যে পাওয়া যায়। তাতে মনে হয় এটি উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোনো জনপদ।

[মহা (k) ৬.৯.৫২; (হরি) ৬.৯.৫২]

□ পুরাণ মতে, ভাগীরথী নদীর সাতটি শাখা যে সমস্ত ভূখণ্ডের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে কুন্তল অন্যতম। এইখানে আবার চীন, যবন ইত্যাদি জাতিগুলির সঙ্গে কুন্তল দেশ তথা কুন্তল জনজাতিরও উল্লেখ রয়েছে—

কুন্তলাংশ্চীনান্ বর্বরান্যবনান্।

তাতে আবার মনে হয় যে, দাক্ষিণাত্যের কুন্তল ও এই কুন্তল এক নয়, দুটি আলাদা জায়গা।

[বায়ু পু. ৪৭.৪২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৪৪]

□ তবে এখনও পর্যন্ত উত্তর বা পশ্চিম ভারতে অবস্থিত কুন্তলদেশের আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

কুন্তল৩ মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, স্বাতিকর্ণবংশীয় একজন রাজা কুন্তল। তিনি আটবছর রাজত্ব করেছিলেন। *[মৎস্য পু. ২৭৩.৮]*

কুন্তি১ মথুরা-শূরসেন অঞ্চলের নিকটে অবস্থিত একটি প্রাচীন জনপদ। পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, যদু-বৃষ্ণি বংশের অন্যতম শাখা ছিলেন এই কুন্তিরা বা কুন্তিরাষ্ট্রের অধিবাসীরা। জরাসন্ধের আক্রমণের ভয়ে কুন্তির অধিবাসীরা উত্তর দিক ছেড়ে দক্ষিণ দিকে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

[মহা (k) ২.১৪.২৬; ৬.৯.৪০; (হরি) ২.১৪.২৬; ৬.৯.৪০; ভাগবত পু. ১০.৫৪.৫৮, ৮৬.২০]

□ অজ্ঞাতবাসের জন্য উপযুক্ত জায়গা কোনটি হতে পারে, সে সম্পর্কে আলোচনা করার সময় অর্জুন কুরুদেশের মোটামুটি কাছে অবস্থিত বেশ কয়েকটি সমৃদ্ধ জনপদের নাম উচ্চারণ করেন, যেগুলি আত্মগোপন করে থাকার পক্ষে উপযুক্ত। অর্জুনের বেছে নেওয়া সেই সব জনপদগুলির মধ্যে কুন্তি অন্যতম। এ থেকে বোঝা যায় যে, কুন্তিরাষ্ট্র পাণ্ডবদের বন্ধুদেশ ছিল। নতুবা অর্জুন অজ্ঞাতবাসের আশ্রয়স্থল হিসেবে কুন্তির নাম উচ্চারণ করতেন না।

[মহা (k) ৪.১.১৩; (হরি) ৪.১.১৩]

□ পরশুরাম ক্ষত্রিয়নিধনকালে কুন্তি-দেশের ক্ষত্রিয়দেরও নির্মূল করেছিলেন।

[মহা (k) ৭.৭০.১১; (হরি) ৭.৬২.৯]

□ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুন্তি-দেশীয় বীরেরা পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করেছিলেন। ভীষ্ম যুদ্ধে এঁদের সংহার করেন।

[মহা (k) ৮.৬.২; (হরি) ৮.৪.২]

□ যদুবংশীয় এবং তাঁদের সমস্ত জ্ঞাতি গোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে কুন্তি-দেশীয় প্রধান পুরুষদেরও কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত সমন্তপঞ্চক তীর্থে সূর্যগ্রহণ দেখতে সমবেত হতে দেখা যায়।

[ভাগবত পু. ১০.৮২.১৩]

□ যদুবংশ ধ্বংসের সময় বিভিন্ন যদুবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত জ্ঞাতিরাষ্ট্রগুলিও পরস্পরের সঙ্গে প্রবল লড়াই শুরু করে। এই সময় কুন্তিরাষ্ট্রের মধ্যেও তুমুল অন্তর্কলহ দেখা দিয়েছিল বলে জানা যায়। *[ভাগবত পু ১১.৩০.১৮]*

□ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভীষ্ম পর্বে কুন্তি নামে দুটি জনপদের নাম পাওয়া যায়। প্রথম কুন্তি দেশের

নাম কৌশল্য ও কান্তিকোশলের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে—

কৌশল্যাঃ কুন্তয়ঃ কান্তিকোশলাঃ।

আর দ্বিতীয়টির নাম অবন্তী ও অপরকুন্তির সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে—

কুন্তয়ো'বন্তয়শ্চৈব তথৈবাপরকুন্তয়ঃ।

[মহা (k) ৬.৯.৪০, ৪৩; (হরি) ৬.৯.৪০, ৪৩]

□ পণ্ডিত জনেরা মনে করেন যে, এই দুই কুন্তি এবং অপরকুন্তি তিনটি আলাদা আলাদা জায়গা। এদের মধ্যে মিল একটিই। এই তিনটি জায়গাতেই যদু বৃষ্ণিদের শাখাগোষ্ঠী কুন্তিরা বাস করতেন। সভাপর্বের সূত্র ধরে দেখা যায়, শূরসেন অঞ্চলে বসবাসকারী কুন্তিজাতির মানুষরা জরাসন্ধের ভয়ে দক্ষিণ দিকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। এঁরা দক্ষিণদিকে গিয়ে যে অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন, সম্ভবত সেই অঞ্চলটিও কুন্তি নামেই পরিচিত হয়। মনে করা হয় যে, পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর পিতা কুন্তিভোজ এই দক্ষিণ দেশীয় কুন্তিনামক অঞ্চলটিতেই রাজত্ব করতেন। এই কুন্তিভোজ কথাটি ব্যক্তিনাম নয়, স্থান বা জাতির নাম হিসেবেই প্রমাণ করা যায়। বিশেষত 'কুন্তি' শব্দের সঙ্গে 'ভোজ'-শব্দটি প্রমাণ করে যে, এটি যদু-বৃষ্ণিদের জ্ঞাতি রাষ্ট্র; কেননা 'ভোজ' জনজাতীয়রা যদু-বৃষ্ণিদের জ্ঞাতি ছিলেন। মথুরাপতি কংসও ছিলেন ভোজ-গোষ্ঠীর মানুষ—

ভোজানাং কুলপাংসনঃ—তিনি ভোজদের কুলাঙ্গার।

অন্যতর বিচারে কুন্তি নামক জনজাতিটির নামেই পাণ্ডুপত্নী কুন্তির পিতা পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয়। এখানে বলে রাখা ভালো যে, এই দক্ষিণদেশীয় কুন্তিরাষ্ট্র অবন্তীর কাছে অবস্থিত। সেই সময় অবন্তীর প্রতিপত্তি মধ্যদেশে প্রবল। শুধু তাই নয় অবন্তীর রাজা বিন্দ ও অনুবিন্দ দুজনেই জরাসন্ধের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। *[দ্র. অবন্তী]*

এমত অবস্থায় কুন্তিদের পক্ষে এই অঞ্চলে টিকে থাকা যথেষ্ট কঠিন ছিল বলে ধারণা করা যায়। সম্ভবত সে কারণেই মথুরা-শূরসেন অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা কুন্তিরা অশ্বনদীর তীরে তাঁদের দ্বিতীয় বাসস্থান ছেড়ে পশ্চিম দিকে তুলনামূলকভাবে সুরক্ষিত জায়গায় নতুন বসতি স্থাপন করে। তবে অন্ততঃ দ্বিতীয়বার সামগ্রিকভাবে না হলেও কুন্তিদের একটি শাখা পশ্চিমদিকে 'migrate' করে অপরকুন্তিতে বসবাস করতে শুরু করে। অপরকুন্তি নামক স্থানটি চম্বলের উপনদী কুনু নদীর অববাহিকায় অবস্থিত ছিল বলে ধারণা করা হয়।

কুন্তিজাতির মানুষেরা গোয়ালিয়রের কাছাকাছি অবস্থিত কোন্টওয়াল (Kontwal) অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

[TIM (Mishra) p. 103; GDAMI (Dey) p. 109; Sudama Misra, Janapada States in Ancient India, Varanasi, Bharatiya Vidya Prakashan; 1973, p. 103]

কুন্তি২ পারিযাত্র পর্বত থেকে উৎপন্ন একটি নদী।

[মৎস্য পু. ১১৪.২৪]

□ মহাভারত থেকে জানা যায় যে, রাজা কুন্তিভোজ অশ্বনদীর অববাহিকা অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। ইনিই পাণ্ডব জননী কুন্তীর পালক পিতা। অনূঢ়া অবস্থাতেই কুন্তীর গর্ভে সূর্যদেবের সন্তান কর্ণের জন্ম হয়। লোকলজ্জার ভয়ে কুন্তী তখন সেই সদ্যোজাত সন্তান কর্ণকে পেটিকায় স্থাপন করে অশ্বনদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। পরে পেটিকাটি ভাসতে ভাসতে অশ্বনদী থেকে চর্মণ্বতী (বর্তমান চম্বল) নদীতে এসে পৌঁছায়।

পণ্ডিত N.L. Dey ও D.C. Sircar-এর মতে, এই অশ্বনদী বা অশ্বরথ নদীটিরই অপর নাম কুন্তী। সম্ভবত কুন্তীর সন্তান ভাসিয়ে দেওয়ার পৌরাণিক জল্পনা থেকেই অশ্বনদীর নাম কুন্তী নামের সঙ্গে একাত্মক হয়ে গেছে। এঁদের মতে, কুন্তী নদী চম্বলেরই একটি উপনদী। এই ধারণার সমর্থন কর্ণের অশ্বা বা কুন্তী নদী থেকে চর্মণ্বতী বা চম্বল নদীতে ভেসে আসার মধ্যেও পাওয়া যায়।

[GDAMI (Dey) p. 109; GAMI (Sircar) p. 54; HGMP (P.K. Bhattacharyya) p. 92]

কুন্তি৩ ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, হৈহয়ের বংশধারায় ধর্মনেত্রের পুত্র এবং সোহঞ্জির পিতা কুন্তি। বিষ্ণু পুরাণে কুন্তির পুত্রের নাম হিসেবে 'সাহঞ্জি' নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে কুন্তি ধর্মনেত্রের পুত্র ও সংহতের পিতা। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে অবশ্য কুন্তির পুত্রের নাম সংজ্ঞেয় বলা হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৯.২৩.২২; বিষ্ণু পু. ৪.১১.৩; মৎস্য পু. ৪৩.৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৯.৫]

কুন্তি$_{8}$ বিষ্ণু পুরাণ ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, যদু বংশীয় ক্রথের পুত্র কুন্তি। কুন্তির পুত্র বৃষ্ণি।

[বিষ্ণু পু. ৪.১২.১৬; ভাগবত পু. ৯.২৪.৩]

□ মৎস্য ও বায়ু পুরাণে আবার কুন্তির পুত্রের নাম হিসেবে 'ধৃষ্ট'-নামটি ব্যবহৃত হয়েছে।

[মৎস্য পু. ৪৪.৩৮-৩৯; বায়ু পু. ৯৫.৩৮]

কুন্তি$_{৫}$ বাসুদেব-কৃষ্ণের ঔরসে নাগ্নজিতী সত্যার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কুন্তি একজন।

[ভাগবত পু. ১০.৬১.১৩]

কুন্তি$_{৬}$ পক্ষীরাজ বৈনতেয় গরুড়ের বংশধারায় সুপার্শ্বের পুত্র কুন্তি। কুন্তির পুত্র প্রলোলুপ।

[মার্কণ্ডেয় পু. ২.৩]

কুন্তিভোজ রাজা কুন্তিভোজ যদুবংশীয় শূরের পিসতুতো ভাই। কুন্তিভোজ নিঃসন্তান ছিলেন। শূরের কাছে তিনি সন্তান দত্তক নেওয়ার প্রার্থনা করেন। শূরও প্রতিজ্ঞা করে কুন্তিভোজকে বলেন যে, তাঁর প্রথম সন্তানকে তিনি দান করবেন। এরপর শূরের যখন 'পৃথা' নামে এক কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করল, তখন সেই কন্যাকে শূর, কুন্তিভোজের হাতে দান করলেন। পৃথাকে দত্তক নিলেন কুন্তিভোজ।

[মহা (k) ১.৬৭.১৩০-১৩২; ১.১১১.১-৩; (হরি) ১.৬২.১৩০-১৩২; ১.১০৫.১-৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৫১-১৫২; বায়ু পু. ৯৬.১৫০; বিষ্ণু পু. ৪.১৪.১০; মৎস্য পু. ৪৬.৭]

□ পরবর্তীকালে অবশ্য কুন্তিভোজের দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মহাভারতের দ্রোণপর্বেই তা উল্লিখিত হয়েছে। কুন্তিভোজের দশটি পুত্রকেই অশ্বত্থামা বধ করেছিলেন।

[মহা (k) ৭.১৫৬.১৮৪; (হরি) ৭.১৩৬.১৭৬]

□ মহাভারতের সভাপর্বে পুরুজিৎকেই সম্ভবত কুন্তিভোজের জ্যেষ্ঠপুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[মহা (k) ২.১৪.১৭; (হরি) ২.১৪.১৭]*

□ মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, কুন্তিভোজের গৃহে যখন দুর্বাসা মুনি অতিথি হয়ে এলেন, তখন কুন্তিভোজ তাঁর কন্যা পৃথা-র ওপরেই অতিথি সৎকারের দায়িত্ব দেন।

[দ্র. কুন্তী]

[মহা (k) ৩.৩০৫.৮-১১, ২১; (হরি) ৩.২৬৯.৮-১১, ২১]

□ মহাভারতের উদ্যোগপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করে যেসব রাজারা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কুন্তিভোজও একজন।

[মহা (k) ৫.১৫১.৬৫; (হরি) ৫.১৪১.৬৫]

□ সহদেব দিগ্বিজয়ের সময় কুন্তিভোজের কাছে গেলে, কুন্তিভোজ নিজেই সহদেবকে অভ্যর্থনা জানান এবং যুধিষ্ঠিরকে কর প্রদান করেন। *[মহা (k) ২.৩১.৬; (হরি) ২.৩০.৬]*

□ সমন্তপঞ্চকে ভগবান বাসুদেবের বিশ্বরূপ দর্শন করতে যেসব রাজারা উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কুন্তিভোজ একজন।

[ভাগবত পু. ১০.৮২.২৫]

কুন্তী যদু-বৃষ্ণিবংশীয় আর্যক শূরের কন্যা পৃথা। পরবর্তী সময়ে ইনিই বিখ্যাত হয়েছিলেন কুন্তী নামে। পুরাণগুলিতে শূরের বসুদেব প্রভৃতি দশ পুত্র এবং পাঁচ কন্যাসন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের খিল-পাঠ হরিবংশ পুরাণ এবং অন্যান্য সমস্ত পুরাণেই শূরের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লিখিত হয়েছে কৃষ্ণ পিতা বসুদেবের নাম। কন্যাসন্তানদের তালিকায় অবশ্য প্রথম নামটি পৃথা-কুন্তীর। তবে পুরাণের বিবরণের সঙ্গে মহাভারতের উপাখ্যান মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, বসুদেব শূরের পুত্রসন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হতেই পারেন কিন্তু জ্যেষ্ঠ সন্তান কখনোই ছিলেন না। আর্যক শূরের জ্যেষ্ঠ সন্তানটি নিঃসন্দেহে কন্যা, এবং সেই কন্যারই জন্মকালে প্রদত্ত নাম পৃথা।

আর্যক শূরের পিসতুতো ভাই কুন্তিভোজ। কুন্তিভোজ যে শুধুমাত্র শূরের নিকট আত্মীয় ছিলেন তাই নয়, তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও ছিল। আর্যক শূর ততদিনে বেশ কয়েকটি পুত্র-কন্যার জনক হয়েছেন। কিন্তু কুন্তিভোজ তখনও নিঃসন্তান। হয়তো নিঃসন্তান কুন্তিভোজ সন্তানপালনের আনন্দলাভের আশায় শূরের একটি সন্তান দত্তক নিতে চেয়েছিলেন। কুন্তিভোজের সেই অনুনয় শুনে শূর বললেন— ঠিক আছে, আমার প্রথম সন্তানটিকেই তুলে দেব তোমার হাতে—

অগ্র্যমগ্রে প্রতিজ্ঞায় স্বস্যাপত্যং তু সত্যবাক্।

সেই প্রতিশ্রুতি মতোই পৃথাকে কুন্তিভোজের হাতে দত্তক হিসেবে তুলে দেওয়া হয়—

অগ্রজাতেতি তাং কন্যাং শূরো'নুগ্রহকাঙ্ক্ষয়া।
অদদৎ কুন্তিভোজায় স তাং দুহিতরং তদা॥

মহাভারতের এই উল্লেখ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, আর্যক শূরের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে কুন্তীই ছিলেন জ্যেষ্ঠ। শূরের এই কন্যাটিকে দত্তক নিয়ে রাজা কুন্তিভোজই তাঁর 'কুন্তী' নামকরণ করে ছিলেন বলে মনে হয়। *[মহা (k) ১.৬৭.১২৯, ১৩১; (হরি) ১.৬২.১৩০-১৩২; হরিবংশ পু. ১.৩৪.২৩-২৪; বিষ্ণু পু. ৪.১৪.১০; বায়ু পু. ৯৬.১৪৯-১৫১; মৎস্য পু. ৪৬.৭-৮]*

□ মহাভারতের অন্তর্গত অংশাবতরণ পর্ব থেকে জানা যায় যে, দ্বাপর যুগে সিদ্ধি দেবী মর্ত্যলোকে পৃথা-কুন্তী রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.১৬০; (হরি) ১.৬২.১৬১]

□ ছোটোবেলায় নিজের বাবা যখন পৃথাকে দত্তক দিলেন, তখনই এই ঘটনা পৃথার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। পৃথা-কুন্তীর সারাটা জীবন কেটেছে বহু দুঃখকষ্ট এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে শান্তিদূত হিসেবে যখন কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে এলেন, তখন বিদুরের বাসভবনে কুন্তীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। কৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র, সুতরাং সম্পর্কে কুন্তী তাঁর বড়ো পিসীমা। কৃষ্ণের সঙ্গে কুন্তীর যখন কথাবার্তা হচ্ছে, তখন পাণ্ডবদের বনবাস শেষ হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে, কুন্তী তখন প্রায় বৃদ্ধা। কিন্তু এই বয়সেও শৈশবের এই অভাবনীয় দুর্ঘটনার স্মৃতি তাঁর মনের মধ্যে বেশ জাগ্রত। কুন্তী বলছেন—নিজের সারাজীবনের কষ্টের জন্য আমি নিজেকেও দোষ দিই না, দুর্যোধনকেও দোষ দিই না, আমি দোষ দিই আমার বাবাকে। ধনী মানুষ যেমন অজস্র টাকা পয়সা দান-ছত্র করে মহাদানী নাম কেনেন—কুন্তী বলছেন—আমার বাবাও আমাকে তাঁর বন্ধুর কাছে দান করে অনেক মান পেলেন—

পিতরং ত্বেব গর্হেয়ং নাত্মানং ন সুযোধনম্।
যেনাহং কুন্তিভোজায় ধনং বৃত্তৈরিবার্পিতা॥

কুন্তীর বৃদ্ধ বয়সেও এমন সোচ্চার প্রতিবাদ থেকেই বেশ স্পষ্ট হয় যে, নিজের বাবা তাঁকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়ায় বাল্যকালেই কতটা কষ্ট পেয়েছিলেন তিনি। নিজের বাবা মায়ের পরিবর্তে এখন অন্য কাউকে বাবা কিংবা মা বলে ডাকতে হবে, এবং এমনটা করতে হবে তার কারণ তাঁর জন্মদাতা পিতাই এমন ব্যবস্থা করেছেন তাঁর মতামতের অপেক্ষা পর্যন্ত না করে। সুতরাং বিষয়টা কুন্তীকে গভীর মানসিক আঘাত দিয়েছিল। পৃথা তখন একেবারে শিশু নন, তিনি তখন 'কন্দুক' অর্থাৎ বল বা গুটি নিয়ে খেলা করেন, নিজের পিতামাতার সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সম্বন্ধও গড়ে উঠেছে—এ অবস্থায় বাবা-মাকে ছেড়ে, আর্যক শূরের রাজভবনের বালক্রীড়া ত্যাগ করে কুন্তিরাষ্ট্রের রাজা কুন্তিভোজের বাড়িতে এলেন পৃথা। এ এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। এ ঘটনা যদি বিবাহসূত্রে শ্বশুরবাড়ি আসার মতো ঘটনা হত, তাহলেও বলা যেত যে, সে যুগে এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটত, আর মেয়েদের তা মেনে নিতেও হত। কিন্তু এ তো তা নয়, বাপের বাড়ি ছেড়ে স্বামীর ঘরে আসার থেকে এই ঘটনা অনেকটাই আলাদা। এক বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আর এক বাবার আশ্রয়ে আসা। বৃদ্ধ বয়সেও পৃথা কুন্তী সেই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা স্পষ্ট স্মরণ করতে পারেন—কৃষ্ণ। তখনও আমি কন্দুক নিয়ে খেলা করি। সেই অবস্থাতেই আমাকে কুন্তিভোজের হাতে দত্তক দিলেন আমার পিতা, তোমার পিতামহ—

বালাং মামার্যকস্তুভ্যং ক্রীড়ন্তীং কন্দুহস্তিকাম্।
অদাত্তু কুন্তিভোজায় সখা সখ্যে মহাত্মনে॥

বৃদ্ধ বয়সে কুন্তী পিতার এই ব্যবহারের প্রতিবাদ করে খুব স্পষ্ট ভাষাতেই তাকে বঞ্চনা বলে উল্লেখ করেছেন। এই বঞ্চনা বালিকা পৃথার মনেই বেশ মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল, খানিকটা জটিল মানসিকতারও সৃষ্টি করেছিল। ফলে আর্যক শূরের শিশুকন্যা কন্দুকক্রীড়া ত্যাগ করে বেশ পরিণত রমণীর মতোই কুন্তিভোজের রাজভবনে প্রবেশ করলেন। কুন্তিভোজ কন্যার নাম দিলেন কুন্তী। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, কুন্তী অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন—

তস্যা কন্যা পৃথা নাম রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।

নিঃসন্তান কুন্তিভোজ এই পালিতা কন্যাটিকে অতি আদরে পরম আহ্লাদে মানুষ করছিলেন হয়তো। বৃদ্ধা কুন্তীর হাহাকারের মধ্যে এই মানুষটির প্রতি কোনো ক্রোধ প্রকাশ পেতে দেখা যায় না। হয়তো বালিকা বয়সেও কুন্তী বুঝেছিলেন যে, সন্তানহীনতার কারণে হাহাকারী এই সরল মানুষটির পিতৃত্বের সাধনায় কোনো দোষ থাকতে পারে না। কুন্তিভোজ যথেষ্টই আদরে ভালবাসায়

প্রতিপালন করছিলেন এই কন্যাটিকে। কিন্তু এই নতুন পরিচয়ে, নতুন রাজভবনে পৃথা-কুন্তীর প্রতিপালনের যে বিবরণ আমরা পাই, সেখানে কুন্তীর মাতা অর্থাৎ কুন্তিভোজের পত্নীর কোনো উল্লেখ পাই না। কুন্তিভোজ-মহিষী কেমন স্নেহে যত্নে কন্যাটিকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, তার উল্লেখ মহাভারতে মেলে না।

[মহা (k) ৫.৯০.৬২-৬৫; ১.৬৭.১২৯; ১.১১১.১-৩; ১.১১২.১, ৬; (হরি) ৫.৮৩.৬২-৬৫; ১.৬২.১৩০; ১.১০৫.১-৩; ১.১০৬.১, ৬]

□ অবশ্য কুন্তীর প্রসঙ্গে উল্লেখ না থাকলেও কুন্তীর এমন মাতৃহীন প্রতিপালনের কারণটা বলা ভাল। কুন্তিভোজের পত্নীর কুন্তীর প্রতিপালনে বিশেষ অংশগ্রহণ করতে না পারার কারণটা মহাভারতের অন্যান্য উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় কুন্তিভোজ নিঃসন্দেহে বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর বংশধর তথা কুন্তিরাষ্ট্রের তৎকালীন সর্বেসর্বা হিসেবে আমরা কুন্তিভোজের পুত্র, পাণ্ডবদের মাতুল পুরুজিতের উল্লেখ পাই। স্বয়ং কৃষ্ণ তাঁকে ভারতবর্ষের জরাসন্ধ বিরোধী রাজগোষ্ঠীর অন্যতম বলে চিহ্নিত করেছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডব শিবিরে কুন্তিভোজ এবং পুরুজিৎ ছাড়াও কুন্তিভোজের আরও দশজন মহারথী পুত্রকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে অনুমান করা যেতে পারে যে, কুন্তিভোজের রাজভবনে কুন্তীর পদার্পণের কিছুকাল পরেই কুন্তিভোজ এবং রাজমহিষী তাঁদের প্রথম পুত্রসন্তানের মুখ দেখার সৌভাগ্য লাভ করেন। হয়তো কুন্তীর পদার্পণের পরই সন্তানলাভের সৌভাগ্যও রাজভবনে পদার্পণ করেছিল বলেই কুন্তিভোজ এই সৌভাগ্যবতী কন্যাটির উপর একটু বেশিই স্নেহশীল ছিলেন, সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে রাজনন্দিনী কুন্তী একটু বাড়তি সম্মান, মর্য্যাদাও ভোগ করতেন হয়তো। কিন্তু কুন্তিভোজের এত স্নেহ, আদরেও নিজের বাবা মায়ের ঘর ছেড়ে চলে আসার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা কুন্তীর মন থেকে মুছে যায়নি।

[মহা (k) ২.১৪.১৬-১৭; ৭.১৫৬.৮৩-৮৪; (হরি) ২.১৪.১৬-১৭; ৭.১৩৬.১৭৬]

□ কুন্তী বড়ো হয়ে উঠলেন ধীরে ধীরে। রাজা কুন্তিভোজের রাজ অন্তঃপুরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়দায়িত্বও এসে পড়ল তাঁর উপরে। তার মধ্যে অন্যতম দায়িত্ব ছিল, অতিথি, মুনি-ঋষিদের দেখাশোনা সেবা-শুশ্রূষা করা। এভাবেই দিন কাটছিল, এমন সময় হঠাৎই রাজা কুন্তিভোজের প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন মহর্ষি দুর্বাসা। বড়ো কঠিন স্বভাব তাঁর, প্রখর তাঁর তেজ, বিশাল তাঁর ব্যক্তিত্ব। জটাজুটধারী ঋষি দুর্বাসা। তপস্যার দীপ্তি সর্বাঙ্গে। এহেন দুর্বাসা মুনি কুন্তিভোজের বাড়িতে এসে বললেন—তোমার বাড়িতে কিছুদিন ভিক্ষাগ্রহণ করতে চাই। তুমি বা তোমার বাড়ির লোকজন আমার সঙ্গে কোনো অপ্রিয় আচরণ কোরো না—

ন মে ব্যলীকং কর্তব্যং ত্বয়া ব তব চানুগৈঃ।

দুর্বাসা নিজেকে চিনতেন। তাই কেমনভাবে তিনি থাকবেন কুন্তিভোজের বাড়িতে—তার একটা আভাস আগেভাগেই দিয়ে রাখলেন। ঋষি বললেন—আমি যেমন ইচ্ছে বাড়ি থেকে বেরবো, যেমন ইচ্ছে ফিরে আসব—

যথাকামঞ্চ গচ্ছেয়ম্ আগচ্ছেয়ং তথৈব চ।

আমার অশন, আসন, শয়ন, বসন—সব কিছুই চলবে আমারই মতে। কেউ যেন আমাকে বাধা দিয়ে অপরাধী না হয়—

নাপরাধ্যেত কশ্চন।

অর্থাৎ কিনা আমাকে যেন কেউ 'ডিসটার্ব' না করে। এই সাবধানবাণীর মধ্যে তাঁর স্বেচ্ছাময়তার ইঙ্গিত যত আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি আছে সেই অপরাধীর উদ্দেশে তাঁর ভবিষ্যৎ ক্ষমাহীনতার ইঙ্গিত। দুর্বাসা কুন্তিভোজকে বলেই দিলেন—আমি এইরকম স্বেচ্ছাচারে থাকব—এতে যদি তোমার অমত না থাকে তবেই এখানে থাকব, নচেৎ নয়—

এবং বৎস্যামি তে গেহে যদি তে রোচতে'নঘ।

দুর্বাসা মুনিকে যাঁরা চেনেন তাঁরা বিলক্ষণ জানেন যে—যদি তোমার অমত থাকে বা যদি তোমার পছন্দ না হয়—এই কথাগুলো শুধুই কথার কথা। বাস্তবে এর কোনো মূল্য নেই। দুর্বাসার শর্ত যদি মানা না হয় কিংবা শর্ত মানতে গিয়েও যদি সামান্যতম ভুলত্রুটি অপরাধ ঘটে—তার ফল অভিশাপ। তবু যদি কোনোক্রমে দুর্বাসা তুষ্ট হন, এই আশায় অন্যদের মতোই কুন্তিভোজ বললেন—না না, আপনি এসব কী বলছেন? আপনি যেভাবে থাকতে চাইছেন,

সেভাবেই থাকবেন আমার বাড়িতে। এই কথা বলতে বলতে এই অদ্ভুত সঙ্কটে কুন্তিভোজ প্রথম যাঁর কথা স্মরণ করলেন—তিনি তাঁর প্রিয় কন্যা মনস্বিনী কুন্তী। কুন্তিভোজ আগাম দুর্বাসাকে বলে বসলেন— আমার একটি বুদ্ধিমতী কন্যা আছে। নাম পৃথা। যেমন তার স্বভাব চরিত্র, তেমনই তাঁর সৎ প্রকৃতি, আমার এই মেয়েটি পরমাসুন্দরীও বটে—

শীলবৃত্তান্বিতা সাধ্বী নিয়তা চৈব ভাবিনী।

কুন্তিভোজ বললেন—আমার এই সর্বগুণ-সম্পন্না মেয়েটিই আপনার দেখাশুনো করবে। আমার ধারণা—সে আপনার অবমাননা না করে তার আপন স্বভাবেই আপনাকে তুষ্ট করতে পারবে। দুর্বাসাকে এইভাবে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে বসিয়ে রেখে, কুন্তিভোজ গেলেন রাজঅন্তঃপুরে, কুন্তীর কাছে। কুন্তিভোজ তাঁকে বললেন—দুর্বাসামুনি এসেছেন আমাদের ঘরে, আমাদের এখানেই তিনি কিছুকাল থাকতে চান। আমি তাতে সম্মত হয়েছি এবং তাঁর থাকা খাওয়ার ব্যাপারে চরম তুষ্টির আশ্বাস তাকে আমি দিয়েছি তোমারই ভরসায়—

ত্বয়ি বৎসে পরার্শ্বস্য ব্রাহ্মণস্যাভিরাধনম্।

কুন্তিভোজ জানতেন—সাধারণ ব্রাহ্মণ আর দুর্বাসা মুনিতে তফাত আছে। দুর্বাসা যে স্বেচ্ছাময়তার কথা বলেছেন আর তাঁর সাবধানবাণী শুনেই কুন্তিভোজ যেমন কোনো ভাবনা চিন্তা না করেই বলে দিয়েছেন যে, তাঁর কন্যা কুন্তী থাকতে দুর্বাসার সেবা যত্নে কোনো ত্রুটি হবে না, হওয়া সম্ভবই নয়—বাস্তব পরিস্থিতিটা ঠিক ততটাও সহজ নয়। দুর্বাসাকে সেবা দিয়ে তুষ্ট করার কাজটি যথেষ্টই কঠিন। কুন্তী কুন্তিভোজের আপন ঔরসজাতা কন্যা হলে এমন গুরুদায়িত্ব কুন্তিভোজ তাঁর উপর চাপিয়ে দিতে পারতেন কী না বলা যায় না, কিন্তু পৃথা-কুন্তী যেহেতু তাঁর পালিতা কন্যা সেহেতু এমন গুরুতর কাজের ভার দেবার সময় কুন্তিভোজ বেশ সচেতনভাবে অনুনয়, বিনয় চাটুকারিতার সাহায্য নিলেন কন্যাকে দায়িত্ব দেবার জন্য।

কুন্তিভোজ বললেন—অতিথি ব্রাহ্মণদের সৎকার করার ব্যাপারে তোমার নিষ্ঠার কথা আমি ছোটোবেলা থেকেই জানি। আমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন এমনকী ভৃত্যদের প্রতি তোমার মধুর ব্যবহারের কথাও আমি জানি। তারা সকলেই তোমার ব্যবহারে তুষ্ট। লোক ব্যবহারের এইসব ক্ষেত্রে তুমি সর্বত্র তোমার উপস্থিতি প্রমাণ আছে, সর্বত্রই তুমি জুড়ে বসে আছ—সর্বম্ আবৃত্য বর্তসে। তবু এখনও তুমি ছোটো এবং তুমি আমার মেয়ে—সেইজন্য ব্রাহ্মণের ক্রোধের বিষয়টা আমি তোমাকে খেয়াল রাখতে বলছি।

এত পর্যন্ত বলেই কিন্তু থামতে পারতেন কুন্তিভোজ। কিন্তু তা তিনি করলেন না। বরং এরপরে তিনি যা বলতে লাগলেন তাতে 'পরের' ঘর থেকে আনা পালিতা কন্যাটির উপর এক ধরনের সংশয় প্রকাশ পেল। কুন্তিভোজের কথায় প্রকাশ পেল যে, কুন্তীকে আপন কন্যার মতো প্রতিপালন করলেও সে যে পরের মেয়ে—এ বিষয়ে কুন্তিভোজ ভীষণ ভাবে সচেতন। তিনি বলতে লাগলেন—প্রসিদ্ধ বৃষ্ণিকুলে তোমার জন্ম। মহারাজ শূরের কন্যা তুমি। জান তো, মন্দ এবং নীচ বংশের মেয়েদের যদি খানিকটা আচার নিয়মের মধ্যে রাখা যায় তবে তারা চপলতার বশে যা করা উচিত নয় তাই করে ফেলে অনেক সময়—

দৌষ্কুলেয়া বিশেষেণ কথঞ্চিৎ প্রগ্রহং গতাঃ।
বালভাবাদ্ বিকুর্বন্তি প্রায়শঃ প্রমদাঃ শুভে॥

হঠাৎ এই মন্দবংশের কথাটা এলো কোথা থেকে? কুন্তিভোজ ঘুরিয়ে যা বললেন, কুন্তী তার অর্থ বুঝলেন সহজভাবেই—দুর্বাসার সেবায় যদি দোষ কিছু ঘটে, সে দোষের ভাগী হবে কুন্তী যে বংশে জন্মেছেন, সেই বংশ—কুন্তিভোজ অনায়াসে কন্যাকে disown করে তাঁর জন্মদাতা পিতার বংশটিকেই মন্দবংশ বলে দোষারোপ করবেন।

কুন্তিভোজ আরও বললেন—পৃথা! রাজকুলে জন্ম তোমার, দেখতেও তুমি ভারী সুন্দর—

পৃথে রাজকুলে জন্ম রূপং চাপি তবাদ্ভুতম্।

তুমি সেই বংশের অভিমান, রূপের অভিমান ত্যাগ করে ঋষির সেবা কোরো। তাতে তোমার মঙ্গল হবে, আমারও। মুনি ক্রুদ্ধ হলে আমার বংশ ছারখার হয়ে যাবে।

কুন্তী পালক পিতার প্রতিটি শব্দ এতক্ষণ খুব মন দিয়ে শুনেছেন। এবার উত্তর দিলেন—রাজেন্দ্র। কুন্তীর এই সম্বোধন থেকেই স্পষ্ট যে

পিতা কুন্তিভোজ যে অনাত্মীকরণের উল্লেখ করেছেন, সেই অনাত্মীয়াসুলভ দূরত্ব বজায় রেখেই তিনি কথা বলছেন আজ। কুন্তীর উত্তরে কোনো কন্যাজনোচিত মমতা প্রকাশ পেলো না। তাই পিতা সম্বোধন না করে কুন্তী 'রাজেন্দ্র' বলে সম্বোধন করলেন কুন্তিভোজকে। যেমন কুন্তিভোজ তাঁকে আর্যক শূরের কন্যা বলে পরিচয় দিয়েছেন, তেমনই কুন্তিভোজের সামনে দাঁড়িয়ে যিনি উত্তর দিলেন, তিনিও কিন্তু কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা কুন্তী নন। কুন্তীর ভিতর থেকে জবাব দিলেন পৃথা।

পৃথা বললেন—মহারাজ! আচার-নিয়ম-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আমি নিশ্চয় সৎকার করব। আপনি যেমনটি কথা দিয়েছেন, তেমনটিই অক্ষরে অক্ষরে পালন করব আমি। ব্রাহ্মণ অতিথি ঘরে এসেছেন, তাঁকে উপযুক্ত মর্য্যাদায় সৎকার করাই তো আমাদের কর্তব্য। এতে যেমন আপনার প্রিয় কার্য্য হবে, তেমনই মঙ্গল হবে আমারও—সে তো আমার বাড়তি পাওনা—

তব চৈব প্রিয়ং কার্যং শ্রেয়শ্চ পরমং মম।

কুন্তী রাজা কুন্তিভোজকে সম্পূর্ণ অভয় দিয়ে বললেন—অতিথি ঋষি সকাল, বিকেল, মধ্যরাত যখন ইচ্ছে ঘরে ফিরুন, আমার উপরে তাঁর রাগ করার কোনো কারণ ঘটবে না। আপনার আদেশ মতো দুর্বাসার মতো ঋষিকে সৎকার করার সুযোগ পাচ্ছি—এতে তো আমারই লাভ মহারাজ—লাভো মমৈষ রাজেন্দ্র। কুন্তী এরপর সম্পূর্ণ ভাবে আশ্বস্ত করলেন রাজাকে—আপনার বাড়িতে অতিথি ঋষির কোনো অসন্তোষ ঘটবে না রাজা, আমার জন্য অতিথি ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কোনো ভাবেই ব্যথা পাবেন না আপনি—

ন মৎকৃতে ব্যথাং রাজন্ প্রাপ্স্যসি দ্বিজসত্তমাৎ।

গুরুদায়িত্ব মাথায় নিলেন কুন্তী। দুর্বাসার মতো কোপনস্বভাব ঋষির সেবাযত্নের ভার তো বটেই, জন্মদাতা পিতার কুলমর্য্যাদা রক্ষার ভারও। তবে এই কথোপকথনের মধ্যে কুন্তিভোজের সঙ্গে কুন্তীর যে মানসিক দূরত্ব প্রকাশ পেল—তাকে আন্তরিক স্নেহ দিয়ে পূরণ করে নেবার চেষ্টা কুন্তিভোজ করলেন না, হয়তো তার প্রয়োজনও অনুভব করলেন না। কুন্তীর বাক্যে পরম আশ্বস্ত কুন্তিভোজ এই বিদগ্ধা রমণীকে পিতৃত্বের মাধুর্যে অভিষিক্ত করেননি। কুন্তীকে তিনি জড়িয়ে ধরেছেন তাঁর আপন আদেশ সমর্থনের আনন্দে—

পরিষ্বজ্য সমর্থ্য চ।

তারপরেই নেমে এসেছে তাঁর শুষ্ক আদেশ—কী কী করতে হবে ইত্যাদি। কথা শেষ করে কুন্তিভোজ মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত হলেন দুর্বাসার কাছে। বললেন—মহর্ষি! এই আমার মেয়ে। ভুল করে, অজ্ঞানে যদি কোনো অপরাধ করে ফেলে, তা হলে তা যেন মনে রাখবেন না, ক্ষমা করবেন।

দুর্বাসার জন্য পৃথক বাসভবনের ব্যবস্থা করলেন রাজা। রাজকন্যা পৃথা রাজার বাড়ির বিলাস-ব্যাসন, অভিমান, আলস্য সব ত্যাগ করে সেই ভবনে দুর্বাসার সেবায় নিযুক্ত হলেন। নিজেকে তিনি বেঁধে ফেললেন কড়া নিয়মে, অবগুণ্ঠন রইল শুচিতার। দুর্বাসা মুনিকে নিয়ে জ্বালা কম নয়। এই তিনি বলে গেলেন—আমি সকালে ফিরব, কিন্তু ফিরলেন হয়তো সন্ধ্যাবেলায় বা রাত্রে। এদিকে সারাদিন কুন্তী বসে রইলেন খাবার দাবার সাজিয়ে। মনে রাগ নেই, ক্ষোভ নেই, মুখে নেই কোনো অপ্রিয় শব্দ। এর মধ্যে যেটা বেড়েই চলেছিল, সেটা নিত্যনতুন ব্যঞ্জনের বাহার। দুর্বাসা অবশ্য এতেই ছেড়ে দিতেন না। হয়তো তিনি বাড়ি ফিরে দুর্লভ কোনো উপকরণের নাম করে বললেন—এই খাবারটার ব্যবস্থা করোনি? জোগাড় করো, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করো—

সুদুর্লভমপি হ্যন্নং দীয়তামিতি সো'ব্রবীৎ।

তারপরে সবিস্ময়ে তিনি লক্ষ্য করতেন যে তাঁর বলার আগেই সে খাবার তৈরি আছে—

কৃতমেব চ তৎ সর্বম্।

কুন্তীর নিরলস সেবা-পরিচর্য্যায় দুর্বাসা পরম সন্তুষ্ট হলেন। কুন্তী এই দুর্মর্ষণ অতিথিকে দেবতার শ্রদ্ধাটুকু দিয়েছেন কিন্তু তাঁর পরিচর্যা করেছেন—প্রিয়শিষ্যার মতো, পুত্রের মতো, বোনের মতো—

শিষ্যবৎ পুত্রবচ্চৈব স্বসৃবচ্চ সুযংযতা।

এই পরিচর্য্যার মধ্যে খোলা হাওয়ার মতো আরও যে এক সুমধুর অথবা স্বেচ্ছা সম্পর্কের অবকাশ ছিল—সেইখানে কুন্তী ছিলেন স্থির। মহাভারতের কবিকেও তাই লিখতে হয়েছে—স্বসৃবচ্চ সুসংযতা। জীবনের প্রান্তকালে কুন্তী যখন দেবতাকল্প শ্বশুর ব্যাসদেবের কাছে নিজের সমস্ত

স্খলন, পতন, ত্রুটিগুলির স্বীকারোক্তি করছেন, সেদিন আরও একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। কুন্তী বলেছেন— -সমস্ত শুচিতা আর শুদ্ধতা দিয়ে আমি সেই মহর্ষির সেবা করেছিলাম। আমার দিকে মহর্ষির ওপর রাগ করার মতো বড়ো বড়ো অনেক ঘটনা ছিল, কিন্তু আমি রাগ করিনি—

কোপস্থানেষ্বপি মহৎস্বকুপ্যন্ন কদাচন।

মনে রাখা দরকার, কুন্তী অসাধারণ রূপবতী ছিলেন। স্বয়ং কুন্তিভোজ তাঁকে তাঁর এই রূপ সম্বন্ধে সাবধান করেছেন, আবার দুর্বাসাকে তুষ্ট করার সময় সেই রূপকে ব্যবহারও করেছেন—হয়তো অনিচ্ছায়, হয়তো বা ইচ্ছে করেই। কিন্তু একভাবে দিনের পর দিন কাছাকাছি থাকতে থাকতে, সেবা-পরিচর্যার দান-আদানের মাঝখানে দুর্বাসার শুষ্ক-রুক্ষ-ঋষি-হৃদয় যদি কখনো কুন্তীর প্রতি সরস হয়ে থাকে, যদি অকারণের আনন্দে কখনো চপলতা কিছু ঘটে গিয়ে থাকে তাঁর দিক থেকে—তবে আপন শুদ্ধতা আর সংযমের তেজে কুন্তী হয়তো মুনির সেই সরসতা এবং চাপল্য সযত্নে পরিহার করেছেন, নিজেকে স্থাপন করেছেন প্রিয়শিষ্যা, পুত্র কিংবা ভগিনীর ব্যবহার ভূমিতে। হয়তো ঋষির দিক থেকে এটাও এক ধরনের পরীক্ষা ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত দুর্বাসা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে বাধ্য হয়েছেন। সন্তুষ্ট হয়েছেন কুন্তীর চরিত্রবলে এবং ব্যবহারেই—

তস্যাস্তু শীলবৃত্তেন তুতোষ মুনিসত্তমঃ।

কুন্তীর সেবায় তুষ্ট দুর্বাসা বর প্রার্থনা করতে বললেন কুন্তীকে। কুন্তী বললেন—আমি যা করেছি, তা আমার কর্তব্য ছিল। আপনি খুশি হয়েছেন, খুশি হয়েছেন আমার পিতা কুন্তিভোজ—আমার আর বর চাওয়ার প্রয়োজন কী—

ত্বং প্রসন্নঃ পিতা চৈব কৃতং বিপ্র বরৈর্মম।

কুন্তীর এই নিষ্কাম ব্যবহারে দুর্বাসা হয়তো আরও খুশি হলেন। বললেন—ঠিক আছে। আমি তোমাকে একটা মন্ত্র দিচ্ছি, সে মন্ত্রে যে কোনো দেবতাকে তুমি আহ্বান করতে পারবে। শুধু আহ্বানই নয়, এই মন্ত্রের মাধ্যমে তুমি যে দেবতাকে ডাকবে, তিনি তোমার বশীভূত হবেন। সকামভাবেই হোক অথবা নিষ্কামভাবে—এই মন্ত্রবলে যে কোনো দেবতা বাঁধা পড়বেন তোমার বাঁধনে, তিনি ব্যবহার করবেন তোমার ভৃত্যের মতো—

বিবুধো মন্ত্রসংশান্তো ভবেদ্ ভৃত্য ইবানতঃ।

এই একটি মাত্র মন্ত্র দান করে দুর্বাসা পৃথিবীর সমস্ত মানবীর থেকে কুন্তীকে আলাদা করে দিলেন। মানবী কুন্তীর কামনা-বাসনা দেবতাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। ঠিক কী ভেবে এমন অদ্ভুত বর দুর্বাসা কুন্তীকে দিয়েছিলেন তা আমরা বুঝতে পারি না। হয়তো দূরদর্শী ঋষি তখনই বুঝেছিলেন যে তাঁর এই মন্ত্র ভবিষ্যতে কুন্তীর এবং তাঁর স্বামীর বংশরক্ষার একমাত্র সহায় হয়ে উঠবে।

সত্যি সত্যিই দুর্বাসার দেওয়া এই মন্ত্র কুন্তীর পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত করেছে অনেকখানি। তবে বরলাভের অব্যবহিত পরে দুর্বাসার এই বশীকরণমন্ত্র নবীন যৌবনবতী কুন্তীর মনে এক নতুন অনুভূতির সঞ্চার করল। মনে জাগল কৌতূহল—সত্যিই কি এমনটা সম্ভব? যে দেবতাকে ডাকব, মন্ত্রের জোরে তিনিই আমার বশীভূত হবেন?

তারপর একদিন। অন্তঃপুরে একলা ঘরে বিছানায় শুয়েছিলেন পুষ্পবতী কুন্তী। ভোরের সূর্য তার কিরণস্পর্শে নবযুবতীর গালখানিও যেন লাল করে দিল। কুন্তীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল পূর্বদিগন্তের রক্তিম সূর্যের দিকে। তিনি দেখতে পেলেন সূর্য দেবতাকে—তাঁর কানে সোনার কুণ্ডল, বুকে-পিঠে বর্ম—

আমুক্ত কবচং দেবং কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতম্।

দুর্বাসার মন্ত্রে কুন্তী আহ্বান করলেন সূর্য দেবতাকে। সূর্য নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করলেন। আকাশ থেকে তাপ বিতরণের কাজ চলতে লাগল আর দিব্য দেহ ধারণ করে তিনি এসে দাঁড়ালেন কুন্তীর সামনে। কুন্তীর জীবনে তিনিই প্রথম অভীপ্সিত পুরুষ, যাঁকে তিনি ডেকেছিলেন সানুরাগে।

প্রথম আলাপের দূরত্বটুকু বজায় রেখে সূর্য বললেন—ভদ্রে! আমি এসেছি তোমার মন্ত্রের শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে। এখন আমি তোমার সম্পূর্ণ বশীভূত। বল আমি কী করব—

কিং করোমি বশো রাজ্ঞি।

অনুরাগবতী কুন্তীর বুঝি এইবার আপন কুমারীত্বের কথা স্মরণ হল। কুন্তী বললেন—আপনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানেই ফিরে যান। আমি কৌতুকবশে অর্থাৎ এমনি মজা করার জন্য আপনাকে ডেকেছি, অতএব আপনি এখন ফিরে যান—

কৌতূহলাৎ সমাহূতঃ প্রসীদ ভগবন্নিতি।

সূর্য কিন্তু যেমন ডাকামাত্র এসেছিলেন, তেমনই বলামাত্র ফিরে যেতে সম্মত হলেন না মোটেই। কুন্তীর উদ্দেশে যথাসম্ভব ভদ্র সম্বোধনে সূর্য দেবতা বললেন—সুন্দরী! যাব, নিশ্চয় যাব, কিন্তু আমাকে সাদরে ডেকে এনে নিজের ইচ্ছে বৃথা করে এমন করে পাঠিয়ে দেবে আমাকে—

ন তু দেবং সমাহূয় ন্যায্যং প্রেষয়িতুং বৃথা।

সূর্য পরিষ্কার বললেন—আমি তোমার ইচ্ছেটুকু জানি। তুমি চাও—সোনার বর্ম, সোনার কুণ্ডল পরা আমার একটি পুত্র হোক তোমার গর্ভে। তুমি যেমন ভেবেছ তেমন পুত্রই হবে তোমার এবং আমিও যাব তোমার সঙ্গে মিলন সম্পূর্ণ করে—

অথ গচ্ছাম্যহং ভদ্রে ত্বয়া সঙ্গম্য সুস্মিতে।

কুন্তী নিজের বোকামিতে সত্যিই লজ্জা পেলেন। সূর্যের প্রস্তাব শোনামাত্র কৌতুকলিপ্সু কুমারী কুন্তী হঠাৎই মানসিকভাবে বেশ পরিণতও হয়ে গেলেন যেন। কুন্তী সানুনয়ে বললেন—আপনি চলে যান সূর্যদেব। আমার পিতামাতা আমাকে এই শরীর দিয়েছেন, মেয়েদের কাছে এই শরীররক্ষার মূল্যই যে সবচেয়ে বেশি, কারণ দ্বিতীয় একটি কুমারীর শরীর তো আমি তৈরি করতে পারব না, অতএব আমার এই কুমারী শরীরটাই আমাকে রক্ষা করতে হবে—

স্ত্রীণাং বৃত্তং পূজ্যতে দেহরক্ষা।

কুন্তী বললেন—আমি আমার অল্প বয়সের চঞ্চলতায় শুধু কৌতুকের বশে মন্ত্রশক্তি জানার জন্যই আপনাকে ডেকেছি। আমার এই ছেলেমানুষি আপনি ক্ষমা করুন।

কিন্তু সূর্যদেব নিজের সিদ্ধান্তে অটল। সঙ্গম পূর্ণ না করে ফিরে যেতে কিছুতেই সম্মত নন তিনি। বিশেষত বশীকরণের মন্ত্রে তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে, এ অবস্থায় কুন্তীর মতো সুন্দরী রমণীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে সূর্য যথেষ্ট বিরক্তও বোধ করলেন। কুন্তীর বারংবার অনুনয়ে, তিনি কান দিলেন না মোটেই। এদিকে কুন্তীও এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন যে, দুর্বাসা তাঁকে যে মন্ত্র দিয়েছেন, তা যে কোনো দেবতার সঙ্গে তাঁর সঙ্গম সুনিশ্চিত করতে, আর তাঁকে একটি করে পুত্র দান করতে সক্ষম। প্রণয়ের হৃদয়াবেগের স্থান সেখানে নেই। এহেন যান্ত্রিক মিলনে তেমন উৎসাহও বোধ হয় আর অনুভব করছেন না কুন্তী। পাশাপাশি তাঁর মনে ভয় জাগছে—সূর্যের সঙ্গে মিলনের ফলে কুমারী অবস্থাতেই যদি তিনি গর্ভবতী হন, তাহলে তাঁর পালক পিতা কুন্তিভোজই বা কী বলবেন? দুর্বাসার সেবায় নিযুক্ত হবার দিনেই কুন্তী বুঝেছিলেন—এই পালক পিতাকে তিনি যেমন অন্তর দিয়ে পিতা বলে গ্রহণ করতে পারেননি, তেমনই পিতা কুন্তিভোজের মনেও পালিতা কন্যাটির জন্য ঠিক সেই স্থানটি তৈরি হয়নি যা তাঁর আপন ঔরসজাতা কন্যার জন্য হতে পারত। খুব সচেতনভাবে না হলেও কুন্তিভোজ কুন্তীকে পরের মেয়েই ভাবেন। কাজেই কুন্তীর কলঙ্ক যদি সমাজে প্রকাশ পায়, কুন্তিভোজ তাঁর এই পালিতা কন্যাটিকে আর্যক শূরের মতো 'মন্দ বংশে'র জাতিকা ভেবে দূরে ঠেলে দেবেন সঙ্গে সঙ্গে। কুন্তী নিজের অবস্থা এবং অবস্থান—দুইই বোঝাবার চেষ্টা করলেন, যথাসাধ্য। কিন্তু তাতে সূর্যের বিরক্তি বাড়ল বই কমল না। কুন্তীর সঙ্গে সূর্যের পরবর্তী সুদীর্ঘ কথোপকথন কতকটা বাদবিতণ্ডার চেহারা নিল। সূর্য ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—এভাবে ডেকে এনে তুমি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে তোমার অপরাধের দণ্ড আমি দেব তোমার পিতা-মাতা-পরিজনদের, তোমার অপরাধের দণ্ড পাবেন ঋষি দুর্বাসাও যিনি বোকার মতো তোমাকে এই বশীকরণমন্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন।

কুন্তী অনেক চিন্তা করলেন। বুঝলেন—তাঁর প্রত্যাখ্যানে নিরপরাধ কুন্তিভোজ এবং স্বয়ং দুর্বাসার বিপদ নেমে আসতে পারে। অন্যদিকে স্বর্গের দেবতা উপযাচক হয়ে তাঁর কাছে প্রসাদ ভিক্ষা করছেন, তাঁর হাতখানিও ধরে আছেন নিজের হাতে—এই বিচিত্র অনুভূতি তাঁর মোহও জন্মাচ্ছে বারে বারে। একদিকে তিনি 'শাপপরিত্রস্তা', অন্যদিকে 'মোহেনাভিপরীতাঙ্গী' —এই ভয় এবং মোহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কুন্তী তাঁর ভয় এবং মোহ দুইই প্রকাশ করলেন সূর্যের কাছে।

ভয়াবিষ্টা কুন্তী বললেন—আমার বাবা, মা, ভাই আত্মীয়স্বজন—এরা কী বলবে আমাকে? আমার গুরুজনরা এখনও বেঁচে আছেন, আর আমি সমাজের নিয়ম ভেঙে নিজেকে হারিয়ে ফেলব? যদি সব নিয়ম ভেঙে এমনি করে হারিয়ে ফেলি নিজেকে—

ত্বয়া তু সঙ্গমো দেব যদি স্যাদ্ বিধিবর্জিতঃ।

—তাহলে আমার বংশের মান-মর্য্যাদা সব যাবে। যদি এত কথা শুনেও আপনার মনে হয়, আপনি যা বলছেন তাই ধর্ম, তবে আমি আত্মীয়স্বজনের দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে আপনার ইচ্ছে পূরণ করব—

ঋতে প্রদানাদ্ বন্ধুভ্যস্তব কামং করোম্যহম্।

কিন্তু আমার একটাই কথা—আমার এই শরীর দিয়েও আমি সতী থাকতে চাই। কুন্তী এই মুহূর্তে সূর্যকে সম্বোধন করলেন 'দুর্ধর্ষ' বলে—

আত্মপ্রদানং দুর্ধর্ষ তব কৃত্বা সতী ত্বহম্।

কুন্তীর কথা শুনে সূর্য আশ্বাস দিয়ে বললেন—আমাদের মিলনের পর আবারও তুমি তোমার কুমারীত্ব ফিরে পাবে—

সা ময়া সহ সঙ্গম্য পুনঃ কন্যা ভবিষ্যসি।

—আর তোমার এই পুত্রও হবে অনন্ত খ্যাতির আধার এক মহাবীর। কুন্তী বললেন—যদি তাই হয়, যদি আমার পুত্রের কুণ্ডল এবং বর্ম দুটোই অমৃতময় হয় অর্থাৎ জীবনে বেঁচে থাকার নিরাপত্তা যদি তার স্বায়ত্তই থাকে, তবে হোক আপনার ঈপ্সিত সঙ্গম, যেমনটি আপনি বলেছেন আমি তাতেই রাজি—

অস্তু মে সঙ্গমো দেব যথোক্তং ভগবংস্ত্বয়া।

মনে করি—আমার পুত্র আপনারই মতো শক্তি, রূপ, অধ্যবসায়, তেজ এবং ধর্মের দীপ্তি নিয়ে জন্মাবে।

সূর্যের সঙ্গে কুন্তীর মিলন হল। কিছুদিনের মধ্যেই কুন্তীর দেহে গর্ভবতী নারীর যাবতীয় লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগল। কুন্তী নিজের ধাত্রীর সহায়তায় নিপুণভাবে লুকিয়ে রাখলেন নিজের বর্ধিত গর্ভ। তাঁর নিখুঁত প্রচেষ্টার কারণেই অন্তঃপুরে কেউ জানতেও পেল না সেকথা। যথাসময়ে কুন্তীর পুত্র জন্মাল। গায়ে সোনার বর্ম, কানে সোনার কুণ্ডল, দেখতে ঠিক সূর্যের মতো—

যথাস্য পিতরং তথা।

সমাজে নিজের সম্মান রক্ষার তাগিদে কুন্তী ধাত্রীকন্যার সঙ্গে পরামর্শ করে একটি বেতের পেটিকার মধ্যে ভাল করে মোম লেপে দিলেন যাতে পেটিকা জলের মধ্যে ভাসলেও তাতে জল না ঢোকে। সেই পেটিকার মধ্যে সুন্দর কাপড় পেতে দিয়ে কুন্তী শুইয়ে দিলেন শিশুপুত্রকে। পেটিকার মুখ ঢেকে সদ্য জননী কুন্তী চললেন সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ীর উপকণ্ঠে অশ্ব-নদীর দিকে। একদিকে কুমারীত্ব প্রতিষ্ঠার সামাজিক দায়, অন্যদিকে পুত্রস্নেহ—এই দুই বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় মাতৃস্নেহই কিন্তু বড়ো হয়ে উঠল কুন্তীর মনে। মহাভারতের কবি মন্তব্য করেছেন—কুমারী মেয়ে গর্ভধারণ করে পুত্রের জন্য বিলাপ করছে—এটা ঠিক নয় জেনেও কুন্তী তাঁর মাতৃহৃদয়ের ক্রন্দন রুদ্ধ করতে পারেননি। ভীষণ ভীষণ কেঁদেছেন তিনি, কেঁদেছেন পুত্রস্নেহে—

পুত্রস্নেহেন রাজেন্দ্র করুণং পর্যদেবয়ৎ।

মাতৃহৃদয় যতই হাহাকার করুক, সমাজ, আত্মীয়-স্বজন, কুলমর্য্যাদার মুখ চেয়ে প্রথম জাত পুত্রকে ভাসিয়ে দিতে হল জলে। নির্জন নদীতীরে ক্রন্দনরতা কুন্তী আকাশ-বাতাসের উদ্দেশে কাতর স্বরে জানালেন জননীর উদ্বেগ—বাছা আমার! ভূলোক-দ্যুলোকে যত প্রাণী আছে, তারা যেন তোমাকে বাঁচিয়ে রাখে—

স্বস্তি তে'স্তু অন্তরীক্ষেভ্য পার্থিবেভ্যশ্চ পুত্রক।

যে জলে তোমাকে ঠেলে দিয়েছি, সেই জলচর প্রাণীরা যেন তোমার ক্ষতি করতে না পারে। জলের রাজা বরুণ তোমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন সর্বত্রগামী বায়ু। বাছা! যিনি দিব্য-বিধানে আমার কোলে দিয়েছিলেন তোমাকে, তোমার সেই তেজস্বী পিতা সর্বত্র রক্ষা করুন তোমায়—

পিতা ত্বাং পাতু সর্বত্র তপনস্তপতাং বরঃ।

সমস্ত দেবতার আশীর্বাদ যাচনা করেও কুন্তী জননীর যন্ত্রণা এড়াতে পারলেন না একটুও। এমন সুন্দর শিশুপুত্রটিকে কোলে চেপে না রেখে তাকে বিসর্জন দিতে হচ্ছে—এই ব্যথার থেকেও আরও কঠিন এক ঈর্ষাকাতর অনুভূতি তাঁকে পীড়িত করতে লাগল, পুত্রস্নেহের আরও এক অন্যতর রূপ এই ঈর্ষা। কুন্তী অঝোরে কাঁদছেন আর বলছেন—বাছা! বিদেশ-বিভুঁয়ে যেখানেই বেঁচে থাকো তুমি, তোমার এই সহজাত বর্ম দেখে তোমাকে আমি ঠিক চিনতে পারব। ধন্য তোমার পিতা, যিনি সহস্র কিরণ-চক্ষুতে নদীর মধ্যেও তোমাকে দেখতে পাবেন। ধন্য সেই মা, যিনি তোমাকে পুত্র কল্পনায় কোলে তুলে নেবেন। বাছা! তুমি যখন মাটিতে হামাগুড়ি দেবে, ধূলায় ধূসর হবে তোমার শিশু-শরীর, তুমি কথা বলবে কলকল করে, আধো-আধো ভাষায়—

অব্যক্ত কলবাক্যানি বদন্তং রেণুগুণ্ঠিতম্।

সেদিনগুলিতে আমি তোমায় দেখতে পাবো না, দেখবেন অন্য কোনো পুণ্যবতী মা। তুমি যখন বড়ো হবে, বন্য সিংহের তেজ আসবে তোমার শরীরে—সেদিনেও আমি তোমাকে দেখতে পাবো না। দেখবেন অন্য কোনো জননী।

হাজারো কান্নাকাটির পর রাতও যখন অর্ধেক হয়ে গেল, তখন কঠিন বাস্তব তাঁকে ফিরিয়ে আনল ঘরে। এত রাত হয়ে গেছে, তবু মেয়ে ঘরে নেই—এ-কথা যদি কোনোভাবে পিতা কুন্তিভোজের কানে যায়, তবে বহুতর অনর্থ ঘটতে পারে। কুন্তী ফিরে এলেন কাঁদতে কাঁদতে। মনে রইল পুত্রশোকার্তা জননীর কামনা—আবার কবে দেখতে পাব আমার প্রথম সন্তানকে—পুত্রদর্শনলালসা। কুন্তী জানেন—কর্ণের মৃত্যু অসম্ভব। কিন্তু ছেলে বেঁচে আছে, অথচ তার জন্য জননীর স্নেহকর্তব্যগুলি করা হলনা, তাকে কোনোদিন বলাও যাবে না—ওরে তুই আমারই ছেলে—এই স্বাধিকারহীনতার গ্লানি কুন্তীকে কেবলই কষ্ট দিতে লাগল।

[মহা (k) ১.৬৭.১৩২-১৪০; ৩.৩০৩.৪-২৯; ৩.৩০৪-৩০৭ অধ্যায়; ৩.৩০৮.১-২৩; ১৫.৩০.১-১৮; (হরি) ১.৬২.১৩৩-১৪০; ৩.২৫৭.৪-২৮; ৩.২৫৮-২৬১ অধ্যায়; ৩.২৬২.১-২৩; ১৫.৩৩.১-১৮]

□ প্রথম পুত্রসন্তানটিকে ভাসিয়ে দেবার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। অন্তঃপুরে কেউ বোধহয় তেমন করে লক্ষ্য করলেন না, কিন্তু সদ্যোজাত পুত্রটিকে ত্যাগ করার শোকেই বোধহয় যুবতী কুন্তী পরিণতা ধীরা এক রমণীতে রূপান্তরিত হলেন ক্রমে ক্রমে। কানীন গর্ভ পরিত্যাগ করার অপরাধবোধ থেকেই বোধ হয় কুন্তী খুব ব্রতধর্মে মন দিলেন—

সত্ত্বরূপগুণোপেতা ধর্মারামা মহাব্রতা।

কন্যাবস্থায় সূর্য-সঙ্গমের অপরাধ-বোধ, পুত্রত্যাগের অনুশোচনা থেকেই ব্রত-ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছিলেন কুন্তী। তিনি এখন পূর্ণ যৌবনবতী। কিন্তু তাঁর এই ব্রত-ধর্ম পরায়ণা নতুন এক শুদ্ধতার তেজে কুন্তীর যৌবন এবং রূপ আরও বেশি করে উজ্জ্বল করে তুলল এবং সেই উজ্জ্বলতা লোক-সমাজে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না।

নানা দেশ থেকে বহু রাজা-রাজপুত্র আসতে লাগলেন কুন্তিভোজের কাছে, কুন্তীকে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। হস্তিনাপুরে মহামতি ভীষ্মও এই সময় ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করছেন। তাঁর কানেও এসে পৌঁছাল যাদবী কুন্তীর রূপ-গুণের কথা। 'যাদবী' কন্যা কথাটা লক্ষ্য করার মতো। কুন্তিভোজ যতই কুন্তীকে দত্তক নিন—মহামতি ভীষ্ম কুন্তীকে যাদবদের মেয়ে বলেই উল্লেখ করেছেন। তার থেকেও বড়ো কথা, যাদবদের এই কন্যার বিবাহের ঘটনা থেকে মনে হয় আর্যক শূর মেয়েকে দত্তক দিলেও মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ করার সময় নিজেই যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করেছেন—এমনকী যাদবদের রাজনৈতিক স্বার্থের কথাও চিন্তা করেছেন। হস্তিনাপুরের কুরুরাজপরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে কংস বিরোধী যাদবগোষ্ঠীর রাজনৈতিক শক্তি-বৃদ্ধি হবে— এই ভাবনা থেকেই হয়তো শূর, বসুদেব এঁরাই পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তীর বিবাহ দেবার চেষ্টা করছিলেন। শৈশবে পৃথা-কুন্তীকে দত্তক দেবার ক্ষেত্রেও আর্যক শূরের তেমন কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। জন্মদাতা পিতার এমনভাবে নিজের কন্যাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার ব্যাপারটা দত্তক দেবার সময়ও কুন্তী পছন্দ করেননি, বিবাহের সময়েও হয়তো নয়। তবু এবারেও তাঁকে পিতার ব্যবস্থা মতোই চলতে হল।

ভীষ্ম বিদুরকে বলেছিলেন যে, তিনি যদুবংশীয়া রাজকন্যা কুন্তীর কথা শুনেছেন। এই শোনার দুটো উৎস থাকতে পারে। প্রথমত, শূর-বসুদেব এঁরাই হয়তো পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তীর বিবাহের প্রস্তাব রেখেছিলেন। দ্বিতীয় সূত্র হলেন পর্যটক ব্রাহ্মণেরা—যাঁদের মুখে ভীষ্ম কুন্তীর রূপ-গুণের কথা শুনে থাকবেন। শুনে থাকবেন দুর্বাসার কাছ থেকে কুন্তীর বশীকরণ মন্ত্রলাভের খবরটাও—একথা মনে হওয়ার সব থেকে বড়ো কারণ—শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে কর্ণ যখন প্রণাম করতে গেলেন, একা—ভীষ্ম তাঁকে সাদরে বলেছিলেন— এসো এসো কর্ণ! তুমি যে রাধার ছেলে নও, কুন্তীর ছেলে—সে আমি জানতাম। সূর্যের তেজে কুন্তীর গর্ভে তুমি জন্ম নিয়েছ—একথা আমি নারদের মুখে শুনেছি, শুনেছি ঋষি দ্বৈপায়ন ব্যাসের মুখেও—

সূর্যজস্তং মহাবাহো বিদিতো নারদান্ময়া।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নাচ্চৈব তচ্চ সত্যং ন সংশয়ঃ॥

ভীষ্ম যখন কুন্তীর কানীন পুত্রের সংবাদ জানতেন, তখন পুত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে কুন্তী যে দৈবশক্তির অধিকারিণী, স্বাধীনোপায়া—একথাও বোধহয় তিনি জানতেন এবং এই মুনি-ঋষিদের মুখ থেকেই হয়তো ভীষ্ম একথা শুনে থাকবেন। পাণ্ডু যে সন্তান উৎপাদনে অক্ষম, সেকথাও সম্ভবত ভীষ্ম জানতেন। পাণ্ডুর জন্মদাতা পিতা ব্যাসের মুখ থেকেই তিনি সেকথা শুনে থাকবেন। পাণ্ডুর জন্মের সময়েই ব্যাস যখন ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে, এ ছেলে পাণ্ডুরবর্ণ হবে—সে সময় স্পষ্টাক্ষরে না বললেও এমনই কোনো ইঙ্গিত ঋষি দিয়েছিলেন বোধহয়। নয়তো পাণ্ডুরবর্ণযুক্ত পুত্র হওয়া এমন কোনো দুঃসংবাদ নয় যার জন্য সত্যবতী ব্যাসকে তৃতীয় একটি পুত্র সন্তানের জন্য অনুরোধ উপরোধ করেছিলেন।

সুতরাং মহাভারতের কাহিনী থেকেই মোটামুটি স্পষ্ট যে, কুন্তিভোজের আয়োজিত স্বয়ংবর সভায় সকলের সামনে কুন্তী পাণ্ডুকে প্রথম দেখলেন, দেখামাত্র পছন্দ করলেন এবং সলজ্জ হেসে বরমাল্য পরিয়ে দিলেন তাঁর গলায়—এমন সহজে কুন্তীর বিবাহ ঘটেনি। কুন্তীর পিতা আর্যকশূর যেমন রাজনৈতিক স্বার্থে কুন্তীর বিবাহ দিতে চাইছিলেন হস্তিনাপুরের রাজা পাণ্ডুর সঙ্গে, তেমনই ভীষ্মও চাইছিলেন কুন্তী পাণ্ডুকেই স্বামীরূপে বরণ করুন, যাতে পাণ্ডুর বংশরক্ষা হয়। সুতরাং স্বয়ংবরসভার আয়োজনের আগেই পরিকল্পিত ছিল যে, কুন্তী বরমাল্য দেবেন পাণ্ডুর গলায়। পিতার রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত হতে পছন্দ না করলেও বুদ্ধিমতী, মনস্বিনী কুন্তী এ ব্যবস্থা মেনে নিলেন—হয়তো স্বয়ংবর সভায় পাণ্ডুর রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে সানন্দেই বিবাহ করলেন তাঁকে। হস্তিনাপুরের রাজা পাণ্ডুর পত্নী কুন্তী রাজ অন্তঃপুরে প্রতিষ্ঠিত হলেন রাজমহিষীর মর্যাদায়। কুন্তীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিয়ে হল, যেন শচীর সঙ্গে মিলন হল ইন্দ্রের। পাণ্ডু কুন্তিভোজের দেওয়া যৌতুক-উপঢৌকন নিয়ে, ঋষি আর ব্রাহ্মণদের জয়ধ্বনির মধ্যে নববধূকে নিয়ে প্রবেশ করলেন রাজধানীতে। কুন্তীর নিশ্চয়ই মনে হয়েছিল—কন্যাবস্থায় সেই আকালিক দুর্ঘটনার পর এবার তিনি সুখে সংসার করবেন। কিন্তু সুখ তাঁর ভাগ্যে ছিল না। কুন্তী কৃষ্ণের কাছে দুঃখ করে বলেছিলেন—বাপের বাড়িতেও আমি সুখ পাইনি, শ্বশুরবাড়িতেও নয়। শব্দটা ছিল 'নিকৃতা' অর্থাৎ ওখানেও লাঞ্ছনা পেয়েছি, শ্বশুররাও আমাকে লাঞ্ছনা দিয়েছেন। শ্বশুর বা শ্বশুরস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম হলেন ভীষ্ম। কারণ পাণ্ডুর নামমাত্র-পিতা বিচিত্রবীর্য বেঁচে নেই এবং পাণ্ডুর জন্মদাতা পিতা ব্যাসদেব কোনোভাবেই কুরুরাজ -পরিবারে হস্তক্ষেপ করেননি। কাজেই কুন্তীর শ্বশুরের প্রথম সম্বন্ধটা ভীষ্মের সঙ্গেই। বিয়ের কিছুদিন কাটতে না কাটতেই পাণ্ডুর আরও একটি বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হলেন মহামতি ভীষ্ম। মদ্রদেশের মেয়ে শল্যের বোন মাদ্রীর কথা তাঁর জানাই ছিল। তাঁকে বাড়ির বউ করে আনার জন্য ভীষ্ম নিজেই সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ছুটলেন সে দেশে। রূপে-গুণে অতুলনীয়া মাদ্রীর সঙ্গে বেশ তড়িঘড়ি বিয়ে হল পাণ্ডুর। মাদ্রী যতখানি পাণ্ডুর বউ হয়ে এলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি কুন্তীর সতীন হয়ে এলেন। সদ্য বিবাহের পরেই ভীষ্মের উদ্যোগে যখন সতীনের সঙ্গে ঘর করার মানসিক প্রস্তুতি নিতে হল, তখন কুন্তীর কাছে সেটা শ্বশুর ভীষ্মের বঞ্চনা বলেই মনে হয়েছিল। মনে মনে তিনি দুঃখও পেয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.১১২.১-১৩; ১.১১৩.১৮; ১.৯৫.৫৮;
(হরি) ১.১০৬.১-১৩; ১.১০৭.১৮; ১.৯০.৭৬]

□ দুই পত্নীকে নিয়ে তিরিশটি দিন মাত্র বিহার করলেন পাণ্ডু। তারপর বেরিয়ে পড়লেন দিগ্বিজয়ে। বেশ কিছুকাল পর দিগ্বিজয় করে রাশি রাশি ধনসম্পদ নিয়ে ফিরে এলেন পাণ্ডু। এসময়টুকু কুন্তী কেমনভাবে কাটালেন হস্তিনাপুরের রাজপুরীতে কিংবা সপত্নী মাদ্রীর সঙ্গেই বা তাঁর কেমন সম্পর্ক তৈরি হল, শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদেরই বা কতখানি আপন হয়ে উঠলেন কুন্তী— মহাভারতে তার কোনো উল্লেখ পাই না।

দিগ্বিজয় সেরে ফিরে পাণ্ডুর ইচ্ছা হল—তিনি দুই পত্নীকে নিয়ে বনে বাস করবেন কিছুদিন। সেই মতো কুন্তী-মাদ্রী পাণ্ডুর সঙ্গে বনে গেলেন। দুই পত্নীকে নিয়ে বিহার করলেও পাণ্ডুর বেশিরভাগ সময় কাটছিল মৃগয়ায়। আর এই মৃগয়া করতে করতেই একদিন কিমিন্দম মুনির অভিশাপের ঘটনা ঘটে গেল।

পাণ্ডু মৃগয়ায় গিয়ে একদিন দুটি মৈথুনরত হরিণ-হরিণীকে বধ করলেন। হরিণটি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন ঋষিকুমার কিমিন্দম। মনুষ্যজাতির মধ্যে মৈথুন চরিতার্থ করার যে লজ্জা আছে, সেই লজ্জা থেকে বাঁচার জন্যই ঋষিকুমার হরিণের আচ্ছাদন গ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুকালে কিমিন্দম পাণ্ডুকে বলেছিলেন—স্ত্রী-সম্ভোগের সুখ আপনি জানেন, অথচ এই অবস্থায় আমাকে মেরে ফেলে কী নারকীয় কাজটাই না আপনি করলেন! ঋষিকুমার বললেন—আমি পুত্রলাভের আশায় মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, আপনি সেই আশা বিফল করে দিলেন—

পুরুষার্থফলং কর্তুং তৎ ত্বয়া বিফলীকৃতম্।

মরণকালে কিমিন্দম পাণ্ডুকে শাপ দিলেন—মৈথুনে প্রবৃত্ত হলেই পাণ্ডুর মৃত্যু হবে। আমরা ধরে নিতে পারি যে, পাণ্ডুর জন্মের সময় থেকেই তাঁর জন্মদাতা পিতা ব্যাস তাঁর প্রজননে অক্ষমতার কথাটা জানতেন। সেই কথাটাই স্পষ্টাক্ষরে জানাবার জন্য কিমিন্দমের অভিশাপের কাহিনীটি তিনি আরোপ করেছেন পাণ্ডুর ওপর। যাই হোক, অভিশাপের কারণেই নিজের অক্ষমতার কথা পাণ্ডু তাঁর স্ত্রীদের কাছে কার্যত স্বীকার করে নিলেন। তারপর গভীর হতাশায়, মানসিক আঘাতে কাতর হয়ে পাণ্ডু স্থির করলেন—দুই স্ত্রীকে ত্যাগ করে তিনি কঠোর তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করবেন। এই অবস্থায় কুন্তী এবং মাদ্রী দুজনের কথায়, সান্ত্বনায় কাজ হল। পাণ্ডুকে তাঁরা অন্তত পত্নীত্যাগে বিরত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু কিমিন্দমের অভিশাপের পর পাণ্ডু রাজ্যপাট ত্যাগ করে পাকাপাকিভাবে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। কুন্তী-মাদ্রীও স্বামীর অনুধর্মে কঠোর নিয়ম-আচার পালন করতে লাগলেন।

তপস্যায়, ব্রত-নিয়মে পাণ্ডুর দিন কাটতে লাগল। অন্তত এই মুহূর্তে পুত্রলাভের জন্যও তিনি খুব একটা কাতর নন। তবু মনের এক কোণে পুত্রহীনতার যন্ত্রণা একটা ছিল। প্রাথমিকভাবে পাণ্ডু, নিয়োগপ্রথারও পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু দিন যত যেতে লাগল, পাণ্ডুর পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষাও ক্রমে বাড়তে লাগল। এর পিছনে কারণ মূলত দুটি। প্রথম কারণটা সাধারণ। আসলে একটা বয়সে বাৎসল্য মানুষকে কাঙাল করে। তবে দ্বিতীয় এবং মূল কারণটা কিন্তু রাজনৈতিক, সহজ কথায় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত। বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেও আসলে পাণ্ডুই এখনও হস্তিনাপুরের রাজা। তাঁর অনুপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী রাজা হিসেবে ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য চালাচ্ছেন। কিন্তু পাণ্ডুর বংশলোপ পেয়ে কুরু রাজসিংহাসন চিরতরে ধৃতরাষ্ট্রের বংশধারায় চলে যাক—এমনটা পাণ্ডুও চাইছিলেন না। তাই যখন গান্ধারীর গর্ভধারণের সংবাদ তিনি পেলেন—তখন পুত্রলাভের জন্য কিংবা বলা ভাল রাজসিংহাসনে উপযুক্ত উত্তরাধিকারী লাভের জন্যও পাণ্ডু বেশ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

পুত্রলাভ করতে হবে নিয়োগ প্রথায়। কথাটা সহজ নয়, স্ত্রীদের অভিপ্রেত না হতেও পারে। অনেক ভেবে চিন্তে পাণ্ডু একদিন নির্জনে ডাকলেন কুন্তীকে। বললেন—তুমি আমার বিপদ তো জানো কুন্তী! আমার প্রজননী শক্তি নেই—নষ্টং মে জননং—এই বিপদে তুমি আমাকে পুত্রলাভের ব্যাপারে সাহায্য করো কুন্তী। পাণ্ডু আরও বললেন সানুনয়ে—দেখো! এই এত বড়ো হস্তিনাপুর রাজ্যের কোনো উত্তরাধিকারী রইল না। শাস্ত্রে বলে—ছয় রকমের পুত্র পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে—নিজের ঔরসজাত পুত্র, ক্ষেত্রজ পুত্র—এমনি করে উত্তরাধিকারীর তালিকায় কানীন পুত্রের কথাও এনে ফেললেন পাণ্ডু। অর্থ পরিষ্কার। কন্যা অবস্থায়, অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে কুন্তীর যদি কোনো পুত্র থেকেও থাকে তবে তার পিতৃত্ব স্বীকার করে নিতেও পাণ্ডুর কোনো দ্বিধা নেই।

কুন্তী কিন্তু এ অবস্থায় অনায়াসে নিজের সূর্যসম্ভব পুত্রটির কথা রাজাকে বলতে পারতেন। পাণ্ডু হয়তো সে ছেলেকে খুঁজে আনতে লোক পাঠাতেন তৎক্ষণাৎ, সেই পুত্রই জ্যেষ্ঠের মর্যাদায় পাণ্ডুর উত্তরাধিকারী হতেন। কিন্তু কুন্তী তা পারলেন না। লোকলজ্জা গ্লানির ভয়ে সেই পুত্রকে কুন্তী ত্যাগ করেছেন। তারপর নিজেকে ব্রত-ধর্মে শুদ্ধ করে ভালবেসেছেন হস্তিনাপুরের রাজাকে। আজ স্বামীর এই বিপন্ন মুহূর্তে, যখন একটি কানীন পুত্রের জন্যও তিনি লালায়িত—সেই অবস্থায় দাঁড়িয়েও কুন্তী তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা রাজাকে বলতে পারলেন না। পাণ্ডুকে তিনি ভালবাসতে চেয়েছিলেন, তাঁকে ঠকাতে চাননি, তাই আজ

পাণ্ডুর মুখে যখন আস্তে আস্তে সেই প্রস্তাবেরই সূচনা হচ্ছে—কুন্তী লজ্জিত, কুণ্ঠিত বোধ করছেন।

কুন্তীর লজ্জার ভাবটা পাণ্ডুও বুঝলেন। সে লজ্জা ভাঙাবার জন্য তিনি একটা গল্প বললেন কুন্তীকে—কেমন করে এক বীর রমণী স্বামীর আদেশ মতো এক যোগসিদ্ধ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করে পুত্রলাভ করেছিলেন। গল্পের শেষে কুন্তীকে অনুরোধ করলেন পাণ্ডু—কুন্তী! আমি মত দিচ্ছি। তুমি কোনো বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের ঔরসে পুত্রলাভের চেষ্টা করো।

কুন্তী পাণ্ডুর ইচ্ছে-অনিচ্ছে জানতেন। প্রজননের শক্তি না থাকায় পাণ্ডুর মনে কতখানি কষ্ট, গ্লানি, ঈর্ষা ছিল তাও কুন্তীর অজানা নয়। এই কিছুকাল আগেও এই মানুষটাই নিয়োগপ্রথার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন— সেকথাও কুন্তী ভোলেননি। নিজের স্বামীর ঔরসপুত্রটি আপন কুক্ষিতে ধারণ করে পূর্বের সমস্ত গ্লানি ভুলতে চেয়েছিলেন কুন্তী। কিন্তু সে বুঝি আর হল না।

আশঙ্কা মনে চেপে কুন্তী পাণ্ডুকে বললেন—মহারাজ! তুমি ধর্মের রীতি-নীতি সব জানো। আমিও তোমার ধর্মপত্নীমাত্র নই, তোমাকে আমি ভালবাসি—

ধর্মপত্নীম্ অভিরতাং ত্বয়ি রাজীবলোচন।

ধর্ম অনুসারে তুমি আমার গর্ভে বীর পুত্রের জন্ম দেবে। সেই বীর পুত্রের জন্য শুধুমাত্র তোমার সঙ্গেই মিলন হবে আমার। তুমি ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে মিলিত হবার কথা তো আমি মনেও ভাবতে পারি না—

ন হ্যহং মনসাপ্যন্যং গচ্ছেয়ং ত্বদৃতে নরম্।

কুন্তী সপ্রেমে জানালেন মনের কথা—তোমার চেয়ে উৎকৃষ্ট অন্য কোনো পুরুষও আমার কাছে আর কেউ নেই।

পাণ্ডু গল্প শুনিয়েছিলেন। তার উত্তরে কুন্তীও এবার গল্প বললেন পাণ্ডুকে। বললেন পাণ্ডুরই পূর্বপুরুষ ব্যুষিতাশ্ব রাজার গল্প। রাজা ব্যুষিতাশ্ব বহুতর যজ্ঞ এবং ধর্মকার্য করে দেবতাদের তুষ্ট করেছিলেন বটে, তবে নিজের স্ত্রী ভদ্রার প্রতি তাঁর অতিরিক্ত আসক্তি এবং সম্ভোগের ফলে তাঁর শরীর হল ক্ষীণ এবং তিনি অপুত্রক অবস্থাতেই মারা গেলেন। মৃত স্বামীর শব জড়িয়ে ধরে প্রচুর বিলাপ করলেন ভদ্রা। সেই বিলাপের মধ্যে পুত্রহীনতার কথাও ঝড়ে পড়ল। যাই হোক, সেই বিলাপ শুনে ব্যুষিতাশ্বের প্রেতাত্মা অন্তরীক্ষ থেকেই জবাব দিল—তুমি ওঠো, শোক কোরো না, চতুর্দশী আর অষ্টমী তিথিতে তোমার শয্যায় ফিরে আসব আমি। আমারই সন্তান হবে তোমার গর্ভে—

জনয়িষ্যাম্যপত্যানি ত্বয্যহং চারুহাসিনি।

কুন্তী বললেন—যদি শব-শরীর থেকে ব্যুষিতাশ্ব রাজার পুত্র হতে পারে—

সা তেন সুষুবে দেবী শবেন ভরতর্ষভ।

তাহলে মহারাজ! তোমার তো যোগ-তপস্যার শক্তি কিছু কম নয়, তুমিই আমাকে পুত্র দেবে—

শক্তো জনয়িতুং পুত্রান্।

পাণ্ডু এসব কথার ধার দিয়েও গেলেন না। নিজের তপস্যার শক্তিতে যে খুব আস্থা দেখালেন তাও নয়। বরং পুরাণে ইতিহাসে কে কবে কোথায় নিয়োগপ্রথায় পুত্রলাভ করেছেন সেকথা শোনাতে লাগলেন কুন্তীকে। পাণ্ডু সবরকম চেষ্টা করলেন কুন্তীকে অন্য একটি পুরুষের সঙ্গে ক্ষণিক মিলনের জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত করার। তিনি নিজেও যে নিয়োগ প্রথার ফলেই জন্মগ্রহণ করেছেন, সেকথাও উল্লেখ করলেন।

সব শেষে পাণ্ডু অনুনয় করে কুন্তীকে বললেন—আমার প্রজনন ক্ষমতা নেই বলেই সন্তানের আকর্ষণ আমার চিরকাল বেশি—

বিশেষতঃ পুত্রগৃদ্ধী হীনঃ প্রজননাৎ স্বয়ম্।

এটাই পাণ্ডুর অন্তরের সত্য কথা। পাণ্ডু অনেক আদর-অনুনয় করে কুন্তীকে বললেন—আমি পুত্র চাই কুন্তী। তুমি আমাকে পুত্র দাও।

কুন্তীর জীবনে স্বামীর ভালোবাসার এই বুঝি চরম মুহূর্ত। পাণ্ডুর আবেগ-মধুর অনুনয়ে কুন্তী বিগলিত হলেন। আস্তে আস্তে তিনি স্বামীকে বললেন মহর্ষি দুর্বাসার দেওয়া বশীকরণ মন্ত্রের কথা। তারপর নিজের স্বাতন্ত্র্য একেবারে ত্যাগ করে কুন্তী জানালেন—তিনি কোন দেবতাকে আহ্বান করবেন, কখন আহ্বান করবেন—এসব কিছুই হবে পাণ্ডুর নির্দেশ মতো। স্বামীর নির্দেশ, স্বামীর চাওয়া—এই পরম অধীনতার মধ্যেই কুন্তী যেন পাণ্ডুর পুত্র পেতে চাইছেন, দেবতার আহ্বান তাঁর কাছে যান্ত্রিকতা মাত্র।

কুন্তী স্বামীকে বললেন—তুমি অনুমতি দাও, দেবতা, ব্রাহ্মণ—যাঁকে তুমি বলবে—

যং ত্বং বক্ষ্যসি ধর্মজ্ঞ দেবং চ ব্রাহ্মণেব চ।

—তাঁকে আমি ডাকতে পারি। তবে কোন দেবতাকে ডাকব, কখন ডাকব—এই সমস্ত ব্যাপারে আমি তোমার আদেশের অপেক্ষা করব, আমি কিছু জানি না। তোমার ঈপ্সিত কর্মে তোমারই আদেশ নেমে আসুক আমার ওপর—

ত্বত্ত আজ্ঞাং প্রতীক্ষন্তীং বিদ্ধ্যস্মিন্ কর্মণীপ্সিতে।

পাণ্ডুর কাছে কুন্তীর এই চরম আত্মনিবেদন এবং শরণাগতি একদিকে যেমন তাঁর প্রথম যৌবনের গ্লানিটুকু ধুয়ে মুছে দেয়, অন্যদিকে তেমনই দেবতা-পুরুষকে নিজে নির্বাচন করার অধিকার ত্যাগ করে সমস্ত ভার পাণ্ডুর ওপর দিয়ে স্বামীর প্রতি একান্ত নিষ্ঠাও তিনি দেখাতে পেরেছেন। নিজের প্রথম সন্তানটির কথা তিনি যে উচ্চারণও করেননি—সেও স্বামীর প্রতি নিষ্ঠাবশতই। পাণ্ডু যদি দুঃখ পান। স্বামীর সম্মতি বা সাহায্য ছাড়া একাই তিনি উৎকৃষ্ট সন্তানের জননী হতে পারেন—এই স্বাধিকার যদি পাণ্ডুকে আহত করে—তাই কন্যাবস্থায় তাঁর পুত্রজন্মের কথাও তিনি উল্লেখ করেননি এবং এখনও তিনি নিজের ইচ্ছায় কাজ করছেন না, করছেন পাণ্ডুর ইচ্ছায়, তাঁরই নির্বাচনে।

কিন্তু পাণ্ডু যা করলেন তা সত্যিই অবাক করে দেবার মতো। কন্যাবস্থায় কুন্তীর কৌতুক-সঙ্গম যেমন হঠাৎই হয়ে গিয়েছিল, তেমনই এখনও কুন্তীকে কোনো মানসিক প্রস্তুতির সময় পাণ্ডু দিলেন না। হয়তো পাণ্ডুও মন্ত্র পরীক্ষার কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই কুন্তীকে বললেন—আজই, আর দেরি নয়, আজই তুমি আহ্বান করো ধর্মরাজকে, তাহলে আমাদের পুত্রলাভ কোনোভাবেই অধর্মের সঙ্গে যুক্ত হবে না—

অধর্মেণ ন নো ধর্মঃ সংযুজ্যেত কথঞ্চন।

আসলে ধর্মকে আহ্বান করাবার মধ্যে পাণ্ডুর দুটি যুক্তি থেকে থাকতে পারে। প্রথমত এতদিন পাণ্ডু ধর্ম-আচার নিয়েই জীবন কাটাচ্ছিলেন, অতএব তাঁর প্রস্তাবে তার একটা প্রতিফলন হয়ে থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, এইভাবে অন্য পুরুষের দ্বারা, হোক না সে দেবতা, তবুও অন্য একজন পুরুষের দ্বারা নিজের স্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করাবার ক্ষেত্রে তাঁর মনে কিছু লজ্জা থেকে থাকবে। কিন্তু সেই পুত্রের জন্মদাতা যদি হন স্বয়ং ধর্মরাজ, তবে তার মধ্যে অধর্মের লজ্জা কিছু থাকে না। অতএব পাণ্ডু ধর্মকেই প্রথমে ডাকতে বললেন।

কুন্তী সংযত চিত্তে ধর্মের পূজা করে দুর্বাসার মন্ত্রে ধর্মকে আহ্বান জানালেন মিলনের জন্য। ধর্ম এলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—কী চাই তোমার কুন্তী! কুন্তী বললেন—পুত্র চাই। পুত্র দিন। তারপর শতশৃঙ্গ পর্বতের বনের ভিতরে একান্তে ধর্মের সঙ্গে মিলন হল কুন্তীর—

শয্যাং জগ্রাহ সুশ্রোণী সহ ধর্মেণ সুব্রতা।

জ্যৈষ্ঠ মাসের এক পূর্ণিমা তিথিতে কুন্তীর প্রথম ছেলের জন্ম হল। নাম হল যুধিষ্ঠির। প্রথম পাণ্ডব। ধর্মের দান প্রথম পুত্রটি লাভ করেই পাণ্ডুর এবার ক্ষত্রিয় জাতির শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা স্মরণ হল। কুন্তীকে তিনি বললেন—লোকে বলে ক্ষত্রিয় জাতির শক্তি-বলই হল সব। তুমি মহাশক্তিধর একটি পুত্রলাভের জন্য চেষ্টা করো। পাণ্ডুর ইচ্ছা জেনে কুন্তী নিজেই এবার বায়ুদেবতাকে স্মরণ করলেন। কারণ দেবতাদের মধ্যে তিনিই মহাবলশালী। বায়ু এলেন। কুন্তীর দ্বিতীয় পুত্রলাভ হল—ভীমসেন।

যুধিষ্ঠির এবং ভীমের জন্মের পর পাণ্ডু যেন হঠাৎই নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করলেন। শাস্ত্রে শুনেছেন—উপযুক্ত পুত্রের জন্য পিতা-মাতাকে তপস্যা করতে হয়। যুধিষ্ঠির এবং ভীমের জন্মের সময় কুন্তীর মন্ত্রশক্তির প্রতি পাণ্ডুর যে কৌতূহল ছিল, সে কৌতূহল এখন শান্ত হয়েছে। রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকার বিষয়েও পাণ্ডু এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। এই সময় তিনি রীতিমতো পরিকল্পনা করে একটি অসামান্য পুত্রের পিতা হতে চাইছেন। এমন একটি পুত্র চান পাণ্ডু যাঁর মধ্যে দেবমুখ্য ইন্দ্রের তেজ থাকবে। থাকবে দেবরাজের সর্বদমন শক্তি এবং উৎসাহ। এমন একটি বীর পুত্রের জন্য পাণ্ডু নিজে তপস্যায় বসলেন আর মুনি-ঋষিদের পরামর্শে কুন্তীকে নিযুক্ত করলেন সাংবৎসরিক ব্রতে। স্বামী-স্ত্রীর যুগল তপস্যায় তুষ্ট হলেন দেবরাজ। স্বীকার করলেন—কুন্তীর গর্ভে অলোকসামান্য পুত্রের জন্ম দেবেন তিনি। পাণ্ডুর ইচ্ছায় কুন্তী এবার দেবরাজকে আহ্বান করলেন সঙ্গম-শয্যায়। জন্ম নিলেন অর্জুন।

অর্জুনের জন্মের পরপরই পাণ্ডু আবার একটি পুত্রের জন্য অনুরোধ করলেন কুন্তীকে। কুন্তী কিন্তু এবারে আর থাকতে পারলেন না। যথেষ্ট বিরক্ত

হয়ে বললেন—মহারাজ! বংশকর পুত্র না থাকায় আমাদের আপৎকাল উপস্থিত হয়েছিল—একথা ঠিক। সেই রকম আপৎকালে স্বামীর সম্মতিতে, দেবপুরুষের সংসর্গে আমাদের পুত্রলাভ হয়েছে—তাতেও দোষ নেই। কিন্তু বিপৎকালেও এই পদ্ধতিতে চতুর্থ পুত্রের জন্ম দেওয়া সাধুদের আচার সম্মত নয়। চতুর্থপুরুষের সংসর্গ করলে লোকে আমাকে বলবে স্বৈরিণী। আবার যদি পঞ্চম পুরুষের সংসর্গ করতে হয় তাহলে তো লোকে বেশ্যা বলবে আমাকে—

অতঃপরং স্বৈরিণী স্যাৎ পঞ্চমে বন্ধকী ভবেৎ।

কুন্তী শুধু এটুকু বলেই থামলেন না। তিনি পাণ্ডুকে রীতিমতো শাসন করে বলেছেন—ধর্মের নিয়মনীতি তুমি যথেষ্টই জানো রাজা। কিন্তু জেনে শুনেও যেন কিছুই তোমার খেয়াল নেই এমনিভাবে সমস্ত ধর্ম-নিয়ম অতিক্রম করে আমাকে আবারও পুত্রের জন্য বলছ কেন—

অপত্যার্থং সমুৎক্রম্য প্রমাদাদিব ভাষসে।

অগত্যা পাণ্ডুকে থামতেই হল। তবে এই গোটা ঘটনায় যিনি ঈর্ষান্বিত এবং দুঃখিত হলেন—তিনি কুন্তীর সপত্নী মাদ্রী। প্রসঙ্গত নিজের বিবাহের অল্পদিনের মধ্যে পাণ্ডুর এই দ্বিতীয়া পত্নী যখন কুন্তীর সতীন হয়ে এলেন, তখন স্বভাবতই কুন্তী খুশি হননি। মাদ্রীর প্রতি পাণ্ডুর আকর্ষণ-প্রণয়ও হয়তো কুন্তীর তুলনায় একটু বেশি ছিল—যার জন্যও কুন্তী পীড়িত বোধ করতেন। কাজেই সেদিক থেকে দেখতে গেলে পুত্রলাভের পর দুই সতীনের রেষারেষিতে আপাতত কুন্তীই চালকের আসনে বসে রয়েছেন। পুত্রলাভের জন্য পাণ্ডুকে কুন্তীরই মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে—এতে কুন্তীর কিছু আত্মতৃপ্তিও এসে থাকবে। স্বভাবতই মাদ্রী এতে খুশি হননি। আবার পুত্রলাভের জন্য কুন্তীর কাছে দীনতা দেখাবার কোনো ইচ্ছাও মাদ্রীর নেই। তিনি স্বামীর মাধ্যমেই নিজের অভীষ্ট পূরণের চেষ্টা করেছেন।

মাদ্রী পাণ্ডুকে একদিন বলেই ফেললেন—মহারাজ! তোমার পুত্র জন্মাবার শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে তাতেও আমার দুঃখ হয়নি। কিন্তু আমিও রাজার মেয়ে এবং পুত্র প্রসব করার শক্তিও আমার ছিল। গান্ধারী শতপুত্রের জননী হয়েছেন—তাতেও আমার কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু মহারাজ! কুন্তীর চাইতে আমি খাটো কিসে? তাঁর ছেলে হল অথচ আমার ছেলে হল না—এ দুঃখ আমি রাখব কোথায়—

ইদন্তু মে মহৎ দুঃখং তুল্যতায়াম্ অপুত্রতা।

মাদ্রী নিজের দুঃখ জানিয়ে এবার আসল প্রস্তাব পেশ করলেন পাণ্ডুর কাছে। বললেন —কুন্তী আমার সতীন বটে। তাঁর কাছে আমি হ্যাংলার মতো ছেলে হওয়ার মন্ত্র শিখতে যাব না—

সংরম্ভো মে সপত্নীত্বাৎ বক্তুং কুন্তিসুতাং প্রতি।

যদি তোমার ইচ্ছে হয় রাজা, যদি তোমার ভাল লাগে—তবে কুন্তীকে তুমিই বলে রাজি করাও।

মাদ্রী যা বললেন, পাণ্ডু তা নিজেই ভেবেছিলেন। স্বামীর গাম্ভীর্য্য বজায় রেখেও কুন্তীর কাছে পাণ্ডু একরকম কাকুতি মিনতিই করলেন। কুন্তী রাজি হলেন। বললেন—ঠিক আছে। এইটুকু দয়া আমি তাকে করব—

তস্মাদনুগ্রহং তস্যাঃ করোমি কুরুনন্দন।

কুন্তী মাদ্রীকে মন্ত্র দিয়ে বললেন—একবার, শুধু একবার মাত্র যে কোনো দেবতাকে আহ্বান করতে পারবে তুমি। কিন্তু মাদ্রী একেবারে যমজ দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান করে কুন্তীর বুদ্ধির ওপর টেক্কা দিলেন। কুন্তীর মনে মনে রাগ হল বটে কিন্তু মুখে তিনি কিছুই বললেন না। এরপর পাণ্ডু আবার মাদ্রীকে মন্ত্র শেখানোর জন্য কুন্তীর কাছে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

কুন্তী মাদ্রীর বঞ্চনাও মুখ বুজে সয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীর এই অনুরোধ শুনে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি প্রায় তিরস্কারই করলেন স্বামীকে। বিশেষত পাণ্ডুর এই বহুপুত্রলাভের কাঙালপনাও কুন্তীর আর সহ্য হচ্ছে না। মাদ্রীর বঞ্চনা এবং পাণ্ডুর বারংবার পুত্রকামনা—এই দুয়ের জন্য স্বামীকেই তিরস্কার করলেন কুন্তী। কুন্তী বললেন—দেখ, মাদ্রীকে একবার একটিমাত্র দেবপুরুষকে ডাকার জন্য মন্ত্র দিয়েছিলাম আমি। তার জায়গায় সে যুগল দেবতাকে আবাহন করে দুটি পুত্র লাভ করেছে। এ তো চরম বঞ্চনা! আমাকে তো বোকা বানানো হয়েছে—তেনাস্মি বঞ্চিতা। এরপরেও যদি তাকে আমি মন্ত্রশিক্ষা দিই, তবে তো সন্তান সৌভাগ্যে ও আমাকেও টেক্কা দেবে, অন্তত সংখ্যায়। এরপর মাদ্রীকে রীতিমতো 'কুস্ত্রী' বলে গালাগালি দিয়েছেন কুন্তী। কুন্তী বললেন মাদ্রী সম্পর্কে—খারাপ মেয়ে মানুষদের স্বভাবই এরকম—

বিভেম্যস্যা পরিভবাৎ কুন্তীণাং গতিরীদৃশী।

এরপর কুন্তী পাণ্ডুকে খুব স্পষ্ট করেই বললেন—তুমি আমাকে আর অনুরোধ কোরো না, দয়া করো আমায়—

তস্মান্নাহং নিযোক্তব্যা ত্বয়েষো'স্তু বরো মম।

পাণ্ডুও আর ঘাঁটাতে সাহস পেলেন না কুন্তীকে। সত্যিই তো, পাণ্ডুকে পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্র দিয়ে তাঁর বংশরক্ষা করেছেন কুন্তী। কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুর কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। পাণ্ডু তাই চুপ করে গেলেন।

[মহা (k) ১.১১৪.৬-১১; ১.১১৮.৫-৩৪; ১.১১৯.১-৫০; ১.১২০.১৫-৪১; ১.১২১-১২৪ অধ্যায়; (হরি) ১.১০৮.৬-১১; ১.১১২.৫-৩৪; ১.১১৩.১-৫০; ১.১১৪.১৫-৪২; ১.১১৫-১১৮ অধ্যায়]

□ পাঁচটি পুত্র এবং দুই পত্নীকে নিয়ে এরপর শতশৃঙ্গ পর্বতেই অনেকগুলি বছর কাটিয়ে দিলেন পাণ্ডু। পুত্রদের প্রতিপালনে ব্যস্ত কুন্তীর দিনগুলি কেমনভাবে কাটছিল তার খুব বিশদ বিবরণ আমরা পাই না। তবে কুন্তীর চরিত্রে একটা সহজাত মাতৃত্ব আছে। কানীন পুত্রটিকে ত্যাগ করার বেদনা সেই মাতৃত্বকে অন্যতর এক মাত্রা দিয়েছে। কুন্তী অতীত ভুলে স্বামী পুত্রদের আগলে রেখে মন দিয়ে সুখে সংসার করতে চেয়েছিলেন। শতশৃঙ্গ পর্বতে ছেলেদের নিয়ে ব্যস্ত কুন্তীর জীবনে পূর্ণতাও এসেছিল অনেকটা। ঠিক এই সময় আবারও একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

কানীন পুত্রলাভের ঘটনা থেকে শুরু করে পাণ্ডবদের জন্ম—এই দীর্ঘ ঘটনাপ্রবাহে কুন্তীর চরিত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে—তাঁর ধৈর্য্য এবং ইন্দ্রিয় সংযম। সূর্যের সঙ্গে তাঁর সঙ্গমে প্রাথমিক ভাবে যে ঔৎসুক্য বা কৌতূহল ছিল তারপর থেকে, হয়তো কানীন পুত্রটিকে ত্যাগ করার বেদনাতেই কুন্তী অসাধারণ সংযমের বাঁধনে আবদ্ধ রেখেছেন নিজেকে। পাণ্ডুর অনুরোধে পুত্র উৎপাদনের সময় দেবপুরুষ সংসর্গের মধ্যেও শুধু যান্ত্রিকতাই ছিল কুন্তীর মনে। কুন্তী এই ইন্দ্রিয় সংযমের বোধ তাঁর স্বামীর মধ্যেও সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। কিমিন্দমের অভিশাপের কথা শোনার পর স্বামীকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে বেশ কড়াভাবেই পাণ্ডুর জীবনধারাকে ইন্দ্রিয় সংযমের পথে চালিত করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন কুন্তী।

কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযমের এই বোধ পাণ্ডুর চরিত্রে তো ছিলই না, বরং ইন্দ্রিয়বিকারের আধিক্যই দেখা যায় বেশি। ফলত যে স্বামীকে নিয়ে সুখে সংসার করার স্বপ্ন কুন্তী দেখেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কুন্তীর একটা অকারণ মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বরং পাণ্ডুর চিন্তাধারার সঙ্গে মাদ্রীর স্বভাব-আচরণের সাদৃশ্য ছিল অনেক বেশি। সুতরাং স্বামীসুখ কুন্তীর কপালে ছিল না। অবশেষে পাণ্ডুর অসংযমের ফলেই কিমিন্দম মুনির অভিশাপে পাণ্ডুর অনিবার্য্য মৃত্যু ঘনিয়ে এলো একদিন।

মুনির অভিশাপেই হোক বা অন্য কোনো কারণে—পাণ্ডুর স্ত্রীসম্ভোগ নিষেধ ছিল। কুন্তী স্বামীকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতেন—যাতে কোনোভাবেই পাণ্ডুর প্রবৃত্তির রাশ আলগা না হয়ে যায়। কিন্তু পাণ্ডু যেন নিয়তির দ্বারা চালিত হয়ে মৃত্যুর কাছে ধরা দিলেন একদিন।

চৈত্র-বৈশাখ মাসের সন্ধিক্ষণ তখন, বসন্তকাল। পাণ্ডু বনে বিহার করছিলেন একদিন। সঙ্গে সূক্ষ্ম বসন পরিহিতা সুসজ্জিতা মাদ্রী। পাণ্ডু নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না আর। মাদ্রীর সঙ্গে মিলিত হবার মুহূর্তেই তাঁর মৃত্যু হল। মাদ্রী স্বামীর মৃত্যুর আশঙ্কায় তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু নিজেকে বা পাণ্ডুকে রক্ষা করার সাধ্য তাঁর ছিল না। পাঁচটি ছেলেকে নিয়ে কুন্তী বসেছিলেন দূরে। দূর থেকে তিনি শুনতে পেলেন মাদ্রীর আর্তনাদ। পাঁচটি কিশোর পুত্রকে নিয়ে বিপদের আশঙ্কায় ভীত-কুন্তী ছুটলেন মাদ্রীর কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে।

মাদ্রী এবং পাণ্ডু এমন অবস্থায় ছিলেন যে সেখানে কিশোর পুত্রদের কাছাকাছি যাওয়াটা বাঞ্ছনীয় ছিল না। কাজেই দূর থেকে কুন্তীকে দেখেই মাদ্রী চেঁচিয়ে বললেন—ছেলে-পিলেদের নিয়ে এখানে যেন এসো না দিদি। তুমি ওদের ওখানেই রেখে, একা এসো—

একৈব ত্বমিহাগচ্ছ তিষ্ঠন্ত্বত্রৈব দারকাঃ।

কুন্তী এলেন এবং দেখলেন—জীবনে যাঁকে তিনি একান্তই আপনার করে পেতে চেয়েছিলেন, তিনি মারা গেছেন।

কুন্তী আর থাকতে পারলেন না। বললেন—রাজা যথেষ্ট বুঝেশুনেই চলছিলেন। আমি তাঁকে

সব সময় এসব ব্যাপার থেকে আটকে রেখেছি—

রক্ষ্যমাণো ময়া নিত্যং বনে সততম্ আত্মবান্।

সেই লোক তোমাকে হঠাৎ আক্রমণ করার সুযোগ পেলেন কী করে? এই দুর্ঘটনার জন্য কুন্তী মাদ্রীকে দোষারোপ করতে ছাড়লেন না। বললেন—মাদ্রী! তোমারই উচিত ছিল রাজাকে সামলে রাখা। এই নির্জন জায়গায় এসে তুমি রাজাকে প্রলুব্ধ করেছ—

সা কথং লোভিতবতী বিজনে ত্বং নরাধিপম্।

আমি সব সময় যে রাজাকে অভিশাপের কথা মনে করে বিষণ্ণ থাকতে দেখেছি— এখানে এই নির্জনে সে তোমাকে পেয়েই তো অতিরিক্ত সরস হয়ে উঠল—

ত্বাম্ আসাদ্য রহোগতাং . . . প্রহর্ষঃ সমজায়ত?

মাদ্রীর ওপরে যতই রাগারাগি করুন, তাঁর স্বামীটিও যে সমান দোষে দোষী—এ-কথা কুন্তী মনে মনে অনুভব করছিলেন। নিজের সম্বন্ধে সচেতনতাও তাঁর কম ছিল না। শাস্ত্রের নিয়মে তিনি জানেন যে, প্রথমা স্ত্রী হলেন ধর্মপত্নী। আর মাদ্রী যতই প্রলুব্ধ করুক তাঁর স্বামীকে, তাঁর বিয়ের মধ্যেই কামনার মন্ত্রণা মেশানো আছে। দ্বিতীয় বিবাহটাই যে কামজ। এত কামনা যে স্বামীর মধ্যে দেখেছেন এবং যাঁর মৃত্যুও হল কামনার যন্ত্রণায়—তাঁকে আর যাই হোক শ্রদ্ধা করা যায় না, ভালও বাসা যায় না। মাদ্রীকে গালাগালি করার পরমুহূর্তেই কুন্তী তাই শুষ্ক কর্তব্যের জগতে প্রবেশ করেছেন। বলেছেন—মাদ্রী! আমি জ্যেষ্ঠা কুলবধূ এবং তাঁর ধর্মপত্নী, কাজেই রাজার সহমরণে যেতে আমাকে বাধা দিয়ো না মাদ্রী। তুমি ওঠো। এই ছেলেগুলিকে তুমি পালন করো।

জীবনের এই চরম এবং অন্তিম মুহূর্তে মাদ্রী কুন্তীর কাছে কতগুলি অকপট স্বীকারোক্তি করে বসলেন। সেকালের পারলৌকিক বিশ্বাস অনুযায়ী মাদ্রী বলে চললেন—স্বামীর সঙ্গে আমিই সহমরণে যাব দিদি। এই সামান্য জীবনে সীমিত স্বামীসুখে এবং সীমিত শারীরিক কামোপভোগে আমার তৃপ্তি হয়নি—

নহি তৃপ্তাস্মি কামানাম্।

আর রাজার কথা ভাবো। আমার প্রতি শারীরিক লালসাতেই তাঁর মৃত্যু হল। এই অবস্থায় আমি মৃত্যুলোকে গিয়েও তাঁর সম্ভোগ-তৃষ্ণা মেটাব না কেন—

তমুচ্ছিন্দ্যামস্য কামং কথং ন যমসাদনে?

মাদ্রীর সেই অসফল সম্ভোগ-বাঞ্ছা ছাড়াও মাদ্রী এবার যা বললেন, তাতে তো কুন্তীর কোনোভাবেই আর মৃত্যুর পথে নিজেকে ঠেলে দেওয়া চলে না। সেটাও যে এক ধরনের স্বার্থপরতা হবে। শুষ্ক কর্তব্যের জন্য, সম্ভোগ-রসিক স্বামীর অনুগমনের জন্য নিজের সন্তানদের বলি দেওয়া সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। মাদ্রী বলেছিলেন—শুধু অসফল কাম-তৃষ্ণাই নয়, আমি তোমার ছেলেদের সঙ্গে আমার নিজের ছেলেদের এক করে দেখতে পারব না—

ন চাপ্যহং বর্তয়ন্তী নির্বিশেষং সুতেষু তে।

এই কথা শোনার পর কুন্তী আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করেননি, সহমরণের কথাও আর দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করেননি। নিষ্কম্প দৃষ্টিতে, সুগভীর ব্যক্তিত্বে তিনি সন্তান-পালনের দায়িত্বটাই বেশি বড়ো মনে করেছেন। স্বামী আর সতীনকে তাঁদের অভিলাষ-পূরণের অবসর দিয়েছেন আপন মূল্যে—ইহজন্মেও-পরজন্মেও।

[মহা (k) ১.১২৫.১-৩১; (হরি) ১.১১৯.১-৩৩]

□ পাঁচটি অনাথ পিতৃহীন বালক পুত্রের হাত ধরে কুন্তী স্বামীর রাজ্যের রাজধানীতে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে আছেন ঋষিরা। তাঁরাই এখন একমাত্র আশ্রয় এবং প্রমাণ। এই পাঁচটি ছেলে যে পাণ্ডুরই স্বীকৃত সন্তান, তার জন্য ঋষিদের সাক্ষ্য ছাড়া কুন্তীর দ্বিতীয় গতি নেই। পাণ্ডু এবং মাদ্রীর মৃতদেহ ঋষিরাই হস্তিনাপুরে বয়ে নিয়ে এসেছেন বটে, কিন্তু মৃত স্বামীর রাজ্যপাট অথবা সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেতে হলে 'সাকসেশন সার্টিফিকেট'টা যে আর্ষবাক্যেই প্রথম পেশ করতে হবে—এ-কথা কুন্তীর ভালই জানা ছিল।

পুরনো আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আবার কতকাল পরে দেখা হবে—এই অধীরতায় কুন্তী খুব দ্রুত হেঁটেছিলেন। পাঁচ ছেলে, রাজার শব আর ঋষিদের সঙ্গে কুন্তী যখন হস্তিনার দ্বারে এসে পৌঁছলেন তখন সকাল হয়েছে সবে। এর মধ্যেই রটে গেল—কুন্তী এসেছেন, রাজা মারা গেছেন, পাঁচটা ছেলে আছে কুন্তীর সঙ্গে। পুরবাসী জনেরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল হস্তিনার রাজসভার কাছে।

মনস্বিনী সত্যবতী, রাজমাতা অম্বালিকা, গান্ধারী —সবাই কুন্তীকে নিয়ে রাজসভায় এলেন। ঋষিরা পাণ্ডুর পুত্র-পরিচয় করিয়ে দিলেন কুরুসভার মান্যগণ্য ব্যক্তিদের কাছে, মন্ত্রীদের কাছে এবং অবশ্যই প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের কাছে।

[মহা (k) ১.১২৬.৫-৯; (হরি) ১.১২০.৫-৯]

□ কুন্তী পাঁচটি পুত্র এবং স্বামী এবং সপত্নীর শব সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন হস্তিনাপুরে। ন্যায়ত পাণ্ডুই ছিলেন হস্তিনাপুরের রাজা, আর সেই হিসাবমতো কুন্তীই জ্যেষ্ঠা রাজমহিষী। কিন্তু সেই মর্য্যাদা বহন করে তো নয়ই, বরং কুন্তী হস্তিনায় ফিরলেন সদ্য বিধবা, কুরুরাজ পরিবারের সামান্য অসহায় এক কুলবধূর মতো। এমনকী কুন্তীর বড়ো জা গান্ধারীও কুন্তীকে কাছে টেনে নিতে এগিয়ে এলেন না সেদিন। গান্ধারী কুন্তীর আগেই গর্ভধারণ করেছিলেন, অথচ কুরুরাজবাড়ির জ্যেষ্ঠ সন্তান জন্ম নিল কুন্তীরই গর্ভে—ঈর্ষার সেই কাঁটাটুকু গান্ধারীকে এতটাই বিদ্ধ করেছিল যে, সারা জীবনে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কখনোই তিনি কুন্তীকে কাছে টেনে নিতে পারেননি। নিজের শ্বশুরবাড়ীতে স্বামী বিয়োগের পর ফিরে এসে যে সহানুভূতি, স্নেহ, আন্তরিকতা কুন্তী আশা করেছিলেন—তা তিনি পেলেন না। তার উপর এমন দুরবস্থায় ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন দামী দামী পোশাক-অলঙ্কারে সেজেগুজে। ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের এমন অমানবিক ব্যবহার কুন্তীর হৃদয়ে ব্যথা দিয়ে থাকবে। কুন্তীর সঙ্গে যে বনবাসী তপস্বীরা এসেছিলেন তাঁরা পাণ্ডুর মৃত্যুসংবাদ এবং পাঁচ পাণ্ডবের সামগ্রিক পরিচয় ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়ে বললেন—মহারাজ! রাজা পাণ্ডু এবং মাদ্রীর শব এখানে রইল। তাঁর জ্যেষ্ঠা পত্নী কুন্তী এবং পাঁচ পুত্রকেও আমরা আপনার কাছে দিয়ে যাচ্ছি। আপনি অনুগ্রহ করে এদের প্রতিপালন করুন। কুন্তী কানে কি একথাগুলো বাজেনি? একবারও কি তাঁর মনে হয়নি—হায়! কে কাকে অনুগ্রহ করে! তাঁর স্বামীই ছিলেন রাজা, ধৃতরাষ্ট্র তাঁরই প্রতিনিধি হিসেবে রাজকার্য চালাচ্ছিলেন মাত্র। কিন্তু আজ শুধুমাত্র রাজধানীতে মৃত্যু না হবার কারণে আসল রাজপুত্রদেরই প্রার্থীর ভূমিকায় প্রতিপালনের অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে হচ্ছে।

ধৃতরাষ্ট্র খুব ঘটা করে পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ করলেন বটে, কিন্তু কুন্তী বা তাঁর ছেলেদের যে রাজকীয় মর্য্যাদা প্রাপ্য ছিল—তা তিনি তাঁদের দেননি। রাজবাড়িতে তাঁরা আশ্রয় পেলেন বটে—কিন্তু সেও রাজপরিবারের সদস্যদের মতো নয়, নিতান্তই আশ্রিতের মতোই। সেখানে তাঁদের থাকতে হচ্ছিল বড়ো দীনভাবে, হীনভাবে। এমনকী ভীমকে দুর্যোধন বিষ খাইয়ে গঙ্গায় ফেলে দিলেন—এত বড়ো ঘটনার পরেও ধৃতরাষ্ট্রকে কিছু বলতে পারেননি কুন্তী। সমস্ত কুরুরাজবাড়ির মান্য গণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে কুন্তীর বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন একমাত্র ছোটো দেবর বিদুর। ভীমকে বিষ খাওয়ানোর ঘটনার পর কুন্তী একান্তে ডেকে এনেছেন বিদুরকে। সুস্পষ্ট এবং সত্য সন্দেহ প্রকাশ করেছেন রাজ্যলোভী দুর্যোধন সম্পর্কে। কিন্তু কোনোভাবেই নিজের সন্দেহের কথা ধৃতরাষ্ট্রকে জানাতে পারেননি কুন্তী। কারণ তিনি বুঝে গিয়েছেন—চক্ষুর অন্ধতার থেকেও ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে স্নেহান্ধতা বেশি। ভীম যখন নাগলোক থেকে ফিরে এসে দুর্যোধনের চক্রান্তের কথা বললেন—তখনও আমরা কুন্তীকে যুধিষ্ঠিরকে দেখছি চুপ করে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন, পাছে আর কোনো ক্ষতি হয়। কুন্তী কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সঙ্গেই একমত হয়েছেন এই সময়।

পাণ্ডবরা বড়ো হতে লাগলেন, মহাকবি স্বকণ্ঠে না বললেও ছেলেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কুন্তীর ভাবনা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তিনি তাঁর সন্তানদের ক্ষত্রিয়োচিত সুশিক্ষা চেয়েছেন। চেয়েছেন তাদের মৃত পিতার রাজ্যের সামান্য উত্তরাধিকার তাঁর ছেলেরা পাক। কিন্তু হঠাৎ তাড়াহুড়ো করে উত্তরাধিকার চেয়ে বসেননি কুন্তী, তিনি ছেলেদের শিক্ষালাভ করে উপযুক্ত হয়ে ওঠার অপেক্ষা করেছেন।

[মহা (k) ১.১২৬.২২-৩৫; (হরি) ১.১২০.৩০-৪৩]

□ ভীষ্মের ইচ্ছায় দ্রোণাচার্যের কাছে রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ হল। রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষার বছরগুলিতে তাঁরা যখন ছাত্রাবাসে কাটাচ্ছেন, সেই সময়টা কুন্তী একাকিনী রাজবাড়িতে কেমন করে কাটালেন —তার উল্লেখ আমরা মহাভারতে পাই না। হয়তো ছেলেদের সুশিক্ষিত, উপযুক্ত হয়ে ওঠার

অপেক্ষায় দিন গুণতে গুণতেই কেটে গেল এতটা সময়।

তারপর কুন্তীর বহু প্রতীক্ষিত সেই দিনটি। রঙ্গভূমিতে রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষার প্রদর্শনী চলছে। ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের প্রদর্শনীর পর কুন্তীর কনিষ্ঠ পুত্র অর্জুনের ধনুর্বিদ্যার প্রদর্শন দেখে দর্শকরা চমৎকৃত। স্বয়ং পুত্রস্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রও সেদিন কুন্তী এবং কুন্তীপুত্রদের প্রশংসা করে বললেন—আমাদের কুন্তী হলেন অগ্নি উৎপাদনকারী শমীকাষ্ঠের মতো। কুন্তীর গর্ভজাত তিনটি পাণ্ডবরূপ অগ্নিকে পেয়ে আমি নিজেকে সব দিক থেকে সুরক্ষিত বলে মনে করছি—

ধন্যো'স্মি অনুগৃহীতো'স্মি
রক্ষিতো'স্মি মহামতে।
পৃথারণিসমুদ্ভূতৈস্ত্রিভিঃ পাণ্ডববহ্নিভিঃ॥

কুন্তী এই দিনটিরই অপেক্ষা করেছেন। বিধবা অসহায় মা যেমন করে অপেক্ষা করেন—ছেলে পড়াশুনো করে, পাঁচজনের একজন হয়ে মায়ের দুঃখ ঘোচাবে, ঠিক তেমনই কুন্তীও এতদিন অপেক্ষা করেছেন। কিন্তু বিধাতা কুন্তীর এত সুখের মধ্যেও কোথায় এক কোণে দুঃখ লিখে রেখেছিলেন। কুন্তীর কনিষ্ঠ পুত্র অর্জুন যখন নিজের অস্ত্রশিক্ষার গুণে সমস্ত রঙ্গস্থল প্রায় মোহিত করে ফেলেছেন, ঠিক সেই সময় সুউচ্চ রঙ্গমঞ্চ থেকে কুন্তী দেখতে পেলেন—বিশাল শব্দ করে আরও এক ধনুর্ধর তাঁর তৃতীয় পুত্রটিকে, যেন ব্যঙ্গ করতে করতে সে ঢুকে পড়ল রঙ্গস্থলে।

কুন্তীর বুক কেঁপে উঠল। সেই চেহারা, সেই মুখ। সেই ভঙ্গি। বুকে সেই বর্ম আঁটা। কানে সেই সোনার কুণ্ডল—মুখখানি যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—কুণ্ডল দ্যোতিতাননঃ। এতকাল পরে নিজের সেই প্রথম জাত পুত্রটিকে আজ দেখলেন কুন্তী, তাও আবার আপন কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায়। কুন্তী অনিমেষ চক্ষে চেয়ে দেখতে লাগলেন—কত শক্তিমান, আর কত লম্বা হয়ে গেছে তাঁর ছেলে। হেঁটে আসছে, মনে হচ্ছে যেন একটা সোনার তালগাছ হেঁটে আসছে কিংবা হেঁটে আসছে আস্ত একটা পাহাড়—

প্রাংশুকনকতালাভঃ . . . পাদচারীব পর্বতঃ।

রঙ্গস্থলের খুঁটিনাটীর মাঝে মহাভারতের কবি একটিমাত্র নিরপেক্ষ মন্তব্য করলেন— যার থেকে বেশ স্পষ্ট হয়ে যায় যে কুন্তীর মনের মধ্যে কী চলছিল। কবি বললেন—সূর্যপুত্র কর্ণ অর্জুনের ভাই হয়েও তাঁকে ভাই বলে বুঝলেন না—

ভ্রাতা ভ্রাতরমজ্ঞাতং সাবিত্রঃ পাকশাসনিম্।

যাঁকে অমর জীবনের আশীর্বাদ জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, সে যে এইভাবে কোনোদিন ফিরে আসবে, তা কুন্তীর কল্পনাতেও ছিল না। তবে প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি যে, পরিত্যক্ত কানীন পুত্রটিকে আজই প্রথম দেখতে পেলেও তার সম্পর্কে কুন্তী যে কোনো খোঁজ খবরই রাখতেন না, তা কিন্তু নয়। স্বয়ং মহাভারতের কবি উল্লেখ করেছেন যে, কর্ণ অশ্বনদীর জল থেকে যমুনা, যমুনা থেকে গঙ্গায় ভেসে গিয়ে শেষে যে সূত অধিরথের ঘরে রাধা মা'র কোলে গিয়ে উঠলেন, সে-খবরটা কিন্তু কুন্তী রেখেছেন রীতিমতো গুপ্তচরদের মাধ্যমে—

চারেণ বিদিতশ্চাসীৎ পৃথয়া দিব্যবর্মভৃৎ।

ছেলে কার কোলে, কোথায় মানুষ হল— সব খোঁজ খবরই বুঝি রাখতেন কুন্তী। পুত্রটিকে ত্যাগ করার সময় থেকে কুন্তীর মমতা এক মুহূর্তের জন্যও বোধ করি পুত্রের অন্বেষণ বন্ধ করেননি। তবু চোখের দেখা আজই প্রথম।

*[মহা (k) ১.১৩৪.৩৫; ১.১৩৫.৭-৩২; ৩.৩০৯.১৫;
(হরি) ১.১২৯.৩৬; ১.১৩০.৭-৩২; ৩.২৬৩.১৫]*

□ এই মুহূর্তে খুবই বিপন্ন বোধ করছেন কুন্তী। কর্ণের জন্মলগ্নে ঠিক যে লোকলজ্জার ভয়ে তাঁর জননীত্ব স্বীকার করতে পারেননি কুন্তী, আজও সেই একই কারণে, লোকলজ্জার ভয়েই যুবক ছেলেদের সামনে উঠে দাঁড়িয়ে কুন্তী পরিচয় করিয়ে দিতে পারলেন না—ও তোমাদের বড়ো ভাই, আমার বড়ো ছেলে। কর্ণের জন্মলগ্নে ভয়ের কারণ ছিলেন পালক পিতা কুন্তিভোজ। আর আজ কুন্তী কুরুরাজ পরিবারের কুলবধূ। তাঁর আর তাঁর ছেলেদের অবস্থাও কুরুরাজ পরিবারে খুব ভাল নয়, সেখানে তাঁর অতীত কলঙ্ক প্রকাশ পেলে যদি তাঁর পুত্রদের আরও বড়ো কোনো বিপন্নতা তৈরি হয়—একথা ভেবেও কুন্তী চুপ করে রইলেন। কিন্তু চোখের সামনে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁরই কনিষ্ঠ পুত্রকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছে—এ দৃশ্য কুন্তী সইতে পারলেন না। তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। মহামতি বিদুর কুন্তীর

অবস্থা দেখে দাসীদের পাঠিয়েছেন চন্দন-জলের ছিটে দিয়ে কুন্তীর শুশ্রূষা করার জন্য। কিন্তু জ্ঞান ফিরে উঠে বসে কুন্তী যা দেখলেন—তাতে বোধ করি তাঁর মনে হল যে, জ্ঞান না ফিরলেই ছিল ভাল। কুন্তী দেখলেন তাঁর দুই ছেলে মারামারি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। দুঃখে, লজ্জায় কী করবেন ভেবে পেলেন না তিনি—

পুত্রৌ দৃষ্ট্বাসুসংভ্রান্তা নান্বপদ্যত কিঞ্চন।

বাঁচালেন কৃপাচার্য। তিনি এগিয়ে এসে কর্ণকে বংশপরিচয় জিজ্ঞেস করে চরম অপমানের মধ্যে ফেলে দিলেন বটে—তবু যুদ্ধ বন্ধ হল দেখে কুন্তী স্বস্তি পেলেন। তারপর দুর্যোধন যখন এগিয়ে এসে অঙ্গদেশের রাজমুকুট পড়িয়ে দিলেন কর্ণের মাথায়—সেই সময় তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ, অপমান-প্রতি অপমানের মধ্যেও কুন্তী দুর্যোধনের প্রতি পরম প্রসন্ন হয়ে উঠেছেন। তাঁর ছেলে আজ রাজা হল—কুন্তীর বাৎসল্যের শান্তি এটুকুই। চাপা আনন্দে বুক ভরে উঠল তাঁর—

পুত্রম্ অঙ্গেশ্বরং জ্ঞাত্বা ছন্না প্রীতিরজায়ত।

কেউ জানুক বা না জানুক কুন্তী বুঝলেন—তাঁর বড়ো ছেলেই প্রথম রাজ্য পেল এবং সবার কাছে সে হীন হয়ে যায়নি। এও এক আনুষ্ঠানিক তৃপ্তি, যার ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ নয়। কিন্তু কুন্তী যেটা বুঝলেন না, সেটা হল—এই রঙ্গভূমিতেই তাঁর জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ পুত্রের মধ্যে এমনই এক শত্রুতার জন্ম হল, যা দুজনের মধ্যে কোনো একের মৃত্যুর আগে শান্ত হবার নয়। তাঁর জননীহৃদয় তখন তাঁর ধনুর্ধর জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতিষ্ঠার আনন্দে আপ্লুত হয়ে আছে। পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত দেখার তৃপ্তি হয়তো কুন্তীকে জননীর দায় থেকেও মুক্ত করল অনেকটাই।

[মহা (k) ১.১৩৬.১-৪১; ১.১৩৭.২৩;
(হরি) ১.১৩১.১-৪১; ১.১৩২.২৩]

□ এরপর একটি বছর কেটে গেল। যুধিষ্ঠির যুবরাজ হলেন। কুন্তীর দুই পুত্র ভীম এবং অর্জুনের অসামান্য শক্তি দেখে হয়তো বাধ্য হয়েই ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুরের যুবরাজ করতে বাধ্য হলেন। যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্য লাভের পর ভীম আর অর্জুনের প্রতাপ আরও বেড়ে গেল। অর্জুন দিগ্বিজয় করে রাশি রাশি সম্পদ নিয়ে ফিরে এলেন হস্তিনায়। পাণ্ডবদের প্রভাব প্রতিপত্তি এতটাই বেড়ে গেল যে, রাজ্যলোভে, ঈর্ষায় ধৃতরাষ্ট্রের মন খুব তাড়াতাড়িই বিষিয়ে গেল পাণ্ডবদের প্রতি—

দূষিতঃ সহসা ভাবো ধৃতরাষ্ট্রস্য পাণ্ডুষু।

ধৃতরাষ্ট্রকে ইন্ধন যোগালেন দুর্যোধন। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বোঝালেন—যেভাবে হোক, পাণ্ডবদের একেবারে মা কুন্তী সহ নির্বাসন দিতে হবে—সহ মাত্রা প্রবাসয়।

ধৃতরাষ্ট্রের মনেও ওই একই ইচ্ছে ছিল, এ ষড়যন্ত্রে তিনি সহজেই সায় দিলেন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, দুর্যোধন যদি শুধু পাণ্ডবদেরই পুড়িয়ে মারেন, তাহলেও তাঁর রাজ্যলাভ নিষ্কণ্টক হয়। তবু কুন্তীকেও যে তিনি সঙ্গে পাঠাতে চাইলেন তার সব থেকে বড়ো কারণ হল—কুন্তীর বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্ব। পাণ্ডবরা গিয়ে যদি শুধু কুন্তী রাজবাড়িতে থাকতেন, তাহলে বারণাবতের জতুগৃহে পাণ্ডবদের দগ্ধ করার পরিকল্পনা ভেস্তেও যেতে পারত। এই আশঙ্কায় কুন্তীকেও ছেলেদের সঙ্গে পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা করলেন। দুর্যোধন কিন্তু বুঝতে পারেননি যে বিদুর গোড়াতেই বুঝে ফেলেছেন দুর্যোধনের চাল। বিদুরের বুদ্ধিতে কুন্তী এবং পাণ্ডবরা শেষ পর্যন্ত জতুগৃহের অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পেলেন।

[মহা (k) ১.১৪১.১-১৮; (হরি) ১.১৩৬.১-১৮]

□ এরপর বেশ কিছু কাল ছেলেদের নিয়ে বনে বনে ঘুরতে হলেও কুন্তী যে খুব কষ্টে ছিলেন, তা কিন্তু নয়। তাঁর ছেলেরা বড়ো হয়েছে এখন, যথেষ্ট বিচক্ষণও হয়েছে। বিশেষত ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, তাঁর স্থিরতা, ব্যক্তিত্ব, নীতিবোধ এতোই প্রখর যে তাঁর ওপর নির্ভর না করে কুন্তীর উপায় ছিল না। যে কোনো বিপন্ন মুহূর্তে যুধিষ্ঠিরের কথা তিনি মেনে চলতেন এবং যুধিষ্ঠিরের কথার মর্যাদা ছিল প্রায় তাঁর স্বামী পাণ্ডুর কাছাকাছি। আবার মেজো ছেলে ভীমের প্রতি কুন্তীর স্নেহ কিছু অন্যরকমের। তিনি জানেন ভীম তাঁর অবোধ, সরল, পাগল, একগুঁয়ে ছেলে। অসম্ভব তাঁর দৈহিক শক্তি। ফলে বনের পথে ক্লান্ত হয়ে ভীমের কাঁধে চড়ে যেতেও তাঁর সঙ্কোচ হয়না। সব ছেলের সমান পরিশ্রমের পর অথবা ভীমের যদি অন্য ছেলেদের থেকে বেশি পরিশ্রমও হয়ে যায়, তবু যেন তাঁকেই ইঙ্গিত করে কুন্তী একটা কথা হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারেন—পাঁচ ছেলের মা হয়ে, আজ এই বনের মধ্যে তেষ্টায়

গলা ফেটে যাচ্ছে আমার। কুন্তী জানেন যে, তাঁর এসব কথার প্রতিক্রিয়া সর্বপ্রথম ভীমের মনের মধ্যেই হবে।

একই গর্ব তাঁর অর্জুনকে নিয়েও। তবে অর্জুনের থেকেই কিন্তু কুন্তীর মাতৃস্নেহে প্রশ্রয়ের শিথিলতা এসেছে। মায়ের কনিষ্ঠ পুত্রটি বিদ্যায় বুদ্ধিতে অসম্ভব কৃতী পুরুষ হয়ে উঠলে সেই ছেলের প্রতি মায়ের মনে যে নিরুচ্চার প্রশ্রয়ের ভাব তৈরি হয়—অর্জুনের ব্যাপারেও কুন্তীর সেই প্রশ্রয় কাজ করত। যদিও সেই প্রশ্রয়ের মধ্যে মায়ের দাবিও ছিল অনেক। কুন্তী মুখে প্রকাশ না করলেও অর্জুন সে কথা বুঝতেন। তবে সে বিষয়ে পরবর্তী সময়ে আলোচনা হবে।

পুত্রদের প্রতি স্নেহ বা পুত্রদের সঙ্গে কুন্তীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে এরপরেই আসে নকুল-সহদেবের কথা। মাদ্রীর মৃত্যুর পর থেকে এঁরা দুজন একান্তভাবে কুন্তীর কাছেই মানুষ, এঁরা কুন্তীরই ছোটো ছেলে। প্রশ্রয় বলতে যেখানে একেবারে বাধা-বন্ধহীন অকৃত্রিম প্রশ্রয় বোঝায়, যার মধ্যে ফিরে পাওয়ার কোনো তাগিদ নেই, যা শুধুই নিম্নগামী স্নেহের মতো, দাদু-দিদিমা বা ঠাকুমা-ঠাকুরদার অন্তরবিলাস—কুন্তীর ঠিক ততখানি প্রশ্রয় ছিল নকুল-সহদেবের ওপর। বিশেষ করে সহদেবের ওপর মাদ্রী যে কুন্তীকে বলেছিলেন—তোমার ছেলেদের সঙ্গে আমার ছেলেদের আমি এক করে দেখতে পারব না—এই কথাটাই কুন্তীকে আরও বিপরীত ভাবে স্নেহপ্রবণ করে তুলেছিল নকুল-সহদেবের প্রতি। আর সে স্নেহ এতটাই যে নকুল-সহদেব বোধ করি কোনোদিন অনুভব করতেও পারেননি যে তাঁরা মাতৃহীন। আবার এদের মধ্যেও কনিষ্ঠ সহদেবের প্রতি কুন্তীর স্নেহ এমনই লাগামছাড়া গোছের ছিল যে, তাঁকে বোধ হয় তিনি বুড়ো বয়স পর্যন্ত খাইয়ে বা ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। তার আন্দাজ-পাওয়া যাবে পাশাখেলায় হেরে পাণ্ডবদের বনবাসে যাবার সময়। পাণ্ডবরা রওনা হবার আগে দ্রৌপদীকে ডেকে কুন্তী বললেন—বনের মধ্যে তুমি আমার সহদেবকে একটু দেখে রেখো—

সহদেবশ্চ মে পুত্রঃ সহাবেক্ষ্যা বনে বসন্।

দেখো ওর যেন কোনো কষ্ট না হয়। কুন্তীর এই মানসিকতা পরবর্তী সময়ে দ্রৌপদীর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে তাঁর কনিষ্ঠ স্বামীটির প্রতি বাৎসল্য বিতরণ করার শিক্ষা দিয়েছে। তবে এসব অনেক পরের কথা। এখনও কুন্তীর পুত্রদের বিয়েই হয়নি। বারণাবতের জতুগৃহ থেকে পালিয়ে কুন্তী নিজেই ছেলেদের নিয়ে ঘুরছেন বনে বনে।

[মহা (k) ১.১৫১.১-২৯; (হরি) ১.১৪৫.১-২৯]

□ বনে বনে ঘুরতে ঘুরতেই সেদিন রাত্রে পাণ্ডবরা এসে পৌঁছালেন হিড়িম্ব রাক্ষসের বনে। ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন সকলে। কুন্তীর মেজো ছেলে ভীম মায়ের কষ্ট দেখে জল আনতে গেলেন এবং জল নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন ক্লান্ত মা আর ভাইয়েরা সকলে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ভীম একা জেগে ঘুমন্ত মা ভাইদের পাহারা দিতে লাগলেন। এদিকে সেই বনের হিড়িম্ব রাক্ষস বোন হিড়িম্বাকে পাঠালো এই মানুষগুলিকে মেরে আনতে। হিড়িম্বা ভাইয়ের কথা মতো পাণ্ডবদের বধ করতেই এসেছিল। কিন্তু মধ্যম পাণ্ডব ভীমকে দেখে মোহিত হয়ে তাকেই স্বামীরূপে বরণ করল সে। ভীমের হাতে হিড়িম্ব রাক্ষসের মৃত্যু হল শেষপর্যন্ত। এরমধ্যেই হিড়িম্বার মুখ থেকে হিড়িম্ব রাক্ষসের কথা জেনেছেন কুন্তী। মনুষ্যরমণীর সাজসজ্জায় সজ্জিত রাক্ষসকুলের এই মেয়েটিকে কুন্তী বেশ পছন্দও করে ফেলেছেন। সরলা হিড়িম্বাও নিজের পছন্দের কথা কুন্তীকে জানিয়েছেন সরলভাবেই। পরিষ্কার জানালেন যে, ভীমকে তিনি বিয়ে করতে চান।

প্রাথমিকভাবে ভীম হিড়িম্বাকে প্রত্যাখ্যানই করেছিলেন, খানিক রূঢ় ব্যবহারও করেছিলেন তাঁর সঙ্গে। এই অবস্থায় হিড়িম্বা কুন্তীকে তার স্বভাবসুলভ সরলতায় বললেন—মা! ভালবাসার কত কষ্ট, সে তো তুমি অন্তত বোঝো। তোমার ছেলের জন্য এখন আমি সে কষ্ট পাচ্ছি। তুমি আর তোমার এই ছেলে—দুজনেই যদি আমাকে এখন প্রত্যাখ্যান করো—

বীরেণাহং তথানেন ত্বয়া চাপি যশস্বিনি।

—তাহলে আমি আর প্রাণে বাঁচবো না। হিড়িম্বা বুঝেছেন যে কুন্তীর কথা ফেলার সাধ্য তাঁর পুত্রদের নেই। তাই সমস্ত লোকলজ্জা ত্যাগ করে কুন্তীর শরণ নিয়েছেন হিড়িম্বা। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—পুত্রলাভ করা পর্যন্ত তিনি ভীমের সঙ্গে থাকবেন, তারপর ছেলেকে নিয়ে তিনি ফিরে যাবেন নিজের জগতে।

যুধিষ্ঠির বুঝলেন—মা একেবারে গলে গেছেন। মায়ের মতেই যুধিষ্ঠির ভীমকে ছেড়ে দিয়েছেন হিড়িম্বার সঙ্গে এবং তাঁদের পুত্রজন্ম পর্যন্ত সময় দিয়েছেন বাইরে থাকার। যথাসময়ে ভীম এবং হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচের জন্ম হল। ছেলেকে নিয়ে ভীম আর হিড়িম্বা এলেন কুন্তীর কাছে। প্রথমজাত এই পৌত্রটিকে কুন্তী যে মর্য্যাদা দিলেন, তাতে শাশুড়ি হিসাবে তাঁর ঔদার্য্য প্রকাশ পেয়েছে অনেক আধুনিকা শাশুড়ির থেকে বেশি। কুন্তী এমনই এক মনস্বিনী রাজমাতা, যিনি নিজের ছেলেকে শুধু রাক্ষসীর সঙ্গে একান্ত বিহারে পাঠিয়েও তৃপ্ত হননি, রাক্ষসীর তথাকথিত বিকট চেহারার ছেলের বিলোম মস্তকে হাত বুলিয়ে অসীম মমতায় তিনি বলে উঠলেন—বাছা! প্রসিদ্ধ কুরুবংশে তোমার জন্ম, আমার কাছে তুমি ভীমের সমানই শুধু নও, এই পঞ্চপাণ্ডবের তুমি প্রথম পুত্র। সবসময় যেন আমরা তোমার সাহায্য পাই—

জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো'সি পঞ্চানাং সাহায্যং কুরু পুত্রক।

এমন অসীম মর্য্যাদায় একটি রাক্ষসীর পুত্রকে যে মনস্বিনী কুরুবংশের মাহাত্ম্যে আত্মসাৎ করেন, শাশুড়ি হিসেবে সেই মনস্বিনীর ধীরতার সঙ্গে আমাদের বর্তমান সমাজের আধুনিকতারও তুলনা চলে না। শাশুড়ি হিসেবে কুন্তীর বিচক্ষণতা এবং মমত্ব এর পরেও আমরা দেখতে পাবো। সেই মমত্বের মধ্যে জননীর সরসতা যতটুকু, ক্ষত্রিয় জননীর বীরতাও ততটুকুই। বরঞ্চ বীরতাই বেশি। ক্ষত্রিয় জননীর স্নেহের সঙ্গে বীরতা এমনভাবেই মিশে যায় যে এর জন্য আলাদা করে তাঁর ভাবার সময় থাকে না। এভাবেই পুত্রদের বড়ো করে তুলেছেন কুন্তী, একই ব্যবহার দেখা যাবে শাশুড়ি হিসেবেও।

[মহা (k) ১.১৫৪.২-১০; ১.১৫৪.৩৬; ১.১৫৫.৪-৪৬;
(হরি) ১.১৪৮.২-১০; ১.১৪৮.৩৬; ১.১৪৯.৪-৪৫]

□ এরপর ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কুন্তীদের বসবাস আরম্ভ হল বকরাক্ষসের দৌরাত্ম্য পীড়িত একচক্রা গ্রামে। বক রাক্ষসের নিয়ম ছিল—নগরের এক একটি বাড়ি থেকে তার খাবার যোগান দিতে হবে প্রতিদিন এবং যে ব্যক্তি সেই খাবার নিয়ে যাবেন তিনিও বকরাক্ষসের খাদ্য বলেই গণ্য হবেন। কুন্তীরা যে ব্রাহ্মণের বাড়িতে ছিলেন, সেই ব্রাহ্মণের বাড়ির পালা পড়ল একদিন। কান্নার রোল উঠল তাদের ঘরে। কুন্তী সব শুনে ভীমকে জানিয়ে ঢুকে পড়লেন সেই বিলাপরত ব্রাহ্মণের ঘরে। কুন্তীর মাতৃহৃদয় তথা স্নেহ-মমতা এই ঘটনায় কতটা উদ্বেলিত হয়েছিল—তা বোঝাবার জন্য কবি উপমা দিয়েছেন—ঘরের মধ্যে বাছুর বাঁধা থাকলে তার ডাক শুনে গোরু যেমন ধেয়ে এসে গোয়ালে ঢোকে কুন্তীও ঠিক তেমনি করেই গিয়ে ঢুকলেন ব্রাহ্মণের বাড়িতে—

বিবেশ ত্বরিতা কুন্তী বদ্ধবৎসেব সৌরভী।

কুন্তী সব শুনলেন। ব্রাহ্মণের এবং তাঁর পরিবারের সকলের কথাই ধৈর্য্য ধরে শুনলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে অথচ বেশ দৃঢ়স্বরে বললেন—আমার পাঁচটি ছেলে। তাদেরই একজন যাবে বকরাক্ষসের খাবার নিয়ে। কুন্তী কিন্তু বেশ ভেবেচিন্তে, ভীমের দৈহিক শক্তি, পরাক্রমের কথা মাথায় রেখেই এ প্রস্তাব রেখেছেন। ব্রাহ্মণ প্রথমে অনেক নিষেধ করলেন। কুন্তী কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। বেশ দৃঢ় স্বরে বললেন—আমার ছেলেকে আপনি চেনেন না। সে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী। অনেক রাক্ষসকেই সে মেরেও ফেলেছে। সে এই বকরাক্ষসকেও নিশ্চয় মারবে আর আপনাদের সকলকে এই রাক্ষসের অত্যাচার থেকে মুক্ত করবে চিরতরে। ব্রাহ্মণ শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। কিন্তু কুন্তীর এমন সিদ্ধান্তের কথা শুনে যুধিষ্ঠির পর্যন্ত চিন্তিত হয়েছেন, ভয় পেয়েছেন, মাকে ভয় দেখিয়েছেন অনেক। কিন্তু কুন্তী তাঁর ছেলেদের চেনেন। তাঁর কোন ছেলে কোন কাজের জন্য উপযুক্ত—সেকথাও তাঁর অজানা নয়। বিশেষ করে হিড়িম্ব বধের ঘটনা চোখের সামনে দেখার পর ভীমের শক্তির ওপর কুন্তীর বিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল অনেকটাই। সেই প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ক্ষত্রিয় জননীর উপকারবৃত্তি। সিংহজননী যেমন সিংহশাবককে বেছে বেছে নরম শিকার ধরতে পাঠায় না, শিকারের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে তাকে ছেড়ে দেয়, কুন্তীও তেমনই ব্রাহ্মণের প্রত্যুপকারবৃত্তির সঙ্গে তাঁর ক্ষত্রিয় জননীর গর্বটুকু মিশিয়ে দিয়েছেন ভীমকে বকরাক্ষসের সামনে ফেলে দিয়ে। ভীম কুন্তীকে নিরাশ করেননি। বকরাক্ষসকে বধ করে তার অত্যাচার থেকে মুক্ত করেছেন একচক্রা গ্রামকে।

[মহা (k) ১.১৫৭.৮-১৯; ১.১৬০.১-১৭;
১.১৬১.১৪; (হরি) ১.১৫১.৮-১৯; ১.১৫৪.১-৩৮]

□ এরপর আরও কিছুদিন কাটল। একচক্রা গ্রামের সেই বাড়িতে বসেই ব্রাহ্মণদের মুখে কুন্তী এবং পাণ্ডবরা শুনলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর উপলক্ষ্যে পঞ্চাল দেশে যে লোক সমাগম হবে সে কথাও। কুন্তীর মনে বোধহয় দীপ্তিময়ী দ্রৌপদীর সম্পর্কে পুত্রবধূর কল্পনা ছিলই। কিন্তু মনে যাই থাক, মুখে কিন্তু তিনি কিছুই প্রকাশ করলেন না। বরং বেশ ঘুরিয়ে পাড়লেন কথাটা—এখানে এই ব্রাহ্মণের ঘরে অনেক কাল থাকলাম আমরা—

চিররাত্রোষিতা স্মেহ ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে।

এখানকার বন-বাগান যা কিছু দ্রষ্টব্য ছিল, সেসবও আমাদের দেখা হয়ে গিয়েছে অনেকবার। এক জায়গায় এতকাল আছি বলে ভিক্ষাও আর মিলছেনা তেমন। তার চেয়ে চল বরং আমরা পঞ্চালে যাই—

তে বয়ং সাধু পাঞ্চালান্ গচ্ছামো যদি মন্যসে।

মায়ের কথায় পাঁচ ভাই পঞ্চালে যাবার তোড়জোড় শুরু করে দিলেন। এমতাবস্থায় একদিন একচক্রায় পাণ্ডবদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন মহর্ষি ব্যাস। যত বড়ো নিরপেক্ষ মুনিই তিনি হন না কেন, কুরুবংশের প্রতি তাঁর অন্যতর মমতা আছে। জতুগৃহের আগুন থেকে পালিয়ে পাণ্ডবরা বনে বনে ঘুরছেন—এতো বড়ো অন্যায় ব্যাস সইতে পারেননি। তখনই বনের মধ্যে তিনি এসে দেখা করেছেন পাণ্ডবদের সঙ্গে। আশ্বাস দিয়েছেন কুন্তীকে—তোমার ছেলেরা ধার্মিক। রাজা হবে তারাই। আজ দ্বিতীয়বার এসে ব্যাস আবারও কুন্তীকে আশ্বাস দিলেন অনেক, পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর সমর্থনের কথাও বললেন, সব শেষে পাঞ্চালী-দ্রৌপদীর কথাও বললেন ব্যাস। তাঁর বক্তব্যের সার এই যে, পাঁচ-পাণ্ডবের এক পত্নী হবেন দ্রৌপদী।

স্বয়ং পাণ্ডবভাইরাও ব্যাসের মর্মকথাটা তেমন করে বোঝেননি যেমনটি বুঝেছেন কুন্তী। পাঞ্চালে এসে এক কুমোরের বাড়িতে বাসা বাঁধলেন পাণ্ডবরা। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরেও তাঁরা গিয়ে উপস্থিত হলেন যথা সময়ে। দ্রুপদ রাজা দ্রৌপদীকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে যে লক্ষ্যভেদের শর্ত আরোপ করেছিলেন, তা করেছিলেন অর্জুনকে জামাতা হিসেবে লাভ করার জন্যই। সভায় উপস্থিত অন্যান্য রাজা-রাজপুত্রদের পক্ষে সে শর্ত পূরণ করা ছিল এক কথায় অসম্ভব। কর্ণ যদিও বা সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করেছিলেন দ্রৌপদী সূতপুত্র বলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের ভীড়ের মধ্য থেকে উঠে এলেন অর্জুন। লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীর বরমাল্য জয় করলেন তিনি। এরপর সভায় উপস্থিত ক্ষত্রিয় রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ-কলহ মিটিয়ে অর্জুন আর ভীম দ্রৌপদীকে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন কুটীরের দরজায়। যুধিষ্ঠির, নকুল-সহদেব তখনও ফেরেননি। দরজায় দাঁড়িয়ে ভীম-অর্জুন একসঙ্গে বললেন—মা! ভিক্ষা এনেছি। ঘরের ভিতর থেকে কুন্তী উত্তর দিলেন—যা এনেছ, তা সকলে মিলে ভোগ করো।

অনেকের ধারণা—স্বয়ম্বর সভার ফল নিষ্পত্তি, যা দ্রৌপদীকে লাভ করার ফলে অর্জুনের সপক্ষেই ঘটেছিল—সে ঘটনাটা কুন্তীর জানা ছিল। এবং জানা ছিল বলেই ভাইদের মধ্যে যাতে এ নিয়ে বিভেদ না হয়, তাই তিনি ইচ্ছে করেই অমন কথাটা বলেছিলেন—যা এনেছ সবাই মিলে ভোগ করো।

মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ এই কথাটা প্রথম এইভাবে বলার চেষ্টা করেন। যুধিষ্ঠিরের কাছে কুন্তী মীমাংসার জন্য গেলেন, আর সিদ্ধান্তবাগীশ লিখলেন—বোঝা যাচ্ছে, যুদ্ধ শেষ হয়েছে শুনেই যুধিষ্ঠির, নকুল আর সহদেব (যাঁরা যুদ্ধের আরম্ভেই বাইরে এসেছিলেন) চলে আসেন কুম্ভকারগৃহে মায়ের কাছে। অর্থাৎ তাঁরাই বলে দেন—দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন অর্জুন। তারপর যখন ভীম-অর্জুন দ্রৌপদীকে নিয়ে এলেন, তখন কুন্তী জেনে বুঝে অমন একটা হঠোক্তি করলেন—যা এনেছ সবাই মিলে ভোগ করো।

কিন্তু মহাভারতের কাহিনী পরম্পরা যেরকম দেখা যাচ্ছে, তাতে করে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের এই মত মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ মহাভারতে দেখা যাচ্ছে—স্বয়ম্বর সভার জের টেনে যুদ্ধ-বিগ্রহ শেষ হতে হতে বেলা গড়িয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য দিন ছেলেরা যে সারাদিনের ভিক্ষা সেরে কুন্তীর কাছে ফিরে আসত—তারও একটা মোটামুটি নির্ধারিত সময় সীমা ছিল। কিন্তু কোনোদিনই এমন দেরি হত না যাতে করে কুন্তী দুশ্চিন্তায় পড়তেন। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে তিনি মহা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন—ছেলেরা ফিরছে

না, ভিক্ষা নিয়ে আসার সময়টাও পেরিয়ে গেছে—

অনাগচ্ছৎসু পুত্রেষু ভৈক্ষ্যকালে'ভিগচ্ছতি।

কুন্তী দুশ্চিন্তা করছেন, নানারকম ভাবনাই তাঁর হচ্ছে। কখনো তিনি ভাবছেন যে, ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা পাণ্ডবদের চিনে ফেলে হত্যা করেছে হয়তো, কখনো ভাবছেন যে হয়তো মায়াবী রাক্ষসরা ধরে নিয়ে গেছে তাঁর ছেলেদের।

দেখা যাচ্ছে, ছেলেরা বাড়ি ফেরেনি এবং ছেলেরা বাড়ি না ফিরলে মায়েদের যে দুশ্চিন্তা হয় তাইই এই মুহূর্তে কুন্তীর মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। তার মানে যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব স্বয়ম্বর সভা থেকে বেরলেও বাড়ি ফেরেননি। সিদ্ধান্তবাগীশ পরে যা লিখেছেন (যা আমরা আগে বলেছি) তার একান্ত স্ববিরোধে এইখানে কুন্তীর দুশ্চিন্তার টীকা রচনা করে বলেছেন— যুধিষ্ঠির, নকুল আর সহদেব বাড়ি ফেরেননি। তাঁরা স্বয়ম্বরের যুদ্ধ রঙ্গ থেকে বেরিয়ে গিয়ে কুম্ভকারগৃহে আসবার পথে কোথাও অপেক্ষা করছিলেন। যদি এই যুদ্ধ-বিগ্রহ দূরে তাঁদের বাড়ি পর্যন্ত ছড়ায়, যদি মায়ের কোনও বিপদ হয়, তাই রাস্তাতেই তাঁরা পাহারা দিচ্ছিলেন—

যুধিষ্ঠির-নকুল-সহদেবাঃ মাতৃরক্ষার্থং রঙ্গান্নিষ্ক্রম্য তৎকুম্ভকারভবনাক্রমণপথে
প্রতীক্ষন্তে স্ম ইতি প্রতীয়তে।

দেখা যাচ্ছে সিদ্ধান্তবাগীশ আগে এক রকম বলেছেন, পরে আরেক রকম বলেছেন।

বস্তুত আমরাও এই অনুমানটাই মানি। হয়তো বাড়তি এইটুকু বলি যে, মায়ের বিপদ হবে—এই ভয়ে নয়, তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন ভীম আর অর্জুনের আশঙ্কাতেই।

তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন যদি বাইরে থেকেও কোনো আক্রমণ হানতে হয়। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধনীতিতে পাঁচজন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কেউ যুদ্ধ করে না। ভীম অর্জুন যুদ্ধ করছেন, সেখানে দরকার হলে বাইরে থেকে আক্রমণ শানানোর সুবিধে বেশি। হয়তো সেই কারণেই তাঁরা রাস্তায় অপেক্ষা করছিলেন। এবং ভীম-অর্জুন যুদ্ধ জিতে দ্রৌপদীকে নিয়ে রাস্তায় নামামাত্রই তাঁরাও এসেছেন একই সঙ্গে। যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব— কেউই ভীম-অর্জুন ফেরার আগে বাড়ি ফিরেছিলেন—কুন্তীর দুশ্চিন্তার নিরিখে সে-কথা বিশ্বাস হয় না। যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব যুদ্ধ-টুদ্ধ কিছুই করেননি, অথচ নতুন বউকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের সামনে গিয়ে বেশ দালালি করে একটা কথা বলবেন—এটা তাঁদের ক্ষত্রিয়বুদ্ধিতে লজ্জা দিয়েছে। তা ছাড়া নতুন বউটিই বা কী ভাববে? তিনি স্বয়ম্বরের রঙ্গস্থলে অর্জুনকেও দেখেছেন, ভীমকেও দেখেছেন। অতএব তাঁরা যে কথাটা বলতে পারেন, যুধিষ্ঠির, নকুল বা সহদেবের সে-কথা বলা মানায় না। তাই তাঁরা কিছু বলেননি এবং মায়ের সঙ্গে বউ-পরিচয়ের চরম লগ্নে তাঁরা একটু আড়ালেই থেকেছেন।

কিন্তু যে মুহূর্তে ভুল ভেঙেছে, যে মুহূর্তে তিনি বুঝেছেন—ফস করে নতুন বউয়ের সামনে অমন কথাটা বলা ভুল হয়ে গেছে, অমনই কুন্তী তাঁর বড়ো ছেলের কাছে দৌড়ে গেছেন। নব-পরিণীতা দ্রৌপদীকেও দেখাতে চেয়েছেন— ক্ষত্রিয়ের বাড়িতে যুদ্ধ জিতে বউ নিয়ে আসাটা যেমন বড়ো কিছু কথা নয়, তেমনই যুধিষ্ঠির যুদ্ধ না করলেও তাঁর মতের মূল্য কিছু কম নয়। কারণ ক্ষত্রিয়ের কাছে যুদ্ধবৃত্তি যত বড়ো, ধর্মবুদ্ধি তার থেকেও বড়ো। তিনি একটা কথা ভুল করে বলে ফেলেছেন, তার মীমাংসার ভার তিনি দিয়েছেন বড়ো ছেলে যুধিষ্ঠিরের হাতে। দেখাতে চেয়েছেন—ভীম-অর্জুন যত বড়ো যুদ্ধবীরই হোক, আমার অন্য ছেলেগুলিও কিছু ফেলনা নয়। সঙ্গে নতুন বউটির সুকুমার মনোবৃত্তির কথাটাও কুন্তী ভুলে যাননি। যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলেছেন— এমন একটা মীমাংসা কর, যাতে আমার কথাটাও মিথ্যে হয়ে না যায়, আর কৃষ্ণা পাঞ্চালীরও যেন কোনো বিভ্রান্তি না হয়—ন চ বিভ্রমেচ্ছ।

যুধিষ্ঠির সিদ্ধান্ত নেবার আগে অর্জুনকে যাচিয়ে নিয়েছেন। বলেছেন—তুমিই দ্রৌপদীকে জয় করেছ। তুমিই তাঁকে বিবাহ করো। অর্জুন সলজ্জে বলেছেন—না দাদা, আগে তোমার বিয়ে হোক, ভীমের বিয়ে হোক, তারপর তো আমি।

লক্ষণীয়, কথাটা অর্জুনকেই বলেছেন যুধিষ্ঠির, সরাসরি। অর্জুন নিজেই উত্তর দিয়েছেন। কুন্তীর এখানে কোনো পার্ট নেই। রসজ্ঞ মানুষেরা বলতে পারেন—কুন্তীর এ বড় অবিচার। কই হিড়িম্বা যখন ভীমকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, তখন তো কুন্তী বলেননি—আগে আমার বড়ো ছেলে যুধিষ্ঠির বিয়ে করবে, তারপর ভীম।

আমি বলি—ভীমের জন্য হিড়িম্বা লজ্জা ত্যাগ করে যেসব কথা বলেছিলেন, সেসব কথা যদি বিদগ্ধা রাজনন্দিনীর মুখ দিয়ে বেরত, তাহলে যুধিষ্ঠির-কুন্তী নিশ্চয়ই অন্যভাবে ভাবতেন। তা ছাড়া ভীম স্বয়ং তো একবারও বলেননি যে, দাদা! এই রাক্ষসী-সুন্দরীকে আগে তুমি বিয়ে করো, তারপর তো আমার বিয়ের কথা আসবে। ভীম সরল লোক। দেখলেন—হিড়িম্বাও জোরজার করছে, মাও বলছেন। তিনি নির্দ্বিধায় হিড়িম্বাকে নিয়ে চলে গেছেন অন্য জায়গায়। কিন্তু অর্জুন যে মহাভারতের নায়ক। যুধিষ্ঠির প্রস্তাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মায়ের বিপাকের কথা ভেবেছেন, দ্রৌপদী সম্বন্ধে ব্যাসদেবের ভবিষ্যৎ-বাণী স্মরণ করেছেন এবং নব-পরিণীতা বধূর সামনে নিজের চারদিকে নায়কোচিত দূরত্বের আড়াল ঘনিয়ে নিয়ে বলেছেন—দাদা, আগে তোমার বিয়ে হোক, তারপর ভীমের বিয়ে হোক, তারপর তো আমি। আমাকে দিয়ে অধর্ম করিও না।

কুন্তী এখানে কী করবেন? এখানে তাঁর কৃত্য কিছু নেই। বিদগ্ধা দ্রৌপদীও কিছু বলেননি। অতএব সমস্ত সিদ্ধান্তটাই চলে গেছে যুধিষ্ঠিরের হাতে। বলতে পারেন—যুধিষ্ঠির যখন—'দ্রৌপদী আমাদের সবারই মহিষী হবেন'—বলে সিদ্ধান্ত দিলেন, সেটাতে কুন্তী আপত্তি করেননি কেন? করেননি, কেননা এতে তাঁর হঠোক্তির দায়টাও চলে গেছে, আর পাঁচ-জনের এক স্ত্রী হলে ভাইদের মধ্যে ভেদ-বিভেদ হবে না—এই সুন্দর যুক্তিটা তাঁর পরম ঈপ্সিত ছিল। কিন্তু এটা তিনি জেনে বুঝে করেছেন তা মনে হয় না। তা ছাড়া এই বিয়ে নিয়ে পরেও কম লড়তে হয়নি। মহামতি দ্রুপদের সঙ্গে, ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে—সবার সঙ্গে এই মায়ের বচন নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে তর্ক করতে হয়েছে। আর কুন্তী যে জেনে-বুঝে পাঁচ ছেলের সঙ্গে এক রূপসীর বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্যই ফস করে একটা মিথ্যার মতো সত্য কথা বলেছেন, তা আমরা মনে করি না। আরও মনে করি না এই কারণে যে, দ্রুপদের সভায় অত বড়ো ঋষি-শ্বশুর স্বয়ং ব্যাসদেবের কাছে কুন্তী অত্যন্ত বিপন্নভাবে আর্জি জানিয়েছেন—ছেলেপিলেদের কাছে আমার কথাটা একেবারে মিথ্যে হয়ে যাবে বলে আমি বড়ো ভয় পাচ্ছি, আমি কী করে এই মিথ্যা থেকে মুক্তি পাব বলুন—

অনৃতান্মে ভয়ং তীব্রং মুচ্যে'হম্ অনৃতাৎ কথম্?

আর যাই হোক, বেদব্যাসের সঙ্গে কুন্তী চালাকি করবেন না।

যাই হোক, দ্রৌপদীর বিবাহের তখনও কিছু দেরি আছে। সেদিন দ্রৌপদীকে নিয়ে পাণ্ডবরা ফিরে আসার পর ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে বসবাসকারী কুন্তী এবং পঞ্চপাণ্ডবের গৃহস্থালীর একটা দীর্ঘ বিবরণ আছে মহাভারতে। সেখান থেকে নববধূ দ্রৌপদীর প্রতি শাশুড়ি কুন্তীর ব্যবহারের, নির্দেশ উপদেশের কথাও জানা যাবে। সংসারে নতুন বউ আসার পর তাকে কীভাবে সংসারের নিয়মকানুনের সঙ্গে পরিচিত, অভ্যস্ত করে নিতে হয়—সে ব্যাপারেও কুন্তী একজন আদর্শ শাশুড়ি হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

মহাভারতের এই অংশে বর্ণনা করা হয়েছে— দ্রৌপদীকে নিয়ে বাড়িতে ফেরার বেশ কিছুক্ষণ পর যুধিষ্ঠির বাদে চার পাণ্ডব ভিক্ষায় বেরোলেন। ভিক্ষা করে ফিরে এসে তাঁরা ভিক্ষালব্ধ জিনিসপত্র জমা দিলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। তারপর কুন্তী নিজে রান্না করলেন সবার জন্য। তারপর তিনি দ্রৌপদীকে ডেকে বললেন—এই প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জনের অগ্রভাগ তুমি প্রথমে দেবে দেবতার উদ্দেশে, তারপর খানিক দেবে ব্রাহ্মণদের—

কুরুষ্ব ভদ্রে বলিঞ্চ বিপ্রায় চ দেহি ভিক্ষাম্।

কুন্তী বলতে লাগলেন—আরও কাজ আছে। তোমার এই বাড়ির চারপাশে কিছু মানুষ থাকবেই, যাঁরা অন্নার্থী হয়ে বসে আছেন, তাঁদের দু-চারজনকে খাইয়ে দাও আগে।

বধূপ্রশিক্ষণের দ্বিতীয় পর্যায়ে কুন্তী নববধূকে তাঁর নিজের বাড়ির সকলের খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—এবার অবশিষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জন সমান দুই ভাগে ভাগ করো। এর মধ্যে একটা ভাগ পুরোটাই দাও আমার ছেলে ভীমকে—

অর্ধন্তু ভীমায় চ দেহি ভদ্রে।
এষো হি বীরো বলভুক্ সদৈব।

আর বাকি অর্ধেক আমাদের ছয়জনের জন্য রাখো। বাড়িতে ছেলের বউ আসার পর সাংসারিক দায়দায়িত্ব কী করে ভাগ করে নিতে হয়

সে ব্যাপারে কুন্তীর আচরণ কিন্তু আধুনিক কালেও যথেষ্ট শিক্ষণীয়।

[মহা (k) ১.১৬৮.৩-১১; ১.১৬৯.১-১৬; ১.১৭০.১-২; ১.১৭০.৪২-৪৭; ১.১৯১.১-১৬; ১.১৯২.৩-৯; ১.১৯৬.১-২৩; (হরি) ১.১৬১.৩-১১;১.১৬২.১-১৬; ১.১৬৩.১-২; ১.১৮৩.৪৫-৫০; ১.১৮৪.১-১৬; ১.১৮৫.৩-৯; ১.১৮৯.১-২৩]

□ শেষমেশ যুধিষ্ঠিরের সিদ্ধান্তে এবং ব্যাসদেবের অনুমোদনে কুন্তীর হঠাৎ বলা কথাটাই পাঁচ ছেলের একত্রে বিবাহ-মঙ্গলে সমাপ্ত হল। বিয়ে হলে স্বামীহারা কুন্তী নববধূ দ্রৌপদীকে স্বামীদের কাছে আদরিণী হবার আশীর্বাদ করলেন প্রথমে। তারপরই প্রবাসিনী রাজমাতা ছেলেদের রাজ-সৌভাগ্যের সম্ভাবনায় কল্যাণী বধূকে বললেন—কুরুদের রাজ্যে তুমি স্বামীর সঙ্গে রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হও। ভাষাটা ছিল—তুমিই তোমার আপন ধর্ম-সৌভাগ্যে স্বামীকে বসাবে রাজার আসনে—

অনু ত্বম্ অভিষিচ্যস্ব নৃপতিং ধর্মবৎসলা।

কুন্তীর তৃতীয় আশীর্বাদ ছিল কুরুবংশের গর্ভধারিণী জননীর একাত্মতায়। তিনি বলেছিলেন—আজকে যেমন বিবাহের পট্টবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় তোমাকে অভিনন্দিত করছি, তেমনই তোমার ছেলে হবার পর পুত্র-সৌভাগ্যবতী তোমাকে আবারও অভিনন্দিত করব।

এই তিনটি আশীর্বাদের মাধ্যমে কুন্তী একদিকে যেমন নববধূ দ্রৌপদীকে কুলবধূর স্বতন্ত্র মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছেন, তেমনই তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন প্রসিদ্ধ ভরত-বংশের পরম্পরার মর্য্যাদা। দ্রৌপদীর সৌভাগ্যেই হোক অথবা পাণ্ডবদের ধৈর্য্যে এবং বীর্য্যে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য দিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। রাজমাতা হওয়া সত্ত্বেও যে অপমান এবং বঞ্চনার গ্লানি নিয়ে কুন্তীকে ঘর ছাড়তে হয়েছিল, কুন্তী সেই ঘরে ছেলে এবং ছেলের বউ নিয়ে ফিরে এলেন সগৌরবে। যুধিষ্ঠির রাজ্য পেলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। ঘটা করে রাজসূয় যজ্ঞ করলেন। আর কুন্তী! নববধূ দ্রৌপদীর হাতে সমস্ত গৌরবের সম্ভাবনা ছেড়ে দিয়ে নিজে সরে রইলেন রাজমাতার দূরত্বে। ভাবটা এই—স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা মাতা হিসেবে ছেলেদের আমি রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত দেখলাম। এইবার তোমরা সুখে থাকো। আমি দায়মুক্ত।

□ যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলায় সর্বস্ব হেরে যাওয়া পর্যন্ত কুন্তীকে আমরা নীরব থাকতেই দেখি। কিন্তু দ্বিতীয় দফার পাশা খেলার পর পাণ্ডবরা বনবাসে যাবার মুহূর্তে আমরা যে কুন্তীকে দেখব, তা কুন্তীর সম্পূর্ণ অন্য এক রূপ। রাজমাতা হিসেবে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসুখ কতদিনই বা ভোগ করলেন তিনি? তার আগে পর্যন্ত সময় কেটেছে দুঃখে কষ্টে, এখন আবার নতুন এবং গুরুতর দুঃখ-কষ্ট এসে উপস্থিত। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা শকুনির ক্রীড়া কুশলতায় প্রথমে তাঁর ছেলেদের সর্বস্ব জিতে নিল। তাও তাঁর সইত। পাশার পণে ছেলেদের বারো বছর বনবাস হল, তাও তাঁর সইত। কিন্তু উন্মুক্ত সভাস্থলের মধ্যে শ্বশুর ভাশুর গুরুজনদের সামনে কুলবধূর লজ্জাবস্ত্র খুলে দেবার চেষ্টা করল দুঃশাসন-দুর্যোধনেরা—এ তিনি সইবেন কী করে?

ঠিক এই জায়গায় কুন্তী দ্রৌপদীর সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। একাত্ম হয়েছেন কুরুকুলের বধূর মর্য্যাদায়। তাঁর নিশ্চয়ই মনে হয়েছে— পাণ্ডুর স্ত্রী হিসেবে কুরুবাড়িতে যে মর্য্যাদা তাঁর প্রাপ্য ছিল, সে মর্য্যাদা তিনি যেমন পাননি, তেমনই তাঁর ছেলের বউও পেল না। তাঁর শ্বশুর কুল তাঁর সঙ্গে যে বঞ্চনা করেছে, সেই বঞ্চনা চলল বধূ-পরম্পরায়। পাশাখেলায় পাণ্ডবরা হেরে গিয়ে যখন বনবাসের জন্য তৈরি হচ্ছেন, তখন কুন্তী তাঁর অবাঙ্মুখ ছেলেদের সঙ্গে কথা বলেননি, কথা বলেছিলেন শুধু পুত্রবধূ দ্রৌপদীর সঙ্গে।

পরিস্থিতিটা বলি। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী আর ভাইদের নিয়ে বিদায় চাইলেন সবার কাছে। কুন্তীও বুঝি ছেলেদের সঙ্গে বনে যাবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছিলেন, কারণ পাণ্ডুর বংশধর পুত্রদের যেখানে ঠাঁই হল না, সেই শত্রুপুরীতে তাঁর স্থান কোথায়? কাজেই তিনিও বনে যাবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মাত্মা বিদুর, যিনি ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রীও বটেন, তিনি পাণ্ডবদের ডেকে বললেন—রাজপুত্রী আর্যা পৃথা বৃদ্ধা হয়েছেন, বেশি কষ্টও তাঁর সইবে না, তিনি আর বনে যাবেন না, তিনি আমারই বাড়িতে থাকবেন আমারই সমাদরে—

ইহ বৎস্যতি কল্যাণি সৎকৃতা মম বেশ্মনি।

কথাটা বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে শোনালেন অর্থাৎ রাজবাড়ির আনুকূল্য ছাড়াও বিদুরের অধিকারে তিনি বিদুরের ঘরে থাকবেন।

যুধিষ্ঠির নিশ্চিন্ত হয়ে কাকা বিদুরের মত মেনে নিয়েছেন, সম্মত হয়েছেন কুন্তীও। ঠিক এই সময়ে বিদগ্ধা দ্রৌপদী উপস্থিত হয়েছেন মনস্বিনী কুন্তীর কাছে। কুন্তী আর চোখের জল রাখতে পারেননি। সেই কালের শাশুড়ি হয়েও ছেলের বউকে যে কত সম্মান দেওয়া যেতে পারে তার একটা উদাহরণ হতে পারে এই কথোপকথন। শাশুড়িরা যদি ছেলের বউদের সম্মান সম্বন্ধে সচেতন হন, তাহলে যে ছেলেরা আপনিই অধিকারে আসে সেটা বোধহয় কুন্তীর মতো কেউ জানতেন না। অবশ্য দ্রৌপদীও বিদগ্ধা বটে, শাশুড়িকে তিনি বুঝেছেন ভালোমতো।

কুন্তী বলেছেন—বাছা! এই বিরাট বিপদের মুহূর্তে কোনো কষ্ট মনে রেখো না তুমি। মেয়েদের কী করা উচিত তা তুমি জানো এবং স্বামীদের সঙ্গে কীভাবে তোমায় চলতে হবে—তাও তোমায় বলে দিতে হবে না। তোমার পিতার কুল এবং শ্বশুরকুল—দুই কুলেরই তুমি অলঙ্কার। কুরুকুলের সৌভাগ্য, তোমার ক্রোধাগ্নিতে এখনও তারা দগ্ধ হয়ে যায়নি। তোমার হৃদয়ে স্বামীদের জন্য ভাবনা যতখানি আছে, স্নেহ-বাৎসল্যও আছে ঠিক ততখানি। দুঃখের কাল শেষ হয়ে কিছুকাল পরেই তোমার সুদিন ফিরে আসবে। আমরা আগেই জানিয়েছি, এইসময় কুন্তী বনবাসকালে আপন কনিষ্ঠপুত্র সহদেবের বিশেষ যত্ন নিতে অনুরোধ করেছেন দ্রৌপদীকে। এরপর ছেলেদের বিদায় দিতে গিয়ে কুন্তীর কান্না দ্বিগুণতর হল। ছেলেদের জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলেন তিনি, অনেক ধিক্কার দিলেন নিজেকে। বললেন—চিরকাল ধরে ন্যায়-নীতি আর সমস্ত উদারতার মধ্যেই ছেলেরা আমার মানুষ হয়েছে, কিন্তু কেউ নিশ্চয়ই ভীষণভাবে খারাপ চেয়েছে আমার—কস্যাপধ্যানজঞ্চেদং—যার ফলে দুর্দৈব উপস্থিত হল। অথবা এ আমারই ভাগ্যের দোষ—আমি তোমাদের জন্ম দিয়েছিলাম; নইলে এত গুণের ছেলে হয়েও এইভাবে দুর্ভোগ পোয়াতে হবে কেন তোমাদের?

কুন্তী এবারে স্মরণ করলেন তাঁর সারা জীবনের কষ্টের কথা, তাঁর স্বামীর কথা, সপত্নী মাদ্রীর কথা, যাঁরা পুত্র-জন্মের সুখে-সুখেই স্বর্গত হয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পরেও ছেলেদের নিয়ে তিনি যে আশায় বুক বেঁধেছিলেন, স্বার্থপর ভাশুরের আগ্রাসনে সে আশা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তিনি বলেছেন—আগে যদি জানতাম ছেলেদের সেই বনবাসই জুটবে আবার কপালে, তাহলে পাণ্ডুর মৃত্যুর পর সেই শতশৃঙ্গ থেকে আর হস্তিনায় ফিরে আসতাম না—

শৃতশৃঙ্গান্মৃতে পাণ্ডৌ নাগমিষ্যং গজাহ্বয়ম্।

স্বামী-সতীনের মরণ দেখেও জীবনে বুঝি আমার বড়ো লোভ ছিল, তাই হয়তো এই কষ্ট—

জীবিতপ্রিয়তাং মহ্যং ধিঙ্মাং সংক্লেশভাগিনীম্।

কুন্তীর করুণ বিলাপে সেদিন পাণ্ডবদের বনবাস-দুঃখ আরও গাঢ়তর হয়েছিল। কোনোদিন কুন্তীকে এত আলুলায়িত ভেঙে-পড়া অবস্থায় আমরা দেখিনি। একবার তিনি ছেলেদের আটকে দিয়ে বলেন—ছাড় আমাকে, আমিও বনে যাব তোদের সঙ্গে, একবার নিজের বেঁচে থাকায় ধিক্কার দেন, আরেকবার সহদেবকে চেপে ধরে বলেন—সবাই যাক বাবা, তুই অন্তত আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য থাক এখানে, তাতে কী এমন অধর্ম হবে—

মৎপরিত্রাণজং ধর্মম্ ইহৈব ত্বমবাপ্নুহি।

এত বিলাপের পর শেষে আর কুন্তী শ্বশুর-ভাশুরের উদ্দেশে দুটো কথা না বলে পারেননি। বলেছেন—ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ এঁরা নাকি ধর্মের নীতি-নিয়ম সব জানেন, এঁরাই নাকি এই বংশের রক্ষক, তা এঁরা থাকতেও আমার এই দুর্দশা হল কেমন করে—

স্থিতেষু কুলনাথেষু কথমাপদুপাগতা?

পাণ্ডবভাইরা ঠোঁট চেপে শরীর শক্ত করে পা বাড়ালেন বনের পথে। মহামতি বিদুর বহু কষ্টে দুর্দৈবের যুক্তিতে শান্ত করার চেষ্টা করলেন কুন্তীকে। বিবাহিত পুত্রদের শোকে আকুল এক মাকে তিনি নিজের ঘরে স্থান দিলেন সসম্মানে। শোকে দুঃখে কুন্তী পাথর হয়ে গেলেন। প্রায় তেরো বছর অর্থাৎ যতদিন পাণ্ডবরা বনবাসে আর অজ্ঞাতবাসে দিন কাটিয়েছেন ততদিন মহাভারতের কবি আমাদের কুন্তীর খবর দেননি।

হয়তো পুত্রশোকাতুর মাতার দুঃখ কবির মরমী ভাষাতে প্রকাশ করলেও যথেষ্ট হত না—তাই কবির এই নীরবতা।

[মহা (k) ২.৭৯.১-৩১; (হরি) ২.৭৬.১-৩০]

□ তেরো বছর পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রস্তুতি যখন প্রায় চূড়ান্ত, তখন শান্তির শেষ চেষ্টা করতে শান্তিদূত হয়ে কৃষ্ণ এলেন হস্তিনায়। এই সময় কৃষ্ণের সঙ্গে দফায় দফায় কুন্তীর যে কথোপকথন রয়েছে তার থেকেও মহাকবির কুন্তীকে অন্তরালে লুকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য খানিকটা বোঝা যায়। মনে রাখা দরকার, কুন্তী ক্ষত্রিয় রমণী। ক্ষত্রিয় রমণীর কাছে পুত্রজন্ম সাময়িক রতি-মুক্তির ফলমাত্র নয়, পুত্রের মাধ্যমে সে জগতের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। এই যে তেরোটি বছর কেটে গেল—আমরা বেশ অনুমান করতে পারি—ছেলেদের নির্বাসনের দিনটি থেকেই কুন্তীর মনের মধ্যে গড়ে উঠেছে প্রতিরোধ। স্বামীর গুরুজন—শ্বশুর-ভাশুরের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর কিছু কম ছিল না। কিন্তু তাই বলেই তাঁরা যা করেছেন, তাই ঠিক—এমন ভাবনা নিয়ে তিনি বিদুরের ঘরে বসে চোখের জল ফেলে যাচ্ছেন—এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। তিনি কুরুবাড়িতে আছেন—নিজের ইচ্ছেয় নয়, বিদুরের ইচ্ছেয়, কিন্তু নিজের স্বাতন্ত্র্যে। এই বিদুরের বাড়িতে বসে বসেই কুন্তী কিন্তু নিজের অন্যায়কারী ভাশুরের বিরুদ্ধে মন শক্ত করে ফেলেছেন।

শান্তিদূত হয়ে কৃষ্ণ এলেন হস্তিনায়। শান্তিদূত হলেও আসলে তিনি এসেছেন পাণ্ডবদের অধিকার বুঝে নিতে। পাণ্ডবদের ন্যায্য অধিকারের বিনিময়ে শান্তি তিনি নেবেন না—এই মনোভাবটা তাঁর ছিল। ফলে কৃষ্ণ যখন কুন্তীর কাছে এলেন, তখন কুন্তীর পক্ষে নিজের শাণিত বক্তব্যগুলি পেশ করাটা খুব কঠিন হয়নি। তা ছাড়া বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই ভাইপোটির ওপর কুন্তীর একান্ত নির্ভরতা ছিল অনেকখানি। মন খুলে তাঁকে নিজের অন্তরের বার্তা শুনিয়েছেন কুন্তী।

কুরুরাজসভায় যাবার আগে কৃষ্ণ কুন্তীর সঙ্গে দেখা করলেন। তেরো বছর কুন্তী দেখেননি নিজের ছেলেদের। ফলে তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়াটাই হল অনর্গল কুশল প্রশ্নে। এতো বছর ধরে এতো অন্যায় তাঁর ছেলেদের সইতে হয়েছে—তার বিরুদ্ধে তাঁর পুত্রদের কী প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত—সে উপদেশও তিনি নিজেই শুনিয়েছেন কৃষ্ণকে। তখনকার মতো কথা এর থেকে বেশি আর এগোয়নি। তবে শান্তিপ্রস্তাব ব্যর্থ হবার পর কৃষ্ণ নিজেই জিজ্ঞাসা করেছেন মনস্বিনী কুন্তীকে—তোমার ছেলেদের কী বলব বলে দাও পিসী। কৃষ্ণ জানেন পাণ্ডবদের এখন যুদ্ধের জন্য পূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি দরকার। এ অবস্থায় কুন্তীর উপদেশ তাঁদের অনুপ্রাণিত করবে।

প্রথমবার যখন কৃষ্ণ কুন্তীর কাছে এলেন তখন নিজের পাঁচ ছেলের প্রায় সমবয়সী কৃষ্ণকে দেখে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কুন্তী কেঁদেই ফেললেন, বলতে লাগলেন—পাঁচ ভাই, পিতৃহারা, ছোটবেলা থেকেই ওরা একমত, একপ্রাণ—অন্যায় ভাবে তাদের পাঠানো হল বনে, একা আমি ওদের কত কষ্ট করে মানুষ করেছি—

বালা বিহীনাঃ পিত্রা তে ময়া সততলালিতাঃ।

আজ তারা রাজসুখ ত্যাগ করে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুন্তী ছেলেদের কথাই বলে চলেছেন—এই যে আমার বড়ো ছেলে যুধিষ্ঠির। যে নাকি অম্বরীষ-মান্ধাতা অথবা যযাতি-নহুষের মতো বিরাট এক রাজ্যের রাজা হবার উপযুক্ত, সেই যুধিষ্ঠির বনের মধ্যে কেমন ছিল, কৃষ্ণ? আর যার গায়ে হাজার হাতির শক্তি, হিড়িম্ব, বক আর কীচকের মতো লোককে যে শায়েস্তা করেছে, সেই আমার ভীষণ রাগী ছেলে ভীম কেমন করে দিন কাটাল বনে বনে? অর্জুন, আমার অর্জুন। যার ওপর সমস্ত পাণ্ডবভাইরা ভরসা করে থাকে, একেক ক্ষেপে যে একশোটা বাণ ছুঁড়তে পারে, সামনাসামনি যুদ্ধ করে কেউ পারবে না যার সঙ্গে—সেই অর্জুন আমার কেমন আছে কৃষ্ণ? এইভাবে নকুল-সহদেব—পিতৃমাতৃহারা যে ভাই দুটিকে চোখে হারাতেন কুন্তী, জননীর সমস্ত প্রশ্রয় দিয়ে যাদের তিনি মানুষ করেছেন, সেই নকুল-সহদেবকে ছাড়া কেমন করে দিন কেটেছে কুন্তীর—তাও তিনি জানালেন কৃষ্ণের কাছে।

সবার শেষে এল কুলবধূ কৃষ্ণার কথা, কুলবধূর সমস্ত মর্য্যাদা একত্র করে শাশুড়ি কুন্তী এবার পুত্রবধূর কথা জিজ্ঞাসা করছেন কৃষ্ণকে। দ্রৌপদীকে অত্যন্ত স্নেহ করেন তিনি, দ্রৌপদীর অপমান, অত্যাচারের কথাও কুন্তীর বিলক্ষণ স্মরণে আছে।

তাই সবার কথা শেষ করে কুন্তী এবার আলাদা করে আসছেন দ্রৌপদীর প্রসঙ্গে। বললেন—আমার সবগুলি ছেলের থেকেও অনেক বেশি আমার কাছে আমার পুত্রবধূ দ্রৌপদী—

সর্বৈঃ পুত্রৈঃ প্রিয়তরা দ্রৌপদী মে জনার্দন।

যেমন তার রূপ, তেমনই তার গুণ। নিজের কচি ছেলেগুলিকে বাড়িতে রেখে সে স্বামীর কষ্টের ভাগ নিতে গেছে বনে। আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য, কৌলীন্য—কিছুই তো কম ছিল না তার, তবু স্বামীদের জন্যই সে বনে গেছে। দ্রৌপদীর জন্য কুন্তী এবার চিরাচরিত ভারতীয় ধর্মদর্শনেও সন্দেহ প্রকাশ করছেন। ধর্মের কর্তা বক্তা এবং অভিরক্ষিতার মতো এক ব্যক্তির নামই হল কৃষ্ণ। তাঁর কাছেই কুন্তী বলছেন—পুণ্য কর্ম করলেই মানুষ সুখ পায়—এমন নিশ্চয়ই নয় কৃষ্ণ, কারণ তা যদি হত তাহলে আমার দ্রৌপদীর সারা জীবন ধরে অক্ষয় সুখ পাওয়ার কথা।

আসলে কুন্তী এবার যেসব মেজাজি কথাগুলি বলবেন তার অন্তঃসূত্র হলেন দ্রৌপদী। ছেলেদের এই চুপ করে বসে থাকা আর তাঁর ভালো লাগছে না। ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম আঁকড়ে থাকা শুভবুদ্ধি আর তৃপ্ত করছে না এই ক্ষত্রিয় রমণীর মনকে। কুন্তী বলছেন—দেখ কৃষ্ণ! যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন অথবা নকুল-সহদেব—কেউ আমার কাছে কৃষ্ণা-পাঞ্চালীর থেকে প্রিয় নয়। অমন একটা মেয়েকে রাজসভার মধ্যে এনে অপমানের চূড়ান্ত করা হল, আর এরা কেউ কিচ্ছুটি করল না—এর থেকে দুঃখের ঘটনা আমার জীবনে কখনো ঘটেনি—

ন মে দুখঃতরং কিঞ্চিদ্ ভূতপূর্বং ততো'ধিকম্।

রজস্বলা অবস্থায় দ্রৌপদীকে শ্বশুর-ভাশুরের সামনে জোর করে নিয়ে আসা হল, আর ব্রহ্মলগ্ন নির্বিঘ্ন পুরুষের মতো সেটা বসে বসে দেখলেন ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্য কৌরবেরা।

কুন্তী এই প্রসঙ্গে বিদুরের অনেক প্রশংসা করলেন কৃষ্ণের কাছে, কেননা তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দ্রৌপদীকে সভাস্থলে নিয়ে আসার নিন্দা করেছিলেন। কুন্তী কিছুই বাদ দিচ্ছেন না, কুরুবাড়ির সমস্ত বঞ্চনা তিনি একটি একটি করে বলতে থাকলেন। তিনি ভাবছিলেন —মানুষটি কৃষ্ণ বলেই তিনি হয়তো শান্তির প্রস্তাব গ্রহণ করাতে সমর্থ হবেন কুরুসভায়। জুটবে আরও এক রাশ বঞ্চনা। বারবার অসহ্য নিপীড়ন আর মাঝে মাঝে দুই-চার মুদ্রা ভিক্ষা দেওয়ার মতো কিছু সান্ত্বনা পেতে পেতে কুন্তী এখন ক্লান্ত। শান্তিকামী কৃষ্ণের উদ্দেশে তিনি তাই ঠাণ্ডা মাথায় নিজের জীবনের বঞ্চনাগুলি একটি একটি উপস্থিত করে তাঁর আসল প্রস্তাবের পথ পরিষ্কার করছেন।

আমরা এখন সেই জায়গায় উপস্থিত, যেখানে থেকে আমরা কুন্তীর জীবনের কথা আরম্ভ করেছিলাম। জীবনের যে উপলব্ধি থেকে কুন্তী নিজেকে অবহেলিত এবং বঞ্চিত বলে মনে করেছেন, আমরা এখন সেই মুহূর্তে উপনীত। কঠিন এবং জটিল এক মনস্তত্ত্বের শিকার হয়ে কুন্তী যখন নিজের ভাইপোকে বলেছিলেন—বাপের বাড়িতেও বঞ্চনা লাভ করেছি, শ্বশুরবাড়িতেও তাই—আমরা এখন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি।

কুন্তী বলেছিলেন—জীবনে দুঃখ আমি কিছু কম পাইনি, কৃষ্ণ—

নানাবিধানাং দুঃখানাম্ অভিজ্ঞাস্মি জনার্দন।

ছেলেদের এই অজ্ঞাতবাস এবং তারপর এখনো যে তাদের রাজ্য দেওয়া হচ্ছে না—সবই সহ্য করা যেত যদি আমি ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতাম। বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি সব জায়গাতেই আমি অবিচার পেয়েছি। তবু আমার এই বিধবার জীবন, ইন্দ্রপ্রস্থের সম্পদ-নাশ এবং কৌরবদের এই শত্রুতা—এও আমাকে তত কষ্ট দেয় না, যতটা দেয় ছেলেদের সঙ্গে আমার থাকতে না পারাটা—

তথা শোকায় দহতি যথা পুত্রৈর্বিনাভবঃ।

এই যে আমি প্রায় চোদ্দোটা বছর ধরে আমার অর্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীম অথবা নকুল-সহদেব—কাউকে চোখে দেখতে পারছি না, এর পরেও কি কারও শান্তি থাকতে পারে? আসলে কী জান কৃষ্ণ, মানুষ মারা গেলে তবেই লোকে তার শ্রাদ্ধ করে, আমার কাছে আমার ছেলেরা কার্যত মৃত, আমিও মৃত তাদের কাছে—

অর্থতস্তে মম মৃতাস্তেষাং চাহং জনার্দন।

সংস্কৃতে 'শ্রাদ্ধ' শব্দটি যে ধাতু থেকে আসছে 'শ্রদ্ধা' শব্দটিও সেই ধাতু থেকেই আসছে। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-তর্পণ মানে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন। সামগ্রিকভাবে এখানে কুন্তীর ভাবটা হল—আমার ছেলেরা আমার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর মতো কিছু করেনি এবং আমিও তাদের মধ্যে শ্রদ্ধা করার মতো কিছু পাইনি। তারা শুধুই আমার কাছে মৃত, আমিও তাদের কাছে তাই; কিন্তু মানুষের মৃত্যু হলে যে শ্রাদ্ধ-তর্পণটুকু করে, অন্তত

সেইটুকু তাদের কাছে আশা করা গিয়েছিল। তারা তাও করেনি—

জীবনাশং প্রণষ্টানাং শ্রাদ্ধং কুর্বন্তি মানবাঃ।

কুন্তী এর পরেই কৃষ্ণকে বলছেন—কৃষ্ণ! সেই রাজা যুধিষ্ঠিরকে বোলো (কুন্তী বনবাস-অজ্ঞাতবাসে ক্লিষ্ট যুধিষ্ঠিরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি একজন রাজাও বটে)—তুমি যে এত ধর্ম-কর্ম করো, সেই ধর্মও যে একেবারে ক্ষীণ হয়ে গেল বাছা! ধিক্ সেই ধর্মপুত্রের জননীকে, যাকে বেঁচে থাকতে হয় পরের ওপর নির্ভর করে—

পরাশ্রয়া বাসুদেব যা জীবতি ধিগস্তু তাম্।

আর ভীম আর অর্জুনকেও বোলো আমার নাম করে, যে ক্ষত্রিয় জননীরা যে সময়ের কথা ভেবে সন্তান প্রসব করে, এখন অন্তত সেই সময় এসে গেছে—

যদর্থং ক্ষত্রিয়া সুতে তস্য কালো'য়মাগতঃ।

এই সময়ও যদি বয়ে যায়, তবে এরপর মিথ্যাই সত্যের জায়গাটা অধিকার করে নেবে—মিথ্যা চাতিক্রমিষ্যতি।

ক্ষাত্র-নীতি-সিদ্ধির জন্য কোন জননী এমন করে ছেলেদের বলতে পারেন? কুন্তীর বক্তব্য—ভীম-অর্জুনের মতো বীর, যাঁরা নাকি যুদ্ধকালে দেবতাদেরও অন্ত ঘটাতে পারেন, সেই তাঁরা যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সভাস্থলে উপস্থিত দ্রৌপদীর অপমান দেখলেন—এটা তাঁদের লজ্জা—

তয়োশ্চৈদ্ অবজ্ঞানং যত্তাং কৃষ্ণাং সভাং গতাম্।

দুঃশাসন-দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁর প্রথমজাত সন্তান কর্ণও দ্রৌপদীর সঙ্গে জঘন্য ব্যবহারটি করেছিলেন—কুন্তী তা ক্ষমার যোগ্য মনে করেন না। বরঞ্চ তাদের শত অপমান এবং কটূক্তির উত্তরে হঠাৎ-ক্রোধী ভীমসেন যে ক্ষেপে উঠেছিলেন—সেই ক্ষিপ্ততাই অনুমোদন করেন কুন্তী। নিজের ছেলেকে তিনি চেনেন। তাঁর ধারণা—দুর্যোধন ভীমের সঙ্গে যে অপব্যবহার করেছে—তার ফল বুঝবে সে—

তস্য দ্রক্ষ্যতি যৎ ফলম্।

এই চরম মুহূর্তে যুধিষ্ঠির এবং অর্জুন যেখানে অসাধারণ ধৈর্য্য নিয়ে ঘটনার গতির দিকে নজর রাখছেন, সেখানে তাঁর ওই অধীর হঠাৎ-ক্রোধী পুত্রটিই যে প্রধান ভরসা। সে যা করেছে, ঠিক করেছে যেন। কৃষ্ণকে কুন্তী বলেছেন—কৌরবদের এই চরম শত্রুতার মুখে আমার ভীম অন্তত চুপটি করে বসে থাকবে না। ভীম সারা জীবন শত্রুতা পুষে রাখে এবং শত্রুর শেষ না করে সে ছাড়বে না। দ্রৌপদীর অপমানে ভীম একান্তভাবে প্রতিক্রিয় হয়েছিলেন বলেই কুন্তীর আবার মনে পড়ল লজ্জারুণা দ্রৌপদীর কথা। কুন্তী বলেছেন—ছেলেরা পাশা খেলায় হেরেছে, দুঃখ নেই আমার, রাজ্য হারিয়েছে তাতেও দুঃখ পাই না, বনবাসে কষ্টে দিন কাটাচ্ছে—তাও আমি গণ্য করি না। কিন্তু রজস্বলা অবস্থায় কুলবধূকে সভার মধ্যে এসে যে অশালীন কথাগুলি শুনতে হল—সে দুঃখের থেকে বড়ো দুঃখ আমার কাছে কিছু নেই কৃষ্ণ। কিছু নেই—

কিন্নু দুঃখতরং ততঃ।

দ্রৌপদীর অপমান আজ কুন্তীর কাছে সমগ্র নারীজাতির একাত্মতায় ধরা দিয়েছে, যে নারী জাতির মধ্যে তিনিও একতমা। বার বার তাঁর মনে পড়ে—অমন অসভ্য পরিস্থিতিতে দ্রৌপদী কাউকে সহায় পায়নি, স্বামীদেরও নয়। আজ কৃষ্ণের শান্তি-প্রস্তাবের প্রাক্কালে দ্রৌপদীর একাত্মতায় কুন্তী তাই নিজেই লাঞ্ছনা ব্যক্ত করছেন কৃষ্ণের কাছে। বলেছেন—ছেলেপিলেদের সঙ্গে আমার সহায় একমাত্র তুমি কৃষ্ণ! তুমি আছ, বলরাম আছে, তোমার বীরপুত্র প্রদ্যুম্ন আছে। আর আমি! তোমরা থাকতেও, ভীম-অর্জুনের মতো ছেলে থাকতেও আমাকে এই সব লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হল—

সো'হম্ এবংবিধং দুঃখং সহেয়ং পুরুষোত্তম।

এই 'পুরুষোত্তম' শব্দটির মধ্যে যেন একটা খোঁচা আছে। অর্থাৎ লোকে তোমায় যে 'পুরুষোত্তম' বলে ডাকে, আমার এই সারা জীবনের লাঞ্ছনা গঞ্জনার নিরিখে ওই নামে বুঝি কলঙ্ক লেগেছে। কৃষ্ণ কুন্তীকে আশ্বাস দিলেন কুন্তীর পিতৃকুলের বিশ্বস্ততায়। বললেন—পিসী! তুমি মহারাজ আর্যক শূরের মেয়ে। এক হ্রদ থেকে আরেক হ্রদে এসে আশ্রয় নেওয়ার মতো বিবাহসূত্রে তুমি এসে পড়েছ কৌরবকুলে। তুমি বীরপুত্রদের জননী বলেই এই আশা আমি রাখি যে, তোমার মতো প্রাজ্ঞ রমণীরাই সাধারণ সুখ-দুঃখের ওপর উঠতে পারবে—

সুখদুঃখে মহাপ্রাজ্ঞে ত্বাদৃশী সোঢুমর্হতি।

বস্তুত তোমার ছেলেরাও বনবাসের পরিসরে

এই সাধারণ সুখ-দুঃখ ক্রোধ-হর্ষের ওপরে উঠে ধৈর্য্য অবলম্বন করেছে। বড়ো মানুষেরা এই রকমই করেন। সাময়িক সুখের থেকে পরিণত কালের অবিচল সুখই তাদের বেশি কাম্য। কৃষ্ণ বললেন—আমার বিশ্বাস—আর খুব বেশি দেরি নেই। শীগগিরই তোমার ছেলেরা তোমার পুত্রবধূ—সবাই এসে নিজেদের কুশল জানিয়ে অভিবাদন জানাবে তোমাকে।

কৃষ্ণের কথায় কুন্তী সাময়িকভাবে শান্ত হয়ে কৃষ্ণের ওপর আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু কুরুসভায় দুর্যোধন যখন কৃষ্ণের শান্তির প্রস্তাব নস্যাৎ করে দিলেন, সেই সময়ে সুখ-দুঃখ অথবা ক্রোধ-হর্ষের ঊর্ধ্বতার দার্শনিক মাহাত্ম্য কৃষ্ণের কাছে আর তত সত্য ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন ধৈর্য্যের দিন এবারে শেষ। এখন শাস্তি দেবার সময় এসেছে। হস্তিনাপুর ছাড়বার আগে তিনি আবার এসেছেন মনস্বিনী কুন্তীর কাছে। কুন্তীর উত্তেজনা পাণ্ডবদের মধ্যে সংক্রমিত করার জন্য কৃষ্ণই নিজে বলছেন—বলো পিসী কী বলতে হবে পাণ্ডবদের, তোমার নাম করে যা বলতে হবে এইবার তা বলো—

কিং বাচ্যা পাণ্ডবেয়াস্তে ভবত্যা বচনান্ময়া।

কৃষ্ণ এখন শুনতে চাইছেন। কৃষ্ণের মতো অত বড়ো বীরপুরুষ এবং বাকপটু মানুষ। নিজের ওপর যাঁর অনেক আস্থা ছিল—ভেবেছিলেন—ঠিক পারব, কৌরব-সভায় সবার মধ্যে দুর্যোধনকে ঠিক রাজি করাতে পারব। কিন্তু পারলেন না। দুর্যোধন এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের ভাব-ভাবনা আগে থেকে জানতেন বলেই কুন্তী কৃষ্ণের মাধ্যমে ছেলেদের যা বল বার তা আগেই বলেছেন। এখন কৃষ্ণ নিজেই এসেছেন কুন্তীর কাছে—বিরক্ত, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ। কুন্তীকে বলেছেন—যুক্তি তর্ক দিয়ে অনেক বলেছি। আমি বলেছি, পণ্ডিত ঋষিরা বলেছেন, একটা কথাও যদি শোনে—

ন চাসৌ তদ্ গৃহীতবান্।

কৃষ্ণ বলেছেন—এখন তুমি বলো, তোমার কথা এখন আমি শুনতে চাই—

শুশ্রূষে বচনং তব।

এই যে একটা সময়ের তফাত হল, তাতে কুন্তীও তাঁর বক্তব্য আরও শাণিত করার সুযোগ পেলেন। আগে যে ব্যক্তি শান্তিকামী হয়ে নিতান্ত পাঁচখানি গ্রামের বদলেই শান্তি বজায় রাখতে উদ্যত ছিলেন, সেই লোকের অর্থাৎ আমাদের কৃষ্ণের সমস্ত 'মিশন' এখন ব্যর্থ হয়ে গেছে। কৃষ্ণের এই ব্যর্থতার সুযোগ, কুন্তীর কাছে এক বড়ো সুযোগ। বস্তুত কৃষ্ণ যে শান্তিকামী হয়ে কৌরব-সভায় পাণ্ডবদের জন্য পাঁচখানি গ্রাম পর্যন্ত প্রার্থনা করেছিলেন—এই প্রার্থনা কুন্তীর মনোমত হয়নি। এখন কৃষ্ণ ব্যর্থ হওয়ার ফলে তিনি সেই কথাগুলি বলতে পারছেন, যা আগে তিনি বলতে পারেননি। কুন্তী আজ বলছেন—তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক বুদ্ধি, মনস্বিতা এবং মাতৃত্বের গ্লানি একত্রিত করে। আর তিনি যা বলছেন, তা শুধু তাঁর পুত্রদের জন্য নয়, সমকালীন সমাজ, এমনকী বর্তমান কালের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেশ।

ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজনীতি-শাস্ত্রের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা উত্থান-শক্তি-সম্পন্ন রাজার কথা শুনে থাকবেন। উত্থান-শক্তি বলতে সাধারণত আমরা উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতাই বুঝি, রাজনীতির পরিভাষাতে ব্যাপারটা প্রায় একই বটে, তবে যে রাজা শত্রুর মোকাবিলা করতে সতত উদ্যোগ নেন, শত্রুর দ্বারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়েও যিনি আপন প্রাপ্তির কথা ভুলে যান না, সুযোগ এলেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন শত্রুর ওপর, প্রাচীন রাজনীতির পরিভাষায় তিনিই উদ্যমী রাজা, উত্থান-শক্তির অধিকারীও তিনিই। তেরোটা বছর ধরে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির যেভাবে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় কষ্ট ভোগ করে চলেছেন কুন্তী তাতে সুখও পাচ্ছেন না শান্তিও পাচ্ছেন না। পাশা-খেলার পণ হিসেবে বনবাসে যাওয়াটা ধর্মের নীতি-নিয়মে যুক্তিসিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু রাজ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের ধীর চেতনা এই ওজস্বিনী ক্ষত্রিয়া রমণীকে পীড়া দিচ্ছে।

কুরু-পাণ্ডবের রাজনীতির মধ্যে কুন্তী হয়তো প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নেই, কিন্তু এই রাজনীতিটা তিনি হাড়ে হাড়ে বোঝেন। আর বোঝেন বলেই রাজনীতির মধ্যে যুধিষ্ঠিরের নিরন্তর ধর্মৈষণা আর তিনি সহ্য করতে পারছেন না। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে তিনি তাই খবর পাঠাচ্ছেন—বাবা! তুমি যেমন ধর্ম-ধর্ম করে যাচ্ছ, সেটাই ধর্ম নয়, তোমার ধর্ম প্রজাপালন, সেই ধর্ম তো নষ্টই হয়ে গেল বাবা—

ভূয়াংস্তে হীয়তে ধর্মো মা পুত্রক বৃথা কৃথাঃ।

কুন্তীর কাছে যুধিষ্ঠিরের হেয়তা এইখানেই। ছেলেকে তিনি লজ্জা দিয়ে বলেন—তোমার বুদ্ধিটা প্রায় গোঁ-গোঁ করে বই মুখস্থ করা ছাত্রের মতো। যারা বেদের অর্থ কিছুই বোঝে না অথচ দিন-রাত বেদ মুখস্ত করে ভাবে যে খুব ধর্ম হচ্ছে, তোমার বুদ্ধিও সেইরকম। ধর্মকার্যের আনুষ্ঠানিক কিছু তৃপ্তিতেই তুমি এমন বুঁদ হয়ে আছ যে ভাবছ খুব ধর্ম হচ্ছে—

অনুবাকহতা বুদ্ধিঃ ধর্মম্ এবৈকমীক্ষতে।

যুধিষ্ঠির পূর্বে রাজা ছিলেন, এখন তিনি রাজ্যহারা, বনবাসী। ব্রাহ্মণোচিত উদার শান্ত ধর্মবুদ্ধির থেকেও তাঁর কাছে এখন রাজ্যোদ্ধারের পরিকল্পনা বড়ো হওয়া উচিত ছিল। অথচ এই যে কৃষ্ণ কুরুসভায় এলেন শান্তির দূত হয়ে, সেখানে শুধু যুধিষ্ঠির কেন, অর্জুন এমনকী ভীমের মতো লোকের কাছ থেকেও পুরাতন রাজ্যপাটের চেয়ে শান্তির কাম্যতা বেশি দেখা গিয়েছিল। এ জিনিস পঞ্চস্বামীগর্বিতা দ্রৌপদীর যেমন সহ্য হয়নি, পঞ্চপুত্রগর্বিতা এই ক্ষত্রিয়া রমণীরও তা সহ্য হয়নি। যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা ছিল—সম্পূর্ণ রাজ্যপাট নাই পেলাম, অন্তত পাঁচ গ্রামের পরিবর্তেও যদি যুদ্ধ এড়িয়ে চলেন দুর্যোধন, তবু সেই কলহ-মুক্তিতে বুঝি ধর্ম আছে, শান্তি তো আছেই।

কুন্তীর কাছে অসহ্য এই সব যুক্তি। পূর্বতন রাজাদের উদাহরণে কুন্তী প্রকারান্তরে ধিক্কার দিচ্ছেন যুধিষ্ঠিরকে। বলেছেন—কৃষ্ণ! যেটা ধর্ম, অন্তত যুধিষ্ঠিরের কাছে যেটা ধর্ম হওয়া উচিত, সেই ধর্ম সে আপন বুদ্ধিতে নির্মাণ করতে পারে না। জন্মলগ্নেই তার ধর্ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন স্বয়ং বিধাতা। ক্ষত্রিয় পুরুষেরা জীবন ধারণ করে বাহুশক্তির ওপর নির্ভর করে। কারণ পরম পুরুষের বাহু থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এই ক্ষত্রিয় জাতি। নৃশংস কাজ করতে হলেও তার চরম অভীপ্সিত কাজ হল প্রজাপালন। তার সেই ধর্ম আজ কোথায়! কুন্তী বলেই চললেন। বললেন—বুড়ো মানুষদের মুখে শুনেছি—কুবের নাকি মুচুকুন্দ রাজাকে খুশি হয়ে এই সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব উপহার দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জানো কৃষ্ণ! মুচুকুন্দ এই দান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—আমি চাই, আমার নিজের শক্তিতে আমি আমার প্রার্থিত রাজ্য অধিকার করে নেব, আপনার দান চাই না আমি—

বাহুবীর্যার্জিতং রাজ্যম্ অশ্নীয়ামিতি কাময়ে।

আসলে কুন্তীও আর এই দান চান না। যিনি রাজরানী ছিলেন তাঁর ছেলেরা বনবাসের দীন প্রকোষ্ঠ থেকে পাঁচখানি গ্রাম ভিক্ষা করবেন আর দুর্যোধন সেই দান করবেন—দুর্যোধনের এই মর্যাদার ভূমিকা কুন্তী সহ্য করতে পারছেন না। কুন্তী মনে করেন—ভাল কথা বলে, রাজ্যের অল্পাংশমাত্র গ্রহণের প্রস্তাব করে দুর্যোধনকে কিছুই বোঝানো যাবে না। পাণ্ডবদের দিক থেকে তার ওপরে চরম দণ্ড নেমে না আসলে ধর্মেরই অবমাননা ঘটবে। কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—তুমি যে পূর্বে রাজা হয়েও ঋষিদের মতো পরম ত্যাগের মাহাত্ম্যে নিজেকে বেশ রাজর্ষির কল্পনায় স্থাপন করেছ, তুমি জেনে রাখো এটা রাজর্ষির ব্যবহার নয়—

নৈতদ্ রাজর্ষিবৃত্তং হি যত্র ত্বং স্থাতুমিচ্ছসি।

তুমি যদি ভেবে থাক যে, কোনো রকম নৃশংসতা না করে নিষ্কর্মার মতো বসে বসেই প্রজাপালনের ফল পাওয়া যাবে, তা হতে পারে না। স্বর্গ থেকে তোমার বাপ-ঠাকুরদারা তোমার এই বুদ্ধি-ব্যবহার দেখে পুলকিত হয়ে আশীর্বাদ করে যাচ্ছেন—এটা ভেবো না, এমন কী মা হিসেবে আমারও কোনো আশীর্বাদ নেই এ ব্যাপারে—

ন হ্যেতাম্ আশিষং পাণ্ডুর্ন চাহং ন পিতামহঃ।

পাঁচ পাঁচটি বীর পুত্র থাকতেও তিনি নিজে অসহায়ভাবে শত্রুপুরীতে বসে আছেন। ছেলেদের শুভদিনের জন্য আর কতই বা অপেক্ষা করতে পারেন কুন্তী! এর থেকে দুঃখের আর কীই বা আছে যে রাজরানী এবং রাজমাতা হয়েও তাঁকে জ্ঞাতিশত্রুর বাড়িতে বসে পরের দেওয়া ভাতের গ্রাস মুখে দিতে হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য—বাপ-ঠাকুর্দার মান আর ডুবিও না যুধিষ্ঠির, তুমি রাজা ছিলে, অতএব রাজার মতো শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়াই তোমার একান্ত ধর্ম—

যুধ্যস্ব রাজধর্মেণ মা নিমজ্জীঃ পিতামহান্।

কৃষ্ণের মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনন্ত উত্তেজনায় সংবাদ পাঠিয়ে কুন্তী এবার কৃষ্ণকে একটা গল্প বলছেন। বলছেন—এই গল্প শুনে ভালটা কী হওয়া উচিত, করণীয়ই বা কী—সেটা তুমি যুধিষ্ঠিরকে বলতে পারবে। এই গল্পটির মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। কুন্তীর গল্পে চরিত্র

দুটি—মা বিদুলা আর তাঁর ছেলে সঞ্জয়, যে সিন্ধুদেশের রাজার কাছে যুদ্ধে হেরে নিরাশ হয়ে শুয়ে ছিল। এখানে বিদুলা ছেলেকে যা বলেছেন, কুন্তীও ঠিক তাই বলতে চান। বিদুলার গল্পে তাঁর ছেলের যে অবস্থা হয়েছে, কুন্তী মনে করেন—তাঁর ছেলেদেরও সেই একই অবস্থা হয়েছে, বিশেষত যুধিষ্ঠিরের। বস্তুত কড়া কড়া যে সব কথা বিদুলা তাঁর ছেলেকে বলেছেন, সেগুলি বোধহয় মা হিসেবে সোজাসুজি বলা যায় না বলেই কুন্তী বিদুলার জবানে বলছেন যুধিষ্ঠিরকে। এখানে বিদুলার সঙ্গে কুন্তীর এক চুলও তফাত নেই, এমনকী কোনো একপদীভাবে কুন্তীকে বিদুলা-কুন্তী বললেও দোষ হয় না। দোষ হয় না বিদুলার ছেলে সঞ্জয়কেও যুধিষ্ঠির ভেবে নিলে।

বিদুলার গল্পের প্রথম প্রস্তাবে কুন্তী বিদুলার ওরফে নিজেরই পরিচয় দিচ্ছেন। কুন্তী বলছেন—জানো কৃষ্ণ! এই বিদুলা ছিলেন রাজচিহ্নে চিহ্নিতা এক ক্ষত্রিয়া রমণী। যেমন বড়ো বংশ, তেমনই তাঁর নিজের খ্যাতি। অবিনয়ী মোটেই নয়, কিন্তু ব্যক্তিত্বময়ী, রাগী মহিলাও বটে। রাজার সংসদে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা বলার ক্ষমতা ছিল, অন্যদিকে তিনি চরম দীর্ঘদর্শিনী, ভবিষ্যতের করণীয় এবং তার ফল সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন।

সন্দেহ নেই, বিদুলার ব্যক্তিত্ব এবং কর্তৃত্ব খ্যাপন করে কুন্তী জানাতে চাইলেন—বংশ, মর্যাদা এবং দীর্ঘদর্শিতার ব্যাপারে বিদুলার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য নেই কোনো। অতএব বিদুলার কথা, তাঁরই কথা। কুন্তী বলেছেন—জানো কৃষ্ণ। সিন্ধুরাজের কাছে হেরে গিয়ে বিদুলার ছেলে হতাশায় শুয়ে ছিল নিজের মনে। বিদুলা সেই পেটের ছেলেকে কী বলেছিলেন জানো? বলেছিলেন—কোথাকার এক কুসন্তান এসে জন্মেছে আমার পেটে। যে ছেলে শত্রুর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে সেই ছেলে হলি তুই। আমার মতো মা তোর জন্ম দেয়নি, তোর পিতাও তোর জন্ম দেননি, তুই কোত্থেকে এসে জুটেছিস আমার কপালে—

ন ময়া ত্বং ন পিত্রা চ জাতঃ ক্বাভ্যাগতো হ্যসি।

একটু আগে যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে কুন্তী বলেছিলেন, তিনি বাপ-ঠাকুরদার নাম ডোবাচ্ছেন—মা মজ্জয় পিতামহান্। এখন বিদুলার মুখ দিয়ে কুন্তী যা বলছেন তাও যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশেই। অতএব এরপর থেকে আমরা আর 'বিদুলা বললেন'—এমন করে বলব না, বরঞ্চ বিদুলার একাত্মতায় আমরা বলব— বিদুলা-কুন্তী বললেন। যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে বিদুলা-কুন্তীর বক্তব্য—ক্রোধলেশহীন ক্লীব পুরুষকে কেউ গণনার মধ্যে আনে না। এমন করে নিজেকে ছোটো কোরো না, এত অল্পে সন্তুষ্ট হয়ো না—

মাত্মানং অবমন্যস্ব মৈনমল্পেন বীভরঃ।

কুন্তী এখানে সেই ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যপাটের পরিবর্তে যুধিষ্ঠিরের চাওয়া পাঁচখানি গ্রামের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করছেন। বিদুলারূপী কুন্তী বলছেন—কাপুরুষ ছেলে কোথাকার, দয়া করে একবার গা তোলো, দুর্যোধনের বুদ্ধিতে পরাজিত হয়ে আর নিষ্কর্মার মতো শুয়ে থেকো না, একবার গা তোলো—

উত্তিষ্ঠ হে কাপুরুষ মা শেষ্বৈবং পরাজিতঃ।

বনবাস থেকেই লোক পাঠিয়ে পাঁচটি মাত্র গ্রাম ভিক্ষে করছ তুমি! আরে মজা নদী যেমন অল্প জলেই ভরে দেওয়া যায়, ইঁদুরের প্রার্থিত অঞ্জলি পূরণ করতে যেমন সামান্যই জিনিস লাগে, তেমনই তোমার মতো সন্তুষ্ট কাপুরুষ অল্পেই সন্তুষ্ট হবে।

নিজের পেটের ছেলে যুধিষ্ঠির। এই তেরো বছর ধরে শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ করা তার উচিত ছিল। উচিত ছিল দুর্যোধনের ওপর বিরাগ-গ্রস্ত মন্ত্রী-প্রজাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা। তারপর এই বনবাসের শেষে একেবারে বাঘের মতো দুর্যোধনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। অথচ যুধিষ্ঠির এসব কিছুই করেননি। কুন্তীর ধৈর্য্য তাই শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে—হয় মারো, নয় মরো। মায়ের কাছ থেকে এই সমস্ত কঠিন কথার উত্তরে বনবাসক্লিষ্ট যুধিষ্ঠির বিদুলার পুত্রের মতো তো বলতেই পারেন যে, মা। আজ যদি আমরা মরে যাই, তা হলে এই রাজ্য-পাট, ভোগ-সুখ অথবা তোমার নিজের জীবনেরই বা কী মূল্য থাকবে —কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা?

কুন্তী জানেন যুধিষ্ঠিরের মতো নিরুপদ্রব শান্তিকামী ব্যক্তির কাছ থেকে এইরকম একটা মর্মবিদারী মমতা-মাখা প্রতিপ্রশ্ন হতেই পারে। তিনি বলতেই পারেন—বুঝি বা আকরিক লোহা সব এক জায়গায় করে মা তোমার হৃদয় গড়ে দিয়েছেন বিধাতা—

কৃষ্ণায়সস্যেব চ তে সংহত্য হৃদয়ং কৃতম্।

নইলে, নিজের ছেলেকে পরের মায়ের মতো এমন করে যুদ্ধে নিয়োগ কর তুমি?

কুন্তী এসব আবেগ-ক্লিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানেন। তিনি জানেন যে, হ্যাঁ, যুদ্ধে গিয়ে ছেলেগুলি আমার মারাও যেতে পারে। কিন্তু তবু এইভাবে দিন দিন হীনবল হয়ে অতি অদ্ভুত এক পর্যায়মরণ বরণ করা ক্ষত্রিয় রমণীর পক্ষে যেমন উপযুক্ত নয়, তেমনই উপযুক্ত নয় ক্ষত্রিয় পুত্রদের পক্ষেও। উৎসাহহীন, নির্বীর্য্য কতগুলি পুত্র আপন কুক্ষিতে ধারণ করার জন্য কুন্তী লজ্জা বোধ করেন। দিনের পর দিন পরের ওপর নির্ভর করার মধ্যে যে দরিদ্রতা আছে, সেই দরিদ্রতা স্বামী-পুত্রের মৃত্যুর চেয়েও তাঁর কাছে কষ্টকর বেশি—

পতিপুত্রবধাদেতৎ পরমং দুঃখমব্রবীৎ।

কেন না, সমস্ত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই পরান্নজীবিতার মধ্যে যে লজ্জা, সেই লজ্জা ক্ষত্রিয়া বীর রমণীর সহ্য হয় না। বিদুলার মতো কুন্তী বলতেই পারেন—আমি ছিলাম বিরাট বৃষ্ণিবংশের মেয়ে, বিয়ে হয়েছিল কুরুদের রাজবাড়িতে, স্বামী আমাকে সমস্ত সুখে রেখেছিলেন, স্বামীর রাজ্যে আমি ছিলাম সব কিছুর ওপর—

ঈশ্বরী সর্বকল্যাণী ভর্ত্রা পরমপূজিতা।

কুন্তী বলতে পারেন—দাস-দাসী, ব্রাহ্মণ-ঋত্বিক, আচার্য-পুরোহিত—আমরা ছিলাম এঁদের আশ্রয়। আর আজ! কেউ আমাদের ভরসা করে না, আমিই অন্যের আশ্রয়ে বেঁচে আছি, এর চাইতে আমার মরণও ছিল ভাল—

সান্যামাশ্রিত্য জীবন্তী পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্।

পুত্রস্নেহের থেকে কুন্তীর কাছে আজ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অনেক বড়ো। কারণ যুদ্ধের জন্যই পুত্রের জন্ম, যুদ্ধ-জয়ের মধ্যেই তার চরম সার্থকতা। যুদ্ধে জয় হোক বা মৃত্যু হোক নিজের, তবু যুদ্ধের মাধ্যমেই ক্ষত্রিয়-পুরুষ হয়ে ওঠে ইন্দ্রের মতো—

জয়ন্ বা বধ্যমানো বা প্রাপ্নোতীন্দ্রসলোকতাম্।

বিদুলার মতো এক ক্ষত্রিয়-রমণীর জবানে কথা বলতে বলতে কুন্তী দেখছি আর যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য বিস্তার করছেন না। রাজনীতির মূল উপদেশের সঙ্গে যখন বীরত্ব আর উত্তেজনার সংবাদ পাঠাতে হল পুত্রদের কাছে, তখন এই শেষ মুহূর্তে কুন্তী আর যুধিষ্ঠিরের কথা মনে আনলেন না। বিদুলার গল্প শেষ করেই কুন্তী কৃষ্ণকে বলেছেন—আমার কথায় তুমি অর্জুনকে একটা খবর শুধু মনে করিয়ে দেবে কৃষ্ণ। সেই ছোট্টবেলার কথা, অর্জুনের তখন কেবলই জন্ম হয়েছে। আমি ছেলে কোলে নিয়ে সূতিকাগৃহে তপোবনবাসী মহিলাদের মধ্যে বসেছিলাম। সেই সময়ে আকাশবাণী হয়েছিল—এই ছেলে তোমার সমস্ত শত্রু হত্যা করে পৃথিবী জয় করবে ভবিষ্যতে, এই ছেলের যশ হবে আকাশ-ছোঁয়া—

পুত্রস্তে পৃথিবীং জেতা যশশ্চাস্য দিবং স্পৃশেৎ।

ভীমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সে নাকি তার পিতার যশ এবং সম্পত্তি উদ্ধার করবে।

কুন্তী বললেন—সেই অর্জুনকে জানিও কৃষ্ণ! যে আশায় ক্ষত্রিয় রমণীরা ছেলে ধরে পেটে, সেই সময় এখন এসে গেছে, ভীমকেও জানিয়ো ওই একই কথা—

এতদ্ ধনঞ্জয়ো বাচ্যো নিত্যোদ্‌যুক্তো বৃকোদরঃ।

কুন্তী আবারও তুললেন দ্রৌপদীর সেই অপমানের কথা। বললেন—সেই অপমানের থেকে আর কোনো বড়ো অপমানের কথা তিনি ভাবতে পারেন না এবং অর্জুনও যেন এই দ্রৌপদীর কথাটা খেয়ালে রাখেন—

তং বৈ ব্রুহি মহাবাহো দ্রৌপদ্যাঃ পদবীং চর।

পাণ্ডব-সহায় কৃষ্ণ পিসী কুন্তীর সমস্ত উত্তেজনার আগুন পোয়াতে পোয়াতে রওনা দিলেন উপপ্লব্য নগরের উদ্দেশে, পাণ্ডবরা সেইখানেই রয়েছেন এখন। কৃষ্ণ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কৌরবসভায় 'রিপোর্ট' চলে এসেছে কুন্তীর বক্তব্য নিয়ে। ভীষ্ম এবং দ্রোণ লাগাম-ছাড়া দুর্যোধনকে শাসন করার চেষ্টা করেছেন মনস্বিনী কুন্তীর চরম যুক্তিগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়ে। তাঁরা বলেছেন—কুন্তীর কথার মধ্যে উগ্রতা থাকতে পারে, কিন্তু সে কথাগুলি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং ধর্মসম্মত—

বাক্যমর্থবদত্যুগ্রমুক্তং ধর্ম্যমনুত্তমম্।

ভীষ্ম-দ্রোণ দুর্যোধনকে জানালেন যে, মায়ের কথা এবার অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে তাঁর ছেলেরা। কৃষ্ণও সেইভাবে তাদের বোঝাবেন।

এতদিন পাণ্ডবরা যা করেননি, এখন তা করবেনই—এই স্পষ্টতা হঠাৎ করে আসেনি। যে ভাষায়, যে যুক্তিতে কুন্তী আজ পাণ্ডবদের যুদ্ধের

জন্য উদ্যোগী হতে বলেছেন, তা একদিনের উত্তেজনা নয়। দিনের পর দিন সহ্য করতে করতে শ্বশুর-কুলের বৃদ্ধ-জনের কাছ থেকে আর যখন কোনো সুবিচারের আশা রইল না, কুন্তী যখন বুঝলেন যে, পাণ্ডবদের জন্য তাঁর ভাশুরের অনুভবগুলি মমতাহীন মৌখিকতামাত্র, সেইদিন কুন্তী তাঁর সমস্ত সৌজন্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চরম দিনের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। নইলে, এতদিন তিনি এত কঠিনভাবে কোনো কথা উচ্চারণ করেননি। কুন্তীর সমস্ত ধৈর্য্য অত্যন্ত সযৌক্তিকভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে বলেই যুদ্ধের উত্তেজনা ছড়ানোর মধ্যেও এখন ধর্মের সম্মতি এসেছে—

উক্তং ধর্ম্ম্যমনুত্তমম্।

[মহা (k) ৫.৯০.১-১০৫; ৫.১৩২-১৩৭ অধ্যায়; (হরি) ৫.৮৩.১-১০৭; ৫.১২৩-১২৮ অধ্যায়]

□ বলা বাহুল্য কুন্তীর সন্দেশ পেয়ে পাণ্ডবরা যথেষ্টই উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন। শান্তির সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হবার পর দুপক্ষেই যুদ্ধের প্রস্তুতিও পুরোদমে শুরু হল। এতদিন পর্যন্ত কুন্তী নিজের পুত্রদের ওপর ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের অন্যায় অত্যাচারের কথা ভেবে দুঃখ পেয়েছেন, দ্রৌপদীর অপমানে ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং সবশেষে বীরপুত্রের উপযুক্ত ক্ষত্রিয়াণী জননীর মতো পুত্রদের যুদ্ধযাত্রার অনুপ্রেরণাও দিয়েছেন। কিন্তু যুদ্ধ আসন্ন দেখে আবার একবার দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন কুন্তী। কারণ আর কেউ জানুক বা না জানুক তিনি নিজে তো জানেন—পঞ্চপুত্র নয়, কুন্তী আসলে মোট ছয়টি পুত্রের জননী। আর এই মুহূর্তে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রয়েছে দুর্যোধনের শিবিরে, তাঁর পঞ্চপুত্রের প্রধান শত্রু—অঙ্গরাজ কর্ণ।

সত্যি কথা বলতে কী, দুর্যোধনের শত অন্যায় দেখেও কুন্তী যে এতকাল ধৈর্য্য ধরে রইলেন তার পেছনে যে গভীর বিষণ্ণ এক সত্য লুকিয়ে আছে, সেই সত্য হয়তো কর্ণ—যাঁকে দুর্যোধন পালন-পোষণে এবং মন্ত্রণায় এক পৃথক মর্যাদা দিয়েছেন। কানীনপুত্রটির প্রতি কুন্তীর মনে যে অপরাধবোধ কাজ করে, সেখানেই কর্ণের প্রতি দুর্যোধনের যে সমাদর তার বিক্রিয়া ঘটে কুন্তীর অপরাধী মনে অন্যতর ধৈর্য্যের জন্ম দিয়েছে।

সেই রঙ্গভূমির দিনটিতে যখন দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গদেশের রাজা করলেন—সেদিন কুন্তীর থেকে বেশি খুশি বোধহয় আর কেউ হয়নি। কিন্তু তার পর দিনের পর দিন অহঙ্কারী দুর্যোধনে সংসর্গে পড়ে নিজের একান্ত জাত সন্তানটিকে একটু একটু করে অন্য রকম হয়ে যেতে দেখলেন কুন্তী। রঙ্গভূমিতে কর্ণের রাজ্যাভিষেকের সময় যত আনন্দ তাঁর হয়েছিল, তা একটু একটু করে ভেঙে যেতে লাগল। তিনি দেখলেন—দুর্যোধনের সঙ্গে মিশে মিশে, তার সমস্ত অন্যায়ের অংশভাগী হয়ে তাঁর প্রথম সন্তানটি একেবারে বয়ে গেল। কর্ণই যে পাশাখেলার দিনে উন্মুক্ত রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করার আদেশ দিয়েছিলেন দুঃশাসনকে—সে খবর কি কুন্তীর কানে যায়নি? গিয়েছিল। দুর্যোধনের প্রতি কুন্তীর কৃতজ্ঞতার সেই বুঝি শেষ দিন, আর আপন কুক্ষিজাত পুত্রটিকে ক্ষমা করারও বোধহয় শেষ দিন সেটিই। কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলার সময় দ্রৌপদীর প্রতি কৌরবদের অন্যায় অপমানের প্রসঙ্গ যখন এসেছিল তখনও কুন্তী কর্ণের অন্যায়কে আপন পুত্রের অন্যায় ভেবে অনুচ্চারিত রাখেননি। কর্ণকেও তিনি সমস্ত ঘটনার জন্য সমানভাবে দায়ী করেছেন—

দুঃশাসনশ্চ কর্ণশ্চ পুরুষাণভ্যভাষতাম্।

কিন্তু এখন তো যুদ্ধ উপস্থিত। এবারে কী হবে? বিদুর যখন ভাবী যুদ্ধের খুঁটিনাটি বোঝাচ্ছেন কুন্তীকে, ঠিক সেই মুহূর্তে কর্ণের নাম শুনে উচ্চকিত হয়ে উঠলেন কুন্তী। বিদুরের রাজনৈতিক ভাষ্যে কর্ণ যুদ্ধ লাগবার অন্যতম কারণ। এই মুহূর্তে কুন্তী অনুভব করলেন এই বিশাল যুদ্ধ যখন লাগবে, তখন সেই যুদ্ধে অনেক বীরপুরুষই মারা যেতে পারে—সে ভীমও হতে পারে, অর্জুনও হতে পারে, আবার কর্ণও হতে পারেন। এই যুদ্ধ হবার পিছনে যুক্তিযুক্ত যে কারণগুলি ছিল, সেগুলি সম্পর্কে কুন্তী অনেক ভেবেছেন। আর ভেবেছেন বলেই পাণ্ডবদের যুদ্ধযাত্রার প্রেরণাও দিয়েছেন। কিন্তু এখন কুন্তীর ভাবনা তাঁর মমত্ববোধের জগতে বিচরণ করছে। কুন্তীর মতে এই যুদ্ধে ভয়ের কারণ তিনজন—পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ এবং দুর্যোধনের প্রিয়সখা কর্ণ। তিনজনই দুর্যোধনের জন্য লড়াই করবেন। তবু এর মধ্যে তাঁর সান্ত্বনা এবং স্থির বিশ্বাস যে, আচার্য দ্রোণ প্রিয় শিষ্যদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইবেন না। আর পিতামহ ভীষ্মই বা কী করে পাণ্ডবদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্নেহমুক্ত হবেন? আর বাকি রইলেন শুধু কর্ণ। হায়! কুন্তী কীভাবে বোঝাবেন

নিজেকে। কৌরব পক্ষে এই কর্ণই হলেন একমাত্র ব্যক্তি, কুন্তীর মতে যার ভবিষ্যতের দৃষ্টি নেই কোনো। দুর্যোধনে পাল্লায় পড়ে মোহের বশে কেবলই সে কতগুলি অন্যায় করে যাচ্ছে, পাণ্ডবদের তো সে চোখেই দেখতে পারে না—

মোহানুবর্তী সততং পাপো দ্বেষ্টি চ পাণ্ডবান্।

মুশকিল হল, যত অনর্থই ঘটাক এই কর্ণ, তার শক্তি এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কুন্তী ভাবেন—ওই অসামান্য শক্তি নিয়ে কর্ণ যে শুধু তাঁর অন্য ছেলেগুলির বিপদ ঘটাতেই ব্যস্ত রইল—এই মর্মান্তিক বাস্তব তাঁকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিল—

তন্মে দহতি সম্প্রতি।

আজ যখন এই মুহূর্তে কৌরব আর পাণ্ডবদের যুদ্ধ অনিবার্য্য হয়ে উঠল, তখন দুর্ভাবনায় হতাশায় হঠাৎই ঠিক করে বসলেন—যাব আমি। ঠিক যাব। কন্যা-জননীর লজ্জা ত্যাগ করে আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের কাছে গিয়ে জানাব যথাযথ সব কথা। জানাব—কেমন করে দুর্বাসার কাছে মন্ত্র পেয়ে কুন্তিভোজের ঘরে বসেই আহ্বান করেছিলাম তার পিতাকে। জানাব—একই সঙ্গে আমার কন্যাত্ব এবং স্ত্রীত্ব—এই পরস্পরবিরোধী আবেগ কী রকম ব্যাকুল করে তুলেছিল আমাকে—

স্ত্রীভাবাদ্ বালভাবাচ্চ চিন্তয়ন্তী পুনঃ পুনঃ।

একদিকে পিতার মর্য্যাদা রক্ষা অন্যদিকে কৌতূহল আর অজ্ঞানতার বশে সূর্যের আহ্বান—কুন্তী ঠিক করলেন—এক এক করে সব কর্ণকে জানাব আমি। কন্যাবস্থায় হলেও সে আমার ছেলে, আমার ভাল কথাটা কি সে শুনবে না, ভাইদের ভালটা কি সে বুঝবে না—

কস্মান্ন কুর্যাদ্ বচনং পশ্যন্ ভ্রাতৃহিতং তথা।

কুন্তী ঠিক করলেন—আজ আমি কর্ণের কাছে গিয়ে সব কথা বলব। তারপর চেষ্টা করব তার মন যাতে পাণ্ডবদের দিকে ফিরে আসে—

আশংসে ত্বদ্য কর্ণস্য মনো'হং পাণ্ডবান্ প্রতি।

কুন্তী রওনা দিলেন। তিনি জানেন এই সময়ে কর্ণ গঙ্গার তীরে পূর্বমুখ হয়ে বসে থাকেন। জপ করেন বেদমন্ত্র। দ্বিপ্রহর কাল অতিক্রান্ত বটে, কিন্তু সূর্যের তাপ প্রচণ্ড। রোদে কুন্তীর শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে। সূর্য কি শাস্তির মতো কোনো সুতীব্র কিরণ বিকিরণ করছেন আজ! ভাগীরথীর তীরে এসে কুন্তী দেখলেন—পুব দিকে মুখ করে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তপস্যায় বসে আছেন কর্ণ। তাঁর মুখ দিয়ে উদগীর্ণ হচ্ছে বেদমন্ত্রের নিস্বন—

গঙ্গাতীরে পৃথাশ্রৌষীদ্ বেদাধ্যয়ন-নিস্বনম্।

পশ্চিম দিক থেকে অলসগমনে আসা তাপার্তা কুন্তীকে কর্ণ দেখতে পাননি। পুত্রের জপ-ধ্যান-বেদমন্ত্র—কিছুর মধ্যেই মায়ের সহজ ভাব নিয়ে নিজেকে ঘোষণা করতে পারলেন না কুন্তী। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। সূর্যাতপে তপ্ত হয়ে নিজের চারদিকে ঘনিয়ে নিলেন আপন উত্তরীয়ের ছায়া, হয়তো প্রথম স্বামীর কাছে লজ্জায়। দেখে মনে হল পদ্মের মালা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে—

পদ্মমালেব শুষ্যতী।

কর্ণের জপ-ধ্যান শেষ হতে হতে বেলা গড়িয়ে গেল। পুব দিক থেকে কর্ণ এবার দৃষ্টি সরিয়ে আনবেন পশ্চিম আকাশে। বিদায় দেবেন প্রায় অস্তগামী সূর্যকে। এই দিক বদলের মুহূর্তেই চোখে পড়ে গেলেন কুন্তী। এই নির্জন নদীতীরে হঠাৎ এই প্রৌঢ়া মহিলাকে একলা দেখেই হাত জোড় করে এগিয়ে এলেন কর্ণ। কতবার তিনি এঁকে দেখেছেন দূর থেকে। অভিমানী বীর কর্ণ সৌজন্যে আনম্র হয়ে সস্মিতভাষে নিজের পরিচয় দিলেন—আমি কর্ণ, 'অধিরথসূতপুত্র রাধাগর্ভজাত'—

রাধেয়ো'হম্ আধিরথিঃ কর্ণস্ত্বমভিবাদয়ে।

কুন্তীর মুশকিল হল—তিনি জানতেন না যে, কর্ণ সব ব্যাপারটাই জানেন। যে পুত্রের জন্মের বৃত্তান্তে কালিমা থাকে, সে নিজের গবেষণাতেই প্রথমত নিজের পরিচয় জানবার চেষ্টা করে। লোকের কথায় আরোই সে জেনে যায় কে সে, কোথা থেকে এসেছে, বিশেষত এখানে এই খানিক আগেই স্বয়ং কৃষ্ণ কর্ণকে একা রথে উঠিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন অন্যত্র। কৃষ্ণ তাঁকে পরিষ্কার জানিয়েছিলেন—দেখো ভাই, তুমি কুন্তীর ছেলে। অতএব চলে এসো পাণ্ডবের দিকে, ঝামেলা মিটে যাবে, দুর্যোধন পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করার সাহসই পাবে না আর। কর্ণ রাজি হননি—সে অন্য কথা, কিন্তু ভাইপো কৃষ্ণ যেখানে পিসী কুন্তীর কন্যাগর্ভের কথা জানে, সেখানে কর্ণ সেটা জানতেন না, তা আমরা ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না। তা ছাড়া যদি আগে নাও জেনে থাকেন, তা হলেও অন্তত কুন্তী যখন তাঁর কাছে এসেছেন, তার আগে তো তিনি কৃষ্ণের মুখেই সব শুনে নিয়েছেন।

এই নিরিখে দেখতে গেলে বলতেই হবে যে, কর্ণের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে কুন্তীর যে সলজ্জ সংশয় ছিল, কর্ণের দিক থেকে তা ছিল না। ফলত প্রথম অভিবাদনের মুখেই কর্ণ তাঁর সারা জীবনের কলঙ্ক-অভিমান, একত্রিত করে দাঁত শক্ত করে নিজের পরিচয় দিয়েছেন— আমি 'অধিরথ সূতপুত্র রাধাগর্ভজাত'—

রাধেয়ো'হম্ আধিরথিঃ।

রাধেয়'—কথাটা শোনামাত্রই কুন্তীর মুখে তাই তীব্র প্রতিবাদ ঝরে পড়েছে—না না, বাছা তুমি মোটেই রাধার ছেলে নও। তুমি আমার ছেলে, তুমি কুন্তীর ছেলে, সূত অধিরথ মোটেই তোমার পিতা নন—

কৌন্তেয় স্ত্বং ন রাধেয়ো ন তবাধিরথঃ পিতা।

সারথির ঘরে তোমার জন্ম নয়। আমি যখন বাপের বাড়িতেই ছিলাম তখন কন্যা অবস্থায় আমারই পেটে জন্মেছিলে তুমি। তুমি আমার ছেলে, তুমি পার্থ। স্বয়ং স্বপ্রকাশ সূর্যদেব তোমার বাবা।

কুন্তী ভেবেছিলেন—তিনি কর্ণকে সব খুলে বলবেন। খুলে বলবেন যে, আমার পালক পিতার মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাকে এই কাজ করতে হয়েছে—

দোষং পরিহরন্তী চ পিতুশ্চারিত্ররক্ষিণী।

যে রমণী বালিকা অবস্থায় আপন পিতার স্নেহে বঞ্চিত হয়ে পালক পিতার ইচ্ছা অনুসারে মানুষ হয়েছেন, পালক পিতার সুনাম রক্ষার জন্য যাঁকে নিজের সন্তান ভাসিয়ে দিতে হয়েছে জলে, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে যাঁকে প্রজনন শক্তি-রহিত একটি পতি বরণ করতে হয়েছে, উপরন্তু শ্বশুরবাড়িতে যাঁর নিজের স্থিতিই অত্যন্ত শঙ্কাজনক, সেই অভাগা রমণী নিজেই নিজের কাছে এত বড়ো করুণার পাত্র যে, তাঁর পক্ষে আপন কন্যাবস্থার পুত্র নিয়ে জীবনে টিকে থাকা কঠিন ছিল।

আজ সেই কন্যাবস্থার পুত্রের সঙ্গে সংলাপে কুন্তী প্রথমেই ধাক্কা খেলেন। যে গর্ভ ধারণের জন্য এতকালের এত মানসিক চাপ—সেই গর্ভ ধারণের যন্ত্রণাটাই অস্বীকার করছে তাঁর পুত্র। হ্যাঁ, বালিকার প্রগল্‌ভতায় পুত্রের প্রতি সুবিচার তিনি করেননি ঠিকই, কিন্তু তাই বলে ছেলে তার গর্ভধারিণীর ভূমিকাটাই অস্বীকার করবে? জননীর মুখের ওপর ছেলে বলবে—না তুমি কখনোই আমার জননী নও? কুন্তী যত কথা বলবেন বলে ভেবে এসেছিলেন, সেসব কিছুই তিনি বলতে পারেননি। আচমকা নিজের গর্ভধারিণীর ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অপ্রস্তুতের মতো আগে বলতে হয়েছে—না-না তুমি রাধার ছেলে নও, তুমি আমার সবার বড়ো ছেলে, তুমি রাধেয় নও, তুমি পার্থ!

সব গুলিয়ে গেল। ভেবেছিলেন—গুছিয়ে গুছিয়ে দুর্বাসার কথা বলব, সূর্যদেবের কথা বলব, নিজের সমস্যার কথা বলব—কিছুই সেভাবে বলা হল না কুন্তীর, সব গুলিয়ে গেল। এই অবস্থায় নিজেকে সপ্রতিভ দেখানোর জন্য কুন্তীকে নিজের বিশাল জীবনসমস্যার কথা খুব তাড়াতাড়ি বলে ফেলতে হল। কুন্তী বললেন—আলোকদাতা সূর্যদেব আমারই কুক্ষিতে তোমার জন্ম দিয়েছিলেন। সূর্য দেবতার মতোই সোনার বর্ম, কানের কুণ্ডল তোমার জন্ম থেকে তোমার শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। আমার বাবা কুন্তিভোজের অন্দর মহলে তোমার জন্ম দিয়েছিলাম আমি।

কুন্তী খুব তাড়াতাড়ি—কর্ণের দিক থেকে কোনো প্রতিবাদ, কোনো বিরূপতার আগেই বলে ফেললেন—সেই তুমি আমার ছেলে হয়েও নিজের মায়ের পেটের ভাইদের চিনতে পারছ না! উলটে কোন এক অজানা মোহে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের তুমি সেবা করে যাচ্ছ। এই কি ধর্ম বাছা? যে পৃথিবী, যে ধন-সম্পদ অর্জুন জিতে এনেছিল, অসাধু লোকেরা সেসব লুটেপুটে নিল, এখন তুমি বাছা আবার সেসব জুটিয়ে এনে নিজেই সব ভোগ করো। লোকে দেখুক—কর্ণ আর অর্জুন এক জায়গায় জুটলে কী হয়, কেমন মাথা নুয়ে যায় সবার—সন্নমন্তামসাধবঃ। কুন্তী ভবিষ্যতের এক অসম্ভবের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়ে সোৎসাহে বলে উঠলেন—কর্ণ আর অর্জুন এক জায়গায় হলে, ব্যাপারটা দাঁড়াবে ঠিক বলরাম আর কৃষ্ণের মতো। তোমাদের দু-জনের সংহত শক্তি রুখবে এমন বুকের পাটা কার বাছা? পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তোমার শোভা হবে যেন দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা। তুমি বাপু আর সারথির ছেলে কথাটা মুখেই এনো না—

সূতপুত্রেতি মা শব্দঃ পার্থস্ত্বমসি বীর্যবান্।

তুমি আমার ছেলে, তুমি পার্থ।

প্রায় প্রগল্‌ভ জননীর ভাবণে কর্ণ কিন্তু একটুও টললেন না। কর্ণ—কুন্তীকে সম্বোধন করলেন—মায়ের ডাকে নয়—বললেন—ক্ষত্রিয়ে। আমার জন্মকালেই আমাকে বিসর্জন দিয়ে যে অন্যায়টি আপনি করেছেন, তাতে আর অন্য কোন শত্রু আপনার থেকে বেশি অপকার আমার করবে—

ত্বৎকৃতে কিন্নু পাপীয়ঃ শত্রুঃ কুর্যান্ মমাহিতম্।

যে অবস্থায় আমি ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত সংস্কার লাভ করে, ক্ষত্রিয়ের মর্য্যাদায় থাকতে পারতাম, সেই অবস্থায় তো আপনি মায়ের কর্তব্য কিছুই করেননি, এখন নিজের স্বার্থে আপনি আমাকে খুব ছেলে ছেলে করছেন—

সা মাং সংবোধয়স্যদ্য কেবলাত্মহিতৈষিণী।

কুন্তী কিন্তু গালাগালি হজম করে যাচ্ছেন, একটি কথাও তিনি বলছেন না। আর কথাগুলি তো ঠিকই। কর্ণ বললেন—আজ যদি আমি সব ছেড়ে পাণ্ডবদের পক্ষে যাই, লোকে আমাকে ভীরু, কাপুরুষ বলবে। কোনোদিন আমার ভাই বলে কেউ ছিল না, আর আজ এই যুদ্ধের প্রাক্কালে হঠাৎ যদি আমি পাণ্ডবদের 'ভাই' বলে আবিষ্কার করি, তাহলে ক্ষত্রিয়জনেরা আমাকে কী বলবে—

অভ্রাতা বিদিতঃ পূর্বং যুদ্ধকালে প্রকাশিতঃ।

কর্ণ এরপর দুর্যোধনের অনেক গুণ গান করলেন। কত সম্মান তিনি কর্ণকে দিয়েছেন, দিয়েছেন রাজপদ, কত ভোগ সুখ—সবই কুন্তীকে তিনি শোনালেন একে একে। আর শোনাতেই বা হবে কেন—কুন্তী নিজেই সেসব বেশ ভালমতো জানতেন, কর্ণের প্রতিষ্ঠা দেখে তিনি কিছু কম সুখী হননি। কিন্তু আজ যুদ্ধের সময় তাঁরই এক পুত্র অন্য পুত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং সে যুদ্ধ এমনই যুদ্ধ যে তাতে তাঁর কোনো না কোনো পুত্রের মৃত্যুর নিশ্চিত—এটাই বা তিনি সহ্য করেন কী করে? কর্ণ কুন্তীর মনের কথা যে বুঝতে পারছেন না, তা নয়। কুন্তীর মনের আশঙ্কা অনুধাবন করেই কর্ণ এবার বললেন—যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব—এদের কারও সঙ্গেই আমার যুদ্ধ হবে না। এদের কাউকে বধও করব না আমি। আমার যুদ্ধ হবে শুধুমাত্র অর্জুনের সঙ্গে। হয় অর্জুনের মৃত্যু হবে আমার হাতে, নয়তো আমার মৃত্যু হবে অর্জুনের হাতে। তবে তাতে আপনার ক্ষতি নেই কোনো। সমস্ত জগত আপনাকে পঞ্চপুত্রের জননী বলেই জানে। যুদ্ধের শেষেও আপনি পঞ্চপুত্রের জননীই থাকবেন—আপনি নিরর্জুনা হলে কর্ণ আপনার থাকবে, আর আপনি, অকর্ণা হলে অর্জুন আপনার থাকবে—

নিরর্জুনা সকর্ণা বা সার্জুনা বা হতে ময়ি।

কুন্তী শুনলেন, কর্ণের সব কথা শুনলেন, অন্যায়-ধিক্কার সব শুনে জননীর দায়-প্রত্যাখ্যান—তাও শুনলেন। ক্ষত্রিয় পুত্রদের জননী হিসেবে কুন্তী বুঝলেন কর্ণকে তার শেষ বক্তব্য থেকে নড়ানো যাবে না। ভবিষ্যতের পুত্রশোক তাঁর হৃদয় গ্রাস করল। তিনি আস্তে আস্তে কর্ণের কাছে এলেন। কর্তব্যে স্থির অটল, অনড় কর্ণকে তিনি সারা জীবনের প্রৌঢ় বাসনায় আলিঙ্গন করলেন—

উবাচ পুত্রমাশ্লিষ্য কর্ণং ধৈর্যাদকম্পনম্।

হয়তো আর হবে না। সেই বালিকা বয়সে পুত্রের জন্মলগ্নে জননীর যে স্নেহ প্রথম ক্ষরিত হয়েছিল, নিরুপায়তার কারণে জলে ভাসিয়ে দিতে হয়েছিল বলে যে শিশুপুত্রটিকে তিনি সজোরে কোলে চেপে ধরেছিলেন, আজ এতদিন পরে সেই ছেলেকে আবারও জড়িয়ে ধরলেন কুন্তী। বুঝলেন—জীবনের ধারায় জননীর কর্তব্য-বন্ধন মুক্ত করে একবার পুত্রকে ভাসতে দিলে সে ভেসেই চলে, সারা জীবন আর তাকে ধরা যায় না, ধরতে চাইলেও না। কুন্তী তাই জড়িয়ে ধরলেন কর্ণকে। আর দেখতে পাই কি না পাই। হয় অর্জুন, নয় কর্ণ—একজন তো যাবেই, যদি কর্ণ যায় তবে সামনা-সামনি একতম পুত্রের সঙ্গে এই শেষ দেখা। কুন্তী কর্ণকে জড়িয়ে ধরলেন দ্বিতীয়বার।

ক্ষত্রিয় পুত্র যেমন তার সত্য থেকে চ্যুত হল না, ক্ষত্রিয়া রমণীও তেমনই তাঁর ভবিষ্যৎ ভাবনা থেকে সরলেন না। কর্ণকে বললেন—কৌরবদের বিনাশ যাতে হয়, তুমি সেই খেয়ালটা রেখো, বাছা। আমি এত করে তোমায় বোঝালাম, কিন্তু কিছুই হল না। কপালে যা আছে হবে—দৈবন্তু বলবত্তরম্। অর্জুন ছাড়া তাঁর অন্য চার ছেলের দুর্বলতা কুন্তী জানেন, অতএব যুদ্ধকালে এই চারজনের যাতে ক্ষতি না হয়, সে-কথা তিনি আবারও মনে করিয়ে দিলেন কর্ণকে; কেন না, কর্ণও কথা দিয়েছিলেন তিনি অর্জুন ছাড়া আর কারও ক্ষতি করবেন না। মহাভারতের কর্ণ-

কুন্তী-সংবাদ শেষ হল অদ্ভুত সৌজন্য-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। কুন্তী বললেন—মঙ্গল হোক তোমার বাছা, সুস্থ থাকুক তোমার শরীর। উত্তরে কর্ণও বললেন একই কথা। যে আবেগ সারা জীবন ধরে কুন্তী জমা করে রেখেছিলেন কর্ণের জন্য, তা উপযুক্ত ভাবে মুক্ত হল না পাত্রের কাঠিন্যে। কুন্তী যখন জড়িয়ে ধরলেন কর্ণকে তখন ব্যাস তাঁর বিশেষণ দিয়েছেন 'অকম্পনম্'। হয়তো কর্ণের এই বিশেষণ তাঁর অনড় অকম্প স্বভাবের জন্যই।

[মহা (k) ৫.১৪৫-১৪৬ অধ্যায়;
(হরি) ৫.১৩৫-১৩৬ অধ্যায়]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হল অবশেষে, শেষও হল আঠার দিন পর। এই আঠার দিনের বর্ণনায় মহাকবি একটি বারের জন্যও কুন্তীর মানসিক অবস্থার উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। তবে আমরা অনুমান করতে পারি যে, জননী কুন্তীর কাছে এটিই বোধহয় ছিল তাঁর জীবনের দীর্ঘতম আঠার দিন। যুদ্ধ আরম্ভের মাত্র কিছুদিন আগে প্রথমজাত পুত্রটিকে শেষ আলিঙ্গন করে এসেছিলেন কুন্তী, সেই কর্ণ আজ মৃত। ফলে যে কুন্তী বিদুলার উপাখ্যান শুনিয়ে আপন পুত্রদের যুদ্ধের জন্য প্রেরিত করেছিলেন, খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি যুদ্ধের শেষে আজ পাণ্ডবপক্ষের পুত্রগর্বিনী রাজমাতার মতো আত্মপ্রকাশ করতে পারলেন না। তিনি আজ চলেছেন বিজিত কৌরবপক্ষের স্বামীহারা, পুত্রহারাদের সঙ্গে, তাঁদের মতোই দুঃখিতা, বিষণ্ণা, তাঁর নিজের অন্তরেও আজ পুত্রশোকের হাহাকার।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যতখানি রোমাঞ্চকর ছিল, যুদ্ধোত্তর কুরুক্ষেত্র ছিল ততখানিই করুণ। এমন কেউ ছিল না, যার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব একজনও মারা যায়নি। যুদ্ধ জয় করে পঞ্চপাণ্ডব বেঁচেছিলেন বটে, তবে তাঁরাও পুত্র হারিয়েছেন, আত্মীয়-কুটুম্ব অনেককেই হারিয়েছেন। আরও যা হারিয়েছেন তা তখনও জানতেন না। যুদ্ধশেষের পর যুধিষ্ঠির ভাইদের নিয়ে প্রথম গান্ধারীর কাছে গেছেন, কারণ তাঁর একটি সন্তানও বেঁচে নেই। তা ছাড়া 'দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে'—সেই নিয়মে ভবিষ্যতের রাজা যুধিষ্ঠির আপন কর্তব্য পালন করে তারপর এসেছেন মায়ের কাছে। দ্রৌপদীও রয়েছেন সেখানেই।

ছেলেরা পাঁচ পাণ্ডবভাইরা মায়ের কাছে এলেন—শুধু এইটুকু বলেই মহাভারতের কবি তুষ্ট হলেন না, বললেন—মাতরং বীরমাতরম্‌—শুধু মায়ের কাছেই নয়, বীরমাতার কাছে। মনে পড়ে কুন্তীর উত্তেজনা—যে সময়ের জন্য ক্ষত্রিয় রমণীরা সন্তান পেটে ধরে, অর্জুন— সেই সময় এখন এসে গেছে। ব্যাসকে তাই লিখতে হল—সংগ্রামজয়ী বীরপুত্রের জননীর কাছে ফিরে এল তার পুত্রেরা—মাতরং বীরমাতরম্। কতক্ষণ ধরে কুন্তী চেয়ে থাকলেন পুত্রদের মুখের দিকে, কতক্ষণ? নিশ্চয়ই মনে হল—আরও একজন যদি থাকত! প্রিয়পুত্রেরা যুদ্ধ করতে গিয়ে কত কষ্ট পেয়েছে, এই যন্ত্রণা যুদ্ধ জয়ের থেকেও এখন পীড়া দিতে থাকল কুন্তীকে। যুদ্ধজয়ের অন্তিম মুহূর্তে কঠিনা ক্ষত্রিয়া রমণী পরিণত হয়েছেন সাধারণী জননীতে।

আনন্দের পরিবর্তে কুন্তীর চোখ ভরে জল এল। এক ছেলে মারা গেছে—সে দুঃখ কেঁদে জানাবারও উপায় নেই তাঁর। কাপড়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন কুন্তী—

বাষ্পমাহারয়দ্দেবী বস্ত্রেণাবৃত্য বৈ মুখম্।

প্রিয় পুত্রদের প্রত্যেকের ক্ষতস্থানে বার বার হাত দিয়ে জননীর স্নেহ-প্রলেপ বুলিয়ে দিলেন তিনি। জ্যেষ্ঠ-পুত্রের শোক ভুলতে চাইলেন জীবিতদের গায়ে হাত বুলিয়ে। স্বামীদের দেখে দ্রৌপদীর দুঃখ তীব্রতর হল। কেঁদে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তিনি বললেন—মা! সুভদ্রার ছেলে অভিমন্যু, আপনার অন্য নাতিরা সব কোথায় গেল? কই, আজকে তারা তো কেউ এল না আপনার কাছে। আমার ছেলেরা কেউ বেঁচে রইল না, আর আমি এই রাজ্য দিয়ে কী করব—

কিংনু রাজ্যেন বৈ কার্য্যং বিহীনায়াঃ সুতৈর্মম।

কুন্তী আবারও একাত্ম হলেন দ্রৌপদীর সঙ্গে। দ্রৌপদী তো আর জানেন না যে, তাঁর মতো কুন্তীও আজ পুত্রহারা। সমদুঃখের মর্য্যাদায় কুন্তী পুত্রবধূকে মাটি থেকে ওঠালেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন মায়ের স্নেহে, সন্তানহারার একাত্মতায়। সবাইকে নিয়ে তিনি চললেন দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীর কাছে। বুঝলেন—যে জননী তার একশোটি পুত্র হারিয়েছে, তার যন্ত্রণা সকলের কষ্ট লঘু করে দেবে। গান্ধারীর দুঃখে কুন্তী নিজে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করলেন। কুন্তী অনেক চেষ্টা করেছিলেন

পুত্রশোক লুকোবার, কিন্তু শেষপর্যন্ত আর পারলেন না। শতপুত্রহারা গান্ধারীর শোক, পুত্রহারা দ্রৌপদী সুভদ্রার শোক, ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রবধূর বিলাপের মাঝে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত সেই সত্য আজ উচ্চারণ করে ফেললেন, যে কথা গর্ভধারণের সময় থেকেই সম্পূর্ণ পৃথিবীর কাছে গোপন করে এসেছেন পৃথা। তখন কুরুরমণীদের সবাইকে নিয়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র উপস্থিত হয়েছেন গঙ্গার ঘাটে। আছেন গান্ধারী, আছেন কুন্তী। পাণ্ডবরা এসেছেন জননীর সঙ্গে। কুরুবাড়ির পুত্রবধূরা জলে নেমে তর্পণ করছেন। এমন সময় মনে মনে বিপর্যস্ত কুন্তী চোখের জলে আপ্লুত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছেলেদের উদ্দেশে বললেন—যে মহাবীরকে সকলে সারথির ছেলে বলে ভাবত, সবাই যাকে জানত রাধার ছেলে—সেই কর্ণ তোমাদের সবার বড়ো ভাই। সৈন্যদলের মধ্যে যাকে দেখতে লাগত সূর্যের মতো, দুর্যোধনের সৈন্যবাহিনীর যে ছিল নেতা, যার মতো বীর এই তিন ভুবনে আর দ্বিতীয়টি নেই—

যস্য নাস্তি সমো বীর্যে পৃথিব্যামপি কশ্চন।

—সেই কর্ণ তোমাদের বড়ো ভাই। এই বিরাট যুদ্ধে সে অর্জুনের হাতে মারা গেছে, তার জন্য এক অঞ্জলি জল দিয়ে গঙ্গায় তর্পণ করিস তোরা। সে তোদের বড়ো ভাই, সূর্যের ঔরসে আমারই গর্ভে তার জন্ম হয়েছিল তোদেরও অনেক আগে—

স হি বঃ পূর্বজো ভ্রাতা ভাস্করান্মমযজায়ত।

পাণ্ডবরা হঠাৎ করে প্রায় অসম্ভব এই নতুন খবর শুনে একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। কর্ণের জন্য তাঁদের দুঃখ ভ্রাতৃসম্বন্ধের নৈকট্যে তীব্রতর এবং আন্তরিক হয়ে উঠল। যে যুধিষ্ঠির যুদ্ধে পর্যন্ত স্থির থাকেন, তিনি রাগে সাপের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে মায়ের কাছে তাঁর প্রথম পুত্রজন্মের সত্যতা সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি শুনতে চাইলেন। মায়ের সঙ্গে যুধিষ্ঠির কখনো এই ব্যবহার করেননি। কিন্তু কুন্তী ওই একবারই যা বলেছেন, তিনি বারবার এক কথা বলেন না। যুধিষ্ঠির মনে আকুল, মুখেও গজর গজর করতে থাকলেন। বার বার বলতে থাকলেন —এ কী আক্কেল তোমার, সব কথা চেপে থাকার জন্য আজ তোমার জন্য আমরা মরলাম—

অহো ভবত্যা মন্ত্রস্য গ্রহণেন বয়ং হতাঃ।

আগে বললে এই লোকক্ষয়ী যুদ্ধ হত না, কর্ণ পাশে থাকলে এই পৃথিবীতে কী আমাদের অপ্রাপ্য ছিল—এইরকম নানা সম্ভাবিত সৌভাগ্যের কথা বলে ধর্মরাজ দুষতে লাগলেন কুন্তীকে। কুন্তী এ-কথারও জবাব দিলেন না। ভাবটা এই—আমার ছেলে মারা যেতে আমার যে কষ্ট হয়েছে, তার চেয়ে বেশি কষ্ট তোমাদের ভাইদেরও হতে পারে না বাছা। যুধিষ্ঠির সাময়িক শ্রাদ্ধ-তর্পণ সেরে চলে এলেন বটে। কিন্তু এর কাছে তার কাছে মায়ের এই রহস্য-গোপনের কথা এবং ভ্রাতৃহত্যার শোক বারংবার বলেই চললেন। তবু কুন্তী কিছু বললেন না।

যুধিষ্ঠির কর্ণের নানা খবর পেলেন মহর্ষি নারদের কাছে। গভীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে থাকলেন অন্তরে। কুন্তী এবার প্রয়োজন বোধ করলেন যুধিষ্ঠিরকে কিছু বলার। বোঝাতে চাইলেন—তোমার দুঃখের চাইতে আমার দুঃখ কিছু কম নয় বাছা। বললেন—কেঁদো না, মন দিয়ে শোনো আমার কথা—

জহি শোকং মহাপ্রাজ্ঞ শৃণু চেদং বচো মম।

আমি চেষ্টা করেছিলাম অনেক। তোমরা যে তার ভাই—এ-কথা আমি অনেক করে বলেছিলাম তাকে। আর শুধু আমি কেন, তার জন্মদাতা পিতা সূর্যদেবও তাকে আমারই মতো করে বুঝিয়েছেন। ভগবান সূর্যদেব এবং আমি অনেক যত্নে, অনেক অনুনয় করে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তাকে না পেরেছি বোঝাতে, না পেরেছি, তোমাদের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিতে। মেলা তো দূরের কথা, সে তোমাদের ব্যাপারে আরও প্রতিকূল হয়ে উঠল। আমিও দেখলাম—যাকে বুঝিয়ে তার ভাইদের দিকে, ন্যায়ের পথে টেনে আনা যাবে না, তাকে উপেক্ষা করাই ভাল। আমি তাই করেছি—

প্রতীপকারী যুস্মাকম্ ইতি চোপেক্ষিতো ময়া।

কুন্তীর এই স্বীকারোক্তির পরেও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে ছাড়েননি। কেন তিনি আগে বলেননি কর্ণের গোপন জন্ম-কথা—এই কারণে অনেক গালাগাল অনেক শাপ-শাপান্ত যুধিষ্ঠিরের কাছে শুনতে হল কুন্তীকে। যুধিষ্ঠির বুঝলেন না—প্রথম পুত্রের মৃত্যুতে অন্য পুত্রদের যুদ্ধ-জয় কুন্তীর কাছে তিক্ত হয়ে গেছে। তাঁর নিশ্চয়ই মনে পড়ে আপন পুত্রবধূর সেই স্মরণীয় বিলাপের

ভাষা—আমার ছেলেরা বেঁচে নেই, এই রাজ্য দিয়ে আমি কী করব—

কিং নু রাজ্যেন বৈ কার্যং বিহীনায়াঃ সুতৈর্মম।

[মহা (k) ১১.২৭.৭-৩০; (হরি) ১১.২৭.৬-২৭]

☐ যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। এর কিছুকাল পরে অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তুতি আরম্ভ হল। যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে দিগ্বিজয় করে এলেন অর্জুন। যজ্ঞে নিমন্ত্রিত কৃষ্ণ যে মুহূর্তে হস্তিনাপুরের রাজপুরীতে পা রাখলেন—ঠিক সেই মুহূর্তে রাজ অন্তঃপুরে কান্নার রোল উঠল। অশ্বত্থামা অভিমন্যুর পত্নীর গর্ভে যে 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন, তার প্রভাবে অভিমন্যুপত্নী উত্তরা এক মৃত পুত্রসন্তান প্রসব করলেন সেই দিন। একমাত্র বংশধরের আশাটুকুও লুপ্ত হল দেখে দ্রৌপদী, সুভদ্রা— সকলে বিলাপ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ এসেছেন শুনে তাঁরা কৃষ্ণকে ডেকে আনলেন অন্তঃপুরে। কারণ কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে উত্তরার গর্ভের সন্তানকে জীবনদান করবেন তিনি স্বয়ং। অন্তঃপুরে এসে কৃষ্ণ সেই মৃত পুত্রটিকে কুন্তীর কোলে তুলে দিয়েছেন। কৃষ্ণ কুন্তীকে বলেছেন—আমি এই ষষ্ঠ মাসে প্রসূত গর্ভটিকে অবশ্যই বাঁচিয়ে তুলব। কিন্তু আপনি একে নিজের ক্রোড়ে ধারণ করুন—

তমুৎসঙ্গেন প্রতিজগ্রাহ পৃথা
নিয়োগাৎ পুরুষোত্তমস্য
বাসুদেবস্য ষান্মাসিকং
গর্ভমহমেনং জীবয়িষ্যামিতি।

পৃথা-কুন্তী যেন মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠছেন এই পর্যায়ে পৌঁছে। একসময় সন্তান উৎপাদনে অক্ষম স্বামী পাণ্ডুর বংশরক্ষা করেছিলেন তিনি, আজ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কুরুবংশ যখন লুপ্ত হবার মুখে, সে সময় পৌত্রবধূ উত্তরার সন্তানটিকে কোলে তুলে নিয়ে জীবনদান করার অনুরোধও কৃষ্ণ করেছেন কুন্তীকেই। যাইহোক, কুন্তীর মাহাত্ম্যেই হোক বা কৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতায়—উত্তরার পুত্রটি আবার বেঁচে উঠল। কুরুবংশ লোপ হবার থেকে রক্ষা পেল। কুন্তীর প্রপৌত্র বিখ্যাত হল পরীক্ষিৎ নামে।

[মহা (k) ১.৯৫.৮৩-৮৪;
(হরি) ১.৯০.১১০-১১৩]

☐ মহাভারতের আশ্রমবাসিক পর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে রাজমাতা কুন্তীর জীবন কেমন কাটছিল, তার একটা বিবরণ পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের পর কুন্তীর রাজমাতার রাজকীয় মর্য্যাদাতেই শেষ জীবন কাটানোর কথা ছিল। কিন্তু কানীনপুত্র কর্ণের মৃত্যু, যুদ্ধে অসংখ্য লোকক্ষয়—কুন্তীর মনে এমনই এক বিষণ্ণতা সৃষ্টি করেছিল যে রাজমাতা হবার সুখ তাঁর হৃদয়কে স্পর্শও করতে পারেনি। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তিনি নিজেকে নিযুক্ত করেছেন ভাশুর ধৃতরাষ্ট্র এবং বড়ো জা গান্ধারীর সেবায়। এই রাজ্যলোভী ভাশুর আর তাঁর পুত্রদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে কুন্তীর সম্পূর্ণ জীবন কেটেছে। কুন্তীই কুরুবংশের জ্যেষ্ঠ সন্তানের মা হয়েছিলেন বলে গান্ধারীর তাঁর প্রতি ঈর্ষাও ছিল যথেষ্ট। সেই অতীত পার হয়ে এসে আজ বৃদ্ধা কুন্তী অনেকটা যেন পুত্রবধূর মতোই এই পুত্রহারা, নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ দম্পতির সেবার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

দেখতে দেখতে পনেরোটা বছর কেটে গেল। যুধিষ্ঠিরের সেবাযত্নে পনেরোটা বছর সুখে শান্তিতে কাটাবার পর ধৃতরাষ্ট্র এবার বনে যাবার জন্য তৈরি হলেন। সঙ্গে চললেন তাঁর সহধর্মচারিণী গান্ধারী। ইচ্ছে—বাকি জীবনটা তপোবনে সাধনায়, তপস্যায় কাটিয়ে দেওয়া। যেদিন গান্ধারীকে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র রওনা দিলেন বনের উদ্দেশে, সেদিন রাজ্যের যত নর-নারী রাস্তায় ভেঙে পড়ল তাঁদের দেখতে। বৃদ্ধ রাজা বনে যাচ্ছেন, গান্ধারী বনে যাচ্ছেন, পাণ্ডবরা সবাই তাঁদের পেছন পেছন চলেছেন। কুন্তীও চলেছেন চোখ-বাঁধা গান্ধারীর হাত ধরে। হস্তিনাপুরের সিংহদ্বার ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছেন তাঁরা। পুরবাসীরা ফিরে গেছে অনেক আগেই। এবার যুধিষ্ঠিরও ফিরবেন। আর কত দূরই বা যাবেন তিনি। ধৃতরাষ্ট্রও বার বার বলছেন—এবার ফিরে যাও বাছা, আর কত দূর যাবে তুমি, যাও যাও।

গান্ধারীর হাত-ধরা কুন্তীকে যুধিষ্ঠির এবার বললেন—আপনি এবার ফিরে যান মা, আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে আরও খানিকটা এগিয়ে দিই—

অহং রাজানমন্বিষ্যে ভবতী বিনিবর্ততাম্।

যুধিষ্ঠির বললেন—ঘরের বউরাও সব রয়ে গেছে, আপনি এবার তাদের নিয়ে ফিরে যান। আমি আরও কিছু দূর যাই মহারাজের সঙ্গে। যুধিষ্ঠিরের এই কথার পর গান্ধারীর হাতটি আরও শক্ত করে ধরলেন কুন্তী। চোখে তাঁর জল এল। তবু একেবারে আকস্মিকভাবে, যুধিষ্ঠিরের একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে কুন্তী বললেন—আমার সহদেবকে যেন কখনো বকাঝকা কোরো না বাছা। সে বড়ো ভাল ছেলে, যেমন আমায় ভালোবাসে, তেমনই তোমাকেও। তাকে সব সময় দেখে রেখো।

যুধিষ্ঠির কিছু বুঝতেও পারেননি। ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীকে পৌঁছতে নয়, কুন্তীও যে তাঁদের সঙ্গে চলেছেন সব ছেড়ে, কিচ্ছুটি না বলে—সে-কথা যুধিষ্ঠির কিছু বুঝতেই পারেননি। কুন্তী এবার বললেন—আর তোমাদের বড়ো ভাই কর্ণকে সব সময় স্মরণে রেখো বাবা। আমারই দুর্বুদ্ধিতে তাকে একদিন আমি প্রতিপক্ষে থেকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিলাম। আর দেখো, আমার হৃদয় নিশ্চয়ই লোহা দিয়ে তৈরি। নইলে কর্ণকে না দেখেও এখনও যে সে হৃদয় আমার খান খান হয়ে যায়নি, তাতে বুঝি এ একেবারে লোহা। ব্যাপারগুলো এমনই হয়েছিল, আমার পক্ষে আরও ভাল করে কী-ই বা করা সম্ভব ছিল, বাছা। তবু সব দোষ আমারই, কেন না আমি কর্ণের সব কথা তোমাদের কাছে খুলে বলিনি—

মম দোষো'য়মত্যর্থং খ্যাপিতো যন্ন সূর্যজঃ।

মনে রাখবেন—এই কথাগুলি কুন্তীর সাফাই গাওয়া নয় অথবা বনে যাবার শেষ মুহূর্তের স্বীকারোক্তিও নয় কিছু। কথাগুলি গভীর অর্থবহ।

আগে বলেছি যে, শৈশবে আপন পিতৃ-মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত কুন্তীর মধ্যে এমনিই এক মানসিক জটিলতা তৈরি হয়েছিল। সে জটিলতা আরও বাড়ে কন্যা অবস্থায় তথাকথিত এক অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়ে। বাবা-মার কাছে এ কথা বলতে পারেননি, স্বামীর কাছে বলতে পারেননি, ছেলেদের কাছে তো বলতেই পারেননি। এদিকে শ্বশুরকুল তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিচ্ছে না, অথচ প্রধানত যাঁর ভরসায় তাঁর শ্বশুরকুল তাঁরই প্রতিপক্ষভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে, তিনিও তাঁর ছেলে, কর্ণ। তিনি এমনই সত্যসন্ধ যে, তাঁকে বলে কয়েও কিছু করা যায়নি। প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর অন্য ছেলেরা এবং কুন্তী পূর্বাহ্নেই জানতে পারছেন —কর্ণ মারা যাবেন।

যে গভীর জটিলতার সূত্রপাত হয়েছিল যৌবনে, যার বৃদ্ধি ঘটেছিল বিধবার সমস্ত জীবনের অন্তর-গুপ্তিতে, সেই জটিলতা কর্ণের মৃত্যুতেও শান্ত হয়নি, বরং তা বেড়েছে। যে যুধিষ্ঠির জীবনে মায়ের মুখের ওপর গলা উঁচু করে কোনোদিন কথা বলেননি, সেই যুধিষ্ঠির রাগে সাপের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে জননীকে বলেছেন—তোমার স্বভাব-গুপ্তির জন্য আজ আঘাত পেলাম আমি—

ভবত্যা গূঢ়মন্ত্রত্বাৎ পীড়িতো'স্মীত্যুবাচ তাম্।

যুধিষ্ঠির জননীকে উদ্দেশ করে সমগ্র নারীজাতিকে শাপ দিয়েছিলেন—মেয়েদের পেটে কোনো কথা থাকবে না—

সর্বলোকেষু যোষিতঃ ন গুহ্যং ধারয়িষ্যন্তি।

কুন্তী যুধিষ্ঠিরের কথার উত্তর দেননি, প্রতিবাদ করেননি, আপন মনে বকবকও করেননি। যুধিষ্ঠির কুন্তীকে বুঝি তখনও চেনেননি। মেয়েদের পেটে কথা না থাকার অভিশাপ শত কোটি প্রগল্‌ভা রমণীর অন্তরে যতই ক্রিয়া করুক, মনস্বিনী কুন্তীর তাতে কিছুই হয়নি। এই যে রাজ্য-পাওয়া বড়ো ছেলে গলা উঁচু করে কর্ণের ব্যাপার নিয়ে অত বড়ো কথাটা বলল, তার প্রতিক্রিয়া কুন্তী মনের মধ্যে চেপেই ছিলেন। যুধিষ্ঠির রাজ্য পাওয়া মাত্রই তিনি রাজমাতার যোগ্য বিলাস ছেড়ে মন দিয়েছিলেন শ্বশুরকল্প ধৃতরাষ্ট্রের সেবায়। যুধিষ্ঠির বুঝতেও পারেননি নিস্তরঙ্গভাবে পুত্রদের দেওয়া ভোগ-সুখ থেকে অবসর নিলেন কুন্তী। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে দিনের পর দিন অন্তরে বৈরাগ্য সাধন করার ফলেই এত সহজে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বনে যাওয়ায় ব্যাপারে। জলপান বা ভাত খাওয়ার মতো অতি সহজেই তিনি বলতে পারছেন—আমিও গান্ধারীর সঙ্গেই বনে থাকব বলে ঠিক করেছি।

লক্ষণীয় বিষয় হল—এই সহজ প্রস্থানের পথে তিনি আবারও সেই কর্ণের প্রসঙ্গ তুলছেন যুধিষ্ঠিরের কাছে, এমন একটা প্রসঙ্গ যা নিয়ে পুত্রের কাছে তিনি উচ্চৈঃস্বরে অভিযুক্ত হয়েছিলেন একদা পনেরো বছর আগে। কুন্তী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেননি, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কাশী কিংবা বনে যাননি। কিন্তু পনেরো

বছর তিনি যুধিষ্ঠিরের কথা মনে রেখেছেন, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া চেপে রেখেছেন নিপুণভাবে। যাবার আগে শুধু জবাবদিহির মতো করে কথাটা আবারও তুলছেন কুন্তী। বলেছেন—আমার হৃদয়টা লোহার মতো বাবা, নইলে কর্ণের মরণ সয়েও বেঁচে রইলাম কী করে? তবে ঘটনার প্রবাহ ছিল এমনই যে, আমি কীই বা করতে পারতাম সেখানে—

এবং গতে তু কিং শক্যং ময়া কর্তুম্ অরিন্দম।

কথাটার মধ্যে পনেরো বছরের অন্তর্দাহ আছে, অভিমান আছে, জবাবদিহিও আছে। যুধিষ্ঠিরের কথাটা যে তিনি সেদিন মেনে নিতে পারেননি, তারই উত্তর দিচ্ছেন আজ পনেরো বছর পরে, বানপ্রস্থে যাবার পথে। অথচ বলার মধ্যে সহজ ভাবটা দেখবার মতো—সবই আমার দোষ, বাছা। তুমি ভাইদের নিয়ে তোমার বড় ভাই কর্ণের কথা সব সময় স্মরণে রেখো। তার মৃত্যু উপলক্ষ করে দান-ধ্যান কোরো।

কুন্তীর যাত্রা এবং বক্তব্যের আকস্মিকতায় যুধিষ্ঠির হতচকিত হয়ে গেছেন। তিনি কথাই বলতে পারছেন না—

ন চ কিঞ্চিদুবাচ হ।

পনেরো বছর আগে বলা কথার জবাবটা যে এইভাবে মায়ের বনবাস-যাত্রার মুখে এমন হঠাৎ করে ফিরে আসবে—এ তিনি ধারণাই করতে পারছেন না। কথা আরম্ভ করার জন্য তাঁকে ভাবতে হল এক মিনিট—

মুহূর্তমিব তু ধ্যাত্বা।

দুশ্চিন্তায় আকুল হয়ে তিনি উত্তর দিলেন— এ তুমি কী বলছ মা! এ তুমি নিজে নিজে কী ঠিক করেছ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার ওপর রাগ কোরো না তুমি—

ন ত্বামভ্যনুজানামি প্রসাদং কর্তুমর্হসি।

মুহূর্তের মধ্যে যুধিষ্ঠির গুছিয়ে নিলেন নিজেকে। বললেন—মা! তুমিই না এক সময়ে আমাদের যুদ্ধে উত্তেজিত করেছিলে? বিদুলার গল্প বলে তুমিই যেখানে আমাদের এত উৎসাহ দিয়েছিলে, সেই তুমি কিছুতেই আমাদের ছেড়ে যেতে পারবে না—

বিদুলায়া বাচোভিস্ত্বং নাস্মান্ সন্ত্যক্তুমর্হসি।

কৃষ্ণের কাছে তোমারই বুদ্ধি পেয়ে আমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, রাজ্যও পেয়েছি তোমারই বুদ্ধিতে। সে বুদ্ধি এখন কোথায় গেল মা? আমাদের এত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম উপদেশ দিয়ে এখন তুমি নিজেই তো সেই ধর্মের চ্যুতি ঘটাচ্ছ। আমাদের ছেড়ে, এই রাজ্য ছেড়ে, তোমার পুত্রবধূকে ছেড়ে কোথায় তুমি বনের মধ্যে গিয়ে থাকবে?

ছেলের কান্না-মাখা কথা শুনে কুন্তীর চোখে জল এল। তবু তিনি চলতে লাগলেন গান্ধারীর সঙ্গে। কুন্তী কোনো কথার উত্তর দিলেন না দেখে ভীম ভাবলেন—মা বুঝি একটু নরম হয়েছেন। ভীম বললেন—তোমার ছেলেরা যখন রাজ্য পেল, যখন সময় এল একটু ভোগ-বিলাসে থাকার, তখনই তোমার এই অদ্ভুত বুদ্ধি হল কেন, মা—

তদেয়ং তে কুতো মতিঃ!

আর যদি এই বুদ্ধিই হবে তবে আমাদের দিয়ে যুদ্ধে এত লোকক্ষয় করালে কেন? বনেই যদি যাবে তবে সেই বালক-বয়সে আমাদের শতশৃঙ্গ পর্বতের বন থেকে কেন টেনে এনেছিলে এখানে? বারবার বলছি মা, কথা শোনো, বনে যাবার কল্পনা বাদ দাও, ছেলেদের উপায়-করা রাজলক্ষ্মী ভোগ করো তুমি, ফিরে চলো ঘরে।

কুন্তী ভীমের কথাও শুনলেন, কিন্তু বাড়ি ফিরবার লক্ষণ একটুও দেখা গেল না তাঁর মধ্যে। দ্রৌপদী-সুভদ্রা কত বোঝালেন কুন্তীকে, ছেলেরা সবাই কত করে বললেন ফিরে যেতে, কুন্তী বারবার তাঁদের দিকে ফিরে তাকান— যেন এই শেষ দেখা, আর চলতে থাকেন। সাশ্রুমুখে পুত্রদের দিকে বারবার তাকানোর মধ্যে কুন্তীর স্নেহানুরক্তি অবশ্যই ছিল—

সা পুত্রান্ রুদতঃ সর্বান্ মুহুর্মুহুরবেক্ষতী।

কিন্তু তাঁর চলার মধ্যে নিশ্চিত সিদ্ধান্তের শক্তি লুকানো ছিল। তিনি তাই থামছিলেন না। বস্তুত ওই শক্তিতে কুন্তী এবার চোখের জল মুছলেন, রুদ্ধ করলেন বাষ্পোদ্ভিন্ন স্নেহধারার পথ। কুন্তী নিজেকে শক্ত করে দাঁড়ালেন বনপথের মাঝখানে। প্রিয় পুত্রেরা তাঁকে যুক্তির জালে আবদ্ধ করেছে। প্রশ্ন করেছে—কেন তুমি পূর্বে আমাদের যুদ্ধে উৎসাহিত করে এখন বনে পালাচ্ছ। ছেলেদের এই প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাবেন তিনি। কুন্তী দাঁড়ালেন। মুখে তাঁর সেই তেজ, সেই দীপ্তি।

কুন্তী বললেন—প্রশ্নটা তোমাদের মোটেই অন্যায় নয় যুধিষ্ঠির! সত্যিই তো, আমি তোমাদের চেতিয়ে দিয়েছিলাম। সেই সময়ে, যখন শত্রুর ওপর আঘাত হানায় তোমরা ছিলে কম্পমান—

কৃতমুদ্ধর্ষণং পূর্বং ময়া বঃ সীদতাং নৃপ।

কেন অমনি করেছিলাম জান? জ্ঞাতিরা পাশাখেলায় তোমাদের সর্বস্ব হরণ করে নিয়েছে, সুখ বলে যখন কোনো কিছুই অবশিষ্ট ছিল না তোমাদের, তখনই আমি তোমাদের উত্তেজিত করেছি—

কৃতমুদ্ধর্ষণং ময়া।

আমি তোমাদের উত্তেজিত করেছি এই কারণে, আমার স্বামী পাণ্ডুর ছেলেরা যাতে পৃথিবী থেকে মুছে না যায়, যাতে তাঁর বীর পুত্রদের যশোহানি না হয়।

এই কথাটার মধ্যে ভীমের প্রশ্নের জবাবও আছে। ভীম বলেছিলেন—বনেই যদি যাবে তবে পাণ্ডুর মৃত্যুর পর কেন আমাদের বন থেকে টেনে এনেছিলে এখানে—

বনাচ্চাপি কিমানীতা ভবত্যা বালকা বয়ম্?

কুন্তী জবাব দিয়েছেন স্বামীর ইতিকর্তব্যতার কথা মনে রেখে। বস্তুত পাণ্ডু অকালে মারা যাবার পর কুন্তী যখন বিধবা হলেন তখন অন্য ব্যক্তিত্বময়ী বিধবা রমণীদের মতো তাঁরও একমাত্র ধ্যান ছিল—কেমন করে তাঁর নাবালক ছেলেগুলিকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া যায়। এর জন্য মুনি-ঋষিদের ধরে পাণ্ডুর মৃতদেহ নিয়ে নাবালকদের হাত ধরে তিনি উপস্থিত হয়েছেন শ্বশুরবাড়িতে। ভূতপূর্ব রাজরানীর প্রাপ্য সম্মান তিনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাননি, পেয়েছেন শুধুই আশ্রয়। সেই আশ্রয়ও নিরাপদ ছিল না। ভীমকে বিষ খাওয়ানো, বারণাবতে সবাইকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা—সব কিছু কুন্তী সয়েছেন এবং অপেক্ষা করেছেন সুদিনের। ছেলেরা ততদিনে মহাশক্তিশালী বীরের মর্য্যাদা পেয়েছে। রাজনীতিতে সমর্থন এসে গেছে কুন্তীর আসল বাপের বাড়ি বৃষ্ণি-যাদবদের কাছ থেকে এবং বিবাহসূত্রে পাঞ্চাল দ্রুপদের কাছ থেকেও।

ধৃতরাষ্ট্র এই বিধবা মহিলার উচ্চাশা চেপে রাখতে পারেননি। চেষ্টা তিনি কম করেননি। কুন্তীকে যদি একটুও ভয় না পেতেন ধৃতরাষ্ট্র, তা হলে অন্তত বারণাবতে কুন্তীসহ পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করতেন না। যাই হোক, পাঞ্চালদের সঙ্গে বৈবাহিক যোগাযোগের পর এবং বারণাবতের ঘটনায় নিজের রাজ্যে নিজেরই মান বাঁচাতে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অবাধ্য ছেলেদের ধৃতরাষ্ট্র রুখতে পারেননি। তাদের প্ররোচনায় পাশাখেলার ছলে পাণ্ডবদের সর্বস্ব নিয়ে বনবাসে পাঠান ধৃতরাষ্ট্র।

কুন্তী এই অন্যায় সইতে পারেননি। বাপের সম্পত্তির ভাগ তারা কিছুই পেল না, উলটে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ছেলেদের পাঠিয়ে দেওয়া হল বনে, কুন্তী এই অন্যায় সইতে পারেননি। স্বামীর অবর্তমানে নিজের কষ্টে প্রতিষ্ঠিত রোজগেরে ছেলেদের দেখে বিধবা মা যে সুখ পান, ঠিক সেই সুখই কুন্তী নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন, যখন যুধিষ্ঠির রাজা হয়েছিলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। কিন্তু দুর্যোধন-ভাইদের জ্ঞাতি চক্রান্তে ছেলেদের যে রাজ্যনাশ হয়ে গেল, তখনও কুন্তী হাল ছাড়েননি। তিনি একা বসেছিলেন শ্বশুরবাড়িতে। বিদুরের কথায় যে তিনি শেষ পর্যন্ত ছেলেদের সঙ্গে বনে যাওয়া বন্ধ করে কুরুবাড়িতেই রয়ে গেলেন, তার কারণ বিদুরের মর্য্যাদারক্ষা যতখানি, তার চেয়েও বেশি তাঁর অধিকারবোধ—আমার শ্বশুরবাড়ি, আমার স্বামীর ঘর, আমার অধিকার আছে এখানে থাকার, আমি রইলাম শুধু পাণ্ডুর উত্তরাধিকারিতার অধিকারে। রাজা পাণ্ডুর বংশ এবং উত্তরাধিকার যাতে মুছে না যায় কুরুবাড়ি থেকে—

যথা পাণ্ডোর্ন নশ্যেত সন্ততিঃ পুরুষর্ষভাঃ।

—সেইজন্যই তিনি কুরুবাড়িতে একা জেগে বসেছিলেন এবং সময়কালে ছেলেদের উত্তেজিত করেছেন চরম আঘাত হানার জন্য—

ইতি চোদ্ধর্ষণং কৃতম্।

কুন্তী বললেন—তোমাদের শক্তি কিছু কম ছিল না। দেবতাদের মতো তোমাদের পরাক্রম। সেই তোমরা চোখ বড়ো করে চেয়ে চেয়ে জ্ঞাতিভাইদের সুখ দেখবে আর নিজেরা বনে বসে বসে কষ্ট সইবে—সে আমি সইতে পারিনি বলেই তোমাদের যুদ্ধে উত্তেজিত করেছি—

মা পরেষাং সুখপ্রেক্ষাঃ স্থাতব্যং তৎ কৃতং ময়া।

যুধিষ্ঠির! মর্য্যাদায় দেবরাজ ইন্দ্রের মতো হয়েও তুমি কেন বনে বাস করবে, সেই জন্যই আমার উত্তেজনা। একশো হাতির বলে শরীরে

নিয়েও ভীম কেন কষ্ট পাবে, সেই জন্যই আমার উত্তেজনা। ইন্দ্রের সমান যুদ্ধবীর হয়েও অর্জুন কেন নিচু হয়ে থাকবে—সেই জন্যই আমার উত্তেজনা। আর তোমরা এত বড়ো বড়ো ভাইরা থাকতে নকুল-সহদেব আমার বনের মধ্যে খিদেয় কষ্ট পাবে—এই জন্যই আমার উত্তেজনা।

কুন্তী এবার শেষ প্রশ্ন তুললেন সমগ্র রাজনীতির সারমর্মিতায়। বললেন—এই যে এই মেয়েটা, পাণ্ডবদের সুন্দরী কুলবধূ দ্রৌপদী। একে যখন সভার মধ্যে নিয়ে এসে অপমান করল সবই, সকলে চুপটি করে বসে থাকল। পঞ্চস্বামীগর্বিতা হয়েও সাহায্যের আশায় যাকে কাঁদতে হল অনাথের মতো, আমার শ্বশুরকুলের বড়ো মানুষেরা ব্যথিত হয়েও চুপ করে বসে থাকলেন। দুঃশাসন এসে তার চুলের মুঠি ধরল—এখনও ভাবলে আমার মনে হয় আমি অজ্ঞান হয়ে যাব—এরকম অসভ্যতা দেখেই আমি তোমাদের যুদ্ধে উত্তেজিত করেছি, শুনিয়েছি বিদুলার উদ্দীপক সংলাপ।

কুন্তী বলতে চান—পাণ্ডবদের যুদ্ধে উত্তেজিত করার মধ্যে তাঁর নিজের স্বার্থ কমই। ছেলেরা রাজ্য জিতে ভোগ-বিলাস এনে দেবে তাঁর কাছে আর তিনি বিলাস-ব্যসনে মজে থাকবেন, বসে বসে সুখ ভোগ করবেন—এই আশায় তিনি যুদ্ধের উত্তেজনা ছড়াননি ছেলেদের মধ্যে। কুন্তীর বক্তব্য—যুদ্ধের উত্তেজনার বিষয় এবং কারণ তাঁর ছেলেদের মধ্যেই ছিল, অর্থাৎ ঘটনা পরম্পরা যা চলছিল—যে অন্যায় যে অবিচার, তাতে বহু পূর্বে তাঁর ছেলেদেরই উত্তেজিত হওয়া উচিত ছিল। তাদের দিক থেকে অত্যন্ত উচিত এই প্রতিক্রিয়া যখন কুন্তী লক্ষ্য করলেন না, তখনই তাঁকে কঠিন কথা বলতে হয়েছে, বিদুলার মরণান্তিক কঠিন সংলাপ শোনাতে হয়েছে ছেলেদের। এর মধ্যে জননী হিসেবে তাঁর পাওয়ার কিছু নেই, যা প্রাপ্য তা তাঁর ছেলেদেরই, ঠিক যেমন যুদ্ধে উত্তেজিত হওয়ার কারণগুলিও ছিল তাদেরই একান্ত।

যুধিষ্ঠির এবং ভীমের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের উত্তরে কুন্তী তাঁর উত্তেজনা চেপে রাখতে পারেননি। যে প্রশ্ন করতে ছেলেদের লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল, সেই প্রশ্ন যখন তারা কঠিনভাবেই করল, তখন উত্তর এসেছে অবধারিত কঠিনভাবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কুন্তী ছেলেদের রেখে বনের পথে পা বাড়িয়েছেন জীবনের মতো। কাজেই অভিযোগের উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে নেমে আসছে প্রশান্তি, বনযাত্রার বৈরাগ্য।

কুন্তী বললেন—তোমাদের যে এত করে যুদ্ধ করতে বলেছিলাম, তার আসল কারণ কী জান? তোমাদের বাবা ছিলেন রাজা। তোমরা রাজার ছেলে। আমারই গর্ভজাত সন্তানদের হাতে পড়ে সেই মহাত্মা পাণ্ডুর রাজবংশ উচ্ছিন্ন না হয়ে যায়, সেই কারণেই আমি তোমাদের উৎসাহিত করেছি। জেনে রেখো, তোমরা নিজেরাই যদি নিরালম্ব অবস্থায় থাকো, তবে তোমাদের ছেলেরা, তোমাদের নাতিরা কোনোদিনই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না—

ন তস্য পুত্রাঃ পৌত্রা বা ক্ষতবংশস্য পার্থিব।

কাজেই যা কিছু উৎসাহ-উদ্দীপনা তা তোমাদেরই কারণে, আমার নিজের ভোগসুখের জন্য কিছু নয়। ভাবতে পারেন কি —একটি সমৃদ্ধিশালী, সুপ্রতিষ্ঠিত বংশধারার জন্য কুন্তী কত আধুনিকভাবে লালায়িত।

ভীম বলেছিলেন—তোমার ছেলেরা এখন রাজ্য জিতেছে, সেই রাজসুখ এখন তোমার ভোগ করার কথা—

যদা রাজ্যমিদং কুন্তি ভোক্তব্যং পুত্রনির্জিতম্।

—রাজমাতার প্রাপ্য সুখ যখন তোমার কাছে আমাদেরই পৌঁছনোর কথা, ঠিক তখনই তোমার এই বানপ্রস্থের ইচ্ছে হল? কুন্তী এই প্রশ্ন এবং পুত্র-নির্জিত রাজ্য-সুখের ভোক্তব্যতা নিয়ে যে অসাধারণ উক্তিটি করেছেন তা এই অতি বড়ো আধুনিক সমাজেও আমাদের অত্যন্ত সযৌক্তিক মনে হয়।

কুন্তী ভীমের প্রশ্নের উত্তরে সদর্পে বললেন —রাজসুখ! রাজসুখ আমি অনেক ভোগ করেছি পুত্র। আমার স্বামীর যখন সুখের দিন ছিল, তখন তাঁর রাজত্বে রাজরানী হয়ে রাজ্যসুখ আমি অনেক ভোগ করেছি—

ভুক্তং রাজ্যফলং পুত্র ভর্তুর্মে বিপুলং পুরা।

টাকা-পয়সা খরচ করার অজস্র স্বাধীনতা তিনি আমাকে দিয়েছিলেন, অনেক অনেক দান করেছি আমি, তিনি কোনোদিন বাধা দেননি। আর আনন্দ! স্বামীর সঙ্গে একত্র বসে সোমপান করেছি—

পীতঃ সোমো যথাবিধি।

আর কী চাই? কুন্তী আজ সেই অতীতের স্মৃতিচারণ করছেন, কারণ আজ স্বামীর অবর্তমানে পুত্র-পৌত্র নির্ভর ভোগ সুখে কুন্তীর তত ভরসা নেই, বরং সংকোচ আছে। আজ বোধ হয় কুন্তীর মনে পড়ছে তাঁর দিদিশাশুড়ী রাজমাতা সত্যবতীর কথা। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাঁচপুত্রকে নিয়ে সদ্যবিধবা কুন্তী ফিরে এসেছেন হস্তিনায়, বাস করছেন ভূতপূর্ব রাজমহিষীর মর্য্যাদায় নয় বরং আশ্রিতার মতো। অন্যদিকে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর সিংহাসন আঁকড়ে বসে রয়েছেন লোভীর মতো। এমনই সময় একদিন মহর্ষি ব্যাস এসে জননী সত্যবতীকে বানপ্রস্থের প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। বলেছিলেন—সুখের দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে মা! আজ বনে গিয়ে ঈশ্বরের চিন্তায় বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়াই ভালো। কুন্তীর মনে আছে, সেদিন ছেলের কথার মর্মার্থ বুঝে দুই পুত্রবধূ অম্বিকা-অম্বালিকার হাত ধরে রাজভবন ছেড়ে বনের পথে যাত্রা করেছিলেন সত্যবতী। কুন্তীর মনে আছে সেসব কথা, শ্বশুর ব্যাসের সেদিনের উপদেশ। সেই উপদেশ পাথেয় করে আজ বনের পথে যাত্রা করছেন কুন্তী। স্বামীর অবর্তমানেও যে পুত্রদের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন—এই তাঁর পরম তৃপ্তি। রাজ্য সুখের কোনো আকাঙ্ক্ষা যেমন কুন্তীর নেই, তেমনই আজকের পুত্রহারা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিও কোনো ক্ষোভ নেই তাঁর। অসীম করুণায় তিনি আঁকড়ে ধরেছেন বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর অসহায় হাত দুটি। যাবার আগে নিজের দৃঢ় সংকল্পের কথাই ঘোষণা করে তিনি বললেন—ফিরে যাও বাছারা। জীবনের শেষ কটা দিন ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারীর মতো শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করে আমি আমার পতিলোকে যাত্রা করতে চাই।

কুন্তী চলে গেলেন। সদর্পে মাথা উঁচু করে চলে গেলেন। যুধিষ্ঠির ভীম—এঁরা যেন একটু লজ্জাই পেলেন—ব্রীড়িতা সন্ন্যবর্তন্ত। ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী অবশ্য কুন্তীকে ফিরে যাওয়ার জন্য অনেক বোঝালেন, কিন্তু কুন্তী ফিরলেন না। ফিরলেন না, কারণ, আমার ধারণা, সেই শ্বশুর ব্যাসদেবের কথা কুন্তীর মনে আছে—পৃথিবী গতযৌবনা। ফিরলেন না, কারণ যুধিষ্ঠির পুত্রশোকার্তা ক্ষত্রিয়া জননীকে কর্ণের কথা বলে একবার হলেও অতিক্রম করেছেন। এই অতিক্রম যে বারবার ঘটবে না তার কী মানে আছে—পৃথিবী গতযৌবনা। তাঁর সময় চলে গেছে। কুন্তী যে দৃঢ়তা নিয়ে পুত্রদের যুদ্ধে উত্তেজিত করেছিলেন, সেই দৃঢ়তা নিয়েই আজ বনে চলে গেলেন।

অগত্যা যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের নিয়ে, কৃষ্ণা-পাঞ্চালীকে নিয়ে ফিরে এলেন হস্তিনায়। মা চলে গেছেন, রাজকার্যে তাঁদের মন বসে না। কিছুদিন পর রাজা যুধিষ্ঠির পরিবারের সকলকে এবং আরও অনেক লোকজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে বনে গেলেন মায়ের সঙ্গে এবং ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-বিদুরের সঙ্গে দেখা করতে। কুন্তীরা তখন সবাই শতযূপ মুনির অরণ্য আশ্রমে থাকেন। পাণ্ডবরা লোকমুখে খবর নিতে নিতে শতযূপের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। আশ্রমের বালকরা তাঁদের জানাল—তাঁরা সকলে গেছেন যমুনায় স্নান করতে, পুজোর ফুল আনতে।

পাঁচ ভাই পাণ্ডব সঙ্গে সঙ্গে চললেন যমুনার দিকে। দেখলেন—বৃদ্ধা কুন্তী এবং গান্ধারী কলসী কাঁখে জল নিয়ে ফিরছেন যমুনা থেকে। সঙ্গে সুস্নাত ধৃতরাষ্ট্র। মাদ্রীপুত্র কনিষ্ঠ সহদেব তো শিশুর মতো ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন কুন্তীকে—

সহদেবস্তু বেগেন প্রাধাবদ্ যত্র সা পৃথা।

আমি আগেই বলেছি—কুন্তী এই সপত্নী পুত্রটিকে কত ভালবাসতেন। সহদেব কুন্তীকে জড়িয়ে ধরে যত কাঁদেন, কুন্তীও ততই কাঁদেন। সাশ্রুকণ্ঠে সানন্দে আর কোনো বীরপুত্রের কথা না বলে গান্ধারীকে তিনি খবর দেন—আমার সহদেব এসেছে, দিদি, সহদেব এসেছে। পাণ্ডবরা একে একে সবাই কুন্তীর কাছে এলেন, তাঁদের কাঁখের কলসী তুলে নিলেন নিজের মাথায়। সবাই ফিরে এলেন শতযূপের আশ্রমে। মুহূর্তের মধ্যে মুনির অরণ্য আশ্রম হস্তিনাপুরের রূপ নিল। আরও আনন্দের খবর এল—কুরু-পাণ্ডব-বংশের বিধাতা মহাভারতের কবি মহামুনি ব্যাসও যুধিষ্ঠিরের সংবাদ পেয়ে উপস্থিত হয়েছেন শতযূপের আশ্রমে।

মহামতি ব্যাসের আজ অন্যরূপ। নিজেরই পুত্র-প্রপৌত্র, পুত্রবধূরা সব এক জায়গায়। ধৃতরাষ্ট্র-কুন্তী-গান্ধারীকে তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন—কী চাও তোমরা বলো। আজ

আমি আমার যোগসিদ্ধির ঐশ্বর্য্য দেখাব। বলো কী চাও? ব্যাস বুঝতে পারছিলেন—ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী এই নির্জন বনে এসে যত তপস্যাই করুন, তাঁদের মনে এখনও কাঁটার মতো ফুটে আছে শত-পুত্রের শোক। ব্যাসের কথা শুনেই ধৃতরাষ্ট্র কেঁদে ফেললেন। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের মনের কথা কেড়ে নিয়ে দ্রৌপদী, সুভদ্রা, সবার মন বুঝে বললেন—এতই যদি আপনার দয়া, তবে আমার মতো অভাগা রমণীদের, যাদের পুত্র গেছে, স্বামী গেছে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে, তাঁদের স্বামী-পুত্রদের একবার দেখান না দয়া করে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কুন্তীর মনের মধ্যে বিদ্যুৎশিখার মতো ভেসে এল কর্ণের প্রতিচ্ছবি, চিরকালের লুকিয়ে রাখা সূর্য-সম্ভবা দীপ্তি—কর্ণ, সেও কি লুকিয়ে রাখা যায়? একবার কি কুন্তী অসাড়ে অস্পষ্টভাবে উচ্চারণও করে ফেলেছিলেন কর্ণের নাম? কেন না ব্যাসের বিশেষণ দেখছি—দূরশ্রবণদর্শনঃ—যিনি দূরের কথা শুনতে পান, মনের ছবি দেখতে পান। ব্যাস কুন্তীকে দেখলেন বড়ো মনমরা। স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলেন—কুন্তী! বলো তুমি। তোমার মনে কীসের কষ্ট; খুলে বলো আমায়।

এই মুহূর্তে কুন্তীকে আমরা দেখছি আত্মনিবেদনের পরম পরিসরে। কুন্তী বললেন—আপনি আমার সাক্ষাৎ শ্বশুর। দেবতার দেবতা। আমার এই চরম সত্যের স্বীকারোক্তি আমার দেবতাদের দেবতাকে আমি শোনাতে চাই—

স মে দেবাতিদেবস্ত্বং শৃণু সত্যাং গিরো মম।

আমরা এখন সেই মুহূর্তে এসে উপস্থিত হয়েছি যখন কুন্তী আবার একবার কর্ণের জন্মকথা স্মরণ করবেন, সর্বসমক্ষে। মনে রাখা দরকার—

এখানে তাঁর পুত্র যুধিষ্ঠির বসে আছেন, যে যুধিষ্ঠির মাকে মৃদু অভিশাপ দিয়েছিলেন কর্ণের কারণে। মনে রাখবেন, এখানে তাঁর স্বামীজ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র আছেন, গান্ধারী আছেন, আছেন কুলবধূরা—যাঁরা শাশুড়ির কীর্তি শুনে ছ্যা-ছ্যা করতে পারেন। কুন্তী আজ সবার সামনে, বিশেষত দেবকল্প শ্বশুর ব্যাসের সামনে নিজের চরম স্বীকারোক্তি করছেন। প্রথমজন্মা সূর্যসম্ভব যে পুত্রটি তাঁর সারা জীবনের পুলক-দীপ্তি হয়ে থাকতে পারত, তাকে সারা জীবন লুকিয়ে রাখার যন্ত্রণা তাঁকে পাপের মতো পুড়িয়ে মারে। যে সারা জীবন পাপের মতো করে অন্তরে লুকিয়ে ছিল, তাকেই আজকে কুন্তী দেখতে চান এবং দেখাতে চান সবার সামনে, প্রাণ ভরে, প্রথম পুত্রের সম্পূর্ণ মর্য্যাদায়।

এই ঘটনাটাকে কুন্তীর জীবনের অসীম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় আমাদের। জীবনের আরম্ভে প্রথম যৌবনের রোমাঞ্চের দিনে যাঁকে দিয়ে কুন্তী প্রথম মাতৃত্বের স্বাদ পেয়েছিলেন, সারা জীবন তাঁকে মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে আজ তিনি তাঁকে সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। পাঁচ ভাই পাণ্ডবকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠা করা তাঁর কাছে যতখানি ছিল, এ তার থেকেও বেশি—আপন মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা, প্রথমজন্মা পুত্রের প্রতিষ্ঠা। কুন্তী যাঁকে দিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিলেন আজ শেষের দিনে তাঁকেই দেখতে চাইছেন। পরম প্রিয় স্বামী নয়, পুত্রদাতা দেবতাদের নয়, যাঁকে দিয়ে কুন্তী নিজের গর্ভের মধ্যে দ্বিতীয় সত্তার আনন্দ পেয়েছিলেন প্রথম, কুন্তী তাঁকেই শেষের দিনে দেখতে চাইছেন, দেখতে চাইছেন কর্ণকে। হয়তো এইজন্যই, এই মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠার জন্যই কুন্তী পঞ্চ পুণ্যবতী রমণীর মধ্যে একতমা—অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা। এর পরেও কে তাঁকে কুলঙ্কষা বলে তিরস্কার করবে?

কুন্তী বললেন—আপনি তো জানেন, সেই ঋষি দুর্বাসা কেমন করে ছিলেন আমার ঘরে। কেমন করে আমি তাঁর সেবা করেছি। সেই যুবতী বয়সে তাঁর ওপরে রাগের কারণ অনেক ছিল আমার, কিন্তু আমি ক্রুদ্ধ হইনি। আমি যে তাঁর কাছে বর নিয়েছি, তাও তাঁর শাপের ভয়ে, আমি নিজে কোনো বর চাইনি। তিনি দেবতার আহ্বান আর সঙ্গমের মন্ত্র দিলেন আমার কানে। তখন আমার কী বা বয়স, যৌবনের স্পষ্টাস্পষ্ট রহস্য জানতে গিয়ে আমি সেদিন আহ্বান করে বসলাম দেব দিবাকরকে। আমার মূঢ় হৃদয়ের কৌতূহলী আহ্বান সত্য করে দিয়ে হঠাৎ তিনি এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। বিশ্বাস করুন—আমি তখন কাঁপছিলাম। কত কেঁদে পায়ে ধরে বলেছিলাম—তুমি চলে যাও এখান থেকে—গম্যতামিতি। কিন্তু গেলেন না, শাপের ভয়, ধ্বংসের ভয় দেখিয়ে নিজের দীপ্ত তেজে আমাকে আকুল করে আমাতে আবিষ্ট হলেন তিনি—

ততো মাং তেজসাবিশ্য মোহয়িত্বা চ ভানুমান্।

হায়! তারপর সেই গূঢ় জাত প্রথমজন্মা পুত্রকে আমার জলে ভাসিয়ে দিতে হল। সূর্যের প্রসন্নতায় আমি যেমন অনূঢ়া কন্যাটির মতো ছিলাম, তাই হলাম আবার।

তবু, কিন্তু তবু, সেদিন আমার সেই ছেলেটিকে —যাকে আমি আমার ছেলে বলে জেনেও অবহেলা করলাম, ভাসিয়ে দিলাম জলে, তার জন্য আমার শরীর মন সব সময় জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। আপনি বোঝেনও সে কথা—

তন্মাং দহতি বিপ্রর্ষে যথা সুবিদিতং তব।

এতক্ষণ সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করে কুন্তী এবার তাঁর কৃতকর্মের ন্যায়-অন্যায় যাচাই করতে চাইছেন। কুন্তী জানালেন—সব আপনাকে বললাম। আমার পাপ হয়েছে, না হয়নি, আমি তার কিচ্ছু জানি না। আমি শুধু আমার সেই ছেলেকে একবার দেখতে চাই—

তং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভগবন্।

—আপনিই তাকে দেখাতে পারেন।

অসামান্য দীর্ঘদর্শিতার কারণে ব্যাস জানেন যে, কন্যা অবস্থায় পুত্রজন্মের জন্য কুন্তীর চরিত্রে পাপের স্পর্শ লেগেছিল কি না—এই প্রশ্ন কুন্তীকে যেমন সারা জীবন কুরে কুরে খেয়েছে, তেমনই এই প্রশ্ন অন্যদের মনেও আছে। কুন্তীর কথার উত্তরে ব্যাস প্রথম বললেন—তোমার কোনো দোষ ছিল না কুন্তী—

অপরাধশ্চ তে নাস্তি।

আর দোষ ছিল না বলেই পুত্রের জন্মের পরেও তুমি দেবতার আশীর্বাদে পূর্বের সেই কন্যাভাব আবারও লাভ করেছ। আসলে কী জান—দেবতারা ওই রকমই। তাঁদের অলৌকিক সিদ্ধি আছে, অতএব ওইভাবেই তাঁরা মনুষ্যশরীরে আবিষ্ট হন। তাঁদের এই অলৌকিক দেহ-সংক্রমণ সত্ত্বেও তুমি যেহেতু অন্য মানুষের মতোই মনুষ্যধর্মেই বর্তমান, সেই হেতু তোমার কোনো দোষ এখানে নেই। ভাবটা এই—যদি দোষ থাকে তবে সেই দেবতার। তবে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস তাঁর এই ভাব-ব্যঞ্জনা শুদ্ধ করে দিয়ে বলেছেন—আসলে কারওরই দোষ নয় কুন্তী—অসামান্য দৈব তেজে বলীয়ান ব্যক্তির দোষ সাধারণের মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না, বড়ো মানুষের সবই ভাল, সবই শুদ্ধ। আর তোমার কী দোষ, তুমি আগেও যা ছিলে, দেবসঙ্গমের পরেও তাই ছিলে—সেই লজ্জারুণা কন্যাটি—

কন্যাভাবং গতা হ্যসি।

প্রশ্নের মীমাংসা হল। মীমাংসা করলেন মহাভারতের হৃদয়-জানা কবি, মীমাংসা করলেন ঋষি-সমাজের মূর্ধন্য-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত কন্যা-সত্যবতীর জাতক পারাশর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব।

ব্যাস উত্তর দিলেন মানে, প্রশ্নের সমাধান সবারই হয়ে গেছে। এইবার মৃতজনদের সামনে নিয়ে আসার জন্য আপন যোগৈশ্বর্য্য প্রকট করবেন ব্যাস। তিনি ভাগীরথীতে স্নান করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মৃত প্রিয়জনদের আহ্বান করলেন আবাহন মন্ত্রে। ভাগীরথীর তীরে তুমুল কোলাহল শোনা গেল—কর্ণ, দুর্যোধন, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলে, দুঃশাসন, শকুনি, ঘটোৎকচ সবাই সশরীরে দেখা দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা—সকলে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

লক্ষণীয় বিষয় হল—এই যে মৃত ব্যক্তিরা সব ব্যাসের তপঃসাধনে ভাগীরথী তীরে সশরীরে উপস্থিত হলেন, এঁদের কারও মনে কোনো গ্লানি নেই, ক্রোধ নেই, অসূয়া নেই, ঈর্ষা নেই—

নির্বৈরা নিরহংকারা বিগতক্রোধমৎসরাঃ।

অত্যন্ত স্বাভাবিক রাজকীয় মর্যাদায় তাঁদের দেখা যাচ্ছে। যেমন তাঁদের বেশ-ভূষা, তেমনই ভাস্বর তাঁদের শরীর-সংস্থান। জীবিত অবস্থায় যে মহাবীরের যেমন বেশ ছিল, যেমন ছিল তাঁদের রথ, বাহন, ঠিক তেমনই রথে চড়ে, ঘোড়ায় চড়ে রাজা-রাজপুত্রেরা সব উপস্থিত হলেন মায়ের সামনে, পিতার সামনে, প্রিয়তমা পত্নীর সামনে।

এমন করে কুন্তী কর্ণকে কোনোদিন দেখেননি। এমনভাবে, এমন সহানুভূতির মহিমায় কোনোদিন কুন্তী কর্ণকে এমন দেখেননি। পুনর্জীবিত অবস্থায় কর্ণকে কুন্তী দেখলেন অন্য এক মূর্তিতে। ভাগীরথীর তীরে কর্ণকে দেখা মাত্রই পাঁচভাই পাণ্ডবরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ধেয়ে গেলেন তাঁর দিকে—

সম্প্রহর্ষাৎ সমাজগ্মুঃ।

পরস্পরকে স্বাভাবিক ভ্রাতৃস্থানে পেয়ে ভারী খুশি হলেন তাঁরা—

ততস্তে প্রীয়মানা বৈ কর্ণেন সহ পাণ্ডবাঃ।

ঠিক এইরকম একটা দৃশ্যই তো কুন্তী সারাটা জীবন ধরে পরম কামনায় দেখতে চেয়েছেন। পাঁচ ভাই নয়, ছয় ভাই যেন এই অনন্ত সৌহার্দ্যে বাঁধা পড়ে—এই তো কুন্তীর চিরকালের বাসনা। শ্বশুর ব্যাসের করুণায়—চিত্রং পটগতং যথা—এই পরম ঈপ্সিত ছয় ভাইয়ের মিলন দেখে কুন্তীর সব আশা পূরণ হয়ে গেল। টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখেছেন—এই দৃশ্যকে স্বপ্ন বলা যাবে না, কেন না তা হলে বলতে হবে ব্যাস 'ম্যাজিক' দেখাচ্ছেন। মোহ বা ভ্রান্তিও বলা যাবে না, কারণ ঋষি-চূড়ামণি ব্যাস আপন বিদ্যায় এবং তপস্যার মাহাত্ম্যে এই নিষ্পাপ প্রত্যক্ষ মনুষ্য-রূপ দেখাচ্ছেন। বস্তুত কুন্তী যে ব্যাসের বিদ্যায় পুত্রকে স্বরূপে দেখতে চেয়েছিলেন, তা শুধু এই অসামান্য দৃশ্যটির জন্য। মহাভারতের কবি এ-কথা লেখেননি যে, কর্ণকে দেখামাত্র কুন্তী ছুটে গেছেন তাঁর কাছে। লিখেছেন—ভাইরা সানন্দে ছুটে গেছেন তাঁর কাছে। কুন্তী তো এইটাই দেখতে চেয়েছেন সারা জীবন ধরে। তাঁর কন্যা অবস্থার প্রচ্ছন্নজাত পুত্রটি স্নেহের সরণিতে কোনোমতেই যে বিধিসম্মত পুত্রদের থেকে আলাদা নয়, সেই প্রতিষ্ঠাই তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠা। এরপর কিছুকাল পরে পাণ্ডবরা ফিরে এলেন হস্তিনায়। কুন্তীর জীবনের অন্তিম সংবাদটি মহাভারতের কবি আমাদের জানিয়েছেন খুব সংক্ষেপে। কবি জানিয়েছেন —পাণ্ডবরা চলে আসার পর কুন্তী এবং গান্ধারীকে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র আরও গহন বনে প্রবেশ করলেন। কঠোর তপস্যায়, অনাহারে শীর্ণ হতে লাগলেন তাঁরা। অবশেষে একদিন সেই বনে জ্বলে উঠল দাবানল। পশুপাখি মারা পড়ল, যারা বাঁচল তারা পালাতে লাগল। কিন্তু তপঃক্লিষ্ট ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী আর গান্ধারীকে নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে রইলেন স্থির হয়ে। অবশেষে দাবাগ্নিতে ভস্মীভূত হলেন তাঁরা।

[মহা (k) ১৫.১.২৩-২৪; ১৫.১৬.৭-৩২; ১৫.১৭.১-২১; ১৫.২৯-৩০ অধ্যায়; ১৫.৩৩.৫; ১৫.৩৭.১০-৩৪; (হরি) ১৫.১.২৩-২৪; ১৫.১৮.৭-৩২; ১৫.১৯.১-২১; ১৫.৩২-৩৩ অধ্যায়; ১৫.৩৬.৫; ১৫.৪০.১০-৩৪]

কুন্দ১ তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে যখন দেবতারা স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন, সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট দেবতারা তাঁদের কয়েকটি বিশিষ্ট অনুচর যোদ্ধাকে তারকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য অনুচর হিসেবে স্কন্দকে দান করেন। ধাতা তাঁর যে পাঁচজন অনুচর স্কন্দকে দান করেছিলেন কুন্দ তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৩৯; (হরি) ৯.৪২.৩৭]

কুন্দ২ শাল্মলীদ্বীপে অবস্থিত একটি পৌরাণিক বর্ষপর্বত। *[ভাগবত পু. ৫.২০.১০]*

কুন্দ৩ বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১০০; (হরি) ১৩.১২৭.১০০]

কুন্দমানা *[দ্র. কুন্দাপরান্ত]*

কুন্দাপরান্ত একটি প্রাচীন ভারতীয় জনপদ।

[মহা (k) ৬.৯.৪৯; (হরি) ৬.৯.৪৯]

□ পণ্ডিতদের মতে এর আরেক নাম কুন্দমানা। প্রাচীনকালে বৃহত্তর কাশ্মীরের কুঠার (Kuṭhār) অঞ্চলটিরই নাম ছিল কুন্দাপরান্ত। বর্তমানে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের পূর্বে আরপথ (Ārapatha) বা হরসা (Harsa) উপত্যকা অবস্থিত। কুন্দাপরান্ত, এই উপত্যকাটিরই একটি অংশ।

তবে K.C. Mishra-র মতে কুন্দমানা ও কুন্দাপরান্ত এক নয়। তাঁর মতে কুন্দাপরান্ত দেশটি ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ছিল। তবে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় না। অবশ্য ড. আগরওয়ালা বলেছেন, আফগানিস্তানের উত্তর সীমান্তে বসবাসকারী কুনদুজ্ (Kunduz) ও কুন্দাপরান্ত দেশের মানুষরা অভিন্ন।

[TIM (Mishra) p. 102; GESMUP (Moti Chandra) p. 91-92; IKP (Agrawala) p. 155]

কুপট একজন দানব। কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্ব থেকে জানা যায় দ্বাপর যুগে এই দানব মর্ত্যে রাজা সুপার্শ্ব রূপে অবতীর্ণ হন। *[মহা (k) ১.৬৫.২৬; ১.৬৭.২৮-২৯; (হরি) ১.৬০.২৬; ১.৬২.২৯]*

□ মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে বলা হয়েছে যে, কুপট দানব দ্বাপরযুগে সুপার্শ্ব নামে এক রাজা রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.২৯; (হরি) ১.৬২.২৯]

কুপথ১ পুরাণ অনুসারে নর্মদা নদীর তীরবর্তী জনপদগুলির মধ্যে কুপথ একটি। এটি একটি পর্বত বেষ্টিত জনপদ বলে মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৬৭; মৎস্য পু. ১১৪.৪৭, ৫৫]*

কুপথ২ প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভজাত দানব পুত্রদের মধ্যে কুপথ একজন দানব।

[বায়ু পু. ৬৮.১০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.১০]

কুবলয় বিষ্ণু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, কাশীর রাজা দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দনের অশ্বের নাম কুবলয়। *[বিষ্ণু পু. ৪.৮.৭]*

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হয়েছে যে, একদা মহর্ষি গালব একটি অশ্ব নিয়ে রাজা প্রতর্দনের কাছে উপস্থিত হন। ঋষি গালব রাজাকে বলেন যে, এই অশ্বটি সবসময় সিংহ, হাতি ইত্যাদি বন্য জন্তুর রূপ ধারণ করে আমার তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। এই প্রাণীটিকে হত্যা করে আমি বহু কষ্টে উপার্জিত এতদিনের তপস্যার ফল এইভাবে ব্যয় করব না। তাই আপনিই এই অশ্বকে ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ করুন। গালব প্রতর্দনকে আরও বলেন যে, এই অশ্বটি সম্পর্কে একটি দৈববাণীও আছে। সেই দৈববাণী থেকে আমি জেনেছি যে, এই অশ্বটি 'কু' অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর বলয়ের মধ্যে অবিশ্রান্ত ভাবে ভ্রমণ করতে পারবে। তাই অশ্বটির নাম হবে 'কুবল' বা 'কুবলয়'। দৈববাণী জানিয়েছে যে, কুবলয় কে রাজা প্রতর্দনই বশীভূত করে তাকে শান্ত করতে পারবেন এবং প্রতর্দনও সেই অশ্বের কারণে খ্যাতি লাভ করবেন। সেই দৈববাণীর কারণেই ঋষি গালব প্রতর্দনের কাছে কুবলয়কে নিয়ে উপস্থিত হন। কুবলয়কে বশীভূত করে রাজা প্রতর্দন কুবলাশ্ব অথবা কুবলয়াশ্ব নামে প্রসিদ্ধ হন।

[মার্কণ্ডেয় পু. ২০.৪১-৫৭]

কুবলয়াপীড় ঐরাবত কুলজাত একটি হস্তী। বাসুদেব-কৃষ্ণকে বধ করার জন্য কংস কুবলয়াপীড়কে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতেই কুবলয়াপীড়ের মৃত্যু হয় শেষ পর্যন্ত।

[মহা (গীতা প্রেস) ২.৩৮.২৯ নং শ্লোকের উত্তর দাক্ষিণাত্য অধিক পাঠ দ্র.; প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮০১]

☐ পুরাণগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে যে, একসময় কংস কৃষ্ণকে বধ করার জন্য মল্লযুদ্ধের প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। কৃষ্ণ ও বলরাম রণাঙ্গনে উপস্থিত হলে কংসের নির্দেশানুসারে অক্রূর 'কুবলয়াপীড়' নামক একটি মত্ত হস্তীকে সেইস্থানে নিয়ে আসেন। বাসুদেব-কৃষ্ণ হস্তীচালককে সেই স্থান থেকে সরে যেতে বললেন। কিন্তু হস্তীচালক রণাঙ্গণ থেকে সরে গেলেন না। উপরন্তু কৃষ্ণকে বধ করার জন্য মত্ত হাতীকে প্ররোচিত করলেন। কুবলয়াপীড় তার শুঁড় দিয়ে কৃষ্ণকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। ভগবান কৃষ্ণ অনায়াসেই নিজেকে ওই মত্ত হাতির কবল থেকে মুক্ত করলেন এবং হাতিটির লেজ ধরে ঘোরাতে লাগলেন। কুবলয়াপীড়ের সঙ্গে কৃষ্ণের ভয়ানক সংঘর্ষ হল। কৃষ্ণ হাতিটিকে মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। পতিত অবস্থায় কুবলয়াপীড় মাটিতে দাঁত ঘষতে লাগল এবং পুনরায় বাসুদেব-কৃষ্ণকে আক্রমণ করল। এই সময় কৃষ্ণ কুবলয়াপীড়ের দাঁত উপড়ে নিলেন। মত্ত হস্তী এবং হস্তীচালক দুজনেই শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হল।

[ভাগবত পু. ১০.৩৬.২৪, ২৫; ১০.৩৭.১৫; ১০.৪৩.১-১৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৩.১০০; বায়ু পু. ৯৮.১০১; বিষ্ণু পু. ৫.১২.২১; ৫.১৫.১১, ১৭; ৫.২০.২৩; ৫.২৯.৫]

কুবলয়াশ্ব *[দ্র. কুবলাশ্ব]*

কুবলাশ্ব ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বৃহদশ্বের পুত্র কুবলাশ্ব। ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, এই কুবলাশ্ব, শত্রুজিৎ, ঋতধ্বজ, প্রতর্দন, বৎস এবং কুবলয়াশ্ব ইত্যাদি নামেও খ্যাত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ৩.২০২.৫; (হরি) ৩.১৭২.৫; ভাগবত পু. ৯.৬.২১; ৯.১৭.৬; মৎস্য পু. ১২.৩১; বায়ু পু. ৮৮.২৮]

☐ ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে ধুন্ধু নামে এক দানব উতঙ্ক মুনির আশ্রমে উৎপাত করতে থাকলে, উতঙ্ক মুনি রাজা বৃহদশ্বকে ধুন্ধু-বধের প্রস্তাব দেন। কিন্তু বৃহদশ্ব তখন অস্ত্র পরিত্যাগ করে বানপ্রস্থে যাওয়ার উদ্যোগ করছিলেন। তিনি উতঙ্ক মুনিকে বলেন যে, তাঁর পুত্র কুবলাশ্ব ধুন্ধু নামক দানবকে বধ করে প্রজাদের রক্ষা করবেন। উতঙ্ক মুনির নির্দেশানুসারে বৃহদশ্ব, কুবলাশ্বকে ধুন্ধু-বধের আদেশ দেন।

কুবলাশ্ব তাঁর একুশ হাজার পুত্রদের সঙ্গে ধুন্ধুকে বধ করার জন্য গমন করলেন।

এইসময় জগতের কল্যাণের জন্য উতঙ্ক মুনির অনুরোধে ভগবান বিষ্ণু কুবলাশ্বের দেহে প্রবেশ করলেন। রাজা কুবলাশ্বও বিষ্ণুর তেজে তেজোদীপ্ত হয়ে উঠতে লাগলেন।

এদিকে ধুন্ধু নামে সেই দানব উতঙ্কের আশ্রমের কাছে মরুভূমিতে বালির নীচে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। কুবলাশ্বের পুত্ররা সেই বালি খনন করে বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে ধুন্ধুকে আঘাত করতে লাগল। তখন ধুন্ধু ক্রুদ্ধ হয়ে মুখ থেকে অগ্নি উদগার করতে লাগল এবং কুবলাশ্বের পুত্রদের সেই আগুনে দগ্ধ করে ফেলল। সেই সময় কুবলাশ্ব ধুন্ধুর সামনে উপস্থিত হলেন। ধুন্ধুর দেহ থেকে প্রচুর জল নির্গত হতে থাকলে তার সব তেজ কুবলাশ্ব পান করে ফেললেন। এরপর তিনি যোগবলে জল দ্বারাই ধুন্ধুর মুখস্থিত অগ্নিকে নির্বাপিত করলেন এবং ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা সেই ভয়ঙ্কর দানবকে দগ্ধ করে ফেললেন। ধুন্ধুকে বধ করার জন্য রাজা কুবলাশ্ব জগতে 'ধুন্ধুমার' নামে খ্যাত হলেন। ধুন্ধুর উৎপীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে ঋষি এবং দেবর্ষিরা কুবলাশ্বকে আশীর্বাদ করে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করেন।

মহাভারতে ও পুরাণগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে যে, কুবলাশ্বের পুত্রদের মধ্যে দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও চণ্ডাশ্ব—এই তিনজনই ধুন্ধুদানব বধের পর জীবিত ছিলেন। মৎস্য পুরাণে আবার বলা হয়েছে যে, কুবলাশ্বের তিনটি পুত্র ছিল। তাঁরা হলেন দৃঢ়াশ্ব, দণ্ড ও কপিলাশ্ব। অবশ্য ভাগবত পুরাণে 'চণ্ডাশ্বে'র পরিবর্তে 'ভদ্রাশ্ব' নামটি উল্লিখিত হয়েছে। বিষ্ণু পুরাণেও 'চণ্ডাশ্বে'র পরিবর্তে 'চন্দ্রাশ্ব' পাওয়া যায়।

[মহা (k) ৩.২০৪ অধ্যায়; (হরি) ৩.১৭৩ অধ্যায়; মৎস্য পু. ১২.৩২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.৩২; ২.৬৩.২৯; বায়ু পু. ৬৮.৩১; ৮৮.৪৮-৬১; ভাগবত পু. ৯.৬.২২-২৪; ৯.১৭.৬; বিষ্ণু পু. ৪.২.৩৯-৪২]

□ মার্কণ্ডেয় পুরাণে অবশ্য রাজা কুবলাশ্ব সম্পর্কিত একটি ভিন্ন কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, একসময় শত্রুজিৎ রাজার কাছে গালব মুনি এসে বললেন যে, তাঁর আশ্রমে এক ভয়ানক দৈত্য এসে উৎপাত করছে। গালব মুনি সেই দৈত্যকে বধ করার জন্য রাজাকে অনুরোধ করলেন। সেই মুহূর্তে আকাশ থেকে একটি অশ্ব পতিত হল। সেই সঙ্গে দৈববাণী হল যে, এই অশ্ব সমগ্র ভূ-বলয়ের মধ্যে গতাগতি করতে সক্ষম। এমনকী আকাশে, পাতালে, জলে বা পর্বতেও তার গতি অব্যাহত থাকবে। তাই এই অশ্ব 'কু-বল' নামে খ্যাত হবে। সেই সঙ্গে এও আকাশবাণী হল যে, শত্রুজিৎ রাজার পুত্র ঋতধ্বজ এই অশ্বে আরোহণ করে দানবকে বধ করবেন এবং কুবলাশ্ব বা কুবলয়াশ্ব নামে পরিচিত হবেন। গালব ঋষির সঙ্গে ঋতধ্বজ সেই অশ্বে আরোহণ করে তাঁর আশ্রমে গেলেন। যখন গালব মুনি সন্ধ্যা-উপাসনা করছিলেন, তখন সেই দৈত্য শূকরের রূপ ধারণ করে তাঁর আশ্রম আক্রমণ করল। কুবলাশ্ব সেই বরাহ-রূপধারী দানবকে বাণে বিদ্ধ করেন। আহত হয়ে দানবটি পালাতে থাকলে কুবলাশ্ব তাকে অনুসরণ করতে থাকেন। অশ্বারোহী কুবলাশ্ব যখন দানবের পিছু নিয়েছিলেন তখন দানব একটি বিশাল গর্তের মধ্যে পতিত হয়। কুবলাশ্বও সেই গর্তে পতিত হয়েছিলেন। গর্তে পতিত হয়ে কুবলাশ্ব বুঝতে পারলেন যে, তিনি পাতালে প্রবেশ করেছেন। সেইস্থানে কুবলাশ্বের সঙ্গে বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্বের কন্যা মদালসার সাক্ষাৎ হয়। একসময় পাতালকেতু নামক দানব মদালসাকে অপহরণ করে তাঁকে বিবাহ করবে বলে মনস্থ করে। কিন্তু কুবলাশ্ব বরাহ-রূপী পাতালকেতু দানবকে বধ করে গালব মুনি এবং অন্যান্য ঋষিদের রক্ষা করেন। মদালসাও দানবের হাত থেকে মুক্তি পান। কুবলাশ্বের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। পরবর্তীকালে বিক্রান্ত, সুবাহু, শত্রুমর্দন এবং অলর্ক নামে তাঁদের চারটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

[মার্কণ্ডেয় পু. ২০-২১ অধ্যায়; ২৫.৯; ২৬.৪, ৬, ১৩]

কুবীরা মহাভারতে ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত জম্বূখণ্ড বিনির্মাণ পর্বে প্রাচীন ভারতবর্ষের যেসব নদীগুলির নাম উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে কুবীরা একটি।

এটি সেই একটি পবিত্র নদী যার জল আর্য ও ম্লেচ্ছ উভয় জাতির মানুষ পান করতেন। অর্থাৎ এই নদী সকল মানুষের উপজীব্য ছিল।

নদীটির আধুনিক নাম বা ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

[মহা (k) ৬.৯.২৭; (হরি) ৬.৯.২৭]

পণ্ডিত Wilson তাঁর অনূদিত বিষ্ণুপুরাণে মহাভারতের ভীষ্মপর্বে বর্ণিত নদীগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, কুবীরা নদীটি কোনো কোনো পাঠে কুচীরা নামেও চিহ্নিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে কুবীরা এবং কুচীরাকে অভিন্ন বলেই মনে করেছেন Wilson.

[বিষ্ণু পু. (Wilson) খণ্ড ২, পৃ. ১৫০]

কুবের কুবের রাক্ষস এবং যক্ষদের অধিপতি এবং ধনসম্পদের দেবতা—

ধনানাং রাক্ষসানাঞ্চ কুবেরমপি চেশ্বরম্।

তিনি ছিলেন যক্ষদের রক্ষক এবং লোকপাল ও দিকপালদের মধ্যে একজন। রামায়ণে উল্লিখিত হয়েছে যে, কুবের উত্তর দিকের রক্ষক বা দিকপাল ছিলেন—

ধনেশস্তূত্তরাং দিশম্।

[মহা (k) ১২.১২২.২৮; ৫.১৫৬.১২;
(হরি) ১২.১১৯.২৮.৫.১৪৫.১২;
রামায়ণ ২.১৬.২৪]

☐ প্রায় এক হাজার বছর ধরে তপস্যা করার পর ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবতাদের বরে কুবের চতুর্থ লোকপালের পদ লাভ করেছিলেন—এমন কথা আছে রামায়ণে। মহাভারতেও একাধিকবার একথা উল্লিখিত হয়েছে। *[রামায়ণ ৭.৩.১৭;*
মহা (k) ৩.২৭৪.১৫; ৫.১৬.২৭;
(হরি) ৩.২২৮.১৫; ৫.১৬.২৭]

☐ রামায়ণ অনুসারে মহর্ষি পুলস্ত্যের পুত্র হলেন বিশ্রবা মুনি। তাঁর ঔরসে ভরদ্বাজমুনির কন্যা দেববর্ণিনীর গর্ভজাত পুত্র হলেন কুবের। বিশ্রবা মুনির পুত্র বলে পিতামহ পুলস্ত্য কুবেরের নামকরণ করেন—বৈশ্রবণ।

[রামায়ণ ১.২০.১৮; ৭.৩.১-৩]

☐ মহাভারতে অবশ্য কুবেরের পরিচয় রামায়ণের থেকে স্বতন্ত্র। কুবেরের পিতা এখানে বিশ্রবা নন।

মহাভারতের বনপর্বে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মার মানসপুত্র, মহর্ষি পুলস্ত্য তাঁর গো-নামে পত্নীর গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁর নাম বৈশ্রবণ।

এই বৈশ্রবণ পিতা পুলস্ত্যকে ত্যাগ করে পিতামহ ব্রহ্মার সেবা করতে লাগলেন। এইকারণে পুলস্ত্য ক্রুদ্ধ হলেন এবং নিজের দেহের অর্ধেক অংশ থেকে তাঁরই প্রতিরূপ সৃষ্টি করলেন। এই প্রতিরূপই 'বিশ্রবা' নামে খ্যাত হলেন। তবে মহাভারতে বিশ্রবা এবং বৈশ্রবণকে নিয়ে এই যে উপাখ্যানটি পাওয়া যায় তা যথেষ্ট সংশয়জনক। *[মহা (k) ৩.২৭৪.১২-১৪;*
(হরি) ৩.২২৮.১২-১৪]

☐ ভাগবত পুরাণে আবার উল্লিখিত হয়েছে যে, বিশ্রবার ঔরসে ইলবিলার গর্ভে কুবের জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[ভাগবত পু. ৪.১.৩৬; ৯.২.৩২]

☐ বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে অবশ্য বলা হয়েছে যে, বিশ্রবা ও দেববর্ণিনীর পুত্র বৈশ্রবণ। বৈশ্রবণের আকৃতি বিশাল, স্থূল ও লোহিত বর্ণের হওয়ায় বিশ্রবা বালকটির নামকরণ করেছিলেন —কুবের। 'কু' শব্দটির অর্থ কুৎসিত। আর 'বের' শব্দের অর্থ শরীর। অর্থাৎ কু-শরীরের জন্যই বৈশ্রবণের নামকরণ হয় কুবের।

[বায়ু পু. ৭০.৩৫-৪০;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৪৪-৪৬]

☐ পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, ঋদ্ধির গর্ভে কুবেরের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম নলকূবর।

মহাভারতে অবশ্য বলা হয়েছে যে, কুবেরের সেবায় তুষ্ট হয়ে স্বয়ং ব্রহ্মা কুবেরকে নলকূবর নামে একটি পুত্র দান করেছিলেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৪৬; বায়ু পু. ৭০.৪১;
মহা (k) ৩.২৭৪.১৬; (হরি) ৩.২২৮.১৬]

☐ স্বয়ং বিষ্ণু যখন রাম অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করলেন, তখন ব্রহ্মার আদেশে দেবতারা বানররূপী অনেক পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, রামকে সাহায্য করার জন্য। কুবের সেইসময় গন্ধমাদন নামে এক বানরের জন্ম দিয়েছিলেন বলে রামায়ণে উল্লিখিত হয়েছে—

ধনদস্য সুতঃ শ্রীমান্ বানরো গন্ধমাদনঃ ॥

[রামায়ণ ১.১৭.১২]

☐ কুবেরের সেবায় তুষ্ট হয়ে পিতামহ ব্রহ্মা কুবেরকে পুষ্পক রথ দান করলেন এবং তাঁর সঙ্গে মহাদেবের সখ্যতা সৃষ্টি করলেন। কুবেরের বসবাসের জন্য ব্রহ্মা রাজধানী হিসেবে লঙ্কানগরীও দান করলেন। কিন্তু বিশ্রবা কুবেরের ওপর ক্রুদ্ধ ছিলেন। তাই পিতাকে তুষ্ট করার জন্য কুবের পুষ্পোৎকটা, রাকা ও মালিনী এই তিন

অপ্সরাকে পরিচারিকা রূপে বিশ্রবার কাছে পাঠালেন। বিশ্রবার ঔরসে পুষ্পোৎকটার গর্ভে কুবেরের বৈমাত্রেয় ভাই রাবণ এবং মালিনীর গর্ভে বিভীষণ জন্মগ্রহণ করছিলেন।

বায়ু পুরাণে অবশ্য রাবণের মাতার নাম হিসেবে কৈকসী নামটি উল্লিখিত হয়েছে।

[রামায়ণ ৭.৩.১৯, ২৬; ১.২০.১৮; মহা (k) ৩.২৭৪.১৫-১৭; ৩.২৭৫.১-৭; (হরি) ৩.২২৮.১৫-১৭; ৩.২২৯.১-৭; বায়ু পু. ৭০.৪২]

☐ রাবণ পরবর্তীকালে লঙ্কার অধিকার প্রার্থনা করেন এবং কুবেরের কাছে তাঁর দূত প্রহস্তকে পাঠান। কুবের, প্রহস্তকে বলেন, তাঁর যা কিছু আছে—ভাই হিসেবে রাবণও তাঁর অধিকারী। পরে তিনি তাঁর পিতার কাছে এই বিষয়ে পরামর্শ চাইলে, বিশ্রবা কুবেরকে কৈলাসে গিয়ে বাস করার পরামর্শ দিলেন। কুবের কৈলাসে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। *[রামায়ণ ৭.১১.৩০-৪০]*

☐ পুরাণে অবশ্য উল্লিখিত হয়েছে যে, যক্ষরাজ কুবের কৈলাস পর্বতের নিকটে অবস্থিত অলকাপুরীতে বাস করতেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.১-২; মৎস্য পু. ১২১.২; বায়ু পু. ৬৯.১৯৬]

☐ একদিন হিমালয় পর্বতে তপস্যা করতে যাওয়ার সময় মহাদেবের পাশে দেবী পার্বতীকে কুবের দেখতে পান। বিস্মিত কুবের দেবীর পরিচয় জানার জন্য তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তাই কুবেরের একটি চক্ষু দগ্ধ হয়ে যায় এবং দেহ পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে। এই কারণে মহাদেব কুবেরের নাম দেন 'একাক্ষি-পিঙ্গল'।

[রামায়ণ ৭.১৩.১৩-২৪]

☐ মহাভারতে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মার বরে শক্তিশালী রাবণ, কুবেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। লঙ্কানগরী থেকে তিনি কুবেরকে বিতাড়িত করেন। কুবের তখন লঙ্কা পরিত্যাগ করে যক্ষ-রাক্ষস-কিন্নর-গন্ধর্বদের সঙ্গে গন্ধমাদন পর্বতে প্রবেশ করেন।

[মহা (k) ৩.২৭৫.৩২-৩৩; (হরি) ৩.২২৯.৩২-৩৩]

☐ রাবণ যখন শক্তিশালী হয়ে দেবতা-গন্ধর্ব-যক্ষ এবং ঋষিদের বধ করতে লাগলেন, তখন দেবতারাও রাবণকে বধ করবেন বলে মনস্থ করলেন। কুবের এই কথা জানতে পেরে রাবণের কাছে দূত পাঠালেন এই ভেবে যাতে সে সংযত হয় এবং দুষ্কর্ম থেকে বিরত হয়। দূত এসে রাবণকে কুবেরের বার্তা জানালেন এবং তার সাথে আরও বললেন—কুবের মহাদেবের বন্ধুত্ব লাভ করেছেন। একথা শুনে রাবণ ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বার্তাবহ দূতকেই হত্যা করলেন। এরপর রাবণ প্রথমে কুবেরের রাজ্য আক্রমণ করলেন। যক্ষদের সঙ্গে তাঁর ভয়ানক যুদ্ধ হল। যক্ষরা পরাস্ত হলে কুবের আপন অনুচর মণিভদ্রকে যুদ্ধে পাঠালেন। মণিভদ্রও যখন পরাজিত হল, তখন কুবের স্বয়ং যুদ্ধে এলেন। তাঁর বীরত্বে রাবণের মন্ত্রী সৈন্যরাও ভয়ে পালিয়ে গেল। অবশেষে রাবণ গদা দিয়ে কুবেরের মাথায় আঘাত করলেন এবং কুবেরের পুষ্পকরথ হরণ করলেন। আহত কুবেরকে পদ্ম প্রভৃতি নিধি-দেবতাগণ নন্দন বনে নিয়ে এসে সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলেন।

[রামায়ণ ৭.১৩.১৩-৩৬; ৭.১৫ অধ্যায়]

☐ মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাবণ, কুবেরের পুষ্পকরথ হরণ করলে কুবের তাঁকে অভিশাপ দিয়ে বলেন যে—এই রথ তোমাকে বহন করবে না, যিনি তোমাকে যুদ্ধে বধ করবেন, এই রথ তাঁকেই বহন করবে। আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আমাকে যখন অবজ্ঞা করেছ, তখন খুব শীঘ্রই তোমার মৃত্যু হবে। রাবণ কুবেরের সঙ্গে শত্রুতা করলেও রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ কুবেরকে অনুসরণ করতেন এবং তাঁর অনুগত ছিলেন। বিভীষণের প্রতি তুষ্ট হয়ে কুবের তাঁকে যক্ষ ও রাক্ষস সৈন্যের সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করলেন।

[মহা (k) ৩.২৭৫.৩৪-৩৭; (হরি) ৩.২২৯.৩৪-৩৭]

☐ মরুত্ত রাজা যখন যজ্ঞ করেছিলেন, তখন অনান্য দেবতাদের সঙ্গে কুবেরও যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ছিলেন। রাবণ সেইস্থানে উপস্থিত হলে কুবের ভীত হয়ে কৃকলাসের (গিরগিটি) রূপ ধারণ করেন। রাবণ চলে যাওয়ার পর কুবের গিরগিটিকে বর দিলেন যে, আজ থেকে তার মস্তক হবে সোনার মতো, দেখে মনে হবে যেন সোনা দিয়ে বাঁধানো হয়েছে।

[রামায়ণ ৭.১৮.৫; ৭.১৮.৩৩-৩৪]

☐ হনুমানকে যখন ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতারা বর দিয়েছিলেন, তখন কুবেরও বর দেন যে, অন্তত

তাঁর নিজের গদার আঘাতে হনুমানের মৃত্যু হবে না। অর্থাৎ কোনো দিন যদি এমনও হয় যে, কুবেরের সঙ্গে হনুমানের দ্বন্দ্ব হল, তখন তাঁর গদাঘাত হনুমানের ওপর কাজ করবে না, একথা নিশ্চিত করলেন কুবের। *[রামায়ণ ৭.৪১.১৬]*

□ মহাভারতের সভাপর্বে কুবেরের সভার একটি বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, কুবেরের সভাটি একশ যোজন লম্বা আর সত্তর যোজন চওড়া ছিল। আর সভাটি ছিল শ্বেত বর্ণের। সভার বিভিন্ন স্থানে মূল্যবান মণিরত্ন খচিত ছিল। যক্ষরাজ কুবেরের সভায় মহাদেবও অবস্থান করতেন। রম্ভা-মেনকা প্রমুখ অপ্সরা, চিত্রসেন, মণিভদ্র, চিত্ররথ প্রমুখ গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, কিন্নর ও বিদ্যাধরগণ, পিশাচগণ প্রমুখরা কুবেরের সভায় উপস্থিত থেকে তাঁর উপাসনা করতেন।

রাক্ষসগণ ও অনান্য পারিষদেরা মহাদেবের উপাসনা করতেন। এছাড়া সভায় কুবেরের বৈমাত্রেয় ভাই বিভীষণ এবং পুত্র নলকূবর উপস্থিত থাকতেন। শঙ্খ, পদ্ম প্রভৃতি অষ্টনিধিও কুবেরের সভায় অবস্থান করতেন দিব্য মূর্তি ধারণ করে। *[দ্র. নিধি]*

ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, দ্বারকা নির্মাণের সময় বাসুদেব কৃষ্ণকে কুবের পদ্ম, মহাপদ্ম, মৎস্য, কূর্ম, উদক, নীল, মুকুন্দ ও শঙ্খ—এই অষ্ট নিধি উপহার হিসেবে দান করেছিলেন।

[মহা (k) ২.১০ অধ্যায়; (হরি) ২.১০ অধ্যায়; ভাগবত পু. ১০.৫০]

□ কুবেরের বাসস্থানের কাছেই অবস্থিত যে সরোবরে কুবের বিহার করতেন, সেই সরোবরটি ক্রোধবশ নামে রাক্ষসেরা পাহারা দিতেন। দ্রৌপদী একসময় যে সৌগন্ধিক পদ্ম পুষ্প আনতে অনুরোধ করেছিলেন ক্রোধবশ নামক রাক্ষসদের দ্বারা রক্ষিত সেই সরোবরে সেগুলি দেখতে পান মধ্যম পাণ্ডব ভীম। দ্রৌপদীর জন্য সেই ফুল তুলতে গেলে, রাক্ষসরা তাঁকে বাধা দেয়। অবশেষে ভীম রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের প্রহার করে সরোবরের জল পান করেন এবং পদ্ম তুলে আনেন।

[মহা (k) ৩.১৫৩.২, ৮; ৩.১৫৪.৪, ১১, ২৪; (হরি) ৩.১২৭.২, ৮, ২০, ২৮, ৪১]

□ মহাভারতের অনুশাসনপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, একসময় অষ্টাবক্র মুনিও কুবেরের সভায় এসেছিলেন এবং প্রায় এক বছর কাল কুবেরের প্রাসাদেই অতিবাহিত করে নৃত্য ও গীতের আনন্দ উপভোগ করেন।

[মহা (k) ১৩.১৯.৪০-৪৭; (হরি) ১৩.১৮.৪০-৪৭]

□ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে কুবের দিব্য অস্ত্র প্রদান করেছিলেন বলে মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ৩.৯১.১৩; (হরি) ৩.৭৬.১৩]

□ ভাগবত পুরাণ অনুসারে বেণপুত্র পৃথুকে তাঁর রাজ্যাভিষেকের সময় ধনাধিপতি কুবের সোনার আসন উপহার দিয়েছিলেন।

[ভাগবত পু. ৪.১৫.১৪]

□ তারকাসুরের সঙ্গে যখন দেবতাদের যুদ্ধ হয়েছিল, তখন কুবেরও যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। ওই যুদ্ধের সময় কুবের মনুষ্যবাহিত রথে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৪৮.৮৪]*

কুবেরণি পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি কুবেরণির বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি অঙ্গিরার বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৬.৩২]

কুবেরস্থান প্রভাসক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র ক্ষেত্র। স্কন্দ পুরাণের প্রভাসখণ্ডে এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিষয়ক কাহিনী হয়েছে।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র) ২৯০.১-৪০]

কুবেরালয় দেবীভাগবত পুরাণ অনুসারে দেবী ভগবতী কুবেরালয়ে দেবী নিধি নামে বিরাজমানা। *[দেবী ভাগবত পু. ৭.৩০.৮১]*

কুব্জা কংসের অঙ্গরাগ প্রস্তুতকারী এক রমণী। তাঁর পিঠে বিশাল কুঁজ থাকায় তিনি কুব্জা নামেই পরিচিত ছিলেন। কুব্জার দেহ তিন জায়গায় ঈষৎ বাঁকা ছিল বলে তিনি ত্রিবক্রা বা অনেকবক্রা নামেও অভিহিত হন। তবে আমরা অনুমান করতে পারি কুব্জা, ত্রিবক্রা—এই নামগুলি তাঁর পিতা-মাতার দেওয়া নাম নয়। কোনো দুর্ঘটনায়, বা অন্য যেভাবেই তাঁর দেহে বক্রতা এসে থাকুক, সেই বক্রতার সঙ্গে সঙ্গেই লোকমুখে এক নামগুলির জন্ম হয়েছে। পুরাণে অবশ্য কুব্জার আসল নামটি উল্লিখিত হয়নি। তবে এ বিষয়ে আমরা প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকার ভাসের শরণাপন্ন হতেই পারি যিনি 'বালচরিত' নাটকে কুব্জা ইত্যাদি

লোকমুখের উপহাসের সম্ভাষণ দুরে সরিয়ে রেখে এই নারীর নাম উল্লেখ করেছেন মদনিকা।

তবে পুরাণের কথকঠাকুররা ভাসের মতো সহৃদয় ভাবে কুব্জা-ত্রিবক্রার প্রকৃত নাম অনুসন্ধানের বিশেষ চেষ্টা করেননি। তাঁদের মূল লক্ষ্য কৃষ্ণ জীবনী রচনা, কুব্জার কোনো মধুর নামকরণের প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেননি। ফলে কুব্জাকে আমাদের কুব্জা ত্রিবক্রা নামেই চিনতে হবে পুরাণকারের বিবরণ অনুযায়ী। যাই হোক, কুব্জার কাহিনীতে প্রবেশ করার আগে একটু অন্য কথায় আসি।সনাতন গোস্বামী মাথুর হরিবংশ থেকে একটি কাহিনীর অবতারণা করেছেন। এখানে বলা হয়েছে যে, কুব্জা পূর্বজন্মে এক রাজার মেয়ে ছিলেন। দেবর্ষি নারদের মুখে কৃষ্ণের রূপ ও গুণের কথা শুনে সেই রাজকন্যা কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হন। এদিকে রাজা তাঁর কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্রের খোঁজ করছেন। কন্যার মন বোঝার জন্য দেবর্ষি যখন রাজপুত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন তখন বুঝতে পারলেন যে, মেয়েটি কৃষ্ণকেই ভালবাসে। অধিগুণসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি এই প্রেমের পরিণতি যে একেবারেই অনিশ্চিত, নারদ বারবার সে-কথা রাজকন্যাকে বললেন। কিন্তু রাজকন্যা যখন নিজের সংকল্প থেকে কিছুতেই নিরস্ত হলেন না, নারদ তখন তাঁকে তপস্যা করতে বললেন। রাজকন্যা যখন কঠোর তপস্যায় রত, তখন একদিন দৈববাণী হল—পরজন্মে কৃষ্ণকে তিনি পতিরূপে লাভ করবেন, কিন্তু তিনি নিজে কুব্জা হয়ে জন্মাবেন।

সেই দৈববাণী সত্য করেই সেই রাজকন্যা কংসের এক মন্ত্রীর ঘরে শরীরের সেই বিরূপতা নিয়ে জন্মালেন এবং এক সময়ে কংস তাঁকে নিযুক্ত করলেন অঙ্গরাগ প্রস্তুত করার কাজে। বৈষ্ণব দার্শনিকরা কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা রাধা প্রভৃতি গোপরমণীদের কিংবা কৃষ্ণের মহিষীদের নিয়ে যেমন আলোচনা করেছেন, ঠিক তেমনি খুব স্বল্প পরিসরে হলেও কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা এই নারীর অস্তিত্বকেও প্রতিষ্ঠা দেবার যথাযথ চেষ্টা করেছেন তাঁরা। কুব্জার পূর্বজন্মের কাহিনীর অবতারণাও ঘটেছে সেই ভাবনা থেকেই।

পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, বৃন্দাবন থেকে মথুরায় পৌঁছবার পরে কৃষ্ণ-বলরাম যখন নগর পরিভ্রমণে বেরোলেন, তখন মথুরার রাজপথে কুব্জাকে কৃষ্ণ দেখলেন। কুব্জা তখন চন্দন, কুঙ্কুম এবং আরও অনান্য সুগন্ধীদ্রব্য থালায় সাজিয়ে চলেছে। তার বক্র শরীর তাকে যত দ্রুত সম্ভব লোকচক্ষুর অন্তরালে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে বলেই বোধ করি কুব্জা যত দ্রুত সম্ভব পথ চলার চেষ্টা করে। কিন্তু সে কুব্জা বলেই সে চেষ্টাও তার সফল হয় না পুরোপুরি, এঁকে বেঁকে বড়ো কুটিল ভঙ্গিতে পথ চলে সে। কুব্জাকে এমন বিচিত্র ভঙ্গিতে সুগন্ধের উপহার নিয়ে পথ চলতে দেখে কৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে? কার জন্য এই সুগন্ধের বাহার সাজিয়ে নিয়ে চলেছ?

কা ত্বং বরোর্বেতদুহানুলেপনং
কস্যাঙ্গনে বা কথয়স্ব সাধু নঃ।

তখন কুব্জা বললেন যে, আমি দাসী, আমি এই অনুলেপন-অঙ্গরাগ কর্মে অতি-নিপুণ বলে কংস আমাকে খুব খাতির করেন। আর আমার চেহারার জন্য লোকে আমাকে ত্রিবক্রা বলে ডাকে—

দাস্যস্ম্যহং সুন্দর কংসসম্মতা
ত্রিবক্রনামা হ্যনুলেপকর্মণি।

কুব্জাকে কৃষ্ণ যে সাদর সম্ভাষণ করলেন, তাতে কুব্জা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। রাজপথের মধ্যে তিনি একথা বলতে পারলেন না যে, আমি তোমারই দাসী, আবার তিনি যে কংসের দাসী তাও বললেন না। কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে হেসে কুব্জা বললেন—আমার নিজের হাতে বানানো এই অঙ্গরাগ কংসের অতিপ্রিয়, তোমরা দুজন ছাড়া কেই বা এই মহার্ঘ্য অনুলেপনের উপযুক্ত হতে পারে—

মন্তাবিতং ভোজপতেরতিপ্রিয়ং বিনা
যুবাং কো'ন্যতমস্তদর্হতি।

কৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্যে, রসিকতাবোধ ও সহাস্য আলাপচারিতায় ত্রিবক্রা কুব্জা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি কৃষ্ণ-বলরাম দুজনেরই হাতে তুলে দিলেন চন্দনাগুরু-কুঙ্কুমের অঙ্গরাগ—

ধর্ষিতাত্মা দদৌ সান্দ্রমুভয়োরনুলেপনম্।

কুব্জার দেওয়া অঙ্গরাগে কৃষ্ণ-বলরাম খুব সুন্দর করে সাজলেন। হলুদ বর্ণের যত অঙ্গরাগ ছিল সেগুলো নিজের গায়ে-মুখে কৃষ্ণ চিত্রিত করলেন, আর বলরাম গ্রহণ করলেন কৃষ্ণবর্ণের অঙ্গরাগ। গাত্রবর্ণের সঙ্গে অঙ্গরাগের এই বৈপরীত্যই কৃষ্ণ-বলরামকে উন্মুক্ত রাজপথের মধ্যে পরম দর্শনীয়

করে তুলল। কংস রাজার জন্য কল্পিত প্রসাধন যেভাবে কৃষ্ণের হাতে কুব্জা তুলে দিয়েছিলেন, তাতে কৃষ্ণ খুব খুশি হলেন। তিনি ঠিক করলেন যে, কুব্জা যেভাবে তাঁকে আপ্যায়িত করলেন, তার কিছু প্রতিদান তিনি দেবেন। তিনি কুব্জার বক্র শরীরটি সমান করে দেবেন বলে স্থির করলেন—

ঋজ্বীং কর্তুং মনশ্চক্রে দর্শয়ন্ দর্শনে ফলম্।

কৃষ্ণ হঠাৎই নিজের পা-দুটি দিয়ে কুব্জার দুই পায়ের অগ্রভাগ চেপে ধরলেন এবং অন্যদিকে হাত দিয়ে তাঁর চিবুকটি ধরে কুব্জার সমস্ত দেহ ওপরের দিকে টানতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ত্রিবক্রা-কুব্জা সুন্দরী রমণীতে পরিণত হল। তাঁর চেহারা হয়ে উঠল ঋজু, সমান এবং সেই শরীরে রমণীর উচ্চাবচ শরীর-সংস্থানগুলি যথোচিত ভাবে প্রকট হয়ে উঠল—

সা তদর্জুসমানাঙ্গী বৃহচ্ছ্রোণিপয়োধরা।

কুব্জার চেহারা ঠিক হয়ে যেতেই কৃষ্ণ চলে যাওয়ার উদ্যোগ করলেন। তখনই কুব্জা গমনোদ্যত কৃষ্ণের উত্তরীয়ের প্রান্ত ধরে ডাকলেন, তাঁর মুখে স্মিতহাসি, আত্মনিবেদনের লাস্যময়ী ব্যঞ্জনা—উত্তরীয়ান্তমাকৃষ্য স্ময়ন্তী জাতহৃচ্ছয়া স্মিত হাসি হেসে কুব্জা কৃষ্ণকে তাঁর গৃহে যাওয়ার জন্য অনুনয় করলেন—এত সহজে এই রাজপথে তোমায় ছেড়ে যাই কি করে? বীর! তুমি আমার ঘরে চল—

এহি বীর গৃহং যামো ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে।

এখানে কুব্জা রমণীর আচরণ কিছুটা গণিকা সুলভ হলেও আমরা তাঁকে গণিকা বলতে পারছি না। তাঁর কারণ বৈষ্ণব দার্শনিকরা বলেছেন যে, কুব্জা হলেন ভূশক্তির অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতীক। আর কুব্জার পিঠের কুঁজ, কংস ইত্যাদি অসুর-দানবের অত্যাচারের ফল-প্রতীক। কৃষ্ণের উত্তরীয়ের প্রান্ত ধরে কুব্জা যে কৃষ্ণকে ডাকলেন, বৈষ্ণব দার্শনিকরা বলছেন যে, ভূ-শক্তি-স্বরূপা কুব্জা অসুর-দানবের অত্যাচারে ভগবান বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের কাছে সহায়তা চেয়েছেন। আর কুব্জার দেহের বক্রতা দূর করে তাকে ঋজুতা প্রদান করা—কংস বধ করে মথুরায় শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রতীক মাত্র।

কুব্জার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও কৃষ্ণ সেদিন তাঁর সঙ্গে তাঁর ঘরে যেতে অপারগ ছিলেন। তাঁর কংসবধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি এখনও। তবু সরাসরি মুখের ওপর 'যেতে পারব না' বলেননি কৃষ্ণ। কৃষ্ণ তাঁকে বললেন—তোমার ঘরে নিশ্চয় একদিন যাব। পুরুষ মানুষের মনের ব্যথা দূর করতে তোমার ঘরটাই তো উপযুক্ত—

এষ্যামি তে গৃহং সুভ্রু পুংসামাধি-বিকর্ষণম্।

তাছাড়া বৃন্দাবন থেকে এসে মথুরায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, ঘর নেই, থাকবার জায়গা নেই। আমার মতো পথিকের তুমিই তো পরম আশ্রয়—

সাধিতার্থো'গৃহাণাং নঃ পান্থানাং ত্বং পরায়ণম্।

কিন্তু যে কাজের জন্য এসেছি সেই কাজ সমাপ্ত করে তোমার ঘরে আসব। এই কথা বলে কৃষ্ণ কুব্জার কাছ থেকে তখনকার মতো বিদায় নিলেন।

তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। কংসবধ হয়ে গেছে, মথুরায় রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে গিয়ে উগ্রসেন আবারও প্রতিষ্ঠিত রাজপদে। কৃষ্ণ তখন গুরু সান্দীপনীর আশ্রম থেকে বিদ্যাশিক্ষা সাঙ্গ করে ফিরে এসেছেন এবং জরাসন্ধ তখনও মথুরা আক্রমণ করেননি। সেইসময় কৃষ্ণ বৃষ্ণিদের মন্ত্রী তথা নিজের পরম সখা, ভক্ত উদ্ধবকে সঙ্গে নিয়েই সৈরিন্ধ্রী-কুব্জার বাড়ীতে পৌঁছলেন। আজ তাঁর সময় হয়েছে, তিনি কুব্জার সেদিনের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছেন, আরও বৃহত্তর ব্যস্ততার পরিসরে প্রবেশ করার আগে। কুব্জার ঘর-বাড়ীর একটি বর্ণনা দিয়েছেন পুরাণের কথক, তা থেকে শুধু মথুরার এই বিশিষ্ট সৈরিন্ধ্রী সুন্দরীর শুধু বিত্ত নয়, জীবনচর্যারও ইঙ্গিত মেলে কিছু। কুব্জার ঘরের আসবাবপত্র যেমন মূল্যবান, তেমনি ঘরের সাজসজ্জা। সুন্দর করে সাজানো দুগ্ধফেননিভ শয্যা, তার অদূরেই একটি মহার্ঘ্য উচ্চাসন। ধূপ ও মাল্য-গন্ধে ঘরটি আমোদিত ছিল। কুব্জার ঘরের আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, অনান্য মূল্যবান উপকরণের সঙ্গে বিভিন্ন কামোদ্দীপক সুরতবন্ধের চিত্রকলা দিয়ে গৃহের অভ্যন্তর সজ্জিত ছিল—

মহার্হোপস্করৈরাঢ্যং কামোপায়োপবৃংহিতম্।

উদ্ধবকে সঙ্গে নিয়ে সেই ঘরে আজ এসেছেন কৃষ্ণ, সৈরিন্ধ্রীর সেদিনের সকাম আমন্ত্রণে সারা দিতে—

সৈরিন্ধ্র্যাঃ কামতপ্তায়াঃ প্রিয়মিচ্ছন্ গৃহং যযৌ।

কৃষ্ণের আগমনে ত্রিবক্রা ব্যস্ত হয়ে উঠল। কুব্জার পরিচারিকা-সখীরা কৃষ্ণ ও উদ্ধবকে

অভ্যর্থনা জানালেন। কৃষ্ণ এসে সেই দুগ্ধফেননিভ শয্যার ওপর বসলেন। উদ্ধব উচ্চাসন স্পর্শ করে ত্রিবক্রার আতিথেয়তা স্বীকার করলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণের সম্মানে তিনি ভূমি-আসনেই বসলেন।

কুব্জা মূল্যবান অলঙ্কারে ও বস্ত্রে নিজেকে সজ্জিত করে কৃষ্ণের সামনে উপস্থিত হলেন। কুব্জার হাত ধরে কৃষ্ণ তাঁকে অন্তর্গৃহের শয্যায় নিয়ে গেলেন এবং রমণে প্রবৃত্ত হলেন।

আসলে কুব্জার গৃহের সাজসজ্জা দেখে তাকে শুধুই প্রসাধিকা বা সৈরিন্ধ্রী বলে মনে হয় না। তার আচরণে, অন্তর্গৃহের সাজসজ্জায় গণিকাসুলভ ভাবটিই ফুটে উঠেছে।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের দার্শনিকরা অবশ্য বলেছেন যে, কুব্জার ভালবাসায় কোনো গভীরতা নেই। কৃষ্ণ যে তার ঘরে এসেছেন, কৃষ্ণের মতো এমন একজন উচ্ছল, বিরাট পুরুষকে দেখে কুব্জার হৃদয়ে যে প্রেমভাবের সঞ্চার হয়েছে তা কৃষ্ণের সঙ্গে সম্ভোগসুখ নিবৃত্ত হবার পরেই শিথিল হয়ে যাবে। কুব্জা কৃষ্ণকে কামনাও করেছেন সেইভাবে। প্রথম দর্শনের দিনেই কুব্জা হৃদয়ের সমস্ত আকুতি দিয়ে কৃষ্ণকে বলেছিলেন—প্রিয়তম, শুধু কটা দিন আমার ঘরে থাক—

সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ দিনানি কতিচিন্ময়া।

কৃষ্ণকে কুব্জা ব্রজরমণীদের মতো করেও চাননি, তাঁর দাসীত্বও মেনে নেননি, আবার সেবাও চাননি। এমনকী কৃষ্ণের সুখও বড়ো করে দেখার দৃষ্টি বা গভীর প্রণয় নেই তাঁর মধ্যে। কুব্জা নিজের অঙ্গজ কামনা তৃপ্ত করতে চেয়েছেন। কৃষ্ণ তার সেই আকাঙ্ক্ষাটুকু পূরণ করেই চলে গেছেন। কুব্জার জন্য তাঁর কোনো দায় নেই। কৃষ্ণ তাঁর প্রার্থনাটুকু পূরণ করেছেন। কুব্জার গৃহে কৃষ্ণ এসেছেনও লোকাচার রক্ষা করে, বৃষ্ণিদের প্রবর মন্ত্রী ও সখা উদ্ধবকে সঙ্গে করে।

মহামতি রূপগোস্বামী কৃষ্ণজীবনের বিভিন্ন প্রেমের স্বরূপ বিচার করে 'সাধারণী রতি' নামে একটি পৃথক বর্গ সৃষ্টি করেছেন, শুধুমাত্র কুব্জার কারণেই। কুব্জা, রাধা-চন্দ্রাবলীদের মতো নিজেকে কৃষ্ণপ্রেমে বিলীন করে দেননি, আবার রুক্মিণী-সত্যভামার মতো পত্নীসুলভ প্রেমের গভীরতাও তাঁর নেই। আবার কুব্জা গণিকাসুলভ আচরণ করলেও তাঁকে গণিকাও বলা যায় না। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনচর্চা যেমনই হোক, কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর আচরণটুকুকে একেবারে সস্তা গণিকাবৃত্তি বলে অমর্য্যাদা করার কোনো উপায় নেই।

তাই তাঁর প্রেমের পর্যায় 'সাধারণীরতি'।

রূপগোস্বামী তাঁর রসগ্রন্থ উজ্জ্বলনীলমণিতে সাধারণী রতির সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন—ভগবান শ্রীহরির প্রতি এখানে প্রেম তত গভীর নয়, কিন্তু তাঁর সম্ভোগবাসনা যদি রমণীর স্বসুখবাসনাই শুধু পূরণ করে, সেই রতির নাম 'সাধারণীরতি'। কৃষ্ণকে দেখার পর কুব্জার মনে সম্ভোগেচ্ছা তৈরি হয়েছে, কিন্তু প্রেমের মধ্যে গভীর ঘনত্ব (অসান্দ্রত্বাৎ) নেই বলে কুব্জার আপন সম্ভোগবাসনা তৃপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর রতিও ক্রমে কমে কমে যাবে—

এতস্যা হ্রাসতো হ্রাস স্তন্ধেতুত্বাদ্রতেরপি।

অন্যদিকে স্বেচ্ছায় কৃষ্ণ কুব্জার মতো রমণীর প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন বলেই হয়তো কুব্জার চরিত্রটি এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

[ভাগবত পু. ১.৪২.১-১২; ১০.৪৮.১-১০; পূর্বোক্ত ভাগবত শ্লোকের ওপর সনাতন গোস্বামীকৃত বৈষ্ণবতোষণী টীকা দ্রষ্টব্য; বিষ্ণু পু. ৫.২০.১-১১; উজ্জ্বলনীলমণি (কাব্যমালা), স্থায়িভাব প্রকরণ, ৩৯-৪১, পৃ. ৪০৮]

কুব্জাম্রতীর্থ মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত একটি তীর্থ।

[মৎস্য পু. ২২.৬৬]

কুমন বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, দক্ষিণাপথের অন্তর্ভুক্ত জনপদগুলির মধ্যে কুমন একটি।

[বায়ু পু. ৪৫.১২৪]

কুমার১ *[দ্র. স্কন্দ কার্তিকেয়]*

কুমার২ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবরা যেসব রাজাদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কলিঙ্গরাজ কুমার একজন।

[মহা (k) ৫.৪.২৪; (হরি) ৫.৪.২৫]

কুমার৩ মহাভারতের সভাপর্বে দু-বার 'কুমার'-এই জনপদটির নাম উল্লিখিত হয়েছে। মহাভারতে বলা হয়েছে যে, ভীমসেন যখন দিগ্বিজয়ে যান তখন তিনি কুমারদেশের রাজা শ্রেণীমানকে জয় করেছিলেন।

আবার সহদেব যখন দক্ষিণ দিক বিজয় করতে গিয়েছিলেন, তখন নররাষ্ট্র ও কুন্তিভোজ জয় করার সময় জনৈক শ্রেণীমান রাজাকে জয় করার সংবাদ সভাপর্বেই আছে। এই শ্রেণীমান কুমার

দেশের রাজা ছিলেন কি না, সেকথা অবশ্য শ্লোকে উচ্চারিত হয়নি। তবে এই দুই শ্রেণীমানকে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলেই মনে হয়।

[মহা (k) ২.৩০.১; ২.৩১.৫-৬;
(হরি) ২.২৯.১; ২.৩০.৫-৬]

□ পণ্ডিত K.C. Mishra এই কুমার জনপদটিকে উড়িষ্যার গঞ্জাম নামে একটি গ্রামের কাছাকাছি অবস্থিত বলে মনে করেছেন।

[TIM (K.C. Mishra), p. 104]

□ বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের একটি পাঠে উল্লিখিত হয়েছে যে, কুমার জনপদটি গঙ্গা নদীর জলধারায় প্লাবিত হত।

[বায়ু পু. ৪৭.৫২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৫৫]

□ পণ্ডিত V.S. Agrawala কুমারকে উত্তর প্রদেশের গাজীপুরেই চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, কুমার কার্তিকেয়র পুজো করা হত এই অঞ্চলে। সম্ভবতঃ সেই কারণেই এই স্থানটির নাম হয়েছে কুমার।

[Bharat-Sabitri, V.S. Agrawala, Vol-I, P. 139]

□ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যে যে জনপদগুলি ধন-সম্পদ দান করেছিল, সেইসব জনপদগুলির মধ্যে কুমার একটি।

[মহা (k) ২.৫২.১৪; (হরি) ২.৫০.১৪]

কুমার৪ পঞ্চাল দেশের রাজা এবং যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক। দোণাচার্যের সঙ্গে পঞ্চালরাজ কুমারের প্রবল সংঘর্ষ হয়। দ্রোণাচার্যের হাতে তিনি নিহত হন।

[মহা (k) ৭.১৬.২১-২৫; (হরি) ৭.১৪.২১-২৫]

কুমার৫ স্কন্দ-কার্তিকেয়র সঙ্গে যখন দেবরাজ ইন্দ্রের সংঘর্ষ হয়েছিল, তখন ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে কার্তিকেয়র দেহ থেকে বহু সংখ্যক বিচিত্রমুখী দেবতা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা স্কন্দ - কার্তিকেয়ের পার্ষদ হিসেবেই পরিচিত হন। কুমার-কার্তিকেয় থেকে এঁরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে কুমারগণ নামেই তাঁরা প্রসিদ্ধ হন।

[মহা (k) ৩.২২৮.১; (হরি) ৩.১৯০.১]

□ এই কুমারগণ ভয়ংকর আকৃতি ধারণ করে গৃহস্থ বালকদের হরণ করত বলে মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ৩.২৩০.৩২; (হরি) ৩.১৯২.৩২]

কুমার৬ গরুড়ের পুত্রদের মধ্যে কুমার একজন।

[মহা (k) ৫.১০১.১৩; (হরি) ৫.৯৪.১৩]

কুমার৭ ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু পুরাণ অনুসারে হব্য (বিষ্ণু পুরাণ মতে ভব্য) শাকদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তিনি শাকদ্বীপকে সাতটি বর্ষ বা খণ্ডে বিভক্ত করে ওই প্রত্যেকটি বর্ষ তাঁর পুত্রদের নামানুসারে নামকরণ করেন।

হব্যর (অন্য মতে ভব্য) পুত্র কুমার। কুমারের নামাঙ্কিত বর্ষটি কৌমার-বর্ষ নামে খ্যাত।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.১৭-১৮;
বায়ু পু. ৩৩.১৬; বিষ্ণু পু. ২.৪.৬০]

কুমার৮ একজন নাগ। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কুমার একজন। [বায়ু পু. ৬৯.৭১]

কুমার৯ পুরাণগুলিতে বলা হয়েছে যে, কুমার একজন প্রজাপতি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১.৫৪; বায়ু পু. ৬৫.৫৩]

কুমারক একজন কৌরব্যবংশীয় নাগ। জনমেজয়ের সর্পসত্রের অগ্নিতে যেসব নাগ দগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কুমারক একজন।

[মহা (k) ১.৫৭.১২; (হরি) ১.৫২.১৩]

কুমারকোটিতীর্থ মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত অন্যতম পবিত্র তীর্থ।

[মহা (k) ৩.৮২.১১৭; (হরি) ৩.৬৭.১৩৫]

কুমারকোশলতীর্থ বায়ু পুরাণে একটি তীর্থ বলে উল্লিখিত হয়েছে। [বায়ু পু. ৭৭.৩৭]

কুমারধারা একটি নদী-তীর্থ। ব্রহ্মসরোবর থেকে উৎপন্ন এই নদীতে স্নান করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

[মহা (k) ৩.৮৪.১৪৯-১৫০;
(হরি) ৩.৬৯.১৪৯-১৫০]

□ কর্ণাটকের বেলারী জেলার অন্তর্গত পশ্চিমঘাট পর্বতের সুব্রহ্মণ্য বা পুষ্পগিরি নামক অংশ থেকে কুমারধারা নদীর উৎপত্তি। এই নদীর তীরেই কুমারস্বামী তীর্থের অবস্থান।

[EAIG (Kapoor) p. 401]

কুমারিকা মহাভারতে উল্লিখিত একটি তীর্থ। দেবরাজ ইন্দ্রের মাহাত্ম্যধন্য এই তীর্থস্থান দর্শনে মানুষ ইন্দ্রলোক লাভ করে। কুমারিকা তীর্থের কাছেই রেণুকা নামে আর একটি তীর্থস্থান আছে।

[মহা (k) ৩.৮২.৮১; (হরি) ৩.৬৭.১০০]

□ স্কন্দ পুরাণে কুমারিকাতীর্থ সম্পর্কে একটি কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা ভরতের পুত্রের নাম ছিল শতশৃঙ্গ। এই শতশৃঙ্গের সাতটি

পুত্র এবং কুমারিকা নামে একটি কন্যা ছিল। পূর্বজন্মে কুমারিকা ছিল একটি ছাগী। এদিক-ওদিক ঘুরতে-ঘুরতে ছাগীটি মহাসাগরের নিকটবর্তী একটি গভীর বনভূমিতে পথ হারায়। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ছাগীটি শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারায়। তার দেহের নিম্নভাগ মস্তক থেকে ছিন্ন হয়ে মহাসাগরের জলে পড়লেও মস্তকটি বন্য লতাগুল্মে আটকে থেকে যায়। মহাসাগর-সঙ্গমের পুণ্যতীর্থের জলে তার দেহটি পতিত হওয়ার কারণে পরজন্মে সে রাজার মেয়ে হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। মহাসাগর সঙ্গমে শুধুমাত্র ছাগীর দেহটির নিম্নভাগ পতিত হয়েছিল। কিন্তু মস্তকটি পড়েনি। ফলে তার দেহের বাকি অংশ মুক্তিলাভ করলেও মস্তকটি মুক্তিলাভ করেনি। এই কারণেই কুমারিকার জন্ম হয়েছিল ছাগমুণ্ডধারী এক নারীরূপে। এরপর কুমারিকা তাঁর পূর্বজন্মের স্মৃতি ফিরে পায় এবং সেই সাগর সঙ্গমে ফিরে গিয়ে অস্থিসর্বস্ব ছাগমুণ্ডটি উদ্ধার করে তার যথার্থ সৎকার করে। এরপর সাগরসঙ্গমের সেই বিশেষ স্থানটিতে শিবের আরাধনা করে কুমারিকা বর লাভ করে। শিবের আশীর্বাদে সেই সময় থেকেই ওইস্থানে মহাদেব বর্করেশ লিঙ্গরূপে সর্বদা অবস্থান করেন। আর মহীসাগর সঙ্গমের সেই স্থানটিই রাজকন্যা কুমারিকার নামে কুমারিকা তীর্থ নামে পরিচিত হয়।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা খণ্ড) ৩৯.৫৭-১০৬]

□ ভারতবর্ষের দক্ষিণতম স্থলভাগ। এখানে চন্দ্রতীর্থ নামে আর একটি তীর্থ রয়েছে। কুমারিকা তীর্থটি জলবেষ্টিত, এটি শ্রাদ্ধকার্যের জন্যও অত্যন্ত উৎকৃষ্ট।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.১১; ২.১৩.২৮; বায়ু পু. ৭৭.২৮; বামন পু. ১৩.১১]

□ কুমারিকা অন্তরীপ বা Cape Comorin। এখানে কুমারিকা দেবীর একটি মন্দির আছে।

[GDAMI (Dey) p.107; GAMI (Sircar) p.22]

কুমারী$_{১}$ পৌরাণিক শুক্তিমান পর্বতের গাত্র থেকে যেসব নদীগুলির উৎপত্তি হয়েছিল, কুমারী সেগুলির মধ্যে একটি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৩৮; মৎস্য পু. ১৬৩.৮৫; বিষ্ণু পু. ২.৩.১৩]

কুমারী$_{২}$ পৌরাণিক শাকদ্বীপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী। *[বায়ু পু. ৪৯.৯২; বিষ্ণু পু. ২.৪.৬৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৯.৯৬]*

কুমারী$_{৩}$ অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। কুমারী সেই মাতৃকাদের মধ্যে অন্যতম।

[মৎস্য পু. ১৭৯.২২]

কুমারী$_{৪}$ দেবী ভগবতী মায়াপুরী নামক তীর্থে কুমারী নামে বিরাজমানা। *[মৎস্য পু. ১৩.৩৪]*

কুমারী$_{৫}$ কেকয়রাজ কন্যা কুমারী। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন তাঁকে বিবাহ করেন। কুমারীর গর্ভে ভীমসেনের প্রতিশ্রবা নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[মহা (k) ১.৯৫.৪৩; (হরি) ১.৯০.৫৩]

কুমারী$_{৬}$ ধনঞ্জয় নামে একজন নাগ ছিলেন। তাঁর পত্নীর নাম কুমারী।

[মহা (k) ৫.১১৭.১৭; (হরি) ৫.১০৮.১৭]

কুমারী$_{৭}$ স্কন্দ-কার্ত্তিকেয়র দেহ থেকে অসংখ্য ভয়ানক দর্শন গর্ভস্থ-শিশু ভক্ষণকারী দেবীর উৎপত্তি হয়েছিল, তাঁরাই কুমারী নামে খ্যাত। স্কন্দ-কার্ত্তিকেয়র দেহ থেকে উৎপন্ন কুমারগণের পত্নী কুমারীগণ।

[মহা (k) ৩.২৩০.৩১; (হরি) ৩.১৯২.৩১]

কুমুথি ব্রহ্মা যখন গয়াসুরের দেহের উপর যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, তখন সেই যজ্ঞে যাঁরা ঋত্বিক হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কুমুথি একজন।

[বায়ু পু. ১০৬.৩৪]

কুমুদ$_{১}$ ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম পার্ষদ। ভগবান বিষ্ণু যখন বামনরূপে অসুররাজ বলির কাছ থেকে তিন পদ পরিমাণ ভূমি প্রার্থনা করেন, তখন অন্যান্য অসুরবীরদের আপত্তি সত্ত্বেও বলি তাঁর সেই প্রার্থনা পূরণ করলেন। এরপর ভগবান বিষ্ণু বিশাল ত্রিবিক্রম মূর্তি ধারণ করলেন। তাঁর তিন পদে ত্রিলোক ব্যাপ্ত হল। অসুররাজ বলি রাজ্যচ্যুত হলেন। ভগবান বিষ্ণু ছলনা করে বলির সর্বস্ব হরণ করলেন একথা বুঝতে পেরে ক্রুদ্ধ দৈত্যেরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। এই সময় দেবতা ও অসুরে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। ভগবান বিষ্ণুর পার্ষদরাও এই যুদ্ধে অংশ নেন। ভগবান বিষ্ণুর অনুচর কুমুদও এই সময় অসুরসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। *[ভাগবত পু. ৮.২১.১৬; ১১.২৭.২৮]*

কুমুদ২ অথর্ববেদবিদ সুমন্তু ঋষির শিষ্য পরম্পরায় অথর্ববেদ প্রচারিত হয়। সুমন্তুর শিষ্য কবন্ধ, কবন্ধের শিষ্য পথ্য। কবন্ধ নিজের সংহিতা দুইভাগে বিভক্ত করে একভাগ পথ্যকে, একভাগ বেদদর্শকে অধ্যয়ন করান। পথ্য নিজের সংহিতা তিন ভাগে ভাগ করে তিনজন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। পথ্যের অন্যতম শিষ্য কুমুদ এর মধ্যে একটি সংহিতা অধ্যয়ন করেন। তাই ঋষি কুমুদও অথর্ববেদের অন্যতম আচার্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। *[ভাগবত পু. ১২.৭.২]*

কুমুদ৩ একজন বানরবীর। শুধুমাত্র রামায়ণে নয়, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও তাঁর নামোল্লেখ পাই। মহাভারতের রামোপাখ্যান পর্বেও সুগ্রীবের অনুগামী বানর দলপতি হিসেবে কুমুদের উল্লেখ পাওয়া যায়। লক্ষ্মণ বানররাজ সুগ্রীবের রাজধানীতে প্রবেশ করে সুষেণ, কুমুদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানর যূথপতির সুরম্য অট্টালিকা দর্শন করেছিলেন। তবে রামায়ণের যুদ্ধ কাণ্ডে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, কুমুদ একসময় গোমতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি বিন্ধ্যপর্বতে বসবাসকারী বানরদের রাজা হন। কিষ্কিন্ধ্যার প্রভাবশালী বানররাজ সুগ্রীবের অনুগামী বানরবীর কুমুদ এবং বিন্ধ্য পর্বতের বানররাজ কুমুদ অভিন্ন বলেই মনে হয়।

[রামায়ণ ৪.৩৩.১১; ৬.২৬.২৫-২৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৪২; মহা (k) ৩.২৮৯.৪; (হরি) ৩.২৪৩.৪]

□ রাম-লক্ষ্মণ যখন বিশাল বানরসেনা নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যা থেকে লঙ্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন সেই সময় যেসব বানরবীর বানর সেনাবাহিনীর যাত্রাপথ পরিষ্কার করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন কুমুদ তাঁদের মধ্যে একজন। বানর সেনাবাহিনী যখন লঙ্কানগরী অবরোধ করে, তখন অন্যান্য বানরবীরদের সঙ্গে লঙ্কানগরীর পূর্বদ্বারে অবস্থান করেছিলেন। কুমুদ লঙ্কা যুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে আমরা কুমুদকে ব্যূহরচনা প্রভৃতি নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত থাকতে দেখি। অতিকায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে কুমুদ আহত হন। একবার ইন্দ্রজিতের বাণেও তিনি গুরুতর আহত হয়েছিলেন। অযোধ্যায় রাজ্যাভিষেকের পর রামচন্দ্র অন্যান্য বানরবীরদের সঙ্গে কুমুদকেও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং নানা বহুমূল্য উপহারে সংবর্ধিত করেন।

[রামায়ণ ৬.৪২.২৩; ৬.৪৬.৩; ৬.৪৭.২-৪; ৬.৫৫.৩০-৩২; ৬.৭১.৩৯-৪২; ৬.৭৩.৬০; ৭.৪৯.২০]

কুমুদ৪ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত নাগ। মহাভারতের আস্তীকপর্বে সর্পনাম কথনের সময় তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে। নারদ মাতলির কাছে ভোগবতী পুরীর যে বর্ণনা দেন, সেখানে ভোগবতী পুরীর অধিবাসী প্রধান নাগদের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি কুমুদের নামও উল্লেখ করেছেন। *[মহা (k) ১.৩৫.১৫; ৫.১০৩.১৩; (হরি) ১.৩০.১৫; ৫.৯৬.১৩]*

কুমুদ৫ তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগে দেবতারা যখন দেবসেনাপতি-পদে স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে অভিষিক্ত করলেন, সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা তাঁদের কয়েকটি বিশিষ্ট অনুচর যোদ্ধাকে তারকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য অনুচর রূপে স্কন্দকে দান করেন। ধাতা তাঁর যে পাঁচজন বিশিষ্ট অনুচর স্কন্দকে দান করেছিলেন কুমুদ তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ৯.৪৫.৩৯; (হরি) ৯.৪২.৩৭]*

কুমুদ৬ স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অনুচর একজন বিশিষ্ট যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্ত্তিকেয়-কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৫৬; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

কুমুদ৭ পক্ষীরাজ গরুড়ের অন্যতম পুত্র। মাতলির কাছে গরুড়ের পুত্রদের নাম বর্ণনা করতে গিয়ে নারদ তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন।

[মহা (k) ৫.১০১.১২; (হরি) ৫.৯৪.১২]

কুমুদ৮ সুপ্রতীক নামক হস্তীর বংশে জাত একজন বিশিষ্ট হস্তী। নারদ তাঁকে পাতালের অধিবাসী বলে বর্ণনা করেছেন।

[মহা (k) ৫.৯৯.১৫; (হরি) ৫.৯২.৮]

□ অবশ্য পুরাণমতে, সমগ্র হস্তীকুলের জন্মদাত্রী ইরাবতীর গর্ভে ঐরাবত প্রভৃতি চার হস্তীর জন্ম হয়। ইরাবতীর এই চার পুত্রের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কুমুদ। *[বায়ু পু. ৬৯.২০৫, ২১১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৭২, ২৭৯-২৯২]*

কুমুদ৯ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আমরা কুমুদ নামে আরও একটি হস্তীর উল্লেখ পাচ্ছি যাকে চান্দ্রমস সাম নামক হস্তীর পুত্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৪৫]

কুমুদ$_{১০}$ মণিবর যক্ষের ঔরসে দেবজনীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন। *[বায়ু পু. ৬৯.১৬০]*

কুমুদ$_{১১}$ শিনিবংশীয় বৃহদুক্‌থের কন্যা বৃহতী জনৈক সুনয়কে বিবাহ করেন। সুনয়ের ঔরসে বৃহতীর গর্ভে যে পুত্র সন্তানদের জন্ম হয় কুমুদ তাঁদের মধ্যে একজন। *[বায়ু পু. ৯৬.২৪৬]*

কুমুদ$_{১২}$ কুবেরের অষ্টনিধির মধ্যে একটি নিধি। *[বায়ু পু. ৪১.১০]*

কুমুদ$_{১৩}$ পুরাকালে মহর্ষি কৌশিকের সাতটি পুত্র সন্তান ছিল। ঋষিপুত্রেরা সকলেই গর্গ মুনির শিষ্য ছিলেন। একবার দেশে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সেই দুর্ভিক্ষের সময় একদিন সাত ঋষিপুত্র গুরুর আদেশে গুরুর হোমধেনুটিকে বনে চরাতে নিয়ে গেলেন। বনের মধ্যে ক্ষুধায় কাতর সাত ভাই মিলে পরামর্শ করলেন—এই কপিলা গাভীটিকেই আহারের জন্য বধ করা হোক। তখন সাতভাই মিলে সেই গাভীটিকে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধে উৎসর্গ করলেন এবং সেই মাংস আহার করলেন। এইভাবে গো-বধ করার ফলে পরজন্মে সাত ঋষিপুত্র ব্যাধ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, এরপর হরিণ এবং তারপরে তাঁরা সাত ভাই মানস সরোবরে চক্রবাক পক্ষী হয়ে জন্মান। সেই চক্রবাক পক্ষীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কুমুদ। *[মৎস্য পু. ২০.২-১৮]*

কুমুদ$_{১৪}$ শাল্মলীদ্বীপে অবস্থিত সাতটি বর্ষপর্বতের মধ্যে অন্যতম। বায়ু পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী এই পর্বত সূর্যের মত উজ্জ্বল, বহু ধাতু ও রত্নের আকর।
[ভাগবত পু. ৫.২০.১০; বায়ু পু. ৪৯. ৩২-৩৩; বিষ্ণু পু. ২.৪.২৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৯.৩৫]

কুমুদ$_{১৫}$ কুশদ্বীপের অন্তর্গত সাতটি বর্ষ পর্বতের মধ্যে প্রথমটির নাম কুমুদ। সূর্যের মত দীপ্তিমান এই পর্বতকে 'বিদ্রুমোচ্চয়' নামেও চিহ্নিত করা হয়েছে। 'বিদ্রুম' শব্দের অর্থ প্রবাল। কুশদ্বীপের এই বর্ষ পর্বতটি প্রবাল গঠিত পর্বত কিনা এবং সেই কারণেই মৎস্য পুরাণ তার উজ্জ্বলতাকে সূর্যের দীপ্তির সঙ্গে তুলনা করেছে কিনা (সূর্যসঙ্কাশ) তা বিচার করা যেতে পারে।
[মহা (k) ৬.১২.১০; (হরি) ৬.১২.১০; মৎস্য পু. ১২২.৫২]

কুমুদ$_{১৬}$ মৎস্য পুরাণ মতে ছয়টি দ্বীপ নিয়ে পৌরাণিক গোমেদকবর্ষ গঠিত। এখানে অবস্থিত দুটি প্রধান পর্বতের মধ্যে প্রথমটির নাম সুমনা এবং দ্বিতীয়টির নাম কুমুদ—

দ্বিতীয়ঃ কুমুদো নাম সর্ব্বৌষধিসমন্বিতঃ॥

এই পর্বতকে বহু ওষধি বৃক্ষের আকর বলা হয়েছে। *[মৎস্য পু. ১২৩.৩]*

কুমুদ$_{১৭}$ জম্বুদ্বীপের অনতিদূরে অবস্থিত সমুদ্র পরিবেষ্টিত একটি দ্বীপ। ধনধান্যে পরিপূর্ণ, বহু গ্রাম ও জনপদশোভিত এই দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহাদেবের ভগিনী কুমুদা। *[বায়ু পু. ৪৮.৩৪-৩৫]*

কুমুদ$_{১৮}$ ভদ্রাশ্ববর্ষে অবস্থিত যেসব বর্ধিষ্ণু জনপদের নাম বায়ুপুরাণে বর্ণিত হয়েছে কুমুদ তাদের মধ্যে অন্যতম। *[বায়ু পু. ৪৩.২১]*

কুমুদ$_{১৯}$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের অন্যতম। 'কু' শব্দের অর্থ পৃথিবী। সংস্কৃতে মুদ্‌ ধাতুর অর্থ আনন্দিত হওয়া। মুদ্‌ ধাতুর সঙ্গে ণিচ্‌ প্রত্যয় করলে রূপটি হয় মোদয়তি। অর্থাৎ আনন্দিত করা। ভগবান বিষ্ণু পৃথিবীর পাপ-ভার হরণ করে পৃথিবীকে আনন্দিত করেন—এই কারণে তিনি কুমুদ নামে খ্যাত—

কুং ধরণিং ভারাবতরণং কুর্বন্‌ মোদয়তীতি কুমুদঃ।
মুদিরক্রান্তর্ভাবিতণিজর্থঃ (শাঙ্করভাষ্য)।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১০০; (হরি) ১৩.১২৭.১০০]

কুমুদ$_{২০}$ বাহুর পুত্র এবং দেবসেনের পিতা কুমুদ। *[কালিকা পু. ৮৯.২৬-২৭]*

কুমুদ$_{২১}$ *[দ্র. কনক$_{৫}$]*

কুমুদক্ষেত্র দেবীভাগবত পুরাণ অনুসারে দেবী ভগবতী কুমুদক্ষেত্র নামক তীর্থে সত্যবাদিনী নামে বিরাজমানা। *[দেবীভাগবত পু. ৭.৩০.৮০]*

কুমুদমালী তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে যখন দেবতারা তারকাসুরকে বধ করার জন্য স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন। সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা তাঁদের কয়েকটি বিশিষ্ট অনুচরযোদ্ধাকে তারকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য অনুচররূপে স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে দান করেন। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁর যে চারজন বিশিষ্ট অনুচর স্কন্দকে দান করেছিলেন, কুমুদমালী তাঁদের মধ্যে একজন।
[মহা (k) ৯.৪৫.২৪-২৫; (হরি) ৯.৪২.২৩-২৪]

কুমুদা$_{১}$ পুরাণগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে যে, দেবী ভগবতী মানসক্ষেত্রে দেবী কুমুদা নামে বিরাজমানা।
[মৎস্য পু. ১৩.২৭; ভাগবত পু. ১০.২.১২; দেবীভাগবত পু. ৭.৩০.৫৬]

কুমুদা২ বায়ু পুরাণ অনুসারে জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত কুমুদ নামে একটি দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন কুমুদা। বায়ু পুরাণে কথিত হয়েছে যে, দেবী কুমুদা মহাদেবের ভগিনী। *[বায়ু পু. ৪৮.৩৫]*

কুমুদাক্ষ১ কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত নাগ। মহাভারতের আস্তীকপর্বে সর্পনামকথনের সময় তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.৩৫.১৫; (হরি) ১.৩০.১৫]

কুমুদাক্ষ২ যক্ষ মণিবরের ঔরসে দেবজনীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১২৯]

কুমুদাক্ষ৩ বামনরূপধারী ভগবান বিষ্ণু যখন বলির যজ্ঞ সভায় ত্রিবিক্রম মূর্তি ধারণ করলেন এবং বলিকে আবদ্ধ করলেন তখন বলির অনুগত অসুরবীররা ক্রুদ্ধ হয়ে ভগবান বিষ্ণুকে আক্রমণ করলেন। সেই সময় বৈকুণ্ঠ থেকে ভগবান বিষ্ণুর যেসব অনুচর এই অসুরগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কুমুদাক্ষ একজন। ভাগবত পুরাণের অন্য একটি শ্লোকে এই কুমুদাক্ষকে কুমুদেক্ষণ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৮.২১.১৬; ১১.২৭.২৮]

কুমুদাদি অথর্ববেদের অন্যতম ঋষি ছিলেন পথ্য। তিনি অথর্ববেদের সংহিতাকে তিন ভাগে ভাগ করে যে শিষ্যদের দান করেন কুমুদাদি তাঁদের মধ্যে একজন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.৫৯; বায়ু পু. ৬১.৫২; বিষ্ণু পু. ৩.৬.১২]*

কুমুদাভ পৌরাণিক কেতুমাল বর্ষের অন্তর্ভুক্ত জনপদগুলির মধ্যে কুমুদাভ একটি।

[বায়ু পু. ৪৪.১২]

কুমুদ্বতী১ মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হয়েছে যে, রাজা দম্ভের কন্যা কুমুদ্বতী। তিনি স্বয়ম্বরসভায় মহারাজ অবীক্ষিতকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন।

[মার্কণ্ডেয় পু. ১২২.১৭]

কুমুদ্বতী২ পুরাণ অনুসারে, বিন্ধ্যপর্বত থেকে উৎপন্ন নদীগুলির মধ্যে কুমুদ্বতী একটি নদী। বায়ু পুরাণে কুমুদ্বতী নদীর উৎসরূপে চিহ্নিত হয়েছে পারিযাত্র বা পারিপাত্র পর্বত। পণ্ডিতরা একে বিন্ধ্য পর্বতেরই পূর্বভাগ বলে মনে করেন। পণ্ডিত B. C. Law এবং অন্যান্য পণ্ডিতজনের মতে কুমুদ্বতী নামে একটি নদী ওড়িশার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত। তবে এই নদীটির আধুনিক নাম সম্পর্কে ধারণা করা যায় না। *[মৎস্য পু. ১১৪.২৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৩৩; বায়ু পু. ৪৫.১০২; মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.২৪; Brajadulal Chattopadhyaya; A Social History of Early India, Vol-2, p. 25; Historical Geography and Dynastic History of Orissa, p. 91]*

কুমুদ্বতী৩ পুরাণ মতে ক্রৌঞ্চদ্বীপের দ্বিতীয় বর্ষপর্বত বামনের সংলগ্ন ভূখণ্ড মনোনুগ—এই স্থানটির উপর দিয়ে যে-সব নদী প্রবাহিত হয়েছে, কুমুদ্বতী তাদের মধ্যে একটি।

[মৎস্য পু. ১২২.৮৮; বায়ু পু. ৪৯.৬৯; বিষ্ণু পু. ২.৪.৫৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৯.৭৫]

কুম্ব *[দ্র. কেশ]*

কুম্ভ১ কুম্ভকর্ণের ঔরসে বজ্রজ্বালার গর্ভে জাত দুই পুত্রসন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন কুম্ভ। তাঁর ছোটো ভাইয়ের নাম ছিল নিকুম্ভ। লঙ্কার রাজা রাবণের ভ্রাতুষ্পুত্র কুম্ভ লঙ্কার রাক্ষসবীরদের মধ্যে অন্যতম। লঙ্কাযুদ্ধের সময় বিভীষণ ভ্রাতুষ্পুত্র কুম্ভের চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন রামের কাছে—তিনি বিশাল বক্ষস্থলবিশিষ্ট, ঘনকৃষ্ণবর্ণদেহ, ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী, (ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ), বয়সে যুবক এবং তিনি রথী-সংজ্ঞা ভুক্ত—

অসৌ চ জীমূতনিকাশরূপঃ
কুম্ভঃ পৃথুব্যূঢ় সুজাতবক্ষাঃ।

তাঁর রথের ধ্বজা সর্পচিহ্নযুক্ত।

[রামায়ণ ৭.১২.২৩-২৪; ৬.৭৫.৪৬; ৬.৫৯.২০; ৬.৭৬.৩৮]

□ হনুমান যখন লঙ্কাদহন করেছিলেন সেইসময় অন্যান্য রাক্ষসবীরদের মতোই রাজকুমার কুম্ভের ভবনটিও ভস্মীভূত হয়।

[রামায়ণ ৫.৫৪.১৫]

□ লঙ্কাযুদ্ধে কুম্ভ যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রাবণ স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করলে যাঁরা তাঁর অনুচর যোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন, কুম্ভ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে রাক্ষসসেনা ভীত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে লাগল। রাক্ষসসেনার সেই বিপদের সময়ে রাবণ যাঁদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন তাঁরা কুম্ভকর্ণের দুই পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভ। যুদ্ধক্ষেত্রে কুম্ভের হাতে বানরসেনা রীতিমতো আহত হতে থাকে। দ্বিবিদ, মৈন্দ, অঙ্গদ আহত হয়ে যুদ্ধস্থল ছেড়ে পলায়ন করেন।

জাম্ববান প্রভৃতিরাও কুম্ভের প্রহারে পিছু হঠতে বাধ্য হন। এরপর সুগ্রীবের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ চলার পর শেষ পর্যন্ত সুগ্রীবের হাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

[রামায়ণ ৬.৫৯.২০; ৬.৭৫.৪৪-৪৬; ৬.৭৬ অধ্যায়; ভাগবত পু. ৯.১০.১৮]

কুম্ভ২ একজন দৈত্যরাজ। তাঁর পত্নীর নাম ছিল কপিলা। কুম্ভের ঔরসে কপিলার গর্ভজাত দৈত্যরা কাপিলেয় দৈত্য নামে পরিচিত।

[বায়ু পু. ৬৯.১৭৬-১৭৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৪৪-১৪৬]

কুম্ভ৩ পঞ্চবিংশ দ্বাপরে যখন বশিষ্ঠ ঋষি-ব্যাস হবেন, তখন ভগবান মহাদেব কোটিবর্ষ নগরে জন্মগ্রহণ করবেন। এই সময় তাঁর নাম হবে মুণ্ডীশ্বর। এই মুণ্ডীশ্বরের যে চারটি পুত্রসন্তান হবে কুম্ভ তাঁদের মধ্যে একজন। *[বায়ু পু. ২৩.২১১]*

কুম্ভ৪ বায়ুপুরাণে বর্ণিত একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করলে মহাপুণ্য হয় বলে উল্লেখ আছে। *[বায়ু পু. ৭৭.৪৭]*

কুম্ভ৫ মৎস্য পুরাণে বিভিন্ন প্রাসাদ ও অট্টালিকার গঠন ও নির্মাণশৈলী বর্ণনা করতে গিয়ে কুম্ভ আকৃতির কুম্ভ নামক প্রাসাদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কুম্ভ আকৃতির প্রাসাদ দৈর্ঘ্যে ষোল হাত বিস্তৃত হয় বলে উল্লেখ আছে মৎস্য পুরাণে।

[মৎস্য পু. ২৬৯.৩৭, ৪৯]

কুম্ভ৬ দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের তিন পুত্রের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.৬৫.১৯; (হরি) ১.৬০.১৯; কালিকা পু. ৩৪.৪৯]

কুম্ভ৭ বারোটি রাশির মধ্যে অন্যতম। ধনিষ্ঠা-নক্ষত্রের শেষার্ধ, সম্পূর্ণ শতভিষা নক্ষত্র-যুক্ত এবং পূর্বভাদ্রপদার প্রথম তিনটি পাদ নিয়ে কুম্ভ-রাশির অবস্থান। কুম্ভরাশির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা কলসধারী পুরুষ। কুম্ভরাশিতে জন্মালে জাতক মেধাবী, ধনৈশ্বর্য্যযুক্ত, দন্তপীড়াযুক্ত, স্নেহশূন্য হয়। কুম্ভলগ্নের জাতক—চঞ্চলচিত্ত, সকলের বন্ধু, পারদারিক, সত্ত্বগুণযুক্ত শরীর এবং মহাসুখী।

[দ্র. শব্দকল্পদ্রুম]

কুম্ভ৮ তিন ধরনের যৌগিক প্রাণায়ামের অন্যতম। অন্তঃপূরিত বায়ুর স্তম্ভনরূপ প্রাণায়াম—যার নাম কুম্ভ বা কুম্ভক—কুম্ভকো নিশ্চলঃ শ্বাসঃ। মহাভারতের শান্তিপর্বে প্রাণায়াম সংক্রান্ত উপদেশে টীকাকার নীলকণ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যের বচন উদ্ধার করে রেচক, পূরক, কুম্ভকের প্রক্রিয়া নির্দেশ করেছেন।

[মহা (k) ১২.৩১৬.৯-১০; (হরি) ১২.৩০৬.৯-১০]

কুম্ভ৯ একজন দানব। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন।

[কালিকা পু. ৩৪.৫৪]

কুম্ভক১ স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচর একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৭৫; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

কুম্ভক২ *[দ্র. কুম্ভ৮]*

কুম্ভকর্ণ ভাগবত পুরাণের সপ্তম স্কন্ধে বলা হয়েছে যে, বৈকুণ্ঠপুরীর সপ্তমকক্ষের দ্বারপাল ছিলেন জয় ও বিজয়। ব্রহ্মার মানসপুত্র সনক প্রভৃতি ঋষিরা একদিন বৈকুণ্ঠলোকে আসেন। জয়-বিজয় তাঁদের সপ্তম কক্ষে যেতে বাধা দিলে সেই ঋষিরা জয়-বিজয়কে অসুর হয়ে জন্মানোর শাপ দেন। সেই সময় ভগবান বিষ্ণুও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁদের ওই শাস্তি বহাল রাখলেন, কারণ একবার তাঁরা অহংকারে মত্ত হয়ে একইভাবে লক্ষ্মীদেবীরও পথ আটকে ছিলেন। ভগবান বিষ্ণু তাঁদের বললেন যে, তোমরা অসুররূপে জন্মগ্রহণ করে আমাকে শত্রুরূপে ভজনা করবে। যার ফলে মাত্র তিনটি জন্মের পরই তোমাদের মুক্তি ঘটবে। এইভাবে জয়-বিজয় প্রথমে কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান বিষ্ণুর বরাহ অবতারের সময় হিরণ্যাক্ষ বরাহরূপধারী বিষ্ণুর হাতে নিহত হন। নরসিংহ অবতার গ্রহণ করে ভগবান বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুকেও বধ করেন। আবার ত্রেতাযুগে বিশ্রবার ঔরসে কেশিনীর গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ রূপে তাঁদের পুনর্জন্ম হয়।

ততস্তৌ রাক্ষসৌ জাতৌ কেশিন্যাং বিশ্রবঃসুতৌ।
রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ সর্বলোকাপতাপনৌ॥

রামের হাতে তাঁদের মৃত্যু হয়। তৃতীয়বার দ্বাপরযুগে কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই শিশুপাল ও দন্তবক্র রূপে তাঁরা জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বধ করেন। *[ভাগবত পু. ৭.১.৩২-৪৬]*

মহাভারতে পাই যে, কুবের একসময় তিন রাক্ষসী পরিচারিকাকে পিতা বিশ্রবার কাছে পাঠান। তাঁদের অন্যতম ছিলেন পুষ্পোৎকটা।

পরে বিশ্রবার ঔরসে পুষ্পোৎকটার গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণের জন্ম হয়—

পুষ্পোৎকটায়াং জজ্ঞাতে দ্বৌ
পুত্রৌ রাক্ষসেশ্বরৌ।
কুম্ভকর্ণ-দশগ্রীবৌ বলেনাপ্রতিমৌ ভুবি॥

[মহা (k) ৩.২৭৫.৭; (হরি) ৩.২২৭.৭]

□ রামায়ণে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী, রাবণের মধ্যম ভ্রাতা তথা কৈকসীর দ্বিতীয় সন্তান কুম্ভকর্ণ। কৈকসীর পিতা রাক্ষসবীর সুমালী একদিন তাঁকে বললেন, তোমার বিবাহের বয়স হয়েছে, তুমি পুলস্ত্যপুত্র মহর্ষি বিশ্রবাকে পতিত্বে বরণ কর। পিতার কথা শুনে কৈকসী মহর্ষি বিশ্রবার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর পুত্রলাভের ইচ্ছার কথা জানতে পেরে মহর্ষি বিশ্রবা তাঁকে বললেন, তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। কিন্তু তুমি সন্ধ্যাবেলায় এসেছ তাই তোমার সন্তানরা সকলেই দারুণ স্বভাবের এবং ভয়ঙ্করদেহী হবে। এরপর যথাসময়ে কৈকসীর গর্ভে রাবণের পরেই কুম্ভকর্ণের জন্ম হয়—

তস্য ত্বনন্তরং জাতঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।

[রামায়ণ ৭.৯.২১-৩৪]

□ বিরোচনপুত্র বলির দৌহিত্রী বজ্রজ্বালা কুম্ভকর্ণের পত্নী। তাঁদের দুই পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভ। লঙ্কার যুদ্ধে সুগ্রীবের হাতে কুম্ভ এবং হনুমানের হাতে নিকুম্ভ মারা যান।

*[রামায়ণ ৭.৯.৭-৩৪; ৭.১২.২৩-২৪; ৬.৭৫.৪৬;
ভাগবত পু. ৭.১.৩২-৪৬; ৭.১০.৩৬; ৪.১.৩৬;
বায়ু পু. ৭০.৪১-৪২; মহা (k) ৩.২৭৫.১১;
(হরি) ৩.২২৯.১১; ৭.১২.২৩-২৪;
ব্রহ্মাণ্ড পু. ৩.৮.৪৭; ৪.২৯.১১৩; ৪.২৯.১১৬]*

□ কুম্ভকর্ণের বর্ণনায় তাঁর বিশাল শরীরটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাঁকে আমরা এক বিশালকায় পুরুষ হিসেবেই দেখি। দৈর্ঘ্যে তিনি ছশো ধনু এবং প্রস্থে একশো ধনু। অর্থাৎ এক ধনু চার হাতের সমান, এই হিসাবে তিনি দু-হাজার চারশো হাত দীর্ঘ ও প্রস্থে চারশো হাত।

ধনুঃশতপরীণাহঃ স ষট্‌শতসমুচ্ছ্রিতঃ।

[রামায়ণ ৬.৬৫.৪১]

আপাতদৃষ্টিতে এই পরিমাপকে মহাকাব্যিক অতিশয়োক্তি বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে। তবে এই অতিশয়োক্তির যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা বোধহয় এই যে, কুম্ভকর্ণ অন্যান্য রাক্ষসজাতীয় মানুষের বা যে কোনো মানুষেরই তুলনায় অনেক বেশি লম্বা এবং স্বাস্থ্যবান ছিলেন। তাঁর মতো প্রকাণ্ড দেহ তাঁর সময়ে পৃথিবীতে অন্য কারো ছিল না।

প্রমাণাদ্ যস্য বিপুলং প্রমাণং নেহ বিদ্যতে।

[রামায়ণ ৭.৯.৩৪]

দূর থেকে তাঁকে গাছপালা পুড়ে-যাওয়া এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ের মতো, দেখতে লাগে—'দগ্ধশৈলোপমো মহান্'। মাথায় কিরীট, হাতে অঙ্গদ-পরা কুম্ভকর্ণকে দেখে মনে হয় যেন কৃষ্ণবর্ণ সজল মেঘে বিদ্যুতের ছটা স্ফুরিত হচ্ছে—'সবিদ্যুদিব তোয়দঃ'। তাঁর বিশাল শরীরের জন্য খাবারও লাগত প্রচুর। ভোজনে তিনি কখনো সন্তুষ্ট হতেন না। খাদ্যের ক্ষেত্রেও তাঁর কোনো বাছ-বিচার ছিল না। সমস্ত রকমের জীব-জন্তু তো তিনি খেতেনই, ধার্মিক ঋষি-মুনিদেরও তিনি ধরে ধরে খেয়ে ফেলতেন। তবু সবসময় তিনি খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন।

কুম্ভকর্ণঃ প্রমত্তস্তু মহর্ষীন্ ধর্ম্মবৎসলান্।
ত্রৈলোক্যে নিত্যাসন্তুষ্টো ভক্ষয়ন্ বিচচার হ॥

[রামায়ণ ৬.৬১.৫; ৭.৯.৩৭-৩৮]

□ কুম্ভকর্ণের এই নির্বিচারে খাওয়ার অভ্যাস খানিকটা নিয়ন্ত্রিত হয় ব্রহ্মার বরদানের পর।

*[রামায়ণ ৬.৬৫.৪১; ৭.৯.৩৪; ৬.৬৫.৪২;
৬.৬১.৫; ৭.৯.৩৭-৩৮]*

□ নির্বিচারে এবং নির্বিশেষে কুম্ভকর্ণের খাওয়ার অভ্যাস কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হল, তার একটা অলৌকিক ইতিবৃত্ত আছে রামায়ণে। বলা হয়েছে—একদিন ধনাধিপতি কুবের পিতা বিশ্রবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ঐশ্বর্য্যশালী কুবেরকে দেখে কুবেরের বিমাতা তথা রাবণ কুম্ভকর্ণের মাতা কৈকসীর ঈর্ষা হল। তিনি তাঁর ছেলেদের বললেন—তোমরা কুবেরের মতো ঐশ্বর্য্যশালী হওয়ার চেষ্টা কর। মায়ের আদেশে ভাইদের সঙ্গে কুম্ভকর্ণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে তপস্যা করতে লাগলেন। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা রোদে পুড়ে, জলে ভিজে দশ হাজার বছর ধরে তিনি কঠোর তপস্যা করলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভগবান ব্রহ্মা তাঁকে বর দিতে গেলে দেবতারা তাঁকে বললেন, প্রভু, আপনি একে বর দেবেন না। একে বর দিলে সৃষ্টিনাশ হয়ে যাবে। এই রাক্ষস

নন্দনবনে ইন্দ্রের দশজন অনুচর, সাতজন অপ্সরা এবং অনেক মুনি-ঋষি ও সাধারণ মানুষকে খেয়ে ফেলেছে। বরলাভ করার আগেই যার খাবার এরকম দৃষ্টান্ত, বর পেলে সে তো গোটা ত্রিভুবনই খেয়ে ফেলবে। তার চেয়ে আপনি বরং বরদানের অছিলায় ওর বুদ্ধিকে মোহগ্রস্ত করুন এবং তা এমনভাবে করুন যাতে সকলের কল্যাণ হয় এবং ওই রাক্ষসও যাতে সেই বর নিতে সম্মত হয়। দেবতাদের এই কথা শুনে ব্রহ্মা দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করলেন। সরস্বতী তাঁর সামনে উপস্থিত হলে তিনি বাগ্‌দেবীকে বললেন, তুমি কুম্ভকর্ণের জিহ্বায় অবস্থান করে তাকে দিয়ে এমন বর প্রার্থনা করাও যাতে সকলের কল্যাণ হয়।—

বাণী ত্বং রাক্ষসেন্দ্রস্য ভব বাগ্দেবতেপ্সিতা।

দেবী সরস্বতী তখন কুম্ভকর্ণের রসনায় অধিষ্ঠিত হলেন এবং ব্রহ্মাও কুম্ভকর্ণকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। কুম্ভকর্ণও মোহাবিষ্ট হয়ে বললেন, প্রভু, আমি অনেক বছর ঘুমিয়ে কাটাতে চাই। আপনি যদি আমার ছয়মাস ঘুমানোর পর একটি দিন মাত্র ভোজন করার ব্যবস্থা করে দেন তাহলে বেশ হয়—

কুম্ভকর্ণস্তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা বচনমব্রবীৎ॥
স্বপ্তুং বর্ষাণ্যনেকানি দেবদেব মমেপ্সিতম্।

[রামায়ণ ৭.১০.৪৪-৪৫]

কুম্ভকর্ণের এই কথা শুনে তথাস্তু বলে ব্রহ্মা চলে গেলেন, সরস্বতীও কুম্ভকর্ণের জিহ্বা ছেড়ে চলে গেলেন। তারপর চেতনা লাভ করে, কুম্ভকর্ণ বুঝতে পারলেন যে, দেবতারা তাঁর সঙ্গে ছলনা করেছেন। কিন্তু দুঃখ করা ছাড়া তখন তাঁর আর কোনো উপায় নেই। অন্যত্র আবার পাই কুম্ভকর্ণের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার নমুনা দেখে ভীত দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা নিজেও কুম্ভকর্ণকে দেখে ভয় পেয়েছিলেন—বিতত্রাস প্রজাপতিঃ। তাই তিনি কুম্ভকর্ণকে বললেন যে, আজ থেকে তুমি মৃতের মতো ঘুমিয়ে থাকবে। ব্রহ্মার শাপ তক্ষুনি ফলল, কুম্ভকর্ণ ঘুমোতে আরম্ভ করলেন। রাবণ কিন্তু বিষয়টিকে অত সহজে ছেড়ে দেননি। তিনি ব্রহ্মাকে বললেন যে, আমি যে সোনার গাছটাকে এতদিন জল দিয়ে বড়ো করলাম সেই গাছে যখন ফল আসছে তখনই আপনি তাকে কেটে ফেললেন। নিজের পৌত্রকে আপনি এভাবে শাপ দিতে পারেন না—

প্রবৃদ্ধঃ কাঞ্চনো বৃক্ষঃ ফলকালে নিকৃত্যতে।
ন নপ্তারং স্বপ্তঞ্চ ন্যায্যং শপ্তুমেবং প্রজাপতে॥

[রামায়ণ ৬.৬১.২১-২৫]

আপনার কথার তো নড়চড় হবে না—আপনি বরং এর ঘুমানোর আর জেগে থাকার একটা সময় ঠিক করে দিন। তখন ব্রহ্মা বললেন, এ ছ-মাস ঘুমিয়ে থাকবে এবং একদিন মাত্র জাগবে। কুম্ভকর্ণকে ব্রহ্মা ছ-মাস পরে একদিন মাত্র জেগে ওঠার বর দিলেন এবং ইচ্ছেমতো খাবারও বন্দোবস্ত করে দিলেন। সেই থেকে কুম্ভকর্ণ ছ-মাস ঘুমানোর পর একদিন জেগে ওঠেন এবং প্রচুর আহার করেন। কখনো কখনো আবার আট, নয় আবার কখনো বা দশমাস টানা ঘুমিয়ে থাকেন। রাবণ নিজেই বলেছেন—

নবসপ্তদশাষ্টৌ চ মাসান্ স্বপিতি রাক্ষসঃ।

[রামায়ণ ৬.৬০.১৭; ৭.৯.৪০-৪৬; ৭.১০ তম সর্গ;
মহা (k) ৩.২৭৫.১৪, ১৭; ৩.২৭৫.২৭-২৮;
(হরি) ৩.২২৯.১৪, ১৭; ৩.২২৯.২৭-২৮;
রামায়ণ ৭.১০.৪৪-৪৫; ৭.১০.৩৫-৪৮;
৬.৬১.২৪-২৬; ৬.৬১.২৭-২৮; ৬.৬০.১৭]

□ সেতু বন্ধনের আগে রাম সৈন্যদের নিয়ে সমুদ্রের তীরে এসে উপস্থিত হয়েছেন—এই খবর পেয়ে রাবণ সভাসদদের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে বসলেন। রাবণের মুখে সীতা হরণের বৃত্তান্ত ও রাম-লক্ষ্মণের লঙ্কার কাছে উপস্থিতির কথা শুনে কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণকে বললেন, আপনি রাম-লক্ষ্মণের কাছ থেকে সীতাকে হরণ করে নিয়ে আসার সময় আমাদের সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করেননি। এখন সব ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আমাদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে কি হবে? আগে যদি আমাদের এ-বিষয়ে জানাতেন তাহলে আমরা আপনাকে সুপরামর্শ দিতে পারতাম। কিন্তু তা না করে আপনি সীতাকে যেভাবে নিয়ে এলেন তা একেবারেই ঠিক করেননি। যাই হোক, আপনি অনুচিত কাজ করে যে যুদ্ধের আয়োজন করেছেন তাতে আমি আপনাকে সাহায্য করব—

তস্মাত্ত্বয়া সমারব্ধং কর্ম হ্যপ্রতিমং পরৈঃ।
অহং সমীকরিষ্যামি হত্বা শত্রুংস্তবানঘ॥

[রামায়ণ ৬.১২.৩৫]

এই মন্ত্রণার পরে রাম লঙ্কায় এসে উপস্থিত হন। যুদ্ধ বাধে। গোড়ার দিকে যুদ্ধে রাবণ, মেঘনাদ ও অন্যান্য বীর রাক্ষস সেনাদের

পরাক্রমে রাক্ষসপক্ষ বেশ ভাল অবস্থাতেই ছিল। কাজেই সেই সময় যুদ্ধে কুম্ভকর্ণের আর প্রয়োজন পড়েনি। তাই তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন, তাঁকে জাগানোরও প্রয়োজন পড়েনি। মেঘনাদ রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে বেঁধে ফেলেছিলেন। কিন্তু বিনতাপুত্র গরুড়ের কৃপায় তাঁরা সেই নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভ করলেন। তাঁদের শক্তিও দ্বিগুণ হল। নিজের বিখ্যাত যোদ্ধাদের পাঠিয়েও রাবণ কিন্তু রাম-লক্ষ্মণ এবং অন্যান্যদের হারাতে পারলেন না। উলটে তাঁদের মৃত্যু হল। তখন বেগতিক দেখে রাবণ নিজেই যুদ্ধে গেলেন। কিন্তু রামের বাণে পরাজিত হয়ে শেষে লঙ্কায় পালিয়ে এলেন। ঠিক এই পরিস্থিতিতেই তিনি কুম্ভকর্ণকে জাগাতে চেয়েছেন। কারণ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ ছাড়া আর কোনো বীর যোদ্ধা তখন তাঁর পক্ষে ছিল না। রাবণ তখন রাক্ষসদের বললেন, রাক্ষসকুলের প্রধান হয়েও এই দুঃসময়ে কুম্ভকর্ণ ঘুমাচ্ছে। আজ যদি সে আমার পাশে না থাকে তাহলে তার ইন্দ্রের সমান শক্তি থাকলেই বা আমার কি লাভ হবে?

কিং করিষ্যাম্যহং তেন শক্রতুল্যবলেন হি।

[রামায়ণ ৬.৬০.১৬-২১]

সে জেগে উঠলে আমার আর কোনো ভয় থাকবে না। কিন্তু, সে মোটে ন-দিন মাত্র ঘুমিয়েছে কাজেই তাকে যত্নের সঙ্গে জাগিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো। রাবণের আদেশ পেয়ে মহাশক্তিশালী রাক্ষসরা ধূপ-মালা ও বহুবিধ খাদ্য নিয়ে কুম্ভকর্ণের বিরাট শয়ন গুহায় ঢোকার চেষ্টা করল। কিন্তু সেখানে ঢুকতে গেলেই কুম্ভকর্ণের ঝোড়ো নিশ্বাসের দাপটে তারা দূরে গিয়ে পড়তে লাগল। শেষে অনেক চেষ্টা করে তারা কুম্ভকর্ণের কাছে গিয়ে পৌঁছাল। তাঁকে জাগানোর জন্য রাক্ষসরা তাঁর মুখের সামনে রাশি রাশি খাদ্যদ্রব্য রেখে তাঁর গায়ে চন্দনের প্রলেপ লাগিয়ে ধূপের ধোঁয়া দিয়ে স্তব করতে লাগল। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙল না। তখন সবাই মিলে একযোগে চিৎকার করতে লাগল, সেইসঙ্গে কানের পাশে একযোগে হাজার শঙ্খ, হাজারটা ঢাক বাজাতে লাগল, কেউ বা তাঁর বুকে একযোগে গদা-মুষলের আঘাত করতে লাগল। কেউ আবার পাহাড়ের চূড়া উপড়ে নিয়ে তাঁর বুকে এনে ফেলতে লাগল। কিন্তু তাতেও কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙানো গেল না। তখন একবারে একসাথে সমস্ত উপায়গুলি প্রয়োগ করা হল—কানের পাশে বাজনা-বাদ্যি বাজানো চলতে লাগল, সেইসঙ্গে ঘোড়া, উট, গাধা, হাতিদের কুম্ভকর্ণের গায়ে উপর উঠিয়ে কাঠের টুকরো, মুগুর, মুষল প্রভৃতি দিয়ে রাক্ষসরা কুম্ভকর্ণকে প্রহার করতে লাগল। বলা বাহুল্য কুম্ভকর্ণ আগের মতোই ঘুমাচ্ছিলেন, এত কাণ্ডেও তাঁর ঘুম ভাঙেনি। তখন রাক্ষসরা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। কেউ তাঁর চুল ধরে টানতে লাগল, কেউ বা তাঁর কানে কামড়াতে লাগল, কেউ কেউ আবার কলসি কলসি জল নিয়ে কুম্ভকর্ণের কানে ঢালতে লাগল। কুম্ভকর্ণ এতেও এতটুকুও নড়লেন না দেখে রাক্ষসরা তাঁর গায়ের উপর অসংখ্য হাতি উঠিয়ে দিল, তাদের কোমল পাদস্পর্শে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই তাঁর ভীষণ খিদেও পেল। তখন তিনি হাই (জৃম্ভণ) তুলতে তুলতে উঠে বসলেন। রাক্ষসরা তাঁর জন্য যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এসেছিল তিনি সেগুলির সদ্‌ব্যবহার করে তৃপ্ত হয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা আমাকে এত তাড়াতাড়ি জাগালে কেন? রাবণ ভাল আছেন তো? তাঁর কোনো বিপদ হয়নি তো?

কচ্চিৎ সুকুশলং রাজ্ঞো ভয়ং বা নেহ কিঞ্চন॥

[রামায়ণ ৬.৬০.৬৭]

তখন রাজমন্ত্রী যূপাক্ষ তাঁকে বললেন যে, রাম-লক্ষ্মণ রাবণের ভয়ের কারণ হয়েছেন। তাঁদের হাতে প্রচুর রাক্ষস সৈন্য মারা গেছে, এমনকী রাক্ষসরাজ রাবণও রামের কাছে পরাজিত হয়েছেন এবং রাম অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে তাঁকে জীবন্ত ছেড়ে দিয়েছেন। বড়ো ভাইয়ের এই লজ্জাজনক পরাজয়ের কথা শুনে কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—রাম-লক্ষ্মণের এত সাহস! আমি আজই বানরসৈন্যদের সঙ্গে তাদেরকেও বধ করব—

রাঘবঞ্চ রণে জিত্বা ততো দ্রক্ষ্যামি রাবণম্॥

[রামায়ণ ৬.৬০.৭৯]

তারপর রাক্ষস মহোদরের পরামর্শে তিনি প্রথমে অগ্রজের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

[রামায়ণ ৬.১২.২৭-৪০; ৬.১৩-৬০ তম সর্গ; ৬.৬০.১৬-২১; মহা (k) ৩.২৮৬.১৮-২৯; (হরি) ৩.২৪০.১৮-২৯; ৫.৬০.২২-৬৭; রামায়ণ ৬.৬০.৭১-৭৭; ৬.৬০.৭৮-৮৩; ৬.৬০.৭৯]

□ রাজপথ দিয়ে তিনি চলেছেন বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে—দেখে মনে হচ্ছে যেন এক বিশাল পর্বত রাজপথ দিয়ে হেঁটে চলেছে। দূর থেকে তাঁকে দেখে রামের বানরসৈন্যরা যে যেদিকে পারল পালাতে শুরু করল, কেউ বা রামের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিল। আসলে কুম্ভকর্ণের আকৃতি পৃথিবীর যে কোনো প্রাণীর থেকেই অনেক বড়ো তাই তাঁকে দেখে বিজাতীয় কিছু বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁকে দেখে রামচন্দ্র পর্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়ে বিভীষণকে জিজ্ঞেস করলেন—এই বিশাল বীর কে? এর আগে এমন চেহারার প্রাণী তো আমি দেখিনি—

ন ময়ৈবংবিধং ভূতং দৃষ্টপূর্বং কদাচন॥

[রামায়ণ ৬.৬১.১-৭]

বিভীষণ তখন কুম্ভকর্ণের পরিচয় দিলেন। তাঁর পূর্বজীবনের খাদ্যাভ্যাস, ইন্দ্রদেব ও সূর্যদেবকে পরাজিত করার বৃত্তান্ত এবং শেষে ব্রহ্মার কাছ থেকে বরলাভের কথা জানালেন। এও বলতে ভুললেন না যে, ভগবান ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বর দিতে এসে নিজেই তাঁর বিশাল চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন—

কুম্ভকর্ণং সমীক্ষ্যৈব বিতত্রাস প্রজাপতিঃ।

[রামায়ণ ৬.৬১.১১-২২]

বিভীষণ রামকে এও বললেন যে আপনি বানর সেনাদের মধ্যে প্রচার করে দিন যে, এ আসলে রাক্ষসদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি যন্ত্র-মাত্র এবং যন্ত্র কখনোই অজেয় হতে পারে না।—

উচ্যন্তাং বানরাঃ সর্ব্বে যন্ত্রমেতং সমুচ্ছিতম্।
ইতি বিজ্ঞায় হরয়ো ভবিষ্যন্তীহ নির্ভয়াঃ।

[রামায়ণ ৬.৬১.৩২]

তখন বানরসেনার ভয় দূর করার জন্য এই কথাই প্রচার করে দেওয়া হল। বানর সৈন্যরাও আশ্বস্ত হল খানিক।

[রামায়ণ ৬.১২.২৭-৪০; ৬.১৩-৬০ তম সর্গ; মহা (k) ৩.২৮৬.১৮-২৯; (হরি) ৩.২৪০.১৮-২৯; ৬.৬০.১৬-২১; ৬.৬০.২২-৬৭; ৬.৬০.৭১-৭৭; ৬.৬০.৭৮-৮৩; ৬.৬০.৯৪-৯৮; ৬.৬১.১-২৮; ৬.৬১.২৯-৩৯]

□ ওদিকে রাবণের কাছে গিয়ে ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ বললেন আমাকে এত তাড়াতাড়ি জাগালেন কেন? বলুন, আজ কার মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য আপনি আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়েছেন? কুম্ভকর্ণের এই কথা শুনে রাবণ বললেন, এতদিন তো তোমার প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু এখন রাম-লক্ষ্মণ আমার বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে। তাকে আর তার সৈন্যদের আজই তুমি বধ কর। রাবণের এই কথা শুনে কুম্ভকর্ণ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই সীতাহরণ করার জন্য জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে প্রবল তিরস্কার করলেন। এইখানে কুম্ভকর্ণের চিত্তবৃত্তিতে সাত্ত্বিকতার স্পর্শ প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু অগ্রজকে তিনি খুবই ভালবাসতেন এবং বিভীষণের মতো স্বপক্ষ ত্যাগ করে পরপক্ষের আশ্রয়ও নেননি। তাই শেষে যুদ্ধে যেতে সম্মত হলেন। তিনি এও বললেন যে, আমি আজই রামকে বধ করব, তার সঙ্গে হনুমান ও সুগ্রীবকেও বধ করব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সীতা আপনারই অনুগামিনী হবেন—

ময়াদ্য রামে গমিতে যমক্ষয়ং/
চিরায় সীতা বশগা ভবিষ্যতি॥

[রামায়ণ ৬.৬৩.৫৬]

কুম্ভকর্ণের এই কথা শুনে মহাবল তাঁকে ব্যঙ্গ করে বললেন রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে তোমার একা যুদ্ধ করতে যাওয়া ঠিক হবে না। বরং রামচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করে দেওয়া হোক তাহলে সীতা রাবণের বশীভূত হবেন। লক্ষণীয়, এই নীতিহীন পরামর্শ কুম্ভকর্ণ মেনে নিতে পারেননি। তিনি রাবণকে বলেছেন, এই চাটুকারের কথা আপনি শুনবেন না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আজই রাম-লক্ষ্মণকে বধ করব। এই বলে কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে চললেন। তাঁর সঙ্গে চলল মহাশক্তিশালী রাক্ষসসৈন্যরা।

[রামায়ণ ৬.৬২; ৬.৬৩; ৬.৬৪; ৬.৬৫]

□ কুম্ভকর্ণ সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হলে বানরসৈন্যরা তাঁকে দেখে দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে লাগল। তখন অঙ্গদ তাদের আবার উৎসাহ দিয়ে একত্রিত করলেন। তারা বড়ো বড়ো গাছ, পর্বতশৃঙ্গ, প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি নিয়ে কুম্ভকর্ণকে মারতে লাগল। কিন্তু সেগুলি কুম্ভকর্ণের গায়ে লেগে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তার উপর আবার কুম্ভকর্ণ বানরদের খেয়ে ফেলতে লাগলেন। অসংখ্য বানরসৈন্য মারা গেল। মহাভারতের রামোপাখ্যানে দেখতে পাই যে এই সময় বল, চণ্ডবল এবং বজ্রবাহু নামক তিন

বানরপ্রধানও কুম্ভকর্ণের হাতে মারা যান। তবে কুম্ভকর্ণ যেভাবে বানরভোজন করবেন বলে ভেবেছিলেন, তা সম্ভব হল না। তাঁর নাকের ফুটো, কানের ফুটো বড়ো হওয়ায় বানরেরা ওই ছিদ্রপথে বেরিয়ে আসতে থাকল। তাঁকে বাধা দিতে গেলে হনুমান, অঙ্গদ ও সুগ্রীব তাঁর হাতে প্রচুর মার খেলেন। শেষে সুগ্রীব তাঁর প্রহারে অজ্ঞান হয়ে গেলে তিনি সুগ্রীবকে কাঁধে ফেলে লঙ্কায় নিয়ে চললেন। এদিকে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে ক্রমে ক্রমে সুগ্রীবের জ্ঞান ফিরল। তখন তিনি আঁচড়ে-কামড়ে কুম্ভকর্ণের নাক-কান কেটে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করে রামের কাছে ফিরে গেলেন। ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধ করে তিনি ক্ষুধার্তও হয়েছিলেন। তাই হাতের সামনে বানর বা রাক্ষস যাকে পেলেন তাকেই খেতে শুরু করে দিলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁকে বাধা দিতে গেলেন। কিন্তু কুম্ভকর্ণ শুধুমাত্র রামের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে চান। তাই রামকেই আক্রমণ করতে গেলেন। রামের সঙ্গে তাঁর প্রবল যুদ্ধ হল। শেষে রাম কুম্ভকর্ণের হাত-পা কেটে দিলেন। কিন্তু সেই অবস্থাতেও কুম্ভকর্ণ রামের দিকে ধাবিত হলেন। তখন রাম তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। তাঁর কর্তিত মুণ্ডটি গিয়ে পড়ল লঙ্কায়। এর ফলে লঙ্কার বহু ঘর-বাড়ি নষ্ট হল এবং তাঁর দেহটি গিয়ে পড়ল সাগরে। তবে মহাভারতে পাই যে, লক্ষ্মণের হাতে কুম্ভকর্ণের মৃত্যু হয়। মহাভারতে রামায়ণের কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিসরে কুম্ভকর্ণের কীর্তি-কলাপও অতি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। তবু তিনি যে রাবণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন ছিলেন তা স্পষ্ট। বিশালকায় অল্পবুদ্ধিশালী এই কুম্ভকর্ণ বিবিধ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। রাবণের স্বেচ্ছাচারিতা তিনি পছন্দ করেননি এবং সীতাহরণের জন্য তাঁকে প্রবল তিরস্কার করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর বড়ো ভাইকে এবং নিজের স্বজন-বন্ধুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাই বিপদের সময় নিজের কথা না ভেবেই তিনি রাবণকে বিপন্মুক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। রাবণকে সাম-দান-ভেদ ইত্যাদি অর্থশাস্ত্রীয় নীতি সম্বন্ধেও তিনি পরামর্শ দেন। কুম্ভকর্ণ অতি সংক্ষেপে রাবণকে যে অর্থশাস্ত্রীয় উপদেশ দিয়েছিলেন, সেটা রাবণের মতো ঐশ্বর্য্যশালী রাজার পক্ষে বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। কুম্ভকর্ণ বলেছিলেন—আমি পূর্বে আপনাকে হিতের কথা বলেছিলাম, কিন্তু আপনি শোনেননি বলেই আজ আপনার এই বিপত্তি নেমে এসেছে—

হিতেষ্বনভিযুক্তেন সো'য়মাসাদিতস্ত্বয়া।

আপনি নিজের বলদর্পিতায় বিষয়ের ভাল-মন্দ নিয়ে বিচার করেননি। ঐশ্বর্য্যের মত্ততায় যিনি পূর্বের কাজ পরে করেন এবং পরের কাজ আগে করেন, তিনি নীতি-অনীতির কিছুই বোঝেন না—ন স বেদ নয়ানয়ৌ। কুম্ভকর্ণের মুখে এখানে প্রায় কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের ভাষা-পরিভাষাগুলি ভেসে আসে। কুম্ভকর্ণ বলেছেন—

ত্রয়াণাং পঞ্চধা যোগং কর্মণাং যা প্রপদ্যতে—

এখানে তিন এবং পাঁচ সংখ্যাটা যথাক্রমে অর্থশাস্ত্রের ক্ষয়-বৃদ্ধি-স্থিতি অনুসারে কর্মের আরম্ভোপায়, পুরুষদ্রব্যসম্পৎ, দেশ-কাল-বিভাগ, বিপত্তি-প্রতিকার এবং কার্যসিদ্ধির ভাবনা বোঝায়। কুম্ভকর্ণ সবচেয়ে জোর দিয়েছেন মন্ত্রী নির্ণয়ের ওপর। কেননা এইখানেই রাবণের দুর্বলতা সবচেয়ে বেশি। কুম্ভকর্ণ বলেছেন— অমাত্য-মন্ত্রীদের মধ্যেও পশুবুদ্ধি মানুষ এমন অনেকে থাকেন, যাঁরা শাস্ত্রের মর্ম না বুঝে বাচালতাবশত কথা বলেন, তাঁদের মতে রাজার চলা উচিত নয় কখনো। যেসব কার্যদূষক মন্ত্রীরা ব্যক্তিগত ধৃষ্টতায় মন্দ বস্তুকে ভালো বলে বর্ণনা করে, তাদের মন্ত্রণার কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত।

কুম্ভকর্ণ এবার সোজাসুজি রাবণকে বলেছিলেন—আপনার বহু বহু কুমন্ত্রী, তারা আপনাকে অকার্যে প্রবৃত্ত করে। ফলে সুমন্ত্রী যাঁরা থাকেন, তাঁরা কুমন্ত্রণাগ্রাহী আপনার বিপদ সমাসন্ন দেখে শত্রুর সঙ্গে মিলিত হয়ে আত্মরক্ষা করেন। কুম্ভকর্ণ স্পষ্টতই বিভীষণের ইঙ্গিত করে শেষে স্পষ্টই বললেন— আপনার অনুজ ভ্রাতা বিভীষণ এবং আপনার পত্নী মন্দোদরী আপনাকে সীতা-প্রত্যর্পণের ব্যাপারে যা বলেছিলেন, সেটাই অমাদের সকলের পক্ষে মঙ্গলকর ছিল। এখন আপনি যেমন বলবেন তেমনই হবে। রাবণ অবশ্যই তাঁর কথা মানেননি এবং সক্রোধে তাঁকে মান্য গুরু এবং আচার্যের মতো উপদেশ দিতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে কুম্ভকর্ণের শক্তি এবং বিক্রমের ওপরে আস্থা রেখে তাঁকে বিপন্মুক্ত করার জন্য সানুবন্ধ অনুরোধও জানিয়ে

ছিলেন। কুম্ভকর্ণ রাবণের জন্যই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে প্রাণ দেন। এ-ঘটনায় প্রমাণ হয়—একদিকে কুম্ভকর্ণ যেমন রাজনীতির 'নয়-অনয়-অপনয়' বোঝেন, তেমনই স্বজন এবং স্বজাতির সুরক্ষার জন্য তিনি প্রাণ দিতেও কুণ্ঠা করেন না। বীরের মতো যুদ্ধ করেই তিনি যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন।

[রামায়ণ, ৬.৬৩.২-৩৭; ৬.৬৬ সর্গ; ৬.৬৭.১-১৭১; মহা (k) ৩.২৮৭.১-১৮; (হরি) ৩.২৪১.১-১৮]

কুম্ভকর্ণাশ্রম বনপর্বে উল্লিখিত একটি তীর্থ। এই তীর্থদর্শনে বিদ্বান মানুষেরা জগতে বিখ্যাত হন।

[মহা (k) ৩.৮৪.১৫৭; (হরি) ৩.৬৯.১৫৭]

□ এই তীর্থটির আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

কুম্ভকর্ণী অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। কুম্ভকর্ণী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ১৭৯.২২]

কুম্ভকারি বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, পৌরাণিক ভদ্রাশ্ববর্ষের অন্তর্ভুক্ত নদীগুলির মধ্যে কুম্ভকারি একটি। *[বায়ু পু. ৪৪.২২]*

কুম্ভগর্ত দৈত্যরাজ বলির একজন পুত্র।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫.৪৩]

কুম্ভগ্রীব ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে যে, ভণ্ডাসুরের অনুচরদের মধ্যে কুম্ভগ্রীব একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.২১.৮৮]

কুম্ভনাভ১ দানবরাজ বলির পুত্রদের মধ্যে একজন দানব। *[বায়ু পু. ৬৭.৮৩]*

কুম্ভনাভ২ একজন দানব। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কুম্ভনাভ একজন।

[বায়ু পু. ৬৮.১০]

কুম্ভনাস ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে যে, ভণ্ডাসুরের অনুচরদের মধ্যে কুম্ভনাস একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.২১.৮৮]

কুম্ভবক্ত্র স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অনুচর, একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৭৫; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

কুম্ভমান একজন দানব। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.১০]

কুম্ভহনু কুম্ভহনু রামায়ণের পরিচিত রাক্ষসবীর প্রহস্তের এক সচিবের নাম। প্রহস্তের সঙ্গে তার যে চার জন সচিব যুদ্ধ করতে এসেছিল, কুম্ভহনু তাদের একজন। অত্যন্ত নির্দয় ভাবে সে বানরদের বধ করছিল। পরে অঙ্গদ একে হত্যা করেন।

[রামায়ণ ৬.৫৭.৩০; ৬.৫৮.১৯; ৬.৫৮.২৩]

কুম্ভাণ্ড১ পুরাণগুলিতে বাণাসুরের অন্যতম মন্ত্রী হিসেবে কুম্ভাণ্ডের নাম উল্লিখিত হয়েছে। বাসুদেব-কৃষ্ণের সঙ্গে যখন বাণাসুরের যুদ্ধ হয়েছিল, তখন বলরামের সঙ্গে কুম্ভাণ্ডের যুদ্ধ হয়।

চিত্রলেখা নামে কুম্ভাণ্ডের এক কন্যা ছিলেন। তিনি বাণাসুরের কন্যা ঊষার সখী ছিলেন।

[ভাগবত পু. ১০.৬২.১৪; ১০.৬৩.৮, ১৬; বিষ্ণু পু. ৫.৩২.১৭]

কুম্ভাণ্ড২ অপ্সরা চিত্রলেখার পিতা কুম্ভাণ্ড। তিনি বানাসুরের অমাত্য ছিলেন বলে শিব-পুরাণে বলা হয়েছে। *[শিব পু. (ধর্ম সংহিতা) ৭.২৬.২০৫]*

কুম্ভাণ্ডকোদর স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচর, একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৬৯; হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে একে কুম্ভাণ্ডকো'পর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

কুম্ভি মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে পক্ষীরাজ সম্পাতির পৌত্র তথা সুপার্শ্বের পুত্র ছিলেন কুম্ভি (পাঠান্তরে কুন্তি)। *[মার্কণ্ডেয় পু. ২.১-২]*

কুম্ভিকা স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.১৫; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোকসংখ্যা ১৫ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

কুম্ভিল একজন রাক্ষস। কুম্ভিল পাতালের তৃতীয় তলে বসবাস করে বলে বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে। *[বায়ু পু. ৫০.২৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.২৮]*

□ বায়ু পুরাণের একটি পাঠে দানবরাজ বলির পুত্র হিসেবে কুম্ভিলের নাম পাওয়া যায়।

[বায়ু পু. ৬৮.৩২]

কুম্ভীক বায়ু পুরাণ মতে অন্যতম এক নরক।

[বায়ু পু. ৮৩.৮৯]

কুম্ভীধান্যক 'কুম্ভ' মানে মাটির কলস বা 'জালা'র মতো বড়ো কোনো মাটির পাত্র। বড়ো পাত্র বলে ব্যাখ্যা করার কারণ মূলত কূর্মপুরাণে প্রদত্ত সংজ্ঞা। মহাকাব্য-পুরাণে সাধারণ গৃহস্থের যে চারটি বৃত্তির কথা বলা হয়েছে তারই অন্যতম কুম্ভীধান্যক। কূর্মপুরাণে কুম্ভীধান্যক ব্যক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—যে পরিমাণ সঞ্চিত ধান বা শস্য দিয়ে এক বৎসর বা তার চেয়ে বেশি কিছুকাল ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যায়, সেই পরিমাণ ধান্য-সঞ্চয়ী ব্যক্তিকে কুম্ভীধান্যক বলা হয়। সেক্ষেত্রে যে মাটির পাত্রে এই পরিমাণ শস্য সঞ্চয় করা যায়—সেটাকে যথেষ্ট বড়ো মাটির 'জালা'র মতো কিছু বলেই ধরে নিতে হবে। এ ধরনের সঞ্চয় যে ব্যক্তির থাকে, তাকে এখনকার দিনের ভাষায় আমরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বলতে পারি। মহাভারতের শান্তিপর্বেও গৃহস্থের বৃত্তি হিসেবে কুম্ভীধান্যকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

[মহা (k) ১২.২৪৩.৩; (হরি) ১২.২৪০.৩; কূর্ম পু. ২.২৫.১৩]

কুম্ভীনসি একজন অসুর। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে বলি, নমুচি, শম্বর প্রভৃতি অসুরবীরের সঙ্গে তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.৩৯.৭; (হরি) ১৩.৩৫.৬]

কুম্ভীনসী$_১$ রাক্ষস সুমালীর ঔরসে কেতুমতীর গর্ভে কুম্ভীনসী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সম্পর্কে রাবণের মাসি ছিলেন। *[রামায়ণ (মুধোলকর) ৭.৫.৩৮-৪০; রামায়ণ (তর্করত্ন) ৭.৫.৩৮-৪০]*

কুম্ভীনসী$_২$ মাল্যবানের কন্যা অনলা। তাঁর মেয়ে কুম্ভীনসী। তিনি রাবণের মাসতুতো বোন এবং মধু রাক্ষসের পত্নী। এর আগে সুমালীর কন্যা কুম্ভীনসী (কুম্ভীনসী$_১$) কে আমরা রামায়ণে পেয়েছি। সুমালীর কন্যা কুম্ভীনসী এবং মাল্যবানের দৌহিত্রী কুম্ভীনসী, এই দুই চরিত্রকে রামায়ণে ভিন্ন চরিত্র হিসাবে বলা হলেও, এঁরা দুজন একই ব্যক্তি কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে। মধুরাক্ষস কুম্ভীনসীকে হরণ করে বিবাহ করলে রাবণ ক্রুদ্ধ হন। তিনি মধু রাক্ষসকে আক্রমণ করার জন্য সসৈন্যে মধুপুরে যাত্রা করেন। কিন্তু মধুপুরে গিয়ে রাবণ মধুকে দেখতে পেলেন না। বরং তাঁর বোন কুম্ভীনসীকে দেখতে পেলেন। রাবণকে দেখে ভীত হয়ে কুম্ভীনসী তাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বললেন—আপনি আমার স্বামীকে হত্যা করবেন না। কুলস্ত্রীদের কাছে স্বামীহত্যার মতো ভীতি আর কিছুই নেই। অতএব আমাকে দয়া করুন।

কুম্ভীনসীর কথা শুনে রাবণের ক্রোধ প্রশমিত হল। তিনি দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের অভিলাষী হয়ে মধু রাক্ষসের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। মধু রাক্ষসও দশাননকে সহায়তা করার জন্য অঙ্গীকার করে বিবিধ উপচারে তাঁকে সম্মানিত করলেন।

[রামায়ণ (মুধোলকর) ৭.২৫.৩৯-৪৮; রামায়ণ (তর্করত্ন) ৭.৩০ অধ্যায়]

কুম্ভীনসী$_৩$ বিশ্রবার ঔরসে পুষ্পোৎকটার গর্ভজাত কন্যা।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৫৫; বায়ু পু. ৭০.৪৯]

কুম্ভীনসী$_৪$ দানবরাজ বলির কন্যা এবং বাণাসুরের ভগিনী। *[মৎস্য পু. ১৮৭.৪০-৪২]*

কুম্ভীনসী$_৫$ গন্ধর্ব অঙ্গারপর্ণের স্ত্রী কুম্ভীনসী। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন অস্ত্রাঘাতে অঙ্গারপর্ণকে অচৈতন্য করলে কুম্ভীনসী মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে তাঁর স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করেন। *[দ্র. অঙ্গারপর্ণ]*

[মহা (k) ১.১৭০.৩৫; (হরি) ১.১৬৩.৩৫]

কুম্ভীশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি তীর্থক্ষেত্র। বারাণসীক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত বরণা নদীর পূর্ব তীরে এই তীর্থ অবস্থিত।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৪৫]

কুরঙ্গ$_১$ করতোয়া নদীর তীরবর্তী একটি দেশ। বনপর্বে একে একটি তীর্থস্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরঙ্গ তীর্থদর্শনে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

[মহা (k) ১৩.২৫.১২; (হরি) ১৩.২৬.১২]

□ কুরঙ্গদেশ বলতে বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা ডিভিশনের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলকে বোঝানো হত বলে মনে করা হয়। এখনও এই অঞ্চলে কুরঙ্গমাতিয়াল নামে একটি জায়গা আছে। করতোয়া নদী সেই অঞ্চল দিয়েই আজও প্রবাহিত হয়। *[দ্র. করতোয়া]*

কুরঙ্গ$_২$ মেরু পর্বতকে চারদিক থেকে যে কুড়িটি পর্বত বেষ্টন করে আছে, তাদের মধ্যে অন্যতম। সম্ভবত মধ্য এশিয়ার কোনো পর্বত।

[দ্র. মেরু পর্বত]

[ভাগবত পু. ৫.১৬.২৬; দেবীভাগবত পু. ৮.৬.৩০]

কুরজ বৈবস্বত মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন বিশ্বেদেব তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ।

ধর্মের ঔরসে দক্ষকন্যা বিশ্বার গর্ভজাত পুত্ররা বিশ্বেদেব নামে পরিচিত। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে একজন কুরজ।

[মৎস্য পু. ২০৩.১৩]

কুরর ভাগবত পুরাণ অনুসারে জম্বুদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত পর্বতগুলির মধ্যে কুরর একটি।

[ভাগবত পু. ৫.১৬.২৬]

কুররী বিষ্ণু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, জম্বুদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত একটি পর্বত কুররী। এই পর্বত মেরু পর্বতের পূর্বদিকে অবস্থিত বলে বিষ্ণু পুরাণে কথিত হয়েছে। *[বিষ্ণু পু. ২.২.২৭]*

কুরীর *[দ্র. কেশ]*

কুরু১ ইন্দো-আর্য জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্যতম প্রাচীন ও প্রধান ক্ষত্রিয় জনজাতি। কুরু জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলই কুরুদেশ নামে পরিচিত। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে কুরুকে উত্তর ভারতীয় জনপদ বলা হয়েছে।

[মহা (k) ১.১.১৩, ১৭৩; ৬.৯.৩৯;
(হরি) ১.১৩.১৩৭; ৬.৯.৩৯;
ভাগবত পু. ১.১০.৩৪; ৯.২৪.৬৩; ৮২.১৩;
৮৪.৫৫; ১০.৫৪.৫৮; ৭১.৩০; ৭২.৫]

□ ঋগ্বেদে সরাসরি কুরুদের উল্লেখ না পাওয়া গেলেও কুরুশ্রবণ ও পাকস্থামা কৌরয়াণ নামে দুজন রাজপুত্রের কথা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদে এই কুরুশ্রবণকে ত্রাসদস্য বা পুরুবংশীয় ত্রসদস্যুর বংশধর বলে উল্লেখ করা হয়েছে (লক্ষণীয়, মহাকাব্য-পুরাণে প্রায় সর্বত্রই ত্রসদস্যুকে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজর্ষি বলা হয়েছে। শুধুমাত্র ঋগ্বেদেই তিনি পরিচিতি লাভ করেছেন পুরুবংশীয় রাজা হিসেবে)। পুরুবংশীয়রা সরস্বতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বাস করতেন। পরবর্তীকালে ওই একই জায়গায় কুরুদের বাস গড়ে ওঠে। আবার ভরতবংশীয়রাও সরস্বতী, আপগা ও দৃষদ্বতী নদী উপত্যকা অঞ্চলেরই মানুষ। একই অঞ্চল থেকে উদ্ভূত হওয়ার কারণেই পণ্ডিতরা কুরুদের ভরতবংশেরই পরম্পরাজাত বলে মনে করেন, তাঁরা একথাও বলেন যে, বৈদিক যুগে ভরতবংশীয়দের একটি শাখা, যার নাম তৃৎসু তাঁদের সঙ্গে পুরুদের শত্রুতা থাকলেও পরবর্তীকালে এই তৃৎসু এবং পুরুদের মিশ্রণেই কুরুজাতির সৃষ্টি হয়।

[ঋগ্বেদ ৩.২৩.৪; ৮.৩.২১; ১০.৩৩.৪;
TAI (Law) p. 18; GAMI (Sircar) p. 70]

□ প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে কুরুদেশ তথা জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শুধু কুরু নয়, এর সঙ্গে একত্রে পঞ্চাল দেশের নামও করা হয়েছে। ফলে একক নাম হিসেবে প্রায় সর্বত্রই 'কুরুপঞ্চাল' সমাসবদ্ধভাবে উঠে আসে। কুরু ও পাঞ্চালরা পরস্পরের জ্ঞাতি এবং প্রতিবেশীও বটে। এঁদের মধ্যে এক ধরণের জ্ঞাতি শত্রুতা বরাবরই ছিল। মহাকাব্যের বহু জায়গাতেই কুরু-পঞ্চালদের পারস্পরিক শত্রুতার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। আবার একথাও ঠিক যে, কুরু ও পঞ্চাল উভয়েই ভারতবর্ষের আর্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র ছিল কুরু এবং পঞ্চাল দেশ। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক মনু কুরু সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কুরুক্ষেত্রকে ব্রহ্মর্ষি দেশ বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন আকর গ্রন্থগুলিতেও প্রাচীন কুরু এবং পঞ্চাল-দেশীয় ব্রাহ্মণদের বিশেষ সম্ভ্রমের চোখে দেখা হয়েছে। তাঁদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যজ্ঞে অংশগ্রহণের জন্য। ফলে বলা যেতেই পারে যে, ভৌগোলিক নৈকট্য এবং প্রায় একই সময়ে আর্যায়ণের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠার কারণেই কুরু ও পঞ্চালদের নাম একসঙ্গে উল্লিখিত হতে দেখা যায়। *[মনু সংহিতা ২.১৯;*
শতপথ ব্রাহ্মণ (Eggling) ১১.৪.১.২;
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১.৮.৪.১, ২;
মৈত্রায়নী সংহিতা ৪.২.৬;
জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণ ৩.৭.৬, ৮.৭; ৪.৭.২;
৩.৩০.৬; ৪.৬.২; কৌশতকী উপনিষদ ব্রাহ্মণ ৪.১;
গোপথ ব্রাহ্মণ ১.২.৯; কাঠক সংহিতা ১০.৬]

□ ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে একাধিক কুরু বংশীয় রাজা এবং তাঁদের নানা যজ্ঞানুষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেসব কুরু বংশীয় রাজাদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা হলেন—ধৃতরাষ্ট্র, শতানীক, সত্রাজিৎ, পরীক্ষিৎ, জনমেজয় প্রমুখ।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Eggling) ১৩.৫.৪.১-৩, ২১-২২]

□ অজমীঢ়ের পৌত্র ঋক্ষ। আবার ঋক্ষের পুত্রের নাম সংবরণ। এই সংবরণের ঔরসে সূর্যকন্যা তপতীর গর্ভে কুরু নামে এক শক্তিশালী পুরুষের জন্ম হয়। কুরুর নামানুসারেই তাঁর শাসনাধীন রাজ্যও কুরুদেশ নামে পরিচিত। ভাগবত পুরাণে এই কুরুকেই কুরুক্ষেত্রাধিপতি বলা হয়েছে—

যো'জমীঢ়সুতো হ্যন্য ঋক্ষঃ সংবরণস্ততঃ।
তপত্যাং সূর্যকন্যায়াং কুরুক্ষেত্রপতিঃ কুরুঃ॥

[মহা (k) ১.১৭৩.৫০; (হরি) ১.১৬৬.৫০; ভাগবত পু. ৯.২২.৪]

□ মহাভারতের আদিপর্বে বলা হয়েছে যে, ভরতবংশীয় সংবরণ বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে নিজের রাজ্য ছেড়ে সপরিবারে সিন্ধুনদের তীরবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন—

ততঃ সদারঃ সামাত্যঃ সপুত্রঃ সসুহৃজ্জনঃ।
রাজা সংবরণস্তস্মাৎ পলায়ত মহাভয়াৎ॥
সিন্ধোর্নদস্য মহতো নিকুঞ্জে ন্যবসত্তদা।
নদীবিষয়পর্য্যন্তে পর্বতস্য সমীপতঃ॥

এখানে জিজ্ঞাস্য—সংবরণ, কোথা থেকে সিন্ধুনদের তীরে পালিয়ে যাচ্ছেন, অর্থাৎ পূর্বে তাঁর রাজ্য কোথায় ছিল? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভরত বংশের অন্যতম আদিপুরুষ যযাতি রাজত্ব করতেন প্রতিষ্ঠানপুরে, যে স্থানটি ছিল গঙ্গা-যমুনার সংযোগস্থলে অর্থাৎ তৎকালীন আর্যাবর্তের ভৌগোলিক ধারণা অনুযায়ী এই স্থান গঙ্গা-যমুনার মধ্যদেশে অবস্থিত ছিল। ধারণা করা যায়, যযাতির উত্তর পুরুষ সংবরণ গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চল বা মধ্যদেশ থেকে সিন্ধুনদের দিকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তার ফলে বলা যায় যে, যযাতির সমসময়ে কুরুদেশ ভারতবর্ষের মধ্যভাগেই অবস্থিত ছিল। আর সংবরণের কারণেই পশ্চিমে সিন্ধুনদের দিকটাও মধ্যদেশ বলে চিহ্নিত হতে থাকে। এখানেই মহাভারত বা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কুরু-পঞ্চালকে মধ্যদেশীয় জনপদ বলার প্রকৃত কারণ বোঝা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শ্লোকে বলা হয়েছে—

তস্মাদস্যাং ধ্রুবায়াং মধ্যমায়াং প্রতিষ্ঠায়াং দিশি
যে কে চ কুরুপঞ্চালানাং রাজানঃ
সবশোশীনরাণাং রাজ্যায়ৈব তে'ভিষিচ্যন্তে।

এই কারণেই কুরুদেশ বলতে এখন আমরা হরিয়ানা, দিল্লী এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল বুঝলেও, প্রাচীনকালে কুরু মধ্যদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সংবরণ সিন্ধুনদী তীরবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিলেও, তিনি ও তাঁর পুত্র কুরুই কালক্রমে ভরত বংশের সাম্রাজ্য পুনর্বিস্তার করেন। কুরুর বাহুবলেই সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যভাগে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কুরু, কুরুক্ষেত্র ও কুরুজাঙ্গল নিয়ে সমগ্র কুরুদেশ গঠিত হয়। এই কুরুদেশের রাজধানী হস্তিনাপুর। বায়ুপুরাণে এমন কথাও বলা হয়েছে যে, রাজা কুরু প্রয়াগ থেকে কুরুক্ষেত্রে পদব্রজে গিয়েছিলেন—

যঃ প্রয়াগং পদাক্রম্য কুরুক্ষেত্রং চকার হ।

কুরুর এই পদব্রজযাত্রা আসলে কুরু সাম্রাজ্যের ভরকেন্দ্র প্রতিষ্ঠানপুর এবং প্রয়াগ থেকে হস্তিনাপুরে স্থানান্তরিত হওয়ার কাহিনীকে ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে সম্ভাবিত করে।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (Haug) ৮.১৪; মহা (k) ১.৯৪.৩৭-৪০; ৫.১১৪.৯; (হরি) ১.৮৯.২৫-২৮; ৫.১০৬.১০; বায়ু পু. ৯৯.২১৪-২১৭; ভাগবত পু. ৯.২২.৫]

□ আদিপর্বের একটি শ্লোকে কুরুজাঙ্গল, কুরু এবং কুরুক্ষেত্র—তিনটি জায়গার নাম পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে এই তিনটি জায়গাই কুরুবংশীয়দের শাসনাধীন ছিল। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর—এই তিন কুরুরাজপুত্রের জন্মের ফলে তিনটি অঞ্চলই সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে।

সমগ্র মহাভারতকে কুরু বংশেরই ইতিহাস বলা যায়। কুরুদের উৎপত্তি, সাম্রাজ্য বিস্তার এবং তাঁদের ধ্বংস সম্পর্কে দীর্ঘ কাহিনি মহাভারতের কবি বর্ণনা করেছেন। আদিপর্বের একটি শ্লোকে মহাভারতে কুরুবংশের গাথা বলে একটি শ্লোকের উল্লেখ করা হয়েছে। শ্লোকটিতে দেখা যাচ্ছে কুরুরাজ জনমেজয়, মহর্ষি বৈশম্পায়নের কাছে মহাভারতের আখ্যান শুনতে চাইছেন। এমন আখ্যান যেখানে কুরুবংশীয়দের বিরাট এবং উদার চরিত্র-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে—

কথিতং বৈ সমাসেন ত্বয়া সর্বং দ্বিজোত্তম।
মহাভারতমাখ্যানং কুরূণাং চরিতং মহৎ॥

মহাভারতে বর্ণিত সমৃদ্ধ কুরুবংশের কাহিনী পাঠে মানুষ পুণ্যলাভ করে এবং সর্বতোভাবে সম্মানিত হয়—

কুরূণাং প্রথিতং বংশং কীর্ত্তয়ন্ সততং শুচিঃ।
বংশমাপ্নোতি বিপুলং লোকে পূজ্যতমো ভবেৎ॥

কুরুদেশের রাজধানীর নাম হস্তিনাপুর, যেটা বর্তমান উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের মেরঠ শহর। কুরুদেশের সমৃদ্ধি সম্পর্কে বহুকথা মহাকাব্যে বলা হয়েছে। শস্যশ্যামল কুরুরাজ্য যেন সুখের প্রতিচ্ছবি। মানুষ তো মানুষ, কুরুরাজ্যে পশুরাও

বড়ো সুখী। শুধু কৃষিকাজ নয় শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কুরুদেশ উন্নত। প্রজারা সকলেই বীর, সচ্চরিত্র এবং জ্ঞানী। সর্বদাই তাদের ধর্ম-কর্মে মন। কুরুদেশের চারিদিকে মনোরম জলাশয়, বন-উপবন ও জলপূর্ণা নদী। সেখানে নিত্যই যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন। উদ্যোগ পর্বে স্বয়ং বাসুদেব কৃষ্ণ, কুরুদের শাস্ত্রজ্ঞানী, সদাচারী, দয়ালু, সরল, সত্যনিষ্ঠ এবং ক্ষমাশীল বলে উল্লেখ করেছিলেন। অঙ্গরাজ কর্ণের মুখেও কুরুদেশের অধিবাসীদের সম্পর্কে প্রশংসা করতে দেখা যায়। তিনি কুরুদের দানশীল ও সজ্জন বলেছেন। কুরুদেশে বহু বেদজ্ঞ পণ্ডিতের বাস। কুরুদেশীয় ব্রাহ্মণরা চিরন্তন ধর্ম সম্পর্কে জানেন এবং চর্চা করেন।

[মহা (k) ১.৬২.১, ৩০; ১০৯.১-১৬; ৫.৫৪.৭; ৯৫.৫-৬; ৮.৪৫.১৪, ১৬, ৩০; (হরি) ১.৫৭.১, ৩০; ১০৩.১-১৬; ৫.৫৪.৭; ৮৮. ৫-৬, ৮.৩৪.১২০, ১২২, ১৩৪]

□ কুরুবংশীয় পাণ্ডু কাশী, সুহ্ম ও পুণ্ড্রদেশ জয় করে সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করেছিলেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে পাণ্ডু, শান্তনু ও ভরতের মাহাত্ম্যধন্য কুরুবংশের বিস্মৃত গৌরব ফিরিয়ে এনেছিলেন।

[মহা (k) ১.১১৩.২৯, ৩৭; (হরি) ১.১০৭.২৯, ৩৭]

□ কথিত আছে—নারায়ণের বাক্য থেকে জন্ম নেন অপান্তরতমা নামে এক পুত্র। ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ অপান্তরমা পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে শাস্ত্র রচনা করেন। নারায়ণ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, দ্বাপরযুগে এই অপান্তরতমা তপস্বীরূপে জন্মগ্রহণ করবেন এবং তাঁরই বংশধরেরা পৃথিবীতে কৌরব নামে পরিচিত হবেন। তিনি আরও জানান যে, কৌরবরা, অপান্তরতমার কথা অমান্য করে জ্ঞাতি-যুদ্ধে নিজেদের ধ্বংস করবে। কলিযুগে অপান্তরতমা বেদকে চারভাগে ভাগ করবেন। তারপর দ্বাপর যুগ শেষ হয়ে কাল-পর্যায় কলিযুগে প্রবেশ করলে অপান্তরতমার গায়ের রং হবে কালো। কারণ কলি বা কৃষ্ণযুগ আগত। এই কৃষ্ণবর্ণ জ্ঞানী পুরুষই হবেন কুরুবংশের ইতিহাস সমৃদ্ধ মহাভারতের রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস।

[মহা (k) ১২.৩৪৯.৪৪-৪৬; (হরি) ১২.৩৩৩.৪৪-৪৬]

□ পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের কালে এসে মহাভারতে কুরুবংশের উল্লেখ সম্পর্কে একটি বিশেষ বিষয় লক্ষ্য করা যায়। এই সময় থেকেই মহাভারতের কবি ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধন বা দুঃশাসন সম্পর্কে 'কুরু' বা 'কৌরব' বিশেষণটির ব্যবহার করেছেন অনেক বেশি। অন্যদিকে কুরু বংশজাত হলেও পাণ্ডু পুত্রদের ক্ষেত্রে পাণ্ডব বিশেষণটি অপেক্ষাকৃত ভাবে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে, যা আসলে একটি নতুন জ্ঞাতি বিভাজনের ইঙ্গিত বহন করে। কুরুবংশীয় হয়েও পাণ্ডবদের যেন এক পৃথক অস্তিত্ব তৈরি হয় এই সময় থেকেই। পাণ্ডবদের বাসস্থান ও কর্মভূমি হল ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাপুর নয়। এই সূত্রে বলা যেতে পারে যে, ইন্দ্রপ্রস্থই হয়ে উঠলো কুরুদেশের দ্বিতীয় রাজধানী।

[মহা (k) ১.২২১.৬৩; (হরি) ১.২১৪.১৫]

□ হস্তিনাপুরের রাজসভায় পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে পাশা খেলার মধ্যে দিয়ে কুরুবংশের ধ্বংসের ইঙ্গিত সূচিত হয়েছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধশেষে কুরুদের ধৃতরাষ্ট্রবংশীয় শাখাটির প্রায় প্রতিটি বংশধরের মৃত্যুর মাধ্যমে সেই ইঙ্গিত বাস্তবরূপ লাভ করে। দ্যূতক্রীড়ার সময়ই অবশ্য দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতিকে কুরুবংশের সর্বনাশের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। *[মহা (k) ২.৬৬.১০-১২; ৯.৩৩.২৫; (হরি) ২.৬৩.১০-১২; ৯.৩১.২৪]*

□ কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে গোবাস, দাসময়ী, বসাতি, প্রাচ্য, বাটধান, তুষার, যবন, খশ, দার্বাভিসার, দরদ, শক, রমঠ, তঙ্গন, অন্ধ্রক, পুলিন্দ, কিরাত, পর্বত এবং সমুদ্রতীরবাসী ম্লেচ্ছদের কৌরব পক্ষে যোগদান করতে দেখা যায়। এদের মধ্যে কেউ কুরুদের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবার কেউ বা কুরুদের প্রতি অধীনতার কারণে যুদ্ধে কৌরবদের পক্ষ নিয়েছিল বলে মনে হয়। এই যুদ্ধে কৌরব পক্ষে মোট আঠারো অক্ষৌহিনী সৈন্য যোগদান করেছিল।

[মহা (k) ১.২.২৮; ৮.৭৩.১৮-২১; (হরি) ১.২.২৮; ৮.৫৪.১৮-২১]

□ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে কুরুবংশ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কোনো বংশধর জীবিত ছিল না। এই সময় উত্তরার গর্ভে কুরুবংশরক্ষক রূপে পরীক্ষিতের

জন্ম হয়। কুরুকুল ক্ষয়ের পর জন্ম বলেই উত্তরা-অভিমন্যুর পুত্রের নাম পরীক্ষিৎ—

পরিক্ষীণেযু কুরুষু পুত্রস্তব ভবিষ্যতি।
এতদস্য পরীক্ষিত্বং গর্ভস্থস্য ভবিষ্যতি॥
তস্য তদ্বচনং সাধোঃ সত্যমেতত্তবিষ্যতি।
পরীক্ষিত্তবিতা হ্যেষাং পুনর্বংশকরঃ সুতঃ॥

[মহা (k) ১০.১৬.৩-৪; (হরি) ১০.১৬.৩-৪]

□ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-শেষে কৌরবদের সম্পূর্ণ বিনাশ গান্ধারীকে প্রচণ্ড বিচলিত করেছিল। গান্ধারী মহাযুদ্ধে তাঁর একশো পুত্র সহ সমস্ত স্বজনকে হারিয়েছিলেন। গান্ধারী ধারণা করেছিলেন বাসুদেব কৃষ্ণই কুরুকুল ধ্বংসের মূল কারণ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কৃষ্ণ ইচ্ছা করলে কৌরব ও পাণ্ডবদের বংশনাশী এই জ্ঞাতি-যুদ্ধ রোধ করতে পারতেন। ফলে ক্রুদ্ধা হয়ে গান্ধারী, কৃষ্ণকে বংশনাশের অভিশাপ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ছত্রিশ বছর পর কৃষ্ণ স্বয়ং যদুবংশ ধ্বংস করবেন। কৃষ্ণকেও বন্ধুবিহীন অবস্থায় হীন উপায়ে হত্যা করা হবে।

[মহা (k) ১১.২৫.৪৩-৪৫; (হরি) ১১.২৫.৪৩-৪৫]

□ ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, ভগবান নারায়ণ, বাসুদেব কৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হয়ে বলরাম, ভীম ও অর্জুন নামে কুরু বীরদের নিধন করবেন। *[ভাগবত পু. ২.৭.৩৫]*

□ কুরু গঙ্গানদী তীরবর্তী একটি দেশ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৫০]

□ কুরুদেশীয় রাজারা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এখানে অবশ্যই ধৃতরাষ্ট্র বংশীয় দুর্যোধন প্রমুখের কথা বলা হয়েছে। *[ভাগবত পু. ১০.৭৫.১২]*

□ মগধরাজ জরাসন্ধের শক্তিতে বলীয়ান মথুরার রাজা কংস যাদবদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার শুরু করেন। তাঁর ভয়ে যাদবরা তাঁদের বাসস্থান ছেড়ে অনান্য দেশে আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হন। এই সময়ে যাদবরা যে সব দেশে লুকিয়ে বাস করতেন সেগুলির মধ্যে কুরু অন্যতম। *[ভাগবত পু. ১০.২.৩]*

□ পণ্ডিত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী কুরুদেশের বিস্তার সম্পর্কে বহু তথ্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, সমগ্র কুরুদেশ সরস্বতী নদী তীরবর্তী অঞ্চল থেকে শুরু করে গঙ্গানদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাভারতে বলা হয়েছে যে, কুরুদেশ, কুলিন্দ দেশ (শতদ্রু, যমুনা ও গঙ্গানদীর উৎসের কাছাকাছি অবস্থিত একটি স্থান) থেকে মথুরা-শূরসেন অঞ্চল, মৎস্যদেশ, রোহিতক হয়ে রোহিলখণ্ডে অবস্থিত পঞ্চাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরুদেশ মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল—কুরু, কুরুজাঙ্গল ও কুরুক্ষেত্র।

তবে কুরুবংশীয় পরীক্ষিতের শাসনের পরবর্তীকাল থেকে দেশটির রাজনৈতিক গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে বলে মনে করা হয়। শুধু তাই নয় কুরুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থারও যথেষ্ট অবনতি হয়েছিল এই সময় থেকেই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জনমেজয়ের উত্তরাধিকারী নিচক্ষু কুরুদের রাজধানী হস্তিনাপুর থেকে কৌশাম্বীতে স্থানান্তরিত করেছিলেন। অনেকে অবশ্য মনে করেন যে, গঙ্গানদীর প্লাবনে ধ্বংস নেমে এসেছিল, সেই কারণেই কুরুদেশের রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। দ্রাবিড়ীয় মটচী আক্রমণও রাজধানী স্থানান্তরণের একটি কারণ হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'মটচী' শব্দটির অর্থ বজ্রপাত। কুরুদেশ বজ্রপাতের কারণেও জনশূন্য হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। তবে এ বিষয়ে পণ্ডিতরা নিঃসন্দেহ যে, রাজধানী স্থানান্তরণের ফলে কুরুরাজ্যের ক্রমাগত রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাসের প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হয়েছিল।

[বিষ্ণু পু. ৪.২১.৩; মৎস্য পু. ৫০.৭৮-৭৯;
বায়ু পু. ৯৯.২৭১-২৭২;
ছান্দোগ্য উপনিষদ ১.১০.১ (শঙ্করাচার্যের টীকা দ্র.);
PHAI (H.C. Roychowdhury) p. 20, 63-64]

□ এখনকার ভাবনায় কুরুদেশ বলতে বর্তমান দিল্লী-মেরঠ ও হরিয়ানার কিছু অংশকে বোঝানো হয়। তবে গঙ্গা-যমুনা নদীর দোয়াবের একটি অংশও কুরুদের শাসনাধীন ছিল।

□ ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে সব সময়ই কুরু পাঞ্চালদের নাম একত্রে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। যা দেখে পণ্ডিত B.C. Law এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, সম্ভবত ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির বেশিরভাগই কুরু-পঞ্চাল জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলেই লেখা হয়েছিল।

কুরুদেশ সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বিস্তারের কাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। *[TAI (Law), p. 18-21]*

□ পণ্ডিত B.C. Law মনে করেন—খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে কুরুদেশ রাজতন্ত্রের পরিবর্তে সংঘরাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। এখানে মনে রাখতে হবে—খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে কৌটিল্য একপ্রকার সংঘ শাসনের উল্লেখ করেছেন, যাদের বলা হয়েছে রাজশব্দোপজীবী—অর্থাৎ শুধু, 'রাজা' উপাধি ধারণ করেই তাঁরা একটি রাজ্যের শাসনকার্য নির্বাহ করতেন। স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে, শুধুমাত্র উপাধি ধারণের মাধ্যমেই একটি রাজ্যের শাসনকার্য নির্বাহ করা সম্ভব নয়; আসলে, যে কয়জন শাসক মিলে এই সংঘের সৃষ্টি করতেন অথবা, আরও সোজা ভাষায়, সংঘভুক্ত শাসকেরা প্রত্যেকেই 'রাজা' শব্দটি পদবি হিসেবেই ব্যবহার করতেন; কিন্তু, সেই রাষ্ট্রের মূল শাসনভার নির্ভর করত একাধিক শাসকের ঐকমত্যের ওপরেই।

এতে অবাক হবার কিছু নেই; কারণ, এক-একটি সংঘের মধ্যে যাঁরা প্রধান পুরুষ বলে বিখ্যাত হতেন, তাঁরাই 'সংঘমুখ্য' বলে পরিচিত হতেন। কৌটিল্য স্পষ্টতই সংঘমুখ্যদের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা এই সংঘমুখ্যদের স্পষ্ট বিবরণ পরে দেব। তার আগে সংঘগুলির উদাহরণ হিসেবে কৌটিল্য যেসব নাম উচ্চারণ করেছেন, তার সম্বন্ধে সামান্য বিচার সেরে নিই।

দ্বিতীয় উদাহরণে, সংঘচারী হওয়া সত্ত্বেও যেখানে গণমুখ্যেরা নিজেদের নামের সঙ্গে 'রাজ' শব্দটা জুড়ে নিতেন, তাঁদের মধ্যে কৌটিল্য নাম করছেন—লিচ্ছবি, বৃজি, মল্ল, মদ্রক, কুকুর এবং কুরু-পাঞ্চালদের কথা। এই দেশ বা জাতিনামগুলির মধ্যে কুরু এবং পাঞ্চালদেশে যে রাজতন্ত্রের প্রচলন ছিল সেটা আমরা স্পষ্টতই মহাভারত থেকে জানি। কিন্তু, মহাভারতেই যেমনটি দেখেছি, তাতে সর্বেশ্বর রাজা হওয়া সত্ত্বেও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মত সবসময় খাটেনি। বিশেষত, কুরুরাজকুলের ভীষ্ম-বিদুর প্রভৃতি কুলবৃদ্ধেরাও রাজ্যশাসনে অংশগ্রহণ করতেন। স্বয়ং দুর্যোধনও ধৃতরাষ্ট্রের আমলেই রাজা বলে চিহ্নিত হয়েছেন। অন্যদিকে, যুধিষ্ঠির রাজা না থাকার সময়েও রাজ শব্দে সম্বোধিত হয়েছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, ভীষ্ম-বিদুরেরা রাজা না হলেও তাঁদেরও কিছু স্বাতন্ত্র্য ছিল। মহামতি দ্রোণাচার্য একবার ক্ষিপ্ত হয়ে দুর্যোধনকে বলেছিলেন—আমি তোমার দেওয়া বৃত্তি ভোগ করে হস্তিনাপুরে থাকি না। স্বয়ং ভীষ্ম আমাকে বৃত্তি দেন। হয়তো এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের কারণেই কুরু-পাঞ্চালদের সংঘ হিসেবে কীর্তন করেছেন কৌটিল্য।

[Arthasāstra; translation by Shāmashāstri; p. 407]

কুরু২ বিখ্যাত পুরুবংশীয় রাজা। ইনি সংবরণ ও তপতীর পুত্র। কুরুর নামানুসারেই তাঁর উত্তরপুরুষরা কৌরব বংশ বলে পরিচিত।

[মহা (k) ১.১.২৩০; ১.৭৫.১; ১.১৭৩.৫০; (হরি) ১.১.১৯৩; ১.৬৩.৪; ১.১৬৬.৫০; ভাগবত পু. ৯.২২.৩]

□ পুরাকালে রাজা সংবরণের রাজত্বকালে একবার ভরতবংশীয়দের রাজ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা শত্রুর আক্রমণে (মূলতঃ জ্ঞাতি পাঞ্চালদের আক্রমণে) প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে সময় রাজা সংবরণ পরিবার-পরিজনসহ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। শত্রুসৈন্যের ভয়ে ভরতবংশীয়রা সিন্ধুনদের তীরবর্তী অঞ্চলের গহন অরণ্যে আত্মগোপন করেন। সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করে তাঁরা বহুবছর বাস করেছিলেন। দীর্ঘকাল নিজরাজ্য থেকে বিতাড়িত অবস্থায় থাকার পর সংবরণ মহর্ষি বশিষ্ঠের আশীর্বাদ লাভ করেন। সংবরণের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট বশিষ্ঠ ভরতবংশের রাজপুরোহিতের পদ গ্রহণ করতে সম্মত হন। এরপর সংবরণ মন দিলেন হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে। তিনি ভরতবংশীয়দের পূর্বতন রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুর পুনরুদ্ধার করতে সমর্থও হন শেষ পর্যন্ত। তবে ভরতবংশীয়দের রাজ্যের প্রকৃত পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা হলেন সংবরণ-পুত্র কুরু। তাঁর ক্ষমতা-মাহাত্ম্যের কারণেই ভরত বংশীয়দের শাসনাধীন অঞ্চল কালক্রমে কুরু-জাঙ্গল নামে পরিচিতি লাভ করে—

রাজত্বে তং প্রজাঃ সর্বা ধর্মজ্ঞ ইতি বব্রিরে।
তস্য নাম্নাভিবিখ্যাতং পৃথিব্যাং কুরুজাঙ্গলম্॥

রাজর্ষি কুরুর নামেই কুরু বংশের পরিচিতি, তাঁর বংশধরেরাই কৌরব নামে খ্যাত—

তস্যান্ববায়ঃ সুমহান্ যস্য নাম্না তু কৌরবাঃ॥

পুরাণে বলা হয়েছে যে, সংবরণ-পুত্র কুরু প্রতিষ্ঠানপুর বা প্রয়াগ থেকে পদব্রজে কুরুক্ষেত্রে পৌঁছান—

যঃ প্রয়াগং পদাক্রম্য কুরুক্ষেত্রং চকার হ।

সম্ভবত পুরাণকার এই বর্ণনার মাধ্যমে রাজা কুরুর সাম্রাজ্য বিস্তারের ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সংবরণের রাজ্যচ্যুত হওয়া এবং তাঁরই পুত্র কুরুর দ্বারা হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার এবং নতুন বিস্তার কুরুবংশের ইতিহাসের মূল ভিত্তি।

[মহা (k) ১.৯৪.৩৫-৫৩; ৩.১২৯.২২; (হরি) ১.৮৯.২৩-৩৯; ৩.১০৬.২৩; ব্রহ্ম পু. ১৩.১০৭; বায়ু পু. ৯৯.২১৪-২১৬; মৎস্য পু. ৫০.২০-২৪]

☐ মহাভারতের শল্যপর্বে রাজা কুরুর দ্বারা পবিত্র ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র স্থাপনের একটি কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা কুরু এই বিশেষ ক্ষেত্রটিকে দীর্ঘকাল কর্ষণ করছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র কুরুর কাছে এর কারণ জানতে চাইলে উত্তরে তিনি জানান—এই কর্ষিত ভূমিকে তিনি এতটাই পবিত্র রূপ দিতে চান যাতে যে ব্যক্তিই সেখানে প্রাণত্যাগ করবেন তিনি পাপশূন্য হয়ে স্বর্গলোক লাভ করেন—

ইহ যে পুরুষাঃ ক্ষেত্রে মরিষ্যন্তি শতক্রতো।
তে গমিষ্যন্তি সুকৃতান্ লোকান্ পাপবিবর্জিতান্॥

কুরুর উদ্দেশ্য শুনে দেবরাজ প্রথমে পরিহাস করলেও কুরু একাগ্রচিত্তে ভূমিকর্ষণে মনোনিবেশ করেন। ইন্দ্রের পরিহাসে রাজা কুরুর মনে কোনো আত্মগ্লানির উদ্রেক হয়নি। কুরুর অধ্যবসায়ে মুগ্ধ হয়ে অনান্য দেবতারা ইন্দ্রের কাছে ভূমিকর্ষণের কারণ জানতে চান। কারণ জানতে পেরে তাঁরা আশঙ্কিত হন যে, যদি কুরু কর্তৃক কর্ষিত ক্ষেত্রে প্রাণীরা দেহত্যাগ করলে স্বর্গলাভ করে তবে দেবতারা মানুষের প্রদত্ত যজ্ঞভাগ থেকে বঞ্চিত হবেন—

যদি হ্যত্র প্রমীতা বৈ স্বর্গে গচ্ছন্তি মানবাঃ।
অস্মাননিষ্ট্বা ক্রতুভির্ভাগো নো ন ভবিষ্যতি॥

সঙ্কট যে অত্যন্ত গভীর তা অনুধাবন করে দেবরাজ ইন্দ্র কুরুর তপস্যা ভঙ্গ করে তাঁকে বর দেন যে, মানুষ যজ্ঞ, উপবাস করে, ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে কুরুকর্তৃক কর্ষিত ভূমিতে প্রাণত্যাগ করলে স্বর্গলাভ করবেন। মানুষ ভিন্ন অপর কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য—এই ভূমিতে যুদ্ধে নিহত হলেও স্বর্গলাভ হয়।

মানবা যে নিরাহারা দেহং ত্যক্ষ্যন্ত্যতন্দ্রিতাঃ।
যুধি বা নিহতাঃ সম্যগপি তির্য্যগ্‌গতা নৃপ॥

কুরুরাজার কর্ষিত ভূমি সে সময় থেকেই পৃথিবীতে পবিত্রতম বলে পরিচিত। কুরুক্ষেত্র প্রজাপতি ব্রহ্মার উত্তর বেদিও বটে।

[মহা (k) ৯.৫৩.১-১৭; (হরি) ৯.৪৯.১-১৭]

☐ কুরু পবিত্র কুরুক্ষেত্র ভূমিতে অসংখ্য যজ্ঞ করেছিলেন। একবার রাজা কুরুর ঈপ্সিত যজ্ঞ সম্পন্ন করতে রাজর্ষিগণ কুরুক্ষেত্রে এসেছিলেন। সেই সময়ে তাঁরা শ্রদ্ধাভরে সরস্বতী নদীকে কুরুক্ষেত্রে আবাহন করেন। কুরুর যজ্ঞ সফল করার জন্য তখন সরস্বতী সুরেণু নামে কুরুক্ষেত্রে প্রকট হন। *[মহা (k) ৯.৩৮.২৭; (হরি) ৯.৩৬.২৭]*

☐ মহাভারতের আদিপর্বে কুরুবংশ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, রাজা কুরু যদুবংশীয় শুভাঙ্গী নামের একটি কন্যাকে বিবাহ করেন। কুরুর ঔরসে শুভাঙ্গীর গর্ভে বিদূরথ নামে এক পুত্রের জন্ম হয়।

আবার আদিপর্বেরই অপর এক অধ্যায়ে কুরুর পত্নী বলা হয়েছে বাহিনীকে। বাহিনী ও কুরুর পাঁচ পুত্রের নাম অশ্ববান বা অবিক্ষিৎ, অভিষ্যন্ত, চৈত্ররথ, মুনি এবং জনমেজয়।

পুরাণে কুরুর পুত্রদের নামের তালিকা ভিন্নরূপ। সেখানে বলা হয়েছে যে, কুরুর পাঁচ পুত্র হলেন সুধন্বা (মতান্তরে সুধনু), জহ্নু, পরীক্ষিৎ, পুত্রক ও অরিমর্দন।

[মহা (k) ১.৯৪.৫২-৫৩; ১.৯৫.৩৯-৪০; (হরি) ১.৮৯.৩৮-৩৯; ১.৯০.৪৯-৫০; বায়ু পু. ৯৯.২১৭-২১৮; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১৯]

☐ মহাভারতের অনুশাসনপর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের কাছে দেবতা, মহর্ষি এবং পুণ্যবান নৃপতিদের নাম উল্লেখ করেন। প্রত্যহ এসব নাম সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় পাঠ করলে বিশেষ পুণ্যলাভ হয়। ভীষ্ম উচ্চারিত নামগুলির মধ্যে রাজা কুরুর পুণ্যনামটিও প্রাতঃসন্ধ্যায় কীর্তনীয়।

[মহা (k) ১৩.১৬৫.৫৮; (হরি) ১৩.১৪৩.৫১]

কুরু₃ স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধারায় প্রিয়ব্রতের পুত্র অগ্নীধ্র। অগ্নীধ্রের নয় পুত্রের মধ্যে কুরু সপ্তম (মতান্তরে অষ্টম)। অগ্নীধ্র কুরুকে জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত শৃঙ্গবান পর্বতের উত্তরদিকে অবস্থিত ভূ-খণ্ড অর্থাৎ শৃঙ্গবেদ্‌বর্ষের শাসক নিয়োগ করেন।

[বায়ু পু. ৩৩.২৯-৩০, ৩৪; বিষ্ণু পু. ২.১.১৭, ২২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.৪৭, ৫১]

কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে মহাকাব্য, পুরাণ—সর্বত্রই এই স্থানটিকে অন্যতম পবিত্র ক্ষেত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈদিক গ্রন্থগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে, সরস্বতী, দৃষদ্বতী এবং আপয়া নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডটিই মোটামুটি বৈদিক যুগ থেকেই কুরুক্ষেত্র নামক পবিত্র ক্ষেত্র হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছে। ঋগ্‌বেদের একটি সূক্তে এই স্থানটিকে পৃথিবীর অন্যতম উৎকৃষ্ট স্থান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অতি প্রাচীন কাল থেকেই স্থানটি পবিত্র যজ্ঞভূমি হিসেবে পরিচিত। ঋগ্‌বেদের মন্ত্রটিতেও যজ্ঞে অগ্নিস্থাপনের সময় অগ্নিকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে—হে অগ্নি! সকলের মঙ্গলের জন্য, সুদিন লাভের জন্য আমরা পৃথিবীর এই উৎকৃষ্ট স্থানে অর্থাৎ দৃষদ্বতী, সরস্বতী এবং আপয়া নদীর মধ্যবর্তী ভূমিতে তোমাকে স্থাপন করেছি—

নি ত্বা দধে বর আ পৃথিব্যা
ইলায়াস্পদে সুদিনত্বে অহ্নাম্।
দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপয়ায়াং
সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি॥

[ঋগ্‌বেদ ৩.২৪.৪]

□ ঋগ্‌বেদের মন্ত্রে স্থানটির মাহাত্ম্য কীর্তিত হলেও এই ভূখণ্ডটিরই নাম যে কুরুক্ষেত্র—তা কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়নি। তবে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে যজ্ঞভূমি কুরুক্ষেত্রের সীমা নির্দেশ করতে গিয়ে স্পষ্টভাবেই সরস্বতী এবং দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের কথা এসেছে। এই স্থানটিকে সেখানে খুব স্পষ্টভাবেই কুরুক্ষেত্র নামে উল্লেখও করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের বিবরণ অনুযায়ী, কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে অবস্থিত খাণ্ডব বা খাণ্ডবপ্রস্থ। উত্তরে অবস্থিত অঞ্চলের নাম তূর্ঘ্ন। পশ্চিম সীমায় অবস্থিত জনপদের নাম পরীণ। কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমে মরু অঞ্চল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে একে 'মরব উৎকরঃ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই উল্লেখ থেকে একে বালুকাময় মরুভূমি বলে মনে হয়—

তেষাং কুরুক্ষেত্র বেদিরাসীৎ। তস্যৈ
খাণ্ডবো দক্ষিণার্ধ আসীৎ। তূর্ঘ্নমুত্তরার্ধঃ।
পরীণজ্জঘনার্ধঃ। মরব উৎকরঃ।

[তৈত্তিরীয় আরণ্যক (আনন্দাশ্রম) ৫.১.১]

□ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ঋগ্‌বেদ সরস্বতী এবং দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী যে পবিত্র ভূখণ্ডের কথা আছে, তাকে সরাসরি কুরুক্ষেত্র নামে উল্লেখ করা হয়নি। বরং ঋগ্‌বেদের বেশ কয়েকটি সূক্তে এই অঞ্চলটিকে শর্যণাবতী নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগ্‌বেদের টীকাকার সায়ণাচার্য এই শর্যনাবতীকে কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি অঞ্চল বলেই মনে করেছেন—

শর্যণা নাম কুরুক্ষেত্রবর্তিনী দেশাঃ।

কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি হ্রদের সমীপবর্তী এই শর্যণাবতী—

তেষামদূরভবং সরঃ শর্যণাবৎ।

ঋগ্‌বেদের বহু মন্ত্রে এই শর্যণাবতীকে উৎকৃষ্ট যজ্ঞভূমি এবং দেবতাদের বিচরণক্ষেত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শর্যণাবৎ সরোবরে যজ্ঞীয় সোমরস নিষ্কাশন করা হত। ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে বৃত্রহা ইন্দ্রকে শর্যণাবতি সোমরস পান করার জন্য আবাহন করা হয়েছে—

শর্যণাবতি সোমমিন্দ্র পিবতু বৃত্রহা।

[ঋগ্‌বেদ ৯.১১৩.১]

□ ঋগ্‌বেদ বর্ণিত উপাখ্যান অনুযায়ী এই শর্যণাবৎ অঞ্চলেই বাস করতেন মহর্ষি দধ্যঞ্চ বা দধীচি। অশ্বের মুখ বিশিষ্ট সেই ঋষি ছিলেন অসুরদের অন্যতম শত্রু। দধীচির মৃত্যুর পর অসুরদের দমন করার জন্য ইন্দ্র শর্যণাবৎ থেকে দধীচির সেই অশ্বের আকৃতিবিশিষ্ট মস্তকটি সংগ্রহ করেছিলেন। তা দিয়েই নির্মিত হয় বজ্র। আর সেই বজ্রের সাহায্যেই পরবর্তী সময়ে বহুবার ইন্দ্র অসুরদের নাশ করে ছিলেন।

[ঋগ্‌বেদ ৯.৮৪.সূক্ত]

□ ঋগ্‌বেদের এই উপাখ্যান থেকেই স্পষ্ট যে, সেই সময় থেকেই শর্যণাবৎ বা কুরুক্ষেত্র শুধু যজ্ঞভূমি বা তীর্থক্ষেত্র হিসেবেই নয়, আর্যসভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল।

[ঋগ্‌বেদ ৮.৬.৩৯; ৭.৭.২৯; ১.৮৪.১৩-১৪]

□ ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে এবং অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে কুরুক্ষেত্রের নাম শুধু যে খুব স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে তাই নয়, বারবারই এই স্থানটিকে দেবতাদের যজ্ঞভূমি এবং পুণ্যক্ষেত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থ শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, বিষ্ণু, বিশ্বেদেবগণ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট দেবতারা এই স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন। দেবতাদের বিচরণভূমি

এবং যজ্ঞভূমি বলেই এই স্থানটি তীর্থের মাহাত্ম্য লাভ করেছে—

তেষাম্ কুরুক্ষেত্রম্ দেবযজনমাস তস্মাদাহুঃ কুরুক্ষেত্রম্ দেবানাং দেবযজনমিতি তস্মাদ্‌য ক্ব চ কুরুক্ষেত্রস্য নিগচতি তদেব মন্যত ইদম্ দেবযজনমিতি তদ্ধি দেবানাম্ দেবযজনম্।

তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে কুরুক্ষেত্রকে প্রজাপতি ব্রহ্মার বেদির তুল্য পবিত্র স্থান বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

[শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪.১.১.২; ৪.১.৫.১৩; মৈত্রায়ণী সংহিতা ২.১.৪; তৈত্তিরীয় আরণ্যক (আনন্দাশ্রম) ৫.১.১; তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ২৫.১৩.৩]

□ বেদোত্তর যুগের সাহিত্যের মধ্যে মহাভারত মহাকাব্যেই কুরুক্ষেত্রের নাম সর্বাধিক চর্চিত। বনপর্বে কুরুক্ষেত্রের অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, দক্ষিণে সরস্বতী এবং উত্তরে দৃষদ্বতী নদী বয়ে চলেছে আর তার মাঝখানে অবস্থিত ভূখণ্ডের নাম পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্র, স্বর্গের মতোই পবিত্র এই স্থান—

দক্ষিণেন সরস্বত্যা দৃষদ্বত্যুত্তরেণ চ।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিবিষ্টপে॥

মহাকাব্যপুরাণে কুরুক্ষেত্রকে ব্রহ্মাবর্ত কিংবা ব্রহ্মর্ষি দেশ বলেও উল্লেখ করা হয়। লক্ষণীয়, পণ্ডিতরা অনেক সময়েই ব্রহ্মাবর্ত এবং আর্যাবর্তকে সমার্থক বলে মনে করেছেন। বৈদিক সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কুরুক্ষেত্রকে আর্যসভ্যতার অন্যতম প্রতিষ্ঠাস্থল বলে উল্লেখ করেছি। হয়তো সে সময় ভারতবর্ষে আর্যায়ণের প্রসারের সীমা ছিল এই কুরুক্ষেত্র পর্যন্তই। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রকে ব্রহ্মাবর্তের সঙ্গে একাত্মক বলে ধরে নেওয়ার ফলে সেই ধারণাই স্পষ্টতর হয়।

[মহা (k) ৩.৮৩.৪; ৩.৮৩.২০৫, ২২৬; (হরি) ৩.৬৮.৪; ৩.৬৮.২০৫-২০৮]

□ স্থানটির কুরুক্ষেত্র নামকরণের পিছনে চন্দ্রবংশীয় বিখ্যাত রাজর্ষি কুরুর কীর্তি এবং মাহাত্ম্য জড়িয়ে আছে। মহারাজ কুরু মহাভারতের মূল চরিত্র কৌরব-পাণ্ডবদের বিখ্যাত পূর্বপুরুষও বটে। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাজর্ষি কুরুর কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র কুরুর শাসনাধীন এই স্থানটিকে পৃথিবীর পবিত্রতম ক্ষেত্র হবার বর দান করেছিলেন। কুরুর নামানুসারেই বৈদিক কার্যনাবৎ বা ব্রহ্মাবর্ত পুরাণের কালে এসে কুরুক্ষেত্র নামে খ্যাত হয়। *[দ্র. কুরু১]*

□ মহাভারতের কালে কুরুক্ষেত্র একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র এবং যজ্ঞভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এই ক্ষেত্রটির পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য এই পুণ্যভূমির চারজন দ্বারপাল যক্ষ।

মহাভারতে অবশ্য তিনটি দ্বারের তিনজন যক্ষের নামই মাত্র উল্লিখিত হতে দেখা যায়—অরন্তুক, তরন্তুক এবং মচক্রুক। আর কুরুক্ষেত্রের চতুর্থসীমায় প্রতিষ্ঠিত পরশুরাম দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত্রিয়দের রক্তে পূর্ণ রামহ্রদ। তবে বামন পুরাণে রামহ্রদের অদূরে কপিলতীর্থ নামে একটি তীর্থ এবং মুঞ্জবট নামে একটি তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। বামন পুরাণের উল্লেখ অনুযায়ী কুরুক্ষেত্রের এই অংশের রক্ষক কপিল নামে এক যক্ষ। তার পত্নী উলূখলমেখলাও এই স্থানটির রক্ষণাবেক্ষণের কাজে রত।

পাণ্ডবদের দ্বাদশবর্ষীয় বনবাসকালে সপরিবার যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য মুনি ঋষিদের তীর্থযাত্রার এক দীর্ঘ বিবরণ মেলে। এই তীর্থযাত্রী দলের প্রধান পথপ্রদর্শক ছিলেন মহর্ষি লোমশ। তীর্থযাত্রা শুরু হবার আগে মহর্ষি লোমশ মহর্ষি পুলস্ত্যের দ্বারা বর্ণিত তীর্থ বিবরণ শুনিয়েছেন। মহর্ষি পুলস্ত্য তীর্থযাত্রারত ভীষ্মের কাছে যেসব উৎকৃষ্ট তীর্থের বর্ণনা দিয়েছিলেন, সেখানেও কুরুক্ষেত্রের দীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনার মধ্যে কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত শতসহস্র উপতীর্থেরও উল্লেখ মেলে। মহর্ষি পুলস্ত্য বর্ণিত এই তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণের পর লোমশ ঋষির নেতৃত্বে পাণ্ডবরা তীর্থযাত্রায় বের হলেন। এ সময়ে তাঁদেরও প্রধান গন্তব্য কুরুক্ষেত্র এবং কুরুক্ষেত্রসংলগ্ন অন্যান্য উপতীর্থ সমূহ। মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত তীর্থযাত্রা পর্বে অধ্যায়ের পর অধ্যায় জুড়ে কুরুক্ষেত্র এবং তৎসংলগ্ন তীর্থগুলির মাহাত্ম্য বিশদে আলোচিত হয়েছে।

মহাভারতের কাহিনীর যে পর্যায়ে কৌরব-পাণ্ডব দুই পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধের সূচনা হয়েছে, সেখানে একটু আশ্চর্যভাবেই কৃষ্ণজ্যেষ্ঠ বলরামকে আমরা যুদ্ধ থেকে বিরত উদাসীন তীর্থযাত্রীর ভূমিকায় দেখি। নানা তীর্থভ্রমণ করে তিনি শেষপর্যন্ত মহাভারতের যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ দেখতে উপস্থিত হয়েছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমিতে, দ্বৈপায়ন হ্রদের

তীরে। মহাভারতের শল্যপর্বে অধ্যায়ের পর অধ্যায় জুড়ে বলরামের তীর্থযাত্রার যে বিবরণ পাওয়া যায়, সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে, তীর্থযাত্রী বলরামেরও প্রধান গন্তব্য হল কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত তীর্থগুলিই। মহাভারতের বনপর্ব আর শল্যপর্বের এই কুরুক্ষেত্রে পরিক্রমায় কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র যেমন বদরপাচন তীর্থ, সপ্তসারস্বত তীর্থ, রামহ্রদ এবং অন্যান্য তীর্থের মাহাত্ম্য বিষয়ক কাহিনীগুলিও বিশদে বর্ণিত হয়েছে। প্রায় সবকটি পুরাণেই তীর্থক্ষেত্র বিষয়ক কয়েকটি অধ্যায় থাকে। সেগুলিতেও কুরুক্ষেত্র এবং তার অন্তর্গত অন্যান্য তীর্থগুলির বিবরণ মেলে। মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত তীর্থযাত্রা পর্বে এবং শল্যপর্বেও সেই বিবরণ আছে।

□ কুরুক্ষেত্রের অপরিসীম মহাকাব্যিক গুরুত্ব এইখানে যে, এই ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রেই অষ্টাদশ দিবসব্যাপী প্রবল রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জন্য সমবেত হয়েছিলেন কৌরব এবং পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা—ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। *[ভগবদ্‌গীতা ১.১]*

এই পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্র মহাভারতে সমন্তপঞ্চক নামেও চিহ্নিত হয়েছে। *[দ্র. সমন্তপঞ্চক]*

মহাভারত মহাকাব্যের কথকঠাকুর সৌতি উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্যে যাবার আগে কুরুপাণ্ডবের এই যুদ্ধভূমি সমন্তপঞ্চক পরিদর্শন করেছিলেন—

গতবানস্মি তং দেশং যুদ্ধং যত্রাভবৎ পুরা।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্॥

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দশমদিনের সন্ধ্যায় এই ক্ষেত্রেই শরশয্যায় শায়িত হয়েছিলেন পিতামহ ভীষ্ম। মহাভারতের সম্পূর্ণ শান্তিপর্ব এবং অনুশাসনপর্বের মূল উপজীব্য হল শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মের মূল্যবান উপদেশ। পরলোকগমনের আগে রাজনীতি, ধর্ম, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে বহু মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন ভীষ্ম এবং সেটা এই কুরুক্ষেত্রেই শরশয়নে শায়িত অবস্থায়।

[পঠিতব্য: R.C. Agarwala, Kuruksetra in Early Sanskrit Literature & Kuruksetra in the Later Sanskrit Literature in Haryana: Past & Present, Ed. by Suresh K. Sharma, Delhi: Mittal Publication, 2005]

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ *[দ্র. ভারত যুদ্ধ]*

কুরুজাঙ্গল পুরু-ভরত-বংশের বিখ্যাত রাজা সম্বরণ এবং সূর্যকন্যা তপতীর বিখ্যাত পুত্র ছিলেন কুরু। তিনি যেমন ধার্মিক রাজা ছিলেন, তেমনই ছিলেন বীর। রাজা কুরুর নামানুসারেই তাঁর রাজ্য কুরুজাঙ্গল নামে বিখ্যাত হয়—

ততঃ সংবরণাৎ সৌরী সুষুবে তপতী কুরুম্॥
রাজত্বে তং প্রজাঃ সর্বা ধর্মজ্ঞ ইতি বব্রিরে।
তস্য নাম্নাভিবিখ্যাতং পৃথিব্যাং কুরুজাঙ্গলম্॥

[রামায়ণ ২.৬৮.১৩; মহা (k) ১.৯৪.৪৯; (হরি) ১.৯০.৩৭; ভাগবত পু. ১.১০.৩৪; ১০.৮৬.২০]

□ মহাভারতের আদি পর্বে কুরুজাঙ্গল, কুরু ও কুরুক্ষেত্রকে তিনটি পৃথক পৃথক জনপদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় যে, রাজা কুরুর অধীনস্থ হলেও, এই জনপদগুলির অবশ্যই পৃথক পৃথক অস্তিত্ব ছিল। বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর তাঁর দুই স্ত্রীর গর্ভে মহাঋষি বেদব্যাসের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর নামে তিনটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এঁদের জন্মের সময়েও পিতামহ ভীষ্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকায় কুরুজাঙ্গল, কুরু ও কুরুক্ষেত্র—তিনটি অঞ্চলই প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল—

তেষু ত্রিষু কুমারেষু জাতেষু কুরুজাঙ্গলম্।
কুরবো'থ কুরুক্ষেত্রং ত্রয়মেতদবর্ধত॥

[মহা (k) ১.১০৯.১; (হরি) ১.১০৩.১]

□ জরাসন্ধ বধের উদ্দেশে কুরুদেশ থেকে মগধের রাজধানী গিরিব্রজপুর যাওয়ার পথে কৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীম কুরুজাঙ্গল পার হয়েছিলেন। এই ঘটনা থেকে আরও স্পষ্ট হয় যে, কুরু ও কুরুজাঙ্গল পাশাপাশি অবস্থিত হলেও অবশ্যই দুটি পৃথক প্রদেশ।

[মহা (k) ২.২০.২৬; (হরি) ২.১৯.২৬]

□ কুরু বংশীয় রাজা সুহোত্র একবার কুরুজাঙ্গলে এক বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেই যজ্ঞে সুহোত্র বিপুল পরিমান ধন-সম্পদ ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন।

[মহা (k) ৭.৫৬.৯; ১২.২৯.২৯; (হরি) ৭.৪৮.৯; ১২.২৯.২৮]

□ কুরুজাঙ্গলের রাজধানীর নামও ছিল হস্তিনাপুর। *[মহা (k) ৮.১.১৭; (হরি) ৮.১.১৭]*

□ রাজা পরীক্ষিৎ একসময় কুরুজাঙ্গল দেশ

শাসন করেছিলেন। বায়ু পুরাণে কুরুজাঙ্গলকে একটি পবিত্র তীর্থ হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে।

[ভাগবত পু. ১.১৬.১১; বায়ু পু. ৭৭.৯৩]

☐ মহর্ষি কৌশিকের সাত ছেলে গো-হত্যার পাপে জাতিস্মর ছিলেন, কিন্তু তাঁরা মনুষ্যেতর জীব হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে এঁরা কুরুজাঙ্গলে প্রধান ব্রাহ্মণ রূপে জন্মগ্রহণ করে সিদ্ধিলাভ করেন। *[মৎস্য পু. ২১.৯, ২৮]*

☐ হস্তিনাপুরের (বর্তমান উত্তর প্রদেশের মেরঠ জেলার একটি শহরের) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সিরহিন্দ (Sirhind) নামে একটি অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চলেই কুরুজাঙ্গল-প্রদেশের অবস্থান ছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। এই অঞ্চলটি কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল হয়তো, কিন্তু কুরুজাঙ্গলের সঠিক অবস্থান নিয়ে অন্য মতই আছে। পণ্ডিতদের একাংশের মতে, বর্তমান রোহতক্ (Rohtak), হান্‌সি (Hansi) ও হিসার (Hissar), নিয়েই প্রাচীন কুরুজাঙ্গল গড়ে উঠেছিল। *[GDAMI (Dey) p.110; IKP(Agrawala) p. 54]*

আবার পণ্ডিত S.M. Ali-র মতে, এটি কুরুরাজ্যের উত্তর-পূর্ব অংশে অবস্থিত অরণ্যাঞ্চল। এই বনভূমিটি আরও উত্তরে প্রসারিত হয়ে কাম্যক বন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে মনে করেন আলি-সাহেব। সরস্বতী নদীর তীরে কাম্যক বন ও যমুনানদীর তীরে অবস্থিত খাণ্ডব বনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল কুরুজাঙ্গল দেশ।

বর্তমানে যদিও হরিয়ানায় কুরুক্ষেত্র বলে যে অঞ্চলটিকে বোঝানো হয়, সেটি এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে অরণ্যের অস্তিত্ব খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু প্রাচীনকালে খুব সম্ভবত কুরুক্ষেত্র এখনকার তুলনায় অনেক বেশি বিস্তৃত ছিল। শুধু তাই নয়, সরস্বতী নদীর কারণে সমগ্র অঞ্চলটি উর্বরও ছিল বলে মনে হয়। সেই যুক্তিতে বিচার করলে এই অঞ্চলে কুরুজাঙ্গলের মত একটি বনভূমির অবস্থান খুব একটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। *[দ্র. কুরু]*

[GP (Ali) p.134; GD (N.N. Bhattacharyya) p.199; GM (Suryavamshi) p.143]

আবার যদি কুরুক্ষেত্রের বর্তমান অবস্থানের নিরিখে তৎসংলগ্ন অরণ্যভূমির প্রকৃতি বিচার করি, তাহলে মনে রাখতে হবে 'জাঙ্গল' শব্দটাই কিন্তু পারিভাষিক একটি শব্দ এবং এই শব্দটা 'কুরু'-শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বলেই কুরুজাঙ্গল-প্রদেশের অবস্থান এখনকার কুরুক্ষেত্রের ভূপ্রকৃতির সঙ্গে মিলে যেতে পারে। মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লূকভট্ট মনুর ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ জাঙ্গল-দেশের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন—যে জায়গায় বহুলভাবে জল পাওয়া যায় না এবং বহুল তৃণাবৃত ভূমিও কম, অথচ জায়গাটায় খুব হাওয়া, খুব রোদ, ধান্যাদি শস্যও প্রচুর পাওয়া যায়, সেই জায়গাকে জাঙ্গল দেশ বলে—

স্বল্পোদকতৃণো যস্তু প্রবাতঃ প্রচুরাতপঃ।
স জ্ঞেয়ো জাঙ্গলো দেশো বহু-ধান্যাদি-সংযুতঃ॥

ঠিক এই নিরিখে দেখলে কুরুক্ষেত্রের অন্তর্বর্তী হওয়া সত্ত্বেও কুরুদেশের এই অঞ্চলটির ভূপ্রকৃতি খানিক অন্যরকম ছিল এবং সেটা প্রধানত জাঙ্গলদেশের মতো, হয়তো এই কারণেই সম্পূর্ণ প্রদেশটাই পৃথকভাবে কুরুজাঙ্গল দেশ বলে পৃথকভাবে চিহ্নিত হয়েছে। অন্তত এখানে 'জাঙ্গল' বলতে জঙ্গল, কিংবা অরণ্য না ভাবাই ভাল।

[দ্র. মনুসংহিতা ৭.৬৯; কুল্লূকভট্টকৃত টীকা]

কুরুবর্ণক সম্ভবত উত্তর-মধ্য ভারতের একটি জনপদ। মহাভারতে এই জনপদটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই জনপদটির আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। তবে নামের প্রথমে 'কুরু' শব্দটির ব্যবহার দেখে মনে হয় যে, সম্ভবত এই জনপদটি কুরুরাজ্যের পার্শ্ববর্তী কোনো অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। মহাভারতে ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত জম্বুখণ্ড বিনির্মাণ পর্বে প্রাচীন ভারতের যেসব জনপদগুলির নাম উল্লিখিত হয়েছে, কুরুবর্ণক সেগুলির মধ্যে একটি। *[মহা (k) ৬.৯.৫৬; (হরি) ৬.৯.৫৬]*

কুরুবশ ভাগবত পুরাণ অনুসারে যদুবংশীয় মধুর পুত্র এবং অনুর পিতা কুরুবশ।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.৫]

☐ পদ্ম পুরাণে আবার পুরুহোত্রকে কুরুবশের পুত্র বলা হয়েছে। *[পদ্ম পু. (সৃষ্টি) ১৩.২৭-২৮]*

কুরুবান ধর্মের ঔরসে বিশ্বার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কুরুবান অন্যতম। বিশ্বার পুত্ররা বিশ্বেদেব বলে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। এই কুরুবান বিশ্বেদেবগণেরই একজন। *[বায়ু পু. ৬৬.৩২]*

কুরুবিন্দ একটি জনজাতি। সম্ভবত এঁরা কুরুদেশীয়দেরই একটি সম্প্রদায়। কুরুক্ষেত্রে এঁদের কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করতে দেখা যায়। যদিও কুরুবিন্দ জাতির মানুষদের বাসস্থল সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু জানা যায় না। তবে সম্ভবত এঁরা কুরুবংশ শাসিত অঞ্চলের মধ্যে অথবা কাছাকাছিই বসবাস করতেন।

[মহা (k) ৬.৮৭.৯; (হরি) ৬.৮৪.৯; Pāndurānga Vāmān Kāne, History of Dharmasastra, (Vol 2, Part 2) p. 36]

কুরুমিন *[দ্র. তুরসিত]*

কুর্চ বৈবস্বত মনুর পুত্র নরিষ্যন্তের বংশধারায় মীঢ্বানের পুত্র কূর্চ এবং কুর্চের পুত্র ইন্দ্রসেন। ভাগবত পুরাণের কোনো কোনো সংস্করণে কূর্চ-কে পূর্ণ নামেও চিহ্নিত করা হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৯.২.১৯]

কুল১ মহাভারতে এই শ্লোকটি দুই থেকে তিন বার পাওয়া যাবে, যেখানে বলা হচ্ছে—বংশের মধ্যে বা কুলের মধ্যে যদি একজন দুষ্ট লোককে তাড়িয়ে দিয়ে বা তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করলে যদি কুল বাঁচে, তবে সেই ব্যক্তিকে অন্তত ত্যাগ করেও কুল বাঁচাতে হবে। আবার একই কুলের অনেকগুলি মানুষ যদি একটি গ্রামের স্বার্থহানি করে, তবে গ্রামের স্বার্থে একটি কুলকেই ত্যাগ করতে হবে। আর যদি একটি গোটা গ্রাম একটি রাষ্ট্রীয় জনপদের অবক্ষয় তৈরি করে একটি জনপদের ক্ষতিসাধন করে, তবে সেই গ্রামটাকেই জনপদ-সুরক্ষার স্বার্থে বাদ দিতে হবে—

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

মহাভারতে এই শ্লোক অন্তত দুবার বলা হয়েছে ধৃতরাষ্ট্রের অন্যায়পরায়ণ পুত্র দুর্যোধনের প্রসঙ্গে—একবার দুর্যোধনের জন্মের পর নানান দুর্লক্ষণ দেখে বিদুর একথা ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন, আবার সেটা বিদুরের মুখেই পুনরুচ্চারিত হয়েছে উদ্যোগপর্বে যখন দুর্যোধন পাণ্ডবদের হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দিতে চাইছেন না এবং তাতে কুরুরাষ্ট্রের বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

[মহা (k) ১.১১৫.৩৮-৩৯; (হরি) ১.১০৯.৩৭-৩৮]

□ মহাভারতের এই শ্লোকটিকে আমরা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি এবং সেটা এই কারণে যে, এই প্রাবাদিক বচনের মধ্যে বৈদিক কালের সামাজিক এবং রাজনৈতিক রাষ্ট্রগঠনের তত্ত্বটা পরিষ্কার হয়ে যায়, বেদের মধ্যে 'কুল' শব্দটা পাওয়াই যায় না, কিন্তু 'কুলপা' শব্দটি পাওয়া যায় এবং তার সঙ্গে 'ব্রজপতি' শব্দটাও আছে—

পরি ত্বাসতে নিধিভিঃ সখায়ঃ/
কুলপা ন ব্রজপতিং চরন্তম্।

এখানে কুল বলতে এক পূর্ণ গৃহস্থকে বোঝানো হচ্ছে, যিনি পুত্র-পরিবার সহ গ্রামের একটি বিশেষ স্থানে বাড়ি বানিয়ে বসবাস করছেন। আসলে কুল বলতে একটি বৃহৎ গৃহস্থ পরিবারই বোঝায়। সেখানে 'কুলপা' মানে এটাই যে, তিনি পরিবারের মাথা বা গৃহপতি যাঁকে উপরি উক্ত মন্ত্রে 'ব্রজপতি' বা গ্রামপতির সহায়-পরিচারক হিসেবে দেখা যাচ্ছে। হয়তো বা এই গ্রামপতি অনেকগুলি গার্হস্থ্য পরিবার বা কুলের অধিপতি হিসেবেই তাঁর সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিচয় বহন করতেন—যেমনটা বলেছেন Macdonell এবং keith—The use of she term Kula points clearly to a system of individual families, each no doubt consisting of several members under the headship of the father or eldest brother, whose Kula the dwelling is. As distinct from Gotra, Kula seems to mean the family in the narrower sense of the members who still live in one house, the undivided family.

এক-একটি একান্নবর্তী পরিবার যেখানে থাকতেন, সেটা অবশ্যই একটি গৃহ এবং সেই গৃহগুলিও কুল নামেই চিহ্নিত হত, তা রামায়ণের একটি শ্লোক থেকে বোঝা যায়। হনুমান যখন সীতার অন্বেষণে লঙ্কায় প্রবেশ করলেন, তখন সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাক্ষসদের যে গৃহগুলি দেখেছিলেন, সেগুলিকে 'কুল' বলে চিহ্নিত করেছেন এবং সেই কুলের মধ্যে কী কী অন্তর্ভুক্ত ছিল সেটাও হনুমানের মুখে উচ্চারিত হয়েছে। হনুমান দেখলেন প্রত্যেক গৃহের মধ্যে অনেকগুলি করে বীর রাক্ষসেরা আছেন, তাঁদের শোয়া-বসার জন্য বিচিত্র শয্যাসন আছে, আছে রথ-অশ্বের বাহন, সমস্ত গৃহগুলি তাদের ঐশ্বর্য্য এবং অহংকার প্রকট করে তুলছে—

মত্তপ্রমত্তানি সমাকুলানি
রথাশ্ব-ভদ্রাসন-সঙ্কুলানি।
বীরশ্রিয়া চাপি সমাকুলানি
দদর্শ ধীমান্ স কপিঃ কুলানি॥

[ঋগ্বেদ ১০.১৭৯.২; ৫.৫.১২; Vedic Index, Vol. 1 (Macdonell & keith), p. 171; রামায়ণ ৫.৫.১২-১৩]

□ পণ্ডিতেরা এটাকে বলেছেন 'metonymy'. অর্থাৎ একটি বিশিষ্ট শব্দের ইঙ্গিতে অন্য কথা বোঝানো। যদি বলি, মাছ-মাংসের সঙ্গে 'বোতল'ও আছে, তাহলে বোতল বলতে যেমন মদ বোঝায়, তেমনই কুল বলতেও পুত্র-পরিবার-স্বজন-সমন্বিত একটি সুস্থিত গৃহ এবং তার গার্হস্থ্যের দিকে ইঙ্গিত করে, সেটা শতপথ ব্রাহ্মণের বয়ান থেকে বোঝা যায়। এই প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থের এক জায়গায় বলা হচ্ছে—দরজা আছে মানেই সেখানে গৃহ আছে—গৃহা বৈ দুর্য্যাঃ। যদি গৃহগুলি দৃঢ়ভাবে স্থিত না হয়, তাহলে তা গৃহস্থ-পরিবার পরিজনদের বিপর্যস্ত করে দেবে। এখানে পরিবার-পরিজন অর্থাৎ বা family বলতে কুল শব্দের প্রয়োগ হয়েছে শতপথ ব্রাহ্মণে—

কুলং বিক্ষোব্ধোত্তানেবৈতদস্যাং
পৃথিব্যাং দৃঢ়ংতি . . .।

কুল বলতে পরিষ্কার একটি পরিবার সমন্বিত গৃহের কথা শতপথ ব্রাহ্মণ আরও তিন থেকে চার জায়গায় বলেছে। দ্বার যেখানে আছে সেটাই গৃহ এবং মানেই সেটা একটি কুলের অবস্থান, এ কথাটা ছান্দোগ্য উপনিষদেও একটি প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে—এই পঞ্চপুরুষ হলেন স্বর্গলোকের দ্বারপাল, যাঁরা এটা জানেন তাঁদের কুলে বীর পুত্রের জন্ম হয়—

স য এতানেবং ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য
দ্বারপান্ বেদাস্য কুলে বীরো জায়তে . . .।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (weber) ১.১.২.২২; ২.১.৪.৪; ২.৪.১.১৪; ১১.৫.৩.১১; ১১.৮.১.৩; ছান্দোগ্য উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ৩.১৩.৬, পৃ. ৩১১]

□ বেদ-উপনিষদের পরের যুগ থেকেই 'কুল' বলতে একটি গৃহের কল্পনা চলে গেছে। কুল বলতে একটি বংশ—সেটা বড়ো বংশই হোক অথবা মধ্যম, অধম; কিন্তু কুল-শব্দের সমস্ত তাৎপর্য্য নিহিত হল বংশের মধ্যে এবং সেই কুল বা বংশ ভালো না মন্দ সেটা নির্ভর করতে আরম্ভ করল কতকগুলি নৈতিক গুণাগুণের ওপর। গুণ থাকলে সেগুলিই একটি প্রসিদ্ধ বংশের লক্ষণ। আর গুণ না থাকলে দোষগুলিই হয়ে উঠল কুলনাশন। কুলের গুণগুলি পরম্পরাগত একটি শ্লোক অনুসারে এইরকম—সদাচার, ইন্দ্রিয় দমনের শিক্ষা, বিদ্যা, সুনাম (প্রতিষ্ঠা), বহুল দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা (তীর্থদর্শন), কর্মনিষ্ঠা, অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা (বৃত্তি), কৃচ্ছ্রসাধনের শক্তি এবং দান—এই নয়টি হল কুলের লক্ষণ—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥

এই নবলক্ষণযুক্ত একটি বিখ্যাত বংশ বা কুলও কিন্তু অনৈতিক কাজকর্মের ফলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা নিতান্ত এক অকুলে পরিণত হতে পারে। কুলনাশন এই কর্মগুলি কী কী হতে পারে, তার একটি তালিকা দিয়েছে কূর্ম পুরাণ এবং মনুসংহিতা। কূর্ম পুরাণের রচয়িতা এবং মনু যে সমাজে বাস করতেন, সেখানে ব্রাহ্মণ্যের সুরক্ষা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলেই, কুলের সংজ্ঞাটাও তাঁরা নঞর্থক প্রবচনেই নির্ধারণ করার চেষ্ট করেছেন।

মনুর মতে কুল নষ্ট হয় কুবিবাহের মাধ্যমে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ যেখানে সর্বর্ণে বিবাহ করছে না, সেখানে কুল নষ্ট হয়। চাতুর্বর্ণ্যের জন্য নির্দিষ্ট ক্রিয়াকর্ম যাদের ঘরে লোপ পেয়েছে, তাদের কুল নষ্ট হয়। যেখানে বেদ অধ্যয়নের নিয়ম, তারা বেদপাঠ না করলে কুল নষ্ট হয়, ব্রাহ্মণদের অসম্মান করলেও কুল নষ্ট হয়।

কূর্মপুরাণ এবং মনু যেভাবে কুলনাশক কর্মের কথা বলে কুলের সংজ্ঞা তৈরি করতে চাইছেন, তাতে মনে হবে যেন ব্রাহ্মণদেরই একমাত্র 'কুল' হতে পারে, অন্য কারও নয়। তাহলে ব্রাহ্মণ যদি যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ছেড়ে শিল্প করে, ব্রাহ্মণ যদি ঋণ দেওয়া-নেওয়ার মহাজনী ব্যবসা করে, সবর্ণা স্ত্রী থাকতেও অসবর্ণা শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে শুধুই শূদ্র সন্তান উৎপাদন করে, ব্রাহ্মণ যদি গোরু, অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতির কেনাবেচার কাজ করে, ব্রাহ্মণ যদি কৃষিকর্ম কিংবা রাজার সেবা করে দিন কাটায়, তাহলে কুলগুলি অকুলে পরিণত হবে।

ব্রাহ্মণের কুল নষ্ট হওয়ার আর এক কারণ অযাজ্যযাজন—সমাজে ব্রাত্য মানুষদের যাগযজ্ঞ করে দেওয়া—সোজা কথায় যাঁর ঘরে যাগযজ্ঞ

করা উচিত নয়, যাঁদের তাঁরা অশুচি মনে করতেন, সেইসব সমাজপতিত মানুষের ঘরে যাগ-যজ্ঞ করলে তাঁদের কুল অকুলে পরিণত হত। নাস্তিক্যবুদ্ধিও কুলনাশের কারণ। শ্রুতিবিহিত অথবা স্মার্ত ক্রিয়াকর্ম এবং অখিল-ধর্মমূল বেদেই যাদের বিশ্বাস নেই, তাদের কুল নাশ হয়ে যায়। একইভাবে বেদমন্ত্রের উচ্চারণই হয় না, বেদাধ্যয়নেরও কোনো ভাবনা নেই এমন মানুষের কুল নষ্ট হয়ে যায়—

কুবিবাহৈঃ ক্রিয়ালোপৈবেদানধ্যয়নেন চ।
কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ॥
শিল্পেন ব্যবহারেণ শূদ্রাপত্যৈশ্চ কেবলৈঃ।
গোভিরশ্বৈশ্চ যানৈশ্চ কৃষ্যা রাজোপসেবয়া॥
অযাজ্যযাজনৈশ্চৈব নাস্তিক্যেন চ কর্মণাম্।
কুলান্যাশু বিনশ্যন্তি যানি হীনানি মন্ত্রতঃ॥

[মনুসংহিতা ৩.৬৩-৬৫]

☐ কুলনাশের কারণ মনু যতটুকু লিখেছেন, কূর্মপুরাণে সেগুলি তো আছেই; তার সঙ্গে কূর্মপুরাণ আর যা যোগ করেছে, সেগুলি হল—মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যাচার (অনৃত), পরস্ত্রীগমন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অশ্রোত্রিয় মানুষকে দান করা, শূদ্রকে দানপাত্র হিসেবে নির্বাচন করা, সদাচারহীন মানুষকে দান করা—

অনৃতাৎ পারদার্য্যাচ্চ তথাভক্ষ্যস্য ভক্ষণাৎ।
অশ্রৌতধর্মাচরণাৎ ক্ষিপ্রং নশ্যতি বৈ কুলম্॥

[কূর্ম পু. ২.১৬.১৯-২২]

☐ মনু এবং কূর্ম পুরাণের কুলনাশিনী বার্তার মধ্যে কুলনাশের কারণগুলি যা বর্ণনা করা হয়েছে, সেই কারণ বা দোষগুলি না থাকলেই তাহলে ইতিবাচকভাবে কুলের সংজ্ঞা তৈরি হতে পারে। কিন্তু কুলের এই সংজ্ঞার সমস্যা এটাই যে, এই সংজ্ঞার মধ্যে ব্রাহ্মণ-কুল ছাড়া আর কোনো কুলের সংকেত পাওয়া যায় না। মহাভারত-রামায়ণে যেসব বিখ্যাত ক্ষত্রিয় কুলের কথা আছে, সেই সব কুলেরও সংজ্ঞা আছে এবং সেই সংজ্ঞার মধ্যে তৎকালীন ক্ষত্রিয় পুরুষদের প্রসিদ্ধ গুণগুলিই অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহলে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশ বা কুলের প্রধান লক্ষণ তো এটাই যে, তাদের ঘরের পুরুষদের শৌর্য্য-বীর্য্য থাকবে, তেজস্বিতা থাকবে, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা—এইসব সাহসিকগুণ থাকবে। আর ক্ষত্রিয় পুরুষরা যেহেতু প্রধানত রাজকার্য্যের সঙ্গে, ধনৈশ্বর্য্যের সঙ্গে সংপৃক্ত থাকেন, তাই দান করার মতো একটা মহৎ কাজ, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার মতো সত্যধর্মও ক্ষত্রিয়কুলের অন্যতম গুণ হবার কথা। আর সবার ওপরে আছে ক্ষত্রিয়ের প্রভুসম্মিত আচরণ বা ঈশ্বরভাব—যেমনটা ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥

বৈশ্যকুলগুলির ক্ষেত্রেও তাঁদের ব্যক্তিগণ বা জাতিধর্মই একান্ত কারণ হবার কথা। ফলে কৃষিকর্ম পশুপালন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষমতা-দক্ষতাও তাঁদের পারিবারিক গ্রন্থিসূত্র। শূদ্রের পক্ষেও পরিচর্যা-কর্ম তাঁদের কুল তৈরি করে।

[ভগবদ্গীতা ১৮.৪৩-৪৪]

☐ মহাভারত-রামায়ণে অসংখ্যবার বিভিন্ন ক্ষত্রিয় কুলের কথা এসেছে এবং তাঁরা কুলের গর্ব করেছেন ক্ষত্রিয়ের জাতিবর্ণসুলভ গুণ দিয়েই। অর্থাৎ রাজ্যশাসন, রাজ্যসম্প্রসারণের জন্য যে বলবীর্য্য লাগে, তার সঙ্গে প্রজারঞ্জনের আন্তর গুণ—ধৈর্য্য, দয়া, দক্ষতা এবং দাক্ষিণ্য—এইগুলি মিলে রাজধর্মের সিদ্ধি ঘটে। এই সিদ্ধিই কিন্তু বিখ্যাত সব ক্ষত্রিয় কুলের গৌরব দান করেছে। লক্ষণীয়, ক্ষত্রিয়-রাজাদের এইসব বিখ্যাত কুলের কথা কিন্তু ঋগ্বেদের মধ্যেই পাই—যেখানে পুরুবংশ, যদুবংশ, ভরতবংশ এবং পিজবনপুত্র সুদাসের বিখ্যাত কুলবংশ ছাড়াও আরও কতকগুলি মহান বংশের কথা বলা হয়েছে। এইসব বিখ্যাত রাজবংশের নাম মহাভারতেও প্রায় অবিকৃতভাবে পাওয়া যায় এবং মহাভারতের কালের আগে ঐতরেয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থেও সোমক-সৃঞ্জয়দের মতো বিখ্যাত কুল অথবা ভরত দৌষ্যন্তির নামে বিখ্যাত ভরতবংশের কথা পাওয়া যায়। আর পাওয়া সাত্বতকুলের কথা যে বংশে স্বয়ং কৃষ্ণ জন্মেছিলেন। এমনকী কুরু, কুরু-পাঞ্চাল এবং মদ্রদের কথাও পাওয়া যায়। কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধিত যদু বা যাদব বংশের কথাও ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়, যদিও যদু বা যাদবের বদলে এখানে প্রায় সময়েই শব্দটা 'যাদ্ব' (যাদব), যদিও যদুবংশের নামটা একসঙ্গে তুর্বশ—যিনি মহাভারত-পুরাণে যযাতি-দেবযানীর এক পুত্র

তুর্বসুর সঙ্গে ভাই হিসেবে উচ্চারিত না হলেও একত্রে উচ্চারিত হয়েছে—

যেনাব তুর্বশং যদুং যেন কণ্বং ধনস্পৃতম্।

অন্যত্র সুদাসরাজার বিরুদ্ধচারী হিসেবে যযাতি-দেবযানীর চার পুত্রের মধ্যে অনু এবং দ্রুহ্যুর নামও যদু এবং ভারত-বংশের সঙ্গে পাওয়া যায়।

[ঋগ্বেদ ১০.৪৮.৫; ১.৪৭.৬; ২.৭.১; ৩.৩৩.১; ১.৩৬.১৮; ৭.১৯.৮; ৮.১.৩১; ৮.৬.৩৯; ৮.৬.৪৮; ৮.৭.২৯; ১.৪৭.৬; ৭.১৮.২৩; ৭.৩৩.৩; ৭.৮৩.৭; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম) ৩৯ অধ্যায় তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৯৩৪; শতপথ ব্রাহ্মণ (weber) ১৩.৫.৪.১-২৩, পৃ. ৯৯৪-৯৯৬]

□ পূর্বোক্ত বেদ এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যে যে কুলবংশগুলির নাম আছে, এই নামগুলি সবসময়েই প্রায় বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে বোঝা যায় যে, বেদ-ব্রাহ্মণের কালেই এই কুলগুলি আর একটি-দুটি পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ নেই, জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর শাখা-প্রশাখা এই কুলগুলিকে এক একটি বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে এবং তাঁদের নেতা হিসেবে সেই সেই বিখ্যাত কুলের বিখ্যাত রাজাদের নাম পাওয়া যাচ্ছে যেমন ভরত, সোমক সাহদেব্য, শতানীক সাত্রাজিত, পারীক্ষিত জনমেজয় কিংবা ইক্ষ্বাকু-কুলের হরিশ্চন্দ্র রাজা। অসামান্য রাজগুণে সমৃদ্ধ এই বৃহৎ ক্ষত্রিয় কুলগুলির কথাই রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে বিস্তারিত হয়েছে।

রামায়ণ-মহাভারতে এক একটি বিখ্যাত কুলের গৌরব এমনই যে, এক-একজন বংশকর পিতার নামে তাঁদের অধস্তন পুরুষদের সম্বোধন করা হয়েছে। রামায়ণে মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর নামে কুল তৈরি হল, তাতে একদিকে যেমন রামের পিতা দশরথকে কিংবা রামচন্দ্রকেও ইক্ষ্বাকু বলেই ডাকা হচ্ছে, তেমনই 'ইক্ষ্বাকু' এই ব্যক্তিনামকে বহুবচনে প্রয়োগ করে বংশের গৌরব কীর্তন করা হয়েছে। একইভাবে ইক্ষ্বাকুদের আর এক পুরুষ ককুৎস্থর নামে একই সঙ্গে দশরথকে উদ্দেশ করে রঘুকুলের মর্য্যাদাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঘটনাটা এই ছিল যে, তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করার জন্য ঋষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে চাইতে এসেছিলেন পিতা দশরথের কাছে। দশরথ প্রথমে কথা দিয়েছিলেন বিশ্বামিত্রকে যে, তিনি তাঁর ঈপ্সিত পূরণ করবেন। কিন্তু পরে তিনি রামচন্দ্রকে যেতে দিতে না চাওয়ায় বিশ্বামিত্র প্রথমে বললেন— আগে প্রয়োজনসিদ্ধির আশ্বাস দিয়ে পরে যে আপনি প্রতিজ্ঞা রাখছেন না, এটা রঘুকুলজাত রাজাদের উপযুক্ত কথা নয়। আপনি ককুৎস্থ কুলের অধস্তন একজন 'কাকুৎস্থ' হয়ে এইরকম 'মিথ্যা প্রতিজ্ঞ' হয়ে থাকুন, আমি চলে যাচ্ছি।

বিশ্বমিত্রের এই যুক্তিযুক্ত ক্রোধ দেখে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ দশরথকে এবার মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর নাম করে বললেন—আপনি ইক্ষ্বাকুদের কুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, সাক্ষাৎ ধর্মের প্রতিরূপ আপনি, আপনি ধৈর্য্যশীল, ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞাকে আপনি ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন, আপনি ভগবতী লক্ষ্মীর আবাসস্থল, আপনি এইভাবে ধর্মত্যাগ করতে পারেন না—

* পূর্বমর্থং প্রতিশ্রুত্য প্রতিজ্ঞাং হাতুমিচ্ছসি।
রাঘবাণামযুক্তোয়ং কুলস্যাস্য বিপর্যয়ঃ॥
যদীদং তে'ক্ষমং রাজন্ গমিষ্যামি যথাগতম্।
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞঃ কাকুৎস্থ সুখী ভব সুহৃদ্‌বৃতঃ॥

* ইক্ষ্বাকূর্ণাং কুলে জাতঃ সাক্ষাদ্ধর্ম-ইবাপরঃ।
ধৃতিমান্ সুব্রতঃ শ্রীমান্ ন ধর্মং হাতুমর্হসি॥

রামায়ণে যেমন ক্ষত্রিয় রাজাদের গুণকর্মের মাধ্যমে তাঁদের এক একজনের কুল বিখ্যাত হয়ে উঠেছে, তবু সেটা তত জটিল নয়। কেননা একই ইক্ষ্বাকুবংশে সগর, হরিশ্চন্দ্র, ভগীরথ, রঘু থেকে রামচন্দ্র পর্যন্ত সকলেই একই বংশের লোক। কিন্তু মহাভারতে কুলের সংখ্যা অনেক। এখানে পাণ্ডব-কৌরবরা একই বংশের মানুষ হলেও তাঁদের কুলের নাম ভরত বা ভারত কুল। প্রসিদ্ধ চন্দ্র বংশে জাত যযাতি রাজার পাঁচ ছেলে যদু, তুর্বশু, দ্রুহ্য, অনু এবং পুরু। পুরু থেকে পৌরব বংশ যেমন চন্দ্র বংশের ধারা রক্ষা করেছে অজমীঢ়, কুরু, ভরতদের মাধ্যমে, তেমনই যদুবংশও তাঁর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে ভোজ, সাত্বত, বৃষ্ণি, অন্ধক, কুকুর বংশের মাধ্যমে। মহাভারতে কুলের 'কন্‌সেপ্ট' এতটাই দৃঢ় যে, এখানে হস্তী, সর্প ইত্যাদিরও কুলের গৌরব আছে।

একজন রাজার শৌর্য্য-বীর্য্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং তেজ কীভাবে একটি কুলের গৌরব তৈরি করে, সেটা মহাভারতে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভরতের নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্রই বোঝা যায়। বলা হয়েছে—ভরত থেকেই সম্পূর্ণ ভরত-

বংশের কীর্তির আরম্ভ। তাঁর নাম থেকেই এই ভারত কুল—এই বংশের সকল উর্ধ্বতন এবং অধস্তন পুরুষের নামই ভারত—

ভরতাদ্ ভারতী কীর্তির্যেনেদং ভারতং কুলম্।
অপরে যে চ পূর্বে বৈ ভারতা ইতি বিশ্রুতাঃ॥

আরও একটা উদাহরণ দিতেই হবে। কুরুবংশীয় মহারাজ শান্তনুর পিতা প্রতীপকে একদিন নির্জনে দেখে গঙ্গা স্ত্রীরূপ ধারণ করে তাঁর দক্ষিণ উরুর ওপরে এসে বসলেন। প্রতীপ তাঁর এই ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করলে গঙ্গা বললেন—তিনি তাঁকে স্বামী হিসেবে কামনা করেন। প্রতীপ বললেন—দক্ষিণ উরু ছেলেপিলে আর পুত্রবধূদের জন্য নির্দিষ্ট। তাই তোমাকে আমার ছেলের বউ হিসেবে চাইতে পারি। তাতে স্ত্রীরূপিণী গঙ্গা বলেছিলেন— তবে তাই হোক। আপনার ছেলেরই স্ত্রী হতে চাই আমি। আমি এই প্রখ্যাত ভারত কুলের বধূ হতে চাই। পৃথিবীর অন্য সকল রাজাদের আশ্রয়স্থল এই বংশ। এই বংশের প্রসিদ্ধ অন্যান্য পুরুষদের কথা, তাঁদের গুণ এবং সাধু আচরণের একশো বছর ধরে বললেও শেষ হবে না—

এবমপ্যস্তু ধর্মজ্ঞ সংযুজ্যে'হং সুতেন বৈ।
তদ্ভক্ত্যা তু ভজিষ্যামি প্রখ্যাতং ভারতং কুলম্॥
পৃথিব্যাং পার্থিবা যে চ তেষাং যূয়ং পরায়ণম্।
গুণা ন হি ময়া শক্যা বক্তুং বর্ষশতৈরপি॥
কুলস্য যে বঃ প্রথিতাস্তৎসাধুত্বমথোত্তমম্।

মহাভারতে পাণ্ডব, কৌরব, পাঞ্চাল, যাদব, শাল্ব, সৌবীর ইত্যাদি নানা কুলের গুরুত্ব এতটাই তৈরি হয়েছে যে, তথাকথিত অনার্যগোষ্ঠীর মধ্যেও কৌল-মাহাত্ম্য তৈরি হয়। হয়তো সেই কারণেই নাগকন্যা উলূপী অর্জুনের কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছেন— ঐরাবতকুলে জাত কৌরব্য-নাগের পুত্রী বলে—

ঐরাবতকুলে জাতঃ কৌরব্যো নাম পন্নগঃ।

এখানে স্বর্গের ঐরাবত হস্তীর সঙ্গে কুরুকুলের নামধারী কৌরব্য তৎকালীন নাগজনজাতির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে বটে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে হস্তী এবং বানর-কুলেরও বিশদ বর্ণনা আছে।

[রামায়ণ ১.২১.২-১৭;
মহা (k) ১.৭৪.৩১; ১.৯৭.১২-১৪; ১.২১৪.১৮;
(হরি) ১.৯২.১২-১৪; ১.২০৭,১৮;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭ অধ্যায়]

□ মহাভারতের কালে কুল ব্যাপারটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে, কতগুলি পরিবার এবং তাঁদের জাতিগোষ্ঠী মিলে যে কুল তৈরি হত, তাঁরাই এক সময় এক-একটি রাষ্ট্র শাসন করেছেন। মনে রাখতে হবে, সংঘবৃত্ত বর্ণনা করার অনেক আগে, যেখানে বংশগত শাসনের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত রাজপুত্রদের রাজ্য না দেবার পরামর্শ দিচ্ছেন কৌটিল্য, সেখানে তিনি বলছেন—এই অবস্থায় সম্পূর্ণ রাজ্যটি একটি কুলসংঘের হাতেও তুলে দেওয়া যেতে পারে, কারণ শত্রুদের পক্ষে এই কুলসংঘগুলিকে জয় করা খুবই কঠিন—

কুলস্য বা ভবেদ্ রাজ্যং কুলসংঘো হি দুর্জয়।

তা ছাড়া, কুলসংঘগুলির গঠন এবং চরিত্র এমনই যে, এতে যেহেতু একটি রাজপরিবারের প্রধান পুরুষেরাই একসঙ্গে সহমতের ভিত্তিতে রাজ্যের শাসন পরিচালনা করেন, তাই এমন হতেই পারে যে, এঁরা পূর্বরাজার ব্যক্তিগত অন্যায়, অশাসন-কুশাসন দূরীভূত করে একটি সুন্দর প্রশাসন উপহার দিতে পারেন রাজ্যবাসী প্রজাদের। এই শাসন এমনও সুযোগ্য হতে পারে যে, সংঘবৃদ্ধেরা বহুদিন অক্ষয়রাজত্ব ভোগ করতে পারেন—

অরাজ্য-ব্যসনাবাধঃ শশ্বদ্ আবসতি ক্ষিতিম্।

কৌটিল্যের কুলসংঘের চরিত্র থেকেও বোঝা যায় যে, এই কুলীন শাসকেরা শুধুমাত্র এক-একটি ক্ল্যান বা গোষ্ঠীমাত্র নন, বরঞ্চ সংঘ মানে একটি গোষ্ঠীতন্ত্র। কুলসংঘই হোক অথবা বার্তাশস্ত্রোপ-জীবী সংঘ, অথবা হোক রাজশব্দোপজীবী, এগুলোর চরিত্র সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক নয় হয়তো, কিন্তু ইংরেজিতে একে সহজেই অলিগার্কি (oligarchy) বলা যেতে পারে। আরও বলা যায়—In its origin it seems to have been a confederation of clans, each clan retaining its chief and all the chief together forming the ruling council.

[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (kangle) ১ম খণ্ড,
১.১৭.৫৩; ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৫]

□ সংঘচারী হওয়া সত্ত্বেও যেখানে গণমুখ্যেরা নিজেদের নামের সঙ্গে রাজ শব্দটা জুড়ে নিতেন, তাঁদের মধ্যে কৌটিল্য নাম করছেন—লিচ্ছবি, বৃজি, মল্ল, মদ্রক, কুকুর এবং কুরু-পাঞ্চালদের

কথা। এই দেশ বা জাতিনামগুলির মধ্যে কুরু এবং পাঞ্চালদেশে যে রাজতন্ত্রের প্রচলন ছিল সেটা আমরা স্পষ্টতই মহাভারত থেকে জানি। কিন্তু, মহাভারতেই যেমনটি দেখেছি, তাতে সর্বেশ্বর রাজা হওয়া সত্ত্বেও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মত সবসময় খাটেনি। বিশেষত, কুরুরাজকুলের ভীষ্ম-বিদুর প্রভৃতি কুলবৃদ্ধেরাও রাজ্যশাসনে অংশগ্রহণ করতেন। স্বয়ং দুর্যোধনও ধৃতরাষ্ট্রের আমলেই রাজা বলে চিহ্নিত হয়েছেন। অন্যদিকে, যুধিষ্ঠির রাজা না থাকার সময়েও রাজ শব্দে সম্বোধিত হয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, ভীষ্ম-বিদুরেরা রাজা না হলেও তাঁদের কিছু স্বাতন্ত্র্য ছিল। মহামতি দ্রোণাচার্য একবার ক্ষিপ্ত হয়ে দুর্যোধনকে বলেছিলেন—আমি তোমার দেওয়া বৃত্তি ভোগ করে হস্তিনাপুরে থাকি না। স্বয়ং ভীষ্ম আমাকে বৃত্তি দেন। হয়তো, এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের কারণেই কুরু-পাঞ্চালদের সংঘ হিসেবে কীর্তন করেছেন কৌটিল্য।

আরও একটা বড়ো কারণ এখানে আছে। আসলে, কুরু এবং পাঞ্চালেরা পাশাপাশি রাজ্যের অধিবাসী। একসময়ে এঁরা একই বংশভুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক তথা জ্ঞাতিশত্রুতার কারণে, এঁদের দুই পক্ষের মধ্য যুদ্ধবিগ্রহও কখনো কখনো হয়েছে। কিন্তু, তবু এঁরা একই বংশের জ্ঞাতিগুষ্টি। তার ওপরে আর এক কথা হল, সেকালের দিনে কুরুরা বা পাঞ্চালেরা এক-একটা স্বতন্ত্র গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন; কিন্তু, অন্তত চার-পাঁচশো বছর তাঁরা এমনভাবেই পরস্পর সম্পৃক্ত ছিলেন যে, বহুদিন পর্যন্ত 'কুরু-পঞ্চালঃ' বলে তাঁদের এক নিঃশ্বাসে ডাকা হয়েছে। হয়তো, এইজন্যেই কৌটিল্য এই দুই জনগোষ্ঠীকে সংঘতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

বৃষ্ণি-অন্ধকেরা মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে সংঘ বা ইংরেজিতে যাকে 'করপোরেশন' বলি, তারই মাধ্যমে শাসন চালাতেন। মহাভারতের যদুবংশপরম্পরায় মন দিলে দেখা যাবে—যদুবংশের ধারায় সাত্বত রাজার ছেলেরা প্রত্যেকেই যখন বেশ পরস্পরপ্রতিস্পর্ধী বড়ো মানুষ হয়ে উঠলেন, তখনই তাঁদের মধ্যে এই সংঘবৃত্ত চালু হয়। কৌটিল্য যে কুকুরবংশের উল্লেখ করেছেন, সেই কুকুর হলেন অন্ধকের পুত্র এবং এই ধারাতেই জন্ম হয় উগ্রসেন এবং কংসের। কংস অবশ্যই একজন গণমুখ্য ছিলেন; কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্যান্য কুলমুখ্যেরা, যেমন অন্ধক, কুকুর, ভোজ, বৃষ্ণি, শূর—ইত্যাদি নামের কুলমুখ্যেরা, কংসের মত মেনে চলতেন। সোজা কথায়, কৃষ্ণের পিতা বসুদেব যেমন একজন কুলমুখ্য ছিলেন, তেমনই কৃষ্ণের জ্ঞাতিগুষ্টিদের মধ্যে উগ্রসেন, অক্রূর, কৃতবর্মা সত্রাজিৎ—এঁরাও ছিলেন কুলমুখ্য। এঁদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতবিরোধ প্রকট হয়ে উঠত বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সংঘের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কুলমুখ্যদের পরস্পর চেষ্টাও কম ছিল না।

বসুদেবপুত্র কৃষ্ণ যখন সংঘমুখ্যের ভূমিকায় এলেন, তখন প্রধানত তাঁর ব্যক্তিত্বে এবং চেষ্টায় ভোজ-বৃষ্ণি-অন্ধকগোষ্ঠীর প্রধানদের তিনি নিজের অনুকূলে আনতে পেরেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই আঠেরোটি কুলসংঘের একতার জন্যই অত্যাচারী কংসের বিপদ ঘটে। মহাভারতের সভাপর্বে এই ঘটনার প্রমাণ মিলবে। পরবর্তী কালে, যখন ভোজ-বৃষ্ণি-অন্ধকদের সংঘসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কৃষ্ণের জ্ঞাতিগুষ্টিদের মধ্যে নানা মতানৈক্য, বিবাদ-বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। মহাভারতে দেখা যাবে—এইসব বিবাদ-বিশৃঙ্খলা একা হাতে মেটানোর ক্ষমতা থাকলেও রাষ্ট্রের সংঘধর্মিতার কারণেই কৃষ্ণ চুপ করে আছেন। একসময়ে তাঁকে নারদের কাছে দুঃখ করে নিজের অসহায়তার কথা বলতেও শুনেছি।

কৃষ্ণ বলেছেন—নারদ! আমি নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করে আমার জ্ঞাতিগুষ্টিকে দাসে পরিণত করতে চাই না। আমার ভোগ্যবস্তুর অর্ধেক আমি ভোগ করি আর অন্য অর্ধেক জ্ঞাতিদের দিয়ে দিই এবং একইসঙ্গে তাঁদের অনেক কটু কথাও আমি মনে মনে জ্বলতে জ্বলতে সহ্য করি—

অর্ধং ভোক্তাস্মি ভোগানাং
বাগ্‌দুরুক্তানি চ ক্ষমে।

কৃষ্ণ তাঁর নিজের দাদা বলরাম, ছোট ভাই গদ, এমনকী তাঁর নিজের ছেলে প্রদ্যুম্নের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—এঁদের এক-একজন এক এক বিষয় নিয়ে মত্ত, কিন্তু আমি বড় নিঃসহায়, নারদ! কৃষ্ণ এবার অন্ধক-বৃষ্ণিদের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেছেন—এঁদের অনেকেই বেশ বড় মানুষ, অনেকেই অত্যন্ত বলবান, দুর্ধর্ষ এবং

যুদ্ধোৎসাহসম্পন্ন। এঁরা যাঁদের পক্ষে থাকবেন, এই জগৎ হবে তাঁদেরই রাজ্য—

যস্য ন স্যু র্ন বৈ স স্যাদ্ যস্য স্যুঃ কৃৎস্নমেব তৎ।

কৃষ্ণ এবার অন্ধক-বৃষ্ণিদের দুজন কুলমুখ্যের নাম করে বলছেন—আহুক এবং অক্রূর, এঁরা দুজনে পরস্পরে বিবাদ করে বেড়াচ্ছেন। অথচ এঁরা দুজনেই আমার আত্মীয়। এরকম আত্মীয় থাকাও কষ্ট এবং না থাকাও কষ্ট, কারণ এঁরা ভীষণ প্রভাবশালী নেতা। মায়ের দুই ছেলেই যদি জুয়ারি হয়, তা হলে তাঁদের মা যেমন একজনের জয় কামনা করেন অথচ অন্যজনের পরাজয় কামনা করেন না, তেমনই আমিও এই আহুক আর অক্রূরের মধ্যে একজনের জয় কামনা করি, কিন্তু অন্যজনের পরাভব কামনা করি না—

একস্য জয়মাশংসে দ্বিতীয়স্যাপরাজয়ম্।

নারদ কৃষ্ণকে অনেক সান্ত্বনা দিয়েছেন। বলেছেন—আপনি যাদবসংঘের মধ্যে প্রধান, আপনাদের সংঘে ভেদ ঘটলে গোটা সংঘটাই বিনষ্ট হয়ে যাবে—

ভেদাদ্ বিনাশঃ সংঘানাং সংঘমুখ্যো'সি কেশব।

আপনি সুবিবেচনা, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়দমন ইত্যাদির মাধ্যমে মৃদু-মধুর বাক্যে এঁদের শান্ত করুন। আপনি চিরকাল সন্ধি-বিগ্রহ ইত্যাদি রাজকীয় প্রক্রিয়ায় পটু। যাদব, কুকুর, ভোজ এবং অন্ধক-বৃষ্ণিদের সকলেই আপনার বুদ্ধির ওপর নির্ভর করেন। কাজেই, আপনি থাকতে যাতে যাদবসংঘ নষ্ট বা বিপন্ন না হয়, সেই চেষ্টা আপনাকে করতেই হবে—

যথা ত্বাং প্রাপ্য নোৎসীদেদ্ অয়ং সংঘস্তথা কুরু।

আমরা আর বিস্তারে যাব না, তবে কৃষ্ণের মুখে যেমন শুনলাম তাতে যাদব-জ্ঞাতিগুষ্টিদের সংঘচরিত্রটা বেশ বোঝা যায়। কোনো সন্দেহ নেই এটা গণরাষ্ট্র নয়, তবে এটা যে কতিপয়ের শাসন, কুলজ্যেষ্ঠদের শাসন, সংঘমুখ্যদের শাসন অথবা অন্য ভাষায় অলিগার্কি, তাতেও কোনো সন্দেহ থাকে না। হয়তো, কৌটিল্যকথিত অন্যান্য সংঘ বা গণরাষ্ট্রেও এইরকম কতিপয়ের শাসন চালু ছিল, যাঁরা প্রত্যেকেই রাজা নাম ধারণ করতেন; অন্তত তাঁরা যে ব্যক্তিগত প্রভাবে এবং স্বাধীনতায় রাজার মতোই শক্তিশালী, তা কৃষ্ণের মতো বিশাল ব্যক্তিত্বের অসহায়তার নিরিখেই প্রমাণ করা যায়।

বৈদিক যুগের শেষ কল্পে, যখন অথর্ববেদ বা ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলি রচিত হচ্ছে, তখনই কিন্তু রাষ্ট্র বলতে একটা ভৌম (territorial) সংজ্ঞা তৈরি হয়ে গেছে। রাজার নামের সঙ্গে তাঁর বংশমাহাত্ম্য জুড়ে যাচ্ছে এবং রাজ্যের ওপর রাজার বংশগত অধিকার ভালো করে কায়েম হয়েছে এইসময়েই। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ প্রতীচ্য, নীচ্য, মধ্যদেশ, উত্তরদেশ ইত্যাদি স্থান নির্দেশ করে সেসব জায়গায় কী ধরনের রাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে তার তালিকা দিয়েছে। এই তালিকায় সাত্বত, ভোজ, কুরু, পঞ্চাল, উশীনর, ভরত-দৌষ্যন্তি—ইত্যাদি গোষ্ঠীনাম এবং ব্যক্তিনামও রাজতন্ত্রের শক্ত বুনিয়াদ সূচনা করেছে।

[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (kangle) ১ম খণ্ড, ১১.১.২-৫; মহা (k) ৫.১৪৮.১৩-১৪; ২.১৪.৩২-৩৫; ১২.৮১.৩-৩১; (হরি) ৫.১৩৮.১২-১৩; ২.১৪.৩২-৩৫; ১২.৭৯.৩-৩১]

□ এটা এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, অনেকগুলি জ্ঞাতিগোষ্ঠী নিয়ে যে কুল তৈরি হত, সেই কুলগুলি একত্রিত হয়েই সংঘবৃত্ত তৈরি করত। সেখানে একজন কুলমুখ্যের ক্ষমতা, তেজ এবং ব্যক্তিত্ব যদি চরম হয়ে উঠত, তাহলে তার নামেই একটি পৃথক রাজতন্ত্রেরও জন্ম হয়ে যেত। কুল ব্যাপারটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সেই কুলের শাসনে যদি রাষ্ট্রশাসন চলত, তাতে পৃথক কুলশাসনের মধ্যে পৃথক পৃথক সামাজিক এবং পারিবারিক নিয়ম কানুনও চালু হয়ে যেত যাকে বলা হয় 'কুলধর্ম'। খেয়াল করে দেখবেন মহাভারতের ভীষ্ম পিতামহ যখন ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুর বিবাহের জন্য উপযুক্ত কন্যা খুঁজতে গেছেন মদ্রদেশে, তখন মদ্রেশ্বর শল্য মাদ্রীকে পাণ্ডুর সঙ্গে বিয়ে দেবেন—একথা স্বীকার করে নিয়েও খানিক ইতস্তত করে ভীষ্মকে বলছেন—আপনার বংশে যদি আমার বোনের একটি বর পাওয়া যায়, তবে তার চাইতে ভাল আর কী হতে পারে—

ন হি মেহন্যো বরস্তত্তঃ শ্রেয়ানিতি মতির্মম।

তবে কিনা . . . শল্য সংকোচ বোধ করছেন কথাটা বলতে। তবে কিনা এতদিনকার কুলপ্রথা স্মরণ করে শল্যকেও বলতেই হবে কথাটা। শল্য বললেন—দেখুন মহাশয়! কথাটা আমাকে বলতেই হচ্ছে, আমাদের প্রাচীন অগ্রজন্মা পুরুষেরা এই নিয়ম চালু করে গিয়েছিলেন—

পূর্বৈঃ প্রবর্তিতং কিঞ্চিৎ কুলে'স্মিন্ নৃপসত্তমৈঃ

আমি জানি, এটা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। কেউ বলতে পারেন কথাটা মন্দ, কেউ বা ভালও বলতে পারেন। কিন্তু যিনি যাই বলুন, আমি আমার পূর্বপুরুষের প্রবর্তিত প্রথাটি অতিক্রম করতে পারব না—

সাধু বা যদি বাসাধু তন্নাতিক্রমিতুম্ উৎসহে।

শল্য এত বেশি ভদ্রলোক যে মুখ ফুটে নিজের কুলপ্রথার কথা বলতেও তাঁর লজ্জা করছে, কেন না এই প্রথার মধ্যে পণ নেবার একটা সমাজ-বিরুদ্ধ মানসিকতা আছে। শল্য বললেন—আমাদের কুলপ্রথা আমি অতিক্রম করতে পারছি না—এটা আপনার মতো মানুষ বুঝতে পারবেন যথেষ্টই, হয়তো ব্যাপারটা আপনার অজানাও নয়। তবু এটা বলতে আমার বাধছে যে, আমাদের ঘরের মেয়ে চাইতে গেলে আপনাকে শুল্ক হিসেবে কিছু দিতে হবে—

ন চ যুক্তস্তদা বক্তুং ভবান্ দেহীতি সত্তম।

—সত্যি, একথা কী করে বলি আপনাকে। অথচ এই রীতিটা আমাদের কুলধর্ম, আর কুলধর্ম ব্যাপারটা যেমন আমার কাছে মান্য, তেমনই আপনি যেহেতু আমাদের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হচ্ছেন, অতএব তা আপনার কাছেও মান্য—

কুলধর্মঃ স নো বীর প্রমাণং পরমং মহৎ।

কিন্তু তবু আমার ধর্মের বিষয়ে আমি যতই নিঃসংশয় হই না কেন, ব্যাপারটা আপনাদের কাছে অপরিচিত বলেই কথাটা বলতে আমার সংকোচ হচ্ছে—

তেন ত্বাং ন ব্রবীম্যেতদ্ অসন্দিগ্ধং বচো'রিহন্।

আমরা শল্যকে যে একটু বিব্রত হয়ে কন্যাপণের কথা বলতে শুনছি, তার কারণ, প্রথমত, কন্যাপণ সে যুগেও তেমন চালু ছিল না, আর দ্বিতীয়ত, তিনি কথা বলছেন কুরুকুলপতি ভীষ্মের সঙ্গে। ভীষ্ম প্রবীণ অভিজ্ঞ পুরুষ, তিনি যেমন নিজের মর্য্যাদা সম্বন্ধে অবহিত, তেমনই পরের মর্য্যাদা সম্বন্ধেও সমান সচেতন। ভীষ্ম বললেন—কুলধর্ম পালন করা সমস্ত মানুষেরই কর্তব্য, স্বয়ং বিধাতার নির্দেশই তো এইরকম। তা ছাড়া এতে আপনার কিছু অন্যথা করবারও কারণ নেই। আপনার পূর্বজেরা যে নিয়ম করে গেছেন, সেখানে আপনার কোনো দোষই নেই—

নাত্র কশ্চন দোষো'স্তি পূর্বৈর্বিধিরয়ং কৃতঃ।

আপনি যে আপনার পূর্ব পুরুষদের নিয়ম মেনে চলছেন—এটাই আমার বেশ লাগছে।

[মহা (k) ১.১১৩.৬-১৩; (হরি) ১.১০৭.৬-১৩]

☐ বলা যেতে পারে, শল্যের গৃহে বৈবাহিক নিয়মের মধ্যে যেটা দেখলাম, সেটা এক একটি বিশেষ কুলের একটি নির্দিষ্ট আচার, যা কন্যার বিবাহের সঙ্গেই সংপৃক্ত। আমরা বলতে চাই, এই ধরনের নিয়মাচার আরও বহু প্রকার আছে, যেগুলি অন্যতর এক একটি বিশেষ কুলের সঙ্গে জড়িত এবং পূর্বপুরুষের তৈরি সংস্কারগুলি অধস্তন পুরুষেরা পালন করে থাকেন। হয়তো এই কারণেই দেশধর্ম এবং কুলধর্মকে যথেষ্ট মর্য্যাদা দিয়েই উল্লেখ করেছেন মনু—

দেশধর্মান্ জাতিধর্মান্ কুলধর্মাংশ্চ শাশ্বতান্।
পাষণ্ডগণধর্মাংশ্চ শাস্ত্রে'স্মিনুক্তবান্ মনুঃ॥

[মনুসংহিতা ১.১১৮]

☐ আসলে কুল এবং কুলধর্ম ব্যাপারটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, কুলের মর্য্যাদা রক্ষা করার সবচেয়ে বড়ো উপায় ছিল কুলবংশগুলির রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখা। প্রাচীনেরা বর্ণসংকর ঘটার মধ্যেই কুলধর্মের সংকট দেখতে পেয়েছেন সবচেয়ে বেশি। এমনটা না হলে ভগবদ্গীতার মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে স্বয়ং অর্জুন এইভাবে গলা ফাটিয়ে বলতেন না যে, আমি আজ যুদ্ধ করে যেভাবে এই বিশাল কুলবংশের বিনাশ ঘটাতে চলেছি, তাতে ফল হবে এটাই— আমাদের কুলটাই শেষ হয়ে যাবে। আর এইভাবে যদি কুলক্ষয় ঘটাই আমরা, তাহলে কুলধর্মও নষ্ট হয়ে যাবে এবং ধর্ম নষ্ট হলে অধর্ম সমস্ত কুলটাকেই শেষ করে দেয়। অন্যদিকে অধর্ম যদি বেড়ে যায় কুলস্ত্রীদের মধ্যে দুষ্টভাব তৈরি হয়। স্ত্রীরা দুষ্ট হলে সেখানে বর্ণসংকর সৃষ্টি হয়। অবশেষে কুলঘ্ন মানুষদের বর্ণসংকর-দোষের কারণে জাতিধর্ম, কুলধর্ম সব উচ্ছন্নে যায়—

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মো'ভিবত্যুত॥
অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসংকরঃ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসংকরকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥

[ভগবদ্গীতা ১.৩৯-৪৩]

□ ভগবদ্গীতার এই কুলধর্ম বিষয়ক শ্লোকগুলি স্পষ্টতই বর্ণাশ্রমধর্মের দৃষ্টিতে লেখা হয়েছে, কিন্তু সাধারণভাবে কুলধর্ম বর্ণাশ্রমধর্ম বা জাতিধর্মের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়। কুলধর্ম বলতে বিশেষ বিশেষ প্রসিদ্ধ বংশ বা কুলের বিশেষভাবে প্রবর্তিত নিয়ম-আচারই বোঝায় এবং সেটা মনুসংহিতায় উল্লিখিত কুলধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রত্যেকটি টীকাকার—মেধাতিথি থেকে কুল্লূকভট্ট, সর্বজ্ঞনারায়ণ থেকে রাঘবানন্দ সকলেই বলেছেন—কুলধর্মাঃ প্রখ্যাতবংশ প্রবর্তিতাঃ।

[মানবধর্মশাস্ত্র (মাণ্ডলিক) ১.১১৮ টীকাগুলি দ্রষ্টব্য, পৃ. ৮৬]

কুল২ রামচন্দ্রের সভাসদদের একজন। এঁরা সকলেই নানা কথোপকথনের মাধ্যমে রামের মনোরঞ্জন করতেন। *[রামায়ণ ৭.৫৩.২]*

কুলক১ ভাগবত পুরাণ অনুসারে কুশদ্বীপের অধিবাসীদের যে চারটি গণে বিভক্ত করা হয়েছে তাদের মধ্যে কূলক অন্যতম গণ।

[ভাগবত পু. ৫.২০.১৬]

কুলক২ কলিযুগের সূর্যবংশীয় রাজা বৃহদ্বলের বংশধারায় ক্ষুদ্রকের পুত্র এবং সুরথের পিতা কুলক। *[মৎস্য পু. ২৭১.১৩]*

কুলত্থ মহাভারতে উল্লিখিত একটি জাতির নাম। ভীষ্মপর্বে ভারতবর্ষের উত্তরদিকে বসবাসকারী ক্রূর ও ম্লেচ্ছ জনজাতিগুলির মধ্যে কুলত্থ জনজাতির কথা পাওয়া যায়। বিষ্ণু পুরাণেও কুলত্থদের উল্লেখ পাওয়া যায়। *[দ্র. কুলুত]*

[মহা (k) ৬.৯.৬৬; (হরি) ৬.৯.৬৬; বিষ্ণু পু. ১.৬.২২]

কুলম্পুন মহাভারতে উল্লিখিত একটি তীর্থ। এই তীর্থ দর্শনে পুণ্যার্থীর সমগ্র কুল পবিত্র হয়। কুলম্পুনের আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

[মহা (k) ৩.৮৩.১০৪; (হরি) ৩.৬৮.১০৪]

কুলম্পুনা একটি নদী-তীর্থ। মহাভারতে কুলম্পুনা নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

[মহা (k) ১৩.১৬৫.২০; (হরি) ১৩.১৪৩.২০]

কুলহ পুরাণে মহর্ষি কশ্যপের গোত্রভুক্ত যে ঋষি বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, কুলহ সেই গোত্রের অন্যতম ঋষি। মহর্ষি কশ্যপ থেকে বংশ বা শিষ্য পরম্পরায় এরাও কাশ্যপ বলে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ১৯৯.১৭]*

কুলিক একজন নাগ প্রধান। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.৬৫.৪১; (হরি) ১.৬০.৪১; কালিকা পু. ৩৪.৭৪]

□ ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, কুলিক নাগ বাসুকি, শ্বেত প্রমুখ নাগ প্রধানদের সঙ্গে রসাতলের নিম্নভাগে পাতাললোকে বসবাস করেন। *[ভাগবত পু. ৫.২৪.৩১]*

কুলিন্দ১ একটি প্রাচীন জনজাতি। জরাসন্ধের ভয়ে কুলিন্দরা তাঁদের বাসভূমি ছেড়ে উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে পালিয়ে গিয়েছিলেন। দিগ্বিজয়ের সময় অর্জুন কুলিন্দদেশ জয় করেছিলেন।

[মহা (k) ৬.১৪.২৬, ২৬.৩; (হরি) ৬.১৪.২৬, ২৫.৩; বায়ু পু. ৪৫.১১৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৪৮]

□ সভাপর্বে বলা হয়েছে যে, সুমেরু ও মন্দর পর্বতের মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ দিয়ে প্রবাহিত শৈলোদা নদী। এই নদীর দুই তীরে কীচক নামে একধরনের বাঁশ গাছের বনভূমি রয়েছে। সেই বনভূমিতে বহু জনজাতির বাস। কুলিন্দরাও সেখানেই বাস করে।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় কুলিন্দরাজারা দ্রোণ নামে একধরনের পরিমাণ নির্ধারক পাত্রে করে প্রচুর পরিমাণে পিপীলিক স্বর্ণ পাণ্ডবদের উপহার দিয়েছিলেন। পিপীলিক স্বর্ণের বৈশিষ্ট্য হল যে, এটি পিপীলিকারা মাটি খুঁড়ে ভূ-পৃষ্ঠে বের করে আনে—

মেরুমন্দরয়োর্মধ্যে শৈলোদামভিতো নদীম্।
যে তে কীচকবেণূনাং ছায়াং রম্যামুপাসতে॥
খসা একাসনা হ্যর্হাঃ প্রদরা দীর্ঘবেণবঃ।
পারদাশ্চ কুলিন্দাশ্চ তঙ্গণাঃ পরতঙ্গণাঃ॥
তদ্বৈ পিপীলিকং নাম উদ্ধৃতং যৎ পিপীলিকৈঃ।
জাতরূপং দ্রোণমেয়মহার্ষুঃ পুঞ্জশো নৃপাঃ॥

[মহা (k) ২.৫২.২-৪; (হরি) ২.৫০.২-৪]

□ গ্রীক পণ্ডিত টলেমীর মতে, কুলিন্দরা বাস করত বিপাশা, শতদ্রু, যমুনা ও গঙ্গানদীর উৎসস্থলের পার্বত্য অঞ্চলে। সভাপর্বের শ্লোকটিতে 'কীচকবেণু' কথাটি এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'কীচক' আসলে এক প্রজাতির বাঁশগাছ। বিপাশা ও শতদ্রু নদীর দোয়াব অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কীচক জাতীয় বাঁশের বন দেখা যায়। যা থেকে মনে হয় যে, কুলিন্দরা এই অঞ্চলেই বাস করত। আবার অনেকের ধারণা যে, বিপাশা নদী-উপত্যকার

উচ্চ অংশে কুলত (Kulata) নামে একটি স্থান আছে, যা টলেমীবর্ণিত কুলিন্দ দেশ বা কুলিণ্ড্রাইন্ (Kulindrine))এর অন্তর্গত ছিল। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং এই অঞ্চলের নাম বলেছেন কিন্-লু-তো (K'in-Lu-to)। ধারণা করা হয় যে, এই কিন-লু-তো থেকেই 'কোলুত' (Koluta) নামটির উৎপত্তি। কুলুত এই শব্দেরই পরিণাম।

পণ্ডিতদের মতে, মেরু-মন্দার পার্বত্য অঞ্চল বলতে হিমালয় ও কুয়েনলুন পর্বতমালার মধ্যবর্তী বিশাল বিস্তৃত পার্বত্যভূমিকে বোঝানো হয়। এই অঞ্চলে মর্মট (Marmot) নামে এক ধরনের কাঠবিড়ালী জাতীয় প্রাণীর দেখা মেলে। এই মর্মটরা মধ্য-এশিয়ার শুষ্ক বন্ধুর পার্বত্যভূমির খুঁড়ে বালিতে মিশে থাকা আকরিক স্বর্ণ মাটির উপরে তুলে আনে। গ্রীক পণ্ডিত হেরোডোটাসের বর্ণনায় এই মর্মটদেরই হিমালয় অঞ্চলের বৃহদাকার পিঁপড়ে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মর্মটদের তুলে আনা স্বর্ণ আকরিকই সম্ভবত কুলিন্দদের পিপীলক স্বর্ণ।

[TAI (Law) p. 90; Journal of the Royal Asiatic Society (Vol-7), Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1843, p.143]

□ দিগ্বিজয়কালে অঙ্গরাজ কর্ণ কুলিন্দদের জয় করেছিলেন। *[মহা (k) ৮.৮.১৯; (হরি) ৮.৬.১৯]*

□ গঙ্গানদী সাতটি ভাগে বিভক্ত হয়ে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই সাতটি শাখা বহুদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। এই দেশগুলির মধ্যে কুলিন্দও অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৪৫]

□ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুলিন্দদের পাণ্ডব ও কৌরব উভয়পক্ষেই যোগ দিতে দেখা যায়। কর্ণপর্বে কুলিন্দদের যুদ্ধাভিলাষী ও যুদ্ধে সুনিপুণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণত কুলিন্দরা বিশালকায় ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতিতে চড়ে যুদ্ধ করতো। কর্ণপর্বে পাণ্ডবপক্ষে এক কুলিন্দ রাজপুত্রকে যুদ্ধ করতে দেখা যায়। ইনি নিজে দুর্যোধনের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর বাহন হস্তীটিও বহু কৌরবযোদ্ধাকে এবং সেই কৌরব-যোদ্ধাদের মধ্যে অগ্রণী বৃক নামক যোদ্ধাকে পায়ের আঘাতে পিষে মারে। পরে বভ্রুপুত্র অঙ্গদ সেই মহাহস্তীটিকে হত্যা করেন।

এছাড়াও কর্ণপর্বে আরেক কুলিন্দ-রাজপুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি নকুলপুত্র শতানীকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রচুর কুলিন্দযোদ্ধা নিহত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ৮.৮৫.৪-৫, ৮, ১৩-১৫, ১৭-২০; (হরি) ৮.৬২.৪৪-৪৫, ৪৮, ৫৩-৫৫, ৫৭-৬০]

□ পণ্ডিতদের একাংশের মতে কুলিন্দ ও পুলিন্দ একই জাতি। পণ্ডিত B.C. Lawও এই মতের সমর্থক। এঁরা পশ্চিম পঞ্জাবে বসবাস করতেন বলে মনে করা হয়। *[TAI (Law) p.90]*

□ পুরাণগুলিতে কুলিন্দ জনপদটির কুণিন্দ কিংবা 'পুলিন্দ' পাঠান্তরও পাওয়া যায়। বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লিখিত কুলিন্দ জনপদটিই মৎস্য পুরাণের পাঠে 'পুলিন্দ' নামে এবং অন্যান্য পুরাণে কুণিন্দ নামে চিহ্নিত হয়েছে। পণ্ডিত D.C. Sircar এই কুলিন্দ বা কুণিন্দদের বর্তমান হিমাচল প্রদেশে কুলু অঞ্চলে বসবাসকারী কুনেত জনজাতি বলে মনে করেছেন। বর্তমান হরিয়ানার অম্বালা এবং সাহারানপুর অঞ্চলেও এরা বসতি বিস্তার করেছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

[মৎস্য পু. ১১৪.৪১; মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.৩৭, ৪৮; GAMI (Sircar) p. 33]

কুলিন্দ২ দক্ষিণ ভারতের একটি জনপদ।

□ একমাত্র ভীষ্মপর্বেই উত্তর ভারতের কুলিন্দ ছাড়াও দক্ষিণ ভারতে একই নামে আর একটি জনপদের কথা বলা হয়েছে। পুরাণে দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত কোনো কুলিন্দ দেশের কথা পাওয়া যায় না। বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখলে মনে হয় মগধরাজ জরাসন্ধের ভয়ে যে সব কুলিন্দরা তাঁদের উত্তর ভারতীয় বাসস্থান থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গিয়েছিলেন, হয়তো বা তাঁরাই দক্ষিণ ভারতে কুলিন্দ নামে নতুন একটি জনপদ গড়ে তোলেন অথবা তাঁদের দক্ষিণ দিকের বাসভূমিও কালের নিয়মেই তাঁদের জাতিসত্তার কারণে কুলিন্দ নামে পরিচিত হয়। কুলিন্দরা মূলত যুদ্ধবাজ যাযাবর উপজাতি। এঁদের পক্ষে একস্থান থেকে অন্যস্থানে migrate করা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। আর ঐতিহাসিক ভাবেও কুলিন্দরা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত থেকেই ভারতের মূল ভূ-খণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, উত্তর ও দক্ষিণ

ভারতের কুলিন্দ দুটি পৃথক জনপদ হলেও সম্ভবত একই জাতির মানুষের বাসস্থান ছিল।

[মহা (k) ৬.৯.৬৩; (হরি) ৬.৯.৬৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৫৯]

কুলীয় একটি প্রাচীন ভারতীয় জনপদ। তবে মৎস্য পুরাণে 'কুলীয়' পাঠ পাওয়া গেলেও অন্যান্য পুরাণগুলিতে 'পুলীয়', 'পুলেয়' বা 'পুলিন্দ্' পাঠ পাওয়া যায়। এই পাঠান্তর পর্যালোচনা করে পণ্ডিত D.C. Sircar 'কুলীয়' এবং 'পুলিন্দ' জনজাতিকে অভিন্ন বলেই মনে করেছেন। তবে ভারতে স্বাধীনতা উত্তরকালেও Census রিপোর্টে অন্ধ্রপ্রদেশে বসবাসকারী 'কুলীয়' নামে একটি তফশিলি উপজাতি তালিকাভুক্ত (Scheduled Tribe) জনজাতির অস্তিত্ব মেলে। সেক্ষেত্রে এই 'কুলীয়' জনজাতির কথাই পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে কী না, এ বিষয়ে ভাবনারও অবকাশ থাকছে।

[মৎস্য পু. ১১.৫১; GAMI (Sircar) p. 41; Census of India, 1961: Andhra Pradesh, India: Office of the Registras Creneral, p. 115]

কুলুত　*[দ্র. উলূক৪, কুলিন্দ]*

কুল্য১ ভাগবত পুরাণ মতে সামবেদের অন্যতম ঋষি ছিলেন পৌষ্যঞ্জি। তাঁর প্রধান পাঁচ শিষ্যের মধ্যে একজন ছিলেন মহর্ষি কুল্য।

[ভাগবত পু. ১২.৬.৭৯]

কুল্য২ যযাতির পুত্র তুর্বসুর বংশধারায় রাজর্ষি মরুত্ত নিঃসন্তান ছিলেন। তাই তিনি পুরুবংশীয় দুষ্যন্তকে পুত্র রূপে গ্রহণ করেন। অবশ্য বায়ু পুরাণ এই পুরুবংশীয় রাজাকে দুষ্কৃত নামে চিহ্নিত করেছে, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ চিহ্নিত করেছে দুষ্কন্ত নামে। দুষ্যন্তের পুত্র ভরত যেমন পুরুর বংশধর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন, দুষ্যন্তের অপর পুত্র সরূপ্য বা শরুথ তেমনই চিহ্নিত হলেন তুর্বসুর বংশধর হিসেবে। এই শরুথ বা সরূপ্যের পুত্র জনাপীড় (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে আণ্ডীর)। জনাপীড়ের চার পুত্রের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কুল্য। তিনি যে রাজ্যস্থাপন করেন তার নাম ছিল কুল্যা।

[বায়ু পু. ৯৯.৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.৬]

কুশ১ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের ঔরসে সীতাদেবীর গর্ভজাত যমজ পুত্রদের মধ্যে কুশ জ্যেষ্ঠ।

বাল্মীকি মুনির আশ্রমেই কুশ ও লব জন্মগ্রহণ করেন। নবজাতকদের অশুভ গ্রহের কুফল থেকে রক্ষা করার জন্য মহর্ষি বাল্মীকি একটি বিশেষ বিধান দেন। তিনি কতগুলি কুশ নিয়ে তার অগ্রভাগ দিয়ে রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এবং অধোভাগ দিয়ে কনিষ্ঠ পুত্রকে মার্জনা করেন। কুশের অগ্রভাগকে 'কুশ' এবং অধোভাগকে 'লব' বলে চিহ্নিত করা হয়। সেই কারণে নবজাতকদেরও নামকরণ হয় কুশ ও লব—

যস্তয়োঃ পূর্বজো জাতঃ স কুশৈর্মন্ত্রসৎকৃতৈঃ।
নির্ম্মার্জনীয়স্তু তদা কুশ ইত্যস্য নাম তৎ॥

কুশ তাঁর যমজ ভাই লবের সঙ্গে সম্পূর্ণ বাল্যকাল বাল্মীকির আশ্রমেই অতিবাহিত করেন।

[রামায়ণ ৭.৭৯.১-১০]

□ রামচন্দ্র যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন, তখন মহর্ষি বাল্মীকির সঙ্গে কুশ ও লবকে দেখা যায়। বাল্মীকির নির্দেশ অনুসারে কুশ ও লব আশ্রমে, ব্রাহ্মণদের গৃহে, রাজপথে, রাজা রামচন্দ্রের প্রাসাদদ্বারে রামায়ণ গান করতে থাকেন। মহর্ষির নির্দেশ মত কুশ ও লব রামায়ণের এক থেকে বিংশ অধ্যায় পর্যন্ত গান করলেন। তাঁদের গানে মুগ্ধ হয়ে রামচন্দ্র প্রচুর ধন, রত্ন, সুবর্ণ ইত্যাদি ঐশ্বর্য্য দিতে মনস্থ করলে কুশ ও লব বলেন—আমরা বনে বাস করি, ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করি, সোনা-দানা নিয়ে বনের মধ্যে আমরা কী করব? তখন রামচন্দ্র ও সভার অনান্য শ্রোতারা কৌতূহলী হয়ে কুশ ও লবকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই কাব্যের রচয়িতা কে? কুশ ও লব জানান যে রামচন্দ্রের জীবনচরিত অবলম্বন করে তাঁদের গুরু বাল্মীকি মুনি রামায়ণ রচনা করেছেন এবং তিনি এই যজ্ঞস্থলেই উপস্থিত আছেন। রামায়ণের বাকি অংশ রামচন্দ্র শুনতে চাইলে দুই ভাই পুনরায় রামায়ণ-গান শুরু করেন। এই রামায়ণ গীত থেকেই রামচন্দ্র জানতে পারেন যে, কুশ ও লব সীতাদেবীর পুত্র।

[রামায়ণ ৭.১০৬ অধ্যায়; ৭.১০৭ অধ্যায়; ৭.১০৮.১-৬]

□ সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশের পর রামচন্দ্র কুশ ও লবকে নিজের পুত্র রূপে গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র কুশকে কোশল রাজ্যে এবং লবকে উত্তর কোশল রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

অযোধ্যার রাজসিংহাসনে কুশ ও লব অভিষিক্ত হলে তাঁরা সুষ্ঠুভাবে প্রজাপালনে মনোনিবেশ করেন। *[রামায়ণ ৭.১২০.১৭]*

□ পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী কোশলে রাজা কুশের রাজধানীটি কুশস্থলী নগরী নামে বিখ্যাত ছিল। কুশের অতিথি নামে এক পুত্রসন্তান হয়। *[ভাগবত পু. ৯.১১.১১; ৯.১২.১; বিষ্ণু পু. ৪.৪.৪৭-৪৮; বায়ু পু. ৮৮.১৯৮-১৯৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১৯৮; মৎস্য পু. ১২.৫১-৫২]*

কুশ$_{২}$ চন্দ্রবংশীয় অমাবসুর বংশধারায় বলাকাশ্বের পুত্র কুশ। তিনি গাধি রাজার পিতামহ এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রপিতামহ। ভাগবত পুরাণে অবশ্য বলা হয়েছে, কুশ অজকের পুত্র।

রামায়ণ অনুসারে বিদর্ভদেশের কোনো রাজকন্যাকে কুশ বিবাহ করেছিলেন। কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্তরজস্ এবং বসু নামে তাঁর চার পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রামায়ণের মূল শ্লোকে অবশ্য অসূর্তরজস্ পাঠ পাওয়া যায়। কিন্তু রামায়ণের তীলক টীকায় ধৃত অমূর্তরজস্ পাঠটিকেই আমাদের অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। *[রামায়ণ ১.৩২.২-৩; মহা (গীতা প্রেস) ৭০নং শ্লোকের উত্তর দাক্ষিণাত্য অধিক পাঠ দ্রষ্টব্য; পৃষ্ঠা ২২৫, প্রথম খণ্ড; ভাগবত পু. ৯.১৫.৪]*

□ কুশের পুত্র কুশনাভ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে কুশ বলেন যে, গাধি নামে তাঁর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। এই গাধি রাজার পুত্র হলেন বিশ্বামিত্র। 'কুশ' বংশে জন্মগ্রহণ করার জন্য ঋষি বিশ্বামিত্র 'কৌশিক' নামে খ্যাত হন। এমনকি বিশ্বামিত্রের বংশধর ও শিষ্যদেরও বহুবার কুশ রাজার নামানুসারে 'কৌশিক' বলা হয়েছে।

এই কুশ রাজা সহস্র বছর রাজ্যশাসন করেছিলেন বলে জানা যায়। *[রামায়ণ ১.৩৪.৫-৬; ১.৫১.১৮-২০]*

□ অন্যান্য পুরাণে বলা হয়েছে যে, কুশাশ্ব (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে কুশাম্ব ও ভাগবত পুরাণ মতে কুশাম্বু), কুশনাভ, তনয় ও বসু নামে কুশের চারটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। *[বিষ্ণু পু. ৪.৭.৩-৪; বায়ু পু. ৯১.৬২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৬.৩২; ভাগবত পু. ৯.১৫.৪; ব্রহ্ম পু. ১০.২৩]*

কুশ$_{৩}$ ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, আয়ুর পুত্রদের মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধ অন্যতম। এই ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র এবং সুহোত্রের পুত্রদের মধ্যে কুশ একজন। কুশের প্রতি নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। *[ভাগবত পু. ৯.১৭.৩, ১৬]*

কুশ$_{৪}$ জ্যামঘের ঔরসে শৈব্যার গর্ভজাত পুত্র বিদর্ভ। তাঁর ভোজ্যা নাম্নী পত্নীর গর্ভে কুশ নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। *[ভাগবত পু. ৯.২৩.৩৭-৩৯; ৯.২৪.১]*

কুশ$_{৫}$ চেদিরাজ উপরিচরবসুর পুত্রদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ৫০.২৭]*

কুশচীরা ভীষ্ম পর্বে উল্লিখিত একটি নদীর নাম। সকলের উপজীব্য এই নদীর জল আর্য ও ম্লেচ্ছ জাতির মানুষরা পান করতেন। একে মহানদী—কুশচীরাং মহানদীম্—বলা হয়েছে।

নদীটির আধুনিক নাম বা ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত কিছু জানা সম্ভব হয়নি। *[মহা (k) ৬.৯.২৩; (হরি) ৬.৯.২৩]*

কুশতীর্থ নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত একটি তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। *[কূর্ম পু. ২.৩৯.৩২]*

কুশধারা একটি পবিত্র নদী। কুশধারাকে ভীষ্মপর্বে মহানদী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নদীর জল আর্য ও ম্লেচ্ছ উভয় জাতির লোকেরাই পান করতেন। অর্থাৎ এই নদী সকল জনজাতির উপজীব্য ছিল।

নদীটির আধুনিক নাম বা ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত কিছু জানা সম্ভব হয়নি। *[মহা (k) ৬.৯.২৪; (হরি) ৬.৯.২৪]*

কুশধ্বজ$_{১}$ ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজ বৃহস্পতির পুত্র। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতির মতোই ছিলেন। কুশধ্বজ নিয়মিত বেদ পাঠ করতেন। বেদবতী নামে তাঁর একটি কন্যা ছিল। কুশধ্বজ চেয়েছিলেন যে, তাঁর মেয়ে বেদবতী ভগবান বিষ্ণুকেই স্বামী হিসেবে লাভ করুক। কোনো দেবতাকেই বেদবতী স্বামী হিসেবে চাইছেন না—একথা ভেবে দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও সর্পের কুল যাঁরা কুশধ্বজের কাছে বেদবতীকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদেরকে কুশধ্বজ প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু বিষ্ণুর সঙ্গে বিবাহের ইচ্ছার কথা শুনে দৈত্যদের রাজা শম্ভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। একদিন রাতে কুশধ্বজ যখন

ঘুমিয়েছিলেন, সেই সময় শম্ভু কুশধ্বজকে বধ করেন। কুশধ্বজের শোকার্তা স্ত্রী তাঁরই সঙ্গে মৃত্যু বরণ করেন। *[রামায়ণ ৭.১৭.৮-১৫]*

কুশধ্বজ২ ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমির বংশধারায় হ্রস্বরোমার দুই পুত্র জনক (সীরধ্বজ) এবং কুশধ্বজ।

পিতা হ্রস্বরোমা কুশধ্বজের লালন-পালনের ভার জ্যেষ্ঠ জনক অর্থাৎ সীরধ্বজের হাতে দিয়ে বনবাসে চলে যান। সীরধ্বজ জনক সাঙ্কাশ্য নগর জয় করেন এবং সেখানে ছোটো ভাই কুশধ্বজকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

[রামায়ণ ১.৭১.১-১৯; বিষ্ণু পু. ৪.৫.১২]

□ ভাগবত পুরাণ মতে কুশধ্বজ, সীরধ্বজের পুত্র এবং ধর্মধ্বজের পিতা। ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু পুরাণ মতে কুশধ্বজ সীরধ্বজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং তিনি কাশীর রাজা ছিলেন। *[ভাগবত পু. ৯.১৩.১৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৪.১৯; বায়ু পু. ৮৯.১৮]*

□ কুশধ্বজের মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি নামে দুটি কন্যা ছিল। বিশ্বামিত্র মুনি ভরত ও শত্রুঘ্নের সঙ্গে তাঁদের বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যথাসময়ে ভরতের সঙ্গে মাণ্ডবীর এবং শত্রুঘ্নর সঙ্গে শ্রুতকীর্তির বিবাহ সম্পন্ন হয়।

[রামায়ণ ১.৭২.১-৮]

কুশনাভ১ কান্যকুব্জের রাজা তথা বিশ্বামিত্র মুনির প্রপিতামহ কুশ জনৈক বৈদর্ভী রমণীর গর্ভে যে চারটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কুশনাভ একজন। মহাভারতের বিবরণ অনুযায়ী তিনি গাধি রাজার পিতা ও মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পিতামহ। কুশের নির্দেশে ক্ষাত্রধর্ম পালনের জন্য তিনি মহোদয় নামক একটি নগরী নির্মাণ করেন।

[রামায়ণ ১.৩২.১-২, ৬; মহা (গীতা প্রেস) ১.৭৪.৬৯নং শ্লোকের উত্তর দাক্ষিণাত্য অধিক পাঠ দ্র., প্রথম খণ্ড; পৃ. ২২৫]

□ কুশনাভের ঔরসে ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে একশত কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

[রামায়ণ ১.৩২.১১]

□ কুশনাভের এই একশত কন্যাকে বায়ু বিবাহ করতে চাইলে কন্যারা বায়ুকে অপমান করেন। তখন ক্রোধবশতঃ বায়ু ওই কন্যাদের শরীরে প্রবেশ করে তাঁদের শরীর ভগ্ন করে দেন। কন্যারা কুশনাভের কাছে বায়ুর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। কন্যারা তাদের কুলের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখায় কুশনাভ কন্যাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজার হাতে তাঁর শত কন্যা দান করেন। *[রামায়ণ ১.৩২ অধ্যায়; ১.৩৩ অধ্যায়]*

পুরাণগুলিতে রাজা কুশনাভের বংশপরিচয় বিশদে বর্ণিত হয়েছে। রাজর্ষি জহ্নুর বংশধারায় এই কুশনাভের উৎপত্তি। ভাগবত পুরাণ মতে জহ্নুর বংশধারায় অজকের পুত্র কুশ। কুশের চারপুত্রের মধ্যে অন্যতম কুশনাভ।

অনান্য পুরাণগুলিতে অবশ্য বলা হয়েছে যে, বলাকাশ্বের পুত্র কুশ। কুশের চারপুত্রের মধ্যে কুশনাভ একজন। বায়ু পুরাণে কুশনাভের পরিচয় দেবার পর ঠিক পরের শ্লোকটিতে জনৈক কুশস্তম্বের সন্তানাদির বিবরণ পাওয়া যায়। তবে অন্যান্য পুরাণের পাঠ থেকে বোঝা যায় এই কুশস্তম্ব আর কুশনাভ আসলে অভিন্ন ব্যক্তি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৬.৩২; বায়ু পু. ৯১.৬২; ভাগবত পু. ৯.১৫.৪; বিষ্ণু পু. ৪.৭.৩]

কুশনাভ২ বৈবস্বত মনুর পুত্রদের মধ্যে একজন হলেন কুশনাভ। *[মৎস্য পু. ১১.৪১]*

কুশপ্রাবরণ *[দ্র. অপপ্রাবরণ]*

কুশপ্লব একটি প্রাচীন তপোবন। ইন্দ্রকে বধ করতে সক্ষম এক পুত্র লাভের আশায় দিতি একহাজার বছর এই স্থানে কঠোর তপস্যা করেন। পরবর্তীকালে এই কুশপ্লব তপোবন জনপদে রূপান্তরিত হয়। রাজর্ষি বিশাল তাঁর নিজনামে বিশালা নামে এক নগরী স্থাপন করেন এই স্থানে। কুশপ্লব তথা বিশালা নগরী পরবর্তী সময়ে কুশস্থলী নামে বিখ্যাত হয়। *[দ্র. কুশস্থলী২]*

[রামায়ণ ১.৪৬.৮-১২; ১.৪৭.১২]

কুশপ্লবন *[দ্র. কুশল২]*

কুশবতী১ রামচন্দ্রের পুত্র কুশের রাজধানী। বিন্ধ্যপর্বত সংলগ্ন এই নগরীর নামকরণ করেন স্বয়ং রামচন্দ্র। এই নগরীও পরবর্তী সময়ে কুশস্থলী নামে খ্যাত হয়। *[রামায়ণ ৭.১২১.৪]*

কুশবতী২ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে যেসব বিশিষ্ট অপ্সরার নাম উল্লিখিত হয়েছে, কুশবতী তাঁদের মধ্যে অন্যতমা।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২২]

কুশবতী৩ পৌরাণিক কেতুমাল বর্ষের মধ্যে দিয়ে যেসব নদী প্রবাহিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে কুশবতী একটি। *[বায়ু পু. ৪৪.১৮]*

কুশবতী৪ মহাভারতের বনপর্বে যুধিষ্ঠিরের কাছে

কুবের বর্ণনা করেছেন যে, একসময় কুশবতী নামে এক নগরীতে দেবতাদের এক মন্ত্রণাসভা আয়োজিত হয়েছিল। কুবের নিজেও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তবে এই কুশবতী নগরীর অবস্থান সম্পর্কে কোনো ধারণা করা যায় না।

[মহা (k) ৩.১৬১.৫৪; (হরি) ৩.১৩৪.৫৭]

কুশবিন্দ মহাভারতে ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত জম্বুখণ্ড বিনির্মাণ পর্বে প্রাচীন ভারতের যেসব জনজাতির নাম উল্লিখিত হয়েছে, কুশবিন্দ সেগুলির মধ্যে একটি। *[মহা (k) ৬.৯.৫৬; (হরি) ৬.৯.৫৬]*

কুশরীর ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে পঞ্চদশ দ্বাপরে আরুণি যখন ব্যাস হবেন, তখন মহাদেব বেদশিরা নামে অবতীর্ণ হবেন। সেই সময় তাঁর যে চারজন পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদের মধ্যে কুশরীর অন্যতম। *[বায়ু পু. ২৩.১৬৯]*

কুশল১ ভাগবত পুরাণ অনুসারে কুশদ্বীপের অধিবাসীরা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কুশল একটি গণ। *[ভাগবত পু. ৫.২০.১৬]*

কুশল২ (কুশপ্লবন) বায়ু পুরাণ অনুসারে কুশল নামে একটি বনে কশ্যপের পত্নী দিতি তপস্যা করেছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে 'কুশল'-এর পরিবর্তে 'কুশপ্লবন' নামটি উল্লিখিত হয়েছে। পুরাণে কথিত হয়েছে যে, দিতিদেবী তপস্যায় মনোনিবেশ করলে এই স্থানে ইন্দ্র তাঁর পরিচর্য্যা করেছিলেন। *[বায়ু পু. ৬৭.৯৪-৯৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫.৫৪-৫৬]*

কুশল৩ ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি দ্যুতিমানের পুত্রদের মধ্যে কুশল জ্যেষ্ঠ পুত্র।

ক্রৌঞ্চদ্বীপের প্রধান সাতটি বর্ষ বা ভূখণ্ড দ্যুতিমানের এই সাত পুত্রের নামে নামাঙ্কিত হয়। কুশলের নামেও একটি ভূখণ্ড কুশল-দেশ নামে খ্যাত হয়েছিল। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. ১.১৪.২২, ২৪; বায়ু পু. ৩৩.২১; বিষ্ণু পু. ২.৪.৪৮]*

☐ মহাভারতের ভীষ্মপর্বেও পৌরাণিক ক্রৌঞ্চদ্বীপের কথা উল্লিখিত হয়েছে। ক্রৌঞ্চদ্বীপের প্রধান দেশগুলির মধ্যে যে কুশল একটি, তাও কথিত হয়েছে।

[মহা (k) ৬.১২.২১; (হরি) ৬.১২.২১]

কুশলীমুখ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বংশধারায় প্রহ্লাদের পৌত্র এবং বিরোচনের পুত্র বাস্কল। বাস্কলের পুত্রদের মধ্যে কুশলীমুখ একজন।

[বায়ু পু. ৬৭.৭৯]

কুশল্য মহাভারতে ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত জম্বুখণ্ড বিনির্মাণ পর্বে প্রাচীন ভারতবর্ষের যেসব জনজাতির নাম উল্লিখিত হয়েছে, কুশল্য সেগুলির মধ্যে একটি। *[মহা (k) ৬.৯.৪০; (হরি) ৬.৯.৪০]*

কুশস্তম্ব১ পৌরাণিক কুশদ্বীপের অন্তর্গত একটি পর্বত। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৯.১৩৯; মৎস্য পু. ১২৩.৩৭]*

কুশস্তম্ব২ *[দ্র. কুশনাভ১]*

কুশস্তম্ব৩ মহাভারতের অনুশাসনপর্বে একটি তীর্থক্ষেত্র বলে উল্লিখিত হয়েছে। এই তীর্থে স্নান করলে, ব্যক্তি স্বর্গলোকে অপ্সরাদের দ্বারা সেবিত হন বলে কথিত হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.২৫.২৮; (হরি) ১৩.২৬.২৭]

কুশস্থলী১ (কুশস্থলপুর) শর্যাতিবংশীয় আনর্তের পুত্র রৈবত সমুদ্র মধ্যে (দ্বীপে) কুশস্থলী নামে নগর স্থাপন করে আনর্ত দেশসমূহ শাসন করেছিলেন।

[দেবী ভাগবত পু. ৭.৭.৪২-৪৫; ভাগবত পু. ৯.৩.২৭; বিষ্ণু পু. ৪.১.২০]

কুশস্থলী দ্বারকা নগরীরই আরেক নাম। বাসুদেব কৃষ্ণ ছিলেন এই কুশস্থলী বা দ্বারকার নায়ক। সংঘপ্রধানদের কৌলিক শাসন চলত বলেই দ্বারকা বা কুশস্থলীতে রাজতন্ত্র ছিল না। মগধরাজ জরাসন্ধের বারংবার মথুরা-আক্রমণ থেকে দীর্ঘকালীন মুক্তি পেতেই কৃষ্ণের আদেশে মথুরাবাসীদের জন্য পৃথক এক বসতি-স্থাপনের প্রয়োজন হয়। হরিবংশ পুরাণ গ্রন্থে কুশস্থলী নগরীর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটি কাহিনী পাওয়া যায়। কৃষ্ণ, গরুড়কে সঙ্গে নিয়ে বিদর্ভ থেকে মথুরায় এসেছিলেন। এরপর গরুড় কৃষ্ণ ও যাদবদের আবাসস্থলের খোঁজে রাজা রৈবতের কুশস্থলী নগরে যান—

"দেব যাস্যামি নগরীং রৈবতস্য কুশস্থলীম্।"

গরুড় জানান কুশস্থলীতে রৈবতগিরি ও নন্দনবনের মতোই সুন্দর এক বন রয়েছে। তবে রুক্মী পর্বত সন্নিহিত সমুদ্র তীরবর্তী এই ভূভাগ নানা বৃক্ষ, লতা, গুল্মে ঢাকা ছিল, তার পাশাপাশি হাতি, সাপ, শূকর, মহিষ ইত্যাদির উপদ্রবে এই স্থান প্রায় বাসের অনুপযোগী ছিল। গরুড় তবুও স্থানটিতে কোনো নগরী স্থাপন করা যেতে পারে কিনা সেই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে কুশস্থলীতে গিয়েছিলেন। *[হরিবংশ পু. ২.৫৫.১, ৭-১০]*

গরুড় কুশস্থলী পর্যবেক্ষণ করে কৃষ্ণকে

জানিয়েছিলেন যে, ওই স্থানে একটি সুন্দর নগর নির্মাণ করা সম্ভব, গরুড়ের মুখে কুশস্থলীর এক সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। গরুড় বলেছেন— সমুদ্রতীরবর্তী হওয়ায় কুশস্থলী কয়েকটি স্থানে জলমগ্ন। এই নগরী উত্তর-পূর্বে খানিক ঢালু ও শীতল। চারদিক সমুদ্রবেষ্টিত হওয়ায় এটি অত্যন্ত সুরক্ষিতও বটে। এখানে বহু মূল্যবান রত্নের খনি রয়েছে। সমগ্র স্থানটিই নানাপ্রকার সুন্দর বৃক্ষে আবৃত।

গরুড়ের মতে কুশস্থলীতে নগরী নির্মাণ করা হলে বসবাসকারীরা সুখে-স্বাচ্ছন্দে পরিপূর্ণ জীবন কাটাতে পারবেন। সেখানে থাকবে বৃহৎ তোরণ, বহু হাতি, অশ্ব ও সৈন্য। থাকবে, বহু সুউচ্চ প্রাসাদ, দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতীর মতোই সুন্দর এই নগরের নাম হবে দ্বারকা—

"নাম্না দ্বারবতী জ্ঞেয়া ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
ভবিষ্যতি পুরী রম্যা শক্রস্যেবামরাবতী।।"

এমনকী মহাসাগরের জলমগ্ন ভূমি উদ্ধার করেও বিশ্বকর্মা সেখানে নগরীর বিশেষ কোনো অংশ নির্মাণ করতে পারেন।

[হরিবংশ পু. ২.৫৫.৭-১৩, ১০২-১১৫]

আধুনিককালে Polder-land বলে একধরনের সমুদ্রে নিমজ্জিত জমি পুনরুদ্ধার করে তাকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার রীতি প্রচলিত রয়েছে নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকা সহ আরও বহু দেশে। হরিবংশে মহাসাগরের জলমগ্ন জমি উদ্ধার করে নগর স্থাপনের কথা শুনলে মনে হয় 'পোল্ডার' ভূমি সৃষ্টিকারী উন্নত প্রযুক্তির মতোই কোনো পদ্ধতি হয়তো বা সেকালেও জানা ছিল।

রৈবতক পর্বতে কোনো এক সময় আচার্য দ্রোণ বসবাস করেছিলেন। একলব্যেরও এক সময়ের আবাসস্থল ছিল এই রৈবতক পর্বত। এই পর্বত সংলগ্ন স্থান ছিল রাজা রৈবত ককুদ্মীর বিহারভূমি। চতুষ্কোণাকার বিহারভূমিটির নাম ছিল দ্বারবতী। কৃষ্ণ এখানেই দ্বারকা নগর স্থাপন করেছিলেন।

জরাসন্ধ এবং কালযবনের আক্রমণের ভয়ে মথুরা ছেড়ে কৃষ্ণ দ্বারকায় চলে আসেন—

কৃষ্ণো'পি কালযবনং জ্ঞাত্বা কেশিনিষূদনঃ।
জরাসন্ধভয়াচ্চৈব পুরীং দ্বারবতীং যযৌ।।

[হরিবংশ ২.৫৬. ২৭-৩৫]

মহাভারতেও কুশস্থলীকে রৈবতক পর্বত শোভিত—এমন কথা বলা হয়েছে। সেখানে জরাসন্ধের ভয়ে কৃষ্ণের কুশস্থলীতে আশ্রয় গ্রহণের কথাও উল্লেখ রয়েছে—

কুশস্থলীং পুরীং রম্যাং রৈবতেনোপশোভিতাম।

[মহা (k) ২.১৪.৫০; (হরি) ২.১৪.৪৯]

ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে—কৃষ্ণের আবাস বলেই কুশস্থলী শুধু স্বর্গের যশকেই ম্লান করে না, পৃথিবীকেও এই নগরী আরও পুণ্যবতী ও যশোবতী করে তুলছে।

"অহো বত স্বর্যশসস্তিরস্করী/
কুশস্থলী পুণ্যযশস্করী ভুবঃ।"

[ভাগবত পু. ১.১০.২৭]

কুশস্থলী-দ্বারকা একটি অত্যন্ত পবিত্র তীর্থ হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল পরবর্তী সময়ে।

[ভাগবত পু. ৭.১৪.৩১]

কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ তাঁর স্ত্রী চারুমতীকে নিয়ে অপূর্ব এক রথে আরোহণ করে ভোজকটপুর থেকে কুশস্থলীতে গিয়েছিলেন।

[ভাগবত পু. ১০.৬১.৪০]

ভাগবত পুরাণে আরো একাধিক স্থানে কুশস্থলীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

[ভাগবত পু. ১০.৭৫.২৯; ১০.৮৩.৩৬.১২. ১২.৩৬]

বর্তমান গুজরাটের কাথিয়াবাড় উপদ্বীপে কুশস্থলী বা দ্বারকার বর্তমান অবস্থান।

[HPAI (S.N. Arya) p. 38]

এলাহাবাদ স্তম্ভে কুশস্থলপুরের উল্লেখ রয়েছে। *[EAIG (Kapoor) p. 410]*

কুশস্থলী২ পুরাকালে তৎপুরুষ নামক এক কাল-পর্যায়ে বেদজ্ঞ মনীষীগণ অবন্তী নগরীর নামকরণ করেছিলেন কুশস্থলী। এই নগরী নাকি প্রথমে হেমশৃঙ্গা নামে বিখ্যাত ছিল। ভগবান বিষ্ণুর সুখোপবেশনের জন্য বিধাতা এই স্থানে কুশ ছড়িয়েছিলেন বলে এর নাম কুশস্থলী।

"স্তীর্ণা কুশৈর্যতা ধাত্রা কুশস্থলী ততঃ স্মৃতা।।"

প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণুকে কুশস্থলে উপবেশন করতে বলেছিলেন, বিষ্ণু সেখানে আশ্রয় নেন। যোজনব্যাপী বিস্তৃত কুশস্থলী নগরীর নামকরণ একযোগে বিষ্ণু ও বিধাতা দুজনেই করেছিলেন। কুশস্থলী তিন লোকেই প্রসিদ্ধ।

"সমন্ততো যোজন সংখ্যয়াবৃতাং/
ততো বিধাতা পুরুষোত্তমস্তথা।
কুশস্থলীতি প্রথিতং জগত্রয়ে/
প্রচক্রতুর্নাম চ তাবুভাবপি॥"

কুশস্থলীতে অবস্থান করে বিষ্ণু এই বিশ্ব শাসন করেন। *[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য)/ অবন্তী ক্ষেত্র মাহাত্ম্য) ৪১.১, ২৮-৩২]*

পণ্ডিতদের মতে কুশস্থলী অর্থাৎ অবন্তী ভারতবর্ষের বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত ছিল। বর্তমান উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশ নিয়ে বুন্দেলখণ্ড গড়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত কনৌজকেও কোনো এককালে কুশস্থল নামে ডাকা হতো। যেহেতু এই 'কুশস্থল' ও 'কুশস্থলী' উভয়েই বৃহদর্থে বুন্দেলখণ্ডেরই অংশবিশেষ ছিল, সেহেতু এই দুটি স্থানের মধ্যে ভৌগোলিক একাত্মতা থাকলেও থাকতে পারে।

এই কুশস্থলী বা কান্যকুব্জে দেবী সতী, গৌরী রূপে অবস্থান করেন। *[মৎস্য পু. ১৩.২৯]*

বরাহপুরাণে কুশস্থলী (কুশস্থল) (কান্যকুব্জ)-কে একটি পাপনাশিনী তীর্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যমুনাতীরে অবস্থিত এই নদী-তীর্থে স্নান করলে স্বর্গলাভ হয়।

"কুশস্থলঞ্চ তত্রৈব পুণ্যং পাপহরং শুভম্।
তত্র স্নাত নরো দেবি ব্রহ্মলোক মহীয়তে।।"

[বরাহ পু. ১৫৭.১৬]

মৎস্য পুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায় এবং বরাহ পুরানের ১৫৭ অধ্যায়ের সাপেক্ষে পণ্ডিত R.C. Hazra-র মত উদ্ধার করে পণ্ডিত-জনেরা বলেছেন—কনৌজ বা কুশস্থল তীর্থরূপে গণ্য হয়েছে অনেক পরে।

[HPAI (S.N. Arya) p. 73]

কুশস্থলী৩ রামচন্দ্রের পুত্র কুশের রাজ্যের নাম কোশলা এবং তারই এক পুরী কুশস্থলী। এই কুশস্থলী বিন্ধ্যপর্বতের সানুদেশে অবস্থিত।

"কুশস্য কোশলারাজ্যং পুরী বাপি কুশস্থলী।
রম্যা নিবেদিতা তেন বিন্ধ্যপর্ব্বতসানুষু।"

[বায়ু পু. ৮৮.১৯৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. ২.৬৩.১৯৯ (মহর্ষি)]

রামায়ণে রামচন্দ্র তাঁর পুত্র লবের জন্য 'কুশাবতী' নামে নগর নির্মাণ করেছিলেন বলা হয়েছে এবং সেই 'কুশাবতী' কুশস্থলী না হলেও সেটি বিন্ধ্যপর্বতের উপর অবস্থিত, এমন কথার উল্লেখ রয়েছে।

"কুশস্য নগরী রম্যা বিন্ধ্যপর্বতরোধসি।
কুশাবতীতি নাম্না সা কৃতা রামেণ ধীমতা।।"

[রামায়ণ, উত্তর. ১০৮.৪]

সুতরাং কুশস্থলী ও কুশাবতী অভিন্ন বলেই মনে হয়।

কুশাগ্র উপরিচর বসুর পুত্র বৃহদ্রথ। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র। ঋষভ নামে কুশাগ্রের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

[ভাগবত পু. ৯.২২.৭; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১৯]

□ মৎস্য ও বায়ু পুরাণে কুশাগ্রের পুত্র 'বৃষভ' বলে উল্লিখিত হয়েছে।

[মৎস্য পু. ৫০.২৮; বায়ু পু. ৯৯.২২৩]

কুশাদ্য মহাভারতে ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত জম্বুখণ্ড বিনির্মাণ পর্বে প্রাচীন ভারতবর্ষের যেসব জনজাতির নাম উল্লিখিত হয়েছে, কুশাদ্য সেগুলির মধ্যে একটি। *[মহা (k) ৬.৯.৪৪; (হরি) ৬.৯.৪৪]*

কুশাবর্ত১ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের বংশধারায় নাভির পুত্র ঋষভদেব। ভাগবত পুরাণে ঋষভদেবের যে নয়জন পুত্রের নাম উল্লিখিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে কুশাবর্ত একজন।

[ভাগবত পু. ৫.৪.১০]

কুশাবর্ত২ মৎস্য পুরাণে যেসব পুণ্যফলদায়ক তীর্থের নাম উল্লিখিত হয়েছে, সেই তীর্থস্থানগুলির মধ্যে কুশাবর্ত একটি। এই তীর্থে পিতৃপুরুষকে শ্রাদ্ধ প্রদান করলে তা বিশেষ ফলদায়ী হয় বলে মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে। *[মৎস্য পু. ২২.৬৯]*

কুশাবর্ত্ত মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে দক্ষিণ দেশের রাজা উদাবসুর পুরোহিত হলেন কুশাবর্ত্ত। তিনি গৌতম মুনির বংশধারায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[মার্কণ্ডেয় পু. ১১৭.২৪]

কুশাম্ব১ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কুশের ঔরসে জনৈকা বৈদর্ভীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কুশাম্ব একজন। পিতার নির্দেশ অনুসারে সুষ্ঠুভাবে প্রজাপালনের জন্য কুশাম্ব কৌশাম্বী নগরী পত্তন করেন।

[রামায়ণ ১.৩২.২-৩, ৪, ৬]

কুশাম্ব২ রাজা উপরিচরবসুর তৃতীয় পুত্রের নাম কুশাম্ব। এই কুশাম্ব মণিবাহন নামেও পরিচিত ছিলেন। ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, কুশাম্ব ছিলেন চেদির রাজা।

[মহা (k) ১.৬৩.৩১; (হরি) ১.৫৮.৪৫; ভাগবত পু. ৯.২২.৬; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১৯]

কুশাম্ব৩ চন্দ্রবংশীয় অমাবসুর বংশধারায় বলাকাশ্বের পুত্র কুশ। এই কুশের চারপুত্রের মধ্যে কুশাম্ব অন্যতম। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৬.৩২; ব্রহ্ম পু. ১০.২৩]*

□ ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, কুশাম্বু, তনয়, বসু এবং কুশনাভ—এই চারজন কুশের পুত্র। কুশাম্বু গাধিরাজার পিতা। সম্ভবতঃ 'কুশাম্ব' ভাগবত পুরাণে কুশাম্বু হয়ে গেছে।

[ভাগবত পু. ৯.১৫.৪]

□ বিষ্ণু ও বায়ু পুরাণে 'কুশাম্ব'-র পরিবর্তে 'কুশাশ্ব' নামটি পাওয়া যায়।

[বিষ্ণু পু. ৪.৭.৩-৪; বায়ু পু. ৯১.৬২]

কুশাল ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে যে মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট অশোকের পুত্র কুশাল। বন্ধুপালিত নামে তাঁর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কুশাল প্রায় আট বছর রাজত্ব করেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৪৬]

কুশাশ্ব১ *[দ্র. কুশাম্ব১]*

কুশাশ্ব২ বিশালায় যে রাজবংশ রাজত্ব করত, সেই বংশের অন্যতম রাজা। কুশাশ্ব ছিলেন সহদেবের পুত্র, সোমদত্তের পিতা। এঁকে বিশ্বামিত্র 'পরম ধার্মিক' রূপে বর্ণনা করেছেন।

[রামায়ণ ১.৪৭.১৫-১৬]

কুশি দানবরাজ বলির পুত্রদের মধ্যে একজন।

[বায়ু পু. ৬৭.৮৩]

কুশিক মহাভারত এবং পুরাণগুলিতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পূর্বপুরুষ হিসেবে কান্যকুব্জদেশের রাজা কুশিকের নাম উল্লিখিত হয়েছে। তবে রামায়ণে বিশ্বামিত্রের উপাখ্যান বিশদে বর্ণিত হলেও সেখানে কুশিকের নামটি পাওয়া যায় না। পরিবর্তে রাজর্ষি কুশকে বিশ্বামিত্রের পূর্বপুরুষ বলা হয়েছে। *[দ্র. কুশ২]*

□ মহাভারতে এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী রাজর্ষি কুশিক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পিতামহ (মতান্তরে প্রপিতামহ)। চন্দ্রবংশীয় রাজর্ষি জহ্নুর বংশধারায় কুশিকের জন্ম। তবে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে প্রাপ্ত বংশলতিকাটি ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় খানিকটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, রাজা বলাকাশ্বের পুত্র রাজর্ষি কুশ। কুশের চারপুত্র—যথাক্রমে কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্তরয়া এবং বসু। এরপর খানিকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই কুশিকের নাম এসে পড়েছে। পুরাণে বলা হচ্ছে যে, জহ্নুবংশীয় রাজা কুশিক একসময় পুত্রলাভের জন্য তপস্যা করছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র জানতে পারলেন যে, রাজা কুশিক ইন্দ্রের সমতুল্য একটি পুত্র লাভ করতে চান। নিজের সমতুল্য কাউকে খুঁজে না পেয়ে ইন্দ্র নিজেই শেষ পর্যন্ত কুশিকের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করলেন। কুশিকের এই পুত্রের নাম গাধি। পরবর্তী সময়ে গাধির ঔরসেই ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেন। কুশিকের বংশধর বলেই গাধি, বিশ্বামিত্র এবং পরবর্তী সময়ে বিশ্বামিত্রের বংশধররাও সকলে কৌশিক নামে খ্যাত হন।

[মহা (k) ১.১৭৫.৩; ১২.৪৯.৩; ১৩.৪.৫-৬;
(হরি) ১.১৬৮.৩; ১২.৪৮.৩; ১৩.৩.৫;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৬.৩৩-৩৫]

□ অন্যান্য পুরাণে বা রামায়ণে কুশিকের নাম বিশ্বামিত্রের পূর্বপুরুষ হিসেবে উল্লিখিত হয়নি—একথা আমরা আগেই জানিয়েছি। তবে মহাভারত এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে প্রাপ্ত তথ্যটিই আমাদের বেশি গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নিতে হবে কারণ পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন গ্রন্থে এর সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। *[দ্র. বিশ্বামিত্র]*

[পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ২১.২২.২]

□ মহাভারতের অনুশাসনপর্বে মহর্ষি চ্যবন এবং কুশিকের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে, সেখানে উল্লিখিত হয়েছে যে মহর্ষি চ্যবনের বরেই কুশিকের বংশধর বিশ্বামিত্র এবং তাঁর পুত্র-পৌত্ররা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। *[দ্র. চ্যবন১]*

□ মহাভারতে অন্যতম প্রাচীন রাজর্ষি হিসেবে কুশিককে যমের সভায় উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। *[মহা (k) ২.৮.১০; (হরি) ২.৮.১০]*

কুশিকন্ধর ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে বিংশতিতম দ্বাপরে যখন মহাদেব অট্টহাস নামে অবতীর্ণ হবেন এবং মহর্ষি বাচঃশ্রবা ব্যাস হবেন, তখন ভগবান রুদ্রের যে চারজন পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদের মধ্যে কুশিকন্ধর একজন। *[বায়ু পু. ২৩.১৯৩]*

কুশীতক বসুদেবের ঔরসে রোহিণীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন কুশীতক।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৬৫;
বায়ু পু. ৯৬.১৬৩]

কুশীতয় *[দ্র. কুণি১]*

কুশীতিয় *[দ্র. ইন্দ্রপ্রতিম]*

কুশীতী বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, মহর্ষি পৌষ্যঞ্জির চারজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে কুশীতী একজন। *[বায়ু পু. ৬১.৩৭]*

কুশীদ ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, কুশীদ (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে কুশীদী) মহর্ষি পৌষ্যঞ্জির

শিষ্যদের মধ্যে একজন। কুশীদ, পৌষ্যঞ্জির কাছে সামবেদের একশত করে শাখা অধ্যয়ন করেন।

[ভাগবত পু. ১২.৬.৭৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.৪০]

কুশীদী [দ্র. কুশীদ]

কুশীদক পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে সব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি কুশীদকের বংশ তার মধ্যে একটি। কুশীদক অঙ্গিরার বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। [মৎস্য পু. ১৯৬.২৬]

কুশূলধান্য মহাভারতের শান্তিপর্বে গৃহস্থের চারটি বৃত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে—

গৃহস্থবৃত্তয়শ্চৈব চতস্র কবিভিঃ স্মৃতাঃ।

এর মধ্যে প্রথম বৃত্তিটি হল কুশূলধান্য। দ্বিতীয়টি কুম্ভধান্য, তৃতীয় অশ্বস্তন এবং চতুর্থটির নাম কাপোতীবৃত্তি—

কুশূলধান্যঃ প্রথমঃ কুম্ভধান্যস্ত্বনন্তরম্।
অশ্বস্তনো'থ কাপোতীমাশ্রিতো বৃত্তিমাহবেৎ।।

'কুশূল' শব্দের অর্থ হল ইটের তৈরি ধানের গোলা। যে গৃহস্থ পরিবার-প্রতিপালনের জন্য গোলা ভরে ধান বা শস্য সংগ্রহ করেন, সেই ব্যক্তির বৃত্তিকে কুশূলধান্যবৃত্তি বলা হয়।

[মহা (k) ১২.২৪২.২-৩; (হরি) ১২.২৪০.২-৩]

কূর্ম পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী, যে পরিমাণ সঞ্চিত শস্য দিয়ে বা বলা ভালো, ধান দিয়ে তিন বছর বা তার বেশি দিন ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যায়, সেই পরিমাণ ধান্য-সঞ্চয়ী ব্যক্তিকে কুশূলধান্যক বলে। বস্তুত কুশূলধান্যককে মোটামুটি সম্পন্ন গৃহস্থ বা ধনী গৃহস্থও বলা যেতে পারে। কারণ তিন বৎসরের মতো খাদ্যশস্য সঞ্চয় করে রাখা কখনোই খুব সাধারণ উপার্জনকারী গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নয়। [কূর্ম পু. ২.২৫.১৩]

কুশেশয়১ পৌরাণিক কুশদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান পর্বতগুলির মধ্যে কুশেশয় একটি। মৎস্য পুরাণে এই পর্বত কঙ্ক নামেও পরিচিত।

[বায়ু পু. ৪৯.৫০; বিষ্ণু পু. ২.৪.৪১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৯.৫৫; মৎস্য পু. ১২২.৫৮]

কুশেশয়২ মহাভারতে ভীষ্মপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, পৌরাণিক ক্রৌঞ্চদ্বীপের অন্তর্গত প্রধান পর্বতগুলির মধ্যে কুশেশয় একটি।

[মহা (k) ৬.১২.১১; (হরি) ৬.১২.১১]

কুশেশয়তীর্থ মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত একটি তীর্থ। এই তীর্থক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কার্য সম্পন্ন করলে সমস্ত মানুষ পুণ্যফল অর্জন করেন বলে কথিত হয়েছে। [মৎস্য পু. ২২.৭৬]

কুশোচ্ছয় ঋষিদের একটি গণ বলে পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। [ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১.৫৫]

কুশোদকা মৎস পুরাণ এবং দেবীভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, দেবী ভগবতী কুশদ্বীপে দেবী কুশোদকা নামে বিরাজমানা।

[দেবীভাগবত পু. ৭.৩০.৮০; মৎস্য পু. ১৩.৫০]

কুষণ্ড একজন পিশাচ। এর বংশধররা কুষণ্ডিক পিশাচ নামে পরিচিত।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৭৯, ৩৮৭]

কুষণ্ডিকা একজন পিশাচী। ইনি কুষণ্ড নামক পিশাচের পত্নী ছিলেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩৭৯, ৩৮২]

কুষ্কক [দ্র. কুণ্ডল]

কুষ্মাণ্ডক কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে কদ্রূর গর্ভজাত নাগ। মহাভারতের আস্তীকপর্বে সর্পনামকথনের সময় তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.৩৫.১১; (হরি) ১.৩০.১১]

কুষ্টি প্রজাপতি মরীচীর ঔরসে সম্ভূতির গর্ভজাত কন্যাদের মধ্যে কুষ্টি একজন। [বায়ু পু. ২৮.৯]

কুষ্মাণ্ডিকা পিশাচদের একটি গণ বলে বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। এই পিশাচদের গাত্র লোমশূন্য হয়। তিল এবং আমিষ জাতীয় খাদ্য এরা ভক্ষণ করে বলে কথিত হয়েছে। [বায়ু পু. ৬৯.২৬৭-২৬৮]

কুষ্মাণ্ডেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থস্থান। ভগবান শিব এই তীর্থে কুষ্মাণ্ডেশ্বর নামে পূজিত হন।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ১০৩]

কুসু যক্ষ মণিবরের ঔরসে দেবজনীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম কুসু।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১২৮]

কুসুম১ তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে যখন দেবতারা স্কন্দ কার্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করলেন, সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা তাঁদের কয়েকটি বিশিষ্ট অনুচর যোদ্ধাকে তারকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য অনুচর হিসেবে স্কন্দকে দান করেন। ধাতা তাঁর যে পাঁচজন অনুচর স্কন্দকে দান করেন কুসুম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। [মহা (k) ৯.৪৫.৩৯; (হরি) ৯.৪২.৩৭]

কুসুম২ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আমরা যে সব বানর বীরের নামোল্লেখ পাই কুসুম তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৩১]

কুসুমপুর বিখ্যাত মগধরাজ অজাতশত্রুর বংশধর উদায়ী (মতান্তরে উপায়ী)-র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি নগরী। উদায়ীর শাসনকালের চতুর্থ বর্ষে কুসুমপুর বা কুসুমাপুর নগরী স্থাপিত হয়েছিল। গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে স্থাপিত নগরীটিকে পুরাণে মনোরম স্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বায়ু পুরাণে উদায়ীর শাসনকালের চতুর্থ বর্ষে কুসুমপুর নগরী স্থাপনার কথা বলা হলেও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ উদায়ী তাঁর রাজ্যাভিষেকের চতুর্থ দিনে নগরীটি প্রতিষ্ঠা করেন এমন তথ্য দিয়েছে।

[বায়ু পু. ৯৯.৩১৯-৩২০;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৩২-১৩৩]

□ আধুনিক পাটনা শহর। সম্রাট অজাতশত্রুর পুত্র উদয়ন পাটনা, পাটলীপুত্র বা কুসুমপুরের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই রাজধানী গিরিব্রজপুর বা রাজগীর থেকে সরিয়ে কুসুমপুরে স্থাপন করেন।

[দ্র. গিরিব্রজপুর]

[PHAI (Raychaudhuri) p. 104, 193]

কুসুমাপুর *[দ্র. কুসুমপুর]*

কুসুমামোদিনী শৈলরাজ হিমালয়ের পত্নী মেনকাদেবীর সখী কুসুমামোদিনী।

মহাদেব একদিন উমাকে 'কালী' বলে পরিহাস করলে দেবী ক্রুদ্ধ হন। তিনি গৌরবর্ণা হওয়ার জন্য হিমালয় পর্বতে যান তপস্যা করতে। সেখানেই উমার সঙ্গে কুসুমামোদিনীর দেখা হয়। উমা তাঁকে সব কথা জানান ও কুসুমামোদিনীকে পাহারায় রেখে যান। উমা তাঁকে বলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে অন্য কোনো নারী যেন মহাদেবের বাসভবনে প্রবেশ করতে না পারে। আর যদি কোনো নারী প্রবেশ করে তাহলে তাঁকে তৎক্ষণাৎ সংবাদ দিতে।

দেবী তপস্যা করতে চলে যাওয়ার পর আড়ি-দৈত্য তাঁর ছদ্মবেশে মহাদেবের বাসভবনে প্রবেশ করে। দেবাদিদেব অবশ্য আড়ি দৈত্যের ছলনা বুঝতে পারেন এবং তাঁকে বধ করেন।

কুসুমামোদিনী এই সংবাদও উমার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৫৬ অধ্যায়]*

কুসুমোৎকর পৌরাণিক সোমকপর্বতের অন্তর্গত একটি বর্ষ বা ভূখণ্ড কুসুমোৎকর।

[মৎস্য পু. ১২২.২৪]

কুসুমোত্তর শাকদ্বীপের অন্তর্গত প্রধান বর্ষ বা ভূ-খণ্ডগুলির মধ্যে কুসুমোত্তর একটি। এই ভূ-খণ্ডের প্রধান পর্বতটির নামও কুসুমোত্তর।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.২০; ১.১৯.৯২;
বায়ু পু. ৪৯.৮৭]

কুসুম্ব (কুমকুম) মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, অষ্ট-সৌভাগ্যের মধ্যে একটি হল কুসুম্ব বা কুমকুম। *[দ্র. অষ্টসৌভাগ্য]*

[মৎস্য পু. ৬০.৯]

কুসুমি একজন শ্রুতর্ষি। ইনি মহর্ষি পৌষ্যঞ্জির শিষ্য ছিলেন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.৪, ৩৫.৪০]*

কুসুমোত্তর ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে, পৌরাণিক শাকদ্বীপের অধিপতি হব্যর পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কুসুমোত্তর। তাঁর নাম অনুসারে শাকদ্বীপের সাতটি বর্ষের মধ্যে একটির নাম হয় কুসুমোত্তরবর্ষ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.১৭-২০]

কুস্তুম্বুরু১ একজন যক্ষ। মহাভারতের সভাপর্ব থেকে জানা যায় যে ইনি যক্ষরাজ কুবেরের সভায় অবস্থান করতেন।

[মহা (k) ২.১০.১৫; (হরি) ২.১০.১৫]

কুস্তুম্বুরু২ যক্ষ মণিবরের ঔরসে দেবজনীর গর্ভজাত সন্তানদের মধ্যে অন্যতম কুস্তুম্বুরু।

[বায়ু পু. ৬৯.১৫৯]

কুহক ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, কদ্রুর যেসব পুত্র ক্রোধবশ নামে খ্যাত তাঁদের মধ্যে কুহক একজন। এই কুহক নাগ পাতালের ষষ্ঠ তলে বাস করতেন বলে উল্লিখিত হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৫.২৪.২৯]

কুহন সৌবীর দেশীয় রাজকুমার। সিন্ধু-সৌবীর দেশের রাজা জয়দ্রথের অনুচর হিসেবে তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ৩.২৬৫.১১; (হরি) ৩.২২০.১০]

কুহরিণী মেরুপর্বতে অবস্থিত একটি গুহা। এখানে ব্যাসদেব তপস্যা করেছিলেন বলে বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। *[বায়ু পু. ১০৪.৬১]*

কুহূ১ স্কন্দ কার্তিকেয়ের স্ত্রী দেবসেনাকে এই নামে ডাকা হয়েছে। *[দ্র. দেবসেনা]*

[মহা (k) ৩.২২৯.৫০; (হরি) ৩.১৯১.৪৮]

কুহূ২ ময়দানবের কন্যা। *[মৎস্য পু. ৬.২১]*

কুহূ৩ পৌরাণিক শাল্মলীদ্বীপের প্রধান প্রধান নদীগুলির মধ্যে কুহূ একটি।

[ভাগবত পু. ৫.২০.১০]

কুহূ৪ হিমালয় পর্বতজাতা একটি পবিত্র নদী। আর্যও ম্লেচ্ছ উভয় জনজাতির মানুষেরা কুহূ নদীর জল পান করে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.২৫; বায়ু পু. ৪৫.৯৫; মৎস্য পু. ১১৪.২১]*

□ কুহূ নদীর আরেক নাম কুভা। বেদে কুভা নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদমন্ত্রে সিন্ধুনদের সঙ্গে একত্রে কুভার উল্লেখ রয়েছে। অপর একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, সিন্ধু কুভা প্রভৃতি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের সম্মিলিত জলধারা বহন করে নিয়ে যায়—

ত্বং সিন্ধো কুভয়া গোমতীং ক্রুমুং
মেহৎস্বা সরথং যাভিরীয়সে।।

এ থেকে বোঝা যায় কুহূ বা কুভা সিন্ধুর উপনদী। পণ্ডিতরা মনে করেন যে, হিন্দুকুশ পর্বতজাত নদী কাবুল যা বর্তমান আফগানিস্তানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় সেটিই প্রাচীন কুহূ বা কুভা নদী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাবুল সিন্ধুর একটি উপনদী। প্রাচীনকালে কুহূ নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতিও কুহূ নামেই পরিচিত ছিল। আধুনিককালে সেই রীতি মেনেই হয়তো বা কাবুল নদীর নামে বিখ্যাত কাবুল শহরের নামকরণ করা হয়েছে। সম্ভবত একই ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে কাবুল শহরের মানুষরা সাধারণভাবে 'কাবুলি' নামে পরিচিত।

[ঋগ্বেদ ৫.৫৩.৯; ১০.৭৫.৬; মৎস্য পু. ১২১.৪৬; EAIG (Kapoor) p. 397]

কুহূ৫ প্রাচীন ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত একটি জনপদ। বর্তমান আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল। এই অঞ্চলের অধিবাসীরাও প্রাচীনকালে কুহূ নামে পরিচিত ছিল। সিন্ধু নদ এবং তাঁর উপনদী কুহূ বা কুভ (আধুনিক কাবুল নদী) সমগ্র অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত। *[দ্র. কুহূ৪]*

[মৎস্য পু. ১২১.৪৬]

কুহূ৬ হবিষ্মান্ প্রজাপতির পত্নী। মৎস্য পুরাণ থেকে জানা যায়, চন্দ্র যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তখন চন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কুহূ হবিষ্মান্‌কে ত্যাগ করে চন্দ্রকে স্বামীরূপে লাভ করতে চেয়েছিলেন এবং চন্দ্র তাঁকে গ্রহণও করেন। চন্দ্র বিষয়ক কালমানক যে কুহূর উল্লেখ আমরা পাই। তিনি এবং এই কুহূ অভিন্ন বলে মনে হয়। *[দ্র. কুহূ৭]*

[মৎস্য পু. ২৩.২৫]

কুহূ৭ মহাভারতে দেবদেব মহাদেব যখন ত্রিপুরবধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, সেই সময় দেবতারা তাঁর-ব্যবহারের জন্য যে রথখানির পরিকল্পনা করেছিলেন, সেখানে সেই রথের চার ঘোড়ার জোয়াল হিসেবে যুক্ত করা হয়েছিল অমাবস্যা-পূর্ণিমা এবং আরও দুইটি সন্নিহিত তিথির প্রতীক সিনীবালী, অনুমতি, কুহূ এবং রাকা-কে—

সিনীবালীসনুমতিং কুহূং রাকাং চ সুব্রতাম্।
যোক্ত্রাণি চক্রুর্বাহানাং রোহকাংস্তত্র কণ্টকান্॥

[মহা (k) ৮.৩৪.৩২-৩৩; (হরি) ৮.২৮.৩৪]

□ কোষকার V.S. Apte এই 'কুহূ'-তিথির অর্থ বলেছেন—'the Last day of lunar month when the moon is invisible.'

কুহূ শব্দটি অমাবস্যার চন্দ্রকলাহীন অবস্থারই নামান্তর, কিন্তু তারও একটা বিশেষ সময় আছে, যেটাকে অমাবস্যার অন্তিম প্রহর বলা যায়। কুহূ-শব্দের প্রহর পর্য্যায়টি বোঝার জন্য সিনীবালী-সংজ্ঞক সময়টিও বোঝা দরকার। তাই কোষকার অমরসিংহের পংক্তি—

সা দৃষ্টেন্দুঃ সিনীবালী সা নষ্টেন্দুকলা কুহূঃ।

এই পংক্তি ব্যাখ্যা করার সময় টীকাকার মহেশ্বর শ্রুতিবচন উদ্ধার করে লিখেছেন—যেটা অমাবস্যার পূর্বকাল, তার নাম সিনীবালী, আর অমাবস্যার উত্তরকাল, সেটাই হল কুহূ—

'যা পূর্বামাবাস্যা সিনীবালী
যোত্তরা সা কুহূরিতি' শ্রুতিঃ।

মহেশ্বর আরও বলেছেন—চতুর্দশীতিথির অন্তিম প্রহরের সঙ্গে অমাবস্যার আট প্রহর ধরলে চন্দ্রের সম্পূর্ণ ক্ষয়কাল হল নয় প্রহর। এর মধ্যে চতুর্দশীর শেষ প্রহর এবং অমাবস্যা লাগার পর প্রথম প্রহর—এই দুই প্রহরে খুব হালকা ভাবে হলেও চাঁদের অস্তিত্বটুকু বোঝা যায়। এই হল 'পূর্বামবস্যা' অথবা অমরসিংহের ভাষায় 'সিনীবালী'—সা দৃষ্টেন্দুঃ সিনীবালী।

অন্য দিকে অমাবস্যা শেষ হবার আগে শেষ দুই প্রহর, যেখানে চন্দ্রকলার সূক্ষ্ম অস্তিত্বটুকুও থাকে না, সেই সময়টুকুর নামই কুহূ; সেটিই—নষ্টেন্দুকলা কুহূঃ, সেটিই উত্তরা অমাবস্যা। মাঝখানে পাঁচ প্রহর কাল হল 'দর্শ'—ঘোর অমাবস্যার কাল।

[অমরকোষ (Talekar) কালবর্গ, ৯নং শ্লোক। মহেশ্বরের টীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ২৪]

□ শব্দকল্পদ্রুমের রচয়িতা-সংকলকেরা কুহূ—শব্দের আলোচনায় অনেকগুলি প্রাচীন বচন উদ্ধার কর প্রথমত কুহূ-কালকে সহজ ভাষায় চন্দ্রকলাহীন অমাবস্যা বলেছেন কালমাধব নামের একটি গ্রন্থে ব্যাসের উক্তি বলে—

দৃষ্টচন্দ্রা সিনীবালী নষ্টচন্দ্রা কুহূর্মতা।

পূর্বামবস্যার প্রহরগুলি অর্থাৎ সিনীবালীতে সার্থক ব্রাহ্মণেরা শ্রাদ্ধাদি কর্ম করতে পারেন, আর কুহূকালে শ্রাদ্ধ করবেন স্ত্রী-শূদ্র এবং সেই সব ব্রাহ্মণেরা যাঁরা আপন সংস্কারোচিত ক্রিয়াকর্ম করেন না—

সিনীবালী দ্বিজৈঃ কার্য্যা সাগ্নিকৈঃ পিতৃকর্মণি।
স্ত্রীভিঃ শূদ্রৈঃ কুহূঃ কার্য্যা তথা চানগ্নিকৈর্দ্বিজৈঃ॥

কুহূ এবং সিনীবালীকে যাস্কের নিরুক্তগ্রন্থে দেবপত্নী বলা হয়েছে—বস্তুত ওই দুই অমাবস্যাকালীন প্রহরগুলির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে—সিনীবালী কুহূরিতি দেবপত্ন্যবিতি। দেবপত্নী হিসেবে কুহূ এবং সিনীবালীর গ্রাহ্যতা এসেছে এই কারণেই যে ভাগবত পুরাণে সিনীবালী, কুহূ, রাকা এবং অনুমতিকে অঙ্গিরা ঋষির ঔরসে শ্রদ্ধাদেবীর কন্যা বলে কীর্তিত করা হয়েছে—

শ্রদ্ধা ত্বঙ্গিরসঃ পত্নী চতস্রোঽসূত কন্যকাঃ।
সিনীবালী-কুহূ-রাকা শ্চতুর্থ্যনুমতিস্তথা॥

[ভাগবত পু. ৪.১.৩৩]

কুহূর কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত একজন নাগ। নারদ মাতলির কাছে পাতালের ভোগবতী পুরীর বিবরণ দিতে গিয়ে সেখানে বসবাসকারী যেসব প্রধান নাগের নাম উল্লেখ করেছেন কুহূর তাদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৫.১০৩.১৫; (হরি) ৫.৯৬.১৫]

কূট কংসের অনুগত একজন মল্ল যাঁকে বলরাম মল্লযুদ্ধে বধ করেছিলেন।

[ভাগবত পু. ১০.৪২.৩৭; ১০.৪৪.২৬]

কূটকম্বল বায়ুপুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, পৌরাণিক কেতুমালবর্ষের অন্তর্ভুক্ত একটি জনপদ। *[বায়ু পু. ৪৪.১০]*

কূটযুদ্ধ কূট-শব্দটির সাধারণ অর্থ কপট, কুটিল, মিথ্যা, অথবা এমন কিছু যার মধ্যে মিথ্যা মায়া আছে, যা ওপর থেকে বোঝা যায় না। মনুসংহিতায় এমন সব অস্ত্রের কথা বলা হয়েছে, যেসব অস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অতিশত্রুর ওপরেও প্রযোজ্য নয়, সেই অস্ত্রগুলির মধ্যে অন্যতম হল কূট অস্ত্র। কূট অস্ত্র কেমনতর হয়, তা বোঝানোর জন্য মেধাতিথি এবং কুল্লূকভট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—এমন অস্ত্র যা বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে কাঠের তৈরি বা বাঁশের তৈরি লাঠি, কিন্তু তার ভিতরে ধারালো লোহার অস্ত্র লুকোনো আছে—

* কূটানি যানি বহিঃকাষ্ঠময়ানি
অন্তর্নিহিতশস্ত্রাণি।
* কূটান্যায়ুধানি বহিঃকাষ্ঠাদিময়ানি
অন্তর্গুপ্ত-নিশিত-শস্ত্রাণি।

অনেকে এখানে 'গুপ্তি' বলে একটা আধুনিক অস্ত্রের কথা বলেছেন এবং মনুর মত হল—শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় কোনো কূট অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে না—

ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাদ্ যুধ্যমানান্ রণে রিপূন্।

[মনুসংহিতা ৭.৯০]

□ যুদ্ধাস্ত্রের ক্ষেত্রে কূট-শব্দের মধ্যে যে মায়া-কপটের তাৎপর্য্য আছে, কূটযুদ্ধের মধ্যে সেই কপটতার তাৎপর্য্য থাকলেও যুদ্ধ ব্যাপারটা যেহেতু শুধুই অস্ত্র দিয়ে চলে না, তাই কূট কথাটার একটা অন্য ভাব তৈরি করে। মহাভারত-রামায়ণে কূটযুদ্ধ কথাটা নেই বটে, কিন্তু 'কূটযোধী' শব্দটা একজন কূটযোদ্ধার বিশেষণ হিসেবে আছে। রামায়ণে বিশ্বামিত্র মুনি যখন তাড়কা রাক্ষসীকে মারার জন্য রামচন্দ্রকে নিয়ে যাবার অনুমতি চাইছেন পিতা দশরথের কাছে, তখন দশরথ করুণ প্রার্থনায় বিশ্বামিত্রকে বলেছেন—এই রাক্ষসরা তো কূটযোধী, কেমন করেই বা আমার সৈন্যরা, অথবা রামচন্দ্র কিংবা আমিই বা এই কূটযোধী রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো—

কথঞ্চ প্রতিকর্তব্যং তেষাং রামেণ রক্ষসাম্॥
মামকৈর্বা বলৈর্ব্রহ্মন্ ময়া বা কূটযোধিনাম্।

[রামায়ণ ১.২০.১৩-১৪]

□ রাক্ষসরা যে মায়াযুদ্ধ করতেন, সেই মায়া বা কপটতাই তাঁদের কূটযোধী আখ্যা দিয়েছে। রামায়ণে মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ থেকে শুরু করে আরও অনেক মায়াবী রাক্ষসই আছেন, যাঁরা কূটযোধী ছিলেন।

যুদ্ধকার্যের স্বাভাবিকতার মধ্যে লুকিয়ে থেকে ছল-কপটতার মাধ্যমে কার্য সমাধা করার যে তাৎপর্য্য কূটযুদ্ধের মধ্যে নিহিত আছে, সেটা পরবর্তী কালে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তিন প্রকার

যুদ্ধবর্ণনার মধ্যেই প্রকট হয়ে উঠেছে। কৌটিল্যের মতে, যুদ্ধের বিষয়ে প্রথম কথা হল—রাজা যদি শক্তিমান হন, তা হলে তিনি ধর্মযুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করবেন। এই ধর্মযুদ্ধেরই আর এক প্রকার হল প্রকাশযুদ্ধ। এতে রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করে, নির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে, দিনের বেলায় যুদ্ধ হয়। এর উলটো হল কূটযুদ্ধ। এক পক্ষকে ভয় দেখানো, আর এক পক্ষকে প্রহার, শত্রুর ব্যসন-প্রমাদ বুঝে তার সৈন্যবল ধ্বংস করা, একদল সৈন্যকে ঘুষ দিয়ে বশ করে অন্য দলকে শেষ করে দেওয়া—এইগুলি হল কূটযুদ্ধ। তৃতীয় প্রকার যুদ্ধের নাম তুষ্ণীংযুদ্ধ, যার সবটাই হয় চুপিচুপি, গোপনে। নানা কৌশলে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, শত্রুপক্ষের সেনামুখ্যদের যদি যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করা যায়, তবে সেটা হল তুষ্ণীংযুদ্ধ।

অর্থশাস্ত্রের দ্বাদশ অধ্যায়ের ২-৩ প্রকরণে কৌটিল্য কূটযুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন। শত্রুর সঙ্গে সমঝোতার পথ একেবারে বন্ধ হয়ে গেলে কীভাবে শত্রুর সঙ্গে কূটযুদ্ধ করতে হবে, তার উপায় দেখানোর সময় কৌটিল্য অন্যায় যুদ্ধের কথাই বলেছেন বেশি। শত্রুপক্ষের সেনামুখ্যদের লোভ দেখিয়ে নিজের পক্ষে আনাই শুধু নয়, শত্রুরাজার রাজকর্মচারী-অমাত্যদেরও তিনি ছলে-বলে-কৌশলে রাজার পক্ষ থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন। এ ছাড়া, শত্রুরাজাকে কৌশলে মেরে ফেলা, অমাত্য-সেনাপতিদের গোপনে হত্যা করা, শত্রুরাজার প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে শত্রুর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা, সংরক্ষিত বস্তু নষ্ট করা—এগুলিই কূটযুদ্ধের মাত্রা। অন্যদিকে, কূটযুদ্ধে গুপ্তচর এবং বশংবদ দুষ্ট পুরুষদের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। তারা নানারকম বেশ ধারণ করে, শত্রুরাজ্যে প্রবেশ করে, রাজা থেকে আরম্ভ করে হাতি-ঘোড়ার খাবারে পর্যন্ত বিষ মেশানোর চেষ্টা করবে। এ ছাড়া, আছে আগুন লাগানোর কূটবুদ্ধি। সবকিছু মিলে কৌটিল্যের উপদেশ এখানে ভয়ঙ্কর কুটিল এবং দুর্বল রাজার পক্ষে এসব উপদেশ ভীষণরকমের গুরুত্বপূর্ণ।

[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (Kangle) ৭.৬.১৭, ৪১; ১২.২-৩ প্রকরণ]

কূটশৈল পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, ভারতবর্ষের প্রধান পর্বতগুলির মধ্যে কূটশৈল একটি।

[বায়ু পু. ৪৫.৯২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.২৩]

কৃতি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করার অভিলাষে বারো জন দেবতা সৃষ্টি করেন। এই বারো জন দেবতা জয় নামে খ্যাত। কিন্তু এঁরা ব্রহ্মার প্রজাসৃষ্টির অভিলাষ পূর্ণ না করে মোক্ষলাভের জন্য তপস্যা করতে লাগলেন। তখন ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে এঁদের শাপ দিলেন—তোমরা প্রতি মন্বন্তরে দেবতা রূপে জন্মগ্রহণ করবে। এই দ্বাদশ জয় দেবতা বৈবস্বত মন্বন্তরে ধর্মের ঔরসে দক্ষ কন্যা সাধ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং বারো জন সাধ্য দেবতা নামে বিখ্যাত হন। এই সাধ্য দেবতাদের মধ্যে কৃতি ছিলেন একজন।

[বায়ু পু. ৬৬.৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.৬, ৪.২]

কৃপকর্ণ বাণাসুরের মন্ত্রীদের মধ্যে কৃপকর্ণ একজন। বাসুদেব কৃষ্ণের সঙ্গে যখন বাণাসুরের যুদ্ধ হয়, তখন সেই যুদ্ধে বাণাসুরের পক্ষে কৃপকর্ণও যুদ্ধ করেছিলেন। এই যুদ্ধে বলরামের হাতে তিনি নিহত হয়েছিলেন। *[ভাগবত পু. ৬৩.৮, ১৬]*

□ ভাগবত পুরাণের অপর একটি পাঠে বলা হয়েছে যে, বৃষ্ণিদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় কৃপকর্ণ সসৈন্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বৃষ্ণিবাহিনীর অন্যতম সেনাপতি কৃতবর্মার হাতে কৃপকর্ণের মৃত্যু হয়।

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ১০.৫০.৪১নং শ্লোকের উত্তর দাক্ষিণাত্য অধিক পাঠে প্রথম অধ্যায়ে ১৮, ২৮-৩০, ৬৪-৬৫নং শ্লোক দ্রষ্টব্য]

কৃপা *[দ্র. কৃপানদী]*

কূর্চামুখ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্রদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১৩.৪.৫৩; (হরি) ১৩.৩.৭২]

কূর্ম১ কবি জয়দেব তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে কূর্ম অবতারের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—যাঁর বিপুল পৃষ্ঠদেশে এই সমগ্র পৃথিবী স্থির হয়েছিলেন, পৃথিবী ধারণের জন্য যাঁর পৃষ্ঠে শুষ্ক চক্রচিহ্ন নির্মিত হয়েছিল, সেই কূর্মরূপধারী কেশবকে প্রণাম করি—

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তবপৃষ্ঠে
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকূর্মশরীর জয় জগদীশ হরে॥

[গীতগোবিন্দ ১.৬]

ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে দ্বিতীয় অবতার হল কূর্ম অবতার। রামায়ণ-মহাভারত এবং প্রায় সব কয়টি পুরাণে সমুদ্রমন্থনের কাহিনী বিশদে বর্ণিত হয়েছে। সেই কাহিনী অনুসারে, দেবতা এবং অসুররা সমুদ্রমন্থনের জন্য মন্দরপর্বতকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকিনাগকে মন্থনরজ্জু হিসেবে ক্ষীরোদ সাগরে স্থাপন করলেন। সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই মন্দর পর্বত তার নিজের ভারে ধীরে ধীরে সমুদ্রে প্রবেশ করতে লাগল। এভাবে সমুদ্র মন্থনের সমস্ত প্রক্রিয়াটাই পণ্ড হওয়ার উপক্রম হল। সকলেই বুঝলেন, সমুদ্রের তলদেশে এমন একটি বস্তু থাকা প্রয়োজন, যার উপরে মন্দর পর্বতকে রাখা যাবে এবং যা মন্দর পর্বতের ভার এবং সমগ্র পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখতে সমর্থ হবে। কিন্তু এতখানি ভার বহনের উপযুক্ত কোনো বস্তু খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু কূর্ম বা কচ্ছপ রূপ ধারণ করে মন্দর পর্বতকে ধারণ করলেন এবং পাশাপাশি এই সমুদ্র মন্থনের বিশাল উদ্যোগে সমগ্র পৃথিবীর ভারসাম্যও রক্ষা করলেন।

কূর্মরূপধারী ভগবান বিষ্ণু যে পৃথিবীকেও ধারণ করলেন, এটা খুব স্পষ্ট ভাষায় কখনওই বলা হয়নি। তবে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, সমুদ্রমন্থনের সময় মন্দর পর্বতের অবস্থান ঠিক রাখা যেমন জরুরি, তেমনি সমুদ্রমন্থনের ফলে যে পৃথিবীরও একটা বিপন্নতা তৈরি হয়, তার স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়—সেটাও অস্বীকার করা যায় না। এই অবস্থায় মন্দর পর্বতকে ধারণ করা মানেও এক অর্থে পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করা এবং ভগবান বিষ্ণু কূর্মরূপে মূলত সেই কাজটিই সম্পন্ন করেন। গীতগোবিন্দের কবির কল্পনায়, পৃথিবীকে সুদীর্ঘকাল ধরে ধারণ করার ফলেই যেন কূর্মরূপধারী বিষ্ণুর পৃষ্ঠের চক্রটি আরও কঠিন হয়ে উঠেছে—

ধরণিধরণকিণ চক্রগরিষ্ঠে। *[দ্র. অমৃতমন্থন]*

[মৎস্য পু. ২৪৯.১৬-২০;
বিষ্ণু পু. ১.৪.৮; ভাগবত পু. ৫.১৮.২৯;
মহা (k) ১.১৫.১১-১২; (হরি) ১.১৪.১১-১২]

□ অবতার হিসেবে ভগবান বিষ্ণুর এই কূর্মরূপটি পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব এবং প্রাণীজগতের বিস্তারের ইঙ্গিতও বহন করে। লক্ষণীয়, বিষ্ণুর প্রথম অবতার মৎস্য। আমরা জানি পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের স্পন্দন দেখা দিয়েছিল জলে। মৎস্য অবতারকে সেই আদিসৃষ্ট প্রাণীর প্রতিরূপ হিসেবে কল্পনা করলে কূর্ম অবতারের মাধ্যমে প্রাণীজগতের বংশ এবং প্রজাতির বিস্তারের দ্বিতীয় ধাপটি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়। কারণ জলচর প্রাণীর পর পৃথিবীতে উভচর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছিল। কচ্ছপ সেই উভচর প্রাণীজগতের প্রতীক। পৃথিবীতে প্রাণসৃষ্টির ইতিহাসের পরম্পরা লক্ষ্য করলে দেখা যায়। কচ্ছপ প্রাণী হিসেবেও অতিপ্রাচীন। পৃথিবীতে যে সময়ে উভচর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে। কচ্ছপের আবির্ভাবও প্রায় সেই সময়েই। সুতরাং ভগবান বিষ্ণুর এই অবতারটি পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশের ভাবনাও বহন করে।

□ 'কূর্ম', 'কচ্ছপ' বা 'কশ্যপ'-কে পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির কারণস্বরূপ, আদিত্য সূর্যের সঙ্গেও অভিন্ন সত্তা রূপে ভাবনা করা হয়। এবিষয়ে প্রজাপতি কশ্যপ প্রসঙ্গে আমরা বিশদে আলোচনা করেছি। *[দ্র. কশ্যপ১]*

কূর্ম২ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত একজন নাগ।

[মহা (k) ১.৬৫.৪১; (হরি) ১.৬০.৪১]

কূর্মপুরাণ কূর্মপুরাণে ভগবান বিষ্ণু কূর্মরূপ পরিগ্রহ করেছেন এবং তিনি নিজেই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে এই পুরাণ উপদেশ করছেন। অধুনা প্রচলিত এই পুরাণ পূর্ব এবং উত্তর দুই ভাগে বিভক্ত। এই পুরাণের অন্তর্গত প্রমাণ থেকেই বলা যায় যে, প্রথমত চারটি সংহিতায় এই পুরাণটি বিভক্ত ছিল—ব্রাহ্মী, ভাগবতী, সৌরী এবং বৈষ্ণবী—

ব্রাহ্মী ভাগবতী গৌরী বৈষ্ণবী চ প্রকীর্তিতাঃ।
চতস্রঃ সংহিতাঃ পুণ্যা ধর্মকামার্থকোবিদাঃ॥

এখন যদিও ব্রাহ্মীসংহিতা ছাড়া আর কোনো অংশই পাওয়া যায় না, তবুও আদিতে ওই অপর সংহিতাগুলিতে কী কী বিষয় ছিল, তার কিছু সংক্ষিপ্তসার নারদপুরাণে পাওয়া যায়। নারদ-পুরাণমতে ভাগবতী সংহিতায় পাঁচটি পাদ ছিল বলে এই সংহিতার নাম পঞ্চপদী। পঞ্চপদী আমরা পাইনি বটে, কিন্তু সমাজ—ইতিহাসের দৃষ্টিতে এই অংশটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল, কেননা এখানে পাঁচটি পাদে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং

মিশ্রবর্ণের জীবিকা অর্জনের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। তৃতীয় গৌরী সংহিতায় আথর্বনিক মারণ-উচাটন-বশীকরণের ষট্-কর্ম বিভাগ বর্ণিত। বৈষ্ণবী-সংহিতার প্রধান বিষয় মোক্ষ। চারটি সংহিতায় শ্লোক সংখ্যা যথাক্রমে ৬০০০, ৪০০০, ২০০০ এবং ৫০০০।

কূর্মপুরাণের মধ্যে উপাখ্যান-কাহিনীর পর্য্যাপ্তি নেই। এখানে দার্শনিক এবং ধর্মতত্ত্বের বিষয়গুলির সন্নিবেশ দেখলে বোঝা যায় যে, পুরাতন পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের ধারা এবং পরবর্তী শৈব পাশুপতের ধারা এই পুরাণে একত্রে মিশেছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন—নূতন উপাখ্যান তীর্থস্থানের বিবরণ এবং আপন সম্প্রদায়ের মাহাত্ম্য বর্ণন—এগুলি শৈব-পাশুপতদেরই সংযোজন। কূর্মপুরাণের পূর্বভাগে মহাবরাহের পৃথিবী-উদ্ধার কাহিনী, উত্তানপাদের কাহিনী, দক্ষযজ্ঞের কাহিনী এবং বামনাবতারের কাহিনী—পুরাতন বৈদিক পরম্পরাগত কাহিনীর স্মারক। সমাজতাত্ত্বিক বিষয়ের মধ্যে বর্ণাশ্রম-বিভাগ এবং প্লক্ষদ্বীপ, পুষ্করদ্বীপ ইত্যাদির ভৌগোলিক বিবরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্মার্ত বিষয়গুলিও অবশ্য বাদ যায়নি—সনাতনধর্ম, আচার, ভক্ষ্যাভক্ষ্য নিরূপণ, নিত্যকর্ম, শ্রাদ্ধকল্প, অশৌচ, অগ্নিহোত্র, বর্ণাশ্রমধর্ম, প্রায়শ্চিত্ত— ইত্যাদি বিশেষ স্থান পেয়েছে এই পুরাণে। এর সঙ্গে আছে বিভিন্ন তীর্থের বর্ণনা এবং মাহাত্ম্য। কূর্মপুরাণ থেকে স্মৃতি এবং নিবন্ধকারেরা বহুল উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উল্লেখ্য, প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকারেরা এই পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ায়, অপিচ প্রাচীন পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের তন্ত্রোপদেশ এখানে বিধৃত হওয়ায় অনেকেই মনে করেন যে, এই পুরাণের একাংশ প্রাচীন এবং তা খ্রিস্টীয় ৬০০ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হয়ে গেছে এবং এই পুরাণের অন্যাংশ রচিত হয়েছে ৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

[অশোক চট্টোপাধ্যায়, পুরাণ পরিচয়, পৃ. ৮৮-৮৯]

কূলকর্তা শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের এই নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

কূলকর্তা পুষ্করাদীনাং মহাতটাকানাং কর্তা।

তাঁকে পুষ্কর, তটাক (তড়াগ বা জলাশয়) প্রভৃতির স্রষ্টা বা নির্মাতা রূপে কল্পনা করে কূলকর্তা নামে সম্বোধন করা হয়েছে। বৃহৎ জলাশয়ের কূল-নির্মাণ বস্তুত জলাশয় নির্মাণকেই লক্ষিত করে। *[দ্র. কূলহারী]*

[মহা (k) ১৩.১৭.১০৯; (হরি) ১৩.১৬.১০৯]

কূলহারী শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের কূলহারী নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—কূলহারী মহাপ্রবাহরূপেণ তীরস্থদ্রুমহারী। নদীতে বান ডাকলে যেমন নদী তট ভেঙে স্রোতের প্রবাহ বহন করে, তেমনই ভগবান শিব প্রলয়কালে সমগ্র জীবকুলকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। বস্তুত, কূলকর্তা এবং কূলহারী শব্দদুটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নীলকণ্ঠ যে 'মহাপ্রবাহ' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন, তা কালপ্রবাহের দ্যোতক। মহাদেব স্বয়ং সেই অনাদি-অনন্ত কালপ্রবাহের স্বরূপ। সেক্ষেত্রে কূলকর্তা এবং কূলহারী শব্দ দুটি তাঁর জগৎস্রষ্টা এবং জগৎসংহর্তা—এই দুটি রূপকেই প্রকাশ করে। সৃষ্টিকর্তা রূপে তিনি তীরস্থ দ্রুম (বৃক্ষ) অর্থাৎ জীবজগতকে সৃষ্টি করেন, প্রলয়কালে সেই সৃষ্টিকেই ভাসিয়ে নিয়ে যান বিধ্বংসী স্রোতে। সৃষ্টি এবং ধ্বংসের এই চক্রের মধ্যে ঈশ্বর নিজে অমূর্ত সাক্ষীরূপে, কালস্রোত রূপে অবস্থান করেন। সেই পরমেশ্বরকেই আমরা কখনো কূলকর্তা রূপে, কখনো বা কূলহারী রূপে কল্পনা করি।

[মহা (k) ১৩.১৭.১০৯; (হরি) ১৩.১৬.১০৯]

কৃষ্মাণ্ড১ মহাদেবের অনুচরেরা যেসব গণে বিভক্ত, তাঁদের মধ্যে একটি হল বিনায়কগণ এই গণের অন্তর্ভুক্ত একজন অনুচর হলেন কৃষ্মাণ্ড।

[মৎস্য পু. ১৮৩.৬৩]

কৃষ্মাণ্ড২ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, মহর্ষি কাক্ষীবানের পুত্ররা যে দুটি গণে বিভক্ত ছিলেন, সেগুলি হল—কৃষ্মাণ্ড এবং গৌতম—

কৃষ্মাণ্ডা গৌতমান্তে বৈ স্মৃতাঃ কক্ষীবতঃ সুতাঃ॥

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.৯১]

কৃষ্মাণ্ড৩ পিশাচদের একটি গণ বলে পুরাণে কথিত হয়েছে। এরা বিকৃত-দর্শন এবং কেশহীন হয় বলে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৬.৮.২৪; ১০.৬.২৭;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৮৪; ২.৪১.২৯;
বিষ্ণু পু. ১.১২.১৩]

কৃষ্মাণ্ডক কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রুর

গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভারতের আস্তীকপর্বে সর্পনাম কথনের সময় এঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.৩৫.১১; (হরি) ১.৩০.১১]

কৃকণ বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে অন্ধক বংশীয় সাত্বতের পুত্র ভজমানের পুত্রদের মধ্যে কৃকণ অন্যতম। তিনি নিমির ভ্রাতা। পণ্ডিত Wilson সম্পাদিত বিষ্ণু পুরাণের পাঠে 'কৃকণ'-এর পরিবর্তে 'বৃকণ' নামটির উল্লেখ আছে।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম) ৪.১৩.২; কূর্ম পু. ১.২৪.৩৮]

□ পদ্মপুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, যদু-বৃষ্ণি বংশীয় ভজমানের পুত্র ভাজ। ভাজের পুত্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন কৃকণ। তবে পদ্মপুরাণের এই পাঠটিকে আমাদের সঠিক বলে মনে হয় না। আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয় থেকে প্রকাশিত পদ্মপুরাণে যে পাঠান্তর উল্লিখিত হয়েছে, সেটিই বরং আমাদের অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হয়। এই পাঠান্তরে 'ভাজ' শব্দের পরিবর্তে 'বাহ্য' বা 'বাহ্যক' পাঠ ধৃত হয়েছে। ভজমানের পুত্র হিসেবে বাহ্যকের নাম অন্যান্য পুরাণেও উল্লিখিত হতে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে বাহ্যকের অন্যতম পুত্র কৃকণ—এই তথ্যটিই সঠিক বলে ধরে নিতে হবে।

[পদ্ম পু. (আনন্দাশ্রম) ১৩.৩৩-৩৪নং শ্লোক এবং পাঠান্তর দ্রষ্টব্য]

কৃকণেয়ু রাজা পুরুর তৃতীয় পুত্র রৌদ্রাশ্বের ঔরসে অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে যে দশজন বীর ও বুদ্ধিমান পুত্র জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে কৃকণেয়ু একজন।

[মহা (k) ১.৯৪.৮-১০; (হরি) ১.৮১.৮-১০]

কৃচ্ছ্র এই ব্রত বা প্রায়শ্চিত্তকে প্রাজাপত্য কৃচ্ছ্রও বলে। অন্য অনেক অপরাধের ক্ষেত্রে তো বটেই, যে কোনো স্ত্রীলোক দেখে কামোদ্রেক হলে কৃচ্ছ্রব্রত করার উপদেশ করেছে মহাভারত। চুল-দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেলে প্রথম তিন দিন সকালে (দিনের বেলায়) মাত্র খাওয়া, পরের তিন দিন শুধুমাত্র সন্ধ্যায় বা রাত্রে খাওয়া, তারপরের তিন দিন যা পাওয়া যায় এমন যাচনা না করে খাওয়া এবং তারপরের তিন দিন উপবাস—এই বারো দিনের কৃচ্ছ্র-সাধনই কৃচ্ছ্র ব্রত বলে চিহ্নিত—

ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহমদ্যাদ্ অযাচিতম্।
ত্র্যহং পরঞ্চ নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ॥

[দ্র. অতিকৃচ্ছ্র]

[মনুসংহিতা ১১.২১২; কূর্ম পু. ২.২৯.২৭; বশিষ্ঠ-সংহিতা (আর্যশাস্ত্র) ২৪.২, ৫-৬; দেবীভাগবত পু. ১১.২৩.৪৭-৪৮; অগ্নি পু. ১৭০.১৫-১৬; মহা (k) ১২.১৬৫.৬৯; ১২.২১৪.১৩; (হরি) ১২.১৬০.৬৬; ১২.২১১.১৩]

কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্তে সব নিয়মই কৃচ্ছ্রের মতো। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। শুধু জল খেয়ে অন্তত বারো দিন কাটাতে হবে—

অব্‌ভক্ষঃ স কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃ।

সাধারণত ব্রাহ্মণকে মেরে রক্তপাত করলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র নামক প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়েছেন মনু—

কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রৌ কুর্বীত বিপ্রস্যোৎপাদ্য শোণিতম্।

[দ্র. অতিকৃচ্ছ্র]

[মনুসংহিতা ১১.২০৯, ২১২; বশিষ্ঠ-সংহিতা (আর্যশাস্ত্র) ২৪.৪; দেবীভাগবত পু. ১১.২৩.৪৭-৪৮]

কৃত১ লোক-প্রচলিত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলির মধ্যে প্রথম যুগ, অর্থাৎ সত্যযুগের নামই কৃত। বনপর্বে ত্রেতাযুগীয় হনুমানের সঙ্গে মধ্যম পাণ্ডব ভীমের দেখা হয় এবং তিনি যুগসংখ্যার বিষয়ে হনুমানকে প্রশ্ন করলে হনুমান কৃত-যুগের গুণ সম্বন্ধে বলেন—কৃত-যুগে ধর্ম সর্বদাই সিদ্ধ। মানুষ তখন কর্তব্য বলে ধর্মকার্য করত না, আগেই তারা ধর্মকৃত্য করে ফেলত। ধর্ম তখন ক্ষীণ ছিল না, লোকক্ষয়ও ঘটত না। কৃত-যুগে দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ—এসব বিভাগ ছিল না; কোনো কিছুর ক্রয়-বিক্রয়ও চলত না। ঋক্, সাম, যজু ইত্যাদি বেদ-বিভাগ ছিল না। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ছিল না। সন্ন্যাসই ছিল একমাত্র ধর্ম। কৃত যুগে মানুষের রোগ, ইন্দ্রিয়হানি, অসূয়া, রোদন, দর্প—এসব ছিল না। ছিল না কলহ, আলস্য, বিদ্বেষ, খলতা, ভয়, ঈর্ষা কিংবা পরশ্রীকাতরতা। যোগী-মুনিদের একমাত্র গতি ছিলেন ধ্যানগম্য ব্রহ্ম।

কৃত-যুগের কিছুকাল গেলেই অবশ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি চতুবর্ণের লক্ষণ তৈরি

হয়, কিন্তু চতুর্বর্ণ তখন নির্বিবাদে চাতুবর্ণিক ধর্ম পালন করত—কৃতে যুগে সমভবন্ স্বকর্ম-নিরতাঃ প্রজাঃ। কিন্তু এই সময়ের আগে সমস্ত মানুষের একরকম আশ্রম, এক প্রকার আচার, পরস্পর পরস্পরের প্রতি সমজ্ঞান করত—

সমাশ্রমং সমাচারং সমজ্ঞানঞ্চ কেবলম্।
তথা হি সমকর্মাণো বর্ণা ধর্মানবাপ্নুবন্॥

কিন্তু বর্ণাশ্রম এক সময়ে চালু হয়ে গেলেও মানুষ ফলের আকাঙ্ক্ষা বর্জন করেই কর্ম করত। কামনা, বাসনা এবং সত্ত্ব-রজ-তমের ত্রিগুণ-প্রভাব তেমনভাবে লক্ষিত হত না।

কৃতযুগে ভগবন্নারায়ণের বর্ণ শ্বেত—
আত্মা চ সর্বভূতানাং শুক্লো নারায়ণস্তদা।

ধর্ম তখন চতুষ্পাদ—
কৃতে যুগে চতুষ্পাদঃ . . . ধর্মো'য়ং কৃতলক্ষণঃ।

[মহা (k) ৩.১৪৯.১১-২২;
(হরি) ৩.১২৩.১২-২৩]

□ কোষকার অমরসিংহ 'কৃত' শব্দের একটি অর্থ করেছেন পর্যাপ্ত। বস্তুত 'কৃত' মানে সম্পূর্ণ সফল, সমস্ত কিছুই পর্যাপ্ত এবং সিদ্ধ। ধর্মকে অনেক সময়েই 'বৃষ' বলে কল্পনা করা হয়েছে—বৃষো বৈ ভগবান্ ধর্মঃ—এবং সেই ধর্ম চতুষ্পাদ। চতুষ্পাদ ধর্ম যে সময়ে ভ্রংশহীন পূর্ণ অবস্থায় থাকে সেই পূর্ণ-সিদ্ধ যুগকালের নামই কৃত—চতুষ্পাৎ সকলো ধর্মঃ সত্যং চৈব কৃতে যুগে। কৃতযুগে সবটাই ধর্ম, অধর্ম কোথাও নেই—

ততঃ কৃতযুগে ধর্মো নাধর্মো বিদ্যতে ক্বচিৎ।
সর্বেষামেব বর্ণানাং নাধর্মে রমতে সনঃ॥

[মহা (k) ১২.৬৯.৮১; ১২.২৩১.২৩;
(হরি) ১২.৬৭.৮৪; ১২.২২৯.৫৩]

□ কৃত-যুগে সব কিছুই ভাল, সবকিছুই মহৎ, নৈতিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, এমনকী প্রাকৃতিক সমস্ত গুণের সমাহারই কৃতযুগ।

[মহা (k) ১২.৬৯.৮২-৮৬;
(হরি) ১২.৬৭.৮৫-৮৯]

□ বস্তুত মহৎ গুণের সমাহার-প্রতীক হিসেবেই একেবারে বেদ-ব্রাহ্মণের কাল থেকে কৃত-যুগের ভাবনা করা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—সত্যের সর্বকালীন অন্বেষণই কৃতযুগের লক্ষণ। মানসিক সত্ত্বগুণ যখন মানুষকে চলতে শেখায়, অনুক্ষণ এক আলস্যহীন চলমানতার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে, সেটাকেই ঐতরেয় ব্রাহ্মণ 'কৃত' বলে চিহ্নিত করেছে—কৃতং সম্পদ্যতে চরণ্।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (Haug) ৭.১৫, পৃ. ১৮০]

□ মহাভারতে আবার এটাও বলা হয়েছে—রাজার প্রশাসনিক প্রকার অথবা রাজশাসনের ভাল-মন্দ প্রকারভেদেই কৃতযুগ এবং অন্যান্য যুগের প্রবর্তন ঘটে—নিজের শাসন সুব্যবস্থাতেই রাজা যুগের প্রতীক হয়ে ওঠেন—

রাজা কৃতযুগস্রষ্টা ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ।
যুগস্য চ চতুর্থস্য রাজা ভবতি কারণম্॥

[মহা (k) ১২.৬৯.৯৮; (হরি) ১২.৬৭.১০১]

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চ ভরতর্ষভ।
রাজবৃত্তানি সর্বাণি রাজৈব যুগমুচ্যতে॥

[মহা (k) ১২.৯১.৬; (হরি) ১২.৮৯.৬]

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণ-কুন্তী-সংবাদে বিদুলার উপাখ্যান বর্ণনা প্রসঙ্গে কুন্তী বলেছেন যে, কালপ্রভাবে রাজার দোষগুণ তৈরি হয় এ-কথা সত্য নয়। রাজার সদসৎ কর্ম অনুসারেই কৃত, ত্রেতা ইত্যাদি কালের সৃষ্টি হয়। রাজাই তাঁর দণ্ডনীতির শুভ প্রয়োগে কৃতযুগের অবতারণা করেন করেন এই পৃথিবীতে—

দণ্ডনীত্যাং যদা রাজা সম্যক্ কার্ৎস্নেন বর্ততে।
তদা কৃতযুগং নাম কালঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রবর্ততে॥
কালো বা কারণং রাজ্ঞো রাজা বা কাল-কারণম্।
ইতি তে সংশয়ো মা ভূদ্রাজা কালস্য কারণম্॥

[মহা (k) ৫.১৩২.১৫-১৬; (হরি) ৫.১২৩.১৫-১৬]

□ মহাভারতে বলা হয়েছে—এই ভারতবর্ষেই শুধু অতীত এবং আগত কালকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেই কাল-ভাগের প্রথমটা হল কৃত—চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি ভরতর্ষভ। এই চার যুগের মধ্যে প্রথম হল কৃতযুগ—পূর্বং কৃত যুগং নাম ততস্ত্রেতা যুগং প্রভো।

[মহা (k) ৬.১০.৩-৪; (হরি) ৬.১০.৩-৪;
বিষ্ণু পু. ২.৩.১৯]

□ মহাভারতের এই অংশে কৃত-যুগের সময়কাল বা আয়ুর সংখ্যা বলা হয়েছে চার হাজার বছর, ত্রেতার সময় তিন হাজার বছর, দ্বাপরের কাল দু-হাজার বছর, আর কলির এক হাজার বছর।

[মহা (k) ১২.৬৯.৯৮-১০০; ১২.৯১.৬; ১২.১৪১.১০;
(হরি) ১২.৬৭.১০১-১০৩; ১২.৮৯.৬; ১২.১৩৭.১০]

—চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং কুরুসত্তম।
আয়ুঃসংখ্যা কৃতযুগে সংখ্যাতা রাজসত্তম॥

[মহা (k) ৬.১০.৫; (হরি) ৬.১০.৫]

মহাভারতের এই জায়গায় কলিকালের সময়-সীমা ধরা না থাকলেও বিষ্ণুপুরাণে সেটা একবৎসরই বলা হয়েছে। তবে এই পরিমাণ দৈব-যুগের পরিমাণে নির্ণীত—

চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্।
দিব্যাব্দানাং সহস্রাণি যুগেষ্বাহুঃ পুরাবিদঃ॥

[বিষ্ণু পু. ১.৩.১১-১৩]

পণ্ডিতদের মতে—প্রাচীন ভারতীয়রা যেহেতু দশমিকের আবিষ্কর্তা, তাই যুগকাল-সংখ্যা দশাত্মক। কৃত, ত্রেতা ইত্যাদি যুগের কাল সমান নয়, এবং যুগবিভাগের ক্ষেত্রে যুগ-সন্ধির জায়গায় একটা সন্ধ্যাংশ যুক্ত হয়। সেই নিয়মে কৃতযুগের আরম্ভে সন্ধ্যাংশ চারশ বছর এবং শেষেও সন্ধ্যাংশ চারশ বছর ধরা হয়।

[মহা (k) ৩.১৮৮.২২-২৭; (হরি) ৩.১৫৯.২২-২৭; বিষ্ণু পু. ১.৩.১০-১৪; পুনশ্চ দ্রষ্টব্যঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু, পুরাণ প্রবেশ, পৃ. ২৬-৩৮]

কৃত২ প্রাচীনকালের পাশাখেলায় সর্বশ্রেষ্ঠ দান। যুগের নাম এবং মান অনুসারেই অক্ষক্রীড়ার এক-একটি ক্রমিক দানের নাম কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি। এই দানগুলির ক্রমিক মানও চার, তিন দুই, এক। কৃতযুগে যেমন চতুষ্পাৎ ধর্ম, তেমনই অক্ষক্রীড়ায় কৃত-দানের মান চার। মহাভারতে বিরাট-রাজ্যে গোধন হরণ করতে গেলে বৃহন্নলাবেশী অর্জুন যখন আত্মপ্রকাশ করেন, তখন দ্রোণাচার্য তাঁর প্রশংসা করে ফেলায় কর্ণ ক্ষিপ্ত হয়ে দ্রোণাচার্যকে তিরস্কার করেন। প্রত্যুত্তরে অশ্বত্থামা কর্ণকে গালাগাল দেবার সময় পূর্বের সেই অন্যায় পাশাখেলার কথা তোলেন এবং বলেন— অর্জুনের গাণ্ডীব ধনুক কিন্তু কৃত বা দ্বাপর দান ফেলে না—

নাক্ষান্ ক্ষিপতি গাণ্ডীবং ন কৃতং দ্বাপরং ন চ।

এখানে কৃত-দান মানে পাশাখেলায় বাজি জেতার শ্রেষ্ঠ দান এবং এই দানটি অক্ষধূর্ত শকুনি ইচ্ছামত দিতে পারতেন বলে তাঁকে 'কৃতহস্ত' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে—

গান্ধাররাজঃ শকুনি-র্বিশাম্পতে/
রাজাক্ষদেবী কৃতহস্তো মতাক্ষঃ।

[মহা (k) ৪.৫০.২৪; ২.৫৮.১৩; (হরি) ৪.৪৫.২৪; ২.৫৫.১৩]

□ উপরিউক্ত—অর্জুনের গাণ্ডীব কিন্তু কৃত কিংবা দ্বাপর দান ফেলে না, গাণ্ডীব শুধু ধারালো বাণ ছোঁড়ে—এই প্রসঙ্গে পাশার কৃত-দানের একটা বিশিষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন টীকাকার নীলকণ্ঠ এবং তাতে বোঝা যায় চার প্রকার সংখ্যাঙ্ক খোদাই-করা পাশ দিয়েই পাশা খেলা হত। নীলকণ্ঠ টীকায় লিখেছেন—যে জিনিসটার এক এক পাশে এক, দুই, তিন, চার—এই অঙ্কগুলি চিহ্নিত থাকে, তাকে বলে পাশ—ক্রমেণ এক-দ্বি-ত্রি-চতুরঙ্কাঙ্কিতৈঃ প্রদেশৈঃ অঙ্কচতুষ্টয়বান্ পাশো ভবতি। তার এক ফোঁটায় কলি-দান, দুই ফোঁটায় দ্বাপর-দান, তিন ফোঁটায় ত্রেতা-দান এবং চার ফোঁটায় কৃত দান। কীভাবে বাজি রেখে পাশাখেলার মাধ্যমে জুয়ো খেলা হত, সেটা তখনকার মুদ্রা দীনার-এর মান বুঝিয়ে দিয়ে নীলকণ্ঠ লিখেছেন। অক্ষক্রীড়ায় নিজের পাঁচটা দীনার আর পরপক্ষের পাঁচটা দীনার সামনে রেখে খেলা আরম্ভ হয়। পাশ-ক্ষেপণের পর যদি এক ফোঁটার কলি-দান পড়ে তাহলে নিজের রাখা পাঁচটি দীনারের এক দীনার মাত্র জয় করা হয়—তদিতঃ পাশ-প্রক্ষেপে যদি একাঙ্কঃ উপরি আয়াতি, তদা স্বীয়েষ্বেক এব জিতং ভবতি। যদি দ্বাপর দান পড়ে, তাহলে পরপক্ষের দুটি দীনার আর নিজের রাখা দুটি দীনার জয় করা হয়। যদি তিন বা ত্রেতা পড়ে, তাহলে অপরের তিনটি এবং নিজের তিনটি জেতা হয়। এইভাবে চার অঙ্কটা ওপরে আসে নিজের সব কটি এবং প্রতিপক্ষেরও সবকটি দীনার নিজের ভাগে আসে— চতুরঙ্কস্যোপরি-পতনে সর্বেপি স্বীয়াঃ পরকীয়াশ্চ জিতা ভবন্তি। কিন্তু কলি-দানে প্রায় কোনো জয়ই নেই—কলিপাতে জয়ো নাস্তি। আর কৃত-দানে সমস্তই জয়।

[তদেব, নীলকণ্ঠকৃত ভারত ভাবদীপ টীকা দ্রষ্টব্য]

কৃত৩ বিশ্বেদেবগণের একজন দেবতা।

ঋগ্‌বেদের মধ্যে অনেকগুলি সূক্তের দেবতা হলেন 'বিশ্বেদেবাঃ'। 'বিশ্বেদেবাঃ' মানে দাঁড়ায় সমস্ত দেবতা। বৈদিক শব্দের প্রথম বিখ্যাত কোষকার যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে লিখেছেন— 'বিশ্বেদেবাঃ' মানে সর্ব-দেবতা—বিশ্বেদেবাঃ সর্বে দেবাঃ। অর্থাৎ সমস্ত দেবতাই। প্রথম দিকে বৈদিকেরা যে তেত্রিশ জন দেবতার কথা বলতেন, তাঁদেরই বিশ্বেদেব বলা হত। পরবর্তী পর্যায়ে আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণও বিশ্বেদেবের

পরিধিতে প্রবেশ করেন। ফলে বিশ্বেদেবগণের দেবতা সংখ্যা বেড়ে যায়। অবশেষে বিশ্বেদেবগণ বৈদিককালেই পিতৃগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান এবং তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ মেলে মহাভারতে। এখানে বলা হয়েছে যে বিশ্বেদেবগণ সবসময়েই পিতৃগণের সঙ্গে থাকেন—

অত্র বিশ্বে সদা দেবা পিতৃভিঃ সার্ধমাসতে।

[মহা (k) ৫.১০৯.৩; (হরি) ৫.১০১.৩]

□ পিতৃগণের সঙ্গে বিশ্বেদেবগণও আমাদের সামনে আবির্ভূত হন—

বিশ্বেদেবাশ্চ যে নিত্যং পিতৃভিঃ সহ গোচরাঃ।

[মহা (k) ১৩.৯১.২৪; (হরি) ১৩.৭৮.২৪]

□ বিশ্বেদেবগণের সঙ্গে পিতৃগণ মিশে যাওয়ায় মহাভারতের কালেই বিশ্বেদেবগণের অন্তর্গত দেবতাদের নামের তালিকা পাল্টে যায় এবং সংখ্যাও একেক জায়গায় এক এক রকম। মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে বিশ্বেদেবগণের যে সব নাম আছে তাঁর মধ্যে একটি নাম কৃত।

[মহা (k) ১৩.৯১.৩১; (হরি) ১৩.৭৮.৩১]

কৃত$_{৪}$ কৃষ্ণপিতা বসুদেবের ঔরসে পৌরবী রোহিণীর গর্ভে জাত বারো জন পুত্রের মধ্যে একজন।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.৪৬]

কৃত$_{৫}$ পুরূরবার পৌত্র আয়ুর এক পুত্র হলেন ক্ষত্রবৃদ্ধ। ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধারায় অধস্তন পুরুষ এই কৃত। তিনি জয়ের পুত্র এবং হর্যবনের পিতা। বিষ্ণু পুরাণ মতে ইনি কৃত নন, তার নাম যজ্ঞকৃৎ এবং তাঁর পুত্রও হর্যবন নয়, তিনি হর্যবর্ধন।

[ভাগবত পু. ৯.১৭.১৬; বিষ্ণু পু. ৪.৯.৮]

কৃত$_{৬}$ দ্বিমীঢ়ের বংশে রাজা সন্নতিমানের পুত্র। বায়ু পুরাণ অনুসারে সন্নতিমানের অপর পুত্র সনতির ভাই হলেন কৃত। ইনি সাম্‌বেদীয় কৌথুমশাখার অন্যতম ঋষি হিরণ্যনাভ বা হিরণ্যনাভির শিষ্য। জৈমিনির শিষ্য-পরম্পরায় যাঁরা সামবেদের শাখা বিভাগ করেন, তাঁদের মধ্যে কোশল দেশে জাত হিরণ্যনাভ ছিলেন যথেষ্ট বিখ্যাত। সেই হিরণ্যনাভের অন্যতম শিষ্য ছিলেন কৃত। তিনি নিজের শিষ্যদের গুরুর উপদিষ্ট চব্বিশ প্রকার সামসংহিতা উপদেশ করেন। কৃতের প্রচারিত সংহিতাগুলি কার্ত এবং প্রাচ্য সাম নামে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণু পুরাণ হিরণ্যনাভের কাছে কৃতের শেখা বিদ্যাকে 'হিরণ্যনাভ যোগ' আখ্যা দিয়েছে এবং বলেছে কৃত-এর প্রচারিত সাম-সংহিতা প্রাচ্যদের প্রিয় ছিল। মহর্ষি কৃতের পুত্রের নাম উগ্রায়ুধ। *[ভাগবত পু. ১২.৬.৭৭, ৮০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.৪৯, ৫৫; মৎস্য পু. ৪৯.৭৫-৭৬; বায়ু পু. ৯৯.১৮৯-১৯০; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১৩]*

কৃত$_{৭}$ কৃষ্ণের ঠাকুরদাদা শূরের পাঁচ মেয়ের মধ্যে একজন হলেন শ্রুতাদেবী অথবা শ্রুতদেবী। তাঁর সঙ্গে কৃত নামে এক রাজার বিয়ে হয় এবং সেই কৃতের ছেলের নাম সুগ্রীব—

কৃতস্য তু শ্রুতাদেবী সুগ্রীবং সুষুবে সুতম্।

[মৎস্য পু. ৪৬.৪-৫]

কিন্তু বিষ্ণু পুরাণে এবং হরিবংশে শ্রুতদেবীর নাম 'শ্রুতদেবা' এবং বিষ্ণুপুরাণে শ্রুতদেবার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে করুষ দেশের রাজা বৃদ্ধশর্মার এবং তাঁর ছেলের নাম দন্তবক্র। আর হরিবংশে শ্রুতদেবার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে অন্ত্য নামে এক রাজার সঙ্গে এবং তাঁর ছেলের নাম 'জগৃহু'। এই বিষমতার নিরিখে অজানা অচেনা এই কৃতের সঙ্গে বিবাহ এবং তাঁদের পুত্র সুগ্রীবের পরিচয় সংশয়পূর্ণ হয়ে পড়ে।

[হরিবংশ, ১.৩৪.২৫; বিষ্ণু পু. ৪.১৪.১১]

কৃত$_{৮}$ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কৃত। *[বায়ু পু. ৯১.৯৬]*

কৃত$_{৯}$ মণিবর নামক যক্ষের ঔরসে দেবজনীর গর্ভজাত এক যক্ষ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১২৭, ১৩০]

কৃত$_{১০}$ যদুবংশীয় ভজমানের বংশধারায় হৃদিকের দশ জন পুত্রের একজন। তিনি বিখ্যাত হার্দিক্য কৃতবর্মার ভাই। *[বায়ু পু. ৯৬.১৩৮-১৩৯]*

কৃত$_{১১}$ কুরুবংশীয় রাজা চ্যবনের পুত্র হলেন কৃত। বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে তিনি বিশ্রুত নামে এক বিখ্যাত পুত্র লাভ করেছিলেন।

[বায়ু পু. ৯৯.১১৯-১২০]

কৃত$_{১২}$ সূর্যের একটি নাম, যদিও দ্বাপর, ত্রেতা, কলিও সূর্যের নামের তালিকায় আছে। বস্তুত সূর্য সর্বকালিক নিত্য বলেই চতুঃসংখ্যক যুগ-নাম সূর্যের নাম বলে চিহ্নিত।

[মহা (k) ৩.৩.২০; (হরি) ৩.৩.২০]

কৃতক$_{১}$ যদুবংশীয় বসুদেবের ঔরসে মদিরার গর্ভজাত পুত্রদের অন্যতম কৃতক।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.৪৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৭২; বিষ্ণু পু. ৪.১৫.১৩]

কৃতক২ কুরুবংশীয় চ্যবনের পুত্র কৃতক। কৃতকের পুত্র উপরিচরবসু। *[বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১৯]*

কৃতকৃত্য ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লিখিত একজন বানরবীর। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৪১]*

কৃতক্ষণ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক কালের বিদেহ দেশের রাজা। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের ময়দানব নির্মিত সভাগৃহে তাঁকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। *[মহা (k) ২.৪.২৭; (হরি) ২.৪.১০নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, খণ্ড ৫, পৃ. ২৬]*

কৃতচেতা বনবাসকালে পাণ্ডবরা দ্বৈতবনে উপস্থিত হলে, দ্বৈতবনে বসবাসকারী যেসব তপস্বী ব্রাহ্মণ পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন কৃতচেতা তাদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৩.২৬.২২; (হরি) ৩.২৩.২২]

কৃতঞ্জয়১ একজন ঋষি। তিনি বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তদশ দ্বাপরে বেদব্যাস হয়েছিলেন।

[বিষ্ণু পু. ৩.৩.১৫]

কৃতঞ্জয়২ ভাগবত পুরাণ অনুসারে ইক্ষ্বাকুবংশীয় বর্হির পুত্র কৃতঞ্জয়। রণঞ্জয় নামে তাঁর একটি পুত্র ছিল।

বিষ্ণু পুরাণে আবার বলা হয়েছে যে, কৃতঞ্জয় ধর্মীর পুত্র এবং রণঞ্জয়ের পিতা। মৎস্য পুরাণে কৃতঞ্জয়ের পিতা হিসেবে বৃহদ্রাজের নাম এবং কৃতঞ্জয়ের পুত্র হিসেবে রণেজয়ের নাম উল্লিখিত হয়েছে। বায়ু পুরাণে কৃতঞ্জয়ের পুত্র হিসেবে 'ব্রাত' নামটি উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ৯.১২.১৩; বিষ্ণু পু. ৪.২২.৩; মৎস্য পু. ২৭১.১১; বায়ু পু ৯৯.২৮৭]

কৃতঞ্জয়৩ আঠাশজন ব্যাসের মধ্যে একজন। পুরাণে বলা হয়েছে যে, সপ্তদশ দ্বাপরে মহাদেব যখন গুহাবাসী নামে আবির্ভূত হবেন, সেই সময়ে কৃতঞ্জয় ব্যাস হবেন।

[বায়ু পু. ২৩.১৭; বিষ্ণু পু. ৩.৩.১৫; কূর্ম পু. ১.৫১.৬; শিব পু. (বায়বীয়) ২.৯.৪৮]

☐ বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, প্রাচীন পুরাণগুলির মধ্যে অন্যতম এই বায়ুপুরাণ প্রথমে বায়ু থেকে উশনা এবং উশনার কাছ থেকে বৃহস্পতি প্রাপ্ত হন। এইভাবে ক্রমে ধনঞ্জয়ের কাছ থেকে কৃতঞ্জয় ও কৃতঞ্জয়ের কাছ থেকে তৃণঞ্জয় বায়ু পুরাণ প্রাপ্ত হন। *[বায়ু পু. ১০৩.৬৩]*

কৃতদেব পুরাণ মতে ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্রদের মধ্যে অন্যতম কৃতদেব।

[বিষ্ণু পু. ৪.৭.১৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৬.৬৮]

কৃতদ্যুতি শূরসেন মথুরা অঞ্চলের রাজা চিত্রকেতু-র জ্যেষ্ঠা এবং প্রধানা মহিষী। *[দ্র. চিত্রকেতু]*

[ভাগবত পু. ৬.১৪.২৮]

কৃতধর্মা মরুত্তর বংশধারায় সঙ্কৃতির পুত্র কৃতধর্মা।

[বায়ু পু. ৯৩.১১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৮.১১]

কৃতধ্বজ নিমির বংশধারায় ধর্মধ্বজের পুত্র কৃতধ্বজ। কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ।

[ভাগবত পু. ৯.১৩.১৯-২০; বিষ্ণু পু. ৬.৭-৮]

কৃতপ্রাপ্তি ভবিষ্যৎ দ্বাদশ মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন, সুতার তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে কৃতপ্রাপ্তি অন্যতম। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৯০]*

কৃতবন্ধু১ চতুর্থ মন্বন্তরের অধিপতি তামস মনুর পুত্রদের মধ্যে অন্যতম কৃতবন্ধু।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৫০]

কৃতবন্ধু২ মহাভারতের আদিপর্বের সূচনায় সঞ্জয় পুত্রশোকার্ত ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বহু প্রাচীন রাজর্ষির নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ করার পর কালের নিয়মে দেহত্যাগ করেছেন। এই প্রসঙ্গে কৃতবন্ধু নামে জনৈক প্রাচীন রাজার নাম উল্লেখ করেছেন সঞ্জয়।

[মহা (k) ১.১.১৩৮; (হরি) ১.১.১৯১]

কৃতবর্মা১ যদুকুলের অন্তর্গত ভোজবংশীয় হৃদিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃতবর্মা।

[মহা (k) ১.১.১৯৬, ২০৪; (হরি) ১.১.১৬০, ১৬৮; ভাগবত পু. ১.১৪.২৮; ৯.২৪.২৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৪০; মৎস্য পু. ৪৪.৮১; বায়ু পু. ৯৬.১৩৯]

☐ মহাভারতের আদিপর্বে কৃতবর্মাকে একান্ত কৃষ্ণ-অনুসারী এক বীরপুরুষ বলা হয়েছে। এমনকী এ প্রসঙ্গে তাঁর নাম সাত্যকির সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হতে দেখা যায়।

[মহা (k) ১.৬৩.২০৫; (হরি) ১.৫৮.১৪৪]

☐ মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে কৃতবর্মাকে মরুদ্‌গণের অংশজাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত্যুর পর তিনি আবার মরুদ্‌গণের দেহে প্রবেশ করেন।

[মহা (k) ১.৬৭.৮১; ১৮.৫.১৩; (হরি) ১.৬২.৮২; ১৮.৫.১২]

☐ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় অনান্য যদু-বৃষ্ণি বীরদের সঙ্গে কৃতবর্মাও উপস্থিত ছিলেন।

[মহা (k) ১.১৮৬.১৮; (হরি) ১.১৭৯.১৮]

□ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় কৃতবর্মা ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত ছিলেন।

[মহা (k) ১.২২১.৩০; ২.৪.১০; (হরি) ১.২১৪.৩১; ২.৪.১০নং শ্লোক পরবর্তী পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

□ সভাপর্বে কৃষ্ণ নিজমুখে কৃতবর্মার বীরত্বের প্রশংসা করে তাঁকে বিষ্ণুতুল্য যোদ্ধা বলে বর্ণনা করেছেন। জরাসন্ধের মথুরা আক্রমণ প্রতিরোধের সময় কৃতবর্মা যদু-বৃষ্ণিদের নেতৃস্থানীয় হয়ে ওঠেন, একথাও মহাভারতের তথ্য থেকে বোঝা যায়।

[মহা (k) ২.১৪.৫৮; (হরি) ২.১৪.৫৬]

□ কৃষ্ণের অনুপস্থিতির সুযোগে একবার তাঁর পরম শত্রু সৌভরাজ শাল্ব দ্বারকা আক্রমণ করেন। সেসময় কৃষ্ণ-পুত্র প্রদ্যুম্নের সঙ্গে একত্রে কৃতবর্মা শাল্বকে প্রতিরোধ করেন।

[মহা (k) ৩.১৮.২৫; (হরি) ৩.১৬.২৫]

□ মৎস্যরাজ বিরাটের কন্যা উত্তরার সঙ্গে অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুর বিবাহের সময় দ্বারকা থেকে অভিমন্যুকে সঙ্গে নিয়ে যেসব যদু-বৃষ্ণিবীরেরা মৎস্য রাজ্যে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কৃতবর্মা একজন।

[মহা (k) ৪.৭২.২১; (হরি) ৪.৬৭.২১]

□ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে দুর্যোধন সৈন্য সংগ্রহের জন্য দ্বারকায় যদু-বৃষ্ণিদের কাছে গিয়েছিলেন। সেসময় ভোজবংশীয় কৃতবর্মা দুর্যোধনকে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য দিয়েছিলেন। এছাড়াও আরেক অক্ষৌহিণী ভোজ ও অন্ধক সৈন্য নিয়ে নিজেও পরে কৌরবপক্ষে যোগদান করেন। *[মহা (k) ৫.৭.৩২; ৫.১৯.১৮-১৯; (হরি) ৫.৭.৩৪; ৫.১৯.১৮-১৯]*

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণ অনুগামী যদু-বৃষ্ণিবীর সাত্যকি কৃতবর্মার সঙ্গে যুদ্ধের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আদিপর্বে কৃতবর্মাকে কৃষ্ণ অনুরাগী বলা হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণ ও কৃতবর্মার সম্পর্ক কতটা অনুরাগের ছিল তা বুঝে ওঠা কঠিন। অন্যদিকে সাত্যকি কৃষ্ণ অনুগামী এবং অর্জুনের শ্রেষ্ঠ শিষ্য। ফলে কৃষ্ণ বিদ্বেষের কারণেই সাত্যকির সঙ্গে কৃতবর্মার সম্পর্ক খুব একটা মধুর হয়ে ওঠেনি। এখানে লক্ষণীয় যে, কৃতবর্মা কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও কৌরবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন যুদ্ধ করার জন্য। যার কারণও খুব সম্ভবত কৃতবর্মার কৃষ্ণবিদ্বেষ।

কৃতবর্মা সম্পর্কে কৃষ্ণের জ্ঞাতি। যদু-বৃষ্ণি বংশীয়দের মধ্যে পূর্বকালে স্যমন্তক মণি নিয়ে যে তীব্র সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল কৃষ্ণ ও কৃতবর্মা উভয়েই তার গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। কৃষ্ণপত্নী সত্যভামাকে নিয়েই এ বিবাদ শুরু। অসামান্য রূপবতী এবং ব্যক্তিত্বময়ী সত্যভামা সত্রাজিতের কন্যা। সে কালে যদু-বৃষ্ণি-ভোজ অন্ধকদের মধ্যে অনেকেই সত্যভামার গুণগ্রাহী ছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বৃষ্ণি বংশীয় অক্রূর এবং ভোজবংশীয় কৃতবর্মা ও তাঁর অনুজ শতধন্বা। অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন স্যমন্তক মণিটি সূর্য দেবতার উপসনা করে লাভ করেছিলেন সত্যভামার পিতা সত্রাজিৎ। বিষ্ণু পুরাণ ও হরিবংশের বর্ণনানুযায়ী কৃষ্ণ যাতে স্যমন্তক মণি চেয়ে না বসেন, সেইজন্য সত্রাজিৎ মণিটি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রসেনের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। বিষ্ণু পুরাণ বলেছে যে, কৃষ্ণ নাকি মহারাজ উগ্রসেনের জন্য এই মণিটির প্রতি সস্পৃহ হয়েছিলেন। কারণ উগ্রসেন যেহেতু রাজা, অতএব মণিটি দেশের রাজারই যোগ্য। হরিবংশে দেখা যাচ্ছে মণিটি একবার চেয়েও ফেলেছিলেন কৃষ্ণ। কিন্তু যাই হোক তিনি সেটি পাননি, এবং সামর্থ্য থাকলেও তিনি জোরও খাটাননি কেননা তাতে আত্মীয়বিরোধ হতে পারে—

গোত্রভেদভয়াচ্চ শক্তো'পি ন জহার।

এইটুকুতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে যে স্যমন্তক মণির অধিকার নিয়ে গোলমাল রীতিমতো পেকে উঠেছিল। এরই মধ্যে প্রসেন করলেন কী, মণিটি গলায় দুলিয়ে মৃগয়ায় চলে গেলেন। বনমধ্যে এক সিংহ প্রসনকে মেরে ফেলে। বৃষ্ণি এবং অন্ধকেরা অর্থাৎ কৃষ্ণের জ্ঞাতিগুষ্টি সবাই প্রসেনের মৃত্যুর খবর পেয়ে এই ধারণা করলেন যে, কৃষ্ণ একসময়ে প্রসেনের কাছে মণিটি চেয়েছিলেন, অতএব সুযোগ বুঝে এখন তিনিই প্রসেনকে বনের মধ্যে গুপ্তহত্যা করেছেন—

ততো বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ কৃষ্ণঃ প্রসেনবধকারণাৎ।
প্রার্থনাং তাং মণের্বুধ্বা সর্ব এব শশঙ্কিরে।

বিষ্ণু পুরাণ বলেছে সমস্ত যদুকুল প্রসেনবধের ব্যাপারে কৃষ্ণকে দায়ী করে কানাকানি করতে থাকল—

যদুলোকঃ পরস্পরং কর্ণাকর্ণি অকথয়ৎ।

যথাসময়ে সব কৃষ্ণের কানে উঠল। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার তাগিদে তিনি সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেন যে ঘটনাস্থল থেকে মণিটি তিনি অবশ্যই উদ্ধার করে আনবেন। এইবারে কৃষ্ণকে আমরা দেখব রীতিমত গোয়েন্দার ভূমিকায়। প্রথমেই তিনি প্রসেন হত্যার অকুস্থলে পৌঁছোতে চাইলেন। যারা পায়ের ছাপ, হাতের ছাপ, সব বোঝে সেই সব লোকেদের সাহায্যে—পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ। তিনি প্রথমে প্রসেনের পায়ের চিহ্ন জোগাড় করলেন। চিহ্ন ধরে এগোতে এগোতে শ্রান্ত ক্লান্ত কৃষ্ণ এক পাহাড়ের কাছে এসে দেখেন প্রসেন মরে পড়ে আছে। যদু কুলের জনগণ এবার ভাবল সিংহই প্রসেনকে মেরেছে, কিন্তু মণির কোনো হদিশ পাওয়া গেল না। কিছুদূর গিয়ে কৃষ্ণ দেখলেন সিংহটিও মরে পড়ে আছে এবং বিভিন্ন পদচিহ্ন পরীক্ষা করে দেখলেন যে, এক ভালুক তাকে মেরেছে। এবার ভালুকের পদচিহ্ন ধরে এগোতে এগোতে একটি গুহার কাছে গিয়ে দেখলেন পদচিহ্ন সেই গুহার মুখে এসেই মিলিয়ে গেছে। বৃষ্ণি-অন্ধকদের সবাইকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে কৃষ্ণ গুহার মধ্যে ঢুকলেন। অর্ধেক ঢুকেই তিনি একটি নারীকণ্ঠের সান্ত্বনাবাণী শুনতে পেলেন। রমণী বলছেন—সিংহ প্রসেনকে মেরেছে আবার জাম্ববান সেই সিংহকে মেরে মণি নিয়ে এসেছে। এ মণি এখন তোমারই—

তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ।

এমন স্পষ্ট কথা শুনে কৃষ্ণ গুহার মধ্যে ঢুকলেন এবং জাম্ববানের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ চলল একুশ দিন। বলরাম এবং অন্যান্য যাদব-বীরেরা সাত-আটদিন অপেক্ষা করে—সপ্তাষ্টদিনানি তস্থুঃ—ফিরে এলেন দ্বারকায়। আপন লোকেরা কৃষ্ণের শ্রাদ্ধশান্তিও করে ফেললেন। এদিকে কৃষ্ণ জাম্ববানকে হারিয়ে মণিরত্ন উদ্ধার করলেন এবং বীরত্বের উপহারস্বরূপ পেলেন জাম্ববানের কন্যা জাম্ববতীকে।

জাম্ববতীর সঙ্গে স্যমন্তকমণি হাতে কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরলেন। নিজের অপবাদ মোচন করার জন্য মণিটি সবার সামনে সত্রাজিতের হাতে দিলেন, কারণ তিনিই তো মূল অধিকারী—

দদৌ সত্রাজিতে তং বৈ সর্বসাত্বতসংসদি।

মণি ফিরে পেয়ে সত্রাজিতের মনে দ্বিগুণ লজ্জা হল। এই মণির জন্য তিনি কৃষ্ণকে লোভী, চোর সবই সাজিয়েছেন। একটু ভয়ও হল। তিনি কৃষ্ণকে খুশি করার জন্য কন্যা সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ দিলেন। সত্রাজিতের এই সিদ্ধান্তে অক্রূর, কৃতবর্মা এবং শতধন্বা প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁদের ধারণা হল যে, সত্রাজিৎ তাঁদের অপমান করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই সত্যভামাকে কৃষ্ণের হাতে তুলে দিয়েছেন। কৃতবর্মা এবং শতধন্বাকে নানা কথা বলে অক্রূর তাঁদের সত্রাজিৎকে হত্যা করার জন্য উত্তেজিত করে তুললেন। কৃতবর্মা এবং শতধন্বা দুই ভাই। তাঁদের মধ্যে শতধন্বা সত্যভামার প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত ছিলেন। আর কৃতবর্মার আসক্তি তত স্পষ্টভাবে বর্ণিত না হলেও তাঁরও যে দুর্বলতা ছিল সত্যভামার প্রতি—পুরাণের কথকঠাকুর সেকথা গোপনও করেননি। আর অক্রূর স্যমন্তক মণিও চান, সত্যভামাকেও চান। অভিজ্ঞ অক্রূর এবং কৃতবর্মা শেষপর্যন্ত কনিষ্ঠ শতধন্বাকে সত্রাজিৎ হত্যায় প্ররোচিত করতে লাগলেন। তাঁরা অঙ্গীকার করলেন যে, সত্রাজিৎকে হত্যা করে স্যমন্তক মণি হরণে কৃষ্ণ যদি বাধা দেন, তবে তাঁরা সম্মিলিতভাবে কৃষ্ণকে প্রতিরোধ করবেন। শতধন্বা, যিনি হয়তো অক্রূর এবং কৃতবর্মার থেকেও সত্যভামার প্রতি বেশি অনুরক্ত ছিলেন, হয়তো বা এদের থেকে বয়সও তাঁর কম ছিল, তিনি বললেন—ঠিক আছে, তাই হবে।

সুযোগও এসে গেল। ঘটনার পটভূমিকাটা এইরকম—দুর্যোধন পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠিয়েছেন জতুগৃহে বন্ধ করে দগ্ধ করার জন্য। জতুগৃহদাহ হয়ে গেছে এবং আচমকা পাণ্ডবদের মৃত্যুসংবাদ রটে গেলে কৃষ্ণ বারণাবতে পৌঁছোলেন ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য। কৃষ্ণ সহজেই বুঝতে পারলেন যে, পাণ্ডবরা জতুগৃহে দগ্ধ হননি। কিন্তু এদিকে আরেক বিপদ হল। কৃষ্ণের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে শতধন্বা নিদ্রিত অবস্থায় সত্রাজিতকে বধ করে স্যমন্তকমণি ছিনিয়ে নিলেন। পিতৃহীন, মণিহীন সত্যভামা একাই রথে করে বারণাবতে উপস্থিত হলেন।

সত্যভামা কৃষ্ণকে পিতার মৃত্যুসংবাদ জানালেন এবং জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যে তাঁর এই অপমান যে অসহ্য, সে কথাও কৃষ্ণকে বোঝাতে ভুললেন না। এত ঝামেলার মধ্যে স্যমন্তক মণির

মূল অধিকারী শ্বশুর সত্রাজিতের মৃত্যুতে কৃষ্ণ মনে মনে খুশিই হলেন। কিন্তু মুখে খুব রাগ দেখিয়ে বললেন—এই অপমানের বিহিত আমি করব।

দ্বারকায় ফিরে কৃষ্ণ প্রথমেই বলরামকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসার জন্য সচেষ্ট হলেন। কৃষ্ণ তাঁকে বললেন—সত্রাজিতের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে স্যমন্তক মণি এখন আমাদেরই—

স্যমন্তকো মহাবাহো হ্যস্মাকং স ভবিষ্যতি।

কৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে নিয়ে শতধন্বাকে মারার চেষ্টা নিলেন। খবরটা ফাঁস হয়ে যেতেই শতধন্বা দাদা কৃতবর্মার শরণ নিলেন। পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলে কৃতবর্মা কৃষ্ণ এবং বলরামের মতো শক্তিধরের বিরুদ্ধে যাবার অসামর্থ্য জানালেন। সময় বুঝে অক্রূরও শতধন্বাকে উলটো কথা বললেন। আসলে সত্রাজিৎ মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে এঁদের সত্যভামার ব্যাপারে খানিকটা ক্রোধশান্তি হয়েছিল।

আসলে সত্যভামার একাকী হস্তিনাপুর চলে যাওয়া এবং কৃষ্ণের ক্রুদ্ধ হয়ে দ্বারকায় ফিরে আসা থেকেই কৃতবর্মা আর অক্রূরের প্রত্যক্ষ ভীতি সঞ্চার হয়। হরিবংশ অবশ্য বলেছে যে, কৃষ্ণের সঙ্গে টক্কর দেবার ক্ষমতা অক্রূরের ছিল কিন্তু শঠতা করেই তিনি হৃদিকপুত্র শতধন্বাকে সাহায্য করেননি—

শক্তো'পি শাঠ্যাদ্ হার্দিক্যমক্রূরো নাভ্যপদ্যত।

তবে অক্রূর রাজনৈতিক কারণে শতধন্বার সাহায্যে এগিয়ে এলেন না—এটা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু কৃতবর্মাও সহোদর শতধন্বাকে এমন বিপদে ফেলে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেন কেন, তা বুঝে ওঠা খুব কঠিন নয়। অবশ্য মহাকাব্য বা পুরাণে সরাসরি এর কোনো কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি বটে, তবে যদু-বৃষ্ণিদের অন্তঃকলহের মধ্যেও কৃষ্ণ যেহেতু রাজনৈতিক-ভাবে অনেক বেশি শক্তিমান, তাই কৃষ্ণের ভয়েই সম্ভবত কৃতবর্মা এজাতীয় সিদ্ধান্ত নেন। কংসনিধনের মাধ্যমে ভোজদের প্রাধান্য নষ্ট করে যদু-বৃষ্ণিকুলের মধ্যে কৃষ্ণ-বলরাম যেহেতু নেতৃস্থানীয় হয়ে ওঠেন, তাই ভোজবংশীয় কৃতবর্মা আধিপত্যের দ্বন্দ্বে প্রথম থেকেই কৃষ্ণের বিপক্ষ শিবিরের মানুষ হয়ে উঠেছেন। সত্রাজিৎকে মেরে ফেলেছেন বলে কৃষ্ণের হাতে শতধন্বার মৃত্যু একরকম নিশ্চিত ছিল বলেই অন্তত মণিটি বাঁচুক এই কথা ভেবে শতধন্বা স্যমন্তক মণিটি অক্রূরের হাতে তুলে দিয়ে প্রাণ রক্ষার তাগিদে বনে পালিয়ে যান। ফলত কৃষ্ণ শতধন্বাকে বধ করেও স্যমন্তক মণিটি পাননি। পরে অবশ্য তাঁরই চাতুর্য্য ও বিচক্ষণতায় অক্রূরের কাছে থাকা মণিটি আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু এই ঘটনাপ্রবাহের শেষ জায়গায় শতধন্বার হত্যাকারী কৃষ্ণ কৃতবর্মার সাক্ষাৎ শত্রু হয়ে ওঠেন। কিন্তু আবারও বলতে হবে, কৃষ্ণের রাজনৈতিক ক্ষমতা তথা সহায়শক্তি এতটাই ছিল যে, কৃতবর্মার পক্ষে সরাসরি কৃষ্ণের বিরোধিতা করা সম্ভব ছিল না তখনও।

[মহা (k) ৫.৫৭.২১; (হরি) ৫.৫৭.২১; ভাগবত পু. ১০.৫৬.১-৪৫; ১০.৫৭.১-৪০; বিষ্ণু পু. ৪.১৩.৯-৭১; হরিবংশ পু. ১.৩৮.১৩-৩৯]

□ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্বে কৃষ্ণের শান্তি দৌত্যের সময় দুর্যোধন প্রমুখেরা পাণ্ডবদের যুদ্ধের আগেই পরাজিত করার কৌশল হিসেবে কৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে বন্দি করতে চেয়েছিলেন। শান্তিদৌত্যের সময় হস্তিনাপুরে কৃষ্ণের সঙ্গী হন সাত্যকি এবং কৃতবর্মা। সাত্যকি প্রথমেই কৌরবদের দুরভিসন্ধির কথা জানতে পারেন। তখন তিনি গোপনে কৃতবর্মাকে যুদ্ধসজ্জা সমাপ্ত করে সৈন্যদের রাজসভার মূল দ্বারে স্থাপন করতে বলেন। কৃষ্ণকে রক্ষা করার এই কৌশলে সাত্যকি ও কৃতবর্মা উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। *[মহা (k) ৫.১৩০.১০-১১; (হরি) ৫.১২১.১০-১১]*

□ কৌরবপক্ষে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মোট এগারো অক্ষৌহিণী সৈন্য যোগ দিয়েছিল। দুর্যোধন আটজন কৌরব পক্ষীয় বীরকে এক এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিনায়ক নিয়োগ করেন। এই আটজন সেনানায়কের মধ্যে কৃতবর্মা একজন।

[মহা (k) ৫.১৫৫.৩২; (হরি) ৫.১৪৪.৩২]

□ পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে শৈব্যকে কৃতবর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। *[মহা (k) ৫.১৬৪.৬; (হরি) ৫.১৫৩.৬]*

□ ভীষ্ম স্বয়ং কৃতবর্মাকে একজন অতিরথ যোদ্ধা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি কৃতবর্মাকে দক্ষ অস্ত্রজ্ঞ এবং পারদর্শী যোদ্ধাও বলেছেন।

[মহা (k) ৫.১৬৫.২৪-২৫; (হরি) ৫.১৫৪.২৪-২৫]

□ অভিমন্যুর মৃত্যু প্রসঙ্গে কৃতবর্মার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। যুধিষ্ঠিরকে বন্দি করার উদ্দেশ্যে দুর্লঙ্ঘ্য চক্রব্যূহ নির্মাণ করলেন দ্রোণাচার্য। কিন্তু জটিল ব্যূহ রচনা করেও অভিমন্যুর পরাক্রম রোধ করা সম্ভব হল না। তখন দুর্যোধন, স্বয়ং দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল এবং কৃতবর্মা— এই সপ্তরথী একত্রে ব্যূহের মধ্যেই অভিমন্যুকে আক্রমণ করেন। এই ঘটনা অবশ্যই সেকালের প্রচলিত যুদ্ধনীতির পরিপন্থী। কারণ, সেই সময় একের প্রতি সম্মিলিত আক্রমণকে ক্ষত্রিয়ধর্ম বিরোধী বলে মনে করা হত।

সপ্তরথীর মধ্যে অন্যান্যদের তুলনায় কৃতবর্মার আচরণ এবং আক্রমণ দুইই ছিল জঘন্য। কৃতবর্মার এই নৃশংস আচরণের কারণও সম্ভবত কৃষ্ণ-বিদ্বেষ। লক্ষণীয় বিষয় হল, অভিমন্যু কৃষ্ণ-সখা অর্জুন এবং তাঁর স্নেহের ভগিনী সুভদ্রার সন্তান। অভিমন্যু কৃষ্ণের একান্ত প্রিয়পাত্রও বটে। হয়তো সেই কারণেই অভিমন্যু-হত্যায় কৃতবর্মার এই অগ্রণী ভূমিকা। *[মহা (k) ৭.৪৭.১৫; ৭.৪৮.১৪; (হরি) ৭.৪২.১৫; ৭.৪৩.১৪]*

□ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে যে তিন কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধা জীবিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কৃতবর্মা একজন। দুর্যোধনের পতনের পর অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্যের সঙ্গে শোকার্ত কৃতবর্মাও দ্বৈপায়ন হ্রদের নিকটবর্তী একটি অরণ্যে অবস্থান করছিলেন। অরণ্যে অশ্বত্থামা পাণ্ডব ও পাঞ্চালদের গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা করেন। কৃপাচার্যের সঙ্গে কৃতবর্মাও অশ্বত্থামার গুপ্ত হত্যার পরিকল্পনা মেনে নিতে পারেননি। দ্রোণ-পুত্র তাদের এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং উত্তেজিত হয়ে পড়েন। সৌপ্তিক পর্বে কৃতবর্মা ও কৃপাচার্যের সঙ্গে অশ্বত্থামার দীর্ঘ বচসার উল্লেখ পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কুরুবংশের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের প্রমাণ স্বরূপ কৃতবর্মা কৃপাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়ে অশ্বত্থামার অনুগমন করতে বাধ্য হন।

[মহা (k) ১০.১.১৬, ৫৬; ১০.৪-৬ অধ্যায় সম্পূর্ণ; (হরি) ১০.১.১৭, ৫৬; ১০.৪-৬ অধ্যায়]

□ অশ্বত্থামা শত্রুশিবিরে প্রবেশ করলে কৃতবর্মা এবং কৃপাচার্য শিবিরের দ্বারে পাহারা দিতে লাগলেন। অশ্বত্থামার অতর্কিত আক্রমণে হতচকিত পাঞ্চাল বীরেরা শিবির থেকে বেরিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে কৃতবর্মা কৃপাচার্যের সঙ্গে একত্রিত হয়ে তাঁদের হত্যা করতে লাগলেন। অনেকেই করজোড়ে তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেও তাঁরা সকলকেই হত্যা করেন। এরপর তাঁরা পাঞ্চাল শিবিরে অগ্নিসংযোগ করেন।

কৃতবর্মার এই আচরণকে অধার্মিক এবং নৃশংস বলা যায়। কারণ ভোজবংশীয় কৃতবর্মাকেও কৃপাচার্য ও অশ্বত্থামার সঙ্গে হত্যাকাণ্ড শেষে উল্লাস প্রকাশ করতে দেখা যায়।

[মহা (k) ১০.৯.১০৬-১১১; (হরি) ১০.৯.১০১-১০৪]

□ কৃতবর্মা এমন এক ব্যক্তি যাঁকে সেই স্যমন্তক মণি বা সত্যভামার প্রতি বিবাহ পূর্ব অনুরাগের সময় থেকে মৌষল পর্বে যদুবংশ ধ্বংস পর্যন্ত নানা বিবাদের কেন্দ্রস্থলে আবিষ্কার করা যায়।

মৌষল-পর্বে যদু-বংশীয়রা মদ্যপ অবস্থায় পরস্পরকে আক্রমণ করেন। প্রথমে সাত্যকি কৃতবর্মাকে পাঞ্চাল এবং পাণ্ডব পুত্রদের নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করাকে অক্ষত্রিয়োচিত বলে সমলোচনা করেন। সাত্যকি তাঁকে সতর্ক করে বলেন যে, যাদবরা এই অত্যাচার সহ্য করবেন না। অপমানিত কৃতবর্মা প্রত্যুত্তরে কুরুক্ষেত্রে সাত্যকির হাতে ছিন্নবাহু প্রায়োপবেশনরত ভূরিশ্রবার হত্যাকাণ্ড, শিখণ্ডীকে অগ্রবর্তী করে অর্জুনের ভীষ্মবধ, ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক দ্রোণাচার্য হত্যা, কর্ণ এবং দুর্যোধনের মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলে সাত্যকিকে তাঁর নিজের এবং পাণ্ডবদের অন্যায় আচরণের কথা বলেন। কৃষ্ণ এসব শুনে পূর্বেই কৃতবর্মার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এরপর আবার সাত্যকি স্যমন্তক মণি সংক্রান্ত বিবাদের সময় কৃতবর্মার ভূমিকার কথা তুলে তাঁকে আক্রমণ করেন। এসময় হঠাৎই সাত্যকি কৃষ্ণের সম্মুখেই তরবারি দিয়ে কৃতবর্মার শিরচ্ছেদ করেন। প্রকৃতপক্ষে কৃতবর্মার মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই যদু-বৃষ্ণি কুলের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আরম্ভ। সেই দিক থেকে বিচার করলে কৃতবর্মা যাদবকুলের সমস্ত ছোটো-বড়ো সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরকালীন জ্ঞাতি বিরোধের মূর্ত প্রতীক।

[মহা (k) ১৬.৩.১৭-৩২; (হরি) ১৬.৩.১৭-৩২; বিষ্ণু পু. ৫.৩৭.৩৬-৪২]

□ যদুবংশ ধ্বংসের পর অর্জুন যদুবংশীয়দের অবশিষ্ট উত্তরাধিকারীদের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসক

নিয়োগ করেছিলেন। এ সময় তিনি কৃতবর্মার পুত্র অশ্বপতিকে খাণ্ডব প্রস্থে অবস্থিত মাতৃকাবত প্রদেশের অধিপতি হিসেবে স্থাপন করেন। অর্জুন অবশিষ্ট ভোজবংশীয় স্ত্রীলোকদেরও সেখানেই পুনর্বাসিত করেন।

অবশ্য ভাগবত পুরাণে কৃতবর্মার পুত্রের নাম বলা হয়েছে মহাবল। এই মহাবলের সঙ্গে কৃষ্ণ-পত্নী রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মীর কন্যা চারুমতীর বিবাহ হয়েছিল। *[মহা (k) ১৬.৭.৬৯; (হরি) ১৬.৭.৮০; ভাগবত পু. ১০.৬১.২৪]*

কৃতবর্মা২ হৈহয় বংশীয় ধনকের (মতান্তরে কনকের) পুত্র কৃতবর্মা। ইনি কার্তবীর্য্যার্জুনের পিতা কৃতবীর্য্যের সহোদর।

[ভাগবত পু. ৯.২৩.২৩; বায়ু পু. ৯৪.৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৯.৪৮; মৎস্য পু. ৪৩.১৩]

কৃতবাক্ অঙ্গিরাবংশীয় মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৪৫.১০১]*

কৃতবাচ্ একজন ঋষি। বনবাসকালে পাণ্ডবরা দ্বৈতবনে উপস্থিত হলে সেখানে বসবাসকারী যেসব তপস্বী ব্রাহ্মণ পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। কৃতবাচ্ তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ৩.২৬.২৪; (হরি) ৩.২৩.২৪]*

কৃতবীর্য্য১ মহর্ষি কশ্যপের বংশধারায় দানবদের সৃষ্টি-কথা বলার সময় জনৈকা 'প্রবাহী'-র নাম উল্লিখিত হয়েছে বায়ু পুরাণে। তিনি দানবী কিনা তা বোঝা যায় না, কশ্যপের স্ত্রী হিসেবেও তাঁর নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু বলা হয়েছে—কোনো এক যজ্ঞকালে প্রবাহীর গর্ভে দশজন উত্তম 'গায়ন' অর্থাৎ দেব গন্ধর্বের জন্ম হয়—

প্রবাহী অজনয়ৎ পুত্রান্ যজ্ঞে বৈ গায়নোত্তমান্।

সেই দশজনের একজন হলেন কৃতবীর্য।

[বায়ু পু. ৬৮.৩৭-৩৮]

কৃতবীর্য্য২ যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর বংশধারায় হৈহয় বংশীয় রাজা ধনক অথবা কনকের পুত্র ছিলেন কৃতবীর্য্য। ইনি হৈহয় বংশীয় বিখ্যাত কার্তবীর্য্যার্জুনের পিতা। কার্তবীর্য্যার্জুনের আগে কৃতবীর্য্যের আরও একশো পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে তাঁরা সকলেই নাকি মহর্ষি চ্যবনের শাপে ভস্মীভূত হন।

[মৎস্য পু. ৪৩.১৩; ৬৮.৬-১২; বায়ু পু. ৯৪.৮; ভাগবত পু. ৯.২৩.২৩-২৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৯.৮; বিষ্ণু পু. ৪.১১.৩]

কৃতবেগ জনৈক প্রাচীন রাজর্ষি। যেসব প্রাচীন রাজা মৃত্যুর পর যমসভায় বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন, কৃতবেগ তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ২.৮.৯; (হরি) ২.৮.৯]

কৃতমাল বর্ষ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কেতুমাল বর্ষকে কৃতমাল বর্ষ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[দ্র. কেতুমাল বর্ষ]

কৃতমালা মলয় পর্বত (বর্তমান কেরালা রাজ্যের মধ্যে দিয়ে বিস্তৃত পশ্চিমঘাট পর্বতের অংশবিশেষ) থেকে উৎপন্ন একটি পবিত্র নদী। অবশ্য মৎস্য পুরাণ মতে কৃতমালা নদীটি মহেন্দ্রপর্বত (পূর্বঘাট পর্বতের অংশবিশেষ) থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

কৃতমালা দ্রাবিড় জনপদ সমূহের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। দ্রাবিড় জনজাতির রাজা সত্যব্রত একবার শফরী মৎস্যের রূপধারী বিষ্ণুকে কৃতমালা নদীর জল থেকে উদ্ধার করেন।

[ভাগবত পু. ৫.১৯.১৭; ৮.২৪.১২; ১১.৫.৩৯; মৎস্য পু. ১১৪.৩০; বায়ু পু. ৪৫.১০৫; বিষ্ণু পু. ২.৩.১৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৩৬; ২.৩৫.১৭]

□ ঔদ্ভিদ নামক পর্বতটি কৃতমালা নদীর তীরে অবস্থিত। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩৫.১৭]*

□ প্রাচীন কৃতমালা নদী বর্তমান তামিলনাড়ুর অন্তর্গত ভাইগাই (Vaigai) নদী। পশ্চিমঘাট পর্বতের ভারুসানাড়ু (Varusanadu) অংশ থেকে ভাইগাই নদীর উৎপত্তি। মাদুরাই শহরটি ভাইগাই নদীর তীরে অবস্থিত।

[GDAMI (N.L. Dey) p. 104]

কৃতযুগ *[দ্র. কৃত১]*

কৃতরথ ভাগবত পুরাণ অনুসারে নিমির বংশধারায় প্রতীপকের পুত্র এবং দেবমীঢ়ের পিতা কৃতরথ।

[ভাগবত পু. ৯.১৩.১৬]

বিষ্ণু পুরাণে আবার প্রতীপকের নামের পরিবর্তে প্রতিবন্ধক নামটি পাওয়া যায়।

[বিষ্ণু পু. ৪.৫.১২]

কৃতলক্ষণ মৎস্য পুরাণ মতে, যদু-বংশীয় বৃষ্ণির ঔরসে মাদ্রীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কৃতলক্ষণ একজন। *[মৎস্য পু. ৪৫.২]*

কৃতশর্মা১ ইক্ষ্বাকুবংশীয় ইড়বিড়ের পুত্র কৃতশর্মা। কৃতশর্মার পুত্র দিলীপ, যিনি খট্টাঙ্গ নামে পরিচিত।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১৮১]

কৃতশর্মা২ ইক্ষ্বাকু বংশধারায় রাজা ঐলবিলের পুত্র হলেন কৃতশর্মা। কৃতশর্মার পুত্র হলেন বিশ্বমহৎ।

[বায়ু পু. ৮৮.১৮১]

কৃতশৌচ কুরুক্ষেত্রের নিকট অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থ দর্শনে ভগবান বিষ্ণুর কৃপা লাভ হয়—

কৃতশৌচং, সমাসাদ্য তীর্থসেবী নরাধিপ।
পুণ্ডরীকমবাপ্নোতি কৃতশৌচো ভবেচ্ছ সঃ॥

[মহা (k) ৩.৮৩.২১; (হরি) ৩.৬৮.২১]

□ মৎস্য পুরাণ মতে, দেবী সতী এই তীর্থে সিংহিকারূপে পূজিতা।

[মৎস্য পু. ১৩.৪৫; দেবী ভাগবত পু. ৭.৩০.৭৫]

□ মহাদেব সৃষ্ট মাতৃকাগণ যখন সৃষ্টি সংহার করতে শুরু করেন, তখন তাদের ধ্বংস করার জন্য নৃসিংহদেব একদল মাতৃকা সৃষ্টি করেছিলেন। নৃসিংহদেব—সৃষ্ট মাতৃকারা মহাদেব—সৃষ্ট মাতৃকাদের ধ্বংস করেন। নৃসিংহদেব যে স্থানে এই মাতৃকাদের সৃষ্টি করেছিলেন ঠিক সেখানেই তাদের সঙ্গে নিয়ে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সেই স্থানটিই কৃতশৌচ তীর্থ নামে বিখ্যাত হয়।

[মৎস্য পু. ১৭৯.৪০-৯০]

□ ভগবান বিষ্ণু, নৃসিংহ রূপে এই তীর্থে অবস্থান করেন। *[বামন পু. ৯০.৫]*

কৃতশ্রম জনৈক ঋষি। ইনি ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত থাকতেন বলে জানা যায়।

মহাভারতের শান্তিপর্বে এঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে বানপ্রস্থ ধর্মের অন্যতম প্রবর্তক হিসেবে। যেসব মুনি-ঋষি বানপ্রস্থ অবলম্বন করে স্বর্গলাভ করেছিলেন, কৃতবেগ তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ২.৪.১৪; ১২.২৪৪.১৮; (হরি) ২.৪.১০ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ৫; পৃ. ২৬; ১২]

কৃতস্থলী পুরাণে পঞ্চচূড়া নামক অপ্সরাদের সে গণের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই গণের অন্তর্ভুক্ত অপ্সরাদের মধ্যে কৃতস্থলী একজন। তিনি চৈত্র মাসে সূর্যরথে বাস করেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কৃতস্থলীকে কৃতস্থলা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[ভাগবত পু. ১২.১১.৩৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৫; ৩.৩৩.১৯]

কৃতস্মর ভারতবর্ষে অবস্থিত একটি পর্বত।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.১৪]

কৃতস্মরতীর্থ প্রভাসক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। ভগবান শিব এই তীর্থে কৃতস্মর নামে লিঙ্গ রূপে পূজিত হন।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র) ১৮৩.৫]

কৃতাগ্নি যদু বংশীয় ধনকের পুত্র কৃতাগ্নি। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও মৎস্য পুরাণে কৃতাগ্নির পিতা ধনককে কনক নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিষ্ণু পুরাণে কৃতাগ্নিকে কৃত্যাগ্নি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৯.২৩.২৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৯.৮; মৎস্য পু. ৪৩.১৩; বিষ্ণু পু. ৪.১১.৩]

কৃতান্ত স্বারোচিষ মনুর পুত্রদের মধ্যে কৃতান্ত একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১৯; বায়ু পু. ৬২.১৮]

কৃতাস্ত্র যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক একজন রাজা। ইনি ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত থাকতেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ২.৪.৩২; (হরি) ২.৪.১০ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ৫; পৃ. ২৬]

কৃতাহার একজন বানরবীর। শ্বেত বানরের দশ পুত্রের মধ্যে কৃতাহার একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৮০]

কৃতি১ বিশ্বেদেবগণের একজন দেবতা।

ঋগ্‌বেদের মধ্যে অনেকগুলি সূক্তের দেবতা হলেন 'বিশ্বেদেবাঃ'। 'বিশ্বেদেবাঃ' মানে দাঁড়ায় সমস্ত দেবতা। বৈদিক শব্দের প্রথম বিখ্যাত কোষকার যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থ লিখেছেন—'বিশ্বেদেবাঃ' মানে সর্ব-দেবতা—বিশ্বেদেবাঃ সর্বে দেবাঃ। অর্থাৎ সমস্ত দেবতাই। প্রথম দিকে বৈদিকেরা যে তেত্রিশ জন দেবতার কথা বলতেন, তাঁদেরই বিশ্বেদেব বলা হত। পরবর্তী পর্যায়ে আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণও বিশ্বেদেবের পরিধিতে প্রবেশ করেন। ফলে বিশ্বেদেবগণের দেবতা সংখ্যা বেড়ে যায়। অবশেষে বিশ্বেদেবগণ বৈদিককালেই পিতৃগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান এবং তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ মেলে মহাভারতে। এখানে বলা হয়েছে যে বিশ্বেদেবগণ সবসময়েই পিতৃগণের সঙ্গে থাকেন—

অত্র বিশ্বে সদা দেবা পিতৃভিঃ সার্ধমাসতে।

[মহা (k) ৫.১০৯.৩; (হরি) ৫.১০১.৩]

□ পিতৃগণের সঙ্গে বিশ্বেদেবগণও আমাদের সামনে আবির্ভূত হন—

বিশ্বেদেবাশ্চ যে নিত্যং পিতৃভিঃ সহ গোচরাঃ।

[মহা (k) ১৩.৯১.২৪; (হরি) ১৩.৭৮.২৪]

☐ বিশ্বেদেবগণের সঙ্গে পিতৃগণ মিশে যাওয়ায় মহাভারতের কালেই বিশ্বেদেবগণের অন্তর্গত দেবতাদের নামের তালিকা পালটে যায় এবং তাঁদের সংখ্যাও একেক জায়গায় এক এক রকম। মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে বিশ্বেদেবগণের যে সব নাম আছে তার মধ্যে একটি নাম কৃতি।

[মহা (k) ১৩.৯১.৩৫; (হরি) ১৩.৭৮.৩৫]

কৃতি$_{২}$ একজন প্রাচীন রাজা। রাজসূয় যজ্ঞের আগে নারদ যুধিষ্ঠিরের কাছে যম-সভার বর্ণনা করছিলেন। সেই যম-সভায় উপস্থিত রাজাদের মধ্যে অন্যতম রাজা হিসেবে কৃতির নাম উল্লেখ করেছেন নারদ। *[মহা (k) ২.৮.৯; (হরি) ২.৮.৯]*

কৃতি$_{৩}$ মহাভারতের সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করার সময় দুর্যোধন অসূয়া-সহকারে পিতা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বলেছিলেন শূকর-দেশ বা শূকর-জনজাতির রাজা কৃতি যুধিষ্ঠিরের জন্য শত শত শ্রেষ্ঠ হাতি নিয়ে এসেছেন। শূকর জন-জাতির অধিপতি এই রাজা আর্যেতর জনগোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর নাম অবশ্যই কৃতি। সংস্কৃত 'কৃতিঃ' শব্দের সঙ্গে রাজা শব্দের সন্ধি হওয়ায় শ্লোকের মধ্যে কৃতি-শব্দে দীর্ঘ ঈকার এসেছে—

কৃতী রাজা চ কৌরব্য শূকরাণাং বিশাম্পতে।

এটা অনেকে বোঝেননি বলে শূকরদের রাজাকে কৌরব্য বলেছেন। কিন্তু শ্লোকে এটি সম্বোধন পদ এবং সেটা ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশে উচ্চারিত। *[দ্র. শূকর]*

[মহা (k) ২.৫২.২৫; (হরি) ২.৫০.২৫]

কৃতি$_{৪}$ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের একটি। ভগবান শঙ্করাচার্য কৃতি-শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন—এই পৃথিবীতে মানুষ যা করে, যেসব চেষ্টা, প্রয়াস, প্রযত্ন করে সেগুলি 'কৃতি'—সেই কৃতি বস্তুত তিনিই। কেননা, বিষ্ণু সর্বাত্মক, সর্বত্র আছেন এবং সমস্ত কিছুর আধার হিসেবেই তাঁকে লক্ষিত করা হয় বলে সমস্ত কৃত্য এবং কর্তব্যও তিনিই বটে—

পুরুষপ্রযত্নঃ কৃতিঃ ক্রিয়া বা; সর্বাত্মকত্বাত্
তদাধারতয়া বা লক্ষ্যতে কৃত্যেতি বা কৃতিঃ।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.২২; (হরি) ১৩.১২৭.২২; দ্র. শঙ্করাচার্যের টীকা]

কৃতি$_{৫}$ চন্দ্রবংশীয় রাজর্ষি নহুষের ছয় পুত্র সন্তানের অন্যতম কৃতি। সম্ভবত কৃতি নহুষের কনিষ্ঠ পুত্র।

[বিষ্ণু পু. ৪.১০.১; ভাগবত পু. ৯.১৮.১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৮.১২]

কৃতি$_{৬}$ ষষ্ঠ মন্বন্তরের অধিপতি চাক্ষুষ মনুর ঔরসে নড্বলার গর্ভজাত দশ পুত্রের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৭৯-৮০]

কৃতি$_{৭}$ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে, ভবিষ্যৎ সাবর্ণি মনুর কালে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন, সুতপ তার মধ্যে একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে কৃতি একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.১৪-১৬]

কৃতি$_{৮}$ চতুর্দশ মন্বন্তরের অধিপতি ভৌত্য মনুর পুত্রদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.১১৪-১১৫]

কৃতি$_{৯}$ বিদর্ভদেশে বিদর্ভ রাজার বংশের অধস্তন রোমপাদের পুত্র বভ্রু। বভ্রুর পুত্রের নাম কৃতি। যদিও বিষ্ণুপুরাণ-মতে 'কৃতি'-নয়, বভ্রুর পুত্রের নাম ধৃতি। কৃতি (মতান্তরে ধৃতি) উশিক-এর পিতা। *[ভাগবত পু. ৯.২৪.২; বিষ্ণু পু. ৪.১২.১৫]*

কৃতি$_{১০}$ সামবেদ সংহিতার শাখা-বিভাগ করেছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন দুজন। একজন পৌষ্যঞ্জি, অন্যজন হলেন কৃতি। সামগান করার ব্যাপারেও তাঁরা দু-জনেই শ্রেষ্ঠ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়—

সামগানাং তু সর্বেষাং শ্রেষ্ঠৌ দ্বৌ তু প্রকীর্তিতৌ।
পৌষ্যঞ্জিশ্চ কৃতিশ্চৈব সংহিতানাং বিকল্পকৌ॥

[বায়ু পু. ৬১.৪৮]

কৃতি$_{১১}$ মৈথিল জনকের বংশের অধস্তন পুরুষ বহুলাশ্বের পুত্র কৃতি। তিনি এই বংশের কনিষ্ঠতম কীর্তিত পুরুষ মহাবশীর পিতা। অন্য মতে কৃতিকেই জনক-বংশের শেষ পুরুষ বলে মনে করা হয়।

কৃতৌ সন্তিষ্ঠতে'য়ং জনক-বংশঃ।

[বিষ্ণু পু. ৪.৫.১৩; ভাগবত পু. ৯.১৩.২; বায়ু পু. ৮৯.২৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৪.২৩-২৪]

কৃতি$_{১২}$ মণিবর যক্ষের ঔরসে দেবজনীর গর্ভে জাত অনেকগুলি পুত্রের মধ্যে একজন।

[বায়ু পু. ৬৯.১৬১]

কৃতি$_{১৩}$ মৈথিল জনকের বংশের অধস্তন এক পুরুষ কৃতরথের পুত্র। তিনি বিবুধের পিতা।

[বিষ্ণু পু. ৪.৫.১২]

কৃতি$_{১৪}$ বশিষ্ঠ ঋষির পুত্র। ভবিষ্যৎ দ্বাদশ মন্বন্তর কালে রুদ্রপুত্র ঋতসাবর্ণি মন্বন্তরে যাঁরা সপ্তর্ষি হবেন, তাঁদের মধ্যে কৃতি মধ্যে একজন ঋষি।

[বায়ু পু. ১০০.৯৬-৯৮]

কৃতি১৫ রুরুর বংশধারায় কুমুদের পুত্র দেবসেনের ঔরসে মান্ধাতার কন্যা কেশিনীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন হলেন কৃতি।

[কালিকা পু. ৮৯.৩৫-৩৬]

কৃতি১৬ গায়ত্রীর চতুর্বিংশতি ঋষিদের একজন।

[দেবীভাগবত পু. ১২.১.১৮]

কৃতিকাশ্রমতীর্থ মহাভারতের অনুশাসনপর্বে বর্ণিত একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থে স্নান এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণ করলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয় বলে উল্লেখ আছে।

[মহা (k) ১৩.২৫.২৫; (হরি) ১৩.২৬.২৫]

কৃতিমান চন্দ্রবংশীয় দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর। যবীনরের পুত্র কৃতিমান। কৃতিমানের পুত্রের নাম সত্যধৃতি। *[ভাগবত পু. ৯.২১.২৭]*

কৃতিরাত ভাগবত পুরাণ ও বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে নিমির বংশধারায় মহাধৃতির পুত্র এবং মহারোমার পিতা কৃতিরাত।

[ভাগবত পু. ৯.১৩.১৭; বিষ্ণু পু. ৪.৫.১২]

কৃতী১ চন্দ্রবংশীয় দ্বিমীঢ়ের বংশধারায় সন্নতিমানের পুত্র কৃতী। এই কৃতী হিরণ্যনাভের কাছে উপদেশ লাভ করে প্রাচ্য সামবেদের ছয়টি সংহিতার অধ্যাপনা করেছিলেন বলে ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে। নীপ নামে কৃতীর একটি পুত্র ছিল।

[ভাগবত পু. ৯.২১.২৮-২৯]

কৃতী২ চন্দ্রবংশীয় রাজা অজমীঢ়ের বংশধারায় চ্যবনের পুত্র কৃতী। তিনি উপরিচরবসুর পিতা।

[ভাগবত পু. ৯.২২.৫]

কৃতী৩ শূকর দেশের রাজা। ইনি বহু গজমুক্তা উপঢৌকন নিয়ে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে উপস্থিত হয়েছিলেন বলে মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে।

[মহা (k) ২.৫২.২৫; (হরি) ২.৫০.২৫]

কৃতেয়ু বায়ু পুরাণ মতে রাজর্ষি পুরুর বংশধারায় রৌদ্রাশ্বের ঔরসে অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন হলেন কৃতেয়ু।

[বায়ু পু. ৯৯.১২৪]

কৃতৌজা যদুবংশীয় ধনকের পুত্র কৃতৌজা। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও মৎস্য পুরাণে ধনককে কনক নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৯.২৩.২৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৯.৮-৯; মৎস্য পু. ৪৩.১৩; বিষ্ণু পু. ৪.১১.৩]

কৃত্তিকা নক্ষত্রগুলির মধ্যে কৃত্তিকা একটি। তবে এঁকে নক্ষত্র না বলে নক্ষত্রমণ্ডলও বলা যায়। কারণ এঁরা সংখ্যায় ছয়জন। এই ছয়জন কৃত্তিকা কুমার-কার্তিকেয়কে প্রতিপালন করেছিলেন বলে জানা যায়। *[মহা (k) ১.৬৬.২৪; ৩.১৩৪.১৩; (হরি) ১.৬১.২৪; ৩.১১০.১৩]*

☐ মহাভারতের শল্যপর্বে স্কন্দ-কার্তিকেয়র জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, মহাদেবের বীর্য্য অগ্নিতে পতিত হয়েছিল। অগ্নি সেই তেজ-শক্তিকে দগ্ধ করতে পারলেন না। তিনি নিজে শক্তিসম্পন্ন ও তেজস্বী হয়েও মহাদেবের সেই তেজশক্তি ধারণও করতে পারলেন না। ব্রহ্মার আদেশে অগ্নি ওই তেজশক্তি গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন। গঙ্গাও সেই তেজ ধারণ করতে অসমর্থ হলেন এবং হিমালয় পর্বতে তা নিক্ষেপ করলেন। সেই তেজশক্তি থেকেই স্কন্দ কার্তিকেয় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই ছয়জন কৃত্তিকা পুত্রপ্রার্থিনী হয়ে কুমার কার্তিকেয়কে পালন করেছিলেন। কৃত্তিকাদের পুত্র বলে তাঁর নাম হয়—কার্তিকেয়।

[মহা (k) ৯.৪৪.৬-১৬; (হরি) ৯.৪১.৬-১৬; বায়ু পু. ৭২.৪২; মৎস্য পু. ৫.২৭; বিষ্ণু পু. ১.১৫.১১৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২১.১৪৫]

কৃত্তিবাসেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত অন্যতম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। বারাণসীক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রধান শিবলিঙ্গগুলির মধ্যে কৃত্তিবাসেশ্বর-শিব অন্যতম।

পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, একসময় গজাসুর নামে এক দৈত্যের অত্যাচারে দেব-মানব সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। গজাসুরের অত্যাচারের অন্যতম অঙ্গ ছিল তপোবনবাসী মুনি-ঋষিদের বধ করা। বারাণসীক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এই শিবলিঙ্গের সম্মুখে একদিন শিবভক্ত মুনিঋষিরা মহাদেবের আরাধনায় রত ছিলেন। এমন সময় গজাসুর সেখানে এসে উপস্থিত হল। গজাসুরের হাত থেকে ভক্তদের রক্ষা করার জন্য স্বয়ং মহাদেব আবির্ভূত হলেন। তাঁর অস্ত্রের আঘাতে গজরূপধারী সেই অসুরের মৃত্যু হল। মৃত্যুর আগে গজাসুর ভগবান শিবকে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর বলে বর্ণনা করে তাঁর স্তব করেন। মহাদেবের হাতে মৃত্যুর ফলে তিনি মুক্তি লাভ করবেন ভেবেও আনন্দ প্রকাশ করেন। তারপর তিনি ভগবান শিবকে নিজের গজচর্মটি পরিধেয় বস্ত্ররূপে গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। ভক্তবৎসল শিব সেই অনুরোধ রক্ষা

করে সেই গজচর্মটি (কৃত্তি) পরিধান করেন। গজচর্ম পরিহিত ভগবান শিব এই তীর্থে কৃত্তিবাসেশ্বর নামে পূজিত হন।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৭৬; কূর্ম পু. ১.৩১.১৪-১৬; পদ্ম পু. (আনন্দাশ্রম) স্বর্গ ৩৪.১০; নারদ পু. ২.৪৯.৬-৯]

কৃত্বী শুকদেবের কন্যা কৃত্বী। অজমীঢ়ের বংশধারায় পারের পুত্র নীপ কৃত্বীকে বিবাহ করেছিলেন। নীপের ঔরসে কৃত্বীর গর্ভে ব্রহ্মদত্ত নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। *[ভাগবত পু. ৯.২১.২৫]*

□ মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, শুকদেবের ঔরসে পীবরীর গর্ভজাত কন্যা হলেন কৃত্বী। অজমীঢ়ের বংশধারায় অনূহের সঙ্গে কৃত্বীর বিবাহ হয়। অনূহের ঔরসে কৃত্বীর গর্ভজাত পুত্র হলেন ব্রহ্মদত্ত। *[মৎস্য পু. ১৫.৮-৯; ৪৯.৫৭]*

কৃত্যানদী সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ভারতবর্ষের বর্ণনা দিতে গিয়ে ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত যেসব নদীর নাম উল্লেখ করেছেন, কৃত্যা তার মধ্যে একটি নদী। *[মহা (k) ৬.৯.১৮; (হরি) ৬.৯.১৮]*

কৃত্রক ভারতবর্ষের অন্তর্গত একটি পার্বত্য জনপদ। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.৫৭]*

কৃপ১ ঋষি শরদ্বানের ঔরসে কৃপাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি গৌতমের পুত্র শরদ্বান্ বেদ, শাস্ত্র ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলে দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হলেন। তিনি শরদ্বানের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য 'জানপদী' নামে এক অপ্সরাকে নিযুক্ত করেন।

সেই অপ্সরাকে দেখে শরদ্বান এতটাই মুগ্ধ হলেন যে, তিনি বিচলিত হয়ে তপস্যার আসন ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলেন। আসন ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সময় শরদ্বানের স্খলিত শুক্র একটি শরগুচ্ছের উপর পতিত হয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। সেই দ্বিধাবিভক্ত শুক্র থেকেই শরস্তম্বে একটি পুত্র এবং একটি কন্যার জন্ম হয়। সেইসময় রাজা শান্তনু মৃগয়া করতে শরদ্বানের আশ্রমে গিয়েছিলেন। হঠাৎই রাজার এক সৈন্য ওই পুত্র ও কন্যা সন্তানটিকে দেখতে পায় এবং শান্তনুকে জানায়। শিশুদুটির পাশে ধনুক, বাণ এবং হরিণের চর্ম দেখে শান্তনু বুঝতে পারেন যে, তাঁরা কোন ধনুর্বেদ পারদর্শী ব্রাহ্মণের সন্তান। তখন শান্তনু কৃপাবশত সেই শিশুদুটিকে নিয়ে 'এরা আমারই পুত্র কন্যা'—একথা বলে নিজের গৃহে চলে এলেন এবং তাদের লালন-পালন করতে লাগলেন। মহারাজ শান্তনু কৃপাবশত শিশুদুটিকে লালন-পালন করেছিলেন বলেই বালকটির নাম 'কৃপ' ও বালিকাটির নাম 'কৃপী' রাখা হল—

কৃপয়া যন্ময়া বালাবিমৌ সংবর্ধিতাবিতি।
তস্মাত্তয়োর্নাম চক্রে তদেব স মহীপতিঃ।
তস্মাৎ কৃপ ইতি খ্যাতঃ কৃপী কন্যা চ সা'ভবৎ॥

এদিকে কৃপ ও কৃপীর জন্মদাতা পিতা শরদ্বান তপোবলে এই সকল ঘটনা জানতে পারলেন। তিনি রাজভবনে এসে কৃপকে তাঁর গোত্র ও প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অবগত করালেন। তিনি কৃপকে নানারকম অস্ত্রবিদ্যা, ধনুর্বেদবিদ্যার বিভিন্ন জটিল বিষয় অধ্যয়ন করালেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কৃপ আচার্য পদ লাভ করলেন। কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষার জন্য ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে কৃপাচার্যকেই কুমারদের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। কৌরব-পাণ্ডবদের সঙ্গে বৃষ্ণি বংশীয় ও অনান্য কিছু দেশের রাজপুত্ররাও কৃপাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা লাভ করতে থাকেন।

[মহা (k) ১.১৩০.১-২৩; (হরি) ১.১২৫.১-২৫; ভাগবত পু. ৯.২১.৩৬; বায়ু পু. ৯৯.২০৪; বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.১৯.৬৭-৬৮]

□ ঋষি বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়কে মহাভারতের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, 'কৃপ' নামের এই ব্রহ্মর্ষি আসলে রুদ্রগণের অংশসম্ভূত—

যস্তু রাজন্ কৃপো নাম ব্রহ্মর্ষিরভবৎ ক্ষিতৌ।
রুদ্রাণাস্তু গণাদ্বিদ্ধি সম্ভূতমতিপৌরুষম্॥

কৃপাচার্য সম্ভবত অকৃতদার ছিলেন, কারণ তাঁর পত্নীগ্রহণের কোনো কথা মহাভারতের কবি উল্লেখ করেননি।

[মহা (k) ১.৬৭.৭৮; (হরি) ১.৬২.৭৮]

□ কুরুকুমাররা কৃপাচার্যের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করলেও, ভীষ্ম কিন্তু কৃপের শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। ভীষ্ম চেয়েছিলেন—যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন প্রভৃতি তাঁর পৌত্রেরা এক-একজন অস্ত্রবিদ্যায় দিক্‌পাল হয়ে উঠুক। কিন্তু যিনি বিশেষ বুদ্ধিমান নন, উদারচেতা

ও দেবতার সমান বলবানও নন, তিনি বলবান কুরুবালকদের কী শিক্ষা দেবেন—

নাল্পধীর্নামহাভাগস্তথা নানাস্ত্রকোবিদঃ।
নাদেবসত্ত্বো বিনয়েৎ কুরূনস্ত্রে মহাবলান্॥

এই কথা চিন্তা করে ভীষ্ম, দ্রোণের কাছে কৌরব ও পাণ্ডবদের শিষ্যরূপে সমর্পণ করলেন। ভীষ্মের এই ভাবনা থেকে বোঝা যায় যে, কৃপাচার্য যত বড়ো অস্ত্রবিদই হোন না কেন, তুলনামূলকভাবে তিনি যুদ্ধবিদ্যায় অল্পধীসম্পন্ন, তেমন উদারচেতাও নন, এমনকী তত বলবানও নন। যার জন্য কৃপাচার্যের পরে দ্রোণাচার্যের নির্বাচন হয়েছে।

[মহা (k) ১.১৩০.২৫-২৬; (হরি) ১.১২৬.২-৩]

☐ রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা সম্পূর্ণ হলে দোণাচার্য তাদের অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনের একটি আয়োজন করেন। সেই রঙ্গভূমিতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মন্ত্রীবর্গ, অন্যান্য সভাসদ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখের সঙ্গে কৃপকেও দর্শকের আসনে দেখা যায়—

তস্মিংস্ততো'হনি প্রাপ্তে রাজা সসচিবস্তদা।
ভীষ্মং প্রমুখতঃ কৃত্বা কৃপঞ্চাচার্যসত্তমম্॥

[মহা (k) ১.১৩৪.১-৩, ১৩, ১৪;
(হরি) ১.১২৯.১-৩, ১৬, ১৪]

☐ কৌরব ও পাণ্ডবদের শিক্ষাদানের জন্য হস্তিনাপুরে কৃপ ও দ্রোণ এই দুই আচার্যই একত্রে অবস্থান করেছিলেন। যদিও রাজবাড়ির দ্বিতীয় অস্ত্রগুরু হিসেবে দ্রোণ, কৃপের থেকেও অধিকতর মাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অস্ত্রকৌশল প্রদর্শনীর প্রারম্ভে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই দুই আচার্যকেই দক্ষিণাস্বরূপ সুবর্ণ-মণি-রত্ন এবং নানাবিধ বস্ত্র প্রদান করে সম্মান প্রদর্শন করেছেন—

প্রদদৌ দক্ষিণাং রাজা দ্রোণায় চ কৃপায় চ॥

এই ঘটনা থেকে প্রতীত হয় যে, রাজবাড়িতে দুই আচার্যের মর্য্যাদা অন্তত সমান ছিল।

[মহা (গীতা প্রেস) ১.১৩৩.২২ নং শ্লোকের উত্তর দাক্ষিণাত্য অধিক পাঠ দ্র.; ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৬;
(হরি) ১.১২৯.২২]

☐ রঙ্গভূমিতে রাজকুমাররা একে একে তাঁদের অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করতে থাকলে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের পর সেই বিস্তীর্ণ রঙ্গভূমিতে কর্ণ প্রবেশ করেন। কৃপ ও দ্রোণকে প্রণাম জানিয়ে অর্জুন যে যে কৌশল প্রদর্শন করেছিলেন কর্ণও সেই সেই কৌশল প্রদর্শন করলেন এবং শেষে কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এইসময়ে কৃপাচার্য কর্ণকে বললেন—এই অর্জুন কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করেছে, সে কুন্তীর কনিষ্ঠ ও পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র, তুমিও তোমার পিতা-মাতার পরিচয় ও বংশ পরিচয় দাও—

ত্বমপ্যেবং মহাবাহো! মাতরং পিতরং কুলম্।

তোমার বংশ পরিচয় জেনে অর্জুন যুদ্ধ করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন। কিন্তু রাজপুত্রেরা হীনবংশ ও হীনাচার লোকের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেন না—

ততো বিদিত্বা পার্থস্ত্বাং প্রতিযোৎস্যতি বা ন বা
বৃথাকুলসমাচারৈর্ন যুধ্যন্তে নৃপাত্মজাঃ॥

কর্ণের আস্ফালন যখন রঙ্গভূমিতে মূল আকর্ষণ, বিশেষত সেই আস্ফালন যখন দ্রোণাচার্যের প্রশিক্ষণ এবং অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্বকে নস্যাৎ করতে উদ্যত, তখন কৃপাচার্যের এই ভূমিকা তাঁর কূটনৈতিক পারদর্শিতাকেই প্রমাণ করে। *[মহা (k) ১.১৩৫ অধ্যায়; ১.১৩৬.৩০-৩৩;*
(হরি) ১.১৩০ অধ্যায়; ১.১৩১.৩০-৩৩]

☐ ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, বারণাবতের জতুগৃহে দগ্ধ হয়ে কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডবের মৃত্যুর গুজব যখন লোকমুখে ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র শ্রবণ করলেন, তখন কৃপাচার্যও সেই দুঃসংবাদ শুনে শোক প্রকাশ করেছিলেন। যদিও মহাভারতে এই ঘটনার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় নি। *[ভাগবত পু. ১০.৫৭.১-২]*

☐ হস্তিনাপুরে কৃপাচার্য এমন একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন যে, যুধিষ্ঠির যখন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয়যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, সেখানে যে পাঁচজন প্রধান মানুষকে তিনি নকুলের মাধ্যমে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কৃপাচার্য ছিলেন অন্যতম। সেখানে ভীষ্ম ও দ্রোণের পরেই এসেছে কৃপাচার্যের নাম—

নকুলং হাস্তিনপুরং ভীষ্মায় ভরতর্ষভ।
দ্রোণায় ধৃতরাষ্ট্রায় বিদুরায় কৃপায় চ॥

রাজসূয় যজ্ঞে সোনা-দানা, মণি-মুক্তো ইত্যাদি ধন-ঐশ্বর্য্যের রক্ষার ভার কৃপাচার্যের ওপরেই ছিল। এমনকী যজ্ঞে বৃত পুরোহিত ও ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা প্রদানের ভার-ও কৃপের ওপরেই ছিল।

[মহা (k) ২.৩৩.৫৪-৫৫; ২.৩৪.৮; ২.৩৫.৭;
(হরি) ২.৩২.৪৬-৪৭; ২.৩৩.৮; ২.৩৪.৭;
ভাগবত পু. ১০.৭৪.১০]

□ এরপর কৃপাচার্যকে আমরা দ্যূতক্রীড়ার সময় কুরুসভায় দেখতে পাই। পাশা খেলায় পরাজিত হয়ে সর্বস্বান্ত যুধিষ্ঠির যখন দ্রৌপদীকে পণ ধরলেন, তখন ভীষ্ম ও দ্রোণের সঙ্গে সঙ্গে কৃপও বিচলিত হয়ে পড়েন। মহাভারতের কবি এই পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে—ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতির ঘর্ম নির্গত হতে লাগল—

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাদীনাং স্বেদশ্চ সমজায়ত॥

[মহা (k) ২.৬৫.৪১; (হরি) ২.৬২.৩১]

□ দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত হতে দেখে যখন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুরেরা নির্বাক হয়ে রইলেন এবং দ্রৌপদীর কাতর প্রার্থনা ও অনেক অনুরোধ-উপরোধ ও শ্লেষবাক্য প্রয়োগেও যখন কেউ প্রতিবাদও করলেন না, তখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিকর্ণ আচার্য দ্রোণ ও কৃপকে উদ্দেশ করে বলেছেন—কেন এই দুই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না। এই নিরুত্তর আচরণ বস্তুত কৌরবগৃহে কৃপাচার্যের আশ্রিত ভাব এবং তন্নিবন্ধন স্বার্থচেতনা প্রকট করে দেয়। সেই সময় অবশ্য সভার মধ্যে নানারকম অমঙ্গলসূচক শব্দ হতে থাকলে ভীষ্ম, দ্রোণদের সঙ্গে কৃপও সভা ত্যাগ করে চলে যান। *[মহা (k) ২.৬৮.১৪; ২.৮১.২৬; (হরি) ২.৬৫.১৪; ২.৭৮.২২]*

□ বনবাসে যাওয়ার পূর্বে কুন্তীও সেই প্রশ্নই তুলেছেন যে, দ্রোণ ও কৃপ থাকতে দ্রৌপদীর সঙ্গে এই অন্যায় কী করে ঘটল। কারণটা আমরা আগেই জানিয়েছি।

[মহা (k) ২.৭৯.২৬; (হরি) ২.৭৬.২৫]

□ পাণ্ডবদের বনবাসের পর তাঁদের হৃতরাজ্য সগৌরবে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ভীষ্ম-দ্রোণের সঙ্গে কৃপাচার্যও দুর্যোধনকে অনুরোধ করেন। যদিও দুর্যোধন, কৃপাচার্যের কথায় কর্ণপাত করেননি। *[মহা (k) ৪.২৯.১; (হরি) ৪.২৭.১]*

□ দুর্যোধনের প্ররোচনায় কৃপ, ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ এবং অন্যান্য কৌরব বীরেরা বিরাট রাজার গো-সম্পদ হরণ করার জন্য বিরাট রাজ্যে উপস্থিত হলেন। প্রায় ষাট হাজার গোরু হরণ করলেন কৌরব বীরেরা। পাণ্ডবরা সেইসময় ছদ্মবেশে বিরাট রাজ্যেই অবস্থান করছিলেন এবং অজ্ঞাতবাসের সময়-সীমাও সবেমাত্র শেষ হয়েছে।

ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ ও দুর্যোধনদের প্রতিহত করার জন্য বিরাট রাজার পুত্র উত্তরের সারথি হয়ে বৃহন্নলাবেশধারী অর্জুন রণক্ষেত্রের উদ্দেশে রওনা দিলেন। অর্জুনের রথের চাকার শব্দে দ্রোণ বলে উঠলেন—রথের যা গম্ভীর শব্দ শোনা যাচ্ছে তাতে বোধ হচ্ছে যিনি আসছেন যুদ্ধ করতে তিনি অর্জুন ছাড়া আর কেউ নন—

যথা রথস্য নির্ঘোষো যথা মেঘ উদীর্য্যতে।
কম্পতে চ যথা ভূমির্নৈষোঽন্যঃ সব্যসাচিনঃ॥

দ্রোণাচার্যের মুখ থেকে অর্জুনের প্রতি এমন প্রশংসাবাক্য শুনে ক্ষিপ্ত কর্ণ বলে উঠলেন—আচার্যের যে অর্জুনের ওপরেই একমাত্র স্নেহ তা লক্ষ্য করে আসছি। অর্জুন আসতে-না-আসতেই তাঁর প্রশংসা শুরু করে দিয়েছেন। সেই মুহূর্তে কর্ণ যেভাবে আস্ফালন শুরু করলেন তাতে কৃপাচার্য কর্ণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণকে বেশ অপমান করেই বললেন—তুমি যুদ্ধের বিষয়ে কিছুই জানো না, কিংবা ফলের অপেক্ষা কর না। এখন যুদ্ধ করার সময়ই নয়। স্থান ও কাল বিবেচনা না করে যুদ্ধ করলে জয়সূচক কোনো ফল লাভ করা যায় না। আর এখন এই স্থানে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা তো উচিতই হবে না। কৃপাচার্য কর্ণের সামনে অর্জুনের পূর্বের বহু গুণপনা এবং যুদ্ধজয়ের উল্লেখ করে চরম অপমান করে বলেছেন—তুমি তো বিবেচনা না করেই তর্জনী তুলে ক্রুদ্ধ সর্পকে শাসন করার চেষ্টা করছ, আর ভাবছ যে এভাবেই তার বিষ দাঁত উপড়ে নেবে—

অবিমৃশ্য প্রদেশিন্যা দংষ্ট্রামাদাতুমিচ্ছসি॥

ছলে-কৌশলে তোমরা পাণ্ডবদের বনবাসে পাঠিয়েছিলে। আর তেরোটা বছর পাণ্ডবরা বনবাসের যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে, তার প্রতিশোধ নিতেই অর্জুন হিংস্র সিংহের মতো আসছে। অতএব একা একা যুদ্ধ করার জন্য বেশি সাহস করতে যেও না, যুদ্ধ করতে হলে আমরা সবাই মিলেই করব।

সম্ভবত দ্রোণাচার্যকে অপমান করাতেই কৃপাচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। লক্ষণীয় ভীষ্ম ও দুর্যোধন কৃপের মত মেনে নিয়ে দুজনেই ক্ষমা চাইলেন তার কাছে—

আচার্য এব ক্ষমতাং শান্তিরত্র বিধীয়তাম্॥

[মহা (k) ৪.৩৫.২-৫; ৪.৪৬.২২-২৪; ৪.৪৭.২১-২২; ৪.৪৯ অধ্যায়; ৪.৫১.১৬; (হরি) ৪.৩২.২-৫; ৪.৪১.১৯-২০; ৪.৪২.২১-২২; ৪.৪৪ অধ্যায়; ৪.৪৬.১৪]

□ অর্জুনকে অগ্রসর হতে দেখে কৃপ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখরা একটি ব্যূহ রচনা করে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন এবং গোরুগুলিকে হস্তিনাপুরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। ব্যূহের দক্ষিণ দিক রক্ষার দায়িত্বে রইলেন কৃপাচার্য।

[মহা (k) ৪.৫২.২১-২২; (হরি) ৪.৪৭.২১-২২]

□ রণস্থলে প্রবেশ করেই অর্জুন প্রথমে কৃপাচার্যের রথ প্রদক্ষিণ করে তাঁকে সম্মান জানিয়েছেন। বিরাট রাজার পুত্র উত্তরকে কৃপাচার্যের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—ইনিই কৃপাচার্য।

এখানে মহাভারতের কবি কৃপাচার্যের রথের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে, কৃপের রথ ছিল নীলপতাকা যুক্ত এবং ব্যাঘ্রচর্মাবৃত—

লোহিতাক্ষমরিষ্টং যং বৈয়াঘ্রমনুপশ্যসি।
নীলাং পতাকামাশ্রিত্য রথে তিষ্ঠন্তমুত্তর॥

[মহা (k) ৪.৫৫.৪১-৪২; (হরি) ৪.৫০.৮-৯]

□ এরপর উত্তর অর্জুনের রথ, কৃপাচার্যের রথের সামনে নিয়ে গেলে কৃপাচার্য ও অর্জুন উভয়ের প্রবল শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে যুদ্ধের সূচনা হল। এই যুদ্ধে প্রত্যাশিত ভাবেই অর্জুনের কাছে কৃপাচার্য পরাস্ত হলেন। তাঁর রথ বিধ্বস্ত হয়ে গেল, ধনুক ছিন্ন হল, সারথিও মৃত্যু বরণ করলেন। কৃপের এই করুণ অবস্থা দেখে অনান্য যোদ্ধারা তাঁকে নিয়ে কোনোরকমে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান—

ততঃ কৃপমুপাদায় বিরথং তে নরর্ষভাঃ।

[মহা (k) ৪.৫৭ অধ্যায়; (হরি) ৪.৫২ অধ্যায়]

□ ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি কুরু প্রবীণেরা দুর্যোধনকে সংযত হতে বলেছেন বারংবার। এমনকী উদ্যোগপর্বে ধৃতরাষ্ট্রও সঞ্জয়কে দুর্যোধন সম্পর্কে বলছেন—

আমার এই পুত্র উন্মত্তের মতো বলছে। এ যুদ্ধে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জয় করতে কখনো সে সমর্থ হবে না—

উন্মত্ত ইব মে পুত্রো বিলপত্যেষ সঞ্জয়।
ন হি শক্তো রণে জেতুং ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্॥

কিন্তু কোথাও কৃপাচার্যের কণ্ঠস্বর শোনা যায়নি। কৌরব সভায় ভীষ্ম, দ্রোণ দুইজনেই দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের হৃত রাজ্য ফিরিয়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু কৃপাচার্যকে সেকরম কোনো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় না।

কিন্তু অন্যান্যদের মতো কৃপও যে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ চাননি, সে কথা ধৃতরাষ্ট্রের কথা থেকেই প্রমাণিত হয়—

ন চ ভীষ্মো ন চ দ্রোণো নাশ্বত্থামা ন সঞ্জয়।
ন সোমদত্তো ন শল্যো ন কৃপো যুদ্ধমিচ্ছতি॥

[মহা (k) ৫.৫৮.৬-৭; (হরি) ৫.৫৭.৬৮-৬৯]

□ দুর্যোধন যখন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রমুখদের জিজ্ঞাসা করেন যে, পাণ্ডব বাহিনীকে কে কতদিনে ধ্বংস করতে পারবেন। তখন ভীষ্ম ও দ্রোণ বলেছেন এক মাসে, অশ্বত্থামা দশদিনে ও কর্ণ পাঁচ দিনে এই কাজটি করতে পারবেন বলেছেন। কিন্তু কৃপাচার্য তাঁর ক্ষমতা বুঝে বলেছেন যে তাঁর পুরো দু-মাস সময় লাগবে পাণ্ডব সৈন্য সংহার করার জন্য—

গৌতমো দ্বিগুণং কালমুক্তবানিতি নঃ শ্রুতম্।

[মহা (k) ৫.১৯৪.৫; (হরি) ৫.১৮৪.৫]

□ যুদ্ধের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য ও ভীষ্মের পর কৃপাচার্যকে প্রণাম করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে কৃপও ভীষ্ম ও দ্রোণের মতো বলেন—আমার কাছে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা না করলে, আমি তোমাকে পরাজয়ের জন্য অভিসম্পাত করতাম। মানুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কারও দাস নয়। আর সেইজন্যই আমি কৌরবপক্ষে বাঁধা পড়ে আছি। কৃপাচার্য বলেছেন যে, আমি জানি ক্লীব ব্যক্তির মতো কথা বলছি, তবুও কৌরবপক্ষে থেকেই আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধত্যাগের পরামর্শ ছাড়া আর যা চাও তাই তোমাকে দেব যুধিষ্ঠির—

অতস্ত্বাং ক্লীববৎ ব্রূয়াং যুদ্ধাদন্যৎ কিমিচ্ছসি॥

আসলে কৃপাচার্যকে দ্রোণ-ভীষ্মের কারণেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। কারণ ভীষ্ম-দ্রোণের মতো কৃপও কুরুবাড়ির অন্নদাস ছিলেন। কৃপাচার্যের এই অসহায়তা বুঝে যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে জানতে চাইলেন—কি উপায়ে কৃপাচার্য বধ্য হবেন। এই কথাটি তিনি ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যকেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু কৃপাচার্য চিরজীবী। তিনি কারও বধ্য নন। একথা স্মরণ করে যুধিষ্ঠির চুপ করে রইলেন। কৃপাচার্য তখন যুধিষ্ঠিরের মনোভাব বুঝতে পেরে বলেছেন—মহারাজ, আমি অবধ্য, কিন্তু তোমারই জয় হবে—

তং গৌতমঃ প্রত্যুবাচ বিজ্ঞায়াস্য বিবক্ষিতম্।
অবধ্যো'হং মহীপাল যুধ্যস্ব জয়মাপ্নুহি॥

কোন তপস্যায় বা কি উপলক্ষ্যে কৃপাচার্য এই চিরজীবিতার বর লাভ করেছিলেন, সে প্রসঙ্গ মহাভারতে উল্লিখিত হয়নি। সম্ভবত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরেও কৃপাচার্যকে জীবিত থাকতে দেখে মহাভারতের কবি কৃপাচার্যের এই চিরজীবিতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন।

[মহা (k) ৬.৪৩.৭৪; (হরি) ৬.৪৩.৬৯]

□ এরপর কৃপাচার্যকে আবার দ্রোণপর্বে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যায়। অর্জুনপুত্র অভিমন্যু যখন বীর বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন, তখন কৃপাচার্য্য অভিমন্যুর পৃষ্ঠবর্তী সারথিদ্বয়কে বধ করেন—

অশ্বানস্যাবধীদ্ দ্রোণো গৌতমঃ পার্ষ্ণিসারথী॥

[মহা (k) ৭.৪৭.৩২; (হরি) ৭.৪২.৫৬]

□ অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করলে শারদ্বত-কৃপ ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করতে থাকেন। কৃপাচার্যের সঙ্গে অশ্বত্থামাও অর্জুনের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু অর্জুনের নিক্ষিপ্ত বাণগুলি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, কৃপাচার্য রথেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। কৃপ, অর্জুনের কাছে পরাস্ত হলে অর্জুন গুরুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করায় নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকেন।

[মহা (k) ৭.১৪৭.১১-২৬; (হরি) ৭.১২৮.১১-২৬]

□ জয়দ্রথ-বধের পর কর্ণ দুর্যোধনকে ভরসা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি একাই কৃষ্ণ ও সসৈন্য পাণ্ডবদের বধ করবেন এবং দুর্যোধনকে নিষ্কন্টক রাজ্য প্রদান করবেন। কর্ণের এই আস্ফালন সহ্য করতে না পেরে কৃপাচার্য কঠোরভাবে কর্ণকে উপহাস করে বলেছিলেন—সবসময়েই তুমি অনেক বড়ো বড়ো কথা বলে থাক, কিন্তু কোনোদিন তেমন কোনো ফল তো দেখলাম না, যাতে তোমার বিক্রম দুর্যোধনকে জয় এনে দিল—

বহুশঃ কথসে কর্ণ কৌরবস্য সমীপতঃ।
ন তু তে বিক্রমঃ কশ্চিদ্ দৃশ্যতে ফলমেব বা॥

বহুবার অর্জুনের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই হয়েছে তোমার, কিন্তু এমন কোনো উদাহরণ তুমি দিতে পারবে না, যেখানে তুমি না পরাস্ত হয়ে শুধু জয়ী হয়েছ—

সর্ব্বত্র নির্জিতশ্চাসি পাণ্ডবৈঃ সূতনন্দন!

কৃপাচার্য এবার ঘোষযাত্রাপর্বে কর্ণের চোখের সামনে দুর্যোধনের অপহরণ এবং বিরাট রাজার গোহরণের সময় অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণের অকৃতকার্যতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন—তুমি একা অর্জুনের সঙ্গেই এঁটে উঠতে পারো না, তাহলে কৃষ্ণ সহ সমগ্র পাণ্ডবকে জয় করার ইচ্ছা প্রকাশ কর কোন সাহসে? শরৎকালের জলশূন্য মেঘ যেমন শুধুই গর্জন করে, কিন্তু বর্ষণ করে না, ঠিক তেমনই তুমিও গর্জন করছ। কিন্তু অর্জুনকে দেখামাত্রই তোমার সব গর্জন স্তব্ধ হয়ে যাবে—

দুর্লভং গর্জিতং পুনঃ॥

কৃপাচার্য এরপর ব্যঙ্গ করে কর্ণকে বলতে থাকেন—ক্ষত্রিয়েরা বাহুবলে বীর, ব্রাহ্মণেরা বাক্‌শক্তিতে বীর, অর্জুন ধনুর গুণে বীর, আর কর্ণ শুধু সঙ্কল্পেই বীর।

ধনুষা ফাল্গুনঃ শূরঃ কর্ণঃ শূরো মনোরথৈঃ॥

কৃপাচার্যের ব্যঙ্গোক্তি শুনে কর্ণ কিন্তু একটুও দমলেন না। উল্টে অনেক কটু কথা শোনালেন কৃপাচার্যকে। এইভাবে দুই জনের বাগ্‌বিতণ্ডা পারস্পরিক ব্যক্তিগত আক্রমণে পরিণত হল। বাচিক আক্রমণ এমন জায়গায় পৌঁছোল যে, কর্ণ গুরুস্থানীয় কৃপাচার্যের জিভ কেটে নিতে চাইলেন খড়্গ দিয়ে—

ততস্তে খড়্গমুদ্যম্য জিহ্বাং ছেৎস্যামি দুর্মতে।

[মহা (k) ৭.১৫৮ অধ্যায়; (হরি) ৭.১৩৮ অধ্যায়]

□ মাতুলের এই অপমান সহ্য করতে না পেরে অশ্বত্থামা কর্ণের শিরচ্ছেদ করতে উদ্যত হলেন। এই অবস্থায় কৃপাচার্য ও দুর্যোধন কর্ণ ও অশ্বত্থামাকে অতি কষ্টে শান্ত করলেন।

[মহা (k) ৭.১৫৯.৯-১০; (হরি) ৭.১৩৯.৯-১০]

□ কৃপাচার্য এবার তাঁর শান্ত স্বভাববশত কিছুটা কোমল স্বরে কর্ণকে বললেন যে, আমরা তোকে ক্ষমা করলাম, কিন্তু তোর সকলকে ছোটো করে দেখার যে স্বভাব বা তোর অহঙ্কার অর্জুন চূর্ণ করে দেবে—

দর্পমুৎসিক্তমেতং তে ফাল্গুনো নাশয়িষ্যতি॥

[মহা (k) ৭.১৫৯.১৮; (হরি) ৭.১৩৯.১৮]

□ কৃপাচার্য কৌরবপক্ষের প্রবীণ যোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাই কর্ণের মৃত্যুর পর কৌরব সেনাদের দুরবস্থা আর অর্জুনের বিক্রম দেখে তিনি দুর্যোধনকে বললেন যে, ক্ষত্রিয়ের ধর্মই যুদ্ধ করা এবং ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধবিমুখ হওয়াটাই অধর্মের। কিন্তু যারা বাঁচতে চায়, তাঁদের কাছে এই ক্ষত্রিয় জীবিকা খুব কঠিন—

তে স্ম ঘোরাং সমাপন্না জীবিকাং জীবিতার্থিনঃ॥

আসলে কৃপাচার্য বৃদ্ধ, উপরন্তু ব্রাহ্মণ। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু দেখতে দেখতে শ্রান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। দুর্যোধনকে তিনি বললেন যে, ভীষ্ম শরশয্যায়, দ্রোণাচার্যও গত হয়েছেন, তাঁর বড়ো সহায় কর্ণও আর জীবিত নেই। জয়দ্রথ, দুঃশাসন ও অনান্য ভ্রাতারা এবং দুর্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণ কেউ-ই আর বেঁচে নেই। যাঁদের ভরসায়, যাঁদের আশায় তুমি এই রাজ্য শাসন করবে ভেবেছিলে তাঁরা সবাই একে একে চলে গেছেন—

যেষু ভারং সমাসজ্য রাজ্যে মতিমকুর্ম্মহি॥

তাছাড়া ভীম, কৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্মুখীন হতে পারবে এমন কোনো বীরপুরুষ আর আমাদের পক্ষে নেই। কৌরব সৈন্যরা অর্জুনকে দেখলেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে। কৃপাচার্য এবার রাজনীতিকে দর্শনের পর্যায়ে উন্নীত করে বললেন—তুমি তোমার সুরক্ষার জন্য বীর ও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের সংগ্রহ করেছিলে, অথচ আজ তোমার অস্তিত্ব নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে। এখন তুমি আত্মরক্ষা কর। কূটনীতিতে সন্ধি হয় সমানে সমানে অথবা হীন অবস্থায়। আর এটাই বৃহস্পতিকথিত কূটনীতি—

হীয়মানেন বৈ সন্ধিঃ পর্য্যেষ্টব্যঃ সমেন বা।
বিগ্রহো বর্দ্ধমানেন নীতিরেষা বৃহস্পতেঃ॥

আর এখন যেহেতু তোমার অবস্থা পাণ্ডবদের থেকেও খারাপ, তাই আপাতত যুদ্ধ থামিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর—

অত্র তে পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধং
সন্ধিং মন্যে ক্ষমং প্রভো॥

[মহা (k) ৯.৩. অধ্যায়; (হরি) ৯.৩ অধ্যায়]

□ কৃপাচার্য বুঝতে পেরেছিলেন যে দুর্যোধনকে সদুপদেশ দেওয়াটা নিজে নিজেই বিলাপ করে তারপর চুপ করে যাওয়ার মতো—

ইতি বৃদ্ধো বিলপ্যৈতৎ কৃপঃ শারদ্বতো বচঃ॥

দুর্যোধন কিন্তু কৃপের কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি কৃপাচার্যকে বললেন—আপনি আমার মঙ্গলের জন্যই সন্ধির প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু এতদিন আমি স্বাধীনভাবে রাজ্য ভোগ করে এসেছি, প্রচুর দান-ধ্যান করেছি, সেই আমিই আমার আত্মীয়দের কাছে দীন হয়ে থাকব! ক্লীবের মতো আচরণ করার সময় এখন নয়, এটা আমাদের যুদ্ধ করারই সময়।

[মহা (k) ৯.৫.২৫-২৭; (হরি) ৯.৪.২৩-২৫]

□ যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসে ভীমের গদাঘাতে ভগ্ন উরু দুর্যোধন যখন দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে আশ্রয় নিলেন, তখন অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মার সঙ্গে কৃপাচার্যও দুর্যোধনের সংবাদ শুনে দ্বৈপায়নহ্রদে এসে উপস্থিত হলেন। দুর্যোধন, কৃপাচার্যকে বললেন—অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করতে। দুর্যোধনের আদেশ অনুসারে কৃপ, অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করলেন।

[মহা (k) ৯.২৭.৫৩-৫৪; ৯.৬৫.৩৯-৪১;
(হরি) ৯.২৯.৫৫-৫৬; ১০.২.৩৭-৪০]

□ সেনাপতি অশ্বত্থামা শেষবারের মতো রাজা দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিলেন। কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা এরপর একটি বিস্তীর্ণ অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। পথ চলতে চলতে সন্ধ্যা নেমে এসেছিল। তাই একটি বটগাছের তলায় এই তিন যোদ্ধা রথ ছেড়ে এসে দাঁড়ালেন এবং সেখানেই বিশ্রাম নেওয়ার উদ্যোগ করলেন। পরিশ্রান্ত ও যুদ্ধক্ষেত্রে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা ঘুমিয়ে পড়লেন—

ততো নিদ্রাবশং প্রাপ্তৌ কৃপভোজৌ মহারথৌ॥

কিন্তু অশ্বত্থামার চোখে ঘুম এল না। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে না পারায় ক্রোধে, রোষে তিনি জেগে বসে রইলেন। হঠাৎই রাতের অন্ধকারে নিদ্রিত কাকেদের ওপর একটি পেচকের আক্রমণ দেখে ছলের মাধ্যমেই শত্রুসংহার করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন। তিনি ভাবলেন সামনাসামনি যখন পাণ্ডবদের পরাজিত করা অসম্ভব, তখন সুপ্ত অবস্থায় রাত্রির অন্ধকারে তিনি পাণ্ডবদের শেষ করে দেবেন—

ইত্যেবং নিশ্চয়ং চক্রে সুপ্তানাং নিশি মারণে॥

এই সিদ্ধান্তে অশ্বত্থামার এত উত্তেজনা হল যে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাতুল কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্মাকে গভীর নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুললেন—

সুপ্তৌ প্রাবধয়ত্তৌ তু মাতুলং ভোজমেব চ।

দুই সুপ্তোত্থিত বীরকে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন। অশ্বত্থামার পরিকল্পনার কথা শুনে কৃপাচার্য্য বিমূঢ় হয়ে গেলেন। এরপর কৃপাচার্য দৈব ও পুরুষকারের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে দুর্যোধনের অপব্যবহারের কথা স্মরণ করতে বললেন অশ্বত্থামাকে। তিনি অশ্বত্থামাকে বললেন যে, লোভী ও অদূরদর্শী দুর্যোধন বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ না নিয়ে, তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষীদের অগ্রাহ্য

করেছিলেন। অসৎ ও নীচ ব্যক্তির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন তিনি এবং তাঁদেরই বুদ্ধিতে এই বিরাট যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। আর আমরাও মূর্খের মতো তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হয়েছি।

কৌরব রাজসভায় থেকে এতদিন যে কৃপাচার্য শুধুমাত্র দ্রোণ-ভীষ্ম প্রমুখদের সমর্থন করে গেছেন, সেই কৃপাচার্য, ভীষ্ম ও দ্রোণের অনুপস্থিতিতে কী করে একা সিদ্ধান্ত নেবেন। আসলে এটি তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ।

তাই অশ্বত্থামাকে তিনি বলেছেন যে, এই বিপদে আমাকে বুদ্ধিবিপাকে পড়তে হয়েছে—

অনেন তু মমাদ্যাপি ব্যসনেনোপতাপিতা।

কৃপাচার্য, অশ্বত্থামাকে একথাও বললেন যে, আমরা এখন মোহগ্রস্ত অবস্থায় আছি। সুহৃদ-বন্ধুদের কাছে এখন আমাদের কী করণীয় সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহারানী গান্ধারী, মহামতি বিদুরকে আমরা এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তারপর আমাদের মঙ্গলের জন্য তাঁরা যা নির্ণয় করবেন, আমরা তাই করব—

তদস্মাভিঃ পুনঃ কার্যমিতি মে নৈষ্ঠিকী মতিঃ।

কৃপ বললেন, যারা পুরুষকারের দ্বারা কাজ সিদ্ধ করতে পারে না, দৈব তাদের আরও বিপদে ফেলে—

কৃতে পুরুষকারে চ যেষাং কার্যং ন সিধ্যতি।
দৈবেনোপ'হতাস্তে তু নাত্র কার্যা বিচারণা॥

[মহা (k) ১০.১-২ অধ্যায়; (হরি) ১০.৩-৪ অধ্যায়]

□ অশ্বত্থামা কিন্তু তাঁর মাতুলের কথা শুনতে চাইলেন না। তিনি বললেন, সবাই যে যার নিজের বুদ্ধি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। আর আমার বুদ্ধি যখন এই কাজটা করতে বলছে, তখন আমি তাই করব। অশ্বত্থামা বললেন, আমার পিতাকে অন্যায়ভাবে নিহত হতে দেখেও যদি উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ না করতে পারি, তাহলে লোকসমাজে কি সদুত্তর দেব—

পিতরং নিহতং দৃষ্টা কিং নু বক্ষ্যামি সংসদি।

আজই এই রাত্রিতেই পাণ্ডব-পাঞ্চালরা যখন তাদের শিবিরে সুখে নিদ্রা যাবে, তখন আমি তাদের হত্যা করব। কৃপাচার্য কিন্তু তাঁর পূর্বসিদ্ধান্তে স্থির থাকতে পারলেন না। দ্রোণহন্তা পাণ্ডবদের শাস্তি দেওয়ার কারণটা একটা কারণ তো বটেই, কিন্তু যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসার দৃঢ়তা—যা ভীষ্ম-দ্রোণের মধ্যে ছিল, সেই দৃঢ়তায় তিনি স্বয়ং স্থিত হতে পারেন না। তিনি শেষ পর্যন্ত অশ্বত্থামাকেই সাহায্য করবেন বলে কথা দিলেন এবং সেই রাত্রিতেই অশ্বত্থামার সঙ্গে শত্রুসংহারকর্মে ব্রতী হলেন। ক্রোধোন্মত্ত অশ্বত্থামা একাই শত্রুসংহারের উদ্দেশে প্রস্থান করলে, কৃপাচার্য নিরুপায় হয়ে কৃতবর্মাকে সঙ্গে নিয়ে ভাগ্নেকে অনুসরণ করলেন।

পাণ্ডব শিবিরের দ্বারদেশে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাকে রেখে অশ্বত্থামা ভিতরে প্রবেশ করলেন।

দ্বারদেশে রক্ষী থাকায় শিবিরের প্রতিষ্ঠিত দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে অশ্বত্থামা শিবিরের ফাঁকফোকর দিয়ে প্রবেশ করলেন। একে একে ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র নিহত হলেন অশ্বত্থামার হাতে। আর যাঁরা শিবিরের দ্বারদেশ দিয়ে বেরোতে চাইলেন, তাঁদের প্রত্যেকেই নিহত হলেন কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার অস্ত্রাঘাতে।

যে কৃপাচার্য এতকাল ভীষ্ম ও দ্রোণের সঙ্গে সমান মর্য্যাদা লাভ করেছেন, সেই কৃপ অশ্বত্থামার সন্তোষের জন্য এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করলেন। এরপর কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মার সঙ্গে দুর্যোধনের কাছে গেলেন। দুর্যোধনের মৃত্যুকাল আসন্ন বুঝতে পেরে কৃপ বললেন যে, জগতে দৈবের থেকে বড়ো আর কিছুই নেই। তা না হলে একাদশ অক্ষৌহিনী সেনার অধিপতি এইভাবে রক্তমাখা অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকেন? আর যে সুবিশাল গদাটি কোনো যুদ্ধে তিনি হাত থেকে নামাননি, সেই গদা কিনা মাটিতে পড়ে আছে পালঙ্কে শায়িত বধূর মতো! যাঁকে দেখলে বড়ো বড়ো বীরেরা ভয়ে মাথা নোয়াত, আজ তাঁরই মৃত শরীরের জন্য মাংসাশী পশুর দল অপেক্ষা করছে—

উপাসতে চ তং হ্যদ্য ক্রব্যাদা মাংসহেতবঃ।

এরপর অশ্বত্থামা, দুর্যোধনকে তাঁর প্রতিহিংসা-চরিতার্থ করার সংবাদ দিলে দুর্যোধন এই তিনজনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং পরম-তৃপ্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

[মহা (k) ১০.৩-৪ অধ্যায়; ১০.৫ অধ্যায়; ১০.৮ অধ্যায়; (হরি) ১০.৫ অধ্যায়; ১০.৬ অধ্যায়; ১০.৯ অধ্যায়;]

□ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষে যখন ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী প্রমুখরা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চলেছেন, তখন পুত্রশোকার্তা গান্ধারীকে কৃপ বলেছিলেন —আপনার পুত্ররা ভীত না হয়ে যুদ্ধ করতে করতে বীরের মতো যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করেছেন। আর আমরাও কিন্তু কৌরবশত্রু পাণ্ডবদের ছাড়িনি। রাতের অন্ধকারে জনপূর্ণ পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করে আমরা ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ সমস্ত পাঞ্চালদের হত্যা করেছি। সেই সঙ্গে দ্রৌপদীর পুত্রদেরও বধ করেছি। কারণ আমরা তিনজন সম্মুখ সমরে কিছুতেই পাণ্ডব সেনাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতাম না। কৃপাচার্যের স্বীকারোক্তির সুরে এই প্রতিশোধ-গ্রহণের কথা শুনে গান্ধারীর কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেই বিবরণ অবশ্য মহাভারতের কবি উল্লেখ করেননি। তবে গান্ধারীর কাছে কৃপ ভীত হয়ে বলেছেন যে, পাণ্ডবেরা তাঁদের পুত্রদের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে খুব শীঘ্রই আমাদের সন্ধান করবেন। তাই গান্ধারীর কাছে প্রস্থান করার অনুমতি চাইলেন কৃপাচার্য। তিনি দেখলেন কৃতবর্মা এবং অশ্বত্থামা অন্যত্র চলে গেছেন। তাই কৃপ হস্তিনাপুরেই ফিরে গেলেন।

[মহা (k) ১১.১১ অধ্যায়; (হরি) ১১.১০ অধ্যায়]

□ মহাভারতের কবি এরপরে কৃপাচার্য সম্বন্ধে বিশেষ কোনো সংবাদ দেননি। পাণ্ডবদের রাজত্বকালে কৃপাচার্যকে রাজসভায় কোনো মন্ত্রণা দিতেও দেখা যায়নি।

মহাভারতের মহাপ্রস্থানিক পর্বে যুধিষ্ঠির যখন মহাপ্রস্থানের আয়োজন করছেন তখন কৃপাচার্যকে আমরা দেখতে পাই খানিকটা আকস্মিকভাবেই। মহাপ্রস্থানের সময় রাজা যুধিষ্ঠির পরীক্ষিতের ওপর রাজ্যভার দিয়েছেন। কৃপাচার্যকে অভ্যর্থনা জানিয়ে পরীক্ষিৎকে তাঁর শিষ্যরূপে সমর্পণ করেন যুধিষ্ঠির—

শিষ্যং পরিক্ষিতং তস্মৈ দদৌ ভরতসত্তমঃ॥

[মহা (k) ১৭.১.১৫; (হরি) ১৭.১.১৫]

□ বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে যে, পাণ্ডবদের বংশধর পারীক্ষিত জনমেজয়ের পুত্র শতানীককেও কৃপাচার্য অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করেছিলেন।

[বিষ্ণু পু. ৪.২১.২]

□ কৃপাচার্য পাণ্ডবদের গুরু ছিলেন, মহাকাব্য-পুরাণে তাঁর সম্পর্কে শেষ সংবাদ ও মেলে পাণ্ডবদের বংশগুরু হিসেবে। কৃপ হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন, কুরুবংশ-বীজ পরীক্ষিতের সঙ্গে। তিনি রইলেন শেষ আচার্য হিসেবে। আর ঠিক এখানেই কৃপাচার্যের চিরজীবিতার প্রবাদটিও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।

□ ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের দিব্য বিশ্বরূপ দর্শনের সময় ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা, কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডবদের সঙ্গে কৃপাচার্যও সমন্তপঞ্চকে উপস্থিত ছিলেন। *[ভাগবত পু. ১০.৮২.২৪]*

□ পুরাণ মতে ভাবী মন্বন্তরে যাঁরা সপ্তর্ষি হবেন, শারদ্বত বংশীয় কৃপ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *[বায়ু পু. ১০০.১১;*
বিষ্ণু পু. ৩.২.১৭]

কৃপ২ প্রাচীন রাজর্ষিদের মধ্যে অন্যতম বলে মহাভারতের অনুশাসন পর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

□ বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, গয়াসুরের পবিত্র দেহে যখন ব্রহ্মা যজ্ঞের আয়োজন করেন, তখন সেই যজ্ঞের পৌরোহিত্য কার্যের জন্য যেসব মহর্ষিরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কৃপ অন্যতম। *[বায়ু পু. ১০৬.৩৪]*

যেসব রাজর্ষিরা শরৎ ও কার্তিক মাসে মাংস ভক্ষণ করতেন না এবং মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন কৃপ।

[মহা (k) ১৩.১১৫.৬৪; (হরি) ১৩.১০০.১০২]

কৃপ৩ ধ্রুবের পুত্র শিষ্টের ঔরসে সুচ্ছায়ার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন কৃপ।

[মৎস্য পু. ৪.৩৯]

কৃপণ *[দ্র. তৃণক]*

কৃপা পুরাণ অনুসারে শুক্তিমান্ পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছিল যেসব নদী, সেই নদীগুলির মধ্যে কৃপা একটি। শুক্তিমান পর্বত বলতে বিন্ধ্য পর্বতের একটি অংশকে বোঝায়, যা ছোটোনাগপুর মালভূমির মধ্যে দিয়ে প্রসারিত। সুতরাং কৃপা নদী বিন্ধ্য পর্বতের এই বিশেষ অংশজাতই হওয়া উচিত। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৩৮;*
বায়ু পু. ৪৫.১০৭; মৎস্য পু. ১১৪.৩২;
মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.৩০]

পণ্ডিত D.C. Sircar অন্যান্য পুরাণগুলির পাঠ তুলনামূলক পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, এই কৃপা নদীকেই কৃশা, কৃপা এমনকী ক্ষিপ্রা নামেও চিহ্নিত করা হয়েছে অন্যান্য পুরাণে। কূর্ম

পুরাণে কৃপার পরিবর্তে 'ক্ষিপ্রা' পাঠ ধৃত হওয়ায় ক্ষিপ্রা বা শিপ্রা নদীরই অপর নাম বা পাঠান্তর কৃপা—এমনটা মনে হওয়াই খুব স্বাভাবিক। তবে পণ্ডিত H.C. Raychaudhuri -র মত উদ্ধার করে পণ্ডিত Sircar জানিয়েছেন যে, ছোটনাগপুর মালভূমির মধ্য দিয়ে কোপা নামে একটি নদী আজও প্রবাহিত হয়। তাঁর মতে, পূর্ব ভারতের আধুনিক বাবলা (Babla) নদীর শাখা কোপা নদীটিই প্রাচীন কৃপা। এটি বিহার ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। এই নদীটিই প্রাচীনকালে কৃপা, কৃশা বা কূপা নামে পরিচিত ছিল।

[GAMI (D.C. Sircar) p. 62; PHAI p. 293]

কৃপি বায়ু পুরাণ অনুসারে দ্বাদশ পর্যায়ের ভবিষ্য মন্বন্তরে, ঋতসাবর্ণি মনুর কালে দেবতারা যে পাঁচটি গণে বিভক্ত হবেন তাঁদের মধ্যে সুকর্ম্মা একটি গণ।

কৃপি এই 'সুকর্ম্মা' গণের অর্ন্তভুক্ত একজন দেবতা। *[বায়ু পু. ১০০.৯২]*

কৃপী ঋষি শরদ্বানের ঔরসে কৃপী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৃপাচার্যের ভগিনী। দ্রোণাচার্যের পত্নী এবং অশ্বত্থামার জননী। *[মহা (k) ১.৬৩.১০৭-১০৮; (হরি) ১.৫৮.১৪৬-১৪৭; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১৮]*

□ মহর্ষি গৌতমের পুত্র শরদ্বান্ বেদ, অনান্য শাস্ত্র ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলে দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হলেন। তিনি শরদ্বানের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য জানপদী নামে এক দেবকন্যাকে নিযুক্ত করেন।

জানপদী অপ্সরাকে দেখে শরদ্বানের চিত্তে চঞ্চলতার সৃষ্টি হল। তিনি ওই দেবকন্যাকে দেখে এতটাই মুগ্ধ হলেন যে তাঁর হাত থেকে ধনুর্বাণ মাটিতে পড়ে গেল। তিনি বিচলিত হয়ে আসন ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলেন। আসন ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সময় শরদ্বানের স্খলিত শুক্র একটি শরগুচ্ছের উপর পতিত হয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। সেই দ্বিধাবিভক্ত শুক্র থেকেই শরস্তম্বে একটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম হয়। সেই সময় রাজা শান্তনু মৃগয়া করতে বেরিয়ে পৌঁছেছিলেন শরদ্বানের আশ্রমের কাছে। হঠাৎই রাজার এক অনুচর ওই পুত্র ও কন্যা সন্তানটিকে দেখতে পায় এবং শান্তনুকে জানায়। শিশুদুটির পাশে ধনুক, বাণ ও হরিণের চর্ম দেখে শান্তনু বুঝতে পারেন যে, তারা কোনো ধনুর্বেদে পারদর্শী ব্রাহ্মণের সন্তান। তখন রাজা শান্তনু কৃপাবশতঃ সেই শিশুদুটিকে 'এরা আমারই পুত্র কন্যা'—একথা বলে নিজের গৃহে নিয়ে এলেন এবং তাঁদের লালন-পালন করতে লাগলেন। শান্তনু মনে মনে ভাবলেন —আমি যখন কৃপা করে এই পুত্র ও কন্যাকে পরম যত্নে প্রতিপালন করলাম, তখন আমিই এদের নামকরণ করব। মহারাজ শান্তনু কৃপাবশতঃ শিশুদুটিকে লালন-পালন করেছিলেন বলেই বালকটির নাম 'কৃপ' ও বালিকাটির নাম 'কৃপী' রাখা হল।

[মহা (k) ১.১৩০.১-২০; (হরি) ১.১২৫.১-২০; বায়ু পু. ৯৯.২০৪; ভাগবত পু. ৯.২১.৩৬]

□ শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে দ্রোণাচার্য বিবাহ করেন। কৃপীর গর্ভে দ্রোণের অশ্বত্থামা নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

[মহা (k) ১.১৩০.৪৫-৪৬; (হরি) ১.১২৬.২১-২২]

□ কৃপীকে দেখতে কেমন ছিল কিংবা কেমন তাঁর স্বভাব, তাঁর জীবন সংক্রান্ত এই সব খুঁটিনাটী মহাভারতের কবি উল্লেখ করেননি। তবে আদিপর্বে ভীষ্মের কাছে নিজের জীবনকথা বর্ণনা করার সময়ে দ্রোণ বলেছেন যে, কৃপী বুদ্ধিমতী, পতিব্রতা। কিন্তু তাঁর মস্তকে অধিক পরিমাণে কেশ নেই—

সো'হং পিতুর্নিয়োগেন পুত্রলোভাদ্‌যশস্বিনীম্।
নাতিকেশীং মহাপ্রাজ্ঞামুপযেমে মহাব্রতাম্॥

কৃপী দীর্ঘ, ঘন সুন্দর কেশরাশির অধিকারী ছিলেন না বলে দ্রোণের মনে কোনো দুঃখ ছিল কী না তা খুব পরিষ্কার নয়। তবে দ্রোণাচার্যের প্রথম জীবন যে হতদরিদ্র অবস্থার মধ্যে কেটে ছিল সেখানে কৃপীর নিরন্তর মৌন সাহচর্য্য এবং আনুগত্য দ্রোণকে খানিক প্রশান্তি দিয়েছিল হয়তো। তবে এ শুধুমাত্র আমাদের অনুমান। মহাকবি কৃপী চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ নীরব রেখেছেন। দু-একবার তাঁর উপস্থিতিমাত্র দেখা যায়।

[মহা (k) ১.১৩১.৪৮-৪৯; (হরি) ১.১২৭.৪৮-৪৯]

□ কৃপীকে স্ত্রীপর্বে আমরা দেখতে পাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর পর কৃপীকে দ্রোণাচার্যের নিকটে বিলাপরত অবস্থায় এবং তাঁকে দ্রোণাচার্যের শেষকৃত্য সম্পন্ন করতেও দেখা যায়। *[মহা (k) ১১.২৩.৩৪, ৩৭, ৪২; (হরি) ১১.২৩.৩৪, ৩৭, ৪২]*

কৃমি$_1$ একটি প্রাচীন সমৃদ্ধ জনজাতি। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে কৃমি জনজাতির অন্যতম প্রধান এক ব্যক্তিত্ব বসু নামে এক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। বসুকে যুগসন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণকারী উদ্ধতস্বভাব ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নিজেদের স্বজন-জ্ঞাতিদের উচ্ছিন্ন করে যাঁরা স্বার্থলোভে রাজা হতে চেয়েছেন, তেমন আঠারোটি রাজার নাম করার সময় ভীম কৃমিবংশীয় বসু-রাজার উল্লেখ করেন। *[মহা (k) ৫.৭৪.১৩; (হরি) ৫.৬৯.১৩]*

☐ রাজা উশীনরের পঞ্চপত্নীর মধ্যে কৃমি একজন। উশীনর ও কৃমির পুত্রের নামও কৃমি। সেকালের রীতি অনুযায়ী এক্ষেত্রে দুটি ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। হয় উশীনর-পত্নী কৃমি, কৃমি জনজাতি প্রধানের কন্যা। সে কারণে জাতি নামেই তিনি পরিচিত। অথবা তাঁর পুত্র কৃমিই কৃমি জনজাতির প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর নামেই জনজাতির নামকরণ। প্রথম সম্ভাবনার ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে উশীনর পুত্র কৃমির পূর্বেও কৃমি জনজাতির অস্তিত্ব ছিল। দ্বিতীয় সম্ভাবনা বিচার করলে বলা যায়, উশীনর পুত্র কৃমিই তাঁর নামে পরিচিত জনজাতিটির প্রতিষ্ঠাতা। এই কৃমিই কৃমিলাপুরীর প্রতিষ্ঠাতা। কৃমি জনজাতির রাজধানী কৃমীড় নামেও খ্যাত ছিল। *[বায়ু পু. ৯৯.১৮-২০]*

☐ পণ্ডিতরা সকলে একমত যে, কৃমিসহ সমস্ত উশীনর পুত্ররা বর্তমান পঞ্জাবের পূর্বাংশে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে পূর্ব পঞ্জাবকেই কৃমিদের আদি বাসভূমি বলে মান্যতা দিতে হয়। মনে রাখা দরকার এই অঞ্চলটি পঞ্চাল রাজ্যও বটে এবং পঞ্চালদেশের প্রাচীন নামও কিন্তু কৃবি। সেক্ষেত্রে 'কৃবি' বা 'কৃমি' জনজাতির ওপর পঞ্চালরা আধিপত্য বিস্তার করেছিল, না পঞ্চাল এবং কৃমিদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক ছিল, তা বিবেচনার বিষয়। *[দ্র. কৃমিলা$_1$]*

[AIHT (Pargiter) p. 109, 264; TAI (B.C. Law) p. 75]

কৃমি$_2$ *[দ্র. কৃমিলা$_1$]*

কৃমি$_3$ পুরাণ মতে উশীনরের ঔরসে কৃমির গর্ভজাত পুত্র হলেন কৃমি। তিনি শিবির ভ্রাতা। কৃমির রাজধানী ছিল কৃমিলাপুরী। সম্ভবতঃ মায়ের নামেই উশীনরের এই পুত্র 'কৃমি'নামেই পরিচিত হয়েছেন। *[বায়ু পু. ৯৯.২০-২২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.২০-২১; বিষ্ণু পু. ৪.১৮.১]*

কৃমি$_4$ ঋষি চ্যবনের পুত্র হলেন কৃমি।

[মৎস্য পু. ৫০.২৫]

কৃমি$_5$ উশীনরের তৃতীয়া পত্নী। এঁর পুত্রের নামও কৃমি।

[বায়ু পু. ৯৯.১৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৮]

কৃমি$_6$ একটি তমসাচ্ছন্ন নরক। গুরুজনের প্রতি অসম্মান করলে কৃমি নরকে পতিত হতে হয়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.২.১৪৭; বায়ু পু. ১০১.১৪৭, ১৫৮]

কৃমিচণ্ডেশ্বর অবিমুক্ত ক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলে মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে।

[দ্র. দৃগিচণ্ডেশ্বর]

[মৎস্য পু. ১৮১.২৯]

কৃমিভক্ষ পুরাণে উল্লিখিত অন্যতম নরকের নাম। যাঁরা গুরুজনদের সেবা করেন না এবং সম্পদের অপব্যবহার করেন, তাঁরা এই কৃমিভক্ষ নরকে পতিত হন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.২.১৪৭, ১৬০; বায়ু পু. ১০১.১৪৭, ১৫৮]*

কৃমিভোজন পুরাণে উল্লিখিত নরকগুলির মধ্যে একটি। যে ব্যক্তি যজ্ঞের ভাগ থেকে দেবতা, পিতৃগণ, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের বঞ্চিত করে এবং শুধুমাত্র নিজেই ভোজন করে, সেই ব্যক্তি কৃমিভোজন নরকে পতিত হয়।

[বিষ্ণু পু. ২.৬.৩, ১৪; ভাগবত পু. ৫.২৬.৭, ১৮]

কৃমিল অন্ধকবংশীয় ভজমানের ঔরসে সৃঞ্জয়ের কন্যা বাহ্যকার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন হলেন কৃমিল। *[মৎস্য পু. ৪৪.৫০]*

কৃমিলা$_1$ একটি প্রাচীন জনপদ। কৃমি জনজাতির রাজধানী।

রাজা উশীনরের পঞ্চ পত্নীদের মধ্যে একজন কৃমি। এই পত্নীর গর্ভজাত উশীনর পুত্রের নামও কৃমি। উশীনর-পুত্র কৃমি প্রতিষ্ঠিত নগরী হল কৃমিলাপুরী—কৃমেস্তু কৃমিলাপুরী।

[বায়ু পু. ৯৯.১৮-২২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.২১]

☐ পণ্ডিতরা সকলে একমত যে, কৃমিসহ সমস্ত উশীনর পুত্ররা বর্তমান পঞ্জাবের পূর্বাংশে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সেই সূত্রেই তাঁরা মনে করেন কৃমি শাসিত কৃমিলা নগরীটি পূর্ব পঞ্জাবেই অবস্থিত ছিল। *[দ্র. কৃমি$_1$]*

[AIHT (Pargiter) p. 264]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মহাভারতীয় পঞ্চাল দেশের

পূর্বনাম কৃবি। এই কৃবি-কে অনেকে কৃমি জনজাতির সঙ্গে একাত্মক করে দেখেন। সেই ধারণা থেকেই 'কৃমি-পঞ্চাল' নামটির উৎপত্তি। অগ্নিপুরাণে অজমীঢ়ের বংশধারায় যে পাঁচজন রাজাকে নিয়ে পঞ্চাল গঠিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কৃমিল তাঁদের মধ্যে একজন। B.C. Law -এর মতে, এই কৃমিলই প্রাচ্য পঞ্চালের প্রতিষ্ঠাতা। অবশ্য পুরাণভেদে কৃমিলের পরিবর্তে কৃমিলাশ্ব এবং কাম্পিল্য নামটিও পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত একথাও মনে রাখা দরকার যে, দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানীর নাম ছিল কাম্পিল্য। প্রাচ্য পঞ্চালের রাজধানীর নামও কৃমিলা।

[অগ্নি পু. ২৭৮.২০; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১৮; TAI (law) p. 30, 32, 75]

□ পণ্ডিত D.C. Sircar এই 'কৃমিলা' জনপদের অবস্থান বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি তথ্য দিয়েছেন। তাঁর মতে বর্তমান বিহারের অন্তর্গত লক্ষ্মীসরাই জেলার বালগুদর (Balgudar) গ্রাম থেকে পশ্চিমে রাজৌন (Rajaun) পর্যন্ত প্রাচীন কৃমিলা নগরী বিস্তৃত ছিল। বিভিন্ন বৌদ্ধযুগীয় শিলালিপিতে কৃমিলার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে নগরীটি গঙ্গা নদীর তীরবর্তী এমন কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বালগুদর এবং রাজৌন দুটি অঞ্চলই গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত।

[GAMI (D.C. Sircar) p. 248-255]

কৃমীশ বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত অন্যতম নরকের নাম।

[বিষ্ণু পু. ২.৬.৩, ১৪]

কৃশ$_{১}$ রৈবত মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, বৈকুণ্ঠ তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম হলেন কৃশ। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৫৭]*

কৃশ$_{২}$ যযাতিপুত্র অনুর বংশধারায় উশীনরের ঔরসে কৃশার গর্ভজাত পুত্র কৃশ। কৃশ বৃষলা নামক জনপদের অধিপতি ছিলেন। *[মৎস্য পু. ৪৮.১৮, ২১]*

কৃশ$_{৩}$ জনৈক তপোবনবাসী ঋষিপুত্র। ইনি শৃঙ্গীর প্রিয় বন্ধু ছিলেন। রাজা পরীক্ষিত শৃঙ্গীর পিতার গলায় মরা সাপ ঝুলিয়ে সেই মৌনব্রতধারী তপস্বীকে অপমান করেন। ঋষিপুত্র শৃঙ্গী তখন বাড়িতে ছিলেন না। শৃঙ্গী বাড়িতে ফিরে কৃশের মুখ থেকে সমস্ত ঘটনা জানতে পারেন।

[মহা (k) ১.৪০.২৭-৩২; ১.৪১.৩-৯; (হরি) ১.৩৫.২৭-৩২; ১.৩৬.৩-৯]

কৃশ$_{৪}$ জনমেজয়ের সর্পসত্রে যেসব ঐরাবত বংশীয় নাগ ভস্মীভূত হয়েছিলেন কৃশ তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ১.৫৭.১১; (হরি) ১.৫২.১১]*

কৃশ$_{৫}$ জনৈক তপস্বী ঋষি। বনবাসকালে শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে দেখতে যেসব মুনি ঋষি কুরুক্ষেত্রে এসেছিলেন, মহর্ষি কৃশ তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১৩.২৬.৭; (হরি) ১৩.২৭.৭]

কৃশ$_{৬}$ মহাভারতের শান্তিপর্বে দক্ষকৃত শিবসহস্রনাম স্তোত্রে ভগবান শিবকে একাধিকবার কৃশ নামে সম্বোধন করা হয়েছে। কৃশ শব্দের আভিধানিক অর্থ শীর্ণ হলেও এক্ষেত্রে মহাদেবকে সূক্ষ্ম দেহধারী পরমাত্মা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। উপনিষদে যে ব্রহ্মকে 'অণোরণীয়ান্' অর্থাৎ অণুর চেয়েও অণু রূপে কল্পনা করা হয়েছে তার স্বরূপতা থেকেই মহাদেবকে কৃশ বলা হয়েছে।

[মহা (k) ১২.২৮৪.৯১, ১১৩; (হরি) ১২.২৭৭.২০, ৪২]

কৃশক একজন নাগ। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে ভোগবতী নগরীতে মাতলির কাছে নারদ যেসব বিশিষ্ট নাগদের নামোল্লেখ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কৃশক একজন।

[মহা (k) ৫.১০৩.১৫; (হরি) ৫.৯৬.১৫]

কৃশা$_{১}$ যযাতির পুত্র অনুর বংশধারায় উশীনরের পত্নী এবং কৃশের মাতা হলেন কৃশা।

[মৎস্য পু. ৪৮.১৬, ১৮]

কৃশা$_{২}$ *[দ্র. কৃপানদী]*

কৃশাঙ্গী একজন অপ্সরা। প্রচেতার ঔরসে সুযশার গর্ভজাত কন্যাদের মধ্যে একজন। বিশাল নাম্নী এক যক্ষের সঙ্গে কৃশাঙ্গীর বিবাহ হয়। বিশালের ঔরসে কৃশাঙ্গীর গর্ভজাত যক্ষগণ কৃশাঙ্গেয় নামে পরিচিত হয়েছে। *[বায়ু পু. ৬৯.১৪]*

কৃশাশ্ব$_{১}$ প্রজাপতি কৃশাশ্ব দক্ষের দুই কন্যা জয়া ও সুপ্রভাকে বিবাহ করেন। কৃশাশ্বের ঔরসে জয়া ও সুপ্রভার গর্ভে অনেক অস্ত্রশস্ত্র উৎপন্ন হয়। রামায়ণে বলা হয়েছে যে, মহাদেব এই সমস্ত অস্ত্রগুলি বিশ্বামিত্রকে দান করেছিলেন।

বিষ্ণু পুরাণেও কৃশাশ্বকে 'দেবপ্রহরণ' বা 'দেবঅস্ত্র'দের পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[রামায়ণ ১.২১.১৩; বিষ্ণু পু. ১.১৫.১৩৭]

□ বিশ্বামিত্র মুনির যজ্ঞে তাড়কা রাক্ষসী যজ্ঞ-বিঘ্ন উৎপাদন করত বলে তাকে বধ করার জন্য তিনি রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হন। তাড়কা রাক্ষসীকে রামচন্দ্র বধ করেন। তাড়কা-বধের পর ইন্দ্র ও অনান্য দেবতারা বিশ্বামিত্রকে বলেন—যে অস্ত্রগুলিকে কৃশাশ্ব পুত্রের সমান মনে করতেন, মহাদেব-প্রদত্ত সেইসব অস্ত্রগুলি যেন রামচন্দ্রকে দিয়ে দেওয়া হয়।

[রামায়ণ ১.২৬.২৭-২৯]

□ ভাগবত পুরাণ অনুসারে প্রজাপতি কৃশাশ্ব সংযমের পুত্র। তিনি দক্ষের দুই কন্যা অর্চি ও ধিষণাকে বিবাহ করেন। কৃশাশ্বের সোমদত্ত নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

[ভাগবত পু. ৬.৬.২, ২০; ৯.২.৩৪-৩৫]

□ অন্যান্য পুরাণগুলিতে আবার কৃশাশ্বকে বৈবস্বত মনুর পুত্র নাভাগের বংশধর সহদেবের পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাণগুলিতে কৃশাশ্ব ও দক্ষের দুই কন্যার বিবাহের কথা উল্লিখিত হয়েছে। কৃশাশ্বের পুত্র হিসেবে সোমদত্তের নামের উল্লেখও আছে।

[মৎস্য পু. ৫.১৪; ১৪৬.১৭; বায়ু পু. ৮৬.২০; বিষ্ণু পু. ১.১৫.১০৪; ৪.১.১৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬১.১৫]

□ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অপর একটি পাঠে অবশ্য বলা হয়েছে যে, কৃষ্ণ যর্জুবেদের চরকশাখার একজন ঋষি হলেন কৃশাশ্ব। তিনি প্রজাপতি দক্ষের একটি কন্যাকে বিবাহ করেন। বায়ু পুরাণের একটি পাঠেও প্রজাপতি কৃশাশ্বের সঙ্গে একজন মাত্র দক্ষকন্যার বিবাহের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.১৩; ১.৩৭.৪৬; বায়ু পু. ৬৩.৪২]

কৃশাশ্ব২ অর্জুনের সঙ্গে কৃপাচার্য ও অনান্য কৌরব যোদ্ধাদের যুদ্ধ দেখার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের বিমানে যেসব রাজর্ষিরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কৃশাশ্ব একজন।

[মহা (k) ৪.৫৬.১০; (হরি) ৪.৫১.১০]

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে যেসব প্রাতঃস্মরণীয় রাজাদের নাম উল্লিখিত হয়েছে, কৃশাশ্ব তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১৩.১৬৫.৪৯; (হরি) ১৩.১৪৩.৪৮]

কৃশাশ্ব৩ ভাগবত পুরাণ মতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বহুলাশ্বের পুত্র এবং সেনজিৎ-এর পিতা কৃশাশ্ব।

[ভাগবত পু. ৯.৬.২৫]

□ ব্রহ্মাণ্ড বায়ু ও বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সংহতাশ্বের পুত্র এবং প্রসেনজিতের পিতা কৃশাশ্ব।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.৬৫; বায়ু পু. ৮৮.৬৩; বিষ্ণু পু. ৪.২.১৪]

কৃশাশ্ব৪ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে তামস মনুর পুত্রদের মধ্যে একজন কৃশাশ্ব।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৫০]

কৃশাশ্ব৫ পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে যে, ধর্মের ঔরসে লক্ষ্মীদেবীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কৃশাশ্ব একজন। *[পদ্ম পু. (সৃষ্টি) ৪০.৮৬]*

কৃষীবল১ একজন প্রাচীন মহর্ষি। মহাভারতের সভাপর্বে বলা হয়েছে যে, দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় যেসব মহর্ষিরা উপস্থিত থাকতেন এবং ইন্দ্রের উপাসনা করতেন, তাঁদের মধ্যে কৃষীবল একজন। *[মহা (k) ২.৭.১৩; (হরি) ২.৭.১৩]*

কৃষীবল২ 'কৃষীবল' কথাটির অর্থ কৃষক।

[মনু সংহিতা ৯.৩৮]

মহাভারতের সভাপর্বে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁর রাজ্যে কৃষকরা সমৃদ্ধ আছেন কি না, অর্থাৎ তারা চাষের জন্য যথার্থভাবে বীজ পাচ্ছেন কিনা। মহাভারতেও 'কৃষক' শ্রেণীকে বোঝাতে গিয়েই 'কৃষীবল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

[মহা (k) ২.৫.৭৭; (হরি) ২.৫.৭৭]

কৃষ্টি মরীচির ঔরসে দক্ষকন্যা সম্ভূতি-র গর্ভজাত কন্যাদের মধ্যে কৃষ্টি একজন। বায়ু পুরাণে অবশ্য কৃষ্টি-র পরিবর্তে 'কুষ্টি'—এই নামটি উল্লিখিত হয়েছে। কৃষ্টি-র তিন ভগিনী হলেন অপচিতি, বৃষ্টি (বায়ু পুরাণ মতে পৃষ্টি) এবং ত্বিষা। পূর্ণমাস নামে তাঁর একটি ভ্রাতাও ছিল।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১১.১২; বায়ু পু. ২৮.৮-৯]

কৃষ্ণ১ মহাকাব্য এবং পুরাণগুলিতে বৃহৎ চরিত্রের সংখ্যা অনেক, জটিল কিংবা বহুমাত্রিক চরিত্রের সংখ্যাও বড়ো কম নয়। কিন্তু কৃষ্ণই বোধহয় একমাত্র চরিত্র যাঁকে নিঃসংশয়ে এই বৃহতের মাঝে বৃহত্তম, জটিল চরিত্রের ভীড়ে জটিলতম

এবং বহুমাত্রিকতার নিরিখেও সবথেকে বেশি বহুমাত্রিক বলে চিহ্নিত করে দেওয়া যায়। মূলত কৃষ্ণচরিত্রের এই অতিবিশালতা এবং বহুমাত্রিকতার কারণেই তিনি মানুষ হলেও তাঁকে শুধুমাত্র একজন আদর্শ মানবচরিত্রের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখা সম্ভব হয় না, তিনি অনায়াসে মানব থেকে অতিমানবত্বে আবার অতিমানবের পর্যায় থেকেও ঈশ্বরত্বের পর্যায়ে উন্নীত হন। একক ব্যক্তি হয়েও তিনি যেন বহুরূপে বিরাজমান কিংবা বলা যায় যে তাঁর বহুরূপের সমন্বয়েই তিনি একক বাসুদেব কৃষ্ণ।

কৃষ্ণকথার সর্বোত্তম গ্রন্থ ভাগবত পুরাণে একক কৃষ্ণের এই বহুরূপতা বিষয়ে একটি শ্লোক আছে। কৃষ্ণ-বলরাম তখন কংসের দরবারে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। ভাগবত পুরাণের কথক জানালেন কৃষ্ণকে দেখামাত্র সমবেত জনগণের মনে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কংসের সভার মল্লদের কাছে কৃষ্ণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অশনিসংকেত ভেসে এল। সাধারণ মানুষজন মনে করল যেন সর্বকালের সেরা মানুষটি প্রবেশ করেছেন কংসের সভায়। যুবতীরা ভাবলেন প্রেমকলার দেবতা অনঙ্গ যেন এসে দাঁড়িয়েছেন মূর্তিমান হয়ে। এদিকে গোপ-বালকদের মধ্যে নতুন কোনো প্রতিক্রিয়া হল না, তাঁদের কাছে কৃষ্ণ তাঁদের চিরকালের বংশীধর গোপসখা। দেবকী আর বসুদেবের মনে দীর্ঘকালের অদেখা পুত্রকে দেখামাত্র সঞ্চারিত হল বাৎসল্য। কংসের সভার অসৎ সামন্তরাজারা বুঝলেন তাঁদের শাস্তি দিতে পারেন যিনি, সেই মানুষটিই এসে দাঁড়িয়েছেন সভায়। স্বয়ং কংস কৃষ্ণের মধ্যে নিজের মৃত্যুকে দেখতে পেলেন। সভায় উপস্থিত যোগী-তপস্বীর মনে পরমতত্ত্ব লাভের অনুভূতি হল। বৃষ্ণিবংশীয়রা তাঁকে চিনলেন রাজা বলে, দেবতা বলে। আর অজ্ঞ লোকেদের বড়ো মানুষ দেখলে যা হয়, তাই হল। তারা বুঝল, এ মানুষটি তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ
স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান।
গোপানাং স্বজনো'সতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ॥
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং
তত্ত্বং পরং যোগিনাং।
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥
[ভাগবত পু. ১০.৪৩.১৬-১৭]

□ কৃষ্ণের এই বহুরূপতা পরবর্তী সময়ে পণ্ডিত সমাজকে যথেষ্ট বিভ্রান্ত করেছে এবং এই নিয়ে তর্কবিতর্কও বড়ো কম হয়নি। প্রসঙ্গত জানাই, জলজ্যান্ত মানুষ হিসেবে কৃষ্ণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ছান্দোগ্য উপনিষদে। ছান্দোগ্য উপনিষদের শঙ্করাচার্যকৃত ব্যাখ্যা থেকে পণ্ডিতমহলে অনেকেরই ধারণা, ছান্দোগ্য উপনিষদের কৃষ্ণ হলেন ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য। শঙ্করাচার্য লিখছেন—কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় শিষ্যায়। মূল উপনিষদে কিন্তু কৃষ্ণ যে ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য, তার কোনো উল্লেখ পর্যন্ত নেই। সেখানে সোমযাগের রূপকে মানুষের জীবনচক্রের বর্ণনা চলছিল। এই যজ্ঞদর্শনটিই ঘোর আঙ্গিরস নামক ঋষি উপদেশ করেন কৃষ্ণকে—

তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়
উক্ত্বা উবাচ অপিপাস এব স বভুব।

শ্রদ্ধেয় বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, এই পঙ্ক্তির ভিত্তিতে কৃষ্ণকে ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য বানানো অনুচিত। বস্তুত পুরাণে ইতিহাসে যেমনটি দেখা যাচ্ছে তাতে কৃষ্ণ ছিলেন সান্দীপনি মুনির শিষ্য আর তাঁর কুলপুরোহিত ছিলেন গর্গ। কিন্তু ভাবা দরকার যে, সে যুগে যদি কেউ ব্রহ্মবিদ্যার মতো কোনো গম্ভীর তত্ত্ব বা শাস্ত্রীয় কোনো শাসন উপদেশ করতেন, তাঁকে গুরু বলেই মেনে নেওয়া হত। শঙ্করাচার্যও হয়তো সেই ভাবনা থেকেই কৃষ্ণকে ঘোর-আঙ্গিরসের শিষ্য বলে প্রতিপন্ন করেছেন। তার থেকেও বড়ো কথা ছান্দোগ্য উপনিষদের সময়েই দেবকীর ছেলে কৃষ্ণের অস্তিত্ব খুব স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়ে যাওয়া। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রায় সমকালীন বা কিছু আগে রচিত তৈত্তিরীয় আরণ্যকে 'বাসুদেব' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে নারায়ণ এবং বিষ্ণুর অভিন্ন সত্তা রূপে—

নারায়ণীয় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি।
তন্নো বিষ্ণুঃপ্রচোদয়াৎ, ইতি।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের টীকাকার সায়নাচার্য

নারায়ণ-বিষ্ণু এবং কৃষ্ণকে স্পষ্ট ভাষায় একাত্মক করে দিয়ে বলছেন—ভগবান নারায়ণ বা বিষ্ণুই কৃষ্ণ অবতারে বসুদেবের পুত্র অর্থাৎ বাসুদেব—

স চ কৃষ্ণাবতারে বসুদেবস্য পুত্রত্বাদ্বাসুদেবঃ।

[ছান্দোগ্য উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ৩.১৭.৬; তৈত্তিরীয় আরণ্যক (আনন্দাশ্রম) ১০.১.১, পৃ. ৭০০, খণ্ড ২]

□ ছান্দোগ্য উপনিষদে যে ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য দেবকীনন্দন কৃষ্ণের কথা আছে, তার সঙ্গে আমাদের মহাভারতের কৃষ্ণের সাদৃশ্যও আছে। ভগবদ্‌গীতায় ভগবান কৃষ্ণের মুখে যে উপদেশগুলি শোনা যাচ্ছে তার সঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষদে যে উপদেশগুলি কৃষ্ণ লাভ করেছেন —তার একটা তুলনামূলক আলোচনা করেছেন ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, শ্লোক ধরে ধরে বিচার করে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে এই দুই কৃষ্ণ বাস্তবে অভিন্ন। শুধু সময়ের অনুক্রমে একসময়ের ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য এখানে নিজেই উপদেশকর্তা হয়ে উঠেছেন, সাধারণ মানুষ থেকে ভগবত্তার পর্যায়েও উন্নীত হয়েছেন।

উপনিষদ বা আরণ্যক গ্রন্থগুলি ঠিক কোন সময়ে রচিত হয়েছিল তা নির্ণয় করা বেশ কঠিন। তবু পণ্ডিত ঐতিহাসিকরা এই দুই প্রাচীন গ্রন্থ এবং অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যের তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে কৃষ্ণ কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন বা কোন সময় থেকে ভগবান হিসেবে পূজিত হয়ে আসছেন তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। উল্লেখ্য, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতেই বৈয়াকরণ পাণিনি তাঁর গ্রন্থে বাসুদেব কৃষ্ণ এবং অর্জুনের নাম একত্রে উল্লেখ করেছেন। এই সূত্রটির গঠনই এমন যে, তাতে কৃষ্ণের পূজ্যত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। মহাভারতে কৃষ্ণের পার্থসারথি রূপ তখনকার জনমানসে এমন প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল যে, রাজারা যুদ্ধে গেলে সৈন্যবাহিনীর সামনে কৃষ্ণের প্রতিমূর্তি বয়ে নিয়ে যেতেন। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর ঐতিহাসিক কার্টিয়াস জানিয়েছেন যে, পুরু যখন আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন, তখন তাঁর প্রাগ্রসর সেনাবাহিনীর সামনে ছিল কৃষ্ণের প্রতিমূর্তি। পুরু যুদ্ধে হেরেছিলেন কিন্তু পার্থসারথি কৃষ্ণের প্রতি ভারতবাসীর আস্থা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি।

সময়ের অনুক্রমে আলেকজাণ্ডারের পরেই আসে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির কথা। খ্রীষ্টপূর্ব একশো পঞ্চাশ শতাব্দীতেই তিনি লিখেছেন যে, তাঁর সময়ে কৃষ্ণজীবনের নানা ঘটনা নিয়ে রীতিমতো নাটক বাঁধা হয়ে গেছিল। বিশেষ করে কৃষ্ণের কংসবধ তখন এতই জনপ্রিয় যে, পতঞ্জলি উল্লেখ করেছেন—অভিনেতারা সব দুই ভাগে ভাগ হয়ে যেত। কংসপক্ষে যারা থাকত তারা হল, 'কালামুখ' আর কৃষ্ণপক্ষে যারা অভিনয় করত তারা হল 'রক্তমুখ'। শুধু অভিনয় নয়, কৃষ্ণের কংস হত্যার কাল সম্বন্ধে পতঞ্জলি এমন একটি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন, যাতে বোঝা যায় তাঁর সময়েই এই ঘটনা ছিল সুদূর অতীতের—

জঘান কংসং কিল বাসুদেবঃ।

পতঞ্জলির ধারণা কৃষ্ণ শুধু ক্ষত্রিয়মাত্র নন, বাসুদেব নামটিই হল ভগবানের সংজ্ঞা—সংজ্ঞৈষা তত্রভবতঃ। আর বাসুদেবের ভক্তদের নাম ছিল বাসুদেবক।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে মেগাস্থিনিস পতঞ্জলির আগের মানুষ। তিনিও কৃষ্ণের কথা জানতেন এবং আরও জানতেন যে মথুরা এবং যমুনা তীরবর্তী কৃষ্ণপুর অঞ্চলের সমভূমির লোকেরা, বিশেষত শৌরসেনীরা কৃষ্ণের পুজো করত।

সমস্ত প্রমাণ থেকেই মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, খ্রীষ্টজন্মের বহুপূর্বকাল থেকেই বাসুদেব কৃষ্ণ পরম ঈশ্বরে পরিণত। কাজেই তিনি যখন মহাভারতের ইতিহাস-রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, সে নিশ্চয়ই আরও আগের ঘটনা। ভারতযুদ্ধের কাল নির্ণয় করা খুব কঠিন তবু এ বিষয়ে বেশিরভাগ গবেষকের মত একত্র করলে মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল পঞ্চদশ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে আটশ পঞ্চাশ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। পুরাণগুলির মত অনুযায়ী পরীক্ষিতের জন্ম থেকে মগধে মহাপদ্মনন্দের সিংহাসনে আরোহণের মাঝে সময়ের ব্যবধান ১০৫০ বছরের। সেই ধারণা অনুযায়ী মহাভারতের যুদ্ধ গিয়ে পড়বে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীর আশেপাশে। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে সেযুগের ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ এই বিরাট মানুষটি ভগবত্তায় উন্নীত হয়েছেন এবং আরণ্যক উপনিষদের কালেই, অর্থাৎ কী না খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম

থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই তিনি পরমেশ্বর রূপে অভিষিক্ত হয়ে গিয়েছেন।

□ বাসুদেব কৃষ্ণের প্রাচীনত্বে এবং ঈশ্বরত্বে আরেকটি বড়ো প্রমাণ হল পঞ্চরাত্র গ্রন্থগুলি। জয়াখ্য সংহিতা, অহির্বুধ্ন্য সংহিতা—এইসব অতি পুরাতন পঞ্চরাত্র গ্রন্থগুলিতে যে ব্যূহবাদের সূচনা হয় তারও মূলে আছেন এই বাসুদেব কৃষ্ণ। ব্যূহবাদের প্রধান কথা হল, বাসুদেব কৃষ্ণই সব, তাঁর থেকেই অন্যান্য দেবতাদের শক্তিবৈচিত্র্য। পরবর্তীকালের আবেশ অবতার, বিভব অবতার, সাক্ষাৎ অবতার এবং আরও শতেক অবতারবাদের অন্যতম উৎসভূমি এই পঞ্চরাত্র গ্রন্থগুলি এবং তারও মূল এই বাসুদেব কৃষ্ণ। কৃষ্ণের প্রতাপ দিনে দিনে এমনই বেড়ে চলছিল যে মহাভারতের নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে যে, নর, নারায়ণ, হরি এবং কৃষ্ণের চতুর্মূর্তি দেখতে পাই সেগুলি একাত্ম হয়ে গেছে বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধের সঙ্গে অর্থাৎ কিনা কৃষ্ণ, কৃষ্ণের বড়ো ভাই বলরাম, কৃষ্ণের ছেলে প্রদ্যুম্ন এবং তাঁরই নাতি অনিরুদ্ধের সঙ্গে। সত্যি কথা বলতে কি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই কৃষ্ণের জ্ঞাতি-গুষ্টি, আত্মীয়-স্বজন, ছেলে-পুলে সবাই জনমনের পূজ্য আসনে বসে গেছেন। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর একটি শিলালিপিতে সঙ্কর্ষণ আর বাসুদেবের নাম তো সম-মাহাত্ম্যে উচ্চারিত। আর খ্রীষ্টজন্মের প্রথম বছরেই অন্য একটি শিলালিপিতে তোষা নামের এক অভিজাত মহিলা শৈলদেবগৃহে পূজা-অর্চনার উদ্দেশ্যে অতিমান্য পাঁচজন বৃষ্ণিবীরদের—ভগবতাং পঞ্চবীরাণাং —অপূর্ব পাঁচটি মূর্তি স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন। লুডার্স সাহেব জৈন গ্রন্থের সূত্র ধরে বৃষ্ণিবংশের এই পাঁচ বীর পুরুষের নামকরণ করেছেন—বলদেব, অক্রূর, অনাধৃষ্টি, সারণ এবং বিদূরথ অর্থাৎ কৃষ্ণ নয়, কৃষ্ণের গুষ্টি। এঁদের মধ্যে অক্রূর ছাড়া আর সবাই কৃষ্ণের পূর্বজ, যদিও পুরাণের বংশাবলীতে তাঁদের সবারই নাম পাওয়া যায় এবং বিদূরথ তো বেশ বিখ্যাত। অধ্যাপক জে. এন. ব্যানার্জী কিন্তু বায়ু পুরাণের প্রমাণ উল্লেখ করে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, লুডার্সের অঙ্কে ভুল আছে। বায়ু পুরাণের মতে এই পাঁচ বৃষ্ণিবীর হলেন যথাক্রমে বলরাম, কৃষ্ণ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। এই প্রমাণই পণ্ডিতমহলে এখন গৃহীত। তার মানে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই শুধু কৃষ্ণ নয়, কৃষ্ণের ছেলে-পুলে মায় নাতি অনিরুদ্ধ পর্যন্ত পূজ্য পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

[S.N. Dasgupta, History of Indian Philosophy, Vol. 3, Cambridge University Press, 1961, p. 34-41; J.A.B. Van Buitenen, 'The name Penetrator' in the History of Religion, vol. 1, 1962, p. 296; D.R. Bhandarkar, The Archaeological Rermaines and Excavations at Nagari, Accheological Survey of India, Memou no. 4; J.N. Baneyia, Development of Hindu Iconography, Calcutta University Press, 1961, p. 93, 386]

□ তবে ঐতিহাসিক মহলে এমন পণ্ডিতেরও অভাব নেই যাঁরা কৃষ্ণের প্রাচীনত্ব তো বটেই এমনকী অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দিহান। বিশেষত পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা কৃষ্ণের অস্তিত্ব এবং সময়কাল নিয়ে এমনই এক বিচিত্র সংশয়ের গোলোকধাঁধাঁ নির্মাণ করে ফেলেছেন, যা থেকে তাঁরা এবং তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত ভারতীয় গবেষক-সাহিত্যিকরাও কৃষ্ণের সম্পর্কে নানা মতামতের অবতারণা করেছেন। পণ্ডিত আর. জি. ভাণ্ডারকর নন্দগোপের দ্বারা লালিত কৃষ্ণের কোনো প্রাচীনত্বই স্বীকার করেন না। তাঁর ধারণা আভীর জাতির লোকেরা ভারতবর্ষে এসেছিল সিরিয়া কিংবা এশিয়া মাইনর অঞ্চল থেকে। তারা তাদের সঙ্গে বয়ে এনেছিল যীশুখ্রীষ্টের গল্প। সেই খ্রীষ্টকথাই রূপান্তরিত হয়ে কৃষ্ণকথার সূচনা করেছে ভারতবর্ষে। ঐতিহাসিক জে. এন. ফারকুহার-এরও মত এই যে, যীশুখ্রীষ্টই একমাত্র ঐতিহাসিক পুরুষ, কৃষ্ণ নন। এমনকী ফারকুহারের মতে ভগবদ্‌গীতার কবির মনোলোকে যীশুখ্রীষ্টের ছবি ছিল। ভগবদ্‌গীতার অনুশাসনে কর্তব্য নিষ্ঠার যে চরম প্রকর্ষ দেখানো হয়েছে তা নাকি যীশুখ্রীষ্টের কল্পনা ছাড়া সম্ভবই নয়, যীশুখ্রীষ্টের মহত্ত্ব বা ভাবনা যে অন্য কোনো ধর্মে বা বিশ্বাসেও যীশুখ্রীষ্টের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও বর্তমান থাকতে পারে—এমনটা তিনি ভাবার চেষ্টাই করেননি। অবশ্য কৃষ্ণের সময়কাল পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ফারকুহারের মত বেশ একটু

স্ববিরোধী, কারণ অন্য একটি গ্রন্থে তিনি বেশ স্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন—খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতেই রাম এবং কৃষ্ণ দুজনেই যুদ্ধবীর হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছেন। ফারকুহার বিশ্বাস করেন, মোটামুটি মেগাস্থিনিসের সমসময়েই রাম এবং কৃষ্ণের নামের সঙ্গে ভগবত্তা যুক্ত হয়ে গেছে এবং খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়া থেকেই এঁরা বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। সেক্ষেত্রে ফারকুহারের নিজের মতেই রাম বা কৃষ্ণের খ্রীষ্টের দ্বারা প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়।

[J.N. Farquhar, A Primer of Hindism, Oxford University Press, 1914, p. 74; J.N. Farquhar, Permanent Lessans of the Geeta, Oxford University Press, 1912, p. 31]

□ কৃষ্ণের সময়কাল নিয়ে এই বিতর্কের পাশাপাশি তাঁর জীবন কাহিনী নিয়েও তর্কবিতর্কের পরিমাণ বড়ো কম নয়। বিশেষত, নানা ঘটনার সমন্বয়ে মহাভারত এবং পুরাণগুলির সম্মিলিত কাহিনীর বিচারে কৃষ্ণের জীবনকথা আকারে আয়তনেও যেমন বিশাল, তেমনই তাঁর ভগবত্তা এবং অবতারবাদের ভাবনা থেকেই সে কাহিনীতে অলৌকিকতার প্রবেশ ঘটেছে। এই ঘটনাবাহুল্য এবং অলৌকিকতাও গবেষকদের মনে সংশয়ের জন্ম দিয়েছে। তাঁরা অনেকেই গোকুলের গোপীবল্লভ নন্দলাল কৃষ্ণ আর ভারতযুদ্ধের পার্থসারথি কৃষ্ণকে পৃথক ব্যক্তি বলেও ধারণা করেছেন। এমনকী বাল্যলীলার বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, মথুরার কৃষ্ণ আর দ্বারকার কৃষ্ণকেও পৃথক করতে চেয়েছেন অনেকে। এ বিষয়ে বিদেশী ঐতিহাসিকদের বহুসংখ্যক গবেষণাপত্র পাওয়া যায়, তবে বাংলা ভাষায় এর সব থেকে বড়ো দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র'। অনেক গবেষকের মতে বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ইউরোপীয় ধর্মযাজকদের হাত থেকে কৃষ্ণ চরিত্রটির মান মর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য। পশ্চিমের ধর্মযাজকরা যীশুখ্রীষ্টের চরিত্রকে আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ধমপ্রচারের প্রয়োজনে ভারতীয় দেবদেবীদের থেকে খ্রীষ্টের মহত্ত্ব অনেক বেশি—এটা বোঝাবার চেষ্টা করতেন, ফলে কৃষ্ণের বাল্যকালে গোপীদের সঙ্গে তাঁর লীলা বা তথাকথিত লাম্পট্য নিয়ে নিন্দাও করতেন অজস্র। কৃষ্ণচরিত্রের সেই নিন্দা-কলঙ্ক মোচনের জন্যই বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনা। কিন্তু কৃষ্ণও অবতীর্ণ হয়েছিলেন কেবলমাত্র আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যই—এমনটা প্রমাণ করতে গিয়ে বঙ্কিম তাঁর বাল্যকালের ব্রজলীলাকে প্রক্ষিপ্ত বলে পরিহার করেছেন এমনকী বহুপত্নীক কৃষ্ণের জীবন থেকে জ্যেষ্ঠা মহিষী রুক্মিণী বাদে বাকিদেরও ছেঁটে ফেলেছেন সযত্নে। কিন্তু এতে মহাভারতের রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের গরিমা হয়তো কোনোক্রমে রক্ষা করা চলে, কিন্তু তাঁর জীবনকথা যায় হারিয়ে। কৃষ্ণের মতো বৃহৎ পুরুষেরও একটা বাল্যকাল থাকতে পারে, শুধু থাকতে পারে কেন, থাকাটাই স্বাভাবিক। তাঁর বালক বয়সের চরিত্রে দুষ্টুমি, বালকসুলভ চাপল্য, যশোদা জননী এবং নন্দগোপের স্নেহ যেমন থাকবে, তেমনি মানুষ হিসেবে যিনি ছোটো থেকেই অসাধারণ তিনি যে অতি অল্পবয়সেই বহুরমণীর কাঙ্ক্ষিত নায়ক পুরুষ হয়ে উঠতে পারেন—এর মধ্যেও অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। আবার যৌবনেও তিনি একটি মাত্র পত্নী নিয়ে সংসারধর্ম পালন করবেন এমনটাও ভাবার কোনো কারণ নেই। বিশেষত তিনি অল্পবয়স থেকেই রমণীকুলের কাছে প্রিয়, তার উপর তাঁর বিচরণক্ষেত্র হল ভারতবর্ষের রাজনীতি, যেখানে বিবাহের রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। কাজেই এই ঘটনাগুলিকে বাদ দিয়ে বা প্রক্ষিপ্ত বলে চিহ্নিত করে মানুষ হিসেবে কৃষ্ণের চরিত্রটিকে নির্মাণ করা এককথায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রক্ষিপ্তবাদের তর্কাতর্কি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা কৃষ্ণের জীবনের প্রায় অর্ধেকটাকেই প্রক্ষিপ্ত বলে পরিহার করা—এই দুই ব্যাপারের কঠোর সমালোচনা শোনা গেছে স্বামী বিবেকানন্দের কথায়। ম্যাড্রাসের (বর্তমান চেন্নাই) এক জনসভায় বঙ্কিমচন্দ্রকে এবং এই প্রক্ষিপ্তবাদকে কটাক্ষ করে তিনি বলেছিলেন—

গোপীপ্রেম দ্বারাই সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বরের সম্বন্ধে বিরোধের একমাত্র মীমাংসা হইয়াছে। কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা দেওয়া। এমন কি দর্শনশাস্ত্র শিরোমণি গীতা পর্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার সহিত তুলনায় দাঁড়াইতে পারে না। আমাদেরই স্বজাতি এমন অনেক অশুদ্ধচিত্ত নির্বোধ আছে যাহারা

গোপীপ্রেমের নাম শুনিলেই উহা অতি অপবিত্র ব্যাপার ভাবিয়া ভয়ে দশ হাত পিছাইয়া যায়।... ভারতে এখন অনেকের মধ্যে একটা চেষ্টা দেখা যায়—সেটা যেন ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতার মত। আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা—কৃষ্ণ গোপীদের সহিত প্রেম করিয়াছেন, এটা সাহেবরা পছন্দ করেন না। তবে আর কি, গোপীদের যমুনার জলে ভাসাইয়া দাও। সাহেবদের অনুমোদিত না হইলে কৃষ্ণ টেকেন কি করিয়া? কখনই টিকিতে পারেন না।... মহাভারতের দু-একটা স্থল ছাড়া—সেগুলির বড়ো উল্লেখযোগ্য স্থল নহে—গোপীদের প্রসঙ্গই নাই। দ্রৌপদীর স্তবের মধ্যে এবং শিশুপালের বক্তৃতায় বৃন্দাবনের কথা আছে মাত্র। এগুলি সব প্রক্ষিপ্ত। সাহেবরা যা চায় না সব উড়াইয়া দিতে হইবে। গোপীদের কথা, এমনকি কৃষ্ণের কথা পর্যন্ত প্রক্ষিপ্ত!'

এই যথেষ্ট। এ বিষয়ে আমাদের আর কোনো বক্তব্য নেই। আমরা শুধু ছোট্ট করে বলি সম্পূর্ণ কৃষ্ণকে যথাসম্ভব বর্ণনা করতে হলে তাঁর বাল্য বয়স, যৌবনটাও চাই।

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচরিত্র, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৩ (১৩৮০ বঙ্গাব্দ) পৃ. ৪৯২, ৪৩৩; রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৯৬৫, দ্র. চতুরঙ্গ, পৃ. ৪৮৬; শঙ্করীপ্রসাদ বসু, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচর্চা, দ্র. দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৫, পৃ.১৩০-১৪২; বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিদ্যাভারতী সংস্করণ, পৃ. ২৮৯-২৯২; স্বামী বিবেকানন্দেরর বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, ৫ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫০-১৫৪]

কৃষ্ণের সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে যে লিপিটিকে আমাদের সবচেয়ে সম্পূর্ণ বনে মনে হয়, সেটি হল দ্বাদশ শতাব্দীর ভোজবর্মার বেলাভ তাম্রশাসন। কৃষ্ণের সম্পর্কে এই লিপিতে ভোজবর্মা লিখছেন—

সো'পীহ গোপীশত কেলিকারঃ
কৃষ্ণো মহাভারতসূত্রধারঃ।

তিনি একজনই, তিনি অদ্বিতীয়। বৃন্দাবনের গোপীদের হৃদয়বল্লভই পরবর্তী সময়ে মহাভারতের রাজনীতির সূত্রধার হয়ে উঠেছেন। আমরা কৃষ্ণের চরিত্র বা জীবনকথা এই সম্পূর্ণতাকে মাথায় রেখেই আলোচনা করব।

□ আমরা কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তে প্রবেশ করব এবং গোড়াতেই জানিয়ে রাখি যে, এবিষয়ে পুরাণগুলি, বিশেষত হরিবংশ, ভাগবতপুরাণ এবং বিষ্ণু পুরাণ-এর পাঠই সবথেকে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এই পুরাণগুলির কাহিনীতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে—কৃষ্ণ জন্মলগ্নেই ভগবান বিষ্ণুর অবতার হিসেবে স্বীকৃত। কংসের অত্যাচার থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার জন্য স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন—একথা একেবারে গোড়াতেই বলা হচ্ছে।

মথুরার রাজা উগ্রসেনের পুত্র কংস। তৎকালীন আর্যাবর্তের একচ্ছত্র সম্রাট জরাসন্ধের তিনি জামাতাও বটে। নিজের এবং জরাসন্ধের বলে বলীয়ান হয়ে কংস পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করলেন, নিজে রাজা হয়ে বসলেন। যদু-বৃষ্ণিদের সংঘরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় রাজপদ একটা ছিল ঠিকই, কিন্তু তা কোনো স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কের পদ ছিল না। কিন্তু কংস সংঘরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উর্ধ্বে উঠে একনায়ক হয়ে বসলেন। তাঁর অত্যাচারে দিনে দিনে সকলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

এমনই সময় মথুরার রাজপরিবারে বিবাহের উৎসব। কংসের কাকা দেবকের কন্যা দেবকীর সঙ্গে যদু-বৃষ্ণিদের অন্যতম সংঘমুখ্য শূর বা শূরসেনের পুত্র বসুদেবের বিবাহ। বিবাহ সুসম্পন্ন হলে কংস নিজে সারথি হয়ে আদরের ছোটো বোন দেবকীকে শ্বশুরালয়ে পৌঁছে দিতে চললেন। ঠিক এমনই সময় দৈববাণী হল—ওরে মূর্খ! যাকে তুই আদর করে স্বামীর ঘরে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিস, তাঁর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোকে বধ করবে—

অস্যাস্ত্বাম্ অষ্টমো গর্ভো হন্তাং যাং বহসে'বধু।

কংস শোনামাত্র প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে দেবকীর চুলের মুঠি ধরে তার শিরচ্ছেদ করতে উদ্যত হলেন। তা দেখে বসুদেব তাঁকে নিরস্ত করার জন্য বেশ খানিকটা স্তুতি প্রশংসায় কংসকে ভরে দিয়ে বললেন—আপনার মতো গুণী মানুষ নিজের বোনকে হত্যা করবে, তাও আবার বিবাহের দিনে—এমনটা কি কখনো হতে পারে? এমন কাজ কখনোই আপনার করা উচিত নয়। কিন্তু বসুদেবের প্রশংসা বাক্যেও কংসের হৃদয়

বিগলিত হল না। দেবকীকে তিনি হত্যা করবেনই। শেষে উপায় না দেখে বসুদেব বললেন—আকাশবাণী অনুযায়ী, দেবকীর পুত্র থেকেই আপনার ভয়, দেবকীর থেকে তো ভয়ের কোনো কারণ নেই। সেক্ষেত্রে আপনি শুধু শুধু দেবকীকে হত্যা করবেন না। দেবকী যখন পুত্রের জন্ম দেবেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই পুত্রকে আপনার হাতে তুলে দেব। বসুদেবের কথা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। তাই কংস আপাতত দেবকীকে বধ করা থেকে বিরত হলেন। কিন্তু নবপরিণীতা দেবকীর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার ব্যাপারটা হয়তো সুসম্পন্ন হল না, কারণ ঠিক এই ঘটনার পরেই সবকটি পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে দেবকীর পুত্রজন্মের অপেক্ষায় কংস বসুদেব-দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন—

দেবকীং বসুদেবঞ্চ গৃহে গুপ্তাবধারয়ৎ।

তবে এই কারাগার খুব সম্ভব একটা নজরবন্দি অবস্থা। ঠিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ অন্ধকার কারাগৃহ নয়। তার প্রমাণও আমরা পুরাণেই পাব। কিন্তু সে প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা যাবে।

দেবকী-বসুদেবের বন্দিদশায় দাম্পত্য জীবন আরম্ভ হল। যথাসময়ে দেবকী গর্ভধারণ করলেন এবং প্রথম পুত্র কীর্তিমানকে জন্মের পরেই পূর্ব প্রতিজ্ঞা মতো তুলে দিলেন কংসের হাতে। বস্তুত এরপর দেবকীর গর্ভজাত ছয়টি পুত্রকেই দেবকী-বসুদেব কংসের হাতে তুলে দিয়েছেন আর কংস নির্মমভাবে পাথরে আছড়ে হত্যা করেছেন তাঁদের। দেবকীর এই প্রথম ছয়টি পুত্রকে একত্রে 'ষড়গর্ভ' বলা হয়। বিষ্ণু পুরাণ মতে এঁরা পূর্বজন্মে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র ছিলেন, হরিবংশ পুরাণ মতে এঁরা ছিলেন অসুররাজ কালনেমির পুত্র। ব্রহ্মার বরে এবং হিরণ্যকশিপুর অভিশাপে তাঁদের দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে কংসের হাতে মৃত্যুবরণ করার কথা—পুরাণকাররা এমনটাই জানিয়েছেন।

[ভাগবত পু. ১০.১.২৯-৬৮; বিষ্ণু পু. ৫.১.৬৮-৭১; হরিবংশ পু. ২.২.২-২৮; ব্রহ্ম পু. ১৮১ অধ্যায়]

□ দেবকীর ছয় পুত্র কংসের হাতে নিহত হবার পর সপ্তমবার তাঁর গর্ভ সম্ভাবনা হলে ভগবান বিষ্ণু যোগমায়াকে আদেশ করলেন যে, তাঁর অনন্ত বা শেষনাগের অংশ যখন দেবকীর সপ্তম গর্ভরূপে সমুৎপন্ন হবেন, তখন সেই গর্ভ আকর্ষণ করে বসুদেবের অন্য পত্নী রোহিণীর গর্ভে তাঁকে স্থাপন করতে হবে। রাত্রিতে গোকুলে রোহিণী যখন রজস্বলা অবস্থায় নিদ্রামগ্ন, সেইসময়ে ভগবতী যোগমায়া দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ করে রোহিণীর উদরে স্থাপন করলেন এবং রোহিণীর স্বপ্নে তিনি জানালেন—তোমার উদরে এই গর্ভ আকর্ষণ করে এনে স্থাপন করার ফলে তোমার পুত্র সঙ্কর্ষণ নামে প্রসিদ্ধ হবেন। এদিকে মথুরায় জানা গেল—দেবকীর হঠাৎই গর্ভপাত হয়ে গিয়েছে। কংসের অত্যাচারের কারণে কংসের বিরুদ্ধে যেমন জনমত তৈরি হচ্ছিল, অন্যদিকে অত্যাচারিত দেবকী-বসুদেবের ওপর জনগণের সহানুভূতি উত্তরোত্তর বাড়ছিল। পুরবাসীরা দেবকীর গর্ভপাতের কথা শুনে বললেন—কংসের ভয়েই হয়তো দেবকীর গর্ভপাত হয়ে গেল—

অহো বিস্রংসিতো গর্ভ ইতি পৌরা বিচুক্রুশুঃ।

এই ঘটনার পরই ভগবান বিষ্ণু ত্রিলোকের কল্যাণের জন্য মর্ত্যে অবতীর্ণ হবার অভিলাষে দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করলেন। আর তাঁর আদেশে ভগবতী যোগমায়াও তার পরেই দিন (অন্য মতে সেই দিনেই) গোকুলে নন্দগোপের পত্নী যশোদার গর্ভে প্রবেশ করলেন—

* যোগনিদ্রা যশোদায়া তস্মিন্নেব ততো দিনে।
* যশোদাপি সমাধত্ত গর্ভং তদহরেব তু।

[বিষ্ণু পু. ৫.১.৬৮-৭৭; ৫.২.২-৩; হরিবংশ পু. ২.২.১-৩০; ২.৪.১-১০; ভাগবত পু. ১০.১.৫৩-৬৬; ১০.২.৬-১৫]

□ ভগবান বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দেবকীর দেহে এক দিব্য অলৌকিক ঔজ্জ্বল্য দেখা দিল। ভাগবত পুরাণ এবং বিষ্ণু পুরাণ—দুটিতেই এ সময়ে দেবতাদের দ্বারা গর্ভস্তুতির বর্ণনা পাওয়া যায়। যদিও হরিবংশে এই মুহূর্তে সে-সব নেই। এখানকার বর্ণনা অনেক বেশি বাস্তবসম্মত। কংসের মন্ত্রী-সান্ত্রীরা অত্যন্ত যত্ন সহকারে চতুর্দিকে পাহারা দিয়ে দেবকীর অষ্টম গর্ভকে সুরক্ষা দিতে লাগলেন এবং ভগবান বিষ্ণুও স্বেচ্ছায় সেই গর্ভের মধ্যে বাস করতে লাগলেন—

সো'প্যত্র গর্ভবসতৌ বসত্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ।

[ভাগবত পু. ১০.২.১৬-৪২; বিষ্ণু পু. ৫.২.২-২১; হরিবংশ পু. ২.৪.৮-৯; ব্রহ্ম পু. ১৮২ অধ্যায়]

□ স্বয়ং ভগবানের জন্মকালে সমস্ত প্রকৃতি প্রসন্ন হয়ে উঠল। বিষ্ণু পুরাণে ভগবান বিষ্ণু ভগবতী যোগমায়াকে বলেছিলেন—আমি বর্ষাকালের শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে জন্মাবো আর তুমি জন্মাবে নবমীর দিনে—

প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি।
উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি॥

অতএব বর্ষাকালে কৃষ্ণাষ্টমীর দিন সারাদিনমানে মন্দ মন্দ সমীরণ আর অপ্সরা-গন্ধর্বদের স্বর্গীয় নৃত্যগীত চললেও নিশীথে আকাশ কালো হয়ে উঠল এবং বৃষ্টিও আরম্ভ হল। সার্থক জন্মলাভের আগে ভগবান বিষ্ণু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মের দৈব চতুর্বাহু-মূর্তিতে দেবকী-বসুদেবের সামনে আবির্ভূত হলেন। ভাগবত পুরাণে এবং বিষ্ণু পুরাণে দেখা যায় যে, বসুদেব-দেবকী ভগবানের এই দিব্যরূপ দেখে স্তম্ভিতভাবে স্তুতি করেছেন এবং অবশেষে জানিয়েছেন—আপনি দিব্যরূপ উপসংহার করুন। কেননা দুরাত্মা কংস যদি এই ঘটনা জানতে পারে, তাহলে আজই আমাদের শেষ করে দেবে। ভগবান বিষ্ণু তাঁর দিব্যরূপ সংবৃত করলেন। ভাগবত পুরাণে অবশ্য এইখানে আরও একটা অলৌকিক সংবাদ আছে যেখানে বলা হচ্ছে—দিব্যরূপী বিষ্ণুই নাকি বসুদেবকে বলেছেন—যদি কংসের ব্যাপারে তোমার ভয় থাকে, তাহলে আমাকে গোকুলে নিয়ে যাও এবং আমারই মায়া, যে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে এখানে নিয়ে এসো।

[ভাগবত পু. ১০.৩.১-৪৬; বিষ্ণু পু. ৫.৩.১-১৪; হরিবংশ ২.৪.১৪-২৪]

□ বসুদেব-দেবকীর প্রার্থনায় বিষ্ণু তাঁর দৈবরূপ সংবৃত করে প্রাকৃত একটি শিশুর রূপ ধারণ করলেন। বসুদেব আর দেরি করলেন না। তিনি তাঁর পুত্রটিকে কোলে নিয়ে সূতিকাগৃহ বেরোনোর ইচ্ছা করতেই ভগবানের মায়াশক্তিতে কংসের কারাগৃহে কর্তব্যরত দ্বারপালদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি স্তম্ভিত হল। দ্বারপাল এবং পুরবাসীরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হল। কারাগৃহের বৃহৎ কবাট, লোহার খিল সব খুলে গেল একে একে। বসুদেব তাঁর শিশুপুত্রটিকে নিয়ে বেরোলেন গোকুলে যাবার জন্য। আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। অনন্ত নাগ তাঁর সহস্র ফণা বিস্তার করে চলতে লাগলেন বসুদেবের পিছু পিছু। যমুনার তরঙ্গসংকুল জলধারা দুভাগ হয়ে গেল বসুদেবকে পথ করে দিতে। বসুদেব গোকুলে প্রবেশ করলেন এবং নিতান্ত দৈবপ্রেরিত বলেই যেন—নন্দগোপের ঘরে পৌঁছোতে তাঁর কোনো অসুবিধে হল না। মাঝরাতে বৃন্দাবনে সকল পুরবাসী যখন নিদ্রায় কাতর, তখন যশোদার শয্যায় আপন শিশুপুত্রটিকে ন্যস্ত করে যশোদার অজ্ঞাতসারেই তাঁর নবজাতা কন্যাটিকে কোলে নিয়ে নিঃশব্দে কংসের কারাগারে ফিরে এলেন বসুদেব। হরিবংশ আগেই জানিয়েছে—যে রাত্রিতে বৃষ্ণিবংশের ধুরন্ধর পুরুষ কৃষ্ণ বসুদেবের স্ত্রী দেবকীর গর্ভে জন্মালেন, সেই রাত্রেই নন্দগোপের পত্নী যশোদাও একটি কন্যা প্রসব করেছিলেন—

যামেব রজনীং কৃষ্ণো জজ্ঞে বৃষ্ণিকুলোদ্বহঃ।
তামেব রজনীং কন্যাং যশোদাপি ব্যজায়ত॥

কিন্তু নন্দপত্নী যশোদা প্রসবপীড়ায় পরিশ্রান্ত ছিলেন, তদুপরি যোগমায়ার বিভূতি, যশোদা জানতেও পারলেন না—তাঁর পুত্র হয়েছিল, না কন্যা। *[ভাগবত পু. ১০.৩.৪৬-৫৩; হরিবংশ ২.৪.১২, ২৫-২৬; বিষ্ণু পু. ২.৩.১৫-২১]*

□ ভাগবত-পুরাণ, হরিবংশ কিংবা বিষ্ণুপুরাণ সর্বত্রই এই কথাটি বলা আছে, যে যশোদার গর্ভে যিনি বৃন্দাবনে জন্মেছিলেন, সেই মেয়েটি ছিল যোগমায়া। ভাগবত এবং হরিবংশে দেখেছি—মাঝরাতে বৃন্দাবনে সকলে যখন ঘুমিয়ে আছে, তখন বসুদেব যশোদার অজ্ঞাতসারেই তাঁর শিশু কন্যাটি পরিবর্তন করে নিজের ছেলেটিকে দিয়ে আসেন। হরিবংশের জবান থেকে পরে কিন্তু জানা যাচ্ছে যে, যশোদার কন্যাটি জন্ম থেকেই মৃতা ছিল, আধুনিকেরা যাকে বলেছেন 'Still-born'।

যাই হোক, বসুদেব মথুরার কারাগারে ফিরলেন প্রায় রজনী প্রভাতে। শিশুকন্যাটিকে শুইয়ে দিলেন দেবকীর পাশে—

প্রগৃহ্য দারিকাঞ্চৈব দেবকী-শয়নে'ন্যসৎ।

□ অন্যান্য পুরাণের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে যে, রাত্রি প্রভাত হতে না হতেই কংসের কারাগার থেকে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনে কংসের দ্বারা নিযুক্ত রক্ষীপুরুষরা দেবকীর সন্তান জন্মাবার খবর জানিয়েছেন কংসকে—

ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা রক্ষিণঃ সহসোত্থিতাঃ।

তবে হরিবংশ পুরাণের তথ্য একটু অন্যরকম

এবং সেটাকেই অনেক বেশি বাস্তবসম্মত বলে আমাদের মনে হয়। এখানে দেখা যাচ্ছে, সকাল হতে বসুদেব নিজেই কংসের কাছে গিয়ে কন্যা সন্তানের জন্ম সংবাদ জানাচ্ছেন। স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, বসুদেব ঠিক শিকলে বাঁধা অবস্থায় কারারুদ্ধ ছিলেন না। তিনি গৃহে নজরবন্দি অবস্থায় ছিলেন। তাঁর যাতায়াতে বাধা নিষেধও খুব একটা ছিল না। যদু-বৃষ্ণি বংশীয়রা মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থার যে সংঘরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। সেই ব্যবস্থার মধ্যে বসুদেবের মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তথা সংঘমুখ্যকে সরাসরি কারারুদ্ধ করা কংসের পক্ষেও সম্ভব ছিল না, তাতে প্রজাবিদ্রোহের সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্ট। ঠিক যেমন আপন পিতা উগ্রসেনকেও কংস নজর বন্দি রেখেছিলেন, শিকল পড়িয়ে কারাগারে রাখেননি। যাই হোক, আমরা দেখছি বসুদেব নিজেই কন্যাসন্তানের জন্ম সংবাদ নিয়ে গেছেন কংসের কাছে। এতে বসুদেবের চরিত্রের দৃঢ়তাও যেমন প্রকাশ পাচ্ছে, তেমনই হরিবংশ যে কন্যাসন্তানটিকে 'মৃত' বলে উল্লেখ করেছে তার সত্যতাও সূচিত হয়।

কংস কিন্তু মায়া দয়া দেখাননি। খবর পেয়েই নিজের অনুচরদের নিয়ে তিনি বসুদেবের ভবনে উপস্থিত হয়েছেন—

আজগাম গৃহদ্বারং বসুদেবস্য বীর্যবান্।

লক্ষণীয়, হরিবংশ কিন্তু একবারও বসুদেবের আবাসকে কারাগার বলে উল্লেখ করেনি। বসুদেব নজরবন্দি ছিলেন। সেই অবস্থা থেকে প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে ঝড়বৃষ্টির রাতে দেবকীর পুত্রটিকে রেখে এসেছেন গোকুলে। ফিরতে কিছু বিলম্ব হয়েছে তাঁর, ফলে কেউ জেনে ফেলল কী না—এ ভয়ও তাঁর মনে কাজ করছে—

পরিবর্তে কৃতে তাভ্যাং গর্ভাভ্যাং ভয়বিক্লবঃ।

কংস গৃহদ্বার থেকেই প্রশ্ন করছেন—কোনো শিশু জন্মেছে নাকি? তাকে এখনই তুলে দাও আমার হাতে। কংসের তর্জন গর্জন শুনে দেবকী বড়ো কষ্ট পেলেন। রাতের অন্ধকারে কোলের ছেলেটিকে দূরে পাঠিয়ে স্বামী একটি মৃতা শিশুকন্যা নিয়ে এসেছেন। সেটিকেও বীভৎস ভাবে তুলে আছাড় মারবেন কংস—এই আশঙ্কায় দেবকী বললেন—তুমি আমার ছয়টি পুত্রকে হত্যা করেছ। এটি কন্যাসন্তান, তাও আবার মৃত অবস্থায় জন্মেছে। বিশ্বাস না হয় হাতে নিয়ে দেখ—

দারিকেয়ং হতৈবৈষা পশ্যস্ব যদি মন্যসে।

দেবকী হয়তো আশা করেছিলেন মৃতা কন্যাসন্তান জেনে কংস কিছু দয়া দেখাবেন। কিন্তু তা ঘটল না। কংস শিশুটিকে কেড়ে নিলেন, মৃত কন্যা দেখে মনে একটু তাচ্ছিল্যের ভাবও এলো। তবু স্বাভাবিক আক্রোশে কিংবা অভ্যাসের বসেই কংস শিশুটিকে শিলায় আছড়ে ফেললেন। আর তখনই শিশুটি আকাশে উড়ে গেল—

সাবধূত শিলাপৃষ্ঠে অনিস্পিষ্টা দিবমুৎপতৎ।

শিশুটি মিলিয়ে গেল আকাশে। পরিবর্তে আবির্ভূতা হলেন ভগবতী যোগমায়া। আলুলায়িত তাঁর কেশরাশি। কোনো পুরাণে তিনি চতুর্ভুজা, কোনো পুরাণে অষ্টভুজা। দিব্য গন্ধ আর অনুলেপন তাঁর দেহে। হারশোভিত-সর্বাঙ্গী মুকুটোজ্জ্বল-ভূষিতা। নীল এবং পীতবর্ণের বস্ত্র পরিধানে, গজকুম্ভোপমস্তনী, মনোরম চন্দ্রমুখ, অঙ্গকান্তিতে বিদ্যুতের ছটা, নয়ন দুটি উষার সূর্যের মতো মোহন লাল। চিরকালের সেই কন্যারূপিণী দেবী—

কন্যৈব সাভবন্নিত্যং।

কখনো নাচছেন, কখনো হাসছেন, কখনো বা বিপরীতভাবে উল্লম্ফন করছেন—

নৃত্যতী হসতী চৈব বিপরীতেন ভাস্বতী।

অট্টহাসি হেসে কংসকে তিনি বললেন—কংস! তোকে যিনি মারবেন, দেবতাদের সর্বস্বভূত সেই পুরুষ জন্ম নিয়েছেন—

জাতো যস্ত্বাং বধিষ্যতি।

কংসের মৃত্যুর নিদান জানিয়ে দেবী অন্তর্হিত হলেন। *[হরিবংশ ২.৪.২৫-৪৫; বিষ্ণু পু. ৫.৩.১৫-২৭; ভাগবত পু. ১০.৪.১-১২]*

যোগমায়ার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই কংস বুঝলেন, তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। দেবকীর পুত্রগুলিকে বধ করে তিনি আপন মৃত্যুকে জয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দৈবক্রমেই হোক বা মানুষের ষড়যন্ত্রে—তাঁর চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। এই মুহূর্তে ক্রমাগত দেবকীর পুত্রবধের কারণে প্রজাসাধারণও তাঁর প্রতি রুষ্ট। এসব ভেবে কতকটা লোকদেখানো ভাবেই দেবকীর সঙ্গে এই মুহূর্তে কংস বেশ সদয় ব্যবহার করলেন।

দেবকীর ছয়টি পুত্রকে হত্যা করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন বার বার, দেবকীর পায়ে মাথা নত করে দুঃখ প্রকাশ করলেন—বোন আমার! আমি মরণ থেকে বাঁচবার জন্য তোমার পুত্র কয়টিকে হত্যা করেছি। কিন্তু এখন দেখছি সে মৃত্যু আসবে অন্য রূপে অন্য জায়গা থেকে—

অন্য এবান্যতো দেবি মম মৃত্যুরুপস্থিতঃ।

তুমি জানো, আমার মধ্যে একটা হতাশা, নৈরাশ্য কাজ করছিল বলেই নৃশংসভাবে অতি আপনজনদের বধ করেছি আমি—

নৈরাশ্যেন কৃতো যত্নঃ স্বজনে প্রহৃতং ময়া।

সবশেষে কংস বলছেন—জানি আমি অপরাধ করেছি। তবু তোমার পায়ে ধরছি, তুমি ক্রোধ কোরো না, আমাকে ক্ষমা করো—

মদ্‌গত স্ত্যজ্যতাং রোষো জানাম্যপকৃতিং ত্বয়ি।

পুত্রশোকে পাথর দেবকীর হৃদয় যেন ডুকরে কেঁদে উঠল। চোখের জল ফেলতে ফেলতে তিনি কংসের মাথায় হাত রেখে তাঁকে আশ্বাস দিলেন। দেবকী মেনে নিলেন, তাঁর পুত্রদের মৃত্যুর জন্য শুধুমাত্র কংস নয় হয়তো কালের অমোঘ নিয়মও একটা কারণ। তবু কংসের সান্ত্বনাবাক্যের উত্তরে তিনি যা বললেন, তাতে একরকম প্রকাশ হয়ে পড়ল যে, এ নৃশংসতা ভোলা যায় না, ভোলা সম্ভব নয়। কংস সব শুনে ফিরে এলেন নিজের ভবনে।

[ভাগবত পু. ১০.৪.১৪-২৮;
হরিবংশ ২.৪.৪৯-৬৫]

□ দেবকীর সঙ্গে আপাতত ভালো ব্যবহার করলেও কংস মনে মনে জ্বলছিলেন নিজের অসফলতায়। যোগমায়া অন্তর্হিত হবার মুহূর্তে বলে গেছেন, যিনি কংসকে বধ করবেন তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু কোথায় সেই শিশু? তাকে না মেরে কংস নিশ্চিন্ত হয়ে বসেন কী করে? জরুরি সভা ডাকলেন কংস। অনুগত মন্ত্রী-অমাত্যরা ছাড়াও অসুর-রাক্ষসরাও উপস্থিত হলেন সে সভায়। অনেক আলোচনার পর স্থির হল, গত কয়েকদিনের মধ্যে মথুরা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে কয়টি শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের প্রত্যেকের ওপরেই নজর রাখা দরকার। তাদের মধ্যে কাউকে যদি দৈবশক্তি সম্পন্ন বলে মনে হয়, তাহলে তখনই তাকে বধ করতে হবে। কংস যখন এমন সব আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত, তখন নন্দগোপের গৃহে উৎসবের পরিবেশ। নন্দরাজা এবং তাঁর পত্নী যশোদার কোল আলো করে পুত্র সন্তান এসেছে। *[বিষ্ণু পু. ৫.৪.১-১৪;*
ভাগবত পু. ১০.৪.২৯-৩৭]

□ কৃষ্ণের জন্মকথার পরবর্তী কাহিনীতে যাওয়ার আগে তাঁর ভগবৎস্বরূপতা এবং স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার হিসেবে জন্মগ্রহণের বিষয়ে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন। একজন ঐতিহাসিক মানুষ হিসেবে কৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব, ক্ষমতা, চাতুর্য্য এবং লোকপ্রিয়ত্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তাতে কৃষ্ণ নিজের জীবৎকালেই ভগবত্তার পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন। আর ভগবান বলেই তাঁর অবতারত্বের প্রসঙ্গও এসেছে। এখানে লক্ষণীয় হল, মহাভারত থেকে আরম্ভ করে মুখ্য পুরাণগুলির অন্যতম দু-একটি পুরাণও কৃষ্ণকে ভগবান বিষ্ণুর অংশ অবতার বলে গণ্য করেছে। কিন্তু ঈষৎ পরবর্তীকালে ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণ কিন্তু বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার বলে চিহ্নিত এবং আরও পরবর্তী সময়ে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তিনিই সমস্ত অবতারের মূল হয়ে উঠেছেন। অর্থাৎ কৃষ্ণ হচ্ছেন 'অবতারী', অন্যান্যরা তাঁরই অবতার—যেমনটা গীতগোবিন্দে জয়দেব কবি কীর্তন করে বলেছেন —কৃষ্ণ হলেন তিনি, যিনি এই দশবিধ অবতারের রূপ ধারণ করেছেন—

কেশবধৃত/দশবিধরূপ/জয় জগদীশ হরে।

মহাভারতের আদিপর্বে 'অংশাবতরণ' নামের অধ্যায়টিতে বাসুদেব কৃষ্ণকে ভগবন্নারায়ণের অংশাবতার বলে জানানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে—যিনি দেবতাদেরও দেবতা, যিনি সেই সনাতন প্রভু নারায়ণ, তাঁরই অংশ হিসেবে বসুদেবের পুত্র মহাপ্রতাপশালী কৃষ্ণ মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন—

যস্তু নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো মানুষেষ্বাসীদ্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥

[মহা (k) ১.৬৭.১৫১; (হরি) ১.৬২.১৫২]

□ দ্রৌপদীর বিবাহবাসরে পঞ্চ-পাণ্ডবের স্ত্রী একা দ্রৌপদী হতে পারেন কিনা, সেই প্রশ্নের সমাধানে ব্যাসদেব 'পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যান' নামে একটি পুরাকাহিনী বর্ণনা করেন। সেই সূত্র ধরেই কৃষ্ণ এবং বলরামের অবতারকল্প ব্যাখ্যা করেন ব্যাস। একই ইন্দ্র পাঁচ দেবতার অংশে পঞ্চ পাণ্ডব হয়ে পৃথিবীতে জন্মাবেন, একথা শুনে ভগবান নারায়ণ

নিজের একটি শুক্ল কেশ এবং একটি কৃষ্ণ কেশ নিজের মস্তক থেকে উৎপাটন করেন। সেই কেশ দুটি যদুকুলে বসুদেবের দুই পত্নী দেবকী এবং রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করল। তার মধ্যে শুক্লবর্ণ কেশগাছি থেকে রোহিণীর গর্ভসম্ভূত বলরামের আবির্ভাব, আর কৃষ্ণবর্ণ কেশ থেকে কৃষ্ণের আবির্ভাব। এইভাবে জন্মানোর ফলে অবতার গ্রহণের এই প্রক্রিয়াটাকেই কেশাবতার বলে—ফলত কৃষ্ণের একটি নামও কেশব।

স চাপি কেশৌ হরিরুদ্ববর্হ/
একং কৃষ্ণমপরঞ্চৈব শুক্লম্।
তৌ চাপি কেশৌ নিবিশেতাং যদূনাং/
কুলে স্ত্রিয়ৌ দেবকীং রোহিণীঞ্চ॥
তয়োরেকঃ বলদেবো বভূব/
যো'স্য শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ।
কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সমভূব/
কেশো যো'সৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ॥

[মহা (k) ১.১৯৭.৩২-৩৩; (হরি) ১.১৯০.৩২-৩৩]

দ্রৌপদী-হরণের পর জয়দ্রথ যখন পাণ্ডবদের কাছে চরম অপমানিত হয়ে মহাদেবের শরণ নিলেন, তখন জয়দ্রথ পাণ্ডবদের পরাস্ত করার বর চেয়েছিলেন প্রার্থনাতুষ্ট শিবের কাছে। শিব বর দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু অর্জুনকে ছাড়া আর চার পাণ্ডবকে মাত্র এক দিন পরাস্ত করার বর ছিল সেটা। আর অর্জুনের প্রসঙ্গে মহাদেব কৃষ্ণের অনুষঙ্গ টেনে এনে বললেন—কৃষ্ণের দ্বারা যিনি রক্ষিত, তাঁকে পরাস্ত করার সাধ্য কারও নেই। কী রকম সেই কৃষ্ণ, সে কথা বলতে গিয়ে মহাদেব আদি সৃষ্টির সময় বিষ্ণুর নাভি কমল থেকে ব্রহ্মার জন্মকথা থেকে আরম্ভ করে, মৎস্য, কূর্ম বরাহ ইত্যাদি অবতারের মূল বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন করলেন। তারপর সেই বিষ্ণু এখন ধর্মরক্ষা করার জন্য এবং দুষ্টের দমনের জন্য মানুষের মধ্যে জন্ম নিয়েছেন, সেই সত্য বলতে গিয়ে মহাদেব জানালেন—সেই মহাপরাক্রমশালী ভগবান বিষ্ণুই কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন যদুকুলে—

* স এষ ভগবান্ বিষ্ণুঃ কৃষ্ণেতি পরিকীর্ত্যতে।
অনাদ্যন্তমজং দেবং প্রভুং লোকনমস্কৃতম্॥
* যমাহুরজিতং কৃষ্ণং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
শ্রীবৎসধারিণং দেবং পীতকৌষেয় বাসসম্।
প্রধানং শস্ত্রবিদুষাং তেন কৃষ্ণেন রক্ষ্যতে॥

[মহা (k) ৩.২৭২.৬৮-৭০; (হরি) ৩.২২৬.৬৮-৭০]

□ কৃষ্ণের ভগবত্তার প্রতিষ্ঠা মহাভারতের মধ্যে অসংখ্যবার হয়েছে এবং এখানে আশ্চর্য হল এই যে, কৃষ্ণকে যেখানে আমরা পুরোপুরি লৌকিক এক মনুষ্য ভূমিকায় পাচ্ছি, সেখানে তাঁর একান্ত পরিজন, এমনকী তাঁর আপন প্রিয় সখা অর্জুনের মুখেও তাঁর ভগবত্তার ঐশ্বর্য্যোচ্চারণ ঘটছে। একইভাবে মহাভারতের উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে শান্তির বার্তা নিয়ে আসার অনেক আগে সঞ্জয় পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ফিরে এসে কৃষ্ণের বিভিন্ন নামের ব্যাখ্যা করার সময় সেই ভগবত্তারই প্রকাশ করেছেন। এখানে কৃষ্ণের বাসুদেব নাম থেকে আরম্ভ করে সর্বব্যাপ্তস্বরূপ বিষ্ণু, মাধব, কৃষ্ণ, পুণ্ডরীকাক্ষ, জনার্দন, সাত্বত, আর্ষভ, বৃষভেক্ষণ, অজ, দামোদর, হৃষীকেশ, অধোক্ষজ, নারায়ণ, পুরুষোত্তম, জিষ্ণু, অনন্ত এবং গোবিন্দ পর্যন্ত সব নামের ব্যুৎপত্তি দেখিয়ে সঞ্জয় কিন্তু কৃষ্ণের ভগবত্তাই প্রকট করেছেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এবং ধৃতরাষ্ট্রও শুনে কৃষ্ণের গুণগান করেছেন প্রায় ভগবত্তার ছন্দেই।

[মহা (k) ৫.৭০-৭১ অধ্যায়; (হরি) ৫.৬৬ অধ্যায়]

□ মহাভারতে কৃষ্ণের ভগবত্তা স্থাপনের আর একটি স্থান হল অর্জুন এবং কৃষ্ণকে নর-নারায়ণ ঋষি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া। মহাভারতের আদিপর্বে অর্জুনের তীর্থযাত্রাপর্বে অর্জুন যখন প্রভাসতীর্থে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন, তখন তাঁদের একত্রে দেখে মহাভারতের কবির মন্তব্য ছিল—এঁরাই আগে নর-নারায়ণ নামে দুই ঋষি ছিলেন এবং তখনও তাঁরা ছিলেন দুই সখার মতো—

আস্তাং প্রিয়সখায়ৌ তৌ নরনারায়ণাবৃষী।

এই কথাটাই পুনরাবৃত্ত হয়েছে ভগবান ব্রহ্মার মুখে, যখন খাণ্ডব-দাহনের পূর্বে অগ্নি ব্রহ্মার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিলেন। ব্রহ্মা তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন—যাঁরা নর-নারায়ণ নামে দুই ঋষি ছিলেন, তাঁরাই খুব শীঘ্র অর্জুন এবং কৃষ্ণের স্বরূপে জন্মাবেন। তাঁরাই খাণ্ডব দহনকর্মে তোমার সহায় হবেন—

* ভবিষ্যতঃ সহায়ৌ তে নরনারায়ণৌ তদা।
* সম্ভূতৌ তৌ বিদিত্বা তু নরনারায়ণাবৃষী।
* নরনারায়ণৌ যৌ তৌ পূর্বদেবৌ বিভাবসো।
* অর্জুনং বাসুদেবঞ্চ যৌ তৌ লোকো'মন্যতে।
তাবেতৌ হি স্থিতৌ তত্র খাণ্ডবস্য সমীপতঃ॥

মহাভারতের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতেও অর্জুন এবং কৃষ্ণের মধ্যে নর-নারায়ণের পূর্বসত্ত্বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বার বার—

এব নারায়ণঃ কৃষ্ণঃ ফাল্গুনশ্চ নরঃ স্মৃতঃ।

[মহা (k) ১.২১৮.৫; ১.২২৪.৪-৯; ৩.৪৭.১০; ৫.৪৯.২০; (হরি) ১.২১১.৫; ১.২১৭.৪-৯; ৩.৪০.১০; ৫.৪৯.২০]

□ নর-নারায়ণের মাহাত্ম্য কত, সেটা বোঝানোর জন্য একটি কাহিনী মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বে উল্লিখিত হয়েছে এবং সেখানেও এই দুই ঋষির একাত্মতা স্থাপিত হয়েছে অর্জুন এবং কৃষ্ণের সঙ্গে। এক সময় সুরাসুর গুরু বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য, ইন্দ্র-অগ্নি ইত্যাদি দেবতারা ভগবান ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবতারা এবং ঋষিরা যখন একত্রে বসে ছিলেন, আদিত্যগণ, সাধ্যগণ এবং সুন্দরী অপ্সরারা যেখানে তাঁদের পরিবেষ্টনীর মধ্যে বসেছিলেন, তখন নর-নারায়ণ নামে দুই ঋষি আপন তেজে সমস্ত দিক যেন আলোকিত করে সেখান দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দুই মুনির তপ-সমৃদ্ধ উজ্জ্বল রূপ দেখে মুনি-ঋষি-দেবতারা বেশ আকর্ষণ বোধ করলেন নর-নারায়ণ ঋষির ব্যাপারে। দেবগুরু বৃহস্পতি ব্রহ্মাকে প্রশ্নই করে বসলেন যে, কে এমন মানুষ এই দু-জন যে, তাঁরা দেবদেব ব্রহ্মার দিকেও একবার দৃষ্টিপাত না করে বেরিয়ে গেলেন, একবার নমস্কার করে গৌরব দান করা তো দূরের কথা। কারা এরা?

ব্রহ্মা এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে বললেন—এই যে দুই তপস্বী, যাঁরা আপন তেজে উজ্জ্বল, কান্তিগুণে সকলের আকর্ষণীয় এবং অবশ্যই মহাবলশালী—এই যে দুই তপস্বী আমাদের অতিক্রম করে চলে গেলেন, এঁরা হলেন নর-নারায়ণ নামে দুই ঋষি। এঁরা আপন আপন তপস্যার তেজে তেজস্বী, অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং মহাপরাক্রমশালী। এই ঋষিরা মর্ত্যলোক থেকে ব্রহ্মালোকে এসেছিলেন। এই ঋষিরা পূর্বে অসুর নিধন করে দেবতাদের সহায়তা করেছিলেন—একথা দেবতা এবং ঋষিদের কাছে বলায় তাঁরা নর-নারায়ণের কাছে গিয়ে আবারও অসুর-বিনাশের প্রার্থনা জানান। এবারে ভগবান ব্রহ্মা জানালেন যে, তাঁরাই এখন অর্জুন এবং কৃষ্ণ হয়ে জন্মেছেন। মনুষ্যলোকে এঁরা ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতা, অসুর, রাক্ষস—সকলের পক্ষেই অজেয়। এই নর-নারায়ণ তপস্যার তেজে অক্ষয় ধ্রুবলোক ব্যাপ্ত করেন, আর যুদ্ধের সময় প্রয়োজনীয় স্থানে বার বার জন্মগ্রহণ করেন। দুষ্টদমন এবং শিষ্টের পালনই এঁদের কাজ।

[মহা (k) ৫.৪৯.২-২৫; (হরি) ৫.৪৯.২-২৫]

□ ভগবান বিষ্ণুর কেশ থেকে জাতই হোন, নর-নারায়ণের অংশজাতই হোন বা স্বয়ং শ্রীহরির পূর্ণ অবতারই হোন—মিথলজিস্টরা কৃষ্ণকে সৌর দেবতা বা Solar God-দের অন্যতম বলে চিহ্নিত করেছেন। কৃষ্ণের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সৌরদেবতাদের যেসব সাদৃশ্য আছে, সেগুলিও বিশদে আলোচনা করেছেন। সৌরদেবতারা সকলেই অযোনিসম্ভব। খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, অ্যাপোলো এমনকী রামচন্দ্রও তাই। কৃষ্ণের জন্মকথাতেও দেখছি, বসুদেবের মন থেকে দেবকীর মনে দেবগর্ভের আধান হল। সৌর বংশতালিকায় আরও এক আশ্চর্য মিল হল—এই সৌর বীরেরা জন্মের পরেই এমন সব বিপদ আপদের মধ্য দিয়ে মানুষ হন, যা তাঁদের শৌর্য্য-বীর্য্যকে প্রতি তুলনায় আরও উজ্জ্বল করে তোলে। যেমন কংস এবং তাঁর অনুগত অসুরদের ভয়ে কৃষ্ণের জীবন বিপন্ন, তেমনই হেরডের ভয়ে খ্রীষ্টের, ফারাওদের ভয়ে মোজেসের। আবার কৃষ্ণকে যেমন জন্মের পরেই গোপপল্লীতে নির্বাসিত করা হয়েছে, মোজেস তেমনই পরিত্যক্ত হয়েছেন নলখাগড়ার বনে, সূর্যপুত্র কর্ণকে ভাসিয়ে দিতে হয়েছে নদীতে। জন্ম মুহূর্তেই এই পুত্রবিসর্জন নাকি সৌর দেবতার জীবনে অত্যন্ত জরুরি কারণ এতে জনমানসে কিংবা ভক্তমানসে যুগপৎ করুণা, ভয় এবং শেষ পর্যন্ত বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। যাই হোক, এই মুহূর্তে আমরা আবার কৃষ্ণের জীবন কথায় ফিরে যাব এবং সেখানে পৌরাণিক কাহিনীগুলিতেই দেখা যাবে, কীভাবে কৃষ্ণের আধিপত্য অতি অল্পবয়সেই দেবলোকে বিস্তৃত হচ্ছে, এমনকী দেখব যে সৌরকুলের প্রধান দেবতা ইন্দ্রও কৃষ্ণের মহিমার সামনে ম্লান হয়ে যাবেন।

□ দেবকীর কোল আলো করে আসা অষ্টম পুত্রটি নন্দগোপের গৃহে পৌঁছে গিয়েছেন জন্মের রাত্রেই। গোপকুলের রাজা নন্দ প্রায় বৃদ্ধ বয়সে পুত্রলাভ করেছেন—ফলে পুত্রজন্ম উপলক্ষে ব্রজভূমিতে উচ্ছ্বাসের জোয়ার বয়ে গেল।

উৎসবে মাতল গোপকুল। এদিকে কংস নিজের মৃত্যুর গতিরোধ করতে না পেরে হতাশ হলেও এই মুহূর্তে একরকম বাধ্য হয়েই বসুদেব-দেবকীকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। বসুদেব জানেন যে, তাঁর পত্নী রোহিণীর গর্ভজাত পুত্র এবং দেবকীর অষ্টম সন্তান—দুজনেই নন্দগোপের গৃহে সুরক্ষিত আছে। কিন্তু মুক্তিলাভের পরেও বসুদেব নন্দের গৃহে গিয়ে পুত্রমুখ দর্শনের চেষ্টা করলেন না, কংসের সন্দেহ এড়ানোর জন্যই। তবে হরিবংশ পুরাণে দেখা যাচ্ছে যে, বসুদেব একবার নন্দরাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এই সাক্ষাতের ঘটনাটা কিন্তু মথুরায় ঘটছে। গোকুলে নয়। এখানে যশোদাও রয়েছেন নন্দের সঙ্গে। হয়তো পুত্রজন্মের আনন্দে কোনো বিশেষ কারণেই তাঁদের মথুরায় আগমন। বসুদেব এই সময় নন্দকে রোহিণীর পুত্র এবং দেবকীপুত্রকে সযত্নে রক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন। দুই পুত্রের বিধিমতে নামকরণ এবং অন্যান্য সংস্কারও করতে বলেছেন। তবে দেবকীর পুত্রকে আপাতত নন্দ যাতে নিজের আর যশোদার পুত্র বলেই পরিচয় দেন—সেকথাও বলেছেন। বসুদেবের পরামর্শ খুবই যুক্তিসঙ্গত। বসুদেবের পুত্র বলে জানাজানি হয়ে গেলে সদ্যোজাত কৃষ্ণের প্রাণসংশয় হতে পারে। হরিবংশে দেখা যাচ্ছে যে, নন্দ-যশোদা দেবকীপুত্রের জন্মরহস্য জেনে গেলেন এবং বসুদেবের পরামর্শে দ্রুত বৃন্দাবনে ফিরে শিশুদের লালন-পালনে মন দিলেন—

রহস্যং বসুদেবেন সো'নুজ্ঞাতো মহাত্মনা।
যানং যশোদয়া সার্ধমরুরোহ মুদান্বিত॥

কংসের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর বসুদেবের সঙ্গে নন্দরাজার সাক্ষাতের উল্লেখ ভাগবত পুরাণেও আছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, প্রায় বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লাভ করে আনন্দে আত্মহারা নন্দ মথুরায় এসেছিলেন কংসকে বার্ষিক কর এবং নানা উপঢৌকন সহ পুত্র জন্মের শুভ সংবাদ দিতে। এই সময়েই এক ফাঁকে বসুদেবের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়। বসুদেব রোহিণীর পুত্রের দেখভাল করার জন্য অনুরোধ করলেও দেবকীপুত্রের সম্পর্কে নন্দরাজাকে কিছু বলেছিলেন কী না—তা ভাগবত পুরাণ জানায়নি। তবে হরিবংশ পুরাণকে কৃষ্ণের জীবনকথার অন্যতম ইতিহাসসম্মত দলিল বলে মনে করেন পুরাণবিদরা। সেখানে প্রাপ্ত এই বিবরণ কিন্তু প্রমাণ করে যে, নন্দ-যশোদা গোড়াতেই জেনেছিলেন যে, তাঁদের আত্মজা কন্যাটি মৃত। যাকে আপন সন্তান ভেবে কোলে টেনে নিয়েছেন, তিনি যদুবৃষ্ণিদের ভাবী ত্রাণকর্তা, ভবিষ্যতের কংসহন্তা দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান। আত্মজ পুত্র নয় জেনেও আপন সন্তানের থেকেও শত-সহস্রগুণ বেশি স্নেহ-মমতা দিয়ে তাঁরা পালন করেছেন কৃষ্ণকে। হরিবংশ পুরাণের এই বিবরণ নন্দরাজা এবং যশোমতী মাতার চরিত্র দুটিকে, তাঁদের স্নেহ-মমতাকে এক অন্যতর উচ্চতায় পৌঁছে দেয়, তাঁদের চরিত্রে বাৎসল্যরসেরও এক নতুন সংজ্ঞা এবং মহিমা যোগ করে। *[হরিবংশ পু. ২.৫.১-১৪; ভাগবত পু. ১০.৫.১৯-৩২; বিষ্ণু পু. ১-৩ অধ্যায়]*

☐ যাইহোক, নন্দরাজা গোকুলে ফিরে রোহিণীপুত্র এবং দেবকীপুত্রের, এই মুহূর্তে যাঁকে আমরা যশোদানন্দনই বলব—নামকরণ সংস্কার সম্পন্ন করলেন। রোহিণীর পুত্রের নাম হল সংকর্ষণ বা রাম, পরবর্তী সময়ে বলরাম। যশোদানন্দন খ্যাত হলেন কৃষ্ণ নামে।

[হরিবংশ পু. ২.৫.১-৮; ২.৬.২-৩]

☐ সৌরকুলের দেবতার স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই হোক, কিংবা কংসের মৃত্যুভয়জনিত হতাশার কারণেই হোক—কৃষ্ণের জীবন শিশু বয়স থেকেই বিপদসঙ্কুল ছিল। হরিবংশ বা বিষ্ণু পুরাণ খুব স্পষ্টভাবে না বললেও ভাগবত পুরাণ বেশ স্পষ্টই জানিয়েছে যে, কংস মোটেই হাল ছেড়ে দিয়ে বসে রইলেন না। নিজের শত্রুকে যাতে শিশু অবস্থাতেই নাশ করা যায় তার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, আর এই উদ্যোগেরই প্রথম ধাপ পূতনার আবির্ভাব। একমাত্র হরিবংশ পুরাণেই পূতনার আক্রমণের আগেই শকট ভঞ্জনের কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে বেশিরভাগ পুরাণেই পূতনার ঘটনাই আগে ঘটেছিল। পুরাণগুলির বিবরণের তুলনামূলক পর্যালোচনা করলেও পূতনার ঘটনাটিই সর্বাগ্রে ঘটেছিল বলে মনে হয়। আমরা পূতনার কথাই আগে বলব।

☐ হরিবংশ পুরাণ জানিয়েছে যে পূতনা ভোজরাজ কংসের ধাত্রী ছিল এবং তার চেহারা ছিল পক্ষিণীর মতো—

পূতনা নাম শকুনী ঘোরা প্রাণিভয়ঙ্করী।

ভাগবত পুরাণ থেকে জানা যায়, কংসের আদেশে পূতনা মথুরা বৃন্দাবনে সেই দিনটিতে বা তার ঈষৎ আগে পরে জন্ম নিয়েছে এমন বহু শিশুসন্তানকেই হত্যা করেছিল। বিষাক্ত স্তন্যপান করিয়ে সে শিশুদের হত্যা করত। এইভাবে ক্রমাগত শিশুবধ করতে করতে একদিন সে নন্দরাজার বাড়িতে এলো শিশু কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য। কৃষ্ণ তার স্তন্যপান করতে করতে তার প্রাণটিও বুঝি পান করে ফেললেন—

তস্যাঃ স্তনং পপৌকৃষ্ণঃ প্রাণৈঃ সহ বিনদ্য চ।

পূতনা যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে নিজের রূপ ধারণ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার শরীর থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেল। পূতনা মারা গেল রাক্ষসীর রূপ ধারণ করে, তবে পুরাণে কৃষ্ণের চেহারায় কোনো অলৌকিক পরিবর্তন দেখা গেল না। স্তন্যপানলুব্ধ সদ্যোজাত শিশুটির মতো তিনি পূতনার ক্রোড়ে রইলেন।

বিষ্ণু পুরাণে দেখেছি—পূতনার প্রাণান্তক চিৎকার এবং ব্রজবাসীদের চিৎকারে জননী যশোমতী যখন সম্পূর্ণ বুঝলেন যে তাঁর শিশুটি বেঁচে গেছে, তখন তিনি সাধারণ গ্রাম্য জননীর মতোই ছেলের সর্বাঙ্গে গোপুচ্ছের ঝাড়া দিয়ে অপদেবতার দোষ অপনোদন করলেন—

গোপুচ্ছং ভ্রাম্য হস্তেন বলদোষমপাকরোৎ।

স্নেহময় নন্দরাজ, যিনি প্রায় বুড়ো বয়সে পুত্রলাভ করেছেন, তিনি গোময়-চূর্ণ হাতে নিয়ে শতেক দেবতার নাম উচ্চারণে ছেলের প্রত্যঙ্গ-রক্ষার মন্ত্র উচ্চারণ করলেন—

গোঃ করীষমাদায় নন্দগোপো'পি মস্তকে।
কৃষ্ণস্য প্রদদৌ রক্ষাং কুর্বংশ্চৈত দুদীরয়ন্॥

[ভাগবত পু. ১০.৬.১-৪৩; ১০.৭.১-৩৭;
হরিবংশ পু. ২.৬.৪-৩৪; ২.৭.১-৩৭;
বিষ্ণু পু. ৫.৫.১-২৩]

□ পূতনার মৃত্যুসংবাদে কংস যতটা ক্ষুব্ধ বিস্মিত হলেন, তার থেকেও বেশি সন্দিহান হলেন নন্দগোপের পুত্রটির অলৌকিক ক্ষমতার আভাস পেয়ে। এই দেবকীর অষ্টমগর্ভের সেই পুত্র নয় তো? এই আশঙ্কায় কংসের মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হল। তারপর তাঁরই আদেশে শকটাসুর এল কৃষ্ণকে বধ করতে। শকট মানে গোরুর গাড়ি। অর্থাৎ শকটাসুরকে বাংলায় গাড়ী-রাক্ষস বলা যায়। নন্দগোপ গয়লাদের রাজা হলেও তাঁর বাড়িঘর কিছু রাজপ্রাসাদ নয়। বাড়ির উঠোনে একটি গোরুর গাড়ীর পাশে যশোমতী শিশুপুত্রকে শুইয়ে রেখেছিলেন। হঠাৎই দেখা গেল গোরুরগাড়ি ভেঙে পড়েছে। হরিবংশ এবং ভাগবতপুরাণ জানিয়েছে, কৃষ্ণের বয়স তখন মাত্র তিন মাস। গাড়ী ভেঙে পড়ার ঘটনা দেখে সবাই দৌড়ে গিয়ে দেখলেন—শিশু কৃষ্ণ খাটে শুয়ে হাত-পা নাড়ছেন, ঠিক পাশটিতেই গোরুর গাড়ি ভেঙে পড়ে রয়েছে। কারও কারও মনেও হল—এমন করে গাড়ি হয়তো শিশুর পদাঘাতেই উল্টে গিয়েছে। তবে এমন কথায় কেউ গুরুত্ব দিলেন না। বরং কৃষ্ণ বেশ বড়োসড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন ভেবে যশোদা প্রভৃতিরা সেই শকটের পূজা করলেন এবং কৃষ্ণকে আরও নানা অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মন্ত্র পড়তে লাগলেন—

রুদন্তং সুতমাদায় যশোদা গ্রহশঙ্কিতা।
কৃতস্বস্ত্যয়নং বিপ্রৈঃ সূক্তৈঃ স্তনমপায়য়ৎ॥

হরিবংশ পুরাণে কিন্তু এ ঘটনায় যশোদার প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি ঘরোয়া একজন স্নেহশীলা জননীর মতো। তিনি দুর্ঘটনার সময় নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে ছেলেকে দুধ খাওয়াবেন, সংসারের কাজকর্ম পড়ে আছে এমন সব ভাবতে ভাবতে এসে ঘটনা দেখে তিনি প্রায় হাহাকার করে উঠলেন। তারপর ঈশ্বরের কাছে পুত্রের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে করতে শিশু কৃষ্ণকে কোলে তুলে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলেন, কোথাও কোনো আঘাত লেগেছে কী না। তারপর শিশু কৃষ্ণকেই নিজের দুশ্চিন্তার কথা শোনাতে বসলেন—বাছা! তোমার বাবা ভীষণ রাগী মানুষ। গাড়ির নীচে তোমাকে শুইয়ে রেখে গিয়েছিলাম, এসে দেখি এই কাণ্ড। তোমার কিছু হয়ে গেলে তোমার বাবাকে আমি কী বলতাম? হায় হায়, কেন তোমাকে এমন একলা শুইয়ে রেখে আমি স্নান করতে গেলাম—

কিংনু কক্ষ্যতি তে পুত্র পিতা পরমকোপনঃ।
ত্বয্যধঃ শকটে সুপ্তে অকস্মাচ্চ বিলোড়িতে॥
কিং মে স্নানেন দুঃস্নানং কিঞ্চ মে গমনে নদীম্।
পর্যস্তে শকটে পুত্র যা ত্বাং পশ্যাম্য পাবৃতম্॥

[হরিবংশ পু. ২.৬.১-২১; ভাগবত পু. ১০.৭.১-১৮;
বিষ্ণু পু. ৫.৬.১-৩৫; ব্রহ্ম পু. ১৮৪ অধ্যায়]

□ পুরাণগুলিতে এরপর শিশুকৃষ্ণের জীবনের সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যমলার্জুন ভঙ্গ। তবে ভাগবত পুরাণে এর আগে দু-একটি ছোটো ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা মূলত কৃষ্ণের ভগবৎ স্বরূপতা বা পরমেশ্বর স্বরূপতাকেই প্রকাশ করে। যেমন দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণ যখন মাত্র এক বছরের, তখন একদিন যশোদা ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করছেন, এমন সময় কৃষ্ণ যেন আপন স্বরূপ প্রকাশ করলেন। তাঁর দেহ এতই ভারী হল যে, যশোদা আর তাঁকে তুলতে পারেন না। শঙ্কিত হয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন—তবে কি কোনো দুষ্টগ্রহ প্রবেশ করল আমার ছেলের দেহে? নইলে এক বছরের এতটুকু শিশুর দেহ এত ভারী হবে কেন? ভীত হয়ে যশোদা মনে মনে নারায়ণ স্মরণ করতে লাগলেন, শিশুর স্বস্ত্যয়ন করাবার জন্য ব্রাহ্মণদের ডেকে পাঠালেন। ঠিক এই সময় কৃষ্ণকে বধ করার জন্য কংস প্রেরিত রাক্ষস তৃণাবর্ত গোকুলে প্রবেশ করল। তৃণাবর্ত রাক্ষস হলেও তার আকৃতি অনেকটা ঘূর্ণিঝড়ের মতো। সে গোকুলে প্রবেশ করতেই সমস্ত গ্রামটা যেন প্রবল ধুলোর ঝড়ে অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর তৃণাবর্ত এসে শিশু কৃষ্ণকে দুই হাতে তুলে ধরলেন। কৃষ্ণের দেহ হঠাৎই প্রচণ্ড ভারী হয়ে গিয়েছিল, আমরা আগেই জানিয়েছি। আর সে ভার এতটাই যে তৃণাবর্তের মতো ঘূর্ণিঝড়ের আকৃতির দৈত্যেরও সেই ভার তুলে ধরার পরে আর নড়াচড়া করার ক্ষমতা রইল না। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ছোটো বাচ্চাদের যখন আদর করে দু-হাতে উঁচুতে তুলে ধরা হয়, তখন তাদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবেই তারা উত্তোলনকারীর গলা জড়িয়ে ধরে। কৃষ্ণও কতকটা তেমন করেই তৃণাবর্তের গলা জড়িয়ে ধরলেন। কৃষ্ণ প্রচণ্ড অলৌকিক শক্তিতে তৃণাবর্তের গলা জড়িয়ে ধরায় সেই ভারেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তার মৃত্যু হল। তার বিশাল দেহ প্রাণহীন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার বিশাল দেহের পতন শব্দে যশোদা এবং অন্যান্য ব্রজরমণীরা ছুটে এসে দেখলেন সেই রাক্ষসের মৃতদেহের বুকে শিশু-কৃষ্ণ দুলছেন। কৃষ্ণ রাক্ষসের কবলে পড়েও বেঁচে গিয়েছেন দেখে সকলে যেমন বিস্মিত হলেন,৩ তেমনই আশ্বস্তও হলেন। যশোদা কৃষ্ণকে কোলে তুলে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, কৃষ্ণের দেহের সেই গুরুভার কখন যেন আবার স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে, একেবারে ছোটো শিশুটির মতোই। [দ্র. তৃণাবর্ত]

[ভাগবত পু. ১০.৭.১৮-৩৪]

□ তৃণাবর্ত বধের ঠিক পরে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণ দুধ খেয়ে মায়ের কোলে বসেছেন, মা যশোদা তাঁকে আদর করছেন, এমন সময় শিশু কৃষ্ণ হাই তুললেন। ঠিক সেই এক পলকের মুখ ব্যাদানে যশোদা যেন সেই মুখের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড আকাশ, স্বর্গ-মর্ত্য-গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য, অগ্নি, সমুদ্র পর্বত-নদী সমস্ত জীবকুলকে দেখতে পেলেন—

খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ
সূর্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীংশ্চ।
দ্বীপান্ নগাংস্তদ্দুহিতৄর্বনানি
ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি॥

কৃষ্ণ যেন আপন লীলার মাধ্যমেই নিজের পরমেশ্বর স্বরূপতা প্রকাশ করে ফেললেন জননীর কাছে। এক পলকের জন্য যশোদা দেখতে পেলেন, যাঁকে পুত্র ভেবে কোলে নিয়ে আদর করছেন, তিনিই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ। বিস্ময়ে কম্পিত হয়ে চোখ বন্ধ করলেন যশোদা।

[ভাগবত পু. ১০.৭.৩৫-৩৭]

□ ভাগবত পুরাণে তৃণাবর্তবধের পর কৃষ্ণ-বলরামের নামকরণ-সংস্কারের উল্লেখ আছে। খুব ছোটো কিন্তু খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ। যদু-বৃষ্ণিদের কুলপুরোহিত ছিলেন মহর্ষি গর্গ। পুত্রদের নামকরণ-সংস্কারের সময় হয়ে গিয়েছে দেখে বসুদেব মহর্ষি গর্গকে গোকুলে নন্দরাজার কাছে পাঠালেন। নন্দরাজা তাঁকে দেখে সাদর অভ্যর্থনা করলেন, বিধিমতে ঋষির পূজাও করলেন। তারপর গর্গ নন্দকে বললেন—আমি এই দুই শিশুর নামকরণ সংস্কার করতেই এখানে এসেছি। কিন্তু একথা গোপন রাখা দরকার। নইলে যশোদানন্দনকে সকলে দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান বলে চিনে ফেলবে। কংসের কাছেও কথাটা চাপা থাকবে না। বিশেষত দৈববাণীই প্রমাণ যে, দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান কখনোই কন্যা হতে পারে না। কাজেই কংসের সন্দেহ হবে—

যদূনামহমাচার্যঃ খ্যাতশ্চ ভুবি সর্বতঃ।
সুতং ময়া সংস্কৃতং তে মন্যতে দেবকীসুতম্॥

কংস পাপমতিঃ সখ্যং তব চানকদুন্দুভেঃ।
দেবক্যা অষ্টমো গর্ভো ন স্ত্রী ভবিতুমর্হতি॥
ইতি সংচিন্ত্যয়ন্ শ্রুত্বা দেবক্যা দারিকাবচঃ।
অতি হস্তাগতাশঙ্কস্তর্হি তন্নো'নয়ো ভবেৎ॥

নন্দ-সমস্যাটা বুঝলেন। তারপর যথাসম্ভব গোপনে নামকরণ সংস্কারের ব্যবস্থাও করলেন। গর্গ ঋষি প্রথমে বলছিলেন বটে, যে কংস সন্দেহ করলে নন্দপুত্রের ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণের নামকরণের সময় স্পষ্টই উচ্চারণ করলেন যে এই শিশু বসুদেবের পুত্র হয়ে জন্মেছিলেন, তাই তিনি 'বাসুদেব' নামেও খ্যাত হবেন—

প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞা সম্প্রচক্ষতে॥

এরপর কৃষ্ণের বিষ্ণু স্বরূপতা বা তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা এবং সবশেষে ইনিই জগতকে অরাজকতা থেকে মুক্ত করবেন—এই ভবিষ্যদ্‌বাণী গর্গ এমনভাবেই উচ্চারণ করলেন যে, কৃষ্ণের জন্মরহস্য নন্দের কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

[ভাগবত পু. ১০.৮.১-২০]

□ কৃষ্ণের ভগবৎস্বরূপতার প্রকাশ হিসেবে আর একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ ভাগবত পুরাণে পাওয়া যায়। শিশু কৃষ্ণ এখন সামান্য বড়ো হয়েছেন, তিনি টলোমলো পায়ে চলাফেরা করেন। একদিন বলরাম আর গোপ বালকরা যশোদাকে এসে বললেন—মা! কৃষ্ণ মাটি খাচ্ছে। যশোদা একথা শুনে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেখেন—সত্যিই তাঁর পুত্র উঠোনে বসে মাটি খাচ্ছে। যশোদা ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে বললেন—দুষ্টু ছেলে! মাটি খাচ্ছিস! কৃষ্ণও সজোরে মাথা নেড়ে বললেন—মোটেই আমি মাটি খাইনি। যশোদা ছাড়ার পাত্র নন, তিনি বললেন—মুখ খোল দেখি। মায়ের কথা শুনে কৃষ্ণ মুখব্যাদান করলেন। যশোদা সবিস্ময়ে দেখলেন—সেই মুখের মধ্যে সম্পূর্ণ চরাচর জগত বিদ্যমান। আকাশ, ভূমি, পাহাড়, সমুদ্র, অগ্নি, বিদ্যুৎ, গ্রহ-নক্ষত্র সবই সেই মুখের মধ্যে রয়েছে—

সদ্যেবং তর্হি ব্যাদেহীত্যুক্তঃ স ভগবান্ হরিঃ।
ব্যাদত্তাব্যাহতৈশ্বর্যঃ ক্রীড়ামনুজবালকঃ॥
সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থাণু চ খং দিশঃ।
সাদ্রিদ্বীপাব্ধিভূগোলং সবায়বগ্নীন্দুতারকম্॥
জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্বান্ বিয়দেব চ।
বৈকারিকানীন্দ্রিয়াণি মনো মাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ॥

যশোদা বিস্মিত হলেন, শঙ্কিত হলেন। ভাবলেন—এ আমি কী দেখলাম? স্বপ্ন না ঈশ্বরসৃষ্ট কোনো মায়া? তবে কি আমার এই পুত্র দৈবশক্তির অধিকারী? বিস্মিত যশোদা পুত্রকে ঈশ্বরস্বরূপ জেনে তার স্তব করলেন, ভক্তিভরে শিশু কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। কিন্তু ভক্তের মধ্যে তো মায়ের বাৎসল্য প্রকাশ পায় না, আমার পুত্র স্বয়ং ঈশ্বর—এই ভাবনা তাকে শঙ্কিত করে রাখে। তাই স্বয়ং কৃষ্ণের আদেশে যোগমায়া যশোদার মনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। যশোদা একটু আগে পুত্রের মুখের মধ্যে বিশ্বদর্শন করেছেন—এ ঘটনা যোগমায়ার প্রভাবে বিস্মৃত হলেন। স্বাভাবিক ভাবেই আদর করে কোলে তুলে নিলেন পুত্রকে। কৃষ্ণও সাধারণ মানবশিশুর মতোই মায়ের আদরে বড়ো হতে লাগলেন দিনে দিনে। *[ভাগবত পু. ১০.৮.৩১-৪৫]*

□ আমরা যমলার্জুন ভঙ্গের ঘটনায় আসি। কৃষ্ণ যত বড়ো হচ্ছেন, তাঁর দুষ্টুমি ততোই বেড়ে চলেছে। তিনি কখনো মাখন চুরি করে খান, কখনো দুধ-দইয়ের কলসি ভেঙে দেন। বিষ্ণু পুরাণে দেখছি—কৃষ্ণ সর্বাঙ্গে গোময় মেখে, ভস্ম আর ধুলো মেখে—

করীষ-ভস্ম-দিগ্ধাঙ্গৌ।

এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান, রোহিণী বা যশোদা তাঁকে সামলাতে পারেন না—

ন নিবারয়িতুং শেকে যশোদা ন চ রোহিণী।

এই সে গোয়ালঘরে যাচ্ছে, পরক্ষণেই হয়তো বাছুরের লেজ ধরে টানছে। একদিন এই দুষ্টুমিতে অতিষ্ঠ হয়ে যশোদা ছড়ি হাতে কৃষ্ণের পিছনে পিছনে দৌড়তে লাগলেন। কৃষ্ণও ছুটোছুটি করে বেড়ান, যশোদাও ছুটে তাঁকে ধরার চেষ্টা করেন। সত্যি যখন কৃষ্ণ মায়ের হাতে ধরা পড়লেন, তখন খানিক বকুনি দেবার পর ছেলের কাঁদোকাঁদো চেহারা দেখে যশোদার আর কৃষ্ণকে মারতে ইচ্ছা হল না। তবু কিছু তো শাস্তি দেওয়া দরকার, বড়ো দুষ্টু হয়েছে ছেলে—এসব ভাবতে ভাবতে যশোদা একটি শস্য ভাঙার জাঁতাকল বা উলূখলের সঙ্গে কৃষ্ণকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলেন। উলূখল বস্তুটি নেহাত ছোটো নয়, তার সঙ্গে শিশুকে বেঁধে রাখলে ছেলের দুষ্টুমির থেকে মায়ের নিশ্চিন্ত

হওয়ারই কথা। কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল কই! উলূখলে বাঁধা অবস্থায় কৃষ্ণ সেই উলূখল শুদ্ধ টেনে নিয়ে চললেন— উঠোন পেরিয়ে পথ, পথ দিয়ে বনের দিকে যেতে পথের ধারে দুটি অর্জুন গাছ পড়ে। গাছ দুটি যেন যমজ গাছ, খুব কাছাকাছি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা একই আকারের দুটি গাছ। শিশু কৃষ্ণ নিশ্চিন্তে দুই গাছের মাঝখানের অংশটুকু দিয়ে হেঁটে গেলেন, আটকে গেল উলূখল। কৃষ্ণ সেই দড়ি বাঁধা উলূখল টানতে লাগলেন। সেই টানের চোটে অর্জুন গাছ দুটি ভেঙে পড়ল একসঙ্গে। কৃষ্ণের কিন্তু তাপ উত্তাপ নেই। এদিকে গাছ ভাঙার শব্দে সকলে ছুটে এসে কাণ্ড দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। ভাগবত পুরাণ বা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের বর্ণনায় যমল অর্জুনকে কুবেরের দুই অভিশপ্ত পুত্র বলা হয়েছে। নারদের শাপে কুবেরের দুই লম্পট পুত্র বৃক্ষরূপ লাভ করেছিল। আজ কৃষ্ণ গাছ দুটিকে ভেঙে ফেলায় তাঁরা শাপমুক্ত হলেন। শিশু কৃষ্ণরূপ নারায়ণের স্তব স্তুতি করে কুবের ভবনে ফিরে গেলেন তাঁরা। হরিবংশের বর্ণনায় এমন অলৌকিকতার ছাপ নেই। সেখানে দেখা যাচ্ছে অর্জুনগাছদুটি গ্রামবাসীর কাছে পূজনীয় ছিল। গাছের পূজা তখনকার দিনে খুব স্বাভাবিক ঘটনা, এমনকী এখনও গ্রামে গঞ্জে পথের ধারে এমন একটি বৃক্ষদেবতার দেখা মেলেই যার পূজো হয়। যার কাছে মেয়ে-বউরা মানত করে মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশায়। এ গাছ দুটিও ঠিক তেমন। ব্রজরমণীরা ত্রস্ত হয়ে সেই বৃক্ষদেবতার পতন সংবাদ যশোদাকে জানিয়েছেন—যে গাছের পুজো করে, যে গাছের সামনে মানত করে আমাদের প্রার্থনা সফল হত, সেই অর্জুন গাছ দুটি তোমার ছেলের ওপর পড়েছে—

যৌ তাবর্জুনবৃক্ষৌ তু ব্রজে সত্যোপযাচনৌ।
পুত্রস্যোপরি তবেতৌ পতিতৌ তে মহীরুহৌ॥

অবশ্য কৃষ্ণের আঘাত লাগেনি। যেন বেশ একটা মজার ঘটনা হয়েছে, এমন ভাব করে তিনি দড়ি বাঁধা অবস্থাতেই দুই বৃক্ষের মাঝে দাঁড়িয়ে হাসছেন—

দৃঢ়েন দাম্না তত্রৈব বদ্ধো বৎস ইবোদরে।
জহাস বৃক্ষয়োর্মধ্যে তব পুত্রঃ স বালকঃ॥

যশোদার শাসন করার পদ্ধতি নিয়ে উল্টো ব্রজরমণীরা তাঁকেই বকাঝকা করলেন—এমন ভাবে ছেলেকে বাঁধতে আছে? যদি সত্যিই গাছ তার উপরে পড়ত? নন্দগোপও যশোদাকেই তিরস্কার করলেন। যশোদার আর ছেলে শাসন করা হল না। এদিকে শিশু কৃষ্ণ অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পাওয়ায় সকলে আনন্দিত হলেন। কিন্তু বৃক্ষদেবতার অবস্থা দেখে সকলে চিন্তিতও হলেন। মিথলজিস্টরা কৃষ্ণের বাল্যকালের এ ধরনের ঘটনা ব্যাখ্যা করে বলেন—সে সময়ে প্রকৃতির নানা স্বরূপকে মানুষ যেভাবে পুজো করত, শকটভঞ্জন বা যমলার্জুন ভঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি পূজায় ভাঙন দেখা দিয়েছে। যমলার্জুন ভঙ্গের পর ব্রজবাসীদের দুশ্চিন্তা এবং আলোচনাই প্রমাণ যে গাছদুটির গুরুত্ব তাঁদের কাছে ঠিক কতখানি ছিল। তবে এই মুহূর্তে শিশু কৃষ্ণই ব্রজবাসীদের সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু, তাঁকে অক্ষত দেখে ব্রজবাসীরা বৃক্ষদেবতার অন্তর্ধান শোকও ভুললেন বা বলা ভালো, বৃক্ষদেবতার বদলে শিশু কৃষ্ণই সকলের মন জুড়ে বসলেন।

তবে সবথেকে বড়ো কথা হল—এই বাল্যলীলার কারণে তিন ভুবনের ঈশ্বরের পেটে মায়ের নিজে হাতে সাজা দেওয়া দড়ির বাঁধন পড়া। ভাগবতের কবি অসামান্য কাব্যবন্ধ তৈরি করে বলেছেন—যাঁর আদি-অন্ত নেই, যাঁর পূর্ব-উত্তর সীমারেখা নেই, সেই সর্বব্যাপ্ত বিভু ঈশ্বরকে জননী যশোমতী প্রাকৃত শিশুর মতো বেঁধে ফেললেন—

গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা।

কৃষ্ণ ব্রজভূমিতে এতটাই আদরের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন যে, মায়ের সেই দড়ি বাঁধার কারণেই তাঁর আদরের নতুন নাম হল দামোদর—

স চ তেনৈব নাম্না তু কৃষ্ণো বৈ দামবন্ধনাৎ।
গোষ্ঠে দামোদর ইতি গোপীভিঃ পরি গীয়তেঃ॥

[হরিবংশ পু. ২.৭.১১-৩৬; ভাগবত পু. ১০.৯.১-২৩; ১০.১০.২-৪৩; বিষ্ণু পু. ৫.৬.১-৮]

□ দিন কাটতে লাগল, কৃষ্ণ-বলরাম খেলাধুলো-দুষ্টুমিতে মেতে জীবন কাটাতে লাগলেন। একটু একটু করে বড়ো হতে লাগলেন। তবে যমলার্জুন ভঙ্গ হবার পর ব্রজবাসীদের জীবনে একটু পরিবর্তন দেখা দিল। কৃষ্ণপিতা নন্দরাজা লক্ষ্য করলেন ব্রজভূমিতে নানা উৎপাত দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে হরিবংশ পুরাণে অবশ্য বেশ একটু অলৌকিক বর্ণনা

পাওয়া যায়। হরিবংশে বর্ণিত হয়েছে গোকুলের মাঠে বনে গোচারণ আর খেলাধুলার ফাঁকে কৃষ্ণই একদিন বলরামকে বললেন—এই অঞ্চলে আর বাস করা সম্ভব নয়। আমাদের অতিরিক্ত ব্যবহারে বনের গাছপালা প্রায় শেষ হতে বসেছে। গোরুদের খাবার ঘাসও কমে এসেছে। গোপজনেরা জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করার নামে অবশিষ্ট গাছপালাগুলিরও অবস্থা খারাপ করে ফেলেছে। জল কমে এসেছে, এমনকী বিশ্রামের জন্য ভূমিও অনুসন্ধান করে বের করতে হয়। পরিবেশ এমন দাঁড়িয়েছে যে, অন্যান্য পশুপাখীরাও এ জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ফল-ফুলও এখানে আর তেমন মেলে না, তাদের স্বাদও ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অতএব আমাদের এই স্থান ত্যাগ করা উচিত আর গোসম্পদ নিয়ে এমন এক ব্রজভূমিতে বসতি স্থাপন করা উচিত যা প্রায় দুর্গের মতো সুরক্ষিত, যার পরিবেশ মনোরম এবং যে স্থান বনসম্পদে সমৃদ্ধ। শিশু কৃষ্ণের মুখ থেকে এমন জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা একটু অস্বাভাবিক শোনায় ঠিকই, তবে তাঁর ভগবত্তার কথা মাথায় রেখে সেটাকে মেনে নিলে তাঁর বক্তৃতার বিষয়টি যে অত্যন্ত আধুনিক এবং বর্তমান যুগের পরিবেশ ভাবনার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই কোন প্রাচীনকালে তিনি মানুষের দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। তার ওপর গোপজনের নতুন বসতির ক্ষেত্রে সুরক্ষার বিষয়টা কৃষ্ণ যেভাবে মাথায় রেখেছেন তাতে মনে হয় কংসের লোকজনের উপদ্রবের ভয়ও কিছু ছিল। ভাগবত পুরাণ থেকে সেটা অবশ্য স্পষ্টভাবেই বোঝা যাবে। যাই হোক, কৃষ্ণ নিজেই নতুন বসতির জন্য স্থান নির্বাচন করেছেন—গোবর্ধন পর্বত সংলগ্ন মনোরম বৃন্দাবন অঞ্চল। স্থানটি যমুনা নদীর তীর, পর্বতসংলগ্ন বনভূমিতে বনসম্পদও প্রচুর। কৃষ্ণ শেষপর্যন্ত বলরামকে বললেন—এমন কোনো ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ব্রজবাসী নিজেরাই স্থান ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কথাটা খুব স্বাভাবিক। দুটি বালকের কথায় গোপেরা গোকুল ত্যাগ করবেন এটা একটু অস্বাভাবিক। তবে যমলার্জুন ভঙ্গের পরে সকলেই একটু ভয়ে আছেন। হরিবংশে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণের মায়ায় তাঁর দেহ থেকে বৃক উৎপন্ন হল। বৃক নেকড়ে বাঘের মতো পশু। এরা গবাদি পশুদের বধ করে—

ঘোরাশ্চিন্তয়তস্তস্য স্বতনূরুহজাস্তদা।
বিনিষ্পেতুর্ভয়কারাঃ সর্বশঃ শতশোবৃকাঃ॥

সেই নেকড়ের দলকে ব্রজভূমিতে ঘুরে বেড়াতে দেখে ব্রজবাসীরা ভীত হলেন, গোসম্পদ বাঁচানোর জন্য নিজেরাই স্থান ত্যাগ করে বৃন্দাবনে বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন পরামর্শ করে। কিছুদিন সময় লাগল, কিন্তু বৃন্দাবনের মনোরম পরিবেশে গোপদের যে নতুন ব্রজভূমি তথা বাসভূমি স্থাপিত হল, তা যে গোকুলের থেকেও অনেক সুন্দর, স্থানটিও অত্যন্ত মনোরম—তা সকলেই মেনে নিলেন। হরিবংশ পুরাণে এই স্থানান্তরে বসতি স্থাপনের বর্ণনায় ব্রজবাসীদের গৃহস্থালীর খুঁটিনাটীর সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। শুধু সমস্যা একটাই। যমুনাতীরে বৃন্দাবনের অদূরে হ্রদের মধ্যে কালিয় নাগের বাস। তবে এই মুহূর্তে কালিয় নাগকে নিয়ে ভাবনা না করে করে কৃষ্ণ বলরাম বৃন্দাবনের মনোরম বনে গোপসখাদের সঙ্গে গোচারণ এবং নিত্যনতুন খেলায় মেতে রইলেন।

[হরিবংশ পু. ২.৮-১১ অধ্যায়;
ভাগবত পু. ১০.১১.১-৪০]

□ কংসও কিন্তু চুপ করে বসে ছিলেন না। পূতনাবধ, শকটভঞ্জন—এই দুই ঘটনাতে তাঁর সন্দেহ দৃঢ় হয়ে থাকবে যে ব্রজভূমিতে নন্দরাজার ঘরে জন্মানো বালকটি মোটেই সামান্য বালক নয়। এমনকী হয়তো নন্দরাজার পুত্রও নয়। দেবকীরই পুত্র হবে। ফলে কংসের অনুগত দৈত্য-দানবদের উৎপাত চলতে লাগল। গোকুল ত্যাগ করে সকলে বৃন্দাবনে বসতি স্থাপন করার পরেও এ উপদ্রব কমল না। একবার এক দৈত্য এসে গোরুর পালের মধ্যে বাছুর সেজে দাঁড়িয়ে রইল। সুযোগ পেলেই কৃষ্ণকে বধ করবে—এমনটাই ইচ্ছে। কিন্তু কৃষ্ণ সে দৈত্যকে চিনে ফেললেন, কৃষ্ণের হাতেই সে মারা পড়ল। তারপর কৃষ্ণকে মারতে এলো কংসের প্রিয় সখা বকাসুর। বিশাল বকের মতোই তার চেহারা। কৃষ্ণের হাতে সেও প্রাণ দিল। বালক কৃষ্ণের পরাক্রম তাঁর গোপসখা এবং ব্রজবাসীদের মনে যেমন বিস্ময়ের সঞ্চার করতে লাগল, তেমনই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন

কৃষ্ণ-বলরামের প্রতি তাঁদের স্নেহ অনুরাগ-সম্ভ্রম উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। নন্দরাজার পুত্র বাস্তবেই বৃন্দাবনে রাখালরাজা 'ভর্তা-দামোদর' হয়ে উঠলেন। এদিকে কৃষ্ণকে হত্যার একের পর এক চেষ্টা বিফলে যাওয়ায় কংসও বিস্মিত হচ্ছিলেন। কৃষ্ণ সম্পর্কে এক অজানা ভয় এবং বিস্ময় তাঁকে গ্রাস করেছিল। তাই বার বার বিফল হয়েও নতুন করে কৃষ্ণবধের চেষ্টা করতে লাগলেন। বকাসুর এবং পূতনার ছোটোভাই ছিল অঘাসুর। বিশাল অজগরের রূপ ধারণ করে সে বৃন্দাবনে এল নিজের ভাই বোনের হত্যার প্রতিশোধ নিতে। পথের ধারে এক প্রকাণ্ড হাঁ করে সে বসে রইল। দেখে মনে হল ঠিক যেন একটা গুহা। কৃষ্ণের গোপসখারা খানিক সন্দেহ করেও সেই অজগরের মুখের মধ্যে প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণ শেষপর্যন্ত অঘাসুরকে বধ করে নিজের সখাদের উদ্ধার করলেন।

[দ্র. বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর]

[ভাগবত পু. ১০.১১.৪১-৫৯; ১০.১২.১-৪৪]

□ ভাগবত পুরাণে এরপর সম্পূর্ণ দুটি অধ্যায় জুড়ে কৃষ্ণের ঐশ্বরিক মহিমা এবং লোকপিতামহ ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ করার উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। তবে হরিবংশ বা বিষ্ণুপুরাণে এধরনের কাহিনী পাওয়া যায় না।

[ভাগবত পু. ১০.১৩-১৪ অধ্যায়]

□ ভাগবত পুরাণে এরপর ধেনুকাসুর বধের উপাখ্যান আছে। ভাগবত পুরাণ মতে, এ ঘটনা যে সময়ে ঘটে, তখন কৃষ্ণের বয়স মাত্র ছয় কিংবা সামান্য বেশি হবে। তিনি কখনো গোরুর পাল নিয়ে গোবর্ধন পর্বতের কাছে যান, কোনো দিন বা যমুনা তীরের বনে। গোচারণ এবং অন্যান্য গোপবালকদের সঙ্গে নানা খেলায় মেতে, বাঁশি বাজিয়ে তাঁর দিন কাটে। এতগুলি অসুর দৈত্যকে বধ করার কারণে কৃষ্ণ বলরামের শক্তিতে সমবয়সী গোপবালকদের অগাধ আস্থা। শ্রীদামা, সুবল প্রভৃতি গোপসখারাই একদিন কৃষ্ণ-বলরামকে জানালেন—সামনে অদূরে এক গভীর বন আছে। সেই তালবনে চমৎকার তাল ফলে। কিন্তু সেখানে ধেনুকাসুর নামে এক ভয়ানক দৈত্যের বাস। তার ভয়েই কেউ সেখানে যেতে চায় না, গেলেও জীবিত ফিরে আসে না। একরকম গোপবালকদের অনুরোধেই কৃষ্ণ-বলরাম সেই তালবনকে ধেনুকাসুরের কবল থেকে মুক্ত করতে গেলেন। কৃষ্ণ-বলরাম মহানন্দে তাল পাড়ছেন, সেই শব্দে ধেনুকাসুর সেখানে এসে উপস্থিত হল। সে কংসের বন্ধু, তার চেহারা গাধার মতো। বলরামের সঙ্গে তালবনে সেই ধেনুকাসুরের ভয়ানক যুদ্ধ হল। বলরামই শেষপর্যন্ত তাকে বধ করলেন। তবে কোথাও কোথাও ধেনুক-বধের ঘটনাটিও কৃষ্ণের ওপর আরোপিত হয়ে গিয়েছে। *[দ্র. ধেনুকাসুর]*

[ভাগবত পু. ১০.১৫.২০-৪০;
হরিবংশ পু. ২.১৩ অধ্যায়; ব্রহ্ম পু. ১৮৬ অধ্যায়;
বিষ্ণু পু. ৫.৮ অধ্যায়]

আমরা ব্রজবাসীদের গোকুল ত্যাগ করে বৃন্দাবনে বসতিস্থাপন প্রসঙ্গে কালিয়নাগের উল্লেখ করেছিলাম। এই মুহূর্তে ভাগবত পুরাণের কাহিনী পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা কালিয়দমনের উপাখ্যানে এসে পৌঁছেছি। হরিবংশ পুরাণে মাঝখানে কংসপ্রেরিত এতগুলি অসুর-দানবের উল্লেখ নেই। বৃন্দাবনে বসতি স্থাপনের অল্পকাল পরেই কালিয়দমনের ঘটনা ঘটেছে।

কৃষ্ণের বাল্য-কৈশোরের নানা বীর-কাহিনীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী হল কালিয়-দমন। কারণ কালিয় কংসের প্রেরিত কোনো অসুর-রাক্ষস নয়, সে নিজেই মূর্তিমান বিপন্নতা। প্রবাহিনী যমুনার যে জল সমস্ত বৃন্দাবনবাসীর জীবনদায়িনী, সেই যমুনার জল বিষাক্ত করে তুলেছে কালিয়। কালিয়র পরিচয় হল—সে নাগরাজ। ভয়ঙ্কর বিষ তার মুখে, শরীরে। যেখানে সে থাকে, সেখানে জনমানব তো আসেই না, এমনকি কোনো পশু-পক্ষীও তার ধারে কাছে আসে না—

ন গোপৈ-র্গোধনৈর্বাপি তৃষ্ণার্তৈরুপযুজ্যতে।

হরিবংশ পুরাণে কালিয়দমনের বর্ণনাতেও যথেষ্ট বাস্তববোধ এবং ইতিহাসবোধ দেখা যাচ্ছে। হরিবংশ পুরাণে বৃন্দাবনে বসতিস্থাপনের অল্পকাল পরেই দেখতে পাচ্ছি কৃষ্ণ বনে ঘুরতে ঘুরতে আপনমনেই আলোচনা করছেন— যমুনাতীরের এই অংশে কালিয় নাগের বাস তা তিনি শুনেছেন। কালিয় নাগের বিষে যমুনা দূষিত হয়ে পড়েছে, এর প্রতিকার না করলে বৃন্দাবনের মানুষজন এবং গোসম্পদের

ক্ষতি হবে। এরপর হরিবংশ একটু অলৌকিকভাবেই বর্ণনা করছে যে, ঈশ্বরের অবতার কৃষ্ণ নিজের অবতার গ্রহণের কারণ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তিনি আপন মনে বলছেন, এই দুষ্টদের দমন করার জন্যই আমার অবতার গ্রহণ। যদি কালিয়কে দমন করে বৃন্দাবনকে গোপজাতির বাসযোগ্য করে তুলতে পারি, তাতে সকলের কল্যাণ হবে, আমার বাহুবলের খ্যাতিও জগতে প্রসিদ্ধ হবে—

ব্রজোপভোগ্যা চ যথা নাগে চ দমিতে ময়া।
সর্বত্র সুখসঞ্চারা সর্বতীর্থসুখাশ্রয়া॥
এতদর্থঞ্চ বাসো'য়ং ব্রজে'স্মিন্ গোপজন্ম চ।
অমীষামুৎপথস্থানাং নিগ্রহার্থং দুরাত্মনাম্॥
এনং কদম্বমারুহ্য তদেব শিশুলীলয়া।
বিনিপত্য হ্রদে ঘোরে দময়িষ্যামি কালিয়ম্॥
এবং কৃতে বাহুবীর্যং লোকে খ্যাতি গমিষ্যতি॥

মর্ত্যলোকে নিজের বাহুবলের খ্যাতি বিস্তারে ঈশ্বরেরও কিছু প্রয়োজন আছে। প্রাথমিক প্রয়োজন কংসের মনে ভয় ধরানো। আর ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে যিনি রাজনীতির সূত্রধার হবেন তাঁরও নিজের বলবত্তার খ্যাতিবিস্তারের প্রয়োজন আছে বৈকি।

যাই হোক, হরিবংশের বর্ণনা মতো কৃষ্ণ সত্যি সত্যিই একদিন খেলতে খেলতে কালিয়হ্রদে ঝাঁপ দিয়েছেন। কালিয়নাগকে বহু ফণাযুক্ত বিষধর সর্প বলা হলেও আমাদের ধারণা—এরা সাপের টোটেমধারী ঐতিহাসিক নাগ জনজাতি। এদের বসতি আর্যদের মতো নয় বলেই হয়তো সাপের মতো হ্রদ বা বিলের কল্পনা। বৃন্দাবনের উত্তরদিকে এই নাগজনজাতির আধিপত্য। ঘোষপল্লী আর নাগবসতির মাঝে একক্রোশ মাত্র এলাকা—

ব্রজস্যোত্তরতস্তস্য ক্রোশমাত্রে নিরাময়ে।

হয়তো এই নাগবসতি পেরিয়ে যমুনায় পৌঁছানো যেত। বৃন্দাবনবাসীদের কাছে যমুনার জল অতি প্রয়োজনীয় আর সেই প্রয়োজনের জন্যই কালিয়কে উৎখাত করা দরকার।

কৃষ্ণ এই দরকারটা বুঝেছিলেন, ব্রজবাসীদের মধ্যে এই নিয়ে আলোচনাও কিছু হয়ে থাকবে হয়তো। কৃষ্ণ খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, যমুনার তীরভূমি-ঘেঁষা এই হ্রদে নাগরাজ কালিয় বাস করেন। তাঁর গায়ের রঙ কালো কাজলের মতো। চিরশত্রু খগরাজ গরুড়ের ভয়ে তিনি এসে এই যমুনার জলে আশ্রয় নিয়েছেন—

অস্মিন্ স কালিয়ো নাম কালাঞ্জনচয়োপমঃ।
উরগাধিপতিঃ সাক্ষাদ্ হ্রদে বসতি দারুণঃ।
উৎসৃজ্য সাগরাবাসং যো ময়া বিদিতঃ পুরা॥

হরিবংশে দেখতে পাচ্ছি—নাগরাজ কালিয় সোজা মানুষ নন। হতে পারে—খগরাজ গরুড়ের তাড়া খেয়ে তিনি পালিয়ে এসেছেন এখানে। কিন্তু নিজভূমিতে তাঁর অখণ্ড প্রতাপ। আমরা আগে জানিয়েছি—নাগগোষ্ঠীর জনজাতিরা যেমন সাপের 'টোটেম' ব্যবহার করতেন, তেমনি খগ-গোষ্ঠীর লোকেরাও ব্যবহার করত পাখির 'টোটেম'। হয়তো খগ বা পক্ষীর 'টোটেম' ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নাগ গোষ্ঠীর জনজাতির চিরন্তন শাশ্বতিক শত্রুতা ছিল এবং হয়তো তাঁরা খগদের হাতে প্রচুর মারও খেয়েছেন।

কিন্তু যমুনার তীরভূমিতে বৃন্দাবন থেকে এক ক্রোশ পথ পরে কালিয় হলেন অবিসংবাদিত রাজা। কোনো মানুষ এই নাগদের ত্রিসীমানার মধ্যে প্রবেশ করে না বা প্রবেশ করার ক্ষমতা রাখে না। সেইজন্যেই কৃষ্ণ বলেছেন—কালিয় যমুনাকে দূষিত করেছে—

তেনেয়ং দূষিতা সর্বা যমুনা সাগরঙ্গমা।

তবে আসল কথাটি হরিবংশ থেকেই টের পাওয়া যায় এবং সেটা ঐতিহাসিক তথ্য। কৃষ্ণ নাগরাজ কালিয়ের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে যা দেখেছেন তা হল—বড়ো বড়ো ঘাস বনটাকে ছেয়ে রেখেছে একেবারে। ছোটো ছোটো আগাছা এবং বড়ো বড়ো গাছে এই ভূখণ্ড পরিপূর্ণ এবং নাগরাজ কালিয়র বিশ্বস্ত মন্ত্রীরা এই বন সযত্নে রক্ষা করে—

রক্ষিতং সর্পরাজস্য সচিবৈরাপ্তকরিভিঃ।

কৃষ্ণ কালিয়র মন্ত্রীদের কথা, গুপ্তচরদের কথা বলছেন বটে, কিন্তু তাঁদের দেখতে পাচ্ছেন না কোথাও। হয়তো কালিয় এবং তাঁর মন্ত্রীদের এই দুস্পর্শ্য, অদৃশ্য চরিত্রই তাঁদের ওপর সর্পের চরিত্রের অনুমান ঘটিয়েছে। কৃষ্ণ একটি হ্রদ দেখতে পাচ্ছেন যার তীরে শৈবাল, পদ্ম এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা-বৃক্ষ দেখা যাচ্ছে। আমাদের অনুমান—এটি জলাধার, কোনো হ্রদ নয়, বিস্তীর্ণ বনভূমির মধ্যে এটিই কালিয়র

আবাসস্থল, যার পাশে আছে প্রবাহিনী যমুনা। কৃষ্ণকে বলতে হচ্ছে—আমাকে এই হ্রদ পর্যন্ত আসবার জন্য দুই দিক থেকে উপযুক্ত পথ তৈরি করতে হবে—

কর্তব্যমার্গৌ ভ্রাজেতে হ্রদস্যাস্য তটাবৃভৌ।

তারপর শাস্তি দিতে হবে কালিয়কে।

ভাগবত পুরাণে ঘটনাটা একটু নাটকীয়—কৃষ্ণ তাঁর সখাদের সঙ্গে গোরু চরাতে চরাতে যমুনার জল-ধোয়া এক নির্জন বনপ্রান্তে এসে পড়েছেন। গরমের সময়। সকলেই তৃষ্ণায় কাতর। এমনকি গোরুগুলোরও জল খাওয়া প্রয়োজন। অবশ্য এদের কাউকেই আর জল খাবার নির্দেশ দিতে হয়নি। আকুল তৃষ্ণাই তাদের যমুনার জলে জল খেতে নামিয়েছে—

দুষ্টং জলং পপুস্তস্যা-তৃষ্ণার্তা বিষদূষিতম্।

আর যায় কোথা! কালিয় নাগের বিষে সেই জায়গার জলরাশি বিষদগ্ধ হয়েই ছিল। জলপান করতেই গোরু-বাছুর এবং কৃষ্ণ-সখারা ঢলে পড়ল যমুনার তীরে। তাদের দেহ থেকে প্রাণই চলে গেছে। গোরু এবং গোপালক বন্ধুদের অবস্থা অন্তরের যোগবিভূতিতে বুঝতে পারলেন কৃষ্ণ। অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টির প্রসাদে কৃষ্ণ তাঁদের বাঁচিয়ে তুললেন—

ঈক্ষয়ামৃতবর্ষিণ্যা সনাথান্ সমজীবয়ৎ।

যাইহোক, বিষাক্ত কালিয়র হাত থেকে ব্রজবাসীদের রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণ কালিয়র হ্রদে পৌঁছালেন, কালিয়র সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বেধে গেল। সে যুদ্ধে কালিয় পরাস্তও হলেন শেষপর্যন্ত। এদিকে গোপবালকদের মুখে খবর পেয়ে যশোদা-রোহিণী নন্দরাজা এবং আরও অনেকে কৃষ্ণের জন্য দুশ্চিন্তায় আকুল হয়ে ভীড় করেছেন যমুনাতীরে। আহত, পরাজিত কালিয়কে কৃষ্ণ প্রাণে মারেননি, নাগপত্নীদের অনুরোধে তাঁর জীবনদান করেছেন। তারপর সব পুরাণেই সেই নাটকীয় দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে—কালিয়র ফণার ওপর নৃত্য করতে করতে জল থেকে উঠে এসেছেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণের নৃত্যের ফলে তাঁর পদচিহ্ন অঙ্কিত হল কালিয়নাগের ফণায়। স্বয়ং ঈশ্বরের পদচিহ্ন লাভ করে কালিয়নাগ ধন্য হলেন, কৃষ্ণের আদেশে যমুনাতীর ত্যাগ করে চলে গেলেন সপরিবারে। স্বয়ং শ্রীহরির পদচিহ্ন যাঁর মাথায়, বিষ্ণুর বাহন গরুড় কখনো তাঁর ক্ষতি করতে পারেন না। কৃষ্ণ তাঁকে সেই অভয়ও দিলেন—

মম পাদেন নাগেন্দ্র চিহ্নিতং তব মূর্ধনি।
সুপর্ণ এব ধৃষ্টবং অভয়ং তে প্রদাস্যতি॥

কৃষ্ণের পরমপদ লাভ করে কালিয়নাগ কৃষ্ণের পরম ভক্ত রূপে নতুন জীবন শুরু করলেন। বৃন্দাবন সর্পভয় থেকে মুক্ত হল।

[ভাগবত পু. ১০.১৫.৪৭-৫২; ১০.১৬.৪-৬৮; ১০.১৭.১-২৫; বিষ্ণু পু. ৫.৭.১-৮১; হরিবংশ পু. ২.১১.৪৮-৬০; ২.১২.১-৪৯; ব্রহ্ম পু. ১৮৫ অধ্যায়; পঠিতব্য : David Kinsley, The Sword and the Flute, pp. 22-23; Heinrich Zimmer, Myths and Symbols in Indian Art and Civilization, (Harper & Row Publishers, 1945) pp. 82-88; Sukumari Bhattacharji, Indian Theogony, pp. 302-304]

□ কালিয়দমনের ফলে কৃষ্ণের বাহুবল এবং দৈবশক্তির খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ব্রজবাসীরা তাঁকে রীতিমতো সম্ভ্রমের চোখে দেখতে লাগলেন। তবে ঐতিহাসিক ভাবে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কালিয়দমন যতখানি দায়ী, তার থেকেও বেশি দায়ী হল ব্রজভূমির মধ্যে ইন্দ্রযজ্ঞের চিরাচরিত প্রথার প্রতিরোধ। এই ঘটনাকে সাধারণ মানুষ মূলত গোবর্ধন ধারণের মাহাত্ম্যে স্মরণ করলেও গোবর্ধন ধারণের মতো অলৌকিক ঘটনার থেকেও ঐতিহাসিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হল একটি অতিপুরাতন প্রথা চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং কৃষ্ণের মাহাত্ম্য সেখানেই যে, কতখানি ব্যক্তিত্ব থাকলে একজন বালকের তর্কযুক্তিতে গোপ সমাজের চিরাচরিত প্রথা স্তব্ধ করে দেওয়া যায়। গোবর্ধন ধারণের ঘটনায় একদিকে যেমন বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের পূজা বন্ধ হয়ে গেল এবং কৃষ্ণ স্বয়ং পূজনীয় দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হলেন, পাশাপাশি ব্রজবাসীদের আপন জীবিকার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হল।

ব্রজভূমি বৃন্দাবনে যখন ইন্দ্রযজ্ঞের তোড়জোড় চলছে, ঠিক সেই মুহূর্তে কৃষ্ণ-বলরাম বোধহয় বাড়িতে ছিলেন না। বর্ষাকালের দু-মাস ধরেই তাঁরা এ-বন সে-বন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাল-বন, ভাণ্ডীর-বনের মতো জায়গায় ধেনুক-প্রলম্ব

ইত্যাদির অধিকার চলে যাবার কারণেই হোক, অথবা এইসব নতুন জায়গায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই হোক, অথবা ক্লান্তি অপনোদনের জন্যই হোক, বর্ষার দু-মাস কৃষ্ণ-বলরাম বাড়ি ছিলেন না—

বনে বিচরতোর্মাসৌ ব্যতিযাতৌ স্ম বার্ষিকৌ।

কৃষ্ণ-বলরাম বাড়ি ফিরতেই দেখলেন—ইন্দ্রোৎসবের জোগাড় হচ্ছে। ধূমধাম ভালোই হবে, তার মধ্যে ব্রজভূমিতে নানান উৎপাতের অবসান ঘটায় এবার সকলের মনে ফূর্তিও খুব। কৃষ্ণ দেখলেন—এই উৎসবের জন্য সকলের উদ্‌গ্রীব, লালায়িত—

গোপাংশ্চোৎসবলালসান্।

সময় বুঝে মানুষ দেখে কৃষ্ণ এক গয়লা-বুড়োকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা। এই ইন্দ্র-যজ্ঞ ব্যাপারটা কী, যার জন্য তোমাদের মনে এত ফূর্তি আসছে—

কো'য়ং শক্রমখো নাম যেন বো হর্ষ আগতঃ?

বুড়ো গয়লা বললেন—আমরা এখানে ইন্দ্রের ধ্বজা বসিয়ে পুজো করি, এবং কেন করি, তার কারণ বলি শোনো। ইন্দ্র হলেন দেবতাদের রাজা আর তিনি হলেন মেঘ-বৃষ্টির দেবতা। তিনি আমাদের চিরকালের রক্ষক। অতএব সেই রক্ষাকর্তার পুজোর জন্যই বহুদিন ধরে ওই উৎসব চলে আসছে—

তস্য চায়ং মখঃ কৃষ্ণ লোকনাথস্য শাশ্বতঃ।

আকাশের মেঘরাশি সেই ইন্দ্রের শাসন মেনে বর্ষার নতুন জলধারা বর্ষণ করেন আর তার ফলেই মাঠে মাঠে শস্য ফলে। ইন্দ্র যে শস্য নিষ্পন্ন করেন, সেই শস্য খেয়েই আমরা বাঁচি; মানুষ বাঁচে, আমাদের গোরু, বলদ, ষাঁড়, সব হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে, গোরুরা ভালো দুধ দেয়। আর সত্যিই তো, যেখানে বর্ষণমুখর মেঘরাশি আছে—বৃষ্টিমন্তো বলাহকা—সেখানে শস্যের অভাব নেই, তৃণের অভাব নেই, ক্ষুধা বলেও সেখানে কিছু নেই—

নাশস্যা নাতৃণা ভূমি-র্ন বুভুক্ষার্দিতো জনঃ।

মেঘ, বৃষ্টি, জল, শস্য—বুড়ো গয়লার মুখে কৃষি সম্পর্কিত এই সব শব্দ এবং সেই সঙ্গে আর্যসভ্যতার অন্যতম প্রধান দেবতা ইন্দ্রের জয়কার শুনে বোঝা যায় তখনও পর্যন্ত বৈদিক দেবতার উত্তরাধিকার হ্রাস পায়নি। বুড়ো গয়লা বলেছে—সমস্ত প্রাণীর শ্রীবৃদ্ধির জন্যই ইন্দ্র এই জল বর্ষণ করেন—

পর্জন্যঃ সর্বভূতানাং ভবায় ভুবি বর্ষতি।

সেইজন্যই এই বর্ষাকালেই রাজাদের ইন্দ্রপূজার সময়। আমরাও এই সময়ে নানা উৎসবে ইন্দ্রযজ্ঞ পালন করি।

কৃষ্ণ ধৈর্য্য ধরে গয়লা-বুড়োর সব কথা শুনলেন। মানুষের ওপর বৈদিক ইন্দ্রের প্রভাব যে কত, তাও তিনি ভালো জানেন। সব শুনে, সব বুঝেও কৃষ্ণ কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করতে উদ্যত হলেন। ব্রজবাসীদের বিপদে, আপদে, ভূবিস্তারে কৃষ্ণ পূর্বাহ্ণেই তাঁদের নায়ক হয়ে উঠেছেন। সকলে এখন তাঁকে এমনই এক আশ্রয়স্থল বলে মনে করে যে, কৃষ্ণ এটা বুঝে গেছেন—তাঁর কথা লোকে শুনবে।

কৃষ্ণ বুড়ো গয়লাকে বললেন—আমরা হলাম গিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ানো বনচারী গয়লা জাতের মানুষ। গোরু-বাছুর নিয়ে আমরা জীবিকা নির্বাহ করি—

বয়ং বনচরা গোপাঃ সদা গোধনজীবিনঃ।

আপনারও এটা জানা উচিত যে,—যা আমাদের জীবিকা, সেই গোরু, যা আমাদের চতুর্দিক থেকে রক্ষা করে, সেই পর্বত, আর যেখানে আমরা থাকি, সেই বন এইগুলোই আমাদের দেবতা—

গাবো'স্মদ্দৈবতং বিদ্ধি গিরয়শ্চ বনানি চ।

কৃষ্ণ এবার বেশ অর্থশাস্ত্রীয় কায়দায় ব্রজভূমির মানুষদের বুঝিয়ে বললেন—কৃষকেরা জীবিকা নির্বাহ করে কৃষিকর্ম করে, ব্যবসায়ী দোকানদাররা জীবিকা নির্বাহ করে ক্রয়-বিক্রয়, বিপণন করে, কিন্তু আমাদের বৃত্তি হল গোপালন—

গাবো'স্মাকং পরা বৃত্তিঃ।

যে মানুষ যে বিদ্যা বা বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত, সেই বিদ্যাই তার দেবতা। পূজা যদি করতে হয় তবে সেই বিদ্যাধিষ্ঠাতৃ দেবতার পূজা করা উচিত। যে মানুষ একজনের কাছ থেকে ফল পেয়ে, সেই ফল ভোগ করে, তারপর অন্য জনের আদর-আপ্যায়ন করে—

যো'ন্যস্য ফলমশ্নানঃ করোত্যন্যস্য সৎক্রিয়াম্।

—তার মতো কৃতঘ্ন মানুষের ইহলোক, পরলোকে কোথাও ঠাঁই হবে না।

কৃষ্ণের যুক্তিতর্ক শুনে গোপকুলের সকলেই

তাঁকে মেনে নিল ভালো মনে। কৃষ্ণ যে কথাগুলি বলছেন, তা যদি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়/তৃতীয় শতাব্দীতেও পৌরাণিকেরা সংকলিত করে রেখে থাকেন, তবে বলতে হবে—এ অত্যন্ত আধুনিক ভাবনা। আজকে যাঁরা অরণ্য-সংরক্ষণ বা পশু সংরক্ষণের কথা ভাবছেন, তাঁরা জানবেন আজ থেকে প্রায় দু-হাজার বছর আগেও এই দুর্ভাবনা ছিল। কৃষ্ণ তাঁর বৃক্ষ-লতা সংকুল অরণ্যভূমির আবাস বৃন্দাবন এবং তার সুরক্ষা-বলয় গোবর্ধন পাহাড়কে বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের চেয়েও বেশি মূল্য দিয়েছেন। বৃন্দাবনের বন আর গোবর্ধন পাহাড়ই তাঁর কাছে দেবতার মতো। তিনি বলেছেন—ব্রাহ্মণরা মন্ত্রযজ্ঞ করেন, আর কৃষকরা পুজো করেন হল-লাঙ্গলের। কিন্তু আমরা গোপজনেরা করব গিরিযজ্ঞ—

গিরিযজ্ঞস্তথা গোপা ইজ্যো'স্মাভিগিরির্বনে।

কৃষ্ণ এখন মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই মর্য্যকাদা অতিক্রম করে কেউ অন্য কথা বলবে, এমন যে হতে পারে না, তা কৃষ্ণ জানতেন। গোপজনেরা বললেন—তোমার এই বুদ্ধি এবং বিচার আমাদের মনে খুব ধরেছে, সত্যিই আমাদের গোরুগুলির মঙ্গল হবে তাতে—

প্রীণয়ত্যেব নঃ সর্বান্ বুদ্ধির্বৃদ্ধিকরী গবাম্।

ব্রজবাসীরা কৃষ্ণের কাছে তাঁদের ঋণ স্বীকার করে বললে—আজ তোমার জন্যই আমরা এই বিশাল গোচারণভূমি আর গোরু নিয়ে সুখে আছি, নিরুপদ্রবে আছি—

ত্বৎকৃতে কৃষ্ণ গোষ্ঠো'য়ং ক্ষেমী মুদিতগোকুলঃ।

কোনো শত্রু আজ এমুখো হয় না—এসব তোমার জন্যই সম্ভব হয়েছে। জন্ম থেকেই তুমি যেসব কাজ করেছ, তা দেবতারাও পারবেন না। সেই তোমার মতো মানুষের কথা শুনে—হতে পারে তোমার কথার মধ্যে অহংকার আছে, কারণ তুমি বলেছ—গোযজ্ঞই করতে হবে—কিন্তু তোমার সাহংকার কথা শুনে আমাদের আশ্চর্য লাগছে—

বোদ্ধব্যাচ্চাভিমানাচ্চ বিস্মিতানি মনাংসি নঃ।

গয়লা বুড়োর হুংকারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজবাসীরা আনন্দে মেতে উঠল—

আনন্দজননো ঘোষো মহান্ মুদিতগোকুলঃ।

ঢাক-ঢোল, বাদ্যি-বাজনা বাজতে আরম্ভ করল। গোরু-বাছুর-ষাঁড় চেঁচাতে লাগল এক সঙ্গে। দুধ-দই-ঘি-ঘোলের পাত্রগুলি হ্রদের মতো দেখতে হল। মাংস আর সুসংস্কৃত অন্নের পাহাড় তৈরি হল—

মাংসরাশিঃ প্রভূতাঢ্যঃ প্রকোশৌদনপর্বতঃ।

গন্ধ-মাল্য-ফুলের স্তূপ রাশীকৃত হল। হৃষ্টপুষ্ট এবং সন্তুষ্ট গোপজনের সঙ্গে দেখা গেল বিচিত্রবেশিনী গোপললনাদের—তুষ্ট গোপজনাকীর্ণো গোপনারীমনোহরঃ। গিরিযজ্ঞ আরম্ভ হল কৃষ্ণের কথায়।

যজ্ঞ আরম্ভ হল একেবারে বৈদিক কায়দায়। আজ্যস্থালী, চরুস্থালী এবং ব্রাহ্মণদের স্বস্তি-বাচনে যজ্ঞস্থল মুখরিত হল। অন্ন-পান আর দক্ষিণায় তুষ্ট হয়ে—

তুষ্টাঃ সম্পূর্ণমানসাঃ ব্রাহ্মণরা প্রভূত আশীর্বাদ করে আসন ছেড়ে উঠলেন। গয়লাদের আনা দই, দুধ, ঘৃত, মাংস কৃষ্ণই আস্বাদন করার সুযোগ পেলেন সবার আগে। তাঁর আদেশ সিদ্ধ হয়েছে, অতএব সন্তুষ্টমনে তিনি গয়লাদের উপহার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণ গোবর্ধন পাহাড়ের সঙ্গে একাত্ম হলেন যেন। বস্তুত, গোবর্ধন নামটি বোধহয় আগে ছিল না। আজ এই অনুষ্ঠানে গোপজনের জীবিকা—গো-বৃদ্ধি বা বর্ধনের জন্যই যেহেতু যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই যজ্ঞ যেহেতু এই পাহাড়ের পাশেই বিস্তৃত প্রদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল অতএব সেই গো-বর্ধন বা গো-মঙ্গল উৎসবই—বুদ্ধিবৃদ্ধিকারী গবাম্—গোবর্ধন -পূজার সঙ্গে একাত্মক হয়ে গেল ইন্দ্রযজ্ঞের প্রচলিত প্রথা রদ করে এখন তিনি 'Final Messiah', গো-পূজা এবং গিরিপূজার অলক্ষ্যে যা ঘটল তা হল—নবীন কৃষ্ণ পুরাতন বৈদিক ইন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত হলেন। সুকুমারী ভট্টাচার্য লিখেছেন—

Thus the account of Krishna fighting the Indra-cult, instructing the cowherds to abandon the old ritual and to worship the mountain and cattle, in only a record of the superimposition of the new Vasudeva-Krishna cult on the old, worn-out Indra-cult.

পুরাতন প্রথা রদ হয়ে গিয়ে যখন নতুন প্রথা নতুন দেবতার প্রতিষ্ঠা হয়, তার মধ্যে ঝুট-ঝামেলা কিছু থাকে। পুরাতন দেবতা নির্দ্বিধায় বিনা দ্বন্দ্বে তাঁর আসন ছেড়ে দেন না। এখানেও তা হল না।

গোপূজা এবং গিরিযজ্ঞ সম্পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রদেব তাঁর মেঘমণ্ডলকে আদেশ করলেন ব্রজভূমি ভাসিয়ে দিতে। মেঘ-ভৃত্যদের নানা নাম আছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হল সংবর্তক। বজ্র-বিদ্যুৎ আর বর্ষণ ক্ষমতায় সে অতুলনীয়। ইন্দ্র তাকেই আদেশ করলেন—সাতদিন নিরন্তর বর্ষণ করার। তিনি কথা দিলেন—বজ্র আর বিদ্যুতের সহায়তা নিয়ে তিনি নিজে উপস্থিত থাকবেন এই প্রলয় মহোৎসবে। হুংকার দিয়ে বললেন—যারা আজ এত জীবিকা চিনেছে, গোরুর গৌরবে আজকে যারা নিজেদের গোপত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত, সেই গোরুগুলিকেই ভাসিয়ে দাও সাতদিনের মধ্যে—

তা গাবঃ সপ্তরাত্রেণ পীড্যন্তাং বর্ষমারুতৈঃ।

ইন্দ্রের আদেশ শুনে যুগান্তকারী মেঘের দল বেরিয়ে পড়ল আকাশ ছেয়ে। সঙ্গে আরম্ভ হল মেঘের গর্জন, ইন্দ্রের বজ্রপাত। ইন্দ্র আজ দেখে নেবেন সবাইকে। তাঁর সবচেয়ে বেশি রাগ নন্দগোপের পুত্র দামোদর কৃষ্ণের ওপর। কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নন্দ ইত্যাদি প্রধান প্রধান গোপজনদেরও তিনি ভাসিয়ে দিতে চান, কেননা তারা ইন্দ্রের বিদ্বেষী। ইন্দ্র বলেই দিয়েছেন—আজকে যারা আমার আশ্রয় ত্যাগ করে ওই সেদিনের ছেলে দামোদরের আশ্রয় নিয়েছে—এতে বৃন্দাবনগতা দামোদর-পরায়ণাঃ—তাদের আমি ছাড়ব না। খ্যাপা মেঘ ছুটে এল আশ্বিনের আঙিনায়। পৌরাণিকেরা খুব যুৎসই করে এই বর্ষণের ভয়ঙ্কর বর্ণনা দিয়েছেন। ব্রজের সর্বত্র জলে জলাকার হয়ে গেল। ব্রজবাসীদের জীবন কিছু গোরু মারাও পড়ল। সকলে কাতর চোখে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি কী করেন সেটাই এখন দেখার।

হয়তো এমন হয়েছিল—ইন্দ্রের রাগ-টাগ কিছুই নয়। কিন্তু ইন্দ্রযজ্ঞ স্তব্ধ হবার পরেই দারুণ বর্ষণ হয়েছিল ব্রজভূমিতে আর সেটাকেই ইন্দ্রের রাগ বলে ধরে নিয়েছিলেন ব্রজবাসীরা। সমস্ত ব্রজবাসীদের করুণ অবস্থা দেখে কৃষ্ণ তাঁদের সবাইকে জড়ো হতে বললেন গোবর্ধন পাহাড়ের কোলে। কৃষ্ণ তাঁর বাম হস্তের কনিষ্ঠিকায় গোবর্ধন পাহাড় উপড়ে তুলেছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু এটা ঠিক যে, পাহাড় মানেই উঁচু জায়গা, সেখানে খাদ আছে, গুহা আছে, পাহাড়ী গাছের ছত্র আছে। কৃষ্ণ সকলকে নিয়ে গোবর্ধন পাহাড়ে এলেন আশ্রয়ের জন্য। পৌরাণিক এক মুহূর্তের ভুলে বলে ফেলেছেন—যে, পাহাড়টিকে পৃথিবীতে নির্মিত গৃহের মতোই লাগছিল—পৃথ্বীগৃহনিভোপমঃ—অথবা ব্রজবাসীরা সেখানে আশ্রয় নেবার ফলেই পাহাড়ও গৃহের সমতা লাভ করেছিল—

গৃহভাবং গতাস্তত্র গৃহাকারেণ বর্চসা।

পর্বতকন্দরে, গিরিগুহায় আশ্রয় নিয়ে ব্রজবাসীরা সেদিন মেঘ-বৃষ্টি-বজ্রপাত কোনোটাই টের পায়নি। তারা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। কৃষ্ণের বুদ্ধি এবং পর্বতের আশ্রয় সেই ভীষণ দুর্দিনে এতটাই বোধহয় প্রয়োজনীয় ছিল যে, এই প্রয়োজনের সিদ্ধিতেই গোবর্ধন পর্বত আজও কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছেন।

বর্ষার প্রবল ধারাপাতে ব্রজভূমি অবরুদ্ধ হল বটে, তবে বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রদেব ব্রজবাসী গোপজনের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারলেন না। কৃষ্ণ তাঁর পরমপ্রিয় আত্মীয়স্বজন বন্ধুদের রক্ষা করলেন গোবর্ধন পর্বতের আশ্রয়ে। সাতদিন অবিরাম বৃষ্টিপাত করে ক্লান্ত শ্রান্ত ইন্দ্রদেব স্বর্গে ফিরে গেলেন। বৃন্দাবনের রাখাল গোপজনেরাও তাদের গোরু-বাছুর নিয়ে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে এল—

স্বঞ্চ স্থানং ততো ঘোষঃ প্রত্যয়াৎ পুনরেব সঃ।

গোবর্ধন পর্বতও স্থিত হল নিজের জায়গায়।

সব কিছুই যখন মিটে গেল, তখনই ইন্দ্রদেবের গভীর চিন্তা হল মনে। এত অত্যাচার, এত কষ্ট দিয়েও যখন কৃষ্ণের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারলেন না ইন্দ্রদেব, তখন তিনি কৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হলেন। স্বর্গের ইন্দ্রসভা ছেড়ে তিনি নেমে এলেন ভুঁয়ে। সামান্য অহংকার তখনও বুঝি ছিল, তাই ঐরাবতের আরোহণ-মঞ্চটি তিনি ত্যাগ করেননি—

আরুহ্যৈরাবতং নাগমাজগাম মহীতলম্।

ইন্দ্র এসে দেখলেন—কৃষ্ণ সেই গোবর্ধন পাহাড়ের একটি পাথরের ওপর বসে আছেন। এত যে ঝড়-ঝাপটা গেল, তাতে কৃষ্ণের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সেই ময়ূরপুচ্ছটি মাথায় এখনও লাগানো আছে, সেই গোপবেশ, সেই রাখাল-রাজার মাধুর্য—

গোপবেশধরং বিষ্ণুং প্রীতিং লেভে পুরন্দরঃ।

অর্থাৎ কৃষ্ণের মনুষ্যস্বভাব একটুও স্খলিত হয়নি।

কৃষ্ণকে এমন অবস্থায় দেখে ইন্দ্র বেশ খুশি হলেন। কৃষ্ণের উপযুক্ত সম্ভ্রম রক্ষা করে ইন্দ্রদেব নেমে এলেন ঐরাবত থেকে। হরিবংশের বর্ণনায় এই মুহূর্তে ইন্দ্রের মুখে অসংখ্য প্রশংসা-বাক্য বেরিয়েছে কৃষ্ণের উদ্দেশে। কৃষ্ণ এখানে পরম ঈশ্বরের মাহাত্ম্য লাভ করেছেন এবং কৃষ্ণের সঙ্গে বৈদিক বিষ্ণুর একাত্মতাও স্থাপিত হয়েছে এই সুযোগে। ইন্দ্র নিজের পরাভব মেনে নিয়ে গোপবেশী কিশোর কৃষ্ণকে একেবারে ভগবান বলেই মেনে নিলেন প্রায়।

ইন্দ্র কৃষ্ণকে বললেন—আমি দেবতাদের ইন্দ্র বটে, তবে তুমি এই ব্রজের গোরুগুলিকে যেভাবে রক্ষা করেছ, তাতে তোমাকে এই গোকুলের ইন্দ্র বলতেই হবে—

অহং কিলেন্দ্রো দেবানাং ত্বং গবামিন্দ্রতাং গতঃ।

আজ থেকে মর্ত্যের মানুষ তোমাকে গোবিন্দ বলে ডাকবে।

ইন্দ্র কৃষ্ণকে রীতিমতো স্বর্গ-মর্ত্যের অধিপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সোনার কলসের দিব্য বারি সেচন করে কৃষ্ণের একটা অভিষেকও করলেন তিনি—

অভিষেকেণ গোবিন্দং যোজয়ামাস যোগবিৎ।

প্রশংসা-স্তুতিবাক্যের বান ডাকল, মুনি-ঋষিরা মন্ত্র পড়লেন কৃষ্ণের উদ্দেশে। সব কিছু হয়ে যাবার পর ইন্দ্রকে আমরা একটা অদ্ভুত অনুরোধ করতে দেখছি কৃষ্ণের কাছে এবং শুধু অনুরোধ নয়, বলা উচিত ইন্দ্র এক আগাম সাহায্য চাইছেন কৃষ্ণের কাছে।

ইন্দ্র বললেন—তুমি কংস-বধ করো, কি কেশী দানবকে বধ করো, অথবা অরিষ্টাসুরকে তুমি না হয় মেরে ফেলো। কিন্তু আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে। তোমার পিসিমা কুন্তীর গর্ভে আমার একটি ছেলে হয়েছে—

পিতৃষ্বসরি জাতস্তে মমাংশো'হমিব স্থিতঃ।

আমারই মতো তার তেজ, সে আমার দ্বিতীয় সত্তা। তুমি সেই পিসিমার ছেলেটিকে সদা-সর্বদা আগলে রাখবে, তাকে আদর করবে, এক কথায় তুমি তাকে তোমার বন্ধু করে নিও—

স তে রক্ষ্যশ্চ মান্যশ্চ সখ্যে চ বিনিযুজ্যতাম্।

আমরা পৌরাণিক মিথলজিস্টদের দৃষ্টি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছি যে, বৃন্দাবনে পূর্বে ইন্দ্র-যজ্ঞ করা হত। কৃষ্ণ সেই প্রাচীন রীতি স্তব্ধ করে দিয়ে গিরিযজ্ঞ প্রতিষ্ঠা করলেন। বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের পূজা-পার্বণ বন্ধ করে দিয়ে সমস্ত জনপদবাসীকে দিয়ে তাঁদের জীবিকা এবং আশ্রয় গোপূজা করালেন কৃষ্ণ। আমরা আগেই জানিয়েছি—একটি অঘাসুর অথবা একটি বকাসুর বধ করতে শারীরিক শক্তি লাগে বটে, কিন্তু একটি প্রাচীন রীতি বা প্রাচীন সংস্কার ভেঙে দিতে ব্যক্তিত্ব লাগে অনেক বেশি। ইন্দ্রপূজা বন্ধ করে গোপূজার ব্যবস্থা করা, অর্জুনবৃক্ষ উৎপাটন করে বৃক্ষ-পূজা বন্ধ করা নাগরাজ কালিয়কে স্থানান্তরিত করা এবং নিজের জীবিকার প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলে গোপূজার রীতি প্রবর্তন করা নিজেদের বসতিস্থান গিরি গোবর্ধনের গৌরব বৃদ্ধি করা—এ সবের পিছনে যে ব্যক্তিত্ব কাজ করে, সেই ব্যক্তিত্বের চরম পর্যায়ে কৃষ্ণ এখন উপনীত।

সাত দিনের অতিবৃষ্টির পরেও যখন কৃষ্ণ ব্রজবাসীদের সম্পূর্ণ সুরক্ষা দিতে সমর্থ হলেন, ইন্দ্র তখন হার মানলেন এবং আকাশ-বাতাস পুনরায় নির্মল হল। এইরকম পরিস্থিতিতে বৃন্দাবনের গোপবৃদ্ধরা সকলকে নিয়ে কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হলেন তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে। তাঁদের কৃতজ্ঞতার ভাষাটা এইরকম—তোমাকে আমাদের মাঝখানে পেয়ে আমরা ধন্য বোধ করছি, কৃষ্ণ! তুমি তোমার ব্যবহার এবং নীতিকুশলতায় আমাদের সবাইকে বড়ো বাঁচিয়েছ—

ধন্যা স্মো'নুগৃহীতা স্মঃ ত্বদ্‌বৃত্তেন নয়েন চ।

ব্রজবাসীদের সুখ-দুঃখে কৃষ্ণের আন্তরিক ব্যবহার এবং তাঁর নীতিজ্ঞতা—যে দুটি তাঁকে ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞে পরিণত করবে—সেই ব্যবহার আর নীতিজ্ঞতাই বৃন্দাবনের সরল মাটিতে তাঁকে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। আমরা আগেই বলেছি—কৃষ্ণ এখন সকলের ভরণ-পোষণ করেন এমন এক ভর্তা হিসেবে পরিচিত। মর্য্যাদা এবং প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে এখন তিনি সকলের কাছে 'ভর্তা দামোদর' নামে পরিচিত।

গোপবৃদ্ধরা কিন্তু কৃষ্ণের পরিচয় নিয়েও একটু সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। তিনি সাধারণ মানুষ নন,

নন্দগোপের পুত্র বলে পরিচিত হলেও তাঁকে ঠিক নন্দপুত্র সামান্য গোপবালক বলে মেনে নিতে তাঁরা পারছেন না। তাঁরা প্রশ্ন করছেন—তুমি দেবতা না দানব, না কী যক্ষা-গন্ধর্ব? আভাসে প্রশ্ন ভেসে এল—তুমি কী বসুদেবের পুত্র? বসূনাং বা কিমর্থঞ্চ বসুদেব পিতা তব। কৃষ্ণ জানেন, নিজের জন্মরহস্য প্রকাশের এটা উপযুক্ত সময় নয়। সুতরাং 'আমি তোমাদেরই লোক' এমন মধুর বাক্যে তিনি তাঁদের বিদায় দিয়েছেন।

[হরিবংশ ২.১৫ অধ্যায় থেকে ২.২০ অধ্যায়; বিষ্ণু পু. ৫.১০.১৭-৪৯; ৫.১১.১-২৫; ৫.১২.১-২৫; ভাগবত পু. ১০.২৪.১-৩৮; ১০.২৫ অধ্যায় থেকে ১০.২৭ অধ্যায়; ব্রহ্ম পু. ১৮৮ অধ্যায়; J. Gonda, Aspects of Early Viṣṇuism, p. 156; Sukumari Bhattacharji, Indian Theogony, p. 306]

☐ কৃষ্ণের কথা শুনে ব্রজ-বৃদ্ধরা যখন বিনা বাক্যে ঘরে ফিরে গেলেন, তখনই বোঝা গেল কৃষ্ণের পরিচয় তাঁরা অল্প-বিস্তর বুঝেই গেছেন। হরিবংশ ঠাকুর জানিয়েছেন—সেই দিনটা ছিল শারদ পূর্ণিমার রাত্রি। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে 'প্রেমনত-নয়নের দীর্ঘচ্ছায়াময় পল্লবের মত।' শরতের চাঁদ তার শীতল করাঙ্গুলি দিয়ে প্রাচীন দিগ্‌বধূর মুখখানি একবার স্পর্শ করতেই সে মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। সমস্ত পূর্বাকাশে ছড়িয়ে পড়ল জ্যোৎস্নার লালিমা। মানুষ কৃষ্ণের মনে হল—এমন শারদ রজনীটি যদি সেই সুন্দরী গোপরমণীরা কাছে থাকতেন। কৃষ্ণের বড়ো ইচ্ছে হল সেই অতি পরিচিতা সরলা রমণীদের সুখ-সঙ্গ লাভ করার। ইচ্ছে হল মিলনের—

শারদীঞ্চ নিশাং রম্যাং মনশ্চক্রে রতিং প্রতি।

ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজবধূদের রাসনৃত্যের আগে দুই পক্ষেই মিলনের একটা আরোহণপর্ব আছে, যেখানে এক পক্ষে গোপরমণীরা কাত্যায়নীর পূজা করছেন কৃষ্ণের আসঙ্গ লাভ করার জন্য, অন্য দিকে কৃষ্ণের বস্ত্রহরণলীলায় তাঁদের পূর্ণ শরণাগতির ভাবনা বুঝে কৃষ্ণ তাঁদের কথা দিচ্ছেন শরৎকালের রাত্রিতে তিনি মিলিত হবেন তাঁদের সঙ্গে—

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।

[হরিবংশ পু. ২.২০.১৪-১৫; ভাগবত পু. ১০.২২.১-২৭]

☐ আমরা এখন কৃষ্ণের কৈশোরের সেই বিখ্যাত ঘটনায় প্রবেশ করেছি যা তাঁকে ঈশ্বর-পুরুষের থেকেও বেশি করে প্রেমিক, গোপীশতকেলিকারের সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই উপাখ্যানের কারণেই বৃন্দাবন কৃষ্ণের বাল্যলীলাভূমি বা ঈশ্বরত্বের মাহাত্ম্য বিজড়িত তীর্থক্ষেত্রের পরিবর্তে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় বিলাসের আধারভূমি হিসেবে জগতে বিখ্যাত হয়ে গেছে। কৃষ্ণের গোপীপ্রেম বা গোপীদের কৃষ্ণপ্রেমের তত্ত্ব, ঐতিহাসিকতা ইত্যাদি নিয়ে মিথলজিস্ট, বৈষ্ণব দার্শনিক এবং রসতাত্ত্বিকরা বহু আলোচনা করেছেন কিন্তু তা বর্ণনা করতে গেলে কৃষ্ণ জীবনের এই পর্যায়েই আমাদের থেমে যেতে হবে। আমরা সংক্ষেপে তাই রাসলীলাটুকু বর্ণনা করে কৃষ্ণের পরবর্তী জীবনকথায় অগ্রসর হতে চাই।

ব্রজভূমিতে শারদ-পূর্ণিমার রাতে যে নাচের আসর বসেছিল তাকে রাসনৃত্য বা মহারাস বলা হয়েছে, হরিবংশ তাকে বলেছে হল্লীসক নৃত্য। হরিবংশে ভাগবত পুরাণের মতো রাসনৃত্যের কোনো পটভূমি রচিত হয়নি, কোনো কৃত্রিমতা নেই, শরৎকালের জ্যোৎস্নারাতের আমোদ প্রমোদের সঙ্গেই গোপীদের প্রেম বিলাস মিলে মিশে গেছে। হরিবংশে দেখা যাচ্ছে 'হল্লীসক' নৃত্য নয়, আমোদ প্রমোদের প্রথম পর্যায়ে কৃষ্ণ ষাঁড়ের লড়াইয়ের আয়োজন করেছেন আর সখাদের নিয়ে মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজনও করেছেন। গোপ জনজাতি যে যোদ্ধা হিসেবে এবং মল্লযোদ্ধা হিসেবেও অসাধারণ ছিলেন (বিশদ দ্র. গোপ) তার প্রমাণ আমরা বহুক্ষেত্রে পাব। সেখানে মল্লযুদ্ধের খেলাটাও আমোদ প্রমোদের অঙ্গ হিসেবে যুক্ত হবে এতে খুব আশ্চর্যের কিছু নেই। সঙ্গে এমন খেলাও রইল যাতে ছাড়া গোরুদের দৌড় করিয়ে শেষে তাদের ধরবার ক্ষমতাও দেখাবেন কৃষ্ণের গোপালক বন্ধুরা—

বনেস বীরো গাশ্চৈব জগ্রাহ গ্রাহবদ্ বিভুঃ।

এই তো স্বাভাবিক। একটি গ্রামে যেখানে গোরু আর গোপালক যুবকদেরই একত্র বাস, সেখানে খেলার সময় ষাঁড়ের লড়াই, মল্লযুদ্ধ অথবা গোরু ছুটিয়ে ধরার খেলাটাই মানায় ভালো, অপিচ রাত্রি একটু গভীর হয়ে এলে

পাড়ার যুবক ছেলেদের এত কসরত দেখার পরেও—সে পাড়ার যুবতী মেয়েরা সব ঘরের মধ্যে ঘোমটা দিয়ে ঘরকন্না করবে এমন আশাও উদ্দাম গোপসমাজের কাছে না করাই ভালো। অতএব শারদ রাত্রির মধুরতায় পাড়ার যুবতীরাও এসে পৌঁছলেন বনে। অবশ্য প্রথম উদ্যোগটা এখানে কৃষ্ণকেই নিতে হয়েছে কিন্তু গাঁয়ের মধ্যে এত শত মজা চলছে যেখানে, সেখানে যোগ দিতে যুবতীদের দেরি হয়নি। তবে এখানে তাঁদের নিয়ে আসার জন্য এস্‌থেটিকসের চূড়ান্ত ভাবনায় 'বামদৃশাং মনাহরম্‌' কোনো মধুর বংশীধ্বনি করতে হয়নি কৃষ্ণকে, অথবা ব্রজযুবতীরাও কোনো কৃষ্ণের 'অনঙ্গবর্ধন' গীত রচনা শুনে 'কেহ কাহুক পথ না হেরি' বনে চলে আসেনি। তাঁরা এসেছেন বনে, কেন না তাঁদের রাখালরাজা আজ নৃত্য-গীতের উদ্যোগ নিয়ে তাঁদের ডেকেছেন জোৎস্না রাতে—

যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সংকাল্য কালবিৎ।

রাখাল-রাজা কাল বোঝেন।

ভাগবত-পুরাণের যে বৃন্দাবন, তার প্রাকৃতিক পরিবেশও এত কৃত্রিমভাবে সুন্দর যে, তাকে যেন ঠিক সহজ স্বাভাবিক মনে হয় না। কুসুমিত বন, শরৎ-সমীরণে আন্দোলিত তরুপল্লবের শোভার মধ্যে পূর্ব দিগ্বধূর গালে চুম্বন দিয়ে এমন সুন্দর করে চাঁদ ওঠে সেখানে—

প্রাচ্যাবিলিম্পন্‌ অরুণেন শন্তমৈঃ।

—যে সেটাকে অসাধারণ কাব্যময়তার উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু গোপপল্লীর স্বাভাবিকতা তাতে নেই। হরিবংশের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে, শারদ পূর্ণিমার রাত্রে নৃত্যগীতের উৎসব হবে বলে পথে পথে গোবর ছড়া দেওয়া হয়েছে এবং ব্রজপথের এই হল অঙ্গরাগ—

স করীষাঙ্গরাগাসু ব্রজরথ্যাসু বীর্যবান্‌।

ভাগবত পুরাণে রাসের পটভূমিতে শুধু নয়, সুন্দরী গোপীদের সাজসজ্জায়, নৃত্যগীতের পূর্বশিক্ষিত পটুত্বেও খানিক কৃত্রিমতার ছাপ আছে। হরিবংশে এই বর্ণনা অনেক সরল, স্বাভাবিক। এখানে দেখা যাচ্ছে গোপপল্লীর যুবতীরা গোময় চূর্ণ মেখে সাজসজ্জা সম্পন্ন করেছেন। কৃষ্ণের মধ্যে যে অসাধারণ নায়কোচিত ব্যক্তিত্ব, যে বীরত্ব তাঁরা দেখেছেন—তার ফলস্বরূপ ব্রজরমণীরা তাকে ভালোবেসে ফেলেছেন। তাঁর প্রতি এই নারীদের দুর্বলতা আছে, সরসতা আছে, কামুকতাও আছে। ফলে কৃষ্ণ ডেকেছেন বলেই কোনো বিচার না করে পিতা-ভ্রাতা-স্বামীদের বাধা তুচ্ছ করে তাঁরা শারদ পূর্ণিমার উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন। এবং এই তথ্যটি কিন্তু সব পুরাণেই শোনা যাচ্ছে, হরিবংশে, বিষ্ণুপুরাণে, ভাগবত পুরাণেও যে, তাঁরা এসেছিলেন পিতা, ভ্রাতা, স্বামীদের নিষেধ সত্ত্বেও—

তা বার্য্যমাণা পতিভিঃ ভ্রাতৃভিঃ মাতৃভিস্তথা।

গোপকুলের রমণীরা কৃষ্ণকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তাঁর আসঙ্গলিপ্সায়—মৃগয়ন্তে রতিপ্রিয়া। কৃষ্ণও প্রথম কৈশোরগন্ধী যৌবনের এমন সুন্দর রাত্রিটি সফল করার জন্য তাঁদের সঙ্গে মেতে উঠেছেন আমোদ প্রমোদে। কৃষ্ণের পরণে ছিল কাঁচা হলুদ রঙের পট্টবস্ত্র, মাথায় মুকুট, গলায় বনমালা। শারদ পূর্ণিমার রাতে কান্তিমতী গোপসুন্দরীরা কৃষ্ণে এই মোহন রূপ দেখে মোহিত হয়ে গিয়েছেন। তাঁদের মনে হচ্ছিল আকাশের চাঁদ যেন নেমে এসেছে মাটিতে। ইতস্তত কটাক্ষপাতে তাঁরা সকলেই কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না পান করছিলেন—

পিবন্তি নয়নাক্ষেপৈঃ র্গাং গতং শশিনং যথা।

গাঢ় আলিঙ্গনে কৃষ্ণকে আবদ্ধ করে অস্ফুটে তাঁর প্রিয় গ্রাম্য নামটিতেই সম্বোধন করেছিলেন তাঁরা—দামোদর! ব্রজরমণীদের কৃষ্ণের প্রতি এই যে আকর্ষণ—এর পিছনে যদিও ভালোবাসাই পরম কারণ, তবু হরিবংশের কবি কিন্তু জানাতে ভোলেননি যে, ব্রজভূমির মধ্যে বহুতর অসামান্য কর্ম করে যিনি সমস্ত বৃন্দাবনের নায়ক হয়ে উঠেছিলেন, ব্রজভূমির রমণীরা সেই বিচিত্রকর্মা নায়কের আকর্ষণ এড়াতে পারেননি—

বিচিত্রচরিতং ঘোষে দৃষ্ট্বা তৎ তস্য ভাস্বতঃ।

যে নায়কোচিত ব্যক্তিত্ব এবং পরাক্রম দেখে ব্রজভূমির যুবক-বৃদ্ধ সকলে কৃষ্ণকে 'ভগবান' বলে সম্বোধন করতে চাইছিলেন, সেই একই ব্যক্তিত্বের কারণে ব্রজরমণীরাও কৃষ্ণকে ভালোবেসেছেন। তাঁরা কৃষ্ণের মধ্যে নায়ক পুরুষকে খুঁজেছেন, নায়কোচিত বিভ্রমে কৃষ্ণ তাঁদেরও দূরে সরিয়ে রাখেননি। তিনি তাঁদের সঙ্গে নৃত্য করেছেন, আলিঙ্গন করেছেন, অথবা

নিবিড় চুম্বনালিঙ্গনে খুলে গেছে তাঁদের আকুল কেশপাশ—

তাসাং গ্রথিতসীমন্তা রতিং নীত্বা'কুলীকৃতাঃ।

এসবের দার্শনিক ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে। কেউ বলেছেন—গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের এই মিলন হল—জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন। রসশাস্ত্রকারেরা এর মধ্যে প্রেমভাবনার চূড়ান্ত পরিণতি দেখেছেন। বৈষ্ণবীয় ভাবুক-রসিকেরা রাসনৃত্যের মধ্যে ব্রজগোপীদের চরম আত্মসমর্পণের মহিমা দর্শন করেই ক্ষান্ত হননি, যেখানে পৌরুষেয় কৃষ্ণ-প্রেমের চেয়েও ব্রজগোপীদের, বিশেষত রাধাপ্রেমের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। কৃষ্ণ এখানে সরলা ব্রজরমণীদের কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ ঋণ স্বীকার করে বলেছেন আমাকে ভালোবেসেছো—এই ভালোবাসার ঋণ আমি কোনো কালেই প্রতিপূরণ করতে পারব না—

ন পারয়ে'হং নিরবদ্যসংযুজাং/
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।

এই রসতত্ত্বের মধ্যে স্বকীয়া-পরকীয়া প্রেমের গভীর তর্কও জুড়ে আছে। স্বামী-বাপ-ভাইদের বারণ সত্ত্বেও গোপীরা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে এসেছিলেন বলে দার্শনিক-রসিকরা অনেকেই মেনে নিয়েছেন পরকীয়া তত্ত্বের আস্বাদন-গরিমা, আবার অন্যদিকে জীব গোস্বামীর মতো ধুরন্ধর দার্শনিকেরা আছেন যাঁরা কৃষ্ণের চরিত্রে কোনো আক্ষেপ কোনো কলঙ্কের রেখাপাত হতে দেবেন না, তাঁরা এই রাসনৃত্যের মধ্যে রসাস্বাদন-তৎপর কৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমের তত্ত্ব স্বীকার করে নিয়েও বলেছেন—এ হল এক ঈশ্বরী মায়া। রাধা ইত্যাদি ব্রজরমণীরা সকলে কৃষ্ণেরই একান্ত স্বকীয়া রমণী। কিন্তু রস আস্বাদনের তীব্রতা প্রকাশ করার জন্য সেই একান্ত স্বকীয়া ব্রজরমণীরাও পরকীয়া রমণীদের মতো ভাব প্রকট করেছেন মাত্র—

পরমস্বীয়া অপি পরকীয়ায়মানা ব্রজদেব্যঃ।

হরিবংশের সময় কাল অন্য পুরাণগুলির চেয়ে অনেক প্রাচীন বলেই তার রাসনৃত্যের বর্ণনায় কবিজনোচিত সফিস্টিকেশন তেমন নেই। গোময় লিপ্ত পথে, গোময়চূর্ণের অঙ্গরাগেই গোপীরা এখানে ওখানে তাঁদের প্রিয়তম নায়কের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। অন্যতম প্রাচীন বিষ্ণুপুরাণ হরিবংশ পুরাণের সহজ ভাবটুকুও বজায় রেখেছে বটে, কিন্তু ভাগবতপুরাণের মধ্যে রাসনৃত্যের যে মধুরোন্মাদী বর্ণনা আছে তার সূত্রটুকু কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা—কৃষ্ণের এই রাসরঙ্গের সহচরী গোপীদের পরিচয় বিশ্লেষণ করলে সাধারণ ধর্ম যেটা এই তিন পুরাণেই একরকম দেখা যাবে সেটা হল—গোপীদের মধ্যে সকলেই—অর্থাৎ কুমারী, অবিবাহিতা এবং বিবাহিতা সকলেই এই নৃত্যপর্বে যোগদান করেছিলেন। এতে আর কিছু নয়, কৃষ্ণ যে কতটা কাম্য পুরুষ ছিলেন অশেষ রমণীকুলের কাছে, সেটা বেশ বোঝা যায়। যাঁরা ভাবেন—রাসনৃত্য মানেই কৃষ্ণের ব্যাকুল পরবধূবিলাস, তাঁদের জানাই—এই পরবধূবিলাসের মধ্যে বিশাল যে দার্শনিকতা কাজ করছে তা সাধারণ পাঠককে বোঝানো সম্ভব নয়। আবার এই নৃত্যের ঘটনাকে যদি ঐতিহাসিক মনে করি, তাহলে ভাসের নাটকের মতো অথবা হরিবংশের মতো আমিও বলব—এমন নৃত্য একটা ঘটেছিল অবশ্যই এবং সেখানে শামিল ছিলেন কুমারী, যুবতী, বিবাহিতা সকলেই।

ভাগবত পুরাণকেই আগে ধরি। কারণ রাসলীলার উত্তরঙ্গ বর্ণনার ক্ষেত্রে ভাগবতের কোনো দ্বিতীয় কল্প নেই। অবশ্য এই পুরাণে রাসনৃত্যের একটা ভণিতা আছে। এখানে কৃষ্ণ নাকি কুমারী গোপীদের কথা দিয়েছিলেন—কোনো এক সুন্দরী রজনীতে তিনি মিলিত হবেন গোপীদের সঙ্গে। বলা হয়েছে—হেমন্তের প্রথম মাসে ব্রজভূমির কুমারী কন্যারা—এখানে কিন্তু পরবধূর কথা নেই—

ভাগবতের ভাষায় 'নন্দব্রজকুমারিকাঃ' অর্থাৎ ব্রজভূমির কুমারী মেয়েরা কাত্যায়নী ব্রত করছিলেন প্রতিদিন। দেবী কাত্যায়নীর কাছে তাঁদের প্রার্থনা ছিল—তাঁরা যেন কৃষ্ণকেই স্বামী হিসেবে পান—

নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।

ব্রজ-কুমারীদের এই অভীষ্টপূরণের আগে কৃষ্ণ তাঁদের একটু পরীক্ষা করে নিয়েছিলেন। পরীক্ষার ধরনটা চিরাচরিত নয় এবং তা অখিল-নট-নাগর কৃষ্ণকেই মানায়। গোপরমণীরা সকালে উঠে নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন—যেমন প্রতিদিন যান তেমনই। তাঁদের দৈনন্দিন ব্রত-নিয়মের আরম্ভ এই স্নানশুদ্ধিতে। কৃষ্ণ জানতেন

—তাঁরা আসেন নদীতে। একদিন নদীর পাড়ে রাখা সমস্ত কাপড় নিয়ে তিনি বসে রইলেন কদম্বের ডালে—

তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ।

সরলা রমণীরা তখনও ব্যাপারটা বোঝেননি ভালো করে। তাঁরা নিজেদের মধ্যে গল্প, জল ছোঁড়াছুঁড়ি এমনকী নানা কথা বলছিলেন কৃষ্ণকে নিয়েই। এবার যখন উচ্চচূড়া কদম্বশাখা থেকে কৃষ্ণের পরিহাসবাক্য ভেসে এল, তখন তাঁরা প্রমাদ গুণলেন। তিনি বলে দিলেন— এমনিতে সহজে তিনি গোপিনীদের লজ্জাবস্ত্র ফেরত দেবেন না। প্রত্যেককে নিজে এসে অথবা একসঙ্গে এসে বিবস্ত্র অবস্থাতেই হাত তুলে কাপড় নিয়ে যেতে হবে কৃষ্ণের কাছ থেকে—

এবৈকেকশঃ প্রতীচ্ছধ্বং সহৈবোত সুমধ্যমাঃ।

তাঁদের প্রিয়তম নায়ক কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে চরম খেলায় মেতেছেন—এতে যেমন গোপীদের পরম রোমাঞ্চ হল, তেমনই স্বভাবজ লজ্জাও তাঁদের গ্রাস করল একই সঙ্গে—

ব্রীড়িতাঃ প্রেক্ষ্য চান্যোন্যং . . .

গোপ্যঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ।

অঘ্রাণের শীতে জলে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাকুতি-মিনতি করার ব্যাপারটা উপভোগ্য ছিল না; গোপীরা কৃষ্ণের বাবার কাছে নালিশ করবেন বলেও ভ্রূকুটি-কুটিল কটাক্ষে শাসিয়েছিলেন, কিন্তু ব্রজভূমির দামাল রাখাল সে সব কথায় খুব একটা কান দেননি। অগত্যা ওই বিবস্ত্র অবস্থাতেই লজ্জারুণ অঙ্গসৌষ্ঠব হাতে ঢেকে গোপীরা একে একে উঠে এলেন জল থেকে। কৃষ্ণ বললেন—বিবস্ত্র অবস্থায় স্নান করাটা পাপ বলে জেনো। তোমরা না সব কাত্যায়নী-ব্রত করছিলে। এই অন্যায় পাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে মাথায় ঠেকিয়ে দেবতার উদ্দেশে প্রণামোচ্চারণ করতে করতে এসো আমার কাছে। তবেই লজ্জার আবরণ মিলবে তোমাদের—

কৃত্বা নমো'ধো বসনং প্রগৃহ্যতাম্।

কৃষ্ণলীলার দার্শনিকেরা বুঝিয়ে দিয়েছেন—ভগবত্তার চিহ্নে চিহ্নিত কৃষ্ণের এই বস্ত্রহরণ-লীলার মধ্যে রসশাস্ত্রের চরম ব্যঞ্জনা লুকিয়ে আছে। অর্থাৎ তাঁকে পেতে হলে নিজের লজ্জার আবরণটুকুও রাখা চলবে না। তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করতে হবে দু-হাত তুলে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে। কৃষ্ণ এই আত্মসমর্পণটুকুই চান এবং সেটাই তিনি করিয়ে নিয়েছেন তাঁর প্রিয়তমা গোপবান্ধবীদের দিয়ে—যাঁরা তাঁকে স্বামী হিসেবে পেতে চান। তিনি বলেছেন—যে কারণে, যে উদ্দেশ্যে তোমরা কাত্যায়নী ব্রত উদ্‌যাপন করছ, তা আমি জানি। আমার প্রতি যদি তোমরা মনে প্রাণে আবিষ্ট হও, তাহলে 'কাম' ব্যাপারটা আর 'কাম' থাকে না, তা প্রেমে পরিণত হয়। ঠিক যেমন—পাকা ধান-যব যদি একবার ভেজে ফেলা যায়, তাহলে সেখান থেকে যেমন আর অঙ্কুরোদ্গমের সম্ভাবনা থাকে না, তেমনই কৃষ্ণপ্রেম যদি একবার বাধা-অপেক্ষা বিরহিত হয়ে আত্মসমর্পণে পর্যবসিত হয়, তাহলে আর তার মধ্যে আর কামনার অভিসন্ধি থাকে না, তার মধ্যে যা থাকে, তা শুধুই আত্মস্বার্থবিবর্জিত কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা। এমন সমর্পণের কাছে কৃষ্ণও শেষ পর্যন্ত হেরে যান।

গোপীরা কৃষ্ণের কথা শুনে তাঁদের লাজ ভয় মান অপমান সুখ দুঃখ ভাবনা সব ত্যাগ করে ঊর্ধ্বকরে তাঁদের লজ্জাবস্ত্র কৃষ্ণের কাছ থেকেই চেয়ে নিয়েছিলেন। পরিবর্তে কৃষ্ণ তাঁদের কথা দিয়েছিলেন—যে উদ্দেশ্যে তোমরা কাত্যয়নী ব্রত পালন করেছ, সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করব তোমাদের। তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব কোনো সময়—আগামী সময়ের কোনো রাত্রিতে—

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।

হরিবংশ কিংবা বিষ্ণুপুরাণ কৃষ্ণের এই ভবিষ্যৎ মিলনের পূর্বরঙ্গটুকু বর্ণনা করেনি। হয়তো ভাগবতের এই বর্ণনায় হরিবংশ কিংবা বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণ জীবনের সহজ সরল ভাবটুকু খণ্ডিত হয়, হয়তো বা পরম ভগবত্তার প্রকট উচ্চারণে কৃষ্ণের মনুষ্যস্বভাবও কিছুটা লজ্জিত হয়, কিন্তু এই ঘটনায় এই সত্যটুকু প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন বৃহৎ কর্মের পাশাপাশি ব্রজভূমির এই মধুরা রমণীদের চরম আত্মসমর্পণ তিনি অবহেলা করেননি। মথুরারাজ কংসের বিরুদ্ধে একদিকে কৃষ্ণ যেমন নায়ক-প্রতিম হয়ে উঠেছিলেন, তেমনই ব্রজভূমির সমস্ত মানুষের একক রক্ষক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ এই সরলা গোপরমণীদের হৃদয়টুকুও অস্বীকার করেননি। তিনি কথা দিয়েছিলেন—নিত্যদিনের মতো তিনি তাঁদের

স্বামী না হতে পারুন, কিন্তু কোনো গভীর নির্জন নিশীথে অন্তত একদিনের জন্যও তিনি তাঁদের স্বার্থবর্জিত প্রেমের মর্য্যাদা দেবেন।

এরই ফলশ্রুতি মহারাস। শারদ-রজনীর অবিশ্রান্ত জ্যোৎস্নাধারার মধ্যে কৃষ্ণ সেদিন গোপরমণীদের নামে সাধা বাঁশিটি বাজিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে একান্ত মিলনের ভাবনায়—

বনঞ্চ তৎ কোমলগোভি রঞ্জিতং/
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্।

সেই বাঁশি শুনে গোপরমণীদের ঘর বার সব একত্র হয়ে গেল যেন। তাঁরা আপন আপন অন্তরের মধ্যে সেই মধুর মুরলীর মনোচোরা ডাক শুনতে পেলেন। প্রত্যেকে তাঁরা ছুটলেন কৃষ্ণের কাছে—বনপথে কি মনোপথে— প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে—একজন আর একজনের খেয়াল করলেন না—

আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ।

—ততহি বেলি, সখিনী মেলি, কেহ কাহুক পথ না হেরি, ঐছনে মিলল গোকুলচন্দ, গোবিন্দদাস-বোলনী।

তখনও রাতের আঁধার গভীর হয়নি। কোনো রমণী সন্ধ্যাবেলার গোদোহনে ব্যস্ত ছিলেন, তিনি গোদোহন অসমাপ্ত রেখে চলে গেলেন। কেউ উনুনে দুধ জ্বাল দিচ্ছিলেন, পড়ে রইল। কেউ বা পরিবেশন করছিলেন খাবার। পড়ে রইল হাতা-হাঁড়ি-থালা। কেউ বা নিজেই খাচ্ছিলেন, পড়ে রইল অর্ধভুক্ত গ্রাস। সন্ধ্যার মধুরতায় কেউ কেউ কৃষ্ণের কথা মনে করে নিজে নিজেই ভরা-শিঙার রচনা করছিল—মুখে লোধ্ররেণুর আভাস, বুকে-কপালে কুম্‌কুমের আলিম্পন, চোখে কাজল—

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যো'ন্যা
অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।

—কারও আর সাজা শেষ হল না, কারও এক চোখে কাজল, এক কানে কুণ্ডল, কোমরের রশনা গলার হারে পরিণত হল—উতলা আঁচল এলো থেলো চুল—কৃষ্ণের বাঁশি শুনে যেখানে যে অবস্থায় ছিলেন গোপিনীরা ছুটলেন কৃষ্ণের কাছে—

ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ।

ঠিক এইখানেই প্রশ্ন আসবে—যাঁরা এমন উতলা হয়ে ছুটে গেলেন কৃষ্ণের কাছে, তাঁদের পরিচয় কী? আগের সেই কাত্যায়নী-ব্রতচারিণীদের সূত্র ধরে বলা যায়, তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই কুমারিকা ছিলেন অনেকেই। আবার অনেকেই ছিলেন পরবধূ। অর্থাৎ তাঁরা বিবাহিত, তাঁদের স্বামী আছে, স্থলবিশেষে পুত্রও আছে। ভাগবত পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ এবং হরিবংশ—এই তিন পুরাণে, তথা অন্যান্য পুরাণেও যে শ্লোকটি একেবারে 'কমন', সেটা হল—সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে—কৃষ্ণের বংশীস্বনে আকুলা পরবধূদের আসার পথে তাঁদের স্বামীরা অনেকেই বাধা দিয়েছিলেন, হয়তো কুমারিকা রমণীরাও বাধা পেয়েছিলেন তাঁদের পিতা, ভাই বা স্বজনদের কাছ থেকে—

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।

কিন্তু কৃষ্ণের সম্মোহনী মুরলীর তানে সেই বাধা কেউ মানেননি। হরিবংশ পর্যন্ত তার সরল সাদাসিধে বক্তব্যে জানিয়েছে—তাঁরা বাধা মানেননি কারণ কৃষ্ণের সঙ্গ পাওয়াটা তাঁদের কাছে স্বামী, পিতা বা স্বজনদের সঙ্গলাভের চেয়ে বেশি কাম্য ছিল—

কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ মৃগয়ন্তে রতিপ্রিয়াঃ।

ভাগবত পুরাণের বর্ণনায় ব্রজভূমির রমণীদের মধ্যে কারা শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের কাছে পৌঁছতে পারলেন এবং কারা পারলেন না—তারও একটা পরিসংখ্যান আছে। যাঁরা পৌঁছতে পারলেন না, তাদের বিষয়ে দার্শনিক বিচারও আছে কিন্তু। আমরা সেই দার্শনিকতায় যাব না। এমনকী যাঁরা এসে মিলিত হয়েছিলেন কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের বিষয়ে হরিবংশ বা বিষ্ণুপুরাণ কোনো দার্শনিক তর্কযুক্তি প্রকাশ না করলেও, ভাগবত কিন্তু সেখানেও দার্শনিকতা অব্যাহত রেখেছে। হরিবংশ বা বিষ্ণুপুরাণে দেখি—বাধা সত্ত্বেও গোপরমণীরা সকলে কৃষ্ণের ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং তাঁরা আসতেই নৃত্যগীত আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণ যখন দেখলেন—তাঁর বাঁশি শুনে বিমোহিত কুলবালিকারা সব চলে এসেছেন বনে, তখন তিনি কথার চতুরতায় বললেন—তোমাদের স্বাগত জানাই। বল তো কী করতে পারি তোমাদের জন্য? ব্রজভূমির সকলে ভালো তো? নইলে হঠাৎ এই অসময়ে . . . সত্যি সত্যি বল তো—তোমরা এখানে কেন এসেছ—

ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রূতাগমনকারণম্।

কৃষ্ণের সঙ্গাসক্ত রমণীকুলকে তির্যকভাবে আঘাত দিয়ে কৃষ্ণ বললেন—রাত্রির এই সময়টা তো ভালো নয়। বাঘ-ভালুকেরও তো ভয় আছে। এই ঘোর রজনীতে ব্রজের কুলবালাদের কী এমন করে এখানে আসতে আছে? তোমরা ফিরে যাও—

প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ।

তাছাড়া তোমরা যে এইভাবে বেরিয়ে এসেছ, তার জন্য তোমাদের বাড়ির লোকেদের কত চিন্তা হচ্ছে বল? তোমাদের পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু-স্বামীরা তোমাদের চিন্তায় আকুল হচ্ছেন, আর তোমরা তাঁদের ভয় বাড়িয়ে দিচ্ছ। এও কি উচিত কাজ? যদি বল আমার জন্য নয়, আজ শরৎপূর্ণিমার জ্যোৎস্নাধারায় ভেসে যাওয়া এই বনের শোভা দেখতে এসেছিলে তোমরা, দেখতে এসেছিলে যমুনার তীরবাহিনী মন্দ হাওয়ায় দুলে ওঠা বনের শোভা। তা বেশ তো, সে শোভা তো তোমাদের দেখা হয়ে গিয়েছে, এবার বাড়ি যাও। বাড়ি গিয়ে স্বামী-পুত্রের সেবা কর। আর সত্যিই যদি এমন হয়ে থাকে যে, আমার জন্যই, আমাতে অনুরক্তির কারণেই তোমরা এসেছ, তার একটা যুক্তি আছে বটে,—কিন্তু সেটা কি বড়ো যুক্তি? আমাকে সবাই ভালোবাসে, তোমরাও আর পাঁচটা প্রাণীর মতোই আমাকে ভালোবেসেছে, এতে বেশি কী আছে?

আগতা হ্যুপপন্নং বঃ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ।

ভালোবাসার জনকে বিঁধলেও কি এমন করে বিঁধতে আছে! তবে এ হল পরীক্ষা, কতটা ভালোবাসলে কতটা সহ্য করা যায় তার পরীক্ষা। যাঁরা বাপ ভাই স্বামীর বাধা না মেনে রাতের অন্ধকারে বনের পথে ছুটে এসেছেন কৃষ্ণের জন্য আকুল হয়ে, তাঁদের আর অন্য কোনো পিছুটান আছে কিনা, পাপ, পুণ্য সামাজিকতার এতটুকু মোহও আছে কিনা কৃষ্ণ সেটা যাচাই করছেন তির্যক শব্দে। চিরাচরিত সামাজিক মর্য্যাদার কথা উল্লেখ করে কৃষ্ণ এমনটাও বললেন যে—স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষ্কপটভাবে স্বামী সেবা করাটাই সবচেয়ে বড়ো ধর্ম, স্বামীর পিতা মাতা পরিজনদের সন্তোষই স্ত্রীলোকের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাছাড়া স্বামী যেমনই হোক, বুড়ো, জড়, দুশ্চরিত্র, রোগী, অর্থহীন—লৌকিক ধর্মে স্বামীকে ছেড়ে আসা উচিত নয়। তাছাড়া স্বামী ছেড়ে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হলে লোকনিন্দাও যেমন, তেমনই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের তুলনায় যেমন তুচ্ছ, তেমনই তা চালিয়ে যাওয়াও দুষ্কর—

অস্বর্গ্যম্ অযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।

শেষ বক্তব্যে কৃষ্ণ প্রায় ভগবানের দূরত্ব রেখেই জানালেন—আমাকেই যদি পেতে চাও, তবে সে তো আমার কথা শ্রবণ-কীর্তন এবং ধ্যানের মাধ্যমেই পেতে পার, তার জন্য তো আমার কাছে আসার প্রয়োজন নেই। তাই ভালো কথা বলছি, তোমরা বাড়ি যাও—

ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্।

ব্রজভূমির রমণীরা যাঁকে প্রিয়তম ব্যক্তি ভেবে স্বামী-স্বজন, বাপ-ভাইদের কথা না শুনে জ্যোৎস্নালোকে বনে চলে এসেছেন, তাঁরই মুখে এমন অপ্রিয় জ্ঞানের কথা শুনে—

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষাণং।

গোপীরা লজ্জায় দুঃখে মাটিতে মিশে যেতে চাইলেন। তাঁদের মুখ শুকিয়ে গেল, শ্বাস দীর্ঘতর হল হতাশায় এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়ার মতো অনেকেই পায়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলেন—

চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।

কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁদের কীই বা করার ছিল? তাঁরা কী ফিরে যাবেন আপন গৃহে—রসিক টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখেছেন—সে তো অনেকটা 'বান্তভক্ষণের মতো—অর্থাৎ স্বামী বাপ ভাই—যাদের অবজ্ঞা করে মনের মানুষের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম, তার কাছে প্রত্যাখাত হয়ে স্বামী বাপ ভাইয়ের কাছে ফিরে যাওয়া মানে নিজের করা বমি নিজে খাওয়া—

এতদাদিষ্টং পত্যাদিভজনরূপং
বান্তভক্ষণং কর্তুং কথং বা প্রভবাম।

গোপীদের পক্ষে আর ঘরে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে কি যমুনার জলে ডুবে জ্বালা মেটাবেন তাঁরা? তাও সম্ভব না। তাহলে তো কৃষ্ণের অমন মধুর মুখখানিই আর দেখা হবে না। তিলেকের তরেও ও মুখ না দেখলে তাঁরা মরেও তো সুখ পাবেন না। অতএব মরাও হল না। —কৃষ্ণের জন্যই মরা যায় না। নাকি রাগ দেখিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াবেন গোপীরা? বোঝা যেত কৃষ্ণের আসল ভাবটা কী?

মনের মধ্যে এত আলোড়ন, এত কষ্ট, এত জল্পনা, কল্পনা, কিন্তু কেউ কিছুই করতে পারলেন না। তাঁদের মুখ শুকোল, চোখ সজল হল, কিন্তু আবারও কৃষ্ণপ্রেমের সর্বাতিশায়ী আকর্ষণে গোপীরা এক একজনে বলতে আরম্ভ করলেন। কারণ স্বামী-পিতা-স্বজনদের প্রতি আর তাঁদের মন নেই, তাঁরা শুধু কৃষ্ণকেই ভালোবাসেন—

কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্তিতসর্বকামাঃ।

একজন বললেন—তুমি যেভাবে যত নৃশংস ক্রূর কথা বললে, এমন করে বলা তোমার উচিত হয়নি, বলার অধিকারও নেই তোমার। সংসারের যত আকর্ষণ আছে, সব ছেড়ে আমরা তোমার কাছে এসেছি—

সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।

আমরা তোমাকেই জানি, তোমাকেই আমরা ভালোবাসি, অতএব এইভাবে তুমি আমাদের ছেড়ে দিতে পার না। মুক্তিকামী ব্যক্তি যদি পুণ্যপাপের সব মোহ ত্যাগ করে ঈশ্বরানুসন্ধান করেন, তাঁকে যেমন ঈশ্বর ত্যাগ করতে পারেন না, তেমনই আমরাও সংসার ধর্মের পুণ্যপাপ সম্পূর্ণ অবহেলা করে এখানে এসেছি, তুমি আমাদের স্বীকার কর ঈশ্বরের মত করুণায়।

সমস্ত গোপীযূথের মধ্যে প্রখরা এক রমণী বললেন—প্রিয় আমার! তুমি যে গুরুঠাকুরের মতো এতক্ষণ স্বামী সেবার উপদেশ দিলে, বললে—সেটাই স্ত্রীলোকের আসল ধর্ম—তা আমরা তো অন্তরের অন্তরে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে তো স্বামী বলে মানিই না। কাজেই এত করে যিনি স্বামী সেবার উপদেশ দিলেন আমরা তো স্বামীর কাছেই এসেছি। যাদের জীবন আছে, তেমন জীবনধারী মানুষের কাছে তুমিই তো সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে বড়ো বন্ধু, সকলের অন্তরাত্মা—

প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা।

কৃষ্ণের সঙ্গে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য গোপীরা এখানে প্রায় বেদান্তের ভাষা ব্যবহার করেছেন।

একজন বলেছেন—স্বামী পিতা ভাইদের সঙ্গে যে আমাদের সম্বন্ধ, সে তো একটা ঔপাধিক সম্বন্ধ। সংসারে অমনই সব নামকরণমাত্র—ইনি পিতা, ইনি স্বামী, ইনি মাতা ইত্যাদি সব। পরম ঈশ্বরের মতো যে তুমি, তোমার সঙ্গেই তো চিরকালের নিত্যসম্বন্ধ আমাদের—অতএব চিরজনের সখা! পরম ঈশ্বর আমাদের! তোমার সঙ্গে মিলিত হবার যে আশা নিয়ে এসেছি, সে আশা এমন করে ছিন্ন করে দিও না—

তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মা স্ম ছিন্দ্যা/
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র।

গোপীরা বললেন—যে হাত দুটি আমাদের ঘরের কাজেই নিপুণ ছিল, পোড়া বাঁশির সুর শুনলে সে হাতও আর কাজ করে না। আর একবার যখন তোমার কাছে এসে পড়েছি, আর কি তোমার চরণ ছেড়ে ঘরের পানে যেতে পা সরবে আমাদের? আমরা যেতেই পারব না।

—পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাৎ।

কৃষ্ণ এবার কিছু বিপর্যস্ত বোধ করলেন। শরৎ পূর্ণিমার রাত্রিতে যাঁদের সঙ্গ কামনা করে তিনি উন্মাদ মুরলীধ্বনি করেছিলেন, তাঁদের ঘরে ফিরে গৃহকর্ম করার উপদেশ দেওয়াটা যে খুব কাজের কাজ হয়নি সেটা তিনি বুঝতে আরম্ভ করেছেন এবার। তিনি নিজে এক লপ্তে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন, এবার এক লপ্তে সুন্দরীদের কথা প্রতিযুক্তিও অনেক শুনতে হচ্ছে। গোপীরা বললেন—আর তো আমাদের ফিরে যাওয়া হবে না, আর ফিরে গিয়েই বা কী করে ঘরের কাজে মন দেব আবার—

যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা?

যদি এমনই তোমার মনে ছিল, তবে কেন তোমার বাঁশির সুরে এমন করে সেধে ডেকে আনলে আমাদের? কেন সেই হেমন্তের প্রভাতবেলায় আমাদের সমস্ত লজ্জাবস্ত্র হরণ করে আমাদের সকলই নিয়েছিলে তুমি? তোমার ভুবনভোলানো হাসি, তোমার দৃষ্টি, তোমার গান, আর তোমার বাঁশির সুরে আমাদের শরীরে মনে আগুন ধরে গেছে। আগুন যে জ্বালায়—বাঁচতে চাইলে সে আগুন নেভাবার দায় তো তারই সখা। কাজেই আমাদের যদি বাঁচাতে চাও তাহলে তোমার চুম্বন-সুধায় সিঞ্চিত কর আমাদের অধর—

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃত পূরকেণ।

নইলে আমরাও আগুন জ্বালাতে জানি। কথায় বলে—মিলন-বিরহের কল্পে কথা বড়ো না হয়ে আমাদের নিজের সুখটাও বড়ো হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু বিরহে তোমার অদর্শনে তুমিই তো

প্রাণ-মন-ধ্যান জুড়ে থাক। কাজেই বিরহের আগুনে জ্বলে পুড়ে ধ্যানের মধ্যে চিরকালের জন্য মিলিত হব তোমার সঙ্গে—

ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে।

ব্রজসুন্দরীরা নিজের মুখে কৃষ্ণের সর্বতিশায়ী আকর্ষণ বর্ণনা করে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেন কৃষ্ণের কাছে। বারবার জানালেন— যে একবার কৃষ্ণের প্রেমে ঘরছাড়া হয়েছে, তার আর ঘরে ফিরে যাবার উপায় নেই। আর শেষ বক্তব্যে যে ভাবনাটুকু জানালেন সেটা একেবারেই বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশের সরল জবানীর সঙ্গে মিলে যায়। তাঁরা বললেন— আদি পুরুষ বিষ্ণু যেমন দেবতাদের রক্ষক, তেমনই তুমিও এই বৃন্দাবনের অধিবাসীদের রক্ষক-ত্রাতার মতো। তা আমরাও তো তোমার শরণ নিয়েছি সখা। তোমার সুন্দর মুখখানি যেদিন থেকে দেখেছি, সেদিন থেকেই তো আমরা তোমার দাসী হয়েছি। আজ আমরা তোমার আসঙ্গ-লিপ্সায় আকুল। আমাদের তপ্ত শরীরে, আমাদের মাথায় তোমার হাতখানি রাখ সখা!

তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্তবন্ধো
/তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাম্।

রাসনৃত্য আরম্ভ হল। কেমন করে, কেমন নব-মধুর শৃঙ্গারে সে নৃত্য চলল—অমানুষী ভাষায় তার বর্ণনা দিয়েছেন ভাগবত পুরাণের ব্যাস। তবে এই রাস এবং গোপীদের কৃষ্ণপ্রেম উপলক্ষ্যে রাধারানীর নাম কৃষ্ণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জুড়ে গেল, তাঁর পৌরাণিক উৎস সন্ধানের দায় আমাদের আছে। ভাগবতে স্পষ্ট করে নেই, অন্য প্রাচীন পুরাণেও নেই, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে রাধার সম্বন্ধে যে কথাসূত্র আছে, ভাগবতে আছে তারই সকাব্যিক বিস্তার। অথবা এই দুই পুরাণের বর্ণনাই তাঁদের নিজস্ব। তথ্যটুকু আছে শুধু মূলে, ঘটনায়।

দামোদর কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীকুলের পরম অভীষ্ট নৃত্য আরম্ভ হল—মিলিত হল বাহুতে বাহু, আলিঙ্গিত হল সর্বাঙ্গ—

বাহুপ্রসার পরিরম্ভ করালকোরু/
নীবীস্তনালভন-নর্ম-নখাগ্রপাতৈঃ।

নৃত্যের চরম পর্যায়ে গোপীকুলের অনেকেরই একক ধারণা হল—কৃষ্ণ বুঝি তাঁকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, তাঁর তুলনায় অন্য রমণীরা তুচ্ছ। অন্যদিকে একটি মাত্র রমণীকে দেখা গেল—মহাকবি তাঁর নাম করেননি—দেখা গেল—রাসরঙ্গের এই উদ্দাম রসোচ্ছ্বাস তাঁকে স্পর্শ করছে না। এতগুলি সুন্দরী রমণীর বাহু পরিবৃত কৃষ্ণকে দেখে তিনি অভিমানে মূক বধির হয়ে গেছেন। কৃষ্ণ দুটোই লক্ষ্য করলেন। তাঁকে পাবার সুখে সকল গোপীকুলের সাহংকার মানসিক অভিব্যক্তিও লক্ষ্য করলেন, আবার সবার মধ্যে থেকেও একাকিনী এক অভিমানিনীর অন্তর্দাহও লক্ষ্য করলেন। তাঁর মনে হল—পাবার পরে হারাই হারাই ভাব নেই যাঁদের, তাঁদের অহংকারটুকু প্রশমিত করতে হবে, আর যিনি তাঁকে পেয়েও পাননি বলে মনে করছেন, তাঁর অভিমানটুকুরও মর্য্যাদা দিতে হবে। একই উপায়ে দুটি কাজ করার জন্য কৃষ্ণ তখন এক কোণে দাঁড়ানো সেই লজ্জাবিধুর রমণীটিকে সঙ্গে নিয়ে সকলের অলক্ষ্যে চলে গেলেন রাসমণ্ডল ছেড়ে—

প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত।

রাসমণ্ডলের প্রণয়োন্মাদী নৃত্যগীত ছেড়ে একাকিনী যে রমণীটির সঙ্গে অন্তর্ধান করলেন কৃষ্ণ, তাঁকে হ্লাদিনী-শক্তির প্রতিমূর্তি রাধা ছাড়া আর অন্য কাউকে ভাবতে পারেননি পণ্ডিত-রসিকেরা। ভালো করে যখন খেয়াল হল যে, কৃষ্ণ তাঁদের ছেড়ে চলে গেছেন, তখন গোপীদের দুঃখের অন্ত রইল না। সে সাহংকার ভাবটুকু দূরের কথা, কৃষ্ণের জন্য বিলাপ করতে করতে কৃষ্ণকে খুঁজতে বেরলেন। খুঁজতে খুঁজতে এক সময় গোপীরা বৃন্দাবনের বনপ্রান্তে কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখতে পেলেন। আরও দেখতে পেলেন কৃষ্ণের পদ চিহ্নের পাশাপাশি পায়ে পায়ে চলা আরও একটি স্ত্রীলোকের পায়ের ছাপ হয়তো বা ক্ষণিকের ঈর্ষায় তাঁরা এই রমণীর নাম করেননি। অথবা ঈর্ষা মোটেই নয়, কেননা সঙ্গে সঙ্গেই এটা তাঁদের মনে হয়েছে যে, তাঁদের চেয়ে এই রমণীর মূল্য এবং আকর্ষণ কৃষ্ণের কাছে বেশি। গোপীরা কৃষ্ণের পদচিহ্নের পাশে অন্যতমা সেই স্ত্রী পদচিহ্ন আবিষ্কার করে বলেছিলেন— কৃষ্ণের পায়ের পাশে এ কার পায়ের ছাপ—

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা?

বেশ বোঝা যাচ্ছে—যাবার সময় আমাদের কৃষ্ণ এই সৌভাগ্যবতীর কাঁধে হাত রেখে চলেছিলেন।

গোপীকুলের দুই দুই চারের অনুমান মিলে গেল। একটু আগে চলার পথে কৃষ্ণের গলায় দোলানো কুন্দফুলের মালাটি পড়ে থাকতে দেখেছেন গোপীরা। উদ্দাম রাসনৃত্যের সময় ওই কুন্দফুলের মালাটি তাঁর গলায় ছিল, কিন্তু এখন যে সেটি পথের ধারে পড়ে আছে অবহেলায় সেই মালাটি তুলে নিয়ে গোপীরা অন্য গন্ধ পেয়েছেন। কুন্দফুলের শ্বেতশুভ্র দলগুলির মধ্যে প্রিয়তমা এক রমণীর বুকে আঁকা পত্রলেখার রক্তিম কুঙ্কুম লেগে ছিল। গোপীরা বলেছেন—এখান দিয়েই গেছেন আমাদের পরাণ সখা, কেননা আমরা কৃষ্ণের গলায় দোলানো কুন্দমালার সেই সুমধুর গন্ধ পাচ্ছি। প্রথমে কুন্দফুলের গন্ধ, তারপর উপযুক্ত পরীক্ষার পর সেই কুন্দকলির ওপর যখন গাঢ় আলিঙ্গনে স্খলিত শৃঙ্গারিণী রমণীর বক্ষ—কুঙ্কুমের চিহ্ন দেখতে পেলেন গোপীরা, তখন গোপীকুলের আর এক সুন্দরীর গন্ধ পেলেন গোপীরা। গোপীরা এও বুঝলেন যে, এই রমণীর প্রতি কৃষ্ণের আকর্ষণ এতটাই যে, আলিঙ্গনের সময় দুজনের মধুরস্পর্শে বাধাস্বরূপ ওই কুন্দফুলের মালাটি ফেলে দিয়েছেন কৃষ্ণ—

কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ/
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ।

কৃষ্ণের সঙ্গে বিশিষ্টা এই রমণীর একান্ত মিলন অনুভব করে ব্রজভূমির গোপিনীকুল কিন্তু মোটেই ঈর্ষাকাতর হলেন না। কৃষ্ণপ্রেমের এও আর এক বিশিষ্টতা—গোপী-সুখ দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত। কৃষ্ণসুখ দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত। —কবিরাজ গোস্বামীর সরল পয়ার—কৃষ্ণের সুখেই গোপীকুলের সুখ। কৃষ্ণের পদচিহ্নের পাশে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা আর এক রমণীর পায়ের ছাপ দেখায় গোপরমণীদের গবেষণা বেড়ে গেল। মনে মনে শুধু একটাই দুঃখ রয়ে গেল—কৃষ্ণ কি তাহলে আমাদের একটুও পছন্দ করেন না—রমণী-পদচিহ্নের ঈষৎ বসে যাওয়া প্রকৃতি দেখে তাঁদের মনে হল—একাকী এই রমণীরই মুখচুম্বন করেছেন কৃষ্ণ। তাঁরা সে রসে বঞ্চিত—

যৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহো ভুঙ্ক্তে'চ্যুতাধরম্।

মনে মনে তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন—নিশ্চয়ই এই সৌভাগ্যবতী সুন্দরী ভগবানের বহু আরাধনা করেছেন, তাঁর প্রার্থনার মধ্যে এতটাই জোর ছিল—যাতে অন্য সমস্ত গোপসুন্দরীদের ত্যাগ করে একা তাঁকে নিয়ে নির্জনে চলে এসেছেন কৃষ্ণ—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

উক্ত শ্লোকটির মধ্যে 'রাধিত' অথবা 'রাধিতঃ' শব্দটির, মধ্যেই রাধা নামের ব্যঞ্জনা অনুভব করেছেন রসিক সুজনেরা। 'রাধ্' ধাতুর অর্থ প্রার্থনা করা। যিনি চিরকাল কৃষ্ণের সঙ্গলাভের জন্য প্রার্থনা করে গেলেন, তিনিই রাধা। ভাগবতের ব্যাস রাধার নামটি কেবল ক্রিয়াপদের ব্যঞ্জনাতেই লুকিয়ে রাখলেন। কৃষ্ণ বিরহাকুল গোপীরা আরও কিছুদূর যাবার পর কৃষ্ণের পায়ের পাশে আর রাধার পায়ের ছাপ দেখতে পেলেন না। কিন্তু কৃষ্ণের পায়ের চিহ্নটি এখন থেকে মৃত্তিকার মধ্যে অধিকতর গভীর এবং আরও বেশি মগ্ন। যমুনার তীর ঘেঁষা অরণ্যের পথ, এখানে মাটি যমুনা জলের শীতল স্পর্শে একটু নরম। তার মধ্যে মাটির সঙ্গে বালিরও মিশ্রণ আছে ঈষৎ—

নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকম্।

ফলত হঠাৎই কৃষ্ণের পায়ের ছাপ অতিগভীর হতেই গোপীরা সন্দেহ করলেন—সেই সৌভাগ্যবতী রমণী আর হাঁটতে পারেননি, বন্যপথে কুশাঙ্কুরে হয়তো ছড়ে গিয়েছিল তাঁর পা। কৃষ্ণ তখন সমব্যথার পুরুষোচিত ভঙ্গিতে প্রিয়তমা রমণীকে কাঁধে তুলে নিয়েছেন—

খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলাম্ উন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ।

গোপরমণীরা এই একতরা রমণীর প্রতি কৃষ্ণের আকর্ষণ লক্ষ্য করে তাঁকে নিজেদের সঙ্গে মেলাতে পারেননি। বিবাহিতা পত্নীর সঙ্গে যে নিঃসঙ্কোচ আচরণ লক্ষিত হয়, গোপীরা এই রমণীর প্রতি কৃষ্ণের সেই মায়া সেই ভাব দেখে তাঁকেই একমাত্র বধূর সম্বোধনে চিহ্নিত করেছেন। ভেবেছেন—এই নির্জন অরণ্যানীর মধ্যে আমরা সবাই এসেছিলাম। কিন্তু একা এই রমণীটিকেই কৃষ্ণ বধূর মতো মেনে নিয়েছেন—

অনুপনীতেনাপি কৃষ্ণেন বনে'ত্র
সা স্ববধূরেব কৃতেতি ভাবঃ।

—টীকাকার চক্রবর্তী ঠাকুর লিখেছেন। একবার তাঁকে কোলে বুকে উঠিয়ে খানিক দূরে নিয়ে গিয়েই তাঁর কষ্ট লাঘব করেছেন, তাই শুধু নয়। এই সামান্য বনের পথে তাঁর আহ্লাদ আবদারও কম শোনেননি কৃষ্ণ। এক জায়গায় গাছের তলায় গোপীরা দেখেছেন—ইতস্তত ফুল

ছড়িয়ে আছে। কৃষ্ণের পদাগ্রভাগ মাটিতে বসে গেছে, নাতিদূরে সেই রমণীর ক্ষুদ্র কোমল পদচিহ্ন আবারও দেখা যাচ্ছে। গোপীরা বুঝলেন—সেই একাকিনীর আবদার মেনে কৃষ্ণ সেখানে পা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বৃক্ষশাখা অবনমিত করে ফুল তুলেছেন প্রিয়ার জন্য—

অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ।

আরেকটা জায়গায় নিজের জানুর ওপরে তাঁকে বসিয়ে তাঁর চুল বেঁধে দিয়েছেন কৃষ্ণ, কেশপাশে গ্রথিত করেছেন অরণ্যের মাধবীমঞ্জরী—

তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্।

ভাগবতের দার্শনিক কবির মতে—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তিনি নিজেই রসস্বরূপ, অতএব নিজের মধ্যেই তিনি স্বয়ং রসাস্বাদন করতে পারেন—

আত্মরত আত্মরামো' প্যখণ্ডিতঃ।

কিন্তু তবুও যে তিনি সাধারণ প্রেমিকের মতো একতমা এক প্রেষ্ঠা রমণীর সঙ্গে বিহার সুখ রচনা করছেন, সে শুধুই মনুষ্যজনোচিত রস আস্বাদনের জন্য। এই রস আস্বাদনের পরম আশ্রয় হলেন রাধা—যাঁকে সমস্ত গোপী সাধারণের মাঝখান থেকে একান্তে নিয়ে এসেছেন কৃষ্ণ। সবার থেকে আলাদা বলেই রাধা বলে তাঁকে চেনা যাচ্ছে। মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বলেছিলেন—নাম-নেই বটে, তবে গন্ধ আছে। আমরা দেখছি—স্পষ্টত না হলেও নামও আছে—অনয়ারাধিতো নূনম্।

ভাগবত পুরাণে দেখলাম—কৃষ্ণের একান্ত সঙ্গসুখে নিমগ্না এই একতমা সৌভাগ্যবতীর মনেও একসময় গর্ব এল—আমাকে ছাড়া কৃষ্ণের চলে না। আমার জন্য সবাইকে ছেড়ে তিনি আমার সঙ্গেই এসেছেন। মানসিক গর্ব প্রকাশও হল কথায়—আর আমার হেঁটে চলবার ক্ষমতা নেই গো। যেখানে ইচ্ছে এখন নিয়ে চল আমাকে—

ন পারয়ে'হং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ।

এ কথা শুনে কৃষ্ণ বললেন—তাহলে আমার কাঁধে চড় তুমি, আমি নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু হায় কাঁধে চড়া আর হল না। তাঁর সগর্ব ভাবটুকু দেখেই কৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন সেখান থেকে। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা রাধা অনুতাপে অনুশোচনায় কান্নায় ভেঙে পড়লেন—

ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত।

যাঁরা কুলশীলমান ছেড়ে একান্তভাবে তাঁরই আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের প্রেমের গর্বটুকুও যে ধূলিসাৎ করে দিলেন কৃষ্ণ! এ কেমন রসজ্ঞতা? ভাগবত পুরাণের মহাকবি নিজের মতো করে একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু আমরা তাতে খুব সন্তুষ্ট হইনি। ভাগবত বলেছে—কৃষ্ণ আত্মারাম পুরুষ এবং মূলত স্ত্রীলোকের বিভ্রমে তিনি বিভ্রান্ত না হলেও তিনি যা করছিলেন, তার মধ্যে স্ত্রীবশীভূত স্ত্রৈণ পুরুষের দীনতা প্রকট হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে যে একতমা রমণীর জন্য তিনি রাসমণ্ডল বিসর্জন দিয়ে এসেছিলেন, তিনি একটু করে এমনই ভাব প্রকাশ করেছিলেন যাকে মাটি ছেড়ে মাথায় ওঠা বলে। প্রেমে পারস্পরিক বশীভবনের মধ্যে পুরুষের এই দীনতা এবং স্ত্রীলোকের এই হীনতা প্রকট হয়ে উঠছে বলেই কৃষ্ণ নাকি অন্তর্ধান করলেন—এই হল ভাগবতের অভিমত—

কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মনাম্।

ভাগবতের এই সাধারণীকৃত মন্তব্য মেনে নিতে অসুবিধা হয়, বরং বলতে পারি— প্রেমের চরম অবস্থাতেও যদি এমন স্ত্রীলোকের ঔদ্ধত্য আসে যে—তাঁর নিয়ন্ত্রিত বশীভূত পুরুষকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করানো যাবে, তবে চরম প্রেমিকের মনেও এক ধরনের গ্লানি আসে, সে বুঝতে পারে যে, তার বশীভাবের সুযোগ নিয়ে স্ত্রীলোক এবার তাকে ব্যবহার করছে। কিন্তু পুরুষ বুঝেও না বোঝার ভান করে থাকে। কিন্তু যেহেতু কৃষ্ণ সাধারণ পুরুষ নন, তাঁর মধ্যে যেহেতু ভগবত্তার চিহ্ন আছে, তাই পূর্বেও যেমন তিনি গর্বস্ফীত গোপী-সমাজের আত্মমানিতার মুহূর্তে তাঁদের ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছিলেন, তেমনই প্রেমময়ী রাধিকাকেও আহত করে অন্তর্হিত হয়েছেন। অন্তত গোপীকুল এবং মহাভাব-স্বরূপিণী রাধিকার ব্যবহারে কৃষ্ণের সাধারণীকৃত অনুমান যে ঠিক ছিল না, এখানে যে তিনি বিনা কারণে শাস্তি দিয়েছেন, তা ভাগবতের পরবর্তী দুই অধ্যায়েই পরিষ্কার হয়ে গেছে। কৃষ্ণকে হার মানতে হয়েছে।

কৃষ্ণ যখন একান্তস্থিতা রাধাকেও ছেড়ে গেলেন, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হল অনুতাপবিদীর্ণা, বিলাপে আকুল সেই গোপরমণীদের যাঁরা এতক্ষণ কৃষ্ণকে খুঁজতে খুঁজতে আসছিলেন। ঠিক এরপর থেকে এক অধ্যায় জুড়ে ভাগবতে কৃষ্ণের উদ্দেশে গোপীদের

চরম আত্মনিবেদনের ভাবনা বিরহসঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় ধ্বনিত হয়েছে। ইন্দিরাছন্দে লেখা এই গোপী-গীতকে ভাগবতের সর্বস্ব বলা যায়—এইখানেই প্রমাণ হয়ে গেছে—গোপীকুলের ভালবাসা কৃষ্ণের চাইতেও অনেক বেশি, কৃষ্ণকে এই ভালোবাসার কাছে হার মানতে হয়েছে। তিনি আবারও ফিরে এসেছেন তাঁদের কাছে হার মানা হাসিতে মুখখানি উজ্জ্বল করে। কৃষ্ণকে দেখে গোপীদের বিরহমৃত শরীরে যেন প্রাণ এসেছে—

তন্বঃ প্রাণমিবাগতম্।

তাঁরা যখন তাঁকে নিয়ে কে কী করবেন, কিছু ভেবে পাচ্ছিলেন না, কেউ হাতে ধরছেন, কেউ গালে গাল রেখে আদর করছেন, কেউ কটাক্ষ করছেন, কেউ কেউ উত্তমাঙ্গের স্তনকুঙ্কুমরঞ্জিত বসন মুক্ত করে বিছিয়ে দিয়ে প্রিয়তমের আসন রচনা করেছেন—

স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈ
/রচীক্লপন্নাসনমাত্মবন্ধবে।

কৃষ্ণ হার মেনেছেন গোপীদের এই নিঃশঙ্ক নির্দ্বন্দ্ব ভালোবাসার কাছে। কৃষ্ণের দেখা পাওয়া আহ্লাদিত গোপরমণীদের হাত ধরে বালুকা-ছড়ানো যমুনারতীরে নিয়ে গেছেন তিনি। বসেছেন তাঁদের আধ-আঁচরে আসন বিছিয়ে—যে আসন অন্তর্হৃদয়ে কল্পনা করেন যোগীরা—

তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো
/যোগেশ্বরান্তর্হৃদি কল্পিতাসনঃ।

ভগবত্তার নামে চিহ্নিত সেই পরম পুরুষটিও এবার হার মানলেন গোপীদের কাছে। কৃষ্ণ যখন গোপীসভায় পুনরুদিত হয়ে কিঞ্চিৎ শীতল হয়ে বসেছেন, আকাশে চাঁদের জ্যোৎস্না যখন ধুয়ে দিচ্ছে যমুনার পুলিনদেশ, গোপীরা তখন কৃষ্ণকে তির্যক্‌ভঙ্গিতে সেই কঠিন প্রশ্নটি করলেন। এতক্ষণ তাঁরা কৃষ্ণের জন্য কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছেন, এবার তিনি ফিরে আসার পর এই প্রশ্ন তো আসবেই। নিরঙ্কুশ সঙ্গদানের লোভ দেখিয়ে যিনি এতক্ষণ তাঁদের রেখে অলক্ষ্যে বসেছিলেন, তাঁর প্রতি ঈষৎ রাগ দেখিয়েই মিনতি করে গোপীরা বললেন—

সংস্তুত্য ঈষৎকুপিতা বভাষিরে।

বললেন—একটা প্রশ্নের জবাব দাও সখা। এক ধরনের মানুষ আছেন, যাঁদের আশ্রয় নিলে, যাঁদের কাছে উপকার চাইলে, অথবা ভজনা করলে তবেই তাঁরা আশ্রয় দেন, উপকার করেন, অথবা উলটে ভজনা করেন—ভজতো'নুভজন্ত্যেকে। আর এক ধরনের মানুষ আছেন, যাঁরা এর বিপরীত, অর্থাৎ তাঁরা ভজনার অপেক্ষা করেন না অর্থাৎ যে ভজনা করছে না, তাঁকেও এঁরা ভজনা করেন। আর তৃতীয় আর এক প্রকার আছেন, তাঁরা যে ভজনা করছে, তাকেও পোঁছেন না, যে ভজনা করছে না, তাকেও পোঁছেন না। গোপীদের শেষ জিজ্ঞাসা হল—এই তিন প্রকারের মানুষের মধ্যে কে ভালো, কে কার থেকে ভালো বলতে পার সখা? আরও স্পষ্ট করে বললে বলা যায়—গোপীরা জিজ্ঞাসা করলেন—এই তিন প্রকারের মধ্যে কোন প্রকারের মানুষ তুমি কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ খুব বিব্রত হলেন না। এমনিতেই তিনি বড়ো সপ্রতিভ মানুষ, কথার ইঙ্গিতও বুঝতে কোনো দেরি হয় না তাঁর। তার মধ্যে আজকে এখন তিনি সম্পূর্ণ হেরে গিয়ে ধরা দিতে এসেছেন। কৃষ্ণ বললেন—উপকার চাইলে, আশ্রয় চাইলে, ভজনা করলে, যারা উপকার করে, আশ্রয় দেয় অথবা ভজনা করে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধটাই তো স্বার্থের সম্বন্ধ। সেখানে ভালোবাসা, সৌহার্দ্য কিছুই নেই। এরা নিজেকেই তুষ্ট করে শুধু, স্বার্থই এখানে প্রধান; ধর্ম বলে কিছু নেই এখানে—

ন তত্র সৌহৃদং ধর্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা।

দ্বিতীয় যে প্রকার অর্থাৎ ভজনা না করলেও যাঁরা ভজনা করেন, তাঁরা তো পিতা মাতার মতো। সন্তানের কাছ থেকে কোনো সেবা-প্রত্যুপকার আশা না করেও তাঁরা সন্তানকে ভালোবাসেন। এখানে স্বার্থ বলে কিছু নেই, উপরন্তু আছে ধর্ম—

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরো যথা।

তৃতীয় প্রকার মানুষের কথা বলতে গিয়ে অন্তত চারটে উপবিভাগের কথা বললেন কৃষ্ণ। বললেন—ভজনা করলেও যাঁরা কোনো গুরুত্ব দেন না, আবার ভজনা না করলেও যাঁরা নিজে থেকে কোনো খেয়াল করেন না, এমন মানুষ চার রকমের হতে পারে। এক আত্মারাম—যাঁরা নিজের মধ্যেই নিজের আনন্দে মত্ত—ধ্যানী যোগী—তাঁরা। দ্বিতীয় আপ্তকাম—অথবা পূর্ণকাম, অর্থাৎ বাইরের কোনো ভোগেচ্ছা নেই

যাঁদের। তৃতীয় হল অকৃতজ্ঞ পুরুষ—পরের কাছে এরা উপকার যাচনা করে, কিন্তু কৃত উপকার মনে রাখে না। চতুর্থ প্রকারের নাম দেওয়া হয়েছে গুরুদ্রোহী—এরা পরের উপকার তো মনে রাখেই না, উপরন্তু উপকারীর নিন্দা করে। এখানে গুরু শব্দের অর্থ পালক, উপকারী; কেন না পূর্বে গুরুরাই পালকের ভূমিকা নিতেন। পরে শব্দটা পালক অর্থে রূঢ় হয়ে গেছে। গুরুদ্রোহীরা অকারণেই উপকারীর নিন্দা করে।

কৃষ্ণ বেশ দার্শনিক স্বভাবে তিন রকম মানুষের উদাহরণ দিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে ঠিক কোন দলে পড়েন, তা ভালো করে বোঝা গেল না। এই সবগুলি প্রকার বলার পর তিনি নিজে যেভাবে বলতে শুরু করলেন—আমি কিন্তু ভজনা করলেই ভজি না—এই 'কিন্তু' দিয়ে আরম্ভ করা মানেই তিনি বলতে চান—আগের দলের চেয়ে তিনি আলাদা। কেমন করে তিনি আলাদা, তাও এবার তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন কারণ এবার তিনি হেরে যেতেই এসেছেন।

একটা বড়ো-সড়ো প্রশ্ন এখানে আসবেই। ভজনা করলে তিনি ভজবেন—কৃষ্ণ বলছেন-এই পারস্পরিক ভজনা স্বার্থপরের মতো—

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে।

গোপীদের প্রথম প্রশ্নের এই ছিল প্রথম উত্তর। ধরে নিলাম—মনুষ্য ব্যবহারের এই কল্প গোপীদের সঙ্গে মেলে না। কেন না তাঁরা তো কোনো স্বার্থ-সাধনের জন্য কৃষ্ণের ভজনা করেননি, কিন্তু তবু কৃষ্ণ তাঁদের ছেড়ে গেছেন। এখানে প্রথমেই তিনি হেরে গেছেন। ভগবদ্গীতায় ভগবত্তার চিহ্নে চিহ্নিত কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—আমাকে যে যেরকমভাবে ভজনা করবে, আমি তাকে সেইভাবে ভজনা করব—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈবভজাম্যহম্।

কই এই প্রতিজ্ঞা তো টিকল না। গোপীরা যেভাবে কৃষ্ণকে চেয়েছিলেন, সেভাবে কই কৃষ্ণ তো প্রার্থনা পূরণ করেননি। কৃষ্ণ প্রথম সওয়ালেই হেরে গেছেন।

জিজ্ঞাসার যে দ্বিতীয় কল্প ছিল সেখানেও কৃষ্ণ অকৃতার্থ। ভজনা করলেও তিনি যেখানে প্রার্থনা পূরণ করেননি, সেখানে ভজনকারীকে পরম কারুণিক পিতা-মাতার মতো না-চাইতেই দেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। তিনি তা দেননি। আবার তৃতীয় যে কল্প—আত্মারাম, আপ্তকাম—এই শব্দগুলি কৃষ্ণের মৌল প্রকৃতি ঈশ্বরভাবের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযুক্ত হয়, কেন না স্বয়ং ভগবান ব্রহ্মস্বরূপ তথা রস এবং আনন্দস্বরূপ, তিনি নিজেই নিজের মধ্যে আনন্দ লাভ করতে পারেন, তাঁর কাছে দ্বিতীয়ের কোনো অপেক্ষা নেই। পুনশ্চ আপ্তকাম তো তিনি বটেই—এমন কোনো কামনা থাকতে পারে না, যা তাঁর অপ্রাপ্য বা যা তিনি লাভ করতে পারেন না। কিন্তু কৃষ্ণ তো এখন আর ঈশ্বর স্বভাবে বর্তমান নেই। তিনি এখন নরলীল। তাঁর সমস্তভাবই মনুষ্য-ভাবনায় ভাবিত। কাজেই বিষ্ণু-নারায়ণ-হরির স্বভাবে তিনি যতই আত্মারাম এবং পূর্ণকাম হোন, বৃন্দাবনে যশোমতী নন্দনের ভূমিকায় তিনি আত্মারামও নন, পূর্ণকামও নন। মায়ের ভালোবাসা কেমন, সখার ভালোবাসা কেমন, প্রিয়ার জন্য প্রেমিকের আকাঙ্ক্ষা কেমন— এসব বোঝার জন্যই আত্মারাম পুরুষের নরলীল মনুষ্যদেহে মর্ত্যে অবতরণ। কাজেই আত্মারাম, পূর্ণকামের গণনায় তিনি নেই আপাতত। আর অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী—এই অপশব্দগুলি কৃষ্ণের সম্বন্ধে তাঁর শত্রুরাও ব্যবহার করবেন না। কাজেই কৃষ্ণকে বলতে হল—এতগুলি প্রকারের মধ্যে আমি কোনোটার মধ্যেই পড়ি না।

তাহলে কেমন তিনি? কোন প্রকারের? কৃষ্ণ নিজের কথা আরম্ভ করছেন আলাদা করে। বললেন—সখীরা আমার! আমাকে ভজনা করলেই যে আমি উলটে সবাইকে ভজনা করব, এমনটি নয়। তাহলে প্রশ্ন ওঠে—তবে তো তুমি সেই তৃতীয় বর্গের মধ্যেই পড়ে—হয় তুমি আত্মারাম, পূর্ণকাম, নয় তো অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী। কৃষ্ণের বক্তব্য—না ঠিক তা নয়। এ ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। এখানে দু-রকমের মানুষ আছে। এক, আমাকে প্রার্থনা করে, আমাকে চায়, তবু আমার জন্য এঁদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ প্রেম জাগ্রত হয়নি। এরা বার বার আমাকে পাবার জন্য চেষ্টা করে, উদ্যম নেয়। কিন্তু তবু আমি সম্পূর্ণ ধরা দিই না। কেন দিই না জান? এইভাবেই আমি তাদের তৃষ্ণা বাড়িয়ে তুলি। নিজের পরে তাদের রাগ হয়, ধিক্কার আসে আমাকে পায়নি বলে।

ভজনা করলেও কৃষ্ণ যাঁদের সর্বদা প্রার্থনা পূরণ করেন না, তাঁদের আরও একটি গণ হলেন

যাঁরা জাতপ্রেম অর্থাৎ কৃষ্ণের ওপরে যাঁদের প্রেম জন্মে গেছে। কৃষ্ণ বলছেন— জাতপ্রেম ব্যক্তিদেরও আমি যে সব সময় ভজনা করি না তারও কারণ আছে। মাঝে মাঝে তাদের কাছে ধরা দিয়েও যে অধরা থাকি, দেখা দিয়েও যে পালিয়ে যাই, সেখানেও কারণ একটাই— সেখানেও তাদের প্রেমটাই বাড়িয়ে তুলি। নির্ধন মানুষের ধননাশ ঘটলে সে যে রকম সেই নষ্টধনের চিন্তায় সদা-সর্বদা ব্যাপৃত থাকে, এটা তেমনই আমাকে না পেলে শুধু আমারই চিন্তা করে।

এই শেষ কল্পের মধ্যে বুঝি গোপীরা পড়েন। কৃষ্ণের ইঙ্গিতটা এমনই ছিল যেন। যেন—এই জাতপ্রেম ব্যক্তিদের প্রার্থিত ভালোবাসা আমি খুব প্রকটভাবে পূরণ করি না বটে, কিন্তু পরোক্ষভাবে আমি তাদের চাই। অর্থাৎ তিনিও এই সর্বশেষ কল্পের অন্তর্ভুক্ত। কৃষ্ণের এই জাতপ্রেম ব্যক্তি মাত্রেরই ব্রজভূমির গোপীজনের সঙ্গে একটা যেন তুলনা চলে। কিন্তু এবার নিজের মুখেই সেই তুলনা নস্যাৎ করছেন তিনি। বোঝাতে চাইছেন যে, এতক্ষণ কথায় কথায় যত বর্গীকরণ চলেছে, তার কোনোটির মধ্যে অন্তত গোপীকুলকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কৃষ্ণ এবার হার মেনে বলেছেন—আমার জন্য তোমরা লোকধর্ম সব ত্যাগ করে আত্মীয় বন্ধুর মোহে জলাঞ্জলি দিয়ে আমারই কাছে এসেছ। আমি যে তোমাদের ছেড়ে গিয়েছিলাম তাতে একদিকে যেমন আমাকে পাবার জন্য তোমাদের অনুরাগ আরও বেড়েছে, তেমনই আমারও এতে স্বার্থ আছে। আমি তোমাদের আড়ালে থেকে তোমাদের প্রেমালাপ শুনেছিলাম, আমার জন্য তোমাদের আকুতিটুকুও অনুভব—উপভোগ করছিলাম। তোমাদের প্রিয়জন ভেবে আমার এই অন্যায় তোমরা ক্ষমা করবে—

ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং/
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ।

দোষ স্বীকার করে এবার গোপীদের সেই বর্গীকরণের কথায় কৃষ্ণ আসলে কোন দলে পড়েন, তার শেষ জবাব দিচ্ছেন। বলছেন— তোমাদের প্রেমের কাছে আমি হেরে গেছি। কুলশীল-মানের সমস্ত বাঁধন আলগা করে দিয়ে আজ যেভাবে তোমরা আমার কাছে এসেছ, তাতে আমি হার মেনেছি তোমাদের কাছে। আমি যদি দেবতাদের মতো সুরলোকের পরমায়ু নিয়েও এই জগতে থাকি, তবুও তোমাদের এই অসাধারণ ভালোবাসার দায়, আমি শোধ করতে পারব না। তোমাদের মতো ভালবাসার ক্ষমতা বোধহয় আমারও নেই। আমি হার মেনেছি তোমাদের কাছে—

ন পারয়ে'হং নিরবদ্যসংযুজাং/
স্বসাধু কৃত্যঃ বিধুবায়ুষাপি বঃ।

স্বয়ং ভগবানের হার মানাতেই গোপীপ্রেমের মাহাত্ম্য, সেই মাহাত্ম্যেই তাঁরা জগতে প্রসিদ্ধ হলেন এবং এই পর্যায়েই আমরা রাস বর্ণনায় ইতি টেনে আবার কৃষ্ণ জীবনের মূল স্রোতে ফিরে যাব। মহাভারত সূত্রধার কৃষ্ণের প্রথম জীবনের গোপীপ্রেম নিয়ে শতসহস্র বছর ধরে যে আলোচনায়, বিশ্লেষণ চলছে, সেই গোপীপ্রেমের পৌরাণিক বিবরণটুকু উদ্ধার না করলে কৃষ্ণ জীবনকথা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। কিন্তু এ বিষয়ে রসতাত্ত্বিক, বৈষ্ণব দার্শনিকদের আলাপ আলোচনার গভীরে আমরা যাব না।

*[হরিবংশ পু. ২.২০.১৫-৩৫;
ভাগবত পু. ১০.২৯-৩৩ অধ্যায়;
বিষ্ণু পু. ৫.১৩ অধ্যায়]*

□ হরিবংশ পুরাণে দেখা যাচ্ছে শারদপূর্ণিমায় হল্লীসক উৎসবের মাঝে সামান্য বাধা সৃষ্টি হয়েছিল। এই বাধার নাম অরিষ্টাসুর। তার আকৃতি ষাঁড়ের মতো। কংসের কৃষ্ণ হত্যার নানাবিধ প্রয়াসেরই একটি অঙ্গ এই অরিষ্টাসুর। কৃষ্ণ তাঁকে বধ করেছেন তারপর আবার ফিরে এসে যোগ দিয়েছেন রাস নৃত্যে।

*[হরিবংশ পু. ২.২১ অধ্যায়; বিষ্ণু পু. ৫.১৪
অধ্যায়; ব্রহ্ম পু. ১৮৯ অধ্যায়]*

□ ভাগবত পুরাণে রাসের বর্ণনা এতটাই স্বতন্ত্র যে সেখানে রাসমণ্ডলের মাঝে কোনো কংসপ্রেরিত অরিষ্টাসুরকে এনে ফেলে ভাগবতের কবি রসভঙ্গ করেননি। উপরন্তু রাসনৃত্যের আগে পরে ভাগবত পুরাণে আরও দু-একটি ছোটো ঘটনার উল্লেখ আছে যা হরিবংশে উল্লিখিত হয়নি। রাসবর্ণনার কিছু আগে দেখা যাচ্ছে একবার নন্দ রাজা রাত্রিবেলায় যমুনায় স্নান করতে গিয়েছিলেন, জলাধিপতি বরুণের সেবক এক অসুর তাঁকে বরুণলোকে টেনে নিয়ে গেল।

বস্তুত কৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শনলাভের আশাতেই বরুণের এই উদ্যোগ। কৃষ্ণ নন্দবাবাকে উদ্ধার করতে বরুণলোকে গিয়েছেন এবং বরুণের পূজাগ্রহণ করে আবার নন্দ-রাজাকে নিয়ে ফিরে এসেছেন বৃন্দাবনে। *[ভাগবত পু. ১০.২৮.১-১৭]*

□ রাসনৃত্যের ঘটনার কিছুদিন পরে কৃষ্ণের দ্বারা সুদর্শন এবং শঙ্খচূড়ের উদ্ধার বর্ণিত হয়েছে। ঘটনা দুটি সংক্ষেপে এই— সেদিন শিবরাত্রি ছিল। সরস্বতীনদীর তীরে অম্বিকাবনে বৃন্দাবনবাসীরা মহাসমারোহে শিবরাত্রিব্রত পালন করেছিলেন। সেই বনে বাস করত এক বিশাল অজগর। ব্রত উপবাসে পরিশ্রান্ত নিদ্রিত নন্দরাজাকে রাতের অন্ধকারে সেই অজগর পেঁচিয়ে ধরল। ব্রজবাসীরা অনেক চেষ্টাতেও তাঁকে ছাড়াতে পারলেন না। নন্দবাবার আর্ত চীৎকার শুনে শেষ পর্যন্ত ছুটে এলেন কৃষ্ণ এবং সেই অজগরকে পদাঘাত করলেন। পদাঘাত করামাত্র অজগর ভস্মীভূত হল আর পরিবর্তে এসে দাঁড়াল সুদর্শন নামক গন্ধর্ব। অঙ্গিরার বংশজাত কোনো এক কুদর্শন ঋষিকে উপহাস করায় সুদর্শন ঋষির অভিশাপে অজগরে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। আজ কৃষ্ণের পদস্পর্শে তাঁর শাপমুক্তি হল।

অন্য আর একদিনের ঘটনা-কৃষ্ণ বলরাম তাঁদের প্রিয়তমা গোপীদের নিয়ে বৃন্দাবনে বিহার করছেন, এমন সময় কুবেরের অনুচর শঙ্খচূড় নামক যক্ষ সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং গোপীদের হরণ করে নিয়ে চলল। কৃষ্ণ শঙ্খচূড়ের হাত থেকে গোপীদের উদ্ধার তো করলেনই, শঙ্খচূড়কেও বধ করলেন। যক্ষ শঙ্খচূড়ের মাথায় একটি বহুমূল্য মণি ছিল। শঙ্খচূড়কে বধ করে সেই মণি কৃষ্ণ দাদা বলরামকে উপহার দিলেন। ভাগবতপুরাণে এরপর কংসপ্রেরিত অরিষ্টাসুরের ব্রজে আগমন এবং কৃষ্ণের হাতে মৃত্যুর উল্লেখ মেলে।

[ভাগবত পু. ১০.৩৪.১-৩২; ১০.৩৬.১-১৫]

□ হরিবংশ পুরাণে দেখা যাচ্ছে, দূত মারফত অরিষ্টাসুর বধের সংবাদ পেয়ে কংস ভয়ংকর ক্ষুব্ধ হলেন। মনে মনে একটু ভয়ও পেলেন। যেদিন থেকে কংস টের পেয়েছেন যে, বসুদেবের পুত্রটি নন্দগোপের গৃহে সুরক্ষিত আছে, সেদিন থেকেই কংস তাঁকে গুপ্তহত্যা করার চেষ্টা করেছেন। আমরা জানিয়েছি, পূতনাবধ আর শকট ভঞ্জনের ঘটনায় শিশু কৃষ্ণের মধ্যে দৈবভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করেই কংস এঁকে দেবকীপুত্র বলে চিনেছিলেন। কৃষ্ণের জীবনের ঘটনাপ্রবাহে দেখেছি, কৃষ্ণের নামকরণ উপলক্ষ্যেই হোক বা বসুদেব-নন্দের কথোপকথনে—মথুরা কিংবা ব্রজভূমির মাটিতেই কৃষ্ণের জন্ম রহস্য নিয়ে কানাকানি হয়েছে যথেষ্ট, ব্রজভূমির বৃদ্ধরা তো প্রায় নিঃসংশয়ে চিনেছেন যে ইনি দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান। সুতরাং কংসও জেনেছেন। আর জেনেছেন বলেই বকাসুর, অঘাসুর, ধেনুকাসুর, প্রলম্ব, অরিষ্টাসুরকে দিয়ে কৃষ্ণকে হত্যা করাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সফল হননি একবারও, উলটে কৃষ্ণের মতো এতটুকু বালকের হাতে এতগুলি অসুরের বধ সংবাদ, কালিয়দমন বা গোবর্ধন ধারণের মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিত্ব, পরাক্রম সর্বোপরি ভগবত্তার প্রতিষ্ঠা কংসের মনে নিদারুণ ভয় জাগিয়ে তুলেছে। এ ভয় দৈববাণী সত্য হওয়ার ভয়, মৃত্যু ভয়।

ভাগবত পুরাণে দেখা যাচ্ছে, ক্ষুব্ধ, ভীত-সন্ত্রস্ত কংসের কাছে অরিষ্টাসুর বধের খবর নিয়ে এসে পৌঁছেছেন নারদ। নারদ বললেন—কংস! যে অলৌকিক শিশুকন্যা তোমার হাত থেকে আকাশে উঠে গিয়েছিল, সে ছিল যশোদার কন্যা। আর ব্রজভূমিতে নন্দ-যশোমতীর পুত্র পরিচয়ে যিনি ব্রজভূমিতে বড়ো হয়েছেন। তিনি দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান, তাঁর সহচর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরাম বসুদেবের ঔরসে রোহিণীর গর্ভজাত পুত্র। আর তুমি কৃষ্ণকে মারবার জন্য যতগুলি অসুরকে পাঠিয়েছিলে, তারা সকলেই কৃষ্ণের হাতে প্রাণ দিয়েছে। নারদ যা বললেন, কংস তা জানেন। এখন একেবারে স্পষ্টাক্ষরে জানলেন। ভাগবত পুরাণে নারদের এই আগমন এবং কথাবার্তাগুলি কংসের ওপর মানসিক চাপ তৈরি করার চেষ্টা বলে মনে হয়। যে ব্যক্তি আগে থেকেই ভীত হয়ে আছে তার কানের কাছে তার ভয়ের কথাগুলিই আবার শোনালে সে ব্যক্তি দিশেহারা হয়ে উলটো পালটা কাজ করে। কিন্তু তাতে ফল কিছু হয় না, বরং তার বিনাশের উদ্দেশে যাত্রাপথ প্রশস্ত হয়। কংসের প্রতিক্রিয়াও তেমনটিই হল। ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে—নারদের কথা শুনে কংসের প্রথমেই মনে হল বসুদেবকেই বধ করা উচিত। তারপর

নারদের নিষেধ শুনেই হোক বা কাজটা বোকামি হবে ভেবেই হোক—কংস নিরস্ত হলেন। কিন্তু বসুদেব দেবকীর প্রতি তাঁর মনে এমনই এক লাগামছাড়া ক্রোধ জন্ম নিল, যে তিনি লোক পাঠিয়ে বসুদেব দেবকীকে বন্দি করে নিয়ে এসে শিকল পড়িয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন।

[ভাগবত পু. ১০.৩৭.১৬-২০]

□ হরিবংশের কংস কিন্তু ক্রোধ ভয় কোনোটাই প্রকাশ করছেন না। কৃষ্ণকে বধ করতে তিনি মরিয়া কিন্তু আচরণটি পাকা রাজনীতিবিদের মতোই। অরিষ্টাসুরবধের খবর পেয়ে সেই মধ্যরাত্রেই যদু-বৃষ্ণি সংঘের জরুরি সভা ডেকেছেন কংস। কংসের দূত সংঘমুখ্যদের প্রায় ঘুম থেকে তুলে উপস্থিতি করেছেন সভায়।

মথুরার সংঘরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় রাজা একটা পদবী মাত্র। সংঘমুখ্যরা অনেকেই রাজোপাধি ব্যবহার করতেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজনকে সংঘরাষ্ট্রের নায়ক বা রাজা হিসেবে নির্বাচন করা হত। সংঘরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বসুদেবের পিতা শূরসেন, কংসের পিতামহ এবং পিতা আহুক এবং উগ্রসেন সেই পদ্ধতিতেই রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু জরাসন্ধের বলে বলীয়ান কংসের হাতে রাজার ক্ষমতা সেভাবে আসেনি। তিনি ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছেন বাহুবলে। রাজ্যশাসনও করতেন একনায়কের মতো। ফলে সংঘমুখ্যরা কংসের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। এই বিরোধিতার প্রধান মুখ হয়তো বসুদেব এবং অবশ্যই কংসপিতা উগ্রসেন। ফলে তাঁদের নজরবন্দি না রেখে কংসের উপায় ছিল না। তবুও তলে তলে সংঘমুখ্যরা একত্র হচ্ছিলেন এবং কংসের অত্যাচার যতো বেড়ে চলেছিল, ততোই এঁরা পরিত্রাণের উপায় খুঁজেছেন। মহাভারতের সভাপর্বে স্বয়ং কৃষ্ণের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যাচ্ছে যে, ব্রজভূমিকে কংসের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য যদু-বৃষ্ণিদের আঠারটি কুল একত্রিত হয়ে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়েছিলেন—

ভোজরাজস্য বৃদ্ধৈস্তু পীড্যমানৈর্দুরাত্মনা।
জ্ঞাতিতাণমভীপ্সদ্ভিরস্মৎসম্ভাবনা কৃতা॥

হরিবংশ পুরাণে রাত্রিবেলার সেই সভায় সংঘমুখ্যদের কথাবার্তায় কংসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তবে লক্ষণীয়, ভাগবত পুরাণের মতো বসুদেবকে কারাগৃহে নিক্ষেপ করার উল্লেখ হরিবংশে নেই। বসুদেব, এমনকী কংসপিতা উগ্রসেনও সেই সভায় উপস্থিত আছেন। বসুদেব বা উগ্রসেনকে সাধারণ বন্দির মতো কারাগারে নিক্ষেপ করে সমগ্র বৃষ্ণিসংঘকে প্রকাশ্যে নিজের বিরুদ্ধে চালনা করবেন, এত বড়ো রাজনৈতিক মূর্খ কংস নন। যাই হোক, অরিষ্টাসুর বধের খবর শুনে ক্ষুব্ধ ভীত কংস আজ যে সভা ডেকেছেন, সেখানে তিনি মূলত বসুদেবকে দোষারোপ করে তাঁর ওপর রাজনৈতিক চাপ এবং মানসিক চাপ তৈরি করতে চাইছেন। কংসের বক্তব্যের ধরনটা এমনই যেন যদু-বৃষ্ণি সংঘের বা মথুরা-শূরসেন অঞ্চলের যা কিছু ক্ষতি হচ্ছে, তার মূলে রয়েছেন বসুদেব। বসুদেবের ওপর ঘুরিয়ে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনছেন কংস, কথাগুলি এমনভাবে সাজাচ্ছেন, যাতে অন্যান্য সংঘমুখ্যদেরও বসুদেবের বিরুদ্ধেই ক্ষেপিয়ে তোলা যায়। কিন্তু কংস আঁচ করতে পারেননি, তাঁর অগোচরেই মথুরায় রাজনৈতিক আবহাওয়ায় পরিবর্তন এসেছে অনেকখানি। কংসের অভিযোগের উত্তরে কিন্তু বসুদেব কোনো কথা বললেন না, কথা বললেন অন্ধকবংশীয় অন্য একজন প্রবীণ সংঘমুখ্য। হরিবংশ পুরাণ তাঁর নাম উল্লেখ করেনি। একটি একটি করে কংসের যাবতীয় দুষ্কর্মের যে খতিয়ান এই বৃদ্ধ তুলে ধরলেন এবং সভায় উপস্থিত সকলের তাঁর প্রতি যে প্রচ্ছন্ন সমর্থনের ইঙ্গিত পাওয়া গেল তাতে কংস ভয় পেলেন। উপরন্তু বসুদেব তাঁর পুত্রদের বৃন্দাবনে লুকিয়ে রেখেছেন বলে কংস যে অভিযোগ করেছিলেন, কংসের অত্যাচারের বিশ্লেষণের ফলে তা উলটে সভাশুদ্ধ লোকের মনে বসুদেবের প্রতিই সহানুভূতির জন্ম দিল। অন্ধক বৃদ্ধ স্পষ্ট ভাষাতেই বললেন বসুদেব-দেবকীর ছয়টি ছেলের নির্মম হত্যার কথা এবং তারপর রীতিমতো যুক্তি সাজিয়ে বললেন— পুত্রের প্রাণ রক্ষা করা পিতার কর্তব্য। তোমার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বসুদেব যদি নিজের পুত্রদের অন্যত্র রেখে এসেই থাকেন, তাতে দোষের তো কিছু নেই—

পুত্রার্থে হ্যাপদঃ কষ্টাঃ পিতরঃ প্রাপ্নুবন্তি হি॥
ছাদিতো বসুদেবেন যদি পুত্রঃ শিশুস্তদা।
মন্যসে যদ্যকর্তব্যং তৎপৃচ্ছ পিতরং স্বকম্॥

উপরন্তু বসুদেবের সেই পুত্রটিকেও হত্যা

করার কতরকম চেষ্টা কংস করেছেন, অন্ধক বৃদ্ধ সভার সকলকে সেটাও স্মরণ করাতে ভুললেন না।

কংস বুঝলেন—বসুদেব, কৃষ্ণ—এদের পক্ষে জনসমর্থন এখন এতটাই বেশি যে তিনি নিজেই সিংহাসনচ্যুত হতে পারেন। অতএব অবিলম্বে কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য তিনি একটা নতুন ষড়যন্ত্র করলেন। আর কাউকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে নয়, মথুরায় নিজের চোখের সামনে কংস কৃষ্ণ-বলরামকে হত্যা করতে চান। তিনি ঠিক করলেন—মথুরার রাজপুরীতে ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন করবেন। যজ্ঞ ব্যাপারটা এখানে নিতান্তই গৌণ, আসলে যেটা হবে, সেটা হল—একটা প্রতিযোগিতার আসর যেখানে ধনুর্ধারী যোদ্ধারা পরস্পর বাণযুদ্ধের প্রতিযোগিতা করবেন; মল্লযোদ্ধারা করবেন মল্লযুদ্ধের প্রতিযোগিতা। কংসের অধীনে দুর্দান্ত মল্লযোদ্ধা এবং ধানুষ্ক দুইই ছিলেন। কংসের উদ্দেশ্য ছিল—প্রতিযোগিতার ছল করে কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় নিয়ে এসে চোখের সামনে তাঁদের নিশ্চিতভাবে মল্ল বা ধানুষ্কদের দিয়ে মেরে ফেলা।

কংস তাঁর সেই সভায় সমবেত সংঘমুখ্যদের সামনে অক্রূরকে ডেকে বললেন—আমার আদেশে তুমি ব্রজভূমি বৃন্দাবনে যাবে। তুমি তো জান—ব্রজভূমিতে নন্দ নামে যে গোপপতি আছে, সেই আমাকে বার্ষিক কর দিতে আসে। বার্ষিক কর এখনও বাকি পড়ে আছে। অতএব সে যেন আমার প্রাপ্য কর নিয়ে মথুরায় আসে—

বাচ্যশ্চ নন্দগোপো বৈ করমাদায় বার্ষিকম্।

আর নন্দগোপ যখন কর দিতে আসবেই, তখন সেই সঙ্গে তার দুই ছেলে কৃষ্ণ-বলরাম এবং অন্যান্য গোপেরা, যারা আমাকে কর দিতে চায়, তাদের সবাইকে নিয়ে তুমি ব্রজ থেকে মথুরায় আসবে। সকলের সামনে কংস মুখে এমন একটা ভাব দেখালেন যেন তাঁর মনে পাপ বলে কিছু নেই। আর ব্রজভূমি থেকে কর আদায়ের ব্যাপারটা বাহ্যত কোনো ছলনাও নয়। কারণ সেই আমলে ব্রজভূমি থেকে কর আদায় করাটা রাজকর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কংসের বক্তব্য—সেই কর দিতেই যখন নন্দরাজ আসবেন, তখন যেন তাঁর পুত্রোপম কৃষ্ণ-বলরামও মথুরায় একবার আসে। কংস এই দুই কুমারের বলবীর্যের কথা শুনেছেন। তিনি শুনেছেন—কৃষ্ণ-বলরাম দুই ভাইই ভালোরকম মল্লযুদ্ধ জানে। অতএব রঙ্গমঞ্চে প্রতিযোগিতার আসরে কংস মথুরাপুরীর দুই প্রধান মল্লবীরকে উপস্থিত রাখবেন, কৃষ্ণ-বলরাম এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিলে রঙ্গ বেশ জমে উঠবে—কংস শুধু এইটুকুই চান—

তাভ্যাং সহ নিয়োৎস্যেতে তৌ যুদ্ধকুশলাবুভৌ।

এই কপট নিমন্ত্রণে কংস আরও কপটতা জুড়ে দিয়ে বললেন—এই কৃষ্ণ-বলরাম আমার খুড়তুতো বোনের ছেলে। তারা ব্রজে-বনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এই বা কেমন। আমারও ইচ্ছে হয় তাদের দেখতে। অক্রূর তুমি আমার আদেশ জানিয়ে তাদের বলবে যে—মহারাজ কংস সপার্ষদ সপুরোহিত কৃষ্ণ এবং সঙ্কর্ষণ বলরামকে সচক্ষে দেখতে চান—

দ্রষ্টুমিচ্ছতি বৈ কংসঃ সভৃত্যঃ সপুরোহিতঃ।

[হরিবংশ পু. ২.২২-২৩ অধ্যায়]

□ ভাগবত পুরাণে দেখা যাচ্ছে, অক্রূরকে বৃন্দাবনে পাঠাবার আগে কংস নিজের ষড়যন্ত্রের কথা বেশ পরিষ্কারভাবেই জানাচ্ছেন। কৃষ্ণকে মথুরায় ডেকে এনে কী উপায়ে তাকে হত্যা করা হবে সেকথা সবিস্তারেই জানাচ্ছেন অক্রূরকে। যাইহোক, অক্রূরকে কংস নিজের প্রতি অনুগত সংঘমুখ্য বলেই মনে করেন আর সেই জন্যই কৃষ্ণ-বলরামকে ভুলিয়ে মথুরায় আনার গুরুদায়িত্ব তিনি ভরসা করে অক্রূরকে দিয়েছেন। কংসের আদেশমতো কৃষ্ণকে আনতে অক্রূর গেলেন মথুরায়। এদিকে কংসও কিন্তু বসে রইলেন না। কৃষ্ণের মথুরায় আসা, ধনুর্যজ্ঞের আয়োজনের মাঝে কৃষ্ণকে ব্রজভূমিতেই হত্যা করাবার আর একটা চেষ্টা তিনি করতে চান। নিজের অনুগত কেশী নামক দানবকে কংস এই কাজের ভার দিলেন।

*[ভাগবত পু. ১০.৩৬.১৯-৪০;
হরিবংশ পু. ১০২৪.৫]*

□ কেশী দানবের চেহারাটা ঘোড়ার মতো, পাগলা ঘোড়ার মতো সে ব্রজভূমি দাপিয়ে বেড়ায়, তার অত্যাচারে ব্রজবাসীরা, এমনকী ব্রজরমণীরাও অতিষ্ঠ হয়ে হাহাকার করতে লাগলেন। তারপর কেশীদানবের সঙ্গে কৃষ্ণের তুমুল যুদ্ধ হল এবং অবশেষে কেশীদানব মারা

পড়লেন কৃষ্ণের হাতে। ভাগবত পুরাণ এবং হরিবংশ—দুই পুরাণেই এই পর্যায়ে কৃষ্ণের সম্মুখে নারদের আবির্ভাব এবং পরমেশ্বর স্বরূপ কৃষ্ণের স্তবস্তুতি বর্ণিত হয়েছে। এবং সেই স্তবের মধ্যে কৃষ্ণের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ব্যস্ততারও একটা আভাস মেলে। মোটামুটি জীবনের এই পর্যায়ে কংসবধের সামান্য কিছুদিন আগে সংঘটিত এই ঘটনাকে কৃষ্ণের ব্রজলীলার অন্তিম পর্যায় বলা যায়। নারদের এই স্তবস্তুতি তাঁর ব্রজে বিচরণ থেকে রাজনৈতিক উত্থানের সূচনা করে।

[দ্র. কেশী২]

[ভাগবত পু. ১০.৩৭.১-২৫; হরিবংশ পু. ২.২৪.৫-৭৬]

□ কৃষ্ণের জীবনের বাল্যলীলার অন্তিম পর্যায়ে নারদকৃত স্তবের মধ্যে হরিবংশ পুরাণ একটি অসামান্য সংবাদ দিয়েছে। পরবর্তী জীবনে মহাভারত এবং পুরাণগুলিতে বহুবার আমরা কৃষ্ণকে কেশব নামে সম্বোধিত হতে দেখেছি। হরিবংশ জানাচ্ছে যে কেশী বধের পর কৃষ্ণের স্তব করতে গিয়ে নারদই তাঁর 'কেশব' নামকরণ করলেন—

যস্মাত্ত্বয়া হতঃ কেশী তস্মান্মচ্ছাসনংশৃণু।
কেশবো নাম নাম্না ত্বং খ্যাতো
লোকে ভবিষ্যসি॥

[হরিবংশ পু. ২.২৪.৬৫]

□ ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণের ব্রজলীলার এই অন্তিম পর্যায়ে কৃষ্ণের হাতে জনৈক ব্যোমাসুরের বধের সংবাদ পাওয়া যায়। *[দ্র. ব্যোমাসুর]*

[ভাগবত পু. ১০.৩৭.২৫-৩৪]

□ তারপর যথাসময়ে অক্রূর এসে পৌঁছালেন বৃন্দাবনে। অক্রূর যেভাবে কংসের ধনুর্যজ্ঞে কৃষ্ণ-বলরাম সহ সমস্ত গোপপ্রধানদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তাতে কংসের আশয়টুকু পরিষ্কার ধরা পড়েছিল। কোনো মহদাশয় নিয়ে কংস যে এই আয়োজন করছেন না এবং সেখানে গিয়ে কংসের সম্মুখে তাঁর যুদ্ধেরও অতিথি হতে হবে—সেটা পরিষ্কার জানালেন অক্রূর। কৃষ্ণ-বলরাম মথুরা যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। প্রস্তুত হলেন নন্দ এবং অন্যান্য গোপপ্রধানরাও। কংসের জন্য বার্ষিক কর নিয়ে তো এঁরা যাবেনই। কিন্তু তার থেকেও বড়ো কথা, এঁরা কৃষ্ণের দেহরক্ষী হয়ে চললেন। গোপপল্লীর এই মানুষগুলির জীবিকা মূলত পশুপালন হলেও এঁরা অস্ত্রশিক্ষায় এবং মল্লযুদ্ধে যে অসামান্য দক্ষ ছিলেন তা জানা যায়। কৃষ্ণ-বলরামও সেই সুবাদে বাল্যকাল থেকেই মল্লযুদ্ধে, গদাযুদ্ধে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। কংস প্রেরিত অতগুলি অসুরবধের ঘটনা থেকেই কৃষ্ণের অসামান্য শারীরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এবং এঁদের যুদ্ধের কলাকৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন যে গোপপল্লীর যোদ্ধারা, তাঁরাও যে অসামান্য যোদ্ধা ছিলেন তা বলা বাহুল্য। এই গোপজনজাতি অনেক সময় যুদ্ধে ভাড়াটে সৈনিকের ভূমিকাও পালন করত বলে জানা যায় এবং সেনা হিসেবে এরা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। পরবর্তী সময়ে সম্ভবত এঁদের একত্র করেই কৃষ্ণ তাঁর 'নারায়ণী সেনা' নির্মাণ করেন, যা সে যুগে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী হিসেবে পরিচিত হয়।

[দ্র. গোপ]

যাইহোক, এই গোপযোদ্ধা পরিবৃত হয়ে কৃষ্ণ-বলরাম অক্রূরের সঙ্গে মথুরায় চললেন।

কৃষ্ণ যেদিন নন্দ-যশোমতীর ঘর শূন্য করে, ব্রজভূমি ছেড়ে মথুরায় চললেন, সেই সকালে চাঁদের মধুর প্রভা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে তার রূপ-মাধুর্য্য নষ্ট করে দিল, আর সূর্য তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে দীপ্তিময় হয়ে দেখা দিল আকাশ ব্যাপ্ত করে—

একো নাশয়তে রূপমেকো বর্ধয়তে বপুঃ।

প্রকৃতির এই পরিবর্তনের মধ্যে কৃষ্ণের জীবনেরও মিল আছে যেন। ব্রজ-বৃন্দাবনের গ্রাম্য সরলা আহিরিণীদের প্রেম, যশোমতীর স্নেহ, শ্রীদাম-সুদাম-সুবল-সখার বন্ধুত্ব—সব কিছুর মধ্যেই চাঁদের স্নিগ্ধ কোমল মাধুর্য্য মেশানো ছিল। সেই মধুর রসের নিবেদন প্রভাহীন হয়ে পড়ল অক্রূরের আগমনে। তার স্থলাভিষিক্ত হল বীররস। এই মথুরা-গমন থেকেই কৃষ্ণের প্রকাশ ঘটবে সূর্যের ভাস্বরতায়। বৃন্দাবনের একান্ত ভূমিতে যে মধুর রসের নায়কটি ছিলেন, তিনি এই মথুরাগমনের পথ ধরেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতের অবিসংবাদিত নায়কে রূপান্তরিত হবেন।

হরিবংশের কবি যশোমতী, নন্দ, কৃষ্ণের বাল্যসখা বা ব্রজললনাদের বিরহের উল্লেখ করেননি। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ কিংবা ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণের মথুরা প্রয়াণে ব্রজবাসীদের বিরহের

মর্মবিদারিণী বর্ণনা আছে। ভাগবত পুরাণে যা দেখেছি—তাতে এই মথুরা-প্রয়াণের দিনে গোপীদের লজ্জা বলে আর কিছু রইল না। যে প্রেম এতদিন চৌর্য্য-মিলনের মাধুর্য্যে আত্মীয়-স্বজন-গুরুকুলের কাছে অস্পষ্ট, অনবধার্য্য ছিল, আজ তা একেবারে নির্লজ্জভাবে প্রকট হয়ে উঠল সবার সামনে। তাঁদের ক্রন্দন-ধ্বনি ব্রজভূমির আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল বিরহাতুর প্রিয়-সম্বোধনে—প্রিয় আমার! গোবিন্দ আমার! দামোদর আমার! মাধব আমার! ফিরে এস—

বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং/
গোবিন্দ দামোদর-মাধবেতি।

কৃষ্ণের বিরুদ্ধবাদী অথবা গোপীকুলের পক্ষপাতী জনেরা অভিযোগ তুলে বলেছেন—কৃষ্ণের হৃদয়ে দয়া-মায়া প্রেম বলে কিছু নেই। নইলে অমন বিরহার্তি শুনেও কেউ রথ থেকে নামে না, একবারও ফিরে এসে জনে জনে বলে না—দরকার নেই আমার কংসবধের প্রতিজ্ঞায়। আমি রইলুম এখানে। আমরা জানি—কৃষ্ণের আর ফেরবার উপায় ছিল না। তিনি ভবিষ্যতে মহাভারতের 'সূত্রধার' হবেন 'গোপীশত-কেলিকার'-এর ভূমিকা থেকে। গোপীদের আকুল ক্রন্দন শুনে কৃষ্ণ যদি সেদিন নেমে আসতেন অক্রূরের রথ থেকে, আবারও মিলিত হতেন বিরহাকুল গোপিনীদের সঙ্গে তাহলে একদিকে মহাভারত মহাকাব্যখানিও অঙ্গহীন হয়ে যেত। অন্যদিকে বৃন্দাবনের নান্দনিক প্রেমের ঔজ্জ্বল্য দৈনন্দিনতার গড্ডালিকায় বদ্ধ পানাপুকুর হয়ে যেত।

কৃষ্ণ রথ থেকে নামেননি। শুধু বিশ্বস্ত দূতমুখে বারবার তাঁদের জানিয়েছেন—আমি তোমাদের ভালোবাসি, আমি আবারও ফিরে আসব—

সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈ রায়াস্যে ইতি দৌত্যকৈঃ।

অক্রূরের রথ চলে গেল ব্রজভূমির মধুর-রসের পথে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যবাদের ধুলো উড়িয়ে দিয়ে। ব্রজরমণীরা কত দূর পর্যন্ত সেই রথের পিছন পিছন গেলেন—যতক্ষণ পর্যন্ত সেই রথের ধ্বজা দেখা গেল, যতদূর রথচক্রের ধূলির আভাসে কৃষ্ণের আভাস ছিল, ততক্ষণ, ততদূর পর্যন্ত গোপীরা পথে চললেন, মনে মনে অনুগমন করলেন কৃষ্ণের পথেই—

যাবদালক্ষ্যতে কেতুর্যাবদ্‌রেণু-রথস্য চ।

বিষ্ণুপুরাণে এই বর্ণনাটা অনেক ক্রুড্'। সেখানে এক গোপী আর এক গোপীকে বলছেন—ওই দেখ! কৃষ্ণের রথের ধুলো উড়ছে। এই ধুলোর জন্যই কৃষ্ণকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ওই দেখ! সেই ধুলোও আর দেখা যাচ্ছে না। বিষ্ণুপুরাণ শেষ মন্তব্য শোনাল—এইভাবে গোপিনীকুলের সানুরাগ, সোৎকণ্ঠ নেত্রান্বেষণের মধ্যে দিয়েই কৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে ব্রজমণ্ডল বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেলেন—

ইত্যেবমতিহার্দেন গোপীজননিরীক্ষিতঃ।
তত্যাজ ব্রজভূভাগং সহ রামেণ কেশবঃ।

[হরিবংশ পু. ২.২৫ অধ্যায়; ২.২৬.১-৩৯;
ভাগবত পু. ১০.৩৮-৩৯ অধ্যায়;
বিষ্ণু পু. ৫.১৮.১৩-৩২]

□ অক্রূর রথে চড়ে কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে চলেছেন, এই সময়ে সবকটি পুরাণেই একটি অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। রথ চলেছে মথুরার পথে, সামনেই প্রবাহিনী যমুনা। অক্রূরের বড়ো ইচ্ছা হল—একবার যমুনায় ডুব দিয়ে স্নান-আহ্নিক করার। সেই ইচ্ছাতেই তিনি কৃষ্ণ বলরামকে বললেন—রথ থামিয়ে রেখে কিছুক্ষণের জন্য অশ্বগুলিকে যথাসম্ভব সংযত রাখার চেষ্টা কর। একটু ঘাস, একটু দানা-পানি খাওয়াও ঘোড়াদের, আমি এই আসছি যমুনার জলে ডুব দিয়ে; নাগরাজ অনন্ত-বাসুকির উদ্দেশে একটু মন্ত্রোচ্চারণ করে, এই আমি আসছি। কৃষ্ণ-বলরামের সম্মতি নিয়ে অক্রূর যমুনার জলে নামলেন। কিন্তু জলে ডুব দিয়ে প্রভু অনন্ত নাগের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে তিনি দেখলেন এক অলৌকিক দৃশ্য। অক্রূর দেখলেন—কৃষ্ণজ্যেষ্ঠ বলরাম সহস্রফণামণ্ডিত শেষনাগের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন এবং সেই শেষ নাগের কুণ্ডলীনির্মিত আসনে বসে আছেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণের রূপও সেখানে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত। ভগবান বিষ্ণু-নারায়ণের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে গেছেন। সিদ্ধ-চারণ, মুনি-ঋষিরা কৃষ্ণের স্তব করেছেন, যোগীরা নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এক ধ্যানে কৃষ্ণেরই মূর্তি ভাবনা করছেন।

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে অক্রূর হতচকিত হয়ে ভাবলেন—এ কেমন হল? এইমাত্র তিনি কৃষ্ণ-বলরামকে রথে রেখে যমুনায় ডুব দিয়েছেন অথচ এখানে তিনি কৃষ্ণ-বলরামকে দেখছেন

ঐশ্বরিক মহিমায়। তিনি পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন—দুই ভাই এখনও সেই যমুনার তীরে রথের এক পাশেই আছেন কিনা। অক্রূর জল থেকে উঠে কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলতে যাবেন, কিন্তু তাঁর বাক্য স্ফুরিত হল না। অক্রূর দেখলেন—কৃষ্ণ-বলরাম যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে। অক্রূর ভাবলেন—তাহলে কি জলের মধ্যে তিনি ভুল দেখলেন! অক্রূর আবারও যমুনার জলে নেমে ডুব দিলেন। কিন্তু সেখানে আবারও সেই দৃশ্য। সেই প্রভু অনন্ত এবং তাঁর কুণ্ডলীকৃত সর্পদেহের মধ্যে উপবিষ্ট ভগবান বিষ্ণুর কৃষ্ণমূর্তি। এবারে আত্মস্থ হয়ে স্তব করলেন অক্রূর।

অক্রূর এবার উঠে আসলেন যমুনা থেকে। সমস্ত অন্তরের মধ্যে তিনি এক অলৌকিক আনন্দ অনুভব করছেন, যদিও কৃষ্ণের সামনে তিনি সেই আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন না। অক্রূরকে দেখে কৃষ্ণ বললেন—মনে হচ্ছে যেন আপনি আশ্চর্য কিছু দেখে এলেন, নেনা এখনও আপনি কী যেন ভেবেই চলেছেন। অক্রূর ঘটা করে কিছু বললেন না। মনে মনে তিনি ঈশ্বর-কৃষ্ণের অনন্ত মহিমা অনুভব করে মুখে বললেন—এই চরাচরে আপনার চেয়ে আশ্চর্য আর কীই বা আছে—

কিং ভবিষ্যতি লোকেষু... আশ্চর্যং ভবতা বিনা।

আর এই আশ্চর্যের থেকে বড়ো কোনো আশ্চর্য আর আমি দেখতেও চাই না।

অক্রূর এবার অলৌকিকতার জগৎ ছেড়ে বাস্তবতায় মন দিলেন। বললেন—আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়। সূর্য অস্ত যাবার আগেই কংস রাজার রাজধানী মথুরাপুরীতে আমাদের পৌঁছে যেতে হবে—

যাবন্নাস্তং ব্রজত্যেষ দিবসান্তে দিবাকরঃ।

মথুরায় তাড়াতাড়ি পৌঁছনোর ব্যাপারে কৃষ্ণ আগেও আপত্তি করেননি, এখনও করলেন না। অক্রূর, কৃষ্ণ এবং বলরামকে নিয়ে রথ চলল ত্বরিত-গতিতে মথুরার উদ্দেশে। এই ঘটনার অলৌকিকতা বা ঘটনায় বর্ণিত কৃষ্ণ-বলরামের ভগবৎস্বরূপতার থেকেও ঘটনাটির রাজনৈতিক তাৎপর্য্যই অনেক বেশি বলে আমাদের মনে হয়। তার প্রমাণও পাব মহাভারতে। প্রসঙ্গত জানাই, কৃষ্ণের মথুরা-দ্বারকার রাজনৈতিক জীবনে অক্রূরের সঙ্গে তাঁর ভক্ত-ভগবান সুলভ কোনো মধুর সম্পর্কের উল্লেখ মেলে না। বরং যদু-বৃষ্ণি সংঘমুখ্যদের মধ্যে যাঁরা সাধারণত কৃষ্ণের বিপক্ষগোষ্ঠীতে অবস্থান করতেন, অক্রূর তাঁদের মধ্যেই একজন। দ্বারকার রাজনীতিতে স্যমন্তকমণির ঘটনা, সত্যভামার বিবাহ প্রভৃতি ঘটনায় কৃষ্ণ এবং অক্রূরের রাজনৈতিক সম্পর্কে জটিলতা বরং বেড়েছে। ফলে এহেন অক্রূরের কৃষ্ণের প্রতি আকস্মিক ভক্তির জন্ম এবং ভবিষ্যতে কৃষ্ণের বিরোধিতা করার সময় সেই ভক্তির আকস্মিক প্রয়াণের থেকে এই তত্ত্বটি আমাদের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয় যে, কৃষ্ণ জানতেন যে, অক্রূর আসলে কংসের বিশ্বস্ত সংঘমুখ্য। পৌরাণিক উল্লেখ থেকেই কথাটার সত্যতা প্রমাণ হয়। মথুরায় যে সভায় কংস নিজের বিরোধী গোষ্ঠীর বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন—সেই বিরোধী শিবিরে কিন্তু অক্রূর ছিলেন না। তিনি কংসেরই পক্ষে ছিলেন। আর সে কারণেই কৃষ্ণ-বলরামকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথাও কংস অক্রূরকে জানিয়েছেন পরম বিশ্বাসে। কৃষ্ণ-বলরামকে ভুলিয়ে মথুরায় আনার গুরুদায়িত্বই কংস তুলে দিয়েছেন অক্রূরের কাঁধে। কংসের প্রতি অক্রূরের বিশ্বস্ততার কথা বুঝতে বুদ্ধিমান কৃষ্ণের সময় লাগেনি। ফলে এই মুহূর্তে কোনো অলৌকিক উপায় আশ্রয় করেই হোক বা রাজনৈতিক কৌশলে—অক্রূরকে কংসের পক্ষ থেকে সরিয়ে আনাই তিনি সব থেকে বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন। মহাভারতই সব থেকে বাস্তব সংবাদ জানিয়েছে। সভাপর্বে কৃষ্ণের নিজের বক্তব্যেই জানা যাচ্ছে, অক্রূরকে স্বপক্ষে আনার জন্য বৈবাহিক রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন কৃষ্ণ এবং উগ্রসেনের কন্যার সঙ্গে অক্রূরের বিবাহ দিয়ে তাঁকে কংসের বিপক্ষশিবিরে নিয়ে আসা হয়—

দত্ত্বাক্রূরায় সুতনুং তামাহুকসুতাং তদা।

যাই হোক, এই মুহূর্তে কৃষ্ণের ভগবত্তার কারণেই হোক বা কোনো রাজনৈতিক সমীকরণে—অক্রূর কৃষ্ণের পক্ষে এসেছেন। পুরাণগুলিতে সেই তথ্যই অলৌকিকতার মোড়কে পরিবেশিত হয়েছে।

[মহা (k) ২.১৪.৩৩; (হরি) ২.১৪.৩৩;
ভাগবত পু. ১০.৩৯.৩৮-৪৭; ১০.৪০.১-৩০;
হরিবংশ পু. ২.২৬.৪০-৭১]

□ কৃষ্ণ যখন মথুরায় পৌঁছালেন, তখন বোধ করি সন্ধ্যা নেমেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ভেদ করে বৃহৎ বৃহৎ সৌধগুলিতে আলো জ্বলে উঠেছে। রাজমার্গে বিভিন্ন বিপণীতে বিচিত্র রকমের পণ্য শোভা পাচ্ছে। রাজপথের মধ্যে হাতির দেখা পাওয়া যাচ্ছে মাঝে-মাঝেই। অশ্বারোহী সৈনিক নগরপাল রাজমার্গে বিচরণরত রমণী-পুরুষের ওপর নজর রাখছে—যাতে কংসের শাসনে কোনো ত্রুটি ধরা না পড়ে। পরের দিনই কংসের ধনুর্যজ্ঞ মহোৎসব। অতএব ধানুষ্ক পুরুষেরা রথচক্রের ঘর্ঘর তুলে সন্ধ্যার শান্তি ব্যাহত করছে, কেন না কংসের রাজমহলে তাঁদের পৌঁছে যেতে হবে। পথের ধারের বিপণীগুলিতে গজদন্তনির্মিত তথা শঙ্খনির্মিত চুড়ি, মালা, এবং অন্যান্য শৃঙ্গারদ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে এবং পুরুষ, রমণী—দুই পক্ষই সেখানে ক্রেতার ভূমিকায়। মথুরায় 'শাটক' নামে এক ধরনের কাপড় বা শাড়ী পাওয়া যেত, যার চাহিদা ছিল অন্যত্রও। অতি মহার্ঘ্য চীনাংশুক অথবা রেশমী কাপড়, যেগুলি উত্তরাপথ এবং ভরুকচ্ছ হয়ে রোমক সাম্রাজ্য পর্যন্ত রপ্তানি হত, সেগুলিও যেহেতু মথুরার রাজার স্পর্শ করে যেত, অতএব মথুরায় বস্ত্রশিল্পের বিপণন হত ভালোরকম।

ভাগবত পুরাণে দেখা যাচ্ছে যে, কৃষ্ণ-বলরাম প্রথমে গিয়ে অক্রূরের অনুরোধে তাঁর বাসভবনে উঠলেন, তারপর অক্রূরের অনুমতি নিয়ে দুই ভাই মথুরা নগরী দেখতে বের হলেন। তবে হরিবংশে দেখছি, মথুরায় পৌঁছেই তাঁরা নগরদর্শনে বেরিয়েছেন। বিশেষত বসুদেব-দেবকী কিংবা অন্য কোনো পরিজনের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাতের সংবাদ পুরাণে পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণ-বলরাম পথে যেতে যেতে এক জায়গায় এসে থামলেন—যেখানে কাপড় রাঙানো হচ্ছে এবং বেশ কিছু কাপড় বিচিত্র রঙ্গকদ্রব্যে রঞ্জিত করে শুকিয়ে পাট-পাট করে রাখা রয়েছে। কাপড় রাঙানোর ব্যাপারটা একরকম শিল্পকর্মের অন্তর্গত ছিল মথুরায়। কাপড় রাঙানোর পারিপাট্যে বিচিত্র বসন দেখে তখনও গোপালকের সজ্জায় সজ্জিত কৃষ্ণের মন বেশ আকৃষ্ট হল। রঙ্গকার ব্যক্তিটি রজক হলেও তার ধরন-ধারণ, ব্যক্তিত্ব একটু অন্যরকম। কৃষ্ণ সেই লোকটির কাছে গিয়ে একটু আমোদিতভাবেই বললেন—ওই পাট-করা 'শাটক'গুলি থেকে আমাদের দুটি কাপড় দাও তো ভাই। বেশ ভালো দামী কাপড় দিও কিন্তু যাতে আমাদের দুই ভাইকে বেশ মানায়—

দেহি-আবয়োঃ সমুচিতান্যঙ্গ বাসাংসি চার্হতোঃ।

মূল্যের জন্য কোনো চিন্তা কোরো না, আমাদের কাপড় দিলে তোমার ভবিষ্যৎ ভালো হবে।

কৃষ্ণের বক্তব্য থেকে ভালো করে বোঝা যায় না যে, তিনি মূল্য দিয়েই মথুরার নাগরিক সাজ কিনতে চেয়েছিলেন, নাকি বিনা-মূল্যে! এতাবৎ পর্যন্ত বৃন্দাবনে যা তিনি পেয়েছেন— যশোমতীর স্নেহ থেকে রাইকিশোরীর প্রেম—সবই তিনি বিনা মূল্যেই পেয়েছেন। অতএব এই কাপড় চাইবার পিছনে গ্রাম্য গোপবালকের সেই স্বাভাবিক আবদারও কাজ করে থাকতে পারে। কিন্তু রঙ্গকার রজক মূল্য অথবা তজ্জাতীয় কোনো বণিকসুলভ বাক্-নৈপুণ্যের মধ্যে গেল না। সে আসলে রাজবাড়ির পরিধেয় প্রস্তুত করার বরাত পেয়েছে এবং রাজগৃহের সংশ্লেষে সে নিজেকে কংসরাজার নিতান্ত কাছের লোক মনে করে। অতএব তার সাহসটাও অন্য বণিকজনের চেয়ে বেশি। সে জবাব দিল—এই তো তোমার জামাকাপড়ের হাত দেখছি, বাছা! বনে-পাহাড়ে সারা দিন ঘুরে বেড়াও, এই তো তোমার উপযুক্ত বসন। তাহলে নিজের অভ্যাস ছেড়ে হঠাৎ এই রাজসজ্জা করার ইচ্ছে হল কেন বাপু—

কিমুদ্বৃত্তা রাজদ্রব্যাণ্যভীপ্সথ?

রঙ্গকার রজক এইটুকু বলেই থামল না। রাজবাড়ি অথবা ক্ষমতার অলিন্দে থাকা মানুষের সঙ্গে যদি সামান্য সংস্রবও থাকে, তবে সাধারণ পণ্যজীবী মানুষও কেমন দুর্মদ হয়ে ওঠে, এই রজক তার উদাহরণ। সে কৃষ্ণকে রীতিমতো কংস রাজার ভয় দেখিয়ে দুর্ব্যবহার করে তাড়াবার চেষ্টা করল। কৃষ্ণ আপাতত শত্রুপুরীতে এসেছেন। তাঁর আপন পিতা-মাতা এখানে নজরবন্দি, তাঁকেও এখানে আনা হয়েছে বধের অভিপ্রায়ে। বৃন্দাবনের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে কৃষ্ণের ছিল প্রাণের বন্ধন, পরম আত্মীয়তা। আর এখানের পরিবেশ একেবারেই অন্যরকম। হাওয়ায় প্রতি মুহূর্তেই যেন শত্রুতার গন্ধ। সামান্য রজকও এখানে কৃষ্ণকে কংস রাজার ভয় দেখাচ্ছে। সেই কবে থেকে যে ব্যক্তির হাতে তাঁর পিতা-মাতা

নিগৃহীত হয়ে চলেছেন, যার ভয়ে জন্মলগ্নেই তাঁকে বিসর্জন দিয়েছেন তাঁর পিতা, সামান্য রজক যখন সেই কংসের ভয় দেখালো, তখন কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি জানেন—নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশে এসে যদি জনসমক্ষে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তার জন্য চরমপন্থা অবলম্বন করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। তাতে অন্য লোক ভয়েই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। অতএব রজকের কথাবার্তা শুনে কৃষ্ণ একটি মোক্ষম আঘাত করলেন তাঁর মাথায়। মল্লযুদ্ধে প্রবীণ কৃষ্ণের এই একটি আঘাতেই রজকের মৃত্যু হল—

রজকস্য করাগ্রেণ শিরঃ কায়াদপতিয়ৎ।

কংসরাজার সঙ্গে একান্ত সংস্রব আছে এমন একটি লোক যখন রাজভয় প্রদর্শন করতে গিয়েও মারা পড়ল, তখন সেই প্রতাপশালী ঘাতক পুরুষের ওপর সম্ভ্রম এল অনেকেরই। কৃষ্ণ-বলরাম যখন হাতে দুখানি কাপড় নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন, তখন একজন 'বায়ক' এসে ওই মহার্ঘ্য কাপড় দুটি পরিয়ে দিতে চাইল। টীকাকার শ্রীধরস্বামী লিখেছেন যে, 'বায়ক' হল এক বিশেষ ধরনের তন্তুবায় অর্থাৎ তাঁতী। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে 'বায়কে'র ক্রিয়াকর্ম দেখে যা বুঝতে পারি, তাতে এই ব্যক্তিটিকে ঠিক তন্তুবায় মনে হয় না। মনে হয় যেন এ এক ধরনের 'বিউটিশিয়ান'। যে মানুষকে সুন্দর করে কাপড়-চোপড় পরিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দেয়। এ তাই করেছে। কৃষ্ণ এবং বলরামকে বিচিত্র বেশে মথুরার নাগরিক সাজে সাজিয়ে দিয়েছে, পরিয়ে দিয়েছে পুরুষের যোগ্য অলঙ্কার। সহৃদয় টীকাকার মনে করিয়ে দিয়েছেন—কংস রাজা ঠিক করে রেখেছেন—কৃষ্ণের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান মল্লযোদ্ধাদের উত্তেজিত করবেন। অতএব 'বায়ক' কৃষ্ণকে এবং বলরামকেও উত্তম এবং বিচিত্র চৈলেয় বসন এবং মল্লজনোচিত অলঙ্কারে সাজিয়ে দিল—

বিচিত্রবর্ণৈ শৈলয়ৈরাকল্পৈরনুরূপতঃ।

বায়কের সাজসজ্জায় সেজে কৃষ্ণ-বলরাম এবং মালাকারের ঘরে পৌঁছলেন। মালাকারের নাম সুদামা (হরিবংশ পুরাণ মতে গুণক)। মথুরা নগরে সন্ধ্যার সময় মালার চাহিদা বাড়ে এবং কৃষ্ণ বোধহয় এই মালাকারের ঠিকানা জানতেন আগে থেকেই। হয়তো মালাকার সুদামাও জানত যে, কৃষ্ণ আসবেন তাঁর ঘরে। অতএব কৃষ্ণ আসতেই সুদামা উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করল কৃষ্ণকে; বসার আসন, পা ধোবার জল সব একে একে এগিয়ে দিলেন সুদামা। সুদামা এমনভাবেই কথা বলল, যে কথার মধ্যে কৃষ্ণের ভগবত্তার সমস্ত তত্ত্বই মেশানো আছে। পরম ঈশ্বরত্বের মহিমা যতখানি থাকে ঠিক ততখানি মহিমা প্রকট করেই মালাকার সুদামা কৃষ্ণ-বলরামকে স্বাগত জানাল। মালাকার সুদামা সুন্দর সুন্দর কতগুলি মালা উপহার দিলেন কৃষ্ণ-বলরামকে। মাথায়, গলায়, হাতে বিচিত্র পুষ্পের আভরণ পরে দুই ভাই আবারও মথুরার রাজামার্গে চলতে আরম্ভ করলেন।

[হরিবংশ পু. ২.২৭.১-২৪;
ভাগবত পু. ১০.৪১ অধ্যায়]

☐ মালাকরের দোকান থেকে বেরিয়ে আবার পথ চলতে চলতে কৃষ্ণের সঙ্গে একটি রমণীর দেখা হল। ভারী সুন্দর তার মুখখানি, শরীরে যৌবনের চিহ্নও অতি প্রকট। অথচ তার শরীরটি ঈষৎ বাঁকা। সে নারীর আসল নামটি কোনো পুরাণই আমাদের জানায়নি। পুরাণে দেখা যাচ্ছে, শরীরের এই বক্রতার কারণে লোকে তাকে কুব্জা বলে, কেউ বা বলে ত্রিবক্রা, কিংবা অনেকবক্রা। কৃষ্ণ যখন তাকে পথে দেখলেন, তখন হাতে নানা অনুলেপন, অঙ্গরাগ, সুগন্ধী থালায় সাজিয়ে নিয়ে চলেছে একটু ব্যস্ত ভাবে। কুব্জ দেহ নিয়ে দ্রুত পথ চললে পথ চলার মধ্যেও একটা কুটিলতা দেখা দেয়—কুব্জা বিদ্যুৎকুটিল গামিনী। কুব্জাকে দেখে একেবারে নাগরিক সরস সম্ভাষণে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে? কার জন্য এই সুগন্ধের বাহার সাজিয়ে চলেছ?

কা ত্বং বরোর্বেতদুহানুলেপনং/
কস্যাঙ্গনে বা কথয়স্ব সাধু নঃ?

এত যে মধুর মধুর সুগন্ধ নিয়ে যাচ্ছ, তা আমাদের একটু-আধটু দিয়ে যাও। আমরাও একটু মাখি, একটু দিলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না তোমার, বরঞ্চ ভালোই হবে। এমন মধুরতায় এখনও পর্য্যন্ত কোনো যুবা পুরুষ কথা বলেনি কুব্জার সঙ্গে—হয়তো কুব্জা বলেই। কিন্তু কৃষ্ণ বলেছেন এবং ভাগবত পুরাণ বলেছে —তিনি সানন্দ সরসতায় তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন হেসে—প্রহসন্ রসপ্রদঃ।

কুব্জা বলল—সুন্দর আমার। আমি দাসী—
দাস্যস্মি সুন্দর কংসসম্মতা।

—আমি এই অনুলেপন-অঙ্গরাগ কর্মে অতি-নিপুণ বলে কংস খুব খাতির করেন আমাকে। আর দেখছই তো আমার চেহারার কী অবস্থা! লোকে আমাকে ত্রিবক্রা বলে ডাকে।

কৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্য, তাঁর রসিকতা-বোধ এবং তাঁর সহাস্য আলাপ দৃষ্টিপাতে ত্রিবক্রা কুব্জা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি দুজনেরই হাতে তুলে দিলেন সান্দ্র চন্দনাগুরু-কুঙ্কুমের অঙ্গরাগ—

ধর্ষিতাত্মা দদৌ সান্দ্রম্ উভয়োরনুলেপনম্।

কুব্জার দেওয়া অঙ্গরাগে কৃষ্ণ-বলরাম দুজনেই খুব সুন্দর করে সাজলেন। যতরকম হলুদ বর্ণের অঙ্গরাগ ছিল, সেগুলো নিজের গায়ে-মুখে চিত্রিত করলেন কৃষ্ণ, আর বলরাম গ্রহণ করলেন কৃষ্ণবর্ণের অঙ্গরাগ। গাত্রবর্ণের সঙ্গে চরম বৈপরীত্যে সেই অনুরঞ্জন কৃষ্ণ-বলরামকে উন্মুক্ত রাজপথের মধ্যে পরম দর্শনীয় এবং চোখে পড়ার মতো করে তুলল। কুব্জা কৃষ্ণের বাক্যে আপ্যায়িত হয়ে যেভাবে কংস-রাজার জন্য কল্পিত প্রসাধন তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তাতে কৃষ্ণ বড়ো খুশি হলেন। তিনি ঠিক করলেন—তার সঙ্গে এই যে কুব্জার দেখা হল এবং কুব্জা তাঁকে আপ্যায়িত করলেন, তার কিছু প্রতিদান তিনি দেবেন। তিনি কুব্জার ত্রিবক্র শরীরটি সমান করে দেবেন—

ঋজ্বীং কর্তুং মনশ্চক্রে দর্শয়ন্ দর্শনে ফলম্।

পুরাণে বর্ণিত হয়েছে, কৃষ্ণ হঠাৎই নিজের পা দুটি দিয়ে কুব্জার দুই পায়ের অগ্রভাগ চেপে ধরলেন এবং হাত দিয়ে তাঁর চিবুকটি ধরে তাঁর বক্র দেহটিকে উপরের দিকে টেনে তুললেন। কৃষ্ণের ভগবত্তার স্পর্শে কিংবা শারীরবিদ্যার ব্যবহারিক জ্ঞানের ফলে কুব্জা কয়েক মুহূর্তেই অসামান্য সুন্দরী রমণীতে পরিণত হলেন। তাঁর দেহের বক্রতা দূর হল, ঋজু দেহে রমণীর উচ্চাবচ শরীর-সংস্থানগুলি যথোচিতভাবে প্রকট হয়ে উঠল—

সা তদর্জুসমনাঙ্গী বৃহচ্ছ্রোণিপয়োধরা।

কৃষ্ণ কিন্তু সহজে ছাড়া পেলেন না। কৃষ্ণের স্পর্শে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ফিরে পেয়ে কুব্জা আনন্দিত হলেন। আর যে পুরুষটি তাঁর রূপ যৌবনকে তার সমস্ত বিরূপতা ঘুচিয়ে সিদ্ধি প্রদান করলেন, তার প্রতি জাগল কামনা। কৃষ্ণের উত্তরীয় প্রান্ত ধরে আত্মনিবেদনের লাস্যময়ী হাসি হেসে, নির্লজ্জভাবেই কৃষ্ণের সঙ্গ কামনা করলেন কুব্জা, আমন্ত্রণ জানালেন নিজের ঘরে—

উত্তরীয়ান্তমাকৃষ্য স্ময়ন্তী জাতহৃচ্ছয়া।

এহি বীর গৃহং যামে ন ত্বাং ত্যক্তুমহমুৎসহে।

কুব্জার বেশ্যাজনোচিত প্রণয় সম্ভাষণকে কৃষ্ণ প্রত্যাখ্যান করেননি। পরে কোনোদিন তাঁর কামনা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দাদা বলরামকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ চললেন রাজভবনের দিকে—

ততস্তৌ কুব্জয়া মুক্তৌ প্রবিষ্টৌ রাজসংসদম্।

[হরিবংশ ২.২৭.২৫-৩৯; ভাগবত পু. ১০.৪২.১-১৪; বিষ্ণু পু. ৫.২০.১-১২]

□ কুব্জাপ্রসঙ্গ মিটে যাবার পর কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর মথুরায় আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে মনোনিবেশ করেছেন। কংস ধনুর্যজ্ঞের বাহানায় কৃষ্ণকে মথুরায় আনিয়েছেন। কিন্তু কৃষ্ণ সেই কপট উপলক্ষটুকু ভেঙে দিতে চান। কংসের বহু যত্নে পরিকল্পিত আয়োজন গোড়াতেই তছনছ করে দিতে চান কৃষ্ণ। উপরন্তু কংসের মনোবলেও একটা ভালরকম ধাক্কাদেবার প্রয়োজন। তাই ধনুর্যজ্ঞের আগের রাতেই কৃষ্ণ রাজভবনে ঢুকলেন।

কৃষ্ণ-বলরামকে রাজপ্রাসাদে ঢুকতে দেখে রক্ষীপুরুষরা কিন্তু কোনো সন্দেহ বা বিপদ আপদের আশঙ্কা করেন নি। কৃষ্ণ-বলরাম রাজভবনে প্রবেশ করে একে তাকে জিজ্ঞাসা করতে করতে শেষ পর্যন্ত অস্ত্রাগারে পৌঁছে গেলেন, যেখানে অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে মূল যজ্ঞের বিশাল ধনুকটিও রাখা আছে বিশেষ মর্য্যাদায়, সজ্জিত করে। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করতে রক্ষীপুরুষরা সেই ধনুক দেখিয়ে দিল, ছেলেমানুষের কৌতূহল ভেবেই—

স তয়োর্দর্শয়ামাস তদ্ধনুঃ স্তম্ভসদৃশম্।

কৃষ্ণ কিন্তু ধনুকটি তুলে ফেললেন অনায়াসে এবং তাতে ছিলাটিও পরিয়ে নিলেন চমৎকার কৌশলে। তারপর সজোরে টংকার দিতে দিতে ধনুকটিকে বাঁকাতে লাগলেন কৃষ্ণ এবং এই প্রয়াসের ফলে শেষ পর্যন্ত সেই বিশাল সুসজ্জিত যজ্ঞধনু ভেঙে পড়ল—

দ্বিধাভূতমভূন্মধ্যে ধনুরায়োগভূষিতম্।

ধনুকের টংকার এবং ভেঙে পড়ার প্রচণ্ড শব্দ একটা হলই; আর তার মধ্যে রক্ষীপুরুষদের শোরগোলের মাঝে কৃষ্ণ-বলরাম প্রায় নিঃশব্দে

রাজভবন থেকে বেরিয়ে গেলেন। যথাসময়ে কংসের কাছেও খবর পৌঁছে দিল আয়ুধাগারের অধিকারিক। কংস খবর শুনলেন, বুঝতেও পারলেন যে এটা কৃষ্ণেরই কাজ। মনে মনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন তিনি কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করলেন না। আয়ুধাগারিককে বিদায় করে অবশ্য বেশিক্ষণ শান্তিতে বসেও থাকতে পারলেন না। তিনি পৌঁছে গেলেন রঙ্গভূমিতে, যেখানে উৎসব উপলক্ষে মল্লযুদ্ধের প্রতিযোগিতা হবে এবং কংস সেখানে কৃষ্ণকেও প্রতিযোগী হিসেবেই নামাতে চান, যাতে তাঁর রাজধানীর শ্রেষ্ঠ মল্ল চানূর মুষ্টিকদের হাতে নির্মমভাবে বালক কৃষ্ণকে পিষে মারা যায়। রঙ্গভূমিতে পৌঁছে চাণূর-মুষ্টিকদের সে আদেশ ভালভাবে বুঝিয়েও দিলেন কংস। বিপুল পরিমাণ পারিতোষিকের প্রলোভনও দিলেন। তারপর রাত্রি ঘনিয়ে এলো।

পরদিন সকাল থেকেই মথুরার পুরবাসী মল্লযুদ্ধ প্রতিযোগিতা দেখার জন্য রঙ্গভূমিতে সমবেত হতে লাগল। হয়তো ততক্ষণে সকলেই ধনুর্যজ্ঞ পণ্ড হবার সংবাদ পেয়ে গিয়েছে, সুতরাং রঙ্গভূমিতে অনেক নতুন ঘটনা, এমনকী অঘটনও ঘটতে পারে—এই ভাবনায় পুরবাসীদের উৎসাহের মাত্রা আজ কিছু বেশি। অন্যান্য মল্লযোদ্ধারা রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করার পর একসময় কৃষ্ণ-বলরামও গোপালক-মল্লের বেশে সেখানে পৌঁছালেন। কংস শুধুমাত্র মল্লযোদ্ধাদের ভরসায় বসে নেই। মল্লযুদ্ধের আগে, আসলে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করার সময়েই যাতে কৃষ্ণকে মত্ত হাতির পায়ের তলায় পিষে দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থাও আছে। ফলে কৃষ্ণ মল্লভূমিতে প্রবেশ করতেই কুবলয়াপীড় নামক কংসের মত্ত হস্তীটি কৃষ্ণকে এসে আক্রমণ করল মাহুতের ইশারায়।

কৃষ্ণ কীভাবে মত্তহস্তীর মুখোমুখি হলেন, অথবা কীভাবে তিনি শেষ পর্যন্ত হাতিটিকে মেরে ফেলতে পারলেন, সে-ব্যাপারে সমস্ত পুরাণগুলির মধ্যেই খানিকটা অলৌকিকতা এসেছে। কিন্তু হরিবংশের বর্ণনায় কৃষ্ণ কীভাবে হাতিটিকে বাগে আনলেন এবং ওই হাতির দাঁত ভেঙে নিয়ে সেই গজদন্তের আঘাতেই হাতিটিকে মেরে ফেললেন—তার অনেকটাই বাস্তবানুগ বর্ণনা আছে। সে বর্ণনাও যদি কেউ বিশ্বাস না করেন তবুও হরিবংশের একটা কথা মানতে হবে। হরিবংশ বলেছে—কৃষ্ণ নাকি সেই হস্তীরই সদৃশ গর্জন করে তাকে একেবারে থমকে দিয়েছিলেন। কৌশলগত লড়াইতে কৃষ্ণের হাতে তার দাঁত-দুটিও অবশ্যই ভাঙা পড়েছিল এবং তার মরণ যদি সত্য নাও হয়, তবু সে যে দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে কৃষ্ণকে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল, সেটা মেনে নিতেই হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, কৃষ্ণ ওই মত্তহস্তীর মাহুতটিকে মেরে ফেলেছিলেন, আর মাহুত মারা গেলে প্রশিক্ষিত হাতির যে দিগ্‌ভ্রান্ত অবস্থা হয়, কৃষ্ণ হয়তো তারই সুযোগ নিয়েছিলেন।

একটু দেরি হয়ে গেলেও রঙ্গশালায় প্রবেশ করে প্রতিযোগী হিসেবে কৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের মল্লোচিত মুখশব্দ এবং বাহ্বাস্ফোটে রঙ্গাগত সমস্ত দর্শকদের মধ্যে আলোড়ন তুলে ফেললেন—

ক্ষ্বেড়িতোৎক্রুষ্টনাদেন বাহ্বোরাস্ফোটিতেন

চ... হর্ষয়ামাসতুর্জনম্।

সমস্ত জনতা তুমুল হর্ষধ্বনি করে কৃষ্ণ-বলরামকে অভিনন্দিত করল। কৃষ্ণ-বলরামের ওপর পুরবাসীজনের অনুরাগ দেখে কংস অবাকও হলেন, ক্ষুব্ধও হলেন। যাদের অপমান-লাঞ্ছনা করার জন্য তিনি রাজ্যের সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে আহ্বান করে এনেছেন, তারা আজ তাঁর শত্রুদের সানন্দে স্বাগত জানাচ্ছে। সব দেখেশুনে—

পৌরাণামনুরাগঞ্চ হর্ষং চালক্ষ্য ভারত।

—কংস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং ব্যথিত হলেন। তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাচ্ছে—

বিষসাদ বৃথামতিঃ।

কিন্তু যত ক্ষোভ, যত ব্যথা, যত ভয়ই তাঁকে গ্রাস করুক না কেন, আজ আর ফেরার পথ নেই। আজ হয় কৃষ্ণকে মারতে হবে, নয় তো নিজের যাবতীয় কৃতকর্মের ফলস্বরূপ কৃষ্ণের হাতে প্রাণ দিতে হবে।

যাই হোক, কংস মল্লযুদ্ধের আদেশ দিলেন। চাণূর মুষ্টিক মল্লযুদ্ধের অভিপ্রায়ে কৃষ্ণের দিকে এগিয়ে আসছেন দেখে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত দর্শকরা বিস্মিত হলেন, ক্ষুব্ধও হলেন। একদিকে বিশাল আকৃতির মল্লযোদ্ধারা, অন্যপক্ষে দুটি অল্পবয়স্ক বালক! জনগণের সহানুভূতি তাঁর দিকে

আসছে, বুঝতে পারা মাত্র কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—আমি এই মল্লযুদ্ধে অংশ নিতে প্রস্তুত। আমি বালক, তবু এঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তবে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, মল্লযুদ্ধের কোনো নিয়ম আমার দ্বারা লঙ্ঘিত হবে না। তবে সেই সঙ্গে কৃষ্ণ এটাও জানাতে ভুলছেন না যে, যুদ্ধে কোনো মল্লযোদ্ধা তাঁর হাতে নিহত হলে, তার দায় কিন্তু তাঁর নয়। সে দোষ সম্পূর্ণই কংসের, কারণ তিনিই এই শত্রুতা তৈরি করেছেন—

অহং বালো মহানন্ধ্রো বপুষা পর্বতোপমঃ।
যুদ্ধং মমানেন সহ রোচতে বাহুশালিনা॥
যুদ্ধব্যতিক্রমঃ কশ্চিন্ন ভবিষ্যতি মৎকৃতঃ।
ন হ্যহং বাহুযোধানাং দূষয়িষ্যামি যন্মতম্॥
. . . প্রতাপার্থে হতা মল্লা মল্লহন্তুর্বধোহিসঃ।

চাণূর মুষ্টিকের সঙ্গে এরপর কৃষ্ণ-বলরামের রীতিমতো ভয়ংকর মল্লযুদ্ধ হল। আর সেই যুদ্ধে কৃষ্ণের হাতে চাণূর এবং বলরামের হাতে মুষ্টিক অত্যন্ত জঘন্য ভাবে নিহত হলেন। কংসের তৃতীয় মল্লটিকেও হত্যা করলেন কৃষ্ণ। বাকি মল্লযোদ্ধারা পালিয়ে বাঁচল।

কংস এতকাল বহু গুপ্তঘাতক পাঠিয়ে কৃষ্ণকে হত্যা করার চেষ্টা করেছেন, ব্যর্থ হয়ে আজ নিজেই তাঁকে চোখের সামনে বধ করবেন বলে মথুরায় ডেকে এনেছেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত উদ্যোগই ব্যর্থ হয়েছে। এই মুহূর্তে কংস নিরুপায়, অসহায় বোধ করছেন। এই বিশাল রঙ্গভূমিতে নিজের প্রজাসাধারণ এবং বিশিষ্ট লোকজনদের মাঝখানে থেকেও আজ তিনি একা। কংস জানেন তিনি সংঘমুখ্যদের সমর্থন, জনসমর্থন সবই হারিয়েছেন। আর কৃষ্ণ রূপে আজ স্বয়ং মৃত্যু তাঁর সামনে উপস্থিত। তবু একটা নিরুপায় আদেশ দেবার চেষ্টা করলেন—এই ছেলে দুটি, যারা বনে ঘুরে বেড়ায়, তাদের দূর করে দাও এখান থেকে। আর বসুদেব আর নন্দ, দুজনকেই বেঁধে নিয়ে যাও কারাগারে। কিন্তু অসহায় রাজার সেই আদেশ শুনতে কেউ এগিয়ে এল না।

কৃষ্ণ আর দেরি করলেন না। তিনি এক লাফে ঝাঁপিয়ে উঠলেন সেই মঞ্চের ওপরে, যেখানে কংস বসে আছেন। কৃষ্ণ কিন্তু কংসের সঙ্গে মারামারি করেন নি। কংসও আঘাত করার ন্যূনতম চেষ্টাও করতে পারেননি। ভয়ে অবশ হয়ে গেছেন। কৃষ্ণ কংসের চুল ধরে মঞ্চ থেকে মাটিতে নামিয়ে আনলেন। কংসের মাথার মুকুট, কানের কুণ্ডল, গলার হার খুলে পড়ে গেছে, কৃষ্ণ তাঁকে মাটিতে ঘষটাতে ঘষটাতে নিয়ে এসেছেন রঙ্গভূমির মাঝখানটিতে—

চকর্ষ চ মহারঙ্গে মঞ্চান্নিষ্ক্রম্য কেশবঃ।

কংস কোনো প্রতিরোধ করতে পারলেন না। কোনো শক্তিই যেন তাঁর শরীরে নেই। আসলে এমনটা হতেই পারে। পরের পর শক্তিধর পুরুষদের হত্যার জন্য পাঠিয়েও যাঁকে কংস হত্যা করতে পারেননি, সেই কৃষ্ণের অসীম শক্তি সম্বন্ধে একটা অসম্ভব ধারণা তাঁর অবচেতনে ছিল। এখন যখন সেই কৃষ্ণই তাঁর চুলের মুঠি ধরে ছেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন তিনি আগেই ভয়ে মরে আছেন। কৃষ্ণ তাঁকে রঙ্গভূমিতে ছেড়ে রাখলেন না, আবারও কংসকে ছেঁচড়ে নিয়ে চললেন রঙ্গভূমির চার দিকে। মল্লযুদ্ধের জন্য পরিকল্পিত রঙ্গভূমির মিহি মাটিতে কংসের দেহভারে একটা পরিখা তৈরি হয়ে গেল যেন—

সমাজবাটে পরিখাং দেহকৃষ্টাং চকার হ।

কংস মারা গেলেন। অচিরেই কংসের দেহ প্রাণহীন হয়ে গেল। সেকালের যুদ্ধ দুর্মদ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করে শত্রুর অস্ত্র বুকে নিয়ে যে বীরোচিত মরণ-মোহ অনুভব করতেন, কংসের সে ভাগ্য হল না। তিনি মারা গেলেন বীরের অযোগ্য বিপরীত বিধিতে, ঘষটে ঘষটে ধুলোয় ধূসর হয়ে তিনি মাটিতে পড়ে থাকলেন কাপুরুষের ভঙ্গিতে—

ক্রমেণ বিপরীতেন পাংশুভিঃ পরুষীকৃতঃ।

আসলে এতকাল যিনি কৃষ্ণের বিরুদ্ধে কখনো সামনে আসেননি, চিরকাল যাঁর বিরুদ্ধে তিনি অবীরোচিতভাবে গুপ্ত হত্যার ছক সাজিয়েছেন, তাঁকে কৃষ্ণ বীরের প্রাপ্য মর্য্যাদাটুকু দেবেন কেন! পৌরাণিক সখেদে মন্তব্য করলেন—বিনা কোনো যুদ্ধেই কংস মারা গেলেন। একটি বীরোচিত রুক্মপুঙ্খ বাণও কংসের দেহ স্পর্শ করল না—

অসংগ্রামহতঃ কংসঃ স বাণৈরপরিক্ষতঃ।

কংসবধের পরে বসুদেবের বাড়িতে যদু-বৃষ্ণিদের সভা বসে গিয়েছিল। কংসের মৃত্যুর পর এই সভা হয়তো কিছুটা 'ইনফরম্যাল', কিন্তু সেই মুহূর্তে কংসহন্তা কৃষ্ণের ওপরে কথা বলবেন, এমন কেউ ছিলেন না সে-সভায়। কৃষ্ণ উগ্রসেনকেই রাজপদ ফিরিয়ে দিলেন আবার।

কৃষ্ণের প্রায় আদেশবাক্য শুনে উগ্রসেন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন—

ব্রীড়িতাধোমুখং তং তু রাজানং যদুসংসদি।

—কৃষ্ণ নিজে উঠে উগ্রসেনের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন। কৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব অনুসরণ করে যদু-বৃষ্ণিদের সমস্ত সংঘমুখ্যরা উগ্রসেনের পিছন পিছন চললেন—কেন না গতাসু কংস রাজার অন্তিম সংস্কারে অংশগ্রহণ করতে হবে—

তং সর্বে যাদবা মুখ্যা রাজানং কৃষ্ণশাসনাৎ।
অনুজগ্মুঃ পুরীমার্গে. . .॥

উগ্রসেনকে রাজা করার আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সারা রাতই প্রায় কেটে গিয়েছিল। কংসের মৃতদেহ তখনও পড়েছিল মল্ল-রঙ্গভূমিতে। কৃষ্ণ সহ সমস্ত যাদব-বৃষ্ণিরা যখন উগ্রসেনের পিছন পিছন এসে সেই রঙ্গভূমিতে এসে পৌঁছলেন, তখন কেঁদে কেঁদে রমণীকুলের শোকও খানিকটা শান্ত হয়ে এসেছে, কেন না ততক্ষণে রাত পেরিয়ে সকাল হয়েছে, সূর্যের মুখ দেখা যাচ্ছে পুব আকাশে—

রজন্যাং তু নিবৃত্তায়াং ততঃ সূর্যে বিরাজিতে।

কৃষ্ণের নির্দেশে যদুমুখ্যেরা কংসের মৃতদেহ শিবিকায় তুললেন। শিবিকা সজ্জিত করে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে কংসের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া হল যমুনার তীরে। সেখানে মৃত্যুকালীন চিতাগ্নিতে কংসের মরদেহ ভস্মীভূত হল। বৃষ্ণি-অন্ধকেরা যমুনায় নেমে কংসের উদ্দেশে জল-তর্পণ করলেন। মথুরায় কংসের অত্যাচারের অধ্যায় শেষ হল। যাদব-বৃষ্ণিরা উগ্রসেনকে সামনে রেখে মথুরায় প্রবেশ করলেন। মহারাজ উগ্রসেন মথুরায় রাজপদবি ধারণ করে সংঘরাষ্ট্রের ভার নিলেন পূর্বের মতো।

মথুরা থেকে কংসের ভয়ে শিশু কৃষ্ণের নির্বাসিত হওয়া থেকে আরম্ভ করে কংসধ্বংস-পর্ব এবং মথুরায় কৃষ্ণের পুনর্বাসন—এই সময়টুকু কৃষ্ণজীবনের একটা বড়ো অধ্যায়। এই অধ্যায়ের শেষে কৃষ্ণ শুধু এক অতিমানুষী ক্ষমতার উৎস হিসেবেই বিবেচিত হননি, এই অধ্যায় তাঁকে সেই সময়ের সবচেয়ে বড়ো কূটনৈতিক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। সে নেতৃত্ব এতটাই তাঁর স্বমহিমায় উজ্জ্বল যে, এখানে তাঁর রাজা হওয়াটা একেবারেই বড়ো কথা নয়, তিনি রাজকর্তা, 'কিংমেকার'। যদুবংশীয়দের ওপরে রাজা হতে না পারার যে অভিশাপ যযাতি দিয়েছিলেন, সেটা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বাস্তব সত্য, কেন না মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে সংঘ-শাসনতন্ত্রের নিরিখে এমনিতেই কেউ রাজা হতে পারতেন না। শুধু সংঘমুখ্যদের প্রশাসনিক কর্মচালনার জন্য একজন রাজপদবি ধারণ করতেন-মাত্র। মহারাজ উগ্রসেন সেই রাজশব্দোপদজীবী প্রধান, যিনি কৃষ্ণের আনুকূল্যে এই পদবি লাভ করেছেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও কৃষ্ণই সেখানে প্রধান নায়ক এবং তিনি সে সম্বন্ধে সচেতনও বটে। মহারাজ উগ্রসেনকে তিনি সবিনয়ে বলেছেন—আমার মতো একজন ভৃত্য থাকতে দেবতারাও আপনাকে মাথা নীচু করে রাজকর দিয়ে যাবে, মানুষ তো কোনো ছার—

বলিং হরন্ত্যবনতাঃ কিমুতান্যে নরাধিপাঃ।

এই যে রাজকর্তার একক প্রভাব, এই প্রভাবেই তিনি যদু-বৃষ্ণি-অন্ধক-কুকুর— ইত্যাদি সমস্ত সংঘচারী মানুষ-জনকে উগ্রসেনের ছত্রচ্ছায়ায় এনে ফেললেন। এঁরা সবাই কংসের অত্যাচারে এবং ভয়ে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন; কৃষ্ণের কূটনৈতিকতায় তাঁরা আশ্বস্ত হয়ে একত্রিত হলেন মহারাজ উগ্রসেনের অধীনে—

যদুবৃষ্ণ্যন্ধকমধুদাশার্হ-কুকুরাদিকান্।
সভাজিতান্ সমানায্য নবদেশাবাসকর্শিতান্॥

ফল যা হল, তাতে পশ্চিম-ভারতে মথুরা-শূরসেন অঞ্চলের সংঘরাষ্ট্র তৎকালীন দিনের অন্যতম রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে পরিগণিত হল এবং তা হল কৃষ্ণেরই রাজনৈতিক বুদ্ধিতে।

[হরিবংশ পু. ২.২৮-৩২ অধ্যায়]

□ মথুরার রাজনৈতিক পালাবদল দেখে কৃষ্ণের পালকপিতা নন্দরাজা বৃন্দাবনে ফিরলেন। আর এদিকে কৃষ্ণপিতা বসুদেব গোপপল্লীতে পালিত পুত্রের ব্রাহ্মণ্য সংস্কারগুলি সম্পন্ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি প্রথম জীবনে নির্বাসিত পুত্রের প্রতি স্নেহ-কর্তব্য করতে পারেননি, কিন্তু আজ মথুরার সামাজিক পরিবেশের শুষ্ক কর্তব্য পালনের তাগিদে তিনি ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডেকে পুত্রের উপনয়নের ব্যবস্থা করলেন—

পুরোধসা ব্রাহ্মণৈশ্চ যথাবদ্ দ্বিজসংস্কৃতিম্।

বৃন্দাবনের রাখাল রাজা কৃষ্ণ এবং রৌহিণেয় বলরাম আজ ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে যথাবৎ যদুবংশের ক্ষত্রিয় হলেন—

ততশ্চ লব্ধসংস্কারৌ দ্বিজত্বং প্রাপ্য সুব্রতৌ।

বিষ্ণু পুরাণ বলেছে—স্বয়ং ভগবানও যখন ধরাধামে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁকেও মানুষের ধারাতেই চলতে হয়। তিনি ইচ্ছা করেই এই কর্তব্য শরীর ধারণ করেছেন, অতএব মানুষের ধারাতেই তাঁকে চলতে হবে। তিনি ইচ্ছা করেই এই কর্তব্য সাধন স্বীকার করেছেন এই জন্য যাতে মানুষ সামাজিক কর্তব্যগুলিকে লঙ্ঘন না করে। পুরাণ বলেছে—তিনি সর্ববিদ্যা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও, অখিলজ্ঞানমূর্তি হওয়া সত্ত্বেও জাগতিক কর্তব্যের উর্ধ্বে উঠে কাজ করেন না। নিজের আচারের মাধ্যমে জগৎকে তিনি শেখান যে, তুমি যদি স্বয়ং ভগবানও হও, তোমাকেও পিতা-মাতার কথা শুনে স্কুলে যেতে হবে—

শিষ্যাচার্য ক্রমং বীরৌ খ্যাপয়ন্তৌ যদূত্তমৌ।

অতএব কৃষ্ণ-বলরাম একবার গুরুগৃহে গেলেন সান্দীপনি মুনির আশ্রমে। সান্দীপনি মুনি কাশীর লোক, কিন্তু তিনি থাকেন অবন্তীতে। কৃষ্ণ-বলরাম অবন্তীদেশে, সান্দীপনির আশ্রমে এলেন শিক্ষাগ্রহণের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণ-বলরামের অসামান্য মেধার কারণেই হোক বা মথুরার রাজনীতিতে কংস পরবর্তী অধ্যায়ের কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী জটিলতার আভাস পেয়ে—কৃষ্ণ-বলরামের ছাত্রজীবন যে অসম্ভব সংক্ষিপ্ত, সে কথা প্রায় সবপুরাণেই উল্লিখিত হয়েছে। ভাগবত, হরিবংশ প্রত্যেকটি পুরাণই উল্লেখ করেছে যে, মেধাবী কৃষ্ণ-বলরাম মাত্র ৬৪ দিনেই সান্দীপনির কাছ থেকে সম্পূর্ণ বেদ-বেদাঙ্গ এবং ৬৪টি কলা বিষয়ে শিক্ষালাভ সম্পন্ন করলেন। তবে হরিবংশ পুরাণ থেকে বিশেষ তথ্য যেটুকু জানা যায়, তা হল—সান্দীপনি অস্ত্রবিদ্যার অন্যতম প্রসিদ্ধ গুরু এবং কৃষ্ণ-বলরাম তাঁর কাছ থেকে যেটা খুব ভালভাবে শিখলেন, তা হল ধনুর্বেদ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রের কলাকৌশল—

চতুষ্পাদং ধনুর্বেদং শস্ত্রগ্রামং সসংগ্রহম্।

শিক্ষাকালীন সময়েই সান্দীপনি মুনি বুঝে গেলেন যে, কৃষ্ণ অতি মেধাবী পুরুষ এবং তিনি অমানুষী অস্ত্রক্ষমতার অধিকারী—

অতীবামানুষীং মেধাং চিন্তয়িত্বা তয়োর্গুরুঃ।

অতএব কৃষ্ণ যখন গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলেন, তখন গুরু বললেন—আমার একটিমাত্র পুত্র হয়েছিল। আমি তাকে নিয়েই তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলাম। সেই সময়ে একদিন প্রভাসতীর্থে স্নান করবার সময় আমার ছেলেটিকে টেনে নিয়ে গেল একটি জলজন্তু—

পুত্র একো'পি মে জাতঃ স চাপি তিমিনা হৃতঃ।

তুমি যদি আমার সেই মৃত পুত্রটিকে এনে দাও। তাহলেই আমি মনে করি আমাকে শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা দেওয়া হল।

কৃষ্ণ সম্মত হলেন এবং গুরুপুত্রের খোঁজে প্রথমেই সমস্ত জলের আকর লবণ-সমুদ্রের জলে প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণের প্রভাব বুঝে সমুদ্র শরীর ধারণ করে কৃষ্ণের সামনে প্রাঞ্জলি হয়ে দাঁড়ালেন। কৃষ্ণ তাঁকে গুরুপুত্রের খবর জিজ্ঞাসা করলে সমুদ্র বললেন—এ-ব্যাপারে আমার কোনো দায় নেই কৃষ্ণ। আমি তোমার গুরুপুত্রকে হরণ করিনি। পঞ্চজন নামে এক অসুর—সে শঙ্খের রূপ ধারণ করে থাকে—সেই সান্দীপনি-মুনির ছেলেকে হরণ করেছে—

দৈত্যঃ পঞ্চজনো মহান্।

অন্তর্জলচরঃ কৃষ্ণ শঙ্খরূপধরো' সুরঃ।

কৃষ্ণ সঙ্গে-সঙ্গে অসুর পঞ্চজনের গৃহে পৌঁছলেন এবং তাঁকে মেরেও ফেললেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর গুরুপুত্রের হদিশ পাওয়া গেল না। তবে এই পঞ্চজনের ঘরেই একটা বড়ো লাভ হল কৃষ্ণের, তিনি অসুরকে মেরে তার ঘরে পেলেন সেই মহাশঙ্খ, যার নাম পাঞ্চজন্য—

যস্তু দেবমনুষ্যেষু পাঞ্চজন্য ইতি শ্রুতঃ।

কোথাও গুরুপুত্রের সন্ধান না পেয়ে কৃষ্ণ কিন্তু হাল ছেড়ে দিলেন না। গুরুর একটিমাত্র মনস্কামনা পূরণ করতে তিনি বদ্ধপরিকর। সমস্ত পুরাণগুলিই এই পর্যায়ে এসে কৃষ্ণের ওপর পরিপূর্ণ ঈশ্বরত্ব আরোপ করে জানিয়েছে যে, গুরুপুত্রকে মর্ত্যে না পেয়ে কৃষ্ণ যমলোকে গেলেন। স্বয়ং কৃষ্ণ এসেছেন জেনে যম এসে তাঁকে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ যমকে গুরুপুত্রের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে বললেন। কিন্তু একাজ যম করতে রাজী হলেন না। কারণ তা জীবন মৃত্যুর স্বাভাবিক চক্রের পরিপন্থী। অবশেষে যম আর কৃষ্ণের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল এবং যমকে পরাস্ত করে মৃত গুরুপুত্রকে পুনরায় জীবিত করলেন কৃষ্ণ। তারপর সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত বিপুল রত্ন সম্পদ, পাঞ্চজন্য শঙ্খ এবং গুরুপুত্রকে নিয়ে ফিরে এলেন গুরুর আশ্রমে—

ততো বৈবস্বতং ঘোরং নির্জিত্য পুরুষোত্তমঃ।
আসসাদ চ তং বালং গুরুপুত্রং তদাচ্যুতঃ॥
আনিনায় গুরোঃ পুত্রং চিরং নষ্টং যমক্ষয়াৎ।
ততঃ সান্দীপনেঃ পুত্রঃ প্রভাবাদমিতৌজসঃ॥
দীর্ঘকালগতঃ প্রেতঃ পুনরাসীচ্ছরীরবান্।
তদশক্যমচিন্ত্যঞ্চ দৃষ্ট্বা সুমহদদ্ভুতম্॥
সর্বেষামেব ভূতানাং বিস্ময়ঃ সমজায়ত॥

সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদ এবং গুরুপুত্রকে গুরুদক্ষিণারূপে প্রদান করে কৃষ্ণ বলরাম ফিরলেন মথুরায়। হরিবংশ পুরাণ জানিয়েছে যে, শিক্ষান্তে কৃষ্ণ-বলরাম গদা এবং পরিঘ চালনায় অসামান্য পারদর্শিতা অর্জন করলেন, পাশাপাশি ধনুর্বিদ্যাতেও অতুলনীয় দক্ষতা অর্জন করলেন—

গদাপরিঘযুদ্ধেষু সর্বাস্ত্রেষু চ তাবুভৌ।
অচিরান্মুখ্যতাং প্রাপ্তৌ সর্বলোকে ধনুর্ভৃতাম্॥
[হরিবংশ পু. ২.৩৩.১-৪০]

□ মথুরায় ফিরে অল্প কিছুদিনের অবসর পেলে কৃষ্ণ। সে সময় একদিন মহামতি উদ্ধবের সঙ্গে তাঁর কথা হল। উদ্ধব যদু-বৃষ্ণি সভার অন্যতম প্রবর মন্ত্রী বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্বন্ধে তিনি কৃষ্ণের অতি প্রিয় সখা—

বৃষ্ণীণাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।

স্বল্পমেয়াদের এই অবসরে নদী পাহাড়-বনে উপবনে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কৃষ্ণের মনে পড়ছে ব্রজভূমি বৃন্দাবনের কথা। নন্দ রাজা, তাঁর অনুরক্তা গোপীরা—সকলকেই কৃষ্ণ কথা দিয়েছিলেন, তিনি আবার ফিরে যাবেন সেখানে। কিন্তু যাওয়া আর হল না। কৃষ্ণ জানেন, আর যাওয়া হবেও না। তবু ব্রজবাসী প্রিয়জনদের কথা মনে করে দীর্ঘশ্বাস ভরে ওঠে কৃষ্ণের বুকে। এমনই একদিন কৃষ্ণ উদ্ধবকে অনুরোধ করলেন—সখা! আমি যেখান থেকে এসেছিলাম, সেই ব্রজভূমি বৃন্দাবনে যাবেন একবার? আমার পিতা-মাতা নন্দ-যশোমতীর কাছে গিয়ে আমার ভালবাসা জানাবেন তাঁদের। এরপর কৃষ্ণ ব্রজগোপীদের প্রেম ভাবনার স্মৃতিচারণ করেছেন। উদ্ধবকে বললেন—ব্রজভূমিতে যে গোপীদের আমি ফিরে যাবার আশ্বাস দিয়ে এসেছি, তারা আমাকে ছাড়া কিছু জানে না। তাদের মন পড়ে আছে আমারই কাছে সদাসর্বদা—

মামেব দয়িতং শ্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ।

কৃষ্ণ নিরুপায় হয়ে বললেন—ওদের বোলো, আমি ফিরে আসব। এই আশাই ওদের বাঁচিয়ে রাখবে—

আশাবন্ধৈঃ সখি নবনবৈঃ কুর্বতী প্রাণবন্ধম্।

কৃষ্ণের সন্দেশ বহন করে উদ্ধব গেলেন মথুরা থেকে বৃন্দাবনে। *[বি. দ্র. উদ্ধব]*

□ নন্দ-যশোমতীর অকৃত্রিম স্নেহ, ব্রজভূমির গোপীদের অপার কৃষ্ণপ্রেম হৃদয় দিয়ে অনুভব করে উদ্ধব ফিরলেন মথুরায়। সকলের খবর তিনি শোনালেন কৃষ্ণকে। পুরাণের কবি কৃষ্ণের কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি। কী বা প্রতিক্রিয়া দেবেন কৃষ্ণ। নন্দ-যশোমতীর স্নেহ বা গোপিনীদের প্রেম—কোনোটাকেই আপন রাজনৈতিক ব্যস্ততা বা নিজের জন্মদাতা পিতামাতার কথা বলে ছোটো করতে পারেন না তিনি। তাই কৃষ্ণ নীরব। ভগবান হয়েও যেন অসহায়ভাবেই নীরব। শুধু সখা উদ্ধবকে যেন দেখাতে চাইলেন— সমুদ্রের থেকেও বিশাল কোন অপার স্নেহ, প্রেম, ভালবসা ত্যাগ করে তিনি পা রেখেছেন কর্তব্য আর জটিল রাজনীতির আঙিনায়।

এতদিন বাদে আরও একটা কর্তব্য স্মরণ হয়েছে কৃষ্ণের। মথুরায় পা রেখে প্রথম দিনেই তিনি কুব্জাকে কথা দিয়েছিলেন, পরে কোনোদিন আসবেন তার ঘরে। সেই কর্তব্য পূরণ করতে উদ্ধবকে সঙ্গে নিয়েই কৃষ্ণ এলেন সৈরিন্ধ্রী কুব্জার বাড়িতে—আজ তাঁর বাসনা পূরণ করবেন তিনি—

সৈরিন্ধ্র্যাঃ কামতপ্তায়াঃ প্রিয়মিচ্ছন্ গৃহং যযৌ।
[দ্র. কুব্জা]

□ ভাগবত পুরাণ জানিয়েছে, কুব্জার বাড়ি থেকে ফিরেই বলরামকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ গেলেন অক্রূরের বাড়িতে। অক্রূরকে একটি গুরুতর কাজের ভার দিলেন কৃষ্ণ। বললেন—আমরা শুনেছি, আমার পিসী কুন্তী তাঁর স্বামী মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যুর পর পাণ্ডবদের নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়ে বাস করছেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ পুত্রস্নেহের বশে ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডবদের সঙ্গে সম-আচরণ করেন না মোটেই—তাও আমরা শুনেছি—

সমো ন বর্ততে নূনং দুষ্পুত্রবশগো'ন্ধদৃক্।

কৃষ্ণ বললেন—আমি চাই, আপনি গিয়ে

পাণ্ডবদের ভালোমন্দের খবর নিয়ে ফিরে আসুন। তারপরে যা উচিত তাই করা যাবে—

গচ্ছ জানীহি তদ্‌বৃত্তমধুনা সাধ্বসাধুবা।

আসলে রাজনীতির বোধ থেকে বোঝা যায় যে, জরাসন্ধের বিরুদ্ধে যদু-বৃষ্ণিদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য অন্য রাষ্ট্রের থেকে হস্তিনাপুরের সঙ্গে যোগাযোগ করাটা কৃষ্ণের পক্ষে অনেক বেশি সুবিধাজনক। কারণ পাণ্ডবরা কৃষ্ণের অত্যন্ত নিকটাত্মীয় এবং মহারাজ পাণ্ডুর উত্তরাধিকারী হিসেবে ন্যায়ত কুরুসাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজ্যভাগ দেননি এবং পাণ্ডবরা সেখানে ঈর্ষাকাতর দুর্যোধনের পীড়নের শিকার হচ্ছেন। এই পটভূমিতে অক্রূরের হস্তিনাপুর যাত্রা।

অক্রূর হস্তিনাপুরে এসে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্য কুরুপ্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। পাণ্ডবদের সম্পর্কে ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব কী, হস্তিনাপুরের প্রজাসাধারণ, মন্ত্রী বা কুরুবৃদ্ধরাই বা কী মত পোষণ করেন, তা বোঝার জন্য অক্রূর দু-তিনমাস থেকে গেলেন হস্তিনায়—

উবাস কতিচিন্মাসান্ রাজ্ঞো বৃত্তিবিবিৎসয়া।

কুন্তীর সঙ্গেও কথা বললেন অক্রূর এবং পাণ্ডবপক্ষপাতী বিদুরের সঙ্গেও কথা বললেন বিশদে। দুর্যোধন যে ইতিমধ্যে ভীমকে বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা করেছেন, সে খবরও পেলেন অক্রূর। তিনি বুঝলেন—প্রাপ্য রাজ্যলাভের ব্যাপারে পাণ্ডবদের প্রধান অন্তরায় দুর্যোধন এবং স্নেহশীল ধৃতরাষ্ট্রের সমর্থন আপন পুত্র দুর্যোধনের পক্ষে। আভাসে ইঙ্গিতে ধৃতরাষ্ট্রকে সচেতন করার চেষ্টাও করলেন অক্রূর। ধৃতরাষ্ট্র অবশ্য পুত্রমোহকেই মাহাত্ম্য দিয়ে অক্রূরকে জানিয়েছেন—তাঁর কিছু করার নেই।

অক্রূরের এই দৌত্যের সব থেকে জরুরী দিকটা হল—কৃষ্ণ পাণ্ডবদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের বঞ্চনার আভাস পেলেন এবং তা নিজের ও পাণ্ডব ভাইদের কৈশোরেই। পিত্রালয় থেকে সহানুভূতি এবং তাঁর পুত্রদের প্রতি সহায়তার মৃদু আভাসে বুঝি সামান্য আশ্বস্ত হলেন কুন্তীও।

[ভাগবত পু. ১০.৪৮.১২-৩৬; ১০.৪৯ অধ্যায়]

□ তবে হরিবংশে প্রাপ্ত সংবাদ থেকে এই দৌত্যের আরও একটা রাজনৈতিক গুরুত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে। ঘটনা প্রবাহ অনুযায়ী জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করবেন খুব শীঘ্রই এবং তাঁর অনুগত রাজমণ্ডলের মধ্যে একেবারে শেষ পংক্তিতে হলেও শকুনি, দুর্যোধন এবং তাঁর ভাইদের উল্লেখ পাওয়া যাবে। পাণ্ডু মহারাজ জীবিত থাকলে কুরুসৈন্য তাঁর শ্বশুরালয়ের দিকে যুদ্ধযাত্রা করত কী না, বলা শক্ত। হয়তো বৈবাহিক সম্পর্কের কারণেই তা ঘটত না। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনদের রাজনৈতিক অবস্থান একেবারে বিপরীত। এ অবস্থায় হস্তিনাপুরের রাজনীতির খুঁটিনাটির সংবাদ কৃষ্ণের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে খুব স্বাভাবিক কারণেই। ভবিষ্যতে এই হস্তিনাপুরের রাজনৈতিক জটিলতা কৃষ্ণের রাজনৈতিক জীবনের দ্বিতীয় কর্মক্ষেত্রে পরিণত হবে। তার ভূমিকাটুকুও এই কৈশোরেই রচিত হল।

□ যাই হোক, কংসের মৃত্যুর পর মথুরার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সত্যিই জটিল হয়ে উঠেছে এই মুহূর্তে। কারণ কংস মগধরাজ জরাসন্ধের জামাতা। জরাসন্ধের দুই কন্যা কংসের মহিষী অস্তি আর প্রাপ্তি কংসের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই পিত্রালয়ে পৌঁছে পিতাকে কংসের নিধনবার্তা যেমন শুনিয়েছেন তেমনই জরাসন্ধকে কৃষ্ণ তথা মথুরাবাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে প্ররোচিত করেছেন। এই দুশ্চিন্তার আবহেই কৃষ্ণের ছাত্রজীবন এবং সংক্ষিপ্ত অবসরকালটুকু কেটেছে। এখন মথুরা বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন।

মহাভারতের সভাপর্বে কৃষ্ণের জবানিতে কিন্তু জরাসন্ধের আক্রমণেরও আগে তাঁর দুই প্রধান অনুগত যোদ্ধা হংস এবং ডিম্ভকের মথুরা আক্রমণের সংবাদ মেলে। কৃষ্ণ জানিয়েছেন, তাঁদের যুদ্ধক্ষমতা এমনই যে কোনো অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে তাদের বধ করা সম্ভব নয়—

নামভ্যাং হংসডিম্ভকাবশস্ত্র নিধনাবুভৌ।

মহাভারতের এই তথ্যটুকুর ওপর ভর করে হরিবংশের শেষপর্বে হংস-ডিম্ভকের রুদ্রশিবের প্রসাদে অজেয় হয়ে ওঠা এবং কৃষ্ণবলরামের সঙ্গে যুদ্ধের বিস্তারিত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মহাভারতের প্রমাণে একথা বলা যায় যে, হংসের সঙ্গে বলরামের যুদ্ধ হয় অন্তত আঠেরোবার এবং একেবারে শেষের যুদ্ধে হয়তো বলরাম তাঁকে কাবু করে ফেলতে পেরেছিলেন—

রামেণ স হতস্তত্র সংগ্রামে'ষ্টাদশাবরে।

শ্লোকের মধ্যে 'হতঃ' শব্দটা শুনে মনে হতে পারে যে, বলরাম তাঁকে মেরেই ফেলেছিলেন। কিন্তু হরিবংশের বক্তব্য এবং মহাভারতের পরবর্তী বয়ান থেকেও তা প্রমাণ হয় না। হরিবংশে কৃষ্ণের সঙ্গে হংসের বহুবার যুদ্ধ হয়েছে এবং শেষে কৃষ্ণের অস্ত্রতাড়না অসহ্য হওয়ায় তিনি যমুনায় ঝাঁপ দেন। হরিবংশের পৌরাণিক ঠাকুর নিজেই সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন—আমরা দু-রকম কথা শুনেছি। এক শুনেছি যে, হংস যমুনায় ঝাঁপ দিলে কৃষ্ণ যমুনার জলের মধ্যেই তাঁকে প্রচণ্ড প্রহার করে পায়ে চিপে মেরে ফেলেন

পাদাভ্যাং . . . প্রাহরত্তঞ্চ . . .

কেচিদেবং বদন্তি হি।

আবার এও শুনেছি—যমুনার জলে ঝাঁপ দিলে পাতালবাসী সর্পেরা তাঁকে খেয়ে ফেলে। তাঁকে আর কেউ ফিরে আসতে দেখেনি—

অদ্যাপি নৈব রাজেন্দ্র দৃষ্ট ইত্যনুশুশ্রুম।

হংসের মৃত্যুর পর তাঁকে আর না দেখে ভাই তাঁর ডিম্ভকও যমুনার জলে আত্মহত্যা করে—একথা হরিবংশেও আছে, মহাভারতেও আছে।

যাইহোক, জরাসন্ধের প্রধান দুই সহায়, যাঁরা কংসের মৃত্যুর পর প্রথম যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন কৃষ্ণের বিরুদ্ধে, তাঁরা মৃত্যুবরণ করলে যুদ্ধোদ্যোগী জরাসন্ধের কাছে সে সংবাদ এল। তিনি এতই মর্মাহত হলেন যে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত প্রাগ্রসর সৈন্যবাহিনীকে ফিরিয়ে এনে তিনি আবারও মগধের রাজধানীতে ঢুকে পড়লেন—

স্বপুরং সর্বসৈন্যেন প্রযযৌ ভরতর্ষভ।

কৃষ্ণ-বলরাম জরাসন্ধের কারণে মোটেই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। কিন্তু আপাতত জরাসন্ধ নিবৃত্ত হলে তাঁরাও আপাতত খানিক স্বস্তি পেলেন। কৃষ্ণ নিজেই মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে একথা বলেছেন যে, জরাসন্ধ সাময়িকভাবে যুদ্ধে ক্ষান্তি দেওয়ায় আমরাও আবার সানন্দে মথুরায় বাস করতে লাগলাম—

পুনরানন্দিতাঃ সর্বে মথুরায়াং বসামহে।

কংসহন্তা কৃষ্ণের কোনো উচিত শাস্তি হল না দেখে এইবার কংসের দুই পত্নী অস্তি এবং প্রাপ্তি পিতা জরাসন্ধকে প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকেন কৃষ্ণকে মারবার জন্য। বারবার তাঁরা বলতে থাকেন—কেন তুমি ফিরে এলে। আর ফিরলে যদি, তাহলে কেন সেই দুরাত্মা কৃষ্ণকে মেরে রেখে এলে না। তুমি যাও—এখনই মার সেই কৃষ্ণকে—

পতিঘ্নং মে জহীতি পুনঃ পুনররিন্দমম্।

মগধের রাজবাড়িতে জরাসন্ধের প্রতি দুই পতিহীনা রমণীর যে প্ররোচনা চলছিল, সে খবর কৃষ্ণ মথুরায় বসেই পেয়ে গেলেন। মহাভারতের সভাপর্বে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে জানিয়েছেন যে, স্বামী হারানোর দুঃখে জরাসন্ধের বড়ো মেয়ে অস্তিদেবী তাঁর পিতাকে ভীষণভাবে প্ররোচিত করেছিলেন—

চোদয়ত্যেব রাজেন্দ্র পতিব্যসনদুঃখিতা।

হরিবংশে দেখেছি—কংসের মৃত্যুর পর-পরই জরাসন্ধ তাঁর চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী নিয়ে মথুরা আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের রাজারা। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, চেদি, করূষদেশ তো আছেই এমনকী হস্তিনাপুরের দুর্যোধনও এই জরাসন্ধ-বাহিনীর পুচ্ছভাগে ছিলেন বলে হরিবংশ মন্তব্য করেছেন—

দুর্যোধনাদয়শ্চৈব ধার্তরাষ্ট্রা মহাবলাঃ।

অবশ্য জরাসন্ধের যুদ্ধবাহিনীর গাঠনিক চিত্র নিয়ে আমাদের আপাতত মাথাব্যথা নেই, আমরা যেটা বলতে চাই, সেটা হল—হরিবংশ জানিয়েছে জরাসন্ধের এই প্রথম ঝাঁপিয়ে-পড়া আক্রমণ কৃষ্ণ-বলরাম এবং অন্যান্য বৃষ্ণিবীরেরা নাকি প্রতিরোধ করেছিলেন এবং জরাসন্ধ নাকি কৃষ্ণ-বলরামের হাতে প্রচুর মার খেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সসৈন্যে পলায়ন করেছিলেন—পরাজিতে ত্বপক্রান্তে জরাসন্ধে মহীপতৌ। শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরে এসেছিলেন স্বস্থানে মগধে।

আমাদের ধারণা—হরিবংশ পুরাণের এই বয়ানে অল্পাধিক অতিশয়োক্তি আছে। আসলে হরিবংশের কথক-ঠাকুরের মনে অবতার প্রমাণ কৃষ্ণের সম্বন্ধে প্রচুর গৌরব নিহিত ছিল এবং সেকালের দিনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহারাজ জরাসন্ধ কৃষ্ণের হাতে একবারও পর্যুদস্ত হলেন না—এটা তিনি মানতে পারেননি বলেই এই ঘোর যুদ্ধে তিনি জরাসন্ধকে পালিয়ে যেতে দেখে বিমলানন্দ লাভ করেছেন। বস্তুত মহাভারতের প্রমাণেও কৃষ্ণের জয়সম্বন্ধী কোনো ঘোষণা সিদ্ধ হয় না এবং হরিবংশের পরবর্তী বয়ানে যে সংশায়িত

মন্তব্য আছে, তাতেও কৃষ্ণের জয় এবং জরাসন্ধের পরাজয় সমর্থিত হয় না। আসলে কৃষ্ণকে প্রাথমিকভাবে জেতানোর পরেই হরিবংশের কথক ঠাকুরের খেয়াল হয় যে, মহাভারতে কৃষ্ণের নিজের বক্তব্যই খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে, অতএব তখন তিনি অন্যভাবে নিজের-বলা কথাকে গিলে ফেলবার চেষ্টা করেছেন।

হরিবংশে কৃষ্ণের জয় এবং জরাসন্ধের পলায়ন দেখিয়েই কথক-ঠাকুর বলছেন— বৃষ্ণি-যদু-বীরেরা জরাসন্ধকে জয় করেও নিজেরা বিজয়ী হয়েছেন বলে ভাবতে পারলেন না—

জরাসন্ধং তু তে জিত্বা মেনিরে নৈব নির্জিতম্।

—কেননা জরাসন্ধের সৈন্যবাহিনী ছিল বিশাল এবং জরাসন্ধ নিজেও ছিলেন মহাবলশালী। তুলনায় যদু-বৃষ্ণিদের সৈন্যবল ছিল সংখ্যায় অনেক কম এবং যুদ্ধ করলে তাঁরা পরাভূত হতেন—

অল্পত্বাদ্ অভিভূতাস্তু বৃষ্ণয়ো ভরতর্ষভ।

হরিবংশের এই স্বীকারোক্তি থেকেই প্রমাণ হয় যে, জরাসন্ধের সঙ্গে পূর্বোক্ত যুদ্ধটা কৃষ্ণের জেতা হয়ে ওঠেনি। হরিবংশ আরও বলেছে যাদবদের সঙ্গে আঠেরোবার যুদ্ধে দেখা হয়েছিল জরাসন্ধের, কিন্তু কোনোবারই জরাসন্ধকে মারা সম্ভবপর হয়নি তাঁদের পক্ষে—

ন চৈনং সমরে হন্তুং শেকুর্মহাবলাঃ।

আমরা বলব—মারাও সম্ভব হয়নি, তাঁকে জেতাও সম্ভব হয়নি এবং হরিবংশ এখন যে দুটি-তিনটি শ্লোক উচ্চারণ করেছে, তার প্রতিপাদ্য অর্থে কৃষ্ণের জয় এবং জরাসন্ধের পলায়ন বোঝায় না। জরাসন্ধের আঠেরো-উনিশবারের মথুরা-অভিযান খুব প্রচলিত প্রবাদ হলেও আমাদের ধারণা— মহাভারতোক্ত আঠেরো-উনিশবারের যে আক্রমণগুলি হংস-ডিম্ভকের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়েছিল, সেই আক্রমণ-গৌরব জরাসন্ধের ওপর বর্ষিত হয়েছে।

না হয় ধরেই নিলাম—হংস-ডিম্ভকের আক্রমণগুলি বকলমে জরাসন্ধেরই আক্রমণ বটে, কারণ তিনিই প্রধান পুরুষ। কিন্তু তাঁদেরও কৃষ্ণ জয় করতে পারেননি এবং তাঁরাও যে কত ভয়ঙ্কর সেকথা কৃষ্ণ নিজের মুখে জানিয়েছেন মহাভারতে। যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলেছেন— হংস, ডিম্ভক এবং জরাসন্ধ—এই তিনজন যদি একত্র থাকেন, তবে এই তিন ভুবনের কারও ক্ষমতা হবে না তাঁদের প্রতিরোধ করার—

ত্রয়স্ত্রয়াণাং লোকানাং পর্যাপ্তা ইতি মে মতিঃ।

আমাদের একান্ত বিশ্বাস—হংস-ডিম্ভককেও কৃষ্ণ কৌশলে মেরেছিলেন, সম্মুখ-যুদ্ধে নয়। কৌশল এবং রাজনৈতিক চতুরতা কৃষ্ণের এতই বেশি ছিল যে, তিনি যেখানে বুঝতেন—গোঁয়ারের মতো ক্ষত্রিয়-যুদ্ধ করে কোনো লাভ নেই, সেখানে তিনি কৌশলই আশ্রয় করতেন—এটাই তাঁর গভীর বাস্তব-বোধ, এটাই তাঁর বুদ্ধি এবং এটার জন্যই কৃষ্ণ এখনও কৃষ্ণ। খেয়াল করে দেখুন— আঠেরো বারের যুদ্ধেও যখন জরাসন্ধ-সহায় হংসকে মারা গেল না, তখন কে-না-কে গিয়ে তাঁর ভাই ডিম্ভকের কাছে অপপ্রচার করে মিথ্যা বলল—আপনার ভাই হংস মারা গেছেন—

হতো হংস ইতি প্রোক্তমথ কেনাপি ভারত।

আমরা বিশ্বাস করি যে, এই অচিহ্নিত ব্যক্তিটি—যে নাকি ডিম্ভকের কাছে হংসের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করল—সেই লোকটিকে কৃষ্ণই ঠিক করে দেননি তো? যেভাবেই হোক তিনি হংস এবং ডিম্ভকের অভিন্নহৃদয়তা এবং অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃপ্রেমের কথাটি জেনে গিয়েছিলেন। ফলে হয়তো তিনি নিজেই কৌশলেই এই মিথ্যা-প্রচার করেছিলেন। ফলে অন্যত্র যুদ্ধরত ডিম্ভক যেমন হংসের নিধনবার্তা শুনে আত্মহত্যা করেন, তেমনই হংসও ডিম্ভকের মৃত্যুর খবর পেয়ে নিজে আত্মহত্যা করেন।

[মহা (k) ২.১৪.৩৪-৪৩; (হরি) ২.১৪.৩৪-৪৩; হরিবংশ পৃ. ২.৩৫-৩৬ অধ্যায়; ভাগবত পৃ. ১০.৫০.১-৪১]

□ মহাভারতে জরাসন্ধের সঙ্গে তাঁর ক্রমিক প্রতিপক্ষতার বিবরণ দিতে গিয়ে কৃষ্ণ নিজেই বলছেন যে,—কংস মারা যাবার পর জরাসন্ধ যুদ্ধে উদ্যত হতেই আমরা সংঘমুখ্যেরা সব মন্ত্রণায় বসেছিলাম। সেখানে আমাদের সিদ্ধান্ত হয় যে, আমরা যদি তিনশ বছর ধরে বিরামহীন ভাবেও জরাসন্ধের সৈন্য ধ্বংস করতে থাকি, তাহলেও আমরা জরাসন্ধকে ক্ষয় করতে পারব না—

ন হন্যামো বয়ং তস্য ত্রিভির্বর্ষশতৈঃ বলম্।

ঠিক এইখানে মহাভারতের সঙ্গে হরিবংশের পরবর্তী বক্তব্য মিলে যাচ্ছে। হরিবংশও

বলেছে—জরাসন্ধের সৈন্য-সামন্ত সংখ্যায় বিশাল আর তুলনায় যদু-বৃষ্ণিদের সৈন্য অনেক কম—

অক্ষৌহিণ্যশ্চ তস্যাসন্ বিংশতিশ্চ মহামতে।

যাই হোক, হংস-ডিম্ভকের আক্রমণ এবং হয়তো জরাসন্ধেরও একাদশ মথুরা আক্রমণের পর কৃষ্ণ এবং যদুবংশীরা যখন খবর পেলেন দুই কন্যার প্ররোচনায় জরাসন্ধের মনে আবারও মথুরা আক্রমণের ইচ্ছা জেগেছে, তখন মথুরায় যদু-বৃষ্ণি সংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা আহূত হল। এই সভায় যা আলোচনা হল, সেদিকে একটু নজর দেওয়া প্রয়োজন, সংক্ষেপে হলেও। কারণ এই সভার শেষে যেমন মথুরাবাসীদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য স্থির হবে, তেমনই কংসবধ করে যদুবংশীদের ত্রাণকর্তা কৃষ্ণের মতো ধুরন্ধর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যিনি রাজা না হয়েও আপন রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণে রাজকীয় মর্য্যাদাই লাভ করেন তাঁর অবস্থাটাও একটু স্পষ্ট হবে। হরিবংশে দেখা যাচ্ছে, আয়োজিত সভার প্রধান বক্তা বিকদ্রু নামে এক সংঘমুখ্য। বিকদ্রুর ভাষণটি অত্যন্ত দীর্ঘ। সেখানে মথুরা নগরীর প্রতিষ্ঠা, যদুবংশের ইতিহাস আলোচনা করার পর বিকদ্রু বললেন—কৃষ্ণ! তুমি স্বয়ং ভগবান। যদুবংশীদের ত্রাণকর্তা। জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতাও তোমার আছে। কিন্তু এই সুপ্রাচীন মথুরা নগরীর সে ক্ষমতা নেই। নগরে দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাব, অস্ত্রশস্ত্রেরও অভাব। এ অবস্থায় জরাসন্ধের আক্রমণ একদিনও ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা মথুরা নগরীর নেই। এ অবস্থায় সব দিক বিবেচনা করে তুমি যা ভালো বোঝ করো। কৃষ্ণপিতা বসুদেবও বিকদ্রুর সঙ্গে একমত। সভার কথাবার্তা যা দাঁড়াল তার ধারা কতকটা এই যে, জরাসন্ধের সঙ্গে শত্রুতা যেন একা কৃষ্ণেরই, কারণ তিনি কংস বধ করেছেন। কিন্তু সেই শত্রুতা যা যুদ্ধের দায় মথুরা কেন নেবে? যদুবংশীয় এই ধুরন্ধর মানুষটি যে সমস্ত যদু-বৃষ্ণিকুলকে কংসের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেছেন, তা যেন কোনো ঘটনাই নয়। তবু কৃষ্ণ এসব যুক্তিতর্কই মেনে নিলেন। সত্যিই তাঁর শত্রুতার কারণে মথুরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। কৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে নিয়ে মথুরা ছেড়ে দক্ষিণে পালালেন। ব্রহ্মপুরাণ এপ্রসঙ্গে একটা অসাধারণ কথা বলেছে। পৌরাণিক মন্তব্য করেছেন—যিনি ঈশ্বরের পরিপূর্ণ অবতার, যাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি-স্থিতি-লয় আবর্তিত হয়, তিনি তো ইচ্ছামাত্রেই এক মুহূর্তে সমস্ত শত্রু ধ্বংস করতে পারেন। কিন্তু যেহেতু কৃষ্ণ মনুষ্যলীলায় অবতীর্ণ, তাই তিনি মনুষ্যধর্মের অনুবর্তন করেই বলবান ব্যক্তির সঙ্গে সন্ধি করেন, দুর্বলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কখনো সাম্যনীতি, কখনো ভেদনীতি, কখনো দণ্ডদান আবার কখনো বা পলায়নও করেন—

করোতি দণ্ডপাতঞ্চ ক্বচিদেব পলায়নম্।

[হরিবংশ পু. ২.৩৭-৩৮ অধ্যায়; ২.৩৯.১-১৬; ব্রহ্ম পু. ১৯৫.১৭]

☐ যাই হোক, কৃষ্ণ-বলরাম দাক্ষিণাত্যের পথে যাত্রা করেছেন জেনে জরাসন্ধও মথুরা আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করে কৃষ্ণকেই অনুসরণ করছেন, ফলে মথুরার শত্রুভয় দূর হয়েছে। এদিকে দাক্ষিণাত্যের পথে সহ্যাদ্রির কাছে ভার্গব পরশুরামের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামের দেখা হল। জায়গাটা করবীরপুরের কাছাকাছি। পরশুরাম কৃষ্ণকে কিন্তু সেখানে থাকতে বারণ করলেন। কারণ করবীরপুর একসময়ে যদু-বৃষ্ণিদের শাসনাধীন হলেও, তখন সেখানে রাজত্ব করছেন জরাসন্ধপন্থী রাজা শৃগাল। তিনি নিজেকে 'বাসুদেব' বলে দাবি করেন এবং যদু-বৃষ্ণিদের সঙ্গেও তাঁর ঘোর শত্রুতা। তাই পরশুরাম কৃষ্ণকে গোমন্তক পর্বতে বাস করার পরামর্শ দিলেন। সেই সঙ্গে কৃষ্ণের ভগবত্তা বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন পরশুরামই প্রথম ঘোষণা করলেন যে, ভগবান বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার কৃষ্ণের কাছে এই গোমন্তক পর্বতেই ভগবান বিষ্ণুর অস্ত্রশস্ত্র, বাহন প্রভৃতি এসে পৌঁছাবে। গোমন্তক পর্বতে শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে কৃষ্ণ-বলরামের যুদ্ধ হবে এবং এই যুদ্ধ 'চক্রমুসল' নামে বিখ্যাত হবে এমন আগাম ঘোষণাও করলেন পরশুরাম—

তত্র চক্রং হলঞ্চৈব গদাং কৌমোদকীং তথা।
সৌনন্দং মুসলঞ্চৈব বৈষ্ণবান্যায়ুধানি চ॥
দর্শয়িষ্যন্তি সংগ্রামে পাস্যন্তি চ মহীক্ষিতাম্।
রুধিরং কালযুক্তানাং বপুর্ভি কালসন্নিভৈঃ॥
স চক্রমুসলো নাম সংগ্রামঃ কৃষ্ণ বিশ্রুতঃ।
দৈবতৈরিহ নির্দিষ্টঃ কালস্যাদেশসংজ্ঞিত॥

পরশুরামের পরামর্শে কৃষ্ণ-বলরাম গোমন্তক পর্বতে বাস করতে লাগলেন এবং যথাসময়ে তাঁরা দিব্য অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হলেন। কৃষ্ণ

ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, কৌমোদকী গদা এবং শার্ঙ্গধনু লাভ করলেন। বলরাম ধারণ করলেন হল এবং মুসল। গোমন্তক পর্বতেই কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন বিষ্ণুর বাহন গরুড় এবং তিনি আকাশ থেকেই ভগবান বিষ্ণুর দিব্যমুকুটখানি বসিয়ে দিলেন কৃষ্ণের মাথায়।

কৃষ্ণ জানতেন, জরাসন্ধ সসৈন্যে গোমন্তক পর্বতে এসে পৌঁছাবেন। হরিবংশ জানাচ্ছে—জরাসন্ধের আক্রমণ এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখেই তাঁরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

জরাসন্ধ যথারীতি গোমন্তক পর্বতেও কৃষ্ণকে নিশ্চিন্তে থাকতে দিলেন না। তিনি এবং তাঁর অনুগত রাজারা প্রথমে চারদিক থেকে পর্বত অবরুদ্ধ করলেন এবং তারপর একসময় পর্বতের চারদিকে আগুন লাগিয়ে দিলেন, যাতে কৃষ্ণ-বলরাম অসহায় ভাবে পুড়ে মরেন। হরিবংশ পুরাণে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণ-বলরাম সেই পর্বত থেকে লাফ দিয়ে জরাসন্ধের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এসে পড়লেন এবং এই সময় যে যুদ্ধ হল তাতে হয়তো বৈষ্ণব দিব্যাস্ত্রের মাহাত্ম্যেই কৃষ্ণ জরাসন্ধকে পরাস্ত করতে সমর্থও হলেন।

[হরিবংশ পু. ২.৩৯.১৭-৮৩; ২.৪০-৪২ অধ্যায়; ২.৪৩.১-৭৭]

□ জরাসন্ধের পরাজয় এবং সসৈন্যে প্রস্থানের পর হরিবংশে একটি ছোটো ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যেটি ছোটো হলেও পৌরাণিক তথ্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। জরাসন্ধ চলে যাওয়ার পর যুদ্ধক্লান্ত কৃষ্ণের সঙ্গে যিনি সাক্ষাৎ করলেন, তিনি চেদিরাজ দমঘোষ। মহাভারত এবং সবকটি পুরাণের তথ্যেই দমঘোষকে জরাসন্ধপক্ষীয় রাজা বলেছে, তার ওপর দমঘোষের পুত্র শিশুপাল জরাসন্ধের পুত্রবৎ, একান্ত অনুগত। শুধু তাই নয়, জরাসন্ধের বিশাল সেনার তিনি সেনাপতিও বটে। এহেন শিশুপালের পিতা তথা কৃষ্ণের পিসী শ্রুতশ্রবার স্বামী দমঘোষ হঠাৎই আত্মীয়তার বার্তা নিয়ে এলেন, জরাসন্ধের বারংবার আক্রমণের নিন্দাও করলেন, তারপর দুই ভাইকে রথে চড়িয়ে পাঠালেন করবীরপুরে। বিষয়টা একটু ষড়যন্ত্রের মতো লাগে কারণ আমরা আগেই জানিয়েছি যে, করবীরপুরের রাজা শৃগাল মানুষটি অত্যন্ত খারাপও বটে, জরাসন্ধপক্ষীয়ও বটে। সেখানে দমঘোষ হঠাৎ আত্মীয় সেজে এসে মিষ্টি কথায় কৃষ্ণ-বলরামকে করবীর পুরে পাঠাবেন কেন? পুরাণে উল্লেখ না থাকলেও অনুমান করা যায় যে, জরাসন্ধ নিজে প্রস্থান করলেও কৃষ্ণকে করবীরপুরে হত্যা করাবার একটা পরিকল্পনা করেছেন আর দমঘোষ সেই ষড়যন্ত্র কার্যকর করতে এসেছেন মাত্র। কৃষ্ণ কিন্তু মুখে দমঘোষকে কিছু বললেন না। যেন দমঘোষই তাঁর পরমাত্মীয় এমন একটা ভাব করে করবীরপুরে গেলেন।

করবীরপুরের রাজা শৃগাল কৃষ্ণের আগমন সংবাদ পেয়ে একেবারে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ জানতেন, এমনটাই হবে। যাই হোক, প্রচণ্ড যুদ্ধের পর কৃষ্ণ শৃগালকে বধ করলেন। তারপর শৃগালের বালক পুত্রকে করবীরপুরের সিংহাসনে বসিয়ে ফিরে এলেন মথুরায়।

[হরিবংশ পু. ২.৪৩.৭৮-৯৮; ২.৪৪.১-৬৫]

□ হরিবংশ পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী জরাসন্ধ আপাতত কিছুকাল যুদ্ধ থেকে বিরত হলেন। মথুরায় সকলে কিছুটা নিশ্চিন্তে বসবাস করতে লাগলেন। এই অবসরে কৃষ্ণ নিজের রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করতে লাগলেন। রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বৈবাহিক রাজনীতি সেকালে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যুবক কৃষ্ণও সেদিকে ঝুঁকলেন।

বৈবাহিক রাজনীতির কেন্দ্র তৈরি হল বিদর্ভরাজ্যে। বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা অপরূপা সুন্দরী রুক্মিণীর স্বয়ংবর উপলক্ষ করে। কৃষ্ণও স্বয়ংবরের খবর পেলেন। কিন্তু ভীষ্মক জরাসন্ধপন্থী রাজা, জরাসন্ধের পরম বন্ধু। ফলে স্বয়ংবরে জরাসন্ধপক্ষীয় অনেক রাজা-মহারাজা আমন্ত্রিত হলেও কৃষ্ণ বা যদুবংশের কেউ সেখানে আমন্ত্রণ পেলেন না। কৃষ্ণ কিন্তু হাল ছাড়লেন না। বরং বাছা বাছা বৃষ্ণি যোদ্ধাদের নিয়ে সসৈন্যে বিদর্ভে গিয়ে উপস্থিত হলেন। যাত্রা করার আগে ব্যবস্থাও করে গেলেন যাতে তাঁদের অনুপস্থিতিতে মথুরায় অতর্কিত আক্রমণ না হতে পারে। কৃষ্ণ বৃষ্ণি যোদ্ধাদের নিয়ে বিদর্ভে পৌঁছে শিবিরস্থাপনের উদ্‌যোগ করছেন, এমন সময় রাজা ক্রথ-কৈশিক এসে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন। ক্রথ-কৈশিকের পরিচয় দিতে গেলে খুব সংক্ষেপে যেটা বলা যায়, তা হল এঁরা

ভীষ্মকেরই পিতৃতুল্য আত্মীয় *[দ্র. ক্রথ১]*। কংসের শাসনকালে উগ্রসেন যেমন কোনঠাসা হয়ে পড়েছিলেন, ভীষ্মকের শাসনে বিদর্ভে তাঁদের অবস্থা কতকটা একই রকম। ফলে বিদর্ভের মাটিতে কৃষ্ণের পা রাখার খবর পেয়েই এই প্রবীণ মানুষগুলি তাঁর অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করেছেন, হয়তো জরাসন্ধ-ভীষ্মকদের হাত থেকে ত্রাণ লাভের নীতি নির্ধারণের আশায়। কৃষ্ণ এই রাজনৈতিক সমীকরণটা সহজেই বুঝলেন এবং ক্রথ-কৈশিকের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। ক্রথ-কৈশিকের প্রাসাদে যে সভা বসল, সেখানে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্মরণ করে ক্রথ-কৈশিক তাঁর পূজা করলেন, দিব্য আড়ম্বরে কৃষ্ণের 'রাজেন্দ্র' পদে অভিষেক সম্পন্ন করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করলেন। আর এই ঘটনাটুকুই স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত রাজাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠল। কৃষ্ণ সসৈন্যে বিদর্ভে এসেছেন, আবার বিদর্ভেও একেবারে নিঃসহায় নন—এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ হতে পারে কী না, সেটাই সব থেকে চিন্তার কথা হয়ে উঠল। জরাসন্ধ এবং তাঁর অনুগামী রাজারা নিজের নিজের মত ব্যক্ত করতে বসলেন। কিন্তু বিপদে পড়লেন কন্যাপিতা ভীষ্মক। এমন যুদ্ধের আবহে যে স্বয়ংবর হতে পারে না তা তিনি ভালোই বুঝলেন। কৃষ্ণ যে রুক্মিণীকে বিবাহ করার ইচ্ছা রাখেন, তাও বুঝলেন। জরাসন্ধপন্থীরা যত বলবানই হোক না কেন, কৃষ্ণের কোনো ক্ষতি তারা এখন পর্যন্ত করতে পারেনি। উপরন্তু কৃষ্ণের একক রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় মথুরা কংসের অত্যাচার মুক্ত হয়েছে, জরাসন্ধের বিরুদ্ধেও কৃষ্ণ পা ফেলেছেন যথেষ্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে। বয়স অল্প হলেও এমন প্রবীণ রাজনীতিক অবহেলার পাত্র নন—সেটা ভীষ্মক ভালোই বুঝলেন। বুঝতে বাধ্যই হলেন কারণ কৃষ্ণ বিদর্ভে এসেই ভীষ্মকের বিরোধীগোষ্ঠীর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। ফলে স্বয়ংবর স্থগিত করে ক্রথ-কৈশিকের বাড়িতে এসে কৃষ্ণের সমাদর করাটাই তাঁর কাছে দরকারি মনে হল। রুক্মিণীর স্বয়ংবর বন্ধ হল। হয়তো রুক্মিণী শুনলেন কারণটাও। হয়তো শুনে শুনেই কৃষ্ণের মতো মানুষের প্রতি অনুরাগ জন্মাল রুক্মিণীর মনে। তবে সে কথায় আমরা যথাসময়ে আসব।

ভীষ্মক কৃষ্ণকে সমাদর করলেন যথেষ্টই, তাঁকে স্বয়ংবরে আমন্ত্রণ না জানানোটা যে অন্যায় হয়েছে তাও মেনে নিলেন। জরাসন্ধ সম্রাট কিন্তু এ ঘটনায় বড়ো আঘাত পেলেন। কৃষ্ণ বিদর্ভে পা রাখতেই রুক্মিণীর স্বয়ংবর যেভাবে বন্ধ হয়ে গেল—সেটাকে জরাসন্ধ তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক পরাজয় হিসেবে দেখতে লাগলেন। ফলে বিদর্ভে বসেই কৃষ্ণের বিরুদ্ধে আর এক দফা ষড়যন্ত্র শুরু হল এবং শাল্বরাজার পরামর্শে কালযবনকে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করা হল।

কৃষ্ণ কিন্তু বুঝেছিলেন, স্বয়ংবর যেভাবে বন্ধ হয়ে গেল তার প্রতিক্রিয়া একটা হবে আর সেটা অবশ্যই মথুরা আক্রমণ। ফলে বিদর্ভে বসেই তিনি অনুমান করেছেন, যদু-বৃষ্ণিদের রাজধানী মথুরা ত্যাগ করতে হবে অবিলম্বে। তাই গরুড়কে পাঠিয়েছেন রাজধানীস্থাপনের জন্য নতুন স্থান অনুসন্ধান করতে।

[হরিবংশ পু. ২.৪৭-৫১ অধ্যায়]

□ কৃষ্ণের রাজনৈতিক জীবনে সব ঘটনাই বড়ো জটিল। তিনি হঠাৎ বিদর্ভে আসায় বিদর্ভে যে আলোড়ন হল, বিদর্ভের ঘটনার পর মথুরায় তার থেকে কিছু কম আলোড়ন উঠল না। যত ধুরন্ধর রাজনীতিকই হোন, কৃষ্ণ মথুরার সংঘমুখ্য বসুদেবের পুত্র—এইটাই ছিল এতদিন তাঁর পরিচয়। নিজ রাজনৈতিক দক্ষতার বলে অল্পবয়স থেকেই, বলা ভালো কংসবধের দিন থেকেই মথুরায় কৃষ্ণ রাজোচিত সম্মান পেয়ে এসেছেন, তাঁর কথা সবাই মোটামুটি মান্য করেন। আপন কীর্তির বলে তিনি প্রায় ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত, তাও ঠিক ছিল। কিন্তু মথুরার বাইরে, বিদর্ভদেশের মাটিতে যখন জরাসন্ধ বিরোধী রাজগোষ্ঠী কৃষ্ণকে রাজেন্দ্র পদে অভিষিক্ত করলেন, তখন মথুরার সংঘমুখ্যরা এমনকী রাজা উগ্রসেনও ভাবতে শুরু করলেন যে, যদু-বৃষ্ণিদের শাসনভার কৃষ্ণের হাতে তুলে দিয়ে তাঁর অধীনতা স্বীকার করাই বোধ হয় ভালো। কৃষ্ণের অন্য দেশের মাটিতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা দেখে বোধহয় ভয়ও পেলেন একটু। যিনি বিদেশে বসে 'রাজেন্দ্র' রূপে সম্মানিত হয়েছেন, তাঁকে রাজ্য না দিলে হয়তো আপন ক্ষমতায় অধিকার করবেন— এমন ভাবনাও উগ্রসেনের মনে এল। ফলে বিদর্ভ থেকে কৃষ্ণ যখন মথুরায় ফিরলেন, তখন

মথুরাবাসীরা 'রাজেন্দ্র' কৃষ্ণকে রাজার মতোই স্বাগত জানাল, স্বয়ং উগ্রসেন এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর সভায় বসিয়ে কৃষ্ণকেই মথুরার রাজা হতে বললেন। কৃষ্ণ কিন্তু রাজা হতে চাইলেন না। উগ্রসেনের আনুগত্য স্বীকার করলেন মাথা নত করে। তারপর ভরা দরবারে তাঁকে ঘোষণাও করতে হল যে, সিংহাসনের লোভ তাঁর নেই। উগ্রসেন এবং সংঘমুখ্যরা আশ্বস্ত হলেন, কৃষ্ণের বিনীত ব্যবহার দেখে আনন্দিতও হলেন। তবু এ ঘটনার তাৎপর্য্য দাঁড়াল এটুকুই যে, কৃষ্ণ আজ থেকে শুধুমাত্র সংঘমুখ্য বসুদেবের ছোটো-ছেলেটির পরিচয়ে আবদ্ধ রইলেন না। মথুরায় তথা সমগ্র ভারতে 'গরুড়ধ্বজ' কৃষ্ণ এক নতুন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং সে প্রতিষ্ঠা সিংহাসনে আসীন না থেকেও কোনো রাজার থেকে কোনো অংশে কম নয়। বলা ভালো বিদর্ভের ঘটনার দ্বারা ভারতের রাজনীতিতে 'ব্র্যান্ড' কৃষ্ণ মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন।

[হরিবংশ পু. ২.৫৫.১-১২৭]

□ এদিকে কালযবনের মথুরা পৌঁছতে আর কদিন মাত্র বাকি। গরুড় এসে সংবাদ দিলেন— রৈবতক পর্বতের কোলে তিন দিক সমুদ্রে ঘেরা নিরাপদ কুশস্থলীতেই নতুন রাজধানী নির্মাণ করা যাবে। উগ্রসেন রাজার সঙ্গে আলোচনা করে কৃষ্ণ যাদবদের মথুরা ত্যাগ এবং নতুন রাজধানী স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন। যদু-বৃষ্ণিদের সভাতেও সকলে এই প্রস্তাব মেনে নিলেন। তারপর সকলে সপরিবারে, ধনসম্পদ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে কুশস্থলীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। কৃষ্ণও গেলেন, তবে নগর নির্মাণ ইত্যাদির কাজ অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে মথুরায় ফিরতে হল কালযবনকে দমন করার উদ্দেশ্যে। সকলকে কুশস্থলীর নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে কৃষ্ণ একা ফিরলেন মথুরায়। *[হরিবংশ পু. ২.৫৬ অধ্যায়]*

□ কালযবন শূন্য মথুরাপুরী আক্রমণ করলেন, কেউ প্রতিরোধ করতে এগিয়েও এল না। শুধুমাত্র কৃষ্ণ কৌশলে কালযবনকে হত্যা করবেন বলেই মাঝে মাঝেই একা একা কালযবনের দৃষ্টিপথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন যাতে সে একা কৃষ্ণকে অনুসরণ করে। কালযবন এই ফাঁদে পা দিলেন। ভাবলেন—মথুরাপুরী বাঁচানোর ক্ষমতা কৃষ্ণের নেই, অতএব সেটা পরে বুঝে নেওয়া যাবে। আপাতত এই কৃষ্ণের বিষয়েই মনঃসংযোগ করে তাঁকে মেরে ফেলা দরকার। কংস-জরাসন্ধের একতম শত্রু নিপাতিত হোক তাঁর হাতে। কালযবন কৃষ্ণের পিছু নিলেন এবং বুদ্ধিমান কৃষ্ণ তাঁকে কৌশলে আকর্ষণ করে নিয়ে চললেন দূরে—মথুরার প্রত্যন্তভূমিতে পাহাড়গুলির কাছে।

অদ্ভুত কৌশলে কৃষ্ণ কালযবনের জীবনান্ত ঘটিয়ে আনলেন। কৃষ্ণ জানেন যে, প্রাচীনকালের ত্রেতাযুগীয় এক রাজা, যাঁরা নাম মুচুকুন্দ, তিনি মথুরার এই প্রত্যন্তদেশীয় পর্বতগুহায় ঘুমিয়ে আছেন। দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের এক বিরাট যুদ্ধে মুচুকুন্দ দেবতাদের সাহায্য করেন। সেই যুদ্ধে জয় হবার পর দেবতারা মুচুকুন্দকে বর দিতে চাইলে ক্লান্ত-শ্রান্ত মুচুকুন্দ নিশ্ছিদ্র নিরন্তর ঘুমের বর চেয়ে নেন। আর বলেন—আমাকে যে ঘুম থেকে জাগাবে সে যেন আমার চোখের সামনে পড়ে ভস্ম হয়ে যায়। কৃষ্ণ এই মুচুকুন্দের সুখনিদ্রার কথা জানতেন বলেই মুচুকুন্দের গুহার খানিক আগে থেকে জোরে ছুট লাগালেন গুহার দিকে। হতচকিত কালযবন এই আকস্মিকতার চালে অস্ত্রশস্ত্র রেখে নিরস্ত্র অবস্থায় ছুটলেন কৃষ্ণের পিছন পিছন। কৃষ্ণ তাঁকে রাজা মুচুকুন্দের গুহায় আকর্ষণ করে আনলেন এবং নিজে লুকিয়ে পড়লেন গুহার অন্ধকারে। কালযবন গুহার আলো-আঁধারে মুচুকুন্দকে কৃষ্ণ ভেবে লাথি মারলেন তাঁর শরীরে। পদাঘাতে জাগ্রত মুচুকুন্দ দেখলেন কালযবন দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সামনে। দেবতার বর কাজ করল। তাঁর চক্ষু থেকে নির্গত ক্রোধবহ্নি ভস্মসাৎ করে দিল কালযবনকে। মুচুকুন্দের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কৃষ্ণ বেরিয়ে আসলেন গুহা থেকে। *[বি.দ্র. কালযবন]*

[হরিবংশ পু. ২.৫৭ অধ্যায়]

□ এরপর বেশ কিছুকাল কেটে গেল। কৃষ্ণের তৎপরতায় যদু-বৃষ্ণিরা দ্বারকার মতো নিরাপদ দুর্গে প্রতিষ্ঠিত হলেন। এমন সময় হঠাৎ আবার রুক্মিণীর বিবাহের উদ্যোগ আরম্ভ হল জরাসন্ধের তৎপরতায়। এবার আর স্বয়ংবর নয়, জরাসন্ধ নিজে ঘোষণা করলেন—তাঁর পুত্রপ্রতিম, অনুগত চেদিরাজ শিশুপালের সঙ্গেই রুক্মিণীর বিয়ে হবে।

মহাভারতে দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণ বলছেন—জরাসন্ধের বিপক্ষ শিবিরের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য কৃষ্ণ বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের মতো শক্তিশালী রাজাকে অনেকদিন ধরেই নিজের অনুকূলে আনতে চাইছিলেন। ভীষ্মক শুধু যে অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা তাই নয়, তিনি মথুরার যদু-বৃষ্ণিদের জ্ঞাতি আত্মীয়ও বটে। কৃষ্ণের দুঃখ—এমন পরাক্রমশালী একজন ভোজবংশীয় রাজা হয়েও ভীষ্মক জরাসন্ধের অনুগত, জরাসন্ধের কথায় ওঠাবসা করেন। ভীষ্মককে নিজের অনুকূলে আনার জন্যই প্রথমে কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বিবাহ করার কথা ভেবেছিলেন। পরে অবশ্য ঘটনার গতি পরিবর্তিত হয়েছে এবং সেখানে স্থান করে নিয়েছে একটি অত্যন্ত আধুনিক প্রেমকাহিনী।

রুক্মিণীর হৃদয়ে কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের জন্ম হয়েছিল, তা আমরা আগেই জানিয়েছি। তবে বিষ্ণুপুরাণ এটাও জানিয়েছে যে, বৈবাহিক রাজনীতি ছাড়াও তিন ভুবনের সেরা সুন্দরী রুক্মিণীর সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের কথা শুনে কৃষ্ণ মনে মনে বেশ আলোড়িত হয়েছিলেন—

রুক্মিণীং চকমে কৃষ্ণঃ সা চ তং চারুহাসিনী।

বিষ্ণুপুরাণের এই বর্ণনার সমর্থন মেলে হরিবংশেও। এই দুই পুরাণে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহে কৃষ্ণ আমন্ত্রণ না পেলেও আপন পিসতুতো ভাইয়ের বিবাহ উপলক্ষেই যেন বিদর্ভে পৌঁছলেন বলরাম এবং কয়েকজন বৃষ্ণিবীরকে সঙ্গে নিয়ে। তারপর যথাসময়ে সুযোগ বুঝে রুক্মিণীকে হরণ করলেন।

তবে ভাগবত পুরাণের বিবরণ অনেক বিস্তারিত। এখানে দেখা যাচ্ছে, রাজারা, অর্থাৎ শিশুপাল-জরাসন্ধের মিত্ররাজারা বিবাহ উপলক্ষে একে একে কুণ্ডিনপুরে সমবেত হচ্ছেন। পাগ্‌জ্যোতিষপুরের ভগদত্ত, শাল্ব, ভূরিশ্রবা, দন্তবক্র, পৌণ্ড্রক বাসুদেব এবং আরও অনেকেই এসে উপস্থিত হলেন বরযাত্রী হিসেবে। রুক্মিণী এই বিবাহের গুরুতর বিপক্ষে, কিন্তু তাঁর মতামতের অপেক্ষা রেখে তো আর বিবাহ হচ্ছে না। তবু শেষ পর্যন্ত এক বিশ্বস্ত সখীকে তিনি জানালেন মনের কথা—শিশুপাল নয়, বাসুদেব কৃষ্ণের গলায় মালা দিতে চান তিনি। সখীর সাহায্যে এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে ডেকে তাঁর হাতে পত্র দিয়ে রুক্মিণী পাঠালেন দ্বারকায়—

বিচিন্ত্যাপ্তং দ্বিজং কঞ্চিৎ কৃষ্ণায়
প্রাহিণোদ দ্রুতম্।

কৃষ্ণ পেলেন রুক্মিণীর পত্র। পত্রপাঠ শেষ হলে কৃষ্ণ একটু অন্যমনস্ক হয়েই ছিলেন। হঠাৎ সামনে তাকাতেই রুক্মিণীর প্রেরিত সেই ব্রাহ্মণ বললেন—এইটুকুই তাঁর গোপনে পাঠানো সংবাদ আপনাকে নিবেদন করলাম। এখন ভেবেচিন্তে আপনি যা করার করুন—

বিমৃশ্য কর্তুং যচ্চাত্র ক্রিয়তাং তদনন্তরম্।

কৃষ্ণ হেসে ব্রাহ্মণের হাত ধরে বললেন—বিদর্ভ রাজনন্দিনী আমার প্রতি যে প্রেমনিষ্ঠা দেখিয়েছেন, আপনি জানবেন—সে নিষ্ঠা আমারও আছে। তাঁর কথা ভেবে-ভেবে আমারও ঘুম আসে না রাতে—

তথাহমপি তচ্চিত্তো নিদ্রাঞ্চ ন লভে নিশি।

আমি জানি ভীষ্মকের পুত্র রুক্মী আমার সঙ্গে তাঁর বিবাহ-ব্যাপারটি বন্ধ করে রেখেছেন, কিন্তু এটা কি সম্ভব হবে? আগুনের শিখাকে কি তার প্রজ্বলন-স্বভাব থেকে বিরত রাখা সম্ভব—

মৎপরাম্ অনবদ্যাঙ্গীমেধসো'গ্নিশিখামিব।

দ্বারকা থেকে বিদর্ভ পথ খুব কম নয়, কিন্তু শীঘ্রগামী রথে এক রাত্রের মধ্যেই কৃষ্ণ পৌঁছে গেলেন বিদর্ভ—

আনর্তাদ্ একরাত্রেণ বিদর্ভান গমদ্ধয়ৈঃ।

কৃষ্ণ ঠিকই করে নিয়েছিলেন যে, রুক্মিণীকে তিনি হরণ করবেন এবং এই ধরনের বিবাহ ক্ষত্রিয়-পুরুষের কাছে কিছু অপ্রচলিত ছিল না। অতএব হরণ করার এই বিষয় তিনি যদু-বৃষ্ণিকুলের প্রধান পুরুষদের সঙ্গে আলোচনা করেই ঠিক করলেন, অন্তত ভাগবত পুরাণের থেকে প্রাচীন হরিবংশ তাই বলে—

তৎপ্রমাথে'করোদ্ বুদ্ধিং বৃষ্ণিভিঃ প্রণিধায় চ।

এই আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল— কেন না কংসহত্যার কারণে কৃষ্ণের সঙ্গে জরাসন্ধ, এবং তাঁর মিত্রপক্ষের সংঘাত বেঁধেছে। এখন কাউকে কিচ্ছু না বলে কৃষ্ণ যদি একাই বিদর্ভে চলে যেতেন, তবে প্রতিক্রিয়া হিসেবে জরাসন্ধ-শিশুপালদের সম্মিলিত আক্রমণের ধাক্কাটা আকস্মিকভাবে যদু-বৃষ্ণিদের ওপরে এসে পড়ত।

অতএব নিজের ব্যক্তিগত বৈবাহিক ভাবনা সবার সঙ্গে আলোচনা করে ফেলায় জরাসন্ধের শত্রুতা নিবন্ধন কোনো সম্ভাব্য আক্রমণ যদু-বৃষ্ণিদের সামগ্রিক ভাবনার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলেন কৃষ্ণ। ফলে কৃষ্ণ যখন দারুককে সারথি করে একা ছুটলেন বিদর্ভের পথে, তখন কৃষ্ণজ্যেষ্ঠ বলরাম বিশাল সৈন্য নিয়ে কৃষ্ণের প্রায় পিছন-পিছনই পৌঁছলেন বিদর্ভে।

হরিবংশতে যেমন দেখি—রুক্মিণী দেবকার্য সম্পন্ন করে মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্রই—নিষ্ক্রামন্তীং সুরালয়াৎ—কৃষ্ণ হঠাৎ কোথা থেকে এসে রুক্মিণীকে একেবারে সবলে কোলে তুলে নিয়ে রথে তুলেছেন—

উন্মথ্য সহসা কৃষ্ণঃ স্বং নিনায় রথোত্তমম্।

কৃষ্ণ রুক্মিণীকে রথে স্থাপন করেই দ্রুতগামী অশ্ব চালিয়ে দিলেন দ্বারকাপুরীর দিকে।

জরাসন্ধের সম্পূর্ণ বাহিনী যখন শরজালে আচ্ছন্ন করল যাদব বাহিনীকে, রুক্মিণী তখন লজ্জা পাচ্ছিলেন, ভয়ও পাচ্ছিলেন। যদু প্রধানদের সঙ্গে জরাসন্ধ-বাহিনীর নামী-দামি রাজাদের যুদ্ধ হয়েছে। সৈন্যদের মধ্যেও হস্তীযোদ্ধা, রথযোদ্ধা এবং অশ্বারোহীরা তাঁদের প্রতিকল্প হস্তী-রথ-অশ্বের সশস্ত্র যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন—

রথৈঃ রথাশ্চ সংরব্ধাঃ সাদিনশ্চাপি সাদিভিঃ।

তবে সেদিন বলরামের যুদ্ধশক্তির প্রদর্শনী ছিল অনবদ্য, যুদ্ধের পরিচালনাও ছিল চমৎকার। জরাসন্ধ-শিশুপাল, শাল্ব-দন্তবক্ররা একসময় বিধ্বস্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিলেন।

জরাসন্ধ শিশুপালরা রণে ভঙ্গ দিলেও রুক্মিণীর ভাই রুক্মী এত সহজে হাল ছাড়লেন না। তিনি বলরাম-সাত্যকিদের ছেড়ে সোজা কৃষ্ণ যে পথে রুক্মিণীকে নিয়ে রওনা দিয়েছেন সেই পথে চললেন। যাওয়ার সময় প্রতিজ্ঞা করলেন—আমি কৃষ্ণকে বধ না করে রাজধানী কুণ্ডিনপুরে ফিরব না—

কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্।

কৃষ্ণের পিছু নিয়ে একসময় রুক্মী তাঁকে ধরেও ফেললেন। কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তাঁকে পরাস্ত হতে হল। তাঁর সারথি মারা গেল, রথের ধ্বজা কাটা পড়ল। এমন সময় রুক্মিণী পরাজিত ভ্রাতার প্রাণভিক্ষা চাইলেন কৃষ্ণের কাছে। কৃষ্ণ রুক্মিণীর কথা রাখলেন এবং রুক্মীকে মুক্ত করে অভয় দান করলেন। তারপর রুক্মিণীকে নিয়ে ফিরে এলেন দ্বারকায়।

[হরিবংশ পু. ২.৫৯-৬০ অধ্যায়;
ভাগবত পু. ১০.৫২-৫৪ অধ্যায়]

□ মহাভারতের কাহিনীতে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতেই প্রথম কৃষ্ণকে সশরীরে উপস্থিত থাকতে দেখা গেলেও, পুরাণগুলিতে বর্ণিত হয়েছে যে, পাণ্ডবরা যখন বিদুরের সহায়তায় বারণাবতের লাক্ষাগৃহ থেকে পালিয়ে অজ্ঞাতবাস করছেন, সেই সময় অগ্নিকাণ্ডে কুন্তী এবং কুন্তীপুত্রদের পুড়ে মারা যাওয়ার সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণ সাত্যকিকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে এসেছিলেন বারণাবতে। অগ্নিদগ্ধ ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে শবদেহ খুঁজছিলেন দুজনে মিলে। কৃষ্ণের হাতে সময় বেশি ছিল না। বারণাবতে তিনি থাকতেও পারেননি বেশিক্ষণ। তবে ঘটনার বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, পাণ্ডবদের অগ্নিদাহের খবর কৃষ্ণ তেমন বিশ্বাস করলেন না। স্থানীয় লোকেরা আগে থেকেই সমাতৃক পঞ্চনিষাদের দগ্ধ দেহ দেখতে পেয়েছিল। তারা সেই দেহাবশেষ কৃষ্ণকে দেখাতে কৃষ্ণ ভালোভাবে নিরীক্ষণ করলেন সেগুলি। কিন্তু সেই দগ্ধ কঙ্কালের মুখাবয়ব, চোয়ালের অবস্থান, শরীরের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি বিবেচনা করেই কৃষ্ণ বুঝলেন—এঁরা পাণ্ডব নন, পিসী কুন্তীও নন। কিন্তু কথাটা তিনি প্রকাশ করলেন না, বরং পাণ্ডবদের প্রয়োজন বুঝেই তিনি একটা লোক দেখানো শ্রাদ্ধ করলেন—

পাণ্ডবানাং তু দগ্ধানাং হরিঃ কৃত্বোদকক্রিয়াম্।

কিন্তু শ্রাদ্ধ করার পর তিনি সাত্যকিকে বলে গেলেন পাণ্ডবদের অস্থিসংগ্রহ করতে। কৃষ্ণ অবশ্য নিজে বারণাবতে আর এক মুহূর্তেও থাকতে পারলেন না। তাঁকে দ্বারকায় ফিরে যেতে হল আপন ঘরের বিবাদ মেটানোর জন্য। দ্বারবতী নগরীতে এমন একটা ভয়ংকর বিবাদ পাকিয়ে উঠেছিল যাতে তাঁর শ্বশুরকে হত্যা করা হয়েছিল নৃশংসভাবে এবং সেটা কৃষ্ণের এই সাময়িক অনুপস্থিতির সময়েই—যখন তিনি বারণাবতে ছুটে এসেছিলেন পাণ্ডবদের খবর নিতে। এই সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের পিছনে অবশ্যই কৃষ্ণের অন্তর্গৃহের বিবাদ ছিল এবং সে বিবাদ কত গভীর, তার হদিশ মেলে এই ঘটনায় যে, কৃষ্ণের মতো এত বড়ো প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের শ্বশুরকেই প্রাণ

হারাতে হল তাঁর প্রায়-স্বজনদের হাতে। সবচেয়ে বড়ো কথা, যাঁর সূত্রে তিনি কৃষ্ণের শ্বশুর—তিনি হলেন সত্যভামা—কৃষ্ণের প্রিয়তমা মহিষী। সত্যভামা সত্রাজিতের মেয়ে এবং সত্রাজিৎ স্বয়ং যদু-বৃষ্ণি-অন্ধকদের বংশে জাত, অন্যতম কুলপ্রধান। সেই দিক থেকে সত্রাজিৎ মোটামুটি কৃষ্ণের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই পড়েন। তাঁকে মেরে ফেললেন কৃষ্ণের আর এক আত্মীয় এবং মৃত্যুঘটনা ঘটার পর সেই সুদূর দ্বারবতী থেকে একটা রথে চড়ে যিনি স্বয়ং বারণাবতে এসে কৃষ্ণের কাছে মৃত্যুর খবর দিলেন, তিনি কৃষ্ণমহিষী সত্যভামা—

প্রযযৌ রথমারুহ্য. . . সত্যভামা যশস্বিনী।

[হরিবংশ পৃ. ১.৩৯.৬-৭]

□ রুক্মিণীর বিবাহের পর এই মুহূর্তে কৃষ্ণের এই যে অন্যতরা পত্নীর নাম শুনলাম আমরা, ইনি কৃষ্ণের তৃতীয়া পত্নী। কৃষ্ণের অন্যতম প্রিয়া পত্নীও বটে। তবে সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ এবং যদু-বৃষ্ণি কুলের আভ্যন্তরীণ দীর্ঘ কলহ ইত্যাদি ঘটনার কেন্দ্রে বস্তুত ছিল একটি মণি। যদুকুলের আভ্যন্তরীণ বিবাদের এই ঘটনাটি কৃষ্ণের রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলেই এবিষয়ে একটু বিশদে আলোচনা করা প্রয়োজন। অনিন্দ্যসুন্দরী সত্যভামা বৃষ্ণি-অন্ধক-ভোজদের কুলে এমনই একজন কাঙ্ক্ষিত রমণী, যাঁর হৃদয়-লিপ্সু ছিলেন অনেকেই এবং সেখানে বয়সের ব্যাপারটা ছিল বড়োই খাপছাড়া—তাঁর সমবয়সি, কম বয়সি, এমনকী বেশ বেশি বয়সের পুরুষেরাও সত্যভামাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। এ কথা আমরা 'বিষ্ণুপুরাণ'-এর প্রাচীন বিবরণ থেকে জেনেছি। বরঞ্চ বলব—কৃষ্ণই কখনো এই আকাঙ্ক্ষী পুরুষদের তালিকায় ছিলেন না। এক্ষেত্রে সত্যভামা ছাড়াও আর যে বস্তুটা তিন-চারজন অভিজাত মানুষকে, আতুর করে তুলেছিল, সেটি এক অলৌকিক মণি। তার নাম স্যমন্তক। শুধু মণি বললে ব্যাপারটা বেশ কম বলা হয়, পৌরাণিকরা অনেকেই এটাকে মণিরত্ন বলেছেন—মণিরত্নং স্যমন্তকম্। সত্যভামা যদু-বৃষ্ণিদের অন্যতম কুলমুখ্য সত্রাজিতের মেয়ে। সত্রাজিৎ এবং প্রসেন দুই ভাই। সূর্যদেবতার প্রাণপ্রিয় বন্ধু ছিলেন সত্রাজিৎ। একসময় সূর্যদেবতার কাছ থেকে তিনি লাভ করলেন এক অলৌকিক মণি—স্যমন্তক মণি।

পরম ভাস্বর এবং উজ্জ্বল এবং বেশ বড়ো এই নবলব্ধ স্যমন্তক মণি, অতএব খুব মহার্ঘ্য এবং অলৌকিকভাবেই ভীষণ মূল্যবান। সত্রাজিৎ যখন এই মণি গলায় বেঁধে, নগরে প্রবেশ করলেন, তখন এটা লুকিয়ে নেওয়ার উপায় ছিল না। লোকে তাঁর পিছন পিছন চলতে লাগল অবাক বিস্ময়ে এবং তারা ভাবল—স্বয়ং সূর্যই বুঝি চলছেন সত্রাজিতের সঙ্গে লগ্ন হয়ে।

'হরিবংশ' এবং 'বিষ্ণুপুরাণ' দুটিতেই বলেছে—এই মণি না কি প্রতিদিন আট ভার সুবর্ণ প্রসব করত এবং এই মণি যার ঘরে থাকবে, তার বাসস্থানিক রাষ্ট্রে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি কিচ্ছু হবে না, রোগভোগ, অগ্নিদাহ, চোর-ডাকাতেরও ভয় থাকবে না।

কৃষ্ণ সঙ্গতভাবে ভেবেছিলেন যে, মণিটি যদু-বৃষ্ণি-সংঘের কুলপতি রাজা উগ্রসেনের কাছেই থাকা উচিত। মণির এত গুণ—সেটি অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি-রোগভোগ সব দূর করে, তার মধ্যে সে মণির এত দাম, অতএব তা রাজোপাধিধারী উগ্রসেনের কাছেই সুরক্ষিত হওয়ার দরকার। তাতে মণিটি রাষ্ট্রের সার্বিক উপকারে লাগবে। কৃষ্ণ এই রাষ্ট্রীয় সম্ভাবনার কথা সত্রাজিৎকে জানিয়েছিলেন, চেয়েওছিলেন সেটা উগ্রসেনের জন্য—

অচ্যুতো'পি তদ্রত্নম্ উগ্রসেনস্য
যোগ্যমেতদিতি লিপ্সাঞ্চক্রে।

কিন্তু কৃষ্ণের এই মানসিকতা সত্রাজিৎ বুঝতে পারলেন না এবং তাঁদের সমগ্র কুলপ্রধানদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতার মুখে স্যমন্তক মণির সঠিক উপস্থাপন নিয়ে একটি-দুটি কথাই কিন্তু তাঁর মনে এই সন্দেহ তৈরি করে দিল যে, ওই মণিটির ওপর কৃষ্ণের লোভ আছে অথবা নিদেনপক্ষে দৃষ্টি আছে মণিটির ওপর।

সত্রাজিৎ আর দেরি করলেন না। পাছে কৃষ্ণ চেয়ে বসেন মণিটি এবং কৃষ্ণ চাইলে মণি না-দিয়ে বসে থাকার যুক্তি মোটেই থাকবে না ভেবে সত্রাজিৎ তাঁর স্বলব্ধ মণিটি রেখে এলেন ভাই প্রসেনের বাড়িতে।

'হরিবংশ' থেকে 'বিষ্ণুপুরাণ'-এর প্রাচীন বিবরণ, সব তথ্যই বলছে যে, প্রসেন একদিন সেই

স্যমন্তক মণি কণ্ঠে ধারণ করে মৃগয়া করতে বেরোলেন এবং সেখানে তিনি এক সিংহের হাতে মারা যান।

মৃগয়া করতে যাওয়ার পর, অনেক দিন কেটে গেল, সত্রাজিতের ভাই প্রসেনও বাড়ি ফিরছেন না, স্যমন্তক মণিরও কোনো হদিশ-খবর নেই। আস্তে আস্তে যদু-বৃষ্ণি-সাত্বত কুলের মানুষজনের মধ্যে নানা কথা আরম্ভ হল। নানা জায়গায় খবর নিয়ে অনেকেই প্রায় নিশ্চিত হলেন যে, প্রসেন আর বেঁচে নেই। সত্রাজিৎ ভাবলেন—কৃষ্ণ এক সময় উগ্রসেনের জন্য মণিটি চেয়েছিলেন—হয়তো বা নিজের জন্যই চেয়েছিলেন, লোভ এড়াতে পারেননি বলেই চেয়েছিলেন। কিন্তু মণিটা কৃষ্ণ চেয়েও পাননি। অতএব প্রসেনকে বনের আড়ালে একলা পেয়ে তাঁকে মেরে ফেলার মতো জঘন্য কাজটা কৃষ্ণই করেছেন, অন্য কেউ নন এবং মণিটিও এখন তাঁর কাছেই আছে—

কৃষ্ণো মণিরত্নমভিলষিতবান্ ন চ প্রাপ্তবান্,
নূনমে তদস্য কর্ম, নান্যেন প্রসেনো হন্যত ইতি।

সত্রাজিৎ তো তবু খানিক অনুমানের প্রমাণ-ভিত্তিতে কৃষ্ণের সম্বন্ধে নিন্দাবাদ আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু, সেই নিন্দাবাদ যখন অন্যান্য যদু-বৃষ্ণি কুলপ্রধানদের কানে পৌঁছল, তখন তাঁরা কৃষ্ণের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদটুকু পাঁচগুণ প্রচার করে দিলেন। ফলত কৃষ্ণের নামে সমস্ত রাষ্ট্র জুড়ে কানাকানি আরম্ভ হল—

অখিল এব যদুলোকঃ পরস্পরং
কর্ণাকর্ণি অকথয়ৎ।

সকলেই অন্যের প্রচারে বিমূঢ় হয়ে, কৃষ্ণকে প্রায় চোর বলে ঠাউরে ফেললেন—সর্ব এব শশঙ্কিরে।

'বিষ্ণুপরাণ' বলেছে—অক্রূর, কৃতবর্মা, শতধন্বা প্রমুখ যাদব কুলের মুখ্যপুরুষরা সত্রাজিৎদুহিতা সত্যভামাকে অনেকদিন ধরে প্রার্থনা করে চলেছিলেন—

তাঞ্চ অক্রূর-কৃতবর্ম-শতধন্ব-প্রমুখাঃ
যাদবাঃ পূর্বং বরয়ামাসুঃ।

এখানে 'প্রমুখ' মানে প্রভৃতি, তার মানে অক্রূর-কৃতবর্মা-শতধন্বাই শুধু নন, যাদবদের আরও কেউ কেউ সত্যভামার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। 'হরিবংশ' কিন্তু প্রথমেই এতজনের নাম বলেনি এবং পরবর্তী ঘটনার গতি-প্রকৃতি থেকেও এটাই প্রমাণ হয়—কৃতবর্মা এবং শতধন্বা পরে অক্রূরের সঙ্গে জড়িয়ে যান এবং জড়িয়ে যাওয়ার পর থেকে, সত্যভামার ব্যাপারে তাঁদের দুর্বলতা বাড়তে থাকে। কিন্তু প্রথমে যে মানুষটি সত্যভামার ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন, তাঁর সত্যভামার ওপরে যতখানি নজর ছিল, ঠিক ততখানি নজর ছিল মণিরত্ন স্যমন্তকের ওপর—তিনি এঁদের বয়োজ্যেষ্ঠ—অক্রূর—

সদা হি প্রার্থয়ামাস সত্যভামাম্ অনিন্দিতাম্।
অক্রূরো'ন্তরমন্বিচ্ছন্ মণিশ্চৈব স্যমন্তকম্॥

তবে সত্রাজিৎ দুহিতা সত্যভামার প্রসঙ্গ ছেড়ে আমরা আপাতত স্যমন্তকমণির কথায় আসি। মণি চুরি যাওয়ার কথা এবং নিজের উপর চোর অপবাদ—এই দুইই যথাসময়ে কৃষ্ণের কানে পৌঁছাল। কতকটা আপন কলঙ্কমোচনের জন্যই, স্যমন্তক মণি কোথা থেকে উদ্ধার করা যায়, এই ভাবনাতেই কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়লেন। সেই বনের পথে, যেখান দিয়ে গিয়েছিলেন সত্রাজিতের ভাই প্রসেন। কৃষ্ণ সঙ্গে নিয়েছিলেন দাদা বলরাম এবং বিশ্বস্ত দু-একজন যদু-মুখ্যকে। বনের মধ্যে প্রবেশ করে, সেখানকার বিশ্বাসী বনচারীদের নিয়ে সেইখানে পৌঁছলেন, যেখানে মৃগানুসারী প্রসেনের পদচিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল। আপ্তপুরুষদের দিয়ে প্রসেনের পদচিহ্ন সংগ্রহ করে—

প্রসেনস্য পদং গৃহ্য পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।

—সেই পদক্রমে এগোতে এগোতে কৃষ্ণ বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন, যদিও ততক্ষণে তিনি ঋক্ষবান এবং বিন্ধ্যপর্বতের মাঝামাঝি এসে পৌঁছেছেন। ঠিক এইখানে প্রসেনের পদচিহ্ন দেখে এগোতে-এগোতেই কৃষ্ণ দেখলেন—প্রসেনের অশ্বটি মরে আছে এবং তার খানিক দূরে প্রসেনের মৃতদেহ। কিন্তু সেখানে ভাস্বর স্যমন্তক মণির কোনো চিহ্ন দেখতে পেলেন না কৃষ্ণ, কিন্তু প্রসেনের মৃত্যুর জায়গা এবং তার আশেপাশে একটি সিংহের পদচিহ্ন দেখতে পেলেন। একবার তাঁর মনে হল, বিশেষত প্রসেনের মরদেহে যেসব আঘাতের চিহ্ন দেখলেন—সিংহটাই প্রসেনকে মেরেছে। তারপর খানিকটা বিমূঢ় হয়ে সিংহের পায়ের চিহ্ন ধরে তিনি এগোতে লাগলেন, হঠাৎই দেখলেন—সিংহটাও মরে পড়ে আছে এবং সেখানে আছে এক ভল্লুকের পায়ের চিহ্ন, লোম

ইত্যাদি। কৃষ্ণ এবার ভল্লুকের পদ-যাত্রাপথে চলতে চলতে শেষপর্যন্ত এক ঋক্ষ-বিল বা ভল্লুকের গুহায় প্রবেশ করলেন।

গুহায় ঢোকার পর কৃষ্ণ শুনতে পেলেন— একটি বালককে একজন ধাত্রী বোঝাচ্ছে— সুকুমার! ছোট্ট ছেলে আমার! অমন করে কাঁদে না—সুকুমারক মা রোদীঃ। এই স্যমন্তক এখন থেকে তোমারই থাকবে। জানো তো, সেই প্রসেনের কাছে এই স্যমন্তক ছিল, সেই প্রসেনকে মেরে ফেলল একটা সিংহ, আর সিংহকে মারল জাম্ববান। জাম্ববান তোমার জন্যই এটা নিয়ে এসেছে, তুমি কেঁদো না বাছা! এই স্যমন্তক এখন তোমারই—তব হি এষ স্যমন্তকঃ—

সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ॥

কৃষ্ণ এটা বুঝতে পারলেন যে, স্যমন্তক মণি উদ্ধার করতে গেলে ভল্লুক-গোষ্ঠীর এই নেতার সঙ্গে তাঁর একটা লড়াই হবেই এবং সেখানে গুহা-পরিসরের অবিকীর্ণ ভূমির মধ্যে অনেকগুলো লোক প্রবেশ করলে লড়াইটা হয়তো সহজ হবে, কিন্তু এক ক্ষুদ্র বালকের অধিকারে থাকা স্যমন্তক-মণির উদ্ধার সেখানে কঠিন হয়ে পড়বে। অতএব কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গী-সাথী, বলরাম এবং অন্যান্য দু-একজন বিশ্বস্ত যদু-বৃষ্ণি-সংঘের লোক, যাঁরা তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁদের সবাইকে ঋক্ষ-গুহার বাইরে অপেক্ষা করতে বলে—

স্থাপয়িত্বা বিলদ্বারি যদূন্ লাঙ্গলিনা সহ।

—একা প্রবেশ করলেন জাম্ববানের গুহায়।

বাইরে বলরাম এবং অন্যান্য দু-একজন যদুমুখ্য সাত-আট দিন অপেক্ষা করলেন কৃষ্ণ কবে ফিরবেন সেই অপেক্ষায়। কিন্তু সাত-আট দিন বড়ো কম সময় নয় এবং এতদিনে কৃষ্ণের মতো কৌশলী নেতা-যোদ্ধা ফিরে আসছেন না, এটা আরও বড়ো কথা। হয়তো এজন্যেই তাঁদেরও সাহস হল না ঋক্ষ-গুহার মধ্যে প্রবেশ করার। অবশেষে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন—কৃষ্ণ মারা গিয়েছেন। বলরামরা দ্বারবতী নগরীতে ফিরে এসে সবাইকে জানালেন—কৃষ্ণ মারা গিয়েছেন—

পুরী দ্বারবতীমেত্য হতং কৃষ্ণং ন্যবেদয়ন্।

এদিকে দ্বারকায় কৃষ্ণের শ্রাদ্ধশান্তিও হয়ে গেল, ওদিকে দীর্ঘ দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর জাম্ববান কৃষ্ণের হাতে পরাস্ত হলেন। জাম্ববান কৃষ্ণের কাছে হেরে গিয়ে, তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করলেন দুটি উপায়ে। প্রথমত, তিনি নিজের মেয়ে জাম্ববতীকে তুলে দিলেন কৃষ্ণের হাতে, সেই সঙ্গে তিনি কৃষ্ণের হাতে তুলে দিলেন স্যমন্তক মণি—একেবারে বৈবাহিক উপহার। কৃষ্ণের দিক থেকে নিজের চৌরাপবাদ এবং হত্যার অপরাধ ঘোচানোর জন্য স্যমন্তক মণি পেয়ে যাওয়াটাই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু উপরি পাওনা হিসেবে জাম্ববতীকে লাভ করাটা তাঁর কাছে মধুর-রসপূর্তির আকস্মিকতাই বলা উচিত। কৃষ্ণের চরিত্রই এমন যে, না চাইতেও বিনা চেষ্টাতে স্যমন্তক মণির সঙ্গে এমন রমণী-রত্ন লাভ করাটা তাঁর অনায়াস-সাধ্য পৌরুষের প্রাপ্তিযোগ বলে মনে হয়।

অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া এই স্বয়মাগতা ভল্লুক-বধূকে তিনি অবহেলা করেননি। তাঁকে বিধিপূর্বক বিবাহ করে নিয়ে এসেছেন দ্বারবতী নগরীতে। সঙ্গে স্যমন্তক মণি। বিষ্ণুপুরাণ বলেছে—যিনি নিজের মেয়েকে কৃষ্ণের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পরম আত্মীয়তা তৈরি করলেন, তাঁর কাছ থেকে স্যমন্তক মণিটা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াটা কৃষ্ণের মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না। কিন্তু নিজেকে চোর অপবাদ থেকে মুক্ত করার দায় তাঁর রয়েছে। অতএব কৃষ্ণ, মণি এবং জাম্ববতীকে নিয়ে এলেন দ্বারকায়।

ঋক্ষরাজ জাম্ববানের কাছ থেকে মণি উদ্ধার হল। কৃষ্ণ সকলের সামনে সত্রাজিতের হাতে স্যমন্তক মণিরত্ন তুলে দিলেন—

দদৌ সত্রাজিতে তং বৈ সর্বসাত্ত্বতসংসদি।

—এবং বিনা বাক্যে বুঝিয়ে দিলেন— কোনো বিচার না করে, পূর্বাপর কোনো ঘটনা ভালো করে খতিয়ে না দেখেই যে হঠাৎ তাঁকে চোর বলে প্রতিপন্ন করা হল—সে-কাজটা ভালো হয়নি মোটেই।

সত্রাজিৎ আপন ব্যবহারে সকলের সামনে খুবই লজ্জা পেলেন এবং মনে-মনে তাঁর একটু ভয়ও ধরল। এই ভয়েই সত্রাজিৎ কৃষ্ণকে খানিকটা সন্তুষ্ট করতে চাইলেন ঋক্ষরাজ জাম্ববানের দৃষ্টান্তেই। তিনি তাঁর অপূর্ব সুন্দরী কন্যা সত্যভামাকে তুলে দিলেন কৃষ্ণের হাতে—বিনা কোনো আড়ম্বরে, বিনা কোনো পূর্বালোচনায়—

ময়া অস্য অভূতমলিনম্ আরোপিতম্ ইতি
জাতসন্ত্রাসঃ স্বসুতাং সত্যভামাং
ভাগবতে ভার্য্যাং দদৌ।

আমরা আগেই জানিয়েছি যে, অক্রূর কৃতবর্মা, শতধন্বার মতো আরও কেউ কেউ সত্যভামার হৃদয়-লিপ্সু মানুষ ছিলেন। এই স্যমন্তক মণি যখন পুনরায় সত্রাজিতের কাছে ফিরে এল, অথচ সত্যভামার বিয়ে হয়ে গেল কৃষ্ণের সঙ্গে, তখন অক্রূরের হৃদয়ে আঘাত নেমে এল সর্বতোভাবে। তাঁর রাজ্যও গেল, রাজকন্যাও গেল। বিশেষত, এতকালের প্রার্থিত সত্যভামা কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় অক্রূর যতখানি কৃষ্ণের ওপর ক্ষিপ্ত হলেন তার চেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত হলেন সত্রাজিতের ওপর। এই বিবাহ-ঘটনার পর, অক্রূর প্রথম গেলেন কৃতবর্মার কাছে, কেননা বিষ্ণুপুরাণের বিবরণ অনুযায়ী কৃতবর্মাও সত্যভামার অনুরাগী ছিলেন এবং সর্বশেষে দুজনে গিয়ে উপস্থিত হলেন শতধন্বার বাড়িতে। বালক-কিশোর শতধন্বা, সে স্যমন্তক মণি বোঝে না, অক্রূরের জটিল হৃদয় বোঝে না, এমনকী দাদা কৃতবর্মার কতটুকু সরসতা আছে সত্যভামার ব্যাপারে, সে তাও বোঝে না, সে শুধু নিজেরটা বোঝে। সে সত্যভামার অন্যতম অনুরাগী। সেই সুযোগটুকু নিয়ে অক্রূর আর কৃতবর্মা তাঁকে উত্তেজিত করার জন্যই বলতে লাগলেন—দেখো শতধন্বা। এই সত্রাজিৎ অতি দুষ্ট লোক—

অয়ম্ অতিদুরাত্মা সত্রাজিতঃ।

অক্রূর বললেন—দ্যাখো, আমরা সবাই তো সত্যভামাকে পেতে চেয়েছিলাম—আমি চেয়েছিলাম, কৃতবর্মাও তাকে চেয়েছিলেন, আর সবার ওপরে আছ তুমি। তুমি কত করে চেয়েছিলে এই সত্যভামার হৃদয় কিন্তু সত্রাজিৎ কী করল? আমাদের সবাইকে অনাদর-অবজ্ঞা করে, বিশেষত তোমার কথা তো খেয়ালই করল না—সে শেষে কিনা কৃষ্ণের হাতে তুলে দিল মেয়েকে—

ভবতা চ অভ্যর্থিতো'পি আত্মজাম্ অস্মান্
ভবন্তং চ অবিগণয্য কৃষ্ণায় দত্তবান্।

সমস্ত ক্রোধের অভিমুখ সত্রাজিতের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে অক্রূর শতধন্বাকে বললেন—এই সত্রাজিৎ লোকটার বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। ওকে এই উচিত শিক্ষাটুকু দেওয়ার জন্য তুমি এই কাজটুকু অন্তত করো, ওকে মেরে ওর কাছ থেকে ওই মণি-রত্ন স্যমন্তক উদ্ধার করো এবং সেটা তুমিই নাও—

ঘাতয়িত্বৈনং তন্মহারত্নং ত্বয়া কিং ন গৃহ্যতে।

শতধন্বা ঠিক করলেন—তিনি সত্রাজিৎকে হত্যা করবেন এবং হঠাৎই দৈবও খুব অনুকূল হয়ে গেল। ঠিক এই সময়েই, মহামতি কৃষ্ণের কাছে খবর এসে পৌঁছল যে, বারণাবতের জতুগৃহে পাণ্ডবরা জননী কুন্তীর সঙ্গে অগ্নিদাহে মারা গিয়েছেন।

কৃষ্ণ যেহেতু দ্বারকার বাইরে, অতএব এই সময়টাই সত্রাজিৎকে মেরে ফেলার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়—এই কথা ভেবে শতধন্বা রাতের অন্ধকারে সত্রাজিতের ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর ঘুমন্ত অবস্থায় সত্রাজিতকে মেরে তাঁর গৃহ থেকেই সংগ্রহ করলেন সযত্ন-রক্ষিত মণিরত্ন স্যমন্তক। পরের দিন সকালবেলায় শোকের ঝড় উঠল দ্বারকায়। সদ্যোবিবাহিতা সত্যভামা পিতৃগৃহে এসে দেখলেন—নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে তাঁর পিতাকে।

কুলমুখ্যদের শাসনে কাছাকাছি আত্মীয়-স্বজন জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যে খবর পেয়ে যাওয়াটা খুব কঠিন কাজ ছিল না। সত্যভামার নিজের সন্দেহও কাজ করছিল। অতএব খবর পেতে তাঁর দেরি হল না। কিন্তু এই মুহূর্তে সবচেয়ে যেটা কঠিন এবং সপ্রতিভ কাজ ছিল, সেটাই করে দেখালেন সত্যভামা। কারও সঙ্গে তিনি আলোচনাতেও প্রবৃত্ত হলেন না, নিজের কাজের জন্য সমর্থিত হওয়ারও চেষ্টা করলেন না। সোজা একটি সারথি সহায় করে রথারূঢ়া সত্যভামা রওনা দিলেন বারণাবতের দিকে।

সত্যভামা বারণাবতে এসে, কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করে বললেন—আমার পিতা তোমার হাতে তুলে দিয়েছেন আমাকে, আর ঠিক সেইজন্যই শতধন্বা রেগে গিয়ে আমার বাবাকেই মেরে ফেলল—

ভগবতে'হং প্রতিপাদিতেতি অক্ষান্তিমতা
শতধন্বনা অস্মৎপিতা ব্যাপাদিতঃ।

এই হত্যার পিছনে সত্যভামার সঙ্গে স্যমন্তক মণিও যে অন্যতম একটা কারণ, সেটাও জানিয়ে সত্যভামা বললেন—মণিটি শতধন্বাই নিয়ে গিয়েছে।

কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে এলেন এবং সময় নষ্ট না করে, বলরামকে বললেন—রথে ওঠো শিগ্‌গির, আমাদের ধরতে হবে শতধন্বাকে, আমার শ্বশুরের হন্তা পুরুষকে শাস্তি দিতে হবে—তদ্‌উত্তিষ্ঠ।

আরুহ্যতাং রথঃ শতধনু-নিধনোদ্যমং কুরু।

কৃষ্ণ এবং বলরাম শতধন্বাকে খুঁজে বার করার জন্য, রথে আরোহণ করলেন।

শতধন্বা খবর পেলেন যে, কৃষ্ণ-বলরামকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে হত্যা করার উদ্যোগ করছেন। কৃষ্ণ-বলরামের ক্ষমতা তিনি জানতেন বলেই বিপন্ন বোধ করে, তিনি প্রথমে উপস্থিত হলেন দাদা কৃতবর্মার কাছে। কৃতবর্মা মুহূর্তে গুটিয়ে নিলেন নিজেকে এবং শতধন্বাকে বললেন—আমি পারব না। কৃষ্ণ এবং বলরাম—দু-জনের সঙ্গে বিরোধ করার ক্ষমতা আমার নেই—

নাহং বলভদ্র-বাসুদেবাভ্যাং
সহ বিরোধায় অলম্।

অক্রূরও এই অসময়ে শতধন্বাকে সাহায্য করলেন না। স্যমন্তক মণির ওপর অক্রূরের লোভের কথা শতধন্বা জানতেন। অতএব সময় নষ্ট না করে তিনি অক্রূরকে বললেন—আপনি যদি আমাকে কৃষ্ণের হাত থেকে বাঁচাতে নাই পারেন, তা হলে আমার কাছে থাকা স্যমন্তক মণিটা অন্তত নিজের কাছে রাখুন—

তদয়মস্মমণিঃ সংগৃহ্য রক্ষ্যতাম্।

অক্রূর বললেন, মণি আমি রাখতে পারি, কিন্তু একটা শর্ত আছে—তোমার যদি কৃষ্ণের হাতে প্রাণসংশয় হয়, কিংবা তুমি যদি মারা পড়ো তাঁর হাতে, তবুও তুমি বলতে পারবে না যে, মণিটি আমার কাছে আছে। শতধন্বা স্বীকার করে নিলেন অক্রূরের শর্ত এবং সেই পরম ঈপ্সিত স্যমন্তক মণি অক্রূর ধারণ করলেন নিজের হাতে—

অক্রূরঃ তন্মণিরত্নং জগ্রাহ।

শতধন্বা স্থির করলেন, তিনি পালিয়ে যাবেন, আর বাঁচার কোনো উপায় নেই তাছাড়া—

অপযানে তত বুদ্ধিং ভোজশ্চক্রে ভয়ার্দিতঃ।

কৃষ্ণ ধাওয়া করলেন শতধন্বাকে, সঙ্গে বলরাম। খুব বেশি দূর তাঁকে যেতে হল না। মাত্র দুই ক্রোশ যাওয়ার পরেই শতধন্বাকে তিনি দেখতে পেলেন, এবং কাল বিলম্ব না করে চক্র নিক্ষেপ করে তাঁর মাথা কেটে ফেললেন মুহূর্তে। মৃত্যুর বদলে মৃত্যুর প্রতিহিংসা চরিতার্থ হল বটে, কিন্তু পরম অভীষ্ট সেই স্যমন্তক মণি আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও কৃষ্ণ পেলেন না শতধন্বার কাছে। কৃষ্ণ বেশ বিব্রত বোধ করলেন। ফিরে এসে বলরামকে তথ্য নিবেদন করে বললেন—বৃথাই আমরা শতধন্বাকে মেরে ফেললাম, কিন্তু তিন ভুবনের সার সেই মণিরত্ন স্যমন্তক খুঁজে পেলাম না। কৃষ্ণ-জ্যেষ্ঠ বলরাম—যিনি সদা-সর্বদা কৃষ্ণের অন্তঃকরণ বোঝেন, সেই বলরাম কিন্তু কৃষ্ণকে বিশ্বাস করলেন না, বিশ্বাস করলেন না কৃষ্ণের সত্য নিবেদন। কৃষ্ণকে তিনি বললেন—তোমাকে শত ধিক্ কৃষ্ণ! অর্থসম্পত্তির ওপর তোমার এত লোভ যে, স্যমন্তক মণি হাতে পেয়েও তুমি সে সত্য চেপে গেলে আমার কাছে। কৃষ্ণের ওপর রাগ করে ক্ষোভ প্রকাশ করার পরেই বলরাম চলে গেলেন মিথিলায়।

শতধন্বা নিহত হওয়ার পর, কৃষ্ণ যদি স্যমন্তক মণিটি পেয়ে যেতেন, তবে এই হত্যাকাণ্ড যথার্থভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারত। অথচ মণি না মেলায় স্বজন-হত্যার একপ্রকার দায় কৃষ্ণের ওপর নেমে এল, এবং সেই অস্বস্তি চরমে উঠল দাদা বলরাম তাঁর সঙ্গ ছেড়ে চলে যাওয়ায়। অতিঘনিষ্ঠ বলরাম, শতধন্বার জীবিত অগ্রজ কৃতবর্মা এবং অবশ্যই অক্রূর—এই তিনজন অতি গুরুত্বপূর্ণ মানুষের বিরোধিতা স্কন্ধে নিয়ে কৃষ্ণ জীবন কাটাতে লাগলেন।

স্যমন্তক মণি হাতে পাননি কৃষ্ণ, পাওয়ার সম্ভাবনাও ক্ষীণ হয়ে আসছিল। কিন্তু বিরাট সংশয়ের মধ্যে ছিলেন—মণিটি গেল কোথায়? সন্দেহের আরও একটা বড়ো জায়গা তৈরি হল কৃষ্ণ যখন দেখলেন—অক্রূর হঠাৎ ফুলে-ফেঁপে বড়োলোক হয়ে উঠছেন। সেকালের দিনে বড়োলোকি দেখানোর একটা বড়ো উপায় ছিল যজ্ঞের আয়োজন করা। অক্রূর পরপর যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করে যাচ্ছিলেন—অর্থাৎ, একটা যজ্ঞ শেষ হতে না হতেই অন্য যজ্ঞ আরম্ভ করছিলেন। সংঘরাষ্ট্রীয় শাসনে হঠাৎই এক কুলপ্রধান এত বড়ো যাজ্ঞিক হয়ে উঠছেন কেন এবং যজ্ঞক্রিয়ায় পরপর এত অর্থ ব্যয় করছেন কেন, এবং কোথা থেকেই বা সে অর্থ আসছে, এই প্রশ্ন কৃষ্ণকে গূঢ়ভাবে সংশয়ান্বিত করে তুলল।

এরই মধ্যে গোষ্ঠী-কোন্দলে কৃষ্ণ-ঘনিষ্ঠ সাত্বত-কুলের এক নেতা শত্রুঘ্নকে ভোজান্ধকেরা মেরে ফেলায় অক্রূর কৃষ্ণের ক্রোধ আশঙ্কা করে কুল এবং দলের অনেককে নিয়ে পালিয়ে গেলেন দ্বারকা ছেড়ে। অক্রূর চলে যাওয়া মানেই স্যমন্তক-মণিও স্থানান্তরিত হল তাঁর সঙ্গে। 'বিষ্ণুপুরাণ'-এর বক্তব্য হল—স্যমন্তক অক্রূরের

সঙ্গে পাচার হয়ে যেতেই দ্বারকায় নানান প্রাকৃতিক দুর্লক্ষণ দেখা দিল—অনাবৃষ্টি, মড়ক এবং আরও নানা উপসর্গ।

পুরাণে আমরা দেখেছি—প্রাকৃতিক দুর্লক্ষণের প্রসঙ্গ তুলেই যাদব-বৃষ্ণিরা বলরাম-উগ্রসেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটা সভার আয়োজন করেছেন এবং তার প্রধান উদ্যোক্তা স্বয়ং কৃষ্ণ। তিনি সভায় প্রশ্ন তুললেন—অক্রূর দ্বারকা ছেড়ে চলে যেতেই যে এতসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় একসঙ্গে দেখা দিল, এর কারণ অনুসন্ধান করে একটা বিহিত তো করতে হবে—

কিয়দিদম্ একদৈব প্রচুরোপদ্রবাগমনম্
এতদ্ আলোচ্যতাম্।

—আপনারা আলোচনা করে দেখুন কী করা যায়। আলোচনা আরম্ভ হল এবং এক সময় অন্ধকগোষ্ঠীর এক যদু-বৃদ্ধ বললেন— অক্রূরের পিতা শ্বফল্ক জায়গা ছেড়ে চলে গেলেও এইরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ হত, অক্রূর চলে গেলেও তাই হচ্ছে। অক্রূরের মতো বড়ো নেতা যদি অন্য জায়গায় চলে যান, সে রাষ্ট্র সুস্থিত নয়, তাঁকে ফিরিয়ে আনতে হবে যে কোনো মূল্যে। এরপর কৃষ্ণ অক্রূরের প্রবল প্রতিপক্ষ রাজা উগ্রসেনকে নিয়ে, বলরামের সঙ্গে নিজে উপস্থিত হলেন অক্রূরের কাছে এবং উপযুক্ত অনুনয়-বিনয় সহকারে ফিরিয়ে আনলেন দ্বারকায়।

অক্রূর ফিরে আসতেই দ্বারকায় সমস্ত প্রাকৃতিক উৎপাত বন্ধ হয়ে গেল এবং কৃষ্ণ একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, স্যমন্তক মণি অক্রূরের কাছেই আছে। অক্রূর একটু থিতোতেই কৃষ্ণ নিজের বাড়িতে একটা সভা ডেকে সংঘবৃত্তের সমস্ত প্রধানকে আহ্বান করলেন। আহ্বান করলেন অক্রূরকেও।

নির্দিষ্ট দিনে যদু-বৃষ্ণি-অন্ধক-ভোজ গোষ্ঠীর কুলপ্রধানরা একে একে কৃষ্ণের বাড়িতে উপস্থিত হলেন—অক্রূরের সঙ্গে সাধারণ হাস্য-পরিহাসে কিছু সময় কাটিয়ে তাঁকে একটু সহজে করে নিয়েই কৃষ্ণ বললেন—দেখুন মহাশয়! আমি জানি যে, শতধন্বা পালিয়ে যাওয়ার আগেই স্যমন্তক মণিটি আপনার কাছেই রেখে গিয়েছে। অক্রূরের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। কৃষ্ণ বললেন—না, না আপনার সংকুচিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। মণি আপনার কাছে যেমন আছে, তেমনই থাকুক। মণি থাকার যে সুফল—সমস্ত দুর্যোগের উপশান্তি—সেই সুফল তো আমরা সকলেই পাচ্ছি। কিন্তু আমার কিছু নিবেদন আছে—আমার দাদা বলরাম, তিনি আমাকে সন্দেহ করেছেন। তিনি ভেবেছেন—শতধন্বাকে মেরে মণিটা আমি তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি এবং আমি সেটা দেখাচ্ছি না, লুকিয়ে রেখেছি। আপনার কাছে আমার আর্জি এই—আমার দাদার এই সন্দেহ এবং অপবাদ-আক্ষেপ থেকে আমাকে মুক্ত করার জন্য সেই মণিটি একবার দেখান—আমার দাদাকেই দেখান—

কিন্তু এষ বলভদ্রো'স্মান্ আশঙ্কিতবান্।
তদস্মৎপ্রীতয়ে দর্শয়।

অক্রূর শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণের সুরে বললেন—হ্যাঁ, এটা সত্যি বটে যে, শতধন্বা এই স্যমন্তক মণি আমারই হাতে দিয়েছিলেন। কিন্তু মণিটি স্বপথে আমার কাছে আসেনি বলেই আমি তো এতকাল কোনো ভোগ-সুখ করতে পারিনি—ন বেদ্মি। স্বসুখকলামপি—পাছে আপনি কিছু ভেবে বসেন আমার সম্বন্ধে। অক্রূর তাঁর অধর-বস্ত্রের তলা থেকে একটা হালকা গোছের সোনার কৌটো বার করলেন, তারপর কৌটোর ভিতর থেকে মণিটি বার করে সমস্ত যদু-সমাজের সামনে স্থাপন করলেন। 'সেই মণি স্থাপিত হইবামাত্র স্বী'য় কান্তি দ্বারা অখিল সভাকে উদ্ভাসিত করিল—

তদখিল-স্থানম্ উদ্দ্যোতিতম্।

অক্রূর-কৃত মণিহরণের কথা পরিষ্কার হয়ে গেলেও ততক্ষণে কৃষ্ণ একথা বুঝে গিয়েছেন যে, ব্যক্তিস্বার্থের মোহ এমনই যাতে এই স্যমন্তক মণির জন্য তাঁর ঘরে এবং তাঁর অতি আপন যাদবগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ আবারও তৈরি হবে। অতএব অদ্ভুত যুক্তি সাজিয়ে তিনি সকলকে শান্ত করে, অক্রূরকেই বললেন— দেখুন মহাশয়! আমার এইটুকুই প্রয়োজন ছিল যে, এতদিন আমাকে যেভাবে চোরের অপবাদ সইতে হয়েছে, সেটা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে শুদ্ধ প্রমাণ করা। ঠিক সেইজন্যই মণিটা সর্বসমক্ষে দেখাতে বলেছি আপনাকে—

এতদ্ধি মণিরত্নম্ আত্মশোধনায় যদূনাং দর্শিতম্।

কিন্তু তাই বলে এই মণি ধারণ করার ক্ষমতা আমার নেই।

কৃষ্ণ সিদ্ধান্ত দিলেন—মণিটি আপনার কাছেই

থাক, অক্রূরমশাই! আপনি দান-ধ্যান করেন, সবাই দানপতি বলে আপনাকে, এত যাগ-যজ্ঞ করেন, অতএব আমি, বলরাম এবং সত্যভামা— সবার পক্ষ থেকেই আমার আর্জি—

বলভদ্রো'হম্ সত্যা চ।

দানপতে প্রার্থয়ামঃ।

—এই মণি আপনিই ধারণ করুন, মণি আপনার কাছে থাকলেই এই যদুরাষ্ট্রের মহদুপকার সম্ভব হবে—

ত্বয়া অন্যথা ন বক্তব্যম্।

কৃষ্ণের কথা শুনে অক্রূর মণিটি গ্রহণ করলেন আবার। আমরা কৃষ্ণের জীবনের এই খণ্ডাংশটুকু এই জন্য তুলে ধরলাম, যাতে আপনারা বোঝেন যে, ভগবত্তা দিয়ে তিনি সমস্যার সমাধান করেন না, তিনি বুদ্ধি দিয়েই যা কিছু করেন। কৃষ্ণের নিজস্ব জীবনে রাষ্ট্র এবং সমাজ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, 'মহাভারতের' মধ্যেও তার প্রভাব আসবে। খেয়াল করে দেখবেন—এই গোষ্ঠীকোন্দল এবং সম্পর্কের সেতুগুলো এমনই যে, 'মহাভারতের' যুদ্ধকালে নিজে তিনি পাণ্ডবপক্ষে থাকলেও তাঁর দাদা বলরাম কিন্তু উদাসীন ছিলেন। যুদ্ধের উদ্যোগপর্বেও তিনি পাণ্ডবদের বিরুদ্ধেই কথা বলেছেন, এবং যুদ্ধের শেষ পর্বে তিনি দুর্যোধনের জয়ের জন্য উৎসুক। পুনশ্চ যে শতধন্বাকে তিনি মেরেছিলেন তাঁর ভাই কৃতবর্মা কিন্তু পাণ্ডবদের বিপক্ষে এবং কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। একেবারে শেষ জায়গায় অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্যের সঙ্গে জুটি বেঁধে দ্রৌপদীর সব কটি ছেলেকে মেরে ফেলার ব্যাপারে কৃতবর্মা এক বিরাট সহায়। আমরা শুধু বলব—এই সব বিপক্ষতা কৃষ্ণের নিজের গোষ্ঠী থেকেই এসেছে এবং হয়তো ভগবান নরলীল বলেই তিনি মানুষের মতো মুখোমুখি হয়েছেন এই সব বিপক্ষতার। তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মতো রাষ্ট্রশক্তি, সমাজনীতি পালটে দেননি। স্যমন্তক মণির গল্পটার মহাভারতীয় তাৎপর্য্য এইখানেই।

[ব্রহ্ম পু. ১৬-১৭ অধ্যায়]

□ সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পাণ্ডবরা যখন দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে পৌঁছবেন, তার অনেক আগেই কৃষ্ণের অন্তত তিনটি বিবাহ সুসম্পন্ন হয়েছে। রুক্মিণী, জাম্ববতী এবং সত্যভামা— কৃষ্ণের জীবনে এসে গিয়েছেন। এই তিনজনের সঙ্গে কৃষ্ণের বৈবাহিক জীবন কেমন কাটছিল, তার টুকরো টুকরো ছবি মহাভারত এবং পুরাণগুলিতে আছে। কৃষ্ণের এই দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য্য আছে, সতীনের প্রতি সতীনের অসূয়া, ঈর্ষা, অভিমানও আছে—আর সে সব মিলিয়ে কৃষ্ণের রাজনৈতিক জীবনের মতোই দাম্পত্য জীবনও কিছু কম ঘটনা বহুল নয়। তবে এই ঘটনাগুলির বিশদ বিবরণে না গিয়ে আমরা শুধু উল্লেখমাত্র করতে চাই, নইলে এই কৃষ্ণকথার কলেবর আরও স্থূল, বিশাল আকার নেবার সম্ভাবনা।

কোনো একসময় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা নরকাসুর দেবমাতা অদিতির কুণ্ডল হরণ করেন। নরকাসুরকে বধ করার জন্য কৃষ্ণ যখন যুদ্ধযাত্রা করেন, সে সময় সত্যভামা কৃষ্ণের সঙ্গী হয়েছিলেন বলে জানা যায়। নরকাসুরবধের পর কৃষ্ণ সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে দেবলোকে গিয়েছিলেন এবং সেখানে স্বয়ং ইন্দ্রাণী শচী সত্যভামাকে সমাদর করেন।

□ এর কিছুকাল পর কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠা মহিষী রুক্মিণী একসময় রৈবতক পর্বতে এক ব্রত পালন করেন। ব্রত উদ্‌যাপনের দিনে নিমন্ত্রিত নারদ কৃষ্ণের হাতে তুলে দেন দেবলোক থেকে আনা পারিজাত ফুল। কৃষ্ণ সেই ফুল উপহার হিসেবে তুলে দিলেন রুক্মিণীর হাতে। নারদ তা দেখে রুক্মিণীর সৌভাগ্য নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন শতমুখে। কারণ পারিজাত বা সন্তানক পুষ্প পুরাণমতে সম্পদ বা ঐশ্বর্য্য প্রদানকারী, এই পুষ্প ধারণ করলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা সব কষ্টই দূর হয়। এইভাবে পারিজাতপুষ্পের গুণ বর্ণনা করে অবশেষে নারদ ঘোষণা করলেন—কৃষ্ণ রুক্মিণীকে পারিজাত ফুল উপহার দিয়েছেন, এর থেকেই প্রমাণ হয় যে, রুক্মিণীই কৃষ্ণের প্রিয়তমা মহিষী। কথাটা সত্যভামার কানে গেল। সত্যভামা ভাবতেন যে, তিনিই কৃষ্ণের সব থেকে প্রিয়া পত্নী, আজ নারদের ঘোষণায় তাঁর সেই অভিমান আহত হল। সত্যভামা ঈর্ষায়, ক্রোধে অন্ধ হয়ে ক্রোধাগারে প্রবেশ করলেন। সত্যভামার মানভঞ্জনের জন্য শেষপর্যন্ত কৃষ্ণকে দেবলোক আক্রমণ করতে হয়েছিল। দেবরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করে সত্যভামার পুণ্যকব্রতের জন্য কৃষ্ণ স্বর্গের পারিজাত বৃক্ষটিকেই তুলে এনেছিলেন দ্বারকায়।

□ কৃষ্ণমহিষী জাম্ববতীর সম্পর্কে অবশ্য খুব বেশি কিছু জানা যায় না। তবে মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে যে, একসময় পুত্রপ্রার্থিনী জাম্ববতীর অনুরোধে কৃষ্ণ উৎকৃষ্ট পুত্রলাভের জন্য হিমালয় পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করেন। কৃষ্ণের ঔরসে জাম্ববতীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সাম্ব। সম্ভবত সাম্ব-র জন্মের আগেই কৃষ্ণ হিমালয়ে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন।

□ মহাভারতে এবং পুরাণগুলিতে কৃষ্ণের রুক্মিণী ছাড়াও মোট আটজন পট্টমহিষীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। এঁরা হলেন যথাক্রমে কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, নাগ্নজিতী সত্যা, জাম্ববতী, রোহিণী, মদ্ররাজকন্যা লক্ষ্মণা, সত্যভামা এবং শৈব্যরাজার কন্যা গান্ধারী (হরিবংশ পুরাণে প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী)। রুক্মিণী কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠা পত্নী বলেই সর্বত্র স্বীকৃত। কিন্তু ঠিক কোন ক্রমানুসারে কৃষ্ণ বাকিদের বিবাহ করেছিলেন, তা নির্ণয় করা কঠিন।

□ বৃন্দাবন-মথুরা-দ্বারকাবাসী কৃষ্ণ অবশেষে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় মহাভারতের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, পিসী কুন্তীর পুত্রদের খোঁজখবর কৃষ্ণ ভালোমতোই রাখতেন। বারণাবতের অগ্নিকাণ্ডে যে পাণ্ডবরা মারা যাননি, সে খবরও তিনি আন্দাজে বুঝেছেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে যাদবরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন, সভা অলংকৃত করছিলেন কৃষ্ণ-বলরামও। এঁরা কিন্তু স্বয়ংবরে অংশ নিতে আসেননি। দর্শক হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন হয়তো দ্রুপদরাজার মিত্রপক্ষীয় হিসেবেই। সভায় কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে বসে থাকা পাণ্ডবদের দেখামাত্র চিনেছেন, এমনকী বলরামকে চিনিয়েও দিচ্ছেন—

শশংস রামায় যুধিষ্ঠিরং স ভীমং
সজিষ্ণুঞ্চ যমৌ চ বীরৌ।

দ্রৌপদী অর্জুনকে বরণ করার পর পাণ্ডবগৃহে যখন সিদ্ধান্তও হয়ে গেল যে, পাঁচ পাণ্ডব ভাইয়েরই বধূ হবেন দ্রৌপদী, তার কিছু পরে প্রায় সন্ধ্যা নেমে আসার পর কৃষ্ণ-বলরাম প্রচ্ছন্নভাবে এসে পৌঁছালেন কুম্ভকার গৃহে। মহাভারতের কাহিনী যেভাবে এগোতে দেখি, তাতে কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে পাণ্ডবদের বহুবার দেখা শোনা হয়েছে, এমনটা ভাবা কঠিন। তবু একেবারেই কোনো পূর্বসাক্ষাৎ হয়নি— এমনটাও হয়তো নয়। সেই বৃন্দাবনে বসেই ইন্দ্রের মুখে কুন্তীপুত্র অর্জুনের কথা শুনেছিলেন কৃষ্ণ। তারপর বিপুল রাজনৈতিক ব্যস্ততার মাঝেও পাণ্ডবদের কুশল সংবাদ তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থানের খোঁজখবর রেখেছেন। দেখা সাক্ষাৎও কিছু ঘটেই থাকবে, যার সুবাদে ছদ্মবেশী পাণ্ডবদের আজ এত সহজে চিনেছেন তিনি। তবু সেটা হয়তো অনেকদিন আগে, কারণ এই মুহূর্তে কুম্ভকারের গৃহে আসার পর আবার একবার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যাই হোক, কৃষ্ণ-বলরাম এসে যখন যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলেন, তখন যুধিষ্ঠির একটু অবাক হয়েই বললেন—আমরা গুপ্তভাবে এখানে বাস করছি, সেটা তুমি বুঝলে কী করে? কৃষ্ণ মজা করে বললেন—আগুন কি কখনো গোপন থাকে মহারাজ—

গূঢ়ো'প্যগ্নির্জ্ঞায়ত এব রাজন্।

স্বয়ংবর সভায় যে শক্তি-পরাক্রম আর ধনুর্বিদ্যার কৌশল দেখলাম, তা কি পাণ্ডব ছাড়া অন্য কারও দ্বারা সম্ভব ছিল? যাই হোক, আমার অনুমান আজ সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে আপনারা সকলে বারণাবতের জতুগৃহ থেকে রক্ষা পেয়েছেন এবং দুর্যোধনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। আমরা চাই, সেই পরম মঙ্গলটুকু নেমে আসুক আপনাদের জীবনে, ঠিক যেমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা আমাদের মনের মধ্যে নিহিত আছে আপনাদের প্রতি—

ভদ্রং বো'স্তু নিহিতং যদ্ গুহায়াম্।

কৃষ্ণ-বলরাম কিন্তু আর সময় নষ্ট করলেন না। কৃষ্ণ পরিষ্কার বললেন—আমরা চাই না এখনই সমাগত রাজা-মহারাজারা তোমাদের চিনে ফেলুন। ফলে এখানে আমাদের আর থাকা উচিত হবে না। আমরা শিবিরে ফিরে যাই, যাতে সকলে ভাবে—যেমনটা চলছিল, তেমনই চলছে—

মা বো বিদ্যুঃ পার্থিবাঃ কেচিদেব
যাস্যাবহে শিবিরায়ৈব তাবৎ।

[মহা (k) ১.১৮৭.৯-১০; ১.১৯১.১৮-২৫;
(হরি) ১.১৮০.৯-১০; ১.১৮৪.১৮-২৫]

□ এতদিনে কৃষ্ণ ধুরন্ধর রাজনীতিক হিসেবে সমগ্র ভারতে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন, যদু-বৃষ্ণিদের নবনির্মিত রাজধানী দ্বারকাও শক্তি-সামর্থ্য সঞ্চয় করেছে যথেষ্ট। ফলে এই মুহূর্তে

কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের যে যোগাযোগটা তৈরি হল তা রাজনৈতিক ভাবে ভীষণভাবেই তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং অবশ্যই পাণ্ডবদের রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির সূচকও বটে। দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহ উপলক্ষে প্রচুর ধনরত্নের উপহার পাঠালেন কৃষ্ণ। এইসব মহার্ঘ্য উপহার ছাড়াও পাঠালেন বিপুল পরিমাণে সামরিক উপহার—যুদ্ধের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট রথ, অশ্ব, হস্তী। একদিকে দ্রুপদ-পাঞ্চাল এবং অন্যদিকে কৃষ্ণের সহায়তা লাভ করে পাণ্ডবরা নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি অনেকটাই বাড়িয়ে তুলতে সমর্থ হলেন।

এ অবস্থায় পাণ্ডবদের জীবিত থাকার সংবাদ পেয়ে কর্ণ যে যুদ্ধের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা রাজনৈতিক কারণেই সমর্থনযোগ্য ছিল না। ভীষ্ম পাণ্ডবদের সহায় সম্বল বৃদ্ধির ঘটনাটা খুব পরিষ্কার ভাবেই আলোচনা করেছেন এবং শেষে প্রায় আদেশের সুরে ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য দান করতে বলেছেন। বিদুরও সহমত পোষণ করেছেন ভীষ্মের সঙ্গে এবং দ্রোণাচার্যও এবিষয়ে ভীষ্ম-বিদুরের সঙ্গে একমত। তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে পাণ্ডবদের প্রতি হিংসার আচরণ সমর্থন করেন না, তবু ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের রাজ্যার্ধ দান করার কথাটা রাজনৈতিক ভাবেও বোঝানোর দরকার হয়ে পড়েছিল। আর তা বোঝাতে গিয়ে কুরুবৃদ্ধরা পাণ্ডবদের শ্বশুরকুল পাঞ্চালদের শক্তির কথা যেমন বলছেন তার পাশাপাশিই উল্লেখ করেছেন কৃষ্ণ এবং তাঁর যাদব বাহিনীর শক্তির কথা। ঘটনা হল, যুদ্ধের পক্ষে মত দিলেও কর্ণও কিন্তু কৃষ্ণ এবং যাদব সৈন্যদের শক্তির বিষয়ে একই রকম সচেতন। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন কৃষ্ণ তাঁর যাদবসেনা নিয়ে আক্রমণ করার আগেই পাণ্ডবদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে—

যাবান্নায়াতি বার্ষ্ণেয় কর্ষন্ যাদববাহিনীম্।

ধৃতরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবদের খাণ্ডবপ্রস্থে রাজ্য দান করেছেন। কিন্তু এই আলোচনাটুকু থেকে আমরা বোঝাতে চাই যে মহাভারতের রঙ্গমঞ্চে কৃষ্ণ কিন্তু পা রেখেছেন বিপুল সামরিক শক্তিধর একজন ধুরন্ধর রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবেই। *[মহা (k) ১.২০২.১৫; ১.২০৪.২৬; (হরি) ১.১৯৫.১৫; ১.১৯৮.২৬]*

□ খাণ্ডবপ্রস্থে পাণ্ডবরা যে রাজ্য পেলেন, তা ভূমিখণ্ড ঠিকই কিন্তু মোটেই বাসযোগ্য নয়। পাণ্ডবরা যখন সেই নতুন রাজ্যে এলেন তখন বলরামকে নিয়ে কৃষ্ণও এসেছেন তাঁদের সঙ্গে। নতুন রাজ্য বা রাজধানী স্থাপনের ব্যাপারে কৃষ্ণের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। দ্বারকা নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁরই পরামর্শ এবং পরিকল্পনায়। নিজের সেই পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পাণ্ডবদের পথপ্রদর্শনের জন্যই হয়তো কৃষ্ণ পাণ্ডবদের নবরাজ্য স্থাপনের সময়ে ছুটে এলেন—

ততস্তে পাণ্ডবাস্তত্র গত্বা কৃষ্ণপুরোগমাঃ।

তারপর পাণ্ডবদের মোটামুটি খাণ্ডবপ্রস্থে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে তিনি ফিরে গেছেন দ্বারকায়।

[মহা (k) ১.২০৭.২৬-৫২; (হরি) ১.২০০.৪১-৬৫]

□ এরপর কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের অল্পকালের মধ্যে আর দেখা হয়নি। কিন্তু একা অর্জুনের সঙ্গে দেখা হয়েছে এক মধুর ঘটনার আয়োজক হিসেবে। নারদ-কৃত দাম্পত্যের নিয়ম ভঙ্গ হয়ে যাওয়ায় দ্বাদশবর্ষের নির্বাসনে গিয়েছেন অর্জুন। মূলত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণের নিয়ম হলেও উলূপী এবং চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে এই পর্যায়েই অর্জুনের বিবাহ সম্পন্ন হয়। তারপর নানা তীর্থে ঘুরতে ঘুরতে অর্জুন এসে পৌঁছালেন প্রভাসক্ষেত্রে। অর্জুনের আগমন সংবাদ কৃষ্ণের কানে যেতেই কৃষ্ণ নিজে এসে অভ্যর্থনা জানালেন কৃষ্ণকে। তারপর রৈবতক পর্বতে এক সুরম্য বিশ্রামগৃহে কৃষ্ণ অর্জুনের থাকার ব্যবস্থা করলেন, নিজেও থেকে গেলেন অর্জুনের কাছে। অর্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণের সখ্য হয়তো এই দীর্ঘ সহবাসেই গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে। এর কিছুকাল পরে রৈবতক পর্বতে যদু-বৃষ্ণিদের বাৎসরিক উৎসব আরম্ভ হল। এই উৎসবে অর্জুন সুভদ্রাকে দেখলেন এবং সুভদ্রার প্রতি অর্জুনের যে আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল তা কৃষ্ণও খেয়াল করলেন—

তং তদৈকাগ্রমনসং কৃষ্ণঃ পার্থমলক্ষয়ৎ।

কৃষ্ণ বুঝলেন, অর্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করতে চান। সুভদ্রা কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী। বলরামের সহোদরা, রোহিণীর গর্ভজাতা। তবে সুভদ্রার প্রতি কৃষ্ণের স্নেহ সহোদর বোনের থেকে কোনো অংশে কম ছিল না। সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ হলে কৃষ্ণও খুশিই হন। শেষ পর্যন্ত বিচার-

বিবেচনা করে গুরুজনদের সামনে বিবাহের প্রস্তাব রাখার থেকে সুভদ্রাকে হরণ করে বিবাহ করার পরিকল্পনাই স্থির হল। প্রস্তাব স্বয়ং কৃষ্ণের, পরিকল্পনাও তাঁরই। সুভদ্রাকে হরণ করলে যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেবে, তাও হয়তো গোড়াতেই ভেবে নেওয়া হল—

ততো'র্জুনশ্চ কৃষ্ণশ্চ বিনিশ্চিত্যেতিকৃত্যতাম্।

কৃষ্ণ নিজের রথখানি দুই প্রিয়, দ্রুতগামী অশ্ব শৈব্য এবং সুগ্রীবকে যোজনা করে দিলেন অর্জুনকে, রথে সজ্জিত রইল প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র।

সুভদ্রাহরণের পর বলরাম অর্জুনের বিরুদ্ধে নানা কথা বলার সময়েই লক্ষ্য করলেন যে, কৃষ্ণ কোনো কথা বলছেন না। বলরাম আন্দাজ করলেন যে, এই হরণপর্বে কৃষ্ণের প্রশ্রয় আছে। তাও সব বুঝেও বলরাম বৃষ্ণি যোদ্ধাদের অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলেন। ঠিক এই সময়ে মুখ খুললেন কৃষ্ণ। তিনি প্রভূত যুক্তিজাল বিস্তার করে অর্জুনের ব্যবহারকে এমনভাবেই সমর্থন করলেন যে, যদু-বৃষ্ণিরা শেষ পর্যন্ত অর্জুনকে প্রসন্ন করে ফিরিয়ে আনলেন দ্বারকায়। অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ সুসম্পন্ন হল এবং এই বিবাহপর্বে কৃষ্ণের সাহায্য এবং সাহচর্য্য ছিল লক্ষ্য করার মতো। বিশেষত বিবাহের পর নববধূ সুভদ্রাকে নিয়ে অর্জুন যখন খাণ্ডবপ্রস্থে ফিরলেন, তখন অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর অভিমান যে নান্দনিক সংকট তৈরি করেছিল, সেখানে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের জীবনযাপনের বুদ্ধিতেই অর্জুন সংকটমুক্ত হয়েছেন। আমরা ধারণা করতে পারি, অশেষ ব্যক্তিত্বময়ী দ্রৌপদী যখন সাভিমানে অর্জুনকে সুভদ্রার কাছেই যেতে বলেছিলেন, তখন অর্জুন যেভাবে সুভদ্রাকে গোপালিকা বেশে দ্রৌপদীর কাছে পাঠালেন, সেটা কৃষ্ণের পূর্বজীবনের স্মরণিকা ছাড়া হতে পারে না।

দ্রৌপদী-সুভদ্রার মধ্যে সখ্য স্থাপিত হল অচিরেই, আর তার কিছুকাল পর বৃষ্ণি সংঘের প্রধান পুরুষরা বিবাহের যৌতুক, মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন সুভদ্রার শ্বশুরালয় খাণ্ডবপ্রস্থে। কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে আত্মীয় কুটুম্বরা সকলে ফিরেও গেলেন, কিন্তু কৃষ্ণকে কেউ ছাড়লেন না। কৃষ্ণ আরও বেশ কিছুকাল অর্জুনের সঙ্গে থেকে গেলেন খাণ্ডবপ্রস্থে—

বাসুদেবস্তু পার্থেন তত্রৈব সহ ভারত।

এই মুহূর্তে এটা বিশেষ ভাবেই লক্ষণীয় যে, কৃষ্ণ একটা দীর্ঘ সময় খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করলেন। অর্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণের গাঢ় বন্ধুত্ব এই অবসরে গাঢ়তর হয়েছে, পঞ্চস্বামী গর্বিতা দ্রৌপদীর সঙ্গেও বহুতর আলাপ-পরিচয়ে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের পরম ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

মহাভারতে সুভদ্রার বিবাহের পরেই অভিমন্যুর জন্মসংবাদ পাওয়া যায়। হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচকে বাদ দিলে পাণ্ডবদের পুত্রসন্তানদের মধ্যে সৌভদ্র অভিমন্যুই জ্যেষ্ঠ। দ্রৌপদীর পুত্রলাভেরও আগে তাঁর জন্ম হয়। অভিমন্যুর জন্মের পর দ্রৌপদী তাঁর পঞ্চস্বামী থেকে জ্যেষ্ঠানুক্রমে পুত্র লাভ করেন। এত দীর্ঘ সময় না হলেও অভিমন্যুর জন্ম পর্যন্ত হয়তো কৃষ্ণ খাণ্ডবপ্রস্থেই বাস করছিলেন। *[দ্র. অর্জুন, সুভদ্রা]*

☐ কৃষ্ণের খাণ্ডবপ্রস্থে বসবাসকালের সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা খাণ্ডবদহন। তখন গ্রীষ্মকাল চলছে, গরমও পড়েছে খুব। অর্জুন প্রস্তাব দিলেন, দেখো কৃষ্ণ! বড়ো গরম পড়েছে, চলো যমুনায় যাই—

উষ্ণানি কৃষ্ণবর্তন্তে গচ্ছাবো যমুনাংপ্রতি।

অনেকটা চড়ুইভাতি বা বনভোজনের মতো, সকাল বেলায় গিয়ে সন্ধেবেলায় ফিরে আসার পরিকল্পনা হল। যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে কৃষ্ণ-অর্জুন গেলেন যমুনাতীরে। সঙ্গে গেলেন দ্রৌপদী, সুভদ্রা আর দাসদাসী ছাড়াও কিছু নৃত্যগীতে পারদর্শী নর্তকী।

নদীতীরে সকলে যখন নাচ গান আমোদ আহ্লাদ সুরাপানে ব্যস্ত, সেই অবসরে কৃষ্ণ এবং অর্জুন সেই জায়গা থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে বসলেন। ভৃত্যরা সেখানেও উচ্চাসন বিছিয়ে দিল। দু-জনে একটু আরাম করে বসে, কবে-কোন-কালে-কোথায় মহাবিক্রমে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, কোথায় শত্রুদের কীভাবে বিধ্বস্ত করেছিলেন, সেই সব স্মৃতি তর্পণ করছিলেন—

তত্র পূর্বব্যতীতানি বিক্রান্তানীতরাণি চ।

এমন সময় তাঁরা দেখতে পেলেন—এক দীর্ঘদেহী ব্রাহ্মণ তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁর গায়ের রং সোনার মতো, পিঙ্গল শ্মশ্রু।

নবোদিত সূর্যের মতো তাঁকে দেখাচ্ছিল। সামান্য পরিচয়-পরিপ্রশ্নের পরেই বিশালাকৃতি ব্রাহ্মণ জানালেন যে, তিনি অগ্নিদেব। তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, কিন্তু সাধারণ ভক্ষ্য-ভোজে তাঁর রুচি নেই। সামনে অবস্থিত খাণ্ডববনটাকেই তিনি খেতে চান। অগ্নিদেব আরও জানালেন—আগেও তিনি এই 'বনভোজন'-এর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ভগবান ইন্দ্রদেব সর্বতোভাবে এই বন রক্ষা করেন এবং ইন্দ্রের সখা তক্ষক নাগ সপরিবারে এই বনে বাস করেন। তাঁকে সুরক্ষা দেন বনের অন্যান্য প্রাণী। ফলে তাঁর ক্ষমতাও কম নয়, তিনিও এই বনের রক্ষায় যত্ন নেন। যখনই বনের মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে, অর্থাৎ অগ্নি যখনই বন দহন করার চেষ্টা করেন, তখনই মেঘবাহন ইন্দ্র জল বর্ষণ করেন বহুধারায়। আগুন নিভে যায়। অগ্নি আজ তাই কৃষ্ণ এবং অর্জুনের সাহায্যপ্রার্থী। তাদের সহায়তায় অগ্নি বন দহন করে তাঁর অতৃপ্ত ক্ষুধা মেটাতে চান। অগ্নি একটা গোটা বন খেতে চাইছেন বনের পশু-পাখি-আবাসিক-সহ। আবার তাঁর নাকি পেটের রোগ হয়েছে। সমস্ত ব্রাহ্মণ্য-যজ্ঞে ঘি খেয়ে-খেয়ে তাঁর পেটের খিদে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অগ্রগণ্য দেবতা ব্রহ্মা তাঁর রোগের নিদান বলেছেন—খাণ্ডববন দহন করে বন্য পশুদের মেদ খাও তুমি, তা হলেই রোগ সেরে যাবে। অগ্নি তাই বনভোজন করতে এসেছেন কৃষ্ণার্জুনের সহায়তায়।

খাণ্ডব-দহনে অগ্নিদেব যখন কৃষ্ণার্জুনের সাহায্য চাইলেন, তখন তাঁরা বেশ প্রস্তুত হয়েই ছিলেন বলে মনে হয়। অর্জুন শুধু বললেন—দেখুন, আমার শক্তি আছে, অস্ত্রশস্ত্রও আছে অনেক, কিন্তু যতখানি শক্তি আছে, সেটা ধারণ করার মতো একখানা মজবুত ধনুক আমার নেই—

ধনুর্মে নাস্তি ভগবন্ বাহুবীর্যেন সম্মিতম্।

তেমন একখানা রথও নেই আমার, যেটা আমার বিশাল অস্ত্ররাশি বয়ে নিয়ে যেতে পারে। তেমন অশ্বও চাই, সেই রথের সঙ্গে জুতে দেওয়ার মতো। আর এই যে কৃষ্ণ, এইরকম শক্তিমান পুরুষ, তাঁকেও তো এই নাগ-পিশাচদের বধ করতে হবে, তাঁরও তো নিজের সমগোত্রীয় একটা অস্ত্র দরকার—

তথা কৃষ্ণস্য বীর্যেণ নায়ুধং বিদ্যতে সমম্।

অর্জুনের প্রার্থনা শুনে অগ্নি স্মরণ করলেন বরুণদেবকে। তাঁর কাছে ছিল সেই বিখ্যাত গাণ্ডীব ধনু, দুটি অক্ষয় তূণীর এবং কপিধ্বজ রথ। সব তিনি অর্জুনকে দিলেন অগ্নিদেবের সাহায্যার্থে। চারটি অশ্ব দিলেন নির্মল মেঘের মতো সাদা। মহাভারত জানিয়েছে, এই সময় স্বয়ং অগ্নির কাছ থেকে কৃষ্ণ পেলেন সুদর্শন চক্র—দানব-মানব-দেবতা— সর্বদমন সুদর্শন চক্র।

খাণ্ডবদহন হয়ে গেল কৃষ্ণের সহায়তায় এবং সেই দগ্ধভূমিতে ময়দানবের সহায়তায় খাণ্ডবপ্রস্থের রূপান্তর ঘটল ইন্দ্রপ্রস্থে।

[মহা (k) ১.২২২-২৩৪ অধ্যায়;
(হরি) ১.২১৬-২২৭ অধ্যায়]

□ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে ভালোই রাজত্ব করছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির যে রাজা হয়েছেন, সেই রাজ্যটুকুও ধৃতরাষ্ট্রের দেওয়া ভূমিখণ্ড; সেখানে ইন্দ্রপ্রস্থের প্রাসাদ নির্মিত হলেও, সেখানে রাজ্যের সার্বভৌমত্বের একটা প্রশ্ন আসে। দেবর্ষি নারদ বোধহয় এই কথাটা মাথায় রেখেই যুধিষ্ঠিরকে তাঁর স্বর্গীয় পিতা পাণ্ডুর আদেশ শুনিয়ে রাজসূয় যজ্ঞ করতে বলে গেলেন এবং এটাও তিনি বলে গেলেন— রাজসূয় যজ্ঞ কিন্তু সোজা কথা নয়, বিশেষত তাতে বিঘ্নও অনেক—

বহুবিঘ্নশ্চ নৃপতে ক্রতুরেষ স্মৃতো মহান্।

সব চেয়ে বড়ো বিঘ্ন এটাই—এই যজ্ঞ করতে হলে রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বের সমস্ত আনুগত্য স্বীকার করাতে হয় বলে প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবেই বহুযুদ্ধ করতে হয়।

নারদ বিদায় নেবার পর যুধিষ্ঠির অনেক আলাপ আলোচনা করলেন ভাইদের সঙ্গে এবং মন্ত্রী অমাত্যদের সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া গেল না বলেই যুধিষ্ঠির দূত পাঠালেন দ্বারকায় কৃষ্ণের কাছে এবং তিনিও অবিলম্বে উপস্থিত হলেন ইন্দ্রপ্রস্থে।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ-ভাবনার উত্তরে কৃষ্ণ বলতে শুরু করলেন প্রগল্ভ রাজনৈতিক বক্তার মতোই। আমরা এই মুহূর্তে মহাভারতের সেই পর্যায়ে উপস্থিত হয়েছি, সেখানে মহাভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ প্রথমবার সমকালীন ভারতবর্ষে জরাসন্ধের একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলছেন। কৃষ্ণ বললেন—

মহারাজ! কোনো সন্দেহ নেই যে রাজসূয় যজ্ঞ করার জন্য যত ক্ষমতা এবং গুণ থাকা প্রয়োজন সে সবই আপনার আছে—

সর্বৈর্গুণৈঃ মহারাজ রাজসূয়ং ত্বমর্হসি।

কিন্তু এটুকু বলার পরেই তিনি প্রায় ভারতবর্ষের একটা তৎকালীন মানচিত্র এঁকেই যেন মগধরাজ জরাসন্ধের প্রতিপত্তির কথা বললেন—পৌরব রাজা এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদের অভিভূত করে ভারতের সমস্ত রাজকুলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে প্রায় সম্রাটের মতো সমগ্র ভারতভূমি অধিকার করে আছেন জরাসন্ধ—

স্থিতো মূর্ধ্নি নরেন্দ্রাণাম্ ওজসাক্রম্য সর্বশঃ।

জরাসন্ধকে সরাসরি সম্রাট আখ্যায় বিশেষিত না করলেও কৃষ্ণ রাষ্ট্রীয় অভিধান ব্যবহার করে ঘুরিয়ে বললেন—আসলে একটা সাম্রাজ্যের অধিকারী তো তিনিই, যিনি এমন এক সর্বময় প্রভুত্ব বজায় রাখতে পারেন, যাঁর বশবর্তী হয়ে থাকেন পৃথিবীর তাবৎ রাজা, এরকম একজন সর্বময় প্রভুর রাজ্যটাকেই তো সাম্রাজ্য বলে আর সেই সাম্রাজ্যের অধীশ্বরকে বলা হয় সম্রাট—

স সাম্রাজ্যং মহারাজ প্রাপ্তোভবতি যোগতঃ।

কৃষ্ণ জরাসন্ধ সম্পর্কে অনেক কথাই বললেন। সেই প্রসঙ্গে জরাসন্ধের অনুগত কংসের অত্যাচারে মথুরার যদু-বৃষ্ণিদের দুরবস্থার কথা এল, এল কংস বধের কথা এমনকী কৃষ্ণ হংস-ডিম্ভক-জরাসন্ধের মথুরা আক্রমণের বৃত্তান্তও শোনালেন সবিস্তারে। নিজের পূর্বস্মৃতি চারণের পাশাপাশি জরাসন্ধের অনুগত অথচ প্রভূত বল-পরাক্রমশালী রাজাদের একটি তালিকাও তুলে ধরলেন পাণ্ডবদের সামনে, যে তালিকায় রয়েছেন জরাসন্ধের পুত্রপ্রতিম চেদিরাজ শিশুপাল, পূর্বভারতের রাজা বাসুদেব পৌণ্ড্রক, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা মুরু-নরকাসুর এমনকী স্বয়ং কৃষ্ণের শ্বশুর বিদর্ভরাজ ভীষ্মকও। রুক্মিণীকে বিবাহ করেও কৃষ্ণ আপন শ্বশুরকে পর্যন্ত নিজের পক্ষে আনতে পারেননি। কৃষ্ণ এ মুহূর্তে যেটা উল্লেখ করলেন না, সেটা আমরা হরিবংশপুরাণের প্রমাণে জানি, আমাদের ধারণা পাণ্ডবরাও ভালোভাবেই জানেন। তা হল, দুর্যোধন এবং তাঁর ভাইয়েরাও জরাসন্ধেরই অনুগত।

কৃষ্ণ সবশেষে বললেন—সামনাসামনি যুদ্ধ করে জরাসন্ধকে হারানো কখনওই সম্ভব নয়। আর জরাসন্ধ যতদিন বেঁচে আছেন, ততকাল রাজসূয় যজ্ঞের মতো একটা রাষ্ট্রবর্ধক যজ্ঞ করা আপনার দ্বারা কখনওই সম্ভব হবে না—

ন তু শক্যং জরাসন্ধে জীবমানে মহাবলে।

যুধিষ্ঠির শান্ত স্বভাবের মানুষ, এসব শুনে তিনি এতটাই ভয় পেলেন যে রাজসূয় যজ্ঞের ভাবনাই ত্যাগ করা ভাল বলে চিন্তা করলেন। কিন্তু এই সময় তাঁকে সাহস জোগালেন ভীম এবং অর্জুন। ভীম বললেন—কৃষ্ণের নীতিকৌশল-বোধ, আমার শক্তি আর অর্জুনের যুদ্ধজয়ের ক্ষমতা-এগুলিই তোমার সমস্ত চিন্তা দূর করে দেবে। কৃষ্ণও সহমত পোষণ করলেন এ বিষয়ে এবং জরাসন্ধের শক্তি এবং যুদ্ধ ক্ষমতার প্রশংসা করেও তাঁর ন্যায়-নীতিহীন শাসনের কথা উল্লেখ করে, বিশেষত জরাসন্ধ যে ক্ষত্রিয় রাজাদের বলি দেবার জন্য বন্দি করে রেখেছেন, তা উল্লেখ করে জরাসন্ধকে যে দমন-নিগ্রহ করা দরকার, তা বোঝালেন যুধিষ্ঠিরকে।

জরাসন্ধকে দমন করার প্রসঙ্গ যখন উঠল, তখন কিন্তু কৃষ্ণ যুদ্ধ পরিকল্পনার ধারপাশ দিয়েই গেলেন না। তাঁর প্রস্তাব—আমরা ছদ্মবেশে ঢুকব জরাসন্ধের রাজধানীতে, তারপর তাঁকে একা পেলেই কাজ সেরে ফেলব—

শত্রুমেকম্ উপক্রম্য তং কামং প্রাপ্নুয়ামহ।

এরপরও কৃষ্ণ কিছু কথা বলছেন। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জরাসন্ধের অলৌকিক জন্মকথা, জরাসন্ধের ওপর মহর্ষি চণ্ডকৌশিকের আশীর্বাদ, তাঁর অতুল বাহুবলের কথাও শোনালেন পাণ্ডবদের।

[বি. দ্র. জরাসন্ধ, চণ্ডকৌশিক]

[মহা (k) ২.১৪-১৯ অধ্যায়; (হরি) ২.১৪-১৮ অধ্যায়]

□ কৃষ্ণের প্রস্তাব যুধিষ্ঠিরের মনোমতো হল। তিনি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন—তুমি যখন এইভাবে ভেবেছ কৃষ্ণ, তখন আমি ধরেই নিচ্ছি জরাসন্ধ যেন মারাই গেছে, বন্দি রাজারা সব মুক্ত হয়েছে, আর আমার রাজসূয় যজ্ঞও যেন সুসম্পন্ন হয়েছে—

রাজসূয়শ্চ মে লব্ধো নির্দেশে তব তিষ্ঠতঃ।

যুধিষ্ঠিরের কথার মধ্যে দুটো-তিনটে খবর প্রাণিধানযোগ্য। প্রথমত, যুধিষ্ঠির তাঁর অন্তঃরাষ্ট্রীয়

পররাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে এখন থেকেই কৃষ্ণকে নেতা বলে মেনে নিচ্ছেন এবং মেনে নিচ্ছেন এই কারণেই যে, কৃষ্ণ যতটা কূটনীতি বোঝেন, এমনটা তাঁর কালের আর কেউ বোঝেননি। আর কূটনীতি বস্তুটা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যতখানি আধুনিকতার সূচনা করে, আগ্রাসী যুদ্ধ উন্মাদনা সেখানে একটা প্রাচীন নির্বোধ পন্থা মাত্র। যুধিষ্ঠির বললেন—তুমি উপায় কৌশলী বুদ্ধিমান মানুষ নরাবিধানজ্ঞ—আমরা তোমাকেই আশ্রয় করে কার্যসিদ্ধি করার চেষ্টা করব—

বয়মাশ্রিত্য গোবিন্দং যতামঃ কার্যসিদ্ধয়ে।

যুধিষ্ঠির আরও বলছেন—অর্জুন ছাড়া কৃষ্ণ হয় না, কৃষ্ণ ছাড়াও অর্জুন হয় না, আর কোনো শক্তিই এঁদের অজেয় নয়। অতএব এই জরাসন্ধ বধের উদ্যোগে কৃষ্ণের পিছনে যাক অর্জুন এবং অর্জুনের পিছনে যাক ভীম—তার মানে কৃষ্ণের নীতি-কৌশলের পিছনে থাকবে অর্জুনের ক্ষত্রিয়োচিত 'রিফাইনড্ পোলিটিক্যাল ফোর্স' আর তার পিছনে ভীমের 'র, আনরিফাইন্ড ওয়াইল্ড ফোর্স'-যুধিষ্ঠিরের ভাষায়—

নয়ো জয়ো বলশ্চৈব বিক্রমে সিদ্ধিমেষ্যতি।

□ কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে মগধের পথে যাত্রা করলেন। স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে তিনজনে কুরুদেশ, কালকূট পর্বত, গণ্ডকী নদী, মহাশোণ, সদানীরা, সরযূ, গঙ্গা-শোন প্রভৃতি নদনদী পার হয়ে এসে পৌঁছালেন মগধে। মগধে পৌঁছাবার পর কৃষ্ণের মুখেই মগধের একটা ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে যা রাজনৈতিক ভাবেও গুরুত্বপূর্ণ বটে। পাঁচ পাঁচটা পাহাড়ে ঘেরা মগধের রাজধানী গিরিব্রজপুর আর এই কারণেই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক উপায়েই মগধ-এর রাজধানী একটি অভেদ্য দুর্গের আকার ধারণ করেছে। মগধ আক্রমণ করাও তাই সহজ নয় মোটেই। কৃষ্ণের রাজনৈতিক বুদ্ধি অনুযায়ী তাঁর মুখে এসময় মগধ রাজধানীর অবস্থানের অকুণ্ঠ প্রশংসা শোনা গিয়েছে।

যাই হোক, গিরিব্রজপুরে পৌঁছে তাঁরা জানতে পারলেন, সে সময়ে রাজা জরাসন্ধ একটি যজ্ঞ করার জন্য ব্রত-উপবাসের নিয়ম গ্রহণ করায় শারীরিক দিক থেকে খানিক দুর্বল রয়েছেন। কৃষ্ণ বুঝলেন ভাগ্য সুপ্রসন্ন, জরাসন্ধকে মল্লযুদ্ধে বধ করার এই উপযুক্ত সময়। গিরিব্রজপুরে দোকান-বাজারে ঘুরে মালা কিনে গলায় পড়ে, দুই বাহুতে চন্দন-অগুরুর চিত্র করিয়ে তাঁরা উপস্থিত হলেন জরাসন্ধের সামনে, রাজসভায়। চন্দনের প্রলেপ বা গলায় মালা পরা কোনোটাই স্নাতক ব্রাহ্মণের উপযুক্ত বেশভূষার মধ্যে পড়ে না। তাই এঁদের দেখে জরাসন্ধের সন্দেহ একটা হল ঠিকই, কিন্তু রাজা হিসেবে জরাসন্ধ অতীব ভদ্রলোক, ব্রাহ্মণের বেশে তিনজনকে দেখে তিনি পাদ্য-অর্ঘ্য-মধুপর্ক দিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন, অতিথি সৎকারও করলেন যথাযথভাবে। তারপর অবশ্য সন্দেহটা ব্যক্তও করে ফেললেন জরাসন্ধ। জিজ্ঞাসা করলেন আগন্তুকদের আসল পরিচয়—

কে যূয়ং মাল্যবন্তশ্চ ভুজৈর্জ্যাঘাতকর্কশৈঃ।

কৃষ্ণ খুব বেশি ভণিতা না করেই বললেন তাঁদের অভিপ্রায়—আপনি এতগুলো ক্ষত্রিয় রাজাকে বন্দি করে রেখেছেন কোন অপরাধে? আপনি তাঁদের হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছেন, মহাদেব রুদ্রের কাছে তাঁদের বলি দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, এটা আমরা মানব না। সর্বোপরি আপনি ভাবেন জগতে ক্ষত্রিয়কুলের মধ্যে আপনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো পুরুষ নেই—এর মতো বড়ো ভুল আর দ্বিতীয়টি নেই—

মন্যসে স চ তে রাজন্ সুমহান্ বুদ্ধিবিপ্লবঃ।

আস্তে আস্তে নিজেদের পরিচয় দিলেন কৃষ্ণ। তর্ক-বিতর্ক, বাক্-বিতণ্ডায় পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে উঠল যে, ক্রুদ্ধ হয়ে জরাসন্ধ নিজেই মল্লযুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে আনলেন। বললেন—কার সঙ্গে যুদ্ধ করব বলো, তোমাদের তিনজনের সঙ্গে এক এক করে, না একসঙ্গে তিনজনের সঙ্গে—

দ্বাভ্যাং ত্রিভির্বা যোৎস্যে'হং
এক একেন বা পুনঃ।

কৃষ্ণ পাল্টা প্রস্তাব দিলেন—আপনিই ঠিক করুন, কার সঙ্গে আপনি যুদ্ধ করতে চান। জরাসন্ধ ভীমকে বেছে নিলেন। অতুল বলশালী ছিলেন ভীম, তবু বৃদ্ধ, উপবাসক্লিষ্ট জরাসন্ধের সঙ্গেও তাঁর লড়াইটা সহজ হয়নি। অবশ্য দীর্ঘ মল্লযুদ্ধের পর রণক্লান্ত জরাসন্ধ ভীমের হাতে নিহত হন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধের সিংহাসনে বসিয়ে কৃষ্ণ ফিরে এলেন ভীম আর অর্জুনকে নিয়ে। তারপর ফিরে গেলেন দ্বারকায়।

কৃষ্ণের কূটনীতির কারণেই ভারতবর্ষের রাজনীতিতে জরাসন্ধ নামক এক বিরাট অধ্যায়ের অবস্থান হল। জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে আর জরাসন্ধের বন্দি রাজাদের পাণ্ডবরা পেলেন মিত্রপক্ষে।

[মহা (k) ২.২০-২৪ অধ্যায়; (হরি) ২.১৯-২৩ অধ্যায়]

□ এরপর পাণ্ডবদের দিগ্বিজয় সমাপ্ত হতে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন আরম্ভ হল। প্রস্তুতি শুরু হতেই সর্বাগ্রে যিনি এসে উপস্থিত হলেন, তিনি কৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির তাঁকে সমাদর করে বললেন—যজ্ঞারম্ভের সংকল্পে তোমারই অনুমতি আমি প্রথমে নেব। বস্তুত ভাইদের সঙ্গে তোমাকে একত্র করেই এই যজ্ঞ আমি করতে চাই—

তদ হং যষ্টুমিচ্ছামি দাশার্হ সহিতস্ত্বয়া।

কৃষ্ণ সবিনয়ে বললেন—রাজসূয় যজ্ঞ করার বা সম্রাট হয়ে ওঠার সমস্ত গুণই আপনার মধ্যে আছে। অতএব আরম্ভ হোক রাজসূয় যজ্ঞ, আমি আপনার মঙ্গলবিধানে উপস্থিত থাকব। কৃষ্ণের বাক্যে বিনয়ের অভাব ছিল না কোনো, তবে বাল্যকালেই যে মানুষটি মথুরার 'কিংমেকার' হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। আজ জরাসন্ধ পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁরই শুভকামনার ছত্রছায়ায় যুধিষ্ঠির ভারতবর্ষের ভূমিতে নিজেকে সম্রাট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন—এটা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

তৎসত্ত্বেও এই বিরাট মানুষটি কিন্তু নিজের বিনয়ের স্থান থেকে চ্যুত হননি, আর হননি বলেই তাঁর চরিত্রটি ঈশ্বরত্বের মহিমা লাভ করেছে। এই বৃহৎ রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠির সকলের মধ্যে নানা কাজের দায়দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন। কৃষ্ণ নিজে থেকে সমাগত অতিথি ব্রাহ্মণদের পা ধুইয়ে দেবার কাজ নিলেন—

চরণক্ষালণে কৃষ্ণো ব্রাহ্মণানাং স্বয়ং হ্যভূৎ।

[মহা (k) ২.৩৫.১০; (হরি) ২.৩৪.১০]

□ রাজসূয় যজ্ঞের শেষ পর্যায়ে একটা সময় এল, যখন কুরুপিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন—একজন যোগ্যতম ব্যক্তিকে তোমার অর্ঘ্য দান করা উচিত, তাতে সময়-বিশেষে সেই ব্যক্তিকে তাঁর সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে মেনে নেওয়া যায়। শাস্ত্রের নিয়মে ছয় ধরনের মানুষ এই বিশেষ অর্ঘ্যের যোগ্য বলে চিহ্নিত—তিনি তোমার গুরু হতে পারেন, পুরোহিত হতে পারেন, শ্বশুর কিংবা জামাই হতে পারেন, স্নাতক ব্রাহ্মণ হতে পারেন, বন্ধু অথবা রাজাও হতে পারেন। ভীষ্ম বললেন—তুমি এই ছ-জনের প্রত্যেকের হাতেই তোমার বিশেষ অর্ঘ্য তুলে দিতে পারো, আবার এমনও হতে পারে, এঁদের মধ্যে যাঁকে তুমি শ্রেষ্ঠতম মনে করো, তাঁর হাতেই তুমি একক অর্ঘ্য তুলে দাও।

বস্তুত এই অর্ঘ্যাহরণের ব্যাপারটাও রাজনীতির ইতিবৃদ্ধিতেই ধরা পড়ে। এখন সেই সময় এসেছে যখন জরাসন্ধের ডানহাত শিশুপালও নিজেকে নতুন সময়ের নায়ক মনে করেছেন, দুর্যোধনও হয়তো ভাবছেন নিজের কথা, এমনকী অন্য কোনও পরাক্রান্ত রাজাও নিজেকে রাজনৈতিক সমৃদ্ধির কেন্দ্র বলে ভাবতে পারেন। এই অবস্থায় পরিবর্তিত সময়ের নায়ককে চিহ্নিত করার প্রয়োজন ছিল। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে নায়ক নির্ণয়ের অনুরোধ জানালে, যুধিষ্ঠির উল্টে তাঁকেই বললেন— কার হাতে এই অর্ঘ্য তুলে দেব, সে তো আপনিই বলবেন, পিতামহ! পিতামহ ভীষ্ম যথেষ্ট বয়স্ক মানুষ হলেও ভীষণ রকমের আধুনিক। নতুনকে চিনতে তাঁর ভুল হয় না এবং তাঁকে মেনে নিতেও তাঁর সম্মানহানি হয় না। যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ শুনে তিনি দ্বিধাহীন চকিত উত্তর দিয়ে বললেন—কৃষ্ণ। একমাত্র কৃষ্ণকেই আমি তোমার অর্ঘ্য দেওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত পাত্র মনে করি—অর্হণীয়তমং ভুবি। সূর্যের মতো তিনি সভা আলো করে আছেন, বায়ুর মতো তাঁর সর্বব্যাপ্ত উপস্থিতি টের পাওয়া যায়, তাঁর উপস্থিতিতে এই সভা আলোকিত এবং আহ্লাদিত হয়ে উঠেছে—

ভাসিতং হ্লাদিতঞ্চৈব কৃষ্ণেনেদং সদো হি নঃ।

মহামতি ভীষ্মের এই একতম মনোনয়ন পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের হৃদয়েই ছিল, এখন তা তীব্রতায় পরিণত হল। তিনি আর কাল বিলম্ব না করে সহদেবকে বললেন রাজ-অর্ঘ্য কৃষ্ণের হাতে দিতে। সমস্ত রাজকুলের সামনে, রাজর্ষি-মহর্ষিদের সামনে, সহদেব ভীষ্মের অনুমতি নিয়ে কৃষ্ণের হাতে অর্ঘ্য তুলে দিলেন—যেন সমস্ত রাজসূয় যজ্ঞের চরম পুণ্যফলটাই সমর্পণ করা হল কৃষ্ণকে। সেই উজ্জ্বল সভার মধ্যে কৃষ্ণও শাস্ত্রীয় বিধি নিয়মেই যুধিষ্ঠিরের প্রদত্ত অর্ঘ্য সানন্দে

স্বীকার করে নিলেন, তিনি যেন যুধিষ্ঠিরের সমস্ত দায়টুকুও স্বীকার করলেন।

[মহা (k) ২.৩৬.২৫-৩২; (হরি) ২.৩৫.২৫-৩২]

□ কৃষ্ণের কাছে যুধিষ্ঠিরের এই বিনীত আত্মনিবেদন অনেকেই মেনে নিলেন না। মনে রাখতে হবে, সদ্য প্রয়াত মগধরাজ জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন সেকালের ভারতবর্ষের অনেক রাজা-মহারাজাই। তাঁদের মাথার উপর থেকে যেন বটবৃক্ষের ছায়া সরে গিয়েছে জরাসন্ধের অকালপ্রয়াণে। আর সেই মৃত্যুও সংঘটিত হয়েছে কৃষ্ণের বুদ্ধিতে। ফলে জরাসন্ধপক্ষের রাজারা, যাদের অনেকেই, এমনকী ধার্তরাষ্ট্ররাও আজ ইন্দ্রপ্রস্থের সভায় উপস্থিত, তাঁরা যে জরাসন্ধহন্তাকে অর্ঘ্যদান মেনে নেবেন না এটাই স্বাভাবিক। তবে জরাসন্ধের পুত্রপ্রতিম চেদিরাজ শিশুপালই এই বিরোধীপক্ষের মূল কণ্ঠ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। মনে রাখতে হবে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবরাও কৃষ্ণের আপন পিসতুতো ভাই, শিশুপালও তাই। কৃষ্ণের পিসি, চেদি রাজমহিষী শ্রুতশ্রবার গর্ভে তাঁর জন্ম। অথচ জরাসন্ধের প্রতি আনুগত্য, রুক্মিণী বিবাহের ঘটনা সব মিলিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর যেন চিরকালীন শত্রুতারই সম্বন্ধ। সেই শিশুপাল আজ সভার মধ্যে কৃষ্ণকে গালাগালি দিতে উঠে দাঁড়ালেন। শিশুপাল প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে বললেন—তা হলে এত নেমন্তন্ন করে এত বড়ো-বড়ো রাজা-মহারাজাকে এখানে এই রাজসভায় ডেকে আনা কেন—কিং রাজভিরিহানীতৈরবমানায় ভারত? শিশুপাল বললেন—আমরা তোমাকে সম্রাট হিসেবে মেনে নিয়েছিলাম, যুধিষ্ঠির। তুমি একটা রাজসূয় যজ্ঞ করেছ, তার একটা মর্যাদা আছে, আমরা সশ্রদ্ধে তোমাকে রাজকর দিয়েছি। কিন্তু মনে রেখো, সেটা কারও ভয়ে দিইনি, কেউ অনুরোধ করেছে বলেও দিইনি, এমনকী তোমার কাছ থেকে আমার কোনও সুবিধে আসবে বলেও দিইনি। কিন্তু এতগুলো রাজা যখন রাজকর দিয়ে তোমার আধিপত্য মেনে নিয়েছে, সেখানে তোমারও একবার ভাবা উচিত ছিল যে, কাকে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানটা দিচ্ছ। একটা লোক—যার মধ্যে আচার্য, ঋত্বিক, রাজা কিংবা সম্মনিত ব্যক্তির একটা সামান্য লক্ষণও ফুটে ওঠেনি, তাকে কিনা মাথায় তুলে পুজো করলে—

অপ্রাপ্ত লক্ষণং কৃষ্ণম্ অর্ঘেনর্চিত বানাসি।

যুধিষ্ঠিরকে এটুকু বলার পর খোদ কৃষ্ণের দিকে ফিরেই শিশুপাল বললেন—আর তোরই বা কেমন বুদ্ধি কৃষ্ণ? এ সম্মান গ্রহণ করার যোগ্যতা নেই, তৎসত্ত্বেও গ্রহণ করলি কী করে? শিশুপালের বক্তব্য বেশ দীর্ঘ। আর তার অধিকাংশটাই এমন গালাগালিতে ভরা, যাকে অশালীনতার ক্ষেত্রেও কোনো মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা কঠিন। শিশুপালের মতে, যজ্ঞে দেবতাদের প্রাপ্য ঘি যদি কুকুরে চেটে দেয়, তাহলেই যেমন সে দেবতা হয় না, অর্ঘ্য প্রাপ্ত কৃষ্ণের অবস্থানটাও ঠিক তেমন—

হবিষঃ প্রাপ্য নিষ্যন্দং প্রাশিতা শ্বেব নির্জনে।

শিশুপালের গালাগালি থেকে বৃদ্ধ কুরুকুলপিতামহ ভীষ্মও বাদ পড়লেন না। অত্যন্ত কুৎসিত ভাষায় শিশুপাল তাঁকে আক্রমণ করলেন। ভীষ্ম নতুন যুগের নায়ক কৃষ্ণের প্রতি আত্মসমর্পণ আগেই করেছেন, তাঁর ভগবত্তায় যে ভীষ্মের অকৃত্রিম আস্থা তার প্রমাণ আমরা পরেও বহুবার পাব। এই মুহূর্তে নিজের এবং কৃষ্ণের এমন কদর্য অপমানে তিনি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ কিন্তু আজ ইন্দ্রপ্রস্থে আপন পৌত্রের যজ্ঞসভায় অতিথির অপমান করতে পারবেন না বলেই যেন প্রতিকারের ভারটুকু কৃষ্ণের হাতে সঁপে দিয়ে তিনি সক্রোধে মৌন হয়ে রইলেন। শিশুপালের গালাগালির মাত্রা ক্রমশ বাড়ছে, এই অবসরে শিশুপালের জন্মকালের এক অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ করলেন মহাভারতের কবি, কৃষ্ণের জবানিতে। জন্মের সময়ে নাকি শিশুপালের তিনটে চোখ ছিল এবং চারটে হাত ছিল। ভগবানও এই চেহারায় মর্ত্যলোকে আসেন না, তাই এইরকম অদ্ভুত মনুষ্যেতর শিশুরূপ দেখে তাঁর জননী শ্রুতশ্রবা চিন্তিত ছিলেন। দৈববাণী এমন ছিল যে, যাঁর কোলে উঠলে এই শিশুর হাত দুটি খসে পড়বে এবং তৃতীয় চক্ষুও লুপ্ত হবে, তিনিই এর মৃত্যুর কারণ হবেন। তদবধি জননী শ্রুতশ্রবা অতিথি অভ্যাগত যিনিই বাড়িতে আসতেন, তাঁর কোলে দিতেন শিশুটিকে। কিন্তু শিশুর রূপ অপরিবর্তিতই ছিল। তারপর নাকি কৃষ্ণ-বলরাম পিসীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং শিশুটিকে কৃষ্ণের কোলে দিতেই তাঁর হাত-

চোখের সমস্যা মিটে গেল। কিন্তু শ্রুতশ্রবা বুঝলেন যে, কৃষ্ণই তাঁর ছেলের মৃত্যুর কারণ হবেন এবং সেই সময়েই আকুলা জননীকে কৃষ্ণ আশ্বাস দেন—তিনি তাঁর ছেলের একশোটি অন্যায় ক্ষমা করবেন—অপরাধশতং ক্ষাম্যম্।

শিশুপালের শত অপরাধের তালিকা অবশ্য কৃষ্ণ দেননি। তবে সামান্য একটু প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে সভাস্থিত রাজাদের তিনি বললেন—আমার পিসিমার জন্যই এতকাল এই লোকটার সব অপমান আমি সহ্য করেছি, একে হত্যা করিনি আমি পিসিমাকে কথা দিয়েছি বলেই। কিন্তু আর নয়, আজ সকলের সামনে যে-অপমানটা আমায় করল, সে-সব আপনারা নিজের চোখে দেখলেন, আর যে সব জঘন্য কাজ ও করেছে, তার কয়েকটা নমুনা আপনারা শুনলেন। কিন্তু এখানে শেষ নয়, লোকটার সাহস কত দূর জানেন—আমার সতী-লক্ষ্মী স্ত্রী রুক্মিণীর ওপরেও কুনজর ছিল এই মরাটার—

রুক্মিণ্যামস্য মূঢ়স্য প্রার্থনাসীন্ মুমূর্ষতঃ।

কিন্তু এটা হতে পারেনি, আমি রুক্মিণীকে ছুঁতে দিইনি, অথচ ওর বড়ো ইচ্ছে ছিল রুক্মিণীকে বিয়ে করার। কৃষ্ণ নিজে রুক্মিণীর কথা তুলতেই শিশুপাল আবারও কদর্য ভাষায় গালাগালি দিলেন কৃষ্ণকে। গালাগালি দেবার কারণও আছে একটু। আমরা জানি, বিদর্ভরাজ ভীষ্মক এবং জরাসন্ধ শিশুপালের সঙ্গেই রুক্মিণীর বিবাহ স্থির করেছিলেন। সেক্ষেত্রে কৃষ্ণ যে সময়ে রুক্মিণীকে হরণ করে বিবাহ করেন, সেসময়ে রুক্মিণী আসলে শিশুপালের বাগ্‌দত্তা। কিন্তু শিশুপাল যখন কৃষ্ণের হৃদয়বাসিনী রুক্মিণীকে সভার মধ্যে নিজের বাগ্‌দত্তা—মৎপূর্বা বলে দাবি করলেন, তখন কৃষ্ণ আর সহ্য করলেন না। কৃষ্ণ বললেন—আমার পিসিমার মুখ চেয়ে অনেক সয়েছি আমি। কিন্তু আর নয়। এতগুলো রাজার সামনে যে অপমান আমার হল, তা আমি সহ্য করব না। কৃষ্ণ তখনই সুদর্শনচক্রের আঘাতে শিশুপালের মাথা ধড় থেকে আলাদা করে দিলেন।

এই অশান্তিটুকু বাদ দিলে রাজসূয় যজ্ঞ মোটামুটি নির্বিঘ্নেই শেষ হল এবং কৃষ্ণও ফিরে গেলেন দ্বারকায়। *[মহা (k) ২.৩৬-৪৫ অধ্যায়; (হরি) ২.৩৫-৪০ অধ্যায়]*

□ মহাভারতের এর পরবর্তী পর্যায়ের সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হস্তিনাপুরের রাজসভায় দুর্যোধন শকুনির বিপক্ষে যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলে সর্বস্বান্ত হওয়া এবং কুরুরাজসভায় সর্বসমক্ষে দুঃশাসনের দ্বারা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের চেষ্টা। কৃষ্ণ এ ঘটনার সময় কুরুসভায় উপস্থিত ছিলেন না। তবু তাঁর ভগবত্তায় অকৃত্রিম বিশ্বাস রেখে সেই চরম সংকটের মুহূর্তে দ্রৌপদী ভগবান কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন, তাঁর স্তব-স্তুতি করলেন। যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর সেই আর্তি শুনে স্বয়ং ধর্ম এসে প্রবেশ করলেন দ্রৌপদীর বস্ত্রে। বস্তুতর বস্ত্রে তিনি আবৃত করলেন দ্রৌপদীকে—

ততস্তু ধর্মো'ন্তরিতো মহাত্মা/
সমাবৃণোদ্ বিবিধৈর্বস্ত্র পুগৈঃ।

অনেক গবেষকেরই ধারণা এটাই অপেক্ষাকৃত ঠিক পাঠ। কেননা মহাভারতে বিভিন্ন সংকট মুহূর্তে সাধারণত ধর্মই এসেছেন ত্রাতার ভূমিকায়, ন্যায় সম্পাদনকারী, দুষ্টের দমনকারীর ভূমিকায়। সেই ধর্মই সেই সংকটকালে অন্তরিত হয়ে রইলেন দ্রৌপদীর বস্ত্রাঞ্চলে—এবং একটার পর একটা নানা রঙের বিচিত্র বসন বেরিয়ে আসতে লাগল দুঃশাসনের বস্ত্রাকর্ষণের ক্রমান্বয়ে—

তদ্রূপমপং বস্ত্রং প্রাদুরাসীদনেকশঃ।

দ্রৌপদীর বিপদ-মুক্তির প্রার্থনায় অন্যতর যে পাঠ বহুজন-সম্মত সেটা একটু ভক্তিরসাশ্রিতই বটে। সেই পাঠটা এইরকম— কর্ণের আদেশে দুঃশাসন অসভ্যের মতো দ্রৌপদীর কাপড় ধরে টানাটানি আরম্ভ করলেন, তখন দ্রৌপদী আর কোনও উপায় না-দেখে নিজের বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য প্রার্থনা জানালেন কৃষ্ণর কাছে—

দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।

শরণাগতি এবং আত্মনিবেদনের জায়গা থেকে দ্বারকাবাসী গোবিন্দর নাম নিলেন দ্রৌপদী। ঘনিয়ে-আসা বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য এবং অবশ্যই সর্বাঙ্গীণ লজ্জা-নিবারণের জন্য দ্রৌপদী কৃষ্ণ ভগবানের শরণ গ্রহণ করলেন। কিন্তু তখনও লজ্জায় অবনত তাঁর ক্রন্দমান মুখ, তিনি রাগে কাঁদছিলেন—

প্রারুদদ্ দুঃখিতা রাজন্ মুখমাচ্ছাদ্য ভামিনী।

মহাভারতের এই পাঠান্তরে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর আর্তিতে সাড়া দিয়েছেন এবং প্রায় অলৌকিক

ভাবে একের-পর-এক রঙিন বসন যুক্ত হতে লাগল দ্রৌপদীর বস্ত্রকোটিতে—

তদ্রূপমপরং বস্ত্রং প্রাদুরাসীদনেকশঃ।

মহাভারতের এই পাঠান্তরে অবশ্য ভক্তি, ভগবান এবং শরণাগতির জয়কার, এমনকী বিভিন্ন প্রদেশের লৌকিক গান, পালা, ভজন-কীর্তন ইত্যাদির মধ্যেও বস্ত্রহরণের কালে দ্রৌপদীর এই লজ্জা-নিবারণের প্রার্থনা এবং কৃষ্ণের অলৌকিক বস্ত্রদানের কাহিনী পরম্পরাগত-ভাবে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু মহাভারতের অত্যন্ত প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপিগুলোতে, বিশেষত কাশ্মীরি এবং নেপালি পাণ্ডুলিপিতে, দ্রৌপদীর এই আর্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায়নি। উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের পাণ্ডুলিপিতেও শ্লোকের হেরফের আছে—সেটা মেহেন্ডেল-এর মতো পণ্ডিত খুব স্পষ্ট করে জানিয়েছেন। এত সব কাণ্ড দেখে পুনে থেকে বেরনো মহাভারতের বিশুদ্ধ সংস্করণ গোটা ব্যাপারটাকেই বাদ দিয়ে দ্রৌপদীর আর্তিপ্রার্থনা ফুটনোটে রেখে দিয়েছে, কিন্তু আশ্চর্য কোনো বুদ্ধিতে এমন একটা-দুটো শ্লোক এখানে মেনে নেওয়া হয়েছে যেটার অর্থ হল—দুঃশাসন দ্রৌপদীর উত্তমাঙ্গের বসন-প্রান্ত ধরে টানাটানি করতেই নতুন-নতুন বস্ত্র সেখানে যুক্ত হতে থাকল পরের পর। পুনের পরিশুদ্ধ সংস্করণে সভাপর্বের সম্পাদক-মশাই অধ্যাপক এড্‌গারটন এই রহস্যের কারণ-সমর্থক কোনো শ্লোক এখানে উদ্ধার করেননি এবং একটি পরম উদার মন্তব্য করে বলেছেন—no mention of Krishna or any other superhuman agency... It is apparently implied (though not stated) that cosmic justice automatically, or "magically" if you like, prevented the chaste and noble Draupadi from being stripped in public.

□ এই কুরুসভাতেই দ্বিতীয়বার দ্রৌপদীর মুখে কৃষ্ণের নাম শোনা যাচ্ছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে। বস্ত্রহরণের নক্কারজনক প্রয়াস ব্যর্থ হবার পর, দ্রৌপদী তখন প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছেন কুরুসভার লোকজন, কুরুবৃদ্ধদের কাছে। সেই সময় দ্রৌপদী নিজের অপমানের কথা বলতে গিয়ে বলছেন—আমি পাণ্ডবদের বিবাহিতা ভার্যা, দ্রুপদ রাজার মেয়ে এবং বাসুদেব কৃষ্ণের সখী—সেই আমি আজ এইভাবে সভার মধ্যে এসে অপমানিত হয়েছি—

বাসুদেবস্য চ সখী পার্থিবানাং সভামিয়াম্।

বিবাহের পর স্বামীর বাড়ির সুখ্যাতি এবং বাপের বাড়ির মর্য্যাদার প্রশ্নটা সব মেয়ের কাছেই বলার মতো বিষয়। কিন্তু সেকালের এক বিরাট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রায় ভগবত্তায় প্রতিষ্ঠিত একজন পুরুষকে আপন সখা বলে উচ্চারণ করে দ্রৌপদী নিজেকে এমন এক স্পষ্ট এবং নির্মল সম্পর্ক সেতুর ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যা একান্তভাবে মহাকাব্যিক রমণীর পৃথক প্রকোষ্ঠ নয়, বরং তা একান্তভাবেই দ্রৌপদীর। তিনিই পারেন রাজসভায় দাঁড়িয়ে বলতে—আপনারা তাড়াতাড়ি এই অসভ্যতা বন্ধ করুন—আমি দ্রুপদ রাজার মেয়ে, পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী এবং বাসুদেব কৃষ্ণের সখী—সেই আমি এখানে পাশা খেলার পণে জিত হয়ে আপনাদের দাসী হয়েছি, না এখনও অদাসী—তাড়াতাড়ি বলে দিন দয়া করে— আমি সেই অনুসারে আমার তর্কপ্রত্যুত্তর জানাব, সেই অনুসারে কাজ করব—

তথা প্রত্যুক্তমিচ্ছামি তৎ করিষ্যামি।

□ যাই হোক, তখনকার মতো পাশা খেলা স্থগিত করে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির তথা পাণ্ডবদের আবার রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন ঠিকই, কিন্তু দুর্যোধনের দুষ্টবুদ্ধিতে আবার দ্বিতীয় দফায় পাশা খেলা হল, যার পরিণাম হল রাজ্য হারিয়ে পাণ্ডবদের দ্বাদশ বৎসরের বনবাস। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, পাণ্ডবদের এই পাশা খেলার ঘটনার সময় কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে ছিলেন না। পাণ্ডবদের বনবাসপর্বের সূচনায় যখন কৃষ্ণ কাম্যক বনে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, সেই সময় তাঁর মুখেই তাঁর পাশাখেলার সময়কার ব্যস্ততার খবর শোনা যায়। আমরা আগেই জানিয়েছি, জরাসন্ধ প্রায় সম্পূর্ণ ভারত ভূখণ্ডের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন, ফলে তাঁর অনুগত রাজা, অভিন্নহৃদয় বন্ধু প্রভৃতির সংখ্যাও নেহাত অল্প ছিল না। আর সেই গোষ্ঠীর মধ্যে সে সময়ের বেশ কিছু পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। জরাসন্ধের মৃত্যুর কারণে তাঁদের মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভ ছিলই, এখন সেই ক্ষোভের আগুনে ঘি পড়ল যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় সভার মধ্যে

কৃষ্ণের হাতে শিশুপালের মৃত্যুর ঘটনায়। আর এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে যিনি উদ্যোগী হলেন, তিনি সৌভদেশের রাজা শাল্ব। শাল্ব জরাসন্ধের অভিন্নহৃদয় বন্ধু, শিশুপাল যেমন জরাসন্ধের পুত্রপ্রতিম, শাল্বর সঙ্গেও তাঁর সম্বন্ধ ততটাই ঘনিষ্ঠ। সেই শিশুপালের মৃত্যুর খবর পেয়ে শাল্ব নিজে দ্বারকা আক্রমণ করলেন। কৃষ্ণ নিজে তখন দ্বারকায় ছিলেন না। ফলে যুদ্ধ তেমন হল না। আক্রমণটা হল একেবারে একপেশে। শাল্বর সৈন্য-সামন্তরা দ্বারকার উদ্যান উপবন তছনছ করে দিয়ে গেল। কিছু অল্পবয়স্ক যোদ্ধা তাদের হাতে মারা পড়ল।

কৃষ্ণ জানিয়েছেন—এ ঘটনার পর কৃষ্ণ নিজে সসৈন্যে শাল্বদেশ আক্রমণ করলেন। শাল্ব রাজার সামর্থ্য কিছু কম ছিল না, ফলে দ্বারকার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে শাল্বদেশের যে যুদ্ধ হল, তাকে এক কথায় ভয়াবহ যুদ্ধই বলা চলে। কৃষ্ণের মুখে সেই যুদ্ধের বিশদ বিবরণ পাওয়া গেলেও আমরা সেই বিবরণ এখানে দেব না। শুধু সংক্ষেপে জানাই, অনেক যুদ্ধের পর শেষ পর্যন্ত শাল্বরাজ মারা পড়লেন কৃষ্ণের হাতে।

□ পাণ্ডবদের বনবাসের খবর ছড়িয়ে পড়তে পাণ্ডবদের আত্মীয় এবং মিত্রগোষ্ঠীর রাজারা যখন কাম্যক বনে একত্রিত হলেন, সেই সময়ে যদুকুলপতি কৃষ্ণও এসে উপস্থিত হয়েছেন কাম্যক বনে। এসেছেন দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেকয় দেশীয় পঞ্চভ্রাতা। লক্ষণীয়, এঁদের সঙ্গে কিন্তু শিশুপালের পুত্র, তৎকালীন চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুও এসেছেন। তিনি কিন্তু পাণ্ডবদের বা কৃষ্ণের প্রতি কোনো শত্রুভাব পোষণ করছেন না। যাই হোক, এই সমবেত রাজার পাণ্ডবদের অবস্থা দেখে দুর্যোধন প্রভৃতির প্রতি যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়েছেন—

ক্রোধামর্ষসমন্বিতাঃ।

এঁরা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর দুরাচার পুত্রদের যথেচ্ছ গালাগালি তো দিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তুতিও দেখালেন যে, আদেশ পেলেই এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন কৌরবদের ওপর। প্রাথমিক এই কথাবার্তার পর সবাই একটু শান্ত হয়ে বসলেন, তখন কথা বলতে শুরু করলেন কৃষ্ণ। তিনি সম্পূর্ণ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন, ফলে শেষ কথাটা তিনি বলে নিচ্ছেন আগেই এবং এই কথাটা এই মুহূর্তে একমাত্র যুধিষ্ঠির ছাড়া বোধহয় আর সকলেই শুনতে চান। কৃষ্ণ বললেন—পৃথিবী এবার রক্তপান করবে। সর্বংসহা পৃথিবীর সমস্ত ধৈর্য্য চলে গিয়েছে। পৃথিবী এবার দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি এবং দুঃশাসনের রক্তপান করবে—

দুঃশাসন-চতুর্থানাং ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্।

কৃষ্ণ আরও বললেন—শুধু এরা নয়, এদের যারা সাহায্য করবে, তারাও কেউ বাদ পড়বে না, সকলকে পরাজিত করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করব সিংহাসনে। যারা এমন ছলনা করে রাজ্য নিয়ে নিল, সেই ছলনার জন্যই এরা বধযোগ্য হয়ে উঠেছে সকলে। কৃষ্ণের এই ক্রোধ অমূলক ছিল না, কিন্তু এখনই সবাই মিলে কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলে যুধিষ্ঠিরের প্রতিজ্ঞাত সত্য একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে ভেবেই প্রথমে অর্জুন তাঁকে শান্ত করলেন। কৃষ্ণের সম্বন্ধে অনেক ভালো-ভালো কথা বললেন অর্জুন। অর্জুনের কথা শেষে কৃষ্ণের ঘোষাণাটা ছিল সখ্যের প্রত্যয়ে মধুর। কৃষ্ণ বলছিলেন অর্জুনকে—বন্ধু হিসেবে তোমার সঙ্গে আমি অভিন্ন। আমার যারা অনুগত মিত্র, তারা তোমারও অনুগত মিত্র, তোমার শত্রু আমারও শত্রু। আমরা এমনই অভিন্নহৃদয় যে, আমাদের মধ্যে ভেদ তৈরি করার ক্ষমতা কারও নেই—

নাবয়োরন্তরং শক্যং বেদিতুং ভরতর্ষভ।

কৃষ্ণের মুখে অর্জুনের সঙ্গে তাঁর এই পরম নৈকট্যের ঘোষণা মহাভারতে অনেকবারই শোনা গেছে। তাঁরা দুজনে সমবয়সী, অভিন্নহৃদয় বন্ধু, দুজনেই মহাবীর, আর লক্ষণীয় সাদৃশ্য হল দুজনেই কৃষ্ণবর্ণ—কিন্তু এইসব সমতার থেকেও তাঁদের অন্তরের সমতা এই মুহূর্তে অন্যতর এক কঠিন ইঙ্গিত বহন করে। ভারতীয় রাজনীতির এই মহানায়কের ভবিষ্যৎ মহাযুদ্ধে 'পার্থসারথি' হয়ে ওঠার এই বুঝি প্রথম ধাপ।

□ এই মুহূর্তে, এই আলোচনার মাঝে উঠে দাঁড়িয়েছেন দ্রৌপদী—

পাঞ্চালী পুণ্ডরীকাক্ষম্ আসীনং ভ্রাতৃভিঃ সহ।

দ্রৌপদীও প্রথমে খুব প্রশংসা করলেন কৃষ্ণের, এমনকী সেই স্তুতিশব্দের মধ্যে ভগবত্তার ঐশ্বর্য্যও মিশ্রিত ছিল। কিন্তু এই প্রশংসা-মুখর উচ্চারণ যখন কৃষ্ণকে প্রায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে দেয়, সেই মুহূর্তেই দ্রৌপদী যেন তাঁকে নামিয়ে

আনেন মাটির বাস্তবে। দ্রৌপদী বললেন— প্রাণীজগতের দিব্যপুরুষ, তাঁদেরও তুমি যেমন ঈশ্বর, তেমনই মানুষের মধ্যেও তুমি সকলের প্রভুর মতো, সুতরাং তোমাকে দুটো দুঃখের কথা বলি ভালোবেসে—

সা তে'হং দুঃখমাখ্যাস্যে প্রণয়ান্মধুসূদন।

দ্রৌপদী বলতে চাইলেন—এত তো তুমি অসাধারণ, অলৌকিকতার সমস্ত বিশেষণ তুমি গায়ে মাখো, আর আমার স্বামীরাও তো সাধারণ কেউ নন, তবু সেই আমি, পাণ্ডবদের ভার্যা হওয়া সত্ত্বেও, তোমার মতো এক বিরাট পুরুষের প্রিয়সখী হওয়া সত্ত্বেও, আর এই ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী হওয়া সত্ত্বেও কী করে আমার মতো রমণীকে ওরা রাজসভায় টেনে আনতে পারল—

কথং নু ভার্যা পার্থানাং তব কৃষ্ণ সখী বিভো।
সভাং কৃষ্যেত মাদৃশী।

কী অবস্থায় ছিলাম আমি? এমন তো নয় যে, রাজসভায় আসার উপযুক্ত বেশ-ভূষা, আবরণ-অলংকরণের প্রস্তুতি ছিল আমার। আমি রজস্বলা অবস্থায় এক বস্ত্রে ছিলাম, কোথায় থাকল আমার নারীত্ব, আভিজাত্য, ওদের ভাব দেখে আমি কেঁপে মরছি, কিন্তু সেই অবস্থায় ওরা আমাকে কুরুসভায় টেনে নিয়ে গেল—

একবস্ত্রা বিকৃষ্টাস্মি দুঃখিতা কুরুসংসদি।

চিরকালের সমাজসাক্ষী সামাজিক হিসেবে রীতিমতো সিদ্ধান্ত দিয়ে বলতে পারি— পাঞ্চালী কৃষ্ণা এবং এই কৃষ্ণ সবচেয়ে আধুনিক একটি মেয়ে এবং ছেলের ততোধিক উষ্ণ এক বন্ধুত্বের আদর্শ হতে পারেন।

'সখী', 'সখা' শব্দদুটোর মধ্যে দুই পৃথক ব্যক্তিত্বের সমপ্রাণতা নিহিত আছে—একপ্রাণ যেখানে আর এক মানুষের প্রাণের কথা সমান-হৃদয়তায় বোঝে, সেই 'সখা।' দ্রৌপদী এটাই বলছেন—আমি তোমার সমপ্রাণা সখী হওয়া সত্ত্বেও তুমি এটা সইলে কী করে যে, আমাকে তারা বাজারের মতো এক সভায় বিক্রয়যোগ্য দাসীর মতো টেনে নিয়ে গেল—

রাজ্ঞাং মধ্যে সভায়াস্তু রজসাভিপরি।

দ্রৌপদী তাঁর পুরুষ-বন্ধুর সামনে অকপটে বলতে পেরেছেন—আমি মেয়েদের একান্ত অবস্থায় ছিলাম, আমি একবস্ত্রা এবং রক্তাক্ত ছিলাম—

স্ত্রীধর্মিনী বেপমানা শোণিতেন সমুক্ষিতা।

সেই অবস্থায় ওরা আমাকে রাজসভায় টেনে নিয়ে গেল। আমার এই নিরালম্ব অবস্থায় কী হাসি ওই ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেগুলোর! আমি ভাবতে পারি না, কৃষ্ণ! কিছুতেই ভাবতে পারি না যে, এই পাণ্ডবরা বেঁচে থাকতে, পাঞ্চাল-বৃষ্ণিবীররা বেঁচে থাকতে ধৃতরাষ্ট্রের ওই ছেলেগুলো আমাকে পয়সা-দিয়ে-কিনে-আনা বেশ্যার মতো ভোগ করতে চাইছিল—

দাসীভাবেন মাং ভোক্তুমীষুস্তে মধুসূদন।

দ্রৌপদী চোখের জল মুছতে-মুছতে উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করছেন বারবার। তাঁর গলা ধরে আসছে উদ্গত দুঃখ-বেদনায়। পূর্বের সেই অপমান, স্বামীদের সেই নিরপেক্ষ সত্যরক্ষার তাগিদ, এবং সামনে সেই সমপ্রাণ সখা কৃষ্ণ—দ্রৌপদী ক্রোধ এবং অভিমান একত্তর করে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন—আমি মনে করি, আমার স্বামীরা নেই, আমার ছেলেরা নেই, আমার কোনও আত্মীয়-স্বজন, বাপ-ভাই কেউ নেই, এমনকী তুমিও নেই কৃষ্ণ, তুমিও নেই আর—

ন ভ্রাতরো ন চ পিতা নৈব ত্বং মধুসূদন।

তথ্য নিবেদন করার মতো যা কিছু ছিল, সব বলে দিয়েছেন দ্রৌপদী। স্বামীরা যে প্রতিবিধান করতে পারেননি, তার পূর্ণ প্রতিবিধান চেয়েছেন স্বনামাঙ্কিত সখার কাছে। দ্রৌপদী বলছেন—চারটে কারণ আছে কৃষ্ণ। কারণ আছে কৃষ্ণ। যে-কারণে সব সময় আমি তোমার সুরক্ষার ছত্রতলে আসার যোগ্য বলে মনে করি নিজেকে, তুমি আমার খেয়াল রাখতে বাধ্য—

চতুর্ভিঃ কারণৈঃ কৃষ্ণ ত্বয়া রক্ষ্যাস্মি নিত্যশঃ।

দ্রৌপদী একবার মাত্র এই কথাটা বলেননি, ভবিষ্যতে আরও একবার খুব কঠিন সময়ে, যখন যুদ্ধের উদ্যোগ-পর্ব শুরু হয়েছে পাণ্ডবপক্ষ থেকে, তখনও এই কারণ-চতুষ্টয়ী উচ্চারিত হয়েছে দ্রৌপদীর মুখে। দ্রৌপদী বলেছেন—চারটে কারণে, প্রথমত নিকট সামাজিক সম্বন্ধ, দ্বিতীয়ত আমার গৌরব, তৃতীয়ত আমাদের পৃথক সেই বন্ধুত্বের অবসর, এবং সবশেষে কারণ তোমার ক্ষমতা—করা, না-করা বা অন্যরকম করার ক্ষমতা, প্রভুশক্তি—

সম্বন্ধাদ্ গৌরবাৎ সখ্যাৎ প্রভুত্বেন চ কেশব।

দ্রৌপদীর অপমানের কথা শুনে কৃষ্ণের অধরোষ্ঠ স্ফুরিত হচ্ছিল ক্রোধে, অ-ক্ষমায়। পাঞ্চাল-বৃষ্ণি-পাণ্ডবদের বীর-সমাগমের মধ্যে কৃষ্ণ তাঁর সখীর মনোমত ইচ্ছাপূরণের বাণী শুনিয়ে দ্রৌপদীকেই বললেন—যাদের ওপরে তোমার রাগ হয়েছে, তাদের স্ত্রীরাও এইভাবেই কাঁদবে, যেমন করে তুমি কাঁদছ এখানে—

রোদিষ্যন্তি স্ত্রিয়ো হ্যেবং যেষাং ক্রুদ্ধাসি ভাবিনি।

আর এ কাজটা আমাকে করতে হবে না, তোমার বীর স্বামী অর্জুনই করবে এই কাজ। প্রতিপক্ষের বীরপুরুষরা অর্জুনের বাণে রক্ত মেখে শুয়ে থাকবে ভুঁয়ে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, দ্রৌপদী, আজকে যদি স্বর্গ ভেঙে পড়ে এই পৃথিবীর ওপর, হিমালয় পাহাড় যদি ছোট্টটি হয়ে যায় অথবা সমুদ্র যায় শুকিয়ে, তবু আমার কথা মিথ্যে হবে না। তুমি রাজরানি হবে আবার। কৃষ্ণের কথা শুনে দ্রৌপদী আর একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। তাঁর বিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছে কৃষ্ণের কথায়।

□ কৃষ্ণ জানিয়েছেন তিনি দ্বারকায় ছিলেন না। দ্বারকায় থাকলে কিংবা পাশাখেলার খবর জানা থাকলে তিনি যে তা বন্ধ করার চেষ্টা করতেন সবরকমভাবে, সেটাও তিনি জানালেন। কৃষ্ণ বলছেন—আমি যদি দ্বারকায় থাকতাম, তাহলে এই পাশাখেলার খবরও আমি পেতাম আর সেক্ষেত্রে দুর্যোধনরা আমন্ত্রণ না জানালেও অনাহূতভাবেই আমি আসতাম—

আগচ্ছেয়ম্ অহং দ্যূতম্
অনাহূতো'পি কৌরবৈঃ।

আর সেখানে উপস্থিত থাকলে এই ভয়ংকর পাশা খেলা আমি হতে দিতাম না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লীক—এই সব কুরুপ্রধানদের উপস্থিতিতে এই পাশা খেলা আমি যে করে হোক বন্ধ করতাম। পাশাখেলার হাজারটা দোষের কথা বলতাম, আর সেসব সদুপদেশে কাজ না হলে ধৃতরাষ্ট্রকে নিগৃহীত করে বন্ধ করে দিতাম পাশা খেলা। তাতে যদি ভিতরের বা বাইরের শত্রু মিত্ররা ধৃতরাষ্ট্রের সমর্থনে এগিয়ে আসত, তা হলে সেই পাশাড়েদের মেরে শেষ করতাম আমি। অবশেষে দুঃখ করে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন—কিন্তু আমি দ্বারকায় ছিলাম না মহারাজ। আর সেই জন্যাই এই বিপদ ঘটে গিয়েছে। দ্বারকায় ফিরে সাত্যকির মুখে সব শুনে আমি এখানে ছুটে এসেছি—

শ্রুত্বৈব চাহং রাজেন্দ্র পরমোদ্বিগ্নমানসঃ।

কিন্তু এখানে এসে তোমাদের এই কষ্ট দেখে নিজেই বড়ো কষ্ট পাচ্ছি।

কৃষ্ণ কেন দ্বারকায় ছিলেন না—সেকথা আমরা আগেই জানিয়েছি। যাই হোক, সেই দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর কৃষ্ণ বিদায় নিলেন পাণ্ডবদের অরণ্য আবাস কাম্যক বন থেকে।

□ পাণ্ডবরা বনবাসে থাকার সময়ে আরও দু-তিনবার তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণের দেখা হয়েছে। অর্জুন যখন দিব্যাস্ত্র লাভের জন্য স্বর্গলোকের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন তখন যুধিষ্ঠিরাদি চার পাণ্ডব দ্রৌপদী সহ তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে একসময় প্রভাসতীর্থে এসে পৌঁছালেন। কৃষ্ণ-বলরাম-শাম্ব-সাত্যকিরা সেই খবর পেয়ে প্রভাসে এসে দেখা করলেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে। পাণ্ডবদের দুর্দশা দেখে তাঁরা খুব কষ্ট পেলেন এবং বলরাম তো এতটাই ক্রুদ্ধ হলেন যে, কৃষ্ণের উদ্দেশেই সক্রোধে বললেন—তাহলে তো দেখছি ধর্মের অনুষ্ঠান করলেও মানুষের কোনো উন্নতি হয় না, আবার অধর্মের কাজ করলেও মানুষের কোনো অবনতি হয় না—

ন ধর্মশ্চরিতো ভবায়/
জন্তোরধর্মশ্চ পরাভবায়।

যুধিষ্ঠির এবং দুর্যোধন এই বৈপরীত্যের উদাহরণ। বলরাম অনেক কথা বললেন বটে, যুধিষ্ঠিরের কষ্ট দেখে তিনি যথেষ্ট উদ্বেলিতও হলেন। কিন্তু বোধ করি দুর্যোধনের প্রতি কিছু অধিক স্নেহের কারণেই অন্য সময়ে যেভাবে তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন, তেমন কোনো ভাবান্তর এক্ষেত্রে হল না। এখানে অর্জুনের অস্ত্রশিষ্য শৈনেয় সাত্যকি বিরাট জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে বলরামের তর্ক-যুক্তি এবং আচরণ-বিহীন মৌখিকতার অভিমুখ ঘুরিয়ে দিয়ে যুদ্ধের উৎসাহে পরিণত করলেন পরিস্থিতিকে। কিন্তু কৃষ্ণ বোধহয় অধিকতর কূটনীতির বোধে বলরামকেও লজ্জা থেকে মুক্তি দিলেন এবং সাত্যকির উদ্যত ক্রোধকেও শান্ত করে দিলেন যৌধিষ্ঠিরী মর্যাদায়। কৃষ্ণ বললেন—হ্যাঁ সাত্যকি, তুমি যা বললে সেটাই আমরা করতে পারতাম—

গৃহ্ণীম তে বাক্যম্ অদীনসত্ত্ব।

কিন্তু কী জানো, এই কৌরবকুলের গর্ব যুধিষ্ঠির এই রাজ্যটা নেবেন কেন, যেটা তিনি নিজেদের বাহুবলে জয় করেননি। মনে রেখো, এটা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। যুধিষ্ঠির কিংবা ভীমার্জুনের মতো মর্য্যাদাসম্পন্ন ক্ষত্রিয়, এমনকী নকুল-সহদেব এবং দ্রৌপদীও আমাদের জয় করা রাজ্য গ্রহণ করতে চাইবেন না। কোনও কামনার বশে, কিংবা ভয়-লোভে আবিষ্ট হয়ে যুধিষ্ঠির কখনও স্বধর্ম থেকে চ্যুত হবেন না, নিজের সত্য থেকেও তিনি চ্যুত হবেন না—

ন হ্যেষ কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্‌যুধিষ্ঠিরো
জাতু জহ্যাৎ স্বধর্মম্‌।

যুধিষ্ঠির সঙ্গে-সঙ্গে কৃষ্ণের ভাবনাটাকে সম্মান জানিয়ে সাত্যকিকে বললেন— একেবারে ঠিক বলেছেন কৃষ্ণ। হ্যাঁ, সাত্যকি, সত্য রক্ষা তো করতেই হবে আমাদের। কিন্তু রাজ্যটা নয়—

সত্যং তু মে রক্ষ্যতমং ন রাজ্যম্‌।

যে কোনও উপায়ে রাজ্য ফিরে পেতে চাই না আমি, সত্যের বিনিময়ে তো নয়ই। কৃষ্ণকে আমি ঠিক-ঠিক বুঝি, এবং তিনিও বোঝেন আমাকে—

কৃষ্ণস্তু মাং বেদ যথাবদেকং-
কৃষ্ণঞ্চ বেদাহমথো যথাবৎ।

আর সময় তো একদিন আসবেই, যেদিন তুমি এবং কৃষ্ণ আসবে আমাদের যুদ্ধ-সহায় হয়ে। আমি চাই—যদু-বৃষ্ণিদের বীরপুরুষরা ফিরে যান এবার। আমাদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছে, আপনারা ভালো থাকুন, সময়কালে আপনাদের দেখা পাই যেন—

দৃষ্টোঽস্মি নাথৈর্নরলোকনাথৈঃ
দ্রষ্টাস্মি ভূয়ঃ সুখিনঃ সমেতান্‌।

□ বনবাসের শেষ পর্যায়ে কৃষ্ণ একবার পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সঙ্গে এলেন তাঁর প্রিয়া মহিষী সত্যভামা। কৃষ্ণ এসময় বেশ কিছুদিন বাস করলেন পাণ্ডবদের সঙ্গে। এই সময় কৃষ্ণের মুখ থেকে একটা জরুরী খবর পাওয়া যায়। পাণ্ডবদের বনবাসের সূচনাকালে দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীর পুত্রদের পাঞ্চাল রাজপুরীতে, তাঁদের মাতুলালয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে, সেখানে তাঁরা বেশিদিন থাকেননি। কৃষ্ণ নিজে বলছেন—দ্রুপদ রাজা নিজে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি মাতুলরা দ্রৌপদীপুত্রদের পাঞ্চালে থাকার যথাযথ ব্যবস্থাও করেছিলেন, তাঁরা যাতে সেখানেই থাকেন তার জন্য আদর-যত্ন প্রলোভন কোনো কিছুই বাকি রাখেননি। কিন্তু দ্রৌপদীপুত্ররা সোজা দ্বারকায় গিয়েছেন। সেখানে বিমাতা সুভদ্রা এবং অভিমন্যুর স্নেহে তাঁরা প্রতিপালিত হয়েছেন, অস্ত্রশিক্ষা করেছেন স্বয়ং কৃষ্ণ, কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন এবং অভিমন্যুর তত্ত্বাবধানে। অর্থাৎ বনবাসের সময়কালে পাণ্ডবপুত্রদের প্রতিপালনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন কৃষ্ণ।

[মহা (k) ৩.১৮৩.২৮-৩০; (হরি) ৩.১৫৪.২৪-৩০]

□ বনবাসের একেবারে শেষ পর্বে কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের সাক্ষাতের ঘটনাটিতে বেশ একটু অলৌকিকতার ছোঁয়া দেখতে পাওয়া যায়। দুর্যোধন একসময় হস্তিনাপুরের রাজপুরীতে আগত মহর্ষি দুর্বাসা এবং তাঁর শিষ্যদের আপ্যায়ন করেন। দুর্বাসা দুর্যোধনের সেবায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলে দুর্যোধন প্রার্থনা করলেন— দুর্বাসা যেন কোনো একদিন দ্রৌপদীর ভোজনের পর সহস্র শিষ্য নিয়ে গিয়ে পাণ্ডবদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। দুর্বাসা সম্মত হলেন। সেই মতো যেদিন দুর্বাসা সহস্র শিষ্য সহ পাণ্ডবদের কুটীরে উপস্থিত হলেন, পাণ্ডবরা এবং দ্রৌপদী সকলেই চিন্তিত হলেন। তখন দ্রৌপদীর আহার সম্পন্ন হয়েছে। সূর্য প্রদত্ত স্থালীতে কোনো খাদ্যই অবশিষ্ট নেই। অথচ অতিথি সৎকার করতে না পারলে দুর্বাসা অভিশাপ দেবেন। এই অবস্থায় দ্রৌপদী কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন, কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রভাবেই এই দুরবস্থা থেকে পাণ্ডবরা মুক্তি লাভ করেন। *[দ্র. দুর্বাসা]*

□ কৃষ্ণকে আবার পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হতে দেখা যাবে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের শেষে, যখন বিরাটরাজার মেয়ে উত্তরার সঙ্গে অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর বিবাহ হচ্ছে, মৎস্যদেশের অন্তর্গত উপপ্লব্য নগরীতে। আমরা আগেই জানিয়েছি যে, কুমার অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষা প্রতিপালন ঘটেছে দ্বারকাতেই, অজ্ঞাতবাসে যাওয়ার আগে পাণ্ডবরা নিজেদের সারথি ও অনুগত ভৃত্যদেরও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দ্বারকায়। সুতরাং কৃষ্ণ যখন এলেন, এঁদের সকলকে সঙ্গে করেই নিয়ে এলেন। পাশাপাশি অভিমন্যুর বিবাহ

উপলক্ষে যদু-বৃষ্ণি সংঘের জ্ঞাতি-গুষ্টি আত্মীয়স্বজনরাও সমবেত হলেন উপপ্লব্যে। লক্ষণীয়, এই বিবাহ উপলক্ষে দ্রুপদ এবং পাণ্ডবদের হিতৈষী অন্যান্য রাজারা যখন উপপ্লব্যে এলেন, তখন তাঁদের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ সৈন্য-সামন্ত এবং রথ-অশ্ব-হস্তীও এল। সরাসরি ঘোষণা না হলেও যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরুই হয়ে গেল প্রকারান্তরে। বৈবাহিক প্রক্রিয়ার অন্তরালে চোরা স্রোতের মতো একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব দেখা গেল এবং সেটা একেবারে প্রকট হয়ে উঠল অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহের ঠিক পরদিনই।

উপপ্লব্য নগরীতে সভা বসল। পাণ্ডবরা এবং পাণ্ডবপক্ষীয় রাজা-মহারাজারা সকলে সেই সভায় সমবেত হলেন। পাণ্ডবদের বর্তমান পরিস্থিতিতে কী করা উচিত তা স্থির করার ক্ষেত্রে সকলেই নিজের মতো করে ভাবনা চিন্তা করেছেন, তবুও, অঘোষিত ভাবেই এই সভায় প্রধান বক্তা কৃষ্ণ। তাঁর মুখের দিকেই তাকিয়ে আছেন সকলে—

তস্থুর্মুহূর্তং পরিচিন্তয়ন্তঃ/
কৃষ্ণং নৃপাস্তে সমুদীক্ষমাণাঃ

উপপ্লব্যে আয়োজিত এই সভার পরিচালনার ভারও তাঁর ওপরেই ন্যস্ত।

কৃষ্ণ বলতে শুরু করলেন—আপনারা সকলেই জানেন যে, শকুনির কপট দ্যূতে পরাস্ত হয়ে দ্যূতের শর্ত অনুযায়ী পাণ্ডবরা বারো বছর বনে কাটিয়েছেন, তারপর শেষ করেছেন এক বছরের অজ্ঞাত বাস। এই তেরোটা বছর তাঁরা অনেক কষ্টে কাটিয়েছেন। কিন্তু এখন সময় এসেছে কথা বলার।

আপনারা এবার বলুন কী করা উচিত, যাতে 'ধর্মপুত্র' যুধিষ্ঠির এবং দুর্যোধন, দু'জনেরই মঙ্গল হয়, পাণ্ডবদের এবং কৌরবদের পক্ষে যেটা ধর্ম হয়, যেটা যুক্তিযুক্ত হয়, যেটাতে তাঁদের দুই পক্ষেরই মান বজায় থাকে, সেটা আপনারা চিন্তা করুন। এখানে একটা কথা মনে রাখুন যে, এই যুধিষ্ঠির অন্যায়ভাবে দেবতাদের রাজ্যেও রাজত্ব করতে চান না, আর ধর্মসঙ্গতভাবে যদি রাজ্য পান, তা হলে যুধিষ্ঠির একটা গ্রামের রাজত্ব পেলেও লজ্জিত হবেন না। একই সঙ্গে এটাও কিন্তু মাথায় রাখুন যে, ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা কিন্তু ছলনা করে কপট-পাশায় বাজি রেখে পাণ্ডবদের পৈতৃক রাজ্য হরণ করেছে এবং তারপর পাণ্ডবরা অসহ্য কষ্ট ভোগ করেছে—

মিথ্যোপচারেণ যথা/
কৃচ্ছ্রং মহৎ প্রাপ্তমসহ্যরূপম্।

সভার 'অধিপতি' হিসেবে কৃষ্ণের বাচনভঙ্গি এখানে লক্ষ্য করার মতো। তিনি দুই পক্ষেরই হিত চাইছেন, কিন্তু একই সঙ্গে দুর্যোধনের অন্যায় কীর্তিকলাপগুলোর প্রতিতুলনায় নিপীড়িত পাণ্ডবদের অকারণ ভোগান্তির কথাটাও তুলে ধরেছেন অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে। বিতর্কের অবতারণার সময়েই কৃষ্ণ জানিয়ে রাখছেন যে, পাণ্ডবদের রাজ্যহরণ করাটা তাদের শত্রুদের বহু দিনের উদ্দেশ্য ছিল। সেই ভাবনায় ছোটোবেলা থেকেই তাদের ওপর নানা আক্রমণ নেমে এসেছে, কিন্তু এই সব অন্যায়-আক্রমণের মধ্যেও পাণ্ডবরা কিন্তু অন্য রাজাদের জয় করে তবেই রাজ্য পেয়েছিলেন, এমনি এমনিই একটা রাজ্য জুটে যায়নি তাঁদের।

পাণ্ডবরা অন্যদেশি রাজাদের জয় করে আপন-ক্ষমতায় রাজ্য অর্জন করেছেন—

যত্তু স্বয়ং পাণ্ডুসুতৈর্বিজিতা/
সমাহৃতং ভূমিপতীন্ নিপীড্য।

—এবং সেই রাজ্যও কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা নিজের শক্তি-ক্ষমতায় জয় করেনি, পাণ্ডবদের বলার্জিত রাজ্য তাঁরা কপটভাবে পাশা খেলে জিতে নিয়েছেন—অতএব সেই রাজ্যটা এই পাঁচ পাণ্ডব ভাইরা ফেরত চান—

তং প্রার্থয়ন্তে পুরুষপ্রবীরাঃ/
কুন্তীসুতা মাদ্রবতীসুতৌ চ।

কৃষ্ণ এটাও বলে দিলেন যে, কৌরবরা যদি সোজাসুজি রাজ্য ফিরিয়ে না-দিয়ে যুদ্ধ কিংবা অন্য কোনও পথে যান, সেখানে পাণ্ডবরাও কিন্তু ছেড়ে দেবেন না। তাঁরা সংখ্যায় অল্প, এটা ভাবার কারণ নেই। সেখানে আপনারা সহায় আছেন তাঁদের। তবে হ্যাঁ, এই সভায় আপনাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব মুশকিল। কেননা পাণ্ডবদের বনবাস-অজ্ঞাতবাস শেষ হয়ে গেলেও দুর্যোধন কী করতে চাইছেন, তার কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা পাইনি। এমন অবস্থায় ঠিক কীভাবে এগোবেন আপনারা, সেটাও তো বেশ কঠিন এবং জটিল সমস্যা—

অজ্ঞায়মানে চ মতে পরস্য/
কিং স্যাৎ সমারভ্যতমং মতং বঃ।

কৃষ্ণ তাঁর অবতারণা শেষ করলেন একটা প্রশ্ন দিয়ে—আচ্ছা, আমরা কি অভিজ্ঞ একজন দূত পাঠাবো হস্তিনাপুরে, দুর্যোধনের কাছে? কৃষ্ণের কথার উত্তরে অনেক আলোচনা হল। শেষ পর্যন্ত দ্রুপদ রাজা প্রস্তাব দিলেন—আমার পুরোহিত ব্রাহ্মণকে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় পাঠিয়ে আমাদের বক্তব্য জানানো হোক—

প্রেষ্যতাং ধৃতরাষ্ট্রায় বাক্যমস্মৈ সমর্প্যতাম্।

দ্রুপদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন কৃষ্ণ। কুরুসভায় দ্রুপদ রাজার পুরোহিতকে দূত করে পাঠানো স্থির হল। এই মুহূর্তে আমরা দেখছি, সর্বসম্মতিক্রমে দূতপ্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হবার পর সভাভঙ্গ হতে কৃষ্ণ সাত্যকি প্রভৃতিরা কিন্তু দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

□ কুরুসভায় দূত পাঠানোর প্রস্তাব গৃহীত হলেও যুদ্ধের উদ্যোগ মোটেই বন্ধ হল না। বরং দ্রুপদ এবং বিরাট রাজার উদ্যোগে বিভিন্ন দেশের রাজাদের কাছে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ পাঠানো হল। যাঁরা সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন, তাঁদের সকলকে একত্রিত করে পাণ্ডবপক্ষে সাত অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত হল। এদিক কৌরবপক্ষও চুপ করে বসে নেই, সেখানেও যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে পুরোদমে। সেক্ষেত্রে কৃষ্ণকেও প্রথামাফিক আমন্ত্রণ জানাবার ব্যাপার এসে যায়। কৃষ্ণ সেসময়ের এতটাই প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যে, সামান্য দূত পাঠিয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর কথা দুর্যোধনও ভাবতে পারেন না। আর পাণ্ডবরা যেমন কৃষ্ণের আপন পিসতুতো ভাই তেমনই দুর্যোধনও কৃষ্ণের নিকট আত্মীয়। উল্লেখ্য, কৃষ্ণজ্যেষ্ঠ বলরামের কন্যা ভানুমতীর সঙ্গে দুর্যোধনের বিবাহ হয়েছিল বলে জানা যায়। অপরদিকে কৃষ্ণপুত্র সাম্ব দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে বিবাহ করেছিলেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে হিসাব মতো দুর্যোধন কৃষ্ণের জামাতাও বটে, আবার বৈবাহিকও বটে। যাই হোক, পাণ্ডবপক্ষ থেকে স্বয়ং কৃষ্ণসখা অর্জুন এবং কৌরবপক্ষ থেকে স্বয়ং দুর্যোধন একই দিনে, একই সময়ে পৌঁছালেন দ্বারকায়। দুজনেই দ্বারপালের কাছে শুনলেন—কৃষ্ণ ঘুমোচ্ছেন। দুর্যোধন তৎসত্ত্বেও কৃষ্ণের শয়ন কক্ষেই প্রবেশ করলেন এবং কৃষ্ণের মাথার পাশে রাখা একটি সুন্দর আসনে বসলেন। প্রবেশ করলেন অর্জুনও, কিন্তু তিনি কৃষ্ণের পায়ের দিকে সাহায্যপ্রার্থীর মতোই দাঁড়িয়ে রইলেন করজোড়ে।

কৃষ্ণের ঘুম ভাঙল এবং চোখ মেলেই দেখতে পেলেন সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অর্জুনকে। তারপরেই পাশে মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেলেন দুর্যোধনকে। কৃষ্ণ তখন দু-জনকেই স্বাগত-কুশল প্রশ্ন করে তাঁর কাছে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করতেই প্রথমে দুর্যোধন কোনও ভণিতা না করেই বললেন—সামনে একটা যুদ্ধ আসছে, সেখানে আপনি আমাকেই সাহায্য করবেন। অর্জুন আপনার বন্ধু বটে কিন্তু আমিও আপনার 'কম'-বন্ধু নই। দু-জনের ওপরেই আপনার সখ্য সমান এবং আপনার সখ্য সমান এবং আত্মীয়তার সম্বন্ধও সমান, বিশেষত আমি এখানে আগে এসেছি। একই উদ্দেশ্যে আসা লোকের মধ্যে যে আগে আসে, তার কথাটাই আগে শোনা উচিত। এবং তারই প্রার্থনা পূরণ করা উচিত—

পূর্বঞ্চাভিগতং সন্তো ভজন্তে পূর্বসারিণঃ।

আপনি ভদ্রলোক, অতএব সদাচার বজায় রেখে সঠিক আচরণ করবেন আশা করি।

এত কথার মধ্যে অর্জুন একটাও কথা বললেন না। সামান্য প্রতিবাদও করলেন না, তর্কযুক্তিতে ঘরে ঢোকার অনুক্রম নিয়ে প্রতিষ্ঠাও করতে চাইলেন না নিজেকে। কথা বললেন কৃষ্ণই। দুর্যোধনকে তিনি বললেন— আপনি যে আমার এখানে আগে এসেছেন, তাতে আমি এতটুকুও সন্দেহ করছি না। কিন্তু ঘুম ভেঙে আমি প্রথম দেখতে পেলাম অর্জুনকে। কিন্তু সে যাই হোক, আমি দু'জনকেই সাহায্য করব—যিনি আগে এসেছেন তাঁকেও, আর যাঁকে আমি দেখেছি তাঁকেও। তবে একটা কথা কী জানেন, বয়সে ছোট যারা, তারা যা চাইবে আগে দিতে হয়—

প্রবারণন্ত বালানাং পূর্বং কার্য্যমিতি শ্রুতিঃ।

ঠিক সেই জন্যই অর্জুন কী বলতে চায়, আগে শুনে নিই। তবে তার আগে আমার নিজের কথাটাও বলে নিই। সেটা বিকল্পের কথা—একটা বেছে নিতে হবে।

অর্জুনকেই বলছেন কৃষ্ণ—আমার মতোই শক্তিমান দশ কোটি গোপসৈন্য আছে আমার। তারা অসম্ভব ভাল যুদ্ধ করে এবং তাদের নাম 'নারায়ণ সৈন্য' বা 'নারায়ণী সেনা'। অর্জুন, এই

যুদ্ধদুর্ধর্ষ 'নারায়ণী সেনা' একটা বিকল্প। আর একটা 'বিকল্প' হলাম আমি—যে আমি এই যুদ্ধে নিরস্ত্র থাকব এবং যুদ্ধও করব না—

অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে ন্যস্তশস্ত্রোহমেকতঃ।

এই দুয়ের মধ্যে তুমি 'এক পক্ষ' বেছে নাও। ধর্ম অনুসারে প্রথম প্রাপ্যটা কিন্তু তুমিই পাচ্ছ। তুমি যুদ্ধের সহায় হিসেবে 'নারায়ণী সেনা' নিতে পারো, আর আমাকে নিলে শুধু মন্ত্রণা আর পরামর্শ দিতে পারি আমি, যুদ্ধ তো করব না। তুমি ভেবে দ্যাখো।

অর্জুন কালবিলম্ব না করে অযুধ্যমান নিরস্ত্র কৃষ্ণকে আপন পক্ষে গ্রহণ করলেন—

অযুধ্যমানং সংগ্রামে বরয়ামাস কেশবম্।

দুর্যোধন বুঝি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন! কৃষ্ণের বুদ্ধি আর মন্ত্রণা দিয়ে তিনি কী করবেন! তাঁর কাছে কর্ণ-শকুনির মন্ত্রণা অনেক বেশি মূল্যবান। তিনি বরং খুশি হলেন অর্জুন সেই বিশাল 'নারায়ণী সেনা' চেয়ে বসেননি। যুদ্ধে কাজে লাগবে এমন হাজার হাজার যুদ্ধদুর্মদ সৈন্য লাভ করেই তিনি ভাবলেন আসলে কৃষ্ণকেই তিনি পেয়ে গিয়েছেন। এটাই তাঁর বেশি প্রয়োজন ছিল। দুর্যোধন কৃষ্ণের কাছে সেই শত-সহস্র নারায়ণী সেনা পাওয়ার ছাড়পত্র জোগাড় করে কৃষ্ণজ্যেষ্ঠ বলরামের কাছে গেলেন।

দুর্যোধন চলে যাওয়ার পর কৃষ্ণ অর্জুনকে প্রশ্ন করলেন—আমি যুদ্ধ করব না জেনেও তুমি আমাকে বেছে নিলে কেন? অর্জুনের উত্তরে কৃষ্ণের বীরত্ব-যশ-কীর্তি-ভগবত্তা— সব কিছুর উপর অটল বিশ্বাস এবং সখ্যভাব প্রকাশ পেয়েছে। তিনি জানেন, কৃষ্ণ যে পক্ষে, ধর্মও সেই শিবিরে থাকবেন। আর ধর্ম যেখানে, যুদ্ধজয় বা যশোলাভ সেখানেই। সবশেষে অর্জুন অনুরোধ করলেন—আমার ইচ্ছা, এই মহাযুদ্ধে আপনি আমার সারথি হবেন—

সারথ্যন্তু ত্বয়াকার্যমিতি মে মানসং তদা।

প্রিয় সখার অনুরোধ সানন্দে স্বীকার করলেন কৃষ্ণ।

□ দ্রুপদের পুরোহিত ব্রাহ্মণ দূত হিসেবে কৌরবসভায় বেশ একটু তীব্র ভাষাতেই নিজের বক্তব্য রেখেছিলেন। পাণ্ডবদের হৃতরাজ্য ফিরিয়ে না দিলে যুদ্ধ হবেই এবং সে যুদ্ধ যে কৌরবদের বিনাশের কারণ হবে, সেটা তিনি এতটাই স্পষ্টভাবে বলেছেন যে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম পর্যন্ত ব্রাহ্মণের বক্তব্যে ঈষৎ ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। তবু দূত চলে যাওয়ার পর কুরুবৃদ্ধরা সকলেই ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনের কাছে পাণ্ডবদের হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব রেখেছেন। এই পরিস্থিতিতে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে দূত হিসেবে পাঠালেন পাণ্ডবদের কাছে।

সঞ্জয় এই দৌত্যকর্মের ভার পেয়ে মোটেই খুশি হলেন না। কারণ ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধ না করে শান্তি বজায় রাখার বার্তা দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দেবার কথা কিছু বলেননি। বরং পাণ্ডবরা যেখানে আছেন, সেখানেই সুখে শান্তিতে থাকুন, রাজ্য চাওয়ার কী প্রয়োজন— এমনটাই ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব, যা শুনে যুধিষ্ঠিরের মতো ধীর মানুষও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এখানেও কৃষ্ণই কথা বলতে শুরু করলেন শেষ পর্যন্ত এবং ঠিক এই পর্যায় থেকে কৃষ্ণ যদিও উভয়পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই অনেক কথা বলবেন, তবু মনে রাখা ভাল যে, দ্বারকায় দুর্যোধন এবং অর্জুনের সঙ্গে কথাবার্তার পর এই মুহূর্ত থেকে তিনি ঘোষিতভাবেই পাণ্ডবপক্ষের মানুষ—নেতা, উপদেষ্টাও বটে। এই মহাযুদ্ধের আগে পাণ্ডব শিবিরের রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি প্রথম বক্তব্য রাখছেন কৌরবপক্ষের দূত সঞ্জয়ের সামনে।

কৃষ্ণ কিন্তু কোনো কৌশলী কথার মধ্যে গেলেন না। খুব স্বচ্ছ একটা প্রশ্ন করলেন। সঞ্জয় খানিক বিষণ্ণ ভাবে যুধিষ্ঠিরকে যে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছিলেন, তার রেশ টেনেই কৃষ্ণ একটা সোজাসাপটা বললেন—আমি কিংবা যুধিষ্ঠির—আমরা কেউ ধর্ম থেকে সরে এসে অন্যায় কাজ করেছি, অন্যায় বলেছি, এমনটা তুমি দেখোনি। তাহলে আজ তুমি যুধিষ্ঠিরকে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম থেকে চ্যুত হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করার কথা বলছ কেন? তিনি তো শুধুমাত্র নিজের রাজ্যটা ফেরত চাইছেন এবং সেটা তো কোনো অন্যায় দাবি নয়। যদি সে দাবি পূরণ করা না হয়, তাহলে অবশ্য যুদ্ধ করেই তা আদায় করতে হবে আর ভীম-অর্জুন প্রভৃতির উপস্থিতিতে পাণ্ডবশিবিরকে যুদ্ধে অসমর্থ কখনওই বলা যাবে না। তবে বিনাযুদ্ধে যদি রাজ্যলাভ সম্ভব হয়, তাহলে আমরা শান্তি বজায় রাখব, এমনকী

দ্যূতসভায় যিনি কৌরববধের ভীষণ প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করেছিলেন, সেই ভীমকেও আমরা অহিংসার মতো ধর্মকার্যে ব্যাপৃত করব—

আর্যে বৃত্তে ভীমসেনং নিগৃহ্য।

দুর্যোধনের সমস্ত অপকর্ম এবার একে একে মনে করিয়ে দিলেন কৃষ্ণ। বিশেষত, দ্রৌপদীর অপমানে ভীষ্ম-দ্রোণ থেকে আরম্ভ করে ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত কেউ কোনো প্রতিবাদ করলেন না—কৃষ্ণ মনে করিয়ে দিলেন—সঞ্জয়, তুমিও সেখানে ছিলে, কিন্তু বসে ছিলে নিশ্চুপে, আর সেই জন্যই সেই দ্যূতসভায় দুর্যোধনের করা সমস্ত অপমান মাথায় না রেখেই আজ তুমি যুধিষ্ঠিরকে ধর্মের উপদেশ দিচ্ছ—

অবুদ্ধা ত্বং ধর্মমেতং সভায়াম্/
অথেচ্ছসে পাণ্ডব স্যোপদেষ্টুম্।

সেদিন এই দ্রৌপদী অনেক বুদ্ধিতে নিজেকে এবং তাঁর স্বামীদেরও বাঁচিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার আগে কর্ণ যেভাবে দ্রৌপদীর অন্য কৌরব-স্বামীর ব্যবস্থা করেছিলেন আপন কুটিল কটুভাষিতায়, সেই ভাষা অর্জুনের মর্ম ভেদ করে স্থায়ী হয়ে আছে এখনও। তারপর দুঃশাসন ভীমকে বনে যাওয়ার মুখেও ছাড়েনি, তাঁকে 'ক্লীব' বলে গালাগালি দিয়েছিল। আর সেই পাশাড়ে শকুনির ছলনাও কি কম? নকুল-সহদেবের পর নিজেকেও পাশায় হেরে যুধিষ্ঠির যখন হতচকিত হয়ে বসে আছেন, তখন শকুনি যুধিষ্ঠিরকে বলে কিনা—তোমার তো আরও একটা বস্তু আছে, তুমি দ্রৌপদীকে পণ রেখে খেল এবার—

কৃষ্ণয়া ত্বং দিব্য বৈ যাজ্ঞসেন্যা।

কৃষ্ণ বললেন—এরপরেও যদি কৌরবদের সঙ্গে 'সন্ধি' করতে হয়, তা হলে আমাকেই যেতে হবে কৌরবসভায়। আর সেই সন্ধির শর্ত যদি তারা না-মানে, তা হলে ভীমার্জুন দুর্যোধনকে সব স্মরণ করিয়ে দেবেন যুদ্ধের সময়। এবার সেই বিখ্যাত মহাভারত-সার উক্তি দুটি উচ্চারণ করলেন কৃষ্ণ এবং হয়তো কৃষ্ণ এটা বলেছিলেন বলেই মহাভারতের প্রারম্ভিক আদি পর্বে এই দুটি শ্লোক প্রস্তাবনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কৃষ্ণ বলেছেন—দুর্যোধন হলেন ক্রোধ-দ্বেষময় সেই মহাবৃক্ষ, কর্ণ সেই বৃক্ষের স্কন্ধদেশ যেখান থেকে ডালপালা বের হয়। শকুনি এই বৃক্ষের শাখা এবং দুঃশাসন তার ফুল এবং ফল, আর ভয়ংকর বৃক্ষের মূল হলেন অবিবেচক ধৃতরাষ্ট্রের মতো মানুষ। একেবারে এর বিপরীতে যুধিষ্ঠির হলেন সেই ধর্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জুন তার স্কন্ধদেশ এবং শাখা ভীমসেন, নকুল-সহদেব এই বৃক্ষের পুষ্পফল। আর এই বৃক্ষের মূল হলেন ব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণ এবং সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণরা—

মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ।

এরপরেও কৃষ্ণ কিছু বলছেন, আর তা বলছেন পাণ্ডব এবং ধৃতরাষ্ট্রের সমন্বয়ের ভাবনা থেকে। কৃষ্ণ বলছেন—বন যদি না থাকে, তাহলে বাঘ-সিংহও থাকতে পারে না সেখানে, আবার বাঘ-সিংহ যদি না থাকে, তাহলে আমরা বনও রাখি না। বন কেটে সাফ করে দিই—

নির্বনো বধ্যতে ব্যাঘ্রো নির্ব্যাঘ্রং বধ্যতে বনম্।

পরস্পরের অস্তিত্বের জন্যই বন এবং বাঘ-সিংহ পরস্পরের উপযোগী। এখানে উপমা দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র হলেন সেই আশ্রয়-স্বরূপ বন, যেখানে পাণ্ডবদের মতো বাঘ-সিংহ নিশ্চিন্তে বসবাস করবেন। ধৃতরাষ্ট্রের মতো বনটা যদি না থাকে, তা হলে পাণ্ডবদের মতো বাঘ-সিংহরাও সমস্যায় পড়বেন। আর পাণ্ডবরা যদি না থাকেন সেখানে, তা হলে সপুত্রক ধৃতরাষ্ট্রের বনটুকুও থাকবে না।

কৃষ্ণ বললেন—সঞ্জয়, আমি চাই পাণ্ডবদের মতো বাঘ-সিংহ ধৃতরাষ্ট্রের মতো বনটাকে বাঁচিয়ে রাখুন, আর ধৃতরাষ্ট্রের মতো বনও বাঁচিয়ে রাখুন পাণ্ডবদের মতো বাঘ-সিংহদের—

তস্মাদ্ ব্যাঘ্রো বনং রক্ষেদ্ ব্যাঘ্রঞ্চ পালয়েৎ।

কৃষ্ণ শেষাশেষি একটা অদ্ভুত কথা শুনিয়েছিলেন সঞ্জয়কে। বলেছিলেন— দ্যাখো, পাণ্ডবরা ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করার জন্য প্রস্তুত আছেন, আবার যুদ্ধ করার জন্যও প্রস্তুত আছেন। অর্থাৎ, তাঁরা শান্তিতেও আছেন আবার যুদ্ধতেও আছেন—

স্থিতাঃ শুশ্রূষিতুং পার্থাঃ স্থিতা যোদ্ধুমরিন্দমাঃ।

—এবার ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ বুঝুন—তিনি কী করবেন অথবা না করবেন?

উপপ্লব্য থেকে ফিরে সঞ্জয় যুধিষ্ঠির তথা পাণ্ডবদের বক্তব্যের পাশাপাশি কৃষ্ণের বক্তব্যও নিবেদন করেছেন ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির সামনে। কৃষ্ণ এই সময়ের ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অন্যতম

প্রধান ব্যক্তিত্বও বটে, ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিতও বটে। ফলে সেই কৃষ্ণ যখন পাণ্ডব শিবিরের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করেছেন, তা দেখে সঞ্জয় যেমন ভীত হয়েছেন, তেমনই কৃষ্ণকে পাণ্ডব শিবিরের প্রধান উপদেষ্টা জেনে কুরুবৃদ্ধরা এমনকী স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রও কম ভীত হননি। পাশাপাশি উপপ্লব্য থেকে ফেরার পর সঞ্জয়ের বিবরণে অর্জুন এবং কৃষ্ণের গাঢ় বন্ধুত্ব এবং অন্তরঙ্গ সম্পর্কের একটা চিত্র পাওয়া যায় এবং এই সম্পর্কের আন্তরিকাতাই যে কৌরবশিবিরের ভীতির মূল কারণ, একথা উল্লেখ করতেও সঞ্জয় ভোলেননি।

এই মুহূর্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং দৌত্যের প্রসঙ্গ ছেড়ে আমরা একবার সঞ্জয় প্রদত্ত বিবরণে চোখ রাখতে চাই। কারণ কৃষ্ণ আর অর্জুন জগৎবিখ্যাত সখ্যের অন্তরঙ্গ ছবিটা এই বিবরণেই সবথেকে বেশি ভালভাবে ধরা পড়ে। সঞ্জয় বলছেন— রাজসভায় বসে প্রাথমিক কথাবার্তা শেষ হবার পর কৃষ্ণ এবং অর্জুনের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলার জন্য সঞ্জয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন। সঞ্জয় যেখানে পৌঁছলেন সেটি কৃষ্ণ অর্জুনের এমনই অন্তরঙ্গ এক স্থান যেখানে অভিমুন্য তো বটেই এমনকী নকুল-সহদেবের মতো বয়ঃ-কনিষ্ঠেরও প্রবেশ নিষেধ—

নৈবাভিমন্যু র্ন যমৌ তং দেশমভিযান্তি বৈ।

বেশ বোঝা যায়, এখানে কৃষ্ণার্জুন ছাড়াও তাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের জায়গায় তাঁদের স্ত্রীদেরও সহজ এবং অসংবৃত চলাফেরা বা অবস্থানের অবকাশ আছে। সঞ্জয় বলছেন— আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম, দুজনেই বেশ আমোদ-প্রমোদের ভাবে বিরাজ করছেন, দুজনেই খানিকটা মদ্যপান করেছেন, চন্দনচর্চিত দেহে উত্তম বস্ত্র, প্রচুর আভরণ, গলায় ফুলের মালা। সেখানে তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন দ্রৌপদী এবং সত্যভামা। কৃষ্ণ এবং অর্জুনের সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা বসার ভঙ্গী থেকেই স্পষ্ট। কৃষ্ণ পা ছড়িয়ে বসতে গিয়ে পা-দুটি তুলে দিয়েছেন অর্জুনের কোলে, এদিকে অর্জুনও পা ছড়িয়ে বসেছেন এবং তাঁর পা-দুটির একখানি দ্রৌপদীর কোলে এবং দ্বিতীয়টি নিঃসঙ্কোচে কৃষ্ণ-মহিষী সত্যভামার কোলে তুলে দিয়েছেন—

অর্জুনোৎসঙ্গগৌ পাদৌ কেশবস্যোপলক্ষয়ে।
অর্জুনস্য চ কৃষ্ণায়াং সত্যায়াং চ মহাত্মনং॥

সঞ্জয় তাঁর বিবরণের শেষে এই অন্তঃপুরে বসে কৃষ্ণ যা বললেন, তার সারমর্ম শোনালেন ধৃতরাষ্ট্রকে। কৃষ্ণ বললেন—ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন প্রভৃতি কুবুদ্ধি মানুষজন ভাল করে যাগযজ্ঞ করুন, দক্ষিণা দিন, যতটা পারেন পুণ্য অর্জন করে নিন এই স্বল্প সময়ের মধ্যে। পুত্র পরিবার নিয়ে আমোদ-আহ্লাদও করে নিন, যতটা পারেন। কারণ সামনে ভয়ঙ্কর সময় আসছে—

পুত্রৈর্দারৈশ্চ মোদধ্বং মহদ্ বো ভয়মাগতম্।

পাশাখেলা যখন হয়, তখন আমি দূরে ছিলাম। কিন্তু সেসময় দ্রৌপদী তাঁর চরম অপমানের মুহূর্তে ত্রাতা হিসেবে আমাকেই স্মরণ করেছিলেন। তাঁর সেই আর্ত আহ্বানের ফলে আমার ঋণ তৈরি হয়েছে আর এই সুদীর্ঘ সময়ে এত বড়ো অন্যায়ের কোনো প্রতিবিধান করতে না পারার ফলে ঋণ আমার ক্রমশ বেড়েই চলেছে, যা আমি কখনওই ভুলতে পারিনি এবং পারি না—

ঋণমেতদ্ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
যদ্‌গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্॥

কৌরবদের সেদিনের অপরাধের সমুচিত জবাব যুদ্ধক্ষেত্রে দেবার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল কৃষ্ণের উক্তির মধ্যে। তা শুনে ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত ভয় পেয়ে দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে বলেছেন। কিন্তু দুর্যোধন তখন পাণ্ডববধ করে নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভের ভাবনায় মত্ত। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশে কান দিলেন না।

[মহা (k) ৫.২৯.১-৫৮; ৫.৫৭.৩-৩১;
(হরি) ৫.২৯.১-৫৮; ৫.৫৮.৩-৩১]

□ দুর্যোধনের যুদ্ধোন্মত্ত মনোভাবের কারণে শান্তির সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হতে বসেছে দেখে কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত নিজেই শান্তির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের অন্যায় ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যথিত এবং বিরক্ত বোধ করছেন এই সময়। দ্রুপদের পুরোহিত এবং সঞ্জয়ের দৌত্যে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ইন্দ্রপ্রস্থ তো নয়ই, পাঁচ পাণ্ডবকে পাঁচখানি মাত্র গ্রামও দুর্যোধন দেবেন না। আর ধৃতরাষ্ট্র মুখে যতই শান্তির কথা বলুন না কেন, দুর্যোধনের এই অন্যায় আচরণে তাঁর পূর্ণ সমর্থন আছে। এই অবস্থায় যুধিষ্ঠির বললেন—সবই তুমি দেখছো কৃষ্ণ। এতকাল আমরা রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে আছি এবং এতকাল সত্যরক্ষা করার পরেও আমি কেন পৈতৃক

সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হব? এখন যা অবস্থা, তাতে বিনাশ উপস্থিত হলেও আমাদের হৃতরাজ্য ফিরে পাওয়ার কথা ভাবতেই হবে। অন্যদিকে এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, কৌরবদের ধ্বংস করে রাজ্য পেতে গেলে সেটা উগ্রতার চূড়ান্ত নিদর্শন হবে, কারণ তাতে অকারণ লোকক্ষয় হবে—

তত্রৈষা পরমা কাষ্ঠা রৌদ্রকর্ম ক্ষয়োদয়া।
যদ্বয়ং কৌরবান্ হত্বা তানি রাষ্ট্রাণ্যবাপ্নুমঃ॥

যুধিষ্ঠির এর পর যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে একটা বিশাল বক্তৃতা দিলেন কৃষ্ণের কাছে এবং এখানে তাঁর সমস্ত বক্তব্যটা এমনই দার্শনিক প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত যে, ধৃতরাষ্ট্র যে কারণে যুদ্ধ চাইছেন না এবং যুধিষ্ঠির যে কারণে যুদ্ধ চাইছেন না—এই দুয়ের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ এবং বিশ্বজনের হিতপ্রবৃত্তি—দুটিই বিপরীত সূচনায় পৃথকভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যুধিষ্ঠির সব শেষে কৃষ্ণকে জানালেন—আমাদের বাসস্থানও দরকার, আবার যুদ্ধও চাই না— এইরকম প্রয়োজনের দ্বৈরথ সঙ্কটে তুমি ছাড়া আর কে আমাকে উদ্ধার করতে পারে?

যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য শোনার পর কৃষ্ণ নিজে উভয়পক্ষের স্বার্থরক্ষা এবং কল্যাণের জন্য শান্তিপ্রস্তাব নিয়ে কুরুসভায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যুধিষ্ঠির অবশ্য দুর্যোধনের দিক থেকে অপমান, জিঘাংসার আশঙ্কা করলেন। অবশ্য কৃষ্ণকে আপন সিদ্ধান্তে অটল দেখে উভয়পক্ষের হিত এবং বিপুল লোকক্ষয় বন্ধ করার জন্য যা করা কর্তব্য তা করার জন্য অনুরোধও জানিয়েছেন। কৃষ্ণ এই মুহূর্তে যা বলছেন, তাতে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর ভাবনাটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। কৃষ্ণ বলছেন— দুর্যোধন আমাকে অপমান করতে পারে, অনেক অন্যায় আচরণও করতে পারে। কিন্তু পাণ্ডবপক্ষ থেকে আমি শান্তির প্রস্তাব নিয়ে যাওয়ার পর, সে প্রস্তাব যদি দুর্যোধন অগ্রাহ্যও করে, তাহলেও সব থেকে বড় সুবিধে এই যে, ভাবী যুদ্ধের জন্য কোনো পক্ষই পাণ্ডবদের দায়ী করতে পারে না, জ্ঞাতিচ্ছেদী যে যুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানানো হবে, তার জন্য পাণ্ডবপক্ষের নিন্দা করতে পারবে না কেউ। ঠিক এই মুহূর্তে আমরা যেটা বোঝাতে চাই তা হল, শান্তির প্রস্তাব যে দুর্যোধন গ্রহণ করতে পারেন না—সেটা কৃষ্ণ বেশ ভালোভাবেই জানেন, আর জানেন বলেই কৃষ্ণের কাছে এই শান্তিদৌত্যের একটা অন্য তাৎপর্য্য আছে। কৃষ্ণের নিজের কথা থেকেই তা স্পষ্ট। যে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ দুই জ্ঞাতিপক্ষের মধ্যে হতে চলেছে, পাণ্ডবপক্ষকে তিনি সেই জ্ঞাতিনাশের দায়-কলঙ্ক-নিন্দা থেকে মুক্ত রাখতে চান। তিনি চান, যুদ্ধটাকে যে দুর্যোধন-ধৃতরাষ্ট্ররা নিজেদের অন্যায় আচরণের মাধ্যমে এবং সর্বোপরি শান্তিপ্রস্তাব অগ্রাহ্য করে নিজেরাই আমন্ত্রণ করছেন, সেটা সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক, যাতে ভাবী যুদ্ধের সম্পূর্ণ দায়টাই কৌরবপক্ষের— একথাই ঐতিহাসিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হোক।

□ কৃষ্ণের শান্তিদৌত্যের গূঢ় তাৎপর্যটুকু স্পষ্ট হয়ে ওঠার পরও কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে অবশ্য একথাও বলছেন যে, তিনি কুরুসভায় গিয়ে দুপক্ষের কথাই সঠিকভাবে তুলে ধরবেন, দুর্যোধনের অন্যায় আচরণের কথাও তুলে ধরবেন আবার শান্তির প্রয়াসেও ত্রুটি রাখবেন না। তবু সবার শেষে যুধিষ্ঠিরের কাছে যুদ্ধের আশঙ্কাটাই জীইয়ে রাখলেন কৃষ্ণ। কারণ সেটাই বাস্তব। কৃষ্ণ দ্বর্থ্যহীন ভাষায় জানিয়েছেন, দুর্যোধনের মতো অনাচারী ব্যক্তিকে মারতে হবে, আর এ ব্যাপারে ইতস্তত করার কোনো কারণ নেই।

কৃষ্ণ কুরুসভায় যাওয়ার আগে বাকি পাণ্ডবদের বক্তব্যও শুনলেন যেখানে এই মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত ভাবে ভীমের মতো রাগী মানুষও শান্তির কথা বলছেন, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে একমত হয়ে। কৃষ্ণ কিন্তু জানেন যে, যুদ্ধ হবেই ফলে ভীমের এই শান্তিভাবনাকে উপহাস-রসিকতায় উড়িয়ে দিয়ে তাঁকে যুদ্ধের জন্যই উত্তেজিত করে তুললেন। কারণ, ভীমের মতো বলবান মানুষের ক্রোধকে শান্ত হতে দেবার কোনো মানে নেই এই মুহূর্তে। যুদ্ধক্ষেত্রে এই ক্রোধেরই বড় প্রয়োজন। অর্জুন কৃষ্ণের যুক্তিটা বুঝেছেন খুব ভালভাবে, সেটা জানালেনও, আবার বড় দাদা যুধিষ্ঠির যে লোকক্ষয় রোধ করার জন্য শান্তি চাইছেন, সে ভাবনাটুকুকেও সম্মান দিলেন যথেষ্ট। নকুলও মোটামুটি শান্তির ভাষায় কথা বলছেন কিন্তু ব্যতিক্রম সহদেব। তিনি বলছেন—মহারাজ যুধিষ্ঠির যা বলছেন, তা হল ধর্মের কথা। আমার মতে, তুমি সেই চেষ্টাই করবে যাতে যুদ্ধ হয়।

দুর্যোধনের যাবতীয় পাপকর্মের কথা স্মরণ করে কৃষ্ণকে সহদেব বললেন—এত ঘটনার পরও ওদের মারতে না পারলে আমার ক্রোধ শান্ত হবে না। সেক্ষেত্রে অন্য কেউ যদি যুদ্ধ নাও করে, আমি একাই যুদ্ধ করব। সবশেষে সহদেবের ক্রোধের সূত্র ধরে দ্রৌপদীও কৃষ্ণকে সাবধান করে দিয়ে বললেন—যদি রাজ্য না দিয়ে দুর্যোধন সন্ধি করতে চায়, তবে তুমি যেন সেখানে গিয়ে সন্ধি করে এস না—

অপ্রদানেন রাজ্যস্য যদি কৃষ্ণ সুযোধনঃ।
সন্ধিমিচ্ছেন্ন কর্তব্যস্তত্র গত্বা কথঞ্চন॥

পাণ্ডবদের বনবাসের আরম্ভে দ্রৌপদী কৃষ্ণের সঙ্গে আপন সখ্যের প্রসঙ্গ তুলে নিজের অপমানের প্রতিকার চেয়েছিলেন। আজ এই শান্তির আলোচনার মাঝে সেই অপমানের প্রসঙ্গই তুলে আনলেন আবার। দ্রৌপদীর সিদ্ধান্ত—শান্তি যদি পাণ্ডবরা চানও তাহলেও দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্নের নেতৃত্বে পাঞ্চাল যোদ্ধারা, সৌভদ্র অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র— এঁরাই যুদ্ধ করে তাঁর অপমানের প্রতিকার করবেন। অবশ্য রাগে-অভিমানে এমন কথা বললেও পাণ্ডবরাই যুদ্ধ করে দুর্যোধনকে বধ করে তাঁর অপমানের প্রতিকার করুন এবং রাজ্য পুনরুদ্ধার করুন, এটাই দ্রৌপদীর আন্তরিক চাওয়া। সবশেষে দ্রৌপদী তাঁর মহাসর্পের মতো গাঢ়-কৃষ্ণ কেশকলাপ বাঁ হাতে ধরে কৃষ্ণের সামনে এসে বলেছেন—তুমি যখন সন্ধির জন্য হস্তিনায় যাবে, তখন দুঃশাসন করাকৃষ্ট এই আমার কেশকলাপ যেন তোমার স্মরণে থাকে—

অয়ন্তু পুণ্ডরীকাক্ষ দুঃশাসনকরোদ্ধৃতঃ।
স্মর্তব্যঃ সর্বকালেষু পরেষাং সন্ধিমিচ্ছতা॥

[মহা (k) ৫.৭২-৮২ অধ্যায়;
(হরি) ৫.৬৭-৭৬ অধ্যায়]

□ শুভ দিনক্ষণ দেখে সাড়ম্বরে কৃষ্ণ শান্তি প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুর যাত্রা করলেন। সঙ্গে সাত্যকি, কৃতবর্মা এবং দশজন বাছাই করা বৃষ্ণি যোদ্ধা। সংখ্যায় অল্প হলেও সৈন্য-সামন্তও কিছু সঙ্গে চলল। ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের যাত্রাপথে বিশ্রামের এবং ভোজনের জন্য বহুমূল্য উপকরণ সাজিয়ে রেখেছিলেন। হয়তো ঠিক যে পন্থায় শল্যকে কৌরবশিবিরে আনা গিয়েছে, তেমনই আদর-যত্নে ভুলিয়ে কৃষ্ণকেও তিনি নিজের পক্ষে টানতে চাইছিলেন। কৃষ্ণের মতো ধুরন্ধর রাজনীতিবিদকে এভাবে পাণ্ডবদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টাটা অত্যন্ত হাস্যকর। কৃষ্ণ বুঝলেন সবই, কিন্তু সেই অভ্যর্থনার উপকরণ অবজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন। দুদিনের এই যাত্রাপথে অনেক বিশিষ্ট মুনি-ঋষির সঙ্গেও কৃষ্ণের দেখা হল। কুরু সভায় শান্তিপ্রস্তাব আলোচনার দিনে এঁদের অনেককেই আমরা সভায় উপস্থিত থেকে দুর্যোধনকে বোঝাবার চেষ্টা করতে দেখব। যাই হোক, দুদিনের পথ অতিক্রম করে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে পৌঁছালেন।

কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে পৌঁছালে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্যের মতো বৃদ্ধরা নগরদ্বারে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। দুঃশাসনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শুধুমাত্র দুর্যোধন উপস্থিত ছিলেন না। ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতির সঙ্গে কৃষ্ণ এসে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হলে সেখানে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে সসম্মানে স্বাগত জানালেন। কৃষ্ণ কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন প্রভৃতির বাসভবনে গেলেন না। তিনি সোজা বিদুরের ভবনে উপস্থিত হলেন। সেখানে কৃষ্ণের পিসীমা তথা পাণ্ডবজননী কুন্তীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। দীর্ঘ তেরো বছর কুন্তী ছেলেদের দেখেননি। কৃষ্ণকে দেখে তাঁর সেই দুঃখ নতুন করে জেগে উঠল। কৃষ্ণ কুন্তীকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন। তারপর বিদুরের বাসভবন থেকে বেরিয়ে দুর্যোধনের প্রাসাদে গেলেন।

[মহা (k) ৫.৮৩-৯০ অধ্যায়;
(হরি) ৫.৭৭-৮৩ অধ্যায়]

□ দুর্যোধনের প্রাসাদে দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর দুর্যোধন তাঁকে নিজের প্রাসাদেই আহার ও বিশ্রামের নিমন্ত্রণ জানালে কৃষ্ণ তা প্রত্যাখ্যান করলেন। লক্ষণীয়, দুর্যোধন কৃষ্ণের বৈবাহিকও বটে। সেক্ষেত্রে কুটুম্ব হিসেবেই দুর্যোধন আমন্ত্রণ জানাতে পারেন, আর তা গ্রহণ করাটাও হয়তো খুব অস্বাভাবিক দেখাত না। কিন্তু কৃষ্ণ দুর্যোধনের অন্যায় ব্যবহারও ভোলেননি আর এই মুহূর্তে তিনি যে দৌত্যকর্মে ব্যস্ত সেকথাও না। আত্মীয়তা দেখাবার সময় এটা নয়। তাই কৃষ্ণ ঈষৎ কঠিন সুরেই বললেন—দূত যদি দৌত্যকর্ম সফল করতে পারেন, তারপরই আতিথেয়তা গ্রহণ করার কথা ভাবা উচিত। আমি এই মুহূর্তে দূত

মহারাজ। যদি আমার দৌত্য সফল হয়, তখন নিশ্চয় আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করব—

কৃতার্থা ভুঞ্জতে দূতাঃ পূজাং গৃহ্ণতি চৈব হ।
কৃতার্থং মাং সহামাত্যস্ত্বমর্চিষ্যসি ভারত॥

দুর্যোধন ছাড়লেন না। কৃষ্ণ কেন আতিথ্য স্বীকার করবেন না—তা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন জুড়ে দিলেন। কৃষ্ণ বুঝলেন, দৌত্যের অজুহাত দেখিয়ে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের যে ভদ্রতাটুকু তিনি করেছেন, তা দুর্যোধনের বোধগম্য হয়নি। এ ভাষা দুর্যোধন বোঝেন না। কাজেই কৃষ্ণ যথেষ্ট রূঢ়ভাবেই বললেন—দেখুন মহারাজ! লোভ, দ্বেষ, ভয় বা অন্য কোনো কারণেই আমি কখনও ধর্মকে ত্যাগ করতে পারি না। বিশেষত ভেবে দেখুন, আহারের নিমন্ত্রণ তখনই গ্রহণ করা যায়, যখন নিমন্ত্রণকারীর সঙ্গে নিমন্ত্রিতের প্রীতির সম্পর্ক থাকে। তা না থাকলেও অবশ্য কারও আমন্ত্রণে আহার করা চলে, কিন্তু তখনই, যখন ব্যক্তি ক্ষুধার্ত, বিপন্ন অবস্থায় থাকে। কিন্তু মহারাজ! আমার ক্ষেত্রে দুটো অবস্থার কোনোটাই খাটে না। আমি তোমার প্রীতির পাত্রও নই আর আমি ক্ষুধার্ত বিপন্ন ব্যক্তিও নই। পাণ্ডবরা আমার পরমাত্মীয়, তাঁদের সঙ্গেও ছোটোবেলা থেকে তুমি শত্রুতাই করে এসেছ—

যস্তান্ দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্তাননু স মামনু।
ঐক্যাত্ম্যং মাং গতং বিদ্ধি পাণ্ডবৈর্ধর্মচারিভিঃ॥

কৃষ্ণের স্পষ্ট কথা, তুমি যখন পাণ্ডবদের শত্রু, তখন তুমি কখনওই আমার মিত্র হতে পার না। আর তোমার মত অনাচারী ব্যক্তির অন্নগ্রহণ করারও কোনো ইচ্ছা নেই আমার। আমি বিদুরের আতিথ্যই স্বীকার করব বলে স্থির করেছি।

দুর্যোধন সারা জীবনে এমন অপমানিত কখনো হননি। কৃষ্ণ কি জানতেন না যে, দুর্যোধন যে চরিত্রের মানুষ, তাতে তাঁর এই ব্যবহারের প্রভাব শান্তিপ্রস্তাবেও পড়তে পারে? আমরা বলতে চাই, কৃষ্ণ জানতেন। উপপ্লব্য থেকে তাঁর যাত্রা করার আগেই যে আলাপ আলোচনা হয়েছে, তা থেকে এটুকু বেশ পরিষ্কার কৃষ্ণ নিজেও জানেন যে, যুদ্ধের কোনো বিকল্প নেই। তিনি সেই যুদ্ধের দায়ভার সম্পূর্ণভাবে দুর্যোধনের ওপর চাপিয়ে দিতে চান। সেই জন্যই তাঁর এই শান্তিদৌত্য। ফলে দুর্যোধনকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে শান্তিপ্রস্তাবের সমর্থন আদায় করে নেবার কোনো দায় তাঁর নেই। যাই হোক, দুর্যোধনের আমন্ত্রণকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কৃষ্ণ সপার্ষদ বিদুরের ভবনেই আহার বিশ্রাম সম্পন্ন করেছেন।

[মহা (k) ৫.৯১.১-৩৬; (হরি) ৫.৮৪.১-৩৬]

□ বিদুরের ভবনে কৃষ্ণ যখন বিশ্রাম করছেন, তখন কৃষ্ণের সঙ্গে বিদুরেরও একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে। বিদুর দুর্যোধন প্রভৃতিকে এতকাল ধরে দেখছেন, এদের আচার-আচরণের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট পরিচয় আছে। এরকম দুরাচার লোকে সভায় শান্তি প্রস্তাব নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ অযথা অপমানের সম্মুখীন হন—এমনটা বিদুর চান না। কৃষ্ণ বিদুরকে যা উত্তর দিলেন, তা থেকেই বোঝা যায় যে, শান্তি প্রস্তাব সমর্থিত হওয়ার আশা তিনিও রাখেন না। কৃষ্ণ বলছেন—এমন বিপুল পরিমাণে লোকক্ষয় হতে পারে যে জ্ঞাতি কলহের পরিণামে, তা যদি সব জেনে শুনেও রোধ করার চেষ্টা না করা হয়, তাহলে সমাজের কাছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় হয়। বিশেষত, এখানে দুপক্ষই আমার পরমাত্মীয়, পরবর্তী সময়ে লোকে যাতে না বলে যে, কৃষ্ণ দুপক্ষের আত্মীয় এবং একজন সমর্থ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও মধ্যস্থতা করার কোনো চেষ্টা করেননি—সেই জন্যই আমার এই প্রয়াস। যদি কৌরবরা এই শান্তি প্রস্তাব মেনে নেন, তাহলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন। *[মহা (k) ৫.৯২-৯৩ অধ্যায়; (হরি) ৫.৮৫-৮৬ অধ্যায়]*

□ আমরা বারবারই বলছি যে, কৃষ্ণ নিজেও জানেন—এ শান্তি দৌত্য সফল হবার নয়। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তবু পরদিন কুরুরাজসভায় ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে শান্তিপ্রস্তাব হিসেবে যে দীর্ঘ বক্তৃতা কৃষ্ণ দিলেন, তাতে যেমন শান্তিস্থাপনের আন্তরিক প্রয়াস লক্ষিত হল, পাশাপাশি ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনের কুকর্মগুলির কথাও কৃষ্ণ স্মরণ করিয়ে দিতে ভুললেন না। কৃষ্ণের বক্তব্য সংক্ষেপে এই—মহারাজ! আপনার পুত্ররা এবং পাণ্ডুপুত্ররা যাতে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারেন, এই ভয়াবহ যুদ্ধ যাতে না হয়, সে জন্যই আমার এখানে আসা। আপনার পুত্রদের নৃশংস আচরণ এবং অন্যায় কাজকর্মের ফলে আজ এত বড়ো বিপদ উপস্থিত। আপনি যদি আপনার পুত্রদের সংযত করতে পারেন, তা হলেই আমার মনে হয় শান্তিরক্ষা করা সম্ভব হবে।

অন্যথায় মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, তাছাড়া ভেবে দেখুন, পাণ্ডবরাও তো আপনার পুত্রবৎ। আপনি সস্নেহে তাঁদের ডেকে রাজ্য ফিরিয়ে দিন—এতেই আপনার এবং কুরুকুলের মঙ্গল হবে।

কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে শান্তিরক্ষার জন্য যা করতে বলছেন, তা পুত্রস্নেহে অন্ধ এবং রাজ্যলোভী ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে এককথায় অসম্ভব কাজ। কৃষ্ণ বলেছেন—মহারাজ! যদি এখনও নিজের পুত্রদের সংযত করে পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে না দেন, তাহলে শুধুমাত্র আপনার কারণেই এত বড়ো মহাযুদ্ধ হবে। তৎসত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্রের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না দেখে সভায় উপস্থিত নারদ, কণ্ব, পরশুরাম প্রভৃতি মুনি ঋষিরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে নানা উপদেশ-উপাখ্যানের মাধ্যমে দুর্যোধনকে এবং ধৃতরাষ্ট্রকেও সন্ধির গুরুত্ব বোঝাতে বসলেন। কিন্তু তাতেও বিশেষ লাভ হল না। পুত্রস্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র যে দুর্যোধনকে কিছুই বলবেন না, তা তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তরেই পরিস্কার হয়ে গেল। ধৃতরাষ্ট্র বললেন—তোমার কথাই ঠিক কৃষ্ণ। কিন্তু দেখ আমার এই দুরাচার পুত্র আমার কোনো কথাই শোনে না, তাকে বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি নিজেই বরং চেষ্টা করে দেখ। কৃষ্ণ একথা শুনে দুর্যোধনকেই উপদেশ দিতে বসলেন। কিন্তু উপদেশে একটু শাসনের সুর, একটু যেন ভয় দেখানোর চেষ্টাও যে দেখা গেল না তা নয়, কৃষ্ণ দুর্যোধনকে বললেন—তুমি যা করে চলেছ তা কুরুকুলের পক্ষে শোভন আচরণ তো নয়ই বরং তোমার আচরণ দেখে তোমাকে একজন অতি নির্লজ্জ এবং নৃশংস ব্যক্তি বলা চলে। তোমার গুরুজনরাও তোমাকে রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে বলছেন, সে পরামর্শও তুমি কানে তুলছ না। অথচ দেখ, যে পাণ্ডবদের সঙ্গে তুমি সারা জীবন এত শত্রুতা করে এসেছ, সেই পাণ্ডবরা কিন্তু কখনো তোমার সঙ্গে শত্রুতা করেন নি। আজও করতে চান না। বরং সন্ধিই করতে চান। তুমি তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দাও। কারণ যে যুদ্ধে পাণ্ডবদের বধ করে তুমি নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করবে ভাবছ, সে যুদ্ধ যদি সত্যিই হয়, তাহলে কিন্তু মৃত্যু ছাড়া তোমার কোনো লাভই হবে না। কারণ অর্জুন বা ভীমের সমতুল্য যোদ্ধা তোমার শিবিরে একটিও নেই। ফলে যদি সপরিবারে জীবিত থাকতে চাও, যুদ্ধের সংকল্প ত্যাগ করে পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দাও।

কৃষ্ণ চুপ করলে ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুরও দুর্যোধনকে উপদেশ দেবার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু এই উপদেশে কোনো ফল তো হলই না, উলটে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণকেই অনেক কটু কথা বললেন। সঙ্গে এটাও বললেন যে, বিনা যুদ্ধে সূচের আগায় যতটুকু মাটি ওঠে, সেটুকুও তিনি পাণ্ডবদের দেবেন না।

দুর্যোধনের এই কথায় শান্তিবৈঠক প্রায় ভেস্তেই গেল বলা চলে। কৃষ্ণও দুর্যোধনের আচরণে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তিনি যথেষ্ট গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন—দেখো দুর্যোধন, তুমি যদি রণক্ষেত্রে বীরশয্যা গ্রহণ করতে চাও, তাহলে তোমার বাসনা অবশ্যই পূর্ণ হবে। তাহলে তুমি প্রস্তুত হও, যে যুদ্ধ তুমি চাও, সেই যুদ্ধই হবে। কিন্তু মনে রেখ, শুধু তোমাকে নয়, এই সভায় উপস্থিত সকলকেই আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, পাণ্ডবদের কোনো অন্যায়ের ফলে কিন্তু এই মহাযুদ্ধ ঘটছে না। দুর্যোধনের মতো এক দুরাচার ব্যক্তি, যে পাণ্ডবদের সম্পদ-ঐশ্বর্য্য দেখে ঈর্ষায় জ্বলে গিয়ে শকুনির সহায়তায় কপটদ্যূতের আয়োজন করেছিল, সেই দ্যূতসভায় পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীর সঙ্গে অত্যন্ত বর্বর আচরণ করা হয়েছিল এবং তারপর দ্যূতের শর্ত অনুযায়ী পাণ্ডবরা বরো বছর বনবাস এবং এক বছরের অজ্ঞাতবাস পালন করা সত্ত্বেও এই দুর্যোধন শুধুমাত্র লোভের বশে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে সম্মত হচ্ছে না, এমনকী বিনা যুদ্ধে সূচের আগায় যতটুকু মাটি ওঠে তাও দিতে চায় না। অতএব এই ভয়াবহ যুদ্ধ যদি হয় তার জন্য দুর্যোধনই সর্বাংশে দায়ী থাকবেন। কৃষ্ণের সংযোজন—পাণ্ডবরা ভদ্রলোকের মত পৈতৃক রাজ্যভাগটুকু চেয়েছেন মাত্র, কিন্তু দুর্যোধন তা দিলেন না। এই ভয়াবহ যুদ্ধ জয় করার পর পাণ্ডবরা শুধু ইন্দ্রপ্রস্থ নয়, সমগ্র কুরুসাম্রাজ্যই অধিকার করবেন। বলাবাহুল্য, সাম্রাজ্যের ভাগ পাওয়ার জন্য কৌরবরা যুদ্ধের শেষে জীবিতও থাকবেন না।

কৃষ্ণের এত কড়া কথার কোনো প্রভাবই পড়ল না দুর্যোধনের ওপর। উপরন্তু তিনি রাগে গজগজ করতে করতে দলবল নিয়ে সভা ছেড়ে চলে

গেলেন। ঘটনার গতি দেখে কুরুপিতামহ ভীষ্ম চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ধৃতরাষ্ট্রও যে খানিকটা ভীত হননি, তা নয়। তাই সভায় গান্ধারীকে আনিয়ে দুর্যোধনকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু গান্ধারীর উপদেশও ব্যর্থ হল। তার উপর দুর্যোধন কৃষ্ণকেই বন্দি করার ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। অবস্থা দেখে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এমনকী স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রও দুর্যোধনকে দফায় দফায় তিরস্কার করেছেন। এই তিরস্কারের সময় কৃষ্ণের ভগবত্তা এবং বাল্যকাল থেকে যেসব অসম্ভব কর্ম তাঁর দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে—বিশেষত বিদুর এই প্রসঙ্গগুলি বিশদে বর্ণনা করেছেন রাজসভায়। কিন্তু কৃষ্ণের ঈশ্বরস্বরূপতার কথাও দুর্যোধনের মনে কোনো রেখাপাত করল না, কৃষ্ণের উপদেশ শোনা তো দূরের কথা, দূত হিসেবে তাঁর প্রতি যে ভদ্রতাটুকু দেখানো উচিত—দুর্যোধন সেটুকুও দেখাতে রাজি নন। তিনি কৃষ্ণকে বন্দি করবেন বলে স্থির করে ফেলেছেন। তা বুঝে কৃষ্ণ নিজেই নিজের পরমেশ্বর স্বরূপতা প্রকাশ করে দুর্যোধনকে বললেন—মূর্খ দুর্যোধন! আমাকে একা নিরস্ত্র মানুষ মনে করে তুমি আমাকে বন্দি করতে চাইছ! তাকিয়ে দেখ—এই আমিই জগৎ সংসার ব্যাপ্ত করে আছি। এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, তা আমার মধ্যেই আছে—একথা বলে কুরুরাজসভায় কৃষ্ণ নিজের বিশ্বরূপ দেখালেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ছাড়া আর কেউ সেই বিশাল রূপের সহস্র সূর্য প্রমাণ তেজ সহ্য করতে পারেন নি। ভয়ে সকলে চোখ বন্ধ করেছেন। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে, এইসময় কৃষ্ণের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করে ধৃতরাষ্ট্রও বিশ্বরূপ দর্শন করলেন।

যাইহোক, দুর্যোধনের ঔদ্ধত্যের কারণে শান্তির শেষ আশাটুকুও নষ্ট হয়ে গেল। কৃষ্ণ সভা ছেড়ে চলে গেলেন সোজা কুন্তীর কাছে। আসন্ন যুদ্ধের সংবাদ দিলেন তাঁকে। কুন্তী তখন বিদুলার উপাখ্যান শুনিয়ে পাণ্ডবদের আসন্ন যুদ্ধের জন্য উজ্জীবিত করেছেন। কুন্তীর সেই বার্তা নিয়েই কৃষ্ণ ফিরে চললেন উপপ্লব্যে। শান্তিপ্রস্তাব তাঁর ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু আসন্ন মহাযুদ্ধের সম্পূর্ণ দায় দুর্যোধনের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার অভিসন্ধি সিদ্ধ হয়েছে।

এই মুহূর্তে হস্তিনাপুর থেকে উপপ্লব্যের পথে ফিরে যাবার মুহূর্তে কৃষ্ণ আসন্ন যুদ্ধ নিয়েই ভাবছেন। কৃষ্ণ জানেন, আসন্ন যুদ্ধে দুর্যোধনের প্রধান ভরসা কর্ণ। পাণ্ডবরা না জানলেও কৃষ্ণ জানেন যে, কর্ণ তাঁর পিসীমা কুন্তীর জ্যেষ্ঠ সন্তান, কানীন পুত্র। উপপ্লব্যের উদ্দেশে যাত্রা করার পথে কৃষ্ণ হঠাৎই এসে কর্ণকে তুলে নিয়েছেন নিজের রথে। নিয়ে এসেছেন নগরের বাইরে, একান্তে। সেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে কর্ণের গভীর আলোচনা হল, অনেকক্ষণ ধরে—

মন্ত্রয়ামাস চ তদা কর্ণেন সুচিরং সহ।

অনেক কথা বলেছেন কৃষ্ণ। নরমে, গরমে, স্তুতিবাদে, টোপ ফেলে সব রকমভাবে কৃষ্ণ কর্ণকে দুর্যোধনের থেকে বিযুক্ত করতে চেয়েছেন। সবশেষে উচ্চারণ করেছেন সেই সত্য, কর্ণের জন্ম-রহস্য, যা কৃষ্ণের পিসীমা কুন্তী এই সুদীর্ঘকাল লুকিয়ে রেখেছেন সম্পূর্ণ পৃথিবীর কাছ থেকে। কর্ণকে আহ্বান জানিয়েছেন পাণ্ডবশিবিরে, জ্যেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্রের মর্য্যাদায়। আশ্বাস দিলেন, পাঁচ পাণ্ডব এসে মাথা নত করবেন কর্ণের পায়ে, পাণ্ডবরা রাজ্যলাভ করলে তিনিই হবেন রাজা। শুধু তাই নয়, পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীও এসে কর্ণকে স্বামীরূপে বরণ করবেন—এই প্রলোভনও দেখাতে ভুললেন না কৃষ্ণ। কিন্তু চিরকাল দুর্যোধনের ছত্রছায়ায় থেকে, দুর্যোধনের যাবতীয় অন্যায় কাজকর্মের সমান ভাগীদার হয়ে, এমনকী পাণ্ডবদের এবং দ্রৌপদীর চরম অপমান করার পরে আজ আর পাণ্ডব শিবিরে গিয়ে দাঁড়াবার অবস্থা কর্ণের নেই, সেটা বাস্তবসম্মতও ছিল না। বেঁচে থেকে এমন বিপ্রতীপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার থেকে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করা অনেক বেশি শ্রেয় মনে হয়েছে কর্ণের কাছে। তবু জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিসেবে একটা কর্তব্য কর্ণ করলেন। কর্ণ জানতেন, তাঁর পরিচয় জানতে পারলে যুধিষ্ঠির বা অন্য কোনো পাণ্ডব তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বা তাঁকে হত্যা করতে সম্মত হবেন না। তাই নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্য কর্ণ বারংবার অনুরোধ জানিয়েছেন কৃষ্ণকে।

□ এ প্রসঙ্গে একট বিষয় ভেবে দেখার মত। কর্ণকে বুঝিয়ে, শাসন করে, প্রলোভন দেখিয়ে পাণ্ডব শিবিরে আনার জন্য কৃষ্ণের যে চেষ্টা, তাতে দুর্যোধনকে দুর্বল করে দেবার মতো কূটনৈতিক অভিসন্ধি কাজ করেছে ঠিকই, কিন্তু

শুধুমাত্র সেটুকুই এখানে সব নয়। ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ কৃষ্ণের মধ্যেও এ বিষয়ে একটা অত্যন্ত সংবেদনশীল অনুভূতি কাজ করেছে। সেটা তাঁর পিসীমা কুন্তীর প্রতি। হস্তিনাপুরে এসে অবধি কুন্তীর সঙ্গে তাঁর যতবার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। সব সময়েই কুন্তী ছেলেদের প্রতি, দ্রৌপদীর প্রতি কৌরবপক্ষের ঘোর অন্যায়ের কথা বলেছেন, বিদুলার উপাখ্যান শুনিয়ে আসন্ন মহাযুদ্ধের জন্য পুত্রদের উজ্জীবিত করার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু গোটা বক্তব্যের মাঝে একবারের জন্যও কৌরবপক্ষের অপরাধী ব্যক্তিদের নাম তিনি উচ্চারণ করেননি। করা সম্ভবও নয়। কারণ দ্রৌপদীর চরম অপমানকারী তাঁর আপন গর্ভজাত পুত্র। এই মহাযুদ্ধে কর্ণ এবং অর্জুন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সামনে দাঁড়াবেন এবং সেক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে একজনের মৃত্যু নিশ্চিত—একথাও কুন্তী জানেন। সেক্ষেত্রে জননী হিসেবে কুন্তীর বর্তমান মানসিক অবস্থা কী হতে পারে—একথা কৃষ্ণ ভালোভাবেই বোঝেন। কর্ণ পাণ্ডবপক্ষে আনতে পারলে তা মানসিকভাবে কুন্তীর পক্ষে অনেকখানি স্বস্তিদায়ক হত—সেকথাও কৃষ্ণ বিচার করে থাকবেন। শুধুমাত্র হস্তিনাপুর থেকে ফেরার পথে নয়, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শুরুর দিনেও কৃষ্ণ দ্বিতীয়বার একই প্রস্তাব রাখেন কর্ণের কাছে, যদিও কর্ণের পক্ষে কৃষ্ণের প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। মহাভারতে কৃষ্ণের এই শান্তিদৌত্য এবং কর্ণের সঙ্গে কথোপকথনের সুদীর্ঘ বর্ণনা উদ্যোগপর্বের বহুসংখ্যক অধ্যায় জুড়ে রয়েছে।

[দ্র. কর্ণ১]

□ কৃষ্ণ উপপ্লব্যে ফিরে এসে পাণ্ডবদের শান্তিদৌত্যের বিবরণ শুনিয়েছেন বিশদে। সঙ্গে এই সম্পূর্ণ দৌত্যকর্ম থেকে যে সারসত্যটুকু তিনি অনুভব করেছেন, সেটুকুও জানাতে ভোলেননি। কৃষ্ণের উপলব্ধি হল, মুখে শান্তির কথা বলছেন অনেকেই, কিন্তু একমাত্র বিদুর ছাড়া কেউই আন্তরিকভাবে শান্তি চান না—

> ন চ ভীষ্মো ন চ দ্রোণো যুক্তং তত্রাহতুর্বচঃ।
> সর্বে তমনুবর্তন্তে ঋতে বিদুরমচ্যুতে॥

কৃষ্ণের এই মন্তব্যের তাৎপর্য্য কিন্তু এই নয় যে, ভীষ্ম-দ্রোণরা পাণ্ডবদের মঙ্গল কামনা করেন না। কৃষ্ণের আজকের মন্তব্যটি তাঁর বিশাল রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ফল। আমরা জরাসন্ধ বধের পরিকল্পনা করার সময়েও কৃষ্ণকে দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে দেখেছি। আর সেই বক্তৃতা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট। তা হল, তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক সমীকরণ বিষয়ে কৃষ্ণের গভীর জ্ঞান, যা একজন প্রবীণ রাজনীতিকের অন্যতম প্রধান গুণও বটে। সেক্ষেত্রে বোঝা যায়, হস্তিনাপুরের বৃদ্ধদের অর্থাৎ ভীষ্ম-দ্রোণ ইত্যাদির সঙ্গে কুরু-পঞ্চাল রাজনীতির যে বিরাট ইতিহাস জড়িয়ে আছে তাও কৃষ্ণের অজানা নয় আর সেই কারণেই ভীষ্ম-দ্রোণ যুদ্ধের একরকম পক্ষপাতীই বটে—একথাও কৃষ্ণ বোঝেন। উপপ্লব্যে ফিরে খুব সংক্ষেপে তিনি সেই বার্তাই দিয়েছেন পাণ্ডবদের।

□ যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল পুরোদমে। যুদ্ধ আরম্ভ হবার মাত্র কয়েকদিন আগে দুর্যোধন শকুনিপুত্র উলূককে পাণ্ডবশিবিরে দূত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। উদ্দেশ্য, পাণ্ডবদের অতি কটূ ভাষায় গালাগালি দেওয়া। দেখা যাচ্ছে, এই গালাগালি দেবার ক্ষেত্রে দুর্যোধন কিন্তু কৃষ্ণকেও বাদ দেননি। তাঁকে কংসের ভৃত্য থেকে শুরু করে নানা কটুকথা বলে অপমান করা হয়েছে। আমরা আগেই জানিয়েছি যে, পাণ্ডবপক্ষে কৃষ্ণই প্রধান পরামর্শদাতা, মুখপাত্রও বটে। উলূকের কথার উত্তরও কৃষ্ণকেই দিতে দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণ কিন্তু এতটুকুও ক্রোধ প্রকাশ করেননি। শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন—উলূক! তুমি যাও, দুর্যোধনকে বোলো, যুদ্ধক্ষেত্রে এসে বীরত্ব প্রকাশ করুন, এত বড়ো বড়ো কথার প্রয়োজন নেই। সঙ্গে একথাও বোলো যে, এই যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করব না, শুধু অর্জুনের সারথ্য করব বলেই বোধ হয় দুর্যোধন আমাকে ভয় করেন না এবং এত কটুকথা শুনিয়েছেন। কিন্তু তিনি যেন মনে রাখেন, প্রয়োজনে আমিও সম্পূর্ণ কুরুসেনাকে দগ্ধ করে দিতে পারি—

> মন্যসে যচ্চ মূঢ় ত্বং ন যোৎস্যতি জনার্দনঃ।
> সারথ্যেন বৃতঃ পার্থেরিতি ত্বং ন বিভেষি চ॥
> জঘন্যকালমপ্যেতন্ন ভবেৎ সর্বপার্থিবান্।
> নির্দহেয়মহং রোধাত্তৃণানীব হুতাশনঃ॥

অবশেষে সেই দিনটি এসে পড়ল। যুদ্ধ আরম্ভের দিন। কৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথির ভূমিকা গ্রহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। যুদ্ধক্ষেত্রে

সকলে সমবেত হবার পর অর্জুনের অনুরোধে কৃষ্ণ তাঁর 'কপিধ্বজ' রথখানিকে নিয়ে এলেন 'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে'। দুপক্ষের যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন অর্জুন— পিতামহ, গুরু, ভাই, পুত্র, পৌত্র, মিত্র, পরমাত্মীয়রা দাঁড়িয়ে রয়েছেন দুই পক্ষে। অর্জুনের মনে বৈরাগ্য এল, আত্মীয়বধের এই বৃহৎকাণ্ডে অংশ নিতে মন চাইল না তাঁর। আমি যুদ্ধ করব না কৃষ্ণ—বলে তিনি বসে পড়লেন রথে—

ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ।

আমরা শুধু মহাভারত কথার নয়। কৃষ্ণের জীবনেরও এক অসাধারণ মুহূর্তে এসে পৌঁছেছি এই মুহূর্তে। তিনি নিজের সময়ের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, আপন ক্ষমতার বলে ঈশ্বরত্বের গরিমায় প্রতিষ্ঠিত। সেই তিনি আজ সেযুগের মহানতম দার্শনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। অর্জুনের বৈরাগ্য দূর করতে কৃষ্ণ উপদেশ দিতে শুরু করলেন এবং একটা পর্যায়ে পৌঁছে তিনি স্বয়ং উচ্চারণ করছেন যে, তিনিই সেই জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বর, জগতের প্রতিকোণে তাঁরই নিত্য অধিষ্ঠান, তাঁরই দেহে এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। তাঁর উপদেশের মাধ্যমে অর্জুনকে নিষ্কাম কর্মে মনোনিবেশ করতে বললেন কৃষ্ণ। কারণ যা কিছু ঘটবে তা তাঁর নিজের ইচ্ছায়, অর্জুনের উচিত শুধু কর্ম করে যাওয়া, এমনকী কর্মফলের দায়টুকুও নেবেন তিনি স্বয়ং। অর্জুন পরমেশ্বর স্বরূপ কৃষ্ণের সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ বিশাল, সহস্র সূয়ে সূর্যের মতো দীপ্তিময় বিশ্বরূপ দর্শন করলেন, কৃষ্ণের উপদেশে তাঁর বৈরাগ্য দূর হল। আর মহাভারতের এই পর্যায়ে এসে কৃষ্ণের উষ্টাদশ অধ্যায় ব্যাপী উপদেশ, যা ভারতীয় দর্শনের অন্যতম মূল্যবান আকরগ্রন্থও বটে, সেই 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' মহাভারতের অঙ্গ হিসেবে সংযুক্ত হল।

□ যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই যুদ্ধে কৃষ্ণ শুধুমাত্র কৃষ্ণের সারথি নন, সম্পূর্ণ পাণ্ডবপক্ষেরই তিনি সারথি, সঞ্চালক। যুদ্ধের আঠার দিনে পাণ্ডবপক্ষের যাবতীয় নীতি-নির্ধারিত হয়েছে কৃষ্ণের দ্বারা। ভীষ্মবধ, দ্রোণবধ, কর্ণবধ এমনকী দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ—সব ক্ষেত্রেই তিনি উপদেষ্টার ভূমিকায়। তাঁর মস্তিষ্কজাত পরিকল্পনাকে পাণ্ডবরা যুদ্ধক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করেছেন। এমনকী একটা সময়ে কৌরবশিবির অনুভব করেছে—এই যুদ্ধে কৃষ্ণই পাণ্ডবদের আশ্রয়, তিনিই পাণ্ডবদের প্রধান শক্তি এবং তিনিই পাণ্ডবদের রক্ষকও বটে—

কৃষ্ণাশ্রয়াঃ কৃষ্ণবলাঃ কৃষ্ণনাথাশ্চ পাণ্ডবাঃ।

যুদ্ধক্ষেত্রে একাধিকবার পাণ্ডবপক্ষের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় কৃষ্ণকে দেখা গেছে। প্রসঙ্গত, সারথি হিসেবে কৃষ্ণ ছিলেন অসম্ভব নিপুণ। সমকালে তাঁর মত নিপুণ সারথি বোধ হয় আর দ্বিতীয় ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে শুধুমাত্র রথকে সঠিকভাবে চালনা করাই নয়, রথীকে রক্ষা করাও সারথির অন্যতম কর্তব্য। সারথি হিসেবে কৃষ্ণের অসামান্য দক্ষতার ফলে একাধিকবার অর্জুনের প্রাণরক্ষা হয়েছে। তাঁর বুদ্ধিতেই অশ্বত্থামার দ্বারা নিক্ষিপ্ত নারায়ণাস্ত্রের সংকট থেকে মুক্ত হয়েছেন পাণ্ডবরা। শুধুমাত্র কর্ণের কাছে অর্জুনবধের জন্য রক্ষিত ইন্দ্র প্রদত্ত শক্তি অস্ত্র থেকে অর্জুনের প্রাণ কীভাবে রক্ষা করা যায়, তা হয়তো কৃষ্ণও চিন্তা করছিলেন। ঘটোৎকচের অসামান্য বীরত্বের কারণে কর্ণ শক্তি অস্ত্রটি তাঁর ওপর প্রয়োগ করতে বাধ্য হওয়ায় অর্জুনের প্রাণরক্ষা হয়, কৃষ্ণও চিন্তামুক্ত হয়েছেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তত ভীষ্মের সামনে তাঁকে ভক্তবৎসল ভগবানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। আমরা জানি, কৃষ্ণের ভগবত্তায় ভীষ্মের অটল বিশ্বাস, অচলা ভক্তি ছিল। সেই ভীষ্ম যখন শুনলেন যে, কৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে শস্ত্রধারণ করবেন না, শুধু সারথ্য করবেন, তখন তিনি ইচ্ছাপ্রকাশ করেন যে, কৃষ্ণকে তিনি শস্ত্রধারণ করিয়েই ছাড়বেন। যুদ্ধের তৃতীয় দিনে ভীষ্মের পরাক্রমে পাণ্ডব সেনার মধ্যে হাহাকার রব উঠল। অর্জুন ভীষ্মকে প্রতিরোধ করছেন ঠিক কথাই, কিন্তু পিতামহকে বধ করার ইচ্ছা তাঁর মনে স্থান করতে পারছে না। এ অবস্থায় কৃষ্ণ অসম্ভব ক্রুদ্ধ হয়ে সুদর্শন চক্র হাতে ভীষ্মকে বধ করতে চললেন। ভীষ্ম দেখলেন, শুধুমাত্র তাঁর কথা রাখতে কৃষ্ণ আজ শস্ত্রধারণ করেছেন। তিনি অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে কৃষ্ণের হাতে মৃত্যু লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাঁর স্তব করেছেন। যুদ্ধের নবম দিনেও ঘোড়ার চাবুক হাতে কৃষ্ণ একবার ভীষ্মকে বধ করতে ছুটেছেন। অভিমন্যু বধের দিন অর্জুন শোকসন্তপ্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, পরদিন সূর্যাস্তের আগেই যদি

তিনি অভিমন্যুর মৃত্যুর প্রধান কারণ জয়দ্রথকে বধ না করেন, তাহলে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে আত্মহত্যা করবেন। কিন্তু সে সংবাদ পেয়ে পরদিন দ্রোণাচার্য যে ব্যূহ রচনা করেন, তাতে সূর্যাস্তের আগে জয়দ্রথকে বধ করা অর্জুনের মতো শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরের পক্ষেও অসম্ভব ছিল। এখানেও কৃষ্ণকে দেখা যায় পরিত্রাতার ভূমিকায়। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রভাবে সূর্যাস্তের অনেক আগেই আকস্মিক ভাবে অন্ধকার নেমে আসে। কৌরব পক্ষের অন্যান্য যোদ্ধাদের সঙ্গে জয়দ্রথও সামনে এগিয়ে এসে অর্জুনের আসন্ন মৃত্যুর ব্যাপারে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে থাকেন। ঠিক তখনই দেখা যায় অন্ধকার দূর হয়েছে, সন্ধ্যা হতে এখনও বেশ কিছু সময় বাকি। এই অবসরে অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করতে সমর্থ হন।

মহাভারতের ভীষ্মপর্ব থেকে শল্যপর্বে—আঠার দিনের যুদ্ধের যে সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে, তাতে পাণ্ডবপক্ষের কর্ণধার হিসেবে কৃষ্ণের উপস্থিতিও আছে প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি মুহূর্তে। আমরা সেই সমস্ত খুঁটিনাটী বিবরণ দিয়ে এই কৃষ্ণ জীবনকথার অকারণ কলেবর বৃদ্ধি করা অনুচিত মনে করে সংক্ষেপে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করলাম মাত্র। কারণ 'মহাভারত সূত্রধার'-এর জীবনের বিশদ আলোচনার প্রকৃত আয়তন প্রায় মহাভারতের সমতুল্য হবার সম্ভাবনা।

□ যাই হোক, দুর্যোধনবধের পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রায় শেষই হল। এই সময়ে যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গেলেন পুত্রশোকার্ত ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিতে। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের ক্ষেত্রে যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। আর তা শুনে শোকার্ত গান্ধারী ক্রুদ্ধ হতে পারেন, এমনকী সেই তপস্বিনীর অভিশাপে পাণ্ডবরাই ভস্মীভূত হতে পারেন—এই আশঙ্কা যুধিষ্ঠিরের মনে ছিল। তাই মূলত গান্ধারীর ক্রোধ শান্ত করার জন্যই তিনি কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়েছেন। কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গেলেন। সেখানে পুত্রশোকে ধৃতরাষ্ট্র কাঁদছেন, হাহাকার করছেন। কৃষ্ণ নিজেও ধৃতরাষ্ট্রের দুঃখ দেখে কেঁদে ফেলেছেন। একদা রাজ্যলোভী, পুত্রমোহে আচ্ছন্ন যে মানুষটি প্রতিনিয়ত ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডবদের অহিত চিন্তাই করে এসেছেন, আজ সেই পুত্রহারা ধৃতরাষ্ট্রের অসহায়তা দেখে পরম মমতায় কৃষ্ণ সেই বৃদ্ধের পুত্রশোকের অংশীদার হয়েছেন।

গান্ধারী সম্পর্কে যুধিষ্ঠিরের অনুমান মিথ্যা ছিল না। তিনি বাস্তবিক ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কৃষ্ণ তাঁর ক্রোধ শান্ত করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেছেন। ক্রুদ্ধ, শোকসন্তপ্ত গান্ধারীকে তিনি বললেন—মা! আপনি সত্যিই তপস্বিনী, আপনার মত ধর্মশীলা পৃথিবীতে আর কে আছে? আমি যখন শান্তিদূত হয়ে কুরুসভায় এসেছিলাম, তখন আপনি দুর্যোধনকে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন, তাও আমার মনে আছে। কিন্তু আপনি তো জানেন যে, আপনার পুত্র সেই ধর্মোপদেশে কর্ণপাত করেননি। এই মহাযুদ্ধে আপনার পুত্র যে ধর্মের পথে চলছিল না, তা জেনেই আপনি তাতে যুদ্ধজয়ের আশীর্বাদ পর্যন্ত করেননি। বলেছেন—ধর্ম যেখানে, জয়ও সেখানে—

যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।

আপনার সেই আশীর্বাদ আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। আপনি শোক পরিত্যাগ করুন, ক্রোধ ত্যাগ করুন। আমার প্রার্থনা, আপনার ক্রোধে পাণ্ডবদের অকল্যাণ যেন না হয়। গান্ধারীর ক্রোধ খানিকটা প্রশমিত হয়েছে কৃষ্ণের কথায়।

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে সান্ত্বনা দেবার পর কৃষ্ণকে তড়িঘড়ি কুরুক্ষেত্রে ফিরে আসতে হয়েছে। তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, অশ্বত্থামা কোনো নৃশংস পরিকল্পনা করতে পারেন। কৃষ্ণের আশঙ্কা অমূলক নয়। সে রাত্রে কৃষ্ণ, সাত্যকী এবং পঞ্চপাণ্ডব যখন শিবিরে ছিলেন না—সে সময়ে অশ্বত্থামা পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সহায়তায় পাণ্ডবশিবিরে ঘুমন্ত যোদ্ধাদের নির্মম ভাবে হত্যা করেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সকলেই সেই হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। শোকসন্তপ্ত দ্রৌপদীর প্ররোচনায় ভীম একাই অশ্বত্থামাকে ধরতে ছুটেছেন ঠিকই, কিন্তু কৃষ্ণ জানতেন যে অশ্বত্থামা ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারেন। অর্জুন ছাড়া আর কেউ তা প্রতিহত করতে পারবেন না। সুতরাং তিনি অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে ছুটেছেন অশ্বত্থামার সন্ধানে। কৃষ্ণের আশঙ্কাই সত্য হয়েছে। অশ্বত্থামা ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন পাণ্ডবদের উদ্দেশে, তাকে প্রতিহত করতে অর্জুনও নিক্ষেপ করেছেন ব্রহ্মশির অস্ত্র। এই সংকট মুহূর্তে ব্যাস এসে

দাঁড়িয়েছেন দুপক্ষের মাঝখানে। দুই ব্রহ্মশির অস্ত্রের সংঘর্ষে প্রলয় ঘটবে—একথা শুনে ব্যাসের নির্দেশে অর্জুন অস্ত্র সংবরণ করলেন ঠিকই, কিন্তু অশ্বত্থামা অস্ত্রসংবরণ করতে জানেন না। তিনি সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন কুরুকুলের অবশিষ্ট বংশধর উত্তরার গর্ভস্থ সন্তানের ওপর। ঠিক এই মুহূর্তে, সম্ভবত জীবনে প্রথমবার কৃষ্ণ অসম্ভব ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। অশ্বত্থামাকে এমন নৃশংস কাজের জন্য কঠোর তিরস্কার তো করেইছেন পাশাপাশি ঘটনার নৃশংসতা দেখে কৃষ্ণের মতো ধীর শান্ত স্বভাবের মানুষও অশ্বত্থামার প্রতি অভিশাপ উচ্চারণ করেছেন। সবশেষে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—কুরুকুলের বংশধরকে তিনি স্বয়ং জীবন দান করবেন।

[মহা (k) ৯.৬২.৩৪-৭৪; ১০.১৩-১৬ অধ্যায়;
(হরি) ৯.৫৯.৩৪-৭৪; ১০.১৩-১৬ অধ্যায়]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা যেন শ্মশানের মতো, চতুর্দিকে মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে। স্বজন-বান্ধবদের অন্ত্যেষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হল এবার। ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীও কুরুক্ষেত্রে এসে পৌঁছেছেন। পাণ্ডবরা তাঁদের প্রণাম করতেও গেছেন কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে। ধৃতরাষ্ট্র এই সময়ে ভীমসেনকে আলিঙ্গন করতে চাইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রমোহ জগদ্বিখ্যাত, কিন্তু সেই পুত্রমোহের মাত্রা ঠিক কতখানি, তা হয়তো পাণ্ডবরাও তেমন জানতেন না। কিন্তু কৃষ্ণ জানতেন। পুত্রমোহে অন্ধ এই মানুষটিকে তিনি খুব ভালোভাবে চিনেছিলেন। তাই ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহালিঙ্গনের অর্থ বুঝতেও তাঁর দেরি হল না। অন্ধ হলেও ধৃতরাষ্ট্র শরীরে সহস্র হস্তীর বল রাখেন, আলিঙ্গনের নামে আসলে তিনি ভীমকে হত্যা করে পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিতে চান। তাই কৃষ্ণ ভীমকে সামনে যেতে দেননি। পাণ্ডবদের বনবাসের সময় দুর্যোধন ভীমের যে লোহার মূর্তি তৈরি করে গদাযুদ্ধ অভ্যাস করতেন, সেই মূর্তিটিকে এগিয়ে দিলেন ধৃতরাষ্ট্রের সামনে। ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গনে লৌহনির্মিত ভীম চূর্ণ হয়ে গেল। এত প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করার ফলে ধৃতরাষ্ট্রের নিজেরও মুখ দিয়ে রক্তপাত হল, তিনি মূর্ছিত হলেন। তারপর জ্ঞান ফিরে আসার পর খানিক প্রকৃতিস্থ হয়ে ভীমের জন্য শোক করতে বসলেন। তখন কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে লৌহভীম চূর্ণ হওয়ার সংবাদ দিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ পুত্রমোহ এবং রাজ্যলোভেই যে আজ এই মহাযুদ্ধ ঘটেছে, তিনিই যে দিনের পর দিন দুর্যোধনের সমস্ত অন্যায়কে সমর্থন করে গেছেন—তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিরস্কারও করলেন খানিকটা। ধৃতরাষ্ট্র লজ্জিত হলেন। তাঁর ক্রোধও শান্ত হল।

কুরুক্ষেত্রের সেই শ্মশানভূমিতে অগুণতি প্রিয়জনের শবদেহের মাঝে দাঁড়িয়ে গান্ধারী, দিব্যচক্ষে তিনি দেখছেন আঠারদিনের পচাগলা শবদেহগুলি, তাদের ঘিরে তাদের বিধবা পত্নীদের বিলাপ। একে একে খুঁজে নিচ্ছেন পাণ্ডব-কৌরব উভয়পক্ষের মৃত কুরুবংশীয়দের অভিমন্যু, দুর্যোধন-দুঃশাসনদের পুত্রদেরও। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে দেখতে গান্ধারীর শোক ক্রমশ ক্রোধের আকার নিল। সেই ক্রোধের লক্ষ্য এই মুহূর্তে কৃষ্ণ। কৃষ্ণের ভগবত্তায় গান্ধারীর বিশ্বাস ছিল। এই মুহূর্তে তাই তিনি ভাবছেন—যে ব্যক্তি স্বয়ং ঈশ্বর, অতুল ক্ষমতার অধিকারী, সে তো চাইলেই এই ভয়াবহ লোকক্ষয় বন্ধ করতে পারত, কুরুকুলের এমন সর্বনাশ নিবারণ করতে পারত। অসম্ভব ক্রুদ্ধ হয়ে গান্ধারী কৃষ্ণকে বললেন—তোমার ইচ্ছা থাকলেই এই মহাযুদ্ধ বন্ধ হতে পারত। কিন্তু তুমি ইচ্ছা করে তার চেষ্টা করনি। এর ফল তোমাকে পেতে হবে। আমার পাতিব্রত্যের তপস্যার যে ফল আমি সঞ্চয় করেছি, সেই বলে আজ তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি—আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর পরে তোমার স্বজন-জ্ঞাতিরাও পরস্পর যুদ্ধ করে নিহত হবে, যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যাবে, আর তুমি জ্ঞাতি-স্বজন পুত্রদের হারিয়ে বনে বনে ভ্রমণ করে সব শেষে শোচনীয় মৃত্যু লাভ করবে। আজ কুরুকুলের বিধবারা যেভাবে আর্তনাদ, বিলাপ করছেন, সেদিন তোমার কুলের স্ত্রীদেরও এক অবস্থা হবে।

পাণ্ডবরা এমন ভয়ংকর অভিশাপ শুনে মর্মাহত হলেও কৃষ্ণ যে প্রচণ্ড দুঃখ প্রকাশ করলেন, তা নয়। ঈষৎ হেসে বললেন—আমি ছাড়া আর কেউ যদু-বৃষ্ণি কুলকে ধ্বংস করতে পারবে না। আর ভবিষ্যতে এমনটা যে ঘটবে, তাও আমার অজানা নয়। এই এক কথায় কৃষ্ণ গান্ধারীকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, গান্ধারী যাকে অভিশাপ বলে ভাবছেন—তা অনিবার্য্য

ঘটনামাত্র, তা ঘটবেই, গান্ধারী অভিশাপ না দিলেও ঘটবে। অতএব গান্ধারীর এই অভিশাপের কোনো মূল্য নেই। তারপর গান্ধারীকেই খানিক তিরস্কার করেছেন কৃষ্ণ। কুরুবংশ ধ্বংস হবার ক্ষেত্রে যে গান্ধারী কিছু কম দায়ী নন তা বলতেও ছাড়েননি। গান্ধারী লজ্জিত হলেন। আর এই তিরস্কার শুনেই বোধ করি তাঁর ক্রোধও শান্ত হল।

[মহা (k) ১১.১২.১৩-৩০; ১১.২৫.৩৭-৪৯; ১১.২৬.১-৬; (হরি) ১১.১১.১৩-৩০; ১১.২৫.৩৭-৪৯; ১১.২৬.১-৬]

□ যুদ্ধ এবং মৃত যোদ্ধাদের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হল। কৃষ্ণ সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের পর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে প্রণাম করে তাঁর স্তব করেছেন। কৃষ্ণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও যাতে তাঁর সাহায্য থেকে বঞ্চিত না হন, সে অনুরোধও জানিয়েছেন বার বার। বাল্যকালে মথুরায় যদু-বৃষ্ণি রাজ্যের 'কিংমেকার' হিসেবে কৃষ্ণের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়েছিল। পরিণত বয়সে মহাযুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে স্থাপন করে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন।

□ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়েছে। এরপর সূর্যের উত্তরায়ণের দিনও ক্রমে এগিয়ে আসছে। শরশয্যায় শয়ান ভীষ্ম মৃত্যুকালে কৃষ্ণকেই স্মরণ করছেন। তাঁর দর্শনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছেন। একথা জানতে পেরে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মের কাছে যাওয়া স্থির করলেন। পাণ্ডবরাও সঙ্গে যাবেন। কিন্তু যাত্রার আগেই কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন— ভীষ্মের তিরোধান হলে পৃথিবী একজন মহাজ্ঞানী মহাত্মাকে হারাবে। অতএব মহারাজ। ভীষ্মের অন্তিম সময়ে আপনি তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করুন।

তারপর কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবরা সকলে কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মের কাছে পৌঁছালেন। নানা দেশ নানা প্রান্ত থেকে সেকালের বিশিষ্ট মুনি ঋষিরা সেখানে সমবেত হয়ে ভীষ্মকে ঘিরে বসে আছেন। কৃষ্ণকে আসতে দেখে ভীষ্মের আনন্দের আর সীমা রইল না। তিনি পরমেশ্বর বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের স্তব করলেন। তারপর কৃষ্ণ ভীষ্মকে বললেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। পিতামহ! আপনার মত জ্ঞানী মানুষ পৃথিবীতে অল্পই আছে। আপনার তিরোধানের পর আপনার সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্ঞানরাশিও তিরোহিত হবে। আপনি আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরকে সেই জ্ঞান দান করুন। এতে তাঁর জ্ঞাতিশোকও প্রশমিত হবে। ভীষ্ম নিজেই কৃষ্ণের পরম ভক্ত। স্বয়ং আরাধ্য পরমেশ্বর তাঁকে উপদেশ দিতে বলছেন শুনে ভীষ্ম ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বললেন—তা হতে পারে না। বরং আপনিই উপদেশ দিন, আমরা শ্রোতার ভূমিকা নেব। কৃষ্ণ জানেন যে ভীষ্ম তাঁর একান্ত ভক্ত। এই অতিবৃদ্ধ পরমজ্ঞানী মানুষটি জ্ঞানী বলেই অত্যন্ত বিনয়ীও বটে। বিশেষত কৃষ্ণের সামনে তিনি সব সময় ভক্ত বা শিষ্যের মতো আচরণ করেন। কিন্তু এখন বিনয় বা নম্রতার সময় নয়। আপন সুদীর্ঘ জীবনকালের সঞ্চিত জ্ঞান ভবিষ্যতের হাতে তুলে দিয়ে যাওয়ার সময়। তাই কৃষ্ণ নিজের ভগবত্তার আসন থেকেই এই জ্ঞানবৃদ্ধকে বললেন— আমারই জ্ঞান আজ আপনাতে প্রতিভাত হোক। আপনার কীর্তি চিরস্থায়ী হোক। যে উপদেশ এখন আপনি পাণ্ডবদের দেবেন, তা পৃথিবীতে বেদবাক্যের মতো পূজিত হবে।

কৃষ্ণের কথায় ভীষ্ম নিজের সারা জীবনের সঞ্চিত জ্ঞানের ঝাঁপি খুলে যুধিষ্ঠিরের তথা পাণ্ডবদের অসংখ্য জিজ্ঞাসার উত্তরে বহুমূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন, বহু প্রাচীন ইতিবৃত্তের উল্লেখ করেছেন যা মহাভারতের সম্পূর্ণ শান্তিপর্ব এবং অনুশাসন পর্ব জুড়ে বর্ণিত হয়েছে।

এই শান্তিপর্ব এবং অনুশাসন পর্বে একাধিকবার কৃষ্ণকে ভগবান বিষ্ণুর অভিন্ন সত্ত্বা বলে ভাবনা করে ভীষ্ম তাঁর স্তব করেছেন। বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রও উচ্চারিত হয়েছে এই প্রসঙ্গেই। পাশাপাশি কৃষ্ণও নিজের পূর্ব জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ভাগ করে নিয়েছেন উপস্থিত সকলের সঙ্গে। এপ্রসঙ্গে পত্নী জাম্ববতীর পুত্রলাভের অভিলাষ পূরণের জন্য কৃষ্ণের হিমালয়ে গিয়ে ভগবান শিবের আরাধনা করার প্রসঙ্গ এসেছে। সেই সময় মহর্ষি উপমন্যু তাঁকে শিবসহস্রনাম স্তোত্র শোনান। সেই স্তোত্র এবং মহাদেবের মাহাত্ম্যও বর্ণনা করেছেন কৃষ্ণ। একসময় কোপন স্বভাব ঋষি দুর্বাসার সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন তিনি এবং রুক্মিণী মিলে।

এমনকী দুর্বাসার আদেশে তাঁর উচ্ছিষ্ট পায়েস সর্বাঙ্গে মেখেছেন। কৃষ্ণই এ কাহিনী বর্ণনা করার সময় সকলকে জানালেন যে, দুর্বাসার উচ্ছিষ্ট পায়েস সর্বাঙ্গে মাখলেও পদতলে মাখেননি দেখে দুর্বাসা বলেছিলেন— পদতলে আঘাত পেয়েই কৃষ্ণের মৃত্যু হবে। এমনকী উপদেশ উপাখ্যানের মাঝে দ্বারকায় অক্রূর এবং আহুক উগ্রসেনের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের প্রসঙ্গও এসেছে। এই স্মৃতিচারণ এবং উপদেশের মধ্য থেকে কৃষ্ণের ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক জীবনের কিছু টুকরো টুকরো ছবি আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।

উত্তরায়ণ আরম্ভ হতে ভীষ্ম যোগবলে দেহত্যাগ করলেন। ভীষ্মের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন ভীষ্ম জননী গঙ্গা। পুত্রশোকে কাতর, নপুংসক শিখণ্ডীর বাণে তাঁর পুত্রের মতো মহাত্মার মৃত্যু হয়েছে—একথা বলে করুণ বিলাপ করছেন তিনি। কৃষ্ণই এসময়ে গঙ্গাকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে এসেছেন। গঙ্গার ভ্রম দূর করে বলেছেন যে, শিখণ্ডীর বাণে নয়, অর্জুনের বাণে আহত হয়েছিলেন ভীষ্ম! কিন্তু তিনি ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী ছিলেন, তাই শরশয্যায় শায়িত হলেও তাঁর মৃত্যু হয়নি। আজ উত্তরায়ণ আরম্ভ হতে তিনি স্বেচ্ছায় ইহলোক ত্যাগ করে দেবলোকে গেছেন। কৃষ্ণের কথা শুনে গঙ্গার শোক প্রশমিত হয়েছে।

এরপরেও কিছুকাল হস্তিনাপুরেই কাটিয়েছেন কৃষ্ণ। সেই সময়েই একদিন অর্জুন তাঁকে বললেন—কৃষ্ণ! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে তুমি যে উপদেশ আমাকে দিয়েছিলে, যুদ্ধের ব্যস্ততায় আমি তা ভুলে গিয়েছি। আমি আবারও তোমার কাছ থেকে সেই উপদেশ শুনতে চাই। অর্জুন তাঁর মূল্যবান উপদেশ ভুলে গেছেন—একথা শুনে কৃষ্ণ ঈষৎ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে তিরস্কার করলেন কিন্তু সখার অনুরোধ রক্ষা করে তাঁকে উপদেশ দিলেনও। মহাভারতের অশ্বেমেধিক পর্বে কৃষ্ণের সেই উপদেশ 'অনুগীতা' নামে ধৃত হয়েছে। *[দ্র. অনুগীতা]*

□ অর্জুনকে উপদেশ দেবার পর কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে গিয়েছিলেন। আবার তিনি হস্তিনাপুরে এসেছেন যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের আমন্ত্রণ পেয়ে। রাজসূয় যজ্ঞের সময়ে যে তৎপরতা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন কৃষ্ণ; আজ অশ্বমেধ যজ্ঞের ভারও একইভাবে তুলে নিয়েছেন নিজের কাঁধে।

তবে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন আরম্ভ হবার আগে, কৃষ্ণ হস্তিনাপুরের রাজপুরীতে পা রাখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘটনা ঘটেছে, কুরুবংশের ইতিহাসে যার গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষ্ণ রাজপুরীতে প্রবেশ করছেন, এমন সময় ব্রহ্মশির অস্ত্রের দ্বারা আহত অভিমন্যু পত্নী উত্তরা একটি মৃত পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। কুরুবংশের শেষ প্রদীপটিও নিভে গেল দেখে অন্তঃপুরে হাহাকার উঠল। কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা কাতর স্বরে বিলাপ করতে লাগলেন। এই সময় কৃষ্ণ এসেছেন শুনে সকলেই এসে কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন—এই শিশুকে প্রাণ ফিরিয়ে দাও। নইলে কুরুবংশ লোপ পাবে। কৃষ্ণ ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগের দিনেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনিই অভিমন্যুর পুত্রকে রক্ষা করবেন। আজ সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের সময় উপস্থিত। কৃষ্ণ মৃত পাণ্ডব পৌত্রের দিকে তাকিয়ে নিজের সমস্ত যোগ তপোবল একত্র করে উচ্চারণ করলেন—যে সত্য এবং ধর্ম আমাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, সেই সত্য ও ধর্মের বলে অভিমন্যুর এই পুত্র বেঁচে উঠুক—

যথা সত্যঞ্চ ধর্মশ্চ ময়ি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ।
তথা মৃতঃ শিশুরয়ং জীবতাদভিমন্যুজঃ॥

কৃষ্ণের তপোবলে ধীরে ধীরে মৃতশিশুর দেহে প্রাণের সঞ্চার হল। জন্ম নিলেন কুরুকুল প্রদীপ পরীক্ষিৎ। রাজপুরীতে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন শুরু হল দ্বিগুণ উল্লাসে।

[মহা (k) ১৪.৬৬.৮-২৯; ১৪.৬৭-৬৯ অধ্যায়;
(হরি) ১৪.৮৪.৮-২৯; ১৪.৮৫-৮৭ অধ্যায়]

□ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হবার পর কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে গেছেন। শুধু ফিরে গেছেন বললে ভুল হবে, মহাভারতের রঙ্গমঞ্চ থেকে একরকম বিদায় নিয়েছেন। কারণ এরপর পঁয়ত্রিশ বছর বাদে যদুবংশ ধ্বংস এবং কৃষ্ণের মৃত্যুর সংবাদ ছাড়া কৃষ্ণের জীবনের অন্য কোনো বৃত্তান্ত জানা যায় না। জীবনের শেষ পঁয়ত্রিশটি বছর এই ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ কোন ব্যস্ততায়, কেমন করে কাটালেন—সে প্রসঙ্গে মহাভারত এবং পুরাণগুলি সকলেই নীরব।

তবে যদুবংশ ধ্বংস হবার যে বৃত্তান্ত পাওয়া

যায়, তা থেকে অনুমান করা যায় যে, বৃহৎ যদু-বৃষ্ণি কুলের অন্তর্কলহ এই সময়টিতে ক্রমশ বেড়েছে। বলা বাহুল্য, এই দ্বন্দ্বের মাঝে যদুপতি কৃষ্ণের শেষ জীবন খুব সুখে কাটেনি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পঁয়ত্রিশ বছর পর স্বয়ং কৃষ্ণপুত্র সাম্ব ব্রাহ্মণদের পরিহাস করতে গিয়ে অভিশাপ লাভ করলেন। সাম্বকে গর্ভবতী রমণী সাজিয়ে নিয়ে গিয়ে কয়েকজন যদুবংশী দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র এবং কণ্বকে প্রশ্ন করলেন— এঁর গর্ভ থেকে পুত্র জন্মাবে, না কন্যা? উপহাসে রুষ্ট হয়ে ঋষিরা শাপ দিলেন—এর গর্ভ থেকে এক লৌহমুষল জন্মাবে, যার কারণে সম্পূর্ণ যদুকুল ধ্বংস হবে।

দেখা যাচ্ছে, নিজে যে কৃষ্ণ রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের পা ধোয়াবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, ব্রাহ্মণ সমাজ যাঁর ভগবত্তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, সেই কৃষ্ণের পুত্ররাই কৃষ্ণের চারিত্রিক গুণ লাভ করেননি। বরং চরম উশৃঙ্খলতায় তাঁদের জীবন কাটছিল। যাই হোক, অভিশাপের ঘটনা শুনে কৃষ্ণ বুঝলেন—যদুবংশের ধ্বংস আসন্ন।

তারপর একদিন যদুবংশীয়রা প্রভাসক্ষেত্রে বনভোজন করতে গেলেন। সেখানে সুরাপানে মত্ত যদুবংশীদের মধ্যে একথা সেকথায় কলহ আরম্ভ হল। সাত্যকি, কৃতবর্মা সকলেই তুমুল কলহে জড়িয়ে পড়লেন। ক্রমে সেই কলহ যুদ্ধের আকার নিল যদুবংশীয়রা নিজেরা নিজেদের আত্মীয়দের বধ করতে লাগলেন। প্রদ্যুম্ন প্রভৃতিকে নিহত হতে দেখে কৃষ্ণ নিজেও শোকে দুঃখে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন হাতে। শেষ পর্যন্ত সেদিনের গৃহযুদ্ধে যদুবংশ ধ্বংস হল। অসংখ্য যদুবংশীয়ের মৃতদেহের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে সমুদ্রতীরে পৌঁছে কৃষ্ণ দেখলেন শেষাবতার বলরাম যোগবলে দেহত্যাগ করছেন। কৃষ্ণ বুঝলেন, এবার তাঁরও ইহলোক ত্যাগ করার সময় হয়েছে। বিষণ্ণ হয়ে চলতে চলতে অরণ্যে প্রবেশ করলেন কৃষ্ণ। সেখানে নিজের মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসে রইলেন যোগযুক্ত হয়ে। গাছের আড়ালে ছিলেন কৃষ্ণ। শুধুমাত্র পা দুটি দেখা যাচ্ছিল। তা দেখে হরিণ ভেবে জরা নামে এক ব্যাধ শরনিক্ষেপ করল। সেই শরাঘাতেই কৃষ্ণের মৃত্যু হল। এ শুধুমাত্র পরমেশ্বরের অবতারের মৃত্যু বা বৈকুণ্ঠলোকে প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া নয়। কৃষ্ণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটা যুগের, এক বৃহৎ রাজনৈতিক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল।

[মহা (k) ১৬.১-৪ অধ্যায়; (হরি) ১৬.১-৪ অধ্যায়]

কৃষ্ণ২ মহর্ষি পরাশরের পুত্র মহর্ষি দ্বৈপায়ন ব্যাসের অপর নাম। *[দ্র. ব্যাস]*

কৃষ্ণ৩ কুন্তীপুত্র অর্জুনের অপর নাম। মৎস্য দেশে কুরুসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগে মৎস্য দেশের রাজকুমার উত্তরকে আত্মপরিচয় দেবার সময় বৃহন্নলা বেশধারী অর্জুন মৎস্য রাজকুমার উত্তরকে নিজের দশটি নাম বলেছিলেন। তার মধ্যে কৃষ্ণ একটি নাম। নিজের 'কৃষ্ণ' নামে পরিচিত হবার কারণ ব্যাখ্যা করে অর্জুন বলেছেন—আমি কৃষ্ণবর্ণ বলে জন্মের সময় আমার পিতা আমার নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণ—

কৃষ্ণ ইত্যেব দশমং নাম চক্রে পিতা মম।
কৃষ্ণাবদাতস্য সতঃ প্রিয়ত্বাদ্বালকস্য বৈ॥

পুরাণেও অর্জুনের 'কৃষ্ণ' নাম উল্লিখিত হয়েছে। *[দ্র. অর্জুন১]*

[মহা (k) ৪.৪৪.৯, ১১, ২২; (হরি) ৪.৪০.৯, ১১, ২২; ভাগবত পু. ১২.১১.২৫]

কৃষ্ণ৪ রাজর্ষি পৃথুর বংশধারায় হবির্ধানের ঔরসে অগ্নেয়ী ধিষণার গর্ভে জাত পুত্র সন্তানদের মধ্যে একজন। *[বিষ্ণু পু. ১.১৪.২; বায়ু পু. ৬৩.২৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৭.২৪; ভাগবত পু. ৪.২৪.৮]*

কৃষ্ণ৫ সারমেয় কুলের জন্মদাত্রী সরমার পুত্র দুল্লোল। দুল্লোলের পুত্রদের মধ্যে কৃষ্ণ একজন। এই কৃষ্ণের থেকে কৃষ্ণবর্ণ সারমেয় কুলের জন্ম হয়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৪৪৩]

কৃষ্ণ৬ ভারতবর্ষে অবস্থিত একটি পর্বত। পুরাণে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণগিরি নামে এই পর্বতের উল্লেখ পাওয়া যায়। পণ্ডিত N.L. Dey এই কৃষ্ণগিরিকে কারাকোরাম পর্বত শ্রেণী বলে উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরময় এই পর্বতশ্রেণীই প্রাচীন কালে কৃষ্ণগিরি নামে খ্যাত ছিল।

[বায়ু পু. ৩৬.২৮; ৪৫.৯১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.২২; GDAMI (N.L. Dey) p. 104]

কৃষ্ণ৭ পুরাণ মতে ত্রিংশতিতম কল্পের নাম কৃষ্ণ। ভগবান শিব এই কল্পে কৃষ্ণবর্ণ এক মূর্তি ধারণ করে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন বলে পুরাণে উল্লেখ আছে। *[বায়ু পু. ২৩.৭৪-৭৬]*

কৃষ্ণ৮ প্রাচীন ভারতবর্ষের অধিবাসীরা যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল, ঠিক তেমনই পৌরাণিক শাল্মলীদ্বীপের

অধিবাসীরাও চতুর্বর্ণে বিভক্ত ছিলেন বলে বিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণু পুরাণ মতে, শাল্মলীদ্বীপের অধিবাসীদের এই চতুর্বর্ণের মধ্যে চতুর্থটির নাম কৃষ্ণ। ভারতবর্ষের চতুর্বর্ণের ক্রমানুসারে এই কৃষ্ণ বর্ণটিকে শূদ্র বর্ণের সমার্থক বলে মনে হয়। *[বিষ্ণু পু. ২.৪.৩১]*

কৃষ্ণ$_{৯}$ *[দ্র. কৃষ্ণপরাশর]*

কৃষ্ণ$_{১০}$ পুরাণে উল্লিখিত একটি নরকের নাম। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে ধর্ষণ করে, অন্যের অধিকৃত ভূমিতে অনুপ্রবেশ করে, যে সর্বদা অশুচি অবস্থায় থাকে, সে এই নরকে পতিত হয় বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। *[বিষ্ণু পু. ২.৬.৩, ২৫]*

কৃষ্ণ$_{১১}$ ব্যাসদেবের পুত্র শুকের ঔরসে পিবরীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ১৫.১০; বায়ু পু. ৭০.৮৫; ৭৩.৩০, ৬২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৯৩; ২.১০.৮১]

কৃষ্ণ$_{১২}$ পৌরাণিক কেতুমাল বর্ষে অবস্থিত প্রধান পর্বতগুলির মধ্যে একটি। *[বায়ু পু. ৪৪.৪]*

কৃষ্ণ$_{১৩}$ পুরাণে মেরুপর্বতের চারদিকে অবস্থিত পর্বতগুলির মধ্যে কৃষ্ণ নামে একটি পর্বতের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পর্বতকে পুরাণে গন্ধর্বদের বাসভূমি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[বায়ু পু. ৩৮.৪৯; ৩৯.৫৯; ৪২.৫২]

কৃষ্ণ$_{১৪}$ একজন অসুর। পাতালের দ্বিতীয় তল অর্থাৎ সুতলে তাঁর বাসস্থান অবস্থিত ছিল বলে উল্লেখ আছে। *[বায়ু পু. ৫০.২১]*

কৃষ্ণ$_{১৫}$ একজন বিশিষ্ট নাগ। ইনি বরুণের সভায় অবস্থান করতেন বলে মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে। *[মহা (k) ২.৯.৮; (হরি) ২.৯.৮]*

কৃষ্ণ$_{১৬}$ তারকাসুর বধের সময় যেসব অনুচর যোদ্ধা স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন, কৃষ্ণ তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৬১; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৬]

কৃষ্ণ$_{১৭}$ পৌরাণিক কুশদ্বীপে অবস্থিত প্রধান পর্বত বা কুলপর্বতগুলির মধ্যে কৃষ্ণ একটি।

[মহা (k) ৬.১২.৪; (হরি) ৬.১২.৪]

কৃষ্ণকর্ণী স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.২৪; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ২৪ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৯)]

কৃষ্ণগিরি ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন পর্বত। পুরাণে কৃষ্ণগিরিকে ভারতবর্ষের প্রধান পর্বতগুলির মধ্যে একটি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

[বায়ু পু. ৪৫.৯১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.২২]

□ কারাকোরাম পর্বতমালা যা কৃষ্ণগিরি বা Black Mountain নামেও খ্যাত। এটি সিন্ধু ও ইয়ারখন্দ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল, উত্তর কাশ্মীর, দক্ষিণ-মধ্য এশিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে বিস্তৃত।

[GDAMI (Dey) p. 104; Journal of the Asia-Pacific Urban Studies and Affairs, Vol 5, 2001, p. 92]

কৃষ্ণতীর্থ একটি তীর্থ বলে মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। *[মৎস্য পু. ২২.৩৮]*

কৃষ্ণতোয়া বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, পৌরাণিক ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলির মধ্যে কৃষ্ণতোয়া একটি।

[বায়ু পু. ৪৩.২৮]

কৃষ্ণপরাশর কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা পরাশর মুনির নামে কয়েকটি বংশধারা প্রচলিত ছিল। সেই বংশধারায় অনেকগুলি সন্তানকে নিয়ে এক-একটি বর্গ রচিত হয়েছিল। কৃষ্ণ-পরাশর এইরকমই একটি বর্গের নাম। এই বর্গের অন্তর্গত পরাশরের সন্তানেরা হলেন—কার্ষ্ণায়ন, কপিমুখ, কাকেয়স্থ, জপাতি, পুষ্কর প্রমুখ। *[মৎস্য পু. ২০১.৩৫]*

কৃষ্ণপক্ষ *[দ্র. পক্ষ]*

কৃষ্ণপাদ পৌরাণিক কেতুমাল বর্ষের অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান জনপদগুলির মধ্যে কৃষ্ণপাদ একটি।

[বায়ু পু. ৪৪.১১]

কৃষ্ণবেণ্যা প্রচলিত নাম কৃষ্ণবেণা। দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণা বা কৃষ্ণবেণী নদী। এই নদীর উৎপত্তিস্থল সহ্যাদ্রি পর্বত। সীতাহরণের পর সুগ্রীব তাঁর বানরদলের নেতাদের সীতার সন্ধানে বহু দেশ-জনপদ ও নদীর তীরে পাঠিয়েছিলেন। সেই নদীগুলির মধ্যে কৃষ্ণবেণ্যা অন্যতম।

[রামায়ণ ৪.৪১.৯; মহা (k) ২.৯.২৮; (হরি) ২.৯.২৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৩৪; বিষ্ণু পু. ২.৩.১১; মৎস্য পু. ২২.৪৬; ১১৪.২৯]

□ বরুণদেবের সভায় যে সব নদী উপযুক্ত দেহধারণ করে তাঁর উপাসনা করতেন, সেগুলির মধ্যে কৃষ্ণবেণ্যা অন্যতম।

[মহা (k) ২.৯.২০; (হরি) ২.৯.২০]

□ কৃষ্ণবেণ্যা নদীর জলে সৃষ্ট জাতিস্মর নামে

একটি পবিত্র হ্রদ আছে। এই হ্রদের জলে স্নান করলে মানুষ জাতিস্মর হয়।

[মহা (k) ৩.৮৫.৩৭; (হরি) ৩.৭০.৩৭]

□ একবার যুগাবসানকালে বালকরূপধারী শ্রীহরি মার্কণ্ডেয় ঋষিকে তাঁর উদরের মধ্যে আশ্রয় দিয়েছিলেন। মার্কণ্ডেয় তখন হরির উদরে বহু নদীকে আশ্রিত অবস্থায় দেখেন। তিনি হরির উদরে কৃষ্ণবেণা নদীকেও দেখেছিলেন।

[মহা (k) ৩.১৮৮.১০৪; (হরি) ৩.১৫৯.১০৫]

□ বনপর্বে কৃষ্ণবেণ্যা নদীকে বেদে উল্লিখিত আহবনীয় পবিত্র অগ্নির উৎসস্থল বলা হয়েছে।

[মহা (k) ৩.২২২.২৫; (হরি) ৩.১৮৫.২৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১২.১৪; মৎস্য পু. ৫১.১৩; বায়ু পু. ২৯.১৩]

□ লোমশ ঋষি তপোবলে বহুনদীকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নিয়ে এসেছিলেন। এই নদীগুলির মধ্যে কৃষ্ণবেণা অন্যতম। [বায়ু পু. ১০৮.৮১]

□ বরাহরূপী বিষ্ণু দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে দমন করেছিলেন। বিষ্ণুর সঙ্গে প্রবল যুদ্ধের পর হিরণ্যকশিপুর দেহ যখন প্রবল আঘাতে মাটিতে পড়ে, তখন সেই আঘাতে পৃথিবীর বহু নদী-জনপদ কেঁপে উঠেছিল। ওই সময় কৃষ্ণবেণ্যা নদীর জলও কম্পিত হয়েছিল।

[মৎস্য পু. ১৬৩.৬১]

□ দক্ষিণ ভারতের তৃতীয় দীর্ঘতম নদী। মহাবালেশ্বরের কাছে পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে কৃষ্ণবেণ্যার উৎপত্তি। কৃষ্ণা নদীর উৎপত্তিস্থলটি স্থানীয়রা খুব পবিত্র জায়গা বলে মনে করে। এখানে একটি প্রাচীন শিবমন্দির রয়েছে। মাসুলিপতম (Masulipatam)-এর সামান্য দক্ষিণে সিপ্পেলার (Sipplar) নামে একটি স্থানে কৃষ্ণনদী বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। তবে অনেকের ধারণা যে, কৃষ্ণবেণ্যা আসলে কৃষ্ণা ও বেণা নদীর মিলিত ধারা। দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী সহ্যাদ্রি পর্বত থেকে উৎপন্ন পাঁচটি নদীকে গঙ্গার সমতুল্য বলে মনে করা হয়। কৃষ্ণবেণ্যা সেই পাঁচটি নদীর মধ্যে অন্যতম।

[EAIG (Kapoor), p. 396; GD (Bhattacharyya), p. 194]

কৃষ্ণভৌম১ বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, ভদ্রাশ্ব বর্ষের অন্তর্ভুক্ত জনপদগুলির মধ্যে কৃষ্ণভৌম একটি। [বায়ু পু. ৪৩.২৩]

কৃষ্ণসূত্র ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও বায়ু পুরাণে উল্লিখিত একটি নরকের নাম। [ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.২.১৫০; বায়ু পু. ১০১.১৪৯]

কৃষ্ণা১ স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.২২; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ২২ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

কৃষ্ণা২ দ্রৌপদীর অপর নাম। [দ্র. দ্রৌপদী]

কৃষ্ণা৩ একটি পবিত্র নদী। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে কৃষ্ণানদীকে 'সর্বদা আরোগ্যকারিণী' বা 'সদা নিরাময়াং কৃষ্ণাং' বলা হয়েছে। আর্য ও ম্লেচ্ছ উভয় জাতির মানুষরা এই নদীর জল পান করতেন। কৃষ্ণা সহ্যাদ্রি পর্বতজাতা। [দ্র. কৃষ্ণবেণ্বা]

[মহা (k) ৬.৯.৩৩; (হরি) ৬.৯.৩৩; বায়ু পু. ৪৫.১০৫]

কৃষ্ণা৪ কশ্যপের ঔরসে খশার গর্ভজাত এক কন্যা।

[বায়ু পু. ৬৯.১৭০]

কৃষ্ণা৫ দেবী যোগমায়ার অপর নাম।

[ভাগবত পু. ১০.২.১২]

কৃষ্ণাঙ্গনা বিরূপাক্ষ নামে এক যক্ষের সভার নাম কৃষ্ণাঙ্গনা বলে বায়ু পুরাণে কথিত হয়েছে।

[বায়ু পু. ৩৪.৮৭]

কৃষ্ণাজিন [দ্র. যজ্ঞায়ুধ]

কৃষ্ণাত্রেয় জনৈক প্রাচীন ঋষি। মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, মহর্ষি কৃষ্ণাত্রেয়ই সর্বপ্রথম তপোবলে চিকিৎসাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

[মহা (k) ১২.২১০.২১; (হরি) ১২.২০৭.২১]

কৃষ্ণানুভৌতিক একজন ঋষি। শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে দেখতে যেসব ঋষি-মহর্ষি কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন, কৃষ্ণানুভৌতিক তাঁদের মধ্যে একজন। [মহা (k) ১২.৪৭.১১; (হরি) ১২.৪৬.১১]

কৃষ্ণৌজা স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অনুচর একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৭৫; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

কেকয়১ ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, শিবির পুত্রদের মধ্যে কেকয় একজন।

[ভাগবত পু. ৯.২৩.৩]

□ মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, কেকয়ের দশ কন্যা ছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই সত্রাজিতের ভার্য্যা ছিলেন। [মৎস্য পু. ৪৫.১৯]

কেকয়$_{2}$ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের একটি বিখ্যাত জনপদ এবং সেই জনপদের নামেই পরিচিত একটি ক্ষত্রিয় জনজাতি। শতপথ ব্রাহ্মণ এবং ছান্দোগ্যোপনিষদের মত প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে কেকয়দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। উভয় গ্রন্থেই অশ্বপতি নামে এক কেকয়দেশীয় রাজার কথা আছে। এই অশ্বপতি একজন অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি, ছান্দোগ্যোপনিষদে মহর্ষি উদ্দালক শ্রদ্ধার সঙ্গে কেকয়রাজ অশ্বপতির নাম উচ্চারণ করেছিলেন। বৈদিক আচার সম্পর্কে অশ্বপতির জ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যায় যে, সেকালে কেকয়দেশ বৈদিক জ্ঞানচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

কেকয়রাজ অশ্বপতির কন্যার নাম কৈকেয়ী। কেকয়জাতির রাজকন্যা হওয়ার জন্যই কৈকেয়ীর এইরকম নামকরণ বলে মনে হয়। কৈকেয়ী অযোধ্যার রাজা দশরথের কনিষ্ঠা পত্নী ছিলেন।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Eggling) ১০.৬.১.২; ছান্দোগ্যোপনিষদ ৫.১১.৪; রামায়ণ ১.১৩.২৪]

□ অশ্বপতির সময়ে কেকয়ের ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি সম্পর্কে যতটা উচ্চধারণা পোষণ করা হত মহাভারতের কালে এসে তার যথেষ্ট অবনতি হয়েছিল। ফলে মহাভারত কেন কেকয়দের কিছুটা হীন চোখে দেখছে, তা খুঁটিয়ে বোঝা দরকার। আসলে যযাতি তাঁর পুত্র অনুকে অকালে জরাগ্রস্ত হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি অনুকে 'বেদোক্ত-অগ্নিকর্মহীন'— অর্থাৎ বেদচ্যুত অনার্যে পরিণত হওয়ার শাপও দেন—

অগ্নিপ্রস্কন্দনপরস্ত্বঞ্চাপ্যেবং ভবিষ্যসি।

পণ্ডিতদের মতে, এই অনুর বংশধরেরাই অনু জনজাতি বা আনব নামে পরিচিত। এঁদের ঋগ্‌বেদেই 'আনব' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুর বংশধারায় উশীনরের পুত্র শিবি এবং শিবির চার পুত্রের মধ্যে একজন হলেন কেকয়। এই কেকয়ের নামানুসারেই তাঁর শাসিত জনপদটির নাম কেকয়—

শিবেস্তু শিবয়ঃ পুত্রাশ্চত্বারো লোকসম্মতাঃ।
বৃষদর্ভঃ সুবীরস্তু কেকয়ো মদ্রকস্তথা॥
তেষাং জনপদাঃ স্ফীতাঃ কেকয়া মদ্রকাস্তথা।

বংশধারার এই সূত্র ধরেই কেকয়দের অনার্য বলা যেতে পারে। তবে একথা ঠিক যে, জন্মগতভাবে নয়, বরং যযাতির অভিশাপের কারণেই কেকয়রা বেদচ্যুত হয়েছিল, এ-কথাটার মধ্যেও অলৌকিকতা আছে। সেটা নিশ্চয়ই আমাদের বিচার্য্য হবে।

[ঋগ্‌বেদ ৮.৪.১; মহা (k) ১.৮৪.২৪-২৬; (হরি) ১.৭২.২৫-২৭; বায়ু পু. ৯৯.২২-২৪; মৎস্য পু. ৪৮.১৯-২০; বিষ্ণু পু. ৪.১৮.১; হরিবংশ পু. ১.৩১.২৯-৩০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.২৩]

□ রামায়ণে যুধাজিৎ নামে এক কেকয় রাজপুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি ব্রাহ্মণগ্রন্থ এবং উপনিষদ খ্যাত কেকয়দেশীয় রাজর্ষি অশ্বপতির পুত্র ছিলেন বলে জানা যায়। যুধাজিৎ ভরত ও শত্রুঘ্নকে কেকয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একবার অযোধ্যায় এসেছিলেন। মিথিলায় ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহের অনুষ্ঠানেও যুধাজিৎ উপস্থিত ছিলেন। *[রামায়ণ ১.৭৭.১৬-১৭; ২.৩৭.১-৬]*

□ রামচন্দ্রের বনবাস যাত্রার সময় ভরত ও শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় উপস্থিত ছিলেন না। সে সময় তাঁরা ভরতের মাতুলালয়ে অর্থাৎ কেকয়ে অবস্থান করছিলেন। রামচন্দ্রের বনবাস এবং দশরথের মৃত্যুর ফলে অযোধ্যা শাসক শূন্য হয়ে পড়ে। সেই সময় ঋষি বশিষ্ঠ সিদ্ধার্থ প্রভৃতি দূতেদের উৎকৃষ্ট বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি মূল্যবান উপঢৌকন সহ কেকয়দেশে প্রেরণ করেন ভরত ও শত্রুঘ্নকে ফিরিয়ে আনার জন্য।

[রামায়ণ ১.৭৭.১৬-১৭; ২.৬৮.৮-১০]

□ অন্যদিকে মহাভারতের শান্তিপর্বে কেকয়দেশ সম্পর্কে একটি কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যা থেকে দেশটির বহু উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের সম্পর্কে জানা যায়। এই কাহিনীটিতে কেকয়কে একটি পবিত্র দেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সে দেশে চোর, মদ্যপায়ী, যজ্ঞে অনাগ্রহী বা অসংযমী কোনো মানুষ বাস করত না। কেকয়দেশীয় ব্রাহ্মণরা প্রত্যেকেই ধার্মিক ও জ্ঞানী। এঁরা সবসময় বেদচর্চা ও অধ্যয়নের কাজে ব্যস্ত থাকেন। কেকয়দেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের মানুষেরাই নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য পালনের বিষয়ে সতর্ক। সাধারণ কেকয়বাসীরা সকলেই সদাচারী, ধার্মিক ও সত্যনিষ্ঠ। এই বিবরণ থেকেই বোঝা যায় যে, কেকয়দের যতই অনার্য বলে সমালোচনা করা

হোক না কেন, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নিরিখে কেকয়ের স্থান প্রাচীন ভারতের চোখে যথেষ্ট উঁচু ছিল।

[মহা (k) ১২.৭৭.৭-৩৮; (হরি) ১২.৭৫.৭-৩৮]

□ কেকয়জাতির একটি শাখার সঙ্গে পাণ্ডবদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। মহাকাব্যে বারবার তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁদের যেমন ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ পাণ্ডবদের উপহার দিতে দেখা যায়, তেমনই পাণ্ডবদের দুর্দিনে বনবাসের সময় তাঁদের কাম্যক বনে পাণ্ডব ভাইদের পাশে এসে দাঁড়াতেও দেখা যায়। বনপর্বে স্বয়ং কৃষ্ণের মুখেই পাণ্ডবদের প্রতি কেকয়দের প্রবল সমর্থনের কথা শোনা যায়। এ প্রসঙ্গে বিশেষত পাঁচ কেকয়রাজপুত্রের কথা উঠে আসে। এই পাঁচ কেকয়রাজপুত্র তাঁদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বৃহৎক্ষত্রের নেতৃত্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এঁরা সম্পর্কে পাণ্ডবদের আত্মীয়। এঁরা কুন্তীর বোন শ্রুতকীর্তি এবং কেকয়রাজবংশীয় ধৃষ্টকেতুর সন্তান। সম্পর্কে এঁরা পঞ্চ-পাণ্ডবের মাসীর ছেলে বা মাসতুতো ভাই। ফলে খুব স্বাভাবিক কারণেই এঁরা পাণ্ডবদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তবে শুধুমাত্র আত্মীয়তার জন্যই কেকয়দেশীয় পাঁচ রাজপুত্র কৌরব বিরোধিতার পথ বেছে নিয়েছিলেন —মহাকাব্য সে কথা বলে না।

উদ্যোগপর্বের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, মহাবীর ও বলবান পাঁচ কেকয় রাজপুত্রকে তাঁদের কেকয়বংশীয় জ্ঞাতিরা দেশ থেকে বিতাড়িত করে অবরুদ্ধ অবস্থায় রেখেছিল। এঁরা পালিয়ে এসে কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করেন। এঁদের লক্ষ্য ছিল যুদ্ধে তাঁদের কেকয়দেশীয় জ্ঞাতিদের পরাজিত করে রাজ্য পুনরুদ্ধার করা—

অবরুদ্ধা বলিনঃ কেকয়েভ্যো
মহেষ্বাসা ভ্রাতরঃ পঞ্চ সন্তি।
কেকয়েভ্যো রাজ্যমাকাঙ্ক্ষমাণা
যুদ্ধার্থিনশ্চানুবর্ত্তন্তি পার্থান্॥

এই শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে, আত্মীয়তা রক্ষার পাশাপাশি জ্ঞাতিশত্রু বিনাশও পাঁচ কেকয় রাজপুত্রের যুদ্ধে যোগদানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আবার উদ্যোগপর্বেই যুধিষ্ঠির ও সঞ্জয়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে জানা যায় যে, কেকয়দের অপর একটি শাখা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষে যোগ দিয়েছিল। সম্ভবত এই শাখাটিই পঞ্চ কেকয় রাজপুত্রের বিরোধী গোষ্ঠী। আসলে সামগ্রিকভাবে কুরুবংশের প্রতি কেকয়দের আনুগত্য ছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় সেই আনুগত্যে ফাটল ধরে। ফলে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, কেকয়দের উভয় শাখাই মূলতঃ জ্ঞাতিশত্রুতার কারণে সরাসরি কুরুক্ষেত্রে পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল—

মহেষ্বাসা রাজপুত্রা ভ্রাতরঃ পঞ্চ কেকয়াঃ।
কেকয়ানেব ভাগেন কৃত্বা যোৎস্যন্তি সংযুগে॥

[মহা (k) ২.৪.৩১; ৫২.১৪; ৩.১২.২; ৩.২২.৫১; ৩.৫১.১৭; ৩.১২০.২৬; ৩.২৬৮.১৬; ৫.৪.৮; ৫.১৯.২৫; ৫.২২.২০; ৫.৩০.২৩; ৫.৫০.৭; ৫.৫৪.১৮; ৫.৫৫.৩; ৫.৫৭.৯, ১৯; ৫.১৯৫.৫; ৬.১৮.১৩; ৭.২১.২৩; ৭.১২৫.৫-২৩; (হরি) ২.৪.১০নং শ্লোক পরবর্তী পাদটীকা দ্র. খণ্ড ৫; পৃ. ২৬; ২.৫০.১৪; ৩.১১.২; ৩.১৯.৫১; ৩.৪৩.১৭; ৩.১০০.৪৮; ৩.২২২.১৬; ৫.৪.১৮; ৫.১৯.১১; ৫.২২.২০; ৫.৩০.২৭; ৫.৫০.৭, ৩৮; ৫.৫৪.১৭; ৫.৫৫.৩; ৫.৫৭.৯, ১৭; ৫.১৮৫.৫; ৬.১৮.১৩; ৭.২১.২৩; ৭.১০৯.৫-২৩; ভাগবত পু. ৯.২৪.৩৮; বিষ্ণু পু. ৪.১৪.১১]

□ মহাভারতে কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতা সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়। এঁদের গায়ের রং ইন্দ্রগোপকীট বর্ণের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইন্দ্রগোপকীট একধরনের লাল রঙের পোকা। এদের সাধারণত বর্ষাকালেই দেখা যায়, অর্থাৎ কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতার গাত্র বর্ণ লালচে সাদা ছিল বলেই মনে হয়—

ইন্দ্রগোপকবর্ণাশ্চ কেকয়া ভ্রাতরস্তথা।

এঁদের যুদ্ধরথগুলিও লাল রঙেরই ছিল। এই পঞ্চভ্রাতার বীরত্ব সম্পর্কেও মহাকাব্য থেকে জানা যায়। চক্রব্যূহে অবরুদ্ধ অভিমন্যুকে রক্ষা করার জন্য এঁরা নির্ভয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, ভগদত্ত প্রমুখ কৌরব বীরদের সঙ্গে পাঁচ কেকয়রাজকুমার প্রচণ্ড যুদ্ধ করেছিলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের হাতে এঁরা বিশেষভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিলেন। দ্রোণাচার্য এঁদের হত্যা করেছিলেন।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, আদিপর্বে

পাঁচজন মহাবীর কেকয় রাজপুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁরা হলেন—অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, অয়ঃশঙ্কু, গগনমূর্দ্ধা ও বেগবান—

অয়ঃশিরা, অশ্বশিরা, অয়ঃশঙ্কুশ্চ বীর্যবান্।
তথা গগনমূর্দ্ধা চ বেগবাংশ্চাত্র পঞ্চমঃ॥
পঞ্চৈতে জজ্ঞিরে রাজন্ বীর্যবন্তো মহাসুরাঃ।
কেকয়েষু মহাত্মানঃ পার্থিবর্ষভসত্তমাঃ॥

সম্ভবত এই পাঁচজনেই কেকয়দেশীয় পঞ্চভ্রাতা।

[মহা (k) ১.৬৭.১০-১১; ৫.১৪১.২৬; ৬.৪৭.৩০; ৯৫.৭২, ৮৫; ১১৮.৪০; ৭.২১.১৭; ১১.২৫.১৫; (হরি) ১.৬২.১০-১১; ৫.১৩২.২৬; ৬.৪৭.৩০; ৯১.৭২, ৮৪; ১১৩.৩৯; ৭.২১.১৭; ১১.২৫.১৫]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্ধেক কেকয়দেশীয় সৈন্য কৌরবপক্ষে যোগদান করেছিল। কৌরবপক্ষীয় কেকয়দের সঙ্গে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানকারী মৎস্যদেশীয়দের প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল।

কর্ণপর্বে বিন্দ নামে এক কেকয়দেশীয় রাজপুরুষের উল্লেখও পাওয়া যায়। ইনি কৌরবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। যদুবংশীয় সাত্যকি যুদ্ধে বিন্দকে হত্যা করেন।

[মহা (k) ৭.২২.৭; ২৫.১৪; ৮.১৩.৩৫-৩৮; (হরি) ৭.২২.৭; ২৩.২১; ৮.১০.৩৫-৩৮]

□ পাণ্ডবদের বনবাসের সময় দ্রৌপদীকে হরণ করার চেষ্টা করেন জয়দ্রথ। জয়দ্রথের সেই অপচেষ্টায় কেকয়দের একাংশ তাঁকে সাহায্য করেছিল।

[মহা (k) ১১.২২.১২; (হরি) ১১.২২.১২]

□ যুধিষ্ঠির অর্জুনকে উত্তরদিকের দেশগুলি জয় করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এই সময় কেকয়দেশীয় এক রাজা অর্জুনের সঙ্গে উত্তর দিকে গিয়েছিলেন এবং তাঁর দিগ্বিজয়ের সঙ্গী হয়েছিলেন।

[ভাগবত পু. ১০.৭২.১৩; বায়ু পু. ৪৫.১১৭]

□ বিদর্ভের রাজকন্যা রুক্মিণীকে বিবাহ করে কৃষ্ণ দ্বারকা নগরীতে পৌঁছানোর পর সমগ্র নগরে আনন্দের স্রোত বয়ে গিয়েছিল। যদু-বৃষ্ণি বংশ ঘনিষ্ঠ সমস্ত জাতিগোষ্ঠীগুলি এই উৎসবে যোগ দিয়েছিল। এঁদের মধ্যে কেকয়রাও ছিল। এঁদের বসুদেবের অশ্বমেধ যজ্ঞেও উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

[ভাগবত পু. ১০.৫৪.৫৮; ৭৫.১২; ৮৪.৫৫]

□ আশ্রমবাসিক পর্বে শতযূপ নামে কেকয়দেশীয় এক রাজার কথা পাওয়া যায়। ইনি বংশধরদের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী একটি আশ্রমে তপস্যা করছিলেন। সেসময় ধৃতরাষ্ট্রসহ সমস্ত কুরুবৃদ্ধরা সন্ন্যাস গ্রহণ করে একই জায়গায় বাস করছিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তপস্যারত শতযূপের দেখা হয়। মহাভারতে শতযূপকে একজন অত্যন্ত জ্ঞানী রাজপুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

[মহা (k) ১৫.১৯.৮-১০; (হরি) ১৫.২১.৮-১০]

□ পণ্ডিত N.L. Dey-এর মতে প্রাচীন কেকয়দেশটি শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত পঞ্জাব প্রদেশের শাহপুর অঞ্চলটিই প্রাচীন কেকয়দেশ। রামায়ণ অনুসারে প্রাচীন কেকয়দেশের রাজধানীর নাম গিরিব্রজ বা রাজগৃহ। তবে এটি অবশ্যই জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজপুর নয়, পণ্ডিত কানিংহামের মতে বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত পাঞ্জাব প্রদেশের জালালপুর বা গিরজক্ (Girjak) ছিল কেকয়দের রাজধানী গিরিব্রজ।

কেকয়রা প্রাচীন ভারতের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জনজাতি, মধ্য এশিয়া থেকে পূর্বমুখী আর্যদের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রান্তে বসবাসকারী যে সব জনজাতিগুলির যোগাযোগ আর্যায়ণের একেবারে প্রথম পর্যায়ে হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে গান্ধার, কেকয় ইত্যাদি জাতি অন্যতম। তবে আর্যরা যত পূর্বমুখী হয়েছিল ততই এইসব জনজাতিদের উপর আর্য প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত এঁরা আর্যসংস্কৃতি বহির্ভূতরূপেই পরিচিতি লাভ করে। তবে অন্যান্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশীয় জনজাতিগুলির মতই কেকয়রাও যুদ্ধবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। একই সঙ্গে এঁদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এঁদের মধ্যেকার কেকয় দেশের সীমা অতিক্রম করে কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে পর্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছিল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই সব গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে যাঁরা অন্যদের বশীভূত করতে সমর্থ হতেন সেই বিশেষ গোষ্ঠীর অধিপতিই সমগ্র জনজাতির প্রধান হয়ে উঠতেন। কেকয়দের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হয়নি।

এঁর প্রমাণ পাওয়া যায় দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত মহাভারতের একটি পাঠে। সেখানে সূত-জাতির অধিপতি হিসেবে জনৈক কেকয়রাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি সম্পর্কে মৎস্যের রাজা বিরাটের পত্নী সুদেষ্ণা এবং শ্যালক কীচকের পিতা। এই সূত্রে বিচার করলে তিনি অবশ্যই কীচক জাতিরই একজন নেতৃস্থানীয় মানুষ। পণ্ডিতদের মতে, সম্ভবত এই কীচকজাতীয় মানুষটিই কেকয়দেশে এসে নিজের জাতির আধিপত্য বিস্তার করেন। কালক্রমে বসতিস্থলের নামানুসারে তিনি কেকয়রাজ হিসেবে পরিচিত হন। এভাবেই যখন যে গোষ্ঠী এই অঞ্চলে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে, তখনই তাঁরা সেই সমগ্র জনজাতিটির প্রধান হয়ে উঠেছে। *[দ্র. কীচক২]*

আবার পণ্ডিত B.C. Law-এর মতে, কেকয়দের একটি শাখা দাক্ষিণাত্যে দেশান্তরিত হয়েছিল। কালক্রমে এরা মাইসোর অঞ্চলে একটি ছোটো জনপদও স্থাপন করে। অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলায় আবিষ্কৃত জগয্যপেত স্তূপের (Jagyyapeta Stūpa) লিপিগুলি থেকে এঁদের কথা জানা যায়। B.C. Law এঁদের মাইসোরের অন্যতম প্রাচীন রাজবংশগুলির মধ্যে একটি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এঁরা উত্তর ভারতীয় ইক্ষ্বাকুবংশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

[TAI (Law) P. 77-78; HGAI (D.C. Sirkar) P. 98; TIM (Mishra) P. 100; PHAI (Roychowdhury) P. 57-58; GDAMI (Dey) P. 98]

□ মহাকাব্য ও পুরাণে শিবি, উশীনর, গান্ধার ও মদ্রদের সঙ্গে কেকয়দের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। যা থেকে বোঝা যায় যে, সম্ভবত অবস্থানগত নৈকট্যের কারণেই এই সব জনজাতিগুলির মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। *[TIM (Mishra) p. 107]*

কেকয়ী মদ্ররাজ সিন্ধুবীর্যের ঔরসে কেকয়ার গর্ভজাত কন্যা কেকয়ী। তিনি মহারাজ মরুত্তের পত্নী। *[মার্কণ্ডেয় পু. ১৩১.৪৬]*

কেকরী অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। কেকরী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৭৯.১৮]*

কেতকী [দ্র. কোটরা]

কেতব স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ঋষি রথীতরের শিষ্য ছিলেন কেতব। *[বায়ু পু. ৬০.৬৬]*

কেতু১ মহাভারতের কর্ণপর্বে অর্জুন এবং কর্ণের রথধ্বজকে যথাক্রমে সূর্য-চন্দ্রের ক্ষয়কারী রাহু ও কেতু নামে দুই আকাশচারী ক্রূর-গ্রহ হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে—

রাহুকেতূ যথাকাশে উদিতৌ জগতঃ ক্ষয়ে।

[মহা (k) ৮.৮৭.৯২; (হরি) ৮.৬৪.৯৪]

□ মহাভারতের অমৃতমন্থন কাহিনীতে দেবতারা যখন বিষ্ণুদত্ত অমৃত পান করছিলেন, তখন রাহু নামে এক দানব দেবতার রূপ ধরে অমৃত পান করছিল। দানবের এই কাণ্ড দেখে চন্দ্র-সূর্য সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুকে জানান এবং অমৃত গলা দিয়ে নামবার আগেই ভগবান বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে রাহুর গলা কেটে ফেলেন। রাহুর অমৃত-পান করা মস্তকটি তখন বিকট শব্দ করে আকাশে উঠে গেল এবং তাঁর কবন্ধটি অর্থাৎ (গলা থেকে পা পর্যন্ত অংশ) ভূতলে পড়ে ছটফট করতে লাগল। সেই কবন্ধের পতনে পৃথিবীর বন, পর্বত এবং দ্বীপসমূহ কম্পিত হল। তারপর রাহুর মুখখানি আকাশে থেকেই ঘোষণা করল যে, সেই দিন থেকে চন্দ্র এবং সূর্যের সঙ্গে তার চিরশত্রুতা তৈরি হয়ে গেল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত রাহু চন্দ্র এবং সূর্যকে গ্রাস করে—

গ্রসত্যদ্যাপি চৈব তৌ।

[মহা (k) ১.১৯.৪-৯; (হরি) ১.১৫.৪-৯]

□ মহাভারতের এই অমৃত-মন্থন কাহিনীতে রাহুর কথা আছে বটে, রাহুর কবন্ধের কথাও বলা হল, কিন্তু কেতুর কথা সেখানে নেই। কেতুর নামও নেই। অথচ কর্ণার্জুনের রথধ্বজের উপমায় রাহুর সঙ্গে কেতুর নাম হল। কিন্তু কেতুর ব্যক্তি-পরিচয় মহাভারত থেকে স্পষ্ট হয় না। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য কথাটি বলেছে স্কন্দ পুরাণ। বলা হয়েছে—রাহুর কণ্ঠদেশ থেকে ছিন্ন যে কবন্ধটি ভূমি বিদীর্ণ করে মাটিতে পড়ল সেটি ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়-পর্বত চূর্ণ করতে লাগল। বিষ্ণুমায়াতেই এই ঘটনা ঘটতে লাগল এবং বিষ্ণুরূপী মোহিনীর ক্রিয়া-কলাপ দেখে স্বয়ং মহাদেব সেই কবন্ধদেহের ওপর অবস্থান করতে লাগলেন এবং তখন মোহিনীর পদতলে নিবাস হল দেবতাদের। তারপর কেতু ধোঁয়ার মতো একটা আকার ধারণ করে আকাশে মিলিয়ে গেল—

কেতুশ্চ ধূমরূপো'সাবাকাশে বিলয়ং গতঃ।

যাবার সময় কেতু স্বকণ্ঠস্থিত অবশেষ অমৃতটুকু চন্দ্রকে দিয়ে চলে গেল।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কেদার) ১২.৬৫-৭০]

□ ঘটনা হল, উপরি উক্ত স্কন্দ পুরাণের এই কাহিনীর নিরিখেই পণ্ডিতেরা অনেকেই মনে করেন যে, কেতুর কোনো পৃথক সত্তা আগে ছিল না। মহাভারতেও দেবতার ছদ্মবেশে অমৃতপানের ক্ষেত্রে শুধু রাহুর নামই উল্লিখিত হয়েছে। ফলত স্কন্দ পুরাণে রাহুর ছিন্ন মুণ্ড আকাশে উঠে যাবার পর যে কবন্ধটি ভূমি বিদীর্ণ করে, নানা দুর্লক্ষণ প্রকাশ করে মাটিতে পড়ল এবং পরে সেই কবন্ধই যদি ধূম্রাকারে আকাশে বিলীন হয়ে থাকে, তবে রাহুর সেই অপরাংশকেই 'কেতু' বলে অনুমান করা যায়। এর অর্থ রাহুর দেহ বিভক্ত হবার পর সেই ছিন্ন দেহই কেতু-সম্বোধন লাভ করেছে।

রাহু এবং কেতু দুই জনেই নবগ্রহের অন্তর্গত দুই গ্রহ হিসেবে নির্দিষ্ট হয়েছেন। কিন্তু কেতু যে রাহুরই কবন্ধ দেহখানিই বটে এবং আকাশে বিলীন হওয়ার সময় তার চেহারাটা ধূমের বর্ণ লাভ করেছিল, তার একটা প্রমাণ হিসেবে বিষ্ণু পুরাণে কেতুগ্রহের রথের বর্ণনা দিয়ে বলা হচ্ছে—পলাল অর্থাৎ শস্যহীন ধানের নাল বা পোয়াল-খড় পুড়িয়ে দিলে ধোঁয়ার যে রঙ হয়, সেইরকম রঙের আটটা ঘোড়া কেতুগ্রহের রথ বহন করে। এই ধূম্রবর্ণের মধ্যে মাঝে মাঝে লাক্ষারসের মত লালচে ভাবও আছে—

পলাল-ধূম-বর্ণাভা লাক্ষা-রসনিভারুণাঃ।

[বিষ্ণু পু. ২.১২.২৩]

□ স্কন্দ পুরাণের প্রভাসখণ্ডে অবশ্য এই 'পলাল-ধূমে'র বর্ণটুকু আর কেতুর অশ্বে সংযুক্ত হয়নি, এখানে স্বয়ং কেতুগ্রহের রঙই—পলাল-ধূম-সঙ্কাশো গ্রহপীড়াপহারকঃ। এই বর্ণনায় কেতু রাহুর মতোই একটি উগ্রগ্রহ। তার চেহারা গোলাকার, বেশ বড়ো, ভয়ংকর তাঁর চোখ, পলাল অর্থাৎ খড়-বিচুলি পোড়ালে যে ধোঁয়া হয়, তার মতো কেতুগ্রহের রঙ এবং সে অন্যগ্রহের পীড়া হরণ করে।

কেতু নাকি খুব শিবভক্ত ছিলেন। আগে দেখেছি, রাহুর সেই কবন্ধ দেহের ওপরেও শিবের অবস্থান ছিল। কেতু দেব-পরিমাণে একশ বছর তপস্যা করে মহাদেবকে তুষ্ট করেছিলেন। কেতুগ্রহের উদয়ে ঘোরতর সময় উপস্থিত হলে কেতুর উপাসিত কেতুলিঙ্গ শিবের পূজা করতে হয়।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র মাহাত্ম্য) ৫১.৩-৬; কালিকা পু. ৭৯.১৩৯; গরুড় পু. (পূর্ব) ৫৮.২৯]

কেতু২ ভাগবত পুরাণ অনুসারে রাজা নাভি এবং তাঁর পত্নী মেরুদেবী সন্তান কামনায় ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করেন। ভগবান বিষ্ণুও তাঁদের আরাধনায় তুষ্ট হয়ে মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভ নামে জন্মগ্রহণ করেন। এই ঋষভের পুত্রদের মধ্যে কেতু অন্যতম। *[ভাগবত পু. ৫.৪.১০]*

কেতু৩ একজন দানব। কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ৬.১৮; ব্রহ্ম পু. ৩.৭৬]

কেতু৪ যযাতির পুত্র দ্রুহ্যু। দ্রুহ্যুর পুত্রদের মধ্যে কেতু অন্যতম। *[মৎস্য পু. ৪৮.৬]*

কেতু৫ ভাগবত পুরাণ অনুসারে চতুর্থ মনু তামসের দশজন পুত্রের মধ্যে কেতু একজন।

[ভাগবত পু. ৮.১.২৭]

কেতু৬ চক্র, রথ, ধনু ইত্যাদিকে রাজাদের সাতটি প্রাণহীন রত্ন বলে গণ্য করা হয়েছে। কেতু এই সাতটি প্রাণহীন রত্নের মধ্যে একটি বলে বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে—

চক্রং রথো মণিঃ খড়্গং ধনূরত্নং চ পঞ্চমম্
কেতুর্নির্বিশ্চ সপ্তৈতে প্রাণহীনাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

[বায়ু পু. ৫৭.৬৯]

□ কেতুকে রত্ন বলে চিহ্নিত করা হলেও কেতু ঠিক কী বা কী জাতীয় রত্ন তা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। কেতু অর্থে ধ্বজ, আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে রথের ধ্বজা বা পতাকা। সেকালের রাজাদের কিংবা অন্যান্য বিশিষ্ট রথী মহারথীদের পরিচয় নির্দেশ করত এই ধ্বজ বা কেতন। মহাভারতে বিরাট পর্বে কিংবা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহারথ যোদ্ধার ধ্বজের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যে ধ্বজ দূর থেকে তাঁকে চিহ্নিত করে, তাঁর প্রতিপত্তি বা পরাক্রম বা মর্যাদার পরিচয়বাহী এই ধ্বজ। যেমন, গরুড়ধ্বজ বললেই কৃষ্ণকে বা কপিধ্বজ বললেই অর্জুনকে সনাক্ত করতে অসুবিধা হয় না। এখনকার দিনে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরিচয়

বাহক যে Logo ব্যবহার করেন প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির ধ্বজের ব্যবহার এবং মাহাত্ম্যও ছিল অনেকটা সেইরকমই। রাজার গরিমার অন্যতম প্রতীক বলেই কেতু বা ধ্বজ রাজার অন্যতম রত্ন বলে চিহ্নিত হয়েছে।

কেতু৭ যেসব ঋষিরা বেদপাঠ করে স্বর্গে গমন করেছেন, কেতু তাঁদের মধ্যে অন্যতম বলে মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ১২.২৬.৭; (হরি) ১২.২৬.৭]

কেতু৮ ভগবান শিবের অনুচর ভৈরবের বংশধারায় রাজা বিজয়ের তেরোটি পুত্রসন্তানের মধ্যে কেতু একজন। *[কালিকা পু. ৮৯.১৫৩]*

কেতুবর্মা ত্রিগর্তরাজ সূর্যবর্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে ত্রিগর্তদেশে উপস্থিত হলে ত্রিগর্তরাজ সূর্যবর্মা যজ্ঞাশ্বটিকে ধরে ফেললেন। ফলে ত্রিগর্তদের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধে সূর্যবর্মার ভাই কেতুবর্মা অর্জুনের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১৪.৭৪.১৪-১৬; (হরি) ১৪.৯৩.১৪-১৬]

কেতুবীর্য্য১ একজন দানব। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কেতুবীর্য্য একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.৬; মৎস্য পু. ৬.১৮; ব্রহ্ম পু. ৩.৭৬; পদ্ম পু. (সৃষ্টি) ৬.৫১]

কেতুবীর্য্য২ মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে মগধের রাজা ছিলেন কেতুবীর্য্য। সুকেশী নামে তাঁর একটি কন্যা ছিল। রাজা মরুত্তের সঙ্গে সুকেশীর বিবাহ হয়।

[মার্কণ্ডেয় পু. ১৩১.৪৬-৪৭]

কেতুমতী নর্মদা নামে এক গান্ধর্বীর কন্যা। রাক্ষস সুকেশের পুত্র সুমালীর সাথে এঁর বিবাহ হয়েছিল। সুন্দরী কেতুমতী ছিলেন তাঁর স্বামীর অত্যন্ত প্রিয় পাত্রী। সুমালীর ঔরসে কেতুমতীর গর্ভে কয়েকটি বলশালী রাক্ষস পুত্র ও কন্যা জন্মায়। পুত্ররা হলেন প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদি, প্রঘস এবং ভাসকর্ণ; আর কন্যাদের নাম যথাক্রমে কুম্ভীনসী, কৈকসী, রাকা ও পুষ্পোৎকটা।

[রামায়ণ ৭.৫.৩৩-৪০]

কেতুমান১ একজন দানব। ইনি কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্ব থেকে জানা যায় যে, দ্বাপর যুগে এই কেতুমান মর্ত্যলোকে রাজা উগ্রমৌজা রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। *[মহা (k) ১.৬৫.২৪; ১.৬৭.১১; (হরি) ১.৬০.২৪; ১.৬২.১২]*

কেতুমান২ একজন অথবা একাধিক রাজা। মহাভারতের সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় উপস্থিত রাজাদের মধ্যে তাঁর নাম একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। তবে ইনি বা এঁরা কোন দেশের রাজা ছিলেন সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। *[মহা (k) ২.৪.২৭, ৩২; (হরি) ২.৪.১০নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র. খণ্ড ২; পৃ. ২৬]*

কেতুমান৩ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষে অংশগ্রহণকারী অন্যতম যোদ্ধা। তবে মহাভারতের সভাপর্বে আমরা যে একাধিক কেতুমান রাজার উল্লেখ পাই (কেতুমান২) ইনি তাঁদের মধ্যেই কোনো একজন কীনা, তা স্পষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধা কেতুমান, নিষাদরাজ হিসেবে চিহ্নিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রথম দিনে যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে যুদ্ধোদ্যত যেসব কৌরব যোদ্ধার নাম উল্লিখিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুর সহযোগী যোদ্ধা হিসেবে আমরা হস্তীপৃষ্ঠে এক সশস্ত্র কেতুমান রাজাকে দেখতে পাই। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে কেতুমান ভীমসেনের হাতে নিহত হন।

[মহা (k) ৬.১৭.৩২-৩৭; ৬.৫১.২০; ৬.৫৪.৫-৬, ৭৭; (হরি) ৬.১৭.৩২-৩৭; ৬.৫১.২০; ৬.৫৪.৫-৬, ৭৭]

কেতুমান৪ দ্বারকায় কৃষ্ণের অন্যতম প্রাসাদ। কৃষ্ণের পত্নী সুদত্তা এই মনোরম ভবনে বাস করতেন বলে জানা যায়।

[মহা (গীতা প্রেস) ২.৩৮.২৯নং শ্লোকের উত্তর দাক্ষিণাত্য অধিক পাঠ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৮১৫]

কেতুমান৫ রজের ঔরসে মার্কণ্ডেয়ীর গর্ভজাত পুত্র, অন্যতম দিক্‌পাল। ব্রহ্মা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই কেতুমানকে পশ্চিমদিকের রাজা নিযুক্ত করেন। ভবিষ্যৎ কোনো মন্বন্তরে ইনি মনু হবেন বলে বায়ুপুরাণে উল্লেখ আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও আমরা একজন লোকপাল হিসেবে কেতুমানের উল্লেখ পাই। *[বায়ু পু. ২৮.৩৭; ৭০.১৭; বিষ্ণু পু. ১.২২.১১; মৎস্য পু. ৮.১০; ১২৪. ৯৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১১.৪৩; ১.২১.১৫৭; ১.৩৬.৩১; ২.৮.১৯]*

কেতুমান$_6$ ভবিষ্যৎকালে দ্বিতীয় দ্বাপরে যখন সত্য ব্যাস হবেন, সেই সময় ভগবান মহাদেব সুতার নামে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন। তাঁর যে চারজন পুত্র উৎপন্ন হবেন তাঁদের মধ্যে কেতুমান একজন।

[বায়ু পু. ২৩.১২১]

কেতুমান$_7$ শুনহোত্রের বংশজাত কাশীরাজ ধন্বন্তরির পুত্র। আয়ুর্বেদের প্রণেতা ধন্বন্তরির পুত্র ছিলেন কেতুমান। কেতুমান কাশীরাজ ভীমরথের পিতা।

[বায়ু পু. ৯২.২৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৭.২৫; বিষ্ণু পু. ৪.৮.৫; ভাগবত পু. ৯.১৭.৫]

কেতুমান$_8$ উত্তম মন্বন্তরে দেবতারা যে কয়টি গণে বিভক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে প্রতর্দন একটি অন্যতম গণ। প্রতর্দনগণের অন্তর্গত দেবতাদের মধ্যে একজন ছিলেন কেতুমান।

[বায়ু পু. ৬২.২৮]

কেতুমান$_9$ যক্ষ মণিভদ্রের ঔরসে পুণ্যজনীর গর্ভে যেসব যক্ষপুত্রের জন্ম হয় কেতুমান তাঁদের মধ্যে একজন। *[বায়ু পু. ৬৯.১৫৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১২৫]*

কেতুমান$_{10}$ কাশীরাজ দিবোদাসের বংশধারায় ক্ষেমের পুত্র ছিলেন কেতুমান, ইনি কাশীরাজ সুকেতুর পিতা। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৭.৭৪]*

কেতুমান$_{11}$ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা অম্বরীষের মধ্যমপুত্র। *[ভাগবত পু. ৯.৬.১]*

কেতুমালবর্ষ জম্বুদ্বীপের নয়টি বর্ষের মধ্যে একটি। অন্য নাম কৃতমাল। স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধারায় অগ্নীধ্রের নয়টি পরাক্রমশালী পুত্রের জন্ম হয়। এঁদের মধ্যে কনিষ্ঠতম হলেন কেতুমাল। অগ্নীধ্র কেতুমালকে গন্ধমাদন বর্ষের শাসক নিয়োগ করেন। কেতুমালের নামানুসারে তাঁর শাসিত গন্ধমাদনবর্ষটি কালক্রমে কেতুমালবর্ষ নামে পরিচিত হয়।

[মহা (k) ২.২৮.৬; (হরি) ২.২৮.৬নং শ্লোক পরবর্তী দাক্ষিণাত্য অধিক পাঠ দ্রষ্টব্য (গীতা প্রেস); বায়ু পু. ৩৩.৪১; বিষ্ণু পু. ২.১.১৮, ২৩; ২.২.৩৫; ভাগবত পু. ৫.২.১৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.৪৭, ৫২]

□ মেরু পর্বতের পশ্চিমে কেতুমালবর্ষের অবস্থান। এর উত্তরে নীল এবং দক্ষিণে নিষধ পর্বত বিস্তৃত। পবিত্র নদী চক্ষু বা বঙ্ক্ষু নদী কেতুমালবর্ষের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত।

মহাভারত ও পুরাণে কেতুমালবর্ষের অধিবাসীদের রূপের বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে। কেতুমাল অথবা কৃতমাল বর্ষের কেন্দ্রস্থলে একটি বিশালাকায় পনস (কাঁঠাল) বৃক্ষ রয়েছে। এই বৃক্ষের ফলের সুমিষ্ট রস পান করেই কৃতমালবর্ষের অধিবাসীরা দীর্ঘায়ু লাভ করেন। এঁদের গায়ের রঙ সোনার রঙের মত। কৃতমালবর্ষের স্ত্রীলোকেরা অপ্সরাতুল্য। সমস্ত অধিবাসীরাই সেখানে নীরোগ, শোকশূন্য এবং প্রফুল্লচিত্ত। অবশ্য ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী কৃতমালবর্ষের পুরুষদের গাত্রবর্ণ কালো এবং নারীদের গায়ের রং পদ্মপত্রের মত।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কৃতমালবর্ষের কেন্দ্রস্থ পনস বৃক্ষটির বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়। উত্তর-দক্ষিণে চৌত্রিশ হাজার যোজন এবং পূর্ব-পশ্চিমে বত্রিশ হাজার যোজন বিস্তৃত কৃতমালবর্ষের কেন্দ্রে পনস বৃক্ষটি অবস্থিত। এই পনসবৃক্ষের ফলে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী ছয়টি স্বাদই বর্তমান। এই কারণেই বৃক্ষটিকে প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্ররূপে কল্পনা করা হয়েছে। *[মহা (k) ৬.৬.১৩, ৩১-৩৩; (হরি) ৬.৬.১৩, ৩১-৩৩; মৎস্য পু. ১১৩.৪৪, ৪৯-৫০; বিষ্ণু পু. ২.২.২৩; বায়ু পু. ৩৪.৫৬; ৪৩.১-৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৫.৫০-৫৬]*

□ কেতুমালবর্ষে সাতটি কুলপর্বত রয়েছে সেগুলির নাম যথাথমে—বিশাল, কম্বল, কৃষ্ণ, জয়ন্ত, হরিপর্বত, অশোক ও বর্ধমান। এছাড়াও কেতুমালবর্ষে অসংখ্য পর্বত অবস্থিত। বহু বিখ্যাত জনপদের অবস্থান এখানে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সুখ, ভ্রমর, সুমৌল, কৃষ্ণাঙ্গ, মৌষীয়, কুব, শ্বেত ইত্যাদি। প্রতিটি রাজ্যই সমৃদ্ধশালী। সুবপ্রা, কম্বলা, গর্ভাবতী, শুকনদী, পলাশা, কুশবতী প্রভৃতি নদী কেতুমালবর্ষের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। *[বায়ু পু. ৪৪.১-২৫]*

□ পুরাণে কেতুমালবর্ষের নামকরণ প্রসঙ্গে একটি কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কেতুমালবর্ষের পশ্চিমে একটি দীর্ঘ অশ্বত্থ গাছ অবস্থিত। দেবতা এবং গন্ধর্বরা প্রতিনিয়ত ওই বিশালকায় বৃক্ষের আরাধনা করে থাকেন। বৃক্ষটি সমগ্র ভূমিভাগের কেতুস্বরূপ। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে এটি যেন সমস্ত ভূ-খণ্ডের মধ্যে প্রধান।

ক্ষীরোদসাগর মন্থনের সময় দেবতা ও দৈত্যগণের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল, দেবরাজ ইন্দ্র সেখানে একটি মনোরম মালা পরে এসেছিলেন।

যুদ্ধের প্রাবল্য সত্ত্বেও ইন্দ্রের গলার সেই মালা অমলিন ছিল। যুদ্ধশেষে ইন্দ্র স্বয়ং মালাটি কেতুমালবর্ষের সেই বিশালকায় অশ্বত্থ বৃক্ষের কাঁধে অর্থাৎ মূল শাখায় টাঙিয়ে দেন। সেই মালা আজও অবিকৃত অবস্থায় বৃক্ষ শাখায় বর্তমান। ভূ-খণ্ডের কেতুস্বরূপ বৃক্ষের শাখায় মালাটি অবস্থান করায় সমগ্র অঞ্চলটি কেতুমালবর্ষ নামে পরিচিত হয়। *[বায়ু পু. ৩৫.৩৬-৪০]*

□ ভগবান বিষ্ণু কামদেবরূপে লক্ষ্মীদেবী এবং প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র ও কন্যাদের সঙ্গে সর্বদা কেতুমালবর্ষে অবস্থান করেন। সেখানে বসবাসকারী প্রজাপতির পুত্র-কন্যাদের সংখ্যা ছত্রিশ হাজার। দেবী লক্ষ্মী ও প্রজাপতির পুত্র-কন্যাগণ কেতুমালবর্ষে কামদেবের আরাধনায় ব্যস্ত থাকেন। *[ভাগবত পু. ৫.১৮.১৫-২৩]*

□ কুরুরাজ তথা পাণ্ডবদের পৌত্র পরীক্ষিৎ পাপাচারী কলিকে তাঁর রাজ্য থেকে বিতাড়নের উদ্দেশে এক দীর্ঘ অভিযান করেছিলেন। সে সময় তিনি বহু দেশ-জনপদ জয় করেন। সেগুলির মধ্যে কেতুমালবর্ষ একটি। *[ভাগবত পু. ১.১৬.১২]*

□ পণ্ডিতরা প্রাচীন তুর্কি, পারস্য এবং আফগানিস্তানকে কেতুমালবর্ষ বলে উল্লেখ করেছেন। N.L. Dey -এর মতে চক্ষু বা ওক্ষস্ (Oxus) নদী বিধৌত অঞ্চল কেতুমালবর্ষ রূপে পরিচিত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, Oxus বলতে আধুনিক আমুদরিয়া (Amu Darya) নদীকে বোঝানো হয়। আমুদরিয়া বৃহত্তর তুর্কপ্রদেশ অর্থাৎ তুর্কমেনিস্তান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। K.C. Mishraও প্রাচীন বাল্খ (Balkh) প্রদেশকেই কেতুমালবর্ষ বলে উল্লেখ করেছেন।

[GDAMI (N.L. Dey) p. 99; TIM (Mishra) p. 157]

□ পণ্ডিত S.M. Ali -এর মতে প্রাচীন ব্যাকট্রিয়াই হল কেতুমালবর্ষ। এর অর্থ বর্তমান আফগান তুর্কিস্তান, আমুদরিয়ার দক্ষিণ তট, সুরখান, কাফিরিস্তান প্রভৃতি অঞ্চল কেতুমালবর্ষের অন্তর্গত ছিল।

[GP (S.M. Ali) p. 97]

কেতুমালী ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে একবিংশ দ্বাপরে যখন মহাদেব দারুক নামে অবতীর্ণ হবেন এবং বাচস্পতি ব্যাস হবেন, তখন ভগবান রুদ্রের যে চারজন পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদের মধ্যে কেতুমালী একজন। *[বায়ু পু. ২৩.১৯৬]*

কেতুরূপ বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে তামস মনুর পুত্রদের মধ্যে কেতুরূপ একজন।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৩.১.১৯]

কেতুশৃঙ্গ₁ ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে দশম দ্বাপরে যখন ত্রিধামা ব্যাস হবেন, তখন মহাদেব ভৃগু নামে অবতীর্ণ হবেন। সেইসময় ভগবান রুদ্রের যে চারজন পুত্র জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদের মধ্যে একজন হবেন কেতুশৃঙ্গ। *[বায়ু পু. ২৩.১৪৯]*

কেতুশৃঙ্গ₂ গরুড় পুরাণ অনুসারে রৈবত মনুর পুত্রদের মধ্যে কেতুশৃঙ্গ একজন।

[গরুড় পু. (পূর্ব) ৮৭.১৮]

কেতুশৃঙ্গ₃ কূর্ম ও লিঙ্গ পুরাণে বলা হয়েছে যে, একাদশতম কলিযুগে মহাদেব উগ্র নামে অবতীর্ণ হবেন। সেই সময় যে চারজন যোগী মহাদেবের শিষ্য হবেন, তাঁদের মধ্যে কেতুশৃঙ্গ একজন।

[কূর্ম পু. ১.৫২.১৭; লিঙ্গ পু. ১.৭.৪২]

কেতুশৃঙ্গ₄ জনৈক প্রাচীন রাজর্ষি। মহাভারতের আদিপর্বের সূচনায় সঞ্জয় পুত্রশোকার্ত ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বহু প্রাচীন রাজা-মহারাজার নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা দীর্ঘকাল রাজৈশ্বর্য ভোগ করার পর কালের অমোঘ নিয়মে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে রাজা কেতুশৃঙ্গের নামও উল্লেখ করেছেন সঞ্জয়।

[মহা (k) ১.১.২৩৭; (হরি) ১.১.১৯৮]

কেদার₁ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি তীর্থ। মহর্ষি কপিল এই তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা। কেদার তীর্থে তপস্যা করলে পাপহীন অবস্থায় সংসারজীবন থেকে মুক্ত হবার শক্তি লাভ করা যায়।

[মহা (k) ৩.৮৩.৭২; (হরি) ৩.৬৮.৭৪]

কেদার₂ প্রয়াগক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি তীর্থ। এখানে ঋষি মতঙ্গের একটি আশ্রম রয়েছে।

[মহা (k) ৩.৮৭.২৫; (হরি) ৩.৭২.২৪]

□ কেদার দেবাদিদেব মহাদেবের অবস্থানস্থল। এখানে তাঁর নিত্য উপস্থিতি। একবার বৃকাসুর মহাদেবকে তুষ্ট করার জন্য কেদারক্ষেত্রে এসে কঠোর তপস্যা শুরু করেন। বৃকাসুর নিজের শরীরের মাংস অগ্নিতে আহুতি দিয়ে মহাদেবের তপস্যা করেছিলেন। অবশেষে যখন বৃকাসুর খড়্গ দিয়ে নিজ মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হলেন, তখন মহাদেব আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বিরত

করেন। এভাবেই বৃকাসুর প্রয়াগক্ষেত্রের অন্তর্গত কেদারক্ষেত্রে মহাদেবের সাক্ষাৎ এবং বর লাভ করেছিলেন। *[ভাগবত পু. ১০.৮৮.১৭-২১; মৎস্য পু. ১৮১.২৯]*

□ পুরাণে কেদারকে একটি পুণ্যফলদানকারী পিতৃতীর্থ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তীর্থে দেবী সতী 'মার্গদায়িনী' নামে পূজিতা হন।

[মৎস্য পু. ১৩.৩০; ২২.১১; কূর্ম পু. ২.২০.৩৪]

কেদার৩ গয়াক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি তীর্থের নামও কেদার। গয়াসুরের মহাযজ্ঞে যে শিলাটি তাঁর মস্তকে স্থাপন করা হয়েছিল সেটিকে নিশ্চল করার জন্য স্বয়ং বিষ্ণু ক্ষীরোদ সাগর থেকে উত্থিত হয়ে তার উপর অবস্থান করেন। এই পবিত্র শিলাটি পিতামহ, প্রপিতামহ, ফল্গীশ, কেদার এবং কনকেশ্বর এই পাঁচ নামে বিভক্ত হয়, যদিও গয়শিলার কেদার খণ্ডটিই গয়ায় কেদার তীর্থ নামে পরিচিত। কেদার তীর্থে স্নান আরাধনা করলে পিতৃগণ মুক্তিলাভ করেন।

[বায়ু পু. ১০৬.৫৬; ১১.৭২]

কেদার৪ বিখ্যাত কেদারনাথ তীর্থ। এই কেদারের নামানুসারেই সম্ভবত অন্যান্য কেদার-নামক তীর্থগুলির প্রতিষ্ঠা। বিষ্ণুধর্মসূত্রে কেদার তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যেসব তীর্থে স্নান করা মাত্রই পুণ্যলাভ হয় সেগুলির মধ্যে কেদার একটি। *[বিষ্ণুধর্ম সূত্র (মহর্ষি) ৮৫.১৭]*

□ কেদার তীর্থে মহাদেব কেদারেশ্বর নামে পরিচিত। শিব পুরাণ মতে, কেদারেশ্বর মহাদেব কেদার তীর্থ-সংলগ্ন বদরিকাশ্রমে অবস্থান করেন। তিনি ভক্তদের দর্শন দেওয়ার জন্যই সর্বদা পার্থিব লিঙ্গরূপে অবস্থিত। বিষ্ণু স্বয়ং হিমালয়বাসী শিবকে আরাধনায় তুষ্ট করে কেদারে অবস্থান করে ভক্তদের ইচ্ছাপূরণের বর প্রার্থনা করেন। তখন থেকেই সন্তুষ্ট মহাদেব জ্যোতির্মূর্তিরূপে কেদারে অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি বদরিকাশ্রমে গিয়ে কেদারেশ্বরের দর্শন করেন তাঁর জীবন পাপ ও রোগ থেকে মুক্ত হয় বলে পুরাণে বলা হয়েছে।

[শিব পু. (জ্ঞান) ৪৭.১-৩১]

□ এই পবিত্র কেদার ক্ষেত্রেই শিব-পুত্র স্কন্দ কার্তিকেয়ের জন্ম হয় বলে কোনো কোনো পুরাণে বলা হয়েছে। তাতে কেদারতীর্থের মাহাত্ম্য আরও বেড়েছে।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কেদারখণ্ড) ২৭.৮৬-৮৭]

□ বর্তমান উত্তরাখণ্ডের অন্তর্গত গাড়োয়াল হিমালয়ের বিস্তৃত অংশ কেদারক্ষেত্র নামে পরিচিত। রুদ্র হিমালয় বা কেদার হিমালয়ের অন্তর্গত গাড়োয়াল জেলায় মহাপন্থ নামে একটি শৃঙ্গ রয়েছে। এই মহাপন্থ শৃঙ্গের পাদদেশে যেখানে মন্দাকিনী এবং দুধগঙ্গা নদী মিলিত হয়েছে সেখানেই কেদারনাথের অবস্থান।

লোকমুখে প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী কেদারনাথ তীর্থের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পঞ্চপাণ্ডবরা। বলা হয় যে, মহাপ্রস্থানের পথে পাণ্ডবদের উত্তরমুখী অর্থাৎ হিমালয়ের দিকে যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পাপস্খালনের জন্য দেবাদিদেব মহাদেবের দর্শন। তাঁরা দূর থেকে শিবকে দেখতে পেলেও কাছে যেতেই তিনি বৃষের রূপ ধারণ করে তুষারাবৃত ক্ষেত্র দিয়ে দৌড়োতে থাকেন। এভাবে পালাতে পালাতে বৃষরূপী মহাদেব একটি তুষার পরিপূর্ণ গর্তের মধ্যে প্রবেশ করেন। পাণ্ডবরাও তাঁর পিছনে পিছনে গর্তে প্রবেশ করলে একটি মৃত বৃষের দেহ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাননি। লৌকিক বিশ্বাসে বলা হয় যে, সেই মৃত বৃষের ককুদ বা কুঁজটিই কেদারনাথ তীর্থে শিবলিঙ্গ রূপে পূজিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেদার শব্দের একটি অর্থ হল জল দ্বারা যা বিদীর্ণ। 'ক' শব্দের অর্থ হল জল। সনাতন শাস্ত্রীয় ভাবনায় গঙ্গা নদীকেই 'জল' শব্দের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সমার্থক বলে ভাবা যেতে পারে। অন্যদিকে 'দার' শব্দের অর্থ পত্নী। 'ক' অর্থাৎ গঙ্গানদী যাঁর দার অর্থাৎ পত্নী এবং যিনি সেই পত্নীকে মস্তকে ধারণ করেন তিনি কেদার। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হল কেদার অর্থাৎ গঙ্গাকে যিনি মস্তকে ধারণ করেছেন—এটা শিবের আরেক নাম।

[অমরকোষ ২ (বৈশ্যবর্গ). ১১ (ক্ষীরস্বামী টীকা দ্রষ্টব্য) GDAMI (N.L. Dey) p. 97-98; Haripriya Rangan; Of Myths and Movements, London: Verso, 2000]

□ উত্তরাখণ্ডের পঞ্চকেদার তীর্থের কথা উল্লেখ না করলে কেদার সংক্রান্ত আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যায়। উত্তরাখণ্ডের চামোলী (Chamoli) জেলার পশ্চিমাংশ জুড়ে কেদার-মণ্ডলের পাঁচটি পবিত্র তীর্থ যথাক্রমে—কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ, মধ্যমহেশ্বর এবং

কল্পেশ্বর। এগুলিই একত্রে পঞ্চকেদার নামে বিখ্যাত। *[J.C. Aggarwal and S.P. Agarwal, Uttarakhand, New Delhi: Concept Publishing Company, 1995, p. 86]*

কেদার৬ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। শিব এই তীর্থে লিঙ্গরূপে পূজিত।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচন কাণ্ড); ৩৭]

কেদারেশ্বরতীর্থ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রখ্যাত তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করে যে ব্যক্তি শিবকে দর্শন করেন, তিনি সপরিবারে স্বর্গে যান।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ৩১.১-৩]

কেবল১ বৈবস্বত মনুর পুত্র নাভাগের বংশধারায় নরের পুত্র এবং ধুন্ধুমানের পিতা কেবল।

[ভাগবত পু. ৯.২.৩০]

□ বায়ু, বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে যে, নরের পুত্র কেবল। কেবলের বন্ধুমান নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[বায়ু পু. ৮৬.১৪; বিষ্ণু পু. ৪.১.১৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬১.৯]

□ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অপর একটি পাঠে বলা হয়েছে যে, কেবলের পুত্র বেগবান।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৩৬]

কেবল২ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অজিত-গণ একটি। কেবল, এই অজিত-গণের অন্তর্ভুক্ত একজন দেবতা।

[বায়ু পু. ৩১.৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৩.৯৪]

কেবল৩ যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্যদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.২৯]

কেলি পিশাচী ব্রহ্মধনার গর্ভজাত এক রাক্ষস।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.৭.৯৮]

কেশ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কেশ বা মাথার চুল অনেকটাই জীবন এবং জীবনীশক্তির প্রতীক ছিল। নখ এবং চুল যেহেতু কেটে ফেলার পরেও আবার জন্মায় এবং বেড়ে ওঠে, তাই বিভিন্ন সাংস্কারিক সময়ে মস্তক মুণ্ডন করা এবং কাটার ব্যাপারটা প্রতীকীভাবে পুনর্জন্মের সূচনা দিত। হয়তো এই কারণেই উপনয়নের সময়, পিতৃ-মাতৃকার্যে অথবা বিভিন্ন প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে মস্তক-মুণ্ডন করাটা অনেকটা পূর্বকৃত পাপ বিসর্জন দিয়ে নূতন পুণ্যজীবন শুরু করার মতো ছিল।

প্রথমেই এ-কথা জানানো দরকার যে, রামায়ণ-মহাভারতে কেশের পরিচর্যা, এবং প্রসাধন দৈনন্দিন জীবনের একটা অঙ্গ ছিল। দিনের প্রথম ভাগে যেমন পুজো সেরে নেবার ব্যাপার থাকে, সেইভাবে কেশের প্রসাধন এবং চোখে কাজল দিয়ে ভালো রাখার ব্যাপারটাও দিনের প্রথম ভাগে সেরে নিতে হত—

প্রসাধনঞ্চ কেশানামঞ্জনং দন্তধাবনম্।

লম্বা চুল রাখার ব্যাপারে মেয়েদের চেয়ে পুরুষের আন্তরিকতা কিছু কম ছিল না। শল্যপর্বে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও আমরা দুর্যোধনকে তাঁর লম্বা চুল একত্রীকৃত করতে দেখেছি—

যময়ন্ মূর্ধজাংস্তত্র বীক্ষ্য চৈব দিশো দশ।

আর অর্জুন যে বিরাট-নগরে গিয়েই তাঁর নপুংসক-বৃত্তিতে লম্বা বেণী রেখেছিলেন, তা নয়। বিরাট নগরে ঢুকবার সময়েই তাঁর পৌরুষেয় বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তিনি দীর্ঘ এবং বহুল কেশরাশি মুক্ত করে দিয়ে পাদভরে ভূমি কম্পিত করে নগরে প্রবেশ করেছেন—

বহূংশ্চ দীর্ঘাংশ্চ বিমুচ্য মূর্ধজান্
মহাভুজো বারণতুল্য-বিক্রমঃ।

তবে বিরাট নগরে প্রবেশ করবার সময় অর্জুন 'বেণীকৃতশিরা' অবস্থায় থাকবেন বলেই বলেছিলেন এবং সেখানে আসার পর বিরাটও তাঁর চুল বেণী-বাঁধাই দেখেছেন—

বিমুচ্য বেণীমপিনহ্য কুণ্ডলে।

সাধারণত লম্বা চুল রাখাটাই যে অধিকাংশ পুরুষের বিলাস ছিল, সেটা যেকোনো যুদ্ধের পর রণলুণ্ঠিত মস্তকের বর্ণনাতেই বোঝা যায়—

কৃত্তকেশম্ অলংকৃতম্।

অথবা, দ্রোণাচার্যের চুল ধরে তাঁর গলা কেটেছিলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন—

ততো মূর্ধানমালম্ব্য গতসত্ত্বস্য দেহিনঃ।

অভিমন্যু এক বিপক্ষ যুদ্ধবীরের রথে উঠে তাঁর চুল ধরে গলা কেটে ফেলেছিলেন—

কেশপক্ষে পরামৃশৎ।

তম্ আগলিত-কেশান্তং দদৃশুঃ সর্বপার্থিবাঃ।

বিরাট পর্বে কীচকের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময়েও কীচকের চুল আঁকড়ে ধরেছিলেন ভীমসেন এবং সে-চুলে আবার মালা জড়ানো ছিল—

ততো জগ্রাহ কেশেষু মাল্যবৎসু মহাবলঃ।

রামায়ণে রামচন্দ্রের চুলও যথেষ্ট বড়ো ছিল, তাঁর একটা বিশেষ ধরনের চুল বাঁধবার কায়দা

ছিল, যাতে দুই দিকে খানিক কাকের পাখার মতো কেয়ারি করা হত—কাকপক্ষধরো ধন্বী। পার্বত্য-জনপদবাসী মানুষেরা তো বড়ো চুল রাখতেনই—

খশা একাসনা হ্যর্হা প্রদরা দীর্ঘবেণবঃ।

আর মেয়েদের চুলের অসামান্য শোভা এবং কেশবন্ধন-কৌশল এতটাই উন্নত ছিল যে, রাজবাড়িতে সৈরিন্ধ্রী দাসী রাখতে হত, যিনি বিচিত্র খোঁপা বেধে দিতেন রাজবাড়ির মেয়েদের, বউদের, রানীদের।

[মহা (k) ৯.৬৪.৪-৫; ৪.১১.২; ৪.১১.৫; ৪.২.২৭; ৪.৩২.১২; ৭.১৩.৫৯,৬১; ৪.২২.৫২; ২.৫২.৩; ৪.৯.১৯; (হরি) ১০.১.৪-৫; ৪.১০.২; ৪.১০.৫; ৪.২.২৭; ৪.৩০.১২; ৭.১২.৫৯, ৬১; ৪.২০.৪৯; ২.৫০.৩; ৪.৮.১৫-১৬; রামায়ণ ১.২২.৬; ৩.৪৬.৩]

অথর্ববেদে পর পর দুটি সূক্তে পুরুষ এবং নারীর কেশ-বৃদ্ধি, কেশের সুরক্ষা, কেশ দৃঢ় করা, পুরাতন কেশের পতন রোধ করার জন্য অভিচার-কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। অভিচার-কর্মে অন্যের অপকার সাধন করেও নিজের স্বার্থ-সাধনের একটা ব্যাপার থাকে। সেটা আমাদের কাছে মুখ্য প্রতিপাদ্য নয়, মুখ্য হল—কেশবৃদ্ধির জন্য নারী-পুরুষের আকাঙ্ক্ষা। অথর্ববেদের মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ-প্রয়োগের পদ্ধতি দেখিয়ে টীকাকারেরা বলেছেন—কেশ-বৃদ্ধির জন্য কাচমাচী ফল, জীবন্ত ফল অথবা ভৃঙ্গরাজকে মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে একত্রে বেঁধে দিতে হবে, তারপর সকলে উঠে ফলগুলির সঙ্গে জল অভিমন্ত্রিত করে কেশে সেচন করতে হবে। এখানে যে মন্ত্রে ফল এবং জল অভিমন্ত্রিত করা হচ্ছে, তার শব্দ এবং অর্থগুলিই নারী-পুরুষের কেশ-বৃদ্ধির চিরকালীন ইচ্ছাটুকুর প্রতিষ্ঠা করে। ওই পূর্বোক্ত ফলগুলির উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণ করে বলা হচ্ছে—

হে ওষধি দেবী, নিম্ন দিকে যার মূল বিস্তারিত হচ্ছে, সেই কেশ দৃঢ় করার জন্য তোমাকে খনন করে সংগ্রহ করছি—

কেশেভ্যো দৃংহনায় খনামসি।

এই মন্ত্রের মধ্যেই পুরাতন কেশকে দৃঢ় করার জন্য, অনুৎপন্ন কেশ উৎপন্ন করার জন্য এবং উৎপন্ন কেশ বৃদ্ধি করার প্রার্থনা করার পরেই চুল পড়া এবং চুল ছিঁড়ে যাওয়ার মতো রোগ যাতে না হয় তার প্রতিষেধক নিয়ে চিন্তা করা হয়েছে। পরের সূক্তেই বিচিত্র একটা খবর দিয়ে বলা হচ্ছে—মহর্ষি জমদগ্নি নিজের মেয়ের চুল বাড়াবার জন্য যে ওষধি খনন করেছিলেন, বীতহব্য সেই ওষধি অসিত মুনির বাড়ির কাছ থেকে সেটা সংগ্রহ করেছিলেন। চুল বাড়ছে কিনা সেটা বোঝার জন্য দেখতে হবে যে, সেগুলি চার আঙুল থেকে ছয় আঙুল হয়েছে কিনা, অবশেষে সেগুলি দু-হাত পর্যন্ত লম্বা হয়েছে কিনা। বলা হয়েছে—হে পুরুষ! তোমার মাথার কালো চুল যেন নড়-তৃণের মতো বহুলভাবে বাড়ে—কেশমূল হবে দৃঢ়, অগ্রভাগ হবে দীর্ঘ-দীর্ঘতর এবং মধ্যভাগ স্থির—

অভীশূন্যা মেয়া আসন্ ব্যামেনানুমেয়াঃ।
কেশা নড়া ইব বর্ধন্তাং শীর্ষ্ণস্তে অসিতাঃ পরি॥
দৃংহ মূল্যমাগ্রং যচ্ছ বি মধ্যং যাময়ৌষধে।

এই সূক্তের অবশিষ্ট মন্ত্রগুলির মধ্যে শত্রুজাতীয় এক পুরুষকে নির্বীর্য্য করে তাকে নপুংসকে পরিণত করার জন্য মন্ত্র পড়া হচ্ছে এবং তার সমস্ত মাথার চুলগুলি মেয়েদের মাথায় নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে স্ত্রীলোকের বিচিত্র কেশবন্ধন-রীতির নামও দেওয়া হচ্ছে।

[অথর্ববেদ (Roth & Whitney), ৬.১৩৬.১-৩; ৬.১৩৭.১-৩; ১.১৩৮.১-৩; অথর্ববেদ (হরফ), পৃ. ১৯২-১৯৩]

□ চুলের বৃদ্ধি এবং চুল যাতে না পড়ে, তার জন্য চুলের যত্ন করার ভাবনা অথর্ববেদের পরম্পরায় নেমে এসেছে পুরাণে। যদিও প্রায় আয়ুর্বেদিক উপাদানে অগ্নি পুরাণ বলেছে—কেশর ফুলের নির্যাসের সঙ্গে বৃহতীর মূল গোপী, ষষ্ঠী (এক ধরনের ধান গাছ) তৃণ এবং উৎপলের নির্যাস ছাগলের দুধ এবং তেলের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে চুল বাড়ে। এমনকী চুল যদি পড়তে থাকে, ভালো চুলের জন্য যে তেলটা ব্যবহার করতে হবে, তা তৈরি করতে হবে ধাত্রী (আমলকী) ভৃঙ্গ, ষষ্ঠী এবং এক পল অঞ্জন দিয়ে এবং তার সঙ্গে থাকবে এক আঢ়ক পরিমাণ ঘন দুধ। তাতে চুল এবং চোখের পাতাগুলির বৃদ্ধি হয়, অদ্ভুত তাড়াতাড়ি—

কেশরং বৃহতীমূলং গোপীষষ্ঠী-তৃণোৎপলম্।
সাজক্ষীরং সতৈলং তদ্ভক্ষণং রোম-জন্মকৃৎ।।

শীর্য্যমানেষু কেশেষু স্থাপনং চ ভবেদিদম্।
ধাত্রীভৃঙ্গরসপ্রস্থং তৈলং চ ক্ষীরমাঢ়কম্॥
যষ্ঠ্যঞ্জনপলং তৈলং তৎ-কেশাক্ষিশিরোহিতম্॥

[অগ্নি পু. (Joshi), ৩০৩.২৫-২৭]

□ মাথাভর্তি চুল থাকাটা এতটাই কাম্য ব্যাপার, যে, ঋগ্‌বেদে এক মহিলা ঋষি অপালা—তিনি প্রথম জীবনে ত্বক্-সংক্রান্ত রোগে কষ্ট পেয়েছেন হয়তো, তারপর দেবতার সহায়তা চেয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে যা বলেছেন তাতে বোঝা যায় যে তাঁর পিতার মস্তক কেশশূন্য ছিল, হয়তো বা রোগজনিত কারণে তাঁর তলপেটের অধঃস্থান কেশশূন্য ছিল এবং তাঁদের নিজস্ব কৃষিক্ষেত্রগুলিও শস্যশূন্য ছিল। তিনি ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করেছেন—আমার পিতার মস্তক যেন কেশরাশিতে ভরে ওঠে, কৃষিক্ষেত্রে যেন শস্য উৎপন্ন হয় এবং আমার 'উপোদর'-স্থান যেন কেশশূন্য না থাকে—

ইমানি ত্রীনি বিষ্টপা তানীন্দ্র বি রোহয়।
শিরস্ততস্যোর্বরামাদিদং ম উপোদরে।।
অসৌ চ যা ন উর্বরাদিমাং তন্বং মম।
অথো ততস্য যচ্ছিরঃ সর্বা তা রোমশা কৃধি॥

[ঋগ্‌বেদ, ৮.৯১.৫-৬]

□ মানুষের মাথার চুল শক্তি এবং সৌন্দর্য্যের প্রতীক হিসেবে পরিচিত হয়েছিল অতি প্রাচীন কাল থেকেই। শতপথ ব্রাহ্মণের মত প্রাচীন গ্রন্থে রাজার অভিষেকের সূত্র ধরে বলা হয়েছে যে, রাজা অভিষিক্ত হওয়ার পর অন্তত এক বছর চুল কাটবেন না। কেননা তাঁর অভিষেক-আর্দ্র শিরে মন্ত্রপূত জল তাঁকে শক্তি এবং শ্রীযুক্ত করেছে। চুল কেটে ফেললে রাজা শ্রীহীন হয়ে পড়বেন, তিনি বীর্য্যহীন হয়ে পড়বেন—

কেশান্ন বপতে; তদ্ যৎ কেশান্ন বপতে
বীর্যং বা এতদ্ অপাং রসঃ সম্ভৃতো ভবতি।

জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ আরও জোর দিয়ে বলেছে যে, মানুষের মাথাই মানুষের সৌন্দর্য্য। অতএব রাজা যদি এক বছরের মধ্যে চুল কাটেন তাহলে আসলে তিনি শক্তি এবং সৌন্দর্য্যকেই কেটে ফেলেছেন—

শ্রীর্বৈ শিরঃ। স যৎ পুরা সংবৎসরাৎ কেশান্
বপেত, শ্রিয়মেব বপেত ন কেশান্।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber), ৫.৫.৩.১-২; জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ (Raghuvira) জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ (Raghuvira), ২.২০৪, পৃ.২৪৮]

□ প্রাচীন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিতে অনেক সময়েই কুশ এবং দূর্বার সঙ্গে কেশের তুলনা করা হয়েছে। কুশ এবং দূর্বা যেহেতু প্রচুর পরিমাণ জন্মায় তাই মনুষ্যদেহের সর্বাঙ্গীন কেশরাশি এবং লোমের সঙ্গে তার তুলনা হয়েছে। কুশ-জাতীয় যত শব্দ—বর্হি, দর্ভ, প্রস্তর এই সব শব্দ কেশের প্রতীকী বিস্তার হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। মুণ্ডকোপনিষদের একটি মন্ত্রে এই বিশ্বসৃষ্টির প্রক্রিয়া উল্লেখ করে বলা হয়েছে—মাকড়সা যেমন বাইরের কোনো সহায়তা ছাড়াই তার সূত্র বিস্তার করে এবং সেগুলিকে আত্মসাৎ করে, ঠিক যেমন পৃথিবীতে ওষধির বিস্তার ঘটে, ঠিক যেমন মানুষের কেশ-লোম জন্মায়, ঠিক সেইভাবেই এই অক্ষর পুরুষ থেকে বাহ্য-সহায়-নিরপেক্ষভাবেই এই বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি।

পণ্ডিতেরা বলেছেন—ওষধি, তৃণ-কুশ ইত্যাদির সঙ্গে একই পংক্তিতে ব্যবহৃত মনুষ্য-কেশ বস্তুত তাদের মধ্যে এক প্রাকৃতিক ঐক্য সূচনা করে।

[J.Gonda, The Ritual Functions and Significance of Grasses in the Religion of the Veda, pp. 83, 187, 199, 221; Alf Hiltebeital and Barbara D.Miller, Hair: Its power and Meaning in Asian Culture, p.29; মুণ্ডকোপনিষদ (দুর্গাচরণ) ১.৭]

□ কেশ-সম্ভার যেমন নর-নারীর শক্তি এবং সৌন্দর্য্যের পরিচয় বহন করেছে, তেমনই কেশ-লোম ইত্যাদি যেহেতু বাড়ে এবং এবং পড়েও যায়, তাই এগুলিকে কেটে পরিচ্ছন্ন রাখার শাস্ত্রীয় প্রথাও তৈরি হয়েছে, এমনকী মস্তক মুণ্ডন করার জন্য কেশ-রক্ষণের বিপরীত তর্কযুক্তিও তৈরি হয়েছে। বৈদিকদের মধ্যে আমরা এমনও দেখেছি যে, কেশের এক একটি নির্দিষ্ট পরিপাটিতে এক-একটি গোত্র-প্রবরভুক্ত ব্রাহ্মণদের চেনা যেত। যেমন বশিষ্ঠ ঋষির পুত্রেরা বা তাঁর অনুগামীরা সাদা পোশাক পরতেন এবং তাঁরা চুলগুলিকে একত্রে এনে মাথার দক্ষিণ দিকে চূড়া করে বেঁধে রাখতেন, একথা ঋগ্‌বেদেই আছে—তাঁদের দেখে বেশ ভালো লাগে—

শ্বিত্যঞ্চো মা দক্ষিণতস্কপর্দা/
ধিয়ং জিন্বাসো অভি হি প্রমন্দুঃ।

আবার শুক্লযর্জুবেদের সেই বিখ্যাত মন্ত্রগুচ্ছ —যেগুলির বিখ্যাত আরম্ভ-মন্ত্র হল—

নমঃ শম্ভবায় ময়োভবায় চ/

নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ।

—এই মন্ত্রের পরেই আসছে—

নমঃ কপর্দিনে চ পুলস্তয়ে চ।

—এখানে 'কপর্দ' মানেই গুচ্ছবাঁধা জটাজুট, কিন্তু সেটা মাথার ওপর সামনের দিকে চূড়া করে বাঁধা—কেননা এটা নাকি পুলস্তি 'স্টাইল'—পুলস্তি মানে সামনের দিকে। পণ্ডিতেরা এখানে কপর্দী মহাদেবের মাথার ওপর সামনে ঝুঁকে থাকা জটাবন্ধের কথা যেমন স্মরণ করেছেন, তেমনই বলেছেন এই সামনে-ঝুঁকে থাকা পুলস্তি 'স্টাইল' আসলে পুলস্ত্য-মুনির বংশধর বা তাঁর অনুগামীদের কেশ-সংস্কারের রীতি। তাঁরা বলেন—দক্ষিণ ভারতে আর্যেতর ভাবনায় ভাবিত পৌলস্ত্যরা, যাঁরা অনেকেই অগস্ত্য-ঋষির বংশধরদের কাছাকাছি মানুষ তাঁরাই এই সামনে ঝুঁকিয়ে চুল বাঁধতেন মাথার ওপর।

[ঋগ্বেদ, ৭.৩৩.১; ৭.৮৩.৮; শুক্লযর্জুবেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতা (Weber), ১৬.৪৩; S.C. Sircar, Some Aspects of The Earliest Social History of India, p.70]

□ বস্তুত কেশ সংগ্রথিত করে মাথার সামনের দিকে উচুঁ করে বেঁধে নেওয়ার 'কপর্দ' রীতি মহাদেবেরই আপন কেশগ্রন্থি বা তাঁর নিজস্ব 'স্টাইল'—ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে—এটা যেমন প্রাচীন বেদ-ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে প্রকট, তেমনই মহাভারতেও 'কর্পদ' যাঁর আছে, তিনি 'কপর্দী' মহাদেব, এমন সম্বোধন ভূরি-ভূরি। পরবর্তীকালে এই কেশগ্রন্থি যেমন বশিষ্ঠের অনুগামীরা গ্রহণ করেছেন তেমনই বেদেই দেখতে পাই—অল্পবয়সী যৌবনবতী এক রমণীর চেহারা হল—তাঁর মাথায় চার-চারটি বেণী চূড়ো করে বাঁধা অথবা খোপা করে বাঁধা, তাঁর শরীর ঘৃতের মতো স্নিগ্ধ, তিনি সুন্দর একখানা কাপড় পরে আছেন—

চতুষ্কপর্দা যুবতিঃ সু পেশা/

ঘৃত-প্রতীকা বয়ূনানি বস্তে।

আসলে 'কপর্দ' নামের কেশগ্রন্থি কোনো অবিন্যস্ত জটাজুট নয় সব সময়। পণ্ডিতেরা লিখছেন—

What the 'kaparda' of men was like, can be very well made out from the traditional representations of the 'kapardin' god and the hair-dressing of his followers : it was a spiral coil of the braided, plaited or matted hair, plied on the top of the head at different angles. It was apparently the same in the case of women, for the maidens four 'kaparda's are compared to the four corners of the alter, and so cannot mean 'braids' or 'plaits'

[ঋগ্বেদ, ১.১১৪.১; ১.১১৪.৫; ১০.১১৪.৩; S.C. Sircar, Ibid, p. 71]

□ মেয়েদের চুল নিয়ে কাব্য-সাহিত্য, রামায়ণ-মহাভারত থেকে অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। তবে তাঁদের কেশসজ্জার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন পরিভাষাগুলি, বেদের মধ্যেই পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে পরিচিত নামগুলি হল 'ওপশ', 'কুরীর', 'কুম্ব', 'স্টুকা', 'সীমন্', 'শিখণ্ড' ইত্যাদি।

ওপশ—এই ধরনের কেশবন্ধ ছেলে-মেয়ে দুই প্রকৃতির মধ্যেই চালু ছিল। এই রীতিতে চুলগুলি একত্র করে ওপর দিকে খুব শিথিল একটা খোঁপার মতো করা হলেও নীচের চুলগুলি এমনভাবেই কায়দা করে অবিন্যস্ত রাখা হত, যাতে মাথার ওপরটা শন-দিয়ে ছাওয়া বাড়ির চালের মতো মনে হয়। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের মাথার ওপর মেঘাবৃত অন্তরীক্ষ-লোকটাকেও এই ওপশ-নামক কেশবন্ধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

[ঋগ্বেদ ১.১৭৩.৬; ৮.১৪.৫; ৯.৭১.১]

আমরা কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়-সংহিতায় সিনীবালী দেবীর কেশচর্চার বিবরণ পেয়েছি—অনন্ত তিন রকম রীতিতে তিনি চুল বাঁধাতেন, তাঁর কপর্দ, কুরীর এবং ওপশ—তিনটিই আছে এবং প্রত্যেকটির আগে বিশেষণ আছে 'সু'—সিনীবালী সুকর্পদা সুকুরীরা স্বৌপশা—তাতে পণ্ডিতদের মন্তব্য হল—

Thus the 'opaśa's of Indra and Soma[1] are like the clouded or vaulted sky; the thatched net-covered roofing of a house (compared to a woman) is like 'opaśa'

spread over the 'viṣūvant'; and the knob-like horns of the year-old cow are 'opaśas.' These last similes show that the 'opaśa' was of the same style in the case of women also,—unless the qualification 'su' in Sinīvālī's description is taken to mean a heavier 'kaparda' and an ampler 'opaśa,' —and with the probable exception of the covering and withholding net; but 'hariḥ' 'opaśa' of Soma might refer to coloured covering-nets used by men as well. It seems that sometimes 'opaśa (by a common figure) meant this covering-net only, as in the case of the bride's hair being dressed into a 'kurīra' and 'opaśa,' where the two apparently form parts of one composite coiffure. The practical identity of the masculine and feminine 'opaśa's is also shown by the Av. (Atharvanic) Charm, which regards the unsexing of a rival as complete only when, after the 'opaśa,' the 'kurīra' and then the 'kumba' are, in addition placed on his head. These two therefore were the distinctively womanly styles: and they are, accordingly not ascribed to men in the texts.

[ঋগ্বেদ, ১.১৭৩.৬; ৮.১৪.৫; ৯.৭১.১; তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম), ৪.১.৫.৩; পৃ. ১৬৮৬; S.C. Sircar, Ibid, p. 72]

কুরীর—অথর্ববেদের যে মন্ত্রগুলি প্রথমেই আমরা উল্লেখ করেছিলাম, সেখানে ওপশ, কুরীর এবং কুম্ব—এই তিন ধরনের কেশবন্ধন রীতির উল্লেখ করা হয়েছে। কুরীর সম্ভবত মাথার দুই দিকে শিঙের মতো উঁচু করে বাঁধা কেশবন্ধ, যা মেয়েদের লম্বা বিনুনী গুটিয়ে নিয়ে মাথার ওপরে শৃঙ্গবৎ শোভা তৈরি করত। পণ্ডিতেরা উল্লেখ করেছেন—হিমালয়ের পার্বত্য উপজাতির মেয়েরা, যারা শতদ্রু এবং গঙ্গা নদীর অববাহিকায় বাস করে তারা এখনও এই কুরীর-রীতিতে চুল বাঁধে।

কুম্ব—কথাটা 'কুম্ভ' থেকেও আসতে পারে, 'কম্বু' থেকেও আসতে পারে। ঘট কিংবা কলসীর তলাটা যেমন গোলাকার হয়, কিংবা কম্বু বা শঙ্খের যেমন আকার হয়, সেই আকারে লম্বা চুল দিয়ে মাথার পিছনে যদি সুন্দর একটা খোঁপা তৈরি করা হয়, তবে সেটাই কুম্ব। পণ্ডিতেরা বলেই দিয়েছেন যে, 'কুম্ব'-কেশবন্ধের সঙ্গে খোঁপা-র কোনো পার্থক্যই নেই আর কেশবন্ধনের বিচিত্র বয়ন শিল্প সবচেয়ে সহজ এবং সুন্দরভাবে হয় খোঁপাতেই। অথর্ববেদের অভিচার-প্রক্রিয়ায় নপুংসকদের সমস্ত কেশগুচ্ছ মেয়েদের মাথায় নিয়ে আসার জন্য মন্ত্র পড়া হয়েছে—

কুরীরমস্য শীর্ষণি কুম্বং চাধিনিদধ্মসি।

আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে এই ইচ্ছেটা প্রকট হয়ে উঠেছে যখন যজ্ঞদীক্ষার সময় যজমানের স্ত্রীর মাথায় কুম্ব-কুরীরের কেশবন্ধন আকাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছে। টীকাকারেরা আপস্তম্বের মূল সূত্র ধরেই বলতে চান যে, কুম্ব-কুরীর বস্তুত একত্রীকৃত কেশজাল—

জালং কুম্ব-কুরীরমিত্যাচক্ষতে।

[অথর্ববেদ (Roth & Whitney), ৬.১৩৮.৩; অথর্ববেদ সংহিতা (Lanman) Vol.I, ৬.১৩৮.৩, পৃ. ৩৮৪; আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe), Vol.II ১০.৯.৫,৭]

স্তুকা বা স্টুকা—ইংরেজিতে বলা হয়েছে Lump. বাংলাতে এই 'স্টুকা'-শব্দটি থেকেই 'থোকা' কথাটা এসেছে বলে মনে করেন অনেকে। তাতে এটা যখন ইন্দ্রাণীর মতো শ্রেষ্ঠতমা স্বর্গসুন্দরীর চুলের প্রশংসায় বলা হয়—

কিং সুবাহো স্বঙ্গুরে পৃথুষ্টো পৃথুজাঘনে।

—তখন বোঝা যায় 'পৃথুষ্টো' কথাটির মধ্যে কেশ-বিন্যাসের চরম সত্যটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন সায়নাচার্যের মতো টীকাকারেরাই। তিনি বলেছেন—'পৃথুষ্টো' মানে 'পৃথুকেশসংঘাতে'। তার মানে পৃথুষ্টো কথাটা সম্বোধন-পদে ব্যবহৃত, যেখানে মূল শব্দটা অবশ্যই 'পৃথুষ্টু'। অন্যত্র বৈদিক মন্ত্রে পুরো শব্দটাই সিনীবালী দেবীর বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করে বলা হয়েছে—'সিনীবালি পৃথুষ্টুকে'। সায়ন এখানে শব্দার্থ সঠিক বোঝেননি বলেই 'পৃথুষ্টুকে' অর্থ বলেছেন 'পৃথুজঘনে'। অথচ তিনি খেয়াল করলেন না যে, তিনি যখন দশম মণ্ডলে 'পৃথুষ্টো' শব্দটার সঠিক অর্থ করছেন, তার পরেই কিন্তু 'পৃথুজাঘনে' শব্দটা পৃথক্‌ভাবেই ছিল।

অবশেষে জানাই পৃথুষ্টুকা মানে সত্যি থোকা করা বেণী-বাঁধানো চুল—one having broad braids, ঠিক বেদেই তার উল্টো হল—'বিষিত-স্তুকা'—অর্থাৎ আলুলায়িত চুল—having loosened braids.

[ঋগ্‌বেদ, ১০.৮৬.৮; ২.৩২.৬; ১.১৬৭.৫; Abinas chandra Das, Rgvedic Culture, p. 217-18]

সীমন্—মাঝখানে সিঁথি কেটে কেশগুচ্ছ দুই ভাগে ভাগ করে পিছনের দিকে ছড়িয়ে দেওয়াটাই সীমন্ বা সীমন্ত-রেখার তাৎপর্য্য। অথর্ববেদে এইভাবেই সীমন্ শব্দটা প্রয়োগ হয়েছে, যদিও পুরুষেরাও অনেকে এইভাবে চুল ভাগ করে বাঁধত, কিন্তু মন্ত্রের সর্বনাম পদটি স্ত্রীলিঙ্গে বহুবচনে ব্যবহৃত—

যাঃ সীমানং বিরুজন্তি মূর্ধানং প্রত্যর্ষণী।

—They that break apart the crown, rushers against the head—এটা Lanman-এর অনুবাদ। সীমন্ থেকে সীমন্ত, চুলের সিঁথি কথাটি যথেষ্ট চালু শব্দ। 'সীমন্তোন্নয়ন' ষোড়শ সংস্কারের একটি অঙ্গ।

[অথর্ববেদ (Roth & Whitney), ৯.৮.১৩; অথর্ববেদ (Lanman), ৯.৮.১৩, পৃ. ৫৫১]

শিখণ্ড—মাথার ওপরে এক গুচ্ছ পৃথক চুলের শোভা, যেটা অবহেলায় যেন ফেলে রাখা হত, ইংরেজিতে tuft অথবা lock। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতায় শিখণ্ডের প্রতিও মঙ্গলকামনা করা হয়েছে—স্বাহা শিখণ্ডেভ্যঃ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে একটি যজ্ঞবেদির সঙ্গে যুবতী-শরীরের তুলনা করে বলা হয়েছে—

চতুঃশিখণ্ডা যুবতিঃ সুপেশা।

—এখানে সায়ন টীকা করে বলেছেন—যেমন বালিকাবয়সী যুবতিদের মাথার ওপর চারটি উঁচু করে বাঁধা কেশগুচ্ছ থাকে—

বালানাং মূর্ধগতঃ শিখণ্ডাশ্চত্বারঃ।

তবে কাব্য-সাহিত্যে কিন্তু শিখণ্ড বলতে বোঝানো হয়েছে—a lock of hair left on the crown or sides of the head at tonsure. কিন্তু শিখণ্ডের আদ্য অর্থ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেই ঠিক আছে।

[কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা, (আনন্দাশ্রম) ৭.৩.১৬.২; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম), ১.২.১.২৭]

শিখা—শিখা বলতে সাধারণত কেশপাশ বোঝায়—যেমনটা অমরকোষে—'শিখা চূড়া কেশপাশী'। আবার একেবারেই লৌকিক সামাজিক আচারে 'শিখা' বলতে ব্রাহ্মণের 'টিকি' বোঝায়। বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটকে কৌটিল্য ক্রুদ্ধ হয়ে বলছে—যে শিখা একবার বেঁধে ফেলেছি, সেই শিখা আবারও মুক্ত করার ইচ্ছে হচ্ছে আমার—

শিখাং মোক্তুং বদ্ধামপি পুনরয়ং ধাবতি করঃ।

প্রধানত এই শিখা-বন্ধনের ব্যাপারটা এক সময় ব্রাহ্মণ্যের একটা অঙ্গ হয়ে উঠলেও পূর্বকালে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কেশপাশ বা কেশগুচ্ছই শিখা-শব্দের অর্থ ছিল। ভাগবত পুরাণে কর্দম ঋষির কাছে নিজ কন্যা দেবহূতিকে রেখে যাবার সময় বিবাহিতা কন্যার কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে এই বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা হৃদয়ে নিয়ে পিতা মনু—আহা মা আমার! মেয়ে আমার—বলে এত কেঁদেছিলেন যে, তাতে মেয়ে দেবহূতির মাথার কেশপাশ (শিখা) ভিজে গিয়েছিল—

অশক্নুবংস্তদ্‌বিরহং মুঞ্চন্ বাষ্পকলাং মুহুঃ।
আসিঞ্চদম্ব বৎসেতি নেত্রোদৈঃ দুহিতুঃ শিখা॥

[মুদ্রারাক্ষস (Telang), ৩.২৯; ভাগবত পু. ৩.২২.২৫; আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন), ১.৭.১৬.১৭]

শিখা বলতে একটা সময়ে মাথার ওপর একগুচ্ছ চুলের ঝুঁটিই বুঝিয়েছে, তা খুব পরিষ্কার বোঝা যায় শতপথ ব্রাহ্মণের একটি বিশেষ নির্দেশ থেকে। সাধারণ পুজোর আগে যেমন পূজার উপকরণ আসন-পুষ্প-ইত্যাদির ওপর জল ছিটিয়ে শুদ্ধ-সংস্কৃত করতে হয়, তেমনই অতিপ্রাচীন যজ্ঞারম্ভের কালে যজ্ঞবেদি থেকে আরম্ভ করে কুশগাছির ওপর জল ছিটিয়ে মন্ত্র পড়ে প্রোক্ষণ করতে হত। এই প্রক্রিয়ায় ছড়িয়ে থাকা কুশগুলির (এখানে এর নাম প্রস্তর) জল ছেটানোর সময় নিয়ম হল—ঋত্বিক্ তাঁর মাথার ওপরের ঝুঁটি-বাঁধা একগুচ্ছ কেশ-গ্রন্থির বন্ধন পুবদিকে ঝুলিয়ে রেখে তারপর সেই কেশগ্রন্থির সঙ্গে কুশ-দর্ভের প্রচ্ছন্ন তুলনায় বর্হি-কুশের উদ্দেশে প্রোক্ষণ-মন্ত্র পড়বেন। তারপর কেশবন্ধনের গ্রন্থিটি খুলে নিয়ে তিনি প্রস্তরগুলির (দর্ভ-কুশের অন্য নাম) উদ্দেশে স্বয়ং বিষ্ণুর কেশরাশির উপমায় মন্ত্র বলবেন—বিষ্ণুই স্বয়ং

যজ্ঞ এই প্রস্তরগুলি (কুশগুলি) সেই যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর কেশস্বরূপ তাঁর শিখা—

যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু-স্তস্যেয়মেব শিখা-স্তূপঃ।

শতপথ ব্রাহ্মণের সূত্র মেনে এ-কথা বলা যাবে না যে, মাথার ওপর পুরো কেশগুচ্ছই টেনে তুলে গ্রন্থিবন্ধন করতেন ঋত্বিক্। কেননা সেকালে ব্রাহ্মণদের যে সমস্ত গার্হস্থ্য-সংস্কার ছিল, সেখানে পাঁচ-সাত বছরের মধ্যেই বালকের চূড়াকরণ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করতে হত। এই অনুষ্ঠানে মাথার পুরো চুল কামিয়ে ফেলে দিতে হত, কিন্তু মাথার ওপরে একগুচ্ছ লম্বা চুল রেখে দেওয়া হত এবং তারই নাম শিখা। দক্ষিণ ভারতের স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের রীতিতে এই চূড়াকরণ অনুষ্ঠান বা চৌলকর্মের আগেই আচার্যরা বালকের উপরি মস্তকের ঘূর্ণমান কেশস্থানের এক গুচ্ছ চুল আগেই নির্ণয় করে পৃথকভাবে আটকে রাখেন, অবশিষ্ট মাথার চুল ফেলে দেওয়া হয়।

সুশ্রুত তাঁর চিকিৎসা এবং শরীর-স্থানে লিখেছেন যে, মস্তকোপরি ওই চুলের ঘূর্ণির জায়গাটাকে বলে 'অধিপতি' সেখানে অনেকগুলি শিরাসন্ধির অবস্থান, সেই রোমাবর্তের 'অধিপতি' স্থানটিকে সযত্নে রক্ষা করতে হয়—

মস্তকাভ্যন্তরোপরিষ্টাৎ শিরাসন্ধি-সন্নিপাতো
রোমাবর্তো'ধিপতিঃ।

পণ্ডিতেরা বলেন—এই 'অধিপতি'-স্থানটিকে সুরক্ষা দেবার জন্যই শিখার ব্যবস্থা। অন্যদিকে শাস্ত্রের নিয়মে উপনয়নের সময় চারপাশের সমস্ত চুল ফেলে দিয়ে শিখা রাখতে হত ধর্মসূত্রের নিয়মে। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে—হয় তুমি সমস্ত কেশগুচ্ছকেই জটা তৈরি করে 'জটিল' হয়ে যাও নয়তো মাথার ওপরে শিখাটাকেই জটার মতো বানাও অন্য সব চুল নাপিত দিয়ে কামিয়ে ফেলে দাও—

শিখাজটো বা, বাপয়েদিতরান্।

এখানে হরদত্ত মিশ্রের উজ্জ্বলা টীকায় লেখা হয়েছে—

শিখমেব জটা কৃত্বা ইতরান্
কেশান্ বাপয়েৎ নাপিতেন।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber), ১.৩.৩.৫, পৃ. ২৮; সুশ্রুত সংহিতা, শরীরস্থান, ৬.২৭; চিকিৎসা-স্থান, ২৪.৭৩; আপস্তম্ব ধর্মসূত্র (চিন্নস্বামী শাস্ত্রী), ১.২.৩১-৩২]

ক্রোধ এবং ক্ষোভে আতুর হলে মুক্তজাল কেশ যেমন ক্রোধ-ক্ষোভের ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠত তেমনই শোকের অবস্থায় শিখা-বন্ধন মুক্ত করার কথাও আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে আছে। তবে শুধু শিখা নয়, শোকাবস্থায় চুল খুলে রাখাটা নারী-পুরুষ সকলেরই সামাজিক প্রকৃতির মধ্যে ছিল। ক্রোধের বশে আমরা দ্রৌপদীকে মুক্তকেশী হয়ে বনবাসে যেতে দেখেছি এবং তিনি সক্রোধে এই বাক্য বলেছিলেন যে, কৌরবঘরের বউরা সব মৃতস্বামীদের আলিঙ্গন করে তাঁদের রক্তে রাঙা করবেন শরীর, এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ধুলায় ধূসর হয়ে তাঁদের শ্রাদ্ধ করবেন মুক্তকেশী হয়ে। এখানে ক্রোধে এবং শোকে মুক্তকেশী দুই উদাহরণই আছে।

কোনো রমণী স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্না, বিরহিণী হলে প্রতীকীভাবেই তিনি একটিমাত্র বেণী বেঁধে বিরহাবস্থার জানান দিতেন। রামায়ণের সীতাকে এমনই একবেণীধরা অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন হনুমান—

একয়া দীর্ঘয়া বেণ্যা শোভমানামযত্নতঃ।

পুনরায় অশোকবনে রাবণের তাড়নায় যখন আহত দেখা যাচ্ছে সীতাকে, তখন তিনি রাবণের ভয়ে কাঁপছিলেন, তখন, তার লম্বিত একবেণীটি সাপের মতো কম্পিত হচ্ছিল—

দদৃশে কম্পিতা বেণী ব্যালীব পরিসর্পতী।

[আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন), ৪.২.৯; মহা (k) ২.৮০.১৯.২১; (হরি) ২.৭৭.১৯.২১; রামায়ণ, ৫.১৯.১৯; ৫.২৫.৯]

সাধারণ ভাবনায় মাথায় অনেক চুল থাকাটা নারী-পুরুষ সকলের পক্ষেই আনন্দের কারণ ছিল এবং সম্মানেরও ছিল। উলটো দিক থেকে সেই কেশগুচ্ছের মধ্যে খানিক কেটে, খানিক রেখে নানা বিকারের সৃষ্টি করাটা চরম অপমানের মধ্যে গণ্য হত। এ-বিষয়ে কৌরবদের একশ ভাইয়ের এক বোন দুঃশলার স্বামী পাণ্ডবদের বনবাস কালে দ্রৌপদীকে বিবাহ করার ইচ্ছায় জোর করে হরণ করার চেষ্টা করেছিলেন বলে তাঁকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, সেই শাস্তির প্রকারের মধ্যে প্রাণে মারার বিকল্প হিসেবে মধ্যম পাণ্ডব ভীম জয়দ্রথের কেশরাশির পাঁচ জায়গায় অর্ধচন্দ্র বাণের ধারালো অংশ দিয়ে তাঁর চুল চেঁছে

ফেলে দিয়েছিলেন, আর অবশিষ্ট চুলগুলি পাকিয়ে পাকিয়ে পাঁচ জায়গায় জটা তৈরি করে দিয়েছিলেন। ভীম বলেছিলেন—আমার কাছ থেকে এই দুরাত্মা জয়দ্রথ বেঁচে ফিরবে না—

নায়ং পাপ-সমাচারো মত্তো জীবিতুমর্হতি।

কিন্তু যুধিষ্ঠিরের কথায় অর্জুন দুঃশলা-ভগিনীর স্বামীকে জীবন দান করতে বলায় এখানে মরণের বিকল্প হিসেবে আংশিক এবং বিকৃত কেশ-মুণ্ডণ এবং বিকৃত-ভাবে কেশগুচ্ছের আংশিক রক্ষণ করে সম্পূর্ণ কেশগুচ্ছকে বিকৃত করে ফেলাটাই মরণের একটা প্রকার হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে—

এবমুক্তঃ সটাস্তত্র পঞ্চ চক্রে বৃকোদরঃ।
অর্ধচন্দ্রেণ বাণেন কিঞ্চিদব্রুবতস্তদা॥

স্বয়ং দ্রৌপদীও—যিনি জয়দ্রথকে মেরে ফেলতেই বলেছিলেন—

বধ্যঃ স পুরুষাধমঃ।

—সেই দ্রৌপদীও কিন্তু জয়দ্রথের কেশ-বিকার দেখে বলেছিলেন—দাসত্ব-ভাব-প্রাপ্ত এই জয়দ্রথের মাথার চুল চেঁছে দিয়ে তুমি পাঁচটা জটা তৈরি করে দিয়েছো যখন, তখন এবার ওকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে—

দাসো'য়ং মুচ্যতাং রাজ্ঞস্ত্বয়া পঞ্চসটঃ কৃতঃ।

পুরুষের কেশকর্তন করার মধ্যে আমরা যে অপমানের প্রকার দেখলাম, সেটাই বিপ্রতীপ যুক্তিতে পুরুষের কেশরাশির মর্য্যাদা প্রতিপন্ন করে। একই কথা স্ত্রীলোকের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। বহু উদারণের মধ্যে না গিয়ে একমাত্র দ্রৌপদীর দৃষ্টান্তই এখানে মোক্ষম হতে পারে। মহাভারতের সভাপর্বে পাশাখেলায় জেতার পর কর্ণ-দুর্যোধনের প্ররোচনায় দুঃশাসন দ্রৌপদীকে যখন জোর করে সভায় নিয়ে যাচ্ছেন, তখন মহাভারতের কবি দ্রৌপদী অসমান্য কেশরাশির সৌন্দর্য্য-বর্ণনা করে প্রথমে বলেছেন—সেই কেশে আকর্ষণ করলেন, দুঃশাসন, যে কেশ অতিদীর্ঘ এবং ঘন কৃষ্ণবর্ণ, সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গের মতো যে কেশ সর্বত্র কুঞ্চিত, সেই কেশে ধরে আকর্ষণ করলেন দুঃশাসন। দ্বিতীয়ত কেশের মর্য্যাদা সূচনা করে কবি বললেন—দ্রৌপদীর সেই কেশ আকর্ষণ করলেন দুঃশাসন, যে কেশ রাজসূয় যজ্ঞের মন্ত্রপূত জলে আর্দ্র হয়েছিল এক সময়—

দীর্ঘেষু নীলেষ্বথ চোর্মিমৎসু/
জগ্রাহ কেশেষু নরেন্দ্রপত্নীম্॥
যে রাজসূয়াবভৃতে জলেন/
মহাক্রতৌ মন্ত্রপূতেন সিক্তাঃ।
তে পাণ্ডবাণাং পরিভূয় বীর্য্যং/
বলাৎ প্রমৃষ্টা ধৃতরাষ্ট্রজেন॥

দুঃশাসন-কর্তৃক দ্রৌপদীর এই কেশাকর্ষণের কথা মহাভারতে বারবার উল্লিখিত হয়েছে প্রায় ধর্ষণের অভিব্যক্তিতে এবং স্ত্রীলোকের চরম অবমাননার যৌক্তিকতায়। অবশেষে উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণ যখন শান্তির বার্তা নিয়ে কৌরবসভায় যাবেন, তার আগে পাণ্ডবরা অনেক ক্রোধ প্রদর্শন করেও অবশেষে অনর্থক রক্তপাতের বিরুদ্ধে সন্ধিকামনা করেছেন। এইখানে দ্রৌপদী সমস্ত সন্ধিকামনার শর্ত উড়িয়ে দিয়ে দিয়ে যুদ্ধই চেয়েছেন এবং তা চেয়েছেন তাঁর চরম অবমাননার প্রতিফল হিসেবে। এখানে অবমাননাটা কী—সেটা বোঝানোর জন্য দ্রৌপদী চরম ক্রোধে তাঁর কুঞ্চিত, আলুলায়িত, কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ বাঁ হাতে তুলে নিয়ে দেখালেন কৃষ্ণকে—সেই কেশ সুন্দর গন্ধে বাসিত হয়েছে তখন এবং তা সমস্ত সুলক্ষণ-সম্পন্ন। দ্রৌপদীর হস্তধৃত সেই কেশরাশি দেখতে ছিল ঠিক কুণ্ডলী-পাকানো সাপের মতো। সেই কেশগুচ্ছ হাতে নিয়ে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে বললেন—এই সেই কেশ যেটাকে কৌরব দুঃশাসন হাত দিয়ে ধরেছিল। তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে হলে আমার এই কেশগুচ্ছের কথা মনে থাকে যেন। দ্রৌপদী বলেছেন—কেউ যদি কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে না চায়, তবে অভিমন্যুকে সামনে রেখে আমার ছেলেরা যুদ্ধ করবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না দুঃশাসনের ওই হাত-দুটি কেটে ধুলোর মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ আমার মনে কোনো শান্তি নেই—কেননা ওই হাত দুটিই আমার কেশাকর্ষণ করেছিল—

ইত্যুক্ত্বা মৃদুসংহারং বৃজিনাগ্রং সুদর্শনম্।
সুনীলমসিতাপাঙ্গী সর্ব্বগন্ধাধিবাসিতম্॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং মহাভুজগবর্চ্চসম্।
কেশপক্ষং বরারোহা গৃহ্য বামেন পাণিনা॥
অয়ন্তু পুণ্ডরীকাক্ষ দুঃশাসনকরোদ্ধৃতঃ।
স্মর্ত্তব্যঃ সর্ব্বকার্য্যেষু পরেষাং সন্ধিমিচ্ছতা॥

পঞ্চ চৈব মহাবীর্য্যাঃ পুত্রা মে মধুসূদন।।
অভিমন্যুং পুরস্কৃত্য যোৎস্যন্তে কুরুভিঃ সহ॥
দুঃশাসনভুজং শ্যামং সংছিন্নং পাংশুগুণ্ঠিতম্।
যদ্যহন্তু ন পশ্যামি কা শান্তির্হৃদয়স্য মে॥

[মহা (k) ২.৬৭.২৯-৩০; ৫.৮২.৩৩-৩৯;
(হরি) ২.৬৪.২৯-৩০; ৫.৭৬.৩৩-৩৯]

চুল থাকাটা সুলক্ষণ এবং না থাকাটা যে দুর্লক্ষণ—এই সাধারণ ধারণার মধ্যে চুল কেটে শাস্তি দেবার ব্যাপারটা অন্যের পক্ষে অপমানজনক—এটা কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব কালেই সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং তা মেগাস্থানিসের বিবরণ থেকেই টের পাওয়া যায়। মেগাস্থানিসের বিবরণটা এইরকম—If one is guilty of hefious offence, the king orders his hair to be cropped, this being the punishment to the last degree infamous.

[Fragment XXVII D. Trans. in Maccrindle, Ancient India as Described by Megasthanes and Arrian, pp. 73-74]

□ কেশপাশ কিংবা অনেক চুল থাকা বা রাখা ব্যাপারটা যেহেতু নারী-পুরুষের সৌন্দর্য্য এবং বিলাসের মাত্রা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হয়তো সেই কারণেই একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ্যের অঙ্গ হিসেবেই চৌল-কর্ম কিংবা অধিকাংশ কেশ বিসর্জনের রীতি তৈরি হয়েছিল, তেমনই বানপ্রস্থী, ত্যাগী, ঋষি-মুনি এবং আরও অনেকেই বহুল এবং অবিন্যস্ত চুলে স্বেচ্ছায় জটাভার তৈরি করতেন এমন উদাহরণ অজস্র আছে। সবচেয়ে বড়ো উদাহরণটি আছে রামায়ণে। বনবাসের উদ্দেশে রামচন্দ্র তখন নিষাদ-বন্ধু গুহের অরণ্য-আবাসে পৌঁছেছেন। কিন্তু অরণ্য-আবাস হলেও লোক-জন সেখানে অনেক—রামায়ণের ভাষায় 'সজনে বনে'। অন্যত্র যাবার আগে রামচন্দ্র এবার বন্ধু গুহকে বট-গাছের আঠা নিয়ে আসতে বললেন। গুহ সেই বট-ক্ষীর নিয়ে আসতেই রামচন্দ্র সেটা নিজের এবং লক্ষ্মণের চুলে মাখিয়ে প্রথমত এক কৃত্রিম জটাভার তৈরি করে নিলেন। তাতে তাঁদের দেখতে লাগছিল মুনি-ঋষিদের মতো যাঁদের চুলে অযত্ন-হেতু জটাভার তৈরি হত—

নেদানীং গুহ যোগ্যো'য়ং বাসো মে সজনে বনে।
জটাঃ কৃত্বা গমিষ্যামি ন্যগ্রোধ-ক্ষীরমানয়।
তৎক্ষীরং রাজপুত্রায় গুহঃ ক্ষিপ্রমুপাহরৎ।।
লক্ষ্মণস্যাত্মনশ্চৈব রামস্তেনাকরোজ্জটাঃ।

[রামায়ণ, ২.৫২.৬৬-৭০]

□ বিলাস-সৌন্দর্য্য এবং দম্ভ ত্যাগ করার জন্য জটাধারণ যেমন একটা প্রকার, তেমনই মস্তক-মুণ্ডনও একটা প্রকার। বনবাস-ব্রত শেষ হবার পর রামচন্দ্র যখন ভরতের ইচ্ছায় সিংহাসন-গ্রহণে প্রস্তুত হলেন, তখন প্রথমে যাঁরা রামচন্দ্রকে ঘিরে দাঁড়ালেন, তাঁরা হলেন ক্ষৌরকর্মে নিপুণ নাপিতেরা। নাপিতের নাম এখানে 'শ্মশ্রুবর্ধন' অর্থাৎ তাঁরা অদ্ভুত সুন্দর গোঁফ তৈরি করতে পারেন, গোঁফ বাড়িয়ে নিয়ে তাকে সুন্দর করে বাগিয়ে রাখতে পারেন যে নাপিতেরা, তাঁরা স্বভাবতই ভীষণ নিপুণ, তাঁরা অযথা খোচা মেরে লাগিয়ে দেন না, তাঁরা শীঘ্রহস্ত এবং নিপুণ—

সুখহস্তাশ্চ শীঘ্রশ্চ . . .নিপুণাঃ শ্মশ্রুবর্ধনাঃ।

তাঁরাই রাম-লক্ষ্মণের জটাভার মুক্ত করলেন—

বিশোধিতজটঃ স্নাতঃ।

[রামায়ণ, ৬.১৩০.১২-১৫]

□ একটি নির্দিষ্ট ব্রতধারণের পর মস্তক-মুণ্ডন করাটাও একটা ব্রতের শেষ কর্ম হিসেবে গণ্য হত। রাম-লক্ষ্মণের জটা-মুণ্ডন একটা অন্যতর ঘটনা, কিন্তু ব্রতের ভাবনায় নিজের শরীরের প্রিয় এবং সুন্দর বস্তু হিসেবে কেশ-মুণ্ডন করাটা একটা সামাজিক প্রথার মতো ছিল। এই দৃষ্টি থেকেই বিভিন্ন তীর্থে গিয়ে মস্তক মুণ্ডন করার রীতি তৈরি হয়েছিল। এমন একটা শাস্ত্রীয় ধারণাও ব্রাহ্মণরা তৈরি করতে পেরেছিলেন যে, মানুষ তাঁর জীবন-জীবিকা চালানোর জন্য যেসব পাপ করে, তা সবটাই জমা হয় মানুষের মাথার জমাট চুলের মধ্যে—

যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে পাপং মনুষ্যো বৃত্তিকর্শিতঃ।
তদেতৎ পর্বতসুতে সর্বং কেশেষু তিষ্ঠতি॥

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র মাহাত্ম্য), ২৯.৪-৫]

□ হয়তো এইরকম একটা ভাবনা থেকেই প্রয়াগ, প্রভাস, কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি বিখ্যাত তীর্থগুলিতে মস্তক-মুণ্ডনের বিধি নিরূপণ করেছে পুরাণগুলি। কোথায় কোথায় মস্তক মুণ্ডন করতে হবে, সেই তালিকা শুধু দীর্ঘ-দীর্ঘতর হতে পারে। স্কন্দ পুরাণে এক কুলিক-গোত্রের ব্রাহ্মণ ভগবান শিবকে সর্বদা নর্মদাতীরে অবস্থান করার প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলেন—তোমার এই মন্দিরের

সামনে যারা মস্তক-মুণ্ডন করবে, তাদের তুমি অভীষ্ট পূরণের বর দেবে—এটাই তোমার কাছে বর চাইছি আমি।

[স্কন্দ পু. (গুরুমণ্ডল), ৫.৩.৩৪.১৬; ৩.১.১.৫০-৫১; ২.৮.৮.১০৪-১০৫; ব্রহ্মবৈবর্ত পু. (পঞ্চানন তর্কতীর্থ), কৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৭৬.২৯]

কেশযন্ত্রী স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.১৭; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ১৭ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

কেশরদ্রোণীপর্বত একটি পৌরাণিক পর্বত বলে বায়ুপুরাণে কথিত হয়েছে। বায়ুপুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, কুমুদ ও অঞ্জন পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে কেশরদ্রোণীপর্বতটি অবস্থিত। *[বায়ু পু. ৩৮.৪৫]*

কেশরপর্বত একটি পৌরাণিক পর্বত বলে ভাগবত পুরাণে কথিত হয়েছে। *[ভাগবত পু. ৫.১৭.৬]*

কেশরী১ বানররাজ কেশরীর প্রধান পরিচয়, তিনি বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের পিতা। মহাকাব্যে মূলত এই পরিচয়েই বহুবার তাঁর নাম উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

গদ্‌গদ নামে এক বানররাজ ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর গর্ভে বৃহস্পতির ঔরসে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। গদ্‌গদের সেই ক্ষেত্রজ পুত্রই হলেন কেশরী—

গদ্‌গদস্যাথ পুত্রো'ন্যঃ গুরুপুত্রঃ শতক্রতোঃ।

এখানে দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র হিসেবে কেশরীর নাম খুব স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়নি। তবে রামায়ণের প্রত্যেকটি প্রাচীন টীকায় বলা হয়েছে যে, গদ্‌গদের এই অন্য পুত্রটির নাম কেশরী—

গদ্‌গদস্য অন্যো দ্বিতীয়ঃ পুত্রঃ কেশরী ইত্যর্থঃ।

[রামায়ণ (মুধোলকর) ৬.৩০.২১; দ্র. তিলক, ভূষণ এবং শিরোমণি টীকা। পৃ. ২২০১]

□ পুঞ্জিকস্থলা নামে এক অপ্সরা শাপগ্রস্ত হয়ে বানররাজ কুঞ্জরের কন্যা অঞ্জনা রূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন। অঞ্জনার সঙ্গেই কেশরীর বিবাহ হয়। পবনদেবের ঔরসজাত এবং কেশরীর ক্ষেত্রজ পুত্র হনুমান।

[রামায়ণ ৪.৬৬.৮-৯; ৪.৬৬.২৮; ৭.৪৪.২০; মহা (k) ৩.১৪৭.২৭; (হরি) ৩.১২২.২৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২২৩]

□ ব্রহ্মপুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, কেশরীর দুই পত্নী অঞ্জনা ও অদ্রিকা অপ্সরা ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের অভিশাপে অঞ্জনার দেহ বানরীর মতো ও অদ্রিকার দেহ মার্জারীর মতো হয়ে যায়। তাঁরা মর্ত্যে অঞ্জন পর্বতে কেশরীর সঙ্গেই বাস করতেন। একদিন অগস্ত্য মুনি অঞ্জন পর্বতে উপস্থিত হলে কেশরীর দুই পত্নী অতিথি সৎকার করেন। তাঁদের সেবায় তুষ্ট হয়ে অগস্ত্য, অঞ্জনা এবং অদ্রিকাকে পুত্র লাভের বর প্রদান করেন।

একদিন অঞ্জন পর্বতে বায়ু ও নির্ঋতি অঞ্জনা ও অদ্রিকাকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে প্রার্থনা করলেন। এরপর বায়ুর ঔরসে অঞ্জনার গর্ভে হনুমান ও নির্ঋতির ঔরসে অদ্রিকার গর্ভে অদ্রি নামে এক পিশাচ জন্মগ্রহণ করেন।

বায়ু ও নির্ঋতি, অঞ্জনা ও অদ্রিকাকে গৌতমী তীরে গিয়ে স্নান ও দান করে শাপমুক্ত হওয়ার নির্দেশ দেন। *[ব্রহ্ম পু. ৮৪ অধ্যায়]*

□ লঙ্কাযুদ্ধের পূর্বে রাবণের মন্ত্রী সারণ যখন রাবণের কাছে রামচন্দ্রের পক্ষে যোগদানকারী বানর বীরদের পরিচয় দিচ্ছিলেন, তখন কেশরীর বসতিস্থল হিসেবে কাঞ্চনপর্বতের উল্লেখ করেন। কাঞ্চন-পর্বত মৃগপক্ষীসমন্বিত এক সুরম্য পর্বত। এখানে প্রচুর মধু পাওয়া যায়। বানর যূথপতি কেশরী এখানেই থাকতেন।

[রামায়ণ ৬.২৭.৩৪-৩৮]

□ রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে হনুমানের জন্মকালের বিবরণ দেবার সময় অবশ্য কেশরী বানরকে সুবর্ণ মণ্ডিত সুমেরু পর্বতে রাজত্বকারী এক রাজা হিসাবে কীর্তন করা হয়েছে—

যত্র রাজ্যং প্রশস্ত্যস্য কেশরী নাম বৈ পিতা॥

[রামায়ণ ৭.৪৪.১৯]

□ হনুমান কেশরীর ঔরসজাত পুত্র নন। তিনি কেশরীর স্ত্রী অঞ্জনার গর্ভে ভগবান পবনদেবের অংশে জাত ক্ষেত্রজ পুত্র। মহাভারতের বনপর্বে এই পরিচয় আরও স্পষ্ট হনুমানের জবানীতেই—

অহং কেশরিণঃ ক্ষেত্রে বায়ুনা জগদায়ুনা।
জাতঃ কমলপত্রাক্ষ হনূমান্নাম বানরঃ॥

[মহা (k) ৩.১৪৭.২৭; (হরি) ৩.১২২.২৭]

□ হনুমানের পিতা হিসেবে বানর যূথপতি কেশরী এবং বায়ুদেবকে সমান মর্যাদায় উপন্যস্ত করে বানরেরা হনুমানের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য বলেছিলেন—তুমি বানররাজ কেশরীর ক্ষেত্রজ

পুত্র, মহাবিক্রমশালী। আবার তুমি ভগবান মারুতের (বায়ুর) ঔরস পুত্র, তাঁর সমান তুমি তেজস্বী—

স ত্বং কেশরিণঃ পুত্রঃ ক্ষেত্রজো ভীমবিক্রমঃ।
মারুতস্যৌরসঃ পুত্রস্তেজসা চাপি তৎসমঃ॥

মহাভারতে অর্জুনের কপিধ্বজ রথ হনুমানের চিহ্নে চিহ্নিত। এই কপিধ্বজকে একটি বিশেষ কারণে ধিক্কার দেবার সময় সমর্যাদায় বলা হচ্ছে—কেশরীর ছেলের চিহ্নে চিহ্নিত যে-রথ সেটাকে ধিক্কার দিচ্ছি—

ধিক্ তে কেতুং কেশরিণঃ সুতস্য।

[রামায়ণ ৪.৬৬.২৯-৩০; মহা (k) ৮.৬৮.৩০; (হরি) ৮.৫০.১১৯]

□ কেশরী নিজে খুব সাধারণ বীর ছিলেন না। হনুমান সীতার অন্বেষণে লঙ্কায় এসে সীতার সাক্ষাৎ পাবার পর আপন পরিচয় দেবার সময় পিতা কেশরীর বলমাহাত্ম্য কীর্তন করে বলেছেন—সমস্ত পর্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাল্যবান নামে একটি পর্বত আছে। কেশরী নামে এক বানর একসময় মাল্যবান থেকে গোকর্ণ পর্বতে যাচ্ছিলেন। যাবার সময় নদীতীর্থে (সম্ভবত তুঙ্গভদ্রার তীরে কোথাও) আমার পিতা দেবর্ষিদের অনুমতি নিয়ে শম্বসাদন নামে একটি অসুরকে মেরে ফেলেন। হনুমান বলছেন—সেই কেশরী আমার পিতা, আমি তাঁরই ক্ষেত্রজ পুত্র। লঙ্কাযুদ্ধের সময় রামচন্দ্র যখন দক্ষিণদিকে সসৈন্যে যাত্রা করেছিলেন, তখন কেশরী বানর গজ, পনস ও অর্ক—এই তিন সহচরের সঙ্গে মিলিতভাবে সেনাবাহিনীর একটি দিক রক্ষা করে ছিলেন। *[রামায়ণ ৫.৩৫.৮০-৮২; ৬.৪.২৩, ৩৩]*

□ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধে হনুমান, সুগ্রীব প্রভৃতি অনেক যূথপতি বানরের সঙ্গে কেশরীও আহত হন এক সময়।

[রামায়ণ ৬.৭৩.৫৮-৫৯]

□ অযোধ্যায় রামচন্দ্র রাজা হবার পর হনুমান, সুগ্রীব ইত্যাদি বানরের সঙ্গে কেশরীকেও সম্মানিত করেন। *[রামায়ণ ৭.৪৯.২০]*

কেশরী₂ শাকদ্বীপে অবস্থিত সাতটি পর্বতের মধ্যে কেশরী একটি পর্বত। মহাভারতে এই কেশরী পর্বতকে 'কেশর' বলা হয়েছে। এখানে কেশর-পুষ্পগন্ধী বায়ু প্রবাহিত হয়। *[বায়ু পু. ৪৯.৮৪; মহা (k) ৬.১১.২৩; (হরি) ৬.১১.২২]*

কেশিনী₁ প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা প্রাধার গর্ভে যেসব অপ্সরা জন্মগ্রহণ করেন কেশিনী তাদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.৬৫.৫০; (হরি) ১.৬০.৫১]

কেশিনী₂ কশ্যপ প্রজাপতি ঔরসে খশার গর্ভে জাত সাত কন্যাসন্তানের মধ্যে একজন।

[বায়ু পু. ৬৯.১৭০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৩৯]

কেশিনী₃ ভাগবত পুরাণ মতে, মহর্ষি বিশ্রবার পত্নী তথা রাবণ ও কুম্ভকর্ণের মাতার নাম কেশিনী।

[ভাগবত পু. ৭.১.৪৩]

কেশিনী₄ পুরুবংশীয় রাজা অজমীঢ়ের তৃতীয়া পত্নী। তাঁর গর্ভে অজমীঢ়ের জহ্নু, জল এবং রূপিণ নামক পুত্রের জন্ম হয়। মৎস্যপুরাণ মতে অবশ্য অজমীঢ়ের পত্নী কেশিনীর একমাত্র পুত্রের নাম কণ্ব। বায়ুপুরাণ এই পুত্রকে কণ্ঠ নামে চিহ্নিত করেছে। তবে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে জহ্নুর মাতা কেশিনী চন্দ্রবংশীয় রাজা সুহোত্রের পত্নী।

[মহা (k) ১.৯৪.৩২; (হরি) ১.৮৯.১০; মৎস্য পু. ৪৯.৪৪; বায়ু পু. ৯৯.১৬৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৬.২৫]

কেশিনী₅ বিদর্ভরাজকন্যা দময়ন্তীর বিশ্বস্ত পরিচারিকা। অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের সারথি বাহুকই প্রকৃতপক্ষে হৃতরাজ্য নিষধরাজ নল কীনা, তা জানার জন্য দময়ন্তী বাহুকের সঙ্গে কথাবার্তা বলা ও তাঁকে পরীক্ষা করার কাজে এই কেশিনীকে নিযুক্ত করেছিলেন। *[মহা (k) ৩.৭৪-৭৫ অধ্যায়; (হরি) ৩.৬০.৩৮-৬৯; ৩.৬১. অধ্যায়]*

কেশিনী₆ মহাভারতের বনপর্বে মার্কণ্ডেয় মুনি পাণ্ডবদের কাছে স্কন্দ কার্তিকেয়ের জন্ম ও তারকাসুরের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কাহিনী শুনিয়েছেন বিস্তারিত ভাবে। স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় পার্বতী তাঁর সহচরীদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মার্কণ্ডেয়ের বর্ণনা থেকে জানা যায়, পার্বতীর একজন সহচরী ছিলেন কেশিনী।

[মহা (k) ৩.২৩১.৪৮; (হরি) ৩.১৯৪.২০]

কেশিনী₇ মহাভারতের উদ্যোগপর্বে বিদুর কেশিনী নামে এক পরমাসুন্দরী কন্যার কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও তাঁর জন্ম পরিচয় কিছু জানা যায় না। কেশিনী উপযুক্ত পতিলাভের আশায় স্বয়ংবরা হবেন বলে স্থির করেন। ব্রাহ্মণ সুধন্বা এবং দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন দুজনেই কেশিনীর পাণিপ্রার্থী ছিলেন। স্বয়ংবরের সময়

কেশিনী জিজ্ঞাসা করেন—এঁদের দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এই সূত্রে বিরোচন ও সুধন্বার মধ্যে এক বিবাদের সূত্রপাত হয়।

[মহা (k) ৫.৩৫ অধ্যায়; (হরি) ৫.৩৫ অধ্যায়]

কেশিনী৮ বিদর্ভের রাজকন্যা তথা ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সগরের পত্নী। মহর্ষি ঔর্ব যখন সগর পত্নীদের পুত্রলাভের বর দেন তখন কেশিনী একটি মাত্র বংশরক্ষক পুত্র প্রার্থনা করেন। ঔর্ব ঋষির বরে সগরের ঔরসে কেশিনীর গর্ভে অসমঞ্জের জন্ম হয়। এই অসমঞ্জই সগরের বংশধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

[বায়ু পু. ৮৮.১৫৫-১৬০; বিষ্ণু পু. ৪.৪.১-৫; ভাগবত পু. ৯.৮.১৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২. ৪৯.২, ৫৯; ২.৫১.৩৭-৩৮]

কেশিনী৯ অন্ধকাসুর বধের সময় মহাদেব অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য নিজের মন থেকে বহুসংখ্যক মাতৃকা সৃষ্টি করেন। কেশিনী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৭৯.২৩]*

কেশিনী১০ যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতার কন্যা এবং দেবসেনের পত্নী। দেবসেন কেশিনীর গর্ভে অঙ্গদ ইত্যাদি সাত পুত্রের জন্ম দেন।

[কালিকা পু. ৮৯.৩৪-৩৬]

কেশী১ একজন দানব। মহাভারতের আদিপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কেশী একজন।

[মহা (k) ১.৬৫.২৩; (হরি) ১.৬০.২৩]

□ মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রজাপতি ব্রহ্মার দুই কন্যা দেবসেনা ও দৈত্যসেনা মানস পর্বতে সখীদের সঙ্গে বিচরণ করতেন। একদিন তাঁরা সখী-পরিবৃতা হয়ে এইভাবেই বিচরণ করছিলেন। কেশীদানব প্রজাপতির এই দুই কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁদের প্রার্থনা করেন। দেবসেনার ভগিনী দৈত্যসেনাও কেশীকে স্বামীরূপে প্রার্থনা করতেন। তাই দৈত্যসেনার সমর্থনেই একদিন কেশী তাঁকে হরণ করেন।

এরপর কেশী দেবসেনাকে হরণ করতে চাইলে দেবসেনা তাঁকে বাধা দেন। কেশীও তাঁকে বল প্রয়োগ করে হরণের চেষ্টা করেন। দেবসেনা তখন আর্তনাদ করেন। তাঁর চীৎকার শুনে দেবরাজ ইন্দ্র সেই স্থানে উপস্থিত হন। তিনি কেশীর হাত থেকে দেবসেনাকে মুক্ত করেন। কেশী-দানব এবং ইন্দ্রের মধ্যে যুদ্ধ হয়। অবশেষে কেশী পলায়ন করেন।

[মহা (k) ৩.২২৩.১১-১৫; ৩.২২৪.১-৪; (হরি) ৩.১৮৬.১১-১৭]

□ মৎস্য পুরাণে অবশ্য উল্লিখিত হয়েছে যে, কেশী একদিন উর্বশীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র কেশীকে পরাস্ত করে উর্বশীকে উদ্ধার করেন। *[মৎস্য পু. ১৪.২৩-২৫]*

কেশী২ একজন দৈত্য এবং কংসের মিত্র বলেই পুরাণগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে। পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, কৃষ্ণকে বধ করার জন্যই কংস, কেশী দৈত্যকে পাঠায় বৃন্দাবনের ব্রজভূমিতে। ব্রজে এসেই কেশী দৈত্য বিরাট আকৃতির একটি অশ্বের ছদ্মবেশ ধারণ করেন। এভাবে অশ্বের রূপ ধরেই কেশী দৈত্য বৃন্দাবনবাসী মানুষ এবং অনান্য জীবজন্তু ভক্ষণ করতে থাকেন। একদিন কেশী গোপপল্লীতে এলে গোপ রমণী, শিশু সবাই কৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন। কৃষ্ণ সকলকে অভয় দিয়ে কেশীর মুখোমুখি হলেন। এদিকে কেশীও কৃষ্ণকে দেখে তাঁকে আক্রমণ করার অভিপ্রায়ে তীব্র বেগে এগিয়ে আসতে লাগলেন। বাসুদেব-কৃষ্ণের সঙ্গে কেশীর ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল। কৃষ্ণ তাঁর বামহাতটি কেশীর মুখগহ্বরে ঢুকিয়ে দিলেন। ক্রমে তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল। হাত-পা ইতস্তত: চালনা করতে করতে কেশী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। হরিবংশ পুরাণে অবশ্য উল্লিখিত হয়েছে যে, কৃষ্ণ কেশীদৈত্যকে দুভাগে বিভক্ত করে বধ করেন।

[ভাগবত পু. ১০.২.১; ১০.৩৬.২০; ১০.৩৭.১-৮; হরিবংশ পু. ২.২৪ অধ্যায়; বায়ু পু. ৯৮.১০০; বিষ্ণু পু. ৫.১.২৩]

কেশী৩ যদুবংশীয় বসুদেবের ঔরসে কৌশল্যার গর্ভজাত পুত্র হলেন কেশী।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.৪৮]

কেশীধ্বজ ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমির বংশধারায় কৃতধ্বজের পুত্র কেশীধ্বজ। তিনি ভানুমানের পিতা।

[ভাগবত পু. ৯.১৩.২০-২১]

□ বিষ্ণুপুরাণে কথিত হয়েছে যে, নিমির বংশধারায় কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ দুই ভাই ছিলেন। কৃতধ্বজের পুত্র কেশীধ্বজ এবং মিতধ্বজের পুত্র

ছিলেন খাণ্ডিক্য। কেশীধ্বজ এবং খাণ্ডিক্য—এই দুই জ্ঞাতি ভাইয়ের মধ্যে সদ্ভাব তো ছিলই না, উপরন্তু তাঁরা সর্বদা পরস্পর পরস্পরকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে চেষ্টা করতেন। একসময় কেশীধ্বজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খাণ্ডিক্যের শোচনীয় পরাজয় হল। তিনি রাজ্যচ্যুত হলেন। পরাজিত খাণ্ডিক্যের রাজ্য, রাজধানী, ঐশ্বর্য্য; সব কিছুই এসে গেল কেশীধ্বজের অধিকারে। আর পরাজিত রাজ্যচ্যুত খাণ্ডিক্য তাঁর মন্ত্রীদের নিয়ে রাজ্য থেকে দূরে এক দুর্গম বনে বাস করতে লাগলেন।

এর কিছুকাল পরে কেশীধ্বজ একটি যজ্ঞের আয়োজন করলেন। কিন্তু যজ্ঞের জন্য নির্দিষ্ট গাভীটিকে একটি বাঘ হত্যা করল। বাঘ যজ্ঞের গাভীকে হত্যা করেছে একথা জানতে পেরে কেশীধ্বজ পুরোহিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের জন্য বিধান চাইলেন। কিন্তু পুরোহিতরা তাঁকে বিধান দিতে ব্যর্থ হলেন। তাঁরা কেশীধ্বজকে প্রথমে কশেরু এবং পরে শুনক নামে দুই মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণের কাছে পাঠালেন। কিন্তু তাঁরা দুজনেই প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতে ব্যর্থ হলেন। শুনক কেশীধ্বজকে বললেন—একমাত্র তোমার শত্রু খাণ্ডিক্যই এই প্রায়শ্চিত্তের বিধান বলতে পারবে। তুমি তাঁর কাছেই যাও। শুনকের পরামর্শ অনুসারে কেশীধ্বজ খাণ্ডিক্যের কাছে গেলেন। খাণ্ডিক্য কেশীধ্বজকে আসতে দেখে ভাবলেন যে, তাঁকে রাজ্যচ্যুত করেও হয়তো কেশীধ্বজ তৃপ্ত হননি, তাই এই গহন বনে এসেছেন তাঁকে হত্যা করতে। খাণ্ডিক্য তাই রণসজ্জায় সজ্জিত হলেন। কিন্তু কেশীধ্বজ খাণ্ডিক্যের কাছে এসে তাঁর যজ্ঞের গাভী হত্যার ঘটনাটি বর্ণনা করে বিনীত ভাবে বললেন—আমার প্রায়শ্চিত্তের বিধান জিজ্ঞাসা করার জন্যই আপনার কাছে এসেছি, যুদ্ধ করতে নয়। খাণ্ডিক্য তখন মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। মন্ত্রীরা খাণ্ডিক্যকে বললেন, কেশীধ্বজকে বধ করতে। কিন্তু খাণ্ডিক্য ভাবলেন তিনি যদি কেশীধ্বজকে বধ করেন, তাহলে খুব স্বল্পদিনের জন্য তিনি রাজ্যশাসন করতে পারবেন, কিন্তু পরলোকে জয়ী হতে পারবেন না। তাই তিনি কেশীধ্বজকে বধ না করে প্রায়শ্চিত্তের বিধান বলে দিলেন। কেশীধ্বজও যজ্ঞভূমিতে ফিরে এলেন এবং যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত করার পর কেশীধ্বজ স্মরণ করলেন যে, খাণ্ডিক্যকে তিনি গুরুদক্ষিণা প্রদান করেননি। তিনি পুনরায় খাণ্ডিক্যের কাছে উপস্থিত হলেন গুরুদক্ষিণা দেওয়ার জন্য। খাণ্ডিক্যের মন্ত্রীরা তখন তাঁকে পরামর্শ দিয়ে বললেন যে, শত্রু যখন নিজেই গুরুদক্ষিণা দিতে এসেছে, তখন আপনি আপনার হৃতরাজ্য চেয়ে নিন দক্ষিণা হিসেবে।

কিন্তু খাণ্ডিক্য সাম্রাজ্য প্রার্থনা করলেন না। তিনি কেশীধ্বজের কাছে জানতে চাইলেন যে, কোন কর্মের দ্বারা তাঁর সমস্ত ক্লেশ দূর হবে। খাণ্ডিক্যের কথা শুনে কেশীধ্বজ তাঁকে অধ্যাত্ম ও পরমার্থ বিষয়ে উপদেশ দেন এবং রাজ্যে ফিরে যান। *[বিষ্ণু পু. ৬.৬-৭ অধ্যায়; নারদ পু. (মহর্ষি) ১.৪৬.৩৮-৪০]*

কেষনাদী পিশাচদের একটি গণ বলে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৮০]*

কেসর পৌরাণিক শাকদ্বীপের অন্তর্গত সাতটি বর্ষপর্বতের বা পর্বত ভূখণ্ডের মধ্যে একটি। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে এই পর্বত সংলগ্ন অঞ্চলে কেসরের সুগন্ধযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয়।

[মহা (k) ৬.১১.২৩; (হরি) ৬.১১.২২]

কেসরী১ পুরাণে উল্লিখিত একজন দৈত্যের নাম। পাতালের ষষ্ঠতলে তাঁর সুরম্য বাসভবন ছিল বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

[বায়ু পু. ৫০.৩৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.৩৯]

কেসরী২ পৌরাণিক শাকদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত প্রধান পর্বতগুলির মধ্যে কেসরী একটি।

[বিষ্ণু পু. ২.৪.৬৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৯.৯০]

কৈকরসপা একজন কশ্যপবংশীয় বংশপ্রবর্তক ঋষি। *[মৎস্য পু. ১৯৯.৭]*

কৈকসী রাক্ষস সুকেশের পুত্র সুমালীর ঔরসে গান্ধর্বী নর্মদার কন্যা কেতুমতীর গর্ভে কৈকসী জন্মগ্রহণ করেন।

একদিন সুমালী তাঁর কন্যা কৈকসীকে সঙ্গে নিয়ে মর্ত্যলোক ভ্রমণ করছিলেন। সেখানে মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র কুবেরের ঐশ্বর্য্য দেখে বিস্মিত হয়ে সুমালী মর্ত্যলোক থেকে পাতালে ফিরে আসেন। ধনপতি কুবেরের ঐশ্বর্য্য দেখে সুমালী ভাবতে থাকেন কি উপায়ে তিনি কুবেরের মতো ঐশ্বর্য্যশালী হবেন?

এই কথা ভাবতে ভাবতে সুমালী মহর্ষি পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবাকে কন্যাদান করবেন বলে মনস্থ করেন। তিনি ভাবলেন যে, মহর্ষি বিশ্রবার ঔরসে তাঁর কন্যার গর্ভে যে সব পুত্র-সন্তান হবে, তারাও কুবেরের মতো ঐশ্বর্য্যশালী হবে। সুমালী কৈকসীকে বললেন যে, সে বিবাহের উপযুক্ত হয়েছে। তাই সে যেন পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবাকে পতিত্বে বরণ করে।

পিতার আদেশ অনুসারে কৈকসী সন্ধ্যাবেলা বিশ্রবার নিকট উপস্থিত হন। বিশ্রবা তখন অগ্নিহোত্র করছিলেন। কৈকসীকে দেখে তিনি তাঁর আগমনের কারণ ও কৈকসীর পরিচয় জানাতে অনুরোধ করেন। কৈকসীর পরিচয় অবগত হয়ে বিশ্রবা জানলেন যে, কৈকসী তাঁর কাছে পুত্র কামনা করেন। কৈকসীকে বিশ্রবা বললেন যে, তুমি সন্ধ্যাকালে আমার কাছে এসে সন্তান কামনা করেছো। সেইকারণে তোমার পুত্ররা খল স্বভাবের এবং ভীষণাকৃতির হবে। কৈকসী একথা শুনে বিশ্রবাকে অনুনয় করে বললেন যে, এইরকম দুষ্ট প্রকৃতির সন্তান তিনি কামনা করেন নি। তিনি বিশ্রবার মতোই তেজস্বী ও ধার্মিক পুত্র প্রার্থনা করেন। বিশ্রবা কৈকসীকে আশ্বস্ত করেন এবং বলেন যে, তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বিশ্রবার মতোই সৎ ও ধার্মিক হবে।

কিছু সময় পরে কৈকসী এক বিকট আকৃতির রাক্ষস সন্তান প্রসব করেন এবং সেইসময় প্রকৃতিতে নানান অশুভ লক্ষণ ফুটে ওঠে। সেই সন্তানের দশটি মাথা, কুড়িটি হাত, বিশাল আকারের দাঁত ও লাল বর্ণের ওষ্ঠ। দশটি মাথা থাকার জন্য সেই রাক্ষস সন্তান দশগ্রীব (রাবণ) নামে খ্যাত হয়। এরপর কুম্ভকর্ণ, শূর্পনখা ও বিভীষণ কৈকসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন ধনপতি কুবেরকে দেখে কৈকসী দশগ্রীব রাবণকে কুবেরের মতো ঐশ্বর্য্যশালী ও তেজস্বী হওয়ার কথা বললেন। মাতার কথা শুনে রাবণ ঈর্ষান্বিত হলেন এবং কুবের অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যবান হবেন এই প্রত্যাশায় তপস্যা করতে শুরু করলেন। *[রামায়ণ ৭.৯.১-৪০]*

ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু পুরাণ মতে কৈকসী মালীর কন্যা। ঋষি বিশ্রবার চারজন পত্নীর মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৪০, ৪৭; বায়ু পু. ৭০.৩৪.৪১]*

কৈকেয়ী১ বর্তমান পঞ্জাবের বিপাশা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলটির নাম পুরাকালে ছিল কেকয়। এই রাজ্যের রাজার নাম ছিল অশ্বপতি। নিশ্চয়ই তিনি নিজের কন্যাটিকে কোনো মধুর নাম দিয়েছিলেন; কিন্তু রামায়ণে কেকয়-রাজকন্যাটি তাঁর স্থানবাচক নামটিতেই পরিচিত। সেই নাম হল—কৈকেয়ী বা কৈকয়ী। তাঁর প্রকৃত নামটি এর আড়ালে চাপা পড়ে গেছে।

যথাসময়ে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। অনেক পরবর্তীকালে ভরত যখন রামকে বুঝিয়ে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিতে চিত্রকূটে এসেছিলেন, তখন রাম ভরতকে একটি কথা বলেন। রামের মুখ থেকে জানা যায় যে, দশরথ ও কৈকেয়ীর বিবাহের সময় দশরথ ভরতের মাতামহ—অর্থাৎ কৈকেয়ীর পিতাকে কথা দিয়েছিলেন— কৈকেয়ীর পুত্রই ভবিষ্যতে রাজা হবে—

পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্।
মাতামহে সমশ্রৌষিদ্ রাজ্যশুল্কমনুত্তমম্'।

রামের এই উক্তি থেকে মনে হয়, দশরথ এই শর্তেই কৈকেয়ীকে বিয়ে করেছিলেন। অবশ্য কৈকেয়ী বা দশরথ—কাউকেই কখনো এমন কোনো শর্তের কথা উল্লেখ করতে দেখা যায় না। *[রামায়ণ ২.১০৭.৩]*

□ রামায়ণে খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও ক্রোধাগারে ভূমিশয্যায় শয়ান কৈকেয়ীকে যেভাবে বৃদ্ধ দশরথের প্রিয়তমা তরুণী ভার্য্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে কৈকেয়ী দশরথের কনিষ্ঠা পত্নী ছিলেন বলেই মনে হয়—

স বৃদ্ধস্তরুণীং ভার্য্যাং প্রাণেভ্যো'পি গরীয়সীম্।
[রামায়ণ ২.১০.২৩]

কৈকেয়ীর প্রতি দশরথ যে খুবই দুর্বল ছিলেন, এমনকী সেই দুর্বলতার বশে অন্যান্য স্ত্রীদের অবহেলা করতেন—তা তাঁর নিজের কথা থেকেই বোঝা যায়। ভরতের উক্তিও সেকথার সমর্থন করে—'মহারাজ বেশির ভাগ সময় আমার মায়ের গৃহেই থাকেন'—রাজা ভবতি ভূয়িষ্ঠমিহাম্বায়া নিবেশনে। মন্থরার কথা অনুযায়ী কৈকেয়ীর জন্য দশরথ প্রাণও বিসর্জন দিতে পারেন—

তব প্রিয়ার্থং রাজা তু প্রাণানপি পরিত্যজেৎ।

এই প্রিয়তমা পত্নীটির জন্য দশরথ যে যে-

কোনো অন্যায়ও করতে পারেন, তা তিনি নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কৈকেয়ীকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, 'বলো, কোন্ অবধ্যকে বধ করতে হবে, কোন্ বধ্যকে মুক্তি দিতে হবে?'

অবধ্যো বধ্যতাংকা বা বধ্যঃ কো বা বিমুচ্যতাম্॥

স্পষ্টতই, দশরথের এই দুর্বলতাই কৈকেয়ীর চরিত্রকে বিচিত্র পথে নিয়ে গেছে, তাঁর পরিণতিকে অনিবার্য করে তুলেছে।

[রামায়ণ ২.৭২.১২; ২.৯.২৫; ২.১০.৩২]

রাজা দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞের পরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞাগ্নি থেকে উঠে আসেন এক দিব্যপুরুষ। দশরথকে সেই দিব্যপুরুষ দান করেন দিব্য পায়েসে পূর্ণ একটি স্বর্ণপাত্র। তিনি বলেন, দশরথ তাঁর স্ত্রীদের পায়েস খাওয়ালেই তাঁরা গর্ভবতী হবেন। দশরথ সেই প্রসাদের অর্ধেক দিলেন কৌশল্যাকে, বাকি প্রসাদের অর্ধেকের অর্ধেক দিলেন সুমিত্রাকে। তারপর সেই অমৃততুল্য পায়েসের অর্ধেকের অবশিষ্ট অর্ধাংশ দিলেন কৈকেয়ীকে—

কৈকয্যৈ চাবশিষ্টার্ধং দদৌ পুত্রার্থকারণাৎ।
প্রদদৌ চাবশিষ্টার্ধং পায়সস্যামৃতোপমম্॥

স্পষ্টতই, দশরথ চেয়েছিলেন—কৌশল্যার পুত্রই যেন সবচেয়ে শক্তিশালী হয়—যে কারণে তাঁর এই বিচিত্র পায়েস ভাগ। যাই হোক, যথাকালে কৈকেয়ী ভরতের জন্ম দিলেন।

রাজপুত্রেরা বড়ো হলে দশরথ মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন, রামকে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন।

এদিকে কৈকেয়ীকে বিবাহের সময় পিতৃকুল থেকে একটি দাসী দেওয়া হয়েছিল, তার নাম মন্থরা। পিঠে কুঁজ থাকায় তাকে কুব্জা বা কুঁজী বলা হত। সেই মন্থরাই কৈকেয়ীকে রামের যৌবরাজ্যে নির্বাচিত হওয়ার খবর এনে দিল। শুনে কৈকেয়ী অত্যন্ত খুশি হয়ে তাকে গয়না উপহার দিতে চাইলেন। বললেন—'আমি রাম আর ভরতের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখি না। রাজা দশরথ রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করবেন শুনে আমি খুবই খুশি হয়েছি।'

রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।
তস্মাত্তুষ্টাস্মি যদ্ রাজা রামং রাজ্যে'ভিষেক্ষ্যতি॥

[রামায়ণ ১.১৫.১-৪; ১.১৬.১-২৭, ১৮, ২৯-৩২; ২.১.২; ৭.১-৩৪; ৩৫]

মন্থরা কৈকেয়ীর এই ব্যবহার দেখে রাগে যেন আগুন হয়ে উঠল। কৈকেয়ীর নিজের ছেলে এবং সপত্নীর ছেলেকে একই দৃষ্টিতে দেখা—এই ব্যাপারটাই তার কাছে হাস্যকর বলে মনে হলো। কারণ মন্থরার মতে, 'সপত্নীর পুত্র মৃত্যুর মতো শত্রু'—

সপত্নীপুত্রস্য বৃদ্ধিং মৃত্যোরিবাগতাম্—

এমনকী তার বৃদ্ধি বা উন্নতিও তাই। এই মন্থরাই প্রথমবার কৈকেয়ীকে বোঝাল, এতদিন ধরে তিনি প্রাধান্য ভোগ করে এসেছেন— কারণ দশরথ তাঁর পক্ষপাতী ছিলেন। এবার রাম রাজা হবে। ফলে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে রামের মা—কৌশল্যার; কারণ সে-ই হবে রাজমাতা। আর কৈকেয়ীকে তাঁর কাছে দাসী হয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—

উপস্থাস্যতি কৌশল্যাং দাসীবত্ত্বং কৃতাঞ্জলিঃ।

এমনকী কৈকেয়ীর ছেলে ভরতকেও হতে হবে রামের দাস—

পুত্রশ্চ তব রামস্য প্রেষ্যত্বং হি গমিষ্যতি।

[রামায়ণ ২.৮.১-১১]

কৈকেয়ী কিন্তু মন্থরার এসব কুকথায় কান দিলেন না। তিনি বরং রামের অনেক প্রশংসা করলেন। বললেন—'রাম দশরথের বড়ো ছেলে, তার উপর সে ধর্মজ্ঞ, গুণবান, জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, পবিত্রকর্মা। সুতরাং সেই যৌবরাজ্যের পক্ষে উপযুক্ত পাত্র'—

ধর্মজ্ঞো গুণবান দান্তঃ কৃতজ্ঞঃ সত্যবান শূচি।
রামো রাজসুতো জ্যেষ্ঠো যৌবরাজ্যমতো'র্হতি॥

কৈকেয়ী আরও বললেন, ভরতের চেয়েও রাম তাঁর বেশি প্রিয়; কারণ রাম কৌশল্যার চাইতে তাঁরই বেশি সেবা করেন। মন্থরা কৈকেয়ীর এইসব কথা শুনে ক্রমেই আরও রেগে যাচ্ছিল। তার নানা ঈর্ষাপরায়ণ কথা কৈকেয়ীর উপর কোনো প্রভাবই ফেলছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুটি কথা কৈকেয়ীর শান্ত মনে ভয়ের সঞ্চার করল। প্রথমত, রাম যাতে নিশ্চিন্তে সিংহাসন পেতে পারেন, সেইজন্যেই ভরতকে দূরে তাঁর মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এতদিন নিজের সৌভাগ্যে আত্মহারা হয়ে কৈকেয়ী রামের মা—কৌশল্যাকে অবহেলা করেছেন। এখন রামচন্দ্রের অভিষেকের পর রাজমাতা কৌশল্যা কি তার প্রতিশোধ নেবেন না—

রামমাতা সপত্নী তে কথং বৈরং ন যাপয়েৎ॥

[রামায়ণ ২.৮.১৩, ১৪-৩৬, ৩৭]

হঠাৎই কৈকেয়ী মন্থরার কথায় জ্বলে উঠলেন। একবারেই তিনি বলে বসলেন— রামকে তিনি বনবাসে পাঠাবেন, ভরতকে সিংহাসনে বসাবেন। এ ব্যাপারে তিনি মন্থরারই সাহায্য চাইলেন, পরামর্শ চাইলেন। মন্থরা কৈকেয়ীকে মনে করিয়ে দিল, দক্ষিণ দিকে দণ্ডকদেশের বৈজয়ন্ত নগরে তিমিধ্বজ বা শম্বুক নামে এক দৈত্য ছিল। ইন্দ্রকে সে যুদ্ধে আহ্বান করে। দশরথ যুদ্ধে ইন্দ্রের হয়ে সংগ্রাম করলে অসুরেরা দশরথকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে। আহত স্বামীকে সেদিন কৈকেয়ীই সরিয়ে নিয়ে এসে বাঁচিয়েছিলেন। সন্তুষ্ট হয়ে দশরথ কৈকেয়ীকে দুটি বর দিতে চাইলে কৈকেয়ী বলেন—যখন ইচ্ছে হবে, তখন তিনি বর চেয়ে নেবেন।—

স ত্বয়োক্তঃ পতির্দেবি যদেচ্ছেয়ং তদা বরম্।

আজ সেই বর চেয়ে কৈকেয়ী যেন রামকে চোদ্দ বছরের জন্য বনে পাঠিয়ে দেন। এই দীর্ঘ অবসরে ভরতও রাজা-হিসেবে প্রজাদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠবেন। রোষাগারে প্রবেশ করে, মলিন বেশে মাটিতে পড়ে থেকে কীভাবে দশরথকে বিচলিত করতে হবে—তাও বলে দিল মন্থরা। কূটবুদ্ধি এই কুব্জা ভালভাবেই জানত, দশরথ কৈকেয়ীর কথা কখনোই ফেলতে পারবেন না—

ন হ্যতিক্রমিতুং শক্তো ন ক্রুদ্ধাং প্রত্যুদীক্ষিতুম্।

কৈকেয়ীও মন্থরার কথায় বশ হলেন, যেন বালিকার মত তিনি তার কথায় বিপথে চলে গেলেন—

কিশোরীবোৎ পথং গতা।

[রামায়ণ ২.৯.১-১৬; ১৭, ১৮-২৫; ২৬, ২৭-৩৭]

কুব্জার বুদ্ধি শুনে শতমুখে কুব্জার রূপগুণ-এর প্রশংসা করে তাকে অনেক কিছু উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৈকেয়ী এবার তৈরি হলেন দশরথকে বশীভূত করার জন্য। ক্রোধাগারে প্রবেশ করে, সব অলংকার খুলে ফেলে তিনি মাটিতে শুয়ে রইলেন। এদিকে দশরথ প্রিয় পুত্র রামের অভিষেকের সুখবর দিতে নিজেই এলেন কৈকেয়ীর কাছে। এসে শুনলেন, কৈকেয়ী খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রোধাগারে ঢুকে পড়েছেন। শুনে দশরথ ভয়ে ভয়ে সেখানে এসে কৈকেয়ীকে রাগের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন— 'বলো, কে তোমায় দুঃখিত করেছে, অথবা তোমার কি কোনো রোগ-ব্যাধি হয়েছে? আর শুধু বলো। আমায় কী করতে হবে?' এমন কী দশরথ এ-ও বললেন যে রাম-ছাড়া আর কাউকেই তিনি কৈকেয়ীর সমান ভালবাসেন না। সেই রামের নামেই তিনি শপথ করে বললেন—কৈকেয়ীর যে-কোনো ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করবেন।—

তেন রামেণ কৈকেয়ি শপে তে বচনক্রিয়াম্॥

কৈকেয়ী এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তিনি এইবার তাঁর অভীষ্ট ভয়ঙ্কর বরটি চাইলেন—রামের পরিবর্তে ভরত রাজা হবে; এবং রাম নিজে হরিণের চামড়া আর গাছের বাকল পরে চোদ্দ বছর দণ্ডকারণ্যে তপস্বীর জীবন কাটাবে—

নব পঞ্চ চ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ॥
চীরাজিনধরো ধীরো রামো ভবতু তাপসঃ।

[রামায়ণ ২.৯.৩৮-৬৬, ১০; ১১.১-৭, ৮, ৯-২৫, ২৬]

দশরথ এই মর্মান্তিক কথা শোনামাত্র অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি অনেক বিলাপ করলেন; বারবার কৈকেয়ীকে বোঝালেন। মনে করিয়ে দিলেন যে, রাম ভরতের চেয়েও বেশি করে কৈকেয়ীর সেবা করে—তার চরিত্র দেবতুল্য। কিন্তু কৈকেয়ী এ সব কথা শুনতে রাজি হলেন না। উল্টে নিষ্ঠুরভাবে দশরথকে মনে করিয়ে দিলেন তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা; মনে করিয়ে দিলেন সত্য থেকে বিচ্যুত হলে তাঁর নরকে গতি হবে। স্পষ্ট ভাষায় এও জানিয়ে দিলেন—রাম যে মুহূর্তে রাজা হবেন, কৈকেয়ী তৎক্ষণাৎ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন। দশরথ উন্মাদের মত বিলাপ করতে লাগলেন, বারবার কৈকেয়ীকে অন্য বর প্রার্থনা করতে বললেন। কিন্তু কৈকেয়ী অদ্ভুত নিষ্ঠুরভাবে অটল অনড় হয়ে রইলেন।

ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ এলেন অভিষেকের বিষয়ে কথা বলতে। তাঁর অনুমতি পেয়ে সুমন্ত্রের মাধ্যমে কৈকেয়ী রামকে সেখানে ডেকে পাঠালেন। দশরথের বিহ্বল অবস্থা দেখে কৈকেয়ী নিজেই রামকে বললেন তার পিতার প্রতিজ্ঞার কথা। রামকে পিতৃসত্য পালনের জন্য অঙ্গীকার করিয়ে নিয়ে কৈকেয়ী তাকে জানালেন—তিনি কী বর

চেয়েছেন। নিষ্ঠুরভাবে একটিমাত্র শানিত বাক্যে রামকে সব জানালেন কৈকেয়ী—ভরতের অভিষেক ও রামের বনবাস।

তত্রো মে যাচিতো রাজা ভরতস্যাভিষেচনম্।
গমনং দণ্ডকারণ্যে তব চৈবাদ্য রাঘব॥

[রামায়ণ ২.১২-১৫ অধ্যায়; ২.১৮.১-৩৩; মহা (k) ৩.২৭৪.৮; ৩২৭৭.১৬-৩৬; (হরি) ৩.২২৮.৮; ৩.২৩১.১৬-৩৬]

রাম অবিচলিত ভাবে তৎক্ষণাৎ বনবাসে যেতে রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু তাতেও যেন কৈকেয়ীর শান্তি হলো না। ভাল কাজ যত দ্রুত হয় ততই ভাল। সুতরাং এবার তিনি সরাসরি মিথ্যে বললেন—'যতক্ষণ তুমি এই পুরী ছেড়ে বনে না যাচ্ছো, ততক্ষণ তোমার পিতা স্নান-আহার করবেন না।'

যাবত্ত্বং ন বনং যাতঃ পুরাদস্মাদতিত্বরম্।
পিতা তাবন্ন তে রাম স্নাস্যতে ভোক্ষ্যতে'পি বা॥

এইবার দশরথ আর সহ্য করতে পারলেন না। 'ধিক! কী কষ্ট!'—এই বলে দুঃখে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কিন্তু রাম বাবার অনুমতিরও অপেক্ষা না করে বনবাসের জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

রামের বিদায়ের দৃশ্যটি মর্মান্তিক। সমস্ত অযোধ্যাপুরী যেন বিষণ্ণ, অসহায় বৃদ্ধ দশরথ বারবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন, কৌশল্যা ও অন্যান্য রাণীরা যেন শোকের প্রতিমূর্তি। সেই অনন্ত বিষাদ আর বিলাপের মধ্যে একমাত্র কৈকেয়ীই অবিচলিতা। বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র, সিদ্ধার্থ—এই সমস্ত হিতৈষীরা তাঁকে বার বার বোঝাচ্ছেন, জনগণ সোচ্চারে তাঁকে ধিক্কার জানাচ্ছে। কিন্তু কৈকেয়ী যেন সর্বনাশের দিকে মুখ করে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। কারো কথা তিনি কানে তুলছেন না। সুমন্ত্র সবাইকে মনে করিয়ে দিলেন, স্বামীর মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও এককালে কৈকেয়ীর মা একটি পাখির ডাকের অর্থ স্বামীর কাছেই জানতে চেয়েছিলেন। তাঁর মেয়ে হয়ে কৈকেয়ীও যে তাঁর মতোই পতিকে হত্যা করার চেষ্টা করবেন— এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। কিন্তু সুমন্ত্রর তীব্র তিরস্কার নানা সুপরামর্শ—কোনো কিছুতেই কৈকেয়ীর মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হলো না। তার মুখভঙ্গিতেও কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না।

ন চাস্যা মুখবর্ণস্য লক্ষ্যতে বিক্রিয়া তদা॥

[রামায়ণ ২.১৯.১-১৫; ১৬; ১৭-৪০; ২০-৩৪; ৩৫.১-৩৬; ৩৭]

নিজের প্রতিজ্ঞার জন্য মর্মান্তিকভাবে দুঃখিত দশরথ এবার সুমন্ত্রকে আদেশ দিলেন— যেহেতু রাম নির্জনে বাস করবেন, দশরথের ধান্যভাণ্ডার এবং ধনভাণ্ডার—দুই-ই যেন রামের সঙ্গেই যায়।

ধান্যকোশশ্চ যঃ কশ্চিদ্ধনকোশশ্চ মামকঃ।
তৌ রামমনুগচ্ছেতাং বসন্তং নির্জনে বনে॥

এবার কিন্তু কৈকেয়ী ভয় পেয়ে গেলেন, তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। দশরথকে তিনি বললেন—সব ধনসম্পদ যদি রামই নিয়ে যান, তাহলে আর এই বিস্বাদ সুরার মত শূন্য রাজ্য নিয়ে ভরত কী করবে? দশরথ কৈকেয়ীর উপর প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তাঁকে তিরস্কার করলে কৈকেয়ী আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—এই রঘুবংশেরই সন্তান অসমঞ্জকে তাঁর পিতা খালি হাতে নির্বাসিত করেছিলেন। তাহলে দশরথ রামকেই বা নির্বাসনে পাঠাতে পারবেন না কেন! এই অদ্ভুত উদাহরণে সকলেরই মাথা নীচু হয়ে গেল। কৈকেয়ী অবশ্য তার কারণ বুঝতে পারলেন না। তখন দশরথের এক প্রবীণ কর্মচারী সিদ্ধার্থ বললেন, অসমঞ্জ শিশুদের সরযুর জলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আনন্দ পেত। রামের এমন কোন্ দোষ আছে, যার জন্য তাঁকে নির্বাসিত করতে হবে? *[রামায়ণ ২.৩৬.১-৬; ৭; ৮-৩৩]*

রাম এইবার বনবাসী হওয়ার জন্য বাকল চাইলেন। কৈকেয়ী নির্লজ্জের মতো নিজেই তাঁর জন্য বল্কলবাস নিয়ে এলেন। রাম-লক্ষ্মণ তা পরলেন। সীতা বাকল পরতে হবে জেনে পাশভীতা হরিণীর মতো ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু কৈকেয়ী তাঁকেও ছেড়ে দিলেন না, সীতাকে তাঁরই হাত থেকে কুশ এবং বল্কল নিতে হল। এইবার এমনকী মহর্ষি বশিষ্ঠেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, তিনি কৈকেয়ীকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করলেন। কিন্তু কৈকেয়ী আগের মতই অনড় রইলেন। দশরথের বিলাপও তাঁকে স্পর্শ করল না। রাম বনের পথে যাত্রা করলেন লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে। সারা অযোধ্যা হাহাকার করে কেঁদে উঠল, রাজবাড়ির ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠল; কেবল কৈকেয়ী আনন্দিত। দশরথ স্পষ্ট বললেন—কৈকেয়ীর সঙ্গে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করছেন, ভরত তাঁর পিতৃকৃত্য করার অধিকার পাবেন না। তবু কৈকেয়ী রাজমাতা হওয়ার আনন্দে উৎফুল্ল।

[রামায়ণ ২.৩৭-৪২]

পুত্রশোক সহ্য করতে না পেরে দশরথের মৃত্যু হল। কৈকেয়ী তখন সেখানে ছিলেন না। অন্য রাণীদের কান্নায় কৈকেয়ী সেখানে এলেন বটে, কিন্তু বৈধব্যের শোক তাঁকে বিশেষ স্পর্শ করল বলে মনে হয় না। অবশ্য তিনিও কাঁদছেন, কিন্তু তা যেন কৃত্রিম শোকপালন বলেই মনে হয়। কেননা, দূতের আহ্বানে, অন্য খবর পেয়ে ভরত যখন এসে মায়ের সঙ্গে দেখা করলেন, তখন কৈকেয়ী ভরতের প্রশ্নের উত্তরে প্রায় সুসংবাদ দেওয়ার ভঙ্গিতে দশরথের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করলেন। বললেন—'এই সংসারে সকল প্রাণীর যে গতি হয়, তোমার পিতা সেই গতি পেয়েছেন।'—

যা গতিঃ সর্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ।

ক্রমে ভরতকে তিনি এ-ও বললেন, রাম-সীতা-লক্ষ্মণের নাম ধরে বিলাপ করতে করতেই দশরথ মারা গেছেন। এরপর ভরত যখন প্রশ্ন করলেন—রাম কোথায়? তখন কৈকেয়ীর মনে হল, এই বাক্যে তিনি যে অপ্রিয় খবরটি দেবেন, তা ভরতের প্রিয় হবে—

মাতাস্য যুগপদ্ বাক্যং বিপ্রিয়ং প্রিয়-শংসয়া॥

কৈকেয়ী তখন খুবই খুশি হয়ে তাঁর বর চাওয়া থেকে আদ্যোপান্ত সব ঘটনা বলে ভরতকে বললেন—তুমি দুঃখ করো না। এই অযোধ্যা এখন তোমারই অধীন, এই রাজ্যও নির্বিঘ্নে তোমার—

ত্বদধীনা হি নগরী রাজ্যং চৈতদনাময়ম্॥

[রামায়ণ ২.৬৬-৭১; ২.৭২.১-১৪; ১৫, ১৬-৪০; ৪১; ৪২-৫২, ৫৩]

এই খবর শোনামাত্র ভরতের সমস্ত দুঃখ ক্রোধে পরিণত হল। কৈকেয়ীকে নিজের মা-কে তিনি তীব্র কটু ভাষায় তিরস্কার করলেন, ধিক্কার দিলেন। পাপদর্শিনী, কুলনাশিনী— এইসব সম্বোধনে তাঁকে ধিক্কার দিলেন ভরত। বারবার জিজ্ঞাসা করলেন—এই রাজ্য নিয়ে তিনি কী করবেন—

কিং নু কার্যং হতস্যেহ মম রাজ্যেন শোচতঃ।

এমন কী স্বয়ং কৈকেয়ীকেই তিনি রাজ্য থেকে নির্বাসিত করতে চাইলেন।

এইবার কৈকেয়ীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি বুঝলেন, কী মহাভুল তিনি করেছেন। কৈকেয়ীর বাকী জীবন যেন এই ভুলেরই প্রায়শ্চিত্ত করে চলা। ভরত যখন রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য চিত্রকূটের পথে রওনা দিলেন, কৈকেয়ীও তাঁর সঙ্গে গেলেন। পথে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে তাঁরা আশ্রয় নিলেন। বিফল-মনোরথ কৈকেয়ী, সকলেই তাঁর নিন্দা করে— লজ্জিতভাবে তিনি ভরদ্বাজের চরণ স্পর্শ করলেন—

অসমৃদ্ধেন কামেন সর্বলোকস্য গর্হিতা।

কৈকেয়ী তত্র জগ্রাহ চরণৌ সবপত্রপা।

দীনচিত্তে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন ভরতের পাশে। অন্যান্য মায়েদের বহু প্রশংসার পর ভরত নিজের মায়ের পরিচয় ভরদ্বাজের কাছে প্রকাশ করলেন এইভাবে—'যাঁর জন্য রাম-লক্ষ্মণ মৃত্যুতুল্য কষ্ট পেয়েছেন, দশরথ পুত্রশোকে স্বর্গে গেছেন, সেই ক্রোধপরায়ণা, প্রজ্ঞাহীনা, গর্বিতা, সৌভাগ্য-মদমত্তা, ঐশ্বর্যলুব্ধা, আর্যার মতো দেখতে কিন্তু অনার্যার মতো যাঁর আচরণ—নিষ্ঠুর সেই কৈকেয়ীকে আমার মা বলে জানবেন। এঁকেই মহাপ্রাণ রামের সকল দুঃখের মূল বলে আমি মনে করি।'

যতো মূলং হি পশ্যামি ব্যসনং মহদাত্মনঃ॥

ভরদ্বাজ অবশ্য ভরতকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন—'রামের এই নির্বাসন পরিণামে সুখকর হবে। এর জন্য তুমি কৈকেয়ীকে দোষ দিও না'—

ন দোষেণৈব গন্তব্যা কৈকেয়ী ভরত ত্বয়া।

কৈকেয়ীর কোনো প্রতিক্রিয়া আর বর্ণনা করা হয় না। তিনি যেন তাঁর ক্ষণিকের মোহের প্রচণ্ডতার শেষে এমন এক পৃথিবীতে জেগে উঠেছেন— যেখানে কেউ নেই। স্বামী-পুত্র-পরিজন-সকলেই তাঁকে ত্যাগ করেছে। সকলের পিছনে ছায়ার মতো তাঁকে দেখা যায়—রামের দৃঢ় প্রত্যাখ্যানে তিনিও কাঁদছেন; রাম বনবাস লঙ্কাজয় শেষ করে নন্দিগ্রামে ফিরলে তিনিও যাচ্ছেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। কিন্তু কোথাও তাঁর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। রামের বনবাসের চোদ্দ বছর এই ভয়ংকর একাকিত্ব আর সর্বব্যাপী ঘৃণার মধ্যে তিনি কীভাবে কাটালেন ভাবতে ভয় হয়।

[রামায়ণ ২.৭৩.২-২৮; ২.৭৪ অধ্যায়; ২.৯২.১-৩০]

কৈকেয়ীর জীবনের শেষটিও বর্ণিত হয় এক অদ্ভুত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে। সীতার পাতাল প্রবেশের পর কৌশল্যা পরলোক গমন করলেন। সুমিত্রা ও কৈকেয়ীও নানা ধর্মকর্ম করে স্বর্গে গেলেন—

অন্বিয়ায় সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ যশস্বিনী।
ধর্ম কৃত্বা বহুবিধং ত্রিদিবে পর্যবস্থিতা॥

রাবণবধের জন্যই রাম অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যকে নিজের অজান্তে সফল করে, বহু নিন্দা মাথায় নিয়ে কৈকেয়ীর সন্তপ্ত জীবন শেষ হল। *[রামায়ণ ৭.৯৯.১৬]*

কৈকেয়ী২ পুরুবংশীয় রাজা সার্বভৌমের পত্নী ছিলেন কেকয় দেশের রাজকন্যা সুনন্দা। কেকয় রাজকন্যা বলেই মহাভারতে তাঁকে কৈকেয়ী নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ১.৯৫.১৬; (হরি) ১.৯০.২১]

কৈকেয়ী৩ মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে যে কুরুবংশীয় রাজা অজমীঢ়ের চার পত্নীর মধ্যে জ্যেষ্ঠা ছিলেন কেকয় রাজকন্যা কৈকেয়ী।

[মহা (k) ১.৯৫.৩৭; (হরি) ১.৯০.৪৭]

কৈকেয়ী৪ কুরুবংশীয় রাজা ভীমসেনের পত্নী। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল কুমারী। তবে কেকয় দেশের রাজকন্যা বলে মহাভারতে তাঁকে কৈকেয়ী নামেও উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ১.৯৫.৪৩; (হরি) ১.৯০.৫৩]

কৈকেয়ী৫ মৎস্য দেশের রাজা বিরাটের পত্নী সুদেষ্ণাকেও মহাভারতে কৈকেয়ী নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ৪.৯.৬; ৪.১৫.২; (হরি) ৪.৮.৬; ৪.১৪.২]

কৈকেয়ী৬ কেকয় রাজকন্যা সুমনাকে মহাভারতের অনুশাসনপর্বে কৈকেয়ী নামে উল্লিখিত হতে দেখা যায়। স্বর্গলোকবাসিনী তপস্বী শাণ্ডিলী তাঁকে পত্নীর কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে। *[মহা (k) ১৩.১২৩.২; (হরি) ১৩.১০৪.২]*

কৈকেয়ী৭ বাসুদেব-কৃষ্ণের ভার্য্যা ভদ্রার অপর নাম। তিনি কেকয় দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তিনি কৈকেয়ী নামে খ্যাত হন।

[ভাগবত পু. ১০.৫৮.৫৬]

কৈটভ একজন দৈত্য। মহাভারত এবং পুরাণে প্রায় সর্বত্র এঁর নাম মধু নামক দৈত্যের সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই দৈত্য যুগলের জীবন কাহিনীও একরকম। *[দ্র. মধু১]*

□ ব্রহ্মপুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, পিপ্পল নামে এক দৈত্য ছিল এই কৈটভের পুত্র।

[ব্রহ্ম পু. ১১৮.১০]

কৈবর্ত একটি প্রাচীন ম্লেচ্ছ জনজাতি বিশেষ। 'কৈবর্ত' শব্দটিও অত্যন্ত প্রাচীন। শুক্লযজুর্বেদ, মনুসংহিতার মত প্রাচীন গ্রন্থে ধীবর অর্থেই কৈবর্ত শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহর্ষি মনুর বর্ণনায় নিষাদের ঔরসে বর্ণসঙ্কর জনজাতি আয়োগব স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের নাম, মার্গব বা দাশ। এই মার্গবরা পেশায় নৌ-কর্মজীবি অর্থাৎ নৌকা প্রস্তুতকারী, ধীবর অথবা মাঝি। আর্যাবর্তে মার্গবগণই কৈবর্ত নামে পরিচিত—

নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌ কর্মজীবিনম্।
কেবর্তমিতি যঃ প্রাহুরার্য্যাবর্তনিবাসিনঃ॥

এ থেকে স্পষ্ট যে, নিকৃষ্ট পেশার কারণেই কৈবর্তদের স্থান ছিল সমাজের নিম্নস্তরে।

শুক্লযজুর্বেদেওকৈবর্তদের জলাধারের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখার একটি ভাবনার উল্লেখ পাওয়া যায়—'মার্গার-মবারায় কৈবর্তং'।

তবে এখানে কৈবর্ত ও ধীবর গোষ্ঠীর পৃথক উল্লেখ লক্ষণীয়।

মহাভারতের অনুশাসনপর্বে অবশ্য কৈবর্তদের সরাসরি মৎস্যজীবি বা ধীবর বলা হয়েছে। অমরকোষেও কৈবর্ত ও ধীবরদের একাত্মক করে দেখা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'কৈবর্তে দাশধীবষ্টৌ'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আর্য সমাজে বর্ণভেদ প্রথা মূলত পেশাগত পরিচিতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট হত। সেই ধারাতেই ধীবর বা নৌকা নির্মাতা বা মাঝিদের সেকালে কৈবর্ত বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল বলে মনে হয়। *[শুক্লযজুর্বেদ ৩০.১৬; মনুসংহিতা ১০.৩৪; মহা (k) ১৩.৫০.১৫; (হরি) ১৩.৪২.১৫; অমরকোষ ১. (বারিবর্গ) ১৫]*

□ মহাভারতের অনুশাসন পর্বে বর্ণিত চ্যবন-নহুষ সংবাদে কৈবর্ত জনজাতির কথা পাওয়া যায়। ভৃগুপুত্র চ্যবন একবার দ্বাদশ বর্ষব্যাপী জলে অবস্থান করে তপস্যা করছিলেন। সে সময় একদল কৈবর্ত জালে করে মৎস্য আহরণ করতে এসে মহর্ষি চ্যবনকেও ভূ-পৃষ্ঠের উপর তুলে আনেন। চ্যবন স্থির করেন যে, জালে ধৃত মৎস্যের সঙ্গে তিনিও প্রাণত্যাগ করবেন। তখন কৈবর্তগণ ব্রহ্মহত্যার গুরুতর পাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শরণাপন্ন হন রাজা নহুষের। তিনি চ্যবনের ইচ্ছানুসারে শ্রেষ্ঠদান অর্থাৎ গোদান করে ঋষির প্রাণরক্ষা করেন। এর ফলে কৈবর্তরাও পাপমুক্ত হন। চ্যবনের বরে তাঁদের স্বর্গলাভ হয়।

[মহা (k) ১৩.৫০.১-২৭; ১৩.৫১.১-৪৮; (হরি) ১৩.৪২.১-৭৫]

□ পুরাণেও কৈবর্তদের ম্লেচ্ছ জনজাতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কলিযুগে অনান্য ম্লেচ্ছ জনজাতির মতো কৈবর্ত জাতির রাজারাও পৃথিবী শাসন করবেন।

[মৎস্য পু. ৫০.৭৭; বায়ু পু. ৯৯.২৬৮]

□ ভবিষ্য মন্বন্তর বর্ণনাকালে পুরাণে মাগধ বিশ্বস্ফানি নামে এক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি কলিযুগে কৈবর্ত জনজাতির প্রধান হিসেবে রাজপদে অভিষিক্ত হবেন—এ কথা পুরাণে বলা হয়েছে। *[বায়ু পু. ৯৯.৩৭৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৯১]*

□ বেদ, মহাভারত ও পুরাণের বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কৈবর্ত জনজাতির মানুষ পেশাগত কারণেই জলভাগের নিকটবর্তী স্থানে বাস করতেন। এঁরা প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন অংশে বসতি গড়ে তুলেছিলেন বলে মনে হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা আধুনিক বাংলাদেশে কৈবর্ত নামে একটি জনজাতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় আজও। এঁরা দুটি শাখায় বিভক্ত—হেলে কৈবর্ত ও জেলে কৈবর্ত। জেলে কৈবর্তদের পেশা মৎস্য আহরণ। অন্যদিকে হেলে কৈবর্তরা মূলত কৃষিজীবী। 'হেলে' শব্দটির উৎপত্তি 'হাল' থেকে বলেই মনে হয়। যা থেকে বোঝা যায় যে, কৃষিজীবী বলেই এঁদের নাম হেলে কৈবর্ত। মূলত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যায় কৈবর্তদের বাস, যা খুবই স্বাভাবিক। কারণ পূর্বভারতের এ সমস্ত রাজ্যে নদী এবং অনান্য জলভাগের আধিক্য। এ কারণেই কৈবর্তদের এ অঞ্চলে বাস একেবারেই অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

[Ed. by G.K. Bera and Bijay S Sahay; In the Lagoons of the Gangetic Delta; New Delhi; Mittal Publications; 2010; p. 214]

কৈরাতি পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার প্রবরভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি কৈরাতির বংশ তার মধ্যে একটি। কৈরাতি অঙ্গিরার বংশজাত একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৬.৭]

কৈলকিল একটি যবন জনজাতি, পুরাণে কলিযুগে পৃথিবীতে কৈলকিল বা কিলকিল যবনদের শাসনের কথা বলা হয়েছে। এঁরা আভীরদের পর পৃথিবী অধিকার করবেন—একথা পুরাণে বলা হয়েছে। পুরাণে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী, কৈলকিল যবনদের শাসনকালে সমস্ত জনপদ এবং আর্য জনজাতি ম্লেচ্ছদের মত আচার-আচরণ করবে। সর্বত্র বিপর্যয় ও অধার্মিকদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। রাজপুরুষেরা লোভী এবং মিথ্যাচারী হয়ে উঠবেন। কৈলকিল যবনদের শাসনকালে ঘোর কলির সমস্ত লক্ষণ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পাঠভেদে অন্যত্র কৈলকিল বা কিলকিলকে কৈঙ্কিল বা কোলিকিল নামেও উল্লেখ করা হয়েছে।

পুরাণগুলিতে বর্ণিত হয়েছে যে, কলিযুগে ম্লেচ্ছ জাতির (বিষ্ণু পুরাণ মতে 'মৌন' নামে একটি উপজাতির) তিনশত বৎসরের রাজত্বের অবসানের পর কৈলকিল যবনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কৈলকিলদের পর বিন্ধ্যশক্তি শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। অবশ্য বিষ্ণুপুরাণে বিন্ধ্যশক্তিকেই কিলকিল যবনদের প্রধান নৃপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিন্ধ্যশক্তির পরবর্তী কৈলকিল যবনজাতির শাসকদের তালিকাটি নিম্নরূপ—পুরঞ্জয়, রামচন্দ্র, ধর্ম, বরাঙ্গ, কৃতনন্দন, সুষিনন্দি, নন্দিযশাঃ ও শিশকপ্রবারী। পুরাণ মতে, এই কৈলকিল যবনদের শাসনকাল প্রায় একশো ছয় বছর স্থায়ী হয়েছিল।

[মৎস্য পু. ২৭৩.২৪-২৭; বায়ু পু. ৯৯.৩৬৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৭৮; বিষ্ণু পু. ৪.২৪.১৪-১৭]

□ পণ্ডিতদের মতে কিলকিল বা কৈলকিল আসলে একটি অনার্য ভাষার নাম। যবনদের যে সম্প্রদায়টি এই ভাষায় কথা বলে তাঁরাই কিলকিল বা কৈলকিল যবন নামে পরিচিত ছিল। Sir W. Jones এর মতে বর্তমান দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যে কৈলকিল ভাষা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। কিলকিল জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলটি সেকালে ভারতের পূর্ব উপকূল বরাবর গোদাবরী থেকে গঙ্গানদীর দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

[W. Taylor; Oriental Historical Manuscripts, Vol-2; Madras; 1835; p. 52]

□ এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কিলকিল বা কৈলকিলদের সঙ্গে 'যবন' শব্দটি ব্যবহারের যৌক্তিকতা কোথায়। পণ্ডিতরা মনে করেন, আফগানিস্তানের বামিয়ান (Bámián) অঞ্চলে ঘুলঘুলেহ (Ghúlghúleh) নামক শহরের সঙ্গে কিলকিলের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। তাঁরা

মনে করেন 'ঘুলঘুলেহ্' শব্দটিরই সংস্কৃত রূপ কিলকিল বা কৈলকিল, কৈঙ্কিল বা কোলিকিল। সম্ভবত ঘুলঘুলেহ অঞ্চল থেকেই কিলকিলদের ভারতে আগমন। সে কারণেই তাঁদের 'যবন' পরিচয়ে পরিচিত করা হচ্ছে। কৈলকিল যবনরাজ বিন্ধ্যশক্তির মাধ্যমেই গুহা কেটে শিল্পস্থাপন পদ্ধতি বামিয়ান থেকে এদেশে এসেছিল একথাও মনে করা হয়।

[Journal of the Bombay branch of the Royal Asiatic Society; January 1861; p. 67]

কৈলাস মহাকাব্য ও পুরাণে আলোচিত সমস্ত পর্বতগুলির মধ্যে পবিত্রতম হল কৈলাস। এটি মহাদেবের বাসভূমি ও লীলাক্ষেত্র। ব্রহ্মার মন থেকে উৎপন্ন সরোবর মানস সরোবরের অবস্থান কৈলাসে। মন্দাকিনী ও সরযূ নদীর উৎপত্তিস্থল কৈলাস পর্বত।

পুরাণে বলা হয়েছে যে, কৈলাস পর্বতের পাদদেশে মন্দ নামে একটি জলধারা রয়েছে। এই জলধারাটি থেকেই মন্দাকিনী নদীর উৎপত্তি। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে পঞ্চকূট পর্বত থেকে মন্দাকিনী নদী কৈলাসে এসে পৌঁছেছে।

[রামায়ণ ১.২৪.৮, ১০; মহা (k) ৬.৬.৪২; (হরি) ৬.৬.৪২; বায়ু পু. ৪২.৩২]

□ যক্ষরাজ কুবেরের নগরী অলকাপুরী কৈলাসে অবস্থিত। রাবণ অলকাপুরীতে গিয়ে কুবেরকে পরাজিত করেন।

কৈলাস যক্ষদের আবাসস্থল। কৈলাসের অপর নাম হেমকূট। *[রামায়ণ ৩.৩২.১৫; মহা (k) ২.৬.১১; ৩.৪১.৩৩; ৬.৬.৪১; ৬.৬.৫২; (হরি) ২.৬.১১; ৩.৩৬.৩৩; ৬.৬.৪১; ৬.৬.৫২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৪১.১৮]*

□ বানররাজ সুগ্রীবের আহ্বানে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সীতা-উদ্ধার অভিযানকে সফল করতে বহু অঞ্চল থেকে বানররা এসে সুগ্রীবের বাহিনী গঠনে অংশগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে কৈলাসে বসবাসকারী বানরদলও ছিল। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে বলা হয়েছে যে, সহস্রকোটি বানর কৈলাস পর্বত থেকে সেসময় সুগ্রীবের আহ্বানে কিষ্কিন্ধ্যায় এসে পৌঁছেছিল। *[রামায়ণ ৪.৩৫.২, ২২]*

□ রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে কৈলাস পর্বতকে দুর্গম এবং পাণ্ডুবর্ণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

[রামায়ণ ৪.৪৩.২০]

□ বনবাসের সময় দ্রৌপদীর অনুরোধে বিচিত্র বর্ণের দিব্য সুগন্ধী পুষ্পসংগ্রহের জন্য ভীম একবার কৈলাস পর্বতে আরোহণ করেন। সেখানে মণিমান্ প্রভৃতি যক্ষদের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল।

[মহা (k) ১.২.১৮২; (হরি) ১.২.১৮৪]

□ পুরাকালে শ্বেতকি নামে এক যজ্ঞপ্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি মহাদেবকে নিজের যজ্ঞের ঋত্বিকরূপে লাভ করার জন্য কৈলাস পর্বতে অবস্থান করে ভয়ঙ্কর তপস্যা করেছিলেন।

[মহা (k) ১.২২৩.৩৬; (হরি) ১.২১৬.৩৬]

□ কৈলাস পর্বতের উত্তরে মৈনাক পর্বতের অবস্থান। *[মহা (k) ২.৩.২, ৯; (হরি) ২.৩.২, ৯]*

□ মহাভারতের সভাপর্বে যক্ষপতি কুবেরের রাজসভার একটি বিবরণ পাওয়া যায়। বহু পর্বত ও নদী সেই সভায় দেবমূর্তি ধারণ করে অবস্থান করেন এবং কুবেরের উপাসনা করেন। এইসব পর্বতগুলির মধ্যে কৈলাস একটি।

[মহা (k) ২.১০.৩১; ৬.৬.৪৩; (হরি) ২.১০.৩০; ৬.৬.৪৩]

□ মহর্ষি ব্যাস কখনো কখনো কৈলাসে বাস করেছেন বলে খবর পাওয়া যায়।

[মহা (k) ২.৪৬.১৭-১৮; (হরি) ২.৪৪.৬১নং শ্লোক পরবর্তী পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

□ কৈলাসপর্বত রোগনিবারক বিভিন্ন ওষধির জন্য খুবই প্রসিদ্ধ। মহাভারতের সভাপর্বে বলবীর্য্য বর্ধনকারী কৈলাসজাত ঔষধের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সমস্ত ঔষধ উত্তর কৈলাস থেকে সংগ্রহ করে বিভিন্ন পার্বত্য জনজাতির রাজারা যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞের সময় উপহার দেন।

[মহা (k) ২.৫২.৬; (হরি) ২.৫০.৬]

□ ভগবান নারায়ণ কৈলাসে বাস করেন। বস্তুত কৈলাস শিবের আবাস বলেই দেবতার মাহাত্ম্য-সাযুজ্যে নারায়ণেরও আবাস বলে কথিত হয়েছে।

[মহা (k) ৩.১২.৪৩; (হরি) ৩.১১.৪২ নং শ্লোক পরবর্তী পাদটীকা দ্রষ্টব্য; মৎস্য পু. ৫৪.৩]

□ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সগর পুত্রকামনায় তাঁর দুই পত্নীকে নিয়ে কৈলাস পর্বতে কঠোর তপস্যা করেন। তাঁর তপস্যার সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান শিব স্বয়ং তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁকে পুত্রলাভের বর দান করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.১০৬.১০; (হরি) ৩.৯০.১১]

□ কুরুবংশীয় রাজা ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্তের সঙ্গে কৈলাস পর্বতের একটি যোগাযোগ আছে। ভগীরথ গঙ্গা আনয়নের লক্ষ্যে সিদ্ধিলাভের জন্য কৈলাস পর্বতে কঠোর তপস্যা করে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব গঙ্গা নদীকে জটায় ধারণ করে তাঁকে মর্ত্যে অবতরণ করার উপায় করে দেন।

[মহা (k) ৩.১০৮.২৫-২৬; (হরি) ৩.৯১.২৫-২৬]

□ মহাভারতের বনপর্বে কৈলাস পর্বতের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এর উচ্চতা ছশো যোজন এবং দেবতারা এই পর্বতে মাঝে মাঝেই আসেন। কৈলাসে কুবেরের অধীনস্থ একটি বিশাল নগরী আছে। যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, নাগ, সুপর্ণ ও গন্ধর্বরা সেখানে বাস করেন।

[মহা (k) ৩.১৩৯.১১-১২; (হরি) ৩.১১৫.১১-১২]

□ মহর্ষি লোমশ কৈলাস পর্বতে বাস করতেন বলে মহাভারতের বনপর্বে উল্লেখ পাওয়া যায়।।

[মহা (k) ৩.১৪০.৩; (হরি) ৩.১১৬.৩]

□ ভীমসেন দ্রৌপদীর অনুরোধে সুরভি পদ্মের সন্ধানে কৈলাস পর্বতে আসেন। সেখানে তিনি কৈলাসশৃঙ্গ এবং কুবের ভবনের নিকটে প্রবাহিত একটি মনোরম পার্বত্য নদী দর্শন করেন। এই নদী কুবেরের অধীনস্থ অঞ্চলে প্রবাহিতা এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীত মানুষ তো দূরের কথা স্বয়ং দেবতারাও সে নদী স্পর্শ করতে সাহস করেন না। কিন্তু ভীম পদ্ম সংগ্রহের উদ্দেশে কুবেরের অনুমতি ছাড়াই নদীতে নামেন। কুবেরের অনুগামী রাক্ষসগণের সঙ্গে কৈলাস পর্বতে সেই সময় ভীমের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল।

[মহা (k) ৩.১৫৩.১-২; ৩.১৫৪.২২; (হরি) ৩.১২৭.১-২; ৩.১২৮.৩৯]

□ বনবাসকালে পাণ্ডবরা বহু পবিত্র পর্বত ও নদী দর্শন করেছিলেন। এই সময় হিমালয়বাসী ঋষি আর্ষ্টিষেণ যুধিষ্ঠিরকে জানান যে, হিমালয় পর্বত শ্রেণীর উত্তরের সুউচ্চ পার্বত্য অঞ্চলটিই কৈলাস পর্বত নামে পরিচিত। জল ও বায়ু সেবনকারী মহাত্মাগণ আকাশপথে পূর্ণিমা ও প্রতিপদ বা অমাবস্যা ও প্রতিপদের সন্ধিক্ষণে এসে কৈলাস পর্বতের আরাধনা করেন। প্রতিপদ ও পঞ্চদশীর সন্ধিকালে যক্ষরাজ কুবের কৈলাসেই আবির্ভূত হন। এটি অপ্সরা, কিন্নর-কিন্নরী, মহানাগ প্রভৃতির বিচরণক্ষেত্র। মানুষ কখনোই কৈলাস পর্বতে যেতে পারে না, কারণ এটি দেবতাদের ক্রীড়াঙ্গন। একমাত্র সিদ্ধ দেবর্ষিগণই কৈলাস পর্বতের শৃঙ্গ অতিক্রম করতে পারেন। ভুলবশত কোনো সাধারণ প্রাণী কৈলাস অতিক্রম করলে কুবের-অনুচর রাক্ষসরা তাঁদের লৌহশূল দিয়ে আঘাত করেন।

[মহা (k) ৩.১৫৯.১৬-২৭; (হরি) ৩.১৩২.১৬-২৭]

□ ইন্দ্রপদ লাভের পর রাজা নহুষের কৈলাসপর্বতে বিচরণের কথা মহাভারতের উদ্যোগপর্বে পাওয়া যায়। *[মহা (k) ৫.১১.১১; (হরি) ৫.১১.১১]*

□ কৈলাস পর্বতটি গঙ্গামহাদ্বার (সম্ভবত গঙ্গা নদীর উৎপত্তিস্থল-এর পশ্চিমে অবস্থিত—এমন একটি উল্লেখ মহাভারতের উদ্যোগপর্বে পাওয়া যায়। *[মহা (k) ৫.১১১.২০; (হরি) ৫.১০৩.২০]*

□ মহর্ষি ভৃগু এক সময় কৈলাস পর্বতের শৃঙ্গে তপস্যা করেছিলেন। একবার ঋষি ভরদ্বাজ সেখানে সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য মহর্ষি ভৃগুর কাছে গিয়েছিলেন।

[মহা (k) ১২.১৮২.৬; (হরি) ১২.১৬৭.৬]

□ মহর্ষি অষ্টাবক্র ঋষি বদান্যের কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁকেই বিবাহ করবেন বলে স্থির করেন। মহর্ষি বদান্যকে তিনি এই বিবাহে সম্মতিদানের জন্য অনুরোধও করেন। মহর্ষি বদান্য অষ্টাবক্রকে কন্যাদান করতে সম্মত হন কিন্তু শর্ত রাখেন যে তাঁর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই অষ্টাবক্র তাঁর কন্যাকে বিবাহ করতে পারবেন। মহর্ষি বদান্যের সেই শর্তপূরণ করার জন্য অষ্টাবক্র একবার বহু পর্বত ভ্রমণ করেন। এই সময় তিনি কৈলাস পর্বতও প্রদক্ষিণ করেছিলেন।

[মহা (k) ১২.১৯.৫৪; (হরি) ১২.১৯.৫৪]

□ দক্ষরাজার কন্যা সুরভি (গোমাতা) একবার কৈলাস পর্বতে কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেন। ব্রহ্মার বরে সুরভি অমরত্ব লাভ করেন এবং তিনি ত্রিভুবনের উপর একটি বিশেষ লোকে বাস করার বর পান। এই লোকটি তাঁর নামানুসারেই গোলোক নামে পরিচিত হয়।

[মহা (k) ১৩.৮৩.২৮-২৯; (হরি) ১৩.৭২.২৮-২৯]

□ বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, মেরু পর্বতের দক্ষিণে কৈলাস পর্বতটি অবস্থিত।

[বায়ু পু. ৩৫.৯; ৩৬.২৪; ভাগবত পু. ৫.১৬.২৭]

□ পুরাণে কৈলাস পর্বতের মধ্যভাগে ছত্রিশ

যোজন পরিমাণ বিস্তৃত একটি মনোরম বনভূমির কথা পাওয়া যায়। সেটি বিভিন্ন প্রকারের দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষ এবং ভয়ঙ্কর জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ।

[বায়ু পু. ৩৮.৩৩]

□ বায়ু পুরাণে কৈলাস পর্বতের দীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে, কৈলাস পর্বত সমস্ত পুণ্যাত্মা ভগবদ্‌ভক্তজনের বাসভূমি।

কৈলাস পর্বতের পূর্বশৃঙ্গে দশটি গন্ধর্ব নগরের অবস্থান। সুবাহু, হরিকেশ, চিত্রসেন, জর প্রমুখ গন্ধর্বরা এইসব নগরের অধিপতি। আর কৈলাসের পশ্চিম শৃঙ্গে রয়েছে একাধিক যক্ষের ভবন। এছাড়াও সেখানে ত্রিশটি সমৃদ্ধ মহাযক্ষ-গৃহ রয়েছে। মহামালী, সুমন্ত্র প্রভৃতি এইসব মহাযক্ষ গৃহের অধিপতি। কৈলাস পর্বতের দক্ষিণে হিমালয় পর্বতের অবস্থান। *[বায়ু পু. ৪১.১-২৬]*

□ পুরাণে মন্দাকিনী নদীর গতিপথ বর্ণনা করতে গিয়ে কৈলাসের প্রসঙ্গ এসেছে। বলা হয়েছে যে, পঞ্চকূট পর্বত থেকে মন্দাকিনী নদী কৈলাসে এসে পৌঁছেছে। *[বায়ু পু. ৪২.৩২]*

□ কৈলাস পর্বতের পাদদেশে মন্দ নামক জলধারা এবং সেখান থেকে মন্দাকিনী নদীর উৎপত্তির কথা বার বার বলা হয়েছে পুরাণে। কৈলাস পর্বতের উত্তর-পূর্বে চন্দ্রপ্রভ নামে একটি রত্নমণ্ডিত পর্বত অবস্থিত। কৈলাসের দক্ষিণ-পূর্বে সূর্যপ্রভ নামে একটি পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে। কৈলাসের দক্ষিণে ধাতুময় দুর্গম এবং ভয়ঙ্কর জীবজন্তু অধ্যুষিত বৈদ্যুতগিরি অবস্থিত। বৈদ্যুতগিরির পাদদেশে মানস সরোবর অবস্থিত। কৈলাসের পশ্চিমে শ্রীমান পর্বতের অবস্থান। উত্তরে গৌর গিরির অবস্থান।

[বায়ু পু. ৪৭.১-২৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.১-৫]

□ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কৈলাস পর্বত তথা কৈলাস শিখরের একটি বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে, কৈলাসের শৃঙ্গে মহাদেবের অবস্থান। সমগ্র শিখরটি বিভিন্ন প্রকার মণি-মুক্তায় পরিপূর্ণ। সূর্যের কিরণে এটিকে গলিত সোনার মত মনে হয়। এখানে চতুর্দিকে মনোরম বৃক্ষ এবং লতার সমাহার। বিভিন্ন ধরনের হাঁস এবং অনান্য জলচর প্রাণী কৈলাসে অবস্থিত হ্রদগুলিতে বিচরণ করে। সিদ্ধ ও চারণগণ এবং কিন্নররা কৈলাসে ভ্রমণ করেন। সেখানে সর্বক্ষণই বীণার মধুর তান শোনা যায়।

মহাদেব এবং তাঁর অনুচরেরা কৈলাস পর্বতে ক্রীড়া করেন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৫.২৪-৪০; মৎস্য পু. ১২১.১-২১]*

□ কৈলাস পর্বতে ঋষি মাতঙ্গের মাহাত্ম্য-ধন্য একটি পবিত্র হ্রদ রয়েছে। এই হ্রদের জলের স্পর্শে পক্ষীরাও স্বর্গ সমান উচ্চতায় উড়তে পারে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৩.৩৬]*

□ ভগবান শ্রীহরি যখন নরসিংহ রূপ ধারণ করে অসুররাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন তখন দৈত্যরাজের শবদেহের পতনের সময়ে শবদেহের ভারে সমস্ত পৃথিবী বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। এই সময় কৈলাস পর্বতও কম্পিত হয়। *[মৎস্য পু. ১৬৩.৮৫]*

□ মানস সরোবরের ২৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত কৈলাস পর্বত। এটি তিব্বতে কাংগ্রিনপোচে (Kangrinpoche) নামে পরিচিত। অনেকে কুয়েনলুন পর্বতের সঙ্গে কৈলাসকে একাত্মক করে দেখেন। তবে এ ধারণা সম্ভবত সঠিক নয়।

তিব্বত মালভূমির নদী ব্যবস্থার অন্তর্গত চারটি প্রধান নদী যেমন—সিন্ধু, শতদ্রু, কার্নালি এবং ব্রহ্মপুত্র কৈলাস পর্বতজাত।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মেরু পর্বতের দক্ষিণে কৈলাসের অবস্থান। তবে অনেকে আবার মেরু পর্বতটিকেই কৈলাস বলে মনে করেন।

[GDAMI (N.L. Dey) p. 82-83; J.P. Mittal; History of Ancient India; New Delhi; Atlantic; 2006; p. 190]

□ বর্তমান তিব্বতের পশ্চিমতম প্রদেশ ঙগারি (Ngari) -র দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কৈলাস পর্বত। বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু এবং বোনপা (Bonpa) নামক তিব্বতি ধর্মের মানুষের কাছে কৈলাস অত্যন্ত পবিত্র বলে বিবেচিত হয়।

[P.Chamaria; Kailash Manasarovar, New Delhi; Abhinav Publications; 1996; 54-55]

কৈলাসক কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি মাতলির কাছে পাতালে অবস্থিত ভোগবতী পুরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে সেখানে বসবাসকারী যেসব প্রধান নাগের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কৈলাসক তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৫.১০৩.১১; (হরি) ৫.৯৬.১১]

কৈলাসগিরিবাসী শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। মহাকাব্য-পুরাণে প্রায় সর্বত্র বর্ণিত হয়েছে যে

ভগবান শিব কৈলাস পর্বত শিখরে বসবাস করেন। সেই পৌরাণিক ভাবনা থেকেই তাঁর এই নাম। *[মহা (k) ১৩.১৭.১০৯; (হরি) ১৩.১৬.১০৯]*

কৈলাসেশ্বরতীর্থ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রখ্যাত শৈবতীর্থ। যে পুণ্যার্থী শিপ্রানদীতে স্নান ক'রে কৈলাসেশ্বর শিবকে প্রণাম করে—তার সকল পাপ দূর হয়।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ৩১.৭৯-৮০]

কৈশিক$_1$ যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু, যদুর পুত্র ক্রোষ্টু। ক্রোষ্টুর অন্যতম বংশধর জ্যামঘ বিদর্ভদেশে গিয়ে নতুন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তাঁর পুত্র বিদর্ভের নামানুসারে জ্যামঘের সেই নতুন রাজ্যটির নাম হয় বিদর্ভ। বিদর্ভের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ক্রথ, কনিষ্ঠ কৈশিক। কৈশিকের পুত্র চেদি বা চিদি, চেদি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বিষ্ণু পুরাণের কোনো কোনো স্থানে এবং বায়ু পুরাণে কৈশিককে কৌশিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। *[দ্র. ক্রথ$_1$]*

[বিষ্ণু পু. ৪.১২.১৪-১৫; মৎস্য পু. ৪৪.৩৬-৩৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭০.৩৭; বায়ু পু. ৯৫.৩৭-৩৮]

কৈশিক$_2$ মহাভারতের খিল পাঠ হরিবংশ পুরাণে কৃষ্ণের সমসময়ে বিদর্ভদেশে বসবাসকারী ক্রথ এবং কৈশিক নামে দুই ভাইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিদর্ভ মূলত ভীষ্মকের শাসনাধীন হলেও হরিবংশে বিদর্ভদেশের অধিবাসী এই দুই বিশিষ্ট জনের নাম উল্লিখিত হয়েছে রাজোপাধি যুক্ত করেই। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, কৃষ্ণের সমসাময়িক এই ক্রথ-কৈশিক হয়তো ক্রোষ্টুর বংশ-পরম্পরায় বিদর্ভের দুই পুত্র ক্রথ-কৈশিকের বংশধর। তাঁদের 'রাজা' বলে সম্বোধন করায় মনে হয় যে, ভোজ রাজন্যেরা যেহেতু মথুরার যদু-বৃষ্ণি-অন্ধকদের মতোই সংঘশাসনে বিশ্বাস করতেন, সেক্ষেত্রে বিদর্ভদেশেও সংঘরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো থাকা অসম্ভব নয়। আর সংঘরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংঘপ্রধানরা যেমন 'রাজা' উপাধি ব্যবহার করতেন ঠিক তেমনই ক্রথ কৈশিকও 'রাজা' বলে উল্লিখিত হয়েছেন।

হরিবংশ পুরাণের একটি শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে যে, কৈশিক ছিলেন বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের পিতা তথা রুক্মীর পিতামহ। তবে রুক্মিণীর স্বয়ংবর উপলক্ষে বিদর্ভ দেশের শাসনতন্ত্রের যে বিবরণ আমরা পাই তাতে জরাসন্ধের সঙ্গে মিত্রতার সুবাদে ভীষ্মককে বিদর্ভদেশে প্রায় একনায়ক রাজার ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। জরাসন্ধের জামাতা কংসও আপন পিতা উগ্রসেনকে রাজপদ থেকে সরিয়ে মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে সংঘরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যেই একরকম একনায়ক হয়ে বসেছিলেন। ভীষ্মকও কৈশিকের রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব করে বিদর্ভ দেশে অনুরূপ স্বৈরতন্ত্র কায়েম করেছিলেন বলে মনে হয়। ভীষ্মক আপন পিতা কৈশিককে কংসপিতা উগ্রসেনের মতো গৃহবন্দি করে রাখেননি, কিন্তু ভীষ্মকের রাজত্বকালে ক্রথ-কৈশিক দুজনেরই রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেকখানি কমে যায়। তাঁরা বসবাসও করতেন বিদর্ভের রাজধানী কুণ্ডিনপরের বাইরে। ক্রথ-কৈশিকের অবস্থা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাঁরা ভীষ্মকের মতো কট্টর জরাসন্ধপন্থী তো ছিলেনই না, বরং নিজেদের রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ায় মনে মনে যথেষ্ট বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আর তা স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, যখন হরিবংশ পুরাণ জানায় যে, রুক্মিণীর স্বয়ংবরের খবর পেয়ে কৃষ্ণ বিদর্ভে এলেন এবং রাজধানী কুণ্ডিনপুরে না গিয়ে তিনি অতিথি হয়ে উঠলেন কৈশিকের বাড়িতে। আর কৈশিক যেমন ভাবে কৃষ্ণকে মহাসমারোহে রাজেন্দ্র পদে অভিষিক্ত করলেন এবং 'কৃষ্ণই স্বয়ং বিষ্ণু'—একথা স্বীকার করে তাঁর মাহাত্ম্যখ্যাপন করলেন এবং তাৎপর্য্যপূর্ণভাবে সেই অভিষেক সভায় যেভাবে অলৌকিকভাবে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের সমাগম হল—তাতে অলৌকিকতার অংশটুকু বাদ দিলে ভীষ্মক-জরাসন্ধের মিত্রশক্তির বিপরীতে ক্রথ-কৈশিক যে কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে এক নতুন রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে চান—সেই সত্যটিই প্রকট হয়ে ওঠে।

[হরিবংশ পু. ২.৪৮.৩৮, ৪৫-৪৬; ২.৫০.১-৯১]

□ মহাভারতের সভাপর্বে কৃষ্ণ আপন শ্বশুর ভীষ্মক রাজার প্রভাব প্রতিপত্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, বিদর্ভরাজ ভীষ্মক আপন প্রতাপে ভোজবংশজাত ক্রথ-কৈশিকদের নিজের পদানত করেছিলেন—

বিদ্যাবলাদ্ যো ব্যজয়ৎ স পাণ্ড্যক্রথকৈশিকান্।

মহাভারতের এই শ্লোকটিতে 'কৈশিক' শব্দটি বহুবচনে, ব্যবহৃত হওয়ায় আমাদের অনুমান আরও দৃঢ় হয় যে, বিদর্ভের পুত্র কৈশিকের কোনো বংশধরকেই হয়তো হরিবংশে রাজা কৈশিক নামে

উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি হরিবংশ পুরাণ মতে ভীষ্মকের পিতাও বটে। বিদর্ভদেশের প্রাচীন রাজপুত্র কৈশিকের বংশধররা কৈশিক নামক গোষ্ঠী হিসেবেই উল্লিখিত হতেন। ভীষ্মকের পিতা কৈশিক সেই গোষ্ঠীরই রাজোপাধিধারী সংঘমুখ্য ছিলেন। কৈশিকের পুত্র ভীষ্মক তাঁর ক্ষমতা খর্ব করে জরাসন্ধের সহায়তায় বিদর্ভদেশে একনায়ক রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ২.১৪.২১; (হরি) ২.১৪.২১]

কোকামুখতীর্থ একটি পবিত্র তীর্থ। ভাগবত পুরাণে 'কোকামুখ' নামটি 'গোকামুখ' বলে লিখিত হয়েছে এবং এখানে একটি পর্বত বলেই এই তীর্থের পরিচয়। এটি কোকা নদীর উৎপত্তিস্থল। কোকামুখতীর্থে স্নান করলে জাতিস্মরত্ব লাভ করা যায়। *[মহা (k) ৩.৮৪.১৫৮; (হরি) ৩.৬৯.১৫৮; ভাগবত পু. ৫.১৯.১৬]*

□ কোকামুখতীর্থে অঞ্জলিকাশ্রম নামে একটি স্থান রয়েছে। সেখানে শাকাহারী হয়ে কৌপীন পরিধান করে স্নান করলে বিশেষ পুণ্যলাভ হয়।

[মহা (k) ১৩.২৫.৫২; (হরি) ১৩.২৬.৫২]

□ বরাহ পুরাণে একটি কাহিনীর মাধ্যমে কোকামুখতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। কোকামুখ বিষ্ণুক্ষেত্র রূপে পরিচিত। পুরাকালে কোকানদীতে একটি মাছের আবাস ছিল। একদিন এক ব্যাধের বড়শির আঘাতে সে আহত হয়। তবে আহত হলেও ব্যাধের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে সে জল থেকে মাটিতে এসে পড়ে। তখন এক শিকারী শ্যেন পক্ষী মাছটিকে নখের আগায় গেঁথে নিয়ে উড়ে যায়। তবে দ্রুত মাছটিকে নিয়ে উপরের দিকে উঠে যাওয়ার সময় নখ থেকে আলগা হয়ে মাছটি আবারও মাটিতে পড়ে যায়। কোকাক্ষেত্রের মাটি স্পর্শ করা মাত্রই মাছ অপরূপ এক রাজকুমারের রূপ লাভ করল।

অন্যদিকে পূর্বোক্ত ব্যাধের পত্নী একদিন শিকার করা মাংস নিয়ে যাওয়ার সময় পথের মধ্যে এক ক্ষুধার্ত চিল পক্ষিণী (চিল্লী) সেই শিকার করা পশুর অঙ্গ থেকে মাংস ছিঁড়ে নিয়ে যায়। ক্রুদ্ধ ব্যাধ-পত্নীর বাণের আঘাতে চিল্লী প্রাণত্যাগ করে। বাণবিদ্ধ চিল্লী আকাশ থেকে কোকামুখে মাটিতে পড়ে। মাটিতে পড়ামাত্রই সেই চিল্লী বা চিল এক অপরূপ রাজকুমারীর রূপ লাভ করল।

সেই রাজকুমার এবং রাজকুমারী যৌবনে পদার্পণ করলে তাঁদের মধ্যে প্রণয় সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। তাঁদের বিবাহ হয়। রাজকুমার-রাজকুমারীর দাম্পত্য জীবন সুখেই কাটছিল। হঠাৎ একদিন রাজকুমার প্রবল শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হলেন। রাজবৈদ্যের বহু চিকিৎসা সত্ত্বেও তিনি আরোগ্য লাভ করলেন না। চিন্তিত রাজকন্যা রাজকুমারের কাছেই তাঁর দুরারোগ্য ব্যাধির কারণ এবং সম্ভাব্য উপশমের পথ জানতে চাইলেন। রাজকুমার জানালেন— একমাত্র কোকামুখতীর্থে গিয়েই তিনি তাঁর ব্যাধির গোপন তত্ত্ব প্রকাশ করতে সক্ষম। রাজকুমার ও রাজকুমারী বহু পথ অতিক্রম করে কোকামুখ তীর্থে পৌঁছালেন। সেখানে অবস্থিত এক প্রাচীন বিষ্ণু মন্দিরের পাশে পড়ে থাকা মাছের অস্থি দেখিয়ে রাজকুমার জানালেন পূর্ব জন্মের কথা। শ্যেনপক্ষীর নখের আঘাতে মাছটির মস্তকে বেদনার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই পূর্বজন্মের আঘাতই এ জন্মেও রাজকুমারের শিরঃপীড়ার কারণ। এবার রাজকুমারীও তাঁর পূর্বজন্মের ইতিহাস প্রকাশ করলেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন যে, কোকাতীর্থে আগমনের ফলেই তাঁদের পূর্বজন্মের কথা স্মরণে এসেছে।

এরপর রাজদম্পতি কোকাতীর্থে বিষ্ণুর আরাধনা এবং প্রচুর দানধ্যান করলেন। বিষ্ণুর কৃপায় তাঁরা শ্বেতদ্বীপে স্থান লাভ করেছিলেন। এভাবে পূর্বজন্মে তির্যকযোনিজাত হয়েও কোকামুখতীর্থ দর্শনের ফলে তাঁরা মুক্তি লাভ করেছিলেন। *[বরাহ পু. ১২২.১-৯৮]*

□ পণ্ডিত D.C. Sircar মনে করেন— কোক শব্দের অর্থ চক্রবাক পক্ষী। যে নদীর উৎসক্ষেত্র বা 'মুখ' চক্রবাক-পক্ষীর মুখের মতো ছুঁচোলো, সেই নদীতীর্থই কোকা মুখ তীর্থ নামে পরিচিত। সরকার কোকানদীকেই আধুনিক কোশী নদীরূপে চিহ্নিত করেছেন। কোশী নদীর উৎপত্তিস্থল নেপাল। সেখান থেকে এটি বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নেপালে কোশী নদীটি সান-কোশী (Sun-Kosi) নামে পরিচিত। নেপালে সান-কোশী নদীর তীরে অবস্থিত বর্তমান বরাহ-ছত্র (Barah-Chatra) অঞ্চলটিকেই প্রাচীন কোকামুখতীর্থ বলে মনে করা হয়। 'ছত্র' শব্দটি সংস্কৃত 'ক্ষেত্র' থেকেই উদ্ভূত বলে পণ্ডিতরা মতপ্রকাশ করেন। *[GAMI (Sircar) p. 279]*

কোকিলক স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অনুচর, একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৭৩; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

কোকিলিকা *[দ্র. কৌকুলিকা]*

কোঙ্কণ দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের একটি জনপদ। এর আরেক নাম কোঙ্ক।

[মহা (k) ৬.৯.৬০; (হরি) ৬.৯.৬০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৫৯]

□ ভগবান ঋষভদেব সংসার ত্যাগ করে মুক্তযোগ অবলম্বন করে বহুদেশ ভ্রমণ করেছিলেন। সেই ভ্রমণের সময় তিনি কোঙ্কণ দেশেও যান। *[ভাগবত পু. ৫.৬.৭]*

□ পুরাণে শ্রাদ্ধকার্যে কোঙ্কণ দেশের অধিবাসীদের বর্জন করতে বলা হয়েছে। যা থেকে বোঝা যায় যে, আর্যায়ণের কালে অনান্য দাক্ষিণাত্য জনপদের মতোই কোঙ্কণকে হীন চোখে দেখা হত। *[মৎস্য পু. ১৬.১৬]*

□ বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের মুম্বই শহরের দক্ষিণে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকুলের একটি দীর্ঘ অংশ। এটি কোঙ্কণ উপকুল নামেই অধিক পরিচিত। মহারাষ্ট্র ছাড়াও গোয়া এবং কর্ণাটকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল কোঙ্কণ উপকুলের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমঘাট পর্বত এবং আরব সাগরের মধ্যবর্তী সমস্ত ভূ-ভাগটিই কোঙ্কণ নামে পরিচিত। *[TIM (Mishra) p. 109-110; GDAMI (Dey) p. 103]*

কোটবী মৎস্য পুরাণ এবং দেবীভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, দেবী ভগবতী কোটিতীর্থে দেবী কোটবী নামে বিরাজমানা।

[দেবীভাগবত পু. ৭.৩০.৬৮; মৎস্য পু. ১৩.৩৭]

কোটরক কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত নাগ। ইন্দ্রের সারথি মাতলির কাছে পাতালে অবস্থিত ভোগবতী পুরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে নারদ সেখানে বসবাসকারী যে সব প্রধান নাগের নাম উল্লেখ করেছেন কোটরক তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ৫.১০৩.১২; (হরি) ৫.৯৬.১২]*

কোটরা মহাভারতের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে এঁকে কেতকী নামে উল্লেখ করা হয়েছে। স্কন্দকার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.১৪; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোকসংখ্যা ১৪ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

কোটরা একজন মাতৃকা বলে ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি ছিলেন বাণাসুরের মা। বাণাসুরের সঙ্গে যখন বাসুদেব-কৃষ্ণের যুদ্ধ হয়েছিল, তখন পুত্রের পরাজয় নিশ্চিত বুঝে এবং পুত্রকে রক্ষা করার জন্য কোটরা বিবস্ত্রা হয়ে আলুলায়িত কেশে কৃষ্ণের কাছে পুত্রের প্রাণভিক্ষা করতে আসেন। কিন্তু কোটরার এইরূপ অবস্থা যাতে দেখতে না হয়, তাই কৃষ্ণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। আর সেই সামান্য অবসরের সুযোগ নিয়ে বাণাসুর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান এবং নিজের প্রাসাদে আত্মগোপন করেন।

[ভাগবত পু. ১০.৬.২৮; ১০.৬৩.২০-২১]

কোটিকাস্য শিবি দেশের রাজা সুরথের পুত্র। তাঁর সম-সময়ে সিন্ধু-সৌবীর এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল জয়দ্রথের। ফলে রাজপুত্র হলেও জয়দ্রথের সামনে কোটিকাস্যের ব্যবহার কতকটা অনুগত অনুচরের মতোই ছিল। সিন্ধুরাজ জয়দথ একবার বিবাহ করার ইচ্ছায় শাল্বদেশের পথে যাত্রা করেছিলেন। সঙ্গে অন্য অনেক অনুগত রাজা-রাজপুত্রের সঙ্গে কৌটিকাস্যও চলছিলেন জয়দ্রথের সঙ্গে। পথে কাম্যকবন। পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে নিয়ে সেসময় কাম্যক বনে বাস করছিলেন। জয়দ্রথ যখন পাণ্ডবদের কুটীরের পাশ দিয়ে চলেছেন, তখন পাণ্ডবরা সকলে মৃগয়ায় গিয়েছেন, একা দ্রৌপদী দাঁড়িয়ে আছেন কুটীরের আঙিনায়, দ্রৌপদীর রূপ দেখে জয়দ্রথ মুগ্ধ হয়ে কোটিকাস্যকে পাঠালেন এই অপরূপ সুন্দরীর পরিচয় জানার জন্য। বস্তুত দ্রৌপদীকে দেখামাত্রই তাঁকে অপহরণ করার দুরভিসন্ধি জেগেছে জয়দ্রথের মনে। জয়দ্রথের দূত হয়ে কোটিকাস্য এলেন দ্রৌপদীর সামনে, যেন শৃগাল এসে দাঁড়াল ব্যাঘ্রবধূর সামনে—

ক্রোষ্টা ব্যাঘ্রবধূমিব।

দ্রৌপদীর পরিচয় বিশদে জানার পর জয়দ্রথ যখন দ্রৌপদীকে হরণ করলেন, তখনও

কোটিকাস্য জয়দ্রথের সহায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে ভীমের হাতে কোটিকাস্যের মৃত্যু হয়।

[মহা (k) ৩.২৬৪.১২-১৬; ৩.২৬৫.১-৬; ৩.২৬৬.৪; ৩.২৬৭.২; ৩.২৭১.৫; (হরি) ৩.২১৯.১২-১৭; ৩.২২০.১-৬; ৩.২২১.৫; ৩.২২২.২; ৩.২২৫.২৪-২৬]

কোটিতীর্থ১ পঞ্চনদ অঞ্চলের একটি বিখ্যাত তীর্থ। মহাভারতের বনপর্বে বলা হয়েছে যে, কোটিতীর্থ দর্শনে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। এখানে বামনদেব অবস্থান করেন। *[মহা (k) ৩.৮৩.১৬-১৭; (হরি) ৩.৬৮.১৬-১৭; বামন পু. ৩৪.২৮]*

কোটিতীর্থ২ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি তীর্থ। এটি কুরুক্ষেত্রের কোনো একটি প্রান্তে অবস্থিত কারণ মহাভারতের বনপর্বে কুরুক্ষেত্রের দ্বারপাল যক্ষ মচক্রুককে প্রণাম করার পর কোটিতীর্থে অবগাহন করার কথা বলা হয়েছে।

এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে কোটীশ্বর মহাদেবের দর্শন করলে কোটি যজ্ঞের ফল লাভ হয় একথা বামন পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। *[মহা (k) ৩.৮৩.২০০; (হরি) ৩.৬৮.২০০; বামন পু. ৩৬.৫৯]*

□ হরিয়ানার কার্ণাল জেলার অন্তর্গত বোরশ্যাম (Borshyam) গ্রামের নিকটে কোটিতীর্থ নামে একটি স্থান বর্তমানেও রয়েছে। এটিই প্রাচীন কোটিতীর্থ বলে পণ্ডিতরা মনে করেন।

[C.V. vaidya, Epic India : India As Described in The Mahabharata and The Ramayana, New Delhi, Asian Educational Services, 2001, p. 91]

কোটিতীর্থ৩ গঙ্গাদ্বারের নিকটবর্তী একটি তীর্থ। মহাভারতের বনপর্বে বলা হয়েছে এই তীর্থে স্নান ও দান করলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। কোটিতীর্থে একরাত বাস করলে সহস্র গোদানের সমান পুণ্যলাভ হয়।

[মহা (k) ৩.৮৪.২৭-২৮; (হরি) ৩.৬৯.২৭-২৮]

কোটিতীর্থ৪ মথুরাক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থক্ষেত্রে কার্তিকেয়র পূজা করলে বিশেষ ফল লাভ হয়।

বরাহ পুরাণে বলা হয়েছে যে, কোটিতীর্থে স্নান করলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে।

[মহা (k) ৩.৮৪.৭৮; (হরি) ৩.৬৯.৭৮; বরাহ পু. ১৫২.৬২, ১৫৪.২৯]

কোটিতীর্থ৫ নর্মদা নদীর তীরবর্তী একটি তীর্থ। এটি নর্মদার উত্তর তীরে অবস্থিত। মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে যেই ক্ষেত্রে একসময় ভগবান শিবের হাতে কোটি সংখ্যক দানব নিহত হয়েছিল বলেই এর নাম কোটিতীর্থ—

কোটির্বিনিহতো তত্র তেন কোটীশ্বরঃ স্মৃতঃ॥

[মহা (k) ৩.৮২.৪৯; (হরি) ৩.৬৭.৬৯; মৎস্য পু. ১৯১.৭-৯]

□ স্কন্দ পুরাণে কোটিতীর্থের মাহাত্ম্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তীর্থক্ষেত্রটি শ্রাদ্ধকার্যের জন্য অত্যন্ত উৎকৃষ্ট।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তী) ২২.৪-১৫]

□ পণ্ডিতরা অনেকেই মনে করেন উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দির চত্বরে যে জলাশয়টি রয়েছে সেটিরই প্রাচীন নাম কোটিতীর্থ।

[Diana L. Eck, India : A Sacred Geography, New York: Harmony Books, 2012, p. 239]

কোটিতীর্থ৬ প্রয়াগ ক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি তীর্থ। এখানে প্রাণত্যাগ করলে বহু বছর স্বর্গসুখ ভোগ করা সম্ভব হয়—

কোটিতীর্থং সমাসাদ্য যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
কোটিবর্ষসহস্রানাং স্বর্গলোকে মহীয়তে॥

এই তীর্থে দেবী সতী কোটবী নামে পূজিতা।

[মৎস্য পু. ১৩.৩৭; ১০৬.৪৪-৪৫; বায়ু পু. ১১২.৩৩]

কোটিতীর্থ৭ সরস্বতী নদীর তীরবর্তী পৃথুদক ক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি তীর্থ। ভগবান শিব এই তীর্থে পূজিত হন। *[বামন পু. ৫১.৫৩; ৮৪.১১-১৫]*

কোটিতীর্থ৮ গয়া ক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি তীর্থ।

[অগ্নি পু. ১১৬.৬]

কোটিশ জনমেজয়ের সর্পসত্রে যেসব বাসুকি বংশীয় নাগ ভস্মীভূত হয়েছিল, কোটিশ তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ১.৫৭.৫; (হরি) ১.৫২.৫]*

কোটীশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত অন্যতম তীর্থ। এই তীর্থে ভগবান শিবের উপাসনা করলে মহা পুণ্যফল লাভ হয়। *[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচন কাণ্ড) পৃ. ৫৪; লিঙ্গ পু. ১.৯২.১৫৭]*

কোণা অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। কোণা সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৭৯.২৮]*

কোদ্রব [দ্র. কেশ]

কোধনু বসুদেব এবং সৌতি অপুত্রক বস্তাবনিকে কতগুলি পুত্র দত্তক দিয়েছিলেন। বস্তাবনির সেই দত্তক পুত্রদের মধ্যে একজন হলেন কোধনু।

[বায়ু পু. ৯৬.১৯০]

কোপচয় পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি কোপচয়ের বংশ তার মধ্যে একটি। ইনি অঙ্গিরার বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৬.২১]

কোপবেগ ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সভায় অবস্থানকারী জনৈক ঋষি।

[মহা (k) ২.৪.১৬; (হরি) ২.৪.১০নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ৫, পৃ. ২৬]

কোবিদ ভাগবত পুরাণ অনুসারে কুশদ্বীপের অধিবাসীরা কয়েকটি গণে বিভক্ত ছিলেন। সেই গণগুলির মধ্যে কোবিদ একটি।

[ভাগবত পু. ৫.২০.১৬]

কোবিদারী অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। কোবিদারী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন। [মৎস্য পু. ১৭৯.৩০]

কোরকৃষ্ণ বশিষ্ঠের বংশধারায় একজন বংশপ্রবর্তক ঋষি। [মৎস্য পু. ২০০.৮]

কোরঞ্জ পৌরাণিক শাকদ্বীপের মধ্যে যে কয়টি বর্ষ পর্বত রয়েছে, কোরঞ্জ তার মধ্যে একটি পর্বত।

[বায়ু পু. ৪৩.১৪]

কোল১ কৌশিক গোত্রীয় বিশ্বামিত্রের বংশজাত ধর্মপরায়ণ ঋষিদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১১৮]

কোল২ বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, দেবতাদের কুকুর দেবশুনী সরমার গর্ভজাত। সারমেয় পুত্রদের মধ্যে কোল একজন। [বায়ু পু. ৬৯.৩২২]

কোল৩ পুরাণে বর্ণিত অন্যতম সঙ্কর জনজাতি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত বর্ণসঙ্করগুলির মধ্যে অন্যতম সঙ্কর জাতি হল তীবর। এরা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ জনজাতি বলেই বিবেচিত ছিলেন। এঁরা পেশায় মূলত ব্যাধ। এই তীবর জাতীয় পুরুষের ঔরসে তৈলকার জাতির স্ত্রী গর্ভে জাত সন্তানরা 'লেট' নামক বর্ণসঙ্কর হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। এই লেট জাতীয় পুরুষ এবং তীবর কুলজাত কন্যা যে বর্ণসংকর জাতিগুলি উৎপন্ন করেছিল, কোল তাদের মধ্যে অন্যতম সঙ্করজাতি।

[ব্রহ্মবৈবর্ত পু. (ব্রহ্মখণ্ড) ১০.১০০-১০১]

□ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কোলদের নিম্নশ্রেণীর বর্ণসঙ্কর বলে উল্লেখ করা হলেও মহাভারতের খিলপাঠ হরিবংশে এঁদের ক্ষত্রিয় বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। হরিবংশপুরাণ মতে, যযাতির দ্বিতীয় পুত্র তুর্বসুর বংশধারায় রাজা মরুত্ত ছিলেন নিঃসন্তান। বংশরক্ষার জন্য তিনি নিজের জ্ঞাতি পুরুবংশীয় দুষ্যন্তকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। দুষ্যন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্র ভরত মূল পুরুরাজবংশের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। অপরদিকে দুষ্যন্তের যে পুত্ররা তুর্বসুর বংশধর হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন, হরিবংশপুরাণ মতে, তাঁদের নাম যথাক্রমে—পাণ্ড্য, কেরল, কোল এবং চোল—

পাণ্ড্যশ্চ কেরলশ্চৈব কোলশ্চোলশ্চ পার্থিবঃ।

এই দুষ্যন্তপুত্র কোল থেকেই কোল জনজাতির উদ্ভব বলে হরিবংশপুরাণ জানিয়েছে।

[হরিবংশ পু. ১.৩১.৮২-৮৫]

□ সংস্কৃত অভিধানগ্রন্থ শব্দকল্পদ্রুমে হরিবংশ পুরাণের নাম করে একটি শ্লোক উদ্ধার করে বলা হয়েছে যে, হৈহয়, তালজঙ্ঘের পাশাপাশি যবন ম্লেচ্ছ এবং অন্যান্য যেসব জাতিগুলি সগর রাজার হাতে পরাস্ত হয়ে ক্ষত্রিয় ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন—কোল তাঁদের মধ্যে অন্যতম একটি জনজাতি। তবে হরিবংশপুরাণের যে সংস্করণগুলি আমরা পাচ্ছি, সেখানে কোনো শ্লোকে 'কোল' নামটি পাওয়া যায় না। শক, যবন, পারদ, দরদ, চোল, কেরলের সঙ্গে যে জনজাতিটির নাম পাওয়া যায়—তার নাম কোলিসর্প—

শকা যবন-কাম্বোজাঃ পারদাশ্চ বিশাম্পতে।

কোলিসর্পাঃ সমহিষা দার্দ্ব্যাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ॥

এখন এই কোলিসর্পদেরই হরিবংশ পুরাণের কোনো সংস্করণে কোল বলে উল্লেখ করা হয়েছে কী না আর শব্দকল্পদ্রুম সেই পাঠের প্রমাণেই কোলদের সগররাজার হাতে পরাস্ত জাতি বলে চিহ্নিত করেছে কী না—তা গবেষণার বিষয়। তবে পুণের Bhandarkar Oriental Research Institute থেকে প্রকাশিত হরিবংশ পুরাণের Critical Edition এ 'কোলিসর্প'-এর পরিবর্তে যে পাঠান্তরগুলি উল্লিখিত হয়েছে— 'কোলসর্পাঃ',

কিংবা 'কোলস্পর্শাঃ'—তা থেকে কোল জনজাতির সঙ্গে এদের নামসাদৃশ্য স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। *[হরিবংশ পু. (Critical Ed.) ১.১০.৪১ (পাদটীকায় পাঠান্তর দ্রষ্টব্য); শব্দকল্পদ্রুম খণ্ড ২, পৃ. ২০৩-২০৪]*

□ বর্তমান বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশে, পশ্চিমবঙ্গের একাংশে মালভূমি অঞ্চলে যে কোল জনজাতি আজও ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছে, খুব সম্ভবত এঁরাই পৌরাণিকের বিবরণে বর্ণাশ্রমচ্যুত ক্ষত্রিয় বা নিম্নশ্রেণীর বর্ণসঙ্কর হিসেবে উল্লিখিত হয়েছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত হয়েছে যে, একসময় রাজা সুরথ শত্রু রাজাদের হাতে পরাস্ত হয়ে রাজ্য ছেড়ে বনে যেতে বাধ্য হন। এই শত্রু রাজাদের সম্পর্কে মার্কণ্ডেয় পুরাণ যে বিশেষণ ব্যবহার করেছে, তা হল—কোলাবিধ্বংসী—

বভুবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা ॥

'কোল' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল শূকর। আর 'অবি' অর্থাৎ মেষ। সেক্ষেত্রে 'কোলাবিধ্বংসী' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়—যে জাতির লোকজন মেষ এবং শূকরের মাংস ভক্ষণ করে। প্রসঙ্গত ছোটো নাগপুর মালভূমি অঞ্চলে যে কোল উপজাতি বাস করে, শূকর মাংস তাদেরও অন্যতম খাদ্য। মার্কণ্ডেয় পুরাণে কোলাবিধ্বংসী বলতে এই কোল উপজাতিদেরই বোঝানো হয়েছে কী না কিংবা কোনোভাবে এই জনজাতির নাম তাদের খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সম্পর্কিত কী না—তা অবশ্যই গবেষণাসাপেক্ষ। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৮১.৪]*

কোলবর্ণ একটি দক্ষিণ ভারতীয় জনপদ। *[বায়ু পু. ৪৫.১২৮]*

কোলাহল১ উত্তর-মধ্য ভারতের একটি পর্বত। মহাভারতের আদিপর্বে কোলাহল পর্বতকে জীবিত বা চেতনাশীল—অরৌৎসীচ্চেতনাযুক্তঃ —বলে কল্পনা করা হয়েছে। কামাসক্ত কোলাহল পর্বত একবার শুক্তিমতী নদীর সঙ্গে বলপূর্বক সঙ্গম করেন। সেই অপরাধে রাজা উপরিচরবসু কোলাহল পর্বতে প্রচণ্ড পদাঘাত করেছিলেন। এই পদাঘাতের ফলে পর্বতের গায়ে একটি রন্ধ্রের সৃষ্টি হয় সেই রন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে নির্গত হয়ে শুক্তিমতী নদী মুক্তি লাভ করেছিল। কোলাহল পর্বতের ঔরসে শুক্তিমতী নদীর গর্ভে একটি পুত্র ও গিরিকা নামে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। উপরিচরবসুর উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে শুক্তিমতী নদী অঙ্গীকার করেন যে, তাঁর গর্ভজাতা কন্যাটি ভবিষ্যতে রাজার পত্নী হবেন এবং পুত্র সন্তানটি হবেন সেনাপতি। *[মহা (k) ১.৬৩.৩৫-৪০; (হরি) ১.৫৮.৪৮-৫৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.২১; বায়ু পু. ৪৫.৯০]*

□ গয়াসুর কোলাহলপর্বতে সহস্র বৎসর ধরে এক কঠোর তপস্যা করেছিলেন। *[বায়ু পু. ১০৬.৪]*

□ পণ্ডিতদের আলোচনায় কোলাহল পর্বতের আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে দুটি ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। মহাভারতের তথ্য অনুযায়ী, উপরিচরবসুর রাজ্যের নিকটেই কোলাহল পর্বত অবস্থিত ছিল। উপরিচরবসু ছিলেন চেদি দেশের রাজা। প্রাচীন চেদি বলতে বর্তমানে মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ডের একটি অংশকে বোঝানো হত। প্রাচীন শুক্তিমতী নদীও পণ্ডিতদের মতে যমুনার অন্যতম উপনদী বর্তমান 'কেন' নদী, যা মধ্যভারত দিয়েই প্রবাহিত। এই সমস্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত বান্দের (Bandair) পর্বত শ্রেণীকেই প্রাচীন কোলাহল বলে চিহ্নিত করেন পণ্ডিতেরা।

দ্বিতীয় ধারণা অনুযায়ী অবশ্য গয়ার অন্তর্গত ব্রাহ্মণী পাহাড়টিই প্রাচীন কোলাহল পর্বত। সম্ভবত গয়াসুরের মাহাত্ম্যধন্য বিহারের গয়াক্ষেত্রের কারণেই গয়াসুরের তপোভূমি কোলাহল পর্বতকেও পণ্ডিতরা বিহারে অবস্থিত বলে মনে করেছেন। *[GDAMI (Dey) p. 101-102]*

কোলাহল২ পুরাণে বিভিন্ন কল্পে সংঘটিত ভয়ঙ্কর দেবাসুর সংগ্রামগুলিকে নানা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে দ্বাদশ সংগ্রামটি কোলাহল নামে পরিচিত। এই সংগ্রামে দেবতাদের হাতে দৈত্যরা পরাজিত হয়।

[মৎস্য পু. ৪৭.৫৩; বায়ু পু. ৯৭.৭৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭২.৭৬; অগ্নি পু. ২৭৬.২৪]

কোলাহল৩ যযাতির পুত্র অনুর বংশধারায় সভানরের পুত্র কোলাহল। পুরাণে এঁকে পরম বিদ্বান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোলাহলের পুত্রের নাম সঞ্জয়। *[মৎস্য পু. ৪৮.১১]*

কোলিক মহাভারতের উদ্যোগপর্বে যে বিড়ালোপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে, সেখানে কোলিক নামে এক বৃদ্ধ মূষিকের নাম উল্লিখিত হয়েছে। *[মহা (k) ৫.১৬০.৩৮; (হরি) ৫.১৪৯.৩৮]*

কোলিসর্প মহাভারতের অনুশাসনপর্বের উল্লিখিত একটি জনজাতির নাম। মহাভারতে এমন বেশ কয়েকটি জনজাতির নাম উল্লিখিত হয়েছে যারা আদতে বৈদিক সংস্কারপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় হলেও পরবর্তী সময়ে দুরাচারের কারণেই ব্রাহ্মণদের রোষে এঁরা জাতিচ্যুত হন এবং শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। মহাভারতে প্রাপ্ত উল্লেখ অনুযায়ী কোলিসর্পও এমনই একটি জনজাতি। *[দ্র. কোল্‌]*

[মহা (k) ১৩.৩৩.২২; (হরি) ১৩.৩২.২২]

কোল্লকপর্বত ভারতবর্ষের একটি পর্বত। এই পর্বতের আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিতরা একাধিক মতামত পোষণ করেছেন। পণ্ডিত Richard L. Thompson এর মতে, বর্তমান হরিয়ানার অন্তর্গত Mewat এ অবস্থিত কোল্ল (kolla) পর্বতটিই ভাগবত পুরাণে বর্ণিত কোল্লকপর্বত। তবে পুরাণে কোল্লক পর্বতকে ঋষভ, ঋষ্যমূক প্রভৃতি মধ্য-দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে উল্লেখ করায় এই পর্বতও মধ্য-দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত পর্বতশ্রেণী বলেই মনে হয়।

[Richard L. Thompson, The Cosmology of the Bhagavata Purana: Mysteries of the Sacred Universe, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2007; ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ৫.১৯.১৬]

কোশকরণ একটি পৌরাণিক জনপদ।

[মৎস্য পু. ১৬৩.৬৬]

কোশল উত্তর-মধ্য ভারতে অবস্থিত একটি প্রাচীন তথা সমৃদ্ধ জনপদ। বেদে এই জনপদের উল্লেখ না পাওয়া গেলেও ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে কোশলের কথা বলা হয়েছে। এটি ষোড়শ মহাজনপদগুলির অন্যতম। বিন্ধ্য পর্বতের কোলে সরযূ নদীর তীরে কোশলের অবস্থান। শতপথ ব্রাহ্মণ ও শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রে বৈদিক সোমযাগের অন্তর্গত অতিরাত্র যজ্ঞের একটি অনুষ্ঠানে কোশলের একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনি অত্নারের পুত্র এবং তাঁর নাম হৈরণ্যনাভ কৌশল্য। শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রে কাশী ও বিদেহর সঙ্গে একত্রে কোশলের নাম উচ্চারিত হয়েছে, যা থেকে এই প্রাচীন জনপদগুলির নৈকট্যের ধারণা পাওয়া যায়।

[শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩.৫.৪.৪; শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র ১৬.৯.১৩; ২৯.৬]

□ রামায়ণের আদিকাণ্ডে কোশলকে প্রাচুর্য সম্পন্ন ক্রমবর্ধমান জনপদরূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অযোধ্যা সেই কোশলের রাজধানী—

কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূত ধনধান্যবান্॥
অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা।

ইক্ষ্বাকু বংশীয় দশরথ ও তাঁর পুত্র রামচন্দ্র কোশল দেশ শাসন করেছিলেন। তবে সম্ভবত অযোধ্যা সমগ্র কোশলের রাজধানী ছিল না। প্রাচীন কোশল উত্তর ও দক্ষিণ এই দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। অযোধ্যা উত্তর কোশলের রাজধানী। রাজা দশরথ পুত্র সন্তান লাভের আশায় এক বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। ঋষি বশিষ্ঠ স্বয়ং সেই যজ্ঞের হোতা। বশিষ্ঠ, দশরথের মন্ত্রী সুমন্ত্রকে আদেশ করেছিলেন—সেই যজ্ঞে বিভিন্ন দেশের রাজা এবং গুণীজনদের আমন্ত্রণ জানাতে। সুমন্ত্রকে সশরীরে উপস্থিত হয়ে যে সব দেশের রাজাকে আমন্ত্রণ জানাতে বলা হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে কোশল একটি। প্রশ্ন ওঠে, তবে সুমন্ত্রের গন্তব্য কোশল কোন দেশ? খুব সম্ভবত এটি দক্ষিণ কোশল এবং সেখানকার রাজা ছিলেন ভানুমান। তিনি দশরথের শ্বশুর ও কৌশল্যার পিতা। পণ্ডিতরা মনে করেন যে, উত্তর কোশল বা মহাকোশলের অনেক ছোটো-বড়ো উপনিবেশ ছিল। দক্ষিণ কোশল তেমনই একটি উপনিবেশ। দশরথ ও কৌশল্যার বিবাহের মাধ্যমে উত্তর কোশল অযোধ্যার মধ্যে অধিগৃহীত হয়। মহাভারতে আবার পূর্ব কোশল নামে একটি জনপদের কথা পাওয়া যায়। এই পূর্ব কোশলের রাজা মগধরাজ জরাসন্ধের ভয়ে দক্ষিণ দিকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন, জরাসন্ধকে বধের উদ্দেশে মগধে যাওয়ার সময়ও পূর্ব-কোশল পার হন। সম্ভবত পূর্ব-কোশলও মহাকোশলের একটি উপনিবেশ।

পরবর্তীকালে আবার রামচন্দ্রকে দেখা যায় তাঁর দুই পুত্র লব ও কুশের জন্য কোশলকে দুটি ভাগে ভাগ করতে। একটি অংশের নাম উত্তর কোশল। দ্বিতীয়টি দক্ষিণ কোশল। উত্তর কোশল বা অযোধ্যার রাজা হন লব। আর কুশ দক্ষিণ কোশলের অধিপতি। তাঁর রাজধানীর নাম কুশস্থলী। তবে এই কুশস্থলী আর দ্বারকার পূর্বাবস্থান কুশস্থলী এক নয়। এটি বিহারে বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত।

পণ্ডিতরা অনেকে মনে করেন যে, দক্ষিণ কোশল দাক্ষিণাত্যে স্থাপিত আর্যজনপদগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। বর্তমান ছত্তিসগড়ের অন্তর্গত রায়পুর, বিলাসপুর ও উড়িষ্যার সম্বলপুর নিয়ে দক্ষিণ কোশল গড়ে উঠেছিল। আর উত্তর কোশল বা মহাকোশলের বিস্তার গোমতী থেকে গণ্ডক নদী ও নেপালের তরাই অঞ্চল থেকে গঙ্গা নদী পর্যন্ত। এমনকি বিন্ধ্য পর্বতের পূর্বাংশ অর্থাৎ কাইমুর পর্বতের পূর্বেও কোশল বিস্তৃত ছিল। ফলে কোশলের ভৌগোলিক বিশালতার কথা চিন্তা করলে এমন বৃহৎ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এই সম্ভাবনাও থেকে যায় যে, মূল কোশল সাম্রাজ্য যতোই বিস্তৃত হয়েছে ততোই শাসকদের মধ্যে বিজিত জনপদগুলিকে কোশল নামে উল্লেখ করার প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। শক্তি প্রদর্শন বা বিশাল সাম্রাজ্যের একতা রক্ষাও এর কারণ হতে পারে।

[রামায়ণ ১.৫.৫-৬; ১৩.২৫; ২.১০.৩৭; ৪৯.৮; মহা (k) ২.১৪.১৭; ২০.২৮; ৩.২৭৯.৩৩; (হরি) ২.১৪.১৭; ২০.২৮; ৩.২৩৩.৩৩; ভাগবত পু. ৫.১৯.৮; ৯.১০.৪, ৪১; বায়ু পু. ৮৮.১৯৯-২০০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১৯৯-২০০; PHAI (Roychaudhuri) p. 176; R.C. Majumdar, A.S. Altekar, The Vākatakā-Gupta Age, Delhi, Motilal Banarasidass, 1967, p. 84-86]

□ কোশলদেশের নগরজীবনই শুধুমাত্র উন্নতমানের ছিল তা নয়, গ্রামাঞ্চলগুলিও সুরক্ষিত, সমৃদ্ধ ও জনাকীর্ণ ছিল। রামচন্দ্র বনবাসে যাওয়ার পথে কোশলের বহু গ্রাম্য জনপদ পার হয়েছিলেন। *[রামায়ণ ২.৫০.৮-১০]*

□ সীতাহরণের পর সুগ্রীব তাঁর বানর দলপতিদের সীতার সন্ধানে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়েছিলেন। এই দেশগুলির মধ্যে কোশল অন্যতম। *[রামায়ণ ৪.৪০.২২]*

□ দিগ্বিজয়কালে ভীমসেন কোশলের রাজা বৃহদ্বলকে পরাজিত করেছিলেন। সভা পর্বে ঠিক এর পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ভীম এরপর অযোধ্যার রাজা ধর্মজ্ঞকেও বশীভূত করেছিলেন। সম্ভবত এই কোশলও বৃহত্তর কোশল সাম্রাজ্যের কোনো উপনিবেশই ছিল। নয়তো ঠিক পরবর্তী শ্লোকে অযোধ্যার কথা পৃথকভাবে উল্লিখিত হতো না। *[মহা (k) ২.৩০.১-২; (হরি) ২.২৯.১-২]*

□ সহদেবও কোশলের রাজাকে পরাজিত করেছিলেন।

[মহা (k) ২.৩১.১২; (হরি) ২.৩০.১২]

□ কোশলরা বাসুদেব কৃষ্ণ ও কর্ণের হাতেও পরাজিত হয়েছিলেন। কর্ণ দুর্যোধনের প্রতিনিধি রূপে কোশল থেকে করও আদায় করেন।

[মহা (k) ৭.১১.১৫; ৮.৫.২১; (হরি) ৭.৯.১৫; ৮.৬.১৯]

□ বিদেহ, কোশলের নিকট প্রতিবেশী। বিদেহ ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যবর্তী স্থানে কোশলের অবস্থান। সম্ভবত বিদেহর সঙ্গে কোশলের বৈরিতার সম্পর্ক ছিল। প্রায় একই সময়ে বেড়ে ওঠা প্রতিবেশী এই জনপদগুলির শাসকরা ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। এঁরা প্রত্যেকেই উত্তর-মধ্যভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্য গঠনের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিলেন। একই ধরণের বৈরিতা কাশী-কোশলের মধ্যেও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

[মহা (k) ৩.৬১.২৩; ৬.৯.৪০; (হরি) ৩.৫১.২৩; ৬.৯.৪০; GD (N.N. Bhattacharyya) p. 191]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কোশলরা পাণ্ডব-কৌরব উভয় পক্ষেই যোগদান করেছিলেন। কোশলরাজ বৃহদ্বল ও অভিমন্যুর মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত অভিমন্যুই বৃহদ্বলকে যুদ্ধে সংহার করেন। অর্জুনও প্রচুর কোশল সেনা নিধন করেছিলেন। আবার দ্রোণাচার্যের হাতেও কোশল সৈন্যদের পর্যুদস্ত হতে দেখা যায়।

[মহা (k) ৬.৪৫.১৫; ৫১.১৫; ৭.২১.২৩; ২৪.৭; ৪৭.২০-২২; ১৫৬.৫১; ১৩৬.৪৯; ৮.৮.১৯; ৫৩.২; (হরি) ৬.৪৫.১৫; ৫১.১৫; ৭.২০.৭; ২২.৭; ৪৩.২০-২২; ১৩৬.৪৯; ৮.৯.১৯; ৪০.২]

□ কর্ণপর্বে কর্ণ ও শল্যের মধ্যে দীর্ঘ বাগ্‌বিতণ্ডার সময় নানা দেশ সম্পর্কে বহু তথ্য উঠে আসে। এ সময় কর্ণ কোশল সম্পর্কে বলেছিলেন যে, এই দেশে বেদজ্ঞানী পণ্ডিত ও মহাত্মাদের বাস। সে দেশের অধিবাসীরা এতই বুদ্ধিমান যে, শুধুমাত্র সামান্য ইঙ্গিতেই তারা সব কথা বুঝতে পারে। *[মহা (k) ৮.৪৫.১৪, ৩৪; (হরি) ৮.৩৪.১২০; ৩৪.১৪০]*

□ শান্তিপর্বে ভীষ্ম, যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে রাজকর্মচারীদের প্রতি আদর্শ রাজার কর্তব্য কী হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে কোশলরাজ ক্ষেমদর্শী ও কালকবৃক্ষীয় ঋষির কাহিনী উল্লেখ করেছিলেন। কালকবৃক্ষীয় ঋষি একসময় একটি খাঁচায় বন্দী কাক সঙ্গে নিয়ে ক্ষেমদর্শীর শাসনাধীন কোশলে এসে পৌঁছান। সে দেশের সাধারণ মানুষের প্রকৃত অবস্থা এবং রাজকর্মচারীদের ব্যবহার সম্পর্কে জানার জন্য তিনি কাকপক্ষী হাতে নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। সর্বজ্ঞ কাকপক্ষীটিকে নিয়ে তিনি ক্ষেমদর্শীর রাজসভায় যান। তিনি রাজাকে তাঁর রাজকর্মচারীদের দুর্নীতি সম্পর্কে অবহিত করেন। সর্বজ্ঞ কাকপক্ষীটির উপর ক্রোধবশতঃ রাজকর্মচারীরা সেটিকে হত্যা করে। তখন কালকবৃক্ষীয় ঋষি ক্ষেমদর্শীকে ভর্ৎসনা করেন এবং প্রজার ধন ও জীবন রক্ষার্থে তাঁর সঠিক কর্তব্য তাঁকে মনে করিয়ে দেন। অবশেষে ক্ষেমদর্শী তাঁর ভুল বুঝতে পেরে কালকবৃক্ষীয়ের উপদেশ অনুযায়ী কোশলরাজ্য পরিচালনা শুরু করেন। কালকবৃক্ষীয় কোশলের মঙ্গলকামনায় অনেক যজ্ঞানুষ্ঠানও করেছিলেন।

[মহা (k) ১২.৮২.৫-৭০; (হরি) ১২.৮০.৬-৭৩]

□ বিচিত্রবীর্যের বিবাহের জন্য ভীষ্ম, কাশীরাজের কন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে হরণ করে হস্তিনাপুরে নিয়ে আসেন তাঁদের স্বয়ম্বর সভা থেকে। স্বয়ম্বর সভায় বিভিন্ন দেশের যোদ্ধা, বীর এবং রাজারা উপস্থিত ছিলেন। ভীষ্ম তাঁদের সবাইকে পরাস্ত করে কাশীর রাজকন্যাদের হরণ করেছিলেন। এ সময় কোশল দেশীয় বীরেরা, ভীষ্মের হাতে বিশেষভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১৩.৪৪.৩৮; (হরি) ১৩.৩৭.৩৮]

□ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় অর্জুনের অশ্বমেধী ঘোড়া কোশল দেশ নির্বিঘ্নে পার করেছিল। যা থেকে বোঝা যায় যে, কোশলরা পাণ্ডবদের বশ্যতা স্বীকার করেছিল।

[মহা (k) ১৪.৮২.২৯; ৮৩.৪;
(হরি) ১৪.১০৫.৩০; ১০৬.৪;
ভাগবত পু. ১০.৭৫.১২]

□ ইক্ষাকু বংশীয় ঋতুপর্ণ অযোধ্যা তথা কোশল শাসন করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.৭৬.২৮; (হরি) ৩.৬২.২৮]

□ ঋষভতীর্থ ও কালতীর্থ নামে পবিত্র স্থানদুটি কোশলের অন্তর্গত।

[মহা (k) ৩.৮৫.১০-১১; (হরি) ৩.৭০.১০-১১]

□ উত্তর কোশলে উদ্দালক ঋষি এক বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। যজ্ঞের সময় উদ্দালক ও অনান্য ঋষিরা সরস্বতী নদীকে সেখানে আসার আহ্বান জানালে, নদীটি আবির্ভূত হয়। উত্তর কোশলে সরস্বতী নদী মনোরমা নামে প্রবাহিত ছিল।

[মহা (k) ৯.৩৮.২৩-২৪; (হরি) ৯.৩৬.২৩-২৪]

□ কোশলে মতঙ্গঋষির আশীর্বাদে পবিত্র একটি জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে স্নান করলে স্বর্গলাভ হয়। *[বায়ু পু. ৭৭.৩৬]*

□ পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কলিযুগে সমগ্র পৃথিবী যখন পাপ ও অধর্মের ভারে ধ্বংসের মুখে পৌঁছাবে, তখন মানুষ শুধুমাত্র বিশেষ কয়েকটি ভূ-খণ্ডে আশ্রয় পাবে। এই ভূ-খণ্ডগুলির মধ্যে একটি কোশল। *[বায়ু পু. ৯৯.৪০২]*

□ জরাসন্ধের সমর্থনে বলীয়ান হয়ে কংস যাদবদের উপর ভীষণ অত্যাচার শুরু করেছিলেন। যাদবরা নিজেদের বাসস্থল ছেড়ে সে সময় নানা দেশে আত্মগোপন করেছিল। তাঁরা কোশলেও আশ্রয় নেন। *[ভাগবত পু. ১০.২.৩]*

□ জনক-বংশোদ্ভূত বহুলাশ্ব মিথিলার শাসক ছিলেন। তিনি পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। বাসুদেব কৃষ্ণ স্বয়ং একবার বহুলাশ্বকে দর্শন দিতে মিথিলা গিয়েছিলেন। পথে তিনি কোশলদেশ পার হন। কোশলের আবালবৃদ্ধবণিতা তখন কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে উঠেছিল। *[ভাগবত পু. ১০.৮৬.২০]*

□ পরশুরাম কোশলের এক রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৪১.৩৯]

□ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে সগরকে শুধু অযোধ্যার নয়, সমগ্র কোশল জাতির অধিপতি বলা হয়েছে। সগর হৈহয়দের আক্রমণ করে তাদের সমস্ত সৈন্যবাহিনী এবং সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিলেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৪৮.১৩-১৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হৈহয়রা বহুবার কাশীরাজ্য ও আক্রমণ করেছিল। *[দ্র. কাশী]*

কোশল যেহেতু কাশীর প্রতিবেশী, সেহেতু হৈহয়দের পক্ষে কোশল আক্রমণ করা অসম্ভব কিছু নয়। বরাবার হৈহয়রা কাশী-কোশল আক্রমণ

করতো বলেই সম্ভবত সগর এদের সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করতে চেয়েছিলেন।

□ ভগবান শ্রীহরির হাতে পরাজিত হয়ে ভীষণ আঘাত-প্রাপ্ত, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রবলভাবে মাটিতে পড়ে যান। তাঁর দেহের আঘাতে বহু জনপদ কেঁপে উঠেছিল। সেই জনপদগুলির মধ্যে কোশলও একটি। *[মৎস্য পু. ১৬৩.৬৭]*

□ কোশল বলতে সাধারণত অওধ বা অযোধ্যাকে বোঝানো হয়। তবে বৃহত্তর কোশল সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল অনেক বেশি। উত্তরে নেপালের দক্ষিণাংশ থেকে দক্ষিণে সৈন্দিকা (Syandika) বা উত্তরপ্রদেশের সাই (Sai) নদী পর্যন্ত। পূর্বে সদানীরা নদী থেকে পশ্চিমে গোমতী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আগেই কোশলের উপনিবেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ব কোশল, দক্ষিণ কোশল (দাক্ষিণাত্যের উত্তর ভাগ) ইত্যাদি মূল কোশলের উপনিবেশ। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কোশল উত্তর-মধ্য ভারতে এক বিরাট এবং শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। কোশলের প্রধান তিনটি নগরীর নাম অযোধ্যা, শ্রাবস্তী এবং সাকেত। পণ্ডিতরা মনে করেন যে, কোশলজাতি সূর্য বংশজাত। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে কোশলের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশ বুদ্ধদেবকে কোশলের অধিবাসী বলেই মনে করেন। আবার অনেকে কোশলকে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক একটি ক্ষত্রিয় জনজাতি বলে উল্লেখ করেছেন। পারজিটার, রামের বনবাস যাত্রার প্রথমাংশে রথে করে কোশলদেশ পার হওয়ার সূত্রে একটি বিশেষ ধারণার কথা বলেছেন। তাঁর মতে কোশলের পথঘাট সে সময় অবশ্যই উন্নত মানের ছিল। না হলে রামচন্দ্র রথে চড়ে এতোটা পথ যেতে পারতেন বলে মনে হয় না। সেই সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি যে, উন্নত পথঘাট অবশ্যই কোশলের সমৃদ্ধ ও উচ্চমানের নাগরিক ব্যবস্থার ইঙ্গিত বহন করে। বৌদ্ধজাতকে এর সপক্ষে যুক্তি মেলে। কারণ জাতকের গল্পে মগধ ও লিচ্ছবিদের কোশল হয়ে সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বাণিজ্য করতে দেখা যায়। ফলে কোশলকে আমরা সে সময়ের অন্যতম প্রধান বাণিজ্য পথ (Trade route) বলতে পারি, আর যে কোনো বাণিজ্যপথের রাস্তাঘাট স্বাভাবিক কারণেই উন্নত হয়।

চীনা পর্যটকদের বিবরণে কোশল কিনো-সা-লো (Kino-Sa-Lo) নামে উল্লিখিত হয়েছে। হিউয়েন সাঙ তাঁর বর্ণনায় উত্তর কোশলের মোট আয়তন ৬০০ লি বলেছেন। তাঁর সময়ে তিনি কোশলকে একটি সমৃদ্ধ দেশ বলে বর্ণনা করেছেন। যেখানে তিনি অসংখ্য মন্দির দেখেছিলেন। অষ্টাধ্যায়ী, রত্নাবলী ইত্যাদি গ্রন্থেও কোশলের বর্ণনা পাওয়া যায়।

বৃহৎসংহিতায় অবশ্য কোশল সম্পর্কে একটি বিশেষ ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। বলা হয়েছে, দক্ষিণ কোশলে একসময় খুব দামী এবং উন্নত মানের হীরে পাওয়া যেত। এগুলির রঙও ছিল একেক রকম। কোনোটি হলুদ, কোনটি লাল বা কোনোটি কালো রঙের হত। N.L.Dey গণ্ডোয়ানা অঞ্চলকে দক্ষিণ কোশল বলে চিহ্নিত করেছেন। আমরা জানি সমগ্র দাক্ষিণাত্য মালভূমিটিই লাভা গঠিত মালভূমি, সেকারণেই এই অঞ্চল আজও বিভিন্ন খনিজের প্রাপ্তিস্থান হিসেবে বিখ্যাত। গণ্ডোয়ানা অঞ্চলে কয়লাও পাওয়া যায়। ফলে হীরে পাওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

মূল্যবান খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যের দিকে তাকিয়ে যদি কাশী-কোশল, মগধ-বিদেহ ইত্যাদি যুগ্মদেশের দিকে তাকানো যায়, তবে এই বৈরিতার একটা সম্পূর্ণ অন্য কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। সেটি হল খনিজ সম্পদের অধিকার স্থাপন। ফলে উত্তর-মধ্য ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের যে লড়াই তাকে শুধুমাত্র বল প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা বলা ঠিক নয়। এই প্রতিযোগিতা সম্ভবত অনেক বেশি প্রাকৃতিক সম্পদ দখলের লড়াই।

[বৃহৎ সংহিতা p. 325-327; PHAI (Roychaudhuri p. 70, 88, 136, 176, 512, 556, 414, 475; GDAMI (Dey) p. 103, 104; EAIG p. 387-390; AIT (Law) p. 35-84; AIHP (Pargiter) p. 278-279]

কোশীতিকা জনৈকা তপস্বিনী। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে একে ব্রহ্মবাদিনী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.১৯]

কোষা মহাভারতে ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত জম্বূখণ্ড

বিনির্মাণ পর্বে যেসব প্রাচীন নদীগুলির নাম উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে কোষা একটি।

[মহা (k) ৬.৯.৩৪; (হরি) ৬.৯.৩৪]

কোহল১ একজন বেদবিদ ঋষি। মহর্ষি কোহলকে রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে অন্যতম পুরোহিতের ভূমিকায় দেখা যায়।

[মহা (k) ১.৫৩.৯; (হরি) ১.৪৮.৯]

কোহল২ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজর্ষি ভগীরথের সমসাময়িক একজন প্রাচীন ঋষি। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, রাজর্ষি ভগীরথ কোহলকে গাভী দান করে পুণ্য ফল লাভ করেছিলেন। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে অন্যত্র উত্তরদিকে বসবাসকারী ঋষিদের মধ্যে কোহলের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১৩৭.২৭; ১৩.১৬৫.৪৫; (হরি) ১৩.১১৫.২৭; ১৩.১৪৩.৪৩]

কোহল৩ মহর্ষি লাঙ্গলের শিষ্যদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.৪৮]

কৌকুরুণ্ডি মৎস্য পুরাণ মতে ঔত্তম মন্বন্তরে যাঁরা সপ্তর্ষি হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কৌকুরুণ্ডি একজন। [মৎস্য পু. ৯.১৪]

কৌকুলিকা হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে এঁকে কোকিলিকা নামে উল্লেখ করা হয়েছে। স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.১৫; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ১৫ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

কৌচকি পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে সব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি কৌচকির বংশ তার মধ্যে একটি। কৌচকি অঙ্গিরার বংশজাত একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৬.১৪]

কৌচহাস্তিক পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যে সব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি কৌচহাস্তিকের বংশ তার মধ্যে একটি। কৌচহস্তিক ভৃগুর বংশজাত একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। কৌচহস্তিক থেকে যে বংশ তার নাম কৌচহাস্তিক বংশ। [মৎস্য পু. ১৯৫.২৬]

কৌচাক্ষি পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যে সব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি কৌচাক্ষির বংশ তার মধ্যে একটি। কৌচাক্ষি ভৃগুর বংশজাত একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। [মৎস্য পু. ১৯৫.২৬]

কৌটিলি পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যে সব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি কৌটিলির বংশ তার মধ্যে একটি। কৌটিলি ভৃগুর বংশজাত একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৫.২৬]

কৌটিল্য কৌটিল্য বা চাণক্য বিষ্ণুগুপ্তের নাম পুরাণগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে কলিযুগের শাসক মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে, যিনি মগধের অত্যাচারী নন্দ রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটিয়ে, আপন রাজনৈতিক বুদ্ধির বলে তিনি মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কৌটিল্য চাণক্য মৌর্যযুগের তথা প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ এবং প্রাচীন ভারতের অন্যতম বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও বটে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৪৩; মৎস্য পু. ২৭২.২২; বায়ু পু. ৯৯.৩৩০; বিষ্ণু পু. ৪.২৪.৬-৭]

কৌণকুৎস্য জনৈক তপোবনবাসী ঋষি। তপোবনবাসী মহর্ষি স্থূলকেশের পালিতা কন্যা প্রমদ্বরা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করলে তাঁকে দেখতে এবং স্থূলকেশকে সান্ত্বনা দিতে যেসব মুনি ঋষি স্থূলকেশের আশ্রমে এসেছিলেন, কৌণকুৎস্য তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.৮.২৫; (হরি) ১.৭.২৪]

কৌণপ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের অগ্নিতে বাসুকি বংশীয় যে সব নাগ ভস্মীভূত হয়েছিলেন কৌণপ তাদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.৫৭.৬; (হরি) ১.৫২.৬]

কৌণপাশন একজন নাগ। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.৩৫.১৪; (হরি) ১.৩০.১৪]

কৌণ্ডিন্য ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সভায় অবস্থানকারী জনৈক মুনি।

[মহা (k) ২.৪.১৬; (হরি) ২.৪.১০ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ৫; পৃ.২৬]

কৌৎস১ পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি কৌৎসর বংশ তার মধ্যে একটি। কৌৎস অঙ্গিরার বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৬.৩২]

কৌৎস২ পুরাণে আরও একজন মহর্ষি কৌৎসের উল্লেখ পাই যাঁকে ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক বলা হয়েছে। *[মৎস্য পু. ১৯৫.২৫]*

কৌতুজাতি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা পরাশর মুনির নামে কয়েকটি বংশধারা প্রচলিত ছিল। সেই বংশধারায় অনেকগুলি সন্তানকে নিয়ে এক-একটি বর্গ রচিত হয়েছিল। যাঁদের গৌর-পরাশর, নীল-পরাশর, কৃষ্ণ-পরাশর, শ্বেত-পরাশর, শ্যাম-পরাশর এবং ধূম্র-পরাশর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরাশরের যে সন্তানেরা নীল-পরাশর নামে অভিহিত তাঁদের মধ্যে কৌতুজাতি একজন। *[মৎস্য পু. ২০১.৩৪]*

কৌথুম পরাশর গোত্রীয় একজন ঋষি। বায়ু পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী কৌথুম অবশ্য কোনও একজন ব্যক্তি নন। মহর্ষি কুথুমির তিন পুত্রসন্তান একত্রে কৌথুম নামে পরিচিত ছিলেন। এঁদের দ্বারাই বেদের কৌথুম শাখা প্রবর্তিত হয়।
[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.৪৫; বায়ু পু. ৬১.৩৮-৪১]

কৌবাক্ষি ভৃগুর বংশধারায় একজন বংশপ্রবর্তক ঋষি। *[মৎস্য পু. ১৯৫.২৬]*

কৌবেরক১ পুরাণে প্রজাপতি কশ্যপের গোত্রভুক্ত যে ঋষি-বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, কৌবেরক সেই গোত্রের একটি। মহর্ষি কশ্যপ থেকে বংশ পরম্পরায় বা শিষ্য পরম্পরায় এরাও কাশ্যপ বলে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ১৯৯.৭]*

কৌবেরক২ কুবের অনুচরদের মধ্যে একজন হলেন কৌবেরক। ইনি কৈলাস পর্বতের নিকটবর্তী হরিশৃঙ্গ পর্বতে অগস্ত্য বংশীয় বিদ্বান ব্রহ্মরাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বসবাস করতেন। *[বায়ু পু. ৪৭.৬০-৬১]*

কৌমার১ মহাভারতে ভীষ্মপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, পৌরাণিক শাকদ্বীপের অন্তর্গত প্রধান প্রধান বর্ষ বা ভূখণ্ডগুলির মধ্যে কৌমার একটি।
[মহা (k) ৬.১১.২৬; (হরি) ৬.১১.২৫]

পৌরাণিক শাকদ্বীপের অধিপতি হব্যের সাত পুত্রের মধ্যে কুমার একজন। হব্য শাকদ্বীপকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটি প্রধান বর্ষ (ভৌগোলিক স্থান) পুত্রদের নামে নামাঙ্কিত করেন। কুমারের নামাঙ্কিত বর্ষ বা ভূ-খণ্ডটির নাম কৌমার বর্ষ। এই ভূ-খণ্ডের প্রধান পর্বত রৈবত-পর্বতও কৌমার নামে খ্যাত হয়েছে।
[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.১৮; ১.১৯.৯২; বায়ু পু. ৩৩.১৭; ৪৯.৮৬; মৎস্য পু. ১২২.২২]

কৌমার২ কৌমার নামে একপ্রকার রাক্ষসদের কথা পুরাণে কথিত হয়েছে। বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, এরা শিশুদের অনিষ্টকারী একপ্রকার রাক্ষস।
[বায়ু পু. ৬৯.১৯১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৬০]

কৌমার৩ রৈবতক পর্বতে অবস্থিত একটি পবিত্র হ্রদ। পুরাণ মতে, নাগ জনজাতির মানুষেরা এই হ্রদের রক্ষাকর্তা। কৌমার হ্রদে স্নান করলে স্বর্গলাভ হয়। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৩.৮৬]*

□ প্রাচীন রৈবতক পর্বত বলতে আধুনিক গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত গিরনার পর্বতকে বোঝানো হয়। কৌমার হ্রদের নির্দিষ্ট অবস্থান এখনও পর্যন্ত স্থির করা না গেলেও এটি গিরনার পর্বতের উপর অবস্থিত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। *[EAIG (Kapoor) p. 278]*

কৌমারী অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। কৌমারী সেই মাতৃকাদের মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৭৯.৯]*

কৌমোদকী ভগবান বিষ্ণুর গদার নাম কৌমোদকী। 'কু' শব্দটির অর্থ হল পৃথিবী। মোদিত করা মানে আনন্দিত করা বা প্রসন্ন করা। যা আনন্দদায়ক তাই মোদক। অসুর এবং দুরাচার ব্যক্তিদের ধ্বংস করে পৃথিবীর ভার লাঘব করেন বা পৃথিবীকে প্রসন্ন, আনন্দিত করেন—এই অর্থে ভগবান বিষ্ণুর গদার নাম কৌমোদকী।

দ্বাপর যুগে স্বয়ং বিষ্ণুই ভূভার হরণের জন্য কৃষ্ণ রূপে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন— একথা মহাকাব্য পুরাণে বহুবার চর্চিত হয়েছে। কৃষ্ণ এবং বিষ্ণু যে অভিন্ন—এই ভাবনা থেকে ভগবান বিষ্ণুর অস্ত্রশস্ত্রগুলিও কৃষ্ণের অস্ত্র হিসেবে আরোপিত হয়েছে।

তবে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবার পর ঠিক কোন সময়ে কৃষ্ণ এই কৌমোদকী গদা এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র লাভ করেছিলেন এ বিষয়ে মহাভারতে এবং পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। হরিবংশ পুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী জরাসন্ধ যখন মথুরা আক্রমণ করেন, সেই যুদ্ধের সময়েই বৈকুণ্ঠ থেকে কৃষ্ণের অন্যান্য অস্ত্রের সঙ্গে কৌমোদকী গদাও তাঁর সামনে আবির্ভূত হন।

মহাভারতে অবশ্য উল্লিখিত হয়েছে যে, সুদর্শন

চক্র এবং কৌমোদকী গদা—এই দুটি অস্ত্রই কৃষ্ণ লাভ করেছিলেন অগ্নি এবং বরুণদেবের কাছ থেকে—খাণ্ডবদহনের পূর্বে।

[মহা (k) ১.২২৫.২৮; (হরি) ১.২১৮.২৮; হরিবংশ পু. ২.৪৩.৯-১০; বিষ্ণু পু. ৫.২২.৬; ভাগবত পু. ৮.৪.১৯]

কৌরব একটি পৌরাণিক পর্বত। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, পক্ষীন্দ্র গরুড় এই পর্বতে বাস করতেন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৪৫৪]*

কৌরবেশ্বরীতীর্থ প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। দেবী শক্তি এই তীর্থে কৌরবেশ্বরী নামে পূজিত হন। কথিত আছে, রাজর্ষি কুরু এই তীর্থে দেবী শক্তির উপাসনা করেছিলেন। কুরুর নামানুসারেই এখানে অধিষ্ঠিত দেবী কৌরবেশ্বরী নামে খ্যাত। মহানবমী তিথিতে এখানে মহাসমারোহে কৌরবেশ্বরীর পূজা হয়। কথিত আছে, মধ্যম পাণ্ডব ভীমও নাকি একবার এই তীর্থে এসে কৌরবেশ্বরীর আরাধনা করেছিলেন।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র) ৩৫০.১-৩]

কৌরব্য১ ঐরাবত বংশীয় একজন নাগ। মহাভারতে যেসব প্রধান প্রধান নাগেদের নাম উল্লিখিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কৌরব্য নাগ একজন।

[মহা (k) ১.৩৫.১৩; (হরি) ১.৩০.১৩]

□ উলূপী নামে কৌরব্য নাগের একটি কন্যা ছিল। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। অর্জুনকে উলূপী তাঁর পিতৃগৃহে নিয়ে গেলে কৌরব্য ভবনের অগ্নিহোত্রের অগ্নিতেই অর্জুন হোম করেন।

[মহা (k) ১.২১৪.১৪; (হরি) ১.২০৭.১৪; ১.২১৪.১৮; ১.২০৭.১৮]

□ দেবর্ষি নারদ ভোগবতীপুরীতে মাতলির কাছে যেসব বিশিষ্ট নাগেদের নাম উল্লেখ করেন, তাঁদের মধ্যে কৌরব্য একজন।

[মহা (k) ৫.১০৩.১৫; (হরি) ৫.৯৬.১৫]

কৌরব্য২ পুরাণে মহর্ষি বশিষ্ঠের গোত্রভুক্ত যেসব ঋষি বংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি কৌরব্যের বংশ তার মধ্যে একটি। তিনি বশিষ্ঠের বংশজাত একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ২০০.৭]

কৌরিষ্ট কশ্যপবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষিদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৯৯.৩]*

কৌরুক্ষেত্রি পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে সব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি কৌরুক্ষেত্রির বংশ তার মধ্যে একটি। কৌরুক্ষেত্রি অঙ্গিরার বংশজাত একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৬.১৭]*

কৌরুপতি পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে সব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি কৌরুপতির বংশ তার মধ্যে একটি। কৌরুপতি অঙ্গিরার বংশজাত একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৬.১৭]*

কৌর্ম মৎস্যপুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, পঞ্চদশ কল্পের নাম কৌর্মকল্প। *[মৎস্য পু. ২৯০.৬]*

কৌলায়ন বশিষ্ঠের বংশধারায় একজন বংশ প্রবর্তক ঋষি। *[মৎস্য পু. ২০০.৮]*

কৌশল্য১ ভাগবত পুরাণ মতে কৌশল্য একজন সিদ্ধপুরুষ যিনি জ্ঞানদানের জন্য সর্বত্র বিচরণ করেন। *[ভাগবত পু. ৬.১৫.১৫]*

কৌশল্য২ পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে সব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি কৌশল্যের বংশ তার মধ্যে একটি। কৌশল্য অঙ্গিরার বংশজাত একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৬.৯]

কৌশল্য৩ মহর্ষি অগস্ত্যের বংশধারায় একজন ঋষি।

[মৎস্য পু. ২০২.১]

কৌশল্যা১ উত্তর কোশল বা অযোধ্যার রাজা দশরথের সঙ্গে দক্ষিণ কোশলের রাজকন্যা কৌশল্যার বিয়ে হয়। কৌশল্যা দশরথের প্রধানা মহিষী। কৌশল্যার প্রকৃত নাম জানা যায় না, দেশ-নামেই তাঁর নাম। রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আগে দশরথের মন্ত্রী সুমন্ত্র কোশলরাজের কাছে আমন্ত্রণ জানাতে যান। সেখানে কোশলাধিপতির নাম বলা হয়েছে ভানুমান, তাতে মনে হয় কৌশল্যা ভানুমানের কন্যা ছিলেন। রামায়ণে কৌশল্যার গায়ের রঙ গৌরবর্ণ, এটা ছাড়া তাঁর শারীরিক সৌন্দর্যের আর কোনো বর্ণনা নেই—হয়তো সেটা নীতিমূর্তি রামচন্দ্রের জননী বলেই। দয়াবতী, দানী ও ধর্মপরায়ণা সুগৃহিণী হিসেবে কৌশল্যার খ্যাতি ছিল।

[রামায়ণ ১.১৩.২১-২৬; ২.১২.৬৮-৬৯; মহা (k) ৩.২৭৪.৮; (হরি) ৩.২২৮.৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩৭.৩১; ৩.৪০.১১২]

রাজা দশরথ নিজে কৌশল্যার গুণ বলার সময় বলেছেন যে, কৌশল্যা সব সময় আমার প্রিয়

কামনা করেন, তিনি সময়ানুসারে মাতা, ভগিনী, পত্নী, সখী ও দাসীর মতো আমার সেবা করেন—

যদা যদা চ কৌশল্যা দাসীবচ্চ সখীব চ।
ভার্য্যাবদ্ ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতে।
সততং প্রিয়কামা মে প্রিয়পুত্রা প্রিয়ংবদা॥

[রামায়ণ ১.১৩.২১-২৬; ২.১২.৬৮-৬৯]

□ কৌশল্যা দশরথের জ্যেষ্ঠা মহিষী হওয়া সত্ত্বেও দশরথ যে কৈকেয়ীর জন্যই তাঁর যথাযথ সমাদর করতে পারেন নি, এ বিষয়ে কৌশল্যার মনেও যেমন দুঃখবোধ ছিল, তেমনি দশরথের মনেও একই রকম দুঃখবোধ ছিল। দশরথ এ-কথা কৈকেয়ীকে বলেও ফেলেছিলেন যে, তোমার জন্যই আমি কৌশল্যাকে সেইভাবে সমাদর করতে পারিনি—যদিও তিনি সেই সমাদরের যোগ্য ছিলেন—

ন ময়া সৎকৃতা দেবী সৎকারার্হা কৃতে তব।

[রামায়ণ ২.১২.৬৯]

কৌশল্যাও রামের কাছে দুঃখপ্রকাশ করে বলেছেন যে, তিনি স্বামীর কাছ থেকে কখনোই যোগ্য সমাদর তথা ভালবাসা পাননি—

ন দৃষ্টপূর্ব্বং কল্যাণং সুখং বা পতিপৌরুষে।

[রামায়ণ ২.২০.৩৮]

সেইকালে এক পতিব্রতা রমণীর মুখে স্বামীর সম্বন্ধে এই প্রতিবাদ অত্যন্ত লক্ষণীয়।

[রামায়ণ ২.১২.৬৯; ২.২০.৩৮]

□ রামের বনে যাওয়ার সময় লক্ষ্মণ রামের সঙ্গী হওয়ার অনুমতি চাইলে রাম লক্ষ্মণকে বলেছেন যে, লক্ষ্মণ তাঁর সঙ্গে বনবাসী হলে দশরথ অথবা কৈকেয়ী হয়তো কৌশল্যা ও সুমিত্রার যত্ন করবেন না এবং তাঁদের ভরণপোষণের কোনো উপায় থাকবে না। রামের এই কথার উত্তরে লক্ষ্মণ বলেছেন যে, কৌশল্যা দেবী তাঁর আশ্রিতদের প্রতিপালনের জন্য সহস্র গ্রাম লাভ করেছেন। সুতরাং তিনি নিজের এবং আমার মায়ের মতো অনেকের ভরণপোষণ করতে সক্ষম—

কৌসল্যা বিভৃয়াদার্য্যা সহস্রং মদ্বিধানপি।
যস্যাঃ সহস্রং গ্রামাণাং সম্প্রাপ্তমুপজীবিনাম্॥
তদাত্মভরণে চৈব মম মাতুস্তথৈব চ।
পর্য্যাপ্তা মদ্বিধানাং চ ভরণায় মনস্বিনী॥

[রামায়ণ ২.৩১.২২-২৩]

এর থেকে বোঝা যায় যে, রাজা দশরথ কৌশল্যাকে জ্যেষ্ঠা পত্নী হিসেবে তাঁর প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করেননি। কৌশল্যাকে দশরথ এক হাজার গ্রাম দান করেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, সম্ভবত কৈকেয়ীর সঙ্গে বিবাহের পূর্বেই রাজা দশরথ তা করেছিলেন। কৈকেয়ীর প্রতি অনুরক্ত হলেও দশরথ কৌশল্যাকে সম্মান করতেন। আমরা দেখি যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় এবং পুত্রেষ্টি যজ্ঞের চরু ভাগ করার সময়ও দশরথ কৌশল্যাকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করেননি।

[রামায়ণ ২.৩১.২২-২৩; ১.১৬.২৫-২৬]

□ প্রধানা মহিষীর সমস্ত দায়িত্ব কর্তব্য কৌশল্যা পালন করেছেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বটির পরিচর্যা করে তিনবার খড়্গাঘাতে অশ্বটিকে কৌশল্যা বধ করেন। শুধু তাই নয় ঐ মৃত অশ্বটির সঙ্গে তিনি সেইস্থানে সংযত মনে রাত্রিবাসও করেছিলেন—অশ্বমেধ যজ্ঞের নিয়ম মত। এর থেকে বোঝা যায় যে, কৌশল্যা কর্তব্য-পালনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুস্থিরা এক নারী। অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়ার পরের বছর কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্রের জন্ম হয়। এরপর বারো বছর বয়সী রামকে যজ্ঞরক্ষার জন্য বিশ্বামিত্র মুনি নিয়ে যেতে চাইলে কৌশল্যা স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী রামের মঙ্গলাচরণ করেছেন। স্বামীর ইচ্ছাকেই তিনি বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছেন এবং তা যথাযথভাবে পালন করেছেন।

[রামায়ণ ১.১৪.৩৩-৩৪; ১.২২.২; ১.১৮.১২]

□ রামের অভিষেকের বিষয়ে কৌশল্যা দশরথের কাছ থেকে কিছুই জানতে পারেন নি। রামের অভিষেকের সংবাদ তিনি রামের প্রিয় বন্ধুদের কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলেন। এই ঘটনাতেও দশরথের প্রধানা মহিষীকে খানিক অবহেলিত মনে হয়।

[রামায়ণ ২.৫.৩০-৩১; ২.৫.৩৮-৪১]

□ প্রস্তাবিত রামাভিষেকের সুসংবাদের পরেই তাঁর বনগমনের সংবাদ পেতে কৌশল্যার দেরি হয়নি। রাম নিজে এসে তাঁর প্রতি কৈকেয়ীর চোদ্দ বছর বনবাসের আদেশের কথা শুনিয়েছেন। এই নিদারুণ সংবাদে পুত্রশোকের চেয়েও প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় তাঁর কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে সপত্নীদের মধ্যে নিজের অবস্থান নিয়ে। কৌশল্যা রামকে বলেছেন—

প্রধানা মহিষী হওয়া সত্ত্বেও আমাকে সপত্নীদের কর্কশ কথা শুনে চলতে হবে—

সা বহূন্যমনোজ্ঞানি বাক্যানি হৃদয়চ্ছিদাম্।

[রামায়ণ ২.২০.৩৯]

আমি ভেবেছিলাম—পুত্রের পৌরুষের ওপর নির্ভর করে আমি সুখ লাভ করবো, কিন্তু তুমি বনে চলে গেলে আমার কি হবে! রামের সঙ্গে তিনি বনে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। স্বামীর নিরন্তর অবহেলা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তাই অন্তত সন্তান-সুখটুকু তিনি পরিপূর্ণভাবে লাভ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু স্বামীর জন্য সেই সন্তানকেও তিনি হারাতে চলেছেন। এক সময় কৌশল্যা অধৈর্য্য হয়ে রামকে পিতার আদেশ অমান্য করতে আদেশ করেছেন। অবশেষে রামের কথায় তিনি শান্ত হয়েছেন এবং ধর্মসঙ্গতভাবে তিনি রামকে বনে গিয়ে পিতাকে ঋণমুক্ত করতে আদেশ করেছেন। এখানে আমরা দেখি যে, পুত্রবিচ্ছেদের মতো নিদারুণ যন্ত্রণাও কৌশল্যাকে তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। *[রামায়ণ ২.২০.২১-৫৫; ২.২০.৩৯]*

□ রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে বনে চলে গেলে শোকাহত দশরথ কৌশল্যার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। এই সময় পতিব্রতা কৌশল্যা রাজা দশরথের তীব্র সমালোচনা করেছেন। রামের বনযাত্রার ষষ্ঠদিনে সুমন্ত্র অযোধ্যায় ফিরে মহারাজা দশরথের কাছে রামের কথা জানালে দশরথ শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছেন, তখন কৌশল্যা দশরথকে তিরস্কার করে বলেছেন যে, পূর্বে রামের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে এখন কেন লজ্জাবোধ করছ?—

অদ্যেমমনয়ং কৃত্বা ব্যপত্রপসি রাঘবে।

[রামায়ণ ২.৫৭.৩০]

এখন এই শোকের সময় তোমারও কেউ সহায় থাকবে না। তিনি আরও বলেছেন যে, দশরথ কাউকে না জানিয়ে হঠাৎ যে সিদ্ধান্ত নিলেন তার ফলে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতাকে চোদ্দ বছরের জন্য বনে যেতে হয়েছে। রামকে তাঁর পিতার জন্যই বিপদে পড়তে হয়েছে। এইভাবে কৌশল্যা বারবার দশরথকে কৃতকর্মের জন্য তিরস্কার করেছেন। কৌশল্যার কথা শুনে শোকাহত দশরথ কৌশল্যার কাছে ক্ষমা চাইলে কৌশল্যা দশরথকে জানিয়েছেন যে, পুত্রশোকে কাতর হয়েই তিনি দশরথকে কটুকথা বলেছেন। আমরা বুঝতে পারি—পুত্রশোকের নিদারুণ ব্যথায় কৌশল্যা কাতর হয়েছিলেন। দশরথ কৈকেয়ীর জন্যই রামকে বনে যেতে বলেছিলেন এই কারণে দশরথকে তিনি প্রবলভাবে তিরস্কার করেছেন। কিন্তু, লক্ষণীয় এই যে স্বামীকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে তিনি ভোলেননি।

[রামায়ণ ২.৫৭.৩০; ২.৬২.১২-১৮]

□ দশরথের মৃত্যুর পর শোক-ক্লিষ্ট কৌশল্যা আর নিজেকে স্থির রাখতে পারেননি এবং সক্রোধে কৈকেয়ীকে বলেছেন—তুমি অসভ্য এবং দুষ্ট স্বভাবের মেয়ে, ভীষণ নৃশংসও বটে। তা এখন তো সেই সময় এসেছে—যখন তুমি রাজা দশরথকে ত্যাগ করে এক মনে নিষ্কণ্টকভাবে এই রাজ্য ভোগ করতে পারবে—

সকামা ভব কৈকেয়ি ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্।
ত্যক্ত্বা রাজানমেকাগ্রা নৃশংসে দুষ্টচারিণি॥

[রামায়ণ ২.৬৬.৩-১০]

কৌশল্যা আরও বলেছেন যে, কুব্জা এবং কৈকেয়ীর জন্যই রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে বনবাসের দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। কৈকেয়ী তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলেও কৌশল্যা কিন্তু কৈকেয়ীকে নিজের ভগিনীর মতোই স্নেহ করতেন। এই বিষয়টি প্রমাণিত হয় ভরতের কথায়। পিতার মৃত্যুর পর অযোধ্যায় ফিরে এসে ভরত কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করে বলেছেন—আমার জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যা দেবী তোমার সঙ্গে বোনের মতো ব্যবহার করেন—

তথা জ্যেষ্ঠা হি মে মাতা কৌশল্যা দীর্ঘদর্শিনী।
ত্বয়ি ধর্মং সমাস্থায় ভগিন্যামিব বর্ততে।

[রামায়ণ ২.৭৩.১০-১১; ২.৬৬.৩-১০; ২.৭৩.১০-১১]

□ ভরতকেও কৌশল্যা নিজের সন্তানের থেকে পৃথক বলে মনে করতেন না কখনো—এর নিদর্শন রামায়ণে বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু, দশরথের মৃত্যুর পর ভরতকেও তিনি কঠোরভাবে তিরস্কার করেছেন। ভরতের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের কথা জানতে পেরে কৌশল্যা ভরতের সঙ্গে দেখা করে ভরতকে বলেছেন যে, তুমি রাজ্য চেয়েছিলে এখন রাজ্য পেয়েছো কিন্তু, এর জন্য রামকে বনে না পাঠালেও হত—

ইদং তে রাজ্যকামস্য রাজ্যং প্রাপ্তমকন্টকম্।
সম্প্রাপ্তং বত কৈকেয্যা শীঘ্রং ক্রূরেণ কর্মণা॥
[রামায়ণ ২.৭৫.৬১-৬৩]

কিন্তু ভরত যখন কৌশল্যার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাতরস্বরে জানালেন যে কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতেন না—তখন কৌশল্যা বুঝতে পেরেছেন যে, রামের বনবাসের ব্যাপারে কৈকেয়ীর দোষ থাকলেও ভরতের কোনো দোষই নেই। তাই ভরতকে নিষ্পাপ জেনে কৌশল্যা ভরতকে আশীর্বাদও করেছেন। আবার, আমরা দেখি চিত্রকূট যাওয়ার সময় নিষাদরাজ গুহের সঙ্গে রাম সম্পর্কিত কথোপকথনের সময় ভরত শোকে দুঃখে অজ্ঞান হয়ে পড়লে জননী কৌশল্যা ভরতের শারীরিক কুশলতার বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ভরতকে বলেছেন সান্ত্বনা দিয়ে কৌশল্যা যে, দশরথের মৃত্যু হয়েছে এবং রামও বনে গেছেন। এখন এই রাজবংশের অস্তিত্ব তোমার উপরই নির্ভর করছে। এ অবস্থায় তুমি শোকে দুঃখে ভেঙে পড়লে রাজ্য এবং রাজবংশ দুইই সংকটে পড়বে—

পুত্র ব্যাধির্ন তে কচ্চিচ্ছরীরং প্রতিবাধতে।
অস্য রাজকুলস্যাদ্য ত্বদধীনং হি জীবিতম্॥
[রামায়ণ ২.৮৭.৯, ১০]

এর থেকেই বোঝা যায় যে, কৌশল্যা তাঁর সপত্নীপুত্রদেরও নিজ পুত্রের মতোই স্নেহ করতেন। *[রামায়ণ ২.৭৫.৬১-৬৩; ২.৮৭.৯, ১০]*

□ আমরা দেখি, শত্রুঘ্নের হাতে লাঞ্ছনার ভয়ে কুব্জার সখীরা কৌশল্যার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, প্রৌঢ়া এই রাজমহিষী অসীম দয়া-মায়া পোষণ করতেন সকলের জন্য। *[রামায়ণ ২.৭৮.১৫]*

□ অযোধ্যায় একাকী কৌশল্যার সময় কীভাবে অতিবাহিত হয়েছে তা জানা যায় না, তবে অনেকে অনুমান করেন যে, এই মহীয়সী জননী পুত্রের কল্যাণ কামনাতেই সম্ভবত তাঁর সময় অতিবাহিত করেছেন। চোদ্দ বছরের বনবাস-শেষে রামচন্দ্র নন্দীগ্রামে ফিরে এলে আনন্দিত কৌশল্যা সীতাকে এবং বানর রমণীদের বিবিধ মূল্যবান সামগ্রী উপহার দিয়েছেন। এরপরেও কৌশল্যা বহু বছর বেঁচেছিলেন এবং অবশেষে পুত্রপৌত্র পরিবৃতা হয়ে তিনি স্বর্গলাভ করেন। রামজননী কৌশল্যাকে পণ্ডিতেরা আদর্শ জননী রূপেই চিহ্নিত করেছেন।

[রামায়ণ ৬.১২৮.১৭, ১৮; ৭.১১২.১৪]

কৌশল্যা₂ যযাতি রাজার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর পত্নী—"পুরোশ্চ ভার্য্যা কৌশল্যা।" তাঁর প্রকৃত নাম কি ছিল তা জানা যায় না। কোশলের রাজকন্যা বলে তিনি কৌশল্যা নামেই পরিচিতা ছিলেন। পুরুর ঔরসে তাঁর গর্ভে জনমেজয়ের জন্ম হয়। *[মহা (k) ১.৯৫.১১; (হরি) ১.৯০.১৪]*

কৌশল্যা₃ কুরুবংশীয় শান্তনুরাজার কনিষ্ঠ পুত্র বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী অম্বিকাকে কৌশল্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কাশীরাজকন্যা অম্বিকা এবং অম্বালিকাকে কৌশল্যা বলাতে কাশী এবং কোশল এই দুই মহাজনপদের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল সে কথাই প্রমাণিত হয়। ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বৈদিক সাহিত্যের সূত্র ধরে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন যে, মহাজনপদ সৃষ্টির প্রাক্কালে কাশী, কোশল—এই দুই জনপদের পৃথক অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে—

The Kāśis, i. e., the people of Kāśi, first appear in the Paippalāda recension of the Atharva Veda (Ved. Ind., II. 116 n.). They were closely connected with the people of Kosala and of Videha. Jala Jātūkarṇya is mentioned in the Śāṅkhāyana Śrauta Sūtra (XVI. 29. 5) as having obtained the position of Purohita of the three peoples of Kāśi, Videha and Kosala in the life-time of Śvetaketu, a contemporary of Janaka.

সুতরাং কাশীরাজকন্যাদের কৌশল্যা বলে সম্বোধন করাতে কোনরকম অস্বাভাবিকতা আছে বলে মনে হয় না। *[মহা (k) ১.১০৫.৪৭-৫০; ১০৬.২; ১.১১৪.৩-৪; ১১৯.২৪; ১২৭.২৪; ১২৮.১১; (হরি) ১.৯৯.৪৭-৫০; ১০০.২; ১.১০৮.৩-৪; ১১৩.২৪; ১২১.২৪; ১২২.১১ PHAI (Raychaudhuri) p. 34]*

কৌশল্যা₄ বিদেহরাজ্যের রাজা জনকের পত্নী। রাজা জনক রাজ্য ত্যাগ করে ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী হবার সঙ্কল্প করলে রাজমহিষী কৌশল্যা জনকরাজাকে রাজধর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন।

[মহা (k) ১২.১৮ অধ্যায়; (হরি) ১২.১৮ অধ্যায়]

কৌশল্যা$_5$ যদুবংশীয় সাত্বতের পত্নী; সাত্বতের ঔরসে তাঁর গর্ভে ভজিন, ভজমান, দিব্য, দেবাবৃধ; অন্ধক, মহাভোজ এবং বৃষ্ণি জন্মগ্রহণ করেন।

[মৎস্য পু. ৪৪.৪৭-৪৮; বায়ু পু. ৯৬.১-২]

কৌশল্যা$_6$ বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবের পত্নীদের মধ্যে অন্যতমা। বসুদেবের ঔরসে তাঁর গর্ভে কেশী নামে এক পুত্র সন্তান হয়।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.৪৮]

কৌশল্যা$_7$ শ্রীকৃষ্ণের পত্নীদের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ৪৭.১৪]

কৌশাপি পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি কৌশাপির বংশ তার মধ্যে একটি। কৌশাপি ভৃগুর বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৫.৩৭]*

কৌশাম্বী একটি প্রাচীন নগরী। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পূর্বপুরুষ কুশ রাজার পুত্র কুশাম্ব এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা—

কুশাম্বস্তু মহাতেজা কৌশাম্বীমকরোৎ পুরীম্।

[রামায়ণ ১.৩২.৬]

☐ শতপথ ব্রাহ্মণে সরাসরি কৌশাম্বীর উল্লেখ না থাকলেও প্রতিকৌশাম্বেয় নামে উদ্দালক আরুণির এক শিক্ষাগুরুর নাম পাওয়া যায়। হরিস্বামীর টীকা অনুযায়ী এই প্রতিকৌশাম্বেয় কৌশাম্বীর অধিবাসী বলেই তাঁর এই নামকরণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পণ্ডিতদের একাংশের ধারণা, প্রাচীনকালে কৌশাম্বী নগরীটি প্রাথমিক ভাবে বৎস দেশের রাজধানী বলেই পরিচিত ছিল। অন্তত মহাভারতের মূল কাহিনীর রচনাকাল পর্যন্ত কৌশাম্বী জনপদরূপে সম্ভবত বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে ওঠেনি। সে কারণেই মহাভারতের মূল কাহিনীতে কৌশাম্বীর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ রামায়ণে সরাসরি এবং শতপথ ব্রাহ্মণে পরোক্ষে কৌশাম্বীর কথা পাওয়া যায়। যা থেকে স্পষ্ট যে, কৌশাম্বীর গুরুত্ব একক পরিসরে স্থাপিত হতে সম্ভবত মহাভারতের মূল কাহিনী রচনার সময়কাল অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Eggling) ১২.২.২.১৩]

☐ পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহাভারতের মূল কাহিনীতে কৌশাম্বীর কথা পাওয়া যায় না। কিন্তু পুরাণে পঞ্চপাণ্ডবদের জীবন পরবর্তী কৌরব বংশের যে কাহিনীর ধারা, সেখানে কৌশাম্বীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পর হস্তিনাপুরের সিংহাসন লাভ করেন অভিমন্যু-পুত্র পরীক্ষিৎ। পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, যাঁর বংশধারায় ষষ্ঠ পুরুষ হলেন নেমিচক্র (মতান্তরে নির্বক্তু বা নিচক্ষু অথবা বিবক্ষু)। হস্তিনাপুর গঙ্গা-নদীর গর্ভে নিমজ্জিত হলে এঁর নেতৃত্বেই কুরু-ভরত বংশীয়রা কৌশাম্বী নগরীতে স্থানান্তরিত হবেন—একথা পুরাণে বলা হয়েছে।

ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকে উদয়ন নামে এক কুরু-ভরতবংশীয় রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই উদয়ন কৌশাম্বী নিবাসী এবং গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক। এ থেকে বোঝা যায় যে, হস্তিনাপুর থেকে কুরু-ভরতবংশীদের কৌশাম্বীতে স্থানান্তরিত হওয়া একটি ঐতিহাসিক সত্যও বটে।

[ভাগবত পু. ৯.২২.৪০; বায়ু পু. ৯৯.২৭১;
বিষ্ণু পু. ৪.২১.৩; মৎস্য পু. ৫০.৭৯;
PHAI (H.C. Raychaudhuri) p. 117-119]

☐ বর্তমান উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ শহরের প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত যমুনা নদীর তীরবর্তী কোশাম্বীনগর বা কোশাখ নামে একটি গ্রাম, এখনও প্রাচীন কৌশাম্বীর স্মারক হয়ে আছে। *[GDAMI (Dey) p. 96-97]*

কৌশারব *[দ্র. মৈত্রেয়]*

কৌশিকা চন্দ্রবংশীয় অমাবসুর বংশধারায় সুহোত্রের পত্নী হলেন কৌশিকা। সুহোত্রের ঔরসে কৌশিকার গর্ভজাত পুত্র হলেন জহ্নু।

[বায়ু পু. ৯১.৫৪]

কৌশিকীতীর্থ নর্মদা নদীর তীরবর্তী একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থ দর্শনে ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর হয়।

[মৎস্য পু. ১৯৪.৪০-৪২]

কৌশিকীনদী হিমালয় পর্বত জাত একটি পবিত্র নদী। রামায়ণ ও পুরাণে কৌশিকী নদীকে মানবী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। গাধিরাজার কন্যা এবং বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী কৌশিকী। কৌশিকী ভৃগুবংশীয় মহর্ষি ঋচীকের পত্নী। স্বামীর অনুগামিনী হয়ে কৌশিকী একটি স্বর্গজাতা নদীতে পরিণত হন। পরে মর্ত্যলোকের কল্যাণের উদ্দেশে কৌশিকী নদী হিমালয় পর্বত থেকে প্রবাহিত হয়। অবশ্য পুরাণে এবং মহাভারতে

কৌশিকী নদীকে ঋচীকের পত্নী ও জমদগ্নির মাতা বলে উল্লেখ করা হলেও তাঁকে সত্যবতী নামে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কিনা রাজকন্যা সত্যবতী বিখ্যাত কুশিক রাজার পৌত্রী বলেই তাঁর অপর নাম কৌশিকী। এই সত্যবতীই কৌশিকী নদী নামে পরিচিতা বলে পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহাভারতের আদিপর্বে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে জলপূর্ণা ও দুর্গম কৌশিকী নদীর সৃষ্টিকর্তা বলা হয়েছে। বিশ্বামিত্র কৌশিকী নদীর তীরে তপস্যা করেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁর আশ্রমটিও এই নদীতীরেই অবস্থিত।

[রামায়ণ ১.৩৪.৪-৯, ২১; ১.৬৩.১৪; মহা (k) ১.৭১.৩২; ৬.৯.১৯; ১৩.৩.১০; ১৩.১৪৬.১৮; ১৩.১৬৫.২৭; (হরি) ১.৮৫.৩২; ৬.৯.১৯; ১৩.৩.১০; ১৩.১২৪.১৮; ১৩.২৪৩.২৮; মৎস্য পু. ১১৪.২২; ১৬৩.৬০; বায়ু পু. ৪৫.৯৭; ৯১.৮৮; ভাগবত পু. ৫.১৯.১৭; ৯.১৫১২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১২.১৫; ১.১৬.২৬; ২.৬৬.৫৯]

□ সীতাহরণের পর বানর দলপতি সুগ্রীব তাঁর অধীনস্থ বানর সৈন্যদের সীতার সন্ধানে নানাদিকে পাঠিয়েছিলেন। সে সময় সুগ্রীব কৌশিকী নদীর তীরেও তাঁদের সন্ধানকার্য চালাতে বলেন।

[রামায়ণ ৪.৪০.২০]

□ কৌশিকী নদীকে একটি পবিত্র তীর্থরূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। এই নদীতীর্থ দর্শনে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় এবং অন্তে গন্ধর্বলোক লাভ হয়। অর্জুন তাঁর বারো বছরের বনবাস পর্বে এই কৌশিকী নদী দর্শন করেছিলেন। পাশাখেলার পর পাণ্ডবদের বারো বছরের বনবাস পর্য্যায়ে অর্জুন যখন স্বর্গলোকে দিব্যাস্ত্র লাভ করতে গেলেন এবং যুধিষ্ঠির অন্যান্য পাণ্ডব ভাইদের এবং ঋষি মহর্ষিদের সঙ্গে নিয়ে তীর্থযাত্রা করলেন সেই সময় তাঁরাও কৌশিকী নদী ও তার তীরে অবস্থিত বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রমটি দেখেছিলেন। বলরামও তাঁর তীর্থযাত্রার সময় কৌশিকী নদী-তীর্থে আসেন।

[মহা (k) ১.২১৫.৭; ৩.৮৩.৯৫; ৩.৮৪.১৩২, ১৪৪; ৩.১১০.২০-২১; ৩.১১১.১-২; ১৩.১০২.৪৭; (হরি) ১.২০৮.৭; ৩.৬৮.৯৫; ৩.৬৯.১৩২, ১৪৪; ৩.৯২.২০-২১; ৩.৯৩.১-২; মৎস্য পু. ২২.৬৩; ভাগবত পু. ১০.৭৯.৯]

□ একবার দেবরাজ ইন্দ্রকে অগ্রবর্তী করে সমস্ত দেবতা ও ঋষিগণ মর্ত্যলোকের বহুতীর্থ দর্শন করেছিলেন। তখন তাঁরা কৌশিকী-নদী-তীর্থেও আসেন।

[মহা (k) ১৩.৯৪.৬; (হরি) ১৩.৮০.৬]

□ ভীমসেন দিগ্বিজয়ের সময় কৌশিকী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে রাজত্বকারী মহাতেজা এক রাজাকে জয় করেছিলেন।

[মহা (k) ২.৩০.২২; (হরি) ২.২৯.২০]

□ প্রলয়কালে বালকরূপী শ্রীহরি ঋষি মার্কণ্ডেয়কে তাঁর উদরমধ্যে আশ্রয় দিয়ে প্রাণরক্ষা করেছিলেন। সেই সময় ঋষি মার্কণ্ডেয় হরির উদরে বহু নদী-পর্বত ইত্যাদিকেও আশ্রয় নিতে দেখেন। এইসব নদীর মধ্যে কৌশিকী একটি।

[মহা (k) ৩.১৮৮.১০২; (হরি) ৩.১৫৯.১০৩]

□ পিতামহ ব্রহ্মা মৃত্যুদেবীকে সৃষ্টি করেছিলেন প্রাণীসংহারের উদ্দেশে। মৃত্যুদেবী দয়াবশতঃ প্রাণীসংহার করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সে সময় তিনি বহু স্থান দর্শন করে তপস্যা করেন। কৌশিকী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেও মৃত্যু দেবী যান এবং বায়ু ও জলমাত্র আহার করে কঠোর তপস্যা করেন। *[মহা (k) ৭.৫৪.২২; ১২.২৫৮.২১; (হরি) ৭.৪৬.২১; ১২.২৫৩.৬৪]*

□ শমীক ঋষির পুত্র শৃঙ্গী কুরুরাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক পিতার অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই কৌশিকী নদীর জলে আচমনরত অবস্থায় অভিশাপ উচ্চারণ করেন। শৃঙ্গী পরীক্ষিৎকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, সাতদিনের মধ্যে মহাসর্প তক্ষক তাঁকে দংশন করবেন এবং তক্ষকের দংশনেই পরীক্ষিতের মৃত্যু হবে।

[ভাগবত পু. ১.১৮.৩৬-৩৭]

□ মহর্ষি লোমশ কঠোর তপস্যার মাধ্যমে বহু পবিত্র স্বর্গপ্রবাহিতা নদীকে মর্ত্যে নিয়ে আসেন। এই নদীগুলির মধ্যে কৌশিকী একটি।

[বায়ু পু. ১০৮.৮১]

□ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কৌশিকী নদীর উত্তরে অবস্থিত এক গভীর বনভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বনাঞ্চলটি 'অঞ্জন' নামক হস্তীদের বাসভূমি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৫৫]

□ হব্যবাহী অগ্নি ষোড়শ নদীকে কামনা করেছিলেন। এই নদীগুলির মধ্যে কৌশিকী একটি। *[বায়ু পু. ২৯.১৪; মৎস্য পু. ৫১.১৪]*

□ আধুনিক কোশী বা কুশি নদী। তিব্বত, নেপাল এবং উত্তর-মধ্য ভারতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। *[GDAMI (N.L. Dey) p. 97]*

কৌশিল্য১ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে কৃষ্ণ-যজুর্বেদের অন্তর্গত চরক শাখার অন্যতম ঋষি ছিলেন কৌশিল্য। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.৮]*

কৌশিল্য২ ঊনবিংশতিতম দ্বাপরে যখন মহর্ষি ভরদ্বাজ বেদবিভাগকারী ব্যাস হবেন, সেই যুগে ভগবান মহাদেব জটামালী নাম গ্রহণ করে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন। তাঁর যে চারটি পুত্রসন্তান হবে, তাঁদের মধ্যে একজন হবেন কৌশিল্য। *[বায়ু পু. ২৩.১৮৭]*

কৌশীতি একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হিসেবে পুরাণে বর্ণিত হয়েছেন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.১০]*

কৌশেয়১ একজন মহর্ষি। রাবণকে বধ করে ফিরে এসে রাম যখন অযোধ্যায় রাজা হলেন। তখন পশ্চিমদিকবাসী অন্যান্য ঋষিদের সঙ্গে কৌশেয় এসেছিলেন রামকে অভিনন্দন জানাতে। *[রামায়ণ ৭.১.৪]*

কৌশেয় *[দ্র. বস্ত্র]*

কৌষ্টিকি পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি কৌষ্টিকির বংশ তার মধ্যে একটি। কৌষ্টিকি অঙ্গিরার বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৬.৬]*

কৌষ্মাণ্ড কাক্ষীবানের পুত্রদের যে দুটি গণে বিভক্ত করা হয়েছে, কৌষ্মাণ্ড তার মধ্যে একটি একটি গণ। *[মৎস্য পু. ৪৮.৮৮]*

কৌসি পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি কৌসির বংশ তার মধ্যে একটি। কৌসি ভৃগুর বংশজাত একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৫.২৬]*

কৌস্তুভ ভগবান বিষ্ণুর বক্ষে বিরাজমান মণিই কৌস্তুভ মণি। সমুদ্রমন্থনের সময় লক্ষ্মীদেবী, সুরাদেবী এবং উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের পরে এই দিব্য মণিটির উৎপত্তি হয়েছিল। ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্মীদেবীকে এবং কৌস্তুভ মণিকে গ্রহণ করেন।

বিষ্ণুর দেবত্ব কৃষ্ণের ওপর আরোপিত হওয়ায় তাঁর অলঙ্কার ও অস্ত্রশস্ত্রও বাসুদেব-কৃষ্ণের ওপরেও আরোপিত হয়েছে। তাই মহাভারতে ও পুরাণে কৌস্তুভ মণিকে বাসুদেব-কৃষ্ণের অলঙ্কারও বলা হয়েছে।

[মহা (k) ১.১৮.৩৫-৩৬; ৫.৯৪.১৪; ৫.১০২.১২; (হরি) ১.১৪.৩৬-৩৭; ৫.৮৭.২৬; ৫.৯৫.১২; ভাগবত পু. ২.২.১০; ৮.৪.১৯; ১০.৩.৯; ১১.১৪.৪০; ১২.১১.১০; মৎস্য পু. ২৫০.৪; ২৫১.৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.৯.৭৩]

ক্রতু১ ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি ক্রতু। ইনি সপ্তর্ষিদের মধ্যে অন্যতম। মহাকাব্য-পুরাণে সৃষ্টির আদিতে জন্মগ্রহণকারী যে একুশজন প্রজাপতির নাম উল্লিখিত হয়েছে, তার মধ্যেও অন্যতম ছিলেন ক্রতু। পুরাণে, মহাভারতে বশিষ্ঠ প্রভৃতি প্রধান ঋষিদের 'চিত্রশিখণ্ডী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ক্রতু 'চিত্রশিখণ্ডী' ঋষিদের মধ্যে অন্যতম।

[দ্র. চিত্রশিখণ্ডী]

[মহা (k) ১.৬৫.১০; ১.৬৬.৪; ১২.১৬৬.১৬; ১২.৩৩৪.৩৫; ১২.৩৩৫.২৯; ১২.৩৪০.৬৯; (হরি) ১.৬০.১০; ১.৬১.৪; ১২.১৬১.১৬; ১২.৩২০.৩৫; ১২.৩২১.৩০; ১২.৩২৬.৬৫]

□ পুরাণগুলিতেও মহর্ষি ক্রতুর প্রধান পরিচয় এই যে তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র, একজন আদি প্রজাপতি। বংশ (প্রজা) বিস্তার করেছিলেন বলেই তাঁর প্রজাপতি সংজ্ঞা। তবে ক্রতুর জন্ম বিষয়ে পুরাণে একাধিক কাহিনী উল্লিখিত হতে দেখা যায়। ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার হাত থেকে ক্রতু প্রজাপতির উৎপত্তি হয়। বায়ু পুরাণ বা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে প্রাপ্ত কাহিনী অনুযায়ী, ব্রহ্মার মানসপুত্র ক্রতু প্রভৃতি ঋষিরা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দক্ষযজ্ঞের সময় স্বয়ং মহাদেবের দ্বারা অভিশপ্ত হন। সেই সময় তাঁরা তাঁদের সেই অভিশপ্ত জীবন ত্যাগ করে ব্রহ্মার পুত্ররূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করার পরিকল্পনা করলেন। এরপর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হল। চাক্ষুষ মন্বন্তরে একসময় ব্রহ্মা বরুণ দেবতার যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। সেই যজ্ঞে দেবতাদের পত্নীরা এবং দেবলোকের অন্যান্য রমণীরাও উপস্থিত ছিলেন। দেবলোকের অপরূপ সুন্দরী রমণীদের দেখে ব্রহ্মা ক্ষুব্ধ হলেন, তাঁর তেজ স্খলিত হল। সেই স্খলিত শুক্র দ্বারা ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির ভাবনায় হোম শুরু করলেন। সেই হোমাগ্নি থেকে অন্যান্য প্রজাপতি ঋষিদের মতোই ক্রতুও পুনরায় জন্মগ্রহণ করলেন। বস্তুত 'ক্রতু' শব্দের অর্থ হল

যজ্ঞ। যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন হলেন বলেই তাঁর নাম ক্রতু—

ক্রতৌ তস্মিন্ সুতো জজ্ঞে যতস্তস্মাৎ
স বৈ ক্রতুঃ।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আবার উল্লিখিত হয়েছে যে, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার অপানদেশ হতে ক্রতু প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন।

[ভাগবত পু. ৩.১২.২২-২৩;
বায়ু পু. ৩.৩.২৮.৫২; ৬৫.৪৪;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.৭৬; ১.৩৫.৯২; ১.৩৬.৮;
২.১.২১, ৪৪; ২.৫.৭০, ৭৯; ২.৯.১৮, ২৪;
মৎস্য পু. ৩.৭]

□ প্রজাপতি ক্রতুর পত্নীর নাম কিংবা সন্তানাদির সম্পর্কেও পুরাণগুলিতে এবং মহাকাব্যে একাধিক রকমের তথ্য পাওয়া যায়। মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে যে, ক্রতু বালখিল্য মুনিদের পিতা। কিন্তু মহাভারতে ক্রতুর পত্নীর নাম উল্লিখিত হয়নি। তবে বিষ্ণু পুরাণে ক্রতুর পত্নী হিসেবে দক্ষকন্যা ক্ষমার নাম উল্লিখিত হয়েছে। আবার ভাগবত পুরাণে কর্দম প্রজাপতির কন্যা ক্রিয়াকে ক্রতু প্রজাপতির পত্নী বলা হয়েছে। পুরাণে অবশ্য বালখিল্য মুনিরা ছাড়াও তুষিত দেবগণকে ক্রতু-প্রজাপতির পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রজাপতি ক্রতু মহর্ষি অগস্ত্যের পুত্র ইধ্মবাহকে পুত্ররূপে কল্পনা করেছিলেন বলে জানা যায়। ফলে অগস্ত্যপুত্র ইধ্মবাহ-র বংশধররা প্রজাপতি ক্রতুরও বংশধরপ্রতিম। *[মৎস্য পু. ২০২.৮]*

□ প্রজাপতি ক্রতু হেমন্তকালে সূর্যের রথে অবস্থান করেন বলে পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে।

[বায়ু পু. ৫২.১৬; ভাগবত পু. ১২.১১.৪৩]

□ মহাভারতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় প্রজাপতি ক্রতুকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। শতশৃঙ্গ পর্বতে অর্জুনের জন্মোৎসবে সমাগত ঋষি-মহর্ষিদের মধ্যে প্রজাপতি ক্রতু অন্যতম। মহাভারতের সভাপর্বে নারদের মুখে দেবরাজ ইন্দ্র এবং লোক পিতামহ ব্রহ্মার সভার যে বিবরণ মেলে, সেখানেও প্রজাপতি ক্রতুর উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখতে পাই।

[মহা (k) ১.১২৩.৫২; ২.৭.১৭; ২.১১.১৯;
(হরি) ১.১১৭.৫৬; ২.৭.১৭; ২.১১.১৯]

□ বশিষ্ঠের পৌত্র তথা শক্তি পুত্র পরাশর যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর পিতা শক্তি একজন রাক্ষসের হাতে নিহত হয়েছেন, তখন সমগ্র রাক্ষসকুলের প্রতিই তাঁর অসম্ভব ক্রোধ জন্মাল। মহর্ষি পরাশর সম্পূর্ণ রাক্ষসকুলের বিনাশসাধনের ইচ্ছায় এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করলেন। তা দেখে প্রজাপতি ঋষি-মহর্ষিরা পরাশরকে এমন ভয়াবহ যজ্ঞ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য এবং নানা উপদেশ দিয়ে তাঁর ক্রোধ শান্ত করার জন্য যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন। এইসময় প্রজাপতি ক্রতুও পরাশরের যজ্ঞসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.১৮১.৯; (হরি) ১.১৭৪.৯]

□ দেবসেনাপতি পদে স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অন্যান্য ঋষি-মহর্ষিদের সঙ্গে প্রজাপতি ক্রতুও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.১০; ৯.৪২.১০]

□ শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে দেখতে যেসব ঋষি-মহর্ষিরা কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিলেন, প্রজাপতি ক্রতুও তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১২.৪৭.১০; ১৩.২৬.৪;
(হরি) ১২.৪৬.১০; ১৩.২৭.৪]

ক্রতু$_{২}$ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদের বংশধারায় উল্মুকের ঔরসে পুষ্করিণীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে ক্রতু অন্যতম। *[ভাগবত পু. ৪.১৩.১৭]*

ক্রতু$_{৩}$ কৃষ্ণের ঔরসে জাম্ববতীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ক্রতু।

[ভাগবত পু. ১০.৬১.১২]

ক্রতু$_{৪}$ জনৈক ব্রাহ্মণ। ইনি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ছিলেন বলে জানা যায়। ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় ইনি ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত ছিলেন।

[ভাগবত পু. ১০.৭৪.৮]

ক্রতু$_{৫}$ ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, ফাল্গুন মাসে সূর্যের রথে অন্যান্য ঋষি, অপ্সরা, রাক্ষস, গন্ধর্বদের সঙ্গে 'ক্রতু' নামে একজন যক্ষও অবস্থান করেন। *[ভাগবত পু. ১২.১১.৪০]*

ক্রতু$_{৬}$ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন 'যাম' তার মধ্যে একটি গণ। এই যামদেবগণের একতর ছিলেন ক্রতু।

[বায়ু পু. ৩১.৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৩.৯২]

ক্রতু$_{৭}$ তৃতীয় মন্বন্তরে যখন উত্তম মনু মন্বন্তরাধিপতি ছিলেন, সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত

ছিলেন, প্রতর্দন তার মধ্যে একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে ক্রতু একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৩১]

ক্রতু$_{৮}$ মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে দেবীর গর্ভে বারোজন ভৃগুবংশীয় সোমপায়ী দেবতা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই ভৃগুবংশীয় দেবতাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ক্রতু। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১.৮৯; বায়ু পু. ৬৫.৮৭; মৎস্য পু. ১৯৫.১৩]*

ক্রতু$_{৯}$ ধর্মের ঔরসে দক্ষকন্যা বিশ্বার গর্ভজাত সন্তানরা বিশ্বেদেবগণ নামে পরিচিত। এই বিশ্বেদেবগণের মধ্যে অন্যতম হলেন ক্রতু।

[বায়ু পু. ৬৬.৩১; মৎস্য পু. ২০৩.১৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.৩০]

ক্রতু$_{১০}$ ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে অর্থাৎ সাবর্ণি মনুর কালে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন, সুতপ তার মধ্যে একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে ক্রতু একজন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.১৪]*

ক্রতু$_{১১}$ ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমির বংশধারায় রাজা বিজয়ের পুত্র ছিলেন ক্রতু। ক্রতুর পুত্রের নাম সুনয়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৪.২২]

ক্রতু$_{১২}$ বিষ্ণু পুরাণ এবং মৎস্য পুরাণে স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদের বংশধারায় জাত ক্রতুর নাম উল্লিখিত হয়েছে তবে ভাগবত পুরাণে যেমন তাঁকে উল্মুকের ঔরসে পুষ্করিণীর গর্ভজাত বলা হয়েছে, (ক্রতু$_{২}$) এই দুই পুরাণের বিবরণ তেমনটি নয়। এই দুই পুরাণ মতে এই বংশে জাত উরুর ঔরসে, আগ্নেয়ীর গর্ভে ক্রতুর জন্ম হয়।

[বিষ্ণু পু. ১.১৩.৬; মৎস্য পু. ৪.৪৩]

ক্রতু$_{১৩}$ পুরাণ মতে ভগীরথের আবাহনে গঙ্গা মোট সাতটি ধারায় মর্ত্যলোকে প্রবাহিত হয়েছিলেন। গঙ্গার এই সপ্তধারার মধ্যে অন্যতম একটি ধারার নাম ক্রতু। *[বায়ু পু. ৪৯.৯৩]*

ক্রতু$_{১৪}$ বায়ু পুরাণ মতে, পৌরাণিক প্লক্ষদ্বীপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলির মধ্যে ক্রতু অন্যতম।

[বায়ু পু. ৪৯.১৭]

ক্রতু$_{১৫}$ বায়ু পুরাণ মতে, সপ্তম কল্পের নাম ছিল ক্রতু।

[বায়ু পু. ২১.৩০]

ক্রতুজিৎ হিরণ্যকশিপুর বংশধারায় কালনেমির পুত্রদের মধ্যে একজন ক্রতুজিৎ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫.৩৯]

ক্রতুবংশ অগস্ত্যের বংশধারায় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি ক্রতুবংশ। *[মৎস্য পু. ২০২.২]*

ক্রতুমান্ বিশ্বামিত্রের পুত্রদের মধ্যে একজন পুত্র ক্রতুমান। *[ভাগবত পু. ৯.১৬.৩৬]*

ক্রতুস্থলা পঞ্চচূড়াগণের অন্তর্ভুক্ত একজন অপ্সরা। পুরাণে পঞ্চচূড়া গণের অন্তর্গত দশজন দৈবীকি অপ্সরার নাম পাওয়া যায়—

পঞ্চচূড়াস্ত্বিমা দিব্যা দৈবিক্যপ্সরসো দশ।

এঁরা হলেন মেনকা, সহজন্যা, পর্ণিনী, পুঞ্জিকস্থলা, ঘৃতস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, পূর্বচী (পূর্বচিত্তি), প্রম্লোচা ও অনুম্লোচন্তী। বায়ু পুরাণে বর্ণিত ঘৃতস্থলাই সম্ভবত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ক্রতুস্থলী বা ক্রতুস্থলা। এইসব দৈবীকি অপ্সরাগণ তাঁদের চুলগুলি পাঁচ ভাগে ভাগ করে বাঁধেন বলেই সম্ভবত এরা পঞ্চচূড়া গণভুক্ত।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১০১]

□ খশার পুত্র যক্ষ একসময় ক্রতুস্থলী অপ্সরাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁকে লাভ করার জন্য যক্ষ নন্দনবন, বৈভ্রাজ বন এবং চৈত্ররথ বনে ভ্রমণ করতে শুরু করেন। অবশেষে নন্দনবনে অন্যান্য অপ্সরাদের সঙ্গে যক্ষ ক্রতুস্থলীকে ক্রীড়ারত অবস্থায় দেখতে পান। ক্রতুস্থলীকে লাভ করার ইচ্ছায় যক্ষ বসুরুচি নামক জনৈক গন্ধর্বের রূপ ধারণ করেন। এই বসুরুচি ছিলেন ক্রতুস্থলীর প্রণয়ী। ফলে বসুরুচির ছদ্মবেশধারী যক্ষকে দেখে মুগ্ধ হয়ে ক্রতুস্থলী সহজেই তাঁর প্রণয় সম্ভাষণে সাড়া দেন এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হন। সঙ্গমের ফলে বসুরুচিরূপী যক্ষ এবং ক্রতুস্থলীর এক দীর্ঘকায় পুত্রের জন্ম হয়েছিল। সদ্যপ্রসূত পুত্রের চেহারা দেখে ক্রতুস্থলী তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। যক্ষপুত্রের জন্মদাত্রী হওয়ার কারণে অন্যান্য অপ্সরাও ক্রতুস্থলীকে যারপরনাই অপমান করেন। যক্ষও পুত্র নাভিকে সঙ্গে নিয়ে যক্ষগণের আবাসস্থলে ফিরে যান। *[বায়ু পু. ৬৯.১৩৬-১৫০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১০১-১১৭]*

□ বিষ্ণু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, অপ্সরা ক্রতুস্থলা মধুমাস বা চৈত্রমাসে সূর্যের রথে অবস্থান করেন। *[বিষ্ণু পু. ২.১০.৪-৫]*

□ অপ্সরা ক্রতুস্থলার প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতায়। বাজসনেয়ী সংহিতার টীকাকার মহীধর ক্রতুস্থলা নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

ক্রতূনাং সংকল্পানাং রূপাদিজ্ঞানানাং
স্থলা স্থানভূতা ক্রতুস্থলা।

'ক্রতু' শব্দের অর্থ সংকল্প। রূপসম্বন্ধী সমস্ত জ্ঞানের সংকল্প যে স্থানে সৃষ্টি হয়—তিনিই ক্রতুস্থলা। অর্থাৎ এই অপ্সরাকে দেখা মাত্র তাঁর রূপের বিষয় ভাবনা করে মনুষ্য হৃদয়ে বিচিত্র সংকল্প তৈরি হয়।

[বাজসনেয়ী সংহিতা (Weber) ১৫.১৯ (মহীধরকৃত টীকা দ্রষ্টব্য)]

ক্রতুস্থলী *[দ্র. ক্রতুস্থলা]*

ক্রথ১ যদুপুত্র ক্রোষ্টুর বংশধারায় বিদর্ভের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন ক্রথ। বিদর্ভ রাজ্যের উৎপত্তির ক্ষেত্রে ক্রথও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

যদুপুত্র ক্রোষ্টুর বংশধারায় পরাবৃতের তৃতীয় পুত্র ছিলেন জ্যামঘ। ইনি অন্যান্য ভাইদের দ্বারা প্রতারিত এবং রাজ্যচ্যুত হয়ে বনে যেতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে নিজের চেষ্টায় সৈন্য সংগ্রহ করে জ্যামঘ নর্মদা নদীর তীর ভূমিতে অবস্থিত মার্ত্তিকাবত নগরী এবং তৎসংলগ্ন ঋক্ষবান পর্বত জয় করেন। লক্ষণীয়, এই মার্ত্তিকাবত নগরী ছিল যদু বংশেরই একটি শাখা হৈহয়দের রাজধানী। ঋক্ষবান পর্বতের একপাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে নর্মদা, যার তীরে অবস্থিত ছিল মার্ত্তিকাবত নগরী। অন্যপাশ দিয়ে শুক্তিমতী নদী প্রবাহিত হয়েছে, যার তীরে অবস্থিত ছিল শুক্তিমতী নগরী। জ্যামঘ ঋক্ষবান পর্বত জয় করেছিলেন বলে কোনো কোনো পুরাণ তাঁকে শুক্তিমতীর অধিপতি বলেও চিহ্নিত করেছে। পণ্ডিত Pargiter এই মত পোষণ করেন যে, হৈহয়দের রাজ্যের উত্তরাংশ (যা শুক্তিমতীর খুব কাছেই অবস্থিত ছিল) পরবর্তীকালে বিদর্ভ নামে আত্মপ্রকাশ করে।

[AIHT (Pargiter) p. 272]

পুরাণ মতে বিদর্ভ ছিলেন জ্যামঘের পুত্র। তাঁর নামেই জ্যামঘের নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানীর নাম হয় বিদর্ভ। বিদর্ভের তিন পুত্রসন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ক্রথ। দ্বিতীয় পুত্র কৌশিক অথবা কৈশিক। বিদর্ভের কনিষ্ঠ পুত্র রোমপাদ পিতার রাজ্য ত্যাগ করে মগধের নিকটবর্তী অঞ্চলে নতুন রাজ্য স্থাপন করেন। তবে ক্রথ এবং কৈশিকের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল বলে মনে হয়। দুই ভাই একত্রে বিদর্ভদেশ শাসন করতেন। ক্রথ-কৈশিক অত্যন্ত খ্যাতিসম্পন্ন রাজা ছিলেন বলে মনে হয়, কারণ মহাভারতে বিদর্ভদেশকে ক্রথ-কৈশিক দেশ নামেও চিহ্নিত হতে দেখা যায়। ক্রথের পুত্র ছিলেন কুন্তি। আর কৈশিকের পুত্র চেদি। এই চেদিই চেদিরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ক্রথ-এর বংশধারাতেই পরবর্তী সময়ে যদুবংশের বিখ্যাত বৃষ্ণি-অন্ধক শাখা জন্মলাভ করে।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.১, ৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭০.৩৭; বায়ু পু. ৯৫.৩৫-৩৯; বিষ্ণু পু. ৪.১২.১৫; মৎস্য পু. ৪৪.৩৬-৩৮; হরিবংশ পু. ১.৩৬.২০]

ক্রথ২ মূলত হরিবংশ পুরাণে কৃষ্ণের সমসাময়িক বিদর্ভরাজ ক্রথ এবং কৈশিকের নাম উল্লিখিত হয়েছে। পুরাণে জ্যামঘের যে বংশলতিকা বর্ণিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে জ্যামঘের পৌত্র ক্রথ-কৈশিক কখনোই কৃষ্ণের সমসাময়িক হতে পারেন না। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে ক্রথ (ক্রথ১) কৃষ্ণের পূর্বপুরুষ অন্ধক-বৃষ্ণি-বংশের অতিবৃদ্ধ পিতামহ। সুতরাং কৃষ্ণ এবং সেই ক্রথ-কৈশিকের মধ্যে কয়েকশো বছরের ব্যবধান। হরিবংশ পুরাণের কাহিনী থেকে মনে হয় বিদর্ভ রাজবংশে দ্বিতীয় কোনো ক্রথ-কৈশিক এই সময়ে বর্তমান ছিলেন। হরিবংশ পুরাণের কাহিনী থেকে জানা যায় যে, ক্রথ-কৈশিক কৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। কৈশিকের বংশধর ভীষ্মক ছিলেন জরাসন্ধের মিত্রপক্ষীয়দের মধ্যে অন্যতম। ক্রথের বংশধর অংশুমান অপেক্ষাকৃত দুর্বল চরিত্রের পুরুষ ছিলেন বলে মনে হয়, কারণ ভীষ্মক বিদর্ভের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে তিনি তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়েছিলেন। হরিবংশ পুরাণের বিবরণ থেকে মনে হয় জরাসন্ধপন্থী কংস যেমন পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে রাজা হয়েছিলেন ভীষ্মকও সম্ভবত পিতা এবং জ্যেষ্ঠতাতকে সরিয়ে নিজেকে বিদর্ভের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। জরাসন্ধের দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের ভিত্তি সে যুগে এইভাবেই রচিত হয়েছিল। মহাভারতের সভাপর্ব এই ভীষ্মককে অত্যন্ত বলবান তথা দেবরাজ ইন্দ্রের পরম বন্ধু বলে বর্ণনা করা হয়েছে—ভোজ ইন্দ্রসখো বলী। মহাভারতে রাজা ভীষ্মক ক্রথ-কৈশিক দেশ জয় করেন বলে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। মহাভারত এবং হরিবংশের কাহিনী বিচার করলে ভীষ্মকের দ্বারা ক্রথ-কৈশিকের সিংহাসনচ্যুত হবার সংবাদটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

যাই হোক, ভীষ্মক জরাসন্ধের অনুগত নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র রুক্মীর কথায় একমাত্র কন্যা রুক্মিণীর স্বয়ংবর আয়োজন করলেন। স্বয়ংবর সভায় জরাসন্ধের শত্রু বলেই কৃষ্ণ-বলরাম আমন্ত্রণ পেলেন না। আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করেই তাঁরা বিদর্ভের রাজধানী কুণ্ডিনপুরে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ক্রথ-কৈশিকের গৃহে অতিথি হলেন। কৃষ্ণের পরম ভক্ত ক্রথ-কৈশিক তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। হরিবংশে বর্ণিত হয়েছে—স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র ক্রথকে আদেশ করেছিলেন যে, কৃষ্ণ উপস্থিত হলেই যেন রাজেন্দ্রোচিত মর্য্যাদায় কৃষ্ণের অভিষেক সম্পন্ন করা হয়। যে রাজা এই অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন না তিনি অবশ্যই নিহত হবেন। ক্রথের মুখে একথা শুনে রাজারা সকলেই স্বয়ংবর সভা ত্যাগ করে কৃষ্ণের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন।

খ্রিষ্টীয় প্রথম তিন-চার শতাব্দী জুড়ে বাসুদেব কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে যে ভক্তিবাদ দানা বেঁধেছিল, তার পাশাপাশি হরিবংশে বর্ণিত এই কাহিনীর মূল প্ররোচনাও কৃষ্ণকে প্রায় ভগবত্তার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে এই কাহিনী থেকে যে রাজনৈতিক সত্যটি উদ্ধার করা যায়, তা বোধহয় এই যে, কৃষ্ণ স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত না থেকেও সম্ভবত ক্রথের সহায়তায় রুক্মিণীর জন্য আয়োজিত প্রথম স্বয়ংবর সভা বিফল করে দিতে পেরেছিলেন।

ক্রথ-কৈশিকের মতো প্রবীণরা যে জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন না এবং যে কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও জরাসন্ধের অকারণ আধিপত্য তাঁদের কাছে সহনীয় ছিল না, এটাও খুব স্বাভাবিক। ভিতরে ভিতরে তাঁরা জরাসন্ধের প্রভাব থেকে মুক্তি পেতেই চাইছিলেন। কৃষ্ণকে আপ্যায়ন, রাজেন্দ্রোচিত মর্য্যাদায় তাঁর অভিষেক সম্পন্ন করা কিংবা একেবারে গোটা রাজ্যটাই তাঁর হাতে তুলে দেবার যে বিবরণ আমরা হরিবংশে পাই, তার মধ্য থেকে ক্রথ রাজার ভগবদ্‌ভক্তির চেয়েও রাজনৈতিক ভাবনাটাই আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। *[মহা (k) ২.১৪.২১; ৩.১২.৩০; (হরি) ২.১৪.২১; ৩.১১.৩০; হরিবংশ পু. ২.৪৭-৫০ অধ্যায়; ২.৫৯.১১-১২]*

ক্রথ৩ মহাভারতের অংশাবতরণ পর্ব থেকে জানা যায় যে, দ্বাপর যুগে ক্রোধবশ অসুরদের অংশে যেসব রাজা মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন ক্রথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইনি হরিবংশ পুরাণে বর্ণিত বিদর্ভদেশের ক্রথ বলেই আমাদের মনে হয়, তবে মহাভারতে খুব স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

[মহা (k) ১.৬৭.৬১; (হরি) ১.৬২.৬২]

ক্রথ৪ সুপার্শ্ব দেশের অথবা তৎসংলগ্ন কোনো রাজ্যের রাজা। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের আগে পূর্বদিক জয় করতে গিয়ে ভীম এই ক্রথ রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন বলে বর্ণিত হয়েছে। ভীম যে পথে দিগ্বিজয় করতে গিয়েছিলেন সে পথে কোন ভাবেই বিদর্ভ অবস্থিত নয় বলেই এই ক্রথ যে বিদর্ভরাজ নন, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

[মহা (k) ২.৩০.৭; (হরি) ২.২৯.৭]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়দ্রথ বধের দিনে সম্ভবত এই ক্রথ রাজাকেই কৌরবপক্ষে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখা যায়।

[মহা (k) ৭.১২০.১০-১১; (হরি) ৭.১০৪.১০-১১]

ক্রথ৫ জনৈক মহর্ষি। কৃষ্ণ শান্তিদূত হিসেবে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলে যাত্রার পূর্বে যে সব ঋষিরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন মহর্ষি ক্রথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ৫.৮৩.২৭; (হরি) ৫.৭৭.২৭]

ক্রথ৬ তারকাসুর বধের সময় যে সব অনুচর যোদ্ধা স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে সহায়তা করেন, ক্রথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ৯.৪৫.৭০; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা। দ্র. খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৬]

ক্রথন১ একজন যক্ষ। মা বিনতাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য গরুড় যখন অমৃত আনতে গেলেন, সেই সময় যেসব যক্ষের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল, ক্রথন তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.৩২.১৮; (হরি) ১.২৭.১৮]

ক্রথন২ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা খশার গর্ভজাত একজন রাক্ষস। বায়ু পুরাণে উল্লিখিত আছে যে সুতল লোকে এঁর বাসভবন ছিল।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৩৩; বায়ু পু. ৫০.২২]

ক্রথন৩ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সভায় উপস্থিত জনৈক অসুরবীর। *[মৎস্য পু. ১৬১.৮০]*

ক্রথন৪ মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে ক্রথন নামে এক অসুরের উল্লেখ পাই। দ্বাপর যুগে ইনি সূর্যাক্ষ নামক রাজা রূপে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ

হয়েছিলেন। মহাভারতের সভাপর্ব থেকে জানা যায়, যেসব অসুর বরুণদেবের সভায় বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও একজন ছিলেন ক্রথন। *[মহা (k) ১.৬৭.৫৭; ২.৯.১৩; (হরি) ১.৬২.৫৮; ২.৯.১৩]*

ক্রথন৫ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের একজন।

[মহা (k) ১.১১৭.১১; (হরি) ১.১১১.১১]

ক্রথন৬ ত্রিপুর নিবাসী দৈত্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতারা মহাদেবকে দৈত্যদের জন্য ময়দানব যে ত্রিপুর নির্মাণ করেছিলেন, তা ধ্বংস করতে অনুরোধ করলেন। এই সময় দেবতারা মহাদেবের যে স্তব করেছিলেন সেখানে তাঁকে ক্রথন নামে সম্বোধন করা হয়েছে। বস্তুত সংস্কৃত 'ক্রথ্' ধাতু থেকে ক্রথন শব্দের উৎপত্তি। 'ক্রথ্' ধাতুর অর্থ বধ করা বা সংহার করা। যিনি সংহার করেন তিনিই ক্রথন। এই ভাবনা থেকে মহাকাব্য-পুরাণে যেমন একাধিক ক্রূরকর্মা যক্ষ-রাক্ষসের ক্রথন নাম উল্লিখিত হয়েছে, ঠিক তেমনই ভগবান শিবও তাঁর প্রলয়কারী সংহারমূর্তির জন্যই ক্রথন নামে সম্বোধিত হয়েছেন।

[মহা (k) ৮.৩৩.৫৮; (হরি) ৮.২৭.৫৯]

ক্রথন৭ জনৈক বানরবীর। রামায়ণে উল্লিখিত আছে যে, অগ্নির ঔরসে গন্ধর্ব কন্যার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। ইনি কৈলাস পর্বতে কুবেরের অলকাপুরীর কাছেই বাস করতেন। লঙ্কাকাণ্ডে উল্লেখ আছে যে, দেবাসুর যুদ্ধে দেবতাদের সহায়তা করার জন্যই অগ্নি এই পুত্রের জন্মদান করেছিলেন। লঙ্কাযুদ্ধে রামের সহায়তা করার জন্য ইনি ষাট লক্ষ বানর সেনা নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

[রামায়ণ ৬.২৬.৪২-৪৩; ৬.২৭.২০-২৩]

ক্রথন৮ মহাভারতে বরুণের সভায় বিশিষ্ট আসন লাভ করেছেন—এমন অসুরবীরদের মধ্যে জনৈক ক্রথনের নাম উল্লিখিত হয়েছে। তবে মহাভারতে এবং পুরাণে ক্রথন নামে একাধিক অসুরের উল্লেখ থাকায় বরুণের সভায় অবস্থানকারী ক্রথনের জন্ম পরিচয় নির্ধারণ করা যায় না। *[মহা (k) ২.৯.১৩; (হরি) ২.৯.১৩]*

ক্রন্থল ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে একজন শ্রুতর্ষি। *[দ্র. ঋষি]*

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.১১]

ক্রব্যাদাগ্নি বস্তুত ক্রব্য-শব্দের অর্থ মাংস। রূঢ় অর্থে মৃতের মাংস। ইংরেজিতে ক্রব্যের খুব কাছাকাছি শব্দ হল corpse যার অর্থ শবদেহ। সেই দেহ যে খায়, সে ক্রব্যাদ। অগ্নি যেহেতু মৃতদেহকে পুড়িয়ে ভস্মসাৎ করে, তাই অগ্নিও এক অর্থে ক্রব্যাদ। ঋগ্বেদে এই শবদাহক অগ্নিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নবজাতকের সন্ধান জানা জাতবেদা অগ্নিকে স্বাগত জানানো হয়েছে—

ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং/ইহৈবায়মিতরো জাতবেদাঃ/দেবেভ্যো হব্যংবহতু প্রজানন্॥

বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে যে, ক্ষাম-এর পুত্র ক্রব্যাদাগ্নি। এই অগ্নিই শবদেহকে দগ্ধ করে। *[ঋগ্বেদ ১০.১৬.৯; বায়ু পু. ২৯.৩৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১২.৩৭]*

ক্রম১ ভবিষ্যৎ দ্বাদশ মন্বন্তর অর্থাৎ ঋতসাবর্ণি মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন, সুকর্ম তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে একজন হলেন ক্রম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৮৭-৮৮; বায়ু পু. ১০০.৯৩]

ক্রম২ বৈবস্বত মনুর পুত্র নাভাগের বংশধারায় বৎসপ্রীর ঔরসে সুনন্দার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন। *[মার্কণ্ডেয় পু. ১১৭.১]*

ক্রম৩ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। সংস্কৃত 'ক্রম্' ধাতু থেকে ক্রম শব্দের উৎপত্তি। 'ক্রম্' ধাতুর একটা অর্থ হতে পারে চলার জন্য পা ফেলা বা পদক্ষেপ করা। ভগবান বিষ্ণু এই জগতকে চালনা করেন। চলমান সময় বা জীবনের গতিশীলতা তাই ভগবান বিষ্ণুর প্রতিরূপ। তাই মনুসংহিতায় মানুষের পদক্ষেপণে বা দুই পায়ে ভগবান বিষ্ণুর অধিষ্ঠান বলে বর্ণনা করা হয়েছে—ক্রান্তে বিষ্ণু। *[মনুসংহিতা ১২.১২১]*

এই কারণে তাঁর নাম ক্রম। 'ক্রম্' ধাতুর দ্বিতীয় অর্থ হল ব্যাপ্ত করা। তিনি সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপ্ত করে আছেন বলেও পরমেশ্বরস্বরূপ ভগবান বিষ্ণু ক্রম নামে খ্যাত—

ক্রমণাৎ ক্রমহেতুত্বাদ্ বা ক্রমঃ (শাঙ্করভাষ্য)।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.২২; (হরি) ১৩.১২৭.২২]

ক্রমজিৎ ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সভায় অবস্থানকারী জনৈক রাজা।

[মহা (k) ২.৪.২৮; (হরি) ২.৪.১০ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ৫; পৃ. ২৬]

ক্রমু পৌরাণিক প্লক্ষদ্বীপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৯.১৯]*

ক্রাথ$_1$ ক্রথ রাজার পুত্র। পুরাণে অবশ্য বলা হয়েছে যে, ক্রথ রাজার পুত্রের প্রকৃত নাম ছিল কুন্তি। তবে ক্রথের পুত্র হিসেবে ক্রাথ নামেই তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয়। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ক্রাথ দ্বাপরযুগে সিংহিকাপুত্র রাহুর অংশে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.৪০; (হরি) ১.৬২.৪১; ভাগবত পু. ৯.২৪.৩; মৎস্য পু. ৪৪.৩৮-৩৯; বায়ু পু. ৯৫.৩৮; বিষ্ণু পু. ৪.১২.১৫]

□ ক্রাথ-র পিতা অর্থাৎ ক্রথের (ক্রথ$_1$) প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা তাঁদের পারিবারিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস বিশদে আলোচনা করেছি। ক্রাথ যে জরাসন্ধপন্থী ছিলেন এবং কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন তাও এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। *[দ্র. ক্রথ$_1$]*

□ দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় আমরা ক্রাথকে উপস্থিত থাকতে দেখি। ধৃষ্টদ্যুম্ন সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে ক্রাথের নাম উচ্চারিত না হলেও পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রুপদ রাজার শর্ত অনুসারে লক্ষ্যভেদ-এর যে বিবরণ আমরা পাই, সেখানে বিফল রাজাদের মধ্যে ক্রাথের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.১৮৭.১৫; (হরি) ১.১৮০.১৫]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ক্রাথ রাজা কৌরব শিবিরে যোগ দান করেন। অভিমন্যু চক্রব্যূহে প্রবেশ করলে যে সব কৌরবপক্ষীয় মহারথী অভিমন্যুকে আক্রমণ করেন ক্রাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কর্ণপর্বে ক্রাথ রাজার হাতে পাণ্ডবপক্ষীয় কুলিন্দ রাজকুমারকে মৃত্যুবরণ করতে দেখা যায়। তবে ওইদিনের যুদ্ধে অন্য একজন কুলিন্দদেশীয় যোদ্ধার হাতে তিনি নিজেই নিহত হন।

[মহা (k) ৭.২০.১৩; ৭.৩৭.২৫; ৮.৮৫.৩, ১৫; (হরি) ৭.১৮.১৩; ৭.৩৪.২৫; ৮.৬২.৪৩, ৫৬]

ক্রাথ$_2$ পুরুবংশীয় রাজর্ষি কুরুর প্রপৌত্র ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এগারোজন পুত্র সন্তানের পিতা ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের এই পুত্র সন্তানদের মধ্যে ক্রাথ একজন।

[মহা (k) ১.৯৪.৫৮; (হরি) ১.৮৯.৪৬]

ক্রাথ$_3$ কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর শতপুত্রের নামের তালিকায় ক্রাথের নাম কোথাও উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কর্ণপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে জনৈক ক্রাথের নাম দেখা যাচ্ছে। ইনি অন্যান্য ভাইদের নিয়ে ভীমসেনকে আক্রমণ করেছিলেন। যুদ্ধে ভীমসেনের হাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

[মহা (k) ৮.৫১.৭, ১৬; (হরি) ৮.৩৯.৭, ১৬]

ক্রাথ$_4$ স্কন্দ-কার্ত্তিকেয়ের অনুচর যোদ্ধাদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ৯.৪৫.৭০; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, খণ্ড ৩৯, পৃ. ৪৭৬]*

ক্রাথ$_5$ একজন বিশিষ্ট নাগ। প্রভাসক্ষেত্রে যদুবংশ ধ্বংস হবার পর শেষাবতার বলরাম যখন যোগবলে দেহত্যাগ করলেন, তখন তাঁর মুখ থেকে সহস্রফণাযুক্ত বিশাল এক সাপ নির্গত হয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করল। সেই সময় সমুদ্রতীরে বহু বিশিষ্ট নাগ শেষনাগকে স্বাগত জানাবার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই নাগদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ক্রাথ। *[মহা (k) ১৬.৪.১৬; (হরি) ১৬.৪.১৬]*

ক্রাথেশ্বর একজন ঋষি। বামন পুরাণ মতে, যাঁরা শিবলিঙ্গের উপাসনা করতেন তাঁদের চারটি শাখা ছিল। কালদমন এই চারটি শাখার মধ্যে তৃতীয়। মহর্ষি আপস্তম্ব এই শাখার প্রবক্তা ছিলেন। ক্রাথেশ্বর এই আপস্তম্বের শিষ্য ছিলেন।

[বামন পু. ৬.৯০]

ক্রিয়া$_1$ কর্দম মুনির কন্যা এবং ক্রতুর পত্নী ক্রিয়া। তিনি ষাটহাজার বালখিল্য ঋষির জন্ম দিয়েছিলেন। *[ভাগবত পু. ৩.২৪.২৩; ৪.১.৩৮]*

ক্রিয়া$_2$ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি থেকে চয়ন করে যে অগ্নি আনা হয় তাকে চিতি-অগ্নি বলে। অগ্নি সর্বদাই চৈতন্য উদয়কারী। চিতি-অগ্নি শব্দটি এই চৈতন্য শব্দের দ্যোতকও হতে পারে। ভাগবত পুরাণে পুরীষ্য অগ্নিকে 'চিতি-অগ্নি' নামে অভিহিত করা হয়েছে। বিধাতা নিজ পত্নী ক্রিয়ার গর্ভে পুরীষ্য ইত্যাদি পাঁচটি চিতি-অগ্নি উৎপাদন করেন।

[ভাগবত পু. ৬.১৮.৪ (শ্রীধর স্বামী কৃত টীকা দ্র.)]

ক্রিয়া$_3$ দক্ষকন্যা ক্রিয়া ধর্মের পত্নী। ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে, যোগ ক্রিয়ার পুত্র। অবশ্য বায়ু পুরাণে নয় (ন্যায়-নীতি), দণ্ড এবং সময়কে ক্রিয়ার পুত্র বলা হয়েছে। বিষ্ণু পুরাণ মতে ক্রিয়ার পুত্র বিনয় এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে দম, শম, ও মনুকে ক্রিয়ার পুত্র বলা হয়েছে। *[মহা (k) ১.৬৬.১৪; (হরি) ১.৬১.১৪; ভাগবত পু. ৪.১.৫০; বায়ু পু. ১০.২৫, ৩৫; ৫৫.৪৩; বিষ্ণু পু. ১.৭.২১, ২৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.২৪; ১.৯.৪৯, ৬০]*

ক্রীড় একজন রাক্ষস। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে খশার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন।
[বায়ু পু. ৬৯.১৬৬]

ক্রীত অন্য মাতাপিতার কাছ থেকে যে পুত্রকে মূল্য দিয়ে কেনা হয়, সেই পুত্রের সংজ্ঞা হল ক্রীতক বা ক্রীত। [দ্র. পুত্র]
[মানব ধর্মশাস্ত্র (মাণ্ডলিক), ৯.১৭৪]

ক্রূর১ মহাভারতে ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত জম্বুখণ্ড-বিনির্মাণ পর্বে প্রাচীন ভারতবর্ষের যেসব জনপদগুলির নাম উল্লিখিত হয়েছে, ক্রূর সেগুলির মধ্যে একটি। [মহা (k) ৬.৯.৬৫; (হরি) ৬.৯.৬৫]

ক্রূর২ একজন রাক্ষস। জন্তুধনার পুত্রদের মধ্যে পৌরুষে একজন। ক্রূর এই পৌরুষেয়-র পুত্র।
[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৯৩]

ক্রূরা [দ্র. ক্রোধা]

ক্রোড়দরায়ন মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত একজন ঋষি।
[মৎস্য পু. ২০০.১০]

ক্রোধ১ ষড়্‌রিপু অর্থাৎ আমাদের মানবমন বা মানব চরিত্রের যে ছয়টি প্রধান দোষ বা শত্রু তার মধ্যে দ্বিতীয়টির নাম ক্রোধ। ষড়্‌রিপুর মধ্যে যেটি প্রথম রিপু, অর্থাৎ কাম—সেই কাম থেকেই মূলত ক্রোধের উৎপত্তি। ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুনকে উপদেশ দিতে গিয়ে ক্রোধের উৎপত্তি সম্পর্কে কৃষ্ণ বলছেন—মানুষ কোনো একটি বিষয় নিয়ে যদি সর্বক্ষণ চিন্তা করে, তার ফলে সেই বিষয় বা বস্তুর প্রতি তার একধরণের আসক্তি তৈরি হয়। সেই আসক্তি থেকে জন্ম নেয় 'কাম' বা কামনা, আর কোনও কারণে সেই কামনা প্রতি হত হলে তা থেকে জন্ম নেয় ক্রোধ—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ
কামাৎ ক্রোধো'ভিজায়তে॥
[ভগবদ্‌গীতা ২.৬২]

ভগবদ্‌গীতায় প্রাপ্ত শ্লোকে কামনা প্রতিহত হলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়—এমন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে টীকাকার শ্রীধরস্বামী বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

আসক্ত্যা চ তেষ্বধিকঃ কামো ভবতি,
কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধো ভবতি।

ভগবদ্‌গীতায় এর ঠিক পরের শ্লোকটিতে কৃষ্ণ অত্যধিক ক্রোধের পরিণাম উল্লেখ করেছেন—মাত্রাতিরিক্ত ক্রোধ মানুষের বিবেকবুদ্ধি নষ্ট করে, তার থেকে ক্রমে ক্রমে স্মৃতিবিভ্রম হয়, স্মৃতিবিভ্রম থেকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বুদ্ধি, মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে যায় যা জীবিত মানুষকেও মৃতের সমতুল্য করে তোলে—

ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥
[ভগবদ্‌গীতা ২.৬৩]

□ ভগবদ্‌গীতা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন—মানুষ ইচ্ছা না থাকতেও কীসের দ্বারা চালিত হয়ে পাপ কাজ করে? উত্তর দিতে গিয়ে কৃষ্ণ মানুষের অন্যায় কাজের প্রধান কারণ হিসেবে ষড়রিপুর প্রধান দুই রিপু কাম এবং ক্রোধের উল্লেখ করেছেন—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥
[ভগবদ্‌গীতা ৩.৩৭]

ভগবদ্‌গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে কৃষ্ণ ক্রোধকে মানব চরিত্রের আসুরী সম্পদ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কথায়—অহংকার, শক্তি, কাম এবং ক্রোধ মানুষের মনের মধ্যে বসবাস করলে তার ফলে ব্যক্তির ন্যায়চিন্তা, নীতিবোধ লোপ পায়, সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, এমনকী যাঁরা সৎকর্ম করেন তাদেরও অপছন্দ করে—

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তো'ভ্যসূয়কাঃ॥
[ভগবদ্‌গীতা ১৬.১৮]

অতএব কৃষ্ণের উপদেশ এই যে, মানব চরিত্রে কাম, ক্রোধ এবং লোভ হল নরকের তিনটি দ্বারের মত, যা মানুষকে প্রতিদিন বিনাশের পথে নিয়ে চলে। অতএব মানুষের উচিত এই তিনটি রিপু অর্থাৎ কাম, ক্রোধ এবং লোভ ত্যাগ করা—

ত্রিবিধং নরকাস্যে দং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥
[ভগবদ্‌গীতা ১৬.২১]

ভগবদ্‌গীতার এই উপদেশ থেকেই ক্রোধের সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে যায়। মহাভারতে অন্যত্র এবং পুরাণগুলিতে মূর্তিমান ক্রোধ-এর জন্ম প্রভৃতি বিবরণ মেলে।

ভাগবত পুরাণের একটি শ্লোকে দেখা যাচ্ছে, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার ভ্রূ থেকে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। সেক্ষেত্রে ক্রোধকে ব্রহ্মার মানসপুত্র বলা চলে। ভাগবত পুরাণে অন্যত্র

ক্রোধকে লোভের ঔরসে নিকৃতির গর্ভজাত সন্তান বলা হয়েছে। বস্তুতে ক্রোধের উৎপত্তি এবং প্রকৃতি বিচার করেই মূর্তিমান ক্রোধের জন্ম সম্পর্কে এমন রূপক কল্পিত হয়েছে। বায়ু পুরাণে আবার ক্রোধকে মৃত্যুর পুত্র হিসেবে উল্লিখিত হতে দেখা যায়। মহাভারতে সৃষ্টির আদি পর্যায়ের একুশজন প্রজাপতির মধ্যে ক্রোধের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১২.৩৩৪.৩৬; (হরি) ১২.৩২০.৩৬; ভাগবত পু. ৩.১২.২৬; ৪.৮.৩; বায়ু পু. ১০.৪১]

□ মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, দ্বাপর যুগে শিব, যম, কাম এবং ক্রোধ—এই চার দেবতার সম্মিলিত অংশে অশ্বত্থামার জন্ম হয়। *[দ্র. অশ্বত্থামা]*

[মহা (k) ১.৬৭.৭২-৭৩; (হরি) ১.৬২.৭৩-৭৪]

ক্রোধ$_2$ প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষ কন্যা কালার গর্ভজাত অসুর পুত্রদের মধ্যে ক্রোধ একজন।

[মহা (k) ১.৬৫.৩৫; (হরি) ১.৬০.৩৫]

ক্রোধন$_1$ যে সব ঋষি মহর্ষি ইন্দ্রের সভায় বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন মহর্ষি ক্রোধন তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ২.৭.১১; (হরি) ২.৭.১১]*

ক্রোধন$_2$ মহর্ষি সংবর্তের উপদেশে রাজা মরুত্ত মুঞ্জবান পর্বতে মহাদেবের উদ্দেশে যে স্তব করেছিলেন, সেখানে মহাদেবকে তিনি ক্রোধন নামে সম্বোধন করেছেন।

[মহা (k) ১৪.৮.২৫; (হরি) ১৪.৮.২৬]

ক্রোধন$_3$ রাজর্ষি কুরুর পুত্র জহ্নুর বংশধারায় অযুতের পুত্র ছিলেন ক্রোধন। ক্রোধন দেবাতিথি নামে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন।

[ভাগবত পু. ৯.২২.১১]

ক্রোধন$_4$ মহর্ষি কৌশিকের সাত পুত্রের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ২০.৩]*

ক্রোধনা স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.৬; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ৬ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

ক্রোধনায়ন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা পরাশর মুনির নামে কয়েকটি বংশধারা প্রচলিত ছিল। সেই বংশধারায় অনেকগুলি সন্তানকে নিয়ে এক-একটি বর্গ রচিত হয়েছিল। যাঁদের গৌর-পরাশর, নীল-পরাশর, কৃষ্ণ-পরাশর, শ্বেত-পরাশর, শ্যাম-পরাশর এবং ধূম্র-পরাশর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরাশরের যে সন্তানেরা শ্যাম-পরাশর নামে অভিহিত তাঁদের মধ্যে ক্রোধনায়ন একজন *[মৎস্য পু. ২০১.৩৭]*

ক্রোধনী অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। ক্রোধনী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ১৭৯.২৯]

ক্রোধবর্ধন জনৈক অসুর। দ্বাপর যুগে ইনি দণ্ডধার রাজা রূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.৪৬; (হরি) ১.৬২.৪৭]

ক্রোধশত্রু কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা কালার গর্ভজাত একজন পুত্র।

[মহা (k) ১.৬৫.৩৫; (হরি) ১.৬০.৩৫]

ক্রোধহন্তা$_1$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা কালার গর্ভজাত অসুরদের মধ্যে একজন। কালার পুত্র বলেই ইনি কালকেয় নামেও চিহ্নিত হয়েছেন। *[মহা (k) ১.৬৫.৩৫; (হরি) ১.৬০.৩৫]*

ক্রোধহন্তা$_2$ মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে ক্রোধহন্তা নামে এক অসুরবীরের উল্লেখ আছে, যাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে দানবরাজ বৃত্রাসুরের অবরজ অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিসেবে। অংশাবতরণ পর্বে কালকেয় দানবদের নাম পৃথকভাবে উল্লিখিত হওয়ায় কালার পুত্র ক্রোধহন্তা এবং ইনি অভিন্ন ব্যক্তি কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। ইনি দ্বাপর যুগে দণ্ড নামক রাজা রূপে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.৪৫; (হরি) ১.৬২.৪৬]

ক্রোধহন্তা$_3$ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানকারী একজন মহারথ যোদ্ধা।

[মহা (k) ৫.১৭১.২০; (হরি) ৫.১৬০.১৯]

ক্রোধা দক্ষপ্রজাপতির কন্যা। ইনি ক্রোধবশা নামেও পরিচিত ছিলেন। মহাভারতে কোথাও কোথাও তাঁকে ক্রূরা নামেও চিহ্নিত করা হয়েছে। কশ্যপের পত্নী ক্রোধা অসংখ্য অসুর পুত্রসন্তানের জন্মদান করেন। ক্রোধার পুত্ররা ক্রোধবশ অসুর নামে পরিচিত।

[মহা (k) ১.৬৫.১২, ৩২; (হরি) ১.৬০.১২, ৩২]

□ ক্রোধা নয়টি কোপনস্বভাবের কন্যাসন্তানের জন্মদান করেন। এঁদের নাম—মৃগী, মৃগমন্দা,

হরী, ভদ্রমনা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভি এবং সুরসা।

[মহা (k) ১.৬৬.৬০-৬১; (হরি) ১.৬১.৬০-৬১]

□ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এই ক্রোধাকেই দেবগন্ধর্বদের মাতা বলে চিহ্নিত করেছে—

ক্রোধা ত্বপ্রতিমান্ পুত্রান্ জজ্ঞে বৈ গায়নোত্তমান্।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে সিদ্ধ, পূর্ণ, বহ্নী, পূর্ণাংশ, ব্রহ্মচারী, শতগুণ, সুপর্ণ, বিশ্বাবসু, ভানু এবং সুচন্দ্র—এঁরা ক্রোধার পুত্র—

সিদ্ধঃ পূর্ণশ্চ বহ্নীচ পূর্ণাংশশ্চৈব বীর্যবান্॥
ব্রহ্মচারী শতগুণঃ সুপর্ণশ্চৈব সপ্তমঃ।
বিশ্বাবসুশ্চ ভানুশ্চ সুচন্দ্রো দশমস্তথা।
ইত্যেতে দেবগন্ধর্বাঃ ক্রোধায়াঃ পরিকীর্তিতাঃ॥

মহাভারতে এই দশজন দেবগন্ধর্বের নাম উল্লিখিত হয়েছে দক্ষকন্যা প্রাধার পুত্র হিসেবে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও মহাভারতের পাঠে সামান্য পার্থক্য থাকলেও নামগুলিকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। মহাভারত অনুযায়ী প্রাধার পুত্ররা হলেন—সিদ্ধ, পূর্ণ, বর্হি, পূর্ণায়ু, ব্রহ্মচারী, রতিগুণ, সুপর্ণ, বিশ্বাসু, ভানু এবং সুচন্দ্র—

সিদ্ধঃ পূর্ণশ্চ বর্হিশ্চ পূর্ণায়ুশ্চ মহাযশাঃ।
ব্রহ্মচারী রতিগুণঃ সুপর্ণশ্চৈব সপ্তমঃ॥
বিশ্বাবসুশ্চ ভানুশ্চ সুচন্দ্রো দশমস্তথা।
ইত্যেতে দেবগন্ধর্বাঃ প্রাধেয়াঃ পরিকীর্তিতা॥

বায়ুপুরাণে এঁরা দানবী প্রবাহীর পুত্ররূপে কল্পিত। তবে, বায়ু পরাণে ধৃত পাঠ অনুযায়ী বীর্য্যবানকেও একজন দেবগন্ধর্ব বলেই মনে হয়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও মহাভারত থেকে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে 'বীর্যবান', 'মহাযশা'—শব্দগুলি বিশেষণ হিসেবেই প্রযুক্ত হয়েছে নাম হিসেবে নয়। যাইহোক মহাভারত ও পুরাণের পাঠে দশ বিশিষ্ট দেবগন্ধর্বের জন্ম পরিচয় প্রসঙ্গে দক্ষকন্যা ক্রোধা, প্রাধা এবং প্রবাহী (দানবী?) একাত্ম হয়ে গিয়েছেন।

[মহা (k) ১.৬৫.৪৭-৪৯; (হরি) ১.৬০.৪৭-৪৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.৩৮-৩৯; বায়ু পু. ৬৮.৩৭-৩৮]

ক্রোধাগার তৎকালীন দিনে অভিজাত মহিলাদের দুঃখ-কষ্ট এবং ক্রোধ নির্জনে প্রকট করার জন্য নির্দিষ্ট একটি প্রকোষ্ঠ। অভিজাত রমণীদের মধ্যে বিবাহিতা অথবা অবিবাহিতা, সকলেই প্রয়োজনে এই ঘর ব্যবহার করতেন বলে মনে হয়। আমরা মহারাজ দশরথের পত্নী দেবী কৈকেয়ীকে দশরথের প্রতি অভিমানে ক্রোধাগারে প্রবেশ করতে দেখছি—

দেব দেবী ভৃশং ক্রুদ্ধা ক্রোধাগারমভিদ্রুতা।

[রামায়ণ ২.১০.২০]

হরিবংশপুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, কৃষ্ণ রুক্মিণীকে পারিজাত ফুল উপহার দিয়েছেন—একথা জানতে পেরে ক্রোধে ঈর্ষায় উন্মত্ত সত্যভামা বহুমূল্য বসন অলংকার ত্যাগ করে ক্রোধাগারে প্রবেশ করেছিলেন।

[হরিবংশ পু. ২.৬৫.৫২-৫৫]

□ পরবর্তীযুগে হয়তো মুসলমানদের অন্দর মহলে এটিই গোঁসাঘর।

ক্রোশনা স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.১৭; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ১৭ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

ক্রোষ্টাক্ষি পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে সব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি ক্রোষ্টাক্ষির বংশ তার মধ্যে একটি। ক্রোষ্টাক্ষি অঙ্গিরার বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৬.২২]*

ক্রোষ্টু১ যদুর পুত্রদের মধ্যে ক্রোষ্টু একজন। মৎস্য পুরাণ এবং বিষ্ণু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে ক্রোষ্টুর পুত্র ছিলেন বৃজিনীবান্।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৯.২; মৎস্য পু. ৪৩.৭; ৪৪.১৪-১৫; বিষ্ণু পু. ৪.১১.৩; ৪.১১.৩; ৪.১২.১]

ক্রোষ্টু২ কার্তবীর্য্যার্জুনের পুত্র একজন রাজর্ষি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭০.১৪-১৫; মৎস্য পু. ৪৩.৪৬]

ক্রৌঞ্চ১ কেতুমাল বর্ষের একটি জনপদ।

[বায়ু পু. ৪৪.১০]

ক্রৌঞ্চ২ মহর্ষি শাকপর্ণির এক শিষ্য। ইনি শাকপর্ণি প্রণীত ঋগ্‌বেদের তিনটি সংহিতার একটি অধ্যয়ন করেন। *[বিষ্ণু পু. ৩.৪.২৪]*

ক্রৌঞ্চদ্বীপ একটি পৌরাণিক দ্বীপ। শান্তিপর্বে বলা হয়েছে যে, মেরু পর্বতের পশ্চিমে অবস্থিত এই ভূ-খণ্ডটি যুধিষ্ঠিরের শাসনাধীন ছিল। তবে

পৌরাণিক এই ভূখণ্ডের আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায় না।

[মহা (k) ৬.১১.৭-৮; ১২.১৪.২২; (হরি) ৬.১১.৭-৮; ১২.১৪.২২]

□ ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ, মহাক্রৌঞ্চ এবং গোমন্ত নামে তিনটি বিখ্যাত পর্বত আছে। ক্রৌঞ্চ নামে মহাপর্বতের উপস্থিতির কারণেই এই ভূ-খণ্ডটির নাম ক্রৌঞ্চদ্বীপ—

যস্মিন্ ক্রৌঞ্চনাম পর্বতরাজো
দ্বীপনামনির্বর্তক আস্তে॥

ক্রৌঞ্চদ্বীপটি আকৃতিতে কুশদ্বীপের দ্বিগুণ এবং ক্ষীরোদ সাগর দ্বারা বেষ্টিত। এই দ্বীপের অন্তর্গত প্রতিটি পর্বতই রত্নখচিত। চার বর্ণের মানুষই মহাক্রৌঞ্চ পর্বতের সমাদর করেন। বিশালাকৃতি গোমন্ত পর্বতে ভগবান বিষ্ণু ও দেবী লক্ষ্মীর আবাস। এই তিনটি পর্বত ব্যতীত ক্রৌঞ্চদ্বীপে বামন, অন্ধকার, মৈনাক, গোবিন্দ এবং নিবিড় নামে পর্বতগুলি ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত। এই সমস্ত পর্বতই একে অপরের থেকে আকৃতিতে দ্বিগুণ। বিভিন্ন পুরাণে অবশ্য ক্রৌঞ্চদ্বীপের অন্তর্গত পর্বত-নামের তালিকাটি ভিন্ন ভিন্ন। ভাগবত পুরাণ অনুসারে পর্বতগুলি হল—শুক্ল, বর্ধমান, ভোজন, উপবর্হণ, নন্দ, নন্দন ও সর্বতোভদ্র। আবার মৎস্য পুরাণ মতে তালিকাটি নিম্নরূপ—দেবন, গোবিন্দ, ক্রৌঞ্চ, পাবনক, অন্ধকারক, দেবাবৃৎ এবং পুণ্ডরীক।

মহাভারত এবং পুরাণে ক্রৌঞ্চদ্বীপের দীর্ঘ বিবরণ পাওয়া যায়। পুরাণ মতে, রাজা প্রিয়ব্রতের পুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ (অন্যমতে দ্যুতিমান) ক্রৌঞ্চদ্বীপের উপর আধিপত্য বিস্তার করে একে সাতটি বর্ষে ভাগ করেন। বর্ষ অর্থ ভৌগোলিক স্থান। ঘৃতপৃষ্ঠ তাঁর সাত পুত্রের মধ্যে এই সাতটি বর্ষ ভাগ করে দেন। তাঁর সাত পুত্রের নামানুসারেই ক্রৌঞ্চদ্বীপের সাতটি বর্ষের নাম হয়—কুশল, মনোনুগ, উষ্ণ, পবন বা প্রাবর, অন্ধকার, দুন্দুভি ও মুনিদেশ। এই সমস্ত বর্ষে (ভূখণ্ডে) বসবাসকারী মানুষের গাত্র গৌরবর্ণ সেখানে সিদ্ধ ও চারণগণের অবাধ বিচরণ।

পর্বত ও সপ্তবর্ষের পাশাপাশি ক্রৌঞ্চদ্বীপে কয়েকটি পবিত্র জলধারাও প্রবাহিত হয়। এই সব নদী-নামের ক্ষেত্রেও পুরাণগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন ভাগবত পুরাণ মতে নদীগুলি হল—অভয়া, অমৃতৌঘা, আর্যকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিত্রবতী ও শুক্লা। আবার মৎস্য পুরাণ অনুসারে নদী-নামগুলি নিম্নরূপ—গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি ও পুণ্ডরীকা।

[মহা (k) ৬.১১.১৭-২৩; (হরি) ৬.১১.১৭-২৩; মৎস্য পু. ১২২.৭৯-৮৮; বিষ্ণু পু. ২.১.১৪; বায়ু পু. ৩৩.১৩, ৪৯.৫৯-৭৩; ভাগবত পু. ৫.২০.১৮-২৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. ১.১৪.১৩, ২২-২৬; ১.১৯.৬৬-৭৭]

ক্রৌঞ্চপদীতীর্থ গয়াক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থ দর্শনে ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর হয়। এমনকী যে ব্যক্তি একবার নয়, অন্তত তিনবার ব্রহ্মহত্যা করেছেন, তিনিও এই তীর্থ দর্শনে পাপমুক্ত হন বলে পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। পুরাণে ক্রৌঞ্চপাদ তীর্থস্থলটিকে গয়াসুরের মস্তক রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.২৫.৪২; (হরি) ১৩.২৬.৪২]

□ ক্রৌঞ্চ ঋষি ক্রৌঞ্চরূপ ধারণ করে গয়ার মুণ্ডপৃষ্ঠে তপস্যা করেন। তাঁর পায়ের স্পর্শেই মুণ্ডপৃষ্ঠটি ক্রৌঞ্চপদ নামে পরিচিত—

ক্রৌঞ্চরূপেণ হি মুণির্মুণ্ডপৃষ্ঠে তপো'করোৎ।
তস্য পাদাঙ্কিতো যস্মাৎ ক্রৌঞ্চপাদস্ততঃ স্মৃত॥

ক্রৌঞ্চপদী তীর্থের অন্তর্গত নিষ্কারা নামক পুষ্করিণীটিতে স্নান করলে পিতৃকুল স্বর্গলাভ করে। *[বায়ু পু. ১০৮.৭৫, ৮৩; ১০৯.১৬]*

ক্রৌঞ্চপর্বত হিমালয় পর্বতের পুত্র ক্রৌঞ্চপর্বত। এটি ক্রৌঞ্চদ্বীপের অন্তর্গত। ক্রৌঞ্চ পর্বতের নামানুসারেই দ্বীপটির নাম ক্রৌঞ্চ দ্বীপ—

যস্মিন্ ক্রৌঞ্চনামা পর্বতরাজো
দ্বীপনামনির্বর্তক আস্তে॥

[মহা (k) ৩.২২৫.৩২-৩৩; (হরি) ৩.১৮৭.৩২-৩৩; ভাগবত পু. ৫.২০.১৮-১৯; মৎস্য পু. ১২৩.৩৭; ১৬৩.৮৮]

□ একবার দৈত্যরাজ বলির পুত্র বাণ দেবাসেনাপতি স্কন্দ কার্তিকেয়র আক্রমণে ভীত হয়ে ক্রৌঞ্চ পর্বতে আশ্রয় নেন। ক্রুদ্ধ কার্তিকেয় তখন বাণের সন্ধানে অগ্নিদেব-প্রদত্ত অস্ত্রদ্বারা সমগ্র ক্রৌঞ্চ পর্বতটিকেই দগ্ধ করেন। পর্বতে বসবাসকারী প্রাণীকুল, পক্ষীকুল অগ্নিভয়ে নানা দিকে পালাতে শুরু করল। কিন্তু প্রজ্বলিত ক্রৌঞ্চ পর্বত যেন তখনও আপন সৌন্দর্যে উজ্জ্বল। ক্রমে

বিচিত্র অলঙ্কারে সজ্জিত হাজার হাজার দৈত্যেরা পুড়ে মরার ভয়ে পর্বত-গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকেন এবং সরাসরি কার্তিকেয়র অনুচরগণের হাতে নিহত হন। ভগবান কার্তিকেয়র আক্রমণে শেষ পর্যন্ত বাণ এবং ক্রৌঞ্চপর্বত উভয়েরই পতন ঘটে।

[মহা (k) ৯.৪৬.৮২-৯৫; (হরি) ৯.৪২.৮৮-১০১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১০.৪৮]

□ পুরাণে ক্রৌঞ্চদ্বীপের বিবরণ প্রসঙ্গে ক্রৌঞ্চ পর্বতকে ভূ-খণ্ডটির প্রথম অর্থাৎ প্রধান পর্বত বলা হয়েছে। অনান্য পর্বতগুলি ক্রৌঞ্চ পর্বতের পর ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৯.৬৬, ১৩৯]

□ স্বর্গবাসী পিতৃগণের মানসী কন্যার নাম মেনা। এই মেনা হিমালয়ের পত্নী। হিমালয় ও মেনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ক্রৌঞ্চ পর্বত।

[বিষ্ণু পু. ২.১০.৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৩.৩৫; মৎস্য পু. ১২২.৭৯; বায়ু পু. ৩০.৩৩]

ক্রৌঞ্চব্যূহ ব্যূহসজ্জা প্রাচীন যুদ্ধরীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যুদ্ধক্ষেত্রে কৌশলী সৈন্যাধিপতিরা তাঁদের বাহিনীকে যে আকার-আকৃতিতে স্থাপন করতেন, সেগুলিই বিবিধ প্রকারের ব্যূহ বলে পরিচিত। ব্যূহের গঠনপ্রণালী সেকালে যুদ্ধাধিনায়কের যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতার একটি প্রধান মাপকাঠি বলে বিবেচিত হত।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডব ও কৌরব উভয়পক্ষের যুদ্ধাধিনায়কদের বিভিন্ন ব্যূহ নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। মহাভারতে উল্লিখিত যেসব ব্যূহগুলি নিয়ে সবচেয়ে বেশী আলোচনা হয়েছে সেগুলির মধ্যে ক্রৌঞ্চব্যূহ একটি।

মহাভারতের যুদ্ধবর্ণনায় মোট তিনবার ক্রৌঞ্চব্যূহ নির্মাণের কথা পাওয়া যায়। এই ব্যূহটি ক্রৌঞ্চারুণ নামেও পরিচিত। দেবাসুর সংগ্রামের সময় দেবগুরু বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে এই ব্যূহ নির্মাণ পদ্ধতি বর্ণনা করেছিলেন—

যং বৃহস্পতিরিন্দ্রায় তদা দেবাসুরে'ব্রবীৎ।

বৃহস্পতির প্রণীত সেই ব্যূহরচনাবিধি মাথায় রেখেই যুধিষ্ঠির যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহ নির্মাণ করতে বলেন।

[মহা (k) ৬.৫১.৪০-৪২; (হরি) ৬.৫০.৪০-৪২]

□ ব্যূহ-নাম সাধারণত স্থির করা হত ব্যূহের আকৃতি অনুযায়ী। স্বাভাবিকভাবেই ক্রৌঞ্চব্যূহ আকৃতিতে ক্রৌঞ্চ অর্থাৎ বক বা চক্রবাক পক্ষীর আকৃতি বিশিষ্ট ছিল বোঝা যায়।

যুধিষ্ঠির নির্দেশিত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন পরিকল্পিত ক্রৌঞ্চব্যূহের মস্তকে ছিলেন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ। কুন্তিভোজ এবং চেদিরাজ ব্যূহের দুই চক্ষুতে দুইজন অবস্থান করছিলেন। দশার্ণ, প্রভদ্র, দাশের ও কিরাতগণ গ্রীবাদেশে এবং পৌণ্ড্র, পৌরব ও নিষাদদেশীয়রা যুধিষ্ঠিরের নেতৃত্বে ব্যূহের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করছিলেন।

ভীমসেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন যথাক্রমে ক্রৌঞ্চের ডান ও বাম পক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে প্রধান হলেন। ভীমের অধিনায়কত্বে ব্যূহের ডানপক্ষে অভিমন্যু, সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ছাড়াও পিশাচ, দরদ, তঙ্গণ, বাহ্লিক, চোল ইত্যাদি জনজাতির সৈন্যরা ছিলেন। বামপক্ষে মালব, শবর, বৎস প্রভৃতি দেশীয় সৈন্যরা অবস্থান করছিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট এবং কাশীরাজ শৈব্য সসৈন্যে ব্যূহের জঘনদেশ রক্ষা করছিলেন।

ক্রৌঞ্চব্যূহের দুই পক্ষ ও মস্তকে যথাক্রমে অযুত ও নিযুত পরিমাণ রথী নিযুক্ত ছিলেন। পৃষ্ঠদেশে অর্বুদ এবং বিংশতি সহস্র সৈন্য অবস্থান করছিলেন। আর গ্রীবায় সপ্ততি সহস্র সৈন্য সমাবেশিত হয়েছিল। ব্যূহের দুই পক্ষে, অগ্রে, মধ্যভাগে এবং পশ্চাতে হস্তীবাহিনীর উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অর্জুন ছিলেন ক্রৌঞ্চব্যূহের একেবারে অগ্রভাগে।

[মহা (k) ৬.৫১.১; (হরি) ৬.৫০.৪৩-৫৭]

□ এরপর ক্রৌঞ্চব্যূহের উল্লেখ পাওয়া যায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ষষ্ঠ দিনে। পাণ্ডবরা যুদ্ধের ষষ্ঠ দিনে মকরব্যূহ নির্মাণ করেছিলেন। তার প্রত্যুত্তরে ভীষ্ম কৌরব সৈন্যদের কৌঞ্চব্যূহে সমাবেশিত করেন।

ভীষ্ম পরিকল্পিত ক্রৌঞ্চব্যূহটি আকৃতিতে বিশাল। ব্যূহমুখে অবস্থান করছিলেন স্বয়ং দ্রোণাচার্য। অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য ব্যূহের নয়নযুগল। কাম্বোজ ও বাহ্লিকদেশীয় সেনাদের সঙ্গে কৃতবর্মা রইলেন ব্যূহের মস্তকে। দুর্যোধন নানা দেশীয় সৈন্যদের নিয়ে ব্যূহের গ্রীবা নির্মাণ করলেন। মদ্র, সৌবীর ও কেকয়দেশীয় যোদ্ধাদের নিয়ে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত রইলেন ব্যূহের

বক্ষস্থলে। সুশর্মা সসৈন্যে ব্যূহের বামপক্ষ এবং তুষার, যবন, শক ও চূচুপদেশীয় যোদ্ধারা দক্ষিণ পক্ষে অবস্থান করছিলেন। শ্রুতায়ু, শতায়ু ও ভূরিশ্রবা নির্মাণ করলেন ব্যূহের জঘনদেশ।

[মহা (k) ৬.৭৫.১৪-২২; (হরি) ৬.৭৪.১৪-২২]

□ মহাভারতের দ্রোণপর্বে বলা হয়েছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একাদশতম দিনে যুধিষ্ঠির আবারও ক্রৌঞ্চব্যূহ নির্মাণ করেন। এই ব্যূহের অগ্রভাগে ছিলেন অর্জুন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কৌরব সেনাপতি দ্রোণ একাদশতম দিনে শকটব্যূহ রচনা করেছিলেন। সেই শকট ব্যূহকে প্রতিরোধ করার জন্যই পাণ্ডবদের ক্রৌঞ্চব্যূহ স্থাপন।

[মহা (k) ৭.৭.২৫; (হরি) ৭.৫.১৫]

□ ক্রৌঞ্চ অর্থাৎ বক আকৃতি বিশিষ্ট এই ব্যূহটিকে পণ্ডিতরা আক্রমণাত্মক ব্যূহসজ্জা বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ এই ব্যূহের মধ্যভাগে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সৈন্য সমাবেশ হয়। অপরদিকে ক্রৌঞ্চের সূচী আকারের চঞ্চুতে অবস্থানকারী সৈন্যদের ভেদশক্তি অপর যেকোনো ব্যূহকে তীক্ষ্ণ আক্রমণে ব্যস্ত করে তুলতে পারে। আর দুটি পক্ষে অবস্থিত যোদ্ধারা সমস্ত ব্যূহ সজ্জার ভারসাম্য রক্ষা করে।

তবে ক্রৌঞ্চব্যূহের রক্ষণাত্মক ক্ষমতাও যথেষ্ট কারণ এখানে সবদিক থেকে নিজ সৈন্যদের সুরক্ষিত রাখা যায়। *[KW (Sensharma) p. 112-113]*

ক্রৌঞ্চা অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। ক্রৌঞ্চা সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৭৯.১৯]*

ক্রৌঞ্চী প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে তাম্রার গর্ভজাত কন্যা ক্রৌঞ্চী। তিনি গরুড়-এর পত্নী এবং পেচক কুলের মাতা। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৪৪৬-৮; রামায়ণ ৩.১৪.১৮]*

ক্লমা বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে প্লক্ষদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত প্রধান নদীগুলির মধ্যে ক্লমা একটি।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ২.৪.১১]

ক্ষণ১ 'ক্ষণ' সময় গণনার অন্যতম একক। সংস্কৃত কোষগ্রন্থ অমরকোষে বলা হয়েছে যে, ক্ষণ হল মোটামুটি ত্রিশ কলার সমপরিমাণ সময়—

অষ্টাদশ নিমেষাস্তু কাষ্ঠা ত্রিংশত্তু তাঃ কলা।
তাস্তু ত্রিংশৎক্ষণস্তে তু মুহূর্তো দ্বাদশাস্ত্রিয়াম্॥

টীকাকার সরল ভাষায় বুঝিয়েছেন—আঠার নিমেষে এক কাষ্ঠা। তিরিশ কাষ্ঠায় এক কলা। তিরিশ কলায় এক ক্ষণ। বারো ক্ষণ মিলে এক মুহূর্ত—

অষ্টাদশ নিমেষা মিলিত্বা একা কাষ্ঠা ভবতি।
ত্রিংশৎ কাষ্ঠা মিলিত্বা একা কলা।
তাঃ কলাস্ত্রিংশন্মিলিত্বা একঃ ক্ষণঃ।
তে ক্ষণাঃ দ্বাদশো মিলিত্বা একো মুহূর্তঃ।

লক্ষণীয় বিষয় হল, ভাগবত পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ বাদে অন্য কোনো পুরাণে সময় গণনার একক হিসেবে ক্ষণের উল্লেখ তেমন পাওয়া যায় না। পণ্ডিত গিরীন্দ্রশেখর বসুও প্রাচীন সময় গণনার একক এবং বর্তমান এককগুলি নিয়ে যে তুলনামূলক গবেষণা করেছেন, সেখানেও ক্ষণের কোনো উল্লেখ নেই। তবে অমরকোষের এবং পুরাণের পাঠ পর্যালোচনা করে আমরা গিরীন্দ্রশেখরের অনুসরণে ক্ষণের আধুনিক পরিমাপও নির্ণয় করতে পারি। পুরাণে দেখা যাচ্ছে—১২ ক্ষণ = ১ মুহূর্ত। আবার ৩০ কলা = ১ মুহূর্ত। অর্থাৎ ৩০ কলা = ১২ ক্ষণ = ১ মুহূর্ত পণ্ডিত গিরীন্দ্রশেখর বসুর গবেষণা অনুযায়ী, ১ মুহূর্ত = ৪৮ মিনিট।

অর্থাৎ এক মুহূর্ত সময়কালের ১২ ভাগের ১ ভাগ হল ১ ক্ষণ। হিসেব মতো প্রায় চার মিনিট সময়কে এক ক্ষণ বলা হয়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৪.৫৬; ভাগবত পু. ৩.২.৭; গিরীন্দ্রশেখর বসু, পুরাণ প্রবেশ পৃ. ২৬-২৭; অমরকোষ ১. (কালবর্গ) ১১]

ক্ষণ২ শিবসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত মহাদেবের অন্যতম নাম। শিবসহস্রনামস্তোত্রে একটি শ্লোকে কলা, কাষ্ঠা প্রভৃতি সময় গণনার এককগুলির প্রত্যেকটিকেই ভগবান শিবের অন্যতম নাম হিসেবে ভাবনা করা হয়েছে। ক্ষণও সময় গণনার প্রাচীন এককগুলির মধ্যে একটি। হিসাবে ক্ষণ বলতে প্রায় ৪ মিনিট সময় বোঝানো হয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মহাদেব আদি-অন্তহীন মহাকাল স্বরূপ, তিনিই অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম—সেক্ষেত্রে তাঁকে সময়-গণনার একটি ক্ষুদ্র একক রূপে সম্বোধন করার তাৎপর্য্য কী? বস্তুত, আমরা সময় বলতে যা বুঝি, বাস্তবে তার আদিও নেই, অন্তও নেই—তা অসীম, অনন্ত। সেই অসীম, অনন্ত সময়কে আমরা আমাদের সামর্থ্য

অনুসারে গাণিতিক নিয়মের সাহায্যে কলা, কাষ্ঠা, ক্ষণ প্রভৃতি নানা এককের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছি আমাদের সুবিধার্থে। ভগবান শিব যেমন অনাদি অনন্ত, গণনার অসাধ্য মহাকাল স্বরূপ তেমনই মহাকালের অংশজাত গণনাসাধ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময়ের এককগুলিরও স্বরূপ। এই ভাবনা থেকেই সময় গণনার অন্যতম একক ক্ষণ ভগবান শিবের অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৭.১৪২; (হরি) ১৩.১৬.১৪১]

ক্ষণভোজী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষে অবস্থানকারী জনৈক রাজা। মহাভারতের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে অবশ্য ক্ষণভোজীর উল্লেখ নেই। *[মহা (k) ৮.৭.১৮; (হরি) হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের পাঠে এই শ্লোকটি নেই]*

ক্ষত্রজিৎ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বংশধারায় কালনেমির পুত্রসন্তানদের মধ্যে একজন ছিলেন ক্ষত্রজিৎ। *[বায়ু পু. ৬৭.৮০]*

ক্ষত্রঞ্জয় পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পৌত্র তথা ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র। মহাভারতের দ্রোণপর্বে উল্লিখিত আছে যে, ধৃষ্টদ্যুম্নের চার পুত্র ক্ষত্রঞ্জয়, ক্ষত্রদেব, ক্ষাত্রধর্মা এবং মানদ কুরুপিতামহ ভীষ্মের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের হাতে ক্ষত্রঞ্জয়ের মৃত্যু হয়।

[মহা (k) ৭.১০.৫২-৫৩; ৭.১৮৬.৩৩-৩৪; (হরি) ৭.৮.৪৯-৫০; ৭.১৬০.৩০-৩১]

ক্ষত্রদেব শিখণ্ডীর পুত্র ক্ষত্রদেব। ইনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করেছিলেন। দ্রোণাচার্য, দুর্যোধন-পুত্র লক্ষ্মণ প্রমুখের সঙ্গে ক্ষত্রদেবের যুদ্ধ হয়েছিল। লক্ষ্মণের হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রদেব নিহত হন।

মহাভারতের দ্রোণপর্বে ক্ষত্রদেবের অশ্বের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে, ক্ষত্রদেব শ্বেতবর্ণের অলঙ্কৃত অশ্বচালনা করতেন।

[মহা (k) ৫.৫৭.৩২; ৫.১৭১.১০; ৫.১৯৬.২৫; ৭.২১.৫১; ৭.২৩.৬; ৮.৬.২৬-২৭; (হরি) ৫.৫৭.৩২; ৫.১০৬.১০; ৫.১৮৬.২৬; ৭.১৯.৫২; ৭.২১.৬; ৮.৬.২৬-২৭]

ক্ষত্রধর্মা১ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পৌত্র তথা ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ছিলেন ক্ষত্রধর্মা। মহাভারতের দ্রোণপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ক্ষত্রধর্মা প্রভৃতি ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্ররা কুরুকুলপিতামহ ভীষ্মের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধাদের শক্তি বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ভীষ্ম অল্পবয়সী ক্ষত্রধর্মাকে অর্ধরথ বলে চিহ্নিত করেছেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অষ্টমদিনে ক্ষত্রধর্মা অন্যান্য পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধাদের সঙ্গে ঘটোৎকচকে রক্ষা করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। দ্রোণপর্বে তাঁকে পিতা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহায়ক হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত দ্রোণাচার্যের হাতে ক্ষত্রধর্মার মৃত্যু হয়েছিল বলে জানা যায়।

[মহা (k) ৫.১৭১.৫; ৬.৯৩.১৪; ৭.১০.৫২-৫৩; ৭.২৩.৫; ৭.১২৫.৬৩-৬৬; (হরি) ৫.১৬০.৭; ৬.৮৯.১৪; ৭.৮.৪৯-৫০; ৭.২১.৫; ৭.১০৯.৬১-৬৫]

ক্ষত্রধর্মা২ চন্দ্রবংশীয় আয়ুর পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধারায় সংস্কৃতি বা সংকৃতির পুত্র ছিলেন ক্ষত্রধর্মা। ক্ষত্রধর্মা ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশের শেষ রাজা ছিলেন। *[বিষ্ণু পু. ৪.৯.৮]*

ক্ষত্রধর্মা৩ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে, আয়ুর পুত্র অনেনা ক্ষত্রধর্ম বা ক্ষত্রধর্মা নামে এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৮.৭]*

চন্দ্রবংশীয় রাজা আয়ুর পুত্র অনেনা। বায়ু পুরাণে অবশ্য তাঁকে অনপায় নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অনেনা বা অনপায়-এর পুত্র ছিলেন ক্ষত্রধর্মা। প্রতিপক্ষ নামে ক্ষত্রধর্মার এক পুত্রসন্তান হয়।

[বায়ু পু. ৯৩.১১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৮.১১]

ক্ষত্রবদ্ধ *[দ্র. ক্ষত্রবিদ্ধ]*

ক্ষত্রবর্মা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পৌত্র তথা ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ছিলেন ক্ষত্রবর্মা। মহাভারতের দ্রোণপর্বে উল্লিখিত আছে যে, ক্ষত্রবর্মা প্রভৃতি ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্ররা কুরুকুলপিতামহ ভীষ্মের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করেছিলেন। মহাভারতের দ্রোণপর্বে ক্ষত্রবর্মাকে জয়দ্রথের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখা যায়। যুদ্ধের ঠিক কোন পর্যায়ে ক্ষত্রবর্মা নিহত হয়েছিলেন, তার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও মনে হয়, দ্রোণাচার্যের হাতে দ্রুপদের যে তিন পৌত্রের মৃত্যু হয়েছিল ক্ষত্রবর্মা তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন।

[মহা (k) ৭.১০.৫২-৫৩; ৭.২৫.১০-১২; ৭.১৮৬.৩৩-৩৪; (হরি) ৭.৮.৪৯-৫০; ৭.২৩.১০-১২ ('ক্ষত্রধর্মা' পাঠ ধৃত হয়েছে); ৭.১৬০.৩০-৩১]

ক্ষত্রবিদ্ধ ভবিষ্যৎ ত্রয়োদশ মন্বন্তরের অধিপতি রৌচ্য মনুর অন্যতম পুত্র। বায়ু পুরাণ তাঁকে ক্ষত্রবদ্ধ নামে চিহ্নিত করেছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইনি চিহ্নিত হয়েছেন ক্ষত্রবুদ্ধি নামে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.১০৪; বায়ু পু. ১০০.১০৯; মার্কণ্ডেয় পু. ৯৪.৩১]

ক্ষত্রবুদ্ধি *[দ্র. ক্ষত্রবিদ্ধ]*

ক্ষত্রবৃদ্ধ চন্দ্রবংশীয় রাজা আয়ুর অন্যতম পুত্র। বিষ্ণু পুরাণ মতে ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র ছিলেন সুহোত্র এবং প্রতিক্ষত্র। *[বিষ্ণু পু. ৪.৮.১; ৪.৯.৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৭.২; ভাগবত পু. ৯.১৭.১-২]*

ক্ষত্রৌজা *[দ্র. ক্ষেমজিৎ]*

ক্ষপা শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। শিবসহস্রনামস্তোত্রের একটি শ্লোকে কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত ইত্যাদি সময় গণনার এককগুলির সঙ্গে 'ক্ষপা' শব্দটিও মহাদেবের নাম হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে—

মুহূর্তাহঃ ক্ষপাঃ ক্ষণাঃ। 'ক্ষপা' শব্দের অর্থ রাত্রি। এক্ষেত্রে অহ বা দিনের পাশাপাশি রাত্রি বা ক্ষপাকেও সময় গণনার অন্যতম একক বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

বস্তুত কাল বা সময় বলতে আমরা যা বুঝি, বাস্তবে তা গণনার উর্ধ্বে—অসীম, অনন্ত, সেই অনাদি অনন্ত কাল বা সময়কে আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুসারে গাণিতিক নিয়মের সাহায্যে কলা, কাষ্ঠা, ক্ষণ প্রভৃতি নানা এককের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছি আমাদের সুবিধার্থে। ভগবান শিব যেমন আদি অন্তহীন ব্রহ্ম স্বরূপ, মহাকালস্বরূপ, তেমনই সেই মহাকালের অংশজাত গণনাসাধ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময়ের এককগুলিরও স্বরূপ। এই ভাবনা থেকেই ক্ষপা বা রাত্রি মহাদেবের অন্যতম নাম। মহাদেবের ক্ষপা নামটিকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যাখ্যা করা চলে। পৌরাণিক ভাবনা অনুযায়ী আমরা যে পরিমাণ সময়কালকে এক 'কল্প' বলি, তা জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার একদিনের সমান বা সমপরিমাণ। এই সম্পূর্ণ দিন বা দিবাভাগ তিনি সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত থাকেন, সৃষ্ট জগৎকে পালন করেন। কল্পকালের শেষে ব্রহ্মার রাত্রি আরম্ভ হয়। তিনি নিদ্রিত হলে আরম্ভ হয় প্রলয়, সংহার প্রক্রিয়া। কল্পকাল ধরে সৃষ্ট জগত প্রলয়ের সময় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। মহাকাব্য পুরাণের ভাবনায় ভগবান শিব জগতের সংহর্তা, প্রলয়ের কারণস্বরূপ। কল্পান্তে তিনিই রাত্রিরূপে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাকে নিদ্রিত করেন, তিনিই প্রলয় রূপে এই সম্পূর্ণ সৃষ্টি ধ্বংস করেন—এই ভাবনা থেকেও রুদ্র-শিব ক্ষপা বা রাত্রি নামে সম্বোধিত হন।

[মহা (k) ১৩.১৭.১৪২; (হরি) ১৩.১৬.১৪১]

ক্ষপাবিশ্বকর পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি ক্ষপাবিশ্বকরের বংশ তার মধ্যে একটি। ইনি অঙ্গিরার বংশে একজন গোত্রকার অথবা বংশকারক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৬.১০]

ক্ষয়১ কলিযুগে অযোধ্যায় যেসব ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রাজত্ব করেছিলেন ক্ষয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইনি রাজা বৃহৎক্ষয়ের পুত্র ছিলেন। ক্ষয়ের পুত্রের নাম বৎসব্যূহ। *[বায়ু পু. ৯৯.২৮১]*

ক্ষয়২ একজন দানব। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষের তৃতীয় কন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম। *[কালিকা পু. ৩৪.৫৩]*

ক্ষান্তি১ মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে তামস মনুর অন্যতম পুত্র ছিলেন ক্ষান্তি। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৭৪.৬০]*

ক্ষান্তি২ পৌরাণিক ক্রৌঞ্চদ্বীপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী। *[বিষ্ণু পু. ২.৪.৫৫]*

ক্ষাম১ পুরাণ মতে সমুদ্রবাসী অগ্নির পুত্র সহরক্ষ। সহরক্ষের পুত্র ক্ষাম। পুরাণ মতে, এই ক্ষাম অগ্নি মানুষের গৃহ দহন করেন।

[বায়ু পু. ২৯.৩৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১২.৩৭]

ক্ষাম২ তৃতীয় মন্বন্তর বা ঔত্তম মন্বন্তরে দেবতারা যে সব গণে বিভক্ত ছিলেন সুধামা তার মধ্যে একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে ক্ষাম অন্যতম। *[বায়ু পু. ৬২.২৫]*

ক্ষারকর্দম পুরাণে বর্ণিত অন্যতম নরকের নাম। ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, অহংকারে মত্ত হয়ে যেসব ব্যক্তি নিজের তুলনায় উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের অসম্মান করেন, যথাযথ সংকার করেন না—তাঁরা মৃত্যুর পর ক্ষারকর্দম নরকে পতিত হন। সম্ভবত এই নরকের ভূভাগ অত্যন্ত পিচ্ছিল, পাপী ব্যক্তিদের মাথা নীচের দিকে এবং পা উপরের দিকে করে এই নরকের ফেলা হয় এবং এভাবেই তাদের যন্ত্রণা দেওয়া হয়ে থাকে।

[ভাগবত পু. ৫.২৬.৭, ৩০]

ক্ষিতিকম্পন স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচর, একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৫৯; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

ক্ষিপ্র১ যদু-বৃষ্ণি বংশীয় তথা কৃষ্ণপিতা বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপাসঙ্গের পুত্র ক্ষিপ্র।

[বায়ু পু. ৯৬.২৪৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.২৫৮]

ক্ষিপ্র২ যদু-বৃষ্ণি বংশীয় উপাঙ্গের অন্যতম পুত্র।

[বায়ু পু. ৯৬.২৪৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.২৫৮]

ক্ষিপ্রা বিন্ধ্য পর্বতজাতা (মতান্তরে পারিযাত্র পর্বত) একটি পবিত্র নদী। এর আরেক নাম শিপ্রা। এটি একটি বিখ্যাত পিতৃতীর্থও বটে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৩২; মৎস্য পু. ২২.২৪; ১১৪.২৭]

□ মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত মালওয়া অঞ্চলের একটি নদী। কালিদাস-বর্ণিত উজ্জয়িনী বা বর্তমান উজ্জয়িনী নগরীটি ক্ষিপ্রা বা শিপ্রা নদীর তীরেই অবস্থিত।

মধ্যপ্রদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ইন্দোরের ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে কাক্‌রি বরদি (Kakri Bardii) পাহাড় থেকে শিপ্রা নদীর উৎপত্তি। মধ্যপ্রদেশের প্রায় ১২০ মাইল বিস্তৃত অঞ্চল দিয়ে ক্ষিপ্রা নদীটি প্রবাহিত হয়েছে।

[HGM (P.K. Bhattacharyya) p. 91-92]

ক্ষীর পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি ক্ষীরের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি আঙ্গিরস গোত্রপ্রবর্তকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৬.৬]

ক্ষীরোদা পৌরাণিক ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী। *[বায়ু পু. ৪৩.২৯]*

ক্ষুত *[দ্র. ক্ষুপ১]*

ক্ষুদ্রক১ প্রাচীন ভারতের এক যুদ্ধপ্রিয় জনজাতি। মহাভারতে প্রায় সব সময়েই মালব-দেশীয় জনজাতির সঙ্গে ক্ষুদ্রকদের নাম একত্রে উল্লিখিত হয়েছে—

বশতলাশ্চ মৌলেয়াঃ সহক্ষুদ্রক-মালবৈঃ।

পুনরায় ভীষ্মপর্বে—

কুলিন্দৈঃ পারদৈশ্চৈব তথা ক্ষুদ্রক-মালবৈঃ।

[মহা (k) ২.৫২.১৫; ৬.৮৭.৭; (হরি) ২.৫০.১৫; ৬.৮৪.৭]

শুধু মহাভারতেই নয়, যুদ্ধপ্রিয় এই দুই জনজাতির একত্র এবং যুগ্ম অবস্থানের প্রথম ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় দেড়শো খ্রিস্টপূর্বাব্দে লেখা পতঞ্জলির ব্যাকরণ-মহাভাষ্যে, যদিও আয়ুধজীবীর অর্থাৎ যুদ্ধজীবীর স্পষ্ট উল্লেখের বীজ নিহিত ছিল পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে ৫.৩.১১৪ সূত্রে। এই সূত্রে আয়ুধজীবী সংঘের কথা বলা আছে এবং বলা আছে ব্রাহ্মণ এবং রাজাদের বাদ দিয়ে এই আয়ুধজীবীদের নির্দেশ করা যায় বাহীকদের সংজ্ঞায়। বস্তুত এই সূত্রেও ক্ষুদ্রক-মালবদের কথা স্পষ্ট বলা নেই, কিন্তু বৌদ্ধ বৈয়াকরণ জয়াদিত্য-বামনের যুগ্মভাবে লেখা কাশিকা-বৃত্তিতে তৎকালীন সময়ের ব্রাহ্মণ ও রাজা ছাড়াও এমনকি বাহীক ছাড়াও আরও কতকগুলি যুদ্ধপ্রিয় জনজাতির উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রকদের পরেই মালবদের উল্লেখ করা হয়েছে—

'ক্ষৌদ্রক্যঃ, ক্ষৌদ্রক্যৌ, ক্ষুদ্রকাঃ। মালব্যঃ, মালব্যৌ, মালবাঃ।'

[কাশিকাবৃত্তি, ৪র্থ ভাগ, ৫.৩.১১৪; পৃ. ৩১৭। গ্রন্থপঞ্জি : কাশিকাবৃত্তি, ৪র্থ ভাগ, বারাণসী: তারা পাব্‌লিকেশনস্ ১৯৬৭]

□ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি সব সময়েই ক্ষুদ্রক-মালব শব্দটি একত্রে পাঠ করেছেন—ন চ ক্ষুদ্রক-মালব-শব্দো গোত্রম্। এরপরেই ক্ষুদ্রক-মালবদের আয়ুধজীবিতার প্রচলিত প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেছেন—ক্ষুদ্রক-মালব শব্দটা একটা নির্দিষ্ট সেনাবাহিনীর ব্যাপারেই প্রযুক্ত হয়—

অথবা নিয়মার্থোঽয়মারম্ভঃ—ক্ষুদ্রক-মালব-শব্দাৎ সেনায়ামেব।

তবে পতঞ্জলিরও অনেক পূর্বে বার্তিককার কাত্যায়ন পাণিনি-সূত্রের বৃত্তিতে পরিষ্কার লিখেছেন—সেনার সংজ্ঞাতেই ক্ষুদ্রক-মালবদের প্রসঙ্গ—ক্ষুদ্রক-মালবাৎ সেনা-সংজ্ঞায়াম্। পতঞ্জলি এই শব্দের পুনরুক্তি করেছেন মহাভাষ্যে—ক্ষুদ্রক-মালবাৎ সেনা-সংজ্ঞায়ামিতি বক্তব্যম্। ক্ষৌদ্রক-মালবী সেনা চেৎ। ক্ব মা ভূৎ ক্ষৌদ্রক-মালবকম্ অন্যদিতি।

[পাণিনি-সূত্র ৪.২.৪৫; দ্র. মহাভাষ্য (keilhorn), vol. 2, p.280]

□ পাণিনির আয়ুধজীবী সংঘ এবং পতঞ্জলির ক্ষুদ্রক-মালবদের সেনা-সংজ্ঞা মাথায় রেখেই

আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বলেছেন যে, ক্ষুদ্রক জন-জাতীয়েরা mercenary সৈন্য বা ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে কাজ করতেন। মহাভারতের সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে অন্যান্য বহুজাতির মতো ক্ষুদ্রক জাতির নেতারাও নানা মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ক্ষুদ্রক-মালব সেনা দুর্যোধনের পক্ষে যোগদান করেছিল। কর্ণপর্বে সঞ্জয়ের বিবরণ থেকে জানা যায় ক্ষুদ্রক সেনাবাহিনী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছিল।

মহাভারতের দ্রোণপর্বে এক জায়গায় দেখা যায় যে, পরশুরাম যখন একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয় শূন্য করেছিলেন, সেই সময় তাঁর আক্রমণে এই ক্ষুদ্রক জাতিও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থের পাশাপাশি গ্রীক ঐতিহাসিকদের রচনাতেও আমরা ক্ষুদ্রক জাতির নামোল্লেখ পাই। আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে আসা গ্রীক ঐতিহাসিকরা এই জাতিকে oxydrakai অথবা sudracae নামে চিহ্নিত করেছেন। আশ্চর্য হল, গ্রীক ঐতিহাসিকরাও ক্ষুদ্রকদের সবসময় যুক্ত করেছেন মালবদের সঙ্গে। গ্রীক ঐতিহাসিক Cutis এর লেখা থেকে জানা যায় যে, Sudracae (ক্ষুদ্রক) এবং Malli অর্থাৎ মালবদের মিলিত সৈন্যবাহিনীতে ৯০০০০ পদাতিক, ১০০০০ অশ্বারোহী এবং ৯০০ রথী সৈন্য যুদ্ধ করত। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, মোটামুটিভাবে বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত পঞ্জাব প্রদেশের Montgomary জেলায়, ইরাবতী এবং বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অর্থাৎ আধুনিক মূলতান অঞ্চলে ক্ষুদ্রকদের আদি বসতি ছিল।

[মহা (k) ২.৫২.১৫; ৬.৫১.১৬; ৬.৫৯.৭৬.১৩৬; ৬.৮৭.৭; ৭.৭০.১১; ৮.৫.৪৮; (হরি) ২.৫০.১৫; ৬.৫১.১৬; ৬.৫৯.৭৫, ১৩৪; ৬.৮৪.৭; ৭.৬২.৯; ৮.৩.৬৪; Indian Antiquary, Vol. I, pp. 156-157; PHAI (H.C. Raychaudhuri) p. 224]

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে আয়ুধজীবী সংঘের উল্লেখ এবং তার উদাহরণ হিসেবে ক্ষুদ্রক-মালবরা কাশিকাবৃত্তিতে চিহ্নিত হওয়ায় আমরা এটা বুঝতে পারি যে, ক্ষুদ্রকদের রাজ্য কুলপ্রধানদের দ্বারা চালিত সংঘরাষ্ট্র বা 'অলিগার্কিক্যাল স্টেট' হিসেবেই পরিচিত ছিল। পণ্ডিতেরা মনে করেন—বাইরের রাজতান্ত্রিক শাসকদের আগ্রাসী রাজনীতিই ক্ষুদ্রক এবং মালবদের একত্রে এনে দিয়েছিল। মালবদের রাজ্যটা যদি মন্টোগোমারি-মূলতান হয়, সেই আন্দাজে E. H. Bunbery সাহেব জানিয়েছেন—they lay on the east or left bank of the Sutledge—the province of Bahawalpur though they may very well have extended as far as its junction with the Indus, and the neighbourhood of Ooch.

[E.H. Bunbary, History of Ancient Geography, vol. I, p.516; London: John Murrary: Albemarle st, 1879]

☐ পণ্ডিত J. Przyluski জানিয়েছেন—ক্ষুদ্রক অর্থ ক্ষুদ্র, অতএব তাঁরা হয়তো দেখতে ছোটোখাটো বেঁটে ছিলেন, হয়তো বা প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষ। এই ধারণা থেকে বুদ্ধপ্রকাশ মন্তব্য করেছেন যে, ক্ষুদ্রকরা ক্ষুদ্র-জনজাতির একটি শাখা, যাঁদের উল্লেখ Achacmenian শিলালিপিগুলিতে বারবার করা হয়েছে বলে সুকুমার সেন জানিয়েছেন প্রাচীন পারস্য-রাজাদের শিলালিপির প্রমাণে।

[Buddha Prakash, Political and Social Movements in Ancient Panjab, p. 157-158; Lahore: Aziz Publishers, 1976]

ক্ষুদ্রক২ পুরাণে ভবিষ্যৎ রাজবংশের যে বিবরণ পাওয়া যায় সেই তথ্য অনুসারে ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা প্রসেনজিতের পুত্র ছিলেন ক্ষুদ্রক। ক্ষুদ্রকের পুত্রের নাম ভাগবত পুরাণ মতে রণক, বিষ্ণুপুরাণ মতে কুণ্ডক, মৎস্য পুরাণ মতে কুনক এবং বায়ুপুরাণ মতে ক্ষুলিক ছিল বলে জানা যায়।

[ভাগবত পু. ৯.১২.১৪-১৫; মৎস্য পু. ২৭১.১৩; বায়ু পু. ৯৯.২৮৯; বিষ্ণু পু. ৪.২২.৯]

ক্ষুদ্রক৩ মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে, অলক্ষ্মীর পুত্র দুঃসহ। দুঃসহের কনিষ্ঠ পুত্র শস্যহা। এই শস্যহা ক্ষুদ্রক নামে এক পুত্র সন্তান লাভ করে। অশুভ দিনে শস্য বপন করলে ক্ষুদ্রক সেই শস্য নষ্ট করে বলে পুরাণে উল্লেখ আছে। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৫১.৮০-৮১]*

ক্ষুদ্রভৃৎ ভাগবত পুরাণ মতে, দেবকীর যে ছয় পুত্রকে কংস হত্যা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে

অন্যতম ছিলেন ক্ষুদ্রভৃৎ। দেবকীর অনুরোধে মৃত্যুর পর সুতললোকপ্রাপ্ত সেই ছয়টি শিশুকে কৃষ্ণ সুতললোক থেকে নিয়ে আসেন দ্বারকায়। এরপর কৃষ্ণের কৃপায় তাঁরা মুক্তিলাভ করেন।

[ভাগবত পু. ১০.৮৫.৫১-৫৬]

ক্ষুধি কৃষ্ণের ঔরসে মিত্রবিন্দার গর্ভজাত একজন পুত্র। *[ভাগবত পু. ১০.৬১.১৬]*

ক্ষুপ₁ একবার ব্রহ্মা একটি যজ্ঞ করবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু বহু সন্ধান করেও কোনো উপযুক্ত পুরোহিত পেলেন না। তখন যজ্ঞের উপযুক্ত পুরোহিত সৃষ্টি করার জন্য ব্রহ্মা নিজের মাথায় একটি গর্ভ ধারণ করলেন। দেখতে দেখতে এক হাজার বছর কেটে গেল। হাজার বছর পরে একদিন হঠাৎ ব্রহ্মা হাঁচলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই গর্ভটি তাঁর মাথা থেকে মাটিতে পড়ল এবং তার থেকে এক পুত্রের জন্ম হল। এই পুত্রের নামই ক্ষুপ। আসলে 'ক্ষুব' শব্দের অর্থ হল বিকার বা বিকৃতাবস্থা। হাঁচিকেও একধরনের বিকার বলা যেতে পারে। সেই ক্ষুব বা বিকার থেকে পতনের ফলে জন্ম হল বলেই তাঁর নাম ক্ষুপ—

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু স গর্ভঃ ক্ষুবতো'পতৎ॥
স ক্ষুপো নাম সম্ভূতঃ প্রজাপতিররিন্দম।

প্রজাপালক রাজা তথা বহু বংশের বংশকর পিতা হিসেবে ক্ষুপ প্রজাপতি নামে অভিহিত। এই রাজর্ষিই ব্রহ্মার যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেছিলেন।

[মহা (k) ১২.১২২.১৫-১৭; (হরি) ১২.১১৯.১৫-১৭]

□ যখন দেবতা, ঋষি ও রাজর্ষিদের মধ্যে সৃষ্টি পালন করার দায়-দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হল সেইসময় নারায়ণ ধার্মিক রাজর্ষি ক্ষুপকে প্রজাপালনের ভার দিয়েছিলেন। লোকপালরা ক্ষুপকে দুষ্টের দমন তথা শিষ্টের পালনের দায়িত্ব অর্থাৎ 'দণ্ড' দান করেছিলেন। ক্ষুপ মনু ও যমকে এই 'দণ্ড' দান করেন।

[মহা (k) ১২.১২২.৩৫-৩৯; (হরি) ১২.১১৯.৩৫-৩৯]

□ মার্কণ্ডেয় পুরাণে ব্রহ্মার পুত্র এই ক্ষুপ-প্রজাপতির মাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, ক্ষুপ ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে কর আদায় করতেন না এবং তিনি তাঁর মোট রাজস্বের এক ষষ্ঠাংশ যজ্ঞ এবং অন্যান্য ধর্মীয় কার্যকলাপে ব্যয় করতেন। *[মার্কণ্ডেয় পু. ১১৯.৬]*

ক্ষুপ₂ জনৈক রাজর্ষি। মহাভারত ও পুরাণ মতে ইনি বৈবস্বত মনুর বংশধর ছিলেন। মহাভারতের আশ্বমেধিকপর্ব থেকে জানা যায় যে, ক্ষুপ ছিলেন বৈবস্বত মনুর বংশধারায় প্রসন্ধির পুত্র তথা ইক্ষ্বাকুর পিতা। তবে বায়ুপুরাণ এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী ক্ষুপ বৈবস্বত মনুর বংশধারায় খনিত্রের পুত্র তথা বিংশ (অন্যমতে বিবিংশ)-এর পিতা ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ তাঁকে খনিত্রের পুত্র এবং বিংশ অথবা বিবিংশের পিতা বলে উল্লেখ করেছে।

[মহা (k) ১৪.৪.৩; (হরি) ১৪.৪.৩ (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে 'ক্ষুপ'-এর পরিবর্তে 'ক্ষুত' পাওয়া যায়); বায়ু পু. ৮৬.৫-৬; মার্কণ্ডেয় পু. ১১৯.১; বিষ্ণু পু. ৪.১.১৬]

□ ক্ষুপ রাজা সিংহাসনে আরোহণ করে ধর্মানুসারে প্রজাপালন করতে লাগলেন। এইসময় একদিন রাজসভায় একদল সূত এলে বললেন—ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি ক্ষুপ নামে এক প্রজাপালক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি যেমন প্রজাবৎসল এবং ন্যায় পরায়ণ ছিলেন আপনিও ঠিক তেমনই রাজা হয়েছেন। রাজা ক্ষুপ একথা শুনে সূতদের কাছে রাজর্ষি ক্ষুপ প্রজাপতির (ক্ষুপ₁) মাহাত্ম্যের কথা জানতে চাইলেন। সূতরা ব্রহ্মার পুত্র ক্ষুপ প্রজাপতির কথা শোনালেন তাঁকে। রাজা ক্ষুপ, ব্রহ্মার পুত্র রাজর্ষি ক্ষুপর প্রজাবৎসল্যের কথা শুনে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে আদর্শ প্রজাপালক রাজা হবার সংকল্প গ্রহণ করলেন। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি শস্যারোপনের আগে, ফসল কাটার আগে এবং ফসল তোলার পরে তিনটি করে যজ্ঞানুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নেন।

[মার্কণ্ডেয় পু. ১১৯.৭-১০]

□ প্রমথা এবং বিদর্ভরাজকন্যা নন্দিনী ক্ষুপ রাজার দুই পত্নী ছিলেন। ক্ষুপের পুত্র বিবিংশ বিদর্ভরাজকন্যা নন্দিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। প্রমথাও ক্ষুপের ঔরসে একটি পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে সেই পুত্রের বীরত্বের উল্লেখ থাকলেও নামোল্লেখ নেই।

[মার্কণ্ডেয় পু. ১১৯.১৩-১৫]

□ অসুরদের দমন করার জন্য ভগবান ব্রহ্মা খড়্গ-নামক অস্ত্র সৃষ্টি করেন। আদিতে সৃষ্ট সেই খড়্গ দিয়েই ভগবান মহাদেব অসুরদের বিনাশ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে পরম্পরাক্রমে

বৈবস্বত মনু সেই খড়্গ লাভ করেন। ক্ষুপ বৈবস্বত মনুর কাছ থেকে সেই খড়্গ লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ১২.১৬৬.৭৩; (হরি) ১২.১৬১.৭৩]

□ মহাভারতের সভাপর্ব থেকে জানা যায়—যেসব বিশিষ্ট রাজর্ষি যমের সভায় স্থান লাভ করেছিলেন রাজর্ষি ক্ষুপ তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ২.৮.১৩; (হরি) ২.৮.১৩]*

□ মহাভারতের অনুশাসনপর্ব থেকে জানা যায়, শরৎকালে শারদ-কৌমুদ মাসে যাঁরা মাংস ভক্ষণ করতেন না, রাজর্ষি ক্ষুপ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ১৩.১১৫.৭৫; (হরি) ১৩.১০০.১০৪]

ক্ষুর এক পাশে ভীষণ ধার, তীক্ষ্ণাগ্র এবং সোজা লম্বা ধরনের অস্ত্র। এর এক পাশের ধার এতটাই বেশি যে, বেদ-উপনিষদের কাল থেকেই ক্ষুর অতি ধারালো একটি অস্ত্র হিসেবে চিহ্নিত—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।

ক্ষুর অতি প্রাচীন কাল থেকে মস্তকমুণ্ডন কিংবা দাড়ি-গোঁফ চেঁছে ফেলার কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে যে কারণে এই কাজগুলি ও একত্রে ক্ষৌরকর্ম হিসেবেও বিখ্যাত হয়ে গেছে। অর্জুন এই ক্ষুর-অস্ত্রে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

[মহা (k) ১.১৩৯.৬; ১.১৪০.৮৯; (হরি) ১.১৩৪.৬; ১.১৩৫.৯৩ দ্র. নীলকণ্ঠকৃত টীকা]

ক্ষুরকর্ণী স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.২৫; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ২৫ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৯)]

ক্ষুলিক পুরাণে ভবিষ্যৎ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদের যে বংশলতিকা বা তালিকা পাওয়া যায়, সেই তালিকা অনুসারে কলিযুগে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা প্রসেনজিতের পুত্র ছিলেন ক্ষুদ্রক। বায়ু পুরাণ মতে, এই ক্ষুদ্রকের পুত্র ছিলেন ক্ষুলিক। *[দ্র. ক্ষুদ্রক১]*

[বায়ু পু. ৯৯.২৯০]

ক্ষেত্রজ্ঞ১ কলিযুগে শিশুনাগবংশীয় রাজা ক্ষেমধর্মার পুত্র ছিলেন ক্ষেত্রজ্ঞ। *[দ্র. ক্ষেমজিৎ]*

ক্ষেত্রজ্ঞ২ ক্ষেত্রজ্ঞ-শব্দের অর্থ যিনি ক্ষেত্রকে জানেন। 'ক্ষেত্র' কাকে বলে সেটা ভগবদ্গীতায় পরিষ্কার বলা হয়েছে— আমাদের এই শরীরকেই ক্ষেত্র বলা হয়—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।

এই শরীরকে যিনি জানেন, তাঁকেই তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলেছেন—

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্‌বিদঃ।

[ভগবদ্গীতা ১৩.২]

টীকাকারেরা জানিয়েছেন যে, এই শরীর হল সমস্ত ভোগের আধার কেননা সংসাররূপ শস্যের জন্মক্ষেত্র হল এই শরীর। যিনি এই শরীরকেই 'আমি', কিংবা এই শরীরটা 'আমার' বলে মনে করেন, তাঁকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন পণ্ডিতেরা। এখানে সমস্যা হল—এই শরীরকে 'আমি-আমার' বলে যাঁরা ভাবছেন, কিংবা যিনি 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি শূদ্র', 'আমি দেবতা', 'আমি মোটা' 'আমি রোগা' ইত্যাদি বুদ্ধিতে যিনি ভোগায়তন শরীরকে চিহ্নিত করছেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বটে, জীবস্বরূপও বটে। কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ বলতে প্রকৃতপক্ষে কী বোঝায়, সেটা গীতার পরবর্তী শ্লোকগুলি থেকে বোঝা যায়।

ক্ষেত্রজ্ঞকে বোঝার জন্য ক্ষেত্রকে আগে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলা হয়েছে গীতায়। বলা হয়েছে—পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, প্রকৃতি, দশেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ তন্মাত্র, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, দেহেন্দ্রিয়ের শারীরিক সংহতি, চেতনা ও ধৈর্য্য—সংক্ষেপে এই সবগুলি নিয়েই ক্ষেত্র এবং এই শরীরে ইন্দ্রিয়াদির সমস্ত বিকারগুলিও থাকবে—অর্থাৎ সেটাও ক্ষেত্রের সংজ্ঞা।

ক্ষেত্রের এই স্বরূপ-বোধ থেকে যদি ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব বুঝতে হয় তাহলে এটাই বলা সোজা হত যে, পূর্বোক্ত শরীর-সংজ্ঞক ক্ষেত্রকে যিনি জানেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। কিন্তু তাহলে এটাই মানে দাঁড়াত যে, জড় এবং সবিকার দেহেন্দ্রিয়গুলিকেই যিনি আমি-আমার ভেবে আত্মবুদ্ধি করছেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সেটা যে কখনোই নয়, তা বোঝানোর জন্যই ক্ষেত্রজ্ঞের লক্ষণ করার সময় গীতায় বলা হল—যাঁর আত্মশ্লাঘা নেই, দাম্ভিকতা নেই, অহিংসা, ক্ষমা, ঋজুতা ইত্যাদি গুণ আছে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে যাঁর বৈরাগ্য আছে, যিনি অহঙ্কার বা 'আমি-আমার' এইরকম বোধের বাইরে গিয়ে জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির দোষগুলিকে অনুধাবন করতে পারেন, তিনিই প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞ।

বস্তুত জীবাত্মার এই যে ক্ষেত্রজ্ঞ-লক্ষণ, এই

লক্ষণের সঙ্গে ব্রহ্মভাবনার তফাৎ নেই কোনো। বিশেষত অদ্বৈতবাদীরা জীবাত্মায় অবস্থিত আত্মচৈতন্যের সঙ্গে পরব্রহ্মের পার্থক্যও দেখেন না কোনো। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' কিংবা 'সো'হম্', 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য এই অদ্বয়ভাব আরো প্রমাণ দেয়। এখানে অবশ্য ক্ষেত্রজ্ঞের লক্ষণটুকু সাংখ্য দর্শনের ভাবনায় বহুপুরুষ-স্বীকারের মধ্য দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলে সুবিধে হবে। কথাটা এইজন্য বলছি যে, সাংখ্য-দার্শনিকেরা প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব-ভাবনায় পুরুষ-বহুত্ব বা বহু পুরুষ স্বীকার করেন। এই কারণেই 'সাক্ষী চেতা কেবল নির্গুণশ্চ।

—এই পরমাত্মারূপী পুরুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কৃষ্ণ বলেছেন—সমস্ত প্রাণী-শরীরে অবস্থিত সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকেও 'আমি' বলেই জানবে—

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।

[ভগবদ্গীতা ১৩.২]

এই ভোগাধার শরীরটাকে (ক্ষেত্র) আমি যে 'আমি' বলে ভাবছি, জানছি বা ভোগের উপকরণ খুঁজে বেড়াচ্ছি, অথবা ভোগ্য বিষয় ভোগই করছি, সেই 'আমি' প্রকৃতিজাত শরীরের মধ্যে অধিষ্ঠিত বলেই এটাকে আমি বলে মনে হচ্ছে—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।

[ভগবদ্ গীতা ১৩.২১]

কিন্তু সেই 'আমি' প্রকৃতপক্ষে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নন। প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞ কিন্তু তিনি, যিনি সেই দেহে অবস্থিত পরম পুরুষ যিনি সাক্ষীর মতো বসে আছেন দেহের মধ্যে, তিনিই আসল ভোক্তা, তিনি পরমাত্মা।

[ভগবদ্ গীতা ১৩.২২]

ক্ষেত্রজ্ঞের প্রকৃত স্বরূপটাই এই যে, ক্ষেত্র-শরীরের গুণগুলি তিনি ভোগ করেন, কিন্তু সেগুলির দ্বারা তিনি ভুক্ত হন না—

যত্তে সর্বশরীরেষু তিষ্ঠন্তি বিচরন্তি চ।
এতান্ গুণাংস্তু ক্ষেত্রজ্ঞো ভুঙ্‌ক্তে
নৈভিঃ স ভুজ্যতে।

[মহা (k) ১২.৩৩৯.২৭-২৮;
(হরি) ১২.৩২৫.২৭-২৮]

গীতায় কৃষ্ণ এই পরমাত্মাস্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞের সঙ্গেই নিজের ভগবৎ-স্বরূপকে একাত্মকভাবে বুঝিয়েছেন—

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।

[ভগবদ্ গীতা ১৩.২]

কৃষ্ণ এবং বিষ্ণুর সঙ্গে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের এই একাত্মতা মহাভারতের অন্য জায়গাতেও আছে।

[মহা (k) ৩.১২.১৭; ৩.৮৮.২৭; ৬.৩৭.১-৩, ২৬; ১২.৪৭.৫২; ১২.৩৩৯.৪০; ১৪.৩৪.১২;
(হরি) ৩.১১.১৭; ৩.৭৩.২৭; ৬.৩৭.১-৩, ২৬; ১২.৪৬.৫৩; ১২.৩২৫.৩৯; ১৪.৩৯.১২]

ভগবদ্গীতা এবং মহাভারতে উল্লিখিত ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব পণ্ডিতদের ভাবনায় এইরকম—

Such is one difficulty in this complex chapter, while on a more philosophical level, it is not always clear whether *purusha* and *prakriti* are to be interpreted microcosmically as soul and body in the human being or macrocosmically as Brahman, the knower, the *Kshetrajna,* and *prakriti* as the manifest universe—all fields. However, the supreme Purusha as *Kshetrajna* is also the true Self that resides in the body that is the *kshetra,* the Self being the pure subject and the body being the object. Important to remember is that any aspects normally equated with the psychological self—intellect (*buddhi*), ego (*ahankara*) and mind (*manas*)—are all *matter* and so constitute the *kshetra* not the *kshetrajna*. And just as a field is sown to produce crops as a result, so we sow seeds by actions through involvement in the *prakritic* world, which must then reap *karmic* results.

The *yoga* of the differentiation between *kshetra* and *kshetrajna* must surely refer to *knowledge* of the difference between them, so knowledge is a key feature of the chapter. Such knowledge is repeatedly *jnana* in the text, and is not knowledge about something or knowledge that something is the case, it is not subjective knowledge. Rather, it is totally objective knowledge by a pure subject, much as Rohit Mehta put it

when he said: 'Now a true objective perception is that from which all subjective projections have been eliminated.' Such objective perception is a neutrality of perception, perception that is not entangled and involved, and to bring this about, one has to have knowledge of the field, the *kshetra* and the knower, the *kshetrajna.* These are not subject—object combined, but subject and object differentiated and separated, *vibhaga.* Thus, Ramanuja defined a *kshetrajna* as one who has knowledge that the body is different from the *atman,* the *kshetrajna* being the subject and the body, the object.

The first proper verse of the chapter equates *kshetra* with the body. Shankara speculated that the body is called a field 'because it is shielded from injury, or because it is destructible, or because it is liable to decay, or because the fruits of actions are reaped in it as in a field'. I am inclined to think it is meant in the sense of the endless field of all activity of thought, speech and action in which the embodied Self can become involved. Just as a field can yield good or bad produce according to its condition, so the individual, in the field of the body, reaps what is good or bad through the law of *karma* according to the condition of his or her *jivatman,* the being he or she has become. It is that *jivatman,* that individual self that has the appearance of being the 'knower' of the matter, the body, which serves it. However, the *true* knower, the true *kshetrajna,* is the pure *atman,* that which can differentiate between unchanging pure spirit that is Brahman, and the world of matter that is constantly changing through the *gunas* of *prakriti. Body, sharira* in the verse, is clearly the human body, so we begin on the microcosmic level of the human being rather that the metaphysical, macrocosmic level of Brahman. The human body, just like all *prakriti,* is subject to change; it will be born, will develop and will die in these processes of change that characterize all phenomena whether living or inanimate. The *kshetrajna* as the *atman* is the unchanging element that permits consciousness and that is the same in all. In Radhakrishnan's words: 'The human being is a union of the universal-infinite and the universal-particular. In his subjective aspects, he is not a part of a whole but is the potential whole.'

[The Bhagavad Gita: A Text and Commentary for Students, J.D. Fowler, pp. 217-218]

ক্ষেত্রপালতীর্থ প্রভাসক্ষেত্রের অন্তর্গত পবিত্র তীর্থ। হিরণ্যতটের উত্তর-পূর্ব কোণে এই পবিত্র স্থান অবস্থিত। এখানে একটি হীরকক্ষেত্র আছে। ভগবান শিব স্বয়ং সেই ক্ষেত্রটিকে রক্ষা করেন বলেই এই পবিত্র ক্ষেত্রে তিনি ক্ষেত্র পাল নামে পূজিত হন।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র) ২৪৩.১-৪]

ক্ষেত্রোপেক্ষ যদু-বৃষ্ণি বংশীয় শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভজাত অন্যতম পুত্র। ইনি অক্রূরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। *[ভাগবত পু. ৯.২৪.১৬]*

ক্ষেম$_১$ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক জনৈক রাজা। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে উল্লেখ আছে যে, দ্বাপর যুগে ক্রোধবশ অসুরদের অংশে যেসব রাজা মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ক্ষেম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মহাভারতের দ্রোণপর্বে দ্রোণাচার্যের হাতে ক্ষেম রাজার বধ সংবাদ পাওয়া যায়। তিনি এবং তাঁর পুত্র সত্যধৃতি পাণ্ডবপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ যোদ্ধা ছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.৬৫; ৭.২১.৫৩; (হরি) ১.৬২.৬৬; ৭.১৯.৪৯]

ক্ষেম$_২$ পৌরাণিক প্লক্ষদ্বীপের অন্তর্গত সাতটি বর্ষের মধ্যে অন্যতম হল ক্ষেমবর্ষ। ভাগবত পুরাণ মতে

প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি ইধ্মজিহ্ব-র সাত পুত্রের মধ্যে একজন ছিলেন ক্ষেম (অন্যান্য পুরাণ মতে মেধাতিথির পুত্র)। তাঁর নামেই প্লক্ষদ্বীপের ওই বর্ষের নাম হয় ক্ষেমবর্ষ।

[ভাগবত পু. ৫.২০.৩; অগ্নি পু. ১১৯.২-৩]

ক্ষেম$_{৩}$ ধর্মের ঔরসে দক্ষকন্যা শান্তির গর্ভে (ভাগবত পুরাণ মতে তিতিক্ষার গর্ভে) জাত পুত্র।

[ভাগবত পু. ৪.১.৫১; বায়ু পু. ১০.৩৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৯.৬১; বিষ্ণু পু. ১.৭.২৮; কূর্ম পু. ১.৮.২৩; অগ্নি পু. ১৬৩.১৩]

ক্ষেম$_{৪}$ কলিযুগে মগধরাজ জরাসন্ধের যেসব বংশধর মগধে রাজত্ব করেছিলেন, ক্ষেম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইনি জরাসন্ধের বংশধর শুচির পুত্র ছিলেন, ক্ষেমের পুত্র ছিলেন সুব্রত। বিষ্ণু পুরাণে ইনি ক্ষেম্য নামে চিহ্নিত হয়েছেন।

[ভাগবত পু. ৯.২২.৪৮; মৎস্য পু. ২৭১.২৫; বায়ু পু. ৯৯.৩০২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১১৬; বিষ্ণু পু. ৪.২৩.৩]

ক্ষেম$_{৫}$ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রজাপতি রুচির ঔরসে অজিতার গর্ভে অজিত দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। এই অজিত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ক্ষেম। *[বায়ু পু. ৬৭.৩৩-৩৪]*

ক্ষেম$_{৬}$ তৃতীয় মন্বন্তরে যখন ঔত্তম মনু মন্বন্তরাধিপতি ছিলেন, সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন সত্ত্ব তার মধ্যে একটি গণ (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে সত্য নামক দেবগণ) এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ক্ষেম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৩৫; বায়ু পু. ৬২.৩১-৩৩]

ক্ষেম$_{৭}$ নীপবংশীয় রাজা উগ্রায়ুধের পুত্র। ভাগবত এবং বিষ্ণু পুরাণে ইনি ক্ষেম্য নামে চিহ্নিত হয়েছেন। ক্ষেম সুবীর নামে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন। *[মৎস্য পু. ৪৯.৭৮; বায়ু পু. ৯৯.১৯৩; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১৫; ভাগবত পু. ৯.২১.২৯]*

ক্ষেম$_{৮}$ পিশাচী ব্রহ্মধনার গর্ভজাত রাক্ষসদের মধ্যে একজন।

[বায়ু পু. ৬৯.১৩২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৯৮]

ক্ষেম$_{৯}$ কাশীরাজ ধন্বন্তরির বংশধারায় সুনীথের পুত্র ছিলেন ক্ষেম। রাজা ক্ষেম কেতুমান নামে এক পুত্র লাভ করেন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৭.৭৩]*

ক্ষেম$_{১০}$ *[দ্র. যোগক্ষেম]*

ক্ষেমক$_{১}$ একজন নাগ। ইনি কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম। মহাভারতের আস্তীকপর্বে সর্পনাম কথনের সময় অন্যান্য কদ্রু পুত্রদের সঙ্গে তাঁর নামও উল্লিখিত হয়েছে। *[মহা (k) ১.৩৫.১১; (হরি) ১.৩০.১১]*

ক্ষেমক$_{২}$ একজন রাজা। ইনি ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন বলে জানা যায়। তবে ইনি কোন দেশের রাজা ছিলেন এ বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে পাণ্ডবরা যেসব রাজাকে পাণ্ডব শিবিরে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ক্ষেমক তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ২.৪.২২; ৫.৪.২৩; (হরি) ২.৪.১০নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, খণ্ড ৫; পৃ.২৬; ৫.৪.২৪]

ক্ষেমক$_{৩}$ ভাগবত পুরাণ মতে ইনি চন্দ্রবংশের শেষ রাজা। কলিযুগে চন্দ্রবংশীয় রাজা নেমির পুত্র ক্ষেমক রাজত্ব করবেন বলে ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত আছে। কুরুবংশীয় রাজা ক্ষেমক অন্যান্য পুরাণে রাজা নিরমিত্র বা নিরামিত্রের পুত্র রূপে কথিত। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.২৪৫; মৎস্য পু. ৫০.৮৭-৮৮; বায়ু পু. ৯৯.২৭৭-২৭৯; বিষ্ণু পু. ৪.২১.৪]*

ক্ষেমক$_{৪}$ একজন রাক্ষস। এই রাক্ষসের উপদ্রবেই কাশীরাজ দিবোদাসের শাসনকালে বারাণসীনগরী প্রায় জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৭.২৭]

ক্ষেমক$_{৫}$ যক্ষ মণিবরের ঔরসে দেবজনীর গর্ভজাত পুত্র সন্তানদের মধ্যে ক্ষেমক অন্যতম।

[বায়ু পু. ৬৯.১৬০]

ক্ষেমক$_{৬}$ প্লক্ষদ্বীপের রাজা মেধাতিথির সাত পুত্রসন্তানের মধ্যে একজন। মেধাতিথি তাঁর সাত পুত্রকে প্লক্ষদ্বীপের সাতটি বর্ষের অধিপতি করেছিলেন। ক্ষেমক যে বর্ষের রাজা হয়েছিলেন তাঁর নাম অনুসারে সেই অঞ্চলের নাম হয়েছিল ক্ষেমক বর্ষ। ক্ষেমকবর্ষ মৎস্য পুরাণে মৈনাক বর্ষ নামেও চিহ্নিত হয়েছে। মৎস্য পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী এই ক্ষেমকবর্ষের অন্তর্গত বর্ষপর্বতের নাম আম্বিকেয়। বায়ু পুরাণে এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ক্ষেমক বর্ষের অন্তর্গত পর্বতটির নাম ঋষভ (বৃষভ)। *[বায়ু পু. ৩৩.৩৩, ৪৯.১৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.৩৭, ৩৯; ১.১৯.১৬; বিষ্ণু পু. ২.৪.৪-৫; মৎস্য পু. ১২২.২৫]*

ক্ষেমকীর্তি *[দ্র. ক্ষেমধূর্তি১]*

ক্ষেমঙ্কর মহাভারতের বনপর্বে জয়দ্রথ কোটিকাস্যকে পাঠিয়েছিলেন দ্রৌপদীর খবর নিয়ে আসার জন্য। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অনুচর কোটিকাস্য দ্রৌপদীকে জয়দ্রথের বাকি অনুচরদের পরিচয় দিতে গিয়ে ক্ষেমঙ্করের নাম উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকে ত্রিগর্তদেশের রাজা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এখানে—

ত্রিগর্তরাজঃ কমলায়তাক্ষঃ ক্ষেমঙ্করঃ।

জয়দ্রথ দৌপদীকে অপহরণ করার চেষ্টা করলে পাণ্ডবরা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলেন দ্রৌপদীকে উদ্ধার করার জন্য। দ্রৌপদী উদ্ধারের সময় পাণ্ডবদের সঙ্গে জয়দ্রথ এবং তাঁর অনুচরদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ক্ষেমঙ্কর নকুলের হাতে নিহত হন।

[মহা (k) ৩.২৬৫.৬-৭; ৩.২৭১.১৬; (হরি) ৩.২২০.৬; ৩.২২৫.১৬-১৭]

ক্ষেমজিৎ মৎস্য পুরাণ মতে কলিযুগে মগধে রাজত্বকারী শিশুনাগ বংশীয় রাজা ক্ষেমধর্মার পুত্র ছিলেন ক্ষেমজিৎ। ক্ষেমধর্মার পুত্রকে অন্যান্য পুরাণে ক্ষেত্রজ্ঞ বা ক্ষত্রৌজা নামেও চিহ্নিত করা হয়েছে। ইনি চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়।

[মৎস্য পু. ২৭২.৮; বায়ু পু. ৯৯.৩১৬-৩১৭; বিষ্ণু পু. ৪.২৪.৩; ভাগবত পু. ১২.১.৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১২৯-১৩০]

ক্ষেমদর্শী কোশল দেশের রাজা। একসময় শত্রুরাজারা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে পরাজিত রাজ্যচ্যুত রাজা ক্ষেমদর্শী কালকবৃক্ষীয় মুনির আশ্রমে এসে নিজের দুরবস্থার জন্য হতাশা প্রকাশ করতে লাগলেন। মুনি রাজাকে বললেন—যা নষ্ট হয়ে গেছে তার জন্য শোক করা উচিত নয়। তবে যদি আমার উপদেশ মেনে চলতে পার, তবে তোমাকে আমি রাজ্যলাভের পথ বলে দিতে পারি। রাজা সম্মত হলে মুনি ক্ষেমদর্শীর শত্রু বিদেহরাজকে ডেকে রাজধর্ম বিষয়ক নানা উপদেশ দিলেন। পরাজিত ক্ষেমদর্শীর সঙ্গে সন্ধি করার সুপরামর্শও দিলেন। বিদেহরাজ কালকবৃক্ষীয় মুনিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর উপদেশ শুনে তিনি ক্ষেমদর্শীকে রাজ্য তো ফিরিয়ে দিলেনই, উপরন্তু নিজের কন্যার সঙ্গে ক্ষেমদর্শীর বিবাহ দিয়ে দুই রাজ্যের মধ্যে চিরস্থায়ী মৈত্রীর সূচনা করলেন। ক্ষেমদর্শী রাজ্য লাভ করে ন্যায় অনুসারে প্রজা পালন করতে লাগলেন।

[মহা (k) ১২.১০৪-১০৬ অধ্যায়; (হরি) ১২.১০১-১০৩ অধ্যায়]

□ কালকবৃক্ষীয় মুনি একবার ক্ষেমদর্শীর রাজধানীতে এলেন। হাতে খাঁচায় বন্দি একটি কাক। রাজপথে সেই কাকটিকে হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে মুনি বলতে লাগলেন—তোমরা সবাই বায়সীবিদ্যা শিক্ষা কর। কারণ কাক-ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব কিছুই বলতে পারে—

অধীধ্বং বায়সীং বিদ্যাং শংসন্তি মম বায়সাঃ।
অনাগতমতীতঞ্চ যচ্চ সম্প্রতিবর্ততে॥

এই ভাবে নিজের পোষা কাকের গুণ প্রচার করতে করতে মুনি রাজার দুর্নীতিগ্রস্ত অমাত্যদের দুষ্কর্ম দেখে বেড়াতে লাগলেন। তারপর উপস্থিত হলেন রাজসভায়। রাজার অমাত্যদের এক একজনকে ডেকে মুনি বলতে লাগলেন—আমার কাক বলছে যে, তুমি অমুকস্থানে অমুক দুষ্কার্য করেছ এবং তার সাক্ষীদের নামও বলে দিয়েছে আমার এই কাক। রাজার সামনেই কাকের মাধ্যমে সমস্ত অমাত্যদের দুর্নীতির কথা তুলে ধরলেন কালকবৃক্ষীয় মুনি। অমাত্যরা ভাবলেন সত্যিই হয়তো কাকটিই বলেছে সব কিছু। তাই রাতের অন্ধকারে নিদ্রিত মুনির নিরীহ পোষা কাকটিকে হত্যা করলেন তাঁরা। সকালে উঠে মৃত কাকটিকে নিয়ে মুনি গেলেন রাজার কাছে। প্রকৃতপক্ষে অমাত্যরা কাকটিকে হত্যা করায় আরও বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, মুনির অভিযোগ নিঃসন্দেহে সত্য। মুনি রাজাকে রাজধর্ম বিষয়ে নানা উপদেশ দিলেন। দুর্নীতিপরায়ণ অমাত্যদের দমন করার উপায়ও বললেন রাজাকে। রাজা ক্ষেমদর্শী কালকবৃক্ষীয় মুনিকে পুরোহিত পদে বরণ করলেন এবং তাঁর উপদেশ অনুসারে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

[মহা (k) ১২.৮২ অধ্যায়; (হরি) ১২.৮০ অধ্যায়]

ক্ষেমধন্বা১ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশের বংশধারায় পুণ্ডরীকের পুত্র ছিলেন ক্ষেমধন্বা। ক্ষেমধন্বার পুত্র ছিলেন রাজা দেবানীক।

[বায়ু পু. ৮৮.২০২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.২০৩]

ক্ষেমধন্বা২ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষে অংশগ্রহণকারী একজন রাজা। তিনি কীরকম বীরত্ব দেখিয়েছিলেন বা পাণ্ডবপক্ষের কোন

যোদ্ধা বা কতজন সৈন্য তাঁর হাতে নিহত হয়েছিলেন—এ বিষয়ে মহাভারতে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ভীষ্মপর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রথম দিনে তাঁকে দুর্যোধনের পাশে অবস্থান করতে দেখা যায়। এরপর তাঁর নামোল্লেখ পাই স্ত্রীপর্বে যেখানে অন্যান্য মৃত যোদ্ধাদের সঙ্গে তাঁর শবদাহ করা হয়।

[মহা (k) ৬.১৭.২৭; ১১.২৬.৩৩; (হরি) ৬.১৭.২৭; ১১.২৬.২৯]

ক্ষেমধর্মা১ একাদশ মন্বন্তরের অধিপতি ব্রহ্মপুত্র সাবর্ণি মনুর আট পুত্রসন্তানের মধ্যে একজন ছিলেন ক্ষেমধর্মা।

[বায়ু পু. ১০০.৮৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৮১]

ক্ষেমধর্মা২ বায়ু পুরাণে এঁকে ক্ষেমবর্মা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে অন্যান্য পুরাণ মতে ইনি কলিযুগে মগধে রাজত্বকারী শিশুনাগ বংশীয় রাজা কাকবর্ণের পুত্র ছিলেন। ক্ষেমধর্মার পুত্র ছিলেন ক্ষেত্রজ্ঞ (বিষ্ণু ও বায়ু পুরাণ মতে ক্ষত্রৌজা)। ক্ষেমধর্মা ২০ বছর (মতান্তরে ৩৬ বছর) রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়। *[দ্র. ক্ষেত্রবর্মা]*

[ভাগবত পু. ১২.১.৫; (মহর্ষি) ২.৭৪.১২৯; মৎস্য পু. ২৭২.৭; বিষ্ণু পু. ৪.২৪.৩]

ক্ষেমধূর্তি১ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক জনৈক রাজা। মহাভারতে তাঁকে কুলূত জাতির রাজা বা কুলূতাধিপতি বলা হয়েছে। মহাভারতের অন্তর্গত অংশাবতরণ পর্ব থেকে জানা যায়, দ্বাপর যুগে ক্রোধবশ অসুরের অংশে রাজা ক্ষেমধূর্তির জন্ম হয়েছিল। *[মহা (k) ১.৬৭.৬৪; (হরি) ১.৬২.৬৫]*

□ উদ্যোগপর্বের সূচনায় পাণ্ডবরা পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য যেসব রাজাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, রাজা ক্ষেমধূর্তি তাঁদের মধ্যে একজন। তবে ক্ষেমধূর্তি কৌরবপক্ষে যোগদান করেছিলেন। *[মহা (k) ৫.৪.১৮; (হরি) ৫.৪.১৮]*

□ দ্রোণপর্বে ক্ষেমধূর্তির সঙ্গে সাত্যকির দ্বন্দ্বযুদ্ধের উল্লেখ আছে। কর্ণপর্বে ক্ষেমধূর্তির সঙ্গে ভীমসেনের দীর্ঘ দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিবরণ মেলে। ক্ষেমধূর্তি এই যুদ্ধে ভীমের হাতে নিহত হন।

[মহা (k) ৭.২৫.৪৭; ৮.৫.৪৪; ৮.১২.২৫-৪৬; (হরি) ৭.২৩.৪৭; ৮.৩.৬০; ৮.৯.২৫-৪৬]

ক্ষেমধূর্তি২ মহাভারতের দ্রোণপর্বে আমরা ক্ষেমধূর্তি নামে আরও একজন কৌরব যোদ্ধার উল্লেখ পাই। জয়দ্রথ বধের দিন ধৃতরাষ্ট্রের তিন পুত্র বিবিংশতি, চিত্রসেন এবং বিকর্ণ ভীমসেনকে আক্রমণ করেন। এই সময় এঁদের সহায়ক যোদ্ধা হিসেবে ক্ষেমধূর্তির উপস্থিতির উল্লেখ পাই। ঐদিনেই পাণ্ডবপক্ষীয় রাজা বৃহৎক্ষত্রের সঙ্গে ক্ষেমধূর্তির যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বৃহৎক্ষত্রের হাতে ক্ষেমধূর্তি নিহত হন।

[মহা (k) ৭.৯৫.৩৬; ৭.১০৬.৮; ৭.১০৭.১-৫; (হরি) ৭.৮২.৩৬; ৭.৯২.১-৬]

ক্ষেমধূর্তি৩ মহাভারতে ক্ষেমধূর্তি নামে অপর একজন কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধার উল্লেখ পাই যিনি সাত্যকির হাতে নিহত হয়েছিলেন। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে এঁকে ক্ষেমকীর্তি নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ৯.২১.৮; (হরি) ৯.১৯.৮]

ক্ষেমবর্মা কলিযুগে মগধে যে সব রাজবংশ রাজত্ব করেছিল, শিশুনাগের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। এই বংশে জাত রাজা ছিলেন ক্ষেমবর্মা। ইনি কুড়ি বছর রাজত্ব করেছিলেন বলে পুরাণে উল্লেখ আছে। *[বায়ু পু. ৯৯.৩১৬]*

ক্ষেমবাহ স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচর একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৬৬; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

ক্ষেমভূমি১ কলিযুগে মগধে রাজত্বকারী শুঙ্গবংশীয় রাজা। ইনি বিক্রমিত্রের পুত্র ছিলেন। ক্ষেমভূমি দশ বছর রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়।

[বায়ু পু. ৯৯.৩৪২]

ক্ষেমভূমি২ *[দ্র. দেবভূমি]*

ক্ষেমমূর্তি ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের একজন।

[মহা (k) ১.৬৭.১০০; (হরি) ১.৬২.১০২]

ক্ষেমশর্মা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষে যোগদানকারী একজন রথী। দ্রোণাচার্য যে গরুড়ব্যূহ নির্মাণ করেছিলেন তার গ্রীবাদেশে ইনি অবস্থান করছিলেন।

[মহা (k) ৭.২০.৬; (হরি) ৭.১৮.৬]

ক্ষেমা মৌনেয় অপ্সরাদের মধ্যে অন্যতম। অর্জুনের জন্মোৎসবে যেসব অপ্সরা নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন ক্ষেমা তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৭; মহা (k) ১.১২৩.৬২; (হরি) ১.১১৭.৬৬]

ক্ষেমাধি ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমির বংশধারায় রাজা চিত্ররথের পুত্র ছিলেন ক্ষেমাধি। রাজা ক্ষেমাধি সত্যরথ নামে এক পুত্র লাভ করেন।

[ভাগবত পু. ৯.১৩.২৩-২৪]

ক্ষেমারি বিষ্ণু পুরাণ মতে ইক্ষ্বাকুপুত্র নিমির বংশধারায় মিথিলার রাজা সঞ্জয়ের পুত্র ছিলেন ক্ষেমারি। ক্ষেমারি অনেনা নামে এক পুত্র লাভ করেন। গরুড় পুরাণে এঁকে সুপার্শ্বের পৌত্র তথা সৃঞ্জয়ের পৌত্র বলা হয়েছে।

[বিষ্ণু পু. ৪.৫.১৩; গরুড় পু. ১.১৪২.৫৩]

ক্ষেমাশ্ব বিষ্ণু পুরাণ মতে ইক্ষ্বাকুপুত্র নিমির বংশধারায় মিথিলার রাজা সঞ্জয়ের (ইনি ক্ষেমারির পিতা সঞ্জয়ের উত্তরপুরুষ) পুত্র ছিলেন ক্ষেমাশ্ব। ক্ষেমাশ্বের পুত্র ধৃতি।

[বিষ্ণু পু. ৪.৫.১৩]

ক্ষেমি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানকারী জনৈক রাজা। তিনি সত্যধৃতি ক্ষেমি নামে পরিচিত। *[মহা (k) ৭.২৩.৫৮; (হরি) ৭.২১.৫৫]*

ক্ষেম্য১ *[দ্র. ক্ষেম৪]*

ক্ষেম্য২ *[দ্র. ক্ষেম৭]*

ক্ষৈমি১ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা পরাশর মুনির নামে কয়েকটি বংশধারা প্রচলিত ছিল। সেই বংশধারায় অনেকগুলি সন্তানকে নিয়ে এক-একটি বর্গ রচিত হয়েছিল। যাঁদের গৌর-পরাশর, নীল-পরাশর, কৃষ্ণ-পরাশর, শ্বেত-পরাশর, শ্যাম-পরাশর এবং ধূম্র-পরাশর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরাশরের যে সন্তানেরা শ্যাম-পরাশর নামে অভিহিত তাঁদের মধ্যে ক্ষৈমি একজন। *[মৎস্য পু. ২০১.৩৭]*

ক্ষৈমি২ *[দ্র. সত্যধৃতি]*

ক্ষৌম *[দ্র. বস্ত্র]*

ক্ষেলা অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। ক্ষেলা সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৭৯.২৫]*

খ

খগ১ কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত একজন নাগ। নারদ মাতলিকে ভোগবতীপুরীতে বসবাসকারী প্রধান নাগদের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর নামোল্লেখ করেছেন।

[মহা (k) ৫.১০৩.১০; (হরি) ৫.৯৬.১০]

খগ২ শিব-মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। তিনি 'খ' অর্থাৎ আকাশে পরিভ্রমণ করেন বা আকাশচারী—তাই তাঁর এই নাম।

[মহা (k) ১৩.১৭.৬৭; (হরি) ১৩.১৬.৬৭]

খগণ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধারায় বজ্রনাভের ঔরসজাত পুত্র খগণ।

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ৯.১২.৩;
(সীতারামদাস) ৯.১২.৩]

খগম খগম নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁর শাপে সহস্রপাৎ মুনি ডুণ্ডুভ বা ঢোঁড়াসাপে রূপান্তরিত হন।

[দ্র. সহস্রপাৎ]
[মহা (k) ১.১০-১১ অধ্যায়; (হরি) ১.৯ অধ্যায়]

খট্বাঙ্গ১ অভিমন্যু পুত্র পরীক্ষিৎ শুকদেবকে প্রশ্ন করেছিলেন—মানুষের পক্ষে কী শ্রবণীয়। কী-ই বা স্মরণীয়। উত্তরে শুকদেব ভরতবংশীয় পরীক্ষিৎকে জানান—যিনি মোক্ষ লাভ করতে চান তাঁর সর্বদা হরিকে শ্রবণ-কীর্তন ও স্মরণ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে তিনি রাজর্ষি খট্বাঙ্গের কথা বলেন। যিনি দেবতাদের কাছে নিজের আয়ুর স্বল্পতা জানতে পেরে সমস্ত বিষয় ত্যাগ করে হরির শরণাগত হয়েছিলেন এবং ব্রহ্মলোক লাভ করেছিলেন।

□ খট্বাঙ্গ ইক্ষ্বাকুবংশীয় ঐড়বিড়ের (পাঠান্তরে ইলিবিল) পৌত্র তথা রাজা বিশ্বসহের পুত্র। মহাবীর খট্বাঙ্গ দেবতাদের অনুরোধে দৈত্যদের যুদ্ধে সংহার করেন। বিজয়ী রাজর্ষিকে দেবতারা বর দিতে চাইলে তিনি দেবতাদের কাছে নিজের আয়ুষ্কাল জানতে চান। দেবতারা খট্বাঙ্গকে জানালেন যে, তাঁর আয়ু আর মুহূর্তকাল মাত্র অবশিষ্ট আছে। একথা শুনে খট্বাঙ্গ জীবনের অন্তিম মুহূর্ত কালে ভগবান শ্রীহরির আরাধনায় মনোনিবেশ করেন।

□ খট্বাঙ্গের পুত্রের নাম দীর্ঘবাহু। দীর্ঘবাহুর বংশধারায় রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

□ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের একটি পর্বে খট্বাঙ্গের মাতা যশোদার নাম পাওয়া যায়। যিনি উপাহূত পিতৃগণের মানসকন্যা। বায়ু পুরাণে আবার যশোদাকে খট্বাঙ্গের মাতা বলা হলেও বিশ্বমহতের পত্নী বলা হয়েছে। তবে যশোদার গর্ভজাত এই খট্বাঙ্গ-ই যে ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিশ্বসহের পুত্র খট্বাঙ্গ সেই সংশয়ের মীমাংসা করেছেন পারজিটার।

□ বায়ু পুরাণের পাঠে খট্বাঙ্গের পরিবর্তে খট্বাঙ্গদ নামটিও পাওয়া যায়। *[দ্র. দিলীপ১]*

[ভাগবত পু. ২.১.১৩; ৯.৯.৪১-৪৯;
৯.১০.১; ১১.২৩.৩০; ১২.৩.৯;
বিষ্ণু পু. (নবভারত) ৪.৪.৩৮-৪০;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১০.৯০;
বায়ু পু. ৭৩.৪১; ৮৮.১৮২;
AIHT (Pargiter) p. 69]

খট্বাঙ্গ২ প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত অস্ত্রবিশেষ। মহাভারতে একটি-দুটি শ্লোকে খট্বাঙ্গের উল্লেখ থাকলেও যুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে খট্বাঙ্গ ব্যবহৃত হতে দেখা যায় নি। সৌপ্তিক পর্বে অশ্বত্থামা ভগবান শিবের স্তব করতে গিয়ে তাঁকে খট্বাঙ্গধারী বলে সম্বোধন করেছেন। শান্তিপর্বে একটি শ্লোকে ভিক্ষুক সন্ন্যাসীকে খট্বাঙ্গ ধারী বলে চিহ্নিত করেছেন মহর্ষি ব্যাস।

[মহা (k) ১০.৭.৪; ১২.৩৫.২;
(হরি) ১০.৮.৪; ১২.৩৫.২]

□ পুরাণেও ভগবান শিবকে খট্বাঙ্গধর বলে সম্বোধন করা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত দেবীমাহাত্ম্যে দেবী চণ্ডিকার হাতে যেসব অস্ত্রশস্ত্র দেখা গেছে, তার মধ্যেও খট্বাঙ্গের উল্লেখ মেলে।

[ভাগবত পু. ৪.১৯.২০; মার্কণ্ডেয় পু. ৮৭.৬]

□ এখন প্রশ্ন হল, খট্বাঙ্গ ঠিক কী জাতীয় অস্ত্র? বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থগুলিতে খট্বাঙ্গকে অস্থিনির্মিত অস্ত্র বলা হয়েছে। মানুষের পায়ের হাড়, তার ওপর একটা করোটি—এই হল তন্ত্রমতে খট্বাঙ্গের আকার। কেউ কেউ এর মাথায় একটা ধারালো ফলা থাকে বলেও বর্ণনা করেছেন।

তবে তন্ত্রগ্রন্থগুলিতে যাই থাকুক না কেন, খট্বাঙ্গকে অস্থিনির্মিত বলা আভিধানিক অর্থের কারণেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। খট্বা বা খট্বা শব্দের অর্থ হল খাট বা পালঙ্ক। খট্বাঙ্গ বলতে সেক্ষেত্রে খাটের পায়া বোঝাবে। বহু প্রাচীন কাল থেকে, যবে থেকে খাট-পালঙ্ক তৈরি হচ্ছে, তবে থেকেই তার মূল উপকরণ হল কাঠ। সেক্ষেত্রে অস্ত্র হিসেবে খট্বাঙ্গকে খাটের পায়ার মতো মোটা লাঠি বা মুদ্গর জাতীয় বস্তু বলতে হয়। এটি নিতান্তই ভোঁতা অস্ত্র (Blunt Instrument) এর মাথায় কোনো ধারালো ফলা লাগানো হত বলে জানা যায় না। অস্ত্রের আকৃতির কারণেই এটিকে অতি প্রাচীন অস্ত্র বলে মনে হয়। প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল—দিব্যাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র এমনকী এখনকার অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের যুগেও প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসেবে লাঠিসোটার ব্যবহার কখনওই কমে না। বস্তুত শিবের অস্ত্র হিসেবে খট্বাঙ্গের উল্লেখও এর প্রাচীনতার অর্থই বহন করে।

[বঙ্গীয় শব্দকোষ (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) পৃ. ৭১৫, খণ্ড. ১; War in Ancient India (Dikshitar) p. 148; Robert Bar, The Handbook of Tibetan Buddhist Symbol, Chicago: Serindia Publications, 2003, p. 141]

খট্বাঙ্গদ *[দ্র. খট্বাঙ্গ, দিলীপ$_2$]*

খট্বাঙ্গেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। খট্বাঙ্গ শিবের অস্ত্রবিশেষের নাম —তারই নামানুসারে এই তীর্থের নামকরণ। এটি সর্বসিদ্ধি ফলপ্রদ। *[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচন কাণ্ড) পৃ. ৫৬]*

খড়্গ$_1$ স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচর, একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৬৭; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

খড়্গ$_2$ প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত অন্যতম যুদ্ধাস্ত্র।

[দ্র. অসি]

খড়্গী শিব-মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের একটি। মহাদেবের যে দশভুজ মূর্তি কল্পনা করা হয়, সেখানে তাঁর দশটি হাত নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। দশভুজ মহাদেব এক হাতে খড়্গ ধারণ করেন বলেই তাঁকে খড়্গী বলা হয়। এইভাবে তাঁর অস্ত্রের মধ্যে নারায়ণাস্ত্রের শক্তিও আরোপিত হয়। *[মহা (k) ১৩.১৭.৪৩; (হরি) ১৩.১৬.৪৩]*

খণ্ড$_1$ একজন দানব। বিরোচনের পুত্রদের মধ্যে জম্ভ একজন। খণ্ড, জম্ভের পুত্রদের মধ্যে অন্যতম।

[বায়ু পু. ৬৭.৭৮]

খণ্ড$_2$ একজন পিশাচ। অজ নামক পিশাচের ভ্রাতা খণ্ড। বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, খণ্ডের জন্তুধনা নামে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল।

[বায়ু পু. ৬৯.১২২-১২৪]

খণ্ড$_3$ বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, শুক্রাচার্যের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব যখন তাঁকে অজেয় এবং অবধ্য হওয়ার বর প্রদান করেন, তখন শুক্রাচার্য যেসব নামে মহাদেবের স্তুতি করেন, সেই নামগুলির একটি খণ্ড। *[বায়ু পু. ৯৭.১৮৪]*

খণ্ডপাণি কলিযুগে পুরুবংশীয় যেসব রাজা কৌশাম্বী নগরীতে রাজত্ব করেছিলেন, খণ্ডপাণি তাঁদের মধ্যে একজন। ইনি পুরুবংশীয় রাজা অহীনরের পুত্র এবং নিরমিত্র-র পিতা। *[বিষ্ণু পু. ৪.২১.৪]*

খনিত্র নাভাগের বংশধারায় প্রমতির পুত্র এবং চাক্ষুষের পিতা খনিত্র। বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, প্রজানির পুত্র খনিত্র এবং তাঁর ক্ষুপ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

বিষ্ণু পুরাণে প্রজানির পুত্র হিসেবে 'কনিত্র' এই নামটি উল্লিখিত হয়েছে এবং কনিত্র-র পুত্র হিসেবে ক্ষুপর নাম পাওয়া যায়।

[ভাগবত পু. ৯.২.২৪; বায়ু পু. ৮৬.৫; বিষ্ণু পু. ৪.১.১৬]

খনীনেত্র বৈবস্বত মনুর বংশধারায় বিবিংশর পুত্র খনীনেত্র। সুবর্চা নামে খনীনেত্রর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। খনীনেত্র অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা ছিলেন, সেই কারণে প্রজারা খনীনেত্রর অনুরক্ত ছিল না। তারা খনীনেত্রকে সিংহাসনচ্যুত করে খনীনেত্রর পুত্র সুবর্চাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

[মহা (k) ১৪.৪.৬-৯; (হরি) ১৪.৪.৬-৯]

□ ভাগবত পুরাণ অনুসারে নাভাগের বংশধারায় বিবিংশতির পুত্র রম্ভ। খনীনেত্র এই রম্ভের পুত্র এবং করন্ধমের পিতা।

বায়ু পুরাণে অবশ্য বলা হয়েছে যে, খনীনেত্র বিবিংশের পুত্র।

বিষ্ণু পুরাণে খনীনেত্রকে, বিবিংশর পুত্র বলা হলেও, তাঁর পুত্র হিসেবে অতি-বিভূতির নাম পাওয়া যায়। *[ভাগবত পু. ৯.২.২৫; বায়ু পু. ৮৬.৭; বিষ্ণু পু. ৪.১.১৬]*

□ মার্কণ্ডেয় পুরাণে অপর একটি কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। রাজা খনীনেত্র অপুত্রক ছিলেন। পুত্র লাভের জন্য তিনি একটি যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞের প্রয়োজনে তিনি বনে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন। যখন তিনি সেই বন থেকে অন্য একটি বনে মৃগয়া করতে যাচ্ছিলেন, তখন একটি হরিণ রাজার কাছে অনুরোধ করে বলে—তিনি যেন ওই হরিণকে বধ করে তার মাংস দিয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

হরিণের এই অনুরোধ শুনে খনীনেত্র তাকে তার স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে চাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। হরিণটি জানায় যে, সে অপুত্রক হওয়ায় জীবন তার কাছে অর্থহীন হয়ে উঠেছে। আর তাই সে প্রাণত্যাগ করতে ইচ্ছুক। হরিণটি খনীনেত্রকে বলে যে, আমাকে বিনাশ করে আমার মাংস দিয়ে আপনার যজ্ঞ সম্পাদন করুন, তাতে আপনার প্রয়োজনও মিটবে আর আমিও উপকৃত হব। এই সময়েই অপর একটি মৃগ রাজাকে বলল যে, এই অপুত্রক মৃগ দ্বারা আপনার যজ্ঞ সম্পন্ন হতে পারে না। আমার অনেকগুলি পুত্র-কন্যা বর্তমান। কিন্তু সবসময় তাদের চিন্তা আমার পক্ষে দুঃখদায়ক হয়ে ওঠায় আমি প্রাণত্যাগ করতে ইচ্ছুক। অতএব আপনি আমার দ্বারাই আপনার যজ্ঞ সম্পন্ন করুন। সপুত্রক হরিণ ও অপুত্রক হরিণ—এদের মধ্যে কে যজ্ঞের উপযুক্ত তা স্থির করতে না পেরে খনীনেত্র পশুবধ থেকে বিরত হলেন এবং তপস্যা দ্বারা পুত্রলাভ করবেন বলে স্থির করলেন।

খনীনেত্র দেবরাজ ইন্দ্রের তপস্যা করতে শুরু করলেন। ইন্দ্র, খনীনেত্রর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পুত্রপ্রাপ্তির বর প্রদান করলেন। দেবরাজের বরে খনীনেত্রর বলাশ্ব নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই বলাশ্ব পরবর্তীকালে করন্ধম নামেও খ্যাত হয়েছিলেন।

[মার্কণ্ডেয় পু. ১২০-১২১ অধ্যায়]

খর১ রামায়ণে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী ইনি রাক্ষসরাজ রাবণের মাসতুতো ভাই। তবে মহাভারত মতে তিনি রাবণের বৈমাত্রেয় ভাই। বিশ্রবার পত্নী রাকার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। আবার ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এবং বায়ু পুরাণ মতে খর বিশ্রবার পত্নী পুষ্পোৎকটার পুত্র। মহাভারতে বলা হয়েছে যে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের যজ্ঞ করার সময় খর ও শূর্পনখা তাঁদের সেবা করতেন। রামায়ণে অবশ্য একথা পাওয়া যায় না। ধনুর্যুদ্ধে খর বিশেষ পটু ছিলেন। রাবণের মন্ত্রীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এই খর। রাবণ যুদ্ধে গেলে খরও তাঁর সঙ্গী হতেন। রাবণ যখন দেবলোক জয় করেন তখন খর তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নেন।

[রামায়ণ ৭.২৯.৩৭; ১.১৭.২৩; ৭.৩২.৩০; মহা (k) ৩.২৭৫.৮; ৩. ২৭৫.১৯; ৩.২৭৫.১২; (হরি) ৩.২২৯.১২; ৩.২২৯.১৯; ৩.২২৯.১২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.৫৫; বায়ু পু. ৭০.৪৯]

□ রাবণের নির্দেশে তিনি দণ্ডকারণ্যে গিয়ে রাজত্ব করতে থাকেন। রাবণ তাঁর সদ্য-বিধবা বোন শূর্পনখাকে খরের অভিভাবকত্বে দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দেন। সেই সময় দণ্ডকারণ্যে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে বাস করছিলেন। একদিন শূর্পনখা বনে ঘুরতে ঘুরতে রামের আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হন। রামকে দেখে মুগ্ধ শূর্পনখা রামকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে রাম রাজি হলেন না। তখন শূর্পনখা সীতাকে বধ করার চেষ্টা করলে লক্ষ্মণ তার নাক-কান কেটে দিলেন। শূর্পনখা কাঁদতে কাঁদতে খরের কাছে গিয়ে রাম-লক্ষ্মণের কথা বললেন আর বললেন—তুমি ওদের শাস্তি দাও। ক্রুদ্ধ খর তখনই চোদ্দোজন রাক্ষসকে রাম-লক্ষ্মণকে বধ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু রামের হাতে তারা নিহত হল। শূর্পনখার কাছে তাদের মৃত্যুর খবর শুনে খর নিজেই চোদ্দ হাজার সৈন্য নিয়ে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলল। তাঁকে বেষ্টন করে চললেন শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্মুক, মেঘমালী, মহামালী, সর্পাস্য ও রুধিরাশন—এই বারোজন বীর যোদ্ধা। মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথী, ত্রিশিরা প্রমুখ চলল খরের পিছন পিছন।

[রামায়ণ ৩.১৯-২৩ তম সর্গ; মহা (k) ৩.২৭৭.৪২; (হরি) ৩.২৩১.৪২]

□ খর রাক্ষসসৈন্য নিয়ে রামের আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলে রামের সঙ্গে রাক্ষসবাহিনীর যুদ্ধ শুরু হল। খরের সৈন্যরা সকলেই রামের হাতে নিহত হল। এমনকী দূষণ, ত্রিশিরা সহ খরের বারোজন সেনাপতিও রামের হাতে নিহত হল। সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতিদের যুদ্ধে নিহত দেখে ভীত হলেও খর কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালালেন

না। রামের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর রথের চারটি ঘোড়া এবং সারথিকেও রাম একে একে বধ করলেন। শেষে ভীষণ যুদ্ধের পর খর রামের হাতে নিহত হলেন।

[রামায়ণ ৩.২৫-২৯তম সর্গ; ৩.৩০.১-৮; ১.১.৪৭; বিষ্ণু পু. ৪.৪.৪৫; ভাগবত পু. ৯.১০.৯; বায়ু পু. ৫০.২৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.২০.২৮; মহা (k) ৩.২৭৭.৪৩-৪৪; (হরি) ৩.২৩১.৪৩-৪৪]

খর২ রাক্ষসরাজ রাবণের অনুচর যোদ্ধাদের মধ্যে যে যে রাক্ষস ছিল তাদের মধ্যে একজন। তবে ইনি রাবণের জ্ঞাতি ভাই খর নন।

[মহা (k) ৩.২৮৫.২; (হরি) ৩.২৩৯.২]

খর৩ একজন দানব। ভাগবত পুরাণ অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খর-দানবকে বধ করেন।

[ভাগবত পু. ২.৭.৩৪]

খর৪ অশ্বতর জাতীয় জীব। কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে তাম্রার গর্ভজাত কন্যাদের মধ্যে সুগ্রীবী অন্যতম। এই সুগ্রীবীর গর্ভে অশ্ব, খর প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করে। *[মৎস্য পু. ৬.৩৩]*

খর৫ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে অনায়ুষার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে বিজর অন্যতম। বিজর-র পুত্রদের মধ্যে খর একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.৩৩]

খরপথ একটি প্রাচীন জনপদ। পুরাণে খরপথকে পূর্বদিকের দেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গঙ্গার নলিনী নামে ধারাটি খরপথের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। পাঠভেদে কোথাও কোথাও খারপথ নামটিও পাওয়া যায়।

[মৎস্য পু. ১২১.৫৬; বায়ু পু. ৪৭.৫৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৫৭]

□ খরপথের আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা খুবই কঠিন। তবে পণ্ডিত D.C. Sircar খরপথ দেশটি বর্তমান মালয় উপদ্বীপের নিকটে অবস্থিত ক্রাইস্থমুস্ (Kra Isthmus) খাঁড়ি সংলগ্ন ছিল বলে ধারণা করেছেন। *[GAMI (Sircar) p. 72]*

খরবক্ত্র *[দ্র. শাকবক্ত্র]*

খরবাচ পুরাণে বলা হয়েছে যে, অত্রিমুনির প্রবরভুক্ত যে ঋষিবংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, খরবাচ সেই প্রবরের অন্যতম। অত্রি মুনি থেকে বংশ বা শিষ্যপরম্পরায় এঁরাও আত্রেয় বলে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ১৯৮.৫]*

খররোমা কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত একজন নাগ। *[বায়ু পু. ৬৯.৭৪]*

খর্ব সংখ্যা গণনার অন্যতম একক। সহস্র কোটিতে হয় এক খর্ব। *[দ্র. সংখ্যা]*

[বায়ু পু. ১০১.৯৬]

খর্বট প্রাচীন যুগে প্রচলিত একটি আঞ্চলিক ভূমি-ভাগ হল খর্বট।

পুরাণগুলিতে বিভিন্ন বর্ণনায় খর্বট শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। যেমন পুরুরবা যখন উর্বশীকে সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেখানে পুরাণকার লিখছেন—

খেটখর্বটবাটীষু নগরে নগরে তথা
পপ্রচ্ছ সকলান্ সত্ত্বান্ বিষীদন্নিদমব্রবীৎ॥

অর্থাৎ খেট, খর্বট, নগরে নগরে তিনি উর্বশীর অন্বেষণ করছেন।

ভাগবত পুরাণের শ্রীধরস্বামীকৃত টীকায় খর্বটকে উল্লেখ করা হয়েছে গিরিতটবর্তী গ্রাম হিসেবে—

খর্বটাঃ গিরিতটগ্রামাঃ।

পর্বতের প্রান্তভাগে নদীর কাছাকাছি অবস্থিত গ্রামাঞ্চল। পর্বতের পাদদেশের এই অঞ্চলগুলি সাধারণত বনাঞ্চল। শ্রীধরস্বামী একটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধার করে লিখেছেন—নদীতট ও পর্বতের পাদদেশের মিশ্রণের পাশাপাশি খর্বটের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, এটি নগরের বাইরে অবস্থিত গ্রাম। খর্বটের যেখানে সমাপ্তি সেই সীমারেখা থেকেই মূল জনপদ বা নগরের শুরু—

একতো যত্র তু গ্রামোনগরং চৈকতঃ স্থিতম্।
মিশ্রাং তু খর্বটাং নাম নদীগিরিসমাগ্রয়ম্॥

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে খর্বট মূলত নিষাদ প্রভৃতি অন্ত্যজদের গ্রাম ছিল। মূল জনপদের বাইরেই যাদের বাসস্থান হত। সেই ভাবনা থেকেই বীররাঘবের টীকায় স্পষ্টভাবেই খর্বটকে নিষাদদের গ্রাম বলা হয়েছে—

খর্বটান্ নিষাদাদিগ্রামান্।

[মহা (k) ৪.২৫.১২; (হরি) ৪.২৩.১২; মৎস্য পু. ২৬০.৪৭; ২৮৩.৩; বায়ু পু. ৯১.৩০; বিষ্ণু পু. ৫.২.১৪; ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ১.৬.১১; Devendra kumar & Rajaram Patil : Cultural History from the Vāya Purāṇa p. 78, 202]

খলপান অনুবংশীয় রাজা বলির পুত্রদের মধ্যে অঙ্গ একজন। খলপান, অঙ্গের পুত্র এবং দিবিরথের পিতা। *[ভাগবত পু. ৯.২৩.৬]*

খলা পুরুবংশীয় রাজা ভদ্রাশ্বের ঔরসে (পাঠান্তরে রৌদ্রাশ্বের ঔরসে) অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভজাত কন্যাদের মধ্যে খলা একজন।

[বায়ু পু. ৭০.৬৯; ৯৯.১২৫]

খলি মহাভারতের অনুশাসনপর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে যে উপদেশমূলক আখ্যানগুলি শুনিয়েছেন তার মধ্যে বায়ু ও কার্তবীর্য্যার্জুনের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিবাদের একটি উপাখ্যানও রয়েছে। বায়ু ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বশিষ্ঠ সম্পর্কে বলেন—একসময় দেবতারা মানস সরোবরতটে বশিষ্ঠের উদ্দেশে এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। দীর্ঘদিন যজ্ঞ করতে করতে তাঁরা দুর্বল ও কৃশ হয়ে যান। এমন সময় খলি নামক দানবগণ তাদের বধ করতে উদ্যত হয়।

হন্তুমৈচ্ছন্ত শৈলাভাঃ খলিনো নাম দানবাঃ॥

যজ্ঞস্থলের অনতিদূরে একটি সরোবর ছিল। এই খলি দানবগণকে ব্রহ্মা বর দিয়েছিলেন—এই সরোবরে স্নান করলেই তারা আবার জীবিত হয়ে উঠবে। ফলত দেবতারা তাদের পরাস্ত করলেও তারা পুনরায় প্রাণ ফিরে পেতে থাকে। দেবতারা এমন অপরাজেয় দানবদের থেকে নিস্তার পেতে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হলেন। ইন্দ্রও দুর্দম এই খলি দানবদের দ্বারা পরাজিত হয়ে শেষপর্যন্ত বশিষ্ঠের সাহায্য চাইলেন। বশিষ্ঠ নিজ তেজে সমস্ত দানবদের দগ্ধ করলেন এবং দেবতাদের বিপদমুক্ত করলেন। মানস সরোবরের তীরে যেখানে 'খলি' দানবগণ বশিষ্ঠের হাতে নিহত হয়েছিল, সেই জায়গাটি খলিন নামে বিখ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৫৫.১৫-২৪;
(হরি) ১৩.১৩৩.১৫-২৪]

খলিন *[দ্র. খলি]*

খলীয়ান কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্যতম ঋষি শাকল্য। শাকল্যের শিষ্যদের মধ্যে খলীয়ান একজন। বায়ু পুরাণে অবশ্য খলীয়ানের পরিবর্তে খালীয় নাম পাওয়া যায়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.২; বায়ু পু. ৬০.৬৪]

খলু মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত জম্বূখণ্ড বিনির্মাণ পর্বে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে ভারতবর্ষের বিবরণ দিতে গিয়ে যে নদীগুলির নাম উল্লেখ করেছেন, খলু তার মধ্যে উল্লিখিত একটি নদী। খলু নদীর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

[মহা (k) ৬.৯.২৮; (হরি) ৬.৯.২৮]

খল্যায়ন কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা পরাশর মুনির নামে কয়েকটি বংশধারা প্রচলিত ছিল। সেই বংশধারায় অনেকগুলি সন্তানকে নিয়ে এক-একটি বর্গ রচিত হয়েছিল। যাঁদের গৌর-পরাশর, নীল-পরাশর, কৃষ্ণ-পরাশর, শ্বেত-পরাশর, শ্যাম-পরাশর এবং ধূম্র-পরাশর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরাশরের যে সন্তানেরা ধূম্র-পরাশর নামে অভিহিত তাঁদের মধ্যে খল্যায়ন অন্যতম।

[মৎস্য পু. ২০১.৩৮]

খশ ভারতের একটি প্রাচীন অনার্য জনজাতি। নামের ক্ষেত্রে অনেক সময় খশের পরিবর্তে 'খস' বানানটিও ব্যাবহৃত হয়। মহর্ষি বশিষ্ঠের অলৌকিক ক্ষমতাশালী কামধেনু নন্দিনীকে বিশ্বামিত্রের সৈন্যরা বলপূর্বক হরণ করতে আসেন। তাঁদের বলপ্রয়োগের অত্যাচারে একসময় নন্দিনীর দেহ থেকে বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ নির্গত হয়। সেই বর্জ্যপদার্থ থেকে বহু অনার্য বর্বর জনজাতির সৃষ্টি হয়েছিল। এ সময় নন্দিনীর দেহের পার্শ্বদেশ থেকে খশ জনজাতির উৎপত্তি ঘটেছিল।

বৈদিক সংস্কারযুক্ত আর্যরা 'খশ'দের হীন জনজাতি হিসেবেই দেখতেন।

[মহা (k) ১.১৭৫.৩৭; ৮.৪৪.৪৭;
(হরি) ১.১৬৮.৩৮; ৮.৩৪.১০৬; বায়ু পু. ৪৫.১৩৫]

□ মহাভারতের বর্ণনানুযায়ী সুমেরু ও মন্দর পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে শৈলোদা নদীর তট বরাবর বাঁশের বনে খশ জনজাতির বসবাস—

মেরুমন্দরয়োর্মধ্যে শৈলোদামভিতো নদীম্।
যে তে কীচকবেণূনাং ছায়াং রম্যামুপাসতে॥
খসা একাসনা হ্যর্হাঃ প্রদরা দীর্ঘবেণবঃ।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে খশ জনজাতির প্রতিনিধিরা তাঁকে দ্রোণ বা দ্রোণকলসে (কুনকের মত একটি পাত্র) মেপে রাশি রাশি পিপীলক স্বর্ণ উপহার দেন।

[মহা (k) ২.৫২.২-৪; (হরি) ২.৫০.২-৪]

□ পণ্ডিতরা প্রাচীন শৈলোদা নদী বলতে আধুনিক খোটান বা হোটান নদীকে বোঝান। কুনলুন (Kunlun) পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন

হয়ে খোটান নদীটি উত্তরে তাকলামাকান মরু অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। চীনা ভাষায় খোটান বা হোটান নদীর আরেক নাম উতিয়ান (Yutian)।

পণ্ডিত Moti Chandra -এর মতে, খশ জনজাতির আদিবাসস্থান মধ্য এশিয়ার বর্তমান কাশগড় (Kashgar) অঞ্চল। এই কাশগড় আসলে চীনের মধ্যভাগে অবস্থিত একটি মরূদ্যান। উতিয়ান বা শৈলোদা নদী কাশগড়ের নিকটবর্তী অঞ্চল দিয়েই প্রবাহিত। সুতরাং মহাভারতের সভাপর্বে বর্ণিত শৈলোদা নদীর তীরবর্তী স্থান বরাবর খশ জনজাতির পূর্ববসতির বিষয়ে ঋজু যৌক্তিকতা পাওয়া যায়।

খশ মূলতঃ যুদ্ধবাজ একটি জনজাতি। মধ্য এশিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে পরবর্তীকালে এরা পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণদিকে দেশান্তরিত (Migrate) হয়। সেই কারণেই পরবর্তীকালে এদের ভারতীয় উপমহাদেশের হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলা, পাকিস্তান (গিলগিট বালতিস্তান), নেপাল ও ভুটানে দেখা যায়।

খশ আসলে ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত একটি জনজাতি। প্রাচীন তুর্কিস্তান অঞ্চলেও খশদের বসতি ছিল। মধ্য এশিয়া থেকে হয়তো বা খশ জনজাতিটি পশ্চিম দিকেও migrate করে। সেই কারণেই বর্তমান তুর্কি এবং তাজিকিস্তানেও তাদের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে অনেকে উত্তর-পশ্চিম চীনের তারিম (Tarim) নদী উপত্যকা থেকেও খশ জনজাতির উদ্ভবের কথা বলেন। পণ্ডিতদের একাংশ আবার খশ ও খাশীরকে অভিন্ন জনজাতি বলে মনে করেন।

[GESMUP (Moti Chandra) p. 132; R.N. Saksena; Social Economy of a Polyandrous People; London; Asia Publishing House; 1962, p. 10; Journal of the Asiatis Society of Bengal, Vol 35, Part 2; 1867; p. 146; পঠিতব্য : Ed. N.S. Bisth and T.S. Bankoti; Ethnography of the Himalayan Tribes; Delhi; 2004; D.P. Saklani; Ancient Communities of the Himalaya; New Delhi; Indus Publishing Co.; 1998]

□ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে খশেরা কৌরবপক্ষে যোগদান করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে একাধিকবার খশ যোদ্ধাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

[মহা (k) ৫.১৬১.২১; ৮.২০.১০; (হরি) ৫.১৫০.২১; ৮.১৫.১০]

□ যবনরাজ কালযবন জরাসন্ধ ও শাল্বরাজের প্ররোচনায় একবার বাসুদেব কৃষ্ণকে আক্রমণ করেছিলেন। যবনরাজ এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কৃষ্ণের অনুসন্ধানে মথুরায় আসেন। তাঁর সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন দেশের ও সম্প্রদায়ের সৈন্য ছিল। এঁদের মধ্যে খশেরাও ছিলেন, যা থেকে মনে হয় খশ জনজাতির লোকেরা পেশাগতভাবে যোদ্ধা (Mercenary) ছিলেন।

[মহা (k) ৭.১১.১৮; (হরি) ৭.৯.১৮]

□ কলিযুগের সন্ধ্যাকালে প্রমিতি নামে এক ম্লেচ্ছ দমনকারী রাজার আবির্ভাবের কথা পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রমিতি খশ জনজাতিকেও দমন করবেন বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

ভগবান বিষ্ণু কলিযুগে কল্কীরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে অন্যান্য অনার্য জনজাতির সঙ্গে খশদেরও দমন করবেন বলে কথিত হয়েছে।

[বায়ু পু. ৫৮.৮৩, ৯৮.১০৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১৪৫]

□ পুরাণে খশ জনজাতিকে রাজা বেণের উত্তরপুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এঁরা বিন্ধ্যপর্বতবাসী একথাও পুরাণে পাওয়া যায়।

[বায়ু পু. ৬২.১২৪]

□ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা হরিশচন্দ্রের পরম্পরায় রুরুকের পুত্র বাহু। এই বাহু একসময় এতই অত্যাচারী হয়ে পড়েন যে, তাঁর অনার্য প্রজারা তাঁকে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন। বাহুর অনার্য প্রজাদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ ছিল খশ জনজাতির মানুষ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১২০]

□ গঙ্গা নদী খশ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একথা পুরাণে বলা হয়েছে। খশেরা উৎপত্তিগতভাবে মধ্য এশিয়ার মানুষ হলেও পরবর্তীকালে পৃথিবীর নানাপ্রান্তে এদের migration -র কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে গঙ্গানদীর তীরবর্তী কোনো অঞ্চলে খশদের দেখা পাওয়া অদ্ভুত শোনালেও নেহাত অবাস্তব বলা যায় না। *[বায়ু পু. ৪৭.৪৭]*

খশা দক্ষ প্রজাপতির কন্যা এবং কশ্যপের পত্নী। কশ্যপের ঔরসে খশার গর্ভে দুটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই দুই পুত্রকে পুরাণে নরখাদক রাক্ষস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এদের আকৃতিও বর্ণনা করা হয়েছে ভয়ঙ্কর রূপে। জ্যেষ্ঠ পুত্রটির জন্মক্ষণ রাত্রি তাই সে লোহিত বর্ণের এবং চতুর্বাহু, চতুষ্পদ বিশিষ্ট। কনিষ্ঠ পুত্রটির আকৃতিও বীভৎস, তার ত্রিপদ, ত্রিহস্ত এবং শঙ্কুকর্ণ।

দ্বিতীয় এই পুত্রটির জন্মক্ষণ উষা। খশার পুত্রদ্বয় প্রসূত হওয়া মাত্রই তারা পরিণত দেহ লাভ করে এবং ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হয়ে জ্যেষ্ঠপুত্র মাতাকেই ভক্ষণ করতে উদ্যত হয়। কনিষ্ঠজন তখন জ্যেষ্ঠকে নিষেধ করে বললেন—ইনি আমাদের মাতা, তাঁকে রক্ষা কর। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হন পিতা কশ্যপ এবং পুত্রদের এমন আচরণ দেখে তিনি তাদের তিরস্কার করলেন। পিতার কাছে তিরস্কৃত হয়ে দুই ভাই দ্রুত আবার মায়াবলে মায়ের কোলে ফিরে এল। মহর্ষি কশ্যপ নিজের পত্নীকে বললেন—তোমার দুই পুত্র কেমন ব্যবহার করেছে বা কী উক্তি করেছে তা আমাকে বল। জেনে রেখো, পুত্র মাতুলালয়ের এবং কন্যা পিতার গুণ প্রাপ্ত হয়। নিজের অন্যান্য পুত্র ও পত্নীদের স্বভাবের সমধর্মিতা উল্লেখ করে তিনি বলেন—তোমার পুত্রদের আচরণ দেখে অনুমান করা যায় তুমিও ক্রোধশীলা। এরপর ঋষি পুত্রদের সামবাক্যে উপদেশ দিলেন। মহর্ষি তাঁর পুত্রদের আচরণের ভিত্তিতে তাদের জাতি নির্দেশ করলেন। প্রথম পুত্র মাতাকে ভক্ষণ করতে চেয়েছিল বলে সে হল যক্ষঃ। 'যক্ষ্' ধাতুর অর্থ ভক্ষণ বা কর্ষণ করা। এবং কনিষ্ঠ পুত্র বলেছিল 'রক্ষেমাং মাতরং' তাই 'রক্ষ্' ধাতু, যার অর্থ পালন করা, তার থেকে সে হল রক্ষঃ। প্রজাপতি কশ্যপ এরপর খশার প্রতি পুত্রদের এমন আচরণ সম্পর্কে অবগত হয়ে এবং তাদের ক্ষুধার্ত দেখে রক্ষ ও যক্ষের আহার নির্দিষ্ট করে দিলেন। তিনি বর দিলেন—রাত্রিকালে সমস্ত বস্তুই তোমাদের হস্তগত হবে এবং এসময় তোমাদের বলবৃদ্ধিও হবে। রাত্রিকালে তোমরা আহার বিহার করবে ও দিবাভাগে নিদ্রা যাবে। খশার পুত্র যক্ষ অজ ও খণ্ড নামক পিশাচদের দুই কন্যা ব্রহ্মধনা ও জন্তুধনাকে বিবাহ করেন।

পুরাণে খশার আরও কয়েকজন মায়াবী ও ইচ্ছারূপধারী পুত্রদের নাম পাওয়া যায়। যেমন—লালবি, কুথন, ভীম, সুমালী, মধু, বিস্ফুর্জিত, বিদ্যুজ্জিহ্ব, মাতঙ্গ, ধূম্রিত, চন্দ্রার্ক, সুকর, বুধ্ন, কপিলোম, প্রহাসক, ক্রীড়, পরশুনাভ, চক্রাক্ষ, নিশাচর, ত্রিশিরা, শতদংষ্ট্র, তুণ্ডকেশ, অকম্পন, দুর্মুখ, শিলোমুখ ইত্যাদি।

খশার সাতটি কন্যার নামও উল্লেখ করেছেন পুরাণকার—তাঁরা হলেন—আলম্বা, উৎকোচা, কৃষ্ণা, নির্ঋতা, কপিলা, শিবা, কেশিনী ও মহাভাগা। এঁরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন রাক্ষসকুলের জন্মদাত্রী।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. ২.৩.৫৬; ২.৭.৩৭, ১৩২-৪২, ৪৬৭;
বায়ু পু. ৬৯.৭৪-১২৬, ১৬৪, ১৭০-১৭২]

খসৃম দানবরাজ বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে খসৃম একজন।

[বিষ্ণু পু. ১.২১.১১]

খাণ্ডব ভৃগুর বংশ পরম্পরায় একজন বংশপ্রবর্তক ঋষি হলেন খাণ্ডব। *[মৎস্য পু. ১৯৫.৪০]*

খাণ্ডবপ্রস্থ যমুনা নদীর তীরবর্তী একটি অরণ্যভূমি। পরবর্তীকালে হস্তিনাপুরের অদূরে অবস্থিত খাণ্ডববন বা খাণ্ডবপ্রস্থেই পাণ্ডবদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী স্থাপিত হয়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মতো প্রাচীন গ্রন্থে খাণ্ডববনকে কুরুক্ষেত্রের একটি বেদি বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

তেষাং কুরুক্ষেত্রং বেদিরাসীৎ।
তস্যৈ খাণ্ডবো দক্ষিণার্ধ আসীৎ।

[তৈত্তিরীয় আরণ্যক (আনন্দাশ্রম) ৫.১.১, পৃ. ৩৬৩;
মহা (k) ১.১.১৫২; ১.২.৮৮;
(হরি) ১.১.১১৩; ১.২.৮৮; ভাগবত পু. ১.১৫.৮]

□ খাণ্ডববন দহনের কাহিনী মহাভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তবে সে কাহিনীতে প্রবেশ করার পূর্বে পাণ্ডবদের খাণ্ডবপ্রস্থে যাওয়ার কার্যকারণ বর্ণনা করা প্রয়োজন। বারণাবতের জতুগৃহ থেকে প্রাণরক্ষা করে পাণ্ডবরা পৌঁছালেন পঞ্চালদেশে। সেখানে পঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করলেন তাঁরা। শক্তিশালী পঞ্চালদের সঙ্গে পাণ্ডবদের আত্মীয়তা, যদু-বৃষ্ণিদের সমর্থন এবং বারণাবত কাণ্ডে দুর্যোধনের ভূমিকা নিয়ে জনমানসে প্রতিক্রিয়া রোধ করার জন্য ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে ফিরে আসতে আহ্বান জানান। তারপর কিছুদিন স্থিত হতেই তিনি পাণ্ডবদের বললেন, এই রাজ্যটাকে

বাড়িয়েছিলেন পাণ্ডু, সে-রাজ্য পালনও করেছেন তিনি বহুদিন—

পাণ্ডুনা বর্ধিতং রাজ্যং পাণ্ডুনা পালিতং জগৎ।

তিনি যে বিরাট কাজটা করেছিলেন, সেটা তোমাদেরও করতে হবে। এতদিনে এটা সবারই বোঝা হয়ে গিয়েছে যে, আমার ছেলেদের কিছু দুর্বুদ্ধি আছে, তারা দর্প-অহংকারে মত্ত, আমার শাসন তারা মানে না, আমার সব কথা তারা শুনবেও না—

শাসনং ন করিষ্যন্তি মম নিত্যং যুধিষ্ঠির।

যারা এইরকম নিজের স্বার্থ নিয়ে চলছে, নিজের অহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, আমি চাইছি—তাদের সঙ্গে তোমাদের যেন আর বিবাদ-বিসংবাদ না হয়। তাই বলছিলাম তোমরা হস্তিনাপুরে না থেকে, একটু সরে গিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়ে একটা রাজ্য তৈরি করো—

পুনর্নো বিগ্রহো মা ভূত্ খাণ্ডবপ্রস্থম্ আবিশ।

তোমরা সেখানে থাকলে এমন কেউ নেই যে তোমাদের অতিক্রম করে চলবে। আর তোমাদের অর্জুন তো আছেই, সে সব দিক থেকে রক্ষা করবে তোমাদের। আমি চাই—তোমরা অর্ধেক রাজ্য লাভ করো এইভাবে এবং খাণ্ডবপ্রস্থে যাও—

অর্ধংরাজ্যস্য সম্প্রাপ্য খাণ্ডবপ্রস্থমাবিশ।

আসলে পাণ্ডবদের খাণ্ডবপ্রস্থে পাঠিয়ে দেবার পিছনে ধৃতরাষ্ট্রের গূঢ় অভিসন্ধি ছিল—হস্তিনাপুর থেকে তাঁদের দূরে রাখা যাতে দুর্যোধনের পক্ষে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরোহণের পথ নিষ্কণ্টক হয়।

ধৃতরাষ্ট্র নিজের ছেলেদের 'অহংকারী' ইত্যাদি শব্দে খানিক দূষণ করলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজেও কি একবারও চেয়েছিলেন যে, পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরে থাকুন? হস্তিনাপুরের মূল ভূখণ্ডকেও কিন্তু তিনি ভাগ হতে দিলেন না। অর্থাৎ পাণ্ডুর পরম্পরাপ্রাপ্ত ভূমিতে স্থান হল না পাণ্ডবদের। তিনি তাঁদের রাজ্য স্থাপন করতে বললেন খানিক দূরে—যদিও খাণ্ডবপ্রস্থ বিস্তীর্ণ কুরুরাজ্যেরই অন্তর্গত ভূমি। ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-বিদুররা খুশিই হলেন, কেননা তাঁরা এটা বুঝেছিলেন যে, এই প্রক্রিয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। হয়তো বা খুশি হলেন কৃষ্ণও।

প্রকৃতপক্ষে কুরুক্ষেত্রের অদূরে অবস্থিত খাণ্ডবপ্রস্থ বা খাণ্ডববন সেকালে কোনো বসবাসযোগ্য স্থান ছিল না। গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ এই অঞ্চলকে বাসযোগ্য করে তোলার পিছনে অর্জুন কর্তৃক খাণ্ডববন দহনের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আসলে খাণ্ডববন সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত না হলে সেখানে ইন্দ্রপ্রস্থের মতো মনোরম নগরী স্থাপন অসম্ভব ছিল।

পাণ্ডবরা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে সেই বনপথে চললেন নতুন ভূখণ্ডের দিকে। নতুন রাজ্যে পাণ্ডবদের সঙ্গে এসেছেন কৃষ্ণ। মথুরা থেকে দ্বারকায় গিয়ে রাজধানী প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞতা আছে কৃষ্ণের। অতএব সেখানে গিয়ে পবিত্র মঙ্গলজনক স্থানে ভূমিপূজা করে আবাস স্থাপন করেই নাগরিক ভাবনায় ভূখণ্ডটিকে মেপে নিলেন কৃষ্ণ এবং আশ্চর্য হল—এখানে আমরা দ্বৈপায়ন ব্যাসকে দেখতে পাচ্ছি কৃষ্ণের সঙ্গে—

নগরং মাপয়ামাসুর্দ্বৈপায়ন-পুরোগমাঃ।

আমরা আগে বলেছিলাম—মহাভারতের কবি এমন একজন মানুষ, যিনি তাঁর আপন সৃষ্ট মহাকাব্যের মধ্যে মাঝে-মাঝেই পদচারণা করেন—ঘটনা যা ঘটে চলেছে, সেখানে তিনি একজন অংশীদার বটে। আজ পাণ্ডুপুত্রদের নতুন রাজ্যস্থাপনের মুহূর্তে, ভূমি পরিমাপের সময়, তিনি উপস্থিত।

একটি রাষ্ট্রস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রধান প্রয়োজন তার সুরক্ষা-ব্যবস্থা। অতএব প্রথমেই লোকজন লাগিয়ে ভবিষ্যৎ নগরের চারপাশে পরিখা কাটার ব্যবস্থা হল এবং তৈরি করা হল সুউচ্চ প্রাচীর। তৈরি করা হল রাজোপযোগী অট্টালিকাও। তারপর অস্ত্রশালা, বড়-বড় রাস্তা এবং নানারকম বাড়ি। ব্রাহ্মণরা, বণিকরা, শিল্পীরা নিজ-নিজ বৃত্তি লাভের আশায় ভিড় জমাতে থাকলেন খাণ্ডবপ্রস্থে। খাণ্ডবপ্রস্থ মোটামুটি বাসযোগ্য হয়ে উঠতেই কৃষ্ণ-বলরাম পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্বারকায় চলে গেলেন। নতুন ভূখণ্ডে নতুন রাজ্যে পাণ্ডবরা নতুন জীবন আরম্ভ করলেন নববধূ দ্রৌপদীকে নিয়ে। *[দ্র. ইন্দ্রপ্রস্থ]*

[মহা (k) ১.২০৭.২৬-৫০; ২.১.১-২০; ৩.২৩৩.৫০; ৫.৯৫.৫৬-৫৭; (হরি) ১.২০০.৩৭-৬২; ২.১.১-২০; ৩.১৯৬.৪৮; ৫.৮৮.৫৬-৫৭]

☐ খাণ্ডববনে অর্থাৎ খাণ্ডবপ্রস্থে ইন্দ্রের সখা তক্ষকনাগ সপরিবারে বাস করতেন। সেকারণেই স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র খাণ্ডববনের রক্ষাকর্তা—

বসত্যত্র সখা তস্য তক্ষকঃ পন্নগঃ সদা।
সগণস্তৎকৃতে দাবং পরিরক্ষতি বজ্রভৃৎ॥

অগ্নিদেব বহুবার চেষ্টা করেও সেজন্য খাণ্ডববন দগ্ধ করতে ব্যর্থ হন। একবার কৃষ্ণ ও অর্জুন যমুনা তীরবর্তী অঞ্চলে বিহার করছিলেন। সে সময় এক বহুভোজী ব্রাহ্মণ রূপে অগ্নিদেব আবির্ভূত হয়ে তাঁদের কাছে একবার যথাহারের ব্যবস্থা করে তাঁকে তৃপ্ত করার অনুরোধ জানান—

ব্রাহ্মণো বহুভোক্তাস্মি ভুঞ্জে'পরিমিতং সদা।
ভিক্ষে বার্ষ্ণেয়পার্থৌ বামেকাং তৃপ্তিং প্রযচ্ছতম্॥

অগ্নির ইচ্ছা কৃষ্ণার্জুনের সাহায্যে ইন্দ্রকে পরাজিত করে তিনি খাণ্ডববন দহন করে তাঁর ক্ষুধা নিবারণ করবেন।

[মহা (k) ১.২২২.২০-৩৩; ১.২২৩.১-১১;
(হরি) ১.২১৫.১৯-৩৬; ১.২১৬.১-১১]

□ অগ্নির খাণ্ডববন দহনের ইচ্ছার পিছনেও একটি কাহিনী রয়েছে। পুরাকালে শ্বেতকি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একাধিক দীর্ঘ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। শ্বেতকি অনুষ্ঠিত দীর্ঘ যজ্ঞানুষ্ঠানে পুরোহিতরা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। যজ্ঞেয় আগুনের ধোঁয়ায় তাঁদের চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়। রোগগ্রস্ত পুরোহিতরা শ্বেতকির যজ্ঞ অসমাপ্ত রেখেই বিদায় নিলেন। এরপর রাজার আবার শতবর্ষব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান আয়োজনের ইচ্ছা কিন্তু পূর্ববর্তী পুরোহিতদের দুর্দশার কথা জানতে পেরে অন্য কেউ আর শ্বেতকির আয়োজিত যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে চাননি। এরপর ক্রুদ্ধ শ্বেতকি ব্রাহ্মণদের তিরস্কারবাক্য শুনে হিমালয় পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করেন। পরে ভগবান মহাদেবের বরে শ্বেতকি মহর্ষি দুর্বাসাকে যজ্ঞের যাজন কার্যের জন্য লাভ করেন। দুর্বাসার পৌরোহিত্যে শ্বেতকি তাঁর দীর্ঘকালীন বৃহৎ যজ্ঞ সুদীর্ঘকাল ধরে যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হল। তাতে আবার অন্য বিপদ দেখা দিল। প্রচুর ঘৃত পানের কারণে অগ্নিদেব অবশেষে অগ্নিমান্দ্যরোগে আক্রান্ত হন। প্রজাপতি ব্রহ্মার পরামর্শানুযায়ী অগ্নি তখন খাণ্ডববনে বসবাসকারী জীবজন্তুদের দগ্ধ করে তাঁদের মেদ ভক্ষণের মাধ্যমে রোগমুক্তির চেষ্টা করেন। কিন্তু অগ্নি যতই বন দগ্ধ করার চেষ্টা করেন, খাণ্ডববাসী প্রাণীদের চেষ্টায় আগুনের শিখা বারবার নির্বাপিত হয়। অবশেষে ব্রহ্মা এর প্রতিকার স্বরূপ নর-নারায়ণ ঋষির মর্ত্যে কৃষ্ণ ও অর্জুন রূপে আবির্ভাবের কথা অগ্নিকে জানান। এঁদের সহায়তায় অগ্নি অনায়াসে খাণ্ডববন দহন করতে সক্ষম হবেন বলে ব্রহ্মা অগ্নিকে জানান।

[মহা (k) ১.২২৩.১৭-৮৩; ১.২২৪.১-৯;
(হরি) ১.২১৬.১৭-৮৩; ১.২১৭.১-৯]

□ অগ্নি নিজের রোগ-দুর্ভোগের কথা জানালেন এবং রোগ নিরাময়ের জন্য খাণ্ডব বনকে দহন করার প্রস্তাব দিলে কৃষ্ণ এবং অর্জুন সম্মত হলেন। অর্জুন ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে তুল্যশক্তি হয়ে ওঠার জন্য নিজের এবং কৃষ্ণের জন্য উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রার্থনা করলেন। চাইলেন—একটি ধনুক, অক্ষয় বাণ, রথ ও অশ্ব। তাঁদের প্রার্থনায় সম্মত হয়ে অগ্নি বরুণদেবের কাছ থেকে অর্জুনের জন্য গাণ্ডীব ধনু এবং কৃষ্ণের জন্য সুদর্শন চক্র এবং কৌমোদকী গদা নিয়ে আসেন। দিব্য অশ্ব যোজিত রথও তাঁদের দান করা হল। সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে অর্জুন অগ্নিদেবকে বললেন খাণ্ডববন বেষ্টন করে জ্বলে উঠতে।

[মহা (k) ১.২২৪.১৫-২০; ১.২২৫.১-৩৩;
(হরি) ১.২১৭.১৫-২০; ১.২১৮.১-৩৩]

□ খাণ্ডবপ্রস্থ দহনের এক বিস্তারিত বর্ণনা মহাভারতের আদিপর্বে পাওয়া যায়। বনের চারিদিকে প্রজ্বলিত অগ্নি আর দুই পার্শ্বে অপেক্ষারত অর্জুন ও কৃষ্ণ। তাঁদের অস্ত্রের আঘাতে কারোর রক্ষা নেই। চারিদিকে ধোঁয়া আর ধোঁয়া। কৃষ্ণ আর অর্জুন যেন সাক্ষাৎ যমরাজ।

বন দহনের বর্ণনায় বারবার লক্ষণীয়ভাবে উঠে আসে নাগদের ধ্বংসের কথা। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, খাণ্ডব অরণ্য ইন্দ্রসখা তক্ষক নাগের বাসস্থান। তিনি সপরিবারে খাণ্ডব অরণ্যবাসী। এখানে আসলে বৃহত্তর অর্থে নাগ জনজাতির মানুষদের কথা বলা হচ্ছে বলে মনে হয়। ইতিপূর্বেও কৌরবদের সঙ্গে নাগ জনজাতির দ্বৈরথের কথা মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে। কৌরব রাজ্যের মূল ভূখণ্ড হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠার সময়েও সেখানকার নাগ জনজাতিকে উৎখাত করতে হয়েছিল এবং সেই নাগরা এতটাই বিখ্যাত ছিলেন যে, তাঁদের নামেই হস্তিনাপুরের নাম 'নাগসাহ্বয়'। নেহাত এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম 'হস্তী' বলে, নামটা হস্তিনাপুর, কিন্তু 'নাগ' মানে যেমন সাপ হয়, তেমনই হাতি-ও হয়। ফলত

সাপের 'টোটেম' ব্যবহার-করা নাগদের অভিধান ত্যাগ করে হস্তী রাজার নামে রাজধানীর প্রতিষ্ঠা হল, কিন্তু মহাভারতের কৃষ্ণবর্ণ কবি, হাজারবার হস্তিনাপুরের জায়গায় 'নাগপুর', 'নাগহ্বয়' শব্দগুলি ব্যবহার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন—এটা নাগদের জায়গা ছিল।

প্রশ্ন উঠেছে—খাণ্ডবপ্রস্থের নাগদের নিয়ে। খাণ্ডববন দহনে ক্রূরতা, নৃশংসতা যেভাবে প্রলয়ের চেহারা ধারণ করেছে, তাতে বন্য বৃক্ষ, বন্য পশুর সঙ্গে নাগ জনজাতিকেও পুড়িয়ে মারার প্রশ্ন উঠেছে, আমাদের বিশ্বাস, তাতে ধ্বংসের প্রকৃতিতে একটা মহাকাব্যিক অতিশায়ন থাকবে, এটাই খুব স্বাভাবিক। আর লৌকিকভাবে এটা বরং বিশ্বাসযোগ্য যে, এই বনদাহে অগ্নিদেবের ক্ষুধামান্দ্য কতটা প্রশমিত হল এটা আজকের দৃষ্টিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরঞ্চ পরিবেশের মমতা-পুষ্ট কবি জানেন যে, মহাকাব্যের দুই হিতবাদী নায়ক আপন স্বার্থে বনে আগুন ধরাচ্ছেন, এটা আমাদের আরণ্যক সংস্কৃতিতে গ্রহণযোগ্য নয়। সেই জন্যই বৈদিক অগ্নির আবির্ভাব। তিনি এখানে ধ্বংসের দায় নিজে গ্রহণ করছেন। অন্যদিকে একটি নতুন ভূমিখণ্ডের ওপর রাজত্বের অধিকার যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের কাছে, বৃহত্তর সামাজিক প্রয়োজন তর্কবহ হওয়ার ফলে 'পারমিসিব্‌ল অফেন্স' বলে যে-কথাটা নীতিশাস্ত্রের অঙ্গ হিসেবে আমরা জানি, তার পরিসর তৈরি হয় অর্জুনের ব্যবহারে।

লক্ষণীয়, বন দহনের মতো একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটল বটে, কিন্তু সেই আগুন থেকে বেঁচে গেলেন ছ-জন। প্রথম হচ্ছেন তক্ষক নাগ, যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের বন্ধু। তিনি এই দহনকালে খাণ্ডব বনে ছিলেনই না। দ্বিতীয় জন, তক্ষক নাগের ছেলে অশ্বসেন; ইন্দ্র নিজে এসে তাঁর দেবমায়া প্রয়োগ করে তাঁকে বাঁচালেন, যদিও এই ঘটনায় তাঁর মা মারা গিয়েছিলেন বলে ভবিষ্যতে অশ্বসেন শত্রুতা করবেন অর্জুনের সঙ্গে। আর বাঁচল চারটি পক্ষিশাবক—মহাভারতীয় রূপকে তারা মন্দপাল ঋষির চার পুত্রসন্তান। আর একজন অবশ্য আগেই অর্জুনের অভয় লাভ করেছিলেন, তিনি অসুরশিল্পী ময়দানব, মহাভারত জানিয়েছে, তিনি নাকি নমুচি দৈত্যের ভাই—

তং পার্থেনাভয়ং দত্তে নমুচের্ভ্রাতরং ময়ম্।

আমরা দেখলাম—খাণ্ডব দহন যতই প্রলয়ঙ্কর হোক, এবং যতই ইন্দ্রবিরুদ্ধ পৌরাণিক প্রতিক্রিয়া বলে চিহ্নিত হোক—ইন্দ্র যাঁকে রক্ষা করতে চাইছিলেন সেই তক্ষক নাগ তো অক্ষতই রয়ে গেলেন, আপন ভবনের বাইরে। আমরা মনে করি, খাণ্ডবপ্রস্থে পাণ্ডবদের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই নিজের সম্মান নিজে রক্ষা করে তক্ষক জনজাতির অধীশ্বর এই 'তথাকথিত নাগ-পুরুষ' খাণ্ডববন থেকে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন এবং তিনি নিজের রাজত্ব গড়ে তুলেছিলেন তক্ষশিলায়—তক্ষক এবং তক্ষশিলার নাম সাযুজ্য লক্ষণীয়। জনমেজয় কিন্তু সর্পযজ্ঞ করেও তক্ষক-কে মারতে পারেননি, অথচ তিনি তাঁর পিতৃহন্তা—রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়, তক্ষক-দংশনে এবং সেসময় নাকি খাণ্ডব-দহনের প্রতিশোধ নিয়েছেন তক্ষক।

দ্বিতীয়ত অশ্বসেন, তক্ষকের পুত্র। যিনি ভবিষ্যতে প্রবেশ করবেন কর্ণের তূণীরে—কর্ণের সে-বাণ, অর্জুনের প্রাণহরণ করার জন্য প্রয়োগ করা হবে এবং কৃষ্ণের রথ ভূপ্রোথিত করে বাণের গতি করে দিতে হবে অর্জুনকে বাঁচানোর জন্য। আর বাঁচলেন চার শার্ঙ্গক পক্ষী, অনুবাদকের ভাবনায় খঞ্জনপক্ষী, তাঁরা মন্দপাল ঋষির পক্ষী-পুত্র—পণ্ডিতদের গবেষণায় তাঁরা শীঘ্র প্রজননের প্রতীক। এসব ব্যাখ্যার পরেও বলি—বন-দাহন ঘটেছে রাজনৈতিক প্রয়োজনে, পরিষ্কার করা জমিতে শস্যের প্রয়োজনে, এবং সামাজিক উৎখাতের পর পুনর্বাসনের প্রয়োজনে। শেষের কথাটা আগে বলি—আমরা ইন্দ্রের সঙ্গে এত বিরুদ্ধতার কথা শুনলাম, কিন্তু এই খাণ্ডবপ্রস্থ শেষ পর্যন্ত ময়-দানবের মতো শিল্পী হাতে পড়ে পুনরায় ইন্দ্রপ্রস্থ-ই হবে; অর্থাৎ কিনা ইন্দ্র কিন্তু থেকেই গেলেন পাণ্ডব-রাজধানীর নামাঙ্কনে। খাণ্ডব দহনের শেষে ইন্দ্রকে দেবগণ-সহ অন্তরীক্ষলোক থেকে নেমে আসতে দেখলাম ভুঁয়ে। তিনি পুত্রের সঙ্গে সন্ধি করে গেলেন—

ততো'ন্তরীক্ষাদ্ ভগবান্ অবতীর্য্য পুরন্দরঃ।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বনভূমিকে বহু পরিশ্রমে ইন্দ্রপ্রস্থের চেহারা দেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে ময়দানবের বিশেষ ভূমিকা

ছিল। মহাভারতের আদিপর্বে ইন্দ্রপ্রস্থকে অমরাবতীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। খাণ্ডব দহনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পর ময়দানব অর্জুনের কাছে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কোনো মঙ্গলজনক কার্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অর্জুন তাঁকে কৃষ্ণের ইচ্ছা অনুরূপ কাজ করার কথা বলেন। আর কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই ময়দানব শেষপর্যন্ত নির্মাণ করেন ইন্দ্রপ্রস্থের অলৌকিক সভাভবন। ময়দানবের হাতেই খাণ্ডবপ্রস্থ শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রপ্রস্থে পরিণত হয়।

[মহা (k) ১.২২৬.১-২২; ১.২২৭.১-৫২; ১.২৩৪.৭-১৫; (হরি) ১.২১৯.১-২২; ১.২২০.১-৫২;১.২২৭.১-৫২; ভাগবত পু. ১০.৫৮.২৫-২৭]

□ উত্তর প্রদেশের মীরাটের উত্তরে অবস্থিত মুজফ্‌ফরনগর। পুরাকালে কুরুক্ষেত্রের একটি অংশও খাণ্ডব অরণ্যের অন্তর্গত ছিল। আধুনিক দিল্লী, যাকে অনেকেই প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ বলে ধারণা করেন, সেটি সেকালে খাণ্ডব বনের একটি অংশমাত্র ছিল। *[GDAMI (N.L. Dey) p. 99]*

খাণ্ডবায়ন পিতা জমদগ্নির মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করলেন। শেষমেশ পিতামহ ঋচীকের হস্তক্ষেপে বন্ধ হল এই বিনাশযজ্ঞ। অতঃপর পরশুরাম দেবরাজকে সন্তুষ্ট করতে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করলেন। যজ্ঞান্তে তিনি পুরোহিত কশ্যপকে তাঁর বিজিত সমগ্র ভূমিই দান করলেন—

স প্রদায় মহীং তস্মৈ কশ্যপায় মহাত্মনে।

পরশুরাম দৈর্ঘ্য-প্রস্থে চল্লিশ হাত ও উচ্চতায় ছাব্বিশ হাত বিস্তৃত একটি স্বর্ণবেদিও নির্মাণ করে কশ্যপকে দান করলেন। কশ্যপ তাঁর সহকারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সেই বেদি খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করে নিতে বললেন। স্বর্ণবেদি খণ্ড খণ্ড করে নিয়ে যাওয়ার দরুণই এই ব্রাহ্মণরা খাণ্ডবায়ন নামে পরিচিত হলেন।

[মহা (k) ৩.১১৭.১৩; (হরি) ৩.৯৮.১৩]

খাণ্ডিক্য নিমির বংশধারায় সীরধ্বজ জনকের পৌত্র ধর্মধ্বজের দুই পুত্র কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ। খাণ্ডিক্য-জনক, মিতধ্বজের পুত্র। খাণ্ডিক্যের সাথে কৃতধ্বজ পুত্র কেশীধ্বজের প্রায়শই যুদ্ধ লেগে থাকত। একসময় খাণ্ডিক্য কেশীধ্বজ কর্তৃক পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন। এরপর স্বল্প কয়েকজন মন্ত্রী-পার্ষদ নিয়ে এক দুর্গম অরণ্যে বাস করতে থাকেন। ইতিমধ্যে কেশীধ্বজের আয়োজন করা এক যজ্ঞের গাভী বাঘে হত্যা করল। তার প্রায়শ্চিত্ত বিধান জানতে কেশীধ্বজ খাণ্ডিক্যের কাছে যান। খাণ্ডিক্য পরকালের কথা ভেবে শত্রুকে কাছে পেয়েও পরাজিত করলেন না, বরং প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিলেন। এরপর কেশীধ্বজ খাণ্ডিক্যকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলে খাণ্ডিক্যের পার্ষদরা তাঁকে পরামর্শ দিল—আপনি আপনার রাজ্য চেয়ে নিন। কিন্তু খাণ্ডিক্য নশ্বর রাজত্ব না চেয়ে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ চেয়ে নিলেন মহাযোগের জ্ঞান। তিনি জানতে চাইলেন কোন কর্মে সমস্ত কষ্টের নিবৃত্তি হয়—

যদি চেদ্দীয়তে মহ্যং ভবতা গুরুনিষ্ক্রয়ঃ।
তৎ ক্লেশপ্রশমায়ালং যৎ কর্ম্ম তদুদীরয়॥

কেশীধ্বজের কাছে যোগ-জ্ঞান লাভ করে খাণ্ডিক্য, পুত্রকে নিজ সম্পত্তির ভার দিয়ে যোগসিদ্ধির জন্য অরণ্যযাত্রা করেন এবং পরমেশ্বরের সাধনায় শেষ জীবন কাটান।

[দ্র. কেশীধ্বজ]

[ভাগবত পু. ৯.১৩.২০-২১; বিষ্ণু পু. ৬.৬-৭ অধ্যায়; নারদ পু. (মহর্ষি) ১.৪৬.৩৮-৪০]

খাশীর উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি বর্বর ম্লেচ্ছ জনজাতি। এরা খাসিয়া বা খাসি নামেও পরিচিত।

[মহা (k) ৬.৯.৬৮; (হরি) ৬.৯.৬৮]

□ উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয়, অসম এবং বাংলাদেশের ভারত সংলগ্ন পার্বত্যভূমিতে বসবাসকারী একটি জনজাতি। উত্তর-পূর্ব ভারতে মূলতঃ এঁদের উপস্থিতির কারণেই একটি সম্পূর্ণ পার্বত্য অঞ্চল খাসি পাহাড় বলে পরিচিত। খাসি পাহাড় ছাড়াও এ অঞ্চলের গারো ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে খাশীর জনজাতির বাস চোখে পড়ে।

মহাভারতের মত প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ খাশীর জনজাতির প্রাচীনত্বের প্রমাণ বহন করে। পণ্ডিতদের মতে মূলতঃ শিকারী জনজাতি রূপেই খাশীরগণ পরিচিত ছিল। তবে প্রাচীন ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে বসবাস করার জন্য বর্বর, চীন ইত্যাদি বহির্দেশীয় জনজাতিগুলির সঙ্গে খাশীরদের যথেষ্ট আদান-প্রদান ছিল।

[GP Singh; Researches into the History and Civilization of the Kirātas; New Delhi; Gyan Publishing House; 2008; p. 127]

খিল মহাভারতে হরিবংশ পুরাণের নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে—'পুরাণং খিলসংজ্ঞিতম্।' 'খিল' শব্দের সাধারণ অর্থ যাই থাকুক তার একটি অর্থ হল শেষ বা অবশিষ্ট। লক্ষ্যণীয়, 'অখিল' বলতে নিখিল বা অশেষ কিছুকে বোঝায়। ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে—যে বৃক্ষগুলি এখনও অবশিষ্ট আছে সেগুলির মঙ্গলহোক—

খিলানাং শিবমস্তু বঃ। *[ভাগবত পু. ৬.৪.১৫]*

সেইদিক থেকে দেখলে মহাভারতের শেষাংশ হল হরিবংশ পুরাণ। কারণ মহাভারতের মধ্যেই বলা হচ্ছে যে—মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বের পর হরিবংশ পুরাণই তার শেষাংশ—

হরিবংশস্ততঃ পর্বঃ পুরাণং খিলসংজ্ঞিতম্।

মহাভারতে এই খিল শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন—ইতিহাস পুরাণ পাঠের সময় অন্য পুরাণ বা অন্যগ্রন্থ পাঠের যে প্রয়োজনীয় আকাঙ্ক্ষা থাকে—আমরা হয়তো এটাকে ইংরেজিতে advanced reading বা reference reading বলতে পারি—সেটাকেই 'খিল' বলা যেতে পারে। নীলকণ্ঠ বলেছেন—ঋগ্‌বেদের একটি শাখা পাঠের সময় শাখান্তরে স্থিত অন্যতর মন্ত্রপাঠের যে আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজনীয়তা থাকে তাকেই 'খিল' শব্দে সংজ্ঞিত করা যায়। যেমন ঋগ্‌বেদের ক্ষেত্রেও 'শ্রী' সূক্ত বা মেধা সূক্তের পাঠ ঋগ্‌বেদের সংহিতা পাঠের সময়েই করা হয় এবং তাকে খিলপাঠ বলা হয়। একইভাবে মহাভারতের ক্ষেত্রে উদাহরণ দিয়ে বলা যায়—কৃষ্ণ দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় প্রথম প্রবেশ করছেন। তাঁর পূর্বজীবন মহাভারতে অন্য কোথাও বলা নেই। কিন্তু পাণ্ডব কৌরবদের পূর্বজীবন সম্বন্ধে অবহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই আকাঙ্ক্ষা এবং প্রশ্ন তৈরি হয় যে, কৃষ্ণের পূর্বজীবনের অন্যান্য ঘটনাগুলি কী, খিল হরিবংশ আমাদের সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়।

সেই কারণেই মহাভারতের খিল-সংজ্ঞার প্রসঙ্গে এই কথাটি বলা হয়েছে যে, হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব শিশুকৃষ্ণের জীবনালোচন যেখানে কংসবধাদি ঘটনাগুলি আছে—

বিষ্ণুপর্ব শিশোশ্চর্যা বিষ্ণোঃ কংসবধস্তথা।

একটি প্রাচীন সংগ্রহ শ্লোকে বলা আছে যে, মহাভারত পুরোটা জানতে গেলে মহাভারতের অষ্টাদশপর্বের সঙ্গে খিলপর্ব অর্থাৎ হরিবংশ পুরাণও পড়তে হবে—

আদৌ সভারণ্য-বিরাট উদ্যমে
ভীষ্মে গুরৌ-সূর্যজ-শল্য-সুপ্তিকে।
স্ত্রী-শান্তি দানাশ্বমথাশ্রমস্থিতৌ
কৌসল্য-যান-দ্যুগমে খিলেষু চ॥

[মহা (k) ১.২.৮৩-৮৪; (হরি) ১.২.৮৪-৮৫]

খিলিখিলি মহর্ষি অত্রির বংশধারায় একজন বংশ প্রবর্তক ঋষি হলেন খিলিখিলি।

[মৎস্য পু. ১৯৪.২১]

খেট পুরাণগুলিতে উল্লিখিত রাষ্ট্রের বিবিধ আঞ্চলিক বিভাজনের মধ্যে খেট একটি।

গ্রামের থেকে অর্ধযোজন ও নগরের থেকে একযোজন (আধুনিক পরিমাপ অনুযায়ী প্রায় ১২ কিমি.) দূরে অবস্থিত একপ্রকার ক্ষুদ্র গ্রাম হল খেট। যার আয়তন নগরের অর্ধেক এবং গ্রামের চেয়ে ছোটো।

নগরাদর্ধবিষ্কম্ভং খেটং গ্রামং ততো বহিঃ॥
নগরাদ্‌যোজনং খেটং খেটাদ্‌গ্রামো'র্ধযোজনম্।

'খেট' এই শব্দটির মধ্যে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভাষার ছাপ রয়েছে। সংস্কৃত 'ক্ষেত্র' শব্দের সঙ্গেও এর ভাষাগত সাদৃশ্য আছে। এখনও 'খেত' শব্দটি সারা ভারতে প্রচলিত। সুতরাং শব্দটির মধ্যেই কৃষিকাজ বা কৃষিজমির অনুষঙ্গ পাওয়া যায়।

ভাগবত পুরাণের শ্রীধরস্বামী টীকায় 'খেট'কে কৃষকদের গ্রাম বলে উল্লেখ করেছেন—

খেটাঃ কর্ষকগ্রামাঃ। আর বীররাঘবকৃত টীকায় খেট মূলত কৃষিপ্রধান অঞ্চল বা গ্রাম—

খেটান্ কৃষীবলগ্রামান্।

পুরাণ ছাড়াও প্রাচীন জৈনগ্রন্থগুলিতে ও খেট এই আঞ্চলিক বিভাগটির উল্লেখ রয়েছে।

[মৎস্য পু. ২৮৩.৩;
বায়ু পু. ৮.৯৯, ১১৬; ৯১.৩০;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৭.৯৩, ১১১;
ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ১.৬.১১;
Devendra Kumar & Rajaram Patil : Cultural History from the Vāyu Prāṇa p. 78, 202]

খেটা অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। খেটা সেই মাতৃকাদের মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৭৯.১৭]*

খ্যাতি$_{১}$ রাজা উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবর বংশধারায় উল্মূকের ঔরসে পুষ্করিণীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে খ্যাতি একজন। *[ভাগবত পু. ৪.১৩.১৭]*

খ্যাতি$_{২}$ পুরাণ অনুসারে তামস মনুর পুত্রদের মধ্যে খ্যাতি একজন।

[ভাগবত পু. ৮.১.২৭; বায়ু পু. ৬২.৪৩;
বিষ্ণু পু. ৩.১.১৯;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৪৯]

খ্যাতি$_{৩}$ চাক্ষুষ মনুর ঔরসে নড্বলার গর্ভজাত পুত্র উরু। এই আগ্নেয়ীর গর্ভে ছয়টি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে খ্যাতি একজন। বিষ্ণু পুরাণে অবশ্য খ্যাতির পরিবর্তে 'স্বাতি' নামটি উল্লিখিত হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১০৮;
মৎস্য পু. ৪.৪৩; বিষ্ণু পু. ১.১৩.৭]

খ্যাতি$_{৪}$ প্রজাপতি কর্দমের কন্যা (বায়ু ও বিষ্ণু পুরাণ মতে দক্ষের কন্যা) এবং মহর্ষি ভৃগুর পত্নী খ্যাতি। ভৃগুর ঔরসে খ্যাতির ধাতৃ ও বিধাতৃ (ভাগবত পুরাণ মতে ধাতা ও বিধাতা) নামে দুই পুত্র এবং শ্রী নামে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

[ভাগবত পু. ৩.২৪.২৩; ৪.১.৪৩;
বায়ু পু. ১০.২৭, ৩০; ২৮.১-৩;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৯.৫২, ৫৪; ১.১১.১;
বিষ্ণু পু. ১.৭.২৫]

খ্যাতি$_{৫}$ পুরাণ অনুসারে ক্রৌঞ্চদ্বীপের সাতটি প্রধান নদীর মধ্যে খ্যাতি একটি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৯.৭৫;
বায়ু পু. ৪৯.৬৯; মৎস্য পু. ১২২.৮৮]

খ্যাতেয় কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা পরাশর মুনির নামে কয়েকটি বংশধারা প্রচলিত ছিল। সেই বংশধারায় অনেকগুলি সন্তানকে নিয়ে এক-একটি বর্গ রচিত হয়েছিল। যাঁদের গৌর-পরাশর, নীল-পরাশর, কৃষ্ণ-পরাশর, শ্বেত-পরাশর, শ্যাম-পরাশর এবং ধূম্র-পরাশর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরাশরের যে সন্তানেরা ধূম্র-পরাশর নামে অভিহিত তাঁদের মধ্যে খ্যাতেয় অন্যতম। *[মৎস্য পু. ২০১.৩৪]*

গ

গগনমূর্ধা প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভজাত দানব পুত্রদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.৬৫.২৪; (হরি) ১.৬০.২৪; বায়ু পু. ৬৮.১০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.১০]

□ মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে বলা হয়েছে যে, গগনমূর্ধা দ্বাপর যুগে কেকয়দেশের প্রধান পাঁচজন রাজার মধ্যে একজন রাজা হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.১০; (হরি) ১.৬২.১০]

গঙ্গা ভারতের মতো নদীমাতৃক দেশের কৃষি, সভ্যতা প্রভৃতি যে প্রধান নদীগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে প্রধানতম নদীটির নাম গঙ্গা। হিমালয় পর্বতের অন্তর্গত গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে গঙ্গানদী বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। গঙ্গার গতিপথ বা ভৌগোলিক অবস্থানের মতো বহুল প্রচলিত চর্চায় না গিয়ে আমরা মহাকাব্য-পুরাণে প্রাপ্ত গঙ্গার কাহিনীই আলোচনা করব।

ঋগ্‌বেদে গঙ্গানদীর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে দশম মণ্ডলে একবার মাত্র গঙ্গার নাম অন্যান্য নদীর সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে—

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি
শুতুদ্রি স্তোমং সচেতা পরুষ্ণ্যা।

[ঋগ্‌বেদ ১০.৭৫.৫]

ভাগবত পুরাণে গঙ্গার উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে—ভগবান বিষ্ণু বলির যজ্ঞক্ষেত্রে ত্রিবিক্রম মূর্তি ধারণ করেছিলেন। তাঁর দক্ষিণপদ দ্বারা ভূতল পরিব্যাপ্ত হলে তিনি বামপদ ঊর্ধ্বে পরিচালিত করেন। তখন তাঁর অঙ্গুষ্ঠনখের আঘাতে ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ হয়েছিল। ফলে ব্রহ্মাণ্ডের বাইরের জলধারা ভিতরে প্রবেশ করতে শুরু করল। এই জলধারাই গঙ্গা। শ্রীহরি বিষ্ণুর পাদপদ্ম থেকে গঙ্গার উদ্ভব এবং কথিত আছে তিনি আপন জলধারায় শ্রীহরির পাদপদ্ম প্রক্ষালন করেন। এই কারণেই তিনি *ভগবৎপদী* নামে পরিচিতা। এরপর গঙ্গা সহস্র যুগ পরিমিত সুদীর্ঘ কাল ধরে উৎপত্তিস্থান থেকে প্রবাহিত হয়ে স্বর্গলোকে পতিত হন। গঙ্গার উৎপত্তি তথা স্বর্গে অবতরণ ক্ষেত্রটিকে পণ্ডিতগণ *বিষ্ণুপদ* নামে অভিহিত করেছেন।

শ্রীহরি বিষ্ণুর পরমভক্ত ধ্রুব এই বিষ্ণুপদে অক্ষয় স্থান লাভ করেন [দ্রঃ ধ্রুব$_1$]। গঙ্গার স্বর্গে অবতরণকালে ধ্রুব এই পরম পবিত্র জলধারাকে মস্তকে ধারণ করেন। এরপর সপ্তর্ষিরা তপস্যার পরমসিদ্ধিস্বরূপ এই জলধারাকে জটায় ধারণ করেন। এরপর গঙ্গা আকাশমার্গে অবতরণ করেন এবং চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করে মেরুপর্বতের শিখরে ব্রহ্মার আবাসস্থলে পতিত হন। এই ব্রহ্মলোক থেকে গঙ্গা চারটি ধারায় বিভক্ত হয়ে চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়েছেন এবং সমুদ্রে মিলিত হয়েছেন। এই চারটি ধারার নাম—সীতা, অলকানন্দা, বঙ্‌ক্ষু (অন্যমতে চক্ষু) এবং ভদ্রা।

সীতা ব্রহ্মলোক থেকে কেশর পর্বতের আদিশৃঙ্গগুলি অতিক্রম করে গন্ধমাদন পর্বতে পতিত হন এবং সেখান থেকে *ভদ্রাশ্ববর্ষের* মধ্যভাগ দিয়ে পূর্বদিকে লবণসমুদ্রে প্রবেশ করেন।

বঙ্‌ক্ষু (বা চক্ষু) মাল্যবান পর্বত থেকে *কেতুমালবর্ষের* দিকে প্রবাহিত হয়ে সেখান থেকে পশ্চিমদিকে সমুদ্রে প্রবেশ করেছেন।

ভদ্রা সুমেরু পর্বতের অগ্রভাগ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হয়ে এক পর্বতের উপর থেকে অপর পর্বতে প্রবাহিত হয়ে 'পশ্চাৎ শৃঙ্গবান' পর্বত থেকে নিম্নভাগে অবতরণ করে *উত্তর কুরুবর্ষের* নিকট দিয়ে উত্তর দিকে লবণসমুদ্রে প্রবেশ করেন।

অলকানন্দা ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সুমেরু পর্বত থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে বহু গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করে। হেমকূট ও হিমকূটের মধ্য দিয়ে *ভারতবর্ষে* প্রবেশ করে দক্ষিণ দিকে লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করেন। *[ভাগবত পু. ৫.১৭.১-৯; মার্কণ্ডেয় পু. ৫৬ অধ্যায়; বিষ্ণু পু. ২.৯.১০৩-১০৯]*

তবে রামায়ণ এবং অন্যান্য পুরাণে গঙ্গাকে হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা বলা হয়েছে।

[মহা (k) ৩.১০৯.৮; (হরি) ৩.৯১.৩৬; রামায়ণ ১.৩৬.১৩-১৫]

মহাভারতে গঙ্গা স্বয়ং জহ্নুমুনির কন্যা, এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন।

[মহা (k) ১.৯৮.১৮; (হরি) ১.৯২.৪১]

□ ব্রহ্মপুরাণে গঙ্গার উৎপত্তি, গতিপথ এবং মর্ত্যে অবতরণ সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ নতুন কাহিনী পাওয়া যায়। শিব-পার্বতীর বিবাহ সভায় পার্বতীর অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখে ব্রহ্মা মোহিত হলেন এবং তাঁর তেজ স্খলিত হল। লজ্জিত ব্রহ্মা বিবাহসভা ত্যাগ করলেন। তখন শিব কৃপাবশত ব্রহ্মার শুদ্ধিকরণের জন্য ভূমি এবং জলের পবিত্র সার থেকে যথাক্রমে কমণ্ডলু এবং এক ত্রিলোকপাবনী বারিধারা সৃষ্টি করলেন। সেই জলপূর্ণ কমণ্ডলু ব্রহ্মাকে দান করলেন মহাদেব। সেই কমণ্ডলুস্থিত পবিত্র জলই গঙ্গা। এরপর ভগবান বিষ্ণু বলির যজ্ঞসভায় তাঁর বামপদ ঊর্ধ্বে পরিচালিত করলে তাঁর চরণ ব্রহ্মালোকে প্রসারিত হল। ব্রহ্মা কমণ্ডলুস্থিত পবিত্র জলধারায় নিজের পিতৃপ্রতিম নারায়ণের চরণ প্রক্ষালন করলেন। এভাবে গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে বিষ্ণুপদে অবতীর্ণা হলেন। সেখান থেকে গঙ্গা মেরুপর্বতে পতিত হলেন এবং চারটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পৃথিবীতে প্রবাহিত হলেন। তার মধ্যে যে ধারাটি দক্ষিণদিকে পতিত হল তাকে মহাদেব জটায় ধারণ করলেন। পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ধারা পুনরায় ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে প্রত্যাবর্তন করলেন। উত্তরদিকের ধারাটি নারায়ণ স্বয়ং গ্রহণ করলেন। পূর্বদিকে প্রবাহিত ধারাটিকে ঋষিগণ, দেবগণ এবং লোকপালগণ গ্রহণ করলেন। এর মধ্যে দক্ষিণে প্রবাহিত এবং ভগবান শঙ্করের জটায় অবস্থিত জলধারা কল্যাণস্বরূপা লোকমাতা নামে জগতে প্রসিদ্ধা।

[ব্রহ্ম পু. ৭২.১৮-৩৬; ৭৩.৫৭-৬৯]

□ মহেশ্বরের জটাস্থিত গঙ্গাকে দুই ব্যক্তি মর্ত্যে আনয়ন করেন। প্রথমজন মহর্ষি গৌতম, দ্বিতীয়জন ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ভগীরথ।

গঙ্গা এবং পার্বতী দুজনেই মহাদেবের প্রিয় পত্নী ছিলেন। কিন্তু গঙ্গার প্রতি শিব অধিক প্রেমভাব পোষণ করতেন যা ক্রমে পার্বতীর অসহ্য হয়ে উঠল। পার্বতী ক্রুদ্ধ হয়ে কৈলাস ত্যাগ করে নিজের পিত্রালয়ে ফিরে যাবার সঙ্কল্প করলেন। তখন তাঁর পুত্র গণেশ মাতাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—যত শীঘ্র সম্ভব আমরা এমন কোনো কাজ করব যাতে পিতা (মহাদেব) জটা থেকে গঙ্গাকে ত্যাগ করেন।

এইসময় মর্ত্যলোকে চোদ্দো বছর ধরে অনাবৃষ্টি দেখা দিল। সমগ্র জীবজগৎ বিনষ্ট হবার উপক্রম হল। কিন্তু মহর্ষি গৌতমের আশ্রম এই ভয়ংকর অনাবৃষ্টিতে বিনষ্ট হল না। মহর্ষি গৌতম ব্রহ্মার যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা পবিত্র ব্রহ্মগিরি পর্বতে আশ্রম নির্মাণ করেছিলেন। সেই স্থানের মাহাত্ম্য এবং মহর্ষি গৌতমের তপোবল ও পুণ্যকর্মের ফলে তাঁর আশ্রম দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্ত ছিল। মহর্ষি গৌতমের এই আশ্রমে সেই ভয়াবহ অনাবৃষ্টির দিনে নানা প্রান্ত থেকে মুনিগণ আশ্রম ত্যাগ করে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগলেন। দানধর্ম এবং অতিথি সেবাপরায়ণ গৌতমমুনিও তাঁদের সকলের যথাযথ সেবা করতে লাগলেন। গণেশ পার্বতীকে বললেন—মহর্ষি গৌতমের মাহাত্ম্য দেবতারাও শ্রদ্ধার সঙ্গে চর্চা করছেন। কারণ দেবতারা যা করতে পারেন না, মহর্ষি গৌতম তা সহজেই করতে পারেন। অতএব ইনিই উপযুক্ত ব্যক্তি, যিনি মহাদেবের জটা থেকে গঙ্গাকে মুক্ত করতে পারবেন। এই পরামর্শের পর গণেশ ব্রাহ্মণের বেশে গৌতমমুনির আশ্রমে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেখানে কিছুকাল বাস করার পর গণেশ অন্যান্য মুনিদের বলতে লাগলেন—মহর্ষি গৌতম আমাদের উপকার করেছেন সত্য, কিন্তু আমরা কি তাঁর অন্নের দ্বারা ক্রীত হয়েছি যে, তিনি আমাদের নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে যাবার অনুমতি দিচ্ছেন না? ইনি আমাদের উপকার করেছেন, তাই এঁকে দণ্ডদান করা উচিত নয়, কিন্তু আপনারা অনুমতি করলে আমি বুদ্ধিবলে এর উপায় করতে পারি। তখন আপনারা স্বেচ্ছায় নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন। মুনিরা সম্মতি দিলে গণেশের পরামর্শে পার্বতীর সখী জয়া গো-রূপ ধারণ করে গৌতম মুনির আশ্রমে প্রবেশ করে খাদ্যশস্য নষ্ট করতে লাগলেন। গৌতম মুনি এই ঘটনা দেখে সেই গাভীকে নিবারণ করার জন্য একটি তৃণখণ্ড দ্বারা তাকে প্রহার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই গাভী আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল, আর উঠল না। আশ্রমে গোহত্যা হয়েছে বলে মহা হাহাকার উঠল। আশ্রিত ব্রাহ্মণরা বললেন—আপনার আশ্রমে পরমপূজ্য গো-মাতার মৃত্যু ঘটেছে।

সুতরাং আর এখানে বাস করলে আমাদের মহাপাপের ভাগী হতে হবে। সুতরাং আমরা আশ্রম ত্যাগ করব। এই ঘটনায় বিস্ময়ে ও শোকে অভিভূত হয়ে মহর্ষি গৌতম ব্রাহ্মণদের কাছে তাঁর গোবধ জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে হবে তা জানতে চাইলেন। তখন ব্রাহ্মণদের অনুমতিক্রমে তাঁদের প্রতিনিধি গণেশ বললেন—ব্রহ্মার কমণ্ডলুস্থিত পবিত্র গঙ্গা মহাদেবের জটায় অবস্থিত আছেন। তপস্যা দ্বারা সেই গঙ্গাকে আপনি মর্ত্যে আনয়ন করুন এবং সেই পবিত্র ধারায় এই ভূপতিত গাভীকে সিঞ্চন করুন। তবে এই গাভী পুনরায় উত্থিত হবে, আপনিও পাপমুক্ত হবেন, আমরাও আপনার আশ্রমে পূর্বের মতো বাস করব।

মহর্ষি গৌতম মুনিগণের আশীর্বাদ নিয়ে মহাদেবের আরাধনা শুরু করলেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। মহাদেব গৌতমমুনিকে বরদান করতে চাইলে মহর্ষি গৌতম তাঁর জটাস্থিত গঙ্গাকে ত্রিলোকের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করলেন। মহাদেব তাঁর জটাস্থিত গঙ্গাকে ব্রহ্মগিরি পর্বতের শৃঙ্গে ত্যাগ করলেন। মহর্ষি গৌতম এই বর প্রার্থনা করলেন যে, এই তীর্থস্বরূপা গঙ্গা যতদূর পর্যন্ত প্রবাহিত হবেন, ততদূর পর্যন্ত সকল স্থানে এই পবিত্র ধারায় স্নান করা মাত্র সমস্ত পাপ যেন নষ্ট হয়ে যায়। প্রসন্ন মহাদেব সেই বর দান করলেন।

গঙ্গা ব্রহ্মগিরি পর্বতে আবির্ভূতা হয়ে মহর্ষি গৌতমকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি দেবলোকে গমন করব, না ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে গমন করব? মহর্ষি গৌতম বললেন—আমি ত্রিলোকের মঙ্গলের জন্য আপনাকে প্রার্থনা করেছি, অতএব আপনি ত্রিলোকের মঙ্গল সাধন করুন। এই কথা শুনে গঙ্গা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতালে গমন করলেন। গঙ্গা স্বর্গে চারভাগে, মর্ত্যলোকে সাতভাগে এবং রসাতলে চারভাগে বিভক্ত হয়ে প্রবাহিতা হলেন। এইভাবে গঙ্গা সর্বমোট পনেরোটি ধারায় ত্রিলোকে প্রবাহিতা হন। মহর্ষি গৌতম গঙ্গাকে আনয়ন করেছিলেন বলে গঙ্গা গৌতমীগঙ্গা নামেও প্রসিদ্ধা। প্রসঙ্গত, বর্তমানে আমরা এই গৌতমী গঙ্গা নদীকে গোদাবরী নামে চিনি। *[দ্র. গোদাবরী]*

ব্রহ্মপুরাণে প্রাপ্ত এই কাহিনী অনুসারে গঙ্গার দ্বিতীয় ধারাটি মহাদেবের জটা থেকে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ভগীরথের দ্বারা মর্ত্যে আনীত হয়। *[ব্রহ্ম পু. ৭৪-৭৭ অধ্যায়; শিব পু. জ্ঞান. ৫২-৫৪ অধ্যায়]*

□ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সগর একবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞীয় অশ্বের সুরক্ষায় নিযুক্ত থাকলেন তাঁর ষাট হাজার মহাবীর এবং মহাদাম্ভিক পুত্র। অশ্বমেধের এই ঘোড়া পৃথিবী পর্যটন করতে করতে একসময় সমুদ্রের তীরে এসে উপস্থিত হল। মহর্ষি অগস্ত্য মহাসমুদ্র শোষণ করার পর থেকে সুদীর্ঘকাল সমুদ্রতল শুষ্ক অবস্থায় ছিল [দ্র. অগস্ত্য]। সেই শুষ্ক সমুদ্রতলে পৌঁছে ঘোড়াটি হঠাৎ অদৃশ্য হল। তবে রামায়ণে বলা হয়েছে যে, সগররাজার পৌত্র অংশুমান যখন যজ্ঞাশ্বের রক্ষণাবেক্ষণ করছিলেন সেই সময় ইন্দ্র রাক্ষসরূপ ধারণ করে যজ্ঞাশ্বটি হরণ করেন। *[রামায়ণ ১.৩৯.৬-৭]*

অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া অলৌকিক উপায়ে অদৃশ্য হয়েছে—এই সংবাদ পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে রাজা সগর পুত্রদের যজ্ঞাশ্ব অনুসন্ধান করার আদেশ দিলেন। সগরপুত্ররা সমগ্র পৃথিবীতে সন্ধান করল, কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পেলনা। ব্যর্থ হয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলে সগররাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রদের বললেন—যেভাবেই হোক, প্রয়োজনে সমগ্র পৃথিবী খনন করে তোমরা অশ্ব ও অশ্ব-হরণকারীর সন্ধান কর, যজ্ঞাশ্ব না নিয়ে তোমরা আর ফিরে এসো না।

পিতার তিরস্কারে ক্রুদ্ধ হয়ে রাজপুত্ররা সমগ্র ধরিত্রী, সমুদ্র খনন করে অশ্বের সন্ধান করতে লাগল। ফলে বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ অকারণে ধ্বংস হল, অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিকে রাজপুত্ররা চোর সন্দেহে হত্যাও করল। ধরিত্রী ষাট হাজার সগরপুত্রের শূল ও হলের ঘায়ে বিদীর্ণ হয়ে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে লাগলেন। অবশেষে সমুদ্রের ঈশানকোণ বিদীর্ণ করে সগরপুত্ররা দেখতে পেল, তাদের যজ্ঞাশ্ব আনন্দে বিচরণ করছে। অদূরে কপিলমুনি তপস্যায় রত ছিলেন। সগরপুত্রেরা তাঁকেই অশ্ব অপহরণকারী মনে করে আক্রমণ করলে ক্রুদ্ধ কপিলমুনির অভিশাপে ষাট হাজার সগরপুত্র ভস্মীভূত হন।

দেবর্ষি নারদ রাজা সগরকে এই বৃত্তান্ত

জানালে দুঃখিত সগররাজা পৌত্র অংশুমানকে যজ্ঞাশ্ব ফিরিয়ে আনার আদেশ দিলেন। অংশুমান সেই স্থানে গিয়ে পৌঁছালেন—যেখানে সগরপুত্রগণ ভস্মীভূত হয়েছিলেন। তিনি অদূরে উপবিষ্ট ঋষিশ্রেষ্ঠ কপিলকে প্রণাম করে তাঁর শরণাপন্ন হলেন। অংশুমানের বিনীত আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে কপিলমুনি, তাঁকে যজ্ঞাশ্ব দান করলেন এবং বললেন যে, স্বর্গলোক থেকে গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করলে গঙ্গার পবিত্রজলের স্পর্শে ভস্মীভূত সগরপুত্রেরা মুক্তিলাভ করবেন। অংশুমান যজ্ঞাশ্ব নিয়ে ফিরে এসে সগররাজাকে এই বৃত্তান্ত জানালেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হল।

রাজা সগরের পর তাঁর পৌত্র অংশুমান রাজা হলেন। অংশুমানের পুত্র পরম ধার্মিক রাজা দিলীপ। দিলীপকে রাজ্যভার দিয়ে অংশুমান হিমালয়ে গিয়ে গঙ্গা আনয়নের জন্য কঠোর তপস্যা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হল। রাজা দিলীপও মর্ত্যে গঙ্গা আনয়নের বহু চেষ্টা করলেন কিন্তু সফল হলেন না। দিলীপের পুত্র রাজা ভগীরথ রাজ্যলাভের পর পিতৃপুরুষদের এই দুর্দশার কাহিনী শুনে মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার দিয়ে হিমালয়ে গমন করলেন এবং গঙ্গা আনয়নের জন্য কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। সুদীর্ঘকাল কঠোর তপস্যার পর গঙ্গা প্রসন্ন হয়ে ভগীরথকে দর্শন দিলেন। ভগীরথ গঙ্গার কাছে মর্ত্যলোকে প্রবাহিত হবার এবং সগরপুত্রদের নিজের পবিত্র জলরাশি দ্বারা মুক্তি দানের বর প্রার্থনা করলেন। গঙ্গা সম্মত হয়ে বললেন—আমি আপনার প্রার্থনার অনুরূপ কাজ করব, কিন্তু আকাশ থেকে আমি যখন ভূতলে অবতরণ করব, সেসময় আমার জলরাশির প্রবল বেগ ধারণ করা বড়ো কঠিন হবে। জলরাশির বেগ ধারণ করা না গেলে সমস্ত সৃষ্টি সেই জলধারায় প্লাবিত হয়ে যাবে। দেবাদিদেব মহাদেব ছাড়া আর কেউ এ কাজে সমর্থও হবেন না। অতএব আপনি তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করুন। মর্ত্যে অবতরণের সময় তিনি আমাকে মস্তকে ধারণ করবেন।

গঙ্গার পরামর্শে ভগীরথ কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে প্রসন্ন করলেন। মহাদেব গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণকালে তাঁকে জটায় ধারণ করতে সম্মত হলেন। এদিকে গঙ্গা মনে মনে চিন্তা করলেন যে, তাঁর স্রোতে মহাদেবও প্লাবিত হয়ে পাতালে প্রবেশ করবেন। গঙ্গার অহঙ্কারে ক্রুদ্ধ হয়ে মহাদেব তাঁর অহঙ্কার প্রশমনের জন্য নিজের জটিল জটাগহ্বরে গঙ্গাকে ধারণ করলেন। গঙ্গা জটায় বন্দিনী হলেন, ভূতলে তাঁর ধারা প্রবাহিত হল না। ভগীরথ আবারও তপস্যা করলেন গঙ্গার অবতরণের জন্য। তাঁর তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে মহাদেব গঙ্গাকে মুক্ত করলেন এবং বিন্দু সরোবরে গঙ্গার স্রোতকে বিসর্জন দিলেন। ফলে সাতটি পবিত্র স্রোত সৃষ্টি হল। তার মধ্যে তিনটি হ্লাদিনী, পাবনী এবং নলিনী নামে পূর্বদিকে প্রবাহিত হল, অপর তিনটি ধারা সুচক্ষু, সীতা এবং সিন্ধু নামে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হল। সপ্তম ধারাটি ভগীরথকে অনুসরণ করে প্রবল বেগে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হল। পথমধ্যে গঙ্গা জহ্নুমুনির আশ্রমে উপস্থিত হলে তাঁর প্রবল জলস্রোতে মহর্ষি জহ্নুর যজ্ঞস্থল ধ্বংস হল। ক্রুদ্ধ মুনি গঙ্গার সমস্ত জলরাশি পান করে ফেললেন। পরে দেবতাদের অনুরোধে এবং ভগীরথের প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে মহর্ষি জহ্নু নিজের দুই কানের ছিদ্রপথ দিয়ে গঙ্গাকে বের করে দিলেন। এই কারণে তাঁকে জহ্নুকন্যা বা জাহ্নবী নামে অভিহিত করা হয়। এরপর গঙ্গা প্রবলবেগে সমুদ্রে প্রবেশ করলেন এবং ভূতলে তাঁর জলধারা সগরপুত্রদের ভস্মরাশি প্লাবিত করল। তাঁর পবিত্র জলরাশিতে শুষ্ক সমুদ্রও আবার পরিপূর্ণ হল। ভগীরথ গঙ্গাজলে তর্পণ করলে সগরপুত্রেরা মুক্তিলাভ করলেন। ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করেছিলেন বলে মর্ত্যে গঙ্গা ভগীরথের কন্যা বা ভাগীরথী নামে খ্যাত। গঙ্গা স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতালে প্রবাহিতা বলে তাঁকে 'ত্রিপথগা' নামে স্মরণ করা হয়। তাঁর জলধারা স্বর্গে অলকানন্দা, মর্ত্যে ভাগীরথী এবং পাতালে ভোগবতী নামে প্রসিদ্ধ।

[মহা (k) ৩.১০৭.১১-৭০, ১০৮, ১০৯-১৯;
(হরি) ৩.৯০.৩৬-৯৭, ৯১, ১-৪৫;
রামায়ণ. ১.৩৯-৪৪ সর্গ;
বৃহদ্ধর্ম পু. ২.১৮.১৫-৫৮; ১৯-২১ অধ্যায়;
২২.১-৫২; ব্রহ্ম পুরাণ. ৭৮.১২-৭৭;
ভাগবত পু. ৯.৮.৭-৩০; ৯.১-১১]

□ গঙ্গা মহাদেবের তেজ ধারণ করে তাঁর পুত্র কার্ত্তিকেয়কে জন্মদান করেন বলে রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে। শিব এবং পার্বতীর বিবাহের পর

দীর্ঘসময় অতিক্রান্ত হলেও তাঁদের কোনো পুত্র হল না। অথচ শিবপুত্রই দেবসেনাপতি হয়ে তারকাসুরের অত্যাচার থেকে ত্রিভুবনকে মুক্ত করতে পারে। অতএব স্বভাবতই দেবতারা উদ্বিগ্ন হলেন। এইসময় শিবের তেজ ক্ষুব্ধ ও স্থানচ্যুত হল। মহাদেবের আজ্ঞায় ধরিত্রী তাকে ধারণ করলেন। এরপর দেবতাদের পরামর্শে অগ্নি সেই তেজপুঞ্জে প্রবেশ করলেন। তখন পিতামহ ব্রহ্মা অগ্নিকে বললেন—শিবের মহাতেজ তুমি হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাকে প্রদান কর। তাঁর গর্ভেই শত্রুদমনকারী দেবসেনাপতি জন্মগ্রহণ করবেন। শিবপত্নী পার্বতীও এই পুত্রকে নিজের পুত্র বলে মেনে নেবেন। দেবতাদের অনুরোধে গঙ্গা দিব্য নারীমূর্তি ধারণ করে অগ্নির দ্বারা নিষিক্ত শিববীর্য্যকে গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর গর্ভে প্রবিষ্ট শিববীর্য্য গঙ্গা সহ্য করতে পারলেন না। তীব্র তেজে তাঁর স্রোতরাশি যেন দগ্ধ হতে লাগল। তিনি তীব্র বেদনায় ক্রন্দন করতে লাগলে অগ্নি তাঁকে বললেন—তুমি এই তেজসম্পন্ন গর্ভটি হিমালয়ের পাদদেশে মোচন কর। গঙ্গা তাই করলেন। ফলে মহাদেবের তেজে হিমালয়ের পাদদেশে নানা মূল্যবান ধাতুর উৎপত্তি হল এবং শেষ পর্যন্ত ওই গর্ভ থেকে একটি দিব্য শিশু জন্মগ্রহণ করল। এই শিশুটিকে কৃত্তিকা নক্ষত্ররা নিজপুত্রের ন্যায় লালনপালন করেন। তাই শিবের এই পুত্র কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত হন।

[রামায়ণ ১.৩৬ এবং ৩৭ সর্গ]

□ স্বর্গে প্রবাহিনী বিষ্ণুপত্নী গঙ্গা দেবী সরস্বতীর অভিশাপে মর্ত্যে নেমে আসেন বলে পুরাণে কথিত আছে। দেবী ভাগবত পুরাণে প্রাপ্ত কাহিনী অনুযায়ী, শ্রীহরি বিষ্ণুর তিনজন পত্নী ছিলেন—লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গঙ্গা। একবার শ্রীহরি এবং তাঁর তিনপত্নী একত্র বসে বাক্যালাপ করছিলেন। এমন সময় গঙ্গা শ্রীহরির প্রতি কটাক্ষপাত করলেন। ভগবান বিষ্ণুও পত্নীকে সহাস্য প্রত্যুত্তর দিলেন। এই ঘটনা দেবী সরস্বতীর অসহ্য বোধ হল। দেবী লক্ষ্মীর বারবার প্রবোধ সত্ত্বেও তিনি শান্ত হলেন না এবং শ্রীহরি ও গঙ্গাকে কটু ভাষায় আক্রমণ করলেন। দুঃখিত শ্রীহরি সেই স্থান ত্যাগ করলে গঙ্গা ও সরস্বতীর মধ্যে ভীষণ কলহ শুরু হল। লক্ষ্মী যেহেতু এই ঘটনায় তেমন গুরুত্ব দেননি, তাই সরস্বতী ক্রুদ্ধ হয়ে লক্ষ্মীকে বৃক্ষ হবার অভিশাপ দিলেন। গঙ্গার চঞ্চল ব্যবহারের জন্য গঙ্গাকে তিনি শাপ দিলেন চঞ্চলা স্রোতস্বিনী নদীরূপা হবার। সরস্বতী গঙ্গাকে তিরস্কার করে বললেন—এমন আচরণের জন্য গঙ্গা স্বর্গচ্যুত হয়ে মর্ত্যে প্রবাহিত হবেন এবং পাপী-তাপী মানুষদের পাপ গ্রহণ করতে হবে তাঁকে। এদিকে সরস্বতীর আচরণেও গঙ্গা যথেষ্টই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন—তিনিও সরস্বতীকে নদীরূপে প্রবাহিত হবার অভিশাপ দিলেন।

ভগবান বিষ্ণু এবার ফিরে এলেন কলহের সময়েই। শান্তস্বভাব লক্ষ্মী মর্ত্যলোকে পদ্মাবতী নদী এবং তুলসী বৃক্ষরূপে অবতীর্ণা হলেন এবং শ্রীহরি তাঁকে নিজ পত্নীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং পতিভক্তিপরায়ণা বলে তাঁর সমাদর করলেন। শ্রীহরি সরস্বতীকে ত্যাগ করলেন এবং তাঁকে তিনি ব্রহ্মার পত্নী রূপে চিহ্নিত হলেন। আর মর্ত্যে তিনি সরস্বতী নদীরূপে প্রসিদ্ধা হলেন। শ্রীহরি গঙ্গাকেও ত্যাগ করলেন এবং তাঁর আদেশে গঙ্গা মহাদেবের পত্নী হলেন। আর মর্ত্যলোকে তিনি ভাগীরথী নদীরূপে প্রসিদ্ধা হলেন। দেবকার্যসাধনের জন্য শ্রীহরি গঙ্গাকে শান্তনুরাজার সহধর্মিনীরূপেও মর্ত্যে অল্পসময় অতিবাহিত করতে আদেশ দিলেন। এইভাবে বিষ্ণুপদী আকাশগঙ্গা মহাদেবপত্নী, ভাগীরথী নদীরূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং রাজা শান্তনুকে অল্পকালের জন্য পতিত্বে বরণ করেন। তবে গঙ্গা ব্রহ্মার অভিশাপে শান্তনুর পত্নী হন, এই কাহিনীই অধিক প্রসিদ্ধ। *[দেবী ভাগবত ৯.৬.১৬-৬০]*

□ ইক্ষ্বাকুবংশে মহাভিষ নামে এক পরম ধার্মিক এবং মহাপরাক্রমী রাজা ছিলেন। তিনি রাজত্বকালে বহু অশ্বমেধ এবং রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে ইন্দ্রকে প্রসন্ন করেন এবং অক্ষয় স্বর্গলাভ করেন। একসময় ব্রহ্মলোকে দেবতারা এবং রাজর্ষিরা ব্রহ্মার আরাধনা করছিলেন। মহাভিষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এইসময়ে গঙ্গাও ব্রহ্মালোকে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ তীব্র বায়ুপ্রবাহে গঙ্গার দেহ থেকে তাঁর সূক্ষ্ম উত্তরীয়বস্ত্রের আবরণ অপসৃত হল। দেবতারা তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে অধোমুখ হলেন কিন্তু মহাভিষ রাজা অসঙ্কোচে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। গঙ্গাও রাজা মহাভিষের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হলেন না,

বরং কিছুটা অনুরাগ এবং লজ্জা প্রকাশ পেল তাঁর আচরণে। ভগবান ব্রহ্মা এঁদের দু-জনকে পরস্পর প্রেমাসক্ত এবং কামমোহিত হতে দেখে ক্রুদ্ধ হলেন এবং মহাভিষকে মর্ত্যলোকে জন্মলাভের অভিশাপ দিলেন। গঙ্গাকেও ব্রহ্মা এই মর্মে অভিশাপ দিলেন যে, মহাভিষ রাজা মনুষ্যলোকে পূনর্জন্ম গ্রহণ করলে গঙ্গা মর্ত্যে গিয়ে তাঁর পত্নী হবেন। ব্রহ্মা মহাভিষকে বললেন, যে গঙ্গার প্রতি তুমি এত অনুরক্ত মর্ত্যে তিনি তোমার অপ্রিয় এবং প্রতিকূল কাজ করবেন। যে মুহূর্তে তুমি তাঁর উপর বিরক্ত হবে, সেই সময় তোমাদের শাপমুক্তি ঘটবে। গঙ্গা নিজের প্রতি অনুরক্ত মহাভিষ রাজাকেই মনে মনে চিন্তা করতে করতে ব্রহ্মালোক থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। এমন সময় তিনি আটজন বসু দেবতাকে স্বর্গলোক থেকে পতিত হতে দেখলেন। বসুগণ মহর্ষি বশিষ্ঠের দ্বারা এই মর্মে অভিশপ্ত হয়েছিলেন যে তাঁরা মর্ত্যলোকে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করবেন। অভিশপ্ত বসুগণ গঙ্গাকে অনুরোধ করলেন যে, গঙ্গা মানবীরূপ ধারণ করে মর্ত্যলোকে শান্তনুর পত্নী হয়ে নিজের গর্ভেই বসুগণকে জন্মদান করুন। গঙ্গা তাতে সম্মত হলে বসুগণ প্রার্থনা করলেন যে, গঙ্গা যেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মুক্তিদান করেন। কিন্তু গঙ্গা শান্তনু রাজার পুত্রকামনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করতে সম্মত হলেন না। তখন বসুগণ বললেন যে, তাঁরা প্রত্যেকে নিজ তেজের এক এক অষ্টমভাগ দান করবেন ফলে শান্তনু এক পূর্ণতেজস্বী পুত্র লাভ করবেন। কিন্তু সেই পুত্র মর্ত্যলোকে কোনো সন্তানের জন্মদান করবেন না, তবে তিনি অত্যন্ত বলবান হবেন। গঙ্গা এতে সম্মত হলেন। তবে মহাভারতে অন্যত্র এই কাহিনী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, বশিষ্ঠ তাঁর হোমধেনু নন্দিনীর অপহরণের অপরাধে বসুগণকে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দেন। অভিশপ্ত বসুগণ বশিষ্ঠের করুণাভিক্ষা করলে বশিষ্ঠ বলেন—তাঁর অভিশাপ মিথ্যা হবে না, বসুগণ অবশ্যই মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করবেন। তবে তাঁদের মধ্যে সাতজন বসু এক বৎসরের মধ্যেই শাপমুক্ত হবেন। কিন্তু প্রকৃত অপরাধী দ্যু-নামক বসু বহুকাল মর্ত্যলোকে বাস করবেন। তবে তিনি ধার্মিক, সর্বশাস্ত্রে নিপুণ হবেন, পিতার প্রিয় ও হিতসাধনে নিরত থাকবেন এবং স্ত্রীসম্ভোগ ত্যাগ করবেন। তাঁর মত মহাত্মা মনুষ্যলোকে আর কেউ হবে না। এই 'দ্যু' নামক বসুই শান্তনু ও গঙ্গার একমাত্র জীবিত পুত্র দেবব্রত ভীষ্ম। *[দ্র. অষ্টবসু]*

[মহা (k) ১.৯৬ অধ্যায়, ৯৮.১-৪৫; (হরি) ১.৯১ অধ্যায়, ৯৩.১-৪৫; দেবী ভাগবত ২.৩.১৫-৪৪]

☐ হস্তিনাপুরের চন্দ্রবংশীয় রাজা প্রতীপ গঙ্গাতীরে জগতের হিতকামনায় বহুবৎসর ধরে তপস্যা করছিলেন। একদিন গঙ্গা মোহিনী স্ত্রীরূপ ধারণ করে জল থেকে উঠে তপস্যারত রাজর্ষির দক্ষিণ উরুদেশে গিয়ে বসলেন। তখন রাজা তাঁকে বললেন—কল্যাণী! তোমার অভীষ্ট কোন প্রিয় কার্য করব? গঙ্গা উত্তর দিলেন—মহারাজ! আমি আপনার প্রতি অনুরক্তা। আমি আপনাকে প্রার্থনা করি। সুতরাং আমাকে সন্তুষ্ট করুন। রাজা প্রতীপ বললেন—সুন্দরী! তুমি উপস্থিত হয়েই আমার দক্ষিণ উরু আশ্রয় করেছো। এই স্থান সন্তান এবং পুত্রবধূদের জন্য নির্দিষ্ট। বাম উরুই স্ত্রীর ভোগ্য। কিন্তু তুমি সে স্থান পরিত্যাগ করেছ। অতএব আমি তোমার সঙ্গে কামব্যবহার করতে পারিনা। তুমি এসেই যখন দক্ষিণ উরু আশ্রয় করেছ, তখন তুমি আমার পুত্রবধূ হও, আমি পুত্রের জন্যই তোমাকে বরণ করছি। গঙ্গা এতে সম্মত হলেন। কিন্তু বললেন—আমি শপথ করে যে কাজ করবো, আপনার পুত্র তার ভালোমন্দ বিচার করতে পারবেন না। এই শর্তেই আমি তাঁর অনুগতা পত্নীরূপে বাস করব। আমার দ্বারা পুত্রলাভ করে তিনি স্বর্গলাভ করবেন। এইকথা বলে গঙ্গা অন্তর্হিত হলেন। রাজা প্রতীপ গঙ্গার বাক্য স্মরণ করে পুত্রকামনায় তপস্যা আরম্ভ করলেন। অভিশপ্ত রাজা মহাভিষ শান্তনু নামে প্রতীপের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করলেন। শান্তনু যৌবনে পদার্পণ করলে রাজা প্রতীপ তাকে সিংহাসনে স্থাপন করলেন এবং তাঁকে সেই দিব্যাঙ্গনা রমণীর বৃত্তান্ত জানিয়ে তাঁকেই বিবাহ করার আদেশ দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন।

এরপর একদিন শান্তনু গঙ্গাতীরে মৃগয়া করতে গিয়ে অপরূপ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত গঙ্গাকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং মনুষ্যরূপধারী গঙ্গাকে পত্নীরূপে লাভ করতে চাইলেন। গঙ্গা তাঁর প্রস্তাব স্বীকার করলেন এই শর্তে যে, তাঁর ভালোমন্দ কোনো কাজেই শান্তনু বাধা দিতে পারবেন না কিংবা

কোনো কটুকথা বলতে পারবেন না। শান্তনু তাতেই সম্মত হলেন এবং গঙ্গাকে বিবাহ করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর ঔরসে ক্রমে ক্রমে আটটি শিশু রূপে অষ্টবসু মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। জন্মের পরেই গঙ্গা তাঁর সদ্যোজাত প্রত্যেকটি পুত্রকেই গঙ্গার স্রোতে ডুবিয়ে মনুষ্যলোক থেকে মুক্তি দিতেন। পুত্রশোকে অধীর হলেও শান্তনু শর্তভঙ্গের ভয়ে কিছু বলতে পারতেন না। এইভাবে গঙ্গা ক্রমে সাতজন বসু দেবতাকে মুক্তি দিলেন। শেষে অষ্টম পুত্রটিকেও যখন গঙ্গা জলে নিক্ষেপ করবেন, তখন শান্তনু তাঁকে বারণ করলেন, তিরস্কার করলেন। গঙ্গা পুত্রবধ করলেন না। গঙ্গা শান্তনুকে বললেন—এই আটটি শিশু আটজন অভিশপ্ত বসুদেবতা। বশিষ্ঠের অভিশাপে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের প্রার্থনায় আমি স্বয়ং তাঁদের মর্ত্যলোকে জন্মদান করি এবং জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে ইহলোক থেকে মুক্তি দান করি। কিন্তু এই অষ্টম পুত্রটিকে আমি বধ করব না, কারণ আপনি পুত্রকামনা করছেন। কিন্তু আপনি শর্তভঙ্গ করেছেন, তাই আপনার সঙ্গে আমার থাকাও এখানেই শেষ হল। এই কথা বলে উপযুক্ত লালনপালনের পর জীবিত এই পুত্রটিকে শান্তনুর কাছে ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গঙ্গা প্রস্থান করলেন। এইভাবে রাজা মহাভিষ এবং গঙ্গা ব্রহ্মার শাপ থেকে মুক্ত হলেন।

শান্তনুর অষ্টমপুত্র সর্বপ্রকার শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করলেন। গঙ্গা সেই পুত্রটিকে শান্তনুর হাতে সমর্পন করলেন। এই পুত্রটি গাঙ্গেয়, দেবব্রত এবং পরবর্তীকালে ভীষ্ম নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.৯৭ এবং ৯৮ অধ্যায়, ১০০.৩১-৩৪;
(হরি) ১.৯২ অধ্যায়, ৯৪.৩১-৩৪;
দেবী ভাগবত ২.৩.৪৫-৬০; ৪.১-৬০]

□ কাশীরাজকন্যা অম্বাকে ভীষ্ম স্বয়ম্বর সভা থেকে হরণ করে নিয়ে আসেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সঙ্গে তাঁর বিবাহের আয়োজন করেন। এই সময় অম্বা জানালেন যে তিনি পূর্বেই শাল্বরাজকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করেছেন এবং অন্য কাউকে পতিরূপে বরণ করতে ইচ্ছা করেন না। ভীষ্মের অনুমতি নিয়ে অম্বা শাল্বরাজের কাছে গেলে তিনিও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন। আশ্রয়হীনা দুর্দশাগ্রস্ত অম্বা ভীষ্মকেই নিজের এই দুরবস্থার জন্য দায়ী মনে করে পরশুরামকে ভীষ্মবধের অনুরোধ করেন। ফলে পরশুরাম এবং তাঁর শিষ্য ভীষ্মের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল। উভয়েই উভয়কে বধ করার সঙ্কল্প করে গঙ্গাতীরে কুরুক্ষেত্রে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য উপস্থিত হলেন। পুত্রের এই বিপদ দেখে গঙ্গা পুত্র ভীষ্ম এবং পরশুরাম উভয়ের সম্মুখেই উপস্থিত হয়ে বারংবার যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করেন। পরশুরামের কাছে পুত্রের আচরণের জন্য গঙ্গাকে ক্ষমাভিক্ষা করতেও দেখা গেছে। কিন্তু গঙ্গা যুদ্ধ বন্ধ করতে সমর্থ হলেন না। পরশুরাম ও ভীষ্মের মধ্যে দীর্ঘদিনব্যাপী ভয়ানক যুদ্ধ চলল। শেষপর্যন্ত দেবতা ও মহর্ষিগণ আবির্ভূত হয়ে উভয়কে যুদ্ধ ত্যাগ করার অনুরোধ করলে গঙ্গা স্বয়ং দু-জনের মাঝখানে আবির্ভূতা হয়ে তাঁদের অস্ত্রের গতি রুদ্ধ করেন।

[মহা (k) ৫.১৭৮.৮৬-৯৪; (হরি) ৫.১৬৮.২২-৩০]

পরশুরাম ভীষ্মকে জয় করতে পারলেন না দেখে নিরাশ হয়ে অম্বা স্বয়ং যুদ্ধে ভীষ্মকে বধ করার জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। এইসময় একদিন জলমধ্যে তপস্যারতা অম্বার সম্মুখে গঙ্গা আবির্ভূতা হলেন। তিনি অম্বাকে তাঁর এই কঠোর তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসা করলে অম্বা ভীষ্ম বধের সংকল্পের কথা গঙ্গাকে জানালেন। এই কথা শুনে গঙ্গা বললেন—তুমি একটি মানুষকে বধ করার জন্য তপস্যা করছো। এই কুটিল আচরণের ফলে তুমি কখনোই তোমার তপস্যার ফল লাভ করতে পারবে না। তুমি যদি ভীষ্মবধের জন্যই তপস্যা করতে থাকো এবং এইভাবে তপস্যা করতে করতেই দেহত্যাগ কর, তবে তুমি এক কুটিলা নদীতে রূপান্তরিত হবে। শুধুমাত্র বর্ষাকালেই তোমাতে জল থাকবে, অপর আটমাস শুষ্ক থাকবে। তখন তোমাকে কেউ নদী বলে চিনতেও পারবে না। তুমি মন্দতীর্থা এবং ভয়ঙ্কর জলজন্তু সমন্বিতা হবে। ফলে মানুষ তোমাকে ভয় করবে। অম্বাকে এই কথা বলে গঙ্গা অদৃশ্য হলেন।

[মহা (k) ৫.১৮৬.৩০-৩৮; (হরি) ৫.১৭৬.৩০-৩৭]

□ মহাভারতে এরপর গঙ্গাকে ভীষ্মের মৃত্যুবরণের পর শোকবিহ্বলা অবস্থায় দেখা

যায়। কুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়রা গঙ্গার পবিত্র জলে ভীষ্মের তর্পণক্রিয়া সম্পন্ন করার পর শোকসন্তপ্তা ভীষ্মজননী গঙ্গা বিলাপ করতে করতে জল থেকে উঠে এলেন। পুত্র দেবব্রতের জন্য তাঁর করুণ বিলাপ উপস্থিত সকলের হৃদয়কে দ্রবীভূত করল। গঙ্গা বললেন—আমার পুত্র ক্ষত্রিয়কুলের গৌরব, অজেয় যোদ্ধা ছিলেন, স্বয়ং পরশুরামও তাঁকে পরাজিত করতে সমর্থ হননি, তিনি শিখণ্ডীর হাতে কীভাবে নিহত হলেন? এই কথা বলে বিস্ময় প্রকাশ করে গঙ্গা অশ্রুবিসর্জন করতে থাকলে কৃষ্ণ এবং বেদব্যাস তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। কৃষ্ণ বললেন—শিখণ্ডীর দ্বারা নয়, অর্জুনের অস্ত্রাঘাতেই ভীষ্মের মৃত্যু ঘটেছে। অভিশপ্ত বসু তাঁর ইহজীবন ত্যাগ করে স্বর্গে বসুভ্রাতাগণের সঙ্গে মিলিত হবেন, এতে শোক করা অনুচিত। এই কথা শুনে গঙ্গা শান্ত হলেন।

[মহা (k) ১৩.১৬৮.২১-৩৭; (হরি) ১৩.১৪৬.২১-৩৭]

☐ অগ্নিপুরাণে গঙ্গার (জাহ্নবী) মূর্তি বর্ণিত হয়েছে। জাহ্নবীর বাম হাতে কুম্ভ (কলস), ডান হাতে পদ্মফুল। তাঁর দেহ শ্বেতবর্ণ। তাঁর আসন অথবা বাহন মকর—

কুম্ভাজহস্তা শ্বেতাভা মকরোপরি জাহ্নবী॥

[অগ্নি পু. ৫০.১৬]

গঙ্গাদ্বার হরিদ্বার। গঙ্গা নদী এখানে পর্বত থেকে সমভূমিতে নেমে এসেছে। এখান থেকে গঙ্গা সমভূমিগামী বলেই স্থানটির নাম গঙ্গাদ্বার। মহাভারতের বনপর্বে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে—যে স্থানে হিমালয় পর্বতকে সবেগে ভেদ করে গঙ্গা নদী নির্গত হয়েছে, সেই পবিত্র স্থানটিই গঙ্গাদ্বার নামে বিখ্যাত—

গন্ধর্বযক্ষরক্ষোভিরপ্সরোভিশ্চ সেবিতম্।
কিরাত কিন্নরাবাসং শৈলং শিখরিণাং বরম্॥
বিভেদ তরসাগঙ্গা গঙ্গাদ্বারং যুধিষ্ঠির।

এটি পৃথিবীর পবিত্রতম স্থানগুলির মধ্যে একটি। প্রাচীনকালে কুরুবংশীয় রাজা প্রতীপ গঙ্গাদ্বারে তপস্যা করেছিলেন। তপস্যাকালেই গঙ্গা নদী স্ত্রীরূপ ধারণ করে এখানে প্রতীপের দক্ষিণ উরুতে উপবেশন করেন। গঙ্গার ইচ্ছাতেই প্রতীপ তাঁকে কুরুবংশের পুত্রবধূ হওয়ার বরদান করেন। প্রতীপের পৌত্র ভীষ্মকেও পিতা শান্তনুর শ্রাদ্ধকার্যের জন্য গঙ্গাদ্বারে উপস্থিত হতে দেখা যায়। *[মহা (k) ১.৯৭.১; ৩.৮৯.১৫; ৩.৯০.২০-২১; ১৩.৮৪.১১; ১৩.১৬৫.২৬; (হরি) ১.৯২.১; ৩.৭৪.১৫; ৩.৭৫.২০-২১; ১৩.৭৩.১১; ১৩.১৪৩.২৬]*

☐ গঙ্গাদ্বারে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম অবস্থিত ছিল। দ্রোণাচার্যের জন্মকথার সঙ্গে গঙ্গাদ্বারের নাম যুক্ত হয়ে আছে। মহর্ষি ভরদ্বাজ এই অঞ্চলে ঘৃতাচী অপ্সরাকে দেখে কামোদ্দীপ্ত হয়ে পড়েন। তাঁর শুক্রস্খলন হয়। কলসে সঞ্চিত ভরদ্বাজের সেই স্খলিত শুক্র থেকেই দ্রোণাচার্যের জন্ম।

[মহা (k) ১.১৩০.৩৩-৩৮; (হরি) ১.১২৬.৯-১৪]

☐ মহাভারতের বনপর্বে গঙ্গাদ্বার তীর্থকে দেব, দেবর্ষি ও গন্ধর্ব সেবিত মনোরম স্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভীষ্ম এখানেই পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশে তর্পণ করেছিলেন। গঙ্গাদ্বার তীর্থেই তিনি মহর্ষি পুলস্ত্যের দর্শন পেয়েছিলেন। সে সময় পুলস্ত্য ভীষ্মকে তীর্থযাত্রার মাহাত্ম্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন, যা বনপর্বে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। *[মহা (k) ৩.৮১.১৩-১৪; (হরি) ৩.৬৭.১৩-১৪]*

☐ গঙ্গাদ্বারে একাধিক উপতীর্থের অবস্থান। সেইসব উপতীর্থের মধ্যে কোটিতীর্থ একটি।

[মহা (k) ৩.৮৪.২৭; (হরি) ৩.৬৯.২৭]

☐ গঙ্গাদ্বার তীর্থের রক্ষাকর্তা হলেন 'ধাম' নামক ঋষিগণ। এটি একটি অতি পবিত্র ও দুর্গম স্থান। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে বর্ণিত গালবঋষির উপাখ্যানে স্বয়ং গরুড় গালব ঋষিকে গঙ্গাদ্বার সম্পর্কে বলেন যে, নারায়ণ ও জিষ্ণু ব্যতীত এস্থান অগম্য।

[মহা (k) ৫.১১১.১৬-১৯; (হরি) ৫.১০৩.১৬-১৯]

☐ একবার মহর্ষি অগস্ত্য ও তাঁর স্ত্রী লোপামুদ্রা গঙ্গাদ্বার তীর্থে এক কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.৯৭.১২; (হরি) ৩.৮১.১২]

☐ পাণ্ডবরা বনবাসকালে গঙ্গাদ্বার তীর্থ দর্শন করেছিলেন। গঙ্গাদ্বার অতিক্রম করেই তাঁরা হিমালয় পর্বতের মনোরম নানা দৃশ্য দেখতে পান।

[মহা (k) ৩.১৪০.৭; ৩.১৫৬.৯; (হরি) ৩.১১৬.৭; ৩.১২৯.৯; মৎস্য পু. ২৪৬.৯২]

☐ মহাদেব গঙ্গাদ্বার তীর্থেই পবিত্র গঙ্গানদীর জল মস্তকে ধারণ করেছিলেন। সেই জলেই মর্ত্যলোকের প্রাণরক্ষা হয়—

এতস্যাঃ সলিলং মুর্দ্ধ্না বৃষাঙ্কঃ পর্য্যধারয়ৎ।
গঙ্গাদ্বারে মহাভাগ যেন লোকস্থিতির্ভবেৎ॥

গঙ্গাদ্বারে শিব শিষ্যগণ পরিবৃত হয়ে বাস করেন বলে মহাভারতে এবং পুরাণগুলিতে উল্লেখ মেলে।

[মহা (k) ৩.১৪০.৯; (হরি) ৩.১১৮.৯; কূর্ম পু. ২.৪২.১৩]

□ দ্রৌপদীহরণে ব্যর্থ হয়ে জয়দ্রথ পাণ্ডবদের কাছে যারপরনাই পর্যুদস্ত ও লাঞ্ছিত হন। এরপর অপমানিত জয়দ্রথ গঙ্গাদ্বার তীর্থে মহাদেবের উদ্দেশে তপস্যা করেন। জয়দ্রথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে অর্জুন ব্যতীত অপর চার পাণ্ডবকে কোনো একদিনের যুদ্ধে পরাজিত করার বর দান করেন।

[মহা (k) ৩.২৭২.২৫; (হরি) ৩.২২৬.২৪]

□ পুরাকালে প্রজাপতি দক্ষ একবার গঙ্গাদ্বার তীর্থে একটি যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। সেই যজ্ঞে সরস্বতী নদী সুরেণু নামে উদ্ভূত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সুরেণু সপ্ত সরস্বতীর মধ্যে একটি।

[মহা (k) ৯.৩৮.২৮; ১২.২৮৩.২১; ১২.২৮৪.৩; (হরি) ৯.৩৬.২৬নং শ্লোক পরবর্তী পাদটীকা দ্রষ্টব্য; ১২.২৭৫.২১; ১২.২৭৬.৩]

□ গঙ্গাদ্বার তীর্থে স্নান করলে স্বর্গলাভ হয়। এটি একটি শুভ পিতৃতীর্থ।

[মহা (k) ১৩.২৫.১৩; (হরি) ১৩.২৬.১৩; মৎস্য পু. ২২.১০; ভাগবত পু. ৬.২.৩৯]

□ হস্তিনাপুর ত্যাগ করে বানপ্রস্থাশ্রমের সময় ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী এবং সঞ্জয় গঙ্গাদ্বার তীর্থে গিয়েছিলেন।

[মহা (k) ১৫.৩৭.১০; (হরি) ১৫.৪০.১০]

□ বানপ্রস্থকালে ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গাদ্বার তীর্থেই দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের স্মৃতির উদ্দেশে সেখানে প্রচুর দানধ্যান করেছিলেন।

[মহা (k) ১৫.৩৯.১৪-১৫; (হরি) ১৫.৪২.১৪-১৫]

□ শিবালিক পর্বত থেকে নির্গত হয়ে গঙ্গানদী যেখানে প্রবল বেগে ভারতীয় সমভূমিতে পদার্পণ করেছে, সেই স্থানটিই গঙ্গাদ্বার বা হরিদ্বার নামে খ্যাত। পৌরাণিকরা গঙ্গাকে ভগবান শ্রীহরির পদজাতা বলে উল্লেখ করেন। সেই নদী যেখানে হরির আবাস তুষারশুভ্র হিমালয় ত্যাগ করে সমভূমিতে নেমে আসে অর্থাৎ হরির আবাসের দ্বারপ্রান্তে এসে উন্মুক্তা হয়—সেইকারণেই স্থানটিকে হরিদ্বার বা গঙ্গাদ্বার বলে কল্পনা করা হয়েছে বলে মনে হয়। *[GDAMI (Dey) p. 74]*

গঙ্গাবদনতীর্থ নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত একটি তীর্থ। এই তীর্থটি গঙ্গেশ্বর তীর্থের নিকটেই অবস্থিত। এখানে মানুষ নিষ্কাম এমনকী সকাম হয়ে স্নান করলেও আজন্মকৃত পাপ থেকে মুক্তিলাভ করেন।

[কূর্ম পু. ২.৩৯.৯৯; মৎস্য পু. ১৯৩.২০]

গঙ্গাবরণসঙ্গম বারাণসী ক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি তীর্থ। বারাণসী ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বরণা নদী এই স্থানে গঙ্গায় এসে মিশেছে। উপযুক্ত তিথিতে এখানে স্নান করলে পিতৃপুরুষেরা বিষ্ণুলোকে পরমগতি প্রাপ্ত হন।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৪৫]

গঙ্গেশ্বরতীর্থ১ নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত একটি তীর্থ। এই তীর্থে শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতিথিতে স্নান করলে ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে বাস করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং পিতৃলোকের তর্পণ করে দেব, ঋষি ও পিতৃ এই তিন প্রকার ঋণ থেকে মুক্ত হন।

[কূর্ম পু. ২.৩৯.৯৭-৯৮; মৎস্য পু. ১৯৩.১৪-১৬]

গঙ্গেশ্বরতীর্থ২ নারদ পুরাণে বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত গঙ্গেশ্বর নামে একটি পবিত্র তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

[নারদ পু. (মহর্ষি) ২.৪৯.৪৬; কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৬৬]

গজ১ ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রকে রাবণবধে সহায়তা করার জন্য দেবতারা যেসব বানরবীরকে জন্ম দান করেন, গজ তাঁদের মধ্যে একজন বলে রামায়ণে উল্লিখিত হয়েছে। তবে গজ কোন্ দেবতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন, রামায়ণে তার উল্লেখ নেই। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বানরদের মহর্ষি পুলহের বংশধর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পুলহবংশীয় বানরদের মধ্যে গজের উল্লেখ পাই। *[রামায়ণ ৭.৪১.৪৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৪১]*

□ কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর অধিবাসী অভিজাত বানরবীরদের মধ্যে গজ নামে এক বানর-যূথপতির সন্ধান পাই, পূর্বোক্ত দেবাংশ-সম্ভূত গজও তিনিই বলে আমাদের মনে হয়। বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেকের সময় তাঁকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সঙ্গে

সাক্ষাতের জন্য কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করে গজের সুন্দর বাসভবন দর্শন করেন।

[রামায়ণ (মুধোলকর) ৪.২৬.৩৫; ৪.৩৩.৯; (তর্করত্ন) ৪.২৬.৩৫ (গদ্য পাঠ ধৃত হয়েছে); ৪.৩৩.৯]

□ রামকে সহায়তা করার জন্য সুগ্রীব যখন বানর সেনাদের একত্রিত হবার আদেশ দিলেন, তখন বানর যূথপতি গজ তিন কোটি বানরসেনা নিয়ে রামের সহায়তার জন্য এসেছিলেন। মহাভারতের বনপর্বে বর্ণিত রামোপাখ্যানেও উল্লিখিত হয়েছে যে, গজ বহুসংখ্যক বানরবীরকে নিয়ে রামের সহায়তার জন্য উপস্থিত হন।

[রামায়ণ ৪.৩৯.২৬; মহা (k) ৩.২৮৩.৩; (হরি) ৩.২৩৭.৩ (গদ্য পাঠ ধৃত হয়েছে)]

□ সুগ্রীব সীতার অনুসন্ধানের জন্য বানরদের যে দলটিকে দক্ষিণ দিকে পাঠিয়েছিলেন, অঙ্গদ, হনুমান প্রভৃতির সঙ্গে গজও সেই দলে ছিলেন। যখন সমুদ্রতীরে বানররা সম্পাতির মুখে সীতার সংবাদ পেলেন, তখন অঙ্গদ সমুদ্র পার হবার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। সঙ্গী বানরদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে তাঁরা কে কত যোজন পর্যন্ত লাফ দিয়ে যেতে পারেন। এই সময় গজ বলেছিলেন যে তিনি এক লাফে দশ যোজন পথ অতিক্রম করতে পারেন।

[রামায়ণ ৪.৪১.৩; ৪.৫০.৫-৮; ৪.৬৫.২-৩]

□ শেষ পর্যন্ত রাম-লক্ষ্মণ সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন করে বিশাল বানরসেনা নিয়ে লঙ্কায় পৌঁছালেন। গজ অঙ্গদের নেতৃত্বে লঙ্কার দক্ষিণদ্বার অবরোধ করেন। লঙ্কাযুদ্ধে বানরসেনাদের রক্ষা করার কাজে গজকে সবসময়ই ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। তপন নামে এক রাক্ষসবীরের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। ইন্দ্রজিতের বাণে গজ গুরুতর আহত হয়েছিলেন। তবে যুদ্ধের পর বানরবীর গজের আর বিশেষ কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

[রামায়ণ ৬.৪১.৩৯-৪০; ৬.৪২.৩১; ৬.৪৩.৯; ৬.৪৭.২-৪; ৬.৭৩.৪৪]

গজ$_3$ গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র। ইনি শকুনির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শকুনির ভাইয়েরা মিলে পাণ্ডবসেনা আক্রমণ করেন। সেই সময় যুদ্ধে অর্জুনের পুত্র ইরাবানের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

[মহা (k) ৬.৯০.২৭-৩০, ৪৫-৪৬; (হরি) ৬.৮৭.২৬-২৯, ৪৪-৪৫]

গজ$_3$ একজন বিশিষ্ট হস্তী।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৩২]

গজ$_4$ *[দ্র. গজহা]*

গজ$_5$ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে, ঋগ্‌বেদের অন্যতম ঋষি রথীতরের শিষ্য ছিলেন গজ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.৪]

□ যেসব ঋষিরা ঋগ্‌বেদের সংহিতা তৈরি করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রথীতর শাকপর্ণ (শাকপূর্ণ, শাকপূর্ণি) ছিলেন অন্যতম। সেই রথীতরের চারজন শিষ্যের মধ্যে গজ একজন। তবে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ছাড়া অন্য কোনো পুরাণে গজের নাম পাওয়া যায় না। আর পৈল যেহেতু সংহিতাকর্তাদের মূল পুরুষ, তাই গজ, শতবলাক ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর নাম থাকায় গজ নামটির সম্বন্ধে সন্দেহ তৈরি হয়।

[AIHT (Pargiter) p. 322-323]

গজ$_6$ তৃতীয় মন্বন্তরের অধিপতি উত্তম মনুর পুত্রদের মধ্যে একজন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৩৯]*

গজকর্ণ$_1$ কুবেরের সভায় অবস্থানকারী একজন বিশিষ্ট যক্ষ।

[মহা (k) ২.১০.১৬; (হরি) ২.১০.১৫]

গজকর্ণ$_2$ একজন বিশিষ্ট দানব। বায়ু পুরাণ মতে পাতালের চতুর্থ তল অর্থাৎ গভস্তলে তাঁর বাসভবন অবস্থিত ছিল। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে পাতালের চতুর্থ তলটির নাম তল। গজকর্ণ সেখানে বসবাস করেন।

[বায়ু পু. ৫০.৩১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.৩২]

গজকর্ণ$_3$ গয়াক্ষেত্রে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করলে অনেক পুণ্যফল লাভ হয় বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

[মৎস্য পু. ২২.৩৮; বায়ু পু. ১১১.৫৫]

গজবীথি *[দ্র. নক্ষত্র]*

গজমুখ কিন্নর বা গন্ধর্বদের একটি গণ। এঁদের মুখ হাতির মত হত বলে এই গণের গন্ধর্বদের গজমুখ বলা হয়েছে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.২২.৫৬]*

গজশিরা স্কন্দ-কার্ত্তিকেয়ের অনুচর একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৬০; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

গজশৈল মানস সরোবরের দক্ষিণে অবস্থিত একটি পর্বত। বায়ু পুরাণ মতে এটি রুদ্রদের আবাসভূমি।

[বায়ু পু. ৩৬.২৪; ৩৯.৪৭]

গজসাহ্বয় *[দ্র. হস্তিনাপুর]*

গজহা শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের অন্যতম। মহাদেবের গজহা নামের উৎস সন্ধান করতে গেলে পুরাণগুলির তথ্য এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। গজাসুর ছিল মহিষাসুরের পুত্র। দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করে দেবতাদের মহিষাসুরের অত্যাচার থেকে মুক্ত করলেন। কিন্তু গজাসুর পিতার হত্যাকারী পার্বতী ও শিবকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলেন না। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য গজাসুর কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। তাঁর তপস্যার তেজে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সন্তপ্ত হল। দেবতারা ভীত হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে অনুরোধ করলেন। দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা এসে উপস্থিত হলেন গজাসুরের সামনে। গজাসুরকে ইচ্ছানুসারে বর প্রার্থনা করতে বললেন তিনি। গজাসুর বর চাইলেন—কামের দ্বারা বশীভূত কোনো নর বা নারী আমাকে বধ করতে পারবে না। ব্রহ্মা গজাসুরকে সেই বর দিলেন। ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে গজাসুর দেব-মানব সকলের উপর অত্যাচার করতে লাগলেন। একসময় গজাসুর এলেন কাশীতে। যথারীতি সেখানেও নিরীহ মানুষজনকে অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে তুললেন তিনি। তখন দেবতারা জগৎকে গজাসুরের অত্যাচার থেকে মুক্ত করার প্রার্থনা নিয়ে গেলেন কৈলাসে, মহাদেবের কাছে। গজাসুরকে বধ করার জন্য মহাদেব এলেন কাশীতে। গজাসুর কামে বশীভূত নর বা নারীর অবধ্য ছিলেন। একমাত্র পরমেশ্বর শিবই তাঁকে হত্যা করতে সমর্থ ছিলেন, কারণ তিনি কাম-ক্রোধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়জাত বিকারের উর্ধ্বে। গজাসুর শিবকে আক্রমণ করলেন ঠিকই তবে পবিত্র বারাণসীক্ষেত্রে স্বয়ং শিবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তাঁর মনে মহাদেবের প্রতি ভক্তি জাগরিত হল। বারাণসীক্ষেত্রে শিবের হাতে যদি তাঁর মৃত্যু হয় তবে তিনি নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করবেন—গজাসুর একথা ভেবে শিবের হাতে মৃত্যুই প্রার্থনা করতে লাগলেন। ভগবান শিব তাঁর দিকে শূল নিক্ষেপ করলেও গজাসুর বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না। মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায় অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আশুতোষ মহাদেব গজাসুরের ভক্তিতে তুষ্ট হলেন। তিনি তাঁকে বর দিতে চাইলে গজাসুর মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষার কথা জানালেন তাঁকে। আর অনুরোধ করলেন—আমার যে গজচর্ম, তা আমার কঠোর তপস্যার ফলে পবিত্র এবং সুগন্ধযুক্ত হয়েছে। অগ্নির দহনশক্তি বা আর কোনো কিছুই একে নষ্ট করতে পারে না। এই গজচর্ম আপনি পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করুন। ভগবান শিব গজাসুরের সেই অনুরোধ রক্ষা করলেন। গজাসুরকে বধ করার জন্যই ভগবান শিব গজহা নামে খ্যাত।

গজাসুরের অনুরোধে তাঁর আর্দ্র চর্মটিকে পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন বলে মহাদেব শিবসহস্রনাম স্তোত্রে 'আর্দ্রচর্মাম্বরাবৃত' নামেও সম্বোধিত হয়েছেন।

গজচর্মধারী ভগবান শিব কাশীক্ষেত্রে কৃত্তিবাসেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে পূজিত হন।

[মহা (k) ১৩.১৭.৪৮; (হরি) ১৩.১৬.৪৮; স্কন্দ পু. (গুরুমণ্ডল) কাশীখণ্ড ২.৬৮.১০-২৯]

গজারোহী প্রাচীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে রাজপদগুলি প্রচলিত ছিল, গজারোহী তাদের মধ্যে একটি। মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে, রাজার গজারোহীকে হস্তী বিশারদ হতে হবে। প্রাণী ও বনাঞ্চল বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান থাকলে এবং কষ্টসহিষ্ণু হলে তবেই সে এই পদের উপযুক্ত। এই জাতীয় পদাধিকারীদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাহুত বলেই মনে হয়।

[মৎস্য পু. ২১৫.৩৭]

গজাসুর একজন অসুর। শিবের হাতে গজাসুরের মৃত্যু হয়।

গজাসুরানঙ্গপুরান্ধকাদি।
বিনাশমূলায় নমঃ শিবায়॥ *[দ্র. গজহা]*

[মৎস্য পু. ৫৫.১৬]

গজেন্দ্রমোক্ষণ *[দ্র. অগস্ত্য (পুরাণকোষ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩১]*

গণতীর্থ শ্রাদ্ধকার্যের জন্য উপযুক্ত একটি তীর্থ হল গণতীর্থ। *[মৎস্য পু. ২২.৭৩]*

গণেশ 'গণ' বলত মলূত শিব-মহাদেবের অনুচর-প্রমথদের বোঝানো হয়। আর গণেশ হলেন তিনিই, যিনি এই প্রমথবর্গের মধ্যে মুখ্য, প্রমথগণের অধিপতি, অধীশ্বর। সেক্ষেত্রে গোড়াতেই জানিয়ে রাখা ভালো যে, শিব-পার্বতীর যে গজানন পুত্র, যাঁকে আমরা সমস্ত দেবতাদের মধ্যে অগ্রপূজার অধিকারী, বিঘ্নেশ্বর গণেশ নামে চিনি, তাঁর জন্মকালীন নাম কিন্তু

গণেশ ছিল না। 'গণেশ' নাম এবং সমতুল্য মর্য্যাদা সমস্ত কিছুই তিনি পরে লাভ করেছিলেন।

বৈদিক দেবতাদের মধ্যে অবশ্য গণেশের উল্লেখ নেই। মহাভারতে গণেশের নাম উল্লিখিত হলেও তাঁর জীবনকথা সেখানে চর্চিত হয়নি। গণেশের জন্মকথা এবং তাঁর জীবনকথার মূল উৎস কিন্তু পুরাণগুলি। পুরাণভেদে কাহিনীর পার্থক্যও বড়ো কম নয়। শুধুমাত্র গণেশের জন্মকথা নিয়েই বিভিন্নপুরাণে বহুসংখ্যক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাঁর জীবন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাহিনীও পুরাণগুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যথাসম্ভব সেগুলিকে সংগ্রহ করে আমরা গণেশ-চরিত্র নির্মাণের চেষ্টা করব।

□ আমরা গণেশের জন্মকথায় আসি। গণেশকে বেশিরভাগ পুরাণই শুধুমাত্র পার্বতীর পুত্র বলে উল্লেখ করেছে। কোথাও কোথাও অবশ্য শিবের পুত্রও বলা হয়েছে তাঁকে। তবে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত এবং হস্তীমুখ লাভের কাহিনী অত্যন্ত বিচিত্র—এক একটি পুরাণে সেই কাহিনী এক এক রকম স্বাদে, রসে পরিবেশিত হয়েছে। বেশ কয়েকটি কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে যে, গণেশ তাঁর জন্মের সময়েই হস্তীমুখ ছিলেন। আবার অনেক পুরাণেই দেখা যাচ্ছে যে, গণেশ সাধারণ মানবদেহ নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন, গজমুখ তাঁর পরে হয়েছিল। গণেশ সম্পর্কে এই মতটিই বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয়। যাই হোক, আমরা গণেশের জন্ম বিষয়ক প্রতিটি কাহিনীই একে একে আলোচনা করব।

মৎস্য পুরাণে বর্ণিত হয়েছে, শিবজায়া পার্বতী পুত্রপ্রার্থী ছিলেন। মনে তাঁর বড়ো ইচ্ছা, একটি বড়ো সুন্দর ছেলে হোক তাঁর। একদিন এইসব ভাবতে ভাবতেই স্নানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন পার্বতী। সখীরা তাঁর চুলে মাখিয়ে দিচ্ছিল সুগন্ধী তেল, গায়ে নানা অনুলেপন। তারপর পার্বতী গাত্রমার্জনা করে সেই সব অনুলেপন এবং স্বেদজ গাত্রমল—সমস্তটা একত্রিত করলেন। তারপর কতকটা খেলার পুতুল গড়ার মতোই পার্বতী এক গজমুখ বালকের মূর্তি নির্মাণ করলেন। পুতুলটি বড়ো সুন্দর হল। পার্বতীর মনে হল, ঠিক এমনই একটি পুত্র যেন কতকাল ধরে কামনা করছেন তিনি। তবু পুতুল তো পুতুলই হয়, সে তো আর সত্যি সত্যি ছেলে নয় তাই খেলতে খেলতে একসময় পার্বতী সেটিকে ভাসিয়ে দিলে গঙ্গার জলে। এদিকে গঙ্গার জলে পড়ামাত্র সেই পুতুলটিতে প্রাণের সঞ্চার হল, ছোটো পুতুলটি একটি বালকের উপযুক্ত আকার লাভ করল। দেবী পার্বতী তা দেখে পরম স্নেহে, মহানন্দে বালকটিকে 'পুত্র' বলে সম্বোধন করলেন। পার্বতীর এই পুত্রকে ভগবান শিবও নিজের পুত্র বলে মেনে নিলেন। এদিকে গঙ্গার স্পর্শে সেই বালকের দেহে প্রাণসঞ্চার হয়েছিল, ফলে জাহ্নবী গঙ্গাও এঁকে আপন পুত্র বলেই কল্পনা করলেন। সেই ভাবনা থেকে শিব-পার্বতীর পুত্র গজানন-গণেশ গাঙ্গেয় নামেও সম্বোধিত হন। স্বয়ং লোকপিতামহ ব্রহ্মা এসে সেই বালককে 'গণাধিপত্য' দান করলেন, তিনি সমস্ত দেবতাদের অগ্রে পূজিত হবেন—এমন ঘোষণাও করলেন ব্রহ্মা। সেই বালকই গণপতি-গণেশ নামে খ্যাত হলেন পরবর্তী সময়ে।

[মৎস্য পু. ১৫৪.৪৯৯-৫০৫]

□ পার্বতীর দ্বারা গণেশের প্রতিকৃতি নির্মাণ এবং তাতে প্রাণ সঞ্চারের কাহিনীটি শুধু মৎস্য পুরাণ নয়, প্রায় সমস্ত পুরাণেই একরকম। শুধু তথ্যগত পার্থক্য কিছু আছে। কয়েকটি পুরাণে বলা হয়েছে যে পার্বতী যে মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন, তা নরমুখই ছিল, গজমুখ ছিল না। পরবর্তী সময়ে তার গজানন রূপ লাভ হয়। কিন্তু গণেশ কী করে গজানন হলেন সে কাহিনীতে আমরা পরে আসব। তার আগে তাঁর জন্ম সংক্রান্ত যে বিচিত্র কাহিনীগুলি বিভিন্ন পুরাণে ছড়িয়ে আছে সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকারে একত্রিত করা প্রয়োজন।

বামন পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, শিব-পার্বতীর বিবাহের পর দেবতারা শিবকে আপন তেজে পুত্র উৎপাদন না করার অনুরোধ করলেন। কারণ শিবের তেজসম্পন্ন পুত্র শিবের সমতুল্যই হবে; অজেয়, অমর—যেন শিবেরই প্রতিরূপ। শিব-দেবতাদের অনুরোধে সম্মতি দিলেন ঠিকই কিন্তু এই ঘটনায় পার্বতী অসম্ভব ক্রুদ্ধ, দুঃখিত হলেন। তিনি দেবতাদের শাপ দিলেন—আজ থেকে তোমরাও আপন পত্নীদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করতে পারবে না। অভিশাপ দিয়ে ক্রুদ্ধ পার্বতী স্নান করতে গেলেন। সেই সময়েই পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষায় পার্বতী স্নানের উপকরণ অনুলেপন

অঙ্গজ মল ইত্যাদি দিয়ে বালকের আকৃতি নির্মাণ করলেন। তারপর সন্তানহীনতার দুঃখে সেই বালকটিকে স্নানগৃহের আসন (পিঁড়ি)-এর নীচে রেখে চলে এলেন পার্বতী। কিছুক্ষণ পরে স্বয়ংশিব সেই স্নানগৃহে এলেন এবং সেই আসনে বসে স্নান করলেন। শিবের দেহ থেকে জলবিন্দু আসন বেয়ে এসে পড়ল সেই বালকের মূর্তিতে। তৎক্ষণাৎ সেই মূর্তিতে প্রাণের সঞ্চার হল, বালক উঠে দাঁড়াল শিবের সামনে। শিব বুঝলেন, এই বালক তাঁর আর পার্বতীরই পুত্র। এই পুত্রই পরবর্তীকালে গণেশ নামে প্রসিদ্ধ হন।

[বামন পু. ৫৪.৫৭-৬৬]

□ স্কন্দ পুরাণের প্রভাস খণ্ডে গণেশের জন্মের একটি নতুন কাহিনী পাওয়া যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে, পার্বতী একদিন নিছক খেলার ছলে গাত্রানুলেপন দিয়ে একটি বালকের আকৃতি নির্মাণ করছিলেন পার্বতী। সমস্ত দেহটাই তৈরি হয়ে গেছে, শুধু মাথাটা বাকি—এই অবস্থায় অনুলেপন শেষ হয়ে গেল। পার্বতী পুত্র কার্তিকেয়কে মূর্তি নির্মাণের জন্য আরও খানিকটা অনুলেপন নিয়ে আসতে বললেন, মায়ের আদেশে কার্তিকেয় গেলেন ঠিকই, কিন্তু অনুলেপন খুঁজে পেলেন না, তবু মায়ের মূর্তি নির্মাণ যাতে সম্পন্ন হতে পারে তার জন্য কার্তিকেয় একটি মত্ত হস্তীর মাথা কেটে নিয়ে এলেন মায়ের কাছে। মূর্তিতে সেই গজানন সংযুক্ত করে প্রাণসঞ্চার করলেন পার্বতী। জন্ম নিলেন গণেশ। অবশ্য স্কন্দ পুরাণের প্রভাসখণ্ডের অন্তর্গত অন্য একটি অধ্যায়ে শিবের কৃপায় পার্বতীর দ্বারা নির্মিত প্রতিকৃতি থেকে গণেশের জন্মের কথা বর্ণিত হয়েছে।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/অর্বুদ) ৩২.২-১১; ৫২.১৮-২৯]

□ স্কন্দ পুরাণের নাগর খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে যে, পার্বতী গাত্রানুলেপন দ্বারা বালকের মূর্তি নির্মাণ করেছেন দেখে ভগবান শিব বুঝলেন যে, পার্বতী এমনই একটি পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছেন মনের মধ্যে। তখন স্বয়ং ভগবান শিব সেই মূর্তিতে প্রাণসঞ্চার করেন। জন্ম হয় গণেশের। *[স্কন্দ পু. (নাগর) ২১৪.৪৮-৫২]*

□ বরাহ পুরাণে গণেশের জন্ম সম্পর্কে একটি নতুন ধরনের কাহিনী পাওয়া যায়। সেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, একসময় সমস্ত জগৎ থেকে যাতে অন্যায় পাপ-বিঘ্ন ইত্যাদি দূরীভূত হয়, তার জন্য দেবতারা ভগবান শিবের শরণাপন্ন হলেন। ভগবান শিব তাঁদের অনুরোধ শুনে চিন্তা করতে লাগলেন। এই সময় হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল দেবী উমা পার্বতীর মুখমণ্ডলে। মহাদেব নির্নিমেষ নয়নে উমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। এক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে শিব ভাবলেন-পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু—সব কিছুরই মূর্তি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আকাশ বা ব্যোমের কোনো আকার নেই কেন? হঠাৎই এমন ভাবনা মাথায় আসতে চিন্তারত মহাদেব আপনমনেই হেসে উঠলেন। সেই হাসি থেকে এক অপূর্ব সুন্দর তেজস্বী বালকের জন্ম হল। বালকের রূপে সকলেই মুগ্ধ হল, স্বয়ং পার্বতীও তাঁর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন। পার্বতীকে অমন অনিমিষ নয়নে সেই বালকের দিকে তাকাতে দেখে শিব ক্ষুব্ধ হলেন, তাঁর ধারণা হল বালকের রূপ পার্বতীর চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ হয়ে উঠেছে। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি সেই বালককে অভিশাপ দিলেন—তুমি আজ থেকে গজমুখ হও, তোমার উদর লম্বিত হোক। মহাদেবের ক্রোধকম্পিত দেহ থেকে সেই সময় অসংখ্য গজমুখ, অস্ত্রধারী বিনায়কের উৎপত্তি হল। ক্রোধ শান্ত হবার পর ভগবান শিব ভাবতে লাগলেন—এই বিপুল সংখ্যক বিনায়ক সৃষ্টির কোন কাজে আসবে? তারপর সস্নেহে সেই পূর্বে সৃষ্ট বালককে তিনি নিজের পুত্র বলে গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে এই সমস্ত বিঘ্ননাশক বিনায়কদের অধিপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সমস্ত জগতের পাপ-বিঘ্ন-অন্যায় দূর করার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করলেন দেবতারা। শিবের পুত্র বিঘ্নেশ্বর গণেশ নামে প্রসিদ্ধ হলেন।

[বরাহ পু. ২৩.১-৩৮]

□ লিঙ্গপুরাণে এমন উল্লেখও পাওয়া যায় যে, শিব-পার্বতীর বিবাহের পর দেবতারা তারকাসুর হন্তা শিবপুত্রের অপেক্ষায় ছিলেন, কিন্তু এদিকে তারকাসুরের অত্যাচারও ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। সেই সময় শিব দেবতাদের এবং মুনি ঋষিদের রক্ষা করার জন্য গণেশের সৃষ্টি করেন। লিঙ্গ পুরাণের এই কাহিনী অনুযায়ী গণেশ কার্তিকেয়ের অগ্রজভ্রাতা।

[লিঙ্গ পু. ১.১০৫.৮-৯]

□ আমরা গণেশের জন্মবিষয়ক নানা কাহিনী আলোচনা করলাম, এবার গণেশের গজমুখ লাভ এবং 'গণেশ' পদলাভের কাহিনীতেও আসি। আগেই বলেছি, পুরাণগুলিতে গণেশের জন্ম সম্পর্কে যেমন অজস্র কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তেমনই তাঁর নরমুণ্ড নষ্ট হয়ে গজমুখলাভের কাহিনীর সংখ্যাও কিন্তু অল্প নয়। বিভিন্ন পুরাণে যেখানে গণেশ জন্মকালে নরমুণ্ড নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে গণেশের গজমুখলাভের সম্পর্কেও একাধিক কাহিনী বর্ণিত হতে দেখা যায়। এরমধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত এবং বিখ্যাত কাহিনীটি পাওয়া যায় শিবপুরাণে। শিবপুরাণে বর্ণিত হয়েছে— বিবাহের পর পার্বতী কৈলাসপর্বতে শিবের বাসভবনে এসে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তাঁর পিতৃগৃহের দুই সখী জয়া-বিজয়াও তাঁর সঙ্গে কৈলাসে এলেন। কৈলাসে স্বয়ং শিবের অনুচর নন্দী এবং অন্যান্য প্রমথরা দেবীর ভবনের দ্বাররক্ষা করতেন ঠিকই, তবু বড়ো অসুবিধা দেখা দিল। কারণ এই প্রমথরা সকলেই শিবের অনুগত, ফলে শিব এঁদের গ্রাহ্য না করেই সময়ে-অসময়ে অন্তঃপুরে এসে প্রবেশ করেন। একবার তো দেবী পার্বতী স্নান করছিলেন, এমন সময় শিব সটান স্নানগৃহেই এসে উপস্থিত হলেন। এমন কাণ্ড দেখে পার্বতীর দুই সখী জয়া-বিজয়া তাঁকে পরামর্শ দিলেন—এটা শিবের অনুচরের কর্ম নয়। তোমার নিজেরই একজন একান্ত বিশ্বস্ত সেবকের প্রয়োজন। যে তোমার নিকটাত্মীয়ও হবে, তোমার একান্ত অনুগত হবে, আর সব থেকে বড়ো কথা—সর্বাগ্রে তোমারই আদেশ সদাসর্বদা পালন করবে। নইলে তো অন্তঃপুরের ন্যূনতম অন্তরালটুকুও বজায় থাকার কোনো উপায় দেখছি না। পার্বতীও তা বিলক্ষণ বুঝছিলেন। ফলে জয়া-বিজয়ার পরামর্শ তাঁর যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হল। তাছাড়া কার্তিকেয়ের জন্ম হয়ে গিয়েছে, কিন্তু পার্বতীর গর্ভে সে জন্ম হয়নি। আপন অঙ্গজ আত্মজ-পুত্রের আকাঙ্ক্ষা না হয় নাই পূরণ হল, তবু নিজের হাতে পুত্র সৃষ্টি করার আনন্দটাও এই সঙ্গেই পূরণ করতে চাইলেন পার্বতী। জলাশয়ের ধার থেকে কাদা মাটি তুলে নিয়ে ঠিক নিজের ছেলেটি যেমন দেখতে হলে ভালো লাগত, তেমনটি কল্পনা করে একটি বালকের মূর্তি নির্মাণ করলেন পার্বতী। তারপর সেই মূর্তিতে প্রাণসঞ্চার করে তাকে পুত্র বলে সম্বোধন করলেন। সদ্যোজাত সর্বাঙ্গসুন্দর সেই বালককে সুন্দর বস্ত্র অলংকারে সাজিয়ে পার্বতী বললেন—তুমি আমার দ্বারা সৃষ্ট, একান্তই আমারই পুত্র। বালক পুত্র পার্বতীকে বললেন—মা! আপনি আদেশ করুন, আমি কী করব? পার্বতী বললেন—পুত্র! তুমি এখন আমার দ্বাররক্ষক হও। আমি স্নান করতে যাচ্ছি, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত, আমার বিনা অনুমতিতে তুমি কাউকে ভিতরে প্রবেশ করতে দিও না। পার্বতীর আদেশে বালক হাতে লাঠি নিয়ে অন্তঃপুরের দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হলেন। লক্ষণীয়, পার্বতী পুত্র সৃষ্টি করলেন ঠিকই, কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি সেই পুত্রের নামকরণ করেননি। অন্তত পুরাণগুলিতে তেমন কোনো উল্লেখ নেই। যাই হোক, ছেলেকে পাহারায় বসিয়ে রেখে পার্বতী ভিতরে চলে গেলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই স্বয়ং মহাদেব তাঁর অনুচরদের নিয়ে অন্তঃপুরের দ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। শিব ভিতরে প্রবেশ করতে যাবেন, এমন সময় বালক গণেশ তাঁকে এসে বাধা দিলেন। গণেশ বললেন— তুমি কে? কোথায় যাচ্ছ? দাঁড়াও, মা স্নান করছেন, তিনি অনুমতি না দিলে তুমি ভিতরে যেতে পারবে না। লাঠি হাতে এক বালক দরজায় পাহারা দিচ্ছে দেখে শিব একটু অবাক হলেন, ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা পেয়ে সামান্য বিরক্তও হলেন কিন্তু বালক বলেই তাকে তিরস্কার করতেও মন চাইল না। শিব বললেন—আরে, আমি বাইরের লোক কেউ নই। আমি শিব, পার্বতীর স্বামী। এটুকু বলে শিব পাশ কাটিয়ে চলেই যেতে চাইছিলেন কিন্তু গণেশ লাঠি হাতে দরজা আটকে দাঁড়ালেন— কে শিব? তুমি ভিতরে কেন যাচ্ছ? শিব আরও বার দু-এক বলে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু গণেশ কিছুতেই তাঁকে ভিতরে যেতে দেবেন না। উল্টে তিনি শিবকেই লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করলেন। শিব তখন বিরক্ত হয়ে নিজের অনুচর-প্রমথদের বললেন—এ ছেলেকে সরাও দরজা থেকে। এই কথা বলে ক্রুদ্ধ শিব সেখান থেকে চলে গেলেন। এদিকে শিবের অনুচরদের সঙ্গে গণেশের প্রথমে কলহ আরম্ভ হল। কিন্তু গণেশ কিছুতেই শিবকে রাস্তা ছেড়ে দেবেন না। মিষ্টি কথায়, বাদবিতণ্ডায়

কিছুতেই গণেশকে বশে আনতে না পেরে শিবের অনুচররা হতাশ হয়ে শিবের কাছে ফিরে গেলেন। নিজের বীর অনুচরদের এমন কাপুরুষের মতো শুধুমাত্র বাগ্‌যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ফিরে আসতে দেখে শিব ভীষণ বিরক্ত হয়ে তাঁদের তিরস্কার করলেন। শিবের প্ররোচনায় প্রমথরা আবার গণেশকে শাসন করতে গেলেন। এবার গণেশের সঙ্গে তাঁদের প্রচণ্ড যুদ্ধ বেঁধে গেল। একদিকে নানা ভয়ংকর অস্ত্রশস্ত্র হাতে শিবের অনুচররা, অন্যদিকে একটি লাঠিমাত্র হাতে নিয়ে একা গণেশ। তবু বালক গণেশের পরাক্রমের কাছে প্রমথদের হার স্বীকার করতে হল, অনেকে গুরুতর আহতও হলেন। এতক্ষণ দেবর্ষি নারদ দূর থেকে এই কলহ, যুদ্ধ সব পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। ব্যাপার গুরুতর দেখে তিনি স্বর্গে গিয়ে দেবতাদের বিস্তারিত জানাবেন। ইন্দ্রসহ দেবতারা খবর শুনে ছুটে এলেন কৈলাসে। এলেন লোকপিতামহ ব্রহ্মা এবং শ্রীহরি বিষ্ণুও। ভগবান শিবের মুখ থেকে সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনে ব্রহ্মা গণেশকে মিষ্টি কথায় শান্ত করতে গেলেন। কিন্তু ব্রহ্মাকে দেখে গণেশ ভাবলেন—এ বোধহয় শিবেরই কোনো অনুচর হবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। গণেশ ব্রহ্মাকে কথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়েই তাঁকে আক্রমণ করলেন। তারপর ব্রহ্মার গোঁফ দাড়ি ধরে দিলেন একটান। দাড়ি উপড়ে যাওয়ায় ব্রহ্মা আহত তো হলেনই তার পরেও যখন দেখলেন যে গণেশ দরজার খিল হাতে নিয়ে তাঁর দিকেই তেড়ে আসছেন তখন ব্রহ্মা ওরে বাবারে, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যুদ্ধ করতে আসিনি—বলতে বলতে সটান পলায়ন করলেন। এবার প্রমথগণ এবং দেবতারা সম্মিলিত ভাবে গণেশকে আক্রমণ করলেন। দুপক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। কিন্তু এত কাণ্ড করেও গণেশকে পরাস্ত করা গেল না। উলটে আক্রমণকারীরাই অল্পবিস্তর আহত হলেন এবং রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হলেন। গণেশের পরাক্রম দেখে তাঁকে যেন মূর্তিমান কাল বলে মনে হতে লাগল। দেবতা, ঋষি, প্রমথ সকলেই তাঁর পরাক্রমে ভীত হলেন। তখন বিষ্ণু এবং শিব গণেশকে পরাস্ত করার জন্য পরামর্শ করে রণকৌশল স্থির করলেন। গণেশকে সামনে থেকে আক্রমণ করলেন স্বয়ং বিষ্ণু। গণেশকে বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত দেখে সেই সুযোগে শিব পিছন দিক থেকে গণেশের ওপর ত্রিশূল দিয়ে আঘাত করলেন। ত্রিশূলের আঘাতে গণেশের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হল, তাঁর দেহ নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। ঘটনা দেখে নারদ গেলেন মহাদেবের অন্তঃপুরে। নারদের মুখে নিজের পুত্রের নিহত হবার বৃত্তান্ত শুনে শক্তিস্বরূপা দেবী পার্বতী ক্রুদ্ধ হলেন। আপন পুত্রের জন্য বিলাপ করতে করতে দেবী অন্তঃপুর থেকে বাইরে এলেন। পুত্রশোকে কাতর দেবী দেবতা প্রমথ এমনকী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের ওপরেও ক্রুদ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ সৃষ্টিই ধ্বংস করবেন বলে স্থির করলেন। পার্বতীর দেহ থেকে শতসহস্র শক্তিরূপিণী রণসজ্জায় সজ্জিতা নারীর আবির্ভাব হল। পার্বতী তাঁদের আদেশ করলেন—তোমরা এই সম্পূর্ণ সৃষ্টি ধ্বংস কর। দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস গন্ধর্ব, প্রমথ এমনকী আমার আত্মীয় স্বজনদের প্রতিও মায়া-দয়া দেখাবার কোনো প্রয়োজন নেই। দেবীর আদেশে তাঁর অনুচরীরা সম্পূর্ণ সৃষ্টি ধ্বংস করতে উদ্যত হলেন। চারদিকে হাহাকার পড়ে গেল। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই ভয়াবহ পরিস্থিতির হাত থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করার উপায় চিন্তা করতে বসলেন। তারপর যে কোনো উপায়ে পার্বতী তুষ্ট হলেই জগৎ রক্ষা পাবে বলে বিবেচনা করে তাঁরা পার্বতীকে তুষ্ট করার চিন্তা আরম্ভ করলেন। কিন্তু পার্বতী তখন এতই ক্রুদ্ধ যে, তিনি কীভাবে তুষ্ট হবেন একথা জিজ্ঞাসা করতে তাঁর সামনে যাবার সাহসও কেউ দেখাতে পারলেন ন। স্বয়ং শিবও নয়। শেষপর্যন্ত নারদ পার্বতীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ভীত ভাবে। অনেক স্তব-স্তুতি-পূজায় তাঁকে তুষ্ট করে নারদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—কী উপায়ে সৃষ্টিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব? ভগবান শিব আপনার স্বামী, আমরা সকলেই আপনার অনুগত ভক্ত, সন্তানের মতো। আমরা আপনাকে প্রসন্ন করার জন্য যে কোনো অসাধ্য কাজও করতে সম্মত আছি। আপনি এই সৃষ্টিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন। পার্বতী নারদের কথায় প্রসন্ন হয়ে বললেন—দেখ, যদি আমার পুত্র আবার জীবনলাভ করে, আর যদি তোমরা সকলে তাকে সমস্ত দেবতাদের পূজনীয় এবং শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করো, তাহলেই এই সৃষ্টি ধ্বংসের হাত থেকে

রক্ষা পাবে। নারদ পার্বতীর কথা মহাদেব তথা অন্য দেবতাদের জানালেন। মহাদেব ব্যস্ত হয়ে নিজের অনুচরদের তথা দেবতাদের আদেশ করলেন—গণেশ যাতে শীঘ্রই পুনর্জীবন লাভ করেন, তার ব্যবস্থা করো। সকলে গণেশের ছিন্ন মুণ্ডটির সন্ধান করতে লাগলেন কারণ মাথা আর ধড় জোড়া না লাগলে পুনর্জীবনলাভ অসম্ভব। কিন্তু শত খোঁজাখুঁজি করেও সেই ছিন্ন মুণ্ডটি কোথাও পাওয়া গেল না। তখন শিব তাঁর অনুচরদের আদেশ করলেন—পার্বতীর পুত্রের ধড়টিকে ভালো করে স্নান করিয়ে তার পূজা অর্চনা কর। আর তোমাদের মধ্যে কোনো একজন উত্তর দিকে যাত্রা করো। সেখানে প্রথম যে প্রাণীটিকে দেখতে পাবে তার মস্তক ছেদন করে এনে এই বালকের ধড়ে সংযুক্ত করলেই বালক পুনর্জীবন লাভ করবে। সেই মতো আয়োজন হল। গণেশের ধড়টিকে স্নান করিয়ে সুসজ্জিত করে তার পূজা করা হল। এরপর শিবের অনুচররা উত্তরদিকে যাত্রা করে প্রথমেই যার দেখা পেলেন, সে একটি হাতি। শিবের আদেশমতো তাঁরা সেই হাতির মাথাটিই কেটে নিয়ে ফিরে এলেন কৈলাসে। সেই হাতির মাথাটি গণেশের ধড়ে সংযুক্ত করা মাত্র গণেশ প্রাণ লাভ করলেন। গণেশকে আবার জীবন্ত দেখে পার্বতী আনন্দিত হয়ে পুত্রকে স্নেহ চুম্বনে ভরিয়ে দিলেন। ভগবান শিবও গণেশকে নিজের পুত্র বলে গ্রহণ করলেন। তারপর পার্বতীর ইচ্ছা অনুযায়ী দেবতারা গণেশকে দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অগ্রপূজার অধিকারী বলে ঘোষণা করলেন। মহাদেবও ঘোষণা করলেন যে, শিবের যাঁরা অনুচর বা গণ তাঁদের অধিপতিও এখন থেকে পার্বতীপুত্রই। গণের অধিপতি হিসেবেই তিনি প্রসিদ্ধ হলেন গণেশ নামে। এছাড়াও শিব তাঁকে বর দিলেন—তুমি আজ থেকে বিঘ্নহর্তা নামেও প্রসিদ্ধ হবে। সমস্ত দেবতাদের আদরে উপহারে পূজা বন্দনায় কৈলাসে একরকম উৎসবের বাতাবরণ তৈরি হল। আর সেই দিন থেকেই অগ্রপূজার অধিকারী রূপে অধিষ্ঠিত হলেন শিব-পার্বতীর পুত্র বিঘ্নহর্তা গজানন গণেশ।

[শিব পু. (জ্ঞান) ৩২-৩৪ অধ্যায়]

☐ অবশ্য গণেশের মুণ্ডচ্ছেদ এবং গজমুখ লাভের কারণ হিসেবে পুরাণে অন্যরকম কাহিনীও পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে প্রাপ্ত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, পার্বতীপুত্র গণেশের জন্মোৎসবে নবজাতককে অভিনন্দন জানাতে দেবতারা সকলে কৈলাসে সমবেত হয়েছিলেন। সূর্যপুত্র গ্রহরাজ শনিও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু শনির দৃষ্টি অশুভ, এ অবস্থায় তিনি নবজাতককে দর্শন করেন কেমন করে? তবু পার্বতীর অনুমতি নিয়ে দেবী-দেবতাদের সাক্ষী রেখে, সাক্ষাৎ ধর্মকে সাক্ষী করে শনি তাঁর ডান চোখ দিয়ে একটি বার মাত্র গণেশের দিকে চেয়ে দেখলেন। আর তাতেই শিশুর মুণ্ড ভস্মীভূত হল। অবশেষে ভগবান বিষ্ণু উত্তর দিক থেকে এক হাতির মাথা কেটে এনে গণেশের দেহের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁকে পুর্নজীবন দান করেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এই কাহিনী বর্ণনা করার পর কয়েক অধ্যায় পরে বলা হয়েছে যে, গণেশের এই মুণ্ডচ্ছেদের ঘটনা নাকি একেবারে আকস্মিক ঘটনা নয়। এক সময় মালী এবং সুমালী নামে দুই অসুর ছিলেন। তাঁরা অসুর হলেও ভগবান শিবের পরম ভক্ত। একসময় দেবাসুর যুদ্ধে সূর্য দেবতা এই মালী-সুমালীকে বধ করেন। তা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ভগবান শিব সূর্যের উদ্দেশেই ত্রিশূল নিক্ষেপ করলেন। ত্রিশূলের আঘাতে সূর্য নিজের রথ থেকে পড়ে গেলেন, গুরুতর আহত হয়ে মূর্ছিত হলেন। সূর্য স্থানচ্যুত হওয়ায় সমস্ত জগতে অন্ধকার নেমে এলো। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের প্রচেষ্টায় সূর্য আবার সুস্থ হয়ে জগৎ আলোকিত করলেন ঠিকই, কিন্তু সূর্যের পিতা কশ্যপ গোটা ঘটনায় শিবের ওপর এতটাই ক্রুদ্ধ হলেন যে তিনি শাপ দিলেন—আমার পুত্রকে তুমি যেমন অন্যায় ভাবে আঘাত করেছ ঠিক তেমনই তোমার পুত্রেরও মুণ্ড ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সেই অভিশাপের ফলেই গণেশের মুণ্ড ছিন্ন হয়েছিল।

[ব্রহ্মবৈবর্ত পু. গণেশ ১২ অধ্যায় এবং ১৮ অধ্যায়]

☐ যাই হোক, গণেশ গজানন তো হলেন কিন্তু তাঁর গজমুখের দুটি গজদন্তের মধ্যে একটি আবার ভাঙা পড়ল একসময়। গণেশের দাঁত কীভাবে ভাঙা গেল—সে বিষয়েও পুরাণগুলিতে একাধিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যাই হোক দাঁত ভাঙার পর বিঘ্নহর্তা গণেশ একদন্ত নামেও বিখ্যাত হলেন। *[দ্র. একদন্ত (পুরাণকোষ ১ম খণ্ড)]*

□ গণেশের বিবাহের উপাখ্যানও কিছু কম বিচিত্র নয়। শিব পুরাণে প্রাপ্ত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, কার্ত্তিকেয় এবং গণেশ— দুজনেই ধীরে ধীরে বড়ো হলেন পিতামাতার স্নেহছায়ায়। তাঁদের বিবাহের বয়সও হল। আর পাঁচজন সাধারণ বাবা-মায়ের মতোই শিব-পার্বতীও পুত্রদের বিবাহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। এমন সময় একদিন তাঁদের কানে এলো—কার্ত্তিকেয় এবং গণেশ দুই ভাই ঝগড়া করছেন। কার্ত্তিকেয় বলছেন—আমার বিবাহ আগে হবে আবার গণেশ বলছেন— কখনোই নয়, আমার বিবাহ আগে হবে। ছেলেদের এই তর্কাতর্কি দেখে শিব-পার্বতী একটা পরিকল্পনা করলেন। তাঁরা একদিন দুই পুত্রকে কাছে ডেকে বললেন—বাছা! তোমাদের এখন বিবাহের বয়স হয়েছে। গুণে, বুদ্ধিতে, বীরত্বে তোমরা কেউই কারও চেয়ে কম নও, দুজনেই সমান। তাই তোমাদের মধ্যে কার বিবাহ আগে হওয়া উচিত—এ নিয়ে আমরা বড়ো ভাবনায় পড়েছি। তাই আমরা স্থির করেছি যে, তোমাদের মধ্যে যে সবার আগে পৃথিবী পরিক্রমা করে আসবে, তারই আগে বিবাহ হবে। একথা শুনেই স্কন্দ-কার্ত্তিকেয় তাঁর ময়ূর বাহন নিয়ে পৃথিবী পরিক্রমায় বের হলেন। এদিকে গণেশ পড়লেন ভাবনায়। তাঁর দেহ বড়ো স্থূল। একটু আধটু দৌড়ঝাঁপ করেই তিনি হাঁফিয়ে ওঠেন, পৃথিবী পরিক্রমা করা তো তাঁর পক্ষে এক কথায় অসম্ভব। অথচ পরাজয় স্বীকার করতেও তাঁর গুরুতর আপত্তি। তখন অনেক ভেবে-চিন্তে গণেশ একটা উপায় স্থির করলেন। তিনি ঘরে এসে পিতা-মাতাকে বললেন—আপনাদের পূজা করার জন্য এখানে আসন পেতেছি, আপনারা এসে বসুন। পুত্রের কথায় প্রসন্ন হয়ে শিব-পার্বতী দুজনে দুটি আসনে বসলেন। গণেশ বিধিমতে পিতামাতার পূজা সম্পন্ন করে পর পর সাতবার তাঁদের প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর তাঁদের সামনে এসে হাত জোড় করে বললেন—এবার আপনারা আমার বিবাহ দিন। শিব-পার্বতী একটু বিস্মিত হয়ে বললেন—সে তো দেবোই বাছা! কার্ত্তিকেয় যেমন পৃথিবী পরিক্রমায় গিয়েছে, তুমিও এবার যাত্রা করো। তুমি যদি আগে ফিরে আসতে পারো, তাহলে তোমার বিবাহই আগে হবে। শুনে গণেশ একটু রেগেই বললেন—আমি তো এইমাত্র সাতবার পৃথিবী পরিক্রমা করলাম। তাহলে আবার আমাকে পৃথিবী পরিক্রমায় বের হবার আদেশ কেন দিচ্ছেন? শিব-পার্বতী বিস্মিত হয়ে বললেন—কখন তুমি পৃথিবী পরিক্রমা করলে? গণেশ বললেন—এইমাত্র আমি আপনাদের পূজা করে সাতবার প্রদক্ষিণ করলাম। শাস্ত্রমতে তা তো পৃথিবী পরিক্রমণেরই সমতুল্য। উপরন্তু শাস্ত্রে আছে—যে ব্যক্তি পিতামাতাকে ত্যাগ করে তীর্থযাত্রা বা পৃথিবী পরিক্রমা করে সে ব্যক্তি পুণ্যসঞ্চয় তো করেই না, বরং পাপের ভাগী হয়। এখন আপনারাই বলুন, আমি শাস্ত্রানুসারে সাতবার পৃথিবী পরিক্রমা করেছি কী না? গণেশের বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতায় শিব-পার্বতী দুজনেই অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং প্রতিশ্রুতি মতো গণেশের বিবাহের আয়োজন করলেন। প্রজাপতি বিশ্বরূপের সিদ্ধি এবং বুদ্ধি নামে দুই কন্যা ছিল। এই দুই কন্যার সঙ্গে শুভদিনে গণেশের বিবাহ সুসম্পন্ন হল। পরবর্তী সময়ে গণেশের ঔরসে সিদ্ধির গর্ভে লক্ষ্য এবং বুদ্ধির গর্ভে লাভ নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়।

এদিকে কার্ত্তিকেয় ফিরে এসে যখন দেখলেন গণেশের বিবাহ সুসম্পন্ন হয়েছে, তখন তাঁর ক্রোধ-অভিমানের আর সীমা রইল না। পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করারও কোনো ইচ্ছা রইল না তাঁর মনে। শিব-পার্বতী তাঁকে অনেক বোঝালেন, তাঁর বিবাহের উদ্যোগ সম্পন্ন হয়েছে, সেকথাও জানালেন—কিন্তু কার্ত্তিকেয় আপন সিদ্ধান্তে অটল। তিনি কৈলাস ত্যাগ করে ক্রৌঞ্চ পর্বতে বসবাস করতে লাগলেন।

[শিব পু. (জ্ঞান) ৩৫ অধ্যায়; ৩৬.১-২৫]

□ পুরাণে একাধিক ঘটনায় গণেশকে বিঘ্নহর্তার ভূমিকাতেই দেখা গেছে। মহর্ষি গৌতমের দ্বারা গৌতমী গঙ্গার মর্ত্যে আবাহনের ঘটনায় গণেশকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। *[বি. দ্র. গঙ্গা, গোদাবরী]*

□ দেবতাদের অনুরোধে একসময় গণেশ রাবণের হাত থেকে পবিত্র শিবলিঙ্গ নিয়ে গোকর্ণক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

[বি. দ্র. গোকর্ণ]

□ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, বেদে বা ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে দেবতা হিসেবে গণেশের

কোনো উল্লেখ নেই। রামায়ণেও বিঘ্নহর্তা গণেশের উল্লেখ মেলে না। সম্পূর্ণ মহাভারত মহাকাব্যেও গণেশের উল্লেখ তেমন নেই। কিন্তু আদিপর্বের সূচনাতেই গণেশের নাম উল্লিখিত হয়েছে ব্যাস রচিত মহাকাব্য মহাভারতের লিপিকর হিসেবে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস তাঁর বিশাল মহাভারত মহাকাব্য রচনা করলেন কিন্তু তা লিপিবদ্ধ করার জন্য কোনো লেখক খুঁজে পেলেন না। লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে তিনি দুঃখের সঙ্গে জানালেনও সেকথা। ব্রহ্মা সব শুনে ব্যাসকে বললেন—তুমি গণেশকে স্মরণ করো। তিনিই তোমার এই বিশাল কাব্যের লেখক হবেন। ব্রহ্মার উপদেশে ব্যাস গণপতি-গণেশকে স্মরণ করতেই গণেশ ব্যাসের তপোবনে আবির্ভূত হলেন। ব্যাস বিঘ্নহর্তা গণেশকে অনুরোধ করলেন—আপনি আমার রচিত এই মহাকাব্য লিপিবদ্ধ করুন—

ততঃ সম্মার হেরম্বং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ॥
স্মৃতমাত্র গণেশানো ভক্তচিন্তিত পূরকঃ।
তত্রাজগাম বিঘ্নেশো বেদব্যাসো যতঃ স্থিতঃ॥
পূজিতশ্চোপবিষ্টশ্চ ব্যাসেনোক্তস্তদানঘ্।
লেখকো ভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়ক॥

গণেশ সম্মত হলেন—বেশ। তাই হবে। আমি তোমার কাব্য লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব নিলাম। কিন্তু একটা শর্ত আছে। আমি যখন লিখতে থাকব তখন আমার লেখনী যেন কোনোভাবেই স্তব্ধ না হয়। ব্যাস দেখলেন— মহা সমস্যা। এত বিশাল রচনা কি এভাবে চিন্তা ভাবনা না করে এক নিঃশ্বাসে বলে চলা যায়? এদিকে লিপিকর অন্য কেউ নন, স্বয়ং গণেশ। তিনি লিখবেনও ঝড়ের গতিতে। তাই ভেবেচিন্তে ব্যাস বললেন—বেশ। মানলাম আপনার শর্ত। কিন্তু আমারও একটা শর্ত আছে। আমি যা বলব তার কোনো কথাই আপনি না বুঝে লিখতে পারবেন না। গণেশ সম্মত হলেন। মহাভারত লেখা আরম্ভ হল। ব্যাস মাঝে মাঝেই গণেশকে অত্যন্ত কঠিন, গূঢ় অর্থবহ একটা করে শ্লোক বলেন, যা লেখার আগে গণেশকেও বিচার বিবেচনা করার জন্য খানিকক্ষণ লেখা থামাতে হয়। সেই অবসরে ব্যাস মনে মনে আরও অনেকগুলি শ্লোক রচনা করে ফেলেন। এভাবেই মহাভারত লেখা চলতে লাগল এবং যথাসময়ে সুসম্পন্ন হল।

[মহা (k) ১.১.৭৩-৮৩; (হরি) ১.১.৫৫ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, খণ্ড ১, পৃ. ৩৮]

☐ প্রসঙ্গত, বর্তমান ভারতবর্ষে গণেশ যেমন অন্যান্য দেবদেবীর পূজার আগে বিধিমতে পূজিত হন তেমন গণেশ চতুর্থীর ব্রত পালন করাটাও যথেষ্ট প্রচলিত এবং জনপ্রিয় উৎসব। শিবপুরাণে প্রাপ্ত কাহিনী অনুযায়ী, কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথিতে গণেশের জন্ম। তাই গণেশের কৃপালাভের জন্য কার্তিকমাসের কৃষ্ণা-চতুর্থী থেকে শুরু করে প্রতি চতুর্থী তিথিতে এক বছর ধরে এই ব্রত পালন করার কথা বলা হয়েছে শিবপুরাণে। তবে আমাদের দেশে সর্বাধিক জনপ্রিয় হল ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথির গণেশপূজা। মূলত মহারাষ্ট্রে প্রচলিত হলেও বর্তমানে প্রায় সারা দেশেই গণেশ চতুর্থী বা বিনায়ক চতুর্থী মহাসমারোহে পালিত হয়।

[শিব পু. (জ্ঞান) ৩৪.৬২-৮৮]

গণেশপদতীর্থ গয়াক্ষেত্রে অবস্থিত একটি পবিত্র স্থান। গণেশপদে শ্রাদ্ধ করলে রুদ্রলোক প্রাপ্তি ঘটে। *[বায়ু পু. ১১১.৫৫]*

গণেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি তীর্থক্ষেত্র। এটি দর্শন করলে গণেশলোকে পরমাগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৪২]

গণ্ডকণ্ডু কুবেরের সভায় অবস্থানকারী একজন বিশিষ্ট যক্ষ।

[মহা (k) ২.১০.১৫; (হরি) ২.১০.১৫]

গণ্ডকী হিমালয় পর্বতজাতা একটি পবিত্র নদী। মহাভারতের আদিপর্বে সাতটি নদী-নামের উল্লেখ রয়েছে। যাদের জল পান করা মাত্রই সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। গণ্ডকী নদী পবিত্র অগ্নিসমূহের উৎপত্তিস্থলও বটে। *[মহা (k) ১.১৭০.২০; ৩.২২২.২১; (হরি) ১.১৬৩.২০; ৩.১৮৫.২১; মৎস্য পু. ১১৪.২২; বায়ু পু. ৪৫.৯৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.২৬]*

☐ পুরাণে গণ্ডকী নদীর উৎপত্তি সম্পর্কে একটি কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। পুরাকালে ভগবান বিষ্ণু একবার হিমালয় পর্বতে কঠিন তপস্যা শুরু করেন। দীর্ঘকাল তপস্যারত থাকার ফলে একসময় বিষ্ণুর গণ্ডদেশ থেকে প্রচুর স্বেদরাশি উৎপন্ন হয়। সেই স্বেদরাশি থেকে একটি নদীর জন্ম হয়েছিল। বিষ্ণুর গণ্ডদেশের স্বেদ থেকে জন্ম বলে মহাদেব নদীটির নামকরণ করেন গণ্ডকী—

গণ্ডস্বেদোদ্ভবা যত্র গণ্ডকী সরিতাং বরা।

[বরাহ পু. ১৪৪.৯২-১০৬]

□ জরাসন্ধ হত্যার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে মগধের রাজধানী গিরিব্রজপুর আসার পথে গণ্ডকী নদী পার হয়েছিলেন।

[মহা (k) ২.২০.২৭; (হরি) ২.১৯.২৭]

□ মহাভারতের বনপর্বে গণ্ডকী নদীকে সমস্ত তীর্থের জল থেকে উৎপন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গণ্ডকী নদীতে স্নান করলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল ও সূর্যলোক লাভ হয়—

গণ্ডকীন্তু সমাসাদ্য সর্বতীর্থজলোদ্ভবাম্।
বাজপেয়মবাপ্নোতি সূর্য্যলোকঞ্চ গচ্ছাতি॥

[মহা (k) ৩.৮৪.১১৩; (হরি) ৩.৬৯.১১৪; বরাহ পু. ১৪৪. ১০৭-১১০]

□ বলরাম তাঁর তীর্থযাত্রার সময় গণ্ডকী নদী দর্শন করেছিলেন। *[ভাগবত পু. ১০.৭৯.১১]*

□ গণ্ডকী, দেবিক ও ব্রহ্মপুত্রা নদীর মিলন স্থল ত্রিবেণী নামে বিখ্যাত। এটি একটি পুণ্যতীর্থ হিসেবে পরিচিত। *[বরাহ পু. ১৪৪.১৩৩-১১৪]*

□ ত্রিপুর দুর্গ দহনের পূর্বে দেবাদিদেব মহাদেবের জন্য একটি বিশেষ রথ নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রধান নদী সমূহ সেই রথের কাঠামোয় বাঁশ রূপে ব্যবহৃত হয়। এই নদীগুলির মধ্যে গণ্ডকী একটি। *[মৎস্য পু. ১৩৩.২৩]*

□ পুরাণে বলা হয়েছে যে, স্বর্গে প্রবাহিত গণ্ডকী নদীকে মহর্ষি লোমশ কঠোর তপস্যার মাধ্যমে মর্ত্যে নিয়ে আসেন। *[বায়ু পু. ১০৮.৭৯]*

□ কালী গণ্ডকী বা গণ্ডকী নদীর উৎপত্তি নেপাল-তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত হিমালয় পর্বতের পর্বতের একটি হিমবাহ থেকে। এটি গঙ্গার একটি প্রধান উপনদী। ভারতবর্ষের বিহার রাজ্যের রাজধানী পাটনার কাছে গণ্ডকী বা গণ্ডক নদী গঙ্গা নদীতে মিশেছে।

[P. Mool, S.R.Bajrachaya, S.P. Joshi; Inventory of Glacial Lakes Outburst Floods; International Centre for Integrated Mountain Development; 2001; p. 323]

□ গণ্ডকী নদী পবিত্র জলধারা হিসেবে যেমন বিখ্যাত, ততটাই বিখ্যাত পবিত্র শালগ্রামশিলার উৎপত্তি এবং প্রাপ্তিস্থান হিসেবে। একমাত্র গণ্ডকী নদীতেই শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। গণ্ডকী নদীতে শালগ্রাম শিলার উৎপত্তি সম্পর্কে বরাহ পুরাণে একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। একসময় তৃণবিন্দু নামে এক ঋষি ছিলেন, জয় এবং বিজয় নামে তাঁর দুই পুত্র ছিল। জয় এবং বিজয় দুজনেই ভগবান বিষ্ণুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তাঁদের নিরন্তর আরাধনায় ভক্তবৎসল হরি এতটাই সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তিনিও জয় বিজয়ের প্রতি অত্যন্ত স্নেহের ভাব পোষণ করতেন। একসময় রাজা মরুত্ত এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেন, সেই যজ্ঞের পুরোহিতদের মধ্যে জয় এবং বিজয়ও ছিলেন অন্যতম। মরুত্তরাজার যজ্ঞ সম্পন্ন হলে রাজা জয়-বিজয়কে প্রচুর ধনসম্পদ দক্ষিণা হিসেবে দান করলেন। বাড়িতে ফিরে সেই দক্ষিণা হিসেবে প্রাপ্ত ধনসম্পদ বন্টন করার সময় দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হল। সেই কলহ এক সময় এমনই চরমে উঠল যে, জয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়কে বললেন—তুমি দক্ষিণা হিসেবে যা গ্রহণ করেছ, তার অংশ যদি আমাকে না দাও, তাহলে আজ থেকে তুমি মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে 'গ্রাহ' (কুমীর জাতীয় জলজন্তু হও। বড়ো ভাইয়ের অভিশাপ শুনে ক্রুদ্ধ বিজয়ও পাল্টা অভিশাপ দিলেন—তুমি একটি হাতিতে রূপান্তরিত হও। এইভাবে জয় এবং বিজয় গণ্ডকী নদীতে কুমীর এবং হাতির রূপ লাভ করে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু এ অবস্থাতেও তাঁদের কলহ বন্ধ হল না। বরং তা যুদ্ধে পরিণত হল। গণ্ডকী নদীর জলে হাতি এবং কুমীরের মধ্যে তুমুল লড়াই চলতে লাগল দীর্ঘকাল ধরে। বিশালাকায় দুই প্রাণীর যুদ্ধে গণ্ডকী নদীর জল বসবাসকারী বহু নিরীহ জলজন্তুর মৃত্যু হতে লাগল, নদীর জল ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠল। তা দেখে জলের দেবতা বরুণ ভগবান বিষ্ণুকে অনুরোধ করলেন এই দুই প্রাণীর যুদ্ধ বন্ধ করে গণ্ডকী নদীকে রক্ষা করতে। ভগবান বিষ্ণু বরুণের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে সুদর্শন চক্রের আঘাতে জয়-বিজয়ের মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। জয়-বিজয়ের উপর প্রহার করার সময় নারায়ণের সুদর্শনচক্র গণ্ডকী নদীর খাতে অবস্থিত শিলাগুলিকে একাধিকবার আঘাত করে। এই আঘাতের ফলে গণ্ডকী নদীর এই শিলাগুলিতে ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রের দাগ রয়ে যায়। ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রে লাঞ্ছিত এই শিলাগুলিই পরবর্তী সময়ে শালগ্রাম শিলা নামে প্রসিদ্ধ হয়।

বরাহ পুরাণে ঐ একই অধ্যায়ে গণ্ডকী নদীতে শালগ্রামশিলার উৎপত্তি সম্পর্কে আরও একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। একসময়ে স্বয়ং গণ্ডকী নদীই সুদীর্ঘকাল ধরে ভগবান বিষ্ণুকে প্রসন্ন করার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। গণ্ডকী নদীর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু সশরীরে তাঁকে দর্শন দিলেন এবং বর প্রার্থনা করতে বললেন। তখন গণ্ডকী নদী বললেন—প্রভু! আপনি যদি সত্যিই প্রসন্ন হয়ে থাকেন। তাহলে আমার গর্ভে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করুন। ভগবান বিষ্ণু তাঁকে বর দিলেন—তাই হবে। আজ থেকে তোমার গর্ভে আমি স্বয়ং শিলাময় রূপ ধারণ করে সর্বদা বাস করব। আমাকে পুত্ররূপে লাভ করার ফলে তুমি এ জগতের অন্যতম পবিত্র নদী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তোমাতে স্নান কিংবা তোমাকে দর্শন করামাত্র মানুষের সমস্ত পাপ দূর হবে। এই কথা বলে ভগবান বিষ্ণু শিলারূপে গণ্ডকী নদীর গর্ভে বাস করতে লাগলেন। তাঁর এই শিলাময় রূপ সুদর্শনচক্র চিহ্নিত এবং বজ্রকীটের দংশন যুক্ত। এই শিলাই শালগ্রামশিলা নামে জগতে প্রসিদ্ধ।

[বরাহ পু. ১৪৪.৩৫-১৪০]

গণ্ডসাহ্বয় গণ্ডকী নদীর অপর নাম গণ্ডসাহ্বয়।

[দ্র. গণ্ডকী]

[মহা (k) ৩.২২২.২২; (হরি) ৩.১৮৫.২১]

গণ্ডা পশুসখ নামে এক শূদ্রের পত্নী গণ্ডা। পশুসখ এবং তাঁর পত্নী গণ্ডা সপ্তর্ষিদের সেবা করতেন।

একবার দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্ত ঋষিরা আপদ্ধর্মের নিয়মে প্রাণরক্ষার জন্য একটি শবদেহ রন্ধন করছিলেন। এইসময় বনে উপস্থিত হলেন শিবি রাজার পুত্র বৃষাদর্ভি। তিনি ঋষিদের শবদেহ ভক্ষণ করতে নিষেধ করলেন এবং তাঁদের ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ আহার্য্য এবং অন্যান্য ধনসম্পদ দান করতে চাইলেন। সাত ঋষি একথা শুনে দান গ্রহণ করার পরিণাম ভয়াবহ বলে মত প্রকাশ করলেন। ঋষিদের দাসী গণ্ডাও ঋষিদের মতকেই নিজের মত বলে ব্যাখ্যা করলেন।

একসময় সপ্তর্ষিরা পদ্মের মৃণাল সংগ্রহ করছিলেন ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য। কিন্তু জল থেকে উঠে এসে সেই মৃণালগুলিকে আর দেখতে পেলেন না। তাঁরা তখন স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরকে সন্দেহ করতে লাগলেন। তারপর নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁরা প্রত্যেকেই চুরি করেননি এই মর্মে সত্য উচ্চারণ করে শপথ করবেন। গণ্ডা এই সময় শপথ নিয়ে চোরের উদ্দেশে বলেন—যে নারী মৃণাল চুরি করেছে সে সর্বদা মিথ্যাকথা বলুক, বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া করুক, এবং শুল্কগ্রহণ করে কন্যাদান করুক। গণ্ডা আরও বললেন—যে মৃণাল চুরি করেছে, সে নিজে রন্ধন করে নিজেই প্রথমে ভোজন করুক, দাসত্ব করে জীবন কাটাক, নানা পাপ কাজ করে অবশেষে তার মৃত্যু হোক—

> অনৃতং ভাষতু সদা বন্ধুভিশ্চ বিরুধ্যতু।
> দদাতু কন্যাং শুল্কেন বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥
> সাধয়িত্বা স্বয়ং প্রাশেদ্দাস্যে জীর্য্যতু চৈব হ।
> বিকর্মণা প্রমীয়েত বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥

গণ্ডার কথা থেকে বোঝা যায়, স্ত্রীলোকের এই ধরণের আচরণ সে যুগের সমাজে নিন্দিত হত।

যাতুধানী নামে এক রাক্ষসীর কাছে নিজের পরিচয় দেবার সময় গণ্ডা নিজের নামের অর্থটিও ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। 'গণ্ড' শব্দের অর্থ গাল বা কপোল। গণ্ডদেশ বা গাল একটু উঁচু বলেই তাঁর নাম ছিল গণ্ডা—

> বক্ত্রৈকদেশে গণ্ডেতি ধাতুমেতং প্রচক্ষতে।
> তেনোন্নতেন গণ্ডেতি বিদ্ধি মানসসম্ভবে॥

স্কন্দ পুরাণে প্রাপ্ত কাহিনীতে অবশ্য সপ্তর্ষিদের দাসীর 'গণ্ডা'র পরিবর্তে 'চণ্ডা' নাম উল্লিখিত হয়েছে। সম্ভবত শূদ্রত্বের কারণেই নামের এই রূপান্তর।

[মহা (k) ১৩.৯৩.২২, ৫০, ১০২, ১৩৩-১৩৪;
(হরি) ১৩.৭৯.২২, ৫০, ১০২, ১৩৩-১৩৪;
স্কন্দ পু. (নাগর) ৩২.১-১০০]

গণ্ডুষ বৃষ্ণিবংশে শূরের ঔরসে মারিষার গর্ভজাত এক পুত্র। কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের নয়জন ভ্রাতার মধ্যে গণ্ডুষ একজন। কৃষ্ণ তাঁর দুই পুত্র চারুদেষ্ণ ও শাম্বকে অপুত্রক গণ্ডুষকে প্রদান করেন।

[বিষ্ণু পু. (নবভারত) ৪.১৪.১০;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৫০, ১৯১;
বায়ু পু. ৯৬.১৪৮, ১৮৮]

গতভয় শাকদ্বীপের অন্তর্গত উদয়াচল গিরির সংলগ্ন দুটি বর্ষ বা ভূখণ্ডের নাম যথাক্রমে উদয় ও জলধার। এই দুটি ভূখণ্ড একত্রে গতভয় নামেও পরিচিত। *[মৎস্য পু. ১২২.২০-২১]*

গতি১ কর্দম মুনির কন্যা। ইনি ঋষি পুলহের পত্নী। পুলহের ঔরসে গতির গর্ভজাত তিনজন পুত্র হলেন কর্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু।

[ভাগবত পু. ৩.২৪.২৩; ৪.১.৩৭]

গতি২ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের 'গতি' নামের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

গতির্ব্রহ্মিষ্ঠানামেব পরায়ণম্।

গতি শব্দের উৎপত্তি 'গম্' ধাতু থেকে। 'গম্' ধাতুর সঙ্গে 'ক্তিন্' প্রত্যয় করলে নিষ্পন্ন রূপটি হয় গতি। গতি শব্দের দ্বারা যেমন গমন বা চলন বোঝায়, তেমনই দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর যে প্রার্থিত ফল-প্রাপ্তি বা আশ্রয়-লাভ, তাকেও বলা হয় 'গতি'। ভগবান শিব তাঁর ভক্তদের আশ্রয়স্বরূপ, যাঁরা পরব্রহ্মের আরাধনায় রত, তাঁদের তপস্যার বাঞ্ছিত ফল হল ব্রহ্মজ্ঞান। শিব সেই ব্রহ্মজ্ঞান স্বরূপ। এই ভাবনা থেকেই ভক্তবৎসল মহাদেবকে ভক্তের একান্ত আশ্রয় বা 'গতি' নামে সম্বোধন করা হয়।

আবার পরমেশ্বর এই সম্পূর্ণ জগতের আধার বা আশ্রয়স্বরূপ—এই ভাবনা থেকেও ভগবান শিব গতি নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.১৩৫; (হরি) ১৩.১৬.১৩৪]

গতিতালী তারকাসুরকে বধ করার সময় যে-সব অনুচর যোদ্ধা স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন, গতিতালী তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৬৭; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র. খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৬]

গতিন বিশ্বামিত্রবংশীয় যেসব গোত্র প্রবর্তক ঋষিদের উল্লেখ পুরাণে রয়েছে গতিন তাঁদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. (মহর্ষি) ১৯৮.১৯]*

গদ১ কৃষ্ণের ঔরসে সত্যভামার গর্ভে জাত এক পুত্রের নাম গদ। ভাগবত পুরাণের যদুকুল সংহার বর্ণনায় কৃষ্ণপুত্র গদকে কৃষ্ণভ্রাতা গদের সাথে যুদ্ধ করতে দেখা যায়।

[ভাগবত পু. ৩.১.৩৫; ১১.৩০.১৬]

গদ২ বসুদেবের ঔরসজাত পুত্র এবং কৃষ্ণের অনুজ ভ্রাতা। গদের মাতৃ পরিচয় সম্পর্কে পুরাণগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। কোথাও রোহিণীকে তাঁর মাতা বলা হয়েছে আবার কোথাও দেবরক্ষিতাকে। বিষ্ণু পুরাণের পাঠে আবার গদের মাতা ভদ্রা। গদ সম্ভবত বসুদেবের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র।

বাসুদেব কৃষ্ণকে মহাভারত, পুরাণের বহু শ্লোকে গদাগ্রজ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এর থেকে অনুমেয় কৃষ্ণের এই অনুজ ভ্রাতাটি একজন বহুপরিচিত এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.৪৬, ৫২; বিষ্ণু পু. ৪.১৫.২৪]

□ মহাভারতে বিবিধ ঘটনায় কৃষ্ণের অনুজ গদকে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে যেমন— দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ ইত্যাদি। ইন্দ্রপ্রস্থে ময়দানব নির্মিত রাজভবনের প্রবেশ অনুষ্ঠানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন।

[মহা (k) ১.১৮৬.১৭; ২.৪.১০; ২.৩৪.১৬; (হরি) ১.১৭৭.১৭; ২.৪.১০নং শ্লোকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ২৬; ২.৩৩.১৫]

□ রৈবতক পর্বতে যদুবংশীয়দের বাৎসরিক উৎসবের সময়েও গদ উপস্থিত ছিলেন।

[মহা (k) ১.২১৯.১০; (হরি) ১.২১২.১০]

□ অর্জুন ও সুভদ্রার বিবাহের পর দ্বারকা থেকে গদকে উপঢৌকন নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে যেতে দেখা যায়।

[মহা (k) ১.২২১.৩২; (হরি) ১.২১৪.৩২]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরিকল্পনা পর্বে অক্রূর, শাম্ব প্রভৃতি বৃষ্ণিবীরদের সঙ্গে গদকেও পাণ্ডবদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে দেখা যায়।

[মহা (k) ৩.৫১.২৪; (হর) ৩.৪৩.২৮]

□ ভাগবত পুরাণের কোনো কোনো পাঠে বর্ণিত হয়েছে যে, মথুরায় বারংবার জরাসন্ধ আক্রমণ করার সময় যেসব বৃষ্ণিবীরেরা নগররক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন গদ তাঁদের মধ্যে একজন।

□ শাল্বের আক্রমণ থেকে দ্বারকাকে রক্ষা করার সময়ও গদকে সক্রিয় দেখা যায়।

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ১০.৫০.২০নং শ্লোকের উত্তর দাক্ষিণাত্য অধিক পাঠের চতুর্থ শ্লোক দ্রষ্টব্য; ১০.৫০.৪১নং শ্লোকের উত্তর দাক্ষিণাত্য অধিক পাঠের প্রথম অধ্যায়ে ১১ সংখ্যক এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২০ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য]

□ মৌষল যুদ্ধের সময় গদের মৃত্যু হলে কৃষ্ণ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পরেন। মহাভারতে উল্লেখ না থাকলেও ভাগবত পুরাণে গদ নামে কৃষ্ণের একপুত্রের উল্লেখ রয়েছে। মৌষল যুদ্ধে মৃত গদ কৃষ্ণের ভ্রাতা না পুত্র এ বিষয়ে সংশয় রয়ে যায়।

[মহা (k) ১৬.৩.১৬; (হরি) ১৬.৩.১৭; ভাগবত পু. ১১.৩০.১৬]

গদ্‌গদ জনৈক মহাবলশালী বানররাজ। রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে যে, লঙ্কার যুদ্ধে গদ্‌গদের দুই ক্ষেত্রজ পুত্র অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই দুই পুত্রসন্তানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, গদ্‌গদের প্রথম পুত্র হলেন ব্রহ্মার অংশজাত, তাঁর নাম জাম্ববান। গদ্‌গদের দ্বিতীয়পুত্র দেবগুরু বৃহস্পতির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বানরবীর কেশরী, মহাবলশালী বানর পবনপুত্র হনুমান তাঁর ক্ষেত্রজ পুত্রসন্তান।

[রামায়ণ ৬.৩০.২০-২১]

গদা প্রাচীন কালে ব্যবহৃত অন্যতম যুদ্ধাস্ত্র। পুরাণে গদার উৎপত্তি নিয়ে একটি কাহিনী আছে। কথিত আছে যে, পুরাকালে গদ নামে এক অসুর ছিলেন। তাঁর হাড়গুলি বা অস্থিগুলি বজ্রের চেয়েও কঠিন এবং দৃঢ় ছিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা 'অপূর্বনির্মাণ'-মোহে একদিন গদাসুরের কাছে তাঁর অস্থিগুলি চাইলেন। অস্থিগুলি জীবন থাকতে দেওয়া যায় না, কিন্তু ব্রহ্মা চেয়েছেন বলেই গদ তাঁর অস্থিগুলি তাঁকে দিয়ে দিলেন—

প্রার্থিতো ব্রহ্মণে প্রাদাৎ শরীরাস্থি সুদুস্ত্যজম্।

এরপর ব্রহ্মা অস্থিগুলি দিলেন বিশ্বকর্মাকে। বিশ্বকর্মা অস্থিগুলি ভালো করে নিষ্পেষিত করে একটা ভ্রমিযন্ত্র বা কুঁদের মধ্যে ফেললেন। গদাসুরের সেই অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা এবার তৈরি করলেন এক অসামান্য অস্ত্র যার নাম হল গদা; অসুর গদের নাম অনুসারে অস্ত্রের নাম গদা। বিশ্বকর্মা এই গদা রেখে দিলেন স্বর্গে।

তারপর স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার পুত্র হেতি রাক্ষস বহু তপস্যা করে দেবতাদের কাছ থেকে বর চেয়ে নিলেন যাতে তিনি বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র এবং দেবতাদের অবধ্য হন। বিশেষত বিষ্ণু-কৃষ্ণের চক্র এবং শিবের ত্রিশূল ইত্যাদি অস্ত্রে যেন তাঁর মৃত্যু না হয়, সে বরও চেয়ে নিলেন হেতি। এবারে হেতি মহাশক্তিশালী হয়ে উঠলেন দেবতাদের বরে এবং তিনি দেবতাদেরই যুদ্ধে পরাজিত করে ইন্দ্রত্ব ভোগ করতে লাগলেন স্বর্গে। ব্রহ্মা-শিব এবার দেবতাদের সঙ্গে ভগবান বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করলেন। বিষ্ণু বললেন—এই হেতি রাক্ষস দেবতাদের অবধ্য এবং বিষ্ণুচক্রের দ্বারাও তাকে বধ করা যাবে না। অতএব তেমন একটা অস্ত্রের ব্যবস্থা করলে তিনি যুদ্ধে যাবেন। দেবতারা তখন বিষ্ণুকে গদাসুরের অস্থি দিয়ে তৈরি গদাখানি দিলেন। দেবতাদের প্রার্থনায় ভগবান বিষ্ণু সেই গদা প্রথম হস্তে ধারণ করলেন বলেই তাঁর নাম হল গদাধর—

দধার তাং গদামাদৌ দেবৈরুক্তঃ গদাধরঃ।

বিষ্ণুই প্রথম এই গদা পেয়েছিলেন বলে তাঁকে আদিগদাধরও বলা হয়। এই গদা দিয়ে গয়াসুরের মস্তকে রাখা শিলাকে প্রথমে নিশ্চল করে সেই শিলার মধ্যেই বিষ্ণু ব্যক্তরূপে প্রকট হয়েছিলেন বলেও তাঁর নাম আদিগদাধর—

গদামাদাববষ্টভ্য গয়াসুরশিরঃশিলাম্।
নিশ্চলার্থং স্থিতো যস্মাত্তস্মাদাদিগদাধরঃ॥
শিলাপর্বতরূপেণ ব্যক্ত আদিগদাধরঃ॥

[বায়ু পু. ১০৯.২-১৪]

□ গদার নির্মাণ-কাহিনীতে গদাসুরের কঠিন এবং দৃঢ় অস্থির ব্যবহারের তাৎপর্য্য এটাই যে, গদা অত্যন্ত কঠিন এবং দৃঢ় এক অস্ত্র এবং গদার আঘাতের মধ্যে আসুরী শক্তি আছে। আদিগদাধর বিষ্ণু-কৃষ্ণের গদার উৎস গদাসুর হোন আর যেই হোন, তাঁর গদার একটা নাম পাওয়া যায় মহাভারতে। খাণ্ডব দহনের আগে বরুণদেব এক ভয়ংকরী বজ্রনিঃস্বনা গদা কৃষ্ণকে দেন; এই গদা 'দৈত্যান্তকরণী' এবং গদার নাম কৌমোদকী গদা।

[মহা (k) ১.২২৫.২৮; (হরি) ১.১১৮.২৮]

তৎকালীন দিনে ব্যবহৃত গদার আকার এবং প্রকার তার গতি এবং প্রকৃতি ভাবনা করে অনেকেই গদাকে কখনো মুষল, কখনো মুদ্গর বলে চিহ্নিত করেছেন বটে, কিন্তু গদার ক্ষেত্রে তার ভার এবং কাঠিন্য একটা বিশেষ মাত্রা ছিল বলেই গদা এই সব কিছু থেকে আলাদা। যুদ্ধের জন্য গদাগুলি লোহা (অয়স্) দিয়ে তৈরি হত এবং সেগুলি যথেষ্ট ভারীও হত—

'স্কন্ধে কৃত্বায়সীং গদাম্' অথবা
অদ্রিসারময়ীং গুর্বীম্'।

গদাগুলিকে ভয়ংকর মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার জন্য গদার উপরিতলে চারদিকে ধারালো শিকের মতো লাগানো হত।

—গদাশ্চ শৈক্যাঃ পরিঘাশ্চ শুভ্রাঃ।

কখনো স্বর্ণখচিতও হত গদাগুলি—আয়সী গদা জাতরূপ-পরিস্কৃতাঃ/স্বর্ণভূষিতৈঃ।

ব্যক্তিগত গদাকে বেশ একটু সুসজ্জিত এবং লোকচক্ষুতে উজ্জ্বল করার প্রয়াসে গদার চার ঘণ্টা লাগানোর চল ছিল কোথাও কোথাও।

গদার যে ভারী নিম্নাংশ দিয়ে আঘাত করা হত, সেই জায়গাটা যে সব সময় গোলাকার হত তা নয়, সেগুলি কখনো ছয়কোণ-বিশিষ্ট 'ষড়স্রি', কখনো অষ্টকোণ-বিশিষ্ট—অষ্টাস্রি' হত এবং তার আঘাত যমদণ্ডের আঘাতের সঙ্গে তুলনীয় ছিল—

যমদণ্ডোপমাং গুর্বীমিন্দ্রাশমিবোদ্যতাম্।

গদাযুদ্ধ-শৌণ্ড পাণ্ডব-মধ্যম ভীমের গদাটিই ছিল অষ্টকোণ বিশিষ্ট একটি লোহার গদা এবং সেটা সোনায় বাঁধানো—

অষ্টাস্রিমায়সীং ঘোরাং গদাং কাঞ্চনভূষণাম্।

সাধারণত গদাগুলি ছয়কোণ বিশিষ্ট চার হাত লম্বা হত—চতুষ্কিকুং ষড়স্রিম্।

[মহা (k) ৯.৩২.৩৬-৩৯; ৭.১৬৩.২১; ৬.৮৭.২৯; ৯.৫৭.১২; ৫.৫১.৮, ২৪, ২৮; (হরি) ৯.৩১.৩৬-৩৯; ৭.১৪২.১৭; ৬.৮৪.২৮; ৯.৫৩.১২; ৫.৫১.৮, ২৪, ২৯; রামায়ণ ৬.৫২.৩৪; ৬.৭৬.১৩; E.A. Hopkins, 'The Social and Military Position of the Ruling Caste in India' In Journal of the American Oriental Society, Vol. 13, p. 281-284]

□ মহাভারতে বলা গদার এই আকৃতি-বৈশিষ্ট্য পরবর্তী সময়ের সমর-সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে এসেছে। আমরা নীতি প্রকাশিকা নামে একটি গ্রন্থে দেখেছি—গদা লোহা দিয়েই তৈরি হবে, চার হাত লম্বা এবং একশটা শিক থাকতে পারে গদার আঘাতকারী স্থূল অংশটায়—

গদা শৈক্যায়সময়ী শতারপৃথুশীর্ষিকা।
শংকু-প্রাবরণা ঘোরা চতুর্হস্তসমন্বিতা॥

[Nitiprakasika (Oppert), 5. 29-30]

মহাভারতের শল্যপর্বে ভীম-দুর্যোধনের যে গদাযুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে, সেটা চরম এক যুদ্ধ বলেই গদাযুদ্ধের কিছু প্রাচীন কৌশল সেখানে উল্লিখিত হয়েছে। গদাযুদ্ধে মুষ্টিযুদ্ধের মতোই খানিকটা জায়গা লাগে বলে ইংরেজিতে যাকে ring বলে, ঠিক সেইরকম একটা মণ্ডলাকার স্থান লাগে। যুদ্ধের সময় প্রহার এবং প্রহার-পরিহারের জন্যও যেহেতু এই মণ্ডলাকার স্থানটিরও একটা উপযোগ আছে তাই গদাযুদ্ধের কৌশলগুলিও মণ্ডল এবং মার্গ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহার হয়। আদিপর্বে ভীম-দুর্যোধনের অস্ত্রপরীক্ষার সময় ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে যে গদাঘাতের পরিকল্পনার কথা 'মণ্ডল' শব্দটির মাধ্যমে উচ্চারিত হয়েছিল, সেটাই শল্যপর্বে গিয়ে গদাযুদ্ধের সময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরস্পরে পরস্পরকে গদার নাগালে পাওয়া, একে অপরের আক্রমণ অথবা আঘাত বাঁচিয়ে চলা এবং পুনরায় আঘাতের জন্য ওঁত পেতে থাকার পর পুনরায় আঘাত করা—এই পূর্ণ ব্যাপারটাকে দুটো বেড়ালের একই খাবার ধরার মহড়ার মতো বলে বর্ণনা করেছে মহাভারত—

মার্জারাবিব ভক্ষার্থে ততক্ষাতে মুহুর্মুহুঃ।

ঠিক এই রকম একটা যুদ্ধের সময়েই গদাযুদ্ধের সময় স্থান গ্রহণ এবং পরিবর্তনের কৌশল হিসেবে মহাভারতীয় কালের কতগুলি পারিভাষিক শব্দ উচ্চারণ করে বলা হয়েছে—এখানে বিচিত্র মার্গ এবং মণ্ডল আছে—মণ্ডলানি বিচিত্রাণি . . . মার্গান্ বহুবিধাংস্তথা। আর গদাযুদ্ধের কৌশলগুলি সাধারণ থেকে জটিল হয়ে ওঠে যেভাবে, তার পরিভাষাগুলি মহাভারতে এইখানেই দেওয়া আছে। সেগুলি হল—

১. মণ্ডল—প্রতিপক্ষের চারদিকে ঘুরতে থাকা এবং ফিরতে থাকা।

২. গত—প্রতিপক্ষের সামনাসামনি হওয়া।

৩. প্রত্যাগত—প্রতিপক্ষের সামনে প্রায় অভিমুখে থেকেও সামান্য পিছনে হটে যাওয়া এবং আবার এগোনো।

৪. অস্ত্রযন্ত্র—অন্য কিছু দিয়ে প্রতিপক্ষের শরীরে কোথাও খোঁচা দিয়ে বা আঘাত করে তাকে ওপরে তুলে নেওয়া, অথবা মাটিতে ফেলে দেওয়া।

৫. প্রহার-পরিমোক্ষ—পিছনে বা পাশে সরে গিয়ে প্রতিপক্ষের গদাঘাত বাঁচিয়ে চলা।

৬. প্রহার-বর্জন—সরে এসে আঘাত পরিহার করা অথবা পরে আরো বেশি সুবিধে পাবার জন্য সাময়িকভাবে নিজেও আঘাত না করা।

৭. পরিধাবন—খুব দ্রুত বেগে ডাইনে-বাঁয়ে যাতায়াত করা।

৮. অভিদ্রবণ—অসামান্য দ্রুততায় দূর থেকে তড়িদ্‌বেগে প্রতিপক্ষের সামনে চলে আসা।

৯. আক্ষেপ—চলার সময় অথবা গতি-পরিবর্তনের সময় প্রতিপক্ষকে মাটিতে ফেলে দেওয়া।

১০. অবস্থান—সব চঞ্চলতা পরিহার করে

শত্রুর রন্ধ্র অন্বেষণ করা অথবা দুর্বলতা খুঁজে বেড়ানো।

১১. সবিগ্রহ—মাটিতে পড়ে যাওয়া বিপক্ষ উঠে দাঁড়ালে আবার তার সঙ্গে যুদ্ধ করা।

১২. পরিবর্তন—প্রতিপক্ষকে প্রহার করার জন্য তার চারদিকে খুব সতর্কভাবে চলাফেরা করা।

১৩. সংবর্ত—প্রতিপক্ষের চলা-ফেরা এবং এগিয়ে আসা অবরুদ্ধ করা।

১৪. অবপ্লুত—প্রতিপক্ষের প্রহার বিফল করে দেওয়ার জন্য শরীরকে সামান্য একটু নীচু করা।

১৫. উপপ্লুত—ওপরের দিকে লাফিয়ে উঠে প্রতিপক্ষের প্রহার করার চেষ্টা বিফল করে দেওয়া।

১৬. উপন্যস্ত—শত্রুর সমূহ দুর্বলতা বুঝে তার কাছে গিয়ে তার ওপর প্রহার করা।

১৭. অপন্যস্ত—একটু ঘুরে গিয়ে শত্রুর পিঠে চড়-চাপড় কষিয়ে দেওয়া।

১৮. গোমূত্রিক—গোমূত্রের ধারার মধ্যে যেমন উচ্চাবচ গতি থাকে, সেইরকম উচ্চাবচ গতিতে প্রতিপক্ষকে প্রহার করার চেষ্টা।

[মহা (k) ৯.৫৭.১৭-২০; ৯.৫৮.২২;
(হরি) ৯.৫৩.১৩-২০; ৯.৫৪.২২]

□ মহাভারতের আদিপর্বে মহারাজ দুষ্মন্তের বাহুবীর্য্য বর্ণনা করার সময় চার প্রকারের গদাযুদ্ধের কথা বলা হয়েছে—

চতুষ্পথ-গদাযুদ্ধে সর্বপ্রহরণেষুচ।

এই চার প্রকারের গদাযুদ্ধ কী কী হতে পারে, তার একটা সাধারণ তালিকা নীলকণ্ঠ তাঁর টীকায় বলেছেন প্রচলিত ভাবনা অনুযায়ী। সেগুলি হল—

১. প্রক্ষেপ, যেখানে দূর থেকেই দূরস্থ প্রতিপক্ষের দিকে গদা ছুঁড়ে দেওয়া হয়—

দূরস্থে শত্রৌ ত্যাগঃ।

২. বিক্ষেপ, সামনাসামনি কাছে থেকে পরস্পরের প্রহার-চেষ্টা।

৩. পরিক্ষেপ, অনেক প্রতিপক্ষের মধ্যে চারদিকে গদা ঘুরিয়ে ভীতি তৈরি করা।

৪. আর অধিক্ষেপ একেবারে সোজাসুজি গদা-প্রহারের চেষ্টা।

[মহা (k) ১.৬৮.১২; (হরি) ১.৮২.১০-১১;
(নীলকণ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)]

□ বৈশম্পায়নের ওপর আরোপিত নীতিপ্রকাশিকার মধ্যে গদাযুদ্ধের স্থান, মার্গ, মণ্ডল অন্তত কুড়ি রকমের বলা হয়েছে। তার মধ্যে বেশির ভাগই মহাভারতের শল্যপর্বে ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের সময়ে বলা প্রকারগুলির সঙ্গে মিলে যায়। নতুন যে শব্দগুলি শোনা যায়—পরাবৃত্ত, সন্নিবৃত্ত, আবিদ্ধ, প্রবিদ্ধ, স্ফোটন এবং জ্বালন—এগুলিও ব্যাখ্যা করলে মহাভারতে বলা গদাযুদ্ধের বিচিত্র মণ্ডল-কর্মের ইতর-বিশেষ হয়ে দাঁড়াবে। অগ্নিপুরাণে বর্ণিত গদা-কর্ম সম্বন্ধেও একই কথা বলতে হবে বটে, কিন্তু এখানে দুবার পৃথকভাবে বলা অনেকগুলি কৌশলের মধ্যে মহাভারতের 'গোমূত্রিক' মণ্ডলটি লক্ষণীয়ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। আর কমলাসন থেকে আরম্ভ করে অন্য যত নাম আছে, তা খানিক পুরাণের কালানুপাতে পরিমার্জিত এবং অলংকারযুক্ত। অগ্নিপুরাণের প্রথম তালিকায় উচ্চারিত কৌশলগুলি হল—আহত, গোমূত্রপ্রভ, কমলাসন, উর্ধ্বগাত্র, নমিত, বাম-দক্ষিণ, আবৃত্ত, পরাবৃত্ত, পাদোদ্ধৃত, অবপ্লুত, হংসমর্দ এবং বিমর্দ। দ্বিতীয় তালিকায় নামগুলি অন্যরকম। কিন্তু দ্বিতীয় তালিকায় গদাযুদ্ধের কৌশলগুলি দ্বন্দ্বযুদ্ধের বা মল্লযুদ্ধের সঙ্গে এমন একাকার হয়ে যায় যে, সেগুলিকে পৃথক করা কঠিন হয়ে পড়ে। এখানে অনুবাদক M.N. Dutt সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত একটি অনুবাদ করে গদাযুদ্ধের অংশটিকে মল্লযুদ্ধের বিমিশ্রিত কৌশলগুলি থেকে পৃথক করে দিয়েছেন—

The function of a *gadā* are to strike a blow, to make out a way and to attack an enemy in the ways in which a lion, an elephant or a boar meet their respective adversaries in battle, to deal a blow from upwards and to deal death both right and left, dispersing the enemies' soldiers in the order known as the Gomūtra.

[নীতিপ্রকাশিকা (Oppert) ৫.৩০-৩৪;
অগ্নি পু. ২৫২.১১-১২, ২২-২৪;
অগ্নি পু. (J.L. Shastri), vol. 2, p. 108]

□ মহাভারতে গদাযুদ্ধে পারদর্শী বহু বিখ্যাত যোদ্ধার নাম পাওয়া যায়। মগধরাজ জরাসন্ধ এঁদের মধ্যে একজন। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে

যে, কৃষ্ণের হাতে কংস এবং হংস-ডিম্ভক প্রভৃতির বধ সংবাদ পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে জরাসন্ধ তাঁর গদাটি নিরানব্বই বার ঘুরিয়ে গিরিব্রজপুর থেকে মথুরার দিকে নিক্ষেপ করেন। মথুরার কাছে একস্থানে সেই গদা পড়েছিল। সেই থেকে স্থানটি 'গদাবসান' নামে খ্যাত হয়। এর থেকে অবশ্য জরাসন্ধ কতটা দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিলেন তারও একটা ধারণা হয়। হরিবংশ পুরাণে জরাসন্ধের মথুরা আক্রমণের যে বিবরণ আছে, সেখানে তাঁকে গদাযুদ্ধে পারদর্শী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বলরামের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ গদাযুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়। অবশ্য এই যুদ্ধে বলরামের হাতে জরাসন্ধের পরাজয়ের উল্লেখ আছে। বলরাম গদাযুদ্ধে যে শুধু জরাসন্ধকে পরাস্ত করেছিলেন তাই নয়, গদাযুদ্ধে তাঁর এতটাই পাণ্ডিত্য ছিল যে, সমকালীন গদাযুদ্ধ বিশারদদের মধ্যে বলরাম কিংবদন্তি হিসেবে, আচার্যের মর্য্যাদায় পূজিত হতেন। তাঁর সময়ের বিখ্যাত দুই গদাধর যোদ্ধা ভীম এবং দুর্যোধন দ্রোণের কাছে অস্ত্রশিক্ষার পর গদাযুদ্ধের বিশেষ পাঠ নিয়েছিলেন বলরামের কাছ থেকে।

রামায়ণে বহু বানর এবং রাক্ষস বীরকেই গদাযুদ্ধে পারদর্শী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এঁদের মধ্যে হনুমান, অঙ্গদ, সুগ্রীব প্রভৃতি এবং রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

[দ্র. ভীম, দুর্যোধন]

[মহা (k) ২.১৯.২১-২৩; (হরি) ২.১৮.২১-২৩; হরিবংশ পু. ২.৩৬.১৩-৩৫; রামায়ণ ৬.৪৩.১৮; ৬.৫৩.৯, ২৫]

গদাবসান মথুরায় অবস্থিত একটি স্থান। কথিত আছে, কৃষ্ণ জরাসন্ধের জামাতা কংসকে বধ করেছেন—একথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে জরাসন্ধ তাঁর রাজধানী গিরিব্রজ নগরী থেকে মথুরার উদ্দেশে এক প্রকাণ্ড গদা নিরানব্বই বার ঘুরিয়ে নিক্ষেপ করেন। মথুরার নিকটবর্তী এক স্থানে এসে সেই গদা পড়েছিল। জরাসন্ধর নিক্ষিপ্ত গদা ওই স্থানে পড়েছিল বলেই স্থানটি গদাবসান নামে খ্যাত।

[মহা (k) ২.১৯.২২-২৫; (হরি) ২.১৮.২০-২৩]

গদায়ন মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপ-বংশীয় ঋষিদের মধ্যে যাঁরা গোত্র প্রবর্তক ঋষি ছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন গদায়ন। *[মৎস্য পু. ১৯৯.৪]*

গদালোল গয়াক্ষেত্রের একটি তীর্থ। বিষ্ণুর গদার আঘাতে হেতি নামে এক অসুরের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হয়। হেতি বধের পর বিষ্ণু যে স্থানে তাঁর গদাটি প্রক্ষালন করেন সেই স্থানটি গদালোল তীর্থ নামে পরিচিত। *[বায়ু পু. ১১১.৭৫-৭৬]*

☐ বিহারের গয়া জেলার অন্তর্গত মরনপুর (Maranpur) গ্রামের এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি অঞ্চল। *[GDAMI (Dey) p. 65]*

গদিনী মৎস্য পুরাণে প্রাপ্ত উল্লেখ অনুযায়ী, যমের শক্তিস্বরূপা সহধর্মিণী হলেন গদিনী। পুরাণকার গদিনীকে বর্ণনা করেছেন মহিষারূঢ়া রূপে।

[মৎস্য পু. ২৮৬.৮]

গন্তুপ্রস্থ একটি প্রাচীন পবিত্র পর্বত-তীর্থ। গন্তুপ্রস্থকে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান পর্বত বলে পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে।

[বায়ু পু. (আনন্দাশ্রম) ৪৫.৯১]

গন্ধকালী দাসরাজের কন্যা তথা শান্তনুপত্নী সত্যবতীই গন্ধকালী নামে পরিচিত ছিলেন। পরাশরের ঔরসজাত বেদবিভাগকারী মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস সত্যবতীর কানীন পুত্র ছিলেন।

[দ্র. সত্যবতী]

গন্ধধারী মহাভারতের অনুশাসনপর্বের অন্তর্গত শিবসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত মহাদেবের অন্যতম নাম। নীলকণ্ঠ তাঁর ভারতভাবদীপ টীকায় মহাদেবের গন্ধধারী নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

গন্ধধারী কুঙ্কুমকস্তূর্য্যাদিসুরভিদ্রব্যধর্ত্তা।

ভগবান শিবের যে দিব্য মূর্তি কল্পিত হয় তা চন্দন, কুঙ্কুম, কস্তূরী প্রভৃতি সুগন্ধীদ্রব্য চর্চিত। সেই কারণেই তাঁর গন্ধধারী নাম প্রসিদ্ধ। একই ভাবনায় চন্দনচর্চিতগাত্র মহাদেব চন্দনী নামেও পরিচিত—

চন্দনী চন্দনালিপ্ত গাত্রঃ।

[মহা (k) ১৩.১৭.৪৬; (হরি) ১৩.১৬.৪৬]

গন্ধপা মহাভারতে উল্লিখিত দেবতাদের একটি গণের নাম গন্ধপা।

[মহা (k) ১৩.১৮.৭৫; (হরি) ১৩.১৭.৭৫]

গন্ধবতী বায়ু পুরাণ অনুসারে বরুণের সভার নাম সতী। বরুণের সভার উত্তর দিকে অবস্থিত পবনের সভা ভবনটি গন্ধবতী নামে খ্যাত।

[বায়ু পু. ৩৪.৮৯]

গন্ধবতী নদী একটি পুণ্যতোয়া নদীর নাম। মহাদেব একদা নিজের কপাল ধুয়ে সেই জল মাটির নিক্ষেপ করেন। সেই স্থান থেকে একটি নদীর

উৎপত্তি ঘটে। এরই নাম গন্ধবতী বা নীল-গন্ধবতী। মৃত পিতৃগণ এই নদীর দক্ষিণ তীরে অপেক্ষা করেন। যখন তাঁদের উত্তরপুরুষেরা এখানে এসে তাঁদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করবেন তখনই তাঁদের স্বর্গলাভ সম্ভব। এইখানে এসে পরলোকগতদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করলে তাঁরা অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেন।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ১৬.১-১০]

গন্ধমাদ১ কাশীরাজকন্যা গান্দিনীর গর্ভে শ্বফল্কের ঔরসজাত পুত্র হলেন গন্ধমাদ। গান্দিনীর গর্ভজাত অক্রূর প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে গন্ধমাদ একজন। ইনি অক্রূরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.১৭;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১১২]

গন্ধমাদ২ *[দ্র. গন্ধমাদন২]*

গন্ধমাদন১ একটি বিখ্যাত এবং পবিত্র পর্বত। গন্ধমাদন পর্বতে নারায়ণের আশ্রম অবস্থিত। নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়ের তপস্যাক্ষেত্রও এই বিখ্যাত গন্ধমাদন পর্বত। পুরাণগুলিতে অনেক সময়েই পৃথিবীকে একটি পদ্মের আকারে কল্পনা করা হয়েছে। সেখানে গন্ধমাদন পর্বতকে পদ্মের দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত বলে উল্লেখ করা হয়। গন্ধমাদন একটি মর্য্যাদা পর্বত। অর্থাৎ এটি মর্য্যাদা বা ভৌগোলিক সীমা হিসেবে কাজ করেছে। বায়ুপুরাণ মতে, গন্ধমাদন গিরির বিস্তার চৌত্রিশ হাজার যোজন। অবশ্য বিষ্ণু পুরাণে এটিকে আশি হাজার যোজন বিস্তৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইলাবৃতবর্ষের পূর্ব সীমায় অবস্থিত এই পর্বতটির পূর্ব দিকে মাল্যবান পর্বতের বিস্তার। মেরু পর্বত ও গন্ধমাদনের মধ্যে দূরত্ব পৌরাণিক অঙ্কে নয় হাজার যোজন।

[মহা (k) ১.২.১৭৮-১৭৯; ১২.৩৪৩.৩৩;
(হরি) ১.২.১৭৮-১৭৯; ১২.৩২৯.৩৩;
বায়ু পু. ৩৪.৩৪; ৩৫.১৬; ৪৬.১৭;
বিষ্ণু পু. ২.২.১৮, ২৭, ৪০; ৫.২৪.৫;
মৎস্য পু. ৮৩.৩২-৩৩; ১১৩.৪৫;
ভাগবত পু. ৪.১.৫৭; ৫.১৬.১০;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৫.৪০; ১.১৭.১৬]

□ কৃত্তিবাসী রামায়ণে হনুমান কর্তৃক গন্ধমাদন পর্বত উত্তোলনের একটি বহুশ্রুত কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে মূল রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণে এই কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত রামায়ণের সংস্করণে কাহিনীটির উল্লেখ রয়েছে।

[J.T. Wheeler; The History of India from the Earliest Ages : The Ramayana and the Brahmanic Period; London; N. Trubner & Co. 1869; p. 371-372]

□ গন্ধমাদন পর্বতের পাদদেশ নানা জাতীয় বৃক্ষে আবৃত। যেমন—আম, নারিকেল, কাঁঠাল, কদলী, চম্পক, পাকুড়, আমলকী ইত্যাদি। বৃক্ষাবৃত অরণ্যভূমিতে চকোর, ভৃঙ্গরাজ, শুক, কোকিল, চাতক প্রভৃতি পাখির দেখা পাওয়া যায়। পর্বতের পাদদেশস্থিত সরোবরে কলহংস, পানকৌড়ি, পিবল, হংস, বক ইত্যাদি পাখি বিচরণ করে। চারিদিক সুগন্ধী বর্ণময় ফুলের সমাহার। পর্বত গুহাগুলিও নানা বর্ণের। কোনোটি স্বর্ণবর্ণ যুক্ত আবার কোনোটি বা উজ্জ্বল রক্তবর্ণের। এই পর্বতের বৃক্ষের ফল-ফুল এবং লতাগুল্মের সৌরভে মানুষ মাদিত হত বলেই সম্ভবত পর্বতটির নাম গন্ধমাদন। এই বর্ণনা থেকে এইস্থানের 'ইকোলজিক্যাল' ব্যালান্সের প্রসঙ্গটা সহজে আসে। *[মহা (k) ৩.১৫৮.৩৭-১০০;*
(হরি) ৩.১৩১.৩৭-১০০]

□ মহাভারতের সভাপর্বের বর্ণনায় দেখা যায়—যক্ষাধিপতি কুবেরের সভায় দেবতুল্য মূর্তিধারণ করে উপস্থিত থেকে বহু পর্বত যেন তাঁর সেবা করেন। সেইসব পর্বতের মধ্যে গন্ধমাদন একটি। গন্ধমাদনই কুবেরের আবাসস্থল।

□ কুবেরের পিতা বিশ্রবাও তাঁর তিন পত্নী (পুষ্পোৎকটা, রাকা ও মালিনী) এবং পুত্র রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও কন্যা শূর্পনখাকে নিয়ে গন্ধমাদন পর্বতে বাস করতেন।

[মহা (k) ২.১০.৩২; ৩.২৭৫.৪-১৩;
(হরি) ২.১০.২৮; ৩.২২৯.৪-১৩]

□ গন্ধমাদন মহর্ষি কশ্যপের তপস্যাক্ষেত্র। কদ্রু-পুত্র শেষনাগও সেখানে তপস্যা করেছিলেন। *[মহা (k) ১.৩০.৯; ১.৩৬.৩;*
(হরি) ১.২৫.৯; ১.৩১.৩]

□ রাজা পাণ্ডু কুরুরাজ্য ত্যাগ করে শতশৃঙ্গ পর্বতে গিয়েছিলেন কঠোর তপস্যার উদ্দেশ্যে। শতশৃঙ্গ পর্বতে যাওয়ার পথে তিনি গন্ধমাদন পর্বত পার হন।

[মহা (k) ১.১১৯.৪৮; (হরি) ১.১১৩.৪৮]

□ মহাভারতের বনপর্বে মহর্ষি লোমশ জানিয়েছেন যে, তপোবলের মাধ্যমেও সরাসরি গন্ধমাদন পর্বতে প্রবেশ করা অসম্ভব। এটি এমনই এক পুণ্যপর্বত, অথবা এতটাই এই পর্বত দুর্গম যে, অনেক তপস্যা বা অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করেও এই পর্বতে পৌঁছোনো কঠিন হয়।

[মহা (k) ৩.১৪০.২২; (হরি) ৩.১১৬.২২]

□ অর্জুন বনবাসকালে দিব্যাস্ত্রলাভের জন্য স্বর্গলোকের উদ্দেশে যাত্রা করার সময় গন্ধমাদন পর্বত দর্শন করেছিলেন। মহাভারতকার অর্জুনকে উদ্ধৃত করে বলেছেন—পূর্বজন্মে কৃষ্ণ দশ হাজার বছর গন্ধমাদন পর্বতে বিচরণ করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.১২.১১; ৩.৩৭.৪১;
(হরি) ৩.১১.১১; ৩.৩৩.৪১]

□ বনবাসরত অর্জুনের সাক্ষাৎ পেতে যুধিষ্ঠির এবং অবশিষ্ট পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে গন্ধমাদন পর্বতে গিয়েছিলেন। তাঁদের গন্ধমাদন অভিযানের সূত্রে গন্ধমাদন পর্বত সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

গন্ধমাদন পর্বতে একটি পবিত্র বদরীবৃক্ষ এবং নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়ের আশ্রম অবস্থিত। যক্ষপতি কুবেরের নামে পরিচিত কুবের সরোবরটিও গন্ধমাদনেই অবস্থিত। রাক্ষসরা দিনরাত এই সরোবরটি পাহারা দেন। নৃশংস, লোভী এবং অসংযত চরিত্রের মানুষ কখনোই গন্ধমাদন পর্বতে আরোহণ করতে পারে না। নিয়ম নীতি অগ্রাহ্য করে এই পর্বতে প্রবেশ করলে বিষাক্ত পোকামাকড় এবং হিংস্র জন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এখানে।

[মহা (k) ৩.১৪১.২২-২৮; (হরি) ৩.১১৭.২২-২৮]

□ দুর্গম গন্ধমাদন পর্বত নদী, সরোবর এবং গভীর বনভূমিতে আবৃত। সেখানে দেবতা, ঋষি, সিদ্ধগণ এবং কিন্নরদের বিচরণ। গন্ধমাদন অপ্সরাদের প্রিয় ক্ষেত্রও বটে। পাণ্ডবরা গন্ধমাদন পর্বতের গভীরে এক প্রবল ঝড়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

[মহা (k) ৩.১৪৩,২-৭; (হরি) ৩.১১৯.২-৭]

□ গন্ধমাদনে যাওয়ার পথে বদরিকাশ্রমের নিকটে একটি সহস্রদল পদ্ম হাওয়ায় উড়ে এসে দ্রৌপদীর কাছে পড়ে। দ্রৌপদীর ইচ্ছানুসারে ভীম আরও সহস্রদল পদ্মের খোঁজে বের হলেন। ভীমসেন ফুলের সন্ধানে গন্ধমাদনের গভীর থেকে গভীরতর অঞ্চলে ছুটে বেড়ান। পর্বতের দুর্গম অংশে নানা বর্ণের ধাতু ও বৃক্ষের সমাহার দেখা গেল। গন্ধমাদন পর্বত সব ঋতুতেই রমণীয়। চারিদিকে প্রস্ফুটিত পুষ্পের সুগন্ধ। মনোরম পার্বত্য গুহা, জলপ্রপাতের সমাহার। গন্ধমাদনের রূপ দর্শন করতে করতেই ভীমের সঙ্গে বায়ুর আরেক পুত্র হনুমানের সাক্ষাৎ হয়।

[মহা (k) ৩.১৪৬.১-৬৮; (হরি) ৩.১২১.১-৬৮]

□ দিব্যাস্ত্র লাভের জন্য স্বর্গলোকে গিয়েছিলেন অর্জুন, এই গন্ধমাদন পর্বতের পথেই তাঁর মর্ত্যভূমিতে ফেরার কথা। অর্জুনের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় গন্ধমাদন পর্বতে এসে পাণ্ডবরা দীর্ঘ পাঁচ বছর বাস করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.১৫৫.৩৪; (হরি) ৩.১২৮.৩৩]

□ গন্ধমাদন পর্বতের উত্তরাংশে বৃষপর্বা ঋষির আশ্রম অবস্থিত। পাণ্ডবরা এই আশ্রম দর্শন করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.১৫৮.১৯; (হরি) ৩.১৩১.১৯]

□ রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রমটিও গন্ধমাদন পর্বতে অবস্থিত। রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণ পাণ্ডবদের জানিয়েছিলেন যে, প্রতিপদ এবং পঞ্চদশী তিথির সন্ধিকালে গন্ধর্ব তুম্বুরু যখন কুবেরের উপাসনা করেন, সেই সামধ্বনির মতো শব্দ গন্ধমাদন পর্বতে অনুরণিত হয়।

[মহা (k) ৩.১৫৮.১০১; ৩.১৫৯.২৯;
(হরি) ৩.১৩১.১০১; ৩.১৩২.২৯]

□ বিখ্যাত বদরিকাশ্রম তীর্থটি গন্ধমাদন পর্বতে অবস্থিত—

বদরীমাশ্রমং পুণ্যং গন্ধমাদনপর্বতে।

পুরাণে বর্ণিত কাহিনী থেকে জানা যায়, অপ্সরাশ্রেষ্ঠা উর্বশী এইস্থানেই জন্মগ্রহণ করেন।

[দ্র. উর্বশী]

[বিষ্ণু পু. ৫.৩৭.৩২]

□ মহাভারতের উদ্যোগপর্বে বিদুর দুর্যোধনের অদূরদর্শিতার পরিণাম বর্ণনা করতে গন্ধমাদন পর্বতে দেখা একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। একবার ভেষজ শাস্ত্রে দক্ষ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে একদল ব্যাধ গন্ধমাদন পর্বতে যান। সেখানে একটি বিপদসঙ্কুল গুহার মধ্যে একটি কুম্ভপাত্রে অর্থাৎ কলসিতে পীতবর্ণের মধু রক্ষিত রয়েছে। এই মধু কুবেরের অত্যন্ত প্রিয় এবং বিষধর সর্পেরা এই মধুকলসের রক্ষাকর্তা।

এই মধু পান করলে মানুষ অমরত্ব লাভ করে, অন্ধ চক্ষুষ্মান হয়ে ওঠে এবং বৃদ্ধেরা যৌবন লাভ করে—

তৎ প্রাপ্য পুরুষো মর্ত্ত্যো'প্যমরত্বং নিয়চ্ছতি॥
অচক্ষুলভতে চক্ষুর্বৃদ্ধো ভবতি বৈ যুবা।

কুম্ভপাত্রে রক্ষিত মধুর গুণাগুণ শুনে ব্যাধেরা পারিপার্শ্বিক বিচার না করেই মধু হরণের উদ্দেশ্যে সর্পে পরিপূর্ণ গুহায় প্রবেশ করে। অচিরেই তারা সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

[মহা (k) ৫.৬৪.১৫-২১; (হরি) ৫.৬৩.১৫-২১]

□ গঙ্গা নদীর চারটি পবিত্র ধারার মধ্যে সীতা একটি। সীতা নদী গন্ধমাদন পর্বত থেকে প্রবাহিত হয়ে ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্যে দিয়ে পূর্বদিকে লবণ সমুদ্রে পতিত হয়েছে।

গন্ধমাদন অলকনন্দা নদীরও উৎপত্তিস্থল।

[ভাগবত পু. ৫.১৭.৬; বায়ু পু. ৪২.২৫-২৬]

□ একবার প্রলয়কালে ভগবান বিষ্ণু বালকের রূপ ধারণ করে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে তাঁর উদরে স্থান দিয়ে রক্ষা করছিলেন। মার্কণ্ডেয় সে সময় শ্রীহরির উদরে বহু নদী-পর্বতকে আশ্রিত অবস্থায় দেখেছিলেন। এই পর্বতগুলির মধ্যে গন্ধমাদন একটি।

[মহা (k) ৩.১৮৮.১১৩; (হরি) ৩.১৫৯.১১৩]

□ দেবী সতী গন্ধমাদন পর্বতে কামাক্ষী নামে পূজিতা। *[মৎস্য পু. ১৩.২৬]*

□ গন্ধমাদন পর্বতের পাশে একটি বিশালাকার শিলা রয়েছে। ঐ শিলাস্থিত জনপদটি গণ্ডিকা নামে পরিচিত। *[বায়ু পু. ৪৩.১]*

□ মাল্যবান ও গন্ধমাদন পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে গোলাকার এবং স্বর্ণবর্ণের মেরু পর্বতটি অবস্থিত। গন্ধমাদনের উত্তর দিকে একাধিক ক্ষুদ্রাকার পর্বত দেখা যায়। এসব অঞ্চলে বসবাসকারীদের আয়ু পৌরাণিক মতে এগারো হাজার বছর। সেখানে বসবাসকারী পুরুষরা কৃষ্ণবর্ণ ও মহাশক্তিশালী। স্ত্রীলোকেরা সুন্দরী ও পদ্মবর্ণ সম্পন্ন, পুরাণের বক্তব্য এইরকমই।

[মহা (k) ৬.৬.১০, ৩৪-৩৬;
(হরি) ৬.৬.১০, ৩৪-৩৬]

□ গন্ধমাদন পর্বত একটি বিশেষ পার্বত্য প্রজাতি গুহ্যকদের দ্বারা রক্ষিত হয়—একথা মহাভারতের কর্ণপর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ৮.৪৫.৩৩; (হরি) ৮.৩৪.১৩৯]

□ জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম গন্ধমাদন পর্বতে মহাদেবের তপস্যা করে বিভিন্ন অস্ত্র এবং মহাতেজ সম্পন্ন পরশু (কুঠার) লাভ করেন।

[মহা (k) ১২.৪৯.৩৩; (হরি) ১২.৪৮.৩৩]

□ মহর্ষি অষ্টাবক্র একবার গন্ধমাদন পর্বতে গিয়েছিলেন বলে সংবাদ পাওয়া যায়।

[মহা (k) ১৩.২১.১৫; (হরি) ১৩.১৯.৪১]

□ সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিদেরও তপস্যাস্থল এই গন্ধমাদন পর্বত।

[মহা (k) ১৩.১৪৭.৪৪; (হরি) ১৩.১২৫.৪৪]

□ গন্ধমাদন পর্বত কিন্নরশ্রেষ্ঠ দ্রুমের আবাসস্থল। বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের পুত্র রুক্মী এই দ্রুমের শিষ্য ছিলেন।

[মহা (k) ৫.১৫৮.৩; (হরি) ৫.১৪৭.৩]

□ হিরণ্যগর্ভ ঋষির কন্যা তৃণবিন্দুর আশ্রমে অমোঘা নামে এক কন্যা বাস করতেন। এই অমোঘা ও হরিবর্ষের রাজা শান্তনুর মধ্যে প্রণয়-সম্পর্ক তৈরি হয়। তাঁরা একত্রে সে সময় বহু পর্বত-নদী ভ্রমণ করেছিলেন। এই পর্বতগুলির মধ্যে গন্ধমাদন একটি। *[কালিকা পু. ৮২.৭]*

□ পুরাকালে কাশীর রাজা বিশাল রাজ্যহারা হয়ে গন্ধমাদন পর্বতে বাস করতে শুরু করেন। সেখানে তিনি বদরী নামে একটি আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। বদরী আশ্রমে বিশালকে তপস্যারত দেখে নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয় তাঁকে বরদান করেন। বরের প্রভাবে বিশাল রাজচক্রবর্তী হয়ে উঠলেন। সেই থেকে বদরী আশ্রম বিশালা নামেও খ্যাত।

[বরাহ পু. ৪৯.১-২৪]

□ রুদ্র-হিমালয় বা গাড়োয়াল হিমালয়ের অংশ বিশেষ। প্রাচীন ভৌগোলিকদের মতে কৈলাস পর্বতের দক্ষিণে গন্ধমাদনের অবস্থান।

[GDAMI (Dey) p. 60

□ পণ্ডিত S.M. Ali গন্ধমাদন পর্বতের অবস্থান সম্পর্কে খানিক ভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে পামীর পর্বতমালাটিই পুরাণখ্যাত মেরু পর্বত। এর উত্তর এবং দক্ষিণে অসংখ্য ছোটো-বড়ো পর্বত শ্রেণীর বিস্তার। পুরাণে একাধিকবার গন্ধমাদনকে কখনো মেরু পর্বতের পশ্চিমে কখনো বা দক্ষিণে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। Ali ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন যে, পুরাণের বর্ণনা একেবারে সঠিক। কারণ, মেরু পর্বত অর্থাৎ পামীরের দক্ষিণে একটি পর্বত

অবস্থান করলেও সেটি ক্রমে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত। এই পর্বতটিই প্রাচীন গন্ধমাদন বলে তাঁর মত।

[GP (Ali) p. 91]

গন্ধমাদন২ একজন বানরবীর। ইনি কুবেরের পুত্র বলে রামায়ণে উল্লেখ করা হয়েছে। রাম-রাবণের যুদ্ধে গন্ধমাদনকে বিভিন্ন সময় রাবণের রাক্ষস বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে বা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে দেখা গেছে। *[রামায়ণ ১.১৭.১২]*

□ সুগ্রীব যখন বানর যূথপতিদের যুদ্ধে সৈন্য সাহায্যের জন্য আহ্বান করেছেন, সেখানে গন্ধমাদন সহস্রকোটি এবং শত সহস্র সৈন্যসহ সুগ্রীবকে সাহায্য করতে এসেছেন।

[রামায়ণ ৪.৩৯.২৮]

□ সীতাকে খুঁজতে সুগ্রীব অঙ্গদের সঙ্গে দক্ষিণদিকে যে বানরবীরদের পাঠান, তাঁদের মধ্যে গন্ধমাদন একজন। *[রামায়ণ ৪.৪১.৪]*

□ অঙ্গদের নেতৃত্বে বানরেরা সীতাকে নদী, পর্বত, গুহা সর্বত্র সন্ধান করলেন কিন্তু সীতা বা রাবণ কারোরই দেখা পেলেন না। পরিশ্রান্ত বানরদলকে অঙ্গদ পুনরায় সীতার খোঁজে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এদের মধ্যে গন্ধমাদন অঙ্গদের সঙ্গে সহমত হন এবং বাকি বানর সেনাদের পুনর্বার সীতার খোঁজে যেতে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর বাক্যানুসারেই বানরসেনা পুনরায় সীতা অন্বেষণে যান।

[রামায়ণ ৪.৪৯.১১-২০; ৪.৫০.১-৮]

□ সাগর পারাপারের সময় অঙ্গদ উপস্থিত বানরবীরদের কাছে জানতে চান যে, তাঁরা কে কত দূর পর্যন্ত লাফ দিয়ে সাগর পার করতে পারবেন। গন্ধমাদন জানান তিনি অন্তত পঞ্চাশ যোজন দূরত্ব পর্যন্ত লাফ দিতে পারবেন।

[রামায়ণ ৪.৬৫.৬]

□ রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে যুদ্ধ চলাকালীন গন্ধমাদনকে বানর সেনার বামভাগ রক্ষা করতে দেখা গেছে।

[রামায়ণ ৬.৪.১৮; ৬.২৪.১৬; ৬.৪২.৩১]

□ কুম্ভকর্ণের সঙ্গে বানরদের যুদ্ধে বানরবীর গন্ধমাদন আহত হন। *[রামায়ণ ৬.৬৭.২৪-২৮]*

□ যুদ্ধ চলাকালীন গন্ধমাদন ইন্দ্রজিতের বাণে আহত হন। *[রামায়ণ ৬.৭৩.৪৩; ৬.৮৯.৪৮-৫১]*

□ রামের রাজ্যাভিষেকের সময় গন্ধমাদন অযোধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। কিষ্কিন্ধ্যায় ফেরার আগে রাম তাঁকে বহু উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন। *[রামায়ণ (তর্করত্ন) ৭.৫০.২০; (মুধোলকর) ৭.৩৯.২০]*

□ পুরাণেও গন্ধমাদনের উল্লেখ রয়েছে। তবে কোথাও কোথাও তাঁকে ছন্দের খাতিরে গন্ধমাদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[ভাগবত পু. ৯.১০.১৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৩১]*

গন্ধমোজ শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভজাত পুত্র গন্ধমোজ। ইনি অক্রূরের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের মধ্যে একজন। *[বিষ্ণু পু. (নবভারত) ৪.১৪.২]*

গন্ধর্ব১ একটি প্রাচীন জনজাতি। মহাকাব্য-পুরাণ থেকে আধুনিক যুগের কল্পনা সর্বত্রই গন্ধর্ব বলতে অপূর্বদর্শন এবং সুকুমার কলায় (বিশেষত নৃত্য-গীত্য) পারদর্শী এক সম্প্রদায়ের চিত্র ফুটে ওঠে।

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে 'গন্ধর্ব' সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, বসুদেবতারা সূর্য থেকে অশ্ব নির্মাণ করেন। সেই অশ্বকে সূর্যের রথে যোজনা করার পর গন্ধর্ব সারথির ভূমিকা গ্রহণ করে অশ্বের লাগাম হাতে নিলেন—

গন্ধর্বো অস্য রশনামগৃভ্ণাৎ
সূরাদশ্বং বসবো নিরতষ্ট।

লক্ষণীয়, এই সূক্তের দেবতাই হলেন অশ্ব, গন্ধর্ব এবং গান্ধার দেশের সঙ্গে অশ্বের একাধিক যোগাযোগের উল্লেখও আমরা পাবো। ঋগ্বেদের এই মন্ত্রই হয়তো তার মূল উৎস। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পুরাণে 'গন্ধর্ব' শব্দটি অশ্বের প্রতিশব্দ বলেও উল্লিখিত হয়েছে। বায়ু পুরাণে ভদ্রাকে গন্ধর্ব নামক অশ্বদের মাতাও বলা হয়েছে। বেদের মন্ত্রে সূর্যের রথের অশ্ব-নিয়ন্ত্রক বা সারথি বলা হয়েছে গন্ধর্বকে। ঋগ্বেদের টীকাকার সায়নাচার্যের ব্যাখ্যা অনুসরণে এক্ষেত্রে আমরা গন্ধর্ব শব্দটিকে একটু অন্যভাবেও বিশ্লেষণ করতে পারি। 'গো' শব্দের অর্থ রশ্মি বা কিরণ। সূর্যের সারথিরূপে তাঁর রশ্মি বা কিরণগুলিকে যিনি ধারণ করেন তিনিই গন্ধর্ব। এই ভাবনা থেকেই দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ গন্ধর্ব সূর্যের রথে অধিষ্ঠান করেন—এই পৌরাণিক ভাবনার উৎপত্তি।

[ঋগ্বেদ ১.১৬৩.২; রামায়ণ ১.১৫.৪; ১.১৮.১৭; বায়ু পু. ৬৬.৭৩; অমরকোষ (নানার্থবর্গ) ৩.১৩২]

□ গন্ধর্বরা যুদ্ধবিদ্যায়ও অত্যন্ত পারদর্শী। গন্ধর্বদের উৎপত্তি-কথা এবং বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করলে কখনোই এঁদের সাধারণ মনুষ্যের

পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। সম্ভবত সে কারণেই দেবতা, মহর্ষিদের পাশাপাশি প্রাচীনকালে বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানে গন্ধর্বদের উদ্দেশেও আহুতি দানের রীতি প্রচলিত ছিল। লাবণ্য কামনায় তাঁদের আরাধনাও করা হতো।

পণ্ডিত K.C. Mishra-এর মতে গন্ধর্বরা ছিলেন প্রাচীন ভারতের উত্তর সীমার রক্ষক। হিমালয় পর্বতের সঙ্গে গন্ধর্বদের নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে হিমালয়ে গন্ধর্বদের অধিষ্ঠানের কথা পাওয়া যায়। মন্দাকিনী নদীর তটেও তাঁরা বাস করতেন।

[রামায়ণ ৪.৪৩.১৪; মহা (k) ১২.১৬৬.১৮; (হরি) ১২.১৬১.১৮; ভাগবত পু. ২.৩.৬]

□ বিষ্ণুপুরাণে গন্ধর্বদের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি পৃথক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সৃষ্টির আদিতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টির তপস্যায় রত ছিলেন। তপস্যা করতে করতে একসময় ব্রহ্মা ক্ষুধার্ত হলেন, ক্রুদ্ধও হলেন। তাঁর সেই ক্ষুধা এবং ক্রোধ থেকে যক্ষ এবং রাক্ষসদের উৎপত্তি হল। এমন ভয়ংকর এবং অপ্রিয় প্রজা সৃষ্টি করে ব্রহ্মা দুঃখিত হলেন। দুঃখে, হতাশায় তখন তাঁর চারটি মস্তক থেকে কেশ অপসৃত হল এবং তার কিছু পরে আবার সেই কেশগুচ্ছ, ফিরে এলো তাঁর মস্তকে। সেই কেশগুচ্ছ থেকে সর্পকুলের জন্ম হল। তারপর ব্রহ্মার তপস্যার ফল রূপে জন্ম নিল বাক্। আর সেই বাক্ বা গীত উচ্চারণ করতে করতে যাঁরা জন্ম নিলেন, তাঁরাই গন্ধর্ব—

ধ্যায়তো'ঙ্গাৎসমুৎপন্না গন্ধর্ব্যাস্তস্য তৎক্ষণাৎ।
পিবন্তো জজ্ঞিরে বাচং গন্ধর্বাস্তেন তে দ্বিজা॥

বস্তুত এই ভাবনা থেকেই অমরকোষ থেকে শুরু করে প্রায় সর্বত্রই গন্ধর্বদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাঁরা গান করেন, তাঁরাই গন্ধর্ব। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার বিষ্ণুচিত্তি সম্পূর্ণ শ্লোকটির থেকে একটি করে বর্ণ চয়ন করে 'গন্ধর্ব' শব্দটিকে গঠন করেছেন। 'ধ্যায়তঃ' শব্দ থেকে 'ধ' বর্ণটি, 'অঙ্গাৎ'—এই শব্দ থেকে 'গ' বর্ণ, আর 'বাচম্' শব্দটি থেকে 'ব' কার চয়ন করা হয়েছে। তারপর বর্ণ বিপর্য্যাসিত করে গন্ধর্ব পদটি নির্বাচন করা হয়েছে।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ১.৫.৪৬]

□ রামচন্দ্রের জন্মের পর স্বয়ং ব্রহ্মা অন্যান্য দেবতাদের আদেশ করেছিলেন গান্ধর্বীদের গর্ভে পরাক্রমশালী পুত্র উৎপাদনের। এইসব বীর্য্যবান পুত্রেরাই ভবিষ্যতে রামচন্দ্রের অনুগমন করবেন।

[রামায়ণ ১.১৭.৫]

□ মহাত্মা ভগীরথ যখন গঙ্গা নদীকে মর্ত্যে আনয়ন করেছিলেন তখন যাঁরা গঙ্গা নদীর অনুগমন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে গন্ধর্বরা অন্যতম। এই রূপকের অন্তরালে প্রকৃতপক্ষে গন্ধর্বদের ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

[রামায়ণ ১.৪৩.৩২]

□ মহেন্দ্র পর্বতে গন্ধর্বদের বসবাসের কথা রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে পাওয়া যায়।

[রামায়ণ ৫.১.৬]

□ রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সিন্ধুনদের উভয়তীরে গন্ধর্বদেশের বিস্তারের কথা বলা হয়েছে—

অয়ং গন্ধর্ববিষয়ঃ ফলমূলোপশোভিতঃ।
সিন্ধোরুভয়তঃ পার্শ্বে দেশঃ পরমশোভনঃ॥

তিনকোটি যুদ্ধবিশারদ গন্ধর্ব সে দেশ রক্ষা করেন। মহর্ষি গর্গ রামচন্দ্রকে এই দেশ জয় করে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার উপদেশ দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভাগবত পুরাণে দুই পুত্র সহ ভরতের দিগ্বিজয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এপ্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, ভরত সে সময় বহু গন্ধর্বের প্রাণ সংহার করেছিলেন। গন্ধর্বদেশ থেকে সংগৃহিত সমস্ত ধন-সম্পদ তিনি অযোধ্যায় নিয়ে আসেন।

রামায়ণের এই বিশেষ শ্লোকটি বিশ্লেষণ করে গবেষকরা গান্ধার দেশকেই গন্ধর্ব দেশ বলে চিহ্নিত করেছেন। এই যুক্তির স্বপক্ষে আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ লুকিয়ে রয়েছে উত্তরকাণ্ডেরই অপর একটি শ্লোকে। আসলে মহর্ষি গর্গের উপদেশ শুনে রামচন্দ্র বলেছিলেন যে, ভরতকে অগ্রবর্তী করে তাঁর দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্কল ভরতের মামা যুধাজিতের সাহায্যে গন্ধর্বদেশ জয় করবেন। তারপর ভরত তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে গন্ধর্বদেশ দুই ভাগ করে তাঁদের প্রতিষ্ঠা করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভরতের দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্কল যে দুটি নগরীর শাসকরূপে অভিষিক্ত হয়েছিলেন সেই নগরীদুটির নাম যথাক্রমে তক্ষশিলা ও পুষ্কলবতী। দুটি নগরীই প্রাচীন গান্ধার দেশের অন্তর্গত ছিল এ

বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই কারণেই Moti Chandra গান্ধারকেই গন্ধর্বদেশ বলে মনে করেছেন। *[রামায়ণ ৭.১১৩.১০-১৬; ভাগবত পু. ৯.১১.১৩-১৪; GESMUP (Moti Chandra) p. 115]*

□ মহাভারতের আদিপর্বে বলা হয়েছে পক্ষীরাজ গরুড়ের আক্রমণে ভীত হয়ে গন্ধর্বগণ একবার পূর্বদিকে পলায়ন করেছিলেন।

[মহা (k) ১.৩২.১৬, (হরি) ১.২৭.১৬]

□ মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে বলা হয়েছে যে, অরিষ্টার পুত্র গন্ধর্বরাজ হংস। এই হংসের অংশেই কুরুপতি জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল।

[মহা (k) ১.৬৭.৮৪-৮৫, (হরি) ১.৬২.৮৪-৮৫]

□ অর্জুনের জন্মের পর তাঁর জন্মোৎসবে গন্ধর্বরা যোগ দিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ১.১২৩.৫০-৫২, (হরি) ১.১১৭.৫৪-৫৬]

□ বকাসুর বধের পর দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় যোগদানের জন্য কুন্তী সহ পঞ্চপাণ্ডব একচক্রা নগরী থেকে পঞ্চাল দেশে যাওয়ার পথে সোমাশ্রয়ায়ণ নামে এক তীর্থে এসে পৌঁছালেন। এই স্থানে অঙ্গারপর্ণ নামে এক গন্ধর্ব বাস করত। সামান্য কারণেই অর্জুনের সঙ্গে অঙ্গারপর্ণের বিবাদ আরম্ভ হয় এবং সেই বিবাদ গড়ায় যুদ্ধ পর্যন্ত। যুদ্ধে শেষপর্যন্ত অঙ্গারপর্ণ পরাস্ত এবং মূর্ছিত হন, তাঁর রথটিও দগ্ধ হয়। অঙ্গারপর্ণের স্ত্রী কুম্ভীনসীর অনুরোধে অর্জুন তাঁকে প্রাণদান করেন। অঙ্গারপর্ণ এই ঘটনার পর নিজ-নাম ত্যাগ করলেন এবং পরিবর্তে চিত্ররথ নাম গ্রহণ করলেন। অর্জুনের আগ্নেয় অস্ত্রের প্রভাবে তাঁর রথখানি দগ্ধ হয়ে বিচিত্র রূপ ধারণ করেছিল বলেই 'চিত্ররথ' নামকরণ।

জীবন লাভের পর চিত্ররথ কৃতজ্ঞতাবশত অর্জুনকে চাক্ষুষী নামে এক বিদ্যা দান করেন। এই বিদ্যা মনু চন্দ্রকে, চন্দ্র বিশ্বাবসুকে এবং বিশ্বাবসু অঙ্গারপর্ণকে দান করেন। ছয় মাস এক পায়ে দাঁড়িয়ে কঠোর তপস্যা করলে তবেই এই বিদ্যা লাভ করা যায়। অর্জুন তপস্যা না করে শুধুমাত্র বীর্য্যবলেই চিত্ররথের থেকে চাক্ষুষী বিদ্যা লাভ করেন। চাক্ষুষী বিদ্যার প্রভাবে ত্রিভুবনের মধ্যে যা ইচ্ছে, যেভাবে ইচ্ছে দেখা সম্ভব।

এছাড়াও গন্ধর্ব চিত্ররথ পঞ্চপাণ্ডবের প্রত্যেককে একশোটি করে উৎকৃষ্ট গন্ধর্বদেশীয় অশ্বদান করেন। এই অশ্বগুলি শুধু বেগবানই নয় তারা ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে সক্ষম। তারা বাহকের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত হতেও সক্ষম। চিত্ররথ এর পরিবর্তে অর্জুনের কাছে চির সখিত্ব ও আগ্নেয় অস্ত্র প্রার্থনা করেন।

[দ্র. অঙ্গারপর্ণ]

[মহা (k) ১.১৭০.১-৫৭, (হরি) ১.১৬৩.১-৫৭]

□ অর্জুনের সঙ্গে গন্ধর্ব চিত্ররথের এই বন্ধুত্বের ফলে পাণ্ডবদের একটি বিশেষ রাজনৈতিক উপকার ঘটেছিল। চিত্ররথই অর্জুনকে বলেছিলেন যে, কোনো ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্তী করে না চলার কারণেই তিনি পাণ্ডবদের আক্রমণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কথা প্রসঙ্গে চিত্ররথ জানান যে, অর্জুনের প্রকৃত পরিচয় দর্শন মাত্রই তিনি জ্ঞাত হয়েছিলেন। সব জানা সত্ত্বেও পত্নীর উপস্থিতিতে অর্জুন কর্তৃক অপমানিত হয়েই তিনি তৃতীয় পাণ্ডবকে আক্রমণের সংকল্প করেন। রাত্রিকালে গন্ধর্বদের বলও বৃদ্ধি পায়। সব মিলিয়েই অর্জুনকে চিত্ররথ আক্রমণ করেছিলেন।

চিত্ররথই অর্জুনকে পরামর্শ দেন যে একজন ব্রাহ্মণকে সম্মুখে রেখেই রাজ্যশাসন সম্ভব। এই প্রসঙ্গে তিনি সম্বরণ-তপতী, বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ, কল্মাষপাদ প্রমুখের কাহিনীও বর্ণনা করেন। চিত্ররথের পরামর্শে মহর্ষি ধৌম্যকে পাণ্ডব-পুরোহিত নিয়োগ করার জন্য যুধিষ্ঠির প্রমুখরা উৎকোচকতীর্থে গিয়েছিলেন। তবে চিত্ররথের দান করা অশ্বগুলি পাণ্ডবরা তখনই গ্রহণ না করে গন্ধর্বরাজের কাছেই গচ্ছিত রাখেন, যথা সময়ে গ্রহণের অঙ্গীকার করে।

[মহা (k) ১.১৭০.৫৯-১৮৩.১-৪; (হরি) ১.১৬৩.৫৯-১৭৬.১-৪]

□ মহাকাব্য-পুরাণে গন্ধর্বদের বিভিন্ন রাজা এবং দেবতার সভায় উপস্থিতির কথা উল্লিখিত হয়েছে। তাঁরা ইন্দ্র, যম, বরুণ, ব্রহ্মা, কুবের তথা যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত থাকতেন।

কুবের-সভায় উপস্থিত গন্ধর্বদের মধ্যে আবার দুটি পৃথক গণের উল্লেখ মহাভারতের সভাপর্বে পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন কিন্নরগণ ও নরগণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কিন্নররা গন্ধর্বদেরই একটি শাখা। এছাড়াও যে সকল বিশিষ্ট গন্ধর্বদের

কুবের-সভায় উপস্থিতির কথা পাওয়া যায় তাঁরা হলেন—বিশ্বাবসু, হাহা, হূহূ, তুম্বুরু, পর্বত, শৈলুষ এবং সংগীতজ্ঞ গন্ধর্ব চিত্রসেন ও চিত্ররথ।

অর্জুন অস্ত্রশিক্ষার জন্য অমরাবতীপুরীতে গিয়ে গন্ধর্ব হাহা ও হূহূ-র সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

[মহা (k) ২.৪.৩৭; ২.৫.১; ২.৮.৩৮; ২.৯.২৬; ২.১০.৯, ১৩-১৪, ২০, ২৫, ২৭; ২.১১.২৮; ২.১২.৩, ৫; (হরি) ২.৪.৩৭; ২.৫.১; ২.৮.৩৮; ২.৯.২৬; ২.১০.৯, ১৩-১৪, ২০, ২৫, ২৭; ২.১১.২৮; ২.১২.৩, ৫; ৩.৩৮.১৪;]

□ অর্জুন দিগ্বিজয়ের সময় গন্ধর্বদেশ জয় করেছিলেন। মহাভারতের সভাপর্বের একটি শ্লোক থেকে জানা যায় যে, এই গন্ধর্বদেশ হাটকদেশের নিকটবর্তী একটি স্থানে অবস্থিত ছিল।

অর্জুন গন্ধর্বদেশ জয় করে সে দেশের রাজধানী থেকে কর রূপে তিত্তিরিপক্ষিবর্ণ, কর্ব্বুরবর্ণ এবং ভেকসদৃশয়নয়ন নামে তিন প্রকারের উৎকৃষ্ট অশ্ব লাভ করেছিলেন।

গন্ধর্বদেশ গয়ের পর অর্জুন আরও উত্তরে হরিবর্ষের দিকে গমন করেন।

[মহা (k) ২.২৮.৫-৭; (হরি) ২.২৭.৫-৭]

□ অস্ত্রশিক্ষার জন্য অর্জুন যখন ইন্দ্রের কাছে অমরাবতীপুরীতে গমন করেন তখন তিনি একাধিক গুণবান এবং সংগীত-নৃত্যে পারদর্শী গন্ধর্বের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হাহা, হূহূ, তুম্বুরু এবং চিত্রসেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ইন্দ্রের পরামর্শেই অর্জুন গন্ধর্ব চিত্রসেনের নিকট গীত-নৃত্য শিক্ষা করতে যান। ইন্দ্র অর্জুনকে বলেছিলেন দেবগণের আবিষ্কৃত যেসব বাদ্য মনুষ্যলোকে প্রচলিত মূলতঃ সেগুলির শিক্ষা করতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এক বছরের অজ্ঞাতবাসকালে মৎস্য দেশে বিরাট রাজার সভায় অর্জুন বৃহন্নলার ছদ্মবেশে বিরাট কন্যা উত্তরাকে গীত-নৃত্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। অমরাবতীতে ইন্দ্রের উৎসাহে অর্জুন গন্ধর্ব চিত্রসেনের কাছে নৃত্য-গীত শিক্ষা না করলে পরবর্তীকালে বৃহন্নলাবেশধারণ করে অর্জুনের পক্ষে আত্মগোপন করা সম্ভব হতো না।

অমরাবতীতে অর্জুন চিত্রসেনের সাহচর্যে অল্পসময়ের মধ্যেই নৃত্য-গীত-বাদ্যে পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

এরপর একসময় ইন্দ্র অনুভব করেন যে, অর্জুন অপ্সরা উর্বশীর প্রতি অনুরক্ত। তখন স্বয়ং দেবরাজ চিত্রসেনের মাধ্যমে উর্বশীর কাছে বার্তা পাঠালেন। চিত্রসেনের সুনিপুণ দৌত্যে উর্বশীও অর্জুনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে ইচ্ছুক হন।

[মহা (k) ৩.৪৩.২৮; ৩.৪৪.৬-১১; ৩.৪৫.১-১৬ (হরি) ৩.৩৮.২৮, ৩৮-৪২; ৩.৩৯.১-১৮]

□ গন্ধর্ব চিত্রসেনের উল্লেখ আবার পাওয়া যায় বনপর্বের ঘোষযাত্রা অংশে। দুর্যোধন সসৈন্যে সবান্ধবে দ্বৈতবনে একবার বিহার করবেন বলে স্থির করেন। ঠিক সেই সময় সবান্ধবে দ্বৈতবনে বিচরণ করছিলেন গন্ধর্ব চিত্রসেন। প্রথমে দুর্যোধন মুষ্টিমেয় অনুচরের মাধ্যমে চিত্রসেনকে বার্তা পাঠান ওই বন ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়ার। গন্ধর্বগণ দুর্যোধনের বার্তা বাহকদের শুধু অগ্রাহ্যই করেননি বরং সরাসরি তাঁদের যমালয়ে পাঠানোর কথা বলেন। উপেক্ষাভরে তাঁরা কুরুসৈন্যদের দ্বৈতবন ত্যাগ করতে বলেন।

দুর্যোধনের মতো আত্মম্ভর ব্যক্তির পক্ষে এই অপমান সহ্য করা সম্ভব ছিল না। দুর্যোধন তাঁর সৈন্যবাহিনীকে আদেশ করেন বলপ্রয়োগ করে তৎক্ষণাৎ দ্বৈতবন থেকে গন্ধর্বদের হটিয়ে দিতে। প্রাথমিকভাবে গন্ধর্বরা শান্তবাক্যে কৌরব সৈন্যদের বারণ করার চেষ্টা করলেও কুরুসৈন্যরা তাঁদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন। অনোন্যপায় গন্ধর্বগণ এবার চিত্রসেনের শরণাপন্ন হলেন। চিত্রসেনের নির্দেশেই গন্ধর্বরা অস্ত্রধারণ করে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের আক্রমণ করলেন। শুরু হল তুমুল যুদ্ধ। কৌরববীরদের মধ্যে একমাত্র কর্ণই গন্ধর্ব-আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর অস্ত্রাঘাতে বহু গন্ধর্ব যুদ্ধে প্রাণ হারান। তবে কিছুতেই চিত্রসেন বা তাঁর অনুগামীদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করা গেল না। মায়াবিদ্যায় পারদর্শী চিত্রসেনের বিচিত্র যুদ্ধকৌশলে কৌরবগণ প্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। একমাত্র কর্ণই তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অটল। অবশেষে গন্ধর্বদের আক্রমণে কর্ণের রথ সম্পূর্ণ ধ্বংস হল।

গন্ধর্বরা কর্ণকে পরাভূত করলে চিত্রসেন তাঁর দ্রুতগামী রথে আরোহণ করে দুর্যোধনকে জীবিত অবস্থায় বন্দি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিবিংশতি, দুঃশাসন, বিন্দ, অনুবিন্দসহ সমস্ত কুরুভার্যাদের

নিয়ে অন্যান্য গন্ধর্বরা দ্রুত প্রস্থান করতে শুরু করেন। এমনকী কৌরবদের অনুগামী বেশ্যারাও গন্ধর্ব-আক্রমণ থেকে রক্ষা পাননি। এমত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে কৌরবরা পাণ্ডবদের শরণাপন্ন হলেন। কুরুমন্ত্রী, সৈন্য সকলেই যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। *[মহা (k) ৩.২৪০-২৪২ অধ্যায়; (হরি) ৩.২০৩.১৮-২৯; ২০৪.১-১৩]*

□ মধ্যম পাণ্ডব ভীম গন্ধর্বদের হাতে কৌরবদের পর্যুদস্ত হওয়ার সংবাদে উৎফুল্লই হয়েছিলেন। কিন্তু মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের পক্ষে জ্ঞাতিকুলের এমন বিপদে নিরাসক্ত হয়ে থাকা সম্ভব হয়নি। তাঁর আদেশেই ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব দুর্যোধনসহ অন্যান্য কুরুবীরদের প্রাণরক্ষা করতে উদ্যোগী হলেন। প্রথমে অনুরোধ পরে প্রয়োজন হলে গন্ধর্বদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের নির্দেশ তাঁদের দিয়েছিলেন যুধিষ্ঠির।

গন্ধর্বরা দুর্যোধনকে বন্দিদশা থেকে সহজে মুক্ত করতে স্বভাবতই অস্বীকার করেন। গন্ধর্বরা কারও কোনো অনুরোধ গ্রাহ্য না করে সরাসরি পাণ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেন। অর্জুনের বাণবর্ষণে শত শত গন্ধর্বের প্রাণ যায়। অবশেষে গন্ধর্বরা ভীত হলেন। তখন গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন স্বয়ং গদাধারণ করে অর্জুনকে আক্রমণ করেন। অর্জুন অবিলম্বেই তাঁর গদাটিকে ধ্বংস করলে চিত্রসেন আবারও মায়াবিদ্যা প্রয়োগ করে নিজেকে আবৃত করলেন। মায়াবিদ্যার প্রয়োগেও অর্জুনের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হচ্ছে না দেখে চিত্রসেন স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে তৃতীয় পাণ্ডবকে তাঁদের বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করালেন।

চিত্রসেন অকপটেই অর্জুনকে জানান যে, বনবাসী পাণ্ডবদের উপহাস করার জন্য দুর্যোধন দ্বৈতবনে আসছেন—

এ সংবাদ পেয়ে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র কৌরবদের উচিৎশিক্ষা দেওয়ার জন্য আদেশ দেন। সেই উদ্দেশ্যেই চিত্রসেনের দ্বৈতবনে আসা। এখন তিনি বন্দি দুর্যোধনকে ইন্দ্রের সামনে উপস্থিত করতে চান। অর্জুন দুর্যোধন সহ অন্যান্য কুরুবীরদের মুক্ত করার অনুরোধ করলে চিত্রসেন যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিলেন। তবে যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে চিত্রসেন সকলকেই মুক্তি দেন। যুধিষ্ঠির গন্ধর্বদের কৃতজ্ঞতা জানান দুর্যোধন জীবনদান করার জন্য।

এরপর গন্ধর্বগণ হৃষ্টচিত্তে অমরাবতীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ইন্দ্র অমৃত বর্ষণ করে যুদ্ধে হত গন্ধর্বদের প্রাণ দানও করেন।

[মহা (k) ৩.২৪৪-২৪৬ অধ্যায়; (হরি) ৩.২০৬.১-৪৯; ৩.২০৭.১-১৭]

□ মৎস্যদেশে বিরাট রাজার রাজভবনে অজ্ঞাতবাসের এক বছর অতিবাহিত করার সময় দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী নাম ধারণ করেছিলেন। দ্রৌপদী বিরাট-ভার্যা সুদেষ্ণার কাছে নিজের পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে নিজেকে পাঁচ মহাবলশালী গন্ধর্বযুবার পত্নী বলে উল্লেখ করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেরা গোপনে থেকে পত্নীকে রক্ষা করে থাকেন। অন্য কোনো পুরুষ তাঁকে লাভ করার ইচ্ছা করলে সৈরিন্ধ্রীর গন্ধর্ব পতিগণ রাত্রিকালে তাঁকে হত্যা করেন।

[মহা (k) ৪.৯.২৭-৩১; (হরি) ৪.৮.২৭-৩১]

□ গন্ধর্বরা শিবলিঙ্গের আরাধনা করেন —একথা মহাভারতের দ্রোণপর্বে বলা হয়েছে। মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে মুঞ্জবান্ নামে একটি তীর্থের কথা পাওয়া যায়। গন্ধর্বরা সেখানে মহাদেবের উপাসনা করেন।

[মহা (k) ৭.২০২.১২৫; ১৪.৮.৫; (হরি) ৭.১৭০.১০৪; ১৪.৮.৫]

□ পুষ্করে ব্রহ্মার মহাযজ্ঞের সময় গন্ধর্বরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

[মহা (k) ৯.৩৮.৯; (হরি) ৯.৩৬.৯]

□ দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র অভিষেক অনুষ্ঠানে গন্ধর্বগণ যোগ দিয়েছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৭; (হরি) ৯.৪২.৭]

□ মহাভারতের সৌপ্তিকপর্বের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যেসকল যোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই পূর্বজন্মে গন্ধর্ব ছিলেন। এঁরা সকলেই যুদ্ধে নিহত হন। *[মহা (k) ১৫.৩১.৬, (হরি) ১৫.৩৪.৬]*

□ দ্রৌপদীর গর্ভে পাণ্ডবদের ঔরসজাত যে পাঁচপুত্র অশ্বত্থামার হাতে নিহত হয়েছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই একেকজন গন্ধর্ব। মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বের একটি শ্লোকে একথা উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ১৮.৪.১৪; (হরি) ১৮.৪.১৪]

□ বেন-পুত্র রাজা পৃথু কর্তৃক পৃথিবীদোহনকালে গন্ধর্ব চিত্ররথকে বৎস রূপে

কল্পনা করা হয়েছিল, একথা পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। *[মৎস্য পু. ১০.২৪]*

□ হৈহয়রাজ কার্তবীর্য্যার্জুনের মহাযজ্ঞে গন্ধর্বরা যোগ দিয়েছিলেন। *[মৎস্য ৪৩.২২]*

□ বিষ্ণু যখন বামনাবতার রূপে আবির্ভূত হন তখন মহাবল গন্ধর্বরা তাঁর উদরে স্থান পেয়েছিলেন—একথা পুরাণে কল্পনা করা হয়েছে। *[মৎস্য পু. ২৪৬.৬১]*

গন্ধর্ব২ একজন কাদ্রবেয় নাগ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৬; বায়ু পু. ৬৯.৭৩]

গন্ধর্ব৩ শিবসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত মহাদেবের অন্যতম নাম। নীলকণ্ঠ তাঁর ভারতভাবদীপ টীকায় মহাদেবের গন্ধর্ব নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—গন্ধর্বশ্চিত্ররথাদিঃ। গন্ধর্বরা অতি প্রাচীন কাল থেকে তাঁদের নৃত্য গীত বাদ্যে নৈপুণ্যের জন্যই প্রসিদ্ধ। সেক্ষেত্রে মহাদেবকে গন্ধর্ব বলে সম্বোধন করায় তাঁর সঙ্গীতগুরু নটরাজ স্বরূপতাই প্রকাশিত হয়। ভগবদ্‌গীতার অন্তর্গত বিভূতিযোগে কৃষ্ণ নিজের পরমেশ্বর স্বরূপতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জগতের সমস্ত সুন্দর এবং শ্রেষ্ঠ বস্তুর মধ্যে আপন অধিষ্ঠান বর্ণনা করে বলেছেন—

গন্ধর্বদের মধ্যে আমি চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব—

গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ। সেক্ষেত্রে গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ চিত্ররথকে ভগবান শিবের স্বরূপতায় ভাবনা করে মহাদেবকে গন্ধর্ব নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১৭.৯৮; (হরি) ১৩.১৬.৯৮]

গন্ধর্বকুণ্ড মথুরার কাছে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। *[বরাহ পু. ১৬৩.১৩]*

গন্ধর্বকূপ সরস্বতীর প্রবাহ পথে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। স্কন্দ পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, হিমালয়ের কেদার ক্ষেত্রে সরস্বতী ভূমি ভেদ করে মাটির নীচে প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে একটি দীর্ঘপথ সরস্বতী অন্তঃসলিলা রূপে প্রবাহিত হয়েছিলেন। এইভাবে কিছুটা পথ প্রবাহিত হবার পর যে স্থানে সরস্বতী নদী আবার ভূমি ভেদ করে উঠে এলেন এবং পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হতে লাগলেন, সেই স্থানটি গন্ধর্বকূপ নামে খ্যাত। কথিত আছে— মতি, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, মেধা, বুদ্ধি,—এই ছয় জন দেবী এখানে দেবী সরস্বতীর উপাসনা করেছিলেন। বস্তুত পুরাণের এই বিবরণের মাধ্যমে নদীরূপা সরস্বতীকে বাগ্‌দেবী সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্নরূপে কল্পনা করা হয়েছে। *[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র) ৩৫.২৭]*

গন্ধর্বতীর্থ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত সরস্বতীর তীরে অবস্থিত একটি নদীতীর্থ হল গন্ধর্বতীর্থ। পবিত্র এইস্থান গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের আবাসভূমি। গন্ধর্ব প্রধান বিশ্বাবসু ও অন্যান্য গন্ধর্বরা এই তীর্থে নৃত্য-গীত-বাদ্য ইত্যাদি করে থাকেন।

□ একসময় বলরাম এই তীর্থে এসে উপস্থিত হন। তিনি এই তীর্থে ব্রাহ্মণদের বহু দান-ধ্যান করেন। দানবস্তুর তালিকায় সোনা, রূপা, থেকে আরম্ভ করে ছাগল, মেষ, গোরু, উট, গর্দভ ইত্যাদি সকল মূল্যবান বস্তুই বর্তমান ছিল।

[মহা (k) ৯.৩৭.১-১৩; (হরি) ৯.৩৫.১-১৩]

গন্ধর্বী কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা ক্রোধার গর্ভজাত কন্যাদের মধ্যে সুরভি একজন। সুরভি ব্রহ্মালোকের কামধেনু। রোহিণী এবং গন্ধর্বী সুরভির দুই কন্যা। সুরভিকন্যা গন্ধর্বী অশ্বকুলের মাতা। *[দ্র. গান্ধর্বী১]*

[মহা (k) ১.৬৬.৬৭; (হরি) ১.৬১.৬৭]

গবয়১ একজন বানর-বীর। সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেকের সময় যেসব বানর-বীর উপস্থিত ছিলেন, গবয় তাঁদের মধ্যে একজন।

[রামায়ণ ৪.২৬.৩৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৩২]

□ সুগ্রীবের নির্দেশে সীতাদেবীর সন্ধান করার জন্য যেসব প্রধান প্রধান বানর যোদ্ধারা দক্ষিণদিকে যাত্রা করেন, গবয় তাঁদের মধ্যে একজন। *[রামায়ণ ৪.৪১.৩]*

□ রামচন্দ্রের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধে গবয় রামচন্দ্রকে পনেরো কোটি সৈন্য দিয়ে সহায়তা করেন। এই কোটি সংখ্যা কাল্পনিক গণনা বটে, কিন্তু এই সংখ্যামান থেকে বোঝা যায় যে, গবয় বহুতর বানর সৈন্য দিয়ে রামচন্দ্রকে সাহায্য করেন।

[রামায়ণ ৪.৩৯.২৩; মহা (k) ৩.২৮৩.৩; (হরি) ৩.২৩৭.৩]

□ অঙ্গদের নির্দেশে গবয় লঙ্কাপুরীর দক্ষিণ দ্বার অবরোধ করেন এবং লঙ্কাধিপতি রাবণকে প্রস্তরখণ্ড নিয়ে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের বাণে গবয় আহত হন।

[রামায়ণ ৬.৪১.৩৯-৪০; ৬.৫৯.৪২-৪৩; ৬.৭৩.৫৯]

□ রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এসে যেসব বানর যোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে গবয়-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

[রামায়ণ ৭.৪১.৪৮]

গবয়₂ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'গবয়'-এর আভিধানিক অর্থ হিসাবে বলেছেন গলকম্বলহীন গো জাতীয় পশু বিশেষ।

বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে যে, গবয় ইত্যাদি গো জাতীয় পশুর উৎপত্তি হয়েছে ভগবান ব্রহ্মার চরণ যুগল থেকে। *[বিষ্ণু পু. ১.৫.৪৭]*

□ বস্তুত গোরুর মতো যেসব প্রাণী আছে, তাদের বোঝানোর জন্য 'গবয়' শব্দের প্রয়োগ করা হত—এ-কথা মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি পাণিনিসূত্রের 'উপমানানি সামান্যবচনৈঃ' *[২.১.৫৫]* নামক সূত্রে লিখেছেন—গৌরিব গবয় ইতি।

[ব্যাকরণ মহাভাষ্যম্, গুরুপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত সংস্থান, খণ্ড ৩, ২.১.৫৫; পৃ. ১২৭]

ভারতীয় দর্শনে শুধু ব্যাকরণশাস্ত্র নয়, ন্যায় এবং মীমাংসা-দর্শনেও 'গবয়' শব্দটি নিয়ে বহুবিধ আলোচনা আছে। সেই গবেষণার সামান্য অংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

While listing four epistemological categories in his *Tarkabhāṣya* Keśava Miśra (about 1275), defines analogy as the following: 'Likening to a model or analogy (*upamāna*) is knowledge of a certain thing as similar to another thing; [this knowledge] is deducted from a recollection of a prototype proclaimed earlier. Suppose, for instance, that someone has heard from a forester that *gavaya* is similar to cow and then goes to a forest and sees an animal similar to cow. By remembering the words of the forester, the person becomes completely convinced that the animal in front of him is a *gavaya.* This knowledge is analogous to or a likening of a model because it is attained by means of analogy or a comparison of a model' (*Vidyābhuṣana,* 357).

In the Section on Submensuring, Book III in *Tattvachintā maṇi,* Gaṅgeṣa Upadahya (about 1200) [wrote about] someone who does not know the signification of the word *'gavaya'*, after as elder has told him it means an animal similar to cow. This person subsequently goes to a forest where he sees an animal similar to a cow. Remembering the words of the elder [person], he establishes a comparison resulting in the conclusion that animal in front of him is an object signified by the word *'gavaya'*. A means of cognition which helped the person reach such a conclusion is called a similarity [likening] to a model (*upamāna*). Such a means produces knowledge of similarity between cow and *gavaya.* The word 'similarity [likening]' is used here to designate the entire process of inference by analogy.

The structure of the operation (*vyāpāra*) in the case of a comparison consists of remembering the instructive statement of the elder [person], namely that the word *'gavaya'* signifies an animal similar to a cow. The result of the comparison (*upamiti*) is knowledge of the connection of a name to something thus named.

Mīmāmsākas proclaim that similarity (*sādṛṣya*) is a specific object not included in the seven categories of *Nyāya.* According to them [*Mīmāṃsākas*] *'gavaya'* can be defined as an animal similar to a cow. Gaṅgeśa considers such a claim confusing and therefore rejects it. One can say that a certain thing is similar to another thing, whereby possessing a specific property of the latter, the 'certain thing' is different in an inheritance relation. After defining similarity in this way, we can assume that there is an infinite quantity of cases of increasing similarity between these given things and their prototypes. According to Gaṅgeśa, the correct denota-

tion of the word *'gavaya'* is not an animal that possesses a similarity to a cow, but an animal which possesses a nature of *'gavayaness'* (a prototype of all *gavayas*). Therefore, the result of an analogy consists of knowing a relation between the word *'gavaya'* and the animal that possesses an inheritance nature of *gavayaness.*

Some say that knowledge of the denotation of the word *'gavaya'* is deduced from perception. This is nonsense. Although a relation between the word *'gavaya'* and the animal named *gavaya* may be perceived immediately, by catching someone's eye, it is impossible to perceive such a relation in all other cases, [especially in those cases] which do not catch someone's eye. Therefore, knowledge of the denotation of the word *'gavaya'* is not deduced from perception, but is [obtained by] a specific means of perception called *upamāna.*

Knowledge of the denotation of the word *'gavaya'* cannot be obtained by means of logical inference, because, in the case of likening, this knowledge is deduced from knowledge of similarity, independently from the existence of an invariable concomitant indispensable for deduction. Furthermore, in the case of knowledge [obtained] by means of similarity and comparison we always reflect through our self-consciousness in the form of 'I compare' or 'I liken', but not in the form; 'I deduce'.

[Ed. by Helena Gourko & Robert S.Cohen, Analogy in Indian Tradition and Western Philosophical Thought, Boston Studies in the Philosophy of Science, Vol. 243, 2006, p. 56-57].

গবল্গণ সঞ্জয়ের পিতার নাম গবল্গণ। মহাভারতে বিভিন্ন জায়গায় সঞ্জয়কে গাবল্গণি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। *[দ্র. সঞ্জয়১]*

[মহা (k) ১.৬৩.৯৭; (হরি) ১.৫৮.১৩৬; ভাগবত পু. ১.১৩.৩২]

গবাক্ষ১ একজন বানরবীর। তিনি গোলাঙ্গুল বানর জাতির অধিপতি। সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেকের সময় যেসব বানর বীর উপস্থিত ছিলেন, গবাক্ষ তাঁদের মধ্যে একজন।

[রামায়ণ ৪.২৬.৩৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৪৩]

☐ সুগ্রীবের নির্দেশে যেসব বানর-যোদ্ধারা সীতাদেবীর সন্ধান করার জন্য দক্ষিণদিকে যাত্রা করেন, তাঁদের মধ্যে গবাক্ষ ছিলেন অন্যতম।

[রামায়ণ ৪.৪১.৩]

☐ সাগর অতিক্রম করার সময় যখন অঙ্গদ বানর-যোদ্ধাদের শক্তি পরীক্ষার কথা বলেন, তখন গবাক্ষ বলেন যে, তিনি বিশ যোজন লাফিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করতে পারেন। *[রামায়ণ ৪.৬৫.৩]*

☐ রামচন্দ্রের সঙ্গে রাক্ষসরাজ রাবণের যুদ্ধে রামচন্দ্রকে গবাক্ষ এক হাজার কোটি সৈন্য দিয়ে সহায়তা করেন। প্রায় এক কোটি সৈন্য নিয়ে তিনি লঙ্কাপুরী আক্রমণ করেন। এই কোটি সংখ্যা কাল্পনিক গণনা বটে, কিন্তু এই সংখ্যামান থেকে বোঝা যায় যে, তিনি বহুতর বানর সৈন্য দিয়ে রামচন্দ্রকে সাহায্য করেন। যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের বাণে বিদ্ধ হন গবাক্ষ। এরপর তিনি রাবণকে প্রস্তরখণ্ড নিয়ে আক্রমণ করেন। পরে কুম্ভকর্ণের পদাঘাতে গবাক্ষ আহত হন।

[রামায়ণ ৪.৩৯.১৯; ৬.৪২.২৮; ৬.৭৩.৫৯; ৬.৫৯.৪২-৪৩; ৬.৬৭.২৪; মহা (k) ৩.২৮৩.৪; (হরি) ৩.২৩৭.৪]

☐ রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এসে যেসব বানর যোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে গবাক্ষের নাম উল্লেখযোগ্য।

[রামায়ণ ৭.৪১.৪৮; ৭.৪৯.২১]

গবাক্ষ২ একজন দানব। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন।

[বায়ু পু. ৬৮.১৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.১৬]

গবাক্ষ৩ প্রহ্লাদের পুত্র শম্ভু। শম্ভুর পুত্রদের একজন গবাক্ষ। *[বায়ু পু. ৬৭.৮১]*

গবাক্ষ৪ গান্ধাররাজ সুবলের পুত্রদের মধ্যে অন্যতম

এবং শকুনির ভ্রাতা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অনান্য গান্ধারদেশীয় বীর যোদ্ধাদের সঙ্গে গবাক্ষও পাণ্ডবদের দুর্জয় ব্যূহ ভেদ করে তার মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনি তাঁর অনান্য ভ্রাতাদের সঙ্গে ইরাবানকে আক্রমণ করলে অর্জুন পুত্র ইরাবান যুদ্ধক্ষেত্রে গবাক্ষকে বধ করেন।

[মহা (k) ৬.৯১.২৭-৩০; ৬.৯১.৪৫-৪৬; (হরি) ৬.৮৭.২৭-৩০; ৬.৮৭.৪৪-৪৫]

গবিষ্ঠ১ প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভজাত দানব পুত্রদের মধ্যে একজন দানব।

মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে বলা হয়েছে যে, গবিষ্ঠ দ্বাপর যুগে দ্রুমসেন নামে একজন শক্তিশালী রাজা রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

[মহা (k) ১.৬৫.৩০; ১.৬৭.৩৫; (হরি) ১.৬০.৩০; ১.৬২.৩৫]

□ ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্য পুরাণ অনুসারে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সভায় যেসব দানবেরা উপস্থিত থাকতেন, তাঁদের মধ্যে গবিষ্ঠ অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.৪; মৎস্য পু. ১৬২.৭৯]

গবিষ্ঠ২ একজন দেবতা। ঋষি অঙ্গিরার ঔরসে মরীচির কন্যা সুরূপার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে গবিষ্ঠ একজন। *[মৎস্য পু. ১৯৬.২]*

গবিষ্ঠির পুরাণে মহর্ষি অত্রির গোত্রভুক্ত যে ঋষি বংশগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, গবিষ্ঠির সেই গোত্রের অন্যতম। মহর্ষি অত্রি থেকে বংশ পরম্পরায় বা শিষ্য পরম্পরায় এরাও আত্রেয় বলে পরিচিত।

[বায়ু পু. ৭০.৭৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৮৫]

□ অত্রিবংশ জাত যেসব ঋষিরা গোত্র প্রবর্ত্তক ও মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে গবিষ্ঠির অন্যতম।

[ঋগ্‌বেদ ৫.১.১২; অথর্ববেদ ৪.২৯.৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১১৩; মৎস্য পু. ১৪৫.১০৭; ১৯৭.৭-৮]

গবিষ্ণু চন্দ্রের রথের দশটি ঘোড়ার মধ্যে একজনের নাম হল গবিষ্ণু। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৩.৫৭]*

গবেষণ১ দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় গবেষণ নামে এক বৃষ্ণিবীরকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। তবে মহাভারতের এইস্থানে গবেষণের পরিচয় উল্লিখিত হয়নি।

[মহা (k) ১.১৮৬.১৯; (হরি) ১.১৭৯.১৯]

□ মহাভারতের খিলপাঠ হরিবংশে উল্লিখিত হয়েছে যে, যদুবংশীয় শ্বফল্কের ভাই চিত্রকের পুত্র ছিলেন গবেষণ। চিত্রকের দুই পত্নী শ্রবণা ও শ্রবিষ্ঠার মধ্যে কে গবেষণের মাতা ছিলেন, তা অবশ্য স্পষ্ট করে বলা হয়নি। সুতরাং সম্পর্কে তিনি অক্রূরের খুড়তুতো ভাই। বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও এই একই তথ্য পাওয়া যায়।

[হরিবংশ পু. ১.৩৪.১৫; ১.৩৮.৫৬; বায়ু পু. ৯৬.১১৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১১৪]

□ রুক্মিণীহরণের পর বিদর্ভে জরাসন্ধ শিশুপাল প্রভৃতির সঙ্গে যদুবংশীয় বীরদের যে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধে গবেষণকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। *[হরিবংশ পু. ২.৫৯.৫৮]*

গবেষণ২ পুরাণে দ্বিতীয় একজন গবেষণের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁকে বসুদেবের ঔরসে দেবকীর সপ্তম পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দেবকীর সপ্তম পুত্র বলতে সাধারণত সঙ্কর্ষণ বলরামকে বোঝানো হয়। সেক্ষেত্রে গবেষণকে দেবকীর সপ্তম পুত্র বলে উল্লেখ করায় পুরাণের এই উল্লেখ সম্পর্কে যথেষ্ট তর্কের অবকাশ থাকছে। ভূর এবং ভূরীন্দ্রসেন নামে গবেষণের দুটি পুত্র ছিল বলে জানা যায়।

[বায়ু পু. ৯৬.১৮১-১৮২, ২৫০; মৎস্য পু. ৪৬.১৯; ৪৭.২২; ব্রহ্মাণ্ড পু. ২.৭১.১৮৪]

গবেষণ৩ মৎস্য পুরাণে অক্রূরের ঔরসে অশ্বিনীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে গবেষণের উল্লেখ পাই। তবে পৃথু, বিপৃথু প্রভৃতি নামের তালিকা দেখে মনে হয় অক্রূরের কাকা চিত্রকের পুত্ররাই সম্ভবত মৎস্য পুরাণের পাঠে অক্রূরের পুত্র হিসেবে উল্লিখিত হয়েছেন। *[মৎস্য পু. ৪৫.৩২]*

গবেষ্ঠি১ প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভজাত দানব পুত্রদের মধ্যে একজন দানব।

[বায়ু পু. ৬৮.৪, ১৬]

গবেষ্ঠি২ প্রহ্লাদের পুত্রদের মধ্যে একজন গবেষ্ঠি। তিনি শুম্ভ, নিশুম্ভ এবং বিষ্বক্‌সেনের পিতা।

[বায়ু পু. ৬৭.৭৬-৭৭]

গব্যূতি একটি পরিমাপক একক। পুরাণ অনুসারে দুই সহস্র ধনুতে এক গব্যূতি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধানে দুই ক্রোশ পরিমাণকে এক গব্যূতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৭.১০০; বায়ু পু. ৮.১০৬; ১০১.১২৬; হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বঙ্গীয় শব্দকোষ: ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬৯]

গভস্তল পুরাণ মতে, পাতালের সপ্ততলের চতুর্থ তল হল গভস্তল। গভস্তলের মৃত্তিকার রঙ পীত বর্ণের। এই তল কালনেমি, গজকর্ণ, সুমালী ইত্যাদি রাক্ষসদের এবং নাগেদের বাসভূমি। বিষ্ণু পুরাণে গভস্তলকে গভস্তিমান বলা হয়েছে।

[দ্র. পাতাল]

[বায়ু পু. ৫০.১২-১৪, ৩১-৩৩; বিষ্ণু পু. ২.৫.২]

গভস্তি শাকদ্বীপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সপ্ত নদীর মধ্যে গভস্তি অন্যতম। মৎস্য পুরাণ মতে, গভস্তির অপর নাম সুকৃতা। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৯.৯৬; মৎস্য পু. ১২২.৩৩; বিষ্ণু পু. (নবভারত) ২.৪.৬৬]*

গভস্তিমান১ বায়ু পুরাণে ভারতবর্ষের যে নয়টি বিভাগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে গভস্তিমান তাদের মধ্যে একটি।

[মৎস্য পু. ১১৪.৮; বায়ু পু. ৪৫.৭৯; বিষ্ণু পু. ২.৩.৬]

গভস্তিমান২ *[দ্র. গভস্তল]*

গভস্তিমান৩ সূর্যের অষ্টোত্তর শতনামের মধ্যে একটি। পাণ্ডবদের বনবাসপর্বের সূচনায় সঙ্গী ব্রাহ্মণদের ভরণপোষণের কথা ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যুধিষ্ঠিরকে ধৌম্য পুরোহিত সূর্যদেবতার আরাধনা করার উপদেশ দেন। সেই সময় তিনিই যুধিষ্ঠিরকে সূর্যের অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্র শিক্ষা দেন। এই স্তোত্রের মধ্যেই সূর্যদেব সম্বোধিত হয়েছেন গভস্তিমান নামে।

[মহা (k) ৩.৩.১৬; (হরি) ৩.৩.১৬]

গভস্তীশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি তীর্থ। সূর্যদেব এইখানে লিঙ্গস্থাপন করেছিলেন।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচন কাণ্ড) পৃ. ৯৪]

গভীর কৈলকিল যবনরাজা বিন্ধ্যশক্তির বংশধারায় গভীর একজন রাজা। বিন্ধ্যশক্তির পুত্র প্রবীর এবং প্রবীরের পুত্র গভীর। ইনি বিশ বৎসর (বায়ু পুরাণ মতে ত্রিশ বৎসর) রাজত্ব করেছিলেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৮৬; বায়ু পু. ৯৯.৩৭২]

গম্ভীর১ পুরূরবার পুত্র রম্ভ, রম্ভের পুত্র রভস এবং এই রভসের পুত্র ছিলেন গম্ভীর। পুরূরবার পুত্র আয়ু চন্দ্রবংশের মূলধারার বাহক হলেও এঁদেরও চন্দ্রবংশীয়ই বলা চলে। গম্ভীর অক্রিয় নামে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন। *[ভাগবত পু. ৯.১৭.১০]*

গম্ভীর২ ভবিষ্যৎ চতুর্দশ মন্বন্তরের অধিপতি মনু হবেন ভৌত্য মনু। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে ভৌত্য মনুর পুত্রদের মধ্যে একজন হলেন গম্ভীর।

বিষ্ণু পুরাণের বঙ্গীয় সংস্করণে গম্ভীরকে গভীর নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.১১৪-১১৬; বিষ্ণু পু. (নবভারত) ৩.২.৪৩]

গম্ভীর৩ ভাগবত পুরাণ অনুসারে চতুর্দশ মন্বন্তরের অধিপতি মনু হবেন ইন্দ্রসাবর্ণি। ইন্দ্রসাবর্ণির পুত্রদের মধ্যে গম্ভীর একজন।

[ভাগবত পু. ৮.১৩.৩৩]

গয়১ সায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদ, উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব। ধ্রুবর বংশধারায় উল্মুকের ঔরসে পুষ্করিণীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে গয় একজন।

[ভাগবত পু. ৪.১৩.১৭]

গয়২ বেন-পুত্র পৃথুর বংশজাত হবির্ধানের ঔরসে ও আগ্নেয়ী ধিষণার গর্ভজাত ছয় পুত্রের মধ্যে গয় একজন। *[ভাগবত পু. ৪.২৪.৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৭.২৪; বায়ু পু. ৬৩.২৩; বিষ্ণু পু. ১.১৪.২]*

গয়৩ জম্বুদ্বীপের আদিরাজা অগ্নীধ্রের বংশধর রাজর্ষি ভরত। ভরতবংশীয় পৃথুষেণের (পাঠান্তরে পৃথু) পুত্র নক্ত। নক্তের ঔরসে দৃতির গর্ভজাত পুত্রের নাম গয়। গয় যেমন একজন প্রবাদ-প্রতিম প্রজারঞ্জক রাজর্ষি ছিলেন, তেমনি পরম বিষ্ণুভক্ত হিসেবেও বিখ্যাত। গয় রাজার শাসনকালেই তাঁর ধর্মপরায়ণতা ও ন্যায়পরায়ণতা খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে একাধিক গাথাও রচিত হয়েছিল। এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন তিনি।

গয় রাজার ঔরসে গয়ন্তীর গর্ভে চিত্ররথ, সুগতি ও অবিরোধন নামক তিন পুত্রের জন্ম হয়।

গয়রাজা তাঁর শেষ জীবনে রাজ্যের শাসনভার ত্যাগ করে বিষ্ণুপদ লাভ করার উদ্দেশে আত্মোৎসর্গ করেন।

□ ভাগবত পুরাণে এমন অনেক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা বিষ্ণুর পরব্রহ্ম স্বরূপতার সাথে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে গয় রাজার উল্লেখ রয়েছে।

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ৫.১৫.৬-১৪; (সীতারাম দাস) ২.৭.৪৪; ১০.৬০.৪১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.৬৮; বায়ু পু. ৩৩.৫৭; বিষ্ণু পু. ২.১.৩৮]

গয়$_8$ সপ্তদ্বীপের অধিপতিদের মধ্যে একজন রাজা হলেন গয়। ভাগবত পুরাণ উল্লেখ করেছে যে, বহু ঐশ্বর্য্য লাভ করে কিংবা বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েও যাঁরা জাগতিক ঐশ্বর্য্যের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করতে পারেননি, গয় তাঁদের মধ্যে একজন। *[ভাগবত পু. ৮.১৯.২৩; ১২.৩.১০]*

গয়$_5$ সুদ্যুম্নের (ইল) পুত্র। সুদ্যুম্নের পুরূরবা ব্যতীত আরও তিন পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে গয় একজন। গয় রাজার রাজধানী ছিল গয়াপুরী। ভাগবত পুরাণ অনুসারে গয় দক্ষিণাপথের রাজা ছিলেন।

□ গয়াক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠার একাধিক কাহিনী মহাকাব্য-পুরাণে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে একটি গয়াসুরের নামে গয়াক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠার কাহিনী এবং অন্যটি গয় রাজা কর্তৃক গয়াপুরী প্রতিষ্ঠার উপাখ্যান।

□ পুরাণকার বলছেন, গয় রাজা একবার এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেন গয়াক্ষেত্রে। এমন বিপুল আয়োজন আগে কখনো হয়নি। এই যজ্ঞে সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতারা গয়কে বর প্রার্থনা করতে বললেন। গয়াসুরের দেহে যজ্ঞানুষ্ঠান করার সময় যেসব ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মার সেই যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেছিলেন তাঁরা পরবর্তীকালে অত্যন্ত অর্থলিপ্সু হয়ে পড়লে ক্রুদ্ধ ব্রহ্মা তাঁদের শাপ দেন। গয় সেই অভিশপ্ত ব্রাহ্মণদের শাপমুক্তির বর চান এবং নিজের নামানুসারে ব্রহ্মপুরীর মত এই পুরী গয়াপুরী নামে প্রতিষ্ঠিত হোক এমন কামনাও করেন।

□ গয় মৃত্যুর পর বিষ্ণুলোকে গমন করেছিলেন।

[ভাগবত পু. ৯.১.৪১; মৎস্য পু. ১২.১৭;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬০.১৮;
বায়ু পু. ৮৫.১৯; ১১২.১-৬]

গয়$_6$ অমাবসুবংশীয় বলাকাশ্বের তিন পুত্রের মধ্যে গয় একজন। *[বায়ু পু. ৯১.৬১]*

গয়$_7$ অমূর্তরয়ার পুত্র। গয় একজন ধর্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। মহাভারতে তাঁর আয়োজিত যজ্ঞের দীর্ঘ বিবরণী পাওয়া যায়। ব্রহ্মসরোবরের তীরে আয়োজিত এই যজ্ঞের প্রাচুর্য্যের কথা উল্লেখ করে মহাভারতকার লিখেছেন—

যস্য যজ্ঞো বভূবেহ বহ্বন্নো বহুদক্ষিণঃ।
যত্রান্নপর্ব্বতা রাজন্! শতশো'থ সহস্রশঃ॥

সেই যজ্ঞে প্রচুর অন্ন ও দক্ষিণা বিতরণ করা হয়েছিল। তার পরিমাণ এতই যে শত সহস্র অন্ন পর্বত তৈরি হয়েছিল।

এছাড়াও শত শত ঘৃতের হ্রদ, দধির নদী, মহামূল্য ব্যঞ্জনের সহস্র ধারা প্রবাহিত হয়েছিল সেই যজ্ঞে দান-দক্ষিণা ভোজনের কোনো ঘাটতি কোথাও ছিলনা।

যজ্ঞে আগত ব্রাহ্মণরা, পুণ্যার্থীরা এমন ব্যাপক আয়োজনে পরিতৃপ্ত হয়ে দেশে দেশে গয় রাজার নামে গাথা গাইলেন। গয় রাজার যজ্ঞ এমনই বৃহৎ ও সাড়ম্বর যজ্ঞ, যে তার অনুরূপ যজ্ঞ আর কোনোদিনই কেউ করতে পারবে না—এমন উল্লেখ করেছেন মহাভারতের কথক স্বয়ং।

[মহা (k) ৩.৯৫.১৮.২৯; (হরি) ৩.৭৯.১৮-৩০]

□ মহাভারতের শল্যপর্বে গয় রাজার প্রসঙ্গ এসেছে। গয়াদেশে তিনি এক মহাযজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞে তাঁর আহ্বানে নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। যজ্ঞে আহূতা নদী সরস্বতী এখানে 'বিশালা' নামে পরিচিতা।

[মহা (k) ৯.৩৮.২০-২১; (হরি) ৯.৩৬.২০-২১]

□ গয় একবার নিষ্ঠাসহকারে এক বৎসর যাবৎ অগ্নিহোত্র পালন করেন এবং এই এক বৎসর যাবৎ শুধু হোমের অবশিষ্ট অন্ন গ্রহণ করলেন। গয়র নিষ্ঠায় তুষ্ট হয়ে অগ্নিদেব তাঁকে বর দিতে চাইলেন। গয় তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, নিয়ম ও গুরুদেবের অনুগ্রহে বেদবিদ্যা লাভ করার ইচ্ছা জানালেন। তিনি আরও প্রার্থনা করলেন, অন্যের প্রতি হিংসা না করে আমি যেন অক্ষয় ধন লাভ করতে পারি। ব্রাহ্মণদের প্রতি যেন আমার শ্রদ্ধা অটুট থাকে এবং স্ববর্ণের ভার্য্যাদের গর্ভেই যেন আমার পুত্র জন্মায় এবং সর্বশেষ আমার ধর্মকার্যে যেন কখনো বিঘ্ন না ঘটে।

অগ্নির আশীর্বাদ পেয়ে গয় বৎসরকাল যাবৎ বিভিন্ন ব্রত অনুষ্ঠান দান ধ্যান ও দেবপূজা করলেন।

শত বৎসর পর্যন্ত তিনি প্রতিদিন সকালে ষাট হাজার গোরু, দশ হাজার ঘোড়া এবং বহুলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান করতেন।

গবাং শতসহস্রাণি শতমশ্বশতানি ষট্।
উত্থায়োত্থা সংপ্রাদাৎ পরিসংবৎসরান্ শতম্।

গয় রাজার বহুল দানের ঘটনার মধ্যে এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞে

মণির কাঁকর মেশানো স্বর্ণময় পৃথিবী নির্মাণ করে ব্রাহ্মণদের দান করতেন।

সৌবর্ণাং পৃথিবীং কৃত্বা য ইমাং মণিশর্করাম্।
বিপ্রেভ্যঃ প্রাদদদ্রাজা সো'শ্বমেধে মহামখে॥

[মহা (k) ৭.৬৬ অধ্যায়; (হরি) ৭.৫৮ অধ্যায়]

□ রাজর্ষি মান্ধাতা যেসব রাজাদের পরাজিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে গয় একজন।

[মহা (k) ৭.৬২.১০; ১২.২৯.৮৮; (হরি) ৭.৫৪.১০; ১২.২৯.৮৬]

□ আদি পর্বে নারদ যে সকল পরলোকগত রাজর্ষির নাম করেছেন গয় তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.১.২২৭; (হরি) ১.১.১৮৯]

□ নারদ যম সভায় উপস্থিত বিভিন্ন ন্যায়পরায়ণ রাজাদের নামোল্লেখের সময় গয় রাজার নাম করেছেন। মহাভারতে অমূতরয়ার পুত্র গয় ছাড়াও যম সভায় আরও একশত গয় রাজার উপস্থিতির উল্লেখ রয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে বিভিন্ন মন্বন্তরে, বিভিন্ন কল্পে গয় নামের একাধিক ন্যায়বান রাজা জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাঁরা সকলেই মৃত্যুর পর যমলোকে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেন এবং যমের সভায় উপস্থিত ছিলেন। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত সংস্করণে অবশ্য এই শত গয় রাজার উল্লেখ নেই। পরিবর্তে সেখানে 'হয়' পাঠ ধৃত হয়েছে।

[মহা (k) ২.৮.১৮, ২২; (হরি) ২.৮.১৮, ২৪]

□ মহাভারতের বিরাটপর্বে কুরু সেনা ও কুরু মহারথীরা একযোগে বিরাট রাজার রাজধানী আক্রমণ করলে ছদ্মবেশী অর্জুন একাই সমগ্র কুরুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন মৎস্যরাজকুমার উত্তরকে সারথি করে। সেই যুদ্ধে অর্জুনের পরাক্রম দেখার জন্য ইন্দ্রের রথে চড়ে যেসব দেব-গন্ধর্ব-স্বর্গত রাজারা এসেছিলেন গয় তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ৪.৫৬.৯; (হরি) ৪.৫১.৯]*

গয়৮ ষষ্ঠ মন্বন্তরের অধিপতি চাক্ষুষ মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র উরু। উরুর ঔরসে আগ্নেয়ীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে গয় অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১০৮; মৎস্য পু. ৪.৪৩]

গয়ন্তী জম্বুদ্বীপের রাজা অগ্নীধ্রের বংশধারায় নক্তের পুত্র গয়। গয়রাজার পত্নীর নাম গয়ন্তী। গয়ন্তীর গর্ভে গয়-র ঔরসে চিত্ররস, সুগতি ও অবিরোধন নামে তিন পুত্রের জন্ম হয়।

[ভাগবত পু. ৫.১৫.১৪]

গয়শিরতীর্থ গয়া তীর্থের অন্তর্গত একটি পবিত্র পর্বত। সেখানে একটি অক্ষয়বট বর্তমান। গয়শির পর্বতে শ্রীহরি পূজিত হন। *[দ্র. গয়া]*

[মহা (k) ৩.৮৭.১১; ৩.৯৫.১০; (হরি) ৩.৭২.১১; ৩.৭৯.১০; ভাগবত পু. ৭.১৪.৩০]

গয়া বর্তমান বিহার রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর গয়া ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন নগরী এবং পবিত্র তীর্থস্থল। বিহারের রাজধানী পাটনা থেকে ১০০ কিমি দক্ষিণে অবস্থিত এই শহর শুধুমাত্র হিন্দুদেরই নয়, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের কাছেও এক পবিত্র তীর্থ হিসেবেই পরিচিত।

উত্তরে রামশিলা পাহাড় এবং দক্ষিণে ব্রাহ্মণী পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত গয়া নগরী গৌতম বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এক স্থান এবং একসময় গয়া বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। তবে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গয়া বৌদ্ধ ধর্মের পরিবর্তে হিন্দুধর্মের পীঠস্থানে পরিণত হয়। চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন এবং হিউ-এন-সাঙ দু-জনেই বিভিন্ন সময়ে গয়া নগরীতে এসেছেন কিন্তু আশ্চর্য এই যে এই স্থান সম্পর্কে তাঁদের পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ পৃথক। ফা-হিয়েন-এর মতে গয়া এক জনমানবশূন্য পুরী। কিন্তু হিউ-এন-সাঙ লিখেছেন গয়া নগরীতে প্রায় হাজারখানেক ব্রাহ্মণ পরিবার এবং অন্যান্য মানুষের বাস ছিল।

[EAIG p. 275; GDAMI p. 64]

□ রামায়ণ, মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণে বহুবার এই গয়াতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। গয়ানগরীর নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পুরাণে দুটি পৃথক কাহিনী পাওয়া যায়। প্রথম কাহিনী অনুসারে গয়াক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা ও নামকরণ হয় গয়াসুরের নামে। গয়াসুর ভগবান বিষ্ণুর পরমভক্ত ছিলেন এবং নারায়ণের বরে তিনিই বিশ্বের পবিত্রতম ব্যক্তি হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু গয়াসুর ভক্তশ্রেষ্ঠ তথা পবিত্রতম ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলে দেবতারা ঈর্ষান্বিত হলেন। কারণ গয়াসুর মর্য্যাদায় ও শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে দেবতাদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। দেবতাদের প্ররোচনায় ব্রহ্মা গয়াসুরকে বললেন—বৎস! আমি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে চাই। কিন্তু তোমার থেকে পবিত্র কোনো স্থান এই মর্ত্যলোকে খুঁজে

পেলাম না। অতএব আমার ইচ্ছা, তুমি নিজের এই দেহকে যজ্ঞভূমি হিসেবে দান কর। গয়াসুর তাতে সম্মত হলেন। গয়াসুর যাতে নিশ্চল হয়ে থাকেন তার জন্য দেবতারা তাঁর মস্তকে স্থাপন করলেন এক পবিত্র শিলা। গয়াসুর যাতে কোনোভাবেই না নড়াচড়া করতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য দেবতারা এবং আদিগদাধর রূপে স্বয়ং নারায়ণ অবস্থান করতে লাগলেন সেখানে। ব্রহ্মার যজ্ঞ সম্পন্ন হল। গয়াসুরের অনুরোধে তার দেহ এবং সেই পবিত্র শিলার সমন্বয়ে সৃষ্টি হল পবিত্রতম তীর্থ গয়াপুরী। দেবতারা বর দিলেন যে, তাঁরা সকলে নিশ্চল হয়ে এই শ্রেষ্ঠ তীর্থে অবস্থান করবেন। গয়াসুরের মস্তকে স্থাপিত শিলা মুণ্ডপৃষ্ঠ, ধর্মপৃষ্ঠ বা গয়শির পর্বত নামে বিখ্যাত হল, পুরাণগুলি এই স্থানকে ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ হিসেবে বর্ণনা করেছে। *[দ্র. গয়াসুর]*

এই গয়াক্ষেত্র পাঁচক্রোশ দীর্ঘ, আড়াই ক্রোশ প্রশস্ত এবং গয়শিরের পরিধি একক্রোশ—

সার্দ্ধক্রোশদ্বয়ং মানং গয়েতি ব্রহ্মণেরিতম্।
পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গয়শিরম্॥

[বায়ু পু. ১০৫.৪-৪০; ১০৬ অধ্যায়]

□ অন্যমতে, গয়াপুরীর প্রতিষ্ঠা হয় চন্দ্রবংশীয় রাজা সুদ্যুম্নের পুত্র গয় রাজার নামে—

গয়স্য তু গয়া মতা।

গয় রাজা একবার এক বিশাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এই স্থানে। এর আগে পৃথিবীতে এত বড়ো যজ্ঞের অনুষ্ঠান আর কখনো হয়নি। গয় রাজার যজ্ঞে সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতারা তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। গয়াসুরের দেহে যজ্ঞানুষ্ঠান করার সময় যেসব ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার সেই যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেছিলেন, তাঁরা পরবর্তীকালে অত্যন্ত অর্থলিপ্সু হয়ে পড়লে ক্রুদ্ধ ব্রহ্মা তাঁদের শাপ দেন। গয় রাজা সেই অভিশপ্ত ব্রাহ্মণদের শাপমুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। এছাড়া নিজের নামানুসারে ব্রহ্মপুরীর মতো পবিত্র এই স্থানে গয়াপুরীর প্রতিষ্ঠাও কামনা করেন তিনি—গয়াপুরীতি মন্নাম্না খ্যাতা ব্রহ্মপুরী যথা।

[মৎস্য পু. ১২.১৭; বায়ু পু. ৮৫.১৯; ১১২.১-৫]

পণ্ডিতরা অনেকেই গয়াসুর এবং গয়রাজার এই কাহিনীকে গয়াক্ষেত্র থেকে বৌদ্ধধর্মের ক্রম অবলুপ্তি এবং হিন্দুধর্মের প্রভাব বিস্তারের ঘটনার রূপক হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

□ বায়ু পুরাণে চতুর্বেদকে একটি মনুষ্যশরীর রূপে কল্পনা করা হয়েছে। এই মূর্তির আনন বা মুখে গয়াতীর্থের অবস্থান বলে বায়ু পুরাণে কল্পিত হয়েছে। *[বায়ু পু. ১০৪.৭৭]*

□ যাইহোক, সমস্ত দেব-দেবীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র পবিত্র তীর্থ গয়ার খ্যাতি মূলত পিতৃতীর্থ হিসেবেই। এখানে পিতৃপুরুষ তথা পিতৃস্থানীয় অন্যান্য ব্যক্তিদের উদ্দেশে তর্পণ এবং পিণ্ডদান করলে যিনি পিণ্ডদান করেন এবং যাঁদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করেন তাঁরা সকলেই স্বর্গলাভ করেন বলে কথিত। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্র ও ভরতের মধ্যে রাজ্য বিষয়ে এক দীর্ঘ কথোপকথন হয়েছে। সেই সময় রামচন্দ্র ভরতকে গয়ানিবাসী গয় নামে এক যাজ্ঞিকের কথা বলেছিলেন। এই গয় শ্রুতিগানের মাধ্যমে বলেছিলেন যে, 'পুৎ' নামক নরক থেকে পিতাকে উদ্ধার করে স্বর্গে প্রেরণ করেন বলে সন্তানকে পুত্র বলা হয়। রামচন্দ্র বলেছেন যে, মানুষ গুণবান বহুপুত্র কামনা করে এই আশায় যে, পুত্রদের মধ্যে কেউ না কেউ গয়ায় এসে পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করে তাকে উদ্ধার করবে—

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
তেষাং বৈ সমবেতানামপি কশ্চিদ্ গয়াং ব্রজেৎ॥

মহাভারতে এবং বিভিন্ন পুরাণে বহুপুত্র কামনা করার কারণ হিসেবে গয়ায় পিণ্ডদানের বিষয়টির একাধিক উল্লেখ পাওয়া যায়।

[রামায়ণ ২.১০৭.১১-১৩;
মহা (k) ৩.৮৪.৯৩; ৩.৮৭.৯-১০; ১৩.৮৮.১৪;
(হরি) ৩.৬৯.৯৪; ৩.৭২.৯-১০; ১৩.৬৭.৩৩;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৯.১১; মৎস্য পু. ২২.৬;
বায়ু পু. ৮৩.১২-৪৪; অগ্নি পু. ১১৫.১-২০, ৬৩-৭৪]

□ পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশে গয়ায় পিণ্ডদানের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বিভিন্ন পুরাণে নানা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বায়ু পুরাণে গয়ায় শ্রাদ্ধ করলে পুণ্য হয় বলে উল্লিখিত আছে। বিশালা নগরীর অধিপতি বিশাল ছিলেন অপুত্রক। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উপদেশে গয়াশিরে পিণ্ডদান করে তিনি পুত্রলাভ করেন বলে বায়ু পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। একসময় গয়াগামী এক বণিকের হাতে শ্রাদ্ধ লাভ করে জনৈক প্রেতরাজ প্রেতগণ সহ স্বর্গে গমন করেছিলেন বলে জানা যায়। অগ্নিপুরাণেও এই কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। মৎস্য পুরাণ মতে গয়াই

হল সর্বোৎকৃষ্ট পিতৃতীর্থ। কারণ স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা এই তীর্থে অবস্থান করেন—

পিতৃতীর্থং গয়া নাম সর্বতীর্থবরং শুভম্।

মৎস্য পুরাণে এক গাথার উল্লেখ পাওয়া যায় যার একটি পর্যায়ে পিতৃপুরুষরা তাঁদের বংশধরদের চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান করতে বলেছেন।

[বায়ু পু. ৭৭.৯৭; ১১২.৭-১৪; ১১২.১৫-২০; অগ্নি পু. ১১৫.৫৪-৫৯, ৬০-৬২; মৎস্য পু. ২২.৫, ১৯২.১১; ২০৪.৮]

□ মহাভারতে তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে বহুবার গয়া তীর্থের প্রসঙ্গ এসেছে। দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য পালনের সময় তীর্থযাত্রারত অর্জুন একবার গয়াতীর্থে এবং তৎসংলগ্ন ফল্গুনদীতে এসেছিলেন। পাণ্ডবদের বনবাসকালে ঋষি পুলস্ত্য বিভিন্ন তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে গয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। পুলস্ত্য যুধিষ্ঠিরকে গয়াক্ষেত্রে ফল্গুনদীতে স্নান, পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ এবং দান ধ্যান করে পুণ্য অর্জনের পরামর্শ দিয়েছেন। অনুশাসন পর্বে ভীষ্মও গয়াকে একটি পবিত্র পিতৃতীর্থ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

[মহা (k) ১.২১৫.৬-৭; ৩.৮৪.৮২-৮৪, ৯৬; ১৩.২৫.৪২; ১৩.১৬৫.২৯; (হরি) ১.২০৮.৬-৭; ৩.৬৯.৮৩-৮৫, ৯৭; ১৩.২৬.৪২; ১৩.১৪৩.২৯]

□ পুরাকালে মতঙ্গ নামে এক তপস্বী ছিলেন। বাল্যকালে তিনি একদিন হঠাৎ জানতে পারলেন যে তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তান নন। প্রকৃত পক্ষে তিনি শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভজাত সন্তান, অর্থাৎ চণ্ডালজাতীয়। একথা জানতে পেরে দুঃখিত মতঙ্গ ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাকে বোঝাতে লাগলেন যে, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাতে আরও ব্যথিত হয়ে মতঙ্গ গয়া ক্ষেত্রে গিয়ে পায়ের একটি মাত্র আঙুলে ভর দিয়ে একশো বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলেন—

এবমুক্তো মতঙ্গস্তু ভৃশং শোকপরায়ণঃ।
অধ্যতিষ্ঠদ্ গয়াং গত্বা সো'ঙ্গুষ্ঠেন শতং সমা॥

[মহা (k) ১৩.২৯.৫; (হরি) ১৩.২৮.৫১]

□ যেসব তীর্থের নাম শ্রবণ করলে বা স্মরণ করলেও পুণ্য লাভ হয় তার উল্লেখ করতে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র গয়াক্ষেত্রের নাম উল্লেখ করেছেন।

[মহা (k) ১৩.১২৫.৪৮; (হরি) ১৩.১০৬.৪৬]

□ গয়াক্ষেত্রের আশে পাশে আরও বহু সংখ্যক তীর্থক্ষেত্র অবস্থিত। ধর্মপৃষ্ঠ, ব্রহ্মবেদী, গৃধ্রবট, গায়ত্রী তীর্থ, সরস্বতী তীর্থ, মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্বত, ভরতাশ্রম, বৈতরণী, ঘৃতকুল্যা প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রের অবস্থানে এই ক্ষেত্রের মহিমা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

[বায়ু পু. ১০৯.১৪-২৪; অগ্নি পু. ১১৬.১-৪২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৩.১০৪; গরুড় পু. ১.৮২-৮৬ অধ্যায়]

গরিষ্ঠ১ একজন দানব। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.১৬]

গরিষ্ঠ২ জনৈক প্রাচীন ঋষি। যেসব ঋষি-মহর্ষি দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন, মহর্ষি গরিষ্ঠ তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ২.৭.১৩; (হরি) ২.৭.১৩]

গরুড়১ অমরকোষে গরুড়ের পর্যায় শব্দগুলি উচ্চারণ করে বলা হয়েছে—

গরুত্মান্ গরুড়স্তার্ক্ষ্যো বৈনতেয়ঃ খগেশ্বরঃ।
নাগান্তকো বিষ্ণুরথ সুপর্ণঃ পন্নগাশনঃ॥

[অমরকোষ ১. (স্বর্গবর্গ), ৩১] অর্থাৎ গরুত্মান্, তার্ক্ষ্য, বৈনতেয়, খগেশ্বর (পক্ষীদের রাজা), নাগান্তক (সর্পকুলের যম), বিষ্ণু, সুপর্ণ এবং সর্পভুক্ বা পন্নগাশন এই সবকয়টি নামেই গরুড় অভিহিত হন।

□ বেদ এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে আমরা গরুড়ের নাম সেভাবে উচ্চারিত হতে দেখিনি। এমনকি কোষগ্রন্থে উল্লিখিত সুপর্ণ নামটিও বেদে গরুড় অর্থে প্রযুক্ত নয়। সুপর্ণ বলতে বড় জোর সুন্দর পর্ণ বা পাখা বিশিষ্ট বৃহদাকার কোনো পক্ষীকে বোঝানো হয়েছে। জীবাত্মা পরমাত্মার ছায়ায় সেই দার্শনিক শ্লোক 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' *[ঋগ্বেদ ১.১৬৪.২০]*

তো আমরা ভালভাবে জানি। কিন্তু ঋগ্বেদে যখন এক কথা বলা কাকাতুয়ার উল্লেখ করে বলা হয়—ছোট্ট পাখিটি! তোমাকে যেন শকুন না মেরে ফেলে, কোনো সুপর্ণও তোমাকে যেন বধ না করে—মা ধা শ্যেন উদ্‌বধীন্ মা সুপর্ণো।

[ঋগ্বেদ ২.৪২.২]

—তখন বোঝা যায় যে, কোনো বৃহদাকার পক্ষীকেই সুপর্ণ বলা হয়েছে, কিন্তু সে-পাখি গরুড় নন। একটি মন্ত্রে। *[ঋগ্বেদ ৪.৪২.৪]*

তো সুপর্ণকে প্রায় শ্যেন-পক্ষী বা শকুনই বলা হয়েছে। কিন্তু ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে যে শ্যেনের পুত্র সুপর্ণ, তিনি অতিদূর দেশ থেকে সোম (পুরাণের অমৃত) নিয়ে এসেছেন, সেই সোম অশেষ কর্মের উপযোগী, তা রক্তবর্ণ, তা সৃষ্টি করে, তা দেখতে সুন্দর এবং কেউ এই সুপর্ণ সংগৃহীত সোমকে নষ্ট করতে পারে না। শ্যেন-সুপর্ণ এই সোমকে আপন চরণের দ্বারা আহরণ করেছেন। *[ঋগ্‌বেদ ১০. ১৪৪. ৪-৫]*

ঋগ্‌বেদে শ্যেনপুত্র সুপর্ণের এই সোম আহরণই হয়তো পরবর্তীকালে গরুড়কে সুপর্ণ নামে চিহ্নিত করেছে এবং অমৃত আহরণের সঙ্গেও যোগ ঘটিয়েছে তাঁর।

□ রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী, গরুড় কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা বিনতার গর্ভজাত পুত্র। সূর্যের সারথি বৈনতেয় অরুণের তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

□ একবার মহর্ষি কশ্যপ পুত্র কামনায় এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে উপস্থিত থেকে ঋষি, গন্ধর্ব তথা দেবগণ তাঁকে নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন। এর মধ্যে কাষ্ঠ আহরণের দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র এবং বালখিল্য মুনিরা ছিলেন অন্যতম। শক্তিশালী ইন্দ্র পর্বতপ্রমাণ কাঠের বোঝা নিয়ে আসছিলেন। এমন সময় দেখলেন, ক্ষুদ্রকায় বালখিল্য মুনিগণ সকলে মিলে অতিকষ্টে একটি ক্ষুদ্র পাতার বোঁটামাত্র বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। পথে একটি জলপূর্ণ গোষ্পদ ছিল। মুনিগণ তার মধ্যে পতিত হয়ে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করতে লাগলেন। এই ঘটনা দেখে বিস্মিত ইন্দ্র হাস্য সংবরণ করতে পারলেন না। তিনি সেই ক্ষুদ্রাকৃতি ঋষিদের উপহাস করে কাঠের বোঝা নিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করলেন। দেবরাজের এই আচরণে তেজস্বী মুনিগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁরা বর্তমান ইন্দ্রকে অপসারিত করে এক অধিক শক্তিশালী ইন্দ্র সৃষ্টি করার সঙ্কল্প করে এক যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র একথা জানতে পেরে দুঃখিত হয়ে পিতা মহর্ষি কশ্যপের শরণাপন্ন হলেন। কশ্যপ বালখিল্যমুনিদের যজ্ঞসভায় উপস্থিত হয়ে তাঁদের মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট করে বললেন—ব্রহ্মার আদেশে যিনি ত্রিলোকের ইন্দ্র হয়েছেন, তাঁকে অপসারিত করে আপনারা ব্রহ্মার বাক্য মিথ্যা করতে পারেন না। আবার আপনারা যে সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন, তাও মিথ্যা হবার নয়। অতএব আমার অনুরোধ, আপনাদের সৃষ্ট ইন্দ্র মহান বলশালী পক্ষীন্দ্র হোক। আপনারা দেবরাজের অপরাধ ক্ষমা করুন। বালখিল্য মুনিগণ এই কথায় প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রকে ক্ষমা করলেন। তাঁদের যজ্ঞের ফলে যে পক্ষীন্দ্র জন্মগ্রহণ করবেন, তিনি কশ্যপের পুত্র হবেন—এই কথাও তাঁরা বললেন। ফলে পুত্রকামনায় কশ্যপ যে যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন তাও সফল হল। কশ্যপ পত্নী বিনতাকে বললেন—বালখিল্য মুনিদের এই যজ্ঞের ফলে তুমি শীঘ্রই ত্রিভুবনের পূজনীয় মহাবীর দুইটি পুত্রলাভ করবে। কশ্যপ ইন্দ্রকে বললেন—তোমার এই দুই ভ্রাতা তোমারই সহায়ক হবে এবং তোমার ইন্দ্রপদও সুরক্ষিত থাকবে। একথা শুনে ইন্দ্র আনন্দিত হলেন। এইভাবেই কশ্যপ পক্ষীন্দ্র গরুড়কে পুত্ররূপে লাভ করেন।

[মহা (k) ১.৩১.৫-৩৫; (হরি) ১.২৬.৫-৩৪]

□ মহর্ষি কশ্যপ একবার তাঁর দুই পত্নী কদ্রু এবং বিনতার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের ইচ্ছানুসারে বর প্রার্থনা করতে বলেন। কদ্রু সমান বলবান এক সহস্র সর্প পুত্র প্রার্থনা করলেন। বিনতা প্রার্থনা করলেন—আমার দুইটি পুত্র হবে, তারা কদ্রুর পুত্রদের থেকে তো বটেই, এমনকী সকলের থেকেই তেজে, আকৃতিতে এবং বিক্রমে প্রধান হবে। কশ্যপ বিনতাকে সেই বর দান করলেন। এর কিছুকাল পর বিনতা দুইটি ডিম প্রসব করলেন। এক সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হলে দ্বিতীয় ডিমটি থেকে গরুড় জন্মগ্রহণ করেন। (দ্রঃ বিনতা এবং অরুণ১) জন্মের পরেই গরুড় স্বয়ং নিজের খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আকাশমার্গে গমন করেন বলে মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১. ১৩. ৬-২৬; (হরি) ১. ১২.৬-২৭]

□ বেশ কিছুকাল পরে গরুড় সমুদ্রের অপর পারে মা বিনতার কাছে ফিরে এলেন। বিনতা তখন সপত্নী কদ্রুর দাসী হয়ে দুঃখে কাল কাটাচ্ছিলেন। (দ্রঃ বিনতা) ফলে গরুড়ও কদ্রু এবং তাঁর পুত্রদের নানারকম আদেশ মানতে বাধ্য থাকতেন। মায়ের দুর্দশা দেখে দুঃখিত গরুড় একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কী জন্য আমাকে এই সাপগুলির আদেশ পালন করতে হয়? বিনতা বললেন—গরুড়! সপত্নী কদ্রুর

ছলনার ফলে পণে হেরে আমি তাঁর দাসীতে পরিণত হয়েছি। তাই তুমিও দুর্দশা ভোগ করছ। এখন দুঃখিত গরুড় মাতার দুঃখমোচনের সঙ্কল্প করে সর্পগণকে জিজ্ঞাসা করলেন—কী করলে বা কী বস্তু দিলে তোমরা আমার মাকে এবং আমাকে এই দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে? কদ্রুর পুত্রেরা এই কথা শুনে বললেন—তুমি যদি অমৃত এনে দিতে পার, তবে আমরা তোমাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারি। গরুড় তাতেই সম্মত হলেন।

যাত্রার পূর্বে গরুড় মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—মা! আমি অমৃত আনতে যাচ্ছি, পথে কি খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করব? বিনতা গরুড়কে ব্যাধভক্ষণ করে ক্ষুধা নিবারণের পরামর্শ দিলেন এবং সাবধান করে দিলেন যেন কখনোই গরুড় ভুল করেও কোনো ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ না করেন। একথা শুনে গরুড় জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রাহ্মণকে পৃথকরূপে কীভাবে চেনা যাবে? বিনতা বললেন—যা আহার করলে তোমার গলায় জ্বালা বোধ হবে এবং যা কখনোই জীর্ণ হবে না—জানবে তিনিই ব্রাহ্মণ। একথা শুনে গরুড় মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে অমৃত আনয়নের জন্য যাত্রা করলেন। অন্ত্যজ ব্যাধকে বধ করার আদেশ এবং ব্রাহ্মণ-ভক্ষণের ফলে গলায় জ্বালা হওয়ার কথাটা হয়তো বা সেকালের দিনের জাতি-বর্ণ-ক্লিষ্ট সমাজের মধ্যে অন্ত্যজ ব্যাধ এবং বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের পার্থক্য প্রকট করে তোলে, তবুও বিনতার কথায় সমসাময়িক সমাজের এই বর্ণাশ্রমের অবস্থান একভাবে আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

যাই হোক, কিছুদূর যাবার পরই গরুড় অসম্ভব ক্ষুধা বোধ করলেন। তিনি নিকটবর্তী ব্যাধপল্লীতে উপস্থিত হলেন এবং সহস্র সহস্র ব্যাধ ভক্ষণ করলেন। এই সময়েই ভুলক্রমে ব্যাধপল্লীতে বসবাসকারী জনৈক ব্রাহ্মণ এবং তাঁর নিষাদ জাতীয়া পত্নী গরুড়ের মুখবিবরে প্রবেশ করেন। গরুড় তাঁদের সসম্মানে মুক্তি দিলেন এবং নিজেও কন্ঠদেশে অসহ্য জ্বালা থেকে মুক্তি লাভ করলেন। কিন্তু এই সামান্য আহারে তাঁর ক্ষুধা নিবৃত্ত হল না। এই সময় পথে পিতা মহর্ষি কশ্যপের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। কশ্যপ পুত্রের কুশল জিজ্ঞাসা করলে গরুড় তাঁর খাদ্যাভাবের কথা পিতাকে জানালেন। মহর্ষি কশ্যপ তখন গরুড়কে নিকটবর্তী সরোবরে বসবাসকারী বিশাল আকৃতিবিশিষ্ট গজ এবং কচ্ছপকে আহার করতে বললেন। গরুড় পিতার আদেশ অনুসারে সেই সরোবরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। গরুড় এক নখে হাতি এবং অপর নখে কচ্ছপটিকে তুলে নিয়ে সেগুলিকে আহার করার জন্য বসার জায়গা খুঁজতে খুঁজতে প্রথমে অলম্বতীর্থে উপস্থিত হলেন। কিন্তু সেখানকার বৃক্ষগুলি গরুড়ের বিশাল দেহকে বসার স্থান দিতে অসমর্থ ছিল। শেষে সেখানে অবস্থিত একটি অতি বিস্তৃত এবং অতি উচ্চ বটবৃক্ষ গরুড়কে নিজের শতযোজন বিস্তৃত শাখায় বসার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। কিন্তু বটবৃক্ষের সেই শাখাটি গরুড়ের ভার বহন করতে সমর্থ ছিল না। গরুড় তার উপর বসার চেষ্টা করতেই শাখাটি ভেঙে পড়ল। এই সময় গরুড় দেখতে পেলেন সেই শাখায় বালখিল্যমুনিরা অধোমুখ হয়ে ঝুলে তপস্যা করছেন। বৃক্ষশাখাটি যদি মাটিতে পড়ে তা হলে ঋষিদের প্রাণহানি ঘটবে—এই আশঙ্কায় গরুড় বালখিল্য মুনিদের রক্ষা করার জন্য ঠোঁট দিয়ে শাখাটি ধরে ফেললেন। ফলে সেটি মাটিতে পড়ল না। মুনিরাও রক্ষা পেলেন। দেবতারাও যে ভার বহন করতে পারেন না গরুড় তা সহজেই বহন করছেন দেখে বালখিল্যমুনিরা বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। পক্ষীরাজ গরুড় সেই গুরুতর ভার নিয়ে আকাশে উড়ছেন তাই মুনিরা তাঁর নাম রাখলেন গরুড়—

গুরুং ভারং সমাসাদ্যোড্ডীন এব বিহঙ্গম।
গরুড়স্তু খগশ্রেষ্ঠস্তস্মাৎপন্নগভোজন॥

[মহা (k) ১. ৩০. ৭; (হরি) ১. ২৫.৭]

গরুড় বহুপথ অতিক্রম করেও বালখিল্য-মুনিদের রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত অবতরণের স্থান পেলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি গন্ধমাদন পর্বতে পৌঁছে পিতা মহর্ষি কশ্যপকে তপস্যা করতে দেখলেন।

মহর্ষি কশ্যপ এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে বিস্মিত হলেন এবং যাতে বালখিল্যমুনিরা গরুড়ের প্রতি ক্রোধ না করেন সেই জন্য তাঁদের মিষ্ট কথায় প্রসন্ন করলেন।

বালখিল্যমুনিরা সন্তুষ্টভাবে সেই বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ করে তপস্যা করতে হিমালয়পর্বতে গেলেন। তখন গরুড় পিতাকে জিজ্ঞাসা

করলেন—এই বিশাল বৃক্ষশাখাটি কোথায় ফেলতে পারি যাতে কোনো প্রাণীর কোনো ক্ষতি না হয়? কশ্যপ গরুড়কে সম্পূর্ণ বরফাবৃত জনপ্রাণীহীন এক পর্বতের সন্ধান দিলেন। গরুড় অল্পকালের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে বৃক্ষশাখাটিকে ফেলে দিলেন। তারপর সেই পর্বতশৃঙ্গে বসে গজ এবং কচ্ছপটিকে ভক্ষণ করে গরুড় পুনরায় যাত্রা করলেন।

গরুড় প্রবল বেগে উড়ে চলেছেন দেখে দেবতাদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হল। দেবরাজ ইন্দ্রকে চিন্তিত দেখে দেবগুরু বৃহস্পতি বললেন—তোমারই অসাবধানতার সুযোগে বিনতাপুত্র গরুড় অমৃত হরণ করবার জন্য আসছে। একথা শুনে ইন্দ্র অমৃতরক্ষক দেবতাদের গরুড়কে প্রতিরোধ করার জন্য সতর্ক করলেন। অমৃতভাণ্ড রক্ষার জন্য অত্যধিক সাবধানতা অবলম্বন করা হল। ইন্দ্র স্বয়ং সেখানে পাহারা দিতে লাগলেন। এই সময় গরুড় সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। অতিবলশালী এই পক্ষীর সামনে অমৃতরক্ষক দেবগণ সহজেই পরাজয় স্বীকার করলেন। বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর গরুড় পাখার ঝাপটায় প্রবল ধুলিঝড় সৃষ্টি করলেন। ফলে দেবতারা আর তাঁকে দেখতে পেলেন না। এই অবসরে গরুড় তাঁদের আঘাত করতে লাগলেন। শেষে বায়ু এসে সেই ধুলিরাশি অপসারণ করলেন। এরপর দেবতারা গরুড়কে প্রতি আক্রমণে জর্জরিত করলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই ভীষণ যুদ্ধে গরুড়ই জয়লাভ করলেন। এরপর গরুড় অমৃতের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলেন—অমৃতের চারপাশে ভয়াবহ আগুন জ্বলছে। সেই অগ্নিশিখা অতিক্রম না করে অমৃত যে কক্ষে সুরক্ষিত আছে সেখানে প্রবেশ করা অসম্ভব। তখন পক্ষীরাজ গরুড় নিজের অজস্র মুখ সৃষ্টি করলেন সেই মুখবিবরগুলি বহু নদীর জলে পূর্ণ করলেন। সেই অসংখ্য জলপূর্ণ মুখ থেকে গরুড় অগ্নিশিখায় জল নিক্ষেপ করলেন। সেই জলধারায় সেই ভয়াবহ অগ্নি নির্বাপিত হল। গরুড় সহজেই অতি ক্ষুদ্র শরীর ধারণ করে অমৃতকলসের কক্ষে পৌঁছে গেলেন। অমৃতের কক্ষে প্রবেশ করে গরুড় দেখলেন—দেবতারা অমৃতের সুরক্ষার জন্য একটি যন্ত্র নির্মাণ করে রেখেছেন। অমৃত কলসের নিকটে একটি তীক্ষ্ণ ধার যুক্ত লৌহচক্র অনবরত ঘুরছে। অমৃত হরণ করতে গেলে সেই চক্রের দ্বারা হরণকারীর মৃত্যু নিশ্চিত। বুদ্ধিমান গরুড় নিজের দেহকে অতি ক্ষুদ্র আকৃতি দান করলেন এবং সেই চক্রের ভিতরে প্রবেশ করলেন। গরুড় সেখানে পৌঁছে দেখলেন অমৃতের কলস দুটি ভয়াবহ সর্প রক্ষা করছে। গরুড় ধুলিরাশি নিক্ষেপ করে তাদের চোখ অন্ধপ্রায় করে দিলেন এবং গরুড়ের প্রহারে তারা নিস্তেজ হয়ে পড়ল। গরুড় সাপদুটিকে হত্যা করে অমৃতের কলস তুলে নিলেন এবং সেই লৌহযন্ত্রটিকে ভেঙে ফেলে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

গরুড় কদ্রুপুত্রদের জন্য অমৃত নিয়ে ফিরে চলেছেন, এইসময় পথে শ্রীহরি বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। গরুড় অমৃত লাভ করেও তা নিজে পান না করে অপরের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন—পক্ষীরাজের এই লোভ সংবরণ গুণে শ্রীহরি মুগ্ধ হলেন। প্রসন্ন নারায়ণ গরুড়কে বরদান করতে চাইলে গরুড় বললেন—আমি আপনার উপরে স্থান পেতে ইচ্ছা করি এবং অমৃত পান না করেও আমি অজর ও অমর হতে চাই। নারায়ণ তাঁকে সেই দুই বর দান করলেন। গরুড় তখন নারায়ণকে বললেন—আমিও আপনাকে বর দিতে ইচ্ছা করি। আপনি বর প্রার্থনা করুন। ভগবান বিষ্ণু গরুড়কে বাহনরূপে প্রার্থনা করলেন। প্রসন্ন গরুড় সেই বর দান করে ফিরে চললেন।

অমৃতহরণকারী গরুড়কে দেখে ক্রুদ্ধ ইন্দ্র এই সময় বজ্রের দ্বারা তাঁকে আঘাত করলেন। কিন্তু বজ্র সেই মহাবলশালী পক্ষীরাজের কোনো ক্ষতিই করতে পারল না। গরুড় দেবরাজকে বললেন—তোমার এই বজ্রাঘাতে আমার কোনো বেদনাই বোধ হচ্ছে না। কিন্তু তবু এই বজ্র যাঁর অস্থি দ্বারা নির্মিত হয়েছে সেই দধীচি মুনির, তোমার এবং এই অস্ত্রের সম্মান রক্ষার্থে আমি আমার পাখার একটি পালক ত্যাগ করলাম।

গরুড়ের পরিত্যক্ত সেই অপূর্ব সুন্দর পালকটি দেখে দেবগণ তাঁর নতুন নাম রাখলেন সুপর্ণ—

তদ্দৃৎসৃষ্টমভিপ্রেক্ষ্য তস্য পর্ণমনুত্তমম্।
হৃষ্টানি সর্ব্বভূতানি নাম চক্রুগরুত্মত:॥
স্বরূপং পত্রমালক্ষ্য সুপর্ণো'য়ং ভবত্বিতি।

অন্যত্রও তাঁকে সুপর্ণ নামে সম্বোধন করা হয়েছে—

"অরিষ্টনেমিং গরুড়ং সুপর্ণম্"।

[মহা (k) ৫. ৭১. ৫; ১. ৩৩. ২৩-২৪; (হরি) ৫. ৬৬. ৬৬; ১. ২৮. ২৩-২৪]

গরুড়ের অপরিসীম শক্তি ইন্দ্রকে আশ্চর্য করল। তিনি গরুড়ের সঙ্গে চিরস্থায়ী মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এইভাবে গরুড় এবং ইন্দ্রের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হল।

দেবরাজ গরুড়কে বললেন—এই অমৃতের কলসে যখন তোমার কোনো প্রয়োজন নেই, তখন তুমি আমাকে তা ফিরিয়ে দাও। কারণ যারা এই অমৃত লাভ করবে, তারাই অমৃত পান করে বলবান হয়ে সকলকে উৎপীড়িত করবে। গরুড় বললেন—বিশেষ কারণে অমৃত নিয়ে যাওয়া আমার একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু আমি কাউকে এই অমৃত লাভ করতে দেব না। আমি অমৃত যে স্থানে রাখব সেই স্থান থেকে তুমি শীঘ্রই তা হরণ করে নিয়ে যেও।

গরুড়ের কথা শুনে অতি প্রসন্ন ইন্দ্র গরুড়কে বর দিতে চাইলেন। গরুড় নিজের এবং মাতার প্রতি সর্পগণের কপট ব্যবহার স্মরণ করে এই বর প্রার্থনা করলেন যে, সর্পগণ তাঁর খাদ্য হবে। নারায়ণের অনুমতিক্রমে ইন্দ্র গরুড়কে সেই বর দান করলেন।

এরপর অমৃতের কলস নিয়ে গরুড় কদ্রূপুত্রদের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন—তোমাদের জন্য আমি অমৃত এনেছি। আমি অমৃতের কলস এই কুশের উপর রাখলাম। তোমরা স্নান করে পবিত্র হয়ে তা পান করো। গরুড় আরও বললেন আমি তোমাদের কথা অনুসারে অমৃত আনয়ন করলাম অতএব তোমরা আমাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দাও। তাই হোক—একথা বলে সর্পগণ স্নান করতে গেলেন। এই অবসরে ইন্দ্র অমৃতের কলস তুলে নিয়ে পলায়ন করলেন। সর্পেরা ফিরে এসে অমৃতের কলস দেখতে না পেয়ে হতাশ হল। তারপর এরই উপর অমৃত ছিল—একথা ভেবে তারা সেই কুশ চাটতে লাগল। ধারালো কুশে তাদের জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত হল। মহাপবিত্র অমৃতের স্পর্শলাভকারী সেই কুশগুলি 'পবিত্র' নামে খ্যাত হয়।

এরপর গরুড় সেই বনে অন্যান্য পক্ষীগণের দ্বারা বিশেষ সম্মানিত হয়ে আনন্দে বাস করতে লাগলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের বরে সর্পগণ তাঁর খাদ্যে পরিণত হল। ব্রহ্মা গরুড়কে পক্ষীন্দ্র পদে অভিষিক্ত করেন।

সাপেদের সঙ্গে শত্রুতা থাকলেও ব্রহ্মা কদ্রূর জ্যেষ্ঠপুত্র তথা সমগ্র পৃথিবীকে মস্তকে ধারণকারী শেষ বা অনন্তনাগের সঙ্গে গরুড়ের মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করান।

[মহা (k) ১.২৭.১২-১৬, ২৮-৩০; ৩২-৩৪ অধ্যায়; ১.৩৬.২৫; (হরি) ১.২২.১২-১৬; ২৩-২৫, ২৭-২৯ অধ্যায়; ১.৩১.২৫]

□ একবার ক্ষুধার্ত গরুড় আহারের সন্ধান করতে করতে যমুনা হ্রদ বা কালিন্দী হ্রদে বসবাসকারী মৎস্যদের দেখলেন। ক্ষুধার্ত গরুড় হ্রদের বৃহৎ মৎস্যগুলিকে নির্বিচারে ভক্ষণ করতে লাগলেন। এই সময় মহর্ষি সৌভরি এই হ্রদে অবস্থান করছিলেন। মৎস্যকুলের প্রতি কৃপাবশত সৌভরি গরুড়কে এই মর্মে অভিশাপ দিলেন যে, ভবিষ্যতে গরুড় যদি কখনো মৎস্যভক্ষণের উদ্দেশ্যে এখানে আসেন তবে নিশ্চিত তাঁর মৃত্যু ঘটবে।

এরপর একবার সর্পগণের চিরশত্রু গরুড় এবং কদ্রূপুত্র কালিয়নাগের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। বিষধর কালিয়নাগ গরুড়ের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিজের বাসস্থান রমণকদ্বীপ ত্যাগ করে সপরিবারে পলায়ন করলেন। কালিয়নাগ জানতেন, গরুড় কালিন্দী হ্রদে প্রবেশ করতে পারেন না। তাই তিনি সপরিবারে কালিন্দী হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। পরবর্তী সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অহঙ্কারী কালিয় নাগকে দমন করে তাঁকে কালিন্দী হ্রদ থেকে নির্বাসিত করেন।

[ভাগবত পু. ১০.১৭.২-১২]

□ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সগর মহর্ষি কশ্যপ এবং বিনতার কন্যা সুমতিকে বিবাহ করেন বলে বিভিন্ন পুরাণে উল্লেখ আছে। ফলে কশ্যপপুত্র গরুড় যে সগরপুত্রগণের মাতুল একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। *[রামায়ণ ১.৩৭.৪; ১.৪১.১৬]*

□ দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি মাতলি নিজ কন্যা গুণকেশীর জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করছিলেন। কিন্তু দেবতা ও মানুষের মধ্যে তিনি কোনো উপযুক্ত বরের সন্ধান পেলেন না। তখন মাতলি নারদকে সঙ্গে নিয়ে পাতালে গুণকেশীর পাত্র সন্ধানের জন্য যাত্রা করলেন। বহুদেশ পর্যটন

করার পর নাগলোকে উপস্থিত হয়ে মাতলি আর্যক নাগের পৌত্র সুমুখকে দেখে বেশ খুশি হলেন এবং তাকেই জামাই করবেন বলে ঠিক করলেন। এই সংবাদ বৃদ্ধ আর্যক নাগের কানে গেল। তিনি বললেন—কিছুদিন আগে এর পিতা, আমার পুত্র চিকুরকে গরুড় ভক্ষণ করছে এবং সে যাবার সময় বলে গেছে যে, পরের মাসে এই সুমুখকেও সে হত্যা করবে। তাই এই বিবাহের সংবাদে আমার কোনো আনন্দ হচ্ছে না। একথা শুনে মাতলি সুমুখের জীবনরক্ষার জন্য তাকে সঙ্গে নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র এবং নারায়ণের শরণাপন্ন হলেন। দেবরাজ সুমুখকে দীর্ঘায়ু দান করলেন। এরপর সুমুখ মাতলির কন্যা গুণকেশীকে বিবাহ করে নাগলোকে চলে গেলেন।

এদিকে সুমুখের দীর্ঘায়ুলাভের সংবাদে গরুড় খুব রেগে গেলেন এবং দেবসভায় গিয়ে ইন্দ্র এবং ভগবান বিষ্ণুর প্রতি নিজের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। গরুড় বললেন— আমি যে নাগকে খাদ্য বলে নির্বাচন করেছি, কেন তোমরা তাকে প্রাণদান করে আমার ভোজনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছ? আমি অতুল বলের অধিকারী হয়েও সবসময় তোমাদের সেবা করে থাকি এবং নিজের অপরিসীম ক্ষমতা সত্ত্বেও সামান্য ভৃত্যের মত নারায়ণকে বহন করে থাকি। সেইজন্যই কি তোমরা আমাকে এমন অবজ্ঞা কর? নিজের দৈহিক শক্তির জন্য গরুড়ের এমন অহঙ্কার দেখে শ্রীহরি বিষ্ণু তাঁকে দমন করার জন্য বললেন—গরুড়! সমগ্র ত্রিভুবনও আমার দেহধারণে সমর্থ হয় না। আমি নিজেই নিজেকে এমনকী তোমাকেও ধারণ ও বহন করি। সুতরাং তুমি অকারণ আত্মপ্রশংসা কোরো না। বিশ্বাস না হয় তুমি আমার এই বামবাহুটিকে বহন কর দেখি। একথা বলে নারায়ণ নিজের বামবাহু গরুড়ের স্কন্ধে স্থাপন করলেন কিন্তু সেই একটিমাত্র বাহুর ভারে গরুড় অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। এইভাবে নারায়ণ গরুড়ের দর্পচূর্ণ করেন। কিন্তু পরে গরুড় ক্ষমাপ্রার্থনা করলে ভক্তবৎসল শ্রীহরি তাঁকে ক্ষমাও করলেন। গরুড়ও সুমুখ নাগের প্রতি বিদ্বেষভাব ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করলেন।

[মহা (k) ৫.১০৪ অধ্যায়; ৫.১০৫.১-৩১; (হরি) ৫.৯৭. অধ্যায় ৯৮.১-৩২]

□ একবার মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁর শিষ্য তপস্বী গালবের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বললেন—তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। অতএব তুমি এখন তোমার ইচ্ছানুসারে আশ্রম ত্যাগ করে যেতে পার। একথা শুনে গালব গুরুকে তাঁর ইচ্ছানুসারে গুরুদক্ষিণা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। গালবের বারংবার অনুরোধে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বিশ্বামিত্র নিজ শিষ্যের কাছে অদ্ভুত বিচিত্র বর্ণের আটশত অশ্ব গুরুদক্ষিণা চাইলেন। গুরুর আদেশ শুনে তপস্বী গালব ভীষণ চিন্তায় পড়লেন। শেষ পর্যন্ত গালব ভগবান নারায়ণের মাধ্যমে গরুড়ের কাছে এলেন সাহায্য ভিক্ষা করতে। নারায়ণের আদেশে তাঁর বাহন গরুড় গালবকে সাহায্য করার জন্য উপস্থিত হলেন। তারপর গালব অশ্বের সন্ধানে প্রথমে পূর্বদিকে গেলেন গরুড়ের পিঠে চড়েই। এক সময় তাঁরা এসে পৌঁছলেন ঋষভ পর্বতের ওপর। সেখানে তাঁরা শাণ্ডিলী নামে এক ব্রাহ্মণী তাপসীকে দর্শন করলেন। শাণ্ডিলী তাঁদের নিজের আশ্রমে খুব সমাদর করলেন, খেতে দিলেন। গরুড় ও গালব তাঁর আশ্রমে ভূমিশয্যায় শয়ন করে তাঁদের পথশ্রান্তি দূর করলেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে-বসে গরুড় ভাবলেন যে, এই সুন্দরী তপস্বিনী এমন নির্জন পর্বতে একা বাস না করে যদি ব্রহ্মা বিষ্ণু অথবা মহেশ্বরের অবস্থানে বসবাস করতেন, তাহলে বেশ হত এবং তাতে তপস্বিনী শাণ্ডিলীরও মর্য্যাদা বাড়ত। এর পরেই অদ্ভূত সেই ঘটনা ঘটল। তপস্বিনী শাণ্ডিলীর বিনা অনুমতিতে তাঁকে স্থানান্তরিত করার ইচ্ছা পোষণ করার ফলে গরুড় নিজের সমস্ত দৈহিকশক্তি হারালেন। তাঁর পাখার পালকগুলি সব ঝরে পড়ল। তিনি এক প্রাণহীন মাংসপিণ্ডের রূপ লাভ করলেন। অনুতপ্ত গরুড় শাণ্ডিলীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলে শাণ্ডিলী এ-কথা বুঝলেন যে, গরুড় তাঁকে অমর্য্যাদা করেননি। তাঁকে ক্ষমা করলেন শাণ্ডিলী। গরুড় পুনরায় তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য্য এবং শক্তি ফিরে পেলেন। এরপর গরুড় গালবকে নিয়ে নানাস্থানে সেই আটশত অশ্বের সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু গালব কোথাও গুরুর নির্দিষ্ট করা অশ্বের সন্ধান পেলেন না। তখন গরুড় গালবকে তাঁর প্রিয় বন্ধু চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষের পুত্র যযাতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বললেন।

যযাতি নিজে গালবের সমস্যার সমাধান করতে না পারলেও তাঁর কন্যা মাধবীর মাধ্যমে গালবের গুরুদক্ষিণার অশ্ব লাভ করা সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু গালবের দক্ষিণা দানে গরুড়ের ভূমিকাটুকু গালব ভোলেননি। *[দ্র. মাধবী, গালব]*

[মহা (k) ৫.১০৬.১৯-২৭; ১০৭-১১৯ অধ্যায়; (হরি) ৫.৯৯.১৯-৪৫; ১০০-১১০ অধ্যায়]

□ বাসুদেব কৃষ্ণ স্বর্গের পারিজাতবৃক্ষ হরণ করলে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। গরুড় কৃষ্ণের পক্ষে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের সঙ্গে তাঁর দুই ঘন্টা ভয়ানক সংঘর্ষ হয়। শেষপর্যন্ত গরুড়ের প্রহার সহ্য করতে না পেরে ঐরাবত ভূমিতে পতিত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ৭.১১.২২; (হরি) ৭.৯.২২; হরিবংশ পু. ৭৩ অধ্যায়]

□ পাণ্ডবরা যখন তেরো বৎসর বনবাস করছিলেন সেইসময় কিছুদিন তাঁরা গন্ধমাদন পর্বতে বসবাস করেন। এইসময় একদিন গরুড় এক হ্রদে বসবাসকারী ঋদ্ধিমান নামক এক নাগকে অপহরণ করেন। মহাবেগশালী গরুড়ের পাখার ঝাপটে প্রবল ঝড়ের সৃষ্টি হল এবং তার ফলে কুবেরের উদ্যান থেকে স্বর্গীয় বহু বিচিত্রবর্ণের পুষ্প উড়ে এসে পাণ্ডবদের কাছে পড়ল। দ্রৌপদীর অনুনয়ে ভীম আরও বেশকিছু ফুল সংগ্রহের জন্য কুবেরের প্রাসাদের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

[মহা (k) ৩.১৬০.১৫-৩১; (হরি) ৩.১৩৩.১৬-৩২]

□ একবার দেবরাজ ইন্দ্র মর্ত্যলোকে উপস্থিত হয়ে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু যজ্ঞের শেষে পশুবলি প্রসঙ্গে দেবগণ এবং বৃহস্পতি প্রমুখ পুরোহিতগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত তাঁরা চন্দ্রবংশীয় রাজা উপরিচর বসুকে মীমাংসা করতে অনুরোধ করলেন। ইন্দ্রের পরমমিত্র রাজা উপরিচর বসু দেবগণের পক্ষে মত প্রকাশ করলে ব্রাহ্মণরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিলেন—তুমি যখন দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করে বেদবাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করলে তখন তুমি পাতালে প্রবেশ কর। পাতালে প্রবেশ করে উপরিচর বসু নিরন্তর ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করতে লাগলেন। তাঁর তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে নারায়ণ গরুড়কে বললেন—তুমি এখনই গিয়ে আমার ভক্ত এই রাজাকে পুনরায় আকাশমার্গে ফিরিয়ে আন, তাঁকে উপরিচর কর। গরুড় উপরিচর বসুকে পাতাল থেকে তুলে পুনরায় আকাশগামী করলেন এবং এইভাবে রাজা শাপমুক্ত হলেন।

[মহা (k) ১২.৩৩৭.৬-৪১; (হরি) ১২.৩২৩.৩-৪২]

□ রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে গরুড়ের নানা রত্ন-অলঙ্কৃত প্রাসাদের বর্ণনা পাওয়া যায়। বানরদল সীতার সন্ধানে যাত্রা করার পূর্বে বানররাজ সুগ্রীব তাদের যে সকল স্থানে সীতার সন্ধান করতে বলেছিলেন তার মধ্যে গরুড়ের বাসভবন অন্যতম। *[রামায়ণ ৪.৪০.৩৬-৩৯]*

□ রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে রাম এবং লক্ষ্মণকে নাগপাশে আবদ্ধ করলে গরুড় সেই স্থানে তাঁদের উদ্ধার করার জন্য উপস্থিত হলেন। গরুড়কে দেখে সাপেরা ভয়ে পলায়ন করল। রাম এবং লক্ষ্মণ মুক্ত হলেন। পরে গরুড়ের স্পর্শে ও আলিঙ্গনে আহত রাম ও লক্ষ্মণ পুনরায় সুস্থ ও সবল হয়ে ওঠেন।

[রামায়ণ ৬.৫০.৩৩-৬০]

□ অর্জুনের জন্মোৎসবে গরুড় উপস্থিত ছিলেন বলে মহাভারতে উল্লেখ আছে।

[মহা (k) ১.১২৩.৭৩; (হরি) ১.১১৭. ৭৭]

□ উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকে কেন্দ্র করে বিনতা ও কদ্রূর মধ্যে পণ রাখা এবং বিনতার পরাজয় এবং তারও পাঁচশত বৎসর পর গরুড়ের জন্ম *[দ্র. বিনতা এবং অরুণ১]* থেকে গরুড় সমুদ্র মন্থনের পরে জন্মগ্রহণ করেন বলে মনে হয়। কিন্তু কয়েকটি পুরাণমতে অমৃতমন্থনের সময় গরুড় মন্থনদণ্ড মন্দর পর্বতকে বহন করে নিয়ে গিয়ে ক্ষীরোদ সাগরের প্রান্তে স্থাপন করেন।

[ভাগবত পু. ৮.৬.৩৮-৩৯]

গরুড়২ পুরাণ মতে, ধর্মের ঔরসে বিশ্বার গর্ভে বিশ্বেদেবগণের জন্ম হয়।

বিশ্বেদেবাশ্চ বিশ্বায়াং ধর্ম্মাজ্জাতা ইতি শ্রুতিঃ॥

বিশ্বার গর্ভজাত এই বিশ্বেদেবগণের মধ্যে একজন হলেন গরুড়। *[মৎস্য পু. ১৭১.৪৮-৫০]*

গরুড়কেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি তীর্থ। গরুড় সিদ্ধিকামনায় এখানে তীর্থস্থাপন করেছিলেন।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচন কাণ্ড) পৃ. ৬৭]

গরুড়পুরাণ অগ্নিপুরাণের মতো এই পুরাণকেও এক

ধরনের বিশ্বকোষ বলা চলে। পূর্ব এবং উত্তর দুইভাগে বিভক্ত এই পুরাণের বক্তা গরুড়, শ্রোতা কশ্যপ। পূর্বখণ্ডে অধ্যায়-সংখ্যা ২৪৩, উত্তরখণ্ডে ৪৫। শ্লোক-সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একমতে ১৮০০০, অন্যমতে ১৯০০০। মৎস্য, স্কন্দ এবং অগ্নিপুরাণ মতে—গারুড়কল্পে বিশ্বাণ্ড থেকে গরুড়ের উৎপত্তি বিষয়ক কথা যে পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে, তারই নাম গরুড়পুরাণ। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত গরুড় পুরাণে গারুড়কল্প বা গরুড়ের উৎপত্তি কোনোটাই নেই। আরও আশ্চর্যের বিষয় হল— কতিপয় প্রাচীন দার্শনিক এবং স্মার্ত পণ্ডিতেরা গরুড় পুরাণ বলে যে সমস্ত শ্লোক উদ্ধার করেছেন, সেই শ্লোকগুলি বর্তমান গরুড়পুরাণে পাওয়া যায় না। এতে ধারণা হয়—প্রাচীনতর কোনো গরুড়পুরাণ আগে প্রচলিত ছিল।

এই পুরাণের পূর্বখণ্ডে চিরাচরিত পৌরাণিক প্রথা অনুযায়ী বিভিন্ন ব্রতের কথা যেমন পাওয়া যায় (অধ্যায় ১১৬ থেকে ১৪১), তেমনই বিভিন্ন স্মার্ত ক্রিয়াবিধিও (২১৮ থেকে ২২৪ অধ্যায়) এখানে উল্লিখিত। এ ছাড়াও আছে সূর্য এবং চন্দ্র বংশের বর্ণনা, যুগধর্ম, অষ্টাঙ্গ যোগ এবং ব্রহ্মতত্ত্বের কথা। এই পুরাণের বিশেষত্বের জায়গাগুলি হল বাস্তু, প্রাসাদ আহ্নিক নির্ণয় সম্বন্ধে ভাবনা। মুক্তা, পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল প্রভৃতি মণিরত্নের পরীক্ষা গরুড়পুরাণের অন্যতর আকর্ষণ তৈরি করেছে। এই পুরাণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে আলোচনা। আয়ুর্বেদীয় নিদান, রোগ এবং চিকিৎসার বিষয় ছাড়াও পশুচিকিৎসা এবং মনোরোগের বিষয়ও খানিকটা এখানে আলোচিত হয়েছে। গরুড় পুরাণের উত্তর খণ্ডে প্রধানত মরণোত্তর প্রেতলোকের বর্ণনা।

ঐতিহ্যগত স্মৃতি-নিবন্ধগুলি ছাড়াও প্রধানত বৈষ্ণবীয় নিবন্ধে—যেমন রূপ গোস্বামীর ভক্তির সামৃতসিন্ধু এবং গোপালভট্টের হরিভক্তি বিলাসে গরুড়পুরাণের বহুতর শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। গরুড়পুরাণের নিজস্বতা নিয়ে বহুতর ভাবনা আছে। পণ্ডিতরা মনে করেন গরুড়পুরাণ যে এক ধরনের বিশ্বকোষে পরিণত হয়েছে, তার কারণ অন্যান্য বহু পুরাণ থেকে বহু কিছু এই পুরাণে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তমর্ণ এই পুরাণগুলির মধ্যে প্রধান হল কূর্মপুরাণ। আর আছে ভাগবত পুরাণ, বায়ু পুরাণ এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ। আয়ুর্বেদের অংশটি দ্বিতীয় বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয় নামক গ্রন্থের সাক্ষাৎ প্রভাবে রচিত। এই পুরাণগুলি ছাড়া মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ইত্যাদি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের গ্রন্থগুলিও এখানে যথেষ্ট ব্যবহৃত। একত্রে গরুড়পুরাণের রচনাকাল নির্ণয় করা খুব কঠিন। তবে পণ্ডিতেরা তর্কযুক্তি দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, অন্যান্য পুরাণের যেসব অংশ গরুড়পুরাণ আত্মসাৎ করেছে, সেই অংশগুলির রচনাকাল বিচার করে গরুড়পুরাণের বিভিন্ন অংশের রচনাকাল নির্ধারণ করা যায়। এই ভাবনা অনুযায়ী কূর্মপুরাণের যে-অংশ গরুড়পুরাণে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলির রচনা-কাল ৭০০ থেকে ৮০০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকাল। অন্যদিকে গরুড় পুরাণের অন্যান্য অংশের অভ্যন্তরীণ বিচার তথা স্মৃতি-নিবন্ধকারদের গরুড়পুরাণের শ্লোকোদ্ধার-পদ্ধতি বিচার করলে বোঝা যায় যে, এই পুরাণের রচনাকাল ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ। পণ্ডিতেরা মনে করেন মিথিলা অঞ্চলে গরুড়পুরাণ লিখিত হয়েছিল।

[দ্র. অশোক চট্টোপাধ্যায়, পুরাণ পরিচয়, পৃ. ৯৪-৯৭]

গরুড়ব্যূহ প্রাচীনকালে যুদ্ধরীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ব্যূহসজ্জা। ব্যূহ বলতে সাধারণভাবে সৈন্যসজ্জার কৌশলকে বোঝানো হয়। রথী অশ্ব, গজ এবং পদাতিক বাহিনী অর্থাৎ চতুরঙ্গের চারটি উপাদান সেনানায়কের নির্দেশানুযায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে যে বিশেষ আকার বা আকৃতিতে সজ্জিত হত—সেটিই ব্যূহ নামে পরিচিত।

মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বর্ণনায় বহুপ্রকার ব্যূহ নাম পাওয়া যায়। রণক্ষেত্রে সেনানায়কের কৌশলগত দক্ষতার পরিচয় বহন করত বিশেষ বিশেষ ব্যূহগুলি।

মহাভারতের ভীষ্মপর্ব থেকে জানা যায় যে, কৌরব সেনাধিপতি দেবব্রত-ভীষ্ম যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন গরুড়ব্যূহ নির্মাণ করে সৈন্যসজ্জা পরিকল্পনা করেছিলেন। আবার ভীষ্মের শরশয্যা গ্রহণের পর পরবর্তী কুরু সেনাপতি দ্রোণাচার্যও আঠারো দিনব্যাপী যুদ্ধের দ্বাদশতম দিনে গরুড়ব্যূহ রচনা করেন।

সাধারণত ব্যূহের আকার-আকৃতির উপর নির্ভর করেই যেহেতু ব্যূহ-নাম স্থির করা হত,

সুতরাং গরুড় ব্যূহটি মহাপক্ষী গরুড়ের আকৃতি বিশিষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, মহামতি ভীষ্ম কুরুপক্ষের কোন কোন যোদ্ধাকে ব্যূহের কোন অংশে স্থাপন করেছিলেন।

অধিনায়ক ভীষ্ম নিজে ছিলেন গরুড়ব্যূহের মুখের সামনে। অর্থাৎ তাঁকে অগ্রবর্তী করেই যাবতীয় আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল। ভীষ্মের দুই পাশে অর্থাৎ গরুড়ের দুই চক্ষু রূপে উপস্থিত ছিলেন দ্রোণাচার্য ও কৃতবর্মা। অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্যকে ঘিরে ত্রিগর্ত, মৎস্য, কেকয় ও বাটধানদেশীয় সৈন্যরা নির্মাণ করলেন গরুড়ের মস্তক। অন্যদিকে ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত এবং মদ্র, সিন্ধু, সৌবীর, পঞ্চনদদেশীয় সৈন্য ও অনুচরেরা একত্রিত হয়ে জয়দ্রথের নেতৃত্বে ব্যূহের গ্রীবাদেশ নির্মাণ করলেন। দুর্যোধন তাঁর সহোদরদের নিয়ে একত্রিত হলেন ব্যূহের পৃষ্ঠদেশে। অবন্তীদেশের মহাযোদ্ধা বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং কম্বোজ, শূরসেন ও শকদেশীয় যোদ্ধারা সংযোজিত হলেন ব্যূহের পুচ্ছদেশে। দাসেরক, মাগধ ও কালিঙ্গগণ গরুড়ব্যূহের দক্ষিণপক্ষে রইলেন এবং কারূষ, বিকুঞ্জ, মুণ্ড ও কুণ্ডবৃষদেশীয় সৈন্যরা বৃহদ্বলের নেতৃত্বে ব্যূহের বামপক্ষ নির্মাণ করেন। গরুড়ব্যূহকে প্রতিহত করার জন্য পাণ্ডবরা অর্ধচন্দ্রব্যূহ নির্মাণ করেছিলেন।

বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, গরুড়ব্যূহের আকৃতি স্পষ্টতই বিশালাকার পক্ষীসদৃশ আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে অনেকটা ঈগল পাখির মত। *[মহা (k) ৬.৫৬.২-১১; (হরি) ৬.৫৬.২-১১]*

□ এবার দেখা যাক দ্রোণাচার্য কিভাবে গরুড়ব্যূহের সজ্জা করেছিলেন। দ্রোণ-রচিত ব্যূহের অগ্রভাবে অর্থাৎ মুখস্থানে ছিলেন দ্রোণাচার্য স্বয়ং। রাজা দুর্যোধন এবং তাঁর সহচর ও অনুচরেরা রইলেন ব্যূহের মস্তকভাগে। কৃতবর্মা এবং কৃপাচার্য ব্যূহের নয়নযুগল নির্মাণ করলেন। ভূতশর্মা, ক্ষেমশর্মা, করকাক্ষ ও কলিঙ্গ, সিংহল, প্রাচ্য, বীর, আভীর, দশেরক, শক, যবন, কাম্বোজ, শূরসেন প্রভৃতি দেশীয় যোদ্ধারা চতুরঙ্গ বাহিনীতে সজ্জিত হয়ে ব্যূহের গ্রীবাদেশ তৈরি করলেন। ভূরিশ্রবা, শল্য, বাহ্লিক প্রমুখ বীরেরা এক অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ রইলেন ব্যূহের দক্ষিণ পক্ষে, আর অবন্তীদেশীয় বীর বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং কম্বোজরাজ বাম পক্ষে। তাঁদের অগ্রভাগে রইলেন অশ্বত্থামা। কলিঙ্গ, অম্বষ্ঠ, মগধ, মদ্রক, গান্ধার প্রভৃতি দেশের সৈন্যদের নিয়ে গঠিত হল ব্যূহের পৃষ্ঠদেশ। গরুড় ব্যূহের পশ্চাদভাগ রক্ষা করলেন সবান্ধব অঙ্গরাজ কর্ণ। জয়দ্রথ, ভীমরথ, ঋষভ, জয়, ভূমিঞ্জয় প্রমুখ দক্ষ যোদ্ধা পরিবৃত হয়ে ব্যূহের বক্ষস্থলে অবস্থান করছিলেন। দ্রোণাচার্য প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্তকে রেখেছিলেন ব্যূহের একেবারে কেন্দ্রে। ভগদত্ত এক বিশাল হাতিতে চড়ে রাজছত্রসহ সদর্পে সেখানে অবস্থান করছিলেন।

চতুরঙ্গবাহিনী বিশিষ্ট গরুড়ব্যূহটি যেন বাতাসে দোদুল্যমান বিশালাকার পক্ষীর মতই দেখাচ্ছিল। যা দেখে মহাভারতের কবির মনে হয়েছিল বায়ু সঞ্চালিত সমুদ্রস্রোত যেন নৃত্য করছে—

দ্রোণেন বিহিতো ব্যূহঃ পদাত্যশ্বরথদ্বিপৈঃ।
বাতোদ্ধতার্ণবাকারঃ প্রনৃত্ত ইব লক্ষ্যতে॥

দ্রোণপর্বের এই বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে যে, গরুড়ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষ থেকে বিদ্যুৎবাহী মেঘের মতই সৈন্যরা ছিটকে বেরিয়ে পড়ছিল। অর্থাৎ এই ব্যূহ সজ্জার সঙ্গে আকস্মিক আক্রমণ করার একটা ভাবনা জড়িয়ে রয়েছে বলে মনে হয়।

এক্ষেত্রেও গরুড়ব্যূহকে প্রতিহত করার জন্য পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের পরামর্শে অর্ধচন্দ্রব্যূহ নির্মিত হল। ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য উভয়ের তৈরি গরুড়ব্যূহ প্রতিরোধ করার জন্যই পাণ্ডবরা দুইবারই অর্ধচন্দ্রব্যূহ রচনা করেন।

[মহা (k) ৭.২০.৪-১৮; (হরি) ৭.১৮.৪-১৮]

□ ব্যূহের ভিতর সৈন্যস্তরভাগের সংখ্যা বিচারে ভীষ্ম-নির্মিত গরুড়ব্যূহের তুলনায় দ্রোণাচার্যের দ্বারা পরিকল্পিত ব্যূহটি জটিল। দুই যুদ্ধ বিশারদ-নির্মিত গরুড়ব্যূহদ্বয়ের মধ্যে অন্যান্য কিছু কৌশলগত পার্থক্যও চোখে পড়ে। যেমন—ভীষ্মের ক্ষেত্রে দুর্যোধনকে ব্যূহের পৃষ্ঠদেশে অর্থাৎ পিছনের দিকে সুতরাং কিছুটা সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে দ্রোণাচার্য ব্যূহ নিমার্ণের সময় দুর্যোধনকে রেখেছিলেন ব্যূহের মস্তকভাগে অর্থাৎ অগ্রে। পণ্ডিতদের মতে, ভীষ্মের সমান

সুরক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্যোধনকে দেওয়া দ্রোণাচার্যের পক্ষে সম্ভব ছিল না কারণ ততোদিনে বহুসংখ্যক কুরুরথীর মৃত্যু হয়েছে। আবার দ্রোণাচার্য ভগদত্তকে ব্যূহের কেন্দ্রে স্থাপন করে দুর্যোধনের অবস্থান সম্পর্কে প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টাও করে থাকতে পারেন।

মনুসংহিতায় স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, অগ্র এবং পশ্চাৎ উভয় দিক থেকেই আক্রমণের আশঙ্কা থাকলে গরুড়ব্যূহ নির্মাণ করতে হবে। তবে মহাভারতের বর্ণনার আলোকে বিচার করলে মনে হয়—গরুড়ব্যূহটি একাধারে রক্ষণাত্মক ও আক্রমণাত্মক শৈলীতে বিন্যস্ত ছিল। এর অগ্রভাগের অপেক্ষাকৃত সূঁচোলো অংশটি (যাকে মহাভারতের কবি গরুড়পক্ষীর মুখ বলেছেন) তীব্র আক্রমণের জন্য প্রস্তুত আবার মধ্যভাগটি পক্ষ বা ডানার মত বিস্তৃত হওয়ায় ঘন সৈন্য সমাবেশের কারণে পৃষ্ঠদেশে অবস্থানকারী যোদ্ধারা যথেষ্ট সুরক্ষিত থাকেন বলে মনে হয়। তবে শুধু অগ্রবর্তী চঞ্চু দিয়েই নয়, প্রয়োজনে পক্ষ বা ডানা জাতীয় অংশ থেকেও গরুড়ব্যূহের যোদ্ধারা সহজেই আক্রমণ করতে পারতেন বলে মনে হয়।

[অগ্নি পু. ২৩৬.২৯; মনু সংহিতা ৭.১৮৭; Kurukshetra War (Sensharma) p. 104-105]

□ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যুদ্ধনীতি ও রীতি সংক্রান্ত আলোচনায় বিশদে সৈন্যব্যূহ সম্পর্কে নানা তথ্য দেওয়া হয়েছে। এই আলোচনায় সরাসরি গরুড়ব্যূহ-নামের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে পক্ষ বা ডানা বিশিষ্ট সৈন্যব্যূহের কথা সেখানে বলা হয়েছে যা একাধারে গরুড় ও ক্রৌঞ্চব্যূহ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ বিষয়ে বিশদ তথ্য ব্যূহের আলোচনায় দেওয়া হয়েছে।

[দ্র. ব্যূহ]

[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (Kangle) ১০.৬.১-৫১; পঠিতব্য : P.C. Chakravarti, The Art of War in Ancient India, Dacca, The University of Dacca, p. 110-118]

গরুত্মহৃদয়া অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব যে সকল মাতৃকাদের সৃষ্টি করেন অন্ধকাসুর পরাজিত হওয়ার পরও তাঁরা নিবৃত্ত হলেন না। ভীষণ মূর্তি ধারণ করে তাঁরা ত্রিলোক গ্রাস করতে উদ্যত হলেন। এই মাতৃকাদের সংহারের জন্য মহাদেব নৃসিংহদেবের শরণ নেন। রুদ্র সৃষ্টি এই মাতৃকাদের সংহারের জন্য নৃসিংহ যে সকল মাতৃকার সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে গরুত্মহৃদয়া একজন। *[মৎস্য পু. ১৭৯.৭১]*

গর্গ১ একজন বিশিষ্ট ঋষি। ঋগ্‌বেদের ষষ্ঠমণ্ডলে একটি মাত্র সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হিসেবে গর্গের নাম উল্লিখিত হতে দেখা যায়। সেখানে তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁকে ভরদ্বাজ পুত্র বা ভারদ্বাজ গর্গ বলা হয়েছে। এছাড়া বেদের মন্ত্রে গর্গের নাম বিশেষ উল্লিখিত হতে দেখা যায় না। গর্গ ঋষির নাম সর্বাধিক উল্লিখিত হয়েছে সূত্র সাহিত্যের কালে। শাঙ্খায়ন শ্রৌত সূত্র এবং কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্রে মহর্ষি গর্গের নাম উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

[ঋগ্‌বেদ ৬.৪৭ সূক্ত; শাঙ্খায়ন শ্রৌত সূত্র (Hillebrandt, vol. 3) ১৬.২২.২; কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্র (Weber, vol. 2) ২৩.২.৮]

□ মহর্ষি গর্গ-সম্পর্কে বিশদ তথ্য মেলে মহাভারতে এবং পুরাণগুলিতে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এবং মৎস্য পুরাণে তাঁকে অঙ্গিরার বংশজাত গোত্রপ্রবর্তক এবং বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষণীয়, ভরদ্বাজ ঋষি কিন্তু অঙ্গিরার বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। সেক্ষেত্রে অঙ্গিরার বংশজাত হিসেবে গর্গের উল্লেখ তাঁর ঋগ্‌বেদে প্রদত্ত 'ভারদ্বাজ' পরিচয়ের সঙ্গে মিলে যায়। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১০৭; মৎস্য পু. ১৪৫.১০১; ১৯৬.২৪]*

□ মহাভারতের শল্য পর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, পুরাকালে মহর্ষি গর্গ সরস্বতী নদীর তীরবর্তী এক স্থানে কঠোর তপস্যা করে কাল নিরূপণ, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর নামানুসারেই সরস্বতী নদীর তীরবর্তী এই স্থানটি 'গর্গস্রোত' তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হয়।

[মহা (k) ৯.৩৭.১৬-১৯; (হরি) ৯.৩৫.১৬-১৯]

□ নিজের এই তপস্যা প্রসঙ্গে মহাভারতের অনুশাসনপর্বে গর্গ নিজেই বিশদ আলোচনা করেছেন। শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে ঘিরে উপবিষ্ট মুনি ঋষিদের মধ্যে গর্গও ছিলেন। ভগবান শিবের মাহাত্ম্য খ্যাপন করে তিনি বলেছেন—সরস্বতী নদীর তীরে সেই তপস্যার ফলে ভগবান শিব প্রসন্ন হয়ে তাঁকে ৬৪ কলা বিষয়ে জ্ঞান দান

করেন। এছাড়াও তাঁকে বংশরক্ষক একটি পরমজ্ঞানী পুত্রলাভের বর দেন।

[মহা (k) ১২.৫৯.১১১; ১৩.১৮.৩৮-৩৯; (হরি) ১২.৫৮.১১১; ১৩.১৭.৩৮-৩৯]

□ মহর্ষি গর্গের এই ৬৪ কলা বিষয়ে জ্ঞানলাভের কথাটি মৎস্য পুরাণে প্রাপ্ত একটি তথ্য থেকেও সমর্থিত হয়। মৎস্য পুরাণে মহর্ষি গর্গকে বাস্তুশাস্ত্র তথা স্থাপত্যবিদ্যার অন্যতম প্রণেতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষণীয়, আমরা ৬৪ কলার মধ্যে যে যে বিষয়ের উল্লেখ করি, বাস্তুশাস্ত্রও তার মধ্যে একটি। সুতরাং মহর্ষি গর্গ জ্যোতিষ, বাস্তুশাস্ত্র প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বলে জানা যাচ্ছে।

[মৎস্য পু. ২৫২.৩]

□ ভাগবত পুরাণে মহর্ষি গর্গ একটি অত্যন্ত চর্চিত নাম। কারণ তিনি যদুবংশের কুলপুরোহিত। কৃষ্ণের বাল্যকালে একাধিক ঘটনায় তাঁকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। বসুদেব কৃষ্ণের জন্মের পর তাঁকে নন্দগোপের গৃহে রেখে আসতে বাধ্য হলেও পুত্র সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ছিল যথেষ্টই। কংসের কারাগার থেকে মুক্তি পাবার পর তিনিই মহর্ষি গর্গকে অনুরোধ করেন, যেন তিনি নন্দগোপের গৃহে গিয়ে কৃষ্ণ ও বলরামের নামকরণ সংস্কার সম্পন্ন করেন। বসুদেবের অনুরোধে নন্দের ভবনে উপস্থিত হয়ে মহর্ষি গর্গ শিশু কৃষ্ণ ও বলরামের নামকরণ সংস্কার সম্পন্ন করেন। ভাগবত পুরাণ জানিয়েছে, সেই সময়েই তিনি নন্দকে আড়ালে ডেকে কৃষ্ণের প্রকৃত জন্মরহস্য তাঁকে জানিয়েছিলেন, কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বিষয়েও তিনি প্রথম থেকেই অবগত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে মথুরায় কৃষ্ণ-বলরামের উপনয়ন সংস্কারও তাঁর দ্বারাই সম্পন্ন হয়। কালযবনের মৃত্যুর কারণস্বরূপ প্রাচীন রাজা মুচুকুন্দকেও মহর্ষি গর্গই কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে অবগত করেছিলেন বলে জানা যায়। এছাড়াও মহাভারতে উল্লেখ না থাকলেও ভাগবত পুরাণ জানিয়েছে যে, ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে মহর্ষি গর্গও উপস্থিত ছিলেন। *[দ্র. কৃষ্ণ১]*

[ভাগবত পু. ১০.৮.১-২০; ১০.২৬.১৫-২৩; ১০.৪৫.২৩, ২৬-২৯; ১০.৫১.৪৫; ১০.৭৪.৮; বিষ্ণু পু. ৫.৬.৮-৯]

□ মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, একসময় মহর্ষি গর্গ গন্ধর্ব বিশ্বাবসুকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

[মহা (k) ১২.৩১৮.৬০; (হরি) ১২.৩০৮.৬০]

□ ঋগ্‌বেদে যে 'ভারদ্বাজ' গর্গের উল্লেখ আছে, পুরাণে প্রাপ্ত পুরুবংশীয় রাজাদের বংশলতিকায় সেই গর্গের যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা দেখা যায়। অন্তত মৎস্য পুরাণ এবং বিষ্ণু পুরাণ এ বিষয়ে একই রকম তথ্য দিয়েছে। এই দুই পুরাণ মতে, রাজর্ষি ভরত যে ভারদ্বাজ ভুমন্যু বা ভুবমন্যু (বিষ্ণু পুরাণের পাঠে মন্যু) কে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, সেই ভুমন্যুর পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গর্গ। গর্গের পুত্রের নাম শিনি। তবে ঋগ্‌বেদে প্রাপ্ত ভারদ্বাজ গর্গ আর ভারদ্বাজ ভুমন্যুর পুত্র গর্গ একই ব্যক্তি কী না—এ বিষয়ে ভাবনার অবকাশ থাকছে। তবে পুরাণের তথ্য সত্য হলে গর্গকে ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলে ধরে নিতে হবে। *[মৎস্য পু. ৪৯.৩৬; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.৯]*

□ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে হৈহয়দের কুলগুরু হিসেবে জনৈক গর্গের নাম পাওয়া যায়। তবে ইনি গর্গ না গর্গবংশীয় অন্য কোনো ব্রাহ্মণ, তা জানা যায় না।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.২৮.৩৯]

গর্গ২ বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে, কাশীরাজ দিবোদাসের বংশধারায় প্রতর্দনের পুত্র ছিলেন গর্গ।

[বায়ু পু. ৯২.৬৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৭.৬৯]

গর্গ৩ মৎস্য পুরাণে কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণের সাত পুত্রের কাহিনী পাওয়া যায়। এঁরা গোহত্যার পাপে একের পর এক সাত বার হীনকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কৌশিকের সাতপুত্রের মধ্যে গর্গ একজন। *[মৎস্য পু. ২০.৩]*

গর্গ৪ গয়াক্ষেত্রে গয়াসুরের দেহের ওপর ব্রহ্মা এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞের পুরোহিত হবার জন্য ব্রহ্মা নিজের মন থেকে অসংখ্য ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করেন। গর্গ ব্রহ্মার মন থেকে সৃষ্ট পুরোহিতদের মধ্যে একজন।

[বায়ু পু. ১০৬.৩৫]

গর্গস্রোতা সরস্বতী নদীর তীরবর্তী একটি পবিত্র তীর্থ। মহর্ষি গর্গ এই তীর্থে কঠিন সাধনা করে কাল নিরূপণ প্রণালী, কালের অবস্থা নির্ণয় এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিভিন্ন অবস্থান সম্পর্কে বিশেষ বিদ্যা আবিষ্কার করেন। বহু ঋষি জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষার জন্য গর্গ মুনির সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে এই

তীর্থস্থল দর্শন করেন। মহর্ষি গর্গের নামানুসারেই এই তীর্থটি গর্গস্রোতা নামে বিখ্যাত হয়েছে।

বলরাম তীর্থযাত্রাকালে গর্গস্রোতা তীর্থ দর্শন করেছিলেন। গর্গস্রোতা তীর্থ থেকে বলরাম মহাশঙ্খ তীর্থে গিয়েছিলেন।

[মহা (k) ৯.৩৭.১৪-১৮; (হরি) ৯.৩৫.১৪-১৮]

গর্গেশ্বরতীর্থ নর্মদা নদীর তীরবর্তী একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করা মাত্রই স্বর্গলাভ হয়। তারপর তীর্থ দর্শনকারী স্বর্গে চতুর্দশ ইন্দ্রের পদ লাভ করে বাস করেন।

নাগেশ্বর নামে তীর্থটি গর্গেশ্বর তীর্থের নিকটে অবস্থিত। *[মৎস্য পু. ১৯১.৮১-৮২]*

গর্জনতীর্থ নর্মদা নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত একটি তীর্থ। গর্জনতীর্থ থেকে উত্থিত মেঘসমূহের প্রভাবে রাবণপুত্র মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ নামে পরিচিত হন—

গর্জনঞ্চ ততো গচ্ছেদ্‌যত্র মেঘচয়োত্থিতঃ।
ইন্দ্রজিন্নাম সম্প্রাপ্তস্তস্য তীর্থ প্রভাবতঃ॥

[মৎস্য পু. ১৯০.৩]

গর্ত্ত বশিষ্ঠবংশীয় সপ্তর্ষিদের একজন। *[দ্র. গোত্র১]*

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১১.৪১]

গর্দভ কশ্যপের ঔরসে তাম্রার গর্ভে যে ছয়টি কন্যার জন্ম হয় তাদের মধ্যে সুগ্রীবী একজন। এই সুগ্রীবী অশ্ব, ও উটেদের সাথে গর্দভদেরও জন্ম দেন।

[বিষ্ণু পু. ১.২১.১৭]

গর্দভাক্ষ বিরোচন পুত্র বলির শত পুত্রের মধ্যে একজন হলেন গর্দভাক্ষ। *[বায়ু পু. ৬৭.৮৩]*

গর্দভী১ অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। গর্দভী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৭৯.১৮]*

গর্দভী২ কলিযুগে যেসব রাজবংশগুলি পৃথিবী শাসন করেছিলেন তাদের মধ্যে গর্দভীবংশ একটি। আভীরদের পরে দশজন মতান্তরে সাতজন গর্দভীবংশীয় রাজার শাসনকাল আরম্ভ হয়েছিল। গর্দভীবংশীয় রাজারা ৭২ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

মৎস্য পুরাণে গর্দভীর পরিবর্তে গর্দভীল পাঠ পাওয়া যায়। *[ভাগবত পু. ১২.১.২৯;*

বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপূরম্) ৪.২৪.৫১;

ব্রহ্মাণ্ড পু. ২.৭৪.১৭২, ১৭৪;

মৎস্য পু. ২৭৩.১৮-২০; বায়ু পু. ৯৯.৩৫৭]

গর্দভীমুখ কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি হলেন গর্দভীমুখ। *[মৎস্য পু. ১৯৯.১৬]*

গর্বি ভবিষ্যৎ সাবর্ণি মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন তাদের মধ্যে সুধর্মা একটি গণ। সুধর্মা গণের অন্তর্গত একজন দেবতা হলেন গর্বি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৬০]

গর্ভ যযাতির পুত্র তুর্বসু এবং তুর্বসুর পুত্র গর্ভ।

[মৎস্য পু. ৪৮.১]

গর্ভভূমি *[দ্র. গার্গ্যভূমি]*

গর্ভশিরা প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভজাত দানব পুত্রদের মধ্যে একজন দানব।

[মৎস্য পু. ৬.১৮]

গর্ভাধান প্রাচীন ভারতীয় আর্য-সমাজে প্রচলিত আচার-সংস্কারের মধ্যে অন্যতম। 'গর্ভাধান' শব্দটা শুনলেই তার অর্থটা স্পষ্ট বোঝা যায়। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় এক বিবাহিতা রমণীর গর্ভে পুরুষের সন্তানবীজ নিষিক্ত হয়, তাকেই গর্ভাধান বলে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে স্ত্রী-পুরুষের সাধারণ বৈবাহিক জীবনে সন্তানকামনা তো অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। এই স্বভাব সন্নিকর্ষের মধ্যে আবার অনুষ্ঠান কিসের?

আমাদের বর্তমান সময়ে এই ধরনের সংস্কার বা প্রথার আর কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের এখনকার জীবনযাত্রার নিরিখে মনে হতেই পারে যে, প্রয়োজন নেই, নিতান্ত অদরকারি বলেই এ প্রথা এখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তবে বোঝা দরকার, প্রাক্‌বৈদিক যুগে সিন্ধুসভ্যতার সময় থেকে, বৈদিক যুগে আমাদের সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ ব্যাপারটা যখন সামাজিক প্রথা হিসেবে স্বীকৃত হয়ে গেছে, গর্ভাধান অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই তার পরের যুগের ঘটনা। সমাজ যখন শিথিল ছিল, নারী-পুরুষের দৈহিক সম্বন্ধ যখন কোনো সামাজিক প্রথার আবর্তে বাঁধা পড়েনি, তখন সবকিছুই মানুষের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করত। কিন্তু গর্ভাধান অনুষ্ঠানের মধ্যে নারী-পুরুষের দৈহিক মিলনের তাৎপর্য্য যতখানি, তার থেকে অনেক বেশি হল সন্তানলাভের বাসনা এবং সন্তান ধারণের তাৎপর্য্য। শুধু সন্তান কথাটাও বলা উচিত হবে না, বলা উচিত পুত্রসন্তান। আর্যরা এদেশে বহিরাগতই হোন অথবা এখানকার লোক, এঁরা বড়ো সমরপ্রিয় জাতি ছিলেন। মানুষের পূর্বাভ্যস্ত পুর-নগর বিদারণ করার

সুবাদে পুরন্দর ইন্দ্র যাঁদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা, সে জাতির রক্তে ছিল যুদ্ধ। আর যুদ্ধ করতে পুরুষ লাগে, প্রচুর পুরুষ। যাযাবর আর্য জাতি যখন ভারতবর্ষে স্থায়ী হয়ে বসে গেছেন, তখনও এই পুরুষের চাহিদা কমেনি। ফলে ঋগ্‌বেদের বহুতর মন্ত্রে মানুষের পুত্রকামনা ব্যাপ্ত হয়ে আছে। একটি গৃহে আবাস, খাদ্য, পুত্র আর বিনিময়ের জন্য পশু—এগুলি থাকলেই বৈদিক কালের মানুষ আত্মতৃপ্ত বোধ করত। নইলে বাড়ি হলে বেশ ভালো, পাল্য পশু পেলে বেশ ভালো, আর পুত্র লাভ হলে বেশ ভালো—

গৃহা ভদ্রং, প্রজা ভদ্রম্ পশবো ভদ্রং।

[ঋগ্‌বেদ ১.১.৬; সায়ণাচার্য কৃত টীকা দ্রষ্টব্য]

—এমন কামনার কথা মন্ত্রবর্ণের মধ্যে প্রবেশ করত না। বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে দার্শনিকতা অনেক আছে, কিন্তু এক সজীব সমাজের বাস্তবতাও এখানে কম নয়। ত্যাগ-বৈরাগ্য-ইন্দ্রিয় দমনের উচ্চ মানসিকতা বৈদিক যুগের পরিণতি হতে পারে, কিন্তু খোদ বেদের মন্ত্রে শতেক দেবতার কাছে আপন স্বার্থসিদ্ধির প্রার্থনা বহুবার শোনা গেছে এবং সেই প্রার্থনার এক অঙ্গ যদি হয় ধন-সম্পত্তি-গৃহ তাহলে অন্য অঙ্গটি হল পুত্রসন্তান—

প্রজাং চ ধত্তং দ্রবিণং চ ধত্তম্।

[ঋগ্‌বেদ ৮.৩৫.১২]

শুধু পুত্র নয়, পুত্রধারা। এমন একটা বাড়ি বৈদিকদের পছন্দ, যেখানে পুত্রেরাও পুনরায় পুত্রের পিতা হয়—

পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি।

[ঋগ্‌বেদ ১.৮৯.৯]

এটা স্বচ্ছন্দে ভাবা যায়—বেদের মধ্যে পুত্রকামনার বৃত্তান্ত যতই থাক, আমরা যাকে গর্ভাধান বলছি, বৈদিক যুগে সেটা কোনো অনুষ্ঠানের রূপ পায়নি, সংস্কার হিসেবেও তা চিহ্নিত হয়নি। সংস্কার হিসেবে এটা এসেছে গৃহ্যসূত্রগুলির সময়ে যা অন্তত বৈদিক যুগের পাঁচশো বছর পর।

তবে হ্যাঁ, গৃহ্যসূত্রের মধ্যে এমন কিছুই বিধি-নিয়ম-সংস্কার আকারে আবদ্ধ হতে পারে না, বেদের মধ্যে যার ইঙ্গিত নেই। বিবাহ ব্যাপারটা যেহেতু বৈদিক যুগে একটি সুপরিকল্পিত রূপ ধারণ করেছিল, তাই বিবাহোত্তর জীবনে যৌনসুখ লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর গর্ভে অনুরূপ পুত্র লাভ করার বাসনাও বেদে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। পুরুষের কথা তো ছেড়েই দিলাম, এমনকী মেয়েরাও যৌনসুখ লাভের জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করছে, সে উদাহরণ ঋগ্‌বেদেই রয়েছে। কক্ষীবান ঋষির কন্যা ঘোষা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ছিলেন, দেববৈদ্য অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের কল্যাণে তাঁর রোগ সেরে যায় এবং তাঁর বিয়েও ঠিক হয়। দীর্ঘ রোগভোগের পর ঘোষার যে সম্ভোগ সামর্থ্য ফিরে এসেছে এবং সেই কারণেই তিনি যে এখন পুত্রের জন্ম দিতে পারেন—সে বিষয়ে ঘোষা তাঁর সচেতনতা ঘোষণা করছেন—জনিষ্ট ঘোষা পতয়ৎকনীনকো . . . অস্মা অহ্নে ভবতি তৎপতিত্বনম্। স্বামী হিসেবে একটি পুরুষ কেন এক যুবতীর কাম্য হয়ে ওঠে, তার কারণ দেখিয়ে ঘোষা বলেছেন—স্বামী তাঁর স্ত্রীর প্রাণ রক্ষার জন্য রোদন করে, দীর্ঘকাল নিজের বাহু দিয়ে সে স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে, স্ত্রীকে সে যজ্ঞকার্যে নিযুক্ত করে, সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে পিতৃলোকের যজ্ঞে তাদের নিযুক্ত করে। ঘোষার ধারণা—রমণীরা এইরকম পতির আলিঙ্গনে সুখী হয়।

তাহলে দেখুন বৈদিক সমাজের একটি নারীও জানে যে, তার স্বামী সার্থকতার প্রধানতম জৈবিক অঙ্গ হল সম্ভোগসুখ এবং সন্তান উৎপাদন। পুরুষপ্রধান সমাজে এক রমণীর পক্ষে সম্ভোগসুখের তাৎপর্য্য বিবাহ-পূর্ব জীবনে অনুধাবন করা কঠিন ছিল বলে ঘোষার মতো রমণী অশ্বিনীদ্বয়ের কাছে প্রার্থনা করে বলেছেন—পুরুষ-রমণীর সম্ভোগসুখ কেমন, তা আমি জানি না। তোমরা সেই সুখের বিষয় ভালো করে বর্ণনা করো—

তস্য বিদ্ম তদু যু প্রবোচত।

ঘোষা যতটুকু জানেন, তাতে তাঁর এ ধারণাটা পরিষ্কার যে, সম্ভোগোত্তর কালে সন্তানধারণের জন্য একজন রেতঃসেক সমর্থ বলিষ্ঠ পুরুষ তাঁর প্রয়োজন। সেই রকম স্বামীর ঘরেই তিনি যেতে চান—

প্রিয়োস্রিয়স্য বৃষভস্য রেতিনো
গৃহং গমেমাশ্বিনা তদুশ্মসি।

[ঋগ্‌বেদ ১০.৪০ সূক্ত]

অন্যদিকে বৈদিক সমাজের পুরুষকে দেখুন। সম্ভোগসুখের কথা সে ভালোই জানে। কিন্তু পুরুষের শক্তি স্ত্রীলোকের গর্ভে প্রবেশ করে কী

অদ্ভুত উপায়ে একটি সন্তান সৃষ্টি করে—এ বিষয়ে তার বিস্ময় আছে। মাঝে মাঝে গর্ভ নষ্ট হওয়ার ফলে সন্তানের জন্ম নিরস্ত হয় বলে, তার বড়ো ভয়ও আছে, আশঙ্কাও আছে। ঠিক এই কারণেই সম্ভোগের পূর্বকালে সে বিভিন্ন দেবতার সাহায্য কামনা করে। তার স্বকীয় সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ সফলভাবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একবার সে বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করে—বিষ্ণু এই নারীর স্ত্রী-অঙ্গকে গর্ভলাভের উপযুক্ত করে দিন। ত্বষ্টা এই গর্ভস্থ সন্তানের অবয়ব স্থির-নির্দিষ্ট করে দিন—

বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপানি পিংশতু।

প্রজাপতি শুক্রপাতন করুন এবং ধাতা তোমার গর্ভকে ধারণ করুন।

[বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬.৪.২১]

□ ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্রটিই ভবিষ্যতে আনুষ্ঠানিকভাবে গর্ভাধানের মন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে, অথচ এই ঋক্‌টি যখন প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল, তখন কিন্তু মন্ত্রদ্রষ্টার হৃদয়ে ঠিক সেই সমস্যাগুলিই ক্রিয়া করেছে, যেগুলি একজন সন্তান-লিপ্সু শঙ্কিত স্বামীর হৃদয় খণ্ডিত করত।

গর্ভাধানের স্মার্ত ক্রিয়াকর্ম আরও কিছু আছে এবং তার সঙ্গেও আছে আরও অনেক মন্ত্র। মন্ত্রগুলির মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় যেটা, সেটা হল—প্রাগ্ আর্য সভ্যতার স্মৃতি হৃদয়ে রেখে ফলবতী বৃক্ষদেবতার কাছে নিজের পুত্রলাভের বাধাস্বরূপ সমস্ত পাপমুক্তির কামনা করা। সেকালে মানুষ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল ছিল। প্রকৃতির রোষ, কোপ এবং অবদান—সব কিছুই মানুষ মনে রাখত বলে এই বৃক্ষলতার পরিবেশটিও তার কাছে আত্মীয়-পরিজনের মতো ছিল। প্রথম সন্তানের জনক এবং জননী হবার জন্য নবদম্পতি তাই প্রার্থনা করত—যে সব বৃক্ষের ফল নেই, এবং যারা ফলধারণের জন্য পুষ্পবতী হয়েছে, তারা সকলেই আমাদের সন্তানধারণের অন্তরায়ভূত পাপ থেকে মুক্ত করো—

যা ফলিনী যা অফলা অপুষ্পা যাস্ত পুষ্পুণীঃ।

[ঋগ্‌বেদ ১০.৯৭.১৫]

যেগুলি একটি সুস্থ সন্তান লাভের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ স্ত্রীলোকের গর্ভলাভ সংক্রান্ত শারীরিক সমস্যা এবং পুরুষের শারীরিক সমস্যা কিংবা গর্ভস্থ সন্তানের বিকলাঙ্গতার আশঙ্কা এবং দীর্ঘ দশ মাস সময়ের মধ্যে যাতে গর্ভপাত না ঘটে সেই ভাবনা। ঋগ্‌বেদের আরও যে দুটি মন্ত্র গর্ভাধানের অনুষ্ঠানে পঠিত হয়, তার মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হল—দুটি স্ত্রীদেবতার উদ্দেশে গর্ভরক্ষার প্রার্থনা এবং অশ্বিনীদ্বয়ের উদ্দেশে গর্ভরক্ষার প্রার্থনা। মনে রাখা দরকার, গর্ভধারণকালে অভিজ্ঞা স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধান এবং উপযুক্ত বৈদ্যের পরামর্শ দুইই দরকার হয়। সিনীবালী এবং সরস্বতী নামে দুই স্ত্রী দেবতা অভিজ্ঞা তত্ত্বাবধানকারিণী নারীর প্রতীক এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেববৈদ্য বলেই স্বীকৃত। পূর্বোক্তা ঘোষাও যেহেতু তিনি পূর্বে রোগিণী ছিলেন—তিনিও দাম্পত্যজীবনের সুখ এবং মঙ্গলের জন্য অশ্বিনীদ্বয়ের কাছেই প্রার্থনা করেছিলেন।

কিন্তু আমরা বলতে চাই—ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্রগুলির মধ্যে সন্তানলাভের ব্যাপারে দেবতার সাহায্য প্রার্থনা করে বৈদিক পুরুষ সন্তানের জন্ম বিষয়ে শুধুই নিশ্চিন্ত থাকতে চেয়েছে এবং ওই মন্ত্রগুলির সামাজিক তাৎপর্য্যও এইখানেই। এইখানে অনুষ্ঠানের বালাই ছিল না বলেই সন্তানলাভের মধ্যে যে আশঙ্কা, ভয় এবং পরিণামী বিস্ময় আছে, তা গর্ভস্থ সন্তানের উদ্দেশেও দেবোচিত প্রার্থনায় সূচিত, নর-নারীর যৌন মিলনেও তাই এখানে দুটি যজ্ঞকাঠ (অরণি) ঘর্ষণের রূপকে আবৃত। দুটি অরণিকাষ্ঠ ঘর্ষণ করে যজ্ঞাগ্নি উৎপাদন করতেন বৈদিকেরা। বৈদিক পুরুষ তাঁর পত্নীর উদ্দেশে বলেছেন—হে পত্নী! অশ্বিনীদ্বয় তোমার গর্ভস্থ যে সন্তানের জন্য সুবর্ণনির্মিত দুই অরণি পরস্পর ঘর্ষণ করেছেন, দশম মাসে প্রসব হবার জন্য তোমার সেই গর্ভস্থ সন্তানকে আমরা আহ্বান করছি—

তং তে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতবে।

[বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬.৪.২২]

গর্ভাধানের জন্য শারীরিক মিলনের যে প্রয়োজনটুকু আছে, হাজারো দৈবতত্ত্বে বিশ্বাসী বৈদিকেরা সেটা কখনোই বিস্মৃত হন নি বা সেটা দেবতার দয়ার ওপরেও ছেড়ে রাখেননি। ঋগ্‌বেদের সময় থেকে অথর্ববেদের কালে এসেই গর্ভাধানের ক্ষেত্রে শারীরিক মিলনের তাৎপর্য্য উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রূপকের মাধ্যমে অথর্ববেদ বলেছে—শমীলতার ওপরে

আরূঢ় হয়েছে অশ্বত্থ বৃক্ষ। ওইস্থানেই পুত্রলাভের স্পষ্টতা আসে। স্ত্রীগর্ভে আমরা সেই পুত্র বহন করে আনি—

তদ্ বৈ পুত্রস্য বেদনং তৎ স্ত্রীষু আভরামসি।

[অথর্ববেদ ৬.২৩.৭]

অথর্ববেদে আরও কিছু মন্ত্র আছে এবং তা এখানে অনুচ্চারিত থাক—কিন্তু সেই মন্ত্র পরম্পরা বিচার করলে দেখা যাবে গর্ভাধানের আনুষ্ঠানিকতা এখান থেকেই আরম্ভ হয়ে গেছে এবং সেই আনুষ্ঠানিকতা একেবারে পরিণত স্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে দ্বৈত এবং অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞানের আধার বৃহদারণ্যক উপনিষদে।

এটা সত্যিই ভাবা যায় না। বৃহদারণ্যকের মতো গুরুগম্ভীর উপনিষদ, যার এক-একটি বাক্য বেদান্তদর্শনের এক-এটি দিক খুলে দেয়, সেই উপনিষদের শেষে কিনা গর্ভাধানের আলোচনা? প্রাজ্ঞংমন্যরা বলে ফেলেন— প্রক্ষেপ। আমরা বলি—শেষেরও শেষ দেখুন। সদ্যোজাত শিশুটিকে জননীর কোলে বসিয়ে দিয়ে পিতা স্ত্রীর উদ্দেশে বলেন তোমাকে স্তুতি করাই উচিত। তুমি সেই পূর্বকল্পের মৈত্রাবরুণী। তুমি এই বীর পুত্র প্রসব করে আমাদের বীরবান করেছ, তাই তুমিও বীরবতী হও—

ইলাসি মৈত্রাবরুণী বীরে বীরমজীজনৎ,
সা ত্বং বীরবতী ভব।

[বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬.৪.২৮]

বীরবংশ এবং ঋষিবংশের পরম্পরা রক্ষা করার কথা মনে রেখেই বৃহদারণ্যক উপনিষদ বেদের পূর্বোক্ত মন্ত্রগুলিকে আনুষ্ঠানিকতার আবর্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছে এবং সেই আনুষ্ঠানিকতাই পরবর্তী স্মৃতিগ্রন্থগুলির মধ্যে আচার এবং প্রথাগত সংস্কারে পরিণত হয়েছে।

পুত্রলাভের ইচ্ছায় গর্ভাধান যখন সংস্কারে পরিণত হয়েছে, তখন কোনো নির্দিষ্ট গ্রন্থ বা প্রাচীন গ্রন্থমতে তার বিধান তৈরি হয়নি। তখন তার মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্র এসেছে। অন্য জায়গায় অন্য প্রসঙ্গে বলা মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের বিধান এসেছে, এমনকী দৈনন্দিন নিত্যপূজাপদ্ধতিও তার মধ্যে খানিকটা এসে গেছে। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর মধ্যেও আছে সেই বাস্তব দৃষ্টি, যার ওপরে ভিত্তি করে এত আচার, বিচার, সংস্কার। অর্থাৎ স্মার্তরা এটা ভোলেন নি যে, ঋতুকাল থেকে ষোলো দিনের মধ্যে গর্ভাধানের অনুষ্ঠানটি করতে হবে। সন্তানটি যাতে পুত্র হয় তার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা পুংনক্ষত্রের যোগ ঘটলে সাধারণ গণেশপুজো, মাতৃকাপূজা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ইত্যাদি সেরে মূল গর্ভাধানের অনুষ্ঠানে বসতে হত। এখানে একটি চরুপাকের ব্যাপার আছে এবং তার মন্ত্রতন্ত্র নেওয়া হয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে। চরু আহুতি দিয়ে অবশিষ্ট চরু নিজে খেয়ে স্ত্রীকে খাইয়ে হোমে বসতে হবে। ওই হোমের সময় বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে আগুনে আহুতি পড়বে এবং তখনকার মন্ত্রগুলি কিন্তু সেই ঋগ্‌বেগের মন্ত্র, যা আমরা আগে বলেছি—বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু—থেকে সেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশে বলা মন্ত্র পর্যন্ত।

গর্ভাধানের মন্ত্রগুলির মধ্যে দেবতা হিসেবে কখনো বিষ্ণু, কখনো অশ্বিদ্বয়, কখনো অগ্নি কখনো বা সূর্যও আছেন। আরও আছেন অন্যান্য দেবতারাও। কিন্তু দিনের বেলায় ব্রত-পূজা-হোমের শেষ পর্বে সূর্যকে অর্ঘ্য দেবার সময় সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ডটাকে 'নবপুষ্পোৎসব' বলে বর্ণনা করার মধ্যে বিশ্ব-পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার চেষ্টা যেমন আছে, তেমনই আছে এক জাগ্রত বিশ্বাস, যাতে বোঝা যায় ফলবান বৃক্ষ দেবতার মতো পুষ্পবতী রমণীও সন্তানরূপ ফলের সঙ্গে যুক্ত হবে—

বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্তা চ বিশ্বেশো বিশ্বদক্ষিণঃ।
নবপুষ্পোৎসবে হ্যেতৎ গৃহানার্ঘ্যং দিবাকরঃ।

[পুরোহিত দর্পণ, পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সঙ্কলিত, ১৭তম সংস্করণ, পৃ. ৪৩৯]

হোমের শেষে সূর্যপ্রণাম শেষ হবার পর যজ্ঞের অবশেষ হিসেবে পত্নী যা পাবেন, তা হল একটি ফল। পত্নী হস্তপ্রসারণ করে সেটি গ্রহণ করেন সন্তানলাভের পূর্বপ্রতীক হিসেবে।

একথা অনস্বীকার্য যে, বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে রামায়ণ-মহাভারতের যুগ পর্যন্তও আমাদের দেশে অতি অল্প বয়সে বিবাহ হত না। আবার অতি অধিক বয়সেও হত না। কাজেই পূর্ণযৌবনা রমণীর সন্তান ধারণের সুস্থতা অনেক বেশি থাকত বলেই সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গর্ভাধানের ব্রত-নিয়ম পালন করেই রাত্রিকালে সহবাসের মন্ত্র পড়তেন স্বামীরা।

শাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র গর্ভাধান-সংস্কারের অন্তরে

চতুর্থী কর্ম বলে একটি স্মার্তক্রিয়ার উল্লেখ করেছে। সেটা আসলে বিবাহের তিন দিন পর স্বামী-স্ত্রীর মিলন সংক্রান্ত কর্ম। গর্ভাধানের হোম-যজ্ঞের পর চতুর্থী কর্ম অন্য কোনো স্মার্ত কর্ম সূচিত করে না। বরং বলা উচিত, দিবসের স্মার্তক্রিয়ার পর এ হল নিশীথরাতের শারীরিক অবসর। রজোদর্শনের ঘটনাটা এখানে স্বতঃসিদ্ধ। পরবর্তী সময়ে স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স কম হয়ে যাওয়ায় চতুর্থী কর্মের আচারও উঠে যায়। থেকে যায় শুধুই গর্ভাধান। অন্যেরা চতুর্থী কর্ম শব্দটা বাদ দিয়ে বলেছেন নিষেক কর্ম। এতে যেসব মন্ত্র উচ্চারণ করে রমণীর যেসব অঙ্গ স্পর্শ করার বিধি আছে, তাতে উচ্চতর গভীর ভাবনা তো কিছু নেইই, বরঞ্চ মন্ত্রবর্ণের শব্দ যে-সব অর্থ প্রকাশ করে, তাতে স্ত্রী-পুরুষের মিলন আরও গাঢ়তর হয়। কিন্তু এর মধ্যেও যেটা খুব লক্ষ্য করার মতো, তা হল মন্ত্রোচ্চারণ বা যৌনমিলনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু বৈদ্যশাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপও আছে। দূর্বা বা অশ্বগন্ধার পিষ্টরস স্ত্রীর নাকে নস্যি দেবার মতো করে দিয়ে নিয়ে তার পর মন্ত্র-তন্ত্র এবং সহবাস বিধি।

গর্ভাধানের শেষ গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকটি হল—যেমন এই পৃথিবীর গর্ভে অগ্নি আছে, যেমন আকাশের গর্ভে আছেন ইন্দ্র, দিক্‌সমুহের গর্ভে যেমন আছে বায়ু সেই রকম আমি তোমার গর্ভাধান করলাম। স্মৃতিশাস্ত্রকারদের কেউ কেউ বলেন প্রথম সন্তানলাভের আগে একবারই মাত্র এই গর্ভাধানের ক্রিয়াকাণ্ড আচরণীয়। অন্যেরা বলেছেন—না, প্রত্যেক সন্তানলাভের পূর্বেই গর্ভাধানের স্মার্ত ক্রিয়া বিধেয়। বলিহারি এই স্মার্তদের। এরা বুঝলেন না—নারী-পুরুষের সহবাসের অভিসন্ধিই যেখানে প্রধান, সেখানে এত ক্রিয়াকাণ্ড, হোমযজ্ঞ, মন্ত্রোচ্চারণের জটিলতা থাকলে সে সংস্কার বেশিদিন টিকে থাকে না। টিকে থাকেওনি। অবশ্য এই সংস্কার উঠে যাবার পিছনে স্মার্তক্রিয়ার জটিলতার চাইতে সামাজিক কারণই বেশি। পঞ্চনদীর জলধোয়া অঞ্চল পিছনে রেখে যে জাতি সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়বার চেষ্টা করছিল, সে জাতির প্রত্যেকটি পুরুষ নিজেদের বহুলভাবে প্রসারিত করার জন্যই এক এক জনে দেবতার কাছে দশটি করে পুত্র চেয়েছে। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন এই প্রসারণ কর্ম অনেকটাই পূর্ণ হয়ে ওঠে, সরস্বতী-দৃষদ্বতীর অন্তর দেশ ছাড়িয়ে উত্তরে, দক্ষিণের এবং পূর্বেও যখন আর্যদের সত্তা প্রতিষ্ঠিত হল, তখন আর দশ-দশটা পুত্র সন্তানের জন্য আর্য পিতাকে কেঁদে মরতে হয়নি। গর্ভধান-কর্মের স্মার্ত সংস্কারও তাই সমাজ থেকে লুপ্ত হল। যা পড়ে রইল, তা একেবারেই আদিম সংস্কার, অনাদি অনন্ত সহবাসবিধি।

গাগ্র পুরুবংশীয় রাজা ভরতের পুত্র ভুমন্যুর চারজন পুত্রের মধ্যে গাগ্র একজন। গাগ্রের পুত্ররা গাগ্র্য নামে পরিচিত। *[বায়ু পু. ৯৯.১৫৯,১৬১]*

গাঙ্গ প্রজাপতি বিক্রান্তের ঔরসজাত একজন বিশিষ্ট গন্ধর্ব। *[বায়ু পু. ৬৯.২৬]*

গাঙ্গোদধি পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে সব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি গাঙ্গোদধির বংশ তার মধ্যে একটি। গাঙ্গোদধি অঙ্গিরার বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৬.১৭]*

গাত্রবান্‌ কৃষ্ণের ঔরসে মাদ্রী-লক্ষ্মণার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে গাত্রবান্‌ একজন।

[ভাগবত পু. ১০.৬১.১৫; বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম) ৫.৩২.৪]

গাত্রমোচনতীর্থ *[দ্র. গাত্রোৎসর্গতীর্থ]*

গাত্রোৎসর্গতীর্থ প্রভাসক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থস্থান। কথিত আছে, প্রভাসক্ষেত্রে এই স্থানেই গৃহযুদ্ধে যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। বলরাম এবং কৃষ্ণও এইস্থানেই নশ্বর দেহ ত্যাগ করেছিলেন। এই কারণেই স্থানটি গাত্রোৎসর্গ বা গাত্রমোচন তীর্থ নামে খ্যাত। এই তীর্থে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করলে তাঁদের আত্মা মুক্তিলাভ করে। যে ব্যক্তি এই তীর্থে এসে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করেন, তাঁরও মহা পুণ্যফল লাভ হয় বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। এই তীর্থ পরবর্তীকালে প্রেততীর্থ নামেও প্রসিদ্ধ হয়।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র) ২২৩.১-১৪]

গাথা সংস্কৃত 'গৈ' ধাতু থেকে গাথা শব্দের উৎপত্তি। গাথা শব্দের অর্থ—যা গীত হয়। অতি প্রাচীন কাল থেকে যেসব কাহিনী শ্লোকাকারে গ্রন্থিত হয়ে লোকমুখে প্রচলিত এবং গীত হয়ে আসছে তারই পারিভাষিক নাম গাথা। এখানে কাহিনী বলতে মূলত ধর্মনিষ্ঠ বিখ্যাত রাজা-রাজর্ষিদের প্রশংসাসূচক শ্লোক বুঝতে হবে যা সুপ্রাচীন কাল

থেকে লোকমুখে প্রচলিত এবং গীত হয়ে আসছে। ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে আমরা যে মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী বা Oral tradition এর কথা বলি, গাথা তার অন্যতম অঙ্গ।

শব্দ হিসেবে 'গাথা' অত্যন্ত প্রাচীন। আর্যরা ভারতে প্রবেশ করার আগেই এই শব্দের উৎপত্তি হয়। ফলে ইরানীয় বা পারস্যের ভাষা এবং প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষা—দুই ক্ষেত্রেই গাথা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। আবেস্তায় গাথা শব্দের উল্লেখ মেলে। অনুরূপভাবে ঋগ্‌বেদের কাল থেকেই ভারতীয় আর্য সাহিত্যে গাথা শব্দের উল্লেখ হতে দেখা যায়। ঋগ্‌বেদের যুগে অবশ্য গাথা বলতে শুধুই গান বা শ্লোক বোঝাত। যিনি গাথা রচনা বা যজ্ঞের সময় গাথা পরিবেশনের দায়িত্বে থাকতেন তাঁকে গাথাপতি বলা হত। তবে গাথাপতি একা গান করতেন না। গাথা মূলত সমবেত সঙ্গীত। যাঁরা গাথা পরিবেশন করতেন তাঁরা 'গাথিন্' একত্রে বহু তবে ঋগ্বৈদিক যুগের গাথা কোনো রাজা-রাজর্ষির কাহিনী নয়। যজ্ঞের সময়ে দেবতারা উদ্দেশে যে স্তবগান হত, ঋগ্‌বেদে তাকেই গাথা বলা হয়েছে। যজ্ঞের সময় গান করা বললেই সাধারণত সামবেদের মন্ত্রোচ্চারণ বলে মনে হয়, কিন্তু গবেষকরা বলছেন যে যজ্ঞগাথা কিন্তু বেদমন্ত্র নয়। তার বিষয় অবশ্যই বেদ-মন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত কিন্তু তা গানই, মন্ত্র নয়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, কৌশিতকী ব্রাহ্মণের মত প্রাচীন গ্রন্থে গাথার উল্লেখ পাওয়া যায়।

[ঋগ্‌বেদ ৮.৩২.১; ৮.৭১.১৪; ৮.৯৮.৯; ১.১৬৭.৬; ৯.১১.৪; ১.৪৩.৪; ১.১৯০.১; ৫.৪৪.৫; ১.৭.১; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (Haug) ৬.৩২; তৈত্তিরিয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম) ৭.৫.১১.২; কৌশিতকী ব্রাহ্মণ (Lindner) ৩০.৫; শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১১.৫.৬.৮; অক্ষয় কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় খণ্ড; পৃ. ২৮৫; কলিকাতাঃ সংস্কৃত যন্ত্র, ১২৮৯ (১৮৮২)]

□ পরবর্তীকালে মহাকাব্য-পুরাণের যুগে গাথার সংজ্ঞা বদলেছে। তা প্রাচীন রাজর্ষিদের কীর্তি-কাহিনীতে পরিণত হয়েছে ধীরে ধীরে। মহাভারতে এবং পুরাণগুলিতে বিভিন্ন প্রাচীন রাজর্ষির নামে প্রচলিত গাথার উল্লেখ মেলে। রাজা জনমেজয়, দুষ্যন্ত, ভরত, শান্তনুর মতো চন্দ্রবংশীয় বিখ্যাত রাজাদের পাশাপাশি স্যমন্তক মণির উপাখ্যান প্রসঙ্গে ও গাথার উল্লেখ মেলে। তবে মহাভারতের একাধিক শ্লোকে গান বা সঙ্গীতের প্রতিশব্দ হিসেবেও গাথার উল্লেখ আছে। মহাভারত পুরাণগুলিতে প্রচলিত শ্লোক বলে যে শ্লোকগুলি উদ্ধার করা হয়, সেগুলিকে গাথা বলেই চিনতে হবে।

[মহা (k) ১.৯৫.৯, ২৭, ৩০, ৪৬; ২.১১.৩৫; ২.৪১.৩৯; (হরি) ১.৯০.১২, ৩৪, ৩৮-৩৯, ৫৮; ২.১১.৩৪; ২.৪০.৪০; ১৩.১৩৭.১৬; ৫.১০১.৯; বিষ্ণু পু. ৪.৪.৩৯; ৪.৮.৮; ৪.১০.২; ৪.১১.২; ৪.১১.৪; ৪.১৩.৪-৫; ৪.১৩.২২; ৪.২০.৫]

□ বিষ্ণু পুরাণের একটি শ্লোকে পুরাণের গঠন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা, কল্প প্রভৃতির সমন্বয়ে পুরাণ গ্রন্থিত হয়—

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥

এই শ্লোকের টীকায় গাথা প্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামী মন্তব্য করেছেন—পিতৃবিষয়ক এবং পৃথ্বীবিষয়ক গীত এবং অন্যান্য কোনো কোনো গীতকে গাথা বলা হয়—

গাথাস্তু পিতৃপৃথ্বী প্রভৃতি গীতয়ঃ।

সামান্য পরিবর্তিত রূপে শ্লোকটি বায়ু পুরাণেও পাওয়া যায়।

[বিষ্ণু পুরাণ (বঙ্গবাসী) ৩.৬.১৬, শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা দ্রষ্টব্য; বায়ু পু. ৬০.২১]

□ পণ্ডিত Martin Haug তাঁর প্রবন্ধে আবেস্তা এবং বৈদিক গ্রন্থে প্রাপ্ত গাথা এবং তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন।

[পঠিতব্য: The Zend Avesta, or the Scripture of the Parsees, in Essays on the Sacred Language, Writings and the Religion of the Parsees, by Martin Haug, Bombay: Bombay Gazette Press, 1862]

গাথী পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি গাথীর বংশ তার মধ্যে একটি। গাথী অঙ্গিরার বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৬.২২]*

গাধি এক প্রাচীন ধার্মিক রাজা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে

গাধির নামটি গাথিন্ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গাথিন্ কুশিকের পুত্র। গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র এবং পৌত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গাধি কান্যকুব্জে রাজত্ব করতেন। বিষ্ণু পুরাণে এই গাধিকে দেবরাজ ইন্দ্রের অংশবিশেষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (Haug) ৭.১৮; রামায়ণ ১.৫১.১৭-১৯; মহা (k) ১.১৭৫.৩; ৬.৯.৮; (হরি) ১.১৬৮.৩; ৬.৯.৮; ভাগবত পু. ২.৭.৪৪; ৯.১৬.২৮; বিষ্ণু পু. ৪.৭.৫]

□ অপুত্রক রাজা কুশনাভ পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ফলে এক পরমধার্মিক পুত্র সন্তান লাভ করেন। সেই পুত্রের নাম গাধি। কুশনাভের বংশধরেরা কুশ বংশজাত গাধির পুত্র হওয়ার কারণেই বিশ্বামিত্র কৌশিক নামে খ্যাত। অবশ্য বায়ু পুরাণ মতে, গাধি কুশিক বা কুশনাভের পুত্র নন, পৌত্র। তিনি সুহোত্র ও পৌরুকুৎসার সন্তান।

[রামায়ণ ১.৩৪.১-৬; বায়ু পু. ৯১.৬৫]

□ গাধি রাজার এক কন্যা কৌশিকী বা সত্যবতী। ইনি ঋচীকের পত্নী। পতিব্রতা সত্যবতী হিমালয় পর্বত থেকে নদীরূপে কৌশিকী নামে প্রবাহিতা। *[রামায়ণ ১.৩৪.৭-১২]*

□ মহাভারতের বনপর্বে গাধিরাজার কন্যার সঙ্গে মহর্ষি ঋচীকের বিবাহকে কেন্দ্র করে একটি কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

কান্যকুব্জরাজ গাধির বনবাসকালে একটি অতি সুন্দর কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। কন্যাটি বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠলে ভৃগুবংশীয় ঋচীক তাঁকে প্রার্থনা করেন। গাধি রাজা বিবাহের পূর্ব শর্ত হিসেবে ঋচীকের কাছে এক অদ্ভুত দাবি পেশ করেন। কুশবংশীয়দের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তিনি কন্যাশুল্ক হিসেবে এক বিশেষ প্রজাতির সহস্র অশ্ব ঋচীকের কাছে দাবি করেন। অশ্বগুলির কানের ভিতরের অংশ রক্তবর্ণ এবং বাইরের অংশ শ্যামবর্ণ এবং অন্যান্য অঙ্গ পাণ্ডুরবর্ণ বিশিষ্ট। একই সঙ্গে অশ্বগুলি দুর্দান্ত গতি সম্পন্ন হবে।

মহর্ষি ঋচীক বরুণদেবের কল্যাণে গাধির প্রার্থিত সহস্র অশ্ব শুল্ক দিয়ে তাঁর কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন।

[মহা (k) ৩.১১৫.২০-২৮; (হরি) ৩.৯৬.২০-২৮]

□ সত্যবতীর বিবাহসূত্রে পাওয়া অশ্বগুলি গাধিরাজ পুণ্ডরীক-যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। ব্রাহ্মণদের থেকে আবার দুইশত করে অশ্ব রাজা হর্যশ্ব, দিবোদাস এবং উশীনররাজা ক্রয় করেন। বাকি চার শত অশ্ব দস্যুদের দ্বারা অপহৃত হয়। পরবর্তীকালে গাধিপুত্র বিশ্বামিত্রের জন্য গালব হর্যশ্ব, দিবোদাস ও উশীনর রাজার নিকট থেকে গুরুদক্ষিণা পরিশোধের জন্য অশ্বগুলি সংগ্রহ করেছিলেন।

[মহা (k) ৫.১১৯.৫-৮; (হরি) ৫.১১০.৫-৮]

□ গাধি রাজার প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পর্কে মহাভারতের শল্যপর্ব থেকে কিঞ্চিৎ ধারণা পাওয়া যায়। সেখানে গাধিকে মহাক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি পুত্র বিশ্বামিত্রের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে স্বর্গযাত্রায় উদ্যোগী হলে কান্যকুব্জের প্রজাদের মধ্যে শোক ও ভয়ের আবহ সৃষ্টি হয়। তাঁরা গাধির দেহত্যাগের পর বিশ্বামিত্রের অধীনস্থ রাজ্যে সুখে বাস করা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

[মহা (k) ৯.৪০.১২-১৬; (হরি) ৯.৩৭.৪৮-৫২]

□ গাধি-পুত্র বিশ্বামিত্রের জন্ম সম্পর্কে মহাভারতের শান্তিপর্বে একটি কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। গাধিরাজার কন্যা সত্যবতীর সঙ্গে মহর্ষি ঋচীকের বিবাহ হয়। ঋচীক সত্যবতীর প্রতি বিশেষ সন্তুষ্টির কারণে গাধি রাজার এবং নিজের পুত্র কামনায় দুটি পৃথক চরু পাক করেন। ঋচীক সত্যবতীর নিজের জন্য একটি এবং গাধি-পত্নী অর্থাৎ সত্যবতীর মাতার জন্য একটি চরু প্রস্তুত করেছিলেন। দুটি চরু ভক্ষণের ফলাফল পৃথক। গাধি-পত্নীর জন্য নির্দিষ্ট চরু ভক্ষণের ফলে তাঁর একটি তেজস্বী ক্ষত্রিয় পুত্র লাভ হওয়ার কথা। ইনি নিজে অপরাজেয় থেকে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুলকে জয় করবেন। অপর চরুটি ভক্ষণ করলে সত্যবতী ধৈর্য্যশীল তপস্বী ব্রাহ্মণ সন্তানের জন্ম দেবেন বলে জানানো হয়। কিন্তু ভুলবশতঃ গাধি-পত্নী কন্যা সত্যবতীর জন্য নির্দিষ্ট চরুটি ভক্ষণ করেন, আর সত্যবতী তাঁর মাতার চরু গ্রহণ করলেন। সমস্ত ঘটনাটি জানতে পেরে ঋচীক সত্যবতীকে বলেন—চরু পরিবর্তনের কারণে তিনি এক কোপনস্বভাব নিষ্ঠুর পুত্রের জন্ম দেবেন। তাঁর মধ্যে যাবতীয় ক্ষাত্রতেজ প্রকাশিত হবে। অপরদিকে গাধি-পত্নী ব্রাহ্মণ্যতেজযুক্ত সন্তানের জননী হবেন। সত্যবতীর অনুরোধে সাড়া দিয়ে ঋচীক অবশেষে কোপনস্বভাব পুত্রের পরিবর্তে

পৌত্রের জন্মদান অনুমোদন করেন। চরুর প্রভাবে ঋচীক-সত্যবতীর পৌত্র রূপে জন্ম নেন পরশুরাম। এঁর পিতা জমদগ্নি কোপনস্বভাব হয়ে জন্মগ্রহণ করেননি। অপরদিকে ঋচীকের তৈরি করা চরু ভক্ষণের ফলে গাধি-পত্নীর গর্ভে বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়, যিনি জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয় হলেও ব্রহ্মর্ষির তেজে উদ্ভাসিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মহর্ষি ঋচীক পূর্বেই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, সত্যবতীর পিতার সমস্ত বংশটাই কালক্রমে ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে—

দৃষ্টমেতৎ পুরা ভদ্রে জ্ঞাতঞ্চ তপসা ময়া।
ব্রহ্মভূতং হি সকলং পিতুস্তব কুলং ভবেৎ॥

চরু পরিবর্তনের ঘটনার মধ্যে দিয়ে ঋচীকের সেই ভবিষ্যৎবাণী যথার্থতা লাভ করে। এই কাহিনীটি থেকে আরও একটা ব্যাপার বোঝা যায়। তা হল, গাধিরাজা প্রজাপালক, ন্যায় পরায়ণ রাজা হলেও সম্ভবত বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অপুত্রক ছিলেন। সেই কারণেই রাজার বনবাসে যাবার সিদ্ধান্ত প্রজাদের উদ্বিগ্ন করে থাকবে। বনবাসকালে গাধিরাজা বৃদ্ধ বয়সে তপস্যার ফল স্বরূপ প্রথমে কন্যাসন্তান লাভ করেন এবং সেই কন্যার বিবাহের পর গাধিরাজার পুত্র এবং দৌহিত্র প্রায় একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বামিত্র এবং তাঁর ভাগিনেয় জমদগ্নি সমবয়সী ছিলেন।

[দ্র. ঋচীক, পরশুরাম, জমদগ্নি]

[মহা (k) ১২.৪৯.৬-৩১; ১৩.৪.২৫-৬৬;
(হরি) ১২.৪৮.৬-৩১; ১৩.৩.২৫-৬৬;
বায়ু পু. ৯১.৬৬-৮৭; ভাগবত পু. ৯.১৫.৫-১১;
বিষ্ণু পু. ৪.৭.৫-১৬]

গাণ্ডীব অর্জুনের বিখ্যাত ধনুক। মহাভারতে অবশ্য গাণ্ডীব ধনুকের ইতিহাস যেমন দেখতে পাওয়া যায়, তাতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর অর্জুনের ধনুক হিসেবে গাণ্ডীব বিখ্যাত তো বটেই, কিন্তু গাণ্ডীব নিজে ধনুক হিসেবেও কিছু কম বিখ্যাত নয়। গাণ্ডীবের মতো বিখ্যাত ধনুক ধারণ করেন বলেই গাণ্ডীবধন্বা অর্জুনও জগতে প্রসিদ্ধ— এমনটা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আমরা জানি, মহাভারতের আদিপর্বে খাণ্ডবদহনের ঠিক আগে স্বয়ং অগ্নিদেবতা অর্জুনের হাতে এই গাণ্ডীব ধনুক তুলে দিয়েছিলেন। মহাভারতের এই পর্যায়ে গাণ্ডীব-ধনুকের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, অগ্নিদেব বরুণের কাছ থেকে গাণ্ডীব এনে অর্জুনকে দেন, বরুণ আবার পুরাকালে সোম বা চন্দ্রের কাছ থেকে এই ধনুক লাভ করেছিলেন। গাণ্ডীব ধনুকের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, গাণ্ডীব ধনুক অত্যন্ত ভারী, মসৃণ তার চেহারা, বিশাল তার আকৃতি। গাণ্ডীব ধনুক হিসেবে এমনই ক্ষমতাসম্পন্ন যে, একা গাণ্ডীব ধনুককে একলক্ষ ধনুকের সমতুল্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এর মাহাত্ম্য কীর্তন করে মহাভারত জানিয়েছে যে, এই ধনুক যুদ্ধে অজেয়, দেব-দানব-গন্ধর্বরা গাণ্ডীবের পূজা করে থাকেন—

সর্বশস্ত্রৈরণাধৃষ্যং সর্বশস্ত্রপ্রমাথি চ।
সর্বায়ুধ মহামাত্রং পরসৈন্যপ্রবর্ষণম্॥
এবং শতসহস্রেণ সম্মিতং রাষ্ট্রবর্ধনম্।
চিত্রমুচ্চাবচৈর্বর্ণৈঃ শোভিতং শ্লক্ষ্মমব্রণম্॥
দেবদানবগন্ধর্বৈঃ পূজিতং শাশ্বতীঃ সমাঃ।
প্রাদাচ্চৈব ধনূরত্নসক্ষয্যে চ মহেষুধী॥

[মহা (k) ১.২২৫.৭-৯; (হরি) ১.২১৮.৬-৯]

□ তবে গাণ্ডীব ধনুকের ইতিহাস সব থেকে বিশদে বর্ণিত হয়েছে মহাভারতের বিরাটপর্বে। এবং তা বর্ণনা করছেন স্বয়ং বৃহন্নলাবেশধারী অর্জুন। বিরাট নগরে কুরুসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগে রাজকুমার উত্তরকে গাণ্ডীব ধনু সম্পর্কে অর্জুন বলছেন—এই ধনুক নির্মাণ করেছিলেন ব্রহ্মা। বহু বছর এই ধনুক তাঁর কাছেই ছিল। তারপর সহস্র বৎসর পরে প্রজাপতি অর্থাৎ মনু ব্রহ্মার কাছ থেকে গাণ্ডীব ধনু লাভ করেন। পাঁচশো তিন বছর মনুই সেই ধনুক ধারণ করছিলেন। তারপর ইন্দ্র গাণ্ডীব লাভ করেন এবং পাঁচাশী বছর তিনি গাণ্ডীব ধারণ করেছিলেন। তার পর পাঁচশো বছর এই গাণ্ডীব ধারণ করলেন চন্দ্র বা সোম। তাঁর কাছ থেকে ধনুক পেলেন বরুণদেব। খাণ্ডবদহনের আগে অগ্নি বরুণের কাছ থেকে গাণ্ডীব চেয়ে অর্জুনকে দিয়েছিলেন—

এতদ্বর্ষসহস্রাণি ব্রহ্মা পূর্বমধারয়ৎ।
ততো'নন্তরমেবাথ প্রজাপতিরধারয়ৎ॥
ত্রীণি পঞ্চশতঞ্চৈব শক্রো'শীতিঞ্চ পঞ্চ চ।
সোমঃ পঞ্চশতং রাজা তথৈব বরুণঃ শতম্॥
পঞ্চষষ্টিঞ্চবর্ষাণি তং পার্থঃ শ্বেতবাহনঃ।
মহাবীর্য্যং মহাদিব্যমেতদ্ধনুরনুত্তমম্॥
এতৎ পার্থমনুপ্রাপ্তং বরুণাচ্চারুদর্শনম্।
পূজিতং সুরমর্ত্যেষু বিভর্তি পরমং বপুঃ॥

মহাভারতের এই অংশে অর্জুন পঞ্চষষ্টি অর্থাৎ পঁয়ষট্টি বছর গাণ্ডীবধনু ধারণ করছিলেন—এই তথ্যটি নিয়ে পণ্ডিতমহলে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ এবং বঙ্গদেশীয় ভারতকৌমুদী টীকার রচয়িতা হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ—দুজনেই নিজের নিজের মতো করে যুক্তি সাজিয়ে গাণ্ডীব ধারণের সময়কাল নির্ধারণ করেছেন কারণ পঁয়ষট্টি বছর ধরে গাণ্ডীব ধারণ করার কথা মেনে নিতে হলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অর্জুনের বয়স কত ছিল—তা নিয়ে বড়োসড়ো প্রশ্ন উঠে যায়। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ এই শ্লোকের পাঠান্তরে—

পার্থ পঞ্চ চ ষষ্টিঞ্চ বর্ষাণি শ্বেতবাহনঃ।

পাঠ গ্রহণ করেছেন এবং ৬০ সংখ্যাটিকে ৬০ ঋতু অর্থাৎ ষড়্ঋতুর সমন্বয়ে এক বছর ধরলে দশ বছর এবং পাঁচ বছর—মোট পনেরো বছর গাণ্ডীব ধারণের সময়কাল বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর যুক্তি, সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহের পরেই তিনি গাণ্ডীব ধনু লাভ করেন এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অভিমন্যুর বয়স ষোল ছিল বলে মহাভারতেই উল্লেখ আছে। ফলে সময়কাল পনেরো বছরের বেশি হতে পারে না। নীলকণ্ঠের মত অন্যরকম। তিনি গণনা করে বলছেন মোটামুটি সাড়ে বত্রিশ বছর অর্জুনের হাতে গাণ্ডীব ছিল, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে পর্যন্ত। আমাদের এই তর্কযুক্তিগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়েছে এবং এবিষয়ে আরও পর্যালোচনা এবং গবেষণার অবকাশ আছে বলে মনে হয়।

[মহা (k) ৪.৪৩.২-৯; (হরি) ৪.৩৯.২-৮
(নীলকণ্ঠ কৃত ভারতভাবদীপ এবং সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত ভারত কৌমুদী টীকা দ্রষ্টব্য)]

□ তবে গাণ্ডীব ধনুক কী দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল, এ বিষয়ে মহাভারতে কোনো আলোচনা নেই। তবে অভিধানকারেরা পাণিনির সূত্র (গাণ্ড্যজগাৎ সংজ্ঞায়াম্) উদ্ধার করে মন্তব্য করেছেন গণ্ডী বা গণ্ডারের শৃঙ্গ বা খড়্গ থেকে যা নির্মিত হয়েছে—তারই নাম গাণ্ডীব। শৃঙ্গ দ্বারা ধনুক নির্মাণের কথা যথেষ্টই গ্রহণযোগ্য কারণ কৃষ্ণকেও শৃঙ্গজাত শার্ঙ্গধনু ধারণ করতে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে ধারণা করা যায় যে, গণ্ডারের শৃঙ্গ বা খড়্গ দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল বলেই অর্জুনের ধনুক গাণ্ডীব নামে খ্যাত। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ গাণ্ডীবের আকৃতি সম্পর্কে অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন—

গণ্ডঃ স্যাৎ পুংসি খড়্গিনীতি মেদিনী।
তেন সহ বাতি গচ্ছতীতি গণ্ডিবম্,
তস্য পৃষ্ঠবংশম্ তদ্বিকারো গাণ্ডীবম্
দীর্ঘমধ্যো'ষপ্যয়ং শব্দঃ ক্বচিদস্তি তদার্যম্।

[মহা (k) ১.১.১৮০; (হরি) ১.১.১৪২
(নীলকণ্ঠকৃত টীকা দ্রষ্টব্য)]

□ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাভারতের ভারতকৌমুদী টীকায় স্কন্দপুরাণ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন—

নরো'পি চ ধনুর্গৃহ্য মহিষাসুর গণ্ডজম্।
গাণ্ডীবং লোকবিখ্যাতং বরাহমিব পর্বতম্॥

মহিষাসুরের গণ্ডদেশের অস্থি দ্বারা নির্মিত বলেই ধনুকের নাম গাণ্ডীব।

[মহা (k) ৪.৪৩.২; (হরি) ৪.৩৯.২
(ভারতকৌমুদী টীকা দ্রষ্টব্য)]

□ জীবনের অন্তিম পর্যায়ে মহাপ্রস্থানের সময়েও অর্জুন এই গাণ্ডীব ধনুক হাতে নিয়েই পথ চলছিলেন। সে সময় অগ্নিদেব আবির্ভূত হয়ে তাঁর কাছ থেকে গাণ্ডীব ধনুক ফিরিয়ে নেন।

[মহা (k) ১৭.১.৩৮-৪৪; (হরি) ১৭.১.৩৮-৪৪]

গান্দিনী শ্বফল্কের পত্নী ও কাশীরাজের কন্যা। শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর জন্মগ্রহণ করেন।

□ শ্বফল্ক যেখানে বাস করতেন সেখানে মরক, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি হত না। একসময় কাশীরাজের রাজ্যে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে সেখানে শ্বফল্ককে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শ্বফল্কের পদার্পণ মাত্রই বৃষ্টিপাত হয় সেই রাজ্যে।

এইসময়-ই গর্ভবতী ছিলেন কাশীরাজের স্ত্রী। কিন্তু প্রসবক্ষণ উপস্থিত হলেও সন্তান ভূমিষ্ঠ হল না। এইভাবে কেটে গেল বারো বছর। অবশেষে কাশীরাজ স্বয়ং গর্ভস্থ সন্তানকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করলেন, তুমি কেন গর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছ না—

কস্মান্ন জায়সে নিষ্ক্রম্যতাম্ . . .।

গর্ভস্থ কন্যাসন্তান পিতাকে প্রত্যুত্তরে জানাল আপনি যদি প্রতিদিন ব্রাহ্মণদের এক একটি করে গো দান করেন, তবে তিন বছর পর আমি জন্মগ্রহণ করব। অতঃপর তিন বছর প্রতিদিন গাভী দান করার পর কাশীরাজকন্যা জন্মগ্রহণ

করলেন। রাজা সেই কন্যার নামকরণ করলেন গান্দিনী।

শ্বফল্কের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত গান্দিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন রাজা।

□ গান্দিনী চিরজীবন প্রত্যহ একটি করে গাভী ব্রাহ্মণকে দান করতেন।

□ অক্রূর ছাড়াও গান্দিনীর আরও অনেক পুত্রের নাম উল্লিখিত রয়েছে পুরাণগুলিতে। বায়ু পুরাণ অনুসারে তাঁরা হলেন—উপমঙ্গু, মঙ্গু, মৃদু, অরিমেজয়, গিরিরক্ষ, যক্ষ, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দন, ধর্মভৃৎ, সৃষ্টচয়, বর্গমোচ, আবহ, প্রতিবাহ।

তবে বিষ্ণু পুরাণের পাঠে অক্রূরের ভ্রাতাদের নামের তালিকাটি একটু অন্যরকম। এই পুরাণের পাঠ অনুযায়ী অক্রূরের কনিষ্ঠ গান্দিনীর অন্যান্য পুত্রদের নাম যথাক্রমে উপমদ্গু, মৃদর, বিশ, অরিমেজয়, গিরিক্ষত্র, উপক্ষত্র, শত্রুঘ্ন, বিমর্দন, ধর্মধৃক্, দৃষ্টশর্মা, গন্ধমোজ, আবাহ এবং প্রতিবাহ।

[বিষ্ণু পু. ৪.১৩.৫৪-৫৬; ৪.১৪.২;

বায়ু পু. ৯৬.১০২-১১১; ভাগবত পু. ৯.২৪.১৫]

গান্ধর্বী১ রামায়ণে প্রজাপতি কশ্যপের সন্তান-সন্ততির যে বিবরণ পাওয়া যায়, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে ক্রোধবশার গর্ভজাত দশ কন্যাসন্তানের অন্যতম হলেন সুরভী। সুরভীর দুই কন্যা রোহিণী আর গন্ধর্বী বা গান্ধর্বী। ইনি অশ্বকুলের জননী ছিলেন বলে রামায়ণে উল্লিখিত হয়েছে।

[রামায়ণ ৩.১৪.২৬-২৮]

□ রামায়ণের বিবরণ অনুসারে গন্ধর্বীকে প্রজাপতি কশ্যপের প্রদৌহিত্রী বলে মনে হলেও মহাভারতের বিবরণ অনুযায়ী কশ্যপের পত্নী ছিলেন দক্ষকন্যা সুরভী। সুরভীর গর্ভজাত দুই কন্যা সন্তানের মধ্যে গান্ধর্বী একজন। এখানেও অবশ্য গান্ধর্বী অশ্বকুলের মাতাই বটে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে প্রাপ্ত উল্লেখ অনুযায়ী গান্ধর্বীর অশ্বপুত্রদের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা একজন।

[মহা (k) ১.৬৬.৬৭; (হরি) ১.৬১.৬৭;

ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.৭৩-৭৭]

গান্ধর্বী২ জনৈক মৌনেয় গন্ধর্বের কন্যা ছিলেন গান্ধর্বী। *[বায়ু পু. ৬৯.১০]*

গান্ধার১ আর্যায়ণের ইতিহাসে গান্ধার এক বিচিত্র স্থান অধিকার করে আছে। বেদ, উপনিষদ এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে গান্ধারের শুধু উল্লেখই পাওয়া যায় না, বরং দেশটি সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশংসাসূচক কথাও বলা হয়েছে। যজ্ঞ প্রসঙ্গে গান্ধারের উল্লেখ করা হয়েছে। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদে গান্ধার দেশের মানুষদের অত্যন্ত বিবেচক ও বিচক্ষণ বলা হয়েছে। যা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, সে সময় গান্ধার সম্পর্কে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করা হত। কিন্তু মহাভারতের কালে এসে এই ধারণা প্রায় সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। মহাভারতে গান্ধারদেশকে আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতিচ্যুত বলে দেখানো হয়েছে। যেমন—কর্ণপর্বে কর্ণ বাহীক দেশের নিন্দা করতে গিয়ে গান্ধারের প্রসঙ্গ তুলেছেন। তিনি বলেছেন, গান্ধার উত্তম স্থান নয়। এই দেশের স্বেচ্ছাচারী এবং স্বল্পবুদ্ধি ব্রাহ্মণরা নিজের বংশেই বিয়ে করেন। শান্তিপর্বেও গান্ধারকে জাতিগতভাবে হীন বলা হয়েছে। এঁদের 'নারায়ণ-নিরপেক্ষ' অর্থাৎ সনাতন ধর্মচ্যুত বলে সমালোচনাও করা হয়েছে। একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে গান্ধারদের মিলনের ফলে উৎপন্ন অবৈধ সন্তান বৈশ্য বা শূদ্র জাতিভুক্ত হয়। ফলে, বলা যেতে পারে যে, গান্ধার দেশ তথা জাতি আর্যায়ণের প্রথমযুগে অর্জিত গৌরব পরবর্তীকালে হারিয়েছিল।

[ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬.১৪.১-২;

মহা (k) ৮.৪৪.৪৭; ৮.৪৫.৯; ১২.৬৫.১৩;

১২.২০৭.৪৩; (হরি) ৮.৩৪.১০৬, ১১৪;

১২.৬৩.১৩; ১২.২০১.৪৩;

P.H.A.I (Raychaudhuri) p. 55-56]

গান্ধার দুর্যোধনের মাতুলালয়। গান্ধারী গান্ধারের রাজবংশজাতা। আর গান্ধারীর ভাই শকুনি গান্ধারের রাজা। ফলে আত্মীয়তাসূত্রে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় গান্ধাররাজ শকুনি সহ গান্ধারদেশীয় বহু যোদ্ধা কৌরবপক্ষে যোগদান করেছিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদের হাতে বহু গান্ধারযোদ্ধা যুদ্ধে মারাও গিয়েছিলেন। বীর অভিমন্যু একাই গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র কালিকেয় সহ তাঁর সাতাত্তরটি অনুচরকে যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন।

তবে গান্ধার যোদ্ধাদের রণনৈপুণ্যের কথা মহাভারতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে এঁরা অত্যন্ত সাহসী যোদ্ধা এবং নখ

ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করতে বিশেষভাবে পারদর্শী।

[মহা (k) ২.৭৭.৩৯; ৫.৯৪.৪৯; ৬.৪৫.৭৬; ৬.৫১.১৪; ৬.৫৮.৭; ৮.৮.১৮; ৮.৯.৩৪; ৮.৭৯.৪৭; ১২.১০১.৩; (হরি) ২.৭৪.৩৯; ৫.৮৭.৬২; ৬.৪৫.৭৬; ৬.৫১.১৪; ৬.৫৮.৭; ৮.৬.১৮,৬৪; ৮.৫৯.৩৭; ১২.৯৮.৩]

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ জয়ের পর যুধিষ্ঠির এক বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। তাঁর অশ্বমেধের ঘোড়াটি পঞ্চনদ-তীরবর্তী দেশ পার হয়ে গান্ধারে পৌঁছায়। যজ্ঞীয় অশ্বকে অনুসরণ করে অর্জুনও গান্ধারে এসে পৌঁছান। তখন গান্ধারে রাজত্ব করছিলেন শকুনির এক পুত্র। পূর্ব শত্রুতার কারণে এবং শকুনির মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে প্রচুর সৈন্য নিয়ে অর্জুনকে আক্রমণ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্জুনের হাতে গান্ধাররা পরাজিত হয়। গান্ধাররাজের মাতা অর্থাৎ শকুনির বিধবা পত্নীর অনুরোধে অবশ্য অর্জুন শকুনিপুত্রের জীবনদান করেন। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে গান্ধার যুধিষ্ঠির-শাসিত হস্তিনাপুরের বশ্যতা স্বীকার করে। অর্জুন গান্ধাররাজকে হস্তিনাপুর যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণও জানান।

[মহা (k) ১৪.৮৩.১৯-৮৪; (হরি) ১৪.১০৬.১৮-১০৭]

☐ অঙ্গরাজ কর্ণ গান্ধার জয় করেন। তিনি সেখান থেকে দুর্যোধনের জন্য কর আদায় করেছিলেন।

বাসুদেব কৃষ্ণও গান্ধারবীরদের পরাজিত করেছিলেন।

[মহা (k) ৮.৮.১৮; ৮.৯.৩৪; ৮.৭৯.৪৭; ১৪.৬.১২; (হরি) ৮.৬.১৮, ৬৪; ৮.৫৯.৩৭; ১৪.৬.১২]

☐ পুরাণে বলা হয়েছে যে, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভৃগুবংশে প্রমতি নামে এক মহাত্মার জন্ম হয়েছিল। এই প্রমতি গান্ধার জাতিকে উচ্ছেদ করেছিলেন।

আবার পুরাণে কল্কি অবতারের দ্বারা গান্ধার জাতিকে দমনের কথাও বলা হয়েছে। কলিযুগে ভগবান বিষ্ণু কল্কি অবতারে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে বহু হীনজাতিকে দমন করবেন। এই হীন জাতিগুলির মধ্যে গান্ধার অন্যতম।

[মৎস্য পু. ১৪৪.৫৭; বায়ু পু. ৫৮.৮২; ৯৮.১০৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩১.৮৩; ৭৩.১০৮]

☐ পণ্ডিতরা মনে করেন যে, প্রাচীন গান্ধার দেশ বর্তমান পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত পেশোয়ার, পঞ্জাব প্রদেশের রাওয়ালপিণ্ডি এবং আফগানিস্তানের কাবুলের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত ছিল। অনেকে দাবি করেন যে, ভারতীয় পঞ্জাবরাজ্যের উত্তর-পশ্চিম অংশটিও গান্ধারের অন্তর্গত ছিল। পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, বর্তমান আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশটিই প্রাচীন গান্ধার। তবে গান্ধারের সীমারেখা শুধুমাত্র কান্দাহারের মধ্যেই সম্ভবত সীমাবদ্ধ ছিল না। 'গান্ধার' ও 'কান্দাহার' নাম-দুটির ধ্বনিগত সাদৃশ্যের কারণেই এই ধারণার জন্ম বলে মনে হয়।

তবে একথা ঠিক যে, গান্ধার দেশের সীমানা সম্পর্কে একাধিক মত প্রচলিত আছে। D.R. Bhanderkar- এর মতে সমগ্র পশ্চিম পঞ্জাব ও পূর্ব আফগানিস্তান নিয়ে গান্ধার দেশ গড়ে উঠেছিল। আবার N.L. Dey পেশোয়ার ও হোতি মর্দন (Hoti Murdan) অথবা ইউসুফজায়ী অঞ্চলকে (কাশ্মীর, সিন্ধুনদের উত্তর-পশ্চিমের ভূ-ভাগ এবং কাবুলের উত্তরাংশ) গান্ধার দেশ বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে কানিংহ্যাম বলেছেন—গান্ধার পশ্চিমে লাঘমান (Laghmān) ও জলালাবাদ, পূর্বে সিন্ধুনদ, উত্তরে সোয়াত ও বুনির উপত্যকা এবং দক্ষিণে কালাবাঘ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

[AGI (Cunnigham) p. 48-49; TAI (B.C. Law) p. 9-10]

☐ পরিশেষে এটা মেনে নেওয়ায় কোনো আপত্তি নেই যে, গান্ধারদেশ প্রাচীন উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় একটি জনপদ। এটি ষোড়শ মহাজনপদগুলির মধ্যে অন্যতম বলে ঐতিহাসিকেরা নির্ণয় করেছেন। পুরাণে গান্ধারকে সিন্ধুনদের তীরবর্তী দেশ বলা হয়েছে।

ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে গান্ধারদেশীয় রোমশ মেষ, যাকে 'অবিকা' বলেছে ঋগ্‌বেদ, সেই অবিকা-নামক প্রাণীর কথা পাওয়া যায়—

রোমশ গন্ধরীণামিবাবিকা।

বেদে শব্দটি হল গন্ধার। এই গন্ধারদেশীয়রাই গান্ধার নামে পরিচিত। পরে গান্ধার জনজাতির নামেই দেশ-নাম হিসেবেও গান্ধার শব্দের প্রয়োগ ঘটতে থাকে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও শতপথ

ব্রাহ্মণে গান্ধারের রাজা নগ্নজিতের কথা বলা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই গান্ধাররাজ নগ্নজিতের সোমযাগে অংশগ্রহণেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

[ঋগ্বেদ ১.১২৬.৭; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭.৩৪; শতপথ ব্রাহ্মণ (Eggeling) ৮.১.৪.১০; মহা (k) ৬.৯.৫৩; (হরি) ৬.৯.৫৩; মৎস্য পু. ১১৪.৪১; বায়ু পু. ৪৫.১১৬; ৪৭.৪৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১১৬.৪৭; ১৮.৪৭; মৎস্য পু. ১২১.৪৬]

গান্ধারের সীমারেখা সম্পর্কে সামান্য মতবিরোধ থাকলেও পুরাণকার থেকে শুরু করে আধুনিক পণ্ডিতরা সকলেই গান্ধারদেশীয় ঘোড়ার মান সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে গান্ধারের উচ্চপ্রজাতির ঘোড়ার বিশেষ প্রশংসাও করা হয়েছে। একথা সকলেই জানে যে, মধ্য এশিয়ার যে অংশটিতে গান্ধারদেশ অবস্থিত ছিল সেই সব অঞ্চলে এখনও খুব উৎকৃষ্টমানের ঘোড়া পাওয়া যায়।

[Trade and Trade Routes in Ancient India; Moti Chandra; New Delhi; Abhinava Publications; 1977, p. 17]

কুরুবংশীয় অরুদ্ধের এক পুত্রের নাম গান্ধার। পুরাণ মতে, এই গান্ধারের নামানুসারেই গান্ধার দেশের নামকরণ করা হয়েছে—

অরুদ্ধস্যতু দায়াদো গান্ধারো নাম পার্থিবঃ।
খ্যায়তে যস্য নাম্না তু গান্ধারবিষয়ো মহান্॥

গান্ধারের এক উত্তর পুরুষের নাম প্রচেত, যাঁর ঔরসে একশোটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। প্রচেতর একশোটি পুত্রের প্রত্যেকেই ক্ষমতাবান রাজা ছিলেন। এঁরা সবাই ছিলেন ম্লেচ্ছ জনপদের শাসক। *[বায়ু পু. ৯৯.৯-১২]*

রামায়ণে গান্ধারকে গন্ধর্বদেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

গন্ধর্বদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়ে চ সঃ॥

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে গান্ধারের দুটি নগরীর কথা পাওয়া যায়—তক্ষশিলা এবং পুষ্কলাবত বা পুষ্করাবত। রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত গান্ধারের গন্ধর্বদের ধ্বংস করে নিজের দুই পুত্র তক্ষক ও পুষ্কল বা পুষ্করকে যথাক্রমে তক্ষশিলা ও পুষ্করাবতী বা পুষ্কলাবতীর শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। তক্ষক ও পুষ্কলের নামানুসারেই নগরী দুটির নামকরণ ও করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পুষ্কলাবতী একসময় গান্ধারের একটি অংশের রাজধানী ছিল।

পুষ্করাবতী সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে এবং তক্ষশিলা পূর্বতীরে অবস্থিত ছিল। যা থেকে বোঝা যায়, একসময় গান্ধার দেশ সিন্ধুনদের উভয় তীরেই বিস্তৃত ছিল। কানিংহামের মতে পুষ্করাবতী গান্ধারের প্রাচীনতম রাজধানী-শহর। অবশ্য হিউয়েন সাঙ তাঁর বিবরণে গান্ধারের রাজধানী হিসেবে তক্ষশিলার নাম করেছেন। যা থেকে গান্ধারে ক্ষমতার ভরকেন্দ্র বদলের ধারণা পাওয়া যায়। *[রামায়ণ ৭.১১৪.১০-১২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১৯০; TIAI (B.C. Law) p. 10]*

□ গন্ধার বা গান্ধার শব্দের আভিধানিক অর্থই হল—যা সুগন্ধ সৃষ্টি করে। 'আছে' অর্থে বা অস্ত্যর্থে সংস্কৃতে মতুপ্, বতুপ্, ইন্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের মতো 'র' প্রত্যয়ও ব্যবহৃত হয়। যেমন মধুর। যাতে গন্ধ আছে এই অর্থে গন্ধ শব্দের সঙ্গে 'র' প্রত্যয় করলে প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দটি 'গন্ধর' হওয়াই উচিত ছিল, এবং হয়তো অনেক রকম গন্ধ বোঝাতে বহুবচনের প্রয়োগে গন্ধা'-র সঙ্গে 'র'-প্রত্যয় যোগ করে গন্ধার শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। গন্ধার বা গান্ধার দেশ অতি প্রাচীনকাল থেকে গন্ধদ্রব্য উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। পণ্ডিত Edward H Schafer এবং অন্যান্য পণ্ডিতরা আলোচনা করেছেন যে, গন্ধারে উৎপাদিত গন্ধদ্রব্য এতটাই বিখ্যাত ছিল যে, গন্ধদ্রব্যের কারণেই অঞ্চলটির নাম হয়ে যায় গন্ধার। চীনা পরিব্রাজকরাও এই দেশকে সুগন্ধের দেশ বলেই চিহ্নিত করেছেন নিজেদের ভাষায়।

[শব্দকল্পদ্রুম Vol. 2, p. 324; Edward H. Schafer. The Golden Peaches of Samarkand, p. 157, 169; R. A. Donkin Dragon's Brain Perfume : An Historical Geography of Camphor, p. 17]

□ শব্দকল্পদ্রুমে গান্ধারি বা গান্ধার দেশজাত পণ্য হিসেবে মাদকদ্রব্যের কথা বলা হয়েছে, চলিত ভাষায় যাকে গাঁজা বলা হয়ে থাকে (Marijuana)। গান্ধার বা কান্দাহার অঞ্চল অতি প্রাচীনকাল থেকে এ জাতীয় মাদকদ্রব্য

উৎপাদনের জন্যও বিখ্যাত। এখনও এ অঞ্চলে গাঁজা, আফিম প্রভৃতির চাষ ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। গন্ধারে মাদকদ্রব্যের উৎপাদনের কারণেই গাঁজা (Marijuana)-র প্রতিশব্দ হিসেবে গান্ধারি নামের উৎপত্তি হয়েছে।

[*শব্দকল্পদ্রুম vol. 2, p. 324; M.Kienholz, Opium Traders and their world, vol 2, Chapter. 40*]

গান্ধার₂ দ্রুহ্যুর বংশধারায় বভ্রুর পৌত্র আরদ্বান এবং আরদ্বানের পুত্র গান্ধার। গান্ধারের পুত্রের নাম ধর্ম এবং পৌত্র ধৃত। [*বিষ্ণু পু. ৪.১৭.৪*]

□ ভাগবত পুরাণ অনুসারে দ্রুহ্যুবংশীয় গান্ধারের পিতার নাম আরদ্ধ।

[*ভাগবত পু. ৯.২৩.১৫*]

□ এই গান্ধার রাজার নাম অনুসারেই পরবর্তীকালে গান্ধার দেশ বিখ্যাত হয়। গান্ধার দেশ বিখ্যাত ছিল ঘোড়ার জন্য। গান্ধার-এর বংশধারায় জাত প্রচেতা রাজার পুত্রেরা দীর্ঘদিন ম্লেচ্ছদেশ শাসন করেছিলেন।

[*ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.৯-১২; বায়ু পু. ৯৯.৯-১১*]

□ মৎস্য পুরাণ অনুসারে আবার দ্রুহ্যুবংশীয় গান্ধারের পিতার নাম শরদ্বান। এবং গান্ধার রাজার পৌত্রের নাম ঘৃত। মৎস্য পুরাণ স্পষ্ট করে লিখছে—গান্ধার রাজার নামেই গান্ধার দেশ বিখ্যাত হয় এবং তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত আরট্ট দেশের অশ্ব পৃথিবী-বিখ্যাত ছিল। [*মৎস্য পু. ৪৮.৬-৯*]

গান্ধার₃ সপ্তস্বরের তৃতীয় স্বর গান্ধার। পুরাণে কথিত আছে চতুর্দশ কল্পের নাম হচ্ছে গন্ধর্ব কল্প। এই কল্পেই গান্ধার স্বরের উৎপত্তি হয়। গান্ধার স্বর থেকেই গন্ধর্বদের উৎপত্তি হয়।

[*বায়ু পু. ২১.৩২; ৮৬.৩৭; মৎস্য পু. ২৪৩.২১*]

গান্ধারকায়ণ অগস্ত্যবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষিদের মধ্যে গান্ধারকায়ণ একজন। [*মৎস্য পু. ২০২.২*]

গান্ধারী₁ গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা গান্ধারী। গান্ধারদেশের রাজা সুবল জন্মলগ্নে তাঁর এই কন্যাটির অন্য কোনো নামকরণ করেছিলেন কী না—তা জানা যায় না। তাঁর দেশের নামটিই তাঁর পরিচয় হয়ে উঠেছে, সমগ্র মহাভারতে গান্ধাররাজ সুবলের এই কন্যা গান্ধারী নামেই উল্লিখিত হয়েছেন। গান্ধারী সম্ভবত গান্ধাররাজ সুবলের একমাত্র কন্যা। শকুনি, অচল, বৃষক প্রভৃতি সুবলের বহু পুত্রসন্তানের নাম উল্লিখিত হলে সুবলের কন্যা হিসেবে একমাত্র গান্ধারীরই উল্লেখ মেলে মহাভারতে।

মহাভারত মহাকাব্যের সূচনায় মহাভারতের কথক সৌতি যখন মহাভারতের মুখ্য চরিত্রদের নাম উল্লেখ করেছেন একে একে, সেই সময় গান্ধারীর নাম প্রথমবার উল্লিখিত হয়। সৌতি গান্ধারীর সম্পর্কে বলেছেন—মহাভারতের কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে গান্ধারীর ধর্মশীলতার কথা—গান্ধার্য্যা ধর্মশীলতাম্। গান্ধারীর চরিত্রের এই ধর্মশীলতাই গান্ধারীর চরিত্রটিকে মহাকাব্যের অন্যান্য নারী-চরিত্রের মাঝে সম্পূর্ণ ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

[*মহা (k) ১.১.৯৯; (হরি) ১.১.৬১*]

□ মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত অংশাবতরণ পর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, দ্বাপর যুগে 'মতি'র অংশে গান্ধারী মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হন। মহাভারত মহাকাব্যেও আমরা গান্ধারীকে দেখতে পাব 'মতি' বা মননের প্রতিমূর্তি হিসেবেই। সেই মতি বা মননে যেমন মনের সংবেদনশীলতা আছে, তেমনই আছে এক সর্বকল্যাণময়ী বুদ্ধি—গান্ধারীর চরিত্রটি এই দুইয়ের সমন্বয়ে গঠিত।

[*মহা (k) ১.৬৭.১৬০; (হরি) ১.৬২.১৬১*]

মহাভারতে গান্ধারীর জন্মকথা কিংবা বাল্যকালের কোনো বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু বিবাহযোগ্য হয়ে উঠেছেন দেখে তাঁদের বিবাহের বিষয়ে ভীষ্ম বিদুরের সঙ্গে যে পরামর্শ করছিলেন, সেখানেই গান্ধারীর সম্পর্কে মোটামুটি একটা বর্ণনা পাওয়া যায়। খুব অল্প বয়স থেকেই গান্ধারী ভগবান শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভগবান শিব স্বয়ং এসে দর্শন দিয়েছিলেন তাঁকে। গান্ধারীকে যখন মহাদেব বর প্রার্থনা করতে বললেন, তখন গান্ধারী চাইলেন শতপুত্রলাভের বর। মহাদেব তাঁকে সেই বর দিলেন—

আরাধ্য বরদং দেবং ভগনেত্রহরং হরম্।
গান্ধারী কিল পুত্রানাং শতং লেভে বরং শুভা॥

লক্ষণীয়, বিবাহের অনেক আগেই গান্ধারী মহাদেবের কাছে পুত্রলাভের বর প্রার্থনা করেছেন। একটি উপযুক্ত পুত্র নয়, শতপুত্রবতী হবার বর চেয়েছেন তিনি। বোঝা যায়, কুমারী অবস্থাতেই মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ছিল গান্ধারীর

হৃদয় জুড়ে। গান্ধারীর এই মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা তাঁর চরিত্রের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সমগ্র মহাকাব্য জুড়ে গান্ধারীকে একজন স্নেহময়ী জননীরূপে দেখতে পাই আমরা। কিন্তু সেই স্নেহের ধারা বড়ো বিচিত্র। তাঁর নিজের পুত্রেরাই কখনো কখনো তাঁর স্নেহ সম্পর্কে সংশয়িত অথচ অন্যের ছেলেরা সেই স্নেহের ধারায় আপ্লুত। আরও অদ্ভুত—তিনি তাঁর নিজের ছেলেদের অন্যায় ক্ষমা করেন না, আবার অপরের ছেলের পক্ষপাতী হয়েও তাঁদেরও পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন না। তবু এত টানাপোড়েন সত্ত্বেও গান্ধারীর মধ্যে এক অপরিসীম মমতাময়ী জননীকে খুঁজে পাওয়া যায়—যে মমত্ববোধ, মাতৃত্ব খুব অল্প বয়স থেকেই তিনি নিজের হৃদয়ে লালন করেছিলেন।

[মহা (k) ১.১১০.৯-১০; (হরি) ১.১০৪.৯-১০]

□ যাইহোক ব্রাহ্মণদের মুখে সুলক্ষণা গান্ধারীর কথা শুনে ভীষ্ম তাঁকে কুরুরাজবংশের উপযুক্ত কুলবধূ বলেই মনে করলেন। শতপুত্রবতী গান্ধারীর পুত্রসন্তানরা কুরু রাজবংশের বৃদ্ধি ঘটাবে—এ ভাবনাও ভীষ্মকে আনন্দিত করল।

ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে গান্ধারীর বিবাহের প্রস্তাব করে দূত পাঠালেন গান্ধাররাজ সুবলের কাছে। বিবাহের সম্বন্ধ হিসেবে এমনিতে মন্দ নয়—রূপে, গুণে, বংশমর্য্যাদায়, রাজনৈতিক প্রতিপত্তির বিচারে কুরুরাজকুমার ধৃতরাষ্ট্র নিঃসন্দেহে যোগ্য পাত্র। তবু ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ। ভীষ্মেরও চিন্তা ছিল—যদি গান্ধাররাজ সুবল অন্ধ জামাতার হাতে কন্যাদান করতে সম্মত না হন—

অচক্ষুরিতি তত্রাসীৎ সুবলস্য বিচারণা॥

তবে বাস্তবে তেমন কিছু ঘটল না। গান্ধাররাজ সুবল পাত্রের অন্ধত্বের থেকেও রূপ-গুণ এবং সর্বোপরি বংশমর্য্যাদার কথাই বিচার করলেন। মেয়ে তাঁর বড়ো ঘরে পড়বে—একথা ভেবে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গেই গান্ধারীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে ফেললেন সুবল। এমনকী কন্যাকেও জিজ্ঞাসা করলেন না, যে তিনি অন্ধ পাত্রের গলায় বরমাল্য দিতে সম্মত কী না। গান্ধারী শুনলেন তাঁর পিতা তাঁকে যে পাত্রে সম্প্রদান করতে চলেছেন-সেই ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ—

গান্ধারী ত্বথ শুশ্রাব ধৃতরাষ্ট্র মচক্ষুষম্।

গান্ধারী বুঝলেনও যে, পিতা-মাতা তাঁদের ভাবী জামাতার বংশমর্য্যাদায় মোহিত হয়েই এ সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন। সেকালের দিনে নারীর নিজের স্বামী মনোনীত করার অধিকার ছিল যথেষ্টই, আর গান্ধারীর মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্না নারী চাইলে যে এ বিবাহ-সম্বন্ধে আপত্তি তুলতে পারতেন না—এমনটাও নয়। পিতা-মাতা তাঁকে অন্ধ স্বামীর হাতে তুলে দিচ্ছেন—একথা জানতে পেরে গান্ধারীর মনে কোনো ক্ষোভ, দুঃখ বা অভিমান জন্ম নিয়েছিল কী না—মহাভারতের কবি সে প্রসঙ্গে নীরব। হয়তো দুঃখ পেয়েছিলেন গান্ধারী, হয়তো অভিমানও হয়েছিল তাঁর। তবু সেই দুঃখ অভিমানকে তাঁর অপরিসীম মমত্ববোধের আবরণে ঢেকে ফেললেন গান্ধারী। গান্ধারী বুঝলেন যে, তাঁর পিতা মহামতি ভীষ্মের যাচনায় যেমন মুগ্ধ হয়েছেন, তেমনি মুগ্ধ হয়েছেন কুরুবংশের মর্য্যাদায়। ভাবী জামাতাকে অন্ধ জেনেও তাই এই মহান বিবাহ সম্বন্ধ অস্বীকার করতে পারছেন না তিনি। গান্ধারের মতো ক্ষুদ্র রাজ্যের পক্ষে হস্তিনাপুরের, বিশেষত ভীষ্মের মতো পরাক্রমশালী ব্যক্তির অনুনয় অবহেলায় অস্বীকার করার সাহস দেখানোও সম্ভব ছিল না। এমন ভেবেই পিতার প্রতি অসীম মমতায় কোনো ক্ষোভ-আপত্তি না জানিয়েই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে স্বামীরূপে বরণ করার প্রস্তুতি নিলেন গান্ধারী।

ভাবী স্বামী অন্ধ—একথা ভেবে তাঁর যে দুঃখ হল তাকেও গান্ধারী ঢেকে ফেললেন অসীম মায়া মমতায়। অন্ধ-অসহায় ধৃতরাষ্ট্রের জন্য মায়া হল তাঁর। গান্ধারী জানেন— চক্ষুষ্মতী রমণী যদি স্বামীকে অন্ধ দেখে, তাহলে পদে পদে যেমন অনভিনন্দন তাকে আক্রান্ত করে তেমনই মনে জাগে অসূয়া—আমার আছে, ওর নেই। গান্ধারী বোঝেন—দৃষ্টি যার থাকে না, সে জগতের রূপ-রস আস্বাদন করে আপন অনুভবে। অনুভবশক্তি এবং সংবেদনশীলতাই তার ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতাকে নিরস্ত করে। সুতরাং ভেবেচিন্তে গান্ধারী মানসিক প্রস্তুতি নিলেন—যেন ভাবী স্বামীর প্রতি অসূয়া তৈরি না হয়, যেন আপন ইন্দ্রিয়ের শক্তি তাঁকে একান্তে স্বামীর চেয়ে অহঙ্কারী করে না তোলে। তিনি অনুভব করলেন—নিজের চোখ দুটি যদি তিনি বেঁধে ফেলেন তবেই তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটবে ভাবী স্বামীর সম-অনুভবের ভূমিতে। স্বামীকে

তিনি বুঝতে পারবেন, অনুভব করতে পারবেন সহমর্মিতায়। স্বামীর প্রতি সহানুভূতি সমব্যথায় তাঁর হৃদয় ভরে উঠল। স্বামী ধৃতরাষ্ট্র যে রূপ-রসে বঞ্চিত তিনি তা ভোগ করতে চাইলেন না। আমি স্বামীকে কোনোভাবেই অতিক্রম করব না—এই প্রতিজ্ঞা করে গান্ধারী পুরু পট্টবস্ত্রে বেঁধে ফেললেন নিজের চোখ দুটি, পরম নির্ধারিতের কাছে আত্মনিবেদন করলেন সম্পূর্ণভাবে—

ততঃ সা পট্টমাদায় কৃত্বা বহুগুণং শুভা।
ববন্ধ নেত্রে স্বে রাজন্ পতিব্রত পরায়ণা।
নাতিশিষ্যে পতিমহমিত্যেবং কৃতনিশ্চয়া॥

মূলত স্বামীর জন্য এই সহমর্মিতাই গান্ধারীর ধর্মশীলতা। ধৃতরাষ্ট্রের মতো জটিল মনস্তত্ত্বের এক ব্যক্তিকে তিনি চোখে না দেখেই অন্তরে স্থান দিলেন—তারপর থেকে আমৃত্যু সেই মানুষটির ন্যায়, অন্যায় মানসিক জটিলতা—সমস্ত কিছুর সঙ্গী হয়েছেন অপরিসীম সহনশীলতার সঙ্গে।

যথাসময়ে নানা বহুমূল্য বসন-ভূষণে সজ্জিতা গান্ধারীকে নিয়ে শকুনি পৌঁছালেন হস্তিনাপুরে। হস্তিনাপুরেই একটি শুভদিনে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হল।

চক্ষুষ্মতী হয়েও স্বামীকে অতিক্রম করবেন না ভেবে স্বেচ্ছান্ধত্ব স্বীকার করেছিলেন বলে কুরুরাজপরিবার নববধূ গান্ধারীকে গ্রহণ করলো পরম সমাদরে। রাজ অন্তঃপুরে গান্ধারী অপরিসীম সম্মান এবং মর্য্যাদা লাভ করলেন তাঁর এই পতিব্রত পরায়ণতার কারণেই। মহাভারতের কবি পতিব্রতা গান্ধারীর আচার আচরণের একটু বর্ণনাও দিয়েছেন। গান্ধারী নিজের স্বভাব, ব্যবহার, কাজকর্মে কুরুরাজ পরিবারের হৃদয় জয় তো করলেনই। তার উপর স্বামীর বিশ্বাস-ভালোবাসা লাভের জন্যও গান্ধারীর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। স্বামী অসন্তুষ্ট হতে পারেন ভেবে গান্ধারী স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের নাম পর্যন্ত মুখে আনতেন না—

গান্ধার্য্যপি বরারোহা শীলাচারবিচেষ্টিতৈঃ।
তুষ্টিং কুরূণাং সর্বেষাং জনয়ামাস ভারত॥
বৃত্তেনারাধ্য তান্ সর্বান্ গুরূন্ পতিপরায়ণা।
বাচাপি পুরুষানন্যান্ সুব্রতা নাম্বকীর্তয়ৎ॥

[মহা (k) ১.১১০.৯-১৮; (হরি) ১.১০৪.৯-১৯]

□ গান্ধারীর দিন কাটতে লাগল স্বামীর গৃহে। এরপর পাণ্ডুর দুটি বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে, দুই পত্নীকে নিয়ে তিনি বনেও গিয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র নিজের জন্মান্ধতার কারণে জ্যেষ্ঠপুত্র হয়ে রাজসিংহাসন লাভ করেননি। পাণ্ডুর বনবাসের পর তিনি পাণ্ডুর প্রতিনিধি হিসেবে সিংহাসনে বসেছেন বটে—কিন্তু সেই সিংহাসন, রাজমুকুট যে তাঁর আপন অধিকারের বস্তু, পাণ্ডুর রাজ্যলাভের ঘটনায় তাঁর প্রতি একরকম অবিচারই হয়েছে—এই ভাবনাই ধৃতরাষ্ট্রকে অস্থির করে তুলেছে। তাঁর শক্ত সমর্থ বাহুদুটি দিয়ে তিনি রাজসিংহাসন, রাজমুকুট প্রাণপণে আঁকড়ে ধরছেন শুধু নিজের অধিকার রক্ষার জন্য নয়—পুত্র পৌত্রক্রমে যাতে তাঁর বংশধরদের হাতেই এ অধিকার নিষ্কণ্টক ভাবে সুরক্ষিত থাকে সে ভাবনাও ধৃতরাষ্ট্রের মনের মধ্যে রয়েছে। স্বামীর প্রতি গান্ধারীর অপরিসীম আনুগত্যের সুযোগে ধৃতরাষ্ট্র নিজের মনের এই জটিলতা গান্ধারীর মনেও সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়।

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করছিলেন। তাঁরই পুত্র যাতে কুরুরাজপরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র হয় —এমনটাই তিনি চান। গান্ধারী সেকথা ভালোভাবেই বোঝেন। এমনই একদিন পথশ্রমে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে মহর্ষি ব্যাস এলেন হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে। গান্ধারী তাঁর শ্বশুরপ্রতিম ব্যাসের সেবাশুশ্রষা করলেন পরম যত্নে। ব্যাস তাঁর এই পুত্রবধূর সেবায় তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলেন। গান্ধারী বিয়ের অনেক আগে ভগবান শিবের কাছ থেকে যে বর চেয়েছিলেন, আবারও শ্বশুরপ্রতিম ব্যাসের কাছেও তিনি একই বর চাইলেন—তিনি যেন শতপুত্রের জননী হতে পারেন। যেন তাঁর স্বামীর অনুরূপ শতপুত্র হয় তাঁর—

সা বব্রে সদৃশং ভর্তুঃ পুত্রানাং শতমাত্মনঃ।

কিন্তু স্বামীর মনোবাসনা জানা সত্ত্বেও ব্যাসদেবের কাছে কুরুরাজপরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জননী হবার বর চাননি গান্ধারী। হয়তো মনের ভুলে কিংবা হয়তো এমনটি চাইবার ভাবনা আদৌ মনেই আসেনি তাঁর। যাইহোক, মহর্ষি ব্যাস গান্ধারীকে শতপুত্রলাভের বর দিলেন।

এরপর যথাসময়ে ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গর্ভধারণ করলেন গান্ধারী। লক্ষণীয়, কুন্তীর গর্ভধারণের এক বছর আগেই গান্ধারী গর্ভবতী হলেন। সুতরাং গান্ধারী যদি যথাসময়ে সন্তানের জন্ম

দিতেন তা হলে সেই পুত্রের কুরু রাজপরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র তথা ভাবী যুবরাজ হয়েই জন্মানোর কথা। কিন্তু বাস্তবে এমনটি হল না। দু-বছর ধরে গান্ধারীর গর্ভ নিশ্চল অবস্থায় রইল। এদিকে শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে দূতমুখে খবর পৌঁছাল হস্তিনায়—জ্যেষ্ঠ কুরুরাজপুত্র যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেছেন। গান্ধারী দুঃখে ঈর্ষায় প্রায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন এ খবর শুনে। স্বামীর অজান্তে নিজের নিশ্চল গর্ভে আঘাত করলেন তিনি—

সোদরং পাতয়ামাস গান্ধারী দুঃখমূর্চ্ছিতা॥

গান্ধারীকে মহাভারতের পরবর্তী কাহিনী পর্যায়ে আমরা যেমনটি দেখতে পাব, সেই ধীরা, মনস্বিনী দীর্ঘদর্শিনী ব্যক্তিত্বের পাশে গান্ধারীর এই ঈর্ষা যেন একেবারেই বেমানান লাগে। কুন্তীর পুত্র জন্মাতেই তিনি যেভাবে ঈর্ষাকাতর হয়ে গর্ভে আঘাত করলেন তা তাঁর স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি তুলনায় বড়ো বেশি বেমানান বলেই ধারণা হয় যে গান্ধারীর এই ঈর্ষা, এই অসহিষ্ণুতা বাস্তবে ধৃতরাষ্ট্রের মানসিক জটিলতারই প্রতিফলন। ধৃতরাষ্ট্র নিজে রাজ্য পাননি। তিনি কুরুবংশের ভাবী প্রজন্মের জ্যেষ্ঠপুত্র, ভাবী রাজার পিতা হিসেবে সিংহাসন নিজের অধিকারে আনতে চান। গান্ধারী স্বামীকে সেই সুখটুকু, সেই স্বস্তিটুকু দিতে চেয়েছিলেন। ফলে কুন্তীর পুত্র ভাবী যুবরাজ হয়ে জন্মাল—এই ভাবনা যেমন গান্ধারীর মনে ঈর্ষার জন্ম দিল, তেমনি স্বামী ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর মানসিক জটিলতার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে আনার যে প্রয়াস গান্ধারী করতে চেয়েছিলেন তাও ব্যর্থ হয়ে গেল—এই কথা ভেবে গান্ধারী দুঃখে আকুল হলেন। এই দুই অনুভূতিরই যৌথ পরিণাম—গান্ধারীর গর্ভপাতের চেষ্টা। গান্ধারীর গর্ভপাত হল ঠিকই কিন্তু তাতেও গান্ধারী পুত্রের মুখ দেখতে পেলেন না। তাঁর গর্ভ থেকে প্রসূত হল একটি লৌহ কঠিন মাংসপেশী—

ততো জজ্ঞে মাংসপেশী লৌহষ্ঠীলেব সংহতা।

গান্ধারী সেই লৌহকঠিন মাংসপিণ্ডটি ফেলে দেবেন বলে স্থির করলেন। এই সময় আবারও হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন গান্ধারীর শ্বশুরপ্রতিম মহর্ষি ব্যাস। তিনি ধ্যানযোগে জানতে পেরেছিলেন গান্ধারীর মনের কথা। ব্যাস গান্ধারীকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এই মাংসপিণ্ডকে নিয়ে কী করতে চলেছ—

কিমিদং তে চিকীর্ষিতম্।

গান্ধারী তাঁর হৃদয়ের সমস্ত কথাই অকপটে নিবেদন করলেন ব্যাসকে। কুন্তীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েই যে তিনি নিজের গর্ভে আঘাত করেছিলেন —সেকথাও গান্ধারী স্বীকার করে নিলেন। তারপর একটু অভিমান করেই গান্ধারী শ্বশুরকে বললেন—আপনি যে একশত পুত্রলাভের বর দিয়েছিলেন আমাকে, সেখানে শতপুত্র তো দূরে থাক, আমার গর্ভে এই মাংসপিণ্ডটি জন্ম নিয়েছে মাত্র—

শতঞ্চ কিল পুত্রাণাং বরো দত্তস্ত্বয়া পুরা।
ইয়ঞ্চ মে মাংসপেশী জাতা পুত্রশতায় বৈ॥

ব্যাস গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—গান্ধারী! আমি বৃথা আলাপের সময়েও কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। সুতরাং তোমাকে যে বর আমি দিয়েছি তাও ব্যর্থ হবার নয়। তুমি একশত ঘৃতপূর্ণ কলসের ব্যবস্থা কর।

এদিকে ব্যাস সেই মাংসপিণ্ডটিকে শীতল জলে সিক্ত করতে থাকলেন। ধীরে ধীরে সেটি একশত সন্তান বীজে বিভক্ত হল।

গান্ধারী ততক্ষণে বুঝেছেন যে, এই মাংসপিণ্ড থেকেই তাঁর শতপুত্র জন্ম নেবে। পুত্রলাভের আনন্দে তিনি তখন আত্মহারা। তবু মনে মনে ভাবতে লাগলেন—লোকে মেয়ে-জামাই নিয়ে কতো আদর-আহ্লাদ করে। একশোটি ছেলে তো আমার হলই, তাদের সকলের থেকে ছোটো একটি মেয়েও যদি হত তাহলে বড়ো ভালো হতো—

মমেয়ং পরমা তুষ্টি দুহিতা মে ভবেদ্ যদি॥
অধিকা কিল নারীণাং প্রীতির্জামাতৃজা ভবেৎ।
যদি নাম মমাপিস্যাদ্ দুহিতৈকা শতাধিকা॥
কৃত্যকৃত্যা ভবেয়ং বৈ পুত্রদৌহিত্র সংবৃতা।

ব্যাস গান্ধারীর মাতৃহৃদয়ে কন্যাসন্তান লাভের যে আকুতি ছিল, তাও যেন ধ্যানযোগে জানতে পারলেন। তিনি গান্ধারীকে এসে আনন্দ সংবাদ শোনালেন—তোমার গর্ভজাত মাংসপিণ্ডটি শতভাগে বিভক্ত হয়েছে। এর থেকেই তোমার শতপুত্রের জন্ম হবে। কিন্তু তার পরেও দেখছি একটা ভাগ বেশি হয়েছে। এটি থেকে জন্ম নেবে তোমার ভাগ্যবতী কন্যাসন্তান—

এষা তে সুভগা কন্যা ভবিষ্যতি যথেপ্সিতা।

ব্যাসের নির্দেশ মতো সেই শত সন্তানবীজকে সযত্নে রক্ষা করা হল ঘৃতকুম্ভে। তারপর একবছর পর সেই কুম্ভ থেকে প্রথম জন্ম নিলেন দুর্যোধন। আরও একমাসের মধ্যে গান্ধারীর বাকি পুত্ররা এবং কন্যা সন্তান জন্ম নিল।

গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন যেদিন জন্মালেন, সেই দিনই শতশৃঙ্গ পর্বতে কুন্তীর গর্ভে ভীমের জন্ম হয়। যুধিষ্ঠিরের থেকে দুর্যোধন এবং ভীম দুজনেই এক বছরের ছোটো। তবু ধৃতরাষ্ট্র এই জ্যেষ্ঠপুত্রটিকে কেন্দ্র করে রাজ্যলাভের স্বপ্নজাল বুনতে আরম্ভ করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের এই অকারণ রাজ্যলোভ থেকেই ভবিষ্যৎ জ্ঞাতিকলহের প্রথম অঙ্কুরেরও জন্ম হল। চারদিকে দুর্লক্ষণ দেখা দিল। বিদুর সেই জ্ঞাতিকলহের পদশব্দ শুনতে পেয়েই যেন ধৃতরাষ্ট্রকে বার বার অনুরোধ করলেন— আপনার এই জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে আপনি ত্যাগ করুন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথা মানলেন না—শুধু যে অন্ধ পুত্রস্নেহের দ্বারা চালিত হয়ে তাই নয়, সিংহাসন লাভের স্বপ্নটুকুকে তিনি ভঙ্গ হতে দিতে চান না বলেও বটে। তবে আশ্চর্যভাবে এ ঘটনায় গান্ধারীর প্রতিক্রিয়া বিষয়ে মহাভারতের কবি নীরব। বিদুরের কথা শুনে গান্ধারীও অসীম মমতায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রটিকে দু-বাহুতে আঁকড়ে ধরেছিলেন কী না—সে সংবাদ মহাভারতে উল্লিখিত হয়নি।

[মহা (k) ১.১১৫.১-৪১; ১.১১৬.৪-১৯;
(হরি) ১.১০৯.১-৪২; ১.১১০.৪-১৯;
ভাগবত পু. ৯.২২.২৬; মৎস্য পু. ৫০.৪৭-৪৮;
বায়ু পু. ৯৯.২৪২; বিষ্ণু পু. ৪.২০.১১]

□ গান্ধারীর পুত্র প্রতিপালন সম্পর্কে মহাভারতের কবি নীরব। ছোটো ছোটো শিশুগুলিকে নিয়ে তাঁর দিন কেমন করে কাটছিল, তাদের একটু একটু করে বড়ো হতে দেখে তাঁর মাতৃহৃদয় কতটা আনন্দিত হচ্ছিল—সে সম্পর্কেও মহাভারতের কবি এক আশ্চর্য নীরবতা অবলম্বন করেছেন। কুরুরাজপরিবারের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে গান্ধারীর এমন অখণ্ড নীরবতা আমাদের একটু বিস্মিত করে।

গান্ধারীর পুত্রেরা কীভাবে জন্ম নিলেন, সে প্রশ্ন রাখার সময় রাজা জনমেজয় বৈশম্পায়নকে একথাও জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র স্বামী হিসেবে গান্ধারীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন। আমরা কুরুরাজপরিবারের নানা ঘটনার মাঝে নীরব স্বেচ্ছান্ধ গান্ধারীর দাম্পত্য জীবনের দিকে আলোকপাত করতে পারি এখন।

বিবাহের সময় গান্ধারী ভেবেছিলেন, স্বামী তাঁর শুধুই অন্ধ, ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রে আর কোনো দোষই নেই। সেই অন্ধত্বের প্রতি সহমর্মিতায় স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব বরণ করেছিলেন গান্ধারী। সিংহাসনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের যে লোভ—তাকে সমর্থন না করেও গান্ধারী হয়তো ভেবেছিলেন যে, এ জটিলতার কারণও ধৃতরাষ্ট্রের জন্মান্ধতা। তাই স্বামীর অনুগমন করার জন্য, স্বামীকে সুখী করার জন্য জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের জননী হবার ক্ষেত্রেও গান্ধারীর আন্তরিক ইচ্ছার কোনো অভাব ছিল না। তবু এতসব করেও ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ে কিংবা জীবনে একচ্ছত্র আসন গান্ধারী পাননি। তাঁর পাতিব্রত্যের জন্য, তাঁর স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব বরণের জন্য সকলের কাছেই তিনি তপস্বিনীর মতো মাননীয়া ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রও পতিব্রতা গান্ধারীকে সম্মান করতেন যথেষ্টই। গান্ধারী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রবতী পট্টমহিষীর মর্য্যাদাও বহন করতেন। ভবিষ্যতে জটিল পরিস্থিতিতে বহুবার রাজসভায় রাজমহিষী গান্ধারীর সুচিন্তিত মতামত, সমালোচনা আমরা শুনতে পাব। ধৃতরাষ্ট্র সেই মতামতকে রাজসভার অন্যান্য প্রধান অমাত্যদের মতোই গুরুত্বও দিতেন। তবু ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর সিংহাসনমোহ, পাণ্ডবদের প্রতি ঈর্ষা-অসূয়া, কিংবা পুত্রদের সম্পর্কেও গান্ধারীর সঙ্গে অন্তঃপুরে কোনো নিভৃত আলাপচারিতায় ব্যস্ত থাকতে দেখিনা কখনো। গান্ধারীর বৈশ্যা দাসী ছাড়াও রাজ অন্তঃপুরে ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য পত্নী বা ভোগ্যা স্ত্রীলোকের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। স্বামীর অনুগমন করা সত্যিই গান্ধারীর তপস্যা হয়ে উঠেছিল প্রায়। তাই সপত্নীদের নিয়ে গান্ধারীকে কোনো ক্ষোভ বা ঈর্ষা প্রকাশ করতেও আমরা দেখিনা। পূজনীয়া দেবীর মতোই জীবন কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন গান্ধারী। একমাত্র প্রেয়সী মহিষী হতে না পারার দুঃখও কোনোদিন তাঁর মুখে প্রকাশ পায়নি।

তবে নীরবে স্বামীর অনুগমন করলেও ধৃতরাষ্ট্রের কার্যকলাপ যে তিনি একনিষ্ঠভাবে সমর্থন করছিলেন না—তার প্রমাণও আমরা

পরবর্তী সময়ে পাব। গান্ধারীর মুখে স্বামীর কঠোর সমালোচনাও শুনতে পাব আমরা। কিন্তু তা শুনতে পাব একেবারে চরম জটিল পরিস্থিতিতে, তার আগে নয়। হয়তো গান্ধারী নিজের ইচ্ছাতেই এই নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন।

□ যাই হোক, গান্ধারীর পুত্ররা জন্মাবার পরেও বেশ কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। শতশৃঙ্গ পর্বতে মৃত্যু হয়েছে পাণ্ডুর। পাণ্ডুর মৃতদেহ এবং বালক পাণ্ডুপুত্রদের নিয়ে কুন্তী যখন হস্তিনাপুর রাজভবনের দ্বারে এসে পৌঁছালেন, তখন অন্যান্যদের সঙ্গে গান্ধারীকেও আমরা সেখানে উপস্থিত থাকতে দেখি। ক্রমে পাণ্ডব-কৌরব রাজকুমাররা বড়ো হলেন, তাঁদের অস্ত্রশিক্ষা শেষ হল। শিক্ষান্তে রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষার যে প্রদর্শনী আয়োজিত হল, সেখানেও গান্ধারীকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। রঙ্গভূমির একপাশে রাজা-রানী এবং রাজপরিবারের সকলের বসার যে ব্যবস্থা হয়েছিল, সেখানে রাজমহিষীর উপযুক্ত আসনে বসেছিলেন গান্ধারী। ঠিক পাশে বসেছিলেন কুন্তী। তিনি গান্ধারীকে রঙ্গভূমির সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে শোনাচ্ছিলেন।

[মহা (k) ১.১২৬.১৬; ১.১৩৪.১৫, ৩৫; (হরি) ১.১২০.২৪; ১.১২৯.১৫,৩৬]

□ বারণাবতে যাবার আগে কুরুরাজ-পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের, গুরুজনদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় যুধিষ্ঠির গান্ধারীকেও প্রণাম করেছিলেন। গান্ধারীও অন্যান্য গুরুজনদের মতোই স্নেহাশীর্বাদ দিয়েছিলেন পাণ্ডবদের। বারণাবতে জতুগৃহের ষড়যন্ত্রের কথা ধৃতরাষ্ট্রের সামান্য জানা থাকলেও, গান্ধারী এর আভাসমাত্রও পাননি।

[মহা (k) ১.১৪৩.১৪; (হরি) ১.১৩৭.১৪]

□ এরপর আবার হস্তিনাপুরে দ্যূতক্রীড়ার আগে গান্ধারীর উল্লেখ পাই আমরা। পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে হস্তিনাপুরে এসে যখন গান্ধারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তখন গান্ধারী রাজঅন্তঃপুরে বসে আছেন শতপুত্রবধূ পরিবৃত হয়ে—যেন অন্যান্য নক্ষত্র পরিবৃত হয়ে উজ্জ্বলভাবে অবস্থান করছেন রোহিণী নক্ষত্র—

দদর্শ তত্র গান্ধারীং দেবীং পতিমনুব্রতাম্।
স্নুষাভিঃ সংবৃতাং শশ্বত্তারাভিরিব রোহিণীম্॥

তবে পাশা খেলা আরম্ভ হবার আগে যখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণ, কৃপ সকলের রাজসভায় প্রবেশের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেসময় গান্ধারীর সভাভবনে প্রবেশের কোনো উল্লেখ নেই। সম্ভবত দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারী এই পাশাখেলার মধ্যে চরম অমঙ্গলের অশনি সংকেত দেখেছিলেন। তাই অন্তঃপুরে আপন কক্ষে অন্যান্য পুরনারীদের নিয়ে বসেছিলেন শোকার্ত গান্ধারী। গান্ধারী সভায় ছিলেন না বলেই ধারণা হয়—কারণ পাশাখেলার যে সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে, সেখানে দুর্যোধনের পৈশাচিক বিজয়োল্লাস, তার সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি বিদুর ভীষ্ম প্রভৃতিদের মানসিক অবস্থা কিংবা আচার আচরণে ফুটে ওঠা ক্ষোভ-দুঃখ-অসহায়তার উল্লেখ থাকলেও গান্ধারীর কোনো উল্লেখ মেলে না। যুধিষ্ঠির যখন দ্রৌপদীকে পণ রাখলেন, সেই সময় লজ্জায় অপমানে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপরা সভায় বসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন, ঘেমে উঠছেন, বিদুর কঠোর ভাষায় দুর্যোধনকে তিরস্কার করছেন—এমন পরিস্থিতিতেও গান্ধারীর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী উপস্থিত থাকলে একেবারে চুপ করে থাকতেন না বলেই মনে হয়। তবে দ্রৌপদীকে দুঃশাসন সভায় টেনে আনার পর গান্ধারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। হয়তো দুঃশাসনের এমন পৈশাচিক কাজের খবর পেয়ে পুরনারী পরিবৃতা হয়ে অন্ধ গান্ধারী ছুটে এসেছিলেন রাজসভায়। কারণ ধৃতরাষ্ট্র নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, গান্ধারী প্রচণ্ড আর্ত চীৎকার করে উঠেছিলেন দ্রৌপদীর অবস্থা দেখে, প্রচণ্ড ভর্ৎসনাও করেছিলেন—

ভরতানাং স্ত্রিয়ঃ সর্বা গান্ধার্য্যা সহ সঙ্গতাঃ।
প্রাক্রোশন্ ভৈরবং তত্র দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাং সভাগতাম্॥

দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীকে সভায় টেনে আনছিলেন, সেসময় দুঃশাসনের হাত থেকে বাঁচার জন্য দ্রৌপদী অন্যান্য রানীদের কাছে আশ্রয় নিতে গিয়েছিলেন, তবে সাহায্য তেমন পাননি। দুঃশাসন হাত ছাড়িয়ে গান্ধারীর কক্ষে ছুটে যাবার মতো উপযুক্ত সময়ও দ্রৌপদী হয়তো পাননি। তবে দ্রৌপদীকে সভায় টেনে আনার খবর শুনেই গান্ধারী পুরস্ত্রীদের নিয়ে ছুটে এসেছিলেন—এমনটা মনে হবার আরও বড়ো কারণ—দ্রৌপদী সভায় এসে কুরু প্রবীণদের

প্রত্যেকের কাছে এমন জঘন্য অন্যায়ের প্রতিকার চেয়েছেন, প্রত্যেকের সামনেই প্রশ্ন রেখেছেন যে তাঁর এমন অপমান ন্যায়সঙ্গত কী না। দ্রৌপদী তাঁর এই শাশুড়ীকে খুব ভালো করেই চিনতেন। অন্তত তাঁর ন্যায়পরায়ণতা যে প্রশ্নাতীত এবং পুত্রবধূর এমন দুর্দশা যে তিনি সহ্য করবেন না—এ ব্যাপারে দ্রৌপদীর মনেও হয়তো সংশয় ছিল না। এ অবস্থায় কুরুরাজসভায় রাজমহিষী গান্ধারী উপস্থিত থাকলে দ্রৌপদী তাঁর কাছেও ছুটে যেতেন নিশ্চয়। সুতরাং ধারণা হয়, গান্ধারী প্রথমে সভায় ছিলেন না—পরে এসেছিলেন। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার পর চারদিকে নানা দুর্লক্ষণ দেখা গেল। গান্ধারী এবং বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে পাশা খেলা বন্ধ করার উপদেশ দিলেন। যে ধৃতরাষ্ট্র এতক্ষণ দুর্যোধনের বর্বরোচিত উল্লাস উপভোগ করছিলেন, তিনিই এবার দুর্যোধনকে তিরস্কার করে বললেন—দুর্বুদ্ধি দুর্যোধন! তুই কী একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিস যে এই কুরুরাজসভার মধ্যে এমনভাবে পাণ্ডবদের ধর্মপত্নী দ্রৌপদীর সঙ্গে কথা বলছিস!—

হতো'সি দুর্যোধন মন্দবুদ্ধে যস্ত্বং
সভায়াং কুরুপুঙ্গবানাম্।
স্ত্রিয়ং সমাভাষসি দুর্বিনীত
বিশেষতো দ্রৌপদীং ধর্মপত্নীম্।।

তবে দুর্যোধনের প্রতি এই তিরস্কারের মধ্যে যে ঘৃণা আছে, বাড়ির বউ, কুলবধূর সঙ্গে এমন অসভ্যতা করছিস—এমন তিরস্কারের মধ্যে যে রমণীসুলভ মর্য্যাদাবোধ আছে—তা শুনে মনে হয় ধৃতরাষ্ট্র নয়, গান্ধারীর মুখ থেকেই প্রথমে বেরিয়েছিল এই কথাগুলি।

যাই হোক, ধৃতরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবদের হৃত রাজ্য, সম্পদ সবকিছু ফিরিয়ে দিলেন। একরকম বাধ্য হয়েই দিলেন। কিন্তু দ্যূতসভার ঘটনার পর গান্ধারীর চরিত্রে বড়ো পরিবর্তন এসেছে। এতকাল ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যলোভ, জ্ঞাতিবিদ্বেষ, দুর্যোধনের ষড়যন্ত্রের কোনো কিছুই সমর্থন না করলেও গান্ধারী তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। নীরবে অন্তরালে থেকেছেন। হয়তো দ্রৌপদীর অপমানের আগে তিনি তেমনভাবে বোঝেননি যে, পুত্রদের অসভ্যতা, বর্বরতা এমন কুৎসিত পর্যায়ে পৌছেছে।

কিন্তু দ্রৌপদীর অপমানের মুহূর্ত থেকে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের পাশ থেকে সরে গেছেন। আস্থিত হয়েছেন আপন স্বতন্ত্রতায়। অতএব যে মুহূর্তে তিনি শুনলেন যে, পাণ্ডবদের আবারও একবার পাশাখেলার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, সেই মুহূর্তে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পৌঁছেছেন। মহাভারতের কবি লিখেছেন যে, গান্ধারী মূলত দুটি কারণে আজ ধৃতরাষ্ট্রের সামনে এসেছেন। প্রথমত, স্নেহবশত, দ্বিতীয়ত ভয়ে—

পুত্রস্নেহাদ্ ধর্মপূর্বং গান্ধারী শোককর্ষিতা।

ধৃতরাষ্ট্রের যে স্নেহ এতাবৎকাল দুর্যোধনের হৃদয়-নিহিত তৃষ্ণা এবং রাজ্যলোভ বাড়িয়ে তুলেছে—এইটাকে স্নেহ বলে না। যে স্নেহ তাঁকে সত্যি মানুষ করে তুলতে পারে, আজ গান্ধারী সেই স্নেহে কথা বলছেন—সেই স্নেহ—যার অনুবন্ধে ধর্ম আছে, নিয়মের নিয়ন্ত্রণ আছে—পুত্রস্নেহাদ্ ধর্মপূর্বং—দ্বিতীয়ত সেই বাস্তব—গান্ধারী এবার ভয় পাচ্ছেন। ক্ষত্রিয়গৃহের বধূ হিসেবে ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা তিনি চেনেন। রাজসভায় সকলের সামনে ভীম দুর্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন, দুঃশাসনের রক্তপান করার প্রতিজ্ঞাটাও ভীমেরই, যিনি কখনো অপমান ভুলে যান না। তা ছাড়া দ্রৌপদীর যে অপমান ঘটেছে, তার প্রতিশোধস্পৃহা সমস্ত পাণ্ডবদের সব সময় তাড়িত করবে চরম ফলাফলের জন্য। এরই মধ্যে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র আবারও পুত্রের কথায় চালিত হয়ে পাণ্ডবদের পুনরায় পাশাখেলায় আহ্বান করার চিন্তা করছেন। গান্ধারী তাই এগিয়ে এসেছেন সেই স্বামীর কাছে, যিনি পুত্রের মধ্যে নিজের লোভ সঞ্চারিত করছেন এবং পুত্রের কারণেই যার বুদ্ধি স্থির থাকে না।

গান্ধারী কোনো ভণিতা না করেই বললেন—দুর্যোধন জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই মহামতি বিদুর এই পুত্রটিকে মেরে ফেলার কথা বলেছিলেন—জাতে দুর্যোধনে ক্ষত্তা মহামতিরভাষত। এই ছেলে জন্মের সময়েই শেয়ালের মতো বিকৃত স্বরে চেঁচিয়ে উঠেছিল, সেই অমঙ্গল কিন্তু এই বংশের ধ্বংস ডেকে আনবে। এই প্রথম গান্ধারী বিদুরের কথা উচ্চারণ করছেন শ্রদ্ধাসহকারে। শৃগালের বিকৃত স্বরের মধ্যে যে দুর্লক্ষণ আছে সেটা দিয়েই যে পুত্রের ভবিষ্যৎ-ক্রিয়া নির্দেশ করা যায় না, সেটা তিনি

জানেন। বস্তুত দুর্যোধন জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র যেভাবে রাজ্যলোভে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন, সেটাই যে বাস্তবিক অমঙ্গল সূচনা করে দিয়েছিল, তার দিকে খেয়াল রেখেই আজ গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন—তুমি নিজের দোষে এই দুঃখসমুদ্রে ডুবিয়ে দিও না নিজেকে। মূর্খ এবং অশিষ্ট পুত্রেরা তোমাকে যা বলছে তুমি তাই করছ। ওদের কথা এইভাবে নির্বিচারে মেনে নিও না তুমি—

মা বালানাম্ অশিষ্টানাম্ অনুসংস্থা মতিং প্রভো।

গান্ধারী কিন্তু ছেলেদের দোষ দিচ্ছেন না তেমন করে। ওই একবার মাত্র বিদুরের কথা বলে দুর্যোধনের জন্মমাত্রিক রাজনৈতিক সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন গান্ধারী। কেননা দুর্যোধনের জন্মলগ্নেই জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অতিক্রম করে দুর্যোধনকেই রাজা করার ভাবনা ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। সেই পুত্রকে মানুষ করার সময়েও নিজের ঈর্ষা-অসূয়াগুলি পূর্ণমাত্রায় সংক্রমিত করে তার লোভ এবং কামনার ইন্ধন তিনিই জুগিয়ে যাচ্ছেন। এত বড়ো একটা গণ্ডগোলের পর পাণ্ডবরা বাড়ি পৌঁছনোর আগেই মাঝপথ থেকে তাঁদের তুলে এনে পাশা খেলতে বসানোর পরিকল্পনাটা যদি ধৃতরাষ্ট্র অনুমোদন না করতেন, তা হলে দুর্যোধনের লেশমাত্র ক্ষমতা ছিল না ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে ডেকে আনার। গান্ধারী সরাসরি ধৃতরাষ্ট্রকে দায়ী করে বলেছেন—এই বংশের ধ্বংসলীলায় তুমি কেন এমন কারণ হয়ে উঠছ—

মা কুলস্য ক্ষয়ে ঘোরে কারণং ত্বং ভবিষ্যসি।

কৌরবরা কৌরবদের জায়গায় আছে, পাণ্ডবরা পাণ্ডবদের জায়গায়, তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সুস্থ সেতু রচিত হয়ে গেছে রাজ্য ভাগ করে দেবার পর থেকেই। সেই আত্মীয়তার সেতুটুকু তো তুমিই ভেঙে দিচ্ছ। বিশেষত রাজসভায় এই ঘৃণ্য কাণ্ড ঘটে গেল, কেবলই পাণ্ডবরা শান্ত হয়েছে, তুমি আবারও সেই নির্বাপিত অগ্নি কেন জ্বালিয়ে তোলার চেষ্টা করছ—

বদ্ধং সেতু কো নু ভিন্দ্যাদ্ ধমেচ্ছান্তঞ্চ পাবকম্।

গান্ধারী ভেবেছিলেন—দ্যূত-সভায় যে-অপমানই হয়ে থাকুক, ধৃতরাষ্ট্র দানে-মানে পাণ্ডবদের যেভাবে তুষ্ট করেছেন, তাতে আপাতত তাঁদের প্রজ্জ্বলিত ক্রোধ শান্ত হয়েছে হয়তো। কিন্তু এই যে আবার অর্ধপথ থেকে তাঁদের ডেকে আনা হচ্ছে পুনরায় পাশাখেলার জন্য, তাতে তো পাণ্ডবদের সমস্ত সংবৃত ক্রোধ পুনরায় আসবে এবং সেই ক্রোধ যে একটি বিখ্যাত বংশ ধ্বংস করে দেবে—সেটা গান্ধারী মনে-প্রাণে বুঝতে পারছেন এখন। গান্ধারী বললেন—পাণ্ডবরা যেভাবেই হোক শান্ত হয়েছে, তুমি একবার ভাবো তো—কোনো সুস্থ মানুষ কি আবার তাদের ক্রোধ জাগিয়ে তুলবে? তুমিও হয়তো আমার মতোই এই কথাটা বেশ বুঝতে পারছ, কিন্তু তবু আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আবার। নিয়ম, আচার, শাস্ত্র—এগুলো দুর্বুদ্ধি, দুষ্টজনকে কোনো শিক্ষা দিতে পারে না, তাকে মঙ্গলের দিকেও চালিত করতে পারে না অথবা অমঙ্গল থেকেও তাকে নিবৃত্ত করতে পারে না—

শাস্ত্রং ন শাস্তি দুর্বুদ্ধিং শ্রেয়সে চেতরায় চ।

আর কোনো বুড়ো মানুষ নিশ্চয়ই বাচ্চা ছেলের যেমন বুদ্ধি, তেমন বুদ্ধি নিয়ে কাজ করে না, যা তুমি করতে চাইছ—

ন বৈ বৃদ্ধো বালমতির্ভবেদ্ রাজন্ কথঞ্চন।

এই শেষ কথাটায় গান্ধারী ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের বুদ্ধিতেই চলছেন, তাঁর নিজের বুদ্ধিতে নয়। গান্ধারী বোঝেন—তাঁর অন্ধ স্বামীর হৃদয়ে অদ্ভুত এক দ্বৈরথ কাজ করে। কখনো তিনি বেশ ভালো, ছোটো ভাই পাণ্ডুর ছেলেদের তিনি আপন পিতৃত্বের বাৎসল্যে অভিষিক্ত করেন, কিন্তু পরক্ষণেই পুত্রের স্বার্থ সেই পিতৃত্বের মহিমা কলুষিত করে দেয়। গান্ধারী বললেন—তোমার ছেলেদের চলার পথে তুমি তাদের প্রকৃত চক্ষু হয়ে ওঠো, এই আমি চাই। আমি চাই তুমি তাদের পথ দেখাও, তা নইলে একদিন বিপক্ষের আঘাতে তারা ধ্বংস করে ফেলবে নিজেদেরই—

ত্বন্নেত্রাঃ সন্তু তে পুত্রা মাং ত্বাং দীনাঃ প্রহাসিষুঃ।

ছেলের ওপর অন্ধ বাৎসল্যে তুমি দুর্যোধনকে ত্যাগ করোনি, কিন্তু আজকে যে সময় এসেছে, তুমি ত্যাগ করো এই ছেলেকে। আমার কথা রাখো—ত্যাগ করো এই বংশনাশা দুর্যোধনকে—

তস্মাদয়ং মদ্বচনাৎ ত্যাজ্যতাং কুলপাংসনঃ।

বরঞ্চ আগেই যদি বিদুরের কথায় এই একটি ছেলেকে তুমি ত্যাগ করতে, তা হলে আজকে এই সামগ্রিক ধ্বংসের মুখে এসে পড়তে হত না। তুমি তাকে ছাড়নি, তার ফল পাচ্ছি—

তস্য প্রাপ্তং ফলং বিদ্ধি কুলান্তকরণায় হ।

গান্ধারী তাঁর স্বামীকে আগেও দেখেছেন, আগেও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এতখানি মান-মর্য্যাদাহীন তিনি ছিলেন না বোধহয়। এই মানুষটাই তো পিতৃহীন পাণ্ডবদের আশ্রয় দিয়েছিলেন, এই মানুষটাই তো রাজ্য ভাগ করে দিয়ে পাণ্ডবদের নিজস্ব সত্তা প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধারীর মনের মধ্যে সেই কুচক্রী রাজার ছায়া পড়ে—এই মানুষটাই জতুগৃহে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনায় শামিল ছিলেন; এই মানুষটাই রাজসভায় বসে বসে যৌবনবতী পুত্রবধূর বস্ত্রহরণের রোমাঞ্চ অনুভব করলেন মানস-চক্ষে অথবা পুত্রদের নয়ন-মাধ্যমে। গান্ধারী কেমন মেলাতে পারেন না সবকিছু। প্রিয় স্বামীর এই মানসিক বিক্রিয়া তাঁকে পীড়িত করছে। তিনি বুঝেছেন—দুর্মদ অশালীন জ্যেষ্ঠপুত্রকে ধৃতরাষ্ট্র কিছুতেই ছেড়ে থাকতে পারবেন না। শেষবাক্যে তাই বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন স্বামীকে—আগে কিন্তু তোমার বুদ্ধি নির্মল ছিল, সেই বুদ্ধির মধ্যে শান্তি, ধর্ম এবং ন্যায়ের অভিসন্ধি ছিল। আজকে যখন তুমি তোমার আপন ভ্রাতুষ্পুত্রদের আবারও পাশাখেলার জন্য ডেকে পাঠাচ্ছ, তখন সেই ন্যায়-ধর্মের বুদ্ধি ফিরে আসুক তোমার মধ্যে—

শমেন ধর্মেণ নয়েন যুক্তা/
সা তে বুদ্ধিঃ সা'স্তু তে মা প্রমাদীঃ।

—তুমি এমন করে উদাসীন বসে থেকো না। এটা ভালো করে জেনে রেখো—রাজলক্ষ্মী যদি ক্রূর নৃশংস অন্যায়ী মানুষের হাতে ন্যস্ত হয়, তবে সেই রাজলক্ষ্মী ধ্বংস ডেকে আনবে, আর সে যদি কোমল ভদ্রলোকের হাতে থাকে, তবে সেই বাড়িতেই রাজলক্ষ্মী তার নিজের বয়স বাড়িয়ে প্রৌঢ়া হয়ে ওঠে, নাতি-নাতনি পর্যন্ত তাঁর স্নেহচ্ছায়া প্রসারিত হয়—

প্রধ্বংসিনী ক্রূরসমাহিতা শ্রীঃ/
মৃদুপ্রৌঢ়া গচ্ছতি পুত্র-পৌত্রান্।

ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু গান্ধারীর এই সুচিন্তিত ভাবনার কোনো মূল্য দিলেন না। আসলে প্রথম পাশাখেলার পর পাণ্ডবদের হৃতসম্পদ যেভাবে ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল তা হয়তো ধৃতরাষ্ট্রের নিজেরও তেমন পছন্দ হয়নি। তাই পাশাখেলার দ্বিতীয় প্রস্তাবটি আশার সঙ্গে সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র তাতে সম্মতি দিয়েছেন। শকুনির হাতে পাণ্ডবরা যে আবারও পরাস্ত হবেন এবং তাঁদের সর্বস্বান্ত হয়ে বনে যেতেও হবে এবিষয়ে ধৃতরাষ্ট্র নিশ্চিন্ত। তাই গান্ধারীর দূরদর্শিতাকে লোভের বশবর্তী হয়েই সমর্থন করার প্রয়োজন দেখছেন না ধৃতরাষ্ট্র। মনে মনে হিতৈষিণী স্ত্রীর কথা তিনি মোটেই মানতে পারছেন না আবার সেই পরম হিতৈষিণী স্ত্রীর সামনে নিজের লোভের কথাটা স্বীকার করতেও পারলেন না। তাই পুত্র দুর্যোধনের উপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে বললেন—কী আর করবে বলো, কপাল, সবই কপাল, ও শেষ হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে এই বংশ। আমি অনেক বুঝিয়েছি। পারিনি ও শুনবে না—

অথাব্রবীন্মহারাজো গান্ধারীং ধর্মদর্শিনীম্।
অন্তঃ কামং কুলস্যাস্তু ন শক্নোমি নিবারিতুম্॥
যথেচ্ছন্তি তথৈবাস্তু প্রত্যাগচ্ছন্তু পাণ্ডবাঃ।
পুনর্দ্যূতং প্রকুর্বন্তু মামকাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ॥

একমাত্র ধৃতরাষ্ট্রই পারতেন এই পাশাখেলা ঠেকাতে। কিন্তু শুধু পুত্রের নয়, তাঁর নিজের অন্তরেও প্রচণ্ড রাজ্যলোভ, সম্পদলীপ্সা বহুকাল ধরে রয়েছে। আজ পাণ্ডবদের সর্বস্বান্ত করে দেবার ভাবনায় তিনি নিজেই মনে মনে পরম আনন্দ লাভ করছেন। গান্ধারীর যুক্তি শুনেও না শোনার ভান করে যেভাবে পুত্রের আর ভাগ্যের উপরে সম্পূর্ণ দোষ চাপিয়ে দিলেন ধৃতরাষ্ট্র, তাতে বেশ বোঝা যে, ছেলেদের উপর যতই তিনি দোষ চাপিয়ে দিন, তিনি নিজেও ওই একই ভাবনায় শামিল। তিনি নিজেই চান—পাশাখেলা হোক।

ধৃতরাষ্ট্রের কৃত্রিমতা আমরা বুঝতে পারছি, দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীও তা বুঝলেন। এবং আবারও নীরব হয়ে রইলেন। পাশাখেলার পর পাণ্ডবরা যখন বনে গেলেন, তখন পাণ্ডবদের বিদায় নেবার সময়েও আমরা গান্ধারীকে উপস্থিত থাকতে দেখি না। এমনকী কুন্তী যখন পুত্রদের বনবাস আর পুত্রবধূ দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় শোকে দুঃখে আকুল হয়ে বিলাপ করছেন, তখনও গান্ধারী কুন্তীকে সমবেদনা জানাতে আসেননি। কুন্তীর প্রতি

গান্ধারীর এই ঔদাসীন্য আমাদের বড়ো বিস্মিত করে। কুন্তীর বিলাপ শুনে সান্ত্বনা দিতে আসার কিংবা ছোটো জা কে নিজের ভবনে, নিজের স্নেহছায়ায় স্থান দেবার কর্তব্য তো গান্ধারীরই ছিল। প্রশ্ন জাগে—পাণ্ডব ভাইদের প্রতি কিংবা কুলবধূ দ্রৌপদীর প্রতি অপরিসীম স্নেহ এবং করুণা যাঁর হৃদয়ে ছিল, সেই গান্ধারী কুন্তীকে কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করেন না কেন? সেই বহুদিন আগে যখন কুন্তীর পুত্রজন্মের সংবাদ শুনে ঈর্ষায় কাতর হয়ে গান্ধারী নিজের গর্ভে আঘাত করলেন—তবে থেকে কুন্তীর প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য হয়তো সেই ঈর্ষার দ্বারাই চালিতে হয়ে আসছে। আরও বড়ো কথা—গান্ধারীর হয়তো মনে হয় যে তাঁর গর্ভ প্রসূত হবার আগেই যদি কুন্তী সন্তানের জন্ম না দিতেন—তাহলে জ্ঞাতি-শত্রুতার এমন দীর্ঘ ইতিহাস রচিতও হত না হয়তো। গান্ধারীর চোখে তাই জ্ঞাতি শত্রুতার মূল কারণ কুন্তীই কিংবা বলা ভালো কুন্তীর মাতৃত্ব। কুন্তীর মাতৃত্বকে গান্ধারীর মতো ধর্মশীলা, ধৈর্যশীলা রমণীরও ঈর্ষা করার কারণ আছে। তবে সেটা শুধু কুন্তী জ্যেষ্ঠ কুরুরাজকুমারের জননী বলেই নয়। গান্ধারীর সম্পূর্ণ জীবন কেটে গেছে স্বামীর অনুগমনে, স্বামীর প্রতি নিষ্ঠায়, সহমর্মিতায়। শতপুত্রবতী হিসেবে তাঁর নাম উল্লিখিত হলেও তাঁর পুত্র প্রতিপালনের সংবাদ যেমন মহাভারতে নেই, তেমনই পরবর্তী জীবনেও পুত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটাও বড়ো অদ্ভুত। দুর্যোধন, দুঃশাসন কাউকেই গান্ধারীর সামনে এসে মাতৃ সম্বোধন করতে দেখা যায় না বিশেষ, আদেশ উপদেশ চাইবারও প্রশ্ন ওঠে না। এমনকী উদ্যোগপর্বে গান্ধারীর উপদেশ শুনে অমাত্য পরিবৃত রাজসভায় দুর্যোধনকে যেভাবে অবজ্ঞা প্রকাশ করতে দেখা যায়—মা হিসেবে তা গান্ধারীর মর্মে আঘাত করেছিল হয়তো, করাটাই স্বাভাবিক। প্রতিতুলনায় কুন্তীর সঙ্গে তাঁর পুত্রদের সম্পর্কের নৈকট্য অনেক বেশি। মায়ের প্রতি পুত্রদের আনুগত্য, ভক্তি-শ্রদ্ধা, সেবা-শুশ্রূষা এবং পুত্রদের প্রতি মায়ের আদেশ-উপদেশ শাসন-স্নেহের সমন্বয়ে এক অপরিসীম মাধুর্যের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকী বিভিন্ন সময়ে পাণ্ডবদের কাছ থেকে তাঁদের জ্যেষ্ঠমাতা গান্ধারী শ্রদ্ধা-ভালোবাসা যতখানি পেয়েছেন, ততখানি কাছে নিজের পুত্রদের তিনি কখনো পাননি। জননী হিসেবে নিজের একাকিত্ববোধ থেকেও হয়তো কুন্তীকে গান্ধারী ঈর্ষা করেন, কুন্তীর মতো পুত্রলাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়নি—এমনটা ভেবে ঈর্ষা করা গান্ধারীর মতো ধীরা রমণীর পক্ষেও খুব অস্বাভাবিক নয়। স্বামীর সঙ্গে গান্ধারীর সম্পর্ক নিয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছি। দ্বিতীয়বার পাশাখেলার সময় দেখছি, ধৃতরাষ্ট্র নিজের স্ত্রীর মতকে গুরুত্বও দেননা, মনের কথা খুলে বলেনও না। কাজেই স্ত্রী হিসেবে, মা হিসেবেও গান্ধারী বড়ো একা। গান্ধারীর এই একাকিত্বই তাঁর সুদীর্ঘ নীরবতারও অন্যতম কারণ। আর আজ কুন্তীকে নিজের মতোই একা হয়ে যেতে দেখেও উদাসীন থাকার জটিলতাও হয়তো এই একাকিত্ব থেকেই জাত। যাই হোক, কুন্তী বিদুরের ঘরে রইলেন, পাণ্ডবরা গেলেন বনবাসে।

[মহা (k) ২.৫৮.২৭-২৮; ২.৭৫.১-১১; ২.৮১.১৯; (হরি) ২.৫৫.২৭-২৮; ২.৭২.১-১২; ২.৭৮.১৭]

□ পাণ্ডবদের বনবাস এবং অজ্ঞাতবাসের তেরোটি বছর গান্ধারী আবার নিজেকে মুড়ে ফেলেছেন অখণ্ড নীরবতায়। ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর পুত্রদের কার্যকলাপ যে তিনি সমর্থন করতেন না, পাশাখেলার দিনে তাঁর চরম আক্রোশের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। সুবুদ্ধি প্রণোদিত হলে ধৃতরাষ্ট্রও কার্যত উপলব্ধি করেন যে, তিনি যা করেছেন বা করছেন তাতে গান্ধারীর সায় নেই; কিন্তু গান্ধারীর দিক থেকে ভাবলে বার বারই মনে হয়—ধৃতরাষ্ট্র যেমন পুত্রবাৎসল্যে অন্ধ আচরণ করছেন, তেমনই গান্ধারী যতটা পুত্রের উপর স্নেহশীল, তার চেয়েও বোধহয় তাঁর অনেক বেশি স্নেহ-বাৎসল্য আছে স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের উপর। পুত্রের ব্যাপারে তিনি হাজার কঠিন শব্দ উচ্চারণ করলেও স্বামীর অন্যায় অপকর্মগুলি তিনি তেমন কোনো অপশব্দে প্রতিহত করেন না অথবা চরম বাধা দিয়ে তা ব্যাহতও করেন না। হয়তো বিবাহের অল্পদিন পর থেকেই স্বামীর প্রতি এই স্নেহ-বাৎসল্য গান্ধারীর মনে তৈরি হয়েছে। যেদিন থেকে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের মুখে তাঁর অন্ধত্বের কষ্টগুলি শুনেছেন, অন্ধত্বের জন্য তাঁর রাজা হবার তীক্ষ্ণ বাসনা কীভাবে প্রতিপদে আহত হয়েছে, এটা যে মুহূর্তে তিনি বুঝেছেন, সেই মুহূর্ত থেকেই স্বামী নামক এই

বয়স্ক বালকটির ওপর তাঁর এক অন্যতর মায়া কাজ করে। সেই কারণেই তিনি কিছুতেই ধৃতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমন প্রতিরোধ তৈরি করতে পারেন না, যাতে তাঁর এই অন্ধ স্বামীটির উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিহত হয়, স্বামীর ভোগাকাঙ্ক্ষাকেও তিনি ঘৃণা করতে পারেন না ক্ষুব্ধ অভিমানে। স্বামীর প্রতি এই দুর্বলতার কারণেই হয়তো কুন্তী বা পাণ্ডবদের সঙ্গেও ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারেন না গান্ধারী। দুর্যোধনও যে শেষ পর্যন্ত পিতার দুর্বিনীত প্রশ্রয়ে একটি বিষবৃক্ষে পরিণত হলেন—তার জন্যও গান্ধারীর দুর্বলতাই কিছুটা দায়ী।

এমন মানসিক জটিলতার ফল দাঁড়াল এই যে, পাণ্ডবদের বনবাসের বারো বছরে একটি বারের জন্যও কুন্তীর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে এলেন না গান্ধারী। আবার ধৃতরাষ্ট্র কিংবা দুর্যোধনের প্রতিও কোনো হিতোপদেশ শোনা গেল না তাঁর মুখ থেকে।

পাণ্ডবদের বনবাস এবং অজ্ঞাতবাসের দীর্ঘ তেরোটি বছরে মাত্র কয়েকবার গান্ধারীর নাম উল্লিখিত হতে দেখি। তাও নিতান্তই অপ্রয়োজনে—দুর্যোধনের বৈষ্ণব যজ্ঞের সময় গান্ধারীর উপস্থিতির উল্লেখ মাত্র পাই আমরা। আর দ্বিতীয় বার জয়দ্রথ যখন দ্রৌপদীহরণের চেষ্টা করে পাণ্ডবদের হাতে ধরা পড়লেন তখন যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ ভীমকে বলেছিলেন—জয়দ্রথকে তুমি প্রাণে মেরো না ভীম, জননী গান্ধারীর কথা মনে রেখো, মনে রেখো ভগিনী দুঃশলার কথা—

দুঃশলামভিসং স্মৃত্য গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্।

[মহা (k) ৩.২৫৬.৫; ৩.২৭১.৪৩;
(হরি) ৩.২১২.৭; ৩.২২৫.৪৩]

□ বনবাস, অজ্ঞাতবাসের তেরো বছর কেটে যাবার পর, উদ্যোগপর্ব থেকে গান্ধারীর সুচিন্তিত মতামত আমরা বহুবার শুনতে পাব। স্বামীর সমালোচনা, পুত্রের প্রতি তিরস্কার এবং স্বামী-পুত্রের মনোগত অভিলাষের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কোটিতে অবস্থান—সবটাই গান্ধারীর চরিত্রে দেখা যাবে, নীরবতা ভঙ্গ করে তাঁকে যথেষ্টই সরব ভূমিকায় দেখতে পাব আমরা এবং গান্ধারীর এই স্পষ্টবাদিনী রূপটি আমরা দেখতে পাব গান্ধারীর মৃত্যু পর্যন্ত। অথচ এই মানুষটিই তেরো বছর চুপ করে রইলেন—ভাবতেও অবাক লাগে। তবে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারীর মনোভাব প্রসঙ্গে যে আলোচনা আমরা আগেই করেছি—গান্ধারীর এই সুদীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার কারণ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা। ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধতার জন্য গান্ধারীর হৃদয়ে যত মায়া তৈরি হয়েছিল, সেই অন্ধতার কারণে সবদিক থেকে সক্ষম এই মানুষটি রাজ্যলাভ না করায় স্বামীর প্রতি তাঁর সমব্যথা তৈরি হয়েছিল আরও অনেক বেশি। হয়তো এই কারণেই ধৃতরাষ্ট্র যা পছন্দ করেননি, অথবা যেখানে যেখানে তাঁর বিরূপতা, ঔদাসীন্য এবং শীতলতা ছিল, ঠিক সেখানে সেখানেই গান্ধারীও এতদিন উদাসীন, শীতল এবং স্পষ্টতই বিরূপ ব্যবহার করে এসেছেন। কিন্তু পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস যখন শেষ হল এবং ধীরে ধীরে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল, অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল কুরুবংশের বিনাশ—তখন ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সেই অসীম মায়া থেকেই গান্ধারী নিজের নীরবতা ভঙ্গ করেছেন।

ধৃতরাষ্ট্রের দূত হিসেবে সঞ্জয় যখন উপপ্লব্য থেকে ফিরে এলেন, সেখানে সঞ্জয়ের মুখেই প্রথম গান্ধারীর নাম আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতে শুনতে পাই। সঞ্জয় উপপ্লব্য থেকে ফিরে আসার পর ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে একান্তে ডেকে পাঠিয়েছিলেন—পাণ্ডবরা যুদ্ধের জন্য কতদূর প্রস্তুতি নিয়েছেন, তাঁদের সৈন্য-সামন্ত রথী-মহারথীদের শক্তিই বেশি না কি তাঁর কুরু সেনার শক্তি বেশি সেটাই বিশদে জানার জন্য। লক্ষণীয়, ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য ফিরিয়ে দেবার কোনো প্রস্তাব পাঠাননি ভ্রাতুষ্পুত্রদের কাছে, বরং তাঁর বক্তব্য থেকেই বেশ পরিষ্কার যে, রাজ্য ফিরিয়ে দেবার অনিচ্ছা একা দুর্যোধনের নয়, ধৃতরাষ্ট্রেরও তাতে যথেষ্ট সম্মতি আছে। আবার সঞ্জয়কে তিনি যে প্রশ্ন করলেন, তার থেকেও বেশ পরিষ্কার যে তিনি নিজেও যুদ্ধের পক্ষে। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নটা মোটে পছন্দ করলেন না। তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন যে, এই বৃদ্ধ অন্ধ রাজা নির্জনে বসে একরকম ভাবেন, আর সর্বসমক্ষে আর একরকম বলেন। তাই ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় বেশ দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলেন—আমি আপনার একার সামনে কিছু বলব না মহারাজ! আপনি আপনার পিতা মহামতি ব্যাসদেবকে

ডাকুন, ডাকুন আপনার স্ত্রী দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীকে —তাঁদের সামনেই আমি খুলে বলব সব কথা—

আনয়স্ব পিতরং মহাব্রতং/
গান্ধারীঞ্চ মহিষীমাজমীঢ়।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্জয় বুঝেছেন—ধৃতরাষ্ট্র যত স্নেহান্ধই হোন না কেন, দ্রৌপদীর অপমানের সময় গান্ধারী যখন কৌরব কুলবধূদের নিয়ে তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করেছিলেন, তখন সে-কথা তিনি ফেলে দিতে পারেননি। দ্বিতীয় দ্যূতক্রীড়ার আগে অবশ্য ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর আবেদন-অনুরোধে কর্ণপাত করেননি, কিন্তু সেদিনের পর থেকে গান্ধারীর শান্ত হৃদয়ের প্রতিবাদ তিনি উপলব্ধি করেছেন। পাণ্ডবদের বনবাসের পর এই সঞ্জয়কেই ধৃতরাষ্ট্র একদিন বলেছিলেন যে, গান্ধারী কিছুতেই দ্রৌপদীর অপমানের কথা ভুলতে পারছেন না। হয়তো সেই কারণেই গান্ধারী এবিষয়ে তেরো বছর একটা কথাও বলেননি ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে, মৌন থেকে প্রতিবাদ করেছেন। ধৃতরাষ্ট্রকে আজ আর বিশ্বাস করতে পারছেন না গান্ধারী। তিনি বুঝতে পারছেন এবং নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করতেও পারছেন যে দুর্যোধনের পাণ্ডববিদ্বেষ এবং যাবতীয় অভব্যতা-বর্বরতার কারণ তাঁর স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ প্রশ্রয়। সঞ্জয় বুঝেছেন যে, ধৃতরাষ্ট্র রাজমহিষী গান্ধারীর এই সত্যদৃষ্টিকে ভয় করেন। অন্তত তাঁর সামনে ধৃতরাষ্ট্রের কোনো ছল চাতুরি চলবে না—একথা ভেবেই সঞ্জয় নিজের বক্তব্য শোনাবার আগে গান্ধারীকে উপস্থিত হতে অনুরোধ করছেন। লক্ষণীয়, সঞ্জয় মহর্ষি ব্যাস এবং গান্ধারীর নাম উচ্চারণ করলেন একসঙ্গে প্রায় এক নিঃশ্বাসে। সঞ্জয়ের এই সশ্রদ্ধ উচ্চারণই গান্ধারীর ধর্মবোধকে প্রতিষ্ঠা দেয় মহর্ষি ব্যাসের সঙ্গে, একাসনে। এঁরা দুজনেই একই রকম সত্যবোধের দ্বারা চালিত হন। সঞ্জয় বললেন—ব্যাস এবং গান্ধারীই আপনার অন্তরে জাত অসূয়া এবং পরশ্রীকাতরতা প্রশমন করতে পারেন। কেননা তাঁরা ধর্ম জানেন—

তৌ তে'সূয়াং বিনয়েতাং নরেন্দ্র/
ধর্মজ্ঞৌ তৌ নিপুণৌ নিশ্চয়জ্ঞৌ।

আমি কেবলমাত্র তাঁদের সাক্ষাতেই আপনাকে সব কথা খুলে বলব মহারাজ।

বিদুর রাজসভায় ডেকে আনলেন গান্ধারীকে। এলেন মহর্ষি ব্যাসও। সঞ্জয় নিজের বক্তব্য রাখার সময় পাণ্ডবদের থেকেও বাসুদেব কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তি এবং ভগবত্তায় গুরুত্ব আরোপ করলেন অনেক বেশি। সঞ্জয়ের বক্তব্য শুনে ধৃতরাষ্ট্রের মনেও কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির প্রতি একটা ভীতির সঞ্চার হল। ধৃতরাষ্ট্র একটু ভীত হয়েই দুর্যোধনকে বোঝাতে গেলেন যাতে দুর্যোধন কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। কিন্তু দুর্যোধন তখন কারও হিতোপদেশই শুনতে রাজী নন। তিনি পিতার উপদেশও উড়িয়ে দিলেন নিজের স্বাভাবিক অহঙ্কারে। এই সময় ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমার ছেলে একেবারে অধঃপাতে গেছে গান্ধারী। ঈর্ষায় অহঙ্কারে তার এমনই অবস্থা যে বড়োদের কথা শোনার সে প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করে না।

এই প্রথম গান্ধারীকে 'তোমার ছেলে অসভ্যতা করছে'—এমন কথা এমনভাবে প্রকাশ্য সভায় বসে বললেন ধৃতরাষ্ট্র। গান্ধারী স্বামীর এ কথার কী উত্তর দেবেন? আমরা আগেই বলেছি, দুর্যোধন এবং অন্যান্য পুত্রদের সঙ্গে গান্ধারীর সম্পর্কে নৈকট্য তেমন ছিল না। বরং বলা ভালো পুত্ররা মাতার থেকে বেশ একটু দূরত্বই বজায় রাখতেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্রয়েই যে আজ দুর্যোধনের এই অহঙ্কার পর্বতের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাও আজ সর্বজনবিদিত। এই দীর্ঘ জীবনযাত্রায় গান্ধারীর স্বামী, পুত্রস্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে কখনো গান্ধারীর সামনে এসে পুত্রের সম্পর্কে ভালো কিছু বলবে শুনিনি আমরা, দোষারোপ করতেও শুনিনি অবশ্য, দুর্যোধনের হাতে রাজ্যভার সঁপে দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র উৎফুল্ল স্বরে গান্ধারীকে বলেননি—তোমার ছেলে আজ রাজা হল। পাশাখেলার পর গান্ধারী যখন রাজসভায় এসে প্রতিবাদ করেছেন তখনও ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে বলেননি যে, সত্যিই তোমার ছেলে বড়ো অন্যায় কাজ করেছে। আজ কুরুবংশের বিনাশের মুখে দাঁড়িয়ে হঠাৎ পুত্রকে প্রশ্রয় দেবার যাবতীয় দায়দায়িত্ব অস্বীকার করে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে বললেন—"তোমার ছেলে!" কথাটা গান্ধারীর বুকে বাজল হয়তো। তবু ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি মায়া গান্ধারী এখনও সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আজ রাজসভায় যখন ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বোঝাতে অনুরোধ করলেন তখনও গান্ধারী শ্বশুর

ব্যাসের সামনে পুত্রকে তিরস্কার করেছেন স্বামীর মর্য্যাদা অতিক্রম না করেই। ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যলোভ ইত্যাদি বিষয়ে কোনো আলোচনা তিনি করেননি। গান্ধারী দুর্যোধনকেই তিরস্কার করলেন সরাসরি—এত তোর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এত তোর লোভ, তুই সমস্ত শাসনের বাইরে চলে গেছিস, বড়োদের কথা শোনার এতটুকু প্রয়োজন বোধ করিস না—

ঐশ্বর্য্যকামদুষ্টাত্মন্ বৃদ্ধানাং শাসনাতিগ।

গান্ধারী আরও বললেন—আজ তুই এতটাই বেড়ে উঠেছিস যে তারপর তোর আকাঙ্ক্ষিত ঐশ্বর্য্যও পাবি না, জীবনটাও যাবে। তখন জীবন-ধনসম্পদ সব খুইয়ে বাবা-মা সব ছেড়ে এমন একটা জায়গায় এসে তুই দাঁড়াবি যে তাতে শত্রুদেরই আনন্দ হবে। আমার কথা, তোর বাবার কথা—এখন কিছুই তোর পছন্দ হবে না, তারপর যখন ভীমের হাতে তোর মরণ ঘনিয়ে আসবে, সেদিন এই বৃদ্ধ পিতার উপদেশ তুই স্মরণ করবি—

ঐশ্বর্য্যজীবিতে হিত্বা পিতরং মাঞ্চ বালিশ॥
বর্দ্ধয়ন্ দুর্হৃদাং প্রীতিং মাঞ্চ শোকানলে দহন্।
নিহতো ভীমসেনেন স্মর্তাসি বচনং পিতুঃ॥

ভীমসেনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা গান্ধারীও স্মরণে রেখেছেন। ভীমের হাতে পুত্রদের মৃত্যুর কথা ভেবে ধৃতরাষ্ট্রের মতো তিনিও ভয় পাচ্ছেন। পুত্রদের মৃত্যুর আশঙ্কায় ধৃতরাষ্ট্রের মনেও একটা ভীতি জন্ম নিয়েছে, সেই ভীতিও কিছুটা সঞ্চারিত হয়েছে গান্ধারীর মনে। তবে গান্ধারীর সেই তিরস্কারে দুর্যোধন যে কর্ণপাতও করলেন না তা বলা বাহুল্য।

যুদ্ধ বন্ধ করার অন্তিম প্রয়াস করতে স্বয়ং কৃষ্ণ এলেন হস্তিনাপুরে, শান্তিদূত হয়ে, কিন্তু কুরুরাজসভায় কৃষ্ণের দৌত্য ব্যর্থ হল। কৃষ্ণের তর্কযুক্তি, শান্তিকামনার সারবত্তা মেনে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং কুরুসভায় উপস্থিত অন্যান্য মুনি-ঋষি এবং বিশিষ্ট জনেরা সকলেই দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করার উপদেশ দিয়েছেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও খানিকটা ভয় পেয়েই ধৃতরাষ্ট্রও এই সময় পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করে নেবার পরামর্শ দিয়েছেন দুর্যোধনকে। দুর্যোধন প্রত্যেকের উপদেশই উপেক্ষা করেছেন, প্রত্যেকের প্রতিই অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত অপমানজনক ভাবে। কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে এমন উপদেশও দিয়েছেন যে, আপনি আপনার এই পুত্রটিকে কারাগারে নিক্ষেপ করুন। দুর্যোধনের জন্মলগ্ন থেকেই ধৃতরাষ্ট্রকে পুত্রত্যাগ করার উপদেশ দিয়ে চলেছেন বিদুর। বিদুরের কথার প্রতিধ্বনিও শোনা গেছে কৃষ্ণের মুখে। ধৃতরাষ্ট্র বুঝতে পারলেন—দুর্যোধনের প্রতি তাঁর অপার প্রশ্রয়কে তিনি মুখে যতই অস্বীকার করুন, তা সকলের চোখেই ধরা পড়ছে। যুধিষ্ঠির পর্যন্ত তাঁকে এখন বিশ্বাস করেন না, কৃষ্ণ তো করছেনই না। কৃষ্ণের মতো ভয়ঙ্কর বুদ্ধিমান মানুষ প্রতিকূলে, প্রতিপক্ষে থাকলে যে তাঁর ভয়ঙ্কর বিপদ—একথাটাও ধৃতরাষ্ট্রের মনে চেপে বসল সাময়িকভাবে। অথচ দুর্যোধনকে বন্দি করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি বিষয়ক আলোচনা করার মনোবল ধৃতরাষ্ট্রের নেই, সে ইচ্ছাও তিনি পোষণ করেন না। এ অবস্থায় ধৃতরাষ্ট্র আবারও গান্ধারীর উপর নির্ভর করেছেন। স্বামীর দ্বিচারিতায় ছিন্ন-ভিন্ন, পুত্রের ঐশ্বর্য্যলোভে তিক্ত-বিরক্ত, লজ্জিত গান্ধারী। অথচ স্বামীর প্রতি মায়ায় গান্ধারীর নিজের অন্তর্গত ধর্মবোধ বার বার খণ্ডিত হয়, পীড়িত হয়। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বললেন—যাও বিদুর, গান্ধারীকে নিয়ে এসো রাজসভায়। তিনি মহাপ্রাজ্ঞা। আমি তাঁর সঙ্গে একত্রে অনুরোধ করব দুর্যোধনকে—যদি তাতে আমার দুর্বুদ্ধি পুত্রের সুবুদ্ধি হয়—

গচ্ছ তাত মহাপ্রাজ্ঞাং গান্ধারী দীর্ঘদর্শিনীম্।
আনয়েহ তয়া সার্দ্ধমনুনেষ্যামি দুর্মতিম্॥

গান্ধারীকে বিদুর নিয়ে এলেন রাজসভায়। মহাভারতের কবি, তাঁকে ঠিক দুর্যোধনের মাতার পরিচয়ে ভূষিত করেননি এখানে। আপন পুত্রকে মা নিজের ঘরে বসেই স্নেহ-আদর করতে পারেন, শাসন-উপদেশও দিতে পারেন। কিন্তু সমগ্র মহাভারতে গান্ধারীর সঙ্গে তাঁর পুত্রদের এমন কোনো বাক্যালাপের উল্লেখ নেই। দুর্যোধনকে উপদেশ দিতে আসার সময়ও গান্ধারীকে রাজসভায় আসতে হয়েছে মাতা নয়, রাজমহিষীর পরিচয় বহন করে— রাজপুত্রী যশস্বিনী। গান্ধারীর উপদেশের উপর ধৃতরাষ্ট্রের নির্ভরতার কারণও এটা নয় যে, গান্ধারী দুর্যোধনের মা, মায়ের উপদেশ দুর্যোধন উপেক্ষা করতে পারবেন না। বরং ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর সকলেরই মত হল

গান্ধারী দীর্ঘদর্শিনী, পট্টবস্ত্রে তাঁর চোখ দুটি বাঁধা থাকলেও সমস্ত ঘটনা এবং ঘটনার জের তিনি বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পান। সেই দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারী রাজসভায় এলেন। এরপর তাঁর যে সুদীর্ঘ উপদেশ মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে সেখানেও পুত্রের প্রতি উপদেশ দেবার সময় মাতৃহৃদয়ের কোনো আকুলতা প্রকাশ পেতে দেখা যায় না। গান্ধারীর মূল্যবান উপদেশের সম্পূর্ণটাই একজন দীর্ঘদর্শী, প্রাজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ অমাত্যের উপদেশের মতো বর্ণিত হয়েছে মহাভারতে।

গান্ধারী আসতেই ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে বললেন—গান্ধারী! তোমার ছেলে সমস্ত শাসনের বাইরে চলে গিয়েছে। রাজ্যের লোভে এ ছেলে একদিন রাজ্য, প্রাণ-দুই‌ই হারাবে—

এষ গান্ধারী পুত্রস্তে দুরাত্মা শাসনাতিপঃ।
ঐশ্বর্য্যলোভাদৈশ্বর্য্যং জীবিতঞ্চ প্রহাস্যতি॥

গান্ধারী জানতেন শান্তিদূত কৃষ্ণ রয়েছেন সভায়, সভায় আসার পথে হয়তো শুনেই এসেছেন যে, সকলের উপদেশ উপেক্ষা করে তাঁর দুর্বিনীত পুত্র সভা ছেড়ে চলে গিয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রও গান্ধারীকে সেকথাটা আবার একবার শোনালেন—এখানে একটা সভা চলছিল গান্ধারী, স্বয়ং কৃষ্ণ এবং আরও অনেক গণ্যমান্য লোক ছিলেন এখানে। তাঁদের সকলকে অবজ্ঞা করে তোমার ছেলে দলবল নিয়ে সভা ছেড়ে বেরিয়ে গেছে অসভ্যের মতো—

সভায়া নির্গতো মূঢ়ো ব্যতিক্রম্য সুহৃদ্বচ॥

আজ এতদিন বাদে যখন জনসমক্ষে পুত্রকে দোষারোপ করার প্রয়োজন পড়েছে, তখন রাজসভায়, জনসমক্ষে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের দায়ভার গান্ধারীর উপর চাপিয়ে দিয়ে বলছেন-তোমার ছেলে! প্রথমবার গান্ধারী তবু সহ্য করেছিলেন, কিন্তু আজ আর গান্ধারীর সহ্য হল না। সারা জীবন বিপুল প্রশ্রয় দিয়ে যিনি পুত্রকে দুষ্ট তৈরি করেছেন, সেই পিতাই আজ জননীকে ডেকে বলেছেন—তোমার ছেলে দুষ্ট। এই 'তোমার ছেলে' বলে দায় চাপানোটা গান্ধারীর কাছে বড়ো অসহ্য ঠেকে। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে বললেন—সেই রাজ্যকামুক লোভী ছেলেকে এখনই নিয়ে এসো এখানে, তুমি যখন বলছ তখন নিয়ে এসো—

আনয়ানয় সুতং ক্ষিপ্রং রাজ্য কামুক মাতুরম্।

তবে এটুকু বলেই কিন্তু গান্ধারী থেমে গেলেন না। দুর্যোধনের উদ্দেশে এর পরে যে তিরস্কার গান্ধারী উচ্চারণ করলেন তার লক্ষ্য কিন্তু পরোক্ষে ধৃতরাষ্ট্রও। গান্ধারী বললেন— কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা, যে লোকটা অশিষ্ট, অবিনীত, ধর্ম তথা অর্থের পুরুষার্থ প্রয়োজন যে জানে না—সে লোকটার তো রাজ্য পাবার অধিকারই নেই, তাহলে সে এমন বিনা বাধায় রাজ্যলাভ করল কেমন করে—

নহি রাজ্য মশিষ্টেন শক্যং ধর্মার্থলোপিনা।
আপ্তুমাপ্তং তথাপীদমবিনীতেন সর্বথা॥

গান্ধারী জানেন, দুর্যোধনের সমস্ত অশিষ্টতা এবং অভব্যতাতে ধৃতরাষ্ট্রই সারাজীবন প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন। দুর্যোধনের অন্যায়ভাবে রাজ্যলাভের পিছনেও মূল প্রশ্রয় ধৃতরাষ্ট্রেরই। সেই ধৃতরাষ্ট্র আজ নীতির কথা বলছেন, গান্ধারীকে সভায় ডাকিয়ে এনেছেন দুর্যোধনকে নীতি বিষয়ে উপদেশ দেবার জন্য। দুর্যোধনকে ধর্ম, নীতি এবং রাজনীতি সম্পর্কে যে দীর্ঘ এবং মূল্যবান উপদেশ গান্ধারী দিতে চলেছেন স্বামীর অনুমতিক্রমে—তার গোড়াতে দুর্যোধনের অশিষ্টতার প্রধান প্রশ্রয় হিসেবে স্বামীকেই দোষারোপ করলেন গান্ধারী, একেবারে সরাসরি। ধৃতরাষ্ট্র আজ রাজধর্মের কথা বলছেন। বিশেষত বিনয়শিক্ষা তো রাজধর্মের মূল কথা। ইন্দ্রিয়দমন, নিজেকে সংযত রাখার শিক্ষা, ঐশ্বর্য্য লাভ করেও উৎফুল্ল না হবার শিক্ষা এবং বিপন্ন হলেও বিষন্ন না হবার শিক্ষা—এইসব কিছু বিনয়-শিক্ষার মধ্যে পড়ে এবং তা রাজা হবার প্রাথমিক শর্তের মধ্যে পড়ে। ধৃতরাষ্ট্র পিতা হয়েও নিজেই এই শিক্ষা সম্পূর্ণ পাননি এবং গান্ধারীর পক্ষে তা স্বামীকে বলাও সম্ভব নয় সোচ্চারে। কিন্তু পুত্রের বিনয়-শিক্ষার প্রশ্ন তুলে তিনি যেন ধৃতরাষ্ট্রকেই বলতে চাইলেন—তবু দুর্যোধন রাজা হল কী করে, কার প্রশ্রয়ে? যাকে তুমি অশিষ্ট, অবিনয়ী, অভদ্র বলছ, সে ছেলে রাজ্য পেল কী করে? এবারে একেবারে সোজাসুজি অধিক্ষেপ—নিন্দা করলে আগে তো তোমাকেই সবচেয়ে বেশি দোষ দিতে হয়, কেননা ছেলের ব্যাপারে এতটাই তোমার মুগ্ধতা যে, কোনোদিন তুমি তার দোষ দেখতে পাওনি, অতএব তোমার দোষটাই সবচেয়ে বেশি—

ত্বং হ্যেবাত্র ভৃশং গর্হ্যো ধৃতরাষ্ট্র সুতপ্রিয়ঃ।

এতদিন পরে স্বামীকে এক কথায় ছেড়ে

দিলেন না গান্ধারী। প্রধানত এই একটি অন্ধ মানুষের ওপর মায়াবশত এতদিন কত অন্যায় তিনি সয়েছেন। আর নয়। গান্ধারী স্বামীকে বললেন—এই ছেলের পাপ-প্রবণতার কথা তুমি সব জানতে। তার সমস্ত অন্যায় কাজে তুমি সবচেয়ে বড়ো সহায় ছিলে এবং সব জেনেশুনেই তুমি এতদিন ছেলের বুদ্ধি অনুসারেই চলেছো—

যো জানন্ পাপতামস্য তৎপ্রজ্ঞাম্ অনুবর্তসে।

গান্ধারী বুঝিয়ে দিলেন যে, এতকাল ছেলের কথামতো কাজ করে আজকে এতদিন পরে তাকে দু-চারটে জ্ঞানমূলক বাণী শোনালেই সে ভালো পথে চলতে আরম্ভ করবে—এই ভাবনাটাই বৃথা। তিনি বললেন—দুর্যোধন আপাদমস্তক লোভী, তার মধ্যে আবার এই রাজ্যের লোভ তার কামনা আরও চতুর্গুণ বাড়িয়ে তুলেছে, আর এই কামনা সামান্য প্রতিহত হবার উপক্রম হলেই তার ক্রোধ বাড়িয়ে তুলছে। এই অবস্থায় যে পৌঁছে গেছে, এবং তুমিই তাকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছ, তাকে এখন জোর করে নিয়ন্ত্রণ করা, সংযত করা প্রায় অসম্ভব—

অশক্যোদ্য ত্বয়া রাজন্ বিনিবর্তয়িতুং বলাৎ।

—এবং তোমার পক্ষে তো একেবারেই অসম্ভব। তুমি নিজে জানতে যে, ছেলে মূর্খ, মূঢ়, সংযমহীন। সে বদলোকের সঙ্গে মেশে এবং তাদের কথাতেই চলে। এমন ছেলের হাতে তুমি যখন রাজ্য তুলে দিয়েছিলে, তারই ফল ভোগ করছ ধৃতরাষ্ট্র—

দুঃসহায়স্য লুব্ধস্য ধৃতরাষ্ট্রো'শুতে ফলম্।

একেবারে ব্যক্তিগত আলোচনা এবং দোষারোপের মধ্যেও হঠাৎ ঘনিয়ে ওঠা যুদ্ধ সম্পর্কে গান্ধারী কিছু রাজনৈতিক মন্তব্য করলেন। এবং সেক্ষেত্রেও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রস্নেহে অন্ধ, অযৌক্তিক রাজনীতিরই কঠোর সমালোচনা শোনা গেল তাঁর মুখে।

গান্ধারী বললেন—একান্ত আত্মীয়দের সঙ্গে আমাদের বিভেদ উপস্থিত হয়েছে, অথচ রাজা হয়ে তুমি সেই ভেদ উপেক্ষা করেছ। আর আত্মীয়দের সঙ্গে বিভেদ উপস্থিত হলে, পূর্বে যারা শত্রু ছিল, তারা আমাদের বিভেদ বুঝে আক্রমণ করবে। আমি রাজনীতির দিক থেকে শুধু এইটুকুই বুঝি যে, আত্মীয়দের সঙ্গে যে আমাদের বিভেদ ঘটেছে—শুধু তাদের সঙ্গে কথা বলে আলোচনার মাধ্যমেই এই বিভেদ মিটিয়ে নেওয়া যেত। যদি আলোচনা ফলবতী নাও হত, তাহলে অন্তত শত্রুদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করেও তো তাদের সমস্ত পরিকল্পনা বিপর্যস্ত করে দেওয়া যেত। কিন্তু সাম-দান-ভেদ কোনো রাজনৈতিক উপায়ের মধ্যেই তোমরা গেলে না, অথচ রাজনীতির শেষ উপায় যুদ্ধ করবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ আত্মীয়দের সঙ্গে—

নিস্তর্তুমাপদঃ স্বেষু দণ্ডং কস্তত্র পাতয়েৎ।

গান্ধারী বলতে চাইলেন—আত্মীয় ভাইদের সঙ্গে আলোচনার পক্ষে না গিয়ে যুদ্ধ করবার এই প্ররোচনা কি শুধুমাত্র তাঁর ছেলের, না ছেলের বাবা ধৃতরাষ্ট্রের? ধৃতরাষ্ট্র অবশ্য এইসব সযৌক্তিক কথার কোনো প্রত্যুত্তর করেননি। ইতোমধ্যে বিদুর দুর্যোধনের কাছে মায়ের কথা বলে তাঁর প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ জানিয়ে কোনো মতে দুর্যোধনকে গান্ধারীর সামনে উপস্থিত করালেন—

মাতুশ্চ বচনাৎ ক্ষত্তা সভাং প্রাবেশয়ৎ পুনঃ।

পিতার প্রতি সম্মানেও নয়, বিদুরের প্রতি সম্মানেও নয়, এমনকী মায়ের প্রতিও যে খুব সম্মানবশত তাও নয়। দুর্যোধন সভায় ফিরে এলেন শুধুমাত্র গান্ধারী কী বলেন তাই শোনার জন্য—

স মাতুর্বর্চনাকাঙ্ক্ষী প্রবিবেশ পুনঃ সভাম্।

দুর্যোধন মায়ের উপদেশ শুনতে এলেন। সভায় প্রায় সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলেছেন এতক্ষণ, তার উপর মা যে হিতোপদেশ দেবেন সেটাও তাঁর খুব পছন্দসই হবে না এটাই স্বাভাবিক। ফলে দুর্যোধন যেমন ক্রুদ্ধ হয়ে সভা ছেড়ে গিয়েছিলেন, তেমনই ক্রুদ্ধ হয়ে সভায় ফিরে এলেন। তাঁর চোখ লাল, চোখে-মুখে ক্রোধ এবং অহঙ্কারের প্রকাশ স্পষ্ট। সভায় প্রবেশ করার সময় দুর্যোধন ক্রোধে সাপের মতো নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগলেন—

অতিতাম্রেক্ষণঃ ক্রোধান্নিশ্বাসন্নিব পন্নগঃ।

গান্ধারী পুত্রের ভাব বুঝতে পারলেন এবং এও বুঝলেন যে, উৎপথচালিত পুত্রকে আর মিষ্টি কথা বলে লাভ নেই। বৃহত্তর প্রয়োজন শান্তি এবং স্বাভাবিক প্রয়োজন পুত্রের জীবন—দু-দিক থেকে ভাবলেও আজ তাঁকে নিন্দা করাই প্রয়োজন। সুবৃহৎ এবং সুচিন্তিত একটি

অনুশাসনের মধ্যে দুর্যোধনের প্রতি তাঁর মাতৃ-সম্বোধনগুলিই একমাত্র স্নেহসূচক শব্দ বলা যেতে পারে। 'পুত্রক', 'তাত' ইত্যাদি শব্দগুলিকে বাংলায় যদি বলে 'বাছা আমার' তবে মাঝে মাঝে দুর্যোধনের প্রতি তার 'মহাপ্রাজ্ঞ' সম্বোধনটির বাংলা করা উচিত—'তুমি তো বুদ্ধিমান ছেলে, তুমি তো সব বোঝো।' কিন্তু এই শব্দগুলি ছাড়া আর যত কথা আছে, তার মধ্যে দুর্যোধনের প্রতি সমস্ত ব্যক্তিগত অনুরোধগুলিই উচ্চারিত হয়েছে রাজনৈতিক পরামর্শের ভাবনায়। এখন যে সময় এসেছে, তাতে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানটাই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক, আর গান্ধারী সেই রাজনীতির কথাই বলছেন, কেননা সুস্থ রাজনীতি তিনি ধৃতরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি বোঝেন, অন্তত তার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রশ্রয় নেই, মা-বাবার আত্মীয়তা নেই।

গান্ধারী বললেন—বাছা আমার! তোমার এবং তোমার সঙ্গে যারা আছে, তাদের সকলের ভালোর জন্যই বলছি বাছা। আমার কথা শোনো, তাতে ভবিষ্যতে তোমার ভালো হবে—

দুর্যোধন নিবোধেদং বচনং মম পুত্রক।

গান্ধারী এতক্ষণ ধৃতরাষ্ট্রকে সোচ্চারে তিরস্কার করেছেন বটে, কিন্তু দুর্যোধনের সামনে তাঁর সম্মান নষ্ট করলেন না, কেননা ধৃতরাষ্ট্র নাচার হয়ে তাঁর শরণ গ্রহণ করেছেন। গান্ধারী বললেন, দুর্যোধন! তোমার পিতা, পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কৃপ এবং বিদুর যেটা বলছেন, সেটা তুমি শোনো; তাঁদের কথা শোনা মানেই কিন্তু তাঁদের সম্মান রক্ষা করা। রাজ্য ব্যাপারটা এমনই যে, একটি মানুষ ইচ্ছে করলেই রাজ্য পায় না, একজন ইচ্ছে করলে সে রাজ্য রক্ষা করতে পারে না, কিংবা ইচ্ছে করলেই সেটা ভোগ করা যায় না—

অবাপ্তুং রক্ষিতুং বাপি ভোক্তুং ভারতসত্তম।

গান্ধারী বোঝাতে চাইলেন যে, দুর্যোধন যে আজ রাজা হয়ে বসেছেন, সেখানে তাঁর নিজস্ব কৃতিত্ব কিছু নেই, তাঁর নিজের রাজা হবার ইচ্ছেটাও সেখানে বড়ো কথা নয়। কেননা অন্তত এই হস্তিনাপুরের অংশে রাজত্বদানের পিছনে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ-কৃপ-বিদুরেরও বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, অথচ দুর্যোধন এখন তাঁদেরই মানছেন না।

এবার ছেলের রাজা হবার যোগ্যতা এবং যদি বা দুর্যোধন অন্যের পৃষ্ঠপোষণে রাজা হয়েও থাকেন, তবে সেই রাজত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে ছেলেকে সরাসরি আক্রমণ করলেন না গান্ধারী। কারণ বিষয়-লালসায় বিমূঢ় ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত বিকার উপশমন করার উপদেশ শোনালে আরও বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। অথচ গান্ধারী সেই কাম-ক্রোধের তাড়না নিরুদ্ধ করার উপদেশই দেবেন দুর্যোধনকে। তাই সরাসরি না বলে, মানুষের কী হয়, তাই বলছেন গান্ধারী। গান্ধারী বললেন— ইন্দ্রিয়গুলি যার বশে নেই, সে কখনো অনেক দিন ধরে প্রশাসনিক পদে অবস্থিত থাকতে পারে না—

ন হি অবশ্যেন্দ্রিয়ো রাজ্যমশ্নীয়াদ্দীর্ঘমন্তরম্।

কেননা ইন্দ্রিয়জয়ের ক্ষমতা না থাকলে কামনা এবং ক্রোধ প্রশাসক নেতাকে কর্তব্য ভুলিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যায়। কামনা এবং ক্রোধ রাজা হবার পথে সবচেয়ে বড়ো শত্রু, এই শত্রু দুটিকে জয় করলেই তবে রাজার রাজ্য সুস্থিত হয়।

এতকাল পরে আজ প্রথম গান্ধারী অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক পাঠ দিচ্ছেন পুত্রকে। রাজনীতি শাস্ত্রের প্রাথমিক পাঠই হল ইন্দ্রিয় জয় এবং বিনয়শিক্ষা। গান্ধারী মনে করেন—ইন্দ্রিয় জয়ের শিক্ষা না থাকার ফলেই দুর্যোধনের এত রাজ্যলোভ আর সেই লোভ ব্যাহত হচ্ছে বলেই তাঁর এত ক্রোধ।

তবে দুর্যোধনের লোভ-ক্রোধের কারণ পর্যালোচনা গান্ধারী করলেন না। তিনি সাধারণ যুক্তিতে বললেন—রাজ্য মানেই তো প্রভুত্ব, সকলেই সে প্রভুত্ব চায়—

কিন্তু যার নিজের লোভ-তৃষ্ণার ওপরে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, সে যদি বা রাজ্য পায়ও কোনো ভাবে সে রাজ্য সে রাখতে পারবে না—

রাজ্যং নামেপ্সিতং স্থানং ন শক্যম্ অভিরক্ষিতুম্।

প্রাচীন রাজনীতি শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়-জয়, বিনয়-শিক্ষার পরেই অমাত্য নিয়োগের প্রশ্ন উঠেছে সর্বত্র। অমাত্যকে রাজার সহায় এবং পরিচ্ছদ বলা হয়েছে, কেননা রাজা কখনো একা রাজ্য শাসন করতে পারেন না। গান্ধারী এই শুষ্ক রাজনীতির সত্যগুলিকে অদ্ভুত চাতুর্যে পরিবেশন করেছেন দুর্যোধনের কাছে। তিনি বোঝাতে চাইলেন— শত্রু বলে যদি কাউকে মানতেই হয়, তবে পাণ্ডবেরা তোমার প্রথম শত্রু নয়, যাদের দমন করতে চাইছ তুমি। প্রথমে নিজেই নিজের সামনে দাঁড়াও, দেখো তোমার নিজের ভিতরেই শত্রু আছে কিনা, প্রথম তুমি সেই আন্তর শত্রুকে দমন করো—

আত্মানমেব প্রথমং দ্বেষ্যরূপেণ যোজয়েৎ।

তারপর দাঁড়াও তোমার মন্ত্রী-অমাত্যদের সামনে। যাঁরা এতকাল তোমার এবং তোমার রাজ্যের হিত চিন্তা করেছেন, তাঁরা হঠাৎই তোমার বিরুদ্ধে কথা বলছেন কেন, সেটা তোমায় বুঝতে হবে এবং তাঁদের জয় করতে হবে নিজের আত্মবুদ্ধি দিয়ে। তারপর তো তৃতীয় অর্থাৎ তোমার বাইরের শত্রু, যাঁরা তোমার মিত্রপক্ষে নেই, তাঁদের জয় করার প্রশ্ন—

ততো'মাত্যান্ অমিত্রাংশ্চ ন মোঘং বিজিগীষতে।

গান্ধারী তাঁর ছেলেকে জানেন। তিনি জানেন যে, কামনা-বাসনা, লোভ, দম্ভ, অহঙ্কার—এই সমস্ত অসদ্‌বৃত্তি তাঁর ছেলেকে আপাদমস্তক গ্রাস করেছে এবং এই সেই কারণেই তিনি কারও কথাই শুনছেন না। গান্ধারী বললেন—যে মানুষ ইচ্ছা ক'রে অথবা নিতান্ত ক্রোধের বশে আপন জনের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করে, সে মানুষকে কেউ সহায়তা করে না। আজকে যে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর—কাউকে তুমি সহায় হিসেবে পাচ্ছ না, তার কারণ তোমার এই ইচ্ছাকৃত অন্যায় আচরণ। সাধারণ নৈতিক কথা শেষ করে এবারে গান্ধারী আসল কথায় এলেন। বললেন—পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই, এককাট্টা হয়ে আছে। তাঁরা বুদ্ধিমান এবং বীর, তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজ্য ভোগ করলেই তবে তুমি সবচেয়ে সুখে থাকবে—

পাণ্ডবৈঃ পৃথিবীং তাত ভোক্ষ্যসে সহিতঃ সুখী।

সত্যি বলতে কি, কর্ণ-দুঃশাসন-শকুনির প্রতিপক্ষে অর্জুন এবং কৃষ্ণ যে কতটা বেশি শক্তিমান—এ কথা দুর্যোধনকে বোঝাতে পারছেন না গান্ধারী। ভীষ্ম এবং দ্রোণও পারেননি, গান্ধারীও পারছেন না। কিন্তু আজ থেকে পাণ্ডবদের বনবাস-পর্বের আগে ভীষ্ম-দ্রোণ বিদুর যে অসাধারণ বুদ্ধিতে কৌরব-পাণ্ডবদের রাজ্য ভাগ করে দিয়েছিলেন, গান্ধারী সেই পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে বলেছেন দুর্যোধনকে। গান্ধারী বলেছেন—আজকে তুমি যে যুদ্ধের জন্য লালায়িত হচ্ছ, সেই যুদ্ধে কোনো মঙ্গল নেই, ধর্ম নেই, সুখও নেই। তোমার স্বার্থও তাতে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হবে না, আর যুদ্ধে যে জয় হবেই সে-কথাও হলফ করে বলা যায় না। সেইজন্যেই বলছি—যুদ্ধের বুদ্ধিটা তুমি একেবারে মাথা থেকে বার করে দাও—

ন চাপি বিজয়ো নিত্যং মা যুদ্ধে চেত আধিথাঃ।

যুদ্ধ যাতে না হয় অথচ পাণ্ডব-ভাইদের সঙ্গে তোমার চিরশত্রুতাও যাতে না হয়, সেই ভয়েই ভীষ্ম, তোমার পিতা এবং রাজসভার অন্য মন্ত্রী-অমাত্যেরা পাণ্ডবদের পৈতৃক অংশ দিয়ে তাঁদের রাজ্য আলাদা করে দিয়েছিলেন—

দত্তো'ংশঃ পাণ্ডুপুত্রাণাং ভেদাদ্ ভীতৈররিন্দম।

আর সেই রাজ্যদানের ফল এখনও তুমি বুঝতে পারছ—তারা রাজ্যটাকে নিষ্কণ্টক শত্রুহীন করে বনে গেছে, তুমি তাদের রাজ্যই সম্পূর্ণ ভোগ করছ—

যদ্ ভুঙ্‌ক্ষে পৃথিবীং কৃৎস্নাং শূরৈর্নিহতকন্টকাম্।

অর্থাৎ গান্ধারী একবারের তরেও মেনে নিলেন না যে, পাণ্ডবদের অংশটা এখন দুর্যোধনের হয়ে গেছে। বরঞ্চ বলতে চাইলেন—তোমার নিজের অংশে তুমি যদি নিশ্চিন্তে রাজ্যভোগ করতে চাও, তা হলে পাণ্ডবদের অংশ, অর্ধেক রাজ্য তাদের দিয়ে দাও—

যদীচ্ছসি সহামাত্যো ভোক্তুমর্ধং প্রদীয়তাম্।

গান্ধারী এবার নিজের অন্তরের ক্ষোভটুকুও সর্বৈব প্রকাশ করে ফেললেন। পাণ্ডবভাইদের ওপর যত অন্যায়-অত্যাচার দুর্যোধন করেছেন, গান্ধারী সেগুলি কোনোদিন মনে মনে মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু স্বামী-পুত্রের সাহঙ্কার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বাধাও দিতে পারেননি। কিন্তু আজ তিনি বুঝতে পারছেন—স্বামী-পুত্রের জীবন এবার বিপন্ন। দুর্যোধনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুনে সকলে এবার পুড়ে মরবে। এখন আর চুপ করে থাকবেন না গান্ধারী। তিনি এবার সত্য উচ্চারণ করবেন, বলবেন বাস্তবের কথা। গান্ধারী বললেন—তুমি তেরো বচ্ছর ধরে অনেক যাতনা দিয়েছ পাণ্ডবদের। আর নয়—

অলমঙ্গ নিকারো'য়ং ত্রয়োদশ সমাঃ কৃতঃ।

এই যাতনায় তাদের নিজেদের পৈতৃক রাজ্যাংশ ফিরে পাবার তীব্রতাও যেমন বেড়েছে, তেমনি তোমার অনন্ত অপমানের ফলে তাদের রাগও জমা হয়েছে অনেক। আমি বলব—তুমি তাদের এই উদ্যত ক্রোধ প্রশমন কর—

শময়ৈনং মহাপ্রাজ্ঞ কাম-ক্রোধ-সমেধিতম্।

দুর্যোধন সেই যে পিতার আদেশে কোনো মতে গান্ধারীর সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন, ব্যাস। ওইটুকুই। এতক্ষণ গান্ধারী কথা বলছেন,

অথচ দুর্যোধন হ্যাঁ-না—কিছুই বলছেন না। কোনো কথা যেন তাঁর কানেও ঢুকছে না, অথবা ঢুকলেও সেই কথার প্রতি তাঁর আদৌ শ্রদ্ধা হচ্ছে না। তিনি গোঁয়ারের মতো অবিচলিত দাঁড়িয়ে আছেন। গান্ধারী পুত্রের মানসিকতা বুঝতে পারছেন, অতএব সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পথ ছেড়ে যুদ্ধের বাস্তব ক্ষেত্রে দুর্যোধনের সুবিধে-অসুবিধের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। গান্ধারী বললেন—তুমি যাদের ভরসায় তোমার ঈপ্সিত যুদ্ধে জয়লাভ করবে বলে ভাবছ, সেই তুমি, কর্ণ এবং তোমার ভাই দুঃশাসন—এরা কেউই পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারবে না।

—ন চৈষ শক্তঃ পার্থানাং যস্ত্বমর্থভীপ্সসি।

আরও একটা জিনিস মনে রেখো—তুমি যে ভাবছ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ—এঁরা সব তোমার পক্ষে সমগ্র শক্তি নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, সেটা ভুল, একেবারেই ভুল—

যোৎস্যন্তে সর্বশক্ত্যেতি নৈতদভ্যুপপদ্যতে।

গান্ধারী খুব জোরের সঙ্গে বললেন—এঁরা তোমাদেরও স্বভাব জানেন, পাণ্ডবদেরও স্বভাব জানেন, তোমাদের সঙ্গে তাঁদের যে আত্মীয়তার সম্পর্ক, পাণ্ডবদের সঙ্গেও তাঁদের ওই একই সম্পর্ক। স্নেহের ব্যাপারটাও তাঁদের একই রকম। রাজ্যাংশও তোমার এবং পাণ্ডবদের একই রকম—

সমং হি রাজ্যং প্রীতিশ্চ স্থানং হি বিদিতাত্মনাম্।

—কিন্তু তফাত আছে একটাই, ন্যায়, নীতি, ধর্মের দিকে পাণ্ডবদের পাল্লা ভারী। অতএব ভীষ্ম-দ্রোণ কৃপেরা নিজেদের সর্বাঙ্গীণ ক্ষমতা তোমার জন্য যুদ্ধে উজাড় করে দেবেন না। আর তুমি যে ভাবছ—আমি এঁদের খাওয়াই-পরাই, এঁরা আমার জন্য কেন করবেন না, তাতে বলি—খাওয়া-পরার মূল্যটা এঁরা জীবন বিসর্জন দিয়ে চুকিয়ে দেবেন, কিন্তু তাই বলে যুধিষ্ঠিরকে এঁরা কখনো শত্রুভাবে দেখবেন না—

রাজপিণ্ড-ভয়াদেতে যদি হাস্যন্তি জীবিতম্।

মাঝখান থেকে ফলটা কী হবে—যুদ্ধ লাগবে। একদিকে ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-কর্ণেরা যুদ্ধের উত্তেজনায় যুদ্ধ করবেন, অন্যদিকে ভীম-অর্জুন-ধৃষ্টদ্যুম্নেরাও মরিয়া হয়ে লড়াই করবে—মাঝখান দিয়ে দুই পক্ষেরই অসংখ্য নিরীহ সৈন্য এবং মিত্র রাজারা মারা পড়বেন। বিপুল রক্তক্ষয় হবে। তাই বলছিলাম—বাছা! তুমি নিজের ক্রোধের মান রাখতে গিয়ে এত রক্তপাত হতে দিয়ো না, তোমার জন্য যেন পৃথিবীটা বীরশূন্যা না হয়—

এষা হি পৃথিবী কৃৎস্না মা গমত্ত্বৎকৃতে ক্ষয়ম্।

তুমি আর লোভ কোরো না বাছা। তুমি শান্ত হও।

হস্তিনাপুর থেকে উপপ্লব্যে ফিরে কৃষ্ণ গান্ধারীর উপদেশ যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, এটুকু উপদেশ দিয়েই থেমে যাননি গান্ধারী। বেশ কড়া কথাই তিনি বলেছিলেন দুর্যোধনকে। সভায় সকলের সামনে, সকলকে সাক্ষী রেখে ছেলের দোষ সোচ্চারে বলেছেন। হয়তো এতেই তাঁর হৃদয়ের ভার কিছুটা লাঘব হয়েছে। কৃষ্ণের জবানিতে গান্ধারীর বক্তব্য এতটাই আন্তরিক যাতে বোঝা যায়—আজ তিনি স্বামী-পুত্রের অন্যায়ের দায় নিয়ে চুপ করে থাকতে পারছেন না, বরং সকলকে সাক্ষী মেনে নিজের এতদিনের নীরবতার দায় মোচন করছেন যেন। কৃষ্ণের বিবরণ অনুযায়ী সমস্ত সভাসদদের সামনে দুর্যোধনকে গান্ধারী বলেছিলেন—যে সব রাজা, রাজপ্রতিম মানুষেরা বসে আছেন এই সভায়, আর যাঁরা ব্রহ্মর্ষি এবং অন্যান্য সভাসদজনেরা তাঁরা সবাই শুনুন, তাঁদের সামনেই দুর্যোধন, তোমার অন্যায়-অপরাধের কথা বলছি। তুমিই অত্যন্ত পাপী বলেই তোমার নিজস্ব মন্ত্রী-অমাত্যের পাপের কথাও একই সঙ্গে আমায় বলতে হচ্ছে—

শৃণ্বন্তু বক্ষ্যামি তবাপরাধং/
পাপস্য সামাত্য-পরিচ্ছদস্য।

মনে রেখো দুর্যোধন! এই রাজ্যে রাজা হবার ব্যাপারে আমরা কুল-পরম্পরা মানি, এখানে পিতৃ-পিতামহক্রমে পর-পর রাজা হন—

রাজ্যং কুরূণামনুপূর্বভোজ্যং/
ক্রমাগতো নঃ কুলধর্ম এষঃ।

তুমি অত্যন্ত নৃশংস এবং অসভ্য বলেই নিজে রাজ্যের অধিকারী না হয়েও নিজের দুর্নীতিতে সমস্ত কুরুরাজ্যটাকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে এসেছ। তুমি রাজা হলেটা কী করে? ধৃতরাষ্ট্রের মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং বিদুরের মতো দীর্ঘদর্শী ব্যক্তি যেখানে এই কুরুরাজ্যের পরিচালনায় রয়েছেন,

সেখানে তাঁদের অতিক্রম করে তুই এখানকার রাজত্ব চাইছিস কী করে—

এতাবতিক্রম্য কথং নৃপত্বং/
দুর্যোধন প্রার্থয়সে'দ্য মোহাৎ।

হয়তো এই কথাটার মধ্যে একটু কৌশলও আছে। গান্ধারী যে তাঁর স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যলোভের কথা জানেন না, তা নয়। বস্তুত তাঁর লোভের কারণেই আজ দুর্যোধন এত পুষ্ট হয়েছেন, তাও তিনি ভালো করে বোঝেন। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে ধৃতরাষ্ট্র যখন পুত্রের সদর্প ঘোষণায় ব্যতিব্যস্ত, তখন সাময়িক শব্দপ্রচারে ধৃতরাষ্ট্রকেই অন্তত শ্রেয় বিকল্প হিসেবে অহঙ্কারী পুত্রের সামনে উপস্থিত করতে চাইছেন গান্ধারী। তিনি বোঝাতে চাইছেন—হস্তিনাপুরের রাজপরম্পরা এমনই, তাতে দুর্যোধনের রাজ্য পাবার কথাই নয়, তিনি বলেছেন—পিতামহ ভীষ্ম রাজা হননি, কিন্তু যদি হতেন তা হলে ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুর তাঁর অধীন হয়েই রাজ্যপরিচালনায় আনুকূল্য করতেন মাত্র। কিন্তু তিনি রাজা হননি বলেই রাজ্য পেয়েছিলেন পাণ্ডু। নিয়ম অনুসারে পাণ্ডুর মৃত্যুর পর সমগ্র রাজ্যটাই তাঁর ছেলেদের পাবার কথা, এবং পাণ্ডবদের পরে তাঁদেরই পুত্র-পৌত্রেরা—এই রাজ্য পাবে—এটাই সোজা হিসেব—

রাজ্যং তদেতন্নিখিলং পাণ্ডবানাং/
পৈতামহং পুত্র-পৌত্রানুগামি।

গান্ধারীর এই কথাগুলি শুধু দুর্যোধনের প্রতি নয়, ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিও একপ্রকার তিরস্কার। আজ শুধুমাত্র দুর্যোধনকে তিরস্কার করার জন্য যে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে সভায় ডেকে এনেছেন, তাঁর রাজ্যলোভই যে দুর্যোধনের জ্ঞাতিবিদ্বেষের মূলে—সেকথা গান্ধারী নিজেও ভুলে যাননি, আর আজ সভাস্থ সকলের সামনেই পরোক্ষে তিনি সে প্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রকেও তিরস্কার করলেন। গান্ধারীর হয়তো আজ মনে পড়ল দুর্যোধনের জন্মের কথা। দুর্যোধন জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যলোভী ধৃতরাষ্ট্র সভাসদদের সামনে প্রশ্ন রেখেছিলেন—যুধিষ্ঠির তো জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে রাজ্যলাভ করবেনই, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের পর কি দুর্যোধন রাজা হবেন? ধৃতরাষ্ট্র এ ভাবনা যখন ভাবছিলেন তখন যুধিষ্ঠির সবেমাত্র এক বছরের শিশু, পাণ্ডুও তখনও জীবিত। সেই অবস্থাতেই ধৃতরাষ্ট্র যেভাবে নিজের পুত্রের রাজা হবার কথা ভাবছিলেন তাতে যুধিষ্ঠিরের মৃত্যু-চিন্তাই বেশি করে ধরা পড়ে। ধৃতরাষ্ট্রই দুর্যোধনের জন্মলগ্ন থেকে ভাবতে শুরু করেছিলেন যে, যুধিষ্ঠিরের মৃত্যু হলেই তাঁর পুত্র দুর্যোধনের নিষ্কন্টক রাজ্যলাভ হবে। সেই লোভ আর জ্ঞাতিবিদ্বেষই ধীরে ধীরে সংক্রমিত হয়েছে পুত্রের মধ্যেও। গান্ধারী এতদিন বাদে পুত্রকে তিরস্কার করতে সভায় এসে ধৃতরাষ্ট্রকেও যেন স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, দুর্যোধনের যে জ্ঞাতিবিদ্বেষের ফলে আজ মহাযুদ্ধ দোরগোড়ায় অপেক্ষা করছে, সেই জ্ঞতিবিদ্বেষ একা দুর্যোধনের নিজস্ব ভাবনা নয়, ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরে যে বিদ্বেষ জন্ম নিয়েছিল তাই কালক্রমে প্রতিফলিত হয়েছে দুর্যোধনের চরিত্রে।

গান্ধারীর উপদেশ থেকেই বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, রাজ্যলাভের ব্যাপারে তিনি নীতি এবং নিয়মের সপক্ষে। তিনি দুর্যোধনকে বলছেন—পরম্পরা যদি পাণ্ডবদের রাজা বানায়, তবে তাই হবে। সেখানে তোমার এত জ্বলে যাবার কারণই নেই। কেননা রাজ্য তোমার পাবারই কথা নয়। গান্ধারী সবার উপরে মনে রেখেছেন—ভীষ্মের মর্য্যাদা। তিনি রাজ্য নেননি এবং শতবার সুযোগ আসা সত্ত্বেও রাজ্য গ্রহণ করেননি। তাঁর মর্য্যাদা তো কুরুরাজ্যে কম নেই। আর সেই মানুষটাও যখন শুধু পাণ্ডবদের রাজ্যাংশমাত্র ফিরিয়ে দিতে বলছেন, তখন সেই মতটা তো মানতে হবে। মানতে হবে ধৃতরাষ্ট্রের কথাও। তিনি আগে যাই বলে থাকুন, এখন তিনি ন্যায় উচ্চারণ করছেন। সত্যি কথা বলতে কী, গান্ধারী কথা বলার পর ধৃতরাষ্ট্রও দুর্যোধনকে একই কথা বলেছেন, অন্তত কৃষ্ণের জবানিতে আমরা তাই শুনতে পাচ্ছি। যদিও দুর্যোধন কারও কথাই শোনেননি। তিনি সভা ছেড়ে চলে গেছেন এবং পরের দিন সকালবেলাতেই সৈন্য সাজাতে চলে গেছেন।

[মহা (k) ৫.৬৭.৬-৮; ৫.৬৯.৮-৯; ৫.১২৪.৫; ৫.১২৫.১৯; ৫.১২৯.১-৫৪; ৫.১৩০.১; ৫.১৪৮.২৮-৩৬; (হরি) ৫.৬৬.৬-৮; ৫.৬৬.৩৩-৩৫; ৫.১১৫.৫; ৫.১১৬.১৯; ৫.১২০.১-৫৪; ৫.১২১.১; ৫.১৩৮.২৮-৩৬]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অবশেষে আরম্ভ হল। যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ধৃতরাষ্ট্র শুনছেন

সঞ্জয়ের মুখ থেকে। কিন্তু এই আঠারো দিনের যুদ্ধের মধ্যে গান্ধারীর বিশেষ কোনো উল্লেখ পাই না। তবে অনুমান করা যায় যে, গান্ধারীও হয়তো স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের পাশে বসে যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ততটাই উৎসাহের সঙ্গে শুনতেন সঞ্জয়ের মুখ থেকে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মতো গান্ধারীকে আমরা পুত্রদের মৃত্যুসংবাদ শুনে ভেঙে পড়তে দেখি না। ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করছেন, বার বার বলছেন যে, দুর্যোধন সন্ধি করতে সম্মত হলে তাঁকে এমনভাবে পুত্রদের মৃত্যুসংবাদ শুনতে হত না, আর পাশে বসে সঞ্জয় যাবতীয় ঘটনার জন্য বারে বারে ধৃতরাষ্ট্রকেই দায়ী করে চলেছেন। গান্ধারীও হয়তো পাশে বসে শুনছিলেন এসব কথা, কিন্তু তাঁর আত্মশক্তি অনেক বেশি বলেই পুত্রদের মৃত্যুতে মুহ্যমান হননি।

কিন্তু কর্ণের মৃত্যুর পর গান্ধারীরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল যেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম - দ্রোণকে দুর্যোধন তেমন বিশ্বাস করেননি। তিনি জানতেন, এঁরা সর্বশক্তি দিয়ে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না। গান্ধারীও দুর্যোধনকে উপদেশ দেবার সময় এ কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কর্ণ ছিলেন দুর্যোধনের একমাত্র ভরসা। কর্ণ যখন মারা গেলেন, কর্ণের মৃত্যুসংবাদ শুনে আমরা ধৃতরাষ্ট্রকেও অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখি এবং দেখা যায় যে, গান্ধারীও কর্ণের মৃত্যু সংবাদ সহ্য করতে না পেরে দুঃখে অজ্ঞান হয়ে গেছেন—

তথা যা পতিতা দেবী গান্ধারী দীর্ঘদর্শিনী।

আশ্চর্য লাগে, অন্যান্য পুত্রদের মৃত্যুতেও যিনি শোকে অভিভূত হননি, সেই গান্ধারী কর্ণের মৃত্যুসংবাদ শুনে সংজ্ঞাহীন স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের পাশে বসে বিলাপ করছেন—

শুশোচ বহুলালাপৈঃ কর্ণস্য নিধনং যুধি।

গান্ধারীকে এমন করুণ বিলাপ করতে দেখে প্রশ্ন জাগে—তাহলে কী গান্ধারীর মনেও এমন কোনো দুরাশা ছিল যে, কর্ণের বাহুবলে দুর্যোধন শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করবেন? গান্ধারীকে অবশ্য ধৃতরাষ্ট্রের মতো একই মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না। আমরা অনুমান করতে পারি, পাশাখেলায় দুর্যোধনকে জয়লাভ করতে দেখে ধৃতরাষ্ট্র যেমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধনের জয়লাভের সংবাদ পেলেও তিনি ততোধিক উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়তেন। কিন্তু গান্ধারী রাজ্যলোভী নন। তিনি পাশাখেলা চাননি, যুদ্ধের পক্ষেও তিনি ছিলেন না। গান্ধারীর বিলাপের পিছনে কারণ হিসেবে দুর্যোধনের পরাজয়ের হতাশার থেকেও অনেক বেশি কাজ করছে জননীর স্নেহান্ধতা। দুর্যোধনের কার্যকলাপ যতই অপছন্দ করুন, তার প্রতি স্নেহ কিংবা অন্ধ স্নেহ গান্ধারীরও কিছু কম ছিল না। কর্ণের মৃত্যুর আগে দুঃশাসন নিহত হয়েছেন, গান্ধারীর আরও অনেকগুলি ছেলে মারা পড়েছে ভীমের হাতে। এমন অবস্থায় এটুকু আশা করা হয়তো গান্ধারীর পক্ষে অস্বাভাবিকও নয় যে, একবার অন্তত তাঁর ছেলে জিতুক, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধন এবং আরও কয়েকটি ছেলে বেঁচে থাক। কর্ণের মৃত্যু শুধু কৌরবপক্ষের পরাজয়ই নিশ্চিত করেনি, তাঁর বাকি পুত্রদেরও আসন্ন মৃত্যুর বার্তা দিয়ে গেছে যেন। মৃত্যুর ভয়ে, পুত্রশোকে আকুল হয়ে গান্ধারী আজ তাই ধৈর্য্য হারালেন—শোকে ভেঙে পড়লেন তিনি। প্রিয় পুত্র দিনে দিনে তিল তিল করে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে কোনো জননীর হৃদয়স্থিতি স্বাভাবিক থাকতে পারে না। গান্ধারীও একরকম মুহ্যমান হয়ে পড়লেন।

[মহা (k) ৮.৯৬.৫৫, ৫৭; (হরি) ৮.৬৯.৫২-৫৩]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আঠারো দিনের মাথায় ভীমের গদার আঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হল। দুর্যোধনের আর মাটি ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা নেই, তিনি মৃত্যুর মুখ দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন শুয়ে শুয়ে। পাণ্ডবপক্ষে জয়ধ্বনির কোলাহল সামান্য শান্ত হতেই ধর্মমতি যুধিষ্ঠিরের মনে পড়ল গান্ধারীর কথা। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ এখন শেষ হয়েছে—যুধিষ্ঠির আজ বিজয়ের উল্লাস দূরে সরিয়ে রেখে জননী গান্ধারীকে স্মরণ করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির মনে মনে ভয় পেলেন—গদাযুদ্ধের নিয়ম ভেঙে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেছেন ভীম। ধর্মদর্শিনী গান্ধারী সেই অপরাধ ক্ষমা করবেন না। যুধিষ্ঠির মনে করেন—গান্ধারী এক তপস্বিনী নারী। সারা জীবন এক অপ্রকাশ ধর্মচর্যার মধ্য দিয়ে নিজেকে চালিত করেছেন বলেই তিনি যেমন নিজের পুত্রদের অন্যায়গুলি মনে মনে মেনে নেননি কখনো, তেমনি আজ, অন্যপক্ষ থেকেও দুর্যোধনের অন্যায় উরুভঙ্গ করে যে অধর্ম হল—তাও বুঝি

তিনি ক্ষমা করবেন না। যুধিষ্ঠির ভীত হয়ে ভাবলেন, গান্ধারী ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর তপস্যার আগুনে পৃথিবীটাকেই ধ্বংস করে ফেলবেন হয়তো—

ঘোরেণ তপসা যুক্তা ত্রৈলোক্যমপি সা দহেৎ।

এসব ভেবে যুধিষ্ঠির এতটাই ভীত হলেন যে গান্ধারীর মুখোমুখি হতেও তাঁর ভয় হল। তিনি ভাবলেন—পাণ্ডব ভাইরা গান্ধারীর সামনে উপস্থিত হবার আগেই তাঁর ক্রোধ শান্ত করা দরকার—

গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধদীপ্তায়াঃ পূর্বং প্রশমনং ভবেৎ।

কেননা যেভাবে ভীম দুর্যোধনকে বধ করেছেন, তাতে তীব্র পুত্রশোকের জ্বালায় আপন মানসাগ্নিতে তিনি পাণ্ডবদের ভস্ম করেও দিতে পারেন, অন্তত যুধিষ্ঠিরের তাই বিশ্বাস—

মানসেনাগ্নিনা ক্রুদ্ধা ভস্মসান্নঃ করিষ্যতি।

যুধিষ্ঠির তাই কৃষ্ণের শরণ নিলেন। কৃষ্ণকে যুধিষ্ঠির বললেন—তুমিই একমাত্র পারো এই কাজটা করতে, আমরা গেলে হবে না। গান্ধারী তাঁর পুত্র-পৌত্রদের মৃত্যুশোকে এতটাই ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন, যে তাঁর সামনে কেউ গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না—

কশ্চ তাং ক্রোধতাম্রাক্ষীং পুত্রব্যসনকর্ষিতাম্।

আমি চাই—তুমি আগে সেখানে যাও, তোমার সময়োচিত শব্দমন্ত্রে তুমি তাঁর ক্রোধ-প্রশমনের চেষ্টা কর—

গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধদীপ্তায়াঃ প্রশমার্থমরিন্দম।

পুত্রশোকাতুরা গান্ধারীর ভয়ঙ্কর ক্রোধ যুধিষ্ঠির দেখতে পাচ্ছিলেন দূর থেকে। গান্ধারী ধর্মশক্তি বা তপস্যার কোন স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বা তিনি আদৌ পাণ্ডবদের ভস্ম করে দিতে পারেন কি না—সেই অলৌকিক তর্কযুক্তিতে না গিয়ে বলা যায়—গান্ধারী পুত্র শোকে এতটাই কাতর হয়েছেন যে, সেই শোকার্তা জননীর সামনে দাঁড়াতে যুধিষ্ঠিরও ভয় পাচ্ছেন।

এখানে গান্ধারীর চরিত্র সম্পর্কে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে। তিনি ধর্মদর্শিনী, দুরাচার পুত্রের অন্যায় কার্যকলাপের সমালোচনা তিনি জনসমক্ষে তো করেইছেন এমনকী পুত্রকে নির্বাসন দেবার কথাও তাঁর মুখ থেকে শোনা গেছে। চিরকাল অধর্মের পথে চলেছেন দুর্যোধন। ধর্মযুদ্ধে তাঁর পরাজয় এবং মৃত্যু তো একরকম স্বাভাবিক ঘটনা, অন্তত গান্ধারীর মতো ধর্মবোধসম্পন্না নারীর তো তা না বোঝার কথা নয়। সে ক্ষেত্রে আত্মজ পুত্রের মৃত্যুশোকে তিনি কাতর হতে পারেন, মূর্ছিত, আলুলায়িতও হতে পারেন, কারণ কুপুত্রের প্রতিও মাতৃহৃদয়ের আকুলতা কিছু অস্বাভাবিক নয়—কিন্তু তিনি এত ক্রুদ্ধ হবেন কেন? মহাকাব্যের কবি গান্ধারীর এই ক্রোধের কারণ খুব স্পষ্ট করে বলেননি, হয়তো বলতে চান না বলেই বলেননি।

মহাভারতের কবি গান্ধারীর মতো অসামান্য নারী সম্পর্কে যা বলতে চান না, তা গান্ধারীর ক্রোধের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ভয় থেকেই খানিকটা অস্ফুটে প্রকাশ পেয়েছে। আসল কথা হল—পুত্রের ব্যাপারে এবং তাঁর স্বভাবের ব্যাপারে যতই অসন্তোষ থাক গান্ধারীর, তবু স্নেহ অতি বিষম বস্তু। ধর্ম, ধর্ম এবং ধর্মের ব্যাপারেই গান্ধারীর যত প্রবণতা, যত মাহাত্ম্য চিহ্নিত হোক, তবু অনুপম যে মাতৃস্নেহ, তাতে কুপুত্রের প্রতি শত ধিক্কার সত্ত্বেও তাঁর মমতার শেষ প্রশ্রয়টুকু থেকেই গেছে দুর্যোধনের প্রতি। স্বামীর অপত্যস্নেহে তিনি বারংবার লজ্জিত হয়েছেন, বারবার সাবধান করেছেন, কিন্তু নিজে একবারও কিন্তু বলেননি—তুমি যা করছ করো, আমি পুত্রের মুখদর্শন করতে চাই না। তার মানে কিন্তু এই দাঁড়ায়—পুত্রের অন্যায়গুলি তিনি মেনে নিতে পারছেন না বটে, কিন্তু সে সর্বথা বঞ্চিত হোক, তার মৃত্যু ঘটুক, এটা তিনি মনে মনে চান না। কোনও জননীই তা চাইতে পারেন না। এবং এখানে তিনি সাধারণ কুপুত্রের মাতার চেয়ে অধিক নন কিছু। সুতরাং আমরা বুঝতে পারি যে, যুধিষ্ঠির আজ যে গান্ধারীকে ভয় পাচ্ছেন, তিনি হস্তিনাপুরের ধর্মদর্শিনী রাজমহিষী নন, পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠমাতাও নন—তিনি শুধুমাত্রই পুত্রশোকাতুরা একজন জননী। আজ পুত্রশোক তাঁকে এতটাই বিহ্বল করে তুলেছে যে পাণ্ডবদের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ করার সময় তিনি হয়তো একেবারেই ভুলে যাবেন যে, তাঁর পরলোকগত পুত্র দুর্যোধন সারাজীবন পাণ্ডবদের প্রতি কত অন্যায় করেছেন, কুলবধূ দ্রৌপদীর প্রতি কী বর্বর আচরণ করেছেন। মহাভারতের কবি তাঁর প্রখর বাস্তববোধ তথা কবিজনোচিত বেদনাবোধে এ-কথা বোঝেন যে, মাতৃস্নেহের ধর্ম সদসদ্‌বিবেকের নিষ্কারণ ধর্মবোধকে অতিক্রম করে এবং মানুষ বলেই তা

করে হয়তো। আর ঠিক সেই কারণেই তিনি এই কঠিন সময়ে উপস্থিত আছেন গান্ধারীর পাশে, যাতে তাঁর পুত্রবধূ এই ভীষণ ধর্মসংকটে শেষ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হন। এমন যেন না হয় যে, গান্ধারী যে স্বাভাবিক ঈর্ষাবশে তাড়িত হয়ে কুন্তীর পূর্বে পুত্র লাভ করার জন্য আপন গর্ভে আঘাত করেছিলেন, আজকে সেই ঈর্ষা, সেই ক্রোধে তিনি চিরকালের জন্য চিহ্নিত হয়ে যান।

আসলে পাণ্ডবরা রাজ্যচ্যুত হোন কিংবা তাঁর পুত্রের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ান—এমনটি যেমন গান্ধারী চাননি তেমনই দুর্যোধনের মৃত্যুও গান্ধারীর ঈপ্সিত ছিল না, জননীর স্বাভাবিক মমত্ববোধের কারণেই ছিল না। তাই দুর্যোধনের মৃত্যুর পর থেকে পাণ্ডবদের পুত্রহন্তা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছেন না গান্ধারী। তাই পাণ্ডবদের প্রতি এতটা ক্রুদ্ধ হয়েছেন তিনি। যুধিষ্ঠির গান্ধারীর এই মনোভাবটাই সঠিক ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। আর বুঝতে পেরেছেন গান্ধারীর শ্বশুর মহর্ষি ব্যাস। তিনি এক মুহূর্তও দেরি না করে আজ পুত্রশোকে কাতর পুত্রবধূর পাশে দাঁড়িয়েছেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কথায় হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়েছেন ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর সামনে। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি। এবং সেগুলি বলে-বলেই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, অন্যায়ী দুর্যোধনের এমন একটা শাস্তি একেবারে প্রাপ্যই ছিল। গান্ধারীকে সান্ত্বনা দেবার সময় কৃষ্ণের শব্দকৌশল আরও সুচতুর, আরও সূক্ষ্ম। কৃষ্ণ বললেন—এখনকার সময়ে আপনার মতো বিশিষ্টা নারী আর একটিও নেই—

ত্বৎসমা নাস্তি লোকেঽস্মিন্নদ্য সীমন্তিনী শুভে।

আপনার তো মনেও থাকবে—আমি যখন শান্তির প্রস্তাব নিয়ে কুরুসভায় এসেছিলাম, তখন উভয় পক্ষের লোকেরাই অনেক হিতের কথা, ভালো ভালো কথা বলেছিলেন, কিন্তু আপনার ছেলেরা কেউ সে সব কথা শোনেননি—

উক্তবত্যসি কল্যাণি ন চ তে তনয়ৈঃ কৃতম্।

তারপর আমার সামনেই সেই ঘটনাটা ঘটল। আপনি আমার সামনেই দুর্যোধনকে যথেষ্ট কড়া কথা বলেছিলেন—

দুর্যোধনস্ত্বয়া চোক্তো জয়ার্থী পরুষং বচঃ।

আপনি দুর্যোধনকে বলেছিলেন—ওরে মূর্খ! আমার কথা শোন—ধর্ম যেখানে জয়ও সেখানে। দেখুন, আজকে আপনার সেই কথাটা ফলেছে। আপনি যদি এই ধর্মের ব্যাপারটাই খেয়াল রাখেন, তা হলে সত্যিই আপনার দুঃখ করার কিছু নেই, আর পাণ্ডবদেরও আপনি প্রতিপক্ষ ভেবে নেবেন না, তাঁদের কোনো ক্ষতি হোক—এই চিন্তাও আপনি মাথায় রাখবেন না—

পাণ্ডবানাং বিনাশায় মা তে বুদ্ধিঃ কদাচন।

আমি জানি, আপনি আপনার মানসিক শক্তিতে, তপস্যার শক্তিতে এই পৃথিবীকেও দগ্ধ করতে পারেন—

চক্ষুষা ক্রোধদীপ্তেন নির্দগ্ধুং তপসা বলাৎ।

কৃষ্ণ বাগ্মী বটে, চতুর বক্তাও বটে। গান্ধারীর কথা দিয়েই গান্ধারীকে স্তব্ধ করে দিলেন কৃষ্ণ। দুর্যোধনের মৃত্যুতে যে ভয়ঙ্কর ক্রোধ তাঁর মধ্যে জমা হয়ে উঠেছিল, কৃষ্ণের মধুর-চতুর উক্তিতে তা প্রকাশ করতে পারলেন না গান্ধারী। শুধু বললেন—আমার মনের ব্যথা আমার বুদ্ধি বিচলিত করে দিয়েছিল—

আধির্ভি-র্দহ্যমানায়া মতিঃ সঞ্চলিতা মম।

—কিন্তু কৃষ্ণ! তোমার কথা শুনে আমার বুদ্ধি এখন অনেকটাই স্থির হয়েছে। আমি জানি—তুমি আছ, পাণ্ডবভাইরা সকলে আছে—এখন তো তোমরাই এই পুত্রহীন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র অবলম্বন—

ত্বং গতিঃ সহিতৈর্বীরৈঃ . . . হতপুত্রস্য কেশব।

কৃষ্ণের বাক্‌চাতুর্য্যের সামনে গান্ধারীর ক্রোধ প্রকাশ পেলনা ঠিকই, কিন্তু তিনি যা বললেন, তাতে তাঁর মনের হতাশা যথেষ্টই প্রকাশ পেল। গান্ধারী এখন বেশ অসহায় বোধ করছেন। তাঁর পুত্ররা যত দুরাচারই হোক, তাদের অন্যায় আচরণে যত বিরক্তই তিনি হয়ে থাকুন, তবু তারা তাঁর আপন পুত্র ছিল। গান্ধারী কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, তাঁর শতপুত্রের একটিও আজ বেঁচে থাকবে না। তাঁর পুত্ররা কুসন্তান হলেও কুরুরাজ্যের শাসনভার ছিল তাদেরই হাতে। রাজমহিষী হিসেবে, রাজমাতা হিসেবেও গান্ধারী মর্য্যাদা লাভ করতেন যথেষ্ট। আজ পুত্ররাও নেই, রাজ্যও নেই। আজ তাঁকে নির্ভর করতে হচ্ছে তাঁদের উপর, যারা তাঁকে পুত্রহীনা বলে মায়া করবেন, করুণা করবেন এবং তাঁরাই

প্রতিপক্ষের যোদ্ধা এবং তাঁর পুত্রদের মৃত্যুর কারণও বটে। গান্ধারী এসব ভেবে একটা মানসিক যাতনা অনুভব করতে লাগলেন, তাঁর বিলাপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অসহায়তা, হতাশাও ঝরে পড়তে লাগল।

দুর্যোধনের মৃত্যু হল অবশেষে। ওদিকে অশ্বত্থামা ঘুমন্ত পাণ্ডবশিবির আক্রমণ করে পশুর মতো হত্যা করলেন পাণ্ডবপক্ষের অবশিষ্ট যোদ্ধাদের, মারা গেল দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র। কুরুবংশের ভাবী বংশধর অভিমন্যুর পুত্রও মাতৃগর্ভেই আহত হল ব্রহ্মশির অস্ত্রের আঘাতে। শেষ হল বহু রক্তক্ষয়ী কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ।

[মহা (k) ১.৬২.৪০-৪১; ১.৬৩.১-৭৮;
(হরি) ৯.৫৮.৪০-৪১; ৯.৫৯.১-৭১]

□ যুদ্ধ শেষ হতে মৃতদের অন্ত্যেষ্টির আয়োজন আরম্ভ হল। ব্যাস, বিদুর প্রভৃতির সান্ত্বনাবাক্যে খানিকটা শান্ত হয়ে ধৃতরাষ্ট্র পুরনারীদের নিয়ে চললেন কুরুক্ষেত্রের উদ্দেশে। গান্ধারী চললেন, সঙ্গে কুন্তীও। এতদিন যে কুন্তীর প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন গান্ধারী, এত বছর যাঁর সঙ্গে কথাটি পর্যন্ত বলেননি, আজ হস্তিনাপুরের ভাবী রাজমাতা সেই কুন্তীর সঙ্গে কুরক্ষেত্রের পথে চলতে হতপুত্রা গান্ধারীর কেমন লাগছিল, সে কথা অবশ্য মহাভারতের কবি বলেননি।

হস্তিনাপুর থেকে বেরিয়ে কুরুক্ষেত্রে যাবার পথে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর দেখা হল অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মার সঙ্গে, পাণ্ডব শিবির ধ্বংস করে তাঁরা তখন পালাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর সামনে এসে কুরুকুলগুরু কৃপাচার্য তাঁদের পুত্রদের মৃত্যুর খবর দিলেন, সান্ত্বনাও দিলেন। কিন্তু তারপরে যেটা কৃপাচার্য বললেন, সেটা আমাদের কাছে পরম আশ্চর্যের।

কৃপাচার্য বললেন—ভীম অন্যায়ভাবে আপনার ছেলেকে মেরেছে শুনে আমরা রাত্রের অন্ধকারে পাণ্ডব-শিবিরে ঢুকে ধুন্ধুমার কাণ্ড করে এসেছি—আমরা দ্রুপদের ছেলেগুলোকে মেরেছি, দ্রৌপদীর ছেলেগুলোকেও মেরে ফেলেছি—

দ্রুপদস্যাত্মজাশ্চৈব দ্রৌপদেয়াশ্চ পাতিতাঃ।

আপনার ছেলের শত্রুদের এইভাবে বিনাশ করে এসেছি বলে তারা এখন আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের আর এখানে থাকা চলবে না, আপনি আমাদের অনুমতি করুন, আমরা যাই—

অনুজানীহি নো রাজ্ঞি ... সংস্থাতুং নোৎসহামহে।

তিন জনে তিন দিকে চলে গেলেন বটে, কিন্তু কৃপাচার্য গান্ধারীকে যে খবরগুলি দিলেন, এই প্রতিহিংসার সংবাদ গান্ধারীর কাছে প্রিয় সংবাদ কিনা, সেটা আমাদের বোঝার উপায় নেই। ভীমের অন্যায় আঘাতে পুত্রের মৃত্যু হয়েছে শুনে যিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তিনি কি নিদ্রিত অবস্থায় দ্রৌপদীর পুত্র-বিনাশনের সংবাদ পেয়ে খুশি হলেন? খুশি হলেন কি না জানা নেই, তার কারণ গান্ধারীর প্রতিক্রিয়া মহাভারতের কবি আমাদের জানাননি। তবে এটাও অনুমানের বিষয় যে, গান্ধারী খুশি হবেন বলেই কৃপাচার্যের এমনতর সংবাদের অবতারণা। অন্যায় হিংসার উত্তরে অন্যায় এই প্রতিহিংসার কথা শুনে গান্ধারী ভালোমন্দ কিছুই বললেন না। এও তো বড়ো আশ্চর্য। আপন অন্তরস্থিত ধর্মবোধে এই মুহূর্তে খুশি হওয়া সাজে না বলেই হয়তো তিনি খুশি হননি, আবার সেই অন্তরস্থিত পুত্রহত্যার প্রতিশোধবৃত্তিও বাইরে প্রকাশ করাটা একান্ত অশোভন বলে তিনি খুশি দেখালেন না এতটুকু। গান্ধারী নিরুত্তরা কেন এত—আমরা তাঁর প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারি না। নাকি সংবেদনশীল মহাকবি তা বুঝতে দিতে চান না।

কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর দেখা হল। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে পাণ্ডবরা সকলে গান্ধারীর কাছে গেলেন এবং গান্ধারীর মনের অবস্থা তখন এইরকম যে, তিনি যুধিষ্ঠিরকেই অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন।

দ্বৈপায়ন ব্যাস এ-কথা পূর্বেই অনুমান করেছিলেন বোধহয়। আমরা দেখেছি— তিনিই বোধহয় এই পুত্রবধূটিকে সর্বাধিক চেনেন। গঙ্গায় স্নান করে ওঠার পরেই তাঁর মনে হয়েছে— বিপত্তি ঘটতে পারে পাণ্ডবদের। তিনি ত্বরায় এসে গান্ধারীর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—এটা কিন্তু অভিশাপ দেবার সময় নয়, গান্ধারী। এটা এখন ক্ষমা করার সময়—

শাপকালম্ অবাক্ষিপ্য ক্ষমাকালমুদীরয়ন্।

—অতএব গান্ধারী তুমি পাণ্ডবদের ওপর ক্রোধ কোরো না। এবারে একটা অসাধারণ যুক্তি দিয়েছেন দ্বৈপায়ন ব্যাস, যেখানে যুদ্ধের সময় আঠারো দিন ধরে গান্ধারী কীভাবে মানসিক লড়াই করেছেন পুত্রের সঙ্গেই এবং বলা ভালো, পাণ্ডবপক্ষেই, আর ঠিক এইখানেই ধরা পড়ে,

কীভাবে সমস্ত খণ্ডিত ক্ষুদ্র বৃত্তিগুলিকে অতিক্রম করে গান্ধারী এক পরম উত্তরণের পথে যান। বুঝতে পারি, কেন দ্বৈপায়ন ব্যাস তুচ্ছ ঘটনাগুলি স্পষ্ট করে বলেন না—অধর্মের বিরুদ্ধে যখন অন্তর্গত ধর্মের লড়াই চলে, তখন তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনাগুলিকে কবিজনোচিত সংবেদনশীতায় এড়িয়ে যেতেই হয়, নইলে শেষ পর্যন্ত গান্ধারীকে বোঝা যায় না।

গান্ধারী যখন পুত্রশোকে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারছেন না, তখনই এই ক্রোধের উদ্‌গম, তিনি যুধিষ্ঠিরকে পর্যন্ত অভিশাপ দিতে উদ্যত। ব্যাস বলছেন—পাণ্ডবদের ওপর তুমি ক্রোধ কোরো না গান্ধারী! তোমার কী মনে পড়ে—যুদ্ধের এই আঠারো দিন গেছে, প্রত্যেক দিন যুদ্ধযাত্রার কালে দুর্যোধন তোমার কাছে এসে বলত—আমি যুদ্ধে যাচ্ছি, মা! আশীর্বাদ করো—আমার যেন মঙ্গল হয়—

শিবমাশংস মে মাতুর্যুধ্যমানস্য শত্রুভিঃ।

তুমি কিন্তু তখন একদিনও সেই ব্যক্তিগত উচ্চারণ করোনি, বলোনি—যাও বীর, জয়যাত্রায় যাও, তোমার জয় হোক। প্রতিদিন পুত্রের জয়ৈষণার উত্তরে তুমি বলেছ—যাও পুত্র, যেদিকে ধর্ম আছে, সেই দিকেই জয় হবে—

উক্তবত্যসি কল্যাণি যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।

ব্যাস আরও বলেছেন—তুমি তো কোনোদিন মিথ্যা বলোনি, চিরকাল সত্য কথা বলেছ, অতএব পুত্র দুর্যোধনের জয়কামনার উত্তরে তুমি নিশ্চয়ই মনে একরকম, মুখে আর একরকম কথা বলোনি, তুমি ধর্মেরই জয় চেয়েছ—

ন চাপ্যতীতাং গান্ধারী বাচং তে বিতথামহম্।

আমাদের মহাকাব্যের কবি এমন এক কবি, যিনি শুধু কবিতা লেখেন না, তিনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের জীবনে অংশগ্রহণ করেন এবং ধর্মের পথে উত্তরণ ঘটানোর জন্য তাঁদের সংশোধন করেন, সময়ে পাশে এসে দাঁড়ান। আজ যখন অন্যায়কারী পুত্রের শোকে গান্ধারী তাঁর সদ্‌বৃত্তের চিত্তপথ থেকে প্রায় বিচ্যুত হতে যাচ্ছেন, সেখানে তাঁর পরমর্ষি শ্বশুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন পুত্রবধূকে ধর্মবৃত্তের মধ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য। ব্যাস বলেছেন—তুমি আগে যাদের ওপর ক্ষমাশীল ছিলে, এখন সেই ক্ষমা তুমি করছ না কেন—

ক্ষমাশীলা পুরা ভূত্বা সাদ্য ন ক্ষমসে কথম্।

তুমি ধর্ম এবং পূর্বের কথা স্মরণ করে তোমার পুত্রস্থানীয় পাণ্ডবদের ওপর তোমার উদ্‌গত ক্রোধ পরিত্যাগ করো—

কোপং সংযচ্ছ গান্ধারী পাণ্ডবেষু সুতেষু তে।

ব্যাসের কথায় প্রকৃতিস্থ হলেন গান্ধারী। আসলে পুরোপুরি ধৃতরাষ্ট্রের মতো না হলেও তাঁর হৃদয়েও সেই দ্বৈরথ খেলা করে। একদিকে কুপুত্র হওয়া সত্ত্বেও সেই বিষম পুত্রস্নেহ, অন্যদিকে ধর্ম। অন্তর্গত ধর্ম তাঁকে যতই স্থির রাখার চেষ্টা করুক। তবু পুত্রস্নেহ, স্বামীর প্রতি মমতা তাঁকে মাঝে মাঝে এক অচিন্ত্য সংকটের মধ্যে এনে ফেলে। তিনি চেষ্টা করেন, পারেন না এবং অবশেষে সাময়িকভাবে পারেন। গান্ধারী ব্যাসকে বললেন—আমি পাণ্ডবদের ওপরে দোষারোপ করি না, তাদের বিনাশও চাই না। আমি জানি—পাণ্ডবরা কুন্তীর কাছে যে রকম, আমার কাছেও তো সেইরকমই, কাজেই তাদের বাঁচিয়ে রাখাটা আমারও উচিত কাজ—

যথৈব কুন্ত্যা কৌন্তেয়া রক্ষিতব্যাস্তথা ময়া।

এই অসামান্য বক্তব্য উচ্চারণ করা সত্ত্বেও গান্ধারী কিন্তু ভীমের অন্যায় গদাঘাতটুকু ভোলেননি। সারা জীবন ধরে পুত্রের অন্যায়গুলি তিনি এই মুহূর্তে ভুলে গেলেন এবং উচ্চারণ করলেন সেই কঠিন প্রতিবাদ। বললেন—ভীম আমার দুর্যোধনকে গদাযুদ্ধে আহ্বান করে কৃষ্ণের সামনেই এমন কাজটা করল—

কিন্তু কর্মাকরোদ্ ভীমো বাসুদেবস্য পশ্যতঃ।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের ক্ষমতা সম্বন্ধে গান্ধারীর সমস্ত গর্ববোধ জেগে উঠল। তিনি বললেন—দুর্যোধন গদাযুদ্ধে ভীমের চাইতে অনেক ভালো, অনেক নিপুণ, এবং ভীম সেটা ভালোই জানত। দুর্যোধন যুদ্ধক্ষেত্রে গদা হাতে চারদিক দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল, আর ঠিক সেই অবস্থায় ভীম তার নাভির নীচে গদাঘাত করল। এই ব্যাপারটাই আমার ক্রোধ বাড়িয়ে তুলেছে—

অধো নাভ্যাঃ প্রহৃতবান্ তন্মে কোপমবর্ধয়ৎ।

বেশ বোঝা যায় গান্ধারীর অনন্ত ধর্মৈষণার তলদেশে অন্যায়কারী পুত্রের সম্বন্ধে তাঁর জননী-স্নেহ এবং গর্ববোধ কম ছিল না। হয়তো প্রশ্রয়ও ছিল, যেটা প্রকটভাবে ধরা পড়ত না সত্যধর্মের জ্বালায়, তবে তাঁর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের পার্থক্য এই যে, যুক্তি-তর্ক, ঊহ-প্রত্যূহের দ্বারা তিনি যাবতীয় ক্ষুদ্র

ভাবনাগুলিকে দূর করে দিতে পারেন এবং পারেন জননীস্নেহ অতিক্রম করে ধর্মবৃত্তে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। গান্ধারীর এই ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে ভীমের মতো মানুষও ভয় পেয়েছেন। তিনি সত্য স্বীকার করে বলেছেন—ধর্মই হোক আর অধর্মই হোক, আমি আত্মরক্ষার জন্য এই অন্যায় করেছি। সবচেয়ে বড়ো কথা, যুদ্ধনীতির সঠিক নিয়ম মানলে আমি কেন, কেউই আপনার ছেলেকে হারাতে পারত না, আর ঠিক সেইজন্যই আমাকে অধর্ম করতে হয়েছে—

ন শক্যঃ কেনচিদ্ধন্তুম্ অতো বিষমম্ আচরম্।

ভীম এবার তর্কে এলেন। বললেন—আর অধর্মের প্রশ্নই যদি তোলেন, তবে বলব—মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে তিনি অন্যায় পাশাখেলায় জিতে তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন। আমাদের সকলের সঙ্গে তিনি অনেক প্রতারণা করেছেন, ফলে আমাকেও অধর্মের আশ্রয় নিতে হয়েছে—

নিকৃতাশ্চ সদৈব স্ম ততো বিষমম্ আচরম্।

দুর্যোধনের অন্যায়ের কথা বলেই ভীম কিন্তু গান্ধারীর মনে আবারও সেই পুত্রগর্ব উদ্দীপিত করে দিয়ে বললেন—বিপক্ষ সৈন্যদের মধ্যে আপনার ছেলে ছিলেন একমাত্র অবশিষ্ট। এদিকে তাঁর মতো গদাযুদ্ধে নিপুণ ব্যক্তির সঙ্গে আমি পেরে উঠব কেন? কিন্তু তিনি বেঁচে থাকলেও আমাদের অপহৃত রাজ্য পাবার সম্ভাবনা কিছু ছিল না। অতএব অন্যায়টা করতেই হল। এবারে শেষ কথাটা বলতে আরম্ভ করলেন, বলতে আরম্ভ করলেন গান্ধারীর চরম লজ্জার কথাটা। বললেন—আপনার ছেলে দুর্যোধন পাণ্ডব-কুলবধূকে রজস্বলা অবস্থায় এক কাপড়ে টেনে এনে কী কী কথা বলেছিলেন; সে-সব আপনি কিন্তু জানেন—

ভবত্যা বিদিতং সর্বং উক্তবান্ যৎ সুতস্তব।

সেদিন যত অপ্রিয় ঘটনা ঘটেছিল সব আমি উল্লেখ করছি না, কিন্তু সমস্ত অপ্রিয় এবং অন্যায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো অন্যায়—আপনার ছেলে উন্মুক্ত রাজসভায় সকলের সামনে পাণ্ডব-বধূকে ঊরু থেকে কাপড় সরিয়ে বাম ঊরু দেখিয়েছিল। আমার মতে, সেইদিনই সকলের সামনে তাকে আমরা মেরে ফেলতাম, কারণ সেটাই উচিত কাজ ছিল—

তদৈব বধ্য সো'স্মাকং দুরাচারো'স্ব তে সুতঃ।

—কিন্তু ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্যবদ্ধ থাকায়, সেটা আমরা পারিনি।

প্রত্যক্ষত দুর্যোধনের অন্যায় কর্মগুলি পরপর সাজিয়ে দিলে গান্ধারী সত্যিই আর সহ্য করতে পারেন না, তখন ভাবেন—এমন ছেলের মরণই ভালো। তবু ভীমের কথার মধ্যে তৃপ্তিকর সারটুকু জননীর মোহে-স্নেহে তিনি আস্বাদন করেন। বলেন—বাছা! তুমি তো তার প্রশংসাই করছ। তুমি তো বলছ—তুমি ওর সঙ্গে পেরে উঠতে না গদাযুদ্ধে, তাই তোমাকে অন্যায় করতে হয়েছে তার নাভির অধোদেশে আঘাত করে। অতএব এটা তার হত্যা নয়, প্রশংসা বটে, তুমি আমার ছেলের প্রশংসাই করছ—

ন ত্বস্যৈষ বধস্তাত যৎ প্রশংসসি মে সুতম্।

আর তুমি যেসব অন্যায়ের কথা বললে, সেগুলো তো সে করেইছে। সেখানে কীই বা আমার বলার আছে। তবে হ্যাঁ, দুর্যোধনকে বধ করার জন্য তোমাকে অন্যায়ের আশ্রয় নিতে হয়েছে সেটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু এ-ব্যাপারটায় কী তুমি বলবে ভীম, তুমি একটা মানুষ হয়ে দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত পান করলে—

অপিবঃ শোণিতং সংখ্যে দুঃশাসনশরীরজম্।

এটা কি কোনো ভদ্রলোকের কাজ, নাকি কোনো ভদ্রলোক এই কাজের প্রশংসা করবে? প্রক্রিয়াটা তো অত্যন্ত নৃশংসও বটে, কাজেই এমন অযৌক্তিক কাজটা তুমি করলে কী করে, ভীম?

ভীম জবাব দিলেন। গান্ধারীর শব্দ-ব্যবহার এবং জিজ্ঞাসার কোমলতা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর ক্রোধ খানিকটা উপশম হয়েছে, দুর্যোধনের অন্যায় কর্মগুলি তিনি মনে মনে মেনে নিতে পারতেন না বলেই সেগুলি উচ্চারিত হলে, তিনি নিজের দোষটুকু বুঝতে পারেন, আর সেইজন্যই এখন ক্রোধ করছেন না বটে, কিন্তু ভীমের কাছে জবাবদিহি চাইছেন—রাগের মাথায় রক্ত খাব বললেই কি এইভাবে কেউ বুক চিরে রক্ত খায়? এ কেমন রাক্ষুসে অসভ্যতা! ভীম বললেন—ঠিকই তো। অন্য মানুষের রক্তই যেখানে পান করা অসম্ভব, সেখানে আমি নিজের রক্ত পান করি কী করে। ভাই তো আমার নিজেরই রক্ত—

যথৈবাত্মা তথা ভ্রাতা বিশেষো নাস্তি কশ্চন।

ভগবান জানেন, আমি কখনোই দুঃশাসনের রক্তপান করিনি। তবে হ্যাঁ, একটা প্রতীকী ব্যাপার

তো ছিলই। আমার হাত দুটো দুঃশাসনের রক্তে নিষিক্ত ছিল এবং সেই রক্ত আমি ঠোঁটে ছুঁইয়েছিলাম, আমার দাঁত এবং ঠোঁটের ওদিকে যায়নি সে রক্ত, কাজেই এমন ভাববেন না যে, আমি রাক্ষসের মতো দুর্বিষহ কোনো অসভ্যতা করেছি—

রুধিরং ন ব্যতিক্রমাদ্ দন্তোষ্ঠাদম্ব মা শুচঃ।

ভীম এবার দুঃশাসনের অন্যায়গুলো বলবার পরেই সেই অনুচ্চার্য্য কথাটা বলে ফেললেন, কেননা গান্ধারীর ধর্মভাবিত বৃত্তির নিরিখে সেই কথাটা আমরা এতকাল বলতে পারিনি। ভীম বললেন—সেই পাশাখেলার আসরে দুঃশাসন পাণ্ডব-কুলবধূ দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে রাজসভায় টেনে এনেছিল। সেদিন আমি তার বুক চিরে রক্তপান করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমি সেই প্রতিজ্ঞা পালন করেছি ক্ষত্রিয়ের ধর্মে—

ততস্তৎ কৃতবান্ অহম্।

দুর্যোধন-দুঃশাসনকে বধ করার জন্য ভীমের বক্তব্যে কোনো অজুহাত কিংবা সাফাই গাওয়া ছিল না, ভীম সব সত্যগুলি উচ্চারণ করার পর এবার গান্ধারীকেই সবচেয়ে বিপদে ফেলে দিলেন। ভীম বললেন—আমরা আগে কোনোদিন তো কোনো অপকার করিনি আপনাদের, কিন্তু আপনার ছেলেরা চিরটা কাল আমাদের ওপর অন্যায় করে গেছে, করেই গেছে। আপনি তো কোনোদিন বারণ করেননি আপনার ছেলেদের—

অনিগৃহ্য পুরা পুত্রান্ অস্মাসু অনপকারিষু।

—অথচ আজকে আপনি আমাদের দুষছেন—কেন আমি আপনার ছেলেদের হত্যা করেছি। আপনি নিজে তাদের অন্যায় কর্মে বারণ না করে আমাকে এভাবে বারণ করতে পারেন না—

ন মামর্হসি কল্যাণি দোষেণ পরিশঙ্কিতুম্।

ভীম যে কথাটা বললেন, তা অপ্রিয় হলেও সত্য বটে। পুত্রদের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক দূরত্ব ছিল গান্ধারীর—তাদের দুরাচার তিনি সমর্থন করেননি, কিন্তু শাসন করেও দুটো কথা বলেননি কখনো। একেবারে দ্যূতসভায় দুর্যোধন যখন বর্বরতার যাবতীয় সীমা অতিক্রম করে গেছেন—সেই সময় প্রথম গান্ধারী ছুটে এসে তিরস্কার করেছিলেন পুত্রকে। বোধহয় সেখানেই প্রথমবার গান্ধারীকে পুত্রের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা গেল। তারপর আবার উদ্যোগপর্বে যুদ্ধ বাঁধবার আগে গান্ধারী রাজসভায় এসে বকাবকি করেছেন পুত্রকে, শাসন করেছেন, উপদেশ দিয়েছেন। এছাড়া কখনো গান্ধারীকে সোচ্চারে পুত্রের কার্যকলাপের প্রতিবাদ করতে দেখা যায় না। ভীমের মুখ থেকে সেকথা স্পষ্টভাবে শুনেও গান্ধারী তাই তেমন আহত হলেন না। বরং এবার তিনি যা বললেন, তা অনেক বেশি কারুণ্য জাগায় মনে। গান্ধারী বললেন—তুমি এই অন্ধ বৃদ্ধের একশোটা ছেলেকেই হত্যা করেছ। তুমি অন্তত একজনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারতে, তা হলে আমিও তোমাকে অন্তত সম্পূর্ণরূপে অপরাধী ভাবতাম না—

কস্মান্নশেষয়ঃ কঞ্চিদ্ যেনাল্পম্ অপরাধিতম্।

আমরা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি, আমাদের রাজ্যও চলে গেছে, একটা ছেলেও যদি বেঁচে থাকত আজ, তা হলে এই দুই বুড়ো-বুড়ির হাতের লাঠি হয়ে সে থাকতে পারত—অন্তত একটা ছেলেকে তুমি বাঁচিয়ে রাখতে পারতে—

নাশেষয়ঃ কথং যষ্টিং . . . বৃদ্ধয়োর্হৃতরাজ্যয়োঃ।

অবাক লাগে—উদ্যোগপর্বে এই গান্ধারীই যুক্তি তর্ক দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে, হস্তিনাপুরের রাজ্য কখনোই দুর্যোধনের প্রাপ্য নয়। এমনকী ধৃতরাষ্ট্রেরও তা প্রাপ্য ছিল না ন্যায়সঙ্গত কারণেই। সেই গান্ধারীই আজ হতাশা প্রকাশ করে বলছেন—আমাদের রাজ্য চলে গেছে। আসলে গান্ধারীর এই হতাশার মূল কারণ যতটা না রাজ্যচ্যুত হওয়া, তার থেকেও বেশি হল পরনির্ভরতা। যত দুরাচার হোক, এতদিন তাঁর পুত্ররাই তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করত, তিনি হস্তিনাপুরের রাজমহিষীর পদমর্য্যাদা বহনও করতেন। আজ সেই পদমর্য্যাদাচ্যুত হয়ে খানিকটা অসহায় বোধ করছেন তিনি, বৃদ্ধবয়সে পুত্রহন্তা ভ্রাতুষ্পুত্রদের উপর নির্ভর করতে তাঁর বিশেষ আনন্দও হচ্ছে না। যুধিষ্ঠিরের উপস্থিতি টের পেতেই গান্ধারীর সেই হতাশা আবার খানিকটা ক্রোধের চেহারা নিল। ভীমের কথাবার্তায়, যুক্তিতে ক্রোধটা চাপা পড়েছিল বটে, কিন্তু এখন আবার ক্রুদ্ধ হয়েই গান্ধারী বেশ তির্যকভাবে প্রশ্ন করলেন—তা তোমাদের রাজা কোথায়—

ক্ব স রাজেতি সক্রোধা পুত্রপৌত্রবধার্দিতা।

এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পরে যুধিষ্ঠিরের এখনও রাজ্যাভিষেক হয়নি প্রথাগতভাবে, তবু এই সম্বোধন। যুধিষ্ঠির কাঁপতে কাঁপতে এলেন গান্ধারীর কাছে, দাঁড়ালেন হাত জোড় করে—

তামভ্যগচ্ছদ্ রাজেন্দ্রো বেপমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ।

সমস্ত দোষ নিজের কাঁধে নিয়ে যুধিষ্ঠির বললেন—সব দোষ আমার। আমিই আপনার পুত্রহন্তা, আমিই এই সমস্ত মৃত্যুর জন্য দায়ী। আপনি আমাকে অভিশাপ দিন জননী—

শাপার্হঃ পৃথিবীনাশে হেতুভূতঃ শপস্ব মাম্।

গান্ধারী কোনো কথা বললেন না, কারণ এ-রকম করে সমস্ত দোষ নিজের কাঁধে নিয়ে যে অবনত হয়, তাকে অভিশাপ দেওয়া যায় না, কিন্তু তবু ক্রোধ সম্পূর্ণ অপগত না হলে উপায়ান্তরের অভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘতর হয়েই যায়, গান্ধারীরও তাই হল, তিনি কোনো কথা বললেন না, শুধু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন অন্তর্গত ক্রোধে—

নোবাচ কিঞ্চিদ্ গান্ধারী নিশ্বাসপরমা ভৃশম্।

অসহায় যুধিষ্ঠির জননী গান্ধারীর পুত্রশোকে সমদুঃখিত হয়ে তাঁর দুরন্ত ক্রোধ প্রশমনের জন্য অবনত হলেন তাঁর চরণ স্পর্শ করার জন্য। চরণ স্পর্শ করে উঠে দাঁড়াতেই গান্ধারীর পট্টান্তরিত চোখের কোণ থেকে জ্বলন্ত ক্রোধবহ্নি এসে লাগল যুধিষ্ঠিরের পদাঙ্গুলির অগ্রভাগগুলিতে—

অঙ্গুল্যগ্রাণি দদৃশে দেবী পট্টান্তরেণ সা।

হয়তো অলৌকিকতার তুলিতে লেখা হয়েছে গান্ধারীর এই বহ্নি-নেত্রপাত, বলা হয়েছে সেই জননীর নেত্রবহ্নিতে যুধিষ্ঠিরের চরণস্থিত সমস্ত পদাঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ পুড়ে গেল। যুধিষ্ঠিরের নখগুলি নষ্ট হয়ে গেল—

ততঃ স কুনখীভূতো দর্শনীয়নখো নৃপঃ।

হয়তো অলৌকিকতা নয়, গান্ধারীর চোখে দেখা এই প্রতীকী নেত্রবহ্নির মাধ্যমে মহাকাব্যের কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, গান্ধারী চিরকাল যে ধর্মভাবনায় ভাবিত হয়ে স্বভাবত শুদ্ধ হতে চান, মানুষের স্বভাববৃত্তি সেখানে স্ফূরিত হয় নিতান্ত অসচেতনভাবেও। আমরা যুধিষ্ঠিরকে দেখেছি—সেই দ্যূতসভায় আপন অপরাজিত ধর্মবৃত্তির মধ্যেও তিনি পাশাখেলায় দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন, আজ আরও এক ধর্মাধার জননীর চিরন্তন ধর্মবোধের মধ্যেও জাগ্রত হয়ে ওঠে সেই স্নেহান্ধতার আগুন, যা ধর্মের, ধর্মশরীরের পদাঙ্গুলি পুড়িয়ে দেয়।

যুধিষ্ঠিরের পায়ের অবস্থা দেখেই বোধহয় অর্জুনের মতো মহাবীরও কৃষ্ণের পিছনে এসে দাঁড়ালেন। কৃষ্ণসহ পাণ্ডব-ভাইরা সকলেই গান্ধারীর ক্রোধ প্রশমন করার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং গান্ধারীর ক্রোধ অচিরেই শান্ত হল। পাণ্ডবরা ফিরে পেলেন পুরাতন জননীকে। বিদ্বেষশূন্যা গান্ধারীকে রেখে পাণ্ডবেরা এবার গেলেন জননী কুন্তীর কাছে, পুনশ্চ কুন্তী এবং দ্রৌপদী দু'জনকে নিয়ে পাণ্ডবেরা আবারও উপস্থিত হলেন গান্ধারীর কাছে। কুন্তী এবং দ্রৌপদী উভয়কে অঝোরে কাঁদতে দেখে গান্ধারী বিশেষত দ্রৌপদীকে উদ্দেশ করে বললেন—এমন করে কষ্ট পেয়ো না বাছা! তোমরা আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখো—

মৈবং পুত্রীতি দুঃখার্তা পশ্য মামপি দুঃখিতাম্।

এই ভয়ংকর যুদ্ধ হয়তো কাল-নিরূপিত, স্বাভাবিক। এখন দ্রৌপদী! তুমিও পুত্রহীন, আমিও তাই, আমাদের কে সান্ত্বনা দেবে? আমি তো আমার ছেলেটাকে বারণ করে রুদ্ধ করতে পারিনি এই যুদ্ধ, তাই আমারই দোষে এত বড়ো বংশটা ধ্বংশ হয়ে গেল—

মমৈব হ্যপরাধেন কুলমগ্র্যং বিনাশিতম্।

এতক্ষণ ক্রোধ প্রকাশ করার পর গান্ধারী এখন সম্পূর্ণ শান্ত। যে জননীর একশোটি পুত্র একটি যুদ্ধে মাত্র আঠেরো দিনের মধ্যে নিহত হয়েছে, তাঁর হৃদয়ের কী অবস্থা হতে পারে—তা অনুমান করার চেষ্টা করলেই বোঝা যায়, গান্ধারীর ক্রোধ এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। বরং খুব স্বাভাবিক, মানসিক অনুভূতির প্রকাশ। তবু তাঁর ধর্মশীলতাও প্রশ্নাতীত—তার কারণ এত ক্ষোভ, এত প্রচণ্ড ক্রোধ জয় করে তিনি একসময় নিজের অন্তঃশক্তিতে নিজের দোষ আবিষ্কার করতে পারেন। সেই কারণেই তিনি প্রকৃত তপস্বিনী, ধর্মের বিষয়ে প্রামাণ্য ব্যক্তিত্ব। লক্ষণীয়, যে মুহূর্তে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধের সমস্ত দোষ নিজের মাথায় তুলে নিয়ে গান্ধারীর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, সেই মুহূর্তে গান্ধারীকেও প্রায় একই বিন্দুতে মিলিত হতে দেখা যায়। তিনি বলছেন—আমারই দোষে এই কুল ধ্বংস হয়ে গেল। আসলে যুধিষ্ঠিরকে আমরা যে ভাবনা

থেকে মূর্তিমান ধর্ম বলে চিহ্নিত করি, সেই একই ভাবনা থেকেই হয়তো গান্ধারীকেও মূর্তিমান ধর্ম বলা যায়। কিন্তু গান্ধারী যে অধম স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন তার কারণ, তিনি ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি পাতিব্রত্য, নিরন্তর স্বামীর অনুগমন করার যে কঠিন ব্রত গান্ধারী পালন করে এসেছেন—তা তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মৈষণায় অন্যতম অন্তরায় হয়ে উঠেছে বলে আমাদের মনে হয়।

[মহা (k) ১১.১০.৪; ১১.১১.৫-১৬;
১১.১৪.১-২১; ১১.১৫ অধ্যায়;
(হরি) ১১.৯.৫; ১১.১০.৫-১৬;
১১.১৩.১-২১; ১১.১৪-১৫ অধ্যায়]

□ সকলকে নিয়ে অবশেষে গান্ধারী কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে এসে পৌঁছালেন। পুত্র, পৌত্র, পাণ্ডবদের পুত্ররা এবং অন্যান্য আত্মীয়রা যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছেন এই স্থানে। মহর্ষি ব্যাস গান্ধারীকে দিব্য দৃষ্টি দিলেন যাতে যুদ্ধোত্তর কুরুক্ষেত্রের অবস্থা তিনি দেখতে পান। যে পুত্র, পৌত্র, আত্মীয়দের গান্ধারী জীবিত অবস্থায় দেখেননি আজ তাঁদের শব দেখতে দেখতে গান্ধারীর অন্তরে যে হাহাকার উঠছিল তা অনুমান করাও কষ্টকর। শবদেহগুলি আঠেরো দিনে পচে গলে গিয়েছে, তাদের চারপাশে শৃগাল, শকুন ঘোরাফেরা করছে মাংসের লোভে। আর সেখানেই লুটিয়ে পড়ে বিলাপ করছেন মৃত যোদ্ধাদের মাতারা, পত্নীরা। গান্ধারী সেই অসহ্য করুণ দৃশ্য দেখছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন কৃষ্ণ। গান্ধারী যে দৃশ্য দেখছেন তার সম্পূর্ণটাই তিনি বর্ণনা করছেন কৃষ্ণের সামনে। শুধু নিজের পুত্র, পৌত্ররা নয় দ্রোণ, দ্রুপদ, বিরাট অর্জুন পুত্র অভিমন্যু—সকলের শব দেখেই গান্ধারীকে করুণস্বরে বিলাপ করতে দেখা যাচ্ছে। আর সেই বিলাপ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনছেন কৃষ্ণ। গান্ধারী সকলের শবদেহের বর্ণনা করার পর কৃষ্ণকে বললেন—মনে হচ্ছে তুমি এবং তোমাকে নিয়ে সমস্ত পাণ্ডবরাই শুধু অবধ্য—

অবধ্যা পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণ সর্ব এবত্বয়া সহ।

নইলে মহাকালের কী পরিণাম দেখ—দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, যাঁরা নাকি দেবতাদেরও বধ করতে পারতেন, তাঁরা সব এখানে মরে পড়ে আছেন—

ত ইমে নিহতাঃ সর্বে পশ্য কালস্য পর্যয়ম্।

এত প্রিয়জনের মৃতদেহ দেখতে দেখতে বিলাপ করতে করতেই বোধহয় গান্ধারী একসময় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। নিজের ধর্মশীলতা দিয়ে যে ক্রোধ তিনি দমন করেছেন, সেই ক্রোধ আবারও জ্বলে উঠল। কিন্তু এবার ক্রোধ পাণ্ডবদের প্রতি নয়, এমনকী তাঁর শতপুত্রহন্তা মধ্যম পাণ্ডব ভীমের উপরেও নয়। গান্ধারীর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল কৃষ্ণের উপর—তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে যে মানুষটি এতক্ষণ ধরে গান্ধারীর অনন্ত দুঃখ, বিলাপ ধৈর্য্য ধরে শুনেছেন, সমস্ত সময়টুকু তাঁর পাশে থেকেছেন সমস্ত সহানুভূতি দিয়ে—সেই কৃষ্ণের উপর অসম্ভব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন গান্ধারী। তিনি বললেন—তোমার শান্তির প্রস্তাব ব্যর্থ হয়ে গেল দেখে তুমি যখন ভাঙা মনে উপপ্লব্যে ফিরে গেলে, আমি সেদিনই বুঝেছিলাম—আমার ছেলেরা যত বলবানই হোক—তারা নিহতই হয়েছে—

তদৈব নিহতাঃ কৃষ্ণ মম পুত্রাস্তরস্বিনঃ।

গান্ধারী আরও বললেন—তুমি চলে যাবার পর সেদিনই মহামতি ভীষ্ম এবং বিদুর এসে আমাকে বলেছিলেন—দেবী! তোমার এই পুত্রদের উপর আর কোনো স্নেহ রেখো না। আজ মনে হয়, তাঁরাও ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁদের দূরদর্শিতাই সত্য হয়েছে, তার অল্পদিনের মধ্যেই আমার সবকটি পুত্র একসঙ্গে নিহত হল—

তয়োর্ন দর্শনং তাত মিথ্যা ভবিতুমর্হতি।
অচিরেণৈব পুত্রা মে ভস্মীভূতা জনার্দন॥

কৃষ্ণকে এসব বলতে বলতে গান্ধারী শোকে দুঃখে জ্ঞান হারালেন একবার। কিন্তু জ্ঞান ফিরে পেয়েও তাঁর ক্রোধ শান্ত হয়নি। হয়তো অনেকক্ষণ ধরেই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কৃষ্ণের উপর রাগ জমা হচ্ছিল গান্ধারীর মনে। কৃষ্ণ বড়ো বিশালবুদ্ধির মানুষ। তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গকে বিশাল দৃষ্টিতে বোঝেন, আর বোঝেন সাময়িক প্রয়োজন এবং দূর ভবিষ্যৎ। গান্ধারী খুব ভালোভাবে জানেন এই বিরাট মানুষটি, যিনি নিজের জীবদ্দশাতেই ঈশ্বরের মহিমায় উন্নীত হয়েছেন, যদি সর্বক্ষণ পাণ্ডবদের পাশে থেকে সহায়তা না করতেন—তাহলে এই মহাযুদ্ধে পাণ্ডবরা এমন অক্ষত থাকতে পারতেন না। অথচ তাঁর সব গেছে—একটি পুত্রও বেঁচে নেই। শোকে অধীর হলে মানুষ স্বয়ং ভগবানকেও দোষারোপ করে, ভৎর্সনা করে। পুত্রশোকে অধীর হয়ে গান্ধারীরও ঠিক সে অবস্থাই হল। পাণ্ডবদের

সহায়ক যে মানুষটি মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ নারায়ণ হিসেবে খ্যাত, তাকেই শাপ দিতে উদ্যত হলেন গান্ধারী। তাঁর মনে হল যে ক্ষতি তাঁর নিজের হয়েছে, পুত্র, পৌত্র সম্পূর্ণ বংশ ছারখার হবার যে কষ্ট তিনি ভোগ করছেন, এই বিশাল মানুষটিও সেই ক্ষতি, সেই বেদনা ভোগ করুন।

গান্ধারী বললেন—কৃষ্ণ! তুমি কিন্তু পারতে; একমাত্র তুমিই পারতে এই ভীষণ যুদ্ধ বন্ধ করতে। পাণ্ডব-কৌরবরা যখন পরস্পর ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেদের বিনষ্ট করতে উদ্যত হল, তখন তুমি কেমন উদাসীন সাক্ষীর মতো হয়ে গেলে। কেন, কেন এমন করলে তুমি—

উপেক্ষিতা বিনশ্যন্তস্ত্বয়া কস্মাজ্জনার্দন।

তুমি তো সমর্থ ছিলে, তোমার ক্ষমতা ছিল, তোমার কথা শোনবার লোক ছিল, বিশাল সৈন্যবল ছিল তোমার—তা তুমি কেন এমন করে উপেক্ষা করলে এই যুদ্ধ? কৃষ্ণের ক্ষমতা সম্বন্ধে গান্ধারী যেটা বলছেন, তার মধ্যে খানিকটা রাজনৈতিক অনুবন্ধ আছে। তার থেকে ব্যক্তি-সম্পর্কগুলি অনেক বেশি সযৌক্তিক হয়ে ওঠে বলে গান্ধারী বললেন—তোমার সঙ্গে কুরুকুল এবং পাণ্ডবকুল—দুই কুলেরই সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়, ফলে তুমি যদি তেমন করে যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইতে তা হলে দু'পক্ষই তোমার কথা শুনত—

উভয়ত্র সমর্থেন শ্রুতবাক্যেন চৈব হি।

এরপরেও যখন তুমি শুধু কুরুকুল-ধ্বংসের ব্যাপারেই উদাসীন হয়ে রইলে, তখন বুঝি, ইচ্ছে করেই তুমি এটা করেছ—

ইচ্ছতোপেক্ষিতো নাশঃ কুরূণাং মধুসূদন।

আমরা জানি—ইচ্ছে করে কৃষ্ণ এ-কাজ করেননি। এটা অবশ্যই ঠিক যে, সেই জতুগৃহদাহ থেকে আরম্ভ করে কপট পাশা এবং বনবাস দুঃখের যে যন্ত্রণা পাণ্ডবদের ওপর দিয়ে গেছে, তাতে একেবারে শেষ কল্পে তাঁর মনে হতেই পারে যে, আর সহ্য করা নয়, এবার চরম আঘাত করা উচিত। কিন্তু সহ্য তো তিনিও কম করেননি। আন্তরিকভাবে শান্তির প্রস্তাব করেও যিনি পাণ্ডবদের জন্য পাঁচখানি গ্রাম পর্যন্ত জোগাড় করতে পারেননি এবং নিজেও যেখানে বন্দি হবার আশঙ্কায় ছিলেন দুর্যোধনের হাতে, সেখানে তাঁর মতো বিশালবুদ্ধি মানুষের দিক থেকে যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। এটা ঠিকই, কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চেয়েইছিলেন। স্পষ্টত নয়, তবে পাণ্ডবদের ওপর অন্যায় বঞ্চনা এবং অপমান আর তিনি সইতে পারছিলেন না। কিন্তু দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারী অন্যায়কারী পুত্রের জননী, অত্যাচারী রাজার গর্ভধারিণী, শত ধর্মবোধ থাকা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি যে, তাঁর পুত্রকৃত অন্যায়-অপমান এবং অসভ্যতা নিয়ন্ত্রণের শেষ বিন্দুটা কোথায়। ইচ্ছা করলেই যে কৃষ্ণ দুর্যোধনের মতো অহংমন্য মানুষকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন না, সেটা গান্ধারী বোঝেন না বলেই, তিনি কৃষ্ণকে বললেন—এর ফল তোমাকে পেতে হবে—

ফলং তস্মাদ্ অবাপ্নুহি।

তুমি যখন ইচ্ছে করেই বিনাশে প্রবৃত্ত দুই যুযুধান শিবিরকে উপেক্ষা করেছ, তাই আমার অভিশাপ তোমাকে সইতে হবে—আমার যেমন হল, তেমনি তোমার বংশও ধ্বংস হবে। আজ থেকে ছত্রিশ বছর পরে মন্ত্রী, অমাত্য, ভাই-বন্ধু ছেলে সব হারিয়ে তোমাকে কুৎসিত উপায়ে মরতে হবে। তোমার বাড়ির বউরাও আমার বাড়ির মতো মাটিতে পড়ে কাঁদবে—

স্ত্রিয়ঃ পরিপতিষ্যন্তি যথৈব ভরতস্ত্রিয়ঃ।

মহাকাব্যের কবি যখন এই অভিশাপ বর্ণনা করেন, তখন তাঁর মধ্যে একটা মহাকাব্যিক অভিসন্ধি কাজ করে। একদিকে এই অভিশাপ গান্ধারীর ধর্মবোধের অন্তরাল থেকে তাঁর অবুঝ মনটাকে প্রকট করে তোলে, অপরদিকে তা মহাকাব্যের ঘটনা সমন্বয় করে, কৃষ্ণের মতো বিশালবুদ্ধি মানুষের নিতান্ত মানবিক মহাপ্রয়াণের ঘটনাকে এই অভিশাপ সযৌক্তিক করে তোলে। যিনি নিজের অযোগ্য পুত্রকে তেমন করে কোনোদিন বাক্যের শাসনে নিয়ন্ত্রণ করেননি, তাঁর এই অভিশাপ দেওয়ারও যে যোগ্যতা নেই, সে-কথা কৃষ্ণের বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিতীয়ত কৃষ্ণের নিজের ঘরে তাঁর ভাই-বন্ধু-আত্মীয়ের মধ্যে যে জ্ঞাতিবিরোধ অনেক দিন ধরে বাসা বাঁধছে, তার ফলেই যে তাঁর নিজের বংশ ধ্বংস হবে এবং তার জন্য গান্ধারীর বাড়তি একটা অভিশাপের প্রয়োজন নেই, সেটা কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আবার কৃষ্ণের এই বিপরীত প্রতিক্রিয়ারও একটা মহাকাব্যিক অভিসন্ধি আছে। গান্ধারীকে কেউ কোনোদিন দোষারোপ করেনি, করার সাহসও

নেই কারও। তাঁর সমস্ত আচার-ব্যবহার এবং জীবনযাত্রার মধ্যে ধর্মের, ধর্মবোধের একটা প্রকট আবরণ আছে; সেটা যে নিতান্তই বাহ্য কোনো আবরণ বা তা নিতান্তই লোক-দেখানো অথবা তা একান্তই কোনো তথাকথিত আড়ম্বর, তাও আমরা বলতে পারি না। মহাভারতের কবি দেখাতে চান—গান্ধারীর মতো এমন গভীর ধর্মপ্রাণতার অন্তরালেও পুষ্পে কীটসম তৃষ্ণা জেগে রয়। পুত্রস্নেহ এবং স্বার্থভাবনা এমনই এক বিষম বস্তু, যা সারা জীবন ধরে সেবিত-লালিত ধর্মচিন্তাকে বিদ্ধ করে ওপরে ফুটে ওঠে। মনুষ্য-স্বভাবকে অতিক্রম করে ওঠা গান্ধারীর মতো ধর্মদর্শিনী নারীর পক্ষেও অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

আরও একটা কথা—কৃষ্ণকে অভিশাপ দেবার সময় গান্ধারী বলেছিলেন—আমি যদি পতি-শুশ্রূষা করে সামান্য তপস্যার ফলও পেয়ে থাকি; সেই তপস্যার সিদ্ধিতে তোমাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি—

পতিশুশ্রূষয়া যন্মে তপঃ কিঞ্চিদুপার্জিতম্।

'শুশ্রূষা' মানে সকলেই ভাবেন সেবা, কায়িক এবং মানসিক সেবা। আমরা প্রকৃতি-প্রত্যাগত অর্থে 'শুশ্রূষা' মানে জানি শোনার ইচ্ছে—শ্রু+সন্+অ। আমরা মনে করি, এই আক্ষরিক অর্থটা এখানে বড়ো জরুরি। হ্যাঁ অবশ্যই দু-একটি চরম মুহূর্তে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর অন্ধ পুত্রস্নেহের জন্য তিরস্কার করেছেন, কিন্তু সেই দু'-একবার ছাড়া ধৃতরাষ্ট্র যেমন বলেছেন, যেমন চেয়েছেন, তেমনটি শুনে গেছেন, গান্ধারী, কোনো জায়গায় তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে সোচ্চারে অতিক্রম করেননি। অতিক্রম যখন করেছেন, তখন বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। ধৃতরাষ্ট্রের মতো স্বামীর প্রতি এই পাতিব্রত্য, এই পাতিব্রত্যধর্মের অন্তরালে অন্যায়ী পুত্রের প্রতি প্রশ্রয়টাও কিন্তু অনুক্তভাবে নিহিত রইল। আমরা এটাকেই শুশ্রূষা বলি—ধৃতরাষ্ট্র যা বলেন, তাই তিনি শোনেন—এটা বলার চেয়ে ধৃতরাষ্ট্র যা চান, তাই তিনি জীবনভর শুনেছেন। গান্ধারীর অভিশাপের প্রতিক্রিয়ায় কৃষ্ণের নিষ্কপট বাক্য প্রতিক্ষেপ গান্ধারীর অন্তরাল-চরিত্রটাকে হঠাৎ করে বাইরে এনে ফেলে।

কৃষ্ণ বললেন—আমার বংশ যে এভাবে ধ্বংস হবে এবং আমার জ্ঞাতিবন্ধুরাই যে একাজ করবে, তা আমি খুব ভালো করেই জানি। সেখানে একটা অভিশাপ দিয়ে আপনি খানিক পিষ্ট-পেষণ করেছেন মাত্র—

জানে'হম্ এতদপ্যেবং চীর্ণং চরসি সুব্রতে।

যাদব-বৃষ্ণিবংশের ধ্বংস হবে। সেটা ধ্বংস আমিই করব। ওদের পরস্পরের মধ্যে যে বিবাদ বেধেছে, সেটাই তাদের ধ্বংসের পক্ষে যথেষ্ট, সেখানে আপনার অভিশাপটা খুব কিছু কাজে লাগবে না—

পরস্পরকৃতং নাশং যতঃ প্রাপ্স্যন্তি যাদবাঃ।

তার মানে কৃষ্ণ গান্ধারীর অভিশাপের যৌক্তিকতাটাই সদম্ভে উড়িয়ে দিলেন। এবং এই উড়িয়ে দেবার মধ্যে একটা সাংঘাতিক যুক্তি আছে। কৃষ্ণ বলতে চাইলেন—নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিপদটাই বংশনাশের কারণ এবং সেটা যেমন তাঁর নিজের ব্যাপারে খাটে, তেমনই সেটা গান্ধারীর ব্যাপারেও খাটে।

কৃষ্ণ এবার কোনো ভণিতা, শ্রদ্ধাবেশ না দেখিয়ে বেশ কঠিনভাবেই বললেন— গান্ধাররাজনন্দিনী! এবার শোকতপ্ত ধূলিশয্যা ছেড়ে উঠুন, উঠে পড়ুন। অত শোক করে, অত অভিশাপ দিয়ে কোনো লাভ নেই। আপনার নিজের দোষেই এত শত লোক মরেছে এই যুদ্ধে—

তবৈব হ্যপরাধেন বহবো নিধনং গতাঃ।

এই যে দুর্যোধন—আপনার গুণধর ছেলে—তার মতো দুরাত্মা দুষ্ট দ্বিতীয় দেখিনি। ঈর্ষা-অসূয়া তাকে গ্রাস করে ফেলেছিল, অহংকার অভিমানেও ধরাকে সরা জ্ঞান করত, সেই দুর্যোধনের সমস্ত অপকর্মগুলির প্রতি আপনার প্রশংসা আছে বলেই আপনি তাঁকে ভালো বলে মনে করছেন—

দুর্যোধনং পুরস্কৃত্য দুষ্কৃতং সাধু মন্যসে।

একটা ছেলে, যে ভদ্র-সজ্জনদের সঙ্গে চিরকাল নিষ্ঠুর শত্রুতা করে যাচ্ছে, বৃদ্ধসজ্জনের সমস্ত শাসনের বাইরে চলে গেছে যে মানুষটা, সেখানে তো আপনারই দোষ আছে, প্রশ্রয় আছে। সেই নিজের দোষটা পরের ঘাড়ে চাপানোর জন্য আপনি এখন আমাকে দূষছেন, আমাকে অভিশাপ দিচ্ছেন; বেশ কথা বটে—

কথম্ আত্মকৃতং দোষং ময্যাধাতুমিহেচ্ছসি।

গান্ধারীকে, চিরকালীন ধর্মদর্শিনী গান্ধারীকে এমন কড়া করে কেউ কথা বলেনি; কৃষ্ণ বলছেন,

কারণ এতক্ষণ গান্ধারী নিজের ছেলের দোষগুলো ওপর ওপর বলছেন বটে, কিন্তু সেই দোষগুলি গভীরভাবে অনুভব না করেই তিনি বারংবার ভীমকে অভিযুক্ত করতে চেয়েছেন, যুধিষ্ঠিরের মতো ধর্মনিত্য মানুষকে অভিশাপ দেবার কথা ভেবেছেন। কৃষ্ণ এতক্ষণ এই মানসিকতা দেখেছেন, সহ্য করেছেন, শেষে নিজেই যখন বিনা কারণে অভিশপ্ত হলেন, তখন কৃষ্ণ দেখলেন—এঁকে সত্য কথা শোনানো দরকার, কঠিন কথা কঠিন ভাবেই তাঁকে বলা দরকার, না হলে তাঁর পুত্রশোকও প্রশমিত হবে না। কৃষ্ণ গান্ধারীর দোষ স্পষ্ট করে বলেই ঝটিতি ফিরে এলেন সেই দার্শনিক যুক্তিতে। বললেন—মৃত মানুষের জন্য শোক করা মানে অপরিহার্য্য বিনষ্ট অতীত নিয়ে শোক করা এবং সেটা এক কথায় দুঃখের ওপর দুঃখভোগ করা, দুটো অনর্থ একসঙ্গে লাভ করা—

দুঃখেন লভ্যতে দুঃখং দ্বাবনর্থৌ প্রপদ্যতে।

পরিশেষ সত্যবাচনের পর কৃষ্ণ এই বলেই গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিলেন যে, ক্ষত্রিয়া রমণী, বিশেষত আপনার মতো ক্ষত্রিয়া রমণী ছেলে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যাবে বলেই গর্ভধারণ করে—

বধার্থীয়ং ত্বদ্বিধা রাজপুত্রী।

গান্ধারী চুপ করে গেছেন। কৃষ্ণের মতো সর্বংসহ মানুষের কাছে কঠিন কথা শুনে গান্ধারী আর একটিও কথা বললেন না।

[মহা (k) ১১.১৬-২৫ অধ্যায়; ১১.২৬.১-৭;
(হরি) ১১.১৬-২৫ অধ্যায়; ১১.২৬.১-৭]

□ তারপর যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ভীষ্মের উপদেশ, ভীষ্মের মৃত্যু কিংবা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল আমরা যেমন ধৃতরাষ্ট্রের উল্লেখ পাই না, তেমনি গান্ধারীরও কোনো উল্লেখ পাই না। মহাভারতের আশ্রমবাসিক পর্বে জনমেজয় রাজার প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বৈশম্পায়ন ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর শেষ জীবনের কথা বর্ণনা করেছেন।

বৈশম্পায়নের সেই বিবরণ থেকে জানা যায়—যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে সর্বাধিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁদের সেবা-যত্নে কোনো ত্রুটি রাখেননি তিনি। পাশাপাশি এই বৃদ্ধ রাজা-রানী যাতে মানসিক ভাবেও নিজেদের অসহায়, নিঃসন্তান, পরনির্ভর বলে মনে না করেন সে বিষয়েও তিনি অত্যন্ত সচেতন। রাজঅন্তঃপুরে কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা এঁরা সকলেই গান্ধারীর সেবা শুশ্রূষা করেন। ধৃতরাষ্ট্র বা গান্ধারী যুধিষ্ঠিরকে যা বলতেন—সে কাজ সহজ হোক বা কঠিন—যুধিষ্ঠির তা অবশ্য পালন করতেন। বৃদ্ধ বয়সে ভ্রাতুষ্পুত্রদের কাছ থেকে ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী যে শ্রদ্ধা, মর্য্যাদা পেলেন—হয়তো এত মর্য্যাদা দুর্যোধনও তাঁদের দেননি কোনোদিন।

ব্যতিক্রম শুধু ভীমের আচরণে। কিংবা গান্ধারীরও হয়তো ভীমের দিকে তাকালে মনে পড়ে যে, এই একটি মাত্র ব্যক্তি একা তাঁদের শতপুত্রকে হত্যা করেছেন। তার থেকেও বড়ো কথা—ভীম নিজেই সেকথা মাঝে মাঝে উদ্ধত ভাবে ঘোষণা করেন, এমন ভাবে বলেন যাতে তাঁরা শুনতে পান এবং কষ্ট পান। ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী কষ্ট পেতেনও। তবু যুধিষ্ঠির সেবাযত্ন মান-সম্মান দিয়ে তাঁদের এমনই দেখাশোনা করতেন যে অতীত ভুলে এমনকী পুত্রশোকের ক্ষতও ভুলে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী ভ্রাতুষ্পুত্রদের কাছে টেনে নিতে পেরেছিলেন।

এমনি করে কাটল পনেরো বছর। তারপর হয়তো ভীমের কটুকথাতেই ধীরে ধীরে বিরক্ত আহত হয়ে ধৃতরাষ্ট্র বানপ্রস্থ অবলম্বনের সংকল্প করলেন। গান্ধারী সারাজীবন স্বামীর অনুগমন করেছেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও যথাসম্ভব স্বামীর সেবা যত্ন করেন—সুতরাং তিনিও যে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গেই বনের পথে যাত্রা করবেন—সেটাই স্বাভাবিক।

যুধিষ্ঠির কিন্তু কিছুতেই বৃদ্ধ, অশক্ত ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে বনে যেতে দিতে চাইলেন না। বার বার অনুনয় করে তাঁদের নিষেধ করতে লাগলেন। এই সময়ে গান্ধারীর উদ্দেশে যুধিষ্ঠিরকে বলতে শোনা যায়—আমি কোনোদিন জননী গান্ধারী এবং আমার গর্ভধারিণী কুন্তীর মধ্যে তফাত করিনি—

গান্ধারী চৈব কুন্তীচ নির্বিশেষা মতির্মম।

যুধিষ্ঠিরের এই আন্তরিক শ্রদ্ধার ব্যাপারে ধৃতরাষ্ট্রও নিঃসংশয় ছিলেন, গান্ধারীও। তবু তাঁরা যুধিষ্ঠিরের নিষেধ শুনলেন না। গান্ধারী বুঝেছেন, ধৃতরাষ্ট্র তপস্যা করে, কৃচ্ছ্রসাধন করে মৃত্যুবরণ করতে চান। তাই তাঁরও কাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুগমন করা এবং ধৃতরাষ্ট্রকে যথোচিত ভাবে অন্তিম

গতির দিকে নিয়ে চলা, গান্ধারীও ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বনে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

বনে যাবার আগে ধৃতরাষ্ট্র যখন প্রজাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন, তখন নিজের অতীতের অপরাধ, পুত্রমোহ, ভয়াবহ যুদ্ধ সব কিছুর জন্যই প্রজাদের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করেছেন। তারপর বিদায় নেবার সময় ধৃতরাষ্ট্র নিজের চিরন্তনী সহধর্মচারিণী গান্ধারীর জন্যও বিদায় চেয়েছেন।

ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন—আপনাদের এই রাজা বৃদ্ধ, পুত্রহীন এবং প্রাচীন রাজাদের বংশধর, অতএব সব ক্ষমা করে আমাকে অনুমতি করুন। আমার সঙ্গে আছেন আমার স্ত্রী গান্ধারী, তিনিও এখন করুণার পাত্রী, তিনিও বৃদ্ধা হয়েছেন, সবগুলি পুত্র হারিয়ে শোকার্তাও বটে, তিনিও আমার মাধ্যমে আপনাদের কাছে বনগমনের অনুমতি চাইছেন—

গান্ধারী পুত্রশোকার্তা যুস্মান্ যাচতি বৈ ময়া।

আমি জানি—আমার লুব্ধ দুর্মতি পুত্রেরা অনেক স্বেচ্ছাচার করেছে, সেজন্য আমি আমার স্ত্রী গান্ধারীর সঙ্গে একত্রে সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি—

কৃতে যাচে'দ্য বঃ সর্বান্ গান্ধারীসহিতো'নঘাঃ।

গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বনগমনে উদ্যত হলে রাজমাতা কুন্তী একেবারে অভাবিত তৎপরতায় গান্ধারীর সঙ্গে সঙ্গে চলতে আরম্ভ করলেন। যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য পাণ্ডবভাইদের কল্পনার মধ্যেও ছিল না, অথচ কুন্তী বললেন—গান্ধারী আমার শাশুড়ির মতো ধৃতরাষ্ট্র আমার শ্বশুর-কল্প। আমি বনের মধ্যে আমার এই শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করব—

শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োঃ পাদান্ শুশ্রূষন্তী বনে ত্বহম্।

কুন্তী কারও কথা শোনেননি, কনিষ্ঠ সহদেবকে তিনি এত ভালোবাসতেন, তাঁর দিকেও আর ফিরে তাকাননি। এমনকী ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে গান্ধারীও তাঁকে অনুরোধ করেন—

ইত্যুক্তা সৌবলেয়ী তু রাজ্ঞা কুন্তীমুবাচ হ।

—কিন্তু কুন্তী কারও কথা না শুনে গান্ধারী এবং ধৃতরাষ্ট্রের অনুগমন করেন। সবার আগে কুন্তী পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন বদ্ধনেত্রা গান্ধারীকে, গান্ধারীর হাত কুন্তীর কাঁধে, আর অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের হাত গান্ধারীর কাঁধে—

কুন্তী গান্ধারীং বদ্ধনেত্রাং ব্রজন্তীং . . .

রাজা গান্ধার্যাঃ স্কন্ধদেশ'বসজ্য।

এ যেন অদ্ভুত এক ফিরিয়ে দেওয়া, কুন্তীর সঙ্গে কোনোদিন গান্ধারী এই ব্যবহার করতে পারেননি। ছেলেরা বনবাসে যাবার পর কুন্তী ঘরেই ছিলেন, কিন্তু একদিনের তরেও গান্ধারীকে মিলিত হতে দেখিনি কুন্তীর সঙ্গে। হয়তো ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধতায় তাঁকেও অন্ধ হয়ে থাকতে হয়েছে চিরকাল, তাঁর ঈর্ষা-অসূয়ার বস্ত্র-আবরণ চোখে লাগিয়ে কোনোদিন গান্ধারী তাঁর ভগিনী-প্রতিমা কুন্তীর প্রতি স্নেহ-মমতা দেখাতে পারেননি। আজ কুন্তী ধৃতরাষ্ট্রের অনুগমন করে তাঁকেই যেন বুঝিয়ে দিলেন—গান্ধারীকে তিনি অন্ধ পথে চালিত করেছিলেন।

বনের মধ্যে যথোচিতভাবে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর সেবায় নিযুক্ত হলেন কুন্তী। সঙ্গে আছেন চিরস্নিগ্ধ বিদুর এবং সঞ্জয়। এখন গান্ধারীর যে অবস্থাটা চলছে, তার সবটাই আশ্রমিক অবস্থান। প্রথমে শতযূপের আশ্রম, তারপর বেদব্যাসের আশ্রম, পরিশেষে গভীর নির্জন বনপথে। এরই মধ্যে বিদুর যোগবলে দেহত্যাগ করেছেন এবং যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্যরা বনে এসে দেখা করেছেন ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীর সঙ্গে। তিনি সবাইকে নিয়ে অন্তত একমাস এখানেই আছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর অরণ্য আশ্রমে এসেছেন ব্যাস, দ্বৈপায়ন ব্যাস—গান্ধারী কুন্তীর শ্বশুর। তিনি এসে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীকে তপস্যা-ব্রত নিয়ম বৈরাগ্যের উত্তরোত্তর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ব্যাসের দিক থেকে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন ছিল—এত তপস্যা, ব্রত, নিয়ম করছ। তা এতদিনে তোমাদের মন থেকে পুত্র বিনাশের দুঃখ দূর হয়েছে তো—

কচ্চিদ্ হৃদি ন তে শোকো
রাজন্ পুত্র-বিনাশজঃ?

ব্যাস সেদিন অনেক কথা বলেছেন, অনেক উপদেশ দিয়েছেন এবং একটি ইচ্ছাপূরণের স্বপ্নও দেখিয়েছেন সবাইকে। বলেছেন—কী চাও বল, ধৃতরাষ্ট্র! তোমার অভীষ্ট আজ পূরণ করব তপস্যার বলে। আসল কথাটা কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বলতে পারলেন না। ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা শোক-দুঃখ, যুদ্ধ, ছেলের দোষ, নিজের দোষ, নিরীহ মানুষের ক্ষয় ইত্যাদি বিকীর্ণ বিষয় উচ্চারণ করে সেই ধ্রুবপদে চলে এলেন—আমি এখনও শান্তি পাচ্ছি না। শোকে, দুঃখে, চিন্তায় আমার মনে এখনও

সেই অস্থিরতা আছে। ধৃতরাষ্ট্রের এই স্মৃতিকাতর অবস্থা দেখে গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা সকলেরই পূর্বস্নেহ, পূর্বসুখ, আবারও শোকের স্বরূপ জাগ্রত করে দিল মনে মনে। এই অবস্থায় শোকার্ত গান্ধারী সবার সামনে উঠে দাঁড়ালেন। অন্ধ স্বামীকে তিনি সবচেয়ে ভালো চেনেন, তাঁর কথাগুলো বুঝে নিতে হয়, তিনি স্পষ্ট করে মনের ঠিক ইচ্ছেটা বলেন না, ঠিক ইচ্ছেটা অন্যকে ভালো করে বুঝতেও দেন না।

দ্বৈপায়ন ব্যাস সরল মানুষ, এইসব অস্পষ্ট ধূসর শব্দরাশি তিনি কবির ব্যঞ্জনাতে বুঝলেও ধৃতরাষ্ট্রের মুখে এখনও সেই নিরুচ্চার দ্বৈভাষিকতা দেখে অবাক হন। এই অবস্থায় ধৃতরাষ্ট্রের ধর্মচারিণী দ্বৈভাষিক উঠে দাঁড়িয়েছেন তপস্বী ঋষির সামনে। তিনি বলেছেন—অন্য কিচ্ছু না। মুনিবর! ইনি পরলোকগত পুত্রদের দেখতে চান এবং আপনি সেটা বুঝতেও পারছেন—

লোকান্তরগতান্ পুত্রান্ অয়ং কাঙ্ক্ষতি মানদা।

সেই যুদ্ধের পর আজকে ষোলোটা বছর কেটে গেল, মুনিবর! পনেরো বছর পাণ্ডবদের ঘরে কাটিয়েছি, আর এই বনে বনে এক বছর কেটে গেল। কিন্তু ষোলো বছর ধরেই ইনি ছেলেদের জন্যেই শোক করে যাচ্ছেন, কোনো শান্তি আসেনি তাঁর মনে—

অস্য রাজ্ঞে হতান্ পুত্রান্ শোচতো ন শমো বিভো।

এখনও সারারাত ইনি ঘুমোন না এবং যেভাবে তাঁর রাত্রির নিঃশ্বাস দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়, তাতে বুঝি এখনও তিনি কিছুই ভোলেননি। গান্ধারী বোধহয় বোঝাতে পেরেছেন যে, তাঁর নিজের অন্তত এই অবস্থা নয়। আপন অন্তরস্থিত দার্শনিক বোধে আজ তিনি সমস্ত শোকই কাটিয়ে উঠেছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র যেমন এখনও রাত্রে ঘুমোতে পারেন না, তেমনটা না হলেও কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা এবং অন্যান্য কৌরব-কুলবধূরা এখনও যে মৃত স্বামী-পুত্রের কথা স্মরণ করে কষ্ট পান, গান্ধারী সে-সব দুঃখ-কথা তপস্বী শ্বশুরকে জানিয়ে সকল বধূদের মনস্তত্ত্বটাও বলেছেন ব্যাসের কাছে। বলেছেন—ওরা যে আমাকে আর ধৃতরাষ্ট্রকে আরও বেশি বেশি করে সেবা করে, আমার সেবার জন্য যে বেশি আড়ম্বর করে, তার কারণ, ওরা পূর্বগত শোক ভুলতে না পেরে ব্যস্ত রাখে নিজেদের—

তেনারম্ভেন মহতা মাম্ উপাস্তে মহামুনে।

গান্ধারী সকলের কথা বলেছেন, নিজের কথা বলেননি। প্রথমত সেই স্বামীর কথা ভেবেই গান্ধারী ব্যাসকে বললেন—আপনি তো সব পারেন, ঠাকুর! আপনি তপোবলে সেই মৃত্যুলোক নিয়ে আসতে পারেন আমাদের সামনে, যেখানে এই বৃদ্ধ রাজার পরলোকগত পুত্রদের দেখা যাবে। বেদব্যাস সকলের কথা বাদ দিয়ে গান্ধারীকে বললেন—ভদ্রে! তুমি ছেলে, ভাই, বন্ধু সবাইকেই দেখতে পাবে—

ভদ্রে দ্রক্ষ্যসি গান্ধারী পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ সখীংস্তথা।

—অন্যেরাও যাঁরা আছেন এখানে, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং তোমার পুত্রবধূরা—সকলেই তাদের প্রিয়জনদের দেখতে পাবে—রাতের ঘুমে জেগে উঠে সুখস্বপ্ন দেখার মতো—

নিশি সুপ্তোত্থিতান্ ইব।

ব্যাসের করুণায় সকলে দেখতে পেলেন সবাইকে এবং দেখলেন—সেখানে কোনো শত্রুতা নেই, ভেদ নেই, ঈর্ষা নেই, অসূয়া নেই। গান্ধারী, কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র সকলে পরম তৃপ্তিতে শান্তি পেলেন।

হয়তো এই আরও একবার জীবন্ত দর্শন সকলের পক্ষেই কাম্য ছিল, অশান্ত হৃদয় দমন করার জন্যই হয়তো এই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু স্বপ্ন মিলিয়ে গেলে যেমন আর দুঃখ থাকে না, ঠিক সেইভাবেই গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র একেবারেই শান্ত হয়ে গেছেন এবার। আরও দু-বছর এর পরে কেটেছে। যুধিষ্ঠির সকলকে নিয়ে ফিরে এসেছেন এবং দু-বছর পরে নারদের কাছে খবর পেয়েছেন যে, এই দু-বছর ধরেই গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র এবং কুন্তী কঠোর নিয়ম-ব্রতে দিন কাটিয়েছেন এবং পরিশেষে দাবাগ্নি-জ্বালায় আত্মাহুতি দিতেও তাঁদের আর কোনো কষ্ট হয়নি। মন-বুদ্ধি-চিত্তকে যোগ সমাধিতে নিমগ্ন করে দাবাগ্নিদাহে ভস্মীভূত হয়ে গেলেন গান্ধারী।

সারা জীবন যত অস্থিরতার মধ্যে কেটেছে, স্বামী-পুত্রকে নিয়ে যত বিপরীত পরিস্থিতি তাঁকে দেখতে হয়েছে, সেই তুলনায় গান্ধারীর শেষ জীবন এবং মৃত্যু বড়ো অনাড়ম্বর। যেদিন রাজবাড়ির বধূ হয়ে এসেছিলেন গান্ধারী, সেদিনও খুব আড়ম্বরের প্রশ্ন ছিল না। কেননা তাঁর স্বামী রাজা ছিলেন না কিন্তু সুস্থিতভাবে তাঁর স্বামী যদি রাজা হতেনও, তা হলেও বুঝি এত

বৈপরীত্যের মধ্যে তাঁকে পড়তে হত না—যদি না অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মনের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার জটিলতা বাসা বাঁধত। তার সঙ্গে পুত্র দুর্যোধন, যিনি ছলে—বলে-কৌশলে পিতার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরম্পরা বহন করেন আপন রক্তের মধ্যে। আমরা এটাকেই গান্ধারীর পক্ষে বিপরীত পরিস্থিতি বলেছি। তিনি কিন্তু এই উচ্চাকাঙ্খায় শামিল ছিলেন না—স্বামীর-পুত্রের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে সংক্রামিত হয়নি কোনোদিন, কিন্তু স্বামী-পুত্রের চাপে তাঁকে এমনই এক অবগুণ্ঠনের মধ্যে থাকতে হয়েছে, যাতে মনে হবে যেন তিনিও পরোক্ষে আছেন তাঁর স্বামী-পুত্রের সঙ্গে। কিন্তু থাকাটা যে কতটা না-থাকা সেটা বুঝতে পারা যায় চরম সব মুহূর্তগুলিতে। পুত্র-স্নেহের মধ্যেও তাঁর কত যন্ত্রণা—যুদ্ধের সংশয়িত মুহূর্তেও যার জয়োচ্চারণ ঘোষণা করা যায় না, যার জীবন কামনা করা যায় না, জননীর স্নেহের রাজ্যে এটা কতটা প্রতিকূল, কতটা বিপরীত পরিস্থিতি। এই বৈপরীত্য নিয়েই গান্ধারীর জীবন কেটেছে চিরকাল। *[দ্র. ধৃতরাষ্ট্র]*

[মহা (k) ১৫.১.১-২৭; ১৫.২.১-৩০; ১৫.৩.১-৮৭; ১৫.৯ অধ্যায়, ১৫.১৭-৩৭ অধ্যায়; ১৫.১৯-৩৭ অধ্যায়; (হরি) ১৫.১.১-২৭; ১৫.২.১-১৩; ১৫.৩.১-১৭; ১৫.৪-৫ অধ্যায়; ১৫.১১ অধ্যায়; ১৫.১৯-২০ অধ্যায়; ১৫.২১-৪০ অধ্যায়]

গান্ধারী২ যদুবংশীয় পরাক্রমশালী বৃষ্ণির পত্নী ছিলেন গান্ধারী। বৃষ্ণির ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত পুত্র সুমিত্র। তবে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে সুমিত্রর মাতা গান্ধারীকে ধৃষ্টির পত্নী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[মৎস্য পু. ৪৫.১; বায়ু পু. ৯৬.১৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৮-১৯]

গান্ধারী৩ কৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী। *[মৎস্য পু. ৪৭.১৩]*

গান্ধারী৪ প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা সুরভীর গর্ভজাত কন্যা গান্ধারী। *[বায়ু পু. ৬৬.৭১]*

গায়ত্রী গায়ত্রী প্রধানত একটি বৈদিক ছন্দ এবং এই ছন্দেই বিখ্যাত গায়ত্রী মন্ত্র রচিত। বিশ্বামিত্র ঋষি এই মন্ত্রবর্ণ দর্শন করেছিলেন বলে তিনিই এই মন্ত্রের ঋষি। এই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন সবিতা সূর্য, যিনি জগৎপ্রসবিতা, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা, সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্ম। এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয় প্রাণায়ামের সময়।

গায়ত্রী এমনই এক মন্ত্র, যা হাজার হাজার বছর ধরে শুধু দ্বিজকুলের উচ্চারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, গায়ত্রী-মন্ত্র মানুষের আরাধনা-উপাসনার বিষয় হয়ে উঠেছে, এই মন্ত্রের তাৎপর্য্যে বিশ্বজনীনতার স্পর্শ লেগেছে—বৈদিক মন্ত্রবর্ণ এখানে চরম দার্শনিকতায় ঔপনিষদিক হয়ে উঠেছে। উপনয়নের সময় যখন উপনীত নতুন ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা করতে বসেন, তখন তাঁর কাছে প্রাবাদিক শাস্ত্রবচন হল—সন্ধ্যা করা মানেই গায়ত্রী— দুই রূপে এদের প্রকাশ। যিনি সন্ধ্যা-উপাসনা করছেন, তিনি ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করছেন। গায়ত্রী ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্রের শক্তিস্বরূপিণী। কথাটা একভাবে মার্কণ্ডেয় পুরাণে শুনেছি—যেখানে গায়ত্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্যের তনুকে ব্রহ্মা, মহেশ্বর শিব এবং বিষ্ণুর তনু বলা হয়েছে—

যো ব্রহ্মা যো মহাদেবো যো বিষ্ণুর্যঃ প্রজাপতিঃ।
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব বৈষ্ণবী চৈব তে তনুঃ॥

হয়তো এইরকম একটা সূত্র ধরেই গায়ত্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার গুণগুলি গায়ত্রীর মধ্যে কল্পনা করে অগ্নি পুরাণ এবং প্রাণতাষিণী তন্ত্রে বলা হয়েছে—গায়ত্রীকে তিন সন্ধ্যায় তিন রূপে ধ্যান করতে হবে গুণভেদে—আর ঠিক এই প্রসঙ্গেই ব্রহ্মার ব্রাহ্মী শক্তি, বিষ্ণুর বৈষ্ণবী শক্তি এবং মহেশ্বরের মাহেশ্বরী শক্তির সঙ্গে একাকার হয়ে যান গায়ত্রী—

প্রভাতে রবিবিম্বস্থাং রক্তবর্ণাং কুমারিকাম্।
হংসারূঢ়াং সাক্ষমালামৃগ্বেদাং ব্রহ্মদৈবতাম্॥

এটা হল গায়ত্রীর প্রাভাতিক ধ্যান এবং গায়ত্রীর এই ব্রাহ্মী রূপ প্রাণতোষিণী তন্ত্রে—

প্রাতর্ব্রাহ্মী রক্তবর্ণা দ্বিভুজা চ কুমারিকা॥
কমণ্ডলুং তীর্থপূর্ণমক্ষমালাঞ্চ বিভ্রতী।
কৃষ্ণাজিনাম্বরধরা হংসারূঢ়া শুচিস্মিতা॥

এই গায়ত্রীই মধ্যাহ্নে বিষ্ণুর শক্তি হিসেবে উপাসকের ধ্যানে আসেন, যদিও অগ্নিপুরাণে তিনি রৌদ্রী—

মধ্যন্দিনে চ সাবিত্রীং রবিবিম্বস্থিতাংশজাম্।
যজুর্বেদময়ীং রুদ্রদৈবত্যং পাণ্ডুনন্দন॥

অগ্নিপুরাণে মাধ্যন্দিন সূর্যের তেজ সবচেয়ে বেশি বলে রুদ্রের দারুণ দহন তেজ মাহেশ্বরী শক্তি আরোপিত হয়েছে গায়ত্রীর মধ্যে। কিন্তু প্রাণতোষিণী তন্ত্রে ব্রহ্মার সৃষ্টি মাধুর্য্যের পরেই

বিষ্ণুর স্থিতিরূপা পালনী শক্তি আরোপিত হয়েছে গায়ত্রীর ওপর। ফলত আগ্নেয় পুরাণে—গায়ত্রী মধ্যাহ্নে রুদ্রশক্তি, কিন্তু তন্ত্রে তিনি বৈষ্ণবী শক্তি। কথাটা আরও পরিষ্কার করে প্রাণতোষিণীতন্ত্রে—

মধ্যাহ্নে সা শ্যামবর্ণা বৈষ্ণবী চ চতুর্ভুজা।
শঙ্খচক্রগদা-পদ্ম-ধারিণী গরুড়াসনা॥
পীনোন্নতকুচদ্বন্দ্বা বরমাল্য বিভূষণা।
যুবতী চ সদা ধ্যেয়া মধ্যে মার্তণ্ডমণ্ডলে॥

সন্ধ্যাবেলায় এই যুবতী গায়ত্রী জরতী হয়ে ওঠেন, তখন তিনি পরিণত এক বৃদ্ধা। সৃষ্টি-স্থিতির পর রুদ্রের লয়রূপ যেমন প্রাণতোষিণী তন্ত্রে যেমন সত্ত্ব-রজ-তমের গুণভেদে সযৌক্তিক হয়ে ওঠে, অগ্নি পুরাণে সেই গায়ত্রী স্নিগ্ধ-মধুর বৈষ্ণবী হয়ে ওঠেন—

সায়ং সরস্বতীং সূর্যমধ্যস্থাং কৃষ্ণবর্ণনীম্।
বৃদ্ধাং চতুর্ভুজাং শঙ্খ-চক্রাং পক্ষীন্দ্রবাহনাম্॥
সামবেদময়ীং বিষ্ণুদৈবত্যাং ক্রমশো জপেৎ॥

প্রাণতোষিণীতন্ত্রে সায়ংকালে গায়ত্রী রুদ্ররূপা—যদিও সেটা জ্ঞানবৃদ্ধা সরস্বতীর মহিমায় মণ্ডিত—

সায়ং সরস্বতীরূপা চন্দ্রার্ধকৃতশেখরা।
অস্তমিতমার্তণ্ডে ধ্যেয়া বিগতযৌবনা॥

সন্ধ্যা-জপ করার সময় আচার্যগুরুরা অনেক সময় নির্দেশ দেন যে, প্রাণায়ামের সময় পূরক, কুম্ভক এবং রেচকের মাধ্যমে নাভিদেশে ব্রহ্মা, হৃদয়ে বিষ্ণু এবং ললাটে মহেশ্বরের চিন্তা করে গায়ত্রীজপ করতে হয়। বেদভেদে নাভিদেশে বিষ্ণু, হৃদয়ে ব্রহ্মা এবং ললাটে মহেশ্বরের ধ্যানও বিহিত হয়। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় গায়ত্রীর এই আধার-শক্তির পরিবর্তন দেখে এক প্রচলিত শ্লোকে বেশ একটু আমোদ করে বলা হয়েছে—ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ করেন এমন দ্বিজকুলের সবাই কেউ শৈবও নন, বৈষ্ণবও নন; তাঁরা সকলেই শাক্ত, কেননা শক্তি হিসেবে বেদমাতা গায়ত্রীকেই উপাসনা করেন—

শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্বে ন শৈব ন চ বৈষ্ণবাঃ।
উপাসন্তে যতো দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরম্॥

[মধ্বাচার্য-বিরচিত 'সন্ধ্যাভাষ্য'। দ্র. সন্ধ্যাভাষ্যসমুচ্চয় (আনন্দাশ্রম), পৃ. ৭৮; প্রাণতোষিণী তন্ত্র, পৃ. ২০৭]

□ ঐতরেয় আরণ্যকের মতো প্রাচীন গ্রন্থে গায়ত্রী-আবাহনের মন্ত্রে গায়ত্রীকে সমস্ত বৈদিক ছন্দের মাতা বলা হয়েছে—গায়ত্রী ছন্দসাং মাতা—হয়তো বা এই গুরুত্বের কারণেই ভগবদ্‌গীতার বিভূতি-যোগে পরম ঈশ্বরের মুখে এই উচ্চারণ—সমস্ত ছন্দের মধ্যে আমি গায়ত্রী—গায়ত্রী ছন্দসামহম্। অতি প্রাচীন কালে এই ছন্দোরূপ গায়ত্রী কীভাবে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করলেন, সেটা নিয়ে একটা কাহিনী আছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। প্রসঙ্গ সেখানে এইটাই যে, আগে সব ছন্দই চার অক্ষর-বর্ণে রচিত হত। অথচ গায়ত্রী আট অক্ষরের, ত্রিষ্টুপ্ এগারো অক্ষরের এবং জগতী ছন্দ বারো অক্ষরের। এটা কেমন করে হল, এই ব্যাপারে একটি কাহিনী আছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। পুরাকালে রাজা সোম স্বর্গলোকে ছিলেন। দেবতারা এবং ঋষিরা চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন—স্বর্গ থেকে কীভাবে রাজা সোমকে নিয়ে আসা যায় তাঁদের কাছে। তাঁরা সমস্ত ছন্দদের ডেকে বললেন—ওহে ছন্দ-সকল! তোমরা এই রাজা সোমকে স্বর্গ থেকে আহরণ করে আমাদের কাছে নিয়ে এসো—

তে'ব্রুবংশ্ছন্দাংসি যূয়ং ন
ইমং সোমং রাজানমাহরেতি।

ছন্দরা সবাই বলল— আপনারা যা বললেন তাই করছি। এই কথা বলে ছন্দরা সব সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট পক্ষীর মতো (সুপর্ণ হয়ে) ওপরে উত্থিত হল। তারা সুপর্ণ হয়ে ওপরে উঠেছিল বলেই আখ্যানবিদেরা এই আখ্যানকে সৌপর্ণাখ্যান। ছন্দেরা সেই রাজা সোমকে আনবার জন্য চলেছে। সেকালে ছন্দগুলির মধ্যে চারটে করে অক্ষর থাকত। এই চতুরাক্ষরা ছন্দগুলির মধ্যে জগতী ছন্দ প্রথমে ওপরে উঠলেন, কিন্তু অর্ধেক পথ উঠে তিনি চতুরাক্ষরের তিনটি অক্ষর ত্যাগ করে একাক্ষরা হলেন, আর তারপর দীক্ষা এবং তপস্যাকে আহরণ করে আবার নেমে গেলেন। এই ঘটনার তাৎপর্য্য এটাই যে, যার পশু আছে সেই দীক্ষা অর্থাৎ যজ্ঞদীক্ষা লাভ করতে পারে, সেই তপস্যা করতে পারে। কেননা পশুগণ জগতী-সম্বন্ধী এবং জগতীই পশুদের।

এরপর ত্রিষ্টুপ্ ওপরে উঠলেন। তিনিও ওপরে উঠে অর্ধেক পথ গিয়ে শ্রান্ত হলেন। তখন তিনি এক অক্ষর পরিত্যাগ করে ত্র্যক্ষরা হলেন এবং দক্ষিণা আহরণ করে আবার নীচে নেমে এলেন।

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দই যেহেতু দক্ষিণা এনেছিলেন তাই ঋত্বিক-পুরোহিতরাও মাধ্যন্দিন সবনে ত্রিষ্টুপের স্থানেই যজমানের দেওয়া দক্ষিণা গ্রহণ করেন।

এবার দেবতারা গায়ত্রীকে বললেন— তুমিই এই সোম রাজাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসো। গায়ত্রী বললেন—তাই করবো। তাহলে তোমরা সমস্ত স্বস্ত্যয়ন করে অনুমন্ত্রিত করো। দেবতারা তাই করলেন। দেবতারা তাঁকে 'প্র'-শব্দ এবং 'আ'-শব্দ—এই দুই মন্ত্রে সকল স্বস্ত্যয়ন দিয়ে অনুমন্ত্রণ করলেন। এই যে 'প্র' ও 'আ' শব্দ—এগুলোই স্বস্ত্যয়ন। যে ব্যক্তি প্রিয় হয় তাকে 'প্র' এবং 'আ' এবং মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ করে। তাহলে সে স্বস্তিতেই গমন করবে ও স্বস্তিতেই আগমন করবে। সেই গায়ত্রী ওপরে উঠে সোমরক্ষকদের ভয় দেখিয়ে নিজের দুই পা দিয়ে এবং মুখ দিয়ে রাজা সোমকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করলেন এবং অন্য দুই ছন্দ যে কয়টি অক্ষর ত্যাগ করে এসেছিলেন, সেগুলিকেও দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করলেন।

গায়ত্রী সোম নিয়ে চলে আসবেন, এই সময় কৃশানু নামে এক সোমরক্ষক পেছন থেকে বাণাঘাত করে গায়ত্রীর বাঁ পায়ের নখ ছিঁড়ে-কেটে দিল। সেই নখই শল্যক বা শজারু। সেই জন্যই শজারু নখের মতো তীক্ষ্ণ রোম-যুক্ত। সেখানে মেদ ঝড়ে পড়েছিল, তাই ছাগল প্রভৃতি পশুর বসা বা মেদ-চর্বি এগুলি যজ্ঞের হব্য। কৃশানু-নিক্ষিপ্ত বাণের লৌহনির্মিত যে শল্যভাগ বা বাণের ফলা তা থেকেই দংশনে অসমর্থ সাপের সৃষ্টি হল। সেই বাণের বেগ থেকে জন্ম দুই মাথাওয়ালা সাপের। সেই বাণের মূলভাগে যে পত্র থাকে তার থেকে সৃষ্টি হল বৃক্ষশাখায় ঝুলে থাকা মন্থাবলের, বাদুর-চামচিকে জাতীয় জীবের। বাণমূলে পত্রগুলি গ্রন্থিত করার জন্য যে স্নায়ুতন্ত্রী ব্যবহার হয়, তা থেকে জন্মাল গণ্ডুপদ—এক ধরনের সর্পাকৃতি জীব। আর সেই বাণের কাষ্ঠভাগ থেকে জন্মাল অন্ধ সর্পেরা।

সেই গায়ত্রী তাঁর ডান পা দিয়ে সোমের যতটুকু গ্রহণ করেছিলেন, তাই যজ্ঞের প্রাতঃসবন। গায়ত্রী নিজে সেই প্রাতঃসবন আশ্রয় করেছেন বলেই সমস্ত সবনের মধ্যে সেটি শ্রেষ্ঠ। গায়ত্রী বামপদে যতটুকু সোম গ্রহণ করেছিলেন তাতেই মাধ্যন্দিন সবনের সৃষ্টি। মাধ্যন্দিন যবনে ত্রিষ্টুভ ছন্দ এবং ইন্দ্রদেবতা অধিষ্ঠান করেন বলেন এই যবন শেষ পর্যন্ত প্রাতঃসবনে সমতা অর্জন করল। গায়ত্রী মুখ দিয়ে যতটুকু সোম আহরণ করেছিলেন, সেটাই হল তৃতীয়সবন বা সায়ংসবন। নীচে নামবার সময় গায়ত্রী মুখ দিয়ে সোমের রস পান করেছিলেন—

তস্য পতন্তী রসমধয়ৎ।

দেবতারা পশুর মধ্যে এই তৃতীয় যবনের আহুতি খুঁজে পেলেন পশুর মধ্যে। কেননা, সোমের প্রতিরূপ যে দুধ, গলিত ঘৃতধারা অথবা পশুর হৃদয় ইত্যাদি অঙ্গ সবই যা যজ্ঞের আহুতি হিসেবে কাজে লাগে, তা সবই পশু থেকেই পাওয়া যায়। এই পশুর যোগ হওয়ার ফলে তৃতীয়সবন প্রাতঃসবনের সমান হয়ে উঠল।

এবার ত্রিষ্টুভ এবং জগতী—এই দুই ছন্দ গায়ত্রীর কাছে এসে বললেন—সোম আহরণের সময় আমরা দুজনে যে চারটি অক্ষর ত্যাগ করে এসেছিলাম সেগুলি আমাদের; সেই অক্ষরগুলি এবার তুমি আমাদের ফেরত দাও। গায়ত্রী বললেন—না তা হয় না। আমরা যে যা পেয়েছি, তাই তার থাক—

নেত্যব্রবীদ্ গায়ত্রী যথাবিত্তমেব নঃ ইতি।

তখন ত্রিষ্টুভ-জগতীরা দেবতারা কাছেও ওই প্রশ্ন তুললেন। দেবতারা বললেন— তোমরা যে যা পেয়েছো তাই তোমাদের থাকুক। তদবধি একালেও কেউ কিছু পেলে যে যা পেয়েছে, সেটা তার। তখন গায়ত্রীর আট অক্ষর—কেননা আগে সব ছন্দই চতুরক্ষর ছিল ফলে আগের চার অক্ষরের সঙ্গে আরও চার অক্ষর যোগ হয়ে গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা হলেন, আর ত্রিষ্টুভ তিন অক্ষর আর জগতী একাক্ষরা হলেন।

সেই অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী প্রাতঃসবন নির্বাহ করেছিলেন, কিন্তু ত্র্যক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ মাধ্যন্দিন সবন নির্বাহ করতে পারলেন না। তাঁকে গায়ত্রী বললেন—ঠিক আছে, আমি আসছি তোমার কাছে, এই মাধ্যন্দিন সবনে আমারও স্থান হোক। ত্রিষ্টুপ্ বললেন—তাই হোক, কিন্তু তাহলে আমার তিন অক্ষরের সঙ্গে তোমার আট অক্ষর যুক্ত হোক

সা অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী প্রাতঃসবনসুদযচ্ছন্
নাশক্রোৎ ত্রিষ্টুপ্ ত্র্যক্ষরা মাধ্যন্দিনং
সবনমুদ্যন্তুং তাং গায়ত্রী অব্রবীদ্—
আয়ানি, অপি মে অত্রাস্তু ইতি। সা
তথেত্যব্রবীৎ ত্রিষ্টুপ্ তাং বৈ
মৈতৈরষ্টাভিরক্ষরৈঃ উপসন্ধেহীতি।

গায়ত্রী বললেন—ঠিক আছে তাই হোক। এই কথা বলে তিনি ত্রিষ্টুপের তিন অক্ষরের সঙ্গে নিজের আট অক্ষর যুক্ত করলেন। তখন মাধ্যন্দিন সবনে মরুত্বতীয় শস্ত্রের যে দুই উত্তরবর্তী প্রতিপৎ এবং তার আর যেসব অনুচর আছে, তা গায়ত্রীকে দেওয়া হল। ত্রিষ্টুপও একাদশাক্ষরা হয়ে মাধ্যন্দিন সবন নির্বাহ করলেন।

এদিকে জগতী ছন্দও একাক্ষরা হওয়ার ফলে তৃতীয় সবন সম্পন্ন করতে পারলেন না। গায়ত্রী তাঁকেও বললেন—আমি আসছি তোমার কাছে, কিন্তু তৃতীয় সবনে আমাকে স্থান দিতে হবে। জগতী বললেন—তাই হোক। কিন্তু আমার একাক্ষরের সঙ্গে তোমার এবং ত্রিষ্টুপের একত্রিত যুক্ত ফল এগারো অক্ষর যোজনা করতে হবে। গায়ত্রী বললেন—তাই হোক গায়ত্রী তাঁর একাদশ অক্ষর যুক্ত করলেন জগতীর সঙ্গে। সেই থেকে তৃতীয় সবনে বৈশ্বদেব শস্ত্রের দুই উত্তরবর্তী প্রতিপৎ এবং তার আর যেসব অনুচর আছে, সেখানে গায়ত্রীর স্থান নির্দিষ্ট হল। জগতীও দ্বাদশাক্ষর ছন্দের পরিণতি লাভ করে তৃতীয় সবন নির্বাহ করলেন। *[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম), ১৩.১-৪; পৃ. ৩৫৪-৩৬৩]*

□ গায়ত্রীর মাহাত্ম্য-বিশেষক ব্রাহ্মণগ্রন্থে যে তিনটি সবন—প্রাতঃসবন, মধ্যাহ্নসবন এবং সায়ংসবনের মধ্যে গায়ত্রীর উপস্থিতি স্মরণ করেই তিন সন্ধ্যায় গায়ত্রীর উপাসনা বিহিত হয়েছে, যাকে এক কথায় ব্রহ্মাচারীদের আচরণীয় 'ব্রহ্মাচার্য্য' বলা হয়। তিন সন্ধ্যায়, তিন সবনে ত্রিরূপা গায়ত্রী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ত্রিবিধা শক্তি বহন করেন বলেই গায়ত্রীকে 'ত্র্যক্ষরা' বলে ধ্যান করা হয়—

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রী ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমো'স্তুতে॥

তবে ত্রিসন্ধ্যায় এই ধ্যানমন্ত্রের উপাদান লুক্কায়িত আছে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের একটি মন্ত্রে। সেখানে গায়ত্রীর মন্ত্রবর্ণকে পর-ব্রহ্মের একাত্মকতায় ধারণ করে বলা হয়েছে—হে বরপ্রদা ঈপ্সিতার্থপ্রদান করো বলেই তুমি বরদা। তুমি ছন্দো'ভিমানিনী দেবতা ছন্দের রূপে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তুমি ব্রহ্মস্বরূপ। তুমি সমস্ত বৈদিক ছন্দের আদিজননী, তুমি জগৎকারণ ব্রহ্ম, তুমি আমাদের উপদেশ দাও—

আয়াতু বরদা দেবী অক্ষরং ব্রহ্মসম্মিতম্।
গায়ত্রী ছন্দসাং মাতা ইদং ব্রহ্ম জুষস্ব নঃ॥

এই মন্ত্রের টীকায় সায়নাচার্য 'অক্ষর' শব্দের অর্থ করেছেন 'বিনাশরহিত' এবং সেটা 'ব্রহ্মসম্মিতম্' শব্দটির বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করে সায়ন বলেছেন বেদান্তদর্শনের নিশ্চিত প্রমাণে পরতত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মতত্ত্ব বোঝানোর জন্যই তুমি আমাদের কাছে এসো। ত্রিষ্টুপ, জগতী ইত্যাদি ছন্দের যে কাহিনী এখানে শোনানো হয়েছে, সেই কাহিনীর তাৎপর্যেই একথা বলা যায় যে, গায়ত্রী সমস্ত ছন্দের জননী। সমস্ত বেদের মধ্যে সর্বব্যাপ্ত এই ভূমিকা থেকেই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের তত্ত্ব প্রকাশ করো আমাদের কাছে।

এই সমাহ্বান শেষ হতেই তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলেছে—হে গায়ত্রী! তুমি সকলের বলস্বরূপ; তুমি শত্রুকুলের বিনাশক শক্তি; শরীরান্তর্গত তেজ তুমি; তুমি ভ্রাজমান দীপ্তি; অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাদের তেজ তোমারই মধ্যে; তুমিই এই বিশ্বজগতের প্রকাশ-রূপ; সকলের আয়ুস্বরূপা তুমি সমস্ত পাপনাশিনী, তোমাকে আমাদের মনের মধ্যে আহ্বান করছি।

[তৈত্তিরীয় আরণ্যক (আনন্দাশ্রম) ২খণ্ড, ১০.২৬-২৭, পৃ. ৭৪৩-৭৪৪]

ঋগ্‌বেদের একটি বিখ্যাত মন্ত্র *[৩.৬২.১০]* —
তৎসবিতুর্বরেণ্য ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

জগদ্‌বিখ্যাত এই মন্ত্রের অর্থ হল—যিনি আমাদের ধীশক্তিকে প্রেরণ করেন, আমরা সেই জগৎপ্রসবিতা সবিতাদেবের ধ্যান করি।

ভারতবিখ্যাত এই মন্ত্রের অর্থ এত সহজ শুনতে লাগলেও এই মন্ত্র যেমন উপনয়ন-ব্রহ্মচর্যের নিদান, তেমনই এই মন্ত্র আমাদের আত্মদর্শনেরও মূল আধার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বেদের প্রসিদ্ধ টীকাকার সায়নাচার্য ঋগ্‌বেদের টীকায় এই মন্ত্রের তিনটি বিকল্প অর্থ দিয়েছেন। সেগুলিকে গদ্যে অন্বয় করলে প্রথম কল্পটা এইরকম দাঁড়ায়—

যঃ [সবিতা দেবঃ (যে সবিতা দেব)] নঃ [অস্মাকং (আমাদের)] ধিয়ঃ [কর্মাণি ধর্মাদিবিষয়া যা বুদ্ধীঃ (আমাদের সমস্ত কর্ম এবং ধর্মাদি

বিষয়ের বুদ্ধিকে)] প্রচোদয়াৎ [প্রচোদয়তি, প্রেরয়েৎ (প্রেরণ করেন)] তৎ [তস্য (তাঁর), পাঠান্তরে (তস্য সর্বাসু শ্রুতিষু প্রসিদ্ধস্য সেই সর্বশ্রুতিপ্রসিদ্ধ)] দেবস্য : [দ্যোতমানস্য (ভাস্বর সেই দেবতার)] সবিতুঃ [সর্বান্তর্যামিতয়া প্রেরকস্য জগৎস্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্য (সকলের অন্তর্যামী হয়ে কর্মে প্রেরণ করেন সেই জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের)] বরেণ্যং [সর্বৈঃ উপাস্যতয়া জ্ঞেয়তয়া চ সম্ভজনীয়ং (সকলের উপাস্য তত্ত্ব এবং একমাত্র জ্ঞেয় তত্ত্ব বলেই যাঁকে বরেণ্য বলে সম্যকভাবে ভজনা করতে হয়)] ভর্গঃ [অবিদ্যা-তৎকার্যয়োর্ভর্জনাদ্ ভর্গঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকং তেজঃ (অবিদ্যা এবং অবিদ্যাপ্রসূত সমস্ত কার্যকে যিনি ভর্জিত করেন, ভেজে দেন, সেইজন্যই ভর্গ, তিনি স্বয়ংজ্যোতিস্বরূপ সেই পরব্রহ্মাত্মক তেজ)] ধীমহি [বয়ং ধ্যায়ামঃ (তাঁকেই আমরা ধ্যান করি)]।

সায়নাচার্য গায়ত্রীমন্ত্রে দ্বিতীয় বিকল্প দিয়ে অর্থ করেছেনঃ

যদ্বা। তৎ ই ভর্গবিশেষণম্—অথবা। তৎ এই শব্দটা ভর্গের বিশেষণ, অবিদ্যা-মায়াজালকে যিনি ভর্জিত করেন, সেই ভর্গ। সবিতুঃ দেবস্য তত্তাদৃশং ভর্গো ধীমহি— জগৎপ্রসবিতা।

যে দ্যোতমান দেবতা সেইরকম ভর্গ, তাঁকে আমরা ধ্যান করি। কিং তদিত্যপেক্ষায়ামাহ— কেমন সেই ভর্গদেব, কেমন তিনি, তার উত্তরে বলা হচ্ছে—য ইতি—অর্থাৎ যে ভর্গদেব আমাদের ধী-বুদ্ধিকে প্রেরণ করেন সেই সবিতাদেবের বরেণ্য ভর্গকে আমরা ধ্যান করি।

এখানে 'তৎ'-শব্দকে 'ভর্গঃ' শব্দের সঙ্গে অন্বিত করা হয়েছে এবং 'যঃ' শব্দের পরে 'ভর্গঃ' শব্দ উহ্য রেখে লিঙ্গ-ব্যত্যয় দোষ দেখিয়েছেন সায়ন—

যঃ ইতি লিঙ্গব্যত্যয়ঃ।
যস্তর্গো ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ।

—যে ভর্গ আমাদের ধী-বুদ্ধিকে প্রেরণ করেন, আমরা তাঁকে ধ্যান করি—

তদ্ধ্যায়েমেতি সমন্বয়ঃ।

এই লিঙ্গ ব্যত্যয়ের কথা এইজন্যই বলছেন সায়ন কেননা ভর্গ-শব্দটা এক মতে ক্লীবলিঙ্গ যার মূল রূপ ভর্গস্।

সায়নের তৃতীয় বিকল্পটি অনেক সহজ: অথবা। যঃ সবিতা—(জগৎপ্রকাশক যে সূর্যদেব) নঃ (আমাদের) ধিয়ঃ (আমাদের সমস্ত কর্মকে) প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি (প্রেরণ করেন) তস্য সবিতুঃ সর্বস্য প্রসচিতুঃ (সেই সবিতার, সমস্ত কিছুর প্রসবকর্তার) দেবস্য দ্যোতমানস্য সূর্যস্য (সেই দ্যোতমান ভাস্বর দেবতা সূর্যের) তৎসর্বৈঃ দৃশ্যমানতয়া প্রসিদ্ধম্ (কেননা সূর্যের ভাস্বরতা, জগৎপ্রকাশকত্ব সকলের কাছে দৃশ্যমান বলেই এব্যাপারে প্রসিদ্ধি আছে তাঁর। আর সেইজন্যই) বরেণ্যং সর্বৈঃ সংভজনীয়ং (সেই বরেণ্য সকলের সম্যক ভজনা করার যোগ্য) ভর্গঃ পাপানাং তাপকং তেজোমণ্ডলং (ভর্গ অর্থাৎ যিনি সমস্ত পাপরাশিকে পুড়িয়ে দেন সেইরকম এক জ্যোতিষ্মান তেজঃ পুঞ্জ) ধীমহি ধ্যেয়তয়া মনসা ধ্যায়েম (তাঁকেই ধ্যান করা উচিত জেনেই মন সমাহিত করে তাঁকে ধ্যান করি)।

সায়নাচার্য চতুর্থ একটি বিকল্প দিচ্ছেন গোপথ ব্রাহ্মণের প্রমাণে। অর্থ করে বলছেন—অথবা। ভর্গ-শব্দের দ্বারা অন্নও বোঝানো হয়—ভর্গশব্দেন অন্নমভিধীয়তে। যে সবিতা-দেব আমাদের ধীশক্তি প্রেরিত করেন, তাঁর কৃপা-প্রসাদে যে ভর্গ অর্থাৎ অন্নাদিলক্ষণ ফল পাওয়া যায়, আমরা তাকে ধারণ করি—

যঃ সবিতা দেবো ধিয়ঃ প্রচোদয়তি তস্য প্রসাদাদ্
ভর্গো' ন্নাদিলক্ষণং ফল ধীমহি ধারয়ামঃ।

সেই অন্নফলের আধারস্বরূপ হতে চাই আমরা—

তস্য আধারভূতা ভবেম ইত্যর্থঃ।

ভর্গশব্দের যে অন্নবিষয়ক অর্থ হতে পারে এবং ধী-শব্দের যে কর্মবিষয়ক অর্থ হতে পারে, সে বিষয়ে অথর্ববেদীয় গোপথ ব্রাহ্মণের বচন আছে—ভর্গশব্দস্য অন্নপরত্বে ধীশব্দস্য কর্মপরত্বে চ আথর্বণং—

বেদাচ্ছন্দাংসি সবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য কবয়ো'ন্নমাহুঃ।
কর্মাণি ধিয়স্তদু তে প্রব্রবীমি
প্রচোদয়ংস্-সবিতা যাভিরেতি॥

[ঋগ্‌বেদ ৩.৬২.১০; সায়নাচার্য-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য]

□ এই গায়ত্রীমন্ত্রের বৈদান্তিক ভাষ্য দিয়েছেন শঙ্করাচার্য। তিনি লিখেছেন আমাদের ধী-বুদ্ধিকে যিনি প্রেরণ করেন—

নঃ ধিয়ঃ যঃ প্রচোদয়াৎ।

—তিনি হলেন—বুদ্ধি সংজ্ঞক যা কিছু আছে তার এবং আমাদের অন্তঃকরণের প্রকাশক, যিনি সর্বসাক্ষী পরমাত্মাস্বরূপ। সেই সর্বসাক্ষী পরমাত্মা যিনি আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরণ করেন, তাঁর অর্থাৎ আত্মার স্বরূপভূত পরব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মক সবিতা অর্থাৎ সেই জগৎপ্রসবিতা, যাঁর মধ্যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-লক্ষণাত্মক সমস্তজগৎ প্রপঞ্চ যেটা ব্রহ্মভিন্ন অন্য দ্বিতীয় কিছু বিভ্রমের অধিষ্ঠান—সেই সবিতার এবং সেই দ্যোতমান দেবতার—যিনি অখণ্ড চিৎ-শক্তি এবং সমস্ত রসের আধার, সেই দ্যোতমান দেবতার সর্ববরণীয় নিরতিশয় আনন্দরূপ ভর্গ অর্থাৎ অবিদ্যাদোষ যেখানে ভর্জিত হয়েছে বলেই জ্ঞানের বিষয় সেই ব্রহ্মকে, সর্বপ্রকাশক চিদাত্মক ব্রহ্মকে আমরা ধারণ করি, ধ্যান করি—

নঃ ধিয়ঃ যঃ প্রচোদয়াৎ প্রেরয়েৎ সর্ববুদ্ধি সংজ্ঞ-অন্তঃকরণ-প্রকাশক-সর্বসাক্ষী প্রত্যগাত্মা ইত্যুচ্যতে। তৎ তস্য স্বরূপভূতং পরং ব্রহ্ম, সবিতুঃ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়লক্ষণস্য সর্বপ্রপঞ্চস্য, সর্বদ্বৈত-বিভ্রমস্য অধিষ্ঠানং লক্ষ্যতে দেবস্য সর্বদ্যোতনাত্মক-অখণ্ড চিদেকরসং বরেণ্যং সর্ববরণীয়ং নিরতিশয়ানন্দরূপং ভর্গঃ অবিদ্যাদোষ -ভর্জনাত্মক-জ্ঞানৈকবিষয়ত্বং সর্বপ্রকাশচিদাত্মকং ব্রহ্ম ইত্যেবং ধীমহি ধারয়াম।

[আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গায়ত্রী পরিচয়, মাধিপুরা: ভাগলপুর, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ (১৯২৪), পৃ. ১৭-৪৩]

☐ সায়নাচার্য এবং শঙ্করাচার্য—এই দুজনের মত মিলিয়ে যদি এই গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থ করা যায়, তাহলে তার মানে দাঁড়াবে—যিনি জগৎরূপে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ উপাধিতে প্রকাশিত হয়ে জগৎ-প্রপঞ্চের আশ্রয় হয়ে উঠে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তারূপে বিরাজিত আছেন, যিনি স্বয়ংজ্যোতিঃ, যিনি পরম পূজনীয়, সেই জ্যোতিঃ স্বরূপকে ধ্যান করি। তিনিও যা আমিও তাই—এই জীব-ব্রহ্মের অভেদ কল্পনায় ধ্যান করি। তিনি আমাদের জীব সমষ্টির অর্থাৎ ব্রহ্মা থেকে স্তম্ব-তৃণগাছি পর্যন্ত সকলের বুদ্ধিকে নিজ প্রেরণা দ্বারা আলোকিত করুন এবং সেই আলোকে দৃশ্য জগৎ এবং স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ সমস্তই সেই ব্রহ্ম, এমনটাই যেন আমরা অনুভব করতে পারি।

[আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গায়ত্রী পরিচয়, মাধিপুরা: ভাগলপুর, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ (১৯২৪), পৃ. ১৭-৪৩]

☐ যথাযথ উচ্চারণে গায়ত্রী পাঠ করতে পারলে গায়ত্রী আপন সাধককে ত্রাণ করে—

গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রীয়ং ততঃ স্মৃতা।
(গায়ত্র্যোচ্যতে বুধৈঃ)।

এই লোককথিত শ্লোকটির উৎস হল ছান্দোগ্য উপনিষদ। এই উপনিষদে বলা হয়েছে—এই দৃশ্যমান জগতের যা কিছু পদার্থ, তা সমস্তই গায়ত্রীস্বরূপ। বাক্ বা শব্দই গায়ত্রী, বাক্ই এই সমস্ত প্রাণীজগতের গান করে এবং বাক্ই সকল প্রাণীকে অভয় দিয়ে ত্রাণ করে—

গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ,
বাগ্‌বৈ গায়ত্রী, বাগ্ বা ইদং সর্বং
ভূতাং গায়তি চ ত্রায়তে চ।

ছান্দোগ্যের এই মন্ত্রের টীকায় শঙ্করাচার্য লিখেছেন—গান করা (গৈ ধাতু) আর ত্রাণ করার (ত্রৈ ধাতু) তাৎপর্য থেকেই গায়ত্রী—

গানাৎ ত্রাণাচ্চ গায়ত্র্যা গায়ত্রীত্বম্।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আবার সমস্ত কিছুর ওপরে প্রাণশক্তির উচ্চতা প্রমাণ করার জন্য বলা হয়েছে—গায়ত্রী প্রাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। 'গয়্'-সমূহকে ত্রাণ করে বলেই তাঁর নাম গায়ত্রী। প্রাণসমূহই গয়। সেই প্রাণরূপী গয়সমূহকে ত্রাণ করে বলেই তার নাম গায়ত্রী-

সা হৈষা গয়াংস্তত্রে, প্রাণা বৈ
গয়াস্তৎপ্রাণাংস্তত্রে তস্মাদ্ গায়ত্রী নাম।

এখানে শঙ্করাচার্য অর্থ করেছেন—বাক্ ইত্যাদি প্রাণসমূহই 'গয়' নামে অভিহিত হয় কেননা গয় শব্দরূপা বাক্, গয়সমূহকে ত্রাণ করেছিলেন বলেই তিনি গায়ত্রী—

প্রাণাঃ বাগাদয়ো বৈ বাগাদয়ো
বৈ গয়াঃ শব্দকরণাৎ;
তান্ তত্রে সৈষা গায়ত্রী।
তৎ তত্রে, যৎ যস্মাদ্
গয়ান্ তত্রে, তস্মাদ্ গায়ত্রী নাম;
গয়তানাৎ গায়ত্রীতি প্রথিতা।

[সন্ধ্যাভাষ্য সমুচ্চয় (আনন্দাশ্রম) p. 99; ছান্দোগ্য উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ১২.৩.১; দ্র. শাঙ্করভাষ্য পৃ. ২৯৪-২৯৫; বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৫.১৪.১]

☐ মূল গায়ত্রী মন্ত্রের দুটি অঙ্গ আছে—ব্যাহৃতি এবং শির (শিরঃ) যেটাকে অতি যত্নে আহরণ করা হয়, তাকে বলে ব্যাহৃতি। অথবা

যাকে খুব যত্ন নিয়ে উচ্চারণ করতে হয়, তাকেও ব্যাহৃতি বলা যায়। কথাটা ভগবদ্‌গীতায় ওঙ্কার উচ্চারণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।

শঙ্করাচার্য বলেছেন—প্রণবযুক্ত অর্থাৎ ওঙ্কার উচ্চারণ-যুক্ত ব্যাহৃতিযুক্ত এবং শিরোযুক্ত গায়ত্রীই সমস্ত বেদের যার—

গায়ত্রীং প্রণবাদিসপ্তব্যাহৃত্যুপেতাং
শিরঃসমেতাং সর্ববেদসারমিতি বদন্তি।

প্রণব, ব্যাহৃতি এবং শিরোযুক্ত গায়ত্রীর রূপ হল—

ঔভূঃ ওঁভুবঃ ওঁস্বঃ ওঁমহঃ ওঁজনঃ ওঁতপঃ ওঁসত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ আপোজ্যোতী-রসো'মৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবস্বরোম্।

গায়ত্রীমন্ত্রের এটা পূর্ণ রূপ হলেও গায়ত্রীজপের সময় প্রধানত তিনটি ব্যাহৃতি উচ্চারিত হয়, যাদের বলা হয় মহাব্যাহৃতি। জপের সময় গায়ত্রীশিবের জায়গায় শুধুমাত্র ওঙ্কারই ব্যবহৃত হয়। শঙ্করাচার্য লিখেছেন— সপ্রণব-ব্যাহৃতিত্রয়োপেতাপ্রণবা গায়ত্রী শিবের জায়গায় শুধুমাত্র ওঙ্কারই ব্যবহৃত হয়। শঙ্করাচার্য লিখেছেন—সপ্রণব-ব্যাহৃতি ত্রয়োপেতা প্রণবা গায়ত্রী জপাদিভিরুপাস্যা। তাতে গায়ত্রীজপের রূপ দাঁড়ায়—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

তিন মহাব্যাহৃতি এবং ওঙ্কারযুক্ত গায়ত্রীজপের এই রূপ যে বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ছিল, সেটা মনুসংহিতার শ্লোক থেকেও বোঝা যায়। মনু বলেছেন—এই প্রণব (ওঙ্কার) এবং ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতি পূর্বে আছে এমন ত্রিপদা গায়ত্রী যে ব্রাহ্মণ দুই সন্ধ্যায় জপ করেন, তিনি বেদজ্ঞ বলে পরিচিত হন—

এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্বিকাম্।
সন্ধ্যয়োর্বেদবিদ্‌বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে॥

[মনুসংহিতা ২.৭৮]

□ গায়ত্রীর সপ্ত ব্যাহৃতি আসলে আমাদের সপ্ত লোক—ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোক। প্রত্যেক লোকই সগুণ ব্রহ্মের স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-দেহের বিভিন্ন প্রদেশ। আবার এই লোকগুলি সেই সেই প্রদেশসুলভ জ্ঞানের বিকাশভূমি এবং জ্ঞানের ক্রমনির্দেশকও বটে। ভাগবত পুরাণ বলেছে—

অণ্ডকোশে শরীরে'স্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে।
বৈরাজঃ পুরুষো যো' অসৌ
ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ।

এই সপ্ত লোক ভগবানের সর্বব্যাপ্ত সমষ্টি দেহের সাতটি আবারণ। কীভাবে লোকগুলি অবস্থিত, তার একট উত্তর দিয়েছে দেবীভাগবত পুরাণ। দেবীভাগবত বলেছে—

এবং সর্বং কৃত্রিমঞ্চ বাহ্যাভ্যন্তরমেব চ।

অর্থাৎ এই সপ্ত লোকের অবস্থান প্রথমত কৃত্রিম, দ্বিতীয়ত এগুলি অন্তর্নিবিষ্টভাবেও অবস্থিত এবং অন্য হিসেবে এরা উপর্যুপরি অবস্থিত। সৃষ্টির কারণেই ভগবান যে কৃত্রিম কারণ-দেহ ধারণ করেন, সেটার প্রথম চেহারা হল সত্যলোক। অসীম যখন লীলায়িত হয়ে সসীমের রূপ ধারণ করেন, তখনই কারণদেহের প্রয়োজন হয়, সেই কারণ-দেহের প্রথম স্বরূপ সত্য লোক। সেই কারণ-দেহের অনুলোম বিবর্তনের ফলে তার কিছু অংশ পূর্বের চেয়ে স্থূলরূপ ধারণ করে তপোলোক নির্মিত হয়। তপোলোক আবার সৃষ্টিমুখী এবং বহির্মুখী বিবর্তনের অনুলোমভাবে পূর্বের চেয়ে স্থূলরূপ ধারণ করে জনলোকের সৃষ্টি করে। একইরকম বিবর্তিত হয়ে পূর্বের চেয়ে আরও স্থূলরূপে মহর্লোকের সৃষ্টি মহর্লোকের কিছু অংশ আরও স্থূলতর হয়ে স্বর্লোক, তার থেকে ভুবর্লোক এবং সর্বশেষে স্থূলতম ভূর্লোকের সৃষ্টি।

দেবীভাগবত পুরাণ এই সপ্তলোকের মধ্যে মহর্লোকটিকে বাদ দিয়েছে তার বদলে সবার ওপরে নিয়ে এসেছে ব্রহ্মলোক, গোলোক এবং বৈকুণ্ঠলোক। প্রলয়কালে কৃত্রিম ধারায় ভূর্লোক থেকে তপোলোক পর্যন্ত বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে কিন্তু সত্যলোকের প্রতিরূপ গোলোক এবং ব্রহ্মলোকের প্রতিরূপ বৈকুণ্ঠকে বিনাশহীন অবস্থানে রেখেছে দেবীভাগবত পুরাণ—

উর্দ্ধ্বং ধরায়া ভূর্লোকো ভুবর্লোকস্ততঃ পরম্॥
ততঃ পরঞ্চ স্বর্লোকো জনলোকস্তথাপরঃ।
ততঃ পরং ব্রহ্মলোক স্তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ॥

এবং সর্বং কৃত্রিমঞ্চ বাহ্যাভ্যন্তরমেব চ। . . .
নিত্যৌ গোলোক-বৈকুণ্ঠৌ
প্রোক্তৌ শশ্বদকৃত্রিমৌ।
[ভাগবত পু. ২.১.২৫;
দেবী ভাগবত পু. ৯.৩.১৪; ৯.৩.১২-১৬]

এই সপ্তব্যাহৃতি সপ্তলোক সগুণ ব্রহ্মের সপ্ত দেহ, ব্যক্ত বিশ্বের সমষ্টিভূত দেহস্বরূপ, এটাও সাঙ্কেতিকভাবে ব্রহ্মের স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীরমাত্র। প্রকৃতির উপাদানে সপ্ততত্ত্বে গঠিত ভগবানের সপ্তদেহের পর গায়ত্রীশির বা গায়ত্রীর মাথার মুকুট নিয়ে দুটি কথা। পূর্বে ভাগবত পুরাণ থেকে যে শ্লোকটি উল্লেখ করা হয়েছিল—অণ্ডকোশে শরীরে'স্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে—এখানে শ্রীধরস্বামী টীকায় দেখিয়েছেন—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্ব এই সাত সাতটি আবরণে আবৃত এই ব্রহ্মাণ্ডই ভগবানের বিরাট্-মূর্তি এবং তাঁর অন্তর্গত যে সর্বনিয়ন্তা পরম পুরুষ, তিনিই জীবের ধারণার বিষয়।

গায়ত্রীর শির হল—

ওঁ আপো জ্যোতীরসো'মৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবস্বরোম্।

শঙ্করাচার্য এবং সায়ন—দুজনেই 'আপঃ' অর্থে ব্যাপ্তি, বুঝেছেন, 'জ্যোতি'-র অর্থে শঙ্কর লিখেছেন প্রকাশরূপ, 'রস' অর্থ সর্বাতিশায়িত্ব সর্বোৎকৃষ্টতা, 'অমৃত'-শব্দের অর্থে শঙ্কর মরণাদি-সংস্কার-বিমুক্ত এক অনুভূতির কথা বলেছেন। সেক্ষেত্রে গায়ত্রী-শিবের অর্থ দাঁড়ায় —সর্বব্যাপী, সর্বপ্রকাশক, সর্বোৎকৃষ্ট, নিত্যমুক্ত সচ্চিদানন্দ যে ওঙ্কার-বাচ্য ব্রহ্ম সেটাই আমি।'

পরিষ্কার করে বলতে গেলে ব্রহ্ম ওঙ্কার-বাচ্য স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং কারণাতীত। তিনি সগুণ অবস্থায় সপ্তব্যাহৃতি-বাচ্য সপ্ত লোক এবং ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, অহঙ্কার-তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্ব ইত্যাদি সপ্ততত্ত্ব-নির্মিত উপাধিপূর্বক এই বিশ্বে বিস্তৃত হয়ে আছেন এবং তার অন্তরালে অধিষ্ঠানচৈতন্য এবং জ্যোতিঃস্বরূপে অবস্থিত। ব্যক্তরূপও তাঁর আবার অব্যক্ত রূপও তাঁর। তিনিই ব্রহ্মাণ্ড এবং তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দেশে অব্যক্ত; তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই জীব। জীবের 'ছোট আমি' পরমাত্মস্বরূপ 'বড়ো আমি'-র কাছে প্রার্থনা করে—হে বিশ্বরূপ! তুমি আমি এক, কেবল উপাধির ব্যবধান তোমার সঙ্গে আমাকে এক হতে দেয় না। তুমি কৃপা করে আমার সমস্ত উপাধিকে এবং বুদ্ধিকে—যা কিছুই তোমার সঙ্গে মিলনের অন্তরায়, সেগুলিকে তোমার জ্যোতির দ্বারা আলোকিত করো।

গায়ত্রীর শির গায়ত্রীর মুকুটমণি। সেখানে স্থূল অন্নময় কোষের অভিমানী জীব প্রার্থনা করে—আমাকে আপস্তত্ত্ব এবং তেজস্তত্ত্বের স্থূলাংশ নির্মিত মনোময় কোষে স্থাপন করো। তেজস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাংশে জ্যোতিস্তত্ত্ব-নির্মিত বিজ্ঞানময় কোষে স্থাপন করো অবশেষে তার চেয়েও সূক্ষ্মতর রসময় আনন্দময় কোষে স্থাপন করো। তারপর সূক্ষ্মতম হিরন্ময় কোষে— যাকে ঔপনিষদিক ভাষায় দহরকোষ বলা হয়—সেই হিরন্ময় দহর কোষে চিৎস্বরূপের অমৃতের মধ্যে স্থাপন করো আমাকে। অবশেষে এই 'ছোট আমি'-র জীব-রূপী বিন্দুকে ব্রহ্ম-সিন্ধুতে মিলিয়ে দাও, একাত্মক হয়ে উঠুক জীব-ব্রহ্ম—

ওঁ আপো জ্যোতী রসো'মৃতম্।
ভূর্ভুবঃ স্বরোম॥

রামপ্রসাদী ভাষায়—খুলে দে মা, চোখের ঠুলি, হেরি তব রাঙ্গাপদ'।

[আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গায়ত্রী পরিচয়, মাধিপুরা: ভাগলপুর, ১৩৩১ সাল (১৯২৪), পৃ. ১৭-৪৩]

□ আমরা এতক্ষণ যা বলেছি, তা সবচেয়ে সরলভাবে প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ঘোষণা—আমি যে ভাবে গায়ত্রী ব্যাখ্যা করি তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিলাম:

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ—

এই অংশ গায়ত্রীর ব্যাহৃতি নামে খ্যাত। চারি দিক হইতে আহরণ করিয়া আনার নাম ব্যাহৃতি। প্রথম ধ্যানকালে ভূলোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে—তখনকার মতো মনে করিতে হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি—আমি এখন কেবলমাত্র কোনো বিশেষ দেশবাসী নহি। বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশ্বজগতের যিনি সবিতা, যিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁহারই বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বজগৎ, এই মুহূর্তে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাঁহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার এই-যে অসীম শক্তি যাহার দ্বারা ভূর্ভুবঃস্বর্লোক অবিশ্রাম

প্রকাশিত হইতেছে, আমার সহিত তাঁহার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে। কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

—যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি। সূর্য আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছে সেই কিরণের দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকার দরুন আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি—সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি এবং সেই ধীশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্তরতম রূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতা রূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এ দুইই একই শক্তির বিকাশ—ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভয় বিষাদ হইতে বিষাদ হইতে মুক্তি লাভ করি। গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের ও অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে . . . এই জন্যই আর্যসমাজে এই মন্ত্রের এত গৌরব:

যো দেবোহগ্নৌ যোহপ্সু যো
বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

ব্রহ্মধারণার পক্ষে এই মন্ত্রই আমি বালকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সরল বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর জলে স্থলে অগ্নিতে ওষধি-বনস্পতিতে সর্বত্র আছেন, এই কথা মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা শান্তিনিকেতনের দিগন্ত প্রসারিত মাঠের মধ্যে অত্যন্ত সহজ। সেখানকার নির্মল আকাশ এবং প্রান্তর বিশ্বেশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ, এ কথা মনে করিয়া ভক্তি করা ছেলেদের পক্ষেও কঠিন নহে। এইজন্য গায়ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে এই মন্ত্রটিও ছেলেরা শিক্ষা করে। গায়ত্রী সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেও এই মন্ত্রটি তাহারা ব্যবহার করিতে পারে।

['শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত) খণ্ড ২৭, পৃ. ৪৩৭-৪৩৮]

□ গায়ত্রী ব্রহ্মার পত্নী, যদিও তিনি প্রথমা পত্নী নন, তিনি দ্বিতীয়া। প্রথমা হলেন সাবিত্রী, দ্বিতীয়া গায়ত্রী। তবে এই দুটি নামের তাৎপর্য্য একই। সবিতা সূর্য, গায়ত্রী-মন্ত্রের মধ্যে যে সবিতা বা জগৎ প্রসবিতা সূর্যের বরেণ্য রূপকে স্মরণ করি আমরা—

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গদেবস্য ধীমহি।

এই সবিতাদেবের শক্তিস্বরূপা হলেন সাবিত্রী। আর গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে সবিতা সূর্যেরই বরেণ্য রূপের ধ্যান অতএব গায়ত্রী আর সাবিত্রীর পার্থক্য কোথায়। কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্রকে যেহেতু সাবিত্র-মন্ত্রও বলা হয়, তাই ব্রহ্মার স্ত্রী হিসেবে দুজনেই আছেন—সাবিত্রী এবং গায়ত্রী।

পৌরাণিক দৃষ্টিতে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল—বাক্ বা সরস্বতী সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মুখে শব্দের প্রথম উচ্চারণ বলেই সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা হিসেবেও যেমন পরিচিত, তেমনই শব্দের সঙ্গে ব্রহ্মার চিরকালীন সম্পর্কের নিরিখেই সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী হিসেবেও পরিচিত। এই সরস্বতীই আবার বহু জায়গায় ব্রাহ্মী, ব্রহ্মাণী অর্থাৎ ব্রহ্মার স্ত্রী হিসেবে গায়ত্রী নামে পরিচিত; সাবিত্রী এবং সরস্বতীর সঙ্গে গায়ত্রী ব্রহ্মার শক্তি বা স্ত্রী হিসেবেই পরিচিত হয়েছেন। মৎস্য পুরাণ বলেছে—শতরূপা, সাবিত্রী, গায়ত্রী, ব্রহ্মাণী এবং সরস্বতী এঁরা সকলেই ভগবান ব্রহ্মার শক্তিমূর্তি এবং এঁরা অভিন্না—

শতরূপা চ সা খ্যাতা সাবিত্রী চ নিগদ্যতে।
সরস্বত্যথ গায়ত্রী ব্রহ্মাণী চ পরন্তপঃ॥

গায়ত্রী, সাবিত্রী এবং সরস্বতী একই ব্রাহ্মী শক্তির তিন রূপ সেটা গোভিলের মত উল্লেখ করে বহ্বৃচসন্ধ্যাপদ্ধতিভাষ্যে বলা হয়েছে—দিনের তিন কালে তিনটি সন্ধ্যা-প্রাতঃসন্ধ্যায় যিনি গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে তিনিই সাবিত্রী এবং সায়াহ্নে তিনিই সরস্বতী। গায়ক-গায়নকে ত্রাণ করে তার নাম গায়ত্রী। সবিতা-সূর্যকে দ্যোতিত করে বলে তাঁর নাম সাবিত্রী, সবিতা জগৎকে প্রকাশিত করেন বলেই প্রসবার্থে, জগৎ-প্রসবিতার ভাবনায়

সাবিত্রী গায়ত্রীর আর এক নাম—কেননা গায়ত্রীমন্ত্রের মধ্যেই 'তৎসবিতুর্বরেণম্' কথাটি আছে, আর গায়ত্রী মন্ত্র যেহেতু বাক্‌স্বরূপা ফলত বাগ্‌রূপা সরস্বতীও গায়ত্রীর সঙ্গে একাত্মক। গোভিলের এই শ্লোকগুলির মধ্যে পদ্মপুরাণের একটি শ্লোক প্রায় হুবহু এসে পড়েছে। এই শ্লোক বলেছে—গায়ত্রীর চেহারা রক্তবর্ণ সাবিত্রীর বর্ণ শুক্ল আর সরস্বতীর বর্ণ কৃষ্ণ অর্থাৎ কালো। বেশ বোঝা যায়, প্রাতঃসূর্যের উদয়কালীন রক্তবর্ণ, মধ্যাহ্ন সূর্যের শুক্লপ্রভা এবং রাত্রির প্রথমান্ধকার আরোপিত হয়েছে—

গায়ত্রী নাম পূর্বাহ্নে সাবিত্রী মধ্যমে দিনে।
সরস্বতী চ সায়াহ্নে সৈব সন্ধ্যা ত্রিষু স্মৃতা॥
প্রতিগ্রহান্নদোষাত্তু পাতকাদুপপাতকাৎ।
গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাদ্ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ॥
সবিতৃদ্যোতনাচ্চৈব সাবিত্রী পরিকীর্তিতা।
জগতঃ প্রসবিত্রী বা বাগ্‌রূপত্বাৎ সরস্বতী॥
গায়ত্রী তু ভবেদ্‌রক্তা সাবিত্রী শুক্লবর্ণিকা।
সরস্বতী তথা কৃষ্ণা উপাস্যা বর্ণভেদতঃ॥

[মৎস্য পু. ৪.৮; বহ্বৃচসন্ধ্যাপদ্ধতি ভাষ্য, দ্র. সন্ধ্যাভাষ্যসমুচ্চয়, আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলি, বিনায়ক গণেশ আপ্তে সম্পাদিত, আনন্দাশ্রম মুদ্রাণালয়, গ্রন্থাঙ্ক কর, পৃ. ৩৭; পদ্ম পু. (সৃষ্টি খণ্ড), ৪৭.১২১]

□ ভগবান ব্রহ্মার সঙ্গে গায়ত্রীর যে সম্পর্ক এবং বাগ্‌দেবী সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর যে একরূপতা, সেটা ব্রহ্মা এবং সরস্বতীর উত্তরাধিকারিতা থেকেও প্রমাণ হয়। ব্রহ্মা এবং সরস্বতী উভয়েই হংসবাহন। গায়ত্রীর ধ্যানমন্ত্রে তিনিও হংসবাহনা। ব্রহ্মার কমণ্ডলু এবং অক্ষমালা গায়ত্রীর ধ্যানমন্ত্রে এসে গেছে। কেননা যজুর্বেদীয় সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণীর ধ্যান করে বলতে হয়—

ওঁ প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলস্থা রক্তবর্ণা দ্বিভুজা অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধরা হংসাসনমারূঢ়া ব্রহ্মাণী ব্রহ্মদৈবত্যা কুমারী ঋগ্‌বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া। এই ধ্যানমন্ত্রোক্ত ব্রহ্মাণী আর গায়ত্রী যে একই, তা সবচেয়ে ভালো বলা আছে মার্কণ্ডেয় পুরাণে যেখানে গায়ত্রীর অক্ষসূত্র, কমণ্ডলু এবং হংসবাহন ব্রহ্মাণীর সম্পত্তি বলে চিহ্নিত হয়েছে—

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে॥

অন্যদিকে ব্রহ্মার সঙ্গে সম্পর্কসূত্রেই সরস্বতীও গায়ত্রীর সঙ্গে একাত্মিকা হয়ে যান। তাতে সরস্বতী আকৃতি, প্রকৃতি এবং তাঁর সমস্ত ব্যবহার্য বস্তুগুলিও গায়ত্রীর উত্তরাধিকারে এসেছে। পদ্ম পুরাণে গায়ত্রীকে 'সপ্তবিধা বাণী' বলে অভিহিত করে গায়ত্রীকে বলা হয়েছে—তুমি শ্বেতা, শ্বেতবর্ণা, তোমার হাতে নির্মল শ্বেতপদ্ম, শুভ্র ক্ষৌম বস্ত্র এবং রক্তবর্ণ উত্তরীয় তোমার পরিধান। এই পুরাণেরই আর এক জায়গায় গায়ত্রীর হাতে সরস্বতীর বীণাটিও এসেছে; এসেছে পুস্তকও। শুক্লপুষ্প আর কমণ্ডলু তো গায়ত্রীর বহুপূর্ব অধিকার—

* গায়ত্রী দুর্গতারিণী বাণী সপ্তবিধা তথা।
* শ্বেতা ত্বং শ্বেতরূপাসি শশাঙ্কেন সমাননা।
* বসানা বসনে ক্ষৌমে রক্তেনোত্তরবাসসা।
* এবং সম্পূজ্য গায়ত্রীং বীণাকমলধারিণীম্।
শুক্লপুষ্পায়তৈর্ভক্ত্যা তাং কমণ্ডলুপুস্তকাম্॥

গায়ত্রীর সঙ্গে সরস্বতীর অভিন্নতা এতটাই যে, মৎস্য পুরাণ এবং কালিকা পুরাণে ব্রহ্মার বাঁ দিকে সাবিত্রী কিন্তু ডানদিকে গায়ত্রীর জায়গায় স্থলাভিষিক্তা হয়েছেন সরস্বতী—

* বামে পার্শ্বেস্য সাবিত্রীং দক্ষিণে চ সরস্বতীম্।
* সাবিত্রী বামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী॥

[হিন্দুসর্বস্ব পৃ. ৪৬; মার্কণ্ডেয় পু. ৮৮.১৪; পদ্ম পু. (সৃষ্টি) ১৬.৩০৩, ৩০৬-৩০৭, ৩২১; ৩৪.৮৪; মৎস্য পু. ২৬০.৪৪; কালিকা পু. ৮০.৭৫]

□ বস্তুত গায়ত্রী এবং সাবিত্রী—এই দুইজনই ব্রহ্মার পত্নী হিসেবে সমধিক খ্যাত। পদ্মপুরাণ মতে—যেখানে যেখানেই ব্রহ্মা আছেন সেখানে সেখানেই বাম স্থানে আছেন গায়ত্রী আর দক্ষিণে আছেন সাবিত্রী—

ব্রহ্মস্থানেষু সর্বেষু ব্রহ্মণো বামতঃ স্থিতা।
দক্ষিণেন তু সাবিত্রী মধ্যে ব্রহ্মা পিতামহঃ॥

বামে যদি থাকেন, স্ত্রী হিসেবে তাঁর সার্থকতা এবং প্রাধান্য বেশি হলেও গায়ত্রীর সঙ্গে ব্রহ্মার পরিণয় হয়েছে অনেক পরে। ফলত ব্রহ্মার প্রথমা স্ত্রী অবশ্যই সাবিত্রী। সাবিত্রী থাকতেও গায়ত্রীর সঙ্গে ব্রহ্মার বিবাহ কীভাবে হল, সেটা নিয়ে একটা কাহিনী আছে পদ্ম পুরাণে।

ব্রহ্মা পুষ্করক্ষেত্রে একটি যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞের প্রস্তুতিপর্বে যজ্ঞদীক্ষিত ব্রহ্মার মস্তক মুণ্ডন করে দিলেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা। সপত্নীক

যজ্ঞকার্যে ব্রতী হওয়ায় ব্রহ্মা ক্ষৌমবসন-পরিহিতা সাবিত্রী দেবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন সমাগত ঋত্বিকদের ব্রাহ্মণদের। যজ্ঞ আরম্ভ হয়ে গেল। যজুর্বেদের পুরোহিত অধ্বর্যু এবার সাবিত্রীকে ডাকলেন ব্রহ্মার পাশে এসে বসার জন্য। কিন্তু সাবিত্রী যজ্ঞস্থলে আসতে দেরি করলেন। তিনি বলে পাঠালেন—লক্ষ্মী আসেননি এখনও, ইন্দ্রাণী আসেননি চন্দ্রপত্নী রোহিণী আসেননি, বশিষ্ঠ পত্নী অরুন্ধতী আসেননি, আরও অনেকে আসেনি। আমি অপেক্ষা করব, ওঁরা এলে তবে আমি যাব।

যজ্ঞে পত্নীর সঙ্গেই দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু অধ্বর্যুর আহ্বান সত্ত্বেও সাবিত্রী যেভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন, তাতে তিনিই ক্ষুব্ধ হয়ে ব্রহ্মাকে বললেন—দেবী সাবিত্রী গৃহকর্মে ব্যস্ত আছেন, তা ছাড়া তাঁর বান্ধবী দেবপত্নীরা না এলে তিনি আসতেও ইচ্ছে করছেন না এখানে—সাবিত্রী ব্যাকুলা দেব প্রসক্তা গৃহকর্মণি। একথা শুনে ব্রহ্মার একটু রাগ হল। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন—তুমি আমার জন্য অন্য একটি পত্নী নিয়ে এসো এখানে, যাতে এই যজ্ঞ চলমান হয় এবং তা কাল অতিক্রম না করা—

পত্নীং চান্যাং মদর্থে বৈ শীঘ্রং শক্র ইহানয়।
যথা প্রবর্ততে যজ্ঞঃ কালহীনো ন জায়তে॥

ইন্দ্র মেয়ের খোঁজে এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করে যা দেখলেন—আশেপাশে যাঁরা আছেন সকলেই কারও না কারও পত্নী; কুমারী কন্যার দেখাই পেলেন না তিনি। শেষে হঠাৎই এক অসামান্যা সুন্দরী আভীরকন্যা অর্থাৎ গোপকুলের মেয়েকে দেখে ইন্দ্র তাকে প্রায় জোর করেই ব্রহ্মার কাছে নিয়ে যান। ইন্দ্র এইভাবে জোর করে তাঁকে নিয়ে যাবার সময় সেই কন্যা বার বার বলেছিল—আমি দুই, দই, নবনী বিক্রী করি। আমাকে এইভাবে নিয়ে যাবার আগে আমার পিতা-মাতাকে জিজ্ঞাসা করো। তাঁরা নিশ্চয়ই সম্মত হবেন। কিন্তু ইন্দ্র এসব কথায় কর্ণপাত না করে তাঁকে সোজা নিয়ে এলেন ব্রহ্মার কাছে।

ব্রহ্মা প্রথমে ভেবেছিলেন—সপত্নীক যাগ সম্পন্ন করতে হবে বলেই শুধুমাত্র যজ্ঞকালিক সময়ের জন্য পত্নী সংগ্রহ করবেন, তারপর যজ্ঞ শেষ হলে তাঁকে ছেড়েও দেবেন। ইন্দ্রকে তিনি সেই মর্মে বলেও ছিলেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এসব জাতিবিচারের প্রয়োজন নেই। যে কোনো মেয়ে, হলেই চলবে। যজ্ঞ শেষ হলেই তাকে মুক্ত করে দেবো—

যাবৎ যজ্ঞসমাপ্তি র্মে বর্ণে ত্বাং মা কৃথাঃ মম।
ভূয়ো'পি তাং প্রমোক্ষ্যামি সমাপ্তৌ
তু ক্রতোরিহ॥

কিন্তু ইন্দ্রের জোরাজুরিতে যে গোপকন্যা ব্রহ্মার কাছে পৌঁছোলেন, তাঁকে দেখার পর ব্রহ্মা তাঁর রূপে মোহিত হলেন এবং অবশেষে সেই গোপকন্যাও ব্রহ্মাকে দেখার পর যথেষ্ট আপ্লুত বোধ করলেন। ব্রহ্মা এবার ভগবান শ্রীহরির কাছে গিয়ে বললেন—এই মহাভাগ্যবতী দেবীর নাম গায়ত্রী। যজ্ঞকর্ম শেষ করার জন্য এঁকেই পেয়েছি আমি—

তাবদ্ ব্রহ্মা হরিং প্রাহ যজ্ঞার্থং সত্বরং বচঃ।
দেবী চৈষা মহাভাগা গায়ত্রী নামতঃ প্রভো॥

ভগবান শ্রীহরি আর কালবিলম্ব না করে ব্রহ্মাকে বিবাহ শেষ করতে বললেন। আর তিনি নিজে গায়ত্রীর অভিভাবকের মতো তাঁকে সম্প্রদান করলেন ব্রহ্মার হাতে। ব্রহ্মার সঙ্গে গায়ত্রীর বিবাহ হল গান্ধর্বমতে—

গান্ধর্বেণ বিবাহেন উপযেমে পিতামহঃ।

গায়ত্রীর সঙ্গে এই বিবাহের ফল ব্রহ্মার পক্ষে শুভ হয়নি। তাঁর প্রথমা পত্নী সাবিত্রী স্বামীর এই দ্বিতীয় বিবাহের জন্য একাদিক্রমে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, মহেশ্বর সবাইকে অভিশাপ দিয়েছেন। গায়ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের কারণে ব্রহ্মার প্রতি সাবিত্রীর অভিশাপ ছিল—কার্তিক মাসে সাংবৎসরিক একটা পূজা ছাড়া ব্রাহ্মণেরা আর কোনো সময় ব্রহ্মার পুজো করবেন না—

ঋতে তু কার্তিকীমেকাং পূজাং সাংবৎসরীং তব।
করিষ্যন্তি দ্বিজাঃ সর্বে মর্ত্যা নান্যত ভূতলে॥

[পদ্ম পু. (সৃষ্টি) ১৬.১০১-১৮৭; ১৭.১৪১-১৪৭]

গায়ত্রীতীর্থ গয়ায় অবস্থিত একটি তীর্থ। মহানদী তীরবর্তী এই তীর্থস্থানটিতে স্নান করে দেবী গায়ত্রীর সম্মুখে উপাসনা করলে পুণ্যফল লাভ হয়। এই তীর্থে সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করলে সমস্ত কুল ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাদ্রিত হয়। *[বায়ু পু. ১১২.২১]*

গায়ত্রীশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি তীর্থ। গায়ত্রীদেবী এখানে তীর্থ স্থাপন করেছিলেন।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচন কাণ্ড) পৃ. ৭০]

গায়ন১ পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি গায়নের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি ভৃগুর বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৫.২৩]

গায়ন২ স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অনুচর একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৬৭; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

গায়ন৩ পুরাণে বলা হয়েছে, যেসব ব্রাহ্মণ অপাংক্তেয় অর্থাৎ যাঁরা ব্রাহ্মণ্য বৃত্তি থেকে চ্যুত হয়েছেন তাঁদের দান করলে কোনো পুণ্যজনক ফল প্রাপ্তি ঘটে না। গায়ন ব্রাহ্মণরা এইসব অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজন।

[বায়ু পু. ৭৯.৬৯; ৮৩.৬১]

আমাদের মনে হয়, অনর্থক রাজস্তুতি করে যেসব ব্রাহ্মণেরা অর্থোপার্জনের চেষ্টা করে ছিলেন, সেই চাটুকারী ব্রাহ্মণদের ঘৃণাসূচক দৃষ্টিতে 'গায়ন' বলে চিহ্নিত করা হত। দৈত্যরাজ বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠা দেবযানীর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর পিতা শুক্রাচার্যকে ইচ্ছে করে গালাগালি দিয়ে দেবযানীকে বলেছিলেন—তোর বাবা আমার বাবার স্তুতিপাঠক 'গায়ন'। হয়তো এইরকম একটা ঘৃণ্যতা থেকেই পরবর্তী কালে এমন ব্রাহ্মণেরা দানের জন্য অপাংক্তেয় হয়ে গিয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.৭৮.৩২-৩৩; (হরি) ১.৬৬.৩২-৩৩]

গারুড়কল্প চতুর্দশ কল্প গারুড়কল্প নামে অভিহিত। গারুড়কল্পে গরুড়ের উৎপত্তি আখ্যান বর্ণনা করে কৃষ্ণ স্বয়ং যে পুরাণ কীর্ত্তন করেছেন সেটি গরুড় পুরাণ নামে পরিচিত। *[মৎস্য পু. ৫৩.৫৩; ২৯০.৬]*

গার্গি একটি নক্ষত্রবীথী। শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা এই বীথীর অন্তর্গত নক্ষত্র। *[দ্র. নক্ষত্র]*

[বায়ু পু. ৬৬.৫১]

গার্গীয় পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি গার্গীয়ের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি ভৃগুর বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৫.৩৮]

গার্গ্যভূমি কাশীরাজ ধন্বন্তরির বংশধারায় বেণুহোত্রের পুত্র গার্গ্য। গার্গ্যের পুত্রের নাম গার্গ্যভূমি।

বায়ু পুরাণের পাঠে অবশ্য গার্গ্যভূমির পরিবর্তে গর্ভভূমি নাম পাওয়া যায়। গার্গ্যভূমির বংশে বহু ধার্মিক ব্রাহ্মণ বিক্রমশালী ক্ষত্রিয়দের জন্ম হয়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৭.৭৮; বায়ু পু. ৯২.৭৩-৭৪]

গার্গ্যহরি অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি হলেন গার্গ্যহরি। *[মৎস্য পু. ১৯৬.৩১]*

গার্গ্যায়ণ পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি গার্গ্যায়ণের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি ভৃগুর বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৫.২৩]

গার্দভি১ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্রদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১৩.৪.৫৯; (হরি) ১৩.৩.৭৮]

গার্দভি২ ভৃগুবংশজাত জনৈক বংশপ্রবর্তক ঋষি।

[মৎস্য পু. ১৯৫.৩৪]

গার্হায়ণ পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি গার্হায়ণের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি ভৃগুর বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৫.২৩]

গালব অন্যতম বিখ্যাত বৈদিক ঋষি। ঋগ্‌বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হিসেবে গালবের নাম পাওয়া যায় না। তবে বেদোত্তর সাহিত্যে, বিশেষত আরণ্যক এবং উপনিষদ গ্রন্থগুলিতে একাধিকবার গালবের নাম বিশিষ্ট ঋষি হিসেবেই উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে, মহাকাব্য এবং পুরাণগুলিতে তাঁর বিশদ পরিচয় এবং জীবনকথা পাওয়া যায়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে গালবকে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐতরেয় আরণ্যকেও গালবের নাম উল্লিখিত হতে দেখা যায়। নিরুক্তকার যাস্ক তাঁর কোষগ্রন্থ নিরুক্তে প্রাচীনকালের অন্যতম বৈয়াকরণ হিসেবে গালবের নাম উল্লেখ করেছেন।

[বৃহদারণ্যক উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ২.৬.৩; ঐতরেয় আরণ্যক (মহর্ষি) ৫.৩.৩; নিরুক্ত ৪.৩]

☐ মহাভারতেই প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় যে, মহর্ষি গালব বিশ্বামিত্রের পুত্র। তবে তাঁর সম্পর্কে বিশদে জানা যায় পুরাণগুলি থেকে। মহাকাব্য পুরাণে বিশ্বামিত্র পুত্র গালবের নাম উল্লিখিত হয়েছে কৌশিক-বিশ্বামিত্র বংশীয় গোত্র প্রবর্তক ঋষি হিসেবে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, বায়ু পুরাণ এবং দেবী

ভাগবত পুরাণে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী—একসময় দীর্ঘকাল ধরে অনাবৃষ্টি দেখা দিল। তার ফলে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। বিশ্বামিত্র সেই সময় স্ত্রী-পুত্র সকলকে ছেড়ে কৌশিকী নদীর তীরে কঠোর তপস্যায় রত। বিশ্বামিত্রের স্ত্রী দারুণ অসহায় বোধ করতে লাগলেন। কোথায় খাবার, কী ভাবে সন্তানদের ভরণপোষণ হবে—এসব ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত তিনি স্থির করলেন—একটি পুত্রকে বিক্রয় করে সেই অর্থে বাকিদের প্রতিপালন করা হবে। একথা ভেবে বিশ্বামিত্রের পত্নী নিজের মধ্যম পুত্রটিকে গলায় দড়ি বেঁধে হাটে নিয়ে চললেন। এই সময়ে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজপুত্র সত্যব্রত, যিনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়ে নিকটেই বসবাস করছিলেন, তাঁর সঙ্গে বিশ্বামিত্র-পত্নীর দেখা হল। ঋষিপত্নীর অসহায় অবস্থার কথা শুনে সত্যব্রত বললেন—দেবী! আপনি পুত্র বিক্রয় করবেন না। পুত্রটিকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে যান। আমি কথা দিচ্ছি, যতদিন না মহর্ষি বিশ্বামিত্র ফিরে আসেন, ততদিন আপনাদের খাদ্য সরবরাহ করার ভার আমার। সত্যব্রতের আশ্বাসবাক্য শুনে বিশ্বামিত্রের পত্নী পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে ফিরে গেলেন। কিন্তু গলায় দড়ি বাঁধা হয়েছিল বলে, সেদিন থেকে বিশ্বামিত্রের মধ্যম পুত্রের নামই হয়ে গেল গালব—

সো'ভবদ্ গালবো নাম গলবন্ধান্মহাতপাঃ।

[মহা (k) ১৩.৪.৫২; (হরি) ১৩.৩.৭১; বায়ু পু. ৮৮.৮৬-৯০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.৮৫-৮৯; দেবীভাগবত পু. ৭.১০.২৩-৪৩]

□ বায়ু পুরাণে এমন উল্লেখও পাওয়া যায় যে, ভবিষ্যৎ সাবর্ণি মনুর কালে যাঁরা সপ্তর্ষি হবেন, মহর্ষি গালব তাঁদের মধ্যে একজন।

[বায়ু পু. ১০০.১০]

□ মহাভারতের ঘটনা প্রবাহে বিভিন্ন সময়ে গালবকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের ময়দানব নির্মিত রাজসভায় মহর্ষি গালব উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ২.৪.১৫; (হরি) ২.৪.১০ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, খণ্ড. ৫, পৃ. ২৬]

□ মহাভারতের সভাপর্বে নারদের মুখে দেবরাজ ইন্দ্রের সভার যে বিবরণ পাওয়া, সেই বিবরণে অন্যান্য ঋষি-মহর্ষিদের সঙ্গে গালবকেও ইন্দ্রসভায় উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

[মহা (k) ২.৭.১০; (হরি) ২.৭.১০]

□ পাণ্ডবদের বনবাসের সময় বনে অন্যান্য মুনি ঋষিদের সঙ্গে গালবও এসে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

[মহা (k) ৩.৮৫.১২০; (হরি) ৩.৭০.১২০]

□ মহাভারতের উদ্যোগপর্বে বেশ কয়েকটি অধ্যায় জুড়ে একটি দীর্ঘ উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে যা গালবোপাখ্যান নামেই বিখ্যাত। এই উপাখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে যে, গালব শুধুমাত্র বিশ্বামিত্রের পুত্র ছিলেন না, শিষ্যও ছিলেন। শিক্ষা সমাপন হবার পর বিশ্বামিত্র যখন গালবকে ছাত্রাবস্থার পর নিজের মনোমতো জীবন যাপনের অনুমতি দিলেন, তখন গালব বিশ্বামিত্রকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলেন। বিশ্বামিত্র প্রথমে গালবকে গুরুদক্ষিণা না দিয়েই প্রস্থান করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু গালবের বারংবার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত কিছুটা বিরক্ত হয়েই আটশত অশ্ব গুরুদক্ষিণা রূপে প্রার্থনা করলেন। অশ্বগুলিও সাধারণ অশ্ব নয়, তাদের একটি কান শ্যামবর্ণ হবে এবং পুরো শরীর হবে দুধের মতো সাদা। গালব বিশ্বামিত্রের অভিলাষ অনুযায়ী গুরুদক্ষিণার জন্য অশ্বসংগ্রহ করতে রওনা হলেন। তারপর প্রথমে গরুড়ের সহায়তায় এবং তারপরে চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির কন্যা মাধবীর সহায়তায় গালব ছয়শত অশ্ব গুরুদক্ষিণা হিসেবে দান করতে সমর্থ হন। সঙ্গে মাধবীকেও নিয়ে আসেন বিশ্বামিত্রের আশ্রমে। মাধবীর গর্ভে বিশ্বামিত্রের ঔরসে অষ্টকের জন্মের পর গালবের গুরুদক্ষিণা সম্পন্ন হয়।

[দ্র. মাধবী]

[মহা (k) ৫.১০৭-১১৯ অধ্যায়; (হরি) ৫.৯৯-১১০ অধ্যায়]

গালবিদ পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি গালবিদের বংশ তার মধ্যে একটি। গালবিদ অঙ্গিরার বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৬.২২]*

গালবেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি তীর্থ। এই তীর্থদর্শনে গুরুভক্তি লাভ হয়।

[কৃতকল্পতরু (তীর্থবিবেচন কাণ্ড) পৃ. ৯৮]

গির যদু-বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবের পুত্র সারণ। সারণের পুত্রদের মধ্যে গির একজন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে গিরকে গিরি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[বায়ু পু. ৯৬.১৬৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৬৭]

গিরি১ যদু-বৃষ্ণিবংশীয় শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন। ইনি অক্রূরের ভাই। *[ভাগবত পু. ৯.২৪.১৬]*

গিরি২ *[দ্র. গির]*

গিরিক যদু-বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবের পুত্র সারণ। সারণের পুত্রদের মধ্যে গিরিক একজন।

[বায়ু পু. ৯৬.১৬৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৬৭]

গিরিকর্ণিকা একটি নদীতীর্থ। এই তীর্থ শ্রাদ্ধকার্যের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত। *[মৎস্য পু. ২২.৩৯]*

গিরিকা কুরুবংশীয় চ্যবনের পৌত্র চৈদ্য উপরিচর বসু-র পত্নীর নাম গিরিকা। গিরিকার সাত পরাক্রমশালী পুত্ররা হলেন—বৃহদ্রথ, প্রত্যশ্রবা, কুশ, হরিবাহন, যজুঃ, মৎস্য, কালী। গিরিকার জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃহদ্রথ মগধের অধিপতি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ৫০.২৬]

বায়ু পুরাণ অনুসারে গিরিকা কুরুবংশীয় বিদ্যোপরিচয়ের পত্নী। গিরিকার পুত্রদের নামের ক্ষেত্রেও পাঠভেদ দেখা যায় বায়ু পুরাণে।

[বায়ু পু. ৯৯.২২১]

পুরাণে নানারকম পাঠান্তর থাকলেও মহাভারত অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই জানিয়েছে যে, গিরিকা শুক্তিমতী নদীর কন্যা, চেদিরাজ উপরিচর বসুর পত্নী। চেদিরাজধানীর কাছেই শুক্তিমতী নামে নদীটি প্রবাহিত হত। কথিত আছে— কোলাহল নামের এক পর্বত কামনায় আচ্ছন্ন হয়ে এই শুক্তিমতী নদীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে। নদীর গতিবেগ রুদ্ধ হলে উপরিচর রাজা তাকে মুক্ত করার জন্য কোলাহল পর্বতকে পদাঘাত করেন। বলশালী সেই রাজার পদাঘাতে কোলাহল পর্বতের একাংশ চূর্ণ হয়ে রন্ধ্র সৃষ্টি হল, সেই রন্ধ্র দিয়ে শুক্তিমতী নদীর আবদ্ধ স্রোত পুনরায় বয়ে চলল। নদীর গর্ভে কোলাহল পর্বতের একটি পুত্র এবং একটি কন্যার জন্ম হয়। পর্বতের কন্যা বলেই তাঁর নাম গিরিকা। কোলাহল পর্বত থেকে মুক্ত হয়ে কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট নদী রাজাকে তাঁর পুত্র এবং কন্যাটি দান করেন এবং বলেন—এই পুত্র আপনার সেনাপতি হবে এবং এই কন্যাটি হবে আপনার উপযুক্ত মহিষী। উপরিচরবসু এই কথা শুনে আনন্দিত হয়ে গিরিকাকে বিবাহ করেন এবং তাঁর ভ্রাতাকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন।

গিরিকা বসু রাজার প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন বলে জানা যায়। রাজা তাঁর এই পরমাসুন্দরী পত্নীকে ছেড়ে মৃগয়ায় যেতে বাধ্য হয়েছিলেন কিন্তু মৃগয়াকালেও তাঁর মন পড়েছিল রাজঅন্তঃপুরে তাঁর পত্নীর কাছে।

[দ্র. উপরিচরবসু]

[মহা (k) ১.৬৩.৩৪-৪২; (হরি) ১.৫৮.৪৮-৫৬]

গিরিগহ্বর উত্তর ভারতের একটি জনপদ।

[মহা (k) ৬.৯.৬৮; (হরি) ৬.৯.৬৮]

মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত জম্বুখণ্ড বিনির্মাণপর্বে খাসীর, পহ্লব প্রভৃতি জনজাতির সঙ্গে গিরিগহ্বর শব্দটির উল্লেখ থাকায় কোনো কোনো পণ্ডিত 'গিরিগহ্বরাঃ' শব্দটিকে খাসীর প্রভৃতি পার্বত্য-জনজাতির বিশেষণ বলে মনে করেছেন। পার্বত্য প্রদেশের এই গুহাবাসী জনজাতিগুলি গিরিগহ্বর শব্দের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে কী না, এ বিষয়ে চিন্তার অবকাশ থাকছে। তবে পণ্ডিত K.C. Mishra এমন মন্তব্যও করেছেন যে, এই গিরিগহ্বর জনজাতিটি হিন্দুকুশ পার্বত্য অঞ্চলের কোনো গুহাবাসী জনজাতিও হতে পারে।

[TIM (Mishra) p. 115]

গিরিদুর্গ চারদিকে পাহাড়-পর্বতের মধ্যে অবস্থিত দুর্গ, পর্বতারোহণের কষ্টই শত্রুদের কাছে গিরিদুর্গ আক্রমণের প্রধান বাধা হয়ে ওঠে। তার মধ্যে যদি আবার গিরিনদী, প্রস্রবণ এবং উচ্চবৃক্ষ থাকে তাহলে দুর্গবাসী মানুষের পক্ষে যত মঙ্গলকর হয়, শত্রুদের কষ্ট সেখানে আরও বাড়ে। গিরিদুর্গবাসী জনেরা সংকটে পড়লে চলাফেরার জন্য গিরিপথ নিজেদের মতো করে বার করে নিতে পারে এবং শত্রুরা তা টেরও পায় না। মনু-মহারাজের ভাবনায় সমস্ত প্রকার দুর্গের মধ্যে সবচেয়ে ভাল হল গিরিদুর্গ। কারণ, পর্বতের নিজস্ব প্রাকৃতিক সুবিধেটা এত বেশি যে, অন্যান্য কৃত্রিম দুর্গের চেয়ে দুর্গাশ্রিত রাজাকে গিরিদুর্গ অনেক বেশি সুবিধে দেয়। তাছাড়া যুদ্ধ এবং শত্রুসৈন্যকে পালটা আক্রমণ করার সুযোগও গিরিদুর্গেই সবচেয়ে বেশি। পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে ফেলা বা শরক্ষেপণও গিরিদুর্গ থেকে অনেক বেশি সহজ এবং অলক্ষিতে সম্ভব হয়। মনু তাই গিরিদুর্গকেই সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্গ বলেছেন—

সর্বেণ তু প্রযত্নেন গিরিদুর্গং সমাশ্রয়েৎ।
এষাং হি বাহুগুণ্যেন গিরিদুর্গং বিশিষ্যতে॥

মহাভারত অবশ্য গিরিদুর্গকে শ্রেষ্ঠ বলেনি, এই গ্রন্থ মতে নরদুর্গ বা মনুষ্যদুর্গই শ্রেষ্ঠ।

[মানব ধর্মশাস্ত্র, ৭.৭০-৭৪; দ্রষ্টব্য মেধাতিথি, কুল্লূকভট্ট এবং রাঘবানন্দের টীকা দ্রষ্টব্য; মহা (k) ১২.৫৬.৩৫; (হরি) ১২.৫৫.৩৫]

গিরিপ্রস্থ নিষধদেশের অন্তর্গত একটি পর্বত। দেবরাজ ইন্দ্র শত্রুদমনের উদ্দেশ্যে গুপ্তভাবে গিরিপ্রস্থ পর্বতে বাস করেছিলেন। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস প্রসঙ্গে ইন্দ্রের গিরিপ্রস্থে বাসের উল্লেখ মহাভারতের বনপর্বে পাওয়া যায়।

[মহা (k) ৩.৩১৫.১৩; (হরি) ৩.২৬৯.১১]

□ গিরিপ্রস্থকে নিষধদেশের রাজধানী বলে উল্লেখ করেছেন Subodh Kapoor। তবে প্রাচীন নিষধদেশের আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। সাধারণভাবে মনে করা হয় বিদর্ভ দেশের নিকটেই নিষধদেশ অবস্থিত ছিল। সেই নিরিখে নিষধদেশ আধুনিক বেরারের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত হওয়া উচিত। Lassen -ও এই মত সমর্থন করেন। Wilson সাহেবের মতে গিরিপ্রস্থ বিন্ধ্যপর্বতের নিকটে অবস্থিত ছিল।

[Vishnupurana (Wilson) Vol 2, p. 156-157; EAIG (Kapoor) p. 499]

গিরিরক্ষ সাত্বতকুলে অনমিত্রের বংশধারায় পৃশ্নির পুত্র শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে গিরিরক্ষ একজন। *[বায়ু পু. ৯৬.১১০]*

গিরিরুহ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। 'গিরিরুহ' অর্থাৎ গিরি বা পর্বতে আরোহণ করে আছেন যিনি। ভগবান শিব কৈলাস পর্বত শিখরে বাস করেন—এ ভাবনা মহাকাব্যে পুরাণে বহুবার বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও হিমালয় পর্বত, সুমেরু পর্বতকে তাঁর বিহারক্ষেত্র বলেও বর্ণনা করা হয়েছে বহুবার। পর্বতে আরোহণ করেন, অর্থাৎ পর্বতে বসবাস করেন বলেই তিনি গিরিরুহ—

গিরিরুহঃ পর্বতারূঢ়ঃ কৈলাসবাসীত্যর্থঃ
(নীলকণ্ঠকৃত টীকা)।

[মহা (k) ১৩.১৭.৫১; (হরি) ১৩.১৬.৫১]

গিরিসাধন শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। *[দ্র. পিনাকধৃক্]*

[মহা (k) ১৩.১৭.৮৯; (হরি) ১৩.১৬.৮৯]

গীত চতুঃষষ্টিকলার প্রথম অঙ্গ হল গীত অর্থাৎ গান। গীতের আরম্ভ সামবেদ থেকে। ঋগ্‌বেদের সুসম্বদ্ধ পাদবদ্ধ ছন্দগুলিতে সুর-সংযোগ করলেই সেগুলি সামে পরিণত হয়। টীকাকার সায়নার্যের ভাষায়—গীতিরূপ মন্ত্রগুলিই সাম—

গীতিরূপা মন্ত্রাঃ সামানি।

সামবেদের দুটি ভাগ আছে—আর্চিক এবং উত্তরার্চিক। ঋগ্‌বেদের যেসব মন্ত্রকে গীতিরূপ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি আর্চিক খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আর উত্তরার্চিকে ঋক্‌মন্ত্র ছাড়াও এমন কতগুলি মন্ত্রগীত আছে যা সামবেদের নিজস্ব। সামবেদের যিনি ঋত্বিক, তাঁর নামও উদ্‌গাতা, অর্থাৎ তিনি গানই করেন। সেই উদ্‌গাতার কিছু সহচর থাকতেন। তাঁরাও গান করতেন উদ্‌গাতার সঙ্গে।

সামবেদই আর্যসঙ্গীতের মূল উৎস। 'সাম' শব্দের একটা অর্থই হল গান। ঋক্ মন্ত্রে সপ্তসুর আরোপ করে সামগান হত। তবে সামগানের একেবারে আদি পর্যায়ে ভারতীয় সঙ্গীতে ঠিক সপ্তস্বরের অস্তিত্ব মেলে না। পাওয়া যায় তিনটি মাত্র সুর। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, এই তিনটি স্বর হল ষড়জ্, গান্ধার এবং পঞ্চম, কারও কারও মতে সে সময় ষড়্‌জ, ঋষভ এবং নিষাদ—এই তিনটি মাত্র সুর ব্যবহৃত হত। ক্রমে ক্রমে সামবেদের যুগেরই শেষ পর্যায়ে সপ্তস্বরের উৎপত্তি হয়।

এখন আমরা সপ্তস্বরকে ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ বা সংক্ষেপে সা, রে গা, মা, পা, ধা, নি—এই নামে চিনি। কিন্তু সামবেদের যুগে এই সপ্তস্বরের নাম ছিল যথাক্রমে—ক্রুষ্ট, প্রথম। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র এবং অতিস্বার্য। আবার বেদের টীকাকার সায়নাচার্য এবং নারদ নামে একটি বৈদিক শিক্ষার (Phonetics) গ্রন্থকারের মত অনুযায়ী—সামবেদের যুগে সপ্তস্বর চিহ্নিত হত যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম নামে। তারপর যখন এই স্বরগুলি, ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে প্রবেশ করল, তখনই তাদের ষড়জ্ থেকে নিষাদ পর্যন্ত আধুনিক নামকরণ হল। সব

পণ্ডিত অবশ্য এই বিষয়ে একমত নন আবার মার্গসঙ্গীত বৈদিক যুগেই সৃষ্টি হয়েছিল কী না—এ বিষয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে বহু বাদানুবাদ আছে। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতই এ বিষয়ে একমত যে সামগানে ব্যবহৃত সপ্তস্বর থেকেই কালক্রমে মার্গসঙ্গীতের সপ্তস্বরের উৎপত্তি হয়েছে।

সামবেদ সহস্র শাখায় বিভক্ত ছিল। আর সামগানের প্রচলিত রীতিও ছিল একাধিক। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি উল্লেখ করেছেন—'সহস্রবর্ত্মা সামবেদঃ'। সামবেদের এই সহস্রপথ বা সহস্রশাখার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পূর্বমীমাংসাসূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী মন্তব্য করেছেন যে, সামবেদে সহস্র বা অসংখ্য প্রকারের গান আছে—

সামবেদে সহস্রং গীত্যুপায়াঃ।

ভারতীয় সঙ্গীতের উৎপত্তির ক্ষেত্রে সামবেদের অবদান এবং গুরুত্ব বিষয়ে সমস্ত পণ্ডিতই একমত। লক্ষণীয়, শুধুমাত্র যজ্ঞের সময়েই সামগান হত এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। অন্য সময়েও সামগান হত।

[যোগীরাজ বসু, বেদের পরিচয়, পৃ. ৩৩-৩৮]

☐ বৈদিক এবং ঔপনিষদিকেরা 'ওম্' উচ্চারণের কথা বলেন গান কিংবা গীতের প্রথম সুরেলা উচ্চারণ হিসেবে। ছান্দোগ্য উপনিষদ, যেটা সামবেদেরই উপনিষদ বলে বিখ্যাত, তার আরম্ভেই গানের জয়গান করে বলা হয়েছে—'ওম্' এই অক্ষরটি উদ্‌গাতা ঋত্বিকের প্রথম গেয় অংশের মধ্যে পড়ে, তিনি ওঙ্কার উচ্চারণ করে গান করেন—

ওমিত্যেতদক্ষরম্ উদ্‌গীথমুপাসীত।
ওমিতি হ্যুদ্‌গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্॥

এই আরম্ভশ্লোকের টীকায় শঙ্করাচার্য লিখেছেন—

ওম্ ইতি প্রথমম্ উচ্চার্য্য উদ্‌গায়তি,
উচ্চৈর্গায়তি, তস্মাদ্ ওঙ্কারউদ্‌গীথঃ।

[ছান্দোগ্য উপনিষদ (দুর্গাচরণ), ১.১., পৃ. ৮-১১]

☐ ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্র বলেছে কেমন করে সমস্ত অক্ষরমালা ছন্দ তৈরি করছে—যা গীতের পূর্বরূপ। ঋগ্‌বেদ বলছে—তিনি গায়ত্রী ছন্দ দিয়ে 'অর্ক' বা অর্চনামন্ত্র রচনা করেন, অর্চনামন্ত্র দিয়ে সোম রচনা করেন, ত্রিষ্টুভ ছন্দ দিয়ে বাক্ নির্মাণ করেন, দ্বিপাদ, চতুষ্পাদ বাক্ (পাদবদ্ধ সমানসংখ্যক অক্ষর) দিয়ে অনুবাদ তৈরি করেন, কতগুলি মন্ত্র নিয়ে বৈদিক সূক্ত তৈরি হয়, অনেকগুলি সূক্ত মিলে এক-একটি অনুবাক তৈরি হয়), এবং তাঁরা অক্ষর যোজনা করে সপ্তচ্ছন্দ রচনা করেন—

গায়ত্রেণ প্রতি মিমীতে অর্কম্/
অর্কেণ সামস্ত্রৈষ্টুভেন বাকম্।
বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদা/
অক্ষরেণ মিমতে সপ্তবাণীঃ॥

মন্ত্রে উল্লিখিত এই সপ্তবাণীকে যেমন সাতটি ছন্দ বলে ব্যাখ্যা করা যায়, তাতে টীকাকারেরা অনেকেই মনে করেছেন—গায়ত্রী, পংক্তি, অনুষ্টুপ, বৃহতী, বিরাজ, ত্রিষ্টুপ, জগতী—এই সাতটি বৈদিক ছন্দই এই মন্ত্রোক্ত সপ্ত বাণীর উপকরণ। আবার অনেকেই একটু বেশি উচ্চাশায় সপ্ত বাণীকে ভবিষ্যৎ গীতের সপ্ত সুরের স্বরগ্রাম বলেও ভাবতে চেয়েছেন।

[ঋগ্‌বেদ ১.১৬৪.২৪; সায়নাচার্যকৃত টীকা দ্রষ্টব্য]

☐ বিশিষ্ট সঙ্গীত গবেষক প্রজ্ঞানানন্দের বক্তব্য এখানে বলতেই হবে। তিনি লিখছেন—

মহাভারতকার উল্লেখ করেছেন,
ঋগ্‌ভির্যমনুশংসন্তি নামকর্মাণি বহ্বচাঃ।
যজুর্ভির্যং হবির্বেদ্যাং জুহুরধ্বর্যবোহ'ধ্বরে।
সামভির্যে চ গায়ন্তি সামগাঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ॥

[মহা (k) ১৩.১৬.৪৭-৪৮; (হরি) ১৩.১৫.৪৮-৪৯]

☐ ঋক্‌ছন্দে স্বর যোজনা করে গীতিরূপ সামের সৃষ্টি হয়। যজুর্বেদ যাগ-যজ্ঞ তথা কর্মানুষ্ঠানের বিধান করে। যাঁরা সাম গান করতেন তাঁদের সামগ বা সামগায়ী বলা হত। তাঁরা শুদ্ধবুদ্ধির প্রেরণা লাভ করেই গানকে আত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় প্রয়োগ করতেন, আর তারই জন্য সামগান ছিল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আভ্যুদয়িক ও মঙ্গলবাচী। 'যম' অর্থে স্বর। স্বর সাতটি। কোমল বা বিকৃত স্বরের তখন ব্যবহার ছিল না। তবে অক্ষরের বিকার বা লোপের জন্য উচ্চারণ ভেদ হত। তাতে করে স্বরে তথা স্বরোচ্চারণে অনেক বিকৃতভাব দেখা দিত—

"তে চাবান্তরভেদৈর্বহুধা ভিন্নাঃ"।

সেই ভেদ অবশ্য চ্যুত-অচ্যুত বা অন্তর-কাকলির সঙ্গে কোনো সম্পর্কযুক্ত ছিল না। ঋগ্‌বেদ-প্রাতিশাখ্যকার শৌনক বলেছেন—

'সপ্তযমানি বাচঃ'। ভাষ্যকার উবট প্রশ্ন করেছেন— 'কে তে যমা নাম?' সূত্রকার যেন উত্তরে বলেছেন—

'সপ্ত স্বরা যে যমাস্তে'।

উবট ভাষ্যে আরো পরিষ্কার করে উল্লেখ করেছেন: 'যে তে সপ্তস্বরাঃ—ষড়্জ-ঋষভ-গান্ধার-মধ্যম-পঞ্চম-ধৈবত-নিষাদাঃ স্বরাঃ, ইতি গান্ধর্ববেদে সমাম্নাতাঃ। তথা সামসু ক্রুষ্ট-প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-মন্দ্রাতিস্বার্যঃ ইতি তে যথা নাম বেদিতব্যাঃ'। সুতরাং যম বলতে বৈদিক সাত স্বর প্রথমাদি ও লৌকিক সাত স্বর ষড়্জাদি বোঝায়।

[ঋক্ প্রাতিশাখ্যম্, (মঙ্গলদেব শাস্ত্রী সম্পাদিত, এলাহাবাদঃ ইন্ডিয়ান প্রেস, ১৯৩১), ১৩.৪২-৪৪, পৃ. ৩৪৫-৩৪৬]

□ তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যে *(২৩.১১, পৃ. ২৪৯)* বলা হয়েছে—

'মন্দ্রাদিষু ত্রিষু স্থানেষু সপ্ত-সপ্ত যমাঃ'।

ভাষ্যকার সোমাচার্য এই সূত্রটির দু-রকম অর্থ করেছেন: (১) ষড়্জাদি বা প্রথমাদি সাত স্বর এবং মন্দ্র, মধ্য ও তার তিনটি স্থানভেদে একুশটি স্বর *(৭ x ৩ = ২১)* ও (২) উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন স্বর—

উচ্চৌ নিষাদগান্ধারৌ নীচাবৃষভধৈবতৌ।
শেষাস্তু স্বরিতা জ্ঞেয়াঃ ষড়্জমধ্যমপঞ্চমাঃ॥

অবশ্য শিক্ষাগুলিতে উদাত্তাদি তিনটি স্থানস্বর থেকে ষড়্জাদি সাত স্বরের সৃষ্টির কথা উল্লিখিত হয়েছে। মহাকাব্য মহাভারতে উল্লিখিত 'ঋগ্‌ভির্যমনুশংসন্তি' *(১৩.১৬.৪৭-৪৮)* শব্দগুলি ঋক্‌ছন্দ ও সাত স্বর—কথা ও সুরের সম্বন্ধেই যে উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

'ঋচো যজুংসি সামানি স্তোমাশ্চ বিধিচোদিতাঃ'।

[মহা (k) ১২.২৬৮.৩৭; (হরি) ১২.২৬২.৩৭]

□ শ্লোকাংশে তখনকার যাগ-যজ্ঞে বৈদিক যুগের মতো সামগানে স্তোমের ব্যবহার ছিল প্রমাণ হয়। মহাভারতকার স্তোমের পরিচয়ও দিয়েছেন। যেমন—

ঋক্‌সামানি তথোঙ্কারং আহুস্ত্বাং ব্রহ্মবাদিনঃ॥
হায়িহায়ি হুবাহায়ি যথাহসকৃৎ।
গায়ন্তি ত্বাং সুরশ্রেষ্ঠ সামগাঃ ব্রহ্মবাদিনঃ॥
যজুর্ময়ো ঋঙ্‌ময়শ্চ ত্বমাহুতিময়স্তথা।
পঠ্যসে স্তুতিভিশ্চৈব বেদোপনিষদাং গণৈঃ॥

[মহা (k) ১২.২৮৪.১২৪-১২৬; (হরি) ১২.২৭৭.৫৩-৫৫]

□ পূর্বানুবৃত্তি-প্রসঙ্গে যজ্ঞানুষ্ঠানে সামগানের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। স্তোভ বলতে সামগানে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বা স্বর, বর্ণ ও কখনো কখনো সমগ্র বাক্য বা পদকে অন্তর্নিবিষ্ট করা বোঝায়। আচার্য সায়ন স্তোভ অর্থে বলেছেন: 'কালক্ষেপমাত্র হেতুং শব্দরাশিং স্তোভ ইত্যাচক্ষতে', অর্থাৎ সামগানে কালক্ষেপের জন্য ব্যবহৃত শব্দরাশির নাম স্তোভ, আর 'অধিকত্বে সতি ঋগ্বিলক্ষণবর্ণঃ স্তোমঃ'। মহাভারতকার তার উদাহরণ দিয়েছেন: 'হায়িহায়ি হুবাহায়ি হাবুহায়ি' প্রভৃতি।

সামগানে কি কি 'সাম' গান করা হত তারও পরিচয় মহাভারতে পাওয়া যায়। যেমন—

রথন্তরং যত্র বৃহচ্চ গীয়তে
যত্র বেদিঃ পুণ্যজনৈর্বৃতা চ।
যত্রোপয়াতি হরিভিঃ সোমপীথী
তত্র ত্বাহং হস্তিনং যাতয়িষ্যে॥

[মহা (k) ১৩.১০২.৫৪; (হরি) ১৩.৮৯.৫৪; (নির্ণয় সাগর প্রেস) ১৩.১৫৯.৫৪]

* * *

□ বৃহদ্ ও রথন্তর সাম দুটি সম্বন্ধে পূর্বানুবৃত্তিতে আলোচিত হয়েছে। আচার্য সায়ন বলেছেন গীতিরূপ মন্ত্রই সাম: 'গীতিরূপাঃ মন্ত্রাঃ সামানি'। বিভিন্ন ছন্দের মধ্যে সমতা রক্ষা করে গান করার নামই 'সাম'। সামবিধানব্রাহ্মণে *(১/১/৫)* উল্লেখ করা হয়েছে সামগ উদ্‌গাতা যখন ঋক্‌ছন্দের ঋকে উৎপন্ন সাম জগতীছন্দের ঋকে অথবা জগতীছন্দের ঋকে (স্বরযোগে) উৎপন্ন সাম ত্রিষ্টুপছন্দের ঋকে গান করেন তখন বিপরীত ছন্দের সমাবেশ থাকলেও পরস্পরের মধ্যে একটি সাম্য থাকে। আর সেই সাম্য বা সমতার নামই 'সাম'।

স যদা গায়ত্রং বৃহত্যাং গায়তি বার্হতং জগত্যা
জাগতং ত্রিষ্টুভি সমতাং চাপদ্যতে তস্মাদেতৎ
সামেত্যাহ সমা উহ বা অস্মিশ্ছন্দাংসি সাম্যাদিতি
(সাম্ন্যাদিতি বা) তৎসাম্ন সামত্বম্॥

সেই সমতা সম্বন্ধে সামগায়ীর জ্ঞান থাকা উচিত। অনেকে অনুমান করেন প্রাচীনকালে ষড়্জ ও মধ্যম এই উভয় গ্রামে (দুটি পদ্ধতিতে)

সামগান করা হত। এই গ্রাম দুটির আদি-অক্ষর স + ম থেকেই 'সাম' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে।

Incidentally, there seem to have been two distinct systenis of Vedic chant—the Sa-type and the Ma-type and hence the term *Sāman.* Vide *The Bulletin of the Deccan College* (1956), Vol. 14, No. 4, p. 31i.

অবশ্য এই অনুমান কতটুকু যে বাস্তব তা বিচারের বিষয়। তবে একথা ঠিক যে ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার গ্রাম তিনটি অতীব প্রাচীন। এদের মধ্যে অনেকের মতে মধ্যমগ্রাম ও অনেকের মতে গান্ধারগ্রাম প্রাচীন।

Vide The Journal of the Music Academy, Madras, Vol. XVII, 1946, p. 84.

এছাড়া কারো কারো অভিমত যে বৈদিক গান (সামগান) বিশেষ করে গান্ধারগ্রামেই গাওয়া হত। কিন্তু এমতের যুক্তিযুক্ত কোনো কারণ এখনো পর্যন্ত আমরা পাইনি। মনে হয় আধারগ্রাম (basic ancient scale) হিসাবে ষড়্‌জগ্রামই অধিকতম প্রাচীন ও সামগানের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। বৈদিক যুগে গ্রামগুলির স্বর-সমাবেশ ছিল অবরোহণ-গতিতে।

'Whereas in the present day musicology and music we do not recognize any grāmas, it is well-known that in ancient musicology they had three standard scales: Sā-grāma, Mā-grāma and Gā-grāma. The last was obsolete even in the time of Bharata. * * * The oldest defined scale that we know of is that of Saman chant and it closely corresponds to Sā-grāma. Hence it is safe to assume that this grāma is the oldest of the three and the other two are later development.' —B. Chaitanya Deva: *Drone in Indian Music* (The Journal of Music Academy, Madras, Vol. XXIII, pts, I-IV., 1952).

রথন্তর ও বৃহদ্ সাম দুটির পরিচয়-প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে রথন্তরসামে স্বরস্তোভ ছাড়া তিনটি ঋকেরও গান করা হত। রথন্তর বৃহদ্‌সাম থেকে প্রাচীন। তবে দুটির মধ্যে মিলও যথেষ্ট, পার্থক্য কেবল শব্দ প্রয়োগ বা স্বরোচ্চারণে। যেমন বৃহদ্‌সামে যেখানে 'ইরা' উচ্চারিত হত, রথন্তরে সেখানে বলা হত 'ইড়া'। সামবেদভাষ্যোপ-ক্রমণিকায় ও পঞ্চবিংশ বা তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে এ দুটি সামের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আছে।

[বেদভাষ্য ভূমিকা সংগ্রহ (সায়ণাচার্য টীকা সংগ্রহ); সম্পাদনা: বলদেব উপাধ্যায়; কালী সংস্কৃত সিরিজ নং ১০২; বারাণসী; ১৯৮৫ পৃ. ৩৭-৩৯; Pañcavimśa-Brāhmaṇa Kaland pp. 145-152]

সায়ন বলেছেন অতিদেশের স্বরূপ নিশ্চয় করে বলেই 'রথন্তর'—শব্দের সার্থকতা। বামদেব্যসাম পাঠ করা হোক এ-ধরণের নির্দেশ থাকলেও তার পরিবর্তে রথন্তরসাম গান করা হত। এরই নাম অতিদেশ। রথন্তর ও বৃহদ্ এ-দুটি সাম গান হিসাবে তাই পরিচিত ছিল।

মহাভারতের যুগে এ-দুটি সামের বিশেষ প্রচলন ছিল বোঝা যায়। মহাভারতকার বলেছেন পবিত্রচেতা সামগ প্রভৃতি ঋত্বিক্‌রা যজ্ঞবেদীর চতুর্দিকে বসে রথন্তর ও বৃহদ্‌সাম গান করতেন—

'রথন্তরং যচ্চ বৃহচ্চ গীয়তে,
যত্র বেদিঃ পুণ্যজনৈর্বৃতা চ'।

তাঁরা স্বর ও অক্ষর প্রয়োগে বিশেষজ্ঞ ছিলেনঃ 'শিক্ষাক্ষরবিশেষজ্ঞঃ' এবং স্তুতিস্তোম, গ্রহস্তোম বেদের পদ ও ক্রম সম্বন্ধে সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁরা বিবিধ লক্ষণ, স্তোভ ও নিরুক্তের প্রয়োগ বিশেষভাবে জানতেন। ওঙ্কার ও গায়ত্রী প্রভৃতি বৈদিক ছন্দের নিগ্রহ ও প্রগ্রহ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

ঋগ্‌বেদো'থর্ববেদশ্চ পদক্রমবিভূষিতঃ
লক্ষণানি স্বরাস্তোভানিরুক্তাঃ স্বরপঙ্‌ক্তয়ঃ॥
ওঙ্কারশ্ছন্দশং নেত্রং নিগ্রহপ্রগ্রহৌ তথা।

[মহাভারত (নির্ণয়সাগর প্রেস), ১৩.১৩২.৪-৫; মহা (k) ১৩.৮৫.৯০-৯১; (হরি) ১৩.৭৪.৮৮-৮৯]

□ সায়ন বলেছেন—'স্তোমঃ স্তবনাৎ'—স্তুতিগানই স্তোম। স্তুতিস্তোম স্তুতিগানেরই নামান্তর। সায়ন তাঁর ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন—

'গানেন সংস্কৃতৈ ঋগাক্ষরৈঃ স্তুতিসম্ভবাৎ'।

[Pañcavimśa-Brāhmaṇa pp. 145-152*]*

স্তুতিস্তোম-গ্রহস্তোম-পদ-ক্রম-বিভাগবিৎ।

* * *

শিক্ষাক্ষরবিশেষজ্ঞঃ পুরাকল্পবিশেষবিৎ॥

* * *

নৃত্তগান্ধর্ববেদী চ সর্বস্যাপ্রতিমস্তথা॥

[মহা (Critical Edition) Appendix ২য় অধ্যায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩৬৬]

□ সাম, স্তুতি, স্তোত্র ও গাথা প্রভৃতি গানের তখন যথেষ্ট প্রচলন ছিল। মহাভারতকার উল্লেখ করেছেন,

(১) গাথামপ্যত্র গায়ন্তি * *।

(২) গীতৈশ্চ স্তুতিসংযুক্তৈঃ * *।

(৩) সামানি স্তুতিগীতানি গাথাশ্চ বিবিধা অপি।

(৪) সামানি গায়ন্ যাম্যানি * *।

(৫) গায়ন্তি গাথা গন্ধর্বাং * *।

(৬) সামানি সামগাস্তস্য গায়ন্তি যমসাদনে।
হবির্ধানং তু তস্যাহুঃ পরেষাং বাহিনীসুখম্॥

[মহা (k) ২.৪১.৩৯; ১.২১২.৮; ২.১১.৩৫; ২.৮০.২২; ৫.১০৯.৯; ১২.৯৮.২৩; (হরি) ২.৪০.৪০; ১.২০৫.৮; ২.১১.৩৪; ২.৭৭.২২; ৫.১০১.৯; ১২.৯৫.৫০]

□ বিহিত মন্ত্রবিশেষের নাম 'গাথা': 'বিহিতা মন্ত্রবিশেষাগাথাঃ'। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৫/১/৮/২) আছে— 'যমগাথাভিঃ পরিগায়তি'। কল্যাণবাচক বা আশীর্বাচক স্তুতিগানের নামও গাথা। টীকাকার কল্লিনাথ অশ্বমেধ-প্রকরণে ধর্মসাধনমূলক মঙ্গলগানের উদ্দেশ্যে গাথা-শব্দের প্রমাণ দিয়েছেন দেখা যায়: 'ব্রাহ্মণৌ বীণাগাথিনৌ গায়ত * * ইতি শ্রুতের্দেবার্চনাদিষু গীতাদেস্তদঙ্গত্বেন পরিগ্রহাচ্চ সিদ্ধম্'। বৈদিক স্তুতি, স্তোম, গাথা প্রভৃতি সামগানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সায়নও উল্লেখ করেছেন বিচিত্র প্রকারে সামগান গাওয়া হত। তাদের রূপও ছিল বিভিন্ন রকমের ও সেগুলি দেবতাদের স্তুতির উদ্দেশ্যেই গাওয়া হত। রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে সামাজিক পরিবেশ, কার্যকলাপ ও মানুষের রুচির অনেক পরিবর্তন হলেও গানে পবিত্র ও অধ্যাত্ম ভাবের কোনো বৈলক্ষণ্য ছিল না। তবে গায়কেরা দেবতাদের গাথা ও স্তুতিগানের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাপালক ধার্মিক রাজাদেরও পুণ্যকার্য ও শৌর্য্য-বীর্য্যের প্রশংসাসূচক স্তুতিগান বা গাথাগান গাইত। নৃত্য গীত বাদ্যও তখন পার্থিব ও অপার্থিব এই উভয় ব্যাপারে নিয়োজিত হত। সঙ্গীত-রত্নাকরের 'ধর্মার্থকামমোক্ষাণাম্' প্রভৃতি শ্লোকটির টীকায় কল্লিনাথ এসম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেছেন:

'* * ইতি শ্রুতের্দেবার্চনাদিষু
গীতাদেস্তদঙ্গত্বেন পরিগ্রহাচ্চ সিদ্ধম্।
অর্থসাধনত্বং লোকতো দৃষ্টম্।
কামসাধনত্বং তু * *। মোক্ষসাধনত্বং চ * *।'

সিংহভূপাল উল্লেখ করেছেন ধর্ম ও মোক্ষসাধনের মতো উপজীবিকার সাধন হিসাবেও গান তথা সঙ্গীতকে লোকে ক্রমশঃ গ্রহণ করেছিল: 'গীতোপজীবিনামর্থসাধনম্'। আর তারি জন্য রামায়ণ ও মহাভারতাদিতে দেখা যায় পুরাণবিদ্, আখ্যানবিদ্, নট, নটী, বৈতালিক, বন্দী, সূত, মাগধ, পাণিবাদক, গন্ধর্ব, অপ্সরা, কিন্নর প্রভৃতিরা দেবতা, রাজা, যুদ্ধবীরগণের বা বংশের স্তুতিগান করছে। যেমন—

(১) গীতবাদিত্রকুশলাঃ শম্যাতালবিশারদাঃ।
প্রমাণে চ লয়ে স্থানে কিন্নরাশ্চ কৃতাশ্রমাঃ॥
তে চোদিতাস্তুম্বুরুণা গন্ধর্বাঃ কিন্নরৈঃ সহ।
দিব্যগানেষু গায়ন্তি গাথাদিব্যাশ্চ ভারত॥
শম্যাতালেষু কুশলাঃ গীতবাদ্যবিশারদাঃ।

* * *

দিবীব দেবা দেবেন্দ্রঃ যুধিষ্ঠিরমুপাসতে॥

(২) নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ ভাবৈশ্চ বিবিধৈরপি।
রময়ন্তি মহাত্মানং দেবরাজং শতক্রতুম্॥

(৩) বন্দিপ্রবাদাঃ পণবাদিকাশ্চ তথৈব
বাদ্যানি চ বংশশব্দাঃ।
সকাংস্যতালং মধুরং চ গীতং,
আদায় নার্যো নগরান্নিরীয়ুঃ॥

(৪) গায়নাখ্যানশীলাশ্চ নটা বৈতালিকাস্তথা।
স্তবন্তস্তানুপাতষ্ঠন্ সূতাশ্চ সহ মাগধৈঃ॥

(৫) অত্র গাথা ব্রহ্মগীতাঃ কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ।

(৬) ততঃ পুণ্যাহঘোষেণ আশীর্বাদস্বনেন চ।
সূত-মাগধ-বন্দীনাং সংস্তবৈর্গীতমঙ্গলৈঃ॥

(৭) পঠন্তি পাণিধ্বনিকা মাগধাঃ স্তবগায়কাঃ।
বৈতালিকাশ্চ সূতাশ্চ স্তবন্তি পুরুষভম্॥
নর্তকাশ্চাপি নৃত্যন্তি গান্দি গীতানি গায়কাঃ।
কুরুবংশস্তবার্থানি মধুরং রক্তকণ্ঠিনঃ॥

(৮) সংস্তূয়মানঃ সূতৈশ্চ বন্দ্যমানশ্চ বন্দিভিঃ।
উদ্‌গীয়মানো গন্ধর্বৈঃ * *।

(৯) সূতাঃ স্তুতিপুরাণজ্ঞা রক্তকণ্ঠাঃ সুশিক্ষিতাঃ।
* * *
পঠন্তি পাণিস্বনিনো গাথা গায়ন্তি গায়কাঃ।
* * *
ততো যুধিষ্ঠিরস্যাপি রাজ্ঞো মঙ্গলসংযুতাঃ।
উচ্চৈরুর্মধুরা বাচো গীতবাদিত্রবৃংহিতাঃ॥

শার্ঙ্গদেব (১৩শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) সঙ্গীত-রত্নাকরে গাথার পরবর্তী প্রবন্ধরূপের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

আর্যৈব প্রাকৃতে গেয়া স্যাৎ পঞ্চচরণাথ বা॥
ত্রিপদী ষট্‌পদী গাথেত্যপরে সূরয়ো জগুঃ।

[মহা (k) ২.৪.৩৮-৩৯; ২.৭.২৪-২৫; ৪.৭২.২৯; ১২.১৩৬.১; ৭.৭.৮; ৭.৮২.২-৪, ২৮; (হরি) ২.৪.১৫; ২.৭.২৪-২৫; ৪.৬৭.২৮; ১২.১৩২.১; ৭.৪.৪২; ৭.৭২.২-৩, ২৮; (নির্ণয় সাগর) ৪.৬৯.৩৪]

□ আর্যার মতো লক্ষণযুক্ত হলে প্রাকৃতপদে গাথা গান করা হয়। আর্যার পদ সংস্কৃতে রচিত। তার পদের শেষে ষড়্‌জাদি স্বর থাকে। আর্যার প্রথমার্ধ দু-বার ও উত্তরার্ধ কিছুটা গান করা হয়। প্রথমার্ধ উদ্‌গ্রাহ ও উত্তরার্ধ বা দ্বিতীয়ার্ধ ধ্রুবধাতু। আভোগে গায়ক ও নিয়ন্তার নাম যুক্ত থাকে। আর্যা-প্রবন্ধের মতো গাথা-প্রবন্ধ সংস্কৃতের পরিবর্তে প্রাকৃতপদে গান করা হয়। গাথা সম্বন্ধে মতান্তরও আছে: গাথা কারু কারু মতে তিনটি অথবা ছ-টি পদযুক্ত হয়। মহাভারতের যুগে গাথার রূপ কি ধরণের ছিল তা নির্ণয় করা দুরূহ, কিন্তু শার্ঙ্গদেব গাথার যে সংস্কৃত প্রবন্ধ-রূপের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রাচীনকে অনুসরণ করে রচিত বলে মনে হয়। মহাভারতে 'দিব্যগান' ও 'দিব্যগাথা'—গান ও গাথাকে আবার পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দিব্যগান অর্থে গান্ধর্ব বা মার্গসঙ্গীত।

□ এটা মানতেই হবে যে, বেদের মধ্যে যে সামগীত শুরু হয়েছিল, তার সবচেয়ে বড়ো ভিত্তি এবং উপাদান হল ছন্দ। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী এই সব স্বতোবিভিন্ন ছন্দোবন্ধই যে বিভিন্ন গীতের জন্ম দিয়েছিল, সেই ধারণা কিন্তু দৃঢ় হয়ে ওঠে রামায়ণের কবি বাল্মীকির বক্তব্যে। রামায়ণের কবির হৃদয় তখন স্ফুটনোন্মুখ কমলকলির মতো হয়ে আছে। কোথা থেকে সূর্যের অরুণ-কিরণ-সম্পাত একটু একটু করে ফুটিয়ে তুলবে সেই কমলকলি, শুধু তারই অপেক্ষা। দেবর্ষি নারদের কাছে ততক্ষণে রামকথার সূত্র শোনা হয়ে গেছে তাঁর। কাব্য-নির্মাণ-কাতর কবি এই সময়ে শিষ্য ভরদ্বাজকে নিয়ে তমসা নদীতে স্নান করতে গেছেন। তারই তীরে বিচরণ করতে করতে অকস্মাৎ সেই ক্ষণভঙ্গ ঘটল। ক্রৌঞ্চমিথুনের একতর ব্যাধের বাণাঘাতে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। মহাকবির মুখ দিয়ে উচ্চারিত হল সেই বিখ্যাত 'মা নিষাদ' শ্লোক। শ্লোক উচ্চারণ করে ক্রৌঞ্চবিরহী কবি নিজেই অবাক হয়ে বললেন—এ আমি কী বললাম—

কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া।

শিষ্য ভরদ্বাজের কাছে নিজের বিস্ময়-চমৎকার প্রকাশ করে তিনি বললেন—আমার মুখ দিয়ে এক্ষুণি যা বেরোল, তার চারটি সমানাক্ষরযুক্ত চরণ আছে অর্থাৎ এটি পাদবদ্ধ এবং প্রতিপাদে সমান সংখ্যক অক্ষর-বর্ণ আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, প্রতিপাদে এইরকম এক 'সিমেট্রি' থাকার কারণেই কিন্তু এই অক্ষরগুলিকে নিয়ে গীতের সৃষ্টি হতে পারে এবং সেই গীত তাল-মৃদঙ্গাদি বাদ্যসহযোগে সমকালিক বিরাম বা 'লয়ে'-র সুযোগ দেবে—ফলত আমার শোকার্ত অবস্থায় মুখনির্গত এই অক্ষর শ্লোক বলে কথিত হোক—

পাদবদ্ধো'ক্ষরসম-তন্ত্রী-লয়-সমন্বিতঃ।
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥

এই শ্লোকের 'কতক' নামক বিখ্যাত টীকায় 'তন্ত্রী' শব্দটি ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—তন্ত্রী মানেই এই অক্ষরবদ্ধ শব্দরাশির গীতযোগ্যতা আছে এবং তাতে লয়ও আছে অর্থাৎ তাল-বাদ্যের সঙ্গে হস্ত-পদের সাঙ্কেতিক অভিনয়ও একটা সমকালিক বিরাম লাভ করতে পারে—

তন্ত্রীশব্দেন গীতিযোগ্যতয়া সমন্বিতঃ।
তথা নৃত্য গীতাদিতালাদিযোগ্যতয়া
চ সমন্বিতঃ।
লয়ঃ তালমৃদঙ্গ-হস্ত-পাদাভিনয়ানাং
সমকালবিরামঃ।

বাল্মীকি আশ্রমে ফিরে সেই ক্রৌঞ্চমিথুনের কথাই ভাবছিলেন এবং সেই সময়ে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলেন এবং বাল্মীকি তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে বসালেন বটে, কিন্তু ভিতরে ক্ষোভ সম্বরণ করতে না পেরে পূর্বের ঘটনা ব্রহ্মার কাছে

বর্ণনা আবারও সেই 'মা নিষাদ' শ্লোকটি গান করলেন—

শোচন্নেব পুনঃ ক্রৌঞ্চীমুপশ্লোকমিমং জগৌ।

ব্রহ্মা বাল্মীকির মুখে শ্লোক শুনে সেই ছন্দেই রামায়ণ রচনা করতে বললেন।

[রামায়ণ ১.২.১৫-৩৬; কতক-টীকা দ্রষ্টব্য]

□ বিশিষ্ট সঙ্গীত-গবেষক প্রজ্ঞানানন্দ লিখেছেন—'অযোধ্যাকাণ্ডের ৬৫ সর্গে পাণিবাদক সূত, আশীর্গান ও গাথাগানের উল্লেখ পাই। এখনকার মতো রাময়ণের যুগেও সুরশিল্পীদের 'গায়ক' বলা হত। রামায়ণকার উল্লেখ করেছেন—'গায়কাঃ শ্রুতিশীলাশ্চ নিগদন্ত পৃথক-পৃথক'। টীকাকার 'শ্রুতিশীলাঃ' অর্থে তন্ত্রীনাদ-বিভাজনশীল বলেছেন—'তন্ত্রীনাদবিভাজনশীলা গায়কাঃ'। বীণাদির তার বা তন্ত্রী থেকে ধ্বনিত সুরের যে সূক্ষ্মাদি ভাগ তা সূক্ষ্মস্বর শ্রুতিরই নামান্তর। সাতটি শুদ্ধ স্বরের ব্যবহার রামায়ণের যুগে ছিল, সপ্তকের অন্তর্গত বিভিন্ন সূক্ষ্মস্বর তথা শ্রুতির অস্তিত্বও ছিল সত্য, কিন্তু সেই সূক্ষ্মস্বর শ্রুতির আবিষ্কার (উদ্ভাবন নয়) ও অনুশীলন-রীতির প্রচলন ছিল কিনা সন্দেহ।... কারণ খ্রিস্টীয় শতাব্দীর সূচনায় যখন সাতটি স্বরের মধ্যে মাত্র পাঁচটি শ্রুতির অন্তর্বিকাশ দেখা যায়, তখন রামায়ণের যুগে বাইশ শ্রুতির কল্পনা সৃষ্টি হয়নি বলেই আমাদের ধারণা।

...সুতরাং 'গায়কাঃ শ্রুতিশীলাশ্চ নিগদন্তঃ পৃথক্ পৃথক্' শ্লোকাংশে 'শ্রুতিশীলা' শব্দটি যে সাঙ্গীতিক শ্রবণযোগ্য সূক্ষ্মস্বরের দ্যোতক নয় একথা ঠিক। শ্রুতি অর্থে এখানে বেদ ও এর আভিধানিক অর্থ বাচস্পত্য-অভিধানকার দিয়েছেন—

'শ্রু-কর্মাদৌ-ক্তিন্।

বেদস্য সর্বৈঃ শ্রূয়মাণত্বাৎ শ্রুতিত্বম্।'

সুতরাং শ্রতিশীল অর্থে বেদজ্ঞ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ এই অর্থ করলে শ্লোকাংশের সংগতিও থাকে যে গায়কগণ ও বেদজ্ঞ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরা পৃথক পৃথক ভাবে রাজার স্তুতিগান করেছিলেন—

'রাজানাং স্তবতাং তেষাম্'।

এই স্তুতিগানের আবার রূপভেদ ছিল। সূত ও ভাট জাতীয় ব্রাহ্মণেরা রাজাদের পূর্ব-কীর্তিকলাপের কথা অবলম্বন করে মুখে মুখে গান রচনা করে গাইত—

'অপদানানুদাহৃত্য পানিবাদান্যবাদয়ন্'।

টীকাকার উল্লেখ করেছেন—

'রাজ্ঞা বৃত্তাঙ্ভূতকর্মানুদাহৃত্য
তদনুগতং পানিবাদান্যবাদয়ন্'।

সূত ও ভাটজাতীয় পানিবাদকেরা (হাততালি দিয়ে যারা গান করত) সমাজে একরকম পতিত ব্রাহ্মণ হিসাবে গণ্য ছিল। অবশ্য তারা রাজাদের কাছ থেকে বৃত্তি পেত ও তাদের কাজই ছিল স্তুতিগান করা। তাদের গানে সুর ও তাল অটুট থাকত। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে আশীর্গান ও গাথা গান করতেন। রাজাদের গৌরবময় ও পুণ্য চরিত্র-বর্ণনাসূচক গানও গাথা ও আশীর্গান শ্রেণীভুক্ত ছিল—

'গাথানাং কেবলগায়কানামাশীর্গেয়মা-
শীর্বাদ প্রধানং গানম্।
যদ্বা গাথা রাজ্ঞাং চরিত্রাদি প্রতিপাদিকা-
স্তাসামাশীর্বাদঘটিতং গানমিত্যর্থঃ'।

এই আশীর্বাদসূচক মাঙ্গলিক তথা আভ্যুদয়িক গানই গান্ধর্ব। ভরত নাট্যশাস্ত্রে ধ্রুবাগানের প্রসঙ্গে ঋক্, পাণিকা, গাথা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন—'যা ঋচঃ পাণিকা গাথা *(৩২/২)*। এগুলি ছন্দযুক্ত হয়ে জয়, স্তুতি, আশীর্বাদ অর্থে গীত হয়। যেমন—

বিধানং ছন্দসামেষাং ময়া পূর্বমুদাহৃতম্।
জয়াশীর্বাদযুক্তানি কার্যাণ্যেতানি দৈবতে॥
ঋগ্‌গাথাপণিকা হ্যেষাং বোদ্ধব্যাস্তু প্রমাণতঃ॥

[নাট্যশাস্ত্র ৩২/৪১৫-১৬]

□ এই ঋক্, গাথা, পাণিকা প্রভৃতি আভ্যুদয়িক গান অঙ্গযুক্ত তথা সপ্তাঙ্গযুক্ত হলেই 'ধ্রুব'। নামে অভিহিত হয় ও ধ্রুবাগান গান্ধর্বেরই অন্তর্ভুক্তঃ 'গান্ধর্বমেতৎ' *(৩২/৪৮৪)*।

ধ্রুবাবিধানঞ্চ ময়া স্বরতালপদাত্মকম্॥
গান্ধর্বমেতৎ কথিতং ময়া হি পূর্বং
যদুক্তং ত্বিহ নারদেন।

এই গান্ধর্বই গেয় বা গান। এর সঙ্গে বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গাদির সমাবেশ থাকত। শিক্ষাকার নারদ গান্ধর্বের আভিধানিক অর্থের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

গেতি গেয়ং বিদুঃ প্রাজ্ঞা ধেতি কারুপ্রবাদনম্।
বেতি বাদ্যস্য সংজ্ঞেয়ং গান্ধর্বস্য বিরোচনম্॥

গানের সঙ্গে বেণু বা বাঁশীর সহযোগ অপরিহার্য ছিল। আর বাদ্য অর্থে বেণু বা

মৃদঙ্গাদিকেও ধরা যায়। রামায়ণে আশীর্গানের বা গাথার সঙ্গে বেণুর পরিবর্তে বীণার উল্লেখ দেখা যায়—'বীণানাং চাপি নিঃস্বনাঃ'। সুতরাং গাথা ও আশীর্বাদসূচক গানও তখনকার (রামায়ণের) সমাজে গান্ধর্ব-শ্রেণীভুক্ত ছিল। গায়ক ও বাদকরাও যাতে শ্রীসম্পন্ন ও সুবেশিত হত তার দিকে লক্ষ্য রাখা হত— 'রূপলক্ষণসংপন্নৌ' *(৩/৪/১১)*। গানের সুর যাতে বাদ্যযন্ত্রকে অনুসরণ করে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে রামায়ণে তারও উপদেশ দেওয়া হয়েছে— 'তন্ত্রীগীতসমাকীর্ণং সমতালপদাক্ষরম্' *(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ৩৩/২১)*। শিল্পীকে বলা হত 'গায়ক'—'কদাচিত্তত্র গায়কৌ' *(১/৪/২৭)* ও গানকে বলা হত 'গেয়'। 'পাঠ্যে গেয়ে' *(১/৪/৮)* অথবা 'গায়তাং মধুরং গেয়ম্' *(উত্তরাকাণ্ড, ৯৩/১৫)*। রামায়ণে বাদ্যযন্ত্রকে বলা হয়েছে 'আতোদ্য'—'আতোদ্যানি বিচিত্রানি' *(সুন্দরকাণ্ড, ১০/৪৯)*। বীণাকে বলা হয়েছে 'তন্ত্রী': 'তন্ত্রীলয়সমন্বিতম' *(বালকাণ্ড, ৪/৮)*। বাদ্যযন্ত্রকে বাদিত্রও বলা হয়েছে: 'বাদিত্রাণি চ সর্বাণি' *(অযোধ্যাকাণ্ড, ১৫/১২)*। এখানে এটাই বলা ঠিক হবে যে, রামায়ণ মহাকাব্যটির সৃষ্টিই হয়েছিল গান করার জন্য। রামায়ণের উত্তরকালে বাল্মীকি আদিকবি তাঁরই আশ্রমে বেড়ে-ওঠা রামচন্দ্রের দুই পুত্র লব-কুশকে নিয়ে যখন রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ দর্শন করতে গেলেন, তখন কুশ-লব দুই শিষ্যকে তিনি আদেশ দিলেন যেন তারা ঋষিদের বসতি স্থানে, ব্রাহ্মণদের পাড়ায়, রাস্তায়, রাজপথে, এমনকী রামচন্দ্রের রাজগৃহের সামনে গিয়ে এবং তাঁর যজ্ঞশালায় ঋত্বিক পুরোহিতদের সামনেও সম্পূর্ণ রামায়ণ গান করে। মহর্ষি বাল্মীকি এটাও বললেন—যদি মহারাজ রামচন্দ্র সভায় আসীন ঋষিদের সামনে তোমাদের রামায়ণ গান করতে ডাকেন, তাহলে তোমরা নির্ভয় চিত্তে সেখানে রামায়ণ-সঙ্গীত পরিবেশন করবে এবং তা করবে যেমনটি আমি শিখিয়ে দিয়েছি তেমন করেই—

ঋষিবাটেষু পুণ্যেষু ব্রাহ্মণাবসথেষু চ।
রথ্যাসু রাজমার্গেষু পার্থিবানাং গৃহেষু চ॥
রামস্য ভবনদ্বারি যত্র কর্ম চ কুর্বতে।
ঋত্বিজামগ্রতশ্চৈব তত্র গেয়ং বিশেষতঃ॥
ইমানি চ ফলান্যত্র স্বাদূনি বিবিধানি চ।
জাতানি পর্বতাগ্রেষু আস্বাদ্যাস্বাদ্য গায়তাম্॥
যদি শব্দাপয়েদ্রামঃ শ্রবণায় মহীপতিঃ।
ঋষীণামুপবিষ্টানাং যথাযোগং প্রবর্ততাম্॥

বাল্মীকি তাঁর দুই শিষ্য লব এবং কুশকে শুধুমাত্র 'যথাযোগম্' অর্থাৎ যেমনটা শিখিয়েছেন, তেমন গাইতে বলেই থামেননি। তিনি বলেছেন —রামচন্দ্রের সামনে যখন গান গাইবে তখন এই বীণার তন্ত্রীগুলিতে মধুর তান তুলবে আর তোমাদের গানের স্বরগুলিতে সেই বীণাতন্ত্রীর মূর্ছনা যুক্ত করবে—

ইমাস্তন্ত্রীঃ সুমধুরা স্থানং বাপূর্বদর্শনম্।
মূর্চ্ছয়িত্বা সুমধুরং গীয়তাং বিগতজ্বরৌ॥

লব-কুশের গান শুনে রামচন্দ্র তাঁদের ডাকিয়ে আনলেন রাজসভায় এবং এই দুই কিশোরের গান কেমন হচ্ছে, সেটা পরীক্ষা করার জন্য এবং পছন্দ করার জন্য রামচন্দ্র আরও যাঁদের ডাকিয়ে আনলেন সভায়, তাঁরা হলেন পৌরাণিক, ছন্দ এবং পদশাস্ত্র জানেন এমন শব্দবিদ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, স্বর-ষড়্জের লক্ষণ জানেন এমন গন্ধর্ব শুধু, গান শুনতে উৎসুক এমন ব্রাহ্মণ এবং স্বরগ্রামে অভিজ্ঞ শব্দনিপুণ লোকেরা এবং একত্রে নৃত্য-গীতে পটু মানুষ—

পার্থিবাংশ্চ নরব্যাঘ্র পণ্ডিতান্নৈগমাংস্তথা॥
পৌরাণিকান্ শব্দবিদো যে বৃদ্ধাশ্চ দ্বিজাতয়ঃ।
স্বরাণাং লক্ষণজ্ঞাংশ্চ উৎসুকান্ দ্বিজসত্তমন্॥
লক্ষণজ্ঞাংশ্চ গন্ধর্বান্ নৈগমাংশ্চ বিশেষতঃ।
পাদাক্ষরসমসজ্ঞাংচ্ছন্দঃসু পরিনিষ্ঠিতান্॥
কলামাত্রা-বিশেষজ্ঞান্ জ্যোতিষে চ পরং গতান্।
চিত্রজ্ঞান্ বৃত্তসূত্রজ্ঞান্ গীত নৃত্যবিশারদান্॥

লব-কুশ রামায়ণের বিশ-বিশটা সর্গ এককে বারে গাওয়া আরম্ভ করতেই রামচন্দ্র আঠেরো হাজার স্বর্ণমুদ্রা তাঁদের হাতে তুলে দিতে বললেন লক্ষ্মণকে। তাঁরা এক পয়সাও নিলেন না, কিন্তু রামচন্দ্র সপার্ষদ পুরো রামায়ণ-গীত শুনলেন এবং সেই গীত-শ্রবণের একশ্লোকী বর্ণনা হল— রামচন্দ্র কুশ-লবের সেই গান শুনে খুব খুশি হলেন এবং সেই গীত-মাধুর্য্য তৈরি হওয়ার কারণ কিন্তু গীতের উপকরণগুলির সার্থক ব্যবহার। এখানে যেমন ছন্দের অসামান্য একটা ভিত্তির ওপর এই গান সুসজ্জিত, পাশাপাশি রামচন্দ্র যেটাতে খুশি হয়েছেন, সেটা হল—এই গীতের মধ্যে তাল-লয় এবং স্বরগ্রাম সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্ত হয়েছে,

তার মধ্যে বীণার তন্ত্রীশব্দ, লয়, এবং সুরের ব্যঞ্জনাও রয়েছে—

শুশ্রাব তত্তাল-লয়োপপন্নং
সর্গান্বিতং সুস্বরশব্দযুক্তম্।
তন্ত্রী-লয়-ব্যঞ্জন-যোগযুক্তং
কুশীলবাভ্যাং পরিগীয়মানম্॥

[রামায়ণ ৭.১০৬.৫-১৩; ৭.১০৭.৪-১০, ৩১]

□ মহাকাব্য হলেও রামায়ণের মধ্যে গীতের সমস্ত উপকরণ আছে বলেই রামায়ণের মধ্যে গীত এবং সঙ্গীতের কথাপ্রসঙ্গ বারবার এসেছে। সকালবেলায় রাজরাজড়াদের ঘুম ভাঙত গীতবাদ্যের শব্দে—এটা যখন রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্রের অভ্যাস ছিল বলে বলা হচ্ছে, তখন এটা বোঝা যায় যে, সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা সেই কালে কোথায় পৌঁছে ছিল। বনবাসী রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নেবার জন্য ভরত যখন নিষাদ গুহের রাজ্যে প্রবেশ করেছেন, সেখানে গুহক ভরতকে রামচন্দ্রের ব্যবহৃত তৃণশয্যার আস্তরণখানি দেখিয়েছিলেন। ভরত সেটা দেখে বিপ্রতীপে রামচন্দ্রের পূর্বাভ্যাস স্মরণ করে কষ্ট পাচ্ছেন। ভরত বলছেন—সারা রাত মহার্ঘ্য শয্যায় শুয়ে ঘুম থেকে ওঠার সময় রামচন্দ্রের ঘুম ভাঙত গীত-বাদ্যের নিঃস্বনে—

গীত-বাদিত্র-নির্ঘোষৈ-র্বরাভরণ-নিঃস্বনৈঃ।
মৃদঙ্গ-বরশব্দৈশ্চ সততং প্রতিবোধিতঃ॥

আমরা এই উক্তি থেকে বুঝি যে, রামচন্দ্রের কালেই নয়, অন্যকালেও রাজা-রাজড়া এবং ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির এই অভ্যাস ছিল। আমরা পরবর্তী কালে মহাকবি ভারবির লেখায়—ইন্দ্রপ্রস্থে পূর্বসমাসীন রাজা যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে দ্রৌপদীর মুখে বলতে শুনেছি যে, তাঁরও সকাল বেলায় ঘুম ভাঙত স্তুতি-গীতের মাঙ্গলিক শব্দে—

পুরাধিরূঢ় শয়নং মহাধনং
বিবোধ্যসে যঃ স্তুতি-গীত-মঙ্গলৈঃ।

[রামায়ণ ২.৮৮.৮;
কিরাতার্জুনীয়ম্ (দুর্গাপ্রসাদ এবং পরব) ১.৩৮]

□ রামায়ণে বর্ণিত যে কোনো বড়ো উৎসবই হোক—সেটা বিবাহের হতে পারে, জন্মোৎসবের, অথবা রাজ্যাভিষেকেরও হতে পারে, কিন্তু সব জায়গায় এটা একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য যে, এই সমস্ত বৃহৎ উৎসবে গন্ধর্বরা গান গাইছেন আর অপ্সরারা নৃত্য করছেন, সেই গীত-নৃত্যের সঙ্গে বাদ্যেরও সংযোগ আছে। রামায়ণে চার ভাইয়ের বিয়ের সময় গন্ধর্বদের গীতবাদ্য এবং অপ্সরাদের নাচের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে—

পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদন্তরিক্ষাৎ সুভাস্বরা।
দিব্যদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ॥
ননৃতুশ্চাপ্সরঃসঙ্ঘা গন্ধর্বাশ্চ জগুঃ কলম্।
বিবাহে রঘুমুখ্যানাং তদদ্ভুত মদৃশ্যত॥

রামচন্দ্রের অভিষেকের ঘটনা পরে কৈকেয়ীর তাড়নায় ব্যর্থ হয়ে যাবে ভবিষ্যতে, কিন্তু দশরথ যখন অভিষেক ঘোষণা করেছিলেন, তখন রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক ঘটবে, এই উত্তেজনায় লোকেরা রাত জেগে রাস্তা সাজাল, এবং সেই রাস্তায় বেরিয়ে গান গাইতে লাগলেন নট-নর্তক সংঘের পেশাদার গায়কেরা—

নট-নর্তক-সংঘানাং গায়কানাঞ্চ গায়তাম্।
মনঃকর্ণসুধা বাচঃ শুশ্রাব জনতা ততঃ॥

[রামায়ণ ১.৭৩.৩৭-৩৮; ২.৬.১৪]

□ অযোধ্যা কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কায় রামায়ণের যুগে সকল ক্ষেত্রেই সঙ্গীতের অনুশীলন ছিল অপ্রতিহত। সে যুগে সমাজের সকল অনুষ্ঠানেই সঙ্গীতের অনুশীলন ছিল অব্যাহত। নিদ্রা থেকে জাগ্রত করায়, আরাধনায়, যুদ্ধাভিযানে, অভিসারে, উৎসবে শবানুগমনে, শিকারকার্যে, যুদ্ধযাত্রায়—সকল আয়োজনেই নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমাবেশ দেখা যায়। স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ, স্তাবক বন্দী, যোদ্ধা সকলেই ছিল সঙ্গীতের অনুরাগী। তার কারণ মনে হয় তখনকার দেশনায়ক ও নৃপতিরা ছিলেন সঙ্গীতের একান্ত পৃষ্ঠপোষক। নর্তক, গায়ক, নট, শৈলূষ, দেবদাসী সকলেরই রাজ-দরবারে ও সমাজে ছিল সমাদর। অযোধ্যাকাণ্ডে দেখা যায় পরিশ্রান্ত ভরত নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাটকে আনন্দ লাভ করছেন,

আয়াসং বিনয়িষ্যন্তঃ সভায়াং চকিরে কথাঃ॥
বাদয়ন্তি তদা শান্তিং লাসয়ন্ত্যপি চাপরে।
নাটকান্যপরে স্মাহুর্হাস্যানি বিবিধানি চ॥
স তৈর্মহাত্মা ভরতং সখিভিঃ প্রিয়বেধিভিঃ।

রাজা যে রাজ্যের নট, গায়ক, নর্তক ও উৎসবকারীদের রক্ষক ও উৎসাহদাতা, তাঁর অভাবে রাজ্য শ্রীহীন হয় একথা রামায়ণকার অযোধ্যাকাণ্ডের ৬৭ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। রাজা দশরথের

মৃত্যুর পর একজন ন্যায়বান ও সর্বপ্রতিপালক নৃপতিকে নির্বাচন করার জন্য অমাত্যেরা সমবেতভাবে ঋষি বশিষ্ঠকে অনুরোধ জানালেন। একজন গুণবান ও গুণগ্রাহী নৃপতি নির্বাচনের পক্ষে তাঁরা যতগুলি কারণ দেখিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একটি হল রাজাবিহীন রাজ্যে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নৃত্য, নাটক, উৎসব ও সমাজ কোনোটাই পরিপুষ্টি লাভ করতে পারে নাঃ

নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টনটনর্তকাঃ।
উৎসবাশ্চ সমাজাশ্চ বর্ধন্তে রাষ্ট্রবর্ধনাঃ॥

মোটকথা তখনকার সময়ে নৃত্য, গীত ও বাদ্য-বিরহিত কোনো রাজ্যের কল্পনাই করা যেত না। তাই দশরথের মৃত্যু-সংবাদের কথা না জেনে ভরত অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করে যখন দেখলেন মৃদঙ্গ, বীণা, ভেরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার ও শব্দ স্তব্ধ, কোনো স্থানেই সঙ্গীতের লেশমাত্র নাই তখন বুঝলেন নিশ্চয়ই কোনো অমঙ্গল ঘটেছে—

ভেরীমৃদঙ্গবীণানাং কোণসংঘট্টিতঃ পুনঃ।
কিমদ্য শব্দো বিরতঃ সদাদীনগতিঃ পুরা॥

এ থেকে বোঝা যায় প্রাচীন ভারতীয় সমাজ সঙ্গীতকে কি শ্রদ্ধার আসনই না দিয়েছিল। তখন শুদ্ধ-জাতিরাগের ব্যবহার ছিল ও তাদের স্বর-রূপ আমরা নাট্যশাস্ত্র থেকে জানতে পারি। বীণায় ও মনুষ্য-কণ্ঠে রাগ মূর্ছনা, তান, লয়, রস প্রভৃতির সমাবেশ নিয়ে প্রকাশিত হত ও সেই গায়কীভঙ্গি ও বাদনপ্রণালীর যে একটি পরিস্ফুট রূপ ও ধারা ছিল, মানুষের মনে যে গান সুরের নক্সা সৃষ্টি করে রস ও আনন্দানুভূতির স্বতঃফূর্ত ধারাকে অব্যাহত রেখেছিল, নাটকে, নৃত্যে ও বিভিন্ন রকম বিদ্যার অনুশীলনে, জাতি ও শ্রেণী-নির্বিশেষে।

□ রামায়ণে গীত-বাদ্যের চমৎকার এমন মোহময় পর্যায়ে পৌছেছিল যে, বর্ষাকালে যখন বনের পশু-পাখি এবং কীট-পতঙ্গ একত্রে ডেকে উঠছে, তখন রামায়ণে কবির কাছে সেটা শুধু গীতধ্বনি বা গানমাত্র নয়, সেটা সঙ্গীত, 'কনসার্ট', নৃত্য-গীত-বাদ্যের এর সমাহার। মেঘের শব্দ এখানে মৃদঙ্গ, ভ্রমরের ধ্বনি বীণার তন্ত্রীশব্দ বা বীণার তান। আর ভেকসমূহের উচ্চারিত অবিরাম শব্দ এই সঙ্গীতের কণ্ঠতাল—একত্রে এই সব শব্দ শুনে মনে হচ্ছে যেন বনের মধ্যে সঙ্গীত আরম্ভ হয়েছে—

ষট্‌পাদ-তন্ত্রী-মধুরাভিধানং
প্লবঙ্গমোদীরিত-কণ্ঠতালম্।
আবিষ্কৃতং মেঘ-মৃদঙ্গ-নাদৈ
র্বনেষু সঙ্গীতমিব প্রবৃত্তম্।

এই বনের মধ্যেই কোনো কোনো জায়গায় ময়ূরেরা নাচছে। তাদের লম্বিত পুচ্ছগুলি বিভূষণের মতো, কোথাও কোথাও তাদের সু-উচ্চ কেকাধ্বনি শোনা যাচ্ছে, আবার কোথাও বা তারা গাছের সামনে শরীর সংলগ্ন করে আছে বলেই সেখানে নৃত্যের আবহ তৈরী হচ্ছে সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে যেন বনের মধ্যে সঙ্গীত আরম্ভ হয়েছে—

ক্বচিৎ প্রনৃত্যৈঃ ক্বচিদুন্নদদ্ভিঃ
ক্বচিচ্চ বৃক্ষাগ্র-নিষণ্ণকায়ৈঃ।
ব্যালম্ববর্হাভরণৈর্ময়ূরৈ
র্বনেষু সঙ্গীতমিব প্রবৃত্তম্।

[রামায়ণ ৪.২৮.৩৬-৩৭]

□ সঙ্গীতজ্ঞ মনীষী গবেষক প্রজ্ঞানানন্দ রামায়ণের সঙ্গীত-সভ্যতার সঙ্গে মহাভারতের প্রতিতুলনায় লিখেছেন—'রামায়ণের পর মহাভারতের যুগে সঙ্গীত কি ধরনের ছিল তা আলোচনা করলে দেখি সঙ্গীতের বিকাশ ও রূপের যতটুকু সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা রামায়ণে পাই—মহাভারতে তা পাই না। তার কারণ নির্ণয় করা দুরূহ। রামায়ণের চেয়ে মহাভারতের সমাজ ও চিন্তাধারা যে উন্নততর ছিল একথা স্বীকার করা অসঙ্গত নয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদ্ স্বীকার করেন রামায়ণের চেয়ে মহাভারতের সমাজ বেশ বিস্তৃত ও জটিল ছিল। মহাভারতের রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাও যথেষ্ট পরিমাণে সংঘাত ও দুর্যোগপূর্ণ ছিল। কাজেই শিল্পকলার রুচি তখন কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল বলে মনে হয়। তবে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় নিশ্চয়ই রামায়ণের যুগের চেয়ে মহাভারতের সমাজে যথেষ্ট উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত ছিল।

আবার ভারতীয় সভ্যতার উত্থান-পতনের নজির দেখিয়ে অনেকে বলতে চান যে মহাভারতের যুগের চেয়ে রামায়ণের সমাজ ছিল যথেষ্ট উন্নত ও বিকাশশীল, কেননা যুধিষ্ঠিরের রাজধানী হস্তিনাপুর ও অন্যান্য প্রাসাদাদির শিল্প-চাতুর্যে ময়দানবের তথা অনার্য অবদান গৌরবময়

হলেও রামরাজ্য অযোধ্যার শিল্প-সম্পদ ও সংস্কৃতির পাশাপাশি দানব-সভ্যতার চরম নিদর্শন স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী তথা আর্য ও অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমান্তরাল বিকাশ মহাভারতের চেয়ে রামায়ণের যুগেই সম্ভব হয়েছিল। বিশেষ করে বানররাজ বালী ও দানবরাজ সাধক ও শাস্ত্রজ্ঞ রাবণের সুরুচি, সৌজন্য ও সৌন্দর্য্যবোধ অনার্য-প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে ম্লান করেছিল। ক্ষত্রিয় সংস্কৃতির কথার তো তুলনাই নাই। অবশ্য এসব যুক্তি ও তুলনা হল তাঁদের পক্ষে প্রযোজ্য যাঁরা রামায়ণ-মহাকাব্যকে মহাভারতের পরবর্তী রচনা হিসাবে প্রমাণ করতে চান। মহাভারতের পাতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক উপাদান ও কাহিনী মহাভারতকেই রামায়ণের পরবর্তী রচনা হিসাবে সপ্রমাণ করে। ডাঃ উইন্টারনিজ, জেকবী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বিভিন্ন যুক্তি ও প্রমাণের নিদর্শন দিয়ে রামায়ণকেই মহাভারতের চেয়ে প্রাচীন বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ ও মহাভারতের অসংখ্য ঘটনা ও কুশী-লবদের নাম প্রভৃতি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলে রামায়ণ মহাভারতের চেয়ে যে প্রাচীন এটাই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। সামাজিক জটিলতা, যুদ্ধ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে কূটনীতির প্রয়োগ, স্থাপত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও চিন্তাশীলতার পরিচয়, বৃহত্তর পরিকল্পনা ও ধর্মের নিগূঢ় ব্যাখ্যা ও উদারতা প্রভৃতি বিষয়গুলি যে সমাজের পরিচয় দেয় সে (মহাভারতের) সমাজ রামায়ণের সমাজকে পেছনে রেখে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে বলে মনে হয়। রামায়ণের সরল জীবনধারার সন্ধান তখন পাওয়া যায় না। অতিশয় উন্নত হলেও মানব-সভ্যতার বহুল সমস্যাপূর্ণ রূপই প্রমাণ করে মহাভারত যে যুগ ও যে সমাজ-পরিবেশের কথা বর্ণনা করেছে সে যুগ ও সমাজ রামায়ণের পরবর্তী।

নৃত্য-গীত-বাদ্যের সমবেত রূপ যে সঙ্গীত ও এমনকি 'সঙ্গীত' শব্দটিরও উল্লেখ আমরা রামায়ণে পেয়েছি তা আগেই আলোচনা করেছি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে নারদীশিক্ষা, নাট্যশাস্ত্র, দত্তিলম্, বৃহদ্দেশী, সঙ্গীতসময়সার প্রভৃতি খ্রিস্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকের সঙ্গীতগ্রন্থগুলিতে 'সঙ্গীত' শব্দটির ও তার তিনটি উপাদান নৃত্য, গীত ও বাদ্যের একত্র উল্লেখ আমরা পাই না। ত্রৌর্যত্রিকের সুস্পষ্ট উল্লেখ ও পরিচয় পাই একেবারে খ্রিস্টীয় ১৩শ শতাব্দীর গ্রন্থ সঙ্গীত-রত্নাকরে। মহাভারতে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের একত্র সমাবেশ যেমন—'ততো বাদিত্রনৃত্তাভ্যাম * * 'গীতৈশ্চ স্তুতিসংযুক্তৈঃ' *(আদি, ২০০/৯৯)*, 'বাদিত্রাণি চ * * ননৃতুর্নর্তকাশ্চৈব জগুর্গীতানি গায়কাঃ' *(আদি, ২০৬/৪)*, সুনৃত্তগীতবাদিত্রৈঃ' *(আদি, ২০৭/১১৪)*, নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ' *(সভা, ৫/২৪)*, 'বাদিত্রং নৃত্তগীতং' *(সভা, ৮/৩৬)*, 'নৃত্তং গীতং চ বাদ্যং চ চিত্রসেনাদবাপ্নুহি' *(আরণ্য, ৪০/৬)*, 'নৃত্যামি গায়ামি চ বাদয়াম্যহং' *(বিরাট, ৯/১৭)*, 'গীতবাদিত্রসংবাদৈঃ তালনর্তনলাসিতৈঃ' *(দ্রোণ, ৭৪/৩৮)*, 'নৃত্যবাদিত্রগীতানাম্' *(শান্তি, ২৯৭/২৮)*, 'নৃত্তৈর্বাদ্যৈশ্চ গান্ধর্বৈঃ' *(অনুশাসন, ১২৮/৩২৪)*, 'নৃত্যবাদিত্রগীতানি' *(আশ্বমেধিক, ৪০/১৩)* প্রভৃতি।

রামায়ণ ও মহাভারতের সমাজে গান্ধর্ব বা গার্ন্ধবগানেরই প্রচলন ছিল। গান্ধর্ব 'মার্গ' নামেও প্রচলিত ছিল ও রামায়ণে 'মার্গবিধানসংপদা' শব্দগুলি তার প্রমাণ। মার্গ-শব্দটি বৈদিক সামগানের মতো মঙ্গলবাচী ছিল; অর্থাৎ যে গান বা সঙ্গীত আভ্যুদয়িক, অধ্যাত্ম উন্নতিকারক, পবিত্র বা অপার্থিব ছিল তাকেই মার্গ বলা হত। তবে 'মার্গ' অভিধানটি বৈদিক সঙ্গীতের পরবর্তী গান্ধর্বের বিশেষ বোধক 'যো মাগিতো বিরিঞ্চাদ্যৈঃ' শব্দগুলি থেকেই তা বোঝা যায়। শার্ঙ্গদেব বলেছেন এই মাগিত বা অন্বেষিত তথা চারবেদ থেকে সংগৃহীত গানই মার্গঃ 'সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ'। স্মার্ত যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন এই গান্ধর্বগান মুক্তির দিশা দেখায় বলে মার্গঃ 'মোক্ষমার্গে স গচ্ছতি।' গান্ধর্ব তথা মার্গগানের যুগেও নৃত্য, গীত ও বাদ্য বা বাদিত্র অঙ্গগুলির সহযোগে সঙ্গীত পরিপূর্ণভাবে সমাজে বিকশিত ছিল।

মহাভারতে গায়ক, নর্তক, বাদক, দেবদুন্দুভি, অপ্সরাদের নৃত্য-গীত, গাথাগান, শঙ্খ, বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, স্তুতি, স্তোম, তাল, লয়, মূর্ছনা প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু গান্ধর্বগানের রূপ কি রকম ছিল, কোনো কোনো গ্রামে তা লীলায়িত ছিল, কোনো রাগেব সমাবেশ ছিল কিনা, কি রীতিতে বাদ্যযন্ত্র তৈরি করা হত ও তাদের বাজানো হত, গানে কি তাল, কি মূর্ছনার বিকাশ

থাকত, এ সকলের সুনির্দিষ্ট কোনো পরিচয় আমরা পাই না। সেজন্য পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বরং রামায়ণে সাঙ্গীতিক রূপ ও ভাবের কিছুটা উল্লেখ আমরা পাই, কিন্তু মহাভারতে তার যথেষ্ট অভাব আছে। মহাভারতকার তদানীন্তন কালের সমাজ, শিল্প ও সংস্কৃতির নিরাবরণ কাহিনী রচনা করেছেন সত্য, কিন্তু সঙ্গীতের বর্ণনায় বিশেষ কার্পণ্য দেখিয়েছেন।

তখনকার গানে যে লৌকিক ষড়্‌জাদি সাত স্বরের ব্যবহার ছিল একথা অজ্ঞাত নয়। মহাভারতকার আশ্বমেধিক পর্বে এই সাত স্বরের উল্লেখ করে বলেছেন তারা শব্দেরই গুণ— আকাশ তথা বায়ুর সংঘাত থেকে উৎপন্ন। যেমন—

তত্রৈকগুণ আকাশঃ শব্দ ইত্যেব স স্মৃতঃ।
তস্য শব্দস্য বক্ষ্যামি বিস্তরেণ বহূন্ গুণান্॥
ষড়্‌জর্ষভঃ গান্ধারৌ মধ্যমঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ।
অতঃ পরং তু বিজ্ঞেয়ো নিষাদে ধৈবতস্তথা॥
ইষ্টশ্চানিষ্টশব্দশ্চ সংহতঃ প্রতিভানবান্।
এবং বহুবিধো জ্ঞেয়ঃ শব্দ আকাশসম্ভবঃ॥

বৈদিকোত্তর গান্ধর্বগানে যে লৌকিক ষড়্‌জাদি সাত স্বরের প্রবর্তন করা হয়েছিল তা বৈদিক প্রথমাদি সাত স্বরের অনুরূপই হয়েছিল। সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ *(১৪৪৬-৬৫ খ্রী.)* এর উল্লেখ করে বলেছেন—

'তৎ সংগ্রহরূপত্বং চ গীতস্যাপি সপ্তস্বরাত্মকত্বাৎ। সামানি হি ক্রুষ্টপ্রথমদ্বিতীয়-চতুর্থমন্দ্রাতিস্বার্যাখ্যাঃ সপ্ত স্বরাঃ, ইহ তু ত এব যথাযোগ্যং ষড়্‌জাদিব্যপদেশভাজ ইতি। ব্রহ্মণাহ'পি বেদাদুদ্ধৃত্য সংগ্রহণে সার্ববর্ণিকত্বং প্রয়োজনমিতি ভাবঃ।'

বৈদিক যুগে সামগানের পাশাপাশি গ্রাম্য দেশী তথা লোক-সঙ্গীতের প্রচলন অবশ্যই ছিল ও তাতে যে ষড়্‌জাদি সাত স্বরেরই প্রচলন ছিল এতে আর সন্দেহ কি! তবে বিভিন্ন আদিম গানে ও পদ্ধতিতে স্বর-সংখ্যার অবশ্য তারতম্য ছিল।

মহাভারতকার গানকে বলেছেন 'গান্ধর্ব'। তবে তিনি বেশির ভাগ সময়ে 'গীত' শব্দই ব্যবহার করেছেন গান্ধর্বকে লক্ষ্য করে। কোনো কোনো জায়গায় আবার গীত ও গান্ধর্ব এই দুটি শব্দই তিনি পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন দেখা যায়—'রুবন্তি মধুরং গীতং গান্ধর্বস্বনমিশ্রিতম্' *(১/১৫২/৩২)*। তবে গীত বা গান অর্থে যে তিনি গান্ধর্বকে বুঝিয়েছেন একথা স্পষ্টভাবেই জানা যায়; যেমন—'নৃত্তৈর্বাদৈশ্চ গান্ধর্বৈঃ' *(অনুশাসনপর্ব, ১২৮/৩২৪)*। এছাড়া 'গান্ধর্বশাস্ত্রং', 'গীতগন্ধর্বঘোষৈশ্চ'। গান্ধর্ব সঙ্গীতপারগ গন্ধর্বদের প্রিয় ছিল একথা নাট্যশাস্ত্রকার ভরত বলেছেন। মহাভারতকার বলেছেন—

'গন্ধর্বা গীতকুশলা নৃত্তেষু চ বিশারদাঃ'।

[আশ্বমেধিক, ৯৪/৪৩]

গীতিকলাবিদ্ তুম্বুরু, নারদ, পর্বত, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন, হাহা, হূহূ প্রভৃতি গন্ধর্বশ্রেষ্ঠদের নামোল্লেখও তিনি করেছেন—

'হাহাহুহুশ্চ গন্ধর্বৈ তুম্বুরুর্নারদাস্তথা'।

□ মহাভারতে 'সঙ্গীত' শব্দটাই সেভাবে পাওয়া যায় না, কিন্তু আশ্চর্য হল একবার যদি বা সেটা পাওয়া যায়, সেটাও ময়ূরের কেকাধ্বনির প্রসঙ্গে। বনপর্বে যুধিষ্ঠির যখন ভাইদের নিয়ে, দ্রৌপদীকে নিয়ে গন্ধমাদন পর্বতের সানুদেশে উপস্থিত হয়েছেন, তখন বিচিত্রভাবে উদ্ভাসিত প্রকৃতির মধ্যে শিখণ্ডিনী ময়ূরীদের সঙ্গে ময়ূরদের দেখতে পেলেন—তারা কলাপ বিস্তার করে কেকাধ্বনি করছে এবং সেই শব্দটা মধুরস্বর সঙ্গীতের মতো লাগছে—

কৃত্বৈব কেকামধুরং সঙ্গীতং মধুরস্বরম্।
চিত্রান্ কলাপান্ বিস্তীর্য সবিলাসান্ মদালসান্॥

মহাভারতে গীত-সঙ্গীতের কথাটা একটা পূর্ণ বিদ্যার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেটাকে বলা হয়েছে গান্ধর্ব বিদ্যা। গন্ধর্বরাই যে গীত-নৃত্যকুশল একটি দৈব প্রজাতি, এ-কথা বারবার উচ্চারিত হয়েছে। বিশেষত গীত বিশারদ দেবগন্ধর্বদের নাম করে গান্ধর্ববিদ্যাকে গানের মূলস্থান হিসেবেই যেন দেখেছে মহাভারত। গীতের সঙ্গে গন্ধর্বদের কণ্ঠস্বর একাকার হয়ে গেছে মহাভারতের এক জায়গায়—

গীত-গন্ধর্বঘোষৈশ্চ ভেরী-পণব-নিস্বনৈঃ।
সদা প্রহ্লাদিতস্তাভির্দেবকন্যাভি রীজ্যতে॥

নারদ, তুম্বুরু, বিশ্বাবসু এবং চিত্রসেন—এই চার জনের সঙ্গে হাহা-হূহূ নামে আরো দুই গন্ধর্ব গায়ককে দেবগন্ধর্ব বলা হয়েছে, তাঁরাই গীত-বাদ্য-নৃত্যের দৈবগুরু। এই গন্ধর্বদের আমরা যেমন অর্জুনের জন্মোৎসবে গান গাইতে দেখেছি, তেমনই যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞের সময়েও দেবগন্ধর্বরা এসেছিলেন গাই গাইতে। তাঁর

যজ্ঞকর্মের অবসরগুলি ভরিয়ে তুলেছিলেন রম্যগীতে—

* নারদশ্চ বভূবাত্র তুম্বুরুশ্চ মহাদ্যুতিঃ।
বিশ্বাবসুশ্চিত্রসেনস্তথান্যে গীতকোবিদাঃ॥
গন্ধর্বাগীতকুশলা নৃত্যেষু চ বিশারদাঃ।
রময়ন্তি স্ম তান্ বিপ্রান্ যজ্ঞকর্মান্তরেষ্বথা॥

* গীত-মাধুর্য-সম্পন্নৌ বিখ্যাতৌ চ হাহাহূহূ।
ইত্যেতে দেবগন্ধর্বা জগুস্তত্র নরর্ষভম্॥

গন্ধর্ব-গায়কদের প্রসঙ্গে গন্ধর্ব চিত্রসেনের কথা না বললে অন্যায় হবে। চিত্রসেন ইন্দ্রসভার গন্ধর্ব এবং তিনি অর্জুনের সখা। অর্জুন যখন দেবলোকে গিয়েছিলেন ইন্দ্রের কাছ থেকে অস্ত্রলাভ করার জন্য, সেইসময় দেবরাজ অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তিনি চিত্রসেনের কাছ থেকে গীত-নৃত্যের কলা শিখে নেন—

নৃত্যং গীতঞ্চ কৌন্তেয় চিত্রসেনাদ্ অবাপ্নুহি।

[মহা (k) ৩.১৫৮.৬১; ১৩.১০৭.৬৮; ১.১২৩.৫৪-৫৯; ১৪.৮৮.৩৯-৪০; ৩.৪৪.৬; (হরি) ৩.১৩১.৫৯; ১৩.৯৪.৬১; ১.১১৭.৫৮-৬৩; ১৪.১১১.৪১-৪২; ৩.৩৮.৩৮]

□ আমরা দেবলোকের যে সমস্ত নামী গন্ধর্বদের নাম শুনেছি, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন গন্ধর্ব চিত্রসেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে এতটাই সম্মান করেন যে, তিনি অর্জুনকে বলেছিলেন—

নৃত্যং গীতঞ্চ কৌন্তেয় চিত্রসেনাদ্ অবাপ্নুহি।
বাদিত্রং দেববিহিতং নৃলোকে যন্ন বিদ্যতে॥

গন্ধর্বরা ছাড়াও যে সাধারণ সংস্কৃতিবান মানুষের ঘরের পুরুষেরাও যে গান-বাজনা এমনকী নাচও শিখত, তার প্রমাণ মেলে বৃহস্পতির পুত্র কচের ব্যবহারে। শুক্রাচার্যের কাছে সঞ্জীবনী বিদ্যা শেখার জন্য তিনি তো প্রথমত দেবযানীর আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাঁকে ভুলানো বা আকর্ষণ করার অন্যতম উপায়-কৌশল ছিল গান গাওয়া, তাঁকে নাচ দেখানো এবং বাজনা বাজানো—

গায়ন্ নৃত্যন্ বাদয়ংশ্চ দেবযানীমতোষৎ।

দেবযানী খানিকটা মজে যাবার পর দেখছি দেবযানীও কচকে গান শোনাচ্ছেন এবং সেই গানে শৃঙ্গাররস বা লাস্যের কোনো অভাব নেই—

গায়ন্তী চ ললন্তী চ বহুঃ পর্য্যচরত্তথা।

গান্ধর্ব-বিদ্যার এই জায়গা থেকেই আমরা প্রমাণ পেয়ে যাই যে গান-নাচ এবং বাজনা একত্রে একটা সংজ্ঞা তৈরী করে দিয়েছিল অতিপ্রাচীন কালেই। আমরা তৌর্যত্রিক কথাটা মনুসংহিতায় পাচ্ছি—

তৌর্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ।

গানের সূক্ষ্মতা এবং উন্নতি হয়েছিল তা পরিষ্কার হয় যায় স্বরগ্রামের সংজ্ঞায়—ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদের পরিষ্কার উচ্চারণে—

ষড়্জ ঋষভ-গান্ধারৌ মধ্যমো ধৈবতস্তথা।
পঞ্চমশ্চাপি বিজ্ঞেয়স্তথা চাপি নিষাদবান্॥
এষ সপ্তবিধঃ প্রোক্তো গুণ আকাশসম্ভবঃ।
ঐশ্বর্যেন তু সর্বত্র স্থিতো'পি পটহাদিষু॥
মৃদঙ্গ-ভেরী-শঙ্খানাং স্তনয়িত্নো রথস্য চ।

[মহা (k) ৩.৪৪.৬-৭; ১.৭৬.২৪; ১.৭৬.২৬; ১২.১৮৪.৩৯-৪১; (হরি) ৩.৩৮.৩৮-৩৯; ১.৬৮.২৪; ১.৬৮.২৬; ১২.১৭৮.৩৯-৪১]

□ সঙ্গীতের ভাবনা কতটা সূক্ষ্ম হলে এটা বোঝা যায়, সপ্ত প্রকার স্বরগ্রামের ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার মৃদঙ্গ, পটহ, ভেরী ইত্যাদি বাদ্যগুলির শব্দেও নিহিত আছে, সপ্তসুরের এই ব্যাপকত্ব এবং অধিকারকেই সুরের ঐশ্বর্য্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে পূর্বোল্লিখিত শ্লোকে—

ঐশ্বর্যেণ তু সর্বত্র স্থিতো'পি পটহাদিষু।
মৃদঙ্গ-ভেরী-শঙ্খানাং সতনয়িত্নো রযস্য চ॥

মহাভারতের কালে কামনা-তৃপ্তি কিংবা উপভোগ-আমোদের মধ্যে গণ্য হয়েছে গীত-বাদ্য এবং নৃত্য—

নিত্যোপভোগ-নৃত্যগীতবাদিত্র-শ্রুতিসুখ-নয়নাভিরাম-দর্শনানাং প্রাপ্তিঃ। এক-একটা উৎসবে, বিবাহসভায় কিংবা জন্মদিনে গীত-নৃত্যের সমারোহ তৈরি হত—

বাদিত্রাণি চ তত্রান্যে বাদকাঃ সমবাদয়ন্।
ননৃতুর্নর্তকাশ্চৈব জগুর্গেয়ানি গায়নাঃ॥

[মহা (k) ১২.১৯১.১৬; ১.২১৯.৪; ১৪.৭০.১৮; (হরি) ১২.১৮৪.২৯; ১.২১২.৪; ১৪.৮৮.৮]

□ হরিবংশ পুরাণে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের সঙ্গে প্রভাবতীর বিয়ে হবে। প্রভাবতী দানব বজ্রনাভের কন্যা। বজ্রপুরে প্রদ্যুম্ন এসেছেন নটের বেশে। ব্রজপুরীতে উৎসব চলছে আজ।

সেখানে নাটকের আয়োজনের সঙ্গে বিচিত্র এক প্রকার গানের আয়োজন হয়েছে যার নাম ছালিক্য গান; এইখানেই অন্য গানের প্রকারগুলি বলতে গিয়ে দেবগান্ধার এবং গ্রামরাগের প্রসঙ্গ আসে —এই সমস্ত গানের প্রকার এবং স্বরগ্রামের উপযোগে এই বিবাহোৎসবে 'গঙ্গাবতরণ' নামে একটি পালা গান করা হয়েছিল—

তেতো ঘনং সসুষিরং মুরজানকভূষিতম্।
তন্ত্রীস্বরগণৈর্ব্বিদ্ধান্নতোদ্যানন্ববাদয়ন্॥
ততস্তু দেবগান্ধারং ছালিক্যং শ্রবণামৃতম্।
ভৈমস্ত্রিয়ঃ প্রজগিরে মনঃশ্রোত্রসুখাবহম্॥
আগান্ধারগ্রামরাগং গঙ্গাবতরণং তথা।
বিদ্ধমাসারিতং রম্যং জগিরে স্বরসম্পদা॥
লয়তালসমং শ্রুত্বা গঙ্গাবতরণং শুভম্।

[হরিবংশ পু. ২.৯৩.২২-২৫; ২.৮৯.৮০-৮৩]

□ রামায়ণ-মহাভারতে গীতের প্রকরণ যতটুকুই আছে তাতে গীত-সঙ্গীতের পূর্ণ একটা রূপ অবশ্যই ফুটে ওঠে। এরপর কামসূত্রে যখন চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে প্রথমেই গীতের নাম করা হল, তখন জয়মঙ্গলা টীকায় যশোধর চার প্রকারের গীতের কথা উল্লেখ করলেন খুব সাধারণভাবে। তার প্রথমটি হল স্বরগ, অর্থাৎ স্বরগ্রামই এখানে প্রধান, দ্বিতীয় পদগ, অর্থাৎ গানের পদে সুরের আরোপ, তৃতীয় লয়গ, অর্থাৎ গানের ধ্রুপদী কৌশল এবং চতুর্থ হল চেতো'বধানগ, অর্থাৎ এমন গান যাতে গায়ক এবং শ্রোতার চিত্রসংবাদ তৈরি হয়—

স্বরগং পদগঞ্চৈব তথা লয়গমেব চ।
চেতো'বধানগং চৈব গেয়ং জ্ঞেয়ং চতুর্বিধম্॥

[কামসূত্র (নির্ণয়সাগর প্রেস) ৩.১, পৃ. ৩৪]

গুড়াকেশ অর্জুনের একাধিক নামের মধ্যে একটি বহু ব্যবহৃত নাম হল গুড়াকেশ। গীতার উপদেশ দেবার সময় কৃষ্ণ একাধিকবার অর্জুনকে 'গুড়াকেশ' বলে সম্বোধন করেছেন। 'গুড়াকা' শব্দটির অর্থ নিদ্রা। নিদ্রার 'ঈশ' বা ঈশ্বর অর্থাৎ নিদ্রাকে যিনি জয় করেছেন তিনিই গুড়াকেশ। শ্রীধরস্বামী তাঁর ভাগবত পুরাণের টীকায় লিখছেন 'গুড়াকা' শব্দের অপর একটি অর্থ ধনুর্বিদ্যা। অর্জুন শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর বলেও গুড়াকেশ তার অপর নাম। *[দ্র. অর্জুন১]*

[মহা (k) ১.১৩৯.৮;(হরি) ১.১৩৪.৮; ভাগবত পু. ১.১০.১৭নং শ্লোকের শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা দ্রষ্টব্য; ভগবদ্গীতা ১.২৪ শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা দ্রষ্টব্য]

গুণকেশী ইন্দ্রের সারথি মাতলির কন্যা। মাতলির পত্নী সুধর্মার গর্ভে তাঁর জন্ম। গুণকেশীর বিবাহের বয়স হলে তাঁর পিতা মাতলি কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু দেবতা বা মানুষের মধ্যে কোনো পাত্রকেই গুণকেশীর উপযুক্ত বলে মনে হল না পিতা মাতলির। তখন মাতলি নারদের সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরে গুণকেশীর জন্য পাত্র সন্ধান করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত নাগলোকে নাগরাজ আর্যকের পৌত্র সুমুখকে দেখে মাতলির পছন্দ হল। তিনি সুমুখকে জামাতা রূপে বরণ করলেন এবং শুভদিনে মাতলির কন্যা গুণকেশী এবং সুমুখের বিবাহ সম্পন্ন হল।

[মহা (k) ৫.৯৭.১৩-২১; ৫.১০৪.৫-৮, ১৮-৩০; (হরি) ৫.৯০.১৩-২১; ৫.৯৮.৫-১০, ১৮-৩০]

গুণত্রয় সত্ত্ব, রজ (রজঃ/রজস্) এবং তম (তমঃ/তমস্)—এই তিনটি প্রকৃতির গুণ, প্রকৃতি থেকেই এই তিনগুণের উদ্ভব। গুণগুলি দেহধারী জীবকে বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ করে—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥

[ভগবদ্গীতা ১৪.৫]

□ আমাদের দর্শনে প্রকৃতিকে প্রধান বলা হয়। প্রধানস্বরূপ প্রকৃতির উপকার করে বলেই সত্ত্ব-রজ-তম গৌণস্থানে থাকে, সেইজন্যই এদের নাম গুণ। আবার প্রকৃতি থেকে যে পরম্পরায় সৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেই প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি পর্যায়ের মধ্যেই সত্ত্ব-রজ-তম যাকে বলে সেটা একটা রজ্জুর (গুণ) মতো থাকে বলেও এগুলির নাম গুণ অর্থাৎ ব্যক্ত প্রকৃতি থেকে একেবারে মানুষ পর্যন্ত গুণ একটা thread হিসেবে কাজ করে বলেও সত্ত্ব-রজ-তমকে গুণ বলে—

সত্ত্বাদীনি দ্রব্যাণি, ন বৈশেষিকা গুণাঃ
সংযোগবিভাগবত্ত্বাৎ।
লঘুত্বচলত্বগুরুত্বাদিধর্ম্মকত্বাচ্চ। তেষ্বত্র
শাস্ত্রে শ্রুত্যাদৌ চ গুণশব্দঃ
পুরুষোপকরণত্বাৎ পুরুষপশুবন্ধক-
ত্রিগুণাত্মকমহদাদিরজ্জুনির্ম্মাতৃত্বাচ্চ প্রযুজ্যতে।
তেষাং সত্ত্বাদিদ্রব্যাণাং যা
সাম্যাবস্থাহন্যূনানতিরিক্তাবস্থা
ন্যূনাধিকভাবেনাসংহতাবস্থেতি যাবৎ।

[সাংখ্যদর্শনম্ (দুর্গাচরণ) সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য ১.৬১, পৃ. ২৮২]

□ প্রকৃতির একটি সংজ্ঞা তৈরি করতে গেলেও আগে ত্রিগুণাত্মিকা কথাটা ব্যবহার করতে হয়। আমরা দেখেছি, প্রকৃতি শব্দটা উচ্চারণ না করেও শুধুমাত্র গুণত্রয়ের উল্লেখ করেই প্রকৃতির দার্শনিক সংবেদন ঘটানো হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয় মন্ত্রে প্রকৃতি কথাটা উচ্চারণ না করেও যখন বলা হল—

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্—

তখন এই মন্ত্রবর্ণের মধ্যে 'স্বগুণৈঃ' এই বহুবচন পদটিকে দার্শনিকেরা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বলেই অনুমান করেন। এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদে এটাই বলা হয়েছে যে, প্রত্যক্ষ-ইত্যাদি কোনো প্রমাণেই তাঁকে জানা যায় না, অতএব জগৎ-কারণকে জানবার জন্য তাঁরা (ব্রহ্মবাদীরা) ধ্যানযোগের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়ে স্বত্ত্ব-রজ-তমের ত্রিগুণ দ্বারা আবৃত সেই দেবাত্মশক্তিকেই (প্রকৃতি, গুণময়ী মায়াকেই) জগৎ-কারণ হিসেবে অনুধাবন করলেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের এই মন্ত্রে (স্বগুণ-নিগূঢ়া দেবাত্মশক্তি'-ই যে আসলে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি, সে-কথা আবারও প্রকৃতি-শব্দ উচ্চারণ না করে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পরবর্তী শ্লোকে বলা হল—

অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্।

অভিধান অনুযায়ী লোহিত, শুক্ল এবং কৃষ্ণ শব্দের অর্থ যথাক্রমে রক্তবর্ণ, শ্বেতবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু গভীর দার্শনিক অনুভবে লোহিত-বর্ণ এখানে রজ-গুণের প্রতীক, শুক্লবর্ণ সত্ত্বগুণের প্রতীক, আর কৃষ্ণবর্ণ তম-গুণের প্রতীক। এই লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণের আড়ালে রজ-সত্ত্ব-তমকে অনেকে অজা বা জন্মরহিত অব্যক্তা প্রকৃতির বিশেষণ হিসেবে দেখতে চাইলেও তাত্ত্বিক-তার্কিকেরা বলেছেন সাংখ্য-মতে সত্ত্ব-রজ-তমের সাম্যাবস্থাই (বা 'ইকুইলিব্রিয়াম'-ই) প্রকৃতির আসল স্বরূপ। ব্রহ্মবাচক বাক্য 'সত্যং পরং ধীমহি'—সেই পরম সত্যের ধ্যান করি—এ-কথা বললে পরে যেমন 'ব্রহ্ম' শব্দটাকে উহ্য আছে বলে পরম সত্যকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলতে হয় না, তেমনই 'লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা' বা 'রজঃ-সত্ত্ব-তমোগুণা' বললেও প্রকৃতি-শব্দটাকে বিশেষ্য হিসেবে জোগান দেবার প্রয়োজন হয় না। এই কারণেই Colebrooke সাহেব লিখেছেন—These three qualities are not mere accidents of nature, but are of its essence and enter into its compositions.

[শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ১.৩; ৪.৫; H.T. Colebrooke, Miscellaneous Essays, Vol 1, (2nd Ed.) P. 249; The Sankhya-karika of Iswara Krishna, John Davies, pp. 37-39]

উপনিষদে রজ-সত্ত্ব-তম গুণের এই যে স্বরূপ, মহাভারত কিন্তু সেটা আদ্যা প্রকৃতির মূল স্বরূপ বলেই মেনে নিয়েছে এবং তা মেনে নিয়েছে আরও বৈজ্ঞানিক ক্রম অনুযায়ী ভাল থেকে মন্দ গুণের অনুক্রমে—শুক্ল-লোহিত-কৃষ্ণ বর্ণের ক্রমানুসারে। মহাভারত বলেছে—এই যে তিন বর্ণ—শুক্ল, লোহিত এবং কৃষ্ণ—এই সব বর্ণ-রূপই কিন্তু আসলে প্রকৃতির স্বরূপ। অর্থাৎ এটাই বলা হল—সত্ত্ব-রজ-তমের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতির রূপ—

শুক্ল-লোহিত-কৃষ্ণাণি রূপাণ্যেতানি ত্রীণি তু।
সর্বাণ্যেতানি রূপাণি জানীহি প্রাকৃতানি বৈ॥

[মহা (k) ১২.২৯১.৪৫; (হরি) ১২.২৯৫.৪৬]

□ সত্ত্বগুণ সুখস্বরূপ, রজ-গুণ দুঃখস্বরূপ এবং তম-গুণ মোহস্বরূপ। প্রকাশের জন্য সত্ত্ব-গুণের উপযোগিতা, প্রবৃত্তির জন্য রজ-গুণের উপযোগ আর সংযমন-নিয়ন্ত্রণের জন্য তমগুণের উপযোগ মহাভারতের সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত। তিনটি গুণের সাধারণ স্বভাব হল—এরা পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে, পরস্পর পরস্পরকে অভিভূতও করে। এরা পরস্পর পরস্পরের পরিণামের প্রতি হেতু বা কারণ হয়ে উঠতে পারে, অথচ পরস্পর পরস্পরের নিত্য সহচর। সত্ত্বগুণকে প্রকাশধর্মী বলা হলেও সত্ত্বগুণের নিজস্ব কোনো ক্রিয়াকারিতা নেই। অথচ রজ-গুণ স্বয়ং ক্রিয়াশীল, সে প্রবর্তক এবং চালক। রজ-গুণের সঙ্গে সত্ত্বগুণের মিলনের ফলে রজ-গুণের প্রভাবেই সত্ত্বগুণ কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। জগৎ এবং জাগতিক সমস্ত বস্তু সৃষ্টি হয় রজ-গুণের প্রবর্তক শক্তিতে, আর সেই রজ-গুণের সঙ্গে সত্ত্বগুণ যদি যুক্ত হয় তবে জগতের শৃঙ্খলা এবং স্থিতি হয় সেই যুগ্ম শক্তিতে। কার্যক্রিয়ায় উন্মুক্ত রজ-গুণ এবং রজের সহায়তায় কার্যতৎপর সত্ত্বগুণ একত্রে মিলে এমন বিপুল ক্রিয়াকাণ্ড তৈরি করতে পারে

যার ধারণ-ক্ষমতা জাগতিক মানুষের নাও থাকতে পারে, সেইজন্যই এক নিয়ামক শক্তি হিসেবে তমোগুণ সেই বিস্ফোরক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে।

গুণত্রয়েব মধ্যে একটি যদি প্রবল হয়, তবে অন্য দুটি গুণ অভিভূত-স্তিমিত অবস্থায় থাকে। যখন সত্ত্বগুণ প্রবল হয় তখন সেটা রজ এবং তমগুণকে অভিভূত-নিস্তেজ করে দিয়ে নিজের শান্তগুণ প্রকট করে তোলে। একই ভাবে রজ-গুণ যদি প্রবল হয়, তাহলে সত্ত্ব এবং তম-গুণ স্তিমিত থাকে এবং রজের ঘোর-রূপ প্রকাশ পায়। আর তমগুণ যদি প্রবল হয়, তাহলে সত্ত্ব-রজ-গুণ অভিভূত হয়ে থাকে, তখন তমের মূঢ়-স্বরূপ প্রকাশ পায়। সাংখ্য-কারিকার টীকায় বাচস্পতি মিশ্রের মতো মহাপণ্ডিত লিখছেন— কোনো কিছুই একান্তভাবে সুখ-স্বরূপ, কিম্বা দুঃখস্বরূপ অথবা শুধুই মোহস্বরূপ হতে পারে না। বস্তুমাত্রেই ত্রিগুণাত্মক। তবে গুণগুলির মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে, অন্য দুটি গৌণভাবে অবস্থান করে। বাচস্পতি উপমা দিয়ে বলেছেন—রূপ যৌবনবতী এক রমণী তাঁর স্বামীর কাছে সুখের কারণ হয়ে ওঠেন। সেখানে তাঁর মধ্যে সুখস্বরূপ সত্ত্বগুণ প্রকট হয়ে ওঠে। আবার সেই একই রমণী তাঁর সপত্নীর কাছে দুঃখের কারণ সেখানে দুঃখ-স্বরূপ রজ-গুণ প্রবল হয়ে ওঠে। আবার যে এই রূপবতী রমণীকে পেল না, সেই কষ্ট-পাওয়া মানুষটার কাছে এই রমণীর মোহাত্মক তম-গুণ প্রকট হয়ে ওঠে, সত্ত্ব-রজ সেখানে গৌণ ভূমিকায় থাকে—

এবৈব স্ত্রী রূপ-যৌবন-কুলসম্পন্না স্বামিনং
সুখাকরোতি ... সৈব স্ত্রী সপত্নীর্দুঃখাকরোতি ...
এবং পুরুষান্তরং তামবিন্দধানং সৈব মোহয়তি।

[সাংখ্যকারিকা (আত্মস্বরূপ উদাসীন) কারিকা নং ১৩, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী টীকা, পৃ. ১৪২-১৪৩]

□ গুণত্রয়ের মধ্যে একের প্রবল ভাব এবং অন্য দুটি গৌণ অবস্থান নিয়ে মহাভারত আরো সূক্ষ্ম আলোচনা করেছে এবং তা করেছে সাংখ্যতত্ত্বগুলির পরম্পরা দেখিয়ে। মহাভারত বলে প্রকৃতি নিজেই ত্রিগুণাত্মিকা তাই প্রকৃতি থেকে জাত প্রথম তত্ত্ব মহান্ বা বুদ্ধি এবং মহান থেকে জাত অহঙ্কার, মন ইত্যাদি তত্ত্বগুলির একই পরম্পরা-সূত্রে ত্রিগুণাত্মক। মহাভারত বলে— ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির সাত্ত্বিক ভাব, রাজসিকভাব, তামসিকভাব বশতই এই জগতের সমস্ত কিছুই পরিচালিত হয়ে থাকে। সেজন্যই 'অধ্যাত্মকথন' অধ্যায়ে বলা হচ্ছে—

পুরুষে তিষ্ঠতী বুদ্ধিস্ত্রিষু ভাবেষু বর্ত্ততু।
কদাচিল্লভতে প্রীতিং কদাচিদনুশোচতি॥
ন সুখেন ন দুঃখেন কদাচিদপি বর্ত্ততে।
এবং নরাণাং মনসি ত্রিষু ভাবেষ্বস্থিতা॥

এই শ্লোকের অর্থ হল বুদ্ধি জীবাত্মাতে থেকে কখনও সুখ বা আনন্দ ভোগ করে, কখনও দুঃখ বা শোক অনুভব করে এবং কখনও মোহে অভিভূত হয়। এর ফলে জাগতিক সৃষ্টির মধ্যেও কখনও আনন্দ অনুভূত হয়, কখনো শোক অনুভূত হয়, কখনো আবার সৃষ্টিতত্ত্বগুলি মোহ-নিমজ্জিত হয়। সৃষ্টি প্রকৃতির এই যে ত্রিবিধ অবস্থার রূপান্তর—তা সবই ঘটে থাকে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক স্বভাববশত। এইজন্যই নীলকণ্ঠ এই অধ্যায়ের অন্য একটি শ্লোকের টীকায় বলেছেন—

বুদ্ধিশ্চ ত্রিগুণাত্মকস্যাজ্ঞানস্য কার্য্যমত-স্ত্রিগুণাত্মকানেব ভাবন্ বিষয়ীকরোতি।

নীলকণ্ঠের এই টীকার অর্থ হল বুদ্ধি ত্রিগুণাত্মক অজ্ঞানের কার্য হওয়ায় বুদ্ধি থেকে জাত যাবতীয় জাগতিক পদার্থেরই এই ত্রিগুণাত্মক ভাব প্রাপ্ত হয়। ত্রিগুণাত্মক বুদ্ধির দ্বারা জাগতিক সৃষ্ট বস্তুসকল কেবল যে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাবই প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তা নয়, মহাভারতে বুদ্ধিকে মোক্ষ-লাভের উপায় বলেও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এইজন্য অধ্যাত্মকথনে—অধ্যায়ে ভীষ্ম বলেছেন—

এতাং বুদ্ধা নরো বুদ্ধ্যা ভূতানামাগতিং গতিম্।
সমবেক্ষ্য শনৈশ্চৈব লভতে শমমুত্তমম্॥

ভীষ্মের উক্ত এই বিবৃতির মধ্য দিয়ে একথাই প্রকাশিত হচ্ছে যে, মানুষ বুদ্ধির সাহায্যেই এই জগতের উৎপত্তি ও ধ্বংসকে জানে এবং শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি সাহায্যেই যাবতীয় দুঃখের পরিসমাপ্তিকারী যে পরম শান্তি তা লাভ করে থাকে।

আমরা আগেই বলেছি—প্রকৃতি যেহেতু ত্রিগুণাত্মিকা তাই প্রকৃতি থেকে জাত মহানও ত্রিগুণাত্মক এবং এই মহত্তত্ত্বকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে—সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস। মহাভারত বলেছে—

ত্রিগুণো'সৌ মহান্ জ্ঞাতঃ প্রধান ইতি বৈ শ্রুতিঃ।
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধাত্মকঃ॥

মহাভারত অবশ্য মহত্তত্ত্বকে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক—এই তিনভাগে ভাগ করলেও এই ভাবগুলির অধিকতর স্পষ্টতার জন্য মহত্তত্ত্বের পরেই ত্রিবিধ অহংকারের কথা বলেছে। অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক, এবং তামসিক অহঙ্কারের জন্ম যেহেতু ত্রিগুণাত্মক মহত্তত্ত্ব থেকেই, অতএব সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় সেই বিকার আরও স্পষ্টতর। তবে মহত্তত্ত্বের এই ত্রিগুণাত্মক সাত্ত্বিক রাজসিক এবং তামসিক ভাবগুলি থেকে কীভাবে পরপর অন্য বিকারগুলি সৃষ্টি হবে তার খুব স্পষ্ট বর্ণনা আছে ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির সংবাদে। ভীষ্ম সেখানে অধ্যবসায়িনী বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বের কথা বলেই ব্যাখ্যা করে বলছেন—সত্ত্ব, রজ, তম, কাল এবং কর্ম—এই পাঁচটি পদার্থ বুদ্ধিকে নানা বিষয়ে পরিচালিত করে। আবার পর্যায়ক্রমে সেই পঞ্চাত্মক বুদ্ধি মন প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়কে বিভিন্ন বিষয়ে পরিচালিত করে। কিন্তু পরিচালিকা বুদ্ধি না থাকলে ইন্দ্রিয়গুলি কোনো কাজ করতে পারে না। বুদ্ধি যার দ্বারা দর্শন করে, সেটাই চক্ষু, বুদ্ধি যার দ্বারা শ্রবণ করে সেটাই কর্ণ, বুদ্ধি যার দ্বারা আঘ্রাণ করে তার নামই নাসিকা, বুদ্ধি যার দ্বারা রসগ্রহণ করে, সেটাই জিহ্বা এবং বুদ্ধি যার দ্বারা স্পর্শ করে সেটাই ত্বক। আর বুদ্ধি যার সাহায্যে কোনো কিছু প্রার্থনা করে সেটাই মন। এইভাবে পুরুষস্থিত বুদ্ধি বার বার বিকৃত হয় অর্থাৎ বার বার নিজেকে ভাঙে এবং গড়ে। এর পরেই মহাভারত বলছে পুরুষস্থিত বুদ্ধি সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিকভাবে অবস্থান করে—তিষ্ঠতী পুরুষে বুদ্ধিস্ত্রিষু ভাবেষু বর্ততে—তার ফলেই কখনো সে আনন্দ লাভ করে, আবার কখনো শোক করে। বুদ্ধি কখনো কেবল সুখে বা কখনো কেবল দুঃখে থাকে না। কিন্তু সাত্ত্বিকাদি ভাবসম্পন্ন সেই বুদ্ধি সর্বদাই সাত্ত্বিকাদি ভাবের অনুসরণ করে—

সেয়ং ভাবাত্মিকা ভাবাংস্ত্রীনেতান্ পরিবর্ত্ততে।

তরঙ্গময় নদীপতি সমুদ্র যেমন বেলাভূমিকে অতিক্রম করে না, তেমনই সাত্ত্বিকাদি ভাব সম্পন্ন বুদ্ধিও সাত্ত্বিকাদিভাবযুক্ত মনেই অবস্থান করে।

মহাভারতের অন্যত্র বশিষ্ঠ-করালজনক সংবাদে বলা হয়েছে, পুরুষ নির্গুণ হওয়া সত্ত্বেও বিকারশীল প্রকৃতির সহবাসবশত তমোগুণ এবং রজোগুণের প্রভাবে নানাবিধ তামসিক এবং রাজসিক ভাব অবলম্বন করেন আবার সত্ত্বগুণের প্রভাবে শমদমাদি সাত্ত্বিক ভাবও ধারণ করেন—

তমসা তামসান্ ভাবান্ বিবিধান্ প্রতিপদ্যতে।
রজসা রাজসাংশ্চৈব সাত্ত্বিকান্ সত্ত্বসংশ্রয়াৎ॥

বশিষ্ঠ-করালজনক-সংবাদে উপরিউক্ত শ্লোকে যে-কথা প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে সংক্ষেপে বলা হয়েছে, সেই কথাই ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন মহত্তত্ত্বকে কেন্দ্র করে এবং একটু বিশদভাবে, কেননা মহত্তত্ত্বই প্রথম ত্রিগুণাত্মক বিকার যা আরও স্পষ্টভাবে অহঙ্কার এবং মনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। ভীষ্ম বলছেন—রজোগুণে প্রদত্ত হলে বুদ্ধি রাজসিকভাবেই চলতে থাকে। তার মধ্যেই যদি কোনোভাবে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয় তবে তার মধ্যে হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, সুখ-শান্তি চলতে থাকে। আবার দাহ, শোক, সন্তাপ, অপূর্ণতা ইত্যাদি কারণবশত রজোগুণের লক্ষণ দেখা দেয়। তারপর আবার অবিদ্যা, রাগ, মোহ, প্রমাদ, স্তব্ধতা, ভয়, দারিদ্র্য, দৈন্য, মূর্চ্ছা, নিদ্রা-তন্দ্রা ইত্যাদি তামসিকভাবও পুরুষের মধ্যে উপস্থিত হয়।

এই সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভাব মানুষ নিজের মধ্যেই বুঝে নিতে পারে। মহাভারত বলছে—যখন দেহে বা মনের মধ্যে প্রীতি-শান্তির প্রবাহ চলবে, তখন সাত্ত্বিক ভাব কাজ করছে এটাই বুঝতে হবে। অন্যদিকে যা কিছু দুঃখযুক্ত এবং অপ্রীতিকর বোধ হবে তখন রজোগুণের কাজ চলছে বুঝতে হবে।

[মহা (k) ১২.১৯৪.২২-২৩; ১২.১৯৪.১৫-২৪ (নীলকণ্ঠকৃত টীকা) ১২.৩০২.৪৫; ১২.২৮৫.২৫-৩১; (হরি) ১২.১৮৭.২২-২৩; ১২.১৮৭.১৫-২৪ (নীলকণ্ঠ-টীকা); ১২.২২৯.২৬ (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে-উল্লিখিত শ্লোকগুলি উত্তর-ভারতীয় সংস্করণে পাওয়া যায় না); ১২.২৯৫.৪৫; ১২.২৭৮.২৫-৩১]

গুণমুখ্যা একজন বিশিষ্ট অপ্সরা। অর্জুনের জন্মোৎসবে যেসব অপ্সরা নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন, গুণমুখ্যা তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.১২৩.৬১; (হরি) ১.১১৭.৬৫]

গুণাকর ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে, বানরজাতি পুলহ প্রজাপতির ঔরসে ক্রোধবশার কন্যা হরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। পুলহবংশীয় এইসব বানরবীরদের মধ্যে গুণাকর একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৮১, ২৪১]

গুণাবরা একজন বিশিষ্ট অপ্সরা। অর্জুনের জন্মোৎসবে যেসব অপ্সরা নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন, গুণাবরা তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.১২৩.৬১; (হরি) ১.১১৭.৬৫]

গুপ্তবংশ পুরাণে ঐতিহাসিক গুপ্তবংশের রাজ্য সীমার ও রাজত্বকালের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। বায়ু পুরাণ মতে নাগ রাজবংশের পর গুপ্তবংশীয় রাজারা গঙ্গা তীরবর্তী প্রয়াগ, সাকেত ও মগধ প্রভৃতি জনপদে রাজত্ব করেছিলেন।

বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে গুপ্তরা গঙ্গা ও প্রয়াগের কাছাকাছি অবস্থিত কান্তিপুরী (প্রাচীন কুতওয়াল বা কুতওয়ার) ও মথুরার অধিপতি ছিলেন।

[বায়ু পু. ৯৯.৩৮৩; বিষ্ণু পু. ৪.২৪.৬৩; Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1865, A. Cunningham; Coins of the Nine Nagas and of two other Dynasties of Narwar and Gwalior; p. 116]

গুরু১ ভরদ্বাজ-বিতথর পুত্রের নাম মন্যু। মন্যুর পঞ্চপুত্রের মধ্যে একজন হল নর। নরের পুত্র সংকৃতি এবং সংকৃতির পুত্র গুরু। গুরুর ভ্রাতার নাম রন্তিদেব। *[ভাগবত পু. ৯.২১.২]*

গুরু২ চতুর্দশ মন্বন্তরের অধিপতি ভৌত্যমনুর পুত্রদের মধ্যে একজন হলেন গুরু।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.১১৪]

গুরু৩ অঙ্গিরাবংশীয় একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি হলেন গুরু। *[মৎস্য পু. ১৯৬.৪৫]*

গুরুণ্ড কলিযুগে যে রাজবংশগুলি পৃথিবীতে রাজত্ব করেছিলেন তাঁদের মধ্যে গুরুণ্ড একটি রাজবংশ। যবন বংশ, তুরস্ক বংশের পর গুরুণ্ড রাজারা ১৩ বছর পৃথিবী শাসন করেছিলেন। এরপর পুনরায় গুরুণ্ড রাজারা তিনশত আশী বৎসর পৃথিবীর অধিপতি হন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে গুরুণ্ডরা ম্লেচ্ছ জাতির একটি শাখা। এঁরা বৃষল নামক অপর একটি ম্লেচ্ছ জাতির সাথে যৌথভাবে তিনশত বৎসর রাজত্ব চালান। *[ভাগবত পু. ১২.১.৩০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৭৩,১৭৭; মৎস্য পু. ২৭৩.১৯,২২-২৩]*

গুরুধী মৎস্য পুরাণ অনুসারে পুরুবংশীয় সঙ্কৃতির পুত্র গুরুধী। *[মৎস্য পু. ৪৯.৩৭]*

গুরুপ্রীতি বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে পুরুবংশীয় সঙ্কৃতির গুরুপ্রীতি একজন।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.১৯.২২]

গুরুবীত অঙ্গিরাবংশীয় মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৪৫.১০২]*

গুরুবীর্য্য পুরুবংশীয় রাজা সাঙ্কৃতির পুত্র গুরুবীর্য্য। *[বায়ু পু. ৯৯.১৬০]*

গুরুভার পক্ষীরাজ বৈনতেয় গরুড়ের পুত্রদের মধ্যে গুরুভার অন্যতম।

[মহা (k) ৫.১০১.১৩; (হরি) ৫.৯৪.১৩]

গুরুসেবী ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লিখিত জনৈক বানরবীর। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৩৬]*

গুর্বক্ষ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বংশধারায় বলির পুত্রদের মধ্যে গুর্বক্ষ একজন। *[মৎস্য পু. ৬.১১]*

গুল্ম যদু-বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবের পুত্র সারণ। সারণের পুত্রদের মধ্যে গুল্ম একজন। *[বায়ু পু. ৯৬.১৬৫]*

গুহ গুহ রামচন্দ্রের প্রিয় সখা। ইনি নিষাদদের রাজা। রামের বনবাসের সময় শৃঙ্গবেরপুরে গুহ রামের সঙ্গে মিলিত হন। বাল্মীকি যখন রামায়ণের পূর্বদর্শন করেছিলেন, তখন তিনি গুহর বৃত্তান্তও জানতে পেরেছিলেন। *[রামায়ণ ১.১.২৯-৩১]*

বনবাসের সময় রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে ভোজরাজ্যে এসে পৌঁছলেন। সুমন্ত্র তখনও তাঁদের রথে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। গঙ্গার তীরে, শৃঙ্গবেরপুরে এসে পৌঁছলেন তাঁরা। এইখানেই নিষাদরাজ গুহ এসে রামের সঙ্গে মিলিত হলেন। বলবান এবং স্থপতি হিসাবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল বলে রামায়ণে উল্লেখ আছে—

নিষাদজাত্যো বলবান্ স্থপতিশ্চেতি বিশ্রুতাঃ।

নরশ্রেষ্ঠ রাম তাঁর রাজত্বের মধ্যে এসে পৌঁছেছেন শুনে বর্ষীয়ান অমাত্য ও আত্মীয়দের সঙ্গে গুহ এসে পৌঁছলেন রামের কাছে। লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রামও তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন—উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করলেন। গুহ যেমন রামকে নানাপ্রকার খাদ্যপানীয় দিয়ে স্বাগত জানালেন, রামও তেমন গুহের বহু প্রশংসা করলেন। গুহ তাঁর সেবক-অনুচরদের দিয়ে রামচন্দ্রের রথ বহন করে আনছিল যে ঘোড়াগুলি, তাদের রথ থেকে মুক্ত করলেন এবং ক্লান্ত ঘোড়াগুলির জন্য খাবার এবং জলের ব্যবস্থা এবং

তাদের বিশ্রামের ব্যবস্থাও করালেন যথাযথভাবে। সেই রাত্রিটি গুহ, লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্রর সঙ্গে জেগেই কাটিয়ে দিলেন। অতিসতর্ক ভাবে ধনুর্বাণ হাতে সীতা ও রামকে রক্ষা করলেন তাঁরা। *[রামায়ণ ২.৫০.৩৩-৫১]*

সেই বিনিদ্র রাত তাঁরা কাটালেন রামের দুঃখময় বনবাসের কাহিনী শুনে। লক্ষ্মণের মুখ থেকে রামের এই দুঃখের কারণ জানতে পেরে গুহের চোখ জলে ভরে গেল। বহু বিলাপ করলেন তিনি। বললেন—এই বনের কিছুই তাঁর অজানা নয়, সেবকদের সঙ্গে নিয়ে তিনিই রামকে রক্ষা করবেন। পরে লক্ষ্মণ গুহকে রামের কাছে নিয়ে গেলে রামচন্দ্র গঙ্গা পার হওয়ার কথা জানালেন। গুহ দ্রুত নৌকা তৈরির আদেশ দিলেন। গুহের আবাসে বসেই রাম-লক্ষ্মণ বটের আঠা দিয়ে নিজেদের জটাভার তৈরি করলেন বনবাসের উচিত ভাব মাথায় রেখে। তারপর গুহের অমাত্যেরা নৌকা এনে দিলে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ গঙ্গা পার হয়ে চলে গেলেন। রাম চলে যাবার পর বহুক্ষণ সুমন্ত্রর সঙ্গে সেই বিষয়েই কথা বলতে লাগলেন গুহ। অবশেষে গুহ সুমন্ত্রকে বিদায় জানালেন। *[রামায়ণ ২.৫১, ৫২, ৫৭.১]*

এই ঘটনার কিছুকাল পর ভরত যখন সপরিবারে, বহু সৈন্য সামন্ত সঙ্গে নিয়ে রামকে বন থেকে ফিরিয়ে আনতে চললেন, তখন ভরতের সঙ্গে অযোধ্যার বিশাল সেনা দেখে গুহ প্রথম সন্দেহ করেছিলেন যে, রামকে বনবাসে পাঠিয়েও বুঝি ভরতের শান্তি হয়নি, বোধ করি তিনি রামকে মেরেই ফেলতে চান। কারণ ভরতের মাতা কৈকেয়ীই যে রামের এই বনবাসের জন্য দায়ী—সেকথা গুহর ভালভাবেই জানা ছিল। ফলে এই পরিস্থিতিতে ভরতকেও সন্দেহের চোখে দেখাই গুহের পক্ষে স্বাভাবিক। ভরত যুদ্ধ করতে চাইলে তিনি রামের পক্ষে যোগ দেবেন এটা ঠিকই করে ফেললেন গুহ এবং নিজের সৈন্যসামন্ত এবং নৌবাহিনীকেও সেই মতো প্রস্তুত থাকতে বলে নিজে তিনি নানা উপঢৌকন নিয়ে ভরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। কিন্তু ভরত আন্তরিকভাবেই রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতে চান, এটা বুঝতে পেরে গুহ আশ্বস্ত হন, শোকগ্রস্ত ভরতকে সান্ত্বনাও দেন তিনি। বনবাসে যাবার পথে যে রাতটি গুহের কাছে কাটিয়ে ছিলেন রাম-লক্ষ্মণ সীতা—সেদিনটির কথা বর্ণনাও করলেন ভরতের কাছে। গুহ ভরতকে জানালেন—সেই রাত্রে লক্ষ্মণ শুধু এই দুঃখেই ঘুমোন নি যে, রাম রাজোচিত সুখশয্যা ছেড়ে কুশশয্যায় শুয়ে আছেন! রামচন্দ্রের গঙ্গা পার হয়ে যাওয়াটাও তাঁর কাছে কত করুণ ছিল সেই দৃশ্যও বর্ণনা করলেন গুহ। শুনে ভরত দুঃখে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। গুহ অত্যন্ত দুঃখ পেলেন, বহু বিলাপ করলেন; আবার ভরত সুস্থ হয়ে উঠলে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখিয়ে দিলেন রামচন্দ্রের সেই কুশশয্যাখানি। পরদিন গুহ ভরতের অনুরোধে সসৈন্যে তাঁকে গঙ্গানদী পার হওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। গুহ নিজে নিয়ে এলেন 'স্বস্তিক' নামে এক নৌকা। ভরত গুহকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন বনবাসী রামচন্দ্র কোথায় আছেন—তার সন্ধান করেন। গুহও পায়ে হেঁটে চললেন রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে রাম-লক্ষ্মণ তাঁকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন পরম বন্ধুর সমমানিতায়। *[রামায়ণ ২.৮৪-৯৯]*

লঙ্কার যুদ্ধশেষে রাম যখন অযোধ্যায় ফিরে আসবেন, তখন হনুমানকে তিনি দূত করে পাঠালেন গুহের কাছেও। কারণ গুহ ছিলেন তাঁর 'আত্মার মতো প্রিয়' বন্ধু। রামের আদেশে হনুমান গুহকে দিয়েছিলেন রামের ফিরে আসার সুসংবাদ। *[রামায়ণ ৬.১২৫.৪-৫; ৬.১২৫.২২-২৪]*

গুহাবাস গয়াসুরের দেহে যজ্ঞ করার জন্য ব্রহ্মা তাঁর যে মানস পুত্রদের পৌরোহিত্যের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে গুহাবাস একজন। *[বায়ু পু. ১০৬.৩৭]*

গুহাবাসী ভবিষ্যৎ সপ্তদশ দ্বাপরে, যখন মহর্ষি কৃতঞ্জয় বেদবিভাগকারী ব্যাস হবেন, সেই সময় মহাদেব মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়ে গুহাবাসী নামে খ্যাত হবেন। হিমালয় শিখরে তাঁর তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ঐ তীর্থস্থান মহালয় নামে বিখ্যাত হবে। এই সময়ে গুহাবাসীর চারটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদের নাম যথাক্রমে উতথ্য, বামদেব, মহাকাল এবং মহালয়। *[বায়ু পু. ২৩.১৭৪-১৭৭]*

গুহ্যক যক্ষরাজ কুবেরের অনুগত একটি সম্প্রদায়। পুরাণে গুহ্যককে যক্ষদেরই একটি শাখা বলে ধারণা করা হয়েছে। বায়ু পুরাণ মতে, যক্ষ রজতনাভ এঁদের পিতামহ এবং যক্ষ মণিবর গুহ্যকদের পিতা।

গুহ্যকগণ স্বভাবত ক্রূর প্রকৃতির—

গুহ্যকা বত যূযং বৈ স্বভাবাৎ ক্রূরচেতসঃ॥

এঁরা প্রজাপতি ব্রহ্মা ও দেবী সতীর উপাসক। গুহ্যকরা মায়াবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী।

[মহা (k) ১.১.৩৫; ১.১৪৬.১২; ২.১০.৩; ২.১২.৩; ২.১১.৪৯; (হরি) ১.১.৩৫; ১.১৪০.১২; ২.১০.৩; ২.১২.৩; ২.১১.৪৭; মৎস্য পু. ১৮০.৯; বায়ু পু. ৯.৩২; ৬৯.১৫১, ১৬২; ভাগবত পু. ৪.৪.৩৪; ১০.৫৫.২৩]

☐ মহাভারতের ভীষ্মপর্বে হেমকূট অর্থাৎ কৈলাসকে গুহ্যকদের বাসভূমি বলে উল্লেখ করা হয়েছে—হেমকূটে তু গুহ্যকাঃ। যক্ষপতি কুবের সেখানে গুহ্যকদের সঙ্গে ক্রীড়া করেন—

হেমকূটস্তু সুমহান্ কৈলাসো নাম পর্বতঃ।

যত্র বৈশ্রবণো রাজন্ গুহ্যকৈঃ সহ মোদতে॥

রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেও কুবের ভবনের নিকটস্থ সরোবরে গুহ্যকদের ক্রীড়ার কথা পাওয়া যায়। এঁরা কুবেরের রাজসভায় উপস্থিত থাকতেন।

[রামায়ণ ৪.৪৩.২৩; মহা (k) ৬.৬.৪১, ৫১; (হরি) ৬.৬.৪১, ৫২; ভাগবত পু. ৪.১০.৫; মৎস্য পু. ১২১.২]

☐ মহাভারতের বনপর্বে আবার হাটকদেশকে গুহ্যকদের বাসভূমি বলা হয়েছে—হাটকং নাম দেশং গুহকরক্ষিতম্। দিগ্‌বিজয়ের সময় অর্জুন কিন্নরদেশ জয় করার পর হাটকদেশে পৌঁছান। তিনি সে দেশও জয় করেন।

কিন্নরদেশের পর হাটকদেশে অর্জুনের যাত্রা থেকে বোঝা যায় এক্ষেত্রেও পার্বত্যভূমির কথাই মহাভারতকার ইঙ্গিত করেছেন। সে পর্বতাঞ্চল অবশ্যই কৈলাস।

[মহা (k) ২.২৮.৩; (হরি) ২.২৭.৩]

☐ মহাভারতের বনপর্বে অধিবঙ্গ নামে একটি উপবনের কথা পাওয়া যায়। গুহ্যকগণ এই বনে আমোদ-প্রমোদ করতেন।

[মহা (k) ৩.৮৪.১১৫; (হরি) ৩.৬৯.১১৬]

☐ মহাভারতের আদিপর্বের একটি শ্লোকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে গুহ্যক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলা হয়েছে—

অশ্বিনৌ গুহ্যকান্ বিদ্ধি।

[মহা (k) ১.৬৬.৪০; (হরি) ১.৬১.৪০]

☐ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় গুহ্যকগণ উপস্থিত হয়েছিলেন। *[মহা (k) ১.১৮৭.৭; (হরি) ১.১৮০.৭]*

☐ প্রলয়কালে একবার মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বালকরূপধারী শ্রীহরির উদরমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় তিনি গুহ্যকদেরও সেখানে আশ্রিত অবস্থায় দেখেন।

[মহা (k) ৩.১৮৮.১১৯; (হরি) ৩.১৫৯.১১৯]

☐ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের একটি শ্লোকে দেবতা, গন্ধর্ব, গুহ্যক প্রমুখদের গুণাবলীর একটি তুলনামূলক বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে গুণের বিচারে গুহ্যকরা গন্ধর্বদের তিন-চতুর্থাংশ মাত্র। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৬৭]*

☐ বিষ্ণু বামনাবতারে পৃথিবীতে যখন আবির্ভূত হন সে সময় বিবিধ প্রাণীরা তাঁর দেহের বিভিন্ন অঙ্গ নির্মাণ করেছিলেন বলে কল্পনা করা হয়। তখন গুহ্যকরা বামনরূপী শ্রীহরির হাতের আঙুল নির্মাণ করেছিলেন।

[মৎস্য পু. ২৪৬.৫৩]

☐ মহাভারতের স্ত্রীপর্বের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যে সকল যোদ্ধারা শ্রান্তি বা দুর্বলতাবশতঃ যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ করে পরিত্রাণ পাওয়ার অপেক্ষায় অপরের অস্ত্রাঘাতে নিহত হয়েছিলেন তাঁরা গুহ্যকলোক প্রাপ্ত হন।

[মহা (k) ১১.২৬.১৪; (হরি) ১১.২৬.১০]

গৃৎস ভৃগুবংশীয় মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ১৪৬.১০০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩২.১০৬]

গৃৎসমদ অন্যতম প্রাচীন বৈদিক ঋষি। ঋগ্‌বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের একাধিক সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হিসেবে গৃৎসমদের নাম উল্লিখিত হতে দেখা যায়। কখনও অগ্নিদেবতা, কখনও ইন্দ্র আবার কখনও বা অশ্বিনীকুমারদের উদ্দেশে তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। ঋগ্‌বেদের সূক্তেই কিন্তু 'গৃৎসমদ' নামে একাধিক ঋষি বা ঋষি সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। ঋগ্‌বেদের একাধিক মন্ত্রে গৃৎসমদ শব্দটি বহুবচনে উল্লিখিত হওয়ায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়। পরে, ব্রাহ্মণগ্রন্থের কালে অবশ্য গৃৎসমদের পুত্র বা শিষ্য পরম্পরায় এই ঋষিরা 'গার্ৎসমদ' নামে অভিহিত হয়েছেন।

[ঋগ্‌বেদ ২.৪; ২.১৯; ২.৩৪; ২.৩৯; ২.৪১ ইত্যাদি সূক্ত]

☐ ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে ঋষি গৃৎসমদের নাম মূলত দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ইনি ইন্দ্রের উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণ করে ইন্দ্রের

বলবৃদ্ধি করেছিলেন। সেই কারণেই পরবর্তী সময়ে তিনি ইন্দ্রের প্রিয় সখা হয়ে ওঠেন। কৌশিতকী ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের সঙ্গে গৃৎসমদের এই সখ্য প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে যে, ইন্দ্রসখা গৃৎসমদ শুধু যে ইন্দ্রলোকে বিশিষ্ট স্থান এবং সমাদর লাভ করেছিলেন তাই নয়, ইন্দ্রের সখা হিসেবে দেবলোকের ভোগ-সুখেও তিনি অংশীদার ছিলেন। ঐতরেয় আরণ্যকেও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রাপ্ত উল্লেখের সমর্থন মেলে।

প্রসঙ্গত কৌশিতকী ব্রাহ্মণেই প্রথমবার স্পষ্টভাবে গৃৎসমদ ঋষিকে ভার্গব নামে সম্বোধিত হতে দেখা যায়। ঋগ্‌বেদের মন্ত্রে একাধিকবার গৃৎসমদকে 'শুনহোত্র' বা শুনহোত্রের শিষ্য বলে উল্লেখ করা হলেও কখনওই 'ভার্গব' বলা হয়নি। যাই হোক, মহর্ষি গৃৎসমদের বিশদ পরিচয় বা 'শুনহোত্র' এবং ভৃগুবংশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা আমরা মহাভারত এবং পুরাণগুলিতে বিশদে পাব।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (Haug) ৫.২;
ঐতরেয় আরণ্যক (Keith) ২.২.১;
কৌশিতকী ব্রাহ্মণ (Lindner) ২২.৪; ২৮.২;
ঋগ্‌বেদ ২.১৮.৬; ২.৪১.১৪, ১৭]

□ মহাভারতে এবং পুরাণগুলিতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মহর্ষি গৃৎসমদ জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তিনি ক্ষত্রিয় রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। বিশ্বামিত্রের মতোই ইনিও ক্ষত্রোপেত দ্বিজ ছিলেন।

বিষ্ণু পুরাণ এবং ভাগবত পুরাণে দেখা যাচ্ছে যে, চন্দ্রবংশীয় আদি রাজা পুরূরবার পুত্র আয়ু। আয়ুর পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশে সুহোত্রের পুত্র ছিলেন গৃৎসমদ। এই গৃৎসমদ পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। গৃৎসমদের পুত্র ছিলেন বিখ্যাত মহর্ষি শৌনক। বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে প্রদত্ত পরিচয়টি অবশ্য ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত শুনহোত্র বা সুনহোত্রের সঙ্গে মিলে যায়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে স্পষ্টভাবেই ক্ষত্রবৃদ্ধ বংশীয় সুনহোত্রকে গৃৎসমদের পিতা বলা হয়েছে। বায়ু পুরাণের পাঠে 'সুতহোত্র' নাম পাওয়া গেলেও ধ্বনিগত সাদৃশ্যের কারণে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণোক্ত সুনহোত্র পাঠটিকেই আমাদের সঠিক বলে মনে হয়। *[ভাগবত পু. ৯.১৭.৩;*
বিষ্ণু পু. ৪.৮.১; বায়ু পু. ৯২.৩-৪;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৬.৮৭; ২.৬৭.৪]

□ মৎস্য পুরাণে গৃৎসমদকে ভৃগুবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি বলে উল্লেখ করা হলেও ভৃগুবংশের সঙ্গে গৃৎসমদের সম্পর্কের বিশদ তথ্যটি শুধুমাত্র মহাভারতেই মেলে।

মহাভারতের অনুশাসনপর্বে কাশী এবং হৈহয় রাজবংশের মধ্যে এক দীর্ঘ শত্রুতার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাশীরাজ দিবোদাস বার বারই হৈহয়রাজ বীতহব্যের হাতে পরাস্ত হচ্ছিলেন। অবশেষে মহর্ষি ভরদ্বাজের কৃপায় যজ্ঞ করে দিবোদাস হৈহয়দের পরাস্ত করতে পারবে—এমন এক পুত্র লাভ করেন। এই পুত্রের নাম প্রতর্দন। প্রতর্দন বড়ো হলে রাজা দিবোদাস তাঁকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করলেন এবং হৈহয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করার আদেশ দিলেন। পিতার আদেশে প্রতর্দন হৈহয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করার আদেশ দিলেন। পিতার আদেশে প্রতর্দন হৈহয়দের আক্রমণ করলেন। প্রতর্দনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হৈহয় রাজা বীতহব্যের পুত্ররা সকলে প্রাণ দিল। পরাজিত বীতহব্য রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে মহর্ষি ভৃগুর শরণাপন্ন হলেন। মহর্ষি ভৃগু বীতহব্যকে শুধু আশ্রয় দিলেন না, তাঁকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন এবং ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে তাঁকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করলেন। এর ফলে প্রতর্দন বীতহব্যকে বধও করতে পারলেন না, পাশাপাশি বীতহব্যের বংশ ভার্গব ব্রাহ্মণ হিসেবে পরিচিত হল। মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে যে, গৃৎসমদ এই বীতহব্যের পুত্র ছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি 'ভার্গব' নামেই পরিচিতি লাভ করেন।

মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী, একবার দৈত্যরা গৃৎসমদকেই ইন্দ্র মনে করে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হয়। আমরা ধারণা করতে পারি—ব্রাহ্মণগ্রন্থে গৃৎসমদের সঙ্গে ইন্দ্রের সখ্য এবং ইন্দ্রলোকে গৃৎসমদের সমাদরের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তা থেকেই এই কাহিনীর জন্ম।

পুরাণগুলিতে শৌনক বা শুনক কে গৃৎসমদের পুত্র বলা হলেও মহাভারতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, শুনক এবং তাঁর পুত্র শৌনক গৃৎসমদের বংশে বহু পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করেন। গৃৎসমদের পুত্র ছিলেন সুচেতা (সুচেতস্)। এই সুচেতার পুত্র-পৌত্র পরম্পরায় ভৃগুবংশে রুরু নামে এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। রুরুর ঔরসে প্রমদ্বরার গর্ভে জন্ম নেন শুনক এবং শুনকের পুত্র শৌনক।

মহাভারতের এই বিবরণ এই জন্যই বেশি গ্রহণযোগ্য যে, এই ভার্গব শৌনক শুধু বিখ্যাত কুলপতি ঋষিই ছিলেন না, নৈমিষারণ্যে এঁর সামনে বসেই সৌতি উগ্রশ্রবা মহাভারত কথা শুনিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে গৃৎসমদ শৌনকের বহুপূর্বপুরুষ হবেন—সেটাই স্বাভাবিক।

[দ্র. বীতহব্য, হৈহয়, শৌনক]

[মহা (k) ১৩.৩০.১৯-৬৫; (হরি) ১৩.২৯.১৯-৬৫; মৎস্য পু. ১৫৫.৪৪-৪৫]

□ কুরুক্ষেত্রে শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে ঘিরে যেসব মুনি ঋষিরা উপস্থিত ছিলেন, গৃৎসমদ তাঁদের মধ্যে একজন। কৃষ্ণ শিবসহস্রনাম স্তোত্র সকলকে শোনালে উপস্থিত মুনি ঋষিরা ভগবান শিবের মাহাত্ম্য আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়লেন। এপ্রসঙ্গে গৃৎসমদ স্মৃতিচারণ করে জানিয়েছেন—একসময় মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিশাপে গৃৎসমদ মৃগরূপ লাভ করেন। মৃগরূপেই তিনি কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করেন এবং মহাদেবের বরে অজর-অমর এবং পরমজ্ঞানী হয়ে ওঠেন।

[মহা (k) ১৩.১৮.১৯-২৯; (হরি) ১৩.১৭.১৯-২৯]

গৃধ্র কৃষ্ণের ঔরসে মিত্রবিন্দার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন। *[ভাগবত পু. ১০.৬১.১৬]*

গৃধ্রকূটতীর্থ গয়াক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। পরশুরামের ক্ষত্রিয়-নিধনের সময় মুষ্টিমেয় কিছু ক্ষত্রিয় সন্তান তাঁর হাত থেকে রক্ষা পান। এঁদের মধ্যে হৈহয়বংশীয় বৃহদ্রথ একজন। কৃষ্ণবর্ণ বানরগণ গৃধ্রকূট পর্বতে গোপন করে রেখে বৃহদ্রথের প্রাণরক্ষা করেছিলেন।

[মহা (k) ১২.৪৯.৮২; (হরি) ১২.৪৮.৮৯; বায়ু পু. ৭৭.৩৮, ৯৭]

□ ভগবান শিব গৃধ্রেশ্বর নামে যে পর্বতে বিরাজ করেন, তা গৃধ্রকূট রূপে পরিচিত। মহর্ষিগণ এই পর্বতে গৃধ্ররূপে তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করেন। গৃধ্রকূটের গুহায় পিণ্ডদান করলে শিবলোক প্রাপ্তি হয়। সেখানে একটি পবিত্র বটবৃক্ষ রয়েছে যা দর্শনে অভীষ্ট লাভ হয়। গৃধ্রকূটে পিতৃগণের প্রিয় একটি শূলক্ষেত্রও বর্তমান। *[বায়ু পু. ১০৮.৬০-৬৫]*

□ গৃধ্রকূট ভগবান নারায়ণের অবস্থানস্থলও বটে। তাঁর আদি-গদাধর রূপ গৃধ্রকূটে ব্যক্ত।

[বায়ু পু. ১০৯.১৫; ১১১.২২]

গৃধ্রপত্র স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচর, একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৭৪; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

গৃধ্রবট১ গয়াক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। গৃধ্রবট তীর্থে মহাদেব পূজিত হন গৃধ্রেশ্বর নামে। এই তীর্থ দর্শনে ব্রাহ্মণ ব্যক্তি দ্বাদশ বৎসরের ব্রতচারণের ফল পাবেন। অন্যান্য বর্ণের ব্যক্তি গৃধ্রবট তীর্থে গমন করলে তাঁদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়।

পিণ্ডদানের পক্ষে গৃধ্রবট তীর্থ অত্যন্ত উপযোগী।

[মহা (k) ৩.৮৪.৯১-৯২; (হরি) ৩.৬৯.৯১-৯২; অগ্নি পু. ১১৬.১২]

□ বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, গৃধ্রকূট পর্বতের উপর একটি পবিত্র বটবৃক্ষ রয়েছে। এই বটবৃক্ষ দর্শনে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। এই বিশেষ বৃক্ষটিই গৃধ্রবট তীর্থ নামে বিখ্যাত। *[বায়ু পু. ১০৮.৬৩]*

গৃধ্রবট২ সৌকর ক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি তীর্থ। পুরাকালে এই স্থানে এক শকুনি বা গৃধ্র দেহত্যাগ করে পরবর্তী জন্মে মনুষ্যযোনি লাভ করেছিল। সে কারণেই এই তীর্থটি গৃধ্রবট নামে পরিচিত।

উত্তর প্রদেশের ইঠা (Itha) জেলার ২৭ মাইল উত্তর-পূর্বে গঙ্গা নদীর তীরে সোরোন (Soron) হল সৌকর ক্ষেত্রের আধুনিক অবস্থান। গৃধ্রবট তীর্থটি এই অঞ্চলেরই অন্তর্গত।

[বরাহ পু. ১৩৭.৫৬; HPAI (Arya) p. 28]

গৃধ্রীকা কশ্যপের ঔরসে তাম্রার গর্ভজাত ছয় কন্যার মধ্যে গৃধ্রীকা (মতান্তরে গৃধ্রী) একজন।

গৃধ্রীকার গর্ভে অরুণের ঔরসে সম্পাতি ও জটায়ু জন্মগ্রহণ করেন। *[বিষ্ণু পু. ১.২১.১৫, ১৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৪৪৬-৪৪৮; মৎস্য পু. ৬.৩০-৩২]*

গৃধ্রেশ্বর *[দ্র. গৃধ্রকূট]*

গৃহেষু বায়ু পুরাণ মতে ভবিষ্যৎ তৃতীয় সাবর্ণি মনুর পুত্রদের মধ্যে একজন। *[বায়ু পু. ১০০.৮৪]*

গেয়মর্থক একটি প্রাচ্যদেশীয় জনপদ। পণ্ডিত D.C. Sircar তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, পুরাণভেদে এই জনপদের নামের পাঠান্তর দেখা যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণের পাঠে এই জনপদটির নাম গেয়মল্লক। মার্কণ্ডেয় পুরাণের কোনো কোনো

পাঠে ভার্গব এবং মল্লক নামে দুটি পৃথক জনজাতির নাম পাওয়া যায়—

ভার্গবা জ্ঞেয়মল্লকাঃ।

বায়ু পুরাণে গেয়মর্থক, মৎস্য পুরাণে গেয়মালব, বামন পুরাণে গেয়মর্ষক বা গেয়মর্ষকা। এই জনপদটির নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। *[মৎস্য পু. ১১৪.৩৪; মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.৪৩; বামন পু. ১৩.৪৫; বায়ু পু. ৪৫.১২৩;* GAMI *(Sircar) p.37]*

গো১ ভারতবর্ষের সমাজে গো বা গোরুর মর্য্যাদা কতটা ছিল, তা বোঝা যায় মহাভারতের অনুশাসনপর্বে গোরুর মর্য্যাদাবিষয়ক কতগুলি অধ্যায় থেকে। এখানে প্রথমেই প্রশ্ন উঠছে— দেবতাদের থেকেও গোরুর মাহাত্ম্য বেশি হয় কী করে—

দেবানাং ভগবন্ কস্মাল্লোকেশানাং পিতামহ।
উপরিষ্ঠাদ্ গবাং লোক এতদিচ্ছামি বেদিতুম্॥

দেবরাজ ইন্দ্রের এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বললেন—গোরুদের যজ্ঞের অঙ্গ বলা উচিত। যজ্ঞে গোজাত দ্রব্য এত বেশি এবং এতবার করে লাগে যে, যজ্ঞকে প্রায় গোরুই বলা যায়—

যজ্ঞাঙ্গং কথিতা গাবো যজ্ঞ এব চ বাসব।

গোজাত যত দ্রব্য—দুধ, দই, ঘি—এগুলি ছাড়া কোনো যজ্ঞই যেহেতু সম্পন্ন হয় না, তাই গোরুর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে উঠেছে যজ্ঞ—

স্পতে দধিঘৃতেনেহ ন যজ্ঞঃ সম্প্রবর্ততে।
তেন যজ্ঞস্য যজ্ঞত্বমতো মূলং চ কথ্যতে॥

মহাভারত বলেছে—পুষ্টির জন্যও গোরুর মাহাত্ম্য এবং পবিত্রতা তৈরি হয়েছে। গোরুর দুধ-দই-ঘৃতে সমস্ত মানুষের পুষ্টি হচ্ছে, আবার গোরু থেকে জন্মানো বলদ দিয়েই ভারতবর্ষের কৃষিকর্ম সম্পন্ন হয়। দেবতা এবং পিতৃলোকের হব্য-কব্য সবই গোদুগ্ধ এবং গোদুগ্ধজাত বস্তু দিয়েই তৈরি হয়। ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত হওয়া সত্ত্বেও গোরু (বলদ) ভার বহন করে মানুষের উপকার করে। মানুষের ক্ষেত্রে এই সার্বিক সহায়তার কারণেই গোরুদের স্থান দেবতাদেরও ওপরে। মহাভারতের এই অনুশাসনপর্বেরই অন্যত্র গোরুকে মানুষের জননীর সমান মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে—

মাতরঃ সর্বভূতানাং গাবঃ সর্বসুখপ্রদাঃ।

[মহা (k) ১৩.৮৩.২-২৩; ১৩.৬৯.৭-৮; (হরি) ১৩.৭২.২-২৩; ১৩.৫৭.৭-৮]

□ মহাভারতের উপদেশাত্মক didactic অংশগুলিতে গোরু প্রায় দেবতার মতোই পূজ্য হয়ে উঠেছে। গোরুর অবজ্ঞা করা তো দূরের কথা, গোরুর গায়ে পায়ের ছোঁয়া লাগাটাও শাস্ত্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ। গার্হস্থ্য জীবনে গাই-বলদের খেয়াল রাখা এবং তাদের পালন-পোষণ করাটা মহাভারতের কালে স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন কিংবা তাদের ভরণ-পোষণ করার সমপর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল। মহাভারতে যুধিষ্ঠির বনে যাবার সময় বহুতর ব্রাহ্মণেরা যখন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বনে যেতে চাইলেন, তখন বনবাসের কৃচ্ছ্রতা এবং অর্থাভাবের মধ্যে সেই ব্রাহ্মণদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে কীভাবে তাঁদের প্রতিপালন করবেন, সেই প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের বলেছিলেন—আমার সঙ্গে যাঁরা বনে যাবেন আমারই অনুগামী হয়ে, আমার সঙ্গে যাঁরা সেখানে থাকবেন, তাদের পালন-পোষণ না করতে পারলে তো আমার দোষ হবে। যুধিষ্ঠির বললেন—গার্হস্থ্য জীবনে কতগুলি বস্তু এবং মানুষকে নিত্য খেয়াল রাখতে হয়, তা নইলে সব ছারখার হয়ে যাবে। যেমন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের নিত্য কর্তব্য অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, গাই-বলদের খেয়াল রাখা, জ্ঞাতি, অতিথি, আত্মীয়দের দেখভাল করা, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার এবং ভৃত্যদের ভরণ-পোষণ—এগুলো যদি না করা যায় তবে গৃহস্থের সংসার ছারখার হয়ে যাবে—

অগ্নিহোত্রমনড্রাংশ্চ জ্ঞাতয়ো'তিথিবান্ধবাঃ।
পুত্রা দারাশ্চ ভৃত্যাশ্চ নির্দহেয়ুরপূজিতাঃ॥

এখানে স্ত্রী-পুত্র, জ্ঞাতি-অতিথিদের সঙ্গে 'অনড্বান্'—অর্থাৎ গাভী, বলদ এবং ষাঁড়ের অন্তর্ভুক্তি গোরুকে গার্হস্থ্য জীবনের একান্ত অংশ হিসেবে পরিচিত করে। পশু হিসেবে গোরুর এই অবস্থান এক সময়ে গোরুকে পূজ্য পর্যায়ে নিয়ে গেছে এবং তার প্রধান কারণ যজ্ঞকর্ম এবং পূজা-হোমের ক্ষেত্রে গব্য বস্তুর ব্যবহার। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে দানধর্মের আলোচনার মধ্যে গোদানের মাহাত্ম্য লেখা হয়েছে অধ্যায়ের পর অধ্যায় জুড়ে। সেই 'গোপ্রদানিক' নামে একটি উপপর্বে গোরুর নানান মাহাত্ম্য এবং গুণকীর্তনের সময় বলা হয়েছে যে, গোসেবা বা গোরুর মধ্যেই সমস্ত ভূতজগৎ বা প্রাণধারীদের প্রতিষ্ঠা— গোরু আমাদের চিরকালীন পুষ্টির নিদান— গাবঃ পুষ্টিঃ

সনাতনী—গোরু আমাদের খাদ্য দেয়, দেবতাদের খাদ্য দেয় ঘৃতধারায়—

অন্নং হি পরমং গাবো দেবানাং পরমং হবিঃ।

গোরুর সম্মান এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সকাল-সন্ধ্যায় গোরুকে নমস্কার করার কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনই তাদের মূত্র পুরীষেও যাতে কোনো ঘৃণার উদ্রেক না হয় সে বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে এখানে। গোমাংস-ভক্ষণের প্রশ্নই এখানে ওঠে না, কেননা গোজাত দ্রব্যের পুষ্টির কথাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—

গবাং মূত্রপুরীষস্য নোদ্বিজেত কথঞ্চন।
ন চাসাং মাংসমশ্নীয়াদ্ গবাং পুষ্টিং তথাপ্নুয়াৎ॥

গোমাহাত্ম্যকীর্তনের মধ্যে বারবার এসেছে দুগ্ধ এবং ঘৃতের উপযোগিতার কথা। গোসেবার প্রাধান্যও তৈরি হয়েছে এই পুষ্টির জন্যই। গোরুকে খাওয়ানোর কথা বলা হয়েছে নিজের মতো করে সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ হবার পর গোরুকে কিছু খাদ্য দেবার রীতি ছিল এই খাদ্যদানের পারিভাষিক নাম ছিল 'গবাহ্নিক দান'। গোরুর এই মাহাত্ম্যের নিরিখে মহাভারতের অনুশাসন পর্বের সম্পূর্ণ চারটি অধ্যায় জুড়ে শুধু গোদানের মাহাত্ম্যের কথাই বলা হয়েছে। গোরুর সঙ্গে গৃহস্থ মানুষের সম্পর্কটাও এমন শব্দে গ্রথিত হয়েছে, যেখানে গোরু এতটাই তার আত্মজন যে, গৃহস্থের প্রার্থনা হল—আমি যেন সবসময় গোরুগুলিকে দেখতে পাই এবং আমি চাই গোরুরাও আমাকে সর্বদা দেখে রাখুক। যেন বলতে পারি—গোরুগুলি যেমন আমাদের তেমনই আমরাও গোরুদের—যেখানে গোরু আমরাও সেখানে—

গা বৈ পশ্যাস্যহং নিত্যং গাবঃ পশ্যন্তু মাং সদা।
গাবোঽস্মাকং বয়ং তাসাং যতো গাবস্ততো বয়ম্॥

[মহা (k) ৩.২.৫৭; ১৩.৭৮.৫-২৪; ১৩.৭১-৭৪ অধ্যায়; (হরি) ৩.২.৫৫; ১৩.৬৩.৫-২৫; ১৩.৫৮-৫৯ অধ্যায়]

□ সর্বত্রই এটা একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে যে, দধি, দুগ্ধ, ঘৃতের উপকারিতার কারণেই এই তিন গব্যবস্তুর মাহাত্ম্য খ্যাপিত হয়েছে, সেখানে গোময় এবং গোমূত্রের পবিত্রতার কারণ কী? এটা তো সাধারণ ধারণা যে, এককালে গোময় দিয়ে গৃহ লেপন করার পর গৃহের প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠ শুদ্ধ বলে মনে হত। গায়ে গোময় লেপন করে স্নান করাও পবিত্র বলে ভাবা হত—

গোময়েন সদা স্নায়াৎ করীষে চাপি সংবিশেৎ।

গোমূত্র সেবন করারও রীতি ছিল সেকালে—

ত্র্যহমুষ্ণং পিবেন্মূত্রং ত্র্যহমুষ্ণং পিবেৎ পয়ঃ।

গোময় এবং গোমূত্রের পবিত্রতা এবং মাহাত্ম্য নিয়ে একটি পুরাকথারও উল্লেখ রয়েছে মহাভারতে। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, কোনো এক সময় ভগবতী লক্ষ্মী তাঁর অসামান্য রূপ নিয়ে একটি গোসমাবেশে গোরুদের মধ্যে বিচরণ করতে লাগলেন। গোরুরা লক্ষ্মীর রূপ দেখে বিস্মিত হয়ে লক্ষ্মীকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করল—

ইচ্ছাম ত্বা বয়ং জ্ঞাতুং কা ত্বং ক্ব চ গমিষ্যসি।

লক্ষ্মী বললেন—আমি সমস্ত লোকের প্রিয়। আমার নাম শ্রী। আমি দৈত্যদের ত্যাগ করেছি বলে তাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। আর আমি দেবতাদের ঘরে এসেছি বলেই তাদের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। আর এই যে বড়ো বড়ো দেবতাদের দেখছো ইন্দ্র, বিষ্ণু, অগ্নি আর যত দেবতা এবং ঋষিরা—আমি তাঁদের মধ্যে আছি বলেই তাঁদের যত সিদ্ধি। আজকে আমি যদি তাঁদের মধ্যে না থাকি তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে তাঁদের। আমার এই ধরনের প্রভাব আছে বলেই বলছি—আমি তোমাদের সবার মধ্যে থাকতে চাই। আমি নিজেই যেচে বলছি, তোমরা গ্রহণ করো আমাকে এবং লক্ষ্মীমন্ত হও তোমরা।

গোরুরা লক্ষ্মীর কথা শুনে বলল—তোমার কোনো স্থিরতা নেই, তুমি খুব চঞ্চলাও বটে। তাছাড়া যার তার কাছে যেতেও তোমার বাধে না—

অধ্রুবা চপলা চ ত্বং সামান্যা বহুভিঃ সহ।

—তোমাকে আমরা চাই না, তোমার যেখানে ভালো লাগে সেখানে যাও। লক্ষ্মী বললেন—এ তোমাদের কেমন ব্যবহার! সমস্ত লোক আমাকে চায়, আমাকে পাবার জন্য সকলে তপস্যা করে, আর তোমরা কিনা আমাকে এইভাবে অপমান করছো! তাছাড়া আমি নিজে যেচে তোমাদের বললাম, তাতে তোমরা যেভাবে আমাকে চলে যেতে বলছো, সেটা তো একটা চরম হার আমার কাছে।

গোরুরা তখন লক্ষ্মীকে বলল—আমরা তোমাকে অপমানও করিনি, তোমাকে হারিয়ে দেবার মতোও কিছু করিনি। শুধু বলেছি—তুমি

অস্থির এবং চপল এবং তোমাকে বর্জন করতে চাই আমরা। লক্ষ্মী বললেন—তোমাদের কাছে এই প্রত্যাখ্যানের ফলে সমস্ত লোকের কাছে আমি উপহাসের পাত্র হয়ে উঠবো—

অবজ্ঞাতা ভবিষ্যামি সর্বলোকস্য মানদাঃ।

আমি চাই, তোমরা আমাকে এই অপমান থেকে বাঁচাও। এতটুকু সম্মান তোমাদের কাছে আমি আশা করতে পারি। আমি তোমাদের শরীরের মধ্যে থাকতে চাই। গোরুরা তখন বলল—ঠিক আছে। তুমি যদি আমাদের শরীরের কোথাও অবস্থান করার সম্মান চাও, তাহলে তুমি আমাদের মূত্র-পুরীষের মধ্যে অবস্থান করো—

অবশ্যং মাননা কার্য্যা তবাস্মাভির্যশস্বিনি।
শকৃন্মূত্রের নিবস ত্বং পুণ্যমেতদ্ধি নঃ শুভে॥

লক্ষ্মী মেনে নিলেন গোরুদের কথা। বললেন, তবে তাই হোক, আমি এটাই তোমাদের অনুগ্রহ মনে করে সম্মানিত বোধ করছি। লক্ষ্মীর এই প্রতিজ্ঞার ফলেই সমস্ত গোজাতির শকৃৎ-মূত্র সেইকাল থেকে পরম পবিত্র বলে গণ্য হতে লাগল। আধুনিক কালে এটা অবশ্যই মনে হবে যে, গো-কুলের মূত্র-পুরীষের মাহাত্ম্যসৃষ্টি করার জন্যই ত্রিভুবন পূজিতা লক্ষ্মীকে এইভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.৮২.২-২৬; (হরি) ১৩.৭১.২-২৬]

□ মহাভারতের গোমাতা বা গোরুর প্রয়োজনীয়তা যতই থাকুক, প্রাচীন সংস্কৃতের শাস্ত্রীয় ভাষায় গো-শব্দের অর্থব্যাপ্তি দেখে চমৎকৃত হতে হয়। পৃথিবীর ইতিহাস এবং প্রাচীনতম সাহিত্যে গোরু অর্থাৎ 'গো' ভারতীয় কৃষ্টির মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করেছিল যে, অন্য কোনো প্রাণী—বাঘ, সিংহ কিংবা হাতি যেখানে বিশ্বসাহিত্যে বহুল বন্দিত, সেখানে বেদ-উপনিষদ-মহাভারতে গো বা গোরুর উল্লেখ যত বার হয়েছে ততটা অন্য কোনো প্রাণীর নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা—আর্য-জীবনের সঙ্গে গো-শব্দটি এমন সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ তৈরি করেছে, এবং গো শব্দের ব্যবহার আমরাই এত বিচিত্রভাবে করেছি যে, বুঝতেও পারি না—সেই শব্দও নিতান্তই গব্য।

গো-শব্দের একটা অর্থ হল—সূর্যরশ্মি। খোদ মহাভারতে খাণ্ডব দহনের সময় মন্দপাল ঋষির পুত্রেরা যখন অগ্নির স্তুতি করেছে, তখন বলা হয়েছে—রবিরশ্মির মধ্যে তাপিত-তপ্ত করার যে উপাদানটি থাকে, সে তাপিনী শক্তি তুমি ছাড়া আর কেউ নয়—কিন্তু এখানে রবিরশ্মির পর্যায়শব্দ হল—

গোন্যন্যস্তপ্তা বিদ্যতে গোষু দেব।

আবার 'গো' অর্থ চাঁদের জ্যোৎস্না বা চন্দ্ররশ্মিও বটে। ভাগবত পুরাণে শারদ রাস আরম্ভ হচ্ছে। সেখানে উদ্দীপনের কথা বলতে গিয়ে কবি বললেন—কৃষ্ণ যখন দেখলেন, সমস্ত বনরাজি নরম চন্দ্রকিরণে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে, তখন কৃষ্ণ রমণীমোহিনী তাঁর বাঁশীটি বাজালেন। এখানে চন্দ্রকিরণের পর্যায় শব্দটা কিন্তু গো—

বনঞ্চ তৎ কোমলগোভী রঞ্জিতং
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্।

'গো'-শব্দের অর্থ বাক্, অর্থাৎ কথা, কথা বলা। মহাভারত বিচার করেছিল কীভাবে এক একটা বংশ নামী এবং উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলা হয়েছে—একটি বংশে যদি অনেক ভালো মানুষ থাকেন, তাহলে তাঁর কুল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বহুল অর্থ সম্পত্তিতেও একটা কুলের উজ্জ্বলতা আসে। আর একটা বড়ো গুণ হল কথা, ভালো কথা, বাক্পটুতা, যাকে মহাভারত বলেছে 'গো'। কথা বা বাক্যের মাধ্যমে একটা কুল সার্থকভাবে কুল হয়ে ওঠে—

কুলানি সমুপেতানি গোভিঃ পুরুষতো'র্থতঃ।

আর একটি বংশের চরিত্রে যদি ভালো কথা বলার অভ্যাস না থাকে, যদি বহু গবাদি পশুধন, অশ্বধন না থাকে, যদি সুসমৃদ্ধা কৃষিব্যবস্থা না থাকে তাহলে কুলের মর্যাদা থাকে না। এখানেও বাক্য-কথা-বাক্ অর্থে গো শব্দ ব্যবহৃত—

গোভিঃ পশুভিরশ্বৈশ্চ কৃষ্যাচ সুসমৃদ্ধয়া।
কুলানি ন প্ররোহন্তি যানি হীনানি বৃত্ততঃ॥

এখানে গো শব্দটি বাগর্থে বাগ্‌দেবীকেই ইঙ্গিত করে অবশেষে। 'গো' অর্থ 'বাক্' অর্থাৎ বাগ্‌দেবী সরস্বতী। গবেষণা মানে বিদ্যা এবং জ্ঞান খুঁজে বেড়ানো বা অন্বেষণ এবং নিরন্তর অন্বেষণই যেখানে গবেষণার তাৎপর্য্য, সেখানে কিন্তু গোরু-খোঁজার মতো স্থূল মর্মটুকুও রয়ে গেছে। গোরু চরতে গিয়ে গোরু হারালে সেই গোরু খুঁজে আনতে যে ধৈর্য্য লাগে, সেই ধৈর্য্যের মর্ম বুঝি গবেষণার মধ্যেও আছে। সেইজন্যই গো-এষণা, গবেষণা, অর্থাৎ সরস্বতী-খোঁজা।

আর্য সমাজের গোরুর প্রিয়ত্ব এতটাই ছিল যে, গো শব্দের একটা অর্থ এই পৃথিবী। আমরা মহাভারত-পুরাণে পৃথিবীকে বারবার গোরূপে দেখতে পেয়েছি। ওই যে সেই 'যখন-যখনই ধর্মের গ্লানি আর অধর্মের অভ্যুদয়ে'র প্রশ্ন এসেছে, তখন পৌরাণিকের চোখে পৃথিবী অশ্রুমুখী গোরুর রূপ ধারণ করে ভগবান বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন—ধরায় অবতীর্ণ হবার জন্য—

গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না ক্রন্দন্তী করুণং বিভো।

পৃথিবীকে এইভাবে গোরুর প্রতীকে দেখার মধ্যে প্রাচীনদের মনের গভীরে গোরুর নিরীহতা, সহিষ্ণুতা এবং বিনা প্রতিবাদে মালিকের অত্যাচার সইবার প্রত্যক্ষ বৃত্তিগুলিই কাজ করেছে। আবার খুব বড়ো বড়ো রাজারা যখন নতুন নতুন নীতি আবিষ্কার করে এই পৃথিবীকে বহুল কর্ষণযোগ্য করে তুলেছেন, নব-নব শস্যের উৎপাদন ত্বরান্বিত করেছেন, পৃথিবীর আকর দ্রব্য লোহা, তামা ব্যবহারযোগ্য করে তুলেছেন, তখনও গোরুর উপমা দিয়ে বলা হয়েছে—অমুক রাজা পৃথিবী দোহন করেছেন এবং এখানে অবধারিতভাবেই পৃথিবীর পর্যায় শব্দ হিসেবে গো-শব্দটাই সরাসরি ব্যবহার করা হয়েছে—দুদোহ গাং স যজ্ঞায়—এ কথা আছে কালিদাসের রঘুবংশে এবং পুরাণগুলিতে। পৃথিবীর সঙ্গে গো এমনই এক অভিন্ন পর্যায়ে তৈরি করেছে, যাতে অনেকগুলি গোরুর অধিকারী মানুষ যেমন গোপতি, তেমনই এই পৃথিবীর অধীশ্বর রাজারও অন্য নাম হল গোপতি। পণ্ডিত R.S. Sharma তো গোটা একটা অধ্যায় লিখে ফেললেন—From Gopati to Bhupati: Changing positions of a king. *[মহা (k) ১.২৩২.৯; ৫.৩৬.২৮-৩১; (হরি) ১.২২৫.১১; ৫.৩৬.২৮-৩১; ভাগবত পু. ১০.২৯.৩]*

□ গোরু ছেড়ে যদি বৃষ বা ষাঁড় নিয়ে ভাবনা করা যায়, তখনও দেখা যাবে যে, সমাজ এবং সামাজিক ব্যবহারে প্রাণী হিসেবে বৃষের মর্যাদাই কিন্তু ভারতীয় ধর্ম এবং দর্শনের ক্ষেত্রে বৃষকে চরম আধ্যাত্মিকতার প্রতীক করে তুলেছে। খোদ মহাভারতে বৃষ মানে হল ধর্ম, বৃষ মানে জ্ঞান—

বৃষো হি ভগবান্ ধর্মঃ।

ঈশ্বরের মুখ থেকেই বৃষের ধর্মাত্মকতার কথা শোনা যাচ্ছে। তিনি বলছেন—এই পৃথিবীতে বৃষকেই ধর্ম বলে জানে মানুষ। আমাকে তুমি উত্তম সেই বৃষ বলেই জানবে—ধর্মই হল বৃষ—

* বিদ্ধি মাং বৃষমুত্তমম্।

* ধর্মশ্চ বৃষ উচ্যতে।

মহাভারত-বিখ্যাত বিষ্ণুসহস্রনামে ভগবান বিষ্ণুর একটি নামই হল বৃষ—

তেজো বৃষো দ্যুতিধরঃ সর্বশস্ত্রবিদাং বরঃ।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে শিবের বাহন ষাঁড়কে নিয়ে যত তামাশাই করা হোক—যেমন ভারতচন্দ্রে—বুড়া গোরু লড়া দাঁত ভাঙা গাছ গাড়ু—কিন্তু মহাভারত-পুরাণে বৃষ জ্ঞান এবং ধর্মের প্রতীক। বৃষবাহন শিব আসলে জ্ঞানবাহন শিব—শিবের কাছেই নিত্যানিত্য, সত্যাসত্য, ধর্মাধর্মের বিবেক জ্ঞান বা পার্থক্য করার জ্ঞান শিখতে হবে বলে শাস্ত্রীয় প্রবাদই এইরকম—

জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদ্ ইচ্ছেৎ।

একটি পুরাণে কৃষ্ণ ভগবান নিজেকে জ্ঞানের মহিমায় প্রকট করে শিবের প্রসঙ্গ তুলে বলেছেন—আমিই বৃষরূপে শিবকে বহন করি—

ততো'হং বৃষরূপেণ বহামি তেন তং প্রিয়ম্।

[মহা (k) ১২.৯০.১৩; ১২.৩৪২.৮৮-৮৯; ১৩.১৪৯.১৯০; (হরি) ১২.৮৮.১৬; ১২.২৮-৭৪; ১৩.১২৭.৬৬-৭৬; ব্রহ্মবৈবর্ত পু. (কৃষ্ণজন্ম) ৩৬.৫৭]

□ প্রাচীন ভারতীয় আর্য সমাজ—যারা প্রথম পর্যায়ে একেবারেই যাযাবর-বৃত্তি ছিলেন, তাঁদের প্রধান আজীব্য এবং উপজীব্য ছিল গোরু। গৃহপালনের জন্য এই নিরীহ জীবটি সবদিক থেকে এতই বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল যে, গোরুর সৃষ্টি নিয়ে মহাভারত-পুরাণে কাহিনী তৈরি হয়েছে।

মহাভারতে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার আদেশে দক্ষ প্রজাপতি মানুষ সৃষ্টি করতে লাগলেন। কিন্তু সেই সৃষ্ট মানুষের জীবন ধারণের উপায় অথবা তাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা তখনও হয়নি। ফলে মানুষ কীভাবে জীবন ধারণ করবে, এই নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। মানুষেরা কান্নাকাটি আরম্ভ করল—

প্রজাতান্যেব ভূতানি প্রাক্রোশন্ বৃত্তিকাঙ্ক্ষয়া।

এইরকম একটা কান্নাকাটির কথা যতই এখানে লেখা থাক, এই কাহিনীর প্রথমারম্ভে দেখা যাচ্ছে

যে, দক্ষ প্রজাপতি নাকি প্রাণীদের হিতকামনায় তাঁদের বৃত্তির কথাটাই আগে ভেবেছেন। অর্থাৎ কিনা, জন্মাবার পর মানুষের কীভাবে জীবনযাত্রা চলবে না চলবে, তাদের খাওয়া-দাওয়া কী হবে না হবে—এসব নাকি দক্ষ প্রজাপতি আগেভাগেই চিন্তা করছেন—

অসৃজৎ বৃত্তিমেবাগ্রে প্রজানাং হিতকাম্যয়া।

মানুষের বৃত্তি কী হবে—এই কথা ভেবে মানুষের প্রাণধারণের উপযোগী কোনো কিছু একটা সৃষ্টি করবেন বলে দক্ষ প্রজাপতি অমৃত পান করলেন। অমৃতপানের পর দক্ষের উদ্‌গার থেকে অপূর্ব এক সুগন্ধের সৃষ্টি হল। সেই সুগন্ধ থেকেই জন্ম নিলেন গোমাতা সুরভি—

দদর্শোদ্‌গারসংবৃত্তাং সুরভিং মুখজাং সুতাম্।

এই সুরভি থেকেই জন্ম হল শত শত কপিলা গাভীদের—যারা একাধারে 'লোকমাতৃকাঃ' কেননা গোদুগ্ধের মাধ্যমে তারা মানুষের পালন পোষণ করে। আর তাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল—তারাই মানুষের জীবিকা উপার্জনের প্রধান উপায় হয়ে উঠল—

সুবর্ণবর্ণাঃ কপিলাঃ প্রজানাং বৃত্তিধেনবঃ।

গোমাতা সুরভির সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সহায়তায় শত-সহস্র কপিলা গাভীর সৃষ্টি হল। কপিলা শব্দটি গাভীর সমার্থক। তারা স্বর্ণ-পিঙ্গল বর্ণা, জীবিকা নির্বাহকারিণী সৌরভেয়ী নামে পরিচিত হল। তারা অমৃতের মতো স্বাদু দুগ্ধ উপহার দিতে লাগল পৃথিবীকে। নদীর তরঙ্গ-জাত ফেনের মত তাদের দুগ্ধধারা এবং দুগ্ধজাত ফেন চারদিকে উপচে পড়ল এবং সেই দুগ্ধফেন বাছুরদের মুখ থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল ভূতলস্থিত মহাদেবের জটার ওপর। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন শিব মহেশ্বর—

স বৎসমুখ বিভ্রষ্টো ভবস্য ভুবি তিষ্ঠতঃ।
শিরস্যবাপতৎ ক্রুদ্ধঃ স তদৈক্ষত চ প্রভুঃ॥

এখানে মহাভারতের কাহিনীকার মনুষ্য-প্রয়োজনের তাগিদে সাধারণভাবে অপবিত্র বস্তুর ধর্মসঙ্গতি প্রতিষ্ঠা করছেন। গোরুর দুধ দোয়ানোর সময় গোবৎসকে দুগ্ধ পান করিয়ে দুগ্ধধারার চলমানতা সৃষ্টি করেছে মানুষ। কিন্তু গোবৎস-স্পৃষ্ট দুগ্ধ যেন পশুর উচ্ছিষ্ট বলে অগ্রহণীয় না হয়, তার জন্যই প্রথমত মহাদেবের ক্রোধসৃষ্টি, তার পরে তার ধর্মীয় সমাধান।

গোবৎস-মুখভ্রষ্ট দুগ্ধফেন মাথার ওপর পড়তেই শিব-মহাদেব ক্রুদ্ধচোখে তাকালেন কপিলা গাভীগুলির দিকে—সেগুলি সঙ্গে নানা বর্ণ ধারণ করল। বিভিন্ন গোরুগুলি যে নানা রঙের হয়, এই হল তার পৌরাণিক ব্যাখ্যা। মহাভারতের কবি এখানে অসাধারণ একটি উপমা দিয়েছেন। বলেছেন—সূর্য যেমন মেঘগুলিকে নানা বর্ণে রঞ্জিত করে তেমনই মহাদেবের নয়নজাত সেই ভীষণ তেজ পিঙ্গলবর্ণ কপিলা গাভীদের নানা বর্ণে রঞ্জিত করল—

তত্তেজস্তু ততো রৌদ্রং কপিলাস্তা বিশাম্পতে।
নানাবর্ণত্বমনয়ন্ মেঘানিব দিবাকরঃ॥

বিভিন্ন বর্ণতায় গোকুলের খুব ক্ষতিসাধন হয়নি দেখেই ব্রহ্মা প্রজাপতি এবার শিবকে বললেন—অমৃতপায়ী দেবতারা অমৃত পান করলেও যেমন অমৃত দূষিত কিংবা অপবিত্র হয় না, তেমনই বৎসলা ধেনুর বৎস (বাছুর) যদি তার মাতৃদুগ্ধ পান করে, তবে দুগ্ধও উচ্ছিষ্ট হয় না—তুমি মহাদেব! বৎসপীত দুগ্ধফেনকে উচ্ছিষ্ট ভেবো না—

অমৃতেনাবসিক্তস্ত্বং নোচ্ছিষ্টং বিদ্যতে গবাম্।

প্রজাপতি ব্রহ্মা তারপর অনেকগুলি গাভীর সঙ্গে মহাদেবকে একটা বৃষও উপহার দিলেন। সেই থেকে মহাদেব বৃষটিকে নিজের বাহন করলেন এবং আপন ধ্বজচিহ্ন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেন বৃষের। মহাদেব বৃষবাহন এবং বৃষভধ্বজ হলেন সেই থেকে।

[মহা (k) ১৩.৭৭.১০-২৯; (হরি) ১৩.৬২.১০-২৯]

□ সামাজিক ক্ষেত্রে গোরুর সার্বিক উপকারিতাই একসময় গোরুকে প্রাচীন মানুষের কাছে ধর্মীয়ভাবে পবিত্র এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সবসময় সংগ্রহের ইচ্ছায় পৌঁছে দিয়েছিল। ফলত গোরুর দুধের পুষ্টি আর গোরুর মাধ্যমেই জীবিকা—এই দুটিই প্রাচীনদের কাছে গোরুকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেনি, তাকে জীবনী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। ভারতীয় কৃষ্টি এবং ধর্মভাবনার সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্‌বেদ থেকে একথা প্রমাণ করা যাবে যে, গোরু এবং ষাঁড় মানুষকে খুব সহজে প্রত্যক্ষ খাদ্য দিয়েছে দুধ এবং মাংসের প্রত্যক্ষ সরবরাহ ঘটিয়ে—অর্থাৎ গোরুর দুধ এবং বৃষের মাংস। খাদ্যের পরে প্রশ্ন আসে জীবিকা—সেই জীবিকার

প্রধান আজীব্য ছিল পশু আরও পরিষ্কার শব্দে এই পশু অবশ্যই গোরু।

আশ্চর্য লাগবে শুনতে—ওই যে মহাভারত একটা শব্দ উচ্চারণ করল—'বৃত্তিধেনু' অর্থাৎ জীবিকার জন্য ধেনু—এই ধেনুর অর্থ কিন্তু সবৎসা গাভী অর্থাৎ প্রজননশক্তি সম্পন্ন গাভীই ব্যবসার কাজে লাগত, বন্ধ্যা গাভী নয়। হয়তো বা বন্ধ্যা গাভী ব্যবসায়ের উপযুক্ত ছিল না বলেই বৃষ ছাড়া একমাত্র বন্ধ্যা গাভীই যজ্ঞের বলি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বন্ধ্যা গাভীর পারিভাষিক নাম ছিল 'বসা'। অন্যদিকে ওই যে বৃত্তি-শব্দটা তার প্রতিশব্দ ছিল 'বার্তা'—বেদ-পরবর্তী যুগে বার্তা বলতে সবসময়েই ব্যবসা বুঝিয়েছে এবং বার্তা শব্দের প্রধান অর্থ ছিল—কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্য। গোরক্ষা বলতে গোপ্রজনন থেকে গোপালন এবং অবশেষে বিনিময়ের মাধ্যমে অন্যবস্তুর সংগ্রহ পর্যন্তই বোঝাত। লক্ষণীয়, ভগবদ্গীতাতেও যখন 'গোরক্ষা'-শব্দটিকে মাঝখানে রেখে বৈশ্য জনজাতি স্বভাবজ কর্মের কথা বলে—কৃষি-গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্যং কর্ম স্বভাবজম্—তখনই বোঝা যায় গোরুকে কেন্দ্র করেই একদিকে কৃষির বিস্তার অন্যদিকে বাণিজ্যেরও বিস্তার। হয়তো বা কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমিতে গোরুর একটা অবস্থান তৈরি হয়েছিল বলেই পশু হিসেবে গোবৃদ্ধি অথবা গোবর্ধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এবং তার জন্য ব্যবসায়িক প্রয়োজনেই প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের প্রান্ত দেশে গোরুর জন্য একটি পৃথক স্থান তৈরি হয়েছিল, যার পারিভাষিক নাম হল ব্রজ বা ব্রজভূমি। এক্ষেত্রে স্মরণ করা উচিত—মথুরায় কংস রাজার ব্রজভূমির কথা এবং মহাভারতের বনপর্বে পাণ্ডবদের কাছে ঐশ্বর্য্যদম্ভ প্রকাশ করার জন্য দুর্যোধন কর্ণদের গোপালনক্ষেত্র ব্রজভূমিতে গোপালকদের সঙ্গে কথা বলতে যাবার অজুহাত।

এক্ষেত্রে হরিবংশে এবং ভাগবত পুরাণে বর্ণিত গোরক্ষণ এবং গোবর্ধনের প্রয়োজনে ভগবৎ-প্রতিম কৃষ্ণকর্তৃক ইন্দ্রপূজার বিলুপ্তি বৈদিক ইন্দ্রের পরিবর্তে গোপালক কৃষ্ণের অধিক মাহাত্ম্য তৈরি করে দেয়। হরিবংশে দেখতে পাচ্ছি ব্রজের গোয়ালারা সব বর্ষারম্ভে ইন্দ্রযজ্ঞ করার আয়োজন করেছিলেন। তখন কৃষ্ণ বললেন—এই উৎসবের প্রয়োজন কি? পক্বকেশ এক গোপবৃদ্ধ এর উত্তরে বৃষ্টি আর কৃষির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন কৃষ্ণকে। তিনি বললেন—ইন্দ্রই আমাদের সনাতন রক্ষক (পাঠক খেয়াল করবেন ঋগ্‌বেদের ধারণাও তাই)। গোপবৃদ্ধ যে বক্তৃতাটি দিলেন, এক কথায় তাকে ঋগ্‌বৈদিক ইন্দ্রস্তুতির পৌরাণিক সংস্করণ বলা চলে। হরিবংশ জানাচ্ছে 'ইন্দ্রের সমস্ত প্রভাব জেনেও—প্রভাবজ্ঞোঽপি শক্রস্য —কৃষ্ণ বললেন—যারা কৃষিজীবী, যাদের শস্য ফলানোর প্রয়োজন আছে, তারা ইন্দ্রযজ্ঞ করুক। আমরা হলুম গিয়ে গোয়ালা, গোরুই আমাদের জীবন। যার কাছে অভীষ্ট ফল পাই, তাকে বাদ দিয়ে অন্যজনের পূজা করা তঞ্চকতা মাত্র। তার ওপরে যে পর্য্যন্ত কৃষি-জমি আছে সেই পর্য্যন্তই ব্রজের সীমা, সেই সীমার পরে বন, বনের পরে পাহাড়; সেই পাহাড়ই আমাদের অবিচল আশ্রয়—

বনান্তা গিরয়ঃ সর্বে সা চাস্মাকং গতির্ধ্রুবা।

অতএব ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রযজ্ঞ করুন, হলযজ্ঞ করুন কৃষকেরা, আর গোয়ালারা করুক গিরিযজ্ঞ—

গিরিযজ্ঞাস্তথা গোপা গিরিযজ্ঞঃ প্রবর্ত্ত্যতাম্।

কৃষ্ণ আরও বললেন—যার যত গোধন আছে সব নিয়ে সুখস্থানে পাহাড়ের কাছে গাছের তলায় ধুমধাম করে গিরিযজ্ঞ হোক। পূজা হল এবং গিরিযজ্ঞের মাধ্যমে কৃষ্ণই সে পূজা গ্রহণ করলেন। ব্রজবাসীরাও পাহাড়ের চূড়ায় কৃষ্ণকেই অধিষ্ঠিত দেখে প্রধানত তাঁরই শরণাগত হলেন। ঠিক এইভাবেই ইন্দ্রপূজা লুপ্ত হয়ে গেল।

কৃষ্ণের গিরিযজ্ঞ জলে ভাসিয়ে দেবার জন্য অনেক বৃষ্টি বর্ষণ করে, ব্রজবাসীদের শতেক পীড়া দিয়েও ইন্দ্র দেখলেন—কৃষ্ণ গোবর্ধন পাহাড়টি হাতে তুলে ধরে সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে সুরক্ষিত রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত আর্যস্বর্গ থেকে ইন্দ্র নেমে এলেন ভুঁয়ে— ভাবলেন এর দ্বারা দেবকার্য সাধিত হবে বুঝি। ঠিক এর পরেই ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের কেমনধারা একটা রফা হয়ে গেল। ইন্দ্র যা বললেন, তার ভাবটা ঠিক এইরকম—বাপু হে! ঠিক আছে, ঠিক আছে। এতকাল ধরে শ্রাবণ-ভাদ্র আর আশ্বিন-কার্তিক—এই চার মাস আমার পূজা আরাধনার সময় নির্দিষ্ট ছিল। এখন থেকে দুমাস আমার, আর দুমাস তোমার; অর্থাৎ কিনা বর্ষাকালটা আমার থাকল, শরৎকালটা পুরোই তোমার—

এষামর্ধং প্রযচ্ছামি শরৎকালং তু পশ্চিমম্।

তোমাকে লোকে ডাকবে গোবিন্দ বলে, যেহেতু তুমি হলে গিয়ে গোরুদের ইন্দ্র, আর আমাকে তো সবাই মহেন্দ্র বলেই ডাকে—

অহং কিলেন্দ্রো দেবানাং ত্বং গবাম্ ইন্দ্রতাংগতঃ।

এখানে এটা পরিষ্কার যে কৃষ্ণের গিরিযজ্ঞ আসলে তাঁদের জীবিকা এবং জীবন গো-বর্ধনের উৎসব-প্রতিষ্ঠা। *[দ্র. কৃষ্ণ১, ইন্দ্র, গোবর্ধন, গোপ]*

[মহা (k) ১৩.৭৭.১৪, ১৮; ৩.২৩৮.১৮-২৪; (হরি) ১৩.৬২.১৪, ১৮; ৩.২০১.১৯-২৩; ভগবদ্গীতা ১৮.৪৪]

□ সেকালের দিনে রাজাদের অর্থনৈতিক উপার্জনের একটা বড়ো উৎস ছিল ব্রজভূমি। আর ব্রজভূমি মানে কোনো বৃন্দাবন নয়, ব্রজ মানে হল এমন একটা জায়গা, যেখানে গোপালন, গোচারণটাই প্রধান হলেও ব্রজভূমি হল গোপ্রজনন কেন্দ্র। পরবর্তী সময়ে ব্রজভূমির কার্য-পরিধি গোরু ছাড়াও অন্য পশুর মধ্যে প্রসারিত হয়েছে। আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখতে পাচ্ছি— একজন রাজার করগ্রহণের যে সাতটি উৎস আছে—দুর্গ, রাষ্ট্র, খনি, বন ইত্যাদি তার মধ্যে 'ব্রজ' একটি এবং এই 'ব্রজ' নামক পারিভাষিক শব্দটির সংজ্ঞা হল—যেখানে গোরু-মোষ, উট-ঘোড়া ইত্যাদির ক্রয় বিক্রয় থেকে আরম্ভ করে দুধ-দই-মাখন, এমনকী ভেড়ার লোম পর্যন্ত রাজার আয়-ব্যয়ের নিদান তৈরি করে এই ব্রজভূমি—

গোমহিষ সজাধিকং খরোষ্ট্রমশ্বাশ্বতরং চ ব্রজঃ।

কিন্তু ব্রজের এই অর্থব্যাপ্তি, যেখানে অন্য পশুদেরও স্থান হয়েছে রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক উপাদানের মধ্যে ব্রজশব্দের এই বিশদ ব্যাপ্ত অর্থ তৈরি হয়েছে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থা পূর্ণতা পাবার পর খ্রিষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে। গোশালা অর্থে 'ব্রজ' শব্দটিই ঋগ্‌বেদে ব্যবহার হয়েছে। বলা হয়েছে—হে ইন্দ্র! তুমি গাভীর নিবাসস্থান ব্রজভূমির দরজা খুলে দাও আমাদের কাছে, আমাদের ধন দান করো তুমি—

গবামপব্রজং বৃধি কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ।

রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বা state formation সম্পূর্ণ হবার আগে, বিশেষত বৈদিক কালে, রাজারা যখন পররাজ্য-জয়ের সঙ্গে রাজসূয়-অশ্বমেধের মতো যজ্ঞগুলিকে সমমাত্রায় দেখছেন, তখন কিন্তু ব্রজ বলতে শুধুমাত্র গোরুদের চারণ-পালন-প্রজননের জন্য নির্দিষ্ট একটি ভূমিখণ্ডই বোঝাত। হয়তো সেটা ছোট্ট একটি গ্রাম, কিন্তু সেই গ্রামটা যদি ব্রজের সংজ্ঞা বহন করে তাহলে তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতাও কিছু ছিল। ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে দেখা যাবে যে, গ্রামশাসনের প্রসঙ্গে গ্রামের মধ্যে যে ছোট্ট ছোট্ট গৃহস্থ ঘর, তাদের নাম ছিল কুল। গ্রামশাসনের ক্ষেত্রে কুলপতির একটা ভূমিকা ছিল এবং তার পারিভাষিক নাম ছিল 'কুলপা'। ঋগ্‌বেদে এবার 'কুলপা' এবং 'ব্রজপতি' শব্দদুটিকে একত্রে এনে বলা হল—কুলপতিরা ব্রজপতির চার দিকেই ঘোরাফেরা করেন—

কুলপা ন ব্রজপতিং চরন্তম্।

এই যে ব্রজপতি, তিনি অবধারিতভাবে গোরুদের পালন-পোষণের সঙ্গে জরিত এবং সেখানে রাষ্ট্রের ব্যবসায়িক স্বার্থ জড়িত আছে।

একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, সেকালের প্রত্যেক রাজার মধ্যে একটি প্রত্যন্ত জায়গায় একটি ব্রজভূমি থাকত, যেখানে তাঁদের গোপ্রজনন কেন্দ্র থেকে গোপালন, গোচারণ সবই চলত এই ব্রজভূমির অধিকর্তার একটা রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ক্ষমতাও ছিল। এখনই এই সামান্য অনুমানটুকু করার সময়—কেননা মথুরারাজ কংসের অত্যাচার নিগৃহীত বসুদেব মথুরার রাজধানী থেকে কংস-রাজার ব্রজভূমি গোকুলেই কিন্তু শিশুকৃষ্ণকে রেখে এসেছিলেন এবং এখান ব্রজপতি কৃষ্ণের পালকপিতা নন্দ কিন্তু কংসরাজার কাছে ব্রজভূমির 'রেভিনিউ কালেকশন' জমা করতেন রাজকর হিসেবে তার প্রমাণ হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণে একাধিকবার পাওয়া যাবে।

[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (kangle) ২.৬.৭; ২.৬.১; ২.১.১৯; ৭.১৬.৫; ঋগ্‌বেদ ১০.১৭৯.২; ১০.১.৭; Vedic Index, p. 171]

□ ঋগ্‌বেদের মধ্যে যাজ্ঞিক ক্রিয়ার ফল হিসেবে দেবতাদের কাছে বহু বহু গাভী প্রার্থনা করে কত আহুতি দেওয়া হচ্ছে, তার কোনো শেষ নেই। ধর্মকার্যের এই স্থান ছাড়াও বেদের কালেই গোরু একেবারে পূর্ণ ব্যবসায়িক সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং এই গো-সম্পদ বা গোধন পাবার জন্য চুরি থেকে বড়ো বড়ো যুদ্ধ পর্যন্ত হয়ে

গিয়েছে। বিশেষত গোরু পাবার জন্য যুদ্ধ করাটা ঋগ্‌বেদের কালেই এত সহজ এবং প্রসিদ্ধ ছিল যে, একজন শক্তিমান রাজা যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন মানেই তাঁর প্রথম প্রয়োজন—কতগুলি গোরু তো আগে পাই, তারপর অন্য কিছু—

স সত্বভিঃ প্রথমো গোষু গচ্ছতি।

অন্য একটি ঋক্‌মন্ত্রে দুই ধনাঢ্য এবং উদ্যোগী পুরুষকে গোরু পাবার জন্য পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করতে দেখা যাচ্ছে। সেখানে মঘবান ইন্দ্র শক্তিমত্তর ব্যক্তিটিকে বন্ধু হিসেবে দেখছেন এবং তাকে গোসমূহ প্রদান করছেন—

গব্যং সৃজতে সত্বভির্ধুনিঃ।

গোরুর অর্থনৈতিক উপযোগিতার কারণেই আর্য পুরুষের গোসমূহের অধিকারী হতে চাইতেন—

বিরাজং গোপতিং গবাম্‌।

ঋত্বিক-পুরোহিতেরা বারবার গোরুকেই দক্ষিণা হিসেবে চাইতেন, সেটা অন্যান্য বহু ঋক্‌মন্ত্র থেকে প্রমাণ করা যেতেই পারে। কিন্তু ঋগ্‌বেদের একটি সূক্তে গোরুই দেবতা এবং যে কয়েকটি মন্ত্র ইন্দ্রের জন্য, সেগুলিতে ইন্দ্রের কাছে গোরুই প্রার্থনা করা হচ্ছে। ভরদ্বাজ এখানে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, তাঁর মুখোদ্‌গীর্ণ মন্ত্রগুলিতে গোরুর জন্য তাঁর মায়া এবং আকূতি ফুটে উঠেছে আদ্যোপান্ত। গৃহপালিত এই পশুটিকে এমন মায়াময়ী কবিতা আর কোথাও লেখা হয়নি। এই সূক্ত আরম্ভ হয়েছে গোরুর আবাহনে আর শেষ হয়েছে গোরুর প্রজনন-প্রার্থনায়।

গোরুর অর্থনৈতিক উপযোগিতার নিরিখেই বীর পুরুষেরা গাভী জয় করে আনার জন্য ধাবিত হতেন—

গা গব্যন্নভি শূরো ন সত্বা।

বীরের পক্ষে গোরু জিতে আনাটা তাকে 'গোজিৎ' উপাধি জুটিয়ে দিত। গোরুর জন্য যুদ্ধ ব্যাপারটা কেমন ছিল, সেটা Doris Srinivasan এর মতো এক অসামান্য গো-গবেষকের গ্রন্থ থেকে উদ্ধার করেই দেখানো উচিত—

The Rig Veda describes cattle wars (*gáviṣṭi, góṣāti*) in such vivid detail that one can readily imagine these contests: a group of warriors (2.25.4) seeking cattle (*vavíṣ, gaviṣá*) riding horses, using chariots (cf. 5.63.5), waving banners (cf. 4.13.2), are ready to contend for 'offspring, cattle, progency, waters, and fertile lands" (6.25.4). The scene of the clash is tumultuous. Warriors with bows and arrows (6.75.2; 10.38.1) keep the adversary at bay; horses are used to stampede the cattle (cf. 5.6.7; 4.38.4) and flaming torches drive the herd together (6.6.5; 8.75.7; 10.156.2). To assure success in gaining booty, the gods' assistance and protection is implored (6.59.7; 6.66.8; 8.5.26). The favorite god for such requests is Indra (1.33.3; 2.30.5; 3.30.20, 21; 3.50.3; 6.19.12; 6.19.12; 6.26.2; 6.35.2; 7.32.16). His cosmic feats establish him as releaser and lord of cows par excelence (see Chap. IV); also he gives herds of cattle at the times when he drinks soma (1.81.7). The descriptions of cattle fights could refer to secular skirmishes or formal ritualized combats.

Cattle fighters (*goṣuyudh-*) rode out against non-Aryan tribes (3.53.14), hostile strangers (*arí*: 1.121.15; 1.33.3) and the type of miser (*paṇí*) who stinted with regard to the sacrificial offerings (8.75.7). However, on whatever pasture they might go (8.4.18) cattle belonging to the Aryans were regarded as Aryan property. It is hard to believe that their herds were free from attack; but for the Vedic sacrificer there was a very real distinction between his herd and that of an outsider. That distinction rested in the belief that the power of the sacrifice benefited the worshipper and his possessions (cf. 8.68.13). It protected the worshipper's herd from theft and slaughter, and secured the grazing areas (6.28.4). Further, it was thought that Pūṣan would

follow the cattle of the yajamāna and of the singers (6.54.6), and that the milk cows would flow to him who had sacrificed in the past and would do so again in the future (1.125.4). On the contrary, as seen above, the cattle of strangers and those who abused or neglected the sacrifice were attacked by Aryan fighters.

[ঋগ্বেদ ২.২৪.৪; ৫.৩৪.৮; ১০.১৬৬.১; ৬.২৮.১-৮; ৯.৮৭.৭; Doris Srinivasan, concept of cow in the Rigveda, Delhi: Motilal Banarsidass, 1979, pp. 14-15]

□ গোরুর জন্য যুদ্ধ, গোধন লাভের জন্য রাজার রাজার শত্রুতা, কিংবা শুধুমাত্র গোরু পাবার জন্য বিনা কারণে বলবত্তর রাজার আক্রমণ—এই উদারণ কিন্তু সবচেয়ে ভালো আছে মহাভারতে। পাণ্ডব যখন বিরাট রাজার রাজগৃহে অজ্ঞাত বাস করছেন এবং সেই অজ্ঞাতবাসের কাল অবশিষ্ট প্রায়, তখন দুর্যোধনের তরফ থেকে প্রচুর অন্বেষণ চলল পাণ্ডবদের খুঁজে বার করার। গুপ্তচরেরা যখন কিছুতেই তাঁদের খুঁজে পাচ্ছে না, তখন হঠাৎই একদিন কৌরবদের কাছে খবর এল যে, বিরাট রাজার মহাবীর সেনাপতি কীচক মারা গেছেন। ত্রিগর্ত দেশের রাজা সুশর্মা এই খবরটা কৌরব দুর্যোধন এবং কর্ণের কাছে এই খবর দিয়ে প্রস্তাব করলেন বিরাট বাজার মৎস্যদেশ আক্রমণ করতে।

সুশর্মাই দুর্যোধন-কর্ণকে বললেন—ত্রিগর্ত এবং কুরুদেশ একসঙ্গে যৌথ আক্রমণ চালাক বিরাটের ওপর। আমরা জোর করে ওদের রাজধানী আক্রমণ করে ওদের রাজ্যটাকে ভাগ করে নিতে পারি অথবা ওদের সম্পদ-সূচক হাজার হাজার গোরু আমরা হরণ করে নিতে পারি—

অথবা গোসহস্রাণি শুভানি চ বহূনি চ।
বিবিধানি হরিষ্যামঃ প্রতিপীড্য পুরং বলাৎ॥

আমরা শুধু এই আক্রমণের বৈকল্পিত সমাধানটার ওপর জোর দিতে চাই। রাজধানী আক্রমণ করে রাজ্য এবং তার ধনসম্পদ ভাগ করে নেওয়া অথবা হাজার হাজার গোরু বিরাটের গোশালা থেকে বার করে আনা—

গাস্তস্য অপহরামাশু সহ সর্বৈঃ সুসংহতাঃ।

কর্ণ কিন্তু বিরাট রাজার গোধন হরণ করাটাই বেশি উপযুক্ত মনে করলেন এবং দেখা গেল এই প্রস্তাবে ভীষ্ম-দ্রোণরাও কোনো বাধা দিলেন না এবং তা দিলেননা এই কারণেই যে, হীনবল রাজাকে আক্রমণ করে গোধন করাটা সেকালের পররাষ্ট্রনীতির অঙ্গ ছিল এবং সেটা রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাত।

সৈন্য-সামন্তদের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলে দুর্যোধন মৎস্যদেশ আক্রমণের স্ট্রাটিজি ঘোষণা করলেন। বললেন—ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা আগের দিন গিয়ে বিরাটের গোশালার আধিকারিক গোপজনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে। তারপর তাদের পরাভূত করে বিরাটের গোশালা থেকে গোরুগুলিকে বার করে আনবেন সুশর্মা এবং তাঁর সৈন্যবাহিনী। কৌরবরা সসৈন্যে যাবেন সুশর্মার পিছন পিছন এবং সুশর্মার প্রথম আক্রমণের পরেই দুই ভাগে পৃথক-সংস্থিত কৌরববাহিনীর এক ভাগ বিরাট রাজ্য থেকে সুশর্মার হরণ-করা গোরুগুলিকে সংরক্ষিত করে কুরুরাজ্যের দিকে নিয়ে যাবে। আর এক প্রস্তুত থাকবে যুদ্ধের জন্য—

গবাং শতসহস্রাণি শ্রীমন্তি গুণবন্তি চ।
বয়মপ্যনুগৃহ্নীমো দ্বিধা কৃত্বা বরূথিনীম্॥

যেমন ঠিক হল, ঠিক সেইভাবেই কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর দিনে সুশর্মা বিরাট রাজ্য আক্রমণ করলেন। আর ঠিক তার পরের দিনেই কৌরবরা একত্রিত হলেন সুশর্মার পিছনে।

—মৎস্যরাজ বিরাটের গোসম্পদ সম্পদ হিসেবেই বিখ্যাত হয়েছে এবং দুর্যোধনের মুখে এই রাজ্য আক্রমণের প্রধান বিশেষণ হল—বিরাট রাজার পশুসম্পদ এবং কৃষি সম্পদে পুষ্ট রাজ্যটি—দুর্যোধন বলেছেন— পশুধান্য সমাকুলম্। মহারাজ বিরাট কিন্তু এই গোধন-হারকের বিরুদ্ধে ভাই-পুত্রকে নিয়ে নিজে গেছেন যুদ্ধে এবং সঙ্গে নিয়ে গেছেন যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল এবং সহদেবকেও। এই বিরাট আয়োজনটা কিন্তু গোরুগুলিকে শুধু উদ্ধার করে আনার জন্য এবং তাতে অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে গোরুর মর্যাদা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? আর বিরাট-রাজার গোশালাটি যে আসলে ব্রজভূমির মৌখিক রূপ এবং সেটা যে তাঁর রাষ্ট্রজীবিকার অন্যতম

অঙ্গ—সেটা বোঝা যায় তাঁর যুদ্ধের প্রস্তুতি দেখে এবং বোঝা যায় এই গোসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁর পূর্ব প্রচেষ্টা দেখে।

এখানে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেবো শুধু সহদেবের কথা। অজ্ঞাতবাসের সময় পাণ্ডব-কনিষ্ঠ সহদেব যখন বিরাট রাজার কাছে এসে বসতি-ভিক্ষা করলেন, তখন তিনি বিরাট-রাজার সামনে এসে বলেছিলেন—আমি আগে পাণ্ডবদের রাজবাড়িতে কাজ করতাম। কিন্তু তাঁরা যে বনবাসের ঝামেলায় কোথায় চলে গেছেন জানি না। কিন্তু আমি তো সাধারণ কোনো জায়গায় কাজও করতে পারবো না, তাই আপনার কাছে জীবিকার জন্য এসেছি। বিরাট জিজ্ঞাসা করলেন—কী ধরনের শিল্পকাজ তুমি জানো—

কিঞ্চাপি শিল্পং তব বিদ্যতে কৃতম্।

সহদেব বললেন—দেখুন মহারাজ! পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তাঁর রাষ্ট্রে আট লক্ষ গোরুর একটা সম্পদ তৈরি করেছিলেন এবং এই সংরক্ষিত সংখ্যা-স্থিতির মধ্যে শত শত গোরু সেখানে কেনাও হত বলে গোরুর সংখ্যা আরও বেশি দাঁড়াবে—

তস্যাষ্ট শত সাহস্র্যা গবাং বর্গাঃ শতং শতম্।

এগুলির সঙ্গে প্রজননক্ষম বৃষ ছিল দশ হাজার এবং বলদ ছিল অন্তত কুড়ি হাজার—অপরে দশসাহস্রা দ্বিস্তাবন্তস্তথা পরে। এই সমস্ত গো-বৃষদের শুভাশুভ লক্ষণ আমার জানা ছিল বলেই আমাকে তিনি আধিকারিকের কাজ দিয়েছিলেন। আমার নাম ছিল 'তন্তিপাল'।

সহদেব এইটুকু বলেই ছাড়লেন না, ফলে একজন উন্নতিশীল রাজার রাষ্ট্রজীবিকা হিসেবে ব্রজভূমিতে গোসম্পদ কীভাবে রক্ষিত এবং বিবর্ধিত হত, তা সহদেবের মুখে তাঁর 'একস্‌পারটাইজে'র বিবরণ শুনলেই বোঝা যায়। সহদেব বললেন—যে কোনো গোরুর ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান আমি জানি; একটা ব্রজভূমির দশ যোজন পর্যন্ত যে সমস্ত গোরুরা চরে বেড়ায় সেগুলির প্রত্যেকটির দুর্লক্ষণ-সুলক্ষণ আমি জানি। আমার এই সমস্ত গুণ সেই মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের জানা ছিল এবং তিনি এই সব গুণের জন্যই আমাকে পছন্দ করতেন। সব চেয়ে বড়ো কথা—গোসম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমার বিদ্যার শিল্প—সার্থকতা তো এইখানেই যে, কীভাবে গোরুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাদের যাতে কোনো রোগ না হয়—এইগুলিই তো—এগুলি সব আমার জানা আছে—

এতানি শিল্পানি ময়ি স্থিতানি।

আর গোপ্রজননক্ষম বৃষগুলির কথাই বা বাদ যায় কেন? উৎকৃষ্ট লক্ষণ বৃষের ব্যাপার আমাদের এতটাই জানা আছে যে, সে সব বৃষের মূত্রগন্ধ শুঁকে একটি বন্ধ্যা গাভীও প্রসব করে ফেলবে—

যেষাং মূত্রম্ উপাঘ্রায় অপি বন্ধ্যা প্রসূয়তে।

সহদেবের কথা শুনে বিরাট বললেন— আমার গাভীগুলির বিশেষত্ব অনুসারে নানান বর্গ আছে। এক-একটি যূত্রে এক এক লক্ষ পশু আছে তাদের জন্য আমার গোশালা আছে আলাদা আলাদা—

শতং সহস্রানি সমাহিতানি/

বর্গস্য বর্গস্য বিনিশ্চিতানি।

বিরাট সমস্ত গোপালক আধিকারিক সহ সবগুলি গোশালা অর্থাৎ তাঁর ব্রজভূমির দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন সহদেবের হাতে।

সহদেবের কথাটা তুললাম এইজন্য যে, একটা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কীভাবে গোসম্পদ তৈরি করা হত রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই এবং অন্য রাষ্ট্র থেকে এই গোধন হরণ করাটা অন্যতর পররাষ্ট্রের সার্বক্ষণিক ভাবনার মধ্যে থাকত এবং সেটা স্বরাষ্ট্রের অর্থপুষ্টির জন্যই। বিশেষত পররাষ্ট্র থেকে এই গোধন হরণ করার কাজটা যে কত নিপুণ ভাবে এবং কতটা সুপরিকল্পিত ভাবনা নিয়ে করা হত, সেটা দুর্যোধনের গোধন-হরণের পরিকল্পনা থেকেই বোঝা যায়।

বিরাটের গোশালা থেকে গোরু তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল গোপালকদের ছত্রভঙ্গ করে—ঘোষান্ বিদ্রাব্য তরসা গোধনং জহ্রুরঞ্জসা। কৌরবরা সংখ্যায় অনেক, সৈন্য-সেনাও তাঁদের অনেক। ফলে তারা বিরাটের বিভিন্ন বর্গের গোশালা থেকে ষাট হাজার গোরু বার করে নিয়ে গোরুগুলির চারপাশে চক্রাকারে রথ সাজিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে গোরুগুলিকে হরণ করে নিয়ে যেতে লাগলেন—

মহতা রথবংশেন পরিবার্য্য সমন্ততঃ।

এখানে বৃহন্নলাবেশি অর্জুন কুমার উত্তরকে সারথি করে যুদ্ধে এসেছিলেন। অর্জুনের মুখোমুখি হবার আগেই ভীষ্ম এক-চতুর্থাংশ সৈন্য

সহ দুর্যোধনকে হস্তিনাপুরের দিকে প্রস্থান করিয়েছেন এবং তা এইজন্য যাতে বিরাটের গোশালা থেকে অপহৃত গোরুগুলিকে অন্তত হস্তিনাপুরে পাঠানো যায়। ভীষ্ম অর্জুনের বিরুদ্ধে সেনাব্যূহ তৈরি করার আগেই দুর্যোধনের দায়িত্বে গোরুগুলিকে রওনা করে দিলেন হস্তিনার দিকে—

ভীষ্মঃ প্রস্থাপ্য রাজানং গোধনং তদনন্তরম্।

অর্জুন যুদ্ধে এসেই প্রথমে গোরুগুলিকে দেখতে না পেয়ে এবং সেই সঙ্গে দুর্যোধনকেও দেখতে না পেয়ে কুমার উত্তরকে বললেন—আমি রাজা দুর্যোধনকে তো দেখতে পাচ্ছি না, আমি নিশ্চিত তিনি অপহৃত গোরুগুলিকে নিয়ে দক্ষিণের পথ ধরেছেন এবং এইভাবে তিনি নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন—

রাজানং নাত্র পশ্যামি . . . দক্ষিণং মার্গমাস্থায়
. . . গা সমদায় গচ্ছতি।

অর্জুন নির্দেশ দিলেন উত্তর-সারথিকে—সামনের সবাইকে ছেড়ে তুমি দুর্যোধনের কাছে চল। যুদ্ধ জিনিসটা কখনোই নিরামিষ হয় না, আমার যেটা লোভের জিনিস, সেটা হল-আগে গোরুগুলিকে ফিরিয়ে আনা। সেই কাজটা সবার আগে করতে হবে।

অর্জুনের রথের গতি এবং লক্ষ্য দেখে কৌরব সেনাপতিরাও বুঝতে পারলেন, কী হতে চলেছে। অর্জুন দুর্যোধনের সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ করে দিলেন বাণাঘাতে। তারপর গোরুগুলির কাছে গিয়ে এমন শব্দ করতে আরম্ভ করলেন যে, গোরুগুলি লেজ কাঁপিয়ে হাম্বা হাম্বা করতে-করতে দক্ষিণ দিক ধরে বিরাট-রাজার গোশালার পথ ধরল—গাবঃ

ঊর্ধ্বং পুচ্ছং বিধুন্বানা রেভমানাঃ সমন্ততঃ।
গাবঃ প্রতিন্যবর্তন্ত দিশমাস্থায় দক্ষিণম্॥

আমরা মহাভারতের এই গোগ্রহণ এবং গোনিবর্তনের কাহিনীটা শোনালাম এইজন্য যে, বৈদিক কাল থেকে মহাভারতের কাল পর্যন্ত গোরু অর্থনৈতিক সম্পত্তি হিসেবে একটি রাষ্ট্রের কাছে কতটা মূল্যবান ছিল সেটা এই গোধন-লাভের জন্য পারস্পরিক যুদ্ধচেষ্টা থেকেই প্রমাণিত হয়।

এই যে, কৌরব-ত্রিগর্তরা বিরাটের গোধন অপহরণ করলেন আবার ইন্দ্রপুত্র অর্জুন সেই গোরুদের ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, এর একটা বৈদিক অনুরূপ আছে বল নামক সেই অসুরের মধ্যে যিনি দেবতাদের গাভী অপহরণ করে কোনো এক গহ্বরে গোপন করে রেখেছিলেন, আর ইন্দ্র সসৈন্যে সেই গহ্বর বেষ্টন করে সেই গহ্বর থেকে গাভী বার করে এনেছিলেন—

ত্বং বলস্য গোমতো অপাবরদ্ রিবো বিলম্।

[মহা (k) ৪.৩০.৮-২৭; ৪.৩১.৪-৯; ৪.১০.১-১৫; ৪.৩৫.৪-১০; ৪.৪২.২১; ৪.৪৩.১৩-২৫; (হরি) ৪.২৮.৮-২৮; ৪.২৯.৪-৯; ৪.৯.১-১৫; ৪.৩২.৪-১০; ৪.৪৭.২১; ৪.৪৮.১৩-২৫; ঋগ্বেদ ১.১১.৫]

□ গোরক্ষণের মাধ্যমে কৃষি এবং বাণিজ্য দুটোই হত—ফলে অর্থনৈতিক জায়গাটা পূর্ণ গোময় হয়ে ওঠার ফলে গার্হস্থ্যের জায়গাটাও কিন্তু সার্বিকভাবে গোতান্ত্রিক হয়ে উঠেছিল। এটা মনে রাখতে হবে যে, গোরুর দুধের অনন্ত প্রশংসা এবং তার উপযোগিতার ব্যাপারটা যেমন বৈদিক হোম-যজ্ঞে গোদুগ্ধের বিশদ ব্যবহার থেকে প্রমাণ হয়, তেমনই খাদ্য হিসেবে গোমাংসের প্রচলনও যাগ-যজ্ঞের যজন-যাজনের মধ্য দিয়েই আর্যসমাজে প্রচলিত হয়েছিল। বস্তুত প্রাচীন আর্যসমাজে গোরুর যে বহুল উপকারিতা লক্ষ্য করা গেছে, সেখানে এই মাংসভক্ষণের সুবিধেটাও কিন্তু অন্যতম উপকারিতা হিসেবেই গণ্য হয়েছে।

সাধারণ মানুষ যে একটা গোরুকে ভাগে ভাগে কেটে তারপর রান্না করে খেত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে ব্যবহৃত একটি উপমায়। বলা হচ্ছে—হে অগ্নি! তুমি কী দেবতাদের মধ্যে কারও ওপর রাগ করেছো? আমি জানি না বলেই জিজ্ঞাসা করছি একথা। মানুষ যেমন খড়্গ দিয়ে একটা গোরুকে ভাগে ভাগে কাটে, তেমনই তুমি আহার্য দ্রব্য পর্বে পর্বে, ভাগে ভাগে কেটে নাও—

পর্বশশ্চকর্ত গামিবাসিঃ।

ইংরেজিতে যাকে আমরা slaughter house বলি, বৈদিক কালে সেই জায়গায় নাম ছিল 'বিশসন-স্থান', যদিও বেদ লিখেছে শুধুই শসন। বলা হয়েছে—পৃথিবীর যে জায়গাটায় গোহত্যা করার পর গোরুগুলি পড়ে থাকে, হে ইন্দ্র! তোমার অস্ত্রে নিহত হয়ে সেইভাবে তোমার শত্রুরাও শুয়ে পড়ুক—

মিত্রক্রুবো যচ্ছশনে ন গাবঃ/
পৃথিব্যা আপৃগমুয়া শয়ন্তে।

দুটো মন্ত্রের মধ্যেই পরিষ্কার গো-শব্দেরই উল্লেখ হয়েছে এবং একটি মন্ত্রে একটি সাধারণ গোকর্তনের জায়গা বা বিশেষণ-স্থানের খবর পাওয়া যাচ্ছে আর একটিতে 'বিশসণ'-এর মতো যাজ্ঞিক শব্দ ব্যবহার না করে একেবারে 'কাটা'-র (কর্তন/চকর্ত) মতো কথা পদ ব্যবহার করা হল।
[ঋগ্‌বেদ ১০.৭৯.৬; ১০.৮৯.১৪]

□ প্রাচীন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে, বিশেষত শতপথ ব্রাহ্মণের মতো সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে যজমান—যিনি যজ্ঞ করবেন—সেই যজমানকে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করানো হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঋত্বিক যাজ্ঞিকেরা আচার ঘোষণা আরম্ভ করলেন—এ যেন গোরু কিংবা ষাঁড়ের মাংস না খায়, কেননা গোরু এবং ষাঁড় এই পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রেখেছে। দেবতারা অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর প্রাণশক্তি গোরু এবং ষাঁড়ের মধ্যে দিয়েছেন। অতএব এই দুটি প্রাণী খেয়ো না—

তস্মাদ্ ধেন্বনডুহয়ো নাশ্নীয়াৎ।

খেলে মহাপাপ হবে। এক অনুচ্ছেদ ধরে গোমাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে পাপ উচ্চারণের পর হঠাৎ এক বিখ্যাত ঋষির কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি বেদ-উপনিষদ ব্রাহ্মণ-পুরাণের সোচ্চার ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি গোরু-ষাঁড়ের নিষেধ-শব্দ উড়িয়ে দিয়ে বললেন—সে তোমরা যাই বলো বাপু! আমি কিন্তু এসব মাংস খাই এবং অবশ্যই খাই যদি রান্না পর করার সে মাংসটা বেশ তুলতুলে নরম হয়—

তদু হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো
অশ্নাম্যেবাহম্ অসংসলং চেন্তবতি।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই সোচ্ছ্বাস ঘোষণা থেকে বোঝা যায় গো-বৃষের মাংস খাওয়াটা যাজ্ঞবল্ক্যের অনেক কালের অভ্যাস এবং এখন এই মাংসগুলির ওপর নিষেধাজ্ঞা নামছে, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সে কথায় আমল দিতে রাজী নন।

বস্তুত বৈদিককালে গোমাংস-ভক্ষণ চালু ছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সে মাংসের একটা বিশেষত্ব আছে। ঋগ্‌বেদের মধ্যে যতবার গোমাংস-ভক্ষণের উল্লেখ আছে, সেখানে বৃষমাংসের কথাটা খুব স্পষ্ট এবং বহুলভাবে আসে, আর গাভীর ক্ষেত্রে বন্ধ্যা গাভীই কিন্তু দেবাহুতির কাজে লেগেছে। বন্ধ্যা গাভীর পারিভাষিক নাম ছিল বসা। একটি ঋক্‌মন্ত্রে অগ্নির বিশেষণ দেওয়া হয়েছে— উক্ষান্ন, বসান্ন। অর্থাৎ অগ্নি 'উক্ষ' অর্থাৎ কী না বৃষমিশ্রিত অন্ন গ্রহণ করেন এবং বন্ধ্যা গাভীর মাংস মিশ্রিত অন্ন ভোজন করেন, এই দুই প্রকার মাংসের পরেই অবশ্য খানিক সোমরসেরও ব্যবস্থা আছে— উক্ষান্নায় বসান্নায় সোমপৃষ্ঠায় বেধসে।

অন্য একটি মন্ত্রে ইন্দ্রের প্রশংসা আছে। সেখানে যেন ইন্দ্রের বন্ধুস্থানীয় একজন, যাঁর নাম বৃষাকপি, ইন্দ্রাণী তাঁকে খুব একটা পছন্দ করেন না বটে, কিন্তু তিনি ইন্দ্রাণীর উদ্দেশে বলছেন— তোমার বৃষদের ইন্দ্র ভক্ষণ করুক, তোমার এই অতিচমৎকার হোমদ্রব্য ইন্দ্র ভক্ষণ করুন। কথাটা শুনে ইন্দ্র নিজেই বৃষভক্ষণের ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে ইন্দ্রাণীকে বললেন— দ্যাখো একটা-দুটোয় হবে না, অন্তত পনেরো-বিশটা—

উক্ষ্ণো হি মে পঞ্চদশ সাকং পচন্তি বিংশতিম্।

—আমার জন্য অন্তত পনেরো বিশটা ষাঁড় রান্না করে দাও, আমি খেয়েদেয়ে একটু মোটা হই আর আমার পেটের দুপাশটাও যেন ভরে যায়।'

দেবরাজ এবং বেদের সবচেয়ে বড়ো যোদ্ধা ইন্দ্রের জন্য পনেরো-বিশটা ষাঁড় কীভাবে রান্না হত, তার বিবরণে যাচ্ছি না, কিন্তু তিনি যে এই উক্ষান্নের গন্ধে আমোদিত হতেন, তার প্রমাণ বেদের মধ্যে যথেষ্টই আছে। শুধু তাই নয় ইন্দ্র যেহেতু প্রধানত যুদ্ধনেতা এবং যৌনতার ক্ষেত্রেও প্রায় অধিপুরুষ নায়কের মতো তাই গোমাংসের চেয়ে বৃষমাংসই তাঁর পছন্দ ছিল বেশি এবং ঋষিরা নিজেরাই সে মাংস রান্না করে উপহার দিতেন ইন্দ্রকে, আর সেটাও সোমরসের সঙ্গে—

অমা তে তুভ্যং বৃষভং পচানি।

গোমাংস বা বৃষমাংস খাবার ব্যাপারে আর্যভাষাভাষী প্রাচীনদের এই উদার এবং ঔদরিক ঘোষণা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। যে জাতির কৃষিভিত্তি তেমন ছিল না এবং প্রধানত যাঁরা পশুপালবৃত্তি নিয়ে যাযাবরদের মতোই জীবন ধারণ করতেন সেই আর্যরা নিজেদের ইন্দো-ইয়োরোপিয়ান ভাষার অবশেষের সঙ্গে ইন্দো-ইয়োরোপিয়ান খাদ্যাভ্যাসটুকুও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। ফলত সেখানে পশুধনের সঙ্গে পশুমাংস, বিশেষত আর্যরা বহুদূর ঠাণ্ডার দেশ থেকে এসেই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন।

প্রথম যেখানে এসে বসতি তৈরি করেছিলেন সেই সপ্তসিন্ধুর দেশটাও ঠাণ্ডা। খাদ্যাভ্যাস যেহেতু দেশ, কাল জলবায়ুর ওপরে অনেকটাই নির্ভর করে তাই গোমাংস, বৃষমাংস ভক্ষণের ব্যাপারটাও খুব সহজভাবে এসেছে ব্রাহ্মণ্য জীবনের মধ্যে। আবার যাজ্ঞিকেরা বৃষমাংস রান্না করে দেবতাদের লোভ দেখাচ্ছেন এইজন্যই কেননা, যজ্ঞের অবশেষ প্রসাদের ওপর তাঁদেরও লোভ আছে। ঋষি বলছেন ইন্দ্রকে—তোমার জন্য পুরোহিতদের নিয়ে স্থূলকায় একটি বৃষ পাক করেছি। আর পনেরোটি তিথির প্রত্যেকটিতে সোমরসও বানিয়েছি তোমার জন্য।

এই মন্ত্রে বৃষপাকের ব্যাপারে টীকাকার সায়নাচার্যকে লিখতে হয়েছে যে, কোন কোন দেবতার উদ্দেশে বৃষ-শরীরের কোন কোন অংশ আহুতি দেওয়া হবে, আর তিনি যেটা লেখেননি, অথচ অন্যেরা অন্য জায়গায় যেটা লিখেছেন, সেটা হল যজ্ঞের ঋত্বিক-পুরোহিতরা ক্রমান্বয়ে যজ্ঞীয় পশুর কোন ভাগ কে পান মর্য্যাদার অনুক্রমে। এবং এটা কোনো টীকা-ভাষ্য নয়, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে ঋত্বিক-পুরোহিতদের এই অনুক্রম পরিষ্কারভাবে বলা আছে। বৈদিক যজ্ঞভাবনা বড়ো বড়ো যজ্ঞের সময় বিশেষ করে পশুযাগ, সোমযাগে চারটি পৃথক বেদের চারজন প্রধান পুরোহিতের সহায়তার স্তরে স্তরে আরও অনেক পুরোহিত থাকতেন তাঁদের প্রত্যেককে যজ্ঞাবশেষ মাংস দেবার জন্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ঘোষণা করে বলেছে—এবার পশুর বিভাগ বলছি শোনো—জিহ্বাসহ হনুদ্বয় প্রস্তোতার শ্যেনাকৃতি বক্ষোভাগ সামবেদীয় প্রধান ঋত্বিক উদ্গাতার ভাগ, দক্ষিণ শ্রোণি ঋগ্‌বেদের প্রধান ঋত্বিক হোতার ভাগ, আর বাম শ্রোণি অথর্ববেদের প্রধান ঋত্বিক ব্রহ্মার, কাঁধ-সহ দক্ষিণ পাশটা পুরো অধ্বর্যুর অর্থাৎ যজুর্বেদীয় প্রধান ঋত্বিকের ভাগ। এইভাবে অন্তত ছত্রিশটা ভাগ সকলের মধ্যে ভাগ করা হত এবং সেটা বৃষই হোক, কমবয়সী ষাঁড় উক্ষই হোক, অথবা অশ্ব কিংবা মেষ-ছাগ। এই ভাগের মধ্যে গৃহপতি এবং তাঁর স্ত্রীও আছেন।

[ঋগ্‌বেদ ১০.৭৯.৬; ৮.৪৩.১১; ৮.৮৬.১৪; ১০.২৭.২; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম, ২য় খণ্ড) ৭ পঞ্চিকা, ১ম খণ্ড, ৩১ অধ্যায়, পৃ. ৮০২-৮০৩]

□ গোমাংসই হোক কিংবা বৃষমাংস তার আর এক প্রায়োগিক জায়গা ছিল মধুপর্ক। একালে মধুপর্ক দধি, দুগ্ধ, মধু আর শর্করায় পর্যবসিত হয়েছে, অর্থাৎ গো-র বদলে গব্য, গোরুর প্রোডাক্ট, কিন্তু সেকালের মধুপর্কে বসার আসন, পা ধোবার জল, ফলমূলের অর্ঘ্য, আচমনের জল আর একটি গোরু—এই ছিল উপাদান—মধুপর্কো গৌঃ। পুরো গোরু যদি নাই দিতেন, গোমাংস কিছু লাগতই কেননা আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে একথা পরিষ্কার যে, মাংস ছাড়া মধুপর্ক দেওয়াই যাবে না—

নামাংসো মধুপর্ক ভবতি।

পরবর্তী সময়ে যখন গোহত্যার ব্যাপারে সমাজ খানিক সংবেদনশীল হয়েছে, তখন মহাভারতে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখেছি যে, ব্যাসদেবের মতো ঋষির জন্য যখন আতিথেয় মধুপর্ক দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠছে, তখন একটি গোরু তাঁকে দেওয়া হচ্ছে বটে—গাঞ্চ ন্যবেদয়ৎ—কিন্তু অতিথি ঋষি ওঁ স্বস্তি বলে গোরুটিকে গ্রহণ করে সেই গোরুটিকে আবার রজ্জুমুক্ত করে দিচ্ছেন। অর্থাৎ পূর্বের প্রথাটুকু প্রতীকীভাবে মানা হচ্ছে বটে, কিন্তু গোবধের ঘটনাটা গোরক্ষণের দিকে এগোচ্ছে।

একই কথা পাণিনি ব্যাকরণের 'গোঘ্ন' শব্দটি সম্বন্ধেও খাটে। 'গোঘ্ন' মানে যে গো হত্যা করে, কিন্তু ব্যাকরণের নিয়মে গোঘ্ন মানে যার জন্য গোরু কাটা হয়। অর্থাৎ গোঘ্ন মানে অতিথি। অতিথি বাড়িতে আসলে তাঁর আতিথেয়তার জন্য গোরু কাটা হত বলে অতিথির নামই হয়ে গেল গোঘ্ন। কিন্তু পরবর্তী কালে এই অতিথিও আর এতটা মাংসরসিক থাকেননি। সমাজে বুদ্ধদেবের আন্দোলন গড়ে উঠেছে পশুহত্যার বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধ মতকে 'অ্যাসিমিলেট' করেছেন যজ্ঞে পশুহত্যার বিকল্প ঘনিয়ে এনে। বৈদিককালেই কিন্তু এই বিকল্প তৈরি হয়ে গিয়েছিল—ষাঁড় না হলে বড়ো একটা ছাগল হলেও হবে—

মহোক্ষং বা মহাজং বা।

পাণিনি যে সূত্রে 'গোঘ্ন' শব্দের উল্লেখ করেছেন, সেই সূত্রটি হল—'দাস-গোঘ্নৌ সম্প্রদানে'। এখানে সোজাসুজি 'গোঘ্ন' মানে হওয়া উচিত ছিল—যিনি গোহত্যা করেছেন।

কিন্তু ব্যাখ্যাকারেরা জানিয়েছেন যে, 'গোঘ্ন' পদটা খুব সাধারণভাবে নিষ্পন্ন হয়নি, এখানে প্রাপক অর্থে সম্প্রদান কারকে এই শব্দ, যার মানে—গোঘ্ন হলেন তিনি, যিনি বাড়িতে আসলে তাঁর জন্য গোরু কাটা হয়—

গাং হন্তি তস্মৈ গোঘ্নঃ অতিথিঃ।

—he, on whose coming the cow is killed in order to give him, that is to say, a guest.

আগেই জানানো হয়েছে যে, কালের পর্যায়ে বাড়িতে অতিথি এলে আর গোরু কাটা হত না। মধুপর্কের উপাদান-সরঞ্জামও পালটে পুরো নিরামিষ গেছে আশ্বলায়নের পর। যে আশ্বলায়ন বলেছিলেন, মাংস ছাড়া মধুপর্কই হয় না—নামাংসো মধুপর্কো ভবতি—তাঁরই উত্তরসূরিরা—পারস্কর, আপস্তম্ব, বৌধায়নেরা মধুপর্কে মাংসের নামও করেননি, গোমাংস তো দূরের কথা। কিন্তু আমরা বলবো গোহত্যা বন্ধ করার এই আন্দোলন বৈদিক কালেই বৈকল্পিকভাবে আরম্ভ হয়েছিল এবং সেটা হয়তো দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের পুষ্টিগুণের নিরিখে এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে। বৈদিকেরাই অনেকে চেয়েছেন যাতে করে গোরুর সঙ্গে গোপালনকারী মানুষটির যেন বিচ্ছেদ না ঘটে—

ন তা নশন্তি ন দভাজি তস্করো/
নাসামমিত্রো ব্যথিরা দধর্ষতি।
দেবাংশ্চ যাভি র্যজতে দদাতিচ/
জ্যোগিত্তাভিঃ সচতে গোপতিঃ সহ।।

এই মন্ত্রের ইতিবাচক প্রার্থনা এবং তার পরের মন্ত্রেই গোরুকে যাতে সংস্কৃত অবস্থায় বলি পর্যন্ত না যেতে হয়—এই প্রার্থনা থেকেই কিন্তু এটাও ইতিবাচকভাবে প্রমাণ হয় যে, একটা সময় দুগ্ধবতী গাভীও যজ্ঞবলি হিসেবে ব্যবহৃত হত, কিন্তু সেই কাজটা যেন বহুপ্রয়োজনীয় গাভীকে দিয়ে করা না হয়, তার জন্য প্রার্থনা করেছেন ভরদ্বাজ।

সার্থকভাবে আধুনিক গো-গবেষণা থেকে প্রমাণ হয় যে, একেবারে বৈদিককালেই যজ্ঞবলি হিসেবে দুগ্ধবতী গাভীর ব্যবহার থেকে বেশ খানিকটা সরে এসেছেন যাজ্ঞিকেরা। হয়তো এই প্রার্থনা থেকেই ঋগ্‌বেদে দুগ্ধবতী গাভী সম্বন্ধে আশ্চর্য এক বিশেষণাত্মক বিশেষ্য-শব্দ তৈরি হয়েছে, যেটা প্রায় সংজ্ঞাবাচক এবং এই শব্দটি হল 'অঘ্ন্যা' অর্থাৎ গোরু কখনোই মারা যাবে না, মারা উচিত নয়। গোরু-শব্দের পর্যায়বাচক এই 'অঘ্ন্যা' বা পুংলিঙ্গে পশুর বিশেষণ হিসেবে 'অঘ্ন্য' শব্দটি অন্তত ষোলো বার ব্যবহৃত হয়েছে ঋগ্‌বেদে। ঋগ্‌বেদের বিশেষ একটি মন্ত্রের মধ্যে 'অঘ্ন্য' কথাটা এমনভাবেই এসেছে, যেখানে অবশ্যই গোরুর দুধের গুরুত্বটা ধরা পড়ে এবং এই শব্দের প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ মন্ত্রসূত্রের মধ্যে একটা পারিবারিক মায়াও প্রতিষ্ঠিত হয়। ঋগ্‌বেদের মন্ত্রে প্রার্থনা করা হচ্ছে—হে হত্যার অযোগ্য অহননীয়া গাভী! তুমি শোভন শস্য-তৃণাদি ভক্ষণ করো এবং প্রভূত দুগ্ধবতী হও। তাহলে আমরাও প্রভূত ধনবান হবো। সর্বকাল ধরে তৃণ ভক্ষণ করো এবং সর্বত্র গমন করে নির্মল জল পান করো—

সূয়বসাদ্ ভগবতী হি ভূয়া
অথো বয়ং ভগবন্তো স্যাম।
অদ্ধি তৃণম্ অঘ্ন্যে বিশ্বদানীং
পিব শুদ্ধমুদকমাচরন্তী॥

দুগ্ধবতী গাভী কখনো হত্যার যোগ্য নয়—এমন ঘোষণা সমস্ত বেদ-ব্রাহ্মণে বারবার উচ্চারিত হলেও বৈদিক কালের মানুষ এমনকী ঋষি-ব্রাহ্মণেরাও গোরু খেতেন না এমন নয়।

মহাভারতে রাজা রন্তিদেবের যজ্ঞে বহুল গোহত্যার কাণ্ডটা বারবার স্মরণ করা হয় যজ্ঞবলির উদাহরণ হিসেবে। রন্তিদেবের যজ্ঞের ফলে গোরক্তের নদী তৈরি হয়েছিল চর্মণ্বতী নামে। কিন্তু রন্তিদেবের গোহত্যা-কাহিনীর পরিণতি হয়েছে গোহত্যা-বন্ধে। লক্ষণীয়, গোহত্যা-বন্ধের এই প্রার্থনা সেই বেদের আমল থেকেই এবং তা গোমাংস-ভক্ষণের যাজ্ঞিক-ব্যবহারের পাশাপাশি অবশেষে সেই মন্ত্র—যেখানে সমস্ত গাভীর অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক গুরুত্ব নির্ধারণ করা হচ্ছে, সেখানে ভরদ্বাজ ঋষির মুখ থেকে এই করুণাঘন উক্তিও শুনতে পাচ্ছি যে, গোরুগুলি এত পুষ্টি দেয় বলেই তস্কর যেন সেই গোরু চুরি না করে, শক্তিমান লোকেদের বলবান সামরিক অশ্বগুলির সামনে পড়ে গোরুগুলি যে অপহৃত হবার জায়গায় না পৌঁছয়, আর যজ্ঞে যে পশুবলির

ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যেন এই গোরুগুলিকে বলি না হতে হয়—

ন সংস্কৃতত্রমুপ যন্তি তা অভি।

[আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (মহর্ষি) ১.২৪.৭; ১.২৪.২৬; অষ্টাধ্যায়ী ৩.৪.৭৩; ঋগ্‌বেদ ৬.২৮.৩; ১.১৬৪.৪০; ৬.২৮.৩-৮]

গো$_2$ নহুষের জ্যেষ্ঠ পুত্র যতির পত্নীর নাম গো। গো কাকুৎস্থের কন্যা ছিলেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. ২.৬৮.১৩; বায়ু পু. ৯৩.১৪]

গো$_3$ বায়ুপুরাণ মতে, সাধ্য নামক পিতৃগণের মানস কন্যার নাম গো। মৎস্য পুরাণেও এই 'গো' নাম্নী কন্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি শুক্রাচার্যের পত্নী ছিলেন। শুক্রাচার্যের ঔরসে তাঁর গর্ভে একত্রিশটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

[বায়ু পু. ৭৩.৩৬-৩৭; মৎস্য পু. ১৫.১৫]

বায়ু পুরাণেই অন্যত্র বলা হয়েছে, সোমপ পিতৃগণের মানস কন্যা হলেন গো। ইনি শুক্রাচার্যের পত্নী। শুক্রাচার্যের ঔরসে গো-এর গর্ভজাত পুত্ররা হলেন যণ্ড, অমর্ক, ত্বষ্টা ও বরাত্রী।

[বায়ু পু. ৬৫.৭৫-৭৭]

গো$_4$ মৎস্য পুরাণ মতে, ব্যাসপুত্র শুকদেবের কন্যার নাম গো। তাঁর অপর নাম কৃত্বী। বিষ্ণুর নির্দেশে শুকদেব কন্যা গো-কে পাঞ্চালরাজের সঙ্গে বিবাহ দেন। বিখ্যাত পাঞ্চালরাজ ব্রহ্মদত্ত গো-এর সন্তান। শুককন্যা গো একজন তপঃসিদ্ধা নারী ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৫.১০]*

গো$_5$ ব্রহ্মার মানস পুত্র পুলস্ত্যের পত্নীর নাম গো। পুলস্ত্যের ঔরসে গো-এর গর্ভে বৈশ্রবণ নামে এক প্রতাপশালী পুত্রের জন্ম হয়।

[মহা (k) ৩.২৭৪.১২; (হরি) ৩.২২৮.১২]

গোকর্ণ$_1$ দক্ষিণ ভারতের একটি পবিত্র তীর্থ। গোকর্ণে একটি পর্বত এবং একটি হ্রদ অবস্থিত। মাল্যবান পর্বত পার হয়ে গোকর্ণ পর্বতে পৌঁছাতে হয়। লঙ্কার পূর্বদিকে সমুদ্র তীরে এই গোকর্ণ তীর্থের অবস্থান। মহর্ষি অগস্ত্যের শিষ্যদের আশ্রমও এই গোকর্ণ তীর্থেই অবস্থিত। শেষনাগ এই তীর্থে তপস্যা করেছিলেন। *[রামায়ণ ৫.৩৫.৮০; মহা (k) ১.৩৬.৩; ৩.৮৮.১৫-১৭; (হরি) ১.৩১.১৩; ৩.৭৩.১৫-১৬; মৎস্য পু. ২২.৩৮; বায়ু পু. ৪৮.৩০]*

□ গোকর্ণ তীর্থে মহাদেব পূজিত হন বলে মহাভারতে বলা হয়েছে। গোকর্ণ তীর্থে একই নামে একটি হ্রদ আছে। সিদ্ধ ও চারণগণ, গন্ধর্ব, কিন্নর সবাই সেখানে মহাদেবের উপাসনা করেন। গায়ত্রীদেবীর উদ্দেশে সমর্পিত গায়ত্রী তীর্থ গোকর্ণ তীর্থেরই অন্তর্গত। এখানে অব্রাহ্মণ ব্যক্তি সাবিত্রী পাঠ করলে সাবিত্রীর গুণাগুণ বিনষ্ট হয়।

[মহা (k) ৩.৮৫.২৪-২৮; (হরি) ৩.৭০.২৪-২৮; বায়ু পু. ৭৭.২১; মৎস্য পু. ১৮১.২৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৩.১৯]

□ সীতাহরণের সময় মারীচ রাক্ষস স্বর্ণমৃগের রূপ ধরে রামকে ছলনা করেছিলেন। রাবণের পূর্ব মন্ত্রী মারীচ রাক্ষস সমুদ্রবেষ্টিত গোকর্ণে বাস করতেন। রাবণ মারীচের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গোকর্ণেই এসেছিলেন।

[মহা (k) ৩.২৭৭.৫৫; (হরি) ৩.২৩১.৫৫]

□ ব্রহ্মার কন্যা মৃত্যুদেবী গোকর্ণ তীর্থে তপস্যা করেছিলেন।

[মহা (k) ৭.৫৪.২৬; (হরি) ৭.৪৬.২৫]

□ চারুশীর্ষঋষি গোকর্ণ তীর্থে একশো বছর তপস্যা করে মহাদেবের বরে দীর্ঘায়ু একশোটি বলশালী পুত্র লাভ করেছিলেন।

[মহা (k) ১৩.১৮.৬-৭; (হরি) ১৩.১৭.৬-৭]

□ সূর্যপুত্র যম গোকর্ণে তপস্যা করে মহাদেবের কাছ থেকে লোকপালত্ব লাভ করেছিলেন। ওই বরেই তিনি পিতৃলোকে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করার অধিকার এবং জগতের ধর্মাধর্ম বিচারের বর লাভ করেছিলেন।

[মৎস্য পু. ১১.১৮-২০]

□ দেবী সতী গোকর্ণে ভদ্রকর্ণিকা নামে পূজিতা হন। *[মৎস্য পু. ১৩.৩০]*

□ বর্তমান কর্ণাটক রাজ্যের উত্তরাংশে মাইসোর জেলার অন্তর্গত গোকর্ণ শহরই প্রাচীন গোকর্ণতীর্থ। *[GDAMI (Dey) p. 70; HPAI (S.N. Arya) p. 49]*

গোকর্ণ$_2$ পশ্চিম ভারতের একটি প্রাচীন জনপদ। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় অর্জুন যজ্ঞীয় অশ্বের সঙ্গে গোকর্ণ দেশে যান। সেখান থেকে অর্জুন প্রভাসতীর্থে গিয়েছিলেন।

[মহা (k) ১৪.৮৩.১৩; (হরি) ১৪.১০৬.১২]

□ গোকর্ণে মহাদেবের বাস। কোনো পাপাচারীর পক্ষে গোকর্ণক্ষেত্রে গমন সম্ভব নয়। অঞ্চলটি পশ্চিম সাগরের তীরে চারশো যোজন ব্যাপী বিস্তৃত। গোকর্ণে অসংখ্য তীর্থের অবস্থান।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে গোকর্ণ তীর্থ সম্পর্কে একটি কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে গোকর্ণ একেবারে সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি ক্ষেত্র। ফলে প্রায়শই এর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন অবস্থায় থাকত। মহর্ষি অগস্ত্য সমুদ্রের জল পান করে নিলে গোকর্ণ সহ বহু জল-সিঞ্চিত দেশ শুষ্ক ভূ-ভাগে পরিণত হয়। পরে আবার সগর রাজার পুত্রদের দ্বারা সমুদ্রের পরিধি বর্ধনের ফলে গোকর্ণ ইত্যাদি জনপদ প্লাবিত হয়। সে সময় গোকর্ণের অধিবাসীরা সমতলভূমি ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী সহ্যাদ্রি পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫৬.৭-৫৬]

□ সহ্যাদ্রি পর্বতে পৌঁছে গোকর্ণবাসী ঋষিগণ মহেন্দ্র পর্বতে তপস্যারত পরশুরামের দ্বারস্থ হন। সমুদ্রের জলে সম্পূর্ণ প্লাবিত দেশ গোকর্ণের পুনরুদ্ধারে পরশুরামই তাঁদের একমাত্র সহায়।

ঋষিদের অনুরোধে পরশুরাম জলের দেবতা বরুণকে আহ্বান জানান। বরুণদেব স্বরূপে প্রকাশিত না হওয়ায় ক্রুদ্ধ পরশুরাম সমুদ্রে বাণ নিক্ষেপ শুরু করেন। পরশুরামের বাণের পীড়নে একসময় সমুদ্রের জলে উন্মত্ত তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। বরুণদেব পরশুরামের বলবীর্য্যের কাছে হার মেনে স্বরূপে প্রকাশিত হন। তাঁর ইচ্ছা মেনে সমুদ্রের জল পশ্চাদপসরণ করে। গোকর্ণক্ষেত্র আবারও জলস্তর ভেদ করে বাইরে প্রকাশিত হয়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫৭.১২-৭৫; ২.৫৮.১-৩৮]

□ অর্জুন একাকী তাঁর বারো বছরের বনবাসকালে গোকর্ণ তীর্থ দর্শন করেছিলেন। বলরামও তাঁর তীর্থযাত্রার সময় গোকর্ণে গিয়েছিলেন। *[মহা (k) ১.২১৭.৩৪-৩৫; (হরি) ১.২১০.৩৪-৩৫; ভাগবত পু. ১০.৭৯.১৯]*

□ নর্মদার নিকটবর্তী গোকর্ণ মহাবালেশ্বর শিবলিঙ্গটিও রাবণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলে পুরাণে বিখ্যাত হয়ে আছে। এই শিবলিঙ্গ সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীটি এই যে—একসময় রাবণ কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করলেন। ভগবান শিব তাঁকে বর দিতে চাইলে রাবণ স্বয়ং শিবকেই লঙ্কায় অধিষ্ঠান করতে অনুরোধ করলেন। শিব রাবণকে বললেন— তা তো সম্ভব নয়, তবে তুমি আমার দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটিকে লঙ্কায় নিয়ে যেতে পার। কিন্তু যাবার পথে তুমি কখনোই থামবে না কিংবা একে মাটিতে রাখবে না। নাহলে তুমি যেখানে এই শিবলিঙ্গ স্থাপন করবে, শিবলিঙ্গটি সেই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হবে চিরতরে। রাবণ সানন্দে-সম্মত হলেন এবং জ্যোতির্লিঙ্গ দুহাতে তুলে নিয়ে লঙ্কার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এদিকে দেবতারা এই ঘটনায় অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। কারণ লঙ্কায় মহাদেবের জ্যোতির্লিঙ্গ স্থাপিত হলে রাবণ অজেয় এবং অমর হয়ে যাবেন। দেবতারা রাবণকে বাধা দেবার জন্য পার্বতীপুত্র গণেশের শরণাপন্ন হলেন। দেবতাদের অনুরোধ রক্ষার জন্য গণেশ রাবণকে বাধা দেবার উপায় খুঁজতে লাগলেন। এদিকে কৈলাস থেকে লঙ্কায় পৌঁছাবার পথে সন্ধ্যা নেমে এল। ভগবান শিব জ্যোতির্লিঙ্গ ভূমিতে স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন অথচ রাবণের সন্ধ্যাবন্দনার সময় হয়েছে। এমনই সময় গণেশ ব্রাহ্মণের বেশে এসে দাঁড়ালেন রাবণের সামনে। রাবণ সেই ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করলেন—আপনি কিছুক্ষণ এই শিবলিঙ্গটি রাখুন, আমি সন্ধ্যাবন্দনা সেরে আসি। এইকথা বলে রাবণ সন্ধ্যা করতে গেলেন। এদিকে রাবণের অনুপস্থিতির সুযোগে ব্রাহ্মণরূপধারী গণেশ সেই স্থানেই ভূমিতে শিবলিঙ্গটি স্থাপন করলেন। সন্ধ্যাবন্দনা শেষ করে এসে এই ঘটনা দেখে রাবণ দুঃখ পেলেন, ক্রুদ্ধও হলেন। ক্রুদ্ধ রাবণ শিবলিঙ্গটিকে মাটি থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করতে গেলেন। টানের চোটে শিবলিঙ্গ বেঁকে গোরুর কানের মত আকৃতি ধারণ করল, কিন্তু রাবণ তাকে মাটি থেকে তুলতে সমর্থ হলেন না। নর্মদা তীরবর্তী সেই স্থানটিতেই গোকর্ণ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হল। বর্তমানে এই স্থানটিই গোকর্ণেশ্বর বা গোকর্ণ মহাবালেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

[বামন পু. ৪৬.১২-১৩;
GDAMI (N.L. Dey) p. 70;
HPAI (Samarendra Narayan Arya) p. 158-159]

গোকর্ণ৩ ভারতের উত্তরে অবস্থিত একটি পার্বত্য তীর্থ। রাবণ ধন ও যশ কামনায় এই তীর্থে মহাদেবের তপস্যা করেছিলেন।

[রামায়ণ ৭.৯.৪৬; বামন পু. ৪৬.১৩]

□ পণ্ডিত S.N. Arya উত্তরে মানস সরোবরের নিকটে গোকর্ণ নামে একটি পবিত্র ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত রাবণের তপস্যাক্ষেত্র অর্থে এই গোকর্ণকেই বোঝানো হয়েছে। *[HPAI (S.N. Arya) p. 49]*

গোকর্ণ৪ উত্তরে হিমালয় পর্বতের অন্তর্গত একটি তীর্থ। অযোধ্যার রাজা ভগীরথ গঙ্গা নদীকে মর্ত্যে আনয়নের জন্য গোকর্ণ তীর্থে এক হাজার বছর তপস্যা করেছিলেন। *[রামায়ণ ১.৪২.১২]*

□ গঙ্গোত্রী থেকে দু-মাইল দূরে অবস্থিত গোমুখ অঞ্চলটিই প্রাচীন গোকর্ণ বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। *[GDAMI (Dey) p. 70]*

গোকর্ণ৫ সরস্বতী নদী ও যমুনা নদীর সঙ্গমে অবস্থিত একটি তীর্থ। এটির আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

এই তীর্থে পূজিত মহাদেবের দর্শন পেলে মৃত্যুর পর যমলোক দর্শন করতে হয় না।

[বরাহ পু. ১৭০.৮৩]

গোকর্ণ৬ ভবিষ্যৎ ষোড়শ দ্বাপরে মহর্ষি সঞ্জয় যখন বেদবিভাগকারী ব্যাসদেব হয়ে জন্ম নেবেন, তখন মহাদেব গোকর্ণ নামে আবির্ভূত হবেন। গোকর্ণ-শিবের আশ্রম সে সময় গোকর্ণ তীর্থ নামে খ্যাত হবে। *[বায়ু পু. ২৩.১৭১-১৭২]*

গোকর্ণ৭ একজন ঋষি। পিতামহ ব্রহ্মা গয়াসুরের দেহের উপর যে যজ্ঞানুষ্ঠানটি করেছিলেন সেটির অন্যতম ঋত্বিক ছিলেন গোকর্ণ।

[বায়ু পু. ১০৬.৩৯]

গোকর্ণ৮ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে অনামিকার প্রান্ত পর্যন্ত যে দূরত্ব তা গোকর্ণ নামে পরিচিত।

[বায়ু পু. ৮.১০৩]

গোকর্ণ৯ মথুরাবাসী বণিক বসুকর্ণের সন্তান গোকর্ণ। একবার পিতার সঙ্গে সমুদ্রে বাণিজ্য যাত্রাকালে গোকর্ণ এবং তাঁর সবসময়ের সঙ্গী প্রিয় শুক পাখিটি ঝড়ে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। উপায়ান্তর না দেখে গোকর্ণ শুক পাখিটিকে সঙ্গে নিয়ে নিকটবর্তী একটি পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রাণ নিয়ে মথুরায় ফিরে আসা সম্ভব নয় একথা অনুভব করে গোকর্ণ তাঁর প্রিয় শুক পাখিটিকে নিজের মৃত্যু সংবাদ মথুরায় তাঁর পিতা-মাতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ জানান। শুক পাখি মথুরায় ফিরে আসে।

কিন্তু গোকর্ণের মৃত্যু হয়নি। প্রবল খাদ্যাভাব সত্ত্বেও সেই অচেনা পর্বতে তিনি জীবিত ছিলেন। পর্বতটি আবার ভগবান শিবের আবাসস্থল। বহুবছর পর মহাদেবের কৃপায় গোকর্ণ মথুরায় ফিরে আসতে সক্ষম হন। সেখানে তিনি মহাদেবের একটি প্রকাণ্ড মন্দির স্থাপন করেন, যা গোকর্ণ শিবক্ষেত্র নামে পরিচিত। এই মন্দিরের শিবলিঙ্গটি শুকেশ্বর নামে বিখ্যাত।

[বরাহ পু. ১৭১-১৭৩ অধ্যায়]

গোকর্ণ১০ বারাণসীর অন্তর্গত একটি তীর্থ। হরিকেশ তীর্থের পশ্চিম দিকে এই গোকর্ণ তীর্থটি অবস্থিত।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচন কাণ্ড) পৃ. ৩৭, ১১৩]

গোকর্ণিকা অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। গোকর্ণিকা সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ১৭৯.২৪]

গোকুল একটি পুরাণখ্যাত স্থান। কৃষ্ণের জীবন ইতিহাসের সঙ্গে গোকুলের নিবিড় সম্পর্ক। কংসের রাজধানী মথুরা সংলগ্ন এই গ্রামের সঙ্গে যদু-বৃষ্ণি বংশীয়দের উত্থান-পতনের অঙ্গাঙ্গী যোগ। মূলত গোপ জনজাতির বসবাসস্থল বলেই অঞ্চলটি গোকুল বলে পরিচিত।

[ভাগবত পু. ২.৭.৩১; বিষ্ণু পু. ৫.১৫.১১]

□ গোকুল বসুদেব-পত্নী রোহিণীর আবাসস্থল। কংস যখন বসুদেব-দেবকীকে গৃহবন্দি করে রাখেন সে সময় কংসের ক্রোধ থেকে রক্ষা করার জন্য বসুদেব তাঁর জ্যেষ্ঠা পত্নী রোহিণীকে গোকুলে নন্দগোপের গৃহে রেখে এসেছিলেন। এই নন্দগোপ যেমন বসুদেবের ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন, তেমনই এই গোপপল্লীর অধিবাসী গোপসমাজের তিনি প্রধানও বটে। *[বিষ্ণু পু. ৫.১.৭৩; ভাগবত পু. ৯.২৪.৬৬; ১০.২.৮; ১০.৫.৬, ১৭-১৮]*

□ ভগবান কৃষ্ণ বাল্যকালে গোকুলে বাস করেছিলেন—এ কাহিনী বহুলচর্চিত।

[ভাগবত পু. ১০.১.৯]

□ মথুরার রাজা কংসের আদেশে অক্রূর কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য গোকুলে এসেছিলেন।

[ভাগবত পু. ১০.৩৮.১, ২৪, ২৮]

□ কংসবধের পর মথুরার সিংহাসনে উগ্রসেনকে অভিষিক্ত করেন কৃষ্ণ-বলরাম। মথুরার সিংহাসন পূর্ণ করার পর অবশ্য তাঁরা গোকুলে প্রত্যাবর্তন করেননি। নন্দগোপ অন্যান্য গোপদের সঙ্গে নিয়ে গোকুলে ফিরে আসেন।

[ভাগবত পু. ১০.৪৫.২৫]

□ মথুরাবাসী কৃষ্ণ তাঁর লীলাক্ষেত্র গোকুলের কথা কখনোই বিস্মৃত হননি। গোকুল তথা গোকুলবাসী স্বজনদের বিরহে কাতর হয়ে তিনি উদ্ধবকে তাঁদের কুশল সংবাদ গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছিলেন। উদ্ধব বেশ কিছুদিন গোকুলে বাস করেছিলেন।

[ভাগবত পু. ১০.৪৬.৩, ৭; ১০.৪৭.৫৫]

□ গোকুল ব্রজধাম নামে বিখ্যাত। উত্তর প্রদেশের মথুরার দু-মাইল দূরে অবস্থিত গোকুল গ্রাম পঞ্চায়েতই বালক কৃষ্ণের লীলাভূমি সেই পৌরাণিক গোকুল এমনটাই পণ্ডিতদের অভিমত।

[GDAMI (Dey) p. 70]

গোকুলাকীর্ণা একটি প্রাচীন জনপদ। ভগবান শ্রীহরির হাতে নিহত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর দেহ যখন ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করে তখন তাঁর দেহের আঘাতে বহু নদী-পর্বত-জনপদ কম্পিত হয়েছিল। সেই সব জনপদের মধ্যে গোকুলাকীর্ণা একটি।

[মৎস্য পু. ১৬৩.৬৩]

গোখল্য ভাগবত পুরাণ অনুসারে ঋগ্‌বেদের অন্যতম ঋষি শাকল্যের শিষ্যদের মধ্যে গোখল্য একজন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে গোখল্যকে গোখল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[ভাগবত পু. ১২.৬.৫৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.২]

গোচপলা *[দ্র. গোপজলা]*

গোচর্মবসন শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি। 'গো' শব্দের অর্থ পশু। ব্যাঘ্র বা হস্তীর চর্মই তাঁর পরিধেয় বস্ত্র—এই ভাবনা থেকে পশুচর্ম পরিহিত ভগবান শিব গোচর্মবসন নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.১১৫; (হরি) ১৩.১৬.১১৪]

গোতীর্থ১ প্রয়াগে অবস্থিত তীর্থগুলির মধ্যে গোতীর্থ একটি। *[মৎস্য পু. ১১০.১]*

গোতীর্থ২ নর্মদা তীরবর্তী তীর্থগুলির মধ্যে গোতীর্থ একটি তীর্থস্থান। এই তীর্থগমনে সর্বপাপ নাশ হয়।

[মৎস্য পু. ১৯৩.৩]

গোতীর্থ৩ বনবাসকালে পাণ্ডবরা যে তীর্থগুলিতে ভ্রমণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে একটি হল গোতীর্থ। এটি গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত।

[মহা (k) ৩.৯৫.৩; (হরি) ৩.৭৯.৩]

গোত্র১ মহাভারতের শান্তিপর্বে পরাশরগীতার মধ্যে গোত্রের প্রসঙ্গে কথা বলার সময় নানান সংশয় দেখিয়ে এমন বলা হচ্ছিল যে, একা প্রজাপতি ব্রহ্মার থেকেই যখন সব কিছু জন্মেছে, তখন নানারকম গোত্রের কথা এখানে আসে কোথা থেকে! আর এও তো সত্য কথা যে, মানুষের মধ্যে বহু রকমের গোত্র তো রয়েছে—

ব্রহ্মণৈকেন জাতানাং নানাত্বং গোত্রতঃ কথম্।
বহূনীহ হি লোকে বৈ গোত্রাণি মুনিসত্তমঃ॥

এই সংশয়-প্রশ্ন থেকেই কয়েকটি শ্লোক পরে উত্তর দিয়ে বলেছে—মূল গোত্রগুলি প্রজাপতি ব্রহ্মার নামাঙ্কিত নয়, মূল গোত্রগুলি এসেছে ব্রহ্মার পুত্র চার জন ঋষির নামে, যাঁরা পুত্রোৎপাদন করে সভ্যতা সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিলেন। অঙ্গিরা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ এবং ভৃগু, এই চারটিকেই এখানে মূল গোত্র বলা হয়েছে মহাভারতে—

মূলগোত্রাণি চত্বারি সমুৎপন্নানি পার্থিব।
অঙ্গিরাঃ কশ্যপশ্চৈব বশিষ্ঠো ভৃগুরেব চ॥

এই চারজন গোত্রকারক ঋষি তপস্যার মাধ্যমে গোত্রের প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু চার গোত্রের প্রবর্তক এই ঋষিদের কথা শোনানোর পরেই মহাভারত বলেছে—অন্যান্য আরও সব গোত্রের সৃষ্টি হয়েছে কর্মের মাহাত্ম্যে, সেই সব গোত্রের নামকরণের মধ্যেও তপস্যা আছে এবং সেইজন্যই সৎপুরুষেরা এই গোত্রগুলিকে গ্রহণ করেছেন—

কর্মতো'ন্যানি গোত্রাণি সমুৎপন্নানি পার্থিব।
নামধেয়ানি তপসা তানি চ গ্রহণং সতাম্॥

[মহা (k) ১২.২৯৬.১০, ১৭, ১৮;
(হরি) ১২.২৮৯.১০, ১৭, ১৮]

□ মহাভারতের এই চতুর্গোত্রের মৌলভাব অর্থাৎ মূল গোত্র প্রথমে চারটিই ছিল—এই ঘোষণা নিয়ে আলোচনা কম হয়নি বিশেষত C.V.Vaidya -এর মতো এক মহাপণ্ডিত মহাভারতের এই 'মূলগোত্রাণি চত্বারি' শ্লোকের ওপর নির্ভর করে অঙ্গিরা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ এবং ভৃগুকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের প্রথম গোত্র-প্রবর্তক পিতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং ভগবান ব্রহ্মার এই চার মানস পুত্রকে, তিনি আর্য ঋষি বলে সম্বোধন করতে চেয়েছেন, অন্য গোত্রপ্রবর্তক ঋষিরা ব্রাহ্মণ ঋষি, কিন্তু ওই চার জন 'Aryan-Rishis', পণ্ডিত C.V. Vaidya মহাশয় এই চার আর্য ঋষির কথা বলে আর্যায়ণের প্রথম পর্যায়ে সূর্যবংশের উৎপত্তির সংবাদ দিতে চেয়েছেন। অন্যদিকে বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রের প্রবরাধ্যায়ে কথিত বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ,

গৌতম, অত্রি, বশিষ্ঠ এবং কশ্যপের মতো সপ্তর্ষির সঙ্গে অষ্টম অগস্ত্যের যোগ করে আর্যায়ণের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে অত্রিমুনির সূত্রে চন্দ্রবংশেরও প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। পণ্ডিত বৈদ্যের কথার ওপর তর্কযুক্তি অনেক এসেছে বলেই তাঁর বক্তব্যটুকু তাঁরই ভাষায় জানিয়ে রাখি এখানে—

According to the latest view the gotra-Rishi is a son or rather a descendant of one of the seven Rishis (সপ্তর্ষি) with the addition of the eightth Agastya who is outside the well-known Saptarshis (see the dictum) of Baudhāyana : —সপ্তানাং সপ্তর্ষীণাম্ অগস্ত্যাষ্টমানাং যদপত্যং তদ্‌গোত্রমিত্যাচক্ষতে। This means that the original Indo-Aryan families were considered to be eight viz., I. Viśvāmitra, 2. Jamadagni, 3. Bharadvāja, 4. Gautama, 5. Atri, 6. Vaśiṣṭha, 7. Kāśyapa and 8. Agastya.

But an important śloka in the Mahābhārata takes us still further back and states that there originally were four gotras only

মূলগোত্রাণি চত্বারি সমুৎপন্নানি ভারত।
অঙ্গিরাঃ কশ্যপশ্চৈব বশিষ্ঠো ভৃগুরেব চ॥

These ancient four gotras 1 Angiras 2 Kaśyapa 3 Vaśishṭha and 4 Bhṛgu are supported by the Pravarādhyāyas also in the several Sūtras which always begin with the Bhṛgu Pravara. (It is hence that the Bhagavadgita has the line মহর্ষীণাং ভৃগুরহম্। He is indeed the first of the great or Pravara Rishis). Now this shows that when the first or solar race Indo-Aryan invaders came to India there were four family stocks viz., 1 Bhṛgu, 2 Angiras, 3 Vaśishṭha and 4 Kaśyapa. These were the patriarchs so to say being the mind-born sons of the creator. And they were progenitors of all the three Aryan classes (which were not castes yet) Brahmins, Kshatriyas and Vaiśyas. They in fact were not Brahmin Rishis but Aryan Rishis.

Now Bhrigu's name does not appear in the Saptarshi but that of his descendant Jamadagni does, so also Angiras is substituted by his two grandsons Bharadvaja and Gautma. Therefore, in order to constitute the later 8 stocks we have to add Atri, Viśvāmitra and Agastya. It is clear that the Atri stock represents the second horde of Aryan invaders viz., the lunar race Aryans, as the moon is looked upon as a son of Atri and the lunar race Aryans have generally the Atri gotra. Agastya, is entirely a new addition but it also took place in Vedic times, for Agastya is a Vedic Rishi while Viśvāmitra an Indo-Aryan Kshatriya became a Brahmin and a Pravara Rishi by his austerities, also in Vedic days when caste was stall of the nature of class and families could give up their here ditary avocation and take up another, especially the priestly intellectual one. Visvamitra's , therefore, was a Solar race Kshatriya stock which became priests by his intelligence and his high religious merit. Thus the old history of gotra as preserved in the Mahabharata shows that the ancient Rishis can well be the progenitors of Brahmanas and Kshatriyas.

[C.V. Vaidya, History of Medieval India, pp. 56-57]

□ বৌধায়ন তাঁর শ্রৌতসূত্র গ্রন্থে লিখেছেন—বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি, বশিষ্ঠ এবং কশ্যপ এই সপ্তর্ষিদের সঙ্গে অগস্ত্যকে নিয়ে আটজন ঋষির নামেই গোত্র-ভাবনা প্রবর্তিত হয়। এঁদের ছেলেরাই পিতার যে গোত্র উচ্চারণ করেছে, সেই গোত্রেরই পরম্পরা নেমে এসেছে, তাঁদের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রের পরম্পরায়—

বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্ভরদ্বাজো'থ গৌতমঃ।
অত্রির্বশিষ্ঠঃ কশ্যপ ইত্যেতে সপ্ত ঋষয়ঃ।
তেষাং সপ্তর্ষীণাম্ অগস্ত্যাষ্টমানাং
যদপত্যং তদ্‌গোত্রমুচ্যতে।

[বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র প্রবরাধ্যায় ৫৪]

□ এখানে স্বাভাবিক ভাবে একটা প্রশ্ন উঠে যায় যে, আসলে গোত্র বলে কাকে? ঋগ্‌বেদের মধ্যে 'গোত্র' শব্দটা ব্যবহার হয়েছে গোরু রাখার জায়গা গোয়াল-ঘর হিসেবে, নয়তো বা অনেকগুলি গোরুর সমষ্টি হিসেবেও।

[ঋগ্‌বেদ ১.৫১.৩; ২.১৭.১; ৩.৩৯.৪; ৩.৪৩.৭; ৯.৮৬.২৩; ১০.৪৮.২; ১০.১২০.৮]

□ কিন্তু 'গোত্র' শব্দটি যখন 'সমূহ' অর্থে ঋগ্‌বেদেই ব্যবহার হল—পণ্ডিতেরা অনুমান করেন—তখন থেকেই কতগুলি সমজাতীয় মানুষের একীকরণ বোঝাতে গোত্র-শব্দের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। এটা ঠিক যে, একজন ঋষি বা তেমন বড়ো মানুষের নামে যে বংশ পরম্পরা নেমে আসে, সেই স্পষ্ট অর্থে গোত্র শব্দের প্রয়োগ ঋগ্‌বেদে ঘটেনি, কিন্তু অথর্ববেদে বিশ্বগোত্র্যঃ' শব্দে যখন সমস্ত পরিবারবর্গকে বোঝানো হল, তখন এটা বোঝা যায় যে, রক্তের সম্বন্ধে বাঁধা এক-একটি পরিবার যেন সমগোত্রিয়তার মধ্যে আবদ্ধ হয়েছে অথর্ববেদের কালের আগেই—

বানস্পত্যঃ সংভৃত উস্রিয়াভির্বিশ্বগোত্র্যঃ।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা যেহেতু সোজাসুজি বৈদিক যজ্ঞ এবং যাজ্ঞিকতার সঙ্গে জড়িত, তাই সেখানে কিন্তু গোত্রের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় রাজসূয় যজ্ঞের প্রসঙ্গে যখন বলা হয়—একজন ভৃগুবংশীয় ভার্গব এখানে ঋগ্‌বেদের ঋত্বিক হোতার কাজ করেন—ভার্গবো হোতা ভবতি—তখনই আমরা বুঝতে পারি একটি বংশের বংশকর পিতা (patriarch) হিসেবে এখানে ভৃগুকে গোত্রকারক পিতা হিসেবেই স্মরণ করা হচ্ছে অর্থাৎ ভৃগু বা ভার্গব গোত্রের একজনই এই রাজসূয় যজ্ঞে হোতা হতে পারবেন।

আবার তৈত্তিরীয় সংহিতাতেই আবার একটি পংক্তিতে দেখা যায়—তাহলে এইরকমটা কখনোই দেখা যাবে না যেখানে পর পর দুইজন 'জামদগ্নিয়' আছেন, যাঁদের চুল পাকা, যাঁরা বুড়ো হয়ে গেছেন—

তস্মাৎ পলিতৌ জামদগ্নিয়ৌ ন সংজানাতে।

এই পংক্তি থেকে বোঝা যায় যে, যজুর্বেদের সময়কালেই জমদগ্নি সেই পুরাতন কোনো প্রজাপতি ঋষি এবং এই সময়ের মধ্যেই তাঁর বংশের অধস্তন পুরুষেরা 'জামদগ্নিয়' বা জামদগ্ন্য নামে খ্যাত হয়েছেন জমদগ্নির নামে। অর্থাৎ এতদিনে জমদগ্নি গোত্রকারক ঋষি হিসেবেই পরিচিত হয়ে গেছেন।

[ঋগ্‌বেদ ২.২৩.১৮; ৬.২৫.৫; অথর্ববেদ ৫.২১.৩; কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম) ১.৮.১৮.১; ৭.১.৯.১]

□ ভার্গব বা জামদগ্ন্য, এই সব তদ্ধিত প্রত্যয়-নিষ্পন্ন নাম থেকে গোত্রের ব্যবহার যেমন বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনই গোত্র হিসেবে না বললেও ঋগ্‌বেদ কিংবা অন্য বেদে একই গোত্রের মানুষদের বহুবচনে 'বশিষ্ঠাঃ' 'ভরদ্বাজাঃ' কিংবা 'ভৃগূণাম্' 'অঙ্গিরসাম্' —অর্থাৎ বশিষ্ঠেরা, ভরদ্বাজেরা কিংবা ভৃগুদের, অঙ্গিরাদের—এইভাবে সম্বোধন করায় গোত্রের একটা পূর্বরূপ আমরা পেয়েই যাই। আর সংহিতা—ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির পরবর্তীতে উপনিষদের যুগে 'গোত্র' ব্যাপারটা খুব ভালোভাবেই এসে গেছে। প্রশ্নোপনিষদের আরম্ভেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ছাত্রকুলকে দেখা যাচ্ছে, যাঁদের নামের সঙ্গে গোত্রের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে। এখানে সুকেশা ভরদ্বাজগোত্রের মানুষ, সৌর্য্যায়ণী গর্গগোত্রীয়, কৌশল্য আশ্বলায়ন গোত্রের, বৈদর্ভি ভার্গব এবং কবন্ধী কাত্যায়ন গোত্রের মানুষ—এঁরা সবাই এসেছেন মহর্ষি পিপ্পলাদের কাছে ব্রহ্মবিদ্যা শিখতে। অন্যান্য উপনিষদেও এইরকম গোত্রনাম আছে ভূরি ভূরি। এর পর যখন ব্রাহ্মণ্যের অহংকার তৈরি হয়ে গেল—শ্রৌতসূত্র, ধর্মসূত্র, গৃহ্যসূত্রের গ্রন্থগুলি যখন ব্রাহ্মণের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি আচার-আচরণ-ব্যবহার পৃথকত্বের মহিমায় চিহ্নিত করতে লাগল, তখন বিবাহ-শ্রাদ্ধের মতো সামাজিক আচরণের জায়গায় গোত্র-নাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল।

গোত্রনাম স্মরণ করার পিছনে মূল মনস্তত্ত্বটা যে একটা সাহংকার ব্যক্তিত্বের ঘোষণা সৃষ্টি করে সেকথাটা একটু নির্লজ্জভাবে বলেও ফেলেছেন মনুর বিখ্যাত টীকাকার মেধাতিথি।

মেধাতিথি তাঁর টীকায় লিখেছেন—যেমন

অনেক পুরুষের মধ্যে পুরুষত্ব ব্যাপারটা সাধারণ হলেও ব্রাহ্মণত্বের একটা অন্য বৈশিষ্ট্য থাকে, তেমনই ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব ব্যাপারটা সাধারণ হলেও বশিষ্ঠ ইত্যাদি গোত্রভেদ আছে, আর এই গোত্র-প্রবর্তক ঋষিদের নামগুলি অনাদি কাল থেকে চলে আসছে। . . . বিভিন্ন গোত্রের কথা, গোত্রনামের কথা তাঁরাই স্মরণ করেন যাঁরা সেই গোত্রে জন্মেছেন, তাঁরা এইরকম ঘোষণা করেন— 'আমরা পরাশর গোত্রের ব্রাহ্মণ', 'আমরা উপমন্যু গোত্রের ব্রাহ্মণ'—

যথৈব সমানে পুরুষত্বে ব্রাহ্মণত্বাদি-বিশেষঃ এবং
সমানে ব্রাহ্মণত্বে বশিষ্ঠাদি-গোত্রভেদঃ,
প্রতিগোত্রঞ্চ সমানার্ষেয়াণি। . . . গোত্রভেদস্তু
তদ্‌গোত্রজৈরেব স্মর্য্যন্তে বয়ং
পরাশরা বয়মুপমন্যব ইতি।

একই শোণিত-সম্বন্ধে পরম্পরাগতভাবে নেমে আসা বংশগুলির যে বর্গীকরণ ঘটেছিল— সেটা গোত্রের মাধ্যমে ঘটেছিল বলেই সেটা শুধু বিশিষ্ট গোত্র ব্রাহ্মণত্বের সাহংকার ঘোষণার মধ্যেই শেষ হয়ে যায় না, বরঞ্চ একই রক্তের সম্বন্ধে বিবাহবন্ধন জাতে না ঘটে, সেটাই বোধহয় গোত্র-স্মরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক বলেই গোত্র সম্বন্ধে সচেতনতা বেশী তৈরি হয়েছিল। মনুসংহিতার টীকাকার এক জায়গায় প্রশ্ন তুলেছেন—এই গোত্র ব্যাপারটা কী—

কিমেতদ্ গোত্রং নাম?

তিনি নিজেই উত্তর দিচ্ছেন—গোত্র হচ্ছে সেই আদিপুরুষের নাম যিনি তাঁর বিদ্যা-বিত্ত-শৌর্য্য এবং ঔদার্য্য ইত্যাদি গুণে খ্যাততম হয়ে উঠেছিলেন এবং সেই খ্যাততম নামটি একটি কুল-বংশের সংজ্ঞা তৈরি করে দেয়। . . . ব্রাহ্মণদের এক-একটা কুল এইভাবেই সেই খ্যাততম পুরুষের নামে যেমন ভৃগু, গালব এঁদের নামে নামাঙ্কিত হয়েছে—

আদিপুরুষঃ সংজ্ঞাকারী বিদ্যা-বিত্ত-
শৌর্যৌদার্য্যাদিগুণযোগেন খ্যাততমো যেন
কুলং ব্যপদিশ্যতে। . . . ব্রাহ্মণানাঞ্চ
তৈরেব (ভৃগুগালবাদিভিঃ)
গোত্রব্যপদেশো যুক্তঃ।
তানি হি মুখ্যানি গোত্রাণি রূঢিরূপেণ তত্র
গোত্রশব্দঃ প্রবর্ততে।

পরবর্তী সময়ে এক-একটি গোত্রের খ্যাত নাম থেকে আরও অন্য খ্যাত নাম সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলিকে আমরা কোনো উপনাম বলতে চাই না, কেননা উপবর্গ হলেও তাঁদের গোত্রও ঋষিদের নামের সঙ্গেই যুক্ত। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে বশিষ্ঠগণের কতগুলি বিভাগ-উপবিভাগ আছে যেমন উপমন্যু, পরাশর, কুণ্ডিন ইত্যাদি। তেমনই এই চার বশিষ্ঠগণের অন্য উপবিভাগগুলিও গোত্র নামেই পরিচিত। বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রে বলা হয়েছে—সহস্র সহস্র গোত্র তৈরি হয়ে গেছে বটে, তবে তাঁদের 'প্রবর' কিন্তু উনপঞ্চাশটাই—

গোত্রাণাং তু সহস্রাণি প্রচ্যুতান্যর্বুদানি চ।
উনপঞ্চাশদেবৈষাং প্রবরা ঋষিদর্শনাৎ॥

গোত্রের সবচেয়ে সহজ সংজ্ঞাটা মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কানে-র ভাষায়— "The general conception about gotra is that it denotes all persons who trace descent in an unbroxeu male line from a common male ancestor. When a person says 'I am Jamadajni-gotra' he means that he traces his descent from the ancient sage Jamadagni by unbroken male desent."

মহাভারত এবং দু-তিনটি পুরাণে গোত্রের বিভাগ নিয়ে অবিন্যস্ত কিছু আলোচনা আছে, আমরা সেই তালিকার প্রসঙ্গে পরে আলোচনায় আসবো। কিন্তু পূর্বোক্ত বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রের শ্লোকটিতে 'প্রবর' শব্দটি নতুন একটি পারিভাষিক নাম যা গোত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে, গোত্রের সঙ্গে সঙ্গতি সে আলোচনাটাও খানিক করতে হবে।

[বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র প্রবরাধ্যায় ৫৪;
P.V. Kane, History of Dharma Sastra,
vol. 2, Pt. 1, p. 484]

□ প্রত্যেকটি গোত্রই এক, দুই, তিন অথবা পাঁচ জন ঋষির সঙ্গে যুক্ত আছে, কিন্তু কখনোই তা চারজন ঋষি বা পাঁচের অতিরিক্ত ঋষি-নামের সঙ্গে যুক্ত নয় এবং এই তিন বা পাঁচ জন ঋষিই এক-একটি গোত্রের 'প্রবর' তৈরি করেন। যেমন উপমন্যু-গোত্রের প্রবর ঋষিরা হলেন বশিষ্ঠ, ভরদ্বসু এবং ইন্দ্রপ্রমদ; পরাশর-গোত্রের প্রবর ঋষিরা হলেন বশিষ্ঠ, শাক্ত্য (শাক্ত্র্য) এবং পারাশর্য্য। কুণ্ডিন-গোত্রের প্রবর-ঋষিরা হলেন

বশিষ্ঠ, মৈত্রাবরুণ এবং কৌণ্ডিণ্য প্রবরের এই চিহ্ন দেখানোর পর পণ্ডিত Kane, পরাশর-মাধবীয় নামক গ্রন্থের একটি পংক্তি উদ্ধার করে লিখেছেন— 'It is therefore some defini pravara as 'the group of sages that distinguishes the founder (the starter) of one gotra from another—

প্রবরঃ গোত্রপ্রবর্তকস্য
মুনের্ব্যাবর্তকো মুনিগণঃ।'

[আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe) ২৪.৫.৭; পরাশর-মাধবীয়, ১ম খণ্ড : ২য় অংশ, পৃ. ৯০]

□ বস্তুত প্রবর ব্যাপার ঠিক কী এবং সেটা গোত্রের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত কেন, সে ব্যাপারে সকল পণ্ডিতেরাও ভাল বোঝেন না। তবে সূত্রগ্রন্থগুলির প্রবরাধ্যায়গুলি থেকে যতটুকু বোঝা যায়, তাতে প্রবর-ঋষিরা হলেন তাঁরাই যাঁরা এক-একটি গোত্রজাত পুরুষদের বহুপূর্বপুরুষ যাঁরা বৈদিক মন্ত্র লিখেছিলেন বা মন্ত্র দর্শন করেছিলেন এবং যাঁরা তাঁদের দৃষ্ট মন্ত্রে অগ্নির প্রশংসা উচ্চারণ করেছিলেন। একজন যাজ্ঞিক বা যাজক নিজের প্রবর উচ্চারণ করে যখন অগ্নির কাছে প্রার্থনা করেন, তখন তিনি এটাই বোঝাতে চান যে, তিনি সেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋগ্‌বৈদিক ঋষিদের বংশধর—যে ঋষিরা তাঁদের দৃষ্ট মন্ত্রের মাধ্যমে স্মরণাতীত কালে অগ্নিস্তুতি করেছিলেন। এমনকী যাজক তখন সেই বংশকর ঋষির নামেই অগ্নিকে সম্বোধন করেন—আপস্তম্ব এটাই সূত্রাকারে বলেছেন—

আর্ষেয়ং বৃণীতে।
ন দৈবের্ন মনুষ্যৈরার্ষেয়ং বৃণীতে।
ঋষিভিরেবার্ষেয়ং বৃণীতে ইতি বিজ্ঞায়তে।

আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র এই 'আর্ষেয়'-স্মরণের কথা বলেছে এটা কোনোভাবেই কোনো শিষ্যপরম্পরা নয়, এটা সন্তান-পরম্পরা এবং এই 'আর্ষেয়' শব্দটি আসলে প্রবর অর্থেই প্রযুক্ত। যজমান প্রবর উচ্চারণ করে ঋগ্‌বেদের মন্ত্রকর্তা প্রথম পূর্বপুরুষদেরই যে স্মরণ করছেন, সেকথা আপস্তম্বের অন্য আর একটি সূত্রে বলা হয়েছে—মন্ত্রকৃতো বৃণীতে। যথর্ষি মন্ত্রকৃতো বৃণীতে ইতি বিজ্ঞায়তে।

এই সূত্র থেকে এটা বোঝা যায় যে, যিনি গোত্রের ঋষি, তিনি মন্ত্রকর্তা, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নাও হতে পারেন, কিন্তু তিনি অবশ্যই বিখ্যাত কোনো মন্ত্রদ্রষ্টা প্রবর ঋষির অধস্তন পুরুষ—যে প্রবর ঋষির নাম একটি নতুন নির্দিষ্ট বংশধারাকে চালিত করেছে। এই আর্ষেয় প্রবরের ভাবনা এই কথাই প্রমাণ করে যে, গোত্র অনেক হতে পারে, হতে পারে অসংখ্যেয়, সেই সব গোত্রের প্রবর ঋষিদের সংখ্যা একেবারেই নির্দিষ্ট, কেননা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের সংখ্যাও সীমিতভাবেই নির্দিষ্ট।

আর ওই যে আগে আপস্তম্বের মত উদ্ধার করে জানিয়েছিলাম যে, প্রবর ঋষিদের নাম উচ্চারণের সময় একজন যজমান মাত্র একজন প্রবর ঋষির নাম বলতে পারেন, দুই বা তিনজন ঋষিরও নাম বলতে পারেন কিন্তু চার জনের নাম কখনোই নয়, আর পাঁচ জনের বেশি নাম বলতেই পারবেন না—

একং বৃণীতে দ্বৌ বৃণীতে ত্রীন্ বৃণীতে
ন চতুরো বৃণীতে ন পঞ্চাতিবৃণীতে।

এর মানে হল—একটি বিশেষ বংশধারায় একটি বিশেষ গোত্রের মানুষ খুব বেশি হলে পাঁচ জন মন্ত্রকর্তা প্রবর ঋষির নাম উচ্চারণ করতে পারেন, ফলে একটি গোত্রে যদি পঞ্চাধিক প্রবর ঋষি থাকেনও, তাহলেও তিনি তিন জন বা পাঁচজন প্রবর ঋষির নাম বলতে পারবেন, কিন্তু চারও নয়, পাঁচের বেশিও নয়। একজন গোত্র ঋষি হয় ওই প্রবর ঋষিদেরই একজন হতে পারেন নয়তো বা ওই প্রবর ঋষিদের অধস্তন এক পুরুষও হতে পারেন।

উদাহরণ দিয়ে বলা যায়—ভরদ্বাজ গোত্রের তিন প্রবর হল আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য এবং ভারদ্বাজ। এখানে গোত্র-ঋষি হিসেবে ভরদ্বাজ প্রবর ঋষিও বটে—তিনি তিন প্রবর ঋষির একজন। আবার দেখুন বৎস গোত্রের প্রবর আছে পাঁচটি—ভার্গব, চ্যবন, আপ্নবান, ঔর্ব এবং জামদগ্ন্য। এখানে বৎস এই পাঁচ প্রবরের একজনও নন, কিন্তু তিনি জমদগ্নির এক বিখ্যাত অধস্তন বংশধর, যিনি একটি বিশেষ গোত্রের বংশকর হিসেবে বংশধারার প্রবর্তন করেছেন।

[আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe) ২৪.৫.১-৭; C.V. Vaidya, History of Medieval India, Vol. 2, pp-56-63]

□ গোত্র এবং প্রবর বলতে আমরা কী বুঝব তা খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন পণ্ডিতপ্রবর Max Müller—

When the fire is to be consecrated, Agni Havyavahana, the god who carries the libations to heaven, must be invoked. This invocation or invitation of Agni, is called *pravara* তস্য (অগ্নেরাহবনীয়স্য) প্রকর্ষেণ প্রার্থণানি তৈস্তৈ মন্ত্রদৃগ্‌ভিরেক-দ্বি-ত্রি-পঞ্চসংখ্যকৈর্বিশিষ্টানি একার্ষেয়া দ্ব্যার্ষেয়া স্ত্র্যার্ষেয়াঃ পঞ্চার্ষেয়াঃ প্রবরা ইত্যুচ্যন্তে।

Agni himself or the fire is called Ârsheya, the offspring of the Ṛishis, because the Ṛishis first lighted him at their sacrifices. He is the Hotṛ as well as the Adhvaryu among the gods. Like the Hotṛ and Adhvaryu priests, he is supposed to invite the gods to the sacrifice, and to carry himself the oblation to the seat of the immortals. When therefore a Brahman has his own fire consecrated, he wishes to declare that he is as worthy as his ancestors to offer scrifices, and he invites Agni to carry his oblations to the gods as he did for his ancestors. The names of these ancestors must then be added to his invitation, and thus the invitation or invocation of the ancestors came to be called *pravara.* For instance, if a Brahman belongs to the family of the Mâṇḍûkeyas, he must know that the Mâṇḍûkeyas belong to the Vatsas, and that the Vatsas are descended from Bhṛgu, and invoke five ancestors. He must, therefore, like all members of the Vatsa-gotra, invoke Agni by the names of Bhârgava, Chyâvana, Âpnavâna, Aurva, and Jâmadgna. If he belong to the family of Yâjnavalkya, a branch of the Kuśikas, descendants of Viśvâmitra, he must invoke Agni by the name of Viśvâmitra, Devarata and Udala. This, at least, is the rule laid down in the Baudhâyana-sûtra, with which the Âśvalâyana-sûtra coincides, except that he does not mention the Yâjnavalkyas as a subdivision of the Kuśikas. This custom was known at the time of the composition of the Brâhmanas, and we have no reason to doubt that ever since the first establishment of Vedic sacrific, the forty-nine families preserved the tradition of their sacred pedigree, and that their genealogies possess a certain historical value.[1]

[1. Thus we read in the Srauta-sutras of the Mânavas, that the Dikshita must say his name, the name of his Gotra, of his father, grandfather, and great grandfather; a sustom which, if observed as a sacred law, must have preserved a genealogical knowledge for many generations
দীক্ষিতো'য়মসাবিতি নাম গৃহ্ণাতি।
আমুষ্যায়ণমিতি গোত্রম্।
অমুষ্য পুত্র ইতি পিতুর্নাম্না।
অমুষ্য পৌত্রেতি পিতামহস্য।
অমুষ্য নপ্তেতি প্রপিতামহস্য।]

□ This is confirmed still further if we consider the ancient Brahmanic laws concerning marriage. To marry a woman belonging to the same Gotra, or having the same Pravara, was considered incest, and visited with severe penance. Âśvalâyana (xii. 15) says: 'Asamânapravarair vivâhah.' 'Marrage takes place with persons who have not the same Pravara, *i.e.* who do not invoke the same Rishis as their ancestors.' Âpastamba says: 'Sagotrâya duhitaram na prayachchhet,' 'Thou shalt not give thy doughter to a man belonging to the same Gotra or family.' Yâjnavalkya says: 'Aroginim bhrâtṛimatim asamânârshagotrajâm udvahet.' 'Let a man marry a woman who is free from

disease, who has brothers, and who is not the doughter of a man having the same ancestors and belonging to the same Gotra as himself.' In each case severe punishments wre threatended if a man transgress these rules knowingly, or even unknowingly. There are some special rules with regard to marriage, which differ again according to different Sûtras; of which the following, taken from Âśvalâyana, may serve as a specimen:

1. Persons who have the same Pravara must not intermarry. Hence a Parâśara must not marry the daughter of a Parâśara.

2. Persons belonging to the same Gotra must not intermarry. Hence a Viśvâmitra must not marry the daughter of a Viśvâmitra.

3. There are exceptions to this rule among the Bhṛigus and Ângirasas. As a general rule, persons are called sagotra, if but one of the Ṛishis whom they invoke is the same. Hence an Upamanyu must not marry the daughter of a Parâśara, because the name of Visishtha occurs in the tryârsheya pravara of both. But the three Gotras of the Bhṛigus, from the Śyaitas to the Śunakas, may intermarry. The first four Gotras of the Bhṛigus must not, neither the six first Gotras of the Gotamas. The Pṛshadaśvas, Mudgalas, Vishṇuvṛiddhas, Kaṇvas, Agastyas, Haritas, Sankṛtis, Kapis and Yaskas may intermarry among themselves, and with the Jâmadagnyas, & c. Dhighatamas', on the contrary, Auchathyas and Kakshîvats are to be considered as members of one Gotra, nor are marriages allowed between the Bharadvâjâgniveśis, Ṛkshas, Śunga-Śaiśiris, (or Śungas, Śaiśiris). Katas, and, according to some, the Gargas.

It is clear from this that the science of genealogy, being so intimately connected with the social and ecclesiastical system of the Brahmans, must have been studied with great care in India, and that the genealogical lists which have been preserved to us in ancient works represent something real and historical.

[Max Müler, A History of Ancient Sanskrit Literature, Landon: williams and Norgate, 1860, pp. 386-389; পাঠ্য: S.V. Karandikar, Hindu Exogamy, Bombay: D.B. Taraporevala song & co, 1929, pp. 22-99; P. Chentsalrod, The principles of Pravara and Gotra, 2nd. Ed, Mysore, 1900; P.V. Kane, History of Dharmasastra, vol. II: Pt. 1, Pune: B.O.R.I, 1997, pp. 478-498]

গোত্র২ মহর্ষি বশিষ্ঠের ঔরসে উর্জার গর্ভজাত সাত পুত্রের মধ্যে একজন। বশিষ্ঠের এই সাতপুত্র তৃতীয় মন্বন্তরে সপ্তর্ষি হয়েছিলেন বলে জানা যায়। বিষ্ণু পুরাণের বঙ্গীয় সংস্করণে মহর্ষি গোত্রকে গাত্র নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের পাঠে তিনি চিহ্নিত হয়েছেন গর্ত নামে।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ১.১০.১৩; বিষ্ণু পু. (নবভারত) ১.১০.১৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১১.৪১]

গোদ একজন গন্ধর্ব। প্রজাপতি বিক্রান্তের পুত্রদের মধ্যে একজন। *[বায়ু পু. ৬৯.২৬]*

গোদাব কেতুমাল নামক পৌরাণিক ভূখণ্ড বা কেতুমাল বর্ষের অন্তর্গত জনপদগুলির মধ্যে একটি। *[বায়ু পু. ৪৪.১৫]*

গোদাবরী ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম তথা অন্যতম পবিত্র নদী। সহ্যপাদ পর্বত অর্থাৎ সহ্যাদ্রি পর্বত গোদাবরীর উৎপত্তিস্থল। সহ্যপাদ পর্বতের উত্তরাংশের যে জায়গাটি থেকে গোদাবরী উৎপন্ন হয়েছে, বায়ুপুরাণে সেটিকে মনোরম স্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুররাজ গোবর্ধন ওই স্থানেই এক নগর নির্মাণ করেছিলেন। ঋষি ভরদ্বাজও ওই

একই জায়গায় রামচন্দ্রের জন্য পর্বত, বৃক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টি করেন।

গোদাবরী মহাকাব্য ও পুরাণে বহু আলোচিত একটি নদীর নাম। রামায়ণে রামচন্দ্রের বনবাসের স্মৃতি গোদাবরী নদীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। গোদাবরীর তীরেই রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার বনবাসের স্মৃতিবিজড়িত পঞ্চবটী বনের অবস্থান। মহাভারতে আবার বলা হয়েছে যে, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা বনবাসকালে গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত দণ্ডকারণ্যে দীর্ঘদিন বাস করেছিলেন।

[রামায়ণ ৩.১৩.১৮; মহা (k) ৩.২৭৭.৪১; (হরি) ৩.২৩১.৪১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৩৪-৩৫; বায়ু পু. ৪৫.১০৪; ৪৬.১১২; বিষ্ণু পু. ২.৩.১২; মৎস্য পু. ১১৪.২৯]

□ রামায়ণের আরণ্যকাণ্ডে রামচন্দ্রের মুখে গোদাবরী এবং তার তীরবর্তী অঞ্চলের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। রাম গোদাবরীকে ফুলে-বৃক্ষে সজ্জিত সুরম্য এক নদী বলে উল্লেখ করেছেন—

ইয়ং গোদাবরী রম্যা পুষ্পিতৈস্তরুভির্বৃতা॥

এই নদীর তীরে হরিণেরা খেলা করে বেড়ায়। এই গোদাবরী নদী রামপত্নী সীতার বিশেষ প্রিয় ছিল। রাবণ যখন সীতাকে হরণ করার জন্য পঞ্চবটীতে আসেন, তখন রাক্ষসকুলপতির ভয়ে গোদাবরী নদীর জল হ্রাস পেয়েছিল। অপহৃত সীতাও গোদাবরী নদীর কাছেই প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর অপহরণের সংবাদ রামচন্দ্রের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। রামচন্দ্রও গোদাবরী নদীর কাছে সীতার খোঁজ করেছিলেন।

[রামায়ণ ৩.১৫.১১-১৩; ১৬.২; ৪৬.৭; ৪৯.৩১; ৬৩.১৩; ৬৪.৯-১১]

□ সীতাহরণের পর সুগ্রীব তাঁর বানরসেনা প্রধানদের সীতার খোঁজে বহু নদী ও জনপদে পাঠিয়েছিলেন। এই নদীগুলির মধ্যেও গোদাবরী অন্যতম। *[রামায়ণ ৪.৪১.৯]*

□ গোদাবরী নদীর অন্য নাম গৌতমী গঙ্গা। পুরাণের একটি কাহিনীতে এই নামকরণের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। মহর্ষি গৌতম একবার গোহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মহাদেবের উপাসনা করেছিলেন। গৌতমের উপাসনায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে বরপ্রার্থনা করতে বলেন। মহর্ষি গৌতম মহাদেবের কাছে তাঁর জটাস্থিত গঙ্গা নদীকে মর্ত্যে প্রবাহিত করার বর চান। মহাদেব তাঁর জটায় রক্ষিত গঙ্গা নদীকে ব্রহ্মগিরি পর্বতের উপর ত্যাগ করেন। মহর্ষি গৌতম প্রার্থনা করেন যে, ব্রহ্মগিরি থেকে গঙ্গার পবিত্রধারা ভূ-পৃষ্ঠে যতদূর পর্যন্ত প্রবাহিত হবে ততদূর পর্যন্ত ভূ-ভাগ যেন সেই পবিত্র জলের স্পর্শে সম্পূর্ণ পাপমুক্ত হয়। মহর্ষি গৌতমই গঙ্গার এই ধারাকে মর্ত্যে নিয়ে এসেছিলেন বলে এর নাম গৌতমী গঙ্গা। আসলে এটি গোদাবরী নদী।

[দ্র. গঙ্গা]

[ব্রহ্ম পু. ৭৪-৭৭ অধ্যায়; শিব পু. (জ্ঞান) ৫২-৫৪ অধ্যায়]

□ বরুণদেবের সভায় যেসব নদী উপযুক্ত দেহ ধারণ করে বরুণদেবের উপাসনা করে, তাঁদের মধ্যে গোদাবরী অন্যতম।

[মহা (k) ২.৯.২০; (হরি) ২.৯.২০]

□ এই নদীর তীরে বহু তীর্থের অবস্থান। পুরাণে গোদাবরী নদীকে সহস্র শিবলিঙ্গ বিশিষ্ট তীর্থ বলা হয়েছে। গোদাবরীর পবিত্র জলে স্নান করলে গোমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় এবং বাসুকিলোক লাভ হয়। দক্ষিণ ভারতের এই নদীর তীরে বহু উদ্যান ও মনোরম বনভূমি আছে। পাণ্ডবরা বনবাসের সময় একবার গোদাবরী-নদী-তীর্থ দর্শন করেছিলেন।

[রামায়ণ ৩.৬৪.২; মহা (k) ৩.৮৫.৩৩; ৮৮.২; ১১৮.৩; (হরি) ৩.৭০.৩৩; ৭৩.২; ৯৯.৩; মৎস্য পু. ২২.৪৬, ৫৭-৫৮]

□ যুগাবসানকালে বালকরূপী শ্রীহরি মার্কণ্ডেয় ঋষিকে তাঁর উদরে আশ্রয় দিয়ে তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষি সেই সময় শ্রীহরির উদরে বহু নদীকে আশ্রিত অবস্থায় দেখেন। তাঁর দৃষ্ট পুণ্যতোয়া নদীগুলির মধ্যেও গোদাবরী অন্যতম।

[মহা (k) ৩.১৮৮.১০৩; (হরি) ৩.১৫৯.১০৪]

□ বরাহ অবতারে ভগবান বিষ্ণু দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। হিরণ্যকশিপুর বিশাল দেহ মারণ-আঘাতে ভূমি স্পর্শ করলে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ কম্পিত হয়। এই সময় গোদাবরী নদীর জলও কম্পিত হয়েছিল। *[মৎস্য পু. ১৬৩.৬১]*

□ গোদাবরী নদী বেদে উল্লিখিত হব্যবহনকারী পবিত্র অগ্নির উৎপত্তিস্থল। আর্য ও ম্লেচ্ছ উভয় জাতীয় মানুষ পবিত্র গোদাবরীর জল

পান করত। অর্থাৎ সমস্ত জনজাতীয় মানুষের উপজীব্য ছিল এই নদী।

[মহা (k) ৩.২২২.২৪; ৬.৯.১৪; ১৩.১৪৩.২২; (হরি) ৩.১৮৫.২৪; ৬.৯.১৪; ১৩.১৪৩.২২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১২.১৫; মৎস্য পু. ৫১.১৩; বায়ু পু. ২৯.১৩; ভাগবত পু. ৫.১৯.১৮]

□ গোদাবরী ভারতের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। মহারাষ্ট্রের ত্রিম্বকেশ্বরের কাছে পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে উৎপন্ন গোদাবরী নদী তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ত্র্যম্বকেশ্বর থেকে গোদাবরীর যে শাখাটি প্রবাহিত হয়েছে স্থানীয়দের কাছে তা আজও গৌতমীগঙ্গা নামে অধিক পরিচিত। মহর্ষি গৌতম ও গৌতমী গঙ্গার কাহিনী স্মরণ করে ত্র্যম্বকেশ্বরের কাছে বারো বছর অন্তর একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

[The History of Sacred Places in India as Reflected in Traditional Literature; Ed by: Hans Bakker; Netherlands, 1990, p. 92; GDAMI (Dey) p. 69]

গোদাশ্রম মৎস্য পুরাণে দেবী শক্তিরমাহাত্ম্য যুক্ত যে তীর্থগুলির উল্লেখ রয়েছে, তাদের মধ্যে গোদাশ্রম একটি। গোদাশ্রমে দেবী ত্রিসন্ধ্যা নামে পূজিতা হন। [মৎস্য পু. ১৩.৩৭]

গোধ১ মধ্যভারতে বসবাসকারী একটি প্রাচীন জনজাতি। [ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৪২]

□ বর্তমান মধ্যপ্রদেশে প্রাচীনকালে গোধ নামে একটি জনজাতি বাস করতো। এঁরা পরবর্তীকালে দেশান্তরিত হয়ে গুজরাটের সুরাট এবং ভালসাদ ও রাজস্থানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। গোধরা মূলত জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত।

[Proceedings-of Indian History Congres, Calcutta; Indian History Congress; 1970, p. 204]

গোধ২ ভীষ্মপর্বে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে ভারতবর্ষের বিবরণ দিতে গিয়ে যে জনপদগুলির কথা উল্লেখ করেছেন গোধ তাদের মধ্যে একটি।

[মহা (k) ৬.৯.৪২; (হরি) ৬.৯.৪২]

গোধন ভারতবর্ষের অন্তর্গত একটি পর্বত। বায়ুপুরাণে এটিকে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান পর্বত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.২২; বায়ু পু. ৪৫.৯১]

□ পণ্ডিতদের মতে গোধন দাক্ষিণাত্যের একটি পার্বত্যভূমি। *[EAIG (Kapoor) p. 282]*

গোধামা একজন বানরবীর।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৪৪]

গোনন্দ স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অনুচর একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৬৫; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

গোনর্দ একটি পূর্বভারতীয় জনপদ।

[মৎস্য পু. ১১৪.৪৫]

□ প্রাচীন বিদিশার নিকটবর্তী একটি অঞ্চল। বৃহদ্‌সংহিতায় গোনর্দ জনপদটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

পণ্ডিত D.C. Sircar-এর মতে, তাত্ত্বিকভাবে গোনর্দকে পূর্বভারতের জনপদ বলা হয়েছে। বাস্তবে এটি বর্তমান মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বিদিশার সংলগ্নই। এ প্রসঙ্গে তিনি মগধের কথা বলেছেন। পুরাণে মগধকে মূলত পূর্বভারতীয় জনপদ বলা হলেও স্থান বিশেষে মধ্যভারতের অঞ্চল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গোনর্দের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয়।

[বৃহৎ সংহিতা. ৯.১৩; GAMI (Sircar) p. 264-274]

গোনীপতি অত্রিবংশীয় বংশপ্রবর্তক ঋষিদের মধ্যে একজন। [মৎস্য পু. ১৯৭.৪]

গোপ১ ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন সম্প্রদায়। গোপ শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'গুপ্‌' ধাতু থেকে 'গুপ্‌' বলতে যেমন গোপন করাও বোঝায় তেমনই রক্ষকও বোঝায়। বৃহত্তর অর্থে 'গোপ' বলতে অবশ্য গোপালক অর্থাৎ গো-রক্ষক সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়।

ঋগ্‌বেদ ও মহাভারতে রক্ষক অর্থেই গোপ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

[ঋগ্‌বেদ ২.২৩.৬; ৩.১০.২; ৫.১২.৪; মহা (k) ১.১৫৫.২; ৬.১২.৩০; (হরি) ১.১৪৯.২; ৬.১২.৩০]

□ শুক্লযজুর্বেদ বাজসনেয়ী সংহিতার একটি মন্ত্রে গোপ অর্থাৎ গোপালকে পুষ্টির উদ্দেশে নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে।

[বাজসনেয়ী সংহিতা (Weber) ৩০.১১]

শতপথ ব্রাহ্মণে শর্য্যাত নামে এক গোপের উল্লেখ পাওয়া যায়। শর্য্যাতকে গোপালক রূপেই শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণনা করা হয়েছে।

[শতপথ ব্রহ্মাণ (Egglihg) ৪.১.৫.৪]

☐ বলা যেতে পারে গোপ শব্দটি সাধারণভাবে সমগ্র গোপালক সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও যমুনাতীরবর্তী বৃন্দাবনবাসী যদু-বৃষ্ণি বংশীয় ঘনিষ্ঠ গোরক্ষকদের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

পুরাণে কৃষ্ণ ও বলরামের পালকপিতা নন্দগোপ সহ সমগ্র গোপ সম্প্রদায়কে দেব অংশজাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[ভাগবত পু. ১০.১.৬২; হরিবংশ পু. ২.৫.৬-৯]

☐ ব্রজবাসী গোপগণের বাসস্থান গোকুল। পুরাণে গোকুলে কৃষ্ণের জন্মোৎসবের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। নন্দগোপ মথুরার গোপগণের প্রধান স্থানীয় ছিলেন বলে মনে হয়। মথুরার রাজা সে সময় কংস। কংসের প্রকোপ থেকে সদ্যজাত কৃষ্ণকে রক্ষা করার জন্য নন্দগোপ প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা, রত্ন এবং মূল্যবান বস্ত্র মথুরায় কংসের কাছে উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।

এ তথ্য থেকে কয়েকটি বিষয় ধারণা করা যায়। প্রথমত, ব্রজের গোপ সম্প্রদায় বেশ সমৃদ্ধশালী গোষ্ঠী বলে পরিচিত ছিল। দ্বিতীয়ত, মথুরার রাজা কংসের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক মধুর ছিল না বলেই মনে হয়। এঁদের কংসের বিরোধী পক্ষই বলা যেতে পারে কারণ এদের সঙ্গে কংসের সম্পর্ক মধুর হলে বসুদেবও আপন পুত্রকে নন্দগোপের আশ্রয়ে রাখতে সাহস পেতেন না। নন্দগোপ অবশ্যই বসুদেবের পক্ষ সমর্থনকারী এবং কৃষ্ণকে পুত্রের মতো প্রতিপালন করেই তিনি বন্ধু হিসেবে আপন বিশ্বস্ততার উৎকৃষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন বলে আমরা মনে করি।

[ভাগবত পু. ১০.৫.১-২০; ১০.১১.৩০-৩৬]

☐ পূর্বে গোপ সম্প্রদায় দেবরাজ ইন্দ্রের উপাসক ছিল। এই রীতি পরিবর্তন করেছিলেন কৃষ্ণ স্বয়ং। একবার ইন্দ্রযজ্ঞের সময় কৃষ্ণ এই বিশেষ উপাসনার কারণ এবং এ সম্পর্কিত ধ্যানধারণা বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করে বলেন যে, গোপগণ কৃষি বা বাণিজ্যজীবী নয়। তাঁরা বনচর (পশুপালক)। ফলে গাভীই গোপদের দেবতা—

ন বয়ং কৃষিকর্ত্তারো বাণিজ্যজীবিনো ন চ।
গাবো'স্মদ্দৈবতং তাত বয়ং বনচরা যতঃ॥

[বিষ্ণু পু. ৫.১০.২৫-২৬; হরিবংশ পু. ২.১৬.২]

☐ কৃষ্ণ গোসমূহকে গোপজাতির পূজ্যত্বে স্থাপন করে গোচারণভূমির প্রান্তসীমায় অবস্থিত গোবর্ধন পর্বতকেও পূজ্যস্থানে স্থাপন করলেন। গোবর্ধনে গিরিযজ্ঞের আরম্ভে তিনি বলেছেন—আমরা স্বস্তিবাচন করে কোনো বড়ো গাছের তলায় অথবা কোনো ভাল জায়গায় আমাদের পাল্য পশুদের একত্র করব। তারপর সাড়ম্বরে আমাদের পূজা আরম্ভ হবে। নির্দেশ হল—গোরুগুলোর শিঙ মুড়ে দিতে হবে শারদ ফুলের রাশিতে, আর তাতে বাঁধা থাকবে ময়ূরের পালক। ঘণ্টা ঝুলিয়ে দিতে হবে প্রত্যেকটি গোরুর গলদেশে। অঞ্জলি ভরে আনতে হবে শরৎকালের ফুল। পুজোর জন্য।

কৃষ্ণের আদেশ এবং উপদেশমতোই গিরিযজ্ঞ আয়োজিত হল সেবার। ঢাক-ঢোল, বাদ্যি-বাজনা বাজতে আরম্ভ করল। গোরু-বাছুর-ষাঁড় চেঁচাতে লাগল এক সঙ্গে। দুধ-দই-ঘি-ঘোলের পাত্রগুলি হ্রদের মতো দেখতে হল। মাংস আর সুসংস্কৃত অন্নের পাহাড় তৈরি হল—

মংসরাশিঃ প্রভূতাঢ্যঃ প্রকাশৌদনপর্বতঃ।

গন্ধ-মাল্য-ফুলের স্তূপ রাশীকৃত হল। হৃষ্টপুষ্ট এবং সন্তুষ্ট গোপজনের সঙ্গে দেখা গেল বিচিত্রবেশিনী গোপললনাদের—

তুষ্ট গোপজনাকীর্ণো গোপনারীমনোহরঃ।

যজ্ঞ আরম্ভ হল একেবারে বৈদিক কায়দায়। আজ্যস্থালী, চরুস্থালী এবং ব্রাহ্মণদের স্বস্তি-বাচনে যজ্ঞস্থল মুখরিত হল। অন্ন-পান আর দক্ষিণায় তুষ্ট হয়ে—তুষ্টাঃ সম্পূর্ণমানসাঃ—ব্রাহ্মণরা প্রভূত আশীর্বাদ করে আসন ছেড়ে উঠলেন। গয়লাদের আনা দই, দুধ, ঘৃত, মাংস কৃষ্ণই আস্বাদন করার সুযোগ পেলেন সবার আগে। তাঁর আদেশ সিদ্ধ হয়েছে, অতএব সন্তুষ্টমনে তিনি গয়লাদের উপহার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণ নিজেই গোবর্ধন পাহাড়ের সঙ্গে একাত্ম হলেন যেন। বস্তুত, গোবর্ধন নামটি বোধহয় আগে ছিল না। আজ এই অনুষ্ঠানে গোপজনের জীবিকা—গো-বৃদ্ধি বা বর্ধনের জন্যই যেহেতু যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই যজ্ঞ যেহেতু এই পাহাড়ের পাশেই বিস্তৃত প্রদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল অতএব সেই গো-বর্ধন বা গো-মঙ্গল উৎসবই— বুদ্ধিবৃদ্ধিকরী গবাম্—গোবর্ধনপূজার সঙ্গে একাত্মক হয়ে গেল।

[বিষ্ণু পু. ৫.১০.৩৭-৪৯; হরিবংশ পু. ২.১৭.১৬-৩৯; ভাগবত পু. ১০.২৪.৩১-৩৮]

□ বৃন্দাবনের ব্রজভূমি, যেটা মথুরারাজ কংসের গোচারণক্ষেত্র ছিল, সেখানকার গোপগণকে শুধুমাত্র দধি-দুগ্ধ, ক্ষীর-ননীর উৎপাদক জাতি হিসেবেই গ্রহণ করা ঠিক হবে না। বিশেষত কংসরাজার গোচারণক্ষেত্র হিসেবে তাঁর ব্রজভূমি বৃন্দাবনের নামান্তর হয়ে উঠলেও সেকালের দিনে প্রত্যেকটি বড়ো বড়ো রাজারই ব্রজভূমি থাকত এবং সেখানে গোকুলের বিচরণমাত্র সম্পন্ন হত না, সেখানে গো-প্রজনন থেকে আরম্ভ করে প্রকৃষ্ট গো-সম্পদ গড়ে তোলাটাও একটা কার্যকর কর্মভূমি হিসেবে গণ্য হত। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে বিভিন্ন শাসন-বিভাগে অধ্যক্ষ-প্রকার নির্ণয় করার সময় 'গো'ধ্যক্ষ বা গবাধ্যক্ষের কার্যক্রম বলার সময় বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, গোরক্ষা-কর্মের জটিলতা কতখানি এবং এই শাসন-ভাগে গো-পশুকর্মের জটিলতা এইজন্যই যে, সেটা শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ের কাজে লাগে। এই গো-ব্যবসায়ের সঙ্গে রাষ্ট্রও নিবিড়ভাবে জড়িত থাকত এবং রাজশাসনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ।

[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (Kangle), ১ম খণ্ড, ২.২৯ অধ্যায়]

□ রাজাদের অবশ্য শিক্ষণীয় যে চারটি বিদ্যার কথা মনু এবং কৌটিল্য বলেছেন, তার মধ্যে একটি হল 'বার্তা'। এই পারিভাষিক শব্দটির অর্থ হল—কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য। আর মনু, কৌটিল্য, মহাভারত, গীতা, সব গ্রন্থই একযোগে বলেছে যে, এটি বৈশ্যবর্ণের কাজ—

কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্যং বৈশ্যং কর্ম স্বভাবজম্।

এই সূত্র থেকে বলা যায় যে ভারতবর্ষের গোপজাতি শুধুমাত্র কংসের ব্রজভূমিতেই আবদ্ধ ছিল না, অন্যত্রও তাঁদের বসবাস ছিল। তবে এখানে এটাও বলা দরকার যে, কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রটিতেও অনেক সময় শূদ্রদের সঙ্গে বৈশ্যদের বিনিময়ও ঘটেছে, অর্থাৎ শূদ্রেরাও গোরক্ষা এবং কৃষিকর্ম করতেন এবং 'সোস্যাল মোবিলিটি' অনেক প্রাচীন কালেই তৈরি হয়েছিল এবং সেটা সামান্য একটু বুঝিয়ে বলতেই হবে।

একথা মনে রাখতে হবে যে, বৈদিক যুগের পরবর্তী কালে শূদ্র জনজাতির গুণকর্ম যখন প্রেশ্যভাবের মধ্যে (Serving other upper classes) নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, তখনও কিন্তু দেখা যাচ্ছে শূদ্রকুলের হাতে গবাদি পশুধন অনেক আছে। এই পশুধন তাঁদের ঘরে থাকার অন্যতম কারণ হল—আর্যরা নিজেরা প্রথমত পশুপালক জাতি ছিলেন এবং গবাদি পশুর মূল্যও তাঁরা খুব ভাল বুঝতেন। কিন্তু ভারতবর্ষের মাটিতে আর্যদের স্থায়ী আবাস গড়ে ওঠার পর উত্তর-বৈদিক যুগে যখন বর্ণবিভাগ বেশ দৃঢ় আকার ধারণ করছে, তখন পশুপালনী বৃত্তিটা শূদ্রদের জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলত আর্যদের পালনীয় পশুগুলি শূদ্রদেরই সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সম্পত্তি যতই হোক, মৈত্রায়ণী সংহিতায় বলা হচ্ছে যে, শূদ্রেরা এই গোধন-অশ্বধন নিজেরা নিজের পরিশ্রমে প্রতিপালন করতেন, কিন্তু উচ্চবর্ণের মানুষেরা তাঁদের কাছ থেকে এই পশু নিয়ে যেতেও পারতেন আপন প্রয়োজনে—

শ্রেয়স্যে হীত্যেতদ্ এতদেবাস্মা
অত্যাহ্বয়তি যো বৈশ্যঃ
শূদ্রো বা বহুপুষ্টঃ স্যাৎ, তস্য গবাং
সাণ্ডং বৎসতরম্ অপময়েত।

এখানে বৈশ্য এবং শূদ্র দুই বর্ণকেই কিন্তু 'বহুপুষ্ট' বলা হচ্ছে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল। বিশেষত এই পশুধনের অধিকারী বলেই পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে শূদ্রদের বর্ণাধমতা স্বীকার করেও তাঁদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা পরিষ্কার করে বলা হচ্ছে যে, শূদ্রদের কোনো দেবতা নেই, যাগ-যজ্ঞ করার অধিকারও তাঁদের নেই, কিন্তু তাঁরা বেশ বড়োলোক কেননা তাঁদের ঘরে বহু পশু আছে, এই পশু কিন্তু গোরু ছাড়া অন্য পশু নয়—

ন কাচন দেবতা শূদ্রো মনুষ্যস্তস্মাচ্ছূদ্র
উত বহুপশুঃ অযজ্ঞীয়ো বিদেবোহি।

এই সূত্র থেকেই শূদ্রজাতিতত্ত্বের বিশারদ পণ্ডিত মন্তব্য করেছেন যে, এইসব গোপালক শূদ্রেরা যতই 'অদেব' কিংবা 'বিদেব' হোন না কেন, তাঁদের কিন্তু স্বাধীন বিত্ত ছিল গবাদি পশু এবং একসময় তো আর্য ব্রাহ্মণদের মুখ থেকে এ কথা বেরিয়েছে যে, পুরুষের বিত্ত, গৃহ, পশু এবং সন্তান (প্রজা) এগুলি সবই মঙ্গলের দ্যোতক—

যদ্ বৈ পুরুষস্য বিত্তং তদ্ ভদ্রং গৃহা
ভদ্রং প্রজা ভদ্রং পশবো ভদ্রম্।

ফলত আর্য পুরুষের পূর্বজীবনের যে পশুধনের আড়ম্বর সেটা শূদ্র গোপালকদের

সম্পত্তি হয়ে যাওয়ায় গোপালকদের শূদ্রতা কিছু কমেই গিয়েছিল এবং হয়তো এই কারণেই মৈত্রায়ণী সংহিতার মতো প্রাচীন গ্রন্থে শূদ্রদের সঙ্গে বৈশ্যরাও একই পংক্তিতে 'বহুপুষ্ট' পদবী লাভ করেছেন।

[মৈত্রায়ণী সংহিতা (Schroeder) ৪.২.৭, পৃ. ২৮; তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ, ৬.১.১১; লাট্যায়ন ব্রাহ্মণ থেকে সায়নাচার্য উদ্ধৃত পংক্তি, ঋগ্‌বেদ ১.১.৬]

□ গোপালক গোপদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা তৎকালীন শূদ্রদের অবস্থান থেকে খানিক উন্নত ছিল বলেই তাঁরা হয়তো প্রশাসনিক জায়গাতেও খানিক উচ্চপদে বহাল হয়েছেন। লক্ষণীয় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে একটি প্রশাসনিক পদের নাম পাওয়া যায়, সে পদের নাম গোপ। হয়তো এই শব্দটি আক্ষরিক অর্থে রক্ষক বা রক্ষাকর্তাই বোঝায়, তবু এই কিন্তু পণ্ডিতেরা অনেকেই মনে করেন যে, 'pastoral economy'-র জায়গা থেকেই 'গোপ'-সংজ্ঞাটা উঠে এসেছে। আর অর্থশাস্ত্রে এটাই দেখা যাবে যে, পাঁচটা বা দশটা গ্রামের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানিক দায়িত্ব থাকত এই গোপের ওপর—

তৎপ্রদিষ্টঃ পঞ্চগ্রামীং দশগ্রামীং বা গোপশ্চিন্তয়েৎ।

গ্রামের কর্ষক-চাষীদের কাছ থেকে রাজকর নেওয়া থেকে আরম্ভ করে গ্রামের মানুষদের সংখ্যাগণনা এবং গ্রামের বিভিন্ন জীবিকোপজীবী মানুষের অবস্থান নির্ণয় করাটাও গোপদের কাজের মধ্যে পড়ত। বিভিন্ন জীবিকার এই শ্রেণীগুলির মধ্যে প্রধান হলেন—কর্ষক, গোরক্ষক গোপেরা, ব্যবসায়ী বণিকেরা, কারুশিল্পী, কর্মকার (কারখানায় কাজ করেন) আর দাস (যাঁরা পরের সেবা করেন)। এখানে খেয়াল করতে হবে যে, কর্ষক, গোরক্ষক এবং বণিক কিন্তু বৈশ্যবর্গের মানুষ। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে, মৌর্যযুগ পর্যন্ত গোরক্ষক গোপকুল কিন্তু শূদ্র বলে পরিগণিত নন, তাঁরা বৈশ্য বর্ণের মানুষ।

এই গোরক্ষক গোপদের কাজ কী ছিল? কৌটিল্য লিখেছেন—

1. The Superintendent of Cattle should know about (cattle) looked after in return for a wage, tended with a tax and a fixed return, become useless and cast off, entered (in the state herds) by payment of a share, the total number of (cattle in) herds, (cattle) that are lost or have perished, and the total produce of milk and ghee.

2. The cowherd, the buffalo-herdsman, the milker, the churner and the hunter should look after one hundred milch-cows, receiving a wage in cash.

3. For, if given a wage in milk and ghee, they might do harm to the claves. These are (cattle) looked after for a wage.

4. One person should look after one hundred animals containing an equal number of aged cows, milch-cows, cows with young, cows with calf for the first time and heifers.

5. He should give eight *vārakas* of ghee, one *paṇa* per animal (and) the hide with the mark, every year. This is tending with a tax and a fixed return.

[Kautilīya Arthaśāstra (Kangle), Vol 1, 2.35.2, p. 92; Vol 2 (Kangle), 2.29.1-5]

□ কৌটিল্যের এই তথ্যসূত্র ধরে এখানে জানানো যায় যে, মথুরারাজ কংসের ব্রজভূমি বৃন্দাবনেও এই প্রকারের কাজ চলত, যদিও কৌটিল্যের সময়ে গোপদের কর্ম-প্রকার আরও বহুল এবং সুবিন্যস্ত। কিন্তু কৌটিল্যের গোপজাতিতত্ত্বকে মাথায় রেখে হরিবংশের সেই গোবর্ধন গিরিযজ্ঞের কথা বললে এটা পরিষ্কার হবে যে, গোপজাতির এক পৃথক identity কৃষ্ণই তৈরি করে দিয়েছেন। ব্রজভূমি বৃন্দাবনে ব্রজের গোপকুল বর্ষারম্ভে ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন করলে কৃষ্ণ বললেন—এই উৎসবের প্রয়োজন কি? পক্বকেশ এক গোপবৃদ্ধ এর উত্তরে বৃষ্টি আর কৃষির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন কৃষ্ণকে। তিনি বললেন—ইন্দ্রই আমাদের সনাতন রক্ষক (পাঠক খেয়াল করবেন ঋগ্‌বেদের ধারণাও তাই)। এর পরে গোপবৃদ্ধ ছোট্টখাট্ট যে বক্তৃতাটি দিলেন, এক কথায় তাকে ঋগ্‌বৈদিক ইন্দ্রস্তুতির পৌরাণিক সংস্করণ বলা চলে। হরিবংশ জানাচ্ছে 'ইন্দ্রের সমস্ত প্রভাব জেনেও—প্রভাবজ্ঞো'পি শক্রস্য—

কৃষ্ণ বললেন—যারা কৃষিজীবী, যাদের শস্য ফলানোর প্রয়োজন আছে, তারা ইন্দ্রযজ্ঞ করুক। আমরা হলুম গিয়ে গোয়ালা, গোরুই আমাদের জীবন। যার কাছে অভীষ্ট ফল পাই, তাকে বাদ দিয়ে অন্যজনের পূজা করা তঞ্চকতা মাত্র। তার ওপরে যে পর্যন্ত কৃষি-জমি আছে সেই পর্যন্তই ব্রজের সীমা, সেই সীমার পরে বন, বনের পরে পাহাড়; সেই পাহাড়ই আমাদের অবিচল আশ্রয়—

বনান্তা গিরয়ঃ সর্বে সা চাস্মাকং গতির্ধ্রুবা।

অতএব ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রযজ্ঞ করুন, কৃষিযজ্ঞ করুন কৃষকেরা—সীতাযজ্ঞাশ্চ কর্ষকাঃ, আর গোয়ালারা করুক গিরিযজ্ঞ—

গিরিযজ্ঞাস্তথা গোপা গিরিযজ্ঞঃ প্রবর্ত্ত্যতাম্।

[হরিবংশ পু. ২.১৫.৪-১৯; ২.১৬.২-১১]

□ হরিবংশ পুরাণের ঠিক এইখানে— হলযজ্ঞ করুন কৃষকেরা আর গোয়ালারা করুক গিরিযজ্ঞ —এই কথাটা বুঝিয়ে দেয় যে, মথুরামণ্ডলের ব্রজভূমিতে কৃষকেরা এবং গয়লারা (গোপেরা) যে বৃত্তির ওপর নির্ভর করতেন, সেটা প্রধানত বৈশ্যবৃত্তি, যেটাকে পারিভাষিক ভাষায় বলে 'বার্তা' অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন বার্তাজীবী। হরিবংশের ঠিক এই জায়গাতেই আমাদের কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ফিরে গিয়ে সংঘবৃত্তের কথা বলতে হবে। আরও বলতে হবে এইজন্য যে, কৃষ্ণ স্বয়ং যেহেতু যদু-বৃষ্ণি সংঘশাসনে অন্যতম প্রধান-পুরুষ ছিলেন। কিন্তু এই সংঘগুলি কেমন করে চলত, এগুলির জীবনবৃত্ত কেমন ছিল, সে ব্যাপারে কৌটিল্যের বক্তব্য শুনে নিলে গোপ-কৃষকদের বৈশ্যবৃত্তির মর্ম আরও বেশি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এখানে প্রথম বক্তব্য হল—বেদের মধ্যে 'গণ' শব্দটার উল্লেখ যেমনটি আছে, তাতে একটি সংখ্যাগত সমাহার বা সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীরও বেশকিছু আগে বৈয়াকরণ পাণিনি 'সংঘ' শব্দের উল্লেখ করেছেন এবং তা করেছেন 'গণ' শব্দের একার্থতায় সংঘো দ্বৌগণ-প্রশংসয়োঃ। পরবর্তী কালে কৌটিল্য তো রাজনৈতিক পরিভাষাতেই সংঘ শব্দটি উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার পাণিনির উল্লিখিত সংঘ শব্দ বলতে বুঝেছেন—a definite organisation bound by laws and regulations, অর্থাৎ, বিধিনিয়মের মাধ্যমে পরিচালিত কোনো সংস্থা। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ডি. আর. ভাণ্ডারকরের মতে, পাণিনির 'সংঘ' এবং 'গণ' শব্দের অর্থ হল—নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে মিলিত কতকগুলি ব্যক্তির সমাহার—a combination of individuals formed for a definite object।

অন্যদিকে, জয়সোয়াল, যিনি অন্তত তিন-চার অধ্যায় জুড়ে ভারতে প্রাচীন গণরাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, তিনি কিন্তু 'সংঘ' এবং 'গণ' বলতে সোজাসুজি বুঝেছেন 'রিপাবলিক' অর্থাৎ গণ বা প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। জয়সোয়াল আরও একটি পাণিনি-সূত্রের উল্লেখ করেছেন, যেখানে 'আয়ুধজীবিসংঘ' কথাটি আছে। আয়ুধ মানে অস্ত্রশস্ত্র। যারা জীবিকার কারণে অস্ত্রশস্ত্রের ওপরেই নির্ভর করে আছে, সেইরকম একটা গোষ্ঠীসংহত মানুষ বোঝাতেই 'আয়ুধজীবিসংঘ' শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে।

পাণিনির বলা আয়ুধজীবিসংঘের মধ্যে রাজনীতির কোনো যোগ আছে কি না—সেটা বুঝতে গেলে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত— 'বার্তাশস্ত্রোপজীবী' এবং 'রাজশব্দোপজীবী' সংঘের প্রসঙ্গ আসবেই। এখানে প্রথম সংঘের উদ্দেশ্যটা বোঝা গেলে পাণিনির আয়ুধজীবীরাও সার্থকনামা হয়ে উঠবেন বলে মনে হয়। বার্তা মানে আগেই জানিয়েছি, অর্থাৎ বার্তা মানে কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্য। যাঁরা এইসবের ওপরেই জীবিকা নির্বাহ করছেন তাঁরা বার্তাজীবী, ডি. আর. ভাণ্ডারকরের ভাষায় craft guilds। 'শস্ত্রোপজীবী' শব্দের সঙ্গে পাণিনির 'আয়ুধজীবী'দের কোনো পার্থক্য নেই এবং হয়তো সেই কারণেই ভাণ্ডারকর এই শব্দের অর্থ করেছেন—a mercenary tribal band।

কৌটিল্যের সম্পূর্ণ সমাসবদ্ধ পদটিকে ভেঙে ভাণ্ডারকর যে অর্থ করেছেন, অথবা জয়সোয়াল যেভাবে সোজাসুজি এদের 'রিপাবলিক' বলেছেন, আমরা তা বলছি না। বরঞ্চ অর্থশাস্ত্রে 'সংঘবৃত্ত' নামে কৌটিল্য যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়খানি লিখেছেন, তার নিরিখে এটা পরিষ্কার বলা যায় যে, রাজতন্ত্র থেকে সংঘতন্ত্র একেবারেই

আলাদা এবং সংঘশাসনের চরিত্র একেবারে 'রিপাবলিকান' না হলেও সংঘমুখ্য বা গণ্যমুখ্যদের অনেকের শাসনতন্ত্রই সংঘশাসিত রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কৌটিল্য যে 'বার্তাশস্ত্রোপজীবী' সংঘের কথা বলেছেন, এই সংঘের মূল চরিত্রটি হল—শান্তির সময়ে এই সংঘভুক্ত মানুষেরা ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষি কিংবা পশুপালনের মাধ্যমেই জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে; কিন্তু, যুদ্ধের সময় তারাই আবার অস্ত্রধারণ করে এবং সেক্ষেত্রেও তারা প্রায় অপরাজেয়। হতে পারে, এমন সংঘের লোকেরা কয়েকটি যুদ্ধবাজ গোষ্ঠীর একক সমাহার, যাদের প্রধান পুরুষেরা অনেকে মিলে রাজ্যশাসন করতেন। আর. পি. কাঙ্‌লে এঁদের সম্বন্ধে বলেছেন—Such Samghas may be supposed to be composed essentially of martial clans।

[অষ্টাধ্যায়ী ৩.৩.৮৬ সূত্র; D.R. Bhandarkar, Some Aspects of Ancient Hindu Polity, pp. 91-92; K.P. Jayswal, Hindu Polity, p. 36; R.P. Kangle, Kautililya Arthasastra, Vol. 3, p. 125]

□ কৌটিল্য-কথিত 'রাজশব্দোপজীবী' সংঘের সঙ্গে বার্তাশস্ত্রোপজীবী-সংঘের মিল ঘটিয়ে দেয় বৃন্দাবনের গোপকুল। এটা তো সকলেরই জানা যে, বৃন্দাবনের গোপ জাতিরা অনেক সময়েই 'আহির' বা আভীর বলে কথিত হয়েছেন পুরাণে। আমরা গবেষণা প্রমাণে জানাতে চাই যে, গোপালক আভীরজাতির সঙ্গে যদুবংশীয়দের দহরম-মহরম ছিল অনেক আগে থেকেই, কাজেই কৃষ্ণকে রাখাল-রাজা নন্দের ঘরে পালিত হতে দেখে আমাদের আশ্চর্য লাগে না। অনেক পণ্ডিতই খুব করে অঙ্ক কষে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে আভীরেরা ভারতবর্ষে ছিলেন বৈদেশিক। কিন্তু তার প্রতিবাদ করেছেন অনেকেই, এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির প্রমাণে বলা যায় যে, অভীরেরা খ্রীস্টপূর্ব দেড়শ শতাব্দীতেই শূদ্রবর্ণের শাখা হিসেবে গণ্য ছিল। এই সময়েই যারা জাতি-বর্ণের ব্যবস্থায় স্থান পেয়ে গেছেন, তারা যে ভারতবর্ষে নবাগত, তা বলা যায় না। আভীর জাতির পুরুষেরা যে পরবর্তী ভারতবর্ষের ইতিহাসেও যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলে, সে প্রমাণও আছে।

এখানে অন্য এক তথ্য জানাই। বৌদ্ধ গ্রন্থ ঘট জাতকে দেখা যাচ্ছে বাসুদেব এবং তাঁর ভাইয়েরা সব কংসের বোন দেবগভ্‌ভার ছেলে। তাদের পালনের ভার পড়ল যাঁদের হাতে, তাঁদের একজন নাকি দেবগভ্‌ভার (মানে অবশ্যই দেবকীর) পরিচারিকা। তার নাম নন্দগোপা এবং আরেকজন তাঁর স্বামী অন্ধকবেহু। ঘট জাতকের সব সংবাদই চিরন্তন ব্রাহ্মণ্য গাথাগুলির সঙ্গে মেলেনি বলে পণ্ডিতেরা অনেকেই এগুলিকে উল্টোপাল্টা বলেছেন কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা, নন্দগোপা না হয় যশোদা, না হয় স্বামীর নামেই তিনি শ্রীমতি নন্দ হলেন—কিন্তু এই 'অন্ধকবেহু'টি কে? কৃষ্ণ তো অন্ধক-বৃষ্ণি কুলেরই বংশধর, এবং 'অন্ধকবেহু' অবশ্যই অন্ধক-বৃষ্ণি শব্দেরই অমার্জিত রূপ। অন্ধক এবং বৃষ্ণি এঁরা দুজনেই যদুবংশেরই অধস্তন পুরুষ বলে পরিচিত। আমরা আগেই বলেছি— যদুবংশীয় পুরুষদের সঙ্গে গোপালকদের গভীর সম্বন্ধ ছিল। তাই ঘটজাতকের সংবাদ শুনে আমাদের মনে হয়, এ সম্বন্ধ ছিল এতটাই যে, অন্ধক-বৃষ্ণিকুলের পুরুষেরা গোপালক নন্দকে অন্ধক-বৃষ্ণিদেরই একজন বলে ভাবতেন, যার জন্য তাঁর নামই হয়ে গেছে অন্ধক-বৃষ্ণি বা অন্ধকবেহু।

[মহাভাষ্য (keilhorn) ৩য় খণ্ড, ১.২.৭২ (৬), পৃ. ২৫২, Ghata-Jataka, Jataka No. 454. In the Jataka, Ed. E.B. Cowell, Cosmo Publications, 1978, pp. 50-52]

□ এবারে মহাভারতের উদ্যোগপর্বে সেই বিখ্যাত জায়গায় আসব—যেখানে দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে অর্জুনকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন—হয় নারায়ণী সেনা নাও, নয় নিরস্ত্র আমাকে নাও। অর্জুন নিরস্ত্র কৃষ্ণকে বরণ-করলেন আর দুর্যোধন নিলেন নারায়ণী সেনা। এটা একটা বহুকথিত প্রসঙ্গ।

এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার নারায়ণী সেনা কৃষ্ণেরই প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত এক বিশেষ শক্তিমান সেনাবাহিনী যা কেবলই গোপালকদের দ্বারা নির্মিত এবং যারা যুদ্ধে কৃষ্ণকেও হার মানাতে পারেন—

মৎসংহননতুল্যানাং গোপানাম্ অর্বুদং মহৎ।
নারায়ণা ইতি খ্যাতাঃ . . . ॥

আগেই বলা হয়েছে যে, গোপেদের সঙ্গে অন্ধক-বৃষ্ণিদের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। কৃষ্ণ গোপেদের দিয়ে এই বাহিনী তৈরি করে তার নাম দিয়েছিলেন—নারায়ণী সেনা। কংসের সম্মুখীন হবার সময় এই বাহিনীর সহায়তা কৃষ্ণ গ্রহণ করেছিলেন কিনা সে খবর ইতিহাস দেয়নি, কিন্তু একেবারে মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কংস আদেশ দিয়েছিলেন—সমস্ত গোপেদের বার করে দাও আমার রাজ্য থেকে—

গোপানামপি মে রাজ্যে ন কশ্চিৎ স্থাতুমর্হতি।

তার মানে কংসের আপন স্থান মথুরাতেও বহুল পরিমাণে গোপেরা ছিলেন, অথবা তাঁরা তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ব্রজভূমির গোপ। শুধুমাত্র কৃষ্ণ-বলরামের ওপর আক্রোশেই যদি কৃষ্ণাশ্রিত গোপেদের ওপর কংসের রাগ হয়ে থাকে সে কথা আলাদা, কিন্তু মহাভারতের নারায়ণী সেনা গোপেদের সেনা। অবশেষে গোপদের বৈশ্য-শূদ্রবৃত্তির মিশ্রভাবটুকু যে অস্ত্রবিদ্যার পরিসর তৈরি করত, সেটা কৌটিল্যের সাধারণ একটি মন্তব্য থেকে প্রমাণ হবে। রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ-তত্ত্ব নির্ণয়ের সময় কৌটিল্য যে দণ্ডসম্পদের কথা বলেছেন, তার প্রধান উপকরণ হল সেনা। প্রাচীন কালে, চতুর্বর্ণের মর্য্যাদার তারতম্য যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি, তখন মনে হয় সমস্ত বর্ণ থেকেই সেনাসংগ্রহ করা হত। কিন্তু, বর্ণব্যবস্থায়, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মর্য্যাদা বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে, সেনাসংগ্রহের ক্ষেত্রেও উচ্চবর্ণের মানুষ বেশি আদরণীয় হয়ে উঠল। কৌটিল্যের পূর্বাচার্যেরা অনেকেই বলেছেন—তেজ এবং সদ্‌গুণের প্রাধান্যের কথা মনে রেখে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার জাতির মধ্যে পূর্ব-পূর্ব জাতিই পরের-পরেরটির চেয়ে বেশি ভালো।

কৌটিল্য এ ব্যাপারে প্রখর বাস্তববাদী। তিনি মনে করেন—অস্ত্রশস্ত্রের প্রহারে অভ্যস্ত তথা স্বাভাবিকভাবে কৃতবিদ্য ক্ষত্রিয়েরাই সৈন্য হিসেবে সবচেয়ে ভালো। এমনকী, বৈশ্য এবং শূদ্র জাতির মধ্যেও যদি সারপদার্থসম্পন্ন বীরপুরুষ অনেক সংখ্যায় থাকে, তবে সৈন্য হিসেবে তারাও অনেক ভালো, কিন্তু ব্রাহ্মণসৈন্য কদাপি সংগ্রহযোগ্য নয়। কৌটিল্যের এই অভিমতের নিরিখে আমরা অবশ্যই এটা বলতে পারি যে, বৈশ্য-শূদ্রের মিশ্রবৃত্তিনির্ভর গোপজাতিও যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন এবং সেই কারণেই কৃষ্ণের নারায়ণী সেনার উপাদান গোপজাতি। কংসের সঙ্গে যুদ্ধে গোপেদের সোজাসুজি কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা যায়নি বটে, তবে কংসের ধনুঃশালায় ঢুকে কৃষ্ণ যখন ধনুকখানি ভেঙে বেরিয়ে আসলেন, তখন কিন্তু কৃষ্ণ গোপদের সঙ্গেই মিলিত হয়েছিলেন—

নির্গম্য ত্বায়ুধগারাৎ জন্মতু গোপসন্নিধৌ।

পুরাণে প্রাপ্ত এই সংবাদটুকু গোপবাহিনীর ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত বহন করে কী না—এ বিষয়ে চিন্তার অবকাশ থাকছে।

[মহা (k) ৫.৭.১৮; (হরি) ৫.৭.১৯; হরিবংশ ২.৩০.৬৬; কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (Kangle), ৯.২.২১-২৪; হরিবংশ ২.২৭.৫০; Ram Sharan Sharma, Sudras in Ancient India, Delhi: Motilal Banarsidass, 1958, p. 174]

□ ভাগবত পুরাণের একটি মাত্র শ্লোকে গোপগণের নিন্দা করে দুর্বৃত্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রভাসতীর্থে যদুবংশ ধ্বংসের পর জলোচ্ছ্বাসে দ্বারকানগরী প্লাবিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। সে সময় অর্জুন দ্বারকাবাসী কৃষ্ণের ষোলো হাজার পত্নীকে রক্ষা করার জন্য স্বয়ং হস্তিনাপুরে নিয়ে আসছিলেন। পথে তাঁরা গোপ দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন। গোপ দস্যুরা যুদ্ধে অর্জুনকে পর্যুদস্ত করেন।

[ভাগবত পু. ১.১৫.২০]

□ মহাভারতের মৌষল পর্বে ভাগবত পুরাণ বর্ণিত কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে গোপদস্যুদের বর্ণনায় তাঁদের পাপচারী, লোভী এবং বিকটাকৃতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা যষ্টিধারী এবং অন্যের দ্রব্য অপহরণ করাই এদের একমাত্র কাজ। দস্যুবৃত্তির কারণেই গোপদের নিন্দা করা হয়েছে মহাভারতে। সম্ভবত যদু-বৃষ্ণিকুলের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার কারণে মথুরা, দ্বারকা প্রভৃতি অঞ্চলে এ সময় খানিক অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই অরাজক পরিস্থিতির ফলেই গোপদের মধ্যে দস্যুবৃত্তির আবির্ভাব ঘটে। তবে পেশাগতভাবে এঁরা গোপালক—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

[মহা (k) ১৬.৭.৪৭-৬৩; (হরি) ১৬.৭.৪৭-৬৩]

□ এ কাহিনী থেকে ধারণা করা যায় যে, গোপরা নেহাত দৈহিক ক্ষমতাহীন যুদ্ধবিমুখ ছিলেন না।

প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তাঁদের ছিল। যুদ্ধের উপকরণ এবং প্রশিক্ষণ তাঁদের ছিল। সে প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতার পরিচয় বহন করছেন এই গোপ দস্যুরা, যাঁরা অর্জুনকে পরাস্ত করে যাদব ধন-সম্পদ হরণে সক্ষম। গোপদের যুদ্ধ পটুতার আরও নিদর্শন মহাকাব্যে লুকিয়ে রয়েছে।

আমাদের ধারণা—কৃষ্ণ যখন মথুরা-দ্বারকায় প্রধানতম ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য হয়েছেন, তখনও তিনি তাঁর পূর্বপরিচিত গোপদের যুদ্ধক্ষমতা ভুলতে পারেননি এবং সেই কারণেই তিনি পরবর্তীকালে নিজেরই তত্ত্বাবধানে এবং নিজেরই প্রশিক্ষণে একটি সৈনিক-দল তৈরি করে, তার বিশেষ নামকরণ করেছিলেন নারায়ণী সেনা। মহাভারতের শল্যপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপোক্তির মধ্যেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র এই সময়ে ভীষ্ম-দ্রোণের মৃত্যু, পুত্রদের মৃত্যু নিয়ে যেমন অনেক বিলাপ করেছেন, ঠিক তেমনই বিলাপ করেছেন নারায়ণী সেনার নিধন নিয়ে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মুখেও সেই সেনার গঠন হল—

নারায়ণাঃ হতা যত্র গোপালা যুদ্ধদুর্মদাঃ।

—অর্থাৎ গোপালকদের নিয়ে তৈরি দুর্দম নারায়ণী সেনাও হত হয়েছে।

[মহা (k) ৫.৭.১৯; ৯.২.৩৯;
(হরি) ৫.৭.১৯; ৯.২.৩৯]

□ সেকালে প্রতিটি নগরী জনপদে গোপপল্লী দেখা যেত। গোপগণ সামাজিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে বিবেচিত। এমনকী এখনও সেই ঐতিহ্য একইভাবে ভারতবর্ষে বর্তমান। তবে এখানে গোপ বলতে মূলত যদু-বৃষ্ণি ঘনিষ্ঠ দ্বারকা-মথুরার গোপালকের কথা বলা হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে এঁরা হয়তো বা সমগ্র মথুরামণ্ডলব্যাপী নানা অংশে বাস করতেন। অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশ থেকে দ্বারকা মানে বর্তমান গুজরাটের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত গোপদের দেখা যেত। *[দ্র. দ্বারকা, মথুরা]*

[EAIG (Kapoor) p. 196, 316]

তবে কৌটিল্যের প্রমাণে বা প্রাচীন ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় যেভাবে দেখা যাচ্ছে তাতে সেযুগের ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত রাজ্যে একটি করে গোপালনক্ষেত্র বা ব্রজভূমি থাকত। ফলে মহাকাব্য পুরাণে মূলত যদু-বৃষ্ণিদের সঙ্গে সম্পর্কিত গোপদের প্রতিই মূল 'ফোকাস' থাকলেও অন্যরাষ্ট্রগুলি একেবারে গোপশক্তিহীন ছিল ভাবলে ভুল হবে। হয়তো যোদ্ধা হিসেবে নারায়ণীসেনার মতো খ্যাতি তাঁদের ছিল না বা ছিলনা মথুরার ব্রজমণ্ডলের গোপদের মতো রাজনৈতিক প্রতিপত্তি। লক্ষণীয়, তাদের কাছে তো কৃষ্ণের মতো নেতা ছিল না, ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রব্যবস্থার বর্ণনার মাঝে তাদের নাম অনুচ্চরিত বা লঘুস্বরে উচ্চারিত থেকে গিয়ে থাকবে। তবু এদের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে কুরুরাজবংশের ব্রজভূমি যা দ্বৈতবনের কাছে অবস্থিত ছিল—তার উল্লেখ করা প্রয়োজন। এঁদের সমৃদ্ধিও ছিল বিপুল কারণ দুর্যোধন গোরক্ষণাবেক্ষণের নামে যে আমোদ-প্রমোদ বিহারের আয়োজন করেছিলেন, সপরিবার দুর্যোধনের সেই বিলাসিতার ব্যবস্থাপনায় কিন্তু এঁরাই দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

[মহা (k) ৩.২৩৭-২৪০ অধ্যায়;
(হরি) ৩.২০০-২০৩ অধ্যায়]

গোপ২ স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, সেই গণ গুলির মধ্যে তুষিত একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে গোপ একজন। এই তুষিত দেবগণরা হলেন মহর্ষি ক্রতুর ঔরসে তুষিতার গর্ভজাত পুত্র। তুষিতার নাম অনুসারে এঁরা তুষিত দেবগণ বলে পরিচিত।

[বায়ু পু. ৬২.৯]

গোপ৩ একজন গন্ধর্বরাজ। ভরত রামের সন্ধানে অরণ্যে গিয়ে ভরদ্বাজের আশ্রমে রাত্রিবাস করেছিলেন। তখন ভরদ্বাজের আশ্রমে গোপ এসেছিলেন এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে ভরতের মনোরঞ্জন করেছিলেন। *[রামায়ণ ২.৯১.৪৬]*

গোপজলা বায়ু পুরাণ অনুসারে পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের ঔরসে অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভজাত কন্যাদের মধ্যে একজন। ইনি অত্রি ঋষির পত্নী। বায়ু পুরাণের অপর একটি শ্লোকে এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে তাঁকে গোচপলা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[বায়ু পু. ৯৯.১২৬; ৭০.৬৯;*
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৭৫]

গোপতি১ কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা মুনির গর্ভজাত গন্ধর্ব পুত্রদের মধ্যে গোপতি একজন।

[মহা (k) ১.৬৫.৪৩; (হরি) ১.৬০.৪২]

অর্জুনের জন্মক্ষণে গোপতি গন্ধর্বকে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে।

[মহা (k) ১.১২৩.৫৫; (হরি) ১.১১৭.৫৯]

গোপতি₂ একজন রাজা। কৃষ্ণ এঁকে বধ করেছিলেন। *[মহা (k) ৩.১২.৩৪; (হরি) ৩.১১.৩৩]*

গোপতি₃ শিবির মহাবলশালী এক পুত্র হলেন গোপতি। পরশুরাম যখন পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করেন সেসময় শিবির পুত্র গোপতিকে গোগন অর্থাৎ কী না গবাদিপশুরা বনের মধ্যে রক্ষা করেছিল।

[মহা (k) ১২.৪৯.৭৯; (হরি) ১২.৪৮.৮৬]

গোপদ স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন তুষিত তার মধ্যে একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে গোপদ একজন দেবতা। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১০]*

গোপন অত্রিবংশীয় বংশপ্রবর্তক ঋষিদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৯৭.৩]*

গোপপার্থিব একটি গোপালক জনজাতি তথা সেই জনজাতি-নামেই পরিচিত জনপদ। এটিকে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পূর্ব ভারতের জনপদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৫৪]*

গোপালকক্ষ একটি পূর্বভারতীয় জনপদ। মহাভারতের সভাপর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ভীমসেন পূর্বদিক জয় করতে বেরিয়ে অযোধ্যা পার হয়ে এই রাজ্যে পৌঁছেছিলেন এবং এই রাজ্য জয় করেছিলেন। এই গোপালকক্ষ জনপদটির নামের ক্ষেত্রে 'গোপালকচ্ছ' পাঠান্তরও দেখা যায়। পণ্ডিত K.C. Mishra গোপালকক্ষের পরিবর্তে 'গোপালকচ্ছ' পাঠটিই গ্রহণ করেছেন। পণ্ডিত Shafer -এর মত উদ্ধার করে Mishra জানাচ্ছেন যে, বর্তমান বিহারের সরণ জেলায় গোপালগঞ্জ নামে যে স্থানটি রয়েছে, সেটিই প্রাচীন গোপালকচ্ছ। মহাভারতের সভাপর্বের উল্লেখ থেকে স্পষ্ট যে, স্থানটি দক্ষিণ কোশল বা অযোধ্যার অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। পণ্ডিত Mishra -র মতে উত্তর কোশল এবং দক্ষিণ কোশল বা অযোধ্যার মধ্যবর্তী জনপদ হল গোপালকচ্ছ যে স্থানটিকে তিনি বর্তমান গোরক্ষপুর জেলার সঙ্গে অভিন্ন বলে মত প্রকাশ করেছেন। Mishra জানাচ্ছেন যে, ভীমের দিগ্বিজয়ের স্মারক হিসেবে এখনও এই অঞ্চলের একটি টিলা ভীমটিলা নামে খ্যাত।

[মহা (k) ২.৩০.৩; ৬.৯.৫৬; (হরি) ২.২৯.৩ (গোপালকচ্ছ পাঠ আছে); ৬.৯.৫৬; TIM (Mishra) p. 115]

গোপালকচ্ছ *[দ্র. গোপালকক্ষ]*

গোপালি₁ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা পরাশর মুনির নামে কয়েকটি বংশধারা প্রচলিত ছিল। সেই বংশধারায় অনেকগুলি সন্তানকে নিয়ে এক-একটি বর্গ রচিত হয়েছিল। যাঁদের গৌর-পরাশর, নীল-পরাশর, কৃষ্ণ-পরাশর, শ্বেত-পরাশর, শ্যাম-পরাশর এবং ধূম্র-পরাশর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরাশরের যে সন্তানেরা গৌর-পরাশর নামে অভিহিত তাঁদের মধ্যে গোপালি একজন।

[মৎস্য পু. ২০১.৩৩]

গোপালি₂ শিবসহস্রনামের অন্তর্গত মহাদেবের অন্যতম নাম। 'গো' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়-সমূহ। ইন্দ্রিয়গুলিকে যিনি পালন করেন, রক্ষা করেন অথবা নিয়ন্ত্রণ করেন—এই অর্থে 'পাল্' ধাতু ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে করেন মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ—

গোপালিরিন্দ্রিয়াণাং পালয়িতা'।

তাই শিবের নাম গোপালি।

[মহা (k) ১৩.১৭.১১৫; (হরি) ১৩.১৬.১১৪]

গোপালী₁ একজন অপ্সরার নাম। বনবাস পর্বে অর্জুন যখন ইন্দ্রসভায় গিয়েছিলেন, তখন ইন্দ্রের আদেশে যেসব অপ্সরারা অর্জুনের মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন, গোপালী তাঁদের মধ্যে একজন—

গোপালী সহজন্যা চ কুম্ভযোনিঃ প্রজাগরা।

[মহা (k) ৩.৪৩.৩০; (হরি) ৩.৩৮.৩০]

গোপালী₂ স্কন্দ-কার্ত্তিকেয়র অনুচরী একজন মাতৃকা। *[মহা (k) ৯.৪৬.৪; (হরি) ৯.৪২.৫২ উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য ৪নং শ্লোক, খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮]*

গোপীন্দ্রতীর্থ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি শৈবতীর্থ।

একসময় গৌতম মুনির পত্নী-অহল্যাকে ধর্ষণ করার অপরাধে ইন্দ্র গৌতম মুনির দ্বারা শাপগ্রস্ত হন। সেই শাপের ফলে ইন্দ্রের সর্বাঙ্গে ভগচিহ্ন দেখা দেয়। লজ্জিত ইন্দ্র বনে প্রবেশ করে অতি কঠোর তপস্যায় শিবকে তুষ্ট করেন। সন্তুষ্ট শিবের দয়ায় ইন্দ্রের শরীরের ভগচিহ্নগুলি গোচক্ষুতে পরিণত হয়। এই জন্যই এই তীর্থে তিনি গোপীন্দ্র নামে পরিচিত হন। এই তীর্থে স্নান করলে স্বর্গবাস হয়, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম হয়।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ৩১.৭২-৭৪]

গোপেশ্বরতীর্থ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত তীর্থ। গোপতীর্থে স্নান করে গোপেশ্বরকে

দর্শন করলে শিবলোকে গমন করে অমৃতপান করা যায়—যার ফলে অমরত্ব লাভ হয়।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ৩১.৮]

গোপ্রতারতীর্থ সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। মহাভারতের বনপর্বে এই তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লিখিত হয়েছে যে, ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র এই ক্ষেত্রেই নশ্বর দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.৮৪.৭০-৭৩; (হরি) ৩.৬৯.৭১-৭৪]

গোপ্রেক্ষকতীর্থ বারাণসী ক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। নারদ পুরাণে ও লিঙ্গ পুরাণে একে গোপ্রেক্ষক নামে উল্লেখ করা হয়েছে তবে অন্যত্র একে গোপ্রেক্ষতীর্থ নামেও উল্লিখিত হতে দেখা যায়। *[পদ্ম পু. (আনন্দাশ্রম) স্বর্গখণ্ড ৩৭.১৬; নারদ পু. ২.৫০.৪৩; লিঙ্গ পু. ১.৯২.৬৭-৬৮; কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৪২]*

গোবর্ধন১ বৃন্দাবনে ব্রজভূমি সংলগ্ন একটি পাহাড়। কৃষ্ণ ব্রজভূমির মানুষ ও গো-সম্পদ ইন্দ্রের প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন করেছিলেন।

[মহা (k) ৫.১৩০.৪৮; (হরি) ৫.১২১.৪৮; ভাগবত পু. ৫.১৯.১৬; ১০.১১.৩৬; মৎস্য পু. ১১৪.৩৮]

☐ ব্রজবাসী গোপগণের জীবনে গোবর্ধন পর্বতের বিশেষ উপযোগী ভূমিকা ছিল। কারণ ব্রজবাসীগণ এই পর্বত এবং তৎসংলগ্ন তৃণভূমিকে পালিত গাভীদের চারণভূমি রূপে ব্যবহার করতেন। গোবর্ধন পর্বতে গোচারণের উল্লেখ একাধিকবার পুরাণে পাওয়া যায়।

[ভাগবত পু. ১০.১৩.২৯, ৩১]

☐ ব্রজভূমির আদি বাসিন্দা গোপগণ ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্রের পূজারী। ইন্দ্রই তাঁদের রক্ষক তথা পালনকর্তা।

একবার ব্রজভূমিতে ইন্দ্রযজ্ঞের প্রস্তুতি চলছে। কৃষ্ণ এক বৃদ্ধ গোয়ালার কাছে গোপগণের ইন্দ্র উপাসনার কারণ জানতে চাইলেন।

বুড়ো গয়লা বললেন—আমরা এখানে ইন্দ্রের ধ্বজা বসিয়ে পুজো করি, এবং কেন করি, তার কারণ বলি শোনো। ইন্দ্র হলেন দেবতাদের রাজা আর তিনি হলেন মেঘ-বৃষ্টির দেবতা। তিনি আমাদের চিরকালের রক্ষক। অতএব সেই রক্ষাকর্তার পুজোর জন্যই বহুদিন ধরে ওই উৎসব চলে আসছে—

তস্য চায়ং মখঃ কৃষ্ণ লোকনাথস্য শাশ্বতঃ।

আকাশের মেঘরাশি সেই ইন্দ্রের শাসন মেনে বর্ষার নতুন জলধারা বর্ষণ করেন আর তার ফলেই মাঠে মাঠে শস্য ফলে। ইন্দ্র যে শস্য নিষ্পন্ন করেন, সেই শস্য খেয়েই আমরা বাঁচি; মানুষ বাঁচে, আমাদের গোরু, বলদ, ষাঁড়, সব হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে, গোরুরা ভাল দুধ দেয়। আর সত্যিই তো, যেখানে বর্ষণমুখর মেঘরাশি আছে—বৃষ্টিমন্তো বলাহকা—সেখানে শস্যের অভাব নেই, তৃণের অভাব নেই, ক্ষুধা বলেও সেখানে কিছু নেই—

নাশস্যা নাতৃণা ভূমি-র্ন বুভুক্ষার্দিতো জনঃ।

কৃষ্ণ বুড়ো গয়লাকে বললেন—আমরা হলাম গিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ানো বনাচারী গয়লা জাতের মানুষ। গোরু-বাছুর নিয়ে আমরা জীবিকা নির্বাহ করি—বয়ং বনচরা গোপাঃ সদা গোধনজীবিনঃ। আপনারও এটা জানা উচিত যে, —যা আমাদের জীবিকা, সেই গোরু, যা আমাদের চতুর্দিক থেকে রক্ষা করে, সেই পর্বত, আর যেখানে আমরা থাকি, সেই বন—এইগুলোই আমাদের দেবতা—

গাবো'স্মদ্দৈবতং বিদ্ধি গিরয়শ্চ বনানি চ।

কৃষ্ণ বলেছেন—যে পর্যন্ত আমাদের কৃষি-জমি, সেই পর্যন্তই ব্রজভূমির সীমা। সীমার শেষে আছে বন, সেই বনের শেষে পর্বত। সেই পর্বতই আমাদের একমাত্র আশ্রয়—

বনান্তা গিরিয়ঃ সর্বে সা চাস্মাকং গতির্ধ্রুবা।

বস্তুত, সেকালের মানুষের কাছে পাহাড় ছিল এক অবাক বিস্ময়। তাকে আশ্রয় বলতেও কেউ দ্বিধা করত না। শত্রু-পক্ষের আক্রমণের পথে পাহাড় ছিল নিদারুণ বাধা। পণ্ডিতজনেরা বলেছেন—পাহাড় হল দেবতাদের আবাস এবং তাঁরা রাজা-মহারাজাদের এমন জায়গায় থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন, যেখানে চারপাশে পাহাড় আছে। পাহাড় সেখানে দুর্গের কাজ করে। বৃন্দাবনের এই গোবর্ধন পাহাড়টি অন্যান্য গিরিদুর্গের তুলনায় কিছুই নয়, তবু এই পাহাড়কেই কৃষ্ণ এক সুরক্ষার স্থল বলে মনে করেছেন। এই গোবর্ধন পাহাড় সংলগ্ন বৃন্দাবন এক বনভূমি। এই বনভূমির জন্যও কৃষ্ণের দুশ্চিন্তা আছে। তিনি মনে করেন—পাহাড় বনভূমিকেও সুরক্ষিত রাখে। তিনি বলেছেন—পাহাড়ে বাঘ-

সিংহের মতো যেসব হিংস্র জন্তু আছে, তারা সেইসব মানুষকে ভয় পাইয়ে দেয়—যারা বন কাটতে চায়। এইভাবে পাহাড়-সংলগ্ন বনকে পাহাড় নিজেই রক্ষা করে—

বনানি স্বানি রক্ষন্তি ত্রাসয়ন্তো বনচ্ছিদঃ।

যে মানুষ বনের আশ্রয়ে থেকে জীবিকা নির্বাহের জন্য সেই বনেরই ক্ষতি করে—

যদা চৈষাং বিকুর্বন্তি তে বনালয়জীবিনঃ।

সেই সব মানুষেরা তাদের রাক্ষুসে কাজের জন্য নিজেরাই মারা পড়ে।

কৃষ্ণ যে কথাগুলি বলেছেন, তা যদি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয়/তৃতীয় শতাব্দীতেও পৌরাণিকেরা সংকলিত করে রেখে থাকেন, তবে বলতে হবে—এ অত্যন্ত আধুনিক ভাবনা। আজকে যাঁরা অরণ্য-সংরক্ষণ বা পশু সংরক্ষণের কথা ভাবছেন, তাঁরা জানবেন আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগেও এই দুর্ভাবনা ছিল। কৃষ্ণ তাঁর বৃক্ষ-লতা সংকুল অরণ্যভূমির আবাস বৃন্দাবন এবং তার সুরক্ষা-বলয় গোবর্ধন পাহাড়কে বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের চেয়েও বেশি মূল্য দিয়েছেন। বৃন্দাবনের বন আর গোবর্ধন পাহাড়ই তাঁর কাছে দেবতার মতো। তিনি বলেছেন—ব্রাহ্মণরা মন্ত্রযজ্ঞ করেন, আর কৃষকরা পুজো করেন হল-লাঙলের। কিন্তু আমরা গোপজনেরা করব গিরিযজ্ঞ—

গিরিযজ্ঞস্তথা গোপা ইজ্যো'স্মাভিগিরির্বনে।

কৃষ্ণ প্রধানত গিরিযজ্ঞের কথা বললেও বৃক্ষ-সমন্বিত বন এবং গোপজনের পালনীয় পশুদের পুজোও তাঁর গিরিযজ্ঞেরই অঙ্গ।

গোপূজার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হবে গিরিযজ্ঞ। স্বর্গের দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করুন, আমরা গিরিরাজ গোবর্ধনের পূজা করব।

[বিষ্ণু পু. ৫.১০.১৭-৩৬; হরিবংশ পু. ২.১৬.২-৯; ভাগবত পু. ১০.২৪.১-৩০]

□ যজ্ঞ আরম্ভ হল একেবারে বৈদিক কায়দায়। আজ্যস্থালী, চরুস্থালী এবং ব্রাহ্মণদের স্বস্তি-বাচনে যজ্ঞস্থল মুখরিত হল। অন্ন-পান আর দক্ষিণায় তুষ্ট হয়ে—তুষ্টাঃ সম্পূর্ণমানসাঃ ব্রাহ্মণরা প্রভূত আশীর্বাদ করে আসন ছেড়ে উঠলেন। গয়লাদের আনা দই, দুধ, ঘৃত, মাংস কৃষ্ণই আস্বাদন করার সুযোগ পেলেন সবার আগে। তাঁর আদেশ সিদ্ধ হয়েছে, অতএব সন্তুষ্টমনে তিনি গয়লাদের উপহার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণ গোবর্ধন পাহাড়ের সঙ্গে একাত্ম হলেন যেন। বস্তুত, গোবর্ধন নামটি বোধহয় আগে ছিল না। আজ এই অনুষ্ঠানে গোপজনের জীবিকা—গো-বৃদ্ধি বা বর্ধনের জন্যই যেহেতু যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই যজ্ঞ যেহেতু এই পাহাড়ের পাশেই বিস্তৃত প্রদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল অতএব সেই গো-বর্ধন বা গো-মঙ্গল উৎসবই—বৃদ্ধিবৃদ্ধিকরী গবাম্—গোবর্ধনপূজার সঙ্গে একাত্মক হয়ে গেল পাহাড়ের নামটিও। *[বিষ্ণু পু. ৫.১০.৩৭-৪৯; হরিবংশ পু. ২.১৭.১৬-৩৯; ভাগবত পু. ১০.২৪.৩১-৩৮]*

□ পুরাতন প্রথা রদ হয়ে গিয়ে নতুন প্রথা নতুন দেবতার প্রতিষ্ঠা সহজ কথা নয়। পুরাতন দেবতা নির্দ্বিধায় বিনা দ্বন্দ্বে তাঁর আসন ছেড়ে দেন না। এখানেও তা হল না। গোপূজা এবং গিরিযজ্ঞ সম্পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রদেব তাঁর মেঘমণ্ডলকে আদেশ করলেন ব্রজভূমি ভাসিয়ে দিতে। মেঘ-ভৃত্যদের নানা নাম আছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হল সংবর্তক। বজ্র-বিদ্যুৎ আর বর্ষণ ক্ষমতায় সে অতুলনীয়। ইন্দ্র তাকেই আদেশ করলেন— সাতদিন নিরন্তর বর্ষণ করার। তিনি কথা দিলেন—বজ্র আর বিদ্যুতের সহায়তা নিয়ে তিনি নিজে উপস্থিত থাকবেন এই প্রলয় মহোৎসবে। হুংকার দিয়ে বললেন—যারা আজ এত জীবিকা চিনেছে, গোরুর গৌরবে আজকে যারা নিজেদের গোপত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত, সেই গোরুগুলিকেই ভাসিয়ে দাও সাতদিনের মধ্যে—

তা গাবঃ সপ্তরাত্রেণ পীড্যন্তাং বর্ষমারুতৈঃ।

ইন্দ্রের আদেশ শুনে যুগান্তকারী মেঘের দল বেরিয়ে পড়ল আকাশ ছেড়ে। সঙ্গে আরম্ভ হল মেঘের গর্জন, ইন্দ্রের বজ্রপাত। যেখানে শারদ ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে গিরিযজ্ঞের ব্যবস্থা হয়েছিল, সেখানে বর্ষার এই ঘন-ঘটা ব্রজবাসীর মনে ভয় জাগিয়ে তুলল—খ্যাপা মেঘ ছুটে এল আশ্বিনেরই আঙিনায়।

ব্রজের সর্বত্র জলে জলাকার হয়ে গেল। ব্রজবাসীদের জীবন বিপন্ন, তাঁদের ঘরবাড়ি ভেসে গেল, কিছু গোরু মারাও পড়ল। সকলে কাতর চোখে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি কী করেন সেটাই এখন দেখার।

সমস্ত ব্রজবাসীদের করুণ অবস্থা দেখে কৃষ্ণ তাঁদের সবাইকে সমবেত হতে বললেন গোবর্ধন পাহাড়ের কোলে। তারপর সমস্ত পাহাড়টিকে এক হাতে উৎপাটন করে নির্যাতিত গোপদের তাঁদের গোধন সহ পর্বতের নীচে আশ্রয় নেওয়ার আহ্বান জানালেন। পাহাড়টিকে পৃথিবীতে নির্মিত গৃহের মতোই লাগছিল—পৃথ্বীগৃহনিভোপমঃ—অথবা ব্রজবাসীরা সেখানে আশ্রয় নেবার ফলেই পাহাড়ও গৃহের সমতা লাভ করেছিল—

গৃহভাবং গতাস্তত্র গৃহাকারেণ বর্চসা।

পর্বতকন্দরে, গিরিগুহায় আশ্রয় নিয়ে ব্রজবাসীরা সেদিন মেঘ-বৃষ্টি-বজ্রপাত কোনোটাই টের পায়নি। তারা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। একটানা সাতদিন চলেছিল ঝড়-বৃষ্টি। কৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তা ও গোবর্ধন পর্বতের কারণে এইভাবেই বৃন্দাবনবাসীর প্রাণরক্ষা হয়। সেজন্যই গোবর্ধন পর্বতকে গোরক্ষক বলা হয়ে থাকে।

[বিষ্ণু পু. ৫.১১.১-২৫; হরিবংশ পু. ২.১৮.৪৫-৬৬; ভাগবত পু. ১০.২৫.১-৩৩; বিষ্ণু পু. ৫.১১.১-২৫; ৫.১২.১-২; ৫.১৩.১]

☐ বর্তমান উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে মথুরা জেলা সংলগ্ন একটি পর্বত। বৃন্দাবন থেকে গোবর্ধন পর্বতের দূরত্ব ১৮ মাইল। এই পর্বতটি পৈথো (Paitho) গ্রামের অন্তর্গত।

[GDAMI (Dey) p. 72]

গোবর্ধন২ গোদাবরী নদীর তীরে রামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন নগরী। মহর্ষি ভরদ্বাজ রামচন্দ্রের প্রিয় বৃক্ষ ও ঔষধি সমূহ এই নগরীতে স্থাপন করেছিলেন। এর ফলে গোবর্ধন নগরীটি মনোরম রূপ লাভ করে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৪৪-৪৫; বায়ু পু. ৪৫.১১৩]

☐ মৎস্য পুরাণে গোবর্ধন নগরীটিকে পবিত্র তীর্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[মৎস্য পু. ২২.৫২]*

☐ আধুনিক মহারাষ্ট্রের নাসিকের নিকটে গোদাবরী নদীর তীরবর্তী গোবর্ধনপুর গ্রাম।

[GDAMI (Dey) p. 72]

গোবর্ধন৩ বাহীক দেশের রাজপ্রাসাদের মূল দ্বারের সামনে স্থিত একটি বটবৃক্ষ।

[মহা (k) ৮.৪৪.৮; (হরি) ৮.৩৪.৬৮]

গোবাসন শিবি বংশীয় একজন রাজা। দেবিকা নামে তাঁর একটি কন্যা সন্তান ছিল যাকে যুধিষ্ঠির স্বয়ম্বরে জয় করে বিবাহ করেন। গোবাসনের কন্যা দেবিকার গর্ভে যুধিষ্ঠিরের ঔরসে যৌধেয় নামে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়।

[মহা (k) ১.৯৫.৭৭; (হরি) ১.৯০.১০২]

☐ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শিবিবংশীয় রাজা গোবাসনকে কৌরব পক্ষের রথীবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে।

[মহা (k) ৬.১৭.২০; (হরি) ৬.১৭.২০]

☐ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণপর্বে গোবাসনকে দশ শত সৈন্যসমন্বিত বাহিনী নিয়ে কাশীরাজ অভিভূর পুত্রের সাথে যুদ্ধ করতে দেখা গেছে।

[মহা (k) ৭.৯৫.৩৮; ৭.৯৬.১১; (হরি) ৭.৮২.৩৮; ৭.৮৩.১১]

গোবিন্দ১ *[দ্র. কৃষ্ণ১]*

গোবিন্দ২ পৌরাণিক ক্রৌঞ্চদ্বীপে অবস্থিত প্রধান পর্বতগুলির মধ্যে গোবিন্দ একটি।

[মৎস্য পু. ১২২.৮০]

গোব্রজ স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অনুচর, একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৬৬; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

গোভবনতীর্থ কুরুক্ষেত্রের সীমায় অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ হল গোভবন। এই পুণ্যস্থানে স্নান করলে সহস্র গোদানের ফল লাভ করা যায়।

[মহা (k) ৩.৮৩.৫০ (হরি) ৩.৬৮.৫০]

গোমতী১ বৈদিক যুগের একটি প্রাচীন পবিত্র নদী। বেদমন্ত্রে একাধিকবার গোমতীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। গোমতী সিন্ধুর একটি উপনদী। ঋগ্‌বেদের নদীস্তুতি মন্ত্রে সিন্ধুর উপনদীগুলির নামের একটি তালিকা পাওয়া যায়। সেই তালিকার মধ্যে পঞ্চম স্থানে গোমতীর নাম রয়েছে। বেদমন্ত্রে বলা হয়েছে কুভা নদীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর গোমতীর সঙ্গে সিন্ধুর মিলন ঘটেছে—

ত্বং সিন্ধো কুভয়া গোমতীং ক্রুমুং
মেহৎস্বা সরথং যাভিরীয়সে॥

[ঋগ্‌বেদ ১০.৭৫.৬]

☐ বৈদিক যুগে সিন্ধুনদ তথা তৎসংলগ্ন প্রতিটি নদীর অববাহিকা অঞ্চলকে অত্যন্ত পবিত্র ভূমি বলে মনে করা হত। গোমতী অববাহিকাও তার ব্যাতিক্রম নয়। বেদমন্ত্রে বলা হয়েছে

শক্তিশালী বরুরাজা গোমতী নদীর তীরে বাস করতেন। *[ঋগ্বেদ ৮.২৪.৩০]*

☐ বেদের একটি মন্ত্রে গোমতী নদীর তীর নিবাসী রাজা দর্ভের পুত্র রথবীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐশ্বর্য্যশালী এই রথবীতি একবার সোমযাগের আয়োজন করেছিলেন। সেই যজ্ঞের হোতা অত্রি বংশীয় অর্চনানা। বেদমন্ত্রে যজ্ঞীয় উপহার সামগ্রী ও অশ্বের বিবরণ থেকে রথবীতির অন্য অর্থে গোমতী অববাহিকা অঞ্চলের প্রাচুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বেদমন্ত্রে রথবীতির কাহিনী সম্পূর্ণাকারে উল্লিখিত না হলেও টীকাকার সায়নাচার্য তাঁর টীকার সম্পূর্ণ কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন।

রাজা রথবীতির এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। যজ্ঞের সময় ঋষি অর্চনানা রাজপুত্রীকে দেখে নিজপুত্র শ্যাবাশ্বের জন্য তাঁকে কামনা করেন। রাজা অর্চনানার প্রস্তাব নিয়ে রাজমহিষী শশীয়সীর নিকট উপস্থিত হন। শশীয়সী এ প্রস্তাব সমর্থন করেননি কারণ এখনও সম্পূর্ণ বেদজ্ঞান লাভ করেননি এমন কোনো ব্যক্তির হাতে নিজ কন্যাকে সমর্পণ করতে তিনি সম্মত নন। এরপর শ্যাবাশ্ব ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে ভিক্ষার্থে পর্যটন করতে শুরু করেন। জ্ঞানী শ্যাবাশ্ব স্তব ও তপস্যার মাধ্যমে মরুদ্‌গণকে তুষ্ট করে ঋষিত্ব লাভ করেন। ঋষিত্ব লাভের পর রথবীতি ও শশীয়সী তাঁদের কন্যাকে শ্যাবাশ্বের হাতে অর্পণ করেন।

এই কাহিনীটি গোমতী অববাহিকার উচ্চকৃষ্টির পরিচায়ক। কারণ এই কাহিনী থেকে বোঝা যায় জ্ঞানই এ অঞ্চলের মানুষের নিকট সর্বোচ্চ ধন বল বিবেচিত হত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই কাহিনীটি বৃহদ্দেবতা গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে।

[ঋগ্বেদ ৫.৬১.১-১৯; বৃহদ্দেবতা ৫.৫০-৮১]

☐ সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরের উপনদী গোমালই প্রাচীন গোমতী। মহাকাব্য বা পুরাণে উল্লিখিত অযোধ্যা সংলগ্ন হয়ে প্রবাহিতা গোমতী এবং বৈদিক গোমতী এক নদী নয়।

বর্তমানে গোমাল বা গোমতী নদীটি পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাংশ এবং আফ-গানিস্তানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত।

বৈদিক যুগের প্রথমাংশে সিন্ধু এবং তৎসংলগ্ন নদীগুলির অববাহিকা অঞ্চল বৈদিক সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। বৈদিক সংস্কৃতির পূর্বমুখী গমনের সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমের অঞ্চলগুলিতে বৈদিক সভ্যতার অবক্ষয় ঘটতে থাকে। গোমতী অববাহিকার ক্ষেত্রেও এর ব্যাতিক্রম ঘটেনি।

বৈদিক সভ্যতার একটি প্রবণতা হল পূর্বে দেখা বিখ্যাত নদীর নামে পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত নদীর নামকরণ। যে কারণে দক্ষিণ ভারতের গোদাবরী উত্তর ভারতের গঙ্গা নদীর অনুসরণে গৌতমী গঙ্গা বলে পরিচিত হয়। এই প্রবণতার কথা মাথায় রেখেই পশ্চিমের গোমতীও পরে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে নতুন রূপ পায়। গঙ্গার উপনদীর নাম হয়ে ওঠে গোমতী।

[Vedic Index (Vol. 1) p. 238;
GRI (Bhargava) p. 128]

গোমতী২ ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন পবিত্র নদী। গোমতী নদীর উৎপত্তিস্থল হিমালয় পর্বত। মহাকাব্য ও পুরাণে গোমতী নদীর নাম বারবার উল্লিখিত হয়েছে। মহাভারতের আদিপর্বে বলা হয়েছে গোমতী নদীর জল পান করলে তৎক্ষণাৎ পাপমুক্তি ঘটে। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে গোমতী নদী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই নদীর জল অত্যন্ত শীতল এবং সাগরগামী। এই নদীর তীর বরাবর বিস্তৃত গো-চারণ ভূমির অস্তিত্বের কথা রামায়ণ থেকেই জানা যায়। সেই চারণভূমির গবাদি পশু সমূহের প্রাণ ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জল ও তৃণ দানকারী বলেই নদীটির নাম গোমতী—

গত্বা তু সুচিরং কালং ততঃ শীতবহাং নদীম্।
গোমতীং গাযুতানূপামতরৎ সাগরঙ্গমান্॥

রামচন্দ্র বনবাস যাত্রার একেবারে শুরুতে গোমতী নদী পার হয়েছিলেন। পরে বনবাসী রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সন্ধানে বের হয়ে ভরতও গোমতী নদী পার করে তৎসংলগ্ন কলিঙ্গ নগরে উপস্থিত হয়েছিলেন। হনুমানও এই নদী পার করে অযোধ্যায় আসেন।

[রামায়ণ ২.৪৯.১০; ২.৭১.১৬; ৬.২৭.২৬;
মহা (k) ১.১৭০.২০; ৬.৯.১৮;
(হরি) ১.৬৩.২০; ৬.৯.১৮; ভাগবত পু. ৫.১৯.১৭;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.২৬; মৎস্য পু. ১১৪.২৪;
বায়ু পু. ২.৯; ৪৫.৯৫]

☐ রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে বলা হয়েছে বানর যূথপতি কুমুদ পুরাকালে গোমতী নদীর তীরে বাস

করতেন। এই কুমুদ পরবর্তীকালে বিন্ধ্য পর্বতের অধিপতি হয়েছিলেন। *[রামায়ণ ৬.২৬.২৬-২৭]*

☐ সীতার অরণ্যে নির্বাসনের সময় লক্ষ্মণ তাঁকে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন। সে সময় তাঁরা গোমতী নদী পার হয়েছিলেন। নদীতীরে তাঁরা একরাত্রি বাসও করেন। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় লক্ষ্মণ ও সীতা গোমতী নদী পেরিয়ে গঙ্গার দর্শনলাভ করেছিলেন। এ থেকে নদী দুটির নৈকট্যের ধারণা পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গোমতী গঙ্গার উপনদী। *[রামায়ণ ৭.৫৬.১৯]*

☐ যে সকল নদী বরুণদেবের সভায় উপস্থিত থেকে তাঁর উপাসনা করেন তাঁদের মধ্যে গোমতী একটি। *[মহা (k) ২.৯.২৩; (হরি) ২.৯.২৩]*

☐ মহাভারতের বনপর্বে গোমতীকে অন্যতম পবিত্র দেবর্ষি-সেবিত একটি নদী-তীর্থ বলা হয়েছে। এই নদীতে অবগাহন করলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

গোমতীর তীরে শতসাহস্রিক নামে একটি তীর্থও রয়েছে। সম্ভবত এই তীর্থ শতসহস্র যজ্ঞের সমতুল্য পুণ্যফল দান করে বলেই তীর্থের এমন নাম। *[মহা (k) ৩.৮৪.৭৫-৭৬; ৩.৮৭.৭; (হরি) ৩.৬৯.৭৫-৭৬; ৩.৭২.৭]*

☐ গোমতী নদীর উপকুল বরাবর অসংখ্য তীর্থস্থল রয়েছে। বনবাসকালে পাণ্ডবরা সেই সব তীর্থগুলি দর্শন করেছিলেন। তাঁরা গোমতী নদীতীরে ব্রাহ্মণদের প্রচুর দান করেন। *[মহা (k) ৩.৯৫.২; (হরি) ৩.৭৯.২]*

☐ মহাভারতের বনপর্বে গোমতী নদীকে বিশ্বভুক্ অগ্নির পত্নী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *[মহা (k) ৩.২১৯.১৯; (হরি) ৩.১৮২.২৭]*

☐ রাবণবধের পর রামচন্দ্র গোমতী নদীর তীরে মহাড়ম্বরে দশটি অশ্বমেধযজ্ঞ করেছিলেন। *[মহা (k) ৩.২৯১.৭০; (হরি) ৩.২৬৩.৬৯]*

☐ গোমতী নদীর তীরে নৈমিষারণ্যে নাগ নামে একটি নগর রয়েছে। সেখানে পুরাকালে বিশালাকার পদ্ম নামে এক মহানাগ বাস করতেন। এই তথ্য থেকে বোঝা যায় প্রাচীনকালে গোমতী নদী তীরে নাগ জনজাতির বাসভূমি ছিল। *[মহা (k) ১২.৩৫৫.২, ৪; (হরি) ১২.৩৩৫.২৭, ২৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২.৯-১০]*

☐ কাশীরাজ দিবোদাস হৈহয় আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরের উচ্চভূমিতে বারাণসী নগরী স্থাপন করেছিলেন। *[মহা (k) ১৩.৩০.১৮; (হরি) ১৩.২৯.১৮; বায়ু পু. ৯২.২৬]*

☐ বলরাম তীর্থভ্রমণকালে গোমতী নদী এবং তৎসংলগ্ন তীর্থ দর্শন করেছিলেন। *[ভাগবত পু. ১০.৭৯.১১]*

☐ নৃসিংহদেব কর্তৃক দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুবধের সময় নৃসিংহদেবের আঘাতের অনুরণনে বহু নদী জনপদ কম্পিত হয়েছিল। এইসব নদীর মধ্যে গোমতী একটি। *[মৎস্য পু. ১৬৩.৬৩]*

☐ গোমতী নদী একটি পবিত্র পিতৃতীর্থ। *[বিষ্ণু পু. ৩.১৪.১৮; মৎস্য পু. ২২.৩১]*

☐ গঙ্গোদ্ভেদ তীর্থ গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। ভগবান বামদেব এই তীর্থে উদ্ভূত হয়েছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৩.২৮]*

গোমতী$_3$ দেবী সতী গোমন্ত পর্বতে গোমতী নামে পূজিতা। *[মৎস্য পু. ২২.১৩]*

গোমতীপুত্র অন্ধ্রবংশীয় একজন রাজা। রাজা শিবস্বাতির পুত্র গোমতীপুত্র। গোমতীপুত্রের পুত্রের নাম পুরীমান্। বিষ্ণু পুরাণের দাক্ষিণাত্য সংস্করণে পুরীমান্‌কে অলিমান্ এবং বিষ্ণু পুরাণের বঙ্গীয় সংস্করণে তাঁকে পুলিমান্ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বংশের রাজাদের নাম থেকে মনে হয় এঁরা সাতবাহন বংশের রাজা। এই বংশের রাজাদের নামকরণ হত তাঁদের মাতার নাম অনুসারে। *[ভাগবত পু. ১২.১.২৬; বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম) ৪.২৪.৪৭; বিষ্ণু পু. (নবভারত) ৪.২৪.১২]*

গোমন্ত$_1$ মথুরা সংলগ্ন একটি প্রাচীন পর্বত। এটি গোমন্তক পর্বত নামেও পরিচিত। জরাসন্ধের আক্রমণের ভয়ে যদু-বৃষ্ণিগণ গোমন্ত পর্বতে আত্মগোপন করেছিলেন। *[মহা (k) ২.১৪.৫২; (হরি) ২.১৪.৫২]*

☐ জরাসন্ধের মথুরা অবরোধকালে কৃষ্ণ ও বলরাম নারদের পরামর্শে নিকটবর্তী গোমন্ত পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে বলরাম পর্বতের মধ্যস্থলে একটি কদম্ব বৃক্ষের সন্ধান পান। বৃষ্টির ধারা সেই বৃক্ষের কোটরে জমে অমৃতে পরিণত হয়েছিল। কদম্ব বৃক্ষজাত সেই সুধা কাদম্বরী নামে বিখ্যাত।

বলরাম গোমন্ত পর্বতের কাদম্বরী সুধা পান করে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন।

[হরিবংশ পু. ২.৪১.১-১৩]

□ কৃষ্ণ ও বলরাম গোমন্ত পর্বতে আত্মগোপন করে রয়েছেন একথা বুঝতে পেরে জরাসন্ধ তাঁর সমর্থক রাজা এবং সৈন্যদের নিয়ে পর্বত ঘিরে ফেলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির করা হয়েছিল যে, পর্বতটিকে অবরুদ্ধ করে কাঠ ও তৃণে অগ্নিসংযোগ করা হোক। গোমন্ত পর্বত এতটাই দুর্গম যে তাতে আরোহণ করা কঠিন। সেকারণেই অগ্নি সংযোগের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেই অগ্নিতে দগ্ধ হয়েই প্রাণত্যাগ করবেন কৃষ্ণ ও বলরাম।

জরাসন্ধের প্রজ্বলিত অগ্নিতে গোমন্ত পর্বত ধ্বংসস্তূপের আকার নেয়। শিলাখণ্ড, বৃক্ষ, প্রাণীসমূহ দগ্ধ হয়ে পর্বত থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। গোমন্ত পর্বতের ধ্বংসপ্রাপ্তরূপ দেখে কৃষ্ণ ও বলরাম নিজেদের রক্ষা করার জন্য গোমন্ত পর্বতের শিখরদেশ থেকে ঝাঁপ দেন। বিষ্ণুর পদাঘাতে সমগ্র পর্বতটি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে পর্বতের চারদিকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্বাপিত হয়।

শেষ পর্যন্ত গোমন্ত পর্বতের যুদ্ধে জরাসন্ধ কৃষ্ণ ও বলরামের কাছে পরাজিত হন।

[হরিবংশ পু. ২.৪২.১-৮৩; ২.৪৩.৮২]

□ দেবী সতী (দক্ষকন্যা/দুর্গা পার্বতীর পূর্বজন্মের নাম) গোমন্ত পর্বতে গোমতী নামে পূজিতা হন। *[মৎস্য পু. ১৩.২৮]*

□ বর্তমান গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত রৈবতক পর্বতের একটি অংশ। অবশ্য বর্তমান গোয়া রাজ্যের অন্তর্গত পশ্চিমঘাট পর্বতের একটি বিচ্ছিন্ন অংশকেও গোমন্ত গিরি নামে ডাকা হয়।

[GDAMI (Dey) p. 70]

গোমন্ত২ ক্রৌঞ্চদ্বীপের অন্তর্গত একটি পর্বত। বিশালাকায় ধাতু সমন্বিত গোমন্ত পর্বত নারায়ণ ও লক্ষ্মীর আবাসস্থল।

[মহা (k) ৬.১২.৮; (হরি) ৬.১২.৮]

গোমন্ত৩ একটি প্রাচীন জনপদ।

[মহা (k) ৬.৯.৪৩; (হরি) ৬.৯.৪৩]

□ বর্তমান গোয়া বা কোঙ্কণ অঞ্চলটি। এই সমগ্র অঞ্চলটি গোমন্ত দেশ নামেও খ্যাত।

[EAIG (Kapoor) p. 241]

গোময়ান কশ্যপবংশীয় বংশপ্রবর্তক ঋষিদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৯৯.৪]*

গোমান্১ একজন মৌনেয় গন্ধর্ব।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২]

গোমান্২ দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের পুত্র শম্ভু। শম্ভুর পুত্রদের মধ্যে গোমান্ একজন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে গোমান্‌কে গোম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[বায়ু পু. ৬৭.৮১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫.৪০]

গোমুখ১ পাতালের দ্বিতীয়তল অর্থাৎ সুতলে অবস্থিত এক নগরী। পুরাণ মতে, সেখানে বিশিষ্ট অসুরদের বাসভূমি।

[বায়ু পু. ৫০.২১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.২২]

গোমুখ২ প্রহ্লাদের কনিষ্ঠ পুত্র শম্ভুর ছয়টি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। গোমুখ শম্ভুর সেই ছয় পুত্রের মধ্যে একজন। *[বায়ু পু. ৬৭.৪১]*

গোমুখ৩ মহর্ষি ব্যাসদেবের শিষ্য পৈল ঋগ্বেদ সংহিতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে তাঁর দুই শিষ্য বাস্কল ও ইন্দ্রপ্রমতিকে শিক্ষা দেন। ইন্দ্রপ্রমতির পুত্র ও শিষ্য পরম্পরায় এসে মহর্ষি বেদমিত্র সেই সংহিতা লাভ করেন এবং তাকে পাঁচভাগে বিভক্ত করে নিজের পাঁচ শিষ্যকে শিক্ষা দেন। বিষ্ণুপুরাণের একটি পাঠ থেকে জানা যায়, গোমুখ এই বেদমিত্রের পাঁচ শিষ্যের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। পণ্ডিত H. H. Wilson এর মন্তব্য এবং বিষ্ণু পুরাণের অন্যান্য পাঠ পর্যালোচনা করলে গোমুখের পরিবর্তে গালব, গোখলু প্রভৃতি পাঠান্তর দেখা যায়। ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী ইন্দ্রপ্রমতির পৌত্র শাকল্য সংহিতাকে পাঁচভাগে বিভক্ত করেন এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গোখল্য। Wilson এই গোখল্যকেও গোমুখ বা গালবের থেকে অভিন্ন বলেই মনে করেন।

[বিষ্ণু পু. ৩.৪.২২; (Wilson, Vol. 3; p. 46); ভাগবত পু. ১২.৬.৫৭]

গোমুখ৪ ইন্দ্রের সারথি মাতলির পুত্র।

[মহা (k) ৫.১০০.৮; (হরি) ৫.৯৩.৮]

□ রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে যে, গোমুখ ছিলেন ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্তের সারথি। রাবণের পুত্র মেঘনাদ স্বর্গলোক আক্রমণ করলে ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্তর সঙ্গে তাঁর ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গোমুখ জয়ন্তের সারথি ছিলেন। মেঘনাদের বাণে তিনি যথেষ্ট আহতও হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

[রামায়ণ (তর্করত্ন) ৭.২৮.১০]

গোমুখ৫ দ্বাপর যুগে ক্রোধবশ অসুরদের অংশে যে সব রাজা মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গোমুখ রাজা তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.৬৭.৬৩-৬৬; (হরি) ১.৬২.৬৩-৬৬]

গোমুখ৬ একটি তীর্থ। স্কন্দ পুরাণে গোমুখ তীর্থের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে—

কোনো এক সময় গোপাল নামে এক ব্যক্তি কুষ্ঠরোগে পীড়িত হয়ে একটি গভীর খাতের মধ্যে অনেক কালের জমে থাকা জল দেখতে পায়, এবং সেখানে স্নান করে কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তি পায়। খাতের মধ্যে এই জল বস্তুত একটি গাভীর (গো) দন্তের আঘাতে তৈরি হয়েছিল। এই খাতে জমে থাকা পবিত্র জলে অবগাহন করলে ব্যাধি ও পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। গাভীর দন্তের আঘাতে সৃষ্টি হয়েছিল বলেই অর্থাৎ গোমুখ থেকে সৃষ্ট বলেই এই তীর্থের নাম গোমুখ—

ততঃ প্রভৃতি তৎখ্যাতং তীর্থং গোমুখ সংজ্ঞিতম্।
গোমুখান্তুতলে জাতং যতশ্চৈব দ্বিজোত্তমাঃ

রাজা অম্বরীষ তাঁর পুত্র সুবর্চ্চার কুষ্ঠ ব্যাধি দূর করার জন্য গোমুখেই ভগবান কৃষ্ণ জনার্দনের উপাসনা করেছিলেন। জনার্দন তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে পাতালবাহিনী জাহ্নবীকে এক সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে এই স্থানে প্রকট করেন। সুবর্চ্চা জাহ্নবীর পবিত্র জলে স্নান করে রোগমুক্ত হন। এভাবেই গোমুখে জাহ্নবীর উদ্ভব।

[স্কন্দ পু. (নাগর) ৯৩.১-৬০]

গঙ্গা নদীর উৎপত্তিস্থল। গঙ্গোত্রীর ১৯ কি. মি. উত্তরে এর অবস্থান। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি পার্বত্য গুহা বিশেষ। এই গুহা থেকে গঙ্গা নদীকে প্রবাহিত হতে দেখা যায়।

[K.S. Gulia, Mountains of the Gods; Spiritual Ecology of the Himalayan Region, pp. 73-74]

গোমেদক প্লক্ষদ্বীপের সাতটি পর্বতের মধ্যে একটি হল গোমেদক (পাঠান্তরে গোমেদ)। এই পর্বতটি যে বর্ষের অন্তর্গত তার নামও গোমেদক বর্ষ (পাঠান্তরে গোমেদ)।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৯.৭,১৩৮; বায়ু পু. ৪৯.৬; বিষ্ণু পু. ১.৪.৭; মৎস্য পু. ১২৩.২৮]

গোমেদগন্ধিক পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে সব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি গোমেদগন্ধিকের বংশ তার মধ্যে একটি। গোমেদগন্ধিক অঙ্গিরার বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৬.১৬]*

গোরথ বশিষ্ঠবংশীয় বংশপ্রবর্তক ঋষিদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ২০০.১০]*

গোলক শাকল্য নামক ঋষির শিষ্যদের মধ্যে গোলক একজন। *[বায়ু পু. (আনন্দাশ্রম) ৬০.৬৪]*

গোলভ গোলভ একজন মহাবীর গন্ধর্বের নাম। এঁর সঙ্গে সুগ্রীবের অগ্রজ বালীর পনেরো বছর ধরে অহোরাত্র যুদ্ধ হয়েছিল। ষোড়শ বছরে বালী গোলভকে হত্যা করে বানরদের নিশ্চিন্ত করেছিলেন। *[রামায়ণ ৪.২২.২৮-৩০]*

গোলাঙ্গুল একজন বানরবীর। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বানরজাতি মহর্ষি পুলহের পুত্ররূপে কল্পিত। সেখানে বিভিন্ন বানরগোষ্ঠীর নাম করতে গিয়ে গোলাঙ্গুলকেও একটি বানরজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বানরবীর গোলাঙ্গুল এই গোষ্ঠীর বানরদলপতি কিনা এ বিষয়ে চিন্তার অবকাশ থাকছে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৭৫, ২৪৪]*

গোশৃঙ্গ ভারতবর্ষের অন্তর্গত একটি পর্বত তথা পার্বত্য জনপদ। মহাভারতের সভাপর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, সহদেব দক্ষিণ দিকে দিগ্বিজয় যাত্রা করে নিষাদদেশ অতিক্রম করে এই গোশৃঙ্গ অঞ্চলটি জয় করেছিলেন।

পণ্ডিত K.C. Mishra নিষাদ দেশ এবং গোশৃঙ্গের সঙ্গে একত্রে উল্লিখিত অন্যান্য জনপদের নামগুলি পর্যালোচনা করে গোশৃঙ্গকে মধ্যভারতীয় জনপদ বলে উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয়, বর্তমান উজ্জয়িনীর অনতিদূরে গোবিষাণ নামে একটি অঞ্চলের অস্তিত্ব এখনও আছে। গোবিষাণ আর গোশৃঙ্গ-শব্দদুটি সমার্থকও বটে। সেই ভাবনা থেকেই Mishra এই গোবিষাণ অঞ্চলটিকেই প্রাচীন গোশৃঙ্গ বলে বর্ণনা করেছেন।

[মহা (k) ২.৩১.৫; (হরি) ২.৩০.৫; TIM (Mishra) p. 116]

গোষ্ঠায়ন পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি গোষ্ঠায়নের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি ভৃগুর বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৫.২৪]

গৌড়দেশ একটি প্রাচীন জনপদ। রাজা যুবনাশ্বের

পুত্র শ্রাবস্ত (মতান্তরে শ্রাবস্তি) গৌড়দেশে শ্রাবস্তী নামে একটি বিখ্যাত পুরী নির্মাণ করেছিলেন।

[মৎস্য পু. ১২.৩০; কূর্ম পু. ১.২০.১৯]

□ প্রাচীন কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তী। এই শ্রাবস্তী এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল প্রাচীনকালে গৌড়দেশ বা উত্তর গৌড় নামেও পরিচিত ছিল। সাধারণভাবে বর্তমান বঙ্গদেশকেই পণ্ডিতরা প্রাচীন গৌড় বলে চিহ্নিত করেন। তবে এটির সঙ্গে শ্রাবস্তী কেন্দ্রিক গৌড়দেশকে অভিন্ন অর্থে না কল্পনা করাই উচিত।

কানিংহাম উত্তর কোশলের গোণ্ডা বিভাগের প্রায় ৪২ মাইল দক্ষিণে প্রাচীন গৌড়দেশের ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন।

বাস্তবে প্রাচীন গৌড়দেশ চারভাগে বিভক্ত ছিল বলে মনে করা হয়—উত্তর গৌড় (শ্রাবস্তী ও সংলগ্ন অঞ্চল), দক্ষিণ গৌড় (কাবেরী নদী সংলগ্ন একটি স্থান), পূর্ব গৌড় (সমগ্র বৃহত্তর বঙ্গদেশ) এবং পশ্চিম গৌড় (গাণ্ডোয়ানা অঞ্চল), তবে শুধুমাত্র উত্তর গৌড়েরই উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায়। *[AGI (Cunningham) p. 408; GDAMI (Dey) p. 63]*

গৌড়িনি বশিষ্ঠবংশীয় বংশপ্রবর্তক ঋষিদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ২০০.৫]*

গৌতম১ বৈদিক যুগের অন্যতম বিখ্যাত এবং প্রতিষ্ঠিত ঋষি। তবে বৈদিক গ্রন্থসমূহ এবং মহাকাব্য এবং পুরাণগুলিতে যেমনটি দেখা যাচ্ছে, তাতে মহর্ষি গৌতম কোনো একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি নন বলেই মনে হয়। গৌতম বলতে মহর্ষি গোতমের বংশধর বা শিষ্য বোঝায়। সেই ভাবনায় বিচার করলে গৌতম কোনো নাম নয়, কিংবা গৌতম বললে কোনো একজন ব্যক্তিকে বোঝায়ও না। এটি গৌতম ঋষির বংশ বা শিষ্যপরম্পরার পরিচয় বহন করে মাত্র।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থ শতপথ ব্রাহ্মণে অরুণ ঔপবেশি নামে জনৈক ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়, যাকে রাজর্ষি অশ্বপতি কৈকেয় 'গৌতম' বলে সম্বোধন করেছেন। শতপথ ব্রাহ্মণেই অন্যত্র মহর্ষি উদ্দালক-আরুণিকেও 'গৌতম' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ছান্দোগ্য উপনিষদ, কৌশীতকি উপনিষদ এবং জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে একাধিকবার মহর্ষি আরুণেয় শ্বেতকেতুকেও 'গৌতম' নামে সম্বোধিত হতে দেখা যায়।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১০.৬.১.৪; ১১.৪.১.৩; বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬.১.৭; ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫.৩.৬; কৌশীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদ ১.১; জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণ ১.৪২.১]

□ শতপথ ব্রাহ্মণের অপর একটি অধ্যায়ে কুশ্রি বাগশ্রবস্ নামে এক ঋষির উল্লেখ মেলে এবং এঁকেও গৌতম বলেই সম্বোধন করা হয়েছে। এছাড়াও বৈদিক গ্রন্থগুলিতে আরও অসংখ্য 'গৌতমের' উল্লেখ পাওয়া যায়।

[শতপথ ব্রাহ্মণ ১০.৫.৫.১]

□ রামায়ণেও আমরা একাধিক গৌতমের উল্লেখ পাই। বৈদিককাল থেকে যে মহর্ষি গৌতম অহল্যার স্বামী হিসেবে বিখ্যাত হয়ে এসেছেন, সেই গৌতমের উল্লেখ এবং উপাখ্যান তো রামায়ণে মেলেই, পাশাপাশি দশরথের পুরোহিত হিসেবেও জনৈক গৌতমের নাম আমরা উল্লিখিত হতে দেখি। দশরথের মৃত্যুর পরদিন এই গৌতম কুলগুরু বশিষ্ঠের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অবিলম্বে নতুন কোনো রাজাকে সিংহাসনে স্থাপন করতে অনুরোধ করেন। বনবাস থেকে প্রত্যাবর্তনের পর অযোধ্যায় যখন রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হল, সে সময় অভিষেক অনুষ্ঠানেও কুলগুরু বশিষ্ঠের সহায়ক ছিলেন এই গৌতম। বাল্মীকির তপোবনে নির্বাসিত সীতাকে অশ্বমেধযজ্ঞের পর রাম আবার একবার জনসমক্ষে অগ্নিপরীক্ষা দিতে অনুরোধ করেন। যেদিন সীতা রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই দিনটিতেও অন্যান্য পুরোহিতদের সঙ্গে নিয়ে গৌতম উপস্থিত ছিলেন রাজসভায়।

[রামায়ণ ১.৭.৫; ২.৬৭.২-৮; ৬.১৩০.৬১; ৭.১০৯.৫]

□ মহাভারত-মহাকাব্যেও বহুসংখ্যক গৌতমের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহর্ষি স্থূলকেশের পালিতা কন্যা প্রমদ্বরা সর্পদংশনে নিহত হলে শোকসন্তপ্ত স্থূলকেশের আশ্রমে যেসব ঋষি-মহর্ষি সমবেত হয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যেও মহর্ষি গৌতম অন্যতম।

[মহা (k) ১.৮.২৫; (হরি) ১.৭.২৫]

□ শতশৃঙ্গ পর্বতে যখন দেবতা-ঋষি-গন্ধর্বরা সমবেত হয়ে অর্জুনের জন্মোৎসব পালন

করেছিলেন, সে সময়েও জনৈক মহর্ষি গৌতম শতশৃঙ্গ পর্বতে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ১.১২৩.৫১; (হরি) ১.১১৭.৫৫]

□ ইন্দ্রপ্রস্থে ময়দানব যুধিষ্ঠিরের জন্য যে সভাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন, সেই সভাভবনে জনৈক মহর্ষি গৌতমকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। নারদ যুধিষ্ঠিরের কাছে দেবরাজ ইন্দ্র এবং লোকপিতামহ ব্রহ্মার সভার যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানেও ইন্দ্রসভায় এবং ব্রহ্মার সভায় কোনো এক মহর্ষি গৌতমের উপস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। *[মহা (k) ২.৪.১৭; ২.৭.১৮; ২.১১.১৯; (হরি) ২.৪.১৭; ২.৭.১৮; ২.১১.১৯]*

□ মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রার সময় লোমশ মুনি ছাড়াও অন্যান্য যেসব মুনি-ঋষি তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যেও জনৈক গৌতম ছিলেন।

[মহা (k) ২.৮৫.১১৯; (হরি) ৩.৭০.১১৯]

□ মহাভারতের শল্যপর্বে একত, দ্বিত এবং ত্রিত নামে যে তিন ঋষিপুত্রের উপাখ্যান পাওয়া যায়, এই তিন ঋষিপুত্রও জনৈক মহর্ষি গৌতমের পুত্র ছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

[মহা (k) ৯.৩৬.১০; (হরি) ৯.৩৪.৯-১০]

□ কুরুক্ষেত্রে শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে দেখতে যেসব ঋষি মহর্ষি উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যেও জনৈক মহর্ষি গৌতমকে দেখতে পাই আমরা। *[মহা (k) ১২.৪৭.১০; ১৩.২৬.৪; (হরি) ১২.৪৬.১০; ১৩.২৭.৪; ভাগবত পু. ১.৯.৭; ১.১০.৯]*

□ মহাভারতে মহর্ষি শরদ্বানের পিতা তথা শারদ্বত কৃপাচার্যের পিতামহ হিসেবেও জনৈক মহর্ষি গৌতমের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এই গৌতমের পরিচয়েই মহর্ষি শরদ্বান্ এবং তাঁর পুত্র কৃপও গৌতম নামে পরিচিত হয়েছেন। শরদ্বানের কন্যা কৃপীকেও সেই সূত্রেই গৌতমী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পুরাণেও একাধিকবার কৃপাচার্যকে গৌতম নামে উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

[মহা (k) ১.৬৩.১০৭; (হরি) ১.৫৮; ভাগবত পু. ১০.৪৯.২; ১০.৭৪.৭]

□ পুরাণগুলিতে মহর্ষি গৌতমকে অঙ্গিরার বংশজাত বলা হয়েছে। তবে এই আঙ্গিরস গৌতমও একজনমাত্র ব্যক্তি না একাধিক ব্যক্তি—সে প্রশ্ন মহাভারত এবং পুরাণের উল্লেখ থেকেই উঠে যায়। বায়ু পুরাণে এবং মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, স্বয়ং মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে স্বরাটের গর্ভজাত (মৎস্যপুরাণ মতে সুরূপার গর্ভজাত) পুত্র ছিলেন গৌতম। আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ এবং বায়ুপুরাণে এমন উল্লেখও পাওয়া যাচ্ছে যে, মহর্ষি গৌতম আসলে উতথ্যের পুত্র মামতেয় দীর্ঘতমারই আর এক নাম। এই দীর্ঘতমা-গৌতম নাকি মহর্ষি ভরদ্বাজের কাছ থেকে বায়ুপুরাণ শ্রবণ করেছিলেন—এমন উল্লেখও মেলে। আবার মৎস্যপুরাণে আঙ্গিরস উশিজের পুত্র তথা দীর্ঘতমার ভ্রাতা ছিলেন গৌতম—এমন উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এই গৌতম কোনো এক সময় তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করেছিলেন বলে জানা যায়।

মহাভারতের আদিপর্বে প্রাপ্ত কাহিনীতে আবার দেখা যাচ্ছে যে, মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে প্রদ্বেষীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন গৌতম। প্রদ্বেষীর আদেশে গৌতম এবং তাঁর ভাইয়েরা মিলেই এক সময় অন্ধ দীর্ঘতমাকে ভেলায় চড়িয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তবে মহাভারতের সভাপর্বে কৃষ্ণ জরাসন্ধের রাজধানী রাজগৃহের বর্ণনা দিতে গিয়ে স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন যে, দীর্ঘতমা ঋষিই গৌতম নামেও খ্যাত ছিলেন। এই রাজগৃহ অঞ্চলেই শূদ্রা ঔশীনরীর গর্ভে তিনি কাক্ষীবান্ প্রভৃতি পুত্রদের জন্ম দিয়েছিলেন এবং এই অঞ্চলেই তাঁর আশ্রমও ছিল (বিশদ দ্র. দীর্ঘতমা)। যাই হোক, মহাভারত এবং পুরাণের কাহিনী থেকে অঙ্গিরার বংশজাত মহর্ষি গৌতমের পরিচয় সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান তেমন সুষ্ঠুভাবে না হলেও তিনি যে অঙ্গিরার বংশধারার অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন—সেটা বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়।

[মহা (k) ১.১০৪.২৪, ৩৯; ২.২৯.৫-৮; (হরি) ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.৩২; ১.৩৮.২৮; মৎস্য পু. ৪৮.৫৩; ১২৬.১৩; ১৩৩.৬৭; ১৯৬.৪-৫; বায়ু পু. ৬৪.২৬; ৬৫.৯৭,১০০;]

□ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য একসময় জনৈক গৌতম ঋষিকে শিবসহস্রনামস্তোত্র শুনিয়েছিলেন বলে উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১৭.১৭৭; (হরি) ১৩.১৬.১৭৭]

□ তবে মহাকাব্য-পুরাণে সর্বাধিক চর্চিত এবং সব থেকে বিখ্যাত গৌতম হলেন অহল্যার স্বামী গৌতম ঋষি। ইনি কোন গৌতম, এঁর জন্ম-পরিচয়ই বা কি—এসব কোনো তথ্যই কোথাও পাওয়া যায় না। মূলত অহল্যার স্বামী হিসেবেই তাঁর পরিচিতি, অহল্যার উপাখ্যানের কারণেই তাঁর খ্যাতি।

কাহিনীটি এরকম—প্রজা সৃষ্টি করার পর পিতামহ ব্রহ্মা দেখলেন যে, তাদের মধ্যে পৃথক কোনো বিশেষত্ব নেই—না দর্শনে, না লক্ষণে, না রূপে—কোনো বিশেষত্বই নেই। সেই কারণে সমস্ত প্রজাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যত সৌন্দর্য্য ছিল, সেই সব বৈশিষ্ট্য একটি স্ত্রীলোকের মধ্যে নিবেশ করে ব্রহ্মা অহল্যাকে সৃষ্টি করলেন—

যদ্ যৎ প্রজানাং প্রত্যঙ্গ বিশিষ্টং তত্তদুদ্ধৃতম্।

'হল' মানে বিরূপতা,সুতরাং অহল্যা মানে যার মধ্যে কোনো বিরূপতা নেই; ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট সর্বাঙ্গসুন্দরী নারী এই অহল্যা—

যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা।
অহল্যেত্যেব চ ময়া তস্যা নাম প্রকীর্তিতম্॥

যাই হোক, এহেন পরমাসুন্দরী অহল্যার জন্মমুহূর্ত থেকেই দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার প্রতি কামাসক্ত ছিলেন এবং মনে মনে তাঁকে পত্নীরূপে বরণও করেছিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রের মনোভাব বুঝেই অহল্যাকে গৌতম ঋষির কাছে গচ্ছিত রাখলেন। বহুকাল অহল্যা গৌতমের কাছে রইলেন কিন্তু তপস্বী গৌতমের মনে অহল্যার প্রতি কোনো বিকার জন্মাল না। গৌতমের এমন নিস্পৃহ আচরণ দেখে ব্রহ্মা শেষ পর্যন্ত তাঁকেই অহল্যার উপযুক্ত স্বামী বলে বিবেচনা করেছেন। গৌতম এবং অহল্যার বিবাহ হল। তাঁরা আশ্রমে সুখে শান্তিতেই দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু অহল্যার প্রতি অদম্য কামজ আকর্ষণ থেকে ইন্দ্র কিছুতেই মুক্ত হতে পারলেন না। অবশেষে একদিন যখন গৌতম তীর্থস্নানের জন্য আশ্রমের বাইরে গিয়েছেন, সেই সময় ইন্দ্র মহর্ষি গৌতমের রূপ ধারণ করে অহল্যার সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং অহল্যার সঙ্গ কামনা করলেন। অহল্যা বুঝতে পেরেছিলেন যে এমন আচরণ তাঁর স্বামীর স্বভাববিরুদ্ধ এবং অহল্যা নিজেও নিশ্চয় জানতেন যে ইন্দ্র তাঁর প্রতি আসক্ত। অহল্যা বুঝলেন ছদ্মবেশে যিনি মিলন-কামনা করছেন—তিনি দেবরাজ। তবু জেনেশুনেই কতকটা কৌতূহলের বশেই অহল্যা মিলনে সম্মত হলেন। মিলনতৃপ্ত ইন্দ্র যখন কুটীর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, ঠিক সেই সময় আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করছেন তীর্থস্নাত ঋষি গৌতম। দুজনের দেখা হল এবং আপন ছদ্মবেশে ইন্দ্রকে দেখতে পেয়ে গৌতম যে আশঙ্কা করেছিলেন, সেই আশঙ্কাই সত্য বলে বুঝতে পারলেন আশ্রমে ফেরার পর। ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে গৌতম অভিশাপ দিলেন—

বিফলস্ত্বং ভবিষ্যসি—অর্থাৎ তাঁর কামুক ইন্দ্রিয়টিই যেন খসে পড়ে যায়। মুনির শাপে ইন্দ্রের জননেন্দ্রিয় খসে পড়ে গেল। মহাভারতে অবশ্য এমন উল্লেখও আছে যে, গৌতমের শাপে কলঙ্কের চিহ্ন স্বরূপ ইন্দ্র 'হরিৎশ্মশ্রু' হলেন। (দ্র. ইন্দ্র) যাইহোক, অহল্যার প্রতিও গৌতম ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যথেষ্টই, তিনি এবার অহল্যাকেও অভিশাপ দিলেন—বহু বৎসর কাল পর্যন্ত বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে, নিরাহারে সকলের অদৃশ্য হয়ে এই তপোবনেই কাল যাপন করবে তুমি—

বাতভক্ষা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যা সর্বভূতানামাশ্রমে'স্মিন্ বসিষ্যসি॥

গৌতম অহল্যাকে একথাও বললেন যে, তুমি রূপ এবং যৌবনসম্পন্না হওয়া সত্ত্বেও আপন মর্য্যাদায় স্থির থাকতে পারো নি। এর ফলস্বরূপ জগতে তুমিই আর অদ্বিতীয়া সুন্দরী থাকবে না। গৌতমের এই ভবিষ্যৎবাণীর ফলে এই ঘটনার পর থেকে জগতে অহল্যার মতো বহু রূপবতী স্ত্রীলোক উৎপন্ন হতে লাগল। অনুতপ্তা অহল্যা নিজের শাপমুক্তির উপায় জানতে চাইলেন স্বামীর কাছে। গৌতম অহল্যাকে বললেন—ভগবান বিষ্ণুর মনুষ্য অবতার, রামচন্দ্র অহল্যার তপোবনে এলে, তাঁর পাদস্পর্শেই অহল্যা শাপমুক্ত হবেন। একথা বলে আশ্রম ত্যাগ করে হিমালয়ে তপস্যা করতে গেলেন মহর্ষি গৌতম। অহল্যা সকলের অদৃশ্য হয়ে কঠোর তপস্যায় কালযাপন করতে লাগলেন। রামায়ণে বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী—এই ঘটনার বহুকাল পর ইক্ষ্বাকুবংশে ভগবান বিষ্ণু রামচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হলেন। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ যখন তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করার পর বিশ্বামিত্রের তপোবনের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন সেই সময় পথে পড়ল অহল্যার আশ্রম।

বিশ্বামিত্রের অনুরোধে রাম সেই আশ্রমে প্রবেশ করে অহল্যাকে শাপমুক্ত করেন। তপোবলে এই ঘটনা জানতে পেরে আশ্রমে ফিরে এলেন মহর্ষি গৌতমও। তপস্যার ফলে পবিত্র, শাপমুক্ত অহল্যার সঙ্গে গৌতমের পুণর্মিলন হল।

রামায়ণের কাহিনীর থেকে মহাভারতে বর্ণিত গৌতম-অহল্যার কাহিনীটি কিছু ভিন্ন। এখানে ইন্দ্র আর অহল্যার মিলনের ঘটনাটি অপরিবর্তিত, কিন্তু কাহিনীর পরিণতি অনেক বেশি উদার এবং অলৌকিকতা থেকে মুক্ত। মহাভারতের শান্তিপর্বে দেখা যাচ্ছে যে, ইন্দ্র আর অহল্যার ব্যভিচার ঘটনার পর একদিন অসম্ভব ক্রুদ্ধ হয়ে গৌতম অহল্যার গর্ভজাত নিজপুত্র চিরকারীকে ডেকে বললেন—তুমি আমার আদেশে তোমার এই পাপিষ্ঠা জননীকে হত্যা করো—

জহীমাং জননীমিতি।

এরকম একটা আদেশ দিয়ে গৌতম আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন এবং তপস্যায় আত্মনিয়োগ করলেন। গৌতমের এই পুত্রটি কিন্তু খুব সামান্য মানুষ নন। চিরকারীর অভ্যাসই হল, তিনি সমস্ত কাজই করেন অনেক ভেবে চিন্তে এবং সে ভাবনাও অনেক সময় তপস্যার মতোই গভীর এবং দীর্ঘমেয়াদী—

চিরং কার্য্যাভিপত্তিশ্চ চিরকারী তথোচ্যতে।

পিতার আদেশ চিরকারীর কাছে অবশ্য পালনীয়, তবু তিনি আপন স্বভাববশতই একবার ভাবতে বসলেন। বহুক্ষণ কিংবা বলা ভালো বহুকাল ধরে ভাবলেন চিরকারী এবং ভাবতে ভাবতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ব্যভিচারের ঘটনা পৃথিবীতে যত ঘটে, সেখানে পরম প্রবৃত্তিটা পুরুষের তরফ থেকেই দেখা যায় এবং মেয়েদের যেহেতু শারীরিক শক্তি কম সেহেতু বলাৎকার, ধর্ষণের মতো ঘটনা মূলত পুরুষের ইচ্ছাধীন তাতে মেয়েদের বিশেষ অন্যায় থাকে না। চিরকারীর বিচারে শেষমেষ ইন্দ্রের অপরাধই বড়ো হয়ে উঠল। মা অহল্যাকে তিনি ইন্দ্রের পুরুষ প্রবৃত্তির বলি হিসেবেই বুঝলেন। ফলে পিতার আদেশ মান্য করার কোনো প্রয়োজনই অনুভব করলেন না চিরকারী।

এদিকে দীর্ঘ তপস্যার পর আশ্রমে ফিরে আসার উদ্যোগ করলেন মহর্ষি গৌতম। তপস্যার ফলে তাঁর মন থেকে ক্রোধ দূরীভূত হয়েছে, ফলে আশ্রম থেকে যাত্রা করার সময় পত্নীকে বধ করার যে আদেশ তিনি পুত্রকে দিয়েছিলেন, তার জন্য গৌতমের মনে গভীর অনুশোচনা হল। অহল্যার যে ঘটনায় বিশেষ কোনো দোষ নেই তা দীর্ঘ তর্কযুক্তি সাজিয়ে অনুভব করলেন গৌতমও। এখন চিন্তার কথা হল, যে ঘটনায় অহল্যার বিশেষ কোনো দোষই নেই, তার জন্য তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়ে এসেছেন গৌতম আশ্রম থেকে যাত্রা করার সময়। একমাত্র ভরসা এখন পুত্র চিরকারী। গৌতম জানেন যে, তাঁর এই পুত্রটি সব কাজই যথেষ্ট ভেবেচিন্তে করেন। যাই হোক, গৌতমের ভাবনা সত্য হল, ফিরে এসে তিনি দেখলেন যে চিরকারী মাতাকে বধ করেননি আপন সুচিরায়ত বিবেচনায়। পুত্রকে অনেক আশীর্বাদ করলেন গৌতম, অহল্যাকেও গ্রহণ করলেন পরম সমাদরে।

মহাভারতে বর্ণিত কাহিনীতে গৌতম এবং অহল্যার পুত্র হিসেবে চিরকারীর নাম উল্লিখিত হলেও রামায়ণে মিথিলার রাজা জনকের কুলপুরোহিত শতানন্দকে গৌতম এবং অহল্যার পুত্র বলা হয়েছে। রামচন্দ্রের দ্বারা অহল্যা উদ্ধারের পর বিশ্বামিত্র যখন রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলায় পৌঁছালেন, তখন বিশ্বামিত্রের মুখ থেকে মায়ের শাপমুক্তির ঘটনা শুনে শতানন্দ আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন।

[রামায়ণ ৭.৩০.২১-৩৩; ১.৪৮.১৬-৩৪;
১.৪৯.১৪-২২; ৭.৩৫.৩৭-৪৫;
ভাগবত পু. ৯.২১.৩৪;
মহা (k) ১২.৩৪২.২৩; ৫.১২.৬; ১২.২৬৬.১-৬৯;
(হরি) ১২.৩২৮.৫৩; ৫.১২.৬; ১২.২৬০.১-৬৯;
বিষ্ণু পু. ৪.৪.৪২; ৪.১৯.১৬;
মৎস্য পু. ৫০.৭; বায়ু পু. ৯৯.২০১]

□ লক্ষণীয়, রামায়ণ-মহাভারতের এই অহল্যা উপাখ্যানের উৎস কিন্তু প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থ শতপথ ব্রাহ্মণ। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যাচ্ছে যে দেবরাজ ইন্দ্রের একটা বিশেষণই হল যে, তিনি অহল্যার উপপতি—অহল্যায়ৈ জারঃ। সেই ব্রাহ্মণগ্রন্থের কাল থেকেই অহল্যা এমনই প্রসিদ্ধ একটি নারী চরিত্র যে, অহল্যার স্বামী গৌতম মূলত-অহল্যার কারণেই বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, গৌতম কোনো বিশেষ ব্যক্তির নাম হয়। বৈদিক কাল থেকেই বহুসংখ্যক

গৌতমের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে—সেকথাও আমরা আলোচনা করেছি। ফলে মহাকাব্য-পুরাণের সময়কালে এসে দেখা যাচ্ছে যে, অহল্যার খ্যাতির কারণেই একাধিক গৌতমের ওপর অহল্যার স্বামীত্ব আরোপিত হয়েছে। রামায়ণে যে গৌতমকে অহল্যার স্বামী হিসেবে দেখা যাচ্ছে তিনি মিথিলা নিবাসী এবং মিথিলার রাজপুরোহিত ঋষি শতানন্দের পিতা। পুরাণগুলিতে কিন্তু কৃপাচার্যের পিতা (মতান্তরে পিতামহ) শরদ্বান্ গৌতমের ওপরেও অহল্যার স্বামীত্ব আরোপিত হতে দেখা যাচ্ছে। মহাভারতে প্রাপ্ত উপাখ্যান অনুযায়ী অহল্যার স্বামী মহর্ষি গৌতম জনৈক চিরকারীর পিতা। আবার অন্য একটি কাহিনীতে গৌতমকে উতঙ্কের আচার্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। উতঙ্ক অহল্যার আদেশে তাঁর জন্য সৌদাসরাজার পত্নীর (আদিপর্বে প্রাপ্ত কাহিনী অনুযায়ী পৌষ্যরাজার পত্নীর) রত্নমণ্ডিত কুণ্ডল আনয়ন করেছিলেন। লক্ষণীয়, মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত পৌষ্যপর্বে কিন্তু ঋষিপত্নীর নামোল্লেখ না থাকলেও উতঙ্কের কুণ্ডল আনয়নের ক্ষেত্রে যে ঋষি অধ্যাপকের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে তিনি বেদ, আরুণি-উদ্দালকের শিষ্য। বৈদিকগ্রন্থে আরুণি উদ্দালককেও যে গৌতম বলে সম্বোধন করা হয়েছে, সে কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি যে, মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে উল্লিখিত উতঙ্কের গুরু মহর্ষি গৌতম এবং আদিপর্বে উল্লিখিত বেদ ঋষি অভিন্ন ব্যক্তি হলেও হতে পারেন কারণ আরুণি-উদ্দালকের শিষ্য পরম্পরায় বেদও তো 'গৌতম'। এইভাবে মূলত অহল্যার খ্যাতির কারণেই মহাকাব্য-পুরাণে বিভিন্ন সময়ে একাধিক গৌতমের উপর অহল্যার স্বামীত্ব আরোপিত হয়ে গিয়েছে।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (weber) ৩.৩.৪.১৮; মহা (k) ১৪.৫৬.২৩-৩৪; ১৪.৫৮.৫৭; (হরি) ১৪.৭২.২৩-৩৪; ১৪.৭৬.২৭; ভাগবত পু. ৯.২১.৩৪]

□ ব্রহ্মপুরাণে গৌতমী গঙ্গা বা গোদাবরী নদীর উৎপত্তি বিষয়ে একটি কাহিনী পাওয়া যাচ্ছে যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, মহর্ষি গৌতম পুরাকালে তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করে তাঁর জটাস্থিত গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করেন। গৌতমের তপস্যার ফলে উৎপন্ন নদীর নাম গৌতমী গঙ্গা, যে নদীটি পরবর্তী সময়ে গোদাবরী নামে খ্যাত হয়েছে। *[দ্র. গঙ্গা, গোদাবরী]*

গৌতম২ পুরাণে মহর্ষি গৌতমকে ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

[মৎস্য পু. ১৭১.২৭; ১৯২.৯০]

গৌতম৩ বিষ্ণুপুরাণের বিবরণ অনুযায়ী, বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের মধ্যে মহর্ষি গৌতম একজন।

[বিষ্ণু পু. ৩.১.৩২; ভাগবত পু. ৮.১৩.৫; মৎস্য পু. ৯.২৭]

গৌতম৪ বায়ুপুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ চতুর্দশ দ্বাপরে ভগবান শিব অঙ্গিরার বংশে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন এবং গৌতম নামে খ্যাত হবেন। *[বায়ু পু. ২৩.১৬৩]*

গৌতম৫ পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, মহর্ষি গৌতম মাঘ মাসে সূর্যের রথে অবস্থান করেন।

[ভাগবত পু. ১২.১১.৩৯; বিষ্ণু পু. ২.১০.১১; বায়ু পু. ৫২.১২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৩.১২]

গৌতম৬ মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত কৃতঘ্ন উপাখ্যানে জনৈক গৌতমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন—মিত্রদ্রোহী বা কৃতঘ্ন কাদের বলে? আমি কৃতঘ্নদের স্বভাব সম্পর্কে যথাযথভাবে জানতে চাই, আপনি বলুন—

বিস্তরেণাথ সম্বন্ধং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যঃ প্রোক্তস্তদ্বদস্ব মে॥

ভীষ্ম বললেন—শোনো তাহলে। মধ্যদেশে গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর শিক্ষা দীক্ষা, বৈদিক সংস্কার কিছুই ছিল না। জীবন ধারণের জন্য এদেশে ওদেশে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তিনি উত্তরদিকে ম্লেচ্ছ অধ্যুষিত এক দেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে একটি বেশ সমৃদ্ধ গ্রাম দেখে ভিক্ষার আশায় সেই গ্রামে প্রবেশ করলেন গৌতম। সেই গ্রাম আসলে দস্যুদের গ্রাম। একজন অত্যন্ত ধনবান দস্যু সেখানে বসবাস করতেন। দস্যু হলেও তিনি ব্রাহ্মণদের সমাদর করতেন, দান-ধর্মেও তাঁর মন ছিল যথেষ্টই। ব্রাহ্মণ গৌতম সেই দস্যুর কাছে একজন মানুষের এক বছরের মতো অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সংস্থান চাইলেন। দস্যু সানন্দে গৌতমকে নতুন ঘর, বস্ত্র, শস্য ইত্যাদি তো দিলেনই, সঙ্গে সেবা-যত্নের জন্য একটি যুবতী স্ত্রীও দান করলেন। ব্রাহ্মণ সেই

যুবতী রমণীর সঙ্গে সুখে ঘরকন্না করতে লাগলেন। এদিকে দস্যুদের গ্রামে থাকতে থাকতে ব্রাহ্মণের স্বভাবও কতকটা দস্যুর মতোই দাঁড়াল। তিনি ধনুক-বাণ দিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে শিখলেন। তারপর শরসন্ধান করে পশুশিকার করার নেশা তাঁকে পেয়ে বসল। প্রতিদিন বনে বনে ঘুরে নানা পশুপক্ষী বধ করে তিনি নিয়ে আসতেন এবং মহাসুখে সেই মাংস ভোজন করতেন। এইভাবে দস্যুগ্রামে বাস করতে করতে বহুকাল কেটে গেল। গৌতম বেশ সুখেই আছেন। এমন সময় একদিন জটা-কৌপীন-মৃগচর্মধারী, পরমজ্ঞানী এক বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ অন্যদেশ থেকে সেই দেশে, সেই গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। এই ব্রাহ্মণ গৌতমের পূর্ব পরিচিত, এককালের প্রিয় সখাও বটে। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ, শূদ্র-দস্যুদের ঘরে তিনি ভোজন বা আশ্রয় গ্রহণে সম্মত ছিলেন না। ফলে আশ্রয়ের জন্য ব্রাহ্মণের ঘর খুঁজতে খুঁজতে তিনি একসময় গৌতমের ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণ এসে দেখলেন—গৌতম শিকার করে ফিরছেন, কাঁধে কতকগুলি মরা হাঁস আর ধনুক-বাণ হাতে। মরা পাখির রক্তে গৌতমের শরীর লাল হয়ে গেছে। আগন্তুক ব্রাহ্মণ বুঝলেন—অনেকদিন ধরে এই দস্যুদের গ্রামে বাস করার ফলে গৌতমের ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, তিনি একেবারেই দস্যুতে পরিণত হয়েছেন। গৌতমের অবস্থা দেখে ব্রাহ্মণ বড়ো দুঃখ পেলেন। তিনি গৌতমকে বললেন—তুমি কীসের মোহে এমন দস্যুর মতো জীবন যাপন করছ? তুমি যে বংশের জাতক, সেই ব্রাহ্মণকুল নিজেদের পাণ্ডিত্য আর চারিত্রিক গুণের কারণেই বিখ্যাত ছিল। তোমার উচিত এমন কুলাঙ্গারের মতো জীবন ত্যাগ করে নিজেদের পূর্বপুরুষদের মান-সম্মান রক্ষা করা এবং প্রায়শ্চিত্ত করে আবার ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি অবলম্বন করা। ব্রাহ্মণ গৌতমকে দস্যুদের গ্রামের বাড়িঘর ত্যাগ করার পরামর্শও দিলেন। আগন্তুক ব্রাহ্মণের উপদেশ শুনে গৌতমের মনে সাময়িকভাবে একটা আত্মগ্লানির সঞ্চার হল। তিনি ব্রাহ্মণের উপদেশ শিরোধার্য করে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করবেন বলেই স্থির করলেন।

আগন্তুক ব্রাহ্মণ সেই রাত্রে গৌতমের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন ঠিকই, কিন্তু গৌতমের জীবনযাপনের ধরন দেখে তিনি এতটাই বিরক্ত হয়েছিলেন যে, গৌতমের বাড়িতে অন্ন জল গ্রহণ করতে তাঁর প্রবৃত্তি হল না। পরদিন সকালে উঠেই সেই ব্রাহ্মণ দস্যুদের সেই গ্রাম ত্যাগ করে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পরে গৌতমও নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সমুদ্র অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে সঙ্গী পেলেন একদল বণিককে। তাঁদের সঙ্গে পথ চলতে চলতে গৌতম অবশেষে নানা ফুল-ফল-গাছপালায় পূর্ণ এক মনোরম বনে এসে উপস্থিত হলেন। সেই বনভূমিটির শোভা নন্দন কাননের সমতুল্য, সেই বনে যক্ষ আর কিন্নরদের বাস, নানা মূল্যবান বৃক্ষ-পত্র-পুষ্প ফলে সেই বনভূমিটি সুসজ্জিত। সেই বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে গৌতম এসে পৌঁছালেন এক বটবৃক্ষের কাছে। গৌতম যখন সেই বট গাছের তলায় এসে দাঁড়ালেন, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এমন সময় গৌতম দেখলেন বিশাল এক বক এসে সেই বটগাছের ডালে বসল। ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর গৌতমের মনে তাঁর দস্যুপল্লীর প্রবৃত্তি জেগে উঠল। তিনি মনে মনে বকটিকে হত্যা করে মাংস খাবার কথা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু সেই বক কোনো সাধারণ বক ছিলেন না। তিনি সমগ্র বকপক্ষীকুলের রাজা, প্রজাপতি কশ্যপের পুত্র, লোকপিতামহ ব্রহ্মার তিনি প্রিয় সখা। যে বটগাছের নীচে গৌতম এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সেটি তাঁর আবাসস্থল। এই বকের নাম রাজধর্মা। রাজধর্মা গৌতমকে দেখে তাঁকে সমাদর করে স্বাগত জানালেন, বসার জন্য সুন্দর আসন, আহারের জন্য সুস্বাদু মৎস্যের ব্যবস্থা করলেন। গৌতমের আহার শেষ হলে গৌতম বটবৃক্ষের ছায়াতেই শয়ন করলেন। সে সময় রাজধর্মা গৌতমের শ্রান্তি দূর করার জন্য নিজের ডানা দুটি দিয়ে গৌতমকে বাতাস করতে লাগলেন। গৌতমের ক্লান্তি কিছুটা দূর হবার পর রাজধর্মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রাহ্মণ! আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন। কী প্রয়োজনেই বা এতদূর দেশে এসেছেন? দীর্ঘকাল ব্যাধ-দস্যুদের মধ্যে বাস করেছেন গৌতম, বিদ্যাবত্তাও তাঁর তেমন ছিল না। ফলে পরিচয় হিসেবে আমি গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ—এর থেকে বেশি কিছু তিনি বলতে পারলেন না। শুধু বললেন—আমি দরিদ্র। তাই ধনলাভের আশায় সমুদ্রের পথে যাত্রা

করেছি। গৌতমের কথা শুনে রাজধর্মা বললেন —ব্রাহ্মণ! আপনি চিন্তা করবেন না। এখন আপনি বিশ্রাম করুন, আপনি যাতে প্রচুর ধন লাভ করতে পারেন, সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। রাজধর্মার কথায় আশ্বস্ত হয়ে গৌতম শান্তিতে নিদ্রা গেলেন।

পরদিন সকালে রাজধর্মা গৌতমকে বললেন —এই বন থেকে তিন যোজন দূরে রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের রাজধানী। রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ আমার বন্ধু। আপনি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আমার কথা তাঁকে জানাবেন। আমার নাম শুনলে আমার বন্ধু বিরূপাক্ষ আপনাকে প্রচুর ধনসম্পদ দান করবেন— এতে কোনো সন্দেহ নেই। রাজধর্মার কথায় গৌতম বিরূপাক্ষের রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। পথে খাবার জন্য রাজধর্মা গৌতমকে এনে দিলেন বনের সুমিষ্ট ফল। তাই খেতে খেতে পথ চলতে লাগলেন গৌতম। তারপর তিনযোজন পথ অতিক্রম করে গৌতম পৌঁছালেন বিরূপাক্ষের রাজধানী মেরুব্রজ নগরীতে। বিরূপাক্ষ যখন জানতে পারলেন যে রাজধর্মা গৌতমকে পাঠিয়েছেন, তখন গৌতম তেমন বিদ্বান ব্রাহ্মণ নয় বুঝেও তাঁর যথেষ্ট সমাদর করলেন এবং তাঁকে প্রচুর ধনসম্পদ দানও করলেন। ধনসম্পদের সেই বৃহৎ ভার বহন করে গৌতম আবারও এসে রাজধর্মার আবাস সেই বিশাল বটবৃক্ষের ছায়ায় এসে পৌঁছালেন। রাজধর্মা গৌতমকে দেখে আগের দিনের মতোই আবারও তাঁর আহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এদিকে গৌতমের মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি জন্মাল। গৌতম ভাবতে লাগলেন—এই বিপুল ধনসম্ভার নিয়ে এখনও এতটা পথ আমাকে যেতে হবে। কিন্তু পথে খাবার মতো উপযুক্ত খাদ্য আমার কাছে কিছু নেই। সামনেই এই রাজধর্মা বক বসে আছে, এ যেমন আকৃতিতে বিশাল, এর শরীরে মাংসও তেমনই প্রচুর। একে বধ করে যদি রন্ধন করে সঙ্গে নিই, তাহলে পথে খাদ্যের কোনো চিন্তা থাকবে না। এই সব ভাবতে ভাবতে গৌতম শেষ পর্যন্ত রাজধর্মাকে হত্যা করাই স্থির করলেন। তারপর সুযোগ বুঝে বিশ্বস্ত ঘুমন্ত রাজধর্মাকে বধ করলেন কৃতঘ্ন গৌতম। কিন্তু তাঁর মনে কোনো পাপ বোধ সঞ্চারিত হল না। গৌতম রাজধর্মা বকের পালক চামড়া ছাড়িয়ে আগুনে তার মাংস ভালোভাবে রান্না করলেন। তারপর সেই রান্না করা মাংস আর ধনসম্পদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে গৌতম বাড়ির দিকে চললেন।

এদিকে পরদিন সকালে রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ যখন দেখলেন যে, অন্যান্য দিনের মতো সেদিন রাজধর্মা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেননি— তখন তাঁর মনে দুশ্চিন্তা দেখা দিল। নিকৃষ্ট শ্রেণীর ব্রাহ্মণ গৌতমকে নিয়ে বিরূপাক্ষের মনে এমনিই অসন্তোষ ছিল। এখন রাজধর্মার অনুপস্থিতি দেখে তাঁর সন্দেহ হল, নিশ্চয় সেই কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণ মাংসের লোভে রাজধর্মাকে বধ করে থাকবে। বিরূপাক্ষ নিজের সন্দেহের কথা পুত্রকে জানালেন। তারপর বিরূপাক্ষের নির্দেশে তাঁর পুত্র রাক্ষস সৈন্যদল নিয়ে রাজধর্মার আবাসস্থান সেই বটবৃক্ষের কাছে এসে পৌঁছালেন। সেখানে পৌঁছে মৃত রাজধর্মার পালক, হাড় প্রভৃতি দেখে তাঁরা বুঝলেন, বিরূপাক্ষের সন্দেহই ঠিক। তখন তাঁরা দিকে দিকে কৃতঘ্ন গৌতমের সন্ধান করতে লাগলেন। একসময় তাঁকে খুঁজেও পেয়ে গেলেন তাঁরা। গৌতমের সঙ্গে পুঁটুলিতে রাজধর্মার মাংসও পাওয়া গেল। রাজধর্মার দেহাবশেষ এবং গৌতমকে নিয়ে রাক্ষসরা মেরুব্রজ নগরীতে বিরূপাক্ষের সভায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। বিরূপাক্ষ রাজধর্মার মৃত্যু সংবাদ শুনে শোকে কাতর হলেন, এদিকে গৌতমের ওপর তাঁর ক্রোধও হল প্রচণ্ড। তিনি পুত্রকে আদেশ দিলেন—এই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে বধ করো এবং এর মাংস রাক্ষসদের খেতে দাও। বিরূপাক্ষের আদেশে গৌতমকে বধ করা হল ঠিকই, কিন্তু এমন জঘন্য কৃতঘ্ন ব্যক্তির মাংস খেতে রাক্ষসরা কিছুতেই রাজি হল না। এদিকে বিরূপাক্ষ রাজকীয় মর্যাদায় রাজধর্মার অন্ত্যেষ্টির আয়োজন করলেন। এই সময় স্বর্গ থেকে গোমাতা সুরভী রাজধর্মার চিতার কাছে এসে দুগ্ধমিশ্রিত ফেন উদ্‌গার করলেন। সেই অমৃতের স্পর্শে রাজধর্মা পুনর্জীবন লাভ করলেন। জীবনলাভ করে রাজধর্মা কিন্তু গৌতমের পাপ বা কৃতঘ্নতার কথা স্মরণও করলেন না। তাঁর বধের সংবাদ পেয়ে আনন্দিতও হলেন না। বরং দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশে জানালেন বিনীত অনুরোধ— দেবরাজ! আপনি যদি সত্যিই আমার ওপর অনুগ্রহ করতে চান, তাহলে সেই গৌতমকে আবার জীবন দান করুন।

গৌতম ইন্দ্রের কৃপায় পুনর্জীবন লাভ করলেন

ঠিকই, তবে শান্তিপর্বের অন্তর্গত এই কৃতঘ্ন-উপাখ্যানের শেষে গৌতমের চারিত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তনের খবর আমরা পাই না, বরং দেখা যাচ্ছে যে, গৌতম সেই ধনসম্পদ নিয়ে নিজের দস্যুপল্লীর বাসস্থানে সেই শূদ্রা স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করতে লাগলেন। দস্যুপল্লীর অন্যান্য লোকজনের মতোই শিকার করে এবং অন্যান্য হীনবৃত্তি অবলম্বন করেই তাঁর জীবন কাটতে লাগল আর শূদ্রার গর্ভজাত তাঁর সন্তানরাও তেমনই হীন সংস্কার লাভ করল। বস্তুত শান্তিপর্বের এই উপাখ্যান সদ্‌বংশজাত অথচ বিদ্যা-বুদ্ধি বা ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারহীন এক ব্রাহ্মণের চরম অধঃপতনের কাহিনী।

[মহা (k) ১২.১৬৯-১৭৩ অধ্যায়;
(হরি) ১২.১৬৩-১৬৭ অধ্যায়]

গৌতমী শারদ্বৎবংশীয় সত্যধৃতির ঔরসজাত কন্যা হলেন কৃপী। কৃপী দ্রোণের পত্নী এবং অশ্বত্থামার মাতা। এই কৃপীর অপর নাম গৌতমী। শারদ্বৎবংশীয়রা ছিলেন গৌতমগোত্রীয়। তাই হয়তো কৃপীকে বেশ কিছু জায়গায় গৌতমী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[দ্র. কৃপী]*

[বায়ু পু. ৯৯.২০৪; ভাগবত পু. ১.৭.৩৩, ৪৫-৪৭]

গৌতমীপুত্র অন্ধ্রবংশীয় একজন রাজা, যিনি একুশ বছর রাজ্য ভোগ করেন। পুরাণে এঁকে গৌতমীপুত্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে অন্ধ্রবংশীয় এই রাজা হয়তো ইতিহাসখ্যাত সাতবাহনবংশীয় রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী। *[দ্র. সাতকর্ণী]*

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৬৭; মৎস্য পু. ২৭৩.১২; বায়ু পু. ৯৯.৩৫৫]

গৌতমেশ্বরতীর্থ১ নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। মহর্ষি গৌতম এই তীর্থে তপস্যা করে ভগবান শিবকে তুষ্ট করেছিলেন। তাই ভগবান শিব এখানে গৌতমেশ্বর নামে পূজিত হন। যে ব্যক্তি উপবাস করে এই তীর্থে স্নান করে, সে মৃত্যুর পর ব্রহ্মালোকে গমন করে বলে পুরাণে উল্লেখ আছে।

মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, এই তীর্থে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করলে পুণ্যফল লাভ হয়।

[মৎস্য পু. ২২.৬৮; ১৯৩.৬০; কূর্ম পু. ২.৪০.৬-৭]

□ পণ্ডিতরা মনে করেন বর্তমান গুজরাট রাজ্যে নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত তিলকওয়াড়া (Tilakvada) গৌতমেশ্বর নামে স্থানটিই প্রাচীন গৌতমেশ্বর তীর্থ। এখানে মহাদেব পূজিত হন।

[Baidyanath Saraswati; The Spectrum of the Sacred; New Delhi; Concept Publishing Company, 1984, p. 39]

□ বর্তমান গুজরাটের ভাবনগর জেলায় সিহোর নামে একটি ছোটো শহরে গৌতমেশ্বর শিবের মন্দির এখনও প্রতিষ্ঠিত। স্থানটি নর্মদা তীর থেকেও খুব দূরে নয় বলে এটিকে পুরাণে উল্লিখিত গৌতমেশ্বর তীর্থ বলে ভাবনা করা যেতে পারে।

[Gazetteers; Bhavnagar District, p. 612]

গৌতমেশ্বরতীর্থ২ বারাণসী ক্ষেত্রেও গৌতমেশ্বর নামে এক পবিত্র তীর্থ আছে বলে জানা যায়।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থ বিবেচন খণ্ড) পৃ. ১১৫]

গৌপায়ন বশিষ্ঠবংশীয় বংশপ্রবর্তক ঋষিদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ২০০.৩]*

গৌর১ মহর্ষি বেদব্যাসের পুত্র শুকদেবের ঔরসে পীবরীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন। মহর্ষি পরাশরের প্রপৌত্র গৌরের বংশধররা গৌর-পরাশর গণ নামে খ্যাত ছিলেন।

[দ্র. গৌর পরাশর]

[বায়ু পু. ৭০.৮৫.৮৭; ৭৩.৩০;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৮.৯৩; ২.১০.৮১;
মৎস্য পু. ১৫.১০]

গৌর২ পঞ্চম মন্বন্তরে যখন রৈবত মনু মন্বন্তরাধিপতি ছিলেন, সেই সময় দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, বৈকুণ্ঠ তার মধ্যে একটি গণ। এই বৈকুণ্ঠ গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে গৌর একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৫৭]

গৌর৩ মহাভারতের ভীষ্মপর্বে সঞ্জয় সমুদ্রবেষ্টিত মধ্যমদ্বীপে গৌর নামে একটি পৌরাণিক পর্বতের উল্লেখ করেছেন।

[মহা (k) ৬.১২.৪; (হরি) ৬.১২.৪]

গৌর৪ কৈলাস পর্বতের উত্তরে অবস্থিত একটি গিরিশৃঙ্গ। এই শৃঙ্গটিতে পীতবর্ণের ধাতুর আধিক্য থাকায় এটিকে সোনার মতো উজ্জ্বল দেখায়। এই শৃঙ্গের পাদদেশে বিন্দুসর নামে এক সরোবর আছে। পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ভগীরথ এই সরোবরের তীরে গঙ্গা আনয়নের জন্য তপস্যা করেছিলেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.২৪-২৮;
বায়ু পু. ৪৭.২৩-২৫; মৎস্য পু. ১২১.২৪]

গৌর-পরাশর কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা পরাশর মুনির নামে কয়েকটি বংশধারা প্রচলিত ছিল। সেই বংশধারায় অনেকগুলি সন্তানকে নিয়ে এক-একটি বর্গ রচিত হয়েছিল। গৌর-পরাশর এইরকমই একটি বর্গের নাম। এই বর্গের অন্তর্গত পরাশরের সন্তানেরা হলেন— কাণ্ডশয়, বাহনপ, জৈহ্মপ, ভৌমতাপন, গোপালি প্রমুখ।

[মৎস্য পু. ২০১.৩৩]

গৌরগ্রীব অত্রিবংশীয় বংশপ্রবর্তক ঋষিদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৯৭.২]*

গৌরজিন অত্রিবংশীয় বংশপ্রবর্তক ঋষিদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৯৭.২]*

গৌরপৃষ্ঠ জনৈক প্রাচীন রাজর্ষি। যেসব প্রাচীন রাজা মৃত্যুর পর যমের সভায় বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন, রাজর্ষি গৌরপৃষ্ঠ তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ২.৮.২১; (হরি) ২.৮.২১]*

গৌরবাহন যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক জনৈক রাজা। ইনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন বলে মহাভারতে উল্লেখ আছে।

[মহা (k) ২.৩৪.১২; (হরি) ২.৩৩.১২]

গৌরবীতি অঙ্গিরাবংশীয় বংশপ্রবর্তক ঋষিদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৯৬.৩১]*

গৌরমুখ১ একজন ঋষি। বরাহ পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, একসময় দুর্জয় নামে এক রাজা অনুচরদের নিয়ে মৃগয়ায় গিয়েছিলেন। বনের মধ্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর রাজা গৌরমুখ ঋষির সুন্দর আশ্রম দেখে সেই আশ্রমে প্রবেশ করলেন এবং ঋষিকে প্রণাম করলেন। গৌরমুখ রাজা ও তাঁর অনুচরদের আশ্রমেই বিশ্রাম করতে বললেন এবং তাঁদের আহারের ব্যবস্থা করতে গেলেন। এদিকে রাজা বসে বসে ভাবতে লাগলেন—এই তপোবনবাসী ঋষি কীভাবে এতগুলি লোকের খাবারের ব্যবস্থা করবেন। গৌরমুখও সেই চিন্তাই করতে লাগলেন—কীভাবে এঁদের সকলকে উপযুক্ত খাদ্য পরিবেশন করা যায়। এই চিন্তা করতে করতেই মহর্ষি গৌরমুখের অন্তরে ভগবান শ্রীহরি বিষ্ণু আবির্ভূত হলেন। গৌরমুখ ঋষি আনন্দিত হয়ে ভক্তিভরে নারায়ণের স্তব করলেন। আশ্রমের কাছে অবস্থিত গঙ্গার জলে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ভগবান বিষ্ণুর স্তব করেছিলেন। বিষ্ণু গৌরমুখের প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে সশরীরে দর্শন দিলেন এবং বর প্রার্থনা করতে বললেন। ভগবান নারায়ণের কথা শুনে গৌরমুখ চোখ খুলে চতুর্ভুজ নারায়ণকে নিজের সামনে দেখতে পেলেন। ভগবান বিষ্ণু গৌরমুখকে একটি মণি দিয়ে বললেন এই মণির কাছে ঋষি যা প্রার্থনা করবেন তাই পাবেন। নারায়ণের বরে গৌরমুখের আশ্রমে মণির প্রভাবে রাজার বিশ্রামের উপযোগী অট্টালিকা হল, প্রচুর খাদ্যদ্রব্য এসে উপস্থিত হল। গৌরমুখ মহানন্দে অতিথি সৎকার করলেন। এদিকে রাজা দুর্জয় বুঝলেন যে, মণিটির প্রভাবেই দরিদ্র ঋষির পক্ষে এমন রাজকীয় অতিথি সৎকার সম্ভব হয়েছে। তখন রাজা দুর্জয় মণিটিকে হরণ করার চেষ্টা করলেন। রাজা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ঋষিকে বন্দি করে মণি লাভ করার চেষ্টা করতে গেলেন। ঋষি গৌরমুখ তখন আশ্রমে ছিলেন না। কিন্তু মণি থেকে ভয়ংকর সেনা সৃষ্টি হয়ে রাজার সৈন্যদের আক্রমণ করল। ঋষি গৌরমুখ আশ্রমে ফিরে এসে সেই যুদ্ধ দেখতে পেলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, রাজা মণি হরণ করার চেষ্টা করাতেই এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। মহর্ষি গৌরমুখ তখন মনে মনে নারায়ণকে স্মরণ করলেন। ভগবান বিষ্ণু গৌরমুখের সামনে আবির্ভূত হলেন। তখন গৌরমুখ ভগবানকে রাজা দুর্জয়ের মণিহরণের অভিসন্ধির কথা বললেন। ভগবান বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্জয়ের উদ্দেশে সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করলেন। সুদর্শন চক্রের প্রভাবে নিমেষের মধ্যে দুর্জয় ও তাঁর সৈন্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যরা ভস্মীভূত হল। ঋষির আশ্রম আবার তার পবিত্র নির্মল শান্ত রূপ ফিরে পেল। তখন ভগবান বিষ্ণু গৌরমুখকে বললেন—নিমেষের মধ্যেই শত্রু নির্মূল হল বলে আজ থেকে এই স্থানের নাম হবে নৈমিষারণ্য—

উবাচ নিমিষেণেদং নিহতং দানবং কুলম্।
অরণ্যেঽস্মিংস্ততস্ত্বেবং নৈমিষারণ্য সংজ্ঞিতম্॥

ভগবান বিষ্ণুর কৃপাধন্য এই গৌরমুখ ঋষির আশ্রম এই ঘটনার পর থেকে নৈমিষারণ্য নামে বিখ্যাত হয়। *[বরাহ পু. ১০.৮০-৮২; ১১ অধ্যায়]*

গৌরমুখ২ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উল্লেখ আছে যে, নন্দগোপ যে ইন্দ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন গৌরমুখ।

[ব্রহ্মবৈবর্ত পু. (কৃষ্ণজন্ম) ২১.১১]

গৌরমুখ৩ মহর্ষি শমীকের একজন শিষ্য। অভিমন্যুর পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ মহর্ষি শমীকের গলায় একটি

মরা সাপ ঝুলিয়ে দিয়ে তাঁকে অপমান করেন। শমীকের পুত্র শৃঙ্গী পিতার অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে পরীক্ষিৎকে শাপ দিলেন—আজ থেকে সাত দিন পর তক্ষক নাগের দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হবে। দয়ালু মহর্ষি শমীক পুত্রের অভিশাপের কথা জানতে পেরে পরীক্ষিৎকে সাবধান করার জন্য তাঁর শিষ্য গৌরমুখকে পরীক্ষিতের সভায় পাঠিয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.৪২.১৩-১৭; (হরি) ১.৪৫.১৩-১৭]

গৌরশিরা১ জনৈক প্রাচীন ঋষি। যেসব ঋষি-মহর্ষি ইন্দ্রের সভায় বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন, গৌরশিরা তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ২.৭.১১; (হরি) ২.৭.১১]

গৌরশিরা২ শরশয্যায় শয়ান ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম বিষয়ে উপদেশ দেবার সময় প্রজাসাধারণের হিতকারী রাজধর্ম বা রাজনীতি শাস্ত্রের প্রণেতাদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। এই প্রসঙ্গেই রাজধর্মশাস্ত্রের অন্যতম প্রণেতা মহর্ষি গৌরশিরার নামও স্মরণ করেছেন ভীষ্ম। *[মহা (k) ১২.৫৮.৩; (হরি) ১২.৫৭.৩]*

গৌরাশ্ব জনৈক প্রাচীন রাজর্ষি। যেসব প্রাচীন রাজা মৃত্যুর পর যমের সভায় বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন, রাজর্ষি গৌরাশ্ব তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ২.৮.১৮; (হরি) ২.৮.১৮]*

গৌরিক যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতার অপর নাম গৌরিক। মাতা গৌরীর নামানুসারেই হয়তো মান্ধাতা গৌরিক নামে পরিচিত হয়েছেন।

[দ্র. মান্ধাতা]

[বায়ু পু. ৮৮.৬৬]

গৌরী১ *[দ্র. পার্বতী]*

গৌরী২ যুবনাশ্বের পত্নী ও মান্ধাতার মাতার নাম গৌরী। যুবনাশ্বের অভিশাপে গৌরী বাহুদা নামে একটি নদীতে পরিণত হন। গৌরীর পুত্র বলে মান্ধাতার অপর নাম গৌরিক।

[বায়ু পু. ৮৮.৬৫-৬৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.৬৭]

গৌরী৩ রন্তিনারের ঔরসে মনস্বিনীর (পাঠান্তরে সরস্বতী) গর্ভজাত কনিষ্ঠ সন্তান গৌরী। তাঁর দুই ভ্রাতা হলেন অমূর্তরয়া ও ত্রিবন।

[মৎস্য পু. ৪৯.৮; বায়ু পু. ৯৯.১৩০]

গৌরী৪ পূর্ণমাসের পুত্র বিরজের পত্নীর নাম গৌরী। বিরজের ঔরসে গৌরীর গর্ভজাত পুত্রের নাম সুধামা।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১১.১৪; বায়ু পু. ২৮.১২]

গৌরী৫ ক্রৌঞ্চদ্বীপের অন্তর্গত একটি নদী হল গৌরী। *[মৎস্য পু. ১২২.৮৮; বায়ু পু. ৪৯.৬৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৯.৭৫; বিষ্ণু পু. ২.৪.৫৫]*

গৌরীকল্প মৎস্য পুরাণে কল্পকালের বিবরণ দেবার সময় যে কল্পগুলির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে অষ্টাবিংশতিতম কল্পের নাম গৌরীকল্প। *[মৎস্য পু. ২৯০.১০]*

গৌরীতপোবন তীর্থ প্রভাসক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। কথিত আছে, একসময় গৌরবর্ণা শিব-পত্নী দেবী পার্বতী কোনো কারণে কৃষ্ণবর্ণা হয়ে যান। পার্বতী কৃষ্ণবর্ণা হলেও তাঁকে অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু মহাদেব কতক রসিকতার ছলেই পার্বতীকে সম্বোধন করলেন 'কালী' বলে। পার্বতী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং তৎক্ষণাৎ কৈলাস ত্যাগ করে চলে গেলেন। স্কন্দ পুরাণের প্রভাসখণ্ডে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী, কৈলাস ত্যাগ করে পার্বতী সোজা চলে এলেন প্রভাসক্ষেত্রে। সেখানে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে নিজের গৌরবর্ণ পুনরায় ফিরে আবার জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। এই তপস্যার ফলে নিজের গৌরবর্ণ পুনরায় ফিরে পেলেন পার্বতী। পার্বতীর তপস্যাক্ষেত্র এই স্থানটি পরবর্তীকালে গৌরী তপোবন নামে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র রূপে প্রসিদ্ধ হয়। দেবী পার্বতীর প্রতিষ্ঠা করা শিবলিঙ্গটি বিখ্যাত হয় গৌরীশ্বর শিবলিঙ্গ নামে।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র) ৬৮.১-২৮; ৬৯.১-৭; ১১০.১]

গৌরীতীর্থ একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করলে মহাপুণ্যফল লাভ হয়। *[মৎস্য পু. ২২.৩১]*

গৌরীশিখর একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করলে মহাপুণ্যফল লাভ হয়। *[মৎস্য পু. ২২.৭৬]*

গ্রসন তারকাসুরের সেনাবাহিনীর একজন সেনাপ্রধান। দেব-দানব যুদ্ধে তাকে দানব সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করতে দেখা যায়।

[মৎস্য পু. ১৪৮.৩৮]

☐ যমের সঙ্গে গ্রসনের যুদ্ধের এক দীর্ঘ বিবরণ মৎস্য পুরাণে পাওয়া যায়। মৎস্য পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী যুদ্ধে গ্রসন যমকে পরাজিত করেন কিন্তু বিষ্ণুর সাথে দ্বন্দ্বে বিষ্ণু সুদর্শন চক্রের দ্বারা গ্রসনকে বধ করেন। *[মৎস্য পু. ১৫০.১-৪৩; ১৫১.২৬-৩৬]*

গ্রহেষু ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে একাদশ মনু ব্রহ্মসাবর্ণির পুত্রদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৮১]

গ্রাম ঋগ্‌বেদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, বেদের যুগের সমাজ বলতে বোঝাত কতকগুলি পরিবারকে। সমাজের এই পারিবারিক ভিত্তি থেকে আমরা তিনটি শব্দ পাই, যেগুলির নাম 'জন', 'বিশ্' এবং 'জন্মন্'। সৌভাগ্যের বিষয়, একটি ঋক্‌মন্ত্রের মধ্যেই তিনটি শব্দ অনুক্রমে লিখিত হওয়ায় পণ্ডিতেরা ধারণা করেছেন যে, বৈদিক যুগের সামাজিক গঠনের প্রথম ইতিহাস এই মন্ত্রের মধ্যেই পাওয়া যাবে। ঋক্‌মন্ত্রটিতে বলা আছে—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণস্পতিকে ঘৃতাহুতি দেয় সে তার পুত্র এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেই শুধু নয়, সে তার 'জন', 'বিশ্' এবং 'জন্মের' সঙ্গে অন্ন এবং ধন লাভ করে—

স ইজ্জনেন স বিশা স জন্মনা স
পুত্রৈর্বাজং ভরতে ধনা নৃভিঃ।

এই ঋকে পুত্রপরিবার, আত্মীয়স্বজনের কথা (পুত্রৈঃ, নৃভিঃ) আলাদাভাবে বলা থাকায় পণ্ডিতেরা বলেছেন—'জন্মন্' বলতে বোঝায় একটা ছোট্ট গ্রাম, যে গ্রামের মানুষেরা পিতৃপিতামহের পরম্পরায় ভিন্ন কিংবা একান্নবর্তী হয়ে একত্র বসতি করেছে। 'জন্ম'সূত্রে বাঁধা এইরকম কতকগুলি গ্রাম সাধারণ আত্মীয়তার সূত্র ধরে জন্ম দিয়েছে 'বিশ্'-এর। সংস্কৃতে বিশ্ একটি পুংলিঙ্গ শব্দ—যার একবচন 'বিশ্', দ্বিবচন 'বিশৌ', বহুবচন 'বিশঃ'। বিশ্ ধাতুর অর্থ প্রবেশ করা, বসতি স্থাপন করা—to enter, to settle। কাজেই, বিশ্ বলতে বুঝব settlement। এক-একটি বিশ্-এর প্রধান পুরুষকে বলা হত বিশ্‌পতি।

আগে দেখেছি কয়েকটি 'জন্মন্'-এর সমষ্টিতে একটি বিশ্ তৈরি হয়, তেমনই কতকগুলি 'বিশ্' একত্র করে একটি 'জন'-এর সৃষ্টি হয়েছে। এই 'জন' হয়তো একটি tribe এবং জনপতি হয়তো একজন রাজা। বৈদিক 'জন্মন্', 'বিশ্' এবং 'জন'-এর সঙ্গে অদ্ভুত একটা মিল পাওয়া যাবে প্রাচীন রোমের জনগোষ্ঠীর বিভাগে। পণ্ডিতেরা লিখেছেন—There the smallest unit, gens, consisted of small number of families descended from a common ancestor; a number of these gens constituted a curia and ten curiae made a tribe. Vedic 'jana' probably corresponded with the tribe, 'vis' with the curia and 'janman' with the gen.

বৈদিক সমাজে একটি ছোটো পরিবার বা গৃহের মধ্যে গৃহপতির যে মূল্য ছিল, ঠিক সেই মূল্য ছিল একজন গ্রামপতির। জিমার বৈদিক গ্রামকে একটি পরিবার এবং একটি জনগোষ্ঠী বা ট্রাইবের মাঝামাঝি রাখতে চেয়েছেন। তবে গ্রাম ব্যাপারটাকে 'বিশ্'-এর একটি ছোটো সংস্করণ ভাবাই ভালো। আর্যায়ণের প্রথম কল্পে একটি গ্রামের সুস্থিতি তেমন ছিল না, জমি দখলের জন্য অরণ্যে হাত পড়ত। তখন একটি সম্পূর্ণ গ্রামকে তার অধিপতির সঙ্গে চলতেও দেখা গেছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে শর্যাত মানব তাঁর গ্রামটি সঙ্গে নিয়েই ঘুরছিলেন। এখানে গ্রাম অবশ্যই চলমান মনুষ্যগোষ্ঠীর পরিচায়ক। কিন্তু, আর্যেরা একটু থিতু হতেই গ্রামও তখন থিতু হয়েছে।

গ্রামের মধ্যে যে ছোটো ছোটো গৃহস্থ ঘর, তাকেই বলা হত কুল। গ্রামের শাসনের ক্ষেত্রে গৃহপতি বা কুলপতির যে একটা ভূমিকা ছিল তা ঋগ্‌বেদের 'কুলপা' এবং 'ব্রজপতি' শব্দদুটি থেকেই বোঝা যাবে। এখানে বলা হয়েছে কুলপতিরা ব্রজপতির চার দিকে ঘোরেন—

কুলপা ন ব্রজপতিং চরন্তম্।

[ঋগ্‌বেদ ১০.১৭৯.২-৩]

কুলপতিরা ব্রজপতির অধীনেই যুদ্ধবিগ্রহ চালাতেন। ব্রজপতিকে গ্রামণী বলেই চিহ্নিত করেছেন পণ্ডিতেরা।

[ঋগ্‌বেদ ২.২৬.৩; শতপথ ব্রাহ্মণ
A.S. Altekar, State and Govt. in Ancient India, Banaras: Motilal Banarsidass, 1949, p. 18]

□ ঋগ্‌বেদের মধ্যে গ্রামের যে চেহারা ফুটে ওঠে, তাতে বোঝা যায় যে গ্রাম ছিল অনেক অনেকগুলি গৃহস্থ পরিবার—জ্ঞাতিগুষ্টি মিলে যাদের এক একটি কুল ছিল, সেই কুলগুলির সমবায় হল গ্রাম—an aggregate of several families not necessarily forming a clan, but only part of a clan (vis), as is often the case at the present day.

আর্য জনজাতির মানুষেরা, যারা প্রধানত যাযাবর-বৃত্তিতে জীবন যাপন করতেন, তাঁরাই সপ্তসিন্ধুর দেশে এসে যখন স্থিত হলেন, তখনই কতগুলি পরিবারভিত্তিক কুলের মাধ্যমে গ্রাম তৈরি করে কৃষিকর্মের ভিত্তিতে এক একটি জায়গায় স্থিত হন। ঋগ্‌বেদের মধ্যে গ্রামের যে চিত্র পাই, তাতে গ্রামগুলি তখনই বেশ সম্পন্ন হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। তাঁদের যাযাবরবৃত্তির প্রধান সহায় অশ্ব এবং রথের সঙ্গে এখন গোরু এবং গ্রামও এখন আর্যদের প্রধান দেবতা ইন্দ্রের সুরক্ষায় থাকে—

যস্যাশ্বাসঃ প্রদিধি যস্য গাবো
যস্য গ্রামা যস্য বিশ্বে রথাসঃ।

কুলগৃহগুলির মধ্যে প্রায় একত্রে একসময়ে যে অগ্নিহোত্র, অগ্নিসমিন্ধন হত, তার জন্য অগ্নি গ্রামের রক্ষাকর্তা হিসেবে পরিচিত হয়েছেন—

অসি গ্রামেষ্ববিতা পুরোহিতো'সি যজ্ঞেষু মানুষঃ।

আশীর্বাদ চাওয়া হয়েছে কপর্দী রুদ্রের কাছে যাতে তিনি পশু এবং মানুষগুলিকে সুস্থ রাখেন এবং তাঁদের গ্রাম যেন পুষ্ট হয় রোগশূন্য হয়—

যথা শমসদ্ দ্বিপদে চতুষ্পদে
বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ননাতুরম্।

ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি রচনার সময়ে গ্রামগুলির উন্নতি এমন একটা পর্যায়ে তো চলেই এসেছিল, যখন একটি গ্রামের সীমা নির্দিষ্ট হয়েছে এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাবার রাস্তাও তৈরি হয়ে গেছে। কোনো কোনো গ্রাম সেখানে কাছে এবং কোনো কোনো গ্রাম সেখানে দূরে সেটাও ওই শতপথ ব্রাহ্মণের উক্তি থেকে বোঝা যায়—

সমধ্বানঃ ক্রামেয়ুঃ সমন্তিকং
গ্রাময়োর্গ্রামান্তৌ স্যাতাম্ . . .
অধ্বানং ক্রামেয়ুর্বিদূরং
গ্রাময়োর্গ্রামান্তৌ স্যাতাম্ . . .।

শতপথ ব্রাহ্মণে যে 'সমন্তিক' কাছের গ্রাম আর দূর-গ্রামের পাশ দিয়ে রাস্তার খবর পাওয়া গেল, সেই গ্রামগুলির মধ্যে সুন্দর একটা সংযোগ-ব্যবস্থা ছিল সেটা ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি তথ্য থেকে পাওয়া যায়। বলা হয়েছে—কোনো একটি সুদীর্ঘ এবং প্রশস্ত পথ যেমন নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী দুই গ্রামেই যায়—হয় পাশ দিয়ে, নয়তো গ্রামের মধ্য দিয়েই যায় অর্থাৎ একই পথ দিয়ে নিকট এবং দূরের দুই গ্রামেই যায়, সেইভাবেই একই পথে আদিত্যের রশ্মি সামনে থাকা জাগতিক পুরুষ এবং দূরস্থিত আদিত্যলোকে গমন করে—

তদ্ যথা মহাপথ আতত উভৌ
গ্রামৌ গচ্ছতীমঞ্চামুঞ্চ
এবমেবৈতা আদিত্যস্য রশ্ময়
উভৌ লোকৌ গচ্ছন্তীমঞ্চামুঞ্চ . . .।

[Vedic Index, vol. 1, p. 245; ঋগ্‌বেদ ১০.২১২.৭; ১.৪৪.১০; ১.১১৪.১; শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১৩.২.৪.২; ছান্দোগ্য উপনিষদ ৮.৬.৩]

□ আর্যরা যখন ভ্রমণবৃত্তির মধ্যে ছিলেন, যখন কৃষি কর্মের মাধ্যমে স্থিতাবস্থা আসেনি সমাজে, তখন জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কুল মিলে যে সমান-পর্যায় মানুষের সমবায় তৈরি হত, সেই জনসমূহই গ্রাম বলে পরিচিত ছিল। বিশেষত সেই গ্রামের অন্তর্ভুক্ত কুলসমূহ তাদের নেতার অনুসরণ করত বলেই ঋগ্‌বেদে যখন ঋষি বিশ্বামিত্রের পরিচালনায় ভরতবংশীয় মানুষেরা শতদ্রু এবং বিপাশা নদী পার হবার চেষ্টা করছেন, তখন দেখা যাচ্ছে ভরতের সঙ্গে তাঁর গ্রামটাও আছে অর্থাৎ ভরতের জ্ঞাতিগুষ্টি অনু, দ্রুহ্যু এবং তুর্বসুরা সকলেই তাঁর সঙ্গে আছেন। ঋগ্‌বেদের এই ঘটনাটা সুদাস রাজার বিরুদ্ধে ভরত ইত্যাদি দশটি প্রধান রাজা বা প্রধান কুলের যুদ্ধ বলে পরিচিত। এই যুদ্ধে সুদাস জিতেছিলেন। কিন্তু আমাদের কাছে প্রণিধানযোগ্য ঘটনা এটাই যে, ভরতের সঙ্গে তাঁর গোটা গ্রামটিই আছে যাঁরা বিপক্ষ গোষ্ঠীর গোধন লাভের আশায় যুদ্ধে বেরিয়েছেন—

যদঙ্গ ত্বা ভরতাঃ সন্তরেয়ুর্গব্যন্ গ্রাম ইযিত— ইন্দ্রজূতঃ।

এই ঋক্‌মন্ত্রে 'ভরতাঃ' শব্দটি বহুবচনে গ্রামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সেটি একদিকে ভরতবংশীয় কুলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করছে—সায়নাচার্য অর্থ করেছেন—ভরতানাং সংঘঃ। অন্যদিকে গ্রাম শব্দটি একটি জনসমন্বিত ভৌগোলিক ভূমির নির্দেশ করে যেখানে ভরতবংশীয়দের কৌলিক অবস্থান তৈরি হয়েছিল। কিন্তু একটি যুদ্ধের সময় সেই গ্রামটিকেই ভরত সঙ্গে নিয়ে গেছেন। ঠিক এই ব্যাপারটাই প্রমাণ হয় ঋগ্‌বেদের সেই বিখ্যাত উক্তি থেকে, যেখানে 'কুলপা' অর্থাৎ এক-একটি কুলের শীর্ষতম ব্যক্তিত্ব ব্রজপতি বা গ্রামপতির সঙ্গে বিপক্ষীয় নেতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন—

কুলপা ন ব্রজপতিং চরন্তম্।

—এখানে ভরত সেই ব্রজপতি বা গ্রামপতি যিনি 'কুলপা'দের নিয়ে সুদাস রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন—The kulapa (lit. house protector'), or chief of the family, is mentioned in the Rigveda as inferior to and attendant on the 'Vrajapati' in war, the latter being perhaps the leader of the village contigent of the clan.

গ্রামের এইরকম একটা আক্রমণাত্মক ঘটনার প্রতিতুলনায় যখন শতপথ ব্রাহ্মণে শর্যাত মানবের সঙ্গে সঙ্গে একটা চলমান গ্রামের দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, তখন বোঝা যায় অনেকগুলি কুল নিয়ে যে গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই কুলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামপতি অন্য কোথাও নতুন একটি জায়গায় তিনি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন। বলা হয়েছে —শর্যাত মানব একটা গোটা গ্রাম সঙ্গে নিয়ে চলতে চলতে কাছাকাছি অন্য একটি স্থানে (Settlement) এসে নিজের গ্রামটিকে নিবেশ করলেন—

শর্যাতো হ বা ইদং মানবো গ্রামেণ চর্চার।
স তদেব প্রতিবিশো নিবিবিশে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এইখানে ভার্গববংশীয় চ্যবন মুনিকে চিনতে না পেরে শর্যাত মানবের ছেলেরা অপমান করে বসে। পরে শর্যাত মানব চ্যবন মুনির সঙ্গে তাঁর মেয়ে সুকন্যার বিয়ে দেন এবং মুনির কাছে প্রার্থনা করেন আমার 'গ্রাম'টি যেন এখানে সুস্থিত হয়ে শান্তিতে থাকে। তখন থেকে শর্যাত মানবের 'গ্রাম' সেখানে সুখশান্তিতে ছিল—

তস্য হ তত এব গ্রামঃ সংজজ্ঞে।

[ঋগ্‌বেদ ৩.৩৩.১১; ১০.১৭৯.২;
Vedic Index, vol. 1, p. 171;
শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ৪.১.৫.২-৭]

□ প্রাচীনদের অনেকগুলি পরিবার জ্ঞাতিগুষ্টি নিয়ে যেখানে একটা গ্রাম্য আবাসস্থল গড়ে উঠত, সেটা বন-অরণ্যের খানিক অংশ পরিষ্কার করেই করা হত, এটা খুব স্বাভাবিক। ঋগ্‌বেদের অসাধারণ কবিত্বময় অরণ্যানী-সূক্তে বিরাট ব্যাপ্ত অরণ্যানী দেখে বৈদিক ঋষি বলেন—হে অরণ্যানী! তুমি যেন দেখতে দেখতে কতদূর চলে যাও, তা স্থির করা যায় না। তুমি কেন গ্রামের কথা বল না, জানাও না কেন গ্রামে যাবার পথ? অরণ্যানী! তোমার একা থাকতে ভয় করে না—

অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ বা প্রেব নশ্যসি।
কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বা ভীরিব বিন্দতী॥

এই মন্ত্র থেকে বোঝা যায় যে, বহুবিস্তৃত বনের আগে পরে উপযুক্ত জায়গা বুঝেই গ্রামগুলির অবস্থান তৈরি করা হত এবং অরণ্যের চাইতে সেখানে বসত করার ভয় সেখানে অনেক কম। অরণ্যের মধ্যে একাকিত্বের যে ভীতি তৈরি হয়, গ্রামে তার সেই ভীতি থাকে না। অরণ্যের সঙ্গে গ্রামের পার্থক্য এইখানেই যে, এখানে মানুষের সঙ্গে তাদের পালিত পশুরাও থাকে এবং সে পশুগুলির চরিত্র বনের পশু থেকে আলাদা—

* পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে।
* তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ॥

অথর্ববেদে একটি গ্রামের মধ্যে যাঁদের বেঁচে থাকার জন্য প্রার্থনা জানানো হচ্ছে— সেখানে মানুষের উপকারী অজ-অবী ইত্যাদি পশুগুলির সঙ্গেই গোরু এবং অশ্বের নাম নেওয়া হচ্ছে পরিষ্কার করে—

* ত্রীয়ন্তামস্মিন্ গ্রামে গামশ্বং পুরুষং পশূন্।
* ইমং ভজ গ্রামে অশ্বেষু গোষু
নিষ্টং ভজ যো অমিত্রো অস্য।

[ঋগ্‌বেদ ১০.১৪৬.১; ১০.৯০.৮, ১০;
অথর্ববেদ (Roth & Whitney) ৮.৭.১১; ৪.২২.২]

□ যেখানে গ্রাম-নিবেশ ঘটেছে, সেখানে কৃষিক্ষেত্রগুলিই ছিল গ্রাম্য জীবনের অন্ন। কৃষির জন্য উর্বর জমির কথা বারবার এসেছে ঋগ্‌বেদের মধ্যে, এসেছে অনুর্বর উষর ক্ষেত্রের (আর্তনা) কথাও—

অপ্নস্বতীষু উর্বরাসু ইষ্টনিঃ আর্তনাসু ইষ্টনিঃ।

গ্রামের মানুষদের এই উর্বর ভূমিগুলির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল বলেই মনে হয়। কেননা একটি ঋকমন্ত্রে যেমন রজ্জু বা বিশেষ পরিমাণযুক্ত লাঠির সাহায্যে জমি মাপার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে—

ক্ষেত্রমিব বি মমুস্তেজনেন/
একং পাত্রমৃভবোজেহমানম্।

—তেমনই অপালা ইন্দ্রের কাছে তো এই প্রার্থনা করেছেন যে, তাঁর পিতার উষর ক্ষেত্রটিতে যেন শস্য হয়—

ইমানি ত্রীণি বিষ্টপা তানীন্দ্র বি রোহয়।
শিরস্ততস্যোর্বরামিদং ম উপোদরে॥
অসৌ চ যা না উর্বরাদিমাং তন্বং মম।

একটি মন্ত্রে দেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানানো হচ্ছে যেহেতু তিনি প্রার্থনাকারীকে উর্বর ক্ষেত্রযুক্ত ধন প্রধান করেছেন—

ক্ষেত্রাসাং দদথুরুর্বরাসাং ধনম্।

আবার এটাও একটা উর্বর কৃষিক্ষেত্রের অধিকার লাভ করার জন্য ব্যক্তিগত প্রার্থনা—হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের সহস্র প্রকার ধন এবং শস্যপূর্ণ কৃষিক্ষেত্রের অধিকার প্রদান করো—

তং ন সহস্রভরমুর্বরাসাং দদ্ধি।

এখানে উর্বর শব্দটার মানেই কিন্তু শস্যযুক্ত ভূমি—

সায়নাচার্য 'শস্যাঢ্যানাং ভূমীনাম্।

অন্যদিকে ইন্দ্রকে যখন অশ্বপতি, গোপতির সঙ্গে উর্বরাপতি বলেই সম্বোধন করা হয়, তখন বোঝা যায় যে, মানুষের মধ্যে একটি কৃষিক্ষেত্রের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা তৈরি হবার পরেই যখন তাঁকে উর্বরাপতি বা 'জমিদার' বলা হত, সেই মনুষ্য উপাধিটাই চেপে বসে দেবতার ওপর—সায়নের ভাষায়—

সর্বশস্যাঢ্যা ভূমিরূর্বরা, তস্য পতে হে ইন্দ্র।

—মানুষও এই শস্যাঢ্য ভূমির অধিকার লাভ করেই উর্বরাপতি হয়ে উঠত।

কৃষিজমি থেকে অন্য প্রকারের ভূমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার কথা অন্য অনেক জায়গা থেকেই প্রমাণ করা যাবে। কিন্তু এখানে শুধু প্রসঙ্গত বলা যায়—একটি গ্রামের মধ্যে পৃথক পৃথক কুলভুক্ত পরিবারগুলি ব্যক্তিগত মালিকানাতেই কৃষিক্ষেত্রে শস্য ফলিয়ে জীবন নির্বাহ করতেন এবং গ্রাম মানেই কতগুলি কুলের বাসস্থান সহ কর্ষণযোগ্য কৃষিভূমি।

[ঋগ্বেদ ১.১২৭.৬; ১.১১০.৫; ৮.৯১:৫-৬; ৪.৩৮.১; ৬.২০.১; ৮.২১.৩]

□ বেদ এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতেই গ্রামের যে পরিণতি ঘটেছে, তাতে রামায়ণের কালেই এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, গ্রামগুলির সঙ্গে নগরের যোগাযোগ যথেষ্ট এবং তারা রাজনৈতিক ভাবেও সচেতন। রামচন্দ্র যখন রাজ্যাভিষেকের মুহূর্তেই কৈকেয়ীর কারণে বনে নির্বাসিত হলেন, তখন রামচন্দ্র নগর ছাড়ানো মাত্রেই বহুতর গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছেন এবং এই গ্রামগুলির মধ্যে যে কৃষিক্ষেত্রগুলি আছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতে সীমান্ত-সংকেত আছে। সবচেয়ে স্পষ্ট কথা হল—প্রত্যেকটি কৃষিক্ষেত্র তখন এমনভাবেই কর্ষিত ছিল যাতে বোঝা যাচ্ছিল যে, সেগুলি বীজবপনের জন্য প্রস্তুত—

টীকায় লিখেছেন—বিকৃষ্ট-সীমান্তান্ বিকৃষ্টাঃ বপনায় কর্ষিতাঃ সীমান্তাঃ সীমাপর্যন্তভূময়ো যেষু তান্—

গ্রামান্ বিকৃষ্টসীমান্তন্ পুষ্পিতানি বনানি চ।
পশ্যন্নতিযযৌ শীঘ্রং শনৈরিব হয়োত্তমৈঃ॥

লক্ষণীয়, গ্রামের একটি সম্পন্ন কৃষি-ব্যবস্থার কথা উচ্চারণ করার পরেই গ্রামবাসী মানুষগুলির কথা এখানে বলা হচ্ছে, যারা রামচন্দ্রের বনবাসের জন্য রাজা দশরথকে ধিক্কার দিচ্ছিল কামবশতার জন্য এবং রামচন্দ্র সেই ধিক্কার-শব্দ শুনতে শুনতেই যাচ্ছিলেন—

শৃণ্বন্ বাচো মনুষ্যানাং গ্রামসংবাসবাসিনাম্।
রাজানং ধিগ্‌দশরথং কামস্য বশমাস্থিতম্॥

এই শ্লোকে 'গ্রাম-সংবাস' বলতে এমন সব গ্রাম বোঝানো হচ্ছে, যেখানে অনেকগুলি গৃহ আছে, আবার 'সংবাদ' অর্থাৎ কোনো কোনো গ্রামে অল্প সংখ্যক গৃহও আছে—রামায়ণ শিরোমণি টীকায় বলা হচ্ছে—

গ্রামাঃ বহুগৃহকাঃ, সংবাসাঃ অল্পগৃহকাঃ,
তদ্‌বাসিনাং বাচঃ শৃণ্বন্ . . .।

গোবিন্দরাজও কিন্তু রামায়ণ-শিরোমণি টীকার সূত্র ধরেই জানাচ্ছেন—এখানে গ্রাম মানেই বহু গৃহ-সমন্বিত মহাগ্রাম আর 'সংবাস' অর্থ—যেখানে অল্প কয়েক ঘর লোক থাকে—

গ্রামাঃ মহাগ্রামাঃ, সংবাসা অল্পগ্রামাঃ।

রামায়ণে মাঝে মাঝেই সম্পন্ন এবং ঋদ্ধ গ্রামের কথা শোনা যাচ্ছে এবং একটি গ্রামের সঙ্গে ঘোষপল্লীর কথাও শোনা যাচ্ছে। বিশেষত গ্রাম এবং ঘোষের সঙ্গে 'মহত্তরাঃ' জুড়ে থাকায় টীকাকারেরা বলছেন—তাঁরা গ্রাম এবং আভীরদের মধ্যে প্রধান পুরুষেরা—গ্রাম-ঘোষমহত্তরাঃ—রামায়ণ শিরোমণি টীকায়— গ্রাম এবং আভীররে অধীশ্বর মুখ্য পুরুষেরা। গোবিন্দরাজ্যের টীকায় 'প্রধানভূতাঃ'। এখানে বৈদিক 'কুলপা' স্মরণীয়। বিশেষত বৈদিক 'কুলপা'-র সঙ্গে পরবর্তী কালের গ্রামশাসনের মুখ্য পুরুষ 'গ্রামণী'র যদি কোনো মিল থাকে, তবে রামায়ণে সেইরকম সদর্থে গ্রামণী শব্দ প্রযুক্ত না হলেও গ্রামণী নামে এক গন্ধর্বের নাম পাওয়া যাচ্ছে—

গ্রামণীনাম গন্ধর্বো বিশ্বাবসুসমপ্রভঃ।

এতে অন্তত বোঝা যায় যে, গ্রামশাসকের তত্ত্বটা রামায়ণ জানত। কেননা একটি রাষ্ট্রের গঠনে নগর-রাজধানী যদি একটা অঙ্গ হয়ে থাকে, তাহলে সেই রাষ্ট্রের জনপদসন্নিবেশের মধ্যে গ্রামও যে সর্বপ্রধান একটা অঙ্গ, সেটা রামায়ণের বিভিন্ন জায়গায় গ্রামের নামোচ্চারণ থেকেই বোঝা যায়। খুব সাধারণভাবে রামচন্দ্র যখন পিতৃসত্যের প্রতিজ্ঞা শোনান, তখন যেভাবে হনুমানকে তিনি বলেছেন—আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—আমি কোনো গ্রামেও প্রবেশ করবো না, কোনো নগরেও প্রবেশ করবো না—

চতুর্দশ সমাঃ সৌম্য গ্রামং বা যদি বা পুরম্।

—তাতে বুঝতে পারি যে, রাষ্ট্রের মধ্যে গ্রাম এবং নগরের পৃথক দুটি অবস্থানই রাজনৈতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

বনের পথে যাবার সময় সীতা পরম আনন্দে পথ পার্শ্বের গ্রাম-নগরের সম্বন্ধে কৌতূহল দেখিয়েছেন, আর ভরত যখন রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনবার জন্য যাচ্ছেন, তখন কিন্তু বেশ কিছু গ্রামের নামও করেছেন হয়তো বা বিখ্যাত গ্রাম বলেই রামায়ণ মহাকাব্যের মধ্যে এই গ্রামগুলির নাম এসেছে। ভরত 'অংশধান' নামের একটি গ্রামে এসে ভাগীরথী পার হয়ে 'প্রাগ্‌বট' নগরে পৌঁছেছেন। সেখান থেকে আবার নদী পেরিয়ে ধর্মবর্ধন গ্রাম, তারপর জম্বুপ্রস্থ গ্রাম পেরিয়ে বরূথ নামে একটি গ্রামে পৌঁছেছেন। তারপর সর্বতীর্থ গ্রাম থেকে হস্তিপৃষ্ঠক নামে ভরতের প্রয়াণ। এরপরেই আবার তিনি একসাল নগরে প্রবেশ করছেন। মহাকাব্যের মধ্যে একসঙ্গে এতগুলি গ্রামের নাম রামায়ণের কালে উন্নত গ্রাম-ব্যবস্থার পরিচয় দেয়।

[রামায়ণ (Mudholakar) ২.৪৯.৩-৮; ৪.২৬.৯; ২.৬৮.১২; ২.৭১.৯-১৬]

□ মহাভারতে গ্রামের অবস্থান অনেক বেশি সুপরিকল্পিত এবং রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামের সমৃদ্ধি এবং তার শাসনব্যবস্থাও এতটাই উন্নত যে, মহাভারতের যুদ্ধশান্তির জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর হৃতরাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থের বদলে পাঁচখানি গ্রাম-মাত্র চেয়েছিলেন। এই পাঁচটার মধ্যে চারটি গ্রামের নাম তিনি নির্দিষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন; পঞ্চমটির নাম না করে বলেছিল—যে কোনো একটা গ্রাম হলেই হবে, তবু শান্ত হোক এই যুদ্ধ—

অবিস্থলং বৃকস্থলং মাকন্দীং বারণাবতম্।
অবসানং ভবত্বত্র কঞ্চিদেবঞ্চ পঞ্চমম্॥
ভ্রাতৃণাং দেহি পঞ্চানাং পঞ্চগ্রামান্ সুযোধন।

[মহা (k) ৫.৩১.১৯-২০; (হরি) ৫.৩১.১৯-২০]

এই পাঁচটি গ্রামের মধ্যে বারণাবতের বিশদ বর্ণনা আছে মহাভারতের জতুগৃহ নামের উপপর্বে। আর মাকন্দী মহাভারত ছাড়াও বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে বহুলভাবে কীর্তিত। আমরা বিস্তারে যাচ্ছি না। কিন্তু মহাভারতে সবচেয়ে বেশি যেটা লক্ষণীয়, সেটা হল urbanisation -এর ভাবনা। বারণাবত এবং মাকন্দীর মতো সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা একটি উন্নত ভূমিখণ্ডকেও এখানে গ্রাম বলা হচ্ছে। এতে মহাভারতের সভাপর্বে সদ্য রাজ্যভারপ্রাপ্ত যুধিষ্ঠিরের কাছে নারদের প্রশ্নটা সার্থক urbanisation এর উদাহরণ হয়ে ওঠে নারদ বলছেন—তোমার রাজ্যে তোমার এই নগর-রাজধানীকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তার আশেপাশে সমস্ত গ্রামগুলিকে নগরের মতো করে ফেলেছো তো? আবার নগরের যে প্রান্তদেশ, সেখানটা গ্রামের মতোই আছে তো—কেননা এই সব জায়গা থেকে তোমার রাজকর সংগৃহীত হবে—

কচ্চিন্নগরগুপ্ত্যর্থং গ্রামা নগরবৎ কৃতাঃ।
গ্রামবচ্চ কৃতাঃ প্রান্তাস্তে চ সর্বে ত্বদর্পণাঃ॥

এখানে টীকাকার নীলকণ্ঠ 'নগরবৎ গ্রাম' বলতে বোঝাতে চাইছেন যে, রাজার পুর-নগরের সুরক্ষার কারণ হিসেবে গ্রামগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণ বীরপুরুষেরা সেখানে মওজুদ আছেন কিনা—

নগরবদিত্যনেন বহুভিঃ শূরৈরধিষ্ঠিতা গ্রামাঃ।

গ্রামের মধ্যে এইরকম শূর-বীর মানুষদের রাখার আর একটা বড়ো কারণ যেটা নারদ বলেছেন, সেটা হল—গ্রামীন রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে পাঁচ রকমের যে আধিকারিক থাকেন—যাঁদের পারিভাষিক নাম—প্রশাস্তা, সমাহর্তা, সংবিধাতা, লেখক এবং সাক্ষী—তাঁরা প্রতিটি গ্রামে তাঁদের পাঁচ প্রকার কর্মে নিযুক্ত থাকেন কিনা? বস্তুত গ্রাম থেকে রাজস্ব আদায়ের এই সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্যই কিছু বীর পুরুষ হয়তো বা তাঁরা সৈন্য-সেনার নেতৃস্থানীয় মানুষ হতে পারেন— তাঁরাই ওই কর-আদায়ী আধিকারিকদের সাহায্য করতেন।

আমরা অবশ্য গ্রামকে 'নগরবৎ' করার মধ্যে করব্যবস্থার এত 'ডিরেক্ট' আয়োজন প্রাচীনকালের বাস্তব কোনো ব্যবস্থা বলে ভাবতে পারি না, কেননা প্রশাস্তা, সমাহর্তা, সংবিধাতারা রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্রীয় আধিকারিক। তাঁরা প্রত্যেক গ্রামে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন না। গ্রামের রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রামণী বা গ্রামাধ্যক্ষের ওপরেই থাকে। কিন্তু সে যাই হোক, আমরা উপরি উক্ত শ্লোকের এই অর্থ বুঝি যে, নারদ চাইছেন—গ্রামগুলির মধ্যে যেন নগরায়ণের তাৎপর্য্য থাকে। অর্থাৎ নাগরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুরক্ষা যেন গ্রামগুলির মধ্যেও ক্রমান্বয়ে ব্যবস্থিত হয়। অন্যদিকে রাষ্ট্রের প্রান্তিক স্থানগুলি—যেখানে বনারণ্যের চেহারা দেখা যায় সেই সব স্থান যেন গ্রামের চেহারা নিতে পারে—কেননা এই সমস্ত জায়গা থেকেই রাষ্ট্রের কর আদায়ের সম্ভাবনা থাকে—

গ্রামবচ্চ কৃতাঃ প্রান্তান্তে চ সর্বে ত্বদর্পণাঃ।

এই ভাবনাটা আরও প্রমাণ হয়, যখন মহাভারতে দেখতে পাই যে, দময়ন্তীর পিতা ভীম দময়ন্তী এবং নলকে খুঁজে বার করার জন্য যে পুরস্কার ঘোষণা করছেন, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি হল একটি 'নগর-সম্মিত' গ্রাম—

অগ্রহারহারাংশ্চ দাস্যামি গ্রামং নগরসম্মিতম্।

[মহা (k) ২.৫.৮০-৮১; ৩.৬৮.৪;
(হরি) ২.৫.৮০; ৩.৫৬.৪]

□ 'নগরসম্মিত গ্রামে'র কথা মহাভারতেই প্রথম পাওয়া যায় বলেই এই কথাটা জোর দিয়েই বলা যায় যে, মহাভারতের কালে একটি গ্রাম পুরোপুরি রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক চরিত্র অর্জন করে ফেলেছে। অনেকগুলি বৃহদ্‌বংশ বা কুলের সমষ্টি গ্রাম একথা প্রথম পাওয়া যায় মহাভারতেই, যদিও একটি বিশেষ পাঠেই এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি আছে। এখানে বলা হচ্ছে, একটি রাষ্ট্রের জনপদের মধ্যে বহুতর গ্রাম থাকে এবং একটি গ্রামের মধ্যে অনেকগুলি কুলবংশের আবাস থাকে—

পুরে পুরে চ নৃপতিঃ কোটি সংখ্যৈর্বলৈ র্বৃতঃ।
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে চ শতশো গ্রামাঃ কুলসহস্রিনঃ॥

[মহা (Critical Edition), Vol. 2, 2.App 21.
699 post; p. 402]

□এই বহুকুলযুক্ত একটি গ্রামের প্রসঙ্গ যেহেতু ঋগ্‌বেদের কালেই যথেষ্ট শোনা গেছে, সেখানে গ্রামের প্রশাসক হিসেবে গ্রামণীর সংজ্ঞাটাও ঋগ্‌বেদেই পাওয়া যায়। একজন রাজা যেমন সেকালে বড়ো বড়ো যাগযজ্ঞ করতেন, তেমনই একটি গ্রামের পরিসরে প্রশাসনিক মুখ্য হিসেবে গ্রামণীও যাগযজ্ঞ করাতেন এবং গ্রামস্থ ঋত্বিক-পুরোহিতেরা বহুদক্ষিণাদাতা একজন গ্রামণীকে প্রায় রাজার সম্মান দিতেন—এই তথ্য ঋগ্‌বেদের মন্ত্র থেকেই পাওয়া যায়। এই মন্ত্রে যাজ্ঞিক বলছেন—যিনি দক্ষিণা দেন তাঁকে সকলের আগে আহ্বান করা হয়, তিনি গ্রামের অধ্যক্ষ, তিনি সকলের আগে আগে যান, যিনি সর্বপ্রথম দক্ষিণা দেন, তাঁকেই অর্থাৎ সেই গ্রামণীকেই আমরা লোকেদের রাজা বলে মনে করি—

দক্ষিণাবান্ প্রথমো হূত এতি
দক্ষিণাবান্ গ্রামণীরগ্রমেতি।
তমেব মন্যে নৃপতিং জনানাং
যঃ প্রথমো দক্ষিণামাবিবায়॥

অন্য একটি ঋক্‌মন্ত্রে স্বয়ং আদিরাজা মনুকেই 'গ্রামণী' বলা হচ্ছে এবং তাঁর প্রধান পরিচয়—তিনি 'সহস্রদা' অর্থাৎ বহু বস্তু দান করেন, তিনি ভূরিদাতা, যাজ্ঞিকেরা চাইছেন এমন গ্রামণীর যেন কোনো অনিষ্ঠ না হয়—

সহস্রদা গ্রামণীর্মা রিষন্মনুঃ
সূর্যেণাস্য যতমানৈতু দক্ষিণা।

[ঋগ্‌বেদ ১০.১০৭.৫; ১০.৬২.১১]

□ বেদ এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে গ্রামণীর উল্লেখ যে ভাবে হয়েছে, তাতে মনে হয় গ্রামাধ্যক্ষ গ্রামণীকে নির্বাচন করতেন রাজাই। অন্যদিকে এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা যে, একটি রাষ্ট্রে রাজাও কিন্তু বৈদিক কালে নির্বাচনের মাধ্যমেই স্বীকৃত হতেন। এই নির্বাচন যাঁরা করতেন, তাঁদের বলা হত 'রত্নী' অর্থাৎ রত্ন-মণির অধিকারী। বস্তুত রাজার নির্বাচনের পর নির্বাচকদের স্বীকৃতিস্বরূপ পলাশ গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি মণির মতো একটি বস্তু নির্বাচকদের হাত থেকে নিতে হত রাজাকে। সেই কারণেই এঁদের নাম রত্নী। এই রত্নীরাই রাজার নির্বাচনে সাহায্য করতেন। যাঁদের কাছ থেকে এই মণি গ্রহণ করতেন রাজা, তাঁদের মধ্যে 'গ্রামণী'-ও কিন্তু একজন। অথর্ববেদে এই রত্নীদের কাছে রাজার প্রার্থনা হল—যেসব বুদ্ধিমান ব্যক্তি রথ তৈরি করেন (রথকারাঃ), যাঁরা

কর্মকার (কর্মারাঃ), যাঁরা মণীষী, তাঁদেরকে আমার সাহায্যে নিয়ে এসো। যাঁরা রাজা, যাঁরা রাজকর্তা, যাঁরা রথের সারথি (সূতাঃ) এবং যাঁরা গ্রামণী—তাঁদের সবাইকে আমার সাহায্যে নিয়ে এসো—

যে রাজানো রাজকৃতঃ সূতা গ্রামন্যশ্চ যে।
উপস্তীন্ পর্ণ মহ্যং ত্বং সর্বান্ কৃণ্বভিতো জনান্॥

এই যে গ্রামণী রাজার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করছেন, তা থেকে একজন গ্রামণীর রাজনৈতিক মর্যাদা বোঝা যায় বলেই রাজাদেরও সেই ভাবনা থাকত যাতে গ্রামণী তাঁর পছন্দের লোক হন। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, গ্রামণী বা গ্রামের প্রধান প্রশাসক ব্যক্তিটি রাজার মনোনীত ব্যক্তি হতেন এবং অনেক সময় এই পদ ছিল বংশগত; কিন্তু বংশগত না হলেও এই পদ গ্রামস্থিত মানুষের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পাওয়া যেত না; বলা উচিত, রাজাই তাঁকে মনোনয়ন দিয়ে নির্বাচন করতেন।

গ্রামণী পদটি যথেষ্টই অর্থকরী ছিল এবং একজন বৈশ্য যদি এই পদ পেতেন, তাহলে ধরেই নেওয়া হত যে, তাঁর উন্নতির চরম সীমায় তিনি পৌঁছেছেন। কথাটা কিন্তু এইভাবেই বলা হয়েছে যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায়। বলা হয়েছে—যিনি ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি নন, তাঁর পক্ষে মহেন্দ্রের উদ্দেশে যাগযজ্ঞ করাটা উচিত হয় না। আর মনে রাখতে হবে—ঐশ্বর্যশালী হলেন তিনি জন—একজন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, একজন গ্রামণী এবং রাজন্য। মহেন্দ্র তাঁদেরই দেবতা—

নাগতশ্রীর্মহেন্দ্রং যজেত।
ত্রয়ো বৈ অগতশ্রিয়ঃ
শুশ্রুবান্ গ্রামণী রাজন্যঃ,
তেষাং মহেন্দ্রো দেবতা।

[অথর্ববেদ ৩.৫.৬-৭; Vedic Index, vol. 1, p. 247; তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম) ২.৫.৪.৪, পৃ. ১২২৪]

□ একজন গ্রামাধ্যক্ষ বা গ্রামণী হতে পারলেই যে তাঁর আর্থিক অবস্থা সম্পন্ন-সুচারু হবে—এটা বেদের কাল থেকে মহাভারতের কাল পর্যন্ত একটি চরম সত্য ছিল। 'গ্রামকাম' অর্থাৎ একটি মানুষ ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য গ্রাম চাইছে—এইরকম একটা প্রায় লোভের মতো আকাঙ্ক্ষা যাতে পুষ্ট হয়, তার জন্য যজুর্বেদীয় সংহিতা বিধান দিচ্ছে—একটা গ্রাম যদি পেতেই হয় তবে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যেই যাগ করতে হবে—

গ্রামকামঃ ইন্দ্রমেব মরুত্বন্তং
স্বেন ভাগধেনেয় উপধাবতি।

এখানে এই ইঙ্গিতও আছে যে, ইন্দ্রকে পশুর ভাগ দিয়ে গ্রামকামী ব্যক্তিটি তাঁর সজাতীয় গ্রামবাসীদের ওপর আধিপত্য লাভ করতে পারে। বস্তুত এখানে 'গ্রামকাম' অর্থ শুধু গ্রামের মতো এক ভৌগোলিক পরিসীমার কৃষিকর্মের অধিকার নয়। এটি গ্রামশাসনের অধিকার, এটি গ্রামাধ্যক্ষতার পদাকাঙ্ক্ষা, গ্রামণী হয়ে ওঠার বাসনা। এই ভাবনাটা পরিষ্কার করে দিয়ে মহাভারত এক একটি গ্রামকামীর সামাজিক স্থিতি প্রকট করে বলে দিয়েছি। মহাভারত দুটি জায়গায় এই 'গ্রামকাম' কথাটা ব্যবহার করছে—একাবার উদ্যোগপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উপদেশে; দ্বিতীয়বার শান্তিপর্বে রাজধর্ম বলতে গিয়ে।

মহাভারত এটাকে রাজধর্মপ্রবক্তা মনুর উক্তি বলে জানাচ্ছে যে, ছয় ধরনের মানুষকে একেবারে ত্যাগ করতে হবে, ঠিক যেমন জলপথে চলতে গেলে ভাঙা নৌকা ত্যাগ করে মানুষ, সেইভাবে ত্যাগ করতে হবে সেই আচার্যকে যিনি বাক্‌পটুতায় শিষ্য প্রবচন দিতে পারেন না। যে রাজা প্রজারক্ষার কাজটুকু করতে পারেন না, যজ্ঞের যে ঋত্বিক পুরোহিত পড়াশুনো না করেই যাগযজ্ঞের কাজে নেমে পড়েছেন—এঁদের ভাঙা নৌকার মতো ত্যাগ করতে হবে। এই প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে—যে গোরক্ষক গোপালক গ্রাম কামনা করছে— তাকে ত্যাগ করতে হবে—

গ্রামকামঞ্চ গোপালং বনকামঞ্চ নাপিতম্।

এখানে টীকাকার নীলকণ্ঠ খুব সরলভাবে জানিয়েছেন যে, একজন গোরক্ষক রাখাল যদি ভাবে—সে গ্রামে বাস করবে, তাহলে গোরুগুলি দেখভাল করবে কে—

গোপালঃ সর্বদা গ্রামবাসপ্রিয়শ্চেদ্
গবাং রক্ষণং ন স্যাৎ।

এখানে জানানো দরকার যে, গ্রামকামী গোপাল বস্তুত এত সুবোধ নয়। আসলে গোপালক, যে গোরু চরিয়ে, দুধ-দই বিক্রী করে জীবন চালায়, সেই গোপালক যদি গ্রামাধ্যক্ষ গ্রামণীর প্রশাসনিক প্রভাব এবং অর্থধনের সম্পন্নতা দেখে গ্রামণীর পদ বা গ্রামাধ্যক্ষতা কামনা করে, তাহলে গোপালকে ভাঙা নৌকোর মতো ত্যাগ করা উচিত। আসলে একজন গ্রামণীর

মধ্যে যে নেতৃত্বের ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক গুণ থাকে, সেই ক্ষমতা এবং গুণ ছাড়াই যদি গ্রামণীর অর্থসম্পন্নতার আকাঙ্ক্ষায় একজন রাখাল গ্রামকামী হয়ে ওঠে, তাহলে সে রাখালের গ্রামধ্যক্ষতা তো জোটেই। না, অন্যদিকে তার গোরক্ষণের স্বকর্ম ভূমিকাটিও ব্যাহত-অবহেলিত হয়। এমন গোপালককে ত্যাগ করাই উচিত এটাই মহাভারতীয় বক্তব্য এবং মনুর বক্তব্যও তাই।

[তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম) ২.১.৩.২; ২.১.১.২; মহা (k) ৫.৩৩.৮০; ১২.৫৭.৪৫; (হরি) ৫.৩৩.৮০; ১২.৫৬.৪৫]

□ মহাভারতে একজন গ্রামাধিপতি কিংবা গ্রামণীর কাজ এবং প্রশাসনিক কর্তব্যগুলি গ্রামশাসনের পদ্ধতি হিসেবেই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু তার আগে এটা জানানো ভালো যে, মহাভারত এবং মনু মহারাজের কালেও গ্রামাধিপতি গ্রামণীর পদটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, মহাভারতের অনুশাসন পর্বে বিষ্ণুসহস্রনাম কীর্তন করার সময়ে ভগবান বিষ্ণুর একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে গ্রামণী। একটি গ্রামের প্রশাসনিক মুখ্য হিসেবে গ্রামণী নামটির উচ্চতা এই নামকরণ থেকে বোঝা যায়—

অগ্রণীর্গ্রামণীঃ শ্রীমান্ ন্যায়ো নেতা সমীরণঃ।

মহাভারতে শিবের জপ্য নামগুলির মধ্যেও শিবের একটি নাম গ্রামণী—

নন্দীশ্বরা মহাকায়ো গ্রামণীর্বৃষভধ্বজঃ।

বিষ্ণু-শিবের গ্রামণী নামটি গ্রামের সংপৃক্ত গ্রামাধিপতির সম্মানের চেয়েও একটি স্বল্পপরিসর স্থানেও তাঁদের সর্বময় মুখ্যতা সূচনা করে অধিকতর। এই মুখ্যতার নিরিখে একটি গ্রামণীর ক্ষমতা একজন রাজার পাশাপাশি উচ্চারিত হয়। স্মরণীয়, মহাভারতে অর্জুনের জন্মের সময় দৈববাণীতে বলা হয়েছিল— কুন্তীর এই ছেলে একদিন সমস্ত গ্রামণী এবং রাজাদের জয় করে ভাইদের সঙ্গে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করবে—

গ্রামণীশ্চ মহীপালানেষ জিত্বা মহাবলঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরো ত্রীন্‌মেধানাহরিষ্যতি॥

গ্রামণীরা রাজার সমতুল্য নিশ্চয়ই নন, কিন্তু তাঁরা যে যথেষ্ট বলশালী ক্ষমতাবান মানুষ হতেন তা মহাভারতের সভাপর্বে নকুলের দিগ্‌বিজয়-প্রসঙ্গে স্বীকার করতে হয়েছে। বলা হয়েছে— পশ্চিম দিক জয় করার উদ্দেশে নকুল উৎসব-সংকেত নামক একটি গণরাজ্য জয় করার পর সিন্ধুনদীর তীরবাসী মহাবলশালী গ্রামণীদের এবং শূদ্র-আভীরদের গণরাজ্যগুলি জয় করেছিলেন—

গণান্ উৎসবসংকেতান্ ব্যজয়ৎ ভরতর্ষভঃ।
সিন্ধুকূলাশ্রিতা যে চ গ্রামণীয়া মহাবলাঃ॥

গ্রামণীরা যে যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন, তাই নয় তাঁদের যে একটা সামরিক চরিত্র ছিল, সেটা হাইনরিখ্ জিমার প্রায় একপেশে ভাবে স্বীকার করেছেন এবং সেই তত্ত্বটা খানিক মেনে নিয়েও Keith-Macdonell-এর মতো পণ্ডিতেরা সেটা খণ্ডনও করেছেন। তাঁদের মতে—By zimmer the Grāmaṇī is regarded as having had military functions only, and he is certainly often connected with the senānī, or 'leader of an army'. But there is no reason so to restrict the sense: presumably the Grāmaṇī was the head of the village both for civil purpose and for military operations.

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৩৭; ১৩.১৫০.২৫; ১.১২৩.৪২; ২.৩২.৯; (হরি) ১৩.১২৭.৩৭; ১৩.১২৮.২৫; ১.১১৭.৪৬; ২.৩১.৯; Vedic Index, vol. 1, p. 247]

□ গ্রামণীর শক্তি এবং মর্যাদার নিরিখেই মহাভারত এবং মনুসংহিতা গ্রামণীর গ্রামশাসনের পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেছে—রাষ্ট্রের সুরক্ষা (রাষ্ট্রগুপ্তি) এবং রাষ্ট্রের রাজস্ব যাতে বাড়ে (রাষ্ট্রস্য সংগ্রহম্), তার জন্য রাজার প্রথম কর্তব্য হল—প্রত্যেকটি গ্রামে একজন গ্রামাধিপতি (গ্রামাধ্যক্ষ, গ্রামণী) স্থির করা; তারপর ভূমিসূত্রে আবদ্ধ দশটি গ্রামের প্রশাসক বা অধিপতি ঠিক করা, দশটি গ্রামের পর বিংশতি, অর্থাৎ কুড়িটি গ্রামের অধিপতি স্থির করা। বিংশতির পর শতগ্রামের অধিপতি, অবশেষে সহস্র গ্রামের অধিপতি নির্বাচিত করবেন বা মনোনীত করবেন রাজা—

গ্রামস্যাধিপতিঃ কার্য্যো দশগ্রাম্যাস্তথা পরঃ।
দ্বিগুণায়াঃ শতস্যৈবং সহস্রস্য চ কারয়েৎ॥

গ্রামের মধ্যে যে সব সমস্যা দেখা দেবে— তা সামাজিক রাজনৈতিক অথবা নিতান্ত গ্রাম্যই হোক, গ্রামাধিপতি গ্রামণী যখন নিজে তার সমাধান

করতে পারছেন না। সেটা দশগ্রামের অধিপতির কাছে জানাবেন। দশপতি জানাবেন বিংশতি-পতিকে; এইভাবে শত গ্রাম এবং সহস্রগ্রামের অধিপতির কাছে খবর পৌঁছোবে। মহাভারত অবশ্য গ্রাম-শত পালক ব্যক্তি পর্যন্তই সমস্যা-সমাধানের সীমা নিধারণ করেছেন—

গ্রামাণাং শতপালায় সর্বমেব নিবেদয়েৎ।

এখানে মনু কিন্তু নিতান্ত গ্রাম্য সমস্যাগুলিও সহস্রপাল গ্রামাধিপতির কাছে নিবেদনের পক্ষে—

শংসেদ্ গ্রামশতেশস্ত সহস্রপতয়ে স্বয়ম্।

বস্তুত এই সব সমস্যা প্রধানত রাজনৈতিক। সুদূর কোনো গ্রামে বসে কেউ বা যারা রাজার বিরুদ্ধাচরণ করছেন, অথবা গ্রামের ওপর যদি আটবিক জনজাতির আক্রমণ হয়, এমনকী দস্যু-তস্করের উপদ্রব যদি বাড়ে এবং একটি গ্রামের গ্রামণী যদি এই সমস্যা গ্রাম্য প্রশাসনের মাধ্যমে সমাধান না করতে পারেন, তাহলে উচ্চতর প্রশাসনিক কর্তাদের তা জানাতেই হত। এখানে অবশেষে সমাধান আসে শেষ পর্যন্ত রাজার কাছ থেকেই। মহাভারত স্পষ্টত না বললেও মনু তাঁর সংহিতাগ্রন্থে জানিয়েছেন—বিভিন্ন গ্রামপতি গ্রামণীদের গ্রাম-সম্পকিত কাজ একত্রিতভাবে এবং পৃথকভাবে বিচার করার জন্য রাজা একজন পক্ষপাতহীন বিশ্বস্ত সচিব নিযুক্ত করবেন, যিনি গ্রামের কার্য্যাকার্য্য নিরলসভাবে খেয়াল রাখবেন—

তেষাং গ্রাম্যাণি কার্যানি পৃথকাগার্য্য চৈব হি।
রাজ্ঞো'ন্য সচিবঃ স্নিগ্ধস্তানি পশ্যেদতন্দ্রিতঃ॥

মনু অবশ্য জনসংখ্যা বুঝে দুটি, তিনটি বা পাঁচটি গ্রামের মধ্যে মধ্যে 'গুল্ম' অর্থাৎ গ্রামরক্ষী পুরুষদের এক একটি দল রাখতে বলেছেন এবং একশটা গ্রামের পরেই একটি করে 'সংগ্রহ' অর্থাৎ থানা বা পুলিশচৌকির মতো সুরক্ষাদায়ী পুরুষদের সংগ্রহ রাখতে বলেছেন। এখানে মহাভারত এতটা বিস্তার করে না বলে গ্রামগুলির ওপর রাজার পূর্ণ অধিকার ব্যক্ত করে সমস্ত গ্রামের সমস্যা এবং গ্রামগুলির সামরিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য পৃথক একজন সচিব নিযুক্ত করতে বলেছেন। তিনি আইন-কানুন এবং ধর্ম-ব্যবহারের অভিজ্ঞতায় নিরলসভাবে কাজ করবেন গ্রামের জন্য—

তেষাং সংগ্রামকৃত্যং স্যাঙ্গ্ গ্রামকৃত্যং চ তেষু যৎ।
ধর্মজ্ঞঃ সচিবঃ কশ্চিওওৎ পশ্যেদতন্দ্রিতঃ॥

[মহা (k) ১২.৮৭.৩, ৯-১০; (হরি) ১২.৮৫.৩, ৯-১০; শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১৩.২.৩.২; মনু সংহিতা ৭.১২০; ৭.১১৪]

☐ এবারে জানাতে হবে—মহাভারতের সেই গোরক্ষক 'গোপাল' কেন একটা গ্রামের অধিপতি হতে চায়—গ্রামকামঞ্চ গোপালম্। বস্তুত একজন গ্রামণী তাঁর প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করলে তাঁর জীবন-যাপন করাটা অনেক সহজ হয়ে পড়ত। মহাভারত এখানে খুব সাধারণভাবে বলেছে যে, গ্রামের মধ্যে যে সব ভোজ্যবস্তু আছে—চাল-ডাল, উচ্ছে-বেগুন-পটল-মুলো ইত্যাদি— গ্রামিক-গ্রামণী তা বিনা মূল্যে পাবেন। প্রত্যেক দশটি গ্রাম থেকে একইভাবে দশপতির, প্রত্যেক বিংশতি থেকে বিংশতিপতির ভরণ-পোষণ চলবে। এইভাবে শতগ্রামাধিপতি যেহেতু এক বিস্তীর্ণ জনসংকুল ভূমির সুরক্ষায় নিযুক্ত অতএব তাঁর ভোগ্য ভোজ্যের ভাগও বিশাল আর সহস্রাধিপতি গ্রামপাল, একেবারে রাষ্ট্রসম্মতভাবে একটা শাখা-নগরই পাবেন তাঁর বসবাস এবং ভোগের জন্য—

শাখানগরমর্হস্তু সহস্রপতিরুত্তমঃ।
ধান্যহৈরণ্যভোগেন ভোক্তুং রাষ্ট্রীয়সঙ্গতঃ॥

মহাভারতের গ্রামণী-ভোগ্য বস্তুর মধ্যে যেটুকু অপরিষ্কার অংশ আছে, তা অনেক পরিষ্কার মনুর বক্তব্যে। মনু বলছেন— গ্রামবাসীরা প্রতিদিন রাজাকে অন্ন, পানীয়, ইন্ধন ইত্যাদি যেসব জিনিস রাজার প্রাপ্য হিসেবে দেবে অর্থাৎ রাজকর হিসেবে দেবার জন্য ধান এবং অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের একের ছয় কিংবা একের আট ভাগ বার্ষিক কর হিসেবে গ্রামবাসীরা যা জমান তারই বিশেষ একাংশ জীবিকা হিসেবে গ্রামণী পেয়ে থাকেন। এইভাবে দশগ্রামাধিপতি গ্রামের একাংশ অর্থাৎ যতটা জমি দুটি লাঙল এবং চারটি বলদ দিয়ে চষা যায়, ততটা জমি বৃত্তি হিসেবে পাবেন। দুটি লাঙল এবং চারটি বলদ দিয়ে যে যতখানি জমি চাষ করা যায় তার পারিভাষিক নাম কুল। এই হিসেবে বিংশতি গ্রামের অধিপতি পাঁচটা কুল পাবেন বৃত্তি হিসেবে। অর্থাৎ দশটা লাঙল আর কুড়িটি গোরু দিয়ে যতখানি জমি চাষ করা যায় ততটা জমি পাবেন তাঁর গ্রামাধ্যক্ষতার বৃত্তি হিসেবে। শতগ্রামের অধিপতি পাবেন একটি গোটা গ্রাম

এবং সহস্রাধিপতি একটি নগরই পাবেন বৃত্তি হিসেবে, যেটাকে মহাভারত পুরোপুরি একটি নগর না বলে শাখানগর বলেছে। এতে মনে হয়—সহস্রগ্রামাধিপতি হাজারটি গ্রামের অধিকার পেলেও তিনি নগরে বসবাস করার সুবাদে রাজা বা রাষ্ট্রযন্ত্রের অনেক কাছের মানুষ।

[মহা (k) ১২.৮৭.৬-৯; (হরি) ১২.৮৫.৬-৯; মনুসংহিতা ৭.১১৮-১২০]

□ পণ্ডিতজনেরা বেদের আমল থেকে মহাভারত-মনুর কাল পর্যন্ত প্রাচীন গ্রামশাসনের যে চিত্র এঁকেছেন, তাতে বোঝা যায় যে, তখনকার কালে এই ব্যবস্থা যথেষ্টই বিজ্ঞানসম্মত এবং রাষ্ট্রশাসনের সবচেয়ে ছোটো 'ইউনিট' হিসেবে গ্রামশাসনের গুরুত্ব তাঁরা রাজনৈতিক এবং সামাজিক মর্যাদায় বুঝতেন। *[Vedic Index, pp. 244-247; Haripada Chakraborti, Vedic India, Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar, 1981, pp. 79-90; V.R. Ramachandra Dikshitar, Hindu Administrative Institutions, Madras: University of Madras, 1929, pp. 314-329]*

গ্রামণী যক্ষদের একটি সম্প্রদায় যাঁরা সূর্যরথে অবস্থান করেন। কখনো কখনো গ্রামণি কথাটি যক্ষের পর্যায় শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। *[দ্র. যক্ষ]*

[বায়ু পু. ৫২.১; বিষ্ণু পু. ২.১০.৩; ভাগবত পু. ১২.১১.৪৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১.৮৩]

গ্রামদ পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি গ্রামদের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি ভৃগুর বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৫.৩১]

গ্রাম্যা অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। গ্রাম্যা সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৭৯.১৫]*

গ্রাম্যায়ণি পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি গ্রাম্যায়ণির বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি ভৃগুর বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৫.৩৩]

গ্রাস *[দ্র. অতিকৃচ্ছ্র]*

ঘ

ঘটেশ মঙ্গলগ্রহের পুত্র হলেন ঘটেশ।

[দেবী ভাগবত পু. ৯.৯.২৪]

ঘটোৎকচ বারণাবতে জতুগৃহের অগ্নি থেকে নিস্তার পাবার পর পাণ্ডবরা যখন নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন একসময় তাঁরা হিড়িম্বরাক্ষসের বনে এসে উপস্থিত হন। এখানে হিড়িম্ববধের পর হিড়িম্বা রাক্ষসীর সঙ্গে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের প্রণয় হয়। যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম প্রায় একবৎসর কাল জুড়ে প্রত্যেক দিন হিড়িম্বার সঙ্গে স্থানান্তরে মিলনের সুযোগ পান। ভীম হিড়িম্বাকে বলেছিলেন—একটি পুত্রের জন্মাবধি কাল পর্যন্ত তিনি হিড়িম্বার সঙ্গে থাকবেন।

হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের এই অভীপ্সিত মিলনেই ঘটোৎকচের জন্ম হয়। রাক্ষসীরা নাকি গর্ভধারণ করেই সদ্য-প্রসব করেন। ফলত হিড়িম্বার পুত্র জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই যৌবন লাভ করেছে। পুত্রের মাথাটি ঘটের মতো এবং তাতে মাথায় চুল প্রায় নেই (কচ মানে চুল, উৎকচ অর্থ কেশহীন) এবং যতটুকু বা আছে, তাও খাড়া-খাড়া বলে জননী হিড়িম্বা তাকে 'ঘটোৎকচ' বলে সম্বোধন করলেন। সেই থেকে তার এই নাম প্রচলিত হয়ে গেল—

ঘটো হাস্যোৎকচ ইতি মাতা তং প্রত্যভাষত।
অব্রবীত্তেন নামাস্য ঘটোৎকচ ইতি স্ম হ॥

ঘটোৎকচ ভীমের মতোই শক্তিশালী ছিলেন, কিন্তু আর্য পিতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ঘটোৎকচের চেহারা তথাকথিতভাবে রাক্ষস জনোচিত। তাঁর দেহটি স্বাভাবিকের তুলনায় বিশাল, মুখখানিও অতি বিশাল, তাতে চোখ দুটিও খানিক অমানুষোচিত, বিরূপ। ঘটোৎকচের কণ্ঠস্বর ভয়াল, ঠোঁট দুটি তাম্রবর্ণ, তীক্ষ্ণ দাঁত, দীর্ঘ নাসা, জানু এবং গুল্‌ফের মধ্যবর্তী অঞ্চল মাংসপেশীসহ ঈষৎ বক্র এবং মাংসল, বক্ষঃস্থল কঠিন এবং প্রশস্ত।

[মহা (k) ১.১৫৫.১৬-৩৩; (হরি) ১.৪৯.১৬-৩৩; মৎস্য পু. ৫০.৫৪; বায়ু পু. ৯৯.২৪৭; বিষ্ণু পু. ৪.২০.১১]

□ ঘটোৎকচের চেহারার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার সময় বলা হয়েছে—একজন মানুষ থেকে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও ঘটোৎকচের অমানুষী আকৃতি ছিল; অন্যান্য পিশাচ, রাক্ষসেরা শক্তি, বল, ক্ষমতায় তাঁর চেয়ে কম। জন্মমাত্রেই ঘটোৎকচ পিতামাতার চরণবন্দনা করেছিলেন আর্যভাবনার পরম্পরায়। এদিকে পূর্বের শপথ-মত ভীম-হিড়িম্বার মিলনকাল ঘটোৎকচের জন্মকালেই শেষ হয়ে আসায় হিড়িম্বা যখন পুত্র ঘটোৎকচকে সঙ্গে নিয়ে কুন্তী এবং অন্যান্য পাণ্ডবদের কাছে বিদায় নিতে এলেন, তখন বিশালকায় ঘটোৎকচ সকলের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বললেন—আপনারা আমাকে কর্তব্য বিষয়ে নির্দেশ দিন, আমি পালন করবো। ঘটোৎকচ সমস্ত পাণ্ডবভাইদের অতিপ্রিয় আত্মীয়ের মতো হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু বিদায়কালে কুন্তী ঘটোৎকচকে অসাধারণ এক আশীর্বাদ উচ্চারণ করে মহাভারতীয় উদারতায় বললেন—তুমি এই প্রসিদ্ধ কুরুবংশের জাতক, তুমি আমার কাছে সাক্ষাৎ ভীমসেনের মতোই, এই পাঁচ ভাই পাণ্ডবদের তুমি জ্যেষ্ঠ পুত্র। তুমি এঁদের সকলকে সাহায্য করবে—

ত্বং কুরূণাং কুলে জাতঃ সাক্ষাদ্‌ভীম-সমো'হ্যসি।
জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো'সি পঞ্চানাং সাহায্যং কুরু পুত্রক॥

ঘটোৎকচ কুন্তীকে আশ্বস্ত করে নিজেকে 'রাবণের কাছে যেমন ইন্দ্রজিৎ'—এই সমতায় প্রতিষ্ঠিত করলেন প্রথমে। তারপর কুন্তী এবং পাণ্ডব-পিতাদের বললেন—যে কোনো প্রয়োজনে আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত হব। এই কথা বলে ঘটোৎকচ মায়ের সঙ্গে উত্তর দিকে চলে গেলেন।

[মহা (k) ১.১৫৫.৩৪-৪৫; (হরি) ১.১৪৯.৩৪-৪৫]

□ পাণ্ডবদের বনবাসকালে প্রয়োজন হল। পাণ্ডবরা তখনও অর্জুনহীন, তবে এবার তাঁর ফিরে আসার সময় হয়েছে বলে পাণ্ডবরা উত্তর দিকে যেতে যেতে গন্ধমাদন পর্বতের সানুদেশে যাবেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু যাবার পথে প্রবল পার্বত্য ঝড় আরম্ভ হল। মোটামুটি এক

ক্রোশ পথ যাবার পরেই দ্রৌপদী অবসন্ন হয়ে একেবারে বসে পড়লেন। চার পাণ্ডব-ভাই দ্রৌপদীর অনেক পরিচর্যা করার পর দ্রৌপদী চৈতন্য-লাভ করলেন। এই সময়ে ভীম যুধিষ্ঠিরের কাছে প্রস্তাব করলেন যে, তিনি সকল পাণ্ডব এবং দ্রৌপদীকে বহন করে নিয়ে যাবার জন্য পুত্র ঘটোৎকচকে স্মরণ করবেন। যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পাওয়ামাত্রই ভীম স্মরণ করলেন ঘটোৎকচকে। ঘটোৎকচ আরও অনেক বলশালী রাক্ষসদের নিয়ে উপস্থিত হলেন ভীমের কাছে। ভীমের স্নেহালিঙ্গন লাভ করার পর যুধিষ্ঠিরের আদেশে ঘটোৎকচ মাতা দ্রৌপদীকে বহন করে নিয়ে চললেন বদরিকাশ্রমের দিকে এবং অন্যান্য বলশালী রাক্ষসেরা যুধিষ্ঠির নকুল, সহদেব, ধৌম্য পুরোহিত এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদের বয়ে নিয়ে চললেন। দীর্ঘ পথ তখন সংক্ষিপ্ত মনে হল ঘটোৎকচের সৌজন্যে। সকলে বদরিকাশ্রমের বদরী বৃক্ষটির কাছে এসে একে একে ঘটোৎকচ এবং তাঁর সঙ্গী রাক্ষসদের কাঁধ থেকে নামলেন। এরপর স্বর্গলোক থেকে অর্জুন ফিরে আসার পরেও পার্বত্যপথে পুনরায় ফিরে যাবার সময়েও আমরা ঘটোৎকচ এবং তাঁর অনুচরবর্গকে সাহায্য করতে দেখি। *[মহা (k) ৩.১৪৪.১-৯, ২২-২৮; ৩.১৪৫.৩-১১, ২৫; ৩.১৭৬.২১; (হরি) ৩.১২০.১-৯ ২২-৪০, ৫৪; ৩.১৪৭.২০]*

□ বস্তুত বনবাসের এই সময়টা, যখন অর্জুন ছিলেন না পাণ্ডবদের সঙ্গে এবং তারপর অর্জুন ফিরে আসার পরেও ঘটোৎকচ বহু সময় ধরে পাণ্ডবদের সঙ্গে ছিলেন। এমনকী ভীম যখন দ্রৌপদীর প্রিয়কামনায় সুরসৌগন্ধিক আনার জন্য কুবেরের পদ্মবনে গেছেন এবং সেখান থেকে কিছুতেই ফিরে আসছেন না, তখনও ঘটোৎকচ এবং তাঁর অনুচরবর্গ দ্রৌপদীসহ অন্যান্য পাণ্ডবদের বয়ে নিয়ে গেছেন অকুস্থলে। এখানে বিমাতা দ্রৌপদীর আদেশ পুত্রবৎ পালন করেছেন ঘটোৎকচ।

[মহা (k) ৩.১৫৫.১৫-২২; (হরি) ৩.১২৮.১৫-২২]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে ঘটোৎকচ এক অক্ষৌহিণী রাক্ষস-সৈন্য নিয়ে পাণ্ডবদের সাহায্য করার জন্য আসেন। রাক্ষস-সৈন্যরা শূল-মুদ্গরের মতো ঐতিহ্যবাহী অস্ত্রশস্ত্র যেমন সঙ্গে এনেছিল তেমনই তাদের স্বাভাবিক অস্ত্র ছিল প্রস্তরখণ্ড এবং বৃক্ষকাণ্ড। ঘটোৎকচের মতোই তাঁর রথ এবং তাঁর রথের ধ্বজাও বিপক্ষের মনে ভয় জাগায়। ঘটোৎকচের রথখানি ইস্পাত-নির্মিত—

কার্ষ্ণায়সং মহাঘোরম্।

রথে ভল্লুকের চর্মাবরণ, রথের ঘর্ঘরে মহামেঘের শব্দ, সে রথের বাহনগুলি নাকি হাতিও নয়, ঘোড়াও নয়, তবে তারা নাকি হাতির মতো কিছু—

যুক্ত গজনিভৈর্বাহৈর্নহয়ৈর্নাপি বারণৈঃ।

রথের মাথায় গৃধ্ররাজ, সেই গৃধ্রের চোখদুটি বিশাল এবং তার পাখা এবং পদদ্বয় চঞ্চল, সে গৃধ্র চিৎকার করছে অবিরাম। ধ্বজের পতাকাটি রক্ত মাখা কাপড়ের মতো লাল।

[মহা (k) ৭.১৫৬.৫৭-৬২; (হরি) ৭.১৩৬.৫৫-৫৯]

□ মহাভারতের দ্রোণপর্বে যেহেতু শেষ পর্যন্ত ঘটোৎকচের মৃত্যু হয়, তাই এই পর্বেই ঘটোৎকচের বীরত্ব এবং আত্মত্যাগ সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দ্রোণপর্বে জয়দ্রথ বধের পরে রাত্রিতেও যুদ্ধ আরম্ভ হল। সেই রাত্রিকালে যখন কর্ণ আর ঘটোৎকচের যুদ্ধ চলছে, সেই সময় অলায়ুধ নামে এক ভয়ংকর রাক্ষস বহু সহস্র রাক্ষস সৈন্য নিয়ে দুর্যোধনের কাছে এসে বলল—সে ভীমকে মারতে চায়। আসলে পূর্বে ভীমের হাতে যারা মারা গেছে, তাদের মধ্যে বক রাক্ষস সম্পর্কে অলায়ুধের জ্ঞাতি এবং হিড়িম্ব রাক্ষস তার বন্ধু, কির্মীর-রাক্ষসের জন্যও তার অনুশোচনা আছে। সে বলল—আমাদের মতো রাক্ষস আত্মীয়দের উপেক্ষা করে ভীম হিড়িম্বাকে ধর্ষণ করেছে। কাজেই ভীমকে এবং তাদের ছেলে ঘটোৎকচকে আমি সানুচরে হত্যা করবো। দুর্যোধনের সানন্দ সম্মতি নিয়ে সে প্রথমেই ঘটোৎকচকে আক্রমণ করল।

[মহা (k) ৭.১৭৬.১-১৩; (হরি) ৭.১৫২.১-১৩]

□ অলায়ুধের শক্তি এবং বীরত্ব ঘটোৎকচের থেকে কিছু কম নয়—

সো'পি বীরো মহাবাহুর্যথৈব স ঘটোৎকচঃ।

অলায়ুধের অস্ত্র-শস্ত্র, যুদ্ধবেগ এবং অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ রাক্ষসোচিতভাবেই ঘটোৎকচের মতনই। দুই জনের ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হল। অলায়ুধ ঘটোৎকচকে লক্ষ্য করে এগোলেও তার প্রধান লক্ষ্য ছিল ভীম। অলায়ুধের সঙ্গে যুদ্ধে ভীম

প্রথমে খানিক সাফল্য পেলেও পরে খানিক অবসন্ন হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় কৃষ্ণ ঘটোৎকচকে প্ররোচিত করেন অলায়ুধের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। তখনই ঘটোৎকচ এগিয়ে গেলেন অলায়ুধের দিকে। ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হল দুই রাক্ষস-বীরের মধ্যে। মহাভারতে এই যুদ্ধকে এক সময় বানররাজ বালী এবং সুগ্রীবের দ্বন্দ্বযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অলায়ুধের অস্ত্রাঘাতে আহত, প্রতিহত হয়ে ঘটোৎকচ এক সময়ে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন এবং অলায়ুধের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। ঘটোৎকচের এই বীরত্ব দেখে সাময়িকভাবে দুর্যোধনও আশাহত হয়ে পড়েন।

[মহা (k) ৭.১৭৭.১৭-৪৭; ৭.১৭৮.১-৪০ (হরি) ৭.১৫৩.১৭-৮৮]

□ ঘটোৎকচ রাত্রিযুদ্ধে বিশেষ পটু ছিলেন এবং মায়া অবলম্বন করে অন্তরীক্ষ থেকেও নাকি যুদ্ধ করতে পারতেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের চোদ্দ দিনের দিন ঘটোৎকচের আক্রমণে কৌরব-সেনারা পর্যুদস্ত হয়ে চীৎকার করতে আরম্ভ করেছিল। মহাবীর কর্ণ পর্যন্ত তাঁর যুদ্ধ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। ঘটোৎকচের যুদ্ধে কৌরবরা চীৎকার করছিলেন,—

প্রাক্রোশন্তঃ কৌরবাঃ সর্ব এব।

কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধারা ভীত হয়ে পালাচ্ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে, শেষ পর্যন্ত কর্ণের কাছেই কুরুবীরেরা অনুরোধ করলেন ঘটোৎকচকে মারার জন্য। এমনকী তাঁরাই কর্ণকে জানালেন যে, সাধারণ অস্ত্রে এই রাক্ষসকে কিছুই করা যাবে না, বরঞ্চ তাঁর কাছে ইন্দ্রদত্ত যে একবীরঘাতিনী শক্তি আছে, সেই শক্তি দিয়ে এই রাক্ষসটাকে আগে মারুন, নইলে ক্ষণে ক্ষণে সৈন্যদল কীভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে চোখের ওপর—

শক্ত্যা রক্ষো জহি কর্ণাদ্য তূর্ণং/
নশ্যন্ত্যেতে কুরবো ধার্তরাষ্ট্রাঃ ।

তারা আরো বলল—ভীম, অর্জুন, কী করবে আমাদের? তাদের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব। কিন্তু এই রাত্রিকালের যুদ্ধে ঘটোৎকচ যাতে ইন্দ্রতুল্য কৌরব-বীরদের না মেরে ফেলে তার জন্য ওই শক্তিটাই তুমি নিক্ষেপ করো ঘটোৎকচের ওপর—

তস্মাদেনং রাক্ষসং ঘোররূপং
জহি শক্ত্যা বৈ দত্তয়া বাসবেন।

সকলের আর্ত অনুরোধ শুনে কর্ণ তাঁর একবীরঘাতিনী বৈজয়ন্তী নামক শক্তি অস্ত্র মোক্ষণ করলেন ঘটোৎকচকে মারবার জন্য। সাক্ষাৎ মৃত্যুর ভগিনীর মতো সেই শক্তি উল্কাপাতের মতো গিয়ে পড়ল ঘটোৎকচের শরীরে। কিন্তু এরই মধ্যে একটি কাণ্ড ঘটালেন ঘটোৎকচ। তিনি বুঝেছিলেন যে, এই শক্তি তাঁর প্রাণঘাতিকা হবে, অতএব শক্তিটি দেখামাত্রই নিজের শরীরটাকে তিনি বিন্ধ্যপর্বতের মতো বড়ো করে ফেললেন। রাত্রিযুদ্ধের সময় তিনি যেহেতু মায়াবলে আকাশ থেকে যুদ্ধ করছিলেন, তাই কর্ণের অস্ত্রাঘাতে তাঁর মায়ার শক্তি তিরোহিত হল বটে, কিন্তু পূর্ববর্ধিত শরীরখানি নিয়ে মৃত অবস্থায় ঘটোৎকচ পড়লেন কুরুসৈন্যের ওপর। তাতে তাঁর শরীরের ভারেই কৌরব সৈন্যের একাংশ মারা গেল—

সৈন্যৈকদেশম্/অপোথয়ৎ স্বেন দেহেন রাজন্।

□ হয়তো ঘটোৎকচের এই শেষ-অবস্থা বর্ণনার মধ্যে কিছু অতিশয়োক্তি আছে, হয়তো বা স্বাভাবিকভাবেই বৃহদাকার তাঁর শরীর দিয়ে মৃতপ্রায় অবস্থাতেও তিনি কুরুসৈন্যের বিনাশ সাধন করেছেন, কিন্তু এই ক্ষতিসাধনের চেয়েও বেশি মহাভারতের কবি যেটা দেখাতে চান, সেটা হল—কুরু-ভরত-বংশের অধস্তন এই রাক্ষস জাতক, যিনি কোনো দিন ইন্দ্রপ্রস্থের রাজধানীতে ধনী জীবন কাটাতে আসেননি, শুধু জননী হিড়িম্বাকে নিয়েই যাঁর আরণ্যক সংসার চলত, সেই তিনি মৃত্যুর সময়েও পাণ্ডব-পিতাদের শত্রুসংখ্যা কমিয়ে দিয়ে গেলেন। পিতৃকার্যের এমন আর্যসম্মত উদাহরণ আর কী হতে পারে!

[মহা (k) ৭.১৭৯ অধ্যায়; (হরি) ৭.১৫৪ অধ্যায়]

□ ঘটোৎকচ মারা যাবার পর পাণ্ডবপক্ষের সার্বিক বিষাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অবসন্ন হয়ে পড়েছেন পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির। ভীমের এই ঔরসপুত্রটির ওপর তাঁর পরম অপত্যস্নেহ ছিল। কৃষ্ণ তাঁকে এই অবস্থায় সান্ত্বনা দিলে তাঁর চোখের জল আর বাধ মানেনি। যুদ্ধক্ষেত্রে রথের মধ্যে তিনি বসে পড়েছিলেন এবং হাত দিয়ে চোখের জল মুছে কোথায় কীভাবে বালক ঘটোৎকচ পাণ্ডবদের কত সাহায্য করেছেন, সেইসব পূর্ববৃত্তান্ত তিনি কৃষ্ণের কাছে বলেছেন—

বালেনাপি সভা তেন কৃতং সাহ্যং জনার্দন।

যুধিষ্ঠিরের আরও দুঃখ এই যে, ভীম-অর্জুনের

মতো বীরেরা বেঁচে থাকতেও ঘটোৎকচকে এইভাবে মরতে হল। যুধিষ্ঠির বলেছেন—সহদেবকে আমরা যেমন ভালবাসি, ঘটোৎকচকেও আমরা তেমনই ভালবাসি।

[মহা (k) ৭.১৮৩.১৯-৩৪; (হরি) ৭.১৫৭.৮-২২]

□ মহামতি ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে শান্ত করার চেষ্টা করেছেন এই বলে যে, একদিকে এটা ভালই হয়েছে, নাহলে কর্ণের ওই ইন্দ্রদত্ত একবীরঘাতিনী শক্তিতে মারা পড়তেন স্বয়ং অর্জুন। তাতে তোমার বিপদ আরও বাড়ত—তুমি শান্ত হও।

[মহা (k) ৭.১৮৩.৫৮-৬৩; (হরি) ৭.১৫৭.৪৪-৪৮]

যুধিষ্ঠির হয়তো তেমন বিশদভাবে জানতেন না যে, ঘটোৎকচের মৃত্যুর পর পাণ্ডবরা যখন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কাঁদছেন তখন বাসুদেব কৃষ্ণ আনন্দে সিংহনাদ করতে করতে জড়িয়ে ধরেছেন অর্জুনকে। এই সময় তিনি আনন্দে হাততালি দিয়েছেন এবং অর্জুনের কপিধ্বজ রথের ওপরেই নেচে নিয়েছেন—

ননর্ত হর্ষসংবীতো বাতোদ্ধৃত ইব দ্রুমঃ।

অর্জুন একটু অবাকই হয়েছেন কৃষ্ণের এই কাণ্ড দেখে। সদ্য প্রিয়পুত্র অভিমন্যুকে হারিয়েছেন তিনি। ঘটোৎকচের মৃত্যুতেও শোক পেয়েছেন যথেষ্ট। তাই এমন অস্থানে এই আকস্মিক হর্ষ দেখে প্রশ্ন করেছেন কৃষ্ণকে—অতিহর্ষোঽয়মস্থানে তবাদ্য মধুসূদন। সৈন্যরা ঘটোৎকচের মৃত্যুতে যুদ্ধবিমুখ হয়ে পড়েছে, আমরা ভীষণ উদ্বিগ্ন। অথচ তোমার এই আনন্দ দেখে এটা বুঝতে পারছি এই কারণ খুব সাধারণ নয়। কৃষ্ণ বলেছেন—আমি এখন অত্যন্ত আনন্দিত এই কারণে যে, ঘটোৎকচের ওপর কর্ণের এই শক্তি ব্যয়িত হয়ে যাওয়ায় এটা বুঝেই নাও যে, কর্ণকে মারার পথ প্রশস্ত হয়ে গেল। ওই শক্তি হাতে থাকলে আমরা কেউই কর্ণের সঙ্গে পেরে উঠতাম না। ভাগ্যিস কর্ণ এই একবীরঘাতিনী শক্তি ঘটোৎকচের ওপরেই খরচ করে ফেলেছে, তা নাহলে বিপদ ছিল তোমারই। কৃষ্ণ তাঁর হর্ষের দ্বিতীয় কারণ হিসেবে বলেছেন—ঘটোৎকচ নাকি ব্রাহ্মণবিদ্বেষী রাক্ষস ছিল, সে ব্রাহ্মণদের যজ্ঞবিঘ্ন করে বেড়াত। এই অন্যায়গুলো সে করত বলেই তাকে প্রচণ্ড যুদ্ধে উত্তেজিত করে কর্ণের অমোঘা শক্তি ব্যয় করিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণকে দিয়ে ঘটোৎকচকে বধ করানোটাও আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। অতএব তুমি দুঃখ কোরো না, পৃথিবীতে যাতে ধর্ম স্থির থাকে সেই কাজটাও ঘটোৎকচ-বধের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।

[মহা (k) ৭.১৮০.১-১৪; ৭.১৮১.২৪-৩০; (হরি) ৭.১৫৫.১-১৪; ৭.১৫৫.৫৬-৬১]

□ ঘটোৎকচবধের ক্ষেত্রে কৃষ্ণের প্রথম যুক্তিটি অবশ্যই গ্রাহ্য এবং তা স্বয়ং ব্যাসও যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন। কিন্তু ঘটোৎকচ ব্রাহ্মণবিদ্বেষী যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষস ছিলেন, এমন প্রমাণ মহাভারতে কোথাও নেই। সম্ভবত সেকালের রাক্ষসদের আর্যবিদ্বেষিতার সামগ্রিক অপবাদ ঘটোৎকচের ওপর আরোপিত হয়ে থাকবে। আর কর্ণের অমোঘা শক্তির কবল থেকে অর্জুন সুরক্ষিত হয়ে যাওয়ায় কৃষ্ণ বোধহয় একটু বেশিই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। ঘটোৎকচবধের ফলে বিষণ্ণ পাণ্ডবদের সামনে এই হর্ষোচ্ছ্বাসের আধিক্য বেমানান ছিল বলেই ঘটোৎকচের ব্রাহ্মণদ্বেষিতার কথা বলে কৃষ্ণ নিজের সাময়িক দোষটুকুকে আবরণ করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়।

ঘটোদরী অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। ঘটোদরী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৭৯.১৫]*

ঘন্টাকর্ণ১ তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে যখন দেবতারা তারকাসুরকে বধ করার জন্য স্কন্দকার্ত্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন, সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট দেবতারা তাঁদের কয়েকটি বিশিষ্ট অনুচর যোদ্ধাকে তারকাসুরবধে সহায়তা করার জন্য অনুচররূপে স্কন্দকে দান করেন। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁর যে চারজন বিশিষ্ট অনুচর স্কন্দকে দান করেছিলেন, ঘন্টাকর্ণ তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৯.৪৫.২৩-২৪; (হরি) ৯.৪২.২৩-২৪]

ঘন্টাকর্ণ২ শিবের অন্যতম অনুচর। তাঁকে গণাধিপতি নামেও চিহ্নিত করা হয়েছে। বারাণসীতে শিবের অন্যান্য প্রধান অনুচরদের সঙ্গে ঘন্টাকর্ণও অবস্থান করেন। *[মৎস্য পু. ১৮৩.৬৫]*

ঘন্টাকর্ণহ্রদ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। বারাণসীক্ষেত্রে অবস্থিত ব্যাসতীর্থের পশ্চিমে এই হ্রদ অবস্থিত। ঘন্টাকর্ণ হ্রদে স্নান করে যে ব্যক্তি ব্যাসতীর্থ দর্শন করে তার মহাপুণ্য ফল লাভ হয়। কাশীতে মৃত্যু হলে অক্ষয় স্বর্গলাভ

হয়—একথা পুরাণে বহুবার চর্চিত হয়েছে। ঘন্টাকর্ণ হ্রদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঘন্টাকর্ণ হ্রদে স্নান করেন তাঁর যদি কাশীতে মৃত্যু না হয়ে অন্য কোনও স্থানেও মৃত্যু হয় তাহলেও তাঁর কাশীতে মৃত্যুর ফল লাভ হয়। ঘন্টাকর্ণ হ্রদের কাছেই পঞ্চচূড়াহ্রদ নামে অপর একটি পবিত্র তীর্থ অবস্থিত।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৮১, ৮৬; নারদ পু. ২.৪৯.২৮-২৯]

ঘন্টারবা অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। ঘন্টারবা সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ১৭৯.২৩]

ঘন্টেশ্বর তীর্থ মৎস্যপুরাণে উল্লিখিত অন্যতম পবিত্র পিতৃতীর্থ। এই তীর্থে শ্রাদ্ধ এবং দানধর্ম করলে পুণ্যফল লাভ হয় বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

[মৎস্য পু. ২২.৭০]

ঘন সীতার সন্ধান করতে করতে হনুমান যে সকল রাক্ষস প্রধানদের প্রাসাদে গিয়েছিলেন, তাদের ঘন অন্যতম। ইনি লঙ্কার অন্যতম রাক্ষসবীর।

[রামায়ণ ৫.৬.২৩]

ঘর্ঘর ঘর্ঘর বা ঘর্ঘরা নদী। মৎস্য পুরাণে ঘর্ঘরাকে পবিত্র পিতৃতীর্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[মৎস্য পু. ২২.৩৫]

□ আধুনিক কর্ণালী (Karnali) নদী। মানস সরোবরের নিকট তিব্বত মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে নেপাল ও পরে ভারতের মধ্যে দিয়ে এই নদীটি প্রবাহিত। ঘর্ঘরা গঙ্গার একটি উপনদী। এটি ভারতের বিহার ও উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। *[EAIG (Kapoor) p. 168]*

ঘৃণি১ বরুণের ঔরসে সামুদ্রীর গর্ভে বৈদ্য নামে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই বৈদ্যের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ঘৃণি। মুনি নামে তাঁর এক কনিষ্ঠ ভ্রাতাও ছিলেন। এঁরা দুই ভাই পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে বিনাশপ্রাপ্ত হন বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

[বায়ু পু. ৮৪.৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫৯.৭]

ঘৃণি২ প্রজাপতি মরীচির ঔরসে ঊর্ণার গর্ভজাত ছয় পুত্রসন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ। ভগবান ব্রহ্মা নিজের কন্যা সরস্বতীকে পত্নী রূপে গ্রহণ করলে এই ঘটনায় মরীচির ছয় পুত্র ব্রহ্মাকে উপহাস করেন। এই পাপে ঘৃণি প্রভৃতি ছয় মরীচিপুত্র প্রথমে হিরণ্যকশিপুর পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বাপর যুগে এই ছয়জন দেবকীর গর্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কংস এই ছয়জনকেই হত্যা করেছিলেন। ভগবান কৃষ্ণের কৃপায় তাঁরা মুক্তিলাভ করেন।

[ভাগবত পু. ১০.৮৫.৪৭-৫১]

ঘৃত দুগ্ধজাত পদার্থ হিসেবে ঘৃতের ব্যবহার বৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে। ঋগ্‌বেদের কাল থেকে ঘৃত অত্যন্ত পবিত্র এবং আয়ুবর্ধক হিসেবে বারবারই ঘৃতের কথা হয়েছে— আয়ুর্বৈ ঘৃতম্। ঋগ্‌বেদে একটি মন্ত্রে ঘৃতকে অতি পবিত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

ঘৃতং পূতম্। *[ঋগ্‌বেদ ৪.১০.৬]*

সংস্কৃত 'ঘৃ' ধাতুর অর্থ সেচন করা বা স্রাবিত হওয়া। সেক্ষেত্রে 'ঘৃত' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় যা ক্ষরিত হয়। সেক্ষেত্রে মনে হতেই পারে যে গলিত অবস্থায় যে ঘি আমরা দেখি, তারই পারিভাষিক নাম ঘৃত। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সায়নাচার্য তাঁর পূর্বাচার্যদের দ্বারা উদাহৃত একটি শ্লোক উদ্ধার করে স্পষ্ট করেছেন যে, গলিত ঘৃত কিন্তু ঘৃত নামে পরিচিত ছিল না। গলিত ঘৃতের পারিভাষিক নাম আজ্য। আর ঘৃত হল এর ঘনীভূত অবস্থা—

সর্পির্বিলীনম্ আজ্যং স্যাদ্ ঘনীভূতং ঘৃতং বিদুঃ।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ঔষধ হিসেবে ঘৃতের ব্যবহার বহুল প্রচলিত।

[দ্র. আজ্য]

[দ্রষ্টব্য শব্দকল্পদ্রুম পৃ. ৩৯৫ (২য় খণ্ড)]

ঘৃতপৃষ্ঠ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত। প্রিয়ব্রতের ঔরসে বর্হিষ্মতীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে ঘৃতপৃষ্ঠ একজন। ইনি ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। ঘৃতপৃষ্ঠের সাত পুত্র হলেন আম, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামক, ভ্রজিষ্ঠ, লোহিতার্ণ ও বনস্পতি।

[দেবী ভাগবত পু. ৮.৪.৫, ২৪; ৮১৩.৫-৮; ভাগবত পু. ৫.১.২৫, ৩৩]

ঘৃতাচী এক প্রখ্যাত অপ্সরা। স্বর্গবাসী ছয়জন প্রধানা অপ্সরাদের মধ্যে ঘৃতাচী অন্যতমা।

[মহা (k) ১.৭৪.৬৮; (হরি) ১.৮৮.৬৮]

□ অপ্সরা হিসেবে ঘৃতাচী নামের প্রাচীনতম উল্লেখ মেলে শুক্ল যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতায়। এখানে একটি মন্ত্রে বিশ্বাচী এবং ঘৃতাচী অপ্সরার নাম একত্রে উচ্চারিত হয়েছে।

বাজসনেয়ী সংহিতার টীকাকার মহীধর অপ্সরা ঘৃতাচীর নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

ঘৃতমঞ্চতি ভুঙ্‌ক্তে ঘৃতাচী।

—মূলত ঘৃতই তাঁর খাদ্য বলে তাঁর ঘৃতাচী নামকরণ হয়েছে। মহীধর এ প্রসঙ্গে অপরাশ্রেষ্ঠা উর্বশীর উক্তি উদ্ধার করেছেন। উর্বশী পুরূরবাকে বলেছিলেন—দিনে একবার মাত্র ঘৃতভোজন করেই আমার ক্ষুধা নিবারণ হয়। উর্বশীর মতোই ঘৃতাচীও ক্ষুধানিবারণ করতেন ঘৃতভোজন করে—

ঘৃতম্ হ্যপ্সরসাম্ অন্নম্ ঘৃতস্য স্তোকম্
সকৃদহ্ন অশ্নামি ইতি উর্বশীবচনাৎ।

বস্তুত বৈদিককাল থেকেই প্রচলিত কথা হল—আয়ুর্বৈ ঘৃতম্। যে খাদ্য গ্রহণে জরা দূর হয়, আয়ু বৃদ্ধি হয় তাই ঘৃত। তেমন পুষ্টিকর আয়ুবর্ধক আহার করতেন বলেই হয়তো অপ্সরাদের ঘৃতভোজনের প্রসঙ্গ এসেছে বার বার। আর সেটিই আরোপিত হয়েছে ঘৃতাচী অপ্সরার নামের উপরে।

[বাজসনেয়ী সংহিতা (Weber) ১৫.১৮ মহীধরকৃত টীকা দ্রষ্টব্য]

□ রামায়ণে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে ঘৃতাচীর উল্লেখ দুটি পৃথক স্থানে পাওয়া যায়। একবার আদিকাণ্ডে, যেখানে ঘৃতাচীকে প্রাচীন চন্দ্রবংশীয় রাজা কুশনাভের একশোটি পরমাসুন্দরী কন্যার মাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়বার কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে। সেখানে প্রসঙ্গক্রমে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঘৃতাচী অপ্সরার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কথা উঠে এসেছে।

[রামায়ণ ১.৩২.১১; ৪.৩৫.৬-৭]

মহাভারতের আদিপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ভৃগুবংশীয় ঋষি প্রমতির ঔরসে অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে এক পুতসন্তানের জন্ম হয়। এই পুত্রের নাম রুরু।

□ মহর্ষি ভরদ্বাজের ঔরসে ও ঘৃতাচীর কারণে মহাভারতখ্যাত শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের জন্ম। মহর্ষি ভরদ্বাজ গঙ্গানদীর তীরে বাস করতেন। একদিন গঙ্গাস্নানকালে তিনি ঘৃতাচী অপ্সরাকে দেখেন। ঘৃতাচী তখন স্নান শেষে বস্ত্র পরিবর্তনে ব্যস্ত। এলোমেলো বাতাসে তাঁর বস্ত্র স্খলিত হওয়ায় ঘৃতাচীর সমস্ত অঙ্গই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সে দৃশ্য দেখা মাত্রই প্রবল কামাবেগে ভরদ্বাজের বীর্য্যস্খলিত হয়। ভরদ্বাজ ঋষি তখন সেই স্খলিত শুক্র তাঁর হাতে ধরা কলসের মধ্যে রাখেন। ভরদ্বাজ ঋষির দেহ জাত কলস মধ্যস্থ শুক্র থেকেই মহর্ষি দ্রোণের জন্ম।

[মহা (k) ১.১৩০.৩৫-৪০; (হরি) ১.১২৬.৯-১৪]

□ ভরদ্বাজ-কন্যা শ্রুবাবতীর জননীও ঘৃতাচী অপ্সরা। পুরাকালে অপ্সরাশ্রেষ্ঠ ঘৃতাচীর রূপ দেখে মুগ্ধ ভরদ্বাজের বীর্য্য স্খলিত হয়। ভরদ্বাজ প্রথমে সেই বীর্য্য হস্তে ধারণ করলেও তা পরে গাছের পাতায় পড়ে যায়। পরে পাতার উপরই ভরদ্বাজের কন্যা শ্রুবাবতীর জন্ম হয়।

[মহা (k) ৯.৪৮.৬২-৬৫; (হর) ৯.৪৫.৬২-৬৫]

□ অর্জুনের জন্মোৎসবে যেসব অপ্সরারা নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন ঘৃতাচী তাঁদের মধ্যে একজন।

সমুদ্রমন্থনে অমৃত উত্থিত হওয়ার পরও ঘৃতাচীকে আনন্দনৃত্য করতে দেখা যায়।

[মহা (k) ১.১২৩.৬৫; ১.১৬৬.১-৫; (হরি) ১.১১৭.৬৮; ১.১৫৯.১-৫; বিষ্ণু পু. ১.৯.১০১]

□ বনবাসকালে অর্জুন যখন অমরাবতীতে যান, তখন অন্যান্য অপ্সরাদের সঙ্গে ঘৃতাচীও তাঁর মনোরঞ্জন করেন। এখানেই একটি বর্ণনায় ঘৃতাচীকে পদ্ম নয়না এবং বিশাল কটি ও নিতম্ব বিশিষ্টা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ৩.৪৩.২৯; (হরি) ৩.৩৮.২৯]

□ হাজার হাজার অপ্সরা কুবেরের সভায় উপস্থিত থেকে তাঁর উপসনা করেন। এঁদের মধ্যে ঘৃতাচী একজন।

[মহা (k) ২.১০.১০; (হরি) ২.১০.১০]

□ মহর্ষি বেদব্যাসের পুত্র শুকদেবের জন্মের সঙ্গে ঘৃতাচী অপ্সরার নাম যুক্ত হয়ে আছে। একবার ব্যাসদেব অগ্নি উৎপাদনের ইচ্ছায় নিজের আশ্রমে বসে অরণি-মন্থন করছিলেন। সেখানে অরণি মন্থনকালে অপ্সরা ঘৃতাচীকে দেখা মাত্রই ব্যাসের মনে কামের উদ্রেক হয়। ঘৃতাচীও কামার্ত কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে শুকপক্ষিণীর রূপ ধরে যথাসময়ে উপস্থিত হলেন। ব্যাসদেব যোগবলে ইন্দ্রিয় সংযমের চেষ্টা করেও বিফল হলেন। অবশেষে অগ্নি উৎপাদনের ইচ্ছায় কামাবেগকে কিছুটা সংযত করলেও হাতে ধরা অরণির উপরই ব্যাসের শুক্র স্খলিত হল। কিন্তু ব্যাসদেব অরণিমন্থন থামালেন না। অরণিমন্থনের ফলে শুক্র মথিত হয়ে ব্যাসপুত্র মহাজ্ঞানী শুকদেবের জন্ম হল।

[মহা (k) ১২.৩২৪.৩০-৩৮; (হরি) ১২.৩১৪.৩০-৩৮]

□ একবার মহর্ষি অষ্টাবক্রের সম্মানে যক্ষরাজ কুবের একটি নৃত্যসভার আয়োজন করেছিলেন। সেই সভায় অন্যান্য অপ্সরাদের সঙ্গে ঘৃতাচীও উপস্থিত ছিলেন। *[মহা (k) ১৩.১৯.৪৪; (হরি) ১৩.১৮.৪৪]*

□ পুরুবংশীয় রাজা রৌদ্রাশ্বের ঔরসে অপ্সরা ঘৃতাচীর মতান্তরে ধৃতার গর্ভে দশটি পুত্রের জন্ম হয়েছিল। এঁরা হলেন ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ু, জলেয়ু, সন্ততেয়ু, ধর্মেয়ু, সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু ও বনেয়ু। *[ভাগবত পু. ৯.২০.৪-৫; বায়ু পু. ৭০.৬৮]*

ভগবান শ্রীহরি দ্বাদশমাসে পৃথক পৃথক দ্বাদশগণের সঙ্গে বিচরণ করেন। মাঘ মাসে হরির বিচরণ-সঙ্গীদের মধ্যে ঘৃতাচী অপ্সরা একজন। *[ভাগবত পু. ১২.১১.৩৯]*

শরৎকালে অর্থাৎ ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ঘৃতাচী অপ্সরা সূর্যরথে অধিষ্ঠান করেন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৩.১৩; বিষ্ণু পু. ১.১০.১০; বায়ু পু. ৫২.১৩]*

দশজন পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট অপ্সরাদের মধ্যে ঘৃতাচী একজন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৫; বায়ু পু. ৬৯.৫১]*

ঘোর১ বৈদিক ঋষি। ঋগ্‌বেদ সংহিতায় বা অন্য কোনো বেদে ঘোরের নাম উল্লিখিত না হলেও ব্রাহ্মণগ্রন্থে সূত্র সাহিত্যগুলিতে এবং উপনিষদে ঘোর-এর নাম একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। এখানে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, মহাভারত কিংবা মুখ্য পুরাণগুলিতে মহর্ষি ঘোরের উল্লেখ না থাকলেও তাঁর নামের একটি পৃথক গুরুত্ব আছে এবং তার কারণ মহাকাব্য পুরাণের বিখ্যাত নায়কচরিত্র তথা ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত দেবকীপুত্র কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নামের একত্র উল্লেখ। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে এই 'ঘোর' ঋষির শিষ্য বলা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ এবং কৌশীতকী ব্রাহ্মণে মহর্ষি ঘোরকে অঙ্গিরার বংশজাত বা ঘোর আঙ্গিরস নামে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাকাব্য পুরাণের যুগের সর্বাধিক চর্চিত ব্যক্তি কৃষ্ণের নাম উপনিষদে উল্লিখিত হওয়ায় এবং সেখানে তাঁর গুরু হিসেবে ঘোর আঙ্গিরসের উল্লেখ এই ব্যক্তির পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি করে—এবিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। *[কৌশিতকী ব্রাহ্মণ (Lindner) ৩০.৬; ছান্দোগ্যে উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ৩.১৭.৬]*

ঘোর২ মৎস্য পুরাণে কল্পগুলির নামের একটি তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকা অনুসারে পঞ্চবিংশতিতম কল্পের নাম ঘোর। *[মৎস্য পু. ২৯০.৯]*

ঘোর৩ *[দ্র. দিব্যাস্ত্র]*

ঘোর৪ মহাভারতের অনুশাসনপর্বে বর্ণিত তণ্ডীকৃত শিবসহস্রনামস্তোত্রে প্রাপ্ত মহাদেবের অন্যতম নাম। *[মহা (k) ১৩.১৭.৫১; (হরি) ১৩.১৬.৫১]*

ঘোরক একটি প্রাচীন জনজাতি। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় ঘোরক জনজাতির ক্ষত্রিয় রাজারা পাণ্ডবদের বশ্যতা স্বীকার করে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হয়েছিলেন। এঁরা উপহার স্বরূপ যুধিষ্ঠিরকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেন।

পণ্ডিত Moti Chandra এই ঘোরকদের আবাসভূমি বলে উল্লেখ করেছেন আধুনিক বাজাউর (Bajaur) কে। টলেমির লেখায় এই বাজাউর স্থানটি গরৌজা নামে পরিচিত। বর্তমানে এই বাজাউর (Goruaja) পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আফগানিস্তান সীমান্তে অবস্থিত। *[মহা (k) ২.৫২.১৪; (হরি) ২.৫০.১৪; GESMUP (Moti Chandra) p. 92, 129]*

ঘ্রাণশ্রবা স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অনুচর একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন। *[মহা (k) ৯.৪৫.৫৭; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]*

ঙ

ঙ বাংলা বর্ণমালার পঞ্চম ব্যঞ্জনবর্ণ। শব্দের আদ্যক্ষররূপে পুরাণকোষে এর ব্যবহার নেই।

চ

চকোর কলিযুগে যেসব অন্ধ্রবংশীয় রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছিলেন, চকোর তাঁদের মধ্যে একজন। মৎস্য পুরাণে তাঁকে স্বাতিকর্ণ চকোর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইনি ছয় মাস মাত্র রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়।

[মৎস্য পু. ২৭৩.১১; ভাগবত পু. ১২.১.২৬]

চক্র$_{১}$ নারায়ণের তথা ভগবান কৃষ্ণের অন্যতম প্রধান অস্ত্র। *[দ্র. সুদর্শন$_{১}$]*

চক্র$_{২}$ একজন নাগ। রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে নাগরাজ বাসুকীর যেসব বংশধর ভস্মীভূত হয়েছিলেন চক্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ১.৫৭.৬; (হরি) ১.৫২.৬]

চক্র$_{৩}$ প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্তর্গত একটি জনপদ। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ভারতবর্ষীয় জনপদ সমূহের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে উত্তর ভারতস্থিত জনপদগুলির মধ্যে চক্রের নাম উল্লেখ করেছেন। *[মহা (k) ৬.৯.৪৫; (হরি) ৬.৯.৪৫]*

চক্র$_{৪}$ তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে যখন দেবতারা তারকাসুরকে বধ করার জন্য স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন, সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট দেবতারা তাঁদের কয়েকটি বিশিষ্ট অনুচর যোদ্ধাকে তারকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য অনুচর রূপে স্কন্দকে দান করেন। বিষ্ণু তাঁর যে তিনজন বিশিষ্ট অনুচর স্কন্দকে দান করেছিলেন, চক্র তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ৯.৪৫.৩৭; (হরি) ৯.৪২.৩৫]*

চক্র$_{৫}$ তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে যখন দেবতারা তারকাসুরকে বধ করার জন্য স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন, সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট দেবতারা তাঁদের কয়েকটি বিশিষ্ট অনুচর যোদ্ধাকে তারকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য অনুচররূপে স্কন্দকে দান করেন। প্রজাপতি ত্বষ্টা তাঁর যে দুইজন বিশিষ্ট অনুচর স্কন্দকে দান করেছিলেন, চক্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ৯.৪৫.৪০; (হরি) ৯.৪২.৩৮]

চক্র$_{৬}$ কৃষ্ণের ঔরসে সত্যভামার গর্ভজাত পুত্র সন্তানদের মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ৪৭.১৭]*

চক্র$_{৭}$ ভাগবত পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী পৌরাণিক কুশদ্বীপের অন্তর্গত বর্ষগুলির সীমানির্ধারণকারী সাতটি বর্ষ পর্বতের মধ্যে অন্যতম হল চক্র।

[ভাগবত পু. ৫.২০.১৫]

চক্র$_{৮}$ দেবরাজ ইন্দ্র যখন পর্বতদের পক্ষছেদন করেন সেই সময় ইন্দ্রের ভয়ে কয়েকটি পর্বত সমুদ্রের তলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। চক্র সমুদ্রতলে প্রবেশকারী পর্বতদের মধ্যে অন্যতম।

[মৎস্য পু. ১২১.৭২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৭৮]

চক্র$_{৯}$ বায়ু পুরাণে রাজার যে কয়টি সম্পদ থাকা অতি আবশ্যক বলে বর্ণনা করা হয়েছে সেই সপ্তরত্নের মধ্যে প্রধান হল চক্র। চক্র শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক অর্থে চক্র বলতে সৈন্য বোঝায়। উৎকৃষ্ট এবং শক্তিশালী অপরাজেয় সৈন্যবাহিনী নিঃসন্দেহে যে কোনো রাজার অত্যাবশ্যক সম্পদের মধ্যে অন্যতম। চক্র বলতে রাজার পারিষদ মণ্ডলকে বোঝায়। রাজসভায় জ্ঞানী বিচক্ষণ লোকের উপস্থিতি শুধু যে রাজসভার শোভা বর্ধন করে তা নয়, তাঁদের সুচিন্তিত উপদেশ প্রজাকল্যাণে সহায়তা করে। চক্র অর্থে রাষ্ট্র বোঝায়। একজন রাজা যখন বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন, এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির স্বাধীন রাজাদের মিত্রতা ও আনুগত্য লাভ করেন—সেই রাজাকে তখন চক্রবর্তী বলা হয়। চক্র শব্দটি এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং পররাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক—এই দুটিকেই বোঝায়। নিঃসন্দেহে এই অর্থেও চক্র রাজার অন্যতম সম্পদ। *[বায়ু পু. ৫৭.৬৮]*

চক্রক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্রসন্তানদের মধ্যে অন্যতম। *[মহা (k) ১৩.৪.৫৪; (হরি) ১৩.৩.৭৩]*

চক্রগিরি ভারতবর্ষের দক্ষিণে বিস্তৃত মহাসাগর মধ্যে অবস্থিত একটি ভূখণ্ডের নাম অঙ্গদ্বীপ। এই অঙ্গদ্বীপের অন্তর্গত একটি পর্বত চক্রগিরি, যেটি বহু প্রস্রবণ ও গুহায় বেষ্টিত। *[বায়ু পু. ৪৮.১৭]*

চক্রচর টীকাকার নীলকণ্ঠ এই চক্রচর শব্দটির অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন—চক্রচরাঃ সূর্যাদয়ঃ। গ্রহ-নক্ষত্রগুলি যে চক্রাকারে আবর্তিত হয়, প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের জ্যোতির্বিদরা সে সম্পর্কে

অবহিত ছিলেন। চক্রাকার কক্ষপথে আবর্তন করে বলেই গ্রহনক্ষত্রদের চক্রচর বলা হয়েছে। মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্বে প্রয়াগতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এই তীর্থে চক্রচররা দেবতারূপে অধিষ্ঠিত আছেন।

[মহা (k) ৩.৮৫.৭২; (হরি) ৩.৭০.৭২]

চক্রতীর্থ২ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত থানেশ্বরের এই তীর্থটি সরস্বতী নদীর কাছেই অবস্থিত। পণ্ডিতদের মতে এর আরেক নাম রামহ্রদ। পণ্ডিত কানিংহাম বলেছেন—এটি অস্থিপুরের নিকট অবস্থিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অস্থিপুরের আধুনিক অবস্থানও কুরুক্ষেত্রে থানেশ্বরের উত্তরে।

[GDAMI (Dey) p. 43;
AGI (Cunningham) p. 336;
EAIG (Kapoor) p. 79]

□ বলরাম একবার এই তীর্থে গিয়েছিলেন।

[ভাগবত পু. ১০.৭৮.১৯]

□ বামন পুরাণে বলা হয়েছে ঋষি রন্তুকের আশ্রম যতদূর বিস্তৃত চক্রতীর্থের বিস্তারও ততটাই—

রন্তুকস্যাশ্রমাদ্ যাবত্তাবত্তীর্থং চ চক্রকম্।

[বামন পু. ৪২.৫]

□ স্কন্দ-কার্ত্তিকেয়কে দেবসেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করার সময় দেবতাদের সঙ্গে পুণ্য নদী, পুণ্যপর্বত ও পুণ্যতীর্থরাও তাঁদের আপন সম্পত্তি দান করেছিলেন। সেই সূত্রে চক্রতীর্থ সুচক্রা এবং গয়াশির মকরাক্ষকে স্কন্দ কার্ত্তিকেয়র অনুচর শক্তি হিসেবে দান করেছিলেন। *[বামন পু. ৫৭.৮৯]*

চক্রতীর্থ৩ ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত সৌকর তীর্থের অন্তর্গত অপর একটি তীর্থের নাম চক্রতীর্থ। বৈশাখ মাসের দ্বাদশীতে সংযত হয়ে এই তীর্থে নিয়মানুযায়ী স্নান করলে পরবর্তী জন্মে ঐশ্বর্য্যশালী বংশে জন্মগ্রহণ সম্ভব বলে বরাহ পুরাণে বলা হয়েছে।

[বরাহ পু. ১৩৭.১৯]

চক্রতীর্থ৩ মথুরার উত্তর দিকে চক্রতীর্থ নামে একটি পবিত্র তীর্থ রয়েছে। এই চক্রতীর্থে মহাগৃহোদয় নামে এক নগর ছিল—

চক্রতীর্থে পুরা বৃত্তং মথুরায়াং তথোত্তরে।

বরাহ পুরাণে এই তীর্থ সম্পর্কে একটি কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে নিকটবর্তী কল্পগ্রামতীর্থের তুলনায় চক্রতীর্থকে শতগুণ শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। *[বরাহ পু. ১৬২.১-৫৭]*

বর্তমান মথুরায় চক্রতীর্থ ঘাট নামে একটি জায়গা রয়েছে। যমুনার তীরে এই ঘাটে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম ঘটে। এই চক্রতীর্থ ঘাটই প্রাচীন চক্রতীর্থ হতে পারে বলে মনে হয়।

[F.S. Growse, Mathura: A District Memoir, New Delhi: Asian Educational Services, 1993, p. 144]

চক্রতীর্থ৪ চক্রতীর্থে চক্রেশ্বরদেব শিব বিরাজ করেন। স্বয়ং বিষ্ণু চক্রলাভের জন্য এখানে মহেশ্বরের আরাধনা করেছিলেন—

যত্র বিষ্ণুঃ স্বয়ং স্থিত্বা চক্রার্থং শঙ্করং প্রভুঃ।
পূজয়ামাস তত্তীর্থং চক্রতীর্থসুদাহৃতম্॥

দক্ষকন্যা সতীদেবীর দেহত্যাগের সংবাদে ভগবান শিব দক্ষের যজ্ঞস্থল আক্রমণ করে তা ধ্বংস করতে শুরু করেন। শিবের রুদ্রমূর্তিতে ভয় পেয়ে দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত দেবতারা চক্রপাণি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু ভূতনাথকে বধ করার উদ্দেশ্যে তাঁর চক্র নিক্ষেপ করলে শিব তা গ্রাস করে নেন। এরপর কোনো এক সময় দেবতাদের রাক্ষসদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিষ্ণু তাঁর চক্র পুনরায় লাভ করার উদ্দেশ্যে গোদাবরী তীরে একটি স্থানে মহেশ্বরের আরাধনা করেন। শ্রীহরির আরাধনায় তুষ্ট মহেশ্বর অবশেষে তাঁর চক্র তাঁকে ফিরিয়ে দেন। এই আরাধনাস্থলটিই চক্রতীর্থ নামে খ্যাত। এই তীর্থে স্নান ও দান অত্যন্ত পুণ্যদায়ক। *[ব্রহ্ম পু. ১০৯.১-৫৭]*

□ রামচন্দ্র বানরসেনাদের সাহায্যে লঙ্কাগমনের জন্য যেখানে সেতু নির্মাণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে সেই জায়গাটির নাম হয় দর্ভশয়ন। এই দর্ভশয়নেরই প্রথম এবং অন্যতম প্রধান তীর্থের নাম চক্রতীর্থ।

[স্কন্দ পু. (ব্রহ্মখণ্ড. সেতুমাহাত্ম্যম্). ২.১০০-১০৪]

□ পুণ্যফলদায়ক এই তীর্থের আরেক নাম ধর্মতীর্থ, গঙ্গা, সরস্বতী, রেবা, পম্পা, গোদাবরী, কালিন্দী, কাবেরী, নর্মদা, মণিকর্ণিকা ইত্যাদি নদীতীর্থগুলির মাহাত্ম্যও চক্রতীর্থের সঙ্গে তুলনীয় নয় বলে স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে—

গঙ্গা সরস্বতী রেবা পম্পা গোদাবরী নদী॥
কালিন্দী চৈব কাবেরী নর্মদা মণিকর্ণিকা।
অন্যানি যানি তীর্থানি নদ্যঃ পুণ্যা মহীতলে॥
অস্য তীর্থস্য বিপেন্দ্রাঃ কোট্যংশেনাপি নো সমাঃ।

[স্কন্দ পু. ব্রহ্মখণ্ড. (সেতুমাহাত্ম্যম্). ৩.৬-৮]

□ ভগবান বিষ্ণুর আরাধনায় রত মহর্ষি গালবকে একবার এক রাক্ষস আক্রমণ করে। বিষ্ণু প্রেরিত সুদর্শন চক্র সেই রাক্ষসকে হত্যা করে। বিষ্ণু গালবকে যে জায়গায় রক্ষা করেছিলেন, তার নামই চক্রতীর্থ। এখানে স্বয়ং ধর্মসৃষ্ট একটি পুষ্করিণী অবস্থিত।

[স্কন্দ পু. (ব্রহ্মখণ্ড/সেতুমাহাত্ম্য) ৩.১১-১১৭]

দক্ষিণ সাগরের তীরে কোনো একটি স্থানে চক্রতীর্থের অবস্থান—একথা স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে। *[স্কন্দ পু. (ব্রহ্মখণ্ড. সেতুমাহাত্ম্য) ৯.৭৪]*

□ ব্রহ্ম পুরাণে বলা হয়েছে যে, যম ও ইন্দ্রের দ্বৈরথে যমকে রক্ষা করার জন্য ভগবান বিষ্ণু চক্রকে এই স্থানে প্রেরণ করেছিলেন।

"প্রেষিতং চক্রিনা চক্রং রক্ষনায় যমস্য হি।
চক্রং যতাভবত্তত্র চক্রতীর্থমনুত্তমম্॥"

সেই থেকে এই তীর্থের নাম চক্রতীর্থ।

[ব্রহ্ম পু. ৮৬.১-২৮]

□ সম্ভবত বর্তমান মহারাষ্ট্রের নাসিকে এই তীর্থটি অবস্থিত।

চক্রতীর্থ৫ স্কন্দ পুরাণে অগ্নিতীর্থে স্নান করে চক্রতীর্থে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

পুরাকালে অহির্বুধ্ন্য নামে এক মহর্ষি সুদর্শন চক্রের উপাসনা করতেন। এই সুদর্শন চক্রই তাঁকে রাক্ষসকুলের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। গন্ধমাদনবাসী এই ঋষিকে সুদর্শন চক্র যে জায়গায় রাক্ষসদের থেকে রক্ষা করে তারই নাম চক্রতীর্থ।

[স্কন্দ পু. (ব্রহ্মখণ্ড/সেতু মাহাত্ম্য). ২৩.১-৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই গন্ধমাদনকে হিমালয়ের অন্তর্গত গন্ধমাদন বলে মনে করা অনুচিত। তামিলনাড়ু রাজ্যে রামেশ্বরমেও গন্ধমাদন নামে একটি পাহাড় রয়েছে। এই গন্ধমাদনই ঋষি অহির্বুধ্ন্যের আবাসস্থল ছিল বলে মনে হয়।

□ স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে যে, দণ্ড-শয়ন থেকে শুরু করে দেবীপত্তন পর্যন্ত চক্রতীর্থের বিস্তার। কিন্তু এর মধ্যভাগের অংশটি খানিক বিচ্ছিন্ন। একসময় দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে আকাশ পথে বিচরণ-সক্ষম পর্বতেরা পক্ষছিন্ন অবস্থায় সমুদ্রে একের পর এক পতিত হতে থাকে। এই পক্ষছিন্ন পর্বতগুলির মধ্যেই কোনো একটি পর্বতের আঘাতে সমুদ্রের খুবই নিকটবর্তী চক্রতীর্থ নামের স্থলভাগটি মধ্যভাগ বরাবর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

[স্কন্দ পু. (ব্রহ্মখণ্ড/সেতু মাহাত্ম্য). ৪.৫১-৬৪]

□ শ্রীবৎসগোত্রীয় জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ পদ্মনাভ চক্রতীর্থে বাস করতেন। বিষ্ণুর আদেশে চক্রতীর্থে অবস্থান করে তিনি তপস্যা শুরু করলে এক রাক্ষস তাঁকে আক্রমণ করে। তখন পদ্মনাভের বিপদ আসন্ন বুঝে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র রাক্ষসকে হত্যা করে তাকে রক্ষা করে। বিষ্ণু সেই সময় থেকেই পদ্মনাভের সঙ্গে চক্রতীর্থে অবস্থান করছেন।

[স্কন্দ পু. (বিষ্ণুখণ্ড/বেঙ্কটাচলমাহাত্ম্য) ২৩.১-৫৩]

চক্রতীর্থ৬ গুজরাটের দ্বারকায় চক্রতীর্থ নামে একটি তীর্থ রয়েছে। এটি গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত।

বরাহ পুরাণে বলা হয়েছে যে, মণিপুর পর্বত থেকে সৃষ্ট পাঁচটি ধারা এই চক্রতীর্থে পতিত হয়েছে।

"পঞ্চধারাঃ পতন্ত্যত্র মনিপুর-সমাশ্রিতাঃ॥"

কথিত আছে যে, চতুর্বিংশতি দ্বাদশীর দিন অর্ধেক রাত্রে এই চক্রতীর্থে এক মধুর শব্দ শোনা যায়। তারই সঙ্গে মৃদু মন্দ বাতাসে সুগন্ধিযুক্ত ফুল একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ধাবিত হয়। কিন্তু কোনো পাপী ব্যক্তি এই দৃশ্য কখনোই দেখতে পান না। *[বরাহ পু. ১৪৯.৫৮-৬৩]*

□ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমান গোমতী নদী যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেই জায়গাটির নাম চক্রতীর্থ ঘাট। দারক শিলা বা সচ্ছিদ্র শিলার আঘাতে আঘাতে অন্য শিলাগুলিতে এক প্রকার চক্র নির্মিত হয়, বলেই এই ঘাটটির এই নামকরণ। এই চক্রতীর্থ ঘাটের অধিষ্ঠিত দেবতার নাম চক্র-নারায়ণ। এই চক্রতীর্থ ঘাট এবং দ্বারকার চক্রতীর্থ একই বলে মনে হয়।

চক্রতীর্থ৭ পশ্চিমঘাট পর্বত বা সহ্যাদ্রি পর্বতের আমলক গ্রামে শ্রীহরি বিরাজ করেন। এই আমলক গ্রামের অন্তর্গত বহুতীর্থের মধ্যে চক্রতীর্থ অন্যতম। *[নরসিংহ পু. ৬৬.৭.১০.৬৬ (মহর্ষি)]*

চক্রতীর্থ৮ অযোধ্যায় চক্রতীর্থ নামে একটি স্থান রয়েছে।

□ বিষ্ণুশর্মা নামে এক পুণ্যবান ব্রাহ্মণের তপস্যায় সন্তুষ্ট বিষ্ণু তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। বিষ্ণুশর্মা তখন বর হিসেবে শ্রীহরির প্রতি অচলা ভক্তিভাব প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু ব্রাহ্মণের

অচলা ভক্তির প্রতিভূস্বরূপ চক্রের আঘাতে ধরিত্রী বিদারণ করে পাতাল থেকে জাহ্নবীর ধারা অযোধ্যায় প্রকট করেন। বিষ্ণুর আদেশেই জাহ্নবী এখানে অচলা হয়ে বিরাজ করেন। এই ঘটনার পর থেকেই স্থানটি চক্রতীর্থ রূপে পরিচিত হয়। এখানে বিষ্ণু, বিষ্ণুহরি নামে অধিষ্ঠিত। এটি একটি মহাপুণ্যদায়ক তীর্থ।

[স্কন্দ পু. (বিষ্ণুখণ্ড/অযোধ্যামাহাত্ম্যম্). ১.৬৯-১০৯]

ধারণা করা যেতে পারে যে, অযোধ্যায় যে জাহ্নবী অর্থাৎ গঙ্গা নদী প্রকট হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা ভৌগোলিক দিক থেকে প্রায় অসম্ভব। ফলে মনে হয় যে, এখানে জাহ্নবী অর্থে অন্য কোনো পবিত্র জলধারা বা নদীর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

□ স্কন্দ পুরাণ অনুসারে পুরাকালে স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা অযোধ্যায় অচ্যুত হরির অবস্থিতি সম্পর্কে জানতে পেরে চক্রতীর্থে বাস করেছিলেন—

পুরা ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টা বিজ্ঞায় হরিমচ্যুতম্।
অযোধ্যাবাসিনং দেবং তত্র চক্রে স্থিতিং স্বয়ম্॥

ব্রহ্মা এই চক্রতীর্থে একটি যজ্ঞ করেছিলেন এবং যজ্ঞের প্রয়োজনে ব্রহ্মকুণ্ড নামে একটি জলাশয় এখান নির্মাণ করান। পবিত্র এই ব্রহ্মকুণ্ড চক্রতীর্থের পূর্বদিকে অবস্থিত।

[স্কন্দ পু. (বিষ্ণুখণ্ড/অযোধ্যামাহাত্ম্যম্). ২.৩-২০]

চক্রতীর্থ৯ নর্মদা তীরেও একটি চক্রতীর্থের সন্ধান পাওয়া যায়—এটি কালমেঘনাশন চক্রতীর্থ নামেও পরিচিত—

চক্রতীর্থং বদন্ত্যন্যে কেচিৎ কালাঘনাশনম্।
বিখ্যাতং ভারতে বর্ষে নর্মদায়া মহীপতে॥

ভগবান বিষ্ণু এই চক্রতীর্থে কালমেঘ নামে এক দানবকে হত্যা করেছিলেন।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্যখণ্ড/রেবাখণ্ডম্) ৯০.১-৭৮]

□ মহাসেন কার্তিকেয়কে দেব সেনাপতি পদে অভিষেকের জন্য চক্রতীর্থে নিয়ে আসা হয়েছিল। এর আরেক নাম সেনাপুর।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্যখণ্ড/রেবাখণ্ডম্) ১০৯.২]

চক্রতীর্থ১০ গৌতমী গঙ্গার তীরে একটি চক্রতীর্থ আছে।

□ একবার রাক্ষসদের হাত থেকে তপস্যারত মুনিদের রক্ষা করার জন্য বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে দানবদের মস্তক ছেদন করেন। তখন সেই মুনিরা প্রসন্ন হয়ে গঙ্গার জলে সুদর্শন চক্রটিকে ধুয়ে দেন। সেই থেকেই এই জায়গাটির নাম চক্রতীর্থ।

[ব্রহ্ম পু. ১০৪.১-১৫]

চক্রদৃক্ জনৈক অসুরবীর। দৈত্যরাজ বলি যখন দেবলোক আক্রমণ করেন, সেই যুদ্ধে ইনি বলির অন্যতম সেনাপতি ছিলেন।

[ভাগবত পু. ৮.১০.২১]

চক্রদেব মহাভারতের সভাপর্বে কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয় যেসব অতিরথ যোদ্ধার নাম উল্লেখ করেছেন চক্রদেব তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ২.১৪.৫৭; (হরি) ২.১৪.৫৫]

চক্রদ্বার পর্বত একটি পবিত্র পৌরাণিক যজ্ঞকার্যের জন্য পর্বতটি বিশেষ উপযুক্ত। পুরাকালে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র প্রধান নামে এক রাজর্ষির বংশের যজ্ঞকার্যের জন্য এই পর্বতটিকে নির্দিষ্ট করেছিলেন।

[মহা (k) ১২.৩২০.১৮২; (হরি) ১২.৩১০.১৮৪]

চক্রধনু সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তা মহর্ষি কপিল, যিনি নিজের ক্রোধাগ্নিতে সগর রাজার পুত্রদের ভস্মীভূত করেছিলেন। সেই কপিল মুনি চক্রধনু নামেও পরিচিত ছিলেন।

[মহা (k) ৫.১০৯.১৭; (হরি) ৫.১০১.১৭]

চক্রধর্মন্ *[দ্র. চক্রধর্মা]*

চক্রধর্মা (চক্রধর্মন্) বিদ্যাধরদের রাজা। মহাভারতের সভাপর্ব থেকে ধনপতি কুবেরের রাজসভার যে বিবরণ আমরা পাই, তাতে বলা হয়েছে যে, বিদ্যাধররাজ চক্রধর্মা তাঁর অনুচরদের নিয়ে কুবেরের সভায় অবস্থান করতেন।

[মহা (k) ২.১০.২৭; (হরি) ২.১০.২৬]

চক্রনদী গণ্ডকী নদীর আরেক নাম। ভাগবত পুরাণ মতে এই নদী মহর্ষি পুলহের আশ্রম সংলগ্ন অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত। *[দ্র. গণ্ডকী]*

[ভাগবত পু. ৫.৭.১০]

চক্রবর্মা দৈত্যরাজ বলির একজন পুত্র।

[বায়ু পু. ৬৮.৩২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.৩৩]

চক্রবাক১ পক্ষীবিশেষ। মহর্ষি কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা তাম্রার গর্ভে যে সব কন্যাসন্তান জন্ম গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন ধার্তরাষ্ট্রী। এই ধার্তরাষ্ট্রীর গর্ভে চক্রবাক পক্ষীদের জন্ম হয়। *[মহা (k) ১.৬৬.৫৮; (হরি) ১.৬১.৫৮]*

চক্রবাক২ শ্রাদ্ধকার্যের জন্য একটি শুভ তীর্থ।

[মৎস্য পু. ২২.৪২]

চক্রব্যূহ প্রাচীন যুদ্ধ কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ব্যূহসজ্জা। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যসজ্জার কিছু বিশেষ রীতি এবং আকার-আকৃতি প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। প্রতিটি সজ্জারীতি পরস্পরের থেকে আকৃতিতে পৃথক। এদের বৈশিষ্ট্যও পৃথক পৃথক। এধরনের সৈন্য সজ্জারীতিগুলিকেই ব্যূহ বলা হত।

মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনায় বিভিন্ন প্রকার ব্যূহের নাম পাওয়া যায়। এইসব ব্যূহগুলির মধ্যে মহাভারতে সর্বাধিক আলোচিত ব্যূহটির নাম চক্রব্যূহ।

দ্রোণাচার্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে চক্রব্যূহ রচনা করেছিলেন। মনুসংহিতা বা অর্থশাস্ত্রে চক্রব্যূহ সম্পর্কে বিশদে কোনো আলোচনা করা হয়নি। মহাভারতকারও চক্রব্যূহের কোনো পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। তবে নামকরণ থেকে ধারণা করা যায় যে, চক্রব্যূহ মণ্ডলাকৃতি বিশিষ্ট। বিশ্লেষণ করলে বলা যায়—চক্রব্যূহের ক্ষেত্রে একটি মাত্র কেন্দ্রবিন্দুকে বেষ্টন করে একাধিক বৃত্ত রচনা করা হত। ব্যূহের ভিতরের থেকে বাইরে ক্রমশ ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর বৃত্তের আকারে সৈন্যদের স্থাপন করা হত। বৃত্তগুলির একেবারে কেন্দ্রে পৌঁছোতে হলে সৈন্যবৃত্তগুলি ভেদ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় বিপক্ষের যোদ্ধাদের কাছে থাকতো না। সৈন্যবৃত্ত একবার ভেদ করে কেন্দ্রে পৌঁছে গেলেও কেন্দ্র থেকে আবার সেনাব্যূহের বাইরে বেরিয়ে আসতে হলে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করতে হত। কারণ সমকেন্দ্রীয় বৃত্তাকারে (Concentric circles) সজ্জিত সৈন্যরা দ্রুতই ব্যূহের পরিধিতে সৃষ্ট ভেদ-স্থান রুদ্ধ করে দিত। স্বভাবতই একবার ব্যূহের কেন্দ্রে প্রবেশ করলে বিপক্ষের যোদ্ধাকে চারপাশ থেকে চক্রাকারে ঘিরে ফেলত ব্যূহগঠনকারী সৈন্যরা। অর্জুন-পুত্র অভিমন্যু এই দুর্গতিরই শিকার হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.১১৯-১২০; (হরি) ১.৬২.১২১-১২২; অগ্নি পু. ২৩৬.২৯; K.W. (Sensharma) p. 109-110]

□ দ্রোণাচার্য কৌরব সেনাপতির পদ গ্রহণের পর দুর্যোধন তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে কৌশলে বন্দি করার। দুর্যোধনের আশা ছিল এর ফলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও অবলীলায় যবনিকাপাত ঘটবে এবং হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে কৌরব আধিপত্য স্থায়ী হবে। দ্রোণাচার্য যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরকে বন্দি করার চেষ্টা করলেও অর্জুনের বিক্রমে তাঁর উদ্যোগ সফল হয়নি। তখন দুর্যোধনের তাড়নায় খানিক অপমানিত হয়েই দ্রোণাচার্য চক্রব্যূহ রচনার পরিকল্পনা করেন যাতে পাণ্ডবপক্ষে মোক্ষম আঘাত হানা সম্ভব হয়।

বীর সংশপ্তক বাহিনীর সঙ্গে অর্জুনকে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে দ্রোণাচার্য কৌশলে দেবতাদেরও অভেদ্য চক্রব্যূহ নির্মাণ করলেন। শিষ্যের অস্ত্রজ্ঞান সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল দ্রোণ জানতেন যে, স্বর্গ ও মর্ত্যে একমাত্র অর্জুনের পক্ষেই জটিল সেই চক্রব্যূহ সফলভাবে ভেদ করা সম্ভব। সেইকারণেই দ্রোণ অর্জুনকে অন্যত্র যুদ্ধে ব্যস্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মহাভারতকারের ভাষায় শরৎকালে মধ্যাহ্ন সূর্যের দিকে তাকালে যেমন চোখ ধাঁধিয়ে যায়, ঠিক সেভাবেই চক্রব্যূহের দিকে দৃষ্টিপাত করাও দুষ্কর—

শরন্মাধ্যন্দিনে সূর্যঃ প্রতপন্নিব দুর্দ্দৃশঃ॥

[মহা (k) ৭.৩৩.১৯; (হরি) ৭.৩১.১৮]

□ দ্রোণপর্বে চক্রব্যূহের বর্ণনায় বলা হয়েছে—ব্যূহমধ্যে কৌরব যোদ্ধারা সকলেই রক্তবস্ত্র ও রক্তভূষণ পরিধান করেছিলেন। সকলের ধ্বজই স্বর্ণখচিত, গলায় সোনার মালা এবং সকলেই রক্তবর্ণের পতাকাধারী। পরিধানে সূক্ষ্ম বস্ত্র। এঁরা সকলেই দুর্যোধন-পুত্র লক্ষ্মণকে অগ্রবর্তী করে চক্রব্যূহ অভিমুখী অভিমন্যুকে আক্রমণ করেন।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল চক্রব্যূহ গঠনকারী সমস্ত কৌরব যোদ্ধার সাজসজ্জা একইরকম (Identical)। সম্ভবত যুদ্ধকুশলী দ্রোণচার্য যোদ্ধাদের সাজসজ্জা একইপ্রকার রেখে বিপক্ষের যোদ্ধাদের বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলেন, যাতে তারা নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষকে সঠিকভাবে চিনতে না পারে।

[মহা (k) ৭.৩৩.৩৩-৩৫; (হরি) ৭.৩১.৩৩-৩৫]

□ দ্রোণাচার্য-নির্মিত চক্রব্যূহের মধ্যভাগে অবস্থান করছিলেন দুর্যোধন। ব্যূহ-কেন্দ্রে দুর্যোধনের অবস্থিতি প্রমাণ করে যে, তাঁকে সর্বাধিক সুরক্ষা প্রদানই ছিল দ্রোণের লক্ষ্য। দুর্যোধনকে বেষ্টন করেছিলেন কর্ণ, দুঃশাসন ও কৃপাচার্য।

ব্যূহমুখে অবস্থান করছিলেন দ্রোণাচার্য স্বয়ং। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা এবং শকুনি, শল্য ও ভূরিশ্রবা।

[মহা (k) ৭.৩৩.৩৭-৪১; (হরি) ৭.৩১.৩৭-৪১]

□ চক্রব্যূহ নির্মাণ করে কৌরব অধিনায়ক দ্রোণ প্রচণ্ড উদ্যমে পাণ্ডব যোদ্ধাদের আক্রমণ করেন। অর্জুন তখন অন্যত্র সংশপ্তক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত এবং অন্যান্য পাণ্ডব যোদ্ধাদের পক্ষে দ্রোণাচার্যকে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না।

যুধিষ্ঠির জানতেন যে, চক্রব্যূহের ভেদ কৌশল অর্জুন ব্যতীত মাত্র তিনজন যোদ্ধার জানা আছে। তাঁরা হলেন কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন এবং অভিমন্যু। যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে অভিমন্যু চক্রব্যূহে প্রবেশ করতে সম্মত হন। কিন্তু অভিমন্যু পিতা অর্জুনের কাছ থেকে শুধুমাত্র চক্রব্যূহে প্রবেশের কৌশলই শিখেছিলেন, ব্যূহ থেকে নির্গত হওয়ার পদ্ধতি তাঁর জানা ছিল না—

উপদিষ্টো হি মে পিত্রা যোগো'নীকবিশাতনে।
নোৎসহে তু বিনির্গন্তুমহং কস্যাঞ্চিদাপদি॥

যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, পাণ্ডব যোদ্ধারা অভিমন্যুর পশ্চাদ্‌গমন করে ব্যূহ থেকে নির্গমনের পথ উন্মুক্ত রাখবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চক্রাকৃতি বিশিষ্ট হওয়ার কারণেই একবার ব্যূহের কোনো একটি অংশে সৈন্য সংহার করে ছিদ্রপথ সৃষ্টি হলেও দ্রুতই পার্শ্ববর্তী সৈন্যদের দ্বারা তা রুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সেই কারণেই ভীমসেন এ সময় বলেছিলেন শত্রু সংহার করে ব্যূহের নির্দিষ্ট স্থানে বারংবার ছিদ্র তৈরি করা হবে—

সকৃদ্ভিন্নং ত্বয়া ব্যূহং তত্র তত্র পুনঃ পুনঃ।
বরং প্রধ্বংসয়িষ্যামো নিঘ্নমানা বরান্ বরান্॥

কিন্তু ভীম এটা বোঝেননি যে, পূর্বকৃত ছিদ্রগুলি যাতে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে ফেলা যায়, সেই কারণেই দ্রোণ চক্রব্যূহ নির্মাণ করেছেন।

চক্রব্যূহের গঠন-কৌশলের জটিলতা সম্পর্কে অভিমন্যুর সম্যক ধারণা ছিল। কিন্তু পাণ্ডবপক্ষীয় অন্যান্য যোদ্ধারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞতাহীন। সে কারণেই তাঁরা নিজেদের দেওয়া আশ্বাসবাণী রক্ষা করতে পারেননি। ফলস্বরূপ অভিমন্যু ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করলেও নির্গত হতে পারেননি। কৌরব যোদ্ধারা তাঁকে ব্যূহের কেন্দ্রেই হত্যা করেন।

[মহা (k) ৭.৩৪.১৩-২৯; (হরি) ৭.৩২.১৩-২৯]

চক্রমন্দ একজন বিশিষ্ট নাগ। শেষাবতার বলরাম যখন প্রভাসে সমুদ্রতীরে বসে যোগবলে দেহত্যাগ করেন তখন তাঁর মুখ থেকে সহস্র ফণাধারী এক বিশাল নাগ বের হয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করে। সেই নাগকে স্বাগত জানাবার জন্য অন্যান্য যেসব বিশিষ্ট নাগ সেই সময় উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন চক্রমন্দ।

[মহা (k) ১৬.৪.১৬; (হরি) ১৬.৪.১৬]

চক্রশকটব্যূহ সৈন্যব্যূহ নির্মাণ প্রাচীন যুদ্ধবিদ্যার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্যূহের আকার এবং সৈন্যবিন্যাসের বিশিষ্টতা অনুযায়ী তার নামকরণ করা হত। সুতরাং 'চক্রশকটব্যূহ' নামটি থেকেই স্পষ্ট যে, এটি চক্র ও শকটাকৃতির ব্যূহসজ্জার মিশ্রণেই এই ব্যূহের সৃষ্টি।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে অভিমন্যু বধের পর অর্জুন পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জয়দ্রথকে বধ করার কঠিন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যুদ্ধের চতুর্দশ দিনে অভিমন্যু-হন্তা জয়দ্রথকে সূর্যাস্তের পূর্বে বধ করতে না পারলে তিনি স্বয়ং স্বেচ্ছামৃত্যু গ্রহণ করবেন। অর্জুনের মৃত্যু যুদ্ধে পাণ্ডবদের পরাজয়েরই সমান—এ কথা উপলব্ধি করে দ্রোণাচার্য জটিল চক্রশকটব্যূহের পরিকল্পনা করেন। আক্রমণের পাশাপাশি জয়দ্রথকে সর্বাত্মক সুরক্ষা দান করাই ছিল এই ব্যূহসজ্জার মূল লক্ষ্য।

মহাভারতের দ্রোণপর্বে বলা হয়েছে যে, চক্রশকটব্যূহটি দু-হাজার চারশো ক্রোশ দীর্ঘ এবং এটির বিস্তার পশ্চাদ্ভাগে দশ ক্রোশ—

দীর্ঘ দ্বাদশগব্যূতিঃ পশ্চার্দ্ধে পঞ্চবিস্তৃতঃ।
ব্যূহঃ স চক্রশকটো ভারদ্বাজেন নির্মিতঃ॥

মূলব্যূহের পশ্চাদ্‌ভাগে 'পদ্ম' নামে একটি অতিদুর্ভেদ্য গর্ভব্যূহ স্থাপন করেছিলেন দ্রোণ। সেই পদ্মব্যূহের মধ্যে আবার 'সূচী' নামের একটি গুপ্তব্যূহ নির্মাণ করা হয়েছিল—

পশ্চার্দ্ধে তস্য পদ্মস্তু গর্ভব্যূহঃ সুদুর্ভিদঃ।
সূচী পদ্মস্য গর্ভস্থো গূঢ়ো ব্যূহঃ কৃতঃ পুনঃ॥

সূচীব্যূহের অগ্রভাগে স্থাপন করা হল কৃতবর্মাকে। এই সূচীব্যূহের মধ্যে লুকিয়ে থাকলেন জয়দ্রথ।

[মহা (k) ৭.৮৭.২২-২৪; (হরি) ৭.৭৫.৪৪-৪৬]

□ দ্রোণাচার্য নিজে সমগ্র ব্যূহটির অগ্রভাগে অবস্থান করছিলেন। তিনি জয়দ্রথকে নির্দেশ

দিয়েছিলেন—ভূরিশ্রবা, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য, কৃপাচার্য প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর নিজের অবস্থান থেকে ছয় ক্রোশ দূরে থাকেন এবং সেখানে জয়দ্রথ এবং সহগামীদের সঙ্গে থাকবে একলক্ষ অশ্বারোহী, ষাটহাজার রথী, চোদ্দহাজার মদস্রাবী হস্তী এবং একুশ হাজার পদাতিক সৈন্য।

ব্যূহমুখ থেকে জয়দ্রথকে নিরাপদ দূরত্বে স্থাপন করে আত্মবিশ্বাসী দ্রোণের মনে হয়েছিল—যেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের নেতৃত্বে দেবকুল উপস্থিত হলেও ব্যূহভেদ করে জয়দ্রথকে খুঁজে বের করা সম্ভব হবে না তাঁদের পক্ষে। দ্রোণাচার্যের কথায় আশ্বস্ত হয়ে জয়দ্রথ নয় হাজার সিন্ধুদেশীয় এবং গান্ধারদেশীয় সৈন্যে বেষ্টিত হয়ে সূচীব্যূহের একপাশে আত্মগোপন করে থাকলেন। অবশ্য দ্রোণ মনে মনে হয়তো এও ভেবেছিলেন যে, প্রিয়শিষ্য অর্জুনকে যে শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন আজই তার সব থেকে কঠিন পরীক্ষা। গুরু জেতেন না শিষ্য—সেদিকেই সাগ্রহে তাকিয়ে রইলেন দ্রোণ।

[মহা (k) ৭.৮৮.১২-১৭, ২৭; (হরি) ৭.৭৫.৩৫-৪০, ৫০]

☐ দ্রোণ-নির্মিত চক্রশকটব্যূহ উপস্থিত সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করছিল। গগনস্থিত সিদ্ধ-চারণগণ যেমন 'ক্ষুব্ধসমুদ্রতুল্য ব্যূহটি দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন তেমনই বিস্মিত হয়েছিলেন দুর্যোধন। দেখে মনে হচ্ছিল ব্যূহটি সমগ্র পৃথিবীকেই গ্রাস করতে চলেছে।

[মহা (k) ৭.৮৭.৩২-৩৩; (হরি) ৭.৭৫.৫৪-৫৬]

☐ P.C. Sensharma-র মতে চক্রশকটব্যূহ কুরুক্ষেত্রের চতুর্দশ দিনের আগে সকলের কাছেই অপরিচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যূহে কেন্দ্রস্থলের আকৃতি শকটের মত হলেও চারপাশ থেকে তাকে বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছিল চক্রব্যূহ। তবে চক্রব্যূহটিও বিশুদ্ধ চক্রাকৃতির ছিল না। দ্রোণাচার্য একটি চক্রাকার ব্যূহের পরিবর্তে পদ্মের পাপড়ির আকৃতি বিশিষ্ট একাধিক ক্ষুদ্র ব্যূহ তৈরি করেছিলেন যেগুলি পরস্পর সংলগ্ন হয়ে কেন্দ্রের শকটব্যূহটিকে রক্ষা করছিল। প্রত্যেকটি পদ্মাকৃতি বিশিষ্ট ব্যূহের অন্তর্বর্তী প্রান্তে রথারোহী যোদ্ধারা অপেক্ষা করছিলেন বিপক্ষের জন্যে।

দ্রোণাচার্য এমন একটি জটিল ব্যূহসজ্জা পরিকল্পনা করেও অবশ্য জয়দ্রথকে রক্ষা করতে পারেননি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে চতুর্দশ দিনের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করেন। তবে সেক্ষেত্রে বাসুদেব কৃষ্ণের কৌশলী ভূমিকাও স্মরণীয়।

[K. W (Sensharama) p. 110-111]

চক্রহৃদয়া অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য ভগবান শিব নিজের দেহ থেকে যেসব মাতৃকা সৃষ্টি করলেন তাঁরা অন্ধকাসুর বধের পর ক্ষুধার্ত হয়ে সমস্ত সৃষ্টিকে গ্রাস করতে উদ্যত হলেন। তখন এই মাতৃকাদের দমন করার জন্য নৃসিংহদেব নিজের দেহ থেকে যেসব মাতৃকা সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে চক্রহৃদয়া একজন।

[মৎস্য পু. ১৭৯.৬৮]

চক্রা পৌরাণিক ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী। *[বায়ু পু. ৪৩.২৫]*

চক্রাক্ষ১ প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা খশার গর্ভজাত রাক্ষসদের মধ্যে একজন ছিলেন চক্রাক্ষ।

[বায়ু পু. ৬৯.১৬৮]

চক্রাক্ষ২ দৈত্যরাজ বলির অন্যতম সেনাপতি। বলি স্বর্গ আক্রমণ করলে যে ভয়াবহ দেবাসুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়, চক্রাক্ষ সেই যুদ্ধের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। *[ভাগবত পু. ৮.১০.২১]*

চক্রাতি ভারতবর্ষের অন্তর্গত একটি জনপদ। মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত জম্বুখণ্ড বিনির্মাণ পর্বে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদের এবং নদনদীর নাম বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। এই প্রসঙ্গেই চক্রাতি জনপদটির নাম উল্লিখিত হয়েছে। তবে এই জনপদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

[মহা (k) ৬.৯.৪৫; (হরি) ৬.৯.৪৫]

চক্রাশ্ম এটি খুব প্রচলিত অস্ত্র নয় এবং যতখানি এটি অস্ত্র, তার চাইতে বেশি হল যন্ত্র। টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখেছেন—এটি হয়তো কাঠের চাকা দিয়ে তৈরি কোনো জিনিস, যেটাকে ঘুরিয়ে বড়ো বড়ো পাথর শত্রুর দিকে নিক্ষেপ করা যায়—

চক্রাশ্মসংজ্ঞং যস্য ভ্রমিবেগেন পাষাণা
অতিদূরে ক্ষিপ্যন্তে তৎ কাষ্ঠময়ং যন্ত্রম্।

অর্জুনের খাণ্ডবদহন পর্বে অসুর-রাক্ষস-নাগজাতীয়রা এই অস্ত্র ব্যবহার করেছিল।

[মহা (k) ১.২২৭.২৫; (হরি) ১.২২০.২৫]

চক্রী১ পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি চক্রীর

বংশ তার মধ্যে একটি। চক্রী মহর্ষি অঙ্গিরার বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক বংশকর পিতা ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৬.২৩]*

চক্রী২ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের অন্যতম। বিষ্ণু সহস্রনাম স্তোত্রে দুবার 'চক্রী' শব্দ ভগবান বিষ্ণুর নাম হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। ভগবান বিষ্ণু সুদর্শনচক্র ধারণ করেন, তাই তাঁর অন্যতম নাম চক্রী। বিষ্ণু পুরাণে একটি শ্লোকে এই চক্রকে মানব মনস্তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

চলস্বরূপমত্যন্তং জবেনান্তরিতানিলম্।
চক্রস্বরূপং চ মনো ধত্তে বিষ্ণুঃ করে স্থিতম্॥

[বিষ্ণু পু. ১.২২.৭১]

মানুষের চিন্তার গতিবেগ সবথেকে বেশি। পণ্ডিত-দার্শনিকরা ভগবান বিষ্ণুর হস্তস্থিত চক্রকে মানব মনের থেকেও বেগবান বলে কল্পনা করেন। সুতরাং মানুষের মনের গতিকেও তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন—এই ভাবনা থেকে ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র মানব মনস্তত্ত্বেরই প্রতিরূপ হিসেবে কল্পিত হয়। বিষ্ণু পুরাণে ধৃত এই শ্লোকটিও এই ভাবনাকেই বহন করছে। চক্র রূপে মানব মনস্তত্ত্বকেই ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করেন বলে ভগবান বিষ্ণু 'চক্রী' নামে খ্যাত—

সমস্তলোকরক্ষার্থং মনস্তত্ত্বাত্মকং সুদর্শনাখ্যং চক্রং ধত্ত ইতি চক্রী (শাঙ্করভাষ্য)।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.১১০, ১২০; (হরি) ১৩.১২৭.১১০, ১২০]

চক্রেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। *[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচন কাণ্ড) পৃ. ৫২]*

চক্রোড় বশিষ্ঠবংশীয় অন্যতম বংশ প্রবর্তক ঋষি। *[মৎস্য পু. (মহর্ষি) ২০০.১৭]*

চক্ষু১ রাজা উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবর বংশধারায় সর্বতেজার ঔরসে আকৃতির গর্ভজাত পুত্র চক্ষু। ভাগবত পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী, এই চক্ষুর ঔরসে চাক্ষুষ মনু জন্মগ্রহণ করেন। তবে ভাগবত পুরাণে চাক্ষুষ মনুর মাতার নাম উল্লিখিত হয়নি। *[ভাগবত পু. ৪.১৩.১৫; ৮.৫.৭]*

□ মৎস্য পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে, চক্ষু ধ্রুবর বংশধারায় রিপুঞ্জয়ের পুত্র। রিপুঞ্জয়ের ঔরসে বীরণ প্রজাপতির কন্যা বীরিণীর গর্ভে তাঁর জন্ম। চক্ষু ষষ্ঠ মন্বন্তরের অধিপতি চাক্ষুষ মনুর পিতা ছিলেন। *[মৎস্য পু. ৪.৪০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১০২]*

চক্ষু২ যযাতির ঔরসে শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন অনু। অনুর দ্বিতীয় পুত্র চক্ষু। *[ভাগবত পু. ৯.২৩.১; বিষ্ণু পু. ৪.১৮.১]*

চক্ষু৩ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, তুষিত তার মধ্যে একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে চক্ষু একজন। *[বায়ু পু. ৬৬.১৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.১৯]*

চক্ষু৪ ধর্মের ঔরসে মরুত্বতী দেবীর গর্ভজাত দেবতারা মরুত্বৎ বা মরুৎ গণ হিসেবে পরিচিত। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে চক্ষু একজন। *[মৎস্য পু. ১৭১.৫২]*

চক্ষু৫ পুরাণ মতে, গঙ্গার চারটি ধারার মধ্যে অন্যতম প্রধান ধারা চক্ষু। ভাগবত পুরাণ এবং বিষ্ণু পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী চক্ষু নদী মাল্যবান পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে পৌরাণিক কেতুমাল বর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিম সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। তবে বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে চক্ষুর গতিপথে অবস্থিত জনপদের একটি বড়ো তালিকা পাওয়া যায়। এই দুই পুরাণ মতে চক্ষু নদী চীন, অরু, তঙ্গণ (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে তালা), সর্বমূলিকা (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে মসমূলিকা), অন্ধ্র (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ভদ্র), তুষার, স্তম্পাক (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে লাম্যাক), পহ্লব (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বাহ্লব), দরদ (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পারট) এবং শক (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে খশ) —এই জনপদ গুলির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পণ্ডিত N.L. Dey এই জনপদের তালিকা থেকে চক্ষুকে পামীর হ্রদ থেকে উৎপন্ন Oxus বা আমুদরিয়া নদীর সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। N.L. Dey -র মতে, জম্বু দ্বীপের এই অঞ্চলটিকেই বা এই জনপদগুলিকেই একত্রে কেতুমাল বর্ষ নামে উল্লেখ করা হয়েছে পুরাণে।

[বায়ু পু. ৪৭.৩৯-৪৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৪১, ৪৬-৪৭; মৎস্য পু. ১২১.৪০; বিষ্ণু পু. ২.২.৩৫, ৩৮; ভাগবত পু. ৫.১৭.৫, ৭; GDAMI (Dey), p. 43]

চক্ষু৬ প্রজাপতি ব্রহ্মার ঔরসে দ্যৌ নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত দশপুত্রের মধ্যে চক্ষু একজন। *[মহা (k) ১.১.৪৫; (হরি) ১.১.৪২]*

চক্ষু৭ মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে রাজা মরুত্ত ভগবান শিবের উদ্দেশে যে স্তব করেছিলেন, সেটি বর্ণিত হয়েছে। এই স্তোত্রে রাজা মরুত্ত শিবকে চক্ষু নামে সম্বোধন করেছেন। পণ্ডিত

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভগবান শিবকে জ্ঞানচক্ষু স্বরূপ বলে উল্লেখ করেছেন ভারতকৌমুদী টীকায়। জ্ঞানচক্ষুস্বরূপ বলেই শিবের একটি নাম চক্ষু। *[মহা (k) ১৪.৮.১৮; (হরি) ১৪.৮.১৯]*

চক্ষুর্বর্ধনিকা মহাভারতে পৌরাণিক শাকদ্বীপের বিবরণ পাওয়া যায় ভীষ্মপর্বে, সঞ্জয়ের মুখে ভুবনকোষ বর্ণনায়। মহাভারতের বিবরণ অনুযায়ী শাকদ্বীপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলির মধ্যে চক্ষুবর্ধনিকা অন্যতম।

[মহা (k) ৬.১১.৩৩; (হরি) ৬.১১.৩২]

চক্ষুষ১ যযাতির পুত্র অনুর বংশধারায় অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন বলি। বলি পুত্র উৎপাদনে অক্ষম ছিলেন। তাই বৃদ্ধ ঋষি দীর্ঘতমাকে রাজমহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের জন্য নিয়োগ করেন। কিন্তু সুদেষ্ণা কুরূপ বৃদ্ধ ঋষির কাছে যেতে চাননি। তাই নিজের পরিবর্তে একটি সুন্দরী দাসীকে সাজিয়ে দীর্ঘতমার কাছে পাঠিয়ে দেন। দীর্ঘতমার ঔরসে সেই দাসীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে চক্ষুষ একজন।

[বায়ু পু. ৯৯.৭০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.৭১]

চক্ষুষ২ বৈবস্বত মনুর পুত্র নাভাগের বংশধারায় খনিত্রের (কাঞ্চীপুরম্ সংস্করণ মতে খনিমিত্রের) পুত্র চক্ষুষ। চক্ষুষের পুত্র বিংশ।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.১.২৫]

চঞ্চলা ঋক্ষবান বা ঋষ্যবন্ত পর্বতজাতা একটি নদী।

[মৎস্য পু. ১১৪.২৬]

চঞ্চু ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা হরিতের পুত্র চঞ্চু। হরিতের পুত্র বলেই তিনি হারীত নামেও বিখ্যাত। রাজা চঞ্চু বিজয় এবং সুদেব নামে দুই পুত্রসন্তানের পিতা ছিলেন। বিষ্ণু পুরাণে চঞ্চুর পুত্র সুদেব বসুদেব নামে উল্লিখিত হয়েছেন। *[বায়ু পু. ৮৮.১১৯-১২০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১১৭; বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.৩.২৫]*

চণ্ড১ মহাপরাক্রমশালী অসুর বাষ্কলের পুত্র চণ্ড।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫.৩৮]

চণ্ড২ ভগবান রুদ্র-শিবের অন্যতম পার্ষদ। শিবের অনুচরগণের অন্যতম অধিপতি হিসেবে পুরাণে চণ্ডের নাম উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৪১.২৮]

চণ্ড৩ রামায়ণে রামচন্দ্রের সহায়ক বানর যূথপতিদের মধ্যে চণ্ড নামে একজন বানরের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি সুগ্রীবের অনুগত ছিলেন। লঙ্কার যুদ্ধে চণ্ডকে অন্যতম সেনাপতি হিসেবে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়।

[রামায়ণ ৬.২৬.২৭-২৮]

চণ্ড৪ স্কন্দ পুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে নর্মদা বা রেবা নদীর তীরবর্তী চণ্ডাদিত্য তীর্থের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে চণ্ড নামে জনৈক অসুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। দৈত্য চণ্ড নর্মদা নদীর তীরে কঠোর তপস্যা করে সূর্য দেবতাকে প্রসন্ন করেছিলেন। চণ্ডের আরাধনায় তুষ্ট হয়ে সূর্যদেব চণ্ডকে অজেয় এবং নীরোগ হবার বর দেন। চণ্ডকে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী বর দেবার পর সূর্যদেব অন্তর্হিত হলে চণ্ড দৈত্য সূর্যের প্রতি ভক্তিবশত ঐ স্থানটিতে চণ্ডভানু নামে এক পবিত্র তীর্থের প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে চণ্ডভানু তীর্থটি চণ্ডাদিত্য তীর্থ নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করে। *[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/রেবা) ৯১.২-৯]*

চণ্ড৫ স্কন্দ পুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে অন্য একটি উপাখ্যানে চণ্ড এবং প্রচণ্ড নামক দৈত্যযুগলের উল্লেখ পাওয়া যায়। একবার চণ্ড প্রচণ্ড দুজনে কৈলাস পর্বতে পৌঁছালেন এবং সেখানে শিব ঘরণী পার্বতীকে দেখে মুগ্ধ হলেন। চণ্ড প্রচণ্ড দুজনে মিলে ধীরে ধীরে পার্বতীর দিকে এগোচ্ছেন দেখে মহাদেবের প্রধান অনুচর নন্দী তাঁদের বাধা দিলেন। চণ্ড-প্রচণ্ড নন্দীর নিষেধ অগ্রাহ্য করলে শিবের অনুচরদের সঙ্গে তাঁদের প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হল। পরাক্রমশালী চণ্ড-প্রচণ্ডের হাতে কৈলাসনিবাসী মহাদেবের বহু অনুচরের মৃত্যুও হল। এই ঘটনা দেখে স্বয়ং মহাদেব দেবী পার্বতীকে চণ্ড-প্রচণ্ডকে বধ করতে অনুরোধ করলেন। শক্তিস্বরূপা দেবী পার্বতী চণ্ড এবং প্রচণ্ড বধ করার জন্য এক ভয়ংকর মুদ্‌গর নিক্ষেপ করেন। মুদ্‌গরের আঘাতে চণ্ড-প্রচণ্ডের মৃত্যু হয়। 'হর' অর্থাৎ শিবের অনুরোধে তাঁর প্রিয়কার্য অর্থাৎ চণ্ডবধ সম্পন্ন করার পর দেবী পার্বতী-দুর্গা 'হরসিদ্ধি' নামেও বিখ্যাত হন।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তী) ১৯.২-১০]

চণ্ড৬ শুধুমাত্র স্কন্দ-পুরাণেই নয়, একাধিক পুরাণে একাধিক যুদ্ধে দেবী দুর্গার হাতে চণ্ডনামক দৈত্যের বধসংবাদ পাওয়া যায়। পুরাণে বর্ণিত এই উপাখ্যানগুলির মধ্যে সবথেকে বেশি প্রসিদ্ধ মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যের অন্তর্গত চণ্ড-মুণ্ড বধের কাহিনী। যুগল দৈত্যাধিপতি শুম্ভ-নিশুম্ভের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন চণ্ড।

দেবী পার্বতী শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের উদ্দেশ্যে 'কৌশিকী' রূপে হিমালয়ে অবস্থান করছিলেন। দেবী কৌশিকীর অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখে শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি চণ্ড এবং মুণ্ড মুগ্ধ হয়ে দৈত্যাধিপতি যুগলকে সেই অপরূপা রমণীর কথা জানালেন। সেই রমণী যে শুম্ভ নিশুম্ভ দুই অসুরের কোনো একজনের মহিষী হবার উপযুক্ত—সেকথাও জানাতে ভুললেন না। শুম্ভ-নিশুম্ভ চণ্ড-মুণ্ডের মুখে দেবী কৌশিকীর রূপের বৃত্তান্ত শুনে মুগ্ধ হলেন। তাঁরা সুগ্রীব নামে এক দৈত্যকে পাঠালেন দূত হিসেবে। প্রস্তাব, দেবী যেন শুম্ভ-নিশুম্ভের মধ্যে কোনো একজনকে স্বামীরূপে বরণ করেন। বিবাহের পাত্র হিসেবে তাঁরা যে সত্যিই উপযুক্ত তা জানাবার জন্য নিজেদের শক্তি-পরাক্রম-ঐশ্বর্য্য সবকিছুর বিশদ বিবরণও তাঁরা জানালেন দূতের মাধ্যমে। দেবী কৌশিকী দূতের মুখে সব শুনে বললেন—বেশ। শুম্ভ-নিশুম্ভ দুজনেই যে মহাপরাক্রমশালী, ত্রিলোকজয়ী দৈত্যরাজ, তা আমি বুঝলাম। কিন্তু আমার নিজের একটা প্রতিজ্ঞা আছে। যে ব্যক্তি আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করবে, শুধুমাত্র তাকেই আমি স্বামীরূপে বরণ করব। দূতের মুখে দেবীর প্রতিজ্ঞার কথা শুনে শুম্ভ-নিশুম্ভ সেনাপতি ধূম্রলোচনকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন সসৈন্যে গিয়ে দেবীকে বন্দি করে নিয়ে আসেন। কিন্তু দেবীর হাতে ধূম্রলোচন এবং তাঁর সঙ্গী অসুর সৈন্যদের মৃত্যু হল। এরপর শুম্ভ-নিশুম্ভের আদেশে দেবী কৌশিকীর বিরুদ্ধে সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা করলেন অসুর সেনাপতি চণ্ড এবং মুণ্ড। দেবীর সঙ্গে চণ্ড-মুণ্ডের তুমুল যুদ্ধ হল। শেষ পর্যন্ত দেবীর হাতে চণ্ড এবং মুণ্ড দুজনেই নিহত হলেন। দেবীর হাতে চণ্ড-মুণ্ড উভয়ের মৃত্যু হল বলেই দেবী খ্যাত হলেন চামুণ্ডা নামে—

যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি॥

[মার্কণ্ডেয় পু. ৮৫-৮৭ অধ্যায়]

চণ্ড$_{7}$ স্কন্দ পুরাণের কাশীখণ্ডে বর্ণিত একটি উপাখ্যানেও দেবী দুর্গার হাতে জনৈক চণ্ড নামক অসুরের নিহত হবার সংবাদ পাওয়া যায়।

[স্কন্দ পু. (কাশী) ২.৭১.৭৩]

চণ্ড$_{8}$ বৈবস্বত মনুর পুত্র নাভাগের বংশধারায় রাজা বৎসপ্রীর ঔরসে সুনন্দার গর্ভজাত বারোজন পুত্রসন্তানের মধ্যে চণ্ড একজন।

[মার্কণ্ডেয় পু. ১১৭.২]

চণ্ড$_{9}$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা সুরভির গর্ভে একাদশ রুদ্রের জন্ম হয়। এই রুদ্রদের মধ্যে চণ্ড একজন। *[শিব পু. (শতরুদ্র) ১৮.১৮-২৮]*

চণ্ড$_{10}$ হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে আনন্দ নামে একটি সরোবর আছে। কথিত আছে এই সরোবরে চণ্ড নামে এক মহাবলশালী নাগরাজ বাস করেন। তাঁর একশত ফণা, একশত ফণার প্রতিটিই ভগবান বিষ্ণুর চক্রচিহ্ন যুক্ত। *[বায়ু পু. ৪১.৭২-৭৩]*

চণ্ড$_{11}$ পুরাণে মহাশিবরাত্রির ব্রতের মাহাত্ম্য উপলক্ষে এক ব্যাধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। শিবপুরাণের বঙ্গীয় সংস্করণে ব্যাধের নাম রুরুদ্রুহ ছিল বলে উল্লিখিত হলেও স্কন্দ এবং পদ্মপুরাণে প্রাপ্ত কাহিনী অনুযায়ী ব্যাধের নাম ছিল চণ্ড।

মহাশিবরাত্রির ব্রতের মাহাত্ম্যের কাহিনীটি এই—কোনো এক সময় সেই ব্যাধ শিকারের সন্ধানে গভীর বনে প্রবেশ করল। কিন্তু সারাদিন ঘুরেও একটি পশুর সন্ধানও পেল না। ঘরে তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা অভুক্ত—এ অবস্থায় খালি হাতে ঘরে ফিরে যাওয়া মোটেই উচিত হবে না। এইসব ভাবতে ভাবতে প্রায় সন্ধ্যার সময় ব্যাধ এক জলাশয়ের ধারে এসে উপস্থিত হল। এই জলাশয়ে নিশ্চয় রাত্রে পশুরা জল খেতে আসবে এবং তখন অবশ্যই শিকার পাওয়া যাবে—এই আশায় চণ্ড জলাশয় তীরের একটি বেলগাছে উঠে বসে রইল। সঙ্গে ছিল খানিকটা পানীয় জল। রাত যত গভীর হতে লাগল, শিকারের দেখা না পেয়ে হতাশ হয়ে চণ্ড বেলগাছের একটি একটি করে পাতা ছিঁড়ে গাছ তলায় ফেলতে লাগল। আর প্রহরে প্রহরে সেই পানীয় জলও একটু একটু করে নীচে ফেলে দিতে লাগল দুঃখে, হতাশায়, অভুক্ত পরিবার-পরিজনের দুশ্চিন্তায়। সেদিন ছিল মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত। ব্যাধ সারারাত শিকারের আশায় জেগে রইল আর প্রহরে প্রহরে বেলপাতা, পানীয় জল ফেলতে লাগল গাছতলায়। ব্যাধ জানতেও পারল না যে, সেই বেলগাছের নীচে একটি শিবলিঙ্গ ছিল। সেই মহাশিবরাত্রির দিনে সারারাত জেগে, নিরম্বু উপবাসে ব্যাধ নিজের অজান্তেই জল এবং বেলপাতা দিয়ে শিবের পূজা-অর্চনা করে

মহাশিবরাত্রির ব্রত সম্পন্ন করল। এই ব্রতের ফলে তার মনে ব্যাধজাতির সহজাত ক্রূর ভাব দূর হল, সমস্ত পাপ দূর হল, ব্যাধের মধ্যে জন্ম নিল আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান।

এদিকে সারারাত ব্যাধ বাড়ি ফিরল না দেখে চিন্তিত হয়ে চণ্ড-ব্যাধের পত্নী স্বামীর জন্য কিছু খাবার নিয়ে পরদিন সকালে এসে পৌঁছালো জঙ্গলে। তখন চতুর্দশী অতিক্রান্ত হয়ে অমাবস্যা আরম্ভ হয়েছে। স্ত্রীকে দেখে চণ্ড গাছ থেকে নেমে এলো এবং আগেরদিন সম্পূর্ণ অভুক্ত অবস্থায় কাটাবার পর এই মুহূর্তে ভোজনের ইচ্ছায় স্নান করার জন্য স্বামী-স্ত্রী জলে নামল। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি কুকুর এসে উপস্থিত হল সেখানে। জলাশয়ের তীরে খাবার পরে আছে দেখে ক্ষুধার্ত কুকুরটি তা খেতে শুরু করল। ব্যাধ আর তার পত্নী যখন স্নান করে এলো ততক্ষণে কুকুরের খাওয়া প্রায় শেষ। তা দেখে ব্যাধ পত্নী ক্রোধে প্রায় অন্ধ হয়ে কুকুরটিকে মারতে গেলো। কিন্তু ব্যাধের মানসিকতায় ততক্ষণে আমূল পরিবর্তন এসেছে। ব্যাধ বলল—ওকে মেরো না, ও যে তৃপ্তি করে পেট ভরে খেয়েছে, তাতেই আমারও ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়েছে। এরপরে ব্যাধের মনে নিজের জীবন, নিজের বৃত্তির প্রতি ঘৃণা জন্মাল, এতকাল নিরীহ প্রাণীদের বধ করে সে জীবন ধারণ করেছে, এই কথা স্মরণ করে অনুশোচনায় তার প্রাণ ভরে উঠল। গভীর দুঃখে হাতের খড়্গ তুলে নিয়ে ব্যাধ আত্মহত্যা করতে উদ্যত হল। ঠিক সেই সময় সেখানে উপস্থিত হলেন মহাদেবের অনুচর প্রমথরা। সঙ্গে এক দিব্য বিমান, ব্যাধকে তাঁরা জানালেন মহাশিবরাত্রির ব্রত পালনের ফলে ব্যাধের মোক্ষলাভের কথা। ব্যাধ এবং তাঁর পত্নী সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করে কৈলাস পর্বতে পৌঁছালেন এবং শিবলোকে শিবের অনুচর রূপে স্থান লাভ করলেন। *[শিব পু. (জ্ঞান) ৭৪ অধ্যায়; পদ্ম পু. (উত্তর) ১৫৪.১-৫৭; স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কেদার) ৩৩.৪-৬১]*

চণ্ড১২ যমরাজের অধীনে কার্যরত অন্যতম যমদূত। যমরাজের আদেশে চণ্ড, মহাচণ্ড এবং অন্যান্য যমদূতেরা পাপচারী ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর তাদের আত্মাকে যমের সামনে উপস্থিত করেন এবং যমের আদেশ অনুসারে তাদের দণ্ড কার্যকর করেন। *[ব্রহ্ম পু. ২১৫.৬৬.৭৭]*

চণ্ডকৌশিক মহর্ষি কাক্ষীবানের পুত্র। মগধরাজ বৃহদ্রথের রাজ্যে একটি আমগাছের ছায়ায় বসে তিনি তপস্যা করছিলেন। অপুত্রক রাজা বৃহদ্রথ পুত্রলাভের আশায় তাঁর দুই পত্নীকে নিয়ে চণ্ডকৌশিকের কাছে গেলেন এবং তাঁর সেবা করে তাঁকে তুষ্ট করলেন। ঋষি চণ্ডকৌশিক তুষ্ট হয়ে রাজাকে বর চাইতে বললেন। তখন রাজা বৃহদ্রথ তাঁর সন্তানহীনতার কথা শোনালেন তাঁকে। রাজার কথা শুনে চণ্ডকৌশিকের দয়া হল। তিনি রাজার পুত্রকামনা করে ধ্যানস্থ হলেন। তাঁর তপোবলে গাছ থেকে একটি পাকা আম পড়ল তাঁর কোলে। চণ্ডকৌশিক সেই মন্ত্রপূত ফলটি রাজার হাতে তুলে দিলেন। ফলটি রাজার দুই রাণী সমান ভাগে ভাগ করে খেলেন। মুনির কৃপায় দুই রাণীর গর্ভে একই পুত্রের দুই অর্ধাংশ জন্মগ্রহণ করল। জরা নামে এক রাক্ষসী সেই দুই অর্ধকে সংযুক্ত করলে পুত্রটি জীবনলাভ করে এবং জরাসন্ধ নামে খ্যাত হয়।

[মহা (k) ২.১৭.২২-৩৬; (হরি) ২.১৭.২৩-৩৬]

□ পুত্রজন্মের কিছুদিন পর রাজা বৃহদ্রথের ভবনে এসে উপস্থিত হলেন চণ্ডকৌশিক। শিশু জরাসন্ধ যে ভবিষ্যতে একচ্ছত্র সম্রাট হবেন সেকথা রাজাকে জানিয়ে গেলেন তিনি।

[মহা (k) ২.১৯.১-১৬; (হরি) ২.১৮.১-১৫]

চণ্ডঘণ্ট ভগবান শিবের একজন বিশিষ্ট অনুচর।

[মৎস্য পু. ১৮৩.৬৪]

চণ্ডতুণ্ডক পক্ষীরাজ গরুড়ের পুত্ররা সকলেই সুপর্ণ নামে খ্যাত। এই সুপর্ণদের মধ্যে একজন ছিলেন চণ্ডতুণ্ডক। *[মহা (k) ৫.১০১.৯; (হরি) ৫.৯৪.৯]*

চণ্ডবল মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব থেকে জানা যায় যে, লঙ্কাযুদ্ধে কুম্ভকর্ণের হাতে সে সব বানরবীর নিহত হয়েছিলেন চণ্ডবল তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৩.২৮৭.৬; (হরি) ৩.২৪১.৬]

চণ্ডবেগ একজন গন্ধর্বরাজ। তাঁর তিনশো ষাট জন গন্ধর্ব পারিষদ ছিল বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। চণ্ডবেগ একবার সপারিষদ রাজা পুরঞ্জন শাসিত নগরীতে প্রবেশ করে লুণ্ঠন করেন। সেই নগরীর দ্বারপাল ছিলেন বিষধর সর্পেরা। তাঁরা সকলে একত্রিত হয়ে চণ্ডবেগের পারিষদগণের বিরুদ্ধে একশো বছর যুদ্ধ করেছিলেন।

ভাগবত পুরাণের ব্যাখ্যায় চণ্ডবেগের পারিষদগণকে রূপক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে।

সেখানে তিনশো ষাট জন পারিষদকে বৎসরের তিনশো ষাট দিন বলে কল্পনা করা হয়। আবার তাঁদের মধ্যে পুরুষ গন্ধর্বদের দিন এবং স্ত্রীদের রাত্রির পরিচায়ক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৪.২৭.১৩-১৬]

চণ্ডবেগা একটি পবিত্র পিতৃতীর্থ। চণ্ডবেগা নদী তীর্থে শ্রাদ্ধকার্য করলে কুরুক্ষেত্রের চেয়েও বেশি পুণ্যলাভ হয়। *[মৎস্য পু. ২২.২৮]*

চণ্ডভার্গব মহর্ষি চ্যবনের বংশজাত একজন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ। ইনি জনমেজয়ের সর্পসত্রের হোতা ছিলেন। *[মহা (k) ১.৫৩.৫; (হরি) ১.৪৮.৫]*

চণ্ডমনা চন্দ্রের রথের দশটি ঘোড়ার মধ্যে একটি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৩.৫৬]

চণ্ডশ্রী কলিযুগের অন্ধ্রবংশীয় একজন রাজা। রাজা শান্তিকর্ণের বংশধারায় বিজয়ের পুত্র চণ্ডশ্রী। ইনি শান্তিকর্ণিক-চণ্ডশ্রী নামেও পরিচিত। চণ্ডশ্রী দশ বছর পৃথিবী শাসন করেছিলেন—একথা পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে। *[মৎস্য পু. ২৭৩.১৫]*

চণ্ডা১ দেবী চণ্ডী বা দুর্গার কোনো পর্যায়বাচক শব্দ নয় এটা। কিন্তু কালিকা পুরাণে দেবী চণ্ডা চণ্ডীর অষ্ট শক্তিমূর্তির একতমা। কালিকা পুরাণে দেবী দুর্গার ধ্যানমন্ত্রে এই অষ্টশক্তির নাম হল—উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চামুণ্ডা এবং চণ্ডিকা—

উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চামুণ্ডা চণ্ডিকা তথা।।

এই কালিকা পুরাণেই বলা হয়েছে যে, দেবী চণ্ডীকে সব সময়ে পরিবেষ্টন করে থাকেন এই অষ্ট দেবী-শক্তি—

অভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্।
চিন্তয়েৎ সততং দেবীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাস্।।

কালিকা পুরাণে চণ্ডাকে দেবী চণ্ডীর অষ্টশক্তির একজন বললেও সেই তালিকার মধ্যে যেহেতু স্বয়ং চণ্ডিকাও আছেন, তাই চণ্ডাকেও দেবী চণ্ডীরই অন্য রূপ, বলে ভাবনা করা হয়। এই ভাবনা আরও দৃঢ় হয়, যখন মহাভারতে অর্জুন-কৃত দুর্গাস্তবে দেখি—দেবী দুর্গাকে চণ্ডা এবং চণ্ডী উভয় নামেই নমস্কার করা হচ্ছে—

চণ্ডি চণ্ডে নমস্তুভ্যং তারিণি বরবর্ণিনি।

চণ্ডা শব্দের অর্থ কোপনা এক ভয়ঙ্করী দেবী।

[কালিকা পু. ৫৯.২০-২১;
মহা (k) ৬.২৩.৫; (হরি) ৬.২৩.৫]

চণ্ডা২ অন্ধকাসুর কে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। চণ্ডা সেই মাতৃকাদের মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৭৯.১৬]*

চণ্ডাল 'চণ্ড' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ ক্রোধ, অর্থাৎ যাঁরা ক্রুদ্ধ হন তাঁরাই চণ্ডাল। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 'ক্রুদ্ধ' অর্থেই চণ্ডাল শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। সে কারণেই 'চণ্ডালের মত রাগ' বা 'চণ্ডাল স্বভাব'—এই জাতীয় শব্দবন্ধ ক্রূরতার পরিচয় হিসেবে আজও ব্যবহার করা হয়। সুতরাং চণ্ডাল অর্থে কোনো একটি বিশেষ জনজাতিকে নয়, সমাজের একটি নিম্ন শ্রেণীকে বোঝান হত, একথা বলা যেতে পারে। এঁরা প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় চতুর্বর্ণ বহির্ভূত মানুষ। হয়তো সেইজন্যই মহাভারতের আশ্রমবাসিক পর্বে বলা হয়েছে যে, কর্মফল অনুসারে মানুষ পাপযোনিজাত চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করে।

'চণ্ডাল' শব্দটির অন্যতম প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় ছান্দোগ্যোপনিষদে। সেখানে বলা হয়েছে যে, মানুষ কুৎসিত কর্মের কারণে চণ্ডালযোনিতে জন্মলাভ করে। কুকুর কিংবা শূকরের মতো অধম প্রাণীর সঙ্গে চণ্ডালের কথা ছান্দোগ্যোপনিষদে একই পংক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও সাধারণীকরণের ধারণাটি স্পষ্ট।

[ছান্দোগ্যোপনিষদ ৫.১০.৭;
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম) ৩.৪.১৭.১;
মহা (k) ১৩.৪৮.১১; ১৪.৩৬.৩০;
(হরি) ১৩.৪৮.৯; ১৪.৪৩.৩০]

□ মনু সংহিতায় শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তানকে নরাধম চণ্ডাল বলা হয়েছে। লক্ষণীয়, এখানে চণ্ডালদের সংকর বলে অপবিত্র জ্ঞান করা হলেও একবারও অস্পৃশ্য বলা হয়নি। আবার মহাভারতের শান্তিপর্বে চণ্ডালদের বেদবর্ণিত চতুর্বর্ণের অনুলোম ও প্রতিলোমবর্গীয় স্ত্রীর গর্ভজাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[মনু সংহিতা ১০.১২;
মহা (k) ১২.২৯৬.৯; ১৩.৪৭.৩৬; ১৩.৪৯.৯;
(হরি) ১২.২৮৯.৯; ১৩.৩৯.৩৬; ১৩.৬১.৯]

□ ছান্দোগ্যোপনিষদের অপর একটি মন্ত্রে বিদ্বান, যাঁর কাছে আত্মপর ভেদ নেই, তাঁর পক্ষে চণ্ডালকেও উচ্ছিষ্ট দান দোষের নয়—এমন কথা বলা হয়েছে। উপনিষদের এই পংক্তিটি

শঙ্করাচার্যের টীকায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে বলা হয়েছে বলা হয়েছে যে এই দান আসলে বৈশ্বানর অগ্নির প্রতি আহুতি দানের মতো। শঙ্করাচার্যের ভাবনা থেকে স্পষ্ট যে, এক্ষেত্রে চণ্ডালকে উচ্ছিষ্টদানের বিষয়টি তাঁর মতানুযায়ী সদর্থক নয়। অর্থাৎ সাধারণভাবে চণ্ডালকে উচ্ছিষ্টদান করা গ্রহণযোগ্য না হলেও বিদ্বান ব্রহ্মবাদীর সে বিচার থাকে না। ফলে তাঁর পক্ষে তা পাপ নয়। *[ছান্দোগ্যোপনিষদ ৫.২৪.৪]*

□ রামায়ণের আদিকাণ্ডে রাজা ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালত্ব প্রাপ্তির কাহিনী রয়েছে। ত্রিশঙ্কু একবার সশরীরে স্বর্গলাভের ইচ্ছায় একটি যজ্ঞানুষ্ঠানের অনুরোধ নিয়ে ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের প্রধান পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হন। বশিষ্ঠ ত্রিশঙ্কুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। বশিষ্ঠের সাহায্য না পেয়ে রাজা উপস্থিত হলেন বশিষ্ঠের তপস্বী পুত্রদের কাছে। ত্রিশঙ্কু সবিস্তারে বশিষ্ঠ কর্তৃক তাঁর প্রত্যাখ্যানের কথা তাঁদের কাছে বর্ণনা করলেন। উদ্দেশ্য বশিষ্ঠ-পুত্রদের সাহায্যে ঈপ্সিত যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন। বশিষ্ঠের তপস্বী পুত্ররা ত্রিশঙ্কুর কুলগুরুকে অমান্য করার স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত এবং ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁরাও সকলেই ত্রিশঙ্কুকে প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু ত্রিশঙ্কুও সহজে মত পরিবর্তন করতে রাজী হলেন না। বশিষ্ঠ এবং তাঁর পুত্রদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর অপর কোনো ঋষির সন্ধান করে তাঁর মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের কথা ত্রিশঙ্কু সদর্পে ঘোষণা করেন। তখন ক্রুদ্ধ বশিষ্ঠপুত্রেরা তাঁকে চণ্ডালত্ব প্রাপ্তির শাপ দেন। অভিশাপগ্রস্ত ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হলেন। তাঁর গায়ের রং নীল, বস্ত্রও নীলবর্ণের, অবিন্যস্ত কেশ, গলায় শ্মশানজাত ফুলের মালা, শ্মশানের ছাইয়ে সমস্ত শরীর ঢাকা। রাজার এই রকম চেহারা দেখে পাত্র-মিত্র-অমাত্য সবাই তাঁকে ত্যাগ করলেন। অসহায় ত্রিশঙ্কু সাহায্যের আশায় বশিষ্ঠের চিরশত্রু মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ত্রিশঙ্কু একসময় বিশ্বামিত্র এবং তাঁর পরিবারের বহু উপকার করেছিলেন। সেই কথা স্মরণ করে বিশ্বামিত্র তাঁকে আশ্রয় দিলেন। চণ্ডালত্বপ্রাপ্ত ত্রিশঙ্কু যাতে সশরীরে স্বর্গলাভ করেন সেই উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান আয়োজনের প্রতিশ্রুতিও দিলেন বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্রের পুত্রেরা পিতার আদেশে যজ্ঞের আয়োজন শুরু করলেন বটে তবে সকল ঋষিরা তাতে যোগ দিলেও বশিষ্ঠ ও তাঁর পুত্রেরা ক্ষত্রিয়-চণ্ডালের যজ্ঞে অংশ নিতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা সরাসরি এই যজ্ঞের দৈবিক মান্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। অপমানে বিধ্বস্ত বিশ্বামিত্র তাঁর আহ্বান অমান্যকারীদের অকাল মৃত্যুর অভিশাপ দেন। এরপর বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর উদ্দিষ্ট যজ্ঞটি আরম্ভ করলেন। যজ্ঞ শেষে তিনি দেবতাদের যজ্ঞীয় হবি গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র এবার একান্ত নিজ তপোবলেই ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে প্রবেশ করতে দিতে অরাজী। গুরুর অভিশাপে শাপগ্রস্ত রাজাকে তিনি অধোমস্তকে ভূতলের দিকে ফেরত পাঠালেন। ইন্দ্রের আচরণে ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র এবার স্থির করলেন ত্রিশঙ্কুর জন্য তিনি দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করবেন। ভাবামাত্রই বিশ্বামিত্রের প্রভাবে নক্ষত্র মণ্ডল সৃষ্টি হল। তাঁরই অভিপ্রায়ে দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডে ইন্দ্রের কোনো অস্তিত্ব রইল না। সমূহ বিপদের আশঙ্কায় সমগ্র দেবকুল বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের বাক্য মিথ্যা হওয়ার উপায় নেই। তখন মহর্ষি বললেন—চণ্ডালরূপী ত্রিশঙ্কু ভূ-তলে নয়, অধোমস্তক অবস্থাতে বিশ্বামিত্র সৃষ্ট নক্ষত্রমণ্ডলে দেবতার ন্যায় অধিষ্ঠান করবেন।

[দ্র. ত্রিশঙ্কু]

[রামায়ণ ১.৫৭.১১-৬০.৩৫]

□ মহাভারতের উদ্যোগপর্বে ব্রাহ্মণশ্রেণীকে হীন চণ্ডালদের সঙ্গে কথোপকথনে নিষেধ করা হয়েছে। *[মহা (k) ৫.৯২.১৪; (হরি) ৫.৮৫.১৪]*

□ মহাভারতের শান্তিপর্বের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, যেসব ব্রাহ্মণেরা অর্থের বিনিময়ে যাজন-যজন, জ্যোতিষচর্চা এবং শব-বহন করেন, তাঁরা সকলেই চণ্ডালতুল্য—

আহ্বায়কা দেবলকা নাক্ষত্রা গ্রামযাজকাঃ।
এতে ব্রাহ্মণচাণ্ডালা মহাপথিকপঞ্চমাঃ॥

[মহা (k) ১২.৭৬.৬; (হরি) ১২.৭৪.৯]

□ মহাভারতের অনুশাসনপর্বে চণ্ডালজাত বর্ণসংকর শ্বপাকের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্মশানে শবদেহের উদ্দেশে অর্পিত মধু, ঘৃত ইত্যাদি শ্বপাকদের খাদ্য। বস্তুত শ্বপাকগণ চণ্ডালদের

থেকেও নিম্নতর শ্রেণী এবং পণ্ডিতরা বলেন এঁরা কুকুরের (শ্বা) মাংস ভক্ষণ করতেন বলেই, তাঁদের নাম শ্বপাক। *[দ্র. শ্বপাক]*

[মহা (k) ১৩.৪৮.২১; (হরি) ১৩.৪০.২১]

□ চণ্ডালের ঔরসে মাগধীর গর্ভজাত বর্ণসংকর পুক্কস নামে পরিচিত। গাধা, ঘোড়া ও হাতির মাংস এঁদের প্রধান খাদ্য। পুক্কসগণ শবের বস্ত্র পরিধান করে এবং ভগ্ন পাত্রে ভোজনেই এঁদের অভ্যাস।

এছাড়াও চণ্ডালের ঔরসে নিষাদীর গর্ভে পাণ্ডুসৌপাক ও অন্তেবসায়ী নামে বর্ণসংকর দুটিও উৎপন্ন হয়। অন্তেবসায়ীরা শ্মশানবাসী এবং অতীব নিকৃষ্ট শ্রেণী বলে বিবেচিত হয়েছেন।

[মহা (k) ১৩.৪৮.২৪, ২৬, ২৮;
(হরি) ১৩.৪০.২৪, ২৬, ২৮]

□ মহর্ষি উতঙ্ক একবার কৃষ্ণের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেছিলেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট কৃষ্ণ তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বললে তিনি জলহীন অঞ্চলের মানুষের জন্য জল প্রার্থনা করেন। মরুভূমিতে জল দুর্লভ বলেই তাঁর এই বর প্রার্থনা।

উতঙ্ককে অভিপ্সীত বরদান করে বিষ্ণু দ্বারকায় গমন করলেন।

এরপর উতঙ্ক একসময় পিপাসার্ত অবস্থায় মরুভূমিতে বিচরণ করতে করতে জলকামনায় কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। কৃষ্ণনাম স্মরণ করতে করতেই জনশূন্য মরুভূমিতে হঠাৎই উতঙ্ক এক চণ্ডালের দেখা পেলেন। নগ্নদেহী, ধূলিধূসরিত সারমেয় পরিবেষ্টিত চণ্ডালটির চেহারা ভীষণ। কোমরে তরবারি, হাতে ধনুর্বাণ। সেই বিশালদেহী চণ্ডাল উতঙ্ককে পিপাসার্ত দেখে তৃষ্ণার জল তাঁর হাত থেকে গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন। চণ্ডালের স্পর্ধায় ক্রুদ্ধ উতঙ্ক তাঁকে যথাসম্ভব অপমান করলেন। বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও প্রত্যাখ্যাত হয়ে চণ্ডাল অন্তর্হিত হলেন। কৃষ্ণ স্বয়ং আবির্ভূত হলে উতঙ্ক চণ্ডালরূপ ধরে ব্রাহ্মণকে জলপানের অনুরোধ করার জন্য অনুযোগ জানালেন। কৃষ্ণ তখন উতঙ্ককে জানান যে, তিনি ইতিপূর্বে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে অনুরোধ করেছিলেন উতঙ্ককে অমৃত দানের। ইন্দ্র মর্ত্যবাসী ঋষিকে অমৃতদান করতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু কৃষ্ণের অনুরোধে ইন্দ্র শেষপর্যন্ত চণ্ডালের রূপ ধরে উতঙ্ককে অমৃত দান করতে উদ্যোগী হন। ব্রাহ্মণ উতঙ্ক হীন চণ্ডালরূপী ইন্দ্রকে চিনতে পারেননি। তাঁর দেওয়া তৃষ্ণার জলও তিনি প্রত্যাখান করেন।

[মহা (k) ১৪.৫৫.১-১৮; (হরি) ১৪.৭১.১-১৮]

□ মহাভারতের শান্তিপর্বে ঋষি বিশ্বামিত্র ও জনৈক চণ্ডালের একটি কাহিনী পাওয়া যায়। ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিকালে একবার বারোবছর ব্যাপী দীর্ঘ অনাবৃষ্টি ও খরা দেখা যায়। যার প্রভাবে সমস্ত জলাশয় শুষ্ক হয়ে পড়ে। প্রাণীরা জল ও খাদ্যের অভাবে প্রাণত্যাগ করে। সে সময় একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্ষুধার্ত অবস্থায় এক চণ্ডালপল্লীতে এসে পৌঁছান। সেখানে চারিদিকে সাপের খোলস দিয়ে সাজিয়ে ছোটো ছোটো কুঁড়ে ঘর তৈরি করা হয়েছিল। নানা আকৃতির মৃৎমাত্র, কুকুর, চর্মচ্ছেদনের অস্ত্র, শূকর ও গর্দভের অস্থি, শব ইত্যাদি সর্বত্র ছড়ানো। ক্ষুধার্ত বিশ্বামিত্র খাদ্যের সন্ধানে নিকটবর্তী একটি চণ্ডালের গৃহে প্রবেশ করেন। সেই গৃহে প্রথমে মাংস, অন্ন, ফল কোনো খাদ্যই তাঁর চোখে পড়লো না। অবসন্ন হতোদ্যম বিশ্বামিত্র তখন চণ্ডালভবনের মাটিতে শুয়ে বিশ্রাম নিতে শুরু করেন। এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল—একস্থানে সদ্য নিহত কুকুরের মাংস এবং দেহাবশেষ পড়ে আছে। দ্বিধাগ্রস্ত ঋষি প্রাণধারণের জন্য তা ভক্ষণ করাই স্থির করলেন। শাস্ত্রের কথা ভেবে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বনেও তখন তিনি সম্মত। রাত্রি গভীর হলে বিশ্বামিত্র সকলের অলক্ষ্যে মাংস চুরি করতে উদ্যত হলেন। গৃহদ্বারে পাহারায় ছিলেন এক চণ্ডাল। তিনি বিশ্বামিত্রের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। চণ্ডাল বিশ্বামিত্রের প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে তাঁকে কুকুরের মাংস গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। কখনো ধর্ম, শাস্ত্র বা আচারের কথা বলে কখনো বা তপস্যাজনিত পুণ্যহানির আশঙ্কার প্রসঙ্গ তুলেছেন চণ্ডালটি। কিন্তু বিশ্বামিত্রের কাছে সেই সময় প্রাণরক্ষার চেয়ে বড়ো কোনো ধর্ম ছিল না। নিজের যুক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি পুরাকালে মহর্ষি অগস্ত্য কর্তৃক বাতাপি অসুরের মাংস ভক্ষণের উদাহরণ দেন। বিশ্বামিত্র এভাবে একের পর এক যুক্তি উত্থাপন করছেন আর চণ্ডাল প্রতিযুক্তিতে তা খণ্ডন করে চলেছেন। যা প্রমাণ করে যে, সেকালে চণ্ডালদের সমাজে হীন বলে প্রতিপন্ন করা হলেও তাঁরা সামগ্রিকভাবে বোধহীন বা অজ্ঞানী ছিলেন

না। তর্কের এক পর্যায়ে পৌঁছে বিশ্বামিত্র অপর কোনো যুক্তি দিতে না পেরে চণ্ডালকে একসময় বলেন শুধুমাত্র চণ্ডাল পরিচয়ের কারণেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করার অধিকার তাঁর নেই।

দীর্ঘ দার্শনিক তর্ক-বিতর্কের পর বিশ্বামিত্র কুকুরের মাংস গ্রহণ করেন এবং আপদ-কালে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে নিজের প্রাণরক্ষার জন্য সমস্ত শিষ্টাচার এবং নীতি-নিয়মকেও যে অগ্রাহ্য করতে হয়, সেই সত্যটাই প্রতিষ্ঠা করলেন বিশ্বামিত্র।

[মহা (k) ১২.১৪১.১২-৯১;
(হরি) ১২.১৩৭.১২-৯১]

☐ ব্রাহ্মণের ধনরক্ষা অপর তিন বর্ণের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের অবশ্য কর্তব্য। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে এবিষয়ে এক ক্ষত্রিয় এবং চণ্ডালের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

পুরাকালে একবার এক রাজার সৈন্যরা কোনো এক ব্রাহ্মণের কতকগুলি গোরু হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল। অদূরেই একটি যজ্ঞস্থল। হৃত গোরুগুলির ক্ষুরের ধুলো যজ্ঞস্থলের সোমরসের সঙ্গে মিশে তাকে দূষিত করে। যজ্ঞের যাজক ব্রাহ্মণ সহ যজ্ঞ অয়োজক রাজাও সেই দূষিত সোমরস পান করে নরকে প্রবেশ করেন। তারপর একসময় সেই গোরুগুলির ক্ষুরের ধুলোয় এক যাজক ব্রাহ্মণের খাদ্য তণ্ডুলও নষ্ট হয়। সেই তণ্ডুল-ভক্ষণের পাপেই যাজক ব্রাহ্মণটি পরবর্তী জন্মে চণ্ডাল রূপে জন্মগ্রহণ করে। সেই চণ্ডাল জাতিস্মর রূপে জন্মেছিলেন। তিনি এক জ্ঞানী ক্ষত্রিয়ের কাছে হীন জন্ম থেকে মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করেন। সেই ক্ষত্রিয়ের উপদেশে চণ্ডাল যথাসময়ে কোনো এক ব্রাহ্মণের ধন রক্ষার যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে মুক্তি পেয়েছিলেন।

[মহা (k) ১৩.১০১.১-২৯; (হরি) ১৩.৮৮.১-২৯]

☐ একবার রাজা হরিশ্চন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে তাঁর ঈপ্সিত বস্তু দক্ষিণা দান করার জন্য রাজ্য, ধন ত্যাগ করে স্ত্রী-পুত্রকেও বিক্রয়ে বাধ্য হন। ধন-মান হীন স্বজনহারা হরিশ্চন্দ্র বহু ত্যাগ স্বীকার করেও বিশ্বামিত্রকে তাঁর অভীষ্ট দান করতে সক্ষম হলেন না। তখন তিনি নিজেকে বিক্রয় করবেন বলে স্থির করলেন। এইসময় ধর্মরাজ এক কুৎসিত শ্মশানচারী চণ্ডালের রূপ ধরে হরিশ্চন্দ্রের সামনে আবির্ভূত হলেন ক্রেতা রূপে। চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রকে ভৃত্য রূপে ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হরিশ্চন্দ্র সে প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। উচ্চবর্ণের কোনো মানুষের দাসত্ব তিনি গ্রহণ করতেই পারেন তবে চণ্ডালের দাস হয়ে সমাজে পতিত হতে চাইলেন না তিনি। এইরকম পরিস্থিতিতে সেখানে উপস্থিত হলেন বিশ্বামিত্র স্বয়ং হরিশ্চন্দ্রের অনীহা দেখে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হলেন। চণ্ডালের বশ্যতা স্বীকারের মাধ্যমে অবশিষ্ট দান-অর্থ সংগ্রহে হরিশ্চন্দ্রের অনিচ্ছা লক্ষ্য করে বিশ্বামিত্র তাঁকে শাপ দিতে উদ্যত হলেন। ভীত হরিশ্চন্দ্র তখন ঋষির কাছে প্রার্থনা করলেন চণ্ডালের পরিবর্তে তাঁকে বিশ্বামিত্রই যেন নিজ দাস রূপে গ্রহণ করেন। বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের প্রার্থনা পূরণ করলেন ঠিকই, কিন্তু তাতে তো দক্ষিণায় প্রাপ্য অর্থের সংস্থান হয়না—এই যুক্তি দেখিয়ে বিশ্বামিত্র প্রয়োগক্ষেত্রে দশযোজন পরিমাণ ভূমির বিনিময়ে দাস হরিশ্চন্দ্রকে চণ্ডালের কাছে বিক্রয় করলেন। ফলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হরিশ্চন্দ্রকে চণ্ডালের দাসত্ব গ্রহণ করতেই হল শেষ পর্যন্ত।

[দেবীভাগবত পু. ৭.২৩.৭-৩৯]

☐ দাস হরিশ্চন্দ্রকে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন চণ্ডাল। তাঁকে ক্রীতদাসের মত তিনি সময়ে সময়ে বেত্রাঘাত করতে লাগলেন। তারপর একদিন হরিশ্চন্দ্রকে তিনি শক্ত বাঁধনে বেঁধে রেখে দিলেন। অসহায় হরিশ্চন্দ্র স্ত্রী-পুত্রের কথা ভেবে ব্যথিত হলেন। কিন্তু তিনি নিজেও জানেন যে, চণ্ডালের সংস্পর্শে ইতিমধ্যেই তিনি সমাজে হীন হয়ে পড়েছেন। ফিরে যাওয়ার পথ নেই। পূর্বজীবনের সুখস্মৃতি মন্থন করা ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় নেই।

চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রকে শ্মশানে পাঠালেন শ্মশান রক্ষা করার কাজে নিযুক্ত করে। সেই সঙ্গে আদেশ দিলেন শ্মশানে শবদেহের ব্যবহৃত বস্ত্র আহরণ করতে। কাশীনগরীর দক্ষিণাংশে অবস্থিত শ্মশানক্ষেত্রই হরিশ্চন্দ্রের কর্মস্থল হয়ে উঠল, তখন থেকে চণ্ডাল প্রদত্ত জীর্ণ কাঠের দণ্ড নিয়ে তিনি শ্মশান রক্ষা করার কাজ শুরু করলেন।

হরিশ্চন্দ্রের এই কাহিনী এবং পূর্বোক্ত মহাভারতের অন্যান্য কাহিনীগুলিকেও বিচার করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, চণ্ডাল বলতে সেকালে কোনো বিশেষ পেশার কিংবা

বর্ণসংকরজাত মানুষকে বোঝানো হত না। এক্ষেত্রে যেমন একাধারে নিষাদ এবং শ্মশানচারীদের চণ্ডাল বলা হল। সুতরাং দুটি সম্ভাবনা থাকতে পারে এক, 'চণ্ডাল' সেকালেও একটি সাধারণীকৃত (Generalised) বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হত। দুই, চণ্ডাল আসলে একটি বর্ণসংকর শ্রেণী বিশেষ। সেই শ্রেণীর মধ্যে পেশাগত বিভিন্নতা বর্তমান। সম্ভবত দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

[দেবীভাগবত পু. ৭.২৪.১-৩২]

□ মৎস্য পুরাণে বারাণসীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এই পবিত্র অবিমুক্তক্ষেত্রে চণ্ডালের মত পাপাচারী জনজাতিগুলিও মুক্তিলাভ করে।

[মৎস্য পু. ৮৪.৫৬]

□ কোনো ব্রাহ্মণ অজ্ঞাত অবস্থায় চণ্ডাল জাতীয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলিত হলে বা চণ্ডাল গৃহে ভোজন করলে ধর্মচ্যুত হন। ব্রাহ্মণ সজ্ঞানে একই অপরাধ করলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হবেন।

চণ্ডাল জাতির হীনত্ব সূচক শ্লোক বিষ্ণু পুরাণেও পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে কোনো চণ্ডাল ব্যক্তি শ্রাদ্ধকার্য দর্শন করলে দেবগণ ও পিতৃগণ সেই শ্রাদ্ধে ভোজন করেন না।

[মৎস্য পু. ২২৭.৫৫; বিষ্ণু পু. ৩.১৭.১২]

□ পূর্ববৈদিক যুগে বর্ণভেদ প্রথার অনুপস্থিতির কারণে সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ খুব একটা প্রবল ছিল না বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। বৈদিক যুগের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বর্ণভেদ-শ্রেণীভেদ ইত্যাদি প্রকট হয়। পণ্ডিত রামশরণ শর্মা প্রমুখরা এই মতের প্রবর্তক। তবে প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি এবং উপনিষদে উদার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টিকে দেখার একাধিক উদাহরণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, বৈদিক সমাজের স্তরবিন্যাসের রীতি মেনে শূদ্র-চণ্ডালদের হীন চোখেই দেখা হত। তবে তাঁরা সম্পূর্ণত সমাজ বহির্ভূত ছিলেন—এ ধারণা বোধহয় খানিক পক্ষপাতদুষ্ট। সর্বোচ্চ সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও শূদ্র-চণ্ডালদের অন্তত ভাবনাগত দিক থেকে একেবারে ব্রাত্য করে দেওয়া হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি শ্লোককে উদ্ধৃত করা যায়। সেখানে প্রলয়কালে সৃষ্টির সমস্ত অংশের একটি মাত্র আদিব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেখানে সৃষ্টির অংশরূপে যেমন ব্রাহ্মণের উল্লেখ রয়েছে একইরকমভাবে চণ্ডালেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রলয়কালে সকলকে সমভাবনায় দেখার চেষ্টা বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্পষ্টভাবেই করা হয়েছে।

শুক্লযজুর্বেদীয় (বাজসনেয়ী) সংহিতায় পুরুষমেধ যজ্ঞের সময় চণ্ডালকে বায়ুর উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উৎসর্গ অর্থ বলিদান নয়, বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে গেলে এখানে অন্যান্য সকল শ্রেণীর মত চণ্ডালদেরও যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশগ্রহণের উদার ভাবনা করা হয়েছে। অস্পৃশ্যতার চিন্তা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

[বাজসনেয়ী সংহিতা (Weber) ৩০.২১; বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪.৩.২২; Ram Sharan Sharma; Sūdras in Ancient India; Delhi; Motilal Banarsidass; 1958; p. 81-82

□ পণ্ডিতদের মতে, ধর্মসূত্রের সময় থেকে শূদ্র-চণ্ডালদের উপর অস্পৃশ্যতা কঠোরভাবে আরোপিত হতে শুরু করে। বর্ণবিভক্ত সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদের অতিরিক্ত প্রাধান্যই এর মূল কারণ বলে ধারণা করা হয়। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে—চণ্ডালের স্পর্শ, দর্শন বা তাঁর সঙ্গে কথোপকথন—সবই প্রায়শ্চিত্তযোগ্য পাপ—

যথা চণ্ডালোপস্পর্শনে সম্ভাষায়াং
দর্শনে চ দোষস্তত্র প্রায়শ্চিত্তম্।

চণ্ডাল সংসর্গজনিত পাপমুক্তির জন্য পবিত্র জলে অবগাহনের কথাও আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে পাওয়া যায়। ফলে আবারও বলা যায় যে, শূদ্র-চণ্ডালদের উপর বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছিল ধর্মসূত্রের সময় থেকে। পূর্ববৈদিক কালে এধরনের কঠোরতা সচরাচর দেখা যেত না।

এ বিষয়ে রামশরণ শর্মার মত, অস্পৃশ্যতা আবির্ভূত হয়েছিল মূলত মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপন পূর্ববর্তী সময় থেকে। তার আগে এর প্রাদুর্ভাব খুব একটা চোখে পড়ে না। পালি ভাষার সাহিত্যেও চণ্ডালদের অস্পৃশ্য বলে বর্ণনা করার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

[আপস্তম্ব ধর্মসূত্র (চিন্নস্বামী) ২.২.৮; Ram Sharan Sharma; Sūdras in Ancient India; Delhi; Motilal Banarsidass; 1958; p. 126]

□ পূর্ব বৈদিক যুগে চণ্ডাল বলতে মূলত অনার্য জনজাতিকে বোঝানো হত। পরে অবশ্য 'চণ্ডাল' অর্থে বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতি নির্দেশ করা হয়।

[Dr. B. Puri; India in the time of Patanjali; Bombay; Bhartiya Vidya Bhavan; 1957; p. 90-91; পঠিতব্য B.R. Ambedkar; The Untouchables; New Delhi; Amrit Book Co.; 1948]

চণ্ডাশ্ব *[দ্র. চন্দ্রাশ্ব]*

চণ্ডী ভগবদ্‌গীতায় যেমন 'যদা যদা হি ধর্মস্য' নামের প্রাবাদিক শ্লোকটিতে 'যখন যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হবে, তখন তখনই আমি আবির্ভূত হবো' এইরকম একটি প্রতিজ্ঞা ছিল, মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত বিখ্যাত দুর্গাসপ্তশতীর মধ্যেও ভগবতী মহামায়ার অনুরূপ একটি প্রতিজ্ঞা আছে এই মর্মে যে, যখন যখনই অসুর-দানবেরা শুভশক্তির পথে বাধা সৃষ্টি করবে, তখন তখনই আমি অবতীর্ণ হয়ে শত্রু বিনাশ করবো—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্ণাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

বস্তুত এই প্রতিজ্ঞাত সত্য প্রকট করার জন্যই সেই মহাশক্তি ভক্তানুগ্রহ এবং শিষ্টপালনের জন্য নানারূপে আবির্ভূত হন। ভগবতী চণ্ডী সেইরকমই এক দেবীরূপ, যিনি মহিষাসুর-বধের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

কীভাবে দেবী চণ্ডী বা চণ্ডিকার আবির্ভাব ঘটল, তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বিবরণ আছে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য বিষয়ক অধ্যায়গুলিতে। লক্ষণীয়, মহিষাসুর-বধের জন্য চণ্ডীর আবির্ভাবের আগে সপ্তশতী চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে সুরথ রাজা এবং সমাধি বৈশ্য নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে বনে এসেছেন এবং তারপর সেখানে এসে সেই আত্মীয়-স্বজনের জন্যই দুঃখ পেতে থাকলেন। এই অবস্থায় তাঁদের সঙ্গে মেধস মুনির দেখা হয়। তিনি তাঁদের জগন্মোহিনী মহামায়ার তত্ত্ব বুঝিয়ে বলেন। বুঝিয়ে বলেন সৃষ্টির আদিস্থিতি সেই পরমা প্রকৃতির কথা। অবশেষে সেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি থেকে যেভাবে ব্রহ্মার সৃষ্টি হল, সেই প্রসঙ্গে যোগনিদ্রায় শায়িত নারায়ণের নাভিকমল থেকে জন্মানো ব্রহ্মা এবং তাঁকে বধ করার জন্য উদ্যত মধু-কৈটভ নামে দুই অসুরের নিধন করার কথা এল। এইখানেই ভগবান ব্রহ্মার একটা স্তুতি আছে এবং সেই স্তুতি কিন্তু যোগনিদ্রার উদ্দেশে। এই যোগনিদ্রাই কিন্তু সেই মহাপ্রকৃতি, তিনিই সেই পরা শক্তি মহামায়া অথবা যোগমায়া। তাঁর অনন্ত বিভূতির মধ্যে যেমন জগন্মোহিনী মায়ার ভূমিকা আছে আবার তিনি পরমা শক্তিরূপে জগতের যোগক্ষেম বহন। আবার তাঁর আত্মস্বরূপ যদি চিনতে পারে কেউ তাহলে তার মুক্তির পথ তৈরি হবে।

সম্পূর্ণ প্রথম অধ্যায় জুড়ে এই মহাপ্রকৃতি-মহাশক্তির স্বরূপ বর্ণনা করে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই মহাশক্তির অপার প্রভাব বলতে আরম্ভ করলেন। ঠিক এখানেই চণ্ডীর প্রসঙ্গ আরম্ভ হল। চণ্ডীর উদ্ভবের কাহিনীটা সেখানে এইরকম—

দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে একশো বছর ধরে যুদ্ধ হয়েছিল, যেখানে অসুরদের অধিপতি ছিলেন মহিষাসুর এবং দেবতাদের অধীশ্বর ছিলেন ইন্দ্র। স্বর্গের আধিপত্যকে কেন্দ্র করে দেবতা এবং অসুরদের যুদ্ধ চলেছিল এক বছর। সেই যুদ্ধে অসুরদের কাছে দেবতারা পরাজিত হয়েছিলেন এবং মহিষাসুর স্বর্গে ইন্দ্রপদ লাভ করেছিলেন—

জিত্বা চ সকলান্ দেবান্ ইন্দ্রো'ভূন্মহিবাসুরঃ।

পরাজিত দেবতারা এবার সকলে মিলে পদ্মযোনি ব্রহ্মার কাছে গেলেন এবং তারপর ব্রহ্মাকে সামনে রেখে উপস্থিত হলেন মহাদেব এবং বিষ্ণুর কাছে। দেবতাদের কাছে মহিষাসুরের অত্যাচারের কথা শুনে ভগবান শ্রীহরি, ব্রহ্মা এবং শঙ্কর মহাদেবের চক্ষু দুটি ক্রোধে কুটিল হয়ে উঠল এবং তাঁদের ক্রোধপূর্ণ বদনমণ্ডল থেকে বেরিয়ে এল এক মহাতেজ—

ততো'তিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ॥

ইন্দ্র ইত্যাদি অন্যান্য দেবতাদের শরীর থেকেও একই সঙ্গে তেজ নির্গত হয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের তেজঃপুঞ্জের সঙ্গে মিলিত হল। সেই তেজঃপুঞ্জ এক জ্বলন্ত পর্বতের মতো দেখতে লাগল। সমস্ত দেবতাদের সম্মিলিত সেই তেজ থেকেই এক অপূর্ব নারীরূপ তৈরি হল।

শিবের তেজে তৈরি হল দেবীর মুখ, যমের তেজে কেশ, বিষ্ণুর তেজে বাহু সমূহ, চন্দ্রতেজে স্তনদ্বয়, ইন্দ্রের তেজে মধ্যভাগ, বরুণের তেজে

জঙ্ঘা ও ঊরু, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পদযুগল, বসুগণের তেজে করাঙ্গুলি, কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রজাপতির তেজে দন্ত, সন্ধ্যার তেজে ভ্রূদ্বয় এবং পবনের তেজে কর্ণদ্বয় গঠিত হয়েছিল। অন্যান্য দেবতাদেরও তেজ দেবীর অবয়ব গঠনে সহায়ক হয়েছিল। তখন দেবতারা নিজ নিজ অস্ত্র, ভূষণ ও বাহনের দ্বারা দেবীকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। মহাদেব দিলেন শূল, কৃষ্ণ দিলেন চক্র, শঙ্খ দিলেন বরুণ, অগ্নি দিলেন শক্তি, মরুদ্‌গণ ধনু ও বাণপূর্ণ তূণ, ইন্দ্র বজ্র ও ঘন্টা, যম দিলেন দণ্ড, হিমালয় দিলেন দেবীর বাহন হিসেবে সিংহকে আর রত্নও তাঁকে দিলেন সাজসজ্জার জন্য, সমুদ্র দিলেন নাগপাশ, প্রজাপতি ব্রহ্মা অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, সূর্য সমস্ত রোমকূপে নিজ রশ্মি ছড়িয়ে দিলেন, কাল দিলেন খড়্গ ও চর্ম (ঢাল)। এইভাবে দেবতারা সকলেই দেবীর আবির্ভাবে সহায়তা করেছিলেন। মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটল সকল দেবতার শক্তি বা তেজের সমবায়ে। এই মহাশক্তি দেবী চণ্ডী বা চণ্ডিকা। সিংহস্কন্ধে আরোহণ করে দেবতাদের পরম শত্রু মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন দেবী চণ্ডিকা। মহিষাসুরের সৈন্য-সেনাপতি অনেক অন্যদিকে দেবী চণ্ডী একাকিনী। দেবী নিঃশ্বাস থেকে শত-সহস্র গণের আবির্ভাব ঘটল, তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল মহিষাসুরের সৈন্যদের ওপর। দেবী চণ্ডী এবং তাঁর সহায়ক গণের সঙ্গে যুদ্ধে মহিষাসুর ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। মহিষাসুরের সেনাপতিরা চিক্ষুর, চামর অসিলোমা, বিড়ালাক্ষ ইত্যাদি অসুরদের সৈন্যদল দেবীর ওপর অস্ত্র নিক্ষেপ করতে থাকল। দেবী চণ্ডী তাঁদের সমস্ত অস্ত্র প্রতিহত করে অসুর সৈন্যদের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করতে লাগলেন ঠিক যেমন দাবাগ্নি ছড়িয়ে পড়ে অরণ্যের মধ্যে সেইভাবে। দেবীর নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে গণসৈন্য প্রস্তুত হতে লাগল। তারা কুঠার অসি এবং নানাবিধ অস্ত্র নিয়ে অসুরসৈন্য বধ করতে লাগল। দেবী চণ্ডিকা নিজে ত্রিশূল, গদা এবং খড়্গ নিয়ে অসুরবধে প্রবৃত্ত হলেন। দেবীর বাহন সিংহও অসুর সংহারে সহায়তা করতে লাগল। এবার দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি চিক্ষুর।

চিক্ষুর যুদ্ধে এসেই জলধারার মতো শরবর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন দেবী চণ্ডীর ওপর। তাঁর শরবর্ষণ প্রতিহত করে দেবী নিজনিক্ষিপ্ত শরে চিক্ষুরাসুরের অশ্ব এবং সারথিকে বধ করলেন। চিক্ষুর বাণাহত অবস্থায় রথ থেকে নেমে খড়্গ আর ত্রিশূল নিয়ে ধেয়ে গেল চণ্ডীর দিকে। তাঁর খড়্গ আর ত্রিশূলে কোনো কাজ হল না। বরং দেবীর ত্রিশূলে তাঁর প্রাণান্ত হল। একে একে মহিষাসুরের অন্য সেনাপতিরাও যুদ্ধে নিহত হলে মহিষাসুর স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

এক মহিষের রূপ ধারণ করে মহিষাসুর দেবীর গণসৈন্যদের মনে রীতিমত ভয় ধরিয়ে দিলেন। কাউকে মুখ দিয়ে, কাউকে খুর দিয়ে, কাউকে বা শিং দিয়ে পর পর আঘাত করতে লাগলেন মহিষাসুর। সমস্ত রণস্থলে সেই অসুর-মহিষ এমন বেগে বিচরণ করতে লাগল যে সকলেই ভয় পেয়ে যাচ্ছিল। মহিষরূপী অসুর প্রথমে দেবীর সিংহকে আক্রমণ করলেন এবং তারপর শিং আর খুরের আঘাতে সব তছনছ করে দিলেন মহিষাসুর। দেবী চণ্ডী এবার সেই মহিষকে বধ করার জন্য পাশ নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু পাশবদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে মায়াবী মহিষাসুর এক সিংহের রূপ ধরে পালিয়ে গেলেন এবার আবার যুদ্ধে ফিরলেন। দেবী তাঁকে খড়্গ দিয়ে মারতে গিয়ে দেখলেন মায়াবী অসুর ততক্ষণে এক খড়্গপাণি পুরুষের চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে। চণ্ডী তাঁর ওপর শরনিক্ষেপ করলে সেই পুরুষ এক হাতিতে রূপান্তরিত হল এবং হস্ত্যাকৃতি অসুর এবার তাঁর শুঁড় দিয়ে সিংহকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। দেবী সেই হাতির শুঁড়ের ওপর খড়্গাঘাত করতেই অসুর আবার প্রথম আকৃতিতে ফিরে এসে মহিষের রূপ ধারণ করলেন।

মহিষাসুর ঘোর গর্জনে যুদ্ধলিপ্সু হয়ে দেবী চণ্ডীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেই তিনি শেষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং মহিষাসুরকে বললেন—তুই যত পারিস গর্জন কর। আমি এই মধুমদ্যের পাত্রটি শেষ করেই আসছি। এরপর যখন তোকে মারবো, তখন দেবতারা এখানে গর্জন করবেন—

গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।
ময়া ত্বয়ি হতে'ত্রৈব গর্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ॥

মধুমদ্য পান করে দেবী চণ্ডীর চক্ষু আরক্ত হয়ে উঠল। পরিপূর্ণ ক্রোধে তিনি মহিষের কণ্ঠে পা

দিয়ে বিচলিত করে বক্ষে শূলাঘাত করলেন। মহিষের কণ্ঠদেশ থেকে এবার বেরিয়ে এল এক পুরুষমূর্তি, কিন্তু পুরোপুরি নয়, সে পুরুষ অর্ধনিষ্ক্রান্ত হতেই শানিত তরবারির আঘাতে দেবী তাঁর শিরচ্ছেদ করলেন। মহিষাসুর মারা গেলেন। দেবী চণ্ডীর হাতে মৃত্যুবরণ করায় মহিষাসুর সাযুজ্য মুক্তি লাভ করলেন এবং পেলেন অমরত্ব। লক্ষণীয়, এখনও দেবী মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডীর পূজার পরে মহিষাসুরও পূজা এবং ভোগ-নৈবেদ্য লাভ করেন।

মহিষাসুর নিহত হলে দেবতারা চণ্ডীর যে স্তব করেন, সেই স্তব আজও উচ্চারণ করি আমরা।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৮২ অধ্যায় থেকে ৮৪ অধ্যায়; শ্রীশ্রীচণ্ডী, ২ অধ্যায় থেকে ৪ অধ্যায়]

মার্কণ্ডেয় পুরাণে যে চণ্ডীর বর্ণনা আমরা পেয়েছি, সেখানে খুব লক্ষণীয় একটা ব্যাপার হল এই যে, এই মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা সমস্ত দেবতেজসম্ভবা চণ্ডী। তিনি এখানে শিবজায়া শিবানীও নন, হিমালয়ের কন্যা উমাও নন। দেবীভাগবত পুরাণে মহিষাসুরবধের জন্য দেবতারা যখন ব্রহ্মাকে নিয়ে শিবের কাছে এসেছিলেন, তখন শিব ব্রহ্মাকেই উদ্দেশ করে বলেছিলেন—আপনিই তাকে বরদান করে বাড়িয়ে তুলেছেন। আবার বলছেন—সে পুরুষবধ্য নয়। এক নারীর হাতেই তার মৃত্যু হবে। তা সে নারী কোথায় পাবো। আমার স্ত্রী কিংবা আপনার স্ত্রীকে দিয়ে তো এই যুদ্ধ হবে না—

কা সমর্থা বরা নারী তং হন্তুং মদদর্পিতম্।
ন মে ভার্য্যা ন তে ভার্য্যা সংগ্রামং গন্তুমর্হতি॥

ব্রহ্মার এই বিসদৃশ বরদানের ঘটনা এবং শিবের বক্তব্য এবার দেবতারা নিবেদন করলেন ভগবান বিষ্ণুর কাছে এবং সমস্যাটার সমাধান চেয়ে বললেন—কোথায় পাবো এইরকম এক নারী, যে এই মায়াবী অসুরটাকে মারবে? কে মারতে পারে তাকে—আমাদের উমা হৈমবতী, লক্ষ্মী, শচী, সরস্বতী—কে পারে—

উমা মা বা শচী বিদ্যা কা সমর্থাস্য ঘাতনে।

বিষ্ণু সিদ্ধান্ত দিয়ে বললেন—আজ সমস্ত দেবতার তেজ এবং রূপসম্পদ দিয়ে সুন্দরী নারী তৈরি হবে, সেই নারী সেই অসুরকে বধ করবে—

অদ্য সর্বসুরাণাং বৈ তেজোভী রূপসম্পদা।
উৎপন্না চেদ্ বরারোহ সা হন্যাত্তং রণে বলাৎ॥

বিষ্ণুর এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতা এবং দেবপত্নীদের তেজোরূপ থেকে সেই অপূর্বা নারীমূর্তি তৈরি হল এবং দেবতাদের কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র লাভ করে তিনি মহিষাসুর বধ করলেন। কিন্তু এখানেও তিনি দেবতেজ-সমুদ্ভবা চণ্ডী। তবে দেবীভাগবত পুরাণের মহিষাসুর যুদ্ধের পূর্বে মার্কণ্ডেয় পুরাণের শুম্ভ-নিশুম্ভের আচরণ অনুকরণ করেছেন।

[দেবীভাগবত পু. ৫.৭.৩৪-৫৯; ৫.৮.১৭-৪৬]

□ দেবতেজ-সমুদ্ভূতা এই চণ্ডীর এই রূপ অন্য একটি উপাখ্যানে ঋষি কাত্যায়নের সঙ্গে জড়িত। দেবতাদের তেজ একত্ব প্রাপ্ত হয়ে কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করে এবং কাত্যায়ন এই তেজকে বর্ধিত করেন তা থেকেই যোগবিশুদ্ধা কাত্যায়নীর জন্ম। ফলত চণ্ডী এখানে কাত্যায়নীর সঙ্গে একাত্মিকা।

[বামন পু. ১৮.৫-৮; কালিকা পু. ৬৩.৭৬-৭৭]

□ মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী চণ্ডী কর্তৃক মহিষাসুর বধের পরেই শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের কাহিনী থাকায় অনেকেই মনে করেন দেবী চণ্ডীই শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের প্রার্থনা দেবতাদের মুখ থেকে শোনার পর দেবী পার্বতী গঙ্গা স্নান করে এলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কার স্তব করছো এখানে—

ভবদ্ভিঃ স্তূয়তে'ত্র কা?

তাতে দেবীর শরীরকোষ আবির্ভূত হলেন শিবা এবং তিনি বললেন—দেবতারা শুম্ভ-নিশুম্ভের হাতে পরাজিত হয়ে আমারই স্তব করছেন। এবার তাঁর শরীরকোষ থেকে যে মাতৃশক্তির সৃষ্টি হল, তাঁর নাম হল কৌষিকী দেবী। কৌষিকী তাঁর চর্মকোষ থেকে বিনির্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবীর রূপ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল এবং তাতে তিনি কালিকা নামে বিখ্যাত হলেন। অবশেষে দেবী যে অসামান্যা সুন্দরীরূপে হিমালয়ের সানুদেশ আলোকিত করে দাঁড়ালেন শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের প্রস্তুতি হিসেবে, সেখানে তাঁকে বারবার অম্বিকা নামে ডাকা হয়েছে। আবার শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পর দেবী দেবতাদের স্তবে তুষ্টা হয়ে দেবী যখন তাঁদের আশ্বস্ত করছেন, তখন তিনি বলেছেন—বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি যুগে শুম্ভ-নিশুম্ভ যখন আবার প্রবল

হয়ে উঠবে, তখন তিনি বিন্ধ্যবাসিনীরূপে তাঁদের বধ করবেন। এতে বোঝা যায় মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডীই এক সময় বিন্ধ্যবাসিনী, কালিকা, কৌষিকী, কাত্যায়নী—এঁদের সকলের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৮৫.৩৭-৪২; ৯১.৩৭-৩৮]*

□ দেবী চণ্ডীর যে মহিষাসুরমর্দিনী রূপ আমরা দুর্গাপূজার সময় পুজো করি সেটা মহিষাসুরকে পুরো বধ করে ফেলার পূর্ব মুহূর্তের মূর্তি-যার বর্ণনা অগ্নিপুরাণে দেওয়া হয়েছে এইভাবে—দশটি হাতে দশটি প্রহরণ, অধোনিম্নদেশে ছিন্নমস্তক মহিষ, মহিষের মুণ্ডটি পাশে থাকবে, মহিষের গ্রীবা থেকে উঠে আসছে এক শস্ত্রধারী পুরুষ, তার হাতে শূল সে রক্তবমি করছে, তার মাথাতেও রক্ত লেগে রয়েছে, গলায় লাল ফুলের মালা, চক্ষু আরক্ত, তার কণ্ঠে পাশ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ, দেবীর সিংহ তার রক্ত আস্বাদন করছে, দেবীর বামপদ সিংহের পিঠে, দক্ষিণপদ পুরুষরূপী অসুরের শরীরে ন্যস্ত। নবপদ্ম-অঙ্কিত একটি স্থানে ত্রিনেত্রা শত্রুদমনকারিণী দুর্গারূপিণী চণ্ডিকা জনসমক্ষে এইভাবে পূজিত হন—চণ্ডী বা দশবাহুকা—

তদধো মহিষচ্ছিন্নমূর্ধা পাতিতমস্তকঃ॥
শস্ত্রোদ্যতকরঃ ক্রুদ্ধস্তদ্গ্রীবাসম্ভবঃ পুমান্।
শূলহস্তো বমদ্রক্তো রক্তস্রঙ্মূর্দ্ধজেক্ষণঃ॥
সিংহেনাস্বদ্যমানস্তু পাশবদ্ধো গলে ভৃশম্।
যাম্যাঙ্ঘ্র্যাক্রান্তসিংহা চ সব্যাঙ্ঘ্রিনীচগাসুরে॥
চণ্ডিকেয়ং ত্রিনেত্রা চ সশস্ত্রা রিপুমর্দিনী।
নবপদ্মাত্মকে স্থানে পূজ্যা দুর্গা স্বমূর্তিতঃ॥

[অগ্নি পু. ৫০.৩-৬]

চণ্ডীশ্বরতীর্থ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রখ্যাত তীর্থ। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে যে ব্যক্তি উপবাসী থেকে চণ্ডীশ্বর দর্শন করেন। তিনি কখনো শোক পান না।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র ২৫.৮]

চণ্ডেশ মহাদেবের একজন অনুচর। রাজা দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করার জন্য ইনি যজ্ঞস্থলেই সূর্যদেবকে আবদ্ধ করেছিলেন। *[ভাগবত পু. ৪.৫.১৭]*

চণ্ডোদরী অশোকবনে সীতাকে যে রাক্ষসীরা পাহারা দিচ্ছিল, চণ্ডোদরী তাদেরই একজন। সে সীতাকে বলেছিল, সীতা যদি রাবণকে বরণ না করেন, তাহলে সে সীতার যকৃৎ, প্লীহা, সুদীর্ঘ দুই বাহুর মধ্যভাগ এবং নাড়ীর বন্ধনসহ হৃদয়—সবই খেয়ে ফেলবে। *[রামায়ণ ৫.২৪.৩৯, ৪০]*

চতুঃশৃঙ্গ পৌরাণিক কুশদ্বীপের অন্তর্গত সাতটি বর্ষ পর্বতের মধ্যে একটি। *[ভাগবত পু. ৫.২০.১৫]*

চতুঃসমুদ্র বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত তীর্থ। এটি একটি পবিত্র কূপ। চতুঃসমুদ্র কূপে স্নান করলে একই সঙ্গে চারটি সমুদ্রে অবগাহন করার সমান পুণ্য হয়।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচন কাণ্ড) পৃ. ৮৯]

চতুরঙ্গ১ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক বাহিনীকে একত্রে চতুরঙ্গ বলা হয়। প্রাচীন ভারতের যুদ্ধবিদ্যার নিরিখে চতুরঙ্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ নাম।

[দ্র. সৈন্যসজ্জা]

চতুরঙ্গ২ অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদের জ্যেষ্ঠপুত্র চতুরঙ্গ। লোমপাদ বা চিত্ররথ (মতান্তরে দশরথ) রাজা দশরথের সখা ছিলেন। দশরথ নিজকন্যা শান্তাকে দত্তকরূপে নিঃসন্তান লোমপাদকে দান করেন। লোমপাদ এই শান্তার সঙ্গে মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ দেন। এরপর পুত্রহীন লোমপাদ পুত্রলাভের আশায় ঋষ্যশৃঙ্গকে মরুদ্‌যজ্ঞ করার অনুরোধ জানান। ঋষ্যশৃঙ্গ আয়োজিত যজ্ঞের ফলে লোমপাদ চারটি সুযোগ্য সন্তান লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম চতুরঙ্গ।

চতুরঙ্গের অপর নাম তুরঙ্গ।

[ভাগবত পু. ৯.২৩.৭-১০;
বায়ু পু. ৯৯.১০৫; বিষ্ণু পু. ৪.১৮.৪]

□ পুরাণে পাঠভেদে চতুরঙ্গের পরিচয় নিয়ে খানিক মতান্তর খুঁজে পাওয়া যায়। বায়ু, বিষ্ণু এবং ভাগবত পুরাণে চতুরঙ্গকে লোমপাদের পুত্র বলা হলেও মৎস্য পুরাণে তাঁকেই লোমপাদ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। *[মৎস্য পু. ৪৮.৯৫]*

চতুরশ্ব জনৈক প্রাচীন রাজর্ষি। যেসব মহান রাজর্ষি যমসভায় বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিলেন চতুরশ্ব তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ২.৮.১১; (হরি) ২.৮.১০]

চতুরাশ্রম চাতুর্বর্ণ্যের বর্ণধর্মের সঙ্গে চারটি আশ্রম বা চতুরাশ্রমের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আসলে বর্ণধর্ম একভাবে আশ্রমধর্মের তুষ্টি তৈরি করে। প্রত্যেক মানুষকেই কোনো-না-কোনো আশ্রমের ধর্ম পালন করতেই হবে। আশ্রম চারটি—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। মনু-মহাভারতের পরম্পরা মেনে মানুষের জীবনকে শতায়ু—শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ। ধরে নিয়ে, একশ বছরের আয়ুকে চার ভাগে ভাগ করে নিয়ে

জীবনের এক-একটি পর্যায়ে এক একটি আশ্রমে বিধান পাওয়া যায়। চতুরাশ্রমের মান্যতা এতটাই যে, মহাভারত বলেছে—মানুষের জীবনকে সার্থক করে তোলার জন্য স্বয়ং ব্রহ্মা নাকি এই আশ্রম-ধর্মের ব্যবস্থা করেছিলেন—

যদেতচ্চাতুরাশ্রম্যং ব্রহ্মর্ষিবিহিতং পুরা।

এটাও লক্ষণীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—চার বর্ণেরই আশ্রমধর্মে অধিকার আছে। তবে শূদ্রের যেহেতু বেদাধ্যয়নে অধিকার ছিল না, তাই সৎ এবং সাধু শূদ্রের সমস্ত আশ্রমেই অধিকার আছে কিন্তু অন্য সাধারণ শূদ্রের এই অধিকার নেই—কেননা, আশ্রম পালনেরও একটা উপযুক্ততা দরকার—

[মহা (k) ১২.১৯১.৮; (হরি) ১২.১৮৪.৮]

চতুরাশ্রম বা জীবনের চারটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন যাপনের যে নিয়ম প্রাচীনেরা তৈরি করেছিলেন, তার সর্বপ্রথম ইঙ্গিত উল্লেখ আমরা পাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন এক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে। আমরা সাধারণভাবে জানি আশ্রম চারটি—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। কিন্তু প্রথম থেকেই এই বৈজ্ঞানিক পর্যায়ক্রম সৃষ্টি হয়নি। হয়তো পাকাপোক্তভাবে আশ্রম-নিয়মগুলি তখনও নির্ধারিত হয়নি বলেই আশ্রমের নাম এবং পর্যায়গুলি অবিন্যস্ত ছিল।

সবচেয়ে পুরাতন গ্রন্থ চতুরাশ্রমের কথা নেই বটে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য বা ব্রহ্মচারীর কথাটা ঋগ্‌বেদ জানত। একটি মন্ত্রে বলা হচ্ছে—শুনুন দেবতারা! সেই বৃহস্পতি ব্রহ্মচারীর মতো সমস্ত যজ্ঞে ব্যাপ্ত হয়ে বিচরণ করছেন, তিনি এই যজ্ঞের অঙ্গ—

ব্রহ্মচারী চরতি বেবিষদ্/
বিষঃ স দেবানাং ভবত্যেকমঙ্গম্।

আসলে ব্রহ্মচর্যের মধ্যে সংযম-নিয়ম এবং বেদাধ্যয়ন এতটাই জড়িত, তাই ঋগ্‌বেদ ব্রহ্মচারীর কথাটা সবার আগে জানে। তবে সঙ্গে গার্হস্থ্যের কথাটাও যে ঋগ্‌বেদ জানত, তার একটা প্রমাণ এই যে, ঋগ্‌বেদের অগ্নিকে 'গৃহপতি' বলা হয়েছে—ব্রহ্মা চাসি গৃহপতিশ্চ নো দমে—তবে এর থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল—বিয়ের সময় যে মন্ত্র পড়া হয় সেখানে স্বামী স্ত্রীর হাত ধরে বলেন—ঈশ্বর গার্হপত্য বা গার্হস্থ্যের জন্য তোমাকে আমার কাছে দিয়েছেন। *[ঋগ্‌বেদ ২.১.২; ১০.১০৯.৫; অথর্ববেদ ৫.১৭.৫]*

☐ ঋগ্‌বেদে কিন্তু বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসের কোনো উল্লেখ নেই, এমনকী প্রাচীন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিতেও তাই। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণে চতুরাশ্রমের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় আর মহাভারত-পুরাণেও যেমন গৃহস্থ আশ্রমের প্রশংসা ব্যাপারটা অন্যান্য আশ্রমের প্রতি তুলনা খ্যাপন করা হয়েছে, এখানেও ঠিক তাই। ঐতরেয় বলেছে—শুধু শুধু নোংড়া ঘেঁটেই বা কী হবে, মৃগচর্ম-অজিন পরেই বা কী হবে, অথবা দাড়ি-গোঁফ বাড়িয়েও লাভ নেই কোনো। বরঞ্চ শোনো ব্রাহ্মণ! একটি পুত্র চাও বিধাতার কাছে— সেই তো পৃথিবী, সেটাই প্রশংসনীয়—

কিং নু মলং কিমজিনং কিমু শ্মশ্রূণি কিংতপঃ।
পুত্রং ব্রহ্মাণ ইচ্ছধ্বং স বৈ লোকো বদাবদঃ॥

এই শ্লোকে বিবাহ বহির্ভূত অথবা বৈবাহিক কালেও অতিরিক্ত রতিসম্ভোগেচ্ছাই মল নামে চিহ্নিত হয়েছে। তারপরেই অজিন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যের প্রতীক। দাড়ি-গোঁফ বানপ্রস্থের ইঙ্গিত দেয়, কেননা মনু-গৌতমের মতো ধর্মশাস্ত্রকারেরা পরবর্তীকালে লিখেছেন বানপ্রস্থের সময় দাড়ি-গোঁফ রাখতে হয়। আর 'তপস্' বোধহয় সন্ন্যাসের ইঙ্গিত বহন করে। তার মানে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কাল থেকেই চতুরাশ্রমের বহিরঙ্গ আচার এবং আকারটুকু বোঝা যাচ্ছে। প্রতিতুলনায় গার্হস্থ্য জীবনের প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন যে পুত্র বা সন্তান পরম্পরা, সেই উল্লেখ করায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ যে গার্হস্থ্য আশ্রমকেই চরম মূল্য দিচ্ছে এটাও স্পষ্ট হয়ে যায়।

লক্ষণীয়, ততটাই প্রাচীনকালে, যখন আপস্তম্ব ধর্মসূত্র চতুরাশ্রমের কথা বলছে, তখন চতুরাশ্রমের পর্যায়গুলি পরবর্তীকালে ব্যবহৃত অনুক্রমে সজ্জিত হয়ে ওঠেনি, তখনও একেবারে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতো ব্যঞ্জনাময় না হলেও একটু অগোছালো ভাবেই চতুরাশ্রমের কথা পেয়ে যাচ্ছি। আপস্তম্ব লিখছেন—চারটি আশ্রম—গার্হস্থ্য, আচার্যকুল, মুনিজনোচিত মৌন এবং বানপ্রস্থ। এখানেও গার্হস্থ্যের গুরুত্বযোজনা করেই তার কথা প্রথমে আসছে; আচার্যকুল মানেই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম যেখানে ছাত্রকে গুরুকুলে বাস করতে হয়, মৌন অর্থে সন্ন্যাসই বুঝবো আমরা, কিন্তু সেটা বানপ্রস্থের আগে উল্লিখিত হল—

চত্বার আশ্রমা গার্হস্থ্যমাচার্যকুলং
মৌনং বানপ্রস্থমিতি।

গৌতম-ধর্মসূত্র পরবর্তীকালে উল্লিখিত

পর্যায়গুলি প্রায় একইরকম রেখেছেন বটে, তবে সন্ন্যাস, যাকে তিনি 'ভিক্ষু' বলেছেন, সেটা এসেছে বানপ্রস্থের আগে আর বানপ্রস্থের নাম গৌতম বলেছেন 'বৈখানস'। তবে ধর্মসূত্রগুলির মধ্যে চতুরাশ্রমের পর্যায়-বিভাগে খানিক অবিন্যস্ত ভাব থাকলেও—এমনকী এই অবিন্যস্তভাব উপনিষদের কালেও ছিল—কিন্তু এই ভাবটা পুরোপুরি কেটে গেছে মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণের কালে। সন্ন্যাসাশ্রমকে ভিক্ষুদের আশ্রম বলে অভিহিত করেই মহাভারত বলেছে— ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষুক—এই চতুরাশ্রমের প্রত্যেক পর্যায়ে নিজের নিজের আশ্রমধর্ম পালন করে মানুষ পরম গতি লাভ করে—

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো'থ ভিক্ষুকঃ।
যথোক্তচারিণ সর্বে গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্॥

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (Hang) ৩৩.১১;
আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ২.৯.২১.১;
গৌতম ধর্মসূত্র (মহর্ষি) ৩.২;
মহা (k) ১২.২৪১.১৩; (হরি) ১২.২৩৯.১৩]

□ ব্রহ্মচর্য্য : আগেই ঋগ্‌বেদ থেকে ব্রহ্মচর্য্যের উদাহরণ দিয়েছিলাম। সেখানে বৃহস্পতি যজ্ঞীয় পত্নী জুহূর অভাবে ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করে আছেন। আসলে ব্রহ্মচর্য্য মানেই যেমনটা আপস্তম্ব তাঁর ধর্মসূত্রে বলেছেন— ব্রহ্মচর্য্য মানেই আচার্যকুল, উপনয়নের সময় থেকে গুরুগৃহে বাস। হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রে একটা উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে ছাত্র গুরুকুলে আসার পর ছাত্রকে দিয়ে আচার্য বলাচ্ছেন এবং ছাত্র বলছে—আমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করার জন্য আপনার কাছে এসেছি, আপনি আপনার কাছে বসতে দিন আমাকে উপনয়নের দীক্ষা দিন। আমি ব্রহ্মচারী হয়ে আপনার কাছে থাকব, সবিতা-সূর্যের অনুশাসন এইরকমই—

অথৈনম্ অভিব্যাহরয়তি।
ব্রহ্মচর্যমাগামুপ মা নয়স্ব,
ব্রহ্মচারী ভবানি দেবেন সবিত্রা প্রসূতঃ।

ঋগ্‌বেদ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের কথা জানত, আকারে-ইঙ্গিতে তা প্রকাশও করেছে, আর অথর্ববেদে পুরো ছাব্বিশটা মন্ত্র জুড়ে একটি সূক্তে ব্রহ্মচারীর প্রশংসা শুনতে পাচ্ছি। ব্রহ্মচারীর বেশ-বাস থেকে আচার আচরণ অনেক কিছুই এই আথর্বণিক মন্ত্রগুলির মধ্যে ধরা পড়েছে। এখানে প্রথম মন্ত্রে বলা হচ্ছে—ব্রহ্মচারী তাঁর যশোমহিমায় ভূলোক-দ্যুলোক দুই স্থানেই ঘুরে বেড়ান। দেবতারাও তাঁর প্রতি আনুকূল্য এবং করুণার ভাব গ্রহণ করেন। ব্রহ্মচারী তাঁর তপঃকৃচ্ছ্রতায় আচার্যের হৃদয় পূর্ণ করে তোলেন। আচার্য ব্রহ্মচারী উপনীত করার পর আপন নৈকট্যে আসা ব্রহ্মচারীকে নিজের গর্ভে অর্থাৎ বিদ্যাশরীরের মধ্যে ধারণ করেন, তিন রাত্রি তাঁকে উদরে ধারণ করেন। তারপর চতুর্থ দিনে সেই বিদ্যাময় শরীর থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মচারীকে দেখার জন্য দেবতারা তাঁর অভিমুখে আসেন—

* ব্রহ্মচারীযজ্ঞংশ্চরতি রোদসী উভে
তস্মিন্ দেবাঃ সম্মনসো ভবন্তি।
স দধার পৃথিবীং দিবঞ্চ
স আচার্যং তপসা পিপর্তি॥

* আচার্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং
কৃণুতে গর্ভমন্তঃ।
তং রাত্রীস্তিস্র উদরে বিভর্তি
তং জাতং দ্রষ্টুমবিসংযন্তি দেবাঃ॥

গুরুগৃহে ব্রহ্মচারীর প্রথম কাজটি হল গুরুর গৃহের যজ্ঞীয় অগ্নিকে নিভতে না দেওয়া। যার জন্য তাঁকে সমিৎ আহরণ করে একটি একটি করে যজ্ঞীয় কাষ্ঠগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে হয়। অথর্ববেদ বলছে—এই পৃথিবী ব্রহ্মচারীর প্রথম সমিৎ, দ্যুলোক তার দ্বিতীয় সমিৎ, অগ্নিতে নিক্ষেপ-করা সমিধের দ্বারা অন্তরীক্ষলোক পূর্ণ হয়। এইভাবে ব্রহ্মচারী তার সমিৎ, মেখলা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শ্রম এবং কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীকে পূর্ণ করে। সকাল-সন্ধ্যায় অগ্নিতে সমিৎ নিক্ষেপ করে সেই অগ্ন্যাধান-জনিত তেজে সন্দীপ্ত হন ব্রহ্মচারী, তিনি কৃষ্ণাজিন পরিধান করেন এবং তাঁর শ্মশ্রু দীর্ঘ হয়, এইভাবে ব্রহ্মচারী পূর্বসমুদ্র থেকে উত্তর সমুদ্রে গমন করে, অর্থাৎ তার মহিমা ব্যাপ্ত হয়—

* ইয়ং সমিৎ পৃথিবী দ্যৌর্দ্বিতীয়ঃ
অতান্তরিক্ষং সমিধা পৃণাতি।
ব্রহ্মচারী সমিধা মেখলয়া শ্রমেণ
লোকাংস্তপসা পিপর্তি॥

* ব্রহ্মচারী এতি সমিধা সমিদ্ধঃ
কার্ষ্ণং বসানো দীক্ষিতো দীর্ঘশ্মশ্রুঃ।
স সদ্য এতি পূর্বস্মাদুত্তরং সমুদ্রং
লোকান্ সংগৃভ্য মুহুরাচরিক্রৎ॥

[হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র (মহর্ষি) ১.৫.২;
অথর্ববেদ ১১.৫.১; ১১.৫.৩; ১১.৫.৪-৬]

□ ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে অথর্ববেদের এই সুদীর্ঘ বিবরণ থেকে এটা বোঝা যায় যে, পিতা-মাতার স্নেহসুখ-সম্বন্ধ ছেড়ে যে গুরুগৃহে অনন্ত পরিশ্রম করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে বেদ অধ্যয়ন করে বিদ্বান হবার জন্য, অথর্ববেদ তাঁর সমিদাহরণের মহিমা থেকে তাঁর কৃষ্ণাজিন, মেখলা, দীর্ঘশ্মশ্রু, এমনকী তাঁর ভিক্ষাবৃত্তিরও মহিমা বর্ণনা করেছে। ব্রহ্মচারীর এই মাহাত্ম্য মহাভারত এবং পুরাণগুলির মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। যদিও তারও আগে একজন ব্রহ্মচারী গুরুকুলে উপস্থিত হলে গুরু তাঁকে কীভাবে গ্রহণ করতেন, কোন কর্ম করার জন্য আচার্য তাঁকে নির্দেশ দিতেন তার একটা উজ্জ্বল বর্ণনা আছে শতপথ-ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থে এবং সেই বর্ণনা ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে গৃহ্যসূত্রগুলিতে উক্ত নির্দেশের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে—একজন বালক আচার্যকে বলছে— আমি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করতে চাই . . . আমি ব্রহ্মচারী হবো . . .। আচার্য জিজ্ঞাসা করেন—কী নাম তোমার? নাম শোনার পর আচার্য ব্রহ্মচারীকে কাছে টেনে নেন, তারপর সসম্বোধনে তার হাত ধরে বলেন—তুমি আজ থেকে ইন্দ্রের ব্রহ্মচারী; অগ্নি তোমার আচার্য, আমিও তোমার আচার্য। আচার্য এবার উপনীত শিষ্যকে প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দেন। মুখে বলেন—জলের কাছে, ওষধিকুলের কাছে সমপর্ণ করছি তোমাকে।. . . তুমি জল পান করো, কাজকর্ম করো, অগ্নিতে সমিৎ নিক্ষেপ করো, দিনে ঘুমোবে না—

ব্রহ্মচর্য্যমাগামিত্যাহ।... ব্রহ্মচারী আসানীত্যাহ...।
অথৈনমাহ কো নামাসি। অথাস্য হস্তং গৃহ্ণাতি।
ইন্দ্রস্য ব্রহ্মচার্য্যসি অগ্নিরাচার্যস্তবাহমাচার্য
স্তবাসাবিতি।... অথৈনং ভূতেভ্যঃ পরিদদাতি।...
অদ্ভ্যস্ত্বা ওষধিভ্যঃ পরিদদামীত্যাহ।... অপো'শান...
কর্ম কুরু...সমিধমাধেহীতি... মা সুষুপ্থা ইতি।

ব্রহ্মচারীকে একজন আচার্য যেভাবে তাঁর নিজস্ব জীবনের সমস্ত কর্মের মধ্যে সমাহিত করেন, তাতে ব্রহ্মচারী একসময় আচার্য-গৃহের অংশ হয়ে ওঠেন। শতপথ ব্রাহ্মণ তাই বলেছে—ব্রহ্মচারীরাই তাঁদের আচার্যকে রক্ষা করে, তাঁর গৃহকে রক্ষা করে, পালিত গবাদি পশুদের রক্ষা করে—এটা এমনই এক রক্ষা যাতে ব্রহ্মচারীদের মনের ভাবটা এইরকম থাকে যে, তাদের আচার্যকে যেন কেউ না অপহরণ করে নিয়ে যায়—

তস্মাদ্ ব্রহ্মচারিণ আচার্যং গোপায়ন্তি
গৃহান্ পশূন্নেন্নো'পহরানিতি।
[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১১.৫.৪; ৩.৬২.১৫]

□ ব্রহ্মচারীর কর্তব্য, অকর্তব্য, আচার্যের সঙ্গে তাঁর সদ্ব্যবহার এবং তাঁর জীবনচর্যা—সবটাই নেমে এসেছে মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণের কালে। মহাভারতের আদিপর্বে অষ্টক-যযাতি-সংবাদে অষ্টকের প্রশ্নে যযাতি ব্রহ্মচারীর লক্ষণ জানিয়ে বলেছেন—ব্রহ্মচর্য্যের কালে ব্রহ্মচারী শিষ্য হবেন আচার্যের 'আহুতকারী'—অর্থাৎ গুরু ডাকলেই শিষ্য সে কাজটা করেন, গুরু যে কাজ দেন, সেই কাজই তাঁকে পরিশ্রমের প্রেরণা দেয়। ব্রহ্মচারী গুরুর আগে ঘুম থেকে উঠবেন, গুরু ঘুমিয়ে পড়বেন, তার পরে তিনি ঘুমোবেন। শিষ্য ব্রহ্মচারী মৃদু স্বভাবের হবেন, সংযতেন্দ্রিয় হবেন, ধৈর্য্যশীল এবং অপ্রমত্ত হবেন, অর্থাৎ কোনো কাজেই প্রায় ভুল করবেন না, আর অবশেষে বেদপাঠ করবেন নিত্য—

আহুতকারী গুরুকর্মচোদ্যঃ
পূর্বোত্থায়ী চরমঞ্চোপশায়ী।
মৃদুর্দান্তো ধৃতিমানপ্রমত্তঃ
স্বাধ্যায়শীলঃ সিধ্যতি ব্রহ্মচারী॥

ব্রহ্মচারীর কর্তব্য বিষয়ে যযাতির এই সূত্রাকার কথাটাই মহাভারতের শান্তিপর্বে আরও বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে এবং কথাগুলো স্বয়ং ব্যাস বলছেন তাঁর পুত্র শুকদেবকে। ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা বড়ো বড়ো ঋষিরাও জগৎ জয় করেছেন—

ব্রহ্মচর্য্যেণ বৈ লোকান্ জয়ন্তি পরমর্ষয়ঃ।

—এই সাধারণ কথাটা বলার পরেই ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত ব্রহ্মচারীর কর্তব্য নির্দেশ করে ব্যাস বলছেন—আয়ুর প্রথম চতুর্থভাগে অসূয়াহীনভাবে শিষ্য গুরুর সঙ্গে গুরুপুত্রেরও সেবা করবেন। গুরুর বাড়িতে সবার শেষে তিনি ঘুমোবেন আর সবার আগে তিনি ঘুম থেকে উঠবেন। একজন ভৃত্য যে সব কাজ করে একজন ব্রহ্মচারীরও কাজ সেটাই, তিনি নির্দিষ্ট কাজ শেষ করেই আবার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবেন ভবিষ্যৎ আদেশের জন্য। এইভাবে ব্রহ্মচারী সব কাজ শিখে নেবেন এবং সর্বকর্মে দক্ষও হয়ে উঠবেন। আচার্য ভোজন করার আগে তিনি ভোজন

করবেন না, তিনি জল না খেলে জলও মুখে দেবেন না শিষ্য। গুরু দাঁড়ালে শিষ্য দাঁড়াবেন তিনি বসলে তবেই শিষ্যও বসবেন। খুব শুদ্ধভাবে অধ্যয়ন আরম্ভ করার আগে আচার্যের বাম চরণ বাঁ হাতে দক্ষিণ চরণ দক্ষিণ হাতে গ্রহণ করে ব্রহ্মচারী আচার্যকে বলবেন আমাকে বিদ্যা দান করুন। ব্রহ্মচর্যের প্রতিকূল উগ্র গন্ধ, উগ্ররস কখনোই ব্রহ্মচারী ব্যবহার করবেন না। ব্রতোপবাস ইত্যাদির মাধ্যমে শরীরকে কষ্টসহ করে তুলবেন। এইভাবে জীবনের প্রথম চতুর্থাংশ, সাধারণত সেটা চব্বিশ বছর পর্যন্ত গুরুগৃহে বাস করে যথাসম্ভব গুরুদক্ষিণা দিয়ে ব্রহ্মচারী স্নাতক হবার পর গার্হস্থ্য আশ্রমের কথা চিন্তা করবেন।

[মহা (k) ১.৯১.২; ১২.২৪১.৬; ১২.২৪১.১৬-৩০; (হরি) ১.৭৯.২; ১২.২৩৯.৬; ১২.২৩৯.১৬-৩০]

□ মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে আরও একবার ব্রহ্মচারীর কৃচ্ছ্রতা সম্বন্ধে জানিয়ে বলা হচ্ছে—ব্রহ্মচারী শুচি অবস্থায় সকাল-সন্ধ্যায় সূর্য এবং অগ্নির উপাসনা করবেন, তারপর বেদাধ্যয়ন করবেন। আচার্যের ঘরে ভিক্ষায় পাওয়া হবিষ্য ভোজন করে বেদপাঠে ব্রতী হবেন। প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে অগ্নিতে হোম করবেন এবং গুরুর আজ্ঞাবহ হয়ে ব্রহ্মচর্য্যের সমস্ত ব্রত নিয়ম পালন করবেন। ব্রহ্মচারীর ব্রতে আচার্যের সেবার মাধ্যমেই অবশেষে আচার্যের কাছ থেকেই বেদের তত্ত্ব জানতে পারবেন।

এটা ঠিক যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করে কাম-ক্রোধ, ঈর্ষ্যা-অসূয়া ত্যাগ করার জন্য একজন ব্রহ্মচারীকে কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়, তপস্যা করতে হয়। সমস্ত প্রলোভন থেকে দূরে থাকতে হয়, স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ তো একেবারেই নিষিদ্ধ। যদিও গুরুপত্নীর সঙ্গে ব্রহ্মচারীর সশ্রদ্ধ বাক্যালাপ অবশ্যই চলবে। নানা কারণে ব্রহ্মচারীর মনে যদি কোনো বিকার উপস্থিত হয় তবে কৃচ্ছ্রতা-সহযোগে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। শরীর এবং মনকে সমস্ত অপচয় থেকে রক্ষা করতে হয় ব্রহ্মচারীকে। এই অপচয়ের মধ্যে প্রধান হল শুক্রক্ষরণ। অতএব শুক্ররক্ষা বা বিন্দুরক্ষণের জন্য ব্রহ্মচারীকে যত্নবান হতে হয়—ফলত ব্রহ্মচর্য্য এক দুষ্কর ব্যাপার।

সুদুষ্করং ব্রহ্মচর্য্যসুপায়ং তত্র মে শৃণু।

ব্রহ্মচর্য্যে চারটি ভাগ, চারটি পর্য্যায় আছে। প্রথম পর্য্যায়ে গুরুশুশ্রূষা, বেদাধ্যয়ন এবং ক্রোধ-অভিমান পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় পর্যায়ে সর্বতোভাবে আচার্যের প্রিয় কর্মের অনুষ্ঠান, আচার্যের পত্নী এবং পুত্রের যথোচিত সেবা করা। তৃতীয় পর্য্যায় হল—বিদ্যালাভের পর আচার্যের অনুগ্রহ স্মরণ করে চিরদিন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং তাঁকে শ্রদ্ধা করা। চতুর্থ পর্যায় হল বিনীত এবং নিরভিমান হয়ে গুরু-আচার্যকে ভক্তিপূর্বক দক্ষিণা দেওয়া। উদ্যোগপর্বে সনৎসুজাত যখন ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্ম এবং শ্রেয়ধর্মের কথা বলছিলেন, তখন এই ব্রহ্মচর্য্যের প্রসঙ্গ আসে। সনৎসুজাত একদিকে যেমন বলেছেন যে, বিদ্যা যদি লাভ করতে হয়, তবে তা ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমেই লাভ করা যায়—

বিদ্যা হি সা ব্রহ্মচর্য্যেণ লভ্যা।

—তেমনই অপরদিকে সেই অথর্ববেদ এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থে বর্ণিত ব্রহ্মচারী শিষ্যকে আচার্য যেভাবে আত্মস্থ করেন সেই প্রাচীন কথাটাও বলেছে।

সনৎ-সুজাত জানিয়েছেন—আচার্যের মানস-যোনিতে প্রবেশ তাঁর গর্ভের মধ্যে ব্রহ্মচারীর ধারণ-লালন ঘটে। এখানে ব্রহ্মচারী পুরাতন দেহ ত্যাগ করে ব্রহ্মচর্যের যোগ লাভ করেন। সনৎ-সুজাতের মতে—মাতা পিতা পুত্রের শরীর তৈরি করছেন মাত্র, কিন্তু আচার্য সাবিত্রী মন্ত্র এবং বেদ অধ্যাপনার মাধ্যমে যে জাতি তৈরি করেন, সেই জাতির জরা-মৃত্যু নেই—

আচার্যশাস্তা যা জাতিঃ সা পুণ্যা সাজরামরা।

ব্রহ্মচারী আচার্যকে পিতা-মাতা মনে করেন, তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মচারী যেন কখনো দ্রোহ আচরণ না করেন।

[মহা (k) ১৪.৪৬.১-৪; ১২.২১৪.১-১৫; ৫.৪৪.২-১৫; (হরি) ১৪.৫৮.১-৪; ১২.২১১.১-১৫; ৫.৪৪.২-১৫]

□ ব্রহ্মচারী তাঁর বিদ্যালাভ সম্পূর্ণ করার পর আচার্যকে যথাশক্তি দক্ষিণাদান করে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উদ্‌যাপন করেন। তারপর গুরুর আশীর্বাদ এবং উপদেশ নিয়ে স্বগৃহে পিতা-মাতার কাছে ফিরে আসেন। এই ফিরে আসা বা বিদ্যালাভ করে গৃহে প্রত্যাবর্তনের নামই সমাবর্তন—

* গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা সমাবর্তেদ্‌ যথাবিধি।

* গুরুণামণৃনো ভূত্বা সমাবর্তেত যজ্ঞবিৎ।

সমাবর্তনের পর বিবাহের আগে পর্যন্ত একজন ব্রহ্মচারীকে স্নাতক বলা হত। অর্থাৎ গার্হস্থ্য

আশ্রমে প্রবেশোন্মুখ ব্রহ্মচারীর নাম স্নাতক। আর যে সমস্ত ব্রহ্মচারী গার্হস্থ্যে প্রবেশ করতেন, তাঁদের পারিভাষিক নাম 'উপকুর্বাণ'। মহাভারতে এইভাবে স্নাতকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি বটে, তবে স্নাতক শব্দটা মহাভারতে বহুলভাবে ব্যবহৃত।

স্নাতক তিন প্রকার। গৃহ্যসূত্রগুলি সেই তিন প্রকার স্নাতকের নাম জানিয়েছে, বিদ্যাস্নাতক (বেদস্নাতক), ব্রতস্নাতক এবং বিদ্যাব্রতস্নাতক বা বেদব্রতস্নাতক। অল্প সময়ের মধ্যে যাঁরা একটি মাত্র বেদের পাঠ শেষ করেই গুরুগৃহ থেকে সমাবর্তন করতেন, তারাই হলেন বিদ্যাস্নাতক বা বেদস্নাতক। আর গুরুগৃহে থেকে শুধুমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত পালন করে গেলেন, স্বাধ্যায় অধ্যয়নের দিকে আর গেলেন না এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলে, তাঁরা হলেন কৃতস্নাতক। আর যাঁরা বিদ্যালাভও করতেন এবং ব্রত পালনও করতেন, তাঁরা হলেন বিদ্যাব্রতস্নাতক বা বেদব্রতস্নাতক—যেমনটা পারস্কর গৃহ্যসূত্র লিখেছে—

ত্রয়ঃ স্নাতকা ভবন্তি বিদ্যাস্নাতকো
ব্রতস্নাতকো বিদ্যাব্রতস্নাতক ইতি।
সমাপ্য বেদম্ অসমাপ্য ব্রতং যঃ
সমাবর্ততে স বিদ্যাস্নাতকঃ,
সমাপ্য ব্রতম্ অসমাপ্য বেদং যঃ সমাবর্ততে
স ব্রতস্নাতক, উভয়ং সমাপ্য য সমাবর্ততে
স বিদ্যাব্রত-স্নাতক ইতি।

স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যাব্রত-স্নাতক, যাঁকে বেদব্রত-স্নাতক বলেছেন বৌধায়ন তাঁর গৃহ্যসূত্রে, তাঁরাই তিন প্রকার স্নাতকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মহাভারত সেই শ্রেষ্ঠ স্নাতকের সমাবর্তনের কথা উল্লেখ করেছে কাব্য করে—

বেদব্রতোপবাসেন চতুর্থে চায়ুষো গতে।

[মহা (k) ১২.২৪১.২৯; (হরি) ১২.২৩৯.২৮; পারস্কর গৃহ্যসূত্র (মহর্ষি) ২.৫; বৌধায়ন গৃহ্যপরিভাষাসূত্র ১.১৫]

□ ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে আর একটা কথা না বললেই নয় এবং সেটা হল ব্রহ্মচর্য্য পালনের কাল। যাঁরা সেই ছোটোবেলায় ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে প্রবেশ করে সারা জীবন একেবারে মৃত্যু পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যই পালন করে গেলেন, গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করার আর কোনো তাগিদ অনুভব করলেন না, তাঁদের বলা হত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। নিষ্ঠা শব্দের একট অর্থ মৃত্যু। আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য্য পালনের নাম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য—যিনি মৃত্যু পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করছেন সেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অবশ্যই এক ঊর্ধ্বরেতা মহাপুরুষ যিনি ব্রহ্মচর্য্যের তেজে সমস্ত পাপরাশি ভস্মীভূত করে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে দেবরাজ ইন্দ্রও ভয় পান। ঋষিদের যে সমস্ত অলৌকিক শক্তি দেখা যায়, সেটা এই আমৃত্যু নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের ফল। এই নৈষ্ঠিকতা মানুষকে দীর্ঘ জীবন দিত এবং পরলোকে এনে দিত ব্রহ্মলোক। যাঁরা এইভাবে আমরণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন তাঁদের কোনো পিতৃঋণ থাকে না, বিয়ে-থা না করলেও তাঁদের পাপ নেই কোনো। মহাভারতে স্ত্রীলোকের মধ্যেও এই নৈষ্ঠিকতার উদাহরণ আছে যেখানে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীদের মধ্যে খ্যাতকীর্তি হয়ে আছেন সুলভা এবং শিবা। আর পুরুষের মধ্যে আছেন পিতামহ ভীষ্ম। গোপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—সমস্ত বেদ পড়ার জন্য যত কাল ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন, সেটা অন্তত আটচল্লিশ বছর। সেটাকে চতুর্বেদের চার দিয়ে ভাগ করলে বারো বছর হল সর্বনিম্ন, সময় যার মধ্যে অন্তত একট বেদ পড়া যায়। গোপথ ব্রাহ্মণ বলেছে—একজন ব্রহ্মচারী যেন যথাশক্তি এবং যথাসম্ভব ব্রহ্মচর্য্য পালন করার চেষ্টা করেন—

অষ্টচত্বারিংশদ্‌বর্ষং সর্ববেদব্রহ্মচর্য্যং
তচ্চতুর্ধা বেদেষু ব্যূহ্য
দ্বাদশবর্ষং ব্রহ্মচর্য্যং দ্বাদশবৃর্ষাণ্যবরার্ধমপি
স্নাস্যংশ্চরেদ্ যথাশক্তি।

[মহা (k) ১৩.৭.১৪; ১৩.৭৫.৩৫-৪০; ১২.৩২০ অধ্যায়; (হরি) ১৩.৬.১৪; ১৩.৬০.৩৫-৪০; ১২.৩১১ অধ্যায়; গোপথ ব্রাহ্মণ (মহর্ষি) ২.৫]

□ গার্হস্থ্য: ধর্মসূত্রগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান বশিষ্ঠ-ধর্মসূত্র, বিষ্ণু-ধর্মসূত্র, বৌধায়ন ধর্মসূত্র এবং গৌতম ধর্মসূত্র গৃহস্থ আশ্রমকেই চতুরাশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে মনু এবং মহাভারতও কিন্তু গৃহস্থাশ্রমেরই শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছেন। বশিষ্ঠ লিখেছেন—গৃহস্থরাই যাগযজ্ঞ করেন, তপস্যা কৃচ্ছ্রসাধন করেন। সেইজন্যই চতুরাশ্রমের মধ্য গৃহস্থ আশ্রমই শ্রেষ্ঠ। সমস্ত নদ-নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে মেশে, সেইরকম অন্য তিন আশ্রমের মানুষই গৃহস্থ-আশ্রমে এসে মেলে।

সমস্ত প্রাণীই যেমন জীবন ধারণের জন্য মায়ের ওপর নির্ভর করে, তেমনই ভিক্ষুক তপস্বী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী—সকলেই তাঁদের জীবন যাপনের জন্য গৃহস্থের ওপরেই নির্ভর করেন—

গৃহস্থ এব যজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণান্তু গৃহস্থশ্চ বিশিষ্যতে॥
যথা নদীনদাঃ সর্বে সমুদ্রে যান্তি সংস্থিতিম্।
এবমাশ্রমিণঃ সর্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্॥
যথা মাতরমাশ্রিত্য সর্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
এবং গৃহস্থমাশ্রিত্য সর্বে জীবন্তি ভিক্ষুকাঃ॥

আপস্তম্বের মতো ধর্মসূত্রকার প্রত্যেকটি আশ্রমকেই সমান মূল্য দিয়েছেন। বলেছেন—প্রত্যেকটি আশ্রমেই যে ইতিকর্তব্যতার নির্দেশ আছে, তা পালন করলে অভীষ্ট মঙ্গল লাভ হবেই এবং সেই দিক থেকে দেখতে গেলে গৃহস্থ আশ্রমের কোনো জ্যেষ্ঠতা নেই—

* তেষু সর্বেষু যথোপদেশমব্যগ্রো
বর্তমানঃ ক্ষেমং গচ্ছতি।
* ন তু তজ্জ্যেষ্ঠম্ আশ্রমানাম্।

কিন্তু বৌধায়ন-গৌতমরা আপস্তম্বের থেকে উদার। তাঁরা যে যুক্তিটা দেন, সেখানে যার কথা হল—সন্তান, পুত্র-সন্তান। চতুরাশ্রমের মধ্যে একমাত্র গৃহস্থাশ্রমই আছে, যেখানে অভীষ্ট পুত্রের জন্ম হয়, বংশপরম্পরা চলতে থাকে। বৌধায়ন এখানে শ্রুতিবাক্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ঋগ্‌বেদ থেকে, যেখানে বলা হচ্ছে—হে অগ্নি! আমরা যেন সন্তান-পরম্পরার মাধ্যমে অমৃতত্ব লাভ করতে পারি। বৌধায়ন এই কথারই সূত্র ধরে বলেছেন—আচার্যদের মতেও আশ্রম একটাই, কেননা অন্য আশ্রমগুলিতে প্রজনন-বিহিত পরম্পরার কোনো ব্যবস্থাও নেই, উপায়ও নেই। এখানে ঋগ্‌বেদের সমর্থন একদিকে—সন্তান-পরম্পরার মধ্যেই অমৃতত্ব-লাভের আর অন্যদিকে যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা বলেছে—জন্মমাত্রেই ব্রাহ্মণ তিনটি ঋণ নিয়ে জন্মায়—ঋষি-ঋণ, দেব-ঋণ এবং পিতৃঋণ। ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ঋষি-ঋণ শোধ করা যায়, যজ্ঞের দ্বারা দেবতার কাছে ঋণ শোধ করা যায়, আর পুত্র-কন্যার জন্মের মাধ্যমে পিতৃঋণ শোধ করা যায়—

একাশ্রম্যং ত্বাচার্য্যা অপ্রজননত্বাদিতরেষাম্।...
প্রজাভিরগ্নে অমৃতত্বমশ্যাম্; জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভি ঋণ্বা জায়তে, ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো,
যজ্ঞেন দেবেভ্যো, প্রজয়া পিতৃভ্য ইতি।

বশিষ্ঠ-বৌধায়ন এবং গৌতমের ধর্মসূত্রে গার্হস্থ্য বা গৃহস্থ আশ্রমের যে শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হয়েছে, সেটা মনুস্মৃতির মধ্যে প্রায় একরকম। একটি শ্লোককে বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রের উদ্ধৃতি বলা যায়। মনু লিখেছেন গৃহস্থ আশ্রমই শ্রেষ্ঠ, কেননা অন্য তিন প্রকার আশ্রমীকে গৃহস্থই অন্নদানাদির মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখে—

গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্তি হি।

মনু বলেছেন—যেমন প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করে সকলে বেঁচে থাকে, তেমনই গৃহস্থাশ্রম হল অন্য সব আশ্রমগুলির আশ্রয়। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অধ্যয়ন করে জ্ঞানার্জনের বিধি, বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসাশ্রমেও পরম জ্ঞানের জন্য অন্বেষণ চলে, কিন্তু একই সঙ্গে জ্ঞান এবং অন্নদানের ক্ষমতা একমাত্র গৃহস্থ ছাড়া আর কারও নেই, অতএব গৃহস্থাশ্রমই জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ—

যস্মাৎ ত্রয়ো'প্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থৈরেব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥

শুনতে আশ্চর্য লাগলেও এটা একটা বড়ো সত্য ভারতবর্ষের আদিকাব্য রামায়ণ, যা অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মব্যবস্থার বিষয়ে নির্ণায়ক কথা বলেছে, সেখানে চতুরাশ্রম সম্বন্ধে বিশদ কোনো কথাই নেই। অথচ অজস্র জায়গায় সুযোগ ছিল আশ্রমধর্ম সম্বন্ধে কথা বলার। কিন্তু রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে, যেখানে একবারই কথা হয়েছে চতুরাশ্রম নিয়ে, সেখানে আশ্চর্যজনকভাবে গার্হস্থ্য আশ্রমকেই শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলা হয়েছে—

চতুর্ণামাশ্রমাণাং গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমাশ্রমম্।
আহুর্ধর্মজ্ঞ ধর্মজ্ঞাস্তং কথং ত্যক্তুমর্হসি॥

মহাভারত যেহেতু প্রধানত শত-সহস্র গৃহস্থেরই ইতিহাস রচনা করেছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব সেখানে বারংবার ঘোষিত হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ খুব স্নিগ্ধ স্বরে গুরুগৃহে পাঠরত ব্রহ্মচারীকে অনুরোধ করেছিল—গুরুদক্ষিণা দিয়ে স্নাতক হবার পর এটা খেয়াল রেখো বাছা! যেন তোমার কুলতন্তু ছিন্ন হয়ে না যায়—

আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য
প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ।

মহাভারত এই ঔপনিষদিক ইচ্ছার সার্থক

রূপ দিয়ে বলেছে—গুরুগৃহে ধর্মলাভের পর ব্রহ্মচারী এবার শুভলক্ষণা পত্নীগ্রহণ করার পর যে গার্হপত্য অগ্নি স্থাপন করবেন, তখন থেকেই আয়ুর দ্বিতীয় ভাগে তাঁর গৃহমেধীর জীবন আরম্ভ হল—

ধর্মলব্ধৈর্যুতো দারৈরগ্নীনুৎপাদ্য যত্নতঃ।
দ্বিতীয়মায়ুবো ভাগং গৃহমেধী ভবেদ্ ব্রতী॥

এই যে গৃহস্থকে 'ব্রতী' বলা হল, এই শব্দ থেকেই বোঝা যায় যে, গার্হস্থ্য-ধর্মটা শুধু রতি সম্ভোগ এবং প্রজননের জন্য নয়, গৃহস্থের কর্তব্যের জায়গাটা যথেষ্টই কঠিন এবং মহৎ। গৃহস্থ শুধুমাত্র নিজের জন্য খাদ্যসংগ্রহ করবেন না। যজ্ঞের কারণ ছাড়া অকারণে প্রাণী-হত্যা করবেন না। দিনে, সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে এবং রাত্রির শেষ ভাগে নিদ্রিত থাকবেন না। দিনে একবার এবং রাত্রিতে একবার তিনি পূর্ণ ভোজন করতে পারেন। ঋতুকাল অর্থাৎ ঋতুকালের অব্যবহিত পরবর্তী কাল ছাড়া স্ত্রীসম্ভোগ নিষিদ্ধ। অভ্যাগত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা এবং সম্মান করা গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। কুলোচিত কর্মে আস্থা রেখে সেই কর্মের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করাটাই তাঁর কাজ। মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র-কন্যা, ভৃত্য এবং অতিথিবর্গ, সকলের খাওয়া হয়ে গেলে গৃহস্থ গৃহপতি ভোজন করবেন। পরিবার এবং পরিজনের সঙ্গে আনন্দে বাস করাটাই গৃহস্থের ধর্ম। তিনি সৎ উপায়ে ধনার্জন করে সেই ন্যায়সঞ্চিত অর্থে দেবতা, অতিথি এবং অন্যান্য পোষ্যবর্গের সেবা করবেন। অন্য কারও ধনে তিনি লোভ করবেন না—

ধর্মাগতং প্রাপ্য ধনং যজেত
দদ্যাৎ সদৈবাতিথীন্ ভোজয়েচ্চ।
অনাদদানশ্চ পরৈরদত্তং
সৈষা গৃহস্থোপনিষৎ পুরাণী॥

[বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র (Olivelle) ১০.১৪-১৬; আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ২.৯.২১.২; ২.৯.২৪.১৪; ঋগ্বেদ ৫.৪.১০; তৈত্তিরীয় সংহিতা ১.৪.৪৬.১; বৌধায়ন ধর্মসূত্র (চিন্নস্বামী) ২.৬.২৯, ৩৬; মনুসংহিতা ৩.৭৭-৮০; ৬.৮৯-৯০; তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১.১১.১; রামায়ণ ২.৯৪.৫৮; মহা (k) ১২.২৪১.৩০; ১২.৬১ অধ্যায়; ১২.১৯১ অধ্যায়; ১২.২২১ অধ্যায়; (হরি) ১২.২৩৯.২৯; ১২.৬০ অধ্যায়; ১২.১৮৪ অধ্যায়; ১২.২২০ অধ্যায়]

□ প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে যে যজ্ঞ তার নাম পঞ্চযজ্ঞ। গৃহস্থের কর্ম বলেই এটা বৈদিক কোনো যাগযজ্ঞের মতো নয়, বরঞ্চ এই যজ্ঞের একটা পারিভাষিকতা আছে। পঞ্চযজ্ঞের প্রথম হচ্ছে ব্রহ্মযজ্ঞ, দ্বিতীয়, পিতৃযজ্ঞ, তৃতীয় দৈবযজ্ঞ, চতুর্থ ভূতযজ্ঞ, আর পঞ্চম হল নৃযজ্ঞ। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা হল ব্রহ্মযজ্ঞ। তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ; হোম হচ্ছে দৈবযজ্ঞ; সমস্ত প্রাণীর জন্য ভোগ্য উৎসর্গের নাম ভূতযজ্ঞ বা ভূতবলি। আর অতিথি সৎকারের নাম নৃযজ্ঞ। মহাভারত বলেছে— গৃহস্থাশ্রমে থেকে যে মানুষ মোহবশত পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না, তার ইহলোকেও সুখ হয় না, পরলোকেও মহান কোনো লাভ ঘটে না। অতএব পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান একজন গৃহস্থের প্রাত্যহিক ইতিকর্তব্যতার মধ্যে পড়ে—

পঞ্চযজ্ঞাংস্তু যো মোহান্ন করোতি গৃহাশ্রমী।
তস্য নায়ং ন চ পরো লোকো ভবতি ধর্মতঃ॥

[দ্র. পঞ্চযজ্ঞ]

[মহা (k) ১২.১৪৬.৭; (হরি) ১২.১৪২.৭]

□ গৃহস্থ যেহেতু গ্রাম-শহরের মধ্যে অন্যান্য আরও কতগুলি গৃহস্থের সঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েই থাকেন, তাই নিজের স্বভাব এবং আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁকে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে পিতামহ ভীষ্ম গৃহস্থের পালনীয় কর্তব্যগুলি নির্দেশ কর বছেন—রাজপথে, গোষ্ঠে অথব ধান্যক্ষেত্রে মল-মূত্র ত্যাগ করা চলবে না। শুচিতা এবং বারংবার আচমন অর্থাৎ হাত ধোয়া, দেবার্চনা, পিতৃতর্পণ—এগুলি গৃহস্থের নিত্য কাজ। সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠতে হবে। সকাল-সন্ধ্যায় গায়ত্রীজপ করতে হবে। হাত-পা-মুখ ভালো করে ধুয়ে নিয়ে পুবমুখো হয়ে খেতে বসতে হবে। পায়ে জল-লাগা অবস্থায় ঘুমোনো চলবে না। যজ্ঞশালা, দেবালয়, বৃষ এবং ব্রাহ্মণকে প্রদক্ষিণ করা উচিত। অতিথি, কুটুম্ব-স্বজন, কাজের লোক বা প্রেষ্যবর্গের সঙ্গে এক রকমের খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। আহার দিনে একবার রাত্রে একবার। বৃথামাংস অর্থাৎ যজ্ঞ, পূজা ইত্যাদিতে নিবেদিত মাংস ছাড়া স্বেচ্ছায় মাংস খাওয়াও চলবে না, অন্যান্য অখাদ্য বস্তুও খাওয়া নিষিদ্ধ। গুরুজনদের অভিবাদন করতে হবে, নবোদিত

সূর্যের দিকে তাকাবে না, সূর্যের দিকে মুখ করে মলমূত্র ত্যাগ করা চলবে না। পত্নীর সঙ্গে একই শয্যায় শয়ন এবং একই পাত্রে ভোজন বর্জনীয়।

মহাভারতে শ্রী-বাসব-সংবাদে গৃহস্থের আচরণীয় কর্তব্যগুলি পালনের ফলে ঐশ্বর্য্য-লাভের কথা বলা হয়েছে এবং অনেক অনাচরণীয় ব্যবহারের ফলে গৃহস্থ যে শ্রীভ্রষ্ট হয়, সে কথাও সবিস্তারে বলা হয়েছে।

সদাচারী গৃহস্থ গৃহস্থ-ধর্ম পালনের ফলেই মুক্তিলাভ করতে পারেন। মুক্তির জন্য তাঁর অন্য আশ্রম গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। মহাভারতে রাজর্ষি জনক ধর্মধ্বজ গৃহস্থ ছিলেন। ব্রহ্মচারিণী সুলভার সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেছিলেন—গার্হস্থ্যধর্মের প্রতি দোষদর্শী হয়ে যে বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসের মতো অন্য আশ্রম গ্রহণ করে, সে যে সব সময় আসক্তি শূন্য হয়, তা তো নয়। বিশেষত রাজারা যে আধিপত্য নিয়ে চলেন, কাউকে তারা অনুগ্রহ করছেন কাউকে বা নিগ্রহ করছেন, ভিক্ষু-সন্ন্যাসীরাও তো অনেক সময় তাই করেন, সেখানে তাঁদের বা মুক্তি হচ্ছে কোথায়! কাজেই অর্থহীন অকিঞ্চন অবস্থায় জীবনধারণ করাটাই শুধু মুক্তির কারণ হতে পারে না। বরঞ্চ মুক্তির প্রধান কারণ যে বিষয়বৈরাগ্য বা বিষয়ে অনাসক্তি সেটা তো গৃহস্থ-আশ্রমেও সম্ভব। কাজেই গৃহস্থ-আশ্রমে মুক্তি লাভের কোনো সমস্যা নেই—

দোষদর্শী তু গার্হস্থ্যে যো ব্রজেদাশ্রমান্তরে।
উৎসৃজন্ পরিগৃহ্নংশ্চ সো'পি সঙ্গান্ন মুচ্যতে॥
আধিপত্যে তথা তুল্যে নিগ্রহানুগ্রহাত্মকে।
রাজভির্ভিক্ষুকাস্তুল্যা মুচ্যন্তে কেন হেতুন॥

[মহা (k) ১২.৩২০.৪৪-৪৫;
(হরি) ১২.৩১০.৪৪-৪৫]

□ একজন গৃহস্থের জীবিকা হতে পারে চার প্রকার। গৃহস্থের জীবিকা প্রয়োজন এই কারণেই যে, এই সময় পত্নীর সঙ্গে সহধর্মচারিতায় ব্রতী হয়ে তাঁকে ধর্ম-অর্থ-কামের চিন্তা করতে হয়, কিন্তু সেটা আবার অগর্হিত উপায়ে অর্থোপার্জনের মাধ্যমে। নিজের বেদবিদ্যা এবং দর্শন-শাস্ত্রের উপলব্ধি বিতরণ করে রাজারাজড়াদের কাছ থেকে দক্ষিণা নিতে পারেন গৃহস্থ। অন্যের যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করে দক্ষিণা মূল্য পেতে পারেন। অধ্যাপনা করে এবং অন্যের দান গ্রহণ করেও গৃহস্থের অর্থের উপার্জন হতে পারে। আর পাহাড় অঞ্চলে পাওয়া মণি-রত্ন, দিব্য ওষধি এবং সোনার আকরস্থান থেকে সোনা সংগ্রহ করেও গৃহস্থ অর্থোপার্জন করতে পারেন। অথবা যাগ-যজ্ঞ, পিতৃশ্রাদ্ধ এবং অন্যান্য নিয়ম অভ্যাসের ফলে দৈবপ্রসাদে যদি অর্থ আসে, তবে সেইভাবে গৃহস্থ ধন উপার্জন করবেন। কিন্তু উপার্জিত অর্থ তাঁর নিজের সুখভোগের জন্য নয়। কেননা ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী, সন্ন্যাসী এবং অতিথি—সকলেই গৃহস্থের ভরণ পোষণের ওপর বেঁচে থাকেন বলেই গৃহস্থাশ্রম সমস্ত আশ্রমের মূল—

তদ্ধি সর্বাশ্রমাণাং মূলমুদাহরন্তি।
গুরুকুলনিবাসিনঃ।
পরিব্রাজকা যে চান্যে
সঙ্কল্পিত-ব্রত-নিয়ম-ধর্মানুষ্ঠায়িনঃ
তেষামপ্যত এব ভিক্ষা-বলি-
সংবিভাগাঃ প্রবর্তন্তে।

এখানে গৃহস্থের ধনার্জনের উপায় সম্বন্ধে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, তা খানিক অবিন্যস্ত বলা যায়। মহাভারতের শান্তিপর্বে শুকানুপ্রশ্নের মতো দার্শনিক বক্তব্যের মধ্য স্বয়ং ব্যাস গৃহস্থের চার প্রকারের বৃত্তি নির্দেশ করে বলেছেন— ১. কুশূলধান্য, ২. কুম্ভধান্য, ৩. অশ্বস্তন এবং ৪. কাপোতী বৃত্তি। কুশূলধান্য মানে প্রচুর ধনের সঞ্চয় আছে যাঁর কাছে। আর কুম্ভধান্য মানে অল্প সঞ্চয় যাঁর আছে। অশ্বস্তন মানে যিনি আগামীকালের জন্যও অর্থ সঞ্চয় করেন না। আর কাপোতী বৃত্তি মানে যিনি কপোতের মতো ধান্যক্ষেত্র থেকে শস্যকণা কুড়িয়ে এনে জীবিকানির্বাহ করেন, এটাকে উঞ্ছবৃত্তিও বলা যেতে পারে—এই বৃত্তিগুলির মধ্যে ক্রমান্বয়ে পরের পরেরটি প্রশস্ত—

গৃহস্থবৃত্তয়শ্চৈব চতস্রঃ কবিভিঃ স্মৃতাঃ।
কুশূলধান্যঃ প্রথমঃ কুম্ভধান্যস্তনন্তরম্।।
অশ্বস্তনো'থ কাপোতীমশ্রিতো বৃত্তিমাচরেৎ।
তেষাং পরঃ পরো জ্যায়ান্ ধর্মতো ধর্মজিত্তমঃ॥

[মহা (k) ১২.১৯১.১০; ১২.২৪২.২-৩;
(হরি) ১২.১৮৪.১০; ১২.২৪০.২-৩]

□ বানপ্রস্থ: বানপ্রস্থের পূর্ব নাম ছিল বৈখানস। বৌধায়ন তাঁর ধর্মসূত্রে এই দুটিকে মিলিয়ে দিয়ে বলেছেন—বৈখানস-শাস্ত্রের সদাচার, সমুদাচারই বানপ্রস্থ—

বানপ্রস্থো বৈখানস-শাস্ত্রসমুদাচারঃ।

আর গৌতম ধর্মসূত্র বানপ্রস্থের জায়গায় বৈখানস আশ্রম বলেই বানপ্রস্থকে মেনে নিয়েছেন—ব্রহ্মচারী গৃহস্থো ভিক্ষুর্বৈখানসঃ।

পুরাতন কালে বানপ্রস্থের আচার-আচরণ নিয়ে নিশ্চয়ই কোনো বৈখানস শাস্ত্র ছিল যেটা মনুসংহিতার টীকায় উল্লেখ করেছেন মেধাতিথি। মনুশ্লোকে 'বৈখানসমতে স্থিতঃ' এই অংশের টীকায় মেধাতিথি লিখেছেন— বৈখানসদের শাস্ত্র হল সেটাই, যেখানে বানপ্রস্থের নিয়ম-বিধি বিহিত হয়েছে—

বৈখানসং নাম শাস্ত্রং যত্র বানপ্রস্থস্য
ধর্মা বিহিতাঃ।

বৈখানসদের মত উদ্ধার করে মহাভারতের শান্তিপর্বে দেবস্থান নামে ঋষি যুধিষ্ঠিরকে বলছেন—বৈখানসদের বচন হল— ধনার্জনের জন্য চেষ্টা করার থেকে ধনের ব্যাপারে অনীহা ব্যাপারটা অনেক ভালো—

বৈখানসানাং কৌন্তেয় শ্রূয়তে বচনং তথা।
ঈহেত ধনহেতোর্যস্তস্যানীহা গরীয়সী।।

[মহা (k) ১২.২০.৬; (হরি) ১২.২০.৬-৭; বৌধায়ন ধর্মসূত্র (চিন্নস্বামী) ২.৬.১৬; গৌতমধর্মসূত্র (মহর্ষি) ৩.২; মানব ধর্মশাস্ত্র ৬.২১]

□ বানপ্রস্থ আশ্রমের পূর্ব নাম যাই থাকুক, চতুরাশ্রমের পরিচিত তৃতীয় ভাগের নামই বানপ্রস্থ অর্থাৎ আরণ্য জীবন বেছে নেওয়া। মনুসংহিতায় বানপ্রস্থী হওয়ার আগে যে গৃহস্থ জীবন, তারই সূত্র ধরে বলা হয়েছে যে, গৃহস্থ যখন দেখবেন যে, তাঁর চুল পেকে যাচ্ছে, মুখমণ্ডলে বলিরেখা ফুটে উঠছে এদিকে তাঁর ছেলে-মেয়ের ঘরে নাতি-নাতনী এসে গেছে, তখন গৃহস্থ অরণ্যে বানপ্রস্থীর জীবন কাটানোর কথা ভাববেন—

গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্ বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥

মহাভারতে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দেবার সময় প্রায় সমার্থকভাবেই বানপ্রস্থের সময় নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন, যদিও তিনি ছেলে-মেয়ের ঘরে নাতিপুতি পর্যন্ত ভাবেননি। বিদুর বলেছেন—মানুষ পিতৃঋণে বাঁধা থাকে, তাই পুত্রলাভ করার পর যখন ঋণমুক্ত হয়ে যাবেন, পুত্রদের জীবিকানির্বাহের উপায়ও যখন স্থির হয়ে যাবে, মেয়েদের যখন উপযুক্ত ঘরে বিয়ে দেওয়া হয়ে যাবে, তখন গৃহস্থ বনবাসী মুনি হবার কথা ভাববেন—

উৎপাদ্য পুত্রাননৃণাংশ্চ কৃত্বা/
বৃত্তিঞ্চ তেভ্যো'নুবিধায় কাঞ্চিৎ।
স্থানে কুমারীঃ প্রতিপাদ্য সর্বা/
অরণ্য সংস্থো'থ মুনির্বুভূষেৎ।।

তবে বিদুর যাই বলুন, মহাভারতের শান্তিপর্বে যেখানে বানপ্রস্থ-আশ্রমের বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে, সেখানে আরম্ভেই মনুকথিত শ্লোকটিই আছে অর্থাৎ বার্ধক্যের সূচনা হলেই নাতি-নাতিনীর মুখ দেখে সংসার-সম্পত্তি ছেলেপিলেদের হাতে দিয়ে গৃহী মানুষ ঈশ্বরচিন্তায় কাল কাটানোর জন্য বানপ্রস্থে যাবেন। জীবনের তৃতীয় এই ভাগের নামই বানপ্রস্থ—

তৃতীয়মায়ুষো ভাগং বানপ্রস্থাশ্রমে বসেৎ।

[মানব ধর্মশাস্ত্র ৬.২; মহা (k) ৫.৩৭.৩৯; ১২.২৪৩.৪-৫; (হরি) ৫.৩৭.৩৯; ১২.২৪১.৪-৫]

□ বানপ্রস্থের নিয়ম-কানুন এবং বানপ্রস্থীর আচার-আচরণ যা যা আছে, সেগুলি ধর্মসূত্রের গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষত গৌতম ধর্মসূত্র, আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, বৌধায়ন ধর্মসূত্র, বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র, বিষ্ণু ধর্মসূত্র এবং মনুসংহিতায় বিস্তারিত ভাবে বলা আছে।

[গৌতম ধর্মসূত্র (Olivelle) ৩.২৬-৩৫, পৃ. ১২৮; আপস্তম্ব ধর্মসূত্র (Olivelle) ২.৯ (পটল), ২১.১-২৪; পৃ. ১০৪-১০৬; বৌধায়ন ধর্মসূত্র (চিন্নস্বামী শাস্ত্রী) ২.৬.১১.১৬-১৭, পৃ. ২৫০; বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র (Olivelle) ৯ম অধ্যায়, পৃ. ৩৮৪; বিষ্ণু ধর্মসূত্র (মহর্ষি), ৯৫ অধ্যায়, পৃ. ৮৮; মনুসংহিতা, ৬.১-৩২]

□ মহাভারতে বানপ্রস্থের বহুল তথ্য এবং বিবরণ আছে। এখানে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল—গৃহস্থ তাঁর বয়সের তৃতীয় পর্যায়ে যখন বানপ্রস্থে যাবেন, তখন তাঁর পত্নীও ইচ্ছা করলে স্বামীর সহধর্মচারিণী হয়ে বানপ্রস্থে যেতে পারেন। স্ত্রী ইচ্ছুক না থাকলে তাঁকে ছেলেদের কাছে রেখে গৃহস্থ নিজে একা সব সময়েই যেতে পারেন—

সদারো বাপ্যদারো বা আত্মবান্ সংযতেন্দ্রিয়।

বানপ্রস্থ অবলম্বন করার পর আরণ্যক-উপনিষদের মতো মোক্ষশাস্ত্র পড়ার নিয়ম বলে মহাভারত এক জায়গায় জানিয়েছে—

তত্রারণ্যকশাস্ত্রাণি সমধীত্য স ধর্মবিৎ।
ঊর্ধ্বরেতা প্রবজিত্বা গচ্ছতক্ষরসাত্মতাম্॥
[মহা (k) ১২.৬১.৪; ১২.৬১.১৫; ১২.২৪২.২৯;
(হরি) ১২.৬০.৪; ১২.৬০.১৫; ১২.২৪০.২৯]

□ বানপ্রস্থে আরণ্যক জীবন কাটানোর মধ্যে পঞ্চাশোর্ধ্ব মানুষের যে কষ্টকৃচ্ছ্রতা আছে, সেটা থেকে বাঁচানোর জন্যই মহর্ষি ভৃগু ভরদ্বাজকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন—বানপ্রস্থীরা বিভিন্ন পুণ্য তীর্থে গিয়ে থাকতে পারেন এবং সেটা লোকসমাগমের মধ্যে জীবন কাটানো। আর থাকতে পারেন নির্জন অরণ্যস্থানে, প্রকৃতির কোলে, যেখানে নদী-প্রস্রবণের অভাব নেই, কিন্তু মৃগ-মহিষ, ব্যাঘ্র-শূকরের মোকাবিলা করেই তেমন জায়গায় থাকতে হবে—

পুণ্যানি তীর্থানি নদী-প্রস্রবণানি সুবিবিক্তেষ্বরণ্যেষু
মৃগ-মহিষ-বরাহ-শার্দূল-বনগজাকীর্ণেষু
তপস্যন্তো'নুসঞ্চরন্তি।

আর একটা বানপ্রস্থী-ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো, যেটা হল—বানপ্রস্থে যাওয়া মানুষেরা সাধারণ মানুষের খাদ্য-পান, বেশ-বাস-পরিচ্ছদ কিছু গ্রহণ করবেন না। গৃহস্থের বসনভূষণ এবং কৃষিলব্ধ চাল-ডালের মতো খাবার তাঁকে বর্জন করতে হবে। বন্য ওষধি, ফল-মূল, বৃক্ষপত্র—এগুলি দিয়েই উদর-পূরণ করতে হবে, যদিও এই খাদ্যও পেট পুরে খাওয়া চলবে না—পরিমিত-বিচিত্র-নিয়তাহারাঃ। বানপ্রস্থীর শয়নেও কোনো বিলাস থাকবে না—ভূমি, পাষাণ, বালি এবং ভস্মরাশিই বানপ্রস্থীর শয্যা। কাশ, কুশ, চর্ম এবং বৃক্ষবল্কল তাঁদের পরিধান। বানপ্রস্থী চুল, দাড়ি, গোঁফ কাটবেন না, নখও কাটবেন না, ক্ষৌরকর্ম তাঁর বিধেয় নয়—কেশ-শ্মশ্রু-নখ-ধারিণঃ—ত্রিসন্ধ্যা স্নান করবেন, সময় ধরে হোম-যজ্ঞ এবং অন্যান্য আহুতি দেবেন। হোম-যজ্ঞে ব্যবহার্য্য সমিৎ, কুশ এবং পূজার ফুল আহরণ করতে হবে সময়মত। এইসব পরিশ্রম-আয়াস এবং কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও বানপ্রস্থীর সর্বশেষে উদ্দেশ্য থাকবে তত্ত্বসাক্ষাৎকার বা ঈশ্বরীয় ভাবনায়। বৈখানসধর্ম এটাই।

বর্ষা-শীত-গ্রীষ্মের মধ্যে থাকতে থাকতে বানপ্রস্থীর শরীর-ত্বক্ বিশীর্ণ হবে। তার সঙ্গে নিয়ম-বিধি পালন করতে করতে এই শরীর শুকিয়ে যাওয়ার মধ্যে—

পরিশুষ্ক-মাংস-শোণিত-ত্বগস্থিভূতাঃ।

—বানপ্রস্থধর্মের একটা মাত্রা আছে এবং শুধু সত্ত্বগুণই যেন এখানে বানপ্রস্থীর শরীর-ধারণে সাহায্য করে—

সত্ত্বযোগাচ্ছরীরাণি উদ্বহন্তে।

বানপ্রস্থাশ্রমী কোন অগ্নিতে তাঁর হোমাদি কর্ম করবেন—অর্থাৎ বানপ্রস্থে যাবার সময় তিনি তাঁর গার্হস্থ্যকালীন গৃহ্য অগ্নি সঙ্গে নিয়ে অরণ্যে পৌঁছোবেন নাকি অরণ্যে নতুন অগ্নিস্থান সৃষ্টি করে সেখানে পৃথক ব্যবস্থা নেবেন কিনা—এসব বিষয়ে একটু-আধটু মতভেদ থাকলেও—মহাভারত বলেছে— পূর্বে যেসব অগ্নিকার্য তিনি করতেন, সেই সেই অগ্নির পরিচর্যা তিনি বানপ্রস্থাশ্রমেও করবেন এবং সেই অগ্নিহোত্র-কর্মের জন্য পূর্বের সেই গোরুগুলি এবং যজ্ঞের কাজের জন্য যে সব উপকরণ লাগে, সেগুলোও তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন—

তানেবাগ্নীন্ পরিচরেদ্ যজমানো দিবৌকমঃ॥
নিয়তো নিয়তাহারঃ ষষ্ঠভক্তো'প্রমত্তবান্।
তদগ্নিহোত্রং তা গাবো যজ্ঞাঙ্গানি চ সর্বশঃ॥

যজ্ঞের মধ্যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস এমনকী চাতুর্মাস্যের কথাও নীলকণ্ঠ টীকার মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছেন। যজ্ঞে আহুতি দেবার বস্তুগুলি অবশ্যই অনায়াস-লভ্য হওয়ার প্রয়োজন। অরণ্যে যা পাওয়া যায়, সেটাই আহুতির দ্রব্য হতে পারত।

বানপ্রস্থ আশ্রমেও চারপ্রকারের জীবিকা বা বৃত্তির কথা বলেছে মহাভারত। কেউ কেউ আছেন, যাঁরা যে দিন যা পেলেন, সেই দিনই সেটা শেষ করে দিলেন, এঁদের নাম বলেছে মহাভারত—

সদ্যঃ প্রক্ষালকাঃকেচিৎ।

আবার কেউ কেউ এক মাসের সঞ্চয় করে রাখেন, কেউ এক বছরের জন্য আবার কেউ বা বারো বছরের জন্য সঞ্চয় করেন—

সদ্যঃ প্রক্ষালকাঃ কেচিৎ কেচিন্মাসিকসঞ্চয়াঃ।
বার্ষিকং সঞ্চয়ং কেচিৎ কেচিদ্দ্বাদশবার্ষিকম্॥

বানপ্রস্থীরা বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভিজবেন, হেমন্তকালে জলে ডুব দিয়ে ঠাণ্ডা সহ্য করবেন আর গ্রীষ্মকালে সামনে-পিছনে আগুন জ্বেলে সূর্যের দিকে তাকিয়ে তপস্যা করবেন। পরিমিত আহার করবেন কিন্তু তাও দিবসের ষষ্ঠ ভাগে।

বানপ্রস্থীরা অনেক সময় পা ওপরে রেখে মাথা নীচের দিকে অবনমিত করে ভূতলে অবস্থান করেন। কেউ পদাগ্রে ভূমিতে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকেন, কেউ খুব ছোট্ট অপরিসর জায়গার মধ্যে অবস্থান করেন, কেউ স্বস্তিকাদি বিভিন্ন আসনে অবস্থান করেন, আবার অনেকে যজ্ঞের সময় বারবার স্নান করেন—সবনেষ্বভিষিঞ্চতে।

খাদ্যগ্রহণের ব্যাপারেও বানপ্রস্থীর কৃচ্ছ্রতা লক্ষ্য করার মতো। দুটি ভাত যে তিনি খাবেন, সেখানে ধান ভেঙে তুষ বার করার সময় তিনি দাঁতের ব্যবহার করবেন এবং এমন হতেই পরে যে সিদ্ধ করা ভাত নয়, দাঁতে ধান ভেঙে তুষ বার করে ওই চালটাই চিবিয়ে খাবেন। এঁদের বলা হয় দন্তোলূখলিক, অর্থাৎ দাঁতকে যাঁরা হামান-দিস্তার মতো ব্যবহার করছেন। আর আছেন অশ্মকুট্টেরা অর্থাৎ তাঁরা ধান থেকে চাল বের করেন পাথর দিয়ে অল্পাঘাতে। অনেক বানপ্রস্থী আছেন যাঁরা শুক্লপক্ষে একবার ছয়ভাগ জলে যবের গুড়ো ঢেলে সেদ্ধ করেন এবং সেই মণ্ড একবার খেয়ে মাস কাটিয়ে দেন। আবার কেউ আছেন যাঁরা কৃষ্ণপক্ষে একবার এই যবমণ্ড বা যবাগু পান করেন। কেউ কেউ যেমনটা পান, ততটুকুই খান। ফলমূল কিংবা ফুল খেয়েও থাকেন অনেকে। কিন্তু এঁদের সকলের কাছেই ব্রহ্মধ্যান বা উপনিষদিক তত্ত্বসাক্ষাৎকার করাটাই সাধারণ ধর্ম।

মহাভারত জানিয়েছে—যেসব ঋষিরা এই বানপ্রস্থধর্ম প্রবর্তন এবং প্রচার করেছেন, তাঁরা হলেন—অগস্ত্য, সপ্তর্ষিবাণ, মধুছন্দা, অঘমর্ষণ, সাংকৃতি, সুদিবাতণ্ডি, যথাবাস, অকৃতশ্রম, অহোবীর্য, কাব্য, তাণ্ড্য, মেধাতিথি, বুধ, বলবান, কর্ণনির্বাক, শূন্যপাল এবং কৃতশ্রম।

[মহা (k) ১২.২৪৩.১-১৮; ১২.১৯২.১-২;
(হরি) ১২.২৪১.১-১৮; ১২.১৮৫.১-২]

☐ মহাভারতের চরিত্রগুলির মধ্যে অনেকগুলি চরিত্র আছে যাঁরা বানপ্রস্থ গ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান চরিত্র ধৃতরাষ্ট্রের বানপ্রস্থাশ্রম স্বীকার করে নিতে একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল। আয়ুষ্কালের তৃতীয় পর্যায়ের পরিবর্তে তিনি হয়তো প্রায় অন্তিম পর্যায়ে বানপ্রস্থাশ্রম স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু বানপ্রস্থের নিয়ম মেনে বল্কল এবং অজিন পরিধান করে, অগ্নিহোত্র হোমের সংস্কৃত অগ্নি ঘর থেকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন বনে। তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁর ধর্মপত্নী গান্ধারী। এই বৃদ্ধ দম্পতি, যাঁদের মধ্য একজন জন্মান্ধ এবং অন্যজন স্বামীর কারণে কৃত্রিম অন্ধত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন—তাঁদের অসহায়তার কথা মনে রেখেই ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর অনুগামিতায় বানপ্রস্থ গ্রহণ করেছিলেন পাণ্ডবজননী কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্রের ছোটো ভাই বিদুর এবং বহুদিনের বিশ্বস্ত অনুচর তথা মন্ত্রী সঞ্জয়। তাঁরা ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী এক অরণ্যে আশ্রয় নিয়ে বৈখানস-ধর্ম পালন করতেন। অনেক তপস্বীরাও ছিলেন তাঁর সঙ্গে। এই আরণ্যক জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা আছে মহাভারতের আশ্রমবাসিক-পর্বে।

লক্ষণীয়, ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীরা যেখানে বানপ্রস্থীর জীবন কাটাচ্ছিলেন, সেখানে কেকয় দেশের রাজা শতযূপও বানপ্রস্থীর ধর্ম অবলম্বন করে কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে এই কেকয়রাজ শতযূপের দেখাও হয়েছিল—

আসসাদাথ রাজর্ষিং শতযূপং মনীষিণম্।

মহাভারতে যদু-তুর্বসু-পুরুর বিখ্যাত পিতা মহারাজ যযাতি পত্নী দেবযানীর সঙ্গে প্রবল দাম্পত্য সুখোপভোগ শেষ করে অবশেষে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন। ফলমূলের দ্বারা জীবন নির্বাহ করে আশ্রমোচিত ধর্মানুষ্ঠান করার ফলে তিনি স্বর্গলাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মহাভারতে যুধিষ্ঠির-ভীমদের পিতা পাণ্ডুও বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা করেছিলেন গৃহস্থাশ্রম পুরোপুরি শেষ না করেই। তিনি হয়তো অন্ধ দাদা ধৃতরাষ্ট্রের অতিরিক্ত রাজ্যলোভ সইতে না পেরেই দুই স্ত্রীকে নিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে আবার মৃগরূপী কিমিন্দম মুনির কারণে পাণ্ডু স্ত্রীসম্ভোগের ফলে অকালে মৃত্যুর অভিশাপ লাভ করেন, তখন পাণ্ডু সংসার-নির্বিন্ন হয়ে বানপ্রস্থীর মতো জীবন কাটাতে থাকেন, যদিও এই বানপ্রস্থের আচরণ স্বাভাবিক পর্যায়ের বানপ্রস্থ নয়।

আবার বিশ্বামিত্রের পিতা রাজর্ষি গাধি, পুরুবংশীয় শান্তনুরাজার পিতা প্রতীপ—এঁরা নিঃসন্তান অবস্থাতেই বানপ্রস্থ অবলম্বন

করেছিলেন এবং সেই সময়ে বংশরক্ষক পুত্র লাভ করেন বলেও জানা যায়।

[মহা (k) ১৫.১৫ এবং ১৮ অধ্যায়; ১৫.১৯.১-১০; ১.৮৬ অধ্যায়; ১.১১৯ অধ্যায়; (হরি) ১৫.১৭ এবং ২০ অধ্যায়; ১৫.২১.১-১০; ১.৭৪.১২-১৭; ১.১১৩ অধ্যায়]

□ সন্ন্যাস : সন্ন্যাস নামক এই চতুর্থ আশ্রম সম্বন্ধে মহাভারতের যুক্তিটা বড়ো বেশি বয়স-নির্ভর চিন্তায় পরিচালিত হয়েছে বলে মনে হয়। মহাভারত বলেছে—শরীর যখন নিতান্ত জরাগ্রস্ত, নানা ব্যাধিতে শরীর আক্রান্ত হয়ে উঠছে, তখন আর কালবিলম্ব না করে বানপ্রস্থ আশ্রম ত্যাগ করবেন, অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করবেন—

জরয়া চ পরিদ্যুনো ব্যাধিনা চ প্রপীড়িতঃ।
চতুর্থে চায়ুষো শেষে বানপ্রস্থাশ্রমং ত্যজেৎ॥

আমরা সন্ন্যাসী বলতে যে সর্বত্যাগী মুক্তস্বভাব বৈরাগীকে বুঝি, সেখানে মহাভারত সে-সব বৈরাগ্যবিদ্যার কথা বললেও এখানে আশ্রম থেকে আশ্রমান্তর গ্রহণ করার একটা কৃত্রিমতা কাজ করে যেন। সেখানে যেন বয়সের ভারবশতই বৈরাগ্য হওয়াটা জরুরী এইরকম একটা ভাব জুড়ে বসে মহাভারতের বক্তব্যে। মহাভারত বলছে—জীবনের চতুর্থ ভাগে বানপ্রস্থাশ্রম ছেড়ে সন্ন্যাসে প্রবেশ করার পূর্বে একদিন ব্যাপী সাদ্যস্ক নামে একপ্রকার বেদোক্ত প্রাজাপত্য যজ্ঞ শেষ করে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দিয়ে আত্মচিন্তা বা ব্রহ্মানুধ্যানে মন দেবেন, তিনি আত্মমোদী আত্মারাম হওয়ার পর ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করবেন।

মহাভারত যেভাবে সন্ন্যাস আশ্রমের আচার-আচরণ বর্ণনা করেছে, তাতে এইরকম মনে হয় যে, বানপ্রস্থ আশ্রমের নিয়ম আচার কৃচ্ছ্রতাই যেন সন্ন্যাস আশ্রমের পথ পরিষ্কার এবং প্রস্তুত করে দেয়—

আশ্রমাদাশ্রমং পুণ্যং পূতো গচ্ছতি কর্মভিঃ।

সন্ন্যাস আশ্রমের প্রধান লক্ষণ সঙ্গত্যাগ, আসক্তি ত্যাগ, এমনকী বেদবিহিত কর্ম-নিয়মাচারেও কোনো আসক্তি থাকবে না। ব্যাস তাঁর পুত্র শুকদেবকে বলছেন—এই অবস্থায় কাউকে স্তব-স্তুতি করারও দরকার হয় না, কাউকে নমস্কারও করতে হয় না। তুমি শুভ এবং অশুভ দুয়েরই চিন্তা পরিত্যাগ করে, যদৃচ্ছালব্ধ যে কোনো বস্তু ভোজনে তৃপ্তি লাভ করে অরণ্যে একাকী বিচরণ করো—

নিস্তুতির্নির্নমস্কারঃ পরিত্যজ্য শুভাশুভে।
অরণ্যে বিচরৈকাকী যেনকেনচিদাশিতঃ॥

সন্ন্যাসীর ধর্ম হল নিবৃত্তিলক্ষণ। ফলে সন্ন্যাসীর ধর্মে অন্যের কোনো সহায়তা দরকার হয় না। পূর্ব পূর্ব আশ্রমের ধর্ম, অগ্নি ত্যাগ করে সর্বত্যাগী যোগী যৎকিঞ্চিৎ উদরান্নের জন্যই শুধু গৃহস্থের কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। সন্ন্যাসীর মনে সমস্ত মানুষের প্রতি দয়ার বৃত্তি থাকবে। কখনো একটি নির্দিষ্ট গ্রামে বেশিদিন বাস করবেন না। কোনো কুটীরই হোক, বিশেষ কোনো নদীতীরবর্তী স্থানই হোক, পরিধানের বসনই হোক বা বসার আসনই হোক, কোথাও কোনো আসক্তি থাকবে না সন্ন্যাসীর, আবেশ থাকবে না অগ্নিহোত্রের। এমনকী সন্ন্যাসের প্রতীক যে ত্রিদণ্ড, সেই ত্রিদণ্ডের প্রতিও তাঁর আবেশ থাকবে না। শয়নের স্থান নিয়ে যেমন ভাবনা থাকবে না, তেমনই পথিকের আশ্রয়স্থল শরণালয়েও তিনি থেকে যেতে পারেন। তিনি বৃক্ষমূলে থাকতে, পোড়ো বাড়িতে থাকতে পারেন, শুতে পারেন নদীর তীরে এবং সেটাই সবচেয়ে ভালো, কেননা জলটা সেখানে সহজে মেলে। পৃথিবীর সমস্ত আসক্তি, সমস্ত স্নেহবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সন্ন্যাসী আত্মচিন্তা করবেন শুধু মোক্ষদৃষ্টি মাথায় রেখে। তার অনাসক্তির মাত্রা এইখানে যেতে হবে যে, তিনি এক জায়গায় কখনো থাকবেন না, একটিমাত্র গ্রামে নয়, নদীর যে তীরে যেখানে তিনি একবার শুয়ে ছিলেন সেখানে দ্বিতীয় বার শোবেন না। মোক্ষবিদ সন্ন্যাসীর এটাই ধর্ম—

ন চৈকত্র সমাসক্তো ন চৈকগ্রামগোচরঃ।
মুক্তো হ্যটতি নির্মুক্তো ন চৈকপুলিনেশয়ঃ॥
এব মোক্ষবিদাং ধর্মো বেদোক্তঃ সৎপথঃ সতাম্।
যে মার্গমনুযাতীমং পদং তস্য চ বিদ্যতে॥

[মহা (k) ১২.২৪৩.২২-২৬; ১২.২৪১.৯; ১৩.১৪১.৮০-৮৮; (হরি) ১২.২৪১.২২-২৬; ১২.২৩৯.৯; ১৩.১১৯.৮০-৮৮]

সন্ন্যাসী ভিক্ষুরাও চার রকমের হন। তাঁদের পারিভাষিক নামগুলি হল—কুটীচক, বহূদক, হংস এবং পরমহংস—

চতুর্বিধা ভিক্ষবস্তে কুটীচক-বহূদকৌ।
হংস পরমহংসশ্চ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ॥

এঁদের মধ্যে কুটীচক সন্ন্যাসীরা এক জায়গায় বসেই ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকেন। কুটী বা কুটীর মানে গৃহ, হয়তো এই গৃহ অরণ্যের গাছপাতা দিয়ে তৈরি আরণ্যক কুটীর। কুটীচক সন্ন্যাসী এইভাবে এক জায়গায় একই কুটীরে থাকেন, তিনি গ্রাম থেকে খুব দূরে যান না। ফলে অরণ্যের আরম্ভেই অথবা বাড়ির কাছেই পৃথক একটি কুটীর বানিয়ে নিজের স্ত্রীপুত্রের কাছেই ভিক্ষাগ্রহণ করেন তাঁরা। বহূদক সন্ন্যাসীরা সদাচারী সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁরা দণ্ড, কমণ্ডলু, শিখা, যজ্ঞোপবীত, কাষায় বস্ত্র কোনোটাই ত্যাগ করেন না। এঁরা তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেন এবং তীর্থস্থানেই সাধনা করেন। কুটীচক এবং বহূদক সন্ন্যাসীরা ত্রিদণ্ড ধারণ করেন। মাংস, লবণ এবং বাসি খাবার ছাড়া অন্য ভিক্ষা গ্রহণ করেন সাত বাড়িতে। কিন্তু মোক্ষচিন্তা ছাড়া অন্য কোনো লক্ষ্য নেই তাঁদের।

হংস সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা লাভের উদ্দেশে এক রাতের বেশি কোনো গ্রামে থাকবেন না, আর নগরে থাকতে পারেন মাত্র পাঁচ দিন, কিন্তু তার বেশি কখনোই নয়। গোমূত্র, গোময়ের ওপরেও তিনি জীবন নির্বাহ করতে পারেন, মাসখানেক উপবাস করতে পারেন, অথবা চান্দ্রায়ণ ব্রত করতে পারেন।

পরমহংস সন্ন্যাসীরা সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে। তাঁদের শৌচাশৌচ বিচার না থাকলেও সাধনের জগতে তাঁরা সর্বোত্তম—সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন। তাঁরা নিস্ত্রৈগুণ্য—সত্ত্ব-রজ এবং তমোগুণের অতীত এই সন্ন্যাসী একটি মাত্র দণ্ড ধারণ করেন। বাহ্যিক আচরণে তাঁরা গাছের তলায় থাকেন, পোড়ো বাড়ি বা শ্মশানেও থাকেন। ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র সকলের দেওয়া ভিক্ষাই তাঁরা গ্রহণ করেন—

> তত্র কুটীচকা গৌতম-ভারদ্বাজযাজ্ঞবল্ক্য-হারীত প্রভৃতীনামাশ্রমেষু অষ্টৌ গ্রাসাংশ্চরন্তো যোগমার্গতত্ত্বজ্ঞা মোক্ষমেব প্রার্থয়ন্তে।
> বহূদকাস্ত্রিদণ্ড-কমণ্ডলু-কাষায়-ধাতু-বস্ত্র-গ্রহণ-বেষধারিণো ব্রহ্মার্ষিগৃহেষু চান্যেষু সাধুবৃত্তেষু মাংস-লবণ পর্যষিতান্নং বর্জয়ন্তঃ সপ্তাগারেষু ভৈক্ষ্যং কৃত্বা মোক্ষমেব প্রার্থয়ন্তে।
> হংসা নাম গ্রামে চৈকরাত্রং নগরে পঞ্চরাত্রং বসন্তস্তদুপরি ন বসন্তো গোমূত্র-গোময়াহারিণো বা মাসোবসিনো বা নিত্যচান্দ্রায়ন ব্রতিনো নিত্যমুত্থানমেব প্রার্থয়ন্তে।
> পরমহংসা নাম বৃক্ষৈকমূলে শূন্যাগারে শ্মশানে বা বাসিনঃ সাম্বরা বা দিগম্বরা বা। ন তেষাং ধর্মাধর্মৌ সত্যানৃতে শ্রদ্ধ্যশুদ্ধ্যাদি দ্বৈতম্। সর্বসমাঃ সর্বাত্মনঃ সমলোষ্ট্রকাঞ্চনাঃ সর্ববর্ণেষু ভৈক্ষাচরণং কুর্বন্তি।

সন্ন্যাস আশ্রমের নানা আচার-আচরণ এবং ব্যবহারের কথা ধর্মসূত্র গ্রন্থগুলির মধ্যে এবং মহাভারতে বিস্তৃতভাবে থাকলেও বেদ বা ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির মধ্যে সন্ন্যাস আশ্রমের পূর্ণ ধারণা পাওয়া যায় না। বেদমন্ত্রের মর্য্যাদা এবং যাগযজ্ঞের বহুল মর্য্যাদার মধ্যে তৎকালীন ধর্মের প্রবৃত্তিমূলক চেতনা গাঢ় থাকায় নিবৃত্তিমূলক সন্ন্যাস আশ্রমের তেমন উল্লেখ পাওয়াই যায় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, এমনকী বানপ্রস্থেরও উল্লেখ আছে একভাবে, কিন্তু সন্ন্যাসের কথাটা এখানে অস্পষ্ট ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে—ধর্মের স্কন্ধ তিনটি—যজ্ঞ-অধ্যয়ন-দান নিয়ে যে আশ্রম সেটা একটা—

> যজ্ঞো'ধ্যয়নং দানমিতি প্রথমঃ।

অর্থাৎ গার্হস্থ্য। তপস্যা হল দ্বিতীয় অর্থাৎ বানপ্রস্থের কথা। আর তৃতীয় ব্রহ্মচর্য্যের কথাটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে কেননা আচার্যকুলে পরিশ্রম-ব্রত-নিয়মের সঙ্গে বেদব্রতী হবার কথাটা এখানে পরিষ্কার লেখা আছে। কিন্তু নিয়মমত যখন চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাসের কথাটা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, তখন বলা হচ্ছে—অবশেষে যদি 'ব্রহ্মসংস্থ' অর্থাৎ ব্রহ্মানুধ্যানে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হও তবে অমৃতত্ব লাভ হবে—ব্রহ্মসংস্থো'মৃতত্বমেতি। আমরা ইঙ্গিত পাই এটাই চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাসের ইঙ্গিত। আর ব্রহ্মসংস্থ সন্ন্যাস ধর্মাধর্মের ওপরে বলেই তিন ধর্মস্কন্ধের মধ্যে সন্ন্যাস-ভাবনার অন্তর্ভাব ঘটেনি ছান্দোগ্য উপনিষদে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে সন্ন্যাসের ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট। কাত্যায়নী-মৈত্রেয়ীকে সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রব্রজ্যা-গ্রহণের ঘটনাটা আমরা সন্ন্যাসের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করতেই পারি, কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ হল সেই ব্রাহ্মণ এবং মুনির লক্ষণ যেটা বৃহদারণ্যকে বলা হয়েছে, সেটা পুরোপুরি সন্ন্যাসীর লক্ষণ হিসেবে বিবৃত হয়েছে মহাভারতে এবং ধর্মসূত্রগুলিতে। বৃহদারণ্যক বলেছে—"তিনিই ব্রহ্মকে জানেন এমন ব্রাহ্মণ শব্দবাচ্য যিনি আত্মাকে জানতে

পেরেছেন বলেই তাঁর কোনো পুত্রৈষণা থাকে না, বিত্তৈষণা থাকে না, কিংবা কোনো লোকাপেক্ষাও থাকে না। তিনি ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহ করেন এবং পাণ্ডিত্যের সমস্ত আভাস বন্ধ করে তিনি বালকের মতো আচরণ করেন, আবার পাণ্ডিত্য এবং বাল্যের ঊর্ধ্বে উঠে কখনো মৌন অবলম্বন করেন কখনো বা অমৌন থাকেন এবং এইভাবেই তিনি ব্রহ্মজ্ঞ অর্থাৎ প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠেন—

এতদ্ বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা
ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ
বিত্তৈষণায়াশ্চ লৌকৈষণায়াশ্চ
ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং
চরন্তি। . . . তস্মদ্ ব্রাহ্মণঃ
পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন
তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ চ নির্বিদ্যাথ
মুনিরমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ।

লক্ষণীয় বিষয় হল মহাভারতও এক জায়গায় এই 'ব্রাহ্মণ' শব্দে ব্রহ্মবিৎ বুঝিয়ে প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাস আশ্রমের কথা ইঙ্গিত করে বলেছে—যাঁর ক্রোধ-মোহ কিছু নেই, মৃৎপিণ্ড এবং সোনার পার্থক্য করেন না, অর্থধনের কোনো বালাই নেই, কারও সঙ্গে বন্ধুত্বও নেই, কারও সঙ্গে ঝগড়াও নেই, স্তুতি-নিন্দার জ্বর তাঁকে স্পর্শ করে না, প্রিয়াপিয়ে দ্বন্দ্ব নেই—সর্বত্র তিনি উদাসীন এবং তিনি ভিক্ষুক, তিনি সন্ন্যাসী—

অরোষমোহঃ সমলোষ্টকাঞ্চনঃ/
প্রহীনকোশো গত-সন্ধিবিগ্রহঃ।
অপেতনিন্দা-স্তুতিরপ্রিয়াপ্রিয়/
শ্চরন্নুদাসীনবদেষ ভিক্ষুকঃ॥

[বৈখানস স্মার্তসূত্র (Caland) ৮.৯; ছান্দোগ্য উপনিষদ ২.২৩.১; বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৩.৫.১; ২.৪.১; মহা (k) ১২.২৪৪.১১-৩৬; (হরি) ১২.২৪২.১১-৩৬; গৌতম ধর্মসূত্র (মহর্ষি) ৩.১০-২৫, পৃ. ৩; আপস্তম্ব ধর্মসূত্র (মহর্ষি) ২.৯.২১.৭-২১, পৃ. ৩০; বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র (মহর্ষি) ১০ অধ্যায়, পৃ. ১৬-১৭; বৌধায়ন ধর্মসূত্র (চিন্নস্বামী শাস্ত্রী) ২.৬.১৮-২৫, পৃ. ২৫১-২৫২; এবং ২.১০.১-১৭, পৃ. ২৮১-২৮৬; মনুসংহিতা ৬.৩৩-৮৬; কূর্ম পুরাণ ২.২৮ অধ্যায় এবং মহাভারতের বহুস্থানে সন্ন্যাস সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আছে]

□ সমস্ত আলোচনার শেষে এটা জানানো দরকার যে, সন্ন্যাস আশ্রম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তিন বর্ণের মধ্যেও আবার ব্রাহ্মণদেরই একমাত্র সন্ন্যাসে অধিকার ছিল, একথা কেউ কেউ বলেছেন এবং এই নির্দেশটা আরও দৃঢ় হয়েছে এই কারণে যে, বৃহদারণ্যকের মতো প্রাচীন উপনিষদে ব্রাহ্মণেরই ভিক্ষুকত্বের অধিকার নির্ণয় করেছে—

এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ
. . . ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যাং চরন্তি।

এখানে শঙ্করাচার্যের মতো ব্রহ্মবিদ টীকাকারও লিখছেন—সন্ন্যাসী হওয়ার এই 'বিশেষ উত্থান'-ব্রত অর্থাৎ ব্যুত্থান ব্রাহ্মণের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে বলেই এখানে 'ব্রাহ্মণ' শব্দটা উচ্চারিত হয়েছে—

ব্রাহ্মণানামেব অধিকরো
ব্যুত্থানে অতো ব্রাহ্মণগ্রহণম্।

অন্যদিকে মনু যখন সন্ন্যাস আশ্রমের কথা আরম্ভ করলেন, তখন ব্রাহ্মণের কথা দিয়ে আরম্ভ করে বললেন—এই ভাবে গার্হপত্যাদি তিন অগ্নিকে নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে সমাহিত করে ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন অর্থাৎ সন্ন্যাসী হবেন—

আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ।

এখানে সন্ন্যাস-আশ্রমের প্রস্তাবেই ব্রাহ্মণের নাম উচ্চারণ করার ফলে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেরও সন্ন্যাসের অধিকার আহত করেছেন মনু এবং সেটা আরও যুক্তিসহ হয়ে ওঠে যখন তিনি অধ্যায় শেষ করে বলেন—ব্রাহ্মণের পক্ষে উপাদেয় এই চার প্রকারের আশ্রমের কথা বলা হল, এবার রাজাদের ধর্মের বিষয় বলছি—তখনও সন্ন্যাসে ব্রাহ্মণের অধিকারই নির্দিষ্ট হয়—

এষো'ভিহিতো ধর্মো ব্রাহ্মণস্য চতুর্বিধঃ।
পুণ্যোক্ষয়ফলঃ প্রেত্য রাজ্ঞাং ধর্মং নিবোধত॥

মহাভারত কিংবা আরও কিছু উপাদান আছে, যেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণকেই সন্ন্যাসের অধিকার দিয়েছে, কিন্তু শূদ্রকে দেয়নি। আবার শান্তিপর্বে মহাভারতের একটি শ্লোক থেকে এমন প্রমাণও মিলছে যে, সন্ন্যাসের ব্যাপারে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য, শূদ্র—কোনো বর্ণই ব্রাহ্মণকে অনুসরণ করতে পারে না—

ব্রাহ্মণস্য তু চত্বারসত্বাশ্রমা বিহিতা প্রভো।
বর্ণাস্তান্নানুবর্তন্তে ত্রয়ো ভারতসত্তম॥

মহাভারতের এই অধ্যায়ের কিছু পরেই কিন্তু এই কথাটা বলা আছে যে, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি

তিন বর্ণের সেবা করেন, গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করে পুত্রোৎপাদন করেন এবং শৌচ-আচার পালন করে বৈশ্যের সমতুল্য হয়ে ওঠেন এবং গুরুমুখে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করতে চান, তাহলে দেশের রাজার অনুমতি নিয়ে একমাত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করা ছাড়া আর তিনটি আশ্রমই গ্রহণ করতে পারেন।

শুশ্রূষোঃ কৃতকার্যস্য কৃতসন্তানকর্মণঃ।
অভ্যনুজ্ঞাপ্য রাজানং শূদ্রস্য জগতীপতে॥
অল্পান্তর গতস্যাপি দেশধর্মগতস্য বা।
আশ্রমাঃ বিহিতা সর্বে বর্জয়িত্বা নিরাশিষম্॥

এখানে শেষ শব্দটি 'নিরাশিষম্' নিষ্কাম সন্ন্যাসীর আশ্রম। পূর্বোক্ত সদ্ধর্মাচরণকারী শূদ্র প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষচর্যাও গ্রহণ করতে পারেন, সেই প্রব্রজ্যা এবং ভিক্ষাচরণ সন্ন্যাস না নিয়েই করতে পারেন, হয়তো এটা বানপ্রস্থ আশ্রমের অন্তিম পর্য্যায় বলেই শূদ্রের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া হল।

শূদ্রের কথাশেষে স্ত্রীলোকের কথাও বলা দরকার। তাঁরা সন্ন্যাসিনী হতে পারতেন কী না। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার টীকাকার বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁর বিখ্যাত মিতাক্ষরা-টীকাতে বৌধায়নের সূত্রগ্রন্থ থেকে 'স্ত্রীণাং চৈকে' নামে একটি সূত্র উদ্ধার করে বলেছেন—বৌধায়ন কিন্তু সন্ন্যাসিনী স্ত্রীদের প্রব্রজ্যার কথা স্মরণ করেছেন—

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও শঙ্করা নামে এক পরিব্রাজিকার নাম করেছেন এবং সেটা খ্রিষ্টপূর্ব দেড়শ শতাব্দীতে—

আর কবিশেখর কালিদাস তার মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে পণ্ডিতা কৌশিকীকে পরিব্রাজিকার বেশে উপস্থিত করেছেন—

এইসব প্রমাণে বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, স্ত্রীলোকের সন্ন্যাসিনী হওয়াতে তেমন আপত্তি ছিল না সমাজের কিংবা সংস্কারক বিধাতাদের। মহাভারতে সুলভা-জনক-সংবাদে সুলভার মতো নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীকে প্রব্রাজিকা এবং ভিক্ষুকী বলা হয়েছে—

মহীমনুচচারৈকা সুলভা নাম ভিক্ষুকী।

সুলভার ভিক্ষু-স্বভাব এবং আত্মদর্শী ব্রহ্মবাদীর সমস্ত লক্ষণ তাঁর মধ্যে দেখে টীকাকার নীলকণ্ঠ মন্তব্য করেছেন যে, বিবাহের পূর্বে অথবা বৈধব্যের পরে স্ত্রীলোকের সন্ন্যাসে অধিকার আছে—

ভিক্ষুকী ইত্যনেন স্ত্রীনামপি প্রাগ্‌বিবাহাদ্ বৈধব্যাদ্ ঊর্ধ্বং বা সন্ন্যাসে অধিকারো'স্তি ইতি দর্শিতম্।

মহাভারতের বিবরণ থেকে স্ত্রীলোকের সন্ন্যাসিনী হবার অধিকার ছিল বলেই মনে হয় যদিও অনেক সময়েই তাঁদের স্বভাব এবং আচরণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী অথবা কুমারী ব্রহ্মচারিণীর সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। মহাভারতে শাণ্ডিল্যদুহিতা জনৈকা তপস্বিনীর খবর পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের কাছেই তাঁর আশ্রম ছিল। এই আশ্রমে বসেই তিনি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। কুমারী অবস্থা থেকেই তিনি ব্রহ্মচারিণী—

তত্রৈব ব্রাহ্মণী সিদ্ধা কৌমারব্রহ্মচারিণী।
যোগযুক্তা দিবং যাতা তপঃসিদ্ধা তপস্বিনী॥

আবার শিবা বেদজ্ঞা ব্রাহ্মণরমণীর খবর পাওয়া যাচ্ছে যিনি কৌমার কাল থেকে বেদ অধ্যয়ন করতে করতেই জীবন অতিবাহিত করেছেন।

মহাভারতে অবশ্য সুলভাই সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ, যাঁর সঙ্গে সন্ন্যাসের সমস্ত লক্ষণ মেলে। সুলভা ভিক্ষুকীর বেশেই মিথিলায় ধর্মধ্বজ জনকের রাজসভায় প্রবেশ করেছিলেন। সেখানে নিজের পরিচয় দেবার সময় বলেছেন—আমি প্রধান নামে এক রাজর্ষির বংশে জন্মেছি। আমি ব্রহ্মচারিণী কেননা, নিজের উপযুক্ত স্বামী আমি খুঁজে পাইনি। আমি গুরুদের কাছ থেকে বিদ্যা গ্রহণ করেছি এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য পালন করি এবং একাকী ঘুরে বেড়াই। আমরা শুধু বলবো—মোক্ষবিদ্যা অধিগত করে এই একাকী ঘুরে বেড়ানোর মধ্যেই সন্ন্যাসের লক্ষণ আছে। আর যেসব আচার-স্বভাব, সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বাতীত হয়ে সন্ন্যাসীর স্বভাবে স্থিত হওয়া—সুলভার মধ্যে সেই সন্ন্যাসগুণেরও কোনো অভাব ছিল না।

[বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৩.৫.১ (শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য); মনুসংহিতা ৬.২৮; ৬.৯৭; মহা (k) ১২.৬২.২; ১২.৩২০.৭; ৯.৫৪.৬-৮; ৫.১০৯.১৯; ১২.৩২০ অধ্যায়; (হরি) ১২.৬১.২৩-২৪]

চতুরুপায় উপায় বলতে সাধারণত কৌশল বোঝায়, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতি-শাস্ত্রে উপায় কথাটা পারিভাষিক অর্থে অনেক বেশি গভীর।

রাজনীতি-শাস্ত্রে চারটি উপায়। অন্তঃ এবং পররাষ্ট্রীয় শত্রু নিবারণের জন্য চার ধরনের রাজনৈতিক কৌশলকে প্রাচীন রাজনীতির পরিভাষায় উপায় বলে। আমাদের নীতিগ্রন্থ হিতোপদেশে উপায়ের রাজনৈতিক প্রভাব সম্বন্ধে বলা হয়েছে—শক্তি, পরাক্রম দিয়ে যে কাজ সিদ্ধ করা যায় না উপায়ের মাধ্যমে তা সিদ্ধ করা যায়—

উপায়েন হি যচ্ছক্যং ন তচ্ছক্যং পরাক্রমৈঃ।

মহাভারতের রাজনীতি-সংক্রান্ত বক্তব্যে বারবার এই চতুরুপায় বা চার প্রকার উপায়ের কথা এসেছে। বনপর্বে ভীমের সঙ্গে পবনাত্মজ হনুমানের দেখা হবার সময় ভীম তাঁকে কিছু রাজনীতির প্রশ্ন করেন। সেখানে রাজনীতির নানা চর্চার পর হনুমান পররাষ্ট্রনীতিতে চার প্রকার উপায়ের নাম করে বলেন—অন্তঃরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র দুই ক্ষেত্রেই শত্রুদের বশে আনার ব্যাপারে রাজাদের উপায় হল চারটি এবং সেই চারটি উপায় প্রয়োগ করতে হলে বুদ্ধি লাগে, উপযুক্ত মন্ত্রণাশক্তি লাগে এবং সামর্থ্যও লাগে। অন্যভাবে এটাও বলা যায় যে, ওই চারপ্রকার উপায়, বুদ্ধি, মন্ত্রণা, নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ এবং দক্ষতা—এগুলি রাজার কার্য সাধনের উপায়। আর চারটি উপায় হল—সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড। এর সঙ্গে উপেক্ষা ব্যাপারটা পঞ্চম একটি উপায়ও বলা যায়—

রাজ্ঞাসুপায়াশ্চত্বারো বুদ্ধি-মন্ত্র-পরাক্রমাঃ।
নিগ্রহোপগ্রহৌ চৈব দাক্ষ্যং বৈ কার্য্যসাধনম্॥
সাম্না দানেন ভেদেন দণ্ডেনোপেক্ষণেন চ।
সাধনীয়ানি কর্মাণি সমাস-ব্যাসয়োগতঃ॥

[হিতোপদেশ (Godbole) মিত্রলাভ কথা ৭, শ্লোক নং ১৯৮, পৃ. ৩৯; মহা (Critical Edition) ৩.১৪৯.৪১-৪২; মহা (k) ৩.১৫১.৪১-৪২; (হরি) ৩.১২৪.৪১-৪২ (শেষোক্ত দুই মহাভারতীয় সংস্করণে 'চত্বারঃ' পাঠের পরিবর্তে 'চারাশ্চ' পাঠ আছে)]

□ মহাভারতে উপায় বলতে রাজনৈতিক কৌশলের কথা যা হয়েছে, তার সংখ্যা যে চার এবং তার নামগুলি যে স্পষ্টতই সাম, দান ভেদ এবং দণ্ড, তা পরিষ্কার হয়ে যায় সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের কাছে নারদের প্রশ্ন থেকে। সেখানে নারদ বলছেন—সাম, দান ভেদ এবং দণ্ড, এই চারটিই রাজনীতি এবং কূটনীতিতে বিধিসম্মত গুণ—

সাম দানঞ্চ ভেদশ্চ দণ্ডশ্চ বিধিবদ্‌গুণাঃ।

[মহা (k) ২.৫.৬১; (হরি) ২.৫.৬২]

□ প্রধানত রাজার পরিপন্থী বিরুদ্ধবাদীদের নিজের অধীনে আনার জন্য চারটি উপায়ের কথা বলেছেন তাত্ত্বিক-পণ্ডিতেরা। উপায়গুলি হল, সাম অর্থাৎ প্রথমে মধুর কথা, মধুর ব্যবহার, আলাপ, আলোচনা। তাতে কাজ না হলে দান, অর্থাৎ তাকে কিছুটা ছেড়ে দিলে যদি সে রাজার অনুকূল হয় সেই চেষ্টা করা। কিছুটা ছেড়ে দেওয়া বলতে সে যেমন নিজকৃত পূর্বশর্ত ছেড়ে দেওয়াও হতে পারে, ধনসম্পত্তি দানও হতে পারে, আবার খানিকটা ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়াও হতে পারে। এই নীতির বশবর্তী হয়েই ভারত একসময় পাকিস্তানকে বেরুবাড়ি অঞ্চল ছেড়ে দিয়েছিল, আবার সেদিন তিনবিঘা অঞ্চল মুক্ত করে দিল বাংলাদেশের কাছে। দান-নীতিতে কাজ না হলে, ভেদ সৃষ্টি করতে হয়। গুপ্তচর বা বিশ্বস্ত পুরুষের সাহায্যে রাজার সঙ্গে মন্ত্রীর, মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রীর, রাজার সঙ্গে প্রজার, প্রজার সঙ্গে মন্ত্রীর—এইভাবে নানা কথায় শত্রুরাজ্যের একের সঙ্গে অপরের মতভেদ তৈরি করে, রাজ্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলা বাধিয়ে দিতে হবে। সাম, দান, ভেদ—এই তিন উপায়ই বিফল হয়ে গেলে, তখন দণ্ডের ব্যবস্থা, অর্থাৎ আক্রমণ। সেজন্য, অবশ্য নিজেকে আগে থেকেই তৈরি করতে হবে। সাম, দান, ভেদের প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ের মধ্যেই শত্রুরাজ্য আক্রমণ করার মতো শক্তি সঞ্চয় করে নিতে হবে। চারটি উপায়ের মধ্যে দান আর ভেদের কৌশলটা বেশ উপযুক্ত মনে হলেও দানের অসুবিধা হল, পরিপন্থী ব্যক্তি বুদ্ধিমান হলে রাজার দানবৃত্তি দেখে সে রাজাকে দুর্বল ভাবতে থাকবে এবং মাঝে মাঝেই দানগ্রহণ করতে থাকবে, অথচ সে পুরো অনুকূল হবে না। এই অবস্থায় ভেদনীতি গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ, রাজার পরিপন্থী ব্যক্তির সঙ্গে তার সমমনা ব্যক্তিদের বিরোধ তৈরি করে দিতে হয়। পররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই ভেদনীতির মাধ্যমে রাজার সঙ্গে তাঁর মন্ত্রীদের, রাজার সঙ্গে সেনাপতির, এমনকী জনগণকেও রাজার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য রাজার সঙ্গে তাদের ভেদসৃষ্টি করা

যেতে পারে। কিন্তু, রাজার বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে ভেদসৃষ্টি করতে হলে অনেকটাই সময় প্রয়োজন, যে সময় রাজার হাতে সবসময় থাকে না। কাজেই, শেষ উপায় হল দণ্ড।

মনু একদিকে বলেছেন—চার উপায়ের মধ্যে তিনটিই যদি অসফল হয়, তবে বলপ্রয়োগ করে দণ্ডের মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদের অনুকূল পথে নিয়ে আসতে হবে। অন্যদিকে, দান এবং ভেদনীতির মধ্যে কিছু দোষ থাকায়, রাজবিরুদ্ধ ব্যক্তিকে অধীনে আনার জন্য মনু প্রথম এবং শেষ উপায় দুটিই বেশি পছন্দ করেন। অর্থাৎ, ভালো কথায় এবং আলাপ-আলোচনার সাম-নীতিতে যদি কাজ না হয়, তবে দানাদির মাধ্যমে শত্রুকে মাথায় চড়তে না দিয়ে, তথা ভেদের মাধ্যমে সময় নষ্ট না করে, অবিলম্বে দণ্ডপ্রয়োগ করাটাই মনুর মতে বাঞ্ছনীয় উপায়।

কৌটিল্য কিন্তু এই চারটি উপায়ের প্রত্যেকটিরই উপযোগিতা স্বীকার করেছেন, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। কৌটিল্য তাঁর অপার বিশ্লেষণী বুদ্ধি প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন যে, প্রধানত পররাষ্ট্রীয় কূটনীতির ক্ষেত্রেই এই চতুরুপায়ের প্রয়োগ ঘটা উচিত এবং এক-একটি ক্ষেত্রে এক-একটি উপায়ের প্রয়োগই বাঞ্ছনীয়। সপ্তাঙ্গ-রাষ্ট্রের শেষ অঙ্গ 'মিত্র' এবং সেইখানেই রাজার পররাষ্ট্রনীতির উপযোগ। কৌটিল্য সেইখানেই এই চতুরুপায়ের প্রয়োগ বিশ্লেষণ করেছেন বলে আমরা এখানে সবিস্তারে আলোচনা করছি না। কিন্তু, এই চতুরুপায়ের শেষতম দণ্ডপ্রয়োগের আধার হিসেবে কৌটিল্য কিন্তু বেছে নিয়েছেন বলবান শত্রু। তিনি বলেছেন—দুর্বল শত্রুকে সামনীতি এবং দাননীতির দ্বারাই বশীভূত করা যায়, কিন্তু বলবান শত্রুকে অধীনে আনতে গেলে ভেদ এবং দণ্ডের কথা চিন্তা করা উচিত—

সাম-দানাভ্যাং দুর্বলান্ উপনময়েৎ,
ভেদ-দণ্ডাভ্যাং বলবতঃ।

বলবান শত্রুর প্রতি দণ্ডের উপায় প্রয়োগ করার কথা বলে কৌটিল্য বোঝাতে চাইলেন যে, একমাত্র নিরুপায় অবস্থাতেই দণ্ডের প্রয়োগ ঘটবে। অন্যদিকে, সাম-দান-ভেদের ক্ষেত্রবিশেষে উপযোগিতা স্বীকার করে কৌটিল্য কিন্তু সেই ভাবনা, বিচার এবং প্রজ্ঞাগুণের কথাই একভাবে স্বীকার করে নিলেন। রাজার শাস্ত্রজ্ঞান, অভিজ্ঞ বৃদ্ধপুরুষের সাহচর্য্য, মন্ত্রীদের পরামর্শ এবং সর্বোপরি নিজের প্রজ্ঞার মাধ্যমেই সাম, দান এবং ভেদনীতির সফল প্রয়োগ ঘটে। এগুলি সফল হলে দণ্ডের প্রয়োজন নেই বলেই কৌটিল্য মনে করেন। অন্যদিকে, ক্ষেত্রবিশেষে সাম-দান-ভেদের উপযোগিতা স্বীকার করে কৌটিল্য কিন্তু দণ্ডকে সেই পূর্বতন নৈতিকতা এবং দার্শনিকতার মধ্যেই খানিকটা আবদ্ধ করে রাখলেন। অর্থাৎ, দণ্ড এখানেও নীতির স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত।

[*মনুসংহিতা* ৭.১০৭-১০৯; *Kautiliya Arthasastra (Kangle), pt. 1, 7.16.3; মহা (k)* ১২.৫৯.৩৫; *(হরি)* ১২.৫৮.৩৫]

□ রামায়ণের নানান জায়গায় সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ডকে উপায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বটে, কিন্তু রামায়ণ মহাকাব্যে যতখানি diplomacy -র অবকাশ আছে, তার থেকে অনেক বেশি আছে স্পষ্ট রাজনীতি। যে কারণে মৃত্যুমুখে পতিত কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বালী রামচন্দ্রকে তিরস্কার করার সময় অপকারী শত্রু রাজার প্রতি দণ্ডই একমাত্র শাস্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সাম এবং দানকে তিনি ক্ষমা, ধর্ম, সত্য, ধৈর্য্য এবং পরাক্রমের সঙ্গে একত্রে চিহ্নিত করেছেন রাজগুণ হিসেবে—

সামং দানং ক্ষমা ধর্মঃ সত্যং ধৃতি-পরাক্রমৌ।
পার্থিবানাং গুণা রাজন্ দণ্ডশ্চাপ্যপকারিষু॥

অন্যদিকে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে হনুমানের সঙ্গে দেখা হবার পর রামচন্দ্রের কুশল জিজ্ঞাসা করার সময় সীতা চতুরুপায়কে দুই ভাগে ভাগ করে জিজ্ঞাসা করছেন—শত্রুদমন রামচন্দ্র মিত্র রাজাদের প্রতি সাম এবং দান আর শত্রু রাজাদের প্রতি ভেদ এবং দণ্ডের প্রয়োগ করছেন তো—

দ্বিবিধং ত্রিবিধোপায়ম্ উপায়মপি সেবতে।

আমরা এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ যেভাবে দিয়েছি, সেটা রামায়ণের তিলকটীকার ব্যাখ্যা, কিন্তু মূল শ্লোকে সীতা যেভাবে বিভাগ করেছেন, তাতে এর অর্থ হওয়া উচিত এইরকম—তিনি শত্রুবর্গকে বশীভূত করার জন্য প্রথমে সাম এবং দান, তাতে কাজ না হলে তারপর সাম, দান এবং ভেদ এবং তিনটেই যদি শেষ পর্যন্ত অকেজো হয়, তাহলে শত্রুদমনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় যেটা সেই দণ্ড প্রয়োগ করেন তো?

আমরা দেখেছি, মহাভারতে, মনু, কৌটিল্যের মতো রাজনীতি শাস্ত্রে diplomacy-র অঙ্গ হিসেবেই চতুরুপায়ের প্রয়োগ ঘটেছে এবং এই চার প্রকার উপায়ই শত্রুরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত, যদি বা সেটা অন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্যও হয় তবে সেটা অন্তঃরাষ্ট্রীয় শত্রুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। এই যে চতুর্থ উপায়টাকে একেবারে দণ্ডের নাম না করে শুধু উপায় বললেন সীতা সেটা মনে হয় স্ত্রীস্বভাববশত। একটু পরেই যখন হনুমান যখন রাবণকে একটু শিক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরতে চাইবেন, তখন তিনি বলবেন—যাঁর খোঁজে সাগর পেরিয়ে এসেছি সেই সীতার সঙ্গে আমার দেখা করা হয়ে গেছে। এখন আর প্রায় কোনো কাজই অবশিষ্ট নেই আমার। কিন্তু একটা যে কাজ আছে, সেটা তিনটি উপায় অতিক্রম করে চতুর্থ উপায়—

ত্রীনুপায়ান্ অতিক্রম্য চতুর্থ ইহ দৃশ্যতে।

কেননা, শত্রুর বলবিক্রম বোঝার জন্য বলবিক্রম প্রকাশ করাটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। হনুমান প্রসঙ্গত চতুরুপায় প্রয়োগ করার ক্ষেত্রগুলিও একটু পরিষ্কার করে বললেন—সরল ভদ্র মানুষেরাই সামনীতির প্রয়োগে বশীভূত হন, রাক্ষসদের ওপর সাম-মধুর বাক্য বলে কোনো লাভ নেই। আবার দাননীতিতে তুষ্ট হয় সেই সব রাজপ্রকৃতির মানুষ যাদের ধনৈশ্বর্য্য কম আছে। রাবণের ঐশ্বর্য্য অনেক, অতএব কোনো কিছু ছেড়ে দিলেও সে তুষ্ট হবে না। বিশেষ রাবণ এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা এতটাই বলগঠিত যে, ভেদনীতি প্রয়োগ করে তাদের একের সঙ্গে অপরের কোনো বিভেদও ঘটানো যাবে না। অতএব দণ্ড বা পরাক্রম প্রকাশ করে তাদের শক্তি বুঝে নেওয়াটাই কাজের কাজ হবে—

ন সাম রক্ষঃসু গুণায় কল্পতে
ন দানমর্থোপচিতেষু যুজ্যতে।
ন ভেদসাধ্যা বলদর্পিতা জনাঃ
পরাক্রমস্ত্বেষ মমেহ রোচতে॥

হনুমানের কথার শেষে এটাই আমাদের বক্তব্য রামায়ণ মহাকাব্য যেমন সরলভাবে এগিয়েছে, সেখানে 'ডিপ্লোমেসি' স্থান খুব নেই বলে, যুদ্ধপ্রিয় বলগর্বিত রাক্ষসপ্রকৃতির ওপর দণ্ড ছাড়া অন্য ত্রিবিধ উপায়ের কোনো প্রয়োগ ঘটে না। সীতার অন্বেষণের সময় প্রথম লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে রাবণের ঐশ্বর্য্য এবং বিভূতি দেখে প্রাথমিক হতাশায় এমন মন্তব্যও করেছিলেন যে, বানর তো কোন্ ছার! দেবতারাও রাবণকে কিছু করতে পারবেন না। আর সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড—এই চার উপায়ের কোনোটা করেই কোনো কিছু হবে না—

অবকাশো ন সান্ত্বস্য রাক্ষসেষ্বভিগম্যতে।
ন দানস্য ন ভেদস্য নৈব যুদ্ধস্য দৃশ্যতে॥

হনুমানের এই হতাশা যতই থাকুক, পরে তিনিই কিন্তু রাক্ষসদের ওপর চতুর্থোপায়ের মর্ম বুঝেছিলেন।

[রামায়ণ ৪.১৭.২৯; ৫.৩৬.১৭; ৫.৪১.২-৪; ৫.২.২৭; ৬.৮৪.১২; ৭.১১.৮]

□ শত্রুশাতনের নির্দিষ্ট উপায়গুলি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কণিক, ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন—সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড—এই চারটে উপায়ের প্রয়োগ করে শত্রুকে একেবারে উচ্ছেদ করে ছাড়তে হবে—

সর্বোপায়ৈঃ প্রশাতয়েৎ।

প্রাচীন পুরাণগুলির মধ্যে বায়ু পুরাণে শুধুমাত্র উপায় শব্দটি উল্লেখ করে সেই উপায়কেই সমস্ত কর্ম সিদ্ধির নিদান বলে বলা হয়েছে—

উপায়তঃ সমারব্ধাঃ সর্বে সিদ্ধন্ত্যুপক্রমাঃ

কিন্তু সামদানাদি কোনো উপায়ের পৃথক আলোচনা এখানে বিশদভাবে নেই এবং ভাগবত পুরাণেও তাই। বিষ্ণু পুরাণে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—এই চতুরুপায়ের সঙ্গে অবস্থা এবং সময় বুঝে পলায়নকেও একটা উপায় হিসেবে বর্ণনা করেছে, যদিও অতিবলশালী জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের নানা যুদ্ধের নিরিখে মনুষ্যলীলাময় কৃষ্ণের এক এক সময় পলায়নের বৃত্তি খেয়াল করেই অগতির গতি এই পঞ্চম উপায় পলায়নের কথা বলা হয়েছে—

সাম চোপপ্রদানঞ্চ তথা ভেদং প্রদর্শয়ন্।
করোতি দণ্ডপাতঞ্চ ক্বচিদেব পলায়নম্॥

[বায়ু পু. ৬২.১৫৮; ভাগবত পু. ৫.৪.১৬; বিষ্ণু পু. ৫.২২.১৭]

□ উপরি উক্ত পুরাণগুলির তুলনায় চতুরুপায় সম্বন্ধে মৎস্য পুরাণের বক্তব্য অনেক বিশদ এবং এখানে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—এই চতুরুপায়ের সঙ্গে উপেক্ষা, মায়া এবং ইন্দ্রজালকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শেষ তিনটিও একজন রাজার রাজনৈতিক 'একস্‌পেডিয়েন্ট'-এর মধ্যে পড়ে না বলেই এগুলিকে দুর্বল উপায় বলে আমরা মনে করি। *[মৎস্য পু. ২২২.১-২]*

□ আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উপায় হিসেবে সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড—এই চারটিরই নাম পাই—

উপায়াঃ সামোপপ্রদান-ভেদ-দণ্ডাঃ।

অপিচ ষাড়্‌গুণ্যের বিস্তারিত আলোচনার সময়েই সবল এবং দুর্বল রাজার সঙ্গে ব্যবহারে কীভাবে এই চতুরুপায়ের প্রয়োগ করতে হবে, সে কথা বলায় আমরা বুঝতে পারি, ষাড়্‌গুণ্যের প্রয়োগ এবং চতুরুপায়ের প্রয়োগ হবে সমান্তরাল। বিষ্ণুধর্মসূত্রে এই কথাটা খুব স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে—শত্রু, মিত্র, উদাসীন এবং মধ্যম রাজার প্রতি যথাসময়ে, প্রয়োজন বুঝে সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড—এই চতুরুপায়ের প্রয়োগ করতে হবে—

শত্রু-মিত্রোদাসীন-মধ্যমেষু সাম-
ভেদ-দান-দণ্ডানি যথাং যথাকাল্ প্রযুঞ্জীত।

এই চতুরুপায় প্রয়োগের প্রয়োজন কী? সেই ভারসাম্য, 'ব্যালান্স অব পাওয়ার'। কথাটা কৌটিল্য স্পষ্ট উচ্চারণ না করলেও, বলেছেন অন্যেরা। শুক্রনীতিসার যদিও অনেক পরবর্তী সময়ের রচনা, তবু সেটা এত পরবর্তীকালের নয় যখন 'ব্যালান্স অব পাওয়ার' কথাটা আধুনিক অর্থে চালু হয়ে গেছে। কিন্তু শুক্রনীতিসার তার সময়ের মতো করেই এই রাজনৈতিক ভারসাম্যের কথা বলেছে। বলেছে—নীতিজ্ঞ রাজা সেই সমস্ত উপায়গুলি প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন যাতে সপ্তাঙ্গ-রাষ্ট্রের প্রথম অঙ্গ স্বামীর (অর্থাৎ, বিজিগীষু রাজার) থেকে কোনোভাবেই তাঁর মিত্ররাষ্ট্র, শত্রুরাষ্ট্র এবং উদাসীনরাষ্ট্র রাজনৈতিকভাবে এগিয়ে না যায়। মহাভারতে এই রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য উপায়প্রয়োগের উদাহরণ আছে ভুরিভুরি। দুঃখের বিষয়, আমরা এখানে মহাভারতের যুদ্ধপূর্ব রাজনৈতিক পটভূমি সবিস্তারে আলোচনা করতে পারছি না; কিন্তু, সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড প্রয়োগ করে মিত্র সংগ্রহ করা, শত্রুর অসুবিধে সৃষ্টি করা, বা শত্রুনাশ করার উদাহরণ মহাভারতে অনেক আছে এবং পণ্ডিতেরা সে বিষয়ে অবহিতও আছেন।

[বিষ্ণুস্মৃতি (Jolly) ৩.৩৮; পৃ. ১৩; শুক্রনীতিসার (জীবানন্দ) ৪.১.৩৭; H.L. Chatterjee, International Law and Interstate Relations in Ancient India, pp. 24-15]

□ মহাভারত, মনু, কিংবা অর্থশাস্ত্র যখন সামাদি চতুরুপায়ের কথা বলেছে, তখন প্রত্যেকটি উপায়েরেই প্রয়োগস্থল পৃথকভাবেই উল্লেখ করেছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে একজন বিজিগীষু রাজা যখন রাজ্য চালান, তখন বাস্তব প্রয়োজনেই এমন হতে পারে যে, সাম-দান ইত্যাদির ক্রমিক প্রয়োগের মধ্যে না গিয়ে চারটি উপায়েরই সমান্তরাল প্রয়োগ ঘটানো যেতে পারে। এটা খুবই কঠিন, কিন্তু একজন বিজিগীষু রাজার রাজমণ্ডলে শত্রু একজন থাকে না, ফলত স্বপ্রয়োজন উদ্ধারের জন্য চতুরুপায়ের সমান্তরাল প্রয়োগ কীভাবে হতে পারে, সে বিষয়ে 'রাজশাস্ত্রার্থবিত্তম' কণিক প্রাণীজগৎ থেকে উদাহরণ দিয়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন—এক বনে একটি শেয়াল থাকত। শেয়ালটি নীতিশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র দুই-ই খুব ভালো জানত। এ গল্প তারই সম্বন্ধে—

জম্বুকস্য মহারাজ নীতিশাস্ত্রার্থদর্শিনঃ।

এই শৃগাল অবশ্যই রাজনৈতিক নেতার প্রতীক। অর্থদর্শী মানেই নিজের লাভ, নিজের সমৃদ্ধি তথা প্রতিপত্তি বিস্তারের উপায় যার জানা আছে। স্বার্থলাভের উপায়জ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শৃগালের বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা—

কৃতপ্রজ্ঞঃ শৃগালঃ স্বার্থপণ্ডিতঃ।

এইসব মিলেই একজন সার্থক রাজনীতিবিদের জীবনচর্যা চলে।

কণিক বলে চললেন—এই বনবাসী শেয়ালের চার জন বন্ধু। এক বন্ধু বাঘ, দ্বিতীয় বন্ধু একটি ইঁদুর, তৃতীয় জন একটি নেকড়ে, আর চতুর্থ বন্ধু হল একটি বেজি। চার জনকে নিয়ে শেয়াল ভালোই আছে, ঠিক যেমন একজন ধূর্ত রাজা তাঁর চারপাশে প্রবল, দুর্বল এবং নিজের সমান শক্তিসম্পন্ন রাজাদের সঙ্গে নিয়েই চলেন।

একদিন হল কী, সেই বনের মধ্যে একটি বিশাল এবং বলিষ্ঠ হরিণ দেখা গেল। নধরকান্তি হরিণটিকে দেখে সকলেরই মাংস খাবার লোভ হল বটে, কিন্তু শেয়াল অন্তত মুখে কিছু বলল না। বাঘ যেহেতু এই পাঁচ জনের মধ্যে অসীম শক্তিধর, অতএব সে কারও তোয়াক্কা না করেই দু-একবার হরিণটিকে ধরার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সে ব্যর্থ হয়েছে। বাঘই যেখানে পারেনি সেখানে অন্যেরা তো কোন ছাড়।

হরিণটিকে মাঝে মাঝেই দেখা যাচ্ছে, তাকে দেখে খাবার লোভও হচ্ছে, অথচ তাকে ধরা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় পাঁচ জনের মন্ত্রণাসভা বসল—আর মন্ত্রণাসভায় কে না জানে, সবার আগে শেয়ালই কথা বলবে? কারণ, তার বুদ্ধি বেশি। শেয়াল বলল—দেখো ভাই বাঘ! তুমি এই হরিণটাকে মারবার জন্য বারবার চেষ্টা করেছ—

অসকৃদ্ যতিতো হ্যেষ হন্তুং ব্যাঘ্র বনে ত্বয়া।

কিন্তু, হরিণটা যেমন জোয়ান, যেমন বেগবান, তেমনই তার বুদ্ধি। তুমি তাই পারোনি ধরতে। কিন্তু, হরিণটা আমাদের চাই-ই চাই। তোমরা আমার বুদ্ধি শোনো। হরিণটা যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তখন আমাদের এই ইঁদুরবন্ধু নিঃশব্দে গিয়ে ওর চারখানা পায়ের গোড়ালির মাংস একটু একটু করে কেটে খেয়ে নেবে। পরের দিন দেখবে—ওর আর দৌড়োবার অত ক্ষমতা থাকবে না। এরপর যে শক্তি এবং বেগে হরিণ দৌড়োবে, তাতে আমাদের বাঘমশায়ের কোনো অসুবিধেই হবে না হরিণটাকে ধরতে। একবার ধরা পড়লে আমরা তখন সকলে মিলে পরমানন্দে হরিণটাকে খাব—

ততৌ বৈ ভক্ষয়িষ্যামঃ সর্বে মুদিতমানসাঃ।

শেয়ালের বুদ্ধি সকলেরই বেশ পছন্দ হল। নির্দিষ্ট কর্তব্য অনুসারে, ইঁদুর সময় বুঝে ঘুমন্ত হরিণের পায়ে এমন মৃদু-তীক্ষ্ণ কামড় লাগল যে হরিণ বুঝতেও পারল না যে, তার চারখানি পা-ই ভীষণ রকমের কমজোরি হয়ে গেল। বাঘের কোনো অসুবিধেই হল না পরের দিন। সে সাবহেলে দু-চার লাফেই ধরে ফেলল হরিণটিকে—

মুষিকাভক্ষিতৈঃ পাদৈর্মৃগং ব্যাঘ্রো'বধীত্তদা।

হরিণটির বিশাল দেহখানি নিথর হয়ে যেতেই—

অনেষ্টমানস্তু ভূমৌ মৃগকলেবরম্।

শেয়াল এবার চার বন্ধুকে বল—এই হরিণটাকে আমি দেখে রাখছি। তোমাদের কোনো চিন্তা নেই। তোমরা নদীতে গিয়ে ভালো করে স্নানটান করে এসো। তারপর শান্তিতে মাংসভোজন করা যাবে—

স্নাত্বগচ্ছত ভদ্রং বো রক্ষামীত্যাহ জম্বুকঃ।

মহাভারতের কবি স্বকণ্ঠে বলেননি বটে, তবে বেশ বোঝা যায়—এ পর্যন্ত গল্প যতটুকু এগিয়েছে, তা হল সাম এবং দানের পরিসর। অর্থাৎ, শেয়াল প্রথমদিকে যে মন্ত্রণা দিয়েছে, যেভাবে দুর্বলতর শক্তি ইঁদুরকে সে কাজে লাগিয়ে সকলের বিশ্বাস উৎপাদন করেছে, তার মধ্যে শেয়ালের মধুর ব্যবহার, সকলের জন্য ভাবনা দেখানো তো আছেই, উপরন্তু বন্ধুদের স্নান করে ফিরে না আসা পর্যন্ত মৃত পশুটিকে আগলে রাখার ভার নিয়ে, সে তার বদান্যতা এবং দানের প্রবৃত্তিও ফুটিয়ে তুলেছে। সোজা কথায়, এখানে সাম-দানের প্রয়োগ ঘটল প্রায় একইসঙ্গে, অবশ্য এটা কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসংক্রান্ত বিষয় নয়, বিষয়টি একটি মৃত পশুর আহারসংক্রান্ত, কাজেই সাম এবং দানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান তত নেই। কিন্তু, বিষয়টা রাষ্ট্রিক না হলেও রাজনৈতিক বটে, কাজেই রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান কিছু বাড়লেও বাড়তে পারে বটে, কিন্তু তাই বলে যুগপৎ সাম-দানের প্রয়োগ হতে পারবে না, তা মোটেই নয়। বরঞ্চ প্রাচীন রাজনীতির বিশেষজ্ঞেরা সামদানের প্রক্রিয়াটি খুব তাড়াতাড়ি মিটিয়ে নিতে বলেন, কারণ তাতে পরবর্তী উপায় দুটি নিঃসংকোচে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কণিকের বলা উপাখ্যান অনুযায়ী বাঘ খুব তাড়াতাড়িই নদীতে স্নান করে এল। পাঁচ জনের মধ্যে সেই সবচেয়ে বলশালী, অতএব মাংসের ভাগটাও তার সবচেয়ে বেশি চাই বলেই হয়তো সে সবার আগে স্নান করে ফিরল—

অথাজগাম পূর্বন্তু স্নাত্বা ব্যাঘ্রো মহাবলঃ।

কিন্তু, এইবার শুরু হল প্রাজ্ঞ শৃগালের আসল খেলা। সম্পূর্ণ হরিণটাকেই সে একা আত্মসাৎ করতে চায়। অতএব, পাঁচ জনে স্নান করতে যেতেই যে সময়টুকু সে পেল, তার মধ্যেই শেয়াল তার ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলল। সে ভয়ংকর রকমের চিন্তার ভান করে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল। বাঘ স্নান করে এসে শেয়ালের এই চিন্তাকুল অবসন্ন ভাব দেখে—চিন্তাকুলিতমানসম্—নিজেও চিন্তাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কী এত ভাবছ, পণ্ডিত! আমাদের মধ্যে তুমিই হলে সবচেয়ে বুদ্ধিমান। সমস্যা হলে তোমার কাছে সমাধান নেই, এমন তো হতেই পারে না—কাজেই চিন্তা কীসের?

কিং শোচসি মহাপ্রাজ্ঞ ত্বং নো বুদ্ধিমতাং বরঃ।

আজকে আমরা সবাই মিলে মহানন্দে মাংস খাব।

শেয়াল বলল—সে তো বেশ ভালোই হত, ভাই! কিন্তু, আমাদের ওই ইঁদুরভায়া এমন একটা কথা বলে গেল, যা তোমাকে বলতেও আমার সংকোচ হচ্ছে, অথচ না বলেও পারছি না। আমার এত চিন্তা তো সেইজন্যই। বাঘ বলল—আহা বলোই না কী বলেছে। শেয়াল বলল—ওইটুকু পুঁচকে ইঁদুর! সে কিনা এত বড়ো একটা কথা বলে গেল! শুনবে সে কথা? ইঁদুরটা এই একটু আগে এসে আমায় বলে গেল—ধিক্ তোমাদের বাঘমশাইকে, আর ধিক্ তার শক্তিকে। লজ্জা বলে যদি কোনো জিনিস থাকে ওই বাঘের! ওই হরিণটাকে মারল কে? আমি। আমি মেরেছি—

ধিগ্‌বলং মৃগরাজস্য ময়াদ্যায়ং মৃগো হতঃ।

ও তো কতবার চেষ্টা করেছে। পেরেছে? আমার শক্তির ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে যে, সে আজ গর্জন করে বলছে—মাংস খাবে। ছি ছি লজ্জাও করে না? তুমি তাকে বলে দিয়ো পণ্ডিত—অমন মাংস আমি ছুঁয়েও দেখি না। আমি হরিণ মেরে দিয়েছি, এখন ও মাংস তোমার বাঘই খাক, অত গর্জন করার দরকার নেই—

গর্জমানস্য তস্যৈবমতো ভক্ষ্যং ন রোচতে।

শেয়াল তার প্রথম ভেদনীতি প্রয়োগ করল, এবং সফল হল। সত্যিই তো, হরিণ-মারার ব্যাপারে ইঁদুরের অবদান আছে। আর বাঘের মতো প্রবল শক্তিশালীর পক্ষে ইঁদুরের এই সাহায্যগ্রহণ লজ্জারই বটে। বাঘ স্বীকারও করল সে কথা। তার নিজের শক্তির ব্যাপারে সে সর্বদাই সচেতন, একজন অতি প্রবল রাজার মতোই আত্মসচেতন। অথচ, হরিণ-মারার ব্যাপারে ক্ষুদ্র ইঁদুরের সাহায্য সে নিয়েছে। বাঘ অতএব একটু সলজ্জেই শেয়ালকে বলল—ইঁদুর যখন একথা বলেই গেছে, তখন তুমি আমাকে সে কথা সময়মতো জানিয়ে খুবই ভালো করেছ—

কালে হ্যস্মিন্ প্রবোধিতঃ।

তুমি আমাকে আমার আত্মসম্মান বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছ। তোমার ইঁদুরকে বোলো—আর তার সাহায্যের দরকার হবে না। আমি আমার নিজের ক্ষমতাতেই বনের পশু মারতে পারব যথেষ্ট—

স্ববাহুবলমাশ্রিত্য হনিষ্যে'হং বনেচরান্।

এবং আমারও খাবার জুটবে, আমার মাংসের অভাব হবে না—

খাদিষ্যে তত্র মাংসানি।

রাগের চেয়ে বাঘের অভিমান হল অনেক বেশি। ইঁদুরের কথায় তার মানে লেগেছে। সে আর বাক্যব্যয় না করে, নিজের পুরুষকার প্রমাণ করার জন্য, বনে চলে গেল—

ইত্যুক্ত্বা প্রস্থিতো বনম্।

এবার, স্নান করে পরিপাটি হয়ে, শেয়ালের সামনে উপস্থিত হল ছোট্ট ইঁদুর। ইঁদুরকে শেয়াল এমনিই মেরে ফেলতে পারত, কিন্তু তাতে বন্ধুদের মধ্যে নানা কথা উঠবে। ইঁদুরের উপকারের প্রসঙ্গও আসবে। রাজনীতিকেরা দুর্বল শত্রুকেও রাজনৈতিকভাবেই মোকাবিলা করেন—সেটা দেখানোর জন্য ইঁদুরের ওপরেও ভেদনীতি প্রয়োগ করল শেয়াল।

শেয়াল বলল—দেখো ভাই ইঁদুর! তুমি এসে গেছ ভালোই হয়েছে। দেখো ভাই! একদিন মাংস খাওয়াটা খুব বড়ো কথা নয়। আমি চাই তোমার সর্বাঙ্গীন সর্বকালীন মঙ্গল হোক, এবং সেইজন্যই একটা কথা তোমায় না বলে পারছি না—

শৃণু মূষিক ভদ্রং তে নকুলো যদিহাব্রবীৎ।

ওই যে বেজি! হরিণ মারার ব্যাপারে সে কী করেছে? এতটুকু সাহায্যও তো করেনি। এদিকে সে কি বলছে জানো? বলছে—ওই হরিণের মাংস আমি খাব না। ওতে বাঘের মুখ লেগেছে, ও মাংস বিষ হয়ে গেছে আমার কাছে—

মৃগমাংসং ন ভক্ষেয়ং গরমেতন্ন রোচতে।

আমি বরং নতুন অনুচ্ছিষ্ট মাংস খাব। আমি ওই ইঁদুরটাকে খেতে চাই, আপনি অনুমতি করুন—

তদ্ ভবান্ অনুমন্যতাম্।

শেয়াল বলল—আমি অনুমতি দিইনি। কিন্তু, সে আমার কথা শুনবে বলে মনে হয় না। ইঁদুর শেয়ালের কথা শুনে, ভয়ে লাফ দিয়ে গর্তে ঢুকে পড়ল। এর পরে, উপস্থিত হল সেই নেকড়ে বাঘ। আমরা একে নেকড়ে বাঘ বলেছি বটে, তবে এ ঠিক নেকড়ে কি না সন্দেহ আছে। সংস্কৃতে আছে 'বৃক'। আমাদের ধারণা—বৈদিক যুগ থেকে যে 'বৃক' শব্দটি নেমে আসছে—সেই বৃক বলতে কুকুরজাতীয় বন্য তথা হিংস্র প্রাণীকেই বোঝায়।

সেই 'বৃক' আসতেই, শেয়াল বলল—দেখো

ভাই! সামনে তোমার ভীষণ বিপদ। কী কারণে জানি না, বাঘ তোমার ওপর ভীষণ ক্ষেপে গেছেন। এর ফল খুব ভালো হবে না বলেই মনে হচ্ছে। তিনি এইমাত্র আমায় বলে গেলেন—ওকে আমি দেখে নেব। তিনি আবার সস্ত্রীক আসছেন, তোমার ওপর রাগ মেটানোর জন্য। একথা শোনার পর তোমার যা কর্তব্য মনে হয় করো—

সকলত্রস্তু-ইহায়াতি কুরুষ্ব যদনন্তরম্।

শেয়ালের কথা শুনে বৃক আর এক মুহূর্তও সেখানে থাকা ঠিক মনে করল না। সেও পালাল।

এইবার, স্নান পরিপাটি সেরে উপস্থিত হল বেজি। শেয়াল জানে—বড়ো বড়ো শত্রুরা তার রাজনৈতিক বুদ্ধির কাছে পরাজিত হয়েছে। বেজি হল শেষ শত্রু এবং সে তার চেয়ে অনেক দুর্বল। অতএব আর কালবিলম্ব নয়। এবার সে নিজেই ভয় দেখাবে। বেজিকে সে বলল—দেখো! ওইসব বাঘ, নেকড়ে—এদের সবাইকে আমি যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছি। তারা এখন আমার ত্রিসীমানার মধ্যে নেই। সব পালিয়েছে—

নির্জিতাস্তে'ন্যতো গতাঃ।

তোমার যদি ইচ্ছে হয় তো আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো এবং আমাকে জয় করে যত ইচ্ছে মাংস খাও—

মম দত্ত্বা নিযুদ্ধং ত্বং ভুঙ্ক্ষ মাংসং যথেপ্সিতম্।

অর্থাৎ সময়বুঝে শেয়াল এখন দণ্ড প্রয়োগ করেছে।

বেজি বুঝল, সে শেয়ালের সঙ্গে পারবে না। অতএব, যুদ্ধ না করেই সে বলল—বাঘ হল পশুদের রাজার সমান, তাকে তুমি হারিয়েছ, তারপর নেকড়ে, এমনকী ওই মহা বুদ্ধিমান ইঁদুরটাকেও তুমি জয় করেছ। এরপর আমি আর তোমার সঙ্গে কোন মুখে যুদ্ধ করব? তুমি সবারই চাইতে বড়ো বীর—

নির্জিতা যৎ ত্বয়া বীরা স্তস্মাদ্বীরতরো ভবান্।

আমার ক্ষমতা নেই বাপু, তোমার সঙ্গে লড়ব। এই কথা বলে বেজিও পালাল। রাজনৈতিক বুদ্ধিতে, সাম-দান ইত্যাদি উপায়ের মাধ্যমে, সামান্য শেয়াল সবাইকে ঠকিয়ে দিয়ে নিজে একা সেই মৃগমাংস ভক্ষণ করল।

শেয়াল-বাঘের গল্প বলে, এবার কণিক ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—রাজনীতি করতে হলে এই শেয়ালের মতো ব্যবহার করতে হবে, মহারাজ! ভীরু লোকটাকে সরিয়ে দেবেন ভয় দেখিয়ে, আর প্রবলতর শত্রুর কাছে হাতজোড় করবেন—

ভয়েন ভেদয়েদ্ ভীরুং শূরমঞ্জলিকর্মণা।

লুব্ধ-লোভী শত্রুকে ধনসম্পত্তি কিছু ছেড়ে দেবেন। আর দুর্বলের ওপর বলপ্রকাশ করবেন। আরও একটা কথা—এই রাজনীতির ব্যাপারে ভাই-বন্ধু, বাপ-ছেলে, গুরু-গুরুবৎ, কিচ্ছু নেই। এঁরা শত্রু হয়ে দাঁড়ালে, এঁদেরও ছাড়া নেই। মারতে হবে। উন্নতি করতে হলে এই নিয়ম জানবেন—

রিপুস্থানেষু বর্তন্তো হন্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা।

এত ক্রূর, নৃশংস রাজনীতির প্রয়োগ করতে গিয়ে, মানুষের মধ্যে যদি ভাবের এবং আচরণের বিকার ঘটে, অতএব সে ব্যাপারেও সাবধান করে দিলেন কণিক। বললেন—দেখুন মহারাজ! অন্তরে আপনার হাজার রাগ থাকুক, বাইরে সেটা প্রকাশ করবেন না। সবসময় কথা বলবেন হেসে। একজনের ওপর রাগ থাকলেও, এমনভাবে তাকে গালাগালি দেবেন না যাতে তার গৌরব নষ্ট হয়—

ক্রুদ্ধো'প্যক্রুদ্ধরূপঃ স্যাৎ স্মিতপূর্বাভিভাষিতা।

মনে রাখবেন—প্রহার করার সময়েও হাসতে হবে।

রাজনীতিবিদ কণিকের মুখে সামাদি চতুরুপায় প্রয়োগের সূত্রে এই উপাখ্যানটি শৃগালোপাখ্যান নামে বিখ্যাত হয়েছে।

[মহা (k) ১.১৪০.১-৯৩; (হরি) ১.১৩৫.১-৯৮]

□ কণিক আরও অনেক উপদেশ দিয়েছেন ধৃতরাষ্ট্রকে এবং এইসমস্ত উপদেশকেই 'ম্যাকিয়াভেলিয়ান' তো বলা যায়ই, বরং আরও বলা যায়, সেগুলি নির্মম, নৃশংস এবং ক্রূর।

রাজনীতি তথা অর্থশাস্ত্রবিদ কণিকের মুখে আমরা চতুরুপায়ের প্রয়োগবিধি গল্পের আকারে শুনলাম বটে, কিন্তু রাজাদের জীবনে, বিশেষত কূটনৈতিক সম্বন্ধস্থাপনে, সাম, দান, ভেদ, দণ্ডের অশেষ ভূমিকা আছে। মিত্রসংগ্রহ এবং শত্রুপীড়নের ক্ষেত্রে এই চতুরুপায়ের যথাপ্রয়োজন প্রয়োগ একজন রাজাকে রাজনৈতিকভাবে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। একেবারে সাম থেকে প্রয়োজন অনুসারে পর্যায়ক্রমে আসে দণ্ড, কিন্তু মনে রাখতে হবে নয়জ্ঞ রাজারা শেষ বিকল্প হিসেবেও যুদ্ধ করতে

চান না। কারণ, তাতে লোকক্ষয় এবং অর্থনাশ। আধুনিক পণ্ডিতেরাও বলেন যে, যুদ্ধ এড়িয়ে রাজনৈতিকভাবে নিজেকে চরম প্রতিপত্তিশালী এবং অদম্য করে তুলতে হলে সাম, দান, ভেদ —এই উপায়গুলিই হল উপযুক্ত মাধ্যম। বস্তুত, শত্রু, মিত্র, এবং অধিক শক্তিশালী রাজার সঙ্গে বিজিগীষু রাজার যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেই সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নিজের প্রতিপত্তি বাড়ানো এবং যুদ্ধ এড়ানো, এই দুটি কাজই চলে সামাদি উপায়ের মাধ্যমে। সাম, দান এবং ভেদ—এই তিনটি উপায় যেখানে কার্যসিদ্ধি ঘটায় না, সেখানে দণ্ড বা যুদ্ধ অনিবার্য। কিন্তু, নয়জ্ঞ রাজা সবসময় চেষ্টা করবেন, যাতে প্রথম তিনটি উপায়েই কাজ হয়ে যায় এবং তাতেই যেন সমগ্র রাজমণ্ডলের শক্তির ভারসাম্য বজায় থাকে।

মহাভারতকার বলেছেন—যদি সাম এবং দানের মাধ্যমেই বিজয়লাভ করা যায়, তবে সেই বিজয় হল শ্রেষ্ঠ বিজয়। যদি ভেদনীতি গ্রহণ করে বিজয়লাভ হয়, তো সে বিজয় হল মধ্যমমানের। আর যুদ্ধ করে যে বিজয়, তার চেয়ে জঘন্য কিছু নেই—

উপায় বিজয়ং শ্রেষ্ঠমাহুর্ভেদেন মধ্যমম্।
জঘন্য এষ বিজয়ো যো যুদ্ধেন বিসাম্পতে॥

কৌটিল্যের পূর্বাচার্য বৃহস্পতি ভেদনীতিকেও কিছু খারাপ বলেননি, কিন্তু অর্থ এবং লোকহানিকর যুদ্ধ তিনিও চান না—একথা মহাভারতেই আছে—

বর্জনীয়ং সদা যুদ্ধং রাজ্যকামেন ধীমতা।
উপায়ে স্ত্রিভিরাদানম্ অর্থস্যাহ বৃহস্পতিঃ॥

মনু-মহারাজ সাম, দান, ভেদ—এই তিন উপায়কে আলাদা আলাদা, অথবা প্রয়োজনে হলে একসঙ্গেও প্রয়োগ করতে বলেছেন। কিন্তু, যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য হল যে, সাম, দান, এবং ভেদনীতি ব্যর্থ হলে, তবেই যুদ্ধের আশ্রয় নিতে হবে। তার মানে, আধুনিক পণ্ডিতেরা যুদ্ধ এড়ানোর প্রয়োজনেই যেমন 'ডিপ্লোমেসি'র প্রয়োজন অনুভব করেন, ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজনীতিবিদরাও তেমনই যুদ্ধ এড়ানোর জন্যই সাম-দান-ভেদের প্রয়োজন অনুভব করেছেন।

[V.R.R. Dikshitar, War in Ancient India, p. 299; মহা (k) ৬.৩.৮১; ১২.৬৯.২৩; (হরি) ৬.৩.৮৪; ১২.৬৭.২৩; মনুসংহিতা ৭.১৯৮-২০০]

চতুর্মুখ শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম একটি নাম। পৌরাণিক ভাবনায় সৃষ্টিকর্তা লোকপিতামহ ব্রহ্মারই চতুর্মুখ মূর্তি বিখ্যাত হয়ে আছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং মহেশ্বরকে অভিন্ন সত্তা রূপে কল্পনা করে মহাদেবকেও চতুর্মুখ নামে সম্বোধন করা হয়েছে মহাভারতে।

[মহা (k) ১৩.১৭.৭৭; (হরি) ১৩.১৬.৭৭]

চতুর্যুগ *[দ্র. যুগ]*

চতুষ্পথ শিব-মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ মহাদেবের এই নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

চতুষ্পথঃ চত্বারঃ উপাসনার্থং পন্থানো'স
স তথা, চ বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞ শিবধ্যানরূপাঃ।

নীলকণ্ঠ উপাসনার চারটি পথ বা মার্গের কথা বললেও সেগুলি ঠিক কী কী তা খুব স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে বলেননি। সেক্ষেত্রে চতুষ্পথ বা উপাসনার চারটি পন্থা ঠিক কী কী হতে পারে তা প্রাচীন গ্রন্থগুলি থেকে প্রাপ্ত নানা তথ্য অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

প্রাচীন ভাবনা অনুযায়ী, আশ্রমধর্মে স্থিত থাকলে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই চতুরাশ্রম যথাযথ ভাবে পালন করলে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয়। তার মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের অপার কৃপা লাভ করে। মহাভারতে একাধিকবার চতুরাশ্রম ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির ঈশ্বরের কৃপালাভের কথা আলোচিত হয়েছে। অভিমন্যুর অকাল মৃত্যুর পর বিলাপ করতে করতে সুভদ্রাও বলেছেন—যথাযথভাবে চতুরাশ্রম পালনকারী ব্যক্তি পরলোকে যে গতি লাভ করেন তাঁর অকালে মৃত পুত্রও যেন সেই পুণ্য এবং সেই গতি লাভ করে—

চতুরাশ্রমিনাং পুণ্যৈঃ পাবি তানাং সুরক্ষিতৈঃ।

[মহা (k) ৭.৭৭.২৭; (হরি)৭.৬৯.২৬]

□ চতুরাশ্রম পালনের মাধ্যমে পরমেশ্বরকে লাভ করা যায় বা তাঁর কৃপা লাভ করা যায়—এই ভাবনা থেকে শিবসহস্রনামস্তোত্রে ভগবান শিব 'আশ্রমস্থ' নামেও সম্বোধিত হয়েছেন। কারণ তিনিই আশ্রম ধর্মস্বরূপ, আর আশ্রমধর্ম পালনের মাধ্যমে ভক্ত তাঁকেই লাভ করে থাকে। একই ভাবনা থেকে চতুরাশ্রম স্বরূপে ভগবান শিব চতুষ্পথ নামেও খ্যাত।

চতুষ্পথের দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে—ধর্ম,

অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ। শাস্ত্রে পুরুষার্থ বলে একটা কথা আছে। পুরুষার্থ মানে পুরুষের প্রয়োজন। প্রধানত চারটি প্রয়োজনের পিছনেই মানুষ ছুটে বেড়ায় এবং সেগুলি হল যথাক্রমে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—

ধর্মার্থকাম মোক্ষাশ্চ পুরুষার্থ উদাহৃতাঃ।

এই চতুর্বর্গ লাভের মাধ্যমেই ব্যক্তির সকল অভীষ্ট পূরণ হয়।

ভগবান শিব স্বয়ং পুরুষার্থের অন্তিম অভীষ্ট যে মোক্ষ তার স্বরূপ তো বটেই। এই ভাবনা থেকেও চতুষ্পথ ভগবান শিবের অন্যতম নাম।

প্রাচীন ভাবনা অনুযায়ী পরমেশ্বরকে লাভ করার পন্থা বা উপায় মূলত চারটি—জপ, হুত, অর্চন এবং ধ্যান। ভগবান শিব স্বয়ং এই চারপ্রকার সাধনমার্গের স্বরূপ, আর এই পথ অতিক্রম করে পরমেশ্বর স্বরূপ মহাদেবকেই লাভ করা যায়—এই দুই ভাবনা থেকেই ভগবান শিব চতুষ্পথ নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৪৯; (হরি) ১৩.১৬.৪৯]

চন্দন শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। শিবসহস্রনাম স্তোত্রে একাধিক বার ভগবান শিবকে বৃক্ষ বা ওষধি সমূহের অধিপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভাবনা থেকে বকুল, চন্দন প্রভৃতি সুগন্ধযুক্ত বা সুগন্ধী পুষ্পশোভিত বৃক্ষের নাম তাঁর নামে আরোপিতও হয়েছে। এই কারণেই সুগন্ধী বৃক্ষ 'চন্দন' শিবের অন্যতম নাম।

চন্দন শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'চন্দি' ধাতু থেকে। 'চন্দি' ধাতুর অর্থ আহ্লাদিত করা বা হর্ষ উদ্রেক করা। চন্দনবৃক্ষের সুগন্ধ যেমন আমাদের হৃদয়কে আহ্লাদিত করে, ঠিক তেমনই জগতে পরমেশ্বরের উপস্থিতি জগৎকে আনন্দময় করে তোলে—এই ভাবনা থেকেও চন্দন মহাদেবের অন্যতম নাম।

জগতের রূপ-রস-স্পর্শ-গন্ধ প্রভৃতি সমস্ত উপাদানকেই পরমেশ্বরের স্বরূপতায় কল্পনা করা হয়। ভগবান শিবের মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে আছে—

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিম্ পুষ্টিবর্ধনম্।

এই সুগন্ধি স্বরূপতা থেকেই ভগবান শিব 'চন্দন' নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.১১০; (হরি) ১৩.১৬.১১০]

চন্দনা *[দ্র. নন্দনা]*

চন্দনী শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের চন্দনী নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

চন্দনী চন্দনালিপ্ত গাত্রঃ।

তাঁর যে জটাধারী ধ্যানমগ্ন তপস্বীর মূর্তি কল্পনা করা হয়, সেই অনিন্দ্যসুন্দর গাত্র চন্দনচর্চিত—এই ভাবনা থেকেই ভগবান শিব চন্দনী নামে সম্বোধিত হন।

[মহা (k) ১৩.১৭.১৩৬; (হরি) ১৩.১৬.১৩৫]

চন্দ্র১ চাঁদ বা চন্দ্র দেবতা। মহাভারত-পুরাণ মতে ইনি অষ্টবসুর মধ্যে একজন। সাধারণভাবে বেদ মন্ত্রে চন্দ্র ও সোম বা সোমলতা ধারণাগত ভাবে একাকার হয়ে গেছে। তবে এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় মহাকাব্য ও পুরাণখ্যাত চন্দ্র দেবতাই। পুরাণে বলা হয়েছে 'চন্দ্' ধাতু, যার অর্থ আহ্লাদন, শুক্লত্ব, অমৃতত্ব ইত্যাদি, তা থেকেই চন্দ্র শব্দের উৎপত্তি।

বেদ মন্ত্রে মাত্র দু-বার চন্দ্রদেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। একবার ঋগ্‌বেদে অগ্নিদেবের আরাধনা প্রসঙ্গে। আরেকবার অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে যজ্ঞে চন্দ্রদেবতাকে আহ্বান করতে দেখা যায়।

[ঋগ্‌বেদ ২.২.৪; অথর্ববেদ (নির্ণয় সাগর) ১২.২.৫৩; মহা (k) ১.৬৬.১৮; (হরি) ১.৬১.১৮; বায়ু পু. ৫৩.৫৫]

□ সমুদ্রমন্থনকালে চন্দ্র দেবতা রথে আরূঢ় অবস্থায় সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়েছিলেন।

মহাকাব্য-পুরাণে সর্বত্রই সমুদ্রমন্থনের ফলে চন্দ্রের উত্থানের কথা বলা হয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে চন্দ্র ক্ষীরোদ সাগরে প্রবেশ করেছিলেন সে কথা একমাত্র স্কন্দ পুরাণেই পাওয়া যায়।

পুরাকালে একবার চন্দ্র ও ক্ষীরাব্ধি পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সে সময়ে চন্দ্র অনুরাগবশতঃ ক্ষীরোদ সাগরে প্রবেশ করেন।

[রামায়ণ ৭.২৩.২২; মহা (k) ১.১৮.৩৪, ৩৮; (হরি) ১.১৪.৩৫, ৩৯; স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কেদার) ১১.৩১-৩৩]

□ চন্দ্র বা সোমের জন্মকথা পুরাণে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে—

মহর্ষি অত্রি ও তাঁর স্ত্রী অনসূয়া বহুকাল নিঃসন্তান জীবন যাপন করেন। নিঃসন্তান হওয়ার শোকে উভয়েই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। এমন এক সময়ে অত্রি অনসূয়াকে অনুরোধ করেন পুত্র লাভের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করার

জন্য। অত্রি বৃদ্ধ হয়েছেন। ফলে শরীর ক্রমে কৃশ হয়ে আসছে—এমত পরিস্থিতিতে তাঁর পক্ষে তপস্যার মত কঠিন কাজ করা সম্ভব নয়। সেকারণেই অত্রি উপস্থিত হলেন স্ত্রী অনসূয়ার কাছে। অনসূয়া স্বামীর ইচ্ছার মর্য্যাদা রেখে পুত্রার্থে তপস্যা করতে সম্মতি দেন। তপস্যার জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন নর্মদা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত ঐরণ্ডীসঙ্গম তীর্থটিকে। সেখানেই ব্রতচারিণী অনসূয়া শাকাহারে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। অত্রি-পত্নী এ সময় গ্রীষ্মঋতুতে পঞ্চাগ্নির মধ্যে, বর্ষায় আর্দ্রবসনে এবং হেমন্ত ঋতুতে জলে বাস করতেন। এইভাবে একশো বছর অতিবাহিত হলে একদিন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব তিন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে অনসূয়ার সামনে আবির্ভূত হলেন। অনসূয়া জপ-ধ্যান ছেড়ে যথাবিহিত পদ্ধতিতে তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করলেন। বারবার তাঁর মনে হতে লাগলো এবার মনোকামনা পূর্ণ হবে, কারণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের প্রকৃত পরিচয় তিনি পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন। দেবতারা স্বরূপে প্রকাশিত হয়ে অনসূয়ার তপস্যার কারণ জানতে চাইলেন। বুদ্ধিমতী অনসূয়া তখন তাঁদের কাছে পার্থনা করলেন যে, যদি তাঁর ভক্তিতে দেবত্রয় তুষ্ট হয়ে থাকেন তবে যেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিনজনেই পুত্র রূপে তাঁর গর্ভে জন্ম নেন।

দেবতারা অনসূয়াকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন দেবগণ কখনোই গর্ভবাস করেন না। সুতরাং তাঁরা যোনিজন্ম ব্যতীতই অনসূয়ার পুত্র রূপে আবির্ভূত হবেন।

এই বাক্য শুনে তপস্যা শেষ করে অনসূয়া মহেন্দ্র পর্বতে মহর্ষি অত্রির কাছে ফিরে গেলেন। বহুবছর পর স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ হল। অনসূয়া প্রেমভরে অত্রির দিকে তাকানো মাত্রই মহর্ষির কপালের মধ্যভাগে একটি দিব্য জ্যোতির আবির্ভাব ঘটে। সেই দিব্যরশ্মি থেকে এক দিব্য পুরুষ জন্ম নেন। এই পুরুষটিই চন্দ্র, অনসূয়ার প্রথম পুত্র। স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা চন্দ্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। *[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/রেবা) ১০৩.১-৯৩; মার্কণ্ডেয় পু. ১৭.১-৪]*

□ ভাগবত পুরাণে আবার চন্দ্রের জন্ম কাহিনীটি সামান্য অন্যরকম। সেখানে বলা হয়েছে প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশে প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে সস্ত্রীক মহর্ষি অত্রি ঋক্ষ পর্বতে তপস্যা করতে যান। সেখানে অত্রি একপায়ে দাঁড়িয়ে বায়ুমাত্র গ্রহণ করে একশো বছর কঠোর তপস্যা করেন। সে সময় অত্রি জগদীশ্বরের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। ঋষির তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর একত্রে অত্রির আশ্রমে আবির্ভূত হন কারণ এই ত্রয়ী একত্রেই জগদীশ্বর। অত্রির তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবতারা বলেন তাঁদের অংশে ঋষি-গৃহে তিনটি বিখ্যাত পুত্রের জন্ম হবে। এই তিন পুত্রের মধ্যে ব্রহ্মার অংশে জন্মগ্রহণকারী অত্রি-অনসূয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম চন্দ্র। *[ভাগবত পু. ৪.১.১৭-৩২]*

□ মৎস্য পুরাণ আবার অন্য কথা বলে—

পুরাকালে প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে মহর্ষি অত্রি কঠোর তপস্যা করেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অত্রির সামনে আবির্ভূত হলেন। তাঁদের আবির্ভাবেই অত্রির দেহের অষ্টমাংশ থেকে তেজোরাশির জন্ম হয়। অত্রির পত্নীরা (মতান্তরে দিগাঙ্গনাগণ) পুত্র কামনায় সেই তেজোরাশিকে তিনশো বছর গর্ভে পালন করেন। অবশেষে তাঁরা তেজোরাশি মোচন করলে তা থেকে এক দিব্যপুরুষের উদ্ভব ঘটে। ইনিই অত্রি-পুত্র চন্দ্র। *[মৎস্য পু. ২৩.১-১০; বায়ু পু. ৯০.১-৯]*

□ সমুদ্র মন্থনের ফলে উত্থিত অমৃত রাহু নামে এক অসুর কৌশলে পান করার চেষ্টা করলে চন্দ্র ও সূর্য দেবতাদের হিতকামনায় বিষ্ণুকে এই সংবাদ দিলেন। অমৃত রাহুর কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছেছে এমতাবস্থায় ভগবান বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে রাহুর মাথা কেটে ফেললেন। রাহুর ছিন্নমস্তকটি তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, চন্দ্র ও সূর্যের প্রতি এখন থেকে তার চিরস্থায়ী শত্রুতা সৃষ্টি হল। সেকারণে আজও রাহু চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করে।

[দ্র. অমৃতমন্থন]

[মহা (k) ১.১৯.৪৮-৫২; (হরি) ১.১৫.৫-৯; ভাগবত পু. ৮.৯.২৪-২৬]

□ এদিকে রাহু চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করার প্রতিজ্ঞা করলে চন্দ্র ভীত হয়ে পড়েন। তিনি আত্মগোপন করার জন্য অর্বুদ পর্বতে যান। সেখানে চন্দ্র মহাদেবের তপস্যা শুরু করেন। অর্বুদ পর্বতের একটি দুর্গম শৃঙ্গে গভীর গর্ত বা বিবর খনন করে চন্দ্র সেখানে বসবাস করতেন এবং কঠোর তপস্যায় কালযাপন করতেন।

দীর্ঘকাল তপস্যার পর চন্দ্র মহাদেবের সাক্ষাৎ পান। চন্দ্র বররূপে রাহুর গ্রাস থেকে মুক্তি প্রার্থনা করলেও মহাদেব তাঁকে বলেন যে, রাহু দেবতাদের অবধ্য ও অজেয়। সুতরাং চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করবেন—একথাও পরিবর্তন হওয়ার নয়। তবে মহাদেব সোমকে বলেন, চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে যত মানুষ পবিত্র কোনো জলধারায় স্নান করবেন চন্দ্রের গ্রহণকালীন বেদনা ততোই হ্রাস পাবে। শিব এছাড়াও চন্দ্র নির্মিত বিবর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলকে চন্দ্রোদ্ভেদ তীর্থ বলে আখ্যা দেন।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/অর্বুদ) ৫১.২-১৪]

□ দক্ষ প্রজাপতির সাতাশটি কন্যার সঙ্গে চন্দ্রের বিবাহ হয়েছিল। এই সাতাশটি কন্যার মধ্যে রোহিণী অন্যতমা। চন্দ্রের ঔরসে রোহিণীর গর্ভজাত চার পুত্রের নাম—বর্চা, শিশির, প্রাণ ও রমণ।

মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে বলা হয়েছে যে, চন্দ্র-পুত্র বর্চাই মহাভারতের কালে অভিমন্যু রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চন্দ্র পুত্র বর্চাকে এতই স্নেহ করতেন যে, মর্ত্যলোকে গিয়ে পুত্রকে অসুর নিধনের অনুমতি দিলেও দীর্ঘ সময় তাঁকে মর্ত্যলোক-বাস করতে দিতে চাননি। চন্দ্রের ইচ্ছাতেই ইন্দ্রের অংশজাত অর্জুনের পুত্র রূপে বর্চা অভিমন্যু নামে জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রের ইচ্ছাতেই অভিমন্যু ষোলো বছর বয়সেই মহারথ যোদ্ধায় পরিণত হন। ষোলো বছর বয়সেই অভিমন্যুর কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধযাত্রা এবং নিহত হওয়া। চন্দ্রের ইচ্ছাতেই অভিমন্যু একটি মাত্র বীর পুত্রসন্তান পরীক্ষিতের জন্ম দেন। এই পরীক্ষিৎ-ই ভরত বংশের রক্ষাকর্তা হবেন—এই দৈববাণীও চন্দ্রদেবেরই করা।

[মহা (k) ১.৬৬.১৮, ২২; ১.৬৭.১১৪-১২৬;
(হরি) ১.৬১.১৮, ২২; ১.৬২.১১৪-১২৬;
অগ্নি পু. ১৮.৩৫]

□ অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা—ইত্যাদি নামে যে সাতাশটি নক্ষত্রের নাম আমরা জানি, দক্ষের মেয়েরা হলেন এই সাতাশ নক্ষত্র-সুন্দরী। দক্ষ এই সাতাশটি মেয়েকে এক সঙ্গে চন্দ্রের হাতে সম্প্রদান করেছিলেন—

যা সপ্তবিংশতিং কন্যাং দক্ষঃ সোমায় বৈ দদৌ।

দক্ষের সাতাশ মেয়ে সাতাশ জন নক্ষত্র সুন্দরী—রূপে-গুণে তাঁরা কেউ কম নন। কিন্তু এঁদের মধ্যে রোহিণী ছিলেন সবচেয়ে সুন্দরী—

অত্যরিচ্যত তাসান্তু রোহিণী রূপ-সম্পদা।

সে সৌন্দর্য্য এমনই অপ্রতিম যে, চন্দ্র তাঁর রূপের মোহে তাঁর অন্য স্ত্রীদের অবহেলা করতে লাগলেন। সব সময় তিনি রোহিণীর সঙ্গেই থাকেন, রোহিণীকেই ভালবাসেন, রোহিণী ছাড়া তিনি আর দ্বিতীয় কিছু জানেন না। চন্দ্রের এই আচরণে জন্য নক্ষত্র সুন্দরীরা সবাই ভীষণ রেগে গেলেন। রোহিণী তাঁদের সহোদরা বোন হলে কী হয়, সপত্নীর কারণে স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হতে কার ভালো লাগে! অতএব সপত্নী এবং স্বামীর প্রিয়া বলেই রোহিণী তাঁর বোনেদের চক্ষুশূল হয়ে উঠলেন।

ছাব্বিশ নক্ষত্র-সুন্দরী স্বামীর ওপর অভিমান করে এক সঙ্গে দল বেঁধে বাপের বাড়ি চলে এলেন। পিতা দক্ষের কাছে সকলে মিলে অভিযোগ করলেন—দেখ বাবা এত তোড়জোড় করে তুমি চন্দ্রের সঙ্গে আমাদের বিয়ে দিলে, কিন্তু স্বামী আমাদের দিকে ফিরেও তাকান না। তাঁর যত ভালোবাসা সব সুন্দরী রোহিণীর ওপর। সব সময় তাঁরই ভজনা করেন চন্দ্র—

সোমা বসতি নাস্মাসু রোহিণীং ভজতে সদা।

দক্ষের ছাব্বিশটি মেয়ে পিতার কাছে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন—কী হবে আর ওই স্বামীর কাছে থেকে? আমরা আজ থেকে এখানেই থাকব।

দক্ষ মনে মনে প্রমাদ গুণলেন। এতগুলি মেয়ে একসঙ্গে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে, এবং এসেছে তাদেরই এক ভগিনীর প্রতি নির্মম ঈর্ষ্যায়। দক্ষ সোজা চন্দ্রকে গিয়ে বললেন—আমার সাতাশটি মেয়েকে তুমি এক সঙ্গে বিয়ে করেছ অথচ সবার দিকে তুমি একরকম করে তাকাও না। এ তোমার কেমন ব্যবহার? সবাইকে তুমি সমানভাবে দেখ। সাতাশটি স্ত্রীর মধ্যে শুধু একতমার প্রতি এই নিদারুণ পক্ষপাত কি ধর্মে সইবে বলে মনে কর—

সমং বর্তস্ব ভার্যাসু মা ত্বাধর্মো মহান্ স্পৃশেৎ।

স্নেহময় পিতা ফিরে এসে মেয়েদের বললেন—এবার স্বামীর বাড়ি যাও। আমি জামাইকে খুব শাসন করে এসেছি। সে এখন সবাইকে সমান চোখে দেখবে।

পিতার কথা শুনে দক্ষ-কন্যারা আবার চন্দ্রের

গৃহে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কোথায় কী! চন্দ্র যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন। সেই রোহিণী। তাঁকেই তিনি ভালোবাসেন, তাঁকে নিয়েই তাঁর দিন-রাত কাটে। দক্ষ-কন্যারা আবার ফিরে এলেন বাপের বাড়ি। এবারে আর নতুন অভিমানে তাঁরা কেঁদে বুক ভাসালেন না। বরং ঠাণ্ডা মাথায় তাঁরা পিতা দক্ষকে বললেন—তাঁরা আর ফিরে যাবেন না। দক্ষের কাছেই থাকবেন। কারণ চন্দ্র দক্ষের কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চলেছেন ক্রমাগত।

কন্যারা যাই বলুক। দক্ষের আত্মাভিমানে লাগল এসব কথা। তিনি আবারও গেলেন চন্দ্রের কাছে এবং অভিশাপের ভয় দেখিয়ে সব মেয়েকে সমদৃষ্টিতে দেখার শাসন জারি করে ফিরে এলেন। মেয়েরা তাঁর কথায় আবার স্বামীর কাছে গেল এবং পুনরায় তাঁর একই অপব্যবহার দেখে বাপের বাড়ি ফিরে এল। তাদের এবার রাগও হল খুব—স্বামীর ওপরে তো বটেই, পিতার ওপরেও খানিকটা। বারবার স্বামীর ভালোবাসা ভিক্ষা করে, বারবার প্রত্যাখ্যাত হতে কোন রমণীর ভালো লাগে! দক্ষ-কন্যারা এবার পিতাকে বললেন—চন্দ্র এখনও রোহিণীর ঘরেই বসে আছেন। আমাদের ভালোভাসার কোনো দায়ই তাঁর নেই—

ন তদ্‌বচো গণয়তি নাস্মাসু স্নেহমিচ্ছতি।

যদি দক্ষ কিছু করতেই চান তবে যেন তিনি এমন ব্যবস্থা করেন যাতে স্বামী তাঁদের ভালোবাসেন।

দক্ষ রাগে দিগ্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হয়ে পুনরায় জামাতার ঘরে এলেন এবং কঠিন অভিশাপ উচ্চারণ করলেন তাঁর উদ্দেশে। মহাভারত বলেছে—চন্দ্রকে শাস্তি দেবার জন্য দক্ষ ভয়ঙ্কর যক্ষ্মা রোগের সৃষ্টি করলেন এবং যক্ষ্মা চন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করল।

[মহা (k) ৯.৩৫.৪১-৮১; (হরি) ৯.৩৩.৪১-৮৩]

☐ চন্দ্রের যক্ষ্মা রোগের কাহিনী এইটুকুই। হয়তো এই কাহিনীর মধ্যে অন্যতর দুটি বিশ্বাস লুকোনো আছে এবং সেই বিশ্বাসই প্রতিপন্ন হয়েছে রোগগ্রস্ত চন্দ্রমার কাহিনীতে। প্রাচীনরা বিশ্বাস করতেন—অতিরিক্ত স্ত্রী-সম্ভোগের ফলে যক্ষ্মা হয় এবং এই ধারণা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও চালু ছিল। আমাদের ধারণা, এই চিরন্তনী ধারণাই উপাখ্যানের আশ্রয় নিয়েছে রোহিণী-চন্দ্রের নিবিড় সম্ভোগে। আরও একটা বিশ্বাস যা আছে, তা শুধু বিশ্বাস নয়, মাহাত্ম্য-খ্যাপন। চন্দ্র এই সাংঘাতিক রোগ থেকে পূর্ণ মুক্তি পাননি, কিন্তু খানিকটা যে তিনি সেরে উঠেছিলেন, তা শুধু সরস্বতীর তীরে প্রভাস তীর্থে স্নান করে।

অমাবস্যা থেকে চন্দ্রের যে এককেটি কলা বৃদ্ধি হতে থাকে, তার কারণ সরস্বতী-প্রভাসে অমাবস্যার দিন নাকি চন্দ্র তাঁর রোগ মুক্তির জন্য স্নান করেছিলেন এবং সেইদিন থেকে পনেরো দিন তিনি ভালো থাকেন, তাঁর শরীরটিও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু পূর্ণিমার দিন তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখা গেলেও আবার তাঁর শরীর শুকোতে থাকে। ফলে পরের অমাবস্যায় আবার তাঁকে তীর্থ-স্নান করতে হয়। প্রসঙ্গত —সরস্বতীর তীর্থে স্নান করে চন্দ্র তাঁর শরীরে দীপ্তি অর্থাৎ প্রভা ফিরে পেয়ে জগৎ আলো করেছিলেন বলেই ওই তীর্থের নাম প্রভাস। *[বায়ু পু. ৫৬.৩০-৩১;*
স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/চতুরশীতি) ২৬.১-৯;
স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাস) ২২.২৭-৩১]

☐ দক্ষের অভিশাপে চন্দ্র অন্তর্হিত হলে দেব, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্বগণ ও পিতৃগণ প্রমাদ গুণলেন কারণ সোমের অনুপস্থিতিতে ওষধিরা ক্রমশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছিলো। এমত পরিস্থিতিতে দেব, যক্ষ সকলে একত্রিত হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা তাঁদের আশ্বাস দিয়ে জানালেন, চন্দ্র অবশ্যই তাঁর কর্মফল ভোগ করবেন। তবে ভগবান বিষ্ণু চন্দ্রের অভিশাপের অবসান ঘটাবেন। তখন দেবতারা বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। বিষ্ণু তাঁদের অভয় দান করে চন্দ্রকে স্মরণ করলেন। কিন্তু চন্দ্র উপস্থিত হলেন না। ক্রুদ্ধ বিষ্ণু তখন ব্রহ্মাকে বললেন, আবার দেবাসুর মিলে সমুদ্রমন্থন করা হোক। সমুদ্র মন্থনের ফলে পুনরায় চন্দ্র উত্থিত হবেন।

বিষ্ণুর আদেশে পুনরায় সমুদ্র মন্থন করা হল। সাগর মথিত করে চন্দ্র আবার আবির্ভূত হলেন।

বিষ্ণু তাঁকে জগতের জ্যেষ্ঠ বলে অভিহিত করেন। চন্দ্রও প্রজাপালনে মনোনিয়োগ করলেন।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/চতুরশীতি) ২৬.১০-৩১;
স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাস) ২২.১০৯-১১৫]

☐ কাহিনীর এই অংশে পৌঁছে পুরাণকার

চন্দ্রের দ্বৈত অস্তিত্বের কথা বলেছেন। স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে যে, দক্ষপ্রজাপতির শাপে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত চন্দ্রদেব দেবর্ষি নারদের মুখে সমুদ্রমন্থনে আবির্ভূত নতুন চন্দ্রের সংবাদ পেয়ে মনোকষ্টে বনবাসী হয়েছিলেন। বিষ্ণু স্বয়ং নবোদিত চন্দ্রকে জগতে জ্যেষ্ঠ বলে অভিহিত করায় শাপগ্রস্ত চন্দ্র তাঁর যাবতীয় অধিকার ও প্রতিপত্তি হারিয়েছিলেন বলেই মনে হয়।

নবোদিত চন্দ্র শাপগ্রস্ত চন্দ্রকে পীড়ন করতে লাগলে ব্রহ্মা এই অবিচার সহ্য করতে পারলেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ব্রহ্মার অংশেই চন্দ্রের জন্ম। সে কারণে কয়েকটি পুরাণে চন্দ্রকে ব্রহ্মার প্রথম পুত্র বলা হয়েছে।

পুত্রের প্রতি অবিচার রোধ করার বাসনায় ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বিষ্ণু-স্তব করতে শুরু করলেন। বিষ্ণু প্রজাপতি ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হয়ে চন্দ্রকে উপদেশ দিলেন মহাকাল বনের উত্তরে অবস্থিত মুক্তিলিঙ্গের উপসনা করতে। প্রথম-চন্দ্রের উপাসনায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান শিব তাঁকে নতুন দেহ দান করবেন।

চন্দ্রও মুক্তিলিঙ্গে শিবের আরাধনা শুরু করলেন। দীর্ঘ স্তবের পর মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে প্রথম-চন্দ্রকে তাঁর হৃত কান্তি ফিরিয়ে দেন। সেই সময় থেকেই চন্দ্রের আরাধ্য লিঙ্গটি সোমেশ্বর নামে বিখ্যাত হয়।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/চতুরশীতি) ২৬.৩২-৬৪]

□ চন্দ্রের অভিশপ্ত হওয়া এবং শাপমুক্তি সম্পর্কে বহু কাহিনী পুরাণে রয়েছে। কাহিনীগুলিকে পরস্পরবিরোধী না বলে পরিপুরক বলা ভালো। প্রতিটি কাহিনীর শেষেই অবশ্য চন্দ্রের মহাদেব-উপাসনা এবং তার ফলস্বরূপ রোগ মুক্তির কথা পাওয়া যায়। তবে কার পরামর্শে চন্দ্র হৃতকান্তি পুনরুদ্ধারে শিবের তপস্যা করেছিলেন সে বিষয়ে পৌরাণিকদের মতামত বিভক্ত। যেমন—স্কন্দ পুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে চন্দ্রকে শিব-উপাসনার পরামর্শদানকারী হলেন বিষ্ণু। আবার স্কন্দপুরাণেরই নাগরখণ্ডে পরামর্শদাতার নাম ঋষি রোমক। *[স্কন্দ পু. (নাগর) ৬৩.৩২-৬১]*

□ মহাকাব্য-পুরাণে উল্লিখিত চন্দ্রদেব এবং নক্ষত্রপতি চন্দ্র বা চন্দ্রমা অভিন্নই। ফলে প্রায়শই চন্দ্রদেবতার বর্ণনা থেকে পৌরাণিকগণ নক্ষত্রপতির বর্ণনায় প্রবেশ করেন। পুরাণে এ জাতীয় এক দীর্ঘ বর্ণনায় বলা হয়েছে—

চন্দ্রদেবের ত্রিচক্র বিশিষ্ট রথ দশটি দ্রুতগামী অশ্ববিশিষ্ট। সেই অশ্বদের নাম যথাক্রমে—যযু, ত্রিমনা, বৃষ, রাজী, বল, বাস, তুরণ্য, হংস, ব্যোমী ও মৃগ (মতান্তরে অজ, ত্রিপথ, বৃষ, বাজী, নর, হয়, অংশুমান, সপ্তধাতু, হংস ও ব্যোমমৃগ)। আদিকালে অশ্বগুলি শ্বেত সর্পদ্বারা রথের সঙ্গে যোজিত হয়েছে। এঁরা একত্রে চন্দ্রাশ্ব নামে পরিচিত। সমুদ্রমন্থনের সময় চন্দ্রদেব রথ ও অশ্বসহই ক্ষীরোদ সাগর থেকে উত্থিত হয়েছিলেন।

ঠিক এর পরই আরম্ভ হয় নক্ষত্রাধিপতি চন্দ্রমার বর্ণনা। শুক্লপক্ষে সূর্য চন্দ্রের সম্মুখে অবস্থান করে চন্দ্রের পুষ্টি সাধন করেন। ষোড়শ কলাবিশিষ্ট চন্দ্রের পঞ্চদশ কলাকে সূর্য সুষুম্না নামক রশ্মি দ্বারা পূরণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে চন্দ্রের কোনো নিজস্ব রশ্মি নেই। সে সূর্যকিরণেই আলোকিত হয়। পৌরাণিকরা এই সত্যকেই এভাবে রূপকের আড়ালে বর্ণনা করেছেন এবং সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞান এবিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রাখত—পুরাণের বর্ণনা থেকে এমন ধারণাই জন্ম নেয়।

শুক্লপক্ষ থেকে কৃষ্ণপক্ষের দিকে যাত্রার সময় চন্দ্রকলা ক্রমে হ্রাস পায়। সে সময় দেবতা-পিতৃ-মহর্ষিগণ চন্দ্রকেই ভক্ষ্যরূপে আস্বাদন করেন—এমন কল্পনা পুরাণে করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতি চন্দ্রের কলাক্ষয়। যে সকল পিতৃগণ চন্দ্রকলা ভক্ষণ করেন তাঁদের নাম সৌম্য, বর্হিষদ, অগ্নিষ্বাত্ত ও কব্য। *[বায়ু পু. ৫২.৪৯-৭০; মৎস্য পু. ১২৬.৫৮-৭২; বিষ্ণু পু. ২.১২.১-১৫]*

□ চন্দ্রের সম্পূর্ণ জীবন-কাহিনী মহাভারতে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে পুরাণগুলিরই উপরই মুখ্যত নির্ভর করতে হয়। মহাভারতের কবি বনপর্বের একটি শ্লোকে শুধুমাত্র বলেছেন—দেবগুরু বৃহস্পতির যিনি স্ত্রী ছিলেন, তাঁকে চন্দ্রেরও স্ত্রী বলা যায়—

বৃহস্পতেশ্চান্দ্রমসী ভার্যাসদ্ যা যশস্বিনী॥

পুরাণ বলছে—দক্ষ-কন্যাদের সঙ্গে বিবাহাদি সম্পন্ন হওয়ার পর চন্দ্র বিষ্ণুর উপাসনা শুরু করেন। চন্দ্রের সেই উপাসনাস্থলটি সোমকুণ্ড তীর্থ নামে বিখ্যাত। কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু

চন্দ্রকে বর দিতে চাইলেন। চন্দ্র তখন বর রূপে ইন্দ্রলোক জয় করার অধিকার প্রার্থনা করেন। একইসঙ্গে তিনি সমগ্র দেবকুলকে নিজের গৃহে অবস্থানরত অবস্থায় দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অর্থাৎ দেবরাজ রূপে ইন্দ্র যে আধিপত্য ভোগ করতেন বর হিসেবে চন্দ্র ভগবান বিষ্ণুর কাছে তা প্রার্থনা করলেন। এক কথায় বলতে গেলে চন্দ্র বিষ্ণুর বরে দেবলোক-প্রধান হয়ে উঠতে চাইলেন। শুধু তাই নয় চন্দ্র বিষ্ণুর কাছে একটি রাজসূয় যজ্ঞ আয়োজনের অনুমতি প্রার্থনা করেন, যেখানে স্বয়ং দেবতারা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের ভূমিকা পালন করবেন এবং শিব উপস্থিত থাকবেন চন্দ্রের রক্ষাকার্যে।

বিষ্ণু চন্দ্রের সমস্ত ইচ্ছাপূরণ করেন। সমগ্র দেবকুল যজ্ঞকার্যে অংশগ্রহণ করলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মার সামগানে মুখরিত হল যজ্ঞস্থল। রাজসূয় যজ্ঞ সমাপনের পর চন্দ্র আপন কমনীয়তায় আরও সুন্দর হয়ে উঠলেন।

পর পর এইসব অভাবনীয় ঘটনায় চন্দ্রের শুধু শারীরিক উজ্জ্বলতাই নয়, মান-মর্য্যাদা ও দেবকুলে তাঁর অবস্থান ক্রমেই উচ্চতর হতে লাগলো। পুরাণের বর্ণনানুযায়ী দেব-রমণীরা ক্রমেই চন্দ্রের রূপ ও ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে লাগলেন। প্রজাপতি কর্দমের স্ত্রী সিনীবালী, বিভাবসুর স্ত্রী দ্যুতি প্রমুখরা নিজের স্বামীকে ছেড়ে দাসীর মত চন্দ্রের সেবায় স্বেচ্ছায় নিযুক্ত হতে চাইলেন। নারায়ণ-পত্নী লক্ষ্মী দেবীও চন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। চন্দ্রও তাঁর প্রতি দেব-রমণীদের সমর্পণ উপভোগ করছিলেন সব অর্থেই। এক্ষেত্রে 'লক্ষ্মী' শব্দটিকে বাচ্যার্থে নয়, ব্যাঞ্জনার্থে ধরলে স্পষ্ট হয় এখানে আসলে চন্দ্রের ক্রমবর্ধমান ঐশ্বর্য্যকেই দেবী লক্ষ্মীর আশ্রয় বলে পুরাণকারেরা বোঝাতে চেয়েছেন।

[মহা (k) ৩.২১৯.১; (হরি) ৩.২৮২.৯;
স্কন্দ পু. (বিষ্ণু/বদরিকা) ৭.১-৩১;
স্কন্দ পু. (কাশী/পূর্ব) ১৪.২৫-৩৪;
মৎস্য পু. ২৩.২২-২৮; বায়ু পু. ৯০.২৪-২৫]

☐ চন্দ্র অগাধ ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তির অধিকারী হলেন। ত্রিভুবন তাঁর কাছে খুবই ছোটো কথা, সপ্ত লোকের আধিপত্যও তখন চন্দ্রের করতলগত—

সপ্তলোকৈক নাথত্বম্ অবাপ তপসা সদা।

এইরকম স্বাধিকার সুখে মগ্ন হয়ে চন্দ্র একদিন তাঁর ভবন-সংলগ্ন উদ্যানে ভ্রমণ করছিলেন। হঠাৎই সেখানে এক সুন্দরী রমণীকে দেখতে পেলেন। উদ্যানের ফুলের আভরণে আবৃতা সেই রমণীর শারীরিক গঠন অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ইনিই দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারা। (তবে ব্রহ্মপুরাণে বলা হয়েছে চন্দ্র বৃহস্পতির কাছে বিদ্যাশিক্ষার সময় গুরুগৃহেই গুরুপত্নী তারাকে প্রথম দেখেন)। চন্দ্র তারার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। নির্জন উদ্যানভূমির মধ্যে তিনি তারাকে আলিঙ্গন করলেন। তারাও চন্দ্রকে বাধা দেওয়ার চেষ্টামাত্র করেননি। বোঝা গেল, দেবগুরুর পরিণীতা স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তারা চন্দ্রের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি নিজেকে চন্দ্রের হাতে সম্পূর্ণ সমর্পণ করলেন। চন্দ্র ও তারার সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠলো।

☐ বৃহস্পতি-পত্নী তারা উদ্যান থেকে নিজগৃহে ফিরে যাননি। সরাসরি তিনি চন্দ্রের সঙ্গে তাঁরই বাসভবনে আশ্রয় নিলেন।

তবে পুরাণে চন্দ্র ও তারার প্রথম সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে অপর একটি কাহিনীও প্রচলিত রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে দেবগুরু বৃহস্পতি নিজেই সস্ত্রীক এসেছিলেন যজমান চন্দ্রের গৃহে। সেখানেই চন্দ্র ও তারার প্রথম সাক্ষাৎ ও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। বৃহস্পতি প্রয়োজনীয় কাজ সমাপ্ত করে নিজ গৃহে ফিরে গেলেও তারা আর ফিরে যাননি। চন্দ্রও তারাকে ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো উদ্যোগ করেননি। এদিকে বৃহস্পতি তারার ভাবনায় আকুল হয়ে পড়লেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল সুমতি হলে তারা আপনি ফিরে আসবেন। কিন্তু বাস্তবে তেমনটা ঘটল না।

অনেক দিন চলে গেল। বৃহস্পতি এবার এক শিষ্যকে চন্দ্রের বাড়িতে পাঠালেন তারাকে ফিরিয়ে আনার জন্য। তারা ফিরলেন না, চন্দ্রও তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার নামও করলেন না। একবার নয়, বৃহস্পতির শিষ্য বারবার গেলেন চন্দ্রের বাড়িতে বার্তাবহ হয়ে। বারবার বিফলতায় ক্রুদ্ধ হয়ে বৃহস্পতি নিজেই এবার উপস্থিত হলেন শিষ্যবাড়িতে। চন্দ্রের বাড়িতে হুংকার দিয়ে চন্দ্রের উদ্দেশে বললেন— ব্যাপারটা কী হচ্ছে? আমার সুন্দরী স্ত্রীটিকে তুমি নিজের ঘরে আটকে রেখেছ? তুমি কি জান না—আমি দেবগুরু, আর তুমি আমার শিষ্য যজমান?

চন্দ্র বৃহস্পতির কথায় কর্ণপাত করা তো দূরের ব্যাপার বরং প্রত্যুত্তরে দেবগুরুকে খানিক তাচ্ছিল্যের হাসি উপহার দিলেন। বৃহস্পতি চন্দ্রের ব্যবহারে অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে স্মরণ করালেন, গুরুপত্নীকে ভোগকারী ব্যক্তি মহাপাতক, আর সে অপরাধ যদি চন্দ্র করে থাকেন তবে দেবস্থানে বাস করার কোনো অধিকার তাঁর নেই। তারাকে ফিরিয়ে না দিলে চন্দ্রকে অভিশাপ দেওয়ার ভয়ও বৃহস্পতি দেখালেন।

বৃহস্পতির দোষারোপের ধরন দেখে মনে হয় সমস্ত ঘটনার জন্য স্ত্রী তারাকে নয়, তিনি সম্পূর্ণভাবে দায়ী মনে করছেন চন্দ্রকে। কিন্তু চন্দ্র কোনো অভিযোগ গ্রাহ্য করলেন না। বরং রাজা সুলভ আধিপত্য নিয়েই বৃহস্পতিকে চন্দ্র বুঝিয়ে দিতে চাইলেন ব্রাহ্মণের এত ক্রোধ মানায় না। তারার অনিচ্ছায় তাঁকে বন্দি বা ভোগ করার মতো কোনো গর্হিত কাজ করা হয়নি—একথাও চন্দ্র স্পষ্ট করে দেন। তিনি খানিক প্রবোধ দেওয়ার মতো করেই বললেন—সময় হলে তারা নিজেই বৃহস্পতির কাছে ফিরে যাবেন। আপাতত তারা চন্দ্র-ভবনে সুখেই আছেন।

চন্দ্র একেবারে আধুনিক মতে ধর্ষণের দায় এড়িয়ে গেলেন। অর্থাৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়, বরং স্বেচ্ছায় তিনি সুখে আছেন। তাঁর ভালো লাগছে—সুখকামার্থিনী হি সা। সবার শেষে গুরুকে তিনি আশ্বস্তও করে দিলেন—এই তো, আর কিছুদিন থেকে তিনি হয়তো স্বেচ্ছাতেই আপনার বাড়ি যাবেন—

দিনানি কতিচিৎ স্থিত্বা, স্বেচ্ছয়া চাগমিষ্যতি।

ভাবটা এই—'মনের মধ্যে ভাবনা কিন্তু রেখো সারাক্ষণ'—ইচ্ছা না হলে কিন্তু যাবেন না।

ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ বৃহস্পতি ফিরলেন। পৌরাণিক বলেছেন—শুধু দুর্ভাবনায় চিন্তাতুর হয়ে নয়, কামাতুর হয়েও ফিরলেন বৃহস্পতি—

জগাম স্বগৃহং তূর্ণং চিন্তাবিষ্টো স্মরাতুরঃ।

পৌরাণিক বৃহস্পতির মনস্তত্ত্ব বুঝেই এই মন্তব্য করেছেন। ঘরে থাকতে দৈনন্দিন দাম্পত্যে অবহেলায় যে স্ত্রীকে বৃহস্পতি প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করেননি, সেই স্ত্রীকেই পুরুষান্তরের শৃঙ্গার-সংসর্গ-লিপ্ত অবস্থায় কল্পনা করে বৃহস্পতি হয়তো কামাতুর হলেন। ঘরে ফিরে বেশিদিন তাঁর থাকা হল না। আবার এলেন চন্দ্রের বাড়িতে। এবারে চন্দ্র-ভবনের দ্বারপালই তাঁকে বাধা দিল। দ্বারপালেরাও প্রভুর ইচ্ছা বোঝে। বৃহস্পতি বাইরে থেকেই তর্জন গর্জন করতে লাগলেন। আবার বৃহস্পতি অভিশাপের ভয় দেখালেন।

□ চন্দ্র হাসিমুখে বৃহস্পতির সামনে এসে উপস্থিত হলেন। অন্যের পত্নী স্বেচ্ছায় যে পুরুষের আশ্রয় নেন তিনি স্বভাবতই নিজেকে বিজয়ী বলে মনে করেন। চন্দ্রও তারাকে পেয়ে সেই আনন্দে মগ্ন। স্বাভাবিকভাবেই বৃহস্পতি দেবগুরু হলেও তখন চন্দ্রের চোখে পরাজিত এক স্বামী ছাড়া আর কিছুই নন। সেই অহমিকাবোধ থেকেই চন্দ্র বৃহস্পতিকে বললেন, তাঁর মত মানুষ সুন্দরী তারার যোগ্য হতে পারেন না। আর স্ত্রীলোক সর্বদাই নিজের সমান যোগ্য পুরুষ পছন্দ করেন। এরপর চন্দ্র চরম বাক্যটি উচ্চারণ করলেন—বৃহস্পতি যাই করুন তারাকে কিছুতেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে না।

দেবগুরু বৃহস্পতি মহা বিপদে পড়লেন। শাপ দিয়ে ভস্ম করে দেবেন তারও উপায় নেই কোনো। অভিশাপ মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়েই আসছিল—কিন্তু চন্দ্র সে অভিশাপের ভয় পাচ্ছেন না একটুও। একে তো তিনি পূর্ব তপস্যার বলে বলীয়ান; দ্বিতীয়ত বৃহস্পতির স্ত্রী স্বয়ং তাঁর অনুরক্তা। এই অবস্থায় বৃহস্পতি বারংবার তাঁর স্ত্রীর অধিকার চাওয়ায় চন্দ্র তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছেন—আপনি নিজেই কামার্ত গুরুদেব। নইলে পালিয়ে যাওয়া একটি স্ত্রীলোকের জন্য কেউ আপনার মতো এরকম করে না।

কামার্তস্য চ তে শাপো ন মাং বাধিতুমর্হসি।

অতএব আপনার শাপে আমার কিছুই হবে না। বৃহস্পতি কোনো অভিশাপ উচ্চারণ করতে পারলেন না। কারণ চন্দ্র নয় বাস্তবিকই তারাই তাঁর সঙ্গে বঞ্চনা করেছেন। ক্রুদ্ধ অপমানিত দেবগুরু শেষপর্যন্ত গিয়ে উপস্থিত হলেন ইন্দ্রের কাছে। দেবরাজকে জানালেন, চন্দ্র তারাকে হরণ করেছেন। চন্দ্রের ঔদ্ধত্যের কথাও বিশদে বর্ণনা করলেন।

□ ইন্দ্র দেবতাদের রাজার মতোই বৃহস্পতিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—আমি অবশ্যই আপনার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনব আপনার কাছে। দরকার হলে যুদ্ধ করব। ইন্দ্র প্রথমে একটি দূত পাঠালেন

চন্দ্রের কাছে। দূত গিয়ে প্রথমে ইন্দ্রের সদুপদেশ অনেক শোনাল—পরের স্ত্রী, বিশেষত গুরুপত্নীকে কি তোমার মতো নীতিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের ভোগ করা শোভা পায়? তাছাড়া ঘরে কি তোমার ভোগ্যা স্ত্রীর অভাব আছে? দক্ষের কন্যারা সকলেই তোমার স্ত্রী। এত নক্ষত্র-সুন্দরী থাকতে তোমার আবার গুরুপত্নীকে সম্ভোগ করার ইচ্ছে হল কেন—

গুরুপত্নীং কথং ভোক্তুং ত্বমিচ্ছসি সুধানিধে?

ইন্দ্র শুধু এটুকুই বলেননি। চন্দ্রের তৃপ্তির জন্য আরও খানিক ভাবনা-চিন্তা তিনি করেছিলেন। দূত মুখে ইন্দ্র চন্দ্রকে আহ্বান জানিয়েছিলেন তারাকে ত্যাগ করে সুন্দরী অপ্সরাদের ভোগ করার। তবে দেবতাদের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রাখার জন্য দেবগুরুর পত্নীকে তাঁকে ত্যাগ করতেই হবে। দেবরাজের কথার মধ্যে যুদ্ধের ইঙ্গিত খানিক লুকিয়েই ছিল।

□ দূত মুখে সব কথা শোনার পর চন্দ্র উচিত জবাব দিতে প্রস্তুত হলেন। চন্দ্রের উত্তরে দেবগুরুর প্রতি কোনো ভক্তি প্রকাশ পাওয়া তো দূরের কথা বরং বৃহস্পতির পূর্ব জীবনের এমন কিছু ঘটনা পুনঃ উচ্চারিত হল যা ইন্দ্র-দূতের পক্ষেই শুধু নয়, বৃহস্পতির কাছেও বিশেষ শ্রুতিমধুর নয়।

চন্দ্র অভিযোগ করে বললেন—তারার সঙ্গে বৃহস্পতির বিবাহ হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু যেদিন তারা আবিষ্কার করলেন স্বামী তাঁকে ছেড়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীর সঙ্গে শৃঙ্গার-রমণে ব্যস্ত সেদিন থেকেই তারা স্বামীকে আর ভালোবাসতে পারেননি। তারা বিরক্ত বোধ করেছেন—

বিরক্তেয়ং তদা জাতা চকমে'নুজকামিনীম্।

আসলে কুশলী চন্দ্র বৃহস্পতিকে তাঁরই প্রণীত নীতিশাস্ত্রের যুক্তিতে পরাজিত করতে চাইছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁর নীতিশাস্ত্রে বিধান দিয়েছিলেন যে, কোনো রমণী যদি স্বেচ্ছায় পুরুষের সম্ভোগ বাসনায় সম্মতি দেন, তবে তাঁকে ভোগ করায় পুরুষের কোনো পাপ হয় না। চন্দ্র সেই সূত্র ধরেই প্রশ্ন তোলেন গুরু-পত্নী স্বয়ং তাঁর আসঙ্গ লিপ্সা করেছেন, তিনি শুধুমাত্র তারার বাসনা পূরণ করেছেন, তাঁরই সম্মতিক্রমে। সুতরাং এ নিয়ে দেবতাদের সঙ্গে চন্দ্রের বিরোধ ঘটতেই পারে না—

কো বিরোধা'ত্র দেবেশ কামনায়াং ভজম্ স্ত্রিয়ম্।

চন্দ্রের স্পষ্ট যুক্তি যে, তারা বৃহস্পতির ধর্মপত্নী হতে পারেন, কিন্তু তিনি ভালোবাসেন চন্দ্রকে। বৃহস্পতির প্রতি তাঁর কোনো প্রেম নেই। চন্দ্রের প্রশ্ন, এমত অবস্থায় বৃহস্পতির নীতিশাস্ত্র অগ্রাহ্য করে কী উপায়ে তিনি তারাকে ফেরত যেতে বলেন!

□ বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে বৃহস্পতির কাছে ফিরিয়ে দিলেন না চন্দ্র। ইন্দ্রের দূত ইন্দ্রের কাছে ফিরে গেলেন। দেবসমাজে এই ঘটনা নিয়ে দারুণ হই-হই পড়ে গেল। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগুরুর অবমাননায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁর নিজেরও অপমান কিছু কম হয়নি। তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন চন্দ্র। অতএব আর সহ্য করা যায় না। ইন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির সম্মানে যুদ্ধের উদ্যোগ নিলেন। দেবসৈন্যদের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

বড়ো বড়ো যুদ্ধে যা হয়। কে কোন পক্ষ সমর্থন করবেন, কে কার পক্ষে যোগ দেবেন—এসব সিদ্ধান্ত খুব তাড়াতাড়িই হয়ে গেল। দেবতাদের যুদ্ধোদ্যোগ দেখামাত্র অসুর-গুরু শুক্রাচার্য চন্দ্রের কাছে এলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির সঙ্গে তাঁর চিরশত্রুতা। সেই শত্রুতাবশতই যেন ব্যাপারটা অন্যায় হলেও তিনি চন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করে তাঁকে বললেন—বৃহস্পতির বউকে ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো দরকার নেই তোমার—

মা দদস্বেতি তং বাক্যমুবাচ শশিনং প্রতি।

—আমি তোমাকে সাহায্য করবো। দেবদেব শঙ্কর শুক্রাচার্যকে চন্দ্রের পক্ষপাতী দেখে ইন্দ্রের পক্ষে যোগ দিলেন। তিনি তাঁর বিশাল আজগব ধনুক দিয়ে চন্দ্রকে শায়েস্তা করবেন বলে ঠিক করলেন। বৃহস্পতির স্ত্রীর সঙ্গে চন্দ্রের আচরণে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। রুদ্র-শিব যেহেতু এক সময়ে বৃহস্পতির পিতার শিষ্য ছিলেন,—

স হি শিষ্যো মহাতেজাঃ পিতুঃ পূর্বো বৃহস্পতেঃ।

—অতএব বৃহস্পতিকে সমর্থন করলেন স্বয়ং মহাদেব। দৈত্য-দানবেরা শুক্রাচার্যের নেতৃত্বে চন্দ্রের পক্ষে যোগ দিলেন।

যুদ্ধ শুরু হল। মহাদেব 'ব্রহ্মশির' অস্ত্র নিক্ষেপ করে দৈত্য-দানবদের অনেককে মেরে ফেললেন বটে, তবে চন্দ্রকে তিনি কিছু করতে পারলেন না।

চন্দ্র বিষ্ণুর বর-পুষ্ট। অতএব দেবপক্ষেরও ক্ষয়ক্ষতি কিছু কম হল না। অনেক দেবতাও চন্দ্রের হাতে মারা গেলেন এবং বাকি যাঁরা থাকলেন, তত্র শিষ্টাস্তু যে দেবাঃ—তাঁরা প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে আর্জি জানালেন—এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য। ব্রহ্মা এসে ইন্দ্র-পক্ষের রুদ্র-শিবকে এবং চন্দ্র-পক্ষের শুক্রাচার্যকে যুদ্ধের প্ররোচনা ছড়াতে নিষেধ করলেন—

ততো নিবার্য্যোশনসং রুদ্রং জ্যেষ্ঠঞ্চ শঙ্করম্।

শুক্রাচার্যকে তিনি ভর্ৎসনা করে বললেন—তোমার কি সঙ্গদোষে এমন অপকর্মে দুর্মতি হল—

কিমন্যায়ে মতির্জাতা সঙ্গদোষান্মহামতে।

আর চন্দ্রকে বললেন—গুরুর স্ত্রীকে এই মুহূর্তে ছেড়ে দাও, চন্দ্র! নইলে স্বয়ং বিষ্ণুকে ডেকে এনে তোমার সর্বনাশ করে ছাড়ব আমি—

নো চেদ্ বিষ্ণুং সমাহুয় করিষ্যামি তু সংক্ষয়ম্।

অবস্থা বুঝে চন্দ্রের পক্ষপাতী শুক্রাচার্য পর্যন্ত চন্দ্রের পিতা মহর্ষি অত্রির নাম করে বললেন—আজকেই ছেড়ে দাও গুরুপত্নীকে। তোমার পিতারও এই ইচ্ছে জেনো—

মুঞ্চ ভার্যাং গুরোরদ্য পিত্রাহং প্রেষিতস্তব।

ব্রহ্মা এবং শুক্রাচার্য—দুজনের কথায় চন্দ্র শেষ পর্যন্ত গুরুপত্নী তারাকে ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু ততদিনে তারা গর্ভবতী হয়েছেন। তারা বৃহস্পতিকে পছন্দ করেন না, তবু বৃহস্পতি তাঁর অধিকারমাত্র লাভেই পরম আনন্দে ঘরে ফিরলেন দেব, দানব, ব্রহ্মা, শিবও—সবাই যে যার বাড়ি ফিরে গেলেন। সর্বত্র শান্তি ফিরে এল।

[বিষ্ণু পু. ১.১০.৯]

□ এইভাবে বেশ কিছুদিন গেল। গর্ভবতী তারা সযত্নে গর্ভরক্ষা করলেন, এবং শুভদিনে শুভ নক্ষত্রে এক অসাধারণ পুত্র প্রসব করলেন। পুত্রের আকৃতি-প্রকৃতি চন্দ্রের মতো, জ্যোতিষ এবং সামুদ্রিক শাস্ত্রের সমস্ত সুলক্ষণ সেই পুত্রের সর্বাঙ্গে। বৃহস্পতি পুত্রমুখ দেখে বড়ো খুশি হলেন এবং শাস্ত্র-বিধি অনুসারে পুত্রের জাতকর্মাদি ক্রিয়াও সম্পন্ন করলেন—

জাতকর্মাদিকং সর্বং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।

চন্দ্রের কাছে তারার পুত্র জন্মের সংবাদ এসে পৌঁছল লোকপরম্পরায়। সব শুনে চন্দ্র লোক পাঠালেন বৃহস্পতির কাছে।

চন্দ্রের দূত এসে বেশ শ্লেষের স্বরেই বৃহস্পতিকে বললেন—এত আড়ম্বরে যে পুত্রের জাতকর্মাদি ক্রিয়া করা হচ্ছে, সে বৃহস্পতির সন্তান নয়। তারার গর্ভজাত পুত্রটি আসলে চন্দ্রের। বৃহস্পতি একথা মানতে রাজী নন। তিনি বেশ অহঙ্কারের সঙ্গে জানালেন, পুত্রটি অবশ্যই তাঁর। চেহারার সাদৃশ্যও সে কথাই প্রমাণ করে—

উবাচ মম পুত্র মে সদৃশো নাত্র সংশয়ঃ।

আবার চন্দ্র আর বৃহস্পতির বিবাদ আরম্ভ হল। আবারও যুদ্ধ পরিস্থিতি। প্রজাপতি ব্রহ্মা সব খবর শুনে আবারও এসে উপস্থিত হলেন। যুদ্ধ তখন প্রায় আরম্ভ হব হব করছে প্রজাপতি ব্রহ্মা আগে দেব-দানব সকলকে যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। তারপর তারার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমিই সত্যি করে বল তো—পুত্রটি কার? চন্দ্রের না বৃহস্পতির? তুমি সত্যি করে বললেই এই সাংঘাতিক যুদ্ধ আর লাগে না—

সত্যং বদ বরারোহে যথা ক্লেশঃ প্রশাম্যতি।

বস্তুত এ প্রশ্ন দেবতারা আগেই করেছিলেন তারাকে। অন্তত মহাভারতের পরিশিষ্ট-রূপী হরিবংশ তাই বলেছে। কিন্তু তারা এই প্রশ্নের কোনো জবাব দেননি। আমাদের ধারণা—দেবতারা বৃহস্পতির পক্ষ হয়ে পূর্বে চন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন বলেই চন্দ্রের অনুরাগিণী তারা হ্যাঁ বা না—কোনো জবাবই দেননি—

পৃচ্ছ্যমানা যদা দেবৈর্নাহ সা সাধ্বসাধু বা।

কিন্তু প্রজাপতি ব্রহ্মা যখন আসন্ন যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি-রক্ষার তাগিদে তারাকে ওই একই প্রশ্ন করলেন, তখন আর উত্তর না দিয়ে উপায় থাকল না তারার। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করলেন—বল এ ছেলে কার—

কস্যায়ং তনয়ঃ শুভে?

শান্তির দূত পিতামহ ব্রহ্মার সামনে লজ্জায় মাথা নিচু করে তারা বললেন—এ পুত্র চন্দ্রের। বলেই তারা দ্রুত ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন—

চন্দ্রস্যেতি শনৈরন্তর্জগাম বরবর্ণিনী।

বিবাহিত স্বামীর ঘরে বসে অন্য পুরুষের পুত্র গর্ভে ধারণ করেছি—এ কথা বলতে কোন রমণীই বা লজ্জা না পাবে। তারাও তাই কথাটা বলেই লজ্জায় ঘরে ঢুকে পড়লেন তাড়াতাড়ি।

হরিবংশে দেখছি—তারার কথা শোনামাত্রই প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই নবজাতকের মস্তক আঘ্রাণ

করে তার নাম রেখেছেন বুধ। অন্য মতে তারার কথাটা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্র বৃহস্পতি-গৃহ থেকে তাঁর পুত্রটিকে নিজের ভবনে নিয়ে যান এবং তাঁর নাম রাখেন বুধ।

চন্দ্র ও তারার পুত্র হলেন বুধ। বুধের ঔরসে ইলা-সুদুম্নর গর্ভজাত পুত্রের নাম পুরূরবা, যিনি চন্দ্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তীকালে এই চন্দ্রবংশই পুরুবংশ বা কুরুবংশ নামে বিখ্যাত হয়েছিল। *[দেবীভাগবত পু. ১.১১ অধ্যায় সম্পূর্ণ]*

☐ মহাভারতের বনপর্বে 'চাক্ষুষী' নামে একটি বিশেষ বিদ্যার কথা পাওয়া যায় যা মহর্ষি মনু চন্দ্রকে দান করেছিলেন। চন্দ্রের থেকে বিশ্বাবসু আবার তাঁর থেকে গন্ধর্ব অঙ্গারপর্ণ এই বিদ্যা লাভ করেন। অঙ্গারপর্ণ বা চিত্ররথের কাছ থেকে চাক্ষুষী বিদ্যালাভ করেছিলেন অর্জুন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চাক্ষুষী বিদ্যার প্রয়োগে ত্রিভুবনে নিজের ইচ্ছামত সমস্ত কিছু দেখা সম্ভব।

[মহা (k) ১.১৭০.৪৩-৪৫;
(হরি) ১.১৬৩.৪৩-৪৫]

☐ পুরাণ মতে, বৈবস্বত মন্বন্তরে ধর্মপুত্র ত্বিষিমান্ বসু চন্দ্রদেব রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

[বায়ু পু. ৫৩.৮০]

☐ পুরাণে চন্দ্রকে শীতবীর্য্য বিশিষ্ট বলা হয়েছে। তিনি জগতের ধারক। গঙ্গা নদীকেও সোমধারারূপিণী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সোমপুত্রগণও বিভিন্ন মহানদীতে পরিণত হয়েছেন। *[বায়ু পু. ৫১.২০-২১]*

☐ রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে চন্দ্রলোকের একটি বিবরণ পাওয়া যায়। আকাশগঙ্গা ছায়াপথের থেকে আশি হাজার যোজন দূরে চন্দ্রলোকের অবস্থান। চন্দ্র-দর্শনমাত্রই রাবণ আহত হয়েছিলেন। চন্দ্ররশ্মি রাক্ষসকুলের জন্য সততই ক্ষতিকারক। *[রামায়ণ ৭.২৩.২১]*

☐ ভাগবত পুরাণের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব লক্ষ যোজন। চন্দ্রের ষোড়শকলার উল্লেখও ভাগবত পুরাণেই পাওয়া যায়। চন্দ্রদেব সমস্ত জীবলোক, পিতৃগণ এবং বৃক্ষ সমাজকে আপ্লুত করে তাঁদের বৃদ্ধিতে সহায়ক হন। *[ভাগবত পু. ৫.২২.৮-১০]*

☐ মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা চন্দ্রকে ওষধি, নক্ষত্র, যজ্ঞ, তপস্যা, দ্বিজ এবং বৃক্ষকুলের অধিপতি রূপে নির্বাচন করেন।

বায়ু পুরাণে স্পষ্টতই বলা হয়েছে, চন্দ্রজাত বলেই রাত্রিকালে ওষধিগণের দীপ্তি অধিক হয়।

[মৎস্য পু. ৮.২; বায়ু পু. ২৩.১৬]

☐ বিষ্ণু বামন অবতার রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হলে চন্দ্রকে তাঁর চক্ষু রূপে কল্পনা করা হয়েছিল। বামনদেবের মানসিক প্রসন্নতাও চন্দ্রদেবের অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে।

[মৎস্য পু. ২৪৬.৫৭]

☐ পুরাকালে চন্দ্রদেব বরুণকে একটি ধনু, দুইটি তূণীর এবং কপিধ্বজ নামে একটি রথ দান করেছিলেন। বিশ্বকর্মা-নির্মিত এই রথে আরোহণ করে চন্দ্রদেব দানবদের জয় করেছিলেন।

[মহা (k) ১.২২৫.৪, ১২-১৩;
(হরি) ১.২১৮.৪, ১২-১৩]

☐ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বৈদিক ধারণায় সোমলতা বা সোম এবং দেবতা চন্দ্রকে অভিন্ন বলে দেখা হয়েছে। এ ধারণার সপক্ষে কয়েকটি শ্লোক মহাভারতের বনপর্বে পাওয়া যায়। সেখানে চন্দ্রকে বৃক্ষসমাজ বা ওষধিগণের অধিপতি বলা হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিষ্ণু পুরাণে উল্লিখিত একটি কাহিনীর কথা বলা যেতে পারে—

পুরাকালে একবার প্রচেতাগণের কঠোর তপস্যার ফলে পৃথিবী কর্ষণহীন হয়ে পড়ে। প্রবল তরুক্ষয় শুরু হয়। শেষপর্যন্ত পৃথিবী প্রায় বৃক্ষহীন হওয়ার পরিস্থিতি হল। তখন বৃক্ষদের অধিপতি সোম বা চন্দ্র প্রজাপতিগণের কাছে গেলেন বৃক্ষদের সঙ্গে তাঁদের সন্ধিপ্রস্তাব নিয়ে। চন্দ্র বৃক্ষ হতে উৎপন্ন নিজ পালিতা কন্যা বার্ক্ষেয়ীর সঙ্গে প্রজাপতিগণের বিবাহ দিয়ে তাঁদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে চাইলেন। চন্দ্র আরও বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁর ও প্রজাপতিদের যুগ্ম তেজে বার্ক্ষেয়ীর গর্ভে বিদ্বান দক্ষ প্রজাপতির জন্ম হবে, যাঁর মাধ্যমে প্রজাবৃদ্ধি ঘটবে।

[বিষ্ণু পু. ১.১৫.১-১০]

☐ পুরাকালে কণ্ডু নামে এক ঋষি গোমতীনদীর তীরে তপস্যা করছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের ইচ্ছায় প্রম্লোচা নামে এক অপ্সরা কণ্ডুর তপস্যা ভঙ্গ করতে উপস্থিত হন। প্রম্লোচার রূপে মুগ্ধ হয়ে কণ্ডু দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে সহবাস করেন। অপ্সরা বারংবার দেবলোকে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও কণ্ডু আসক্তি বশতঃ প্রতিবারই

তাঁকে বিরত করেন। এভাবে কয়েকশো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর কণ্ডু একদিন হঠাৎই অনুভব করেন দীর্ঘ অপ্সরা সংসর্গের কারণে তাঁর তপস্যা বিনষ্ট হয়েছে। তখন তিনি নিজের ও প্রম্লোচার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন। ঋষির ক্রুদ্ধ রূপ দেখে প্রম্লোচ্ছা ভয়ে ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় দেবলোক গমন কালে প্রম্লোচা তাঁর দেহজাত স্বেদবিন্দু বৃক্ষপত্রে মুছেছিলেন। কণ্ডুর বীর্য্যজাত, প্রম্লোচার দেহ নিঃসৃত সেই স্বেদবিন্দু বৃক্ষপত্রগুলি ধারণ করে মারিষা নামে এক কন্যার জন্ম দেয়। এই মারিষারই অপর নাম বার্ক্ষেয়ী। বৃক্ষের অধিপতি চন্দ্র তাঁর পালক পিতা রূপে পরিচিত হন।

বার্ক্ষেয়ীর সঙ্গে প্রচেতাগণের বিবাহের ফলে দক্ষ প্রজাপতির জন্ম হয়েছিল।

[বিষ্ণু পু. ১.১৫.১১-৪৯]

□ অঙ্গিরার সপ্তম কন্যার নাম কুহূ। মহাভারতের বনপর্বের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে কুহূ যখন উদিত হন তখন চন্দ্রের একটি কলাও অবশিষ্ট থাকে না বলে তিনি অন্ধকারময়ী।

[মহা (k) ৩.২১৯.৯; (হরি) ৩.২০২.৯]

□ চন্দ্র পাঁচশো বছর গাণ্ডীব ধনু ধারণ করেছিলেন। *[মহা (k) ৪.৪৩.৭; (হরি) ৪.৩৯.৬]*

□ মহাভারতের ভীষ্মপর্বে চন্দ্রের আকার সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে চন্দ্রের বিস্তার এগারো হাজার যোজন, পরিধি তেত্রিশ হাজার যোজন এবং ব্যাস ঊনষাট হাজার যোজন—

বিষ্কম্ভেণ কুরুশ্রেষ্ঠ ত্রয়স্ত্রিং শক্র মণ্ডলম্।
একো ষষ্টিবিষ্কম্ভং শীতরশ্মের্মহাত্মনঃ॥

রামায়ণের একটি শ্লোকে আবার বলা হয়েছে আকাশগঙ্গা ছায়াপথ থেকে চন্দ্রের দূরত্ব আশি হাজার যোজন। *[রামায়ণ ৭.২৭.১৬; মহা (k) ৬.১২.৪২; (হরি) ৬.১২.৪২]*

□ ত্রিপুর-দহনের জন্য সমস্ত দেবতা ও গন্ধর্বরা সম্মিলিতভাবে মহাদেবের জন্য একটি দিব্যরথ ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করেন। সেই দিব্যরথের চক্ররূপে চন্দ্র নিযুক্ত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ৭.২০২.১৪১; (হরি) ৭.২০৭.৬৫]

□ ব্রহ্ম পুরাণে কান্তিমতী নামে চন্দ্রের এক কন্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিক্ষণে মেরুপর্বতে অবস্থানকারী দিব্যপিতৃগণ ও বিশ্বেদেবগণকে ইনি প্রেম নিবেদন করেছিলেন। কান্তিমতী এ সময় নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন যে, প্রথমে তাঁর নাম ছিল ঊর্জ্জা, তাঁর দ্বিতীয় নাম স্বধা। যেহেতু পিতৃগণ তাঁর পরিচয় জানতে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, তোমার প্রভু কে—

কো ভবত্যাঃ প্রভুঃ, কাসি।

—সেহেতু কান্তিমতীর অন্যনাম কোকা।

পিতৃগণ ও বিশ্বেদেবগণ কোকার রূপে মুগ্ধ হয়ে যোগভ্রষ্ট হলেন। তপস্যাভঙ্গের ভয়ে তাঁরা তৎক্ষণাৎ স্বর্গে চলে যান। ইতিমধ্যে চন্দ্র কন্যার সন্ধান না পেয়ে যোগাচার শুরু করেছেন। তপোবলে তিনি জানতে পারেন কান্তিমতী পিতার অনুমোদন ব্যতীতই স্বাধীনভাবে পতি-বরণ করেছেন। অন্যদিকে পিতৃগণ ও বিশ্বেদেবগণ প্রেমপীড়িত কান্তিমতীকে ত্যাগ করেছেন। চন্দ্র তখন উভয়কেই অভিশাপ দেন। চন্দ্রের অভিশাপে কান্তিমতী হিমালয় পর্বতে প্রবাহিতা কোকা নদীতে পরিণত হন। অভিশাপগ্রস্ত পিতৃগণ এবং বিশ্বদেবগণও যোগভ্রষ্ট হয়ে হিমালয়ের পাদদেশে পতিত হলেন। *[ব্রহ্ম পু. ২১৯.৭-২০]*

□ বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, উত্তরদিকে চন্দ্রের একটি নগরী রয়েছে। সেটির নাম বিভাবরী। *[বায়ু পু. ২.৮.৯]*

□ তৃণ, গুল্ম, লতা, বীরুধ, গুচ্ছ প্রভৃতির অধিপতি চন্দ্র বা সোম। চন্দ্রই জ্যোৎস্না বিতরণ করে জগৎকে পোষণ করেন—

তৃণগুল্মলতা বীরুধবল্লীগুচ্ছাদি কোটিশঃ।
এতেষা মধিপশ্চন্দ্রো ধারয়ত্যখিলং জগৎ॥

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাস) ২০.৬৮-৭৮; অগ্নি পু. ১৯.২৩]

□ সোম বা চন্দ্র অমাবস্যা তিথিতে বনস্পতিসমূহে প্রবেশ করেন। সেকারণে এই দিনে বৃক্ষচ্ছেদন করা মহাপাপ।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/রেবা) ১০৩.৯৪-১০৩]

□ চন্দ্র সম্পর্কে এমন বহুসংখ্যক পৌরাণিক কাহিনীর পাশাপাশি যেটা সর্বাধিক প্রচলিত সংবাদ, তা হল—চন্দ্রদেব ভগবান শিবের শিরোভূষণ। চন্দ্রকে মস্তকে ধারণ করেন বলেই ভগবান শিব চন্দ্রশেখর, চন্দ্রমৌলি প্রভৃতি নামে সম্বোধিত হয়েছেন। চন্দ্র কীভাবে মহাদেবের শিরোভূষণ হলেন—এ বিষয়ে পুরাণে একটি

কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে, প্রজাপতি দক্ষ যখন জামাতা চন্দ্রের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হবার অভিশাপ দিলেন তখন ভীত হয়ে চন্দ্র ভগবান শিবের শরণাপন্ন হলেন। দয়ালু মহাদেব চন্দ্রকে স্থান দিলেন নিজের মস্তকে। মহাদেবের মস্তকে স্থানলাভ করে চন্দ্র নিরোগ হলেন, অমরত্বও লাভ করলেন। আর চন্দ্রকে মুকুটের মতো আপন শিরোভূষণ রূপে গ্রহণ করার ফলস্বরূপ মহাদেব খ্যাত হলেন 'চন্দ্রশেখর' নামে। চন্দ্র তাঁর ললাট এবং মস্তকের শোভা বর্ধন করলেন—

দৃষ্টা চন্দ্রং শঙ্করশ্চ ক্লেশিতং শরণাগতম্।
করুণাসাগরস্তস্মৈ কৃপয়া চাভয়ং দদৌ॥
তং শিবঃ শেখরে কৃত্বা বভূব চন্দ্রশেখরঃ।
নাস্তি দেবেষু লোকেষু শিবাৎ শরণপঞ্জরঃ॥

এদিকে দক্ষের কন্যারা পড়লেন বিপদে। পিতা দক্ষ স্বামীকে শাপ দিলেন আর তার ওপর এখন আবার চন্দ্র পত্নী-পরিজন সকলকে ত্যাগ করে মহাদেবের মস্তকে অবস্থান করছেন। তাঁরা পিতার কাছে গিয়ে অনুনয় করতে লাগলেন চন্দ্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য। দক্ষ প্রজাপতি শিবের কাছে গিয়ে চন্দ্রকে ফিরিয়ে দিতে বললেন। দাক্ষায়নী সতীর স্বামী হিসেবে শিবও সম্পর্কে দক্ষের জামাতা। তিনি শ্বশুরকে অনেক সম্মান প্রদর্শন করলেন ঠিকই কিন্তু শরণাগত চন্দ্রকে ত্যাগ করতে সম্মত হলেন না। শেষ পর্যন্ত ভগবান বিষ্ণুর মধ্যস্থতায় চন্দ্রের অর্ধাংশ শিবের শিরোভূষণ হয়ে রইল আর অর্ধদেহযুক্ত চন্দ্র পত্নী-পরিজনদের নিয়ে সুখে বসবাস করতে লাগলেন।

[ব্রহ্মবৈবর্ত পু. (ব্রহ্ম) ৯.৪৮-৯৮]

□ অবশ্য মহাদেবের মস্তকে চন্দ্রের স্থানলাভের কারণ হিসেবে অন্য একটি কাহিনীরও উল্লেখ মেলে। রাহু যখন দেবতাদের মাঝে ছদ্মবেশে এসে বসে অমৃত পান করলেন তখন সূর্য আর চন্দ্র এই দুই দেবতা তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন এবং তাঁদের কারণেই ভগবান বিষ্ণুর চক্রের আঘাতে রাহুর মস্তক দেহহীন হয়ে যায়। ক্রুদ্ধ রাহু প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি চন্দ্র এবং সূর্যকে গ্রাস করবেন। রাহুর দ্বারা গ্রস্ত হবার ভয়ে ভীত হয়ে চন্দ্র ভগবান শিবের শরণাপন্ন হলেন। ভগবান শিব সেই সময় শরণাগত চন্দ্রকে আপন মস্তকে ধারণ করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে শিবপুরাণে।

[শিব পু. (J.L. Shastri) শতরুদ্র ১৬.৯-১৩]

□ চন্দ্রকে শশাঙ্ক বা মৃগাঙ্ক নামে ও সম্বোধন করা হয়েছে পুরাণে। চন্দ্রের শশাঙ্ক নামকরণের কারণ হিসেবে পুরাণে একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। স্কন্দ পুরাণের প্রভাসখণ্ডে বর্ণিত হয়েছে যে, অমৃতমন্থনের পর দেবতারা যখন অমৃত পান করলেন, তখন চন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন ন। তিনি দক্ষের শাপে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হয়ে ছিলেন। মহাদেবের কৃপায় রোগমুক্ত হয়ে চন্দ্র যতক্ষণে অমৃত পানের জন্য এসে পৌঁছেছেন, ততক্ষণে দেবতাদের অমৃতপান সাঙ্গ হয়েছে। চন্দ্রের কথা তাঁদের মনেও ছিল না। চন্দ্র এসে যখন অমৃতের ভাগ চাইলেন, তখন দেবতারা পড়লেন বিপদে। সত্যিই, চন্দ্রকে অমৃতের ভাগ না দেওয়া বড়ো অন্যায় হয়ে গিয়েছে। দেবতারা খুঁজতে লাগলেন, যদি অমৃতের একটা বিন্দুও চন্দ্রের জন্য কোনো স্থান থেকে সংগ্রহ করা যায়। অনুসন্ধান করে দেবতারা দেখলেন—নিকটস্থ জলাশয়ে অমৃতের কয়েকবিন্দু পতিত হয়েছে এবং তা জলে মিশেও গেছে। দেবতারা চন্দ্রকে সেই জলাশয়ের জল পান করতে বললেন। চন্দ্র যখন জলপান করছেন, সেই সময় ঐ জলাশয়ে একটি শশক বা খরগোশও জলপান করতে গিয়েছিল। জলাশয়ের জলের সঙ্গে সঙ্গে সেই শশকটিও চন্দ্রের উদরে প্রবেশ করে। কিন্তু অমৃতযুক্ত জল পান করার ফলে শশকটির মৃত্যু হল না। সে চন্দ্রের উদরেই অবস্থান করতে লাগল। সদ্য রোগমুক্ত চন্দ্রও অমৃতপানের ফলে সুস্থ এবং কান্তিময় হয়ে উঠলেন। আর শশকটিও তাঁর উদরে বা অঙ্কে জীবিত অবস্থায় রইল, উপরন্তু অমৃতপানের ফলে আপন তেজে সে চন্দ্রের দেহের মধ্যে অবস্থান করেও দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। এই ঘটনার ফলে শশককে উদরে বা অঙ্কে ধারণ করেন এই ভাবনায় চন্দ্র শশাঙ্ক নামে খ্যাত হন।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে প্রাপ্ত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, গুরুপত্নী-তারাকে হরণ করার পর ভগবান শিব-চন্দ্রকে বলেছিলেন যে এমন গুরুতর পাপের ফলস্বরূপ তোমার উদরে একটি মৃগ বা হরিণের আকৃতির কলঙ্ক দেখা দেবে যা তোমার পাপকর্মের চিহ্নস্বরূপ সর্বদা তোমার

দেহে অবস্থান করবে। এই ঘটনার পর চন্দ্র মৃগাঙ্ক নামে খ্যাত হন। বস্তুত পূর্ণচন্দ্রের শ্বেতশুভ্র দেহে আমরা যে কালো দাগগুলি দেখতে পাই, পুরাণের কথকরা কখনো তাকে চন্দ্রের উদরস্থিত শশক, কখনও বা মৃগরূপ কলঙ্ক বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তার থেকেই এই সকল পৌরাণিক কাহিনীর উৎপত্তি।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র) ২৫৮.৩-১৭; ব্রহ্মবৈবর্ত পু. (শ্রীকৃষ্ণ/উত্তর) ৮১.২৩-৬২]

চন্দ্র$_2$ দনুর পুত্র একজন দানব। *[বায়ু পু. ৬৩.১১]*

চন্দ্র$_3$ একজন কিন্নর। মহানীল পর্বতে কিন্নরদের একটি নগরী রয়েছে। এটি চন্দ্রের আবাসস্থল।

[বরাহ পু. ৮১.২]

চন্দ্র$_4$ ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা বিশ্বগন্ধির পুত্র চন্দ্র। চন্দ্রের পুত্রের নাম যুবনাশ্ব। *[ভাগবত পু. ৯৬.২০]*

চন্দ্র$_5$ হিরণ্যকশিপুর বংশধারায় বিরোচনের পুত্র বলি। বলির পুত্রদের মধ্যে চন্দ্র একজন।

[মৎস্য পু. ৬.১১]

চন্দ্র$_6$ কৃষ্ণ ও সত্যভামার এক পুত্র চন্দ্র।

[ভাগবত পু. ১০.৬১.১৩]

চন্দ্র$_7$ বৈবস্বত মনুর পুত্র নরিষ্যন্তের বংশধারায় নরের পুত্র এবং কেবলের পিতা।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম) ৪.১.৪১-৪২]

চন্দ্র$_8$ প্লক্ষদ্বীপের উত্তরাংশে বিস্তৃত একটি পর্বত। পর্বতটি বিবিধ প্রকারের জীবনদায়ী ওষধিতে পরিপূর্ণ। অমৃত আহরণের জন্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় চন্দ্র পর্বত থেকে ওষধি সংগ্রহ করেছিলেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৭৬; ১.১৯.৮]

চন্দ্রক মহাভারতের শান্তিপর্বে মার্জার-মুষিক-সংবাদে চন্দ্রক নামে এক পেচকের (উলুক) নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১২.১৩৮.৩৩; (হরি) ১২.১৩৪.৩২]

চন্দ্রকান্ত$_1$ একটি প্রাচীন নগরী। দশরথ পুত্র লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রকেতু। রামচন্দ্র স্বয়ং চন্দ্রকেতুকে মল্লদেশে চন্দ্রকান্ত বা চন্দ্রকান্তা নামে নগরীর শাসক রূপে অভিষিক্ত করেন। রামায়ণে চন্দ্রকান্তা নগরীটিকে স্বর্গের অমরাবতীর তুল্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[রামায়ণ ৭.১১৫.৯-১৫]*

চন্দ্রকান্ত$_2$ ভদ্রাশ্ববর্ষের একটি পৌরাণিক জনপদ।

[বায়ু পু. ৪৩.১৯]

চন্দ্রকান্ত$_3$ উত্তরকুরু দেশের দুটি কুলপর্বতের মধ্যে একটি চন্দ্রকান্ত। পুরাকালে পর্বতের ডানা থাকত একথা পুরাণে বলা হয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্র একবার ক্রুদ্ধ হয়ে পর্বতের পক্ষচ্ছেদনে উদ্যত হয়েছিলেন। সে সময় বহু পর্বত ইন্দ্রের ভয়ে সমুদ্র তলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সেসব পর্বতের মধ্যে চন্দ্রকান্ত একটি।

[বায়ু পু. ৪৫.২৫; মৎস্য পু. ১২১.৭৩]

☐ পণ্ডিত S.M. Ali-র বিশ্লেষণ অনুযায়ী চীনের জিনজিয়া; (Xingiang) প্রদেশের অন্তর্গত তারবাগাতাই (Tarbagatai) পর্বতটিই পুরাণ-বর্ণিত চন্দ্রকান্ত পর্বত। *[GP (Ali) p. 86]*

চন্দ্রকান্ত$_4$ কুরুবর্ষের কুলপর্বতগুলির অন্যতম।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৫৯.২২]

চন্দ্রকেতু$_1$ জনৈক কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধা। অভিমন্যু একা চক্রব্যূহ আক্রমণ করলে সেই সময় যেসব কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধা তাঁর বাণে আহত হন চন্দ্রকেতু তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ৭.৪৮.১৫; (হরি) ৭.৪২.৩৯]

চন্দ্রকেতু$_2$ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামচন্দ্রের অনুজ লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রকেতু। রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে যে, রামচন্দ্র কারুপথ (পুরাণমতে কারাপথ দেশ) জয় করে লক্ষ্মণের দুই পুত্র অঙ্গদ এবং চন্দ্রকেতুকে সেখানকার রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। রামায়ণে চন্দ্রকেতুর বিশেষণ হিসেবে 'মল্ল' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। চন্দ্রকেতু কারুপথ বা কারাপথের যে অংশে রাজা হয়েছিলেন তার নামও মল্লভূমি। সম্ভবত কারুপথের এই অঞ্চলটি মল্লযোদ্ধা অধ্যুষিত ছিল এবং চন্দ্রকেতু নিজেও বীর মল্লযোদ্ধা ছিলেন বলেই তাঁকে এই অঞ্চলে রাজা করা হয়েছিল—

চন্দ্রকেতোশ্চ মল্লস্য মল্লভূম্যাং নিবেশিতা।

তবে রামায়ণের রামায়ণ শিরোমণি টীকায় উল্লেখ আছে যে, চন্দ্রকেতুর যুদ্ধবিদ্যায় নৈপুণ্যের কারণেই তাঁর অপর নাম বা বিশেষণ মল্ল। তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের উপরেও চন্দ্রকেতুর এই রণনৈপুণ্যের খ্যাতি আরোপিত হয়ে স্থানটি মল্লভূমি নামে বিখ্যাত হয়েছে। চন্দ্রকেতুর রাজধানীর নাম হয় চন্দ্রকান্তা (পুরাণ মতে চন্দ্রচক্র বা চন্দ্রবক্ত্রা)। *[রামায়ণ ৭.১১৫.২, ৬, ৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১৮৮; বায়ু পু. ৮৮.১৮৭-১৮৮; বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম) ৪.৪.১০৪]*

চন্দ্রকেতু$_3$ প্রজাপতি বিক্রান্তের ঔরসে যেসব

গন্ধর্বের জন্ম হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন চন্দ্রকেতু। *[বায়ু পু. ৬৯.২৬]*

চন্দ্রগিরি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধারায় রাজা তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রগিরি। চন্দ্রগিরি ভানুচন্দ্র নামে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন। *[মৎস্য পু. ১২.৫৫]*

চন্দ্রগুপ্ত₁ ভারতবর্ষে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। মাতা মুরার নামানুসারে চন্দ্রগুপ্ত প্রবর্তিত রাজবংশ মৌর্য নামে পরিচিত। কৌটিল্য বা চাণক্যের সহায়তায় নন্দ বংশীয়দের উৎখাত করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাণ মতে, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সময়কাল চব্বিশ বছর।

চন্দ্রগুপ্তের পুত্রের নাম বিন্দুসার (মতান্তরে ভদ্রসর বা বারিসার) এবং তৎপুত্র অশোক বা অশোকবর্ধন। *[ভাগবত পু. ১২.১.১২-১৩; বায়ু পু. ৯৯.৩৩১; বিষ্ণু পু. ৪.২৪.৪-৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৪৪]*

☐ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য হলেন প্রথম শাসক যিনি বৃহত্তর একত্রিত অখণ্ড ভারতবর্ষ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি সে স্বপ্ন বাস্তবায়িতও করেন।

[PHAI (Raychaudhuri) p. 466, 468, 246]

চন্দ্রগুপ্ত₂ হৈহয়রাজ কার্তবীর্য্যার্জুনের মন্ত্রী চন্দ্রগুপ্ত। এই চন্দ্রগুপ্তের পরামর্শেই কার্তবীর্য্যার্জুন মহর্ষি জমদগ্নির দুর্মূল্য একটি গাভীকে হরণ করতে সম্মত হন। কার্তবীর্য্যার্জুন চন্দ্রগুপ্তকেই গাভী হরণের জন্য প্রেরণ করেন। জমদগ্নির নিষেধ সত্ত্বেও চন্দ্রগুপ্তের নির্দেশ মত হৈহয় সৈন্যরা বলপূর্বক গাভীটিকে হরণ করতে গেলে ঋষি তাঁদের বাধা দেন। সৈন্যরা বৃদ্ধ ঋষি জমদগ্নিকে প্রচণ্ড প্রহার করেন। জমদগ্নি তপঃপ্রভাবে অতি সহজেই চন্দ্রগুপ্ত সহ সৈন্যদের ধ্বংস করতে পারতেন, তবে তপোবলের অপব্যবহার হবে ভেবে তিনি তা থেকে বিরত হন। এভাবেই সৈন্যদের হাতে প্রহৃত হয়ে জমদগ্নি প্রাণত্যাগ করেন।

জমদগ্নির মৃত্যুর পর গাভীটি বাঁধনের দড়ি ছিঁড়ে আশ্রম ত্যাগ করে। পড়ে রয়ে যায় শুধু বাছুরটি। নিরুপায় চন্দ্রগুপ্ত শেষপর্যন্ত বাছুরটিকে নিয়ে কার্তবীর্য্যাজুনের সভায় উপস্থিত হন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.২৮.৩১-৩৭]

চন্দ্রচক্রা দশরথ পুত্র লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রকেতু। চন্দ্রকেতু শাসিত হিমালয় পর্বত সংলগ্ন নগরীর নাম চন্দ্রচক্রা। বায়ু পুরাণের পাঠে অবশ্য চন্দ্রচক্রার পরিবর্তে চন্দ্রবক্রা কথাটি পাওয়া যায়। *[দ্র. চন্দ্রকান্তা]*

[বায়ু পু. ৮৮.১৮৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১৮৯]

চন্দ্রতীর্থ₁ নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। পূর্ণিমা তিথিতে এই তীর্থে স্নান করলে ব্যক্তি মৃত্যুর পর চন্দ্রলোক লাভ করেন বলে বর্ণিত হয়েছে পুরাণে। *[কূর্ম পু. ২.৪০.১৪; মৎস্য পু. ১৯৩.৭৫]*

চন্দ্রতীর্থ₂ কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ। পুরাণ মতে এই চন্দ্রতীর্থই কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থল। এই তীর্থে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করলে পুণ্যফল লাভ হয় বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৩.২৮; কূর্ম পু. ২.৩৬.২৩]*

☐ পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অন্তর্গত কোডাগু (kodagu) পাহাড় থেকে কাবেরী নদীর উৎপত্তি। স্থানটি বর্তমান ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে অবস্থিত। সম্ভবত এই পাহাড়েই চন্দ্রতীর্থের অবস্থান।

[Karnataka State Gazetteer, Vol. 20, p. 12]

চন্দ্রতীর্থ₃ পদ্ম পুরাণে বারাণসী ক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি চন্দ্রতীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

[পদ্ম পু. (আনন্দাশ্রম) স্বর্গ ৩৭.১৪]

চন্দ্রতীর্থ₄ চন্দ্রদেবের মাহাত্ম্যধন্য একটি তীর্থ। বালখিল্য ঋষিরা এই তীর্থে তপস্যা করেন।

[মহা (k) ৩.১২৫.১৭; (হরি) ৩.১০৩.৪১]

☐ কুমারিকা অন্তরীপ বা কন্যাকুমারীতে চন্দ্রতীর্থের অবস্থান। শ্রাদ্ধকার্যের জন্য চন্দ্রতীর্থ অতি উৎকৃষ্ট। এখানে চন্দ্রালোকে স্নান করলে বিশেষ পুণ্য লাভ হয়। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৩.২৮; বায়ু পু. ৭৭.২৮; মৎস্য পু. ১৯৩.৭৫-৭৬]*

চন্দ্রদেব₁ ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের মধ্যে একজন। ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার সঙ্গেই ইনি অর্জুনকে আক্রমণ করতে অগ্রসর হন। এই সময় যুদ্ধে অর্জুনের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

[মহা (k) ৮.২৭.৩, ১১, ১৩; (হরি) ৮.২১.৩, ১১, ১৩]

চন্দ্রদেব₂ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষে যোগদানকারী অন্যতম পাঞ্চাল যোদ্ধা। ইনি যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক ছিলেন বলে জানা যায়। কর্ণের হাতে চন্দ্রদেবের মৃত্যু হয়।

[মহা (k) ৮.৪৯.২৭; (হরি) ৮.৩৭.২৫]

চন্দ্রদ্বীপ উত্তরকুরু দেশের দক্ষিণে অবস্থিত চন্দ্রাকৃতির একটি দ্বীপ। এটির বিস্তার পাঁচ হাজার যোজন। পুরাণমতে চন্দ্রদ্বীপ দেবতাদের আবাসস্থল। দ্বীপটির চতুর্দিক নানা রকমের ফুলে শোভিত। এর মধ্যস্থলে মনোহর উপত্যকা বিশিষ্ট কুমুদপ্রভা নামে একটি পর্বত রয়েছে যা থেকে চন্দ্রাবর্তা নামে নদী প্রবাহিতা। স্বচ্ছবর্ণের জলবাহিত এই নদীতে গ্রহনেতা চন্দ্র প্রায়শই অবতরণ করেন। চন্দ্রের নামানুসারেই সমগ্র ভূ-খণ্ডটি স্বর্গ ও মর্ত্যে চন্দ্রদ্বীপ নামে খ্যাত।

চন্দ্রদ্বীপবাসীরা সকলেই সৌম্যকান্তিসম্পন্ন, দীর্ঘায়ু, ধার্মিক এবং উদার-স্বভাব।

[বায়ু পু. ৪৫.৫২-৬০]

□ পণ্ডিত S.M. Ali-এর মতে, দক্ষিণ সাইবেরিয়ার তুভা (Tuva) পার্বত্য অঞ্চলটিই প্রাচীন পুরাণকল্পিত চন্দ্রদ্বীপ। তুভা অঞ্চলের মধ্যভাগে কাল-দে-সক্ (Cul-de-sac) নামে একটি পর্বত রয়েছে। পর্বতটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি বিশিষ্ট। এই পর্বত থেকে ইয়েনিসেই (Yenisei) নদীর উৎপত্তি। Ali মনে করেন ইয়েনিসেই-ই পুরাণ-বর্ণিত চন্দ্রাবত নদী এবং তার উৎপত্তিস্থল অর্থাৎ কাল-দে-সক্ পর্বত হল কুমুদপ্রভা।

[GP (Ali) p. 77-78, 86-87]

চন্দ্রক্রম প্রজাপতি বিক্রান্তের ঔরসে যেসব নরমুখ কিন্নরের জন্ম হয় চন্দ্রক্রম তাঁদের মধ্যে একজন।

[বায়ু পু. ৬৯.৩৫]

চন্দ্রপ্রভ১ যক্ষ মণিভদ্রের ঔরসে পুণ্যজনীর গর্ভজাত একজন যক্ষ। *[বায়ু পু. ৬৯.১৫৫]*

চন্দ্রপ্রভ২ রাজা ইলের অশ্বের নাম চন্দ্রপ্রভ ছিল বলে জানা যায়। দেবী পার্বতী যে বনে বিহার করছিলেন, সেই বনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ইল নারীতে রূপান্তরিত হন, তাঁর ঘোড়া চন্দ্রপ্রভও একটি ঘোটকীতে রূপান্তরিত হয়। *[মৎস্য পু. ১২.৩]*

চন্দ্রপ্রভ৩ কৈলাস পর্বতশৃঙ্গের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত গিরিশৃঙ্গ। এই শৃঙ্গে অচ্ছোদ নামে এক সরোবর এবং তার থেকে উৎপন্ন অচ্ছোদা নদী প্রবাহিত হয়েছে বলে জানা যায়। অবশ্য ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে সরোবর এবং নদীটিকে 'স্বচ্ছোদ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাণ মতে, এই নদীর তীরেই মনোরম চৈত্ররথ বন। যক্ষরাজ মণিভদ্র এই শৃঙ্গে বাস করেন বলে পুরাণে উল্লেখ আছে। *[বায়ু পু. ৪৭.৫-৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৫-৮; মৎস্য পু. ১২১.৬-৯]*

চন্দ্রপ্রমর্দন কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা সিংহিকার গর্ভজাত চার পুত্রের একজন।

[মহা (k) ১.৬৫.৩১; (হরি) ১.৬০.৩১]

চন্দ্রপ্রস্থ একটি পৌরাণিক পর্বত।

[মৎস্য পু. ১৬৩.৮৭]

চন্দ্রবতী প্রচেতাদের ঔরসে সোমনন্দিনী মারিষার গর্ভজাত একটি নদী। *[মৎস্য পু. ৪.৫০]*

চন্দ্রবক্ত্রা *[দ্র. চন্দ্রকান্ত১]*

চন্দ্রবর্মা কাম্বোজদেশের রাজা। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্ব থেকে জানা যায় যে, চন্দ্র নামক দৈত্য দ্বাপর যুগে রাজা চন্দ্রবর্মারূপে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হন।

[মহা (k) ১.৬৭.৩১; (হরি) ১.৬২.৩১]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে চন্দ্রবর্মা কৌরবপক্ষে অবস্থান করছিলেন বলে জানা যায়। ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে তিনি নিহত হন।

[মহা (k) ৭.৩২.৬৬; (হরি) ৭.৩০.৬৬]

চন্দ্রবিজ্ঞ ভাগবত পুরাণমতে, কলিযুগে অন্ধ্রবংশীয় যেসব রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছেন, চন্দ্রবিজ্ঞ তাঁদের মধ্যে একজন। ইনি অন্ধ্রবংশীয় রাজা বিজয়ের পুত্র ছিলেন। বিষ্ণু পুরাণে বিজয়ের পুত্র 'চন্দ্রশ্রী' নামে উল্লিখিত হয়েছেন।

[ভাগবত পু. ১২.১.২৭; বিষ্ণু পু. ৪.২৪.১৩]

চন্দ্রবিমর্দন পিতা মহামুনি কশ্যপ, মাতা প্রজাপতি দক্ষের ষষ্ঠ কন্যা সিংহিকা। *[কালিকা পু. ৩৪.৬৪]*

চন্দ্রভ১ স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচর একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৭৫; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

চন্দ্রভ২ যক্ষ মণিভদ্রের ঔরসে পুণ্যজনীর গর্ভজাত পুত্রসন্তানদের মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১২৪]

চন্দ্রভানু কৃষ্ণের ঔরসে সত্যভামার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন। *[ভাগবত পু. ১০.৬১.৬০]*

চন্দ্রমা১ পিতা মহামুনি কশ্যপ, মাতা প্রজাপতি দক্ষের তৃতীয়া কন্যা দনু। *[কালিকা পু. ৩৪.৫৪]*

চন্দ্রমা২ দনুর পুত্র চন্দ্রপা।

[মহা (k) ১.৬৫.২৬-২৭; (হরি) ১.৬০.২৬-২৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.৮]

চন্দ্রমা৩ ভারতবর্ষের একটি নদী।

[মহা (k) ৬.৯.২৯; (হরি) ৬.৯.২৯]

চন্দ্ররসা দক্ষিণ ভারতের একটি নদী। তাম্রপর্ণী (আধুনিক থামিরবরণী) নদী অববাহিকার নিকটবর্তী অঞ্চল দিয়ে চন্দ্ররসা নদীটি প্রবাহিত।

পশু দেশের রাজা মলয়ধ্বজ একবার চন্দ্ররসা নদীর তীরে তপস্যা করেছিলেন।

[ভাগবত পু. ৪.২৮.৩৫]

চন্দ্রশুক্ল ভাগবত পুরাণ-মতে জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত আটটি উপদ্বীপের মধ্যে চন্দ্রশুক্ল একটি।

[ভাগবত পু. ৫.১৯.৩০]

চন্দ্রশ্রী *[দ্র. চন্দ্রবিজ্ঞ]*

চন্দ্রসেন১ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষে অংশগ্রহণকারী জনৈক যোদ্ধা। শল্য প্রধান সেনাপতি হলে এই চন্দ্রসেন তাঁর চক্ররক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। যুধিষ্ঠিরের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। *[মহা (k) ৯.১২.৫২; (হরি) ৯.১০.৫২]*

চন্দ্রসেন২ বঙ্গদেশের রাজা সমুদ্রসেনের পুত্র। চন্দ্রসেন দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ১.১৮৬.১১; (হরি) ১.১৭৯.১১]

☐ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের আগে পাণ্ডবরা দিগ্বিজয়ে বের হলেন। এই সময় পূর্বদিক জয় করতে গিয়ে ভীমসেন বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। সমুদ্রসেন এবং তাঁর পুত্র চন্দ্রসেন দুজনেই এই সময় ভীমসেনের হাতে পরাজিত হন।

[মহা (k) ২.৩০.২৪; (হরি) ২.২৯.২২]

☐ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে রাজা চন্দ্রসেন পাণ্ডব শিবিরে যোগ দেন। ভীষ্ম চন্দ্রসেনের নাম পাণ্ডব শিবিরের গুরুত্বপূর্ণ যোদ্ধাদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। দ্রোণাচার্য কৌরব শিবিরের প্রধান সেনাপতি হলে পাণ্ডবপক্ষের বিভিন্ন যোদ্ধা একত্রে দ্রোণকে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হন। এইসময় চন্দ্রসেনও দ্রোণকে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হন। মহাভারতের কবি চন্দ্রসেনের রথের সমুদ্র থেকে উঠে আসা উচ্চৈঃশ্রবার মতো শুভ্র এবং তেজস্বী অশ্বগুলির সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে চন্দ্রসেন অশ্বত্থামার হাতে নিহত হন।

[মহা (k) ৫.১৭১.১৯; ৭.২৩.৬০; ৭.১৫৬.১৮৩; (হরি ৫.১৬০.১৮; ৭.২১.৫৭; ৭.১৩৬.১৭৬]

চন্দ্রসেন৩ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে অংশগ্রহণকারী পাঞ্চাল রাজকুমার। কৃপাচার্য পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথীদের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে এই চন্দ্রসেনের পরিচয় দিয়েছেন পাঞ্চাল রাজকুমার তথা যুধিষ্ঠিরের শ্যালক হিসেবেই।

[মহা (k) ৭.১৫৮.৩৯; (হরি) ৭.১৩৮.৩৭]

চন্দ্রহন্তা১ একজন অসুর। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্ব থেকে জানা যায় যে, দ্বাপর যুগে ইনি রাজর্ষি শুনক রূপে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হন।

[মহা (k) ১.৬৭.৩৭; (হরি) ১.৬২.৩৮]

চন্দ্রহন্তা২ পিতা মহামুনি কশ্যপ, মাতা প্রজাপতি দক্ষের ষষ্ঠ কন্যা সিংহিকা। *[কালিকা পু. ৩৪.৬৪]*

চন্দ্রহর্তা কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা সিংহিকার গর্ভজাত চার পুত্রসন্তানের একজন।

[মহা (k) ১.৬৫.৩১; (হরি) ১.৬০.৩১]

চন্দ্রহ্রদ মেরু পর্বতস্থিত একটি হ্রদ। সুমেরু পর্বতের শীর্ষ থেকে গঙ্গা এই হ্রদে পতিত হয়েছে বলে মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ৬.৬.২৯; (হরি) ৬.৬.২৯]

চন্দ্রা১ পৌরাণিক শাল্মলী দ্বীপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রধান সাতটি নদীর মধ্যে একটি।

[বায়ু পু. ৪৯.৪২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৯.৪৬; বিষ্ণু পু. ২.৪.২৮]

চন্দ্রা২ দানবরাজ বৃষপর্বার কন্যা। *[মৎস্য পু. ৬.২২]*

চন্দ্রাংশু কলিযুগে বিদিশা নগরীতে যেসব রাজা রাজত্ব করেছিলেন, চন্দ্রাংশু তাঁদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৮১]

চন্দ্রাংশুতাপন দৈত্যরাজ বলির একশত পুত্রের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ৬.১১]*

চন্দ্রাবতী পৌরাণিক কেতুমাল নামক ভূভাগ বা কেতুমাল বর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী।

[বায়ু পু. ৪৪.১৯]

চন্দ্রাবর্তা একটি পবিত্র নদী। উত্তরকুরুদেশের দক্ষিণে অর্ধচন্দ্রাকার একটি ভূখণ্ড অবস্থিত, এর নাম চন্দ্রদ্বীপ। এই চন্দ্রদ্বীপের মধ্যভাগে কুমুদপ্রভা পর্বতের অবস্থান। কুমুদপ্রভা পর্বত থেকে চন্দ্রাবর্তা নদীর উৎপত্তি।

চন্দ্রাবর্তা নদীর জল স্বচ্ছ। গ্রহপ্রধান চন্দ্র এই দেবসেবিত নদীর জলে অবতরণ করেন।

[বায়ু পু. ৪৫.৫৬-৫৮]

☐ পণ্ডিত S.M. Ali-র মতে দক্ষিণ সাইবেরিয়ায় প্রবাহিত ইয়েনিসেই (Yenisei) নদী। *[দ্র. চন্দ্রদ্বীপ]*

[GP (Ali) p. 77-78, 86-87]

চন্দ্রাবলোক ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের পুত্র

কুশের বংশধারায় রাজা সহস্রাশ্বের পুত্র চন্দ্রাবলোক। ইনি রাজা তারাপীড়ের পিতা।

[মৎস্য পু. ১২.৫৪]

চন্দ্রার্ক প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা খশার গর্ভজাত রাক্ষসদের মধ্যে একজন।

[বায়ু পু. ৬৯.১৬৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১৩৪]

চন্দ্রাশ্ব ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কুবলাশ্বের অন্যতম পুত্র। দৈত্য মধু-কৈটভের পুত্র ধুন্ধুর সঙ্গে যুদ্ধে রাজা কুবলাশ্বের একুশ হাজার পুত্র সন্তানের প্রায় সকলেই নিহত হয়। তিনটি মাত্র পুত্র অবশিষ্ট থাকে। কুবলাশ্বের এই তিন জীবিত পুত্রের মধ্যে একজন ছিলেন চন্দ্রাশ্ব। তবে মহাভারতের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে চন্দ্রাশ্বের পরিবর্তে 'চণ্ডাশ্ব' উল্লেখ পাওয়া যায়।

[মহা (k) ৩.২০৪.৪০; (হরি) ৩.১৭৪.৩৭]

চন্দ্রিকা১ অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। চন্দ্রিকা সেই মাতৃকাদের মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৭৯.৩০]*

চন্দ্রিকা২ মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত একটি পবিত্র নদী তীর্থ। এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করলে পুণ্যলাভ হয় বলে উল্লিখিত আছে। *[মৎস্য পু. ২২.৬৩]*

চপট পিতা মহামুনি কশ্যপ, মাতা প্রজাপতি দক্ষের তৃতীয়া কন্যা দনু। *[কালিকা পু. ৩৪-৫৬]*

চপল পুরাণ-বিখ্যাত এক হস্তীর নাম। মৃগ নামক হস্তীর পুত্র। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৩৩]*

চমস১ আহুতির সময়ে সোমরস গ্রহণের জন্য তিন রকমের পাত্র লাগে। এগারোখানি 'পাত্র', চারখানি স্থালী এবং দশখানি চমস। 'চমস' চামচের আকৃতির আহুতি প্রদানের পাত্র। অধ্বর্যু বা প্রতিপ্রস্থাতা পাত্রে বা স্থালীতে সোম গ্রহণ করে গ্রহাহুতি দেন। চমসের পক্ষে ভিন্ন নিয়ম। যজমান এবং ঋত্বিকের জন্য দশখানি চমস ও দশজন চমসাধ্বর্যু থাকে। যাঁর কাছে চমস থাকে তাঁকে চমসী বলা হয়। সাধারণ হোতা, ব্রহ্মা, উদ্‌গাতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংশী, পোতা, নেষ্টা, অচ্ছাবাক্, আগ্নীধ্র এবং যজমান্—এই দশ জন চমসী হন। যিনি চমস সোমরসের দ্বারা পূর্ণ করেন তিনি চমসাধ্বর্যু।

পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, চন্দ্র যে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন, সেই যজ্ঞে বিশ্বেদেবগণ চমসাধ্বর্যুর ভূমিকা পালন করেছিলেন। পূতভৃৎ থেকে সোমরস তুলে চমসে পূরণ করার নাম চমসোন্নয়ন। আহুতির পর রিক্ত চমস পুনরায় পূরণ করার নাম চমসাপ্যায়ন। চমসাহুতির সময় চমসী ঋত্বিক ধিষ্ণ্যে বসে যাজ্যাপাঠ করেন। কোনো কোনো সময় চমসস্থ সোমের আহুতি হয় না। চমসাধ্বর্যু হাতে রাখা চমস কাঁপিয়ে দেন বা নাড়িয়ে দেন। একে বলে চমস-প্রকম্পন। আহুতি বা প্রকম্পনের পর চমসীরা চমসস্থ সোমশেষ পান করেন। একে বলা হয় চমসভক্ষণ।

[আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe), ১২.২.৮; ১২.২১.১৪-১৯; বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র (Caland), ২.৩; ২৫.১৩; কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র (Thite), ৯.১১.২; ৯.১১.২৪-৩০; ৯.১৩.৩৫; মৎস্য পু. ২৩.২২]

চমস২ প্রিয়ব্রতের পুত্র জম্বুদ্বীপের অধিপতি অগ্নীধ্রের বংশধারায় ঋষভের পুত্র ছিলেন চমস। ইনি ক্ষত্রিয় বৃত্তি ত্যাগ করে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনায় মনোনিবেশ করেন। একসময় রাজা নিমি চমসকে ভগবান বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বিষয়ে প্রশ্ন করেন। চমস রাজা নিমিকে ভগবান বিষ্ণুর স্বরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করে শোনান এবং যাঁরা ভগবান বিষ্ণুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না তাঁদের কঠোরভাবে নিন্দাও করেন।

[ভাগবত পু. ৫.৪.১১; ১১.২.২১; ১১.৫.২-১৮]

চমূস্তম্ভন শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। 'চমূ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হয় সেনা। 'স্তম্ভন' শব্দটি সংস্কৃত 'স্তম্ভ্' ধাতু থেকে আসছে, 'স্তম্ভ্' ধাতুর অর্থ নিশ্চল হয়ে যাওয়া অথবা জড়বৎ নিশ্চল করে দেওয়া। শোকে, দুঃখে, আনন্দে বা বিস্ময়ে মানুষ যখন নিস্পন্দ জড় হয়ে পড়ে, আমরা সেই অবস্থাকে স্তম্ভিত হওয়া বলি। যিনি স্তম্ভিত করে দেন, তিনি স্তম্ভন। তিনি দেবাসুর যুদ্ধে দেবতাদের পক্ষে অবস্থান করেন, তাঁর পরাক্রমে দৈত্যসেনা স্তম্ভিত হয়, শক্তিহীন জড়বৎ হয়ে পড়ে বলেই মহাদেব চমূস্তম্ভন নামে খ্যাত—

চমূস্তম্ভনো দৈত্যসেনাস্তম্ভনকৃৎ।

[মহা (k) ১৩.১৭.৭৩; (হরি) ১৩.১৬.৭৩]

চম্পা১ গঙ্গানদীর তীরবর্তী একটি নগরী। এটি প্রাচীন অঙ্গদেশের রাজধানী। মহাভারতের বনপর্বে চম্পা নগরীকে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তীর্থে নদীতে স্নান ও তর্পণ করলে পুণ্য লাভ হয়। *[মহা (k) ৩.৮৪.১৬৩; ৩.১১৩.১৫; (হরি) ৩.৬৯.১৬৩; ৩.৯৪.৫৬]*

□ চম্পা নগরীতে দণ্ড নামক দেবতা পূজিত হন। সেখানে দণ্ড দেবের অর্চনা করলে সহস্র গোদানের ফল পাওয়া যায়।

[মহা (k) ৩.৮৫.১৪; (হরি) ৩.৭০.১৪]

□ মহাভারতে বনপর্বে চম্পাকে সূত অধ্যুষিত নগরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র-সখা সূত অধিরথ চম্পা নগরীতেই বাস করতেন। সেখানে গঙ্গার জলে ভাসমান পেটিকায় শিশু কর্ণ বসুষেণকে খুঁজে পান অপুত্রক অধিরথ ও তাঁর স্ত্রী রাধা।

দুর্যোধনের অনুগ্রহে বসুষেণ-কর্ণই চম্পা নগরী শাসন করতেন।

[মহা (k) ৩.৩০৮.২৬; ১২.৫.৭;
(হরি) ৩.২৬২.২৫; ১২.৫.৭]

□ পুরাকালে ঋষি দেবশর্মা চম্পক নগরীতে বাস করতেন।

[মহা (k) ১৩.৪২.১৬, ৩৩; (হরি) ১৩.৩৬.১৬, ৩৪]

□ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা হরিতের পুত্রের নাম চম্প। ইনিই চম্পা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। অবশ্য অন্যত্র পাওয়া যায়, অনুবংশীয় পৃথুলাক্ষের পুত্র চম্পের নামানুসারেই মালিনী নগরী চম্পা নামে বিখ্যাত হয়—

পৃথুলাক্ষসুতশ্চাপি চম্পনামা বভূব হ।
চম্পস্য তু পুরী চম্পা পূর্বং যা মালিনো'ভবৎ॥

বায়ু পুরাণ মতে চম্পাবতী ও মালিনী দুটি পৃথক নগরী। *[ভাগবত পু. ৯.৮.১; বিষ্ণু পু. ৪.১৮.৪;*
মৎস্য পু. ৪৮.৯৭; বায়ু পু. ৯৯.১০৬]

□ পুরাণে কলিযুগ বর্ণনায় বলা হয়েছে, কলিযুগে দেবতাদের দ্বারা রক্ষিত জনজাতিগুলি চম্পা নগরী শাসন করবে। আবার বায়ু পুরাণে কলিযুগে চম্পানগরীতে মণিধান্য বংশীয়দের শাসনের কথা বলা হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৯৭; বায়ু পু. ৯৯.৩৮৫]

□ বিহারের ভাগলপুর শহরের চার মাইল পশ্চিমে অবস্থিত দুটি গ্রাম—চম্পানগর, চম্পাপুর, পণ্ডিতরা মনে করেন এখানেই প্রাচীন চম্পা নগরী অবস্থিত ছিল। এই অঞ্চলে একটি দুর্গ দেখা যায়। প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী অঙ্গরাজ কর্ণ এই দুর্গটি নির্মাণ করেছিলেন। বৌদ্ধ যুগে চম্পা পূর্বভারতের অন্যতম সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এখনও এ অঞ্চলে বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

পণ্ডিতদের একাংশের ধারণা চম্পা নগরীটি গঙ্গা এবং তার ক্ষুদ্র শাখা চম্পা নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চম্পা নদীটির আধুনিক নাম চন্দন। দুই নদীর মিলনস্থল হওয়ার জন্যই চম্পা বাণিজ্য কেন্দ্র রূপে খ্যাতি লাভ করে। *[GDAMI (Dey) p. 44;*
PHAI (Raychauduri) p. 96;
Ed. V.K. Agnihotri;
Indian History; New Delhi;
Allied Publishers Pvt. Ltd. 2010; p. 165]

চম্পা$_2$ একটি পবিত্র নদীতীর্থ। শ্রাদ্ধকার্যের পক্ষে স্থানটি অত্যন্ত উত্তম ফলদায়ক।

[মৎস্য পু. ২২.৪১]

□ পণ্ডিত N.L. Dey-র মতে প্রাচীন অঙ্গ ও মগধের মধ্যেকার সীমারেখা বরাবর চম্পানদী প্রবাহিত হত। এর আধুনিক নাম চন্দন।

[দ্র. চম্পা$_1$]
[GDAMI (Dey) p. 43]

চম্পাবতী$_1$ একটি নগরী। নাগজনজাতির রাজধানী। এটি মথুরার নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।

বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে, কলিযুগে নয়জন নাগ রাজা চম্পাবতী নগরীতে রাজত্ব করবেন। *[বায়ু পু. ৯৯.৩৮২;*
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.১৯৪]

□ মুম্বইয়ের ২৫ মাইল দক্ষিণে কোলাবা জেলার অন্তর্গত চউল (Chaul) কেই পণ্ডিতরা প্রাচীন চম্পাবতী বলে মনে করেন। মধ্যযুগে চউল পশ্চিম উপকূলের একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে পরিচিত ছিল।

[GDAMI (Dey) p. 46]

চম্পাবতী$_2$ কেতুমাল বর্ষের একটি নদী।

[বায়ু পু. ৪৪.২০]

চর$_1$ যক্ষ মণিবরের ঔরসে দেবজনীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১২৮]

চর$_2$ মানুষের স্বার্থ এবং সামাজিকতা একই সঙ্গে গড়ে উঠেছে বলেই মানুষের নিজস্ব প্রয়োজনেই অপরের ইচ্ছা, প্রবৃত্তি এবং চেষ্টা জেনে রাখার প্রয়োজনও তৈরি হয়েছে আর ঠিক সেই প্রয়োজনেই চরবৃত্তিও গড়ে উঠেছে বহুকাল ধরেই। মহাভারত বলেছে—একজন রাজা নিজে কীভাবে চলবেন, কী আচরণ করবেন, সেটা

বোঝার জন্যই পরের আচরণ-বিচরণ তাঁকে জানতে হয়—

এবং বিচিনুয়াদ্ রাজা পরচারং বিচক্ষণঃ।

পরের আচরণ-বিচরণ জানার জন্যই চরবৃত্তির সৃষ্টি হয়েছে। আমরা বেদের কালে 'চর' শব্দটা গুপ্তচর অর্থে পাই না বটে, কিন্তু গুপ্তচর বা চর অর্থে 'স্পশ'—শব্দটি পাই, যা ইংরেজি 'spy' শব্দটির খুব কাছাকাছি একটা শব্দবন্ধ, যার মানে গুপ্তচর। ঋগ্বেদে বরুণ-দেবতার প্রসঙ্গে 'স্পশ' কথাটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে—স্পশ-গুপ্তচরেরা সব সময়েই বরুণের চার পাশে বসে আছে, তারা চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে—পরি স্পশো নি ষেদিরে। একটি ঋকে বলা হচ্ছে—বরুণের যারা চর তাদের গতি সব দিকে, তারা অন্তরীক্ষ লোক এবং এই পৃথিবীর সর্বত্র সকলকে দেখে বেড়ায়—

পরি স্পশো বরুণস্য স্মদিষ্টা।
উভে পশ্যন্তি রোদসী সুমেকে।

বেদের এই স্পশ-গুপ্তচরেরা যে শুধু বরুণেরই পার্শ্বচর তা কিন্তু নয়, বরুণের সঙ্গে যাঁর নাম যুগলে উচ্চারিত হয় স্পশদের ওপর সেই মিত্র দেবতারও অধিকার সমভাবে উচ্চারিত হয়েছে। অন্যদিকে অগ্নি, সোম এইসব দেবতারাও কিন্তু গুপ্তচরদের অধিকারী। ঋগ্বেদেই শেষ পর্যন্ত একটি ঋক্‌মন্ত্রে দেখছি যে, শুধু বরুণ নন, অগ্নি, সোম কিংবা সূর্যরশ্মির মতো সূক্ষ্মভাবে আরোপিত চরবৃত্তিই নয়, সমস্ত দেবতাদেরই জাগতিক পাপ-পুণ্যের সংবাদ লাভের জন্য গুপ্তচর স্পশদের সাহায্য নিতে হয়, এটা পরিষ্কার হয়েছে ঋগ্বেদের বিখ্যাত সূক্ত যম-যমী-সংবাদে। এখানে যম-যমী দুই ভাই-বোনের মধ্যে যমী একরকমের 'incestuous' প্ররোচনা তৈরি করেছিলেন যমের মনে। তখন যম বলছেন—স্পশরা সব দেবতাদের গুপ্তচর, এদের গতিবিধি সর্বত্র, এই স্পশেরা চক্ষু নিমীলন করে না—

ন তিষ্ঠন্তি ন নি মিষন্ত্যেতে
দেবানাং স্পশ ইহ যে চরন্তি।

[ঋগ্বেদ ১.২৫.১৩; ৭.৮৭.৩; ৭.৬১.৩; ১.৩৩.৮; ১০.১০.৮; Macdonell, Vedic Mythology, pp. 23.24; Sukumari Bhattacharji, Indian Theogeny p. 26]

□ ঋগ্বেদের 'স্পশ'-গুপ্তচরদের সূত্র থেকে চর-বৃত্তির উদ্ভব-সূত্রটুকু পরিষ্কার হয়ে ওঠে, আর এর থেকেও আশ্চর্য হল—বৈদিক এই স্পশ-শব্দটি অবিকৃতভাবে মহাভারতের শ্লোকের মধ্যে চলে এসেছে একেবারে গুপ্তচর অর্থেই। মহাভারতের শান্তিপর্বে শরশয়ান ভীষ্ম যখন যুধিষ্ঠিরকে সাধারণভাবে রাজনীতির উপদেশ দিচ্ছেন, তখন খুব সাধারণভাবেই যেসব জিনিস রাজার জেনে রাখা দরকার, সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ভীষ্ম বলেছেন—একজন রাজা যেন আত্মরক্ষা করার আশ্বাসটুকু সব সময় পান এবং সেই সূত্রেই 'স্পশ'-গুপ্তচরদের সার্বক্ষণিক দৃষ্টির মধ্যে তাঁর থাকা দরকার। এই শ্লোকটি অবশ্য মহাভারতের সব সংস্করণে একইভাবে নেই, কিন্তু পুণে থেকে প্রকাশিত পরিশুদ্ধ সংস্করণে 'স্পশ' শব্দের উল্লেখ আছে—

কৃৎস্না মার্গগুণীশ্চৈব তথা ভূমিগুণাশ্চ হ।
আত্মরক্ষণমাশ্বাসঃ স্পশানাং চান্ববেক্ষণম্॥

[সর্পাণাং চান্ববেক্ষণম্]

□ মহাভারত এই 'স্পশ' গুপ্তচরদের মাধ্যমে সংবাদ আহরণের কাজটা তো স্বীকার করেইছে, পরবর্তীকালে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যেমন এমন বিশ্বস্ত গুপ্তচরের সন্ধান পাব, যারা গুপ্তঘাতক হিসেবেও রাজার বিশ্বাসভাজন হবেন, তেমন গুপ্তচর হিসেবে কিন্তু স্পশদের নাম করা হয়েছে মহাভারতের জতুগৃহ-পর্বাধ্যায়ে। যুধিষ্ঠির এখানে দুর্যোধন-প্রেরিত পুরোচনের 'স্পশ' গুপ্তচরদের ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন এবং বলছেন যে কোনো সময় দুর্যোধন তাঁর স্পশ-গুপ্তচরদের মাধ্যমে আমাদের মেরেও ফেলতে পারে—

বয়ন্ত যদি দাহস্য বিভ্যতঃ প্রদ্রবেমহি।
স্পশৈর্নিঘাতয়েৎ সর্বান্ রাজ্যলুব্ধঃ সুযোধনঃ॥

[মহা (k) ১২.৫৯.৪৪; ১.১৪৬.২৬; (হরি) ১২.৫৮.৪৪; ১.১৪০.২৬; (Critical ed.) ১২.৫৯.৪৪]

□ এমনিতে রাজা এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে গুপ্তচরদের যে অশেষ প্রয়োজন আছে, সেটা মহাভারতের শান্তিপর্বে কথিত রাজধর্মের অন্যতম অঙ্গ। কীভাবে একটি জনপদ রক্ষা করতে হয়, যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নে ভীষ্ম বিশেষভাবে জানালেন যে, একজন রাজাকে তাঁর নিজের সুরক্ষার বিষয়ে এবং তাঁর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ তথা পররাষ্ট্রীয় শত্রুর বিষয়ে যদি অবহিত থাকতে হয়, তবে

তাঁকে আপন প্রণিধি হিসেবে গুপ্তচর নিয়োগ করতে হবে রক্ষীপুরুষদের নিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে।

ভীষ্ম পিতামহের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রণিধি বা গুপ্তচর হিসেবে রাজা যাঁদের নিয়োগ করবেন, তাঁরা জড় ব্যক্তি হতে পারেন, অন্ধ কিংবা বধিরও হতে পারেন। তবে রাজা প্রতিবন্ধী গুপ্তচর নিয়োগ করবেন, এমনটা ভাবার থেকে বোধহয় এটাই বেশি ব্যাখ্যাযোগ্য যে, তারা জড়, মূক, অন্ধ-বধিরদের আকৃতি ধারণ করবে। তবে দেহে-মনে খানিক প্রতিবন্ধিতা থাকলেও তাঁদের এই পরীক্ষা করে নিতে হবে যে, তারা খিদে-তেষ্টা যথেষ্ট সইতে পারে কী না এবং তারা যথেষ্ট পরিশ্রম সইতে পারে কী না, সবশেষে তাদের যথেষ্ট বুদ্ধি-প্রজ্ঞা আছে কী না—

প্রণিধীংশ্চ তত কুর্যাজ্জড়ান্ধবধিরাকৃতীন্।
পুংসঃ পরীক্ষিতান্ প্রাজ্ঞান্
ক্ষুৎ-পিপাসা-শ্রমক্ষমান্॥

কোথায় কোথায় এই চরদের নিয়োগ করতে হবে, সে প্রশ্নে মহাভারত পরবর্তীকালের কৌটিল্য থেকে কোনো অংশে কম যায় না। মহাভারত বলেছে—সর্ব প্রকার অমাত্য, বিভিন্ন ধরনের বন্ধু, এমনকী রাজপুত্রদের মধ্যেও গুপ্তচর ছড়িয়ে দেবেন রাজা। স্থান হিসেবে রাজধানী, জনপদ-রাষ্ট্র, সামন্ত রাজ্যে গুপ্তচরদের তো নিয়োগ করতেই হবে, এমনকী হাট-বাজারের দোকানগুলিতে, খেলাধুলো করার জায়গা, বেড়াবার জায়গা, বড়ো বড়ো মানুষের সমাজে, বৌদ্ধভিক্ষু অথবা ভিখারিদের জায়গা, রাজোদ্যান, সাধারণ উদ্যান (পার্ক), পণ্ডিতদের সমাবেশ, খনিজ সম্পত্তির আকরস্থান, বিভিন্ন সভা এবং রাজসভা, বড়ো মানুষের বাড়ি—এই সমস্ত রকম জায়গায় রাজা গুপ্তচর নিয়োগ করবেন। মহাভারত বলেছে—এইভাবে যদি আগে থেকেই গুপ্তচরের জাল বিছিয়ে রাখা যায়, তবেই একজন রাজার ভাল হতে পারে—

এবং বিচিনুয়াদ্রাজা পরচারং বিচক্ষণঃ।
চারে হি বিদিতে পূর্বং হিতং ভবতি পাণ্ডব॥
[মহা (k) ১২.৬৯.২-১৩; (হরি) ১২.৬৭.২-১৩]

□ চর-শব্দের প্রধান অর্থ গুপ্তচর, কিন্তু রাজ-প্রশাসনে যথেষ্ট মর্য্যাদাসম্পন্ন দূতবৃত্তির মধ্যে চরের বৃত্তিও কিছু মিশে আছে। মনু, মহাভারতকার এবং কৌটিল্য—এঁরা দূতের মর্য্যাদা এবং গুণাবলি অত্যন্ত মর্য্যাদার সঙ্গে প্রকাশ করলেও, দূত যে একধরনের ভদ্র চর সে কথা প্রথম বলেছেন কামন্দক। তিনি বলেছেন—চর হল দুরকম। দূত হলেন প্রকাশ্য চর আর অন্যেরা হলেন গুপ্তচর—

প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ চরস্তু দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ।
অপ্রকাশো'য়মুদ্দিষ্টঃ প্রকাশো দূত উচ্যতে॥
[কামন্দকীয় নীতিসার, ১৩.৩৩]

□ আজকের দিনেও কথাটা একইভাবে এবং আরও চতুরভাবে বলেছেন এক ব্রিটিশ দূত। তাঁর নাম, স্যর হেনরি ওটন। ১৬০৪ খ্রিষ্টাব্দে অগস্‌বার্গ শহরে এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তিনি বলেছেন—an ambassador is an honest man who is sent to tell lie abroad for the good of his country। ব্রিটানিকার সংজ্ঞাও প্রায় একইরকম—an ambassador is often nothing more than an honourable spy acting under the protection of the law of nations। সবচেয়ে বড়ো কথা হল—কামন্দক যে প্রকাশ এবং অপ্রকাশ চরের কথা বলেছেন, আধুনিক কালে সেটাকেই open এবং secret diplomacy বলে আখ্যাত করেছেন কূটনীতির অন্যতম এক গবেষক।

[Izaak Walton, the Life of Henry Wotton, Anglican History, Project Canterbury, Retrieved 11, January 2015; Harold Nicolson, Diplomacy, London: Oxford University Press, 1942, pp. 14, 178-198]

□ দূতের চরবৃত্তির সঙ্গে মহাভারত-পুরাণ এবং কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত চতুরুপায়ের ভেদনীতি যথেষ্ট জড়িত বলেই ভদ্রচর হিসেবে দূতের কাজটাও বৃহৎপরিধি লাভ করে। এমনিতেই এই ভেদনীতি ভীষণরকমের জটিল। এর মধ্যে, মিথ্যা রটনা, গুপ্তচর পাঠিয়ে শত্রুর রাজ্যে প্রচার চালানো, নিজের রাজ্য থেকে অমাত্যদের একে একে নিষ্কাষিত করে শত্রুর নানা অপকারসাধনে নিযুক্ত করা—সব কিছুই পড়ে। এই অপকারের মধ্যে বিষ দেওয়া, আগুন দেওয়া, অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করা, সবই থাকবে। শত্রুরাজার সৈন্য নষ্ট করা, শস্য নষ্ট করা, সাহায্য করতে আসা শত্রুর বন্ধুদের আটকানো—

এইসমস্ত কাজই ভেদনীতির মধ্যে পড়ে। শত্রুরাজার সেনাপতি, রাজপুত্র, এবং সৈন্যচালনাকারী পুরুষেরাও এই ভেদনীতির পরিসর থেকে বাদ পড়বেন না, এবং এই ভেদনীতির অবসান ঘটে দণ্ডের পরিকল্পনায়।

ভেদনীতির সবচেয়ে বড়ো সাধন হল গূঢ়-পুরুষ, অর্থাৎ গুপ্তচর। আজকের দিনে দেশে-বিদেশে যে বিশাল-বিশাল গুপ্তচরচক্র চালু আছে, সেই চক্রপরিকল্পনার আদিপুরুষ হলেন কৌটিল্য। কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুপ্তচরেরা যে বিশাল কার্যসাধন করেন, তার আরম্ভ হয় দূত থেকে। ইংরেজিতে এদের diplomatic agents বলা যেতে পারে। বিজিগীষু রাজার পররাষ্ট্রসম্বন্ধীয় এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই দূত এবং চরদের গুরুত্ব অপরিসীম। দূত এবং গুপ্তচরের মর্য্যাদার পার্থক্য আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এদের কাজের একটা সাধারণ ক্ষেত্র আছে। এদের দুজনের কাজ হল, পররাষ্ট্র বা শত্রুরাষ্ট্রের বিভিন্ন গোপন সংবাদ সংগ্রহ করা। দূতের সঙ্গে গুপ্তচরের সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য, কামন্দক যেমন বলেছেন—দূতকে প্রথাগতভাবে এবং প্রকাশ্যভাবে পররাষ্ট্রে প্রেরণ করা যায়, কিন্তু চর পাঠাতে হয় গোপনে।

পররাষ্ট্রে গিয়ে দূত নিজের রাজার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কতগুলো ব্যাপার পরিষ্কারভাবে বুঝে আসবেন। তাঁর নিজের রাজা সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য যেখানে সৈন্যনিবেশ করবেন, সেটা যেহেতু দূত আগে থেকেই জানেন, অতএব সেই তুলনায় শত্রুপক্ষের সৈন্যনিবেশের সম্ভাব্য জায়গাটা কীরকম সেটা দূত বুঝে আসবেন। এ ছাড়া, যুদ্ধ করার যোগ্য ভূমি, যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসার রাস্তা—এসবই নিজের রাজার সঙ্গে তুলনা-প্রতিতুলনায় তিনি বুঝে নেবেন। শত্রুরাজার দুর্গ এবং তাঁর জনপদের আয়তন, তাঁর রাজ্যে সোনাদানা এবং ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ, লোকের জীবিকা-অর্জনের উপায়, রাজ্যের সুরক্ষাব্যবস্থা কীরকম, কোন কোন জায়গায় শত্রুরাজার দোষ এবং তাঁর রাজ্যের দোষ আছে —এগুলি সঠিক অবধারণ করে নিজের রাজাকে জানানোটা দূতের কাজ।

বিদেশের রাজা তাঁর রাজার কথা শুনে তুষ্ট হলেন অথবা অসন্তুষ্ট হলেন, তা যেমন শত্রুরাজার ইঙ্গিত, আকার এবং ব্যবহার থেকে বুঝে নেবেন দূত, তেমনই তিনি দূতকে কতটা খাতির করছেন, কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন, কতটা বিশ্বাস করছেন—এগুলো থেকেও তিনি শত্রুরাজার তুষ্টি-অতুষ্টি বিচার করতে পারবেন। তবে যত আদরযত্ন আর খাতিরই তিনি পান, দূত কিন্তু নিজের দুর্গ-রাজ্য-সৈন্য ইত্যাদির ব্যাপারে অল্পই মুখ খুলবেন এবং এসব কথা কথার চালেই এড়িয়ে যাবেন।

দূতের আর একটা কাজ, যেটা কৌটিল্য বলেছেন, তা হল—তাঁর নিজের রাজ্যের যেসব গুপ্তচর বিভিন্ন কাজে শত্রুরাষ্ট্রে আগে থেকেই নিযুক্ত আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। এটা হলে, যে খবর তিনি জানতে চান, তা এদের সাহায্যে খানিকটা বেশি জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে। এ ছাড়া, শত্রুরাষ্ট্রের গ্রামে, গঞ্জে, মন্দিরে তিনি ঘুরবেন; উন্মত্ত, প্রলাপী ভিখারি এবং ঘুমন্ত ব্যক্তির কথা শুনেও তিনি শত্রুরাষ্ট্রের দোষ-গুণ বুঝে নেবেন খানিকটা।

দূত যেহেতু প্রথামাফিকভাবেই পররাষ্ট্রে প্রবেশ করছেন, অতএব তিনি শত্রুরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি নেবেন। কিন্তু, তাঁর সংবাদ-সংগ্রহের কাজ শেষ হয়ে গেলে, তিনি যদি দেশে ফিরতে চান এবং শত্রু রাজা যদি ফেরবার অনুমতি না দিয়ে সেখানে থাকবার জন্য উপরোধ সৃষ্টি করেন, তখন কিন্তু তাঁর কাজ হবে শত্রুরাজাকে সন্দেহ করা, এবং কেন তিনি ফিরতে দিতে চাইছেন না তা অবধারণ করা। বিশেষত, তখন তিনি নিজ রাজার রাজমণ্ডলে অবস্থিত অন্যান্য শত্রুরাজার সঙ্গে এই রাজার কোনো যোগাযোগ বা যোগসাজশ হয়েছে কি না, অথবা শত্রুরাজা তাঁর স্বামীর সঠিক আক্রমণের সময় ভেস্তে দিতে চাইছেন কি না, অথবা সময়ের সুযোগ নিয়ে শত্রুরাজা নিজের কোষ এবং সেনা বাড়িয়ে তুলে যুদ্ধের উপযোগী করে তোলবার চেষ্টা করছেন কি না—এইসব কূটতর্ক সমাধান করে, প্রয়োজন বুঝলে সেই রাষ্ট্রে অবস্থান করবেন, অথবা প্রয়োজনে শত্রুরাজার অনুমতি না নিয়েই পালানোর চেষ্টা করবেন।

দূতের কর্মবিস্তার আলোচনার শেষ পর্যায়ে, দূতের অমাত্যোপম ক্ষমতাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন কৌটিল্য। প্রভুর সন্দেশ বহন করা ছাড়া, পূর্বকৃত সন্ধি নতুনভাবে সম্পন্ন করা, মিত্রসংগ্রহ করা, শত্রুরাজ্যে ভেদনীতি চালানো,

শত্রুর বন্ধুরাষ্ট্রে ভেদব্যবস্থা করা, শত্রুর সেনা এবং গুপ্তচরদের বিতাড়িত করা, এমনকী, দরকারে, সুযোগ বুঝে শত্রুরাজাকে মেরে ফেলার ব্যাপারটাও দূতকর্মের মধ্যে পড়ে।

পররাষ্ট্রসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে দূতের যে সার্বিক ভূমিকা আছে একজন গুপ্তচরের ভূমিকা সেইরকম না হলেও, তার কাজ কিন্তু পররাষ্ট্রের মতো অন্তঃরাষ্ট্রেও ব্যাপ্ত। চরের ভূমিকা এতটাই ব্যাপক যে চরকে সবসময় রাজার চক্ষু বলে নির্দেশ করা হয়েছে। রাজা একা সব কাজ দেখতে পারেন না বলে, সব কাজই তিনি চরের মাধ্যমে দেখেন। মহাভারত বলেছে—চরেরা সকলের অজ্ঞাতসারে শত্রু, মিত্র এবং উদাসীন রাজার রাজ্যের সমস্ত খবর যেমন জোগাড় করবে, তেমনই অন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রজাদেরও সব খবর তারা রাজার কানে পৌঁছে দেবে। এই মতের বিস্তারিত প্রতিধ্বনি আছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। কৌটিল্য শত্রু, মিত্র এবং উদাসীন রাজার সঙ্গে মধ্যম রাজারও নাম করেছেন এবং বলেছেন—এঁদের রাজ্যের অষ্টাদশ তীর্থের প্রতি নজর রাখবে চরেরা। তবে, এই অষ্টাদশ তীর্থ শুধু শত্রুরাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, অন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও অন্তত পঞ্চদশ তীর্থের ওপর নজর রাখবে চরেরা।

তীর্থ কথাটা এখানে পারিভাষিক। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের নবনির্মিত ইন্দ্রপ্রস্থসভায় এসে নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—আপনার শত্রুরাজ্যের আঠেরোটি এবং নিজের রাজ্যের পনেরোটি তীর্থের ওপর আপনার চরেরা ঠিক নজর রাখে তো? এখানে তীর্থ বলতে টীকাকার নীলকণ্ঠ যা বুঝিয়েছেন, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে তার প্রায় কোনো প্রভেদ নেই। এই তীর্থগুলিকে মহামাত্র বা মহামাত্যও বলা হয়। তীর্থগুলির বিবরণ দিতে গিয়ে, কৌটিল্য লিখেছেন—গূঢ়-পুরুষদের রাজভক্তি এবং কর্মদক্ষতা স্মরণে রেখে বিভিন্ন ছলে বিদেশের আঠেরোটি তীর্থের ওপর চরদের নজর রাখতে বলবেন রাজা। এই তীর্থগুলি হল—(১) মন্ত্রী, (২) পুরোহিত, (৩) সেনাপতি, (৪) যুবরাজ, (৫) দৌবারিক, (৬) অন্তর্বংশিক (অন্তঃপুরের রক্ষায় নিযুক্ত প্রধান পুরুষ), (৭) প্রশাস্তা (কারাগারের প্রধান প্রশাসক), (৮) সমাহর্তা (রাজকর সংগ্রহীতাদের প্রধান পুরুষ), (৯) সন্নিধাতা (রাজভাণ্ডারে সঞ্চয়যোগ্য বস্তুর সংগ্রাহক), (১০) প্রদেষ্টা (ফৌজদারি বিচারের প্রধান বিচারক), (১১) নায়ক সেনাপতি (অন্যত্র নগরাধ্যক্ষ শব্দটি ব্যবহৃত), (১২) পৌরব্যবহারিক (পৌর আইন প্রয়োগকর্তা, বিচারক), (১৩) কার্মান্তিক (খনি বা কারখানার প্রধান পর্যবেক্ষক), (১৪) মন্ত্রিপরিষদের অধ্যক্ষ (অমাত্যপরিষদের অধ্যক্ষ), (১৫) দণ্ডপাল (সেনারক্ষার অধিপতি), (১৬) দুর্গপাল, (১৭) অন্তপাল (রাজ্যের সীমারক্ষক), (১৮) আটবিক (অটবীপাল)।

পরের দেশে বা শত্রুর দেশে এই আঠেরোটা জায়গায় নজরদারি ছাড়াও, নিজের দেশেও এইসব তীর্থ বা ক্ষেত্রগুলিতে কড়া নজর রাখবার জন্য চর নিযুক্ত করবেন রাজা। তবে, নিজ দেশে তীর্থসংখ্যা আঠেরোটি থেকে কমে পনেরোটি হবে, কারণ নিজের দেশে মন্ত্রী, পুরোহিত এবং যুবরাজকে এই নজরদারির আওতা থেকে বাদ দিতে হবে। মহাভারতও এই অষ্টাদশ তীর্থের কথা বলেছে এবং সেখানেও স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্রনির্বিশেষে গুপ্তচরের ব্যবস্থা রাখতে বলা হয়েছে। এই অষ্টাদশ তীর্থ অনেকটাই একটি রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বিভাগীয় অধিকরণকে বোঝায়। তবে, গুপ্তচরের বিচরণপরিসর শুধু এইটুকু জায়গার মধ্যেই সংকুচিত নয়। সত্যি কথা বলতে কী, স্বরাজ্য এবং পররাজ্যের ভালো-মন্দ সব খবরই যেহেতু বিজিগীষু রাজার দরকার, তাই চরনিযুক্তির ক্ষেত্র শুধুমাত্র বিস্তৃত বললে ভুল হবে, বলা উচিত সর্বত্র ব্যাপ্ত।

উপরি-উক্ত তীর্থগুলি ছাড়াও, মহাভারতে স্বরাজ্যে যেসব জায়গায় চর লাগিয়ে রাখতে বলা হয়েছে, সেগুলি মোটামুটি হল—উদ্যান, বেড়ানোর জায়গা, মন্দির, পানশালা, রাজপথ, চৌমাথার মোড়, তীর্থস্থান, যাগযজ্ঞের জায়গা, খনি, পার্বত্য অঞ্চল, বন, নদী, অনেক মানুষের মিলিত হবার জায়গা—সেটা বাজারও হতে পারে, পণ্ডিতদের বিদ্যা-বিতণ্ডা-সভাও হতে পারে, অথবা যেকোনো জটলার জায়গাও হতে পারে। এতসব জায়গার নাম না করে বরং বলা উচিত—যেকোনো জায়গা, যেখান থেকে রাজা তার প্রয়োজনীয় সংবাদ পেতে পারেন, সেইসমস্ত জায়গাতেই চর নিযুক্ত করাটা রাজার অন্যতম

নীতির মধ্যে পড়ে। কারণ, চরেরা যেমন নিজ রাজার শুভার্থী হয়ে সদা-সর্বদা public opinion যাচাই করবে, তেমনই পররাষ্ট্রে শত্রুকে আঘাত করা, এমনকী তাকে মেরে ফেলার ব্যাপারে যদি কোনো পরিকল্পনা রাজা করে থাকেন, তবে সেটাও কার্যকর করবে চরেরাই।

এ ব্যাপারে, কৌটিল্যের মত আরও স্পষ্ট। তিনি যে বারো রকমের রাজমণ্ডল কল্পনা করেছেন, সেই মণ্ডলস্থিত মিত্ররাষ্ট্র এবং শত্রুরাষ্ট্র সর্বত্রই তিনি চর নিযুক্ত করতে বলেছেন। বিশেষত, যাঁরা বিজিগীষু রাজার শত্রু, তাঁদের সঙ্গে বাইরে বন্ধুত্বের ভাব বজায় রেখে চরের মাধ্যমে তাঁদের একটি একটি করে মেরে ফেলা যায় কি না, সে বিষয়েও কৌটিল্য বিশেষ যত্ন নিতে বলেছেন। অন্যদিকে, মহাভারত যে বলেছে—নিজের রাজ্যে অন্তত মন্ত্রী, পুরোহিত এবং যুবরাজকে গুপ্তচরের নজরদারি থেকে মুক্তি দেওয়া উচিত—

মন্ত্রিণং যুবরাজঞ্চ হিত্বা স্বেষু পুরোহিতম্।

—সে ব্যাপারে কৌটিল্য মোটেই একমত নন। কারণ, অমাত্য নিযুক্ত করার মুহূর্তেই, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, চরের কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। যিনি মন্ত্রী নিযুক্ত হবেন, তাঁর কামনার বিকার, অর্থলোভ, ভয়োদ্বেগ ইত্যাদি কতটা— সেগুলি চরেরা ভালো করে পরখ করে দিলে তবেই মন্ত্রীনিয়োগের প্রশ্ন আসে।

অর্থশাস্ত্রে চরেদের বলা হয়েছে গূঢ়-পুরুষ, এবং রাজকার্যে তাদের গুরুত্ব এতটাই যে, মন্ত্রী-অমাত্য নিয়োগের পরেই রাজাকে চর নিযুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন কৌটিল্য। কেন? তার কারণ, কৌটিল্য বলেছেন—রাজা তাঁর নিযুক্ত গূঢ়-পুরুষদের যথেষ্ট অর্থ এবং সম্মান দিয়ে সমাদর করে রাজকর্মচারী তথা রাজার ওপর জীবিকানির্বাহকারী অমাত্য, সেনাপতি এবং অন্যান্য বিভাগীয় কর্মচারীদের শুচিতা পরীক্ষা করার কাজে ব্যবহার করবেন।

শুচিতা পরীক্ষা করার ব্যাপারে একজন গুপ্তচরের কার্যাবলি এতই সূক্ষ্ম এবং বিচিত্র যে, যার বিরুদ্ধে গুপ্তচরেরা কাজ করছে, তার বোধেও আসবে না যে, তার পিছনে রাজার গুপ্তচর লেগেছে। রাজা বা অমাত্যপুরুষ যাদের গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগ করবেন, তাদের কাজ যে শুধু রাজাকে প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ করা, তাই নয়। বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষেরা যাতে রাজার প্রতি আনুগত্য রেখে চলে, অথবা তাঁরই আনুগত্য নিয়ে থাকবার কারণগুলি সার্থকভাবে বোঝে, সেজন্যও চরেরা কাজ করবে।

কৌটিল্য এই ধরনের চরদের পাঁচটি প্রকার নির্দেশ করে, তাদের নাম দিয়েছেন 'সংস্থ', অর্থাৎ রাজার প্রয়োজনে তারা নিজ রাজ্যে এবং পররাজ্যে এক-একটি নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করেই গুপ্তচরের কাজ চালায়। পাঁচ প্রকার 'সংস্থ'দের মধ্যে প্রথম হল, 'কাপটিক'। এরা ছাত্রের বেশে গুপ্তচরের কাজ করে, কথা বলতে পারে খুব ভালো, উপস্থিত বুদ্ধি অত্যন্ত বেশি, এবং অন্যের দোষ সব জানে—

পরমর্মজ্ঞঃ প্রগল্ভঃ ছাত্রঃ কাপটিকঃ।

রাজার প্রধানমন্ত্রী এই ধরনের ছাত্রবেশী গুপ্তচরকে প্রচুর টাকাপয়সা এবং সম্মান দিয়ে অন্যান্য অমাত্যদের অন্যায় কাজগুলি রাজা বা প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানানোর নির্দেশ দেন, এবং সেই নির্দিষ্ট পথেই অন্যান্য অমাত্য, বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত অধ্যক্ষদের কামজ এবং ক্রোধজ দোষ, বিশেষত অর্থের দানাদানসম্পর্কিত দূষণগুলিও, রাষ্ট্রপ্রধানের কর্ণগোচর হয়।

দ্বিতীয় সংস্থের নাম, 'উদাস্থিত'। এই শব্দের সাধারণ অর্থ, উদাসীন সন্ন্যাসী। এঁরা অত্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি। টাকাপয়সার ব্যাপারে অত্যন্ত শুদ্ধ বটে, কিন্তু সন্ন্যাস অথবা প্রব্রজ্যার যে ব্রত নিয়ে তাঁরা জীবনচর্যা শুরু করেছিলেন, সেই সন্ন্যাসীর ধর্ম থেকে তাঁরা বিচ্যুত হয়েছেন। রাজা এই ধরনের বুদ্ধিমান বিজ্ঞদের কাজে লাগানোর জন্য এঁদের অনেক টাকাপয়সা দিয়ে নিজ রাজ্যে বা পররাজ্যে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এঁদের বাসস্থান নির্দেশ করবেন। এঁরা এতটাই টাকাপয়সা পাবেন, যাতে শিষ্যসামন্তদের নিয়ে কৃষি, বাণিজ্য, বা পশুপালনের মতো কিছু করতে পারেন। এইসব কর্ম থেকে যে লাভ হবে, সেই লাভের টাকা দিয়ে 'উদাস্থিত'-গুপ্তচর বৌদ্ধ, জৈন, পাশুপত ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষদের সাধারণ গ্রাসাচ্ছাদন এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন প্রথমে। এই কৃতজ্ঞতা তৈরির সুযোগ নিয়েই উদাস্থিত তাদের নিজের বশে নিয়ে আসবেন; তারপর তাদের কাছে প্রস্তাব দিয়ে বলবেন—তোমরা যেমন বৌদ্ধ, জৈন

ইত্যাদির বেশ ধারণ করে আছ, তেমনই থাকো, কিন্তু এই অবস্থায় তোমরা রাজার প্রয়োজন সিদ্ধ করো। পরিবর্তে, খাওয়াদাওয়ার জন্য ধান-চাল দরকার হলে, অথবা বেতনের প্রয়োজন হলেই আমার কাছে আসবে। এইভাবে, এরা আবার অপরাপর জৈন, বৌদ্ধদের এক-একটি গোষ্ঠীকে নিজের বশে আনবে।

উদাস্থিতের গুপ্তচরবৃত্তি থেকে বোঝা যায়—রাজা নিজে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবিত হলেও, তাঁর দেশের অন্যান্য ধর্মীয়সম্প্রদায়ভুক্ত পরিব্রাজক-সন্ন্যাসীরা যাতে তাঁর বশে থাকেন, অথবা তাঁর বিরুদ্ধে অন্তত বিক্ষুব্ধ না হন,তার জন্য রাজার চেষ্টার অন্ত ছিল না। নিজ দেশের ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি এবং তাঁর স্বধর্মবিরুদ্ধ সাধু-সন্ন্যাসীরাও যাতে রাজার বিরুদ্ধে কোনো কর্ম না করেন, তার জন্য 'উদাস্থিত' নামের গুপ্তচরগোষ্ঠী (সংস্থ) রাজার হয়ে কাজ করতেন। শত্রুরাষ্ট্রের খবর জানার জন্য উদাস্থিত গুপ্তচরেরা জনপদসীমাতে বসবাস করবেন এবং সেখানেও পূর্বনির্দিষ্টভাবেই তাঁরা রাজার সেবা করবেন।

তৃতীয় গুপ্তচরসংস্থার নাম, 'গৃহপতিব্যঞ্জন'। এরা রাজ্যের ব্যবসায়ী কৃষকগোষ্ঠীকে রাজার অনুকূলকর্মে প্রবৃত্ত করে। কৌটিল্যের আশ্চর্য বুদ্ধি হল এই যে, রাজ্যের 'প্রোডিউসিং ম্যাস'কে হাতে রাখার জন্য তিনি যে গুপ্তচর ব্যবহার করছেন, সে নিজেও কিন্তু একজন কৃষক। কৌটিল্য তার আর্থিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে তাকে গুপ্তচরের কাজে নিয়োগ করার পরামর্শ দিচ্ছেন। অর্থশাস্ত্রে বলা হচ্ছে— কৃষিবৃত্তিতে যিনি কোনো লাভের মুখ না দেখে শুধুই লোকসান খেয়ে দরিদ্র হয়ে গেছেন, এমন একজন কৃষক, অথচ যার বুদ্ধি প্রখর এবং অর্থবিষয়ক শুচিতা আছে, এমন লোককেই রাজা কৃষিকর্মের জন্য নির্দিষ্ট মানুষজনের মধ্যে কোনো অন্যায় আচরণ চলছে কি না, সেটা দেখার জন্য চর হিসেবে নিযুক্ত করবেন। তার পারিভাষিক নাম, 'গৃহপতিব্যঞ্জন'। কৃষিকর্মের জন্য নির্দিষ্ট ভূমিতে থেকে তিনি, উদাস্থিত-চরের মতোই, কৃষকবেশী মানুষদের অর্থাদির লোভ দেখিয়ে নিজের বশে আনবেন, যাতে তারা রাজার অনুকূল কাজ করে।

একইভাবে, বাণিজ্যবৃত্তিতে লোকসান-খাওয়া, দরিদ্র অথচ প্রজ্ঞা-শুদ্ধি-যুক্ত কোনো বণিককে রাজা বাণিজ্যকর্মের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে চর হিসেবে নিয়োগ করবেন। সেও, পূর্বকথিত উদাস্থিত বা গৃহপতিক পুরুষের মতো, অর্থ-মানের পরিবর্তে অন্যান্য বণিকবেশধারী মানুষদের স্ববশে এনে গুপ্তচরের কাজে লাগাবেন। এই গুপ্তচরসংস্থের নাম, 'বৈদেহকব্যঞ্জন'। বাণিজ্যের কারণে এরা শত্রুর দুর্গ বা রাজধানীতেও যেতে পারে বলে, বৈদেহকব্যঞ্জন পুরুষদের পররাষ্ট্রের দুর্গ সম্বন্ধে খবর আনার কাজে লাগানো যায়।

কৌটিল্যের নিজের সময়ে তো বটেই, তা ছাড়া, তাঁর সময়ের আগে এবং পরেও বৌদ্ধ-জৈন ভিক্ষুদের গুপ্তচরের কাজে লাগানোটা প্রায় রীতির মধ্যে ছিল। যারা মাথা ন্যাড়া করে বৌদ্ধভিক্ষু বা ক্ষপণকের বেশ গ্রহণ করত, অথবা যারা শৈব-পাশুপত-সম্প্রদায়ী সাধুদের মতো জটা ধারণ করে তপস্বী সাজত, তারা যদি নিজের জীবিকার জন্য রাজার গুপ্তচরবৃত্তি গ্রহণ করত, তবে তাকে বলা হয় 'তাপস-ব্যঞ্জন' গুপ্তচর। এরা নগরের উপকণ্ঠে একইরকম মাথা-ন্যাড়া অথবা জটাধারী শিষ্যসামন্ত নিয়ে বসবাস করবে, এবং নিজেকে নিরাহার তপস্বী প্রমাণ করার জন্য, একমাস বা দুমাস পর পর প্রকাশ্যে অন্য লোকের সামনে শাক বা তৃণমাত্র ভোজন করবে। কিন্তু, এমনিতে অন্য লোকে যেমন প্রতিদিন খায়দায়, তেমনই খেতে পারবে, কিন্তু গোপনে।

আগে যে বৈদেহক-ব্যঞ্জন গুপ্তচরের কথা বলা হয়েছে, সেই বৈদেহকের লোকজনেরা এই তাপস-ব্যঞ্জন গুপ্তচরকে খুব সম্মানটম্মান দেখিয়ে লোকের মধ্যে প্রচার চালাবে যে, তাপস-ব্যঞ্জন ব্যক্তিটি ভবিষ্যৎ-সম্পত্তির খবর বলতে পারেন। তিনি 'সামেধিক' (ভবিষ্যৎ-সম্পদ-বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন যিনি) এবং তিনি অন্য মানুষের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ সম্বন্ধে বলতে পারেন। এই প্রচারের পর সেই 'সামেধিক' তাপস-ব্যঞ্জন গুপ্তচরের কাছে মানুষ যখন ভবিষ্যৎ-সম্পদের আশায় আসা-যাওয়া করতে থাকবে, তখন আগত ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব, তার অঙ্গ-চিহ্ন, নিজের জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞান এবং শিষ্যদের ইঙ্গিত অনুসারে নানা কথা বলবেন। সেই কথার মধ্যে অশুভ-সম্ভাবনার কথাও থাকবে। যেমন, এটা হবে না, এটা তুমি পাবে না, তোমার ঘরে

আগুন লাগতে পারে, চোরে তোমার অনেক সম্পত্তি চুরি করে নিতে পারে। আগত ব্যক্তি যদি রাজদ্বেষী হয়, তবে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বধ-বন্ধনাদির সম্ভাবনার কথাও বলবেন। আগত ব্যক্তির সম্বন্ধে রাজা এইরকম-সেইরকম করতে পারেন বলেও জানাবেন সামেধিক।

যেসব অশুভ-সম্ভাবনার কথা তাপস-ব্যঞ্জন গুপ্তচর ভবিষ্যদ্‌বাণী করবেন, যেমন গৃহদাহ, চোরভয় ইত্যাদি—সেসব কথা অন্যান্য গুপ্তচরদের মাধ্যমে কাজে পরিণত করতে হবে। ভবিষ্যতের সমৃদ্ধিকামী প্রশ্নকর্তারা যদি প্রজ্ঞা-বাগ্মিতা ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হন, তবে রাজা বা মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলে ভালো কাজ হবে—এইধরনের ভবিষ্যদ্‌বাণীও করবেন তাপসরূপী গুপ্তচর, এবং এরা রাজা বা মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলে, গুপ্তচরের কথা মনে রেখে তাদের ভালো কাজ দেবারও ব্যবস্থা করবেন রাজা বা মন্ত্রী। পররাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে, প্রধানত দুর্গসীমায় তাপস-ব্যঞ্জন গুপ্তচরদের বসবাস করিয়ে সেই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে খবর আনতে বলা হয়।

কাপটিক থেকে তাপস-ব্যঞ্জন গুপ্তচর— এই পঞ্চ-সংস্থা থেকে পাওয়া খবরে যদি জানা যায় যে, কিছু মানুষ ন্যায়সঙ্গত কারণে ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তবে তাদের অর্থ এবং সম্মান দিয়ে সন্তুষ্ট করা উচিত রাজার। আর, সংস্থ-গুপ্তচরদের খবরে যদি জানা যায় যে, কিছু মানুষ অকারণে অন্যায়ভাবে রাজার ওপর দ্বেষ পোষণ করছে, তবে তাদের ধরে এনে গোপনে বধ করাবেন রাজা।

পাঁচ প্রকার সংস্থ-গুপ্তচরেরা যেমন এক জায়গায় থেকেই সংবাদ সংগ্রহ করেন, তথা প্রজাদের রাজার আনুগত্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন, তেমনই গুপ্তচরগোষ্ঠীর আরও এক সাধারণ প্রকারের নাম 'সঞ্চার'। এরা সর্বত্র সঞ্চরণ করে রাজার প্রয়োজনীয় গোপন সংবাদ নিয়ে আসে বলে তাদের এই নাম। নিজের রাজ্যে তো বটেই, শত্রুর রাজ্যেও এদের অবাধ সঞ্চার। পূর্বকথিত আঠেরোটি তীর্থের ওপর নজর রাখা ছাড়াও, শত্রুরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় 'সাবোতাজ' করা, রাজা বা মন্ত্রীর বধসাধন, মন্ত্রী-সেনাপতি-প্রজাদের মধ্যে ভেদ তৈরি করাটা এই 'সঞ্চার' গুপ্তচরদের প্রধান কাজ।

স্বাভাবিকভাবেই, সঞ্চার-পুরুষদের একাংশকে অত্যন্ত পণ্ডিত এবং শাস্ত্রনিপুণ হতে হবে। এদের বলা হয় 'সত্রী'। হাত দেখা, কুষ্ঠি দেখা, সামুদ্রিকাদি লক্ষণশাস্ত্র, শিক্ষা-কল্প ইত্যাদি বেদাঙ্গশাস্ত্র, অথবা মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চিহ্ন দেখে ভবিষ্যৎ বলা, বশীকরণ, ইন্দ্রজাল, মনুকথিত আশ্রমধর্ম, পাখির ডাক শুনে শুভাশুভ নির্দেশ করা, কামশাস্ত্র এবং গীতবাদ্যাদি বহু শাস্ত্রের জ্ঞান থাকে সত্রী নামের এই গুপ্তচরদের।

সঞ্চার-পুরুষদের আর একটি প্রকার হল 'তীক্ষ্ণ'। জিনিসপত্র বা অর্থের লোভ এদের এতই বেশি যে, এরা নিজেদের জীবনের পরোয়া করে না। নিজের শক্তিতে সম্পূর্ণ আস্থাবান হয়ে, হাতি-বাঘের সঙ্গে লড়তেও এরা কুণ্ঠিত হয় না। রাজা স্বরাষ্ট্রে বা শত্রুরাষ্ট্রের অনিষ্ট পুরুষকে হত্যার জন্য এই গুপ্তচরদের ব্যবহার করেন। স্বকার্যসাধনে তীক্ষ্ণতার কারণেই এদের এই নাম। একই ধরনের কাজ আরও নির্মমভাবে করতে পারে 'রসদ' নামের গুপ্তচরেরা। আত্মীয়স্বজনের প্রতিও এদের কোনো মায়ামমতা নেই। এরা স্বভাবে ক্রূর এবং কিছু অলস। 'রস' মানে, এখানে বিষ বা প্রাণঘাতী কোনো 'কেমিক্যাল'। মায়ামমতাহীন হওয়ায়, মানুষকে বিষ দিয়ে মারতে এদের একটুও হাত কাঁপে না।

বিশেষ ধরনের কিছু স্ত্রী-গুপ্তচরও ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন কৌটিল্য। ব্রাহ্মণের ঘরের বুদ্ধিমতী বিধবা, যাঁরা দারিদ্রের কারণে রাজ-অন্তঃপুরে জীবিকার জন্য আসেন, তাঁরা 'পরিব্রাজিকা' শ্রেণীর গুপ্তচরের মধ্যে পড়েন। উচ্চকুলের মানুষ বলে, রাজদরবারের অভিজাত তথা পদমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে এই পরিব্রাজিকাদের যাতায়াত থাকে। গোপন সংবাদ সরবরাহ করার জন্য, রাজা এঁদের কাজে লাগাতেই পারেন। তবে এই উচ্চকুলীন বামুনবিধবাই শুধু নয়, বৌদ্ধভিক্ষুনী বা শূদ্রা পরিচারিকাদেরও রাজা গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োগ করতেন।

পূর্বকথিত অষ্টাদশ তীর্থে সঞ্চার নামের গুপ্তচরেরা কাজ করবে। রাজা তাদের রাজভক্তি এবং কর্মক্ষমতা বিবেচনা করে যখন একটি নির্দিষ্ট কাজে লাগাবেন, তখন তাদের দেশ, বেশ, ভাষা এবং আভিজাত্যের ছলনাও রাজা নির্দিষ্ট করে দেবেন। তীক্ষ্ণ নামের সঞ্চার-পুরুষেরা মহামাত্য

বা উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তিদের বহির্জীবনের সমস্ত খবর জেনে, তা প্রথম জানাবে সত্রী নামের গুপ্তচরদের। তারা সে খবর জানাবে পূর্বোক্ত 'সংস্থ' নামের গুপ্তচরদের। তারা সেইসব খবর পৌঁছে দেবে রাজা বা প্রধানমন্ত্রীর কাছে, গোপন সাংকেতিক লিপির মাধ্যমে।

রাজকর্মে নিযুক্ত উচ্চপদাধিকারীদের আভ্যন্তর জীবনের সমস্ত খবর জোগাড় করবে রসদ নামের সঞ্চার-পুরুষেরা। এর জন্য, তারা শত্রুরাষ্ট্রের রাজপুরে নানা বিশ্বস্ত কর্মে নিযুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে। পাচক, নাপিত, মাংস-বিক্রেতা সেজে রসদ-সঞ্চারেরা ঘরের খবর জানার চেষ্টা করবে। এ ছাড়া, রাজাকে স্নান করিয়ে দেবার কাজ, তাঁর অঙ্গমর্দনের কাজ, তাঁর শয্যা প্রস্তুত করা বা তাঁকে জল দেবার কাজ নিয়েও অভ্যন্তরীণ নানা সংবাদ তারা সংগ্রহ করতে পারে। কৌটিল্য আরও পরামর্শ দিয়ে বলেছেন যে, গুপ্তচরেরা কুঁজো, বামন, ব্যাধ, বোবা, কালা, অথবা নাচিয়ে, গাইয়ে বা বাজিয়ে সেজে রাজা বা উচ্চপদাধিকারীদের অভ্যন্তরীণ সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে। তামাশা দেখানোর লোক অথবা নাটকের কুশীলব সাজাটাও খবর জোগাড় করার ছদ্ম-উপায় হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

রসদ-গুপ্তচরের পাওয়া সংবাদও সাংকেতিক লিপির মাধ্যমে পাঠাতে হবে সংস্থ-গুপ্তচরদের কাছে। এই সংকেতের মাধ্যমে অবশ্য শুধু লিপিই নয়, গান রচনা, শ্লোক রচনা, অথবা নির্দিষ্ট বাদ্য বাজিয়েও সংকেত পাঠানোর কথা জানিয়েছেন কৌটিল্য। সংবাদ সংগ্রহের প্রয়োজনে আগুন লাগানো বা বিষ দেওয়াটাও কৌটিল্যের অনুমত পথ।

[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (kangle) ১.১১; ১.১২; ১.১৬; ৭.১৩; মহা (k) ১২.১৪০.৪০; ২.৫.২৫-২৬, ৩৮ (নীলকণ্ঠকৃত টীকা দ্রষ্টব্য); ১৫.৫.১৫,৩৮; ১.১৪০.৬৩-৬৫; ১২.৬৯.১১-১৩; (হরি) ১২.১৩৬.৪০; ২.৫.২৫-২৬, ৩৮ (নীলকণ্ঠকৃত টীকা দ্রষ্টব্য); ১৫.৭.১৫, ৩৭; ১.১৩৫.৬৩-৬৫; ১২.৬৭.১১-১৩]

☐ গুপ্তচরদের একজন আর একজনকে চিনবে না—এটাই সাধারণ নিয়ম, এবং অন্তত তিনজন গুপ্তচর যদি একই সংবাদ দেয়, তবে সেই সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য বলে পরিগণিত হবে। কিন্তু, বারেবারেই যদি গুপ্তচরেরা পরস্পরবিরোধী সংবাদ পরিবেশন করে, তবে গোপনে তাদের দণ্ড দিতে হবে বা রাজ্য থেকে বিতাড়িত করতে হবে। সংস্থ বা সঞ্চার-পুরুষেরা ছাড়াও আরও একধরনের গুপ্তচর আছে, যাদের বলা হয়েছে 'অপসর্প'। এরা শত্রুরাষ্ট্রে গিয়ে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি নেয় এবং বেতনও নেয়। চাকরির সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ খবর এরা নিজ রাষ্ট্রে প্রেরণ করে। এরা যেহেতু গুপ্তচরবৃত্তির জন্য বিজিগীষু রাজার কাছ থেকেও বেতন পায় এবং শত্রু দেশে চাকরি করার জন্য শত্রুরাজার কাছ থেকেও বেতন পায়, তাই এদের বলা হয় 'উভয়বেতন' গুপ্তচর। উভয়বেতন চরেদের নিযুক্ত করার সময়ে, তার স্ত্রী-পুত্রকে বিজিগীষু রাজা নিজের অধীনে রাখবেন, যাতে চর বিশ্বাসঘাতকতা না করে। অন্যদিকে, শত্রুরাজার দ্বারা নিজ রাজ্যে প্রেরিত উভয়বেতন চরেদের খবর, তার উদ্দেশ্য এবং করণীয় সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ বিজিগীষু রাজা স্বনিযুক্ত উভয়বেতন চরেদের মাধ্যমেই নেবেন।

গুপ্তচরেরা নিজ রাজ্যে এবং পররাজ্যে কোথায় কীভাবে কথা বলবে, কাদের মধ্যে ভাঙন ধরাবে, কাদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটাবে এবং কাদেরই বা দান-মানে তুষ্ট করে নিজের দলে টানবে—সে বাবদে কৌটিল্য অনেক পরামর্শ দিয়েছেন; কিন্তু, সেসব কথা বিস্তারিত আলোচনার উপায় এখানে নেই। স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, এমন বিভাগ বা অধিকরণ খুব কমই আছে, যেখানে কৌটিল্যের মতে চরেদের কর্মপরিসর সৃষ্টি হয় না। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, যেখানে শুধুমাত্র রাজার সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা যাচাই করার জন্য ছোটখাটো একটি পথনাটকই করতে হয়। সত্রী-গুপ্তচরেরা একত্রে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে ঝগড়া করতে থাকে। একদল রাজাকে গুণহীন মন্দ বলে, অন্য দল রাজার ক্রিয়াকর্মের যৌক্তিকতা দেখিয়ে তাঁকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। জনমত যাচাইয়ের কাজটা এইভাবেই করতে বলেছেন কৌটিল্য।

জনমত পাওয়া গেলে, যারা রাজার ওপর সন্তুষ্ট আছে, রাজা নানাভাবে তাদের প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করবেন, কিন্তু যারা তুষ্ট নয়, তাদের প্রথমে দান-মানে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবেন। এতে কিছু না হলে, অতুষ্টদের মধ্যে পরস্পরে ভেদ তৈরি

করবেন গুপ্তচরদের মাধ্যমেই, এবং তারা যাতে কোনোভাবেই শত্রুরাজা, আটবিক, অথবা রাজকুলজাত অন্যান্য অসন্তুষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ না করতে পারে, সেটা খেয়াল করবেন রাজা। এসবেও কিছু না হলে, রাজা তাদের রাজকর আদায় এবং জরিমানা করার কাজে নিযুক্ত করবেন। কয়েকদিন এই কাজ করলেই, জরিমানা দিতে দিতে প্রজাদের অসন্তুষ্টি জন্মাবে তাদের ওপর। এই সুযোগে তাদের গুপ্তহত্যা করাবেন রাজা, অথবা কৃত্রিমভাবে জনসাধারণের কোপ সৃষ্টি করে তাদের এক-একজনকে মারবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু, এই জনকোপসৃষ্টির ব্যাপারেও প্রধান কাজটি করে গুপ্তচরেরাই।

পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, কারা শত্রুরাজার ওপর ক্রুদ্ধ, কারা শত্রুরাজার আচরণে, ভীত, কারা লোভী প্রকৃতির এবং কারা অহঙ্কারী মানী মানুষ—এসবই খুঁজে বার করবে গুপ্তচরেরা। শত্রুরাষ্ট্রের এই চারপ্রকারের মানুষ—ক্রুদ্ধ, ভীত, লোভী এবং মানী—এদের সবসময়ই শত্রুরাজার ওপর বীতশ্রদ্ধ করে তোলা যায়। ক্রুদ্ধ মানুষ (তারা রাজকর্মচারীও হতে পারেন)—তাদের আরও খেপিয়ে দিয়ে, ভীত মানুষকে আশ্রয় দিয়ে, লুব্ধ মানুষকে অর্থ এবং ভূসম্পত্তির ঘুষ দিয়ে, তথা মানী মানুষকে সম্মানের আশ্বাস দিয়ে নিজের রাজার অনুকূলে ভাঙিয়ে আনবে নিযুক্ত গুপ্তচরেরাই । অবশ্য, ভাঙিয়ে আনার পর তারা ঠিক ঠিক বিজিগীষু রাজার হয়েই কাজকর্ম করছে কি না, সেটার ওপরেও নজর রাখবে গুপ্তচরেরা।

[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (kangle) ১.১২; ১.১৩; ১.১৪]

চরক১ মহর্ষি পুলহের পুত্র। তামস মন্বন্তরের সাতজন ঋষিদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৪৮]

চরক২ কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্যতম ঋষি। কৃষ্ণ যজুর্বেদের মূল প্রবক্তা ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর শিষ্য । চরক প্রমুখরা যাজ্ঞবল্ক্যের থেকেই যজুর্বেদ শিক্ষা করেছিলেন। সেই কারণে পুরাণে যাজ্ঞবল্ক্যকে চরকের গুরু বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[বায়ু পু. ৬১.১০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.১৩]

☐ বায়ু পুরাণে একটি কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাকালে একবার ঋষিদের একটি বৃহৎ সম্মেলন হয়েছিল। সম্মেলনের আয়োজক ঋষি ঘোষণা করছিলেন—যে সকল ঋষিরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন না, তাঁরা ব্রহ্মহত্যার পাপে অভিযুক্ত হবেন। ঘটনাচক্রে বৈশম্পায়ন সেই সম্মেলনে অনুপস্থিত হওয়ার কারণে ব্রহ্মহত্যার পাপে অভিযুক্ত হন। তখন তিনি যাজ্ঞবল্ক্য এবং তৎশিষ্য চরক ইত্যাদিকে সেই ব্রহ্মহত্যার পাপ ভাগ করে নিতে বলেন। যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়ে গুরুর থেকে পাওয়া বিদ্যা বমন করে ত্যাগ করেন। তবে চরক প্রভৃতিরা গুরুর পাপ ভাগ করে নিতে সম্মত হন। পরবর্তী সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য স্বয়ং সূর্যদেবের কাছ থেকে যজুর্বেদ লাভ করেন। যাজ্ঞবল্ক্যপ্রণীত যজুর্বেদ শুক্লযজুর্বেদ নামে খ্যাত হয়। অপর দিকে বৈশম্পায়ন প্রণীত যজুর্বেদ কৃষ্ণযর্জুবেদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। চরক মূলত কৃষ্ণযর্জুবেদের ঋষি। চরকের শিষ্য পরম্পরায় প্রচলিত যজুর্বেদ কৃষ্ণযজুর্বেদের চরক শাখা নামে খ্যাত। এই শাখার ঋষিরা চরকের নামানুসারে চরকাধ্বর্যু নামে খ্যাত হয়েছিলেন। *[বায়ু পু. ৬১.১০, ২৩, ২৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.১৩]*

চরন্ত মহর্ষি আর্ষ্টিসেনের পুত্র। *[বায়ু পু. ৯২.৫]*

চরিষ্ণু১ অঙ্গিরসের বংশধারায় কীর্তিমান ও ধেনুকার পুত্র চরিষ্ণু। এঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ধৃতিমান; পুরাণে বলা হয়েছে চরিষ্ণু সহস্র কৃতিমান পুত্রের জনক।

বায়ু পুরাণের পাঠে অবশ্য চরিষ্ণুর পরিবর্তে বরিষ্ঠ নামটি পাওয়া যায়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১১.২০-২২; বায়ু পু. ২৮.১৭]

চরিষ্ণু২ সাবর্ণ মনুর দশটি পুত্রের একজন।

[মৎস্য পু. ৯.৩৩; বায়ু পু. ১০০.২২]

চরিষ্ণু৩ হরি নামক দেবগণের পিতা। চারিষ্ণব মন্বন্তরে বিকুণ্ঠার গর্ভে চরিষ্ণুর ঔরসে হরিদেবগণের জন্ম। হরিদেবগণ বৈকুণ্ঠ নামেও খ্যাত। *[বায়ু পু. ৬৭.৪০]*

চরু চরু বলতে যজ্ঞীয় দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন বোঝায়। তবে আর্য সভ্যতার আদিকাল থেকে খাদ্যবস্তু মাত্রেই প্রথমে দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত এবং তার পরে গ্রহণযোগ্য ছিল। সেই হিসাবে 'চরু'কে শুধুমাত্র অন্ন বা পাক করা শস্য হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। অমরকোষের টীকাকার এই ভাবনায় চরু শব্দের অর্থ করেছেন—যা খাওয়া

হয়, তাই চরু। বস্তুত সংস্কৃত 'চর্' ধাতুর অন্যতম অর্থ হল খাওয়া, ভক্ষণ করা, সুতরাং 'চর্' ধাতু থেকে উৎপন্ন 'চরু' শব্দের অর্থ হল—যা খাওয়া হয়—

চর্যতে ভক্ষ্যতে ইতি চরু।

[অমরকোষ (Jhalakikar) ২.ব্রহ্মবর্গ. ২২ (টীকা দ্রষ্টব্য)]

□ 'চরু' আর্যসভ্যতার অতি প্রাচীন অধ্যায় থেকে আর্যদের খাদ্যাভ্যাসের অঙ্গ হয়ে রয়েছে। ধরে নিতে হবে, যবে থেকে শস্য রান্না করে খাওয়ার পদ্ধতি শুরু হয়েছে, 'চরু' নামক খাদ্যটিও ঠিক ততটাই প্রাচীন।

এখন কথা হল, চরু রান্না করতে হয় কী ভাবে? প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে চরু পাক করার যে পদ্ধতি দেখা যাচ্ছে, তা থেকে বোঝা যায় 'চরু' হল ভাত রান্না করার আদি সংস্করণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন গ্রন্থের সূচনাতেই দেবতার উদ্দেশে চরু পাক করার কথা বলা হয়েছে। চরু সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে যেটুকু তথ্য এই গ্রন্থে পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে যে, চরু রান্না করতে হয় ভাতের মতোই, চাল সিদ্ধ করে। রান্না হয়ে যাওয়ার পর উপর থেকে দুধ বা গলিত ঘৃত ঢালতে হয় তাতে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদক Martin Haug বলছেন—Charu is boiled rice. It can be mixed with milk and butter; but it is no essential part. It is synomymous with Odanam, the common name of boiled rice.

পণ্ডিত Haug চরু কে ওদন বা ভাতের সমার্থক বলতে গিয়ে শতপথ ব্রাহ্মণের মত উদ্ধার করেছেন। শতপথ ব্রাহ্মণ স্পষ্টই জানাচ্ছে—চরু দেবতাদের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন বা ওদন—

চরুর্বৈ দেবানামন্নমোদনো হি চরু রোদনো
হি প্রত্যক্ষমন্নং তস্মাচ্চরুর্ভবতি।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (Haug) ১.১; শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ৪.৪.২.১]

□ শতপথ ব্রাহ্মণের উল্লেখ থেকে পরিষ্কার, আমরা যাকে রান্না করা ভাত বলে বুঝি, তার সঙ্গে চরুর খুব একটা পার্থক্য কিছু নেই। তবে শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত প্রত্যক্ষ অন্ন শব্দটা লক্ষ্য করার মত। জৈমিনীয় মীমাংসা দর্শনের শবরভাষ্য টীকায় চরু বা ওদন পাক করা সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, চাল সিদ্ধ করে চরু পাক করতে হবে। কিন্তু জলের মাপ এবং সিদ্ধ করার মাত্রা এমন হতে হবে, যাতে চাল সিদ্ধ হলেও গলে না যায়, ঝরঝরে থাকে। জলও এমন বেশি না হয় যে ফ্যান ঝাড়তে হবে—Cooked rice from which water was not strained was called Caru. সুতরাং স্পষ্ট বোঝা গেল যে চরু বিশেষ কোনো খাদ্য নয়, আমরা আজও যা প্রত্যহ খাই, সেই আদি অকৃত্রিম ভাত।

[মীমাংসাদর্শন (আনন্দাশ্রম) ১০.১.৪২, শবরস্বামীকৃত টীকা দ্রষ্টব্য; (Om Prakash, Food and Drinks in Ancient India (From earliest times to 1200 AD), Delhi: Munshiram Manaharlal, 1961, p. 170, 285]

□ তবে একথা ঠিক যে আমরা এখনও যেমন বিভিন্ন চাল নানাভাবে রান্না করি, প্রাচীনকালেও তেমনই নানা বিচিত্র পদ্ধতিতে চাল রান্না করা হত। যদি দুধে সিদ্ধ করে পায়েসের মতো রান্না করা হত, তখন সেই চরুকে বলা হত ক্ষীরৌদন। শতপথ ব্রাহ্মণে এই 'ক্ষীরৌদন' পাক করার পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ২.৫.৩.৪]

□ চালের সঙ্গে ডাল বা অন্য শস্য মিশিয়ে যে খিচুড়ি রান্নার পদ্ধতি এখনও প্রচলিত আছে, সেটিরও জন্ম এই প্রাচীন কালেই। Martin Haug লিখছেন—There are different varieties of this dish; some being prepared with the addition of barley or some other grains. কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতায় দেখা যাচ্ছে, কোন বৈদিক দেবতার চরু কীভাবে প্রস্তুত করা হবে, তার একটা তালিকা দেওয়া আছে। যেমন সোমের জন্য এবং পশুপতি রুদ্রের জন্য ব্রীহিধানের চরু, সবিতার জন্য শ্যামা ধানের চরু, বৃহস্পতির জন্য গাবীধুক (একরকম শস্য)-এর চরু, ইন্দ্রের জন্য নিবার ধানের চরু ইত্যাদি। ঠিক তেমনই যবময় চরু পাক করার কথাও উল্লিখিত হয়েছে।

[তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম) ১.৮.১০.১; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (English translation by Haug) p.4]

□ অথর্ববেদ এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থেও চরু পাক করার উল্লেখ মেলে। তবে আপস্তম্ব

শ্রৌতসূত্রে চরু পাক করার একটা পদ্ধতি পাওয়া যায়। এখানে বলা হচ্ছে—গার্হপত্য অগ্নিতে প্রথমে চরু পাক করার বাসনটি রাখতে হবে। সেটি গরম হয়ে উঠলে প্রথমে চাল দিতে হবে তার মধ্যে, তারপর উপর থেকে ফুটন্ত জল ঢেলে দিতে হবে। চাল সিদ্ধ হবার পর নামিয়ে নিতে হবে।

[আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র (Garbe) ২৪.৩.২৫-২৮]

□ মহাভারতে এবং পুরাণে অসংখ্যবার চরু পাক করার প্রসঙ্গ এসেছে। এর মধ্যে মহর্ষি ঋচীকের আপন পত্নী এবং শ্বশ্রূমাতার জন্য চরুপাক করার কাহিনীটি যথেষ্ট বিখ্যাত।

[দ্র. ঋচীক]

চর্মকোটিতীর্থ একটি উত্তম পিতৃতীর্থ। এখানে শ্রাদ্ধকার্য অত্যন্ত শুভ ফলদায়ক।

[মৎস্য পু. ২২.৪২]

চর্মবান্ গান্ধাররাজ শকুনির কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের মধ্যে একজন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দশম দিনে শকুনির যে ছয় ভাই অর্জুনপুত্র ইরাবানের হাতে নিহত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে চর্মবান্ ছিলেন অন্যতম।

[মহা (k) ৬.৯০.২৭; (হরি) ৬.৮৭.২৭]

চর্মবর্মভৃৎ বৃষ্ণিবংশীয় যুধাজিতের দুই পৌত্রের মধ্যে একজন শ্বফল্ক অন্যজন চিত্রক। এই চিত্রকের পুত্র হলেন চর্মবর্মভৃৎ। *[বায়ু পু. ৯৬.১১৪]*

চর্মমণ্ডল একটি প্রাচীন উত্তর ভারতীয় জনপদ।

[মহা (k) ৬.৯.৪৭; (হরি) ৬.৯.৪৭;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৪৬]

চর্মী শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে অন্যতম নাম। রুদ্র-শিবের যে মূর্তি কল্পনা করা হয়, তা ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত মূর্তি। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করেন, গজাসুর বধের সময় গজাসুরের অনুরোধে তার গজচর্মটিও মহাদেব পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং পশুচর্মই তাঁর পরিধেয় বস্ত্র—এই ভাবনা থেকেই মহাদেব চর্মী নামে খ্যাত—

চর্মী চর্ম ব্যাঘ্রস্য গজস্য বা কৃত্তিস্তদ্বান্।

[মহা (k) ১৩.১৭.৩২; (হরি) ১৩.১৬.৩২]

চর্ষণি ভাগবত পুরাণের একটি শ্লোকে অর্যমার ঔরসে মাতৃকার গর্ভজাত পুত্রদের ব্রহ্মা চর্ষণি নামে উল্লেখ করেছেন। এঁদের থেকেই মনুষ্য জাতির উৎপত্তি এমন কথাও বলা হয়েছে—

অর্যম্নো মাতৃকা পত্নী তয়োশ্চর্ষণয়ঃ সুতাঃ।
যত্র বৈ মানুষী জাতির্ব্রহ্মণা চোপকল্পিতা॥

[ভাগবত পু. ৬.৬.৪২; ১০.২৯.২]

এমন পৌরাণিক ভাবনার কারণ—অতি প্রাচীন কাল থেকে 'চর্ষণি' শব্দটি মানুষ বা জনসাধারণের পর্যায়-শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে; ঋগ্‌বেদ বহু মন্ত্রে সাধারণ মানুষ বোঝাতে 'চর্ষণি' শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে। প্রজাপালক রাজাকে বহুবার জনসাধারণের রাজা—রাজা চর্ষণিনাম্ বলা হয়েছে। বৈদিক গ্রন্থগুলি এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রের পণ্ডিতদের মতে—'চর্ষণি' শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'কৃষ্' ধাতু থেকে। যারা কৃষির জন্য ভূমি কর্ষণ করে, তারাই চর্ষণি বা প্রচলিত ভাষায় কৃষক। কৃষিপ্রধান আর্যসমাজে জনসাধারণ মূলত কৃষিজীবি ছিল বলেই কৃষকরা এবং জনসাধারণ অভিন্নরূপেই 'চর্ষণি' নামে অভিহিত হয়ে গিয়েছে। লক্ষণীয়, আমাদের বাংলা ভাষায় এখনও 'কৃষ্' ধাতু থেকে উৎপন্ন এবং 'চর্ষণি'র সঙ্গে ধ্বনিগত সাদৃশ্যযুক্ত 'চাষা' বা 'চাষী' শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

[শব্দকল্পদ্রুম vol. 2, p. 438;
Vedic Index, vol. 1, p. 257;
ঋগ্‌বেদ ১.৮৬.৫; ১.১৮৪.৪; ৩.৪৩.২; ৪.৭.৪;
৩.১০.১; ৫.৩৯.৪; ৬.৩০.৫; অথর্ববেদ ৮.১.৩৮]

চর্ষণী বরুণের পত্নী। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার থেকে যে ভৃগু ঋষির উৎপত্তি হয়েছিল, তিনিই চর্ষণীর গর্ভে বরুণের ঔরসে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন।

[ভাগবত পু. ৬.১৮.৪]

চল কৃষ্ণপিতা বসুদেবের ঔরসে মদিরার গর্ভজাত পুত্র চল। *[বায়ু পু. ৯৬.১৬৯]*

চলকুণ্ডল পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি চলকুণ্ডলের বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি ভৃগুর বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৫.২৭]

চলি পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি চলির বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি ভৃগুর বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৫.৩৭]

চষাল পশুযাগের সময় পশুবন্ধনের জন্য ব্যবহৃত যূপের মাথায়-পরানো এবং আটকে রাখা মুকুটের

বৈদিক নাম। মহাভারতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহারাজ দিলীপের প্রশংসা করার সময় বলা হয়েছে—দিলীপের যজ্ঞে যজ্ঞীয় পশুবন্ধনের জন্য যূপটি সুবর্ণনির্মিত ছিল—

যস্য যজ্ঞে মহানাসীৎ যূপঃ শ্রীমান্ হিরণ্ময়ঃ।

সেই যূপের ওপরে চষালটিও ছিল সুবর্ণময়। আমরা বৈদিক ভাবনা থেকে বুঝতে পারি—যূপের দুই দিক থেকে ওঠা দুদিকের কাঠের মাথাতেই টোপর পরানো হত বলে মনে হয়। কেননা দিলীপের যজ্ঞীয় যূপে চষাল দুটিও সুবর্ণময় বলে বলা হয়েছে—

চষালে যস্য সৌবর্ণে তস্মিন্ যূপে হিরন্ময়ে।

মহাভারতের অন্যত্র অবশ্য সাধারণ যজ্ঞ-সামগ্রীর মধ্যেই চষালের নাম করা হয়েছে এবং রাজা অমূর্তরয়া বা গয়ের যজ্ঞের সাত-সাতটা যূপের মাথায় সুবর্ণ-চষাল দেওয়া হয়েছিল—

সপ্তৈকৈকস্য যূপস্য চষালাশ্চোপরি স্থিতাঃ।

[মহা (k) ১২.২৯.৭৪-৭৫; ৩.১২১.৫-৬;
(হরি) ১২.২৯.৭২-৭৩; ৩.১০১.৫-৬]

চাক্ষুষ১ ষষ্ঠ মন্বন্তরের অধিপতি, মনু। ইনি প্রথম জন্মে ব্রহ্মার চক্ষু থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। পরজন্মে রাজর্ষি অনমিত্রের ঔরসে রানী ভদ্রার গর্ভে জাতিস্মর রূপে তাঁর জন্ম হল। কিন্তু পূর্বজন্মে ব্রহ্মার চক্ষু থেকে উৎপন্ন হওয়ায় এই জন্মেও তাঁর নাম হল চাক্ষুষ।

শিশু চাক্ষুষকে কোলে নিয়ে তাঁর মাতা ভদ্রা তাঁকে আদর করছিলেন। তাতে জাতিস্মর চাক্ষুষ হঠাৎই একটু হেসে উঠলেন। তা দেখে তাঁর মাতা ভীত ও ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে শিশু চাক্ষুষ বললেন—সামনে ওই বিড়ালটি আমাকে খাবে বলে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, এই জাতহারিণী (জন্মমাত্রেই যারা শিশু হরণ করে) আমাকে খাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এদের কাছে আমি অপরিচিত, তবু নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা আমার আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। আপনিও তেমনি নিজের স্বার্থেই সম্পূর্ণ অপরিচিত আমাকে এমন আদর করছেন, সেটা দেখেই আমার হাসি পেল। একথা শুনে চাক্ষুষের মাতা ক্রুদ্ধ হয়ে শিশুকে ফেলে রেখে সূতিকাগৃহ ছেড়ে চলে গেলেন। এই সময় জাতহারিণী এসে চাক্ষুষকে হরণ করে বিক্রান্ত নামক রাজার ঘরে তাঁর পত্নী হৈমনীর সদ্যোজাত পুত্রের স্থানে চাক্ষুষকে রেখে সেই শিশুটিকে নিয়ে বিশালগ্রামবাসী এক ব্রাহ্মণের ঘরে রাখল। তারপর ব্রাহ্মণের শিশুপুত্রটিকে ভক্ষণ করল।

এদিকে বিক্রান্ত রাজা চাক্ষুষকেই নিজের পুত্ররূপে পালন করতে লাগলেন এবং তাঁর নাম রাখলেন আনন্দ। উপনয়নের পর রাজগুরু আনন্দকে বললেন—মাতাকে প্রণাম কর। আনন্দ জিজ্ঞাসা করলেন—কোন মাতাকে প্রণাম করব? জন্মদাত্রীকে না পালনকারিণীকে? একথা শুনে গুরু তাঁর এই প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। জাতিস্মর, মহাজ্ঞানী চাক্ষুষ তাঁর জন্ম ও জাতহারিণী কর্তৃক অপহরণের সম্পূর্ণ কাহিনী গুরুকে জানালেন। জন্মপরবর্তী এই জটিল পরিস্থিতি বালক চাক্ষুষের মনে বৈরাগ্যের জন্ম দিল। তিনি সংসার ত্যাগ করে বনে গিয়ে আত্মার শুদ্ধি ও মুক্তিলাভের জন্য কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। তখন ব্রহ্মা এসে চাক্ষুষকে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করে মন্বন্তরাধিপতি মনু রূপে প্রজাপালনের আদেশ দিলেন। ব্রহ্মার উপদেশে চাক্ষুষ তপস্যা থেকে বিরত হলেন এবং চাক্ষুষ মনু রূপে বিখ্যাত হলেন। উগ্র নামক রাজার কন্যা বিদর্ভা চাক্ষুষ মনুর পত্নী ছিলেন। তাঁর গর্ভে চাক্ষুষ মনুর উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন প্রভৃতি পরাক্রমশালী পুত্রের জন্ম হয়। *[মার্কণ্ডেয় পু. ৭৬ অধ্যায়]*

☐ মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণেও ষষ্ঠ মন্বন্তরের অধিপতি চাক্ষুষ মনুর বিবরণ মেলে। মহাভারতে চাক্ষুষ মনুর পুত্র বরিষ্ঠের নাম উল্লিখিত হয়েছে। বিষ্ণু ও বায়ু পুরাণ মতে চাক্ষুষ মনু ছিলেন রিপুর ঔরসে বৃহতীর গর্ভজাত পুত্র। ভাগবত পুরাণ মতে তিনি উত্তানপাদের বংশধারায় সর্বতেজার ঔরসে আকৃতির গর্ভে জাত পুত্র। বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নড্বলা তাঁর পত্নী ছিলেন। এই নড্বলার গর্ভেই চাক্ষুষ মনুর দশ পুত্র সন্তানের জন্ম হয়।

[মহা (k) ১৩.১৮.২০; (হরি) ১৩.১৭.২০;
ভাগবত পু. ৪.১৩.১৫; ৮.৫.৭-৯;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১.১০৫;
বিষ্ণু পু. ১.১৩.২-৩; ৩.১.৬;
বায়ু পু. ৩০.৩৭; ৬২.৩, ৮৮-৮৯]

চাক্ষুষ২ ভাগবত পুরাণ মতে বৈবস্বত মনুর পুত্র অগ্নীধ্রের বংশধারায় খনিত্রের পুত্র ছিলেন চাক্ষুষ। এই চাক্ষুষ বিবিংশের পিতা। *[ভাগবত পু. ৯.২.২৪]*

চাক্ষুষ৩ চাক্ষুষ মন্বন্তরে রাজা প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতা, চাক্ষুষ নামে এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। তবে ইনি যে চাক্ষুষ মনু নন, পুরাণে তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বৃক্ষকন্যা মারিষা এই চাক্ষুষ রাজার পত্নী ছিলেন। চাক্ষুষের ঔরসে মারিষার গর্ভে মহাদেবের হাতে নিহত দক্ষপ্রজাপতি পুনর্জন্ম লাভ করেন। *[বায়ু পু. ৩০.৬০-৬১, ৭৪-৭৫]*

চাক্ষুষ৪ যযাতির পুত্র অনুর তিন পুত্র সন্তানের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চাক্ষুষ। *[মৎস্য পু. ৪৮.১০]*

চাক্ষুষ৫ ভবিষ্যতে চতুর্দশ ভৌত্য মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন চাক্ষুষ তার মধ্যে অন্যতম একটি গণ। সাতজন বিশিষ্ট দেবতাকে নিয়ে এই গণ নির্মিত। *[ভাগবত পু. ৮.১৩.৩৪; বায়ু পু. ১০০, ১১২; ১১১.১০০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.১০৬-১০৭; বিষ্ণু পু. ৩.২.৪২-৪৩]*

চাটুহাস গয়াসুরের দেহের উপর প্রজাপতি ব্রহ্মা এক যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের একজন ঋত্বিক চাটুহাস। *[বায়ু পু. ১০৬.৩৮]*

চাণক্য জনৈক প্রাচীন রাজর্ষি। কথিত আছে, নর্মদা তীরবর্তী শুক্লতীর্থে স্নান, দানধ্যান এবং তপস্যার ফলে রাজর্ষি চাণক্য সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯২.১৪]*

চাণূর১ মথুরারাজ কংসের অনুচর এক বিশিষ্ট মল্ল যোদ্ধা। চাণূর প্রকৃত পক্ষে করূষ দেশের অধিবাসী। কংস জরাসন্ধের আশ্রয়ে থাকা যে সব অনুচরদের সাহায্যে যদুবংশীয়দের সঙ্গে বিরোধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে চাণূর একজন। ভাগবত পুরাণে কংস অনুগামী বাণাসুর, নরকাসুর প্রভৃতিদের সঙ্গে একত্রে চাণূরের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

[ভাগবত পু. ১০.২.১-২; হরিবংশ পু. ২.৩০.২৩]

□ মল্লযুদ্ধে চাণূরের পটুতার বিবরণ কংসের নিজের মুখেই শুনতে পাওয়া যায়। কংস মল্লভূমিতে চাণূরকে 'বজ্র-সদৃশ' বলে বর্ণনা করেছেন। *[ভাগবত পু. ১০.৩৬.৩২]*

□ ব্রজধামে বলরাম ও কৃষ্ণ কংসের মৃত্যুর কারণ হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন—এ সংবাদ শোনা মাত্র মথুরার রাজা কংস একটি বিশেষ আপৎকালীন সভার আয়োজন করবেন বলে স্থির করেন। অক্রূরকে কংস দায়িত্ব দিয়েছিলেন ব্রজভূমি থেকে বলরাম ও কৃষ্ণকে মথুরায় মল্ল যুদ্ধের সভায় আহ্বান করে নিয়ে আসার। কংস পরিকল্পনা করেছিলেন যে, প্রথমত একটি মত্ত হস্তী দিয়ে তাঁদের পদপিষ্ট করে ফেলতে হবে। যদি সে কৌশল চরিতার্থ না হয়, তবে কংস চাণূর প্রভৃতি বীর মল্ল যোদ্ধাদের প্রতি কৃষ্ণ এবং বলরামকে যুদ্ধে প্ররোচিত করবেন এবং শেষপর্যন্ত চাণূর মুষ্টিকের হাতেই তাঁদের মল্লযুদ্ধে মেরে ফেলা হবে। এমনকী কৃষ্ণ ও বলরামের নিধন করতে পারলে চাণূর, মুষ্টিক প্রভৃতিকে উপহারে রাজ্য-ভাগ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তবে কংসের এই পরিকল্পনার কথা দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণের কাছে ব্যক্ত করেন। দেবর্ষি যুদ্ধে কৃষ্ণের হাতে চাণূরের মৃত্যু দৃশ্য দেখার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন।

[ভাগবত পু. ১০.৩৬.২১-৪০; ১০.৩৭.১৬; বিষ্ণু পু. ৫.১৫.৭,১৬; ৫.২০.১৭-২০; হরিবংশ পু. ২.২৮.১-২৯]

□ কংসের পরিকল্পনা আপাতভাবে নিখুঁতই ছিল। যুদ্ধসভার দ্বারে উপস্থিত কুবলয়াপীড় নামক বিশালাকার হস্তীটি কৃষ্ণ ও বলরামকে পিষে ফেলতে উদ্যত হল। কিন্তু অচিরেই ব্রজধাম থেকে আগত এই দুই বালকের বিক্রমের কাছে মহাহস্তীকে পরাস্ত হয়ে প্রাণ হারাতে হল। তাঁদের বল ও শৌর্য্যে তখন সমগ্র উৎসবস্থল মুখরিত। সেখানে উপস্থিত মথুরাবাসীগণ কৃষ্ণ ও বলরামকে দেখে মুগ্ধ। এমত পরিস্থিতিতে চাণূরের নেতৃত্বে কংসের অনুগত মল্ল যোদ্ধারা তাঁদের মল্ল যুদ্ধের আহ্বান জানান। চাণূরই তাঁদের জানান যে, বাহুযুদ্ধে কৃষ্ণ ও বলরামের বহুশ্রুত নৈপুণ্যের সাক্ষী হতে চান মথুরার রাজা কংস। শাস্ত্রাচার অনুযায়ী এবং দর্শক-প্রজা উভয়ের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য কৃষ্ণ ও বলরামকে মল্লযুদ্ধের আহ্বান স্বীকার করতে বলেন চাণূর। তিনি কোনো পরিস্থিতিতেই কৃষ্ণ ও বলরামকে মল্লযুদ্ধ থেকে মুক্তি দিতে রাজী নন। তাই চাণূর একের পর এক যুক্তির অবতারণা করতে লাগলেন। গো-পালক বনবাসী বলে মল্লযুদ্ধ শিক্ষা নেই এই যুক্তিও চাণূর মানতে রাজি নন, কারণ বনমধ্যে মল্লযুদ্ধ ক্রীড়া করতে করতেই গোপ বালকরা গো-চারণ করতে অভ্যস্ত। কৃষ্ণ তাঁর ও বলরামের সঙ্গে কংস অনুমোদিত মল্ল যোদ্ধাদের বয়সের পার্থক্য সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেন। কিন্তু বলশালী হস্তীর বিনাশ নিজ চোখে দেখার পর

চাণূর কৃষ্ণ-বলরামের বালকত্ব মানতে অরাজী হলেন। চাণূর তাঁদের দুজনকে একত্রে ধর্মসম্মত যুদ্ধে আহ্বান জানালেন। হরিবংশ পুরাণে বলা হয়েছে যে, কংসের নির্দেশেই চাণূর কৃষ্ণকে মল্লযুদ্ধের জন্য বেছে নিয়েছিলেন—

কংসেনাপি সমাজ্ঞপ্তশ্চাণূরঃ পূর্বমেব তু।
যোদ্ধব্যং সহ কৃষ্ণেণ ত্বয়া যত্নবতেতি বৈ।।

[ভাগবত পু. ১০.৪৩.১-৪০; বিষ্ণু পু. ৫.২০.৩০-৪০; হরিবংশ পু. ২.২৮.৩০-৩৫; ২.২৯.২৪-৩৬]

□ এরপর কৃষ্ণের সঙ্গে চাণূরের এবং বলরামের সঙ্গে মুষ্টিকের যুদ্ধ শুরু হল। তাঁরা একে অপরকে মস্তক ও পা দিয়ে রোধ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ ও চাণূর পরস্পরকে অরত্নি (কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত হাতের অংশ), দুই জানু মস্তক ও বক্ষঃস্থল দিয়ে আঘাত করলেন। চালন, অধঃক্ষেপণ ইত্যাদি মল্ল যুদ্ধের নানা কৌশল এখানে প্রযুক্ত হল। উপস্থিত দর্শকরা যুদ্ধের ভীষণতায় চমকে উঠলেন। চাণূর ইত্যাদি পূর্ণবয়স্ক ও কুশলী মল্ল যোদ্ধাদের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরামের মতো বালকের যুদ্ধকে তাঁদের অধর্ম বলে মনে হল। দর্শকরা অনেকেই সে কারণে যুদ্ধস্থল ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন।

যুদ্ধে কৃষ্ণের আক্রমণে চাণূর বারবার আহত হলেন। তাঁর সমস্ত শরীরে প্রবল ব্যথা অনুভূত হল। কিন্তু চাণূর সহজে পরাজয় স্বীকার করার পাত্র নন। তিনিও শ্যেন পক্ষীর মত তীব্র বেগে কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে আঘাত করলেন। প্রবল আঘাতেও কৃষ্ণ অবিচল। তিনি চাণূরের বাহুদ্বয় হাতে ধরে সবেগে তাঁকে মাটিতে ছুড়ে ফেললেন। স্রস্তকেশ, স্রস্তবেশ চাণূর ভূপতিত হলেন। অন্যদিকে বলরামও মুষ্টিক নিধনপর্ব সম্পন্ন করলেন।

চাণূর ও মুষ্টিকের মৃত্যুর পর তাঁদের অনুগামী অন্যান্য মল্ল যোদ্ধারা প্রাণভয়ে পলায়ন করলেন। কংস ব্যতীত উপস্থিত অন্যান্য সকলেই সাধু সাধু রবে কৃষ্ণ ও বলরামের প্রশংসা করতে লাগলেন।

[ভাগবত পু. ১০.৪৪.১-৩০; বিষ্ণু পু. ১০.২০.৫২-৬৭; হরিবংশ পু. ২.৩০.১২-৪৭]

□ পুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণের চাণূর বধের ঘটনা এতটাই প্রসিদ্ধিলাভ করেছে যে, মহাকাব্য পুরাণে বহুবার কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন— এই ভাবনায় ভগবান বিষ্ণুও চাণূরসূদন, চাণূরঘ্ন, চাণূরমর্দন, ইত্যাদি নামে সম্বোধিত হয়েছেন।

চাণূর২ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক একজন রাজা। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের ময়দানব নির্মিত সভাগৃহে যেসব নৃপতিরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে চাণূর একজন। *[মহা (k) ২.৪.২৬; (হরি) ২.৪.১০ নং শ্লোক পরবর্তী পাদটীকা দ্রষ্টব্য]*

চাণূর৩ বারাহ নামক অতি দুর্দম দৈত্যের ঔরসে চাণূরের জন্ম হয়। *[দেবী ভাগবত পু. ৪.২২.৪৫]*

চাতকি পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি চাতকির বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি ভৃগুর বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৫.২৩]

চাতুর্বর্ণ্য ভারতবর্ষের সমাজটাকেই বর্ণাশ্রমিক সমাজ বলা হয়। অর্থাৎ চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম এই সমাজের গঠনতন্ত্রের মতো।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণ ভারতীয় সমাজকে চার ভাগ করে দিয়েছিল, যদিও অনেকেই মনে করেন যে, বর্ণ এবং জাতি একই ভাবনা নয়। বর্ণ বলতে ওই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ইত্যাদি চারটি সামাজিক বিভাগ। ওই চার বর্ণের মধ্যে সমান বর্ণের নারী-পুরুষের ছেলে-মেয়েরাও বাবা-মায়ের বর্ণ-পরিচয় লাভ করত। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের নারী-পুরুষ যখন বিষম বর্ণের মিলনের মাধ্যমে পুত্র-কন্যার জন্ম দিতেন, তখন সেই পুত্র-কন্যারই জাতিত্বের প্রশ্ন আসত। পরবর্তী কালে জাতি এবং বর্ণের তত্ত্ব প্রায় একাকার হয়ে গেছে, কিন্তু আগে তেমন ছিল না। চতুর্বর্ণ ছাড়াও বহুতর জাতি প্রাচীন বৈদিককালেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল এবং কালে কালে জাতির সংখ্যা বহুসংখ্যায় বেড়ে গিয়েছে—

Actually, the term 'caste' refers to not one but two institutions: *varna* and *jaati*. Varna (literally, 'colour') is the ancient division of Hindu society into the priest (brahmin), warrior (*kshatriya*), tradesman (*vaishya*) and servant (*shudra*) classes—in that order of ranking—which is encountered in the Vedas and other founding texts of Hinduism. This fourfold classification is still used to locate a person in the wider social space, as when political commen-

tators speak of mobilizing the brahmin, vaishya or the backward castes (as the shudras are now called) to vote in a state election.

However, caste today almost always refers to jaati, which is caste in all the immediacy of daily social relations and occupational specialization. The jaati system is made up of more than three thousand castes. The hierarchical order of these castes is not static but changes from village to village and from one region to another...

[Sudhir Kakar & Katharina Kakar, The Indians: Portrait of a People, Penguin India : New Delhi, 2007, pp. 25-26]

□ চতুর্বর্ণের যে বিভাগ পরবর্তীকালে বিরাট এক সামাজিক বৈষম্যের জন্ম দিয়েছে, সেই বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে মহাভারত একটি অসামান্য তথ্য নিবেদন করেছে। মহাভারত বলেছে— সভ্যতার প্রথম কালে বর্ণের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। সমস্ত মানুষের জন্ম ব্রহ্মা থেকেই হয়েছে বলে সকলেই ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত ছিলেন। তারপর যারা যেরকম কাজ করতে লাগল, সেই কর্ম অনুসারেই তাদের বর্ণ নির্ধারিত হল—

* অসৃজদ্ ব্রাহ্মণানেব পূর্বং ব্রহ্মা প্রজাপতীন্।
* ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্মভির্বর্ণতাং গতম্॥

[মহা (k) ১২.১৮৮.১; ১২.১৮৮.১০; (হরি) ১২.১৮১.১; ১২.১৮১.১০]

এটা খুব বড়ো একটা কথা যে, স্বাভাবিক নিয়মেই একটা শুদ্ধ নির্মল অবস্থা থেকে পরবর্তী সময়ে বিকারগুলি তৈরি হয়। এখানে মহাভারতে দেখা যাচ্ছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সম্বন্ধে বর্ণ শব্দটাকে রঙের পর্যায় শব্দ হিসেবে ব্যবহার করে বলা হচ্ছে—ব্রাহ্মণের বর্ণ হল সাদা (সিত/শ্বেত), ক্ষত্রিয়দের লাল (রক্ত), বৈশ্যদের হলুদ (পীত) এবং শূদ্রদের বর্ণ হল কালো (অসিত, কৃষ্ণ)—

ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাং তু লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা॥

টীকাকারেরা বুঝিয়ে বলেছেন যে, প্রকৃতির মধ্যে যেমন সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ নিহিত আছে, তেমনই সেই সেই গুণের প্রতিরূপেই সিত-রক্ত-পীত অর্থাৎ সাদা, লাল, হলুদ এবং মিশ্রবর্ণের ভাবনা এবং সেই সেই বর্ণের অনুরূপ প্রকৃতি অনুসারে ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণাত্মক শ্বেতবর্ণের প্রতিভূ, ক্ষত্রিয়েরা রজোগুণাত্মক রক্তবর্ণের প্রতিভূ, বৈশ্যেরা রজস্তমের মিশ্রগুণ পীতবর্ণের অধিকারী আর শূদ্রেরা তমোগুণাত্মক কৃষ্ণবর্ণের প্রতিভূ।

টীকাকার নীলকণ্ঠ আরও পরিষ্কার করে বলেছেন—সত্ত্বগুণ হল স্বচ্ছ এবং প্রকাশ-স্বভাব, ব্রাহ্মণ সেই সত্ত্বগুণের অধিকারী। রজোগুণ প্রবৃত্তি, উৎসাহ, উদ্যম তৈরি করে; শৌর্য্য-বীর্য্য প্রকট হয়ে ওঠে রজোগুণের প্রভাবে। রক্তবর্ণ রজোগুণের দ্যোতক, ক্ষত্রিয়রা তাই রক্তবর্ণের প্রতিরূপ। পীতবর্ণ রজস্তমের মিশ্রণ, কৃষিকর্ম, পশুপালন, বাণিজ্য এই ধরনের কাজগুলি ওই বিমিশ্র গুণের কর্ম, বৈশ্যরা তাই পীতবর্ণের প্রতিরূপ। আর অসিত কৃষ্ণবর্ণ আবরক তমোগুণের দ্যোতক, স্বয়ং কোনো কর্মে প্রবৃত্ত হয় না, সতত পরের দ্বারা প্রেরিত হয়ে কাজ করে, তাই শূদ্রেরা কৃষ্ণবর্ণের প্রতিরূপ—

সিতঃ স্বচ্ছঃ সত্ত্বগুণঃ প্রকাশাত্মা
শমদমাদিস্বভাবঃ। লোহিতঃ
রজোগুণঃ প্রবৃত্ত্যাত্মা শৌর্য্য-তেজ-
আদিস্বভাবঃ। পীতকঃ
রজস্তমোব্যামিশ্র-কৃষ্যাদিনিহীনকর্ম -
প্রবর্তকঃ। অসিতঃ কৃষ্ণঃ
আবরণাত্মা তমোগুণঃ স্বতঃ প্রকাশ-
প্রবৃত্তিহীনঃ শকটবৎ পরপ্রের্য্যঃ।

[মহা (k) ১২.১৮৮.৪-৫; (হরি) ১২.১৮১.৪-৫ (নীলকণ্ঠকৃত টীকা)]

□ বস্তুত জাতিবর্ণ-বিভাগ চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টির প্রসঙ্গে একাথাটা স্বীকার করতেই হবে যে, বৈদিক যুগের শেষ ভাগেই চতুর্বর্ণের একটা ভাগ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে ঋগ্‌বেদের বিখ্যাত পুরুষসূক্তে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের বিভাগ তৈরি করা হয়েছে বিরাট পুরুষের অঙ্গ হিসেবে। পুরুষসূক্তে বলা হয়েছে—এই বিরাট পুরুষের মুখ থেকে সৃষ্টি হল ব্রাহ্মণের, দুই বাহু থেকে সৃষ্টি হয় রাজন্যের, উরু থেকে জন্মালেন বৈশ্যেরা এবং তাঁর দুই চরণ থেকে জন্মালেন শূদ্রেরা—

ব্রাহ্মণো'স্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্‌বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো'জায়ত॥

মহাভারতের ভীষ্মপর্বে ঠিক একই কথা বলা হয়েছে বৈদিক পরম্পরা অক্ষরে অক্ষরে ধারণ করে—

মুখতো'সৃজদ্ বিপ্রান্ বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াংস্তথা।
বৈশ্যাংপ্যু তো রাজন্ শূদ্রান্ বৈ পাদতস্তথা॥

পণ্ডিতেরা অনেকেই মনে করেন ঋগ্‌বেদের প্রথম কল্পে চতুর্বর্ণের কোনো স্পষ্ট রূপ দেখা যায়নি। ঋগ্‌বেদ-সৃষ্টির মূল পর্বে জাতির বিভাগ ছিল সহজ-সরলভাবেই দুই প্রকার—আর্য এবং দাস—দাসস্য বা মঘবন্নার্যস্য বা। পরে যখন চতুর্বর্ণের স্পষ্টতায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই ধরনের জাতি-বর্ণের সমাজ গড়ে উঠল, তখন এই দাস-জাতীয় মানুষেরাই শূদ্রবর্ণভুক্ত হয়ে গেছেন হয়তো অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে দাস অর্থে শূদ্র শব্দেরই ব্যবহার ঘটেছে। কেননা এখানে 'আর্য' শব্দের বিপরীতে দাস কথাটা ব্যবহার না করে শূদ্র কথাটাই এসেছে সোজাসুজি। ঋগ্‌বেদের অষ্টম মণ্ডলের একটি সূক্তে পর পর তিনটি ঋকে ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ), ক্ষত্র (ক্ষত্রিয়) এবং বিশ্ (বৈশ্য) জাতির নাম বলা হলেও, শূদ্রের জাতি-চতুর্থতা তখনও স্পষ্ট হয়নি—এটাও যেমন হতে পারে, তেমনই দাসবর্ণ হিসেবে এঁদের কথায় উদাসীন থেকেছেন ঋষি, এটাও তেমনই হতে পারে। আরও একটা তথ্য খুব প্রকট যে, বৈদিক যুগেই চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের নির্দিষ্ট বৃত্তিভেদ প্রথম বৈদিক কালে তৈরি হয়নি এবং বর্ণগত দিক থেকে ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ছেলে ক্ষত্রিয় এইরকম পুরুষানুক্রমিকতাও কিন্তু তৈরি হয়নি। এটা ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্র থেকে একেবারে প্রমাণ হয়ে যায়। এখানে বলা হচ্ছে—

সকলের কাজ একরকম নয়, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কাজ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। আমাদের কাজও নানা রকম। দ্যাখো, তক্ষা (ছুতোর) কাষ্ঠ তক্ষণ করে, বৈদ্য রোগের প্রার্থনা করে, স্তোত্র পাঠক যজ্ঞকারী ব্যক্তিকে ধরতে চায়। দ্যাখো, আমি স্তোত্রকার, আমার পুত্র চিকিৎসক, আমার মেয়ে পাথরের জাঁতা দিয়ে যব ভাঙে। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করছি। গোরু যেমন খাদ্যের আশায় গোষ্ঠে বিচরণ করে, আমরাও তেমনি ধনকামনায় তোমার পরিচর্যা করছি, ইন্দ্রদেবত্ত—

নানানং বা উ নো ধিয়ো বি ব্রতানি জনানাম্।
তক্ষা রিষ্টং রুতং ভিষগ্ ব্রহ্মা
সুন্বন্তমীচ্ছন্তীন্দ্রান্দো পরিস্রব॥
কারুরহং ততো ভিষগুপলপ্রক্ষিণী নানা।
নানাধিয়ো বসুযবো'নু গা ইব
তস্থিমেন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব॥

এই বৈদিক মন্ত্র থেকে বোঝা যায় বর্ণ-জাতির পার্থক্য-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বৃত্তির একটা ভূমিকা ছিল। হয়তো বিদ্যাচর্চা, যজন-যাজন নিয়ে থাকতেন বলেই ব্রাহ্মণের সৃষ্টি সেই বিরাট পুরুষের মুখ থেকে। রাষ্ট্রের শান্তিরক্ষা করতেন বলেই বাহু থেকে ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব। রাষ্ট্রের এবং সমাজের অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা করতে অনেক পরিশ্রম করতে হত বলেই বৈশ্যদের উৎস সেই বিরাট পুরুষের ঊরু। অন্যদিকে সেবাবৃত্তি বেছে নিয়েছিলেন বলেই চরণ থেকে শূদ্রের উৎপত্তি। উল্লেখ্য বৈদিক কোষগ্রন্থ যাস্কের নিঘন্টুগ্রন্থে বর্ণশব্দের নিরুক্তি দেখিয়ে বলা হয়েছে—বর্ণো বৃণোতেঃ। বরণ করা অর্থেই বর্ণ-শব্দের প্রয়োগ। সমাজ একটা বিশেষ ধরনের কাজের জন্য একজনকে বরণ করছে এবং সেও নিজের উপযুক্ততা বুঝে একটা বিশেষ বৃত্তিকে বরণ করছে, এখানেই কিন্তু বর্ণ শব্দটার তাৎপর্য্য নিহিত। আর ঠিক এইখানে ওই উপযুক্ততার জায়গাতেই প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষের স্বভাবটাও কাজ করে, অন্যদিকে সেই স্বভাবও আবার সত্ত্ব, রজ, তম গুণ অনুসারেই তৈরি হয়। পিতা-মাতা পুত্র-কন্যার কর্ম এবং মানসিক প্রবণতা দেখেই বুঝতে পারতেন যে, তাদের কোন ধরনের কর্মে রুচি আছে। বিশেষ বিশেষ কর্মে রুচি এবং মনের গতি—এই দুটিকেই ভগবদ্‌গীতায় 'কর্ম স্বভাবজম্' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে সৎপথে থাকছে, ভোগ-বিলাসে মন না দিয়ে যে মানুষ পড়াশুনো নিয়ে থাকতে চায়—বুঝতে হবে যে, এই মানুষটি সত্ত্বগুণই তাকে ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

অন্যদিকে ছোটোবেলা থেকেই যে সাহসী ডানপিটে, স্বভাবের মধ্যেই একটা সহজাত নেতৃত্বের ভাব আছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে দুর্বলকে সুরক্ষা দিতে চায়—এইরকম সত্ত্বমিশ্র-রজোগুণ-প্রধান স্বভাবটাই তাকে ক্ষত্রিয়

হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। যে মানুষ অর্থোপার্জন করে ধনী হতে চায়, অশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করাটা হয়নি বটে কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য করে, কৃষিকার্য অথবা পশুপালন করে যে সম্পদ লাভ করতে চায়, সেই রজোমিশ্রিত-তমোগুণ প্রধান মানুষটি বৈশ্য হবারই উপযুক্ত। আর তেমন মানুষও এই পৃথিবীতে বহু আছেন, যাদের কাজ করতে ইচ্ছে করে না। উৎসাহ উদ্যোগ নিয়ে কোনো কাজের দিকে এগিয়ে যাওয়াটা তাঁদের মানসিকতার মধ্যেই আসে না। এমন তমোগুণপ্রধান মানুষদের সেবা-পরিচর্যার কাজ ছাড়া আর কিছু জোটে না, ফলত শূদ্র হয়ে ওঠাটা তাঁদের কর্মপ্রবৃত্তি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়।

কর্ম-বৃত্তি গ্রহণ করার ব্যাপারে মানুষের জন্মগত ভাব বা স্বভাব যে কাজ করে, এটা অত্যন্ত বিজ্ঞান-সম্মত বুঝেই কিন্তু ভগবদ্গীতার মোক্ষম প্রতিপাদ্য হল— স্বভাবজ গুণ এবং সেই গুণানুযায়ী যে কর্মটা মানুষ বেছে নিচ্ছে, সেটাই তার বর্ণ—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥

ভগবদ্গীতার এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, বর্ণ বা জাতিবিভাগের পিছনে পুরুষানুক্রমিকতার ব্যাপারটা পরে তৈরি হয়েছে। বৈদিককালের প্রথম স্তরেও জাতি-বিভাগ ছিল না, কেননা তা থাকলে বেদমন্ত্রের মধ্যে স্তোত্ররচনাকারী ব্রাহ্মণের ছেলে চিকিৎসক আর মেয়ে যব ভেঙে ছাতু বানানোর কাজ করত না। তবে কিনা বর্ণ-বিভাগের মধ্যে পুরুষানুক্রমিকতা তৈরি হতেও যেমন দেরি হয়নি তেমনই পুরুষানুক্রমিকতার বিরুদ্ধে গুণ-কর্মের আন্দোলন শক্তিমান হয়ে উঠতেও সময় লাগেনি। একটা তো মানতেই হবে যে বৈদিক পুরুষসূক্তের মধ্যে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি জাতির মুখ-বাহুর ক্রমান্বয়ে উত্তমাধমের ক্রম যেভাবে তৈরি হয়েছিল—তার মধ্যে একটা ইচ্ছাকৃত চেষ্টা ছিল এবং সেই চেষ্টার বিরুদ্ধে গুণ-কর্মের প্রতিবাদটাও ধ্বনিত হয়েছে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির মধ্যে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কবষ ঐলূষ নামে এক ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, যার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে জারজ দাসীপুত্র বলে, তাঁকে খানিক জুয়োচোর ঠকবাজ বা কিতব বলেও চিহ্নিত করা হচ্ছে, আর অব্রাহ্মণ তো বটেই। ঋষিরা এক সময় সরস্বতী-নদীর তীরে যজ্ঞ করছিলেন, সেই সময় তাঁরা ইলুষপুত্র কবষ ঐলুষকে সম্ভবত খানিক দূরেই দেখতে পান। সম্ভবত তিনি দূরে দাঁড়িয়ে ঋষিদের যজ্ঞ কর্মের সুচারু প্রক্রিয়াগুলি দেখছিলেন। ঋষিরা বললেন—এই দাসীপুত্র অব্রাহ্মণ, সে তো যজ্ঞে দীক্ষা নেয়নি, সে 'ব্রতী' নয় আমাদের মতো। ঋষিরা তাঁকে সোমযাগের জায়গা থেকে তাড়িয়ে দেন অন্যত্র সেইরকম একটা জায়গায় যেখানে জল নেই। তারা বললেন—পিপাসা এই লোকটাকে শেষ করে দিক, আর কিছুতেই যেন এ লোকটা পবিত্র সরস্বতীর জল না খেতে পারে। কবষ ঐলূষ সেই জলবর্জিত দেশে, বাস করতে করতে পিপাসায় কাতর হয়ে 'প্রদেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেতু' এই মন্ত্রে অপ্‌দেবতা বা জলের উদ্দেশে স্তুতি নিবেদন করলেন। তাতে সরস্বতী নদী উপচে পড়ল তাঁর গায়ে, নদী তাঁকে চার দিক থেকে ঘিরে ফেলল। অবস্থা দেখে ঋষিরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন—দেবতারাও এই কবষ ঐলূষকে মেনে নিয়েছেন, অতএব আমরা কবষকে কাছে ডেকে নিই। ঋষিরা তাঁকে ডেকে নেবার ফলে যেটা হল—কবষ ঐলূষের মতো এক দাসীপুত্র অব্রাহ্মণেরও ব্রাহ্মণত্ব তথা ঋষিত্বেরও প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল এবং সেটা হল চেষ্টা, তপস্যা এবং আর্তির মাধ্যমে। বিদ্যার গুণে কবষ ঐলূষ মন্ত্রদ্রষ্টা আচার্য হয়ে উঠলেন—

ঋষয়ো বৈ সত্রমাসত। তে বৈ কবষমৈলূষ সোমাদনয়ন্‌দাস্যাঃ
পুত্রঃ কিতবো'ব্রাহ্মণঃ কথং নো
মধ্যে'দীক্ষিষ্টেতি তং বহির্ধন্বোদবহন্নত্রেনং
পিপাসা হন্তু সরস্বত্যা উদকং মা পাদিতি।
স বহির্ধন্বোদূহ্লঃ পিপাসয়া
বিত্ত এতদপোনপত্রীয়মপশ্যৎ 'প্র
দেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেতু' ইতি তেনাপাং
প্রিয়ং ধামোপগচ্ছওমাপোনূদায়ংস্তং
সরস্বতী সমন্তং পর্য্যধাবৎ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই কাহিনী বুঝিয়ে দেয় যে, ব্রাহ্মণ্য সর্বত্র জন্মগত ছিল না, তপস্যা, চেষ্টা এবং সদ্‌বৃত্তির মাধ্যমে অব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির পদবীতে উন্নীত হতে পারতেন।

[ঋগ্‌বেদ ১০.৯০.১২; ১০.১০২.৩; ৮.৩৫.১৬-১৮; ৯.১১২.১-৩; নিরুক্ত (ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস) ২.৩.৩, পৃ. ১১০; ভগবদ্গীতা ৪.১৩; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম) ৮.১.১৯, পৃ. ২১৬]

☐ মহাভারতে ঋগ্‌বেদের পরম্পরা ঠিক এই দুই ভাবেই নেমে এসেছে। অর্থাৎ মহাভারত একদিকে মনে করে—সমস্ত প্রাণীরই কর্ম তার জন্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ব্রাহ্মণকুলে জন্মালেই তিনি পূজা পাবার যোগ্য—

* যদেতজ্জায়তে'পত্যং স এবায়মিতি শ্রুতিঃ।
* স্বযোনিতঃ কর্ম সদা চরন্তি।
* ব্রাহ্মণো নাম ভগবান্ জন্ম প্রভৃতি পূজ্যতে।

মহাভারতে এই ব্রাহ্মণদের ব্যাপারে এমন কথা যেখানে আছে যে, ব্রাহ্মণ যেরকমই হোন, খারাপ-ভালো যে কর্মই করুন, তবু একজন ব্রাহ্মণকে সব সময় সম্মান করবেন এবং রক্ষা করবেন, তখনই বোঝা যায় পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মানোটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যেন মহাভারতে এবং কর্মের ওপরে যেন কোনো গুরুত্বই নেই। এখানে বলা হচ্ছে— ব্রাহ্মণদের গুণ অনন্ত। অত্যন্ত সাহসী লোকেরাও তাঁদের ভয় করে চলেন। অনেকে তাঁরা তৃণাবৃত কূপের মতো আবার অনেকে নির্মল আকাশের মতো। মহাভারত এখানে জানিয়েছে যে, অন্য কর্ম বা অন্য বৃত্তি গ্রহণ করেছেন বলে তাঁদের সম্মান করবো না বা তাঁদের মানবো না, এমনটা হবে না। তাঁদের মধ্যে এমন ব্রাহ্মণেরা আছেন, যাঁরা জোর করে নিজের ইচ্ছে-মতো কাজ করেন, কারোও কারোও মন আবার তুলোর মতো নরম, আবার কেউ বা নীচ-শঠ বলেও চিহ্নিত।

মহাভারতের মূল শ্লোকগুলি এখানে শুধু ব্রাহ্মণদের কথা বললেও প্রসিদ্ধ টীকাকারেরা এখানে বড়ো বড়ো ঋষিদের নাম বলতে আরম্ভ করেছেন যাতে শক্তিমান অদ্ভুতকর্মা ঋষিদের নাম করলে সাধারণ ব্রাহ্মণদের দুর্নাম তৈরি না হয়। মহাভারত বলেছে—অনেক ব্রাহ্মণ কৃষি কর্ম এবং গোপালনও করেন, কেউ ভিক্ষা করেন, অনেকে চুরিও করেন, কেউ বা মিথ্যা কথা বলেন, অন্য ব্রাহ্মণেরা ক্ষেত্রবিশেষে নটনর্তকও হন। অনেক ব্রাহ্মণ রাজবাড়িতে কিংবা অন্য কারো বাড়িতে সব রকমের কাজ করেন, আবার অনেকে নানান আকারে, নানান চেহারায় ঘুরে বেড়ান। কিন্তু নানা কর্মই করুন আর বহুতর অন্য ধরনের কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করুন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা ধর্মজ্ঞ এবং সাধু, তাঁদের গুণটাই দেখতে হবে—

প্রসহ্যকারিণঃ কেচিৎ কার্পাসমৃদবো'পরে।
সন্তি চৈষামতিশঠা স্তথৈবান্যে তপস্বিনঃ॥
সর্বকর্মসহাশ্চান্যে পার্থিবেষ্বিতেরেষু চ।
বিবিধাকার-যুক্তাশ্চ ব্রাহ্মণা ভরতর্ষভ॥
নানাকর্মসু রক্তানাং বহুকর্মোপজীবীনাম্।

লক্ষণীয়, অন্য একটি মহাভারতীয় শ্লোকে এ-কথা আরো দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ যদি যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার মতো কুলোচিত কর্ম বাদ দিয়ে অন্য জাতি-বর্ণের কর্ম করে বিকর্মস্থও হন, তবু দেশের রাজা যেন তাঁকে উপেক্ষা না করেন। কোনো রাজার রাজ্যে যদি কোনো ব্রাহ্মণ চোর হন, তাহলে সেটা রাজারই দোষ বলে গণ্য হবে। কেননা ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের বৃত্তিতে অর্থলাভ করতে পারেনি বলেই সে চোর হয়েছে এবং এই অবস্থায় রাজার উচিত সেই বিকর্মস্থ ব্রাহ্মণের ভরণ-পোষণ করা—

বিকর্মস্থাশ্চ নোপেক্ষ্যা বিপ্রা রাজ্ঞা কথঞ্চন।
নিয়ম্যাঃ সংবিভজ্যাশ্চ ধর্মানুগ্রহকারণাৎ॥
যস্য স্ম বিষয়ে রাজন্ স্তেনো ভবতি বৈ দ্বিজঃ।
রাজ্ঞ এবাপরাধং তং মন্যন্তে তদ্বিদো জনাঃ॥

[মহা (k) ১২.২৯৬.২; ৩.২৫.১৬; ১২.২৬৮.১২; ১২.৭৬.১১-১২; ১৩.৩৩.১০-১৪; (হরি) ১২.২৮৯.২; ৩.২২.১৬; ১২.২৬৩.১২; ১২.৭৪.২৩-২৪; ১৩.৩২.১১-১৪]

☐ মহাভারতের উপরি-উক্ত কথাগুলি চতুর্বর্ণেরই জন্মগত জাতি স্বীকার করে বলে মনে হয়। জন্মগত জাতির পক্ষে যাঁরা কথা বলেন, তাঁরা বলেন—গুণ-কর্মের দ্বারাই যদি জাতি স্থির হত, তাহলে বর্ণসংকর কথাটার কোনো তাৎপর্য্য থাকে না। কেননা গুণ-কর্মের ভাবনায় যিনি যে জাতির জন্য নির্দিষ্ট স্বধর্ম-কর্ম পালন করবেন, তিনি সেই জাতির মানুষ হিসেবেই পরিচিত হবেন। অথচ বর্ণসংকর ব্যাপারটা পুরোপুরিই জন্মের দ্বারা ঠিক হয়। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ইত্যাদি চতুর্বর্ণ ছাড়াও অতিরিক্ত যে জাতিগুলি, সে সবই তো বর্ণসংকর, কিন্তু তারা একেবারে নির্দিষ্ট দুটি উত্তমাধম বা অধমোত্তমের জাতির সন্তান হওয়ার পরেই আবার বিশেষ একপ্রকার সংকরজাতীয় বলে পরিচিত হন। ফলত মূল জায়গায় জন্মগত জাতির অস্তিত্বই তো মেনে নেওয়া হচ্ছে।

জন্মগত জাতিবর্ণের অনুকূলে মহাভারতে আরও একটা অনুমান হল এই যে, মহাভারতে

কোথাও কোথাও বলা হচ্ছে—প্রাণীরা বহু জন্মের সুকৃতি সাধন করার পর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে—

সম্পতন্ দেহজালানি কদাচিদিহ মানুষে।
ব্রাহ্মণ্যং লভতে জন্তুস্তৎ পুত্র পরিপালয়॥

এখানে অদ্ভুত একটা ক্রমের কথাও বলা হয়। বলা হচ্ছে—পশু-পাখি ইত্যাদি নানান জন্ম ভোগ করার পর মনুষ্যদেহে প্রাণীরা প্রথম চণ্ডাল হয়ে জন্মায়। তারপর সাধু কর্মের ফলে ক্রমে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ সম্ভব হয়—

তির্য্যগ্‌যোন্যাঃ শূদ্রতামভ্যুপৈতি
শূদ্রো বৈশ্যং ক্ষত্রিয়ত্রত্বঞ্চ বৈশ্যঃ।
বৃত্তশ্লাঘী ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণত্বং
স্বর্গং পুণ্যং ব্রাহ্মণঃ সাধুবৃত্তঃ॥

মহাভারতের এই সব শ্লোক-বচন যেমন বর্ণবিভাগের মধ্যে জন্মগত জাতিভাবনার সূচনা করে, তেমনই মহাভারত যখন বলে—ব্রাহ্মণ বিদ্বান হোন বা মূর্খ হোন, তিনি বালক হোন বা বৃদ্ধ, সমস্ত অবস্থাতেই ব্রাহ্মণ পূজা-সম্মান লাভ করার পক্ষে উপযুক্ত—তখনই বোঝা যায় যে, এই কথাগুলিও জন্মগতভাবেই ব্রাহ্মণত্বের সিদ্ধি ঘটায়—

* অবিদ্বাংশ্চৈব বিদ্বাংশ্চ ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ।
* যেষাং বৃদ্ধশ্চ বালশ্চসর্বঃ সম্মানমর্হতি।

উপরি উক্ত শ্লোকগুলির মধ্যে আগুনের একটা উপমা টেনে বলা হচ্ছে—যেমন যজ্ঞের জন্য প্রণীত অগ্নি এবং সাধারণ আগুনের দাহিকা শক্তি একই রকম, এমনকী শ্মশানে শবদাহের জন্য অগ্নিকেও যেমন কেউ দূষিত কোনো অগ্নি বলে না, তেমনই বিদ্বান-অবিদ্বান, কিংবা বালক-বৃদ্ধের বিষমতাতেও ব্রাহ্মণত্বের হানি হয় না কোনো—

প্রণীতশ্চাপ্রণীতশ্চ যথাগ্নির্দৈবতং মহৎ।
শ্মশানে হ্যপি তেজস্বী পাবকো নৈব দুষ্যতি॥

এইসব মন্তব্য অবশ্যই ব্রাহ্মণ সহ সমস্ত বর্ণেরই জন্মগত জাতিভাবনা স্বীকার করে। বিশেষত এই মহাভারতেই যখন বিভিন্ন ব্যক্তি পুরুষের ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য তপস্যার প্রয়াস দেখতে পাওয়া যাবে, সেখানে জন্মগত জাতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ কিন্তু মহাভারতের অনুশাসনপর্বে ইন্দ্র-মতঙ্গ-সংবাদ। মতঙ্গের জন্ম হয়েছিল ব্রাহ্মণীর গর্ভে, কিন্তু এক নাপিতের ঔরসে। তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করেন। কিন্তু তপস্তুষ্ট ইন্দ্র দেবতা মতঙ্গকে ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তির ঈপ্সিত বর দেননি। বহু জন্মের তপস্যা এবং সুকৃতির ফলে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয়—এই সত্য-প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণ দুটি অধ্যায় ইন্দ্র-মতঙ্গ-সংবাদে ব্যথিত হয়েছে। তাতে জন্মগত জাতিত্ব শুধু ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় না, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রেরও জন্মগত জাতিত্ব সিদ্ধ হয়ে ওঠে একভাবে।

[মহা (k) ১২.৩২১.২২; ১৩.১১৮.২৪; ১৩.১৫১.২০-২২; (হরি) ১২.৩১২.২২; ১৩.১০২.৫৩; ১৩.১২৯.২০-২২]

□ এখন অবশ্য বলতেই হবে যে, জন্মগত এবং পুরুষানুক্রমিক জাতিভাবনার সঙ্গে সমান্তরালভাবেই কিন্তু গুনকর্মের মাধ্যমে জাতি নিরূপণ করার ভাবনাও কিন্তু বৈদিক কাল থেকেই দেখা গেছে। যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতার একটি পংক্তিতে প্রথমে বলা হল—ব্রাহ্মণ ঋষির ছেলে যিনি, তাঁকে যেমন ঋষিই বলা হয়, ব্রাহ্মণ বলা হয়, তেমনই আর্ষেয় এবং ব্রাহ্মণ তাঁকেও বলা হবে, যিনি বিদ্যা অর্জন করেছেন—

ঋষিমার্ষেয়মিত্যাহৈষ ব্রাহ্মণ ঋষিরার্ষেয়ো যঃ
শুশ্রুবান্ তস্মাবেমাহ।

যজুর্বেদীয় মৈত্রায়ণী সংহিতা এবং কাঠক-সংহিতায় ঠিক একরকম একটা প্রশ্ন উঠেছে—তুমি কে ব্রাহ্মণ, কেমন ব্রাহ্মণ—

কো'সীতি ব্রাহ্মণ ইতি কতমো ব্রাহ্মণ ইতি?

এর উত্তরটা আসছে ভীষণ পরিষ্কার। বলা হচ্ছে—ব্রাহ্মণের বাবা কে অথবা মা কে—এসব কথা জিজ্ঞাসা কোরো না। ব্রাহ্মণের বিষয়ে একমাত্র জানার বিষয় হল বিদ্যা-পাণ্ডিত্য এইসব। এটা যার মধ্যে থাকে কিংবা যদি এটা থাকে, তবে তাঁকেই বাপ-ঠাকুরদা বলে জানবে, অর্থাৎ তিনিই ব্রাহ্মণ—

কিং ব্রাহ্মণস্য পিতরং কিমু পৃচ্ছসি মাতরম্।
শ্রুতং চেদস্মিন্ বেদ্যঁ স পিতা স পিতামহঃ॥

যজুর্বেদীয় সংহিতাগুলির প্রমাণে একথা বেশ স্পষ্ট হয় যে, জাতিবর্ণের পুরুষানুক্রমিক সত্তার সঙ্গে মানুষের গুণ-কর্ম অনুসারে জাতির বিচারও বৈদিক পরম্পরায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

[কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম) ৬.৬.১-৪, পৃ. ২৪৭২; মৈত্রায়ণী সংহিতা (Schroeder) ৪.৮.১; কাঠক সংহিতা]

□ গুণ এবং কর্মের কারণেই যে জাতিবর্ণের উদ্ভব ঘটেছিল, তার পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক প্রমাণ কিন্তু এটাই যে, প্রথম যাকে ব্রাহ্মণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল কিংবা ক্ষত্রিয় বলে যাঁকে ব্রাহ্মণ থেকে পৃথক করা হয়েছিল, একই ভাবে বৈশ্যকেও এবং শূদ্রকেও, সেটা তো অবশ্যই প্রথমে গুণ, তারপর কর্মের ভিত্তিতেই। অর্থাৎ একটি মানুষের মধ্যে অহিংসা, সত্য, কৃপা, করুণা এবং সদ্বৃত্তি দেখার পরেই তাঁকে ব্রহ্মভাবনার অনুষঙ্গে প্রথম ব্রাহ্মণশব্দে অভিহিত করা হয়েছিল নিশ্চয়। খেয়াল করে দেখবেন, পাণ্ডবদের যখন বনবাসের সময় চলছে, তখন বনবাস-দুঃখ ভীমকে এক সময় অধীর-অধৈর্য করে তুলল। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বোঝাতে চাইলেন যে, পাণ্ডবদের শক্তি আছে, বুদ্ধি আছে, অস্ত্র আছে এবং ন্যায়সঙ্গত যুক্তিও আছে, সেক্ষেত্রে তাঁরা বনের মধ্যে এত দুঃখভোগ করবেন কেন। ভীম দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করার অনুমতি চাইলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে।

যুধিষ্ঠির এই অবস্থায় ভীমকে তাঁর সত্যরক্ষার দায় থেকে আরম্ভ করে রাজনীতি বাধ্যবাধকতা সবটাই বুঝিয়ে তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। তাতে ভীমের ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। কুপিত ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন— তোমার যেমন দয়া, তা ব্রাহ্মণকেই শুধু মানায়। কী করে যে তুমি এই ক্ষত্রিয়কুলে জন্মালে, তাই ভাবি। ক্ষত্রিয়ের বংশে প্রায়ই ক্রূরবুদ্ধি মানুষেরা জন্মায়, ব্রাহ্মণদের মতো এত দয়া-মায়া তাঁদের থাকে না—

ঘৃণী ব্রাহ্মণরূপো'সি কথং ক্ষত্রেষু জায়েথাঃ।
অস্যাং হি যোনৌ জায়ন্তে প্রায়শঃ ক্রূরবুদ্ধয়ঃ॥

মহাভারতে ভীমের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয়ের গুণের সঙ্গেই তাদের জাতিবোধ সংযুক্ত হয়েছে। লক্ষণীয়, এই গুণের অনুষঙ্গেই কিন্তু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চতুর্বর্ণের কর্মও সৃষ্টি হয়েছে। মহাভারতের ভৃগুভরদ্বাজসংবাদে দেখা যাবে—যিনি জাতকর্মাদি দশকর্মাদি দশবিধ সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত, যিনি বেদাধ্যয়নশীল, যিনি সন্ধ্যা-স্নান-জপ ইত্যাদি ষট্কর্মনিরত, তিনি ব্রাহ্মণ। যিনি যুদ্ধ-বিগ্রহতৎপর, প্রজাপালনে রত এবং যিনি বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, তিনি ক্ষত্রিয়। যিনি বাণিজ্য, কৃষি এবং পশুপালন করেন অথচ বেদাধ্যয়নও করেন, তিনি বৈশ্য। যিনি সব রকমের ভক্ষ্য-ভোজ্য গ্রহণ করেন, যিনি অশুচি থাকেন এবং অনাচারী তিনি শূদ্র—

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্‌বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্যং দানমথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃত॥
ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নসঙ্গতঃ।
দানাদানারতির্যস্তু স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে॥
বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥
সর্বভক্ষরতির্নিত্যং সর্বকর্ম্মকরোহ'শুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥

ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র, এই চতুর্বর্ণের গুণকর্ম উল্লেখ করার পরেই এখানে পরিষ্কার জানানো হল ব্যক্তিগত একটি বর্ণে গুণ-কর্মের লক্ষণ যদি অন্য বর্ণের মধ্যে থাকে, তাহলে সেই লক্ষণ দিয়েই তার বর্ণ-বিচার হবে, পুরুষানুক্রমিকতায় নয়। অর্থাৎ কিনা শূদ্রের মধ্যে যদি ব্রাহ্মণের গুণকর্ম দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণকর্মগুলি না দেখা যায়, তাহলে সেই শূদ্রও আর শূদ্র থাকেন না, অন্যদিকে ব্রাহ্মণও থাকেন না ব্রাহ্মণ—

শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥

[মহা (k) ৩.৩৫.২০; ১২.১৮৯.২-৮;
(হরি) ৩.৩১.২০; ১২.১৮২.২-৮]

□ কুলক্রমাগত পুরুষানুক্রমিক জাতি-বর্ণের তত্ত্বে মহাভারত যে তেমন আস্থা রাখে না, একথা মহাভারত একবার নয়, বার বার বলেছে। বিশেষত মহাভারতের অনুশাসন পর্বে গুণকর্মের কারণে কীভাবে জাতিবর্ণের সংজ্ঞা পরিবর্তন ঘটে সেটা এত স্পষ্ট এবং বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে এ ব্যাপারে মহাভারতের তাত্ত্বিক প্রবণতা পরিষ্কার হয়ে যায়। এখানে উমা-মহেশ্বর-সংবাদে স্পষ্টভাষায় বলা হল—উচ্চ বর্ণে জন্ম, উচ্চকুলের সংস্কার, শাস্ত্রজ্ঞান এবং শ্রেষ্ঠ একটা মানুষের সন্তান হওয়াটাই ব্রাহ্মণত্বের কারণ নয়, কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের কারণ হল ব্যক্তিচরিত্র—

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু করণম্॥

মহাভারতের এই অধ্যায়ে শূদ্র-বৈশ্য-ক্ষত্রিয়রা

সৎকর্মের ফলে কীভাবে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতর বর্ণে উত্তরণ করতে পরেন, সেই তত্ত্বও যেমন বিচার করা হয়েছে, তেমনই অন্যায় এবং পাপকর্মের ফলে 'কর্মবিপাক' বশতই কীভাবে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেরা কীভাবে অধমাধম বর্ণের পদবী লাভ করেন, সেটাও সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে। আর এখানে শেষ কথা হল—জগতে সমস্ত মানুষই চরিত্র এবং কর্মের গুণে ব্রাহ্মণ হতে পারে এবং সৎকর্ম পালন করছেন যে শূদ্র, তিনিও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারেন—

সর্বো'য়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রো'পি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥

পুরুষানুক্রমিক জাতিবর্ণের নিবিষ্ট মানসিকতার বিরুদ্ধে গুণ-কর্মানুযায়ী জাতিবর্ণের মহিমা প্রতিষ্ঠা করাটা মহাভারতের একটা বিশেষত্ব—যে বিশেষত্ব আমাদের অপর মহাকাব্য রামায়ণে প্রায় নেই। রামায়ণে চাতুবর্ণ্যের সৃষ্টি, বর্ণ-জাতির পৃথক ব্যবহার গুণ-কর্ম—এসব বিষয়ে বহুল নির্দেশ প্রায় নেইই। ব্রাহ্মণের কিংবা ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে জাত-কর্ম থেকে আরম্ভ উপনয়ন ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের কথা প্রায় শোনাই যায় না। অন্যদিকে রাজবাড়িতে রামের অভিষেকের মতো উৎসবে শূদ্রদেরও ডাক পড়েছে বিনা দ্বিধায়। নিষাদ গুহক রামচন্দ্রের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁকে আলিঙ্গন করতেও তাঁর বাধে না, তাঁর বাড়ির অন্ন-পান গ্রহণ করতেও তাঁর কোথাও বাধেনি। অন্যদিকে রাক্ষসরাজ রাবণের মুখে বেদমন্ত্রের উচ্চারণ, হনুমানের মুখে বেদমন্ত্রের উচ্চারণ, এমনকী বালীপত্নী তারার মুখেও বেদমন্ত্র রাময়ণের যুগে জাতিবর্ণব্যবস্থার কঠিন ভেদাভেদ সূচনা করে না। এই নিরিখে রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে শূদ্র শম্বুকের তপশ্চরণ এবং সেই কারণে শম্বুকহত্যার ঘটনাটা বিপ্রতীপভাবে অত্যাশ্চর্যের ঘটনা হয়ে ওঠে বলেই ওই ঘটনার ওপরে প্রক্ষিপ্তবাদের আরোপ তৈরি হয়েছে।

রামায়ণের কালে বর্ণব্যবস্থা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, সেটা এক্কেবারে পরিষ্কার, এমনকী অন্য সংকরজাতীয় মানুষেরও যে অবস্থান ছিল সেটাও বোঝা যায় যখন শুনি—বর্ণব্যবস্থার মধ্যে 'অগ্র্য' প্রধান চারটি বর্ণের প্রত্যেকেই শাস্ত্রবিধি-মতই দেবতা-অতিথিদের মেনে চলতেন এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন সচ্চরিত্র এবং বীর। বর্ণের অনুলোম বিধিতে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদের মেনে চলতেন, বৈশ্যরা ক্ষত্রিয়দের এবং শূদ্রেরা—

* বর্ণেষ্বগ্র্যচতুর্থেষু দেবতাতিথিপূজকাঃ।
* ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখঞ্চাসীদ্ বৈশ্যাঃ ক্ষত্রমনুব্রতাঃ।
শূদ্রাঃ স্বকর্মনিরতাঃ ত্রীন্ বর্ণানুপচারিণঃ॥

বেদে কিংবা মহাভারতে যেখানে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের সৃষ্টির উৎস ধরা হয়েছে সেই বিরাট পুরুষ কিংবা ব্রহ্মাকে, রামায়ণে সেখানে স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন মনু। বহির্দৃষ্টিতে রামায়ণের কালে পুরুষানুক্রমিক জাতিবর্ণের একটা ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু একই সঙ্গে রাময়ণী বর্ণ ব্যবস্থার এটাও এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে, ব্রাহ্মণের ত্যাগ-তিতিক্ষা-ধৈর্য-দয়া ইত্যাদি গুণ কিংবা যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার মতো গুণ না থাকলেও তিনি খুব শ্রদ্ধেয় হবেন, কিংবা গুণ-কর্মহীন ধ্বজাধারী ব্রাহ্মণকেও ব্রাহ্মণ বলে লোকে শ্রদ্ধা করবে, এমনটা রামায়ণেও মানা হয়নি। এর সবচেয়ে, বড়ো উদাহরণটি পাওয়া যাবে বানররাজ বালীর মুখে—যে বালীকে রামচন্দ্র অন্যায়ভাবেই হত্যা করেছেন বলে মনে করা হয়। আর বালী যেহেতু ক্ষত্রিয় রাজা রামচন্দ্রকেই কথা শোনাচ্ছেন, তাতে বোঝা যায় ক্ষত্রিয় রাজারাও তাঁদের বর্ণানুকূল গুণ-কর্মের কারণেই সম্মান লাভ করতেন, শুধু ক্ষত্রিয় জন্মের জন্যই নয়।

বালী রামচন্দ্রকে বলেছিলেন—তোমার সঞ্চিত ধর্মবোধও এখানে কাজ করছে না, রাজোচিত সমৃদ্ধির বুদ্ধিও নেই এখানে। তুমি ইন্দ্রিয়তাড়িত হয়ে আমার মতো ফল-মূল-খাওয়া এক বানরকে মেরেছো, এবং এখানে যে তুমি তোমার ক্ষত্রিয়ধর্ম, রাজধর্মের কথা বলছো, সে অনেকটাই সেই ব্রাহ্মণের উপদেশের মতো যে শুধু গলায় পৈতে ঝুলিয়েই ব্রাহ্মণত্ব ফলায়—

ন তে'স্ত্যপচিতো ধর্মো নার্থবুদ্ধিরবস্থিতা।
ইন্দ্রিয়ৈঃ কুপ্যসে হি ত্বং সূত্রবদ্ধ ইব দ্বিজঃ॥

এই শ্লোকটি রামায়ণের সব সংস্করণে নেই বটে, কিন্তু এই শ্লোকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্যটুকু এটাই যে ব্রাহ্মণের জাতিতত্ত্বে শুধুমাত্র উপবীত ধারণের মূল্য নেই, তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণের গুণগুলিও থাকতে হবে। হয়তো একথা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের সম্বন্ধেও সত্য বিশেষত রামায়ণে মহর্ষি বিশ্বামিত্র এক বিরাট উদাহরণ, যিনি ক্ষত্রিয়ের

পদবী থেকে তপস্যা-ব্রহ্মচর্য্য এবং অন্য সমস্ত ব্রাহ্মণ্য গুণ আয়ত্ত করেই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মর্ষি হয়েছিলেন। বিশ্বামিত্র যখন ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, তখন মহর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাঁধে এবং বশিষ্ঠের ব্রাহ্মণ্য-মাহাত্ম্য দেখেই তিনি বশিষ্ঠের মতে ব্রহ্মর্ষি হওয়ার সংকল্প করেন। তিনি তপস্যা আরম্ভ করলে তপস্যার বিভিন্ন পর্যায়ে বিশ্বামিত্রকে যেভাবে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করে চলতে হয়েছে, যেভাবে ক্রোধ, মাৎসর্য্য এবং অসূয়া ত্যাগ করতে হয়েছে এবং পরিশেষে যে বশিষ্ঠের সঙ্গে তাঁর বিবাদ, সেই বশিষ্ঠ মুনির কাছেই যেভাবে বিনয়াবনত হয়ে তাঁকে প্রসন্ন করেছেন তিনি, তাতে এটা বোঝা যায় যে, রামায়ণের বার্তা এটাই। অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত গুণ অর্জন করলে তবেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, কুলক্রমাগত ভাবে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মালেই ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা থাকে না।

বিশ্বামিত্রকে ভগবান ব্রহ্মা যখন ব্রহ্মর্ষি পদবী দান করলেন, তখন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাদের কাছে এটাই প্রার্থনা করে বলেছিলেন—আমার যদি ব্রাহ্মণ্য লাভ হয়েই থাকে, তাহলে ওঙ্কার, বষট্‌কার এবং সমস্ত বেদ আমাকে বরণ করে নিক। আর সবচেয়ে বড়ো কথা—স্বয়ং বশিষ্ঠ আগে আমাকে ব্রহ্মর্ষি বলে স্বীকার করুন। দেবতাদের অনুরোধ বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মর্ষি বলে স্বীকার করলেন এবং বিশ্বামিত্রও বিনয়াবনত হয়ে বশিষ্ঠের পূজা করলেন।

রামায়ণের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পাঠে পূর্বোক্ত শ্লোকগুলির চেয়েও আরও বেশি কিছু শ্লোক পাওয়া যায়, যেগুলির মর্মার্থ এটাই যে, শুধুমাত্র ওঙ্কার, বষট্‌কার, বেদ কিংবা সত্যের স্ফুরণই একজন মানুষকে ব্রাহ্মণত্ব দেয় না। বিশ্বামিত্র আরও কিছু গুণের কথাও বলেছিলেন, যেগুলি হল—সিদ্ধি, ধৈর্য, স্মৃতি, বিদ্যা, মেধা, যশ, ক্ষমা, তপস্যার কৃচ্ছ্রতা, ইন্দ্রিয় দমন করার শক্তি, শান্তি, সর্বজ্ঞত্ব, কৃতজ্ঞতা, অসংমোহ, সমস্ত প্রাণীর প্রতি অদ্রোহ আচরণ এবং নিষ্পাপ আচরণ। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্যের জন্য এই গুণগুলি কামনা করেছিলেন ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য, কারণ এইগুলিই ব্রাহ্মণের লক্ষণ—

যদি প্রাপ্তং ময়া ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণ্যং তপসো বলাৎ।
ততো ব্রহ্ম চ বেদাশ্চ সত্যঞ্চ বরয়ন্তু মাম্॥
সিদ্ধির্ধৃতিঃ স্মৃতিশ্চৈব বিদ্যা মেধা যশঃ ক্ষমা।
তপো দমশ্চ শান্তিশ্চ সর্বজ্ঞত্বং কৃতজ্ঞতা॥
অসংমোহ ইতি প্রাদুর্ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।
অদ্রোহঃ সর্বভূতানামপকল্মষসংজ্ঞিতঃ॥
তস্মা ভজতু বিপ্রেশং ব্রহ্মাব্যয়মনুত্তমম্।

[মহা (k) ১৩.১৪৩.৫০-৫১;
(হরি) ১৩.১২১.৫০-৫১;
রামায়ণ (Lahore Ed.) ১.৬১.১৩-১৬, পৃ. ৪১৮;
রামায়ণ (পঞ্চানন) ১.৬.১৭-১৯;
৩.১৪.২৯-৩০; ৪.১৬.৬০]

□ রামায়ণে কথিত বিশ্বামিত্র মুনির তপস্যার ক্রমের মধ্যে কাম-ক্রোধ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সাধ্য রিপু-দমনের মাধ্যমে অবশেষে বেদোক্ত কর্মগুণ এবং বিদ্যা, ক্ষমা, শান্তি, অসংমোহ এবং সর্বভূতের প্রতি অদ্রোহ আচরণের মতো যেসব মানসিক গুণ বিশ্বামিত্রের মধ্যে নিহিত হয়েছে, তার মধ্যে জন্মগত ব্রাহ্মণ্যের প্রশ্ন তো আসেই না, বরঞ্চ গুণকর্মের আয়ত্তীকরণের মধ্য দিয়েই অন্য বর্ণের মানুষের ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠাটা নিশ্চিত হয়ে যায়। হয়তো এই কারণেই মনুর মতো সংরক্ষণশীল মানুষকেও রাজধর্মের অন্তর্গত বিনয়-শিক্ষার মাহাত্ম্য বোঝানোর সময় বলতে হয়েছে যে, বিনয় বা ইন্দ্রিয়দমনের শিক্ষা আয়ত্ত করেই আদিরাজা পৃথু রাষ্ট্রশাসনের অধিকার পেয়েছিলেন, এইভাবেই রাষ্ট্র পেয়েছিলেন মনু, বিনয়-শিক্ষা করেই কুবের অতুল ধনৈশ্বর্য্য লাভ করেছেন, এমনকী এই বিনয়-বলেই গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্বও লাভ করেছিলেন—

পৃথুস্তু বিনয়াদ্ রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ।
কুবেরশ্চ ধনৈশ্বর্য্যং ব্রাহ্মণ্যঞ্চৈব গাধিজঃ॥

এই মনুশ্লোকের সমস্ত টীকাকারেরই প্রশ্ন তুলে বলেছেন—বিনয় শিক্ষার গুণে রাজাদের রাষ্ট্রপ্রাপ্তি এবং রাষ্ট্রের প্রশাসনিক অধিকার লাভের মতো রাজনৈতিক প্রসঙ্গের মধ্যে হঠাৎ করে—'গাধিপুত্র ব্রাহ্মণত্বের মতো দুর্লভ জাতিসংস্কার লাভ করেছিলেন ক্ষত্রিয় হয়েও' —এই কথাটা মনুর এই হৃদয়াভিসন্ধিই প্রকাশ করে যে, বিশিষ্ট কর্ম এবং গুণের মাধ্যমেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়। শুধুমাত্র জন্ম এবং ব্রাহ্মণের পুরুষানুক্রমিকতাই ব্রাহ্মণত্বের কারণ নয়। *[মনুসংহিতা ৭.৪২, মেধাতিথি এবং কুল্লূকভট্টের টীকা দ্রষ্টব্য]*

□ জন্ম নয়, জাতি নয়, পুরুষ-পরম্পরা নয়, শুধুমাত্র গুণ-কর্মের নিরিখেই ব্রাহ্মণত্বের নির্ণয় হবে—এইরকম বক্তব্য সবচেয়ে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে মহাভারতেই। অজগর সর্পরূপী নহুষের প্রশ্ন ছিল যুধিষ্ঠিরের কাছে—কাকে ব্রাহ্মণ বলবো বলুন দেখি—ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্ রাজন্—যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—যে মানুষটির মধ্যে সত্য, দান, ক্ষমা, সচ্চরিত্র, নৃশংসতার লেশশূন্য আচরণ, তপস্যা-বৈরাগ্য এবং কৃপার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে, তিনিই ব্রাহ্মণ—

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যতে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ-ইতি স্মৃতঃ॥

যুধিষ্ঠিরের মুখে ব্রাহ্মণের এই লক্ষণ শুনে অজগররূপী নহুষ জিজ্ঞাসা করলেন—সত্য, দান, ক্ষমা, অনৃশংসতা, অহিংসা—এই সব গুণ তো জন্মগতভাবে একজন শূদ্রের মধ্যেও থাকতে পারে—

শূদ্রেষ্বপি চ সত্যঞ্চ দানসক্রোধ এব চ।

—তো সেখানে কী হবে? যুধিষ্ঠির বললেন—কী আবার? শূদ্রের মধ্যে যদি সত্য, দান, অক্রোধ, অনৃশংসতার মতো গুণ থাকে, তবে তাঁকে ব্রাহ্মণই বলবে। শূদ্রের জাতিগত গুণ পরিচর্য্যা ইত্যাদি যদি ব্রাহ্মণের মধ্যে থাকে তবে তাঁকে শূদ্রই বলবো। শূদ্রে যদি ব্রাহ্মণের গুণ-লক্ষণ থাকে, তবে সে শূদ্র শূদ্র নয়, আবার ব্রাহ্মণের মধ্যে যদি সে লক্ষণ না থাকে, তবে সে ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নয়। অতএব যে মানুষের মধ্যে সত্য, দয়া, অহিংসা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যাবে, তিনি শূদ্র হলেও তাঁকে ব্রাহ্মণ বলেই জানতে হবে। আর যে মানুষের মধ্যে এইসব গুণ থাকবে না, তিনি ব্রাহ্মণ হলেও তাঁকে শূদ্র বলেই নির্দেশ করতে হবে—

শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দিশেৎ॥

মহাভারতের বনপর্বেই যেখানে ধর্মরূপী যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করছেন যে, ব্রাহ্মণ কাকে বলা হবে, তখনও যুধিষ্ঠির কিন্তু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন—শোনো যক্ষ! ব্রাহ্মণ হবার জন্য বংশও নয়, স্বাধ্যায়-বেদপাঠও নয়, বহুতর বিদ্যারও প্রয়োজন হয় না সেখানে, ব্রাহ্মণত্বের একমাত্র তাঁর সচ্চরিত্র। কোথায় সে জন্মাল, তার কুলক্রমাগত জাতকর্মাদি সংস্কার আছে কিনা, বেদবিদ্যায় সে নিষ্ণাত কিনা, কিংবা তার ব্রাহ্মণ্য-পরম্পরা আছে কিনা,—এগুলি দ্বিজত্বের কোনো কারণ নয়, চরিত্রই শুধু ব্রাহ্মণত্বের কারণ—

* শৃণু যক্ষ কুলং তাত ন স্বাধ্যায়ো ন চ শ্রুতম্।
কারণং হি দ্বিজত্বে চ বৃত্তমেব ন সংশয়ঃ॥
* ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥

[মহা (k) ৩.১৮০.২৫-২৬; ৩.৩.১৩.১০৮; ১৩.১৪৩.৫০-৫১; (হরি) ৩.১৫১.২০-২৬; ৩.২৬৭.৮০নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, খণ্ড. ১১, পৃ. ২৫৭৩; ১৩.১২১.৫০-৫১]

□ মহাভারতের কাল যখন চলছে, তখনও জন্ম অনুসারে জাতির মাহাত্ম্য তেমন তৈরি হয়নি। কুরু-পাণ্ডবদের শস্ত্রবিদ্যার প্রদর্শনীতে অর্জুনের পরীক্ষা-চলাকালীন সময়ে কর্ণ যখন রঙ্গস্থলে এসে উপস্থিত হলেন, তখন ভীম তাঁকে সূতপুত্র বলে উপহাস করেছিলেন। তখন প্রত্যুত্তরে দুর্যোধন কড়া জবাব দিয়ে বলেছিলেন—জল থেকে যেমন অগ্নির জন্ম, দধীচি মুনির অস্থি থেকে যেমন বজ্রের উৎপত্তি, অগ্নি, কৃত্তিকা, রুদ্র এবং গঙ্গা—এই চারজন ভগবান স্কন্দ-কার্তিকেয়ের উৎপত্তি-আবির্ভাবের কারণ। মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছেন, আচার্য দ্রোণের জন্ম কলস থেকে, শরস্তম্ব বা নল-খাগড়ার বনে কৃপাচার্যের জন্ম—সুতরাং দুর্যোধনের বক্তব্য হল—মানুষের কর্মের দ্বারাই তার জাতি বিচার করতে হবে, জন্ম দিয়ে নয়।

দুর্যোধনের বক্তব্যের মধ্যে না থাকলেও মহাভারত আরও একটা বড়ো উদাহরণ দেয় রাজা বীতহব্যের। বীতহব্য ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, তিনি মহর্ষির ভৃগুর প্রসন্নতা লাভ করে ব্রহ্মর্ষি হয়েছিলেন—

এবং বিপ্রত্বমগমদ্ বীতহব্যো নরাধিপঃ।
ভৃগোঃ প্রসাদাদ্ রাজেন্দ্র ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ॥

বীতহব্যের ব্রাহ্মণত্ব এতটাই এবং মহর্ষি ভৃগুর কৃপা-করুণাও এখানে এমন ছিল যে, ভৃগুর বচনমাত্রেই তিনি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করেছিলেন এবং এই বীতহব্যের পুত্র গৃৎসমদ ঋগ্‌বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। এটা প্রমাণ করে যে, একজন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হবার পর তাঁর বংশে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির জন্ম

হওয়াটা ক্ষত্রিয়ত্বের জন্মজাতিত্ব লুপ্ত করে দিচ্ছে—

ঋগ্‌বেদে বর্ততে চাগ্র্যা শ্রুতির্যস্য মহাত্মনঃ।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার শেষে সারাৎসার এটাই যে, পুরুষানুক্রমে জন্মগত ব্রাহ্মণের একটা ধারা অবশ্যই পুরাণ—মহাভারতের কালেও যথেষ্টই প্রচলিত ছিল, কিন্তু গুণ এবং কর্মের নিরিখে ব্রাহ্মণত্বের আরোপ এবং তার প্রাধান্য মহাভারত এবং পৌরাণিক কালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হয়তো এই কারণেই মহাভারতে ধর্মব্যাধ, তুলাধার বৈশ্য—এই সব চরিত্র শূদ্র-বৈশ্যের তকমা হারিয়ে প্রকৃত ব্রাহ্মণের সম্মান লাভ করেছেন। ফলত গুণকর্মের মাধ্যমে ব্যক্তিচরিত্র যেভাবে প্রকট হয়ে উঠত, সেটাই তাঁর স্বাভাবিক জাতির পরিচয়, এটাই মহাভারতের বার্তা, তাতে জন্মগত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়—এই শব্দগুলি নিতান্তই এক উপাধি হয়ে ওঠে মহাভারতে।

[মহা (k) ১.১৩৭.১১-১৬; ১৩.৩০.৫৭-৬০;
(হরি) ১.১৩২.১১-১৬; ১৩.২৯.৫৭-৬০]

□ ব্রাহ্মণ: সেই বিরাট পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণের জন্ম—ব্রাহ্মণো'স্য মুখমাসীৎ—ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্রটিকে যতই পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ বা হোক, সেই প্রক্ষেপের প্রাচীনতাও এত যে, বেদপরবর্তী গ্রন্থগুলিতে ব্রাহ্মণকে সেই পরম পুরুষের মুখ বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে, ফলত যেমন জন্মগত তথা পুরুষাক্রমে জাতি-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই মন্ত্রটি এক প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তেমনই সমস্ত জাতিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রাধান্যও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। মহাভারত এবং পুরাণের মধ্যেও অনেক জায়গায় বৈদিক ওই পুরুষসূক্তের মন্ত্রটির অনুরণন ঘটতে থাকে—একেবারে ঋগ্‌বেদে যেমনটা আছে, ঠিক তেমনটাই শুধু অন্য ছন্দে—

* ব্রহ্মাসৃজন্মুখে বিপ্রান্ ক্ষত্রিয়ানপি বাহুতঃ।
* ব্রহ্মাস্যতো ব্রাহ্মণাঃ সম্প্রসূতাঃ
  বাহুভ্যাং বৈ ক্ষত্রিয়া সম্প্রসূতাঃ।
* ব্রহ্মা বক্ত্রং ভুজৌ ক্ষত্রং কৃৎস্নমূরূদরং বিশঃ।
* ব্রহ্মাননং ক্ষত্রভুজো মহাত্মা/
  বিড়ূরুরঙ্ঘ্রিশ্রিত-কৃষ্ণবর্ণঃ।
* বিপ্রোমুখাদ্ ব্রহ্ম চ যস্য গুহ্যং
  রাজন্য আসীদ্ ভুজয়োর্বলঞ্চ।

[মহা (k) ৮.৩২.৪৩; ১২.৪৭.৬৭; ১২.৩১৮.৯০;
(হরি) ৮.২৬.৩৪; ১২.৪৬.৬৭; ১২.৩০৮.৯০]

□ চাতুর্বর্ণ্যের আলোচনায় আমরা আগেই ভৃগু-ভরদ্বজ-সংবাদের প্রমাণে জানানো হয়েছে যে, সৃষ্টির আদিতে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, তারপর কর্মের উত্তরোত্তর হীনতাবশত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র জাতির সৃষ্টি হয়েছে। ভৃগু-ভরদ্বাজ-সংবাদ ছাড়াও এই মত মহাভারতের শান্তিপর্বে আরও একবার খুব গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে। এখানে ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে প্রশংসা শোনানোর আগেই বলা হচ্ছে—দেবদেব ভগবান ব্রহ্মা বাক্‌সংযম করে সৃষ্টির তপস্যায় বসার সময় সমস্ত মানুষই ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিল, তারপর অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের সৃষ্টি হয় ব্রাহ্মণ থেকেই—

* ব্রাক্যসংযমকালে হি তস্য বরপ্রদস্য
  দেবদেবস্য ব্রাহ্মণাঃ প্রথমং
  প্রাদুর্ভূতাঃ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ শেষা বর্ণাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ।
* সংসৃষ্টা ব্রাহ্মণৈরেব ত্রিষু বর্ণেষু সৃষ্টয়ঃ।

[মহা (k) ১২.৩৪২.২১; ১২.৬০.৪২;
(হরি) ১২.৩২৮.৪৯; ১২.৫৯.৪৪]

□ সাধারণত 'বৃহ্' (বৃহি) ধাতু থেকে ব্রাহ্মণ শব্দ নিষ্পন্ন হয় এবং 'বৃংহ' ধাতুর অর্থ 'বর্ধতে' অর্থাৎ বেড়ে ওঠা। লক্ষণীয় পরমাত্মস্বরূপ 'ব্রহ্ম', ব্রহ্মা—এই একই ধাতু থেকে এসেছে। তার মানে ধাতুগতভাবেই ব্রাহ্মণ-শব্দটির সঙ্গে শ্রেষ্ঠত্বসূচক 'বৃদ্ধি'-র কথাটা আপনিই জড়িয়ে আছে। অন্যেরা ব্রহ্মার পুত্র ব্রাহ্মণ অথবা 'ব্রহ্ম'-কে জানেন এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত করে ব্রাহ্মণ-শব্দের নিষ্পত্তি করেন। বিদেশী পণ্ডিতজনেরা ব্রাহ্মণ-শব্দটি উৎপত্তি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সেটা সংক্ষেপে জানানোর চেষ্টা করি একটা উদ্ধৃতি দিয়ে—

The word Brahman, according to the renowned lexicographers Böhtlingk and Roth, is derived from the root 'bṛh' (Barh) and is taken to signify 'the godward striving devotion, which appears as an exuberance of spirit and particularly the pious expression of it in the service of the divine.' Geldner takes it to signify the mysterious power inspiring the poet and the seers. To Haug it signifies 'growth' or the means of securing

growth, i.e., worship and prayer. He connects the word 'brahma' with 'baresma' of the *Zend-Avesta.* Other scholars like Osthoff, Oldenberg, and Hillebrandt have found a relation between Brahman and 'Bricht' and tae the word to signify magic. While Wintdernitz found that in the Veda this word means mere formula and the verses having sacred magical power, Haug believes that in the *Ṛgveda* the term 'Kṛtabrahman' signifies' a mysterious power which can be called forth by various ceremonies.' But it seems that the significance of the magical power found in the word is much more predominant in the *Atharvaveda* than in the *Ṛgveda* wherein the word very often signifies 'a simple prayer.'

[Govind Prasad Upadhyay, Brahmanas in Ancient Indiam pp. 2-3]

ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যুৎপত্তি যেভাবেই সাধিত হোক না কেন, একথা আগেই পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, দুইভাবে আমরা ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ হিসেবে দেখতে পেয়েছি—এক, জাতিগত পরম্পরায়, পুরুষানুক্রমে; দুই, শম, দম, ক্ষমা ইত্যাদি উদার চরিত্রগুণে। চাতুর্বর্ণ্যের আলোচনায় এটাও আমরা দেখেছি যে, পুরুষানুক্রমিক ব্রাহ্মণদের চাইতে গুণ-কর্ম-চরিত্রে যাঁরা মহত্ত্ব অর্জন করেছেন, তাঁদের মাহাত্ম্যটাই বেশি।

কর্মের নিরিখে ব্রাহ্মণের সাধারণ লক্ষণ হল—ব্রাহ্মণকে 'ষট্কর্মা' বলা হয়েছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কর্ম ছয় প্রকার—যজন অর্থাৎ নিজের ঘরে তিনি অগ্নিহোত্রাদি যজন করবেন। যাজন অর্থাৎ অন্যের যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করবেন। তিনি নিজে দান করবেন এবং অন্যের দান তিনি গ্রহণও করবেন। তিনি নিজে বেদ-বেদাঙ্গ ইত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন এবং তিনি সেই বিদ্যা অধ্যাপনাও করবেন—

যজনং যাজনঞ্চৈব তথা দানপ্রতিগ্রহৌ।
অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং ষট্কর্মা ধর্মভাগ্ দ্বিজঃ।

লক্ষণীয়, এই ছয়টির মধ্যে যাজন, প্রতিগ্রহ অর্থাৎ অন্যের দান-দক্ষিণা নেওয়া এবং অধ্যাপনা করা—এই তিনটিই ছিল ব্রাহ্মণের জীবিকা অর্জনের উপায়। এগুলি ছাড়া অন্য উপায়ে জীবিকা অর্জন করলে সেই ব্রাহ্মণ নিন্দিত হতেন।

ব্রাহ্মণের এই বৃত্তির সঙ্গে যদি চারিত্রিক গুণগুলি যুক্ত হত, তাহলে ব্রাহ্মণত্বের গুণগুলি নিশ্চিত হত। ভীম যুধিষ্ঠিরকে এক জায়গায় বলছেন—যাঁরা বিদ্যাসম্পন্ন মানুষ, যাঁদের মধ্যে শমদমাদি লক্ষণ আছে এবং যাঁরা সর্বত্র সমদর্শী, সেই ব্রাহ্মণেরাই ব্রহ্মতুল্য—

বিদ্যালক্ষণসম্পন্নাঃ সর্বত্র সমদর্শিনঃ।
এতে ব্রহ্মসমা রাজন্ ব্রাহ্মণাঃ পরিকীর্তিতাঃ॥

ব্রাহ্মণের ষট্কর্মের মধ্যে দান এবং প্রতিগ্রহ সাধারণ জীবিকা, এখানে ধর্মের চ্যুতি ঘটবে যদি প্রতিগ্রহ বা দান গ্রহণের দিকে অতিরিক্ত মন যায়; আর যজন-যাজনের মধ্যে যেহেতু যাজনের সর্বশেষ জায়গায় দক্ষিণালাভের একটা অনুষঙ্গ থাকে, তাই সেখানেও ধর্মের চ্যুতি ঘটে অতিযাজিতায়, যেটা অধ্যাপনার ক্ষেত্রেও একইরকম—অধ্যাপনার পরিবর্তে অর্থকামিতা। ফলে ব্রাহ্মণত্বের আন্তরিক গুণের মধ্যে 'বিদ্যালক্ষণসম্পন্ন'তাও ব্রাহ্মণত্বের একটা সংরক্ষণশীলতা তৈরী করে—সেখানে বেদজ্ঞতা, বিশুদ্ধ বংশ, স্বাধ্যায়, বেদবেদাঙ্গের জ্ঞান এগুলি কখনো কখনো ব্রাহ্মণত্বের প্রয়োজনীয় গুণ হয়ে ওঠে। কিন্তু মহাভারতের মধ্যেই এই উদারতা এসেছে, যেখানে বেদ-বেদাঙ্গের জ্ঞান, কিংবা শুধু বংশের পরিবর্তে অন্য মানবিক গুণগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যাঁর মধ্যে সত্য, দান, অদ্রোহ, আনৃশংস্য, লজ্জা, দয়া এবং কৃচ্ছ্রসাধনের তপস্যা আছে, তিনিই ব্রাহ্মণ—

সত্যং দানমহাদ্রোহ আনৃশংস্য এপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

[মহা (k) ১৩.১৪১.৬৮; ১২.৭৬.২; ১৩.৬০.১২; ১.১১.১৫; ১২.১৮৯.৪; (হরি) ১৩.১১৯.৬৭; ১২.৭৪.২; ১৩.৪৯.১০-১১; ১.৯.২৩; ১২.১৮২.৪]

□ ক্ষত্রিয়: জাতিবর্ণের বিভাগে দ্বিতীয় স্থানে আছেন ক্ষত্রিয়রা, যাঁদের বৈদিক পরিচয় এটাই যে, আদি সৃষ্টিরকালে সেই পরম পুরুষের বাহু দুটি থেকে ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছিল—

বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।

বাহু যেহেতু শক্তি এবং বলের প্রতীক তাই মানুষের সুরমা এবং রাষ্ট্রের পালনকর্ম ক্ষত্রিয়ের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রপালনের যশ এবং যুদ্ধজয়ের কৃতিত্ব যেহেতু একটি মানুষের কীর্তি যশ স্থাপন করে, তাই ঋগ্‌বেদের এক জায়গায় পরিষ্কার বলা হয়েছে—ক্ষত্রায় ত্ব শ্রবসে—অর্থাৎ লোকে অনেক সুখ্যাতি করবে, অনেক নাম করবে, সেইজন্যই ক্ষত্রিয়কে জাগ্রত করেছেন দেবতা। মানুষের যে ভিন্ন ভিন্ন জীবনোপায় প্রকাশ পেয়েছে, ঋগ্‌বেদ যেটাকে বলেছে 'বিসদৃশ'—বিসদৃশা জীবিতাভিপ্রচক্ষ—সেই 'বিসদৃশ' জীবনোপায়ের মধ্য যখন এক একটি জাতিবর্ণের স্পষ্টতা তৈরি হচ্ছেন, তখন খ্যাতি-শ্রুতির মহাত্ম্যটুকু যুক্ত হয়েছে ক্ষত্রিয়ের সঙ্গেই।

হয়তো বাহুর প্রতীকে শক্তি, বল, নেতৃত্বের প্রসঙ্গ আসে বলেই বেদ এবং ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয় জাতির সঙ্গে বল এবং রাষ্ট্রশক্তি একাকার হয়ে গেছে। একজন দেবতার মধ্যে অনেক শক্তি বা বল আছে, এটা বোঝাবার জন্য ক্ষত্র-শব্দের ব্যবহার হয়েছে ঋগ্‌বেদেই।

* মহি বা ক্ষত্রং দেবেষু।

* ক্ষত্রং দেবাসো অদধুঃ সযোষাঃ।

ক্ষত্র বা ক্ষাত্র বলের প্রতিরূপ হয়ে যাওয়ায় শতপথ ব্রাহ্মণে কিন্তু খুব যুক্তিযুক্তভাবে এটা বলা হয়েছে যে, রাজন্য বা রাজশক্তি আসলে এই ক্ষত্র বা বলেরই একটা আকারমাত্র অথবা ক্ষত্র হল শক্তি, আর বলবীর্য্যই রাজন্য—

* ক্ষত্রস্য বা এতদ্‌রূপং যদ্ রাজন্যঃ

* ওজঃ ক্ষত্রং বীর্য্যং রাজন্যঃ।

অবশেষে ক্ষত্র একাকার হয়ে গেছে রাষ্ট্রের সঙ্গেই—

ক্ষত্রং হি রাষ্ট্রম্।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ আরও বলেছে—ক্ষত্রিয় জন্মেছে মানেই জগতে সমস্ত প্রাণীর অধিপতি জন্মেছে, ক্ষত্রিয় জন্মেছে মানে সমস্ত বৈশ্য করদাতাদের কর ভোগ করার মানুষটি জন্মেছে, ক্ষত্রিয় জন্মেছে মানে সমস্ত শত্রুদের হত্যাকারী জন্মেছে, ক্ষত্রিয় জন্মেছে মানেই ব্রাহ্মণদের রক্ষাকর্তা জন্মেছে—

ক্ষত্রিয়ো'জনি বিশ্বস্য ভূতস্য অধিপতিরজনি, বিশামত্তা অজনি, অমিত্রাণাং হন্তা অজনি, ব্রাহ্মণানাং গোপ্তা অজনীতি।

[ঋগ্‌বেদ ১০.৯০.১২; ১.১১৩.৬; ৫.৬৮.৩; ৫.৬৭.৫; শতপথ ব্রাহ্মণ (weber) ১৩.১.৫.৩, পৃ. ৯৬০; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম), ৮.৩৬.২, পৃ. ৮৯৮; ৭.৩৫.২২, পৃ. ৮৬৮; ৮.৩৮.১২, পৃ. ৯৩০]

□ ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টির ব্যাপারে ঋগ্‌বেদে যেভাবে সেই পরম পুরুষের বাহু থেকে তার উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে, মহাভারতে তার অনুরণন শোনা গেছে—

ব্রহ্মাসৃজন্মুখে বিপ্রান্ ক্ষত্রিয়ানপি বাহুতঃ।

এখানে ভাগবত পুরাণ ক্ষত্রিয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে খুব সুনিপুণভাবে ক্ষত্রিয় রাজন্যের সঙ্গে 'ক্ষত্র' অর্থাৎ বলের অংশটাও জুড়ে দিয়ে চলেছে—

রাজন্য আসীদ্ ভুজয়োর্বলঞ্চ।

অর্থাৎ সেই পরম পুরুষের বাহু থেকে রাজন্যস্বরূপ বলেরও সৃষ্টি হল। ক্ষত্রিয়ের এই রূপকাকার অলৌকিক সৃষ্টিতত্ত্বে কথা বাদ দিলে ক্ষত্রিয় শব্দের আরও একটা সাধারণ নিরুক্তি তৈরি হয়েছে সাধারণের মানসিকতা থেকে। রাজতন্ত্রের আদর্শ রাজার কাছ থেকে সাধারণ মানুষ যে সুরমা পেত, বিপন্ন মানুষ যেভাবে আর্তত্রাণের সমাধান লাভ করত রাজা বা ক্ষত্রিয়ের কাছে, তাতে এইরকম একটা কথা সমাজের মধ্যে রূঢ় হয়ে গিয়েছিল যে, ক্ষত্রিয়রা সাধারণ মানুষকে ক্ষত থেকে ত্রাণ করেন। মহাভারতে অভিমন্যু সপ্তরথীর আক্রমণে মৃত্যুবরণ করার পর যুধিষ্ঠির যখন বিলাপ করছিলেন, তখন ষোলো জন বিখ্যাত রাজার মৃত্যুকাহিনী শোনানো হয়। সেখানে আদিরাজা পৃথুর কথা বলার সময় তাঁর ক্ষত্রিয়ত্ব ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—আমাদের সকলকে ক্ষত থেকে ত্রাণ করবেন বলেই মহারাজ পৃথুর ক্ষত্রিয়ত্ব সাধিত হয়—

ক্ষতান্নস্ত্রাস্যতে সর্বানিত্যেবং ক্ষত্রিয়ো'ভবৎ।

আর্ত মানুষকে ত্রাণ করার জন্যই ক্ষত্রিয়ের ধনুকটি আছে এই বার্তা রামায়ণেও একই রকম। সীতা রামচন্দ্রকে রাক্ষস হত্যার বিপদ স্মরণ করিয়ে দিলে রাম বলছিলেন যে, আর্তের আর্তনাদ যাতে না শুনতে হয়, সেইজন্যই ক্ষত্রিয়ের ধনুক—

ক্ষত্রিয়ৈ ধার্য্যতে চাপং নার্তশব্দো ভবেদিতি।

রামায়ণ এবং মহাভারতের এই কথাটা প্রায়

একইরকম ভাবে আক্ষরিকভাবে মেনে নিয়ে কালিদাস তাঁর রঘুবংশে মহারাজ দিলীপ যখন যে কোনো মূল্যে বশিষ্ঠের হোমধেনুটির সুরক্ষায় মন দিয়েছিলেন, তখনও তিনি একই কথা বলেছিলেন—ক্ষত থেকে ত্রাণ করেন বলেই 'ক্ষত্র' নামক এই উগ্র শব্দটি ক্ষত্রিয় অর্থে রূঢ় হয়ে গেছে। দিলীপ বলেছেন—যে ক্ষত্রিয় পুরুষ ক্ষত থেকে ত্রাণ করতে পারে না তার কাছে রাজ্য পালন করাটা বিপরীত বৃত্তি হয়ে দাঁড়ায়, এমনকী প্রাণ ধারণ করাটাও এমন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কলঙ্ক হয়ে দাঁড়ায়—

ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রো
ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ।
রাজ্যেন কি তদ্‌বিপরীতবৃত্তেঃ
প্রাণৈরুপক্রোশমলীমসৈর্বা ॥

[রামায়ণ (Lahore) ৩.১১.৩]

□ রাজ্যপালন এবং প্রজাপালনের প্রয়োজনে আর্তত্রাণের এই সুরই কিন্তু ক্ষত্রিয়ের গুণকর্ম নির্ধারণ করে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন আর রাজা হতে চাইছেন না, স্বজনক্ষয়ের অনুতাপ যখন তাঁর হৃদয় আলোড়িত করে চলেছে, তখন তিনি রাজ্য ত্যাগ করে অরণ্যবাসী হতে চেয়েছিলেন ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শে। সেই সময় স্বয়ং মহামুনি ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিলেন যে, তিনি যেটা করতে চাইছেন, সেটা ব্রাহ্মণের বৃত্তি—

ব্রাহ্মণানাং মহারাজ চেষ্টা সংসিদ্ধিকারিকা।

কিন্তু বাছা! তোমার কাজটা ক্ষত্রিয়ের এবং সে কাজগুলি কীরকম, সেটা তুমিও জানো। ক্ষত্রিয়রা বড়ো বড়ো যাগযজ্ঞ করবেন; বেদবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা লাভ করবেন; সমস্ত কর্মে সদা উত্থানশীল হতে হবে তাঁকে; আর ভূমিলাভ-ঐশ্বর্য্যলাভের ব্যাপারে সর্বসময় তাঁর মধ্যে একপ্রকার অসন্তোষ কাজ করবে; তিনি সকলের মঙ্গলের জন্য দণ্ড ধারণ করবেন এবং সেই দণ্ডদানের ক্ষেত্রে ভীতি প্রদর্শনী উগ্রতাও থাকবে; অবশেষে প্রজাপালনের কাজটা তাঁর অগ্রাধিকার। তিনি অনেক অর্থ উপার্জন করবেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্রপালনের প্রয়োজনে সেটা ব্যবহার করার পর উদ্‌বৃত্ত অর্থ রাজা উপযুক্ত পাত্রে দানও করবেন। সবার শেষে তুমি এটাও মনে রাখো যে, ক্ষত্রিয়ের প্রধান কাজ হল দণ্ডধারণ, কেননা ক্ষত্রিয়ের প্রধান লক্ষণ হল এই যে, তার মধ্যে বল আছে, শক্তি আছে, আর সেই শক্তি প্রকাশ লাভ করে দণ্ডের মাধ্যমেই। সংক্ষেপে এই যেসব বিদ্যার কথা বললাম, এগুলিই একজন ক্ষত্রিয়কে সিদ্ধিদান করে—

* যজ্ঞো বিদ্যাসমুত্থানমসন্তোষঃ শ্রিয়ং প্রতি।
দণ্ড ধারণমুগ্রত্বং প্রজানাং পরিপালনম্‌॥
* দ্রবিণোপার্জনং ভূরি পাত্রে চ প্রতিপাদনম্‌॥
* এষাং জ্যায়স্তু কৌন্তেয় দণ্ডধারণমুচ্যতে।
বলং হি ক্ষত্রিয়ে নিত্যং বলে দণ্ডঃ সমাহিতঃ॥
এতা বিদ্যা ক্ষত্রিয়াণাং রাজন্‌সংসিদ্ধিকারিকা।

লক্ষণীয়, মহাভারতে বিশদ ক্ষেত্রে বারবার ক্ষত্রিয়ের কাজ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে ভগবদ্‌গীতার মধ্যে সংক্ষেপে সেই একই কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ স্বভাব, পাত্রে দান এবং প্রভুত্বভাব—এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবত স্বকর্ম—

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্‌॥

[মহা (k) ১২.৩১৮.৯০; ১২.২২.৯-১৫; ৭.৬৭.২;
(হরি) ১২.৩০৮.৯০; ১২.২২.৯-১৫; ৭.৬১.২;
ভগবদ্‌গীতা ১৮.৪৩; ভাগবত পু. ৮.৫.৪১]

□ মহাভারতের প্রমাণ থেকেই এটা বোঝা যায় যে, প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয় শব্দের পর্যায় হিসেবেই রাজা-বাচক শব্দগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেই শব্দগুলি হল রাজা, ভোজ, বিরাট্‌, সম্রাট্‌, ভূপতি, নৃপ ইত্যাদি—

রাজা ভোজো বিরাট্‌ সম্রাট্‌ ক্ষত্রিয়ো ভূপতির্নৃপঃ।
য এভিঃ স্তূয়তে শব্দৈঃ কস্তং নার্চিতুমর্হতি॥

আরও একটা জিনিস এখানে বলা দরকার যে, রাজাই একমাত্র ক্ষত্রিয়ের কিংবা ক্ষত্রিয় জাতির একমাত্র প্রতিভূ নন, বস্তুত ক্ষত্রিয়রা হলেন warrior class বা ruling class. ফলত মন্ত্রী, অমাত্য, সেনাপতি এবং আরও যেসব মানুষ যাঁরা পরাক্রমশালী, যাঁরা যুদ্ধ-বিগ্রহ পছন্দ করতেন তাঁরা সকলেই ক্ষত্রিয় পদবীভুক্ত হতেন। মহাভারতে বলা হয়েছে—যিনি যুদ্ধ ইত্যাদি হিংসাকার্য করে থাকেন, বেদ অধ্যয়ন করেন এবং ব্রাহ্মণদের অর্থ দেন এবং রাজ্যপালনের জন্য প্রজাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করেন, তিনিই ক্ষত্রিয়—

ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম বেদাধ্যয়নসঙ্গতঃ।
দানাদানরতির্যস্তু স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে॥

এই ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যিনি শিষ্টের পালন আর দুষ্টের দমনে সতত নিযুক্ত তাঁকেই রাজা করা উচিত, কেননা এমন মানুষই পৃথিবীধারণে সমর্থ—

নিত্যং যস্তু সতো রক্ষেদ্ অসতশ্চ নিবর্তয়েৎ।
স এব রাজা কর্তব্যস্তেন সর্বমিদং ধৃতম্॥

রামায়ণেও আমরা দেখেছি যে, প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা বা বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা সুষ্ঠু চালনার জন্য, ব্রাহ্মণের তপস্যা যাতে নির্বিঘ্ন হয় তার জন্য এবং সবার ওপরে আছে সর্বসাধারণের সুরক্ষা—সেটা ছাড়া ক্ষত্রিয়ের আর কোনো ধর্ম নেই—

সৃষ্টা ধর্মব্যবস্থার্থং তপস্যারক্ষণায় চ।
ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ তথা ভবিতুমর্হসি॥
নান্যো ধর্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং রক্ষণাৎ তাত ইষ্যতে।

[মহা (k) ১২.৬৮.৫৪; ১২.১৮৯.৫; ১২.৭৮.৪৪; (হরি) ১২.৬৬.৫৪; ১২.১৮২.৫; ১২.৭৬.৪৪; রামায়ণ (Lahore) ১.১৯.৮-৯]

□ মহাভারতের শান্তিপর্বে পিতামহ ভীষ্ম রাজধর্ম বিস্তারিতভাবে বলার আগেই কৃষ্ণের কাছে বলেছিলেন—ব্রাহ্মণের কাছে যেমন তাঁর পবিত্র কর্তব্য হল দান, অধ্যয়ন এবং তপস্যা, তেমনই ক্ষত্রিয়ের একমাত্র ধর্ম হল যুদ্ধে শরীরপাত করা—

* ব্রাহ্মণানাং যথা ধর্মো দানমধ্যয়নং তপঃ।
ক্ষত্রিয়াণাং তথা কৃষ্ণ সমরে দেহপাতনম্॥
* ক্ষত্রিয়স্য হি সর্বস্য নান্যো
ধর্মো'স্তি সংযুগাৎ।

যুদ্ধে শত্রুকে হত্যা করে বিনাশ করো নয়তো নিজে যুদ্ধে বিনষ্ট হও—এটাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। ক্ষত্রিয় হয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছেন, পালিয়ে আসছেন, এর মতো অধর্ম ক্ষত্রিয়ের দ্বিতীয় কিছু হয় না। ক্ষত্রিয় জাতিতে জন্ম লাভ করে সেই মানুষ ঘরে শুয়ে শুয়ে মারা যাচ্ছেন, এটা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত নয়। ক্ষত্রিয় মানেই তাঁর বীরত্ব এবং শূরত্বের অভিমান থাকবে। যে ঘটনায় তাঁর শৌর্য্যবীর্য্যের অভিমান নষ্ট হয় সেটাই তাঁর পক্ষে অধর্ম। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সংগ্রামে পলায়নী মনোবৃত্তির মতো অধর্ম কিছু নেই, যুদ্ধ করাই তাঁর ধর্ম এবং সেই যুদ্ধে যদি শরীর শেষ হয়ে যায়, সেটাই তাঁর যশের পথ, সেটাই তাঁর স্বর্গলাভ। ক্ষত্রিয় ঘরে বসে স্বচ্ছন্দমরণ চাইবেন না—

* ক্ষত্রিয়স্য হি ধর্মো'য়ং হন্যাদ্ হন্যেত বা পুনঃ।
* ন হ্যধর্মো'স্তি পাপীয়ান্ ক্ষত্রিয়স্য পলায়নাৎ।
ন যুদ্ধধর্মাচ্ছ্রেয়ো'ন্যঃ পন্থাঃ স্বর্গস্য কৌরবাঃ॥
* ন গৃহে মরণংতাত ক্ষত্রিয়াণাং প্রশস্যতে।
শৌটীরা নাম শৌটীর্য্যমধর্মং কৃপণঞ্চ তৎ॥

ভগবদ্‌গীতায় অর্জুন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে নিকট আত্মীয় পরিজনদের শত্রুপক্ষে দেখে করুণায় কাতর হলেন, তখন কৃষ্ণের মুখেও সেই ক্ষত্রিয়ধর্মের উচ্চারণ ঘটেছিল। কৃষ্ণ অর্জুনকে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—তুমি তোমার স্বধর্ম স্মরণ করেও এমন কাতর হতে পারো না। কেননা এই ধর্মযুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া ক্ষত্রিয়ের কাছে আর কিছু শ্রেয় হতে পারে না। তোমার সামনে হঠাৎ করেই যেন এক স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে। এমন একটা যুদ্ধ পেলে ক্ষত্রিয়রা সততই খুশি হন। এর পরেও যদি তুমি এই ধর্মসম্মত যুদ্ধ না করো, তাহলে ধর্ম তো যাবেই, উপরন্তু অশেষ পাপের ভাগী হবে তুমি। অর্থাৎ কিনা একজন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ না করাটাই পাপের। আর পাপ শুধু নয়, তুমি যুদ্ধ না করলে লোকে ভাববে—ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও মানুষটা যুদ্ধ করতে ভয় পেল। এর চেয়ে বেশি নিন্দা আর কী হতে পারে ক্ষত্রিয়ের। তাই বলছিলাম—হয় তুমি যুদ্ধে নিহত হয়ে স্বর্গ লাভ করো নয়তো যুদ্ধ করে এই পৃথিবী ভোগ করো। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হল উত্থানশীলতা, তুমি ওঠো যুদ্ধে যাও—

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছেয়োহ'ন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥
যদৃচ্ছায়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহ'ব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে॥
ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা
ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥
[মহা (k) ১২.৫৫.১৪; ৩.৩৫.৩৫; ৭.১৯৬.৩৮; ৮.৯৩.৫৯; ১২.৯৭.২৫; (হরি) ১২.৫৪.১৪; ৩.৩১.৩৫; ৭.১৬৭.৮৯; ৮.৬৭.৭৩-৭৪; ১২.৯৪.২৫; ভগবদ্‌গীতা ২.৩১-৩৭]

□ ক্ষত্রিয়ের আর এক ধর্ম হল দান। যেহেতু ক্ষত্রিয় রাজা প্রজাদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করেন, অন্যের রাজ্য আক্রমণ করে তাঁর ভূমি নিজের অধিকারে আনেন, শত্রুর ধনৈশ্বর্য্যও যেহেতু রাজার অধিকারে আসে, তাই ক্ষত্রিয় রাজার কাছে অর্থের জোগান অবশ্যই একটা উদ্‌বৃত্ত তৈরি করে। আর ঠিক এইখানেই সৎপাত্রে দানের প্রশ্ন আসে। এখানে সৎপাত্র বলতে প্রজাকল্যাণের যে বিভাগগুলি দুর্বল, সেখানে যেমন রাজা অর্থযোজনা করবেন, তেমনই রাষ্ট্রের যে শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্ষত্রিয়দের মতো চাকুরীজীবী নন, সেই ব্রাহ্মণদেরও অর্থদান করার ব্যাপারটা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। রামায়ণে ভরত রামচন্দ্রকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় পথে যেতে যেতে নিষাদ গুহের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। রামচন্দ্র নিষাদগৃহে থাকার সময় গুহ যখন খাবারদাবার দিয়েছেন রামচন্দ্রকে, তখন রাম সব খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ না করে যা বলেছিলেন গুহকে, সেটা গুহ নিজেই ভরতকে জানিয়েছেন। রাম সামান্য খাদ্য গুহের কাছ থেকে স্বীকার করেছেন এবং সবটা যে তিনি নেননি, তার কারণ নাকি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। তিনি বলেছেন— ক্ষত্রিয় কখনো দান গ্রহণ করতে পারেন না, কেননা, দান করাটাই তাঁর ধর্ম। ধনুক উঁচিয়ে সামনাসামনি যুদ্ধ করা, সেটাও ক্ষত্রিয়ের কাজ। অতএব এত দান আমি নিতে পারবো না—

তৎপ্রীত্যা চ ময়ানীতং প্রণয়েন চ রাঘবঃ।
সর্বং ন প্রতিজগ্রাহ ক্ষাত্রং ধর্মমনুস্মরণা॥
আহ চ স্ম স ধর্মাত্মা চলিতং মামধোমুখম্।
অস্মাভির্ন প্রতিগ্রাহ্যং দেয়মেব তু সর্বশঃ॥
চাপং চোদ্যম্য যোদ্ধব্যমেতৎ ক্ষত্রভৃতাংব্রতম্।

ক্ষত্রিয়ের এই বৃত্তি—আর্তের ত্রাণ, শিষ্টের পালন, সংগ্রাম এবং দান—এই সবটাই এক ক্ষত্রিয়কে এক প্রজারঞ্জক রাজায় পরিণত করে, যে রাজার সংজ্ঞা মহাভারতের ভাষায়—

রঞ্জিতাশ্চ প্রজাঃ সর্বাস্তেন রাজেতি শব্দ্যতে।
[মহা (k) ১২.৫৯.১২৫; ১২.৬৯.৬৩-৬৫; (হরি) ১২.৫৮.১২৫; ১২.৬৭.৬৩-৬৫; রামায়ণ (Lahore) ২.৯৯.১৬-১৮]

□ বৈশ্য: ঋগ্‌বেদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, বেদের যুগের সমাজ বলতে বোঝাত কতকগুলি পরিবারকে। সমাজের এই পারিবারিক ভিত্তি থেকে আমরা তিনটি শব্দ পাই, যেগুলির নাম 'জন', 'বিশ্' এবং 'জন্মন্'। সৌভাগ্যের বিষয়, একটি ঋক্‌মন্ত্রের মধ্যেই তিনটি শব্দ অনুক্রমে লিখিত হওয়ায় পণ্ডিতেরা ধারণা করেছেন যে, বৈদিক যুগের সামাজিক গঠনের প্রথম ইতিহাস এই মন্ত্রের মধ্যেই পাওয়া যাবে। ঋক্‌মন্ত্রটিতে বলা আছে—যে ব্যক্তি ব্রহ্মণস্পতিকে ঘৃতাহুতি দেয় সে তার পুত্র এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেই শুধু নয়, সে তার 'জন', 'বিশ্', এবং 'জন্মের' সঙ্গে অন্ন এবং ধন লাভ করে—

স ইজ্জনেন স বিশা স জন্মনা স
পুত্রৈর্বাজং ভরতে ধনা নৃভিঃ।

এই ঋকে পুত্রপরিবার, আত্মীয়স্বজনের কথা (পুত্রৈঃ, নৃভিঃ) আলাদাভাবে বলা থাকায় পণ্ডিতেরা বলেছেন—'জন্মন্' বলতে বোঝায় একটা ছোট্ট গ্রাম, যে গ্রামের মানুষেরা পিতৃপিতামহের পরম্পরায় ভিন্ন কিংবা একান্নবর্তী হয়ে একত্র বসতি করেছে। 'জন্ম'সূত্রে বাঁধা এইরকম কতকগুলি গ্রাম সাধারণ আত্মীয়তার সূত্র ধরে জন্ম দিয়েছে 'বিশ্'-এর। সংস্কৃতে বিশ্ একটি পুংলিঙ্গ শব্দ—যার একবচন 'বিশ্', দ্বিবচন 'বিশৌ', বহুবচন 'বিশঃ'। বিশ্ ধাতুর অর্থ প্রবেশ করা, বসতি স্থাপন করা—to enter, to settle। কাজেই, বিশ্ বলতে বুঝব settlement। এক-একটি বিশ্-এর প্রধান পুরুষকে বলা হত বিশ্‌পতি। *[ঋগ্বেদ ৭.৫৫.৫]*

'ক্ষত্র' বা 'ক্ষত্রিয়', যা সেকালের 'nobility'-র প্রতীক ছিল, সেই 'ক্ষত্র' এবং তার শাসনভূমি রাষ্ট্রকে বৈদিক সমাজের মানুষেরা অনেকসময় 'খাদক' বলে মনে করেছেন। বৈদিক প্রজারা মনে করেছেন—তাঁদের সঙ্গে রাজা এবং রাষ্ট্রের সম্পর্ক খাদ্য-খাদকের। 'ক্ষত্র' বা রাজাকে তাঁরা রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছেন—

ক্ষত্রং হি রাষ্ট্রম্।

রাষ্ট্রের বিপুল সঞ্চিত ভাণ্ডার রাজাকে ভীষণভাবে পুষ্ট করত বলেই রাষ্ট্র থেকে 'ক্ষত্র'কে তাঁরা আলাদা করতে পারেননি। রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্মক রাজার চরিত্র কীরকম? না, রাজা বা ক্ষত্রিয় হলেন খাদক (অত্তা) আর খাদ্য (অন্ন) হলেন রাষ্ট্রস্থিত প্রজারা—

অত্তা বৈ ক্ষত্রিয়ঃ অন্নং বিট্।

খাদক ক্ষত্রিয়ের খাদ্য বা অন্ন যদি বেশি থাকে, তবেই সে রাষ্ট্র সমৃদ্ধিলাভ করবে, সেই রাষ্ট্রই টিকে থাকবে। শতপথ-ব্রাহ্মণ অন্যত্র আরও কাব্য করে বলেছে—রাষ্ট্র টিকে থাকে রাষ্ট্রের জনগণকে খেয়ে। প্রজারা যে কর দেয় বা রাজার ভরণের জন্য তারা যে ত্যাগ স্বীকার করে, তার ওপরেই রাষ্ট্র টিকে থাকে। অতএব, আপন স্থিতির জন্য রাষ্ট্র জনগণকে নিজের খাদ্যে পরিণত করে। রাষ্ট্রের অধিকর্তা জনগণকে খেয়ে বেঁচে থাকেন—রাষ্ট্রী বিশমত্তি। রাষ্ট্র যেন এক হরিণ, আর জনগণ হল তার খাদ্য 'যব'। রাষ্ট্র-হরিণ জনগণরূপী যব খেয়েই বাঁচে।

এই যে প্রজা-রাজার খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক, এইখানেই বলবত্তরের স্বৈরশাসন স্মরণ করা যায়। রাষ্ট্রের শুভকামী মানুষেরা তখন একত্রিত হন এবং বিশৃঙ্খলার বিষ মন্থন করে সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রের অমৃত তুলে আনেন। এই মন্থন শুরু হয় রাষ্ট্রের মানুষের মধ্যেই। শতপথ-ব্রাহ্মণ তখন বলেন—বিশ্ বা জনগণই রাজার জন্ম দেয়, বিশ্ থেকেই রাজার সৃষ্টি—

বিশ্ এব তদ্ ক্ষত্রং জনয়তি,

বিশো হি ক্ষত্রং জায়তে।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭.৩৪; শতপথ ব্রাহ্মণ ৬.১.২.২৫; ১৩.২.৯.৮; ১২.৭.৩.৮]

□ 'বিশ্' শব্দের তাৎপর্যে একটি গ্রাম অথবা গ্রামস্থিত জনসমূহই হোক—রাজাকে যে বিশ-সমূহের খাদক বা ভোক্তা বলা হয়েছে, তার অর্থ একটাই—বিশগুলিই রাজার খাবার জোগাত, রাজকর দিয়ে রাষ্ট্রে তাঁর সুস্থিতি প্রতিষ্ঠা করত। 'বিশ্' হচ্ছে যব, রাজা সেই যবভোক্তা হরিণের মতো—এই কথাটা এক সুচারু করনীতির সূচনা করে দেয় এবং যাঁরা এই রাজকর দিতেন সেই বিশ্ভুক্ত মানুষেরাই যে ক্রমে বৈশ্য হিসেবে পরিচিত হন তার প্রমাণ যেমন শতপথ ব্রাহ্মণের স্পষ্ট উচ্চারণ থেকে বোঝা যায়, তেমনই বোঝা যায় মহাভারত থেকে।

রাষ্ট্রের করদাতারা করদানের পরিবর্তে নিজের আত্মীয়জন এবং নিজের জীবিকা চালিয়ে যাবার সুস্থিতি কামনা করেছেন বলেই শতপথ ব্রাহ্মণে এইরকম একটা এসেছে যে, একজন বৈশ্য যদি তার ব্যবসা করার পশুগুলি নিজের দখলে রাখতে চায় তবে তাকে রাজার বশেই থাকতে হবে। কেননা, সুরক্ষাদাতা একজন ক্ষত্রিয় মাথার ওপরে থাকলেই পশুগুলি একজন বৈশ্যের ঘরে ঠিকঠাক থাকে—

ক্ষত্রিয়স্যৈবং বশে সতি বৈশ্যং

পশব উপতিষ্ঠন্তে।

সেকালের দিনে গবাশ্ব প্রভৃতি পশুই মানুষের সম্পদ ছিল, বিনিময়ের একক হিসেবেও পশুরই ব্যবহার ছিল অগ্রগণ্য। সর্বোপরি পশুপালনই যেহেতু ব্যবসা করার অন্যতম উপাদান হিসেবে বৈশ্যরাই আত্মসাৎ করছিলেন, তাই পশুগুলির সফল সংরক্ষণ, যার মধ্যে গোরু-ছাগল চড়ে আসার পর তাদের সংখ্যা গুণে ঘরে তোলা, অন্যের আত্মসাৎ-ক্রিয়া থেকে পশুগুলিকে রক্ষা করা—এগুলি ব্যবসার কাজের অঙ্গ ছিল। আর সেখানে পারস্পরিক গ্রাম্য বিবাদের হাত থেকে রক্ষা পেতেই সুরক্ষাদাতা রাজপুরুষ ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন হত এবং তাঁদের হাতে রাজকর তুলে দিতেন প্রধানত বৈশ্যরাই আর সেটা অবশ্যই আপন রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার প্রয়োজনে। শতপথ ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থ এই তথ্য স্বীকার করেছে—

ইমা বিশঃ ক্ষত্রিয়ায় বলিমাহরন্তি।

অর্থাৎ বিশভুক্ত একটি প্রধান গোষ্ঠী— যাদের আমরা পরে বৈশ্য বলেছি—তাঁরাই কিন্তু প্রধানত রাজকর দিতেন।

বৈদিক কাল থেকে যে রীতি চলে আসছে তাতে একমাত্র লেখাপড়া এবং ধর্মীয় কার্য ছাড়া ব্রাহ্মণেরা রাষ্ট্রের কোনো উৎপাদনশীল কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। ক্ষত্রিয়েরা রাজ্যশাসন, যুদ্ধ এবং রাজকর্মের বিভিন্ন পরিসরে ছোটো-বড়ো কাজে নিযুক্ত হতেন। আর শূদ্রদের কোনো ভূসম্পত্তির বালাই ছিল না। ফলে, রাজ্যের সমস্ত উৎপাদনশীল কর্মের সঙ্গে—সে কৃষিই হোক পশুপালন হোক আর ব্যবসাবাণিজ্যই হোক—

এইসমস্ত উৎপাদনশীল কর্মের সঙ্গে বৈশ্যরাই প্রধানত জড়িত ছিলেন। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে তাই বৈশ্যদের সংজ্ঞাই হল—যাঁরা রাজাকে কর দিয়ে বেড়ান—অন্যস্য বলিকৃৎ—আর মহাভারতে রাজ-অধীনতার বহুল প্রচলিত উপমাই হল—বৈশ্যদের মতো যারা রাজার অধীন করদাতা।

মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে অন্যান্য দেশের রাজারা নানা মহার্ঘ্য বস্তুর উপঢৌকন নিয়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সৌহার্দ্য বিনিময় করেছিলেন। আহৃত উপহারবস্তুর মধ্যে মণি-রত্ন থেকে আরম্ভ করে পশুসম্পদ তথা দেশজ বস্তুর পরিমাণ দেখে দুর্যোধন ঈর্ষ্যাকাতর হয়ে বলেছেন—ঠিক যেমন বৈশ্যরা বিনীত হয়ে রাজকর দেয়, সেইভাবে যেন রাজারাই আপন বশ্যতার জন্য এই সব উপহার এনেছেন—

তথা হি রত্নান্যদায় বিবিধানি নৃপা নৃপম্।
উপতিষ্ঠন্তি কৌন্তেয়ং বৈশ্যা ইব করপ্রদাঃ॥

মহাভারতে এই কথাটা প্রায় প্রবাদের মতো একাধিকতার উচ্চারিত হয়েছে। এই প্রাবাদিক সত্য থেকে বোঝা যায় যে, বৈদিক কাল থেকে রাজাদের অর্থের উৎস ছিলেন বৈশ্যরাই। বৈশ্যদের দেওয়া রাজকরে রাজাদের কোশ ভরে উঠত বলেই ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে বৈশ্যেরা রাজাদের খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন; আর রাজকরে ফাঁকি কিংবা রাজকোশে টান পড়লেই বৈশ্যরাই হয়ে উঠেছেন রাজার খাদ্য—তাঁদের সঙ্গে যখন-তখন যেমন-তেমন ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—

যথাকাম-প্রযাপ্য, অন্যস্য বলিকৃৎ,
অন্যস্যাদ্যো যথাকামো জেয়ঃ।

ব্রাহ্মণযুগের পরবর্তী কালে যখন সুনির্দিষ্ট করব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে, তখন রাষ্ট্রশাসকরা বুঝে গেছেন যে, অর্থের উৎস বৈশ্যদের অত্যাচার করলে রাজা এবং রাষ্ট্রের দুয়েরই বিপদ বাড়বে। হয়তো সেই মনুসংহিতার মতো গ্রন্থে বলা হয়েছে—যেভাবে হোক রাজা যেন বৈশ্যদের সব সময় রক্ষা করে চলেন, কেননা, বৈশ্যদের যথোপযুক্ত সুরক্ষা দিলেই তবে রাজা তাঁদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কর আদায় করতে পারবেন—

শাস্ত্রেণ বৈশ্যান্ রক্ষিত্বা ধর্ম্যমাহরয়েদ্ বলিম্।

এই মনুশ্লোকের টীকায় মেধাতিথির মতো আচার্য লিখেছেন—রাজা বৈশ্যদের রক্ষা করবেন এইজন্য যে, বৈশ্যের অনেক অর্থসম্পদ থাকে। অতএব বৈশ্য যদি অপরাধও করে, তবু তাদের নিধন করা উচিত নয়—

বৈশ্যা মহাধনা ভবন্তি।
ততস্তথাহরণে নিযুক্তাঃ কৃতাপরাধা ন হন্যন্তে।

বৈশ্যরা ধনবান হন—এই বোধটা মহাকাব্যের কালে খুব ভালোভাবে চলে আসায় তাঁদের শোষণ করলে রাষ্ট্রের ক্ষতি হবে—এই বোধটাও শরশয়ান ভীষ্ম খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরকে। বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, অল্পমূল্যেই হোক, আর বহু মূল্য দিয়েই হোক, বৈশ্যদের এক জায়গায় জিনিস কিনে অন্য জায়গায় বিক্রয় করতে হয়। এখানে ক্রীত দ্রব্য এবং অর্থের সঞ্চয় নিয়ে দূরপথ যাতায়াত করতে হয় এবং মাঝপথে এমন এমন জায়গায় থেকে যেতে হয়, যেখানে বিক্রেয় বস্তু এবং অর্থ হৃত হবার সম্ভবনা থাকে। ভীষ্ম এই বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁদের সুরক্ষার কথা বলছেন একটিমাত্র শব্দে—দূর পথে বনে-জঙ্গলে তাঁদের বিশ্রাম করতে হয়, অতএব তোমার রাজ্যে বণিক বৈশ্যরা রাজকরের ভারে জর্জরিত হয় না তো—

ক্বচিত্তে বণিজো রাষ্ট্রে নোদ্বিজন্তি করার্দিতাঃ।
ক্রীণন্তো বহুনাল্পেন কান্তারকৃতবিশ্রমাঃ॥

[শতপথ ব্রাহ্মণ ১.৩.২.১৫; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭.২৯; মনুসংহিতা ১০.১১৯; মহা (k) ২.৪৭.২৮; ১২.৮৯.২৩; (হরি) ২.৪৫.২৭; ১২.৮৭.২৩]

□ জাতিগতভাবে বৈশ্যদের প্রধান বৃত্তি ছিল কৃষিকর্ম, গোরক্ষা অর্থাৎ গবাদি পশুপালনের মাধ্যমে গবাশ্ব প্রভৃতির পশুর বৃদ্ধি ঘটানো এবং সেই পশুর বিনিময়ে অন্য প্রয়োজনীয় বস্তুর আমদানি করা। আর তৃতীয়টি হল বাণিজ্য। ভগবদ্‌গীতা খুব সহজে বলেছে—

কৃষি-গোরক্ষ্য-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।

এটা মনে রাখতে হবে যে, বৈশ্যরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের নিরিখে 'দ্বিজ', তাঁদের বেদপাঠেও যেমন অধিকার আছে তেমনই তাঁদের উপনয়ন সংস্কারও হত। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের দূত হয়ে পাণ্ডবদের কাছে পৌঁছোলে অনেক কথার শেষে যখন তিনি কৃষ্ণের মুখোমুখি হলেন—তখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চতুর্বর্ণের বৃত্তির

কথা বললেন কৃষ্ণ। সেখানে বৈশ্যদের বৈশ্যদের কর্ম নির্দেশ করার সময় কৃষ্ণ বলছেন—বৈশ্য পশুপালন করবেন, কৃষিকর্ম করবেন এবং বাণিজ্য করবেন। এই তিন প্রকারে অর্থ উপার্জন করে অপ্রমত্তভাবে অর্জিত অর্থের সুরক্ষা করবেন বৈশ্যরা কেননা তাতেই ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়। এছাড়া তাঁরা বেদ অধ্যয়ন করবেন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের প্রিয়সাধন করবেন—অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের দান করবেন আর ক্ষত্রিয় রাজার রাজকরে ফাঁকি দেবেন না। এইভাবেই গৃহস্থ বৈশ্যরা ধর্ম এবং পুণ্যের ভাগী হন—

বৈশ্যো'ধীত্য কৃষি-গোরক্ষ-পণ্যৈ
বিত্তং চিন্বন্ পালয়ন্নপ্রমত্তঃ।
প্রিয়ং কুর্বন্ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াণাং
ধর্মশীলঃ পুণ্যকৃদাবসেদ্ গৃহান্।

ব্যবসাবাণিজ্য এবং কৃষি-পশুপালনের মাধ্যমে বৈশ্যরাই যেহেতু রাষ্ট্রের সবচাইতে বড়ো ধনী মানুষ বলে গণ্য হতেন, অতএব তাঁকে খুব ধার্মিক এবং পুণ্যশীল হিসেবে দেখতে চেয়েছেন অন্য বর্ণের মানুষেরা। মহাভারতের এক জায়গায় ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতির উপদেশ দেবার সময় জনৈক কেকয়দেশীয় রাজার বয়ান শুনিয়েছেন। তাঁকে রাক্ষসেরা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি তাঁর জনপদের চাতুর্বর্ণ্যের সুষ্ঠু ক্রিয়াকারিতা ব্যাখ্যা করে বৈশ্যদের সম্বন্ধে বলেছিলেন—আমার রাজ্যের বৈশ্যরা সব অকপটে কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্যের কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু তাঁরা সকলেই অপ্রমত্ত অর্থাৎ নিজের বৃত্তিবিষয়ে ভ্রান্তিহীন নিরলস। নিজের জাতিগত অন্য কর্মেও তাঁদের পূর্ণ প্রযত্ন আছে, তাঁরা 'ক্রিয়াবান্' ব্রত-নিয়মের ক্ষেত্রেও তাঁরা নিষ্ঠাবান, তাঁরা সত্যবাদী, স্বধর্ম পালন করে স্বকর্ম করেন, পরস্পর পরস্পরকে দেখেন— অন্যকে ভোগবঞ্চিত করে তাঁরা শুধুই নিজের ভোগ করেন না, ইন্দ্রিয়দমন, শুচিতা এবং সৌহার্দ্য তাঁদের অন্তরঙ্গ গুণ। এইরকম ধরনের উপযুক্ত বৈশ্যরা যেখানে থাকেন—কেকয়রাজ এবার রাক্ষসকে সাবধান করে বললেন— এইরকম ধার্মিক বৈশ্যরা যেখানে থাকেন, সেই আমার রাজ্যে তুমি প্রবেশ করো কী করে—

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যমুপজীবন্ত্যমায়য়া।
অপ্রমত্তাঃ ক্রিয়াবন্তঃ সুব্রতাঃ সত্যবাদিনঃ॥
সংবিভাগং দমং শৌচং সৌহৃদঞ্চ ব্যপাশ্রিতাঃ।
মম বৈশ্যাঃ স্বকর্মস্থা মামাকান্তারমাবিশঃ॥

বৈশ্যেরা ব্যাবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ উপায় করতেন বলেই যেহেতু তাঁদের উপার্জিত অর্থের একাংশ রাজকরের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ঘটাত তাই বৈশ্যদের অর্থোপার্জন সুস্থিত করার জন্য রাজারা বিভিন্ন বণিক্‌পথ তৈরি করাতেন এবং সে পথ যে অনেক সময় পার্বত্য পথও হত, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে দ্রোণপর্বে কৃষ্ণার্জুনের উপমায়। কৃষ্ণ এবং অর্জুন যখন জয়দ্রথকে বধ করার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেছেন, তখন তাঁদের মুখবর্ণ লক্ষ্য করে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বলছেন—বাঘ-সিংহ-হাতিতে ভরা পার্বত্য পথ পেরিয়ে আসার পর বণিক্‌দের মুখগুলি যেমন জরামৃত্যুর ধকল সয়ে -ওঠা উজ্জ্বল অথচ নিস্তরঙ্গ হয়ে ওঠে, অভিমন্যুর মৃত্যু সয়ে-ওঠা কৃষ্ণার্জুনের মুখ-দুটিও তেমনই সংকল্পিত এবং কঠিন হয়ে উঠেছে—

ব্যাঘ্র-সিংহ-গজাকীর্ণান্ অতিক্রম্য চ পর্বতান্।
বণিজাবিব দৃশ্যেতাং হীনমৃত্যুজরাতিগৌ॥

হয়তো সুদূর পথ-সরণি বেয়ে বৈশ্যবণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যেতেন বলেই বৈশ্য-বণিকদের 'সারণিক' বলা হয়েছে মহাভারতে। আরও বলা হয়েছে—একজন রাজা যখন বহুকষ্ট-সওয়া এই সারণিক বৈশ্যদের পুত্রবৎ সুরক্ষা দেন এবং তাঁদের মর্যাদা ভঙ্গ না করে যথোচিত সম্মান দেন, সেটা কিন্তু রাজার ধর্ম বলেই প্রশংসিত হয়—

যদা সারণিকান্ রাজা পুত্রবৎ পরিরক্ষতি।
ভিনত্তি চ ন মর্যাদাং স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে।।

[মহা (k) ৫.২৯.২৬; ১২.৭৭.১৫-১৬; ৭.৯৯.২০; ১২.৯১.৩৬; (হরি) ৫.২৯.২৬; ১২.৭৫.১৫-১৬; ৭.৮৮.২০; ১২.৮৯.৩৬; ভগবদ্‌গীতা ১৮.৪৪]

□ শূদ্র: 'শুচ্' ধাতুর অর্থ শোক করা। প্রকৃতি-প্রত্যয়গতভাবে মূলে এই ক্রিয়াপদ থাকায় সাধারণ ভাবে মনে করা হয়, যাঁরা শোক করেন অথবা শোক বা কষ্ট পাওয়ার কারণ উপস্থিত হতেই যাঁরা প্রতিবিধানের পথ চিন্তা না করেই আগে শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েন—শোকে দ্রবীভূত হন—তাঁদেরই শূদ্র বলে। আবার এমনটাও তো হতে পারে জন্মগত ভাবে নয়, বৃত্তিগতভাবে যাঁরা উচ্চবর্ণের

সেবায় নিযুক্ত হলেন, সেই শোকই ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে শূদ্র বলে পরিচিত করেন।

শব্দকল্পদ্রুমে বেশ কয়েকটি প্রাচীন শব্দকোষের প্রমাণে শূদ্রের অন্তত পনেরোটি পর্য্যায়-শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে এবং শব্দগুলি প্রমাণ করে সমাজের উচ্চবর্ণের প্রতিভূরা কী চোখে কতটা নিম্ন দৃষ্টিতে সমাজের এই বৃহত্তম জাতিগোষ্ঠীকে দেখেছেন। শূদ্রের পর্যায়শব্দ অমরকোষে—অবরবর্ণ, বৃষল, জঘন্যজ। শব্দরত্নাবলীতে—দাস, পাদজ, অন্যজন্মা, জঘন্যজ, দ্বিজসেবক। জটাধর-কৃত কোষে শুধু একটাই পর্য্যায়শব্দ—পদ্য, অর্থাৎ সেই বিরাট পুরুষের পা থেকে শূদ্রের জন্ম। হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতে শূদ্রের পর্যায়শব্দগুলি হল—অন্ত্যবর্ণ, বৃষল, পদ্য, পজ্জ এবং জঘন্যজ (শ্লোক ৫৫৮, পৃ. ১৪০)। রাজনির্ঘন্টে লিখিত পর্য্যায় শব্দগুলি হল—চতুর্থ, দ্বিজদাস, উপাসক।

[শব্দকল্পদ্রুম, খণ্ড ৫, পৃ. ১২৬-১২৭]

☐ বস্তুত ঋগ্‌বেদের বিখ্যাত সেই পুরুষসূক্তে যেদিন বলা হয়েছিল—সেই বিরাট পুরুষের পা থেকে শূদ্রেরা জন্মালেন—

পদ্ভ্যাং শূদ্রো'জায়ত—

সেদিন থেকেই শূদ্রদের সামাজিক নিম্নতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যেন। সেদিন থেকেই যেন পায়ের প্রতীকে সকল উচ্চবর্ণের সেবাকাজে দৌড়োদৌড়ি শুরু হল। কেউ এটা ভাবলেন না যে, পদযুগল হলেও সেটা সেই বিরাট পুরুষের পদযুগল, যে পরম পদের রহস্য বোঝার জন্য দেবতারা নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকেন—

তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।

কিন্তু মনুষ্য সমাজ এবং তার মধ্যে উচ্চবর্ণের মানুষেরা স্বপ্রয়োজনে পরম পুরুষের পদযুগলের নিম্নতা ব্যাখ্যা করেছেন। অথর্ববেদে একবার শূদ্র-শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা চতুবর্ণের অন্তর্গত একটি বর্ণের বিষয়ে তথ্য নিবেদনের মতো করে এসেছে এবং তাও এসেছে সম্পূর্ণ আর্য জন-জাতির বিপ্রতীপে এক পৃথক জনজাতি হিসেবে। এখানে সন্দপুষ্প নামে একটি ওষধি ডান হাতে বেঁধে ঋষি ভাবছেন—সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের দেওয়া এই ওষধির গুণে তিনি শূদ্র থেকে আর্য সকলকেই ভালো করে চিনতে পারবেন—

তাং মে সহস্রাক্ষো দেবো দক্ষিণে হস্ত আদধৎ।
তয়াহং সর্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্র উতার্য্যঃ॥

শুক্লযজুর্বেদেও ব্যাপারটা একই রকম এবং এখানেও শূদ্র শব্দের সঙ্গে একত্রে আর্য জনজাতির সমাসবদ্ধ পদ তৈরি হয়ে একত্রে ব্যবহৃত—

নবদশভিঃ অস্তুবত শূদ্রার্যাবসৃজ্যেতাম্।

মূল বেদগুলির মধ্যে শূদ্রের মধ্যে যে আর্য্যেতর সংজ্ঞার সৃষ্টি হচ্ছে এর মধ্যে একটা ঐতিহাসিক তথ্য আছে। পণ্ডিতজনেরা মনে করেন—বৈদিক আর্যরা সপ্ত সিন্ধুর আবাস ছেড়ে পশ্চিম থেকে পুবের দিকে বসতি তৈরি করতে আরম্ভ করলেন তখন নতুন নতুন জনপদ তাঁদের এক্তিয়ারভুক্ত হল। কুরু-পঞ্চাল, কোশল (অযোধ্যা), বিদেহ (উত্তর বিহার), মগধ (দক্ষিণ বিহার), অঙ্গ (পূর্ব বিহার) এগুলি তাঁদের নতুন বাসস্থান।

অন্যদিকে আর্যদের আর একটি শাখা ভারতবর্ষের দক্ষিণে গেল বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করে। চতুর্বেদের মন্ত্রপদে এই অভিযানের তেমন উল্লেখ না থাকলেও ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে এই ঘটনার উল্লেখ যথেষ্টই আছে। আর্যরা যখন এইভাবে পূর্ব এবং দাক্ষিণাত্য-ভূমিতে পদচারণা আরম্ভ করলেন, তখন পূর্ব-দক্ষিণের মূল জনপদবাসীদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই তাঁদের বিবাদ-বিসংবাদ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হয়ে গেল। নতুন নতুন জনপদে এতকালের বাসিন্দা যাঁরা আর্যদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছিলেন, আর্যদের কাছে তাঁদের সংজ্ঞা ছিল দস্যু। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির আভাস থেকে বোঝা যায় যে, দাক্ষিণাত্যের পূর্বাধিবাসীরাই তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষার জন্য মাঝে মাঝেই আর্যদের ওপর হঠাৎ আক্রমণ চালাতেন। এই আক্রমণ এবং প্রত্যাক্রমণের ফলে শেষ পর্যন্ত আর্যেতর পূর্বাধিবাসীরা যেখানে আর্যদের বশ্যতা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁরাই দাস বলে পরিচিত হয়েছেন এবং তাঁদের অন্য নাম শূদ্র—যাঁরা আর্যদের কাছে হেরে শোক লাভ করেছেন এবং শোকে দ্রবীভূত হয়েছেন—শুচা দ্রবতি-তাই শূদ্র। আর এই আক্রমণে যাঁরা আর্য্যদের বশ্যতা স্বীকার করলেন না, তাঁরাই পরিচিত হলেন দস্যু বলে। হয়তো এই কারণেই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন ব্রাহ্মণে শূদ্রদের সেই বিরাট পুরুষের পদসম্ভূতির কথা না বলে

বলা হয়েছে—শূদ্রদের জন্ম হয়েছে অসুরদের কাছ থেকে—অসূর্য্যঃ শূদ্রঃ। শতপথ ব্রাহ্মণ তো শূদ্রদের ব্যাপারে এতটাই কড়া যে, ঋগ্‌বেদের অনুকরণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতিকে প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি বললেন, কিন্তু শূদ্রদের নামও উচ্চারণ করলেন না। খানিক পরে যখন ব্রাহ্মণ, রাজন্য এবং বৈশ্যকে ব্রহ্ম, ক্ষত্র এবং মরুৎ-দেবতার সঙ্গে একাত্মক করে দেওয়া হচ্ছে, তখন শূদ্রদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—শূদ্রেরা আছে শুধু পরিশ্রম করার জন্য—

তপো বৈ শূদ্রম।

শতপথ ব্রাহ্মণের আরও বহু জায়গাতেই শূদ্রদের ব্যাপারে অনেক বিধি-নিষেধের কথা আছে, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ-রাজন্যের যজ্ঞস্থলে তাঁদের প্রবেশও নিষেধ করা হয়েছে। ফলত আর্যসমাজের বাইরে তাঁদের স্থান নির্ণয় হল বলেই তাঁদের শূদ্ররা শুধু অবহেলা, ঔদাসীন্য অমর্য্যাদার শিকার হয়ে রইলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এমন কথাও লেখা হল—শূদ্র মানেই তারা অন্যের দাসত্ব করবে, যখন তখন তাদের তাড়িয়েও দেওয়া যায়, যখন তখন তাদের মেরেও ফেলা যায়—

অন্যস্য প্রেষ্যঃ কামোথাপ্যো যথাকামবধ্যঃ।

[ঋগ্‌বেদ ১০.৯০.১২; অথর্ববেদ (Roth & Whitney) ৪.২০.৪, পৃ. ৬৩; শুক্লযজুর্বেদ সংহিতা (নির্ণয় সাগর প্রেস) ১৪.৩০, পৃ. ২৭৩; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (এ. মহাদেব শাস্ত্রী), ১.২.৬.৫০, পৃ. ১২৯; শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber), ১৩.৬.২.১০; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম) ২য় খণ্ড, ৩৫.৩.২৯, পৃ. ৮৮২]

□ মহাভারত-রামায়ণের কালেও ব্রাহ্মণ্য সংস্কার শূদ্রদের ব্যাপারে অনেক শিথিল হয়ে উঠলেও সংস্কারগতভাবে শূদ্রদের প্রতি উচ্চবর্ণের মনোভাবটাই এমন অশ্রদ্ধার ছিল যে, তাঁরাও শূদ্রকে সমাজের অধম স্থানে তাঁদের বৃত্তি নির্ণয় করেছেন। এখানে চতুবর্ণের মধ্যে তাঁরা বর্ণ হিসেবে স্বীকৃত, কিন্তু তাঁদের সংজ্ঞাটাই কিন্তু আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত স্মরণ করিয়ে দেবে। অর্থাৎ সেই পরাজিত ভূখণ্ডের ভূমিপুত্ররা যাঁরা দাস হিসেবে আর্যদের অধীনস্থ হলেন তাঁরাই শূদ্র। তাঁদের কাজ তিন উচ্চবর্ণের পরিচর্যা করা—

* প্রজাপতির্হি বর্ণানাং দাসং শূদ্রমকল্পয়ৎ।
তস্মাচ্ছূদ্রস্য বর্ণনাং পরিচর্যা বিধীয়তে॥
* নিত্যংত্রয়াণাং বর্ণানাং শুশ্রূষুঃ শূদ্র উচ্যতে।
* পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্‌।
* শূদ্রাংশ্চৈবাপি বর্ণাংস্ত্রীন্‌ শুশ্রূষন্তো'নসূয়বঃ।

[মহা (k) ১২.২৯৪.২; ১২.৬০.২৮; (হরি) ১২.২৮৭.২; ১২.৫৯.২৮; ভগবদ্‌গীতা ১৮.৪৪; রামায়ণ (Lahore) ১.৬.২১]

□ রামায়ণ মহাকাব্যে শূদ্রদের যে সামাজিক স্থিতি দেখতে পাওয়া যায়, সেটা অনেক বেশি উদার। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই 'যজ্ঞীয়' ত্রিবর্ণ ছাড়া 'অযজ্ঞীয়' শূদ্রদের যেখানে যজ্ঞস্থলের ধারে-কাছে যেতে বারণ করেছেন শতপথ ব্রাহ্মণ, সেখানে রামায়ণের দশরথ রাজা তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলে অন্যান্য তিন উচ্চবর্ণের সঙ্গে শূদ্রদেরও নিমন্ত্রণ জানিয়ছেন হাজারে হাজারে—

নিমন্ত্রয়স্ব নৃপতীন্‌ পৃথিব্যাং যে চ ধার্মিকাঃ।
ব্রাহ্মণান্‌ ক্ষত্রিয়ান্‌ বৈশ্যান্‌
শূদ্রাংশ্চাপি সহস্রশঃ॥

সবচেয়ে বড়ো কর্মকর দাসের ওপরে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে যে ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে, কালের পর্যায়ে সেই ঘৃণা অস্তমিতও হয়েছে মহাকাব্যের যুগে। বিশেষত রামায়ণে যেটা দেখতে পাই, সেটা হল দাস-শূদ্রজনের প্রতি প্রভু হিসেবে রামচন্দ্রের মায়া। তাঁরা যে কর্মকর শূদ্র ছিলেন, সেটা তাঁদের বৃত্তি থেকে বোঝা যায়। তাঁরা কেউ কাপড় কাচতেন অর্থাৎ ধোপা, কেউ চুল-দাড়ি কাটতেন এমন নাপিত, যাঁরা অনুলেপন দিতেন রামচন্দ্রকে, যাঁরা স্নান করাতেন, হাত-পা টিপে দিতেন, যাঁরা বন্দনা গান করে রামচন্দ্রের ঘুম ভাঙাতেন —এইসব সেবক শূদ্রদের কথা রামচন্দ্র স্মরণ করছেন পিতৃসত্য পালন করার জন্য বনে যাবার আগে। লক্ষ্মণকে তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে বনে যাবার পর এই সব শূদ্র জনজাতীয়রা বৃত্তিহীন না হয়ে পড়েন। তাঁদের জন্য রামচন্দ্র এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং খাবার জন্য হাজার বস্তা শালীধান দিতে বলেছেন। পরিচর্যাবৃত্তি এই শূদ্র সেবকদের তালিকায় মল্লযোদ্ধা, বিদূষক, রথের চাকা খাদ থেকে তুলে দেয় এমন মানুষ, এমনকী জননী কৌশল্যার পরিচর্যাকারীরাও ছিলেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, শূদ্রদের বেদপাঠে অধিকার ছিল না—

নাধিগন্তুং ময়া শক্যা সাবিত্রী বৃষলৈরিব।

এমনকী উত্তর কাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত বলে কথিত শূদ্র শম্বুকের তপস্যার ভূমিকায় রামচন্দ্রের হাতে শূদ্র

শম্বুকের হত্যার ঘটনাও সেই একই মর্ম ঘোষণা করে। কিন্তু রামায়ণের শূদ্রের সঙ্গে উচ্চ তিন বর্ণের যে সম্পর্ক উল্লিখিত হয়েছে, তাতে রামচন্দ্র কর্তৃক শম্বুক-বধের ঘটনা প্রক্ষিপ্তবাদের মতবাদই দৃঢ়তর করে তোলে। কেননা অযোধ্যায় তিন উচ্চবর্ণের সঙ্গে শূদ্ররাও তাঁদের পরিচর্যার কাজটা করতেন সঠিক তাল মিলিয়ে এবং সেখানে অন্য উচ্চবর্ণের প্রতি তাঁদের কোনো ঈর্ষ্যা-অসূয়া ছিল না—

ব্রহ্ম পর্য্যচরৎ ক্ষত্রং বৈশ্যাঃ ক্ষত্রমনুব্রতাঃ।
শূদ্রাংশ্চৈবাপি বর্ণাংস্ত্রীন্ শুশ্রূষন্তো'নসূয়রঃ॥
আসীৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখং বিট্‌শূদ্রং রাজভক্তিমৎ।

[রামায়ণ (Lahore) ১.৯.৭৭; ২.৯.২১-২৫; ২.৯২.১৮; ১.৬.২১-২২]

□ শূদ্রদের ব্যাপারে মহাভারতের চিত্রটা উদার এবং অনুদার দুইই। মহাভারতে যেটা 'didactic portion', সেখানে শূদ্রদের দিয়ে দাসকর্ম করানো, কিংবা যজ্ঞ সম্বন্ধে তাঁদের অনধিকার কিংবা শূদ্রান্নভোজনে উচ্চবর্ণের পাতিত্যের কথাটা বেশ ঘোষিতভাবে তীক্ষ্ণ। অথচ মহাভারতের ব্যবহারিক জায়গায় শূদ্রদের উপস্থিতি দাসকর্মের নিষেধ অতিক্রম করে অনেক সময়েই অনেক গৌরবের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত।

মহাভারতের বনপর্বে শূদ্রদের চিরকালীন ধর্ম যে উচ্চ তিন বর্ণের সেবা করা, সেটা একটা ঘোষিত সত্যের মতোই উচ্চারিত। একই সঙ্গে সন্ন্যাসীর ভিক্ষাবৃত্তি কিংবা ব্রতহোম যে একেবারেই শূদ্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ, একথা একেবারে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে—

শুশ্রূষা চ দ্বিজাতীনাং শূদ্রানাং ধর্ম উচ্যতে।
ভৈক্ষ্য-হোম-ব্রতৈর্হীনাস্তথৈব গুরুবাসিতা॥

উচ্চবর্ণের ঘরে তাঁরা হীন কাজ করবেন, এটাই বিধি। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে এক জায়গায় যেমন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই ত্রিবর্গের বা ত্রিবর্ণের পরিচর্যা করাটাই শূদ্রধর্ম এমনটা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে আবার অদ্ভুত একটা উদারতা দেখিয়ে বলা হচ্ছে—সর্বতো ভাবে সকল উচ্চবর্ণের অতিথি সৎকার করা এবং যথাশক্তি ধর্মার্থকামের সেবা করাও শূদ্রধর্ম—

সর্বাতিথ্যং ত্রিবর্গম্য যথাশক্তি নিশানিশম্।
শূদ্রধর্মঃ সমাখ্যাতস্ত্রিবর্গপরিচারণম্॥

শূদ্রদের সম্বন্ধে বারবার এই ত্রিবর্ণের সেবার সাধারণ উপদেশ দেবার সঙ্গে সঙ্গে একটা সময় মহাভারত কিন্তু সেবারও একটা পার্থক্য নির্ণয় করছে। উদ্যোগপর্বে শূদ্রধর্ম বলার সময় মহাভারত বলছে—ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের প্রিয়কার্য সাধন করে শূদ্র ধর্মশীল এবং পুণ্যকারী হয়ে গৃহাশ্রমী হবেন। শূদ্র সম্পত্তির জন্য নিরলস এবং উদ্যমী হয়ে ব্রাহ্মণদের বন্দনা এবং পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত হবেন। শূদ্র বেদাধ্যয়ন কিংবা যজ্ঞানুষ্ঠান করবে না, কেননা পুরাতন শূদ্র-ধর্মানুসারে বেদাধ্যয়ন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ—

প্রিয়ং কুর্বন্ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াণাং/
ধর্মশীলঃ পুণ্যকৃদাবসেদ্ গৃহান্।
পরিচর্য্যাবন্দনং ব্রাহ্মণানাং/
নাধীয়ীত প্রতিষিদ্ধো'ত্র যজ্ঞঃ।
নিত্যোত্থিতঃ ভূতয়ে'তন্দ্রিতঃ স্যাদ্
এবং স্মৃতঃ শূদ্রধর্মঃ পুরাণঃ॥

এখানে দ্বিতীয় শ্লোকে শুধু ব্রাহ্মণদের পরিচর্য্যা-বন্দনার কথা বলা হয়েছে তিন বর্ণের কথা বলা হয়নি। প্রথম শ্লোকপংক্তিতে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের প্রিয় সাধন করতে বলা হয়েছে শূদ্রকে, বৈশ্যদের কথা বলা হয়নি। অন্য একটি শ্লোকে শান্তিপর্বে বলা হয়েছে—শুধু তিন বর্ণের সেবা নয়, শূদ্র তিন বর্ণকে অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করে—

ত্রীন্ বর্ণানুপজীবন্তি যথাবদনুসূয়কাঃ।

এটা ঘটনা যে শূদ্র উচ্চ-তিন বর্ণের সেবা করত এবং সেটা হয়তো ভৃত্যের কাজ। কিন্তু অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে—দাস-শূদ্রের নিজের অর্থসম্পত্তি বলে কিছু থাকবে না—

ত্রয় এব অধুনা রাজন্ ভার্য্যা দাসস্তথা সুতঃ

এই কথাটা কিন্তু মহাভারতের ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় খানিকটা উদার মাত্রা লাভ করছে। কেননা শূদ্রেরা যে মহাভারতের শুধুমাত্র ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পরিচর্য্যা করে ধন্য হত, তা কিন্তু নয়, তাঁদের সেবা-পরিচর্য্যার বিনিময়ে তাঁরা অর্থও উপার্জন করতেন। শান্তিপর্বে মহাভারত বলছে—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চতুর্বর্ণই জীবনযাত্রা নির্বাহ করে কিছু পাবার জন্য। ব্রাহ্মণ দান পাবার জন্য অন্যের যাগযজ্ঞ করেন, রাজারা কর আদায় করেন, বৈশ্যেরা কৃষিকর্ম-ব্যবসা করেন আর শূদ্রেরাও নিজের পরিচর্যার কাজ করে ভাতা-বেতন

পান—টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখেছেন তাঁর টীকায়—

চতুর্বিধা হি লোকে'স্মিন্ যাত্রা তাত বিধীয়তে।
মর্ত্যা যত্রাবতিষ্ঠন্তে সা চ কামাৎ প্রবর্ততে॥

তাছাড়া দীর্ঘকাল ধরে শূদ্র জনজাতিকে দাসবৃত্তি করতে দেখে এমন একটা সামাজিক মানসও কিন্তু তৈরি হয়েছিল, যাতে মানুষ এটা ভাবত যে, শূদ্র যেমন তিন বর্ণের পরিচর্যা করে, তেমনই তাঁদেরও ভাতা-বেতন-পুরস্কার দিয়ে ভরণ-পোষণ করা দরকার, মাঝে মাঝে তাঁদের উশীর বেষ্টন, ছাতা, জুতো, পাখা এসবও দিতে হবে—

অবশ্যং ভরণীয়ো হি বর্ণানাং শূদ্র উচ্যতে।
ছত্রং বেষ্টনমৌশীরমুপানদ্‌ব্যজনানি চ।।

শূদ্রের জন্য অথবা সেবাকার্যে নিরত ভৃত্য বা দাসের জন্য এই যে মায়াবোধ এতে একটা social mobility ও তৈরি হয়েছিল, তা না হলে প্রভুর সন্তানাদি না থাকলে, আত্মীয়-স্বজন তেমন না থাকলে সে প্রভুর পিণ্ড দেবে, এইরকম পারলৌকিক কাজের বিধান মহাভারতে পাওয়া যেত না—

দেয়ঃ পিণ্ডো'নপত্যায় ভর্তব্যৌ বৃদ্ধদুর্বলৌ।

আর একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে, পরিচর্য্যা ছাড়াও অন্য যে কাজ শূদ্রেরা করতে পারতেন, তার একটা বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় মহাভারতে—শূদ্রেরা দেবতার মন্দির তৈরি করতেন, শিল্পকর্ম করতেন, এটা প্রায় প্রতিষ্ঠিত সত্য, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হল—শূদ্রেরা যদি পরিচর্যাত্মক কর্মে বৃত্তিলাভ না করতে পারতেন তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্য পশুপালন ইত্যাদি বৈশ্যের কর্ম তাঁরা করতে পারতেন—এই সামাজিক নিদানটুকু সেবাপরায়ণ শূদ্রের মুক্তির যেটুকু জায়গা তৈরি করেছিল, ভবিষ্যতে সেটা প্রসারিত হয়েছে—

বাণিজ্যং পশুপাল্যঞ্চ তথা শিল্পোপজীবনম্।
শূদ্রস্যাপি বিধীয়ন্তে যদা বৃত্তি র্ন জায়তে॥

[মহা (k) ৩.১৫০.৩৬; ১৩.১৪১.৭৫; ৫.২৯.২৬; ১২.৭৭.১৭; ৫.৩৩.৬৮; ১২.২৯০.৯; ১২.৬০.৩২-৩৫; (হরি) ৩.১২৪.৩৬; ১৩.১১৯.৭৪; ৫.২৯.২৬; ১২.৭৫.১৭; ৫.৩৩.৬৮; ১২.২৮৩.৮৩; ১২.৫৯.৩২-৩৫]

☐ শূদ্রের এই সামাজিক স্বধর্ম-বর্ম থেকে বেরিয়ে আসাটা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সেভাবে গ্রহণ করতে পারেনি বলেই কোনো কোনো পুরাণে যেমন শূদ্রদের পরিচর্যার বৃত্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে, তেমনই বহুতর পুরাণে কথিত ভক্তি-আন্দোলনের পথগুলি শূদ্রকুলের সামাজিক মুক্তির দ্বার আরও বেশি উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ভগবদ্‌গীতায় ভগবানের মুখনিঃসৃত ঘোষণা সেখানে ব্রাহ্মণ্যের বিপ্রতীপে নতুন এক শপথ তৈরি করেছে। ভগবান বলছেন—আমাকে আশ্রয় করে স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র এমনকী অন্ত্যজ পাপযোনির মানুষেরাও পরমা গতি লাভ করে—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যে'পি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যা স্তথা শূদ্রাস্তে'পি যান্তি পরাংগতিম॥

[ভগবদ্‌গীতা ৯.৩২]

চান্দ্রব মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বংশজাত একজন বংশ প্রবর্তক ঋষি। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৬.৭০]*

চান্দ্রমসি পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি চান্দ্রমসির বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি ভৃগুর বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৫.২৬]

চান্দ্রায়ণ পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্রের গ্রন্থে চান্দ্রায়ণ ব্রত অন্যায় আচরণের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পূর্ণ এক বৎসর ধরে চান্দ্রায়ণ ব্রতের কৃচ্ছ্রতা সাধন করার পর হিংসা করা, বা চুরি করার মতো পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, একথা বায়ু পুরাণ বলেছে—

ভূয়ো নির্বেদমাপন্নশ্চরেচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্।
বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন সংবৎসরমিতি শ্রুতিঃ॥
ততঃ সংবৎসরস্যান্তে ভূয়ঃ প্রক্ষীণকল্মষঃ।

এমনকী যাঁরা কোনো অন্যায়-পাপ করেননি, যাঁদের চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, যাঁরা যোগী, তাঁদের পক্ষেও চান্দ্রায়ণ ব্রত শ্রেষ্ঠ—

যোগীনাঞ্চৈব সর্বেষাং শ্রেষ্ঠং চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্।

সুতরাং শক্তি অনুসারে দুই, তিন বা চারটি চান্দ্রায়ণ ব্রত করা যোগীর পক্ষেও বিধেয়—

একং দ্বে ত্রীণি চত্বারি শক্তিতো বা সমাচরেৎ।

[বায়ু পু. ১৮.১৩-১৪; ১৬.১৬]

☐ যে সমস্ত পাপ আচরণ করলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করা উচিত, তার একটা ক্ষুদ্র তালিকা আছে মৎস্য পুরাণে। পুরুষকে বা স্ত্রীলোককে হরণ করা, অন্যের জমি হাতিয়ে নেওয়া, অন্যের কুয়ো অথবা

পুষ্করিণী দখল করে নেওয়া—এই সব ঘটনায় চান্দ্রায়ণ ব্রত করতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত অগম্যাগমন যেমন বন্ধুর স্ত্রী, পুত্রবধূ, অন্ত্যজ স্ত্রী, কুমারী কন্যা, মামাতো, পিসতুতো বোন, ভ্রাতৃবধূ—এই সব অগম্যা রমণীর সঙ্গে যৌনতায় লিপ্ত হলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করতে হবে। যে স্ত্রী ব্রাহ্মণের যৌনতায় দূষিত হয়েছে, তাকে নির্জন গৃহে আটকে রাখবেন স্বামী, তারপর এই রমণী যদি আবার পরপুরুষের দ্বারা প্ররোচিত হয়, তবে কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ ব্রতই তার প্রায়শ্চিত্ত।

[মৎস্য পু. ২২৭.৪৩, ৫০-৫১, ৫৬-৫৭]

চান্দ্রায়ণ ব্রতের পরিচিতি মহাভারতেও আছে এবং সেটা পাপশুদ্ধির জন্যই বিহিত হয়েছে—

চান্দ্রায়ণং চরেন্মাসং কৃচ্ছ্রং বা পাপশুদ্ধয়ে।

[মহা (k) ১২.১৬৫.৬৯; ১২.৩০৩.২১;
(হরি) ১২.১৬০.৬৬; ১২.২৯৬.২১]

□ পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে চান্দ্রায়ণ ব্রত খুব পুরাতনকালেই প্রচলিত ছিল, কেননা খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত পাণিনির ব্যাকরণ-সূত্রে চান্দ্রায়ণের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে—

পারায়ণ-তুরায়ণ-চান্দ্রায়ণং বর্তয়তি।

[অষ্টাধ্যায়ী ৫.১.৭২]

চান্দ্রায়ণ ব্রতের মধ্যে চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির একটা অনুকরণগত মিল আছে বলেই এই ব্রতের নাম চান্দ্রায়ণ—চন্দ্রের অয়ন অনুসারে এখানে ব্রত পালন হয়, এমনটাই বলা হয়েছে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির মিতাক্ষরা টীকায়—

চন্দ্রস্যায়নমিবায়নং চরণং যস্মিন্ কর্মণি
হ্রাসবৃদ্ধিভ্যাং তচ্চান্দ্রায়ণম্।

খুব প্রাচীনকাল থেকেই চান্দ্রায়ণ-ব্রত অমাবস্যা-পূর্ণিমার ভেদে দুটি নামে বিখ্যাত হয়েছে। এখানে খাদ্য গ্রহণের নিয়ম চান্দ্রতিথি অনুসারে বাড়ে কমে। তাতেই এই ব্রতের দুই ভাগ এবং দুটি নাম। একটি নাম যবমধ্য আর অপর নাম পিপীলিকামধ্য। যবের দানার মাঝখানটায় যেমন পেটমোটা মতো আর দুই দিকে সরু হয়ে ওঠে, তেমনই যবমধ্য চান্দ্রায়ণে এক একদিন করে খাবার খেয়ে পনেরো দিনের দিন সবচেয়ে বেশি খাবার খেয়ে যেন পেটমোটা যবের মতো হয়ে ওঠা। তারপর আবার খাবার কমাতে কমাতে পিপীলিকার মধ্যদেশ যেমন পাতলা হয়ে ওঠে সেইভাবে একদিন পূর্ণ উপবাসের দিন আসে, সেই চান্দ্রায়ণ হল পিপীলিকামধ্য—

তদেতচ্চান্দ্রায়ণং পিপীলিকামধ্যম্।
বিপরীতং যবমধ্যম্।

'যবমধ্য' চান্দ্রায়ণ ব্রতের নিয়ম হল—শুক্লপক্ষের প্রতিপদে এক গ্রাস খাদ্য গ্রহণ করার পর দ্বিতীয়া তিথিতে দুই গ্রাস, তৃতীয়া তিন গ্রাস—এইভাবে পূর্ণিমার দিন একজন চান্দ্রায়ণব্রতী পনেরো গ্রাস খাবার খেতে পারবেন। কিন্তু পূর্ণিমা গেলে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে চোদ্দ গ্রাস, দ্বিতীয়ায় তেরো গ্রাস এবং এই ভাবে কমতে কমতে কৃষ্ণা চতুর্দশীতে এক গ্রাস এবং অমাবস্যার দিনে পূর্ণ উপবাস। যেহেতু এই ধরনের ব্রতে মাসের মাঝখানে পূর্ণিমার দিন সবচেয়ে বেশি খাওয়া তাই যবের সঙ্গে তুলনায় এই চান্দ্রায়ণ যবমধ্য—

তাংশ্চ চন্দ্রকলাভিবৃদ্ধৌ বর্ধয়েদ্ হানৌ
হ্রাসয়েদ্ অমবস্যায়াং নাশ্চীয়াদ্ এষ
চান্দ্রায়ণো যবমধ্যঃ।

পিপীলিকামধ্য চান্দ্রায়ণ ব্রতে কৃষ্ণপক্ষে ব্রতারম্ভ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে চোদ্দ গ্রাস, দ্বিতীয়ায় তেরো গ্রাস—এইভাবে খাদ্যগ্রাস কমাতে কমাতে অমাবস্যার দিন পূর্ণ উপবাস এবং শুক্লপক্ষে শুরু হতেই প্রতিপদে এক গ্রাস। দ্বিতীয়ায় দুগ্রাস—এইভাবে বাড়াতে বাড়াতে পূর্ণিমার দিন পনেরো গ্রাসের আহার। এই প্রকার চান্দ্রায়ণে প্রথম দিকে এবং শেষ দিকে আহারের পরিমাণ বেশি থাকে এবং মধ্যের অমাবস্যা তিথিতে উপবাস থাকে বলেই এটি পিপীলিকামধ্য। একেবারে মধ্যভাগে খাদ্যের পরিমাণ সবচেয়ে কম থাকে বলেই এই নাম—

পিপীলিকাবন্মধ্যে হ্রসিষ্ঠং ভবতীতি
পিপীলিকামধ্যমিতি উচ্যতে।

যবমধ্য এবং পিপীলিকামধ্য ছাড়াও আরও অন্য ভাবেও চান্দ্রায়ণের প্রক্রিয়া কল্পিত হয়েছে। এখানে ভাগ হল মুখ্য চান্দ্রায়ণ এবং গৌণ চান্দ্রায়ণ। মুখ্য চান্দ্রায়ণ হয় যবমধ্য অথবা পিপীলিকামধ্য। আর গৌণ চান্দ্রায়ণের আবার প্রকার চারটি—সামান্য চান্দ্রায়ণ, ঋষি চান্দ্রায়ণ, শিশুচান্দ্রায়ণ এবং যদি চান্দ্রায়ণ। সামান্য চান্দ্রায়ণে এক মাসে দুশ'চল্লিশ গ্রাস অন্ন খাবেন, তবে তিরিশ দিনের মধ্যে কবে কম কবে বেশি গ্রাস

খাবেন, এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই ব্রতীর। কোনো দিন চার গ্রাস খেতে পারেন। কোনো দিন বারো গ্রাস, আবার কোনো দিন না খেতেও পারেন। কিন্তু তিরিশ দিনে সব মিলিয়ে দু'শ চল্লিশ গ্রাস—

যথা কথঞ্চিৎ পিণ্ডানাং তিস্রো' শীতীঃ। সমাহিতঃ।
মাসেনাশ্নন্ হবিষ্যস্য চন্দ্রস্যেতি সলোকতাম্॥

এটাকেই সামান্য চান্দ্রায়ণ বা সাধারণ সর্বতোমুখ চান্দ্রায়ণ বলা হয়। বিষ্ণু ধর্মসূত্র গৌণ চান্দ্রায়ণকে তিন প্রকারে ব্যাখ্যা করেছে এবং ঋষি-চান্দ্রায়ণের কথা বলেনি। মনুসংহিতাও তাই বলেছে। শিশু চান্দ্রায়ণ হল—সকাল বেলায় চার গ্রাস অন্ন, আর সূর্য অস্তমিত হলে আর চার গ্রাস—

সায়ংপ্রাতশ্চতুরশ্চতুরঃ স শিশুচান্দ্রায়ণঃ।

অবশেষে যতিচান্দ্রায়ণ হল—প্রত্যেকদিন আট গ্রাস অন্ন এবং ব্রতদিনের পরিমাণ এক মাস—

অষ্টৌ গ্রাসান্ প্রতিদিবসং
মাসমশ্নীয়াৎ স যদিচান্দ্রায়ণঃ।

গ্রাসের পরিমাণ সম্বন্ধে বিষ্ণু ধর্মসূত্র এবং গৌতম ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে—যেভাবে খেলে হাঁ-মুখের কোনো বিকার হয় না, গ্রাসের পরিমাণ হবে সেইরকম—

গ্রাসান্ অবিকারান্ অশ্নীয়াৎ।

আর যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা বলেছে যে, চান্দ্রয়ণের অন্ন-গ্রাস হবে মুরগীর ডিমের মতো, পরাশরের মতও তাই—

কুক্কুটাণ্ডপরিমাণং গ্রাসং বৈ পরিকল্পয়েৎ।

[যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা (Setlur) ৩.৩২৪-৩২৭; মিতাক্ষরা টীকা দ্রষ্টব্য; বৌধায়ন ধর্মসূত্র (চিন্নস্বামী শাস্ত্রী) ৩.৮.৩৪-৩৫; ৪.৫.১৭-২১; বিষ্ণুধর্মসূত্র (মহর্ষি) ৪৭.২-৯, পৃষ্ঠা ৫১; মনুসংহিতা (মাণ্ডলিক) ১১.২১৮-২২০; পরাশর সংহিতা ১০.২-৩]

চান্দ্রেশ্বর কলাকুণ্ড প্রভাসক্ষেত্রের অন্তর্গত পবিত্র তীর্থ। পুরাণে কথিত আছে, সুপ্রাচীন কালে দক্ষের অভিশাপে যক্ষা রোগগ্রস্ত চন্দ্রদেব ভগবান শিবের কৃপায় এই ক্ষেত্রেই রোগমুক্ত হয়েছিলেন। চন্দ্রের রোগমুক্তি এবং ভগবান শিবের মাহাত্ম্যেই এই তীর্থের এমন নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা হয়।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্রে) ৩৪২.১-৪]

চামরকেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। অমরকহ্রদে স্নান করে এই শিবলিঙ্গ দর্শন করলে মহাপুণ্য হয়।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৫৩]

চামুণ্ডা১ মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী চণ্ডিকার সঙ্গে যখন শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ হচ্ছে তখন এই অসুরদ্বয়ের সেনাপতি ছিলেন চণ্ড এবং মুণ্ড। মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী উপাখ্যানে কালী চণ্ড এবং মুণ্ড নামের এই দুই দানবকে বধ করেছিলেন। তখন দেবী চণ্ডী কালীকে বলেছিলেন তুমি যখন চণ্ড এবং মুণ্ডের মুণ্ড নিয়ে আমার কাছে এসেছো, তাই তুমি চামুণ্ডা নামে বিখ্যাত হবে—

যস্মাচ্চণ্ড মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো খ্যাতা দেবি ভবিষ্যতি॥

বরাহ পুরাণে চামুণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে অন্য ভাবে। এখানে রুরু দানবের চর্ম অর্থাৎ বাঁ হাতে ধরা ঢাল এবং তার মুণ্ড কেটে ফেলেছিলেন বলেই দেবীর নাম চামুণ্ডা—

রুরোস্তু দানবেন্দ্রস্য চর্মমুণ্ডে ক্ষণাদ্ যতঃ।
অপহৃত্যাহরদেবী চামুণ্ডা তেন সাভবৎ॥

[শ্রীশ্রী চণ্ডী (পঞ্চানন) ৭.২৫, পৃ. ৩৩২; বরাহ পু. (Mitra), ৯৬.৩২]

□ দেবী কালীর সঙ্গে চামুণ্ডা সংশ্লিষ্ট এবং ঘনিষ্ঠ হলেও চামুণ্ডার সঙ্গে কালীর মূর্তি এবং স্বভাবেরও তফাৎ আছে। দু-একটি পুরাণে কালী শুষ্কমাংলা, কোটরগত চক্ষু, তবুও কালী 'যৌবনাভরণোজ্জ্বলা' এবং 'পীনোন্নতপয়োধরা'। কিন্তু এদিক থেকে চামুণ্ডা রীতিমত ভয়ঙ্করী এবং তার চেহারা অস্থিচর্মসার, মেদমাংসহীন—

শুষ্কমাংসাতিভৈরব।

অগ্নি পুরাণে চামুণ্ডার রূপ যেভাবে বর্ণনা করা আছে, তাতে চামুণ্ডার চক্ষু কোটরগত, মাংসহীন মুখ, তিনটি চোখ, শরীর অস্থিচর্মসার, চুল খাড়া হয়ে উড়ছে, ক্ষীণ-কৃশ উদরদেশ, তিনি ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করে আছেন, বাঁয়ের দুই হাতে নরকপাল এবং পট্টিশ আর ডাইনের দুই হাতে কর্তরিকা (কাটারি) এবং শূল, শবের ওপরে তাঁর অবস্থান এবং তাঁর সমস্ত অলঙ্কার অস্থিনির্মিত—

চামুণ্ডা কোটরাক্ষী স্যান্নির্মাংসা তু ত্রিলোচনা।
নির্মাংসা অস্থিসারা বা উর্ধ্বকেশা কৃশোদরী॥
দ্বীপিচর্মধরা বামে কপালং পট্টিশং করে।
শূলং কর্ত্রী দক্ষিণে'স্যাঃ শবারূঢ়াস্থিভূষণা॥

স্কন্দ-পুরাণ আবার জানিয়েছে যে, চামুণ্ডা দেবী শ্মশানবাসিনী, ভূত-প্রেত তাঁর সহচর। তিনি যোগিনী এবং যোগসিদ্ধা, কিন্তু একই সঙ্গে মেদ-মাংস এবং মদ্যপান পছন্দ করেন—

আরাধয়ামাস তদা চামুণ্ডাং মুণ্ড মণ্ডিতাম্।
শ্মশানবাসিনীং দেবীং বাহুভূত-সমন্বিতাম্॥
যোগিনীং যোগসংসিদ্ধাং বসামাংসাসবপ্রিয়াম্॥

হয়তো চামুণ্ডার এই স্কন্দপুরাণোক্ত ভাবনা থেকেই সপ্তম খ্রিষ্টাব্দের নাট্যকার ভবভূতি তাঁর মালতী-মাধব নাটকের পঞ্চম অঙ্কে চামুণ্ডার মন্দিরে নরবলির ব্যবস্থা করতেও কুণ্ঠিত হননি। তবে ভবভূতির নাটকের মধ্যে দেবীর চামুণ্ডা-মূর্তির এই অন্তর্ভাব সপ্তম শতাব্দীতেই তাঁর জনপ্রিয়ত্বের সূচনা দেয়।

[শ্রীশ্রী চণ্ডী (পঞ্চানন), ৭.৬, পৃ. ৩২৪; অগ্নি পু. ৫০.২১-২৩; স্কন্দ পু. (অবন্তী/রেবা), ১৮৬.১১-১২; মালতীমাধব, ৫ম অঙ্ক পৃ. ১২৬,১২৯ (Ed. by M. R. Telanga, Bombay Nirnaya Sagar press, 1926) ৯.১৫]

চামুণ্ডা₂ অন্ধকাসুর কে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। চামুণ্ডা সেই মাতৃকাদের মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৭৯.১০]*

চাম্পেয় মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্রদের মধ্যে একজন।
[মহা (k) ১৩.৪.৫৮; (হরি) ১৩.৩.৭৭]

চারিত্র ধর্মের ঔরসে দক্ষকন্যা মরুত্বতী দেবীর গর্ভে মরুদ্‌গণের জন্ম হয়। এই মরুদ্‌গণের মধ্যে চারিত্র একজন। *[মৎস্য পু. ১৭১.৫৪]*

চারিষ্ণব প্রায় সবকটি পুরাণেই মন্বন্তরগুলির যে বিবরণ পাওয়া যায়, সেই বিবরণ অনুযায়ী পঞ্চম মন্বন্তরের অধিপতি ছিলেন রৈবত মনু। বায়ু পুরাণে একটি শ্লোকে রৈবত মনুর নাম উল্লিখিত হলেও পঞ্চম মন্বন্তরের বিবরণ দেবার সময় 'রৈবত' নামের পরিবর্তে চরিষ্ণব বা চারিষ্ণব নাম উল্লিখিত হয়েছে—

পঞ্চমে ত্বথ পর্য্যায়ে মনোশ্চারিষ্ণবে'ন্তরে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে অনুরূপ শ্লোকে দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষের নামটিই পুনরাবৃত্ত হয়েছে—

পঞ্চমে ত্বথ পর্যায়ে মনোঃ স্বারোচিষে'ন্তরে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অনুবাদক Dr. G.V. Tagare এই 'স্বারোচিষ পাঠটিকে ভ্রান্ত বলেই মনে করেছেন। পঞ্চম মনুর পুত্রদের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের পাঠে মনুর নাম আবার পরিবর্তিত হয়েছে। বায়ু পুরাণে যে শ্লোকটিতে 'চরিষ্ণোস্তু শুভাঃ পুত্রাঃ' পাঠ পাওয়া যায়। অনুরূপ শ্লোকে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে 'বরিষ্ঠাশ্চ শুভাঃ পুত্রাঃ' পাঠ ধৃত হওয়ায় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের পাঠ নিয়ে সংশয় আরও বেড়েছে।

তবে বায়ু পুরাণের দুটি ভিন্ন অধ্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য থেকে নিশ্চিত ভাবেই ধারণা হয় যে, রৈবত মনুরই অপর নাম চরিষ্ণব বা চারিষ্ণব ছিল। পুরাণ মতে ইনি পীত বর্ণ এবং স্বরবর্ণগুলির মধ্যে অন্যতম যে উ-কার—তার অধিষ্ঠাতা দেবতা। বায়ু পুরাণের পাঠ থেকে পণ্ডিতরাও রৈবত এবং চারিষ্ণব মনুকে অভিন্ন বলেই মত প্রকাশ করেছেন। সেক্ষেত্রে মন্বন্তর বিষয়ক আলোচনার সময় বহুল প্রচলিত রৈবত মনু নামটিকেই আমরা চারিষ্ণবের পরিবর্ত পর্যায় হিসেবে বিবেচনাসঙ্গত বলে মনে করি। *[বায়ু পু. ২৬.৩৭; ৬২.৪৪, ৪৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৫০, ৫২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (Tagare) Vol. I, p. 365; Devendra Kumar, Rajaram Patil, Cultural History from the Vayu Purana, p. 70]*

চারু বাসুদেব কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভজাত দশটি (মতান্তরে নয়টি) পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠতম।
[ভাগবত পু. ১০.৬১.৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.২৪৬; বায়ু পু. ৯৬.২৩৭; বিষ্ণু পু. ৫.২৮.২]

চারুক এক যদুবংশীয় বীর। প্রভাসক্ষেত্রে পারস্পরিক বিবাদে যদুবংশ ধ্বংসকালে চারুকও নিহত হন। *[বিষ্ণু পু. ৫.৩৭.৪২]*

চারুকেশী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর রাজসভায় উপস্থিত একজন অপ্সরা। *[মৎস্য পু. ১৬১.৭৫]*

চারুগুপ্ত কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভজাত এক পুত্র। মৎস্যপুরাণে চারুগুপ্তকে রণবিশারদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[মৎস্য পু. ৪৭.১৬; ভাগবত পু. ১০.৬১.৪; বিষ্ণু পু. ৫.২৮.১]*

চারুচন্দ্র কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভজাত পুত্র চারুচন্দ্র। *[ভাগবত পু. ১০.৬১.৮]*

চারুচিত্র ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের একজন। তবে মহাভারতের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত সংস্করণে অনুচিত্র নাম ধৃত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ষষ্ঠ দিনে চারুচিত্র প্রভৃতি ধার্তরাষ্ট্রদের পাণ্ডব সৈন্যদের

সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখা যায়। জয়দ্রথবধের দিন ভীম কৌরবসৈন্যে আক্রমণ করলে ধার্তরাষ্ট্ররা বার বার তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করেন। এই সময় ভীমসেনের হাতে রাজকুমার চারুচিত্রের মৃত্যু হয়।

[মহা (k) ১.১১৭.৪; ৬.৭৭.৮; ৭.১৩৬.২০; (হরি) ১.১১১.৪; ৬.৭৪.৭১; ৭.১১৭.৫৮]

চারুচিত্রাঙ্গদ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের একজন। পণ্ডিতরা এঁকে চারুচিত্র নামক ধার্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। *[মহা (k) ১.৬৭.৯৫; (হরি) ১.৬২.৯৭]*

চারুণাবতী জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ভদ্রাশ্ববর্ষের একটি নদী। *[বায়ু পু. ৪৩.২৯]*

চারুদেষ্ণ শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন। তবে কোথাও কোথাও চারুদেষ্ণ বা চারুদেষ্ণী জাম্ববতীর পুত্র বলেও চিহ্নিত হয়েছেন। *[ভাগবত পু. ১০.৬১.৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৯১, ২৪৫; বায়ু পু. ৯৬.১৮৮, ২৩৭; মৎস্য পু. ৪৬.২৬; ৪৭.১৫; বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.১৫.৩৭; ৫.২৮.১]*

□ দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় আমরা কৃষ্ণপুত্র চারুদেষ্ণকে উপস্থিত থাকতে দেখি।

[মহা (k) ১.১৮৬.১৭; (হরি) ১.১৭৯.১৭]

□ রৈবতক পর্বতে বৃষ্ণি-অন্ধকবংশীয়দের বাৎসরিক উৎসবেও চারুদেষ্ণকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

[মহা (k) ১.২১৯.১০; (হরি) ১.২১২.১০]

□ অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহের পর কৃষ্ণের পরামর্শে যদুবংশীয়রা প্রচুর মূল্যবান যৌতুক নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হন। এই সময় চারুদেষ্ণও ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞেও তাঁকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। *[মহা (k) ১.২২১.৩২; ২.৩৪.১৬; (হরি) ১.২১৪.৩২; ২.৩৩.১৫]*

□ চারুদেষ্ণ অন্ধক-বৃষ্ণিবংশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মহারথ যোদ্ধা ছিলেন বলে মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছেন। কৃষ্ণ নিজেই সভাপর্বে যদুবংশীয় প্রধান মহারথীদের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে পুত্র চারুদেষ্ণের নামও উল্লেখ করেছেন। মহাভারত এবং ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, শাল্ব দ্বারকানগরী আক্রমণ করলে যদু-বৃষ্ণিবংশের রথী মহারথীরা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এই সময় চারুদেষ্ণও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। শাল্বরাজের অনুগত বিবিন্ধ্য নামে এক দানব চারুদেষ্ণের বাণে নিহতও হয়েছিল বলে মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ২.২.৩৫; ২.১৪.৫৭; ৩.১৬.৯; ৩.২২.২৩-২৭; (হরি) ২.২.৩৪; ২.১৪.৫৫; ৩.১৫.৮; ৩.১৫.২৩-২৭]

□ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে বলরাম আসন্ন বিনাশকারী সংগ্রামে লিপ্ত না হওয়ার জন্য পাণ্ডবদের নিকট নানা যুক্তি ও পরামর্শ উত্থাপন করেছিলেন। এ সময় তাঁকে এক বিরাট মন্ত্রণা সভায় আলোচনা করতে হয়েছিল। সেই মন্ত্রণা সভায় যে সকল যদু-বৃষ্ণি বীরেরা বলরামের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণ-পুত্র চারুদেষ্ণ একজন।

[মহা (k) ৫.১৫৭.১৯; (হরি) ৫.১৪৬.১৯]

□ হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় অন্যান্য যদু-বৃষ্ণি বীরগণের সঙ্গে চারুদেষ্ণও উপস্থিত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১৪.৬৬.৩; (হরি) ১৪.৮৪.৩]

□ মহাভারতের মৌষলপর্বে প্রভাসক্ষেত্রে যদুবংশীয়দের মধ্যে গৃহযুদ্ধকালে চারুদেষ্ণ নিহত হন। তবে গৃহযুদ্ধের ঠিক কোন পর্যায়ে বা কার হাতে চারুদেষ্ণ নিহত হয়েছিলেন, তার কোনো স্পষ্ট উল্লেখ মেলে না।

[মহা (k) ১৬.৩.৪৪; (হরি) ১৬.৩.৪৪]

চারুদেহ কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন।

[ভাগবত পু. ১০.৬১.৮; বিষ্ণু পু. ৫.২৮.১]

চারুনেত্রা কুবেরের রাজসভায় যেসব অপ্সরাগণ নৃত্যগীত পরিবেশন করে তাঁর আরাধনা করেন তাঁদের মধ্যে চারুনেত্রা একজন।

[মহা (k) ২.১০.১০; (হরি) ২.১০.১০]

চারুপদ ভাগবত পুরাণ মতে পুরুবংশীয় রাজা নমস্যুর পুত্র ছিলেন চারুপদ। চারুপদ সুদ্যু নামে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন।

[ভাগবত পু. ৯.২০.২-৩]

চারুবক্ত্র স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচর একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৭৩; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

চারুবর্মা জনৈক বৃষ্ণিবংশীয় বীর। প্রভাস ক্ষেত্রে যে

গৃহযুদ্ধের ফলে যদুবংশ ধ্বংস হয়, সেই যুদ্ধে চারুবর্মাও নিহত হয়েছিলেন।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৫.৩৭.৪৭; (নবভারত) ৫.৩৭.৪২]

চারুবিদ্ধ *[দ্র. চারুবিন্ধ্য]*

চারুবিদ্য *[দ্র. চারুবিন্ধ্য]*

চারুবিন্দ *[দ্র. চারুবিন্ধ্য]*

চারুবিন্ধ্য কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন। বায়ু পুরাণের বঙ্গীয় সংস্করণে অবশ্য 'চারুবিদ্ধ' পাঠ ধৃত হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ইনি চারুবিদ্য নামে চিহ্নিত হয়েছেন। বিষ্ণু পুরাণে এঁকে চারুবিন্দ নামে উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

[বায়ু পু. (আনন্দাশ্রম) ৯৬.২৩৮; (নবভারত) ৯৬.২৩৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.২৪৬; বিষ্ণু পু. ৫.২৮.২]

চারুবেশ শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন। কৃষ্ণ বারো বছর হিমালয়ে শিবের তপস্যা করে চারুবেশকে পুত্র রূপে লাভ করেন। *[মহা (k) ১৩.১৪.৩৩; (হরি) ১৩.১৩.৩৩]*

চারুভদ্র কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ৪৭.১৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.২৪৬]

চারুমৎস্য মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্রদের মধ্যে একজন। মহাভারতের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে অবশ্য 'অন্তোরুহশ্চারুমৎস্য' কথাটি পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তিত পাঠে এর পরিবর্তে 'অন্তোরুহশ্চামৎস্যাশী' পাওয়া যায়।

[মহা (k) ১৩.৪.৫৯; (হরি) ১৩.৩.৭৮]

চারুমতী কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভজাত কন্যাসন্তান। ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে কৃতবর্মার পুত্র বলীর সঙ্গে চারুমতীর বিবাহ হয়। বায়ুপুরাণে তাঁকে চারুমহী নামে উল্লেখ করা হয়েছে। *[ভাগবত পু. ১০.৬১.২৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.২৪৬; মৎস্য পু. ৪৭.১৬; বিষ্ণু পু. ৫.২৮.২; বায়ু পু. ৯৬.২৩৮]*

চারুমহী *[দ্র. চারুমতী]*

চারুমুখী জনৈক মৌনেয় গন্ধর্বের কন্যা। তবে ইনি কোন গন্ধর্বের কন্যা ছিলেন সে বিষয়ে বায়ু পুরাণে স্পষ্ট কোনো উল্লেখ নেই।

[বায়ু পু. ৬৯.১০]

চারুযশা কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভজাত আটটি (মতান্তরে নয়টি) পুত্রের মধ্যে একজন।

কৃষ্ণ হিমালয়ের প্রত্যন্তে মহাদেবের উদ্দেশে দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যা করে চারুযশা সহ অপর পুত্রদের লাভ করেছিলেন।

[মহা (k) ১৩.১৪.৩৩; (হরি) ১৩.১৩.৩৩]

চারুরূপ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পুলহ প্রজাপতির বংশে উৎপন্ন যেসব বানরবীরের নাম উল্লিখিত হয়েছে চারুরূপ তাঁদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৩৭]

চারুশীর্ষ জনৈক ঋষি। মহাভারতে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে আলম্বায়ন গোত্রীয় ঋষি বলে। ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের পরম বন্ধু ছিলেন বলে জানা যায়—

শক্রস্য দয়িতঃ সখা।

যুধিষ্ঠিরকে দেবাদিদেব মহাদেবের মাহাত্ম্য বোঝাতে গিয়ে ইনি বলেছেন যে, কোনো এক সময় ইনি গোকর্ণ পর্বতে শতবৎসর কঠোর তপস্যা করে মহাদেবকে প্রসন্ন করেছিলেন। মহাদেব প্রসন্ন হয়ে চারুশীর্ষকে লক্ষ বৎসর পরমায়ুসম্পন্ন জরাবিহীন একশত পুত্র দান করেন।

[মহা (k) ১৩.১৮.৫-৭; (হরি) ১৩.১৭.৫-৭]

চারুশ্রবা শ্রীকৃষ্ণ ও বিদর্ভ রাজকন্যা রুক্মিণীর পুত্রদের একজন। কৃষ্ণ দ্বাদশ বৎসর হিমালয়ে শিবের কঠোর তপস্যা করে চারুশ্রবা সহ অন্যান্য পুত্রদের লাভ করেছিলেন।

[মহা (k) ১৩.১৪.৩৩; (হরি) ১৩.১৩.৩৩]

চারুহাস মৎস্য পুরাণ মতে কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে চারুহাস একজন।

[মৎস্য পু. ৪৭.১৬]

চারুহাসবান ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পুলহ প্রজাপতির বংশে উৎপন্ন যেসব বানর বীরের নাম উল্লিখিত হয়েছে চারুহাসবান তাঁদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৩৮]

চাষবক্ত্র স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অনুচর একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৭৬; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

চিকিত্বান স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, তুষিত তার মধ্যে একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে চিকিত্বান একজন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১১]*

চিকুর আর্যক নাগের বংশধারায় একজন বিখ্যাত নাগ। ইনি গরুড় কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন।

চিকুরের পুত্রের নাম সুমুখ। এই সুমুখের সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি মাতলির কন্যা গুণকেশীর বিবাহ হয়েছিল।

[মহা (k) ৫.১০৩.২২-২৪; (হরি) ৫.৯৬.২২-২৪]

চিতি$_1$ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মা বারোজন দেবতা সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁরা জয়দেবগণ নামে পরিচিত। চিতি সেই জয়দেবগণের অন্তর্ভুক্ত একজন দেবতা। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৪.২]*

চিতি$_2$ ত্রয়োবিংশতম কল্প, যা চিন্তক নামে পরিচিত, সেই কল্পে ব্রহ্মার মানসকন্যা চিতি।

[বায়ু পু. ২১.৫৩]

চিত্তহার্য্য বৈবস্বত মন্বন্তরে ধর্মের ঔরসে দক্ষকন্যা সাধ্যার গর্ভজাত দেবতারা সাধ্য দেবগণ নামে খ্যাত। এই সাধ্য দেবতাদের মধ্যে চিত্তহার্য্য একজন। *[মৎস্য পু. ২০৩.১১]*

চিত্তি$_1$ সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা যে বারোজন 'জয়' দেবতাদের সৃষ্টি করেছিলেন। সেই 'জয়' নামক গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে চিত্তি একজন।

[বায়ু পু. ৬৬.৬]

চিত্তি$_2$ বৈবস্বত মন্বন্তরে ধর্মের ঔরসে দক্ষকন্যা সাধ্যার গর্ভজাত দেবতারা 'সাধ্য' দেবগণ নামে খ্যাত ছিলেন। এই 'সাধ্য' দেবতাদের মধ্যে 'চিত্তি' একজন। *[বায়ু পু. ৬৬.১৬]*

চিত্র$_1$ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের একজন। দ্রোণপর্বে দেখা যাচ্ছে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা সাতজন একত্রে ভীমসেনকে আক্রমণ করেন, যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চিত্র। ভীমসেনের সঙ্গে যুদ্ধে এই সময় তাঁর মৃত্যু হয়। *[মহা (k) ১.৬৭.৯৫; ১.১১৭.৪; ৭.১৩৬.২০; ৭.১৩৭.৩০; (হরি) ১.৬২.৯৭; ১.১১১.৪; ৭.১১৭.৫৮; ৭.১১৮.৩০]*

চিত্র$_2$ যেসব বিশিষ্ট নাগ বরুণের সভায় উপস্থিত থেকে তাঁর উপাসনা করেন, চিত্র তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ২.৯.৮; (হরি) ২.৯]*

চিত্র$_3$ একটি বিশিষ্ট হস্তী। মহাভারতের বনপর্বে বর্ণিত স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের উপাখ্যানে তার নাম উল্লিখিত হয়েছে হস্তীশ্রেষ্ঠ ঐরাবতের সঙ্গে।

[মহা (k) ৩.২২৫.২৩; (হরি) ৩.১৮৭.২২]

চিত্র$_4$ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানকারী এক বিশিষ্ট পাঞ্চাল যোদ্ধা। দ্রোণপর্বে সঞ্জয়ের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তাঁর রথ, ধ্বজা, অশ্ব প্রভৃতি নানা রত্নখচিত এবং বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত ছিল। কর্ণপর্বে অন্যান্য পাঞ্চাল যোদ্ধাদের সঙ্গে চিত্রও কর্ণকে আক্রমণ করেছিলেন। এই সময় চিত্র প্রভৃতি আটজন পাঞ্চাল যোদ্ধাকে বধ করেন কর্ণ।

[মহা (k) ৭.২৩.৬৪; ৮.৫৬.৪৪-৪৬; (হরি) ৭.২১.৬৩; ৮.৪২.৪৬-৪৮]

চিত্র$_5$ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে অংশগ্রহণকারী অপর এক যোদ্ধা। ইনি সম্ভবত চেদিদেশীয় বীর ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। *[মহা (k) ৮.৫৬.৪৯; (হরি) ৮.৪২.৪৯]*

চিত্র$_6$ কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত অভিসার দেশের রাজা চিত্রসেনের ভাই। কর্ণ নিজের সেনাপতিত্বকালে প্রথম দিন কৌরব সেনাকে মকর ব্যূহে সুসজ্জিত করেন। চিত্র এবং চিত্রসেন সেই ব্যূহের পুচ্ছদেশে অবস্থান করছিলেন। যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্যের সঙ্গে দীর্ঘ দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর প্রতিবিন্ধ্যের হাতেই চিত্র মৃত্যুবরণ করেন।

[মহা (k) ৮.১১.২১; ৮.১৩.৭; ৮.১৪.২০-৩৪; (হরি) ৮.৮.২১; ৮.১০.৭; ৮.১১.২০-৩৪]

চিত্র$_7$ বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবের পুত্র অগাবহ যে চারটি পুত্রসন্তান লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন চিত্র। বায়ু পুরাণে প্রাপ্ত পাঠ থেকে চিত্রের জন্ম পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। এখানে অগাবহ এবং চিত্র একই পংক্তিতে পরপর অবস্থান করছেন। ফলত তিনি অগাবহের পুত্র কিনা তা পরিষ্কার বোঝা যায় না।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.২৫৭; বায়ু পু. ৯৬.২৪৭]

চিত্র$_8$ বৃষ্ণিবংশীয় শূরের পুত্র বসুদেবের ঔরসে মদিরার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন চিত্র। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৭২]*

চিত্র$_9$ ভণ্ডাসুরের একজন সেনাপতি। দেবী ললিতার অনুচরী চিত্রার হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.২৫.৯৯]

চিত্রক$_1$ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম।

[মহা (k) ১.৬৭.১০৫; (হরি) ১.৬২.১০৭]

চিত্রক$_2$ যদুবংশীয় অনমিত্রের বংশধারায় বৃষ্ণির (অন্যমতে পৃশ্নির) দুই পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন চিত্রক। চিত্রকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন শ্বফল্ক। চিত্রক পৃথু, বিপৃথু প্রভৃতি বহু পুত্রসন্তানের জনক ছিলেন বলে জানা যায়।

[বিষ্ণু পু. ৪.১৪.২; বায়ু পু. ৯৬.১০১, ১০৩-১১৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১০২, ১১৪]

চিত্রক৩ একটি পার্বত্য জনজাতি। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত যেসব জাতির নাম উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে চিত্রক অন্যতম। নীপ এবং কুকুর গোষ্ঠীর সঙ্গে একত্রে চিত্রকের নাম উচ্চারিত হয়েছে—

নীপাশ্চিত্রককৌকুরাঃ।

নীপ পাঞ্চালদের একটি শাখা এবং কুকুর যদু-বৃষ্ণি বংশীয়দের একটি শাখা হিসেবে মহাভারতে পুরাণে বহুচর্চিত বলে এই চিত্রক গোষ্ঠীর পরিচয় নিয়ে সামান্য সংশয় তৈরি হয়েছে। বিশেষত বৃষ্ণির কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন চিত্রক, ফলে বৃষ্ণিবংশীয় রাজাদের নাম আলোচনার সময় চিত্রকের বংশধর রাজাদের নাম আলোচিত হচ্ছে বলে মনে করাটাও খুব অস্বাভাবিক নয়। তবে পণ্ডিতজনেরা চিত্রককে উত্তর-পশ্চিম ভারতের পার্বত্য জনজাতি বলেই মনে করেছেন। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে চিত্তল পর্বতের নাম উল্লিখিত হয়েছে। এই চিত্তল বা চিত্রলকে পণ্ডিতরা বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত হিন্দুকুশ পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তিরিচমিরের সঙ্গে একাত্মক বলেই মনে করেন। এই পর্বতের পাদদেশে পাকিস্তানের চিত্রল জেলা এবং চিত্রল নামে একটি ছোটো শহরের অস্তিত্ব আজও আছে। এই চিত্রলে বসবাসকারী জাতিই চিত্রক নামে অভিহিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। পণ্ডিতদের এই ধারণার পিছনে জোরালো যুক্তি হল চিত্রকের অব্যবহিত পরেই কারস্কর জাতির নামোল্লেখ। হিন্দুকুশ পর্বতের Kasgar বা Kashkar উপত্যকা মহাভারতের কারস্কর বলেই মনে হয় এবং সেটি এই তিরিচমির এবং চিত্রলের অত্যন্ত নিকটবর্তী একটি অঞ্চল। এই তথ্য থেকেই পণ্ডিতরা চিত্রকদের উত্তর-পশ্চিম ভারতের পার্বত্য জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

[মহা (k) ২.৫০.২০; (হরি) ২.৪৮.১৬; K.C. Mishra, Tribes in the Mahabharata, p.117; Dr. Moti Chandra, Geogrphical and Economic Studies in the Mahabharata; Upayana Parva, pp.45-46]

চিত্রকুণ্ডল ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের একজন।

[মহা (k) ১.১১৭.৬; (হরি) ১.১১১.৬]

চিত্রকূটগিরি একটি পবিত্র গিরিতীর্থ। পুরাণে চিত্রকূটকে একটি শুভ পিতৃতীর্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পয়স্বিনী বা মন্দাকিনী নদী চিত্রকূট দিয়ে প্রবাহিত। আসলে চিত্রকূটগিরি মন্দাকিনী নদীর উপর অবস্থিত একটি বিচ্ছিন্ন পাহাড় বিশেষ। বরাহপুরাণেও চিত্রকূটকে ভারতবর্ষের একটি বিচ্ছিন্ন পাহাড় বলা হয়েছে।

[মহা (k) ৩.৮৫.৫৮; (হরি) ৩.৭০.৫৮; মৎস্য পু. ২২.৬৫; বামন পু. ১৩.১৮; বরাহ পু. ৮৫.৪]

□ রামচন্দ্রের বনবাসী জীবনের সঙ্গে চিত্রকূটগিরির গভীর যোগাযোগ আছে। বনবাসের সময় রামচন্দ্রকে ঋষি ভরদ্বাজ চিত্রকূটগিরির কথা বলেছিলেন। ভরদ্বাজ বলেছিলেন, মধু এবং প্রচুর ফল-মূল যেখানে পাওয়া যায়, সেই চিত্রকূটগিরি রামচন্দ্রের বসবাসের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হবে—

মধু-মূল-ফলোপেতং চিত্রকূটং ব্রজেতি হ।

ভরদ্বাজ রামচন্দ্রের কাছে চিত্রকূটপর্বতে যাওয়ার পথও সবিস্তারে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছিলেন—চিত্রকূট পর্বতে যেতে হলে যমুনা পার হয়ে নদী স্রোতের বিপরীত দিকে এগোতে হবে।

রামায়ণে চিত্রকূটগিরির বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। মাল্যবতী নদী এই পর্বতের পাশ দিয়ে প্রবাহিত। বলা হয়েছে, বাল্মীকি নামে এক ঋষি সেখানে বাস করতেন। যদিও এই বাল্মীকি এবং রামায়ণ রচয়িতা মহর্ষি বাল্মীকি এক ব্যক্তি নন বলেই মনে হয়।

রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা চিত্রকূটগিরিতে পর্ণকুটির নির্মাণ করে বাস করতেন। সুমন্ত্র-সারথি রামচন্দ্রের চিত্রকূট পাহাড়ে পৌঁছানোর সংবাদ অযোধ্যায় দশরথের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

[রামায়ণ ২.৫৪.৩৮-৮২; ২.৫৫ অধ্যায় ৫৬ অধ্যায় সম্পূর্ণ]

□ বরাহ পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, ঋষি আত্রেয় বাস করতেন চিত্রকূটগিরিতে। আত্রেয় বলতে অত্রিবংশীয় ঋষি বোঝায়। তবে পুরাণে এই ঋষিকে আত্রেয় নামে উল্লেখ করা হলেও তাঁর নিজের নামটি কী ছিল, তা জানানো হয়নি। পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী, এই ঋষির বরে রাজা সবল এক পরাক্রমশালী পুত্র লাভ করেছিলেন। তাঁর নাম দুর্জয়।

আবার পরবর্তীকালে এই দুর্জয়ই রামরূপী নারায়ণের স্তব পাঠ করে তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য

চিত্রকূটগিরিতে আসেন। এখানে চিত্রকূটকে রামরূপী নারায়ণের আবাসস্থল বলে কল্পনা করা হয়েছে। *[বরাহ পু. ১০.২০, ২৭; ১২.১-৪]*

□ বারাণসীরাজ সুপ্রতীক তাঁর পুত্রের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে বৃদ্ধ বয়সে চিত্রকূট পর্বতে বাস করতে গিয়েছিলেন। *[বরাহ পু. ১০.৩২-৩৪]*

□ বর্তমান বুন্দেলখন্দের অন্তর্গত কামতানাথ গিরিই প্রাচীন চিত্রকূট পর্বত। উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলায় এই পাহাড়টি অবস্থিত। এই অঞ্চলে চিত্রকূটগিরি নামে একটি রেল স্টেশনও আছে, যেখান থেকে প্রায় চার মাইল দূরে পাহাড়ের অবস্থান।

পণ্ডিতরা মনে করেন যে, গুপ্তযুগ থেকেই চিত্রকূট তীর্থরূপে পরিচিত হয়।

[HPAI (S.N. Arya) p. 70]

চিত্রকেতু১ ইনি শূরসেন-মথুরা অঞ্চলের রাজা।

অপুত্রক চিত্রকেতু ঋষি অঙ্গিরার আশীর্বাদে তাঁর জ্যেষ্ঠা মহিষী কৃতদ্যুতির গর্ভে এক পুত্র সন্তান লাভ করেছিলেন। ঘটনাক্রমে কৃতদ্যুতি ও তাঁর সন্তানের প্রতি ঈর্ষান্বিত চিত্রকেতুর অন্যান্য মহিষীরা বিষ প্রায়োগ করে শিশুপুত্রটিকে হত্যা করেন। শোকে বিহ্বল চিত্রকেতু ও কৃতদ্যুতি পুত্রের মৃত্যুতে উন্মাদের মতো বিলাপ করতে থাকেন। তাঁদের শোকে ব্যথিত হয়ে নারদ ও অঙ্গিরা ঋষি চিত্রকেতুকে নানা উপদেশ দেন, তাঁদের উপদেশে চিত্রকেতু আবার বেঁচে থাকার নতুন উদ্যম লাভ করেন। পবিত্র যমুনার জলে স্নান ও তর্পণ করে চিত্রকেতু অঙ্গিরা ও নারদের আরাধনা করেন। তুষ্ট নারদ তাঁকে পঞ্চরাত্রোক্ত বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ইত্যাদি চতুর্ব্যূহের তত্ত্ব-জ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত করেন। অন্যদিকে, চিত্রকেতুর শিশুহত্যার অপরাধে অপরাধী মহিষীরাও ঋষি অঙ্গিরার আদেশানুসারে যমুনার জলে শিশুহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করেন।

[ভাগবত পু. ৬.১৪.১০-১৬.১৮]

চিত্রকেতু২ বশিষ্ঠের ঔরসে উর্জার গর্ভে জাত সাতপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তিনি এবং তাঁর ছয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা তৃতীয় মন্বন্তরে সপ্তর্ষি হয়েছিলেন।

[ভাগবত পু. ৪.১.৩৯-৪০]

চিত্রকেতু৩ ভাগবত পুরাণে প্রাপ্ত বশংলতিকা অনুযায়ী, রামচন্দ্রের ছোটো ভাই লক্ষ্মণের দুই পুত্রের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চিত্রকেতু। *[ভাগবত পু. ৯.১১.১২]*

চিত্রকেতু৪ যদু বৃষ্ণিবংশজাত শূরের পুত্র দেবভাগের ঔরসে কংসার গর্ভজাত পুত্র।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.৪০]

চিত্রকেতু৫ শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে জাম্ববতীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন। *[ভাগবত পু. ১০.৬১.১২]*

চিত্রকেতু৬ গন্ধর্বরাজ বিক্রান্তের পুত্র। তিনি এবং তাঁর ভাইয়েরা 'বালেয়' নামক 'গন্ধর্বগণ' হিসেবে পরিচিত। *[বায়ু পু. ৬৯.২০]*

চিত্রগু কৃষ্ণের ঔরসে নাগ্নজীতি সত্যার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন। *[ভাগবত পু. ১০.৬১.১৩]*

চিত্রগুপ্ত১ ধর্মরাজ বা যমের মন্ত্রী এবং জ্ঞানী পুরুষ। পৌরাণিক কাল থেকেই এই ভাবনা চলে আসছে যে, যমালয়ে চিত্রগুপ্তই ইহলোকের সমস্ত প্রাণীর পাপ পুণ্যের হিসাব রক্ষা করেন।

[মহা (k) ১৩.১২৫.৬; (হরি) ১৩.১০৬.৬]

□ মহাভারতের অনুশাসনপর্বে স্বয়ং যম চিত্রগুপ্তকে উদ্ধৃত করে ধর্মের প্রকৃত রহস্য বর্ণনা করেছেন। তিনি ধর্মের এসব বার্তাকে কখনো 'চিত্রগুপ্তমতং' বা চিত্রগুপ্তের অভিমত আবার কখনওবা ধর্মশ্চিত্রগুপ্তেন ভাষিত' বা চিত্রগুপ্তের ভাষণ বলে বর্ণনা করেছেন। চিত্রগুপ্ত অনুমোদিত ধর্মাচরণের অন্তর্ভুক্ত হল পূর্বকৃত পাপ বা পুণ্য ভোগব্যতীত বিনষ্ট হয়না। সেসব সঞ্চয় করে রাখেন স্বয়ং সূর্যদেব। মানুষ পরলোক গমন করলে আবার সেসব ফিরে পায়। ব্রাহ্মণকে ছত্র, গোরু এবং পাদুকা দান সংক্রান্ত পুণ্যার্জনেরও বিশদ বিবরণ দিয়েছেন চিত্রগুপ্ত। পরলোকবাসী পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে পুণ্যোদকা নদীর জল অর্পণ করতে হয়। চিত্রগুপ্ত পরলোকে প্রদীপ দান বিষয়েও নানা কথা বলেছিলেন। আলোকদাতা নিজে গ্রহ-নক্ষত্রের আলোয় আলোকিত হন। দেবতারা তাঁর উপর তুষ্ট হন। চিত্রগুপ্ত নির্দিষ্ট করে পুষ্করতীর্থ দর্শনকারী ব্রাহ্মণকেই শুধুমাত্র গোরুদান করার পরামর্শ দিয়েছেন। ব্রাহ্মণের উদ্দেশে দানই পরলোকে সুখপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। সূর্যদেব চিত্রগুপ্তের এই গোপন ধর্ম ব্যাখ্যা শুনে রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১৩.১২৫.৬; ১৩.১৩০.১৪-৩৬;
(হরি) ১৩.১০৬.৬; ১৩.১০৮.১৪-৩৬]

□ ইহলোকের পাপকার্যের জন্য মৃত্যুর পর মানুষ যমরাজের সাক্ষাত পায়। ভীষণাকৃতি যমের নিকটেই অবস্থান করেন প্রবলাকার চিত্রগুপ্ত।

তিনি পরলোকপ্রাপ্ত পাপীদের ধর্মবাক্য শুনিয়ে প্রবোধ দেন।

আবার নারদ পুরাণে চিত্রগুপ্তকে যমলোকের যাবতীয় দণ্ডবিধি বর্ণনা করতে দেখা যায়। স্কন্দ পুরাণের কাহিনী অনুসারেও চিত্রগুপ্তকেই ইহলোকে সম্পন্ন পাপের শাস্তিবিধান যমলোকে করতে দেখা যায়।

[ব্রহ্ম পু. ২১৫.৫৫-৫৯; নারদ পু. ২.৩১.৪৩-৪৭; স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কেদার) ১৮.৬৩-৬৪]

চিত্রগুপ্ত২ পুরাণে চতুর্দশ কল্পে চোদ্দজন পৃথক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা লোকসংহর্তা যমের পদ গ্রহণ করবেন। তাঁদের মধ্যে চিত্রগুপ্ত একজন।

[নারদ পু. ১.১১৯.৫৮-৫৯]

□ স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে, যমতীর্থে ধর্মরাজ বহুনামে পূজিত হন। চিত্রগুপ্ত সেই নামগুলির মধ্যে অন্যতম। *[স্কন্দ পু. (ব্রহ্ম/ধর্ম) ৪.৮৩-৮৪]*

চিত্রগুপ্ত৩ কেতুগ্রহের অধিদেবতা চিত্রগুপ্ত। পুরাণে তর্পণ বিধিসমূহ বর্ণনা প্রসঙ্গে চিত্রগুপ্তের উদ্দেশে তর্পণ করতে বলা হয়েছে।

[মৎস্য পু. ৯৩.১৫; ১০২.২৩]

চিত্রগুপ্তেশ্বর তীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। ভগবান শিব এই তীর্থে চিত্রগুপ্তেশ্বর নামে পূজিত হন।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচন কাণ্ড) পৃ. ১০২]

চিত্রচাপ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের একজন।

[মহা (k) ১.৬৭.৯৮; (হরি) ১.৬২.১০০]

চিত্রজ্যোতি প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা দিতির গর্ভে উনপঞ্চাশজন মরুৎ দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। এই দেবতারা সাতটি গণে বিভক্ত ছিলেন। এর মধ্যে প্রথম গণের অন্তর্ভুক্ত মরুৎ দেবতাদের মধ্যে চিত্রজ্যোতি একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫.৯২]

চিত্রদেব স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অনুচর একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৭১; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; (খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬)]

চিত্রধর্মন্ *[দ্র. চিত্রধর্মা]*

চিত্রধর্মা (চিত্রধর্মন্) যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক কালের জনৈক রাজা। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্ব থেকে জানা যায় যে, অসুররাজ বিরূপাক্ষ মর্ত্যলোকে রাজা চিত্রধর্মা রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.২৩; (হরি) ১.৬২.২৩]

চিত্রনাথ বৈবস্বত মনুর পুত্র ধৃষ্ট। ধৃষ্টের তিন পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন চিত্রনাথ। *[মৎস্য পু. ১২.২১]*

চিত্রপথানদী প্রভাসক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি পবিত্র নদী। এই নদীর নিকটে চিত্রাদিত্য নামে এক শিবলিঙ্গ ও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। পুরাণে কথিত আছে—একসময় চিত্র নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। চিত্রকে যমদূতেরা নিয়ে চলল যমালয়ে। এ ঘটনায় চিত্র-র কন্যা চিত্রা অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং শোকার্ত চিত্রার বিলাপ থেকে যে নদীর উৎপত্তি হয়—তারই নাম চিত্রপথা। তবে পুরাণেই উল্লিখিত আছে যে, এই নদী সব ঋতুতে জল বহন করে না। শুধুমাত্র বর্ষাকালেই এতে জল থাকে।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র) ১৪০.১-১৪]

চিত্রবতী যদু-বৃষ্ণি বংশীয় চিত্রসেনের কন্যা। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে অবশ্য তাঁকে অগাবহের কন্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[বায়ু পু. ৯৬.২৪৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.২৫৭]

চিত্রবর১ যদু-বৃষ্ণি বংশীয় চিত্রসেনের পুত্র।

[বায়ু পু. ৯৬.২৪৮]

চিত্রবর২ *[দ্র. চিত্ররথ৬]*

চিত্রবর্মা১ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি ভীমসেনের হাতে নিহত হন।

[মহা (k) ১.৬৭.৯৭; ১.১১৭.৬; ৭.১৩৬.২০; (হরি) ১.৬২.৯৯; ১.১১১.৬; ৭.১২৭.৫৮]

চিত্রবর্মা২ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের অন্যতম পুত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রুপদপুত্র বীরকেতু দ্রোণাচার্যের হাতে নিহত হলে চিত্রবর্মা এবং অন্যান্য পাঞ্চাল রাজকুমাররা একত্রে দ্রোণকে আক্রমণ করেন। এই সময় চিত্রবর্মা দ্রোণের হাতে নিহত হন।

[মহা (k) ৭.১২২.৪৩; (হরি) ৭.১০৬.৩৯]

চিত্রবর্মা৩ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক জনৈক রাজা। উদ্যোগপর্বের সূচনায় দ্রুপদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজাকে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে উপদেশ দিয়েছেন। রাজা চিত্রবর্মার নাম এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

[মহা (k) ৫.৪.১৩; (হরি) ৫.৪.১৩]

চিত্রবর্মা$_{8}$ কর্ণপর্বের সূচনায় নিহত পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধাদের মধ্যে সঞ্জয় জনৈক রাজা সুচিত্র এবং তাঁর পুত্র চিত্রবর্মার নাম উল্লেখ করেছেন। এঁরা দ্রোণাচার্যের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ৮.৬.২৭; (হরি) ৮.৪.২৭]

চিত্রবর্মা$_{৫}$ বালেয় গন্ধর্বদের মধ্যে অন্যতম।

[বায়ু পু. ৬৯.২০]

চিত্রবর্হ মহাভারতের উদ্যোগপর্বে গরুড়ের যে পুত্রগুলির নাম উল্লিখিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে চিত্রবর্হ একজন।

[মহা (k) ৫.১০১.১২; (হরি) ৫.৯৪.১২]

চিত্রবর্হি গরুড়ের পুত্র এবং স্কন্দ কার্ত্তিকেয়র বাহন ময়ূরটির নাম চিত্রবর্হি। দেবসেনাপতি স্কন্দ কার্ত্তিকেয়র অভিষেকের পর দেবতারা সকলেই তাঁকে বিভিন্ন প্রকারের উপহার দিয়েছিলেন। সে সময় গরুড় বিচিত্রবর্ণের পুচ্ছ বিশিষ্ট নিজ পুত্র চিত্রবর্হিকে স্কন্দ কার্ত্তিকেয়র বাহন রূপে উপহার দেন। *[মহা (k) ৯.৪৬.৫০-৫১; (হরি) ৯.৪২.৫৮-৫৯]*

চিত্রবাণ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের একজন। শতপুত্রের অপর তালিকায় অবশ্য তাঁর নামোল্লেখ নেই। দুই তালিকার তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে কোনো কোনো পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, চিত্রবাণ এবং চিত্রবাহু সম্ভবত এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

[দ্র. চিত্রবাহু]

[মহা (k) ১.১১৭.৬; (হরি) ১.১১১.৬]

চিত্রবাহন মণিপুরের রাজা। অর্জুন বনবাসকালে মণিপুরে উপস্থিত হয়ে এই চিত্রবাহন রাজার আশ্রয়ে কিছুকাল বাস করেন। চিত্রবাহনের একমাত্র সন্তান রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার রূপে মুগ্ধ হয়ে অর্জুন রাজা চিত্রবাহনের কাছে গিয়ে রাজকন্যাকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। একথা শুনে রাজা চিত্রবাহন বললেন—আমার পূর্বপুরুষ রাজা প্রভঞ্জনকে মহাদেব বর দিয়েছিলেন যে, তোমাদের বংশে এক এক পুরুষের একটি করে সন্তান হবে। এর পর থেকে এই বংশে পুরুষানুক্রমে সকলেরই একটি করে পুত্রসন্তান জন্মাতো। ফলে বংশরক্ষায় কোনো বিঘ্ন দেখা দেয়নি। কিন্তু আমি একমাত্র সন্তান রূপে একটি কন্যা লাভ করলাম। ফলে ওই কন্যার দ্বারাই বংশরক্ষা করার জন্য পুত্রিকাপুত্রের বিধান অনুসারে আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করেছি। অতএব, ওই কন্যার গর্ভে যে পুত্র হবে, সেই হবে আমার বংশধর এবং মণিপুরের পরবর্তী রাজা। তুমি এই শর্তে সম্মত থাকলে তবেই চিত্রাঙ্গদার বিবাহ তোমার সঙ্গে হতে পারবে। অর্জুন এতেই সম্মত হলেন এবং চিত্রবাহন আনন্দিত হয়ে কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুনের হাতে সম্প্রদান করলেন।

[মহা (k) ১.২১৫.১৫-১৭; (হরি) ১.২০৮.১৫-২৭]

চিত্রবাহা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্ভুক্ত জম্বুখণ্ড বিনির্মাণ পর্বে যেসব পৌরাণিক নদীগুলির নাম উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে চিত্রবাহা একটি।

[মহা (k) ৬.৯.১৭; (হরি) ৬.৯.১৭]

চিত্রবাহু$_{১}$ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম। *[দ্র. চিত্রবাণ]*

[মহা (k) ১.৬৭.৯৭; (হরি) ১.৬২.৯৯]

চিত্রবাহু$_{২}$ শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র।

[ভাগবত পু. ১০.৯০.৩৩]

চিত্রবেণিক নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশে জন্মগ্রহণকারী একজন নাগ। জনমেজয় রাজার সর্পযজ্ঞে অন্যান্য নাগদের সঙ্গে ইনিও ভস্মীভূত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.৫৭.১৮; (হরি) ১.৫২.১৯ (এখানে চিত্রবেণিক পাঠ পাওয়া যায়)]

চিত্রভানু কৃষ্ণের পুত্র। ইনি প্রবল পরাক্রমশালী যোদ্ধা ছিলেন। *[ভাগবত পু. ১০.৯০.৩৩]*

চিত্রযোধী চিত্রযোধী শব্দের সাধারণ অর্থ—যিনি বিচিত্র প্রকারে যুদ্ধ করতে পারেন। বিচিত্র প্রকারে যুদ্ধ করাটাই যে একজন যোদ্ধার বৈশিষ্ট্য, সেটা প্রকাশ করে মহাভারত দুই/তিন বার অন্য শব্দের সঙ্গে চিত্র শব্দটা প্রয়োগ করেছে। মহাভারতের কর্ণপর্বে একজন রাজার নামই চিত্রযোধী। তাঁর সহকারী আর এক যোদ্ধার নাম চিত্রায়ুধ। তাঁরা দুজনেই কর্ণের হাতে মারা পড়েছিলেন, বিকল্প পাঠে তাঁরা মারা পড়েছিলেন বিকর্ণের হাতে। কিন্তু এই মারণ-প্রক্রিয়ায় যেটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল—বিচিত্র কৌশলে যুদ্ধ করে কর্ণ কিংবা বিকর্ণ তাঁদের হত্যা করেছিলেন—

* চিত্রমার্গেণ বিক্রম্য বিকর্ণেন হতো মৃধে।
* চিত্রমার্গেণ বিক্রম্য কর্ণেন নিহতৌ যুধি।

এখানে শুধু চিত্রযোধী নামটা শোনা মাত্রই বিচিত্র মার্গে যুদ্ধের কথা স্মৃতিতে এসেছে বলেই এটা বলা যায় যে, মহাভারতে যে সব যোদ্ধারাই অত্যন্ত যুদ্ধ নিপুণ ছিলেন এবং যাঁরাই

বিচিত্র উপায়ে যুদ্ধ করে যুদ্ধবিদ্যার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, তাঁরাই চিত্রযোধী বিশেষণ লাভ করেছেন। মহাভারতে এই অর্থে পাণ্ডব নকুলকে, পুরুজিৎ কুন্তিভোজকে, কৃপাচার্যকে এবং দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে চিত্রযোধী বলা হয়েছে। আর সর্বার্থে চিত্রযোধী যুদ্ধ-নায়ক বলতে যাঁদের বলা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অবশ্যই নাম করতে হবে কর্ণের, দ্রোণাচার্যের, দুর্যোধনের এবং অবশ্যই অর্জুনের।

[মহা (Critical Edition) ৮.৪.৬৮; বায়ু পু. ৯৬.১৮১; মহা (k) ৮.৬.১৮; ৫.৪৮.২৪; ৫.৯০.৪০; ৫.১৫১.২৮; ৫.১৭০.৩; ৫.১৭২.১-৩; ৫.১৮৭.১৪; ৬.২০.১৩; (হরি) ৮.৪.১৭; ৫.৪৮.২৪; ৫.৮৩.৪০; ৫.১৪১.২৮; ৫.১৫৯.৩; ৫.১৬১.১-৩; ৫.১৭৭.১৪; ৬.২০.১৩]

□ চিত্রযোধী কথাটার কোনো বিশেষ সংজ্ঞা না থাকলেও মহাভারতে চিত্রযোধী কথাটা শব্দক্ষেপণ দেখে কথাটার সংজ্ঞার্থটুকু পরিষ্কার হয়ে যায়। মহাভারতে অন্তত চার-পাঁচ জায়গায় চিত্রযোধী শব্দটার আগেই বিশেষণ হিসেবে একটি শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে বোঝা যায় চিত্রযোধী মানেই তাঁর বাণক্ষেপণে' বা গদাঘাতে কিংবা যিনি যে অস্ত্র বিশেষভাবে ব্যবহার করছেন, সেই অস্ত্রের প্রয়োগে তাঁর হাত খুব দ্রুত চলে—মহাভারত যাকে বলেছে—'ক্ষিপ্রাস্ত্র', 'লঘ্বস্ত্র', 'শীঘ্রাস্ত্র' কিংবা ক্ষিপ্রহস্ত—

* ক্ষিপ্রহস্তশ্চিত্রযোধী মতঃ সেনাপতির্মম।
* লঘ্বস্ত্রশ্চিত্রযোধী চ মনস্বী দৃঢ়বিক্রমঃ।
* শীঘ্রাস্ত্রশ্চিত্রযোধী চ ভবিষ্যসি সুমম্মতঃ।

সম্ভবত যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রপ্রয়োগের সময় যে যোদ্ধার হাত অসাধারণ দ্রুত চলে তিনিই চিত্রযোধী। তিনিই হস্তের দ্রুততায় বিচিত্রভাবে বিচিত্র কৌশলে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন বলেই তিনি চিত্রযোধী।

[মহা (k) ৫.১৫১.২৮; ৫.১৭০.৩; ৫.১৮৭.১৪; (হরি) ৫.১৪১.২৮; ৫.১৫৯.৩; ৫.১৭৭.১৪]

চিত্ররথ১ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষ কন্যা মুনির গর্ভজাত গন্ধর্ব পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ। ভগবদ্গীতায় (বিভূতিযোগ) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নাম উল্লেখ করে বলেছেন যে, গন্ধর্বদের মধ্যে আমি গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ—

গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ।

গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ চিত্ররথের শ্রেষ্ঠত্ব এই উল্লেখ থেকেই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়।

[মহা (k) ১.৬৫.৪৩; ৬.৩৪.২৬ (ভগবদ্গীতা ১০.২৬); (হরি) ১.৬০.৪৪; ৬.৩৪.২৬]

□ পুরাণগুলিতেও মৌনেয় গন্ধর্বদের মধ্যে চিত্ররথের নাম উল্লিখিত হয়েছে গন্ধর্ব, কিন্নর এবং বিদ্যাধরদের রাজা হিসেবেই।

[মৎস্য পু. ৮.৬; বায়ু পু. ৬৯.২; ৭০.৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩; ২.৮.১০]

□ সৃষ্টির আদিতে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যখন পৃথু রাজা পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন, সেই সময় দেবতা, গন্ধর্ব প্রভৃতিরাও পৃথিবীকে দোহন করেন। গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ এই সময় গোবৎসের ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ৭.৬৯.২৫; (হরি) ৭.৬১.২৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.২২১]

□ অর্জুনের জন্মোৎসবে যেসব দেবগন্ধর্ব এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ১.১২৩.৫৬; (হরি) ১.১১৭.৬০]

□ মহাভারতের সভাপর্ব থেকে জানা যায় যে, কুবেরের সভায় যাঁরা বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিলেন গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *[মহা (k) ২.১০.২৬; (হরি) ২.১০.২৫]*

□ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ তাঁকে চারশত অশ্ব উপহার দেন। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব থেকে জানা যায় যে, অর্জুনের রথের চারটি ঘোড়াও গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের কাছ থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া।

[মহা (k) ২.৫২.২৩; ৫.৫৬.১৬; (হরি) ২.৫০.২৩; ৫.৫৬.১৬]

□ ভাগবত পুরাণে বর্ণিত কাহিনী অনুসারে মহর্ষি জমদগ্নির পত্নী রেণুকা গঙ্গায় জল আনতে গিয়ে গন্ধর্বরাজ চিত্ররথকেই অপ্সরাদের সঙ্গে জলক্রীড়ারত অবস্থায় দেখতে পান। তবে মহাভারত ও অপর কয়েকটি পুরাণের বর্ণনায় জলক্রীড়াকারী ব্যক্তির নাম চিত্ররথ হলেও পরিচয় ভিন্ন। *[ভাগবত পু. ৯.১৬.২-৩]*

□ কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ নারায়ণ-কবচ লাভ করেছিলেন। এই কবচ অর্থাৎ বিদ্যা-বর্ম লাভ করলে রাজা, দস্যু, ব্যাধি, গ্রহ প্রভৃতির ভয়

দূর হয়। কৌশিক নামে সেই ব্রাহ্মণ অবশ্য এই কবচ লাভ করেও জলশূন্য দেশে যোগবলে দেহত্যাগ করেন। অপ্সরা-পরিবৃত গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ এই ঘটনা দেখে তাঁর আকাশগামী স্বর্গীয় বিমান থেকে মাটিতে নেমে এলেন এবং সেই ব্রাহ্মণের অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করলেন।

[ভাগবত পু. ৬.৮.৩৭-৪০]

চিত্ররথ$_{২}$ মার্তিকাবত দেশের রাজা। মহাভারতের বনপর্বের বিবরণ অনুযায়ী, মহর্ষি জমদগ্নির পত্নী রেণুকা নদী থেকে স্নান করে ফেরার পথে এই রাজাকে তাঁর পত্নীর সঙ্গে জলক্রীড়ারত অবস্থায় দেখে মনে মনে তাঁকে কামনা করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.১১৬.৬-৭; (হরি) ৩.৯৭.৬-৭; কালিকা পু. ৮৩.৮-৯]

চিত্ররথ$_{৩}$ অঙ্গদেশের একজন রাজা। প্রভাবতী নামে তাঁর এক পত্নী ছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ১৩.৪২.৮; (হরি) ১৩.৩৬.৮]

চিত্ররথ$_{৪}$ পাঞ্চাল রাজকুমার। ইনি পাঞ্চাল রাজকুমার বীরকেতুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দ্রোণাচার্য বীরকেতুকে বধ করলে চিত্ররথ প্রভৃতি বীরকেতুর অন্যান্য ভাইরা দ্রোণকে আক্রমণ করেন। দ্রোণাচার্যের হাতে এই সময় চিত্ররথের মৃত্যু হয়।

[মহা (k) ৭.১২২.৪৩; (হরি) ৭.১০৬.৩৯]

চিত্ররথ$_{৫}$ যদুবংশীয় অনমিত্রের বংশধারায় বৃষ্ণির পুত্র ছিলেন চিত্ররথ। তবে বিভিন্ন পুরাণে তিনি চিত্রক নামেও চিহ্নিত হয়েছেন। পৃথু প্রভৃতি কয়েকটি পুত্র সন্তানের পিতা ছিলেন তিনি।

[দ্র. চিত্রক$_{২}$]

[মহা (k) ১৩.১৪৭.২৯; (হরি) ১৩.১২৫.২৯; ভাগবত পু. ৯.২৪.১৫, ১৮]

চিত্ররথ$_{৬}$ বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবের পুত্র অগাবহের চার পুত্রসন্তানের একজন ছিলেন চিত্ররথ। বায়ুপুরাণের পাঠে ইনি চিত্রবর।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.২৫৭; বায়ু পু. ৯৬.২৪৭]

চিত্ররথ$_{৭}$ চন্দ্রবংশে পারীক্ষিৎ জনমেজয়ের (অভিমন্যুর পৌত্র) পরবর্তীকালে যাঁরা রাজা হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন চিত্ররথ। ইনি ভূরির পুত্র তথা শুচিদ্রবের পিতা। ভাগবত পুরাণ তাঁকে উক্তের পুত্র তথা শুচিরথের পিতা বলে উল্লেখ করেছে। বিষ্ণু ও বায়ু পুরাণ মতে ইনি উষ্কের পুত্র তথা শুচিরথ বা শুচিদ্রথের পিতা। বিষ্ণু পুরাণের দক্ষিণ ভারতীয় সংস্করণে ইনি বিচিত্ররথ নামে চিহ্নিত হয়েছেন।

[মৎস্য পু. ৫০.৮০; ভাগবত পু. ৯.২২.৪০; বায়ু পু. ৯৯.২৭২; বিষ্ণু পু. ৪.২১.৩]

চিত্ররথ$_{৮}$ স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রতর পুত্র অগ্নীধ্রের বংশধারায় গয় নামে এক রাজা ছিলেন। এই গয় রাজার পুত্র ছিলেন চিত্ররথ। চিত্ররথের পত্নীর নাম ঊর্ণা। ঊর্ণার গর্ভে চিত্ররথের ঔরসে সম্রাট নামে এক পুত্রসন্তান হয়।

[ভাগবত পু. ৫.১৫.১৪]

চিত্ররথ$_{৯}$ যযাতির পৌত্র তথা যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর অন্যতম পুত্র ছিলেন ক্রোষ্টু। এই ক্রোষ্টুর বংশধারায় রসাদু বা রুষদ্রুর পুত্র ছিলেন চিত্ররথ। মৎস্য পুরাণ রসাদু বা রুষদ্রুর পরিবর্তে রুষঙ্গু নাম উল্লেখ করেছে, ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী চিত্ররথের পিতা ছিলেন রুশেকু। পুরাণ গুলিতে চিত্ররথের নাম উল্লিখিত হয়েছে প্রভাবশালী রাজা হিসেবে। চিত্ররথের পুত্রের নাম শশবিন্দু। তবে একমাত্র বায়ু পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী চিত্ররথ রাজাই পরবর্তী কালে শশবিন্দু নামে বিখ্যাত হন। 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্র' অর্থাৎ পুত্ররূপে পিতাই দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণ করেন—এই ভাবনা থেকেই হয়তো শশবিন্দুর পিতা চিত্ররথও শশবিন্দু নামে পরিচিত হয়েছেন। *[ভাগবত পু. ৯.২৩.৩১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭০.১৮; মৎস্য পু. ৪৪.১৭; বিষ্ণু পু. ৪.১২.১; বায়ু পু. ৯৫.১৭-১৮, ২০-২১]*

চিত্ররথ$_{১০}$ যযাতির পুত্র অনুর বংশধারায় অঙ্গের পৌত্র ধর্মরথের পুত্র ছিলেন চিত্ররথ। এই চিত্ররথ রোমপাদ নামেও পরিচিত ছিলেন বলে ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। নিঃসন্তান রাজা চিত্ররথ রোমপাদ ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশরথ রাজার কন্যা শান্তাকে দত্তক নেন। তবে অন্যান্য পুরাণ মতে, চিত্ররথের দশরথ নামে এক পুত্র ছিল।

[ভাগবত পু. ৯.২৩.৭-১০; মৎস্য পু. ৪৮.৯৪; বিষ্ণু পু. ৪.১৮.৩]

চিত্ররথ$_{১১}$ নিমিবংশীয় রাজা সুপার্শ্বকের পুত্র ছিলেন মিথিলার রাজা চিত্ররথ। তাঁর পুত্রের নাম ক্ষেমাধি। *[ভাগবত পু. ৯.১৩.২৩]*

চিত্ররথ$_{১২}$ পিতা মহামুনি কশ্যপ। মাতা দক্ষকন্যা বরিষ্ঠা। *[কালিকা পু. ৩৪.৭৬]*

চিত্ররথা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্বের অন্তর্ভুক্ত জম্বূখণ্ড বিনির্মাণ পর্বে যেসব পৌরাণিক

নদীগুলির নাম উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে চিত্ররথা একটি।

[মহা (k) ৬.৯.৩৪; (হরি) ৬.৯.৩৪]

চিত্ররশ্মি ধর্মের ঔরসে মরুত্বতীর গর্ভজাত দেবতারা মরুৎ দেবগণ নামে খ্যাত ছিলেন। এই মরুৎ দেবতাদের মধ্যে চিত্ররশ্মি একজন।

[মৎস্য পু. ১৭১.৫৩]

চিত্ররেফ পৌরাণিক শাকদ্বীপের রাজা মেধাতিথির সাত পুত্রসন্তানের মধ্যে একজন। মেধাতিথি শাকদ্বীপকে সাত ভাগে বিভক্ত করে এক একটি ভূখণ্ডে নিজের এক একজন পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন। মেধাতিথির এই পুত্রদের নামেই শাকদ্বীপের সাতটি বর্ষের নামকরণ হয়। চিত্ররেফ যে বর্ষে বা ভূখণ্ডে রাজা হয়েছিলেন তাঁর নামেই সেই ভূখণ্ডের নামকরণ হয়েছিল বলে ভাগবত পুরাণে উল্লেখ পাওয়া যায়।

[ভাগবত পু. ৫.২০.৫]

চিত্রলেখা১ ইন্দ্রলোকের একজন অপ্সরা। অর্জুন যখন স্বর্গলোকে গিয়েছিলেন তখন যেসব অপ্সরা তাঁর চিত্তবিনোদন করেছিলেন চিত্রলেখা তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ৩.৪৩.৩০; (হরি) ৩.৩৮.৩০; অগ্নি পু. ২১৯.৩৮]*

চিত্রলেখা২ বাণাসুরের মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের কন্যার নাম চিত্রলেখা। ইনি বাণ-রাজার কন্যা ঊষার প্রিয়তমা সখী ছিলেন।

চিত্রলেখা ব্যক্তির মানসপট থেকে উপাদান গ্রহণ করে তিনি যে কোনো চিত্র অঙ্কন করতে পারতেন। বাণ-কন্যা ঊষা একবার স্বপ্নে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দেখে তাঁর প্রেমে কাতর হয়ে পড়েন। তখন ঊষা প্রাণেশ্বর অনিরুদ্ধের পরিচয় জানার জন্য চিত্রলেখার সাহায্য চান। চিত্রলেখা ঊষার কল্পনা অনুসরণ করে দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ প্রমুখের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। অবশেষে চিত্রলেখা অনিরুদ্ধের প্রতিকৃতি ঊষার কাছে তুলে ধরেন। ঊষার সম্মতি পাওয়া মাত্রই চিত্রলেখা যোগবলে দ্বারকা নগরে যান। সেখানে রাজপুরীর মধ্যে অনিরুদ্ধকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে চিত্রলেখা তৎক্ষণাৎ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ঊষার কাছে ফিরে আসেন।

[ভাগবত পু. ১০.৬২.১৪-২৩; শিব পু. (J.L. Shastri) (রুদ্র/যুদ্ধ) ৫১-৫৩ অধ্যায়; অগ্নি পু. ১২.৪৫-৪৬; বিষ্ণু পু. ৫.৩২.১৭-২৪]

□ হরিবংশ পুরাণে অনিরুদ্ধ-ঊষার কাহিনী প্রসঙ্গে চিত্রলেখা সম্পর্কে আরও কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। হরিবংশ থেকে জানা যায় যে, দেবর্ষি নারদের কৃপায় চিত্রলেখা তামসীবিদ্যা অর্জন করেছিলেন। এই বিদ্যার প্রয়োগে তিনি ইচ্ছামতো ব্যক্তির চোখের সামনে আচ্ছাদন সৃষ্টি করতে পারতেন। তামসী বিদ্যার দ্বারাই চিত্রলেখা কৌশলে অনিরুদ্ধের কাছে ঊষার সংবাদ পৌঁছে দিয়েছিলেন। *[হরিবংশ পু. ২.১১৯.১-৫৪]*

চিত্রলেখা৩ গন্ধর্বরাজ বসুভূতির কন্যা রত্নাবলীর তিন পরমচতুরা সখীর মধ্যে চিত্রলেখা একজন।

[স্কন্দ পু. (কাশী) ৬৭.৪০]

চিত্রলেখা৪ ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম প্রধান পরিচারিকা বকুলমালিকার তিনজন সখীর মধ্যে চিত্রলেখা একজন। *[স্কন্দ পু. (বিষ্ণু/বেঙ্কট) ৫.৮-১২]*

চিত্রলেখা৫ পুরাকালে শত্রুঞ্জয় নামে এক রাজা ছিলেন যাঁর পত্নীর নাম চিত্রলেখা। ইনি চৈত্র মাসে ব্রত গ্রহণ করে নিষ্ঠাভরে বিষ্ণুর উপাসনা করেছিলেন। এর ফলে ভগবান বিষ্ণুর কৃপায় চিত্রলেখা ও শত্রুঞ্জয়ের জীবন অপার সুখ-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। চিত্রলেখা ব্রত পালনের মাহাত্ম্যে যমরাজের কোপ থেকে স্বামীর প্রাণ রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

[ভবিষ্য পু. ৮.১৫-২৩]

চিত্রশিখণ্ডী মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ—এই সাতজনকে যেমন ব্রহ্মার মানস পুত্রও বলা হয়, তেমনই এই সাতঋষিকে একত্রে চিত্রশিখণ্ডীও বলা হয়। এঁদের প্রত্যেকে পৃথক ছাঁদে কেশ-সন্নিবেশ করে চূড়া বাঁধতেন বলেও যেমন চিত্রশিখণ্ডী নাম হতে পারে, তেমনই সাত ঋষি তাঁদের পৃথক পৃথক সাত মুখে লোকধর্মের কথা, মানুষের পালনীয় নিয়ম-আচারের কথা বলেছিলেন বলেও তাঁদের নাম একসঙ্গে চিত্রশিখণ্ডী হতে পারে—

আস্যৈঃ সপ্তভিরুদ্‌গীর্ণং লোকধর্মমনুত্তমম্।

[মহা (k) ১২.৩৩৫.২৯; (হরি) ১২.৩২১.২৯]

সাংখ্য-দর্শনোক্ত মহদাদি সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতির স্বরূপ বলেও এঁদের চিত্রশিখণ্ডী বলা হয়ে থাকতে পারে—

সপ্ত-প্রকৃতয়ো মহদহংকারাদি মূর্তয়ঃ
স্বায়ম্ভুবস্তু মূলপ্রকৃতিরেব। *[দ্র. নীলকণ্ঠ টীকা]*

[মহা (k) ১২.৩৩৫.৩০; (হরি) ১২.৩২১.৩০]

পুরাকথা এইরকম যে, চিত্রশিখণ্ডীরা মেরুশিখরে বসে একমতি হয়ে বেদ সহ সমস্ত শাস্ত্রকে সাতমুখে প্রচার করেছিলেন মানুষের কাছে।

যে হি তে ঋষয় খ্যাতা সপ্ত চিত্রশিখণ্ডিনঃ।
তৈরেকমতিভি র্ভূত্বা যৎপ্রোক্তং শাস্ত্রমুত্তমম্।
বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সমিত কৃতং মেরৌ মহাগিরৌ॥
আস্যৈঃ সপ্তভিরুদ্‌গীর্ণং লোকধর্মমনুত্তমম্।
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
বশিষ্ঠশ্চ মহাতেজাস্তে হি চিত্রশিখণ্ডিনঃ॥

[মহা (k) ১২.৩৩৫.২৭-৩০;
(হরি) ১২.৩২১.২৭-৩১]

চিত্রশিলা মহাভারতে ভীষ্মপর্বের অন্তর্ভুক্ত জম্বূখণ্ড বিনির্মাণ পর্বে যেসব পৌরাণিক নদীগুলির নাম উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে চিত্রশিলা একটি।

[মহা (k) ৬.৯.৩০; (হরি) ৬.৯.৩০]

চিত্রসানু পৌরাণিক সপ্তদ্বীপের অন্যতম পুষ্কর দ্বীপের পূর্বভাগে অবস্থিত একটি পর্বত। চিত্রসানু পর্বতটি দৈর্ঘ্যে চব্বিশ হাজার যোজন এবং প্রস্থে সাতাশ হাজার যোজন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে চিত্রসানু পর্বতকে মূল্যবান রত্নখচিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *[মৎস্য পু. ১২৩.১২-১৫;*
বায়ু পু. ৪৯.১০৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৯.১১০]

চিত্রসেন১ একজন বিশিষ্ট গন্ধর্ব। কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা মুনির গর্ভে যেসব গন্ধর্ব জন্মগ্রহণ করেন, চিত্রসেন তাঁদের মধ্যে একজন। ইনি কৈলাস অঞ্চলে রাজত্ব করতেন বলে পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। সূর্যের রথে হেমন্তকালে (অগ্রহায়ণ মাসে) গন্ধর্ব চিত্রসেন অবস্থান করেন বলে জানা যায়।

[বায়ু পু. ৪১.২১; ৬৯.১; ৫২.১৭; ৯৬.২৪৮;
বিষ্ণু পু. ২.১০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২৩.১৭]

☐ মহাভারতের সভাপর্ব থেকে জানা যায় যে, গন্ধর্ব চিত্রসেন ইন্দ্র ও কুবেরের সভায় বিশিষ্ট আসনের অধিকারী ছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহেও মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের উপস্থিতির উল্লেখ আছে।

[মহা (k) ২.৭.২২; ২.১০.২৬; ২.৪.৩৭;
(হরি) ২.৭.২২; ২.১০.২৫; ২.৪.১৪]

☐ অর্জুন দিব্যাস্ত্রলাভের জন্য ইন্দ্রলোকে গেলে সেই সময় চিত্রসেনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। ইন্দ্রের আদেশে অর্জুন চিত্রসেনের কাছ থেকে নৃত্য-গীত-বাদ্য শিক্ষা করেছিলেন। অর্জুন উর্বশীর প্রতি আসক্ত হয়েছেন মনে করে ইন্দ্র অর্জুন এবং উর্বশীর সাক্ষাৎকারের জন্য চিত্রসেনকেই মধ্যস্থতা করার আদেশ দেন। অর্জুন যে সময় ইন্দ্রলোকে বসবাস করেছিলেন তার মধ্যে একাংশ চিত্রসেনের সাহচর্যেই অতিবাহিত হয়েছিল।

[মহা (k) ৩.৪৪.৬-৮; ৩.৪৫-৪৬ অধ্যায়;
(হরি) ৩.৩৮.৩৮-৪২; ৩.৩৯ অধ্যায়]

☐ মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত ঘোষযাত্রা পর্বে আমরা গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখব।

পাণ্ডবরা দ্রৌপদীর সঙ্গে বনে দুঃখ কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন, এই সময় শকুনির পরামর্শে দুর্যোধন নিজেদের ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে তাঁদের কষ্ট দেবার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। পাণ্ডবরা সেসময় দ্বৈতবনে বাস করছিলেন। সেখানে কাছেই কুরু রাজাদের ব্রজভূমি বা গোচারণ ভূমি। কুরুরাজবংশের গোসম্পদ এখানেই রক্ষিত হত। কর্ণ এবং শকুনির পরামর্শে স্থির হল যে, গোপালকদের আমন্ত্রণে গোরু রক্ষণাবেক্ষণ কেমন হচ্ছে তা দেখা এবং গাভী ও বৎস গণনা করার জন্য দুর্যোধন অন্যান্য কৌরবদের নিয়ে ঘোষযাত্রা করবেন।

ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্য প্রবীণ ব্যক্তিদের নিষেধ সত্ত্বেও দুর্যোধন তাঁর অন্যান্য ভাই ও কুলস্ত্রীদের নিয়ে মহাসমারোহে ঘোষযাত্রা করলেন।

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র দুর্যোধনের এই দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেরে দুর্যোধনকে উচিত শাস্তি দেবার জন্য গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনকে আদেশ করলেন। ইন্দ্রের আদেশে চিত্রসেন বহু সৈন্য নিয়ে দ্বৈতবনের নিকটবর্তী জলাশয়ে উপস্থিত হলেন এবং অপ্সরা ও গন্ধর্ব রমণীদের নিয়ে জলক্রীড়া করতে লাগলেন। তাঁর সৈন্যরা দ্বৈতবনের সীমায় কড়া পাহারা দিতে লাগল। এদিকে দুর্যোধন সৈন্যসামন্ত নিয়ে দ্বৈতবনে প্রবেশ করতে গেলেন। সেখানে চিত্রসেন গন্ধর্বের নিযুক্ত রক্ষীরা তাঁদের পথ রোধ করল। উভয় পক্ষের মধ্যে বচসা, ঝগড়া, ক্রমে যুদ্ধ শুরু হল। কর্ণ আহত হয়ে পলায়ন করলেন। দুর্যোধন প্রভৃতিরা পরাজিত হলেন। চিত্রসেনের দলবল দুর্যোধন প্রভৃতিদের এমনকী কুরু পরিবারের কুলস্ত্রীদের পর্যন্ত বন্দি করে নিয়ে চলল। খবর পেয়ে যুধিষ্ঠির ভীম এবং অর্জুনকে

পাঠালেন দুর্যোধন প্রভৃতিদের মুক্ত করে আনার জন্য। যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম-অর্জুন বন্দিদের নিয়ে প্রস্থানোদ্যত গন্ধর্বসেনাকে আক্রমণ করলেন। চিত্রসেনের সঙ্গে অর্জুনের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। শেষ পর্যন্ত চিত্রসেন অর্জুনের হাতে পরাজিত হলেন। পরম বন্ধু এবং শিক্ষক চিত্রসেনকে আহত ও পরাজিত দেখে অর্জুন যুদ্ধ বন্ধ করলেন এবং চিত্রসেনকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। কুশল প্রশ্ন বিনিময়ের পরে অর্জুন চিত্রসেনকে জিজ্ঞাসা করলেন—এভাবে কৌরবদের বেঁধে নিয়ে চলেছো কেন? চিত্রসেন বললেন— তোমরা বনবাসে দুঃখ-দারিদ্র্য ভোগ করছ, তাই এই দুষ্ট দুর্যোধন নিজের ঐশ্বর্য্য এবং বিলাসবাহুল্য দেখিয়ে তোমাদের উপহাস করতে আর মনোকষ্ট দিতে এখানে এসেছিল। তাই দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে আমরা এই দুর্বৃত্তকে সপরিবারে বন্দি করে নিয়ে যাচ্ছি। শেষপর্যন্ত অর্জুনের অনুরোধে চিত্রসেন দুর্যোধন প্রভৃতিদের বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিলেন।

[মহা (k) ৩.২৩৬-২৪৬ অধ্যায়;
(হরি) ৩.২০০-২০৭ অধ্যায়]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর হস্তিনাপুরের রাজপদ লাভ করে যুধিষ্ঠির যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, সেই যজ্ঞসভায় অন্যান্য গন্ধর্বদের নিয়ে চিত্রসেনও এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১৪.৮৮.৩৯; (হরি) ১৪.১১১.৪১]

চিত্রসেন২ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম। তবে মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের যে দুটি তালিকা পাওয়া যায় তাতে চিত্রসেনের নাম উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু বৈশম্পায়ন ধৃতরাষ্ট্রের যে এগারোজন মহারথী পুত্রের নাম উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে আমরা চিত্রসেনের নাম পাই। মহাভারতের অন্য এক জায়গায় কবি বলছেন—ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের মধ্যে দুর্যোধন, দুঃশাসন, চিত্রসেন এবং বিকর্ণ—এই চারজনই প্রধান—

তেষাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাণাং চত্বারঃ প্রধানা বভূবুঃ।
দুর্যোধনো দুঃশাসনো বিকর্ণশ্চিত্র সেনশ্চেতি।

ধার্তরাষ্ট্রদের মধ্যে চিত্রসেন যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন—তার প্রমাণ আমরা মহাভারতের পরবর্তী পর্বগুলি থেকে পাই।

[মহা (k) ১.৬৩.১১৯; ১.৯৫.৫৭;
(হরি) ১.৫৮.১৫৮; ১.৯০.৭৫]

□ রাজকুমার চিত্রসেন দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়। দ্রৌপদীর সঙ্গে বিবাহের পর দ্রৌপদীকে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব যখন হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন, সেই সময় অন্যান্যদের সঙ্গে চিত্রসেনও পাণ্ডবদের স্বাগত জানাবার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

[মহা (k) ১.১৮৬.৩; ১.২০৭.১৩;
(হরি) ১.১৭৯.৩; ১.২০০.১৩]

□ মহাভারতের সভাপর্বে যখন বিদুর ইন্দ্রপ্রস্থে দ্যূতক্রীড়ার আমন্ত্রণ জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে কারা কারা এই দ্যূত বিষয়ে উৎসাহী তা জিজ্ঞাসা করেন। তখন অন্যান্য রাজকুমারদের সঙ্গে বিদুর চিত্রসেনের নামও উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিদুর দ্যূতে উৎসাহী যেসব ধার্তরাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে জয়, সত্যব্রত, পুরুমিত্ররা পরবর্তীকালে শকুনির কপট দ্যূত কিংবা দ্যূতসভায় সংঘটিত অন্যান্য ঘটনাকে সমর্থন করেননি, বরং বিরোধিতাই করেছেন। তবে রাজকুমার চিত্রসেনের সঙ্গে দুর্যোধনের এমন কোনো মতান্তর বা মনান্তরের কথা জানা যায় না। বরং তিনি যে দুঃশাসন প্রভৃতিদের মতোই দুর্যোধনকে সমর্থন করে চলতেন— মহাভারতে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ মেলে। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে ধার্তরাষ্ট্রদের চরিত্র সম্পর্কে পাণ্ডবরা যেসব মন্তব্য করেছেন, তা থেকে চিত্রসেনের কপটতায় পরিপূর্ণ চরিত্রেরই পরিচয় মেলে। যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে প্রস্থানোদ্যত সঞ্জয়ের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র এবং অন্যান্য স্বজনদের জন্য যে কুশল-সন্দেশ পাঠিয়েছেন সেখানে চিত্রসেন সম্পর্কে বলেছেন—সঞ্জয়, যিনি ধনহরণে এবং অক্ষক্রীড়ায় অদ্বিতীয়, যাঁর ছল গুপ্ত থাকে, অক্ষক্রীড়ায় দুর্জয় হলেও যুদ্ধে যিনি দুর্জয় নন, সেই চিত্রসেনের মঙ্গল জিজ্ঞাসা কোরো—

নিকর্তনে দেবনে যো'দ্বিতীয়শ্ছন্নোপধঃ
সাধুদেবী মতাক্ষঃ।
যো দুর্জয়ো দেবিতব্যে ন সংখ্যে স চিত্রসেনঃ
কুশলং তাত বাচ্যঃ॥

রাজকুমার চিত্রসেনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় এই শ্লোক থেকেই পাওয়া যায়। স্ত্রীপর্বের সূচনায় সঞ্জয় নিহত রাজা দুর্যোধনের

পরামর্শদাতাদের মধ্যেও চিত্রসেনের নাম উল্লেখ করেছেন।

[মহা (k) ২.৫৮.১৩; ৫.৩০.২৮; ৫.৪৭.৮; ৫.৫৫.৬৪; ৫.৬৬.৬; ১১.১.২৭; (হরি) ২.৫৫.১৩; ৫.৩০.২০; ৫.৪৭.৮; ৫.৫৫.৬৫; ৫.৬৫.৬; ১১.১.২৫]

মহাভারতের বনপর্বে ঘোষযাত্রার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দুর্যোধন এবং তাঁর অন্যান্য ভাইয়েরা যখন গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সৈন্যদের হাতে বন্দি হলেন সেই সময় ধার্তরাষ্ট্র চিত্রসেনও তাঁদের হাতে বন্দি হয়েছিলেন।

বিরাটপর্বে অর্জুনের সঙ্গে কুরুসৈন্যের যুদ্ধেও রাজকুমার চিত্রসেন উপস্থিত ছিলেন।

[মহা (k) ৩.২৪২.৬; ৪.৩৫.৩; ৪.৫৪.৭; (হরি) ৩.২০৫.৬, ৮; ৪.৩২.৩; ৪.৪৯.৭]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরব শিবিরে চিত্রসেনকে আমরা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোদ্ধা হিসেবে দেখতে পাই। কুরু সেনাপতি ভীষ্মের পৃষ্ঠরক্ষকের ভূমিকায় আমরা অন্যান্য যোদ্ধাদের সঙ্গে চিত্রসেনকে উপস্থিত থাকতে দেখি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রথম দিনেই চিত্রসেন অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে ভীমসেনকে আক্রমণ করেন। ওই দিনেই বিরাট রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্বেতের সঙ্গে চিত্রসেন এবং অন্যান্য কৌরব যোদ্ধাদের তুমুল যুদ্ধ হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের তৃতীয় দিনে অর্জুনের হাতে চিত্রসেন পরাজিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। যুদ্ধের চতুর্থদিনে অভিমন্যুর সঙ্গেও তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। ঘটোৎকচ, চেকিতান, সাত্যকি, ভীমসেন, শিখণ্ডী প্রমুখ প্রধান পাণ্ডব যোদ্ধাদের সঙ্গে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করার পর জয়দ্রথবধের দিনে চিত্রসেন প্রভৃতি সাতজন ধার্তরাষ্ট্র একত্রে ভীমসেনের হাতে নিহত হন।

[মহা (k) ৬.১৭.২১; ৬.১৮.১১; ৬.৪৪.১৬; ৬.৪৮.৬৪; ৬.৫৯.১৩৬; ৬.৬১.১; ৬.৬২.১৬, ২৬; ৬.৭১.২১; ৬.৭৩.২৪-২৮; ৬.৯২.২৪, ৩৪; ৬.১০৪.১৯; ৬.১১০.৮; ৬.১১৩.২-২২; ৭.১২০.১০-৩৭; ৭.১৩৭.৩০, ৪৬; (হরি) ৬.১৭.২২; ৬.১৮.১১; ৬.৪৪.১৬; ৬.৪৮.৬৩; ৬.৫৯.১৩৫; ৬.৬১.১, ৬২; ৬.৭০.২২; ৬.৭২.২৪-২৮; ৬.৮৮.৫৫, ৬৫; ৬.১০০.১৯; ৬.১০৬.৮; ৬.১০৯.২-২২; ৭.১০৪.১০-৩৭; ৭.১১৮.৩০, ৪৬]

□ দ্রোণপর্বে চিত্রসেনের মৃত্যুর স্পষ্ট উল্লেখ থাকলেও কর্ণপর্বে দেখা যায় যে, সঞ্জয় কর্ণবধের পরেও যেসব যোদ্ধারা বেঁচে আছেন বলে বর্ণনা করেছেন সেখানে অন্যান্য ধার্তরাষ্ট্রদের মধ্যে চিত্রসেনের নামও উল্লিখিত হয়েছে। তবে এখানে চিত্রসেনের জীবিত থাকার সংবাদটিকে ভ্রান্ত বলেই মনে হয়।

[মহা (k) ৮.৭.১৭; (হরি) ৮.৫.১৭]

চিত্রসেন$_{৩}$ পুরুবংশীয় রাজা অবিক্ষিতের পুত্র ছিলেন পরীক্ষিৎ। এই পরীক্ষিৎ রাজা জনমেজয় প্রভৃতি সাতটি পুত্রসন্তান লাভ করেন। চিত্রসেন এই সাত পুত্র সন্তানের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১.৯৪.৫৪; (হরি) ১.৮৯.৪৩]

চিত্রসেন$_{৪}$ মগধরাজ জরাসন্ধের অন্যতম মন্ত্রী তথা সেনাপতি ডিম্ভকের প্রকৃত নাম চিত্রসেন ছিল বলে জানা যায়। [দ্র. ডিম্ভক]

[মহা (k) ২.২২.৩২; (হরি) ২.২১.৩২]

চিত্রসেন$_{৫}$ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে অবস্থানকারী জনৈক পাঞ্চাল যোদ্ধা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ইনি কর্ণের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ৮.৪৮.১৫; (হরি) ৮.৩৬.৩৮]

চিত্রসেন$_{৬}$ কর্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যেদিন দুঃশাসন বধ হয়েছিল, সেই দিন পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধা রাজকুমার যুধামন্যুর হাতে চিত্রসেন নিহত হন।

[মহা (k) ৮.৭৫.৮; ৮.৮৩.৩৭-৪০; (হরি) ৮.৫৬.৮; ৮.৬১.৬২-৬৬]

চিত্রসেন$_{৭}$ ত্রয়োদশ মন্বন্তরের অধিপতি রৌচ্য মনুর (ভাগবত পুরাণ মতে দেবসাবর্ণি মনুর) পুত্রসন্তানদের মধ্যে একজন ছিলেন চিত্রসেন।

[বায়ু পু. ১০০.১০৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.১০৪; বিষ্ণু পু. ৩.২.৪১]

চিত্রসেন$_{৮}$ সমুদ্র তীরবর্তী কোনো একটি দেশের রাজা। মহাভারতে তাঁর বিশেষ পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁকে 'সামুদ্র' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ইনি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধা তৎকালীন বঙ্গ-দেশের রাজা সমুদ্রসেন এই চিত্রসেনকে বধ করেন। [মহা (k) ৮.৬.১৫; (হরি) ৮.৪.১৫]

চিত্রসেন$_{৯}$ অঙ্গরাজ কর্ণের পুত্র। তাঁকে কৌরব পক্ষের গুরুত্বপূর্ণ মহারথী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কর্ণপর্বে যুধিষ্ঠির একবার এই

চিত্রসেনকে আক্রমণ করেছিলেন। এরপর নকুলের সঙ্গে চিত্রসেনের দীর্ঘ দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত চিত্রসেন নকুলের হাতে নিহত হন।

[মহা (k) ৮.৭.২০; ৮.৬১.১২; ৯.৬.২; ৯.১০.৯-২১; (হরি) ৮.৫.২০; ৮.৪৭.১২; ৯.৫.২; ৯.৮.৯-২১]

চিত্রসেন১০ ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার অন্যতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার সঙ্গে এঁরাও পাণ্ডব সৈন্যকে আক্রমণ করেন।

[মহা (k) ৮.২৭.৩; (হরি) ৮.২১.৩]

চিত্রসেন১১ জনৈক বিশিষ্ট নাগ। কর্ণ এবং অর্জুনের মধ্যে যে ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হয় তা দেখতে আকাশচারী দেবতা, নাগ, গন্ধর্ব প্রভৃতিরা সেই স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অর্জুনের আবার কেউ কেউ কর্ণের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই সময় অর্জুনের পক্ষ অবলম্বনকারী যেসব বিশিষ্ট নাগের নাম উল্লিখিত হয়েছে চিত্রসেন তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৮.৮৭.৪৩; (হরি) ৮.৬৪.৪৫]

চিত্রসেন১২ অভিসার দেশের রাজা। ইনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিত্রকে সঙ্গে নিয়ে পাণ্ডবসৈন্য আক্রমণ করেন। অর্জুনের পুত্র শ্রুতকর্মার সঙ্গে তাঁর তুমুল যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত চিত্রসেন শ্রুতকর্মার হাতে নিহত হন।

[মহা (k) ৮.১১.২১; ৮.১৩.৭; ৮.১৪.১-১৬; (হরি) ৮.৮.২১; ৮.১০.৭; ৮.১১.১-১৬]

চিত্রসেন১৩ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে, ভবিষ্যৎ চতুর্থ সাবর্ণি মনুর (ভাগবত পুরাণ তাঁকে দেবসাবর্ণি মনু বলে চিহ্নিত করেছে) পুত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন চিত্রসেন।

[ভাগবত পু. ৮.১৩.৩০; ব্রহ্মাণ্ড পু. ৩.১.৯৪]

চিত্রসেন১৪ যদু-বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবের অন্যতম পুত্র অগাবহের পুত্রসন্তানদের মধ্যে একজন। বায়ু পুরাণে এঁর নাম উল্লিখিত হলেও চিত্রসেনের পরিচয় সঠিকভাবে বোঝা যায় না। শ্লোকের পাঠটি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.২৫৭; বায়ু পু. ৯৬.২৪৭]

চিত্রসেন১৫ বৈবস্বত মনুর পুত্র নরিষ্যন্ত। এই নরিষ্যন্তের পুত্র ছিলেন চিত্রসেন। ইনি ঋক্ষ নামে একটি পুত্রসন্তান লাভ করেন।

[ভাগবত পু. ৯.২.১৯]

চিত্রসেনা১ যেসব অপ্সরা কুবেরের রাজসভায় নৃত্য পরিবেশন করতেন ও কুবেরের উপাসনা করতেন, তাঁদের মধ্যে চিত্রসেনা একজন।

[মহা (k) ২.১০.১০; (হরি) ২.১০.১০]

□ অর্জুন যখন ইন্দ্রের রাজসভায় গিয়েছিলেন, তখন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে যেসব অপ্সরা নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে চিত্রসেনা একজন। [মহা (k) ৩.৪৩.৩০; (হরি) ৩.৩৮.৩০]

চিত্রসেনা২ মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত জম্বুখণ্ড বিনির্মাণ পর্বের অন্তর্ভুক্ত যেসব পৌরাণিক নদীগুলির নাম উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে চিত্রসেনা একটি।

[মহা (k) ৬.৯.১৭; (হরি) ৬.৯.১৭]

চিত্রসেনা৩ কুবেরের রাজসভায় উপস্থিত একজন অপ্সরা। অর্জুন যখন ইন্দ্রলোকে গিয়েছিলেন তখন চিত্রসেনা তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য ইন্দ্রের সভায় নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন।

[মহা (k) ২.১০.১০; ৩.৪৩.৩০; (হরি) ২.১০.১০; ৩.৩৮.৩০]

□ বিষ্ণুভবনবাসী অপ্সরাদের মধ্যেও চিত্রসেনার নাম পাওয়া যায়। [ব্রহ্ম পু. ৬৮.৬১]

চিত্রসেনা৪ দেবসেনাপতি স্কন্দ কার্ত্তিকেয়র একজন অনুচরী মাতৃকার নাম চিত্রসেনা। বামন পুরাণে বলা হয়েছে যে, রৌদ্র মহালয় তীর্থে দেবসেনাপতি রূপে কার্ত্তিকেয়র অভিষেকের পর চিত্রসেনা নামে অনুচরীটিকে উপহার রূপে তাঁকে দান করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৬.১৪; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোক পরবর্তী পাদটীকা দ্রষ্টব্য; খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮; বামন পু. ৫৭.৯৮]

চিত্রসেনা৫ মহাভারতের ভীষ্মপর্বে উল্লিখিত ভারতবর্ষের প্রধান নদীগুলির মধ্যে চিত্রসেনা একটি। এই নদীর আধুনিক নাম বা প্রবাহ পথ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

[মহা (k) ৬.৯.১৭; (হরি) ৬.৯.১৭]

চিত্রসেনা৬ অন্ধকাসুর বধের উদ্দেশ্যে মহাদেব যে সকল মাতৃকা সৃষ্টি করেছিলেন চিত্রসেনা তাঁদের মধ্যে একজন।

[বিষ্ণুধর্মোত্তর পু. (shah) ১.২২৬.২৩]

চিত্রস্বন জনৈক রাক্ষস। ইনি আষাঢ় মাসে সূর্যের রথে অবস্থান করেন বলে ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। [ভাগবত পু. ১২.১১.৩৬]

চিত্রা১ হিমালয় পর্বতের উত্তর অংশে পুষ্পভদ্রানদী

যেস্থান থেকে নির্গত হয়েছে সেই স্থানে চিত্রা নামে একটি পবিত্র শিলা অবস্থিত। এই শিলার নিকটে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র আশ্রম। *[ভাগবত পু. ১২.৮.১৭]*

চিত্রা$_2$ বসুদেবের ঔরসে পৌরবী রোহিণীর গর্ভজাতা কন্যা চিত্রা। ইনি কৃষ্ণ ও বলরামের কনিষ্ঠ ভগিনী।

বসুদেব ও রোহিণীর কন্যা সুভদ্রার আরেক নাম—

চিত্রাং নাম কুমারীঞ্চ রোহিণীতনয়া দশ।
চিত্রা সুভদ্রেতি পুনর্বিখ্যাতা কুরুনন্দন॥

[দ্র. সুভদ্রা]

[বায়ু পু. ৯৬.১৬৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৬৫; হরিবংশ পু. ১.৩৫.৬; মৎস্য পু. ৪৬.১২]

চিত্রা$_3$ কুবেরের সভায় উপস্থিত একজন অপ্সরা। মহর্ষি অষ্টাবক্র যখন কুবেরের সভায় যান তখন অপ্সরা চিত্রা তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য সেখানে নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন।

[মহা (k) ১৩.১৯.৪৪; (হরি) ১৩.১৮.৪৪]

□ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আবার অপ্সরা চিত্রাকে কুবের ও অপ্সরা ঘৃতাচীর কন্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে চন্দ্রের পুত্র বুধের ঔরসজাত সন্তানের নাম চৈত্র। এই চৈত্র সমগ্র পৃথিবী শাসন করেছিলেন।

[ব্রহ্মবৈবর্ত পু. (প্রকৃতি) ৬১.৯৩-৯৬]

চিত্রা$_4$ পুরাকালে সর্বভূত নামে এক ধর্মাত্মা কায়স্থ ছিলেন। কালক্রমে সর্বভূতের একটি তেজস্বী পুত্র এবং একটি অপরূপা কন্যার জন্ম হয়েছিল। এই কন্যা সন্তানটির নামই চিত্রা।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস) ১৩৯.২-৪]

চিত্রা$_5$ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরকালের জনৈকা মুনিপত্নী। প্রিয়ব্রতের পুত্র সবন পুত্রহীন অবস্থায় দেহত্যাগ করলে তাঁর পত্নীর অপুত্রক অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য সবন আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। আকাশমার্গে পত্নীর সঙ্গে রমণরত অবস্থায় সবনের শুক্র স্খলিত হয়ে একটি জলাশয়ে পতিত হয়। চিত্রাসহ কয়েকজন মুনিপত্নী সেই শুক্র মিশ্রিত জলকে অমৃতজ্ঞানে স্নান ও পান করতে শুরু করেন। স্বামীদের অজান্তেই তাঁরা এই কার্য করতেন। এই পাপকার্যের ফলে অচিরেই তাঁরা কলুষিত হয়ে স্বামী পরিত্যক্তা হলেন। সবনের শুক্রের প্রভাবে চিত্রাসহ সব মুনিপত্নীরা মোট সাতটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছিলেন। ব্রহ্মার কৃপায় এই সাতটি পুত্র সন্তানই পরবর্তীকালে মরুৎগণরূপে বিখ্যাত হন। *[বামন পু. ৭২.১৫-২৩]*

চিত্রা$_6$ চন্দ্রের পত্নী চিত্রা। মহাকাব্য ও পুরাণে চিত্রা নক্ষত্রকেই চন্দ্রের পত্নীরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

[রামায়ণ ৩.১৭.৩; ব্রহ্মবৈবর্ত পু. (ব্রহ্ম) ৯.১৪; লিঙ্গ পু. ১.৪২.৭৯]

চিত্রাক্ষ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের চতুর্দশ দিনে তিনি ভীমসেনের হাতে নিহত হন।

[মহা (k) ১.৬৭.৯৫; ১১৭.৪; ৭.১৩৬.২০; (হরি) ১.৬২.৯৭; ১১১.৪; ৭.১২৭.৫৮]

চিত্রাঙ্গদ$_1$ কুরু-ভরতবংশীয় রাজা শান্তনুর ঔরসে সত্যবতীর গর্ভজাত দুই পুত্রসন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন চিত্রাঙ্গদ। ইনি গঙ্গাপুত্র ভীষ্মের বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা। চিত্রাঙ্গদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য।

সত্যবতীর সঙ্গে শান্তনুর বিবাহের সময়েই শান্তনুর জ্যেষ্ঠপুত্র ভীষ্ম সত্যবতীর পিতা দাসরাজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, শান্তনুর অবর্তমানে সত্যবতীর গর্ভজাত সন্তানই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবেন। সেই মতো শান্তনুর মৃত্যুর পর ভীষ্ম সত্যবতীর গর্ভজাত দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদকে সিংহাসনে বসালেন। মহাভারতের ঘটনাক্রম থেকে ধারণা হয়ে যে, চিত্রাঙ্গদ বেশ অল্পবয়সেই রাজসিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু চিত্রাঙ্গদের ভাগ্যে অকালমৃত্যু লেখা ছিল। সিংহাসনে আরোহণের অল্পকাল পরেই একদিন চিত্রাঙ্গদ নামে এক পরাক্রমশালী গন্ধর্ব এসে চিত্রাঙ্গদকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্বের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হয়।

[মহা (k) ১.২.৯৯; ১.৯৫.৫০; ১.১০১.২-১০; ১.১০২.১; ৫.১৭২.১৮; (হরি) ১.২.১০১; ১.৯০.৬৫; ১.৯৫.৬-১৫; ১.৯৬.১; ৫.১৬২.৫-৬]

চিত্রাঙ্গদ$_2$ একজন প্রবল পরাক্রমশালী গন্ধর্ব। শান্তনুর ঔরসে সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্র চিত্রাঙ্গদ যখন শান্তনুর মৃত্যুর পর হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তার কিছুকাল পর একদিন চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব একদিন শান্তনুপুত্র চিত্রাঙ্গদকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্বের হাতে শান্তনুপত্র চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হয়।

[দ্র. চিত্রাঙ্গদ$_1$]

চিত্রাঙ্গদ৩ পাণ্ডবদের সমসাময়িক একজন রাজা। তবে ইনি কোন দেশের রাজা, সে বিষয়ে মহাভারতে কোনো উল্লেখ মেলে না। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় নানা দেশের রাজাদের মধ্যে আমরা চিত্রাঙ্গদকেও উপস্থিত থাকতে দেখি।

[মহা (k) ১.১৮৬.২২; (হরি) ১.১৭৯.২২]

চিত্রাঙ্গদ৪ কর্ণের মৃত্যুর পর কৌরবপক্ষের কোন কোন যোদ্ধা জীবিত, অবশিষ্ট ছিলেন, সঞ্জয় তাঁদের নামের একটা তালিকা দিয়েছেন। সেই তালিকায় অবশিষ্ট কৌরব যোদ্ধাদের নামের মধ্যে জনৈক চিত্রাঙ্গদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

[মহা (k) ৮.৭.২০; (হরি) ৮.৫.২০]

চিত্রাঙ্গদ৫ কলিঙ্গদেশের রাজা। দুর্যোধন কর্ণকে সঙ্গে নিয়ে কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যার স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত ছিলেন। কর্ণের সহায়তায় দুর্যোধন কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যাকে হরণ করে বিবাহ করেছিলেন। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদ দুর্যোধনের শ্বশুর। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে খুব স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও কর্ণপর্বে জীবিত যোদ্ধাদের মধ্যে কৌরবপক্ষীয় যে চিত্রাঙ্গদের উল্লেখ আমরা পাই, তিনি দুর্যোধনের শ্বশুর কলিঙ্গরাজ হলেও হতে পারেন।

[দ্র. চিত্রাঙ্গদ৪]

[মহা (k) ১২.৪.২; (হরি) ১২.৪.২]

চিত্রাঙ্গদ৬ মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে জনৈক দশার্ণদেশীয় রাজা চিত্রাঙ্গদের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে অর্জুন দিগ্বিজয়ে বের হলে দশার্ণরাজ চিত্রাঙ্গদ যজ্ঞাশ্ব হরণ করলেন। ফলে অর্জুনের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড যুদ্ধও হল। যুদ্ধে অবশ্য চিত্রাঙ্গদ অর্জুনের হাতে পরাস্ত হন।

[মহা (k) ১৪.৮৩.৬; (হরি) ১৪.১০৬.৬]

চিত্রাঙ্গদা মণিপুরের রাজা চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদা। মহাভারতে বর্ণিত এই মণিপুর কলিঙ্গদেশের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল বলে ধারণা হয়। কারণ, নিজের দ্বাদশবর্ষীয় ব্রহ্মচর্য্য তথা বনবাস পর্যায়ে নানা দেশে ভ্রমণ করতে করতে কলিঙ্গদেশ অতিক্রম করে অর্জুন মণিপুরে এসে পৌঁছেছেন।

মণিপুরের নানা তীর্থ এবং অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখার পর মণিপুরের রাজা চিত্রবাহনের প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন অর্জুন। সাক্ষাৎ করলেন চিত্রবাহনের সঙ্গে। এই সময়েই চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে দেখা হল তাঁর। বঙ্গদেশের মহাকবি রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার উপাখ্যান সামনে রেখে গীতিনাট্যে যে চিত্রাঙ্গদার চরিত্রচিত্রণ করেছেন, তিনি পুত্রবৎ প্রতিপালিতা, নারীজনোচিত আচার আচরণ নয় বরং প্রজাপালন, অস্ত্রশিক্ষার মতো রাজ পুত্রবৎ পরিপালনে তাঁর জীবন কেটেছে। কবিগুরুর চিত্রাঙ্গদার মুখে কিংবা তাঁর প্রজাদের মুখে সময়ে সময়ে তেমন বিবরণই মেলে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কখনও অর্জুনের কাছে প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আক্ষেপ করছেন— পুরুষের বিদ্যা করেছিনু শিক্ষা/লভি নাই মনোহরণের দীক্ষা। কখনো মদন দেবতার বরে অপরূপা হয়ে ওঠার পর নিজের পূর্বজীবন বর্ণনা করে নিজেই অর্জুনকে বলছেন যে, চিত্রাঙ্গদা মানুষটি তেমনই যে নাকি—

সন্ধিতে পারে লক্ষ্য . . .

বিঁধিতে পারে না বীরবক্ষ কুটিল কটাক্ষ শরে।

আবার প্রজাদের কথায়—স্নেহবলে তিনি মাতা, বাহুবলে তিনি রাজা।

আমরা মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনীতে প্রবেশ করার আগে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার কথা তুলে আনলাম মূলত দুটি কারণে। প্রথমত এই বঙ্গদেশে কিংবা শুধু বঙ্গদেশে কেন, বাংলার বাইরেও চিত্রাঙ্গদার এই রাজপুত্রবৎ পরাক্রমের ছবিটি জনমানসে অত্যন্ত বিখ্যাত, মহাভারতীয় চিত্রাঙ্গদার নিজস্ব খ্যাতির সীমা ছাড়িয়ে চিত্রাঙ্গদার এমন একটি মূর্তিই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর দ্বিতীয় কারণ, মহাভারতের কবি চিত্রাঙ্গদার সম্পর্কে এতসব কথা কিছু না বললেও একটি মাত্র শ্লোকে সূত্রাকারে চিত্রাঙ্গদার প্রাক্‌বিবাহ জীবনচর্যার যেটুকু ইঙ্গিত রেখেছেন, আমাদের বিশ্বাস, সেই ইঙ্গিতটুকুই পরবর্তী সময়ে চিত্রিত চিত্রাঙ্গদার চরিত্রের মূল বীজ। মণিপুরের রাজকন্যা অসামান্যা সুন্দরী চিত্রাঙ্গদা। রাজবাড়ির মেয়েদের জীবনযাপন খুব একটা পরাধীন ভাবে না হলেও অন্দরমহল একটা থাকতই। একেবারে বীর বিক্রমে পুরুষের মতো মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমনটা মহাভারতের উদারকালেও কল্পনীয় ছিল না। অথচ মহাভারতের কবি চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অর্জুনের সাক্ষাতের কথা বলার সময় ঠিক সেই ইঙ্গিতটাই দিলেন। অর্জুন

দেখলেন—একটি মেয়ে, সে নিজের ইচ্ছেমতো যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাজধানীর পথে—

তাং দদর্শ পুরে তস্মিন্ বিচরন্তীং যদৃচ্ছয়া।

সেই কন্যাই রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা।

রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে মুগ্ধ হলেন অর্জুন। তিনি নিজেই মণিপুররাজ চিত্রবাহনের কাছে গিয়ে চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছেন—মহারাজ! আমি ক্ষত্রিয় এবং উচ্চবংশে আমার জন্ম। আপনার কন্যাকে আমি বিবাহ করতে চাই—

দেহি মে কন্বিমাং রাজন্ ক্ষত্রিয়ায় মহাত্মনে।

অর্জুনের কথা শুনে চিত্রবাহন তাঁর পরিচয় বিশদে জিজ্ঞাসা করলেন। অর্জুনের পরিচয় জানার পর চিত্রবাহন বললেন—বেশ কথা। তোমার সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ আমি দিতেই পারি। কিন্তু তার আগে আমারও কতকগুলো কথা তোমার শোনা দরকার। রাজা চিত্রবাহন নিজের পূর্বপুরুষের কাহিনী শোনাতে লাগলেন অর্জুনকে—আমাদের বংশে আমাদের পূর্বজ রাজা ছিলেন প্রভঞ্জন। তিনি সন্তানার্থী হয়ে শিবের তপস্যা করলে মহাদেব শিব তাঁকে বর দেন যে, আমাদের বংশে প্রত্যেক পুরুষের একটি করেই সন্তান হবে। এতদিন তাই হয়েছে, কিন্তু আমি পর্যন্ত আমার পূর্বজদের সবারই সন্তান ছিল এক-একটি পুত্র। কিন্তু আমার বেলাতেই এমন হয়েছে যে, আমার ঘরে একটি মেয়ে হয়েছে। আমি তাকে অবহেলা করিনি। আমি ধরেই নিয়েছি— আমার মেয়েটিই আমার ছেলে এবং সেই আমাদের বংশ-রক্ষা করবে—

পুত্রো মমায়মিতি মে ভাবনা পুরুষর্ষভ।

সেকালে যতখানি পিতৃতান্ত্রিক পৌরুষেয়তার ভাবনা ছিল, তাতে একটি কন্যা-সন্তানকে পুত্রের সংজ্ঞায় মানুষ করা এত সহজ ছিল না। কিন্তু মহারাজ চিত্রবাহন বলেছেন— আমার পত্রিকা বা কন্যাকেই আমি পুত্রের সংজ্ঞা দিয়েছি—

পুত্রিকাহেতুবিধিনা সংজ্ঞিতা ভরতর্ষভ।

টীকাকার নীলকণ্ঠ বড়ো ভালো একটা উদাহরণ দিয়েছেন। বলেছেন—যে মানুষ লাঙলের সাহায্যে কৃষিনির্ভর জীবিকা চালায়, সে যেমন বলে—এই লাঙলই আমার জীবন —অর্থাৎ এখানে যেমন লাঙলের ওপর জীবন, শব্দের প্রয়োগ ঘটে যাচ্ছে, তেমনই কন্যা-পুত্রিকার ওপরে পুত্রশব্দের প্রয়োগ। 'পুত্রিকা-পুত্র'—এই শব্দটার মধ্যে অবশ্য তখনকার দিনের একটা আইনি সংশ্লেষও আছে। সেকালে যাঁদের ঘরে পুত্রসন্তান জন্মাত না, সেখানে স্মার্ত নিয়ম এই ছিল যে, মেয়ের ঘরে যে নাতি হবে, সে যেমন দাদু-দিদিমার পিণ্ড-দানের অধিকারী হত, তেমনই সম্পত্তিরও অধিকারী হত। কিন্তু মণিপুরেশ্বর চিত্রবাহন এই স্মার্ত-ভাবনা থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন—তিনি তাঁর 'পুত্রিকা' অর্থাৎ মেয়েটিকে পুত্র-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করার জন্য বিধি অনুসারে যজ্ঞ করেছেন, তাতে একটাই সমস্যা দাঁড়িয়েছে, তাঁর মেয়েটির বিয়ে হলে সে শ্বশুরবাড়ি যাবে না, কেননা তার সংজ্ঞা তো ছেলের।

চিত্রবাহন এবার শর্ত দিয়ে বললেন— আমার মেয়ের ঘরে যে ছেলে জন্মাবে, সেই ছেলে কিন্তু তোমার বংশধর হবে না, অর্জুন! সে হবে আমারই বংশধর, অর্থাৎ আমার পুত্র-সংজ্ঞিত পুত্রিকার পুত্র, সে আমার রাজ্যটাও পাবে। এবার তুমি শপথ করো যে, এই শর্তে তুমি রাজি আছো কী না, অর্থাৎ বিবাহিত বধূর মতো আমার মেয়েকে তুমি নিজের বাড়িতেও নিয়ে যাবে না এবং তার গর্ভজাত সন্তানটিও আমারই বংশধরের কাজ করবে, তবেই তুমি আমার মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারো—

এতেন সময়েনেমাং প্রতিগৃহ্নীষ্ব পাণ্ডব।

চিত্রবাহনের শর্তেই চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করতে সম্মত হলেন অর্জুন। মহাভারতের কবি জানাচ্ছেন ইতিপূর্বে উলূপীকে বিবাহ করার সময় উলূপী অর্জুনের ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত বিষয়ক দ্বিধা দূর করে বলেছিলেন যে, অর্জুনের ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কেবলমাত্র দ্রৌপদীর ক্ষেত্রেই খাটে, অন্য কোনো রমণীর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হতে পারে না। উলূপীর এই তর্কই কিন্তু চিত্রাঙ্গদার ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছেন অর্জুন। কিন্তু সেই তর্ক মেনে নিতে হলে হয়তো একটু সুবিধেবাদীই মনে হবে অর্জুনকে, কেননা সুখময় তর্কতীর্থর মতো অগ্রগণ্য পণ্ডিতও অর্জুনের এই অজিতেন্দ্রিয় আচরণ ভালো চোখে দেখেননি, বরঞ্চ সেটাকে একটা বড়ো স্খলন বলেই মনে করেছেন। আমরা অবশ্য মহাবীর অর্জুনের মানসিক অবস্থা বুঝি, তাঁর মতো এক

সর্বগুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের নিরীন্দ্রিয় আচরণ মানায় না। অর্জুন বিবাহ করে ফেললেন পৌরুষের দৃষ্টিতে লালিতা চিত্রাঙ্গদাকে, হয়তো-বা তাঁর মধ্যে দ্রৌপদীর অবভাসও লাভ করলেন অংশত। বিবাহ করে চলেও গেলেন না—বারো বছর বনবাসের মধ্যে এক চতুর্থাংশ—তিন-তিনটে বছর তিনি কাটিয়ে দিলেন মণিপুরের রাজভবনেই, কাটিয়ে দিলেন চিত্রাঙ্গদার সাহচর্যে—

উবাস নগরে তস্মিন্ তিস্রঃ কুন্তীসুতঃ সমাঃ।

অবশ্য তিন বছরের মধ্যে খানিক সময় তিনি বাইরে কাটালেন আবারও কিছু তীর্থস্থানে ঘুরে। হয়তো বা বুঝলেন এটাও যে, উলূপীর ব্রহ্মচর্য্য-ঘাতক যুক্তিগুলো চিত্রাঙ্গদার ক্ষেত্রে একটু বেশিই প্রয়োগ করে ফেলেছেন। কিন্তু তাঁর ওপরে যেহেতু শর্ত ছিল—চিত্রবাহন রাজাকে নাতির মুখ না-দেখিয়ে মণিপুর ছাড়বেন না, তাই চিত্রাঙ্গদার গর্ভে পুত্র-সম্ভাবনা হতেই তিনি আবারও তীর্থযাত্রায় বেরলেন চিত্রাঙ্গদাকে আলিঙ্গন করে—

তস্যাং সুতে সমুৎপন্নে পরিষ্বজ্য বরাঙ্গনাম্।

[মহা (k) ১.২১৫.১৩-২৭; (হরি) ১.২০৮.১৩-২৭]

□ অবশ্য বেশি তীর্থ এবার ভ্রমণ করা হল না। কেননা অর্জুন জানেন যে, এতদিনে চিত্রাঙ্গদার কোল-আলো-করা সেই পুত্রটি জন্মে গিয়েছে। অর্জুন তাই আবার ফিরে এলেন চিত্রাঙ্গদার কাছে, পুনরায় তাঁকে দেখার জন্য—

চিত্রাঙ্গদাং পুনর্দ্রষ্টুং মণিপুরপুরং যযৌ।

অর্জুন দেখলেন—তাঁর পুত্র হয়েছে এবং পুত্রের নাম হয়েছে বভ্রুবাহন। নাতির নামটা নিশ্চয়ই মণিপুররাজ চিত্রবাহনেরই দেওয়া, 'বাহন'-শব্দটি তাঁরই নামের অন্ত্য-স্মরণিকা হয়তো। আর অর্জুন যেহেতু কৃষ্ণবর্ণের মানুষ ছিলেন, তাই তাঁর পুত্রের গায়ের রংও হয়তো খানিকটা চাপা ছিল—'বভ্রু'-শব্দের অর্থ পাঁশুটে-তামাটে রং। যাই হোক অর্জুন কথা রেখেছেন—শ্বশুর চিত্রবাহনের হাতে নিজের পুত্র বভ্রুবাহনকে তুলে দিয়ে অর্জুন বলেছেন—এই নিন, চিত্রাঙ্গদার অধিকারী স্বামী হওয়ার জন্য আপনি যে মূল্য চেয়েছিলেন, এই নিন সেই মূল্য। আমার পুত্র বভ্রুবাহন আপনার বংশধর পুত্র হিসেবেই রইল এই মণিপুরে—

চিত্রাঙ্গদায়াঃ শুল্কং ত্বং গৃহাণ বভ্রুবাহনম্।

—এবারে আমাকে ঋণমুক্ত করুন মহারাজ।

অর্জুন এবার সত্যিই চলে যাবেন। তিন বছর মণিপুর রাজবাড়িতে—চিত্রাঙ্গদা যেন তাঁর মহুয়ার নেশা—মহাভারতের কবি চিত্রাঙ্গদার গায়ের রঙের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—আহা! জলে-ভেজা মহুয়ার রং যেন চিত্রাঙ্গদার গায়ে—

চিত্রাঙ্গদা চৈব নরেন্দ্রকন্যা

যৈষা সবর্ণার্দ্রমধুকপুষ্পৈঃ।

সেই মহুয়ার নেশা চিত্রাঙ্গদাকে ছেড়ে এবার অর্জুন চলে যাবেন দূরে, আরও দূরান্তে। যাওয়ার আগে চিত্রাঙ্গদাকে শেষ বিদায় জানিয়ে অর্জুন বললেন—তুমি এখানেই থাকো তা হলে, এবং ভালো থেকো। লালন-পালন করে বড়ো করে তোলো আমার পুত্র বভ্রুবাহনকে—

ইহৈব ভব ভদ্রং তে বর্ধেথা বভ্রুবাহনম্।

অর্জুন, চিত্রবাহন এবং চৈত্রবাহনী চিত্রাঙ্গদার মনোভাব থেকে এটা বুঝেছেন যে, বিনা কোনো কৃচ্ছ্রতাতেই বভ্রুবাহন মাতামহের রাজ্য-লাভ করবে এবং তাতেই তৃপ্ত থাকবেন চিত্রাঙ্গদা। বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি না-যাওয়া নিয়ে চিত্রাঙ্গদাকে তিনি এতটুকুও জোর করেননি—হয়তো দ্রৌপদী সেখানে আছেন বলেই। অতএব পুত্রকে নিয়ে চিত্রাঙ্গদা অবস্থিত থাকুন মণিপুরে। বিদায়ের আগে অর্জুন শুধু বললেন—একবার আমাদের খাণ্ডবপ্রস্থের আবাসে এসো, ভালো লাগবে তোমার—

ইন্দ্রপ্রস্থ নিবাসং মে ত্বং ততাগত্য রংস্যসি।

সেখানে আমার জননী কুন্তী আছেন, যুধিষ্ঠির-ভীম আমার দাদারা আছেন, আছে দুই ছোটো ভাই নকুল-সহদেব। সেখানে সবার সঙ্গে তোমার দেখা হবে, তোমার ভাল লাগবে—

বান্ধবৈঃ সহিতা সর্বৈর্নন্দসে ত্বমনিন্দিতে।

অর্জুন সব কথা বললেন, কিন্তু দ্রৌপদীর কথাটা একবারও বললেন না চৈত্রবাহনী চিত্রাঙ্গদাকে।

[মহা (k) ১.২১৭.২৩-৩৫; (হরি) ১.২১০.২৩-৩৪]

□ অর্জুনের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার বিবাহের সংবাদ দেবার পর থেকে একেবারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পরবর্তী যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ পর্যন্ত চিত্রাঙ্গদা কিংবা তাঁর পুত্র বভ্রুবাহনের প্রসঙ্গে মহাভারতের কবি নীরব। এমনকী কুরুক্ষেত্রের এত বড়ো যুদ্ধে অর্জুনের অন্যান্য পুত্ররা অংশ নিলেও বভ্রুবাহন

আসেননি। এমনকী মণিপুর থেকে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতে কোনো সৈন্যদলও আসতে দেখি না। যাই হোক, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরোলেন অর্জুন, নানা দেশ ঘুরে অশ্ব এসে উপস্থিত হল মণিপুরে। ততদিনে চিত্রাঙ্গদার পিতা চিত্রবাহন প্রয়াত হয়েছেন, বভ্রুবাহনই তখন মণিপুরের রাজা। বভ্রুবাহন যখন শুনতে পেলেন যে, পিতা অর্জুন যজ্ঞাশ্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন মণিপুরে, তখন নানা মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন সানন্দে। অর্জুন কিন্তু পুত্রের এমন আনন্দে আত্মহারা, গদগদ ভাব দেখে মোটেই খুশি হলেন না। বরং তিরস্কার করে বললেন—আমি হস্তিনাপুরের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে তোমার রাজ্যে এসেছি। এ অবস্থায় একজন পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় রাজা হিসেবে তোমার উচিত ছিল আমার সঙ্গে এসে যুদ্ধ করা। আমি যদি নিরস্ত্র অবস্থায় আসতাম, তাহলে না হয় তুমি এমন ভাবে এসে অভ্যর্থনা করতে পারতে, সেক্ষেত্রে সেটা সঙ্গতও হত। পিতার এমন তিরস্কার শুনে এবং বিমাতা উলূপীর প্ররোচনায় বভ্রুবাহন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। সেই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বভ্রুবাহনের দ্বারা অর্জুন পরাজিত এবং নিহত হলেন। রাজ অন্তঃপুরে বসে অর্জুনের নিহত হবার সংবাদ পেলেন রাজমাতা চিত্রাঙ্গদা। এতদিন পর স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার কথা ছিল, আর তার বদলে কিনা মৃত্যুসংবাদ! চিত্রাঙ্গদা ছুটে এলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। সেখানে অর্জুনের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে তৎক্ষণাৎ জ্ঞানও হারালেন। তারপর জ্ঞান ফিরে আসতে চিত্রাঙ্গদার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল উলূপীর ওপর। কারণ উলূপীই পিতার আদেশমতো যুদ্ধের প্ররোচনা দিয়েছিলেন বভ্রুবাহনকে। অনেক বিলাপ করলেন চিত্রাঙ্গদা, উলূপীকে অনেক তিরস্কারও করলেন। সেই বিবাহ পূর্বকালের পুত্রবৎ স্বেচ্ছা-বিচরণকারিণী চিত্রাঙ্গদা আজ ধীরা, পতিব্রতা, শান্ত এক রমণীতে পরিণত হয়েছেন। মহাভারতের কাহিনী পরম্পরায় এই পর্যায়ে এসে যেন চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে আমাদের নতুন করে পরিচয় হয় আবার। এবং এই নবরূপের নবপরিচয়েও চিত্রাঙ্গদা আমাদের নতুন করে মুগ্ধ করেন।

যাই হোক, নাগলোক থেকে আনা সঞ্জীবন মণির প্রভাবে অর্জুন জীবনলাভ করলেন আবার, চিত্রাঙ্গদা আর বভ্রুবাহনকে হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। আমন্ত্রণ জানালেন উলূপীকেও।

[মহা (k) ১৪.৭৯-৮১ অধ্যায়;
(হরি) ১৪.৯৯-১০৪ অধ্যায়]

□ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের সময়েই বস্তুত অর্জুনের স্ত্রী হিসেবে উলূপী-চিত্রাঙ্গদার প্রথম শ্বশুরালয়ে পদার্পণ। চিত্রাঙ্গদা নবপরিণীতা বধূ হয়ে শ্বশুরবাড়িতে আসেননি। আজ এলেন পরিণত বয়সে, যখন উপযুক্ত পুত্রকে পিতৃকুলের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা এবং অন্যান্য গুরুতর দায়দায়িত্ব সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। মণিপুরের আপন পিতৃকুল এবং রাজসিংহাসন দুইয়ের কাছেই তিনি আজ দায়মুক্ত। দায়মুক্ত চিত্রাঙ্গদা নিমন্ত্রিত হিসেবেই পা রাখলেন হস্তিনাপুরে। কিন্তু পুত্রের হাত ধরে মণিপুরে ফিরে গেলেন না আর। হস্তিনাপুরেই থেকে গেলেন কুরুরাজপরিবারের রাজবধূর পরিচয়ে।

রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল, পরিণতবয়স্কা পতিব্রতা মণিপুরের রাজমাতা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গেও আমাদের পরিচয় হয়েছে। হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে প্রৌঢ়া চিত্রাঙ্গদা দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উলূপীর সঙ্গে মিলে আর এক নতুন জীবন আরম্ভ করলেন। রাজকুলবধূর জীবন। রাজকন্যা, মণিপুর রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী, পরবর্তী সময়ে রাজমাতা—এতসব রাজকীয় মর্য্যাদার যাবতীয় অভিমান ত্যাগ করে চিত্রাঙ্গদা শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবায় মন দিলেন। গান্ধারীর সেবায় নিযুক্ত কুলবধূদের মধ্যে আমরা চিত্রাঙ্গদাকেও দেখতে পাচ্ছি।

পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের সময়েও চিত্রাঙ্গদা জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়। পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদী মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করার পর চিত্রাঙ্গদা আবার ফিরে গিয়েছেন পিত্রালয় মণিপুরে, পুত্র বভ্রুবাহনের কাছে। তবে চিত্রাঙ্গদার মৃত্যুসংবাদ মহাভারতে পাওয়া যায় না।

[মহা (k) ১৫.১.২৩; ১৭.১.৩০;
(হরি) ১৫.১.২৩; ১৭.১.৩০]

চিত্রায়ুধ১ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে চিত্রায়ুধ একজন—

চিত্রায়ুধো নিষঙ্গী চ পাশী বৃন্দারকস্তথা।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে অবশ্য এই শ্লোকটির উল্লেখ পাওয়া যায় না।

[মহা (k) ১.১১৭.৮]

□ দুর্যোধনের সেনাবাহিনীর মধ্যে এই চিত্রায়ুধও ছিলেন।

কিন্তু ভীমসেনের হাতে চিত্রায়ুধ নিহত হন।

[মহা (k) ৫.১৬০.১২৩; ৭.১৩৬.২১; ৭.১৩৭.৩০; (হরি) ৫.১৪৯.১২৩; ৭.১১৭.৫৮; ৭.১১৮.৩০]

চিত্রায়ুধ২ একজন রাজর্ষি। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় যেসব রাজর্ষি ও রাজকুমাররা উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে চিত্রায়ুধ একজন।

[মহা (k) ১.১৮৬.১০; (হরি) ১.১৭৯.১০]

চিত্রায়ুধ৩ কৌরবপক্ষীয় একজন যোদ্ধা বলে মহাভারতে কথিত হয়েছে। কিন্তু হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃতপাঠে চিত্রায়ুধের নাম পাওয়া যায় না। *[মহা (k) ৮.৭.১৮; (হরি) ৮.৪.১৭]*

চিত্রেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। এই তীর্থ দর্শন করলে মনোমতো ফল পাওয়া যায়।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচন কাণ্ড) পৃ. ৯৭]

চিত্রোৎপলা ঋক্ষ পর্বত বা ঋক্ষবত্ বা ঋক্ষবান্ পর্বত থেকে উৎপন্ন একটি পবিত্র নদী। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে একে চিত্রোপলা নদী নামে অভিহিত করা হয়েছে।

[মহা (k) ৬.৯.৩৪; (হরি) ৬.৯.৩৪; মৎস্য পু. ১১৪.২৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৩১; মার্কণ্ডেয় পু. ৫৭.২২; বরাহ পু. ৮৫ অধ্যায়; স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/রেবা) ৪.১৬.৪৮]

□ চিত্রোৎপলা নদীর আধুনিক নাম প্রসঙ্গে পণ্ডিতদের মধ্যে সাধারণভাবে দুটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে। অনেকে মনে করেন বর্তমান উড়িষ্যা রাজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত মহানদীই প্রাচীন চিত্রোৎপলা। মহানদী প্যারি (Pyri) নামে এর শাখানদীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চিত্রোৎপলা নামে প্রাচীনকালে পরিচিত ছিল। আবার পণ্ডিতদের অপরাংশের মতে মহানদীর চিতুলা (Chittula) নামে যে শাখাটি রয়েছে সেটিই চিত্রোৎপলা বলে পূর্বকালে পরিচিত ছিল।

[GDAMI (Dey) p. 50]

চিদি বিদর্ভের পৌত্র তথা কৈশিকের পুত্র চেদি বা চিদি। এঁর বংশধরেরাই চৈদ্য নামে পরিচিত হয়।

[বায়ু পু. ৯৫.৩৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.৩৯]

চিন্তক পুরাণে বিভিন্ন কল্পের বর্ণনাকালে বলা হয়েছে ত্রয়োবিংশ কল্পটির নাম চিন্তক। ব্রহ্মা এই কল্পের আদিতে চিন্তান্বিত থাকার কারণে এটির নাম হয় চিন্তক। *[বায়ু পু. ২১.৫৩]*

চিপিটাতীর্থ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পুণ্য তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করে এখানকার শিবকে দর্শন করলে কখনো তির্যগ্‌যোনিতে জন্ম হয় না।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ৩১.৯]

চিবিলক কলিযুগে যেসব অন্ধ্রবংশীয় রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব করেন চিবিলক তাঁদের মধ্যে একজন। ইনি অন্ধ্রবংশীয় রাজা লম্বোদরের পুত্র ছিলেন। চিবিলকের পুত্র ছিলেন মেঘস্বা।

[ভাগবত পু. ১২.১.২৪]

চিবুক একটি জনজাতির নাম। হীন ম্লেচ্ছ জনজাতি হিসেবেই মহাভারতে চিবুকের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা বিশ্বামিত্র যখন নিজের সৈন্যদের সহায়তায় বশিষ্ঠ ঋষির হোমধেনু নন্দিনীকে হরণ করতে উদ্যত হলেন, তখন নিরুপায় বশিষ্ঠ তাঁকে রক্ষা করতে সমর্থ হবেন না বুঝতে পেরে নন্দিনী নিজেই আত্মরক্ষার জন্য বহু ম্লেচ্ছসৈন্য সৃষ্টি করেন। সেই সময় নন্দিনীর মুখ থেকে নির্গত ফেনা থেকে চিবুক জনজাতির উদ্ভব হয় বলে মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.১৭৫.৩৮; (হরি) ১.১৬৮.৩৯]

চিরকারী মহর্ষি গৌতমের ঔরসে অহল্যার গর্ভজাত পুত্র চিরকারী। মহাভারত-রামায়ণ এবং পুরাণগুলিতে অহল্যার উপাখ্যান একাধিক বার বর্ণিত হলেও চিরকারীর উল্লেখ পাওয়া যায় শুধুমাত্র মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত কাহিনীতে।

মহাভারতের শান্তিপর্বে শরশয্যায় শয়ান পিতামহ ভীষ্মকে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করেছিলেন —একটা কাজ করার বা কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে কী করা উচিত খুব ধীরে ধীরে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, নাকি খুব তাড়াতাড়ি? ভীষ্ম এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই চিরকারীর কাহিনীর অবতারণা করেছেন। শান্তিপর্বের উপাখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে যে, মহর্ষি গৌতমের পুত্র চিরকারী পরম জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নাম চিরকারী ছিল তার কারণ, তিনি সমস্ত কাজই ভীষণ ভেবে চিন্তে সময় নিয়ে করতেন। শুধু কাজ নয়, চিরকারী যখন ঘুমোতেন তখনও অনেক বেশি সময় নিয়ে ঘুমোতেন,

আবার যখন জেগে থাকতেন, তখনও সুদীর্ঘকাল জেগেই থাকতেন। যে কোনো কাজই তিনি অত্যন্ত বেশি সময় নিয়ে করতেন বলেই তাঁর নাম হয়ে গেল চিরকারী—

চিরকারী মহাপ্রাজ্ঞো গৌতমস্যাভবৎসুতঃ।
চিরেণ সর্বকার্যাণি বিমৃষ্যার্থান্ প্রপদ্যতে॥
চিরং সঞ্চিন্তয়ত্যর্থাং শ্চিরং জাগ্রচ্চিরং স্বপন্।
চিরং কার্যাভিপত্তিশ্চ চিরকারী তথোচ্যতে।

এইরকম একজন লোক, যে নাকি সব কাজই অতিবিলম্বে সম্পন্ন করে, তাকে যে লোকে ভীষণ বোকা, অলস বলবে এটাই খুব স্বাভাবিক।

যাই হোক, মহাভারতে চিরকারীর প্রসঙ্গ এসেছে ইন্দ্রের দ্বারা অহল্যা ধর্ষণের ঘটনার পরে। ঘটনার কিছুকাল পরে একদিন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে গৌতম পুত্র চিরকারীকে ডেকে বললেন— তুমি তোমার জননীকে হত্যা করো আমার আদেশে—জহীমাং জননীমিতি। মহর্ষি গৌতম পুত্রকে আদেশ দিয়েই তপস্যা করতে বনে চলে গেলেন। আর ওদিকে চিরকারী বসলেন ভাবনার তপস্যায়। চিরকারী ভাবতে লাগলেন পিতার আদেশই বা তিনি অমান্য করবেন কী করে, আবার ছেলে হয়ে মাকেই বা তিনি হত্যা করবেন কী করে—দুদিকেই তাঁর ধর্মসঙ্কট, এ অবস্থা থেকে তিনি মুক্তই বা হবেন কী করে—

কথং ধর্মচ্ছলেনস্মিন্ নিমজ্জেয়ম্ অসাধুবৎ।

চিরকারী তাঁর পিতার সম্বন্ধে রীতিমতো শাস্ত্রীয় সম্ভ্রম পোষণ করেন এবং অনুরূপ সম্ভ্রম পোষণ করেন মাতার সম্পর্কেও। বহুতর শ্লোকরাশি যা কিনা পিতার মাহাত্ম্য এবং পূজ্যতা প্রমাণ করে সেগুলি চিরকারী গভীরভাবে আলোচনা করলেন মনে মনে। আবার মায়ের ব্যাপারে যত শাস্ত্রীয় বিচার আছে, সেগুলিও তিনি ভাবলেন পরম যৌক্তিকতায়। শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ব্যভিচার এবং পর কামুকতার ক্ষেত্রে পুরুষ মানুষরা যতটা দায়ী, স্ত্রীলোক ততটা নয়। এমনকী নিজের মায়ের ক্ষেত্রেও চিরকারী বিচার করে দেখলেন— অহল্যার দোষ কতটুকু? ইন্দ্র তাঁর স্বামী গৌতমের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন অতি নিপুণভাবে, ফলত অহল্যা তাঁকে স্বামী বলে মেনে নিয়েছিলেন বলেই নিজেকে সর্বাত্মকভাবে সমর্পণ করেছিলেন—

তস্যাত্মনা তু সদৃশম্ আত্মানং পরমং দদৌ।

চিরকারী পিতা-মাতার গুণ এবং মাহাত্ম্য নিয়ে যে তুল্য মূল্য বিচার করেছিলেন, তাতে শেষের দিকে মায়ের পাল্লাটাই যেন একটু ভারী হয়ে গেছে। এর ওপরেও জীবনের বিচিত্র অভিসন্ধি মাথায় রেখে তিনি যখন নিজের জননীকে একজন স্ত্রী হিসেবে বিচার করলেন, সেখানে ব্যভিচারের ঘটনা মাথায় রেখেও উদার সামাজিক শুভৈষণায় ভেবেছেন— ব্যভিচারের ঘটনা পৃথিবীতে যত ঘটে, সেখানে পরম প্রবৃত্তিটা পুরুষের তরফ থেকেই দেখা যায়। আর মেয়েদের যেহেতু শারিরীক শক্তি কম, অতএব বলাৎকার, ধর্ষণ ইত্যাদি ঘটনা প্রধানত পুরুষের ইচ্ছাধীন এবং অন্যায়টা সেই প্রথম করে, মেয়েরা করে না—

সর্বকার্যাপরাধ্যত্বান্ নাপরাধ্যন্তি চাঙ্গনাঃ।

চিরকারী শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রকেই তাঁর পুরুষ প্রবৃত্তির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করে তাঁর মা অহল্যার দিকটা বুঝে নিতে চাইলেন সেই পুরুষ প্রবৃত্তির বলি হিসেবে। পিতার আদেশ মান্য করে তাঁকে হত্যা করা তো দূরের কথা, চিরকারী মনুষ্য জীবনযাপনের গার্হস্থ্য বিচারেই অহল্যাকে সমস্ত অন্যায় থেকে মুক্তি দিয়ে বসে রইলেন। সব কাজই তিনি দেরি করে করেন, এই কাজটাও সারতে তাঁর বেশ দেরিই হল।

অনেককাল কেটে গেছে এর মধ্যে। সুদীর্ঘ তপস্যার পর গৌতমও ফিরে আসছেন আশ্রমের পথে। তপস্যার ফলে তাঁর মন থেকে ক্রোধ দূরীভূত হয়েছে তখন। গৌতমের মনে পড়ল, আশ্রম থেকে রওনা দেবার সময় তিনি চিরকারীকে অহল্যাকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে এসেছেন। কিন্তু গৌতম নিজেও এখন অহল্যাকে ততখানি দোষী বলে ভাবতে পারছেন না আর। ফলে অহল্যাকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে এসেছেন—এ কথা মনে পড়ায় প্রচণ্ড অনুতপ্ত হয়ে পড়েছেন গৌতম। এখন তাঁর ভরসা একটাই—চিরকারী। সব কাজই সে দেরি করে করে, বিবেচনা করে করে।

গৌতম আশ্রমে ফিরে দেখলেন—চিরকারী আপন সুচিরায়ত বিবেচনায় মাতৃহত্যা করেননি। তিনি পরম আনন্দে পুত্রকে অনেক আশীর্বাদ করলেন, পত্নী অহল্যাকেও সব অভিযোগ থেকে মুক্ত করে সাদরে গ্রহণ করলেন গৌতম। কিন্তু

পূর্বঘটনা স্মরণ করে চিরকারীকে তিনি আদেশ দিলেন—তাঁর অনুপস্থিতিতে চিরকারী যেন অস্ত্রধারণ করে জননীকে রক্ষা করেন। কিন্তু সেই মাতৃহত্যার আদেশটা চিরকালের জন্য স্থগিত হয়ে গেল চিরকারীর বিবেচনার ফলে—

হন্যা ইতি সমাদেশঃ শস্ত্রপাণৌ সুতেস্থিতে।

[দ্র. অহল্যা, গৌতম$_1$]

[মহা (k) ১২.২৬৬.১-৬৯; (হরি) ১২.২৬০.১-৬৯]

চিরব ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পুলহ প্রজাপতির বংশে উৎপন্ন যেসব বানরবীরের নাম উল্লিখিত হয়েছে চিরব তাঁদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৩৪]

চিরান্তক মহাভারতের উদ্যোগপর্বে গরুড়ের যেসব পুত্রদের নাম উল্লিখিত হয়েছে, চিরান্তক তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৫.১০১.১৩; (হরি) ৫.৯৪.১৩]

চীন প্রাচীন ভারতের উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব সীমায় বসবাসকারী একটি হীন জনজাতি। এই জনজাতির নামানুসারেই আধুনিক চীনদেশের নামকরণ বলে মনে হয়।

আদিপর্বে বলা হয়েছে যে, বিশ্বামিত্রের সৈন্যরা ঋষি বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে হরণ করতে এসে তাঁর উপর প্রচণ্ড বলপ্রয়োগ করে। বলপ্রয়োগের ফলে নন্দিনীর দেহ নির্গত বর্জ্য পদার্থ থেকে বহু হীন জনজাতির সৃষ্টি হয়েছিল। সে সময় নন্দিনীর মুখ নিঃসৃত এবং দুগ্ধজাত ফেনা থেকে চীন জনজাতির উদ্ভব।

[মহা (k) ১.১৮৫.৩৮; ৬.৯.৬৫;
(হরি) ১.১৬৮.৩৮; ৬.৯.৮৫]

□ প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (বর্তমান কামরূপ)-এর রাজা ভগদত্ত অত্যন্ত প্রতাপশালী ব্যাক্তি ছিলেন। এঁর সৈন্যদলে চীনা সৈনিকরা যুদ্ধ করতেন বলে সভাপর্ব থেকে জানা যায়। এই চীনদেশীয় সৈনিকগণ ভগদত্তের সঙ্গেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় কৌরবপক্ষে যোগদান করেন।

ভারত ও চীনের মধ্যে সেকালেও যে যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল তার প্রমাণ কামরূপের রাজার সেনাবাহিনীতে চীনা সৈন্যদের উপস্থিত। সম্ভবত এঁরা প্রকৃতিগতভাবে ভাড়াটে সৈন্য (Marcenary)। উত্তর তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে চীনের ভৌগোলিক নৈকট্য এবং জলবায়ুগত ও ভূ-প্রকৃতিগত মিল এই যোগাযোগের মূল কারণ। পুরাণেও চীনাংশুক শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবী পার্বতী চীনাংশুক পরিধান করে শিবের সঙ্গে সাক্ষাতে চলেছেন—এ বর্ণনা বায়ু পুরাণে রয়েছে। যা থেকে বোঝা যায় যে, মহাকাব্য বা পুরাণের কালেও চীনদেশের উৎকৃষ্ট রেশম বস্ত্র ভারতে ব্যবহৃত হত। যা চীন-ভারত বাণিজ্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শনও বটে। চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক তথা অন্য যাবতীয় আদান-প্রদান দেখে বোঝা যায় যে, কোনো কারণে বহুলালোচিত 'সিল্করুট' চীনদেশ থেকে ভারতবর্ষের একটি অংশকে ছুঁয়েই পশ্চিম দিকে প্রসারিত হয়েছিল।

[মহা (k) ২.২৬.৯; ৫.১৯.১৫;
(হরি) ২.২৫.৯; ৫.১৯.১৫; বায়ু পু. ১৫৪.২৭৬;
অর্থশাস্ত্র ২.১১.১১৪; অর্থশাস্ত্র (English Translation. by Shayama Shashtai) p. 83;
Susan Whitfield; The Silk Road (Trade, Travel, War and Faith); Chicago; The British Library; 2004; p. 81]

□ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় চীনদেশীয়রা ইন্দ্রপ্রস্থে নানা উপহার নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। হীনজাতি হওয়ায় দৌবারিকগণ এঁদের যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। তখন তাঁরা মেষলোম, পট্ট ও কীটসূত্রের বস্ত্র (রেশমকীটজাত রেশম বস্ত্র) ইত্যাদি পাণ্ডবদের কর হিসেবে দান করেন।

[মহা (k) ২.৫১.১৯, ২৪; (হরি) ২.৪৯.১৯, ২৪]

□ পাণ্ডবগণ বনবাসের সময় হিমালয় সন্নিহিত সুবাহুরাজার দুর্গম দেশে গিয়েছিলেন। সেদেশে যাওয়ার সময় তাঁরা চীনদেশ পার হন।

শুকদেবও আর্যাবর্তে মিথিলাপতি জনকের কাছে আসার সময় চীনদেশ পার হন।

[মহা (k) ৩.১৭৭.১২; ১২.৩২৫.১৪;
(হরি) ৩.১৪৮.১২; ১২.৩১৪.৭১]

□ উদ্যোগপর্বে যুগসন্ধিকালেজাত অত্যাচারী রাজপুরুষদের একটি তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকার মধ্যে চীনদেশের ধৌতমূলক নামে এক রাজার উল্লেখ রয়েছে।

[মহা (k) ৫.৭৪.১৪; (হরি) ৫.৬৯.১৪]

□ উদ্যোগপর্বে চীনদেশজাত মৃগচর্মকে বিশেষ উৎকৃষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ৫.৮৬.১০; (হরি) ৫.৮০.১০]

☐ মূল আর্যাবর্ত ভূ-খণ্ড এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে কিন্তু চীনদেশীয়রা বাস করতো বলে শান্তিপর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ১২.৬৫.১৩; (হরি) ১২.৬৩.১৩]

☐ গঙ্গানদীর সাতটি ধারা যে সব দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত সেগুলির মধ্যে চীনদেশ অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৪৬; বায়ু পু. ৪৭.৪২]

☐ কলিযুগে চন্দ্রবংশে বিষ্ণুর অংশ রূপে মহাত্মা প্রমতির আবির্ভাব ঘটবে। এই প্রমতি পৃথিবী থেকে বহু হীন জনজাতিকে নির্মূল করবেন। এসব জনজাতির মধ্যে চীন অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩১.৮৩; বায়ু পু. ৫৮.৮৩]

চীনাংশুক *[দ্র. বস্ত্র]*

চীরক মহাভারতের Kinjawadekar সম্পাদিত সংস্করণে কর্ণপর্বে চীরক নামে একটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র উল্লেখ করেছেন যে, দিগ্বিজয়ের সময় কর্ণ এঁদের পরাস্ত করেছিলেন। তবে মহাভারতের অন্যান্য সংস্করণে চীরকের পরিবর্তে কীচক কিংবা কীকট পাঠ ধৃত হয়েছে এবং এই পাঠগুলিকেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলেও মনে হয়। *[দ্র. কীচক এবং কীকট]*

[মহা (k) ৮.৮.১৯]

চীরবাসা[১] জনৈক রাজা। মহাভারতে অংশাবতরণ পর্ব থেকে জানা যায় যে দ্বাপরযুগে ক্রোধবশ অসুরদের অংশে মর্ত্যলোকে যেসব ক্ষত্রিয় রাজা জন্মগ্রহণ করেছিলেন চীরবাসা তাঁদের মধ্যে একজন। *[মহা (k) ১.৬৭.৬১; (হরি) ১.৬২.৬২]*

চীরবাসা[২] জনৈক যক্ষ। মহাভারতের সভাপর্ব থেকে জানা যায়, কুবেরের সভায় অবস্থানকারী যক্ষদের মধ্যে একজন ছিলেন চীরবাসা।

[মহা (k) ২.১০.১৮; (হরি) ২.১০.১৭]

চীরবাসা[৩] শিব-মহাদেবের অন্যতম নাম। চীর অর্থাৎ বল্কল বসন পরিধান করেন বলেই তাঁর এই নাম। শুধুমাত্র অনুশাসন পর্বে প্রাপ্ত অষ্টোত্তর সহস্রনাম তালিকাতেই নয়— মহাভারতের অন্যান্য স্থানেও মহাদেবকে এই নামে কীর্তিত করা হয়েছে। দ্রোণপর্বে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে ব্যাসদেব অর্জুনকে যে শতরুদ্রীয় স্তব শুনিয়েছেন সেখানেও আমরা চীরবাসা নামে মহাদেবকে সম্বোধিত হতে দেখি। আশ্বমেধিক পর্বে মহর্ষি সংবর্তের উপদেশে মরুত্ত রাজা মহাদেবের উদ্দেশে যে স্তব করেছিলেন তার উল্লেখ আছে। সেখানেও মহাদেবের অন্যতম নাম হিসেবে চীরবাসা শব্দটি ধৃত হয়েছে।

[মহা (k) ৭.২০২.১১; ১৩.১৭.৪৭; ১৪.৮.১৭; (হরি) ৭.১৭০.১১; ১৩.১৬.৪৭; ১৪.৮.১৮]

চীরিণী মহাভারতে উল্লিখিত একটি পৌরাণিক নদী। কথিত আছে, বৈবস্বত মনু একসময় এই চীরিণী নদীর তীরেই তপস্যায় রত ছিলেন, এই সময় একদিন এই চীরিণী নদীর জলেই মৎস্য রূপধারী ভগবান বিষ্ণু বৈবস্বত মনুর কাছে আসেন।

[মহা (k) ৩.১৮৭.৬; (হরি) ৩.১৫৮.৬]

চুচুক *[দ্র. চুচুপ]*

চুলিক মধ্য এশিয়ার একটি প্রাচীন পার্বত্য জনজাতি। পুরাণে যবন, কেবর্ত প্রভৃতি অনার্য জনজাতিগুলির সঙ্গে একত্রে চুলিকদের নাম উচ্চারিত হয়েছে। যা থেকে বোঝা যায় চুলিকরাও একটি আর্যেতর জনজাতি বিশেষ।

[বায়ু পু. ৪৫.১২১; মৎস্য পু. ৫০.৭৬]

☐ পণ্ডিত D.C. Sircar-এর মতে, প্রাচীন অক্সস (Oxus) বা বর্তমান আমুদরয়া (Amu Darya) নদীর উত্তরে বসবাসকারী সোগ্‌দিয়ান (Sogdian) -রাই পুরাণ-বর্ণিত চুলিক জনজাতি, প্রসঙ্গ উল্লেখ্য যে, প্রাচীনকালে সোগ্‌দিয়ান বা চুলিকরা মূলতঃ সমরখণ্ড, বুখারা, খুজান্দ ইত্যাদি অঞ্চলে বাস করতো। এই সমস্ত অঞ্চল বর্তমানে উজবেকিস্তান, এবং তাজিকিস্তানের অন্তর্গত।

[GAMI (Sircar) p. 35; Peter L. Roudik, The History of the Central Asian Republic, London, Greenwood Press, 2007, p. 29]

চুলুকা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত জম্বুখণ্ড বিনির্মাণ পর্বে ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত যেসব নদীর নাম উল্লিখিত হয়েছে চুলুকা তার মধ্যে একটি নদী। পণ্ডিত H.H. Wilson তাঁর অনূদিত বিষ্ণুপুরাণে চুলুকার পাঠান্তর হিসেবে চলুকা নামটিও উল্লেখ করেছেন। তবে চলুকা থেকেও চুলুকা নামটিই আমাদের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। 'চুলুক' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল অঞ্জলিবদ্ধ হাতে যতটুকু জল ধরে ঠিক সেই পরিমাণ জল। পুজোর সময় জল পাত্র হিসেবে যে কোশা ব্যবহার হয় সেই জল পরিমাণ মানেও চুলুক। তবে কোনো কোনো পণ্ডিত চুলুক অর্থে কমণ্ডলুর জলও বুঝিয়েছেন। তবে কোষগ্রন্থ শব্দকল্পদ্রুমে 'চুলুক' শব্দের অর্থ

করা হয়েছে—মাষমজ্জনজলম্। আচমনের জন্য হাতের তালুতে একটি মাত্র মাষকলাই ডুবতে পারে এই পরিমাণ জল নেওয়া হয়। সেই জলটুকুকে বলা হয় চুলুক—

মাষমজ্জনজলমাচামং তচ্চুলুকমিতি।

এই চুলুক পরিমাণ জলের ভাবনা থেকে এটা মোটামুটি স্পষ্ট বোঝা যায় যে চুলুকা নামের নদীটির জলধারা অত্যন্ত ক্ষীণ, শীর্ণ। চুলুকা নদীর আধুনিক অবস্থান সম্পর্কে অধিকাংশ পণ্ডিত নীরব, তবে প্রাচীন দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে আমরা যে বাদামির চালুক্য বংশের অস্তিত্ব দেখতে পাই, এই চালুক্যরা মোটামুটিভাবে বর্তমান মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশের সংযোগস্থলে রাজত্ব করতেন বলে জানা যায়। চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা এই অঞ্চলের চালুক্য নামের কোনো পাহাড়ে দেবী পার্বতীর উপাসনা করেছিলেন— এমন তথ্য যেমন পাওয়া যায়, তেমনই চালুক্যদের রাজ্য কোনো এক চুলুকা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল—এমন মতও ঐতিহাসিকরা প্রকাশ করেন। বিশেষত মহাভারতেও চুলুকার নাম দক্ষিণ ভারতে প্রবাহিত নদীর সঙ্গেই উল্লিখিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে বর্তমান মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশের সংযোগস্থলে সেকালে কোনো একটি শীর্ণকায়া নদী প্রবাহিত হত—এমন সম্ভাবনা থাকছে।

[মহা (k) ৬.৯.২০; (হরি) ৬.৯.২০; Durga Prasad Dikshit, Political History of the Chalukyas of Badami, Delhi: Abhinav Publications, 1980, p. 25; শব্দকল্পদ্রুম, খণ্ড ২, পৃ. ১৫৬]

চূচুপ দক্ষিণ ভারতের ম্লেচ্ছ জনজাতিগুলির মধ্যে একটি। এঁদের বাসভূমিও চূচুপ বা চুচুপ নামে পরিচিত। মহাভারতে চূচুপ এবং চুচুক উভয় পাঠই পাওয়া যায়।

মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে বলা হয়েছে যে, চূচুপ দেশীয়রা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরব পক্ষে যোগদান করেছিলেন।

[মহা (k) ৫.১৪০.২৬; ৬.৭৫.২১; ১২.২০৭.৪২; (হরি) ৫.১৩১.২৬; ৬.৭৪.২১; ১২.২০১.৪২]

□ K.C. Mishra-র মতে চূচুপ বা চুচুকরা একটি মিশ্র জনজাতি যাঁদের পেশা ছিল পান এবং চিনির ব্যবসা।

[TIM (Mishra) p. 118, 192, 331]

চূড়াকরণ 'চূড়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ শিখা বা চলিত বাংলায় টিকি। 'করণ' মানে করা। অর্থাৎ মাথার ওপরে চূড়ার মতো উঁচু করে চুল রাখা। সোজা কথায় টিকি রাখা। আশ্চর্য হল—চূড়াকরণের মধ্যে টিকি রাখার মতো একটা অস্তিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও এর নেতিবাচক দিকটা অর্থাৎ মাথা ন্যাড়া করা বা চুল ফেলে দেবার দিকটাই কিন্তু জনমনে বেশী প্রকট এবং সেটাও আজ থেকে নয়, বহু প্রাচীন কাল থেকেই। যদিও এই সংস্কারের নাম দেবার সময় কখনো নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। কখনো এর নাম চূড়াকরণ, কখনো চূড়াকর্ম আবার কখনো বিবর্তিত ভাষায় চৌলকর্ম। অর্থাৎ নামের মধ্যে অধিকাংশ চুল ফেলে দিয়ে চূড়ার মতো চুল রাখার অর্থটাই বেশী প্রকট।

সংস্কার শব্দের পারিভাষিকতর দিক থেকে এর মধ্যেও গর্ভদোষ নষ্ট করার হেতু আছে বলে স্মার্তরা অনেকে মনে করলেও অনেকেই বলেছেন—চূড়াকরণের মাধ্যমে পাপ নষ্ট হয় এবং দীর্ঘায়ু তথা যশলাভ ঘটে—

তেন তে আয়ুষে বপামি সুশ্লোকায় স্বস্তয়ে।

অর্থাৎ সাংস্কারিক অর্থে চূড়াকর্মের মধ্যে দোষাপনয়ন এবং গুণাধান দুইই আছে। সংস্কার, ধর্ম, আচার—সবকিছু বাদ দিয়ে যদি লৌকিক দৃষ্টিতে দেখি, তবে বলতে হবে—এই সংস্কারের জন্ম হয়েছিল নিছক প্রয়োজনীয়তা থেকে এবং সে প্রয়োজনীয়তাও অনেকটাই শারীরিক।

ভেবে দেখুন, অতি প্রাচীনকালে এখনকার দিনের মতো ভালো চিরুনি পাওয়া যেত না। যদি বা শজারুর কাঁটা বা অন্য কিছু দিয়ে চুল আঁচড়ানো বা পাট করার পদ্ধতি কিছু থেকেও থাকে, তবু তা দুই-তিন বছরের শিশুর মাথার পক্ষে খুব বোধহয় উপযোগী ছিল না। ফলত শিশুর মাথায় যেসব ঘা বা ক্ষতের সৃষ্টি হত, তা থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় ছিল মাথা ন্যাড়া করে ফেলা। আবার ন্যাড়া করার বিপদও কিছু কম নয়। মাথায় যে ক্ষুর দিয়ে চুল চেঁছে ফেলতে হবে সে ক্ষুরের ধারও কম নয়। ক্রন্দনরত শিশুর মাথায় ক্ষুর দিয়ে চুল ফেলে দিতে গেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাতে বাপ-মায়ের মনে ভয়ও কিছু কম হত না। ফলে শিশুর পিতা চূড়াকরণের সময় মন্ত্র পড়ে শুধু ক্ষুরের স্তুতি

করেন, যাতে ক্ষৌরকর্মে শিশুর অন্য বিপদ না আসে। *[অথর্ববেদ ৬.৬৮.১; শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতা ৩.৬৩]*

মাথা ন্যাড়া করার স্বাস্থ্যসম্মত কারণ বা প্রয়োজনীয়তা বুঝতে আমাদের অসুবিধে নেই এমনকী মন্ত্রগত ক্ষুরস্তুতির কারণও আমরা লৌকিকভাবে বুঝতে পারি, কিন্তু মাথার পেছনে একগুচ্ছ চুল রেখে দিয়ে চূড়া সৃষ্টি করার লৌকিক তাৎপর্যটা কী? এর উত্তর দিয়েছেন সেকালের ডাক্তার-বদ্যিদের প্রধান চরক-সুশ্রুত। সাধারণভাবে বলবার সময় সুশ্রুত লিখেছেন—মাথা ন্যাড়া করলে এবং নখ কাটলে শরীরের শুদ্ধতা এবং লঘুতা যেমন-আসে, তেমনই আসে হর্ষ, সৌভাগ্য এবং উৎসাহ—হর্ষ-লাঘব-সৌভাগ্যকরম্ উৎসাহবর্ধনম্। চরকও ওই একই কথা বলেছেন, তবে তিনি একটু বেশি বয়সেই চুলদাড়ি-নখ কাটার কথা-প্রসঙ্গে উপরি উক্ত হর্ষ,সৌন্দর্য্যের উল্লেখ করেছেন।

আমাদের বক্তব্য—বেশ তো, ন্যাড়া হলাম, কিন্তু মাথার পিছনে ওই এক ঝুঁটি চুল রেখে ন্যাড়া হবার প্রয়োজন কী! পরিষ্কার হব তো পুরো মাথা কামিয়েই পরিষ্কার হই। শুশ্রুত তাঁর নিজস্ব অ্যানাটমির জ্ঞান থেকে বিধান দিয়ে বলেছেন—মাথার পেছনে ওপরের দিকে, যেখানাটা বাইরে থেকে চুলের একটা ঘূর্ণিমতো দেখা যায় সেখানে মাথার ভিতরে কতগুলি শিরার সন্ধিস্থান। এর নাম অধিপতি। এইখানে কোনো আঘাত লাগলে নিশ্চিত মরণ—

শিরাসন্ধিসন্নিপাতো রোমাবর্তো'ধিপতি স্তত্রাপি সদ্যো মরণম অতএব মাথার ওই অংশে যদি ভালো করে একটা ঝুঁটি বেধে টিকি রাখা যায়, তাহলে যথাসম্ভব সুরক্ষিত থাকে মাথার ওই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবেদনশীল জায়গাটা। চূড়াকরণের বৈদ্যক প্রয়োজনীয়তা ওইখানেই।

[আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (মহর্ষি) ১৭.১২, পৃ. ৯; সুশ্রুত সংহিতা (চিকিৎসাস্থান) ২৪.৭৪; (শরীরস্থান) ৬.২৭]

সাংস্কারিক নিয়মমতো চূড়াকরণের বয়স শিশুর এক বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে। মনুর মত অন্তত তাই। কিন্তু আশ্বলায়ন লিখেছেন—জন্ম থেকে তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম বৎসর এমনকী উপনয়নের সময়েও এই মৌলকর্ম করা যায়, আজকাল অবশ্য শেষেরটাই চলে। তবে সেযুগে যেহেতু আট বছরেই উপনয়নের সময় হয়ে যেত, তাই মাথা-ন্যাড়া করার সাংস্কারিক কর্মটি যে খুব দেরিতে হত, তা বলা যায় না।

চূড়াকরণের মন্ত্র-তাৎপর্য্য আগেই বলেছি—ধারালো ক্ষুরের কাছে স্তুতি, নাপিতের কাছে স্তুতি—যাতে বালকের কোনো ক্ষতি না হয়। আর যেটা না বললেই নয়, সেটা হল টিকি রাখার পদ্ধতি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটা পারিবারিক নিয়মেই চলত, তবে কোথাও কোথাও গোত্রপ্রবরের সংখ্যা মেনে ততগুলি শিখা রাখা হত। বশিষ্ঠ ঋষির বংশধারায় মাথার মাঝখানে মোটা টিকি, অত্রি এবং কাশ্যপ গৌত্রীয়দের মাথার পিছনে দুই দিকে দুই শিক্ষা। আঙ্গিরস গোত্রীয়দের পাঁচটি শিখা—এতে মাথার পিছনটা ভরেই থাকত চুলে। আর ভার্গবরা টিকি রাখতেন না। তাঁরা একেবারেই মুণ্ডিত মস্তক। এইভাবে প্রাচীনকালে চূড়াকরণের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর শরীরে যেন তার বংশপরিচয় সাংকেতিকভাবে অঙ্কিত করে দেওয়া হত।

[Raj Bali Pandey, Hindu Sanskaras, pp. 162-166, Banaras: Vikrama Publishing, 1949]

চূড়ামণিলিঙ্গতীর্থ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। কার্তিক মাসের শুক্লা নবমীতে এই লিঙ্গের পূজা করলে মানুষ কখনো ইতরযোনি প্রাপ্ত হয় না। *[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ২৫.৭]*

চূর্ণনাভ দনুর পুত্র একজন দানব।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.৯]

চূলী (চূলিন্) এক মহাদ্যুতিময়, সদাচারী উর্ধ্বরেতা তপস্বীর নাম। পুরাকালে চূলী ব্রহ্মভাবনায় তপস্যা করেছিলেন। তপস্যাকালে উর্মিলা নামে এক গন্ধর্বীর কন্যা—সোমদা তাঁর বহু সেবা করেছিল। সেই সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে চূলী সোমদাকে জিজ্ঞাসা করেন—তোমার কোন প্রিয়কার্য আমি করতে পারি? সোমদা তাঁর কাছে একটি ধার্মিক এবং ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন পুত্রের জননী হতে চাইলে চূলী তাঁকে বিবাহ করেন। চূলী এবং সোমদার পুত্রের নামই ব্রহ্মদত্ত। *[রামায়ণ ১.৩৩.১১-১৮]*

চেকিতান একজন যদু বৃষ্ণিবংশীয় রাজা। ইনি বসুদেবের ভগিনী শ্রুতকীর্তির পুত্র। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় চেকিতান উপস্থিত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.১৮৬.১১; (হরি) ১.১৮৯.১১; বায়ু পু. ৯৬.১৫৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৫৭]

☐ ইন্দ্রপ্রস্থে ময়দানব নির্মিত সভাস্থলে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশের সময় যে সব নৃপতিগণ তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁদের মধ্যে চেকিতান একজন।

চেকিতান রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষ্যে যুধিষ্ঠিরকে একটি তূণীর উপহার দেন।

[মহা (k) ২.৪.২৭; ২.৫৩.৯; (হরি) ২.৪.১০নং শ্লোক পরবর্তী পাদটীকা দ্রষ্টব্য; ২.৫১.৯]

☐ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যুধিষ্ঠির পঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাণ্ডবদের সেনাপতি নির্বাচন করেন। এরপর ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডব পক্ষীয় যোদ্ধাদের মধ্যে কে কোন কৌরব যোদ্ধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না স্থির করে দেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন এ সময় চেকিতানকে সোমদত্তের পুত্র শলের সঙ্গে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। *[মহা (k) ৫.১৬৪.৮; (হরি) ৫.১৫৩.৮]*

☐ যুদ্ধে দুর্যোধন চেকিতানকে বধ করেন।

[মহা (k) ৯.১২.৩০-৩২; (হরি) ৯.১০.৩০-৩২]

চেতস কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দিতির গর্ভে উনপঞ্চাশজন মরুদ্‌দেবতা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা আবার সাতটি পৃথক গণে বিভক্ত ছিলেন। এইসব মরুদ্‌গণের মধ্যে চেতস একজন। *[বায়ু পু. ৬৭.১২৮]*

চেদি একটি প্রাচীন বৈদিক ক্ষত্রিয় জাতি তথা সেই জাতির নামে পরিচিত জনপদ। বেদমন্ত্রে কশু নামে এক চেদি রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। মন্ত্রটিতে রাজা কশুরের যেমন প্রশংসা করা হয়েছে, তেমনই তাঁর রাষ্ট্রসম্বন্ধী সমগ্র চেদি জাতির দানশীল চরিত্রেরও প্রশংসা করা হয়েছে। রাজা কশুর অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন বলেই মনে হয়। কারণ, বেদে একটি যজ্ঞের সময় অপর দশজন রাজাকে দাস হিসেবে দান করতে দেখা যায় তাঁকে। *[ঋগ্‌বেদ ৮.৫.৩৭-৩৯]*

☐ বেদের মন্ত্র থেকেই সমসময়ে চেদি জাতির ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তবে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে চেদির অনুল্লেখ প্রমাণ করে যে, সেই সময় চেদির গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল। আবার মহাকাব্যের যুগে চেদির রাজা উপরিচর বসু বা শিশুপালের কর্মকাণ্ড থেকে স্পষ্ট হয় যে, মহাভারতের যুগে চেদি তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিল। পরবর্তী সময়েও অবশ্য চেদি তার প্রভাব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। তার প্রমাণ ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম একটি জনপদ হিসেবে চেদির উল্লেখ।

[TAI (Law) p. 52]

☐ পুরুবংশীয় রাজা উপরিচর বসু ইন্দ্রের উপদেশে শস্য-শ্যামল চেদি রাজ্য শাসন করতেন। আদিপর্বে সেই সূত্রেরই চেদির একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। চেদি ধন-রত্ন ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ একটি ভূমি। সেখানে ধার্মিক ও সত্যবাদী মানুষের বাস। চেদি রাজ্যের প্রতিটি বর্ণের মানুষই নিজের নিজের কর্তব্য যথানিয়মে পালন করেন।

শুক্তিমতী নদী (বর্তমান কেন নদী)-র উৎস কোলাহল পর্বত। এই পর্বতের নিকটেই শুক্তিমতী নদীর তীরে চেদি দেশের রাজধানী শুক্তি-র অবস্থান। পণ্ডিতদের মতে, শুক্তিমতী নদী সংলগ্ন হওয়ার জন্য চেদির রাজধানীর নাম হয়েছিল শুক্তি। উপরিচর বসু এবং শুক্তি নগরীতেই ইন্দ্রদেবের আরাধনা করার জন্য ইন্দ্রোৎসবের প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় তাঁর যজ্ঞীয় অশ্বটি শুক্তি নগরীতে পৌঁছতেই শিশুপালের পুত্র শরভ তাকে বাধা দেন। যজ্ঞের প্রথানুযায়ী এই সময় অর্জুন ও শরভের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত চেদিরাজ শরভ অর্জুনের কাছে পরাজিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করেন।

[মহা (k) ১.৬৩.২, ৯, ১১, ১৯, ৩৩, ৪৮-৫০; ১৪.৮৩.২-৪; (হরি) ১.৫৮.২, ৯, ১১, ১৯, ৩৩, ৪৮-৫০; ১৪.১০৬.২-৪; বায়ু পু. ৯৩.২৬; TAI (Law) p. 47]

☐ চেদির রাজা দমঘোষের পুত্র শিশুপাল মহাভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। শিশুপালের সূত্রেই সে সময় চেদির প্রভাব ও রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে নানা কথা বলা যায়। শিশুপাল কৃষ্ণের পিসি শ্রুতশ্রবার পুত্র। সেদিক থেকে বিচার করলে শিশুপাল কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই। আঞ্চলিক রাজনীতির কারণেই হোক বা কৃষ্ণ বিদ্বেষের জন্য শিশুপাল কৃষ্ণের আর এক শত্রু মগধরাজ জরাসন্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয়েছিলেন। সম্ভবত শিশুপালের লক্ষ্য ছিল যাদবদের নির্মূল করে উত্তর তথা উত্তর-পশ্চিম ভারতে চেদির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা বা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের স্থানে শিশুপালের মাধ্যমে চেদির সদর্প উপস্থিতি চোখ

এড়ায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় কৃষ্ণ-শিশুপালের শত্রুতা চরমে পৌঁছয় এবং কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করেন। এরপর শিশুপাল-পুত্র ধৃষ্টকেতুকে পাণ্ডব ও কৃষ্ণের উদ্যোগে চেদির রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়।

আসলে শিশুপাল বধের পর পাণ্ডব এবং বাসুদেব কৃষ্ণের মনোনীত প্রার্থীরূপেই ধৃষ্টকেতু চেদির সিংহাসন লাভ করেন। রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত কারণেই এ সময় চেদি কৃষ্ণের অনুগামী হয়ে পড়েছিল। সেকারণেই সম্ভবত উদ্যোগপর্বে চেদিকে 'কৃষ্ণ অবলম্বী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ১.১৮৭.২৪-২৫; ২.১৪.১৮; ২.৪৩.১; ৫.২২.২৫; ৫.২৮.১১; (হরি) ১.১৮০.২৪-২৫; ২.১৪.১৮; ২.৪৩.১; ৫.২২.২৫; ৫.২৮.১১; ভাগবত পু. ৭.১.১৩-১৪; বিষ্ণু পু. ৪.১৪.১২]

□ শিশুপালপুত্র চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করেছিলেন। সমগ্র চেদি জাতির মধ্যে একমাত্র চেদি রাজপুরুষ ধৃষ্টকেতুই তাঁর অনুগামীদের নিয়ে যুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষ নিয়েছিলেন—

একপসৃত্য চেদিভ্যঃ পাণ্ডবান্ যঃ সমাশ্রিতঃ।

ধৃষ্টকেতু যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করেছিলেন।

ধৃষ্টকেতু ব্যতীত চেদি জনজাতির অন্য অংশটি যুদ্ধে কৌরব পক্ষে যোগ দিয়েছিল। ভীষ্মপর্বে নিষাদরাজ কেতুমানের নেতৃত্বে চেদি সৈন্যদের কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করতে দেখা যায়। কৌরবপক্ষের চেদি যোদ্ধাদের সঙ্গে ভীমসেনের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল।

[মহা (k) ৫.১৯.৭; ৫.৫৭.৩৩; ৬.৫৪.৪-৫; ৭.১০.৪৩; ৭.২১.২৩; ৭.২৩.২২; ৮.৬.৩০; (হরি) ৫.১৯.৭; ৫.৫৭.৩৩; ৬.৫৪.৪-৫; ৭.৮.৪২; ৭.১৯.২৩; ৭.২১.২২; ৮.৪.৩০]

□ কর্ণপর্বে অঙ্গরাজ কর্ণ মদ্রের রাজা শল্যের সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথনের সময় চেদি জাতির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। কর্ণ জানিয়েছিলেন যে, চেদিদেশে বহু বেদজ্ঞ পণ্ডিতের বাস। যাঁরা চিরন্তন ধর্ম বিষয়ে অত্যন্ত জ্ঞানী। এঁরা সনাতন ধর্ম অবলম্বন করেই জীবন নির্বাহ করেন।

[মহা (k) ৮.৪৫.১৫-১৮; (হরি) ৮.৩৪.১২০-১২২]

□ অর্জুনের জন্মের সময় দৈববাণী হয়েছিল যে, তিনি ভবিষ্যতে চেদি রাজ্য জয় করে কুরুবংশের মান বৃদ্ধি করবেন।

[মহা (k) ১.১২৩.৪০; (হরি) ১.১১৭.৪৪]

□ অর্জুন যখন পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের জন্য উপযুক্ত কয়েকটি দেশের নামোল্লেখ করেছিলেন, সেই দেশগুলির মধ্যে চেদি অন্যতম।

[মহা (k) ৪.১.১১-১২; ৬.৯.৪০; (হরি) ৪.১.১১-১২; ৬.৯.৪০]

□ রাজা জ্যামঘের এক উত্তর পুরুষের নাম চেদি। পুরাণ মতে এই চেদির সন্তান-সন্ততিগণই চৈদ্য রাজবর্গ হিসেবে পরিচিত।

[বিষ্ণু পু. ৪.১২.১৫; অগ্নি পু. ২৫৭.১৮; কূর্ম পু. ১.২৪.৯]

□ উদ্যোগ পর্বে সহজ নামে এক চেদি রাজার কথা পাওয়া যায়। এই সহজ পৃথিবীতে ধর্ম পরিবর্তনের এক সন্ধিক্ষণে চেদি দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[মহা (k) ৫.৭২.১৪; (হরি) ৫.৬৯.১৬]

□ মার্কণ্ডেয় পুরাণে বপুস্মতী নামে এক চেদি রাজকন্যার কথা পাওয়া যায়। ইনি বৈবস্বত মনুর বংশধারায় নাভাগের পুত্র মরুত্তের পত্নী ছিলেন।

[মার্কণ্ডেয় পু. ১৩১.৪৭]

□ পণ্ডিতরা মনে করেন যে, বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরে বর্তমান বুন্দেলখণ্ড, বিশেষত এর দক্ষিণাংশ এবং জব্বলপুরের উত্তরাংশ জুড়ে প্রাচীন চেদি দেশটি বিস্তৃত ছিল। H.C. Ray Chaudhuri জানিয়েছেন যে, একসময় চেদিরাজ্য নর্মদা নদীর সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তবে চেদি জনজাতির একটি শাখা উত্তরে নেপালের পার্বত্য অঞ্চলে বাস করত বলে মনে করা হয়।

টডের মতে, বর্তমান মালওয়া ও বুন্দেলখণ্ডের সীমান্তে অবস্থিত চান্দেরী (Chanderi) অঞ্চলটিই শিশুপালের রাজধানী ছিল। তবে পারজিটারের মতে, চেদি রাজধানীর শুক্তি নগরীটি 'কেন্' নদী (প্রাচীন শুক্তিমতী)-র তীরবর্তী বান্দা অঞ্চলটির কাছে অবস্থিত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গুপ্ত যুগে কালঞ্জরকে চেদির রাজধানী বলে মনে করা হত। চেদির আর এক নাম ছিল ত্রিপুরী।

[TAI (Law) p. 50-51; PHAI (Ray Chaudhuri) p. 116-117; GDAMI (N.L. Dey) p. 48]

☐ পণ্ডিতদের মতে, বৈদিক যুগে অন্যান্য ক্ষুদ্র ভারতীয় জনগোষ্ঠী (Tribe) -দের মতোই চেদিরাও আসলে একাধিক প্রভাবশালী বংশের সমষ্টি ছিল। এসব ক্ষেত্রে সমষ্টির অন্তর্গত প্রভাবশালী বংশগুলিই জনজাতির প্রধান বা রাজা রূপে একজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করত। চেদিদের মধ্যেও এই প্রথাই প্রচলিত ছিল।

[TAI (Law) p. 52]

চেনাতকি পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার বংশধারায় যে সব বংশ প্রবর্তক ঋষির নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে চেনাতকি একজন। *[মৎস্য পু. (মহর্ষি) ১৯৬.৩০]*

চেষ্টা একজন ব্রহ্মরাক্ষসী। ইনি রাক্ষসী ব্রহ্মধনার কন্যা। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৯৯]*

চৈত্য১ মগধের রাজধানী গিরিব্রজপুরকে পাঁচটি পর্বত বিভিন্ন দিক থেকে বেষ্টন করে বিস্তৃত ছিল। সেই পাঁচটি পর্বতের মধ্যে চৈত্য বা চৈত্যক একটি। চৈত্যগিরি মগধের রাজধানীটিকে ভৌগোলিক সুরক্ষা প্রদান করেছিল। সেদিক থেকে বিচার করলে চৈত্যককে গিরিব্রজের প্রাকৃতিক সুরক্ষাকবচ বলা যেতে পারে।

[মহা (k) ২.২১.১৮; (হরি) ২.২০.২]

☐ জরাসন্ধবধের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ এবং ভীম ও অর্জুন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে গিরিব্রজপুরে আসেন। তাঁরা চৈত্য পর্বত পেরিয়ে সকলের অলক্ষ্যে নগরীর কেন্দ্রস্থলে এসে পৌঁছান।

[মহা (k) ২.১৯.৪১; (হরি) ২.২০.৪১]

☐ জরাসন্ধের সময়কাল উল্লিখিত গিরিব্রজপুর বলতে আধুনিক বিহারের রাজগীর অঞ্চলকে বোঝানো হয়। সেই নিরিখে বিচার করলে রাজগীর সংলগ্ন অথবা তাকে বেষ্টন করে বিস্তৃত কোনো একটি পার্বত্যভূমিরই নাম হওয়া উচিত চৈত্যক পর্বত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাজগীরের দুই দিক বরাবর রাজগীর পর্বতশ্রেণীর বিস্তার। এটি কোনো হিমালয় সদৃশ সুউচ্চ পার্বত্যভূমি নয়। মূলতঃ উচ্চ টিলা প্রকৃতির ক্ষয়জাত পাহাড়ের বিস্তার। সুতরাং চৈত্যক পর্বতকেও সেই প্রকৃতিতেই কল্পনা করা শ্রেয়।

পণ্ডিত N.L. Dey প্রাচীন গিরিব্রজপুরকে ঘিরে থাকা পাঁচটি পাহাড়ের আধুনিক নাম সন্ধান করতে গিয়ে চৈত্যক পর্বতকে রত্নাচল পাহাড়ের সঙ্গে একাত্মক করে দেখেছেন। কানিংহাম বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লিখিত বিপুলা পর্বত ও চৈত্যককে অভিন্ন বলে মত দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চৈত্যকের নাম রত্নাচল বা বিপুলা যাই হোক না কেন তা সম্ভবত আধুনিক রাজগীর পাহাড়ের অংশবিশেষ। *[GDAMI (Dey) p. 66; PHAI (Raychaudhuri) p. 100]*

চৈত্য২ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দিতির গর্ভজাত মরুদ্গণের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫.৯২]

চৈত্র১ তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষিগণের অন্যতম ঋষি।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৭৪.৫৯]

চৈত্র২ স্বারোচিষ মনুর সাত পুত্রসন্তানের মধ্যে অন্যতম। বিষ্ণু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে স্বারোচিষ মনুর নয়টি পুত্রসন্তান হয় যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চৈত্র।

[মার্কণ্ডেয় পু. ৬৭.৫; বিষ্ণু পু. ৩.১.১২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১৯]

চৈত্র৩ বিক্রান্ত নামক রাজার ঔরসে রাজমহিষী হৈমনীর গর্ভজাত পুত্র। সদ্যোজাত এই সন্তানকে হরণ করে জাতহারিণী নামক রাক্ষসী তাকে বিশালগ্রাম নিবাসী এক ব্রাহ্মণের ঘরে রাখল এবং ব্রাহ্মণের সদ্যোজাত পুত্রটিকে হরণ করে ভক্ষণ করল। বোধ নামক সেই ব্রাহ্মণ এ ঘটনার কিছুই জানতে পারলেন না এবং বিক্রান্ত রাজার পুত্রকেই নিজের পুত্র মনে করে পালন করতে লাগলেন। এই বালকের নাম হল চৈত্র। পরবর্তী সময়ে চৈত্রের প্রকৃত জন্ম পরিচয় প্রকাশ পেলে রাজা বিক্রান্ত তাকে ঘরে ফিরিয়ে এনে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। *[দ্র. চাক্ষুষ, আনন্দ]*

[মার্কণ্ডেয় পু. ৭৬.২৫-৩৯]

চৈত্র৪ জনৈক পুলস্ত্য বংশীয় ঋষি। পুরাণ মতে ইনি তামস মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৪৮]

চৈত্র৫ একটি মাসের নাম। পুণ্যফলদায়ক ব্রত আচরণের ক্ষেত্রে চৈত্রমাস অত্যন্ত আদর্শ—একথা মহাভারত এবং পুরাণে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। বনপর্বে উল্লেখ আছে যে চৈত্রমাসের শুক্ল-চতুর্দশীতে সরস্বতী সঙ্গমে স্নান করলে মহাপুণ্য হয়। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে উল্লিখিত আছে যে, চৈত্র মাসে যে ব্যক্তি দিনে একবার মাত্র আহার করে ব্রত পালন করেন তিনি পরজন্মে সম্পন্ন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। চৈত্রমাসের শুক্ল দ্বাদশী তিথিতে যিনি উপবাস

করে ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করেন তিনি দেবলোক লাভ করেন। মৎস্য পুরাণে চৈত্র মাসের শুক্ল দ্বাদশী তিথিতে মদন-দ্বাদশী ব্রত পালন করার কথা বলা হয়েছে।

মৎস্য পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, রাজার যুদ্ধযাত্রা করার পক্ষে সব থেকে উপযুক্ত হল চৈত্র এবং অগ্রহায়ণ মাস।

[মহা (k) ৩.৮২.১২৭; ৩.১৩০.১৫; ১৩.১০৬.২৩; ১৩.১০৯.৭; (হরি) ৩.৬৮.১৪৪; ৩.১০৭.১৫; ১৩.৯৩.২২; ১৩.৯৬.৭; মৎস্য পু. ৭.১০; ১৭.৬; ৫৪.৮; ৫৬.৩; ৬০.৩৩; ২৪০.৫]

চৈত্রকতীর্থ মৎস্য পুরাণে একে প্রয়াগক্ষেত্রে অবস্থিত একটি পবিত্র তীর্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[মৎস্য পু. ১১০.২]

চৈত্ররথ একটি মনোরম বনভূমি। মহাকাব্য ও পুরাণে চৈত্ররথকে দেবোদ্যান বা দেব বনভূমি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বহু মহাকাব্যিক ঘটনার পটভূমি হিসেবে চৈত্ররথের নাম পাওয়া যায়। চিত্ররথ গন্ধর্বের নামানুসারে এই বনভূমির নাম চৈত্ররথ।

রামায়ণের কবির বর্ণনায় চৈত্ররথ বন উত্তরকুরুদেশে অবস্থিত। এই বনাঞ্চল ধনপতি যক্ষরাজ কুবেরের শাসনাধীন। রামায়ণের কবি চৈত্ররথ বনের বর্ণনা দিতে গিয়ে এই বনের গাছের পাতাগুলিকে দিব্যবস্ত্রের দ্বারা তৈরী অলঙ্কার এবং ফলগুলিকে সুন্দরী রমণীর সঙ্গে তুলনা করেছেন—

বনং কুরুষু যদ্দিব্যং বাসোভূষণপত্রবৎ।
দিব্যনারীফলং শশ্বৎ তৎ কৌবেরমিহৈব তু॥

মনোরম এই উদ্যানে বছরের ছয়টি ঋতুর সার্বিক উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

[রামায়ণ ২.৯১.১৯; ৩.৭৩.৭; মহা (k) ১.৬৩.৪৫; (হরি) ১.৫৮.৫৭; ভাগবত পু. ৩.২৩.৪০; মৎস্য পু. ২৭.৪; ৮৩.৩১; বায়ু পু. ৩৬.১১; বিষ্ণু পু. ৪.৬.২৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৭; রঘুবংশ ৫.৬০; শব্দকল্পদ্রুম (Vol-2) p. 462]

□ মহাভারতে চৈত্ররথকে কৈলাসপর্বত-সংলগ্ন বনভূমি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাণ মতে এটি অচ্ছোদা বা অচ্ছোদিকা নদীর তীরবর্তী বনভূমি। আবার বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে যে, বিমলোদকা নদীটি চৈত্ররথকে বেষ্টন করে প্রবাহিত হয়েছে। বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে যে, চৈত্ররথ বন সুমেরু পর্বতের পূর্বদিকে অবস্থিত।

[মহা (k) ৫.১১১.১১; (হরি) ৫.১০৩.১০; ভাগবত পু. ৫.১৬.১৪; মৎস্য পু. ১২১.৮; বায়ু পু. ৪২.১৫; ৪৭.৬; বিষ্ণু পু. ২.২.২৫]

□ লঙ্কাপতি রাবণ একবার চৈত্ররথবন আক্রমণ করেছিলেন। এ সময় তিনি চৈত্ররথ বনের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত একটি মনোরম সরোবর ধ্বংস করেন। *[রামায়ণ ৩.৩২.১৪-১৬]*

□ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চৈত্ররথ বনভূমিটি বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। মহাকাব্য ও পুরাণে আলোচিত একাধিক বিখ্যাত বা স্বল্পখ্যাত চরিত্র বিভিন্ন সময়ে তাঁদের সঙ্গী বা সঙ্গিনীদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদের জন্য উপস্থিত হয়েছেন চৈত্ররথ বনে। যেমন—যযাতি রাজা কনিষ্ঠপুত্র পুরুর সঙ্গে জরা বিনিময়ের পর পুরু প্রদত্ত যৌবন লাভ করে স্বর্গবেশ্যা বিশ্বাচীকে নিয়ে চৈত্ররথে গিয়েছিলেন। পুরূরবা ও উর্বশীকেও সেখানে বিহার করতে দেখা যায়। বনবাসের সময় কুন্তী ও মাদ্রীকে নিয়ে পাণ্ডু নাগপাশ পর্বত পার হয়ে চৈত্ররথ বনে পৌঁছান। আবার উপরিচরবসুর ঔরসে অদ্রিকার গর্ভে সত্যবতীর জন্মের ইতিহাসের সঙ্গেও চৈত্ররথ বনভূমির নাম জড়িয়ে আছে।

উপরিচরবসুর কাহিনীটি একটু পৃথকভাবে খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, এই কাহিনীতে যে চৈত্ররথ বনের কথা বলা হয়েছে সেটি আসলে যমুনা নদীর কাছাকাছি কোনো একটি অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। কারণ উপরিচরবসুর বীর্য্য গ্রহণকারী মৎস্যরূপধারিণী অপ্সরা অদ্রিকা বাস করতেন যমুনা নদীর জলে। অন্যদিকে মহাকাব্য ও পুরাণের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, চৈত্ররথ বনভূমিটি হিমালয় পর্বত সংলগ্ন। সম্ভবত উপরিচরবসুর কাহিনীতে উল্লিখিত যমুনা নদীর নিকটবর্তী চৈত্ররথবন এবং হিমালয় সংলগ্ন চৈত্ররথ একই স্থান নয়। বরং পৃথক দুটি বনভূমি, পণ্ডিতরা মনে করেন যে, মহাকাব্য ও পুরাণে হিমালয় পর্বত সংলগ্ন যে চৈত্ররথের কথা পাওয়া যায় সেটি হয়তো বা বর্তমান দেরাদুন বা মুসৌরীর কাছে অবস্থিত ছিল।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে, মহাকাব্য ও পুরাণে উপরে আলোচিত দুটি চৈত্ররথ বন

ছাড়াও একাধিক চৈত্ররথ বনের নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত বনভূমিগুলির সৌন্দর্যের উৎকর্ষ বোঝানোর জন্যই এগুলিকে চৈত্ররথ নামে ডাকা হয়েছে। বলা ভালো 'চৈত্ররথ' এক্ষেত্রে একটি Common name -এ পরিণত হয়েছে। ফলে হিমালয় ও যমুনা নদী সংলগ্ন চৈত্ররথ বনভূমি দুটি ব্যতীত অপর যেসব চৈত্ররথ বনের নাম মহাকাব্য বা পুরাণে পাওয়া যায়, সেগুলিকে Mythical Eden বা পৌরাণিক বনভূমি বলেই মেনে নেওয়া ভালো। বাস্তবে এদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন।

[মহা (k) ১.৬৩.৫৮; ৭৫.৪৮; ১১৯.১৮; (হরি) ১.৫৮.৭৩; ৬৩.৫০; ১১৩.১৮; ভাগবত পু. ৯.১৪.২৪; বায়ু পু. ৬৯.১৩৭; ৯১.৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১০২; ৬৬.৬; G.M. (Suryavanshi) p. 143]

□ বাসুদেব কৃষ্ণ চৈত্ররথ বনে বহু যজ্ঞ করেছিলেন। সেই সব যজ্ঞে তিনি প্রচুর দক্ষিণা দান করেন।

[মহা (k) ৩.১২.২৩, ৪১; (হরি) ৩.১১.২৩, ৪১]

□ দেবসেনাপতি স্কন্দ কার্তিকেয় চৈত্ররথ বনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে। *[মহা (k) ৩.২২৬.৪; (হরি) ৩.১৮৮.৪]*

□ ত্রিপুরদুর্গবাসী রাক্ষসদের পারস্পরিক যুদ্ধের সময় একবার চৈত্ররথবন ধ্বংস হয়েছিল।

[মৎস্য পু. ১৩১.৪৮]

□ দেবী সতী মদোৎকটা নামে চৈত্ররথে পূজিতা হন। *[মৎস্য পু. ১৩.২৮]*

চৈত্ররথী রাজর্ষি শশবিন্দুর কন্যা এবং যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতার পত্নী। এঁর অপর নাম বিন্দুমতী। চৈত্ররথী দশ হাজার ভ্রাতার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন।

পুরাণে চৈত্ররথীকে অপূর্ব সুন্দরী এবং ন্যায় পরায়ণা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

মান্ধাতার ঔরসে চৈত্ররথীর গর্ভজাত তিন পুত্র হলেন—

পুরুকুৎস, অম্বরীষ এবং মুচুকুন্দ।

[বায়ু পু. ৮৮.৭০-৭২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.৭০; শিব পু. (J.L. Shastri) উমা ৩৭.৪৫-৪৬]

চৈত্রসেনি$_1$ জনৈক রাজা চিত্রসেনের পুত্র। তবে চিত্রসেনের এই পুত্রের প্রকৃত নাম জানা যায় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ইনি পাণ্ডবপক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দ্বাদশ দিনে ইনি দ্রোণাচার্যের হাতে পরাজিত হন।

[মহা (k) ৭.২১.৬২; (হরি) ৭.১৯.৫৮]

চৈত্রসেনি$_2$ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র রাজকুমার চিত্রসেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে চিত্রসেনের পুত্র চৈত্রসেনিকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। যুদ্ধের দ্বাদশ দিনে অর্জুনের পুত্র শ্রুতকর্মার সঙ্গে তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে দেখা যায়।

[মহা (k) ৭.২৫.২৭; (হরি) ৭.২৩.২৬]

চৈত্রা যদুর পুত্র ক্রোষ্টুর বংশধারায় জ্যামঘ নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। অন্যান্য বেশির ভাগ পুরাণে এই জ্যামঘ রাজার পত্নীকে শৈব্যা নামে উল্লেখ করা হলেও মৎস্য পুরাণের পাঠে তাঁকে শৈব্যার পরিবর্তে চৈত্রা নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

[দ্র. শৈব্যা]

[মৎস্য পু. ৪৪.৩২, ৩৬]

চৈত্রায়ণ মহর্ষি অত্রির বংশে জাত একজন বংশ প্রবর্তক ঋষি। *[মৎস্য পু. ১৯৭.২]*

চৈদ্যবর গৌতম বংশীয় মৈত্রেয়র পুত্র চৈদ্যবর। এঁর পুত্র সুদাস বিদ্বান রূপে বিখ্যাত।

[মৎস্য পু. ৫০.১৪-১৫]

চৈল মহর্ষি শৃঙ্গির পুত্র কৌথুমের শিষ্যদের মধ্যে একজন। *[বায়ু পু. ৬১.৪০]*

চোল দক্ষিণ ভারতের একটি প্রাচীন জনজাতি তথা ওই জনজাতির নামে পরিচিত জনপদ। পণ্ডিত B.C. Law--এর মতে, চোল জনজাতিয়েরা আসলে একটি দেশান্তরিত জনজাতি বিশেষ। তিনি মনে করেন যে, শিবিদের একটি শাখা দক্ষিণ ভারতে দেশান্তরিত হয়ে চোল নামে পরিচিত হয়। সীতাহরণের পর সুগ্রীব তাঁর বানর সেনাপতিদের সীতার অনুসন্ধানে বহু দেশে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই দেশগুলির মধ্যে কাবেরী নদীর তীরবর্তী চোল অন্যতম ছিল।

[রামায়ণ ৪.৪১.১২; মহা (k) ৬.৯.৬০; (হরি) ৬.৯.৬০; মৎস্য পু. ১১৪.৪৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৫৬; TAI (B.C. Law) p. 85]

□ চোল জাতি পাণ্ডবদের বশ্যতা স্বীকার করেছিল—একথা মহাভারতে পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় চোল দেশের প্রতিনিধিদের ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। স্বয়ং দুর্যোধনের মতে, পাণ্ডবদের অস্ত্রশক্তির

কাছে পরাভূত হয়েই চোলেরা বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তবে চোলদের পাণ্ডবরা তাঁদের সমতুল্য রাজবর্গ বলে মনে করেননি। বরঞ্চ যুদ্ধে আনত, বশীভূত করদ রাজা বলেই মনে করেছেন। সেই কারণেই সম্ভবত যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞক্ষেত্রে এঁদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। চোল দেশের রাজা তরল চন্দনে পরিপূর্ণ স্বর্ণকুম্ভ, মলায় ও দদুর পর্বত থেকে আনা উৎকৃষ্ট চন্দন ও অগরুকাঠ, মূল্যবান ধন-রত্ন এবং বস্ত্র ইত্যাদি উপহার নিয়ে যজ্ঞস্থলের বাইরে অবস্থান করে দাঁড়িয়ে ছিলেন—

সুরভীং শ্চন্দনরসান্ হেমকুম্ভ সমাস্থিতান্।
মলয়াদ্দর্দুরাচ্চৈব চন্দনাগুরুসঞ্চয়ান্॥
মণিরত্নানি ভাস্বন্তি কাঞ্চনং সূক্ষ্মবস্ত্রকম্।
চোলপাণ্ড্যাবপি দ্বারং ন লেভাতে হ্যপস্থিতৌ॥

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও চোলদের পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করতে দেখা যায়।

[মহা (k) ২.৫২.৩৪-৩৫; ৩.৫১.২২; ৮.১২.১৫; (হরি) ২.৫০.৩৪-৩৫; ৩.৪৩.২২; ৮.৯.১৫]

□ চোলরা একসময় বাসুদেব কৃষ্ণের পরম শত্রু কালযবনের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। কৃষ্ণ এঁদের পরাজিতও করেছিলেন।

[মহা (k) ৭.১১.১৭; (হরি) ৭.৯.১৭]

□ রাজা সগর বহু ক্ষত্রিয়কুলকে সনাতন ক্ষত্রিয় ধর্ম থেকে বিচ্যুত এবং চিরাচরিত ক্ষত্রিয়াচার থেকে বহিষ্কৃত করেছিলেন। চোলরা সে রকমই এক ক্ষত্রিয় ধর্মচ্যুত জনজাতি।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১৪০]

□ পুরাণ মতে, দুষ্যন্তের বংশধারায় রাজা ডীরের (মতান্তরে জনাপীড়) পাঁচ পুত্রের নাম সন্ধান, পান্ড্য, কেরল, চোল ও কর্ণ। তাঁর পুত্রদের অধিকৃত জনপদগুলিও তাঁদের নামেই পরিচিত। সেই সূত্রে চোল রাজার অধিকৃত জনপদটির নাম চোল—

পান্ড্যশ্চ কেরলশ্চৈব চোলঃ কর্ণস্তথৈব চ।
তেষাং জনপদাঃ স্ফীতাঃ
পান্ড্যাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ॥

[মৎস্য পু. ৪৮.৪-৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭৪.৬; বায়ু পু. ৯৯.৬]

□ প্রাচীন চোলদেশ (মতান্তরে সাম্রাজ্য) করমণ্ডল উপকূল বরাবর উত্তরে পেন্নার (Pennar) নদী থেকে দক্ষিণে পিনাকিনী (Pinakini) নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্বে সমুদ্রতীর থেকে পশ্চিমে কুর্গের সীমানা পর্যন্ত ছিল চোলের বিস্তার। আধুনিক তামিলনাডুর অন্তর্গত ত্রিচিনোপল্লী, তাঞ্জোর এবং পুদুকোট্টাই ইত্যাদি অঞ্চলগুলি চোল দেশের অন্তর্গত ছিল।

খ্রিস্টীয় পঞ্চম এবং দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে চোল সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

[TAI (B.C. Law) p. 186-189; GDAMI (Dey) p. 51]

চোলভদ্রা ভারতবর্ষের পূর্বদিকে বসবাসকারী একটি প্রাচীন জনজাতি। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৫১]*

চৌর একটি হীন জনজাতির নাম। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে এমন বেশ কয়েকটি জনজাতির নাম উল্লিখিত হয়েছে যারা আদতে বৈদিক সংস্কারপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় হলেও পরবর্তী সময়ে দুরাচারের কারণে ব্রাহ্মণদের রোষের মুখে পড়েন। ব্রাহ্মণদের রোষেই তাঁরা ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে চ্যুত হয়ে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। মহাভারতের উল্লেখ অনুযায়ী চৌর তেমনই একটি জাতি।

[মহা (k) ১৩.৩৫.১৭; (হরি) ১৩.৩২.৭৫]

চৌলি বশিষ্ঠবংশীয় একজন বংশপ্রবর্তক ঋষি।

[মৎস্য পু. ২০০.৬]

চ্যবন১ বৈদিক যুগ থেকে মহাকাব্য পুরাণের কাল পর্যন্ত যেসব ঋষি-মহর্ষির নাম তাঁদের পাণ্ডিত্য এবং কীর্তির কারণে বিখ্যাত হয়ে আছে, মহর্ষি চ্যবন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বৈদিক গ্রন্থগুলি থেকে শুরু করে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-সর্বত্র চ্যবন সম্পর্কে নানা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

আমরা চ্যবনের জন্মকথায় আসি। বৈদিক গ্রন্থে চ্যবনকে ভার্গবও বলা হয়েছে, কখনো কখনো আবার আঙ্গিরসও বলা হয়েছে। তবে অঙ্গিরা ঋষিকুলের সঙ্গে চ্যবনের শিষ্য পরম্পরায় কোনো সম্পর্ক থাকলেও চ্যবন যে, ভৃগুবংশীয় সে বিষয়ে বৈদিক গ্রন্থ থেকে মহাকাব্য-পুরাণ—সকলেই একমত।

মহাভারতে বর্ণিত কাহিনী থেকে জানা যাচ্ছে যে, চ্যবন স্বয়ং মহর্ষি ভৃগুর পুত্র। ভৃগুর ঔরসে পুলোমার গর্ভে চ্যবনের জন্ম। মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, একসময় পুলোমা নামে এক রাক্ষস ভৃগুপত্নী পুলোমাকে হরণ করে। ঋষিপত্নী সে সময়

গর্ভবতী ছিলেন। পুলোমা রাক্ষস তাঁকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময়েই ঋষিপত্নীর গর্ভচ্যুত হয়। গর্ভস্থ শিশুটি ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র নিজের তেজে মাতার অপহরণকর্তা রাক্ষসকে ভস্মীভূত করে দেন। মাতার গর্ভ থেকে চ্যুত হয়েছিলেন বলেই ভৃগুর পুত্রের নাম হল চ্যবন—

ততঃ স গর্ভো নিবসন্ কুক্ষৌ ভৃগুকুলোদ্বহ।
রোষান্মাতুশ্চ্যুতঃ কুক্ষেশ্চ্যবনস্তেন সো'ভবৎ॥

তবে মহাভারত যতই বলুক না কেন যে, বালক নিজেই মাতৃগর্ভচ্যুত হয়ে বাইরে এসেছিল সক্রোধে—এ বিষয়ে পুরাণে প্রাপ্ত ব্যাখ্যাটাই আমাদের অনেক বেশি যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়। বায়ু পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, ভৃগুর ঔরসে পৌলোমীর গর্ভে চ্যবনের জন্ম। কিন্তু ভৃগুপত্নী পৌলোমীর গর্ভাবস্থায় অষ্টম মাসে কোনো ক্রূর কারণে (যেটা মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী রাক্ষসের দ্বারা ভৃগুপত্নীর অপহরণের ঘটনাও হতে পারে) পৌলোমী বা পুলোমার গর্ভপাত হয়ে যায়। তৎসত্ত্বেও গর্ভস্থ সন্তানটি অবশ্য বেঁচেই গিয়েছিল। মাতৃগর্ভ থেকে চ্যুত হবার কারণে সেই সন্তানের নাম হয় চ্যবন আর এমন জটিলতা সত্ত্বেও গর্ভচ্যুত সন্তান চেতনা লাভ করেছিল বলেই সেই সন্তানের অপর নাম প্রচেতা—

পৌলোম্যজনয়ৎ পুত্রং ব্রহ্মিষ্ঠং বশিনং বিভূম্।
ব্যাধিতঃ সো'ষ্টমে মাসি গর্ভঃ ক্রূরেণ কর্মণা॥
চ্যবনৎচ্যবনঃ সো'থ চেতনস্তু প্রচেতসঃ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মহর্ষি চ্যবন প্রচেতা নামেও খ্যাত ছিলেন। মহাভারতে অন্যত্র উল্লিখিত হয়েছে যে, মহর্ষি চ্যবন ভৃগুর সাত পুত্র সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন।

[মহা (k) ১.৬.২-৯; ১.৭.২১; ১.৬৬.৪৫; ১৩.৮৫.১২৮; (হরি) ১.৬.২-৯; ১.৭.২১; ১.৬১.৪৫; ১৩.৭৪.১২৬]

☐ চ্যবনের জন্মবৃত্তান্ত যেমন বিচিত্র, তাঁর জীবনকথাও কিছু কম বিচিত্র নয়। বৈদিক গ্রন্থ থেকে মহাকাব্য পুরাণ—মহর্ষি চ্যবন সম্পর্কে সর্বাধিক চর্চিত কাহিনীটি হল অশ্বিনীকুমারদের দ্বারা তাঁর বার্ধক্য দূর হয়ে পুনরায় যৌবনলাভের কাহিনী। কাহিনীটি এরকম—

মহর্ষি ভৃগুর পুত্র চ্যবন সুদীর্ঘকাল তপস্যায় অতিবাহিত করেছেন। তপস্যা করতে করতে তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর সারা শরীরে উইটিপি গজিয়ে গিয়েছে। কোনো এক বনের মধ্যে সরোবরের তীরে তিনি তপস্যায় রত ছিলেন, এমন সময় একদিন সেই বনে শর্যাতি রাজা সপরিবারে ভ্রমণ করতে এলেন। তাঁর পরমাসুন্দরী যৌবনবতী কন্যা সুকন্যাও এলেন বনে। অরণ্যের মধ্যে বান্ধবী-সখীদের সঙ্গে অনেক সুন্দর জায়গায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনুভব করতে করতে একসময় সুকন্যা এসে পৌঁছালেন সেই সরোবরের তীরে, মৃত্তিকা স্তূপের কাছে। মহাভারতে যেমনটি পাচ্ছি, সুকন্যা অসামান্যা সুন্দরী, তাঁর বয়স কম, তাঁর অন্তরে আছে বয়সোচিত কামনা আর আছে—ললিত রাজপুত্রীর অহংকার—

রূপেণ বয়সা চৈব মদনেন মদেন চ।

মহর্ষি চ্যবন সেই মৃত্তিকাস্তূপের ভিতর থেকেই দেখতে পেলেন সুকন্যাকে, মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন রাজনন্দিনীর বিভঙ্গিম ক্রিয়াকলাপ। দেখতে পেলেন, এই মুহূর্তে সেই রমণী নিতান্ত একা, তাঁর সখীরা তাঁর সঙ্গে নেই, তিনি একবস্ত্রা এবং অলংকৃতা। তিনি চলাফেরা করছেন—মনে হচ্ছে যেন বিদ্যুৎ খেলে বেড়াচ্ছে সমস্ত বন জুড়ে। নির্জন বনের মধ্যে একাকিনী সুকন্যাকে দেখে তপস্যায় ক্লিষ্ট, রুক্ষ-শুষ্ক ঋষির মনও আন্দোলিত হল—

তাং পশ্যমানো বিজনে স রেমে পরমদ্যুতিঃ।

রাজকুমারী সুকন্যা নানা খেলায় মেতে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো সেই প্রায় মনুষ্যাকৃতির মৃত্তিকাস্তূপ। রাজকন্যা ভালো করে দেখলেন—সেই স্তূপের মধ্যে দুটি ছোটো ছোটো ছিদ্র, সেই ছিদ্রের মধ্যে দুটি উজ্জ্বল কী যেন বস্তু। রাজকন্যার কী যেন মনে হল, তিনি ছোটো দুটি কাঠি নিয়ে ছিদ্রের মধ্যেকার উজ্জ্বল বস্তু দুটিকে খুঁচিয়ে ফেললেন। বস্তু দুটি বলাবাহুল্য মহর্ষি চ্যবনের দুটি চোখ। সেই চোখে কাঠির খোঁচা লাগতে চ্যবন অসম্ভব ব্যথা পেলেন, ক্রুদ্ধও হলেন। তাঁর ক্রোধ আর তপস্যার প্রভাবে শর্যাতিরাজার সৈন্য-সামন্ত অনুচরদের মলমূত্র স্তব্ধ হয়ে গেল—

ততঃ শর্যাতি সৈন্যস্য শকৃন্মূত্রে সমাবৃণোৎ।

রাজকন্যা সুকন্যার চেতনা হল এবার। তিনি বিপদ বুঝে নিজেই পিতা শর্যাতিকে

বললেন—আমি এই অরণ্যে এক বৃহদাকার মৃত্তিকাস্তূপের মধ্যে কোটরগত দুটি উজ্জ্বল বস্তু দেখেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল—সে দুটি যেন জোনাকি পোকার মতো কিছু, আমি কাঠি দিয়ে সে দুটিকে বিদ্ধ করেছি—

খদ্যোতবদ্ অভিজ্ঞাতং তন্ময়া বিদ্ধমন্তিকাৎ।

মেয়ের কথা শুনে শর্যাতি রাজা ছুটে গেলেন মৃত্তিকাস্তূপের কাছে। মৃত্তিকাস্তূপের মধ্যে বসে থাকা মহর্ষি চ্যবনের কাছে রাজা ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন মেয়ের কৃতকর্মের জন্য, নিজের অনুচর সৈন্যদের রোগমুক্তি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু রাজার এমন বিনম্র ব্যবহারেও চ্যবন কিন্তু নিরস্ত হলেন না। তিনি পরিষ্কার বললেন—দেখুন মহারাজ! আপনার মেয়ের মনে নিজের অতুলনীয় রূপের গর্ব ছিল। আপন কৌতুক চরিতার্থ করার জন্য তিনি যা ইচ্ছে তাই করছিলেন, নইলে আমার চোখ দুটোকে জোনাকি পোকা ভেবে কাঠি দিয়ে খোঁচানোর মোহ তাঁর তৈরি হত না। চ্যবন এরপর প্রায় ন্যায় বিচারের দাবি জানিয়ে বলেছেন—মহারাজ! আপনি এর বিহিত করুন। আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করে এখান থেকে যেতে চাই—

তামেব প্রতিগৃহ্যাহং রাজন্ দুহিতরং তব।

রাজা শর্যাতি আর দেরি করেননি। ঋষির প্রস্তাব শোনামাত্র তিনি নিজের কন্যাকে তুলে দিয়েছেন চ্যবনের হাতে। রাজনন্দিনী সুকন্যাও নিজের রাজকীয় ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে বেছে নিলেন তপস্বীর মৌন জীবন। চ্যবনের সঙ্গে সঙ্গে চললেন তাঁর তপোবনে। সেখানে বৃদ্ধ স্বামীর পরিচর্যায় তাঁর দিন কাটতে লাগল। ভালোই চলছিল তাঁদের দাম্পত্য জীবন। এমন সময় একদিন সুকন্যা আশ্রমের নিকটবর্তী নদীতে স্নান করতে গেছেন। সেখানে তাঁকে দেখতে পেলেন দেবকুলের বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়। তাঁরা অপরূপ সুন্দরী সুকন্যাকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। সদ্যস্নাতা সুকন্যা প্রথমে খানিক লজ্জিত বোধ করলেও বেশ স্পষ্টভাবেই জবাব দিলেন—আমি শর্যাতি রাজার কন্যা, মহর্ষি চ্যবনের পত্নী। সুকন্যার কথা শুনে অশ্বিনীকুমাররা হাসতে হাসতে খানিক উপহাসের স্বরেই বললেন—তোমার বাবা আর লোক খুঁজে পেলেন না? শেষে এমন অতিবৃদ্ধ এক ঋষির হাতে কন্যা সম্প্রদান করেছেন!

কথং ত্বমসি কল্যাণি পিতা দত্তা গতাধ্বনে।

সুকন্যার রূপ গুণের অনেক প্রশংসা করে শেষে অশ্বিনীকুমারেরা বললেন—এমন সুন্দরী হয়ে অমন জরা-জর্জরিত স্বামীর সেবা কেন করবে তুমি! তুমি তো এর যোগ্য নও। এমন এক পুরুষ তোমার স্বামী, যাঁর কামভোগের শক্তি পর্যন্ত নেই, তোমাকে পালন-পোষণও তিনি করতে পারবেন না। তোমার মতো সুন্দরী রমণীর কি এমন স্বামী নিয়ে জীবন কাটানো চলে? তার থেকে বরং আমাদের দুজনের মধ্যে কোনো একজনকে তুমি স্বামী হিসেবে বেছে নাও।

সুকন্যা উত্তর দিলেন—আমার বৃদ্ধ স্বামীকে আমি যথেষ্টই ভালোবাসি। অন্তত এ বিষয়ে আমার ওপর কোনো সন্দেহ না করাই ভালো। তখন অশ্বিনীকুমার যুগল একটা অসম্ভব সুন্দর প্রস্তাব দিলেন সুকন্যাকে। তাঁরা বললেন—কল্যাণী! আমরা দেব-চিকিৎসকদের মধ্যে প্রধান। অনেক ধরনের চিকিৎসাই আমাদের জানা আছে। তুমি যদি চাও তো আমাদের সুচিকিৎসায় তোমার স্বামীকে আমরা আবার রূপবান যুবকে রূপান্তরিত করতে পারি—

যুবানং রূপসম্পন্নং করিষ্যাবঃ পতিং তব।

তবে এর মধ্যেও শর্ত আছে। অশ্বিনীকুমাররা শর্ত রাখলেন—তোমার স্বামীকে আবার যুবকে পরিণত করার পর আমরা তিন জন একই রকম রূপ ধরে এসে দাঁড়াব তোমার সামনে। তখন সেই তিনজনের মধ্য থেকে কোনো একজনকে স্বামী হিসেবে বরণ করবে তুমি।

শর্তের ব্যাপারটা একটু জটিল ঠিকই, তবে গোটা ব্যাপারটাতে সুকন্যা অসম্ভব খুশি হলেন। এমন অভাবনীয় ঘটনা যে ঘটতে পারে সেটা তাঁর কল্পনারও অতীত ছিল। সুকন্যা তাড়াতাড়ি কুটীরে ফিরে স্বামীকে অশ্বিনীকুমারদের কথা শোনালেন। মহর্ষি চ্যবনও স্ত্রীর প্রস্তাব শুনে মনে মনে যথেষ্ট খুশি হয়ে বললেন—বেশ, তোমার যা ভালো মনে হচ্ছে তুমি তাই করো—

তচ্ছ্রুত্বা চ্যবনো ভার্যামুবাচ ক্রিয়তামিতি।

সুকন্যা স্বামীর সম্মতির কথা অশ্বিনীকুমারদের জানালেন। তখন অশ্বিনীকুমাররা চ্যবনকে এক সরোবরের জলে ডুব দিয়ে আসতে বললেন। জলে ডুব দেবার পরেই চ্যবন মুনি এক দিব্য যুবকের মতো হয়ে গেলেন। এখানে এই প্রক্রিয়ার

মধ্যে একটা অলৌকিকতা থাকলেও পণ্ডিতেরা বলেন যে, আধুনিক কালে যে আয়ুর্বেদিক ঔষধটি চ্যবনপ্রাশ নামে খ্যাত সেরকম কোনো ঔষধই অশ্বিনীকুমাররা প্রয়োগ করেছিলেন চ্যবন মুনির ওপর। মহর্ষি চ্যবনের পুনর্যৌবনলাভের ঘটনা থেকে তাঁর নামেই এই ওষধি ব্যাপক ভাবে প্রচার লাভ করেছে।

যাই হোক, চ্যবন যুবাবস্থা ফিরে পাওয়ার পরে দুই অশ্বিনীকুমার এবং চ্যবন অবিকল এক রূপ ধারণ করে সুকন্যার সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং সুকন্যাকে বললেন তিন জনের মধ্যে কোনো একজনকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নিতে। সুকন্যা কিন্তু ভুল করলেন না। তিনি নিজের স্বামীকে ঠিকই চিনে নিলেন।

চ্যবন-সুকন্যার দাম্পত্য এবং অশ্বিনীকুমারদের দ্বারা চ্যবনের পুনর্যৌবনলাভের ঘটনাটি মহাভারতে এবং পুরাণগুলিতে বিশদে বর্ণিত হলেও এটি কিন্তু নব্যশ্রুত কোনো কাহিনী নয়, এ কাহিনী বেদ-ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তিমাত্র। ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলেই আমরা পর পর তিনবার এই মর্মে চ্যবনের নাম উল্লিখিত হয়েছে যে, অশ্বিনী কুমাররা বুড়ো চ্যবনকে যুবক বানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর শরীরে শক্তি আর জ্যোতি ফিরে এসেছিল—

যুবং চ্যবন মশ্বিনা জরন্তং/
পুনর্যুবানং চক্রযুঃ শচীভিঃ।

একটি ঋক্‌মন্ত্রে আবার বলা হয়েছে— অশ্বিদ্বয়! তোমরা বুড়ো চ্যবনকে এমন চেহারা দিয়েছো যেন তাঁর ওপরের ছাল-চামড়া পুরো উঠে গিয়েছে। তাতে একদিকে যেমন তাঁর পুত্র-কন্যাদের দ্বারা পরিত্যক্ত জীবন বৃদ্ধিলাভ করেছিল, তেমনই অল্পবয়সী মেয়েরাও তখন তাঁকে স্বামী হিসেবে লাভ করেছিল—

আয়ুর্দস্রাদিৎ পতিমকৃণুতং কনীনাম্।

এখানে হয়তো একটু অতিশয়োক্তি আছে কারণ সুকন্যা চ্যবনকে ছেড়ে গিয়েছেন, এমন কথা কোথাও উল্লিখিত হয়নি। বরং একটি ঋক্‌মন্ত্রে চ্যবনের সেই মসৃণ-চর্ম সুরূপ চেহারাকে তাঁর সুরূপা বধূর কাঙ্ক্ষিত অভিরূপ মূর্তি বলেই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে—

যুবা যদী কৃথঃ পুনরা কামসৃণ্বে বধ্বঃ।

তাই মনে হয়, পূর্ববর্তী মন্ত্রের ভাবার্থ এইরকম যে, একসময়ে চ্যবনের তপোবৃদ্ধ শরীর দেখে তাঁর পুত্রেরা তাঁকে কুৎসিত চোখে দেখতে আরম্ভ করেছিল এবং এই অবস্থায় অশ্বিনী-রসায়ণে তাঁর চেহারায় এমন জ্যোতি আসে যে, অল্পবয়সী রমণীদের কাছেও তিনি কাম্য হয়ে ওঠেন।

তবে ঋগ্‌বেদের মন্ত্রসমস্যার সমস্ত সমাধান করে দিয়েছে বেদের অব্যবহিত পরবর্তীকালে রচিত শতপথ ব্রাহ্মণ। সেখানে চ্যবন-পত্নী সুকন্যা মহাভারতের কাহিনীর মতোই শর্যাত রাজার কন্যা, তাঁর সঙ্গে বৃদ্ধ মহর্ষি চ্যবনের বিবাহ হয়। শতপথ ব্রাহ্মণের কাহিনীতেও চ্যবনের রিজুভিনেশন-এর মোটিভ্ তৈরি হয়েছে সেই পুকুরে ডুব দিয়ে ওঠা থেকেই। চ্যবনের পুনরায় যৌবনলাভের পর বৈদিক গ্রন্থ থেকে মহাকাব্য—সর্বত্র যে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি বর্ণিত হচ্ছে তা হল অশ্বিনীকুমারদের অন্য দেবতাদের সঙ্গে একাসনে বসে যজ্ঞীয় সোমরসের ভাগ পাবার বৃত্তান্ত এবং শতপথ ব্রাহ্মণ জানিয়েছে যে মহর্ষি চ্যবন নিজে তো অশ্বিনীকুমারদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেনই কিন্তু অশ্বিনীকুমারদের সোমপানের অধিকার দেবার ক্ষেত্রে চ্যবনপত্নী সুকন্যার অনুরোধ এবং প্ররোচনাও কাজ করেছে। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যাচ্ছে যে, যৌবন ফিরে পাওয়ার পর চ্যবন অশ্বিনীকুমারদের বললেন— কুরুক্ষেত্রের মতো পুণ্যভূমিতে যজ্ঞানুষ্ঠান করে সেই যজ্ঞে দেবতাদের মধ্যে আমি তোমাদের দুজনকে স্থান করে দেব—

কুরুক্ষেত্রে অমী দেবা যজ্ঞ
তন্বতে তে বাং যজ্ঞাদ অন্তর্যান্তি।

শতপথ ব্রাহ্মণের এই সুকন্যাসূত্রই মহাভারতের কাহিনীতে আরও সামাজিক সচেতনতায় পরিবেশিত হয়েছে।

[ঋগ্‌বেদ ১.১১৬.১০; ১.১১৭.১৩; ৫.৭৪.৫; শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ৪.১৫.৮-১৪; মহা (k) ৩.১২১.১-২৪; ৩.১২২.১-২৯; ৩.১২৩.১-২৪; (হরি) ৩.১০১.১-৫৪; ৩.১০২.১-২৫; ভাগবত পু. ৯.৩.১১-২৬; বায়ু পু. ১০.৭১; ৩০.৮৪; ৩৯.৪৭; দেবীভাগবত পু. ৭.৪.২৫-২৬]

☐ মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী এর পরের ঘটনা এইরকম—মহর্ষি চ্যবন যে পুনরায় যৌবন লাভ করেছেন, এখবর গিয়ে পৌঁছাল চ্যবনের

শ্বশুর, সুকন্যার পিতা শর্যাতি রাজার কাছে। শর্যাতি আনন্দে আত্মহারা হয়ে লোকজন সঙ্গে নিয়ে মেয়ে-জামাইকে দেখতে এলেন। উৎফুল্ল শর্যাতিকে জামাতা চ্যবন এবার বললেন—মহারাজ! আমি আপনার যজ্ঞ করতে চাই, আপনি আয়োজন করুন। বরিষ্ঠ মহর্ষি চ্যবন শর্যাতি রাজার যজ্ঞ করাবেন—এটা বিরাট খুশির কথা। শর্যাতি মহাসমারোহে যজ্ঞের আয়োজন করলেন। বিরাট যজ্ঞশালায় যজ্ঞ আরম্ভ হল। এই যজ্ঞে চ্যবন অশ্বিনীকুমারদের উদ্দেশে আহুতি দেবার জন্য সোমপাত্র গ্রহণ করলেন হাতে—

অগৃহ্নাৎ চ্যবনো সোমম্ অশ্বিনোর্দেবয়োস্তদা।

কিন্তু মন্ত্র পড়ে আহুতি দিতে গিয়ে দেখলেন—তাঁর হাতটি ধরে ফেলে আটকে রেখেছে কেউ।

দেবরাজ ইন্দ্র। তিনি চ্যবনের হাতে ধরা সোমপাত্র থেকে সোমরস পড়তে দিলেন না। বললেন—শুনুন ঋষি! এই দুই অশ্বিনীকুমার কিন্তু আমার মতে সোমরসের অর্ঘ্য-সম্মান পেতে পারেন না। এঁরা দেবতাদের চিকিৎসক মাত্র। চিকিৎসক বলেই অশ্বিনীকুমাররা অন্য দেবতাদের মতো কুলীন নয়—একথা বোঝাবার চেষ্টার কোনো ত্রুটি করলে না। কিন্তু চ্যবন ইন্দ্রের তর্ক যুক্তি মানতে রাজি নন। তিনি বললেন—এই দুই অশ্বিনীকুমার যেমন উৎসাহী, তেমনই মহান এঁদের হৃদয়। আমাকে এঁরা জরাবিহীন এক যুবকে পরিণত করে নতুন জীবন দিয়েছেন। আর এটাই বা কেন হবে যে, আপনি আর দু-চারজন দেবতা ছাড়া আর কেউ কেন যজ্ঞীয় সোমরসের ভাগ পাবেন না—

ঋতে ত্বাং বিবুধাংশ্চান্যান্ কথং বৈ নাহতঃ সবম্।

চ্যবন দেবরাজের বক্তব্য অগ্রাহ্য করে সোমরসের পাত্র নিয়ে আবারও প্রস্তুত হলেন আহুতির জন্য। দেবরাজ দেখলেন—মিষ্ট কথায় কোনো ফল হবে না। তখন তিনি চ্যবনকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করলেন—যদি সোমরসের একটি ফোঁটাও অশ্বিনীকুমাররা আহুতি হিসেবে পান, তাহলে আমি বজ্রপ্রহার করব আপনার ওপর—

বজ্রং তে প্রহরিষ্যামি ঘোররূপমনুত্তমম্।

ইন্দ্র শেষপর্যন্ত বজ্রপ্রহার করতে উদ্যতও হলেন। কিন্তু চ্যবন এতকালের তপোবৃদ্ধ মানুষ। তিনি যোগবলে স্তব্ধ করে রাখলেন ইন্দ্রের দুই বাহু এবং সেই বাহুধারী ইন্দ্রকে একেবারে চিরতরে শেষ করে দেবার জন্য অগ্নিতে আহুতি দিয়ে এক মারণশক্তি সৃষ্টি করলেন তিনি। সেই বিশাল কৃত্যা ইন্দ্রকে গ্রাস করতে উদ্যত হলে ভীত হয়ে ইন্দ্র বললেন—আমি মেনে নিচ্ছি আপনার কথা, আজ থেকে অশ্বিনীকুমাররাও সোমপায়ী সম্ভ্রান্ত দেবতা হিসেবে গণ্য হবেন—

সোমার্হৌ অশ্বিনাবেতৌ অদ্য প্রভৃতি ভার্গব।

ইন্দ্র অনুরোধ করলেন—আপনার সৃষ্ট এই মারণ দেবতাও অন্য কোনো কাজে লাগুক বরং। চ্যবনের ক্রোধ শান্ত হল। তিনি তাঁর সৃষ্ট মারণশক্তিকে নিবৃত্ত করলেন। তারপর আবার সোমপাত্র গ্রহণ করে চ্যবন অশ্বিনীকুমারদের সোমপানের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ইন্দ্রকেও তিনি বঞ্চিত করলেন না। ইন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমাররা এক পংক্তিতে বসে সোমপান করলেন।

মহাভারতের এই কাহিনীর মূল বীজটুকু যে শতপথ ব্রাহ্মণেই পাওয়া যায় তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

পুনরায় যৌবনলাভের পর পত্নী সুকন্যার প্ররোচনায় চ্যবন অশ্বিনীকুমারদের সোমপায়ী দেবতার মর্য্যাদা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—এ উল্লেখ শতপথ ব্রাহ্মণেই পাওয়া যায়। পাশাপাশি স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত না হলেও জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ-এর মতো গ্রন্থে যেটুকু উল্লেখ পাওয়া যায়, তা থেকে এটুকু বেশ স্পষ্ট যে, অশ্বিনীকুমারদের সমর্থন করাকে কেন্দ্র করে ইন্দ্রের সঙ্গে চ্যবনের একটা ঝামেলা হয়েই ছিল এবং জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের মতন গ্রন্থ জানাচ্ছে যে, স্বয়ং চ্যবনের পিতা মহর্ষি ভৃগু এবিষয়ে চ্যবনের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মহর্ষি চ্যবনের দ্বারা শার্যাত রাজার যজ্ঞ সম্পাদন তথা ঐন্দ্র মহাভিষেক সম্পাদন করার কথা বলা হয়েছে। ফলে শর্যাতি এবং চ্যবনের ঘটনা কিংবা ইন্দ্রের সঙ্গে চ্যবনের দ্বন্দ্বের ঘটনা সে যুগের বহুল প্রচলিত ঘটনার মধ্যে অন্যতম ছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

[মহা (k) ৩.১২৪.৪-২৫; ৩.১২৫.২-১০;
১৩.১৫৬.১৬-৩২; (হরি) ৩.১০৩.১-৩২;
১৩.১৩৪.১৫-৩২;
স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/চতুরশীতিলিঙ্গমাহাত্ম্য) ৩০.২-৪৯;
জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ৩.১২১-১২৮;
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮.২১]

□ মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে যে চ্যবনের ঔরসে সুকন্যার গর্ভজাত পুত্রের নাম প্রমতি। এছাড়াও মহাভারতে মনুর কন্যা আরুষীকে চ্যবন বিবাহ করেছিলেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে আরুষীর পুত্র-কন্যার উল্লেখ মহাভারতে মেলে না। পুরাণে আত্মবান্ (মতান্তরে আপ্নুবান্) এবং দধীচিকে চ্যবনের ঔরসে সুকন্যার গর্ভজাত পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[মহা (k) ১.২.১৭০; ১.৫.৮-১২; ১.৮.৯; ১.৬৬.৪৫; (হরি) ১.২.১৭২; ১.৫.৮-১২; ১.৮.১; ১.৬১.৪৬; বায়ু পু. ৬৫.৮৯-৯০]

□ পুরাণে ভৃগুপুত্র চ্যবনকে ভৃগুবংশের অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতে আস্তীকের উপাখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, চ্যবন জরৎকারুর পুত্র আস্তীকের শিক্ষাগুরু ছিলেন। আবার জনমেজয়ের সর্পসত্রের যিনি হোতা, সেই মহর্ষি চণ্ডভার্গবও চ্যবনের বংশধর ছিলেন বলে মহাভারতে উল্লেখ পাওয়া যায়। *[মহা (k) ১.৪৮.১৮; ১.৫৩.৫; (হরি) ১.৪৩.১৮; ১.৪৮.৫; মৎস্য পু. ১৯৫.১৫.২৮-২৯]*

□ প্রাচীন ঋষি চ্যবনকে নানা পৌরাণিক ঘটনাতেও উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। মহাভারতের সভাপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে যেসব ঋষি-মহর্ষি ব্রহ্মার সভায় বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন, মহর্ষি চ্যবন তাঁদের মধ্যে একজন। ভাগবত পুরাণে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে চ্যবনের উপস্থিতির উল্লেখ থাকলেও তিনি বাস্তবেই আদি ঋষি চ্যবন না তাঁর কোনো উত্তরপুরুষ, তা বোঝা যায় না। কৃষ্ণের সঙ্গে সমন্তপঞ্চক এবং মিথিলায় মহর্ষি চ্যবনের সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে জানা যায়। শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে দেখতে যেসব ঋষি-মহর্ষি কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যেও চ্যবন একজন। আবার পাণ্ডবদের পৌত্র পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনের সময়েও তিনি উপস্থিত ছিলেন হস্তিনাপুরে। *[মহা (k) ২.১১.২২; ১২.৪৭.৮; (হরি) ২.১১.২২; ১২.৪৬.৮; ভাগবত পু. ৬.১৫.১৪; ১০.৭৪.৭; ১০.৮৪.৩; ১০.৮৬.১৮; ১.১৯.৯]*

□ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রামায়ণ-মহাভারতের মতো মহাকাব্যের ইতিহাসকে পণ্ডিতরা অনেক সময়েই ভৃগুবংশের ইতিহাস বলে বর্ণনা করে থাকেন। মহাকাব্যগুলির সৃষ্টির পিছনে ভৃগুবংশীয়দের অবদান অপরিসীম। রামায়ণের স্রষ্টা মহর্ষি বাল্মীকির সম্পর্কে এরকম প্রসিদ্ধি আছে যে, তিনি মহর্ষি চ্যবনের পুত্র ছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাল্মীকির পূর্ব-জীবনের দস্যুবৃত্তির উল্লেখ করতে গিয়ে কৃত্তিবাস স্পষ্টই জানিয়েছেন—

চ্যবনমুনির পুত্র নাম রত্নাকর।

রামায়ণ মহাকাব্য প্রথমে চ্যবনের দ্বারাই পরিকল্পিত হয়েছিল, পরে চ্যবনপুত্র বাল্মীকি তা রচনা করেন—এমনও শোনা যায়। তবে রামায়ণ মহাকাব্যে এমন কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা পাই না। যে তথ্যটুকু পাই, তা হল—তমসানদীর তীরে বাল্মীকির আশ্রমের যে অবস্থান তার থেকে মাত্র একদিনের দূরত্বেই চ্যবনের আশ্রম, জায়গাটা মথুরা থেকেও খুব দূরে নয়। কারণ লবণাসুর বধের জন্য যাত্রা করে যেদিন রাত্রে শত্রুঘ্ন বাল্মীকির তপোবনে বাস করলেন এবং সীতার পুত্রজন্মের সংবাদ পেলেন, ঠিক তার পরদিনই সন্ধ্যায় তিনি চ্যবনের আশ্রমে পৌঁছেছেন এবং চ্যবন নিজেই শত্রুঘ্নকে লবণবধের বিষয়ে নানা উপদেশ দিয়েছেন। এখন আশ্রমের নৈকট্য থেকে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক কিংবা রামায়ণ রচনায় চ্যবনের অবদান সিদ্ধ হয় না ঠিকই তবে যেমনটি পুরাণে দেখা যাচ্ছে তাতে মহর্ষি চ্যবনই প্রচেতা নামে খ্যাত ছিলেন এবং রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একটি শ্লোকে বাল্মীকিকে প্রাচেতস বলে উল্লেখ করায় চ্যবনের সঙ্গে তাঁর সোজাসুজি সম্পর্কের তথ্যটা স্পষ্ট হয়ে পড়ে। প্রচেতা-চ্যবনের পুত্র বলেই রামায়ণের কবিকে প্রাচেতস নামে সম্বোধন করা হয়েছে। এবং সেখানে বেশ স্পষ্টাক্ষরেই বাল্মীকিকে 'ভার্গব' বলায় বিষয়টা আরও যুক্তিগ্রাহ্য হয়।

[রামায়ণ ৭.১০৬.১৬-১৮; ৭.১০৭.২৫; AIHT (Pargiter) pp. 201-202]

□ ভৃগুবংশীয় ঋষিদের সঙ্গে যেমন মহাকাব্যরচনার ইতিহাস জড়িয়ে আছে তেমনই দুরাচার ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে ভৃগুবংশীয় ঋষিদের সংঘর্ষের ইতিহাসও সুপ্রাচীন। আমরা সকলেই জানি তার অন্তিম পরিণাম ভার্গব পরশুরামের হাতে একুশবার ক্ষত্রিয়নিধন। কিন্তু এর সূচনা যে চ্যবনের সময়কাল থেকেই ঘটেছিল তার একটা আভাস পুরাণে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি

যে, পরশুরামের পিতামহ ঋচীককে মহাভারতে চ্যবনের পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং সম্পর্কে চ্যবন পরশুরামের প্রপিতামহ। কিন্তু পুরাণে উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে যে, চ্যবনের সময়কালেই ব্রাহ্মণদের প্রতি হৈহয়বংশীয়দের অত্যাচার বাড়তে শুরু করে। মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি চ্যবনের অভিশাপেই কার্তবীর্য্যার্জুনের পুত্ররা ধ্বংস হয়েছিলেন। *[মৎস্য পু. ৬৮.৯; ১৪৫.৯২, ৯৯]*

□ পরশুরামের উৎপত্তির প্রসঙ্গে মহাভারতে একটি ভিন্ন স্বাদের উপাখ্যান পাওয়া যায় যার মূল চরিত্র স্বয়ং মহর্ষি চ্যবন। একসময় মহর্ষি চ্যবন তপোবলে জানতে পারলেন যে তাঁর বংশে পুত্রবধূ হয়ে জনৈকা কুশিক বংশীয়া রাজকন্যা আসবেন এবং তাঁর কারণেই চ্যবনের বংশে এমন এক পুত্র জন্ম নেবে যে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মালেও তার স্বভাবচরিত্র হবে ক্ষত্রিয়ের মতো। চ্যবনের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল রাজর্ষি কুশিকের ওপর, যদিও তাঁর এ ব্যাপারে কোনো দোষই ছিল না। কিন্তু চ্যবন ক্রুদ্ধ হয়ে ভাবলেন যে, তিনি অভিশাপ দিয়ে কুশিকের বংশটাকেই ধ্বংস করে দেবেন। কিন্তু চাইলেই তো আর একজন নিরপরাধ মানুষকে শাপ দেওয়া যায় না, তাই কুশিকের দোষ আবিষ্কার করার জন্যই চ্যবন তাঁর প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হয়ে বললেন—তোমার এখানে কিছুদিন বাস করতে চাই। রাজর্ষি কুশিক নিজে তাঁর পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে চ্যবনের সেবায় নিযুক্ত হলেন। তাঁকে পা ধোয়ার জল দিলেন, আসন দিলেন বসতে, যত রকম ভাবে চ্যবনের মতো মহর্ষির সম্মান করা উচিত, কোনো কিছুতেই কোনো ত্রুটি রইল না। তারপর একসময় চ্যবনকে বিনীতভাবে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন আর কোন ভাবে তাঁর সেবা করলে ঋষি তুষ্ট হবেন। তা শুনে চ্যবন বললেন—আমি আপনার এখানে বসেই একটা ব্রত পালন করব। আমার ইচ্ছা—ব্রত চলাকালে আপনি এবং আপনার পত্নী আমার সেবায় নিযুক্ত হবেন। রাজা-রানী সানন্দে চ্যবনের সেবার ভার গ্রহণ করলেন এবং একটি সুসজ্জিত কক্ষে চ্যবনের থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন। চ্যবন আহার সম্পন্ন করে বললেন—বড়ো ঘুম পেয়েছে। আমি ঘুমাই। কিন্তু আপনি আমাকে জাগিয়ে দেবেন না যেন। কুশিক বললেন—তাই হবে। রাজা-রানী নিদ্রিত চ্যবনের পদসেবা করতে লাগলেন, চ্যবন ঘুমিয়েই চললেন টানা একুশ দিন। এই একুশ দিন অনাহারে অনিদ্রায় ক্লান্ত হয়েও কুশিক বা তাঁর পত্নী মনে কোনো দুঃখ বা বিরক্তি রাখলেন না, সানন্দে ঋষির সেবা করে চললেন। একুশদিন পর চ্যবন নিজেই জাগলেন এবং কাউকে কিছু না বলেই সোজা প্রাসাদের বাইরে চলে গেলেন। রাজা-রানী দুজনেই তাঁর পিছনে পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত গেলেন কিন্তু একটা সময় চ্যবন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, কুশিক আর তাঁকে খুঁজে পেলেন না। ঋষি অন্তর্হিত হলেন দেখে কুশিক বড়ো দুঃখিত মনে প্রাসাদে ফিরলেন। কিন্তু ফিরে দেখলেন চ্যবন তাঁর নির্দিষ্ট ঘরটিতে সেই শয্যাতেই শয়ন করে আছেন। রাজা-রানী তা দেখে আশ্চর্য হলেন কিন্তু কোনো প্রশ্ন না করে আবারও এসে চ্যবনের পদসেবায় নিযুক্ত হলেন। তারপর একসময় জেগে উঠে চ্যবন বললেন—রাজা! আমি স্নান করব। আমার গায়ে মাখার তেল দিন। রাজা-রানী দীর্ঘক্ষণ বসে বসে চ্যবনকে তেল মাখাতে লাগলেন কিন্তু চ্যবন কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না। রাজা কুশিক আর তাঁর পত্নী তাতেও কোনো অসন্তোষ দেখালেন না দেখে চ্যবন উঠে স্নান গৃহে গেলেন। রাজা-রানীও গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু স্নান ঘরে ঢুকেই চ্যবন আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রাজা-রানীর মনে তাতেও কোনো ক্ষোভ জন্মাল না। রাজর্ষি কুশিকের ব্যবহারে চ্যবন কোনো দোষ তো দেখলেনই না, বরং তাঁর প্রতি প্রসন্ন হতে লাগলেন। তিনি একসময়ে নিজেই স্নান করে এসে রাজা কুশিকের সিংহাসনে গুছিয়ে বসলেন। রাজা তাতেই আনন্দিত হয়ে হাত জোড় করে জিজ্ঞাসা করলেন—মহর্ষি! আপনার কী সেবা করব? আপনার আহারের জন্য অন্ন প্রস্তুত আছে, আপনি গ্রহণ করুন। চ্যবন বললেন—আমার খাবার এইখানে নিয়ে আসুন। রাজা ঋষি যাতে কোনোভাবেই অসন্তুষ্ট না হন বা শাপ না দেন তা মনে রেখে আশ্রমবাসী ঋষির কিংবা রাজার উপযুক্ত যতরকম খাদ্য হতে পারে সবই এনে ঋষির সামনে সাজিয়ে দিলেন। কিন্তু চ্যবন সেই খাদ্য, নিজের বহুমূল্য শয্যা, আসন ভস্ম করে দিয়ে আবার অদৃশ্য হলেন। অদৃশ্য হয়ে চ্যবন লক্ষ্য করলেন কুশিক বা তাঁর পত্নী কারও মনেই কোনো অসন্তোষের লক্ষণ নেই। তাঁরা সেখানেই বসে চ্যবনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। অনাহারে অনিদ্রায় তাঁদের দিন কাটতে

লাগল। ঋষি যদি এসে ভোজন করেন, সেই আশায় প্রতিদিন প্রচুর অন্ন-ব্যঞ্জন আসতে লাগল, আবার ফিরে যেতে লাগল। কিন্তু না, শত চেষ্টা করেও কুশিকের অতিথি সৎকারে চ্যবন কোনো দোষ খুঁজে পেলেন না।

তখন চ্যবন এসে বললেন—আপনার রথ আনতে বলুন এবং আপনি এবং রাজমহিষী আমাকে বহন করে নিয়ে চলুন। রাজা তাতেও রাগলেন না। সানন্দে বললেন—তাই হবে। আপনি কেমন রথ চান? ক্রীড়ার উপযুক্ত না যুদ্ধ যাত্রার রথ? চ্যবনের আদেশে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যুদ্ধযাত্রার রথ এল। চ্যবন তাতে আরোহণ করলেন এবং রাজা-রানী অশ্বের পরিবর্তে নিজেরা চ্যবনকে রথসুদ্ধ বহন করে নিয়ে চললেন। চ্যবন আদেশ করলেন—ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে এগোবে। আমার যেন কোনো কষ্ট না হয়। পথে কোনো পথিককে যেন সরিয়ে দিও না। আমি তাদের ধন দান করব। রাস্তার সমস্ত লোক যেন দেখতে পায় যে রাজা-রানী আমাকে রথে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। আর হ্যাঁ, ভালো কথা—আমি যে দান করব বললাম তার জন্য রাজকোষ থেকে ধন সম্পদ সব নিয়ে আসতে বলো। রাজা কুশিক চ্যবনের প্রতিটি আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন, তৎসত্ত্বেও চ্যবন মাঝে মাঝেই রাজাকে চাবুকের আঘাত করতে লাগলেন। রাজা তাতেও অবিষণ্ণ। এমনকী প্রজারাও ঋষির শাপের ভয়ে কিছু বলল না বরং মহর্ষি চ্যবনের তপোবল আর রাজা-রানীর ধৈর্য্যের প্রশংসা করতে লাগলো। চ্যবনের দান-পুণ্যের ফলে রাজার রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল, তাতেও তাঁর দুঃখ নেই। তা দেখে চ্যবন যে ক্রোধের বশে এসে ছিলেন সে ক্রোধ তো দূর হলই উপরন্তু কুশিকের মতো মহানহৃদয় রাজার প্রতি চ্যবন এতটাই সন্তুষ্ট প্রসন্ন হলেন যে তাঁকে বর দিতে উদ্যত হলেন। কুশিক আর তাঁর পত্নী বিনীতভাবে চ্যবনকে বললেন—আপনি যে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের সেবায় তুষ্ট হয়েছেন—এতেই আমাদের সব থেকে ভালো বর লাভ হয়েছে, মনে হচ্ছে যেন আমাদের কোনো আকাঙ্ক্ষাই আর অপূর্ণ নেই। আর কী বর আমরা আপনার কাছ থেকে চাইব? একথা শুনে চ্যবন বললেন রাজা! আপনি আপনার মহিষীকে নিয়ে কাল আমার কাছে আসবেন।

রাজা কুশিক রাজপুরীতে ফিরে যাবার পর মহর্ষি চ্যবন গঙ্গাতীরে আপন তপস্যার বলে এক মনোরম তপোবন নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করতে লাগলেন। পরদিন রাজা কুশিক মহর্ষি চ্যবনের আদেশ মতো পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে সেই তপোবনে উপস্থিত হলেন। রাজা কুশিক সেই যোগবলে সৃষ্ট তপোবনের সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য দেখে এতটাই মুগ্ধ হলেন যে তাঁর মনে হতে লাগল, যেন ঋষির তপোবনে নয়, তিনি সশরীরে স্বর্গে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এমনই সময় চ্যবনের তপস্যার প্রভাবেই সেই স্বর্গলোকের তুল্য তপোবন অন্তর্হিত হল, রাজা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন গঙ্গার সেই তীরভূমি আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। রাজা বুঝলেন, চ্যবনের তপস্যার প্রভাবেই সেই স্বর্গীয় উদ্যান, অট্টালিকা সব সৃষ্টি হয়ে ছিল। তিনি মনে মনে ভাবলেন ক্ষত্রিয় হয়ে রাজার ঐশ্বর্য্য লাভ করা অনেক সহজ, কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব কিংবা ব্রাহ্মণের তুল্য তপোবল লাভ করা সত্যিই অনেক বেশি কঠিন। কিন্তু ক্ষত্রিয়ত্বের তুলনায় ব্রাহ্মণত্বই সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। চ্যবন তপোবলে জানতে পারলেন রাজার মনের কথা। তিনি রাজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আবারও জিজ্ঞাসা করলেন— কী বর চাও রাজা? রাজা আবারও আভূমি নত হয়ে বললেন—আপনি যে আমার ওপর তুষ্ট হয়েছেন সেই আমার কাছে বর লাভের তুল্য, তাতেই আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে, এই আমার কাছে তপস্যার পরম ফলের মতো। শুধু আমার মনে এক জিজ্ঞাসা আছে। আপনি অনুগ্রহ করে সেই প্রশ্নের উত্তর দিন। চ্যবন বললেন—নিশ্চয় দেব। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি আমার বাড়িতে বাস করার সময়ে যেসব ঘটনা ঘটেছিল, তার পিছনে রহস্য কি? রাজা কুশিকের প্রশ্নের উত্তরে চ্যবন বললেন— রাজা! আমি তোমার বা তোমার পত্নীর সঙ্গে যে আচরণই করেছি, তা শুধুমাত্র তোমার স্বভাব পরীক্ষা করার জন্য। তাতে জানলাম, তোমার মনে রাজত্ব বা দেবরাজত্বের তুলনায় ব্রাহ্মণত্ব এবং তপস্যার প্রতি শ্রদ্ধা সবসময় বেশি, তুমি ব্রাহ্মণত্ব এবং তপস্যার ফলকে সবসময় শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করো। সুতরাং আমার বরে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। তোমার থেকে উৎপন্ন তৃতীয় পুরুষ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবে।

তোমার বংশ ভৃগুবংশের তেজেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবে এবং কৌশিক ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ হবে। চ্যবন কুশিককে একথাও জানালেন যে কুশিকের পৌত্রী ভৃগুবংশে পুত্রবধূ রূপে আগমন করবেন এবং ক্ষাত্রতেজসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরশুরামের জন্মের কারণও হবেন তিনি। এরপর যাবার আগে চ্যবন আবার কুশিককে বর প্রার্থনা করতে বললেন। নিজের বংশের ব্রাহ্মণত্ব লাভের কথা শুনে কুশিক আগেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছিলেন, এখন চ্যবনের কথা শুনে বর প্রার্থনা করলেন—মহর্ষি! আমাকে এই বর দিন যে, আমার ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত বংশধরদের যেন সর্বদা ধর্মে মতি থাকে—

ব্রহ্মভূতং কুলং মে'স্তু ধর্মে চাস্য মনো ভবেৎ।

মহর্ষি চ্যবন বললেন—তথাস্তু। তাই হবে।

[মহা (k) ১৩.৫২-৫৬ অধ্যায়; (হরি) ১৩.৪৩-৪৫ অধ্যায়]

□ কোনো একসময় মহর্ষি চ্যবন ক্রোধ, হর্ষ, শোক পরিত্যাগ করে জলের মধ্য কঠোর তপস্যায় লীন হয়ে ছিলেন। তপস্যা করতে করতে বারো বছর কেটে গেল। এই বারো বছরে তিনি মৎস্য প্রভৃতি জলজন্তুদেরও বিশ্বাস অর্জন করে ছিলেন। তারা তাঁকে ভালোবাসত এবং নির্ভয়ে তাঁর আশেপাশে ঘোরাফেরা করত। এমন সময় একদিন চ্যবন যেখানে তপস্যা করছিলেন ঠিক সেই স্থানে এসে মৎস্যজীবী ধীবররা জাল ফেলল। সেই জালে অন্যান্য মাছের সঙ্গে ঘটনাচক্রে চ্যবনও আটকা পড়লেন এবং ধীবররা তাঁকে জল থেকে টেনে তুলল। জলে বাস করতে করতে চ্যবনের সারা শরীর শেওলা, শামুক-ঝিনুক ইত্যাদিতে ঢেকে গিয়েছিল। কিন্তু ধীবররা জল থেকে তুলে আনার পর তাঁকে দেখে চিনতে পারল—ইনি কোনো জলজন্তু নন, স্বয়ং বেদবিৎ মহর্ষি চ্যবন। তারা বেশ ভয়ও পেল। তপস্বী ঋষিকে এভাবে জল থেকে তুলে আনা হয়েছে, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিতেও পারেন। তারা চ্যবনের পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইতে লাগল। তাঁর ক্রোধ শান্ত করে তাঁকে তুষ্ট করার চেষ্টাও করতে লাগল। কিন্তু মহর্ষি চ্যবন আদতে মোটেই ক্রুদ্ধ হননি। তিনি শান্তভাবে বললেন—যে মাছগুলিকে তোমরা ধরেছ, তাদের সঙ্গে বহুকাল আমি একই পরিবারের সদস্যের মতো বাস করেছি। ফলে আজ তাদের ত্যাগ করে যেতে পারব না। সেক্ষেত্রে এই মাছগুলির যা পরিণতি হবে,আমারও তাই হবে। ধীবররা একথা শুনে চিন্তিত হয়ে রাজা নহুষের কাছে গিয়ে তাঁকে সমস্ত ঘটনা জানালেন। নহুষ নিজের মন্ত্রী পুরোহিত সকলকে নিয়ে সেইস্থানে এসে উপস্থিত হলেন এবং মহর্ষি চ্যবনকে যথাযথ ভাবে সম্মান প্রদর্শন করলেন। তারপর নহুষ রাজা চ্যবনকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার কোন প্রিয় কার্য করব আপনি বলুন। সে কাজ যত দুষ্করই হোক না কেন, আমি নিশ্চয় করব। চ্যবন নহুষকে বললেন—আমাকে আর এই মাছগুলিকে জল থেকে টেনে তুলতে এই মৎস্যজীবীদের বড়ো পরিশ্রম হয়েছে। অতএব মহারাজ! আপনি উচিত মূল্য দিয়ে আমাকে আর এই মাছগুলিকে ক্রয় করুন। তাতে এদের পরিশ্রমের সুফল লাভ হবে। তখন পুরোহিত চ্যবনের সহস্র স্বর্ণমুদ্রা মূল্য নির্ধারণ করলেন। চ্যবন বললেন—এ আমার উচিত মূল্য হল না। আপনি আমার উচিত মূল্য নিরূপণ করুন। চ্যবনের কথায় পুরোহিত এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিতে চাইলেন। চ্যবন তাকেও উপযুক্ত মূল্য বলে মনে করলেন না। মূল্য বাড়তে বাড়তে ক্রমে নহুষের সমগ্র রাজ্যই চ্যবনের পরিবর্তে দান করা স্থির হল। কিন্তু চ্যবন তাতেও সন্তুষ্ট নন। রাজা, মন্ত্রী, পুরোহিত—সবাই চিন্তিত এবং বিষণ্ণ হলেন। এমন সময়ে সেখানে অন্য এক তপস্বী ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হলেন। তিনি চিন্তিত নহুষ রাজাকে আশ্বস্ত করে বললেন— আমি এখনই চ্যবন ঋষির উপযুক্ত মূল্য স্থির করছি। ভীত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রাজা নহুষ সেই মুনিকে বললেন— মহর্ষি চ্যবনের উপযুক্ত মূল্য স্থির না হলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে শাপও দিতে পারেন। আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোনো উপায় করে আমাকে, আমার রাজ্য আর প্রজাদের রক্ষা করুন। তখন সেই ব্রাহ্মণ বললেন—রাজা! বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আর গোরু—ডএই দুটিই অমূল্য। সেক্ষেত্রে আপনি চ্যবনের মূল্যস্বরূপ একটি গোরু দান করুন—

অনর্ঘেয়া মহারাজ দ্বিজা বর্ণেষু চোত্তমাঃ।
গাবশ্চ পুরুষব্যাঘ্র গৌর্মূল্যং পরিকল্প্যতাম্।।

রাজা নহুষ সেকথা শুনে মহর্ষি চ্যবনের কাছে গিয়ে বললেন—মহর্ষি! আপনাকে আমি একটি গোরুর বিনিময়ে ক্রয় করলাম। আপনি উঠে

আসুন। মহর্ষি চ্যবন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। এরপর সেই ধীরবদের এবং নহুষ রাজাকে অনেক আশীর্বাদ করে চ্যবন আবার ফিরে গেলেন নিজের আশ্রমে।
[মহা (k) ১৩.৫১ অধ্যায়; (হরি) ১৩.৪২ অধ্যায়]

চ্যবন২ পাঞ্চালরাজ দিবোদাসের পুত্র মিত্রেয়ু। মিত্রেয়ুর পুত্র চ্যবন। পুরাণমতে এই চ্যবনের পুত্র পাঞ্চালরাজ সুদাস। তবে ভাগবত পুরাণে সুদাসকে চ্যবনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[ভাগবত পু. ৯.২২.১; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১৮; বায়ু পু. ৯৯.২০৭]*

চ্যবন৩ পাঞ্চালরাজ সুহোত্রের পুত্র চ্যবন। ইনি পাঞ্চালরাজ মিত্রেয়ুর পুত্র চ্যবনের পরবর্তী সময়ের রাজা। চ্যবনের পুত্রের নাম কৃতি।
[ভাগবত পু. ৯.২২.৫; বায়ু পু. ৯৯.২১৭; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১৯]

চ্যবন৪ বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে চ্যবন নামে একজন অসুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাতালের তৃতীয় তল অর্থাৎ বিতলে এঁর বাসভবন ছিল বলে উল্লিখিত হয়েছে।
[বায়ু পু. ৫০.২৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.২৮]

চ্যবন৫ ভবিষ্যৎ ষোড়শ দ্বাপরে মহর্ষি সঞ্জয় যখন বেদবিভাগকারী ব্যাস হবেন, সেই সময় ভগবান শিব মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়ে গোকর্ণ নামে বিখ্যাত হবেন বলে বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। এই গোকর্ণ-এর যে চারটি পুত্র সন্তান হবে তাঁদের মধ্যে চ্যবন একজন। *[বায়ু পু. ২৩.১৭৩]*

চ্যবন৬ কুরুবংশীয় রাজা প্রতীপের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবাপি সিংহাসন ত্যাগ করে তপস্যার জন্য বনে গমন করেন। তপস্যার ফলে দেবাপি ব্রাহ্মণত্বও লাভ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দেবাপির এই দুই পুত্রের মধ্যে চ্যবন ছিলেন জ্যেষ্ঠ। *[বায়ু পু. ৯৯.২৩৭]*

চ্যবন৭ মৎস্য পুরাণ মতে, রাজর্ষি কুরুর পাঁচ পুত্র সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন সুধন্বা। এই সুধন্বার পুত্র চ্যবন, চ্যবনের পুত্র কৃমি। *[মৎস্য পু. ৫০.২৪]*

চ্যবনাশ্রম১ ভৃগুবংশজাত মহর্ষি চ্যবন। মহাকাব্য এবং পুরাণগুলিতে চ্যবন ঋষির সম্পর্কে যেমন একাধিক কাহিনীর উল্লেখ মেলে। তেমনই চ্যবনের আশ্রম বা তপোবনেরও একাধিক অবস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাকাব্য পুরাণে মহর্ষি চ্যবনের আশ্রম অন্যতম পবিত্র তীর্থের মর্যাদা লাভ করেছে।

□ রামায়ণের আদিকাণ্ডে বর্ণিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, মহর্ষি চ্যবনের আশ্রম ছিল হিমালয় পর্বতে। এই আশ্রমেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সগরের জন্ম হয়। *[মহা (k) ১.৭০.৩১-৩২]*

□ রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লবণাসুর বধের উদ্দেশ্যে শত্রুঘ্নের যাত্রাপথে মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমের উল্লেখ মেলে। অযোধ্যা থেকে যাত্রা শুরু করে গঙ্গা পার হয়ে শত্রুঘ্ন প্রথমে তমসা নদী তীরবর্তী বাল্মীকির আশ্রমে এক রাত্রি বাস করেন। তারপর সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে সাতদিন পরে শত্রুঘ্ন পৌঁছেছিলেন যমুনাতীরে, চ্যবনের তপোবনে। লবণাসুর সে সময় মথুরা অঞ্চল শাসন করতেন। লবণের রাজধানীর অনতিদূরে যমুনাতীরে অবস্থিত বলে বর্ণিত হওয়ায় ধারণা হয় যে, মহর্ষি চ্যবনের এই আশ্রমটিও মথুরার কাছেই অবস্থিত ছিল।
[রামায়ণ ৭.৭৯.১৫-১৭; ৭.৮০.১-২৬]

চ্যবনাশ্রম২ গয়াক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। এইস্থানে মহর্ষি চ্যবন জ্বরা ত্যাগ করে পুণরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিলেন বলে মনে করা হয়।

পুনঃপুনা নামে এক পবিত্র নদী চ্যবণাশ্রমের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। *[বায়ু পু. ১০৮.৭৩]*

□ S.N. Arya -এর মতে চ্যবনাশ্রম বলতে দক্ষিণ বিহারের বক্সার (Buxar) জেলার অন্তর্গত চৌসা (Chausa) অঞ্চলকে বোঝানো হয়। পাটনার ১৫০ কিমি. পশ্চিমে গঙ্গার একটি শাখা নদী কর্মনাশা (Karmanāsa) -র তীরে এটি অবস্থিত। পণ্ডিতদের মতে এই চ্যবনাশ্রমকেই বৃহত্তর গয়াক্ষেত্রের অন্তর্গত বলে পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে। *[HPAI (Arya) p. 19]*

চ্যবনাশ্রম৩ নর্মদা নদীর তীরবর্তী একটি পবিত্র তীর্থ। মহাভারতের বনপর্বে বলা হয়েছে এই তীর্থক্ষেত্রে স্বল্প সময় তপস্যা করলেই সিদ্ধিলাভ সম্ভব।

বনপর্বেরই অপর এক কাহিনী থেকে জানা যায় কালেয় অসুরগণ একশোজন ব্রাহ্মণকে চ্যবনাশ্রম তীর্থে বধ করেছিলেন।
[মহা (k) ৩.৮৯.১২; ৩.১০২.৪; (হরি) ৩.৭৪.১২; ৩.৮৭.৪]

চ্যবনেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। এই তীর্থ দর্শন করা মাত্র পুণ্যার্থী জ্ঞানবান হয়ে ওঠে।
[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ৬৬]

ছ

ছগল১ রাক্ষসী কপিশার গর্ভে কুষ্মাণ্ড পিশাচগণের জন্ম হয়। এই পিশাচরা সকলেই যমজ মিথুনরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই যমজ মিথুনদের মধ্যে ছগল একজন। তাঁর ভগিনীর নাম ছগলা।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৭৬; বায়ু পু. ৬৯.২৫৭-২৬২]

ছগল২ পঞ্চবিংশতিতম দ্বাপরে ব্যাসদেব বশিষ্ঠ (মতান্তরে শক্তি) রূপে যখন আবির্ভূত হবেন তখন মহাদেব দণ্ডী মুণ্ডেশ্বর নামে মর্ত্যলোকে জন্ম নেবেন। সে সময় তাঁর চারটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করবেন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ছগল। শিব পুরাণে অবশ্য ছাগল পাঠ পাওয়া যায়।

[বায়ু পু. ২৩.২১১; শিব পু (J.L. Shastri); শতরুদ্র ৫.৩৭-৩৮]

□ লিঙ্গ পুরাণে ছগলকে মহাযোগী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এঁর চারজন মহাজ্ঞানী শিষ্যের উল্লেখও পুরাণে পাওয়া যায়। *[লিঙ্গ পু. ১.৭.৪৯]*

ছত্রবতী উত্তর পঞ্চাল রাজ্যের রাজধানী অহিচ্ছত্রের আরেক নাম ছত্রবতী। পুরাকালে অহিচ্ছত্র বৃহত্তর পাঞ্চাল দেশেরই অন্তর্গত ছিল। পঞ্চালরাজ দ্রুপদই সমগ্র দেশে রাজত্ব করতেন। মহাভারতের আদিপর্বে দ্রুপদকে দ্রুপদো নাম চ্ছত্রবত্যাং নরেশ্বরঃ অর্থাৎ ছত্রবতীর অধীশ্বর বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।

পাণ্ডব ও কৌরবদের অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হলে তাঁদের শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য তাঁদের থেকে এক বিশেষ প্রকারের গুরুদক্ষিণা দাবি করেন। ইতিপূর্বে দ্রোণাচার্য পঞ্চালরাজ দ্রুপদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছেন। বাধ্য হয়েছেন নিজদেশ পঞ্চাল ত্যাগ করে পঞ্চাল জনজাতির জ্ঞাতি শত্রু কৌরবকুলে আশ্রয় নিতে। দ্রোণ দিনের পর দিন শুধু অপেক্ষা করে গিয়েছেন দ্রুপদকে উপযুক্ত উত্তর দেওয়ার সুযোগের জন্য। সে কারণেই কুরু বালকদের নিকট গুরুদক্ষিণা রূপে তিনি দ্রুপদের রাজ্য দাবি করেন।

পাণ্ডবরা যুদ্ধে পরাজিত দ্রুপদকে দ্রোণাচার্যের নিকটে নিয়ে এলে দ্রোণ বিজিত রাজ্যের অর্ধাংশ দ্রুপদকে দান করেন। স্থির হয় গঙ্গার দক্ষিণ তীরে পঞ্চালের যে অংশ সেখানে রাজত্ব করবেন দ্রুপদ এবং উত্তর তীরের অংশটি থাকবে দ্রোণাচার্যের অধিকারে।

এই উত্তর পঞ্চালের রাজধানীর নাম অহিচ্ছত্র। অহিচ্ছত্রেরই আরেক নাম ছত্রবতী। *[দ্র. অহিচ্ছত্র]*

[মহা (k) ১.১৬৬.২১; (হরি) ১.১৫৯.২১]

ছত্রোপানহ উৎপত্তি *[দ্র. জমদগ্নি]*

ছন্দ 'ছন্দস্' বা 'ছন্দঃ' শব্দটি একটা অর্থ বেদ। বেদ অর্থে 'ছন্দস্' শব্দের প্রথম প্রয়োগ হয়েছে শতপথ ব্রাহ্মণে। সেখানে বলা হয়েছে—গুরুকুলে বেদ-পড়তে আসা যে কেউ 'ছন্দস্'-এর একটি অংশ পাঠ্য (স্বাধ্যায়) হিসেবে পড়ছে, সে কিন্তু একই সঙ্গে সেই বৈদিক মন্ত্রের বিনিয়োগ বা প্রায়োগিক কর্মটাও শিখছে; যজ্ঞের আহুতি তাকে দিতে হয় কাজেই প্রতিদিনই বেদ অধ্যয়ন করতে হবে।

[শতপথ ব্রাহ্মণ (Weber) ১১.৫.৭.৩; পৃ. ৮৬৭; গোভিল গৃহ্যসূত্র (চিন্তামণি ভট্টাচার্য), ৩.৩.১৫-১৬]

□ উপরি উক্ত অংশে সম্পূর্ণ বেদ বিশিষ্ট কতগুলি ছন্দে লেখা পদ্যময়ী বাণী বলেই ছন্দস্ নামে চিহ্নিত হয়েছে সেটা বোঝা যায়। ছন্দ্ ধাতুর অর্থ প্রসন্ন করা, বেদের মন্ত্রগুলি দেবতাদের প্রসন্নতা তৈরি করত বলেই বেদের সম্পূর্ণ মন্ত্রভাগই ছন্দস্ নামে কথিত হয়েছে এবং বেদের এই কাব্যময় পদ্যভাবনা থেকেই পরবর্তীকালে বিশেষ বিশেষ ছন্দে গাঁথা গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, জগতীকে ছন্দস্ বলে পৃথক শাস্ত্রের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে—

Chandas in the Rigveda usually denotes a 'song of praise' or 'hymn.' The original sense of the word, as derived from the verb *chand,* 'to please,' was probably 'attractive spell,' 'magic hymn,' which prevailed on the gods. In a very late hymn of the Rigveda, as well as in one of the Atharvaveda, the word is mentioned in the plural (*chandāṃsi*), beside Ṛc (*ṛcaḥ*), Sāman (*sāmāni*), and Yajus, and seems to retain its original meaning, not improbably with reference

to the magical subject-matter of the Atharvaveda. From denoting a (metrical) hymn it comes to mean 'metre' in a very late verse of the Rigveda, in which the 'Gāyatrī, the Triṣṭubh, and all (*sarvā*) the metres (*chandāṃsi*) are mentioned.

[Macdonell and Keith, Vedic Index of Names and Subjects, p.266]

বেদ অর্থে 'ছন্দস্' শব্দের সবচেয়ে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন বৈয়াকরণ পাণিনি। বৈদিক শব্দের ব্যাকরণগত বিশেষত্ব বলার জন্য তিনি সব সময়েই এইভাবে সূত্র করে বলেছেন—এমনটা ছন্দে বা বেদে আছে—

'ছন্দসি চ' *[৫.১.৬৭; ৫.৪.১৪২; ৬.৩.১২৬]*, 'ছন্দসি পরে'পি' *[১.৪.৮১]*, 'ছন্দসি ঘস্' *[৫.১.১১৬]*।

আমাদের ধারণা, বেদের ভাষা যেহেতু সবটাই ছন্দোবদ্ধ কবিতা, তাই সম্পূর্ণ বেদকেই 'ছন্দস্' নামে ডাকার কোনো সমস্যা ছিল না। নিরুক্তকার যাস্কও বেদের ছন্দোবদ্ধ ভাষার নিরিখেই বেদকে ছন্দস্ বলেছেন—ছন্দোভ্যঃ সমাহৃত্য সমাহৃত্য সমাম্নাতা—অর্থাৎ বৈদিক শব্দগুলি ছন্দস্ বা বেদ থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে।

[নিরুক্ত (Sarup), ১.১. পৃ. ২৭]

□ পূর্বকালে ছন্দ বলতে যে বেদকেই বোঝাত এবং সেটা যে তার ছন্দোবদ্ধ ভাষার কারণেই বোঝাত, এই সত্যটা কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতায় একটা কাহিনীর মাধ্যমে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে—প্রজাপতি একসময় অগ্নিচয়ন করছিলেন, সেই সময় অগ্নি উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ধারালো ক্ষুরের তীক্ষ্মরূপ ধারণ করে দেবতাদের সামনে আবির্ভূত হলেন। অগ্নির এই ভীষণ উগ্ররূপ দেখে দেবতারা কেউ তার কাছে যাবার সাহস করলেন না। তারপর তাঁরা ছন্দোযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করে (অর্থাৎ ছন্দোযুক্ত মন্ত্রজপের মাধ্যমে নিজেদের সুরক্ষা বিধান করে) অগ্নির কাছে গেলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতা এবার বলেছে—বেদের ছন্দগুলির ছন্দত্ব বা বেদত্ব এইখানেই। বেদ বা ছন্দগুলিই ব্রহ্মা—

ছন্দোভিরাত্মানং ছাদয়িত্বা উপায়ন্,
তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্, ব্রহ্ম বৈ ছন্দাংসি।

[কৃষ্ণযর্জুবেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫.৬.৬.১]

□ মহাভারত যেহেতু বেদ-পরবর্তী যুগের গ্রন্থ তাই বেদ-তাৎপর্য্যময় ছন্দস্-শব্দের অর্থটা যে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মবিদ্যা বা উপনিষদের তাৎপর্যে পর্যবসিত হয়েছে, সেটাই মহাভারত গ্রাহ্য করেছে এবং একই সঙ্গে এটাও বোঝা যায় বেদ বলতে ছন্দস্ শব্দের প্রয়োগের কথাও মহাভারত জানত। মহাভারতের সনৎ-সুজাতীয় নামক উপপর্বে চতুর্বেদ, তিনবেদ, দুইবেদ বা একবেদপাঠী ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয়েছে। সেখানে সনৎ-সুজাত বলছেন—বহুশাস্ত্রের কথা বললেই তাঁকে ব্রাহ্মণ মনে করবেন না, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলে জানবেন। ঠিক এই প্রসঙ্গে ছন্দস্-শব্দ উচ্চারণ করে বলা হয়েছে—পূর্বকালে বৈদিক ঋষি অথবা মহর্ষিদের কাছে যেগুলি বলা হয়েছিল, সেগুলির নামই ছন্দস্, ফলে যাঁরা শুধুই কর্মকাণ্ড-প্রতিপাদক বেদ অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরাই শুধু ছন্দোবিৎ নন, কেননা তাঁরা বেদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকেই জানেন না। বেদ বা ছন্দোবদ্ধ বেদগুলি মনুষ্যকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, কিন্তু উপনিষদগুলি আপন বলেই ব্রহ্মপ্রতিপাদক গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। অতএব সেই মানুষকে ছন্দোবিৎ বা বেদজ্ঞ ব্যক্তি বলাই যাবে না যিনি বেদ পড়েও বেদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম-পদার্থ বুঝতে পারেন না—

ছন্দাংসি নাম দ্বিপদাং দ্বিপদাং বরিষ্ঠ/
স্বচ্ছন্দ যোগেন ভবন্তি তত্র।
ছন্দোবিদস্তেন চ তানধীত্য/
গতা ন বেদ্যস্য ন বেদ্যমার্য্যাঃ॥

বস্তুত উপনিষদগুলিও আমাদের দেশে বেদের মর্য্যাদা লাভ করেছে; ব্রহ্ম-প্রতিপাদক উপনিষদগুলিকে শ্রুতিও বলা হয়েছে বহুবার। আর পর পর দুটি মহাভারতীয় শ্লোকে কর্মকাণ্ড-প্রতিপাদক বেদকেই শুধু ছন্দ না বলে, উপনিষদ-বেদ্য ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনিও ছন্দোবিৎ—এ-কথা জানিয়ে মহাভারত বেদ এবং উপনিষদ দুটিকেই ছন্দস্ বলে প্রমাণ করতে চেয়েছে। এই সিদ্ধান্তের সূত্র কিন্তু কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতাতেই পাওয়া যাবে এবং তা পূর্বে বলা হয়েছে—ব্রহ্ম বৈ ছন্দাংসি।

[মহা (k) ৫.৪৩.৫০-৫১; (হরি) ৫.৪৩.৫০-৫১]

ভগবদ্গীতায় কিন্তু সংসার-বৃক্ষকে উর্ধ্বমূল অধঃশাখ এক অশ্বত্থবৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করার

সময়, সেই অশ্বত্থবৃক্ষের পর্ণগুলিকে ছন্দস্ বলে অভিহিত করা হয়েছে—

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি।

এখানে টীকাকার শ্রীধরস্বামী স্পষ্টতই ছন্দাংসি বলতে বেদ বা চতুর্বেদকেই বুঝিয়েছেন—

ছন্দাংসি বেদা যস্য পর্ণানি—
ধর্মাধর্ম-প্রতিপাদনদ্বারেণ ছায়াস্থানীয়ৈঃ
কর্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষস্য
সর্বজীবাশ্রয়ণীয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ
পর্ণস্থানীয়া বেদাঃ। *[ভগবদ্গীতা ১৫.১; দ্র. শ্রীধরস্বামী-কৃত সুবোধিনী টীকা]*

বেদ-পরবর্তীকালে যখন বেদপাঠ এবং বেদজ্ঞানের অধ্যয়ন-পর্বের সূচনা হল, তখন ছয়টি বেদাঙ্গের জ্ঞান অপরিহার্য্য হয়ে পড়ল। অর্থাৎ বেদ বুঝতে হলে বেদের ছয়টি অঙ্গকেও বুঝতে হবে—

ষড়ঙ্গো বেদো'ধ্যেতব্যঃ। *[দ্র. বেদাঙ্গ]*

এই ছয়টি বেদাঙ্গের একটি হল ছন্দ, অর্থাৎ বৈদিক ছন্দগুলি। নিরুক্তকার যাস্ক তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ছান্দোগ্য উপনিষদের পংক্তিটি নিশ্চয় মনে রেখেছিলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় সেই যে ছন্দোযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা দেবতারা শরীর আচ্ছাদন করে অগ্নির কাছে গিয়েছিলেন—

ছন্দোভিরাত্মানং ছাদয়িত্বা উপায়ন্।

সেটা ছান্দোগ্য উপনিষদে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—যেহেতু ছন্দগুলির দ্বারাই দেবতারা শরীর আচ্ছাদন করেছিলেন, তাই সেই আচ্ছাদন কর্মের মধ্যেই ছন্দের ছন্দস্ত্ব—যদেভিঃ অচ্ছাদয়ন্ তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্। নিরুক্তকার যাস্ক এখান থেকেই শব্দনিরুক্তি করে বলেছেন—ছন্দাংসি ছাদনাৎ—আচ্ছাদন করে বলেই এর নাম ছন্দস্। বস্তুত বিচিত্র শব্দরাশি এবং তার বাক্যগত সংস্থানে যদি শ্রুতি কটুতা বা কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য তৈরি হয়, সেই দোষ আচ্ছাদন করে শব্দরাশিকে সংহত এক নির্দিষ্ট রূপ দেয় বলেই সেই শব্দপ্রযুক্তির নাম ছন্দ। ছদ্ ধাতু থেকে ছন্দস্-শব্দের উৎপত্তি।

[ছান্দোগ্য উপনিষদ (দুর্গাচরণ), ১.৪.২; পৃ. ৬৩; নিরুক্ত (Sarup) ৭.১২; পৃ. ১৩৮]

□ এইরকমও একটা মত আছে যে, ঋষিদের কাছে ছন্দ যখন প্রকাশিত হয়েছিল, তখন তাঁরা হৃদয়ে আনন্দের যে স্পন্দন অনুভব করেছিলেন, সেই স্পন্দনই ছন্দের রূপ ধারণ করেছিল। হয়তো ছন্দের এই আহ্লাদক গুণ আছে বলেই ব্যাকরণের উণাদিসূত্রে আহ্লাদার্থক 'চদ্' ধাতু থেকে (চন্দয়তি আহ্লাদয়তি) অসুন্ প্রত্যয়ে 'চ'-বর্ণের ছ আদেশে ছন্দস্ শব্দের উৎপত্তি।

[শব্দকল্পদ্রুম পৃ. ৪৬৬]

□ ঋগ্‌বেদের মধ্যেই অসামান্য একটি পংক্তি আছে ছন্দের অগাধ বোধ সম্বন্ধে। বলা হয়েছে—এমন পণ্ডিত কে আছেন যিনি সমস্ত ছন্দের বিষয় অবগত আছেন—

কচ্ছন্দসাং যোগমাবেদ ধীরঃ?

বেদে যে সাতটি প্রধান ছন্দ আছে, সেই ছন্দগুলির প্রত্যেকটিই অক্ষর-ছন্দ। অর্থাৎ মন্ত্রের অক্ষর গুণে সেই অক্ষর-সংখ্যার নির্দিষ্ট নির্মাণেই এক একটি ছন্দ তৈরি হয়েছে। অক্ষর বলতে এখানে syllable বোঝানো হচ্ছে। এই নিয়মে প্রধানত সাতটি ছন্দের নাম আছে এবং এই সাতটি ছন্দ যে, ঋগ্‌বেদের কালেই নির্ভুলভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছিল, তা ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। এখানে বলা হয়েছে—তিনি অক্ষর যোজনা করে দ্বিপদী, চতুষ্পদী সপ্ত ছন্দ রচনা করেছেন—বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদা/অক্ষরেণ মিমতে সপ্ত বাণী। বেদের মধ্যে সেই সাতটি ছন্দ হল—গায়ত্রী (২৪ অক্ষর), উষ্ণিক্ (২৮ অক্ষর), অনুষ্টুপ্ (৩২ অক্ষর), বৃহতী (৩৬ অক্ষর), পংক্তি (৪০ অক্ষর), ত্রিষ্টুপ্ (৪৪ অক্ষর) এবং জগতী (৪৮ অক্ষর) খোদ বেদের মধ্যেই এই সাতটি ছন্দের নাম পাওয়া যায় বিভিন্ন মন্ত্রের মধ্যে। 'পংক্তি' ছন্দের বদলে 'বিরাট্' নামে একটি ছন্দের নামও পাওয়া যাচ্ছে। আর এই সাত রকম মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী ছন্দের প্রাধান্য সূচনা করে ঋগ্‌বেদ বলেছে—পণ্ডিতেরা বলেন গায়ত্রী তিন পদের ছন্দ, অতএব গায়ত্রী মাহাত্ম্য এবং ওজস্বিতায় সমস্ত ছন্দকে অতিক্রম করেছে—

গায়ত্রস্য সমিধস্তিস্র আহু/
স্ততো মহ্না প্ররিরিচে মহিত্বা।

[ঋগ্‌বেদ ১০.১১৪.৯; ১.১৬৪.২৪-২৫; ১০.১১৪.৫; ১০.১৪.১৬; ১০.১৩০.৪-৫; অথর্ববেদ ৬.৪৮.১-৩; E.V. Arnold, Vedic Metre pp.22-175]

☐ ঋগ্‌বেদ এবং অথর্ববেদের সমস্ত মন্ত্রগুলিই ছন্দোবদ্ধ, সামবেদ তো গায়কীর প্রয়োজনে আপনিই ছন্দোবদ্ধ। গদ্যে রচিত যজুর্বেদকেও ছন্দোবদ্ধ ভাবা হয় নানা কারণে। বৈদিক ছন্দের সম্বন্ধে নানান আলোচনা বেদ-পরবর্তী অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে থাকলেও পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রই বৈদিক ছন্দের সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ।

[শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র (Hillebrandt) ২য় খণ্ড, ৭.২৭.৩০, পৃ. ৩৫২; (৩য় খণ্ড), ১০.১২.৬; ১৫.২.২; ১৬.৮.৯; পৃ. ৬৩-৭৯, ২৬৬, ৩৫৭-৩৫৯]

☐ ঋগ্‌বেদে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ এবং বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের উদ্দেশে রচিত মন্ত্রগুলি প্রায় সময়েই ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দে নিবদ্ধ হয়েছে। একইভাবে অগ্নির উদ্দেশে রচিত মন্ত্রগুলি প্রায়ই গায়ত্রী ছন্দে নির্মিত। ধ্রুপদী সাহিত্যের কালে রামায়ণ-মহাভারতে যে ছন্দের সর্বাধিক প্রয়োগ, সেই অনুষ্টুপ ছন্দ বেদ-মন্ত্রের মধ্যে খানিক পরবর্তী কালে প্রচলিত হয় বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। বৈদিক অনুষ্টুপের সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারতের পরিনিষ্ঠিত অনুষ্টুপের কিছু তফাৎ আছে যদিও, কিন্তু এই দুই মহাকাব্যও কিন্তু বৈদিককালের ছন্দোবিধি সম্বন্ধে অবহিত ছিল। মহাভারতে অষ্টাবক্র মুনি বন্দী-মুনির সঙ্গে তর্ক করার সময়ে চতুষ্পদী জগতী ছন্দের এক-একটি চরণে বারোটি অক্ষর থাকবে একথা জানিয়ে বলেছিলেন—

জগত্যাঃ পাদো দ্বাদশৈবাক্ষরাণি।

আবার গায়ত্রী ছন্দের প্রাধান্যের কথা যেমন ঋগ্‌বেদের মধ্যেই বলা হয়েছে, তেমনই মহাভারতেও গায়ত্রীকে বলা হয়েছে—সমস্ত ছন্দের আদি ছন্দ হল গায়ত্রী—

গায়ত্রী ছন্দসাম্‌ আদিঃ।

[মহা (k) ৩.১৩৪.১৯; ১৪.৪৪.৭; (হরি) ৩.১১০.১৯; ১৪.৫৫.৭]

বস্তুত মহাভারত-রামায়ণের শ্লোক-রচনায় যে ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলিকে গণ-ছন্দ বলে। গণছন্দে তিনটে তিনটে অক্ষর নিয়ে এক একটি গণ হয় এবং উচ্চারণে লঘু-গুরুর সন্নিবেশে সেই গণগুলির নামকরণ করা হয়। মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণে বহুলভাবে যে অনুষ্টুপ্‌ ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তাকেই প্রথমত শ্লোক-ছন্দ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তা করেছেন আদিকবি বাল্মীকি—

শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা।

এই অনুষ্টুপ থেকেই যে কোনো ছন্দের শ্লোকই পরবর্তী কালে শ্লোক বলেই চিহ্নিত হয়েছে।

[রামায়ণ ১.২.১৮]

ছন্দক বহুশিখর বিশিষ্ট মন্দিরকে ছন্দক বলা হয়। এই ধরনের মন্দিরের মূল তোরণের উচ্চতা দ্বাদশ হস্ত সমান হলে শুভ ফলদায়ক হয়—একথা মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে। *[দ্র. প্রাসাদ]*

[মৎস্য পু. ২৬৯.৩২, ৪৯]

ছন্দোগেয় অত্রিবংশীয় একজন বংশ প্রবর্তক ঋষি।

[মৎস্য পু. ১৯৭.৫]

ছাগমুখ স্কন্দ কার্তিকেয়র ছয়টি মস্তকের মধ্যে ছাগময় মস্তকটি ছাগমুখ নামে পরিচিত।

[দ্র. কার্তিকেয়]

[মহা (k) ৩.২২৮.১০-১৩; (হরি) ৩.১০৯.১০-১৩]

ছাগল হিমালয় পর্বতের একটি শিখর। বৈবস্বত মন্বন্তরে দ্বাপর যুগে মহাদেব শ্বেত নামে আবির্ভূত হয়ে ছাগল শৃঙ্গে অবস্থান করেছিলেন। সে সময় ওই পর্বত শিখরেই তাঁর চার পুত্র তথা শিষ্যের অবস্থানের কথা পুরাণে পাওয়া যায়।

[বায়ু পু. ২৩.১১৬]

ছাগলাতীর্থ একটি পবিত্র তীর্থ। দেবী সতী ছাগলান্ততীর্থ প্রচণ্ডা নামে পূজিতা। এই তীর্থে শ্রাদ্ধকার্য অত্যন্ত শুভ ফলদায়ক।

[মৎস্য পু. ১৩.৪৩; ২২.৭২]

ছালিক্য হরিবংশেই শুধু এই ছালিক্য-গানের উল্লেখ আছে। এই গানে স্বর এবং সুরের চেয়েও যন্ত্রের বহু অনুষঙ্গ আছে। একটি নৃত্য-গীতের আসরে স্বয়ং কৃষ্ণ যখন ছালিক্য-গানের আদেশ দেন, তখন তার প্রথম সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইভাবে যে, এই গানের মধ্যে বহু প্রকারের যন্ত্রানুষঙ্গ আছে—

ছালিক্যগেয়ং বহুসন্নিধানং যদেব
গান্ধর্বমুদাহরন্তি।

পাঁচ জন যন্ত্রবিদ গন্ধর্ব একত্র হয়ে যন্ত্রযোগে বৈঠকী গান করেন—

প্রযোজিতং পঞ্চভিরিন্দ্রতুল্যৈঃ/
ছালিক্যমিষ্টং সততং নরাণাম্‌।

কৃষ্ণ এই গানের নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীণায় তান তুলেছেন নারদ, বিভিন্ন রাগের

ষড়গ্রামের সঙ্গে যুক্ত হল কৃষ্ণের হল্লীসক বাদ্য, তাতে নিষাদ ঋষভের সপ্ত স্বর বাজাতে লাগলেন কৃষ্ণ। তাই বলে কৃষ্ণের বাঁশী বাজানোও বাদ যাচ্ছে না। আর মৃদঙ্গ ইত্যাদি বাজাতে লাগলেন পাশে থাকা অর্জুন।

ছালিক্য যে প্রধানত যন্ত্রসঙ্গীত সেটা বোঝা যায় হরিবংশেরই অন্য একটি সূত্র থেকে। সেখানে মেয়েরা নিষাদ-গান্ধারের একটা সুর তুলে রাখছে বটে কিন্তু 'দেবগান্ধার' এবং 'শ্রবণামৃত'-স্বরূপ ছালিক্য-গানের আগেই যন্ত্রগুলির কথা বলা হচ্ছে—

তেতো ঘনং সসুষিরং মুরজানকভূষিতম্।
তন্ত্রীস্বরগণৈর্বিদ্ধান্ আতোদ্যাননবাদয়ন্
ততস্তু দেবগান্ধারং ছালিক্যং শ্রবণামৃতম্।

'ঘন' এখানে কাংস্যতাল (কাঁসি), সুষির হল ছিদ্রযুক্ত বাঁশী, সুরজা হল মাদল, আনক হল পটহ, আর তন্ত্রী হল রুদ্রবীণা প্রভৃতি। তবে ছালিক্য গানকে একদিকে 'দেবগান্ধার' এবং যন্ত্রানুষঙ্গের বর্ণনা সেরেই 'গান্ধার পর্যন্ত গ্রামরাগ'— আগান্ধারং গ্রামরাগম্' বলায় স্বরগ্রামের গান্ধারাবধি গানও ছালিক্যের অঙ্গ বলে মনে হয়—

Harivaṃśa 93, 22 refers to a *"devagāndhāra" chalikya* (= *chalika*) song. In the music of later centuries *devagāndhāra* is the name of a well known rāga. In the next verse the author of the Harivaṃśa defines the musical structure of the above mentioned song as *"āgāndhāragrāmarāgam"*, i.e. "being based on the grāmarāga up to the [note] gāndhāra". The fact that the song is elucidated in terms of the ancient system (i.e. the system of grāmarāgas), may indeed indicate that this musical reference dates from the older period.

[হরিবংশ (বিষ্ণু) ৮৯.৬৭-৬৯; ৮৯.৭৩-৮৩; ৯৩.২২-২৪; দ্র. Emmie Te Nijenhuis, Indian Music: History and Structure, p. 4]

ছিদ্রদর্শী পুরাকালে ঋষি কৌশিকের সাত পুত্র তাঁদের গুরুর পালিত গাভীটিকে হত্যা করার অপরাধে পরবর্তী কয়েক জন্মে উচ্চতর কুল ছেড়ে হীনকুলে অথবা বিভিন্ন পশুপাখি রূপে জন্মগ্রহ করেন। ষষ্ঠ জন্মে এঁরা সকলেই চক্রবাক পক্ষী হয়ে মানস সরোবরে জন্মেছিলেন। সেই সাতটি চক্রবাক পাখির মধ্যে ছিদ্রদর্শী একজন।

[মৎস্য পু. ২০.১৮]

জ

জগদ্ধাত্রী দেবী চণ্ডীর মতো বা দুর্গার মতো জগদ্ধাত্রী পৃথক কোনো দেবী হিসেবে পূর্বে তেমন করে পূজিত হননি। পুরাণগুলির মধ্যেও জগদ্ধাত্রী কোনো পৃথক দেবীস্বরূপে উল্লিখিত নন। তবে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দুর্গা-সপ্তশতীর মধ্যে ভগবতী চণ্ডীকে যেখানে ভগবান বিষ্ণুর মায়াশক্তি হিসেবে পরমা প্রকৃতির স্বরূপে স্তব করা হচ্ছে, সেখানে বিষ্ণুর যোগনিদ্রাস্বরূপিণী সেই বিষ্ণুমায়াই যে জগৎকে ধারণ করে আছেন, তিনিই জগদ্ধাত্রী, এই বিশেষণ-বাচক শব্দটিই অবশেষে পূর্ণদেবী স্বরূপা জগদ্ধাত্রী নামে পরিচিত হয়েছেন—

বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্।
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ॥

কিন্তু অন্যান্য পুরাণ বা মহাভারতের মধ্যে কোথাও দেবী জগদ্ধাত্রীর রূপ বা তাঁর পূজ্যতা আমরা লক্ষ্য করিনি।

বঙ্গদেশে অবশ্য অন্য ভাবনায় জগদ্ধাত্রী-দেবী পূজনীয়তা লাভ করেছেন, বঙ্গদেশের বিখ্যাত স্মৃত গ্রন্থকার রঘুনন্দন চৈতন্য মহাপ্রভুর ঈষৎপরবর্তী যোড়শ শতাব্দীর মানুষ। তিনি তাঁর অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের কোথাও জগদ্ধাত্রী পূজার উল্লেখ করেননি, কিন্তু তাঁর অন্তত দু-শো বছর আগে, আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় স্মার্তপরম্পরার অন্য এক বিখ্যাত গ্রন্থকার শূলপাণি তাঁর কালবিবেক গ্রন্থে জগদ্ধাত্রী-পূজার বিধান দিয়ে বলেছেন—কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে সিংহপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিতা জগদ্ধাত্রীর পূজা করবেন—

কার্তিকে'মল পক্ষস্য ত্রেতাদৌ নবমে'হনি।
পূজয়েত্তাং জগদ্ধাত্রীং সিংহপৃষ্ঠে নিষেদুষীম্॥

তন্ত্রসারে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ যে ধ্যানমন্ত্র লিখেছেন, তাতে তিনি 'জগদ্ধাত্রী' শব্দটা ব্যবহারই করেননি বটে, কিন্তু এই দেবী চতুর্ভুজা, তাঁর রক্তবস্ত্রের পরিধান এবং সিংহবাহিনী রূপই আগমবাগীশের দুর্গা-মন্ত্রকে জগদ্ধাত্রী দেবীর ধ্যানমন্ত্রে পরিণত করেছে। হয়তো এটাই জগদ্ধাত্রীর জনপ্রিয় হয়ে ওঠার নিদান। স্মার্ত শূলপাণি যেভাবে কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রী পূজার বিধান দিয়েছেন, সম্ভবত সম্পন্ন এবং অভিজাত বাঙালীর মানসলোকে তা আভাসিত হতে থাকবে। বিশেষত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের মতো তন্ত্রশাস্ত্রবিদ যোড়শ শতাব্দীতেই দেবী দুর্গার নামে জগদ্ধাত্রীর ধ্যানমন্ত্র লিখে ফেলার ফলে বঙ্গদেশে জগদ্ধাত্রী-পূজার উৎপত্তিটুকু বেশ একটা সাড়ম্বর কাহিনীর মধ্য দিয়ে আমাদের ধাতস্থ হয়েছে।

বঙ্গদেশ এটাই প্রচলিত কিংবদন্তী যে, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন কোনো কারণে। কারাগার থেকে যখন তাঁর মুক্তি হল, তখন মুর্শিদাবাদ থেকে নিজের ভদ্রাসন নদীয়ায় ফিরে আসছিলেন তিনি। এই যাত্রাপথে মাঝে মাঝেই তাঁর কানে ঢাকের বাদ্যি ভেসে আসছিল। নৌকায় জলপথে যেতে যেতে খোঁজ নিয়ে জানলেন—সেদিন বিজয়াদশমী। রাজার মন খুব খারাপ হল। দুর্গাপূজার কোনো সাড়ম্বর অনুষ্ঠান তিনি করতে পারেননি সে বছর। দুঃখে কাতর হয়ে রাত্রে যখন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন তখন দেবী ভগবতী তাঁর স্বপ্নে দেখা দিলেন চতুর্ভুজা জগদ্ধাত্রী-রূপে এবং তাঁকে আদেশ করলেন—ঠিক এক মাস পরে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে তাঁর পূজা করার জন্য। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর স্বপ্নে দেখা জগদ্ধাত্রীর প্রতিমা নির্মাণ করালেন উপযুক্ত শিল্পীকে দিয়ে এবং সাড়ম্বরে পূজা সম্পন্ন করলেন নবমীতে।

এই কিংবদন্তীর বার্তা হল—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই তাহলে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন হয়েছে এবং সেটা খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীই হওয়া উচিত। কিন্তু লক্ষণীয় এখানে যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বপ্নদৃষ্ট জগদ্ধাত্রী মূর্তির চেহারা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের ধ্যানমন্ত্রের মতো। জগদ্ধাত্রী মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার মতোই সিংহবাহিনী, কিন্তু দশভূজা তিনি নন, তিনি চতুর্ভুজা, এখানে মহিষাসুরের কোনো অবস্থান নেই, কার্তিক-গনেশও নেই। লক্ষ্মী-সরস্বতীও

নেই, কিন্তু আছেন দুই সখী জয়া এবং বিজয়া দেবীর বাঁ দিকের দুই হাতে শঙ্খ এবং শার্ঙ্গধনু, ডান দুই হাতে ওপরে-নীচে চক্র এবং পাঁচটি বাণ একত্রে।

জগদ্ধাত্রী পূজার রীতিও দুর্গাপূজার মতো, তবে ষষ্ঠীতে বোধনও হয় না, নবপত্রিকা বা কলা-বউয়েরও কোনো উপস্থিতি নেই। জগদ্ধাত্রী পূজা করাটা যথেষ্ট কষ্টকর কেননা, দুর্গাপূজার রীতি অনুসারে সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী তিন তিথির পূজাই নবমী তিথিতে হয়। এখানে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বপ্নতিথিটিও পূর্বভাবিত স্মার্ত শূলপাণির নির্দিষ্ট তিথি হওয়ায় আমরা মন্তব্য করতে পারি—জগদ্ধাত্রী পূজার প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন বাঙালি শূলপাণি এবং সেটা চৈতন্য মহাপ্রভু আসার পূর্বে। বাঙালীর সেই পূজা-সংকল্প অনুষ্ঠানে পরিণত করার জন্য কৃষ্ণচন্দ্রের মতো একজন অভিজাত সম্পন্ন গৃহস্থের প্রয়োজন ছিল। ফলে তাঁরই মাধ্যমে জগদ্ধাত্রী পূজা বঙ্গদেশে পরিচিতি পায়। শোনা যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুপ্রেরণাতেই তাঁর বন্ধু ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাঁর আপন বাসস্থান চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো আরম্ভ করেন। তদবধি কৃষ্ণচন্দ্রের স্থান কৃষ্ণনগরে এবং ইন্দ্রনারায়ণের চন্দননগর—এই জায়গাতেই জগদ্ধাত্রী পুজো হয় সবচেয়ে বেশী। এই পূজার জনপ্রিয়তা সেইকালেই তৈরি হয় বলে জগদ্ধাত্রী পূজা অন্যত্রও পালিত হয় সাড়ম্বরে। তবে জগদ্ধাত্রী পূজা প্রধানত বাঙালীরই পূজা।

[শূলপাণির উল্লিখিত শ্লোকটি পঞ্চানন তর্করত্নের লেখা 'শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী-পূজা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। এই প্রবন্ধ সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' (১৩৪০ সাল) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এটি যেখানে সংকলিত হয়েছে, সেই গ্রন্থ—অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত বাঙালীর পূজাপার্বণ, (কলিকাতা বিশ্বদ্যিালয়:কলিকাতা, ১৯৫০) পৃ. ৬৫-৭১; বৃহৎ-তন্ত্রসার (পঞ্চানন), পৃ. ৪৮৭-৪৮৮]

জঙ্গ কেতুমাল ভূখণ্ডের অন্তর্গত জনপদগুলির মধ্যে একটি। *[বায়ু পু. ৪৪.১৪]*

জটামালী১ ভবিষ্যত চতুর্দশ কল্পে উনিশতম দ্বাপরে মহর্ষি ভরদ্বাজ যখন ব্যাস হয়ে জন্মাবেন তখন মহাদেব জটামালী নামে হিমালয় পর্বতে আবির্ভূত হবেন। জটামালীর নামানুসারে হিমাদ্রি শিখর সে সময় জটায়ু পর্বত রূপে খ্যাতি লাভ করবে। জটামালীর চারজন বিদ্বান পুত্রের জন্ম হবে। তাঁরা হলেন হিরণ্য, কৌশিল্য, কাক্ষীব ও কুথুমি। এঁরা সকলেই ভবিষ্যতে মাহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হয়ে রুদ্রলোক লাভ করবেন।

[বায়ু পু. ২৩.১৮৬-১৮৮]

জটামালী২ গয়াক্ষেত্রে গয়াসুরের দেহের উপর ব্রহ্মা এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। সেই যজ্ঞানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জটামালী একজন। *[বায়ু পু. ১০৬.৩৩-৩৯]*

জটামালী৩ স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে কয়েকজন যোগী পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন শিব-ধর্মের উপদেশ দানের জন্য। সেই সকল যোগীদের মধ্যে জটামালী একজন।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ৪০.২১১-২১৬]

জটামালী৪ *[দ্র. কুথুমি১]*

জটায়ু বিনতাপুত্র অরুণের ঔরসে তাঁর পত্নী শ্যেনীর গর্ভে জটায়ুর জন্ম হয়। জটায়ু অরুণপুত্র সম্পাতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে জটায়ু নিজেই নিজের পরিচয় রামকে দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে, তিনি রামচন্দ্রের পিতা দশরথের বন্ধু। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা জটায়ুর পরিচয় জানতে পেরে পিতা দশরথের প্রতি তাঁরা যে শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, অনুরূপ শ্রদ্ধার সঙ্গে জটায়ুকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৬.৬৯-৭০; হরি ১.৬১.৭৪; রামায়ণ ৩.১৪.৩, ৩৩]

□ জটায়ু এবং সম্পাতি একবার ইন্দ্রকে জয় করতে গিয়েছিলেন। দেবতাদের পরাজিত করে আকাশপথে ফিরে আসার সময় তাঁরা সূর্যের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। সূর্যের প্রখর তাপে জটায়ু পীড়িত এবং অবসন্ন হয়ে পড়লে সম্পাতি তাঁর পাখা দুটি দিয়ে ছোটো ভাই জটায়ুকে ঢেকে দিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড তাপে সম্পাতির পাখা পুড়ে গেল। তিনি আহত অবস্থায় বিন্ধ্যপর্বতে পতিত হলেন। জটায়ু অবসন্ন অবস্থায় জনস্থান অরণ্যে পতিত হন। এরপর জটায়ু এবং সম্পাতির আর কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। *[রামায়ণ ৪.৫৮.৪-৭]*

রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সীতা কাতর স্বরে জটায়ুকে সম্বোধন করে বলতে থাকেন—মাননীয় জটায়ু! আপনি আমার হরণের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে রাম

এবং লক্ষ্মণকে জানান। সীতার কাতরোক্তি শুনে জটায়ু তাঁকে উদ্ধার করার জন্য ছুটে আসেন এবং রাবণকে আক্রমণ করেন। রাবণের সঙ্গে জটায়ুর তুমুল যুদ্ধ হয়। শেষে রাবণ জটায়ুর দুটি পাখা, পা এবং পার্শ্বদেশ ছেদন করলে আহত, মৃতপ্রায় জটায়ু ভূমিতে পতিত হন।

রাম ফিরে এসে সীতাকে দেখতে না পেয়ে বনের মধ্যে তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে মৃতপ্রায় জটায়ুকে দেখতে পান। রাম তাঁকে সীতার হরণ সংবাদ জিজ্ঞাসা করলে রাবণ বিশ্রবার পুত্র এবং কুবেরের ভ্রাতা—এইটুকু কথা মাত্র বলে জটায়ু প্রাণত্যাগ করেন। রামচন্দ্র, যেভাবে নিজের পিতার শ্রাদ্ধ করা হয়, ঠিক সেইভাবে সমমর্যাদায়, শোকার্তভাবে জটায়ুর অন্ত্যেষ্টি ও শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন।

[রামায়ণ ৩.৪৯.৪০; ৩.৫০-৫১ অধ্যায়; ৩.৬৭ অধ্যায়, ৩.৬৮.১-১৬]

জটালিকা স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.২৩; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ২৩ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৯)]

জটিলা প্রাচীনকালে রমণীদের বহুস্বামী গ্রহণের কথা বলতে গিয়ে যুধিষ্ঠির জটিলা নামে জনৈকারমণীর কথা বলেছেন—যিনি সাতজন মুনিকে বিবাহ করেছিলেন এবং পতিরূপে লাভ করেছিলেন। এই জটিলা 'গৌতম' বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে মহাভারতের আদিপর্বে কথিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.১৯৬.১৪; (হরি) ১.১৮৯.১৪]

জটী১ জটাধারী সাধক বা সাধিকা। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে দেবগুরু বৃহস্পতি কলিযুগে বেদাচার অমান্যকারী সম্প্রদায় যেমন—নগ্ন, জটী ইত্যাদির লক্ষণ সমূহ বিশদে বর্ণনা করেছেন। সেই প্রসঙ্গেই জটী শব্দটির উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায়—

বৃথা জটী বৃথা মুণ্ডী বৃথা নগ্নশ্চ যো দ্বিজঃ।

তবে কলিযুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে জটীদের কথা উঠে এলেও ব্রাহ্মণবাদী জটাধারী ব্যক্তিদের অবশ্যই 'জটী' সম্প্রদায় রূপে এখানে চিহ্নিত করা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র বেদাচার অমান্যকারীদের কথাই বলা হচ্ছে।

দ্বাদশ শতাব্দীর দার্শনিক নেমিচন্দ্র জটী বা জটিল নামে সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন যাঁরা বেদাচার বহির্ভূত হীন সম্প্রদায় বলে বিবেচিত হতেন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৪.৪০; A.L. Basham, History and Doctrines of The Ājīvikas, London, Luzac & Company Ltd. 1951, p. 181]*

জটী২ বিঘ্নেশ্বর গণেশের অন্যতম নাম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.৪৪.৭০]

জটী৩ রসাতলবাসী একজন নাগ। রাবণের কাছে পরাস্ত হয়ে জটী তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন।

[রামায়ণ ৬.৭.৯]

জটেশ্বরতীর্থ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পুণ্যতীর্থ। যে ভক্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে, জটাশৃঙ্গে স্নান করে জটেশ্বরকে দর্শন করেন—তাঁর সকল পাপ ধ্বংস হয়। এই তীর্থে যেতে হয় রৌদ্রের সময়। এইভাবে কষ্টকর পথে গিয়ে শিবকে দর্শন করলে পিতৃ ও মাতৃকুল—দুইই উদ্ধার করতে পারা যায়।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ৩১.৪-৫]

জঠর১ মেরু পর্বতের পূর্বদিকে অবস্থিত একটি পর্বত। এটি দৈর্ঘ্যে আঠারো হাজার যোজন এবং প্রস্থে দুই হাজার যোজন। পবিত্র নদী শীতা শীতান্ত পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে বহু পথ অতিক্রম করে জঠর শৈলে পতিত হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৫.১৬.২৭; বায়ু পু. ৩৫.৮; ৪২.২০; বিষ্ণু পু. ২.২.৪১]

জঠর২ প্রাচীন ভারতের একটি জনপদ।

[মহা (k) ৬.৯.৪২; (হরি) ৬.৯.৪২]

জতুগৃহ 'জতু' শব্দের ব্যাপক অর্থ হল নির্যাস। কোষগ্রন্থ 'শব্দকল্পদ্রুমে' 'জতু' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—

জায়তে বৃক্ষাদিভ্য ইতি।

অর্থাৎ কী না বৃক্ষ প্রভৃতি থেকে যার জন্ম হয়। লঘু অর্থে এই 'জতু' বলতে লাক্ষা বোঝায়। সেক্ষেত্রে জতুগৃহ বলতে বোঝাবে লাক্ষাগৃহ। তবে মহাভারতে যে জতুগৃহের বর্ণনা আমরা পাই, তা যে শুধুমাত্র লাক্ষা দিয়ে তৈরি হয়েছিল—এমনটা কিন্তু নয়, অনেক রকম দাহ্য পদার্থই সেই গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল। তবে সে বর্ণনায় যাওয়ার আগে লাক্ষাগৃহ নির্মাণের পিছনের ইতিহাসটুকু একটু বলা দরকার।

মহাভারতের মূল কাহিনীর পরম্পরা অনুসারে সময়টা তখন মোটামুটি এরকম—কুরুরাজ-পরিবারের রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা শেষ হওয়ার

পর এক বছর কেটে গেছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও একরকম বাধ্য হয়েই ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছেন। ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরের জনপ্রিয়তা ক্রমশই বেড়ে চলেছে, এদিকে অর্জুনও দিগ্বিজয় করে হস্তিনাপুরের তথা যুবরাজ যুধিষ্ঠিরের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। পাণ্ডবদের এই উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লক্ষ্য করে রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধন একদিকে যেমন ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছেন, অন্যদিকে এই শঙ্কাও মনের মধ্যে বাসা বাঁধছে যে, এরকম চলতে থাকলে ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর বংশধরদের কুরু সিংহাসন লাভের পথ অচিরেই চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। নিজের এই ঈর্ষা আর দুর্ভাবনার কথা রাজা ধৃতরাষ্ট্র, নিজের বিশ্বস্ত মন্ত্রী কণিককেও জানিয়েছেন। কণিক পরামর্শ দিয়েছেন—শত্রুকে চিরতরে বিনষ্ট করাই হল নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভের একমাত্র পথ। এবং এক্ষেত্রে কে আত্মীয়, সে স্বজন—এসব ভেবে মায়া দয়া দেখানোর কোনো মানেই হয় না। অনেক টানাপোড়েনের পর ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের সমূলে বিনাশ করার ব্যাপারে খানিকটা সম্মত হয়েছেন বটে, তবে এ ব্যাপারে ষড়যন্ত্রের ভার নিজে না নিয়ে দুর্যোধন এবং তাঁর মন্ত্রণাদাতা কর্ণ শকুনিদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। এঁরা অনেক পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, বারণাবতে একটা জতুগৃহ বানানো হবে এবং তারপর কুন্তীসহ পাণ্ডবদের সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ব্যাপারটা হবে অনেকটা নির্বাসনে পাঠানোর মতোই, কিন্তু সেটা ঠিক লোকসমক্ষে প্রচার হবে না। দেখানো হবে, যেন পাঁচ পাণ্ডব ভাই কুন্তীকে নিয়ে আনন্দভ্রমণে গেছেন বারণাবতে। তারপর সুবিধামতো একদিন রাতের অন্ধকারে সেই জতুগৃহে আগুন লাগানো হবে। এমনভাবে, যাতে পাণ্ডবরা সবাই ঘুমের মধ্যেই মারা যান, কেউ জীবন্ত বেরিয়ে আসতে না পারেন।

দুর্যোধনের পরম বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী পুরোচন। দুর্যোধন তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার ভার তুলে দিলেন এই পুরোচনের ওপর। পুরোচন দুর্যোধনের আদেশে এবং বলাবাহুল্য অর্থলোভে বারণাবতে জতুগৃহ নির্মাণের এবং পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন।

দুর্যোধন পুরোচনকে সবিস্তারে বোঝালেন নিজের পরিকল্পনার কথা—বারণাবতে পৌঁছে তুমি একটি চকমিলান বাড়ি তৈরি করবে। সে বাড়ির মধ্যে দানধ্যানের উপযুক্ত মণি-রত্ন-ধনসম্পদ যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে ক্ষত্রিয়ের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র—

আয়ুধাগারমাশ্রিত্য কারয়েথা মহাধনম্।

মনেরেখ, এই বাড়িতেই রাজরানী কুন্তীসহ পাণ্ডবরা থাকবেন, অতএব রাজবাড়ির আবরু এবং আভিজাত্য যাতে বজায় থাকে, সেইভাবে বাড়ির চারদিকে একটা প্রাচীরও তৈরি করে দিও। এবার আসল কথা—বাড়ি তৈরির উপকরণের সঙ্গে মিশিয়ে দিও দাহ্যবস্তু। যা কিছু আছে, যাতে সহজে আগুন ধরে যেমন শনগাছ, ধুনো—

শণ-সর্জরসাদীনি যানি দ্রব্যানি কানিচিৎ।

এসব মিশিয়ে দিও বাড়ি তৈরির মশলার সঙ্গে। বাড়ির ভিতরে বাইরে প্রলেপ দেবার সময় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে অনেকটা করে ঘি, তেল, চর্বি, আর গালা—

সর্পিস্তৈলবসাভিশ্চ লাক্ষায়া চাপ্যনল্পয়া।

এতে বাড়ির রং সুন্দর হবে, চকচকেও হবে। বাড়ির চারদিকে উঁচু উঁচু বেদি তৈরি করাবে বসবার জন্য। তার ভিতরেও থাকবে শণ, তেল, ঘি, গালা এবং সে বেদি বানানোর কাঠ দেবে এমন যাতে সহজে আগুন ধরবে।

দুর্যোধন জানতেন যে, নতুন বাড়িতে ঢোকার সময় রাজারাজড়ারা সাধারণত বিশেষজ্ঞ দিয়ে বাড়ি পরীক্ষা করিয়ে নেন। এখানে হয়তো তেমন জোরদার কোনো পরীক্ষা করাবেন না যুধিষ্ঠির। কিন্তু ওপর ওপর পরীক্ষা করলে যাতে বাড়ি তৈরির মশলাটি না বোঝা যায়, তার জন্য পুরোচনকে সাবধান হতে বললেন দুর্যোধন—

যথা চ তন্ন পশ্যেরন্ পরীক্ষন্তো'পি পাণ্ডবাঃ।

দুর্যোধন পুরোচনকে বারণাবতে এমনভাবে থাকতে বলছেন, যেন তিনি পাণ্ডবদের 'কেয়ার টেকার' হিসেবেই থাকবেন। দুর্যোধন বলেছেন—ওই বড়ো বাড়ির সঙ্গে তুমি নিজের জন্যও অমনই একটা ঘর বানাবে পাশেই আর সেই ঘরও তৈরি হবে ঐ একই উপকরণ দিয়ে যাতে পাণ্ডবদের মনে আপাতভাবে কোনো সন্দেহ দানা না বাঁধে। বাড়ির মধ্যে দামি আসবাবপত্র, বেড়াতে যাবার জন্য ভাল রথ ইত্যাদির ব্যবস্থাও রাখতে বললেন দুর্যোধন।

সবশেষে বললেন—তারপর যখন একদিন বুঝবে, পাণ্ডবরা যথেষ্ট বিশ্বাস করছেন তোমাকে এবং যখন দেখবে তাঁরা বিশ্বস্তভাবে নিরুদ্বেগে বাড়ির মধ্যে ঘুমোচ্ছেন— সেইরকম একটি দিনে সুযোগ বুঝে সেই বাড়িতে আগুন দেবে তুমি। জনপদবাসীরা এটাকে দুর্ঘটনা বলেই ভাববে, অন্তত পাণ্ডবদের মৃত্যুর জন্য আমাদের কেউ দায়ী করবে না—

ন গর্হয়েয়ুরস্মান্ বৈ পাণ্ডবার্থায় কর্হিচিৎ।

দুর্যোধনের এই পরিকল্পনারই ফসল হল বারণাবতের জতুগৃহ বা লাক্ষাগৃহ, আগাগোড়া দাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি একটি বাড়ি। তবে এই বাড়ি তৈরির সময়েই এই ষড়যন্ত্রের আদ্যোপান্ত যিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন তিনি কুরুরাজ পরিবারের অন্যতম সদস্য তথা কুরুসভার অন্যতম প্রধান মন্ত্রী বিদুর। বারণাবতে যাবার আগে বিদুরই যুধিষ্ঠিরকে দুর্যোধনের ষড়যন্ত্র বিষয়ে সাবধান করে দেন। বারণাবতের সেই জতুগৃহ থেকে পাণ্ডবরা যাতে সুরক্ষিত ভাবে বেরিয়ে যেতে পারেন তার জন্যও বিদুরই এক বিশ্বস্ত খনককে পাঠিয়ে দেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। সেই খনক বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্য এক সুড়ঙ্গ তৈরি করে দেন পাণ্ডবদের। প্রায় ছয়মাস সেই জতুগৃহে বাস করার পর সুড়ঙ্গ নির্মাণ শেষ হলে একদিন রাত্রে পাণ্ডবরা নিজেরাই সেই জতুগৃহে আগুন লাগিয়ে সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে যান। সেই জতুগৃহে অগ্নিকাণ্ডে মারা পড়েন পুরোচন আর মারা গিয়েছিলেন পাণ্ডবদের আয়োজন করা ভোজসভায় উপস্থিত এক নিষাদজাতীয়া রমণী এবং তাঁর পাঁচ পুত্র। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে সে রাত্রে সে বাড়িতেই অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। হয়তো পাণ্ডবরাও চেয়েছিলেন তেমনটিই যাতে লোক তাদের মৃতদেহকেই কুন্তী এবং পাণ্ডবদের মৃতদেহ বলে মনে করে। যাই হোক, পাণ্ডবদের সেই পরিকল্পনা সফল হয়েছিল। লোকে প্রাথমিক ভাবে সেই নিষাদী এবং তাঁর পাঁচ পুত্রকেই কুন্তী এবং তাঁর পঞ্চপুত্রের শবদেহ বলে মনে করেছিল।

লক্ষণীয়, পুরোচনের দ্বারা নির্মিত এই জতুগৃহের নাম 'শিব' বা শিবভবন, 'শিব' শব্দের অর্থ মূলত মঙ্গলজনক বা কল্যাণকারী। তবে আমরা ভগবান শিবকে প্রলয়কর্তা বা জগতের সংহর্তার ভূমিকাতেই কল্পনা করে থাকি। হয়তো সেই ভাবনা থেকেই পঞ্চপাণ্ডবের মৃত্যুলীলার মঞ্চটির নাম 'শিবভবন' রাখা হয়ে থাকবে।

[মহা (k) ১.১৪১.২৫-৬৮; ১.১৪২.৬-২৪; ১.১৪৩.১-১৮; ১.১৪৪.২-১৯; ১.১৪৫.২০-৩৪; ১.১৪৬.১-১১; ১.১৪৬.১৩-৩১; ১.১৪৭.১-২১; ১.১৪৮.১-১৮; (হরি) ১.১৩৬.২৫-৬২; ১.১৩৭.১-৮; ১.১৩৮.২-১৯; ১.১৩৯.২০-৩৪; ১.১৪০.১-১১; ১.১৪০.১৩-৩১; ১.১৪১.১-২১; ১.১৪২.১-১৮]

জতুনাভ একজন যক্ষ। তিনি মণিবরের পিতা।

[বায়ু পু. ৬২.১৮৩]

জতৃণ পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি জতৃণ-এর বংশ তার মধ্যে একটি। জতৃণ অঙ্গিরার বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৬.৩৯]

জনক১ মহাভারতে আমরা অনেকগুলি জনকের নাম পাই—জনক জনদেব, করাল জনক, জনক ধর্মধ্বজ, জনক ঐন্দ্রদ্যুম্নি, জনক বসুমান ইত্যাদি। রামায়ণে সীরধ্বজ জনকের কথা পাই এবং পুরাণে জনকের বংশে যাঁরাই বংশধর তাঁরা সবাই জনক নামে পরিচিত। এদের সবার ওপরে অবশ্য আছেন জনক বৈদেহ বা বিদেহ জনক, যিনি উপনিষদের কাল থেকে আত্মতত্ত্বজ্ঞানী রাজর্ষি। বিদেহ বংশীয় 'জনক' নামে প্রসিদ্ধ রাজারা সকলেই পরমজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞ হিসেবে প্রসিদ্ধ মূলত 'জনক' নামেই এঁরা পরিচিত হলেও যেহেতু এঁদের প্রত্যেকের আলাদা নাম, পরিচয় এবং অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় সেহেতু আমরা প্রত্যেকের জীবন এবং কীর্তির কথা পৃথক ভাবে আলোচনা করব।

□ আমরা বিষ্ণু পুরাণে বৈদেহ জনকের জন্ম বৃত্তান্ত শুনেছি। বলা হয়েছে—সূর্যবংশীয় বিখ্যাত রাজার পুত্র ছিলেন নিমি। একটি যজ্ঞের আয়োজন করতে গিয়ে মহর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়। তাতে বশিষ্ঠ এক সময় তাঁকে 'বিদেহ' অর্থাৎ দেহবিহীন হবার অভিশাপ দেন। সরল ভাষায় এটি মৃত্যুর অভিশাপ যাতে আত্মা থেকে শরীর বিশ্লিষ্ট হয়। বশিষ্ঠের শাপে অপুত্রক নিমির দেহ প্রাণহীন হবার পর ঋষিরা তাঁর শরীর অরণি-কাষ্ঠের মধ্যে মন্থন করলেন। তাতে তাঁর পুত্র জন্মাল—এইভাবে

পিতার মৃতদেহই পুত্রোৎপত্তিতে কারণ বা 'জনক' ছিল বলেই নিমির পুত্রের নাম হল জনক—

জননাজ্জনক সংজ্ঞাঞ্চাসাববাপ।

রাজা নিমি দেহহীন বা বিদেহ ছিলেন বলেই তিনি বৈদেহ জনক নামেও খ্যাত, আবার মন্থন বা মথন থেকে তাঁর সৃষ্টি হয়েছিল বলে তাঁর অন্য নাম মিথি—

অভূদ্ বিদেহো'স্য পিতেতি
বৈদেহো, মথনান্মিথিরভূৎ।

এই মিথি শব্দ থেকে হয়তো বা এই বিদেহ জনক মৈথিল জনকও বটে।

[বিষ্ণু পু. ৪.৫.৫-১২; রামায়ণ ১.৭১.৪; বায়ু পু. ৮৯.৩-৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. ২.৬৪.১-৫]

□ বৈদেহ জনক আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ রাজর্ষি ছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বারবার জনক বৈদেহের প্রসঙ্গ এসেছে আত্মজ্ঞানী হিসেবে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেষ্টা হিসেবে। এতটাই সেই খ্যাতি যে, গর্বিত স্বভাবের গার্গ্য বালাকি যখন কাশীর রাজা অজাতশত্রুকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করতে চাইলেন, তখন অজাতশত্রু বলেছিলেন— এই একটা কথার জন্যই আমি তোমাকে এক হাজার গোরু দিতে পারি। কেননা আত্মবিদ্যার বক্তা এবং শ্রোতা হিসেবে সকলেই 'জনক-জনক' বলে দৌড়োয়—

জনকোজনক ইতি বৈ জনা ধাবন্তীতি

—আরে আমরাও তো আছি। অজাতশত্রুর মুখে বৈদেহ জনকের সমন্ধে এই জনবাদ বৃহদারণ্যক উপনিষদে নানা জায়গায় বৈদেহ জনকের উল্লেখ থেকেই প্রমাণ হয়। হয়তো বা এই জনকের কথাই ভগবদ্গীতায় উচ্চারণ করেছেন কৃষ্ণ—

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতা জনকাদয়ঃ।

[ভগবদ্গীতা ৩.২০; বৃহদারণ্যক উপনিষদ (দুর্গাচরণ) ২.১.১; ৪.১.১-৭; ৪.২.১; ৪.২.৪; ৪.৩.১; ৪.৪.৭; ৫.১৪.৮]

জনক২ শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠির শর-শয়ান ভীষ্মকে প্রশ্ন করেছিলেন—কীভাবে মোক্ষজ্ঞানী মিথিলাধিপ জনক সমস্ত ভোগ ত্যাগ করে মোক্ষলাভ করেছিলেন। তাতে ভীষ্ম সাংখ্যাচার্য পঞ্চশিখের সঙ্গে জনক-জনদেবের কথোপকথন শুনিয়েছিলেন—

জনকো জনদেবস্তু মিথিলায়াং জনাধিপঃ।

জনকবংশীয় জনদেবের মিথিলার রাজসভায় শাস্ত্রচর্চার একটা বড়ো কেন্দ্র ছিল। শত শত বিদ্বান এবং আচার্য-স্থানীয় মানুষ এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় অংশ নিতেন। রাজর্ষি জনক জনদেবের রাজসভা সব সময় শাস্ত্রবিচারে মুখর থাকত। আস্তিক এবং নাস্তিক দর্শনের মহা-মহাপণ্ডিত সমান-ভাবে তর্ক চালিয়ে এই রাজসভাতেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন—

তস্য স্ম শতমাচার্যা বসন্তি সততং গৃহে।
দর্শয়ন্তঃ পৃথগ্ধর্মান্ নানাশ্রম-নিবাসিনঃ॥

জনক৩ পিতামহ ভীষ্মের কাছে যুধিষ্ঠির অক্ষর এবং ক্ষর পদার্থের স্বরূপ জানতে চেয়েছিলেন। তাতে মহামতি ভীষ্ম করাল নামে এক জনকের সঙ্গে বশিষ্ঠ মুনির তত্ত্বালোচনার কথা শুনিয়েছিলেন—

বশিষ্ঠস্য চ সংবাদং করাল-জনকস্য চ।

[মহা (k) ১২.৩০২.৭; (হরি) ১২.২৯৫.৭]

জনক৪ মহাভারতের শান্তিপর্বে ধর্মধ্বজ জনকের কথা তাত্ত্বিক দিক যেমন গভীর, সুলভা নামে এক সিদ্ধযোগিনীর সঙ্গে তাঁর যে প্রক্রিয়ায় কথোপথন হয়েছিল, সেটা যোগসিদ্ধির দিক থেকেও রোমাঞ্চকর। এখানে ধর্মধ্বজ জনককে সংন্যাসধর্মতত্ত্বজ্ঞ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন ছিল—গার্হস্থ্য ধর্ম ত্যাগ না করেও মোক্ষতত্ত্ব কেউ জানতে পারেন কিনা? তারই উত্তরে ভীষ্মের মুখে জনক-সুলভা সংবাদ বিবৃত হয়েছে—

জনকস্য চ সংবাদং সুলভায়াশ্চ ভারত॥
সংন্যাস-ফলিকঃ কশ্চিদ্বভূব নৃপতিঃ পুরা।
মৈথিলো জনকো নাম ধর্মধ্বজ ইতি শ্রুতঃ॥

[মহা (k) ১২.৩২০.৩-৪; (হরি) ১২.৩১০.৩-৪]

□ সম্পূর্ণ মহাভারতে যত শাস্ত্রচর্চার আসর বসেছে, তার মধ্যে ধর্মধ্বজ জনক এবং সুলভার শাস্ত্রবিচার বোধহয় সবচেয়ে চমকপ্রদ। সুলভা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী ছিলেন এবং ছিলেন যোগশাস্ত্রজ্ঞা যোগিনী। তিনি মোক্ষবিষয়ক আত্মবিদ্যার আলোচনা করে দিন কাটাতেন এবং ঘুরে বেড়াতেন দেশে দেশে। মিথিলায় জনক ধর্মধ্বজের রাজসভায় প্রবেশ করেছিলেন ভিক্ষুকীর বেশে। চরম যোগৈশ্বর্য্য এবং অধ্যাত্মজ্ঞান তাঁর করায়ত্ত ছিল বলেই তাঁর চেহারা এবং রূপের মধ্যেও তা প্রকট হয়ে উঠত। রাজা জনক স্থিতধী নির্বিকারচিত্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর

অসামান্য রূপলাবণ্য এবং যোগজ দিব্যকান্তি দর্শন করে আশ্চর্য হয়ে যান। সুলভা জনকের কাছে নিজের পরিচয় দেবার সময় বলেছিলেন—আমি প্রধান নামে এক রাজর্ষির বংশে জন্মেছি। আমি ব্রহ্মচারিণী এবং আমি আমার উপযুক্ত স্বামী খুঁজে পাইনি। আমি অনেক গুরুর কাছ থেকে বিদ্যা গ্রহণ করেছি এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য পালন করছি এতকাল। আমি একা-একাই ঘুরে বেড়াই। আমি লোকমুখে শুনেছি যে, আপনি মোক্ষধর্মে সিদ্ধিলাভ করেছেন। সেইজন্যই আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য মিথিলায় এসেছি। জনক ধর্মধ্বজ তাঁকে যথোচিত অভ্যর্থনা এবং আতিথেয় সৎকারের পর যোগিনী সুলভা রাজা জনকের যোগশক্তি পরীক্ষা করার জন্য আপন যোগ-বন্ধন প্রয়োগ করে নিজের মনো-বুদ্ধি-চিত্ত ইত্যাদি বৃত্তিকে রাজার মনো-বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করলেন এবং রাজার সমস্ত আন্তর বৃত্তি নিশ্চলা করে দেবার চেষ্টা করলেন। রাজা ধর্মধ্বজ জনকও সাংখ্য-যোগের সাধনে পরম অভিজ্ঞ ছিলেন বলেই যোগিনী সুলভার যোগ-বন্ধনে এতটুকুও বিচলিত হলেন না। তিনি নানান অপ্রিয় প্রশ্ন করে সুলভাকে বিব্রত করতে লাগলেন, একই সঙ্গে তাঁর যোগ-সাধনের পরীক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে মোক্ষশাস্ত্রে সুলভার অসামান্য পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হলেন জনক। শ্রদ্ধায় তাঁর মাথা নুয়ে এল সুলভার কাছে। জনক নিজেও তো কম যোগসিদ্ধ নন। নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছিলেন—ঋষি পরাশরের সমান পণ্ডিত মহাত্মা পঞ্চশিখের শিষ্য আমি। সাংখ্য, যোগ, রাজনীতিশাস্ত্র তো বটেই জ্ঞানকাণ্ড, কর্মকাণ্ড এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি সমস্ত কর্মের চরম সিদ্ধি আমি লাভ করেছি। সেই ধর্মধ্বজ জনক আজ অবাক হয়েছেন যোগিনী সুলভার যোগসিদ্ধি দেখে। সুলভা বলেছেন—যেমন পুরনগরের ব্যস্ত জীবনযাত্রার মধ্যেও ভিক্ষুক কোথাও একটা শুয়ে রাত কাটিয়ে দেয়, তেমনই একটা রাত্রি আমি যোগবন্ধনে আপনার শরীরের মধ্যে বাস করে গেলাম—

তথাহং ত্বচ্ছরীরে' স্মিন্নিমাং বৎস্যামি শর্বরীম্।

[মহা (k) ১২.৩২০ অধ্যায়; সুলভা-জনক-সংবাদ; (হরি) ১২.৩১০ অধ্যায়]

জনক$_{৫}$ কহোড় ঋষির পুত্র অষ্টাবক্র এবং জনকের কথোপকথনের সময় বালক-জ্ঞানী অষ্টাবক্র ঐন্দ্রদ্যুম্নি জনকের নাম করেছেন। অষ্টাবক্র এখানে বরুণের পুত্র বন্দী নামে মহাপণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক-বিতণ্ডা করার জন্য এসেছিলেন। সেখানে দ্বারপাল তাঁর প্রবেশপথ রুদ্ধ করলে স্বয়ং রাজা তাঁর আগমন-পথ মুক্ত করে দেন। এই রাজাকে ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র ঐন্দ্রদ্যুম্নি জনক বলেই উল্লেখ করেছেন অষ্টাবক্র। টীকাকার নীলকণ্ঠ ঐন্দ্রদ্যুম্নিকে জনক বলেই চিহ্নিত করেছেন।

[মহা (k) ৩.১৩৩.২-৪; (হরি) ৩.১০৯.২-৪]

জনক$_{৬}$ সাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব পুরুষকে আরো একটু প্রসারিত দৃষ্টিতে দেখে তাঁকে প্রায় বৈদান্তিক ব্রহ্মের সত্তায় প্রতিষ্ঠা করে পুরুষকে ষড়্‌বিংশতিতম তত্ত্ব বলেছে মহাভারত। এই প্রসঙ্গেই এক জনকের পুত্র বসুমান জনকের সঙ্গে এক ভার্গব ঋষির কথোপকথন উল্লিখিত হয়েছে মহাভারতে—

মৃগয়াং বিচরন্ কশ্চিদ্‌বিজনে জনকাত্মজঃ।
পশ্চাদনুমতস্তেন প্রপ্রচ্ছ বসুমানিদম্॥

[মহা (k) ১২.৩০৯.১-২; (হরি) ১২.৩০১.১-২]

জনক$_{৭}$ বিষ্ণু পুরাণে বৈদেহ কিংবা মৈথিল জনকের বংশে যাঁরাই জন্মেছেন তাঁরা সকলেই যেমন 'জনক' নামের উপাধিটি ধারণ করে আছেন, তেমনই এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন 'আত্মানুসন্ধান'-পরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞানী রাজা। সম্পূর্ণ জনক-বংশ কৃতি নামক জনকের জন্মের পরেই শেষ হয়ে যায়—এই ঘোষণা করার পরেই বিষ্ণু পুরাণ ঘোষণা করেছে—কৃতির সঙ্গে সঙ্গেই জনকবংশের শেষ। এঁরাই মৈথিলও বটে এবং এঁদের বেশির ভাগ রাজারাই আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যায় পারঙ্গম পণ্ডিত—

কৃতৌ সন্তিষ্ঠতে'য়ং জনক-বংশঃ।
ইত্যেতে মৈথিলাঃ।
প্রাচুর্যেণ এতেষাম্ আত্মবিদ্যাশ্রয়িণো
ভূপালা ভবিষ্যন্তি।

[বিষ্ণু পু. ৪.৫.১২-১৪]

জনক$_{৮}$ মহাভারতে এক দৈবরাতি জনকের কথা এসেছে। বংশক্রমানুসারে তিনি অবশ্যই দেবরাতের পুত্র এবং তাঁর প্রধান পরিচয়—তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য—

যাজ্ঞবল্ক্যং মুনিশ্রেষ্ঠং দৈবরাতির্মহাযশাঃ।
প্রপচ্ছ জনকো রাজা প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বরম্॥

বিষ্ণু পুরাণে যেখানে জনকদের বংশকীর্তন করা হচ্ছে, সেখানে এই দেবরাতের পুত্রের নাম বৃহদুক্‌থ—

তততো নন্দিবর্ধনঃ, তস্মাৎ সুকেতুঃ,
তস্যাপি দেবরাতঃ, ততশ্চ বৃহদুক্‌থঃ।

আবার রামায়ণে দেবরাত এবং সুকেতুকে যথাক্রমে পিতা-পিতামহের নাম হিসেবে ঠিক রেখেও দৈবরাতি জনকের নাম বৃহদুক্‌থের বদলে বৃহদ্রথ হয়েছে—

সুকেতোরপি ধর্মাত্মা দেবরাতো মহাবলঃ।
দেবরাতস্য রাজর্ষের্বৃহদ্রথ ইতি স্মৃতঃ॥

[মহা (k) ১২.৩১০.৪; (হরি) ১২.৩০২.৪; বিষ্ণু পু. ৪.৫.১২; রামায়ণ ১.৭১.৬]

জনক৯ রামায়ণে সীতা যাঁর কন্যা হিসেবে কীর্তিত সেই জনকের নাম সীরধ্বজ জনক। কুশধ্বজ ছিলেন তাঁর ভাই, তাঁকে জনক নামে ডাকা না হলেও দশরথের পুত্র ভরত এবং শত্রুঘ্নকে কন্যাদান করেছিলেন বলে বিষ্ণুপুরাণ সীরধ্বজ জনকের পাশাপাশি সাঙ্কাশ্য-দেশের অধিপতি কুশধ্বজের কথাও একত্রে বলেছে, যদিও মূল জনকবংশ সীরধ্বজের পরম্পরায় নেমে কৃতি-তে গিয়ে শেষ হয়েছে। বিষ্ণু পুরাণ এ-কথাও সংক্ষেপে জানিয়েছে যে, হ্রস্বরোমার পুত্র ছিলেন সীরধ্বজ জনক। 'সীর'-শব্দের অর্থ লাঙ্গল। এই জনক যখন পুত্রলাভের জন্য তাঁর যজ্ঞভূমি কর্ষণ করছিলেন, সেই সময় লাঙ্গলের অগ্রভাগে সীতা নামে তাঁর দুহিতা উৎপন্ন হন। আমাদের মনে হয়—মিথিলাধিপতি এই জনকের নাম আগে সীরধ্বজ ছিল না। রামায়ণ-বিখ্যাত সীতা তাঁর লাঙ্গলের ফলায় উঠে আসার পরেই তাঁর নাম হয় জনক সীরধ্বজ। ভাগবত পুরাণ তাই বলেছে সীতা সীরাগ্রতো জাতা তস্মাৎ সীরধ্বজঃ স্মৃতঃ।

[বিষ্ণু পু. ৪.৫.১২; ভাগবত পু. ৯.১৩.১৮]

☐ রামায়ণে সীরধ্বজ জনকের নাম প্রথম উল্লিখিত হচ্ছে মহামুনি বশিষ্ঠের মুখে। তিনি রাজা দশরথের পুরোহিত এবং মন্ত্রী। দশরথ যখন পুত্রলাভের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন বশিষ্ঠ সেই উদ্যোগ করার জন্য যজ্ঞোপকরণ সংগ্রহ করার আদেশ দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট অতিথিদেরও যজ্ঞে আমন্ত্রণ করার নির্দেশ দিলেন সুমন্ত্র-সারথিকে। ঠিক এই সময়ে বিভিন্ন অতিথিদের নাম বলার সময় বশিষ্ঠ বলেছেন যে, তিনি যোগবলে জানতে পেরেছেন—মিথিলার রাজর্ষি জনক ভবিষ্যতে দশরথের বৈবাহিক হবেন—তিনি মহাবীর এবং সত্যবাদী মানুষ, তাঁকে যথোচিত সম্মান দিয়ে নিজে গিয়ে নিয়ে আসতে হবে—

তমানয় মহাভাগং স্বয়মেব সুসৎকৃতম্।

[রামায়ণ ১.১৩.২১-২২]

☐ জনকের প্রসঙ্গ দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হয়েছে বহুতর ঋষিদের মুখে। তাঁরা অনেকেই বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে ছিলেন এবং বিশ্বামিত্র তখন রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণকে দিয়ে তাড়কা রাক্ষসীকে এবং যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদনকারী অন্যান্য রাক্ষসদের বধ করার জন্য আপন সিদ্ধাশ্রমে এসেছিলেন। রাক্ষসবধের পর বন ছেড়ে চলে যাবার সময় ঋষিরা বললেন —আমরা এখন মিথিলাধিপতি জনকের যজ্ঞ দেখতে যাচ্ছি। তিনি পরম ধর্মময় এক যজ্ঞ করবেন, সেটা দেখার জন্য তোমরাও সেখানে চল—

মৈথিলস্য নরশ্রেষ্ঠ জনকস্য ভবিষ্যতি।
যজ্ঞঃ পরমধর্মিষ্ঠঃ তত্র যাস্যামহে বয়ম্॥

ঋষিরা অবশ্য জনকের যজ্ঞদর্শন ছাড়াও একটি বাড়তি আকর্ষণের কথা বলেন। তাঁরা জানান যে, দেবতাদের কাছ থেকে পাওয়া 'সুনাভ' নামে এক ভয়ংকর ধনু আছে। দেশ-বিদেশের কোনো রাজা সেই ধনুকে গুণ পরাতে পারেননি। জনকের ঘরে রীতিমত ধূপ এবং অন্যান্য গন্ধদ্রব্য দিয়ে সেই ধনুকের পুজো হয়। সেই ধনুকটাও রাম-লক্ষ্মণের মতো বীরের দ্রষ্টব্য বস্তু হওয়া উচিত—

অদ্ভুতঞ্চ ধনূরত্নং তত্র ত্বং দ্রষ্টুমর্হসি।

[রামায়ণ ১.৩১.৫-১৩]

☐ বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলা-নগরীতে এসে জনকের যজ্ঞ-সমারোহ দেখতে পেলেন। যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ শকটে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নানা দেশ থেকে বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণেরা এসেছেন, লোকজন ছোটাছুটি করছে —জনকের যজ্ঞসমৃদ্ধি দেখে অবাক হলেন রামচন্দ্র। জনক বিশ্বামিত্রের আসার খবর পেয়ে কুলপুরোহিত শতানন্দকে নিয়ে তাঁর কাছে এলেন এবং যথোচিত অতিথি সৎকার করে নিজের ধন্যভাব জ্ঞাপন করলেন। যজ্ঞ দর্শন করার আমন্ত্রণ জানিয়ে জনক এবার নবাগত এবং সহাগত রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁদের ক্ষত্রিয়োচিত চেহারা

দেখে জনক যেমন খুশি হলেন, তেমনই তাঁদের রাজোচিত মহিমা দেখে—এতটা পথ পায়ে হেঁটে তাঁরা এলেন কী করে, সে বিষয়েও বিস্ময় প্রকাশ করলেন। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণের সবিশেষ পরিচয় দিয়ে জনকের ধনুক নিয়ে তাঁদের কৌতূহলের কথাও জানিয়ে রাখলেন।

[রামায়ণ ১.৫০.১-১৩, ১৭-২৫]

□ রাজা জনক পরদিন প্রভাতকালে বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বিশ্বামিত্র আগেই জনককে তাঁর ধনুক নিয়ে রাম-লক্ষ্মণের কৌতূহলের কথা জানিয়েছিলেন। জনক ধনুকের গুণ-মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন যে, এই ধনুকটি তাঁর পূর্বপুরুষ নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র দেবরাত লাভ করেছিলেন। পূর্বে মহাদেব যখন দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করেছিলেন, সেইসময় তিনি যজ্ঞের ভাগ না পাওয়ায় দেবতাদের ওপর ক্রুদ্ধ হন এবং এই ধনুক দিয়েই তাঁদের শিরচ্ছেদ করতে যান। তখন দেবতারা মহাদেবের স্তব করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেন। মহাদেব প্রসন্ন হয়ে দেবতাদের ধনুকটি দিয়ে দেন। পরবর্তীকালে দেবতারা নিমির পুত্র দেবরাতের কাছে এই হরধনু গচ্ছিত রাখেন। সেই থেকে বংশ পরম্পরায় ধনুকটি তাঁর কাছেই ছিল।

একদিন জনক লাঙ্গল দিয়ে মাটি কর্ষণ করছিলেন। সেইসময় তিনি মাটিতে একটি সদ্যোজাত কন্যাকে দেখতে পান। বস্তুতঃ ভূমি কর্ষণ করার সময় লাঙ্গলের ফলার রেখাটিকে সীতা বলা হয়। সেই হলাগ্র রেখায় কন্যাটিকে পাওয়া গেল বলে জনক কন্যাটির নাম রাখলেন সীতা। ক্রমে সীতা বড়ো হতে লাগলেন। জনকও স্থির করলেন যে, এই হরধনুতে যে বীর গুণ পরাতে পারবেন, তাঁর হাতেই তিনি সীতাকে সমর্পণ করবেন। দেশ-বিদেশ থেকে অনেক রাজা, রাজপুত্র এল হরধনুতে গুণ পরাবার জন্য। কিন্তু তাদের কেউ সেই ধনু তুলতেই পারল না। জনক তাদের শৌর্য্য-বীর্য্যের প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন সকলকে।

জনক বললেন যে, সেই প্রত্যাখ্যাত রাজারা সকলে একত্রিত হয়ে মিথিলা-পুরী আক্রমণ করলেন। আমি দেবতাদের সন্তুষ্ট করায় তাঁরা আমাকে চতুরঙ্গ সেনা প্রদান করলেন। এই চতুরঙ্গ সেনাই মিথিলাকে রক্ষা করল শত্রুদের হাত থেকে। এখন আমি রাম-লক্ষ্মণকে সেই ধনুকটি দেখাব, যদি দাশরথি-রাম ধনুতে গুণ পরাতে পারেন, তাহলে আমার কন্যা সীতাকে তাঁর হাতে আমি সমর্পণ করব। *[রামায়ণ ১.৬৬.১-২৭]*

□ জনক রাজার আদেশে সেই মহা ধনু রাজসভায় আনা হল। প্রায় পাঁচহাজার লোক সেই প্রকাণ্ড ধনুকটি বহন করে নিয়ে আসলেন। জনক, রাম-লক্ষ্মণ এবং বিশ্বামিত্রকে ধনুকটি দেখিয়ে বললেন যে, এই সেই শ্রেষ্ঠ ধনুক। যা সকলের কাছেই পূজ্য। সীতার পাণিপ্রার্থী হয়ে যেসব রাজারা এসেছিলেন তাঁরা কেউ এই ধনুক তুলতেই পারেন নি। কোনো দেবতা, রাক্ষস বা যক্ষও এতে শর-সংযোজন করতে পারেনি। আপনাদের অনুমতি নিয়ে এই ধনুক সভায় আনা হয়েছে, আপনারা চেষ্টা করে দেখুন। তখন রামচন্দ্র রাজসভায় সকলের সামনে ঘোষণা করলেন যে, তিনি ধনুকটি উত্তোলন করবেন এবং তাতে টঙ্কারও দেবেন। একথা বলেই দাশরথি-রাম সহস্র দর্শকের সামনে অবলীলায় ধনুক উত্তোলন করে তাতে গুণ পরালেন এবং পরে ধনুকটি ভেঙ্গেও দিলেন। রামচন্দ্রের বীরত্বে জনক মুগ্ধ হলেন।

তিনি রাম ও সীতার বিবাহের আয়োজন করলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুমতি নিয়ে জনক, রাজা দশরথকে মিথিলায় আনার জন্য তাঁর মন্ত্রীদের প্রেরণ করলেন। *[রামায়ণ ১.৬৭.১-২৮]*

□ জনকরাজার মন্ত্রীরা অযোধ্যায় গিয়ে রাজা দশরথকে জনকের প্রতিজ্ঞা ও রামচন্দ্রের হরধনু ভঙ্গ সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় জানালেন। সেইসঙ্গে রাজা দশরথকে মিথিলায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। দশরথ তাঁর পুরোহিত, মন্ত্রী এবং অপর দুই পুত্র ভরত-শত্রুঘ্নকে নিয়ে মিথিলায় উপস্থিত হলেন। জনক সসম্মানে অতিথি সৎকার করলেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে জনকের অপর কন্যা ঊর্মিলার বিবাহ স্থির হল।

কন্যাদ্বয়ের বিবাহের পূর্বে সেই আনন্দক্ষণে জনক তাঁর ভাই কুশধ্বজকে স্মরণ করলেন। কুশধ্বজকে মিথিলায় নিয়ে আসার জন্য তিনি সাঙ্কাশ্যা নগরীতে দূত পাঠালেন। আনন্দ-সংবাদ পেয়ে কুশধ্বজও, সীরধ্বজ-জনকের বাড়িতে উপস্থিত হলেন।

[রামায়ণ ১.৬৮.১-১৯; ১.৬৯.৭-১৮; ১.৭০.১-১০]

☐ কন্যাদ্বয়ের বিবাহের পূর্বে জনক নিজের বংশ-মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি হ্রস্বরোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং কুশধ্বজ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। হ্রস্বরোমা জ্যেষ্ঠ পুত্র সীরধ্বজ-জনকের ওপর রাজ্যের ভার দিয়ে বনে গমন করেন। কিছুদিন পর সাঙ্কাশ্যানগরের অধিপতি রাজা সুধন্বা হরধনু এবং জনকের কন্যা সীতাকে প্রার্থনা করেন। কিন্তু জনক অসম্মত হওয়ায় সুধন্বার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সুধন্বা নিহত হন। সীরধ্বজ-জনক সাঙ্কাশ্যা নগরীতে কুশধ্বজকে অভিষিক্ত করেন। *[রামায়ণ ১.৭১.১২-১৬]*

☐ বংশ পরিচয় দিয়ে জনক আবার রাজা দশরথকে কথা দিলেন যে, রামের হাতে সীতাকে এবং লক্ষ্মণের হাতে ঊর্মিলাকে সমর্পণ করবেন। জনক, দশরথকে বৈবাহিক-ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করলেন। এই সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র, দশরথের অপর দুই পুত্র ভরত ও শত্রুঘ্নের জন্য জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজের দুই কন্যা—মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তিকে প্রার্থনা করলেন।
[রামায়ণ ১.৭১.২০-২২; ১.৭২.৪-৬; ১.৭৩.৩১-৩৩]

☐ বিবাহ-অনুষ্ঠান মহা-সমারোহে সম্পন্ন হয়ে গেলে রাজা জনক কন্যাদের এক লক্ষ গো-সম্পদ, বহু মূল্যবান রত্ন ও অলঙ্কার, দাস-দাসী, হাতি, ঘোড়া, পদাতিক সৈন্য এবং সীতা ও তাঁর ভগিনীদের প্রত্যেককে একশ সখী যৌতুক দিলেন। রাজা দশরথ, জনককে অযোধ্যায় যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করে পুত্র ও পুত্রবধূদের সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যায় যাত্রা করলেন।
[রামায়ণ ১.৭৪.৩-৭]

☐ বনবাসে যাওয়ার আগে রামচন্দ্র একবার লক্ষ্মণকে বলেছিলেন যে, রাজা জনক যৌতুক হিসেবে দিব্য ধনুক, কবচ, খড়্গ ইত্যাদি প্রদান করেছিলেন।

এরপরে রামচন্দ্রের বনবাসকাল থেকে সুদীর্ঘ একটি সময় পর্যন্ত জনক রাজাকে আর দেখা যায় না। তবে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সময় আবার জনককে আমরা দেখতে পাই। রামচন্দ্র জনককে বহুমূল্য রত্ন উপহার দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।
[রামায়ণ ২.৩১.২৮-৩০; ৭.৪৮.১-৫]

জনকেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। নিমিবংশীয় রাজর্ষি জনক এই ক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে উল্লিখিত হয়েছে। শুষ্কেশ্বরতীর্থের পশ্চিমে, শঙ্কুকর্ণেশ্বর-তীর্থের অদূরে এই তীর্থ অবস্থিত।
[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ১১৭]

জনপদ ঋগ্‌বেদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, বেদের যুগের সমাজ বলতে বোঝাত কতকগুলি পরিবারকে। সমাজের এই পারিবারিক ভিত্তি থেকে আমরা তিনটি শব্দ পাই, যেগুলির নাম 'জন', 'বিশ্‌' এবং 'জন্মন্‌'। সৌভাগ্যের বিষয়, একটি ঋক্‌মন্ত্রের মধ্যেই তিনটি শব্দ অনুক্রমে লিখিত হওয়ায় পণ্ডিতেরা ধারণা করেছেন যে, বৈদিক যুগের সামাজিক গঠনের প্রথম ইতিহাস এই মন্ত্রের মধ্যেই পাওয়া যাবে। ঋক্‌মন্ত্রটিতে বলা আছে—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণস্পতিকে ঘৃতাহুতি দেয় সে তার পুত্র এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেই শুধু নয়, সে তার 'জন', 'বিশ্‌', এবং 'জন্মের' সঙ্গে অন্ন এবং ধন লাভ করে—

স ইজ্জনেন স বিশা স জন্মনা স
পুত্রৈর্বাজং ভরতে ধনা নৃভিঃ।

একটিই ঋকে পুত্রপরিবার, আত্মীয়স্বজনের কথা (পুত্রৈঃ, নৃভিঃ) আলাদাভাবে বলা থাকায় পণ্ডিতেরা বলেছেন—'জন্মন্‌' বলতে বোঝায় একটা ছোট্ট গ্রাম, যে গ্রামের মানুষেরা পিতৃপিতামহের পরম্পরায় ভিন্ন কিংবা একান্নবর্তী হয়ে একত্র বসতি করেছে। 'জন্ম'সূত্রে বাঁধা এইরকম কতকগুলি গ্রাম সাধারণ আত্মীয়তার সূত্র ধরে জন্ম দিয়েছে 'বিশ্‌'-এর। সংস্কৃতে বিশ্‌ একটি পুংলিঙ্গ শব্দ—যার একবচন 'বিশ্‌', দ্বিবচন 'বিশৌ', বহুবচন 'বিশঃ'। বিশ্‌ ধাতুর অর্থ প্রবেশ করা, বসতি স্থাপন করা—to enter, to settle। কাজেই, বিশ্‌ বলতে বুঝব settlement। এক-একটি বিশ্‌-এর প্রধান পুরুষকে বলা হত বিশ্‌পতি। ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে এক প্রেমিক তার প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে রাতের আঁধারে। সে চাইছে—সবাই যেন তখন ঘুমিয়ে থাকে। প্রেমিকার মা, বাবা, আত্মীয়স্বজনই শুধু নয়। সে চায়, বিশ্‌পতিও তখন ঘুমিয়ে থাকুন—

সস্তু মাতা সস্তু পিতা সস্তু স্বা সস্তু বিশ্‌পতিঃ।
[ঋগ্‌বেদ ৭.৫৫.৫]

অধিকাংশ বিশ্‌ই তার প্রধান পুরুষ বা একটি ভূমিখণ্ডের নামে নামাঙ্কিত হত। যেমন,

ঋগ্‌বেদের প্রার্থনা—হে দেবগণ! তোমরা তৃণস্কন্দের বিশ্‌গুলি রক্ষা করো—

তৃণস্কন্দস্য নু বিশঃ পরিবৃংক্ত সুদানবঃ।

[ঋগ্‌বেদ ১.১৭২.৩]

তৃণস্কন্দ কোনো জায়গার নাম, যেখানে নুয়ে-পড়া তৃণভূমি আছে। আবার প্রধান পুরুষের নামেও 'বিশ্'-এর পরিচয় পাওয়া যাবে। ঋগ্‌বেদ বলেছে—বশিষ্ঠ যখন তৃৎসুদের পুরোহিত নিযুক্ত হলেন, তখন তাদের বিশ্‌গুলির নাম ছড়িয়ে পড়ল—

অভবচ্চ পুর এতা বশিষ্ঠ

আদিত্তৃৎসূনাং বিশো অপ্রথন্ত।

[ঋগ্‌বেদ ৭.৩৩.৬]

হাইনরিখ জিমার বলেছেন—বৈদিক বিশ্-এর প্রকৃতি শুধু ভৌগোলিকতার মধ্যেই আবদ্ধ রাখা যাবে না, বিশ্‌গুলিকে এক-একটা সামরিক 'ইউনিট' হিসেবেও মেনে নেওয়া যেতে পারে। ঋগ্‌বেদের অনেকগুলি ঋক্ উল্লেখ করে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, যার মধ্যে প্রধান ঋক্‌টি হল—

বিশং বিশং যুধয়ে সংশিশাধি।

—প্রত্যেকটি বিশ্‌কে তুমি যুদ্ধের জন্য তীক্ষ্ণতেজা করো। *[ঋগ্‌বেদ ১০.৮৪.৪]*

আগে দেখেছি কয়েকটি 'জন্মন্'-এর সমষ্টিতে একটি বিশ্ তৈরি হয়, তেমনই কতকগুলি 'বিশ্' একত্র করে একটি'জন'-এর সৃষ্টি হয়েছে। এই 'জন' হয়তো একটি tribe এবং জনপতি হয়তো একজন রাজা। বৈদিক 'জন্মন্', 'বিশ্' এবং 'জন'-এর সঙ্গে অদ্ভুত একটা মিল পাওয়া যাবে প্রাচীন রোমের জনগোষ্ঠীর বিভাগে। পণ্ডিতেরা লিখেছেন—There the smallest unit, gens, consisted of small number of families descended from a common ancestor; a number of these gens constituted a curia and ten curiae made a tribe. Vedic 'jana' probably corresponded with the tribe, 'vis' with the curia and 'janman' with the gen.

[Heinrich Zimmer, Altindisches Leben : Die Cultur der Vedischen Arier, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1879, pp. 159-160; A.S. Altekar, State and Govt. in Ancient India, Banaras, Motilal Banarsidass, 1949, p. 18]

□ বৈদিক সমাজে একটি ছোটো পরিবার বা গৃহের মধ্যে গৃহপতির যে মূল্য ছিল, ঠিক সেই মূল্য ছিল একজন গ্রামপতির। জিমার বৈদিক গ্রামকে একটি পরিবার এবং একটি জনগোষ্ঠী বা ট্রাইবের মাঝামাঝি রাখতে চেয়েছেন। তবে গ্রাম ব্যাপারটাকে 'বিশ্'-এর একটি ছোটো সংস্করণ ভাবাই ভালো। আর্যায়ণের প্রথম কল্পে একটি গ্রামের সুস্থিতি তেমন ছিল না, জমি দখলের জন্য অরণ্যে হাত পড়ত। তখন একটি সম্পূর্ণ গ্রামকে তার অধিপতির সঙ্গে চলতেও দেখা গেছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে শর্যাত মানব তাঁর গ্রামটি সঙ্গে নিয়েই ঘুরছিলেন। এখানে গ্রাম অবশ্যই চলমান মনুষ্যগোষ্ঠীর পরিচায়ক। কিন্তু, আর্যেরা একটু থিতু হতেই গ্রামও তখন থিতু হয়েছে।

একটি গ্রামে গ্রামপতি বা গ্রামণীর প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। টীকাকারেরা গ্রামণীকে গ্রামের নেতা বলে চিহ্নিত করেছেন এবং তার যে প্রভাব কত ছিল তা বোঝা যাবে রাজার অভিষেক উৎসবে। 'জন্মন্' বা গ্রাম যেমন বৈদিক সমাজের সবচেয়ে ছোটো 'ইউনিট', তেমন 'জন' হল সবচেয়ে বড়ো 'ইউনিট', যার অধিপতিকে রাজা নামে অবশ্যই ডাকা যায়। ভরত, যাঁর নামে এই ভারতবর্ষ, তাঁকেও এক জনগোষ্ঠীর নায়ক বলেই সম্বোধন করা হয়েছে ঋগ্‌বেদে। স্বয়ং বিশ্বামিত্র এই ভারতজনের বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করেছেন—

বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্মেদং ভারতং জনম্।

[ঋগ্‌বেদ ৩.৫৩.১২]

এইভাবে যাদবজন, পঞ্চজন (পঞ্জজনাঃ, জনাসঃ) শব্দগুলিও অধিপতি বা গোষ্ঠীনামে চিহ্নিত হয়েছে।

গ্রামগুলি অবশ্যই কৃষিভিত্তিক ছিল, কিন্তু গ্রামের সুরক্ষার জন্য প্রস্তরনির্মিত দেওয়াল কখনো বা লোহার বেষ্টনিও ব্যবহার করা হত। এই বেষ্টনিটুকু থাকলেই তাকে 'পুর' বলে চিহ্নিত করা হত। আর্যগোষ্ঠীর প্রধান প্রতিভূ এইরকম অনেক 'পুর' ধ্বংস করেছিলেন বলেই তাঁর নাম পুরন্দর। গ্রামের মধ্যে যে ছোটে ছোটো গৃহস্থ ঘর, তাকেই বলা হত কুল। গ্রামের শাসনের ক্ষেত্রে গৃহপতি বা কুলপতির যে একটা ভূমিকা ছিল তা ঋগ্‌বেদের 'কুলপা' এবং 'ব্রজপতি' শব্দদুটি থেকেই বোঝা যাবে। এখানে

বলা হয়েছে কুলপতিরা ব্রজপতির চার দিকে ঘোরেন—

কুলপা ন ব্রজপতিং চরন্তম্।

[ঋগ্‌বেদ ১০.১৭৯.২-৩]

কুলপতিরা ব্রজপতির অধীনেই যুদ্ধবিগ্রহ চালাতেন। ব্রজপতিকে গ্রামণী বলেই চিহ্নিত করেছেন পণ্ডিতেরা। গ্রামণী যেমন তাঁর পৌর-জানপদ কর্তব্যগুলি করতেন, তেমনই তাঁর সামরিক কর্তব্যও ছিল। অন্যদিকে, 'সেনানী', যাঁর প্রধান কাজ ছিল যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধ করা, তিনি কিন্তু শান্ত সময়ে পৌর ক্রিয়াকর্মগুলি দেখভালো করতেন। ঋগ্‌বেদে বর্ণিত দশরাজ্ঞীয় যুদ্ধে আমরা সুদাসকে এক বিজয়ী যুদ্ধবীর হিসেবে দেখতে পাচ্ছি। তিনি নাকি দুটি জনপদের (বৈকর্ণয়োঃ) একুশটি জনকে বিনাশ করেছিলেন—

একং চ যো বিংশতিং চ শ্রবস্যা

বৈকর্ণয়ো জনান্ রাজা ন্যস্তঃ

[ঋগ্‌বেদ ৭.১৮.১১]

পণ্ডিতেরা বলেন—এই একুশটি মিলে হয়তো একটি সম্মিলিত জনগোষ্ঠীর সংবাদ পাচ্ছি আমরা এবং সম্মিলিত গোষ্ঠীটি হয়তো কুরু এবং কৃবিদের, অর্থাৎ কুরু এবং পাঞ্চালদের। অবশ্য, এই একুশ সংখ্যাটা, সাধারণত যাকে আমরা 'জন' বলেছি, তার চেয়েও কোনো বড়ো জনগোষ্ঠীর সূচক কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেই গেছে।

সামাজিক বিবর্তনকে যদি রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনের ধারায় ব্যাখ্যা করা যায় তবে ঋগ্‌বেদের মধ্যে 'গোপা জনস্য', জনের রক্ষাকর্তা, অথবা 'গোপতি র্জনস্য'—এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে জনগোষ্ঠীর রক্ষাকর্তা হিসেবে জনপতিকে পাওয়া যাবে। এই জনপতির সঙ্গে রাজা নামক মানুষটির যে গভীর সম্পর্ক আছে, সেটা বোঝা যাবে—যখন দেখব একটি ঋক্‌মন্ত্রে রাজাকে একটি জনের সুরক্ষার জন্য অথবা একটি জনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রার্থনা জানানো হচ্ছে—

যূয়ং রাজানমির্যং জনায় বিভ্বতষ্টং

জনয়থা যজত্রাঃ।

[ঋগ্‌বেদ ৫.৫৮.৪]

একজন রাজাই যে জনের অধীশ্বর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি রাষ্ট্রেরও অধীশ্বর হন, তা ঋগ্‌বেদেই দেখা যাবে। সেখানে এক জনাধিপ সমস্ত শত্রুপাতন করে সিংহনাদ করছেন— আর আমার কোনো শত্রু নেই, আমি আজ এই রাজ্যের অধীশ্বর। সমস্ত মানুষের ওপর (এখানে 'জন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে) আমার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

[ঋগ্‌বেদ ১০.১৭৪.৫]

ঋগ্‌বেদে অনেকগুলি জন-জাতি এবং তাঁদের রাজাদেরও নাম আছে। ভরত, দ্রুহ্যু, যদু, তুর্বসু, অনু, সৃঞ্জয়, তৃৎসু, সুদাস— এগুলো যদি জনাধিপতি রাজার নাম হয়, তবে পঞ্চাল, যাদব, বাহ্লিক, মদ্র—এইরকম সুনির্দিষ্ট কতকগুলি জনজাতির যে নাম পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি প্রধানত স্থাননামে চিহ্নিত। এই জনাধিপতিই হলেন রাজা। অনু, দ্রুহ্যু, যদু এবং তুর্বসু—এই চারটি জনগোষ্ঠী মহারাজ পুরুর সহায়তা করেছিলেন ভরত জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময়। প্রথম ওই পাঁচটি জনগোষ্ঠীই ঋগ্‌বেদে পঞ্চজন নামে পরিচিত বলে জিমার সাহেব মন্তব্য করেছেন। যদিও 'পঞ্চজন' বলতে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেবতা, মানুষ, গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং নাগদের বোঝানো হয়েছে, কিন্তু, নিরুক্তকার যাস্ক পঞ্চজনের মধ্যে মানুষকে ধরেনইনি। তাঁর মতে, গন্ধর্ব, পিতৃগণ, দেবতা, অসুর, আর রাক্ষস মিলে পঞ্চজন। এ বিষয়ে সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত কথা বলেছেন বেদের টীকাকার সায়ন। ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ এবং নিষাদগণের সমষ্টিই তাঁর মতে পঞ্চজন। জার্মান পণ্ডিত রোট্ এবং গেলড্‌নার এই মত প্রায় মেনে নিয়ে বলেছেন পৃথিবীর সামগ্রিক জনসমাজের কথা বলতে গিয়েই পঞ্চজনের কথা বলেছেন বৈদিক কবি। কিন্তু, আমাদের ধারণা—পৃথিবীর মানুষ নয়, ভারতবর্ষের সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর কথা ভেবেই 'পঞ্চজন' শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে।

আর্যায়ণের প্রথম কল্পে একটি বৃহদ্ জনগোষ্ঠীর ওপর রাজত্ব করার জন্যই যে রাজার সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রমাণ বেদেও পাব এবং পাব ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিতে। রাজার অভিষেকের সময় পুরোহিত সেখানে মন্ত্র পড়েন—মাননীয় দেবতারা! আপনারা এই ব্যক্তিকে শত্রুহীন করুন, ইনি যাতে প্রধানপুরুষেণ পদবি লাভ করেন, যাতে সবার ওপরে অধিকার পান এবং যাতে 'জন'-এর ওপর রাজত্ব করতে পারেন, আপনারা তা ত্বরান্বিত করুন—

ইমং দেবা অসপত্নং সুবধ্বং মহতে
ক্ষত্রায় মহতে জ্যেষ্ঠায় মহতে জানরাজ্যায়।

[V.M. Apte, 'Political and Legal Institutions' in Vedic Age, ed. R.C. Mazumdar, Bombay, Bharatiya Vidya Bhawan, 1965 p. 151 and fn. 15, p. 359; বাজসনেয়ী সংহিতা ৯.৪০]

□ রাজ্য, রাষ্ট্র, দেশ জনপদ—এই শব্দগুলির মাধ্যমেই ভারতবর্ষে state বোঝানো হয়েছে—একথা স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নিয়েই জানাই যে, 'রাজ্য' শব্দটাই state -এর সবচেয়ে প্রচলিত প্রতিশব্দ এবং এই শব্দের অর্থের মধ্যেই সকলের জন্য শুভৈষণা বা 'good purpose' লুকোনো আছে। মূল যে ধাতু থেকে রাজা এবং রাজ্য—এই দুটি শব্দই আসছে, সেই ধাতুটা হল 'রন্‌জ্', যার অর্থ 'খুশি করা', 'রাঙিয়ে দেওয়া'। আরও গভীর অর্থ ধরলে কিন্তু, 'রন্‌জ' ধাতুর অর্থ শোভা পাওয়া (shine), 'বিরাজতে', 'বিরাজমান' —এইসব শব্দের মধ্যেও এই গভীরার্থটুকু পাওয়া যাবে। কিন্তু, 'রন্‌জ্' ধাতু থেকে আসা রাজা এবং রাজ্য শব্দটা যে সাধারণ অর্থে রঞ্জন করা বা খুশি করাই বোঝায়, তা সবচেয়ে ভালো বোঝা যাবে মহাকবি কালিদাসের শব্দব্যবহারে।

দশরথের পিতামহ রঘুর 'রাজা' নাম কতটা সার্থক, সেটা বোঝানোর জন্য কালিদাস লিখেছেন—প্রকৃষ্টভাবে আনন্দ বা আহ্লাদ দেয় বলে যেমন চন্দ্রের চন্দ্র নামটি সার্থক, (সার্থক—connotative, চন্দ্র = আনন্দ), তাপ দান করে বলে সূর্যের 'তপন' নামটি যেমন সার্থক, তেমনই প্রজাদের রঞ্জন করার জন্যই রঘুর রাজা নামটি সার্থক—

তথৈব সো'ভূদন্বর্থো রাজা প্রকৃতি-রঞ্জনাৎ।

রাজা বা রাজন্ শব্দের সঙ্গে 'ষ্য' প্রত্যয় যুক্ত করলেই আমরা রাজ্য শব্দটি পাব। রাজার ভাব এবং কর্ম যে বস্তুর মধ্যে নিহিত, তাকেই বলে রাজ্য। রাজা এবং রাজ্য শব্দদুটি একই ধাতু থেকে আসার ফলে, শুধু রাজ্য বলতে—রাজা, তাঁর প্রশাসন এবং শাসিত প্রজাদের একইসঙ্গে বোঝানো যায়।

সংস্কৃতে রাজ্য শব্দটা বিভিন্ন আকরগ্রন্থে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে; সেগুলির মধ্যে এমন অর্থও মিলবে, যা আমাদের মহামতি অ্যারিস্টটলের কাছাকাছি চলে যাবে। অ্যারিস্টটল লিখেছিলেন—Our own observation tells us that every polis is a community of persons formed with a view to some good purpose.

আমাদের কৌটিল্য লিখেছেন—একটি নির্দিষ্ট জনপদের মধ্যে যদি নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠী না থাকে, তবে রাজ্য বা জনপদ আপন সংজ্ঞা লাভ করে না—

ন হ্যজনো জনপদো রাজ্যং
জনপদং বা ভবতীতি কৌটিল্যঃ।

'জন' বলতে যে একটি গোষ্ঠী বা কমিউনিটি বোঝাত, সে আমরা বেদের আমলেই দেখেছি এবং দেখেছি—জন হল কতকগুলি 'বিশ্'-এর সমষ্টি—

স ইজ্ জনেন স বিশা স জন্মনা স
পুত্রৈর্বাজং ভরতে ধনা নৃভিঃ।

[ঋগ্‌বেদ ২.২৬.৩]

কৌটিল্য যখন জনবিশিষ্ট একটি জনপদকেই রাজ্যের আখ্যা দিচ্ছেন, তখন মনুসংহিতার টীকাকার মেধাতিথি রাজ্য বলতে বোঝাচ্ছেন—সম্পন্ন ব্যক্তিদের আবাস।

প্রজৈশ্বর্যং হি রাজ্যমুচ্যতে।

—অর্থাৎ, যেখানে প্রজারা সুখে থাকে, তারা ঐশ্বর্যশালী হয়, সেটাই রাজ্য। এইরকম প্রজা না থাকলে কারই বা রাজ্য টিকবে—

তাসু বিনশ্যন্তীষু কস্য বা রাজ্যং স্যাৎ।

হয়তো, এই দিক দিয়ে দেখলে, আমাদের রাজ্যকেও Polis বলা যায় এবং এইরকম প্রজাদের বলা যায় Political।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা অথবা মহাভারত কিন্তু এইরকম এক কথায় রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে রাজি নন। রাষ্ট্র বলতে তাঁরা সাতটি অঙ্গের কথা বলেছেন। মানবশরীরের যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে, সেইরকম কয়েকটি অঙ্গের সমূহই রাষ্ট্রশরীর। এই অঙ্গ সাতটি, যাকে মহাভারত এবং মনু বলেছেন সপ্তাঙ্গ এবং অর্থশাস্ত্র বলেছে সপ্ত-প্রকৃতি। এই সাতটি অঙ্গ বা প্রকৃতি যথাক্রমে—স্বামী (রাজা বা সার্বভৌম নৃপতি), অমাত্য (মন্ত্রী), জনপদ (রাষ্ট্র এবং প্রজা), দুর্গ (সংরক্ষিত নগর অথবা রাজধানী), কোশ (রাজকোশ, অর্থসঞ্চয়), দণ্ড (স্বরাষ্ট্র এবং

পররাষ্ট্রশাসনের শক্তি তথা উপায়) এবং মিত্র (স্ব-অনুকূল পররাষ্ট্রসমূহ)। মানব শরীরের হাত-পা-মাথা যেমন, রাষ্ট্রের পক্ষেও স্বামী, অমাত্য ইত্যাদি তেমনই। অঙ্গ বলতে বোঝায় শরীরের অংশ, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'organ', আর প্রকৃতি মানে স্বভাব, nature, যেটাকে অপরার্ক তাঁর যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির টীকায় বিশদ করে বলেছেন—যার থেকে কার্য্যের সৃষ্টি হয়, যাতে কার্য্যের অবস্থান এবং যাতে শৃঙ্খলা অনুসারে কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাকেই বলে প্রকৃতি। কানের দুল বানাতে হলে সোনার যে ভূমিকা, সেই সোনা যেমন কুণ্ডলের 'প্রকৃতি', তেমনই স্বামী, অমাত্য ইত্যাদি ছাড়া রাজ্যের উৎপত্তি হয় না, যদি বা উৎপন্ন হয়, তবে স্বামী-অমাত্য ছাড়া রাজ্য স্থায়ী হয় না এবং সেইজন্যই স্বামী, অমাত্য ইত্যাদি হল রাজ্যের অঙ্গ।

মেধাতিথি তাঁর মনুভাষ্যেও সপ্তাঙ্গ-রাজ্য সম্বন্ধে ওই একই অঙ্গাঙ্গীভাব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বলেছেন—স্বামী, অমাত্য, এগুলি হল রাজ্যের প্রকৃতি, অর্থাৎ অবয়ব বা কারণ, যেমন ঘট বানাতে গেলে তার অবয়বগুলি। পরবর্তী সময়ে লেখা শুক্রনীতিসার রাজ্যের সাতটি অঙ্গকে একেবারে একটি মানবশরীরের সঙ্গেই মিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, সপ্তাঙ্গ-রাজ্যের মাথাটা হলেন রাজা, চক্ষু হলেন মন্ত্রীরা, রাজার মিত্রস্থানীয়েরা হলেন রাজার কান, রাজকোশ হল মুখ, মন হচ্ছে দণ্ড (বল), দুর্গ হল হাত আর পা হল জনপদ।

[Politics of Aristotle, Trans. by E. Baker, Chapter 1.1; কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (Kangle) ১৩.৪; Manu Smriti, Vol. 2, ed. Ganganath Jha, p. 70; P.V. Kane, History of Dharmashastra, Vol. 3. p. 18-19; মনুসংহিতা ৯.২৯৪; ১.২৯৪ (মেধাতিথি); যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১.৩৫৩; যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি (আনন্দাশ্রম) পৃ. ৫৮৮ (অপরার্কের টীকা); শুক্রনীতিসার ১.৬১-৬২]

□ সপ্তাঙ্গ-রাষ্ট্রের তৃতীয় অঙ্গ হল জনপদ। জন্ম, বিশ্‌ এবং জন শব্দের ব্যাখ্যা আমরা পূর্বে করেছি, তাতে বোঝা যায়—জনপদ শব্দের দ্বারা আমরা যদিও মনুষ্যসমন্বিত একটি রাষ্ট্র বুঝি, তবু এই শব্দের মধ্যে বৈদিক যুগের এক-একটি জনগোষ্ঠী বা 'ট্রাইবে'র স্মৃতি লুকোনো আছে। জনপদ অর্থে আরও কতগুলি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে প্রাচীন রাজনীতিশাস্ত্রে, মহাভারতে, এবং স্মৃতি-গ্রন্থগুলিতে। রাষ্ট্র, বিষয়, দেশ—এই শব্দগুলি একের পরিবর্তে অন্যটি ব্যবহৃত হলেও, জনপদ শব্দটির একটি অন্য তাৎপর্য্য আছে। বিশেষত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় আধুনিকেরা যে চতুরঙ্গ-তত্ত্বের ব্যবহার করেন, তার মধ্যে সার্বভৌমত্বের সঙ্গে সপ্তাঙ্গ-তত্ত্বের স্বামী এবং শাসনব্যবস্থার সঙ্গে অমাত্য-কর্ম খুব ভালোভাবেই খাপ খায়। এই প্রক্রিয়ায় ভূখণ্ডের কথা যখন আসে, তখনই রাষ্ট্রের স্মৃতি কাজ করতে থাকে বটে, কিন্তু জনসমষ্টি বা 'পপুলেশন'-এর কথা আসলেই স্পেলম্যানের (Spellman) মতো পণ্ডিতেরা বলে ওঠেন— a serious deficiency is that the subjects are not included। অন্য পণ্ডিতেরা অবশ্য এ মত মানেননি। তাঁরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে জনপদের বিশদ তাৎপর্য্য লক্ষ্য করে রায় দিয়েছেন যে, ভূখণ্ড এবং জনসমষ্টি—এই দুটি তত্ত্বেরই অন্তর্ভাব ঘটবে জনপদ শব্দের তাৎপর্য্যে। মহাভারত, মনুস্মৃতি অথবা অন্যান্য রাজনীতিবিষয়ক শাস্ত্রগুলিতে যেখানেই জনপদের উল্লেখ আছে, সেখানেই আগে জনপদবাসী মানুষের কথা আরম্ভ হয়েছে।

কামন্দকীয় নীতিসারে বলা হয়েছে— রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ-তত্ত্ব যেখানে থেকে উদ্ভূত হয়েছে, সেটা হল রাষ্ট্র। অতএব, রাজা যেন রাষ্ট্র বা জনপদের উন্নতিসাধনে যত্ন নেন। এই রাষ্ট্র বলতে যে জনপদবাসী বা রাষ্ট্রবাসী বা বিষয়বাসী মানুষকে বোঝায়, তার সমস্ত ইঙ্গিত রয়ে গেছে মহাভারতে। বলা হচ্ছে—সেই রাজাকেই সবচেয়ে ভালো রাজা বলা যাবে, যে রাজার পুরবাসী এবং রাষ্ট্রবাসীরা (জনপদ-বাসীরা) টাকাপয়সার হিসেব বা সঞ্চয় চেপে রাখে না, যারা ন্যায়নীতি এবং অন্যায়ের ভেদটুকু জানে, যারা নিজের নিজের কাজটি ঠিকমতো করে। এ ছাড়া, যারা সংযমী যাদের সহজে বশে আনা যায়, কাজে লাগানো যায় এবং যারা নিজেদের মধ্যে কখনো ঝগড়াবিবাদ করে না—এইরকম মানুষেরা যে জনপদে থাকে, সেই জনপদের রাজাই আসল রাজা।

মহাভারতের উপরি-উক্ত শ্লোকগুলির মধ্যে

'জন' এবং 'রাষ্ট্র', 'জন' এবং 'বিষয়' শব্দগুলি একই সঙ্গে উল্লিখিত হওয়ায়, জনপদ বলতে যে ভূখণ্ডের সঙ্গে জনসমষ্টিকেও বোঝানো হচ্ছে, সেটা অনুমান করা যায়। আর কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এসে দেখব যে, জন ছাড়া জনপদের অস্তিত্বই নেই। তিনি লিখেছেন—জনশূন্য জনপদের কল্পনাই করা যায় না, আবার জনপদশূন্য রাষ্ট্রের কল্পনাও সম্ভব নয়।

জনপদ উচ্ছিন্ন হয়ে গেলে যেহেতু সপ্তাঙ্গ-রাষ্ট্রেরই অস্তিত্ব বিপন্ন হয়, সেইজন্য একটি শত্রুরাষ্ট্রেরও জনসমষ্টি যাতে উচ্ছিন্ন না হয়, সেজন্য কৌটিল্যের দুশ্চিন্তা আছে। রাজার অর্থসঞ্চয়, সৈন্যদল সংগ্রহ, তামা-লোহার জোগান, রাজকর্মচারী জোগাড় করা এবং চাল-ডাল-তেল, এমনকী হাতি-ঘোড়াও যেহেতু জনপদ থেকে সংগ্রহ হয়, তাই রাষ্ট্রস্থিত জনসমষ্টির উচ্ছেদ কৌটিল্য একেবারেই পছন্দ করেন না। এমনকী, নতুন যে রাষ্ট্রকে রাজা যুদ্ধের মাধ্যমে অবদমিত করেছেন, সেই রাষ্ট্রের জনসমূহও যাতে অন্যত্র না যায় সেটা রাজাকে চিন্তা করতে হত। শত্রুরাজ্যে যুদ্ধ হলে শত্রুরাজাকে তথা শত্রুদেশের অমাত্যকে মেরে ফেলা সম্ভব হলেও—কর্শনপূর্বম্—রাজা কিন্তু জনপদবাসী জনসমূহকে অভয় দিয়ে যাবেন। রাজ্যের পূর্ব-রাজা বা অমাত্য মরে গেছে বলে শত্রুরাজ্যের জনসমূহ যদি আন্দোলনে উৎসাহী হয়ে ওঠে, তবে বিজিগীষু রাজা (যিনি শত্রুরাজ্য জয় করেছেন বা জয়ের ইচ্ছে করেছেন) সেই নবজিত জনসমূহকে টাকাপয়সা দিয়ে বশ করবেন, নয়তো কর-ছাড় দেবেন, একেবারে করমুক্তও করে দিতে পারেন। কিন্তু, কোনো অবস্থাতেই রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠীকে দেশ ছেড়ে যেতে দেবেন না। মহামতি কৌটিল্য এই প্রসঙ্গেই সিদ্ধান্ত করেছেন, জনসমূহ ছাড়া যেহেতু রাষ্ট্রেরই অস্তিত্ব নেই, সেইজন্যই জনগণ যাতে অন্য কোথাও না চলে যায়—সেটা ভাবতে হবে রাজাকে। অর্থাৎ, কৌটিল্যের বক্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, অ্যারিস্টটলের মতো অত কঠিন এবং দার্শনিকভাবে না হলেও, কৌটিল্যের জনপদ ভূখণ্ড এবং জনসমষ্টিকে একত্র সমাহৃত করে।

একইভাবে, জনপদের স্বনির্ভরতা বা স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথায় আসলেও কৌটিল্যকে খুব অল্পধী বলে মনে হয় না। অন্তত স্বনির্ভরতার ব্যাপারে অ্যারিস্টটলের সাধারণ ধারণাটা কৌটিল্যের জনপদে পুরোপুরি আদর্শায়িত না হলেও, কৌটিল্য তাঁর মতো করে অনেক কিছুই ভেবেছেন, যা মহামতি অ্যারিস্টটল উড়িয়ে দিতে পারবেন না। অ্যারিস্টটলও লিখছেন— '. . . everyone would agree in praising the State which is most entirely self-sufficient and that must be the State which is all-producing . . . In size and extent, it should be such as many enable the inhabitants to live temperately and ilberally.

এই নিরিখে দেখতে গেলে, আগেই কৌটিল্যের বিস্তারে না গিয়ে মনু-মহারাজের কথাটা প্রথমে উল্লেখ করে নিই। মনু বলেছেন—রাজা এমন দেশে থাকবেন (রাষ্ট্র, বিষয়, বা জনপদ না বলে মনু দেশ শব্দটাই ব্যবহার করেছেন)—যে দেশে প্রচুর শস্য পাওয়া যায়, যে দেশে ভদ্রসজ্জন ব্যক্তিরা থাকেন, যেখানে ঘন ঘন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে না এবং যে দেশটি পরম রমণীয়। রাজা সেই দেশে বাস করবেন, যে দেশের প্রতিবেশি সামন্ত রাজারা পূর্বাহ্নেই অবদমিত বা বশীভূত এবং যে দেশে ব্যাবসাবাণিজ্য, কৃষিকর্ম, পশুপালন সহজে সম্ভব অথবা যেখানে জীবিকা সুলভ। প্রাকৃতিক দিক থেকে একটি আদর্শ জনপদের অবস্থান হওয়া উচিত এমন, যেখানে অতিরিক্ত জল নেই অথবা অতিরিক্ত গাছগাছড়াও নেই, অথচ হাওয়া আর রোদ সেখানে থাকতে হবে যথেষ্ট এবং যেখানে ধান-যব যথেষ্ট হয়। রাজার রাজত্বের পক্ষে এইরকম একটি জায়গা বা জনপদই আদর্শতম।

[R.S. Sharma, Aspects of Political Idea, p. 34-35, 39, 234; K.P. Jayswal, Hindu Polity, Part. 2, pp. 61-68; P.V. Kane, History of Dharmashastra, vol. 3, pp. 132-133, 138-139; U.N. Ghoshal, A History of Indian Political Ideas, p. 482; W.J. Spellman, Political Theory of Ancient India, p. 132; কামন্দকীয় নীতিসার ৬.৩; কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (Kangle) ১৩.৪; ২.১; ৮.১; মনু সংহিতা ৭.৬৯; মহা (k) ১২.৫৭.৩৪-৩৬; (হরি) ১২.৫৬.৩৪.৩৬]

□ কোনো সন্দেহ নেই যে, পশ্চিমি তাত্ত্বিকদের মতো কৌটিল্য রাষ্ট্রের কোনো সংজ্ঞা নির্ধারণ করেননি। তার কারণও আছে। সবচেয়ে বড়ো কারণ—কৌটিল্য নিজে কোনো তাত্ত্বিক নন এবং তাত্ত্বিকতা তাঁর খুব পছন্দের জিনিসও নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে, চূড়ান্ত ক্ষমতাশালী এক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যগ্রতাতেই যেহেতু অর্থশাস্ত্র লেখা হয়েছে, তাই রাষ্ট্রের সংজ্ঞার চেয়েও রাষ্ট্রের প্রয়োজন এবং পরিচালনা নিয়েই কৌটিল্য মাথা ঘামিয়েছেন বেশি। তাই বলে আধুনিক ভাবনার তাত্ত্বিকতা মেশানো কি কিছুই নেই কৌটিল্যে? আছে। সামান্য হলেও আছে। যেমন কৌটিল্য বলেছেন—রাজ্য আসলে রাজ্যের মানুষগুলি। মানুষ না থাকলে রাজ্যের কোনো মূল্য নেই—

পুরুষবদ্ধি রাজ্যম্।

অপুরুষা গৌর্বন্যেব কিং দুহেত।

আবার অন্যত্র বলেছেন—জন ছাড়া জনপদ হয় না, রাজ্যও হয় না—

ন হ্যজনো জনপদো রাজ্যং
জনপদং বা ভবিতুমর্হতি।

রাষ্ট্র বলতে যে একটি নির্দিষ্ট জনপদ এবং সেই জনপদভুক্ত মনুষ্যগুলিকে বোঝায়, সে কথা একটি সংজ্ঞার মতো করে না বললেও অর্থশাস্ত্রের নানা আলোচনা থেকে তা বোঝা যায়। বিশেষত, কৌটিল্য যখন অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞাতেই 'মনুষ্যবতী ভূমি'র কথা উল্লেখ করেন, তখনই যেন আধুনিক রাষ্ট্রের সংজ্ঞা কৌটিল্যের বক্তব্যের মধ্যে নিহিত হয়। কৌটিল্যের ভাবনায় একটি রাষ্ট্রের আয়তন কী হতে পারে তা সঠিকভাবে উচ্চারণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন। পণ্ডিতেরা মনে করেন— কৌটিল্য যে রাষ্ট্রের কল্পনা করেছেন তার আয়তন খুব বড়ো হতে পারে না। তার একটা বড়ো কারণ হল—একটি রাজ্যের আশেপাশে, সামনে-পিছনে যে রাজমণ্ডলের কথা কৌটিল্য লিখেছেন, তার সংখ্যা অন্তত বারোটি হওয়ায় পণ্ডিতেরা মনে করেন—যে রাজ্যে আগে-পরে কমপক্ষে বারোটা রাজ্য আছে, সে রাষ্ট্রের আয়তন খুব বিরাট হতে পারে না।

সত্যি কথা বলতে কী, সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে একটি সাম্রাজ্য যদি কল্পনা করা যায়, তবে কৌটিল্য তাঁর নাম দিয়েছেন 'চক্রবর্তিক্ষেত্র'। তবে সমগ্র ভারতবর্ষে একটি চক্রবর্তী রাজার অধিকার কল্পনা করা যে মোটেই বাস্তবসম্মত নয়, সেটা কৌটিল্য বুঝেছিলেন। অন্যদিকে, একটি অধিকৃত রাজ্যের আগে-পরে শত্রু-মিত্র মিলে যে দ্বাদশ রাজমণ্ডলের কল্পনা করা হয়েছে, তাতেই কৌটিল্যের অভীষ্ট রাজ্যটুকু খুব ছোটো হয়ে যাবে, সেটাও ধারণা করা ঠিক হবে না। বরঞ্চ এই রাজমণ্ডলের নিরিখেই কৌটিল্যের অভীষ্ট রাজ্যটিকে সাধারণের তুলনায় একটু বড়োই ভাবা উচিত।

অন্যেরা বলেন—রাজ্যের সপ্তাঙ্গ বিবেচনার সময় কৌটিল্য মনু-মহাভারতের মতো রাষ্ট্র শব্দটা ব্যবহার করেননি মোটেই। তিনি ব্যবহার করেছেন 'জনপদ' শব্দটি। আর কে না জানে যে, প্রাচীন বেদ-ব্রাহ্মণের যুগে এক-একটি জন-জাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলকেই জনপদ বলা হত। যেমন, পাঞ্চাল জনপদ, কৌশল জনপদ। এই জনপদ শব্দটিও তাই ছোট্ট একটি রাষ্ট্রেরই ইঙ্গিত দেয়। আমাদের ধারণা—কথাটা এত সহজ করে না ভাবাই ভালো। তার কারণ হল, 'জনপদ' শব্দটি ব্যবহার করে কৌটিল্য তাঁর প্রাচীনদের প্রতি সম্মান জানিয়েছেন, কারণ রাষ্ট্র শব্দটি তাঁর কিছু অজানা ছিল না। খোদ বৈদিক যুগেই রাষ্ট্র শব্দটি যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়েছে। এতৎসত্ত্বেও, তিনি সপ্তাঙ্গ-রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে জনপদ শব্দটি ব্যবহার করেছেন এইজন্য যে, তাঁর কথিত রাষ্ট্র শুধু ভূখণ্ডমাত্র নয়, সেটি মনুষ্যসমৃদ্ধ একটি রাজ্য বা রাষ্ট্র, অন্য জায়গায় যাকে তিনি বলেছেন—পুরুষবৃদ্ধি রাজ্যম্।

আরও একটা কথা ভাবা দরকার। অর্থশাস্ত্রের মধ্যে একটি রাষ্ট্রের যে শাসনযন্ত্রের কথা বলেছেন, যতগুলি বিভাগ, বিভাগীয় অধ্যক্ষ, তাদের বেতন এবং যত প্রকারের রাজকর্মচারীর কথা বলেছেন কৌটিল্য, তা একটি ছোট্ট জনপদের পরিসর নয় মোটেই। বরঞ্চ বলা যায় যে, এই রাষ্ট্রের অগ্র-পশ্চাতে যে রাজমণ্ডল, সেই মণ্ডলবর্তী রাজ্যগুলির প্রত্যেকটির আয়তনই বরং ছোটো হতে পারে। সপ্তাঙ্গনির্ণয়ের সময় একটি জনপদের প্রথম বিশেষণ দিয়েছেন—'স্থানবান', অর্থাৎ প্রচুর

জায়গা থাকবে সেখানে; তার মধ্যে দুর্গ, কৃষিক্ষেত্র, হস্তীবন ইত্যাদি যেসব জনপদ-প্রয়োজন কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন, তাতে তাঁর অভীষ্ট রাষ্ট্র মোটেই খুব ছোটো নয়।

[Beni Prasad, State in Ancient India, p. 252; R.P. Kangle, Kantitya Arthaśāstra, Vol. 3, pp. 120-121; কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র ৯.১; B.K. Sarkar, Indian Historical Quarterly, 1, 1925, p. 751]

□ কামন্দক বলেছেন—রাজার রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি সেই সেই রাষ্ট্রের ভূমিগুণের ওপর নির্ভর করে। অতএব, সুষ্ঠু শাসনের জন্য রাজা সেইরকম একটি জনপদ পছন্দ করবেন, যেখানে শস্যলাভের সুবিধে আছে, যেখানে প্রচুর খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, যেখানে পণ্যের জোগান ভালো, যে দেশের পশুপালনের উপযোগিতা আছে, কৃষিকর্মের জন্য প্রচুর জল আছে, শুধু বৃষ্টির ওপর যেখানে নির্ভর করতে হয় না এবং যেখানে ব্যাবসাবাণিজ্যের উপযোগী রাস্তা আছে। জনপদটি পার্বত্য এলাকায় বা বনভূমিতে হলে সেখানে চোর-ডাকাতের উপদ্রব হয়, আর শুষ্ক জলহীন ভূমি হলে কাঁটাগাছ আর সাপের উপদ্রব হবে।

আমরা জানি, যেমন ঠিক কৌটিল্যও জানেন যে, এইরকম একটি আদর্শ প্রাকৃতিক পরিবেশসম্পন্ন জনপদেই প্রত্যেক রাজার বসতি সম্ভব নয়। তাঁর যুগে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ জুড়ে রাষ্ট্রের সেই সার্বভৌম প্রকৃতিও ছিল না, যে এক জায়গায় বিশেষ কিছুর অভাব থাকলে অন্য জায়গায় সেটা মিলবে। কৌটিল্য তাই জনপদের প্রকৃতি এবং সংজ্ঞা ঠিক করেছেন রাজনৈতিকভাবে, অর্থাৎ সপ্তাঙ্গ-রাষ্ট্রের অন্যতম এক প্রকৃতি বা অঙ্গ হিসেবে জনপদের ভূমিকা কী হবে, কৌটিল্য সেটাই নির্ধারণ করেছেন।

কৌটিল্য প্রথমেই ইঙ্গিত করেছেন জনপদবাসী মনুষ্যপ্রকৃতির দিকে। অর্থাৎ, যাঁরা একটি জনপদে থাকবেন, তাঁদের সামাজিক প্রকৃতিটাই কৌটিল্যের মতে জনপদগঠনের প্রথম সোপান। আবার অন্যদিক দিয়ে, একটি জনপদ বা রাষ্ট্রের আয়তন যেহেতু বিশাল—অন্তত যেহেতু সেটা কয়েকটি গ্রামের সমষ্টির চেয়ে স্বল্পায়তন নয়— তাই কৌটিল্য একটি গ্রামকে জনপদের সবচেয়ে ছোটো 'ইউনিট' হিসেবে ধরেছেন। পণ্ডিতেরা এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে 'জিও-পলিটিক্যাল' আখ্যায় চিহ্নিত করেছেন। পরিষ্কার বোঝা যায়—এখানেও ভূখণ্ড এবং জনসমষ্টির ভাবনা কৌটিল্যকে প্ররোচিত করেছে, তা না হলে জনপদবাসীর সামাজিক গঠন এবং গ্রামের কথা প্রথমেই আসত না। আমরা একে একে সেসব কথায় আসছি।

একটি জনপদের কাম্য প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে কৌটিল্য যে সূত্রগুলি দিয়েছেন, তার সঙ্গে মনু, মহাভারত বা কামন্দকের খুব একটা পার্থক্য নেই। তবে কৌটিল্যের বৈশিষ্ট্য হল—জনপদের সাধারণ ধর্মগুলি বলবার সময় তিনি বলেছেন—জনপদের মানুষজন এমন হওয়া দরকার, যারা রাজাকে কর দেওয়া বা দরকারে জরিমানা দেবার ব্যাপারটা সহ্য করতে পারে। এ ছাড়া, কৃষকেরা যেখানে ভালো কাজ করে অথচ জমি বা কোনোকিছুর মালিকেরা যেখানে সুবিবেচক এবং যেখানে নিম্নবর্ণের লোকেরা বেশি বাস করে, সেটাই আদর্শ জনপদ।

সপ্তাঙ্গ-রাষ্ট্রের সপ্ত-প্রকৃতি বর্ণনা করার সময় কৌটিল্য জনপদের বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে দেখিয়েছেন মাত্র। কারণ, পুস্তক আরম্ভ করার সময়, রাজা অমাত্য, রাজপুত্র অথবা রাজার শিক্ষার ব্যাপারে কথাবার্তা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই, কৌটিল্য জনপদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে নিয়েছেন এবং সে আলোচনার ভৌগোলিক তথা রাজনৈতিক তাৎপর্যের মূল স্থান হল গ্রাম এবং গ্রামের জনগোষ্ঠীর সামাজিক গঠন।

কৌটিল্য যেমনটি নির্দেশ করেছেন, তাতে একটি জনপদের সবচেয়ে ক্ষুদ্রাংশের নাম হল গ্রাম। দশখানি গ্রাম একত্রিত হলে, তার নাম হবে 'সংগ্রহণ'। সংগ্রহণ একটা বড়ো বা মহাগ্রাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যে মহাগ্রামের মধ্যে শহরের ছোঁয়াটুকু না থাকলেও শহরায়ণ বা নগরায়ণের প্রবণতার আরম্ভ এইখান থেকেই। এইভাবে এপাশে একশোটি ওপাশে একশোটি গ্রামের মাঝখানে থাকবে 'খার্বটিক', যাকে একটা ছোট্ট 'টাউনশিপ' বলা যায়। চারশোটি গ্রামের মাঝখানে যে স্থানটিকে কৌটিল্যের

ভাষায় 'দ্রোণমুখ' বলা হয়েছে, সেটা একটা উপনগরবিশেষ। একইভাবে, আটশোটি গ্রামের মাঝখানে থাকবে স্থানীয়, যেটিকে একটি নগর বলা যায়। পরবর্তী কালে, এর নাম হয়েছে নিগম। 'স্থানীয়' শব্দটির সঙ্গে আধুনিক 'থানা' শব্দের উচ্চারণগত মিল দেখিয়েছেন কৌটিল্যের অনুবাদক ড. শামা শাস্ত্রী।

জনপদের মধ্যস্থিত গ্রাম-বিভাগের একটা 'ক্রুড্' পরিকল্পনা আমরা মনুস্মৃতি এবং মহাভারতেও পাব। সেখানে ভাগটা আছে দশ গ্রাম, কুড়িটি গ্রাম, একশোটি গ্রাম এবং এক হাজার গ্রামের। মনু বলেছেন—দুটি, তিনটি অথবা পাঁচটি গ্রামের অন্তরে অন্তরে রাজার নিযুক্ত একটি করে রক্ষকপুরুষ থাকবেন। সেই রক্ষকপুরুষের পারিভাষিক নাম গুল্ম। কৌটিল্যের মতে অবশ্য, গ্রামশাসনের ব্যাপারে প্রথম রক্ষকপুরুষ থাকবেন দশটি গ্রামের অধিকর্তা হিসেবে। তার নাম 'গোপ'। আর সম্পূর্ণ জনপদ এবং নগরের চতুর্থাংশের অধিকারী এবং রক্ষীপুরুষ হলেন 'স্থানিক'। এর সঙ্গে আটশো গ্রামের মাঝখানে অবস্থিত স্থানীয় নামক নগরের সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়।

এই রক্ষীপুরুষের সঙ্গে হয়তো দণ্ডের সম্পর্ক ছিল, কিন্তু শাসনপরিচালনার ব্যাপারটা বোধ হয় প্রধানত নির্ভর করতো দশ, দুশো, চারশো বা আটশো গ্রামের মাঝে মাঝে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর বা উপনগরকল্প সংগ্রহণ, খার্বটিক, দ্রোণমুখ বা স্থানীয়ের ওপর। এগুলিই বোধ হয় তখনকার গ্রামসমূহের 'হেড কোয়ার্টার' হিসেবে কাজ করত। এটাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে এইজন্য যে, পরবর্তী কালের শিলালিপিগুলিতে এক-একটি স্থানকে আমরা দশ, বারো, পনেরো বা কুড়িটি গ্রামের 'হেড কোয়ার্টার' হিসেবে কাজ করতে দেখেছি। পঞ্চম শতাব্দীর বা কতক রাষ্ট্রে প্রবরেশ্বর বলে একটা বড়ো জায়গায় নাম পাওয়া যাচ্ছে, যেটা অন্তত ছাব্বিশটি গ্রামের মূল কেন্দ্র বা 'হেড কোয়ার্টার' হিসেবে কাজ করত। একইভাবে, বারোটি গ্রামের মূল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে রাজপুতনার তনুকূপ নামে একটি জায়গা। গুজরাতের ঘড়হড়িক বা বুন্দেলখণ্ডের খট্টাগুাও ওই বারোটি গ্রামের 'হেড কোয়ার্টার' ছিল।

পণ্ডিতেরা অনেকে বলেছেন—তখনকার দিনের একশোটা গ্রামের যে 'ইউনিট'গুলি করা হত, এখনকার দিনের ভাষায় সেগুলিকে এক-একটি তহশিল বা তালুক বলা যায়। এমনকী, দুশো গ্রাম নিয়ে যে খার্বটিক এবং চারশো গ্রাম নিয়ে যে দ্রোণমুখের কথা বলেছেন কৌটিল্য, সেগুলি যেহেতু একটি জনপদ বা বিষয়ের উপরিভাগ বা মহকুমার মতো কিছু, তাই সেগুলিকেও আধুনিক তহ্‌শিল বলতে দ্বিধা করেননি পণ্ডিতেরা।

একটি গ্রামের সামাজিক গঠন নিয়ে প্রাচীনদের মধ্যে মতপার্থক্য কিছু আছে। মনু বলেছিলেন— একটি গ্রামের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষেরই আর্যগুণসম্পন্ন হওয়া দরকার— 'আর্যপ্রায়ম্'। আর্য বলতে এখানে বিশদর্থে ভদ্রলোকই বোঝাবে এবং মনুর দৃষ্টিতে সেই ভদ্রলোক অবশ্যই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বংশজ। এ ব্যাপারে কৌটিল্য অনেক বেশি বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন। তিনি জানেন যে, সেকালের দিনের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরা রাজসংগতি পছন্দ করতেন এবং তাঁরা অনেকেই ছিলেন রাজকর্মে নিযুক্ত। অতএব, রাজা বা রাজপুরুষের সমস্ত সান্নিধ্য ছেড়ে তাঁরা সবাই গ্রামের উন্নতি ঘটাচ্ছেন— এটা কৌটিল্য ভাবতে পারেননি। তা ছাড়া, অত্যন্ত বাস্তব কারণেই গ্রাম্যকর্মে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের কোনো উপযোগ নেই। গ্রামের জীবিকা এবং গ্রামের উন্নতি যেহেতু কৃষিকর্মনির্ভর এবং সেই কৃষিকর্মের পরোক্ষ ফল যেহেতু সমস্ত জনপদই লাভ করে, তাই গ্রামের ভিত্তি হওয়া উচিত কৃষক।

কৌটিল্য মনে করেন—একটি গ্রামে বেশির ভাগ মানুষ হওয়া উচিত শূদ্রজাতীয় কৃষকশ্রেণীর। এক-একটি গ্রামে কমপক্ষে একশো ঘর এবং বেশিপক্ষে পাঁচশো ঘর গৃহস্থের বাস হওয়া উচিত। একটি গ্রাম থেকে আর একটি গ্রামের ব্যবধান বা দূরত্ব হওয়া উচিত এক থেকে দুই ক্রোশ, যদিও বিপদের সময় একটি গ্রাম যাতে অন্য গ্রামটির সাহায্যকল্পে এগিয়ে আসতে পারে সে ব্যবস্থা থাকা উচিত। একটি গ্রাম যাতে অন্য গ্রামের সঙ্গে মিশে গিয়েও নিজের বৈশিষ্ট্য বা 'আইডেনটিটি' হারিয়ে না ফেলে, তার জন্য নদী, পাহাড়, বন, জলাশয়, শমী-শাল্মলী অথবা জংলা

গাছের বেড়া দিয়ে গ্রামের সীমানির্দেশ করতে বলেছেন কৌটিল্য।

[কামন্দকীয় নীতিসার, ৪.৫০-৫৬;
কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ৬.১; ২.১;
P.V. Kane, Hist. of Dharmaśāstra, vol. III, p. 139-140;
A.S. Altekar, State and Govt., p. 164-165;
Epigraphia India, XXIV. p. 264;
Epigraphia India, II p. 109;
Indian Antiquary, VI. p. 193-4;
Epigraphia India, IV, p. 157;
U.N. Ghoshal, A History of Indian Political Ideas, p. 125]

সপ্তাঙ্গ-রাষ্ট্রের তৃতীয় অঙ্গ হিসেবে জনপদের বিবেচনা করার সময়, কৌটিল্য জনপদবাসী মানুষগুলিকে নিয়েও গভীর চিন্তা করেছেন। জনপদস্থিত প্রত্যেকটি পরিবারের একটি বালক থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধ পর্যন্ত, স্ত্রীলোক (সধবা, অধবা, পুত্রহীনা) থেকে আরম্ভ করে ক্রীতদাস, গৃহস্থ থেকে আরম্ভ করে সন্ন্যাসী পর্যন্ত— সকলের সামাজিক ব্যবহার পর্যালোচনা করেছেন কৌটিল্য। এমনকী, রাজকর্মচারী এবং রাজার প্রিয় তোষামুদে রাজবল্লভজনেরা কৃষক, বণিক এবং অন্যান্য জনপদবাসীদের কীভাবে উৎপীড়ন করেন এবং তার প্রতিকার কী—সে ব্যাপারেও কৌটিল্যের সতর্ক নজর আছে। শত্রুরাষ্ট্র যাতে জনপদের ক্ষতি না করতে পারে, তার জন্য সামরিক সুরক্ষা ছাড়াও, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, চোর-ডাকাত, এমনকী পশুপক্ষীর উপদ্রব সম্বন্ধেও রাজাকে সদাসর্বদা সজাগ থাকতে হত, নইলে জনপদের বিনাশে, সপ্তাঙ্গ-রাষ্ট্রের অন্যতম অঙ্গের হানি ঘটবে বলে কৌটিল্যের বিশ্বাস।

[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র ২.১]

জনমেজয়১ কুরুবংশীয় রাজা পরীক্ষিতের ঔরসে, মাদ্রবতীর (অন্যমতে ইরাবতীর) গর্ভে জনমেজয়ের জন্ম হয়। তাঁর তিন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁদের নাম—শ্রুতসেন, উগ্রসেন এবং ভীমসেন।

[মহা (k) ১.৩.১; ১.৯৫ (হরি) ১.৩.১; ১.৯০.১১৪;
ভাগবত পু. ১.১৬.২]

□ রাজা পরীক্ষিৎ মহর্ষি শমীকের পুত্র শৃঙ্গী বা গবিজাতের অভিশাপে তক্ষকনাগের দংশনে প্রাণত্যাগ করেন। রাজপুত্র জনমেজয় তখন নিতান্ত শিশু। তাই মন্ত্রীরাই পরীক্ষিতের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। তারপর তাঁরা বালক জনমেজয়কে পরবর্তী রাজা বলে মেনে নিলেন এবং শুভদিনে তাঁর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করলেন।

বালক জনমেজয় কৃপাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করলেন। ক্রমে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হলে যৌবনে পদার্পণ করে জনমেজয় রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিলেন এবং ন্যায় অনুসারে প্রজাপালন করতে লাগলেন।

[মহা (k) ১.৪১.১০.১৪; (হরি) ১.৩৬.১০-১৪;
দেবী ভাগবত ২.৮.১৮-২৮; ১১.১-১১]

□ কাশীরাজ সুবর্ণবর্মার কন্যা বপুষ্টমা রাজা জনমেজয়ের পত্নী ছিলেন। তাঁর গর্ভে জনমেজয়ের ঔরসে শতানীক এবং শঙ্কু নামে দুই পুত্রসন্তান হয়। শতানীকের ঔরসে বিদেহনন্দিনীর গর্ভে অশ্বমেধদত্ত নামে এক পুত্রসন্তান হয়। ইনি রাজা জনমেজয়ের পৌত্র তবে হরিবংশ পুরাণে জনমেজয়ের বংশধর সম্পর্কে ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়।

সেখানে বলা হয়েছে জনমেজয়ের দুই পুত্রের নাম ছিল চন্দ্রাপীড় এবং সূর্যাপীড়। জনমেজয়ের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রাপীড় সিংহাসন লাভ করেন। চন্দ্রাপীড়ের একশত পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যকর্ণ চন্দ্রাপীড়ের পরে সিংহাসন লাভ করেন। সত্যকর্ণ এবং তাঁর ভাইয়েরা জনমেজয় (বা জানমেজয়) ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন—

চন্দ্রাপীড়স্য পুত্রাণাং শতমুত্তমধন্বিনাম্।
জনমেজয় ইত্যেবং ক্ষাত্রং ভুবি পরিশ্রুতম্॥

[মহা (k) ১.৪৪.৮-৯; ১.৯৫.৮৬;
(হরি) ১. ৩৯.৮-৯; ১.৯০.১১৫-১১৬;
দেবী ভাগবত ২.১১.১২;
হরিবংশ পু. ভবিষ্য পর্ব. ১.৩-৫]

□ মহর্ষি উতঙ্ক তক্ষক নাগের দ্বারা অত্যন্ত উৎপীড়িত হয়েছিলেন। তাই তক্ষক নাগের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি একদিন রাজা জনমেজয়ের সভায় এসে উপস্থিত হলেন। উতঙ্ক জনমেজয়কে বোঝালেন যে তক্ষক নাগই তাঁর পিতা পরীক্ষিতের মৃত্যুর জন্য দায়ী। অতএব পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের উচিত তক্ষক তথা সমগ্র সর্পবংশের উপর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়া। মহর্ষি উতঙ্কের কাছ থেকে পিতার মৃত্যুর

বিবরণ শুনে জনমেজয় অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। শুধুমাত্র তক্ষক নয়, সমগ্র সর্পজাতির প্রতি তাঁর তীব্র ক্রোধ সৃষ্টি হল। মহর্ষি উতঙ্কের প্ররোচনাতেই তিনি সর্পযজ্ঞ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—একথা বলা চলে।

[মহা (k) ১.৩.১৬৯-১৮৭; (হরি) ১.৩.১৮৬-২০৪; ৪.২]

□ মহর্ষি উতঙ্কের মুখে পিতার মৃত্যুর ঘটনা শুনে জনমেজয় শোকে আকুল হলেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর জন্য যে তক্ষক নাগই দায়ী তা জনমেজয় উপলব্ধি করলেন এবং তক্ষক তথা সমগ্র সর্পজাতির উপর তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। সমগ্র সর্পজাতির বিনাশ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করে জনমেজয় তাঁর পুরোহিতদের পরামর্শে সর্পযজ্ঞ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। চ্যবন বংশীয় মহর্ষি চণ্ডভার্গব ছিলেন এই যজ্ঞের ঋগ্বেদের পুরোহিত বা হোতা, মহর্ষি কৌৎস ছিলেন সাম্‌বেদের পুরোহিত বা উদ্‌গাতা, জৈমিনি ও শার্ঙ্গরব ছিলেন এই যজ্ঞের ব্রহ্মা বা অথর্ববেদের পুরোহিত এবং মহর্ষি পিঙ্গল ছিলেন যজুর্বেদের পুরোহিত বা অধ্বর্যু। সর্পযজ্ঞ আরম্ভ হলে বহুসংখ্যক সর্প-মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের আগুনে এসে পড়তে লাগল। বহু সাপের মৃত্যু হল। সর্পকুলের প্রধান বাসুকিনাগ সাপেদের রক্ষা করার জন্য তাঁর বোন জরৎকারুর পুত্র আস্তীকের শরণাপন্ন হলেন, কারণ ব্রহ্মার বরে একমাত্র আস্তীকই জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ বন্ধ করতে পারেন। আস্তীক নিজের মাতুল বংশকে রক্ষা করার জন্য জনমেজয়ের যজ্ঞক্ষেত্রের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

যজ্ঞ আরম্ভের সময়েই যজ্ঞশালার নির্মাতা ভূতত্ত্ব-বিদ্যায় বিশারদ এক শিল্পী রাজা জনমেজয়কে সাবধান করেছিলেন—যে স্থানে এবং যে সময়ে এই যজ্ঞশালার পরিমাপ করা আরম্ভ হয়েছে তার ফলস্বরূপ কোনো ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞ শেষ হবার আগেই তা বন্ধ করতে পারেন। রাজা জনমেজয় একথা শুনে যজ্ঞশালায় কড়া পাহারার ব্যবস্থা করলেন। রাজার বিনা অনুমতিতে কোনো ব্যক্তির সেই স্থানে প্রবেশের অধিকার ছিল না। একথা জানতে পেরে বুদ্ধিমান আস্তীক সেই যজ্ঞশালার প্রহরীদের সামনে জনমেজয় রাজা এবং তাঁর সর্পযজ্ঞের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। আস্তীকের দ্বারা যজ্ঞ নষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই মনে করে প্রহরীরা আস্তীককে পথ ছেড়ে দিল। আস্তীক যজ্ঞশালায় প্রবেশ করে জনমেজয় রাজা, উপস্থিত ঋষিগণ এবং অগ্নিকে স্তবের দ্বারা তুষ্ট করলেন। রাজা জনমেজয় সন্তুষ্ট হয়ে আস্তীককে ইচ্ছা অনুসারে বর প্রার্থনা করতে বললেন। তখন আস্তীক 'সর্পযজ্ঞ বন্ধ হোক' এই বর প্রার্থনা করলেন। শেষপর্যন্ত উপস্থিত ঋষিগণ, অগ্নি এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনের অনুরোধে রাজা জনমেজয় আস্তীকের ইচ্ছা অনুসারে সর্পযজ্ঞ বন্ধ করলেন। *[মহা (k) ১.৫১-৫৬ অধ্যায়; (হরি) ১.৪৬-৫১ অধ্যায়]*

□ কুরুকুলের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ মহর্ষি ব্যাস তাঁর শিষ্যদের নিয়ে এই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। রাজা জনমেজয় তাঁর কাছে মহাভারতের কাহিনী শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ব্যাসদেবের আদেশে তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়কে ব্যাসরচিত মহাভারতের কাহিনী শুনিয়েছিলেন। প্রতিদিন দিনের কাজকর্ম সমাপ্ত হবার পরে রাজা জনমেজয় এবং তাঁর সভাসদরা মহাভারতের কাহিনী শুনতেন।

[মহা (k) ১.৬০.১৫-২৪; (হরি) ১.৫৫.১৫-২৪]

□ সর্পযজ্ঞের পর রাজা জনমেজয় একটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন বলে জানা যায়। *[হরিবংশ পু. ৩.২.৫-৬]*

□ মহাভারতের আশ্রমবাসিক পর্বে মহর্ষি বেদব্যাসের কৃপায় ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্য কুরুবংশীয়রা তাঁদের মৃত আত্মীয় স্বজনদের দর্শন করেছিলেন—এই কাহিনী শুনে জনমেজয় অবিশ্বাস ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন যদি মহর্ষি ব্যাস তাঁর পরলোকগত পিতার দর্শন করাতে পারেন, তবেই তিনি একথা বিশ্বাস করবেন। মহর্ষি ব্যাসের কৃপায় জনমেজয় স্বর্গত রাজা পরীক্ষিতের দর্শন লাভ করেছিলেন।

[মহা ১৫.৩৫.১-৮; (হরি) ১৫.৩৮.১-৮]

□ মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে রাজা জনমেজয় তক্ষশিলা জয় করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। তক্ষশিলা বোধহয় তক্ষক নাগের বাসভূমি ছিল। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যেই জনমেজয় তক্ষশিলা অভিযান করেন। তবে সেখানে তিনি পিতার আততায়ীর সন্ধান পাননি।

তাই পরে নাগজাতিকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য নতুন করে উদ্যোগ নিয়েছিলেন জনমেজয়।

[মহা (k) ১.৩.২০; (হরি) ১.৩.২১-২২]

□ একবার রাজা জনমেজয় কুরুক্ষেত্রে এক দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞ চলাকালীন যজ্ঞক্ষেত্রে এক কুকুর এসে উপস্থিত হল। জনমেজয়ের ভ্রাতারা সেই কুকুরটিকে প্রহার করলে সে কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের কাছে গেল। কুকুরটির মা, সরমা যখন শুনলেন যে তাঁর পুত্রের কোনো অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও জনমেজয় রাজার ভ্রাতারা তাকে প্রহার করেছে তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে যজ্ঞশালায় উপস্থিত হয়ে জনমেজয় রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার পুত্র তোমাদের যজ্ঞের হবিতেও মুখ দেয়নি, কোনো অপরাধও করেনি। তা সত্ত্বেও তোমরা তাকে মেরেছ কেন? রাজা বা তাঁর সভাসদরা কেউ এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে সরমা জনমেজয় রাজাকে অভিশাপ দিলেন—আমার পুত্র কোনো অপরাধ করেনি, তা সত্ত্বেও তোমরা যখন তাকে মেরেছ তখন কোনো অতর্কিত ভয় তোমাদের উপর এসে পড়বে।

এই অভিশাপ শুনে দুঃখিত ও ভীত জনমেজয় রাজা অভিশাপ কীভাবে নিষ্ফল হবে তার উপায় খুঁজতে লাগলেন। এইসময় তিনি জানতে পারলেন যে, মহর্ষি শ্রুতশ্রবার পুত্র সোমশ্রবা মহাদেবের অভিশাপ ছাড়া অন্য যে কোনো অভিশাপ নিবারণ করতে সক্ষম। একথা শুনে জনমেজয় সোমশ্রবাকে নিজের পুরোহিত নিযুক্ত করতে ইচ্ছা করলেন। তা শুনে শ্রুতশ্রবা বললেন—কোনো ব্রাহ্মণ যদি সোমশ্রবার কাছে কিছু প্রার্থনা করেন তাহলে তিনি তাঁকে সেই বস্তু অবশ্যই দান করে থাকেন। তাঁর এই নিয়ম যদি তুমি মানতে সমর্থ হও তবে সোমশ্রবা অবশ্যই তোমার পুরোহিত হবেন। জনমেজয় তাতেই সম্মত হলেন। এইভাবে জনমেজয় রাজা সরমার অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন।

[মহা (k) ১.৩.১-১৯; (হরি) ১.৩.১-২০]

□ মৎস্য পুরাণে বর্ণিত আছে যে, রাজা জনমেজয় তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞে ঋষি বাজসনেয়কে পুরোহিত পদে বরণ করলে মহর্ষি বৈশম্পায়ন তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। মৎস্য পুরাণ এই বিষয়টিকে যজ্ঞকর্মে ব্রাহ্মণ পুরোহিত এবং ক্ষত্রিয় পুরোহিতের অধিকারের দ্বন্দ্ব হিসাবে দেখেছে। মৎস্য পুরাণ মতে বাজসনেয় ক্ষত্রিয় ছিলেন বলেই তাঁকে পুরোহিত পদে বরণ করায় ব্রাহ্মণ মহর্ষি বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হন এবং তিনি রাজাকে অভিশাপ দেন। তবে Iravati Karve এবং অন্যান্য পণ্ডিতরা এই মত পোষণ করেন যে, বাজসনেয় এবং বৈশম্পায়নের মধ্যে দ্বন্দ্ব মূলত কৃষ্ণযজুর্বেদ এবং শুক্লযজুর্বেদকে কেন্দ্র করে। বাজসনেয় ঋষি এবং তাঁর শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য শুক্ল যজুর্বেদের প্রবক্তা। তাঁরা প্রাচীন কৃষ্ণ-যজুর্বেদের পাঠ এবং ভাবনা তেমন মানতেন না। ঋষি বৈশম্পায়ন ছিলেন কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্যতম প্রবক্তা। সম্ভবত সেইজন্যই বাজসনেয়কে পুরোহিত পদে বরণ করলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে জনমেজয় রাজাকে অভিশাপ দেন। তবে জনমেজয় রাজা অভিশাপের ভয়ে পুরোহিত পরিবর্তন করেননি। বাজসনেয় ঋষির দ্বারাই তিনি দুটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এই কারণে রাজা জনমেজয়কে 'মহাবাজসনেয়ক' বলা হয়েছে। অশ্বমেধযজ্ঞের শেষে অভিশপ্ত রাজা বনে গমন করলেন। ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন এই ঘটনার পরে কুরুরাজবংশের সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন বলে মনে হয়। সেই জন্যই হয়তো ভাগবত পুরাণে আমরা দেখি জনমেজয় রাজার পুত্র শতানীককে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যই বেদ শিক্ষা দিচ্ছেন।

[মৎস্য পু. ৫০.৫৭-৬৪; ভাগবত পু. ৯.২২.৩৮; Iravati Karve, Hindu Society; an interpretation, p. 136-138]

জনমেজয়২ মহারাজ কুরুর পৌত্র পরীক্ষিৎ-এর সাতজন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম জনমেজয়। তাঁর ছয় ভাইয়ের নাম যথাক্রমে কক্ষসেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন, ইন্দ্রসেন, সুষেণ এবং ভীমসেন।

[মহা (k) ১.৯৪.৫২-৫৫; (হরি) ১.৮৯.৪৩; বিষ্ণু পু. ৪.২০১]

□ এই পারীক্ষিৎ জনমেজয় সম্পর্কে প্রাচীনতম তথ্য পাওয়া যায় বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এবং শ্রৌতসূত্রে। শতপথ ব্রাহ্মণে এই কথা আছে যে জনমেজয়ের ঘোড়াগুলি শ্রান্ত হয়ে গেলে তাদের মিষ্ট পানীয় খাওয়ানো হত। এই মিষ্ট পানীয় সম্ভবত সোমরসই, কেন না শতপথ

ব্রাহ্মণের একটি মন্ত্রে—দেবানাং সোমাঃ সোমৈর্ব্যতিষক্তাঃ প্রবন্তে . . . হয়ান্ কাষ্ঠভৃতো যথা পূর্ণপরিস্রুতা . . . কুম্ভান্ জনমেজয় সাদনে . . .—

Julius Eggeling অনুবাদে লিখেছেন—
. . . difficult to be understood is the wisdom of the deities: streams of Soma flow, interlinked with streams of Soma:—Even as they constantly sprinkle the equal prize winning steeds, so (they pour put) the cups full of fiery liquor in the palace of Ganamegaya. Then the Asura Rakshas went away.

[Satapatha Brahmana, SBE, Vol.44, Part 5, Page 95]

□ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ থেকে জানা যায় এই জনমেজয়ের রাজধানী ছিল আসন্দীবৎ নগর।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (Hang) ৮.২১]

মহাভারতের শান্তিপর্ব থেকে জানা যায় যে, রাজা জনমেজয় মাত্র তিনদিনে পৃথিবী জয় করেছিলেন।

[মহা (k) ১২.১২৪.১৬; (হরি) ১২.১২১.১৬]

□ পুরুবংশীয় রাজা যযাতির উপর সন্তুষ্ট হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র একটি অপূর্ব সুন্দর এবং দ্রুতগামী রথ তাঁকে দান করেছিলেন যযাতির মৃত্যুর পর সেই রথ পুরুষানুক্রমে তাঁর বংশধরদের অধিকারে আসে। ক্রমে কুরুর পৌত্র পারীক্ষিৎ জনমেজয় এই রথের অধিকারী হন। কিন্তু একবার মহাত্মা গর্গের অভিশাপে এই রথ অদৃশ্য হয়ে গেল। ক্রুদ্ধ রাজা জনমেজয় মহর্ষি গর্গের বালক পুত্রকে হত্যা করলেন। ব্রহ্মহত্যার অপরাধে তাঁর দেহ 'লোহগন্ধ' যুক্ত হয়ে গেল। তাঁর পুরোহিতরা এমনকী প্রজারাও ব্রহ্মহত্যাকারী রাজাকে ত্যাগ করলেন। অনুতপ্ত রাজা রাজ্য ত্যাগ করে বনে গেলেন এবং কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। তারপর ব্রহ্মহত্যার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য জনমেজয় রাজা শুনক বংশীয় মহর্ষি দেবাপির পুত্র ইন্দ্রোত নামক মহান তপস্বীর শরণাপন্ন হলেন। জনমেজয়ের অপরাধের কথা শুনে ইন্দ্রোত কঠোর ভাষায় তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন। রাজা জনমেজয় বিনীতভাবে নিজের অনুতাপ ব্যক্ত করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং ইন্দ্রোত মুনির কাছে এই পাপ থেকে মুক্ত হবার উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা জনমেজয় যে তাঁর কৃতকর্মের জন্য সত্যিই অনুতপ্ত তা বুঝতে পেরে দয়ালু মহর্ষি ইন্দ্রোত রাজাকে ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বেষ ত্যাগ করার উপদেশ দিলেন। তাঁর উপদেশে রাজা জনমেজয় 'আর কখনো ব্রহ্মহত্যা করব না'—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে নানা তীর্থে স্নান করে পবিত্র হলেন। এরপর মহর্ষি ইন্দ্রোতর পৌরহিত্যে তিনি এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন যার ফলস্বরূপ তিনি ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হন। রাজা জনমেজয়ের এই অশ্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখ পাই শতপথ ব্রাহ্মণে—

এতেন হ ইন্দ্রোতো দৈবাপঃ শৌনকঃ
জনমেজয়ম্ পারীক্ষিতং যা জ্ঞাং চকার।
তেনেষ্টা সর্বাং পাপকৃত্যাং সর্বাং ব্রহ্মহত্যাম্
অপজঘান সর্বাং হ বৈ পাপকৃত্যাম্ সর্বাং
ব্রহ্মহত্যাম্ অপহন্তি যো'শ্বমেধেন যজতে।

[শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩.৫.৪.১]

রাজা জনমেজয় এবং তাঁর তিন ভাই উগ্রসেন, ভীমসেন এবং শ্রুতসেন যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে পাপমুক্ত হয়েছিলেন, তার উল্লেখ আছে শাংখ্যায়ন শ্রৌত সূত্রে। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতে গিয়ে এই কাহিনীর উল্লেখ করেছেন।

[মহা (k) ১২.১৫০-১৫২ অধ্যায়; (হরি) ১২.১৪৭-১৪৯ অধ্যায়; শাংখ্যায়ন শ্রৌত সূত্র ১৬.৮.২৭-২৮; ৯.১-৭; ব্রহ্ম পু. ১২.৬-১৫; বায়ু পু. ৯৩.২০-২৬]

□ রাজা জনমেজয়ের আটটি পুত্র ছিল। তাঁরা হলেন যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বাহ্লীক, নিষধ, জাম্বূনদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসাতি। জনমেজয় রাজার মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ধৃতরাষ্ট্র রাজা হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.৯৪.৫৫-৫৮; (হরি) ১.৮৯.৪৪-৪৫]

□ যে সব ধার্মিক রাজা মৃত্যুর পর যমের সভায় বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিলেন জনমেজয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। *[মহা (k) ২.৮.২৩; (হরি) ২.৮.২৩]*

জনমেজয়$_3$ পুরাকালে জনমেজয় নামে কোনো একজন রাজা ছিলেন যিনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা মান্ধাতার হাতে পরাজিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। *[মহা (k) ৭.৬২.১০; (হরি) ৭.৫৪.১০]*

জনমেজয়$_{৪}$ কোনো এক জনমেজয় রাজা নিজের শরীর ব্রাহ্মণকে দান করে উত্তম স্বর্গলাভ করেছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ১২.২৩৪.২৪; (হরি) ১২.২৩১.২০]

জনমেজয়$_{৫}$ রাজা কুরুর ঔরসে কুরুরাজমহিষী বাহিনীর গর্ভে পাঁচটি পুত্রসন্তান হয়। তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রের নাম জনমেজয়।

[মহা (k) ১.৯৪.৫১; (হরি) ১.৮৯.৩৯]

জনমেজয়$_{৬}$ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্র, পাণ্ডবদের শ্যালক। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় কৃপাচার্য তাঁর এবং তাঁর অন্যান্য ভাইদের নাম মহাবীর যোদ্ধা বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর রথের ঘোড়াগুলি সর্ষেফুলের মতো হলুদ ছিল বলে জানা যায়।

[মহা (k) ৭.২৩.৫১; ১৫৮.৩৯; ৮.৪৮.২০; ৪৯.৩৫; ৫৬.৬৫; (হরি) ৭.২১.৪৮; ১৩৮.৩৬; ৮.৩৬.৪৩.৩৭.৩৩; ৪২.৬৬]

জনমেজয়$_{৭}$ যে সমস্ত দুর্বৃত্ত রাজারা অহংকারী হয়ে নিজেদের স্বজন জ্ঞাতিদের উচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন ভীম তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন দুর্যোধনের জ্ঞাতিচ্ছেদী ভাবের প্রসঙ্গে—

যে সমুচ্চিচ্ছিদুর্জ্ঞাতীন্ সুহৃদশ্চ সবান্ধবান্।

আঠেরো জন এইরকম দুর্বৃত্ত রাজার নাম করার সময় ভীম নীপবংশীয় রাজা জনমেজয়ের নাম উল্লেখ করেছিলেন।

[মহা (k) ৫.৭৪.১৩; (হরি) ৫.৬৯.১৩]

জনমেজয়$_{৮}$ যুধিষ্ঠিরের সমকালীন কোনো এক রাজ্যের রাজা। যুধিষ্ঠির যে সব রাজাদের পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ৫.৪.১৬; (হরি) ৫.৪.৬]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানকারী একজন পার্বত্যদেশীয় রাজা জনমেজয়ের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। তাঁকে গদাযুদ্ধে পারদর্শী বলে উল্লেখ করা হয়েছে— জনমেজয়ো গদাযোধী পার্বতীয় প্রতাপবান্। হয়তো এই জনমেজয়কেই যুধিষ্ঠির পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্মুখ এই জনমেজয় রাজাকে বধ করেছিলেন। *[মহা (k) ৮.৬.১৯; (হরি) ৮.৪.১৯]*

জনমেজয়$_{৯}$ রাজা যযাতির পুত্র পুরু রাজার ঔরসে, কৌশল্যার গর্ভে জনমেজয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর রাজত্বকালে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তিনি একটি বিশ্বজিৎ যজ্ঞও করেছিলেন।

[মহা (k) ১.৯৫.১১; (হরি) ১.৯০.১৪-১৫; ভাগবত পু. ৯.২০.২; মৎস্য পু. ৪৯.১]

□ রাজা জনমেজয় মগধরাজের কন্যা অনন্তাকে (অন্যমতে 'মাধবী' বা মাধবের কন্যাকে) বিবাহ করেছিলেন। অনন্তার গর্ভে জনমেজয়ের একটি পুত্রসন্তান হয়। তাঁর নাম প্রাচীন্বান্।

[মহা (k) ১.৯৫.১২; (হরি) ১.৯০.১৬; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১]

জনমেজয়$_{১০}$ বরুণের সভায় উপস্থিত থেকে যে সব নাগ তাঁর উপাসনা করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন নাগ। *[মহা (k) ২.৯.১০; (হরি) ২.৯.১০]*

জনমেজয়$_{১১}$ বিভ্রাজবংশীয় রাজা উদক্‌শেনের পুত্র ভল্লাট। ভল্লাটের পুত্র রাজা জনমেজয়। এই জনমেজয় রাজাকে রক্ষা করার জন্য সূর্য বংশীয় রাজা উগ্রায়ুধ নীপ বংশ ধ্বংস করেছিলেন বলে জানা যায়। পুরাণ এই জনমেজয়কে জনমেজয় দুর্বুদ্ধি নামে চিহ্নিত করেছে। আর সম্ভবত এঁর কথাই ভীম উল্লেখ করেছেন জ্ঞাতিহত্যাকারী রাজা হিসেবে।

[বায়ু পু. ৯৯.১৮২; মৎস্য পু. ৪৯.৫৯]

জনমেজয়$_{১২}$ যযাতির পুত্র অনুর বংশে এই জনমেজয় রাজা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অনুবংশীয় রাজা সৃঞ্জয়, অন্যমতে পুরঞ্জয়ের পুত্র। জনমেজয়ের পুত্র মহাশাল (অন্যমতে মহাশীল) একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন।

[বায়ু পু. ৯৯.১৫; বিষ্ণু পু. ৪.১৮.১; ভাগবত পু. ৯.২৩.২]

জনমেজয়$_{১৩}$ পুরাকালে রাজা তৃণবিন্দুর পুত্র বিশাল বৈশালী নগরী নির্মাণ করেন। তাঁর বংশজাতরা বৈশালক এই নামে খ্যাত ছিলেন। এই বিশাল রাজার বংশের রাজা সোমদত্তের পুত্র জনমেজয়। এই জনমেজয় রাজার সুমতি নামে এক পুত্র হয়।

[বিষ্ণু পু.৪.১.১৮; ভাগবত পু. ৯.২.৩৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. ২.৬১.১৬ (মহর্ষি)]

জনমেজয়$_{১৪}$ যযাতির পুত্র অনুর বংশধারায় বলির পুত্র অঙ্গের বংশে বৃহদ্রথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্র জনমেজয়। *[মৎস্য পু. ৪৮.১০২]*

জনমেজয়$_{১৫}$ মহাভারতের নির্ণয় সাগরপ্রেস সংস্করণে ধৃত পাঠ থেকে জানা যায়, চন্দ্রবংশীয় রাজা দুষ্যন্তের ঔরসে লক্ষণার গর্ভে জনমেজয়

নামে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। মহাভারতের উল্লেখ থেকে মনে হয়, ইনি সম্ভবত ভরতের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন। তবে দুষ্মন্ত শকুন্তলার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, শকুন্তলার পুত্র ভরতই রাজা হবেন। সম্ভবত সেই কারণেই জনমেজয় সিংহাসন পাননি।

[মহা (নির্ণয় সাগর প্রেস) ১.৮৮.১৮; (হরি) ১.৮১.১৯]

জনন্তম্ব১ যদু-বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবের ঔরসে শান্তিদেবার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.১৮০]

জনন্তম্ব২ একজন বৃষ্ণি বংশীয় রাজা জনন্তম্ব। তাঁর পুত্রেরা হলেন—তুম্ব ও তুম্ববাণ।

[বায়ু পু. ৯৬.২৪৯]

জনস্থান দণ্ডকারণ্যের অংশবিশেষ। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে জনস্থানকে তীর্থ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। গোদাবরী নদীর তীরবর্তী এই অঞ্চলটি মহাকাব্যিক তথা ঐতিহাসিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুরাকালে রাজা দণ্ড এই অঞ্চলকে শাসন করতেন। তাঁর নামানুসারেই এই অঞ্চল দণ্ডক নামে পরিচিত ছিল। রাক্ষসদের কুলগুরু শুক্রচার্যের কন্যা অরজাকে ধর্ষণের অপরাধে রাজা দণ্ডক অভিশপ্ত হন। মাত্র সাতদিনের মধ্যে রাজা স্বয়ং তাঁর সেনাবাহিনী ও রাজ্যসহ ভস্মীভূত হন। দণ্ড রাজার সেই রাজ্যই কালক্রমে এক মহারণ্যের আকার নেয় যা দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত ছিল। সেই দণ্ডকারণ্যেরই অন্য নাম জনস্থান। এই স্থান মূলতঃ রাক্ষস অর্থাৎ আর্যেতর জনজাতির আবাসস্থলে পরিণত হয়। সেই ধারাতেই রামায়ণের কালে রাবণের অনুজা শূর্পনখা বা অনুজ খর রাক্ষসের অবাধ বিচরণস্থল হয়ে উঠেছিল জনস্থান। রামায়ণের বর্ণনা থেকে জানা যায় রামায়ণের সমকালে প্রায় চোদ্দ হাজার দুর্দান্ত রাক্ষস বাস করত জনস্থানে।

পণ্ডিতজনেরা 'জনস্থান' নামকরণের সঙ্গে রাক্ষসদের বসবাসের একটি যোগসূত্র রচনা করার চেষ্টা করেছেন। সেই বিশ্লেষণের গভীরে যাওয়া এক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন। বেদমন্ত্রে 'জন্মন্' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। জন্মন্ একটি ভৌগোলিক একক। জন্মন্ মানে একটি ছোটো গ্রাম যেখানকার অধিবাসীরা পিতৃপিতামহের পরম্পরায় ভিন্ন অথবা একান্নবর্তী হয়ে বাস করে। জন্মসূত্রে সম্পর্কিত এই ধরনের কয়েকটি গ্রাম নিয়ে তৈরি হয় একটি 'বিশ্' বা settlement অর্থাৎ কয়েকটি 'জন্মন্' নিয়ে গড়ে ওঠে একটি বিশ্। আবার একাধিক 'বিশ্' নিয়ে একটি জন। সম্ভবত 'জন' শব্দ অর্থে সেকালে ক্ষুদ্র জনজাতি বা tribe কে বোঝান হত। আর 'জন'-এর প্রধান হলেন জনপতি অর্থাৎ রাজা। এই আলোচনা সূত্রে বলা যায় যে, বেদাচার বহির্ভূত এক বৃহৎ অনার্য গোষ্ঠী যেখানে বাস করতেন তাঁদের জন-বহুলতার কারণেই এই জায়গাটির নাম হয়েছিল জনস্থান। দণ্ডরাজার কাহিনী থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, তাঁর শাসন বিলুপ্ত হবার পরেই দণ্ডকারণ্য বেদাচারী আর্য জনজাতির স্পর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। এসব অঞ্চলে অনার্য, যাঁদের স্থানবিশেষে রাক্ষসকুলজাত বলা হয়েছে, তাঁদের বসতি গড়ে ওঠা খুব অস্বাভাবিক বিষয় নয়। দণ্ডকারণ্যের ক্ষেত্রেও সম্ভবত জনস্থান নামটির উৎপত্তিবীজ এইখানেই।

[ঋগ্‌বেদ ৭.৫৫.৫; রামায়ণ ১.১.৪৬-৪৮; মহা (k) ১৩.২৫.২৯; (হরি) ১৩.২৬.২৮; বামন পু. ৬৩.২০-৮৬; ৬৪ ও ৬৫ অধ্যায় সম্পূর্ণ, ৬৬.১-২১; বায়ু পু. ৮৮.৯; বিষ্ণু পু. ৪.২.৩; ভাগবত পু. ৯.৬.৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.৯]

□ রামায়ণের কাহিনী থেকে আবার জনস্থান নামকরণের আরেকটি তত্ত্ব উঠে আসে। উত্তরকাণ্ডে রামায়ণের কবি রাজা দণ্ডের অভিশাপ লাভের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে শুক্রাচার্যের অভিশাপে দণ্ডের সমগ্র রাজ্য অর্থাৎ বিন্ধ্য পর্বত থেকে ঋক্ষ পর্বত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছিল। যার ফলে এই সমগ্র অঞ্চল মানুষ তো দূরের কথা, অন্যান্য প্রাণীদেরও বসবাসের উপযুক্ত রইল না। কালক্রমে সেখানে গভীর বনভূমি সৃষ্টি হয় যা দণ্ডকারণ্য নামে বিখ্যাত। এই বিজন ভূ-ভাগ বহুকাল পতিত হয়ে থাকার পর অবশেষে তপস্বীদের আগমনে পূর্ণ হয়ে ওঠে। সেসময়ই সমগ্র অঞ্চলটি জনস্থান, অর্থাৎ বিজন থেকে জনাগমের অর্থে জনস্থান-নামে পরিচিত হয়ে ওঠে—

ততঃ প্রভৃতি কাকুৎস্থ দণ্ডকারণ্যমুচ্যতে।।
তপস্বিনঃ স্থিতা হ্যত্র জনস্থানমতো'ভবৎ।

[রামায়ণ (মুধোলকর) ৭.৮১.২০; রামায়ণ ৭.৯৪.১১-২০]

□ ব্রহ্মপুরাণে জনস্থান নামের অপর একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পুরাকালে বৈবস্বত মনুর বংশে জনক নামে এক পুণ্যাত্মা রাজা ছিলেন। রাজসুখে নিরন্তর অতিবাহিত করা সত্ত্বেও জীবনে চূড়ান্ত মুক্তিলাভের লক্ষ্যে জনক রাজপুরোহিত যাজ্ঞবল্ক্যের শরণাপন্ন হলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশানুসারে তপস্যা করে জনক প্রজাপতি ব্রহ্মার দর্শন লাভ করেন এবং বহু পুণ্যলাভের ইচ্ছায় ব্রহ্মার আদেশে দণ্ডকারণ্যে গৌতমী গঙ্গার তীরে একটি স্থানে অশ্বমেধ সহ নানা প্রকার যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই সময় থেকেই রাজা জনকের বংশ পরম্পরায় জনক-উপাধি অবলম্বন করে সেই যজ্ঞক্ষেত্রটি 'জনকস্থান' নামে প্রসিদ্ধ হয়, পরবর্তী সময়ে এই 'জনকস্থান' নামটিই সংক্ষেপে জনস্থান নামে পরিচিত হয়—

তথা জনকরাজানো বহবস্তত্র কর্মণা॥
মুক্তিং প্রাপুর্মহাভাগা গৌতম্যাশ্চ প্রসাদতঃ।
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং জনস্থানেতি বিশ্রুতম্॥

জনস্থান তীর্থক্ষেত্রটি চার যোজন বিস্তৃত। এই তীর্থ দর্শনে দর্শনার্থী মুক্তি লাভ করে।

[ব্রহ্ম পু. ৮৮ অধ্যায় সম্পূর্ণ]

□ জনস্থান রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্দান্ত খর রাক্ষসের আবাসস্থল ছিল। নরখাদক এই রাক্ষস জনস্থাননিবাসী তপস্বীদের প্রচণ্ড অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে তিনি মুনিদের যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটাতেন। কখনো বা হোমাগ্নিতে জলবর্ষণ করে, কখনো আবার জল সঞ্চয়ের পাত্র নষ্ট করে খর এবং তাঁর সঙ্গীরা জনস্থানকে তপস্বীকুলের বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছিলেন। খরের অত্যাচারে ঋষিরা সাময়িকভাবে এই অঞ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

রামচন্দ্র বনবাসকালে সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রাক্ষস-উপদ্রুত জনস্থানে এসেছিলেন। অন্যদিকে রামের বনবাসের সংবাদ পেয়ে তাঁর অনুজ ভরতও জনস্থানের নিকটবর্তী অঞ্চলে জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করেন। ভরতকে দর্শন করে রামচন্দ্র অনুজের দুঃখ ও স্মৃতিতে কাতর হয়ে পড়েন। তাঁর মনে হয়েছিল জনস্থানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলেই তিনি আরও বেশি কাতর হয়ে পড়বেন। সে কারণে রামচন্দ্র রাক্ষস অধ্যুষিত জনস্থান ত্যাগ করাই শ্রেয় বলে স্থির করেন। তবে এই স্থানটিকে রাক্ষসদের অত্যাচার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য দেবতাদের অনুরোধে রামচন্দ্র কিছুকাল জনস্থানে থেকে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে রামচন্দ্রই খর রাক্ষসের নিধন করেছিলেন। রাক্ষসী শূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদের সঙ্গেও জনস্থানের নাম জড়িয়ে রয়েছে।

[রামায়ণ ২.১১৬.১১-২৬; ২.১১৭.১-৪; ৩.১৮.২৪;
মহা (k) ৩.২৭৭.৪২; ৭.৫৯.৩, ১৮;
(হরি) ৩.২৩১.৪২; ৭.৫১.৩, ১৮;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৩.১৯৫; বায়ু পু. ৮৮.১৯৪]

□ শূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদের পর খরসহ জনস্থাননিবাসী রাক্ষসদের সঙ্গে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে জনস্থানের প্রায় সমস্ত রাক্ষস নিহত হয়। অকম্পন নামে এক রাক্ষস কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে লঙ্কায় রাবণের কাছে পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছে দিয়েছিল। সে সময় ক্রুদ্ধ রাবণকে তাঁরই প্রতিপালিত জনস্থানকে ধ্বংস করার বিষয়ে কার সাহস হতে পারে, সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে দেখা যায়। এ থেকে বোঝা যায় রামায়ণের কালে দণ্ডকারণ্য অর্থাৎ প্রায় বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত লঙ্কাপতি রাবণের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের বলবিক্রমে জনস্থানের ওপর রাবণের আধিপত্য নষ্ট হয়।

[রামায়ণ ৩.৩১.১-২, ৪০]

□ সোনার হরিণরূপী মারীচ রাক্ষস বধের পর রামচন্দ্র জনস্থানে সীতাদেবীর কাছে দ্রুত ফিরে আসতে চেষ্টা করেন, একথা রামায়ণে বলা হয়েছে—যা থেকে বোঝা যায় যে, রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণ বনবাসের অনেকটা সময় জনস্থানেই বাস করেছেন এবং সেখান থেকেই রাবণ সীতাকে হরণ করেন। *[রামায়ণ ৩.৪৪.২৭;*
মহা (k) ৩.১৪৭.৩৩; ৭.৫৯.৪;
(হরি) ৩.১২২.৩৩; ৭.৫১.৪]

□ রামায়ণের আরণ্যকাণ্ডে জনস্থানের একটি বিবরণ লক্ষ্মণের মুখে শুনতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মণ জনস্থানকে রাক্ষসাকীর্ণ বিস্তীর্ণ এক গভীর বনাঞ্চল বলে বর্ণনা করেছেন। সেখানে বহু দুর্গম গিরিদুর্গ, ভয়ঙ্কর গুহা ছিল। কিন্নর ও গন্ধর্বদের আবাসস্থলও জনস্থান—

ইদমেব জনস্থানং ত্বমন্বেষিতুমর্হসি।
রাক্ষসৈর্বহুভিঃ কীর্ণং নানাদ্রুমলতাযুতম্॥

সন্তীহ গিরিদুর্গাণি নির্দরাঃ কন্দরাণি চ।
গুহাশ্চ বিবিধা ঘোরা নানামৃগগণাকুলাঃ॥
আবাসাঃ কিন্নরাঞ্চ গন্ধর্বভবনানি চ।

[রামায়ণ ৩.৬৭.৪-৬]

□ রামায়ণে বর্ণিত এই জনস্থান একটি সুরম্য অরণ্যপ্রদেশ ছিল—এ বর্ণনা পরবর্তী সময়ের কবিদের রচনাতেও পাওয়া যায়। ভবভূতির উত্তররামচরিত নাটকের প্রথম অঙ্কে চিত্রপটে অঙ্কিত জনস্থান অরণ্য এবং প্রস্রবণগিরির সৌন্দর্য্যের অসামান্য বিবরণ মেলে, যার অনুসরণে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর 'সীতার বনবাস' গ্রন্থখানিতে লিখেছিলেন সেই বিখ্যাত বর্ণনা— আর্য্যে! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি; এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সততসঞ্চরমানজলধরপটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্ন সলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে।'

ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটকের সম্পূর্ণ তৃতীয় অঙ্কটির পটভূমি এই 'জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি।' সীতাকে বনবাসে দেবার পর সীতার বিরহে কাতর রাম বনবাসের সুখস্মৃতিচারণের জন্য গিয়ে পৌঁছেছেন সুরম্য জনস্থানে।

[Uttararamacharita, Ed. by C Sankara Rama Sastri, Madras, Balamanorama Press,1962, Act. 1, p. 20; Act ৩ (Whole); সীতার বনবাস, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কলকাতা, The Sanskrit Press, 1873, পৃ. ১৬-১৭]

□ রামচন্দ্র বনবাসকালে জনস্থাননিবাসী এক রাক্ষসের মস্তকচ্ছেদ করেছিলেন। রাক্ষসের ছিন্নমস্তকটি নিকটস্থ অরণ্যে বিচরণকারী মহোদর মুনির জঙ্ঘার অস্থিভেদ করে প্রবেশ করে। ঋষি বহু সাধ্য-সাধনা করেও জঙ্ঘালগ্ন কর্তিত মস্তকটি থেকে মুক্তি পাননি। অবশেষে সরস্বতী নদীর তীরবর্তী ঔশনস তীর্থের পবিত্র জলে স্নান করে মহোদর ঋষি মুক্তি লাভ করেন।

[মহা (k) ৯.৩৯.১০; (হরি) ৯.৩৭.১০]

□ বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের ঔরঙ্গাবাদসহ গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর তীরবর্তী অঞ্চল। নাসিকও প্রাচীন জনস্থানের অন্তর্গত ছিল। পারজিটারের মতে, গোদাবরী নদী উপত্যকার জনস্থানে প্রাচীনকালে লঙ্কাবাসী রাক্ষসদেরই একটি শাখা বাস করতো। সম্ভবত একারণেই লঙ্কারাজ রাবণের আত্মীয় এবং আশ্রিতদের প্রতাপ জনস্থানে দেখা যেত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তামিল শব্দ 'ইরাইবান'-এর অর্থ রাজা। 'ইরাইবান' শব্দটি থেকেই সংস্কৃত রাবণ শব্দের উৎপত্তি। রাবণ কোনো ব্যাক্তিনাম নয়, একটি পদবিশেষ। পুরাকালে বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশ থেকে সিংহল পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানটির অধিপতি রাজাকে ইরাইবানই বলা হত। সেই অর্থেই সম্ভবত জনস্থানকে ইরাইবান বা রাবণের শাসনাধীন অঞ্চল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[GDAMI (Dey) p. 80; AIHT (Pargiter) p. 276-277; J.W. Mc Crindle; Ancient India as Described by Ptolemy; London; Trubner & Co; 1884; p. 21-23]

জনাপীড় পুরুবংশীয় শরুথের পুত্র জনাপীড়। জনাপীড়ের চারজন পুত্র ছিলেন। তাঁদের নাম পাণ্ড্য, কেরল, চোল, কুল্য। *[বায়ু পু. ৯৯.৫-৬]*

জনেশ্বরী *[দ্র. জলেশ্বরী]*

জন্তু পাঞ্চালরাজ সোমক সাহদেব্য-র পুত্র জন্তু। পঞ্চাল রাজবংশের রাজপুত্র জন্তুর জন্ম-পুর্নজন্মের বিচিত্র উপাখ্যানই মহাভারতের বনপর্বে জন্তুপাখ্যান নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

পঞ্চাল দেশের রাজা সোমক সাহদেব্য দীর্ঘকাল অপুত্রক ছিলেন। একশোজন রানী তাঁর, অথচ কোনো রানীরই কোনো সন্তান নেই। অবশেষে রাজা যখন প্রায় বুড়ো হয়ে গিয়েছেন, তখন তাঁর সেই একশো রানীর মধ্যে কোনো একজনের গর্ভে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হল। রাজা সোমকের এই পুত্রটির নাম হল জন্তু। একশো রানীর ঘরে একটি মাত্র ছেলে জন্মাল, তাও আবার কিনা এতকাল অপেক্ষার পর, অথচ কোন রানীর গর্ভে এই ছেলে হল, তার নামও জানা গেল না মহাভারতে, জানা গেল না বংশকীর্তনকারী পুরাণগুলি থেকেও। আর কেনই-বা এই ছেলের নাম জন্তু, তাতেও যেন কেমন একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন তৈরি হয়। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা ভালো যে, 'জন্তু' শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'জন্' ধাতু থেকে। 'জন্' ধাতুর অর্থ জন্মানো। সেই দিক থেকে বিচার করলে যার জন্ম হয়েছে, সেই জন্তু। সেক্ষেত্রে কিন্তু 'জন্তু' বলতে

পুত্রও বোঝায়। স্বয়ং আচার্য মনু মনুসংহিতায় 'পুত্র' শব্দের পর্যায় শব্দ হিসেবে 'জন্তু' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। তবু রাজবংশের বহু আকাঙ্ক্ষিত বংশরক্ষক পুত্রের এমন নামকরণ খানিকটা আশ্চর্যজনক তো বটেই। যাই হোক, এই ছেলে জন্মানোর পর থেকেই রাজবাড়ির একশো রানীর সমস্ত স্নেহ-বাৎসল্য গিয়ে পড়ল ওই এক ছেলে জন্তুর ওপর। তাঁদের রাজরানীর বিলাস, সাজগোজ, ব্যক্তিত্ব সব যেন এক ফুঁয়ে উড়ে গেল, তাঁরা সেই ছেলে নিয়ে পড়লেন। স্নেহে পাগল করে দেন ছেলেকে—

তং জাতং মাতরঃ সর্বাঃ পরিবার্য সমাসতে।

একদিন মা-রা সবাই বসে আছেন জন্তুকে ঘিরে। এমন সময়ে এক ক্ষুদ্র পিপীলিকা শিশুপুত্রের পিছনে কামড়ে দিল। জন্তুর চিৎকার আরম্ভ হল সঙ্গে-সঙ্গে এবং তারই সঙ্গে শুরু হল শত মায়ের আর্ত চিৎকার। মহাভারতের কবি রসিক মানুষ—ভগবদ্‌গীতা-র আরম্ভে যুদ্ধোদ্যমের মুহূর্তে শঙ্খ-তুরী-ভেরী-দামামা বেজে ওঠার পর কবি লিখেছিলেন—সেই শব্দ একেবারে বিশাল-তুমুল হয়ে উঠল—

স শব্দস্তুমুলো'ভবৎ।

ঠিক এই যুদ্ধকালীন শব্দের অর্ধশ্লোকী 'কমন্ এপিথেট' এখানে তুলে আনলেন মহাভারতের কবি—জন্তুকে ঘিরে জন্তুর স্নেহময়ী একশো মায়ের তুমুল রোদন ধ্বনির মধ্যে—

প্রবার্য্য জন্তুং সহিতাঃ স শব্দস্তুমুলো'ভবৎ।

মা-দের সেই আর্ত চিৎকার-ধ্বনি রাজসভায়-বসা রাজার কানেও পৌঁছাল। রাজা তখন তাঁর যজ্ঞযাজী ব্রাহ্মণের সঙ্গে বসেছিলেন। রানীদের কান্না শুনে তিনি ত্বরায় পাঠালেন দৌবারিককে। দৌবারিক সমস্ত খবরাখবর নিয়ে এসে রাজাকে জানাল—বিশেষ কিছু হয়নি, মহারাজ। আপনার একমাত্র ছেলের নিতম্বে একটি পিঁপড়ে কামড়েছে, তার জন্যই আপনার একশো রানী চিৎকার করে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন।

রাজা এবার মন্ত্রী-অমাত্যদের সঙ্গে নিয়েই অন্তঃপুরে এলেন, তারপর যেভাবে হোক পুত্রকে শান্ত করে তিনি ফিরে এলেন রাজসভায়। সেখানে মন্ত্রী-অমাত্যদের সঙ্গে রাজপুরোহিত ঋত্বিককে নিয়ে এক বিশেষ আলোচনায় বসলেন তিনি। কথারম্ভেই সোমক সাহদেব্য আলোচনার শীর্ষক সৃষ্টি করে বললেন—দেখুন, আমার মনে হয়, স্বামী-স্ত্রী'র সংসার-জীবনে বরং পুত্র-কন্যা না-হওয়াও ভালো, কিন্তু একটামাত্র ছেলে হওয়ার জীবনকে আমি ধিক্কার দিই—

ধিগস্তু-একপুত্রত্বম্ অপুত্রত্বং বরং ভবেৎ।

রাজা আরও বললেন—আমি দেখেছি—সংসারে একটা মাত্র ছেলে মানেই সব সময় পীড়া আর কষ্টের কারণ। আমি একটি পুত্রলাভের জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। অনেক দেখে-শুনে অনেক পরীক্ষা করে একশোটা বউ বিয়ে করে এনেছি। কিন্তু তাঁদের কোনো সন্তানই হল না, এমনই কপাল—

ইদং ভার্যাশতং ব্রহ্মন্ পরীক্ষ্য সদৃশং প্রভো।

তারপর অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর এই ছেলে হল যার নাম জন্তু। এখন অবস্থা দেখুন—রাজা বললেন পুরোহিত ঋত্বিককে —আমার নিজের তো বটেই আমার স্ত্রীদেরও যৌবন চলে গেছে—

বয়শ্চ সমতীতং মে সভার্যস্য দ্বিজোত্তম।

—ফলে এই যে একটা ছেলে হয়েছে বাড়িতে, ওই একটা ছেলের ওপর সবার স্নেহ একত্র হয়েছে যেন, সবার প্রাণ যেন ওই একটা ছেলের মধ্যেই আটকে আছে—

আসাং প্রাণাঃ সমায়ত্তা মম চাত্রৈকপত্রকে।

সাহদেব্য সোমকের এই সমস্যা ভীষণ আধুনিক তো বটেই এবং তা খুব মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্বও বহন করে। আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষে বহু পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষাটা জনক-জননীর বাৎসল্য মুক্তির অন্যতম একটা উপায় ছিল। মৃত্যুর পর পরলোকে পিণ্ডলাভ করা কিংবা পুন্নাম নরক থেকে উদ্ধার লাভ করার শাস্ত্রীয় যুক্তি পুত্রাকাঙ্ক্ষার যত বড়ো কারণ হিসেবেই দেখানো হোক, আমাদের মানসিক দ্বিচারিতাতেই এটা বাস্তবসম্মতভাবে আমরা জানি যে, সন্তানের মাধ্যমে মানুষ নিজেকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চায় পরম্পরাক্রমে। এর সঙ্গে আছে ধন-জন, বিষয় সম্পত্তির উপযুক্ত উত্তরাধিকার তৈরি করা এবং অবশ্যই বাৎসল্য-মুক্তির একটা-একটা উপযুক্ত আধার হিসেবে নিজে 'সিকিওরড' বোধ করা। এত সব অন্তর্গত কারণ মুখে স্পষ্টভাবে বলা যেত না বলেই পুত্রসন্তান-হীনতার জন্য আক্ষেপটা ছিল চিরকালীন এবং শাস্ত্রীয়তার বিশ্বাসে নির্মিত। ঠিক এইরকম একটা বিশ্বাস এবং বাস্তবতার মধ্যে যদি পুত্রের সংখ্যা হত এক এবং একমাত্র, তা হলে

পুত্রের জীবন নিয়ে শঙ্কা এবং সংশয় চরম পরিণতি ধারণ করত। বিশেষত, এক পুত্রের ওপর স্নেহ এবং বাৎসল্যের পরিমাণ কী দাঁড়ায়, তা আজকের দিনের অণু পরিবারগুলোর প্রত্যেকটি ঘরে দেখতে পাই। সোমক সাহদেব্যও অত্যন্ত বাস্তব এই ঘটনাটা লুকানোর চেষ্টা করেননি। তাঁর একশোটি স্ত্রী-ই যাতে আপন বাৎসল্যের আধার খুঁজে পান, তাই রাজ্যের প্রধান পুরোহিত-ঋত্বিকের কাছে যাচনা করলেন—কাজটা ভালো হোক বা মন্দ হোক, ছোটো কাজ বা বড়ো, আপনি এই ব্যবস্থা করুন যাতে আমার একশোটা ছেলে হয়, সেটা সম্ভব কী করে বলুন আপনি—

স্যাত্তু কর্ম তথা যুক্তং যেন পুত্রশতং ভবেৎ।

ঋত্বিক বললেন—হতে পারে, এটা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু আমি যদি সেই যজ্ঞ করি, তবে সেই হোমে আহুতি দিতে হবে আপনার পুত্র সেই 'জন্তু'কেই—

যজস্ব জন্তুনা রাজন্ ত্বং ময়া বিততে ক্রতৌ।

ঋত্বিক যাজক বলতে লাগলেন—আপনার পুত্র জন্তুর মেদ-মাংস-চর্বি আগুনে আহুতি দিয়ে যখন হোম করব, তখন সেই যজ্ঞধূম আঘ্রাণ করলেই আপনার একশো রানী গর্ভধারণ করবেন, একশোটি ছেলে হবে আপনার। আর আপনার এই যে পুত্র জন্তু, ইনিও পুনর্জন্ম লাভ করবেন। যে রানীর গর্ভে এঁর জন্ম হয়েছিল, তিনিই আবার জন্ম দেবেন এঁকে। তবে বিশেষ এইটুকুই যে তাঁর বাঁ পাশে একটা সোনার মতো চিহ্ন আঁকা থাকবে। সোমক সাহদেব্য সম্মতি জানালে যাজক যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। কিন্তু এই ভয়ংকর মারণ যজ্ঞ নিয়ে ভালোরকম একটা অশান্তি হল। জন্তুর মায়েরা কিছুতেই তাঁদের লালিত পুত্রকে আভিচারিক যাজকের হাতে ছাড়বেন না, আর ওদিকে যাজকও তাঁর যজ্ঞ সমাপনের জন্য ছেলের বাঁ হাত ধরে টানতে লাগলেন। অবশেষে জন্তুকে বলি দেওয়া হল এবং সোমক সাহদেব্য-র পুরোহিত জন্তুর মেদ মাংস যজ্ঞে আহুতি দিলেন। সেই মেদগন্ধের ঘ্রাণ নাকে পৌঁছানো মাত্র সোমকের একশো রানী মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং এঁরা সকলেই গর্ভবতী হলেন। যথা সময়ে তাঁদের একশোটি ছেলে হল এবং সেই জন্তু তাঁর ভূতপূর্ব জননীর গর্ভে পুনরায় জন্মালেন সেই স্বর্ণচিহ্ন সহ। আশ্চর্য এই যে, সোমকের স্ত্রীরা সবাই পুত্রলাভ করলেও জ্যেষ্ঠ সেই জন্তুই এবারও সকলের প্রিয়তম হয়ে উঠলেন।

আমরা অনুমান করতে পারি যে, এই যজ্ঞের প্রক্রিয়াকালে এই যে সোমকের একশো রানী যজ্ঞধূম আঘ্রাণ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং তারপর গর্ভবতী হলেন—এগুলো আভিচারিক ক্রিয়াকর্মের সংবাদ। কিন্তু মহাভারত জানাচ্ছে যে, একসময় সোমক রাজার সেই যাজক মারা গেলেন এবং তারপর মারা গেলেন সোমকও। কিন্তু পরলোকে গিয়ে সোমক দেখলেন—তাঁর সেই যাজক নরক ভোগ করছেন এবং খুব কষ্টে আছেন। সোমক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি এইভাবে নরক ভোগ করছেন কোন অপরাধে? যাজক বললেন—সেই যে আমি আপনার যজ্ঞ করলাম, আপনার পুত্রের মেদ-মাংস আহুতি দিলাম যজ্ঞে, তারই ফলে এই নরক ভোগ করছি আমি—

ত্বং ময়া যাজিতো রাজন্ তস্যেদং কর্মণঃ ফলম্।

যজ্ঞকারী যাজকের এই নরক-গতি দেখিয়ে মহাভারত কিন্তু এটাই বলতে চাইছে যে, অভিচার কর্মের কিছু-কিছু বৈদিককালেই অনুমোদিত হয়েছিল বটে, এমনকী 'বহুচ' ব্রাহ্মণে পুত্রবধের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু যতই বৈদিক অনুমোদন থাকুক, এই সব আভিচারিক যজ্ঞের পিছনে, মহাভারত এটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, হিংসা করা কখনোই কোনো ধর্মের বিচার হতে পারে না। যাজক পুরুষের নরকবাসের দহন-যন্ত্রণা দেখিয়ে মহাভারত কিন্তু যজ্ঞে পশুবধের নিন্দা করছে এবং সেই ভাবনা থেকেই জন্তুর জন্ম এবং পুনর্জন্মের বৃত্তান্তটি একটি অন্যতর মাত্রা লাভ করেছে।

[মহা (k) ৩.১২৭-১২৮ অধ্যায়;
(হরি) ৩.১০৫-১০৬ অধ্যায়]

জন্তুধনা অজ নামে এক পিশাচের কন্যা জন্তুধনা। সমস্ত জীব-জন্তুই এই কন্যার ধন এবং খাদ্যরূপে নির্দিষ্ট। সেকারণেই এই পিশাচ-পুত্রীর নাম জন্তুধনা। পুরাণে জন্তুধনার বর্ণনায় বলা হয়েছে এঁর সর্বাঙ্গ লোমে ঢাকা।

জন্তুধনার বোনের নাম ব্রহ্মধনা। এঁর অঙ্গে রোমের রেখা পর্যন্ত নেই।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৮৫-৮৬;
বায়ু পু. ৬৯.১২৪-১২৫]

জন্ম প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দনায়ুবার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে জন্ম একজন। *[বায়ু পু. ৬৮.৩০]*

জন্মেশ্বর একটি পবিত্র তীর্থ বলে মৎস্য পুরাণে কথিত হয়েছে। *[মৎস্য পু. ২২.৪২]*

জন্য শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ ভগবান শিবের জন্য নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

জন্যে সংগ্রামে সাধুর্জন্যঃ।

জন্য শব্দের একটি অর্থ হল যুদ্ধ। তিনি যুদ্ধে সাধু অর্থাৎ পারদর্শী বা তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা—এই ভাবনা থেকে ভগবান শিব জন্য নামে খ্যাত। কিংবা তিনি মৃত্যুস্বরূপ, সুতরাং তিনি বহুলোকক্ষয়কারী যুদ্ধস্বরূপও বটে—এই ভাবনা থেকেও শিব 'জন্য' নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৫৭; (হরি) ১৩.১৬.৫৭]

জপ$_1$ বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে তৃতীয় মন্বন্তরে অর্থাৎ উত্তম মনুর কালে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যে জপ একটি। বারো জন দেবতা এই গণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিষ্ণু পুরাণের বঙ্গীয় সংস্করণে অবশ্য 'জপ' এর পরিবর্তে 'শিব' নামক গণের কথা উল্লিখিত হয়েছে। *[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৩.১.১৪; বিষ্ণু পু. (নবভারত) ৩.১.১৪]*

জপ$_2$ ভগবদ্গীতার বিভূতিযোগে সেই বিরাট পুরুষের অন্যতম বিভূতি হিসেবে জপের প্রশংসা করা হয়েছে। ভগবান বলেছেন—যত প্রকার যজ্ঞ-যাগ আছে সেগুলির মধ্যে আমি হলাম জপযজ্ঞ। এটা লক্ষণীয় ব্যাপার যে, বৈদিক কালে যজ্ঞের যে প্রাধান্য ছিল, কর্মমার্গের পন্থা হিসেবে সেই যজ্ঞের প্রাধান্য কিন্তু উপনিষদ-গীতার মধ্যেও কিছু কমেনি। কিন্তু সেই প্রাধান্য প্রতিহত করে জপের শ্রেষ্ঠত্ব তৈরি হয়েছে এই কারণেই যে, জপের মধ্যে শুষ্ক যজ্ঞীয় ক্রিয়াকলাপের চাইতেও অনেক বড়ো একটি মাত্রা যুক্ত হয়। সেটা হল যজ্ঞীয় দেবতার ধ্যান এবং অনুধ্যান। বারংবার মন্ত্রের উচ্চারণ করে মন্ত্রোদ্দিষ্ট দেবতাকে মন্ত্রবর্ণের মধ্যে অনুধ্যান করা যায় বলেই সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে জপই পরমেশ্বরের অন্যতমা বিভূতি হিসেবে কীর্তিত হয়েছে—

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোʼস্মি . . . গিরামপ্যেকমক্ষরম্।

নরসিংহ পুরাণে জপের প্রশংসা করে বলা হয়েছে—নিত্য দিন জপের মাধ্যমে স্তুতি করলেই দেবতা প্রসন্ন হন। তিনি প্রসন্ন হয়ে সমস্ত ভোগও দান করতে পারেন এবং শাশ্বতী মুক্তিও দান করতে পারেন—

জপেন দেবতা নিত্যং স্তূয়মানা প্রসীদতি।
প্রসন্না বিপুলান্ ভোগান্ দদ্যান্মুক্তিং চশাশ্বতীম্॥

[ভগবদ্গীতা ১০.২৫; নরসিংহ পু. (মহর্ষি) ৫৮.৮৩]

মহাভারতে জপের প্রাধান্য প্রকাশ করার জন্য একটি উপাখ্যান কথিত হয়েছে। শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠির এখানে শরশয়ান ভীষ্মকে জপের ফল সম্বন্ধে নির্দিষ্ট একটি প্রশ্ন করেছেন। তার উত্তরে ভীষ্ম জাপকদের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। জাপক অর্থ যাঁরা জপ করেন, জপকারী। ভীষ্ম বলেছেন—বেদ-উপনিষদ, সাংখ্য-যোগের শেষ কল্পে যে সন্ন্যাসের ভাবনা সৃষ্টি হয়, জপের মধ্যেই তার উপযোগ ঘটে—

সন্ন্যাস এব বেদান্তে বর্ততে জপনং প্রতি।

জপের প্রতীক হিসেবে এখানে গায়ত্রী-জপের কথাই বলা হয়েছে এবং গায়ত্রী-জপ যে একটা মানুষকে পরব্রহ্মের সন্ধান দিতে পারে, সেটা একটি উপাখ্যানের মাধ্যমে জানিয়েছেন ভীষ্ম। আমরা পূর্বে জপের বিষয় হিসেবে বেদ-উপনিষদের কিয়দংশ পাঠের কথা বলেছিলাম। মহাভারত সেখানে জপের প্রক্রিয়ার মধ্যে সংহিতা-জপের কথা বলছে। সাধারণত সংহিতা বলতে আমরা ঋগ্বেদ ইত্যাদি চার বেদকেই সংহিতা বলি, কিন্তু মহাভারতের শ্লোকে এই সংহিতা-জপের পারিভাষিকতা বেদের সারাৎসার গায়ত্রীর মধ্যেই নিহিত হয়েছে। চিত্তের সমস্ত স্থৈর্য্য ধ্যানের আকারে যখন গায়ত্রীর মন্ত্রবর্ণ জপ করে, তখন মানুষ বস্তুত পরব্রহ্মকেই জপের মাধ্যমে অনুধাবন করে—

তদ্ধিয়া ধ্যায়তি ব্রহ্ম জপন্ বৈ সংহিতাং হিতাম্।
সন্নস্যত্যথবা তাং বৈ সমাধৌ পর্য্যবস্থিতঃ॥

এইসব জপকারী মানুষদের সম্বন্ধে বিস্তারিত যে আলোচনা মহাভারতে আছে, সেখানে জপকর্মের প্রধান গুণ এবং অনুষঙ্গগুলির মধ্যে বৈরাগ্য, চিত্তশুদ্ধি, মানসিক স্থৈর্য্য এবং ফলাকাঙ্ক্ষাহীন অনাসক্ত কর্ম করার মতো দার্শনিক প্রত্যয়গুলি জপেরই অবান্তর ফল হিসেবে আসে। এখানে এক ব্রাহ্মণ জাপক অর্থাৎ নিরন্তর জপ করেন এইরকম এক ব্রাহ্মণের জীবন-কাহিনী বলার সময় ভীষ্ম বলছেন—এই

ব্রাহ্মণ নিজে বেদ-বেদাঙ্গবিৎ, মহাপণ্ডিত এবং বংশকৌলীন্যে তিনি কৌশিকগোত্রীয় পিপ্পলাদের পুত্র। কিন্তু তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি জাপক, তিনি গায়ত্রী জপ করেন।

একসময় তিনি হিমালয়ের পাদদেশে এই গায়ত্রী-জপের সাধনা আরম্ভ করেন। তপস্যায় অনেক বছর কেটে গেলে স্বয়ং বেদমাতা গায়ত্রী সেই জাপক ব্রাহ্মণের সামনে দেখা দিয়ে বললেন—আমি সন্তুষ্ট হয়েছি তোমার তপস্যায়। কিন্তু একথা শুনেও সেই ব্রাহ্মণে জাপক নীরবে তাঁর জপই আবৃত্তি করতে থাকলেন। তিনি কোনো উত্তর করলেন না—

জপ্যমাবর্তয়ংস্তূষ্ণীং ন স তাং কিঞ্চিদব্রবীৎ।

বেদমাতা গায়ত্রী ব্রাহ্মণের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর জপকর্মের নিষ্ঠার বিষয়ে আরও প্রশংসা করলেন। এইবার সেই ব্রাহ্মণ জপের সমাপ্তি ঘটিয়ে গায়ত্রী মায়ের চরণে পতিত হলেন এবং প্রার্থনা করে বললেন—আপনি যদি প্রীত হয়ে থাকেন আমার ওপর, তাহলে আমার মন যেন সর্বদা এই জপেই নিরত থাকে—

যদি চাপি প্রসন্নাসি জপ্যে মে রমতাং মনঃ।

গায়ত্রী দেবী বর দিতে চাইলেন ব্রাহ্মণ জাপককে। যা ইচ্ছে চাইতে বললেন। জাপক বললেন—আমি আর অন্য কিছু চাই না। বরঞ্চ আপনি এই বর দিন, যাতে আমার এই জপের ইচ্ছেটা আরও বেড়ে যায়, আর তাতেই যেন আমার মনের সমাধি হয়—

জপ্যং প্রতি মমেচ্ছেয়ং বর্ধত্বিতি পুনঃ পুনঃ।
মনসশ্চ সমাধির্মে বর্ধেতাহরহঃ শুভে॥

গায়ত্রী দেবী তথাস্তু বলে বর দিলেন জাপককে এবং তারপরেই একটা অসাধারণ কথা জানিয়ে বললেন—আমার বরে তুমি সমস্ত অভীষ্ট লাভ করবে, কিন্তু তুমি যেন অন্যান্য ব্রাহ্মণদের মতো স্বর্গে যেতে চেয়ো না, নিত্য এবং অনিন্দিত ব্রহ্মলোকে তোমার স্থান হবে।

মহাভারতে এরপরেই এই জাপক ব্রাহ্মণের কাছে ধর্ম, কাল, মৃত্যু, যম—সকলেই একে একে উপস্থিত হলেন—তাঁরা স্বর্গে যাবার জন্য তাঁকে প্রলোভিত করলেন, কিন্তু স্বর্গ তো চিরস্থায়ী স্থান নয় কারও পক্ষে, আর ভোগসুখেও এই ব্রাহ্মণ জাপকের কোনো মতি নেই। জাপকের পরলোকগতি নিয়ে বেশ বড়োসর একটা তর্কযুদ্ধ উপস্থিত হল, যেখানে মহারাজ ইক্ষ্বাকুর মতো প্রবীণ মহানুভব রাজাও অংশগ্রহণ করলেন। পরিশেষে জাপকোথ্যানের সারমর্ম হল—একটু মানুষ নিরন্তর জপকর্মের মাধ্যমে রাগদ্বেষশূন্য হয়ে, দ্বন্দ্বদুঃখহীন অক্ষরসংজ্ঞক পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করতে পারেন, জাপক ব্রাহ্মণ সেই গতিই লাভ করেছেন—

এবমেটা মহারাজ জাপকস্য গতির্যথা।

[মহা (k) ১২.১৯৬.৩-২২; ১২.১৯৯.৪-১২৮;
(হরি) ১২.১৮৯.৩-২২; ১২.১৯২.৪-১২৮]

□ ধর্মসূত্র-গ্রন্থগুলিতে জপ বলতে মন্ত্রের আবৃত্তি-পুনরাবৃত্তি বোঝাত এবং সেই জপ শুধুমাত্র একটি মন্ত্রজপ বা গায়ত্রী-জপের মতো কোনো ব্যাপার বোঝাত না। জপের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করার একটা প্রক্রিয়ায় তাঁরা বিশ্বাস করতেন, ফলে উপনিষদ, বেদান্ত কিংবা বেদের সংহিতাভাগের কোনো কোনো অংশ, মধু-শব্দটি যার মধ্যে আছে, এমন যজুর্বেদের মন্ত্র (মধুশব্দযুক্তানি যজূংষি), অঘমর্ষণ মন্ত্র, অথর্বশিরা, রুদ্র সূক্ত (শতরুদ্রীয়), পুরুষসূক্ত, রাজন এবং রৌহিণেয় সাম, জ্যেষ্ঠ সাম, সাবিত্রী ইত্যাদি জপ করে আত্মশুদ্ধি ঘটানো পবিত্র হওয়া অথবা সম্ভাব্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবেও উপরি উক্ত জপের বিধি ছিল—বৌধায়ন ধর্মসূত্রে

তস্য নিষ্ক্রয়ণানি জপস্তপো হোম উপবাসো দানম্।
উপনিষদো বেদাদয়ো বেদান্তাঃ সর্বছন্দস্সু সংহিতা
মধূনি অঘমর্ষণমথর্বশিরো রুদ্রাঃ পুরুষসূক্তং
রাজনরৌহিণে সামনী বৃহদ্রথন্তরে পুরুষগতি-
মহানাম্ন্যো মহাবৈরাজং মহাদিবাকীর্ত্যং
জ্যেষ্ঠসাম্নামন্যতম বহিস্পবমানং কুষ্মাণ্ড্য
পাবমান্যঃ সাবিত্রী চেতি পাবনানি।

আত্মশুদ্ধির জন্য, নিজের মনের মধ্যে একটা পবিত্র ভাব আনার জন্য গায়ত্রীমন্ত্র জপ করা থেকে উপনিষদের শ্লোকপাঠ এগুলি পরবর্তীকালে গীতা পাঠ, চণ্ডীপাঠ, বিভিন্ন স্তোত্রপাঠ অথবা হরিনাম জপের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। আবার ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় কৃত অপরাধ বা অন্যায় থেকে অথবা অপরাধবোধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যও জপের ভাবনা বিহিত ছিল। মনুসংহিতা তাই পরিষ্কার বলেছে—অনিচ্ছাকৃত পাপগুলি বেদাভ্যাসেই মুক্ত হয়ে যায়—

অকামতঃ কৃতং পাপং বেদাভ্যাসেন শুধ্যতি।

এখানে 'বেদাভ্যাস' অবশ্যই ধর্মসূত্রগুলিতে বলা পূর্বোক্ত জপ, যা বৌধায়ন-গৌতমেরা ধর্মসূত্রে বলেছেন। এমনকী ইচ্ছাকৃত পাপের বেলাতেও বেদের কোন সূক্ত, কোন মন্ত্র জপ করে মুক্ত হওয়া যাবে, তার কতগুলি উদাহরণও দিয়েছেন মনু এবং তার প্রত্যেকটি জায়গায়—'জপত্বা', 'জপেৎ', 'জপন্' ইত্যাদি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, জপ বলতে শুধু একটি বিশেষ মন্ত্রকেই বারবার আবৃত্তি করা বোঝায় না। 'কেননা, সেকালে উপনিষদ-বেদের মন্ত্রশ্লোক একবার আবৃত্তি করা এবং পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করাকেও জপ বলা হত। লক্ষণীয় কিন্তু এটাই যে, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদির বৃহদংশ মন্ত্রপাঠ বাদ দিয়ে একসময় পবিত্র ওঙ্কার কিংবা গায়ত্রীজপই কিন্তু বেদোপনিষদের প্রতিভূ হয়ে উঠল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় যোগসূত্রে, যেখানে বলা হচ্ছে—ঈশ্বর ভাবনার বাচকই হল পবিত্র ওঙ্কার বা প্রণব মন্ত্র, প্রণবমন্ত্র জপ করলেই ঈশ্বরে মনঃসন্নিবেশ করা যায়—

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপস্তদর্যভাবনম্।

যোগসূত্রের অন্তর্গত এই দুটি সূত্রের টীকায় বাচস্পতি লিখেছেন—

প্রণবস্য জপঃ প্রণবাভিধেয়স্য চেশ্বরস্য ভাবনম্।
তদস্য যোগিনঃ প্রণবং জপতঃ প্রণবার্থ চ
ভাবয়তঃ চিত্তম্ একাগ্রং সম্পদ্যতে।

[বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র (চিন্নস্বামী শাস্ত্রী) ৩.১০.১০-১১; গৌতম ধর্মসূত্র (olivelle) ১৯.১২; মানব ধর্মশাস্ত্র ১১.৪৬, ২৪৯-২৫৭; যোগসূত্র ১.২৭-২৮]

□ বেদ-উপনিষদ-মনুর কাল চলে গেলে মহাভারত-পুরাণে যখন ত্রিমূর্তি বা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা হল, তখন ভগবান নারায়ণ বিষ্ণু, হরি কিংবা কৃষ্ণের নাম জপই আত্মশুদ্ধি এবং পাপ-প্রশমনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হয়ে উঠল। পৌরাণিক সময়ে জপের আরও একটা বৈশিষ্ট্য তৈরি হল, সেটা খানিক ওই ধর্মসূত্রগুলির ভাবনার প্রতিরূপ। অর্থাৎ তখন যেমন বেদ-উপনিষদের এক-একটা অংশ, কিংবা শতরুদ্রীয়, পুরুষসূক্তের মতো অংশ জপের মাত্রা লাভ করেছিল, পৌরাণিক সেগুলি বিভিন্ন পুরাণে প্রসঙ্গত উচ্চারিত নানান স্তব স্তুতিগুলিও পাপ-প্রশমন এবং আত্মশুদ্ধির জন্য পাঠ্য এবং জপ্য হয়ে উঠল। ব্রহ্মপুরাণে কণ্ডুমুনির মুখে ভগবান বিষ্ণু-কৃষ্ণের যে স্তব রচনা করেছিলেন, সেটা পড়লে বা শুনলেই মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবে—এই কথাটা জপের একটি পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত হল—

যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি কথাং কণ্ডোর্মহাত্মনঃ।
বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যঃ স্বর্গলোকং স গচ্ছতি॥

[ব্রহ্ম পু. ১৭৮.১২৮-১৯২]

□ শেষে কিন্তু এটাই বলা দরকার যে, স্তবস্তুতির পর্যায়ভুক্ত এই বিষয়গুলি জপ্য বলে মনে হলেও স্তবের সঙ্গে জপের একটা পার্থক্য আছে। মীমাংসাশাস্ত্রকার শবরস্বামী তাঁর ভাষ্যে লিখেছেন—কথা বলা বা বচনক্রিয়ার সঙ্গে জপন-ক্রিয়ার কোনো পার্থক্য হয় না। কেননা জপ ব্যক্ত অবস্থায় বাচনের মধ্যেই অবস্থান করে। ফলত যেখানে মন্ত্রের বচনটুকুই মাত্র আছে, কোনো স্তুতির অংশ নেই, কোনো আশা প্রকাশ করা হচ্ছে না, দেবতার কাছে, সেটাকেই জপ বলে। অর্থাৎ ধরা যাক, 'ওঁ নমঃ শিবায়'—এটাই জপ করার মতো 'বচন', যেখানে—

'নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়/
দিগম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়।'

—এই ধরনের স্তুতির মেদ যেখানে নেই অথবা নেই কোনো গৃহ-বিত্ত-দারার প্রার্থনা, সেই মূল মন্ত্রবচনই বারবার উচ্চারণ করলে, সেটাকে জপ বলে—

বচনং জপনমিতি সমানার্থঃ,
যস্মাৎ জপ-ব্যক্তায়াং
বাচীতি স্মর্য্যতে। তেন যত্র
বচনমাত্রং মন্ত্রস্য ক্রিয়তে,
ন স্তূয়তে নাশাস্যতে স জপঃ।

[Shavara-bhāṣya as quoted in Kane's History of Dharmasastra, vol. 4, p. 45, note 105]

□ এটা জানানো দরকার যে, জপের প্রকারভেদ এবং তার সংজ্ঞা সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায়, তা নরসিংহ পুরাণ নামে একটি উপপুরাণের মধ্যেই ধরা আছে। এখানে বেদমাতা গায়ত্রীর জপ-প্রসঙ্গে কথা বলার সময় হারীত মুনির মুখে শুনতে পাচ্ছি—জপ তিন প্রকার। বাচিক, উপাংশু এবং মানস—

ত্রিবিধো জপযজ্ঞঃ স্যাৎ তস্য ভেদং নিবোধত।
বাচিকশ্চ উপাশুশ্চ মানসস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ॥

জপ তিন রকমের হয়। বাচিক অর্থাৎ উচ্চারিত হলে যেখানে মন্ত্রের শব্দবর্ণ শুনতে পাওয়া যায়—

মন্ত্রমুচ্চারয়ন্ বাচা জপযজ্ঞস্তু বাচিকঃ।

দ্বিতীয় প্রকার জপের নাম হল উপাংশু অর্থাৎ যেখানে মন্ত্রবর্ণ উচ্চারিত হতে থাকে, কিন্তু বাইরে থেকে ভালো করে সেটা শুনতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ যিনি এইভাবে জপ করছেন, তাঁর ঠোঁট দুটো নড়ে এবং শব্দ ঠিক ততটুকুই হয় যা খুব অস্পষ্টভাবে শুনতে পাওয়া যায়। এটাকেই বলে উপাংশু জপ—

শনৈরুচ্চারয়ন্ মন্ত্রং কিঞ্চিদোষ্ঠৌ প্রচালয়েৎ।
কিঞ্চিচ্ছ্রবণযোগ্যঃ স্যাৎ স উপাংশুজপঃ স্মৃতঃ॥

আর হল মানস জপ, যেখানে বাইরের সমস্ত ইন্দ্রিয়-ধার্য্য কর্ম থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে নিজের মধ্যেই জপ্য ঈশ্বরকে জপের মাধ্যমে একাগ্রভাবে অনুভব করার চেষ্টা করতে হয়। মানস জপের সম্বন্ধে নরসিংহ পুরাণ বলেছে যে, মানস জপ হল সেটাই যেখানে মন্ত্রাক্ষরের প্রতিটি বর্ণ থেকে অন্য বর্ণে বুদ্ধি সমাহিত করতে হয়, তারপর প্রতিটি পদ থেকে প্রতিটি পদে, অবশেষে পদ-পদার্থ সম্বন্ধে শব্দার্থ চিন্তা করতে করতে শব্দার্থদ্যোতক ঈশ্বরে মনঃসন্নিবেশ ঘটাতে হয়—

ধিয়া যদক্ষরশ্রেণ্যা বর্ণাদ্‌বর্ণং পদাৎপদম্।
শব্দার্থচিন্তনং ধ্যানং তদুক্তং মানসং জপঃ॥

বাচিক, উপাংশু এবং মানস জপের মধ্যে পরের পরেরটি শ্রেয় বলে পরিগণিত হয়েছে—

ত্রয়াণাং জপযজ্ঞানাং শ্রেয়ান্ স্যাদুত্তরোত্তরম্।

এমনও বলা হয়েছে লঘুহারীতের স্মৃতিতে যে, উচ্চৈস্বরে উচ্চারণ করা বাচিক জপের মাত্রা যদি একগুণ হয়, তবে সেই বাচিক জপটুকু যদি খানিক ধ্যানের মধ্যে আসে, তবে তার দশগুণ বেশী ফল হয়। সেখানে উপাংশু জপের মধ্যে ধ্যানের ভাবনা প্রথম থেকেই অনুস্যূত হয় বলে উপাংশ জপের ফল একশ গুণ বেশী হয় আর মানস জপের মূল্য দাঁড়ায় সহস্রগুণ—

উচ্চস্ত্বেকগুণঃ প্রোক্তো ধ্যানাদ্ দশগুণঃ স্মৃতঃ।
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ॥

[নরসিংহ পু. (মহর্ষি) ৫৮.৭৮-৮২; হারীত সংহিতা ৪.৩৯-৪৪]

জপাতয় বশিষ্ঠ বংশীয় একজন বংশ প্রবর্তক ঋষি।

[মৎস্য পু. ২০১.৩৫]

জপাতি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা পরাশর মুনির নামে কয়েকটি বংশধারা প্রচলিত ছিল। সেই বংশধারায় অনেকগুলি সন্তানকে নিয়ে এক-একটি বর্গ রচিত হয়েছিল। যাঁদের গৌর-পরাশর, নীল-পরাশর, কৃষ্ণ-পরাশর, শ্বেত-পরাশর, শ্যাম-পরাশর এবং ধূম্র-পরাশর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরাশরের যে সন্তানেরা কৃষ্ণ-পরাশর নামে অভিহিত তাঁদের মধ্যে জপাতি একজন।

[মৎস্য পু. ২০১.৩৫]

জব একজন রাক্ষস। জবের ঔরসে শতহ্রদার গর্ভজাত পুত্র বিরাধ। *[রামায়ণ ৩.৩.৫]*

জবন স্কন্দ কার্তিকেয়ের অনুচর, একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৭৫; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

জবিন পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি জবিনর বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি ভৃগুর বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৫.২]

জবিষ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে যে বিশ্বেদেবদের নাম উল্লিখিত হয়েছে, জবিষ্ঠ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৩.৯৫]

জমদগ্নি ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্তে এমনভাবে জমদগ্নির নাম করা হয়েছে যাতে মনে হয় তিনি সেই সূক্তটির মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি—

গৃণানা জমদগ্নিনা যোনাবৃতস্য সীদতম্।

[ঋগ্বেদ ৩.৬২.১৮]

সায়নাচার্যের টীকা অনুসারে জমদগ্নি এখানে ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন এবং তা প্রমাণিত হয় অন্য একটি ঋক্ মন্ত্র থেকে যেখানে ভগবান ইন্দ্র একজনকেই সম্বোধন করে বলছেন—হে বিশ্বামিত্র এবং জমদগ্নি—

প্রতিবিশ্বমিত্রজমদগ্নীদমে।

[ঋগ্বেদ ১০.১৬৭.৪]

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে জমদগ্নি বিশ্বামিত্র ঋষির সঙ্গে যেভাবেই হোক সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন এবং তৈত্তিরীয় সংহিতার বচন থেকে তাঁকে বিশ্বামিত্রের বন্ধু এবং ঋষি

বশিষ্ঠের বিরুদ্ধপক্ষীয় ঋষি বলে মনে করা হয়। *[তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম) ৩.১.৭.৩; ৫.৪.১১.৩]*

□ ভৃগবংশীয় মহর্ষি ঋচীকের ঔরসে তাঁর পত্নী গাধি রাজার কন্যা সত্যবতীর গর্ভে মহর্ষি জমদগ্নির জন্ম হয়। ইনি পরশুরামের পিতা। মহাভারতের আদিপর্বে বলা হয়েছে, জমদগ্নি ঋচীকের শতপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। বনপর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, সত্যবতী তাঁর স্বামীর কাছে শান্তিপর্বে একই কাহিনীতে স্বামী ঋচীকের পরিবর্তে শ্বশুর ভৃগুঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়। নিজের এবং নিজের মাতার জন্য উত্তম পুত্রলাভের বর প্রার্থনা করেন। মহর্ষি ঋচীক দুইভাগ চরু প্রস্তুত করে সত্যবতীকে দিয়ে বললেন—তুমি এবং তোমার মাতা যত্ন সহকারে এবং ভক্তিভরে এই চরু ভক্ষণ করবে। এর ফলে ভগবানের কৃপায় তোমরা বংশের শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করবে। কিন্তু সত্যবতী এবং তাঁর মাতা অজ্ঞানবশত চরু ভক্ষণে বিপর্যয় ঘটালেন অর্থাৎ সত্যবতীর মাতা সত্যবতীর চরু ভক্ষণ করলেন এবং সত্যবতী মাতার চরু ভক্ষণ করলেন। তপোবলে তা জানতে পেরে ঋচীক পত্নীকে বললেন—তোমার মাতার চরুতে আমি ক্ষত্রতেজের সমাবেশ ঘটিয়েছিলাম এবং তোমার চরুটি ব্রহ্মতেজ-সম্পন্ন ছিল। এখন বিপর্যয়ের ফলে তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়বৃত্তি এবং তোমার মাতার পুত্র ব্রহ্মর্ষি হবে। সত্যবতী দুঃখিত হয়ে প্রার্থনা করলেন—আমার পুত্র যেন ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন হয়, ক্ষত্রিয় না হয়। বরং আমার পৌত্র সেইরকম হোক, যেমনটি আপনি বললেন। তাই হোক—ঋচীক পত্নীকে সেই বর দান করে সন্তুষ্ট করলেন। এরপর যথাসময়ে সত্যবতী এবং তাঁর মাতা গর্ভধারণ করলেন এবং তাঁদের দুটি পুত্র সন্তান জন্ম নিল। সত্যবতী পরম তপস্বী ঋষি জমদগ্নিকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হলেন এবং তাঁর মাতার গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্ম নিলেন যিনি রাজা হলেও পরবর্তীকালে তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মর্ষি পদ প্রাপ্ত হন। বেদে বর্ণিত বিশ্বমিত্র এবং জমদগ্নির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এই কাহিনীতে সমর্থিত হয়েছে। এই কাহিনী থেকে জানা যাচ্ছে যে, বিশ্বামিত্র জমদগ্নির সমবয়স্ক মাতুল ছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৬.৪৭; ৩.১১৫.৩১-৪৪; ১২.৪৯.৬-৩২; (হরি) ১.৬১.৪৯; ৩.৯৬.৩১-৪৫; ১২.৪৮.৬-৩২]

□ জমদগ্নি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে এবং অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং এই মহান তপস্বী তপোবলে দেবগণকে বশীভূত করেছিলেন বলে জানা যায়। *[মহা (k) ৩.১১৫.৪৫; ১১৬.১; (হরি) ৩.৯৬.৪৬; ৯৭.১]*

□ জমদগ্নি একসময় ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা প্রসেনজিতের (অন্যত্র এঁকে রেণু নামে উল্লেখ করা হয়েছে) কন্যা রেণুকাকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং রাজার কাছে গিয়ে সেই কন্যাকে পত্নীরূপে প্রার্থনা করলেন। রাজা সানন্দে রেণুকাকে মহর্ষি জমদগ্নির হাতে সম্প্রদান করলেন। রেণুকাকে পত্নীরূপে লাভ করে আনন্দিত মহর্ষি পত্নীর সঙ্গে তপস্যায় কাল অতিবাহিত করতে লাগলেন।

[মহা (k) ৩.১১৬.২-৩; (হরি) ৩.৯৭.২-৩; ভাগবত পু. ৯.১৫.১২]

□ শ্রাদ্ধে ছত্র ও পাদুকাদানের পুণ্য প্রসঙ্গে মহাভারতের অনুশাসনপর্বে ছত্র ও পাদুকা সৃষ্টির পশ্চাতে একটি অভিনব কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে।

মহর্ষি জমদগ্নি একদিন তীর ধনুক নিয়ে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করছিলেন। নিক্ষিপ্ত বাণগুলি সংগ্রহ করে আনছিলেন পত্নী রেণুকা। জমদগ্নি অতি উৎসাহে খেলায় মেতে ছিলেন, কতখানি সময় পার হয়ে গেল সেদিকে তাঁর খেয়ালই নেই। বেলা গড়িয়ে সূর্য ধীরে ধীরে মাঝ আকাশে এসে পৌঁছাল। প্রখর রৌদ্রের তাপ, তার মধ্যে বাণ সংগ্রহ করতে করতে রেণুকা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি আর চলতে পারেন না। অথচ পাছে স্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন। সেই ভয়ে কিছু বলতেও পারেন না। শেষ পর্যন্ত সূর্যের তাপে তাঁর মাথা যেন জ্বলতে লাগল, খালি পায়ে চলতে চলতে পা-দুটি যেন পুড়ে যেতে লাগল। বাধ্য হয়েই রেণুকা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে খানিক বিশ্রাম করলেন। ফলে তীর কুড়িয়ে আনতে খানিক দেরি হল। জমদগ্নি রেণুকাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। রেণুকা ভয়ে ভয়ে স্বামীকে বলেই ফেললেন নিজের কষ্টের কথা। এতক্ষণে জমদগ্নির হুঁশ হল যে বেলা হয়েছে অনেক, রোদের তাপও অতি ভীষণ। রেণুকার অবস্থা দেখে তাঁর কষ্টও হল খুব আর যত রাগ গিয়ে পড়ল মাঝ আকাশে জ্বলতে থাকা সূর্য দেবতার ওপর। জমদগ্নি রেগে গিয়ে সূর্যকেই ধ্বংস করতে

উদ্যোগী হলেন। সূর্য ভয় পেলেন ঋষির ক্রোধ দেখে। তারপর ব্রাহ্মণের বেশে এসে দাঁড়ালেন জমদগ্নির সামনে। ক্রুদ্ধ জমদগ্নিকে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে বোঝাতে লাগলেন সূর্যের প্রয়োজনীয়তা কতখানি। বলতে লাগলেন সূর্যই এ জগতে প্রাণের উৎস ইত্যাদি। জমদগ্নি কিন্তু ব্রাহ্মণবেশী সূর্যকে চিনে ফেললেন এবং বেশ ক্রুদ্ধ হয়েই তাঁকে বললেন—রেণুকার যত কষ্ট হয়েছে তার জন্য শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। মধ্যাহ্নে তুমি যখন মাঝ আকাশে থাকবে, তখন তোমাকে আমি অবশ্যই শাস্তি দেব। সূর্য তখন জমদগ্নির শরণাপন্ন হয়ে প্রাণ ভিক্ষা করলেন। জমদগ্নি শরণাগত সূর্যকে প্রাণ দান করে বললেন—বেশ, তোমাকে বধ করব না। কিন্তু তোমার এই প্রখর তাপে চলাফেরা করতে মানুষের যে কষ্ট হয়, তার একটা বিহিত করো তুমি। এমন ব্যবস্থা করো যাতে উত্তপ্ত পথে চলতে কষ্ট না হয়, তোমার প্রখর তাপ থেকে মানুষের শরীর যাতে রক্ষা পায়। সূর্য জমদগ্নির হাতে তুলে দিলেন মস্তক রক্ষাকারী ছত্র এবং চরণ রক্ষাকারী পাদুকা (উপানহ)। জমদগ্নি সন্তুষ্ট হলেন। সেই সময় থেকেই জগতে ছত্র এবং পাদুকার ব্যবহার প্রচলিত হল। *[মহা(k) ১৩.৯৫.৬-২৮; ৯৬.১-১৫; (হরি) ১৩.৮১.৭-৪৩;]*

□ মহর্ষি জমদগ্নির ঔরসে রেণুকার গর্ভে পাঁচটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠপুত্র রুমন্বান, দ্বিতীয় পুত্র সুষেণ, তৃতীয় পুত্র বসু, চতুর্থ বিশ্বাবসু এবং পঞ্চম পুত্র রাম, অর্থাৎ পরশুরাম। এই রাম সত্যবতীর ক্ষত্রতেজসম্পন্ন চরু ভক্ষণের ফলে উগ্রস্বভাব, ক্ষত্রতেজসম্পন্ন অজেয় বীর পৌত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

[মহা(k) ৩.১১৬.৪.১০; (হরি) ৩.৯৭.৪,১০]

□ কোনো একসময় মহর্ষি জমদগ্নির পুত্রেরা ফলাহরণ করার জন্য বনে গেলেন এবং তাঁর পত্নী রেণুকা স্নান করতে গেলেন। স্নান করে নদীতীরের পথ দিয়ে ফেরার সময় রেণুকা নদীতে পত্নীর সঙ্গে জলক্রীড়ারত মার্তিকাবত দেশের রাজা চিত্ররথকে দেখলেন। পরমসুন্দর রাজা চিত্ররথকে দেখে রেণুকা একান্ত মুগ্ধ হলেন এবং রাজার প্রতি একান্ত আসক্ত হলেন। রাজা চিত্ররথের কথা চিন্তা করতে করতেই রেণুকা আশ্রমে ফিরে এলেন। কিন্তু মহর্ষি জমদগ্নি তাঁর মনোভাব বুঝে ফেললেন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর নিন্দা করতে লাগলেন। এই সময় তাঁর পুত্রেরা একে একে আশ্রমে ফিরে এলেন। জমদগ্নি জ্যেষ্ঠক্রমে তাঁর পুত্রদের মাতৃবধে প্রণোদিত করতে লাগলেন। কিন্তু মাতার প্রতি স্নেহবশত জমদগ্নির চার পুত্রই মাতৃবধ করতে অস্বীকার করলেন। পুত্রেরা তাঁর আদেশ পালন করল না দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে মহর্ষি তাঁদের অভিশাপ দিলেন। জমদগ্নির অভিশাপে তাঁর পুত্ররা মনুষ্য জনোচিত চৈতন্য হারালেন এবং পশুপক্ষীর সমান অবস্থা প্রাপ্ত হলেন। এরপর কনিষ্ঠ পুত্র রাম আশ্রমে ফিরে এলেন। জমদগ্নি অন্যান্য পুত্রদের মতোই রামকেও বললেন—পুত্র! তোমার এই পাপিষ্ঠা মাতাকে বধ করো। পিতার আদেশ শুনে রাম এক মুহূর্ত দেরি না করে কুঠারের আঘাতে মাতার শিরচ্ছেদ করলেন। তখন জমদগ্নির উগ্র ক্রোধ প্রশমিত হল। তিনি প্রসন্ন হয়ে রামকে বললেন—তুমি আমার আদেশে অতি দুষ্কর এই কাজ করেছো। অতএব তুমি যতগুলি ইচ্ছা ততগুলি বর প্রার্থনা কর। রাম মাতার পুনরায় জীবনলাভ, মাতৃহত্যার ঘটনা বিস্মৃত হওয়া, মাতৃহত্যার পাপ থেকে মুক্তি, ভ্রাতাদের শাপমুক্তি, যুদ্ধে নিজের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং দীর্ঘ আয়ু—এইসকল বর প্রার্থনা করলেন। মহর্ষি জমদগ্নি প্রসন্নভাবে এইসকল বর দান করলেন।

[মহা(k) ৩.১১৬.৫-১৮; (হরি) ৩.৯৭.৫-১৮; ভাগবত পু. ৯.১৬.২-৭]

□ হৈহয় অধিপতি কার্তবীর্য্যার্জুন একবার মৃগয়ার জন্য নির্জন বনে ভ্রমণ করতে করতে মহর্ষি জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। মহর্ষি জমদগ্নি তাঁর কামধেনুর সহায়তায় রাজা এবং তাঁর সৈন্য প্রভৃতির যথাযথ সৎকার করলেন। কামধেনুর আশ্চর্য ক্ষমতা লক্ষ্য করে রাজা সেটিকে হরণ করার জন্য নিজের সৈন্যদের আদেশ করলেন। রাজার অনুচররা বৎসসহ ক্রন্দনরতা গাভীটিকে বলপূর্বক কার্তবীর্য্যার্জুনের রাজধানী মাহিষ্মতী পুরীতে নিয়ে গেল। উপরন্তু আশ্রমের গাছপালা নষ্ট করে আশ্রমটিকে শ্রীহীন করে রেখে গেল। জমদগ্নির কনিষ্ঠ পুত্র রাম এইসময় আশ্রমে ছিলেন না। তিনি ফিরে এসে পিতার মুখে রাজার এইরূপ দৌরাত্ম্যের কথা শুনে ক্রোধে অন্ধ হলেন এবং রাজা অর্জুন রাজধানীতে প্রবেশ করার পূর্বেই তাঁকে আক্রমণ করলেন। পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধে রাজা কার্তবীর্য্যার্জুন

পরাজিত এবং নিহত হলেন। তাঁর সহস্র পুত্র পলায়ন করল। এরপর রাম অপহৃত কামধেনু এবং তার বৎসটিকে উদ্ধার করে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কিন্তু কার্তবীর্য্যার্জুনের পুত্রেরা তখনকার মতো পলায়ন করলেও পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগল। একদিন মহর্ষি জমদগ্নি একা আশ্রমে তপস্যায় রত ছিলেন, তাঁর পুত্ররা কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এই সুযোগে তারা জমদগ্নির আশ্রমে প্রবেশ করে নিরস্ত্র তপস্যারত মহর্ষির মস্তক ছেদন করল। এইভাবে মহর্ষি জমদগ্নির মৃত্যু ঘটে। পিতার মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ পরশুরাম শুধু যে মাহিষ্মতী পুরীতে গিয়ে কার্তবীর্য্যার্জুনের পুত্রদের মস্তক ছেদন করলেন তাই নয়, দুর্বিনীত ক্ষত্রিয়গণের প্রতি বিদ্বেষবশত তিনি ক্রমাগত একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করেন।

তবে প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, জমদগ্নি স্বভাবে অত্যন্ত শান্ত হলেও আত্মরক্ষায় অক্ষম ছিলেন বলে আমরা মনে করি না। ছত্র এবং পাদুকার উদ্ভবের কাহিনীতেই আমরা জমদগ্নিকে শরসন্ধান অভ্যাস করতে দেখি। সব থেকে বড়ো কথা, ভৃগুবংশীয় ঋষিদের যে ইতিহাস আমরা মহাকাব্য পুরাণে পাই তা থেকে বোঝা যায় যে শুধুমাত্র ঔর্ব কিংবা পরশুরাম নন, ভৃগুবংশীয় ঋষিরা প্রায় সকলেই অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ ছিলেন। জমদগ্নিও অস্ত্রবিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন এটা ভৃগুবংশীয়দের ইতিহাস থেকেই অনুমেয়। তবে স্বভাবতই শান্ত এই ঋষির প্রতি-আক্রমণের মানসিকতা একেবারেই ছিল না। ফলে জীবনের অন্তিমক্ষণেও কার্তবীর্য্যার্জুনের পুত্রদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা তিনি করেননি।

রামায়ণে কার্তবীর্যার্জুনের পুত্রদের হাতে জমদগ্নির হত্যার ঘটনাটি সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। তবে জমদগ্নির ধনুর্বিদ্যায় উৎসাহ এবং পারদর্শিতা সম্পর্কে রামায়ণেই একটি ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। পরশুরাম যে বৈষ্ণবধনু হাতে একুশবার ক্ষত্রিয় নিধন করেছিলেন, সেই ধনুকটি তিনি পিতা জমদগ্নির কাছ থেকে পেয়েছিলেন। মহাকাব্য-পুরাণে ধনুকের ইতিহাস অনেক সময় ধনুর্ধরের পরাক্রম সূচিত করেছে। যেমন কর্ণের বিজয় ধনুক বা অর্জুনের গাণ্ডীব। বৈষ্ণবধনু জমদগ্নিও পরম্পরাক্রমেই লাভ করেছিলেন। ফলে ধারণা হয় যে, তিনি নিজের সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর ছিলেন। *[রামায়ণ ১.৭৫.২২-২৩;*
মহা (k) ১১৬.১৯-২৯; ১১৭.৫-৯;
(হরি) ৩.৯৭.১৯-২৯; ৯৮.৫-৯;
ভাগবত পু. ৯.১৫.২৩-৩৬; ১৬.৯-১৯;
ব্রহ্মাণ্ড পু. ২.২৮.৩১-৭৫; ২৯.১-২৪; ৩০-৪৬ অধ্যায়
(Pdf. Maharshi University of Management Vedic Literature Collection)]

☐ শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য চতুর্দিক থেকে বিশিষ্ট ঋষিগণ অযোধ্যায় সমবেত হন। এঁদের মধ্যে উত্তরদিক হতে আগত ঋষিদের মধ্যে মহর্ষি জমদগ্নি অন্যতম—এমন উল্লেখ রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মেলে। কিন্তু জমদগ্নির মৃত্যুসংবাদ আমরা সর্বত্র পাই। তারপর পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়শূন্য করার ঘটনাও ঘটে গেছে। রামচন্দ্র পরশুরামের দর্পচূর্ণও করেছেন বহুকাল আগেই। ফলে এই জমদগ্নি জমদগ্নি বংশীয় অন্য কোনো ঋষি কী না সে বিষয়ে ভাবনার অবকাশ থেকে যায়। *[রামায়ণ ৭.১.৬]*

☐ মহাভারতের আদিপর্ব থেকে জানা যায় পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের জন্মোৎসবে যে সকল মহর্ষি সমবেত হন তাঁদের মধ্যে জমদগ্নি অন্যতম। এক্ষেত্রে অবশ্য পরিষ্কার যে, জমদগ্নি স্বর্গলোকে বিরাজমান অন্যান্য ঋষিদের সঙ্গে এসেছিলেন।

[মহা (k) ১.১২৩.৫১; (হরি) ১.১১৭.৫৫]

☐ মহাভারতের সভাপর্বে নারদ ব্রহ্মার সভার সে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় ব্রহ্মার সভায় সে সকল মহর্ষি উপস্থিত থাকেন তাঁদের মধ্যে জমদগ্নি অন্যতম।

[মহা (k) ২.১১.২২; (হরি) ২.১১.২১]

☐ দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর ঠিক আগে স্বর্গ থেকে বহু ঋষিমহর্ষি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর সামনে। দ্রোণকে যুদ্ধ বন্ধ করে স্বর্গলোকে যাবার অনুরোধ করেছিলেন তাঁরা। এই সময় মহর্ষি জমদগ্নিও এসেছিলেন দ্রোণের সামনে।

[মহা (k) ৭.১৯০.৩৩; (হরি) ৭.১৬৪.২৪]

☐ মহাভারতের অনুশাসনপর্ব থেকে জানা যায় প্রতিগ্রহ বিষয়ে সংযম করা উচিত এই মর্মে মহর্ষি জমদগ্নি রাজা বৃষাদর্ভিকে উপদেশ দান করেন। *[মহা (k) ১৩.৯৩.৪৮; (হরি) ১৩.৮৯.৪৮]*

□ পুরাকালে একসময় প্রভাস-তীর্থে সমবেত হয়ে ঋষিগণ ভারতের সমস্ত তীর্থ পর্যটন করার সিদ্ধান্ত নেন। এই ঋষিদের দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন মহর্ষি জমদগ্নি। ইন্দ্রকে নিজেদের দলপতি নিযুক্ত করে তাঁরা তীর্থযাত্রা করলেন। একসময় ব্রহ্মসরোবরে উপস্থিত হয়ে ঋষিগণ অবগাহনের সময় পদ্মের মৃণাল তুলে নিচ্ছিলেন। এইসময় মহর্ষি অগস্ত্যের সংগৃহীত সুন্দর পদ্মফুলটি অপহৃত হল। মহর্ষি অগস্ত্য অন্যান্য ঋষিদের উদ্দেশ্যে আপনাদের মধ্যেই কেউ নিশ্চয় আমার ফুলটি অপহরণ করেছেন —বলে অভিযোগ করলেন। ঋষি ও রাজর্ষিগণ সেই অভিযোগ অস্বীকার করলেন এবং নিজেদের নিরপরাধ প্রমাণ করার জন্য প্রকৃত অপরাধীর প্রতি কঠোর অভিশাপ উচ্চারণ করলেন। মহর্ষি জমদগ্নি এইসময় বলেন—যে লোক আপনার (অগস্ত্যের) পদ্ম হরণ করেছে সে অনধ্যায়ে অধ্যয়ন করুক, শ্রাদ্ধে মিত্রকে ভোজন করাক এবং নিজে শূদ্রের শ্রাদ্ধে ভোজন করুক। এই কাজগুলি সেযুগের সমাজে নিন্দনীয় ছিল বলে মনে হয়।

[মহা (k) ১৩.৯৪.৫-৯.২৫; (হরি) ১৩.৮০.৫-৯.২৫]

জমদগ্নিতীর্থ *[দ্র. জামদগ্ন্যতীর্থ$_1$]*

জমদগ্নিলিঙ্গতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পুণ্যতীর্থ। ঋষি জমদগ্নি এখানে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। *[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচন কাণ্ড) পৃ. ৮৫]*

জমদগ্নীশ্বরতীর্থ প্রভাসক্ষেত্রের অন্তর্গত অন্যতম পবিত্র তীর্থ। স্কন্দ পুরাণে কথিত আছে যে, পরশুরাম এই ক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজের পরলোকগত পিতার উদ্দেশে এই স্থান উৎসর্গ করেন। পরশুরামের পিতা মহর্ষি জমদগ্নির নামানুসারেই এই ক্ষেত্রে জমদগ্নীশ্বর তীর্থ নামে খ্যাত। বনবাসকালে তীর্থযাত্রী পাণ্ডবরা এই তীর্থ দর্শন করেছিলেন বলেও স্কন্দ পুরাণে কথিত হয়েছে। জমদগ্নীশ্বর শিবের কাছেই একটি পবিত্র জলাশয় আছে বলে জানা যায়।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র) ১৯৭.১-৫]

জম্বুক$_1$ স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অনুচর একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৭৪; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

জম্বুক$_2$ স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অনুচর একজন যোদ্ধা। ইনি তারকাসুর বধের সময় স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে সহায়তা করেছিলেন।

[মহা (k) ৯.৪৫.৭৬; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র.; খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

জম্বুক$_3$ পিশাচী জম্বুধনার গর্ভজাত রাক্ষসদের মধ্যে একজন ছিলেন অপ। এই অপের পুত্রের নাম জম্বুক। *[বায়ু পু. ৬৯.১৩০]*

জম্বুকেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ।

জম্বুতীর্থ প্রভাসক্ষেত্রের নিকটবর্তী অর্বুদক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। পুরাকালে রাজা নিমি বানপ্রস্থ অবলম্বন করে এই ক্ষেত্রে আসেন এবং এখানেই ঈশ্বরের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তবে এই নিমি রাজা ইক্ষ্বাকুপুত্র মহাত্মা নিমি নন বলেই আমাদের বিশ্বাস। কারণ নিমি রাজার শেষজীবনে তাঁর দেহহীন হয়ে যাওয়ার যে বহুচর্চিত উপাখ্যান পুরাণগুলিতে পাওয়া যায়, সেই উপাখ্যানের সঙ্গে এই নিমি রাজার জীবন কথার কোনো মিল নেই। যাই হোক, রাজা নিমির তপোবনে একদিন বিখ্যাত ঋষি লোমশ এসে উপস্থিত হলেন। নিমি এবং আশ্রমবাসী অন্য ঋষি-মহর্ষিরা তাঁর কাছ থেকে নানা বিখ্যাত তীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ করলেন। এরপর রাজা এবং সেই তপোবনের অন্যান্য সমস্ত মুনি-ঋষিদের মনে সেইসব তীর্থস্থান দর্শনের অভিলাষ জন্মাল। কিন্তু তাঁরা সকলেই বৃদ্ধ হয়েছেন, এত দীর্ঘপথ ভ্রমণের শক্তি তাঁদের নেই। তাই তাঁদের অনুরোধে লোমশ মুনি নিজের তপস্যার বলে সেই স্থানে সমস্ত পুণ্যতীর্থগুলিকে আবাহন করলেন।

এইভাবে তীর্থ দর্শনের পর নিমি রাজা সেই স্থানেই দীর্ঘকাল তপস্যা করেন এবং তপস্যার ফলস্বরূপ অক্ষয় স্বর্গলাভ করেন। রাজা নিমি যে সময় তপস্যারত ছিলেন, সেই সময় এই ক্ষেত্রে একটি জম্বুবৃক্ষের জন্ম হয়। রাজার স্বর্গলাভের পর সমস্ত তীর্থের একত্র উপস্থিতির মাহাত্মে ধন্য এই স্থানটি জম্বুতীর্থ নামে বিখ্যাত হয়।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/অর্বুদ) ৬০.১-১৪]

জম্বুদ্বীপ মহাভারত ও পুরাণ অনুযায়ী পৃথিবী সাতটি দ্বীপ বা ভূ-খণ্ড এবং সাতটি জলভাগ বা সমুদ্র দ্বারা গঠিত। জম্বুদ্বীপ এই সাতটি দ্বীপের মধ্যে অন্যতম। এটি সপ্তদ্বীপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং এর মধ্যভাগে রয়েছে মেরুপর্বত। পুরাণ

অনুসারে সমগ্র ভূ-মণ্ডল পদ্মফুলের আকৃতি বিশিষ্ট। এই সাতটি দ্বীপ বা ভূ-খণ্ড পদ্মের পাপড়ি বা কোষের মতো পর পর বিস্তৃত। আবার মহাভারতে জম্বুদ্বীপকে চক্রাকার বলা হয়েছে। চক্রাকৃতির জন্যই জম্বুদ্বীপের আরেক নাম সুদর্শন। ফলে দ্বীপগুলির চক্রাকৃতি বা পদ্মফুলের কোষের ন্যায় বিস্তার সম্পর্কে পুরাণ ও মহাভারত একমত। একলক্ষ যোজন ব্যাপী বিস্তৃত জম্বুদ্বীপ নয়টি বর্ষ বা দেশ নিয়ে গঠিত। অর্থাৎ জম্বুদ্বীপের নয়টি ভাগ—ইলাবৃতবর্ষ, হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ, ভারতবর্ষ, কেতুমালবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, হিরন্ময়বর্ষ, কুরুবর্ষ ও রম্যকবর্ষ। 'জম্বু' শব্দের অর্থ জাম। মহাভারত ও পুরাণ মতে নীল পর্বতের দক্ষিণে এবং নিষধ পর্বতের উত্তরে সুদর্শন নামে একটি অতি প্রাচীন, অতিবৃহৎ ও মনোকামনাপূরণকারী জামগাছ বা জম্বুবৃক্ষ রয়েছে। এই জম্বুবৃক্ষটির জন্যই সমগ্র ভূভাগটি জম্বু বৃক্ষ নামে বিখ্যাত—

দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু।
সুদর্শনো নাম মহান্ জম্বুবৃক্ষঃ সনাতনঃ॥
সর্বকামফলঃ পুণ্যঃ সিদ্ধচারণ সেবিতঃ।
তস্য নাম্না সমাখ্যাতো জম্বুদ্বীপঃ সনাতনঃ॥

এই জম্বুবৃক্ষটির সুমিষ্ট ফলের রসে জাম্বুনদের উৎপত্তি। অবশ্য মহাভারতের অপর একটি শ্লোকে জাম্বুনদকে গঙ্গানদীর একটি ধারা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জম্বুদ্বীপে ছয়টি বর্ষ পর্বত অবস্থিত—হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, নীল, শ্বেত পর্বত ও শৃঙ্গবান পর্বত। এছাড়াও জম্বুদ্বীপে অসংখ্য পর্বত, নদী, মনোরম বন এবং সরোবর রয়েছে। জম্বুদ্বীপের একদিকে পিপ্পল এবং অন্যদিকে শশ নামে দুটি বৃহৎ দেশ অবস্থিত। সম্ভবত আকৃতিগত কারণেই দেশ দুটির এইরূপ নামকরণ বলে মনে হয়। জম্বুদ্বীপ লবণ সাগর দ্বারা বেষ্টিত। এর আটটি উপদ্বীপ—স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্রশুক্র, আবর্তন, রমণক, মন্দহরিণ, পাঞ্চজন্য, সিংহল এবং লঙ্কা। পুরাণ মতে, সগরের পুত্ররা যজ্ঞীয় অশ্বের খোঁজে যখন পৃথিবী খনন করছিল, তখনই এই উপদ্বীপগুলির সৃষ্টি। জম্বুদ্বীপের দীর্ঘ বর্ণনা মহাভারত ও পুরাণে পাওয়া যায়। এই দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মেরু পর্বতে প্রজাপতি ব্রহ্মার আবাসস্থল ব্রহ্মপুরী রয়েছে। জম্বুদ্বীপে দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ—সকলেই বাস করেন। মহাভারতে জম্বুদ্বীপের অধিবাসীদের গায়ের রং সম্পর্কে বলা হয়েছে—'তরুণাদিত্যবর্নাশ্চ' অর্থাৎ উদীয়মান সূর্যবর্ণ বা অতিউজ্জ্বল গৌরবর্ণ। এ থেকে মনে হয়, এখানে এমন কোনো জাতির কথা বলা হচ্ছে, যাদের গায়ের রং উজ্জ্বল সাদা, এরা দেবকান্তি বিশিষ্ট আর্যজাতি বলেই মনে হয়। পণ্ডিত গিরীন্দ্রশেখর বসুর লেখায় পাওয়া যায় যে, ইলাবৃতবর্ষ (জম্বুদ্বীপের কেন্দ্রে অবস্থিত ভূ-ভাগ বা দেশ) দেবতাদের আবাসস্থল। আমরা জানি আর্য জাতি প্রাচীন মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল এবং ইলাবৃতবর্ষ বলতে আধুনিক এশিয়া মাইনর ও পশ্চিম এশিয়াকে বোঝানো হয়। এ থেকে মনে হয়, আর্যরাই জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত ইলাবৃতের 'দেবতা'।

[মহা (k) ৬.৫.১২-৬.৯.৭৬; (হরি) ৬.৫.১২-৬.৯.৭৬; বিষ্ণু পু. ২.২.৭-৫৪; ৩.২১-২৮; ভাগবত পু. ৫.১৬.৬-১৯, ৩০; মৎস্য পু. ৮৩.৩২, ১১৩. ৭-১১৪.৮৬, ২৮৪.২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৭.২৪-৩৭, ১৫.৮-৮০; পুরাণ প্রবেশ, গিরীন্দ্র শেখর বসু, কলকাতা, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ২০০৭; পৃ. ২১৮]

□ স্বায়ম্ভুব মনুর বংশজাত প্রিয়ব্রতের পৌত্র অগ্নীধ্রকে, প্রিয়ব্রত জম্বুদ্বীপের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীকালে অগ্নীধ্র তাঁর নয় পুত্রকে জম্বুদ্বীপের নয়টি দেশ বা নয়টি বর্ষের রাজপদে অভিষিক্ত করেন। যুধিষ্ঠিরও সমগ্র জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন, একথা পুরাণে বলা হয়েছে। ভাগবত পুরাণ অনুসারে, পৃথিবী পরিক্রমাকালে প্রিয়ব্রতের রথের চাকার আঘাতে পৃথিবীতে সাতটি খাত সৃষ্টি হয়েছিল। এই সাতটি খাতই সপ্তসমুদ্র এবং সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত সাতটি ভূখণ্ড দ্বীপ বলে পরিচিত। সপ্তদ্বীপেরই অন্যতম জম্বুদ্বীপ। ভাগবতের এই সপ্তদ্বীপ উৎপত্তিতত্ত্বের সঙ্গে আধুনিক পাত-সঞ্চরন-তত্ত্ব বা Plate Tectonics Theory- এর মিল পাওয়া যায়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সমগ্র পৃথিবী মূলত সাতটি (মহান্তরে আটটি) সঞ্চরণ শীল (floating) পাত বা প্লেট দ্বারা গঠিত। এই সঞ্চরণশীল পাতগুলির পারস্পরিক দূরত্ব বৃদ্ধি, হ্রাস এবং সংঘর্ষের ফলেই নতুন ভূ-ভাগ ও সমুদ্রখাতের উৎপত্তি হয়। প্রিয়ব্রতের রথের চাকার আঘাতে সমুদ্রখাত সৃষ্টি হওয়া এবং সঞ্চরণ শীল পাতের পারস্পরিক

সংঘর্ষের ফলে গহ্বর বা খাত সৃষ্টিকে একাত্ম করে দেখা সম্ভব বলে মনে হয়।

[বিষ্ণু পু. ২.১.১২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.১১; ৪৩; ৫২; বায়ু পু. ৩৩.১১.৪৫; ভাগবত পু. ১.১২.৫; ৫.১.৩১; Plate Tectonics; Continental Drift and Mountain Building; Wolfgang Frisch, Martin Meschede, Ronald Blakey; Berlin, Springer; 2011; p.1]

□ জম্বুদ্বীপের বিস্তার এবং ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে একাধিক পরস্পরবিরোধী তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে জম্বুদ্বীপের সম্ভাব্য ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্ভবত এর চক্রাকৃতি বা পদ্মফুলের মতো আকৃতি। পৌরাণিক তথ্য অনুযায়ী জম্বুদ্বীপের ঠিক পরবর্তী দ্বীপটি হল প্লক্ষদ্বীপ—যা নিজেও চক্রের মতো আকৃতি বিশিষ্ট। পুরাণে এও বলা হয়েছে যে, সমগ্র ভূ-মণ্ডলটিই পদ্মফুলের আকৃতিতেই বিস্তৃত। এখন জম্বুদ্বীপ, এই চক্রাকৃতি বিস্তারের কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় এবং এই দ্বীপটির কেন্দ্রস্থলে (heart) মেরু পর্বত থাকায় অনেকে মনে করেন এটিই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল বা মেরু বা Pole। জম্বুদ্বীপে যেহেতু ভারতবর্ষ এবং হিমবান বা হিমালয় পর্বত অবস্থিত। সেইহেতু অবশ্যই এটি উত্তর গোলার্ধের অন্তর্গত। সেক্ষেত্রে এই পোল বা মেরু উত্তরমেরু বা North Pole। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, পৃথিবী প্রকৃতই সাতটি মহাদেশ (Continent) দ্বারা গঠিত এবং মহাভারত ও পুরাণেও ভূ-মণ্ডলকে সাতটি দ্বীপেই ভাগ করা হয়েছে। এই সূত্র ধরেই আমরা বলতে পারি যে, জম্বুদ্বীপ পৃথিবীর সাতটি মহাদেশ বা Seven Continents-এর মধ্যে অন্যতম। আবার পণ্ডিতদের একাংশের মতে সমগ্র ইউরেশিয়া মহাদেশটিই প্রাচীন জম্বুদ্বীপ। আগেই আলোচিত হয়েছে যে, জম্বুদ্বীপের কেন্দ্রস্থল—ইলাবৃতবর্ষ বলতে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া বা এশিয়া মাইনর এবং সাইবেরিয়ার দক্ষিণাংশে বোঝানো হয় এবং উত্তর-দক্ষিণে জম্বুদ্বীপের বিস্তার যথাক্রমে ঐরাবতবর্ষ থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত। এভাবে বিচার করলে ইউরেশিয়াই যে প্রাচীন জম্বুদ্বীপ এই ধারণা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আবার অন্য একটি মত অনুযায়ী বর্তমান জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত জম্মুই প্রাচীন জম্বুদ্বীপ। এই ধারণা অনুযায়ী মেরুপর্বত হল প্রকৃতপক্ষে হিমালয়।

[The First Spring: The Golden Age of India; Abraham Early; New Delhi; Penguin Books India Pvt Ltd. 2011; p. 810]

□ উপরের তত্ত্বগুলি থেকে একটি বিষয় প্রমাণ হয় যে, যাযাবর-প্রকৃতি আর্যজাতির প্রচরণের (migration) সঙ্গে সম্ভবত জম্বুদ্বীপের অবস্থান সংক্রান্ত ধারণার বিবর্তনও সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ জাম্বুনদ সম্পর্কে কিছু কথা বলা যেতে পারে। জম্বুবৃক্ষের বৃহদাকার জম্বুফলের রসে জাম্বুনদটি পুষ্ট। আবার মহাভারতে একে গঙ্গার একটি ধারা বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতদের একাংশের ধারণা যে, জাম্বুনদ হল জর্ডন নদী, যা পশ্চিম এশিয়ার সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত। ফলে ভৌগোলিক কারণে জাম্বুনদের পক্ষে, গঙ্গা নদীর শাখা হওয়া অসম্ভব। তবে পুরাণ ও মহাভারতকার অকারণে গঙ্গা নদীর সঙ্গে জাম্বুনদের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন বলে মনে হয় না। আর সেই সূত্রেই আর্যায়ণের ক্রমবিকাশের বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। আমরা জানি গঙ্গা একটি অত্যন্ত পবিত্র নদী এবং জাম্বুনদও পবিত্র বলেই বিচার্য্য, কারণ এই নদীর অববাহিকায় যে দুর্লভ ও উৎকৃষ্ট মানের স্বর্ণ আকরিক পাওয়া যেত, তা দিয়ে দেবতাদের অলঙ্কার প্রস্তুত করা হয়—এমন কথা মহাভারত ও পুরাণে বলা হয়েছে। এশিয়া মাইনর অঞ্চলবাসী হওয়ার কারণে আর্যদের পক্ষে জাম্বুনদ বা জর্ডন নদীর অববাহিকার উৎকৃষ্ট স্বর্ণ আকরিকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অর্থনৈতিক কারণেও নদীটি তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই সূত্রে বিচার করলে মনে হয় যে, আর্যরা যতোই ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অভিমুখে প্রচরণ করেছে ততই তাদের পূর্ব পরিচিত পবিত্র বস্তু এবং বিষয়গুলিও নাম-গত ভাবে পূর্বাভিমুখী হয়েছে। এভাবেই হয়তো আর্যায়ণের কোনো পর্যায়ে গঙ্গা নদীর গুরুত্ব বিচার করে তারা জাম্বুনদের সঙ্গে এর যোগসূত্র স্থাপন করেছে অথবা পূর্ব পরিচিত জাম্বুনদের নামেই গঙ্গা নদীর কোনো ধারার নামকরণ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রাচীনকালে কোনো

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নদীর নামের গুরুত্ববিচারে অন্য নদীর নামকরণের রীতি প্রচলিত ছিল। যেমন—উত্তর ভারতের গঙ্গা নদীর নামানুসারে দক্ষিণ ভারতের গোদাবরী নদীকে গৌতমী-গঙ্গা বলা হয়। জাম্বুনদের ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, কালপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে আর্যায়নের চিহ্ন যত স্থান পরিবর্তন করেছে, ততই বদলে গেছে ভৌগোলিক ধ্যান-ধারণা। এভাবেই হয়তো বা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জম্বুদ্বীপের অবস্থান সম্পর্কে ধারণাও বিবর্তিত হয়েছে।

[Desi Words Speak of the Past; Dr. Liny Srinivasan; USA; Author House, 2011; p. 219; The Aryan Race: Its Origins and Achievements; Charles Moreis; New York; The Renaissance Publishing House, 1888; p. 290]

জম্বুমার্গতীর্থ মহাভারতে উল্লিখিত একটি পবিত্র তীর্থের নাম। মহাভারতের বনপর্ব, অনুশাসনপর্ব দুই জায়গাতেই পুণ্যফলদায়ক তীর্থ হিসেবে জম্বুমার্গ তীর্থের নাম উল্লিখিত হয়েছে। পুষ্কর থেকে এই তীর্থে যাওয়ার নির্দেশ থাকায় মনে হয় এটি পুষ্করের নিকটবর্তী কোনো তীর্থক্ষেত্র।

[মহা (k) ৩.৮২.৪০-৪৩; ১৩.২৫.৫১; (হরি) ৩.৬৭.৬০-৬৩; ১৩.২৬.৫১]

জম্বুমালী সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে হনুমান লঙ্কানগরীর যে সকল রাক্ষস-প্রধানদের প্রাসাদে গিয়েছিলেন, জম্বুমালী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। জম্বুমালী প্রহস্তের পুত্র, অত্যন্ত বলবান, বীর যোদ্ধা। হনুমান রাবণের অশোকবন ভেঙে তছনছ করার পর রাবণ রাক্ষসবীরদের হনুমানকে বন্দি করার আদেশ দিলেন। এই সময় রাবণের আদেশে জম্বমালী হনুমানকে আক্রমণ করেন। প্রচণ্ড বাণবর্ষণ করে জম্বুমালী হনুমানকে গুরুতর ভাবে আহতও করেন। ক্রুদ্ধ হনুমান তখন রাক্ষসদের ছুঁড়ে-মারা একটি পরিঘ বা লোহার মুগুর নিয়ে জম্বুমালীকে আক্রমণ করেন, এবং এই আক্রমণেই তিনি নিহত হন। পরে হনুমান তার প্রাসাদেও অগ্নিসংযোগ করেছিলেন।

[রামায়ণ ৫.৬.২১; ৫.৪৪.১-১৮]

কিন্তু যুদ্ধকাণ্ডে আরও একবার জম্বুমালীকে দেখা যায়। তিনি হনুমানকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আক্রমণ করেন এবং তাঁর অস্ত্রের প্রহারে হনুমানের বক্ষস্থলে গুরুতর আঘাত লাগে। হনুমানও তাঁকে বিপর্যস্ত করেন। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হয়, সুন্দরকাণ্ডে হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধে জম্বুমালী মৃতবৎ আহত হলেও তাঁর মৃত্যু হয় নি। যুদ্ধকাণ্ডে যেহেতু জম্বুমালীর কোনো পৃথক পরিচয় দেওয়া হয়নি, তাই এই অনুমানই সঙ্গত। অথবা ধরে নিতে হয়, একই নামে এ অন্য কোনো রাক্ষসবীরের কথা।

[রামায়ণ ৬.৪৩.৭; ৬.৪৩.২১-২২]

জম্বুলা ঋক্ষ পর্বতজাতা একটি নদী।

[বায়ু পু. ৪৫.১০০]

জম্ভ$_1$ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। *[বায়ু পু. ৬৯.৬৯]*

জম্ভ$_2$ রাবণের একজন অনুচর। জম্ভের পুত্রের নাম সুন্দ। সুন্দের ঔরসে যক্ষিণী তাড়কার গর্ভে জন্ম হয়েছিল মারীচ রাক্ষসের। *[রামায়ণ ১.২৫.৮; মহা (k) ৩.২৮৫.২; (হরি) ৩.২৩৯.২]*

জম্ভ$_3$ বানররাজ সুগ্রীবের সেনাদলের একজন যূথপতি। *[রামায়ণ ৬.৪.৩৬]*

জম্ভ$_4$ হিরণ্যকশিপুর পৌত্র এবং প্রহ্লাদের পুত্র। জম্ভের চার পুত্রের নাম জম্ভাস্য, শতদুন্দুভি, দক্ষ ও খণ্ড। *[বায়ু পু. ৬৭.৭৬, ৭৮]*

জম্ভ$_5$ নবম মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন সুধর্মা তার মধ্যে একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে জম্ভ একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৬০]

জম্ভ$_6$ অন্ধকাসুরের একজন সেনাপতি। দেবাসুর সংগ্রামে জম্ভ প্রমথগণ কর্তৃক নিহত হলে শুক্রাচার্য এঁকে সঞ্জীবনী সুধায় জীবন দান করেছিলেন।

[স্কন্দ পু. (কাশীখণ্ড/পূর্ব) ১৩.১৪, ৩১]

জম্ভ$_7$ রুরু দৈত্যের পুত্র দুর্গ। এই দুর্গের অন্যতম প্রধান সেনানায়ক ছিলেন জম্ভ।

[স্কন্দ পু. (কাশী/উত্তর) ৭১.৬৭]

জম্ভ$_8$ নরকাসুর-ঘনিষ্ঠ এক রাজা। পুরাণে অবশ্য এঁকে স্থানবিশেষে দৈত্যরাজ কুশের সেনাধিপতিও বলা হয়েছে। কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে কুশের একবার যুদ্ধ হয়েছিল। জম্ভ এই যুদ্ধে বলরামের হাতে নিহত হন। *[দ্র. জম্ভক$_1$]*

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/দ্বারকা) ২০.৫০]

জম্ভ$_9$ এক অতিবলশালী অসুরাধিপতি। রাক্ষসরাজ বলির নেতৃত্বে জম্ভ দেবাসুর সংগ্রামে যুদ্ধ করেছিলেন। জম্ভের কন্যার নাম কয়াধু। কয়াধুর সঙ্গে অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর বিবাহ হয়েছিল।

প্রহ্লাদ জম্ভের দৌহিত্র। সেক্ষেত্রে প্রহ্লাদের পৌত্র বলিরনেতৃত্বে দেবাসুর যুদ্ধে যে জম্ভ অংশ নিয়েছিলেন তিনি প্রহ্লাদের মাতামহ না তাঁর অন্য কোনো বংশধর তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

[ভাগবত পু. ৬.১৮.১২; ৮.১০.১৯-২০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.১০]

□ জম্ভাসুর একশো সিংহ-চালিত রথে আরোহণ করে যুদ্ধ করতেন। দেবতাদের বিরুদ্ধে তারকাসুরের যুদ্ধে জম্ভ অসুরপক্ষীয় সেনাপতিদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৪৮.৪২-৫৪]

□ দেবাসুর সংগ্রামের সময় জম্ভ বা জম্ভাসুরের সঙ্গে যম, কুবের বিশেষত বিষ্ণুর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। জম্ভ স্বেচ্ছায় বিষ্ণুকে যুদ্ধে আহ্বান জানান। তাঁর মুদ্গরের আঘাতে গরুড় সহ স্বয়ং বিষ্ণু আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। জম্ভের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে বিষ্ণু তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রেই আলিঙ্গন করেন।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ২০.৭৯-৯০]

□ জম্ভাসুর মহর্ষি দুর্বাসার অভিশাপে কেবলমাত্র ইন্দ্রের দ্বারা বধ্য ছিলেন। সে কারণেই বিষ্ণু তাঁকে বধ করেননি। দেবাসুর সংগ্রামে দেবরাজ ইন্দ্রই শেষপর্যন্ত তাঁকে আক্রমণ করেন।

জম্ভাসুর নানা প্রকারের রূপ ধারণ করতে পারতেন। শুধুমাত্র অস্ত্রপ্রয়োগ করে দেবরাজ ও দেবসেনাকে পরাজিত করা অসম্ভব একথা বুঝতে পেরে জম্ভ কৌশলে সর্পের রূপ ধারণ করে দেবসৈন্যকে নিঃশ্বাসে দগ্ধ করতে লাগলেন। দীর্ঘ যুদ্ধের পর বিষ্ণুর পরামর্শে ইন্দ্র অঘোর মন্ত্রে শুদ্ধ অর্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করে জম্ভকে হত্যা করেন।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ২১.১২-১৩, ৭২-১৫৫; মৎস্য পু. ১৫৩.১৩-১৫৪; বায়ু পু. ১৪.১৪; ৯৭.১০৩; বিষ্ণু পু. ৪.৬.১৪]

জম্ভ১০ পুরাণ এবং মহাভারতে জম্ভ নামে একাধিক অসুরের উল্লেখ আছে। বিভিন্ন দেবাসুর সংগ্রামে একাধিক জম্ভকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। পুরাণে জম্ভের একাধিক জন্ম পরিচয় উল্লিখিত হয়েছে। ভাগবত পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পত্নী তথা প্রহ্লাদের মাতা কয়াধু ছিলেন জনৈক জম্ভের কন্যা। কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দনুর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যেও আমরা একজন জম্ভের নামোল্লেখ পাই। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে জনৈক দৈত্যরাজ বাস্কলের পুত্র জম্ভের উল্লেখ পাওয়া যায়, বায়ু পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী জম্ভ ছিলেন প্রহ্লাদের পৌত্র এবং দৈত্যরাজ বিরোচনের অন্যতম পুত্র।

দেবরাজ ইন্দ্র এবং বলির যুদ্ধে জম্ভকে সেনাপতিত্ব করতে দেখা যায়। তিনি সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করে ইন্দ্রকে আক্রমণ করেন এবং ইন্দ্রের হাতে নিহত হন। তারকাময় যুদ্ধেও অন্যতম অসরবীর হিসেবে আমরা জম্ভের উল্লেখ পাই।

মহাভারতেও একাধিক বার অসুরবীর জম্ভের উল্লেখ আছে। যুদ্ধের ভয়াবহতা বোঝাতে শক্র অর্থাৎ ইন্দ্র এবং জম্ভের কিংবা বিষ্ণু এবং জম্ভের যুদ্ধের কথা উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। দৈত্যরাজ বলিকে দমন করার সময় ভগবান বিষ্ণু জম্ভকেও বধ করেছিলেন, একথা মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে। দ্রোণপর্বে উল্লিখিত আছে কৃষ্ণ জম্ভ নামে এক অসুরকে বধ করেছিলেন।

বস্তুত জম্ভ শব্দের অর্থ ভক্ষক বা নাশক। সেক্ষেত্রে ভয়াবহ অসুর মাত্রেই জম্ভ নামে সম্বোধিত হয়েছে বলে মনে হয়। পাশ্চাত্য ভাবায় Syncretism বলে যে শব্দটি পাওয়া যায়, জম্ভের ক্ষেত্রেও সেটি প্রযোজ্য। নিদারুণ হিংস্র রাক্ষসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় যে একাধিক জম্ভাসুরের উল্লেখ পাওয়া যায় এটি একটি Syncretistic ভাবনা।

[মহা (k) ৩.১০২.২৪; ৭.১১.৫; (হরি) ৩.৮৭.২৪; ৭.৯.৫; ভাগবত পু. ৬.১৮.১২; ৮.১০.২১-৩২; ৮.১১.১৩-১৮; মৎস্য পু. ৪৭.৭২;১৪৮.৫২-৫৪; ১৫০-১৫৩ অধ্যায়; বিষ্ণু পু. ৫.১৪.১৪; ৪.৬.১০; বায়ু পু. ৬৭.৭৬; ৯৭.১০৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫.৩৮; ২.৬.১০]

জম্ভক১ তারকাসুরের প্রধান দশজন সেনাপতিদের মধ্যে জম্ভক একজন। *[পদ্ম পু. (সৃষ্টি খণ্ড) ৪২.৭২-৭৩]*

জম্ভক২ চর্মণ্বতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি জনপদের রাজা। স্থানবিশেষে জম্ভকের পরিবর্তে জম্ভ নামটিও পাওয়া যায়। ইনি নরকাসুরের মিত্র ছিলেন বলে জানা যায়। কৃষ্ণ জম্ভককে বধ করেছিলেন।

সহদেব দিগ্বিজয়ের সময় জম্ভক পুত্রকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। *[দ্র. জম্ভ]*

[মহা (k) ২.৩১.৭-৮; (হরি) ২.৩০.৭-৮; স্কন্দ পু. (প্রভাস/দ্বারকা) ২০.৫০]

জম্ভক৩ একজন অসুর। দেবাসুর সংগ্রামে জম্ভক বিষ্ণুর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করেছিলেন।

[স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কুমারিকা) ১৯.৬৪]

জয়১ 'জয়' বলতে রূঢ় অর্থে মহাভারতকে বোঝায়—

জয়ো নামেতিহাসো'য়ংশ্রোতব্যং মোক্ষমিচ্ছতা।

[মহা (k) ১৮.৫.৫১; (হরি) ১৮.৫.৫০]

মহাভারতের অপর নাম জয়-সংহিতা— ততো জয়মুদীরয়েৎ। তবে সাধারণভাবে 'জয়' শব্দের তাৎপর্য্য অনেক বিশদ। ভবিষ্য পুরাণে 'জয়' বলতে অষ্টাদশ পুরাণ, রামচন্দ্রের চরিত্রগ্রন্থ, বৈষ্ণব-শাস্ত্র, শৈবশাস্ত্র, সৌর-গণপত্যাদি শাস্ত্র, মনুর ধর্মশাস্ত্র এবং অবশ্যই কৃষ্ণচরিত্র-সংক্রান্ত মহাভারতকেও বোঝানো হয়েছে—

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতং তথা।
বিষ্ণুধর্মাদি-শাস্ত্রাণি শিবধর্মাশ্চ ভারত॥
কার্ষ্ণঞ্চ পঞ্চমো বেদ যন্মহাভারতং স্মৃতম্।
সৌরাশ্চ ধর্মা রাজেন্দ্র মানবোক্তা মহীপতে।
জয়েতি নাম চৈতেষাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

[নীলকণ্ঠ কৃত ভারত ভাবদীপ-টীকা দ্র.; মহা (k) ১.১.১; (হরি) ১.১.১; সিদ্ধান্তবাগীশকৃত মহাভারতের ভারতকৌমুদী টীকায় ভবিষ্য পুরাণের ব্রহ্ম খণ্ড থেকে উদ্ধৃত বচন। দ্র. ভারতকৌমুদী টীকার আরম্ভ অংশ, পৃ. ২]

হয়তো 'জয়' শব্দ বিশদর্থে পুরাণগুলি এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থকে বোঝায় বলেই ওই সব গ্রন্থের বেশির ভাগের মধ্যেই আদি শ্লোকটি ওই একই—

নারায়ণং নমস্কৃত্য . . . ততো জয়োমুদীরয়েৎ।

'জয়' শব্দের ব্যুৎপত্তি জয়তি অনেন সংসারম্—যার দ্বারা সংসারকে জয় করা যায় এই রকম গ্রন্থ—অথবা সমস্ত পুরুষার্থ প্রতিপাদক গ্রন্থ।

[স্মার্ত তিথিতত্ত্ব থেকে সিদ্ধান্তবাগীশ-কৃত ভারতকৌমুদী টীকায় উদ্ধৃত বচন; দ্র. মহাভারত ভারতকৌমুদী টীকার আরম্ভ অংশ পৃ.২]

পণ্ডিতেরা অনেকে বলেছেন যে মহাভারতকে প্রথমে 'জয়' বা জয়সংহিতা নামেই অভিহিত করা হত। কিন্তু মহাভারতের মধ্যে বহুবার মহাভারতকে 'মহাভারত' বা 'ভারত' বলা হয়েছে। বিশেষত এই পুরো শ্লোকটি যে কোনো মহাভারত বক্তা বা পাঠকের মুখে উচ্চারিত মঙ্গলাচরণ শ্লোক যা প্রত্যেক পুরাণের আদিতেও উচ্চারিত হয়। আদিতে মঙ্গলাচরণ করা প্রত্যেক সংস্কৃত কাব্য-নাটকের রেওয়াজ। কাজেই এই প্রথম শ্লোকে দেব-দেবীদের নমস্কার জানিয়ে অনন্ত মহাভারত শ্রোতার উদ্দেশে মহাভারত বক্তা জয়াশীর্বাদ উচ্চারণ করেছেন, এটাই স্বাভাবিক যেমনটা সংস্কৃতের রীতি মেনে চৈতন্য চরিতামৃতের কবি আপন ইষ্টদেবতাকে প্রণাম জানিয়ে বলেছিলেন—

চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্বাদ।
সর্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণ চৈতন্য প্রসাদ॥

'জয়মুদীরয়েৎ'—মানে 'জয়কার' উচ্চারণ করবে।

জয়২ কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভজাত একজন নাগ। তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগে যখন দেবতারা স্কন্দ কার্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন, সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট দেবতারা তাঁদের কয়েকটি বিশিষ্ট অনুচর যোদ্ধাকে তারকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য স্কন্দকে দান করেন। নাগরাজ বাসুকি তাঁর যে দুজন বিশিষ্ট অনুচর স্কন্দকে দান করেছিলেন জয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কদ্রুপুত্র জয় পাতালের পঞ্চম তল অর্থাৎ মহাতলে বাস করতেন বলে পুরাণে উল্লিখিত আছে।

[মহা (k) ৫.১০৩.১৬; ৯.৪৫.৫২-৫৩; (হরি) ৫.৯৬.১৬; ৯.৪.৫০; বায়ু পু. ৫০.৩৬; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২০.৩৭]

জয়৩ মহাভারতের আদিপর্বে যে ধৃতরাষ্ট্রের এগারোজন মহারথী পুত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, জয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। চিত্রসেন, জয় সত্যব্রত, পুরুমিত্র—এঁদের নাম আমরা ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের প্রাথমিক তালিকায় পাই না। কিন্তু মহাভারতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা এই চারজনের নাম ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র হিসেবেই একত্রে উচ্চারিত হতে দেখব। বিরাট পর্বের যুদ্ধে অন্যান্য কুরু মহারথীদের সঙ্গে জয়ও উপস্থিত ছিলেন। রাজকুমার জয় শুধু যে মহারথী যোদ্ধা ছিলেন তা নয়, কুরু রাজপরিবারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে জয়, পুরুমিত্রের নাম উচ্চারিত হওয়ায় মনে হয় তাঁরা বিচক্ষণ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। এই কারণে কুরুরাজ পরিবারে তাঁদের মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হত। ধৃতরাষ্ট্র যুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করার পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেছেন, জয়, পুরুমিত্র এঁরাও এই মহাযুদ্ধ চান না। এমনকী, তাঁরা দ্যূতক্রীড়ারও পক্ষপাতি ছিলেন না। তবে দ্যূতক্রীড়া উপলক্ষে যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ জানাতে বিদুর যখন ইন্দ্রপ্রস্থে আসেন, তখন যুধিষ্ঠির প্রশ্ন

করেছিলেন—দ্যূতক্রীড়া করার জন্য কারা উপস্থিত হয়েছেন হস্তিনাপুরের রাজসভায়। উত্তরে কুরু রাজসভায় উপস্থিত দ্যূতবিলাসী রাজা ও রাজকুমারদের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে বিদুর চিত্রসেন, সত্যব্রত, জয় এবং পুরুমিত্রের নাম উল্লেখ করেন। এরা কিন্তু সকলে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, কিন্তু এই রাজকুমাররা প্রাথমিকভাবে দ্যূতকীড়ার আয়োজনটাকে সরল ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। শকুনির কপটদ্যূত বা দ্যূতসভায় যেসব অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে তার বিন্দুমাত্র পূর্বাভাসও তাঁদের কাছে ছিল না। তাই শেষপর্যন্ত শকুনি পরিচালিত দ্যূতসভাকে তাঁরা নীতিগত কারণেই সমর্থন করেননি এবং সেটা ধৃতরাষ্ট্রের কথা থেকেই ধরা পড়ছে। লক্ষণীয়, ধৃতরাষ্ট্র দ্যূত বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, সঞ্জয়ের মতো বিশিষ্টজনের মতামতের সঙ্গে জয়, পুরুমিত্র, সত্যব্রতের মতো কুরুরাজকুমারের মতামত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করছেন। তবে দুর্যোধন এই মতামত সদর্পে অস্বীকার করেছেন। একথাও বলেছেন যে, এঁরা চাইলে তাঁকে সাহায্য নাও করতে পারেন। তিনি স্বয়ং, দুঃশাসন এবং কর্ণই পাণ্ডবদের বিনাশ করার পক্ষে যথেষ্ট। স্পষ্ট বোঝা যায়—জয় প্রভৃতি রাজকুমাররা দুর্যোধনের ছোটো ভাই হলেও তাঁর মতাদর্শকে অনুসরণ করতেন না, বরং বিরোধিতাই করতেন। ফলত দুর্যোধনও তাঁদের পছন্দ করতেন না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়, পুরুমিত্র প্রভৃতিকে গুরুত্বপূর্ণ যোদ্ধা হিসাবে কৌরব শিবিরে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। যুদ্ধের প্রথম দিনেই জয় অন্যান্য ভাইদের নিয়ে ভীমসেনকে আক্রমণ করেন। দ্রোণাচার্য যে গরুড়ব্যূহ রচনা করেছিলেন তার বক্ষস্থল অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে জয়দ্রথ প্রভৃতি কুরু মহাযোদ্ধাদের সঙ্গে জয়ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি অন্যান্য ভাইদের নিয়ে পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথীদের আক্রমণ করেছিলেন। ভীমসেনের সঙ্গে দ্রোণপর্বেও একবার জয় প্রভৃতি কৌরবদের যুদ্ধ হয়। দুর্যোধনের অনুরোধে শকুনি অর্জুনকে আক্রমণ করলে জয় প্রভৃতি কৌরব যোদ্ধারা শকুনিকে সহায়তা করার জন্য তাঁর পিছনে পিছনে আসতে থাকেন। রাজকুমার জয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঠিক কোন পর্যায়ে পৌঁছে মৃত্যু বরণ করেন কিংবা কার হাতে তাঁর মৃত্যু হয়—তা জানা যায় না। তবে কর্ণপর্ব পর্যন্ত তাঁকে আমরা জীবিত অবস্থাতেই দেখি।

[মহা (k) ১.৬৩.১২০; ২.৫৮.১৩; ৪.৫৪.৭; ৫.৫৮.৭; ৬.১৮.১১; ৬.৪৪.১৬; ৭.২০.১২; ৭.২৫.৪৫; ৭.৮৫.২৮; ৭.১৩৫.৩০; ৭.১৫৬.১২২; ৮.৭.১৮; (হরি) ১.৫৮.১৫৯; ২.৫৫.১৩; ৪.৪৯.৭; ৫.৫৭.৬৯; ৬.১৮.১১; ৬.৪৪.১৬; ৭.১৮.১৩; ৭.২৩.৪৪; ৭.৭৪.২৭; ৭.১১৭.২৯; ৭.১৩৬.১১৮; ৮.৫.১৮]

জয়৪ একজন দেবতা। দেবরাজ ইন্দ্র খাণ্ডববন দাহ করার সময় কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বাধা দিয়েছিলেন। এই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে কৃষ্ণার্জুনের রীতিমত যুদ্ধ হয়। ইন্দ্রের অনুগত যেসব দেবতা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, জয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইনি মুষল হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ১.২২৭.৩৪; (হরি) ১.২২০.৩৪]

জয়৫ একজন প্রাচীন রাজর্ষি। মৃত্যুর পর যেসব প্রাচীন রাজা যমের সভায় স্থান লাভ করেছিলেন, জয় তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ২.৮.১৫; (হরি) ২.৮.১৫]

জয়৬ দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের সূচনা পর্বে বনবাসের সঙ্গী ব্রাহ্মণদের ভরণ পোষণের জন্য যুধিষ্ঠির সূর্যদেবের সহায়তা প্রার্থনা করেন। ধৌম্য পুরোহিত সেই সময় যুধিষ্ঠিরকে সূর্যের অষ্টোত্তরশতনামস্তোত্র শুনিয়েছিলেন। জয় সেই স্তোত্রে উচ্চারিত সূর্যের একটি নাম।

[মহা (k) ৩.৩.২৪; (হরি) ৩.৩.২৪]

জয়৭ অর্জুনের অন্যতম নাম। মহাভারতের বহু শ্লোকে অর্জুন জয় নামে চিহ্নিত হয়েছেন। বিরাটপর্বে উত্তরের প্রশ্নের উত্তরে বৃহন্নলা বেশধারী অর্জুন নিজের যে দশটি নামের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে অবশ্য জয় নামটি পাওয়া যায় না। যে নামটি পাওয়া যায়, তা হল বিজয়। তিনি যুদ্ধে অজেয় তাই তাঁর এই নাম। মনে হয় প্রিয়জনদের প্রিয় সম্বোধনে এই বিজয় নামটিই সংক্ষেপে জয় হয়ে গিয়েছে। সভাপর্বে আমরা কৃষ্ণের মুখে অর্জুনকে জয় নামে চিহ্নিত হতে দেখি। কৃষ্ণ বলছেন—আমার কৌশল, ভীমের বাহুবল একত্রিত হলে এবং জয় অর্থাৎ অর্জুন যদি আমাদের রক্ষা করেন তবে আমরা সহজেই জরাসন্ধকে বধ করতে পারব—

ময়ি নীতির্বলং ভীমে রক্ষিতা চাবয়োর্জয়ঃ।
মাগধং সাধয়িষ্যাম ইষ্টিং ত্রয় ইবাগ্নয় ॥

অর্জুনপুত্র অভিমন্যুকেও আমরা 'জয়াত্মজ' বলে চিহ্নিত হতে দেখি—

জানামি বীর্যঞ্চ জয়াত্মজস্য।

[মহা (k) ২.২০.৩; ৩.১২০.১২; (হরি) ২.১৯.৩; ৩.১০০.৩৪]

জয়৮ অজ্ঞাতবাসের সময় যুধিষ্ঠির পাঁচ পাণ্ডব ভাইয়ের পাঁচটি গোপন নাম রেখেছিলেন। যে নামে তাঁরা শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে পরিচিত থাকবেন। এই সময় যুধিষ্ঠির জয় নাম গ্রহণ করেন। *[মহা (k) ৪.৫.৩৫; (হরি) ৪.৫.৩৫]*

জয়৯ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে অবস্থানকারী একজন যোদ্ধা। ইনি পঞ্চালদেশীয় যোদ্ধা। তিনি পাঞ্চাল রাজকুমার ছিলেন কিনা সে বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও তাঁকে দ্রুপদরাজার পুত্র বলেই মনে হয়। পাঞ্চালদেশীয় বীররা একত্রিত ভাবে যখন কৌরব সেনাপতি কর্ণকে আক্রমণ করেন, তখন জয়ও সেই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

[মহা (k) ৮.৫৬.৪৪; (হরি) ৮.৪২.৪৬]

জয়১০ যুদ্ধ জয়ের অমূর্ত জয়-কল্পনা দেবতা রূপে মূর্ত হয়েছে 'জয়' শব্দের মধ্যে। স্কন্দ কার্তিকেয়ের যুদ্ধযাত্রার সময় জয়কে ব্যবসায়, ধর্ম, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, ধৃতি এবং স্মৃতির সঙ্গে স্কন্দের সেনাবাহিনীর সামনে চলতে দেখা যায়।

[মহা (k) ৯.৪৬.৬৪; (হরি) ৯.৪২.৭১]

জয়১১ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের একটি। সমস্ত প্রাণীবর্গকে যিনি জয় করেন তিনি জয়াত্মক বিষ্ণু—

সমস্তানি ভূতানি জয়তীতি জয়ঃ।

[দ্র. শঙ্করাচার্যের টীকা]

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৬৭; (হরি) ১৩.১২৭.৬৭]

জয়১২ ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম পার্ষদ। জয় ও বিজয় এই দু-জনের নাম সবসময় একই সঙ্গে উচ্চারিত হতে দেখা যায়।

□ ভগবান বিষ্ণু বামনরূপে বলির যজ্ঞ সভায় উপস্থিত হয়ে তিন পদ পরিমাণ ভূমি প্রার্থনা করেন। অসুররাজ বলি সানন্দে তাঁকে তিন পদ পরিমাণ ভূমি দান করলেন। এরপর ভগবান বিষ্ণু বামনরূপ ত্যাগ করে বিরাট মূর্তি ধারণ করে মাত্র তিন পদে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ব্যাপ্ত করলেন। রাজা বলি ভগবান বিষ্ণুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। বলিরাজার সেনাপতি, অসুরবীররা ভাবলেন, ভগবান বিষ্ণু ছলনা করে তাঁদের রাজার সাম্রাজ্য হরণ করলেন। বলির অনুমতি না নিয়েই বামনরূপধারী বিষ্ণুকে আক্রমণ করলেন তাঁরা। এইসময় তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বৈকুণ্ঠলোক থেকে ভগবান বিষ্ণুর পারিষদরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। জয়-বিজয়ও অসুর সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন।

[ভাগবত পু. ৮.২১.১৬]

□ একবার ব্রহ্মার মানসপুত্র সনক প্রভৃতি ঋষিরা বৈকুণ্ঠলোকে এসে উপস্থিত হলেন। বৈকুণ্ঠপুরীর সপ্তম কক্ষে দ্বারপাল হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন জয়-বিজয়। ঋষিদের দেখে তাঁরা উপযুক্ত সম্মান তো জানালেনই না উপরন্তু সেই কক্ষে প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন তাঁদের। ঋষিরা রেগে গিয়ে বললেন—তোমরা ভগবান বিষ্ণুর সাহচর্যে থাকার উপযুক্তই নও। অতএব তোমরা পাপাচারী অসুর হয়ে জন্মাবে। এই সময় ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্মী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। অভিশাপ বৃত্তান্ত শুনে তিনি বললেন—ঋষিদের শাপ যাতে আমার প্রিয় পারিষদদের পতনের কারণ না হয় সে ব্যবস্থা আমি করতে পারি বটে, কিন্তু এই অভিশাপ আমার অভিলাষেই ঘটেছে। একদিন তোমরা স্বয়ং দেবী লক্ষ্মীর পথ রোধ করেছিলে, তিনিও তোমাদের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। অসুর জন্ম গ্রহণ করে তোমরা আমাকে শত্রুভাবে কল্পনা করবে। ফলে আমারই হাতে তোমরা অসুর জন্ম থেকে মাত্র তিনটি জন্মের পরেই মুক্তি লাভ করবে। লক্ষণীয়, ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং নিজের পার্ষদদের উপদেশ দিচ্ছেন যে তাঁরা শত্রুভাবে তাঁকে কল্পনা করুক। কারণ মানুষ যাকে শত্রুভাবে কল্পনা করে, সর্বক্ষণ তার কথাই চিন্তা করে, ফলে চিন্তার যে নিরন্তরতা তৈরি হয়, তার ফলেই দ্রুত এঁদের মুক্তি হবে, এ কথাই ভাগবত পুরাণে নির্দেশিত হয়েছে—

তস্মাদ্ বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্॥
যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥

[ভাগবত পু. ৭.১.২৫-২৬ (শ্রীজীব গোস্বামী এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত টীকা দ্রষ্টব্য)]

যাইহোক, ঋষিদের অভিশাপে জয়-বিজয় প্রথমে জন্ম নিলেন কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দিতির গর্ভে। তাঁদের নাম হল হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ। ভগবান বিষ্ণু বরাহ অবতার গ্রহণ করে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন এবং হিরণ্যকশিপুকে বধ করার জন্য ভগবান বিষ্ণু নরসিংহ অবতার গ্রহণ করেন। এরপর ত্রেতা যুগে জয়-বিজয় মহর্ষি বিশ্রবার ঔরসে কেশিনীর গর্ভে (রামায়ণ মতে কৈকসীর গর্ভে) জন্মগ্রহণ করেন—তাঁদের নাম হয় রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ। রামচন্দ্রের হাতে তাঁদের মৃত্যু হয়। দ্বাপর যুগে যখন ভগবান তাঁরা কৃষ্ণের দুই পিসতুতো ভাই শিশুপাল ও দন্তবক্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণ তাঁদের হত্যা করলে তাঁরা অভিশাপ মুক্ত হন এবং বৈকুণ্ঠলোকে প্রত্যাবর্তন করেন।

[ভাগবত পু. ৭.১.৩৫-৪৭; ৩.১৬.২৬-৩৭; ৮.২১.১৬]

জয়$_{১৩}$ দশম মনু ব্রহ্মসাবর্ণির সময়ে যাঁরা সপ্তর্ষি হয়েছিলেন, জয় তাঁদের মধ্যে একজন।

[ভাগবত পু. ৮.১৩.২২]

জয়$_{১৪}$ রাজা ধ্রুবের পুত্র বৎসরের ঔরসে সুবীথীর গর্ভে ছয়টি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম জয়।

[ভাগবত পু. ৪.১৩.১২]

জয়$_{১৫}$ ইক্ষ্বাকুর পুত্র রাজা নিমির বংশধারায় শ্রুত রাজার পুত্র। অবশ্য বায়ু পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে তাঁকে শ্রুতের পৌত্র বলা হয়েছে। এই দুই পুরাণ মতে শ্রুতের পুত্র ছিলেন সুশ্রুত, এই সুশ্রুতের পুত্র জয়। জয় বিজয় নামে একটি পুত্র লাভ করেন।

[ভাগবত পু. ৯.১৩.২৫; বায়ু পু. ৮৯.২১; বিষ্ণু পু. ৪.৫.১৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৪.২২]

জয়$_{১৬}$ পুরূরবার ঔরসে উর্বশীর গর্ভে যে ছয়টি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়, তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম জয়। *[ভাগবত পু. ৯.১৫.১]*

জয়$_{১৭}$ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র।

[ভাগবত পু. ৯.১৬.৩৬]

জয়$_{১৮}$ পুরূরবার জ্যেষ্ঠপুত্র আয়ু। আয়ুর দ্বিতীয় পুত্র ক্ষাত্রবৃদ্ধের বংশজাত সঞ্জয়ের পুত্র ছিলেন জয় (অন্যমতে সৃঞ্জয়ের পুত্র)। জয়ের পুত্রের নাম কৃত (অন্যান্য পুরাণ মতে বিজয়)।

[ভাগবত পু. ৯.১৭.১৬; বায়ু পু. ৯৩.৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৮.৮]

জয়$_{১৯}$ আয়ুর পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশজাত সংকৃতির পুত্র। ভাগবত পুরাণ তাঁকে মহারথ যোদ্ধা বলে উল্লেখ করেছে। ভাগবত পুরাণের বর্ণনা অনুসারে সম্ভবত ইনিই ক্ষাত্রবৃদ্ধের বংশের শেষ পুরুষ ছিলেন। *[ভাগবত পু. ৯.১৭.১৭]*

জয়$_{২০}$ পুরুবংশীয় ভরত রাজার দত্তকপুত্র ছিলেন বিতথ। বিতথের পুত্র মন্যু। এই মন্যুর যে পাঁচটি পুত্র সন্তান হয়, জয় তাঁদের মধ্যে একজন।

[ভাগবত পু. ৯.২১.১]

জয়$_{২১}$ যদুবংশীয় যুযুধানের পুত্র। যদুবংশীয় যুধাজিতের পুত্র অনমিত্রের বংশধারায় তাঁর জন্ম হয়। জয় কুনি নামে এক পুত্র সন্তান লাভ করেন।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.১৪]

জয়$_{২২}$ শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে ভদ্রার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম। *[ভাগবত পু. ১০.৬১.১৭]*

জয়$_{২৩}$ ঋক্ষরাজ জাম্ববানের পুত্র।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩০২]

জয়$_{২৪}$ স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবতারা যে কয়টি গণে বিভক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে বিকুণ্ঠ একটি গণ। এই বিকুণ্ঠ গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতা জয়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৫৭]

জয়$_{২৫}$ বরুণের পুত্র কলি। কলির পুত্র জয়।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৫৯.৭; বায়ু পু. ৮৪.৭]

জয়$_{২৬}$ বায়ুপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে, আয়ুর পুত্র রাজা ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধারায় জয় রাজার পুত্র বিজয়, সেই বিজয়ের পুত্রের নামও জয় ছিল। ইনি হর্য্যশ্বকের (হর্য্যদ্বতের) পিতা।

[বায়ু পু. ৯৩.৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৮.৯]

জয়$_{২৭}$ সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার মুখ থেকে বারোজন দেবতার সৃষ্টি হয়। এই বারোজন দেবতা একত্রে জয় নামে পরিচিত। ব্রহ্মা তাঁদের প্রজা সৃষ্টি করতে আদেশ করলেন। কিন্তু তাঁরা সংসার ধর্মকে অসার বলে বিবেচনা করে ব্রহ্মার আদেশ পালন করলেন না। তাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করে তপস্যায় কাল অতিবাহিত করতে লাগলেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মা তাঁদের অভিশাপ দিলেন—তোমরা আগামী ছয় মন্বন্তরে দেবতা রূপে জন্মগ্রহণ করবে। বেদবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সন্তান উৎপাদন, দানধর্ম, যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি সৎকার্যে তোমরা নিযুক্ত থাকবে। বৈবস্বত মন্বন্তরের শেষে তোমরা আবার ব্রহ্মলোকে ফিরে আসবে। জয়রা অভিশপ্ত হয়ে যোগবলে দেহত্যাগ করলেন। তাঁদের দেহ জয় নামে কুরু দেশে অবস্থিত বারোটি বিশাল হ্রদে পরিণত হল। এই জয় দেবতারা এরপর ছয়টি

মন্বন্তরে বিভিন্ন গণের দেবতা রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। *[বায়ু পু. ৬৬,৬৭ অধ্যায়; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৭২-৭৩; ২.৩.৬৫]*

জয়$_{২৮}$ পুরুবংশীয় রাজা অজমীঢ়ের বংশ ধারায় ভদ্রাশ্বরাজার পাঁচটি পুত্র সন্তান হয়। তাঁরা পাঁচভাই মিলে যে জনপদ প্রতিষ্ঠা করেন তারই নাম পঞ্চাল। ভদ্রাশ্বের এই পাঁচপুত্রের মধ্যে জয় অন্যতম। *[মৎস্য পু. ৫০.৩]*

জয়ৎসেন$_{১}$ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের তালিকা অনুযায়ী জয়ৎসেনের নামের কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় জয়ৎসেনকে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ষষ্ঠ দিনে নকুলের পুত্র শতানীকের বাণে তিনি গুরুতর আহত হয়েছিলেন। যুদ্ধের দশম দিনে কৌরবপক্ষে যোগদানকারী পুরু রাজা আহত হয়ে জয়ৎসেনের রথে আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। শল্যপর্বে জয়ৎসেন প্রভৃতি এগারোজন কৌরব রাজপুত্র ভীমসেনকে আক্রমণ করেন এবং ভীমের হাতেই এইসময় জয়ৎসেনের মৃত্যু হয়।

[মহা (k) ৬.৭৯.৪০-৪৫; ৬.১১৫.২৫; ৯.২৬.৫, ১১; (হরি) ৬.৭৬.৪১-৪৬; ৬.১১২.২৫; ৯.২৪.৪, ১১]

জয়ৎসেন$_{২}$ মগধরাজ জরাসন্ধের পুত্র। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্ব থেকে জানা যায়, কালকেয় দানবদের অংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় সহদেব প্রভৃতি জরাসন্ধের অন্যান্য পুত্রদের সঙ্গে জয়ৎসেনও উপস্থিত ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময়ও তাঁকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। ইনি এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যোগদান করেন। দ্রোণপর্বে দেখা যায় জয়ৎসেন প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধাকে বাধা দেবার জন্য কৌরব রাজকুমাররা মিলিতভাবে তাঁদের আক্রমণ করেন। স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলাকালীন কোনো এক সময় জরাসন্ধপুত্র জয়ৎসেন নিহত হয়েছিলেন বলে মনে হয়।

[মহা (k) ১.৬৭.৪৮; ১.১৮৬.৮; ২.৪৪.১৯; ৫.১৯.৮; ৫.১৯৬.১৬; ৭.২৫.৪৫; (হরি) ১.৬২.৪৯; ১.১৭৯.৮; ২.৪৩.১৯; ৫.১৯.৮; ৫.১৮৬.১৬; ৭.২৩.৪৪]

জয়ৎসেন$_{৩}$ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষে যোগদানকারী একজন রাজা। মহাভারতের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে তাঁকে কোথাও কোথাও জয়সেন নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দশম দিনে ভীমের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। অভিমন্যুর হাতে তিনি নিহত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। আশ্চর্য এই যে পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধা জয়ৎসেন (জয়ৎসেন$_{২}$) এবং কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধা জয়ৎসেন দু-জনেই মগধরাজ জরাসন্ধের পুত্র বলে চিহ্নিত হয়েছেন। কৌরবপক্ষীয় জয়ৎসেনের মৃত্যু সংবাদ দিতে গিয়ে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন, জরাসন্ধের পুত্র মহাবল জয়ৎসেন সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যুর হাতে নিহত হয়েছেন—

জয়ৎসেনস্তথা রাজন্ জারাসন্ধির্মহাবলঃ।
মাগধো নিহতঃ সংখ্যে সৌভদ্রেণ মহাত্মনা॥

আবার যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যোগদানকারী জয়ৎসেন সম্পর্কেও অনুরূপ শব্দ উচ্চারিত হয়েছে—

মাগধশ্চ জয়ৎসেনো জারাসন্ধির্মহাবলঃ।
অক্ষৌহিণ্যৈব সৈন্যস্য ধর্মরাজমুপাগমৎ॥

তথ্য দুটি আপাতদৃষ্টিতে বিভ্রান্তিকর হলেও মনে হয় এই দুই জয়ৎসেনই মগধরাজ জরাসন্ধের বংশজাত ছিলেন। সম্ভবত কোনো রাজনৈতিক বিরোধের কারণেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় দুই জয়ৎসেন দুই পক্ষে যোগদান করেন।

[মহা (k) ৫.৬৬.৬; ৬.১৬.১৬; ৬.১০৮.১৪; ৬.১১৪.৩২; ৮.৫.৩১; (হরি) ৫.৬৫.৬; ৬.১৬.১৬; ৬.১০৪.১৪; ৬.১১০.৩২; ৮.৩.৪৭]

জয়ৎসেন$_{৪}$ পৌরববংশীয় রাজা সার্বভৌমের ঔরসে, কেকয় রাজকন্যা সুনন্দার গর্ভে জয়ৎসেনের জন্ম হয়। রাজা জয়ৎসেন বিদর্ভের রাজকন্যা সুশ্রবাকে বিবাহ করেন। সুশ্রবার গর্ভে জয়ৎসেনের অর্বাচীন (অন্যমতে রুচির বা আরাধিত) নামে একটি পুত্র হয়।

[মহা (k) ১.৯৫.১৬-১৭; (হরি) ১.৯০.২১-২২; মৎস্য পু. ৫০.৩৬; বায়ু পু. ৯৯.২৩১; বিষ্ণু পু. ৪.২০.৩]

জয়ৎসেন$_{৫}$ অজ্ঞাতবাসের সময় যুধিষ্ঠির পাঁচ ভাইয়ের পাঁচটি গোপন নাম রেখেছিলেন যে নামে তাঁরা শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে পরিচিত থাকবেন। এই সময় নকুলের নাম জয়ৎসেন রাখা হয়েছিল। অবশ্য হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে 'জয়সেন' নাম পাওয়া যায়।

[মহা (k) ৪.৫.৩৫; (হরি) ৪.৫.৩৫]

জয়ৎসেন৬ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে জনৈক জয়ৎসেন নহুষের পিতামহ বলে চিহ্নিত হয়েছেন। ইনি অহীনের পুত্র, সংকৃতির পিতা। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ নহুষকে সংকৃতির পুত্র বলে উল্লেখ করেছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৮.১০]

জয়ৎসেনা স্কন্দ কার্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.৬; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ৫ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

জয়দ পুরুবংশীয় মনস্যুর পুত্র। এই জয়দ রাজা ধুন্ধুর পিতা ছিলেন। *[বায়ু পু. ৯৯.১২১]*

জয়দ্রথ১ জয়দ্রথকে কখনো সিন্ধুপ্রদেশের রাজা বলা হয়েছে, কখনো বা সিন্ধু-সৌবীরের রাজা হিসেবেও তিনি চিহ্নিত হয়েছেন। তিনি বৃদ্ধক্ষত্রের পুত্র, তাঁর মায়ের নাম জানা যায় না—

ততঃ স রাজা সিন্ধূনাং বার্দ্ধক্ষত্রির্জয়দ্রথঃ।

[মহা (k) ৩.২৬৪.১১; (হরি) ৩.২১৯.১১]

পতিঃ সৌবীর-সিন্ধূনাং দুষ্টভাবো জয়দ্রথঃ।

[মহা (k) ৩.২৬৭.৮; (হরি) ৩.২২১.৭]

□ এক জায়গায় জয়দ্রথের প্রতি দ্রৌপদীর কুশল-প্রশ্নে দেখতে পাচ্ছি তিনি জিজ্ঞাসা করছেন—আপনি একাই শিবিগণ এবং সিন্ধুদেশের সঙ্গে সৌবীর দেশকে ধর্মানুসারে পালন করছেন তো—

কচ্চিদেকঃ শিবীন্ আঢ্যান্
সৌবীরান্ সহ সিন্ধুভিঃ।

এই কথা থেকে মনে হয় যে, জয়দ্রথ সিন্ধু-সৌবীর দেশ ছাড়াও শিবি-জনজাতিকেও নিজের শাসনাধীন করেছিলেন। সিন্ধুদেশ এখনকার পাকিস্তানের সিন্ধু এবং ভারতবর্ষেরও খানিক অংশ নিয়ে অবস্থিত ছিল। আর ঝিলম-চেনাবের অন্তর্বর্তী ভূমিতে সুবীর বা সৌবীর দেশ, তারও উত্তর-পশ্চিমে হয়তো ঔশীনর শিবি জনজাতির বসবাস ছিল। জয়দ্রথ সেখানকার রাজা ছিলেন।

[মহা (k) ৩.২৬৭.১১; (হরি) ৩.২২১.১১]

□ কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র মেয়ে দুঃশলার সঙ্গে জয়দ্রথের বিবাহ হয়। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠতা-বিচারের সময় একেবারে শেষে বলা হয়েছে যে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বৈদিক বিবাহবিধি অনুসারে দুঃশলাকে জয়দ্রথের হাতে তুলে দিলেন—

দুঃশলাঞ্চাপি সময়ে ধৃতরাষ্ট্রো জনাধিপঃ।
জয়দ্রথায় প্রদদৌ বিধিনা ভরতর্ষভ॥

মহাভারতের অন্যত্র দেখতে পাচ্ছি যেন সিন্ধু-সৌবীরাধিপতি জয়দ্রথের সঙ্গে দুঃশলার বিবাহের প্রস্তাবটা গান্ধারীর ভাই শকুনির কাছ থেকেই এসেছে। গান্ধার দেশের জাতক হিসেবে শকুনি সিন্ধু-সৌবীর দেশের অধিপতি জয়দ্রথকে চেনেন অনেক বেশি। ফলে শকুনির অনুমতিক্রমেই ধৃতরাষ্ট্র দুঃশলার পাত্র হিসেবে জয়দ্রথকে মনোনীত করেন—

দুঃশলাং সময়ে রাজন্ সিন্ধুরাজায় কৌরবঃ।
জয়দ্রথায় প্রদদৌ সৌবলানুমতে তদা॥

[মহা (k) ১.৬৭.১০৯-১১০; (হরি) ১.৬২.১১১]

□ দুঃশলার গর্ভজাত জয়দ্রথের পুত্রের নাম ছিল সুরথ। মহাযুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞের সময় অর্জুন যখন যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে সিন্ধুদেশে উপস্থিত হন, তখন অর্জুনের নাম শোনামাত্র ভয় পেয়ে সুরথের মৃত্যু হয়।

[মহা (k) ১৪.৭৮.২৩-৩১; (হরি) ১৪.৯৮.১-৯]

□ পঞ্চাল-রাজ্যে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় জয়দ্রথ দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী হয়েই এসেছিলেন বলে মনে হয়। স্বয়ংবরে 'রাজনাম-কীর্তন'-এর সময় কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর নাম করেছেন সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ।

[মহা (k) ১.১৮৬.২১; (হরি) ১.১৭৯.২১]

□ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় মর্যাদাশালী কুটুম্বের মতোই তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে এসেছিলেন। পাণ্ডব নকুল স্বয়ং বাহ্লীক, ধৃতরাষ্ট্র এবং সোমদত্তের সঙ্গে জয়দ্রথকে আপ্যায়ন করে রাজসভায় নিয়ে আসেন এবং জয়দ্রথকে এখানে জামাতার মর্যাদায় প্রভুবৎ ভৃত্যবর্গের ওপর আদেশ এবং নিয়োগ জারি করতে দেখা যাচ্ছে—

নকুলেন সমানীতাঃ স্বামিবত্তত্র রেমিরে।

[মহা (k) ২.৩৪.৮; ২.৩৫.৮; (হরি) ২.৩৩.৮; ২.৩৪.৮]

□ ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা হিসেবে তো বটেই, একজন মহাবীর হিসেবেও জয়দ্রথ এতটাই মর্যাদা ভোগ করতেন যে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অর্ঘ্যদানের সময় ভীষ্ম যখন নতুন যুগের নায়ক হিসেবে কৃষ্ণকে মনোনীত করলেন, তখন শিশুপাল তার তীব্র প্রতিবাদ করে প্রথিতযশা রাজাদের নাম করে, তাঁদের গুণাবলী স্মরণ

করিয়ে দিয়ে ক্রমান্বয়ে বলতে থাকেন—এমন গুণ থাকা সত্ত্বেও এঁকে বাদ দিলেন কেন, তাঁকে বাদ দিলেন কেন? শিশুপালের মুখে কীর্তিত এই সব বিখ্যাত রাজাদের মধ্যে জয়দ্রথেরও নাম আছে। শিশুপাল ভীষ্মকে বলেছেন—যাঁর বিক্রম কখনো শিথিল হয় না, যিনি বিরাট অস্ত্রবীর, সেই জয়দ্রথকে অতিক্রম করে আপনি কৃষ্ণকে অর্ঘ্যদান করলেন কী করে—

জয়দ্রথঞ্চ রাজানং কৃতাস্ত্রং দৃঢ়বিক্রমম্।

[মহা (k) ২.৪৪.১৬; (হরি) ২.৪৩.১৬]

□ মহাভারতে শিশুপালের মুখে জয়দ্রথের প্রশংসা শুনেই বোঝা যায় যে, জয়দ্রথ শিশুপালের সুহৃদ জরাসন্ধেরও বন্ধু ছিলেন। ভাগবতপুরাণের একটি অতিরিক্ত পাঠে জরাসন্ধ কর্তৃক মথুরা-অবরোধের সময় আমরা জয়দ্রথকে জরাসন্ধের মিত্রবাহিনীতে দেখতে পাচ্ছি। গোমন্ত পর্বতে অগ্নিসংযোগের সময়েও জয়দ্রথকে জরাসন্ধের সহকারী হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়।

[ভাগবত পু. (কৃষ্ণশঙ্কর শাস্ত্রী) ১০.৫০.১১নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকায় ৭নং শ্লোক; ১০.৫২.১১ শ্লোকের উত্তর পাদটীকায় ৬নং শ্লোক]

□ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা বলেই হয়তো কুরুবাড়ির যে কোনো মহোৎসবেই জয়দ্রথ ডাক পেতেন। আমরা তাই পাশাখেলার আসরেও জয়দ্রথকে উপস্থিত দেখেছি। কেননা পাশাখেলার আগের দিন যুধিষ্ঠির যখন সপরিবারে হস্তিনাপুরে এলেন, তখন দুঃশাসন জয়দ্রথেরা যুধিষ্ঠিরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন—

জয়দ্রথেন চ তথা কুরুভিশ্চাপি সর্বশঃ।

[মহা (k) ২.৫৮.২৬০; (হরি) ২.৫৫.২৫]

□ মানুষ হিসেবে জয়দ্রথের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় মহাভারতের বনপর্বে। পাণ্ডবরা যখন কাম্যক বনে, তখন একদিন তাঁরা শিকারে বেরোলেন। অরণ্য-কুটীরে দ্রৌপদী থাকলেন মহর্ষি তৃণবিন্দু এবং ধৌম্য-পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে। এই সময়ে আমরা সিন্ধু-সৌবীরের রাজা জয়দ্রথকে দেখতে পাচ্ছি—তিনি পত্নী দুঃশলা বর্তমান থাকতেও পুনরায় একটি বিবাহ করার জন্য শাল্বদেশের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। মধ্যপথে তিনি কাম্যক বনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। দ্রৌপদী তখন অরণ্যকুটীরে একা। দূর থেকে সর্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদীকে দেখে জয়দ্রথ অতীব মুগ্ধ হয়ে বন্ধু কোটিকাস্যকে পাঠালেন দ্রৌপদীর খবর নিতে। এমনও ঘোষণা করলেন যে, এই রমণীকে পেলে তাঁর আর বিবাহ করার প্রয়োজন হবে না—

বিবাহার্থো ন মে কশ্চিদ্ ইমাং প্রাপ্যাতিসুন্দরীম্।

জয়দ্রথ কোটিকাস্যকে দ্রৌপদীর সব খবর নিয়ে বুঝে আসতে বললেন। বিবাহ করতে চাইলে দ্রৌপদীর মানসিক প্রস্তুতি থেকে আরম্ভ করে দ্রৌপদীর রক্ষণাবেক্ষণে কারা আছেন সব জেনে আসতে বললেন কোটিকাস্যকে। কোটিকাস্য দ্রৌপদীর কুটীরে প্রবেশ করলেন, যেন শৃগাল প্রবেশ করল ব্যাঘ্রবধূর গুহায়। দ্রৌপদীকে তিনি অনেক প্রশ্ন করে তাঁর সর্বাঙ্গীন পরিচয় জেনে জয়দ্রথকে জানালেন সমস্ত কিছু। এটাও বললেন যে, দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের অতিপ্রিয়া সতী স্ত্রী। তুমি তাঁকে না নিয়ে সৌবীর-দেশে ফিরে চল। পাণ্ডবদের স্ত্রী বলে জানা সত্ত্বেও জয়দ্রথের মন শান্ত হল না, তাঁর দুষ্টভাব জাগ্রত হল মনে। তিনি দ্রৌপদীর সঙ্গে দেখা করার জন্য এগোলেন—

পশ্যামো দ্রৌপদীমিতি . . . দুষ্টভাবো জয়দ্রথঃ।

জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে কুশল-প্রশ্ন করতেই দ্রৌপদী স্বামীদের কুশল জানালেন এবং জয়দ্রথকে দুঃশলা-ননদিনীর স্বামী হিসেবে মর্য্যাদা দিয়ে তাঁর উপযুক্ত জলযোগের ব্যবস্থা করতে চাইলেন। জয়দ্রথ পাণ্ডবদের প্রত্যাবর্তনের আশঙ্কায় ভোজন-বিলাসের মধ্যে যেতে চাইলেন না। বরঞ্চ সরাসরি তাঁকে রথে ওঠার কুপ্রস্তাব দিলেন। জয়দ্রথ বললেন—তুমি আমার স্ত্রী হবে। এই সব সহায়-সম্পদহীন স্বামীদের নিয়ে কোন সুখে থাকবে তুমি? তুমি আমাকে বিয়ে কর, তাহলে আমার সঙ্গে সমগ্র সিন্ধু-সৌবীর দেশও পেতে পার একসঙ্গে—

ভার্যা মে ভব সুশ্রোণি ত্যক্তৈনান্ সুখমাপ্নুহি।
অখিলান্ সিন্ধুসৌবীরানাপ্নুহি ত্বং ময়া সহ॥

[মহা (k) ৩.২৬৪.৪-১৭; ৩.২৬৭.২-২০; (হরি) ৩.২২১.৪-১৭; ৩.২২০.২-১৯]

জয়দ্রথের কথা শুনে দ্রৌপদী প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন এবং জয়দ্রথকে নিজের বীর স্বামীদের ভয়ও দেখালেন সাধ্যমত। জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে গ্রাহ্যই করলেন না, বরঞ্চ তিনি যে পাণ্ডবদের থেকে গুণে-মানে-বিক্রমে অনেক বেশি

উল্লেখযোগ্য, সেটা ঘোষণা করে তিনি আবারও দ্রৌপদীকে রথে তুলতে চাইলেন। দ্রৌপদী অসামান্য একটি উত্তর দিয়ে বললেন— আমাকে তুমি দুর্বল ভাবছ নাকি, আমি কিন্তু নিজের শক্তিতেই বিশ্বাস করি—

মহাবলা কিন্বিহ দুর্বলেব/
সৌবীররাজস্য মতাহমস্মি।

তোমার আক্রমণের ভয়ে তোমার কাছে কাতরোক্তি করার লোক নই আমি। আর আমার ওপর জোর করলে পাঁচ পাণ্ডব ভাই, কৃষ্ণ, কেকয়-পাঞ্চালরা আমার পিছন পিছন আসবেন এবং আবার ঠিক এইখানেই ফিরে আসব।

জয়দ্রথ দ্রৌপদীর গর্বোক্তিগুলিকে শূন্য আড়ম্বর মনে করে তাঁর উত্তরীয় স্পর্শ করে আকর্ষণ করলেন। অমনই দ্রৌপদী তাঁকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিলেন। কিন্তু জয়দ্রথের গায়ের জোর কম নয়, তিনি জোর করেই দ্রৌপদীকে রথে তুললেন এবং দ্রৌপদীও বলপ্রয়োগ করার বৃথা চেষ্টা না করে ধৌম্য-পুরোহিতকে ঘটনা জানিয়ে জয়দ্রথের রথে উঠে পড়লেন। নিরুপায় ধৌম্য জয়দ্রথকে খানিক তিরস্কার করলেন বটে, কিন্তু বলশালী জয়দ্রথকে বাধা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। জয়দ্রথের রথ চলতে আরম্ভ করল তীরবেগে, ফলে অরণ্য-প্রকৃতির মধ্যে একটা আকস্মিক আলোড়ন তৈরি হল। দূরে শিকাররত পাণ্ডবরা তাতে সচেতন হলেন এবং তাঁরা কাম্যকবনে কুটীরের পথ ধরলেন। কুটীরে দ্রৌপদীর দাসীর কাছে তাঁরা খবর পেলেন যে, জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করে নিয়ে গেছেন। পাণ্ডবরা বিপক্ষ সৈন্যের পদচিহ্ন অনুসরণ করে এগোতে থাকলে পথে ধৌম্য-পুরোহিতের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল এবং তিনি সঠিকভাবে জয়দ্রথের গতিপথ নির্দেশ করে দিলেন। খানিক দূর এগোতেই জয়দ্রথ এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীর দেখা পেলেন পাণ্ডবরা। বীর স্বামীদের দেখেই উৎসাহিত দ্রৌপদী একে একে তাঁর স্বামীদের বীরত্ব এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আখ্যাপন করলেন জয়দ্রথের কাছে।

জয়দ্রথের সৈন্যবাহিনী অচিরেই পর্যুদস্ত হল পাণ্ডবদের হাতে। কিন্তু এই যুদ্ধের ব্যস্ততার ফাঁকে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে কোনো মতে ফেলে রেখে নিজে পালিয়ে গেলেন। অর্জুন তখন ভীমকে সঙ্গে রেখে যুধিষ্ঠির নকুল সহদেবকে ফিরে যেতে বললেন অরণ্য-কুটীরে এবং তাঁরা নিজেরা রওনা হলেন জয়দ্রথকে খুঁজে বার করার জন্য। তাঁরা যাবেন, এই সময়ে ধীর-গম্ভীর ভাবনায় যুধিষ্ঠির অর্জুনের উদ্দেশে বললেন—অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছে জয়দ্রথ, কিন্তু তবু ভগিনী দুঃশলা এবং জননী গান্ধারীর কথা ভেবে জয়দ্রথকে যেন প্রাণে মেরে ফেলো না—

দুঃশলামভিসংস্মৃত্য গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্।

দ্রৌপদী এক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠস্বামীর কথার প্রতিবাদ করেছেন, কেননা জয়দ্রথের ধর্ষণ-প্রায় তাড়নাগুলি তাঁকেই সইতে হয়েছে। তাই তিনি বললেন—আমার প্রিয় কাজটি যদি করতে চাও, তো মেরেই ফেলবে জয়দ্রথকে—

কর্তব্যঞ্চেৎ প্রিয়ং মহ্যং বধ্যঃ স পুরুষাধমঃ।

[মহা (k) ৩.২৬৮.১-২৫; ৩.২৬৯.১৬-১৭, ২৬-২৮; ৩.২৭১.৩২-৪৫; (হরি) ৩.২২২.১-২৫; ৩.২২৩.১৬-১৭, ২৬-২৮; ৩.২২৫.৩২-৪৫]

জয়দ্রথ ততক্ষণে এক ক্রোশ পথ পার হয়ে গিয়েছিলেন। ভীম-অর্জুন দ্রুতগতিতে এসে একসময় ধরে ফেললেন জয়দ্রথকে। জয়দ্রথ রথ থেকে নেমে পালাচ্ছিলেন, কিন্তু ভীম এক সময় তাঁকে ধরে ফেললেন এবং চুলের মুঠি ধরে এমন প্রহার আরম্ভ করলেন, যাতে অর্জুন এক সময় যুধিষ্ঠিরের সতর্কবার্তা শোনাতে বাধ্য হলেন ভীমকে। ভীম তবুও থামতে চান না। অবশেষে অর্জুন-যুধিষ্ঠিরকেই খানিক তিরস্কার করে অর্ধচন্দ্র বাণ দিয়ে জয়দ্রথের কেশগুচ্ছ মধ্যে মুণ্ডন করে মাথার মধ্যে পাঁচ-পাঁচটা জটা নির্মাণ করলেন। জয়দ্রথের প্রতিবাদ করার শক্তি ছিল না। ভীম তাঁকে বেঁধে নিয়ে এলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। যুধিষ্ঠির তাঁর অবস্থা দেখেই বুঝলেন—কতটা প্রহৃত হয়েছেন জয়দ্রথ। তিনি তাঁকে ছেড়ে দিতে বললেন। কিন্তু দ্রৌপদীর অনুমতি ছাড়া ভীম তাঁকে মুক্ত করতে চাইলেন না। দ্রৌপদী অবশ্য জয়দ্রথের মুণ্ডিত-মস্তকে পাঁচ ভাগে জটাগুচ্ছ দেখে মন্তব্য করলেন—এই বেচারা এখন যুধিষ্ঠিরের দাসে পরিণত হয়েছে, তুমি এবার একে ছেড়ে দিতে পারো ভীম। জয়দ্রথ মুক্ত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে যথাযোগ্য সম্মান জানালে তিনি শেষপর্যন্ত দাসত্বের দায় থেকেও মুক্তি দিলেন এবং

সতর্ক করে দিয়ে বললেন—আর কোনো দিন এমন অসভ্যতার কাজ কোরো না—

মৈবং কার্যীঃ পুনঃ ক্বচিৎ।

[মহা (k) ৩.২৭২.১-২৩; (হরি) ৩.২২৬.১-২৩]

চরম অপমানিত জয়দ্রথ সঙ্গে-সঙ্গে নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন না। তিনি নীরবে গঙ্গাদ্বারে উপস্থিত হয়ে ভগবান মহাদেবের তপস্যা আরম্ভ করলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে দেখা দিলে জয়দ্রথ বর চাইলেন যে, তিনি যেন পাঁচ ভাই পাণ্ডবকেই যুদ্ধে পরাজিত করতে পারেন। মহাদেব বললেন—অর্জুন ছাড়া অন্যান্য পাণ্ডবদের তুমি যুদ্ধে নিবারিত করতে পারবে, কিন্তু তাঁদের জয়ও করতে পারবে না, বধও করতে পারবে না।

[মহা (k) ৩.২৭২.২৪-২৯; (হরি) ৩.২২৬.২৪-২৯]

□ যুদ্ধের উদ্যোগ-পর্বের পূর্ব পর্যন্ত আর আমরা জয়দ্রথের সংবাদ তেমন পাই না। কিন্তু উদ্যোগপর্বে যখন দুর্যোধনের সামনে কৌরব পক্ষের বীর-মহাবীরদের নাম করছেন ভীষ্ম, তখন তিনি কিন্তু জয়দ্রথকে সাধারণ বীর যোদ্ধাদের চাইতে অনেক বেশি মর্য্যাদা দিয়ে বলেছেন—জয়দ্রথ এক মহাবীর, পারিভাষিক সংজ্ঞায় তিনি 'দ্বিগুণ রথ'—সিন্ধুরাজো মহারাজ মতো মে দ্বিগুণো রথঃ। বিশেষত পাণ্ডবরা তাঁকে যেভাবে লাঞ্ছিত করেছেন, সেটা তিনি স্মরণে রাখবেন বলেই তিনি অশেষ বীরত্ব প্রকট করে যুদ্ধ করবেন তোমার জন্য।

[মহা (k) ৫.১৬৪.৩০-৩৩; (হরি) ৩.১৫৪.৩০-৩৩]

□ দুর্যোধন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়দ্রথকে এক অক্ষৌহিণী সেনার অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করে যুদ্ধে বরণ করেছেন এবং যুদ্ধকালে তাঁর রথের রাজকীয় আড়ম্বর দেখা গেছে। জয়দ্রথের রথের ধ্বজায় রজতনির্মিত এক বরাহ শোভা পেত। সেই বরাহটিকে আবার সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়ায় সেটাকে দেখাত রক্তাভ সূর্যের মতো।

[মহা (k) ৫.১৫৫.৩১-৩২; ৭.৪৩.২-৪; ৭.১০৫.২০-২১; (হরি) ৫.১৪৪.৩১-৩২; ৭.৩৯.২-৪; ৭.৯০.২০-২১]

□ দুর্যোধনের তিরস্কারে খানিক উত্তেজিত হয়েই দ্রোণাচার্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে চক্রব্যূহ তৈরি করেছিলেন পাণ্ডবদের বড়ো একটা ক্ষতি করার জন্য। অভিমন্যু সেই চক্রব্যূহ ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করার পর যেমনটি কথা ছিল, সেইভাবে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ইত্যাদি পাণ্ডবপক্ষের বীর যোদ্ধারা অভিমন্যুকে সাহায্য করার জন্য চক্রব্যূহে প্রবেশ করার চেষ্টা করলেন বহুভাবে। কিন্তু চক্রব্যূহের দ্বারে দাঁড়িয়ে ছিলেন জয়দ্রথ। মহাদেবের বর লাভ করেই হোক, অথবা আপন শক্তির প্রভাবেই হোক, জয়দ্রথ সেদিন প্রত্যেক পাণ্ডব এবং অন্যান্য পাণ্ডবপক্ষপাতী বীরদের ব্যূহ-প্রবেশ রোধ করেছেন। ফলে যে পথে অভিমন্যু ব্যূহে প্রবেশ করে তাঁর কাকা-জ্যাঠাদের পথ দেখিয়ে দিয়ে গেলেন, সেই পথ পাণ্ডবদের কাছে রুদ্ধ করে দিলেন একা জয়দ্রথ—

পাণ্ডূনাং দর্শিতঃ পন্থাঃ সৈন্ধবেন নিবারিতঃ।

[মহা (k) ৭.৪৩.৬-১৯; (হরি) ৭.৩৯.৬-১৯]

□ অভিমন্যুকে সপ্তরথী মিলে যেভাবে হত্যা করতে পারলেন, তার সমস্ত দায় এসে চাপল জয়দ্রথের ওপর। কেননা তাঁর অমানুষিক ক্ষমতার জন্যই সেদিন অভিমন্যুকে কেউ সাহায্য করতে পারেননি। অভিমন্যুবধের পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা শুনে অর্জুন ক্রোধে জ্বলে উঠলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে, পরের দিন সূর্য অস্ত যাবার আগেই তিনি জয়দ্রথকে বধ করবেন এবং প্রতিজ্ঞার অন্যথা হলে নিজেই আত্মাহুতি দেবেন জ্বলন্ত অগ্নিতে। গুপ্তচরের মুখে এ-খবর পৌঁছে গেল জয়দ্রথের কাছে। জয়দ্রথ ভীষণ ভয় পেলেন এবং খানিক ভয়ে খানিক ঘৃণায় অর্জুনের কুৎসা করে দুর্যোধনকে বললেন—পাণ্ডুর স্ত্রীর গর্ভে কামুক ইন্দ্র যার জন্ম দিয়েছে, সে আমাকে বধ করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। অতএব এবার হয় আমাকে প্রাণ দিতে হবে, নয়তো আমাকে রক্ষা করার সমস্ত সুব্যবস্থা তোমাদের করতে হবে। আমি ভয়ে অবসন্ন বোধ করছি এবং পাণ্ডবদের হর্ষোল্লাস দেখে মনে হচ্ছে যেন দেবতারাও অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারবেন না। সব দেখে শুনে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের মতো আমার শরীর কাঁপছে—

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুমূর্ষোরিব পার্থিবাঃ।

জয়দ্রথের ভগ্নোৎসাহ, ভেঙে-পড়া অবস্থা দেখে দুর্যোধন তাঁকে বীরের মতো অভয় দিলেন এবং তাঁকে দ্রোণাচার্যের কাছে নিয়ে গেলে তিনি অর্জুনের বলবত্তা স্বীকার করে নিয়েও সগর্বে

বললেন—আমার বাহুরক্ষিত পুরুষের কাছে দেবতারাও ঘেঁষতে পারবে না, সেখানে কীসের ভয়? আমি এমন ব্যূহ রচনা করবো, যেখানে অর্জুন প্রবেশই করতে পারবে না। জয়দ্রথ এই সব কথায় মনে কিছু বল পেলেন এবং যুদ্ধে মনোনিবেশ করলেন।

[মহা (k) ৭.৭৪.১-৩৪; (হরি) ৭.৬৬.১-৩৩]

□ পরের দিনের যুদ্ধ-বাস্তবটা অবশ্য আগের দিনের সান্ত্বনা-বাক্যের মতো হল না। অর্জুন ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ করলেন এবং যুদ্ধস্থলে দ্রোণাচার্যকে সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে ধেয়ে গেলেন জয়দ্রথের অবস্থান খুঁজে বার করার জন্য। কৌরবপক্ষের যোদ্ধারা কেউই অর্জুনকে ছেড়ে কথা বললেন না এবং সেখানে জয়দ্রথকে বাঁচানোর চেষ্টা এতটাই ছিল যে, জয়দ্রথবধের মূল বর্ণনার আগে অধ্যায়ের পর অধ্যায় গেছে কৌরবদের সঙ্গে অর্জুনের বিপুল যুদ্ধ-বর্ণনায়। পরিশেষে সেই বিখ্যাত ঘটনা ঘটল। কৃষ্ণের মায়াজালে অথবা খুব অল্পসময়ের জন্য সূর্যগ্রহণের ফলে সূর্য অস্ত গেছে বলে মনে হল। জয়দ্রথ তখন ছয় জন মহাবীরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সত্ত্বেও আনন্দে ব্যূহগর্ভ থেকে বেরিয়ে সূর্যদর্শন করতে লাগলেন। কিংবা বলা উচিত অস্তগত সূর্য দেখে অর্জুনের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে মহানন্দ লাভ করতে লাগলেন। ঠিক তখনই কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন তাঁর অভিমন্ত্রিত বাণখানি দিয়ে জয়দ্রথের মাথা কেটে বাণগতিতেই সেই মাথা উড়িয়ে নিয়ে গেলেন সমন্তপঞ্চকের বাইরে— যেখানে জয়দ্রথের তপস্বী পিতা বৃদ্ধক্ষত্র সন্ধ্যাবন্দনায় বসেছিলেন, সেই পিতার কোলের ওপরে নিয়ে অর্জুন ফেললেন জয়দ্রথের কর্তিত মুণ্ডখানি। জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষত্র রাজাও মারা গেলেন পুত্রের সঙ্গে।

এ-ঘটনা কৃষ্ণই অর্জুনকে বলেছিলেন। বলেছিলেন যে, জয়দ্রথের পিতা তপস্যা করে মহাদেবের কাছ থেকে এই বর পেয়েছিলেন যে, কোনো মহাবীর যদি তাঁর পুত্রের মাথা কেটে মাটিতে ফেলে, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে তার মাথাটিও চৌচির হয়ে ফেটে যাবে। কৃষ্ণ এই খবর জানতেন বলেই জয়দ্রথ-বধের সময় অর্জুনকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং কৃষ্ণের নির্দেশ অনুযায়ী জয়দ্রথের মাথাটি নিয়ে অর্জুন ফেলেছেন তাঁর পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের কোলের ওপর। হঠাৎ কোথা থেকে কী এসে কোলের পড়ল ভেবে যেই না বৃদ্ধক্ষত্র উঠে দাঁড়ালেন ভয়ে, অমনই জয়দ্রথের মাথা গড়িয়ে পড়ল মাটিতে এবং অমনই বৃদ্ধক্ষত্রের মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হল।

[মহা (k) ৭.১৪৬.৩-১৩১; (হরি) ৭.১২৭.৩-৭৮]

□ মহাভারতের স্ত্রীপর্বে গান্ধারী যখন কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরদের সঙ্গে রণক্ষেত্রে মৃত বীরদের পরিদর্শন করছেন, তখন মৃত জয়দ্রথকে দেখিয়ে গান্ধারী কৃষ্ণকে বলেছেন—অর্জুন এগারো অক্ষৌহিণী সেনা ভেদ করে জয়দ্রথকে বধ করে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন। তবে আমি মনে করি, যেদিন জয়দ্রথ কাম্যক বনে এসে দ্রৌপদীকে নিয়ে পালাচ্ছিল, সেদিনই সে পাণ্ডবদের বধ্য হয়ে গেছে। পাণ্ডবরা তখন দুঃশলা ভগিনীর কথা ভেবে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল, এখন তারা দ্রৌপদীর অপমানের শোধ নিয়েছে। আজকে আমার মেয়ে দুঃশলা স্বামীর মৃত্যুতে আত্মহত্যা করতে চাইছে এবং জয়দ্রথের দেহচ্ছিন্ন মস্তকটি খুঁজে চলেছে। গান্ধারীর সমস্ত উক্তির মধ্যে এই বার্তাও আছে যে, দুঃশলা ছাড়াও জয়দ্রথের আরো কতগুলি স্ত্রী ছিলেন এবং তাঁরাই জয়দ্রথের দেহ ঘিরে বসে ছিলেন—

সংরক্ষ্যমানং ভার্যাভিরনুরক্তাভিরচ্যুত।

[মহা (k) ১১.২২.৭-১৫; (হরি) ১১.২২.৭-১৫]

জয়দ্রথ₂ যযাতির পুত্র অনুর বংশধারায় অঙ্গদেশের রাজা বৃহন্মনার পুত্র ছিলেন জয়দ্রথ। মৎস্য পুরাণ তাঁকে বৃহদ্ভানুর পুত্র বলে চিহ্নিত করেছে।

[বিষ্ণু পু. ৪.১৮.১-৩; বায়ু পু. ৯৯.১১১; ভাগবত পু. ৯.২৩.১১-১২; মৎস্য পু. ৪৮.১০১]

জয়দ্রথ₃ পুরুর বংশজাত অজমীঢ়ের বংশধারায় বৃহৎকর্মার (অন্যমতে বৃহদিষুর) পুত্র ছিলেন জয়দ্রথ। ভাগবত পুরাণ মতে ইনি বৃহৎকায়ের পুত্র ছিলেন। জয়দ্রথ বিশদ (অন্যমতে বিশ্বজিত বা অশ্বজিত) নামে এক পুত্র সন্তান লাভ করেন।

[ভাগবত পু. ৯.২১.২২-২৩; মৎস্য পু. ৪৯.৪৯; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১১]

জয়দ্রথ₄ ভবিষ্যত দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর পুত্র সন্তানদের মধ্যে একজন ছিলেন জয়দ্রথ।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৭২]

জয়ধ্বজ কার্তবীর্য্য অর্জুনের পুত্র, তালজঙ্ঘের পিতা। ইনি বৈকর্ত নামেও বিখ্যাত ছিলেন। মহারথ জয়ধ্বজ অবন্তীতে রাজত্ব করতেন বলে জানা যায়।

[ভাগবত পু. ৯.২৩.২৭-২৮; বায়ু পু. ৯৪.৫০; বিষ্ণু পু. ৪.১১.৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৪১.১৩; ৪৭.৬৬; ৬৯.৫০; মৎস্য পু. ৪৩.৪৬]

জয়ন্ত$_{1}$ দশরথের আটজন মন্ত্রীর অন্যতম। রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় ফিরে আসেন, তখন তাঁকে স্বাগত জানাতে জয়ন্তও এসেছিলেন।

[রামায়ণ ১.৭.৩; ৬.১২৭.১১; অগ্নি পু. ৬.৪]

জয়ন্ত$_{2}$ একজন দূতের নাম। এঁকে বশিষ্ঠ পাঠিয়েছিলেন ভরতের কাছে, দশরথের মৃত্যুসংবাদ জানাতে এবং তাঁকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনতে। জয়ন্ত রাজগৃহে পৌঁছলে কেকয়রাজ এঁকে স্বাগত জানান। পরে ইনি ভরতকে বশিষ্ঠ যে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, তা বলেন। তাঁর পাঠানো উপহারগুলিও হস্তান্তরিত করেন। ভরতের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর জয়ন্ত তাঁকে অতি সত্বর অযোধ্যায় ফিরে আসতে বলেন।

[রামায়ণ ২.৬৮.৫; ২.৭০.১-৫; ২.৭০.১১-১২]

জয়ন্ত$_{3}$ ইন্দ্র ও শচীর সন্তান। দেবাসুর সংগ্রামে ইনি অন্যতম দেবসেনাপতি ছিলেন। ইনি মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। শচীর পিতা, জয়ন্তর মাতামহ পুলোমা তাঁকে নিয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করেন।

কোনো দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা বা পূজার্চনা করার পূর্বে অন্যান্য দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের সঙ্গে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকেও স্মরণ করা হয়। *[রামায়ণ ৭.২৮.৬-২১; মহা (k) ১.১১৪.৪; ১.২২১.৬৫; (হরি) ১.১০৮.৪; ১.২১৪.৬৫; ভাগবত পু. ৬.১৮.৭; বায়ু পু. ৬৮.২৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬.২৪; মৎস্য পু. ২৬৬.৪৩]*

☐ রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে জয়ন্ত সম্পর্কে একটি কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোক বনে বন্দী থাকাকালীন সীতাদেবী হনুমানের কাছে কাহিনীটি বর্ণনা করে বলেছিলেন এটি অভিজ্ঞানস্বরূপ রামচন্দ্রের কাছে উল্লেখ করতে। বনবাসকালে চিত্রকূট পর্বতের নিকটে মন্দাকিনী নদীর তীরে একবার বাস করছিলেন সীতা। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত একদিন কাকের বেশ ধরে সেখানে উপস্থিত হলেন। মাংসলোভী কাকটি বিশ্রামরতা সীতাকে দেখে হঠাৎই তার চঞ্চু দিয়ে সীতার বক্ষঃস্থলে আঘাত করতে লাগলো। কিছুতেই সীতাদেবী তাকে নিবারণ করতে পারলেন না। আত্মরক্ষার জন্য তিনি বস্ত্রগ্রন্থিগুলি দৃঢ় করবার চেষ্টা করতেই সীতার বসন স্খলিত হয়। রামচন্দ্র সে দৃশ্য দেখে পরিহাস করেছিলেন। এরপর অভিমানিনী সীতা পতির কাছে এসে মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁর ঘুমের সুযোগে কাকটি আবারও সীতার বক্ষঃস্থল বিদারণ করতে থাকে। বারবার তার তীক্ষ্ণ চঞ্চু ও নখের আঘাতে সীতার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়ে রক্তপাত শুরু হয়। রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেই কাকটি প্রবল বেগে সে স্থান থেকে পালানোর চেষ্টা করে। রাম তখন একমুঠো ঘাস তুলে নিয়ে তাকে ব্রহ্মাস্ত্রে যোজন করে কাকটিকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। কাকরূপী জয়ন্ত ততক্ষণে ব্রহ্মাস্ত্রের ভয়ে ভূলোক ত্যাগ করে ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতির কাছে আশ্রয়প্রার্থী। কারো কাছে আশ্রয় না পেয়ে অবশেষে সে রামচন্দ্রের শরণে আসে। রামচন্দ্র দয়াবশতঃ তার প্রাণরক্ষা করেন। কিন্তু নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যর্থ করা স্বয়ং নিক্ষেপকর্তারও অসাধ্য। সুতরাং জয়ন্তর কোনো একটি অঙ্গ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আহত হবে নিশ্চয়ই। জয়ন্ত তখন তাঁর ডান চোখটিকে ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে উন্মুক্ত করে দেন। এরফলে তাঁর একটি চোখ চিরতরে বিনষ্ট হয়।

[রামায়ণ ৫.৩৮.১২-৩৬]

☐ বামন অবতাররূপী বিষ্ণুকে অসুররাজ বলির অনুগামীরা আক্রমণ করেছিলেন। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত সে সময় বামন দেবের নেতৃত্বে অসুর সৈন্যদের প্রতিহত করেন।

[ভাগবত পু. ৮.২১.১৬]

জয়ন্ত$_{4}$ বিষ্ণু সহস্রনামের মধ্যে একটি।

[ভাগবত পু. ১১.৫.২৬]

জয়ন্ত$_{5}$ মৎস্যদেশে রাজা বিরাটের ছত্রছায়ায় অজ্ঞাতবাসে থাকাকালীন পাণ্ডবরা প্রত্যেকে ছদ্মবেশের সঙ্গে একটি করে ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। এইসময় ভীমসেনের ছদ্মনাম হয়েছিল জয়ন্ত। *[মহা (k) ৪.৫.৩৫; ৪.২৩.১২; (হরি) ৪.৫.৩৫; ৪.২১.১২]*

জয়ন্ত$_{6}$ একজন পাঞ্চাল মহারথ যোদ্ধা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন।

[মহা (k) ৫.১৭১.১১; (হরি) ৫.১৬০.১১]

জয়ন্ত$_{7}$ একাদশ রুদ্রের অন্যতম।
[মহা (k) ১২.২০৮.২০; (হরি) ১২.২০২.২০; মৎস্য পু. ৫.৩০]

জয়ন্ত$_{8}$ দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে একজন। এই জয়ন্তর পত্নীর নাম কীর্তি।
[মহা (k) ১৩.১৫০.১৫; (হরি) ১৩.১২৮.১৪; মৎস্য পু. ২৩.২৫]

জয়ন্ত$_{9}$ দক্ষকন্যা মরুত্বতী ও ধর্মের দুই পুত্র। তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠতম পুত্র জয়ন্ত। এই জয়ন্তকে বাসুদেবের অংশ বলে ভাগবত পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে। জয়ন্ত উপেন্দ্র নামেও খ্যাত।
[ভাগবত পু. ৬.৬.৮]

জয়ন্ত$_{10}$ ঋক্ষরাজ জাম্ববানের পুত্রদের মধ্যে একজন। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩০২]*

জয়ন্ত$_{11}$ কেতুমাল বর্ষের একটি কুলপর্বত।
[বায়ু পু. ৪৪.৪]

জয়ন্ত$_{12}$ কাশীরাজকন্যা জয়ন্তীর গর্ভে বৃষ্ণিবংশীয় বৃষভের ঔরসজাত পুত্র জয়ন্ত। মৎস্য পুরাণ মতে এই জয়ন্ত অক্রূরের পিতা।
[মৎস্য পু. ৪৫.২৬-২৭]

জয়ন্ত$_{13}$ পবিত্র বারাণসী নগরীর বিনায়কগণের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৮৩.৬৩]*

জয়ন্ত$_{14}$ বিকুক্ষিপুত্র রাজা নিমির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নগরী। গৌতমাশ্রমের নিকটে নিমি এই নগরীটি স্থাপন করেছিলেন। পুরাণে জয়ন্ত নগরীটিকে অমরাবতীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
[বায়ু পু. ৮৯.২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৪.১-২]

জয়ন্ত$_{15}$ মহাদেবের সহস্রনামের মধ্যে একটি। মরুকেশ্বর তীর্থে শিব জয়ন্ত নামে পূজিত।
[স্কন্দ পু. (নাগর) ১০৯.১৩; মৎস্য পু. ৪৭.১৫২]

জয়ন্ত$_{16}$ বিক্রমাদিত্যের সমকালের একজন ব্রাহ্মণ। ইনি ইন্দ্রের তপস্যা করে স্বর্গলোক লাভ করেছিলেন। *[ভবিষ্য পু. ২.২৩.১৪-১৫]*

জয়ন্ত$_{17}$ ভগবান বিষ্ণুর একজন পার্ষদ। কলিযুগে ইনি বিষ্ণুর সভার পূর্বদ্বারে অবস্থান করেন।

পুরাণে বাসগৃহ নিমার্ণরীতি বর্ণনাকালে বাসস্থানের পূর্বদিকে জয়ন্ত নামক দ্বার প্রতিষ্ঠা করা শুভফলদায়ক। সম্ভবত বিষ্ণুর পার্ষদ জয়ন্তর নামানুসারেই এই নিমার্ণরীতির কথা বর্ণিত হয়েছে। *[মৎস্য পু. ২৫৫.৮; স্কন্দ পু. (মাহেশ্বর/কেদার) ২১.১৬৮]*

জয়ন্তী$_{1}$ একটি পবিত্র নগরী। সোমতীর্থ জয়ন্তী নগরীর অন্তর্গত। এই তীর্থে স্নান করলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করা যায়।
[মহা (k) ৩.৮৩.১৯-২০; (হরি) ৩.৬৮.১৯-২০]

জয়ন্তী$_{2}$ দেবরাজ ইন্দ্রের কন্যা। ঋষভদেবের পত্নী। জয়ন্তীর গর্ভে ঋষভদেবের ঔরসে একশোটি দেবতুল্য পুত্রের জন্ম হয়েছিল। জয়ন্তীর জ্যেষ্ঠতম পুত্র ভরত, যাঁর নামে ভারতবর্ষের নামকরণ হয়েছে। *[ভাগবত পু. ৫.৪.৮-৯]*

জয়ন্তী$_{3}$ ইন্দ্রের কন্যা। তবে ঋষভদেবের পত্নী জয়ন্তী এবং ইনি কখনওই অভিন্ন ব্যক্তি হতে পারেন না। লক্ষ্য রাখতে হবে, ইন্দ্রের কন্যা জয়ন্তী দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের পত্নী হিসেবেই বেশি বিখ্যাত।

ধূম্রব্রত দেবাসুর সংগ্রামের সময় নারায়ণ যুদ্ধকালে মহর্ষি ভৃগুর পত্নীকে বধ করেছিলেন অসুরদের আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে। ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য সেসময় অসুরকুলের হিতার্থে মহাদেবের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করছিলেন। মহর্ষি ভৃগু সঞ্জীবনী মন্ত্রের বলে পত্নীর জীবন দান করেন দেবরাজ ইন্দ্রের সামনেই। ইন্দ্র ভৃগুর তপস্যার বল দেখে ভীত হয়ে নিজকন্যা জয়ন্তীকে তপস্যারত শুক্রাচার্যের কাছে পাঠান তাঁর তপস্যাভঙ্গ করার জন্য। আসলে ইন্দ্র সম্যকভাবে বুঝেছিলেন যে, শুক্রাচার্য তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করলে অসুরগণ দেবতাদের অবধ্য হয়ে উঠবেন।

জয়ন্তী শুক্রাচার্যের তপঃস্থলে পৌঁছে দেখেন শুক্রাচার্য গভীর তপে মগ্ন। তপঃপ্রভাবে তাঁর শরীর কৃশতা প্রাপ্ত হয়েছে, কণ্ঠাধার থেকে ক্রমাগত ধূমকণা নির্গত হয়ে চলেছে। জয়ন্তী পিতার নির্দেশানুসারে শুক্রাচার্যের সেবা করতে লাগলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি থেকে জয়ন্তীই শুক্রাচার্যকে তপস্যাকালে রক্ষা করেছিলেন। এইভাবে সহস্র বছর অতিকান্ত হলে শুক্রাচার্যের তপস্যা শেষ হয়। মহাদেব তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভৃগুপুত্রকে এককভাবে দেবতাদের পরাস্ত করার বর দান করেন। শিবস্তুতি সমাধা করার পর শুক্রাচার্য জয়ন্তীকে প্রথমবার লক্ষ্য করেন। তাঁর সেবায় তুষ্ট হয়ে ভৃগুনন্দন জয়ন্তীর পরিচয় এবং প্রার্থনা বিষয়ে বিশদে জানতে চান। দিব্যনেত্রে তিনি জানতে পারেন জয়ন্তী দশ বছর শুক্রাচার্যের সান্নিধ্যপ্রার্থী। শুক্রাচার্য অবিলম্বে জয়ন্তীকে বিবাহ করে দশ বছর তাঁর সঙ্গে বাস করেছিলেন। শুক্রাচার্য ও জয়ন্তীর কন্যা হলেন দেবযানী।

জয়ন্তীর সংসর্গে শুক্রাচার্য মোহাবিষ্টের ন্যায় দশ বছর অতিক্রম করেন। জয়ন্তীর মায়ায় সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত শুক্রাচার্যের সন্ধান অসুরগণ কোনভাবেই পাচ্ছিলেন না। এই সুযোগে দেবগুরু বৃহস্পতি শুক্রাচার্যের ছদ্মবেশে অসুরদের কাছে উপস্থিত হন। অসুরদের বিভ্রান্ত করে তাঁদের ধ্বংস তরান্বিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ইতি মধ্যে জয়ন্তীর প্রার্থিত দশবছর অতিক্রান্ত হওয়ায় শুক্রাচার্য পত্নীর কাছে বিদায় চান। জয়ন্তীও তাঁর পথরোধ না করে ভক্তগণকে দর্শন দেওয়ার পরামর্শ দেন। এরপর শুক্রাচার্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অসুরদের বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেন। *[মৎস্য পু. ৪৭.১১৪-১৮৮; বায়ু পু. ১.১৫৩; ৯৭.১৩০-২০২; ৯৮.১-২২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭২.১৫০-১৫৬; ২.৭৩.৩-২১]*

জয়ন্তী৪ দেবী সতী হস্তিনাপুরে জয়ন্তী নামে পূজিত হতেন। ইনি দেবী শক্তির অন্যতম রূপ।

[মৎস্য পু. ১৩.২৮; দেবীভাগবত পু. ৭.৩০.৫৮; অগ্নি পু. ৫২.৮; লিঙ্গ পু. ২.২৭.৮৭]

জয়ন্তী৫ অন্ধকাসুর বধের সময় মহাদেবের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি হয়েছিল। জয়ন্তী তাঁদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৭৯.১৩]*

জয়ন্তী৬ রাত্রির অন্যতম একটি মুহূর্ত। বাসুদেব কৃষ্ণ এই বিশেষ মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[বায়ু পু. ৯৬.২০১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.২০৫]

জয়ন্তী৭ মৎস্য পুরাণ মতে, বৃষ্ণিবংশীয় অক্রুরের পিতার নাম জয়ন্ত। এই জয়ন্তর মাতার নাম জয়ন্তী। ইনি কাশীরাজার কন্যা এবং বৃষভের পত্নী।

[মৎস্য পু. ৪৫.২৬]

জয়ন্তী৮ মহর্ষি গৌতম ও অহল্যার চার কন্যার মধ্যে একজন। জয়ন্তীর অপর তিন ভগিনীর নাম জয়া, বিজয়া ও অপরাজিতা।

দক্ষকন্যা সতী সম্পর্কে জয়ন্তীর মাসি। তিনি পরবর্তীকালে শিব-পত্নী সতীর সখী রূপে পুরাণে বর্ণিত। বামন পুরাণের বর্ণনায় জয়ন্তীকে সতীর পরিচর্যা করতে দেখা যায়।

অন্ধকাসুর বধের সময় মহাদেব যুদ্ধ শুরুর পূর্বে পার্বতীর যে সকল সখীদের উপর তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে জয়ন্তী অন্যতম।

[বামন পু. ৪.৩-৪; ৫৪.১২-১৩; ৬৮.৯-১০]

জয়প্রিয়া স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.১২; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ১২ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

জয়বর্মা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষে যোগদানকারী একজন যোদ্ধা। দুর্যোধনের অনুরোধে শকুনি যখন অর্জুনকে আক্রমণ করেন, সেই সময় শকুনিকে রক্ষা করার জন্য যেসব যোদ্ধা তাঁর পিছনে ছিলেন, জয়বর্মা তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৭.১৫৬.১২৬; (হরি) ৭.১৩৬.১১৯]

জয়বাহ মণিবর যক্ষের ঔরসে দেবজনীর গর্ভজাত পুত্রসন্তানদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১২৮]

জয়রাত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষে অংশগ্রহণকারী একজন যোদ্ধা। ঘটোৎকচ বধের দিনের যুদ্ধে ইনি ভীমসেনের হাতে নিহত হন।

[মহা (k) ৭.১৫৫.২৭-২৮; (হরি) ৭.১৩৫.২৭-২৮]

জয়সেন১ চন্দ্র বংশীয় রাজা আয়ুর পুত্র এবং নহুষের ভ্রাতা ক্ষত্রবৃদ্ধ। এই ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধারায় হীন (মতান্তরে অদীন)-এর পুত্রের নাম মহারথ জয় (মহান্তরে সংহৃতি)।

[ভাগবত পু. ৯.১৭.১৭; বিষ্ণু পু. ৪.৯.৮]

জয়সেন২ মগধরাজ জরাসন্ধের বংশধারায় সার্বভৌমের পুত্র জয়সেন। জয়সেনের পুত্রের নাম রাধিক। *[ভাগবত পু. ৯.২২.১০]*

জয়সেন৩ কুরুবংশীয় পরিক্ষিতের বংশধারায় সার্বভৌমের পুত্র জয়সেন। এই জয়সেনের সঙ্গে বসুদেবের ভগিনী রাজাধিদেবীর বিবাহ হয়েছিল। জয়সেন ও রাজাধিদেবীর দুই পুত্র হলেন মহাবীর বিন্দ ও অনুবিন্দ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পুরাণে একাধিক সার্বভৌমপুত্র জয়সেনের উল্লেখ পাওয়া যায়। সে কারণে জয়সেনের পরিচয় নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। *[ভাগবত পু. ৯.২৪.৩৯; বিষ্ণু পু. ৪.২০.৩]*

জয়সেন৪ পুরাকালে কাশীদেশে জয়সেন নামে একজন রাজা ছিলেন দেবী লক্ষ্মীর অংশজাত মদ্ররাজ বিষ্কসেনের কন্যা পদ্মাবতীকে তিনি পত্নী রূপে লাভ করেন।

[স্কন্দ পু. (নাগরখণ্ড) ১৭৭.১৬-১৯]

জয়া১ দক্ষ প্রজাপতির কন্যা জয়া। ইনি অসুর নিধনের উদ্দেশে পঞ্চাশটি মহারথ পুত্র প্রসবের

বর লাভ করেছিলেন। রামায়ণের আদিকাণ্ডে বলা হয়েছে যে, জয়ার ভগিনী সুপ্রভাও অসুরবধের জন্য সংহার নামে পাঁচশো অস্ত্র প্রসব করেছিলেন। *[রামায়ণ ১.২২.১৫-১৬]*

জয়া২ অন্ধকাসুর বধের সময় মহাদেবের দেহ থেকে বহু মাতৃকার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সব মাতৃকাগণের মধ্যে জয়া একজন।

[মৎস্য পু. ১৭৯.১৩]

জয়া৩ দেবী সতী বরাহ শৈলে জয়া নামে পূজিতা। ইনি দেবী শক্তির অন্যতম রূপ।

[মৎস্য পু. ১৩.৩২; ২.৬০.১৯;
হরিবংশ পু. ২.৩.৪; দেবীভাগবত পু. ১২.১২.৩৫]

জয়া৪ দেবী পার্বতীর সখীদের মধ্যে অন্যতম। মৎস্য পুরাণে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি বর্ণনাকালে বলা হয়েছে যে, মূর্তির উভয় পার্শ্বে পার্বতীর সখী জয়ার অবয়ব স্থাপন করা হবে।

[মৎস্য পু. ৬৩.২১; অগ্নি পু. ১৭৮.৩;
স্কন্দ পু. (কাশীখণ্ড) ৭২.৫৭;
দেবীভাগবত পু. ৭.৩০.৬২;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.৪০.৩৩]

□ ব্রহ্মপুরাণে মহর্ষি গৌতম কর্তৃক মর্ত্যে গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে পার্বতী-সখী জয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ব্রহ্মার কমণ্ডলু হতে নির্গতা গঙ্গা পার্বতীর মতোই মহাদেবের প্রিয় পত্নী। গঙ্গাদেবী সর্বদা স্বামী শিবের জটাজুটে অবস্থান করেন। তিনি শিবের একান্ত অনুরক্তা এবং মহাদেবও গঙ্গার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট। নিরূপায় পার্বতী স্বামীর উপর অভিমান করে সব মায়া ত্যাগ করে হিমালয়ে তপস্যা করতে যাবেন বলে স্থির করলেন। পুত্র বিনায়ক-গনেশ মায়ের দুঃখ সহ্য করতে পারলেন না। তিনি পার্বতীকে খানিক প্রবোধ দিয়ে স্কন্দ-কার্তিকেয় ও মাতৃসখী জয়ার সঙ্গে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিষয়ে মন্ত্রণা, করবেন বলে স্থির করেন। ঠিক এই সময় পৃথিবীতে চতুর্দশ বর্ষব্যাপী এক ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি দেখা দিল। জলাভাবে পৃথিবী প্রায় ধ্বংস হওয়ার অবস্থা। কিন্তু মহর্ষি গৌতম প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণ হারালেন না। নারদ সে সময় ব্রহ্মগিরিতে এক তপস্যার আয়োজন করেন। মহর্ষি গৌতমও সংবাদ পেয়ে ব্রহ্মগিরিতে উপস্থিত হন এবং সেখানেই আশ্রম স্থাপন করে বাস করতে থাকেন। অন্যান্য ঋষিরাও গৌতমের আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। প্রকৃতির প্রকোপ থেকে জীবনরক্ষার সেটাই একমাত্র উপায়। বিনায়ক-গণেশও ব্রাহ্মণের রূপ ধরে জয়াকে সঙ্গে নিয়ে গৌতমাশ্রমে উপস্থিত হলেন। কারণ গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়নের ক্ষমতা একমাত্র প্রভাবশালী মহর্ষি গৌতমেরই রয়েছে।

ব্রাহ্মণবেশী বিনায়ক কিছুকাল আশ্রমবাসের পর সমবেত অন্যান্য ব্রাহ্মণদের নিয়ে অন্যত্র যাওয়ার অনুমতি চাইলেন গৌতমের কাছে। গৌতম প্রীতিবিশতঃ তাঁদের আশ্রম ত্যাগ করতে দিলেন না। বিনায়ক ঋষির অনুগ্রহ বিষয়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যুক্তি-তর্ক শুরু করলেন। স্থির হল যে, মহর্ষি গৌতমের মাধ্যমে বিনায়ক এমন কার্য সমাধা করবেন যার ফলে পৃথিবীর বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হয়। গণেশ মায়ের অভিপ্রায় স্মরণ করে জয়াকে নির্দেশ দেন গোপনে গো-রূপ ধারণ করে গৌতম ঋষির সম্মুখেই তাঁর আশ্রম সংলগ্ন ক্ষেতে শালিধান ভক্ষণ ও নষ্ট করতে হবে। গৌতম তাঁকে বিন্দুমাত্র তাড়না করলে আর্তস্বরে তিনি যেন মাটিতে জীবন্মৃতের মত পড়ে থাকেন। গো-রূপধারী জয়া অবিলম্বেই নির্দেশ মতো কাজ করলেন। মহর্ষি গৌতম কর্তৃক ধাবিত গাভীটিকে মৃত ভেবে ব্রাহ্মণরা তৎক্ষণাৎ গোহত্যার পাপের কারণে তপার্জিত ক্ষমতা ক্ষয়ের ভয়ে আশ্রম ত্যাগে উদ্যোগী হলেন। গৌতম জীবন্মৃত গাভীটির নিষ্কৃতির উপায় অনুসন্ধানে বিনায়কের শরণাপন্ন হলেন। গণেশ তখন তাঁকে বললেন, মহাদেবের জটাজুট থেকে তপস্যাবলে গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করে গাভীটিকে পবিত্র জলে অভিষিক্ত করলেই তাঁর নিষ্কৃতি ঘটবে। মহর্ষি গৌতম শেষ পর্যন্ত কঠোর তপস্যার মাধ্যমে গৌতমী গঙ্গার মর্ত্যে আগমন নিশ্চিত করেন।

[ব্রহ্ম পু. ৭৪ অধ্যায় সম্পূর্ণ]

□ কোনো দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপন করে পূজা করার পূর্বে যেসব অন্যান্য দেবতাদের আরাধনা করা হয় তাঁদের মধ্যে জয়া একজন।

[অগ্নি পু. ২১.১৫; ১৪৮.৩; ৩০৯.১০; ১৪৬.২১]

জয়া৫ বাসুদেব কৃষ্ণের ষোলো হাজার পত্নীর মধ্যে একজন। *[অগ্নি পু. ২৭৬.৪]*

জয়া৬ গোলোকে সুরভী-পুত্র নীলের সঙ্গে বিচরণকারী গাভীদের মধ্যে একটি।

[স্কন্দ পু. (নাগরখণ্ড) ২৫৭.৪৫]

জয়া$_{৭}$ জয়াভিষেকের গোমুখী ব্যূহের দ্বিতীয় আবরণে অবস্থিত শক্তিগুলির মধ্যে একটি।
[লিঙ্গ পু. ২.২৭.৯২]

জয়া$_{৮}$ নৃসিংহদেবের শরীর থেকে উদ্ভূত মাতৃকাগণের মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৭৯.৭১]*

জয়া$_{৯}$ পুরাকালে আর্ষ্টিসেন নামে রাজা গঙ্গার উত্তর তীরে রাজত্ব করতেন। এঁর পত্নীর নাম ছিল জয়া। পুরাণে জয়াকে সাক্ষাৎ লক্ষীস্বরূপা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *[ব্রহ্ম পু. ১২৭.২]*

জয়া$_{১০}$ গায়ত্রীর চতুর্বিংশতি শক্তির অন্যতম।
[দেবীভাগবত পু. ১২.২.২-৩]

জয়ানীক$_{১}$ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানকারী একজন পাঞ্চাল যোদ্ধা। ইনি দ্রুপদের পুত্র ছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্রুপদের পুত্র সুরথ অশ্বত্থামার হাতে নিহত হলে জয়ানীক প্রভৃতি সুরথের কনিষ্ঠ ভ্রাতারা অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে জয়ানীক অশ্বত্থামার হাতে নিহত হন।
[মহা (k) ৭.১৫৬.১৮১; (হরি) ৭.১৩৬.১৭৪]

জয়ানীক$_{২}$ মৎস্যদেশের রাজা বিরাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মহাভারতের দ্রোণপর্বে কৃপাচার্য বিরাটের অন্যান্য ভ্রাতাদের সঙ্গে এঁর বীরত্বেরও প্রশংসা করেছেন।
[মহা (k) ৭.১৫৮.৪২; (হরি) ৭.১৩৮.৩৯]

জয়াবতী স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।
[মহা (k) ৯.৪৬.৪; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ৪ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

জয়াশ্ব$_{১}$ মৎস্য দেশের রাজা বিরাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দ্রোণপর্বে কৃপাচার্য বিরাট রাজা এবং তাঁর ভাইদের বীরত্বের প্রশংসা করতে গিয়ে এঁর নাম উল্লেখ করেছেন।
[মহা (k) ৭.১৫৮.৪২; (হরি) ৭.১৩৮.৩৯]

জয়াশ্ব$_{২}$ দ্রুপদ রাজার পুত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যেসব পাঞ্চাল যোদ্ধা অবস্থান করছিলেন জয়াশ্ব তাঁদের মধ্যে একজন। দ্রুপদ-পুত্র সুরথ অশ্বত্থামার হাতে নিহত হলে জয়াশ্ব প্রভৃতি সুরথের কনিষ্ঠ ভ্রাতারা অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে অশ্বত্থামার হাতে জয়াশ্ব নিহত হন।
[মহা (k) ৭.১৫৬.১৮১; (হরি) ৭.১৩৬.১৭৪]

জর$_{১}$ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে যাম একটি। যাম গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে জর অন্যতম।
[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৩.৯৫]

জর$_{২}$ একজন গন্ধর্বরাজ। কৈলাস শৃঙ্গের পূর্বাংশে দশটি গন্ধর্ব শাসিত নগরী অবস্থিত। জর সেগুলির মধ্যে একটি নগরীর শাসক। *[বায়ু পু. ৪১.২১]*

জর$_{৩}$ *[দ্র. জরা]*

জর$_{৪}$ শাক্তদেবগণের মধ্যে একজন।
[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৩.৯৬]

জরৎকারু$_{১}$ আস্তীক মুনির পিতা এবং জরৎকারু নাম্নী নাগকন্যার স্বামী মহর্ষি জরৎকারু ছিলেন কঠোর তপস্বী। প্রথম জীবনে তিনি স্থির করেছিলেন যে, শুধুমাত্র ব্রহ্মচর্য্য পালন করেই জীবন অতিবাহিত করবেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত জরৎকারু মত পরিবর্তন করেন তাঁর পূর্বপুরুষদের স্বর্গলাভের পথ প্রশস্ত করার জন্য। শুধুমাত্র বায়ুভক্ষণ করে এবং পরিব্রাজকের মতো পর্যটন করে জরৎকারু দিন অতিবাহিত করছিলেন। মহাভারতের কবি বলেছেন, 'জরৎ' শব্দের অর্থ 'ক্ষয়' এবং 'কারু' শব্দের অর্থ—'দারুণ'। অর্থাৎ কঠোর তপস্যার দ্বারা যৌবনকালে শরীরের দৃঢ়তা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল বলেই হয়তো এই মহর্ষির নাম 'জরৎকারু' হয়েছে।

একদিন জরৎকারু লক্ষ্য করলেন যে, একটি গর্তের মধ্যে ঘাসজাতীয় গাছের মূলগুলি ঝুলছে এবং তার একটাই মাত্র শেকড় আছে। সেই শেকড়টাকে আস্তে আস্তে একটা ইঁদুর কেটে ফেলছে। অথচ ওই একটি মাত্র শেকড়ের সাহায্যেই কয়েকটি মানুষ উল্টোভাবে (মাথা নীচে, পা উপরে) ঝুলছে। এই দৃশ্য দেখে কৌতূহলী হয়ে জরৎকারু তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁরা কারা এবং কেন ওইরকম উল্টোভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় আছেন। জরৎকারু তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে জানতে পারেন যে, তাঁদের বংশের একমাত্র সন্তান জরৎকারু শুধুমাত্র তপস্যা অবলম্বন করে থাকার জন্য বংশলোপের আশঙ্কায় তাঁরা পাপীর মতো অবস্থান করছেন। আর ওই গর্তবাসী ইঁদুরটি হল সময়। বংশ লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুরটি যেই শেকড়টিকে সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করে দেবে, তখনই তাঁরা নরকে পতিত হবেন। তাঁদের বংশের একমাত্র সন্তান জরৎকারু পুত্র উৎপাদনের মাধ্যমে বংশরক্ষা করলে তবেই তাঁরা স্বর্গলাভ করতে পারবেন। সব কথা শুনে জরৎকারু পূর্বপুরুষদের কাছে

নিজের পরিচয় দেন। জরৎকারুকে তাঁর পিতৃপুরুষরা বিবাহের আদেশ করেন। তখন জরৎকারুও বলেন—যে কন্যার নাম, আমার নামের সমান হবে, এবং যাকে নিঃস্বার্থভাবে দান করা হবে, সেই কন্যাকেই আমি স্ত্রী রূপে গ্রহণ করব। এরপর জরৎকারু মুনি ভার্য্যালাভের জন্য সর্বত্র ভ্রমণ করতে থাকলেন। ইতোমধ্যে সর্পমাতা কদ্রুর অভিশাপ থেকে নাগেরা পরিত্রাণের পথ খুঁজছিলেন। ভগবান ব্রহ্মা নাগেদের এই শাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা হল—বাসুকি নাগের ভগিনী সমনাম্নী জরৎকারুর সঙ্গে এই মহর্ষি জরৎকারুর বিবাহ দিলে তাঁদের পুত্র আস্তীক মাতৃকুলের শাপমোচন করবেন এবং পিতৃকুলের বংশও রক্ষা করবেন। এলাপত্র নাগ যথাসময়ে বাসুকিকে ভগবান ব্রহ্মার নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিলেন। বাসুকিও তৎক্ষণাৎ জরৎকারুর অন্বেষণের জন্য অন্যান্য নাগদের নিযুক্ত করলেন। এদিকে মহর্ষি জরৎকারু পূর্বপুরুষদের দুঃখের কথা স্মরণ করে নিজের মনেই তিনি বলতে লাগলেন—'আমি কন্যা প্রার্থনা করি।' সেইসময় যেসব নাগ মহর্ষি জরৎকারুর সন্ধান করছিলেন, তাঁরা নাগরাজ বাসুকির কাছে গিয়ে জরৎকারুর কথা বললেন। বাসুকি তাঁর ভগিনী জরৎকারুকে সঙ্গে নিয়ে মহর্ষির সামনে উপস্থিত হলেন। প্রথমে জরৎকারু বাসুকির ভগিনীকে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলেন না। কিন্তু পরে মহর্ষি জরৎকারু কন্যার নাম জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন—আমি এর ভরণ পোষণ করতে পারব না। নাগরাজ বাসুকি মহর্ষিকে জানান যে, কন্যার নাম তাঁরই নামের অনুরূপ। বাসুকি আরও বলেন—ইনি আমার ভগিনী। আপনার জন্য এঁকে দীর্ঘদিন ধরে রক্ষা করছি। এখন আপনি আমার ভগিনীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করুন। একথা বলে বাসুকি জরৎকারু মুনির হাতে নিজের ভগিনী জরৎকারুকে দান করলেন।

[মহা (k) ১.১৩.৯-৩১; ১.১৪.১-৭; ১.৪৫-৪৬ অধ্যায়; ১.৪৭.১-৫; (হরি) ১.১০.৯-৩১; ১.১১.১-৭; ১.৪০-৪১ অধ্যায়; ১.৪২.১-৫]

□ বিবাহের কিছুদিন পর জরৎকারু মুনি বাসুকির ভগিনী জরৎকারুকে পরিত্যাগ করে চলে যান। অবশ্য গৃহত্যাগের অনেক আগে জরৎকারু তাঁর পত্নীকে বলেছিলেন—"তুমি আমার অপ্রিয় কোনো কাজ করলে কিংবা অপ্রিয় কথা বললে আমি তোমাকে এবং তোমার বাসগৃহকে পরিত্যাগ করব।"

একদিন জরৎকারু মুনি তাঁর পত্নীর কোলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলেন। সূর্যাস্তের সময় হয়ে আসছিল। এদিকে জরৎকারু দেবী ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন এই ভেবে যে, সন্ধ্যার সময় অতিক্রান্ত হলে তাঁর স্বামী সন্ধ্যাবন্দনা করতে পারবেন না এবং তাতে তাঁর অধর্ম হবে। আবার তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছেন, তাঁকে জাগালেও মহর্ষির ক্রোধ উৎপন্ন হবে। অনেক ভাবনা-চিন্তা করে জরৎকারু দেবী ধর্মলোপের ভাবনাটাই বেশি করে ভাবলেন এবং স্বামীকে বললেন—মহর্ষি! সূর্য অস্ত যাচ্ছে, আপনি এবার উঠুন। হাত-মুখ ধুয়ে সন্ধ্যা-বন্দনা করুন। অন্যান্য ঋষিরাও অগ্নিহোত্র শুরু করে দিয়েছেন। এইভাবে মহর্ষিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করাতে জরৎকারু মুনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি তাঁর পত্নীকে বললেন—তুমি আমার নিদ্রাভঙ্গ করে আমাকে অবজ্ঞা করেছ। আমি ঘুমিয়ে থাকাকালীন সূর্যের অস্ত যাবার ক্ষমতাই নেই। এখানে তোমার অবজ্ঞার পাত্র হয়ে আমি আর থাকতে পারি না।

স্বামীর কথা শুনে জরৎকারু দেবী তাঁর জ্ঞাতি ও আত্মীয়-পরিজনদের জন্য ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়লে, জরৎকারু মুনি তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, মহাধার্মিক, বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী এবং তেজস্বী কোনো ঋষি তাঁর গর্ভে আছেন।

[মহা (k) ১.৪৭.১৫-৪২; (হরি) ১.৪২.১৫-৪২]

□ মহর্ষি জরৎকারু, জরৎকারু দেবীর গর্ভস্থ বালকটিকে লক্ষ্য করে 'অস্তি' এই কথা বলে বনে গিয়েছিলেন, সেইকারণে বালকটি 'আস্তীক' নামেই বিখ্যাত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে মহর্ষি জরৎকারু ও জরৎকারু দেবীর এই পুত্র 'আস্তীক'ই পিতৃ ও মাতৃকুলের আশঙ্কা দূর করেন।

[মহা (k) ১.৪৮.১৭-২১; (হরি) ১.৪৩.১৭-২১]

জরৎকারু২ বাসুকি নাগের ভগিনী জরৎকারু কিংবা জরৎকার্বী মহর্ষি কশ্যপের মেয়ে এবং বাসুকি নাগের ভগিনী বলেই পরবর্তীকালে মনসা বলে আখ্যাত হয়েছেন। তিনি জরৎকারু মুনির পত্নী এবং আস্তীক মুনির মাতা। *[দ্র. জরৎকারু১]*

জরন্ধম কৃষ্ণের ঔরসে সত্যভামার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন। মৎস্য পুরাণে ইনি জলন্ধম নামে এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে জরন্ধর নামে সম্বোধিত হয়েছেন। *[বায়ু পু. ৯৬.২৩৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.২৪৭; মৎস্য পু. ৪৭.১৭]*

জরন্ধমা শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে সত্যভামার গর্ভজাত কন্যাসন্তানদের মধ্যে একজন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ তাঁকে চিহ্নিত করেছে জরন্ধরা নামে।

[বায়ু পু. ৯৬.২৪০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.২৪৮]

জরন্ধর *[দ্র. জরন্ধম]*

জরন্ধরা *[দ্র. জরন্ধমা]*

জরা১ মগধবাসী এক রাক্ষসী জরা রাক্ষসীর কারণেই মগধরাজ বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধ নামে পরিচিত হন।

পুরাকালে মগধ রাজ্যে রাজত্ব করতেন উপরিচরবসুর পুত্র বৃহদ্রথ। অতুল সম্পদের অধিকারী বৃহদ্রথ কাশীরাজের দুই যমজ কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। বিষয়কার্যে সদা যত্নবান বৃহদ্রথের জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হল রাজকার্যে। গতযৌবন রাজা বংশ রক্ষাকারী সন্তানের অভাবে মনোকষ্ট পেতে লাগলেন। রাজা বহু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করলেন কিন্তু তাঁর পুত্রাকাঙ্ক্ষা কিছুতেই চরিতার্থ হয় না। হতাশ রাজা মহর্ষি কাক্ষীবানের পুত্র চণ্ডকৌশিক মুনির দর্শনে সপরিবারে গমন করলেন। বৃহদ্রথ ও তাঁর দুই রানীর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে ঋষি চণ্ডকৌশিক তাঁদের ইচ্ছামত বর প্রার্থনা করতে বলেন। দুঃখী রাজা ঋষিকে তাঁর পুত্রহীনতার কথা জানান। চণ্ডকৌশিক একটি মন্ত্রপূতঃ ফল বৃহদ্রথকে দিয়ে বললেন—এই ফলটি খেলেই রাজমহিষী সন্তানলাভ করবেন এবং রাজার দুঃখ দূর হবে। রাজা ফলটি দুইভাগ করে দুই রানির হাতে তুলে দিলেন। সময় উপস্থিত হলে দুজনেই গর্ভধারণ করলেন। এর ঠিক দশ মাস পর রাজার দুই পত্নী দুইটি পৃথক শরীরখণ্ড প্রসব করেন। প্রত্যেকটি খণ্ডই একটি করে চোখ, হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গ ছিল। শরীর খণ্ড দুটি দেখে দুই রানীই ভয়ে-আশঙ্কায় সে দুটিকে পরিত্যাগ করবেন বলে স্থির করলেন। রাজমহিষীদের নির্দেশে ধাত্রীরা শরীর খণ্ড দুটি কাপড়ে মুড়ে সকলের অলক্ষ্যে পথের ধারে ফেলে চলে এলেন। সেই সময় সেখানে উপস্থিত হলেন রক্তমাংসভোজী জরা নামে এক রাক্ষসী। শরীর খণ্ড দুটিকে নিজের হাতে নিয়ে সে দুটি অর্ধাংশকে সংযোজন করলো। সংযোজন করা মাত্রই শরীর খণ্ডদুটি পূর্ণাঙ্গ শিশুর আকার ধারণ করলো। জরা রাক্ষসী বিস্ফারিত চোখে বীর শিশুটির দিকে চেয়ে রইলো। শিশুটি ততক্ষণে ডান হাতের মুঠো মুখে ঢুকিয়ে জলদ-গম্ভীর স্বরে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। সেই শব্দ শুনে রাজা বৃহদ্রথ ও তাঁর দুই রানী বাইরে বের হয়ে এলেন। রাজমহিষীদের চেহারা দেখেই জরা বুঝতে পারলো এই দুই খণ্ড সংযুক্ত করে যে শিশু জন্মেছে। সেই খণ্ড দুটি রানীদেরই গর্ভজাত সন্তান। সে বৃহদ্রথের উদ্দেশে জানালো যে, মহাত্মা কিন্তু পুত্রহীন রাজার এই সন্তানটিকে সে হত্যা করতে অপারগ। তারপর রানীদের দুটি শরীর খণ্ড প্রসব এবং পরিত্যাগের কাহিনী বৃহদ্রথের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করে জরা সদ্যজাত বজ্রতুল্য শিশু পুত্রটিকে রাজার কাছে দান করেন। কাশীরাজ কন্যারা তৎক্ষণাৎ শিশুটিকে গ্রহণ করলেন। কৃতজ্ঞচিত্তে বৃহদ্রথ জরার কাছে তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানতে চাইলেন। এইসময় বৃহদ্রথ জরাকে 'পদ্মকোষবর্ণা' বলে সম্বোধন করেছেন। তাঁর মনে হয়েছিল জরা রাক্ষসী নন, কোনো দেবী হবেন রাক্ষসীদের সম্পর্কে এধরনের বিশেষণ ব্যবহার খুব একটা চোখে পড়ে না। সম্ভবত পুত্রলাভে অভিভূত হয়েই বৃহদ্রথ রাক্ষসী জরাকেও পদ্মফুলের বর্ণ সমন্বিতা বলে দেখেছেন। তখন জরা নিজেকে ইচ্ছাধারী রাক্ষসী বলে পরিচয় দেন। তিনি বলেন বৃহদ্রথের গৃহেই তাঁর বাস। এ রাজ্যের প্রতিটি গৃহস্থ ঘরেই রাক্ষসীরা গৃহদেবীর মত পূজিত হন। জরাও বৃহদ্রথের গৃহে সেভাবেই পূজিত হয়েছেন।

জরার বর্ণনা থেকে আরও জানা যায় যে, মগধের সমস্ত পুত্রবতী যুবতীরা রাক্ষসী-গৃহদেবীর চিত্র ঘরের দেওয়ালে এঁকে রাখে। এ প্রথা অমান্য করলে বিপদ অনিবার্য। সে কারণেই রাক্ষসী জরার চিত্রও গর্ভবতী বৃহদ্রথের দুই পত্নীর ঘরে আঁকা ছিল। প্রতিদিন সে চিত্র বিশেষভাবে পূজিতও হয়েছে। জরা বৃহদ্রথের গৃহে বিশেষভাবে আরাধিত হয়ে যারপরনাই সন্তুষ্ট। সেজন্যই তিনি বৃহদ্রথ পুত্রের জীবন দান করেছেন। তবে দৈববশতই দুটি শরীরখণ্ড

সংযোজন করতে তিনি সফল হয়েছেন— একথাও জরার মুখে শোনা যায়।

জরা এবার সদর্পে ঘোষণা করলেন যে তিনি সুমেরু পর্বত গিলে ফেলতেও সক্ষম ফলে বালকটির প্রাণহরণ শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। শুধুমাত্র আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়েই তিনি বৃহদ্রথকে পুত্রটি দান করলেন। আনন্দে আপ্লুত বৃহদ্রথ জরারাক্ষসীর নামে মগধে উৎসব পালনের নির্দেশ দিলেন। যেহেতু জরা শিশুদেহটি সংযোজন করেছিলেন সেজন্য শিশুটি জরাসন্ধ নামে পরিচিত হল—

জরয়া সন্ধিতো যস্মাজ্জরাসন্ধো ভবত্বয়ম্॥

মহাভারত-রামায়ণে যত রাক্ষসী পাবেন, তাঁদের মধ্যে হিতকারী এবং ভালো রাক্ষসীও আছেন দু-চারজন। কিন্তু এই জরা নিজেকে রাক্ষসী নামে পরিচয় দিলেও তার প্রকৃতি এবং পরিচর্যার ঘটনাটা আর্যকৃষ্টির মধ্যে প্রান্তিক জনজাতির সংস্কৃতি মিশিয়ে দেয় যেন। মনে রাখতে হবে, জায়গাটা মগধ—এই পূর্বদেশে সরস্বতী-দৃষদ্বতীর মধ্যস্থানীয় আর্যরা এলে তাঁদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হত—

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র-মগধেষু চ।

কিন্তু পুণ্যতোয়া গঙ্গা এবং আর্যায়নের নিজস্ব প্রয়োজনে আর্যরা যখন এই পুবদিকে এসেছেন, তখন অন্য জায়গায় মতো এখানকার দেশজ সংস্কৃতিও আর্যকৃষ্টির অন্তরে প্রবেশ করেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—দুই রানীর গর্ভে দুই অর্ধাঙ্গী শিশুর অলৌকিক কথাতিশয় বাদ দিয়ে যদি এমনভাবে ভাবি যে, বৃহদ্রথের রাজবাড়ির অন্তঃপুর-চারিণীরা মহারানীর সুখপ্রসব ঘটাতে পারেনি, বরঞ্চ এই ঘটনায় সাহায্য নিতে হয়েছে নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক এক অভিজ্ঞ ধাত্রী-জননীর—যাঁর নাম জরা—আর জরা মানে অধিক বয়সের অভিজ্ঞতাও তো বটে। লক্ষণীয়, তাঁকে গৃহদেবী বলা হয়েছে—হয়তো বা মগধের আদিবাসী সংস্কৃতিতে ঘরের দেওয়ালে ছবি আঁকা হয় আদিবাসী-বিশ্বাসের দেবতার—আর্যকুলের ধারণায় সেটা রাক্ষসীর ছবি। হয়তো এই জনজাতীয় প্রান্তিক ঘর থেকেই ধাত্রী জরার ডাক পড়েছিল রাজবাড়িতে এবং নবজাতক শিশুটির দেহে-মুখে কিংবা অন্য কোনো প্রত্যঙ্গে তিনি এমন কিছু আদিম ঔষধ-সন্ধি ঘটিয়েছিলেন, যার ফলে বার্হদ্রথ রাজজাতক মুখে আঙুল পুরে কেঁদে ওঠে বিপুল চিৎকারে এবং বেঁচে থাকার প্রতিজ্ঞা তৈরি করে দেয়—

বালস্তাম্রতলং মুষ্টিং কৃত্বা চাস্যে নিধায় সঃ/
প্রাক্রোশদতিসংরব্ধঃ।

মহাভারতে শত শত শিশুর জন্ম হয়েছে, কিন্তু তাঁদের একজনের ক্ষেত্রেও জন্মকালীন ক্রন্দনের কথা এত সোচ্চারে ও সাড়ম্বরে উল্লেখ করতে হয়নি। অথচ এই ক্রন্দনের বৈদ্যক প্রয়োজন এতটাই যে স্বাভাবিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অথবা জীবন-বহনের প্রয়োজনে জন্মলগ্নেই ধাত্রী-জননীর হাতে চড় খেতে হয় শিশুকে। আমাদের ধারণা— নবজাতক শিশুকে এই প্রয়োজনে রাজবাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে হয়েছে এবং তার জীবনের সঞ্চার ঘটেছে বহু-অভিজ্ঞা জরা-জননীর হাতে। জরা যে প্রান্তিক স্থানে থাকত সেখানে ঘরের দেওয়ালে-আদি-সংস্কৃতির ছবি আঁকা হত পরম পূজ্যতায়। ছেলের জীবন-সঞ্চার করে জরা-রাক্ষসী আজ আর্যরাজার সম্মান পেল, আর্যায়নী ধারায় মিশে গেল লৌকিক সংস্কৃতি।

[মহা (k) ২.১৭.১৩-৫২; ২.১৮.১-১১; (হরি) ২.১৭.১৩-৬৪; ভাগবত পু. ৯.২২.৮; ১০.৭১.৩; মৎস্য পু. ৫০.৩১-৩২; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১৭-১৯]

□ জরাসন্ধ বৃহদ্রথের ঔরসে দুই কাশীরাজকন্যার গর্ভজাত পুত্র হলেও তিনি জরা রাক্ষসীর নামেই অধিক পরিচিত। মহাকাব্যিক বিচারে জরা রাক্ষসীই জরাসন্ধের সৃষ্টিকর্ত্রী। আবার জরার মৃত্যুর কারণও জরাসন্ধ স্বয়ং। মহাভারতের দ্রোণপর্বে বলা হয়েছে যে, বলরামের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে জরাসন্ধ একবার ইন্দ্রের বজ্রের মত শক্তিশালী একটি গদা বলরামের দিকে নিক্ষেপ করেন। বলরাম গদাটিকে প্রতিহত করার জন্য স্থূলাকর্ণ নামে এক অস্ত্র চালনা করলেন। সেই অস্ত্রে প্রতিহত হয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট গদাটি মাটিতে পড়ে যায়। সে সময় সেই স্থানে সপারিবারে বন্ধুজন সমবেত হয়ে উপস্থিত ছিলেন জরা রাক্ষসী। জরাসন্ধের গদার আঘাতে সপরিবারে সবান্ধবে নিহত হন জরা।

[মহা (k) ৭.১৮১.১২-২০; (হরি) ৭.১৫৫.৪০-৪৮]

জরা২ গোকর্ণ তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রয়াগের নিকটবর্তী পর্বতবাসী জনৈক ভিল্ল

কর্কটের পত্নী জরার কথা জানা যায়। ব্যাভিচারিণী জরা স্বামী কর্কটের প্রতি যত্নবান না হয়ে পাঁচটি উপপতির সঙ্গে প্রেম সম্বন্ধে যুক্ত হন। কৌশলে তাঁদের প্রত্যেককে হত্যা করার পর জরা বিষ মেশানো লাড্ডু খাইয়ে কর্কটকেও হত্যার পরিকল্পনা করেন। স্ত্রীর পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে কর্কট খড়্গ দিয়ে জরার শিরচ্ছেদে উদ্যত হলেন। জরা প্রাণভয়ে সেই স্থান থেকে পালিয়ে গিয়ে গোকর্ণ তীর্থে উপস্থিত হলেন। কর্কটও তাঁর সন্ধানে সেখানে এসে জরার শিরচ্ছেদ করলেন। তারপর জরার খণ্ডিত মস্তক গোকর্ণ তীর্থের পবিত্র জলে ভাসিয়ে দিলেন। সেই পবিত্র জলের স্পর্শে ব্যাভিচারিণী জরার সমস্ত পাপ ধুয়ে যায়। গোকর্ণ তীর্থে মৃত্যু লাভ করায় সে কৈলাসে দেবী পার্বতীর সখী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে।

[পদ্ম পু. (নবভারত) উত্তরখণ্ড ২২২.২৮-৩৫]

জরা৩ কৃষ্ণ-পিতা বসুদেবের দাসী-পত্নীর দুই পুত্র পুণ্ড্র ও কপিল। এই পুণ্ড্র নিষাদত্ব প্রাপ্ত হয়ে জরা নামে বিখ্যাত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পুণ্ড্র শব্দের মাধ্যমে শূদ্র বোঝানো হয়।

পুরাণের সূত্র ধরে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, পুণ্ড্র জরা নামে নিষাদদের রাজা হয়েছিলেন। বায়ু পুরাণেই একমাত্র 'জরা' পরিবর্তে 'রজ' পাঠটি পাওয়া যায়। তবে অন্যান্য পুরাণে 'জরা' পাঠটিই রয়েছে।

বসুদেব-পুত্র এই জরা-নিষাদ এবং কৃষ্ণহন্তা জরা একই ব্যক্তি কিনা সে বিষয়ে মহাকাব্য বা পুরাণে কোনো প্রামাণ্য সূত্র পাওয়া না গেলেও যদুবংশ ধ্বংসের ক্ষেত্রে যে বিপুল জ্ঞাতিকলহ এবং হত্যার সংবাদ পাওয়া যায় তার কারণেই এ বিষয়ে চিন্তার অবকাশ থেকেই যায়।

[মৎস্য পু. ৪৬.২২; বায়ু পু. ৯৬.৮৩-৮৪]

জরা৪ একজন নিষাদ বা ব্যাধ। মহাভারতের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত সংস্করণে 'জরা'-র পরিবর্তে 'জর' পাঠ ধৃত হলেও মহাভারতের অন্যান্য সংস্করণে এবং বেশিরভাগ পুরাণে অবশ্য 'জরা' নামটিই বহুলভাবে প্রচলিত এবং প্রসিদ্ধ। মহাকাব্য-পুরাণে জরা বিখ্যাত হয়ে আছেন বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার কৃষ্ণের মর্ত্যলীলা সাঙ্গ হবার বা তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসেবে।

মহাভারতের মৌষলপর্বে প্রভাসক্ষেত্রে প্রবল গৃহযুদ্ধে যদুবংশ ধ্বংস হল। শেষাবতার বলরাম নাগরূপে দেহত্যাগ করে সমুদ্রে প্রবেশ করলেন। বিষণ্ণ, ক্লান্ত কৃষ্ণও এসব দেখে নিজের মৃত্যুর কথাই চিন্তা করতে করতে উদ্দেশ্যহীনভাবে নিকটবর্তী বনে বিচরণ করতে লাগলেন। তারপর ইহলোক ত্যাগের ইচ্ছায় একসময় কৃষ্ণ নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে রুদ্ধ করে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। ঠিক সেই সময়ই শিকারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে জরা সেই স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। জরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখান থেকে কৃষ্ণের পুরো শরীরটা দেখা যাচ্ছিল না। দেখা যাচ্ছিল মাত্র চরণ দুটি। ব্যাধ তা দেখে দূর থেকে মানুষের পা বলে বুঝতে পারলেন না, ভাবলেন হরিণ-টরিণ কিছু হবে। তাই ভেবে জরা শিকারের উদ্দেশে শর নিক্ষেপ করলেন। সেই সুতীক্ষ্ণ শর বিদ্ধ হল কৃষ্ণের পদতলে। কিন্তু শিকার সংগ্রহ করতে এসে জরার ভুল ভাঙল। তিনি দেখলেন—হরিণ নয়, পীতাম্বর এক মহাবল যোগীপুরুষ শুয়ে আছেন মাটিতে। জর নিজের অপরাধবোধে শঙ্কিত হয়ে কৃষ্ণের পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। নিজের গুরুতর অপরাধের জন্য নিজের হীনকুলে জন্ম আর হীন বৃত্তিকেই দোষারোপ করতে লাগলেন বারবার। কৃষ্ণ তো মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষাতেই ছিলেন। ফলে ব্যাধের কৃতকর্মের প্রতি তাঁর কোনো ক্রোধ ছিল না। অনুতপ্ত ব্যাধকে আশ্বস্ত করে কৃষ্ণ সানন্দে ইহলোক ত্যাগ করলেন।

[মহা (k) ১৬.৪.১৭-২৪; (হরি) ১৬.৪.১৭-২৪; বিষ্ণু পু. ৫.৩৭.৬০-৬৪; ভাগবত পু. ১১.৩০.২৯-৩৮]

☐ মহাভারতের বিবরণে শুধুমাত্র ঘটনাটুকু এবং কৃষ্ণ জরার কথোপকথনের উল্লেখমাত্র পাওয়া যায়। তবে ভাগবত পুরাণ এবং বিষ্ণু পুরাণে এ বিষয়ে আরও একটু বিশদ বিবরণ মেলে। সেখানে প্রথমত জরার দ্বারা নিক্ষিপ্ত শরটিকে যদুবংশনাশক মুষলের চূর্ণ থেকে উৎপন্ন শরবনের অংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে যদুবংশের অন্যতম প্রাণপুরুষও যে সেই মুষলের অংশবিশেষের হাত থেকে পরিত্রাণ পাননি—সেই ভাবনাই ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয়ত কৃষ্ণ হত্যার পাপে ভীত, অনুতপ্ত জরা ব্যাধ সম্পর্কে এই পুরাণগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে যে, কৃষ্ণ যে শুধু

জরা কে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, তাই নয়। কৃষ্ণের আশীর্বাদে জরা অক্ষয় স্বর্গলাভও ঘটেছিল।

[বিষ্ণু পু. ৫.৩৭.৬৬-৬৭; ভাগবত পু. ১১.৩০.৩৮-৪০]

□ 'জরা' ব্যাধের এই উপাখ্যানের থেকেও বেশি কৌতূহল উদ্রেক করে তার নামটি। আমরা শুরুতেই উল্লেখ করেছি যে, মহাভারতের বেশির ভাগ সংস্করণে এবং পুরাণে এই ব্যাধ 'জরা' নামে বিখ্যাত হলেও হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ এঁকে 'জর' নামে চিহ্নিত করেছেন। বস্তুত 'জরা' শব্দটি আ-কারান্ত শব্দ এবং সেই কারণেই এটি যে পুংলিঙ্গ বোধক শব্দ হতে পারে তা হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মানেননি এবং অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ বোধক 'জর' শব্দটিই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। তবে 'জরা' শব্দটি আ-কারান্ত হলেও বৈয়াকরণ হেমচন্দ্র রচিত 'শব্দানুশাসন' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, 'জরা' শব্দের মূল হল সংস্কৃত 'জরস্' শব্দ—যার থেকে উৎপন্ন 'জরা' শব্দটি আকারান্ত হলেও পুংলিঙ্গ শব্দই বটে। এখন প্রশ্ন হল, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী 'জরা' শব্দের উৎস হল 'জৃ' ধাতু। 'জৃ' ধাতুর অর্থ জীর্ণ হওয়া বা বার্ধক্যের কারণে শরীরে যে দৌর্বল্য বা শিথিলতা আসে। 'জৃ' ধাতুর সঙ্গে অঙ্ প্রত্যয় করলে নিষ্পন্ন রূপটি হয় জরা। ফলে যে 'জরস্' শব্দের কথা আমরা উল্লেখ করলাম তার সঙ্গেও 'জৃ' ধাতুরই সম্পর্ক থাকার কথা। কিন্তু অভিধান গ্রন্থগুলিতে এবং ব্যাকরণে দেখা যাচ্ছে যে সংস্কৃত 'জৃ' ধাতুর প্রাকৃত রূপ হল 'জর' ধাতু। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃত রূপ লাভ করার পর সেই রূপান্তরিত শব্দটি এতটাই জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছে যে, সেই শব্দটিই মানে সেই প্রাকৃত শব্দটিই সংস্কৃত ভাষায় পুনরায় গৃহীত এবং ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সংস্কৃত শব্দ 'মিত্র' প্রাকৃত ভাষায় রূপ লাভ করেছে 'মিহির'। কিন্তু 'মিহির' শব্দটি এতটাই জনপ্রিয় বা বহুল ব্যবহৃত শব্দ হয়ে উঠেছিল, যে পরবর্তী সময়ে তা সংস্কৃত ভাষাতেও ব্যবহৃত হতে শুরু করে। জরা শব্দের ক্ষেত্রেও 'জৃ' ধাতু থেকে জরার উৎপত্তি হলেও হেমচন্দ্র উল্লিখিত 'জরস্' শব্দটি প্রাকৃত 'জর' ধাতুর থেকেই উৎপন্ন বলে ধারণা হয়।

[শব্দানুশাসন (হেমচন্দ্রকৃত) ২.১.৩, পৃ. ১০৮-১০৯]

জরান্ধক কৃষ্ণের ঔরসে সত্যভামার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ইনি জরো'ন্ধক বলে চিহ্নিত হলেও 'জর' বলে কোনো পৃথক পুত্রনাম এখানে কল্পনীয় নয়, আবার অন্ধকের বিশেষণও এটা নয়। এটা জরান্ধকই হওয়া উচিত ছিল। *[বায়ু পু. ৯৬.২৩৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.২৪৭]*

জরায়ু স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.১৯; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ১৯ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

জরাসন্ধ১ মহাকাব্য ও পুরাণে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী মহাভারতের সমসময়ে ভারতবর্ষের অন্যতম একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন জরাসন্ধ। উপরিচর বসুর বংশধারায় বৃহদ্রথের পুত্র তিনি। ইনি পূর্বভারতের মগধ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন।

[মহা (k) ১.১.১৩১, ১৫৫; (হরি) ১.১.৯২, ১১৬]

□ মহাভারতের অংশাবতরণপর্বে বলা হয়েছে দানবরাজ বিপ্রচিত্তির অংশে দ্বাপরযুগে জরাসন্ধের জন্ম।

[মহা (k) ১.৬৭.৪; (হরি) ১.৬২.৪]

□ জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্তটি অত্যন্ত চমকপ্রদ। পুরাকালে মগধরাজ্যে রাজত্ব করতেন চেদিরাজ উপরিচরবসুর বংশধর বৃহদ্রথ। কাশীরাজ্যের দুই যমজ কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। রাজকার্যে মনোযোগী বৃহদ্রথ ছিলেন নিঃসন্তান। প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে নিঃসন্তান রাজা মনকষ্টে রাজ্য ত্যাগ করে সস্ত্রীক তপোবন গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ঠিক সে সময়ই লোকমুখে তিনি শুনতে পান গৌতমবংশীয় মহাত্মা কাক্ষীবানের পুত্র চণ্ডকৌশিক ঋষি তপস্যায় পরিশ্রান্ত হয়ে একটি বৃক্ষমূলে অবস্থান করছেন। রাজা তাঁর দুই পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে ঋষি-দর্শনে উপস্থিত হলেন। বৃহদ্রথের আচরণে সন্তুষ্ট চণ্ডকৌশিক তাঁকে বরদান করতে চাইলে মগধরাজ তাঁর পুত্রহীনতার কথা বলে রাজ্য ত্যাগের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করলেন। মহর্ষি চণ্ডকৌশিক তখন বসেছিলেন একটি আমগাছের তলায়। সন্তানহীন রাজার মনোকষ্টের কথা শুনে চণ্ডকৌশিক রাজার পুত্রলাভের কামনায় তপস্যায়লীন হলেন। তাঁর তপস্যার প্রভাবে সেই গাছ থেকে একটা আম আপনা থেকেই তাঁর কোলে এসে পড়ল।

চণ্ডকৌশিক মন্ত্রোচ্চারণ করে সেই দিব্যফলটি বৃহদ্রথকে পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে দান করেন। রাজা বৃহদ্রথ তাঁর দুই পত্নীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, দুই স্ত্রীকেই তিনি সমান সমাদর করবেন। দুই পত্নীর প্রতি তাঁর প্রণয়ে কখনো বিন্দুমাত্র পক্ষপাত হবে না। ফলে যথা সময়ে ঋতুকাল উপস্থিত হলে বৃহদ্রথ ফলটি তাঁর দুই পত্নীকে দেন। তাঁরা ফলটি সমান দুভাগে ভাগ করে ভক্ষণ করেন। এরপর দুই রানীই গর্ভবতী হলেন এবং দশমাস পর দুজনেই দুটি অর্ধেক শরীরখণ্ড প্রসব করলেন। প্রতিটি অর্ধেকেই একটি চোখ, একটি করে পা, হাত, উদর, মুখ ও স্ফিক্-সমন্বিত ছিল। দুই রানী ভয়ঙ্কর মাংসপিণ্ড দুটিকে দেখে হতাশায় সেগুলিকে ত্যাগ করলেন। তাঁদের নির্দেশমত ধাত্রীরা মাংসখণ্ড দুটিকে রাজপ্রাসাদের বাইরে পথে নিক্ষেপ করে এলেন। সেই পথে জরা নামে এক রাক্ষসী পিণ্ড দুটিকে গ্রহণ করে কৌতূহল বশতঃ সে দুটিকে সংযোজিত করলেন। মাংসখণ্ড দুটি সংযোজিত হওয়া মাত্রই সে দুটি খণ্ড একটি শিশুপুত্রের অখণ্ড শরীরের রূপ ধারণ করল। রাক্ষসী জরা বিস্মিত চোখে বীর শিশুটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন। শিশুটি ওজনে এতই ভারী যে রাক্ষসী তাঁকে বহন করতে সক্ষম হল না। শিশুটি গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে কাঁদতে লাগলো। শিশুটির কান্নার শব্দে অন্তঃপুর থেকে রাজা এবং তাঁর পত্নীরা বেরিয়ে এলেন। জরা রাক্ষসী তখন বৃহদ্রথের কাছে ব্যক্ত করলেন রাজার ধার্মিকতার কারণেই তিনি শিশুটিকে হত্যা করেননি। এই বলে শিশু পুত্রটিকে রাক্ষসী বৃহদ্রথের হাতে তুলে দিল। তৎক্ষণাৎ অপুত্রক রাণীরা ছুটে গেলেন শিশুটিকে গ্রহণ করতে। বৃহদ্রথ জানতে চাইলেন রাক্ষসীর পরিচয়। জরা রাক্ষসী জানাল সে মগধেই বাস করে। রাজভবনে সে নিত্যপূজিত হয়। দৈবের বশে মাংস খণ্ডদুটি পথের মাঝে তাঁর হাতে এসে পড়লে সে দুটিকে সংযোজিত করে। রাজার প্রতি বিশেষ সন্তোষবশতই জরা পুত্রটি বৃহদ্রথকে দান করেছে।

কৃতজ্ঞ বৃহদ্রথ সঙ্গে সঙ্গে জরার উদ্দেশে মগধে মহোৎসবের নির্দেশ দিলেন। বালকটির নামকরণ করা হল 'জরাসন্ধ'। জরা রাক্ষসী সদ্যোজাত মাংস খণ্ডদুটিকে জুড়ে অর্থাৎ সন্ধি করে পুত্রটির জন্ম দিয়েছিলেন বলেই তাঁর নাম হল জরাসন্ধ। অর্থাৎ জরা রাক্ষসীর দ্বারা যাঁর দুই অবয়বের সন্ধি ঘটেছে, তাই জরাসন্ধ।

[মহা (k) ২.১৭.১৩-৫২; ২.১৮.১-১১; (হরি) ২.১৭.১৩-৬৪; ভাগবত পু. ৯.২২.৮; মৎস্য পু. ৫০.৩১-৩২; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১৭-১৯]

□ জরাসন্ধের জন্মের কিছুকাল পরে চণ্ডকৌশিক ঋষি মগধে এলেন। বৃহদ্রথ তাঁকে যথোচিত সম্মানে রাজধানীতে গ্রহণ করলেন। দিব্যদর্শী ঋষি জরাসন্ধের ভবিষ্যৎ বর্ণনা করতে গিয়ে জানালেন ইনি অচিরেই মহাবলবান এক নৃপতি হয়ে উঠবেন। শত্রুবিজয়ী জরাসন্ধ সমস্ত রাজাদের মধ্যে প্রধান এবং বিত্তহারী পরিচয় লাভ করবেন। অতি শক্তিমান নৃপতিও জরাসন্ধের কোপে বিনষ্ট হবেন। তিনি জীবদ্দশায় সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পাবেন।

চণ্ডকৌশিকের ভবিষ্যৎ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বৃহদ্রথ জরাসন্ধকে মগধের রাজসিংহাসনে অভিশিক্ত করেন। জরাসন্ধ রাজ্যাভিষেকের পরই বাহুবলে অন্যান্য বহু নৃপতিকে বশীভূত করলেন।

[মহা (k) ২.১৯.১-১৯; (হরি) ২.১৮.১-১৯]

□ জরাসন্ধের শাসনকালে উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরিখে মগধ এক অপরাজেয় রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। জরাসন্ধের জন্মকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণ নিজেই বৃহদ্রথের সময়ে মগধের ঈর্ষণীয় সামরিক শক্তি এবং বৈভবের কথা বলেছেন। সে সময়ে মগধের নিজস্ব সৈন্য সংখ্যা ছিল এক অক্ষৌহিণী। বৃহদ্রথ বৈভব ও বিত্তে কুবেরের সমান। এমন এক ভূ-খণ্ডে জরাসন্ধ প্রায় অলৌকিকভাবে আবির্ভূত হলেন। ঋষি চণ্ডকৌশিকের ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে জরাসন্ধ হয়ে উঠলেন ত্রিভুবনজয়ী বীর। সামরিক সক্ষমতার পাশাপাশি তাঁর কূটনৈতিক তথা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা মগধের প্রভাব ধীরে ধীরে ছড়িয়ে দিল সমগ্র উত্তর ও পূর্ব ভারতে।

জরাসন্ধের প্রাবল্যে ও রাজনৈতিক কৌশলে সে সময়কার বহু রাজা হয় সরাসরি তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন, নতুবা মগধের দিকে ইচ্ছেয় বা ভয়ে সখ্যতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সে সময় উত্তর ও পূর্ব ভারতে বেশির ভাগ নৃপতি জরাসন্ধ-পক্ষীয় বলে পরিচিত ছিলেন। এইসব নৃপতিরা হলেন চেদিরাজ শিশুপাল—ইনি

জরাসন্ধের পুত্রতুল্য, করূষাধিপতি তথা শিশুপালের ভ্রাতা দন্তবক্র—ইনি জরাসন্ধের শিষ্যস্বরূপ, মহাবল হংস ও ডিম্ভক, রাজা করভ ও মেঘবাহন, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা নরকাসুর এবং তাঁর আজ্ঞাবাহী মুর দৈত্য, যবনাধিপতি ভগদত্ত, পূর্ব ভারতে বঙ্গ, পুণ্ড্রক ও কিরাত দেশের রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেব, বিদর্ভরাজ ভীষ্মক ও তাঁর পুত্র রুক্মী—সকলেই জরাসন্ধের বশীভূত। এছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধ মতবাদী বহু রাজাকে জরাসন্ধ বন্দি করেছিলেন—একথাও কৃষ্ণের মুখ থেকে জানা যায়।

[মহা (k) ২.১৪.১০-২৪; (হরি) ২.১৪.১০-২৪]

□ জরাসন্ধের এই মিত্রগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ করে নাম করতে হবে মথুরা-শূরসেন অঞ্চলের রাজা ভোজরাজ কংসের। তাঁর জন্ম কাহিনীর সঙ্গে পণ্ডিতরা জরাসন্ধের পরোক্ষ যোগের কথা বলেন। কংস ভোজরাজ উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। সৌভপতি দ্রুমিলের ঔরসে উগ্রসেন-পত্নী পদ্মাবতীর গর্ভে কংসের জন্মকথাকে আকস্মিক বলেই বর্ণনা করা যায়। সৌভদেশ বলতে প্রাচীনকালে যমুনা থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ভূ-খণ্ডকে বোঝায়। ঐতিহাসিকভাবে সৌভের সঙ্গে মৎস্যদেশ অর্থাৎ বর্তমান রাজস্থানের আলোয়ার অঞ্চলের বিশেষ সখ্যতা ছিল। আর মৎস্যদেশে বাস করতেন জরাসন্ধের আত্মীয়-স্বজনরা। এমত পরিস্থিতিতে সৌভপতি দ্রুমিল জরাসন্ধের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন একথা বিশ্বাস করা কঠিন। আবার দ্রুমিলেরই ঔরসজাত পুত্র কংস, যিনি ভবিষ্যতে মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে জরাসন্ধের প্রতিনিধি হয়ে উঠবেন—এর মধ্যেও যেন জরাসন্ধের প্রেরণা আছে কোথাও। *[ভাগবত পু. ৯.২৪.২৪; হরিবংশ পু. ২.২৮.৫৭-১০৩, ১১৬; মৎস্য পু. ৪৪.৭৪]*

□ জরাসন্ধ সমগ্র উত্তর-মধ্য-পূর্ব ভারতে তাঁর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। একমাত্র যমুনা তীরবর্তী মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে বসবাসকারী যাদবগণ তাঁর প্রভাবমুক্ত ছিলেন। আসলে মগধের সঙ্গে যাদবদের সঙ্গে জরাসন্ধের শত্রুতা বহু পুরাতন। জরাসন্ধের পিতামহ উপরিচরবসু এক সময় চেদি থেকে যাদবদের সরিয়ে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর থেকেই যাদবদের মধ্যে অসন্তোষ চলছে। যদুবংশের জ্যামঘ রাজা যে শুক্তিমতী নদীর তীরে আস্তানা বানিয়েছিলেন, সেই শুক্তিমতীর তীরেই জাঁকিয়ে বসেছিলেন উপরিচর বসু—

পুরোপবাহিনীং তস্য নদীং শুক্তিমতীং গিরিঃ।

'উপরিচর' নামটা পৌরাণিকেরা অপব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, ওই রাজা নাকি আকাশে উঠে যেতে পারতেন এবং সেই জন্যই তিনি নাকি চৈদ্য উপরিচর। আমরা কিন্তু সাদা বাংলায় বুঝি যে, তিনি চৈদ্য রাজার ওপরে চড়াও হয়েছিলেন বলেই চৈদ্য উপরিচর। বস্তুত বসু রাজার আক্রমণের ধরনেই চেদিবাসী যাদব চৈদ্যদের মনে হয়েছে যেন আকাশ থেকে চড়াও হয়েছিলেন তিনি। এ দুঃখ যাদবরা ভুলবে কি করে? সেই থেকেই তারা পথ খুঁজছিল কিভাবে বসু মহারাজকে জব্দ করা যায়। কিন্তু কপাল মন্দ, জব্দ তো দূরের কথা, তার বদলে তাঁর ছেলে বৃহদ্রথ এবং তাঁরও ছেলে জরাসন্ধ এমন শক্তিমান হয়ে উঠলেন, যে তখন তাদের নিজেদের রাজ্য সামলানোই দায় হয়ে পড়ল। অনেক যাদব জাতভাইরাও যুক্ত হল জরাসন্ধের পক্ষে। কিন্তু তার কারণ কী? আসলে সেইখানেই জরাসন্ধের রাজনীতি।

জরাসন্ধের দুটি মেয়ে ছিল—অস্তি আর প্রাপ্তি। জরাসন্ধ নিজের এই মেয়ে দুটিকে দান করলেন মথুরাদেশে ভোজপুঙ্গব কংসের হাতে। আমাদের ধারণা কংস যে মথুরার রাজত্ব পেয়েছিলেন, তাতে জরাসন্ধের হাত ছিল। কেননা যিনি আগে মথুরার রাজা ছিলেন, তিনি হলেন যাদবদের অনুমোদিত পুরুষ উগ্রসেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই যে তাঁর ছেলে কংস মথুরার রাজ্যভার পেলেন, এর পেছনে জরাসন্ধের ইন্ধন ছিল। হরিবংশ একেবারে স্পষ্ট খবর দিয়ে বলেছে যে, কংস শৌরসেনী যাদবদের রাজা হয়েছেন যাদবদের সম্মিলিত ইচ্ছাকে অনাদর করে এবং এই অনাদর তিনি করার সাহস পেয়েছেন মগধরাজ জরাসন্ধের মদতে—

সমাশ্রিত্য জরাসন্ধম্ অনাদৃত্য চ যাদবান্।

মথুরা ও মগধের ভৌগোলিক দূরত্বও জরাসন্ধের কূটনৈতিক প্রজ্ঞাকে দমাতে পারেনি। ভোজ-বৃষ্ণিদের মধ্যকার গৃহবিবাদ সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। উগ্রসেন-পুত্র কংসকে বশ্যতা স্বীকার করিয়ে জরাসন্ধ মথুরা-

শূরসেন অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতে চাইলেন। কংস জরাসন্ধের প্রশ্রয়ে পিতা উগ্রসেনকে কারাবন্দি করলেন। প্রধান প্রতিপক্ষ বসুদেবও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। জরাসন্ধের ভয়ে অন্যান্য যদুসংঘ মুখ্যরা কংসের বশ্যতা স্বীকার করলেন একরকম বাধ্য হয়েই। এভাবেই জরাসন্ধ কংসের মাধ্যমে চিরশত্রু শূরসেনী যাদবদের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন।

বস্তুত জরাসন্ধ মগধে রাজত্ব করলেও তাঁর প্রতিপত্তির সীমা ভৌগোলিক বাধা পেরিয়ে মগধকে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে ভারতবর্ষের মানচিত্রে মথুরা-শূরসেন, হস্তিনাপুর এবং পঞ্চাল ব্যতীত উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব সর্বত্রই জরাসন্ধ-পক্ষীয়দের রাজত্ব ছিল। দক্ষিণে এবং উত্তর ভারতের মৎস্য দেশের আগে যেহেতু যাদবদেরই একচ্ছত্র অধিকার ছিল অতএব যাদবদের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন জরাসন্ধ। যাদবরা জরাসন্ধের অগ্রগতি রোধও করতে পারেননি, তাঁর সঙ্গে সন্ধিও করতে পারেননি। অন্যদিকে জরাসন্ধ মথুরা-শূরসেনের অর্থাৎ যাদবদের মূল ঘাঁটিতে ঢুকতে চাইছিলেন, কিন্তু ওই একটি জায়গায় যাদবদের অধিকার অত্যন্ত দৃঢ়প্রোথিত থাকায় জরাসন্ধ সোজাসুজি সশস্ত্র আক্রমণের মধ্যে যাননি। তিনি উপায় খুঁজছিলেন, যে উপায়ে সুদূর মগধরাজ্য থেকে কোনো আক্রমণ না চালিয়েও মথুরা-শূরসেনে নিজের শাসন কায়েম রাখা যায়। কংসই তাঁর সেই দূরক্ষেপী অস্ত্র হয়ে উঠেছিলেন। কৃতজ্ঞতা এবং কুটুম্বিতা বশতঃ কংস জরাসন্ধকে গুরুজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতে থাকেন। *[হরিবংশ পু. ২.৩৪.৫-৬; ভাগবত পু. ১০.৭০.২৩-২৪, ২৯]*

□ একই ধরনের দূরদর্শিতার পরিচয় জরাসন্ধ করূষ বা চেদির ক্ষেত্রেও দিয়েছেন। শুধুমাত্র তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধিতেই যাদবরা এই দুই রাজ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করেও তার কৌশলগত সুফল পেতে ব্যর্থ হন।

যেভাবেই হোক, জরাসন্ধ তাঁর মতাদর্শ এই দুই দেশের রাজা দন্তবক্র এবং শিশুপালের ওপর চাপাতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিশেষত হরিবংশের বর্ণনা মতো শিশুপাল জরাসন্ধের পুত্রকল্প ছিলেন। পুরাণ এবং শাস্ত্রগ্রন্থগুলি দন্তবক্র এবং শিশুপালকে পূর্বজন্মের রাবণ-কুম্ভকর্ণ অথবা হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু সাজিয়ে তাঁদের কৃষ্ণ-বিদ্বেষের কারণ খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু আমরা জানি—জরাসন্ধের ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক বুদ্ধি এতই প্রখর ছিল যে, দন্তবক্র-শিশুপাল দু-জনেই জরাসন্ধের অন্ধ পক্ষপাতী হয়ে পড়েন। এর জন্য কোনো অজুহাতেরই প্রয়োজন নেই।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, শিশুপালের পিতা দমঘোষ জরাসন্ধের পূর্বজ উপরিচর বসুর বংশধর। সেদিক থেকে বিচার করলে জরাসন্ধ ও দমঘোষ সম্পর্কে জ্ঞাতি। সুনীথ বা দমঘোষ সেই সম্পর্কে সূত্রেই পুত্র শিশুপালকে জরাসন্ধের হাতে তুলে দেন। শিশুপালও কালক্রমে জরাসন্ধের পুত্রকল্প তথা একান্ত অনুগামী হয়ে ওঠেন।

[হরিবংশ পু. ২.৫৯.২৩-২৪]

□ বসুদেব ও দেবকীর অষ্টম সন্তানরূপে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু কৃষ্ণ নামে জন্মগ্রহণ করেন। কংসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মথুরা-শূরসেনবাসীদের সামনেই তিনি জরাসন্ধের স্নেহের জামাতাকে বধ করলেন। কংসবধের মধ্যে দিয়েই কৃষ্ণ সমস্ত যদুকুলের প্রধান হয়ে দাঁড়ান। তাঁর নেতৃত্বে যদুবংশের উত্থান জরাসন্ধের চোখ এড়ায়নি। একদিকে কংসের মৃত্যু আর অন্যদিকে মথুরা-শূরসেন অঞ্চলে আধিপত্য বিনষ্ট হওয়া—এই দুই কারণে জরাসন্ধের যাবতীয় ক্রোধের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠলেন কৃষ্ণ। আসলে ব্রজবাসী এই গোপ যুবকটির প্রতিস্পর্ধাকে জরাসন্ধ খানিক ভয়ই করেছিলেন। তিলে তিলে গড়ে তোলা একাধিপত্য খর্ব হওয়ার ভয় তাঁর মনের গভীরে বাসা বেঁধেছিল।

ইতিপূর্বে জরাসন্ধের ভয়ে আঠারোটি ভোজবংশীয় শাখা আদি বাসভূমি ছেড়ে পশ্চিমদিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। শূরসেন, ভদ্রকায়, বৌধ, শাল্ব, পটচ্চর, সুস্থল, কুন্তি ইত্যাদি জনজাতির মানুষও বাসভূমিচ্যুত। তালিকাটি আরও দীর্ঘ হয়ে সেখানে দক্ষিণ পঞ্চাল, কোশল ও মৎস্য দেশের রাজাদের নামও যুক্ত হয়। এহেন প্রতাপশালী জরাসন্ধ কংসের মৃত্যুতে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন সেটাই স্বাভাবিক। লক্ষণীয় বিষয় হল, জরাসন্ধের প্রকোপে পড়তে দেখা যাচ্ছে কুরুরাজ্য সংলগ্ন দক্ষিণ। দ্রোণাচার্য পৃষত-পুত্র দ্রুপদকে পরাজিত করে উত্তর পঞ্চাল নিজ অধিকারে আনেন। অর্থাৎ উত্তর পাঞ্চালকে

একপ্রকার কুরু শাসনাধীন বলা যায়। আর দক্ষিণ পাঞ্চালে দ্রুপদের রাজত্ব।

উপরিচরবসুর সূত্রে জরাসন্ধ কৌরবদেরও জ্ঞাতি। সেই কারণেই হয়তো বা হস্তিনাপুর বরাবর জরাসন্ধের প্রকোপ থেকে মুক্ত থেকেছে। কৌরবরাও কখনো জরাসন্ধের বিরোধিতা করেননি। এমনকী দুর্যোধনও জরাসন্ধের প্রভাব অতিক্রম করার কোনো চেষ্টা করেননি। অন্যদিকে দ্রুপদের সঙ্গে হস্তিনাপুরের শত্রুতা সর্বজনবিদিত। সম্ভবত সেই জন্যেই জরাসন্ধের প্রকোপের শিকার হয়েছিল দক্ষিণ পাঞ্চাল।

ভোজ-বৃষ্ণিরাও অবশ্য কৌরব শক্তিকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। ভোজরাজকন্যা তথা কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের বোন কুন্তীর সঙ্গে কুরুরাজ পাণ্ডুর বিবাহ এই নীতিরই অংশ আবার বসুদেব নিজেও পৌরবী বা কৌরবী রোহিণীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তবে এক্ষেত্রে বৈবাহিক কূটনীতির সুফল থেকে যদু-বৃষ্ণিরা বঞ্চিত হলেন। পাণ্ডুর জীবদ্দশায় জরাসন্ধের সঙ্গে তাঁর কোনো সরাসরি শত্রুতা হয়নি বটে, কিন্তু পাণ্ডুরাজা দীর্ঘায়ু ছিলেন না। জরাসন্ধের সঙ্গে যাদবদের শত্রুতাও পাণ্ডুর মৃত্যুর পর থেকেই শুরু হয়েছিল বলে মনে হয়। মোট কথা পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তীর বিবাহ সম্পর্কের কোনো সুফল যাদবরা পাননি। মাঝখানে পাণ্ডু মারা যাবার পর পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রের রাজমহলে যে-রকম বিপদ-আপদের মধ্যে দিন কাটাতে লাগলেন, তাতে জরাসন্ধের প্রতিপত্তি আরও বেড়ে গেল। দুর্যোধন আরও বেশি করে জরাসন্ধের পক্ষ অবলম্বন করলেন পাণ্ডবদের সঙ্গে যাদবদের সখ্য বৃদ্ধি পাওয়ায়।

[মহা (k) ২.১৪.২৫-২৮; (হরি) ২.১৪.২৫-২৮]

□ কংসবধের ফলে মথুরা তথা সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে ছিল। হরিবংশ এবং অন্যান্য পুরাণের মতে জরাসন্ধের দুই মেয়েই প্রথম এসে জরাসন্ধকে তাঁদের স্বামী-নিধনের বার্তা শোনান—

শুশ্রাব নিহতঃ কংসং দুহিতৃভ্যাং মহীপতিঃ।

কথাটা একভাবে ঠিকও বটে, আবার বেঠিকও বটে। ঠিক এইজন্য যে, মেয়েদের করুণ অবস্থা দেখেই জরাসন্ধ কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। আবার বেঠিক এইজন্য যে, জরাসন্ধ তখন যে মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং যে ধরনের উন্নত গুপ্তচরবৃত্তি তাঁর শাসনযন্ত্রের অন্তর্ভূত ছিল, তাতে জামাই মারা যাবার খবর তিনি আগে পাননি, তা হতেই পারে না।

মহাভারতে দেখছি—জরাসন্ধের যুদ্ধোদ্যোগ শুরু হতেই সমস্ত বৃষ্ণিরা মন্ত্রণায় বসেছেন এবং জরাসন্ধের সম্বন্ধে এবং তাঁর যুদ্ধ কৌশল সম্বন্ধে কোনো কথা বলার আগেই কৃষ্ণ সেখানে বলছেন—হংস এবং ডিম্ভক নামে জরাসন্ধের দুই প্রধান সহায় ছিলেন এবং তাঁদের যুদ্ধ ক্ষমতা এমন যে, কোনো অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তাঁদের মেরে ফেলা সম্ভব নয়—

নামভ্যাং হংসডিম্ভকাবশস্ত্র-নিধনাবুভৌ।

মহাকাব্য-পুরাণের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় এই হংস ও ডিম্ভক জরাসন্ধের মথুরা-গমনের পূর্বেই কৃষ্ণ ও বলরামকে আক্রমণ করেন। মহাভারতের প্রমাণে মানতে হবে যে, হংস-ডিম্ভক জরাসন্ধের অন্যতম দুই সহায় এবং কংসের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া মাত্রই এই দুই বীর মথুরা যাত্রা করেছেন কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে যুদ্ধের ইচ্ছায়। জরাসন্ধ তাঁর বাহিনী নিয়ে আসছিলেন তাঁদের পিছন পিছন, খানিক পরে।

মহাভারতের প্রমাণে একথা বলা যায় যে, হংসের সঙ্গে বলরামের যুদ্ধ হয় অন্তত আঠারোবার এবং একেবারে শেষের যুদ্ধে হয়তো বলরাম তাঁকে কাবু করে ফেলতে পেরেছিলেন—

রামেণ স হতস্তত্র সংগ্রামে'ষ্টাদশা বরে।

হরিবংশে অবশ্য কৃষ্ণের সঙ্গেই হংসের বহুবার যুদ্ধ হয়েছে এবং শেষে কৃষ্ণের অস্ত্রতাড়না অসহ্য হওয়ায় তিনি যমুনায় ঝাঁপ দেন। হংসের মৃত্যুর পর তাঁকে আর না দেখে তাঁর ডিম্ভকও যমুনার জলে আত্মহত্যা করেন—একথা হরিবংশেও আছে, মহাভারতেও আছে।

[মহা (k) ২.১৪.৩৬-৪২; (হরি) ২.১৪.৩৬-৪২; ভাগবত পু. ১০.৫০.১-৩, ৪৩; বিষ্ণু পু. ৫.২২.১-২]

□ হংস ও ডিম্ভকের মৃত্যু সংবাদে ক্রুদ্ধ জরাসন্ধ মগধের রাজধানী গিরিব্রজপুর থেকে কৃষ্ণের উদ্দেশে মথুরায় একটি গদা নিক্ষেপ করেন। সেই গদাটি নিরানব্বই যোজন দূরত্ব পার

করে মথুরার নিকটবর্তী একটি স্থানে পতিত হয়। এই স্থানটি গদাবসান নামে পরিচিত হয়।

[মহা (k) ২.১৯.২২-২৫; (হরি) ২.১৮.২০-২৩]

□ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জরাসন্ধ হংস ও ডিম্ভকের অনুসরণে মথুরা গমন করছিলেন। মাঝপথেই তাঁর কানে এল হংস ও ডিম্ভকের মৃত্যু সংবাদ। খবর শোনা মাত্রই জরাসন্ধ তাঁর বিশাল অগ্রবর্তী সেনাবাহিনী (Forward force) নিয়ে গিরিব্রজপুর বা রাজগৃহ অর্থাৎ মগধের রাজধানীতে ফিরে এলেন।

ভৌগোলিক দূরত্বের কারণেই জরাসন্ধের পক্ষে ঘন ঘন বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ মগধ থেকে মথুরা আক্রমণ সম্ভব ছিল না। ফলে আপাতত জরাসন্ধ নিবৃত্ত হলে কৃষ্ণ সাময়িক স্বস্তি পেলেন। কৃষ্ণ নিজেই মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে একথা বলেছেন যে, জরাসন্ধ সাময়িকভাবে যুদ্ধে ক্ষান্তি দেওয়ায় আমরাও আবার সানন্দে মথুরায় বাস করতে লাগলাম—

পুনরানন্দিতাঃ সর্বে মথুরায়াং বসামহে।

অবশ্য ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে, প্রথমবার কৃষ্ণ-বলরামের মুখোমুখি হয়েই জরাসন্ধ পরাজিত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ২.১৪.৩৬-৪৪; (হরি) ২.১৪.৩৬-৪৪; ভাগবত পু. ১০.৫০.৪-৩৪, ৪২; বিষ্ণু পু. ৫.২২.৯-১০]

□ কংসহন্তা তথা নিজেদের স্বামী-হন্তা কৃষ্ণের কোনো উচিত শাস্তি হল না দেখে এইবার কংসের দুই মেয়ে অস্তি এবং প্রাপ্তি পিতা জরাসন্ধকে প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকেন কৃষ্ণকে মারবার জন্য। বারবার তাঁরা বলতে থাকেন—কেন তুমি ফিরে এলে? আর ফিরলে যদি, তাহলে কেন সেই দুরাত্মা কৃষ্ণকে মেরে রেখে এলে না? তুমি যাও— এখনই মার সেই কৃষ্ণকে—

পতিঘ্নং মে জহীতি পুনঃ পুনররিন্দমম্।

মগধের রাজবাড়িতে জরাসন্ধের প্রতি দুই পতিহীনা রমণীর যে প্ররোচনা চলছিল, সেই খবর কৃষ্ণ মথুরায় বসেই পেয়ে গেলেন। মহাভারতের সভাপর্বে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে জানিয়েছেন যে, স্বামী হারানোর দুঃখে জরাসন্ধের বড়ো মেয়ে অস্তিদেবী তাঁর পিতাকে ভীষণভাবে প্ররোচিত করেছিলেন—

চোদয়ত্যেব রাজেন্দ্র পতিব্যসনদুঃখিতা।

[মহা (k) ২.১৪.৪৫-৪৭; (হরি) ২.১৪.৪৫-৪৭; হরিবংশ পু. ২.৩৪.৫-৬; অগ্নি পু. ১২.২৭-২৮]

□ কৃষ্ণের সময়ে জরাসন্ধের মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ নরপতি আর দ্বিতীয়টি ভূ-ভারতে ছিলেন না। তিনি যখন মথুরা আক্রমণের জন্য বের হলেন তখন এক বিশাল চতুরঙ্গবাহিনী তাঁর অনুগামী হল। আসলে কংসবধের ঘটনা জরাসন্ধের অহংবোধে প্রচণ্ড আঘাত করেছিল। ফলে যে কোনো মূল্যে প্রত্যাঘাত করতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। হরিবংশের বর্ণনানুযায়ী মথুরা আক্রমণকালে জরাসন্ধকে দেখে মনে হত যেন তিনি স্বয়ং জ্বলন্ত অগ্নি। তিনি পূর্ণ উদ্যোগ নিয়েই কৃষ্ণকে আক্রমণ করার জন্য ব্রতী হয়েছিলেন—এ কথাও পুরাণ থেকে স্পষ্ট হয়।

[হরিবংশ পু. ২.৩৪.৪, ১০-১১]

□ মহাকাব্য পুরাণের বর্ণনানুযায়ী জরাসন্ধ আঠারোবার মথুরা আক্রমণ করেছিলেন। কুশলী কৃষ্ণ এবং বলরাম জরাসন্ধকে ঠেকানোর জন্য সময় বিশেষে মথুরা ছেড়ে অন্যান্য নানা জায়গায় আত্মগোপন করছেন। কৃষ্ণের অন্য জ্ঞাতিদেরও পরিস্থিতিও প্রায় একই রকম ছিল। প্রবলের সঙ্গে যুদ্ধ না করার নীতি নিয়েই সমগ্র কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়রা জরাসন্ধকে উপেক্ষা করছিলেন অর্থাৎ এড়িয়ে চলেছিলেন—

এবমেষ তদা বীর বলিভিঃ কুকুরান্ধকৈঃ।
বৃষ্ণিভিশ্চ মহারাজ নীতিহেতোরুপেক্ষিতঃ॥

[মহা (k) ২.১৮.২৮; (হরি) ২.১৮.২৬; হরিবংশ পু. ২.৩৬.৩৭; ভাগবত পু. ১০.৫৭.১৩]

□ জরাসন্ধ তাঁর অনুগামী রাজাদের নিয়ে যমুনার তীরে মথুরাকে ঘিরে সৈন্যশিবির স্থাপন করলেন এবং সরাসরি মথুরা আক্রমণ না করে নগরীটিকে বাইরে থেকে অবরুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। যতক্ষণ না পর্যন্ত কৃষ্ণ ও বলরাম উচিত শিক্ষা লাভ করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে এই অবরোধ। মথুরা অবরোধ জরাসন্ধের প্রজ্ঞার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মনে রাখতে হবে যে, কৃষ্ণ কংসবধের মাধ্যমে যে প্রবল প্রতিপক্ষকে গৃহদ্বারে এনে উপস্থিত করেছেন, তার দায় কৃষ্ণের জ্ঞাতিরা নিতে অসম্মত ছিলেন। সম্ভবত এ ধারণা জরাসন্ধেরও ছিল। সেই কারণেই কৃষ্ণ-বলরামকে সসৈন্য জরাসন্ধের হাতে অর্পণ করাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া যদু-বৃষ্ণিদের মতবিরোধ-সম্ভাবনাকে কৌশলে জিইয়ে রাখলেন মগধরাজ।

[হরিবংশ পু. ২.৩৫.১-৩৭]

□ মথুরা অবরোধকারী রাজন্যবর্গরা প্রত্যেকেই মগধরাজ জরাসন্ধের বশংবদ। এঁরা হলেন চেদিরাজ শিশুপাল ও করূষাধিপতি দন্তবক্র, কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু, পুণ্ড্ররাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেব, শাঙ্কৃতি, কৈশিক, বিদর্ভরাজ ভীষ্মক ও তাঁর পুত্র রুক্মী। এছাড়াও ক্রথ, অঙ্গ-বঙ্গ, কাশি-কোশল, বিদেহ, ত্রিগর্ত, শাল্ব, দরদ, যবন, সৌবীর, গান্ধার, কাশ্মীর এবং অবশেষে কুরুরাজ কুমার দুর্যোধনও।

জরাসন্ধের নির্দেশ অনুযায়ী প্রায় অর্ধ উত্তর, মধ্য ও পূর্ব ভারতের রাজারা সসৈন্যে মথুরা নগরী অবরোধ করলেন। মথুরার চারদিকের চারটি দ্বারেই এঁদের অবস্থান করতে দেখা যায়।

[হরিবংশ পু. ২.৩৪.১৩-২১; ২.৩৫.৩৯-৪৮]

□ এইভাবে চারদিক থেকে মথুরা অবরোধ করে সৈন্যব্যূহ রচনার পর জরাসন্ধ স্বয়ং ব্যূহের অগ্রভাগে অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁর নির্দেশে অন্যান্য নৃপতিরা মথুরা আক্রমণ করলেন। যদু-বৃষ্ণিবীরগণ যথাসাধ্য চেষ্টায় জরাসন্ধের অগ্রবর্তী সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করছিলেন। ঠিক সেই সময়ই সুযোগ বুঝে কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরা থেকে নির্গত হলেন। হরিবংশের কাহিনী অনুযায়ী এই সময় অলৌকিকভাবে কৃষ্ণ-বলরাম তাঁদের দিব্য অস্ত্রসমূহ লাভ করলেন। জরাসন্ধের বাহিনীর সঙ্গে তাঁদের প্রবল যুদ্ধ শুরু হল। কৃষ্ণ-বলরামের বলবীর্যে বাহিনী প্রায় ছত্রখান। এ অবস্থায় জরাসন্ধকে তাঁর বাহিনীর প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক বহু কথা বলতে দেখা যায়। মগধরাজ কিন্তু তখন দুই 'গোপবালক বধে' বদ্ধ পরিকর। এই যুদ্ধে কৃষ্ণের কাছে জরাসন্ধ খানিক পর্যুদস্ত হয়েছিলেন বলা চলে। বলরামও তাঁকে উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। উভয় পক্ষই মরণপণ সংগ্রামে একে অপরকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করছিলেন। যুদ্ধে জরাসন্ধ যাদবদের হাতে সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট ধন্দ রয়েছে। হরিবংশ পুরাণে একবার স্পষ্ট করে বলা হয়েছে জরাসন্ধ পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন। যাদবরা অবশ্য 'পরাজিত' শত্রুর পশ্চাদ্ধবন করেননি—

দীর্ঘকালং মহারাজ নিঘ্নতামিতরেতরম্।
পরাজিতে ত্বপক্রান্তে জরাসন্ধে মহীপতৌ॥

[হরিবংশ পু. ২.৩৫.৪৯-১১১; ২.৩৬.১-৩২]

□ জরাসন্ধের সসৈন্য পশ্চাদ্‌গমনে যাদবরা তথা মথুরাপুরী সাময়িকভাবে সুরক্ষিত হল বলা যায়। কৃষ্ণ জরান্ধের পশ্চাদ্ধাবন না করে সে সময় মথুরার সুরক্ষা বিধানকেই অগ্রাধিকার দেন এবং যাদব সৈন্য নিয়ে মথুরায় ফিরে আসেন।

তবে অভিজ্ঞ বৃষ্ণিরা জানতেন জরাসন্ধকে তাঁরা সাময়িকভাবে পর্যুদস্ত করেছেন মাত্র। সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হননি। জরাসন্ধের প্রকোপ থেকে খুব বেশিদিন মুক্তি পাওয়া যাবে না—এ ধারণা তাঁদের কাছে স্পষ্ট ছিল। জরাসন্ধ আপাতত মগধে ফিরে গেলেও আবারও পূর্ণোদ্যমে মথুরা অভিযান করবেন এ নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না তাঁদের মনে।

[হরিবংশ পু. ২.৩৭.৩১-৩৬]

□ জরাসন্ধের মথুরা আক্রমণের সময় যদু-বৃষ্ণিদের সংঘমুখ্য নির্বাচিত হলেন কংসের পিতা উগ্রসেন। কংস-বধের পর কৃষ্ণ উগ্রসেনকেই আবার মথুরার সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। এবার বৃদ্ধ উগ্রসেনকে কেন্দ্র করেই জরাসন্ধকে প্রতিরোধ করার কৌশল চিন্তায় মগ্ন হলেন যদু-বৃষ্ণিরা। যাদবদের মধ্য বিকদ্রু বলে একজন গোষ্ঠীপ্রধান ছিলেন, যিনি রাষ্ট্রনীতি এবং অন্তঃরাষ্ট্রীয় নগর-রক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত অভিজ্ঞ। বিকদ্রু বললেন—কৃষ্ণ! জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি হয়তো তোমার আছে এবং অবশ্যই জেনো যে, যুদ্ধ যদি লাগে তো আমরা সবাই তোমার সঙ্গে আছি। কিন্তু এটাও সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত রাজার মাথার ওপর বসে আছেন মহাবলশালী জরাসন্ধ। যাঁর অসংখ্য সৈন্যবল এবং আমরা তুলনায় অনেক অল্পবল—

অপ্রমেয়বলশ্চৈব বয়ঞ্চ কৃশসাধনাঃ।

আর এই যে মথুরাপুরী, শত্রুরা যদি এসে এখানে একদিনের অবরোধ করে, তাহলেই এ-পুরী সবকিছু নিয়ে হুড়-মুড় করে ভেঙে পড়বে—

ন চেয়মেকাহমপি পুরী রোধং সহিষ্যতি।

বিকদ্রু বললেন—মথুরার দুর্গে খাদ্য, জ্বালানি কোনোটারই কোনো প্রাচুর্য্য নেই। তার মধ্যে চতুর্দিকে প্রাকার দিয়েও এ দুর্গ প্রতিষ্ঠিত নয়—

কৃশভক্তেন্ধনক্ষামা দুর্গৈরপরিবেষ্টিতা।

এই পুরীর চারদিকে যে জলপূর্ণ পরিখা ছিল, তাও সংস্কারের অভাবে মজে গেছে। নগরের দ্বার

বলতে কিছু নেই এবং সেই দ্বারে অস্ত্রশস্ত্রের প্রহরাও নেই কিছু। নগরের যতগুলি অস্ত্রাগার আছে, তারও সংস্কার প্রয়োজন। এতদিন এসব কিছুই হয়নি। নগর-রক্ষী-পুরুষেরাও এসব দিকে নজর দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি, কেননা কংস নিজের শক্তির ওপরে নির্ভর করে চলেছে, নগর-রক্ষার প্রয়োজনই সে বোধ করেনি—

কংসস্য বলভোগ্যত্বাৎ নাতিগুপ্তা পুরা জনৈঃ।

কিন্তু কংস মারা যাবার পর যে নতুন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং যখন এই মথুরাপুরী কেবল উন্নতির পথে পা বাড়াচ্ছে, তখন এই দেশ যদি শত্রুর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, তবে একদিনও সে অবরোধ সইবার ক্ষমতা এর নেই—

পুরী প্রত্যগ্ররোধেব ন রোধং বিসহিষ্যতি।

বিকদ্রু স্বদেশের কূটনৈতিক পরিস্থিতির কথাটাও জানালেন। বললেন—মথুরায় আমাদের সুস্থিতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা যেসব রাজ্যের বিরোধিতা করেছি, তারা এখন আমাদের বিভিন্ন কুলসংঘের ভিতর মতভেদ ঘটিয়ে দিতে চাইছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, অন্যান্য রাজ্যে যেসব রাজা আছেন, তাঁরা জরাসন্ধের ভয়ে বা পীড়নে কেউ আমাদের পিছনে এসে দাঁড়াবেন না, কেননা নিজেদের রাজ্যে কেউই জরাসন্ধের ক্রোধ আমন্ত্রণ করে আনবেন না। অতএব তাঁরা সবাই জরাসন্ধের পিছনেই দাঁড়াবেন সমর্থনে—

জরাসন্ধভয়ার্তানাং দ্রবতাং রাজ্যসম্ভ্রমে।

আর সাধারণ নিরীহ মানুষ—তারা যদি এখন জরাসন্ধের আক্রমণে মথুরাপুরীতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে সবাই তারা বলবে যে,—আজকে যাদব-বৃষ্ণিদের জন্য আমরা মারা পড়লাম জরাসন্ধের হাতে—

যাদবানাং বিরোধেন বিনষ্টাঃ স্মেতি কেশব।

কূটনীতি, সাধারণ মানুষের বক্তব্য এবং যদু-বৃষ্ণিদের সবার কথা বলার পর বিকদ্রু একটা সাংঘাতিক কথা বললেন কৃষ্ণকে। বললেন—আমাদের কথা আমাদের মতো করেই তোমাকে জানালাম, কৃষ্ণ! আমরা তোমাকে করণীয় বিষয়ে কিছু বোঝাতে চাইছি না, কারণ তুমি তা যথেষ্টই বোঝ। এটাও ঠিক যে, তুমি আমাদের সমস্ত যদু-বৃষ্ণিদের নেতা এবং সকলেই তোমাকে মানেও যথেষ্ট, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এটাও মনে রেখো যে, আজকে যে জরাসন্ধের মতো সাংঘাতিক শত্রুর সঙ্গে আমাদের বিরোধ লেগেছে, তার মূল কারণ কিন্তু তুমি। তোমার জন্যই আজকে যেহেতু আমরা এই ভীষণ বিপদের সম্মুখীন, অতএব আমাদের সর্বাঙ্গীন সুরক্ষার দায়ও তোমারই—

ত্বন্মূলশ্চ বিরোধো'য়ং রক্ষাস্মানাত্মনা সহ।

কৃষ্ণ নিজেও জানেন জরাসন্ধের আক্রমণের লক্ষ্য যত না মথুরা, তাঁর চেয়ে অনেক বেশি তিনি স্বয়ং এবং বলরাম। কংসবধই এর মূল কারণ। ঠিক এই পর্যায়ে পৌঁছেই আবার কৃষ্ণের কূটনৈতিক প্রজ্ঞার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

তিনি মনে করেন—ক্ষত্রিয়ের ওই যুদ্ধাভিমানিতার চেয়ে রাজনীতি তথা কূটনীতির মাধ্যমে শত্রুকে দমিয়ে রাখা এবং সময় উপযুক্ত হলে তাকে মেরে ফেলাটা সবচেয়ে ভাল। কৃষ্ণ বললেন—দেখুন, শত্রু যদি অতিরিক্ত বলবান হয়, তবে তার কাছাকাছি থাকা উচিত নয়। যে রাজনীতিজ্ঞ সময়ের সঠিক ব্যবহার বোঝে, সে বলবান শত্রুর কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রথমত দূরে সরে যাবে, তারপর যখন সে বুঝবে যে, নিজের শক্তিতে সে শত্রুকে মেরে ফেলতে পারবে, তখনই সে যুদ্ধ করবে—

অপক্রমেদ্ধি কালজ্ঞঃ সমর্থো যুদ্ধমুদ্‌বহেৎ।

কৃষ্ণ বললেন—অতএব আমরা আপাতত পালাব। আমি এবং দাদা বলরাম—এই দুইজনে যত শক্তিশালী হই না কেন, আপাতত আমরা পালাব। আমরা দক্ষিণে বা পশ্চিমে যেখানেই যাই না কেন, জরাসন্ধের রাগটা যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে আমাদের দুজনের ওপরেই, অতএব তিনি আমাদের পিছনে ধাওয়া করবেন—

আবয়োর্গ্রহণে চৈব নৃপতিঃ প্রযতিষ্যতি।

এতেই মথুরাপুরী এবং শূরসেন-দেশের মঙ্গল। *[হরিবংশ পু. ২.৩৭.১-৭৩; ২.৩৮.৬৬]*

□ কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরা থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে সহ্যাদ্রি পর্বতমালার অন্তর্গত গোমন্ত পর্বতে উপস্থিত হলেন। পথে করবীরপুরে বেণানদীর তীরে ভৃগুপুত্র পরশুরামের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। পরশুরামই তাঁদের পথ প্রদর্শন করে গোমন্ত পর্বতে নিয়ে আসেন। কংসবধ এবং তার পরম্পরায় জরাসন্ধের কোপ সম্পর্কে পরশুরামও জ্ঞাত ছিলেন। কৃষ্ণ ও জানতেন তাঁর ও বলরামের মথুরা ত্যাগের সংবাদ

পাওয়া মাত্রই জরাসন্ধ মথুরা থেকে মনোযোগ সরিয়ে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবনে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

জরাসন্ধ সসৈন্যে গোমন্ত পর্বত অবরোধ করেছিলেন বলে হরিবংশের মন্তব্য আছে। আরও বলা আছে যে, শত্রু গিরিদুর্গে থাকলে চতুর্দিকের অবরোধই কাজ দেয় বেশি—

দুর্গযুদ্ধে ক্রমঃ শ্রেয়ান্ রোধযুদ্ধেন পার্থিবাঃ।

—কারণ, তাতে খাবার-দাবার এবং ইন্ধন কমে গেলে দুর্গাশ্রিত ব্যক্তির বিপদ বাড়বে। জরাসন্ধ-পক্ষপাতী রাজারা কৃষ্ণ-বলরামের বিপন্নতা সৃষ্টির জন্য নানা দাহ্য পদার্থ জড়ো করে গোমন্তক পর্বতের চারদিকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে কৃষ্ণ-বলরাম পর্বত থেকে বেরোতে না পেরে মরেন। জরাসন্ধের অভিলাষ পূর্ণ হয়নি অবশ্য। হরিবংশের বয়ান অনুযায়ী কৃষ্ণ-বলরাম দুই ভাই গোমন্তক পর্বতের চূড়া থেকে অলৌকিক লম্ফদান করে জরাসন্ধের সৈন্য বাহিনীর মধ্যে পড়েন এবং এই যুদ্ধেও কৃষ্ণ-বলরামের অলৌকিক বীর্য্যে জরাসন্ধ হেরে গিয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হন।

লৌকিক দৃষ্টিতে এ কাহিনী বিশ্বাস করা কঠিন। মহাভারত-পুরাণে এই কথাটা প্রাবাদিক হয়ে গেছে যে, জরাসন্ধ বহুবার কৃষ্ণকে এবং তাঁর আবাসস্থলে আক্রমণ হেনেছেন। কৃষ্ণ হয়তো কখনো প্রতিরোধ করেছেন ভাল, কখনো বা কূটনৈতিকভাবে জরাসন্ধকে বিভ্রান্তও করেছেন, কিন্তু জরাসন্ধ কৃষ্ণ-বলরামের কাছে যুদ্ধে হেরে পালিয়ে এলেন মগধে—একথা খুব বিশ্বাস্য নয়। মহাভারতে জরাসন্ধের ব্যাপারে কৃষ্ণের আর্ত মন্তব্য থেকেই এই অবিশ্বাস দৃঢ় হয়।

[হরিবংশ পু. ২.৩৯.১-৭৯; ২.৪২.১-৮৭; ভাগবত পু. ১০.৫২.৯-১৪]

□ পূর্বেই কৃষ্ণ-বলরাম সুদর্শন চক্র, কৌমোদকী গদা, শার্ঙ্গধনুক ইত্যাদি দিব্যাস্ত্র সমূহ লাভ করেছিলেন। গোমন্ত পর্বতে জরাসন্ধকৃত অগ্নিবেষ্টনী থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁরা ক্রুদ্ধ মকরের ন্যায় সেসব অস্ত্র নিয়ে মগধরাজের সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বলরামের হাতে যুদ্ধে নিহত হলেন জরাসন্ধ-অনুগত দরদ। বলরাম ও জরাসন্ধ পরস্পর গদাযুদ্ধে মুখোমুখি হলেন। তাঁদের গদার আঘাতে সমস্ত পর্বত কেঁপে উঠলো। ঠিক সেই সময়ই দৈববাণী হল—বলরামের হাতে জরাসন্ধের মৃত্যু ভবিতব্য নয়। জরাসন্ধের জন্য কাল অন্যতর ভাবনা ভেবে রেখেছেন। বলরামকেও খেদ বা দুঃখ না করে যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়ার আদেশ দিল এই দৈববাণী—

ততো'ন্তরিক্ষে বাগাসীৎ সুস্বরা লোকসাক্ষিণী।
ন ত্বয়া রাম বধ্যো'য়মলং খেদেন মানদ॥
বিহিতো'স্য ময়া মৃত্যুস্তস্মাৎ সাধু ব্যাপারম্।
অচিরেণৈব কালেন প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যতি মগধঃ॥

আকাশবাণী শোনা মাত্রই বলরাম নিরস্ত হলেন, জরাসন্ধ একরকম পরাজয় স্বীকার করেই সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন।

[হরিবংশ পু. ২.৪৩.১-৭৫]

□ মহাভারতে কৃষ্ণ বলেছেন—আমাদের মথুরার মন্ত্রণা-সভায় যখন ঠিক হল যে আমরা পালাব, তখন আমরা আমাদের যদু-বৃষ্ণিদের সমস্ত সম্পত্তি যথাসম্ভব সংক্ষেপ করে নিয়ে আলাদা আলাদা দল করে মথুরা থেকে বেরিয়ে পড়লাম—

পৃথক্‌ত্বেন মহারাজ সংক্ষিপ্য মহতীং শ্রিয়ম্।

এত স্বাভাবিক এবং ঐতিহাসিক তথ্য আর হতে পারে না। কংসের মৃত্যুর পর যদু-বৃষ্ণিরা এখন কৃষ্ণের নেতৃত্বে একত্রিত হয়েছেন, এই সময়ে বলবত্তর শত্রুর ভয় উপস্থিত হয়েছে জরাসন্ধের মাধ্যমে। তখন এটা মোটেই স্বাভাবিক নয় যে, যদুবৃষ্ণিরা সব রয়ে গেলেন মথুরায় আর তাঁদের দুই নেতা প্রাণভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। কৃষ্ণ বলেছেন—আমরা ছেলে-পুলে, ভাই-বোন সবাই জরাসন্ধের ভয়ে পৃথক পৃথক দলে পশ্চিম দিকপানে বেরিয়ে পড়লাম—

ইতি সঞ্চিন্ত্য সর্বে স্ম প্রতীচীং দিশমাশ্রিতাঃ।

এর পরেই একেবারে স্পষ্ট ঠিকানা বলেছেন কৃষ্ণ—আমরা রৈবতক পর্বতের শোভাশালিনী কুশস্থলী নগরীতে গিয়ে পুনরায় বসতি তৈরি করলাম—

পুনর্নিবেশং তস্যাঞ্চ কৃতবন্তো বয়ং নৃপ।

কুশস্থলী নগরী আর দ্বারকা যে একেবারে এক জায়গা, সেটা মহাভারত থেকেই প্রমাণ হবে। কিন্তু কৃষ্ণের এই আবাসস্থল একেবারে স্থায়ী ঠিকানা। এখানে যে দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছে নতুন করে তাতেও সময় লাগবার কথা। কাজেই হরিবংশ-

কথিত গোমন্তক পর্বতের ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হবে।

[মহা (k) ২.১৪.৫২-৫৩; (হরি) ২.১৪.৫২-৫৩]

□ পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে কৃষ্ণের সমসময়ে জরাসন্ধের মত শক্তিমান রাজা ভূ-ভারতে আর ছিলেন না। সেই প্রবল জরাসন্ধের আক্রমণ নানাকৌশলে আঠারো বার প্রতিহত করেছিলেন কৃষ্ণ। এর ফলে যাদবদের প্রতিনিধিরূপে কৃষ্ণ এক নতুন রাজনৈতিক শক্তিরূপে উত্থিত হন, জরাসন্ধ যাঁকে কিছুতেই পরাজিত করতে পারেননি। এমত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক মেরুকরণ সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। সম্ভবত হয়েওছিল তাই। উত্তর-মধ্য তথা পশ্চিম ভারতের রাজাদের মধ্যে এক পক্ষ জরাসন্ধের প্রতি অপর পক্ষ কৃষ্ণের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে থাকেন। গোমন্ত পর্বতে জরাসন্ধের পরাজয়ের পরপরই কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মগধরাজ কর্তৃক একত্রিত বিশাল সৈন্যবাহিনী এবং রাজারা যে যাঁর নিজদেশে ফিরে যান। জরাসন্ধ তাঁদের আবার একত্রিত করার একটি সুযোগ খুঁজছিলেন। সুযোগ এসে গেল বিদর্ভের রাজা ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীর স্বয়ম্বর আহ্বানের মাধ্যমে।

কাহিনী পরম্পরায় বিচার করলে এ ঘটনা দ্বারকা নগরী স্থাপনের পূর্ববর্তী অর্থাৎ তখন কৃষ্ণ এবং জরাসন্ধ উভয়েই পরস্পরকে কূটনৈতিক অস্ত্রে পর্যুদস্ত করতে উদ্যোগী ছিলেন।

বিদর্ভরাজকন্যা সুন্দরী রুক্মিণী স্বয়ম্বরা হবেন—এই সংবাদটা চারদিকেই ছড়াচ্ছিল এবং এই সংবাদ কৃষ্ণও পেয়ে গেছেন সংবাদ সংগ্রহকারী প্রাবৃত্তিক পুরুষদের মুখে—

প্রাবৃত্তিকা নরাঃ প্রাহুঃ পার্থিবাত্যয়িকং বচঃ।

তারা এসে জানিয়েছিল যে, বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের মেয়ে রুক্মিণীর স্বয়ম্বর আসন্ন। সেই উপলক্ষে দেশ বিদেশের সমস্ত রাজারা রুক্মিণীর বিবাহ-কামনয় বিদর্ভে এসে শিবির স্থাপনা করেছেন। এই খবর শুনে কৃষ্ণও বিদর্ভে যাওয়া মনস্থ করলেন, যদিও মথুরা ছেড়ে যাবার ব্যাপারে তাঁর শঙ্কা ছিল। তাঁর ভয় ছিল—মথুরাপুরীতে তিনি না থাকলে জরাসন্ধের পক্ষপাতী রাজারা যে কোনও ছলে মথুরা আক্রমণ করতে পারেন—

ক্ষত্রিয়া বিকৃতিপ্রজ্ঞাঃ . . . জঘন্যে'ভিপতন্তীহ।

যাই হোক, বিদর্ভরাজ্যে উপস্থিত হয়ে, তিনি সোজাসুজি বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের রাজসভায় উপস্থিত হলেন না, অথচ অন্যান্য রাজারা জরাসন্ধ-শিশুপাল ইত্যাদি তাঁরা কিন্তু ভীষ্মকের আতিথ্যেই বিদর্ভে উপস্থিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণ উঠলেন ক্রথ-কৈশিকের রাজবাড়িতে। এই ক্রথ-কৈশিক আবার এমন এক ব্যক্তি যিনি ভীষ্মকের আধিপত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। ভীষ্মকের সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্কও মধুর নয়। কারণ ভোজ বংশজাত হয়েও ভীষ্মক যাদবদের সঙ্গে শত্রুতাই করে গিয়েছেন। এমনকী জরাসন্ধের পক্ষ নিতেও তিনি পিছুপা হননি।

মহাভারতে ভোজবংশীয় ভীষ্মকের সম্বন্ধে কৃষ্ণের এই হাহাকার থেকে বোঝা যায় যে রূপবতী রুক্মিণীকে লাভ করার আন্তরিক ইচ্ছার সঙ্গে কৃষ্ণের মনে একটা রাজনৈতিক সম্ভাবনাও কাজ করে থাকবে। অর্থাৎ তিনি ভেবেছিলেন যে, রুক্মিণীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হলে বিদর্ভের পরাক্রমশালী রাজা ভীষ্মক—হাজার হলেও তিনি ভোজবংশীয় বলে কথা, তিনি কৃষ্ণের পক্ষপাতী হলে অতুলবলশালী অদম্য জরাসন্ধের বিপক্ষে একটা মিত্রশক্তি গড়ে উঠবে।

[মহা (k) ২.১৪.২১-২৪; (হরি) ২.১৪.২১-২৪]

□ কৈশিক-ক্রথের বাড়িতে কৃষ্ণ আসা-মাত্রই ভীষ্মকের রাজধানীতে সম্মিলিত রাজ সমাজের কাছে খবর চলে গেল। হরিবংশে এই রাজাদের শক্তি এবং প্রভাব সম্বন্ধে যা বলা আছে, তাতে সকলেই তাঁরা খুব পরাক্রমশালী তো বটেই, তেমনই তাঁরা রাজনীতি, কূটনীতির প্রয়োগেও কুশল—

মন্ত্রায় মন্ত্রকুশলা-নীতিশাস্ত্রার্থবিত্তমাঃ।

কৃষ্ণ এই বিবাহ-সভার কাছাকাছি এসে অবস্থান করায় প্রতিপক্ষ রাজাদের মধ্যে যে একটা কমোশন তৈরি হবে—এটা তিনি জানতেন। ভীষ্মকের সভায় মিলিত রাজাদের মধ্যে প্রধান অবশ্যই সেই জরাসন্ধ এবং তিনি সন্দেহ করেছেন যে, কৃষ্ণ সোজাসুজি বিবাহ সভাতেও এলেন না অথচ এক প্রতিপক্ষীয় বিজিত রাজার বাড়িতে এসে অবস্থান করছেন, অপিচ তাঁর সঙ্গে যদু-বৃষ্ণিদের দলবলও আছে—অতএব কৃষ্ণের মনে অবশ্যই কোনো পরিকল্পনা আছে। জরাসন্ধ মনে করেন—কৃষ্ণ অবশ্যই রুক্মিণীকে লাভ করবার

চেষ্টা করবেন এবং হয়তো বা সেই কারণে যুদ্ধও লেগে যাবে—

অবশ্যং কুরুতে যত্নং কন্যাবাপ্তির্যথা ভবেৎ।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, কৃষ্ণ কিন্তু গরুড়কে সঙ্গে নিয়ে ক্রথ-কৈশিকের বাসভূমিতে এসে উপস্থিত হন। এই মধ্যবর্তী সময়টুকুতেই রৈবতক পর্বতে কুশস্থলী নগরীর প্রশস্ত ভূমিতে দ্বারকা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

[হরিবংশ পু. ২.৫৫.৪-১১]

□ কৃষ্ণের আগমন-সংবাদে বিচলিত জরাসন্ধ বিদর্ভের রাজসভায় স্বয়ম্বরের জন্য উপস্থিত সমস্ত রাজাদের উদ্দেশে এক দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন। সেখানে কৃষ্ণ সম্পর্কে সমস্ত কথাই প্রশস্তিবাচক। তবে এর ঐতিহাসিকতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা যথেষ্ট সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন।

কৃষ্ণ সম্পর্কে জরাসন্ধের মুখনিঃসৃত ভাগবতী কথাটুকু বাদ দিলে বাকি বক্তব্যকে একধরনের প্রস্তাবনা বলা যেতে পারে। কৃষ্ণ বিদর্ভ-রাজ্যে পা রেখেছেন অনিমন্ত্রিত ভাবে। তাতে বিবাহ-উৎসবে গণ্ডগোলের আশঙ্কা রয়েছে—এই অবস্থায় কী করা যায়—জরাসন্ধ অন্য রাজাদের মনোভাব বুঝতে চাইছেন। কারণ মহারাজ ভীষ্মক জরাসন্ধের অনুগামী হলেও কন্যার পিতা হিসেবে কোনো গণ্ডগোল অথবা এই বিয়ের ব্যাপারে কোনো যুদ্ধ লেগে যাওয়াটা তিনি চাইবেন না। সেইখানে করূষ-দেশের রাজা দন্তবক্র ছিলেন। তিনিও জরাসন্ধের অনুগামী। তিনি বললেন—কৃষ্ণ এখানে এসেছে, তো কী হয়েছে? ভীষ্মক রাজার মেয়ে স্বয়ংবরা হবেন—সেখানে কন্যালাভের জন্য আমরাও এসেছি, কৃষ্ণও এসেছেন তা এতে এত শোরগোল করার কী হল? এতে দোষও নেই গুণও নেই—সবাই আমরা একই উদ্দেশ্যে এসেছি—

কিমত্র দোষো গৌণ্যো বা
কন্যাহেতোঃ সমাগতাঃ।

আমরা বরং পূর্বশত্রুতার কথা ভুলে গিয়ে এই বিবাহ সভায় কৃষ্ণের সঙ্গে আপাতত সন্ধি করে নিই। তাহলে আর কোনো উদ্বেগ-আশঙ্কা থাকবে না—

এবং সন্ধানতঃ কৃত্বা কৃষ্ণেন সহিতা বয়ম্।

দন্তবক্রের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন সৌভপতি শাল্ব। তিনি কৃষ্ণের ভয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করতে রাজী নন। এই অংশে আমরা ভীষ্মকের রাজসভায় উপস্থিত রাজাদের মধ্যে আসন্ন করণীয় বিষয়ে মতপার্থক্য হতে দেখি।

কন্যাপিতা ভীষ্মক এতক্ষণ চুপ করে সবার কথা শুনছিলেন। তিনি জরাসন্ধের অনুগামী বটে, তবে কৃষ্ণের সম্বন্ধেও তাঁর কিছু সমীহ আছে। বিশেষত জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণকে এখনও কিছু করতে পারেননি, উপরন্তু জরাসন্ধ এবং তাঁর অনুগামীরা কুণ্ডিনপুরে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণ তাঁর পার্শ্ববর্তী এলাকায় নিজের অনুগামীর বাড়িতে উঠেছেন—এতে তাঁর সমীহও যেমন বেড়েছে, আশঙ্কাও তেমনই বেড়েছে। এর মধ্যে আরও একটা ভয় তাঁর মনে কাজ করছে এবং সেটা তাঁর ছেলেকে নিয়ে। ভীষ্মকের পুত্র, রুক্মিণীর ভাইয়ের নাম রুক্মী। তিনি একেবারে কট্টর জরাসন্ধপন্থী।

বিদর্ভরাজ ভীষ্মক সমবেত কৃষ্ণবিরোধী রাজ-সমাজের উত্তেজনা হৃদয়ঙ্গম করে অদ্ভুত একটা আচরণ করলেন। তিনি দেখলেন—জরাসন্ধপন্থীরা মনে যতই কৃষ্ণ-বিরুদ্ধতা রাখুন, আপাতত তাঁরা খুব কঠিন কথা বলছেন না। বিশেষত স্বয়ংবর সভার রেওয়াজ অনুযায়ী একটু গণতান্ত্রিক ব্যবহারও করছেন তাঁরা। ভীষ্মক এই সুযোগটুকু নিলেন। তিনি নিমন্ত্রণ না করা সত্ত্বেও কৃষ্ণ এসে তাঁরও বিজিত সামন্ত-নৃপতির ঘরে উঠেছেন, অতএব তাঁকে যে একটু মান-সম্মান প্রদর্শন করা দরকার, সেটা বুঝেই ভীষ্মকের একটু আত্মগ্লানি হল—

কন্যার্থে চাগতঃ কৃষ্ণ স্তত্রাপি ন কুতো'তিথিঃ।

ভীষ্মক ঠিক করলেন—অন্তত তাঁর রাজোচিত সৌজন্যটুকু বোঝানোর জন্যই কৃষ্ণের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার—

গমনায় মতিং চক্রে প্রসাদয়িতুমচ্যুতম্।

ভীষ্মক ক্রথ-কৈশিকের রাজ্যে এসে কৃষ্ণকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, এই স্বয়ংবর সভার ব্যাপারে তিনি নিজে খুব আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর ছেলে রুক্মীই এ ব্যাপারে অত্যুৎসাহী হয়ে তার বোনের বিয়ে দিতে চেয়েছে স্বয়ংবর সভা ডেকে, অতিথি নিমন্ত্রণ করে। তিনি একেবারেই উৎসাহী ছিলেন না—

স্বয়ংবরে নরেন্দ্রাণাং ন চাহং দাতুমুৎসহে।

ভীষ্মক ভাল মানুষ সেজে বললেন—যাক, যা

হবার তা হয়ে গেছে। ছেলেটা একেবারেই চপল স্বভাব, না বুঝে এই সব ছেলেমানুষি করেছে—এর জন্য ছেলের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে—

অতঃ প্রসাদয়িষ্যে ত্বাং পুত্রদুর্নয়হেতুনা।

কৃষ্ণ ভীষ্মকের মনোভাব সহজেই বুঝতে পারলেন। ভীষ্মকের অঙ্গুলিহেলন ছাড়া স্বয়ম্বরের আয়োজন করা হয়নি এ ব্যাপারে কৃষ্ণ একপ্রকার নিশ্চিতই ছিলেন। স্বয়ম্বরে অনাহুত কৃষ্ণ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অপমানিত বোধ করেছেন। তবে ভীষ্মক যতই রুক্মিণীকে জরাসন্ধপন্থী কোনো রাজপুরুষের হাতে অর্পণ করার বিষয়ে পুত্র রুক্মীর আগ্রহের কথা বলুন—তিনি নিজেও বিপরীত কর্ম করে জরাসন্ধের বিরাগভাজন হতে চাননি। কৃষ্ণের হাতে রুক্মিণীকে তুলে দেওয়ার কোনো ইচ্ছাই তাঁর ছিল বলে মনে হয়না। তবে কৃষ্ণের কথায়-বার্তায় ভীষ্মক রুক্মিণী সম্পর্কে বাসুদেব কৃষ্ণের আগ্রহের কথা বুঝতে পেরেছিলেন।

সে-ক্ষেত্রে কৃষ্ণের এই বিরোধিতা এবং জরাসন্ধ ইত্যাদির প্রতিকূল আচরণ এক বিরাট সমস্যা তৈরি করবে। অতএব ভীষ্মক বিদর্ভে ফিরে এসেই সমবেত রাজাদের সামনে বললেন—রুক্মিণীর স্বয়ংবর নিয়ে সমবেত রাজাদের সঙ্গে কৃষ্ণের যে বিরোধ পাকিয়ে উঠেছে, তাতে এই স্বয়ংবরের মধ্যে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আমি আপাতত তাই স্বয়ংবর সভা বন্ধ করে দিতে চাইছি—

স্বয়ংবরকৃতং দোষং বিদিত্বা বো নরাধিপাঃ।
ক্ষন্তব্যোং মম বৃদ্ধস্য . . .।

[হরিবংশ পু. ২.৪৮.৩৭; ২.৫১.১-৬৫; ২.৫২.৩-৮]

□ ভীষ্মকের এই ঘোষণার পর স্বয়ংবরে উপস্থিত রাজারা একে একে ফিরে যেতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু গেলেন না সেই পরাক্রমী রাজারা—যাঁরা ভীষ্মকের মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সেই জরাসন্ধ, সুনীথ, দন্তবক্র, শিশুপাল—এঁরা সব সহস্যের গন্ধ পেয়ে বিদর্ভ-রাজধানীতে থেকে গেলেন ভীষ্মকের মর্মকথা শোনার জন্য—

শ্রোতুকামা রহো বাক্যং স্থিতা বৈ ভীষ্মকান্তিকে।

ভীষ্মক উপস্থিত নৃপতিদের সামনেই রুক্মীর বালকসুলভ আচরণের করণে তৈরি হওয়া বিপদ সম্পর্কে ভয় প্রকাশ করলেন। রুক্মীর আহ্বানে এই স্বয়ম্বর সভা। সেখানে আবার কৃষ্ণ অনাহূত। বাসুদেবের কোপ থেকে বিদর্ভ বা মুক্তি পাবে না সে বিষয়ে ভীষ্মক নিশ্চিত। বিদর্ভরাজ যখন এমন বিলাপ করছেন তখন রুক্মীর সমর্থনে কথা বলতে দেখা যায় আরেক জরাসন্ধপন্থী রাজা সৌভপতি শাল্বকে। তাঁর যুক্তি হল মহাবীর রুক্মী কৃষ্ণদমনে সক্ষম কিন্তু বাসুদেবের ভগবত্তা বিচার করেই এখন পর্যন্ত সে কর্মে তিনি বিরত আছেন। শাল্বের মতে কৃষ্ণ-বধের উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন পরাক্রমশালী যবনরাজ কালযবন। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণেরও অবধ্য—

অদ্য তস্য রণে জেতা যবনাধিপতির্নৃপ॥
স কালযবনো নাম অবধ্যঃ কেশবস্যহ।

[হরিবংশ পু. ২.৫২.৯-২৫; বিষ্ণু পু. ৫.২৬ অধ্যায় সম্পূর্ণ; বিষ্ণু পু. ১০.৫৪.৯-১৭]

□ সৌভপতি শাল্ব জরাসন্ধের মনের ভাব বুঝে, তাঁকে এতটুকু লজ্জা না দিয়ে এবং তিনি যাতে পুলকিতও হন, সেই ভাবনাতে প্রণোদিত হয়ে হঠাৎই এক আকস্মিক প্রস্তাব করে বসলেন। শাল্বরাজ এটা বুঝেছেন যে, কৃষ্ণকে আরও একবার শাস্তি দেওয়া দরকার, তাতে জরাসন্ধ খুশি হবেন, কিন্তু আপাতত জরাসন্ধকে অগ্রগামী করে কোনো আক্রমণ নয়, কৃষ্ণকে শাস্তি দিতে হবে অন্যভাবে। সেই উদ্দেশ্যেই 'কালযবন' নামটির অবতারণা। আসলে গার্গ্যমুনির পুত্র কালযবন মহাদেবের বরে মথুরাবাসীদের অবধ্য। অপরদিকে কালযবনের আক্রমণে মথুরার যে কোনো মানুষ অসহায়। তবে কালযবন সম্পর্কে শাল্ব জানেন অনেক বেশি। যবনরাজ জরাসন্ধের বিশেষ পরিচিত নন। *[দ্র. কালযবন]*

[হরিবংশ পু. ২.৫২.২৬-৩০]

□ জরাসন্ধ অনতিবিলম্বে সৌভপতি শাল্বকে আকাশ পথে তাঁর দিব্যবিমানটি নিয়ে কালযবনের কাছে দৌত্য করতে পাঠালেন। জরাসন্ধ দ্রুত কালযবনকে দ্রুত মথুরা আক্রমণে সম্মত করানোর দায়িত্ব শাল্বের কাঁধে তুলে দিয়ে সসৈন্যে মগধে ফিরে গেলেন।

[হরিবংশ পু. ২.৫২.৩২-৪৬]

□ জরাসন্ধের দূত শাল্ব কালযবনের কাছে মগধরাজের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। যবনাধীশ কালযবন জরাসন্ধের নাম যথেষ্টই জানেন এবং

তাঁকে এতাবৎ কাল না দেখলেও তাঁর প্রতি কালযবন পরম শ্রদ্ধালু। যবনের 'নেটওয়ার্ক'ও এতটাই ভাল যে শাল্ব তাঁর কাছে পৌঁছবার আগেই তাঁর কাছে খবর চলে এসেছে যে, জরাসন্ধের দূত হয়ে তাঁর কাছে আসছেন শাল্বরাজ। কালযবন জরাসন্ধের প্রতি সম্পূর্ণ বশ্যতা জানিয়ে বললেন—জানি, সব জানি কেন আপনি এসেছেন। আমার শুধু আশ্চর্য লাগছে যে, যাঁর বাহুবল আশ্রয় করে আমরা নিরুদ্বেগে দিন কাটাই, সেই জরাসন্ধের কাছে কোন কাজটা এমন অসাধ্য হয়ে উঠেছে, যার জন্য আপনাকে দূত করে পাঠিয়েছেন আমার কাছে—

কিম সাধ্যং ভবেদস্য যেনাসি প্রেষিতো ময়ি।

তিনি কী বলে পাঠিয়েছেন বলুন আমাকে। আমার পক্ষে একান্ত দুষ্কর হলেও সে কাজ আমি করব।

প্রত্যুত্তরে শাল্বরাজ সবিস্তারে কৃষ্ণের ক্রমিক শক্তিবৃদ্ধির কথা জানালেন। কংসের মৃত্যু থেকে আরম্ভ করে জরাসন্ধের সঙ্গে তাঁর বারংবার 'এনকাউন্টার', গোমন্ত পর্বতের ঘটনা —সব কিছু জানিয়ে শাল্বরাজ জরাসন্ধের অভীষ্টপূরণ করতে বললেন। কালযবন সানন্দে জরাসন্ধের ইচ্ছানুসারে মথুরার উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

বিদর্ভ থেকে মথুরায় ফেরার পর থেকেই কৃষ্ণ জানতেন রুক্মিণীর স্বয়ম্বর উদ্যোগ নষ্ট করে দেওয়ার জন্য জরাসন্ধ ও তাঁর অনুগামীরা বাসুদেবকেই দোষারোপ করেন। আবার যে কোনো সময় জরাসন্ধের প্রকোপ নেমে আসতে পারে মথুরার উপর। কৃষ্ণ যেন আক্রমণের পথ চেয়ে বসেই ছিলেন। ঠিক সেই সময় কালযবনের যুদ্ধ যাত্রার সংবাদ এসে পৌঁছাল তাঁর কানে। কৃষ্ণ জানতেন কালযবন তো নিমিত্ত মাত্র। আসল চক্রী জরাসন্ধ।

মুশকিলটা আরও বাড়ল যখন কৃষ্ণের কাছে খবর এল যে, এবার যৌথ আক্রমণ হবে মথুরায়, অর্থাৎ মথুরায় পশ্চিমোত্তর দিক থেকে আসবেন কালযবন আর পুবদিক থেকে আসবেন জরাসন্ধ। ঠিক এই অবস্থাতেই কৃষ্ণ স্থায়ীভাবে মথুরা ছেড়ে যাবার পরিকল্পনা করেন সপার্ষদে। এই সময়ই রৈবতক পাহাড়ের উপর কুশস্থলীর স্থানে দুর্গসদৃশ দ্বারকা নগরীর প্রতিষ্ঠা। ফলে বলা যেতেই পারে একরকম জরাসন্ধের কারণেই যাদবদের মথুরা ত্যাগ করে দ্বারকায় দেশান্তরিত হতে হয়েছিল।

কৃষ্ণ কৌশলে রাজর্ষি মুচুকুন্দের হাতে কালযবনকে বধ করালেন মথুরারই অদূরে। জরাসন্ধের কৌশল আবারও ব্যর্থ হল।

[হরিবংশ পু. ২.৫৩-৫৪ অধ্যায় সম্পূর্ণ; ভাগবত পু. ১০.৫০.৪৪-৪৭; ১০.৫১.১-৬৪; বিষ্ণু পু. ৫.২৩.১-৪৫]

☐ জরাসন্ধ বার বার ব্যর্থ হয়ে লজ্জিত হয়ে রইলেন প্রাথমিকভাবে। কালযবনের মৃত্যুর পর আরও একবার জরাসন্ধ কৃষ্ণকে রাজনৈতিকভাবে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন। উপলক্ষ বিদর্ভ দেশের রাজকন্যা রুক্মিণীর দ্বিতীয় বারের স্বয়ম্বর সভা। রুক্মিণী ইতিমধ্যেই মনে মনে কৃষ্ণকে স্বামিত্বে বরণ করেছেন। কৃষ্ণ অবশ্য প্রথমদিকে রুক্মিণী নয়, অনেক বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁর বিবাহকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া রাজনৈতিক আবর্তে অংশগ্রহণ করতে। সুতরাং যেকোনো প্রকারে কৃষ্ণকে রুক্মিণী লাভ থেকে বঞ্চিত করতে উদ্যোগী হলেন জরাসন্ধ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চেদিরাজ শিশুপাল জরাসন্ধের পুত্রপ্রতিম। হরিবংশের বর্ণনানুযায়ী জরাসন্ধ নিজেই আহ্বায়ক হয়ে শিশুপাল ও রুক্মিণীর বিবাহ সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। তাঁর আহ্বানেই উত্তর-পূর্বে তথা উত্তর ও মধ্যভারতের নরপতিরা এই বিবাহানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে একত্রিত হয়েছিলেন বিদর্ভের রাজধানী কুণ্ডিনপুরে। জরাসন্ধের ধারণা ছিল রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক ও ভাই রুক্মী উভয়েই তাঁর অনুগামী এবং কৃষ্ণবিদ্বেষীও বটে। সুতরাং অতি সহজেই জরাসন্ধের ইচ্ছাপূরণ হবে।

[হরিবংশ পু. ২.৫৯.১-২৪]

☐ শিশুপালও জরাসন্ধের প্রশ্রয়ে বৃষ্ণিদের বিরুদ্ধে নানা কাজ করেছেন। কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা সুবিদিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শিশুপালের মাতা শ্রুতশ্রবা আবার বসুদেবের বোন, অর্থাৎ কৃষ্ণও শিশুপাল কৃষ্ণের আপন পিসতুতো ভাই।

[হরিবংশ পু. ২.৫৯.২৬]

☐ জরাসন্ধের উদ্যোগে শিশুপাল ও রুক্মিণীর বাগ্‌দান পর্ব সমাধা হওয়ার পর বিবাহ উৎসবের জন্য সবান্ধবে সকলে বিদর্ভ রাজ্যের দিকে রওনা দিলেন। পিসীমা শ্রুতশ্রবার সম্মানে কৃষ্ণ-বলরামও সেখানে উপস্থিত হলেন।

মহাভারতের সভাপর্বে কৃষ্ণকে বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের বিষয়ে আক্ষেপ করতে দেখা যায়।

ভীষ্মক ভোজ বংশেরই মানুষ অথচ স্ববংশের ক্ষতি করেই তিনি জরাসন্ধের অনুগামী—এটিই কৃষ্ণের ক্ষোভের কারণ।

[মহা (k) ২.১৪.২১-২৪; (হরি) ২.১৪.২১-২৪; হরিবংশ পু. ২.৫৯.২৮-৩১]

□ রুক্মিণীরই অনুরোধে কৃষ্ণ কুণ্ডিনপুরের অদূরে অবস্থিত দেবালয় থেকে তাঁকে হরণ করেন। বলরাম, সাত্যকি, অক্রূর প্রভৃতিকে আসন্ন আক্রমণ প্রতিহত করার দায়িত্ব দিয়ে কৃষ্ণ রুক্মিণীকে নিয়ে রওনা হলেন দ্বারকা অভিমুখে। জরাসন্ধের নেতৃত্বে শিশুপাল, দন্তবক্র প্রমুখরা তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধে এঁরা যদু-বৃষ্ণিদের কাছে পরাজিত হন। ভীষ্মকপুত্র রুক্মী কৃষ্ণের কাছে পরাস্ত হয়ে রাজত্যাগ করেন।

রুক্মিণী-হরণের ঘটনাকে জরাসন্ধের ক্ষমতা ও প্রভাবের বিরুদ্ধে কৃষ্ণের বজ্রনির্ঘোষই বলা যায়। জরাসন্ধ যে অতীতের অপসৃয়মান ছায়া হয়ে উঠতে চলেছেন, সে ইঙ্গিত এই ঘটনার মধ্যে লুকিয়ে ছিল।

[হরিবংশ পু. ২.৫৯.৪৩-৮১; ২.৬০.১-৩৩]

□ রুক্মিণী হরণের পর মহাকাব্যের পাতায় জরাসন্ধকে আবার খুঁজে পাওয়া যায় দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার প্রসঙ্গে। ধৃষ্টদ্যুম্নের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, জরাসন্ধ তাঁর তিন পুত্র সহদেব, জয়ৎসেন ও মেঘসন্ধিকে নিয়ে দ্রুপদের রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

অন্যান্য বহু ক্ষত্রিয় পুরুষের মত জরাসন্ধও লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করতে চেয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে জরাসন্ধ প্রায় ভীষ্মের সমসাময়িক। সেই নিরিখে বিচার করলে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের সময় তিনি বৃদ্ধ।

দ্রুপদের রাজসভায় বহু শক্তিমান রাজার মধ্যে বৃদ্ধ জরাসন্ধ গিয়ে দাঁড়ালেন বিশাল ধনুকে গুণারোপ করতে। ধনুক তোলার চেষ্টা মাত্রই প্রত্যাঘাতে সভা মধ্যে হাঁটু মুড়ে পড়ে গেলেন মগধরাজ। তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব ইতিমধ্যেই অস্তমিত। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে বল-বীর্য্যও যেন জনসমক্ষে জরাসন্ধকে ত্যাগ করল। ক্লান্ত, আত্মগ্লানিতে মূহ্যমান জরাসন্ধ আর অপেক্ষা করেননি। পতন মাত্রই সভাত্যাগ করে মগধে ফিরে গেছেন। *[মহা (k) ১.১৮৬.৮; ১.১৮৭.২৬-২৭; (হরি) ১.১৭৯.৮; ১.১৮০.২৬-২৭]*

□ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার পর মহাভারতে জরাসন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায় যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ প্রসঙ্গে। তবে সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে মহাকাব্যে উল্লিখিত জরাসন্ধ সংক্রান্ত অন্যান্য কিছু তথ্য দেখে নেওয়া প্রয়োজন। যেমন—

কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যার স্বয়ংবরে মগধরাজ জরাসন্ধ উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে অঙ্গরাজ কর্ণের সঙ্গে তাঁর প্রবল যুদ্ধ হয়। দুই রথীই দীর্ঘ সময় যুদ্ধ করে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ঠিক সেই সময় বুদ্ধিমান কর্ণ জরাসন্ধের দেহের সেই স্থানটিতে আঘাত করতে উদ্যত হন, যেস্থানটি জরারাক্ষসীর দ্বারা সংযোজিত হয়েছিল। জরাসন্ধ বিপদ বুঝে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ান। কর্ণের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তিনি অঙ্গদেশের মালিনীনগরীটি তাঁকে উপহার দেন। পরবর্তীকালে জরাসন্ধের অনুগ্রহে কর্ণ চম্পানগরীর শাসন ক্ষমতাও লাভ করেছিলেন।

[মহা (k) ২.৪৪.১১; ১২.৫.১-৭; (হরি) ২.৪৩.১১; ১২.৫.১-৭]

□ কৃষ্ণের পত্নী তথা মদ্র দেশের রাজকন্যা লক্ষণার স্বয়ম্বর সভাতেও জরাসন্ধ উপস্থিত ছিলেন। তিনি লক্ষণার পাণিগ্রহণের পূর্বশর্তরূপে ধনুর্বাণদ্বারা বিশেষ লক্ষ্যভেদে বিফল হন।

[ভাগবত পু. ১০.৮৩.২৩]

□ জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথ দেবরাজ ইন্দ্রের সখা। ইন্দ্র বৃহদ্রথকে একটি মনোহর রথ উপহার দেন। বৃহদ্রথের পরে সেই রথটি লাভ করেন জরাসন্ধ। জরাসন্ধবধের পর রথটি ভীম কৃষ্ণকে উপহার দিয়েছিলেন। *[বায়ু পু. ৯৩.২৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৬৮.২৭-২৮]*

□ মহাভারতের দ্রোণপর্বে জরাসন্ধের সৃষ্টিকর্ত্রী অর্থাৎ জরা রাক্ষসীর একটি কাহিনী পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে, বলরামের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে জরাসন্ধ একবার ইন্দ্রের বজ্রের মত শক্তিশালী একটি গদা নিক্ষেপ করেন। বলরাম গদাটিকে চূর্ণ করার জন্য স্থূণাকর্ণ নামে একটি অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। বলরামের অস্ত্রে প্রতিহত হয়ে গদাটি প্রচণ্ড শব্দে মাটিতে পড়েছিল। সেই গদার আঘাতে জরাসন্ধের সৃষ্টিকর্ত্রী জরা রাক্ষসী সপরিবার এবং সবান্ধবে নিহত হন।

দ্রোণপর্বের এই কাহিনীর শেষে বলা হয়েছে বজ্রতুল্য গদাটি হারিয়ে জরাসন্ধের যথেষ্ট

শক্তিক্ষয় হয়েছিল। গদাহীন অবস্থায় ভীমসেনের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ফলেই জরাসন্ধকে নিহত হতে হয়েছিল— এমন ইঙ্গিত মহাভারতে পাওয়া যায়।

[মহা (k) ৭.১৮১.১২-২০;
(হরি) ৭.১৫৫.৪০-৪৮]

□ প্রবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধের মৃত্যু কীভাবে ঘনিয়ে এল, সেটা বোঝার জন্য যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বার্তী মন্ত্রণাসভায় সভায় যেতে হবে। কৃষ্ণ পাণ্ডবদের আমন্ত্রণে যজ্ঞের পূর্বে এসে উপস্থিত হলেন ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির স্বভাবতই যজ্ঞবিষয়ে কৃষ্ণের মতামত জানতে চাইলেন। রাজসূয় যজ্ঞকারী রূপে যুধিষ্ঠিরের যোগ্যতা সম্পর্কে কৃষ্ণের কোনো সন্দেহ নেই তবে জরাসন্ধের জীবিতাবস্থায় এই যজ্ঞের কার্যকারিতা বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সন্দিহান। কারণ রাজসূয় যজ্ঞকারী রাজা সম্রাট আখ্যায় ভূষিত হন। তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি নিজ রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্য নৃপতিরাও সেই যজ্ঞকারী রাজার আধিপত্য স্বীকার করে নেন। কৃষ্ণ বললেন—যতদিন মগধরাজ জরাসন্ধ বেঁচে রয়েছেন, ততদিন পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এবার কৃষ্ণ জরাসন্ধ বিষয়ে নানা তথ্য যুধিষ্ঠিরকে দিলেন। জরাসন্ধ অন্যান্য ক্ষত্রিয় নরপতিদের বশ করে সমগ্র মধ্যভারত শাসন করছেন। তাঁর আচরণ ও আধিপত্য প্রকৃতই সম্রাটসুলভ। উত্তর, মধ্য ও পূর্ব ভারতের বেশিরভাগ রাজাই তাঁর অনুরক্ত। কৃষ্ণ আরও জানালেন যে, বিরুদ্ধাচারী নৃপতিদের জরাসন্ধ মগধের রাজধানী গিরিব্রজপুরে বন্দি করে রেখেছেন। মহাদেবকে আরাধনায় তুষ্ট করে জরাসন্ধ বন্দি রাজপুরুষদের উৎসর্গ করে পুরুষমেধযজ্ঞের পরিকল্পনা করেছেন। তিনি বলপূর্বক অন্যান্য রাজাদের থেকে কর গ্রহণ করেন। যজ্ঞে বলিদানের জন্য জরাসন্ধ ইতিমধ্যেই ছিয়াশিজন রাজাকে বন্দি করেছেন। আর মাত্র চোদ্দজন নৃপতিকে বন্দি করতে পারলেই পুরুষমেধযজ্ঞ শুরু হবে এবং সেই একশত রাজাকে যজ্ঞে বলি দিতে পারলেই জরাসন্ধ অজেয় হয়ে যাবেন। যদু-বৃষ্ণিদের সঙ্গে জরাসন্ধের শত্রুতার ইতিবৃত্তও কৃষ্ণ বিস্তারিতভাবে যুধিষ্ঠিরের কাছে ব্যক্ত করলেন। স্পষ্টভাষায় কৃষ্ণ বুঝিয়ে দিলেন যে, একমাত্র জরাসন্ধকে জয় করতে পারলেই অন্য রাজাদের জয় করা সহজ হয়ে যাবে এবং তাতেই সম্রাটের পদবী লাভ করা সম্ভব হবে—

প্রাপ্নুয়াৎ স যশো দীপ্তং তত্র যো বিঘ্নমাচরেৎ।
জয়দ্‌যশ্চ জরাসন্ধং স সম্রাড্ নিয়তং ভবেৎ॥

[মহা (k) ২.১৪-১৫ অধ্যায় সম্পূর্ণ;
(হরি) ২.১৪-১৫ অধ্যায় সম্পূর্ণ;
ভাগবত পু. ১০.৭১.২-৪]

□ কৃষ্ণ জানতেন, সম্মুখ সমরে জরাসন্ধবধের চেষ্টা করে বিশেষ লাভ হবে না। সেজন্য ভীম ও অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে কৌশলে জরাসন্ধকে হত্যা করতে হবে। এই পরিকল্পনা তিনিই ব্যক্ত করেন। ছদ্মবেশে শত্রুর গৃহে প্রবেশ করে তাঁকে একাকী আক্রমণ করার নীতিও কৃষ্ণেরই পরামর্শ।

[মহা (k) ২.১৭.৭-১৭; (হরি) ২.১৭.৭-১৭]

□ কৃষ্ণের পরামর্শে ভীম ও অর্জুনের সাহচর্যেই একত্রে জরাসন্ধবধের কৌশল স্থির করা হল। ঠিক হল—তাঁরা তিনজনেই এক এক করে জরাসন্ধকে একক যুদ্ধে আহ্বান করবেন। কৃষ্ণ জরাসন্ধকে সম্যক জানেন বলেই তাঁর এই ধারণা ছিল যে, তিনজনের আহ্বানে অন্ততঃ একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে জরাসন্ধ সম্মত হবেন। আর ভীম যেহেতু কৃষ্ণ ও অর্জুনের তুলনায় আকার-আকৃতিতে অনেক বেশি বলশালী, তাই জরাসন্ধ অবশ্যই দ্বিতীয় পাণ্ডবকেই মল্লযুদ্ধের প্রতিপক্ষ হিসেবে বেছে নেবেন। ভীম এরপর জরাসন্ধকে বধ করবেন।

[মহা (k) ২.২০.১-৬; (হরি) ২.১৯.১-৬]

□ যুধিষ্ঠিরের সম্মতি নিয়ে কৃষ্ণ, ভীম এবং অর্জুন স্নাতক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে মগধের দিকে যাত্রা করলেন। বহু পথ অতিক্রম করে তাঁরা মগধের রাজধানী গিরিব্রজপুরে এসে উপস্থিত হলেন। সে সময় জরাসন্ধ কোনো এক যজ্ঞানুষ্ঠানের কারণে ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করছিলেন। ব্রত-উপবাসেই দিনের অধিকাংশ সময় তিনি অতিবাহিত করতেন। স্নাতক ব্রাহ্মণ রাজদর্শন প্রার্থী হয়ে এলে জরাসন্ধ গভীর রাত্রেও তাঁদের ফেরাতেন না—তাঁর এই সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত ছিল। সে কথা স্মরণে রেখে কৃষ্ণ এবং ভীমার্জুন মধ্যরাত্রে জরাসন্ধের সাক্ষাৎপ্রার্থী

হয়ে অন্তঃপুরে উপস্থিত হলেন। ছদ্মবেশের কারণে মগধরাজ তাঁদের প্রকৃত পরিচয় বুঝতে পারেননি ঠিকই তবে চেহারা দেখে এঁরা যে সামান্য মানুষ নন তা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। তাঁদের তিনজনের দেহেই অনুলেপন ও মালা, হাতে ধনুকের জ্যা-আকর্ষণের চিহ্ন স্পষ্ট অথচ বেশভূষা ব্রাহ্মণের—এ সব অভিজ্ঞ জরাসন্ধের চোখ এড়িয়ে যায়নি। তিনি কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে তাঁদের প্রকৃত পরিচয় জানতে চাইলেন। এছাড়াও গিরিব্রজপুরে পৌঁছানোর জন্য তাঁরা চৈত্যক পর্বত পার হয়েছেন—একাজ সাধারণ ব্রাহ্মণের হতে পারে না, তাও জরাসন্ধ জানেন। এছাড়াও লক্ষণীয় বিষয় হল, ব্রাহ্মণজ্ঞানে জরাসন্ধের অর্পণ করা পাদ্য, অর্ঘ্য ইত্যাদি এই তিন পুরুষ গ্রহণ করেননি। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কৃষ্ণ বলেছেন শত্রুর পূজা তাঁরা গ্রহণ করেন না।

কৃষ্ণের কথায় জরাসন্ধের আর বুঝতে বাকি রইল না যে, এঁরা প্রকৃতই ক্ষত্রিয়। তবে শত্রুতার কারণ সম্পর্কে তিনি তখনও সম্পূর্ণ অন্ধকারে। কৃষ্ণ একে একে জরাসন্ধের কাছে তাঁর অপরাধ বর্ণনা করতে লাগলেন। তিনি ক্ষত্রিয় নৃপতিদের বন্দি করে রেখেছেন, পুরুষমেধযজ্ঞে তাঁদের বলিদানের পরিকল্পনা করেছেন, ক্ষত্রিয়দের প্রতি জরাসন্ধের ব্যবহার পশুসুলভ। সুতরাং ক্ষত্রিয়দের অস্তিত্ব রক্ষার্থেই তাঁকে বধ করা প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। যেহেতু ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু যুদ্ধক্ষেত্রেই হওয়া শ্রেয় সেহেতু কৃষ্ণ জরাসন্ধকে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। নিজেদের প্রকৃত পরিচয়ও প্রকাশ করলেন। শর্ত একটাই—হয় সমস্ত বন্দি ক্ষত্রিয় রাজপুরুষদের মুক্তি, নয়তো যুদ্ধ।

[মহা (k) ২.২১.১-৫০; ২.২২.১-৬; (হরি) ২.২০.১-৫০; ২.২১.১-২৬; ভাগবত পু. ১০.৭২.১৫-২৭]

□ জরাসন্ধ যুদ্ধের ব্যাপারে সম্মত হবেন এটাই স্বাভাবিক। তিনি কোনো মূল্যেই বিজিত বন্দি রাজাদের মুক্তি দিতে সম্মত নন। ভয় ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয় সুতরাং জরাসন্ধ এককভাবে বা সসৈন্য সংগ্রামে প্রস্তুত। তিনি একা কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুনের সঙ্গে একত্রে বা তিনজনের সঙ্গেই পৃথক পৃথকভাবে অথবা যে কোনো একজনের বিরুদ্ধে মল্লযুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলেন।

জরাসন্ধ হয়তো এই যুদ্ধে মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখেছিলেন। সে কারণেই যুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করা মাত্রই পুত্র সহদেবকে মগধ রাজসিংহাসনের উত্তরসূরী নির্বাচিত করেন। একই সঙ্গে মহাযোদ্ধা কৌশিক ও চিত্রসেনকে দেশের সামরিককার্য প্রধান রূপে স্বীকৃতি দেন।

মহাভারতের সভাপর্বে বলা হয়েছে যে, জরাসন্ধের যুদ্ধ আহ্বান শুনে কৃষ্ণ স্থির করলেন—তিনি এককভাবে মগধরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন না। তাঁর মনে হয়েছিল জরাসন্ধ যাদবদের অবধ্য।

[মহা (k) ২.২২.২৭-৩৬; (হরি) ২.২১.২৭-৩৬; ভাগবত পু. ১০.৭২.২৮-৩১]

□ কৃষ্ণ জানতেন একক আহ্বান পেলে জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে চাইলেন। বাস্তবে তাই হল। শুরু হল ভীম ও জরাসন্ধের প্রবল মল্লযুদ্ধ। তবে ভাগবত পুরাণের মতে ভীম ও জরাসন্ধের মধ্য মল্লযুদ্ধ নয়, গদাযুদ্ধ হয়েছিল। মত্ত হস্তির মত দুই মহাবল পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। তাঁরা একে অপরের বিরুধে পূর্ণচক্র, তৃণপীড়, কাল, মুষ্টি ইত্যাদি মল্লযুদ্ধের নানা কৌশল প্রয়োগ করতে লাগলেন। নগরবাসীরা এই ভীষণ যুদ্ধ দেখতে সমবেত হলেন। ত্রয়োদশী তিথিতে শুরু হয়ে যুদ্ধ যখন চতুর্দশীর দিন রাত্রে পৌঁছাল, তখন জরাসন্ধ ঈষৎ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তখন কৃষ্ণ কৌশলে ভীমের কাছে গিয়ে বললেন—জরাসন্ধ ক্লান্ত হয়েছেন। তাঁকে একটু ধীরে আঘাত করো। আসলে কৃষ্ণ মুখে যাই বলুন ভীমকে ঠিক বিপরীত বার্তাই দিতে চাইছেন। অর্থাৎ জরাসন্ধ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এটিই তাঁকে বধ করার উৎকৃষ্ট সময়। ভীমসেন কৃষ্ণের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে উত্তরে বলেছিলেন —যদু-বৃষ্ণিবান্ধবদের প্রতি জরাসন্ধ যে ব্যবহার করেছেন, সেজন্যই কৃষ্ণের তাঁকে অনুগ্রহ দেখানো অনুচিত। মনে রাখা দরকার, যুদ্ধ হচ্ছে জরাসন্ধের নিজ রাজধানীতে তাঁরই প্রজাদের সামনে। ফলে পারিপার্শ্বিকতার বিচারে কৃষ্ণের পক্ষে জরাসন্ধবধের বার্তা ভীমকে উচ্চস্বরে দেওয়া সম্ভব ছিল না।

কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম ক্লান্ত জরাসন্ধকে দুই হাতে তুলে একটানা ঘোরাতে লাগলেন। একশোবার ঘুরিয়ে সজোরে তাঁকে মাটিতে নিক্ষেপ করলেন।

তারপর প্রবল আঘাতে জরাসন্ধের পিঠের হাড় ভেঙে তাঁকে বধ করলেন।

[মহা (k) ২.২৩.৬-৩৪; ২.২৪.১-৭; (হরি) ২.২২.৬-৩৪]

☐ তবে ভাগবত পুরাণে জরাসন্ধবধের উপাখ্যানটি বেশ একটু অন্য স্বাদে পরিবেশিত হয়েছে। যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞ করার কথা চিন্তা করছেন—একথা যখন কৃষ্ণ জানতে পারলেন, তখন ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্দেশে যাত্রা করার আগে কৃষ্ণ যদু-বৃষ্ণিদের এক জরুরি সভা ডাকলেন। সেই সভায় বৃষ্ণিদের অন্যতম বিচক্ষণ মন্ত্রী উদ্ধবই প্রথম ব্যাখ্যা করেন যে, জরাসন্ধ বেঁচে থাকতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়া এক কথায় অসম্ভব। জরাসন্ধকে গিরিব্রজনগরে গিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে বধ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। উদ্ধবের এই পরামর্শ যে কৃষ্ণ সাদরে গ্রহণ করেছিলেন মহাভারতে এবং পুরাণে বর্ণিত জরাসন্ধবধের বিবরণই তার প্রমাণ। যাইহোক, পরিকল্পনা অনুযায়ী যথারীতি কৃষ্ণ ভীম এবং অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজপুরে গিয়ে পৌঁছালেন স্নাতক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে। ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে জরাসন্ধ ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। কোনো ব্রাহ্মণ প্রার্থী হয়ে তাঁর কাছে এলে কখনো খালি হাতে ফিরতেন না। কৃষ্ণ-ভীম-অর্জুনও ব্রাহ্মণ যাচকের মতো জরাসন্ধের সামনে এসে দাঁড়ালেন। জরাসন্ধ তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে তাঁরা বললেন—রাজা! আপনার কল্যাণ হোক। আমরা বহুদূর থেকে প্রার্থী হয়ে আপনার কাছে এসেছি। দানবীর, দয়াবান রাজা হিসেবে আপনি বিখ্যাত। আমাদের প্রার্থনাও আপনি পূরণ করুন।

জরাসন্ধ ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেন—এঁরা প্রার্থী সেজে ব্রাহ্মণের বেশে এসেছেন বটে, কিন্তু এঁদের আকার আকৃতি ক্ষত্রিয়ের মতো। হাতে ধনুকের গুণের দাগ। মুখগুলিও কেমন চেনা চেনা যেন। জরাসন্ধ ভাবতে লাগলেন—এরা ক্ষত্রিয় তো বটেই। তবে বোধহয় আমার ভয়েই ব্রাহ্মণ সেজে এসেছে। ভাগবত পুরাণে দেখা যাচ্ছে জীবনের অন্তিমলগ্নে এসে জরাসন্ধের মনে কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তির সঞ্চার হয়েছে। তিনি চিন্তা করছেন—এরা ক্ষত্রিয়ই হোক আর যাই হোক—ভিক্ষা চাইতে যখন এসেছে, তখন ভিক্ষা আমি অতি অবশ্যই দেব। স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুও বামনরূপে ব্রাহ্মণের বেশে এসেই ভিক্ষা হিসেবে বলি রাজার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ত্রিলোক গ্রহণ করেছিলেন। এমনকী বলিকে আবদ্ধও করেছিলেন। কিন্তু তাতে বলির কোনো ক্ষতি তো হয়নি। দৈত্যরাজ বলির কীর্তি, যশ আজও অমর হয়ে আছে। যেমন এদের দেখামাত্রই আমি বুঝেছি যে এরা ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয়—বলি রাজাও তো নারায়ণকে দেখামাত্রই চিনেছিলেন। তবু দান করার সময় পিছিয়ে আসেননি। সম্পূর্ণ জগৎ সংসার তিনি নারায়ণকে দান করেছিলেন। জরাসন্ধ এই মুহূর্তে সাম্রাজ্য, সম্রাট হবার লোভ, জাগতিক ভোগ-ঐশ্বর্য্যের ভাবনা ত্যাগ করে চিন্তা করেছেন—এই মানব শরীর তো নশ্বর। একদিন না একদিন এতে মৃত্যু আসবেই। সেক্ষেত্রে জীবদ্দশায় যদি যশলাভ না করলাম, যদি ক্ষত্রিয় হয়ে জন্মেও প্রার্থী ব্রাহ্মণের (সে যতই ছদ্মবেশী হোক না কেন) প্রার্থনা পূরণ না করলাম, তাহলে আর বেঁচে থেকে কী লাভ?

এত সব ভাবনাচিন্তা করে জরাসন্ধ ছদ্মবেশধারী কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন— বলুন, আপনারা কী চান? আপনারা যা চাইবেন, আমি তা অবশ্যই দেব। তখন কৃষ্ণ আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন—আমরা আপনার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চাই। আমাদের মধ্যে কোনো একজনকে আপনি দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য বেছে নিন। জরাসন্ধ ভীমকে বেছে নিলেন। ভাগবত পুরাণে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী, দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় প্রথমে ভীম এবং জরাসন্ধের মধ্যে গদাযুদ্ধ আরম্ভ হল। তারপর শুরু হল মল্লযুদ্ধ, এবং ভাগবত পুরাণ জানিয়েছে যে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ নাকি পুরো সাতাশ দিন ধরে চলেছিল। সাতাশ দিন ধরে যুদ্ধ করতে করতে জরাসন্ধ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, সেইসময় কৃষ্ণ বুঝলেন, জরাসন্ধকে বধ করার একমাত্র উপায় হল ঠিক যেভাবে দুই অর্ধ জোড়া দিয়ে তাঁর জন্ম হয়েছিল, অনুরূপ ভাবে তাঁর শরীর দুভাগে চিড়ে ফেলা। কৃষ্ণ তখন একটা গাছের ডাল হাতে নিয়ে তাকে দৈর্ঘ্য বরাবর দুভাগে চিড়ে ফেলতে ফেলতে ভীমকে ইশারা করলেন। ভীম সেই ইঙ্গিতের অর্থ বুঝে যুদ্ধক্লান্ত জরাসন্ধের দু-পা ধরে তাঁর শরীর দু-ভাগে চিড়ে ফেললেন। এইভাবে জরাসন্ধের মৃত্যু হল।

[ভাগবত পু. ১০.৭২.৩২-৪৭]

□ জরাসন্ধের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই রথে চেপে কৃষ্ণ, ভীম এবং অর্জুন মগধরাজের বন্দি করা নৃপতিদের মুক্ত করে গিরিব্রজনগর থেকে নির্গত হলেন। কারামুক্ত রাজারা শাস্ত্রানুযায়ী কৃষ্ণের স্তুতি করতে লাগলেন। জরাসন্ধপুত্র সহদেব প্রচুর ধন-রত্ন নিয়ে কৃষ্ণকে আদর করলেন। কৃষ্ণের অনুগ্রহেই মগধের সিংহাসনে সহদেবের অভিষেকানুষ্ঠান সমাধা হল। ভীম ও অর্জুনও তাঁর সখ্যতা গ্রহণ করলেন।

[মহা (k) ২.২৪.১০-৪৩; (হরি) ২.২৩.১০-৪৩; ভাগবত পু. ১.১৫.৯; ৯.২২.৯; ভাগবত পু. ১০.৭২.৪৬-৩৮; ১০.৭৩.৩১]

□ অবশ্য সহদেব জরাসন্ধের জ্যেষ্ঠ পুত্র নন। মহাভারতের কর্ণপর্ব থেকে জানা যায় জরাসন্ধের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম অদৃঢ়। জরাসন্ধের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্ররা সম্ভবত নিজ নিজ মত অনুযায়ী বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যান। এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ—মগধরাজ সহদেবের পাণ্ডব সখ্যতার বিপরীতে অদৃঢ় প্রভৃতির কৌরব শিবিরে উপস্থিতি। জ্যেষ্ঠপুত্র হওয়া সত্ত্বেও সিংহাসনের অধিকার না পাওয়ার ক্ষোভেই অদৃঢ় ইত্যাদিকে সহদেবের বিপক্ষ শিবিরে দেখা যায়। *[দ্র. অদৃঢ়]*

[মহা (k) ৮.৭.১৮; হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে শ্লোকটি পাওয়া যায় না]

জরাসন্ধ২ ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর একশো পুত্রের মধ্যে একজনের নাম।

[মহা (k) ১.১১৭.৮; (হরি) ১.১১১.৮]

জরাসন্ধেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। সম্ভবত শিবভক্ত মগধরাজ জরাসন্ধ এইস্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই তাঁর নামানুসারেই এখানে ভগবান শিব জরাসন্ধেশ্বর নামে পূজিত হন।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচনকাণ্ড) পৃ. ১১৫]

জরিতা মহর্ষি মন্দপালের পত্নী একটি খঞ্জন পাখির নাম জরিতা। ইনি পুরাকালে খাণ্ডব বনে বাস করতেন। পুত্র সন্তানের অভাবে মন্দপালের জন্য পিতৃলোকের প্রবেশদ্বার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনুপায় মন্দপাল তখন নিজে খঞ্জন পাখির রূপ ধরে সন্তানলাভের উদ্দেশে জরিতা নামে এক খঞ্জন পক্ষিণীর সঙ্গে মিলিত হলেন। জরিতার গর্ভে যখন মন্দপালের চার বেদপারঙ্গম পুত্র অণ্ডরূপে আবির্ভূত হয়েছে তখনই ঋষি তাঁদের পরিত্যাগ করে লপিতা নামে অপর এক খঞ্জনপক্ষিণীর অনুরাগী হয়ে পড়েন।

মন্দপাল জন্মের পূর্বেই সন্তানদের ত্যাগ করলেও জরিতা মাতৃস্নেহে তাঁদের ত্যাগ করতে অসমর্থ হন। একদা অগ্নিদেব খাণ্ডববন দগ্ধ করছেন দেখে মন্দপাল নিজ পুত্রদের প্রাণ রক্ষার জন্য স্তব করে অগ্নিকে তুষ্ট করেন। অগ্নি মন্দপালকে বলেন যে, তিনি সমগ্র খাণ্ডববন দগ্ধ করলেও তাঁর পুত্রদের পরিত্রাণ করবেন।

এদিকে জরিতা অগ্নির প্রাবল্য দেখে ভীত। তাঁর শাবকগুলি এখনও নিতান্তই শিশু। তাঁদের ডানা নেই। ফলে অন্যত্র উড়ে গিয়ে নিজেদের প্রাণরক্ষা করতে তাঁরা অক্ষম। অথচ জরিতার পক্ষেও তাঁদের ত্যাগ করা অসম্ভব। এমন পরিস্থিতিতে জরিতা শাবকদের আবৃত করে নিজেও তাঁদের সঙ্গে দগ্ধ হবেন বলে স্থির করেন। শাবকরা অবশ্য এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত হননি। তাঁদের যুক্তি হল জরিতা জীবিত থাকলে তাঁরই মাধ্যমে তাঁদের পিতৃবংশ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সুতরাং জরিতার উচিত অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে গমন। জরিতা পুত্রদের প্রাণরক্ষার অপর কোনো উপায় না দেখে শাবকগুলিকে নিকটবর্তী একটি পরিত্যক্ত ইঁদুরের গর্তে প্রবেশ করে আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করতে বলেন। ইতর শ্রেণীর প্রাণী বিশেষের আক্রমণ নিহত হওয়ার থেকে অগ্নিদগ্ধ হয়ে স্বর্গলাভ শ্রেয়—এই যুক্তিতে তাঁরা জরিতার কথা অমান্য করেন। বহু তর্ক-বিতর্কের পর জরিতা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে চার শাবককে ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। *[মহা (k) ৩.২২৯-২৩১ অধ্যায় সম্পূর্ণ; (হরি) ৩.২২২-২২৪ অধ্যায় সম্পূর্ণ]*

□ জরিতা ও মন্দপালের শাবক পুত্রগুলির নাম জরিতারি, সারিসৃক্ক, স্তম্বমিত্র ও দ্রোণ।

জরিতা পুত্রদের অনুরোধে অগ্নি শিখার সামনে তাঁদের পরিত্যাগ করে যেতে বাধ্য হলেও আগুন নির্বাপিত হলে তিনি আবার তাঁদের সন্ধানে ফিরে আসেন। অবাক হয়ে দেখেন তাঁর পুত্রেরা আগুন থেকে সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছে। পুত্রেরাও সাদরে জরিতাকে সম্মান দেখান। ইতিমধ্যে মন্দপালও সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বারবার জরিতা ও পুত্রদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা কেউই মন্দপালের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন

না। তাঁদের মনের কথা বুঝতে পেরে মন্দপাল তখন নিজের আচরণের জন্য জরিতা ও চার পুত্রের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাঁদের জানান যে, মন্দপালই লোকপাল অগ্নির কাছে পুত্রদের প্রাণরক্ষার জন্য স্তব করেছিলেন। পুত্রদের ঋষিত্বের পরিচয় পেয়েই অগ্নি তাঁদের দগ্ধ করেননি। এই সমস্ত কথা প্রকাশ করে মন্দপাল স্ত্রী জরিতা ও পুত্রদের নিয়ে খাণ্ডববন ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে চলে যান।

[মহা (k) ৩.২৩২-২৩৪ অধ্যায়.৪;
(হরি) ৩.২২৫-২২৭ অধ্যায়.৪]

জরিতারি মন্দপাল ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠপুত্র।

[মার্কণ্ডেয় পু. ২.৩২]

জর্জরাননা স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.১৯; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ১৯ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

জর্তিক বাহীকদেশের একটি জনজাতি। মহাভারতের কর্ণপর্বে অঙ্গরাজ কর্ণ ও মদ্ররাজ শল্যের এক দীর্ঘ বচসার বর্ণনা পাওয়া যায়। সেই বচসার সময় কর্ণ বহুতর হীনদেশ ও জনজাতির কথা বিশদে উল্লেখ করেছিলেন। সেই জনজাতিগুলির মধ্যে জর্তিক অন্যতম। কর্ণ পর্বের একটি শ্লোকে জর্তিকদের অত্যন্ত নিন্দিত চরিত্র বলা হয়েছে—

জর্তিকা নাম বাহীকাস্তেষাং বৃত্তং সুনিন্দিতম্॥

[মহা (k) ৮.৪৪.১০; (হরি) ৮.৩৪.৭০]

□ বাহীক জাতির অন্তর্গত একটি সম্প্রদায় জর্তিক। মহাভারতের সামগ্রিকভাবে বাহীক ও তাঁদের শাখা সম্প্রদায় জর্তিকদের যেসব বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণিত হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ—

এঁরা খই সহযোগে গুড়জাত মদ, গোমাংস, বরাহ, কুক্কুট, গর্দভ ইত্যাদি এবং অন্যান্য বিকৃত খাদ্য গ্রহণ করেন। জর্তিক স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই প্রবল পানাসক্ত। রমণীরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বিবস্ত্রা হয়ে অসংযত আচরণ করেন। অশ্বতর সেখানে যানবাহনরূপে ব্যাবহৃত হয়। বাহীকদেশের অধিবাসীরা ব্যাভিচারী এবং সংস্কারহীন। দেবতা, ব্রাহ্মণ বা পিতৃলোকবাসীরা বাহীকদের দান গ্রহণ করেন না। প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিকভাবেই বাহীকগণ পিশাচ যোনিজাত। সেদেশে ধর্ম সম্পূর্ণই বিপর্যস্ত।

[দ্র. বাহীক]

[মহা (k) ৮.৪৪.১১-৪২; (হরি) ৮.৩৪.৭০-১০১]

□ মহাভারতের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় প্রাচীনকালে উশীনর দেশ পর্যন্ত প্রায় সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশকেই বাহীক দেশ বলে অভিহিত করা হত। সেদিক থেকে বিচার করলে এই অঞ্চলেই জর্তিক সম্প্রদায়টির বাস ছিল। *[TIM (Mishra) p. 188]*

জলদ মহাভারতের ভীষ্মপর্বে যে পৌরাণিক ভূ-খণ্ড বা বর্ষগুলির কথা উল্লিখিত হয়েছে, শাকদ্বীপ সেগুলির মধ্যে একটি। জলদ এই শাকদ্বীপের অন্তর্গত প্রধান পর্বত বা বর্ষ পর্বতগুলির মধ্যে একটি। এই পর্বতের নিকটেই কুমুদোত্তর বর্ষ অবস্থিত বলে মহাভারতে কথিত হয়েছে।

[মহা (k) ৬.১১.২৫; (হরি) ৬.১১.২৪]

জলধার১ শাকদ্বীপের সপ্ত পর্বতের অন্যতম। বিষ্ণু পুরাণ এই পর্বতকে জলাধার নামে চিহ্নিত করেছে। পুরাণ মতে, মেঘবাহন ইন্দ্র বৃষ্টিপাতের জন্য প্রয়োজনীয় জল এই পর্বত থেকেই সংগ্রহ করে থাকেন। শাকদ্বীপের সাতটি ভূমিভাগের মধ্যে অন্যতম সুকুমার নামক ভূখণ্ড বা বর্ষটি এই জলধার পর্বতকে কেন্দ্র করে অবস্থান করছে।

[বিষ্ণু পু. ২.৪.৬২; মৎস্য পু. ১২২.৯, ২০; বায়ু পু. ৪৯.৭৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৯.৮৫-৮৬]

জলধার২ মহাভারতের ভীষ্মপর্বে যে পৌরাণিক শাকদ্বীপের কথা উল্লিখিত হয়েছে, সেই শাকদ্বীপের প্রধান পর্বত বা বর্ষ-পর্বতগুলির মধ্যে জলধার একটি। সুকুমার-বর্ষ জলধার পর্বতের নিকটে অবস্থিত বলে মহাভারতে কথিত হয়েছে।

[মহা (k) ৬.১১.১৬, ২৫; (হরি) ৬.১১.১৬, ২৪]

জলন্ধম *[দ্র. জরন্ধম]*

জলন্ধর১ শিবের অংশ থেকে জাত এক দৈত্য। একদিন ভগবান শিব দেবরাজ ইন্দ্রের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে নিজের তৃতীয় নেত্র হতে জাত দগ্ধ করতে চাইলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি মহাদেবের স্তুতি করে তাঁকে শান্ত করলেন বটে, কিন্তু মহাদেব তাঁর ক্রোধ সংবরণ করার জন্য সেই ক্রোধাগ্নিকে নিক্ষেপ করলেন সমুদ্রের জলে।

মহাদেবের ক্রোধাগ্নি সমুদ্রের জলে পতিত হতেই তা ছোটো একটি বালকের আকার নিল। সেই বালকের ক্রন্দনধ্বনিতে সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হতে লাগল। তখন ব্রহ্মা কৌতূহলবশতঃ সাগর তীরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মাকে দেখে সমুদ্র বললেন যে, এই বালক আমার পুত্র। আপনি এর নামকরণ করুন এবং আমার পুত্রকে রক্ষা

করুন। শিশুটিকে ব্রহ্মা কোলে নিলে সে ব্রহ্মার দাড়ি টেনে ধরল, এর ফলে ব্রহ্মার চোখে জল আসল। বালকের চক্ষু জল ধারণ করল বলে ব্রহ্মা তার নাম রাখলেন জলন্ধর।

ব্রহ্মা সমুদ্রকে বললেন যে, পরবর্তীকালে এই বালক অত্যন্ত শক্তিশালী হবে। একমাত্র মহাদেব ছাড়া অন্য সকল প্রাণীর অবধ্য হবে সে। এমনকী যে-স্থানে তার উৎপত্তি সেই স্থানেই জলন্ধরের বিনাশ হবে বলে ব্রহ্মা জানালেন।

ভগবান ব্রহ্মা একথাও বললেন যে, যথাসময়ে জলন্ধরের সঙ্গে কালনেমি দানবের কন্যা বৃন্দার বিবাহ সম্পন্ন হবে।

জলন্ধর বড়ো হলে শুক্রাচার্য তাকে অসুরদের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করেন। সমুদ্র তাঁর পুত্রের জন্য কালনেমির কাছে বৃন্দাকে প্রার্থনা করেন। বৃন্দার সঙ্গে জলন্ধরের বিবাহ হয়। জলন্ধরও রাজ্য শাসন করতে থাকেন। প্রাচীনকালে দেবতাদের কাছে পরাজিত হয়ে দৈত্যরা পাতাল লোকে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই দৈত্যরা জলন্ধরের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মর্ত্যে বাস করতে লাগলেন। একদিন ছিন্ন মস্তক রাহুকে দেখে জলন্ধর এর কারণ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যকে জিজ্ঞাসা করেন। তখন শুক্রাচার্য সমুদ্র-মন্থনের বিষয়ে জলন্ধরের কাছে বর্ণনা করেন। সমুদ্র মন্থনে সমুদ্র-গর্ভস্থ রত্ন অপহরণ, দেবতাদের জয় ও দৈত্যদের পরাজয়, রাহুর মস্তকছেদন ইত্যাদি ঘটনার কথাও জলন্ধরকে অবগত করান। পিতা সমুদ্রের মন্থনের কথা শুনে জলন্ধর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘস্মর (পদ্মপুরাণ অনুসারে দুর্বারণ) নামে এক দৈত্যকে দূত হিসেবে ইন্দ্রের সভায় প্রেরণ করলেন। দূতের মাধ্যমে জলন্ধর ইন্দ্রকে দুটি কথা বললেন। প্রথমত, কেন তাঁর পিতা সমুদ্রকে শৈল দ্বারা মন্থন করা হয়েছে? দ্বিতীয়ত, সমুদ্র-মন্থনের ফলে উত্থিত সমস্ত রত্নরাজি, যা দেবরাজ ইন্দ্র অপহরণ করেছেন, সেইগুলি যেন তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়।

ইন্দ্র দূতের কথা শুনে বিস্মিত হলেন। তিনিও দূতের মাধ্যমে জলন্ধরকে বললেন যে, প্রাচীনকালে পর্বতরা এবং অসুররা যখন দেবরাজের ভয়ে ভীত ছিল, সেইসময় সাগর তাদের সকলকে আশ্রয় দেয়। সেই কারণে ইন্দ্র সাগর থেকে জাত রত্ন অপহরণ করেছিলেন। সমুদ্রের অপর পুত্র শঙ্খও দেবতাদের সঙ্গে শত্রুতা করেছিলেন বলে বিষ্ণু তাকে হত্যা করেন। ইন্দ্র বললেন যে, এই কারণেই তিনি সমুদ্র-মন্থন করেছিলেন। দূত এসে জলন্ধরকে এই সংবাদ দিতেই সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

যুদ্ধে দেবতাদের সৈন্যরা নিহত হলে দেবগুরু বৃহস্পতি দ্রোণগিরির দিব্য ঔষধির মাধ্যমে সেই মৃত সৈন্যদের প্রাণ ফিরিয়ে দেন। এই ঘটনায় জলন্ধর ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রোণগিরি অপহরণ করে।

বিষ্ণু, জলন্ধরের পরাক্রমে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বর প্রদান করতে চাইলেন। তখন জলন্ধর বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করে বললেন যে, আপনি এবং আমার ভগিনী কমলা এবং অনান্য দেবতারাও আমার প্রাসাদে অর্থাৎ জলন্ধর পুরে একত্রে বসবাস করবেন। দেবতাদের সঙ্গে সমস্ত রত্ন-ঐশ্বর্য্য জলন্ধর নিজের প্রাসাদে নিয়ে এলেন এবং রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

[স্কন্দ পু. (বিষ্ণু খণ্ড/কার্তিকমাস মাহাত্ম্য) ১৪-১৬ অধ্যায়; পদ্ম পু. (উত্তর খণ্ড) ৪-৮ অধ্যায়]

□ একদিন নারদ জলন্ধরকে বললেন যে, কৈলাসপতি মহাদেবের পত্নী পার্বতী আসলে জলন্ধরেরই উপযুক্ত। দেবাদিবের যোগ্যা তিনি নন।

নারদের কাছ থেকে এই কথা শুনে জলন্ধর মহাদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। দেবতারাও মহাদেবের কাছে জলন্ধরকে বধ করার জন্য, প্রার্থনা জানালেন।

তখন মহাদেব ও অনান্য দেবতাদের মিলিত শক্তি দিয়ে দিব্য অস্ত্র-শস্ত্র নির্মিত হল। দেবতা ও দানবদের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হল। এই যুদ্ধে অবশ্য শিব-অনুচর ও পিশাচগণ এবং ভৈরবগণেরাও দেবতাদের সহায়তা করতে লাগল।

এরই মধ্যে জলন্ধর রুদ্রমোহিনী নামে এক মায়া বিস্তার করলেন। এই মায়ার ফলে গন্ধর্ব ও অপ্সরা—সকলে নৃত্য-গীত করতে লাগলেন। কেউ আবার বেণু, মৃদঙ্গ বাজাতে লাগলেন। মহাদেব এই মধুর নাদ ও তাল শ্রবণে মোহিত হয়ে পড়লেন। তাঁর হাত থেকে ধনুক খসে পড়ে গেল, তিনি ভ্রূক্ষেপ ও করলেন না। জলন্ধর, শুম্ভ ও নিশুম্ভকে মহাদেবের কাছে পাহারায় রেখে পার্বতীর কাছে গেলেন।

পার্বতী অবশ্য জলন্ধরকে চিনতে পারলেন না।

কারণ মহাদেবের বেশ ধারণ করেই জলন্ধর পার্বতীর কাছে উপস্থিত হলেন। পার্বতীকে দর্শন করা মাত্রই জলন্ধরের বীর্য্য স্খলিত হল। তখন পার্বতী জলন্ধরকে চিনতে পারলেন এবং অন্যত্র চলে গেলেন। তিনি বিষ্ণুকে স্মরণ করলেন। পার্বতী বিষ্ণুকে বললেন যে, জলন্ধরের পত্নী বৃন্দার পাতিব্রত্যই জলন্ধরকে রক্ষা করছে। তাই বৃন্দার পাতিব্রত্য ভঙ্গ না হলে জলন্ধরের মৃত্যু সম্ভব নয়।

পার্বতীর মান রক্ষার জন্য এবং জলন্ধরের মৃত্যু সুনিশ্চিত করার জন্য বিষ্ণু জলন্ধরের ছদ্মবেশে বৃন্দার সঙ্গে রমণ করলেন। কিন্তু বৃন্দা যখন প্রকৃত ঘটনা জানতে পারলেন তখন তিনি অভিমানে ও পাতিব্রত্য ভঙ্গের জন্য অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে মহাদেবও এরপর দানবরাজ জলন্ধরকে হত্যা করেন। জলন্ধরের দেহ থেকে একটি তেজ নির্গত হয়ে ভগবান শঙ্করের দেহে বিলীন হয়ে যায়।

[স্কন্দ পু. (বিষ্ণু খণ্ড/কার্তিকমাস মাহাত্ম্য) ১৭-২১ অধ্যায়; পদ্ম পু. (উত্তর খণ্ড) ১৩-১৮ অধ্যায়]

জলন্ধর২ মহর্ষি কশ্যপের বংশধারায় একজন বংশ প্রবর্তক ঋষি। *[মৎস্য পু. ১৯৯.১৫]*

জলপ্রভাসক্ষেত্র প্রভাসক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র জলাশয়। কথিত আছে, একুশবার ক্ষত্রিয় নিধনের পর পরশুরামের মনে অনুতাপ হয় এবং বৈরাগ্য দেখা দেয়। অনুতপ্ত পরশুরাম এই ক্ষেত্রে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। পরশুরামে তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভগবান শিব এই জলাশয়ের মধ্য থেকে লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হন। মহাদেবের কৃপায় এই ক্ষেত্রেই পরশুরাম ক্ষত্রিয়হত্যার পাপ থেকে মুক্ত হন। জলের মধ্য থেকে শিবলিঙ্গ উঠে এসেছিল বলে এই পুণ্যক্ষেত্র জলপ্রভাসক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্রে) ১৯৬.১-১৬]

জলসন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের মধ্যে একজন জলসন্ধ। ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের নামের দুটি তালিকাতেই জলসন্ধের উল্লেখ মেলে।

[মহা (k) ১.৬৭.৯৪; ১.১১৭.২; ১.১৩৮.৬; (হরি) ১.৬২.৯৬; ১.১০১.২; ১.১৩৩.৬]

☐ মহাভারতের ভীষ্মপর্বে বলা হয়েছে ধৃতরাষ্ট্রের চোদ্দজন পুত্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে একযোগে ভীমকে আক্রমণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে জলসন্ধ অন্যতম। ইনি যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমের হাতেই নিহত হন।

[মহা (k) ৬.৬৪.২৮, ৩৩; (হরি) ৬.৬৩.২৮, ৩৪]

জলসন্ধি পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি জলসন্ধির বংশ তার মধ্যে একটি। জলসন্ধি অঙ্গিরার বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৬.২৬]*

জলা একটি প্রাচীন পবিত্র নদী। যমুনা নদীর দুই পাশ দিয়ে দুটি ক্ষুদ্র জলধারা প্রবাহিত হয়েছে। সে দুটির মধ্যে একটির নাম জলা, অপরটি উপজলা। পুরাকালে উশীনর রাজা এই নদীর তীরে যজ্ঞ করে ইন্দ্রের চেয়েও অধিক ক্ষমতা লাভ করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.১৩০.২১; (হরি) ৩.১০৭.২১]

জলাধার *[দ্র. জলধার]*

জলাশী অগ্নির ঔরসে স্বাহার গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে কনিষ্ঠ। *[বিষ্ণু পু. ১.১০.১৫]*

জলেয়ু পুরুর বংশধারায় রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে জলেয়ু একজন। বিষ্ণু পুরাণে জলেয়ুর পরিবর্তে জলেযু নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[বায়ু পু. ৯৯.১২৩-১২৪; ভাগবত পু. ৯.২০.৪-৫; ব্রহ্ম পু. ১৩.৬; বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ৪.১৯.১]

জলেলা স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.১৬; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ১৬ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

জলেশয় শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের মধ্যে একটি নাম। টীকাকার নীলকণ্ঠ শিবের জলেশয় নামের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

জলেশয়ঃ বিষ্ণুরূপী শেষপর্য্যঙ্কে জলশায়ী।

ভগবান বিষ্ণুর যে মূর্তি কল্পনা করা হয় তা ক্ষীরোদ সাগরের মাঝে শেষ অর্থাৎ অনন্ত নাগের কুণ্ডলীকৃত দেহের উপর শয়ান। অনন্ত নাগের দেহটিই তাঁর পালঙ্ক। 'নার' মানে জল। সেই জলই যাঁর 'অয়ন' বা আশ্রয় বা বাসস্থান—এই ভাবনা থেকেই ভগবান বিষ্ণু নারায়ণ নামেও সম্বোধিত হন। ভগবান শিব এবং বিষ্ণু পরব্রহ্মের স্বরূপ, পৃথক রূপে বর্ণিত হলেও অনেক সময়ই তাঁরা অভিন্ন সত্তারূপে কল্পিত হন। সেই ভাবনা থেকেই

নারায়ণ স্বরূপ ভগবান শিব জলেশয় নামে সম্বোধিত হন।

[মহা (k) ১৩.১৭.৯৯; (হরি) ১৩.১৬.৯৯]

জলেশ্বরতীর্থ নর্মদা নদীর তীরে অমরকন্টক পর্বতের পশ্চিমাংশে অবস্থিত একটি তীর্থ। এই তীর্থক্ষেত্রে একটি পবিত্র হ্রদ রয়েছে। জলেশ্বর তীর্থে পিণ্ডদান করে সন্ধ্যাবন্দনা করলে পিতৃগণ দীর্ঘ পরিতৃপ্তি লাভ করেন। *[মৎস্য পু. ১৮৬.৩৮-৩৯]*

□ মহাদেবের ত্রিপুরদুর্গ জয়ের কাহিনীর সঙ্গে জলেশ্বর তীর্থের নাম জড়িয়ে আছে। পুরাকালে ত্রিপুরাধিপতি বাণাসুরের অত্যাচার থেকে দেবতাকুলকে রক্ষার জন্য ইন্দ্র প্রমুখরা জলেশ্বর তীর্থে এসেই মহাদেবের স্তব করেছিলেন। তাঁদের প্রার্থনায় কাতর হয়ে শিব এই মহাক্ষেত্রেই দেবর্ষি নারদকে উপস্থিত হতে বলেন। দেবর্ষি সেখানে উপস্থিত হলে মহাদেব তাঁকে কৌশলে বাণাসুরের ত্রিপুরদুর্গবাসী অসংখ্য রমণীর মন থেকে ধর্মের বোধ দূর করে ভিন্ন পথে পরিচলনা করার নির্দেশ দেন। আসলে এইসব নারীদের তেজেই ত্রিপুরদুর্গের পতন সম্ভব ছিল না। সুতরাং ত্রিপুর দুর্গে ছিদ্র সৃষ্টি করার এমন এক পথই মহাদেবকে বেছে নিতে হয়েছিল

নারদের পরামর্শে ত্রিপুরবাসী রমণীগণ ধর্মের পথ ত্যাগ করে ভিন্নমতি হয়ে পড়তেই মহাদেব ত্রিপুর আক্রমণ করলেন। তাঁর শরক্ষেপণে দুর্গবাসী রমণীরা প্রভাবহীন হয়ে পড়লেন। মহেশ্বরের বাণে ত্রিপুরের সমস্ত দিকে লেলিহান শিখায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হল। সমগ্র দুর্গটি একটি জলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হল। এই সময় বাণাসুর তাঁর প্রাসাদে আরাধ্য শিবলিঙ্গটিকে আগুনের শিখা থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হলেন। মহাদেবকে তুষ্ট করার জন্য তিনি মহাদেবের স্তব শুরু করলেন। তাঁর স্তবে তুষ্ট হয়ে শিব বাণাসুরকে দেবতাদের অবধ্য হওয়ার বর দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে দুর্গের দুটি পুর বা নগর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। শিবের কৃপায় তৃতীয় পুরটি রক্ষা পায়। অপর দুটি পুর বিস্ফোরণে শ্রীশৈল ও অমরকন্টকে পতিত হয়। দগ্ধ পুরদ্বয়ের স্থানে রুদ্রকোটি স্থাপিত হয়। জ্বলন্ত পুরের উপর প্রতিষ্ঠা হওয়ার জন্য এটির অপর নাম হয় জ্বালেশ্বর বা জলেশ্বর। *[দ্র. ত্রিপুর]*

[মৎস্য পু. ৮৮ অধ্যায় সম্পূর্ণ]

জলেশ্বরী হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে জলেশ্বরীকে জনেশ্বরী নামে উল্লেখ করা হয়েছে। স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের সময় অনুচরী হিসাবে উপস্থিত একজন মাতৃকা।

[মহা (k) ৯.৪৬.১৩; (হরি) ৯.৪২.৫২ নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, শ্লোক সংখ্যা ১৩ (খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৮)]

জলেষু *[দ্র. জলেয়ু]*

জহু ভাগবত পুরাণ অনুসারে বৃহদ্রথের বংশধারায় পুষ্পবানের পুত্র জহু। *[ভাগবত পু. ৯.২২.৭]*

জহ্নু১ মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে যে, অজমীঢ়ের ঔরসে কেশিনীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে জহ্নু একজন। মহাভারতের শান্তিপর্বে অজ কে জহ্নুর পুত্র বলা হয়েছে।

অগ্নিপুরাণে অবশ্য জহ্নুর পুত্রের নাম হিসেবে অজকাশ্বের নাম উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১.৯৪.৩২; ১২.৪৯.৩; (হরি) ১.৮৯.২০; ১২.৪৮.৩; অগ্নি পু. ২৭৮.১৬]

জহ্নু২ পুরাণ অনুসারে কুরুর পুত্রদের মধ্যে জহ্নু একজন। সুধন্বা, পরীক্ষিৎ, পুত্রক, অরিমর্দন প্রমুখরা ছিলেন জহ্নুর ভ্রাতা। জহ্নুর পুত্র হলেন সুরথ। *[বায়ু পু. ৯৯.২১৪-২১৮; বিষ্ণু পু. ৪.১৯.১৯; ৪.২০.২; মৎস্য পু. ৫০.৩৪; ভাগবত পু. ৯.২২.৪-৫, ৯]*

জহ্নু৩ বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, পুরূরবার বংশধারায় রাজা সুহোত্রের ঔরসে কেশিনীর গর্ভজাত পুত্র জহ্নু। কাবেরীর গর্ভে জহ্নুর সুহোত্র নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। ভাগবত পুরাণে কথিত হয়েছে যে, হোত্রকের পুত্র ও পুরুর পিতা জহ্নু।

বিষ্ণু পুরাণে আবার বলা হয়েছে যে, সুহোত্রের পুত্র জহ্নু এবং তিনি সুজহ্নুর পিতা।

ব্রহ্ম পুরাণ অনুসারে সুহোত্রের পুত্র ও সুনন্দের পিতা জহ্নু।

রামায়ণ ও পুরাণে জহ্নু সম্পর্কিত একটি কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে—ভগীরথ রাজাকে অনুসরণ করতে করতে যখন গঙ্গা মর্ত্যলোকে আসেন, তখন তিনি রাজর্ষি জহ্নুর যজ্ঞস্থলটিকেও প্লাবিত করেন। জহ্নু ভাবলেন গঙ্গা তাঁর অহঙ্কার প্রদর্শন করছেন। তাই ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গার সমস্ত জলরাশি তিনি পান করলেন। কিন্তু পরে বিষয়টি বুঝতে পেরে জহ্নু গঙ্গার সমস্ত

পবিত্র জলরাশি নিঃসৃত করলেন। দেবতা, গন্ধর্ব ও মুনি-ঋষিরা এই কারণে গঙ্গাকে জহ্নুর কন্যা বলে স্বীকার করলেন। জহ্নুও গঙ্গাকে কন্যা রূপে স্বীকৃতি দিলেন। জহ্নু-সুতা বলে গঙ্গার নাম হল—'জাহ্নবী'। *[রামায়ণ ১.৪৩.৩৪-৩৮; বায়ু পু. ৯১.৫৪-৬০; ভাগবত পু. ৯.১৫.৩; বিষ্ণু পু. ৪.৭.৩; ব্রহ্ম পু. ১০.১৪]*

জহ্নু৪ বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, অষ্টকের পুত্ররা জহ্নু নামে খ্যাত হয়েছিলেন। অষ্টকের পুত্রদের একত্রে জহ্নুগণ বলা হত।

[বায়ু পু. ৯১.১০৩]

জাগুড় একটি জনপদ তথা জনজাতির নাম। মহাভারতের বনপর্বে কৃষ্ণের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এই জাগুড় দেশের লোকজন মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হয়েছিল। তবে মহাভারতের সভাপর্বের অন্তর্গত উপায়নপর্বে ইন্দ্রপ্রস্থে সমাগত যেসব জনজাতির নাম উল্লিখিত হয়েছে, সেখানে জাগুড়ের উল্লেখ মেলে না।

[মহা (k) ৩.৫১.২৫; (হরি) ৩.৪৩.২৫]

□ পণ্ডিত শশীভূষণ চৌধুরী জাগুড় জনপদটিকে বর্তমান আফগানিস্তানের কান্দাহারের উত্তরে গজনীর দক্ষিণে অবস্থিত একটি অঞ্চল বলে বর্ণনা করেছেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউ-এন-সাং কে উদ্ধৃত করে চৌধুরী মন্তব্য করছেন যে, এই অঞ্চলটির মূল খ্যাতি ছিল জাফরান উৎপাদনের জন্য। হিউ-এন-সাং তাঁর নিজের রচনায় এইস্থানের নাম উল্লেখ করেছেন Tsao-ku-ta—যা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় জগুড় বা জাগুড়। পণ্ডিত শশীভূষণ চৌধুরী জানিয়েছেন যে ওখানকার স্থানীয় ভাষায় জগুড় শব্দের অর্থই হল জাফরান। সেক্ষেত্রে জগুড় বা জাগুড় জনপদ মানেই বোঝায় জাফরানের দেশ। প্রাচীনকালে গজনী এই জাফরানের দেশ বা জাগুড়ের রাজধানী ছিল বলে জানা যায়।

[Shashi Bhushan Chaudhuri, Ethnic Settlements in Ancient India, p. 102; TIM (Mishra) pp. 120-121; GAMI (Sircar) p. 35]

জাঙ্গল *[দ্র. কুরু-জাঙ্গল]*

জাজলি১ এক বিখ্যাত তপস্বী। মহর্ষি পথ্যের তিন প্রধান শিষ্যের মধ্যে একজন। পুরাণে জাজলিকে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের প্রণেতাও বলা হয়েছে। ইনি ভারতবর্ষের পশ্চিম সমুদ্র উপকূলে কঠিন কৃচ্ছ্র সাধনের মাধ্যমে বহু বছর তপস্যা করেছিলেন। মহাতপা জাজলি বেদপাঠ ও যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা তপস্যার যথাযথ ফল লাভ করেন। তিনি বর্ষা ঋতুতে উন্মুক্ত আকাশের নীচে এবং হেমন্তকালে জলে বাস করতেন। গ্রীষ্মকালেও প্রখর সূর্যের তাপে জাজলির কোনো বিকার ছিল না। জাজলি সম্পূর্ণ বায়ুভোজী ছিলেন। বৃষ্টির জলে ও শিশিরে তাঁর মাথার চুল জড়িয়ে গিয়ে এক সুবিশাল জটার সৃষ্টি হয়েছিল। জাজলি সমস্ত পরিস্থিতিতেই অনাকুলভাবে থাকতে সমর্থ ছিলেন। কোনো ঘটনাই তাঁকে বিচলিত করতে পারতো না।

মহাভারতের শান্তিপর্বে সূক্ষ্মধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞা সম্পর্কিত আলোচনার সময় ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে জাজলি ও কাশীনগরবাসী বণিক তুলাধারের কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন—

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে জাজলির মাথায় এক বিশাল জটা ছিল। অবিচল অবস্থায় স্থাণু জাজলির মাথার জটাটিকে বৃক্ষের শাখা কল্পনা করে এক চটক (চড়াই পাখি) দম্পতি সেখানে বাসা তৈরি করে। দিনের পর দিন কেটে যায় পক্ষীদম্পতিও নিশ্চিন্ত আশ্রয় ভেবে জাজলির মাথার জটায় ডিম পাড়ে। ডিম থেকে পক্ষী শাবক জন্মায়। তাদেরও ডানা গজায়। এত ঘটনাতেও জাজলি অবিচল। পক্ষীশাবকগুলি কয়েকদিন পর পর উড়ে যায়। আবার বাসায় ফিরে আসে। কিন্তু একবার তারা উড়ে গেল একমাস পরেও ফিরলো না। এবার জাজলি ধারণা করলেন তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়েছে। তিনি সূর্যের উপাসনা করে ধর্ম লাভ করেছেন ভেবে গর্ববোধ করলেন। ঠিক তখনই আকাশবাণী হল—জাজলি ধর্মে বণিক তুলাধারের সমতুল্য নন।

আকাশবাণী শুনে জাজলি অসহিষ্ণু পায়ে বারাণসী নগরীতে তুলাধার বণিকের সাক্ষাৎ লাভের জন্য চললেন। তুলাধার পূর্বেই জাজলি ও তাঁর কঠোর তপস্যা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। জাজলির কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর নিজস্ব সূক্ষ্মধর্মবোধ সম্পর্কে নানা কথা বলেন। তিনি জানান সকল ব্যক্তির কাছেই তাঁর তুলাদণ্ড সমান থাকে—

তুলা মে সর্বভূতেষু সমতিষ্ঠতি জাজলে॥

তুলাধার জাজলিকে জানান তিনি সকল পরিস্থিতিতেই নিস্পৃহ থাকেন। সর্বপ্রকার যুক্তিযুক্ত ধর্মবোধই তিনি পোষণ করেন। তুলাধার জাজলিকে অনুভব করান যে, শ্রদ্ধা রহিত তপস্যা বা সাধনা কখনোই সূক্ষ্মধর্মের পরিচায়ক নয়। নিস্পৃহভাবেই ধর্মকে লাভ করতে হয়। কোনো প্রকারেই গর্ববোধ ধর্মলাভের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

কালক্রমে জাজলি ও তুলাধার উভয়েই স্বর্গলোক লাভ করেন। জাজলিও তুলাধারের দার্শনিকতায় শান্তিলাভ করেন।

[মহা (k) ১২.২৬১-২৬৩ অধ্যায় সম্পূর্ণ; (হরি) ১২.২৫৫.২১-৭০; ২৫৬-২৫৮ অধ্যায় সম্পূর্ণ; ভাগবত পু. ৪.৩১.২; ৭.১২.২; বায়ু পু. ৬১.৫২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৩.২; ১.৩৫.৫৭]

□ গয়াসুর কঠোর তপস্যায় ভগবান বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করলে ভগবান বিষ্ণু তাঁকে বর দিতে চাইলেন। গয়াসুর বললেন—আমাকে এই বর দিন যে আমি যেন সমস্ত দেবতা, ঋষি, ধার্মিক-সকলের থেকে পবিত্র হই। ভগবান বিষ্ণু তাঁকে সেই বর দিলেন। গয়াসুর ত্রিলোকের পবিত্রতম ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হলে সেই বরের প্রভাবে দেবতারাও গয়াসুরের তুলনায় হীন বলে বিবেচিত হলেন এবং স্বর্গপুরী তার ঐশ্বর্য্য হারালো। চিন্তিত দেবতারা ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হলেন। বিষ্ণুর পরামর্শে ব্রহ্মা গয়াসুরের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন—আমি একটি যজ্ঞ করতে চাই কিন্তু ত্রিলোকের কোথাও আমি তোমার শরীরের থেকে পবিত্র কোনো যজ্ঞভূমি খুঁজে পেলাম না। অতএব তোমার এই পবিত্র দেহকে যজ্ঞভূমি হিসাবে দান কর। গয়াসুর আনন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং ব্রহ্মা তাঁর শরীরে এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন। এই যজ্ঞে পৌরোহিত্য করার জন্য ব্রহ্মা তাঁর মন থেকে যে সব ঋষিদের সৃষ্টি করেন জাজলি তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[বায়ু পু. ১০৬.৩৪]

জাজলি২ কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালীর অনুগত বানরাধিপতিদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৩৯]

জাজলি৩ জনৈক ঋষি। মনুবংশজাত রাজা উৎকল একবার পুষ্করতীর্থে রাজসূয়যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। সেই যজ্ঞের প্রধান পুরোহিতদের মধ্যে জাজলি একজন।

[ব্রহ্মবৈবর্ত পু. (প্রকৃতি) ৫০.৩৫]

জাঠর১ মহাভারতের বনপর্বে বর্ণিত আছে যে, বনবাসের সূচনায় ধৌম্য পুরোহিতের উপদেশে যুধিষ্ঠির সূর্যদেবের আরাধনা করেন। সেই সময় সূর্যের স্তব করতে গিয়ে সূর্যের যে একশত আটটি নাম উচ্চারিত হয়েছে জাঠর তার মধ্যে অন্যতম। জঠর শব্দের অর্থ উদর। এই জঠরে অবস্থানকারী অগ্নিকে জাঠর অগ্নি বা জঠরানল বলা হয়। জাঠর অগ্নির স্বরূপ বলেই সূর্যকেও জাঠর নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

[মহা (k) ৩.৩.১৯; (হরি) ৩.৩.১৯]

□ বস্তুত সূর্যশক্তি এবং অগ্নিশক্তির পরস্পর অনুপ্রবেশের কথা বেদ-উপনিষদের সঙ্গে জড়িত। কালিদাসের রঘুবংশে—

দিনান্তে নিহিতং তেজঃ সবিত্রেব হুতাশনঃ।

এই শ্লোকের টীকায় মল্লিনাথ লিখেছেন—সূর্যের তেজ সন্ধ্যাকালে অগ্নির মধ্যে সংক্রমিত হয়, আবার নিশান্তে অগ্নির তেজ সূর্যের মধ্যে সংক্রমিত হয়—এই সত্য শ্রুতিতেই বলা আছে।

[দ্র. রঘুবংশ ৪.১, মল্লিনাথের সঞ্জীবনী টীকা]

আমরা বায়ু পুরাণে জাঠর অগ্নিকে সূর্যের শক্তি হিসেবেই চিহ্নিত হতে দেখেছি। এখানে বলা হয়েছে—যে অগ্নি সূর্যের মধ্যে থেকে তাপ দান করে, তার নাম শুচি অগ্নি। সেটা বৈদ্যুত অগ্নিও বটে। আবার বৈদ্যুত অগ্নিই জাঠরাগ্নি—বৈদ্যুতাখ্যস্তু জাঠরঃ। বলা হয়েছে—সূর্য অস্ত গেলে এক পাদ পরিমিত সৌরী প্রভা অগ্নির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। আবার সূর্যোদয়কালে পার্থিব অগ্নির এক পাদ-পরিমিত প্রভা সূর্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সূর্যকে যে 'জাঠর' বলা হয়েছে, তার কারণ জাঠর অগ্নির মূল স্বরূপ সূর্যই।

[বায়ু পু. ৫৩, ৭-১০ ১২-১৪]

জাঠর২ তারকাসুর বধের সময় যেসব অনুচর যোদ্ধা স্কন্দ কার্তিকেয়কে সহায়তা করেন জাঠর তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ৯.৪৫.৬২; (হরি) ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্র., খণ্ড ২৯; পৃ. ৪৭৬]

জাঠর৩ একটি বিশিষ্ট অগ্নি। মহাভারতের সভাপর্বে নারদ ইন্দ্রসভার যে বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে ইন্দ্রের সভায় সাতাশজন অগ্নির উপস্থিতির কথা

বলা হয়েছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ এই প্রসঙ্গে সাতাশটি অগ্নির নাম উদ্ধার করেছেন। জাঠর অগ্নি তার মধ্যে একটি। *[মহা (k) ২.৭.২১; (হরি) ২.৭.২১ (নীলকণ্ঠকৃত টীকা দ্র.)]*

জাতকর্ম আভিধানিক অর্থে জাতকর্ম হল—পুত্র জাত হলেই যে কর্ম করতে হয়। পুরুষ-শিশু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই পিতা যেহেতু বংশের পারম্পর্য্য রক্ষা এবং নিজের অহং-মমত্বের তুষ্টিসাধন করতে পারতেন, অতএব সঙ্গে সঙ্গেই তার সংস্কার আরম্ভ হত এবং এই সংস্কারের নামই জাতকর্ম। দোষ অপনয়ন অথবা গুণাধান যদি সংস্কারের লক্ষণ হয় তবে জাতকর্মের মাধ্যমে এর দুটিই ঘটত বলে মত প্রকাশ করেছেন হারীত এবং পারস্কর। হারীত বলেছেন—পিতা-মাতার শুক্র-শোণিত এবং গর্ভসংক্রান্ত সমস্ত দোষ জাতকর্মের দ্বারা দূরীভূত হয়। আর পারস্কর গৃহ্যসূত্রের মতে—জাতকর্ম সংস্কার পুত্রের মেধা এবং আয়ু বৃদ্ধি করে—

অবভৃথমব যন্তি। পরা স্থালীরস্যন্তি।
উদ্‌বায়ব্যানি হরন্তি।
তস্মাৎ স্ত্রিয়ং জাতাং পরাস্যন্তি।
উৎপুমাংসং হরন্তি।

[পারস্কর গৃহ্যসূত্র (মহর্ষি) ১৬.২; Harita as quoted in Samskara Tattva referred by P.V. Kane, History of Dharmasastra, vol. 2: pt. 1, p. 192, Pune: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1997]

□ জাতকর্মের সঙ্গে মূলত পুত্রসন্তানের জন্মের ব্যাপারটাই অধিক মাত্রায় চর্চিত বলে কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে জাতকর্ম সংস্কার হত না এমনটা ভাবার কিন্তু কোনো কারণ নেই। তবে অতি প্রাচীন কাল থেকেই কন্যার জন্ম হলে পিতা-মাতার মন বিষণ্ণ হত আর সেই বিষাদের প্রতিফলন খানিকটা সংস্কারের মধ্যেও দেখা যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতার একটি মন্ত্রের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, কন্যা সন্তান জন্মালে শিশুটিকে এক পাশে শুইয়ে রাখা হত; আর পুত্র জন্মালে তাকে তুলে নেওয়া হত—এটাই রীতি। কিন্তু কন্যাসন্তানকে একপাশে শুইয়ে রাখার মধ্যে বিষাদের প্রতীকটুকুই আছে। তাকে বর্জন বা হত্যার ভাবনাও যেমন প্রাচীন ভারতে ছিল না, তেমন কন্যা বলেই তার সংস্কারের প্রয়োজন নেই এমনটাও নয়। *[তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম) ৬.৫.১০.৩, পৃ. ২৪৬৯]*

□ একেবারে সুপ্রাচীন কালে পুত্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী কাটার আগেই জাতকর্ম বিহিত ছিল—

প্রাঙ্ নাভিবন্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম বিধীয়তে।

তবে পরবর্তী সময়ে এই বিধিতে কিছু পরিবর্তনও এসে থাকবে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় দেখা যাচ্ছে—পুত্র জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে পিতা বারোটি মৃৎপাত্রে রক্ষিত পিঠের মতো কোনো খাদ্যদ্রব্য বৈশ্বানরের উদ্দেশে আহুতি দিয়ে যাগ করতেন। এতে নাকি পিতার ধন, ধান্য এবং বলের বৃদ্ধি হত। অন্যদিকে শতপথ ব্রাহ্মণ বলেছে—পুংশিশুর নাড়িচ্ছেদের আগেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ নবজাত পুংশিশুটিকে আঘ্রাণ করবেন। অভাবে পিতাই এ কাজ করবেন। তবে বাস্তব কারণেই এই বিধান চলেনি। হয়তো আর্যখণ্ডের কোনো প্রজাতির মধ্যে এই নিয়ম চালু ছিল। *[তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম) ৬.৫.১০.৩; Satapatha Brahmana as quoted in History of Dharmasastra, by P.V. Kane p. 229]*

□ জাতকর্মের সবচেয়ে সুন্দর প্রথাটি চিত্রিত বৃহদারণ্যক উপনিষদে এবং ওই উপনিষদ সারাংশই পরবর্তীকালের স্মার্ত সংস্কারের মধ্যে অন্তর্ভুক্তও হয়েছে। বৃহদারণ্যকে জাতকর্মের প্রধান দিকটি হল—পুত্রজন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই শিশুর মুখে এক ফোঁটা গব্য ঘৃত দিয়ে চাটানো হত এবং তারপরে মায়ের স্তন্য পান করতে পেত শিশু—

তস্মাৎ কুমারং জাতং ঘৃতং বৈ
প্রতিলেহয়ন্তি স্তনং বা অনুধাপয়ন্তি।

বৃহদারণ্যকে জাতকর্মের যে বিস্তার আছে তার প্রধান অঙ্গগুলি হল— (১) দধি-ঘৃত সহযোগে একটি সমন্ত্রক হোম। (২) নবজাত পুত্রের কানে তিনবার 'বাক' শব্দটি উচ্চারণ করতেন পিতা। জন্মলগ্নেই এই শব্দ তিনবার উচ্চারণ করে তিন বেদ অর্থাৎ জ্ঞানকে পুত্রের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করতেন পিতা। (৩) একটি সোনার আংটির সাহায্যে পিতা দই-ঘি মধুর মিশ্রণ পুত্রের মুখে দিতেন তার মেধা এবং আয়ুবৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে। (৪) জন্মলগ্নেই একটি গুপ্ত নাম দেওয়া হত শিশুকে। (৫) এরপর শিশুকে মাতৃস্তন্য পানে সমন্ত্রে প্রবৃত্ত করতেন পিতা। (৬) বীরপুত্রপ্রসবিণী জননীকে সমন্ত্রক অভিনন্দন জানাতেন স্বামী।

[বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬.৪.২৪.২৮]

গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে এই সমস্ত প্রক্রিয়ার

কোনো কোনো অংশ আছে আবার কোনোটি বাদও গেছে, বিশেষত জননীকে অভিনন্দনের ব্যাপারটা বাদ গেছে অধিকাংশ গৃহ্যসূত্রে। উপনিষদ এবং গৃহ্যসূত্রগুলির সমস্ত পরম্পরা গ্রহণ করে পরবর্তীকালে জাতকর্মের রূপ সৃষ্টি হয়েছে, তাতে প্রথমেই একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে পুত্রমুখ দর্শন করে পিতা স্নান করে আসতেন, তারপর সোনার কাঠিতে ঘি-মধু নিয়ে পুত্রের মুখে দিতেন পুত্রের শতায়ু কামনায় মন্ত্র বলতেন—দেবতাদের দ্বারা রক্ষিত হয়ে এই পৃথিবীতে তুমি শত শরৎ জীবিত থাকে—

আয়ুষ্মান গুপ্তো দেবতাভিঃ শতং
জীব লোকে অস্মিন্।

আয়ুষ্কামনায় সঙ্গে সঙ্গেই পুত্র যাতে মেধাবী হয় তাও কামনা করা হত মন্ত্র পড়ে। উপনিষদের মধ্যে শিশুকর্ণে যে 'বাক্' শব্দ উচ্চারণের প্রথা ছিল, সেটা পরবর্তীকালের ছন্দোবন্ধে মেধা-জন্মানোর মন্ত্রে পর্যবসিত হয় এবং মেধা চাওয়া হয়েছে জ্যোতিস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ সূর্যের কাছে, বাক্‌রূপিণী সরস্বতীর কাছে—

ওঁ মেধাং তে দেবঃ সবিতা
মেধাং দেবী সরস্বতী।

এই আয়ুষ্কামনা এবং মেধা-জন্মানোর মন্ত্র পরবর্তীকালে পৃথক দুটি সংস্কারে পরিণত হয়েছে যার নাম 'মেধাজননায়ুষ্যকর্ম'।

পুত্রের মেধা আর আয়ুষ্কামনা করে নবজাতকের কানে কানে যে সব মন্ত্র উচ্চারণ করতেন পিতা, সে সব মন্ত্রের চমৎকারিতা শিশুপুত্রের মধ্যে নতুন ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এই সব মন্ত্র নবজাতককে এক মুহূর্তের মধ্যে যেন পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গলোকের সঙ্গে একাত্ম করে তোলে—

ওঁ ভূস্ত্বয়ি দধামি, ভুবস্ত্বয়ি দধামি স্বস্ত্বয়ি দধামি।

শুধু তাই নয়, মন্ত্রের মাধ্যমে পিতাও একাত্ম হন পুত্রের সঙ্গে। তিনি বলেন—আমি যেমন তোমাকে জানি তুমিও সেটা জানো, আমরা একসঙ্গে শত শরতের শোভা দেখব, একসঙ্গে শত শরৎকাল বাঁচব, এক সঙ্গে শত শরৎ পরস্পরকে শ্রবণ করব—

পশ্যেম শরদঃ শতম্।
জীবেম শরদঃ শতম্।
শৃণুয়াম শরদঃ শতম্।

যে শিশু কিছুই বোঝে না, তার কানে কানে এত কথা বলে নবজাতক শিশুটিকে পিতা যেভাবে আত্মীকরণ করেন, তার তীব্রতা অকল্পনীয়। শেষে ছোটো শিশুটির কাঁধে হাত রেখে আশীর্বাদ করেন পিতা—পাথরের মতো কঠিন শরীর হোক তোমার। কুঠারের মতো আমার বিরোধীদের ছেদন করো তুমি। পুত্র! আমিই তুমি হয়ে জন্মেছি, তুমি একশো বছর বেঁচে থাকো—

আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্।

এতগুলি মন্ত্র কিন্তু নাড়ি কাটার আগেই। পিতা পুত্র এবং তার জননী এইভাবে একাত্ম হয়ে ওঠার পরেই জননীর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হত শিশুকে। শিশুর মুখে জননী তখন প্রথমে দক্ষিণ স্তন প্রদান করতেন, তারপর দ্বিতীয় স্তন। জননীর সেই শতধার দুগ্ধও তখন পিতার মুখোচ্চারিত মন্ত্রে পুত্রের আয়ু বল এবং যশের প্রতীক হয়ে উঠত—

অস্মৈ স্তনৌ প্রযুঞ্জানা আয়ুর্বর্চো যশো বলম্।

জাতকর্মের প্রক্রিয়ার মধ্যে আরও একটি অসাধারণ অঙ্গ হল জন্মদাত্রী মাতার অভিমন্ত্রণ। অভিমন্ত্রণ মানে প্রশংসা। একালের দিনে জন্মদাত্রী রমণীকে শাড়ি-গয়নার উপহার দিয়ে তুষ্ট করতে দেখি স্বামীদের। সেকালের দিনে উপহার দেবার প্রথা ছিল না বটে তবে পুরুষ-শাসিত সমাজে এবং হয়তো বা একটি পুরুষের জন্ম দেবার জন্যই সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে স্ত্রীকে অভিনন্দন করতেন স্বামীরা। অভিনন্দনের মন্ত্রে পুত্রের জননী দেবমাতা ইলা এবং মিত্রাবরুণের কন্যার সঙ্গে একাত্মতা প্রাপ্ত হন। স্বামী তাকে দেবী সম্বোধন করে একজন বীর রমণীর সম্মান দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন—তুমি বীরের জন্ম দিয়েছ। এইভাবে তুমি যেমন বীরের জননী হয়েছ, তেমনই আমাকেও এক বীর পুত্রের পিতা হতে সাহায্য করেছ—

বীর বীরমজীজনথাঃ।
সা ত্বং বীরবতী ভব যা'স্মান্ বীরবতো'করোৎ।

[আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (মহর্ষি) ১৫.১;
পারস্কর গৃহ্যসূত্র (মহর্ষি) ১৬.১৭;
বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬.৪.২৫, ২৭;
পারস্কর গৃহ্যসূত্র (মহর্ষি) ১৬.১৮. ১৯-২০]

□ মহাকাব্য-পুরাণে বহুবার বহু নবজাতকের জাতকর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণের

উত্তরকাণ্ডে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে সীতার পুত্রজন্মের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে—বাল্মীকির আশ্রমে ঋষিপুত্ররা এবং আশ্রমবাসিনী স্ত্রীরা এসে সীতার পুত্র জন্মের খবর দেবার সঙ্গে সঙ্গে বলছেন—মহর্ষি! আপনি এসে সীতাদেবীর যমজপুত্রদের অশুভগ্রহ নিবারণ করুন এবং তাদের রক্ষার যথাবিধি ক্রিয়া সম্পন্ন করুন। বুঝতে সমস্যা হয় না যে, প্রকারান্তরে জাতকর্ম সম্পন্ন করার কথাই বলা হচ্ছে। বাল্মীকি নিজে গিয়ে সীতার পুত্রদের নানা দুষ্টগ্রহের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, তারপর তাদের নামকরণ করলেন।

মহাভারতেরও বিভিন্ন বিখ্যাত চরিত্রের জন্ম এবং জাতকর্ম সংস্কারের বহু উল্লেখ পাওয়া যায় তবে জাতকর্মের বিধি-বিধান সংক্রান্ত কোনো বিশদ বিবরণ সেখানে পাই না। *[রামায়ণ ৭.৭৯.১-৯; মহা (k) ১.৭৪.৩; ১.১০৯.১৮; ১.১৭৮.২; ৯.৪৪.২১; (হরি) ১.৮৮.৩; ১.১০৩.১৮; ১.১৭১.২; ৯.৪১.২১]*

জাতন্বি মহর্ষি কশ্যপের বংশধারায় একজন ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ। *[মৎস্য পু. ১৯৯.১৩]*

জাতিস্মর১ মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করলে দর্শনার্থী জাতিস্মরত্ব লাভ করেন।

[মহা (k) ৩.৮৪.১২৮; (হরি) ৩.৬৯.১২৮]

জাতিস্মর২ এক ঋষি। ইনি কলিঙ্গবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট যম ও তাঁর পরিচারকের কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। বিষ্ণু পুরাণে এই কাহিনীটির উল্লেখ পাওয়া যায়। *[বিষ্ণু পু. ৩.৭.৯, ১৩]*

জাতুকর্ণ১ একজন ঋষি। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় জাতুকর্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হয়েছিলেন।

[মহা (k) ২.৪.১৪; (হরি) ২.৪.১০নং শ্লোক পরবর্তী পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

জাতুকর্ণ২ বিভিন্ন মন্বন্তরের দ্বাপরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পূর্বে সাতাশজন ঋষি বেদবিভাগকারী ব্যাস রূপে আবির্ভূত হন। এঁদের মধ্যে জাতুকর্ণ সপ্তবিংশতিতম ব্যাস হয়েছিলেন বলে পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পুরাণ প্রবক্তারূপে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এতই বিখ্যাত এক নাম যে অনেক সময় পুরাণে জাতুকর্ণকেও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

[বিষ্ণু পু. ৩.৩.১৯; বায়ু পু. ২৩.২১৪; ৯৮.৯৩]

□ বায়ু পুরাণে জাতুকর্ণকে মহর্ষি বশিষ্ঠের দৌহিত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইনি বশিষ্ঠ বংশীয় একজন বংশপ্রবর্তক ঋষিও বটে।

[বায়ু পু. ১.১০; স্কন্দ পু. (ব্রহ্মখণ্ড/ধর্মারণ্যখণ্ড) ৯.২৮; মৎস্য পু. ২০০.১৮-১৯]

□ পুরাণে বলা হয়েছে যে, ঋষি জাতুকর্ণ মহর্ষি পরাশরের থেকে পুরাণ উপদেশ লাভ করেছিলেন। আবার জাতুকর্ণের থেকে পুরাণ-পাঠ করেছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। জাতুকর্ণ একজন সিদ্ধ পুরুষ। *[বায়ু পু. ১০৩.৬৬; বিষ্ণু পু. ৬.৮.৪৭-৪৮; ভাগবত পু. ৬.১৫.১৩]*

□ পুরাকালে রামচন্দ্র সীতাদেবীর ইচ্ছায় সীতাপুর সংলগ্ন। অঞ্চলে পঞ্চাশটি গ্রাম আঠারো হাজার ঋষির মধ্যে বন্টন করেছিলেন। সেই ঋষিদের মধ্যে জাতুকর্ণ একজন।

[স্কন্দ পু. (ব্রহ্ম খণ্ড/ধর্মারণ্য) ৩৫.৩১-৩৬]

জাতুকর্ণ৩ মহর্ষি মনুর বংশধারায় দেবদত্তের পুত্র অগ্নিবেশ্য। ইনি পরবর্তীকালে মহান ঋষি জাতুকর্ণ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

এই অগ্নিবেশ্য থেকে অগ্নিবেশ্যায়ন নামে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশের সৃষ্টি হয়েছিল।

[ভাগবত পু. ৯.২.২০-২২]

জাতুকর্ণ্য১ *[দ্র. জাতুকর্ণ১]*

জানকি১ দ্বাপরযুগে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক একজন রাজা। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে বলা হয়েছে যে, বিনাশন নামে যে অসুর চন্দ্রকে জয় করেছিলেন, তিনিই জানকি নামে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

[মহা (k) ১.৬৭.৩৯; (হরি) ১.৬২.৩৯]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে যেসব রাজাকে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, জানকি তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৫.৪.২০; (হরি) ৫.৪.২০]

জানকি২ একজন রাজর্ষি। মহাভারতের অংশাবতরণ পর্বে বলা হয়েছে যে, বিনাশন নামে এক অসুর পরবর্তীকালে জানকি নামে রাজা রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[মহা (k) ২.৬৭.৩৯; (হরি) ২.৬২.৩৯]

□ পাণ্ডবরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য যেসব রাজাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন, জানকি তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ৫.৪.২০; (হরি) ৫.৪.২০]

জানকী [দ্র. সীতা]

জানন্তি একজন মুনি। ইনি দেবমালি নামে এক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্ম বিষয়ক উপদেশ দিয়েছিলেন।

[দ্র. দেবমালি]

জানপদী মহাভারতে জানপদীকে অপ্সরাই বলা হয়েছে। মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী ধনুর্বিদ্যার সাধনায় রত শরদ্বান্ ঋষির পরাক্রমে ভীত হয়ে ইন্দ্র জানপদী অপ্সরাকে পাঠান শরদ্বান্‌কে প্রলুব্ধ করে তাঁর মনঃসংযোগ নষ্ট করার জন্য। তবে জানপদী নামটির কারণেই ইনি স্বর্গীয় অপ্সরা না কি স্থানীয় কোনো রাজার পাঠানো কোনো গণিকা —সে বিষয়ে সংশয় জাগে।

[মহা (k) ১.১৩০.৬; (হরি) ১.১২৫.৬]

জানুজঙ্ঘ$_1$ জনৈক প্রাচীন রাজর্ষি। মহাভারতের আদিপর্বের সূচনায় পুত্রশোকার্ত ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সঞ্জয় বহু প্রাচীন রাজর্ষির নাম উল্লেখ করেছেন যাঁরা সুদীর্ঘকাল রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করার পর কালের অমোঘ নিয়মে পরলোকে গমন করেছেন। এই প্রসঙ্গে সঞ্জয় রাজর্ষি জানুজঙ্ঘের নাম উল্লেখ করেছেন।

[মহা (k) ১.১.২৩৬; (হরি) ১.১.১৯৭]

☐ মহাভারতের অনুশাসন পর্বে যেসব প্রাতঃস্মরণীয় রাজর্ষির নাম উল্লিখিত হয়েছে, জানুজঙ্ঘ তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১৩.১৬৫.৫৯; (হরি) ১৩.১৪৩.৫৬]

জানুজঙ্ঘ$_2$ চতুর্থ মন্বন্তরের অধিপতি তামস মনুর পুত্রদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.৪৯;
বিষ্ণু পু. ৩.১.১৯; গরুড় পু. ১.৮৭.১৩]

জাবালি$_1$ একজন মহর্ষির নাম। ইনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র। জাবালি দশরথের ঋত্বিক বা পুরোহিতদের মধ্যে অন্যতম। দশরথ যখন পুত্রকামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন তিনি অন্যান্য পুরোহিতদের সঙ্গে জাবালিকেও অযোধ্যায় আনিয়েছিলেন। দশরথ যখন জনকের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মিথিলায় গেলেন, তখনও অগ্রবর্তী ব্রাহ্মণদের মধ্যে ছিলেন জাবালি। দশরথের মৃত্যুর পরদিন সকালে মার্কণ্ডেয়, মৌদ্‌গল্য প্রমুখ ব্রাহ্মণের সঙ্গে জাবালিও বশিষ্ঠের কাছে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেরা বশিষ্ঠকে পরামর্শ দেন, আজই কোনো একজন ইক্ষ্বাকুকুমারকে রাজপদে বরণ করা হোক যাতে রাজসিংহাসন শূন্য না থাকে এবং রাজ্যে অরাজকতা দেখা না দেয়।

[রামায়ণ ১.৭.৫; ১.৮.৬; ১.৬৯.৫-৬; ২.৬৭.৫-৮;
মহা (k) ৩.৮৫.১২১; ১৩.৪.৫৫;
(হরি) ৩.৭০.১২১; ১৩.৩.৭৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. ২.২৩.৪]

☐ ভরত যখন রামকে ফিরিয়ে আনতে বনে গিয়েছিলেন, তখন জাবালি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। অন্যেরা রামকে বোঝাতে ব্যর্থ হলে জাবালি নাস্তিক মত অনুসারে তাঁকে উপদেশ দেন। তিনি বলেন, যেহেতু পরলোক বলে কিছু নেই, সুতরাং মৃত পিতার কাছে করা অঙ্গীকারও পালন করা অপ্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে জাবালি বহু উদাহরণও দেন। কিন্তু রাম তাঁর নাস্তিক মতকে অশ্রদ্ধেয় বলে প্রত্যাখ্যান করলে জাবালি তৎক্ষণাৎ তাঁর মত পরিবর্তন করেন। তখন তিনি বলেন, তিনি নিজেও নাস্তিক নন। সময়-অনুযায়ী তিনি নাস্তিক ও আস্তিক হয়ে থাকেন। রামকে বনবাস থেকে নিবৃত্ত করার জন্য তখন যা বলা প্রয়োজন ছিল, তাই জাবালি বলেছিলেন। রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য।

[রামায়ণ ২.১০৮.১-১৮; ১০৯.১-৩৯]

☐ রামের রাজ্যাভিষেকের সময় জাবালি বশিষ্ঠকে সাহায্য করেন। রামের রাজত্বকালে এক ব্রাহ্মণের বালকপুত্রের অকালমৃত্যু হয়। রাম এই অকালমৃত্যুর কারণ জানার জন্য যে আটজন ব্রাহ্মণকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, জাবালি তাঁদের অন্যতম। অশ্বমেধ যজ্ঞের বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে জাবালিকেও ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সীতার শপথগ্রহণ দেখার জন্য জাবালি রামের সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

[রামায়ণ ৬.১৩০.৬০; ৭.৮৭.৪-৫;
৭.১০৪.২; ৭.১০৯.২]

জাবালি$_2$ কোশল দেশবাসী মহর্ষি ঋতধ্বজের মহাতপস্বী পুত্র জাবালি। ইনি যোগবলে সর্বশাস্ত্রজ্ঞ হয়েছিলেন। ঋতধ্বজ পুত্রের ভবিষ্যৎ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, জাবালি পাঁচ হাজার বছর বালক হয়ে থাকবেন। দশ হাজার বছর কৌমার দশা ভোগ করবেন। যথাক্রমে কুড়ি ও চল্লিশ হাজার বছর যৌবন ও বার্ধক্য যাপন করবেন। জাবালিকে বালকাবস্থায় পাঁচশো বছর দৃঢ় বন্ধন ভোগ করতে হবে। কৌমার কালে একশো বছর কায়পীড়নে এবং যৌবনের দু-হাজার বছর মহাভোগে তাঁর কাটবে। অবশেষে

বৃদ্ধবয়সে তিনি চারহাজার বছর অতিশয় ক্লেশ ভোগ করবেন।

পিতা ঋতধ্বজের এরূপ ভবিষ্যৎবাণী শোনার পর বালক জাবালি একদিন হিরন্ময়ী নদীতে স্নান করতে যান। সেখানে একটি বিশালাকার বানর ক্রোধবশতঃ তাঁকে বৃক্ষের শাখায় নিজের জটাজালে আবদ্ধ করে বন্দি করেন। বন্দি জাবালির সঙ্গে এই অবস্থায় সাক্ষাৎ হয়েছিল বিদর্ভের রাজকন্যা দময়ন্তীর কাছে জাবালি এই কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন।

[বামন পু. ৬৪.২৩-৩৯]

□ জাবালিকে বৃক্ষ শাখায় বন্ধনকারী বিশালাকার বানরটি আসলে ছিলেন বিশ্বকর্মা। মহর্ষি ঋতধ্বজ যখন দেখলেন বালক জাবালিকে বৃক্ষশাখায় বেঁধে রাখা হয়েছে তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে শরের আঘাতে বৃক্ষশাখাটিকে তিন টুকরো করলেন। বৃক্ষশাখার সেই টুকরোগুলির একটি জাবালির মস্তকের সঙ্গে চিরতরে সংযুক্ত হয়ে থেকে যায়। ঋতধ্বজের অনুরোধে বানররূপী বিশ্বকর্মা শাখাটিকে জাবালির মস্তক থেকে পৃথক করেন। এরপর মহর্ষি ঋতধ্বজ সন্তুষ্ট হয়ে বিশ্বকর্মার বানরত্বের শাপমোচন করে তাঁকে তাঁর প্রকৃত রূপ ফিরিয়ে দেন।

[বামন পু. ৬৫.৯৪-৯৯]

জাবালি৩ পুরাকালে জাবালি নামে এক ব্রাহ্মণ কৃষিকাজে ব্রতী হয়ে কৃষকত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি মধ্যাহ্নের খররৌদ্রেও নিজের বৃষভ দুটিকে কৃষিক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম করাতেন। বৃষদুটিকে প্রচণ্ড প্রহারও করতেন। সুরভিমাতা সেই দুই বৃষের কষ্টে আপ্লুত হয়ে তাঁদের উদ্ধারের জন্য মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেব গো-সব নামে এক যজ্ঞের আয়োজন করে বৃষদুটিকে রক্ষা করেন। এরপর থেকেই জাবালির কৃষিক্ষেত্রটি বৃষদুটির উদ্ধারের মাহাত্ম্যে গোবর্ধন তীর্থ নামে বিখ্যাত হয়। *[ব্রহ্ম পু. ৯১.১-১২]*

জাবালি৪ বিখ্যাত শিবপূজক তপস্বী জাবালি। ইনি দেবী সরস্বতীর বিশ্ববিজয় কবচ ধারণ করে সাধনায় সফল হয়েছিলেন।

[ব্রহ্মবৈবর্ত পু. (প্রকৃতি) ৪.৭১]

জাবালি৫ বশিষ্ঠ বংশজাত এক বেদবিৎ ঋষি। একবার তাঁর পতিব্রতা পত্নী ঋতুকালে সঙ্গম কামনা করে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। জাবালি সে সময় তপস্যারত থাকার কারণে পত্নীর অনুরোধ রাখতে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তাঁর উপদেশে জাবালি-পত্নী পরবর্তী ঋতুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে সম্মত হন। কিন্তু দীর্ঘ তপস্যার কারণে জাবালি বারংবার ঋতুমতী স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করতে লাগলেন। এমত পরিস্থিতিতে জাবালি-পত্নী হতাশায় প্রাণত্যাগ করেন। তপস্বী জাবালি এর ফলে পত্নীর মৃত্যু দোষে দুষ্ট হন। তাঁর তপস্যার ফল নষ্ট হয়। জাবালির দেহের বিভিন্ন অংশ শীর্ণ হয়ে যায়। তাঁর সমস্ত শরীরে কুষ্ঠ দেখা দেয়।

জাবালি আরোগ্য কামনায় সূর্যের শরণাপন্ন হন। তিনি নর্মদা নদীর উত্তর তীরে ভাস্কর তীর্থের উদ্দেশে তপস্যার জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত জাবালির পক্ষে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ভাস্কর তীর্থে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাঁর পক্ষে যতটা পথ অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছিল সেইস্থানেই তিনি সূর্যদেবের কঠোর তপস্যা শুরু করেন। বায়ুভোজী হয়ে জাবালি একশত বছর তপস্যা করেছিলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে জাবালির প্রার্থনায় নর্মদার তীরে সূর্যদেব ঋষির তপস্যাস্থলটিতেই আবির্ভূত হয়ে অবস্থান করেন। সেই সময় থেকেই নর্মদাতীরবর্তী ঐ স্থান আদিত্যেশ্বর তীর্থ নামে বিখ্যাত হয়।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/রেবা) ৫৩.১-৪৩]

জাবালি৬ পুরাকালে জাবালি নামে এক ঋষি কঠোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। তাঁর তপস্যায় ভীত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ-অপ্সরা রম্ভাকে পাঠান তপস্যা ভঙ্গের জন্য। জাবালির তপস্যার মূল শক্তি নিহিত ছিল তাঁর আশৈশব কৌমারব্রত পালনের মধ্যে। রম্ভা তাঁর কৌমারব্রত ভঙ্গ করার জন্য হাটকেশ্বর নামে একস্থানে অবতীর্ণ হলেন। দেবরাজ পাঠালেন বসন্ত বায়ু। অনুকূল পরিবেশে সদ্যস্নাতা রম্ভাকে দেখে জাবালির কামোদ্রেক হল। ভঙ্গ হল তাঁর তপস্যা। রম্ভার রূপে মুগ্ধ কামাবিষ্ট জাবালি রম্ভার সঙ্গে রমণে প্রবৃত্ত হলেন। কামক্রীড়া সাঙ্গ হলে রম্ভা স্বর্গে ফিরে গেলেন। কিছুকাল পর রম্ভার গর্ভে জাবালির ঔরসে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হল। জন্মমাত্রই রম্ভা কন্যাটিকে জাবালির আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে পিতার স্নেহে ফলের রস পান করে কন্যাটি ক্রমে বেড়ে উঠতে লাগলো ফলবতী নামে।

ফলবতী যৌবনে উপনীত হলে একদিন অরণ্য ভ্রমণকালে তাঁর সঙ্গে গন্ধর্ব চিত্ররথের সাক্ষাৎ হল। গন্ধর্ব চিত্রাঙ্গদ ফলবতীকে দেখে কামাসক্ত হলেন। তাঁকে বারবার সঙ্গমের জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। ফলবতীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও চিত্রাঙ্গদ একসময় তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। প্রাথমিকভাবে ফলবতী চিত্রাঙ্গদের ব্যবহারে রুষ্ট হলেও ধীরে ধীরে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

এদিকে জাবালি কন্যার সন্ধানে সমস্ত বন ঘুরে বেড়াতে থাকলেন। অবশেষে মনোরম একটি পুষ্পবীথিতে চিত্রাঙ্গদ ও ফলবতীকে আবিষ্কার করেন। চিত্রাঙ্গদের আচরণে ক্রুদ্ধ হলেও ঘটনার পারম্পর্য্য বিচার না করেই প্রায় বিবস্ত্রা ফলবতীকে একটি শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে প্রহার করতে শুরু করলেন। বিপদ বুঝে চিত্রাঙ্গদ অদৃশ্য হওয়ার চেষ্টা করলেও ফলবতী জাবালির ক্রোধ থেকে রক্ষা পেলেন না। প্রচণ্ড আঘাতে ফলবতী জ্ঞান হারিয়ে ফেললে জাবালি তাঁকে মৃতা ভেবে পরিত্যাগ করলেন। জাবালির অভিশাপে চিত্রাঙ্গদও কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হলেন। শুধু চিত্রাঙ্গদই নয় জাবালি নিজ কন্যার উদ্দেশেও অভিশাপ উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ফলবতী যদি জীবিত থাকেন তবে তিনি আজীবন বস্ত্রহীন অবস্থাতেই থাকবেন। বস্ত্র পরিধান করা মাত্রই তাঁর মস্তক দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে।

বহুকাল এ অবস্থায় কেটে যাওয়ার পর একদিন চিত্রাঙ্গদ ও ফলবতী উভয়েই মহাদেবের দর্শন পান। মহাদেব চিত্রাঙ্গদকে বলেন তাঁর উপাসনা করতে এবং ফলবতীকে শিবের অনুচরী যোগিনীদের সঙ্গে যোগদান করতে। তবেই উভয়ে মুক্তিলাভ করতে পারবেন। এরপর বিবস্ত্রা ফলবতী যোগিনীদের সঙ্গে সর্বত্র ভ্রমণ করে শিবের উদ্দেশ্যে নৃত্য উপস্থাপন করতে লাগলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে ফলবতীকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। ফলবতী বললেন, তাঁরই মতো পিতা জাবালিও যেন বসন-মুক্ত হয়ে প্রাণধারণে বাধ্য হন। শিবের কৃপায় চিত্রাঙ্গদও রোগমুক্ত হন। ফলবতী যোগিনী রূপে পূজা লাভ করেন। কিন্তু জাবালি বস্ত্রহীন অবস্থায় হাস্যাস্পদ হয়ে জীবনধারণে বাধ্য হন। কন্যার প্রতি নিজের অবিচারের কথা কল্পনা করে তিনি প্রচণ্ড মনোকষ্ট পেতে থাকেন। দুঃখে শোকে জাবালি স্ত্রী-জাতির নিন্দা শুরু করেন। তাঁর ধারণা হয় সমগ্র স্ত্রীজাতিই ব্যাভিচারী এবং সেই পাপেই তাঁরা অন্যদেরও অনিষ্ট করে থাকে। তাঁর আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে সমস্ত যোগিনীকূল। তাঁদের সঙ্গে জাবালির দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়। জাবালি-কন্যা ফলবতীও যোগিনীদের সঙ্গে পিতার বিরূদ্ধে বিতর্কে অংশ নেন। দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের পর জাবালি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। তিনি ফলবতীর কাছে পূর্ব আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। জাবালিও নিজ ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হন।

[স্কন্দ পু. (নাগর খণ্ড) ১৪৩ ও ১৪৪ অধ্যায় সম্পূর্ণ]

জাবালি৭ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের সমসাময়িক একজন ঋষি। কুরুবংশীয় বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীদের গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের পর ব্যাসদেব বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে সময় তিনি ঋষি জাবালির শরণাপন্ন হন। ব্যাসদেবের ইচ্ছাপূরণে জাবালি বটিকা নামে এক কন্যা তাঁকে প্রদান করেন। ব্যাসদেবের ঔরসে বটিকার গর্ভে সাঙ্গ নামে এক বেদবিশারদ পুত্রের জন্ম হয়েছিল।

[স্কন্দ পু. (নাগর) ১৪৭.৫-১০]

জাবালি৮ পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার বংশধারায় বংশপ্রবর্তক যেসব ঋষির নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে জাবালি একজন। *[মৎস্য পু. ১৯৫.৩৮]*

জামদগ্ন্যতীর্থ১ কূর্ম পুরাণ এবং স্কন্দ পুরাণে একে জমদগ্নিতীর্থ নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। নর্মদা নদী যেখানে সমুদ্রে মিশেছে সেই স্থানে এই তীর্থ অবস্থিত। ভগবান জনার্দন বিষ্ণু এই তীর্থে অবস্থান করেন। পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, এই স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে দেবরাজ ইন্দ্র ইন্দ্রপদ লাভ করেছিলেন। এই তীর্থে স্নান করলে অশ্বমেধ যজ্ঞেরও তিনগুণ বেশি পুণ্যফল লাভ হয় বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। *[মৎস্য পু. ১৯৪.৩৪-৩৫; পদ্ম পু. (আনন্দাশ্রম) স্বর্গ ২১.৩৪-৩৫; কূর্ম পু. ২.৪০.৩৩-৩৪]*

জামদগ্ন্যতীর্থ২ মৎস্য পুরাণে গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত দ্বিতীয় একটি জামদগ্ন্যতীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। এইস্থানে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করলে পুণ্য লাভ হয়। *[মৎস্য পু. ২২.৫৭-৫৮]*

জামলজা পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের ঔরসে অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভজাত কন্যাদের মধ্যে একজন।

[বায়ু পু. ৯৯.১২৫]

জামিত্র স্বারোচিষ মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত ছিলেন, তুষিত তার মধ্যে একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতাদের মধ্যে জামিত্র একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৬.১০]

জাম্ববতী ঋক্ষরাজ জাম্ববান এর ঔরসে ব্যাঘ্রীর গর্ভজাতা কন্যা। জাম্ববতী কৃষ্ণের দ্বিতীয়া পত্নী।

[মহা (k) ১৩.১৪.২৮; (হরি) ১৩.১৩.২৮; ভাগবত পু. ১.১১.১৭; ৩.১.৩০; বায়ু পু. ৯৬.২৩৩; বিষ্ণু পু. ৪.১৫.১৯; ৫.২৮.৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩০১]

□ জাম্ববতী ঋক্ষরাজ জাম্ববানের কন্যা। এখানে 'ঋক্ষ' বলতে অবশ্যই কোনো আর্যেতর জনজাতিকে বোঝানো হচ্ছে, যাঁরা ঋক্ষ অর্থাৎ ভাল্লুকের টোটেম ব্যাবহার করতেন। অতএব জাম্ববতীকে অনার্য রাজকন্যা বলা যেতে পারে। জাম্ববতীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহের কাহিনীটি বেশ রোমাঞ্চকর। যদু-বৃষ্ণিবংশীয় সত্রাজিৎ নামে এক রাজপুরুষ সূর্যদেবের উপাসনা করে স্যমন্তক নামে একটি অলৌকিক মণি লাভ করেছিলেন। স্যমন্তক মণি থেকে প্রতিদিন প্রচুর সোনা উৎপন্ন হত। শুধু তাই নয়, এই মণিটি যে রাজ্যে থাকত সেখানে কোনো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা রোগ-ব্যাধির প্রকোপ দেখা যেত না। ফলে স্যমন্তক মণির প্রতি সমগ্র যদুকুলের যথেষ্ট নজর ছিল। স্বয়ং কৃষ্ণও রাজা উগ্রসেনের হাতে মণিটি তুলে দেবার জন্য সত্রাজিৎকে অনুরোধ করেছিলেন বলে জানা যায়। ফলে স্যমন্তকমণির ওপর কৃষ্ণের আগ্রহ বা লোভও যথেষ্ট ছিল একথা পুরাণের কথকরাও স্বীকার করে নিয়েছেন। এ অবস্থায় মণিটিকে অনান্য জ্ঞাতিদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই সত্রাজিৎ এটি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রসেনের কাছে গচ্ছিত রাখেন। একদিন প্রসেন মণিটি গলায় পরে মৃগয়ায় যান এবং একটি সিংহের হাতে নিহত হন। হরিবংশ পুরাণে বলা হয়েছে যে, সিংহটি মণির জন্যই প্রসেনকে হত্যা করেছিল। সেই সিংহটিকে আবার ঋক্ষরাজ জাম্ববান মেরে ফেলেন এবং স্যমন্তক মণিটি নিয়ে তাঁর গুহায় প্রবেশ করেন। এদিকে প্রসেনের নিখোঁজ হওয়াকে কেন্দ্র করে যদু-বৃষ্ণিদের ধারণা হয় যে, কৃষ্ণই যাবতীয় গোলযোগের মূলে। কারণ স্যমন্তক মণির প্রতি তাঁরও বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এই অপবাদ থেকে মুক্তি পেতে কৃষ্ণ প্রসেন ও মণির খোঁজে বনে যান। সেখানে তিনি প্রসেন ও মৃত সিংহটির দেহ আবিষ্কার করেন। সিংহটি যে কোনো ঋক্ষের দ্বারাই আক্রান্ত হয়েছিল তা বুঝে নিতেও কৃষ্ণের বেশি সময় লাগেনি। ঋক্ষের পদচিহ্ন অনুসরণ করে কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত জাম্ববানের গুহার কাছে এসে পৌঁছান। সেখানে তিনি স্যমন্তক মণিটি নিয়ে জাম্ববানের পুত্র সুকুমারকে খেলা করতে দেখেন।

স্যমন্তক মণিটি উদ্ধার করতে গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে জাম্ববানের একুশদিন ব্যাপী এক ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে জাম্ববান পরাজিত হন। পরাজিত জাম্ববান কৃষ্ণের মধ্যে বিষ্ণুর ত্রেতাযুগীয় অবতার শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ দেখতে পান এবং স্বয়ং নারায়ণই যে কৃষ্ণরূপে এখন তাঁর সামনে উপস্থিত। তা বুঝতে পেরে তাঁর পূজা ও স্তব করেন। তারপর স্যমন্তক মণির সঙ্গে সঙ্গে নিজ কন্যা জাম্ববতীকেও সম্প্রদান করেন কৃষ্ণের হাতে—

ভেজে জাম্ববতীং কন্যামৃক্ষরাজস্য সম্মতাম্।
মণিং স্যমন্তকঞ্চৈব জগ্রাহাত্মবিশুদ্ধয়ে॥

এরপর কৃষ্ণ মণি ও জাম্ববতীকে নিয়ে দ্বারকায় ফিরে আসেন। কৃষ্ণের প্রতি চৌর্যবৃত্তির যে অপবাদ আনা হয়েছিল, তা খণ্ডনের সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হয়ে উঠলেন জাম্ববতী স্বয়ং।

[হরিবংশ পু. ১.৩৮.২৭-৪২; ভাগবত পু. ১০.৫৬.১৩-৩২; বায়ু পু. ৯৬.৪৭-৪৮; বিষ্ণু পু. ৪.১৩.১৩-৩২; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.৪৮-৫০]

□ কৃষ্ণ ও জাম্ববতীর একাধিক পুত্র ও কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। এঁরা হলেন—শাম্ব, ভদ্র, ভদ্রগুপ্ত, ভদ্রচিত্র (মতান্তরে ভদ্রবিন্দ্য, ভদ্রবাহু (মতান্তরে সপ্তবাহু) এবং ভদ্রাবতী ও সাম্বধনী।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭১.২৪৯-২৫০; বায়ু পু. ৯৬.২৪১]

□ শাম্বই জাম্ববতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। কৃষ্ণের প্রথমা পত্নী রুক্মিণীর পুত্রদের দেখে জাম্ববতীরও পুত্র লাভের ইচ্ছা হয়। জাম্ববতী পুত্র লাভের জন্য কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। কৃষ্ণ জাম্ববতীর অনুরোধ রক্ষা করার জন্য হিমালয় পর্বতে দীর্ঘ তপস্যা করেছিলেন। এই তপস্যার ফলেই কৃষ্ণ ও জাম্ববতী শাম্বকে লাভ করেন।

[মহা (k) ১৩.১৪.২৯-৪১; (হরি) ১৩.১৩.২৯-৪১]

□ যদুবংশের বিনাশের পর কৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। জাম্ববতী কৃষ্ণের দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে অনুসরণের বিধান অনুযায়ী অগ্নিতে প্রবেশ করেন। *[মহা (k) ১৬.৭.৭৩; (হরি) ১৬.৭.৮৪]*

জাম্ববতী নদী প্রভাসক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি পবিত্র নদী-তীর্থ। যদুবংশ ধ্বংস হবার পর কৃষ্ণের পত্নী জাম্ববতী যখন স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ পেলেন তখন শোকে-দুঃখে কাতর হয়ে তিনি নদীর তীরে চিতা নির্মাণ করে তাতে ঝাঁপ দিলেন। মৃত্যুর পর জাম্ববতী প্রভাসক্ষেত্রে নদী রূপে প্রবাহিত হলেন এবং কৃষ্ণের চিতাভস্ম সঙ্গে নিয়ে মিশলেন সমুদ্রের জলে। কৃষ্ণপত্নী জাম্ববতীর নামেই এই নদীর নামকরণ হয়। কথিত আছে যে নারী এই নদীতে স্নান করেন তিনি বা তাঁর বংশের কেউ কখনো বৈধব্যের দুঃখ ভোগ করেন না। তবে এই নদীর বর্তমান অবস্থান বা গতিপথ সম্পর্কে কোনো তথ্য মেলে না।

[স্কন্দ পু. (প্রভাস/প্রভাসক্ষেত্র) ২৩১.১-৮]

জাম্ববান্ জাম্ববান্ ব্রহ্মার পুত্র এবং বানর দলপতি ধূম্রের ভাই। একদিন হাই (জৃম্ভন) তোলার সময় হঠাৎই ব্রহ্মার মুখ থেকে তাঁর জন্ম হয়—

পূর্ব্বমেব ময়া সৃষ্টো জাম্ববান্ ঋক্ষপুঙ্গবঃ।
জৃম্ভমাণস্য সহসা মম বক্ত্রাদজায়ত॥

[রামায়ণ ১.১৭.৭]

তবে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে, ঋক্ষ নামক এক শক্তিশালী বানরের ভগিনী রক্ষার গর্ভে ঋক্ষরাজ জাম্ববানের জন্ম হয়। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁর পিতা। রামায়ণের তিলকটীকায় আবার বলা হয়েছে যে, জাম্ববান্ ঋক্ষরাজ গদ্গদের ক্ষেত্রজ পুত্র। ব্রহ্মার হাই (জৃম্ভণ) তোলার সময় যে ঐশ্বরিক শক্তি উৎপন্ন হয় তা গদ্গদের পত্নীর গর্ভে জাম্ববানের সৃষ্টি করে। রামায়ণে বলা হয়েছে—

গদ্গদস্যাথ পুত্র বৈ জাম্ববানিতি বিশ্রুতঃ।

[রামায়ণ ৬.৩০.২০]

তিনি বীর, তেজস্বী। নীল কাজলের মতো তাঁর গায়ের রঙ—

ঋক্ষরাজস্তেজস্বী নীলাঞ্জনচয়োপমঃ।

[রামায়ণ ৬.৯৯.৮]

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে, জাম্ববানের পত্নী ব্যাঘ্রী। তাঁদের কন্যা জাম্ববতী, যাঁর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়। জাম্ববানের সতেরোজন পুত্র ছিলেন। তাঁরা নিজেরাও অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। এঁরা হলেন জয়ন্ত, সর্বজ্ঞ, মৃগরাট, সংকৃতি, জয়, মার্জার, বলিবাহু, লক্ষণজ্ঞ, শ্রুতার্থকৃৎ, ভোজ, রাক্ষসজিৎ, পিশাচ, বনগোচর, শরভ, শলভ, ব্যাঘ্র, সিংহ।

[রামায়ণ ১.১৭.৭; ব্রহ্মাণ্ড পু. ২.৭.২৯৯-৩০০; ৬.২৭.৮-১১; ৬.৩০.২০; ৬.৯৯.৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. ২.৭.৩০১; ২.৭.৩০২-৩০৪]

□ বিভিন্ন পুরাণে জাম্ববানকে ঋক্ষরাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ পৌরাণিক চরিত্র। যাঁকে সমুদ্রমন্থনের কাল থেকে দ্বাপর যুগ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। বাল্যবয়সে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। তবে রামচন্দ্রের সময় তিনি বৃদ্ধ বয়সে এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু ওই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি রামের সাহায্যের জন্য দশ কোটি সৈন্য নিয়ে সুগ্রীবের কাছে এসে উপস্থিত হন—

ঋক্ষরাজো মহাতেজা জাম্ববান্নাম নামতঃ।
কোটিভির্দশভির্ব্যাপ্তঃ সুগ্রীবস্য বশে স্থিতঃ॥

[রামায়ণ ৪.৩৯.২৬]

মহাভারতে জাম্ববানের এই সৈন্যদলের আকৃতিরও পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কপালে শ্বেতচিহ্নধারী অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণ ভালুকের সঙ্গে জাম্ববান্ সুগ্রীবের কাছে আসেন।—

কৃষ্ণাণাং মুখপুণ্ড্রাণামৃক্ষাণাং ভীমকর্মণাম্।
কোটীশতসহস্রেণ জাম্ববান্ প্রত্যদৃশ্যতে॥

[রামায়ণ ৪.৩৯.২৬; মহা (k) ৩.২৮০.২৩; ৩.২৮৩.৮; (হরি) ৩.২৩৪.২৩; ৩.২৩৭.৮]

□ সুগ্রীব সীতার সন্ধানে পৃথিবীর চতুর্দিকে বানরদল পাঠিয়েছিলেন। দক্ষিণদিকে যে বানরদলটি তিনি পাঠান, সেই দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন জাম্ববান্। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ ছিলেন। তাই সকলে তাঁকে মান্য করতেন। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে সীতার সন্ধান করেন কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পেলেন না। এদিকে সুগ্রীবের দেওয়া নির্দিষ্ট সময়সীমাও পেরিয়ে গেল দেখে শাস্তির ভয়ে বানর সৈন্যরা বসে বসে দুশ্চিন্তা করতে লাগল। এমন সময় জটায়ুর দাদা সম্পাতি তাঁদের বললেন, সমুদ্রের ওপারে লঙ্কাপুরী আছে। রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে সেখানেই আটকে রেখেছে। তোমরা সেখানে গিয়ে সীতার খোঁজ কর। বিশাল সাগর পার হতে হবে ভেবে বানরবীররা ভাবতে লাগলেন, এখন কী করা যায়? তখন অঙ্গদ সকলকে বললেন, আপনাদের মধ্যে কার এই বিশাল সাগর পার হবার শক্তি আছে

বলুন। অঙ্গদের এই কথা শুনে মুখ্য বানরেরা কে কতদূর পর্যন্ত লাফ দিতে পারেন, তার পরিমাণ জানালেন। জাম্ববান্ বললেন, এককালে আমিও খুব শক্তিশালী ছিলাম। বহুকাল আগে যখন শ্রীবিষ্ণু বামনরূপ ধারণ করেন তখন তাঁর সেই স্বর্গ-মর্ত্যব্যাপী বিশাল মূর্তিকে প্রদক্ষিণ করেছিলাম—

ময়া বৈরোচনে যজ্ঞে প্রভবিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
প্রদক্ষিণীকৃতঃ পূর্ব্বং ক্রমমাণস্ত্রিবিক্রমঃ॥

[রামায়ণ ৪.৬৫.১৫]

তখন আমার বয়সও কম ছিল দেহেও প্রচুর শক্তি ছিল। কিন্তু এখন বৃদ্ধ হয়েছি, আগের মতো শক্তিও নেই। তবু আমি এখনও নব্বই যোজন অনায়াসে যেতে পারি। কিন্তু তাতে আমাদের কাজ হবে না—

যৌবনে চ তদাসীন্মে বলমপ্রতিমং পরম্॥
সম্প্রত্যেতাবদেবাদ্য শক্যং মে গমনে স্বতঃ।
নৈতাবতা চ সংসিদ্ধিঃ কার্যস্যাস্য ভবিষ্যতি॥

[রামায়ণ ৪.৬৫.১৬-১৭]

জাম্ববানের এই কথা শুনে অঙ্গদ নিজেই লঙ্কায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে জাম্ববান অত্যন্ত বিচক্ষণ বুদ্ধিতে অঙ্গদের যুবরাজ-মর্য্যাদার কথা চিন্তা করে বললেন, কুমার! আমরা জানি যে তুমি অনায়াসে শতসহস্র যোজন যেতে পার। কিন্তু তুমি আমাদের প্রভু, আমাদের আশ্রয়। তাই তোমার যাওয়া চলবে না। তোমাকে অবলম্বন করেই আমরা আমাদের কাজ সম্পন্ন করব। তুমি ভেবো না, আমি যথার্থ ব্যক্তিকেই এই কাজে পাঠাব—

তস্য তে বীর কার্য্যস্য ন কিঞ্চিৎ পরিহাস্যতে।
এষ সঞ্চোদয়াম্যেনং যঃ কার্য্যং সাধয়িষ্যতি॥

[রামায়ণ ৪.৬৫.৩৪]

এরপর তিনি হনুমানকে বিভিন্নভাবে লঙ্কায় যেতে উৎসাহিত করেছেন। বলেছেন, দেখ বাবা, আমি তো এখন বৃদ্ধ হয়েছি। কিন্তু একবার সমুদ্রমন্থনের সময় আমি দেবতাদের আদেশে গোটা পৃথিবী একুশবার ঘুরে ওষধি সংগ্রহ করে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করেছিলাম—

ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী পরিক্রান্তা প্রদক্ষিণম্॥
তদা চৌষধয়ো'স্মাভিঃ সঞ্চিতা দেবশাসনাৎ।
নির্মথ্যমমৃতং যাভিস্তদানীং নো মহদ্বলম্॥

[রামায়ণ ৪.৬৬.৩১-৩৩]

সেখান থেকেই পরে অমৃত উঠেছিল। কিন্তু আজ আর সেই আগের শক্তি নেই। আজ তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা, একমাত্র তুমিই এই বিশাল সাগর অতিক্রম করতে পার। যাও, সীতার সন্ধান নিয়ে এসো। এই কথা বলে জাম্ববান্ হনুমানকে সীতার সন্ধানে উদ্‌যুক্ত করলেন।

[রামায়ণ ৬.৪৪-৫৯ তম সর্গ; ৬.৬৪.৭; ৬.৬৪.২০-২২; ৬.৬৫.১০-৩৫; ৬.৬৬ তম সর্গ]

□ যথাসময়ে হনুমান সীতার সন্ধান নিয়ে ফিরে এলেন। দলের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ ছিলেন জাম্ববান্। তিনিই তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কী করে সীতাকে দেখলে? তিনি কেমন আছেন? দুষ্ট রাবণ তাঁর সঙ্গে কোনো খারাপ আচরণ করেনি তো? তোমার কথা শুনেই আমরা আমাদের কর্তব্য স্থির করব।

যশ্চার্থস্তত্র বক্তব্যো গতৈরস্মাভিরাত্মবান্।
রক্ষিতব্যঞ্চ যত্তত্র তদ্ভবান্ ব্যাকরোতু নঃ॥

[রামায়ণ ৫.৫৮.৬]

এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, লঙ্কায় সীতার সম্বন্ধে যদি কোনো কলঙ্কের ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে তা রামচন্দ্রকে বলা উচিত হবে না। তাই, সমস্ত ঘটনা জানা প্রয়োজন। তখন হনুমান লঙ্কার সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাঁর কথা শুনে অঙ্গদ বানরদলপতিদের বললেন, হনুমান লঙ্কার রাক্ষসদের প্রায় শেষ করে দিয়ে এসেছেন। এখন সীতাকে উদ্ধার করা ছাড়া তো আর কোনো কাজ নেই। চলো, আমরা সীতাকে উদ্ধার করে রামচন্দ্রের কাছে যাই। অঙ্গদের এই প্রস্তাব জাম্ববানের কাছে যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়নি। তিনি বলেছেন, আমাদের শুধুমাত্র সীতার অনুসন্ধানের দায়িত্বই দেওয়া হয়েছিল, রাম বা সুগ্রীব তাঁকে নিয়ে যেতে বলেননি। তার উপর আবার তাঁরা দু-জনেই সীতাকে উদ্ধার করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন, কাজেই তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করা ঠিক হবে না। তাছাড়া লঙ্কা জয় করাও খুব একটা সহজ কাজ নয়। সুতরাং চলো আমরা কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে রাম ও সুগ্রীবকে সমস্ত বিষয়টা জানাই।

[রামায়ণ ৫.৫৭ তম সর্গ; ৫.৫৮.১-৬ তম সর্গ; ৫.৬০ তম সর্গ]

□ তারপর তাঁরা কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এলেন। হনুমানের মুখে সমস্ত কথা শুনে রাম ও সুগ্রীব যুদ্ধযাত্রা করলেন। বেশ কিছুদিন পর তাঁরা সমুদ্রের তীরে এসে উপস্থিত হলেন। সেই সময় বিভীষণ রামের কাছে এসে আশ্রয় নিতে চাইলে

তাঁকে আশ্রয় দেওয়া উচিত হবে কিনা এ বিষয়ে রাম সকলের মতামত জানতে চাইলেন। তখন জাম্ববান্ বললেন, বিভীষণ আমাদের শত্রুর কাছ থেকে এসেছে তাই তাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না—

বদ্ধবৈরাচ্চ পাপাচ্চ রাক্ষসেন্দ্রাদ্বিভীষণঃ।
আদেশকালে সম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বথা শঙ্ক্যতাময়ম্॥

[রামায়ণ ৬.১৭.৪৬]

অবশ্য পরে তাঁর এই সন্দেহ ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে তবু রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর এই সন্দেহ যুক্তিসম্মত বলেই আমাদের মনে হয়।

[রামায়ণ ৫.৬৫-৬.৫তম সর্গ ৬.১৭.৪৫-৪৬]

জাম্ববানের উপর রামের বিশেষ ভরসা ছিল। তাই লঙ্কার আশেপাশে সেনানিবেশের সময় তিনি জাম্ববানকে সমস্ত সৈন্যের মাঝখানে রেখেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে জাম্ববানও নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন ইন্দ্রজিতের ভয়ে বানর সৈন্যরা যখন পালাতে শুরু করে তখন তিনিই তাদের শান্ত করেন। তারপর ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রে রাম-লক্ষ্মণ ও অন্যান্য বানরসৈন্যের সঙ্গে তিনিও আহত হন। সেই রাতে বিভীষণ ও হনুমান মশাল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন জাম্ববান, অঙ্গদ, সুগ্রীব প্রমুখ যোদ্ধা মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে আছেন। শরবিদ্ধ জাম্ববানকে দেখে বিভীষণ বললেন, আপনি নিহত হননি তো? জাম্ববান অতিকষ্টে বললেন, বিভীষণ, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না শুধু কণ্ঠস্বরে চিনেছি। তুমি হনুমানকে আমার কাছে নিয়ে এসো। একমাত্র সে-ই এই বিপদে আমাদের রক্ষা করতে পারে। এই কথা শুনে হনুমান তাঁর চরণ স্পর্শ করলে জাম্ববান তাঁকে বললেন, তুমি হিমালয় পর্বতে যাও। সেখানে মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানকরণী নামক ওষধি দেখতে পাবে তুমি শীঘ্র এই সমস্ত ওষধি নিয়ে এসে আমাদের প্রাণ রক্ষা কর। জাম্ববানের কাছে এই আদেশ পেয়ে হনুমান ওষধি নিয়ে আসেন, তার ফলে সকলের প্রাণ রক্ষা হয়। মহাভারতে বলা হয়েছে, কুবের মন্ত্রপূত পবিত্র জল পাঠান। সেই জল দিয়ে রাম-লক্ষ্মণ, জাম্ববান, হনুমান, অঙ্গদ প্রমুখ চোখ ধুয়ে ফেলেন। এর ফলে তাঁরা অদৃশ্য বস্তু দেখতে সক্ষম হন। শুধুমাত্র পরামর্শদাতা হিসেবেই নয় যোদ্ধা হিসেবেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অঙ্গদ, হনুমান, বিভীষণ প্রমুখ যোদ্ধার সঙ্গে তাঁকেও যুদ্ধ করতে দেখা যায়।

*[রামায়ণ ৬.২৪.১৭; ৬.৫০.১১; ৬.৭৪.১৩-৩৪;
৬.৭৬.৫৬-৫৯; ৬.৪৩.১-৪; ৬.৮৯.৭-১৯;
ভাগবত পু. ৯.১০.১৯;
মহা (k) ৩.২৯০.৩; ৩.২৮৯.১২-১৪;
(হরি) ৩.২৪৪.৩; ৩.২৪৩.১২-১৪]*

□ লঙ্কা জয় করে রাম-লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে জাম্ববান ও অন্যান্য বানর দলপতিরাও অযোধ্যায় যান। তারপর অন্য সকলের সঙ্গে জাম্ববানও রামের অভিষেকে অংশ নেন এবং অভিষেকের পর তিনি স্বস্থানে ফিরে যান। বহুকাল পরে রামের মহাপ্রস্থানের কথা শুনে তিনি অযোধ্যায় এসে উপস্থিত হন। রামের সঙ্গী হতে চাইলে রাম তাঁকে বলেন, এখনও তোমার দেহত্যাগের সময় হয়নি। তোমাকে এখনও বহুকাল পৃথিবীতে থাকতে হবে কলিকালের পূর্ব পর্যন্ত তুমি পৃথিবীতে থাকবে—

মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব পঞ্চ জাম্ববতা সহ॥
যাবৎ কলিশ্চ সম্প্রাপ্তস্তাবজ্জীবত সর্ব্বদা।

*[রামায়ণ ৬.১২৪.১৮-২৭; ৬.১৩০.৫১-৫৬;
৭.৫০ তম সর্গ; ৭.১২১.৩৩-৩৫;
ভাগবত পু. ৯.১০.৪২-৪৩]*

□ বিভিন্ন পুরাণে দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জাম্ববানকে দেখতে পাই। স্যমন্তক মণিকে কেন্দ্র করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাঁধে। শ্রীকৃষ্ণের পত্নী সত্যভামার পিতা সত্রাজিৎ ছিলেন সূর্যের উপাসক। একদিন সত্রাজিৎ সূর্যদেবের উপাসনা করছিলেন। তখন সূর্যদেব তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বর প্রার্থনা করতে বলেন। তখন সত্রাজিৎ সূর্যের গলার মালাটিই চেয়ে বসলেন। সেই মালাটির মধ্যমণি স্যমন্তক মণিটি অসাধারণ সুন্দর ছিল। মণিটির অলৌকিক ক্ষমতাও ছিল। প্রতিদিন এই মনি আট ভার সোনা প্রসব করত। এর প্রভাবে রাজ্যেও কোনো অশান্তি ছিল না। সত্রাজিৎ তাঁর ভাই প্রসেনকে এই মণিটি ভালবেসে দিলেন। তবে বিষ্ণুপরাণে বলা হয়েছে যে, পাছে কৃষ্ণ এই মণিটি তাঁর কাছে চেয়ে বসেন সেই ভয়ে তিনি মণিটি প্রসেনকে দিয়ে দেন। যাই হোক, প্রসেন এক দিন মণিটি গলায় ঝুলিয়ে মৃগয়ায় গেলেন। সেই বনের মধ্যে এক সিংহ তাঁকে মেরে ফেলল।কৃষ্ণের

জ্ঞাতিগোষ্ঠির সকলে প্রসেনের মৃত্যুর কথা জানতে পেরে কানাকানি করতে লাগল যে, কৃষ্ণই মণির লোভে প্রসেনকে হত্যা করেছেন। কানাঘুষোয় এই কথা শুনতে পেয়ে কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি অবশ্যই স্যমন্তক মণি উদ্ধার করে নিজের কলঙ্ক মোচন করবেন। এই ভেবে অনুচরদের নিয়ে কৃষ্ণ স্যমন্তক মণির খোঁজে বেড়িয়ে পড়লেন। প্রসেনের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে তিনি প্রসেন এবং সিংহ উভয়ের মৃতদেহ খুঁজে পেলেন। কৃষ্ণ কিন্তু মণি পেলেন না। তখন বিভিন্ন পদচিহ্ন পরীক্ষা করে দেখলেন যে এক ভালুক সিংহটিকে মেরেছে। ভালুকের পদচিহ্ন অনুসরণ করে তিনি এক গুহার মুখে উপস্থিত হলেন। গুহার মুখে কিছুটা ঢুকেই তিনি একটি নারীকণ্ঠের সান্ত্বনাবাণী শুনতে পেলেন। রমণী বলছে—সিংহ প্রসেনকে মেরেছে, আর জাম্ববান সেই সিংহকে মেরে মণি নিয়ে এসেছে। এই মণি এখন তোমারই। —এই কথা শুনে কৃষ্ণ এগিয়ে যেতেই ওই রমণী অপরিচিত পুরুষ দেখে আর্তনাদ করে উঠল। তখন জাম্ববান তার কণ্ঠস্বর শুনে সেইস্থানে এসে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে জাম্ববানের মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হল। যুদ্ধ করতে করতে একুশ দিন পেরিয়ে গেল। ওদিকে কৃষ্ণের অনুচরেরা কৃষ্ণকে মৃত ভেবে ফিরে গেল। কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত জাম্ববানকে যুদ্ধে পরাজিত করলেন। পরাজিত জাম্ববান শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু বলে চিনতে পারলেন। এই কাহিনী প্রসঙ্গে একমাত্র মৎস্যপুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, এইসময় জাম্ববান নিজেই ভগবান বিষ্ণুর পরমপদ লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাঁর সুদর্শন চক্রের আঘাতে মৃত্যুর ইচ্ছা প্রকাশ করেন—

ইচ্ছে চক্রপ্রহারেণ ত্বত্তো'হং মরণং প্রভো।

[মৎস পু. ৪৫.১৫]

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের সেই ইচ্ছা পূরণ করেন। মৃত্যুর আগে জাম্ববান্ কন্যা জাম্ববতী ও স্যমন্তক মণি শ্রীকৃষ্ণের হাতে সম্প্রদান করেন। অন্যান্য পুরাণে অবশ্য এই ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায় না। তবে ভাগবত পুরাণের একাদশ স্কন্ধে জাম্ববানের মৃত্যুসংবাদ স্বয়ং কৃষ্ণের মুখেই উচ্চারিত হয়েছে। যদুবংশ ধ্বংসের পরে ও দেহত্যাগের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ধর্মোপদেশ দেন। সেই সময় তিনি বলেছেন, জাম্ববান প্রমুখ তাঁর (শ্রী বিষ্ণুর) পরম পদ লাভ করেছেন।

[ভাগবত পু. ১০.৫৬.১৪-৩২; ব্রহ্মাণ্ড পু. ৩.৭১.৩৫; বিষ্ণু পু. ১৩.৮-৩৮; মৎস্য পু. ৪৫.৪-১৬; বায়ু পু. ৯৬.২০-৪১]

জাম্বুনদ পুরাণ অনুযায়ী জম্বুদ্বীপের একটি নদী। এর আরেক নাম জম্বুরসবতী। পুরাণের বর্ণনায় জম্বুদ্বীপে সুদর্শন নামে একটি বিশালাকৃতি জম্বুবৃক্ষ বা জামগাছ আছে। সেই জম্বুবৃক্ষের সুমিষ্ট ফলের রসে জাম্বুনদের উৎপত্তি। এটি সুমেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করে উত্তরকুরু দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত—

পরিণাহন্তু বৃক্ষস্য ফলানাং রসভেদিনাম্॥
পতমানানি তান্যুর্ব্যাং কুর্বন্তি বিপুলং স্বনম্।
মুঞ্চন্তি চ রসং বাজংস্তস্মিন্ রজত সন্নিভম্॥
তস্যা জম্ব্বাঃ ফলরসো নদী ভূত্বা জনাধিপ।
মেরু প্রদক্ষিণং কৃত্বা সংপ্রয়াত্যুত্তরান্ কুরূন্॥

জাম্বুনদের ধারা এতোই সুমিষ্ট যে, একে পুরাণে মধুবাহিনী বলেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে—জম্বুনদী নাম প্রবৃত্তা মধুবাহিনী। জাম্বুনদের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে অপর একটি মত প্রচলিত রয়েছে। কয়েকটি পুরাণে পাওয়া যায় যে, মেরু পর্বতের উপর অবস্থিত চন্দ্রপ্রভা নামে একটি হ্রদ থেকে জাম্বুনদের উৎপত্তি। ভাগবত পুরাণ মতে, জাম্বুনদ মেরু পর্বতের উপর থেকে প্রবলবেগে নিম্নভূমিতে পতিত হয়ে ইলাবৃতবর্ষ পর্যন্ত প্রবাহিত। জাম্বুনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে, এর অববাহিকায় ইন্দ্রগোপকীট বা কাঁচপোকার গায়ের রঙের মতো উজ্জ্বল পীতবর্ণের উৎকৃষ্ট ও দুর্লভ প্রকৃতির স্বর্ণ আকরিক পাওয়া যায়, যা দিয়ে দেবতাদের অলঙ্কার তৈরি হয়—

তত্র জাম্বুনদং নাম কনকং দেবভূষণম্।
ইন্দ্রগোপকসঙ্কাশং জায়তে ভাস্বরন্তু তৎ॥

ভাগবত পুরাণে জাম্বুনদ অববাহিকায় জল, বায়ু ও সূর্যকিরণের সংযোগে (রাসায়নিক বিক্রিয়ায়) এই উৎকৃষ্টমানের স্বর্ণ আকরিক সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। জাম্বুনদের অববাহিকায় বসবাসকারীদের গায়ের রং অতি উজ্জ্বল, এরা দীর্ঘায়ু এবং জরাগ্রস্ত নন কারণ তাঁরা জাম্বুনদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত সুমিষ্ট ফলের রসে লালিত।

[মহা (k) ৬.৭.১৯-২৭; (হরি) ৬.৭.১৯-২৭; বায়ু পু. ৩৫.২৬-৩০, ৪৭.৬৬; ভাগবত পু. ৫.১৬.১৯-২০; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৭.২২, ১.১৮.৬৯]

□ মহাভারতের অপর একটি শ্লোকে জাম্বুনদকে, গঙ্গানদীর সপ্তধারার মধ্যে অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

তত্র দিব্যা ত্রিপথগা প্রথমন্তু প্রতিষ্ঠিতা।
ব্রহ্ম লোকাদপক্রান্তা সপ্তধা প্রতিপদ্যতে॥
বস্বৌক সারা নলিনী পাবনী চ সরস্বতী।
জাম্বুনদী চ সীতা চ গঙ্গা সিন্ধুশ্চ সপ্তমী॥

[মহা (k) ৬.৬.৪৯; (হরি) ৬.৬.৪৯]

□ মেরু পর্বতের উপর থেকে মাটিতে পতিত হওয়ার পর জাম্বুনদ ইলাবৃতবর্ষ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে—একথা ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে।

[ভাগবত পু. ৫.১৬.১৯]

□ পণ্ডিতদের মতে, জাম্বুনদ হল বর্তমান জর্ডন নদী, যা পশ্চিম এশিয়ার সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত। এই জর্ডন নদীর তীরেও উৎকৃষ্টমানের একধরনের ধাতু সুপ্রাচীন কাল থেকে পাওয়া যায়। এটি মিটিওরিক আয়রন (Meteoric Iron) যার রং উজ্জ্বল লাল ও ঘন নীল বর্ণের মিশ্রণ। বাইবেলেও জাম্বুনদের তীরবর্তী স্বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ধাতুটি সম্ভবত স্বর্ণ আকরিক নয় কিন্তু এর উজ্জ্বল বর্ণের কারণেই একে স্বর্ণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে মনে হয়। আমরা জানি জর্ডন নদীর তীরে বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ এখনো পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে অন্যতম হল মিটিওরিক আয়রন। পুরাণ উল্লিখিত বিশেষ ধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে জাম্বুনদ অববাহিকায় মিশ্র খনিজ পদার্থ উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। সম্ভবত এই খনিজটি মিটিওরিক আয়রণ। এবং এই খনিজটির সহজলভ্যতার কারণেই জর্ডন নদী বা জাম্বূনদ অর্থনৈতিক ভাবে বাইবেলের সৃষ্টিকর্তা এবং মহাভারত ও পুরাণকারদের কাছে একই রকম গুরুত্ব পেয়েছিল বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মহাভারতের একটি শ্লোকে জাম্বুনদকে গঙ্গার ধারা বলে বর্ণনা করা হলেও এই তথ্যটিকে আক্ষরিক অর্থে বিচার না করাই ভালো বলে মনে হয়। সম্ভবত ক্রমে ক্রমে পূর্বগামী আর্যজাতি, যাদের মূল বাসস্থল ছিল এশিয়া মাইনর অঞ্চল বা পশ্চিম এশিয়া, তারাই গঙ্গানদীর কোনো একটি ধারাকে জাম্বুনদ নামে আখ্যা দিয়েছিলেন। কারণ পশ্চিম এশিয়ায় বসবাসকালে জর্ডন নদী অর্থনৈতিক তথা ভৌগোলিক কারণে তাদের কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশের পর গঙ্গা নদী তাদের কাছে ঠিক ততোটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে গঙ্গার উপধারার নাম জাম্বুনদের ওপর আরোপিত হওয়াটা সম্ভব একটি রূপক বলেই মনে হয়।

[Desi words speak of the Past, Dr. Liny Srinivasan, USA: Author House, 2011; p. 219]

□ অবশ্য পণ্ডিত গিরীন্দ্রশেখর বসু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ আলাদা একটি ধারণা দিয়েছেন। তাঁর মতে জাম্বুনদ সৃষ্টিকারী জম্বুবৃক্ষের বৃহদাকৃতি ফলগুলি বরফের বিশাল খণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর ধারণা জাম্বুনদ সম্ভবত হিমালয় পর্বতাঞ্চলের একটি হিমবাহ। অবশ্য উপরে আলোচিত দুটি তত্ত্বকেই একত্রে মেনে নিতে অসুবিধা হয় না। কারণ ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাংশের সমস্ত নদীই কোনো না কোনো হিমবাহজাত। সেদিক থেকে বিচার করলে আর্যায়ণের কোনো পর্যায়ে পশ্চিম এশিয়ার জর্ডন নদী বা জাম্বুনদ ভারতীয় উপমহাদেশের হিমবাহজাত গঙ্গানদীর একটি ধারায় রূপান্তরিত হয়েই থাকতে পারে। এক্ষেত্রে ভৌগোলিক দূরত্ব নয়, বরং ঐতিহাসিক বিবর্তন বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকতে পারে।

[পুরাণ প্রবেশ; গিরীন্দ্র শেখর বসু; বিবেকানন্দ বুক সেন্টার; কলকাতা ২০০৭; পৃ. ২১৮]

জারুথী একটি প্রাচীন নগরী। মহাভারতের বনপর্বে জারুথীর একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। ইনি হলেন আহুতি। কৃষ্ণ এই আহুতিকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.১২.৩০; (হরি) ৩.১১.৩০]

জারুধি পুরাণ-বর্ণিত উত্তর দেশের একটি পবিত্র বর্ষপর্বত। বিশালাকায় মেরু পর্বতের পাদদেশে যেসব পর্বত সমান্তরালে বিস্তৃত সেগুলির মধ্যে জারুধি একটি। পুরাণে জারুধিকে দেবগিরি বলা হয়েছে। এই পর্বতে যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব, নাগ প্রভৃতিদের আবাস। ভদ্রসোমা নামে পবিত্র নদীটি জারুধি পর্বত স্পর্শ করে প্রবাহিত।

জারুধি পর্বতটি বহুশৃঙ্গ বিশিষ্ট। এর অষ্টম শৃঙ্গে আনন্দজল নামে তিনশো যোজন বিস্তৃত একটি সরোবর অবস্থিত। সেখানে নাগাধিপতি চণ্ডের বাস। *[বায়ু পু. ৪১.৬৬-৭৩; ৩৬.৩২; ৪২.৭১; ভাগবত পু. ৫.১৬.২৬; বিষ্ণু পু. ২.২.৪২]*

□ পণ্ডিতদের মতে বর্তমান কিরঘিজস্তানের অন্তর্গত উলা-তাউ (Ula-Tau) বা "The Great Mountains"-ই পুরাণোল্লেখিত জারুধি পর্বত। আর জারুধি স্পর্শ করে প্রবাহিত 'ভদ্রসোমা' নদীটির আধুনিক নাম সির্ দরিয়া (Syr Darya) যা পশ্চিমে আরল সাগরে মিশেছে।

[GP (Ali) p. 80; M.Malte-Brun, Universal Geography (vol-2), London, Black and Longman, 1822, p. 362]

জালধি পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি জালধির বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি ভৃগুর বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৫.২২]

জালবাসিনী বাসুদেব-কৃষ্ণের পত্নীদের মধ্যে জালবাসিনী একজন বলে বায়ু পুরাণে কথিত হয়েছে। *[বায়ু পু. ৯৬.২৩৪]*

জিত১ যদুর পাঁচজন পুত্রের মধ্যে জিত একজন। তাঁর অপর ভ্রাতারা হলেন—সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নীল এবং লঘু। *[বায়ু পু. ৯৪.২]*

জিত২ ব্রহ্মার মানস পুত্র 'জয়' নামের দেবতারা ব্রহ্মার আদেশানুসারে সৃষ্টিকার্যে মনোনিবেশ না করে তপস্যায় রত হন। ব্রহ্মা তাঁদের অভিশাপ দেন। এর ফলে জয় নামে দেবতারা প্রতি মন্বন্তরেই দেবতা রূপে জন্মগ্রহণ করতে লাগলেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে জন্মগ্রহণকারী এই জয় দেবগণের অন্তর্ভুক্তী একজন দেবতা হলেন জিত।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৩.৮; বায়ু পু. ৩১.৪]

জিত৩ স্বায়ম্ভুব মনুর মানস পুত্রদের মধ্যে জিত একজন। তিনি জিৎ ও অজিতের ভ্রাতা।

[বায়ু পু. ৩১.৪]

জিতবতী রাজা উশীনরের কন্যা জিতবতী। তিনি অষ্টবসুর একতর 'দ্যু' নামক বসুর পত্নীর সখী ছিলেন বলে মহাভারতের আদিপর্বে উল্লিখিত হয়েছে। *[মহা (k) ১.৯৯.২২; (হরি) ১.৯৩.২২]*

জিতব্রত পৃথুর বংশধারায় হবির্ধানের ঔরসে তাঁর পত্নী হবির্ধানীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একজন।

[ভাগবত পু. ৪.২৪.৮]

জিতারি পুরুবংশীয় রাজর্ষি কুরুর জ্যেষ্ঠপুত্র অবিক্ষিৎ। অবিক্ষিতের আট পুত্রসন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন জিতারি।

[মহা (k) ১.৯৪.৫৩; (হরি) ১.৮৯.৪১]

জিষ্ট ঋতসাবর্ণি মনুর কালে অর্থাৎ ভাবী দ্বাদশ মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন, সেই গণগুলির মধ্যে সুকর্মা একটি। জিষ্ট, এই সুকর্মাগণের অন্তর্ভুক্ত একজন দেবতা। *[বায়ু পু. ১০০.৯৪]*

জিষ্ণু১ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের দশটি নামের মধ্যে অন্যতম। মহাভারতে বহুবার অর্জুনকে 'জিষ্ণু' নামে সম্বোধন করা হয়েছে। *[দ্র. অর্জুন১]*

[মহা (k) ১.১৮৭.১০, ২৯; ১.১৮৯.১৯; ১.১৯০.৭; ৪.৪৪.৯, ২১; (হরি) ১.১৮০.১০, ২৯; ১.১৮২.১৯; ১.১৮৩.৭; ৪.৪০.৯, ২১]

জিষ্ণু২ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে অংশগ্রহণকারী চেদি দেশীয় একজন যোদ্ধা জিষ্ণু। কর্ণের হাতে তিনি নিহত হয়েছিলেন বলে মহাভারতের কর্ণপর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ৮.৫৬.৪৮; (হরি) ৮.৪২.৫০]

জিষ্ণু৩ গরুড় পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, ভৌত্য মনুর পুত্রদের মধ্যে জিষ্ণু একজন।

[গরুড় পু. ১.৮৭.৫৭-৫৮]

জিষ্ণু৪ স্কন্দ-কার্ত্তিকেয়র একজন অনুচর বলে বামন পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। ওঘবতী নদী স্কন্দ-কার্ত্তিকেয়কে জিষ্ণু নামে এই গণ বা অনুচর প্রদান করেন। *[বামন পু. ৫৭.৮৩]*

জিষ্ণু৫ বায়ু পুরাণ অনুসারে চরিষ্ণব মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যে অভূতরজ একটি গণ। জিষ্ণু এই গণের অন্তর্ভুক্ত একজন দেবতা। *[বায়ু পু. ৬২.৪৪-৪৫, ৪৮-৪৯]*

জিষ্ণুকর্মা মহাভারতের কর্ণপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, জিষ্ণুকর্মা, চেদি দেশের একজন যোদ্ধা। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। কর্ণ যেসব চেদি-যোদ্ধাদের বধ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জিষ্ণুকর্মা একজন।

[মহা (k) ৮.৫৬.৪৮; (হরি) ৮.৪২.৫০]

জিহ্মক ভৃগুবংশীয় বংশপ্রবর্তক ঋষিদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৯৫.২৭]*

জীব১ নবগ্রহের মধ্যে অন্যতম। দেবগুরু বৃহস্পতি। বৃহৎ তপস্যার প্রভাবে মহাদেবের বরে বৃহৎ অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে দেবগুরু গ্রহগণের মধ্যে বিশেষ মর্য্যাদায় পূজিত হন। শিবলিঙ্গের পূজা করে বৃহস্পতি মহাদেবের জীবনস্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন বলেই তিনি জীব নামেও খ্যাত।

[মৎস্য পু. ৯৩.১৬; স্কন্দ পু. (কাশী/পূর্ব) ১৭.৪৪]

জীব২ বিষ্ণু সহস্রনাম স্তোত্রে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম।

[মহা (k) ১৩.১৪৯.৬৮; (হরি) ১৩.১২৭.৬৮]

জীবদেহ অন্নের শেষ পরিণামে শুক্র উৎপন্ন হয়। (দ্র. অন্ন) শুক্র থেকেই দেহের সৃষ্টি। ঋতুকাল অতীত হলে নির্দোষ শুক্র যোনিমধ্যে প্রবেশ করে এবং তা বায়ুর দ্বারা উৎসৃষ্ট হয়ে স্ত্রী-রক্তের সঙ্গে ডিম্বাণুর সঙ্গে একত্ব প্রাপ্ত হয়। শুক্র স্ত্রীরক্তে মিশ্রিত হলে এক দিনের মধ্যেই কলল (ভ্রূণের প্রথম অবস্থার নাম) উৎপন্ন হয়। পাঁচ রাত্রের মধ্যে কললের মধ্যে দেহের সম্ভাবনাযুক্ত বুদবুদের সৃষ্টি হয়। এক মাসের মধ্যে মাংসের সৃষ্টি হয়, তার পরে গ্রীবা, শীর্ষ, স্কন্ধ, পৃষ্ঠাংশ, উদর, পাণি, পাদ, পার্শ্ব কটি এবং গাত্র উৎপন্ন হয়। চার মাসে অঙ্গুলীগুলি রূপ পায়। পাঁচ মাসে মুখ, নাক, কান, দন্তপঙ্ক্তি, জিহ্বা এবং নখ উপন্ন হয়। ছয় মাসের মধ্যে কানের ছিদ্র সৃষ্টি হয় এবং পায়ু, মেঢ্র, উপস্থ এবং শিশ্ন উৎপন্ন হয়। সাত মাসে গাত্রসন্ধি সৃষ্টি হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আট-মাসে সম্পূর্ণ হয়, মস্তক কেশসমন্বিত হয় এবং সমস্ত অবয়ব বিভক্ত এবং সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে। জননীর নাভিসূত্রে নিবদ্ধ আহার-সারে জীব বৃদ্ধি পায় এবং পঞ্চভূতের যোগে পরিপক্ক হতে থাকে। পুরাণমতে গর্ভমধ্যে শরীর-গঠন সম্পূর্ণ হলে জীব স্মৃতি লাভ করে এবং পরাকৃত সুখ দুঃখ নিদ্রা স্বপ্ন সবই তার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। *[পদ্ম (ভূমি) ৬৬.৭-৪২]*

জীবন্তি পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর গোত্রভুক্ত যেসব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি জীবন্তির বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি ভৃগুর বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন।

[মৎস্য পু. ১৯৫.১৮]

জীবল মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের সারথি জীবল। নল রাজা যখন বাহুক নামে ঋতুপর্ণ রাজার প্রাসাদে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, সেইসময় জীবল বাহুক বেশী রাজা নলের সেবা করেছিলেন।

[মহা (k) ৩.৬৭.৭,৮,১১; (হরি) ৩.৫৫.৭,৮,১১]

জীমূত১ সূর্যের অষ্টোত্তর শতনামের মধ্যে একটি।

[মহা (k) ৩.৩.২২; (হরি) ৩.৩.২২; ব্রহ্ম পু. ৩৩.৪০]

জীমূত২ মৎস্য দেশের একজন বিখ্যাত মল্লযোদ্ধা। বিরাট রাজের সভায় জীমূত যোদ্ধারূপে উপস্থিত ছিলেন। অজ্ঞাতবাসের সময় বল্লভ-রূপী ভীমসেনের সঙ্গে বিরাট রাজার রাজসভায় জীমূতের দ্বৈরথের কথা বিরাটপর্বে পাওয়া যায়।

জীমূতকে মহাভারতকার মহাযোদ্ধা বলে উল্লেখ করেছেন। ভীম ও জীমূত পরস্পরের বিরুদ্ধে মল্লযুদ্ধের যাবতীয় কৌশল প্রয়োগ করেন। দীর্ঘ বাহুযুদ্ধের পর বৃত্রাসুরের মত পরাক্রমশালী জীমূতকে ভীমসেন দু-হাতে মাথার উপরে তুলে একশোবার শূন্যে ঘুরিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করেন। এইভাবে পৃথিবীখ্যাত মল্লবীর জীমূত ভীমসেনের হাতে নিহত হন।

[মহা (k) ৪.১৩.২০-৩২; (হরি) ৪.১২.২০-৩২]

জীমূত৩ একজন ব্রহ্মর্ষি। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে গরুড় মহর্ষি গালবকে উত্তরদিকের মাহাত্ম্য বোঝাতে গিয়ে ব্রহ্মর্ষি জীমূতের কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন।

উত্তরদিকে হিমালয় পর্বতে ব্রহ্মর্ষি জীমূত একটি স্বর্ণখনির সন্ধান পেয়েছিলেন। জীমূত নিজে সেই ধন গ্রহণ না করে সমস্ত স্বর্ণ ব্রাহ্মণদের দান করেন। ধন দানের সময় জীমূত ব্রাহ্মণদের কাছে একটি প্রার্থনাই করেছিলেন —সেই ধন যেন তাঁরই নামে খ্যাত হয়। পরবর্তীকালে সেই ধন জৈমূত নামে প্রসিদ্ধ হয়—

ব্রাহ্মণেষু চ যৎ কৃৎস্নং স্বন্তং কৃত্বা ধনং মহৎ।
বব্রে ধনং মহর্ষিঃ স জৈমূতং তদ্ধনং ততঃ॥

[মহা (k) ৫.১১১.২৩-২৪; (হরি) ৫.১০৩.২৩-২৪]

জীমূত৪ রোমপাদের বংশধারায় ব্যোমের পুত্র জীমূত। এঁর পুত্রের নাম বিকৃতি।

[ভাগবত পু. ৯.২৪.৪; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭০.৪১-৪২; মৎস্য পু. ৪৪.৪০-৪১; বায়ু পু. ৯৫.৪০; বিষ্ণু পু. ৪.১২.১৬; ব্রহ্ম পু. ১৫.২৪; অগ্নি পু. ২৭৫.২০]

জীমূত৫ শাল্মলীদ্বীপের অধিপতি বপুষ্মানের সাতজন পুত্রের মধ্যে অন্যতম। জীমূত শাল্মলী দ্বীপের যে অংশটির উপর রাজত্ব করেন সেই ভূ-ভাগটি তাঁর নামানুসারে জীমূতবর্ষ নামে বিখ্যাত।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৪.৩১-৩৪; বায়ু পু. ৩৩.২৮-২৯; বিষ্ণু পু. ২.৪.২৩, ২৯; ব্রহ্ম পু. ২০.২৩]

জীমূত৬ একজন বানর দলপতি। রামচন্দ্রের লঙ্কা অভিযানে যেসব বানর যূথপতি তাঁর সেনাদলে যোগ দিয়েছিলেন জীমূত তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.২৪০]

জীমূত$_{৭}$ একটি পৌরাণিক পর্বত। পুরাণ কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, সেকালে পবর্তরা পক্ষ বিশিষ্ট ছিল। অর্থাৎ তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে উড়ে যেতে সক্ষম ছিল। একবার দেবরাজ ইন্দ্রের কোপে পর্বত সমূহের পক্ষচ্ছেদন শুরু হয়। তখন ইন্দ্রের ভয়ে পর্বতরা সমুদ্রের তলদেশে আত্মগোপন করেছিল। সেইসব পর্বতগুলির মধ্যে জীমূত একটি। *[মৎস্য পু. ১২১.৭৫]*

জীমূত$_{৮}$ শাল্মলী দ্বীপের একটি বর্ষ। এটি বলাহক পর্বত সংলগ্ন অঞ্চল। *[দ্র. জীমূত$_{৬}$]*

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৯.৪৪; বায়ু পু. ৪৯.৪০]

জীমূত$_{৯}$ পৌরাণিক বর্ণনানুসারে তিনপ্রকারের মেঘের মধ্যে জীমূত একটি প্রকারভেদ। এই প্রকারের মেঘ বিদ্যুৎ ও শব্দহীন। এটি জলধারায় পরিপূর্ণ এবং বিশালাকার।

বর্ষণকারী মেঘ বলেই সম্ভবত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে জীমূতকে প্রাণসৃষ্টিকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[বায়ু পু. ৫১.৩১; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.২২.৩৩]

জুহূ *[দ্র. যজ্ঞায়ুধ]*

জৃম্ভক$_{১}$ স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত ব্রহ্মখণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে যে, জৃম্ভক যক্ষ ধর্মারণ্যে বাস করতেন। তিনি ওই অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার চালাতেন। এই কারণে ধর্মারণ্যবাসী ব্রাহ্মণরা দেবতাদের কাছে এই যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালে, দেবতারা জৃম্ভক যক্ষ ও অন্যান্য যক্ষ ও রাক্ষসদের দমণ করার জন্য মাতৃকা, ও প্রধান প্রধান কয়েকজন সিদ্ধগণকে ধর্ম্মারণ্যে স্থাপন করেন।

[স্কন্দ পু. ব্রহ্মখণ্ড (ধর্মারণ্যখণ্ড) ৯.১০২-১০৬]

জৃম্ভক$_{২}$ কাশীক্ষেত্র রক্ষাকারী দেবতাদের মধ্যে জৃম্ভক একজন। *[স্কন্দ পু. (কাশীখণ্ড/উত্তর) ৭২.৯৮]*

জেতা$_{১}$ ভাবী সাবর্ণি মন্বন্তরে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন, অমিতাভ তার মধ্যে একটি। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতা হলেন জেতা।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.১৬; বায়ু পু. ১০০.১৬]

জেতা$_{২}$ রৈবত মনুর কালে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ভূতরজ একটি। এই গণের অন্তর্ভুক্ত দেবতা হলেন জেতা।

[বায়ু পু. ৬২.৪৪-৪৫, ৪৮-৪৯]

জৈগীষব্য$_{১}$ একজন বিশিষ্ট ঋষি। প্রজাপতি ব্রহ্মার সভায় তিনি অবস্থান করতেন বলে জানা যায়।

[মহা (k) ২.১১.২৪; (হরি) ২.১১.২৩]

☐ বলরাম তীর্থযাত্রাকালে সারস্বততীর্থ দর্শন করে অসিতদেবল ঋষি যেখানে বাস করতেন সেই স্থানে এসে উপস্থিত হন। সেখানেই বলরাম জৈগীষব্য মুনির কথা শোনেন। জৈগীষব্য পরম যোগী। তিনি যোগ-বিভূতিতে অসিত-দেবলের বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন। দেবলের আশ্রমে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন ভিক্ষুকের বেশে। শুধুমাত্র আহারের সময় এবং ভিক্ষা নেবার সময়েই তিনি উপস্থিত হতেন দেবলের সামনে। অন্য সময় দেবল কোথাও তাঁকে দেখতে পেতেন না। এইভাবে বহুবছর যাবার পর, দেবল একদিন যোগবলে আকাশপথে সমুদ্রে কলসি নিয়ে জল আনতে গেছেন। সেখানে পৌঁছে তিনি দেখলেন, জৈগীষব্য পূর্বাহ্নেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। অসিত-দেবল স্নান করে জলের কলসি নিয়ে আশ্রমে ফিরে এসে দেখলেন—জৈগীষব্য সেখানে পূর্বেই এসে বসে আছেন। জৈগীষব্যের যোগজ প্রভাব দর্শন করে বিস্মিত দেবল তাঁর সম্বন্ধে আরও বেশি জানার জন্য সিদ্ধ-চারণদের কাছে উপস্থিত হলেন। সেখানে দেবল দেখলেন যে জৈগীষব্য সিদ্ধ মুনিদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেবল এবার পিতৃলোকে গেলেন। সেখানেও দেখলেন—জৈগীষব্য আছেন। এইভাবে অসিত-দেবল বহুতর দেবলোক, রুদ্রলোক, বসুলোক, ব্রহ্মলোক সর্বত্র ঘুরে সব জায়গাতেই জৈগীষব্যকে তাঁর আগেই সেখানে উপস্থিত থাকতে দেখলেন। এরপর একদিন অসিত-দেবল জৈগীষব্য মুনির কাছে মোক্ষধর্ম এবং যোগসিদ্ধির বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। জৈগীষব্য তাঁকে যোগসিদ্ধির সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে দিলেন। এখানে জৈগীষব্য সম্বন্ধে নারদ ও দেবতাদের প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হয়েছে এবং সরস্বতী নদীর তীরস্থিত একটি স্থান জৈগীষব্য এবং অসিত-দেবলের নামে তীর্থস্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

[মহা (k) ৯.৫০.৫-৬৬; (হরি) ৯.৪৬.৫-৬৭]

☐ অসিত-দেবলের সঙ্গে জৈগীষব্যের কথোপকথনের মাধ্যমে যে মোক্ষধর্ম উপদিষ্ট হয়েছে, তা ভীষ্মের জবানীতে মহাভারতের শান্তিপর্বে বিবৃত হয়েছে।

[মহা (k) ১২.২২৯.৩-২৫; (হরি) ১২.২২৭.৩-২৫]

☐ গন্ধর্ব বিশ্বাবসুকে ইনি সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেছিলেন। *[মহা (k) ১২.৩১৮.৫৯; (হরি) ১২.৩০৮.৫৯]*

☐ ভগবান শিব জৈগীষব্যের আরাধনায় তুষ্ট হয়ে বারাণসীতে তাঁকে অষ্টাঙ্গ যোগৈশ্বর্য্য প্রদান করেন। *[মহা (k) ১৩.১৮.৩৭; (হরি) ১৩.১৭.৩৭; মৎস্য পু. ১৮০.৫৭]*

☐ একটি কাহিনীতে বিবৃত হয়েছে যে, জৈগীষব্য এক সময়ে শিব-দুর্গার মাঝখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের মধ্যে তৎকাল প্রবৃত্ত তত্ত্বালোচনা ভেঙে দেন এবং ব্রহ্মতত্ত্বকে চরম সাধ্য বস্তু বলে চিহ্নিত করেন। দুর্গা ক্রুদ্ধ হলে শিব বলেন—সে আমার ভক্ত, সখা এবং শিষ্য। জৈগীষব্যের নিস্পৃহ ভাব পরীক্ষা করার জন্য শিব এবং দুর্গা তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি পুনরায় নিজ মত প্রতিষ্ঠা করে বলেন—মায়াশক্তি পরব্রহ্মে লীন হয়ে আছেন এবং এ বিষয়ে একটি উপমাই প্রসিদ্ধ—সূত্র সূচীকেই অনুসরণ করে—

সূচীম্ অনু মহাদেব সূত্রং সমনুগচ্ছতি।

মহাভারতের একমাত্র হরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ ধৃত সংস্করণেই এই কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। *[মহা (k) ১২.২২৭.১-২৫; (হরি) ১২.২২৭.১-৬০]*

☐ পুরাণে মহর্ষি জৈগীষব্যকে মহর্ষি শতশিলাকের (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে শতশলাকের) পুত্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পুরাণের বিবরণ অনুযায়ী হিমালয় তাঁর তিন কন্যা অপর্ণা (উমা), একপর্ণা এবং একপাটলাকে যথাক্রমে রুদ্রশিব, মহর্ষি অসিত এবং মহর্ষি জৈগীষব্যের হাতে সম্প্রদান করেন। মৎস্য পুরাণে অবশ্য উমা এবং অপর্ণাকে পৃথক রূপে কল্পনা করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে উমা মহাদেবের এবং অপর্ণা জৈগীষব্যের পত্নী ছিলেন বলে মৎস্য পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। মহর্ষি জৈগীষব্য শঙ্খ ও লিখিত নামে দুই মানস পুত্র লাভ করেন। *[বায়ু পু. ৭২.১৮-১৯; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১০.২০-২১; মৎস্য পু. ১৩.৯]*

☐ ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, নীপবংশীয় রাজা ব্রহ্মদত্তের পুত্র বিষ্বক্সেন জৈগীষব্যের কাছ থেকে যোগসিদ্ধি বিষয়ে উপদেশ লাভ করেন। *[ভাগবত পু. ৯.২১.২৬]*

জৈগীষব্য২ বায়ু পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে ভবিষ্যৎ সপ্তম দ্বাপরে ভগবান শিব জৈগীষব্য নামে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হবেন। তাঁর চারটি মহাযোগী পুত্র সন্তান হবে। তাঁদের নাম—সারস্বত, সুমেধা, বসুবাহু এবং সুবাহন। *[বায়ু পু. ২৩.১৩৮]*

জৈগীষব্য৩ প্রজাপতি ব্রহ্মা গয়াক্ষেত্রে গয়াসুরের দেহের উপর যে বিশাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন সেই যজ্ঞের পুরোহিতদের মধ্যে একজন। *[বায়ু পু. ১০৬.৩৬]*

জৈগীষব্যেশ্বরতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত তীর্থ। মহর্ষি জৈগীষব্য এখানে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। জৈগীষব্যের নামে স্থানটি জৈগীষব্য গুহা নামেও খ্যাত। *[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচন কাণ্ড) পৃ. ৯১; লিঙ্গ পু. ১.৯১.৫২-৫৩]*

জৈত্যদ্রৌণি পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে সব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি জৈত্যদ্রৌণির বংশ তার মধ্যে একটি। জৈত্যদ্রৌণি অঙ্গিরার বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৬.১৭]*

জৈত্র১ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে একজন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি ভীমের হাতে নিহত হন। *[মহা (k) ৯.২৬.৪,১৪; (হরি) ৯.২৪.৪,১৩]*

জৈত্র২ বাসুদেব কৃষ্ণের একজন পরিচারক। *[ভাগবত পু. ১০.৭১.১৩]*

জৈবন্ত্যায়নি পুরাণে মহর্ষি ভৃগুর প্রবরভুক্ত যে সব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে মহর্ষি জৈবন্ত্যায়নির বংশ তার মধ্যে অন্যতম। ইনি ভৃগুর বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৫.৩৭]*

জৈমিনি জনৈক প্রাচীন ঋষি। তবে চার বেদে এমনকী ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতেও জৈমিনির নাম খুব একটা উল্লিখিত হতে দেখা যায় না। বেদ-পরবর্তী যুগে, সূত্রসাহিত্যগুলির রচনা কালে প্রথম জৈমিনির নাম উল্লিখিত হতে দেখা যায়। শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রে একাধিকবার পৈল, বৈশম্পায়ন প্রভৃতি ঋষিদের সঙ্গে একত্রে জৈমিনির নাম উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণ, জৈমিনীয় ন্যায়মালা, জৈমিনীয় আরণ্যক, জৈমিনীয় গৃহ্যসূত্র, জৈমিনীয় শ্রৌতসূত্রের মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রণেতা হিসেবে মহর্ষি জৈমিনির নাম উল্লিখিত হতে দেখা যায়। *[শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র (মহর্ষি) ৪.১০; ৬.৬]*

☐ বেদ পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে সুমন্তু, বৈশম্পায়ন, পৈল-র সঙ্গে জৈমিনির নামোল্লেখ তাঁর সঙ্গে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের সম্পর্কের যে ইঙ্গিতটুকু দেয়, মহাভারত-পুরাণে তা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে। মহাভারতে স্পষ্টই

বলা হয়েছে যে, বৈশম্পায়নের মতোই জৈমিনিও ছিলেন মহর্ষি ব্যাসের শিষ্য। হস্তিনাপুরে, রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে জৈমিনিকে সামবেদের পুরোহিত বা উদ্‌গাতার ভূমিকায় দেখা যায়। প্রসঙ্গত সামবেদে জৈমিনীয় সংহিতা নামে একটি শাখা পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য জৈমিনি স্বয়ং সেই সংহিতার প্রণেতা। পুরাণগুলিতে বেশ স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনি তাঁর কাছ থেকে সামবেদ শিক্ষা করেছিলেন। জৈমিনি ব্যাসের কাছে যে সামবেদ শিক্ষা করেছিলেন, ভাগবত পুরাণে তাকে 'ছন্দোগসংহিতা' নামে চিহ্নিত করেছে।

[মহা (k) ১.৫৩.৬; ১.৬৩.৮৯;
(হরি) ১.৪৮.৬; ১.৫৮.১২৮;
ভাগবত পু. ১২.৬.৫৩, ৭৫; বায়ু পু. ৬০.১৩, ১৮;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৪.৪, ১৩;
বিষ্ণু পু. ৩.৪.৯; ৩.৬.১-২;
Vedic Index, Vol. 1, p. 290]

□ পুরাণে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মহর্ষি জৈমিনির পুত্র ছিলেন সুমন্তু। জৈমিনির কাছ থেকেই সুমন্তু সামবেদ শিক্ষা করেন। *[বায়ু পু. ৬১.২৭]*

□ মহাভারতে একাধিক ঘটনায় মহর্ষি জৈমিনিকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। মহাভারতের সভাপর্বে উল্লিখিত হয়েছে, ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের ময়দানব নির্মিত সভাগৃহে অন্যান্য ঋষি-মহর্ষিদের সঙ্গে জৈমিনিও উপস্থিত থাকতেন বলে জানা যায়। *[মহা (k) ২.৪.১১;*
(হরি) ২.৪.১০ পাদটীকা দ্রষ্টব্য, খণ্ড ৫, পৃ. ২৬]

□ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হবার পর শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে দেখতে যেসব মুনি-ঋষিরা সমবেত হয়েছিলেন, জৈমিনিও তাঁদের মধ্যে একজন।

[মহা (k) ১২.৪৭.৬; (হরি) ১২.৪৬.৬]

□ ভাগবত পুরাণ থেকে জানা যায়, ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যেসব বিশিষ্ট ঋষি পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন, জৈমিনি তাঁদের মধ্যে একজন। *[ভাগবত পু. ১০.৭৪.৮]*

□ পুরাণে জৈমিনিকে শ্রুতর্ষি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রুতর্ষি অর্থাৎ যাঁরা বেদব্যাসের মতো ঋষিদের কাছ থেকে শ্রবণ-এর দ্বারা শ্রুতি বা বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে শিষ্যদের সেই বেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন। সামবেদের অন্যতম ঋষি জৈমিনিকেও সেক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই শ্রুতর্ষি বলা চলে। পুরাণে অন্যত্র তাঁকে অন্যতম যোগী বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে। *[দ্র. ঋষি, শ্রুতর্ষি]*

জৈমিনীশতীর্থ বারাণসীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। মহর্ষি জৈমিনী স্থাপিত এই তীর্থ দর্শন করলে সকল পাপ দূর হয়।

[কৃত্যকল্পতরু (তীর্থবিবেচন কাণ্ড) পৃ. ৯৭]

জৈহ্বলায়নি পুরাণে মহর্ষি অঙ্গিরার গোত্রভুক্ত যে সব ঋষিবংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে, মহর্ষি জৈহ্বলায়নির বংশ তার মধ্যে একটি। জৈহ্বলায়নি অঙ্গিরার বংশজাত অন্যতম গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ছিলেন। *[মৎস্য পু. ১৯৬.১৭]*

জৈহ্মপ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা পরাশর মুনির নামে কয়েকটি বংশধারা প্রচলিত ছিল। সেই বংশধারায় অনেকগুলি সন্তানকে নিয়ে এক-একটি বর্গ রচিত হয়েছিল। যাঁদের গৌর-পরাশর, নীল-পরাশর, কৃষ্ণ-পরাশর, শ্বেত-পরাশর, শ্যাম-পরাশর এবং ধূম্র-পরাশর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরাশরের যে সন্তানেরা গৌর-পরাশর নামে অভিহিত তাঁদের মধ্যে জৈহ্মপ একজন। *[মৎস্য পু. ২০১.৩৩]*

জ্ঞান জ্ঞান বলতে মহাভারত যা বোঝাতে চায়, তা সবচেয়ে সুন্দর এবং স্পষ্টভাবে বলা আছে ভগবদ্‌গীতায়। জ্ঞানের সম্বন্ধে ভগবদ্‌গীতায় সোচ্ছ্বাসে বলা হয়েছে যে, এই পৃথিবীতে জ্ঞানের মতো পবিত্র কিছু নেই—

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।

এই জ্ঞান তৈত্তিরীয় উপনিষদ থেকে আরম্ভ করে অন্যতর বহু উপনিষদেই ব্রহ্মের অপর একটি পর্যায় শব্দ—

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম।

ভগবদ্‌গীতা সেই জ্ঞান-লাভের প্রক্রিয়াটাই এমনভাবে দেখিয়েছে, যাতে ব্রহ্মভাবেই সেই জ্ঞানের পরিণতি ঘটে। উপনিষদের পরম্পরায় এটি মহাবাক্য বলে পরিচিত এবং গীতায় দেখানো হয়েছে যে, নিষ্কাম কর্মের শেষ পর্যায়ে জ্ঞানের আরম্ভ। যিনি সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভ ইত্যাদি দ্বন্দ্বভাবের ওপরে আছেন, যিনি সর্বত্র সমদর্শী, সমস্ত ভূতবর্গকে যিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেন এবং নিজেকে সর্বভূতের মধ্যে অনুভব করেন—সেই আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে তাঁর অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, সেই

জ্ঞান সূর্যের মতো সেই পরম পুরুষ বা ব্রহ্মকে প্রকাশিত করে।

[ভগবদ্‌গীতা ৪.৩৮; ৪.১৯-৩৩, ৩৬-৪২; ৫.৩, ১৫-২৫; ১৩.২৩-৩৪]

মহাভারত বলে যে, প্রবৃত্তিমূলক যে বেদধর্ম, জ্ঞানী ব্যক্তিরা সে পথে কখনোই যান না। রজ-তম ইত্যাদি গুণের দ্বারা চালিত হয়ে ক্রোধ-লোভের বশ্যতা স্বীকার করেন না তাঁরা, বরঞ্চ সেই জ্ঞানের পথে তাঁরা চলেন যাতে পরমা গতি লাভ হয়। আর এই জ্ঞান মানেই কর্মসঙ্গহীন এক নির্মোহ অধ্যাত্মবোধ যাতে সেই অব্যয়-অদ্বয় ব্রহ্মে বিশ্রান্তি ঘটে। মহাভারত যা বলেছে, আমাদের বেদান্তদর্শন তো তা বলবেই, এমনকী ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য-কারিকাও অন্যভাবে এই জ্ঞানের কথা বলবে। ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেন—সম্যক জ্ঞান হলে পারলৌকিক ধর্মাধর্মের সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়ে যায়, যদিও এই পার্থিব শরীরটা চলতে থাকে ঘূর্ণ্যমান চাকার গতি শেষ হয়ে গেলেও অবশেষ ঘোরার মতো—

সম্যগ্‌ জ্ঞানাধিগমাদ্‌ ধর্মাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমবদ্‌ ধৃতশরীরঃ॥

এই অবস্থার নাম জীবন্মুক্ত অবস্থা অর্থাৎ এই জীবনেই জ্ঞান এই পরম নির্বিকার সত্যের সন্ধান দেয়।

[মহা (k) ১২.২১২.১-৬; (হরি) ১২.২০৯.১-৬]

□ মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র সনৎসুজাত ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—যাঁরা এই ঋক্‌, সাম, যজু, এই ত্রয়ী বেদকে জানেন, তিনি যদি অন্যায় পাপ কর্ম করেন, তাহলে কি সেই পাপ তাঁর বন্ধন তৈরি করবে? সনৎসুজাত বলেছিলেন—ঋক্‌-সাম-যজু-র কর্মমার্গ কখনো এক মায়াবদ্ধ জীবকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে না। বৈদিক কর্মের পবিত্রতা বড়ো জোর তাঁকে প্রকৃষ্ট ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, যেমনটা এই বাক্য আছে—ঋক্‌-সাম-যজু-র চর্চায় একজন মানুষ ব্রহ্মলোকে (ব্রাহ্মণ্যে মধ্যে) বিরাজ করেন। অর্থাৎ যা যা করলে দেবতার পদবী লাভ করা যায়, সেই দেবতাদের অবস্থান বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণের মধ্যেই—

ঋগ্‌যজুঃসামভিঃ পূতো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
যাবতীর্বৈ দেবতাস্তাঃ সর্বা বেদবিদি
ব্রাহ্মণে বসন্তি॥

কিন্তু এই মূর্তামূর্ত মায়াজগতের বাইরে আরও এক মহত্তম তত্ত্ব আছে, তার জন্যই তপস্যা করতে হবে। সেই তপস্যার পুণ্যে সমস্ত পাপরাশি নির্মূল হবার পর জ্ঞানের উদয় হবে, সেই জ্ঞানেই আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ ঘটে। জ্ঞানের দ্বারাই একমাত্র সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে লাভ করা যায়, তা নইলে মুক্তি নেই, বারংবার শুধু এই মায়িক জগতে আসা যাওয়া—

জ্ঞানেন চাত্মানমুপৈতি বিদ্বানথান্যথা
বর্গফলানুকাঙ্ক্ষী।
অস্মিন্‌ কৃতং তৎ পরিগৃহ্য সর্বম অমুত্র
ভুঙ্‌ক্তে পুনরেতি মার্গম্‌॥

সনৎসুজাত মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম পর্বের সারটুকু বলে দিলেন ব্রহ্মের পর্যায় শব্দ 'সত্য'কে জ্ঞানেরও অপর পর্যায়-শব্দ হিসেবে উল্লেখ করে। তিনি বললেন—সমস্ত বেদের জ্ঞাতা কেউ নেই অর্থাৎ সমস্ত বেদ কেউ জানে না। যদি এমনটাই না হত, তাহলে সম্পূর্ণ বেদ জানে এমন কেউ থাকত, তেমনটা বাস্তবে নেই। সত্যি বলতে কী, যিনি বলেন—আমি বেদ জানি, তিনি আসলে যেটা জানতে হবে সেই 'বেদ্য' বা জ্ঞাতব্য বস্তুটাকেই জানেন না। যিনি সত্যে স্থিত আছেন, তিনি আসলে 'বেদ্য' বা 'জ্ঞাতব্য' বস্তুকে জানেন—

ন বেদানাং বেদিতা কশ্চিদস্তি/
কশ্চিদ্‌ বেদান্‌ বুধ্যতে বাপি রাজন্‌।
যো বেদ বেদান্‌ ন স বেদ বেদ্যং/
সত্যে স্থিতো যস্তু স বেদ বেদ্যম্‌॥

ঠিক এইখানেই সত্য, জ্ঞান, অনন্ত এবং ব্রহ্মের সংজ্ঞাস্বরূপ মহাবাক্যের মধ্যে জ্ঞান একেবারে ব্রহ্ম হয়ে ওঠে মহাভারতে।

*[মহা (k) ৫.৪৩.৩-৯; ৫.৪৩.৪৮-৫৪;
(হরি) ৫.৪৩.৩-৯; ৫.৪৩.৪৮-৫৪
(নীলকণ্ঠকৃত টীকা দ্রষ্টব্য)]*

জ্ঞান বলতে সাধারণত 'জানা' to know বোঝায়। জানা মানেই জ্ঞান। বুদ্ধি, উপলব্ধি, প্রত্যয়—এইসব শব্দ একই অর্থ বহন করে। ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায় 'বুদ্ধিত্বরূপ সামান্য বিশিষ্ট আত্মায় আশ্রিত যে প্রকাশ' তা হল জ্ঞান। অর্থের প্রকাশ হচ্ছে বুদ্ধি। আবার সব ব্যবহারের অসাধারণ কারণ যে বুদ্ধি, তাকেও 'জ্ঞান' বলে প্রাচীনরা আমাদের চিনিয়েছেন। আত্মা সর্বব্যাপী হলেও জ্ঞান শুধু দেহের সীমাতেই আত্মায় উৎপন্ন হয়—ন্যায় বৈশেষিক সম্প্রদায় এমনটাই মনে করেন। তাঁদের বিশ্বাস জ্ঞান হচ্ছে আত্মার বিশেষ

গুণ, তবে আত্মার সবটা জুড়ে তা থাকে না। বিশেষ একটা অংশেই থাকে। জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় মনে এবং একটি জ্ঞান হবার পরে অন্য আর একটি জ্ঞান যখন উৎপন্ন হয়, তখন দ্বিতীয় জ্ঞানের বিশেষ গুণের দ্বারা প্রথম জ্ঞানের নাশ হয়ে যায়, তাই জ্ঞান হচ্ছে ক্ষণিক। মনে রাখতে হবে, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ ছাড়া সব জ্ঞানই মানস প্রত্যক্ষের মাধ্যমে হয়ে থাকে, অথবা 'জ্ঞান'কে জানা যায় আর একটি জ্ঞানের মাধ্যমে। ফলতঃ জ্ঞান অনুব্যবসায়গম্য। অনুব্যবসায় মানেই একটি জ্ঞানের জন্য আর এক জ্ঞানের ব্যবহার। জ্ঞান তার বিষয়ের দ্বারাই আমাদের কাছে পরিচিত হয় ঠিকই, কিন্তু বিষয়ের জ্ঞানের দ্বারা 'জ্ঞানে'র কোনো আকার প্রাপ্তি হয় না। একটা মত হল—সব জ্ঞানই নিরাকার; অর্থের দ্বারা তার নিজের কোনো আকার জ্ঞানে উৎপাদিত হয় না, তবে সব জ্ঞানই অর্থের দ্বারাই নিরূপিত হয়ে থাকে। আর অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধ যে জ্ঞান, সেটাই মন দিয়ে জানতে পারা যায়। 'আমি ঘটজ্ঞানযুক্ত'—এমনি একটা না একটা বিষয়, বৈশিষ্ট্য ও বিশিষ্টে অবগাহিত হয়েই সাধারণত আমাদের কোনো কিছু জানা সম্ভব হয়। শুধু 'আমি জ্ঞানবান্' এমন জ্ঞান হয় না—

ঘটজ্ঞানবানমূম্ ইত্যেব, ন তু
জ্ঞানবানহম্ ইত্যেতাবন্মাত্রং জ্ঞায়তে।

সাংখ্য ও যোগদর্শনের মতে 'জ্ঞান' হচ্ছে বুদ্ধির ধর্ম বা পরিণাম। আত্মার নয়। জ্ঞানের ফল হল অর্থের প্রকাশ। অর্থের প্রকাশ হচ্ছে পৌরুষেয়, যা পুরুষের চৈতন্যের দ্বারা সম্পাদিত। আমাদের জ্ঞানে যে আকার প্রকাশিত হয় তা আসলে বুদ্ধিরই পরিণাম।

অদ্বৈত বেদান্ত সম্প্রদায়ের মতে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুর সন্নিকর্ষ হলে ওই বস্তুর আকারে আকারিত অন্তঃকরণের যে বৃত্তি, বিশেষতঃ 'বুদ্ধি'বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের দ্বারা আমাদের জ্ঞানে বিষয়ের প্রকাশ হয়। বুদ্ধিবৃত্তি 'বিষয়'কে বুদ্ধিতে সমর্পণ করে, তার ফলে যে বিষয়ে জ্ঞান হবে তার অজ্ঞানের আবরণটা চলে যায়। আমরা বস্তুকে জানতে পারি। বা বলা ভাল তখনই বিষয়ের সরাসরি বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব হয়। আর যখন পরোক্ষ জ্ঞান হয় তখন বিষয়ের এই আবরণভঙ্গ আংশিক হয়, তাই পরোক্ষ জ্ঞান হলে সেই জ্ঞানের বিষয় সবসময় 'আছে' বলে বোধ হয়, আর অপরোক্ষ জ্ঞান হলে 'অস্তি ভাতি চ' অর্থাৎ 'আছে এবং প্রকাশ পাচ্ছে' বলে বোধ হয়।

বেদান্ত মতে জ্ঞানের দুটো দিক রয়েছে— ১. বুদ্ধির পরিণাম বা বৃত্তির দ্বারা বিষয়ের আকার গ্রহণ; ২. চৈতন্য বা চিদাভাসের দ্বারা অর্থের প্রকাশ। বিষয়ের পরিচ্ছেদ বুদ্ধির বৃত্তির দ্বারা হলেও বিষয়ের স্ফুরণ বা প্রকাশ—চিচ্ছায়া অথবা চিদাভাসের দ্বারাই হয়। অদ্বৈতী মনে করেন জ্ঞানকে ক্ষণিক হতেই হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। কোনো একটি বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তি যদি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় তাহলে জ্ঞানও বেশিক্ষণ স্থায়ীই হবে। এই জ্ঞানকে জানার জন্য আর একটি জ্ঞানের বা অনুব্যবসায়ের কোনো দরকার নেই। কারণ, সব জ্ঞানই সাক্ষিচৈতন্যভাষ্য। শঙ্করাচার্যের মতে প্রকাশস্বভাব চৈতন্যই হল জ্ঞানের স্বরূপ। কেননা তার দ্বারাই অর্থের প্রকাশ ঘটে থাকে। তবে বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্য ছাড়া ওই চৈতন্যের অভিব্যক্তি যেহেতু সম্ভব হয় না, তাই বৃত্তিকেও উপচরিতভাবে 'জ্ঞান' বলা হয়ে থাকে। সুতরাং বলা যায়, জ্ঞানের প্রসঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি আর চৈতন্য বা চিদাভাসের প্রকাশ—দুটিরই গুরুত্ব রয়েছে।

রামানুজ মনে করেন জ্ঞান হচ্ছে আত্মার ধর্ম বা গুণ। যা নিজের আশ্রয় আত্মার কাছে বিষয়কে প্রকাশ করে বিষয় ব্যবহারের হেতু হয়, তা 'জ্ঞান'। জ্ঞান হল স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ জ্ঞান যখন বিষয় প্রকাশ করে তখন অন্য কোনো জ্ঞান ছাড়াই জ্ঞান নিজের আশ্রয় আত্মার কাছে প্রকাশিত হয়। ধর্মভূত জ্ঞান পদার্থ স্বরূপতঃ অনন্ত কিন্তু কর্মরূপ অবিদ্যার দ্বারা জ্ঞান সঙ্কুচিত হয়ে জীবকে অল্পজ্ঞ করে রাখে। আমরা যাকে জ্ঞানের উৎপত্তি, বিনাশ বলে জানি, তাকে রামানুজ আবির্ভাব, তিরোভাব বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে সব জ্ঞানই যথার্থ। জ্ঞানের কোনো উৎপত্তি বা বিনাশ নেই।

প্রাভাকর মীমাংসক তার্কিকের মতো জ্ঞানকে আত্মার গুণ বলেই মানেন, তবে তাঁদের মতে জ্ঞান শুধু বিষয়কেই প্রকাশ করে না, নিজেকে প্রকাশ করে এবং নিজের আশ্রয় আত্মাকেও প্রকাশ করে। এজন্যই জ্ঞান জ্ঞানের ত্রিপুটী প্রকাশক, অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা—তিনটিই প্রকাশ করে। অপরদিকে কুমারিলভট্ট সম্প্রদায়ের মত হল জ্ঞান স্বপ্রকাশ নয়। সাক্ষিভাষ্য ও নয়, আবার

অনুব্যবসায়গম্যও নয়। জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হয় না। অর্থাপত্তি প্রমাণের সাহায্যেই 'জ্ঞান'কে জানা যেতে পারে।

বৌদ্ধদের কথা হল—'প্রতিবিজ্ঞপ্তিই বিজ্ঞান' —বিজ্ঞানং প্রতিবিজ্ঞপ্তিঃ। যখন 'আমি' বলে যে সূক্ষ্মবিজ্ঞান ধারা সুষুপ্তির সময়ও চলতে থাকে, সেটা হচ্ছে আলয় বিজ্ঞান, সেটাই আত্মা। আর নীল, হলুদ এমনি বিষয়ে যে বিজ্ঞান তা প্রবৃত্তি বিজ্ঞান। জ্ঞান বিষয় প্রকাশ করার সময় নিজেকেও প্রকাশ করে থাকে।

[সপ্তপদার্থী (কলকাতা সংস্কৃত সিরিজ), সূত্র ৮৬; পৃ. ৫৬; সর্বদর্শনকৌমুদী (ত্রিবেন্দ্রাম) পৃ. ৩২; তর্কসংগ্রহ (পঞ্চানন তর্করত্ন পৃ. ৯৪-৯৫; তর্কভাষা (চৌখাম্বা), উত্তরভাগ, পৃ. ২১৯; শালিকনাথ-কৃত প্রকরণ-পঞ্চিকা (BHU) পৃ. ১৭০-১৭১; অভিধর্মকোশ (দ্বারিকাদাস), ১.১৫-১৬, যশোমিত্র-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য]

জ্ঞানসংজ্ঞেয় মহর্ষি কশ্যপের বংশধারায় বংশ প্রবর্তক একজন ঋষি। *[মৎস্য পু. ১৯৯.৮]*

জ্ঞানী ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে ভাবী দ্বাদশ মন্বন্তরে অর্থাৎ রুদ্রসাবর্ণি মনুর কালে দেবতারা যেসব গণে বিভক্ত হবেন, সেগুলির মধ্যে রোহিত অন্যতম একটি গণ। এই গণের অন্তর্ভুক্ত একজন দেবতা। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৮৫]*

জ্বর রোগবিশেষ। মহাভারতের শান্তিপর্বে জ্বররোগের উৎপত্তি প্রসঙ্গে একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। শরশয্যায় শয়ান কুরুপিতামহ ভীষ্মের কাছে যুধিষ্ঠির জ্বরের উৎপত্তি বিষয়ে প্রশ্ন করলে পিতামহ ভীষ্ম বললেন—

পুরাকালে শিববিদ্বেষী প্রজাপতি দক্ষ এক বিশাল অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। দেবতা, গন্ধর্ব, প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহর্ষিরা সকলেই সেই যজ্ঞে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। শুধু মহাদেবের প্রতি বিদ্বেষবশত দক্ষ তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন না। এদিকে শিবজায়া পার্বতী দুঃখিত হবেন ভেবে মহাদেব নিজেও পার্বতীকে দক্ষের এই বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের কথা জানাতে চাননি। কিন্তু দেবতারা সকলে সাজসজ্জা করে কোথাও চলেছেন দেখে পার্বতীর কৌতূহল হল। তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—দেবতারা সকলে এত সাজসজ্জা করে কোথায় চলেছেন? মহাদেব ইতস্তত করে উত্তর দিলেন—এঁরা সব প্রজাপতি দক্ষের অশ্বমেধযজ্ঞে যোগ দিতে চলেছেন। পার্বতী প্রশ্ন করলেন—এঁরা সকলেই যখন চলেছেন, তখন আপনি প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞে যাচ্ছেন না কেন? মহাদেব বললেন—অনেক কাল আগে থেকেই দেবতারা এই নিয়ম স্থির করে রেখেছেন যে, কোনো যজ্ঞেই আমার প্রাপ্য কোনো যজ্ঞভাগ নেই। তাই এ যজ্ঞেও আমার আমন্ত্রণ নেই। পার্বতী একথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, রুষ্টও হলেন। তিনি স্বামীকে বললেন—আপনি সমস্ত প্রাণীর আদি দেবতা, সকলের থেকে প্রভাবশালী, শক্তিশালী এবং গুণবান। সেখানে আপনারই কি না যজ্ঞভাগ নিষিদ্ধ! একথা শুনে আমার বড়ো দুঃখ হচ্ছে, ক্রোধও হচ্ছে—

ভগবান্ সর্বভূতেষু প্রভাবাভ্যধিকো গুণৈঃ।
অজয্যশ্চাপ্যধৃষ্যশ্চ তেজসা যশসা শ্রিয়া॥
অনেন তে মহাভাগ প্রতিষেধেন ভার্গতঃ।
অতীবদুঃখমুৎপন্নং বেপথুশ্চ মমানঘ॥

পার্বতীর মতামত জানার পর ভগবান শিব দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করাই স্থির করলেন। মহাদেবের আদেশে তাঁর অনুচররা দক্ষের যজ্ঞভূমি তছ নছ করে দিলেন। স্বয়ং যজ্ঞরূপ যে দেবতা, তিনি মহাদেবের ভয়ে ভীত হয়ে মৃগরূপ ধারণ করে কোনোক্রমে যজ্ঞস্থল থেকে পলায়ন করলেন। তা দেখে স্বয়ং শিব ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে সেই মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। এই সময় ক্রোধ থেকে মহাদেবের ললাটদেশে ঘর্মবিন্দু বা স্বেদবিন্দু দেখা দিল। সেই স্বেদবিন্দু মাটিতে পড়া মাত্র তা-এক প্রলয়ঙ্কর অগ্নির রূপ ধারণ করল। সেই অগ্নিশিখার সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম হল এক খর্বকায় অথচ ভীষণমূর্তি পুরুষের। ক্রমে সেই অগ্নির লেলিহান শিখায় সম্পূর্ণ জগত আবৃত হল। দেবতারা ভীত, সন্ত্রস্ত হলেন। এই সময় সম্পূর্ণ সৃষ্টি ধ্বংস হতে বসেছে দেখে স্বয়ং জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা এসে মহাদেবের সামনে দাঁড়ালেন এবং করজোড়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। ব্রহ্মা একথাও ঘোষণা করলেন যে, এরপর থেকে সমস্ত যজ্ঞে ভগবান শিবও যজ্ঞভাগ লাভ করবেন—

ভবতো'পি সুরাঃ সর্বে ভাগং দাস্যন্তি বৈ প্রভো।
ক্রিয়তাং প্রতিসংহারঃ সর্বদেবেশ্বর ত্বয়া॥

ব্রহ্মার স্তব স্তুতিতে ভগবান শিব প্রসন্ন হলেন। তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হল। মহাদেবের স্বেদবিন্দু

জাত অগ্নিশিখা থেকে যে পুরুষটির জন্ম হয়েছিল, ব্রহ্মা তাঁর নাম রাখলেন জ্বর। কিন্তু মহাদেবের সেই তেজ ধারণ করার ক্ষমতা এই ব্রহ্মাণ্ডে কারও ছিল না। তাই ব্রহ্মার অনুরোধে ভগবান শিব মনুষ্য এবং অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে জ্বরকে বহুভাগে বিভক্ত করে দিলেন।

[মহা (k) ১২.২৮৩.১-৫১; (হরি) ১২.২৭৫.১-৫০]

□ মহাভারতে বর্ণিত জ্বরোৎপত্তির উপাখ্যান প্রসঙ্গে বৃত্রাসুরের জ্বরাক্রান্ত হবার প্রসঙ্গও এসেছে। অতি বলশালী বৃত্রাসুরকে যখন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা বধ করতে সমর্থ হলেন না, তখন তাঁরা ভগবান বিষ্ণুকে সঙ্গে নিয়ে বৃত্রবধে মহাদেবের সহায়তা প্রার্থনা করলেন। ভগবান শিব সম্পূর্ণ সৃষ্টি রক্ষার জন্য দেবতাদের বৃত্রবধে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মহাদেবের তেজ ভয়ঙ্কর জ্বরের রূপ ধারণ করে বৃত্রাসুরের শরীরে প্রবেশ করল। বৃত্রাসুর জ্বরে আক্রান্ত হলে মহাভারতে তাঁর দেহে রোগের যেসব লক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যেও অলৌকিকতার কোনো ছোঁয়া নেই। প্রবল জ্বরের সাধারণ লক্ষণ হিসেবেই এগুলিকে আমরা আজও চিনি। জ্বরাক্রান্ত বৃত্রাসুরের মুখ উত্তাপে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, শরীর বিবর্ণ হয়ে পড়ল, গায়ে রীতিমতো কাঁপুনি ধরল এবং ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়তে লাগল—

জ্বলিতাস্যো'ভবদ্‌ঘোরো বৈবর্ণ্যঞ্চাগমৎ পরম্।
গাত্রকম্পশ্চ সুমহান্ শ্বাসশ্চাপ্যভবন্ মহান্॥

এছাড়াও তাঁর দেহে রোমাঞ্চ দেখা দিল, চৈতন্য, স্মৃতিশক্তি প্রায় লোপ পেল। আর এর সঙ্গে খুব সম্ভব দেহের উত্তাপ বোঝাতেই যুক্ত হয়েছে যে বৃত্রাসুরের চারপাশে যেন জ্বলন্ত উল্কাপাত হতে লাগল—

রোমহর্ষশ্চ তীব্রো'ভূন্নিশ্বাসশ্চ মহান্ নৃপ।
শিবা চাশিবসঙ্কাশা তস্য বক্ত্রাৎ সুদারুণা॥
নিষ্পপাত মহাঘোরা স্মৃতিঃ সা তস্য ভারত।
উল্কাশ্চ জ্বলিতাস্তস্য দীপ্তাঃ পার্শ্বে প্রপেদিরে॥

[মহা (k) ১২.২৮১.৩০-৪৪; ১২.২৮২.১-৪; (হরি) ১২.২৭৪.৩০-৪৮]

□ মহাভারতে মহাদেবের তেজোপ্রভাবে বৃত্রাসুরের জ্বরের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার উৎস মূলত কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতায় মেলে। এখানে বলা হচ্ছে যে বৃত্রাসুরের মুখবিবরে অগ্নি এবং সোম অবস্থান করছিলেন। বৃত্রবধে উদ্‌যোগী ইন্দ্রকে তাঁরা বললেন—হে ইন্দ্র! আপনি বৃত্রকে আঘাত করবেন না। আমরা তাঁর মুখের মধ্যে আছি। একথা শুনে ইন্দ্র বললেন—তোমরা বৃত্রের মুখ থেকে বেরিয়ে এসো। তোমরা আমার পক্ষে ছিলে, আমার পক্ষেই তোমাদের থাকা উচিত। একথা শুনে অগ্নি আর সোম বললেন—আমরা বেরিয়ে যেতেই পারি কিন্তু বৃত্রের দু-পাটি দাঁত আমাদের আবদ্ধ করে রেখেছে। একথা শুনে ইন্দ্র বৃত্রের দেহে সন্তাপ সৃষ্টি করলেন, জ্বরে তাঁর দেহ কম্পিত হল, আর সেই কম্পনের সুযোগ নিয়েই সোম এবং অগ্নি দেবতা দাঁতের ফাঁক গলে বেরিয়ে এলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতার এই কাহিনীতে অবশ্য জ্বর শব্দটির সরাসরি কোনো উল্লেখ নেই। এখানে প্রযুক্ত শব্দটি হল শীতরূর—

স ইন্দ্র আত্মনঃ
শীতরূরাবজনয়ওচ্ছীতরূরয়োর্জন্ম।

কিন্তু টীকাকার সায়নাচার্য এই শীতরূর কে স্পষ্টতই জ্বর বলেই উল্লেখ করেছেন—

তদানীং শীতরূরশব্দাভিধেয়য়োর্জ্বর
তাপয়োর্জন্ম সমুৎপন্নম্।

[তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম) ২.৫.২.৩ সায়নাচার্যকৃত টীকা দ্রষ্টব্য]

□ সংস্কৃত 'জ্বর' ধাতুর প্রকৃত অর্থ হল রোগ। কিংবা সন্তাপ; বিপদ-আপদ বোঝাতেও 'জ্বর' শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ঋগ্‌বেদেও 'জ্বর' শব্দটি মূলত বিপদ বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়েছে। মন্ত্রটিতে বলা হচ্ছে যে, আমাদের শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে নিয়ে যাও, পথে যেন নতুন কোনো বিপদ না হয়—

অভি সূযবসং নয় ন নবজ্বারো অধ্বনে।
পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ।

এখানে 'জ্বর' শব্দটি বিপদ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে মূলত। *[ঋগ্‌বেদ ১.৪৩.৮]*

□ সুশ্রুতসংহিতায় জ্বরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, স্বেদনির্গমন বন্ধ হয়ে যাওয়া, শরীরে প্রচণ্ড উত্তাপ দেখা দেওয়া, শরীরে কাঁপুনি ইত্যাদি দেখা দেওয়াকেই মূলত জ্বর বলা হয়ে থাকে—

স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্বাঙ্গ'গ্রহণং তথা।
বিকারা যুগপৎ যস্মিন্ জ্বরঃ স পরিকীর্তিত॥

[সুশ্রুত সংহিতা (উত্তরতন্ত্র) ৩৯.১১]

□ সুশ্রুত সংহিতার উত্তরতন্ত্রে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় জুড়ে জ্বর, জ্বরের কারণ এবং তার চিকিৎসা নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।

[সুশ্রুত সংহিতা (উত্তরতন্ত্র) ৩৯ অধ্যায়]

□ প্রচলিত অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে গরুড় পুরাণ এমন একটি পুরাণ থাকে প্রায় বিচিত্র বিষয়ের বিশ্বকোষ বলা চলে। এই গরুড় পুরাণেও সম্পূর্ণ একটি অধ্যায় জুড়ে জ্বর, জ্বরের প্রকারভেদ, জ্বরের কারণ এবং তার চিকিৎসা সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।

[গরুড় পু. ১.১৫১.১-৮২]

□ মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত জ্বরোৎপত্তি উপাখ্যান বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা আলোচনা করেছি যে, ভগবান শিব জ্বরকে মনুষ্য এবং পশুকুলের জন্য বহুভাগে বিভক্ত করলেন। মহাভারতে সংক্ষেপে বিভিন্ন পশুপাখির দেহে জ্বরের লক্ষণ বিষয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে, তা থেকে সে যুগে বিভিন্ন পশু পাখির যে রোগলক্ষণ নির্ণয় করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তার একটা ধারণা পাওয়া যায়। আমরা আগেই বলেছি যে, জ্বর বলতে সেই বস্তুকে বোঝায় যা ক্ষতিকারক বা বিপদজনক। সেই ভাবনা থেকে জল, মৃত্তিকা, প্রভৃতি জড়বস্তুর পক্ষে যা কিছু ক্ষতিকারক বা জ্বর উৎপাদক—তাও আলোচনা করা হয়েছে। মহাভারতের বিবরণ অনুযায়ী হাতির মাথা গরম হয়ে যাওয়া জ্বরের লক্ষণ, শিলাক্ষয় পাওয়া পর্বতের জ্বর, শেওলার মতো জলজ উদ্ভিদ জল বা জলাশয়ের জ্বর, সাপের খোলসত্যাগ করাই সাপের জ্বর। গোরু বা গবাদি পশুদের জ্বর উৎপন্ন হয় তাদের ক্ষুরের রোগ থেকে, ক্ষারমৃত্তিকা হল ভূমির জ্বর, কারণ এর ফলে ভূমি উষর হয়ে যায়, চাষযোগ্য থাকে না। মহাভারত উল্লেখ করেছে বিভিন্ন পশুপাখির ক্ষেত্রে এমনকী কোকিলের ক্ষেত্রেও দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়া জ্বরের অন্যতম লক্ষণ। গলরন্ধ্রের ভিতরে মাংসপিণ্ড তৈরি হলে তা থেকে অশ্বের জ্বর উৎপন্ন হয়। আর ময়ূরের জ্বরের লক্ষণ হল তার মাথার শিখা নষ্ট হয় যাওয়া—

শীর্ষাভিতাপো নাগানাং পর্বতানাং শিলাজতু।
অপাস্তু নীলিকাং বিদ্যান্নির্মোকং ভুজগেষু চ॥
খোরকঃ সৌরভেয়াণামূষরং পৃথিবী তলে।
পশূনামপি ধর্মজ্ঞ দৃষ্টিপ্রত্যবরোধনম্।
রন্ধ্রাগতমথাশ্বানাং শিখোদ্‌ভেদশ্চ বর্হিণাম্।
নেত্ররোগঃ কোকিলস্য জ্বরঃ প্রোক্তো মহাত্মনা॥

এছাড়াও পিত্তভেদ মেষের জ্বরলক্ষণ, হিক্কা শুকপক্ষীর জ্বরলক্ষণ বলে কথিত হয়েছে। এছাড়াও বাঘ এবং সমস্তপ্রাণীর মধ্যেই জ্বরের সাধারণ লক্ষণ হল পরিশ্রান্ত বোধ করা—

অবীনাং পিত্তভেদশ্চ সর্বেষামিতি নঃ শ্রুতম্।
শুকানামপি সর্বেষাং হিক্কিকা প্রোচ্যতে জ্বরঃ॥
শার্দূলেষ্বথ ধর্মজ্ঞ শ্রমো জ্বর ইহোচ্যতে।
মানুষেষু তু ধর্মজ্ঞ জ্বরো নামৈষ ভারত॥

জ্বরকে এত ভয়ংকর রোগ বলে উল্লেখ করে, তার উৎপত্তি, লক্ষণ প্রভৃতি বিশদে বর্ণনা করার পর মহাভারত একটি পরম সত্য উচ্চারণ করেছে। তা হল, মহাদেবের তেজস্বরূপ এই যে জ্বর প্রাণীমাত্রেই অন্তত তিন বার তার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। প্রথম জন্মের সময়, দ্বিতীয়ত মৃত্যুকালে এবং তৃতীয়ত সম্পূর্ণ জীবদ্দশায় কখনো না কখনো—

মরণে জন্মনি তথা মধ্যে চবিশতে নরম্।
এতন্মাহেশ্বরং তেজো জ্বরো নাম সুদারুণঃ॥

মহাভারতের ভাবনায় তাই জ্বর শুধু রোগমাত্র নয়, জীবনের স্বাভাবিক লক্ষণও বটে।

[মহা (k) ১২.২৮৩.৫১-৫৭;
(হরি) ১২.২৭৫.৫০-৫৬]

□ জ্বরের নানাবিধ চিকিৎসার কথা চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা দুই গ্রন্থেই বিশদে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয়, জ্বরাক্রান্ত রোগীর শরীর ঠাণ্ডা করার জন্য শীতল জলের ব্যবহার অত্যন্ত প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। গবেষক লিখছেন—

In the early medical treatises, a burning sensation of the body (*dāha*) is generally a symptom of fever (*jvara*), and various types and parts of lotuses are often employed in treatment to remove the bodily heat. One therapy required the patient to lie down on a bed covered with the cooling shoots (*dala*) of species of the lotus plant (*puṣkara, padma, utpala*), leaves of the plantain, and other cooling elements. He should be cooled by fanning with species of the lotus and

sprinkled with water steeped with sandalwood, and should be bathed in rivers, pools, and lakes with lotuses and clean water.

Suśruta does not mention such a treatment in his chapter on fevers (*jvara*) but prescribes that various species of lotus be used in a bath for the removal of burning sensations in the body. Elsewhere in the *Suśruta shṃhitā,* excessive bodily heat (*dāha*) appears as a separate disease unconnected with fever (jvara). A therapy for this morbid condition resembles that outlined in the *Caraka Saṃhitā* for aburning body caused by fever: the patient should lie down on a bed of moistened lotus flowers and leaves and become cooled by being surrounded and imbued with the sight, touch, and scent of lotuses. This remedy is prescribed specifically for a burning body resulting from vitiated bile caused by intoxication (*pāna*) and generally in cases of hot bodily sensations caused by hemorrhagic disorders (*raktapitta*) and thirst (*tṛṣ*).

Use of different parts and types of the lotus for the purpose of cooling a patient whose body is racked by extreme heat forms part of the early medical traditions of both Caraka and Suśruta. Suśruta's inclusion of therapeutic employment of lotuses against a specific condition of bodily sensations of heat, unrelated to fever, points to a derivative use of cooling lotus remedies based on a subsequent classification of fever symptoms into separate diseases. Their primary use was as a treatment for fever, which is supported by their application in early Buddhist medicine for a febrile condition exemplified by burning over the entire body. Although not stated, Sāriputta's remedy, like that in the medical treatises, probably involved his lying on a bed of lotus sprouts and stalks in order to cool his body. The use of lotuses in the treatment of fevers, therefore, likely derived from a source common both to early Buddhist medicine and to the tradition of Caraka, whose description of their use suggests how they might have been employed by the Buddhist monks.

[চরক সংহিতা (চিকিৎসা) ৩ অধ্যায়; সুশ্রুত সংহিতা (উত্তরতন্ত্র) ৩৯ অধ্যায়; Kemeth G. Zysk, Asceticism and Healing in Ancient India, Delhi: Motilal Banarsidass Pvt. Ltd. 1991]

□ 'জ্বর'শব্দের অর্থ আলোচনা করার সময় আমরা দেখেছি 'জ্বর' শব্দটা যেমন রোগের পর্য্যায় শব্দ, তেমনই জ্বর বিপদ আপদ কিংবা দুশ্চিন্তা-র অর্থও বহন করে। সেই অর্থে মহাভারতে পুরাণে বহুবার বিভিন্ন ব্যক্তির দুশ্চিন্তামুক্ত কিংবা বিপন্মুক্ত অবস্থা বোঝাতে 'বিগতজ্বর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, দ্রোণাচার্য যখন গুরুদক্ষিণা হিসেবে একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে নিলেন তখন অর্জুন একলব্য আর কোনোভাবেই তাঁর থেকে বেশি কুশল ধনুর্ধর হয়ে উঠতে পারবেন না—একথা ভেবে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন এবং ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী একলব্যের অবস্থা দেখে চিন্তামুক্ত বোধ করছিলেন একথা বোঝাতে অর্জুনকে 'বিগতজ্বর' বলা হয়েছে মহাভারতে—

ততো'র্জুনঃ প্রীতমনা বভূব বিগতজ্বরঃ।

[মহা (k) ১.১৩২.৬০; (হরি) ১.১২৮.৬৯]

□ মহাভারতে বর্ণিত উপাখ্যানে যেহেতু 'মূর্তিমান' জ্বর-কে রুদ্রশিবের তেজসম্ভূত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই অনুসারে পুরাণগুলিতেও রুদ্র-শিবের অন্যতম গণপতি বা অনুচর হিসেবে জ্বরের নাম উল্লিখিত হতে দেখা যায়। *[বায়ু পু. ৬৬.৬৮-৭০; স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/চতুরশীতিলিঙ্গ মাহাত্ম্য) ৭৭.২০-২১]*

জ্বলনা মৎস্য পুরাণ অনুসারে তক্ষকনাগের কন্যা জ্বলনা। তিনি পুরুবংশজাত রাজা ভদ্রাশ্বের পুত্র ঔচেয়ুর পত্নী। ঔচেয়ুর ঔরসে জ্বলনার গর্ভজাত পুত্র হলেন রন্তিনার। *[মৎস্য পু. ৪৯.৬-৭]*

□ বায়ু পুরাণে আবার অনাদৃষ্টের পুত্র রিবেয়ুর পত্নী এবং রন্তিনারের মাতা বলা হয়েছে জ্বলনাকে। তবে বায়ু পুরাণের এই পাঠটি ত্রুটিপূর্ণ বলেই মনে হয়। *[দ্র. জ্বালা১]*

[বায়ু পু. ৯৯.১২৮]

□ মহাভারতে উল্লিখিত জ্বালা ও পুরাণে উল্লিখিত জ্বলনাকে একই ব্যক্তি বলে মনে হয়।

জ্বালা১ মহাভারতের আদিপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, তক্ষক নাগের কন্যা জ্বালা। পুরুবংশীয় রাজা অরিহের পুত্র ঋক্ষের সঙ্গে জ্বালার বিবাহ হয়েছিল। জ্বালার গর্ভে ঋক্ষের মতিনার নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[মহা (k) ১.৯৫.২৫; (হরি) ১.৯০.৩১]

জ্বালা২ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে কপিশা নামে এক পিশাচীর কন্যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জ্বালা। ইনি একজন পিশাচী। পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর গায়ের রং জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো লাল।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.৩৭৭]

জ্বালাজিহ্ব তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে যখন দেবতারা তারকাসুরকে বধ করার জন্য স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন, সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট দেবতারা তাঁদের কয়েকটি বিশিষ্ট অনুচর যোদ্ধাকে তারকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য অনুচর রূপে স্কন্দকে দান করেন। অগ্নিদেব নিজ পুত্র স্কন্দকে যে দুইজন অনুচর দান করেছিলেন, জ্বালাজিহ্ব তাঁদের মধ্যে একজন। স্কন্দ-কার্ত্তিকেয়ের অনুচর যোদ্ধাদের তালিকায় দু-বার এঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে। *[মহা (k) ৯.৪৫.৩৩; ৯.৪৫.৬১; (হরি) ৯.৪২.৩২; ৯.৪২.৫২নং শ্লোকের উত্তর পাদটীকা দ্রষ্টব্য; খণ্ড ২৯, পৃ. ৪৭৬]*

জ্বালামুখী১ অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। জ্বালামুখী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৭৯.৩১]*

জ্বালামুখী২ *[দ্র. বড়বা১]*

জ্বালী শিবের অষ্টোত্তর সহস্রনামের একটি নাম। মহাদেব পুরাণে—মহাভারতে বহুবার অগ্নির সঙ্গে একাত্মক রূপে কল্পিত হয়েছেন। জ্বাল অর্থাৎ দীপ্তিমান এবং দহনশক্তিসম্পন্ন বলেই অগ্নিস্বরূপ ভগবান শিব জ্বালী নামে খ্যাত।

[মহা (k) ১৩.১৭.৫৮; (হরি) ১৩.১৬.৫৮]

জ্যামঘ যদুবংশীয় রুচক (মতান্তরে রুক্মকবচ)-এর পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যামঘ একজন। চার ভাইয়ের দ্বারা পিতৃরাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হয়ে জ্যামঘ বনে গমন করেন। সেখান থেকে নতুন দেশ জয় করে নিজ রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছায় তিনি নর্মদা নদীর উপত্যকা অতিক্রম করে ঋক্ষবান পর্বত ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল অধিকার করে সেখানে বসতি স্থাপন করেন। এই দেশের নাম শুক্তিমতী।

জ্যামঘের পত্নীর নাম শৈব্যা (মতান্তরে চৈত্রা) জ্যামঘ নিঃসন্তান হলেও মনে করা হয় পত্নী শৈব্যার ভয়ে দ্বিতীয় বিবাহ করেননি।

একসময় জ্যামঘ যুদ্ধ জয় করে বিজিত দেশ থেকে উপদানবী নামে এক কন্যাকে হরণ করে আনেন। পতির রথে অন্য রমণীকে দেখে শৈব্যা ক্রুদ্ধ হয়ে অপরিচিতার সম্পর্কে জ্যামঘের কাছে জানতে চান। জ্যামঘ পত্নীকে জানালেন এই কন্যাটি তাঁর ভবিষ্যৎ পুত্রবধূ। শৈব্যা স্বামীর কথায় অবাক হলেন কারণ তিনি নিজে নিঃসন্তান এবং তাঁর কোনো সপত্নীও নেই। এমতাবস্থায় পুত্রবধুর কল্পনা নেহাতই অদূরদর্শী বাক্য বলে ধারণা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু আত্মবিশ্বাসী জ্যামঘ আবারও শৈব্যাকে আশ্বস্ত করে বললেন উপদানবী শৈব্যা-পুত্রেরই পত্নী হবেন।

অবশেষে পিতৃগণ ও বিশ্বেদেবগণের কৃপায় শৈব্যার গর্ভে জ্যামঘের ঔরসে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়, যাঁর নাম বিদর্ভ। পরে বিদর্ভের সঙ্গে উপদানবীর বিবাহ হয়। তিনটি পুত্র সন্তান হয়েছিল—কুশ, ক্রথ ও রোমপাদ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জ্যামঘ তাঁর পুত্রের নামকরণ করেছিলেন বিদর্ভ। এই সময় জ্যামঘ দক্ষিণে রাজ্যবিস্তার করতে গিয়ে যে জয় করেন সেটির, নামও রাখা হয়েছিল তাঁর পুত্রের নামানুসারেই। অর্থাৎ বিদর্ভ দেশের নামকরণ হয়েছিল জ্যামঘ-পুত্রের নাম অনুসরণ করে।

[ভাগবত পু. ৯.২৩.৩৫-৩৯; ৯.২৪.১; মৎস্য পু. ৪৪.২৮-৩৬; বায়ু পু. ১.১৪৪; ৯৫.২৮-৩৬; বিষ্ণু পু. ৪.১২.৩৬-৪৭]

জ্যামহানি যজুর্বেদ শাখার অন্যতম ঋষি লাঙ্গলের শিষ্যদের মধ্যে একজন।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.৩৫.৪৮]

জ্যেষ্ঠ মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, সামবেদ-সংহিতার অন্যতম প্রবক্তা জ্যেষ্ঠ। বর্হিষদ

মুনিরা, জ্যেষ্ঠর কাছ থেকে এই সামবেদ-সংহিতা অধ্যয়ন করেছিলেন বলে কথিত হয়েছে।

[মহা (k) ১২.৩৪৮.৪৬-৪৭; (হরি) ১২.৩৩২.৪৬-৪৭]

জ্যেষ্ঠপুষ্কর মহাভারতের বনপর্বে এই জ্যেষ্ঠপুষ্কর তীর্থের কথা উল্লিখিত হয়েছে। কথিত হয়েছে যে, এই তীর্থে কপিলা গাভী দান করলে, ব্রাহ্মণের পাদ-প্রক্ষালনের ফলে অর্জিত পুণ্যের সমান পুণ্য লাভ হয়। *[দ্র. পুষ্কর তীর্থ]*

[মহা (k) ৩.২০০.৬; (হরি) ৩.১৭০.৬৪]

জ্যেষ্ঠসাম সামবেদের অন্যতম একটি শাখা। মহাভারতে এবং পুরাণে জ্যেষ্ঠ নামে জনৈক সামবেদবিদ ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়। মহর্ষি জ্যেষ্ঠ প্রণীত সামবেদের শাখাই জ্যেষ্ঠসাম নামে খ্যাত বলে মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে। মৎস্য পুরাণেও জ্যেষ্ঠ সাম সূক্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধকার্যে এই জ্যেষ্ঠসাম পাঠ করা উচিত বলে মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে।

[মহা (k) ১২.৩৪৮.৪৬; ১৩.৯০.২৭;
(হরি) ১২.৩৩২.৪৬; ১৩.৭৭.২৭;
মৎস্য পু. ১৭.৩৮; ৫৮.৩৬; ৯৫.৩০]

□ আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের অন্তর্গত শ্রাদ্ধ বিষয়ক অধ্যায়ে জ্যেষ্ঠসাম পাঠের উল্লেখ পাওয়া যায় যা মৎস্য পুরাণের তথ্যকে সমর্থন করে।

[আপস্তম্ব ধর্মসূত্র (চিন্নস্বামী শাস্ত্রী) ২.১৭.২২]

জ্যেষ্ঠা১ নক্ষত্র বিশেষ। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে দান করা অত্যন্ত শুভ ফল দায়ক। শ্রাদ্ধকার্যের জন্যও এটি উপযুক্ত সময়। *[মহা (k) ৫.১৪৩.৯; ৬.৩.১৬;*
১৩.৬৪.২৩; ১৩.৮৯.৯; (হরি) ৫.১৩৪.৯;
৬.৩.১৬; ১৩.৫৩.২৩; ১৩.৭৬.৪৩;
ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.১৮.৯]

□ মহাভারতের অনুশাসনপর্বে মহর্ষি জমদগ্নি ও রেণুকার একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই কাহিনী থেকে জানা যায় যে, মধ্যাহ্নকালে সূর্য জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে অবস্থান করলে পৃথিবীতে প্রখর কিরণপাত হয়।

[মহা (k) ১৩.৯৫.৯; (হরি) ১৩.৮১.৯]

□ মহাভারতের অনুশাসনপর্বে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপ্রতিপদে বিভিন্ন নক্ষত্রকে চন্দ্রের দেহের বিভিন্ন অঙ্গরূপে কল্পনা করার কথা বলা হয়েছে। এই বর্ণনায় জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে চন্দ্রের গ্রীবা রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

[মহা (k) ১৩.১১০.৭; (হরি) ১৩.৯৭.৭]

□ ভাগবত পুরাণে শিশুমার নক্ষত্রপুঞ্জকে মনুষ্য রূপে কল্পনা করা হয়েছে। মনুষ্যরূপী শিশুমারের বাম স্কন্ধে অবস্থান করে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র। *[ভাগবত পু. ৫.২৩.৬]*

□ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে জ্যেষ্ঠাকে চন্দ্রের পত্নী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *[ব্রহ্মবৈবর্ত পু. ১.৯.৫১]*

□ যুধিষ্ঠির এই জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে—

ঐন্দ্রে চন্দ্রসমাযুক্তে মুহূর্তেঽভিজিতেঽষ্টমে।

শ্লোকে উল্লিখিত এই 'ঐন্দ্র' শব্দটি জ্যেষ্ঠা শব্দের দ্যোতক। *[মহা (k) ১.১২৩.৬;*
(হরি) ১.১১৭.৮ (নীলকণ্ঠকৃত টীকা দ্রষ্টব্য)]

জ্যেষ্ঠা২ অন্ধকাসুর বধের পূর্বে মহাদেবের দেহ থেকে সৃষ্টি হওয়া মাতৃকাগণের মধ্যে একজন।

[মৎস্য পু. ১৭৯.২০]

জ্যেষ্ঠা৩ একজন দেবী। শিবলিঙ্গ স্থাপনের পূর্বে আধাররূপী অন্যান্য যেসব দেবীর মূর্তি স্থাপনের কথা পুরাণে বলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা একজন।

শিলাদ-পুত্র নন্দীকেশ্বরের জন্মোৎসবে অংশগ্রহণকারী দেবীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা একজন।

[অগ্নি পু. ৯৬.৯২-১০১; লিঙ্গ পু. ১.৪২.২৩]

জ্যেষ্ঠা৪ দেবী শক্তির একটি রূপ।

[অগ্নি পু. ১৪৭.৯; ৩০৪.২১-২২; লিঙ্গ পু. ২.২৪.১৩]

জ্যেষ্ঠা৫ কাশীতে জ্যেষ্ঠেশ্বর শিবলিঙ্গের পাশে স্থাপিত পার্বতী মূর্তিটি জ্যেষ্ঠা নামে পূজিতা।

[স্কন্দ পু. (কাশী/উত্তরার্ধ). ৬৩.১৩-১৪]

জ্যেষ্ঠা৬ সৃষ্টির আদিকালে ভগবান বিষ্ণু যেসকল পাপ সৃষ্টিকারী শক্তির জন্ম দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা একটি। *[লিঙ্গ পু. ২.৬.৪]*

জ্যেষ্ঠা৭ অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। জ্যেষ্ঠা সেই মাতৃকাদের মধ্যে অন্যতম। *[মৎস্য পু. ১৭৯.২০]*

জ্যেষ্ঠিল মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, জ্যেষ্ঠিল একটি পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থে সহস্র গোদান করলে পুণ্য ফল লাভ হয় বলে মহাভারতে কথিত হয়েছে।

[মহা (k) ৩.৮৪.১৩৪; (হরি) ৩.৬৯.১৩৪]

জ্যোৎস্না ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ও বায়ু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, জ্যোৎস্না একটি পৌরাণিক ও পবিত্র নদী। মানস সরোবর থেকে এই নদীটির উৎপত্তি হয়েছে বলে পুরাণে কথিত হয়েছে।

[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৭১; বায়ু পু. ৪৭.৬৮]

জ্যোৎস্নাকালী মহাভারতের উদ্যোগপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, জ্যোৎস্নাকালী নামে চন্দ্রের একটি কন্যা ছিল। এই জ্যোৎস্নাকালী বরুণের জ্যেষ্ঠপুত্র পুষ্করকে বিবাহ করেছিলেন।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত পাঠে জ্যোৎস্নাকালীর পরিবর্তে জ্যোৎস্নাকারী নামটি উল্লিখিত হয়েছে। তবে সিদ্ধান্তবাগীশ ধৃত 'জ্যোৎস্নাকারী' পাঠটি নিয়ে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ থাকছে।

[মহা (k) ৫.৯৮.১২-১৩; (হরি) ৫.৯১.১২-১৩]

জ্যোৎস্নামুখী অন্ধকাসুরকে বধ করার সময় অন্ধকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য মহাদেব নিজের দেহ থেকে অসংখ্য মাতৃকার সৃষ্টি করেন। জ্যোৎস্নামুখী সেই মাতৃকাদের মধ্যে একজন। *[মৎস্য পু. ১৭৯.২৬]*

জ্যোতি (জ্যোতিস্)১ অষ্টবসুর অন্যতম 'অহঃ' নামক বসুর চারজন পুত্রের অন্যতম। *[দ্র. অষ্টবসু]*

[মহা (k) ১.৬৬.২৩; (হরি) ১.৬১.২৩]

জ্যোতি (জ্যোতিস্)২ অগ্নিদেব তাঁর দুই অনুচরকে কার্তিকেয়কে অনুচরস্বরূপ দান করেন। তাঁদের একজন জ্যোতি নামে খ্যাত।

[মহা (k) ৯.৪৫.৩৩; (হরি) ৯.৪২.৩২]

জ্যোতি (জ্যোতিস্)৩ ভীষ্মের কৃষ্ণস্তুতিতে (ভীষ্মস্তবরাজ) কৃষ্ণকে জ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[মহা (k) ১২.৪৭.৫৫; (হরি) ১২.৪৬.৫৫]

জ্যোতি (জ্যোতিস্)৪ ভগবান বিষ্ণুর সহস্রনামের অন্যতম। *[মহা (k) ১৩.১৪৯.৭৯, ১০৭; (হরি) ১৩.১২৭.৭৯, ১০৭]*

জ্যোতিক কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। মহাভারতের আস্তীকপর্বে সর্পনাম কথনের সময় তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে। পাতালে ভোগবতী পুরীতে বসবাসকারী নাগদের মধ্যে আমরা জনৈক জ্যোতিষ্কের উল্লেখ পাই। সম্ভবত জ্যোতিক এবং জ্যোতিষ্ক অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। *[মহা (k) ১.৩৫.১৩; ৫.১০৩.১৫; (হরি) ১.৩০.১৩; ৫.৯৬.১৫]*

জ্যোতির্ধামা তামস মন্বন্তরে যাঁরা সপ্তর্ষি হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন। *[ভাগবত পু. ৮.১.২৮; ব্রহ্মাণ্ড পু. ১.৩৬.৪৭; বিষ্ণু পু. ৩.১.১৮]*

জ্যোতির্মুখ রামের সহায়তার জন্য ত্রেতাযুগে ব্রহ্মার আদেশে দেবতারা বানররূপী পুত্রদের জন্ম দিয়েছিলেন। সূর্যদেব যে পুত্রের জন্ম দেন, তাঁর নাম জ্যোতির্মুখ। যুদ্ধের সময় ইনি একটি প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড নিয়ে রাবণকে আক্রমণ করেন, কিন্তু নিজেই আহত হয়ে পড়েন। পরে ইন্দ্রজিৎও এঁকে আহত করেছিলেন।

[রামায়ণ ৬.৩০.৩২; ৬.৫৯.৪২-৪৩; ৬.৭৩.৫৯]

জ্যোতিষ বেদ-পরবর্তী যুগে চতুর্বেদকে ভিত্তি করে বিভিন্ন বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচিত হয়। যেমন, বেদ মন্ত্রের ছন্দ বিষয়ে 'ছন্দ' শাস্ত্র, বেদমন্ত্রের ভাষা বিষয়ে 'ব্যাকরণ' কিংবা সমকালীন শব্দকোষ নিরুক্ত। এই বিষয়গুলি প্রাচীনকাল থেকে বেদাঙ্গ নামে পরিচিত। এই বেদাঙ্গ শাস্ত্রগুলির অন্যতম হল জ্যোতিষ। জ্যোতিষ বলতে আমরা এখন যে ভবিষ্যৎ গণনার শাস্ত্র বুঝি, প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্র কিন্তু তা নয়। প্রাচীন বেদাঙ্গ জ্যোতিষ শাস্ত্রকে অনেক ব্যাপকভাবে বুঝতে হবে।

জ্যোতিষশাস্ত্র হল বৈদিক যুগের কাল বা সময় গণনার পদ্ধতি। প্রাচীনকালে ঋগ্‌বেদ সময় থেকেই সূর্য এবং চন্দ্রের গতি বিচার করে কাল গণনা করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। দর্শপূর্ণমাস, চাতুর্মাস্যের মতো বৈদিক যাগযজ্ঞের ক্ষেত্রে তিথি-নক্ষত্র-সময় গণনার প্রয়োজনীয়তাও ছিল যথেষ্টই। সৌর এবং চান্দ্র মতে মাস, বৎসর গণনা করাও সেই সময়েই প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। গবেষকরা ঋগ্‌বেদের পঞ্চম মণ্ডলের একটি সূক্ত উদ্ধার করেছেন যেখানে সেই সূক্তের ঋষি অত্রিকে সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করতে দেখা যাচ্ছে। গবেষকদের মতে, সূর্য এবং চন্দ্রের গতি প্রকৃতি বিচার করে সূর্যগ্রহণের সময় নির্ণয় করার দক্ষতা সেযুগে অত্রি এবং অত্রিবংশীয় ঋষিদের মধ্যে ছিল। *[ঋগ্‌বেদ ৫.৪০ সূক্ত]*

□ যজুর্বেদের কালে এসে এই বিদ্যা আরও পরিণতি লাভ করে। আমরা এখন যেমন ৩৬৫ দিন এবং প্রায় ৬ ঘণ্টা সময় মিলিয়ে এক সৌর বছর গণনা করি, সেই হিসাব যজুর্বেদের সময়কালেই প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতায় এর প্রমাণ মেলে। এখানে দেখা যাচ্ছে, দ্বাদশ চান্দ্র মাস অতিক্রান্ত হবার পর চৈত্র বা বৈশাখ মাসের সঙ্গে ১১দিন সংযুক্ত করা হচ্ছে। এই ১১দিনে একাদশরাত্র যজ্ঞ করার কথা বলা হয়েছে। আমরা আধুনিক হিসেবে বুঝি, ৩৫৪ দিনে চান্দ্র বৎসর সম্পূর্ণ হলেও সৌর বৎসর পূর্ণ হতে ঠিক ১১দিনই বাকি থাকে।

[তৈত্তিরীয় সংহিতা (আনন্দাশ্রম) ৭.২.৬]

সুতরাং Calendar বা পঞ্জিকা তৈরির প্রয়োজনীয়তা সেকালেই অনুভূত হয়েছিল আর

সেই গণনা পদ্ধতিও ছিল যথেষ্ট আধুনিক এবং নির্ভুল। বেদ এবং বৈদিক গ্রন্থগুলিতে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান, মাস-তিথি-দিনক্ষণ বিচারের এমন অজস্র উদাহরণ মেলে। মূলত তার থেকেই প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রের জন্ম যা পরবর্তী সময়ে Astrology রূপে বিকাশপ্রাপ্ত হলেও এটি অত্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক Ancient Indian Astronomy.

বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রাচীনতম প্রণেতা হিসেবে মহর্ষি লগধের নাম পাওয়া যায়। ইনি কোন সময়কালে বর্তমান ছিলেন, তা নিয়ে অবশ্য গবেষক মহলে মতপার্থক্য আছে। সেউ তাঁকে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ব্যক্তি বলেছেন, কেউ ৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের ব্যক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। তবে মোটামুটি সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের আগেই লগধ বর্তমান ছিলেন এবং তাঁর বেদাঙ্গ জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণীত হয়ে গিয়েছিল। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ গ্রন্থের সম্পাদক K.V. Sarma গ্রন্থের ভূমিকায় লগধকে ১১৮০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের ব্যক্তি বলেছেন। যাই হোক, লগধ প্রণীত বেদাঙ্গ জ্যোতিষ মূলত দুটি শাখায় বিভক্ত। একটি আর্চ বা ঋগ্‌বৈদিক জ্যোতিষ এবং দ্বিতীয়টি যাজুষ বা যজুর্বৈদিক জ্যোতিষ। *[পঠিতব্য Vedanga Jyotisa of Lagadha, Ed. K.V. Sarma, New Delhi : Indian National Science Academy, 1985]*

জ্যোতিষ্ক১ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। *[দ্র. জ্যোতিক]*

জ্যোতিষ্ক২ মেরু পর্বতের একটি শৃঙ্গ। বায়ু পুরাণের বর্ণনানুসারে মহাদেব পত্নী গঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে এই শৃঙ্গে অবস্থান করেন। নন্দীশ্বর শূল হাতে শিবের পাশে সেখানে বিরাজমান। আদিত্যগণ, সনৎকুমারগণ, দেবর্ষিগণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা প্রমুখরা এই স্থানে নিত্য মহাদেবের সেবা করেন। বিবিধপ্রকার রাক্ষস ও পিশাচগণ সহ শিবের অনুচরগণ এখানে মহাদেবের সেবা করেন। *[বায়ু পু. ৩০.৮১-৯২]*

জ্যোতিষ্ক৩ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে একজন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি ভীমের হাতে নিহত হন। *[মহা (k) ৯.২৬.৪,১৪; (হরি) ৯.২৪.৪,১৩]*

জ্যোতিষ্ক৪ *[দ্র. মেরু১]*

জ্যোতিষ্মতী হরিবর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি পবিত্র নদী। হেমকূট পর্বতের বর্চবান্ মতান্তরে শায়ন হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে মনস্বিনী (মতান্তরে সরস্বতী) ও জ্যোতিষ্মতী নামে দুটি নদী। জ্যোতিষ্মতী নদী পশ্চিম সাগরে পতিত হয়েছে।

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে বলা হয়েছে হরিবর্ষে গঙ্গা নদীই জ্যোতিষ্মতী নামে পরিচিত ছিল। *[মৎস্য পু. ১২১.৬৫; বায়ু পু. ৪৭.৬৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৮.৬৬; বিষ্ণুধর্মোত্তর পু. ১.২২.১১]*

জ্যোতিষ্টোম ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে একজন মৌনেয় গন্ধর্ব। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ২.৭.১১]*

জ্যোতিষ্মান্১ কশ্যপ প্রজাপতির ঔরসে দক্ষকন্যা দিতির গর্ভে উনপঞ্চাশ জন মরুৎ দেবতার জন্ম হয়। এই উনপঞ্চাশ জন দেবতা সাতটি গণে বিভক্ত ছিলেন। এর মধ্যে প্রথম গণের অন্তর্গত সাতজন দেবতার মধ্যে একজন ছিলেন জ্যোতিষ্মান্। *[বায়ু. পু. ৬৭.১২৩]*

জ্যোতিষ্মান্২ প্লক্ষদ্বীপের অন্তর্গত সাতটি বর্ষ পর্বতের মধ্যে অন্যতম। *[ভাগবত পু. ৫.২০.৪]*

জ্যোতিষ্মান্৩ পৌরাণিক কুশদ্বীপের অধিপতি। মৎস্য পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এঁর পরিচয় দিয়েছে স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র হিসেবে। তবে বায়ু পুরাণ ও বিষ্ণু পুরাণ মতে, তিনি স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র। স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রতের অন্যতম পুত্র জ্যোতিষ্মান্। প্রিয়ব্রত তাঁকে কুশদ্বীপের অধিপতি নিযুক্ত করেন। জ্যোতিষ্মানের সাতটি পুত্র সন্তান হয়। তিনি কুশদ্বীপকে সাতটি বর্ষে বিভক্ত করে এক এক পুত্রকে এক একটি বর্ষের রাজপদে অভিষিক্ত করেন। *[মৎস্য পু. ৯.৫; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৩.১০৪; ১.১৪.৯, ২৭-২৮; বায়ু পু. ৩১.১৮; ৩৩.৯,১২]*

জ্যোতিষ্মান্৪ ভৃগুবংশীয় একজন ঋষি। পুরাণ মতে ভবিষ্যৎ রোহিত মন্বন্তরে যাঁরা সপ্তর্ষি হবেন, জ্যোতিষ্মান্ তাঁদের মধ্যে একজন। *[বিষ্ণু পু. ৩.২.২৩; ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ৩.১.৬৩]*

ঝ

ঝর্ঝর বিষ্ণু পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে, দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের পুত্রদের মধ্যে ঝর্ঝর একজন।

[বিষ্ণু পু. (কাঞ্চীপুরম্) ১.২১.৩]

ঝষাক্ষ মহাভারতের Critical Edition-এ স্কন্দ কার্ত্তিকেয়ের অনুচর যোদ্ধাদের মধ্যে জনৈক ঝষাক্ষের নাম পাওয়া যায়। অবশ্য মহাভারতের অন্যান্য সংস্করণগুলিতে এই 'ঝষাক্ষ'-নামটির পরিবর্তে একাক্ষ, রথাক্ষ প্রভৃতি পাঠ পাওয়া যায়। তবে লক্ষণীয়, 'ঝষ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, মৎস্য বা মকর জাতীয় প্রাণী। স্কন্দ-কার্ত্তিকেয়ের এই অনুচরটির চোখ দুটির তেমন বিশিষ্ট আকৃতির কারণে তার এমন নামকরণ হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। *[মহা (Critical ed.) ৯.৪৪.৫৮]*

ঝল্ল একটি প্রাচীন ভারতীয় জনজাতি। মনুসংহিতায় ঝল্লদের ব্রাত্য ক্ষত্রিয় জাতির শ্রেণীভূক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহাভারতের সভাপর্বেও ঝল্ল জনজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় এঁরা ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করে সাতদিন ব্যাপী যুধিষ্ঠিরের সেবা করেছিলেন।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ শ্লোকে উল্লিখিত 'ঝল্ল' শব্দটির বঙ্গানুবাদ করতে গিয়ে 'বাহুযোদ্ধা' শব্দটি ব্যাবহার করেছেন। পরবর্তীকালে পণ্ডিত রামশরণ শর্মা ঝল্লদের রাজপুত জনজাতির একটি ব্রাত্য শাখা-সম্প্রদায় বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এক্ষেত্রেও ঝল্লদের মল্লযোদ্ধা বলেই বর্ণনা করা হয়েছে।

[মহা (k) ২.৪.৭; (হরি) ২.৪.৭; মনু সংহিতা ১০.২২; R.S. Sharma, Sudras In Ancient India, Delhi, Motilal Banarsidass, 1958, p. 206]

ঝিল্লিক একটি ভারতীয় জনজাতি তথা জাতির নামেই পরিচিত জনপদ। *[ব্রহ্মাণ্ড পু. (মহর্ষি) ১.১৬.৫২]*

□ পণ্ডিত K.C. Mishra -এর মতে, মহাভারতে উল্লিখিত কুন্তিক বা কর্ণিকা জনজাতিটির একটি শাখা ঝিল্লিক। রাজপুতদের মধ্যেকার মোট ছত্রিশটি শাখার মধ্যে একটির নাম 'ঝালা' (Jhala)। পণ্ডিতরা মনে করেন এই ঝালা-রাই প্রাচীনকালে ঝিল্লিক নামে পরিচিত ছিল। *[দ্র. ঝল্ল]*

[TIM (Mishra) p. 89]

ঞ

ঞ বাংলা বর্ণমালার দশম ব্যঞ্জনবর্ণ। শব্দের আদ্যক্ষররূপে পুরাণকোষে এর ব্যবহার নেই।

ট

টিট্টিভ জনৈক অসুর। যেসব বিশিষ্ট দৈত্য-দানব জলাধিপতি বরুণের সভায় বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন টিট্টিভ তাঁদের মধ্যে একজন। বরুণের সভায় আসন লাভ করেছিলেন বলেই তাঁকে বিশিষ্ট একজন দৈত্য বা দানব বলে মানতে হবে, কারণ মহাভারতে বা পুরাণে কোথাও এই টিট্টিভের কার্যকলাপের কোনো উল্লেখ মেলে না।
[মহা (k) ২.৯.১৫; (হরি) ২.৯.১৫]

ঠ

ঠ বাংলা বর্ণমালার দ্বাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ। শব্দের আদ্যক্ষররূপে পুরাণকোষে এর ব্যবহার নেই।

ড

ডমরুকেশ্বরতীর্থ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। পূর্বে এই স্থানে স্বয়ং শিব ডমরু বাজিয়েছিলেন, তাই এই তীর্থটি ডমরুকেশ্বর নামে খ্যাত হয়। এই তীর্থ দর্শন করলে ভক্ত ব্যাধিভয় থেকে মুক্ত হয়।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ২০.৮-১০]

ডম্বর তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে যখন দেবতারা তারকাসুরকে বধ করার জন্য স্কন্দ কার্ত্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন, সেই সময় ইন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট দেবতারা তাঁদের কয়েকটি বিশিষ্ট অনুচর যোদ্ধাকে তারকাসুর বধে সহায়তা করার জন্য অনুচর রূপে স্কন্দকে দান করেন। ধাতা তাঁর যে পাঁচজন বিশিষ্ট অনুচর স্কন্দকে দান করেছিলেন, ডম্বর তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

[মহা (k) ৯.৪৫.৩৯; (হরি) ৯.৪২.৩৭]

ডাকিনী অতিপ্রাচীন কাল থেকেই 'ডাকিনী' শব্দটা হীনজাতীয় এবং ক্ষতিকারক স্ত্রীলোকের পর্যায় শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মহাকাব্য-পুরাণে শিশুদের অপহরণকারী বা অনিষ্টসাধনকারী স্ত্রীলোক হিসেবে যে 'জাতহারিণী'র উল্লেখ মেলে, 'ডাকিনী'র সঙ্গে তার আকারে-প্রকারে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তবে 'ডাকিনী' শব্দটা সরাসরি কোথাও উল্লিখিত হয়নি। একমাত্র ভাগবত পুরাণে শিশুর অনিষ্টকারী হিসেবে 'ডাকিনী' শব্দের উল্লেখ মেলে। এদের ঠিক 'প্রেতিনী' বা 'রাক্ষসী' বা 'পিশাচী' বলা যায় না। অবশ্য রাক্ষসী বা পিশাচীর সঙ্গেও এদের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। কারণ এরা আকারে ভয়ংকর এবং মূলত ক্ষতিসাধন করাই এদের কাজ। ভাগবত পুরাণে দেখা যাচ্ছে, শিশু কৃষ্ণের সুরক্ষার জন্য জননী যশোদা বিভিন্ন অপদেবতা যাতে কৃষ্ণের কোনো ক্ষতি করতে না পারে, তার জন্য সুরক্ষার মন্ত্র পড়ছেন। সেই সময় 'ডাকিনী' শব্দটিও উল্লিখিত হতে দেখা যায়। ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে, ভগবান বিষ্ণুর নামে ভীত হয়ে ডাকিনীরা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

[ভাগবত পু. ১০.৬.২৭; ১০.৬৩.১০]

□ 'ডাকিনী' শব্দটি তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিচিত শব্দ। গবেষক উপেন্দ্রকুমার দাস জানাচ্ছেন—'সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই মত অনুসারে সশক্তিদেবারাধনা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তান্ত্রিক দেবমণ্ডলেই যত সব ভয়ঙ্করী দেবীদের দেখা পাওয়া যায়। বৌদ্ধ স্ত্রীদেবতাদের মর্য্যাদা অনুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এক—দেবী, দুই—শক্তি, তিন—ডাকিনী। দেবীদের আবার দুই শ্রেণী। এক শ্রেণীর দেবীরা বোধিসত্ত্বের সমপর্যায়ের, এঁরা সৌম্য। অন্য শ্রেণীর দেবীরা ধর্মপালের সমপর্যায়ের, এঁরা উগ্র। . . . ডাকিনীরা মর্য্যাদায় সব স্ত্রীদেবতাদের নীচে। সাধারণত দেখা যায়, এদের মূর্তি নৃত্যের ভঙ্গীতে দাঁড়ান। মূর্তিগুলি সৌম্য এবং উগ্র উভয়ই হতে পারে।

'ডাকিনী'রা বৌদ্ধদেবী হিসেবে নিম্নস্তরের তো বটেই, বোধ করি তৎকালীন ভারতবর্ষে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের কাছে বৌদ্ধরা নিন্দিত ছিলেন বলেই 'ডাকিনী' প্রায় ক্ষতিকারক অপদেবতার পর্যায় শব্দে পরিণত হয়েছে। এবং লক্ষণীয়, 'ডাকিনী' শব্দের এই হীন অর্থ বহনের ধারা কিন্তু এই আধুনিক যুগেও বর্তমান। 'ডাকিনী' থেকেই পরবর্তী সময়ে 'ডাইনী' শব্দের উৎপত্তি এবং সারা ভারতে প্রায় সমস্ত ভাষায় 'ডাকিনী' বা 'ডাইনী' শব্দটি ক্ষতিসাধনকারী স্ত্রীলোক অর্থে আজও ব্যবহৃত হচ্ছে।

[উপেন্দ্রকুমার দাস, ভারতীয় শক্তি সাধনা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩৪-১৩৫; Alice Getty, Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and progressive evolution through the Northern Buddhist Countries, London : Oxford Clarendon Press, 1914, p. 104]

ডিম্ভক মহাভারত ও পুরাণে বর্ণিত জরাসন্ধের অনুগামী একজন গুরুত্বপূর্ণ যোদ্ধা, কৃষ্ণ-জরাসন্ধ দ্বন্দ্বে ডিম্ভক এবং তাঁর ভাই হংস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

হংস ও ডিম্ভক জরাসন্ধের অন্যতম প্রধান সেনাপতিও বটে, সেনাপতি রূপে তাঁরা যথাক্রমে কৌশিক ও চিত্রসেন নামে পরিচিত, মহাভারতের সভাপর্বে বাসুদেব কৃষ্ণের বর্ণনা থেকে একথা জানা যায়। কৃষ্ণ স্বয়ং ডিম্ভককে মহাবীর বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে জরাসন্ধ এবং হংস ও ডিম্ভক যুদ্ধক্ষেত্রে একত্রিত হলে তাঁরা সম্মিলিত বলে ত্রিভুবন বিধ্বস্ত করতে সক্ষম। একথা জরাসন্ধের সমকালের সর্বজনবিদিত সত্য বলে কৃষ্ণের অভিমত। হংস ও ডিম্ভক একত্রে দেবতার মতো বলশালী এবং কোনো অস্ত্রের দ্বারা বধ্য নয়—

তস্য হ্যমরসঙ্কাশৌ বলেন বলিনাং বরৌ।
নামভ্যাং হংসডিম্ভকবশস্ত্রনিধনাবুভৌ॥

*[মহা (k) ২.১৪.১৬, ৩৬-৩৭; ২.২২.৩৩;
(হরি) ২.১৪.১৬,৩৬-৩৭; ২.২১.৩৩]*

□ হংস ও ডিম্ভক উভয়েই নীতিশাস্ত্রে এবং মন্ত্রণাবিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জরাসন্ধের সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রভাব বহুলাংশে এঁদের উপর নির্ভরশীল ছিল। কংসবধের পর জরাসন্ধ ও যাদব-বৃষ্ণিদের দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছিল। জরাসন্ধ তাঁর দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তির সঙ্গে কংসের বিবাহ দেন। অস্তিদেবীর প্ররোচনায় কংসহন্তা কৃষ্ণকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্যে জরাসন্ধ বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে মথুরা আক্রমণ করেন।

জরাসন্ধ মথুরা এসে পৌঁছানোর আগেই সদলবলে মথুরা আক্রমণ করতে উপস্থিত হন হংস ও ডিম্ভক। সেদিক থেকে বিচার করলে এই দুই জরাসন্ধ অনুগামীকে মগধের মূল সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী নেতা বলা যেতে পারে।

মহাভারতের সভাপর্বে হংস ও ডিম্ভকের বিনাশ সম্পর্কে কৃষ্ণ যে কাহিনীর বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে খানিক কূট কৌশল লুকিয়ে ছিল বলে মনে হয়।

কৃষ্ণ বলেছেন আঠার বারেরও বেশি হংসের সঙ্গে বলরামের যুদ্ধ হয়েছিল। বহুবার যুদ্ধের পর বলরাম হংসকে বধ করেছিলেন। হংসের মৃত্যু সংবাদ জনৈক ব্যক্তির মুখে শুনে ডিম্ভক শোকবিহ্বল হয়ে স্বেচ্ছায় যমুনার জলে নিমগ্ন হন। আত্মহননের সময় ডিম্ভক আর্ত চিৎকার করে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর পক্ষে হংসকে ছাড়া জীবনধারণ সম্ভব নয়—

হতো হংস ইতি প্রোক্তমথ কেনাপি ভারত।
তচ্ছ্রুত্বা ডিম্ভকো রাজন যমুনাম্ভস্যমজ্জত॥
বিনা হংসেন লোকে'স্মিন্ নাহং জীবিতুর্মুৎসহে।
ইত্যেতাং মতিমাস্থায় ডিম্ভকো নিধনং গতঃ॥

এরপরই কৃষ্ণকে বলতে দেখা যায় ডিম্ভকের আত্মহননের সংবাদে হংস শত্রুনগর বিজয় করা সত্ত্বেও শোকে যমুনা নদীতে ঝাঁপ দেন। এ থেকে বোঝা যায় বলরামের হাতে হংসের মৃত্যু ঘটেনি। ইতিপূর্বে হংসের যে মৃত্যু সংবাদটি ডিম্ভকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল সেটিও সঠিক নয়। সম্ভবত কৌশলে কৃষ্ণই এই কাজটি করেছিলেন। কারণ প্রবল পরাক্রমী এই দুই ভাইকে সংহার করতে না পারলে জরাসন্ধের ক্ষমতা খর্ব করা যাবে না।

পুরাণের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হংস ও ডিম্ভকের মৃত্যু সংবাদ শুনে জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণের পরিকল্পনা সাময়িকভাবে স্থগিত করে মাঝপথ থেকেই সসৈন্যে মগধে ফিরে যান।

*[মহা (k) ২.১৪.৩৮-৪৪; ২.১৯.২০, ২৪-২৫;
২.২০.১, ২.২২.৩৩ (হরি) ২.১৪.৩৮-৪৪;
২.১৮.২০, ২৪-২৫; ২.১৯.১; ২.২১.৩৩;
ভাগবত পু. ১০.৫০.১-৩, ৪৩; বিষ্ণু পু. ৫.২২.১-২]*

□ হংস ও ডিম্ভকের মৃত্যু সংবাদে ক্রুদ্ধ হয়ে জরাসন্ধ মগধের রাজধানী গিরিব্রজপুর থেকে কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে মথুরার দিকে একটি গদা নিক্ষেপ করেন। সেই গদাটি নিরানব্বই যোজন দূরত্ব অতিক্রম করে মথুরার নিকটবর্তী একটি স্থানে পতিত হয়। এই ঘটনার কারণেই মথুরা সংলগ্ন সেই স্থানটি গদাবসান নামে পরিচিত হয়।

[মহা (k) ২.১৯.২২-২৫; (হরি) ২.১৮.২০-২৩]

ঢ

ঢুণ্ঢেশ্বরতীর্থ অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থ। ভগবান শিব এই তীর্থে ঢুণ্ঢেশ্বর নামে লিঙ্গরূপে পুজিত হন। শিপ্রা নদীতে স্নান করে যে ভক্ত ঢুণ্ঢেশ্বর দর্শন করে, সে অশ্বমেধযজ্ঞ করার সমান ফল লাভ করে।

[স্কন্দ পু. (আবন্ত্য/অবন্তীক্ষেত্র) ২০.৭]

ণ

ণ বাংলা বর্ণমালার পঞ্চদশ ব্যঞ্জনবর্ণ। শব্দের আদ্যক্ষররূপে পুরাণকোষে এর ব্যবহার নেই।

মৌল গ্রন্থপঞ্জী

- *অগ্নিপুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৯৯
- *অগ্নিপুরাণ,* সম্পাদনা: হরি নারায়ণ আপটে, পুণা: আনন্দ্রম মুদ্রণালয়, ১৯০০
- *অথর্ববেদ সংহিতা ১-৪ খণ্ড,* সম্পাদনা: শঙ্কর পাণ্ডুরং পণ্ডিত, বারাণসী: কৃষ্ণদাস আকাদেমি, ১৯৮৯
- *অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ (শাঙ্করভাষ্য সহিত),* সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, কলকাতা: লোটাস লাইব্রেরী, ১৯০৪
- *অথর্ববেদীয় মাণ্ডুক্যোপনিষৎ,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, কলকাতা: লোটাস লাইব্রেরি, ১৩১৯ (১৯১৬)
- *অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, কলকাতা: লোটাস লাইব্রেরি, ১৩১৮ (১৯১৫)
- *অষ্টাধ্যায়ীসূত্রপাঠ,* সম্পাদনা: শঙ্কররামশাস্ত্রী, মাদ্রাজ: বাল মনোরমা মুদ্রণালয়, ১৯৩৭

- *আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র,* গণেশ শাস্ত্রী গোখলে সম্পাদিত: পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯১৭
- *আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী,* সম্পাদনা: বিনায়ক গণেশ আপটে, পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯৩৬

- *ঋক্ প্রাতিশাখ্যম,* সম্পাদনা: মঙ্গলদেব শাস্ত্রী, এলাহাবাদ: ইন্ডিয়ান প্রেস, ১৯৩১
- *ঋগ্‌বেদ সংহিতা প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড* (রমেশচন্দ্র দত্ত-এর অনুবাদ অবলম্বনে) সম্পাদনা: আব্দুল আজিজ আল আমান, কলকাতা: হরফ, আগস্ট ২০১

- *ঐতরেয় আরণ্যক, আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী,* সম্পাদনা: হরি নারায়ণ আপটে, পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৮৯৮
- *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী,* সম্পাদনা: হরি নারায়ণ আপটে ও কাশীনাথ শাস্ত্রী আগাশে, পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৮৯৬

- *কল্কিপুরাণ,* সম্পাদনা: শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র বেলুড়মঠ, ১৯৫৯
- *কালিকা পুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, কার্তিক ১৩৮৪ (১৯৭৭)
- *কূর্ম পুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৩৯৫ (১৯৮৮)
- *কৃষ্ণ যর্জুবেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষদ,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, কলকাতা: লোটাস লাইব্রেরি, ১৩২৯ (১৯২৬)
- *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র,* সম্পাদনা: রাধাগোবিন্দ বসাক, ১ম , ২য় খণ্ড, কলকাতা: ১৯৬৪

- *গরুড়পুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, জৈষ্ঠ্য ১৩৯২ (১৯৮৫)
- *গীতগোবিন্দ* (পূজারীগোস্বামীকৃত টীকাসহ) উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত: কলিকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির ১৯২৮
- *গোপথ ব্রাহ্মণ,* সম্পাদনা: বিজয়পাল বিদ্যাবারিধি, কলকাতা: সাবিত্রী দেবী বাগড়িয়া ট্রাস্ট ১৯৫০

- *চরকসংহিতা আদ্য খণ্ড-তৃতীয় খণ্ড,* সম্পাদনা: নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও বলাইচন্দ্র সেনগুপ্ত, কলকাতা: ধন্বন্তরি স্টীম প্রেস, ১৯০৬-১৯০৭
- *চৈতন্যচরিতামৃত,* রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত: কলিকাতা: ভক্তিগ্রন্থ প্রচার ভাণ্ডার, ১৩৫৫-১৩৬০ বঙ্গাব্দ (খ্রিস্টাব্দ ১৯৪৮-১৯৫৩)

- *ছান্দোগ্যোপনিষদ,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, কলকাতা: ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার, ১৩৩৩ (১৯২৬)

- জৈমিনীয় ন্যায়মালা মাধবাচার্য রচিত টীকা সহ, *আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী গ্রন্থ ২৪,* সম্পাদনা: গঙ্গাধর বাপুজি কালে পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রাণালয়, ১৯৪৬

- *তর্কসংগ্রহ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন শাস্ত্রী, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯২ (১৯৮৫)

- *দেবী পুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৪০০ (১৯৯৩)
- *দেবীভাগবত পুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, আষাঢ় ১৪০১ (১৯৯৪)

- *পদ্মপুরাণ (উত্তর খণ্ড),* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, মাঘ ১৪২০ (২০১৩)
- *পরাশর মাধবীয় (১ম খণ্ড, ২য় অংশ),* ??
- *পদ্মপুরাণ (ক্রিয়াযোগসার),* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স
- *পদ্মপুরাণ (পাতাল খণ্ড),* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, জ্যৈষ্ঠ ১৪০২ (১৯৯৫)
- *পদ্মপুরাণ (ব্রহ্ম খণ্ড),* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, রথযাত্রা ১৪১৬ (২০০৯)
- *পদ্মপুরাণ (ভূমি খণ্ড),* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৯৭ (১৯৯০)
- *পদ্মপুরাণ (সৃষ্টি খণ্ড),* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৪১২ (২০০৫)
- *পদ্মপুরাণ (স্বর্গ খণ্ড),* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, মাঘ ১৩৯৬ (১৯৮৯)
- *পাতঞ্জল দর্শন,* সম্পাদনা: হরিহরানন্দ আরণ্য, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৮ (ষষ্ঠ সংস্করণ)
- *পাতঞ্জল দর্শন,* সম্পাদনা: হরিহরানন্দ আরণ্য, ধর্মমেঘ প্রকাশ ব্রহ্মচারী কর্তৃক কপিলাশ্রম থেকে প্রকাশিত, হুগলী: ১৯২৫
- *পাতঞ্জলদর্শনম্,* বাচস্পতি মিশ্র কৃত তত্ত্ববৈশারদীটীকা সহ, দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত: কলকাতা: সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ (১৯৪৭)
- *পাতঞ্জল যোগদর্শন,* সম্পাদনা: হরিহরানন্দ আরণ্য, ধর্মমেঘ আরণ্য ও রায় যজ্ঞেশ্বর বাহাদুর, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮
- পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, *মেঘদূত পরিচয়,* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৩৬
- *পুরুষোত্তমদেবকৃত একাক্ষরকোষ,* Asiatic Society MS. No. G 5291 Fol. 1
- *প্রাণতোষিণী তন্ত্র,* সম্পাদনা: হেরম্বচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা: সমাচার সুধা বর্ষণ যন্ত্র, ১৮৫৬

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড,* সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৩
- *বরাহপুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৪০১ (১৯৯৪)

- *বশিষ্ঠ-সংহিতা,* সম্পাদনা: শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, আর্যশাস্ত্র, ১৩৬৯
- *বামনপুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৯৬ (১৯৮৯)
- *বায়ুপুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলিকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, আষাঢ় ১৩৯৭ (১৯৯০)
- *বায়ুপুরাণ,* সম্পাদনা: হরি নারায়ণ আপটে, পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯০৫
- বাসুদেবশরণ অগ্রবাল, *ভারত সাবিত্রী খণ্ড ১-৩,* দিল্লী: সৎসাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৫৭
- *বিষ্ণুপুরাণ (বিষ্ণুচিত্তি টীকাসহ),* সম্পাদনা: অণ্ণঙ্গরাচার্য, কাঞ্চীপুরম, গ্রন্থমালা কার্যালয়, ১৯৭২
- *বিষ্ণুপুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, অগ্রহায়ণ ১৪১৭ (২০১০)
- *বিষ্ণুধর্মত্তোর পুরাণ,* সম্পাদনা: ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস, দিল্লি, নাগ পাবলিশার্স, ২০০৯ (তৃতীয় সংস্করণ)
- *বৃহৎ তন্ত্রসার,* সম্পাদনা: রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়, অনু: চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার, নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৮২
- *বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১-৮ খণ্ড,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ, কলকাতা: লোটাস লাইব্রেরি, ১৩২২ (১৯১৯) - ১৩২৪ (১৯২১)
- *বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২য় খণ্ড,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ, কলকাতা: ক্ষীরোদ চন্দ্র মজুমদার, ১৩৪০ (১৯৩৩)
- *বৃহদ্ধর্মপুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা, নবভারত পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৯৬
- *বৃহন্নারদীয় পুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৯৬ (১৯৮৯)
- *বেতাল পঞ্চবিংশতি,* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কলকাতা: সংস্কৃত প্রেস, ১৮৫৮
- *বেদভাষ্যভূমিকাসংগ্রহ (সায়ণাচার্যকৃত টীকা সংগ্রহ),* সম্পাদনা: বলদেব উপাধ্যায়, কাশী সংস্কৃত সিরিজ নং ১০২, বারাণসী, ১৯৮৫
- *বেদান্তদর্শনম্,* সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, কলিকাতা: ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার, ১ম খণ্ড ১৯৬৯, (পূণর্মুদ্রণ), ২য় খণ্ড, ১৯৫১, ৩য় খণ্ড, ১৯৫৩
- *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ,* আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, খণ্ড ১-২, সম্পাদনা: বিনায়ক গণেশ আপটে, পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯৩৫
- *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ,* সম্পাদনা: জীবভট্টাচার্যন্যায়তীর্থ ও নিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ, কলকাতা, আর্যশাস্ত্র, বৈশাখ ১৩৯১-জৈষ্ঠ্য ১৩৯১ (১৯৮৪)
- *ব্রহ্মপুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, কার্ত্তিক ১৪০৯ (২০০২)
- *ব্রহ্মসূত্র,* আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, সম্পাদনা: হরি নারায়ণ আপটে, পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯১১
- *ব্রহ্মসূত্র,* আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, খণ্ড ১, সম্পাদনা: হরি নারায়ণ আপটে, পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৮২০
- *ব্রহ্মসূত্র,* আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, খণ্ড ২, সম্পাদনা: মহাদেব চিমণাজী আপটে, পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৮৯১
- *ব্রহ্মসূত্র সিদ্ধান্ত মুক্তাবলি,* আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, সম্পাদনা: বিনায়ক গণেশ আপটে, পুণা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯৪২
- *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৩৯৬ (১৯৮৯)
- *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ,* সম্পাদনা: হরি নারায়ণ আপটে, পুণা: আনন্দশ্রম মুদ্রণালয়, ১৮৯৫
- *ভবিষ্য পুরাণ,* সম্পাদনা: ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস, মুম্বই: বেঙ্কটেশ্বর স্টীম প্রেস, ১৯৫৯
- *ভাগবত পুরাণ ১-১২ খণ্ড,* সম্পাদনা: সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ, কলকাতা: সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত শিক্ষা সংসদ, ১৪০৩ (১৯৯৬)
- *মৎস্য পুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৩৯৫ (১৯৮৮)
- *মনুসংহিতা,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯৭ (১৯৯০)

- *মহাভারত, আদিপর্ব-খিলহরিবংশপর্ব,* সম্পাদনা: রামচন্দ্রশাস্ত্রী কিঞ্জাওয়াদেকর, পুণা: চিত্রশালা প্রেস, ১৯০৭-১৯৩৬; পুণর্মুদ্রণ: Oriental Books Reprint Corporation, New Delhi: 1979
- *মহাভারত, আদিপর্ব-ভীষ্মপর্ব,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য, কলকাতা: নটবর চক্রবর্তী, ১৮৩৭
- *মহাভারত, দ্রোণপর্ব-স্বর্গারোহণপর্ব,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য, কলকাতা: নুটবিহারি রায়, ১৮৮৩
- *মহাভারত, পঞ্চম খণ্ড শান্তিপর্ব,* সম্পাদনা: রামনারায়ণদত্ত শাস্ত্রী, গোরক্ষপুর: গীতাপ্রেস
- *মহাভারত ১-৪৩ খণ্ড,* হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য অনুদিত, কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৩৮৩-১৪০০ বঙ্গাব্দ (১৯৭৬-১৯৯৩)
- *মার্কণ্ডেয় পুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, আষাঢ় ১৩৯০ (১৯৮৩)
- *মৈত্রায়ণী-সংহিতা,* সম্পাদনা: দামোদরভট্ট সান্তবলেকর, ভারত: মুদ্রণালয়, ১৯৪১

- *যজুর্বেদীয় কঠোপনিষৎ,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, কলকাতা: লোটাস লাইব্রেরি, ১৩১৮ (১৯১৫)
- *যুক্তিদীপিকা,* যদুপতি ত্রিপাঠী শাস্ত্রী সম্পাদিত: কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০১

- *রামায়ণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, সংগ্রহ, অভিজিৎ শীল, কলকাতা: বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, আষাঢ় ১৪০৭ (২০০০)

- *লঘুভাগবতামৃত* (শ্রীরূপগোস্বামীকৃত), বলাইচাঁদ গোস্বামী এবং অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত: কলকাতা: সিমুলীয়া, মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী লেন, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ (১৮৯৭)
- *লিঙ্গপুরাণ,* অনুবাদ: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৩৯৬ (১৯৮৯)

- *শতপথ ব্রাহ্মণ,* Albrecht Weber সম্পাদিত, বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৯৭
- *শব্দকল্পদ্রুম ১-৫ খণ্ড,* রাধাকান্তদেব, দিল্লী: মোতিলাল বানারসীদাস, ২০০৯ (১৮৮৬)
- *শাংখ্যায়ণ ব্রাহ্মণ,* আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, সম্পাদনা: হরি নারায়ণ আপটে, পুনা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯১১
- *শিবপুরাণ,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, পরিদৃষ্ট, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৪১৬ (২০০৯)
- *শুক্ল-যজুর্বেদ বাজসনেয়িসংহিতা (মহিধরকৃত টীকা সহিত),* সম্পাদনা: জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলকাতা: গোবর্ধন পান, ১৯০৮
- *শুক্ল-যর্জুবেদীয় ঈশোপনিষৎ,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, কলকাতা: লোটাস লাইব্রেরি, ১৩১৮ (১৯১৫)
- *শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, শাঙ্করভায্যসমেত,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৫৪
- *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা,* স্বামী ভাবঘনানন্দ অনূদিত, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৮
- *শ্রীশ্রী চণ্ডী,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: ১৯২৬

- *ষড়বিংশব্রাহ্মণ, সায়নাচার্যকৃত টীকাসহ, খণ্ড ১-১২,* সম্পাদনা: রামচন্দ্র শর্মা, বেদার্থ প্রকাশন, তিরুপতি: কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ, ১৯৮৩

- *সঙ্গীতরত্নাকর (১ম, ২য় খণ্ড) আচার্য শার্ঙ্গদেব প্রণীত,* সম্পাদনা: বিনায়ক গণেশ আপ্টে, পুনা: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯৪২
- *সপ্তশতীসংগ্রহ (গাথা সপ্তশতী),* সম্পাদনা: রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী, নতুন দিল্লী: রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান, ২০১২

- সম্পাদনা: তারানাথ তর্কবাচস্পতি, *বাচস্পত্যম্,* খণ্ড ১, কলকাতা: ১৮৭৩
- সম্পাদনা: তারানাথ তর্কবাচস্পতি, *বাচস্পত্যম্, খণ্ড* ২-৬ (চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ), বেনারস: ১৯৬২
- *সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী,* সম্পাদনা: নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৪
- *সাংখ্যদর্শনম্,* ব্যাখ্যানুবাদ, কালীবর বেদান্ত বাগীশ, সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, কলকাতা: সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৯৫১
- *সামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ বা কেনোপনিষৎ,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, কলকাতা: লোটাস লাইব্রেরি, ১৩১৮ (১৯১৫)
- *সামবেদ সংহিতা,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: পরিতোষ ঠাকুর, কলকাতা: হরফ, আগস্ট ২০১১/ *অথর্ববেদ-সংহিতা,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: বিজনবিহারী গোস্বামী, কলকাতা: হরফ, আগস্ট ২০১১/ *যজুর্বেদ-সংহিতা,* শুক্ল ও কৃষ্ণ, অনুবাদ ও সম্পাদনা: বিজনবিহারী গোস্বামী, কলকাতা: হরফ, আগস্ট ২০১১
- *সুশ্রুতসংহিতা, খণ্ড ১-৪,* সম্পাদনা: মুরলীধর শর্মা, মুম্বই: বেঙ্কটেশ্বর স্টীম প্রেস, ১৮৩৩-১৯৫৩
- *সৌরপুরাণ,* সম্পাদনা: বিনায়ক গণেশ আপটে, আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯২৪
- *স্কন্দ পুরাণ ১-৭ খণ্ড,* সম্পাদনা: পঞ্চানন তর্করত্ন, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৩৯৭ (১৯৯০)
- *স্মৃতি সন্দর্ভ, ১ম-৫ম খণ্ড,* কলকাতা: ১৯৫২-১৯৫৫
- *হরিবংশ পুরাণ,* সম্পাদনা: সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ, কলকাতা: আর্যশাস্ত্র, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৮৪ (১৯৭৭)

- *Abhidharmakosam by Vasubandhu (Part-1),* Ed by Swami Dwarikadas Sashtri, Varanasi: Boudhha Bharati Series 7; 1972
- *Agnimahapuranam Vol. 1-2,* Ed. K.L Joshi, Delhi: Parimal Publications, 2010
- *Agnipurana,* Translated by N. Gangadharan, Ed by J.L. Shastri, Delhi: Motilal Banrasidass
- *Ahirbudhnya Samhita,* Ed. F. Otto Schrader, Madras: Adyar Library, 1916
- *Aitareya Aranyaka,* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text), Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Aitareya Brahman,* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text), Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Aitareyopanishad with Commentary of Shankaracharya in Anandashrama Sanskrit Series, Book 11,* Ed. Binayak Ganesh Apte, Poona: Anandashrama Press, 1931
- *Amarakośa Vol 1-3,* Ed. A.A. Ramanathan, Madras: The Adyar Library and Research Centre, 1971-1983
- *Amarakośa,* Ed. Raghunath Sastri Talekar, Bombay: Government Central Book Depot, 1907
- *An English Translation of the Sushruta Samhita, Vol 1-3,* Ed. Kaviraj Kunjalal Bhihsagratna, Calcutta: 1907-1916
- *Atharvaveda Samhita,* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection, (refer to as Maharshi in the text); Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Atharva-veda Saṃhitā, Vol 1-2, Harvard Oriental Series Vol 8,* Translated by W.D. Whitney, Ed. Charles Rockwell Lanman, Cambridge: Harvard University Press, 1905
- *Atharvaveda,* Maurice Bloomfield, K.J. Trübner, 1899
- *Atharva-Veda-Samhita,* Ed. R. Roth and W.D. Whitney, Berlin: Fred. Dummler's Verbagsbuchhaudlung, 1856

- *Athrvadveda Samhita, Vol 1-2,* Sriram Sharma Acharya, Haridwar: Brahmabarchas, 2002
- *Baudhāyana Dharma Sūtra,* Ed. by A. Chinnaswami Shastri, Benaras: Chowkhamba Sanskrit Series, 1934
- *Baudhāyana Śrauta Sūtra ,Vol 1-3,* Ed. W.Caland, Calcutta: Asiatic Society, 1904-1913
- *Bhagavata Purana Book 1-12,* Ed. Krishnashankar Shastri,Shrimadbhagavata Vidyapith, Ahmedabad: 1965-1975
- *Bharata-Savitri Vol-1-3,* Vasudev Sharan Agrawala, New Delhi: Satsahitya Prakashan, 1957-196
- *Bhava Prakash Nighantu,* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text); Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Brahma-Sutras,* Ed. Vireswarananda, Almora: Advaita Ashrama, 1936
- *Brihadaranyaka- Upanishad, Part 1,* Translated by Sris Chandra Vasu in the Sacred Books of the Hindus Vol 14, General Editor B.D.Basu, Allahabad: Indian Press 1913
- *Brihadaranyakopanishad with Commentary of Anandagiri, Vol 1-3, in Anandashrama Sanskrit Series Book 16,* Ed. Mahadeb Chimnaji Apte, Poona: Anandashrama Press, 1891-1893
- *Brihaspati Sutra,* Ed. F.W.Thomas, Lahore: Punjab Sanskrit Series, 1921
- *Buddhacharita of Asvaghosha,* Translated and Ed. by E.H. Johnston, University of Punjab, Lahore: Calcutta Baptist Mission Press, 1933
- *Buddha-charitam,* Ed. Nandargikar, Poona: Aryabhushan Press, 1911
- *Buddhist Suttas,* Translated by T.W. Rhys Davids in the *Sacred Books of the East Vol 11,* Ed. F. Max Muller, Oxford: 1881
- *Chandogyopanishad with Commentary of Shankaracharya in Anandashrama Sanskrit Series Book 14,* Ed. Binayak Ganesh Apte, Poona: Anandashrama Press, 1934
- *Charakasamhita by Agniveśa,* Ed. Vaidya Yadavji Trikamji Acharya, Bombay: Nirnaya-Sagar Press, 1935
- *Chhandogya Aranyaka,* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text); Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Chhandogya Brahmana,* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text), Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Chhandogyopanishad with Commentary of Ramanuja in Anandashrama Sanskrit Series Book 63,* Ed. Binayak Ganesh Apte, Poona: Anandashrama Press, 1910
- *Dharmasūtras : The Law Codes of Āpastamba Gautama Baudhāyana and Vasiṣṭha, Annoted Text and Translation* by Patrick Olivelle, Delhi: Motilal Banarsidass, 2000
- *Dhvanyaloka of Anandavardhana,* Ed. K. Krishnamoorthy, Dharwar: Karnatak University, 1974
- *Durga Saptasati,* Translated by F.E Pargiter, Delhi: Bharatiya Kala Prakashan, 2012

- Ed. B.D. Basu, *The Sacred Books of the Hindus (the Sukraniti) Vol 13,* Allahabad: 1914
- Ed. Bhimacharya, *Nyāyakośa (Vol 1),* Bombay: Nirnaya-Sagara Press,1928
- Ed. Bimalacarya Jhalakikar, *Nyāyakośa* , Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1928
- Ed. by F. Max Muller, *The Sacred Books of the East Vol 19,* 27, Oxford: 1883,1885
- Ed. F. Max Muller, *Buddhist Mahāyāna Texts,* Part 1-2 in The Sacred Books of the East Vol-49, Oxford: 1985-1894
- Ed. F. Max Muller, *The Sacred Books of the East Vol-43-44,* Oxford: 1897-1900
- Ed. F. Max Muller, *The Sacred Books of the East: The Satapatha Brahmana* (translated by Julius Eggling) Part1-5, Vol.12,26,43,44; Delhi: Motilal Banarasidass Publishers Pvt. Ltd, 2011(First published by Clarendon Press, 1885)
- Ed. K.V. Rangaswami, *Aiyangar Kṛtyakalpataru of Bhatta Laksmidhara,* Baroda: Oriental Institute, 1942
- Ed. S.R Sehgal, *Shankhayana Grihyasutram,* Delhi: Satguru Publications, 1987
- Ed. Stella Kamrisch, *The Vishnudharmottar Purana,* Calcutta: Calcutta University Press, 1928
- *Gobhilagṛhyasūtram, with Commentary of Bhaṭṭanārāyana,* Ed. Chintamani Bhattacharya, New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, 1936
- *Gopatha Brahmana;* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text), Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Haracaritacintāmaṇi* by Bopadeva with a Commentary of Madhusudana Saraswati and Srimad Bhagavata (First Sloka) with Paramhamsapriya Commentary, Ed. Devi Datta Upadhyaya, Benaras: Chowkhamba Sanskrit Series, 1933
- *Harita Samhita,* Ed by Jibananda Vidyasagara, Calcutta: Siddheswar,1894
- *Hiranyakesigrihyasutra,* Maharishi University of Management, Vedic Literature Collection
- *Hymns of the Athava-Veda,* Translated by Maurice Bloomfield in *The Sacred Books of the East Vol-42,* Ed. F. Max Muller, Oxford: 1897
- *Isavasya Upanishad in Anandashrama Sanskrit Series Book 5,* Ed. Hari Narayan Apte, Poona: Anandashrama Press, 1905
- *Jaimini Talavakara Brahmana,* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text); Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Jaiminiya Aranyaka;* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text); Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Jaiminiya Nyāya Mālā Vistara with Commentary of Madhvacharya,* Ed. Theodor Goldstucker, London: Trubner & Co. 1865
- *Jaina Sutra Part 1,* Translated by Hermann Jacobi in *The Sacred Books of the East Vol- 22,* Ed. F. Max Muller, Delhi: Motilal Banarsidass, 1980

- *Jaina Sutras, Part 2,* Translated by Hermann Jacobi in *The Sacred Books of the East Vol- 45,* Ed. F. Max Muller, Oxford: 1895
- *Jataka* No. 484, In the Jataka, E.B.Cowell, New Delhi: Cosmo Publications, 1978
- *Jayadeva's Gitagovinda,* Ed Barbara Stoler Miller, Delhi: Motilal Banarsidass, 1984
- *Jīva Vicāra Prakaraṇam with Pathaka Ratnakara's Commentary,* Ed. Ratna-Prabha Vijaya, Ahmedabad: Sri Jaina Siddhanta Society, 1950

- K.S. Ramaswami Sastri, *The Dharmasastras and The Dharmasastras,* Tirupati: Tirumala-Tirupati Devasthanams Press; 1952
- *Kalhana's Rājatarañginī : A Chronicles of the Kings of Kashmir Vol.1, Book 1-7,* Ed. by M.A Stein, Westminster; 1900
- *Kalhana's Rājatarañginī : A Chronicles of the Kings of Kashmir Vol 2,* Ed. by M.A Stein, Bombay: Education Society Press, 1892
- *Kalhana's Rājatarañginī, Vol 2,* Ed. by M.A Stein, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. 1900 (first edition)
- *Kālidāsa: Abhijñāna – Śakuntalam,* Ed. Ramendra Mohan Bose, Calcutta: Modern Book Agency Pvt. Ltd. 1950
- *Kalkipurāṇam, in Sarasvati Bhavana Granthamala,* Ed. Asoke Chatterjee Sastri, Varanasi: 1972
- *Kamandakiya Nitisara,* Ed. By Manmatha Natha Dutt, Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1979
- *Kapiṣṭhala Kaṭha Saṃhitā,* Ed. Raghu Vira, Lahore: Sanskrit Book Depot, 1932
- *Kāśikā: A Commentary on Panini's Grammatical Aphorism,* by Jayaditya, Ed. Bala Sastri, Benares: 1876
- *Katyayana Srautasutra (Vol-1,2),* Ed by G.U. Thite, Delhi: New Bharatiya Book Corporation; 2006
- *Kathaka Brahman,* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text), Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Kathaka Samhita,* Ed. Leopold von Schroeder, Leipzig: In Commission Bei F.A.Brockhaus, 1900
- *Kathakopanishad with Commentary of Shankaracharya in Anandashrama Sanskrit Series Book 7,* Ed. Vinayak Ganesh Apte, Poona: Anandashrama Press, 1935
- *Kathasaritsagara,* Ed. Durgaprasad and Kashinath Pandurang Parab, Bombay: Nirnaya-Sagar Press, 1893
- *Kātyāyana Śrautasutrawith a Commentary of Karkacharya,* Ed. Madanmohan Pathak, Benaras: Chowkhamba Sanskrit Book Depot, 1903
- *Kaula and other Upanishads in Tantrik Texts (Vol 11),* Ed. Sitarama Sastri, General Ed. Arthur Avalon, Calcutta: Agamanusandhana Samiti, 1922
- *Kautiliya Arthashastra,* Ed. Vishvanath Shastri Datara, Varanasi: Sampurnanand Sanskrit University, 1991
- *Kautilya's Arthasastra,* Ed. R. Shamasastry, Bangalore: The Govt Printing Press, 1915
- *Kautilya's Arthasastra,* Ed. R. Shamasastry, Mysore: Sri Raghuveer Printing Press, 1951

- *Kavikanthadharana,* In Minor Works of Ksemendra, Ed by E.V.V. Raghavacharya, Hyderabad: Osmania University, 1961
- *Kaushitaki Brahmana,* Ed by B.Lindner, Jena: Hermann Costenoble, 1887
- *Kenopanishad with Commentary of Shankaracharya in Anandashrama Sanskrit Series Book 6,* Ed. Hari Narayan Apte, Poona: Anandashrama Press,1909
- *Krishnayajurvedia Taittiriya Samhita , Vol 1-2,* Ed. Vinayak Ganesh Apte, Poona: Anandashrama Press, 1940
- *Krishnayajurvedia Taittiriya Samhita, Vol 1-8,* Ed. Mahadev Chimnaji Apte, Poona: Anandashrama Press, 1947-1949

- *Lalitopakhyana (from the Uttarakhanda of Brahmandapurana;* Ed. T.N.K. Tirumulpad, Bombay: Nirnaya-Sagar Press, 1918
- *Linga Mahapurana (Translated by Shanti Lal Nagar) Vol. 1-2,* Delhi: Parimal Publications, 2011

- *Mahabharata (Based on South Indian Texts) Asvamedhikparva,* Ed. T.R. Krishnacharya and T.R. Vyasacharya, Bombay: Nirnaya-Sagar Press, 1910
- *Mahabharata (Based on South Indian Texts) Karnaparva,* Ed. T.R. Krishnacharya and T.R. Vyasacharya, Bombay: Nirnaya-Sagar Press, 1907
- *Mahabharata (Based on South Indian Texts) Udyogaparva,* Ed. T.R. Krishnacharya and T.R. Vyasacharya, Bombay: Nirnaya-Sagar Press, 1907
- *Mahabharata (Based on South Indian Texts) Vanaparva,* Ed. T.R. Krishnacharya and T.R. Vyasacharya, Bombay: Nirnaya-Sagar Press, 1908
- *Mahabharata (Based on South Indian Texts) Adiparva,* Ed. T.R. Krishnacharya and T.R. Vyasacharya, Bombay: Nirnaya-Sagar Press, 1906
- *Mahabharata (Translation according to M.N Dutt) Vol 1-9,* Delhi: Parimal Publications, 2008
- *Maitrāyani Samhitā,* Ed by Dr. Leopold Von Schroeder, Leipzig, In Commission Bei F.A. Brockhaus; 1886
- *Maitrāyani Samhitā,* Ed. Leopold Von Schroeder, Leipzig, 1881
- *Maitrāyani Samhitā,* Ed. Satvalekar and P. Shripada Damodara, Satara: Bharatmudranalaya, 1941
- *Maitrāyani Samhitā,* Vol 3-4, Ed. Leopold Von Schroeder; Leipzig; 1923
- *Maitrayaniya Aranyaka,* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text); Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Malatimadhavam (by Bhavabhuti),* Ed by M.R. Telanga; Bombay: Nirnaya Sagara Press; 1926
- *Mānava Dharma Śāstra,* Ed. Vishvanath Narayan Mandlik, Bombay: Ganpat Krishnaji's Press, 1886
- *Manava-Srauta-Sutra Vol-1-5,* Ed. Friedrich Knauer, ST-Petersbourg: 1900
- *Mandukyopanishad with Commentary of Shankaracharya in Anandashrama Sanskrit Series Book 10,* Ed. Binayak Ganesh Apte, Poona: Anandashrama Press, 1921

- *Manu Smriti,* Ed. By Ganganath Jha, Calcutta: Asiatic Society, B.I. no. 256, 1939
- *Medini by Medinicara,* Ed. Somanatha Mukhopadhyaya, Calcutta, 1869
- *Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary,* Motilal Banarsidass, New Delhi: 2004 (First Edition: Oxford: Clarendon Press, 1872)
- *Muṇḍaka Upanisad,* Ed. Sirsa Chandra Vasu in the *Sacred Books of the Hindus Vol 1,* General Editor B.D.Basu, Allahabad: 1909
- *Mudrakshasa by Visakhadatta,* Ed by K.T. Telang, Bombay, Nirnaya Sagara Press, 1915
- *Mundakopanishad with Commentary of Shankaracharya in Anandashrama Sanskrit Series Book 9,* Ed. Binayak Ganesh Apte, Poona: Anandashrama Press, 1935

- *Nāradīya Dharma Śāstra,* ed. Julius Jolly, London: Turbner & Co, 1876
- *Narasimha Purana,* Ed and Translated by K.L.Joshi and Bindiya Trivedi, Delhi: Parimal Publications, 2013
- *Nārāyaṇīya of Narayana Bhatta with the Commentary Bhaktapriya of Desamangalavarya,* Ed. T. Ganapati Sastri, Trivandrum: 1912
- *Nāṭyadarpaṇa,* G.K. Shigondekar and Gajanan Kushaba, Baroda: Oriental Institute, 1929
- *Natyasastra of Bharata Muni,* Ed. Sivadatta and Kasinath Pandurang Parab, Bombay: Nirnaya Sagara Press, 1894
- *Natyasastra of Bharatamuni Vol 1-3,* Ed. M. Ramkrishna Kavi, Baroda: Oriental Institute, 1934-1956
- *Nirukta by Maharshi Yaskacharya Vol-1-4, With a Commentary* by Bhagwat Durgacharya, Calcutta: 1952- 1953
- *Nitiprakashika,* Ed. T. Chandrasekharan, Madras: Govt. Press, 1953
- *Nitiprakasika,* Ed. by Gustav Oppert, New Delhi: Kumar Brothers, 1970 (1882)
- *Nrisimhapurvottaratapaniyopanishad with Commentary of Shankaracharya in Anandashrama Sanskrit Series Book 30,* Ed. Binayak Ganesh Apte, Poona: Anandrashrama Press, 1929

- *Padmapurana Vol 1-5,* Ed. Mahadev Chimanaji Apte, Anandrasrm Sanskrit Series: 1894
- *Pañcaviṃśa Brāhmana,* Translated by W. Caland, Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1931
- *Paraskaragrihyasutra,* Maharishi University of Management, Vedic Literature Collection
- *Paraskara Grhyasutra with the commentaries of Karka,* Jayarama, Harihara and Gadadhara, Ed by M.G. Bakre, New Delhi: Munshiram Monoharlal Publishers Pvt Ltd, 1982
- *Patanjali's Yoga Sutras,* Translated by Rama Prasada in the *Sacred Books of the Hindus Vol 4,* General Editor: B.D.Basu, Allahabad: 1924
- *Prakaranapancika by Shalikhnath Mishra,* Ed by A. Subrahnmanyan Sastri, Kasi: Benaras Hindu University Press, 1961

- *Politics of Aristotle,* Trans. By E. Barker, Oxford University Press, 1952
- *Prasnopanishad with Commentary of Shankaracharya in Anandashrama Sanskrit Series,* Ed. Hari Narayan Apte, Poona: Anandashrama Press, 1911
- *Prasnopanishad with Commentary of Shankaracharya in Anandashrama Sanskrit Series Book 8;* Ed. Binayak Ganesh Apte, Poona: Anandashrama Press, 1932
- *Ratnavali of Shri Harsha,* Ed by Ashokanath Bhattacharya, Calcutta: Modern Book Agency, 1939
- *Ṛgveda Brahmanas: The Aitareya and Kausitaki Brahmanas,* Translated by A.B. Keith, Cambridge: Harvard University Press, 1920
- *Ṛgveda Saṃhitā with the commentary of Sayanacharya Vol1-10,* Ed. N.S. Sontakke & C.G. Kashikar, Poona: Vedic Research Institute, 1933-1979
- *Richard Garbe, Samkhya-Sutra-vritti or Aniruddha's commentary and the original parts of Vedantin Mahadeva's commentary to Samkhya Sutras,* Calcutta: J.W. Thomas, Baptist Mission Press, 1988
- *Rig-Veda-Samhita The Sacred Hymns of the Brahamans together with the Commentary of Sayanacarya, Vol 1-4,* Ed. F. Max Muller, London: Oxford University Press, 1890-92
- Sanātana Dharma, *An Advanced Text Book of Hindu Religion and Ethics,* Benares: The Board of Trustees, 1903
- *Śāñkhayana Śrauta Sūtra, Together with the Commentary of Varadattasuta Ānartiya, Vol 2,* Ed. Alfred Hillebrandt, Calcutta: The Baptist Mission Press, 1891
- *Śāñkhayana Śrauta Sūtra, Together with the Commentary of Varadattasuta Ānartiya, Vol 2,* Ed. Alfred Hillebrandt, Calcutta: The Baptist Mission Press, 1891
- *Śāñkhayana Śrauta Sūtra, Together with the Commentary of Varadattasuta Ānartiya, Vol 3,* Ed. Alfred Hillebrandt, Calcutta: The Asiatic Society of Bengal, 1897
- *Śāñkhayana Śrauta Sūtra, translated in English* by W. Caland, Ed. Lokesh Chandra, Nagpur: The International Academy of Indian Culture, 1953
- *Sankhyayana Aranyaka;* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (referred to as Maharshi in the text); Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Saptapadarthi by Sivaditya,* Ed by Amarendra Mohan Tarkatirtha and Narendra Chandra Vedantatirtha, Calcutta Sanskrit Series No. 8, Calcutta: Metropolitan Printing and Publishing House Ltd, 1934
- *Sarada-Tilaka Tantram,* Ed. Arthur Avalon, Delhi: Motilal Banarsidass,1982
- *Sarbadarshanakaumudi,* Ed by K. Sambasiva Sastri, Publd. Under the Authority of the Govt of His Highness Maharaja of Travancore, Trivandram: 1938
- *Sarvadarshanasamgraha with Commentary of Madhavacharya,* Ed. by Vinayak Ganesh Apte, *Anandashram Sanskrit Series Vol. 81,* Poona: Anandashram Press, 1950
- *Śatapatha Brāhmana , Part 1-3,* Translated by Julius Eggeling in *The Sacred Books of the East Vol- 12,* Ed. F. Max Muller; Delhi: Motilal Banarsidass; 1963

- *Śatapatha Brāhmana , Part 2,* Translated by Julius Eggeling in *The Sacred Books of the East Vol- 26,* Ed. F. Max Muller, Oxford: 1885
- *Shadvimsha Brahman,* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text); Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- Shankaracharya Bhagavatapada, *The Vivekacudamani,* Ed. John Grimes,
- *Shvetashvatara Upanishad in Anandashrama Sanskrit Series Book 17,* Ed. Vinayak Ganesh Apte, Poona: Anandashrama Press, 1927
- *Śrī Lalitā Sahasranāma,* D.S.Sharma, Madras: The Madras Law Journal Office, 1961
- *Sribhasya of Ramanujacharya Vol 1,* Translated by M. Rangacharya and M.B.V. Aiyangar, Madras: Educational Publication Company, 1961-65
- *Srimadbhagavadgita with the Commentaries,* Ed. Vasudev Laxman Shastri Pansikar, Bombay: Nirnaya Sagara Press, 1912
- *Srngaramanjari of Akbar Shah,* Ed. V. Raghavan, Madras: Hyderabad Govt. 1951
- *Sukranitisara,* Ed. By Gustav Opert, Madras, Government Press, 1882
- *Śukra Nīti Sāra Part 1-2,* Translated by Benoy Kumar Sarkar in the *Sacred Books of the Hindus Vol 13,* General Editor B.D.Basu, Allahabad: 1913
- *Sukra Niti Sara,* Ed by Jivananda Vidyasagar, Calcutta: Narayana, 1890
- *Sushrutasamhita,* Ed. Khemraj Shrikrishnadasshresthi, Bombay: Shri Venkateshvara Steam Press, 1911
- *Sushrutasamhita,* Ed by Jadavji Trikumji Acharya, Bombay: Ayurvediya Granthamala, 1915

- *Taittiriya Aranyaka with the Commentary of Bhattabhaskara Misra Vol 1-2,* Ed. Mahadeva Sastri, and K. Rangacharya, Mysore: Government Branch Press, 1900
- *Taittiriya Aranyaka, Vol 1,* Ed. Hari Narayan Apte, Poona: Anandashrama Press, 1898
- *Taittiriya Aranyaka, Vol 2,* Ed. Vinayak Ganesh Apte, Poona: Anandashrama Press, 1927
- *Taittiriya Aranyaka:* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text); Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Taittiriya Brahman,* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text); Link: http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Taittiriya Samhita, Vol 1-6,* Ed. Richard Garbe, Calcutta: Asiatic Society, 1882-1889
- *Taittiriyopanishad with Commentary of Shankaracharya in Anandashrama Sanskrit Series Book 12,* Ed. Mahadeb Chimnaji Apte, Poona: Anandrashrama Press, 1889
- *Taittiriyopanishad with Commentary of Sureswaracharya in Anandashrama Sanskrit Series Book 13,* Ed. Hari Narayan Apte, Poona: Anandrashrama Press, 1911
- *Tandyamahabrahmana,* Ed: A. Chinnaswami Sastri, Banaras: The Chowkhamba Sanskrit Series Office,1936
- *Tāṇḍyamahābrāhmaṇa with Commentary of Sayana Acharya Vol 1-2;* Ed. Anandachandra Vedantavagisa, Calcutta: The New Sunskrit Press, 1870
- *Tāṇḍyamahābrāhmaṇa, belonging to the Sama Veda with the Commentary of*

Sayanacharya Part 1-2, Ed. A. Chinnaswami Sastri, Benares: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1935-36

- *Tarkabhasa* by Kesava Mishra, Ed by S.R. Iyer, Varanasi: Chaukhambha Orientalia, Gokuldas Sanskrit Series No. 36, 1979
- *Tarka-Sangraha of Anna Bhatta,* Ed and Translated by Jibananda Vidyasagara, Calcutta: Sarasudhanidhi Press, 1872
- *Tarka-Sangraha of Anna Bhatta,* Ed and Translated by Y.V. Athaye, Bombay: Bombay Sanskrit Series, 1918
- *The Aitareya Aranyaka,* by A.B Keith, Oxford: Clarendon Press, 1909
- *The Aitareya Brahmana Vol 1,* Ed. Acarya Satyavrata Samarsrami, Calcutta: The Asiatic Society of Bengal, 1895
- *The Aitareya Brahmana Vol 1,* Ed.R.Anantakrishna Sastri, Trivandrum: University of Travancore, 1942
- *The Aitareya Brahmana Vol 1-2,* Ed. Martin Haug, London: Turbner & Co. 1863
- *The Aitareya Brahmana Vol 2,* Ed. Acarya Satyavrata Samarsrami, Calcutta: The Asiatic Society of Bengal, 1896
- *The Aitareya Brahmana Vol 3,* Ed. Acarya Satyavrata Samarsrami, Calcutta: The Asiatic Society of Bengal, 1890
- *The Aitareya Brahmana Vol 4,* Ed. Acarya Satyavrata Samarsrami, Calcutta: The Asiatic Society of Bengal, 1906
- *The Aitareya Brahmanam with the Bhashya of Shrimat Sayanacharya,* Ed. Kasinath Sastry Agase, Poona: Anandashrama Press, 1896
- *The Anguttara-Nikaya, Part 1-5,* Ed. Richard Morris, London: The Pali Text Society, 1885-1900
- *The Arthashastra of Kautilya,* Trans. & Ed. By Dr. Radhagovinda Basak, Calcutta: General Printers and Publishers Pvt. Limited, 1967
- *The Atharvaveda,* M. Bloomfield, Strassburg: Verlag Von Karl J. Trubner, 1899
- *The Bhagavad-Gita with Eleven Commentaries,* Ed. Shastri Gajanana Shambhu Sadhale, Bombay: Gujarati Printing Press, 1935
- *The Bhagavadgita with the Sanatsujatiya and the Anugita,* Translated by Kashinath Trimbak Telang in the *Sacred Books of the East Vol 8,* Ed. E. Max Muller, Oxford: 1882
- *The Bhagavad Gita,* A Text and Commentary for Students, Ed by J.D Fowler, Sussex: Sussex Academic Press, 2011
- *The Brahmanda Purana,* (Translated and annotated by Ganesh Vasudeo Tagare); *Ancient Indian Tradition & Mythology* (Ed: J.L. Saastri), Delhi: Motilal Banarsidass, 1999
- *The Brahmasūtra Śāṅkara Bhāṣya with the Commentaries of Bhamati, Kalpataru and Parimala,* Ed. Anantkrisna Sastri, Bombay: Nirnaya Sagara Press, 1938
- *The Bṛhaddevatā attributed to Śaunaka (Part 1) in the Harvard Oriental Series Vol 5,* Ed by A.A. Macdonell, General Ed. C.R. Lanman, The Harvard University Press, 1904
- *The Gitagovinda by Jayadeva Goswami,* Ed. Jibananda Vidyasagara, Calcutta: Sanskrit College, 1882

- *The Gopatha Brahmana,* Ed. Rajendralala Mitra and Harachandra Vidyabhusana; Calcutta: The Ganesa Press, 1872
- *The Great Liberation (Mahânirvâna Tantra),* Translated by Arthur Avalon, Madras, Ganesh & Co. 1953
- *The Grihya Sutra Part 2,* Translated by Hermann Oldenberg in *The Sacred Books of the East Vol- 30,* Ed. F. Max Muller, Delhi: Motilal Banarsidass, 1964
- *The Grihya Sutra, Part 1,* Translated by Hermann Oldenberg in *The Sacred Books of the East Vol- 29;* Ed. F. Max Muller, Oxford: 1886
- *The Haracharitachintamani, of Rajanaka Jayaratha,* Ed. Sivadatta, Bombay: Nirnaya-Sagar Press, 1897
- *The Hitopadesa Of Narayana Pandit,* Ed by Narayana Balkrishna Godbole and K.P. Parab, Bombay: Nirnaya Sagara Press, 1904
- *The Hymns of Rigveda Vol.1-2,* Ed. F. Max Muller, London: Trubner & Co. 1877
- *The Institutes of Vishnu (Vishnusmriti),* Translated by Julias Jolly, Delhi: Motilal Banarsidass, 1970
- *The Jaimini Bharata, Daniel Sanderson,* Bangalore: Wesleyan Mission Press, 1852
- *The Jaiminiya or Talavakara Upanishad Brahmana in Journal of the American Oriental Society Vol 16,* Ed. Hanns Oertel, 1896
- *The Kamasutra of Vatsayayana,* Trans and Ed by Richard Burton, Benaras & New York: Hindu Kamasastra Society, 1883-1925
- *The Kamsavadha of Serakrisna,* Ed. Durgaprasada, Kasinath Pandurang Parab, Bombay: Nirnaya-Sagar Press, 1935
- *The Kamasutra* by Vatsyana Muni, Ed by Goswami Damodar Shastri, Benaras: Vidya Vilas Press, 1929
- *The Kasika Vivarana Panjika, Vol 2, Part 1 (The Naya) A Commentary on Vamana-Jayaditya's Kasika,* Translated by Jinendra Buddhi, Ed. Sris Chandra Chakravarti, Rajshahi: Barendra Research Society, 1925
- *The KautiLiya ArthaShastra,* Ed. R. P.Kangle, Delhi, Motilal Banarsidass, 1969
- *The Kavyadarsa of Sri Dandin,* Ed by Premachandra Tarkabagisa, Calcutta: Baptist Mission Press, 1863
- *The Kūrma Purāṇa in Ancient Indian Tradition and Mythology Vol 20-21,* Translated and Annotated by Ganesh Vasudeo Tagare, General Ed. J.L.Shastri, Delhi: Motilal Banarsidass,1981-1982
- *The Laws of Manu,* Translated by G. Buhler in *The Sacred Books of the East Vol-25,* Ed. F. Max Muller; Oxford: 1886
- *The Mahabharata Critical Edition (Adiparva),* V.S. Sukthankar, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1933
- *The Mahabharata Critical Edition (Anusasanaparva),* V.S. Sukthankar, S.K Belvalkar, P.L Vaidya and R.N Dandekar, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1966
- *The Mahabharata Critical Edition (Aranyakaparva),* V.S. Sukthankar, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1942
- *The Mahabharata Critical Edition (Asramavasikaparva),* V.S. Sukthankar and S.K Belvalkar, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1959

- *The Mahabharata Critical Edition (Asvamedhikparva),* V.S. Sukthankar, S.K Belvalkar, Raghunath Damodar Karmakar, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1960
- *The Mahabharata Critical Edition (Bhismaparva),* V.S. Sukthankar and S.K Belvalkar, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1947
- *The Mahabharata Critical Edition (Dronaparva),* V.S. Sukthankar, S.K Belvalkar and Sushil Kumar De, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1958
- *The Mahabharata Critical Edition (Harivamsa),* Ed. Vishnu S Sukthankar, S.K Belvalkar, P.L Vaidya, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1961-1971
- *The Mahabharata Critical Edition (Karnaparva),* V.S. Sukthankar, S.K Belvalkar and P.L Vaidya, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1954
- *The Mahabharata Critical Edition (Sabhaparva),* V.S. Sukthankar and S.K. Belvalkar, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1944
- *The Mahabharata Critical Edition (Salyaparva),* V.S. Sukthankar, S.K Belvalkar, P.L Vaidya and R.N Dandekar, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1951
- *The Mahabharata Critical Edition (Santiparva), Part 1-3,* V.S. Sukthankar and S.K Belvalkar, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1954 (1951)
- *The Mahabharata Critical Edition (Udyogaparva),* V.S. Sukthankar and Sushil Kumar De, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute,1940
- *The Mahabharata Critical Edition (Virataparva),* V.S. Sukthankar and Raghu Vira, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1936
- *The Matsya Purana in the Sacred Books of the Hindus Vol 17,* General Editor B.D.Basu: Allahabad, 1916
- *The Meghaduta of Kalidasa, with the Commentary of Bharata Mallika in Pracyavani Mandira (Dr. K.N.Katju Series Vol 2),* J.B.Chaudhuri, Calcutta: 1950
- *The Mitakshara with Visvarupa and Commentaries of Subodhini and Balambhatti,* Ed. S.S. Setlur; Madras; Brahmavadin Press; 1912
- *The Narada Purana, in Ancient Indian Tradition and Mythology Vol 16,* Translated and Annotated by Ganesh Vasudeo Tagare, General Ed. J.L.Shastri, Delhi: Motilal Banarsidass,1998
- *The Nighantu and The Nirukta The Oldest Indian Treaties and Etymology, Philology and Semantics,* Ed. Lakshman Sarup, University of Punjab: 1927
- *The Nirukta of Yaska Vol 2,* Edited with Durga's commentary by R.G.Bhadkamkar, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1942
- *The Nirukta of Yaska Vol 2,* Edited with Durga's commentary by R.G.Bhadkamkar; Bombay: The Government Central Press, 1918
- *The Purva Mimamsa Sutras of Jaimini,* Ed. by Ganganath Jha in the *Sacred Books of the Hindus Vol 10, 28,* General Editor B.D.Basu, Allahabad: 1916-1925
- *The Questions of King Milinda Part 1,* Translated by T.W. Rhys Davis in *The Sacred Books of the East Vol- 35,* Ed. F. Max Muller, Oxford: 1890
- *The Questions of King Milinda Part 2,* Translated by T.W. Rhys Davis in *The Sacred Books of the East Vol- 35,* Ed. F. Max Muller, Oxford: 1894
- *The Ramayana,* Balakanda (North-Western Recension), Ed by Bhagvad Datta, Lahore: Dayananda Mahavidyalaya, 1931

- *The Ramayana,* Ayodhyakanda (North-Western Recension), Ed by Pandit Ramalabhaya, Lahore: Dayananda Mahavidyalaya, 1928
- *The Ramayana,* Aranyakanda (North-Western Recension), Bhagvad Datta, Biswabandhu Shastri, Lahore: Dayananda Mahavidyalaya,1935
- *The Ramayana,* Kiskindhakanda (North-Western Recension), Ed by Biswabandhu Shastri, Lahore: Dayananda Mahavidyalaya, 1936
- *The Ramayana,* Sundarakanda (North-Western Recension), Ed by Biswabandhu Shastri, Lahore: Dayananda Mahavidyalaya, 1940
- *The Ramayana,* Yuddhakanda (North-Western Recension), Ed by Biswabandhu Shastri, Lahore: Dayananda Mahavidyalaya, 1944
- *The Ramayana,* Uttarakanda (North-Western Recension), Ed by Biswabandhu Shastri and Pitambara Datta Shastri, Lahore: Dayananda Mahavidyalaya, 1947
- *The Ramayana of Valmiki,* Translated by R.T.H Griffith, Benares: E.J. Lazarus, 1895
- *The Ramayana of Valmiki (Vol-4),* Ed by Robert P. Goldman, Delhi: Motilal Banrasidass, 2007
- *The Ramayana of Valmiki,* Ed by Shastri Shrinivasa Katti Mudholakara, vol. 1-7, Oriental Booksellers Publishers, 1983
- *The Sacred Laws of the Aryas Part 1,* Translated by George Buhler in *The Sacred Books of the East Vol- 2,* Ed. F. Max Muller, Oxford: 1896
- *The Sacred Laws of the Aryas Part 2,* Translated by George Buhler in *The Sacred Books of the East Vol- 14,* Ed. F. Max Muller, Oxford: 1882
- *The Sankhya Karika of Iswara Krishna,* Translated by John Davies, Calcutta: Sushil Gupta Ltd. 1957 (1881)
- *The Sankhya-karika of Ishwar Krisha,* Ed by John Davies, London: Trubner & Co., 1881
- *The Sankhya Karika of Iswara Krishna,* Translated by John Davies, London: Trubner & Co. Ltd. 1894
- *The Sankhya-karika of Ishwar Krisha with Goudapadavasya,* Ed by Jwala Prasad Goud, Varanasi: Chowkhamba Vidya Bhawan, 1930
- *The Siva Purana Vol 1-4,* Trans & Ed. By J.L. Shastri, Delhi: Motilal Banarsidass, 1970
- *The Śrauta Sūtra of Āpastamba,* Ed. S. Narasimhachar, Mysore: The Assistant Superintendent at the Govt. Branch Press, 1944
- *The Srauta Sutra of Apastamba,* (Vol 1, Prasnas 1-7), Ed, Dr. Richard Garbe, Calcutta: Asiatic Society, 1882
- *The Srauta Sutra of Apastamba,* (Vol 2, Prasnas 8-15), Ed. Dr. Richard Garbe, Calcutta: Asiatic Society, 1883
- *The Srauta Sutra of Apastamba,* (Vol 3, Prasnas16 -24), Ed. Dr. Richard Garbe, Calcutta: Asiatic Society, 1884
- *The Sukranitisara,* Ed. Jibananda Vidyasagara; Calcutta: Saraswati Press, 1882
- *The Sushruta Samhita, Vol 1-3,* Ed. Kunja Lal Bhisagratna, Calcutta: 1907-1916
- *The Taittiriya Brāhmana with the Commentary of Bhatta Bhaskara Misra Supplemented with Sayana's ASHTAKA 2,* Ed. R. Shama Sastry, Mysore: Government Branch Press,1921

- *The Taittiriya Brāhmana with the Commentary of Bhatta Bhaskara Misra Supplemented with Sayana's ASHTAKA 3 Part 1,* Ed. A. Mahadeva Sastri and L. Srinivasacharya, Mysore: Government Branch Press, 1911
- *The Taittiriya Brāhmana with the Commentary of Bhatta Bhaskara Misra Supplemented with Sayana's ASHTAKA 3 Part 2,* Ed. A. Mahadeva Sastri and L. Srinivasacharya, Mysore: Government Branch Press, 1918
- *The Tantrasamuccaya of Nārāyaṇa with the Commentary of Vimarsini of Sankara,* Ed. T. Ganapati Sastri, Delhi: Nag Publishers, 1919
- *The Upanishads Part 1,* Ed F. Max Muller in *The Sacred Books of the East Vol 1,* Oxford: 1879
- *The Upanishads Part 2,* Ed F. Max Muller in *The Sacred Books of the East Vol 15,* Oxford: 1884
- *The Vaiśeṣika Sūtras of Kaṇāda,* Translated by Nandalal Sinha in *the Sacred Books of the Hindus Vol 6,* General Editor B.D.Basu, Allahabad: 1923
- *The Vajasaneyi-Samhita with the commentary of Mahidhara,* Ed by Dr. Albrecht Weber, Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series no 103, Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1972
- *The Varāha Purāṇa,* Ed. Anandaswarup Gupta and M.A. Shastri; Benaras; The All India Kashiraj Trust; 1960
- *The Varāha Purāṇa,* Ed. Hrishikesa Sastri, Calcutta: Asiatic Society, 1893
- *The Veda of the Black Yajus School entitled Taittiriya Samhita (Part 1 Kandas 1-3) in the Harvard Oriental Series Vol 18,* Ed by A.B.Keith, General Ed. C.R. Lanman, The Harvard University Press: 1914
- *The Veda of the Black Yajus School entitled Taittiriya Sanhita Part 1-2: Kandas 1-7,* Translated by A.B Keith, Cambridge: Massachusetts: The Harvard University Press, 1914
- *The Vedanta Sutras with Commentary of Sankarakarya Part 1-2,* Translated by George Thibaut in The Sacred Books of the East Vol 34, Oxford: 1890-1896
- *The Vedantasara with Commentaries of Nrisimhasarasvati and Ramatirtha;* Ed. G.A. Jacob; Bombay; Nirnaya-Sagar Press; 1934
- *The Vedanta-Sutras of Badarayana with the Commentary of Baladeva,* Ed. Sris Chandra Vasu in *the Sacred Books of the Hindus Vol 5,* General Editor B.D.Basu, Allahabad: 1934
- *The Vishnupurana:* Ed. H.H.Wilson in *The System of Hindu Mythology and Tradition Vol 1- 5,* London: Trubner & Co. 1964-1868
- *The Works of Sankaracharya Vol 4-5,* Srirangam: Sri Vani Vilas Press,1910
- *The Zend Avesta or the Scripture of the Parsees,* in Essays on the Sacred Language, Writings and the Religion of the, by Martin Hang, Bombay: Bombay Gazette Press, 1862
- *Trikandasesha of Purushottamadeva,* Bombay: Venkateswara Steam Press, 1916
- *Upanishad Samuccayah in Anandashrama Sanskrit Series Book 29,* Ed. Hari Narayan Apte, Poona: Anandashrama Press, 1895
- *Uttaramacharita,* Ed by C Sankara Rama Sastri, Madras: Balamanorama Press, 1962

- *V.S Apte, Sanskrit-English Dictionary Vol 1,* Poona: Prasad Prakashan, 1957-59
- *Vaikhānasa Śrauta Sūtra,* Ed. Parthasarathi Bhattacharya, Tirupati: Tirumala-Tirupati Devasthanams, 1997
- *Vaikhānasa Śrauta Sūtra,* Ed. W.Caland, Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal, 1941
- *Vaikhanasa Smarta Sutras,* Ed and translated by W. Caland, Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1927
- *Vamana Purana,* Ed: K.L. Joshi, O.N. Bimali, Delhi: Parimal Publications, 2005
- *Vamsha Brahman;* Maharishi University of Management Vedic Literature Collection (refer to as Maharshi in the text); Link:http://is1.mum.edu/vedicreserve/
- *Varahamihira's Brhatsamhita,* Ed. M. Ramakishna Bhat, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. 2010
- *Vedāntasāra of Bhagavad Ramanuja,* Translated by M.B. Narasimha Ayangar and Ed. V.Krishnamacharya, Madras: The Adyar Library and Research Centre, 1979
- *Vedantasara with Commentary of Balabodhini of Apadeva, Srirangam,* Sri Vani Vilas Press, 1911
- *Vedic Hymns Part1-2,* Translated and Ed. by F. Max Muller in *the Sacred Books of the East Vol 32-46* Oxford: 1891-1897
- *Vinaya Texts Part 1,* Translated by T.W. Rhys Davids and Herman Oldenberg in *the Sacred Books of the East Vol 13, 20,* Ed F. Max Muller, Delhi: Motilal Banarsidass, 1965
- *Vinaya Texts Part 2,* Translated by T.W. Rhys Davids and Herman Oldenberg in the *Sacred Books of the East Vol 17;* Ed F. Max Muller; Oxford; 1882
- *Vinaya Texts;* Translated by T.W. Rhys Davids and Herman Oldenberg in the *Sacred Books of the East Vol 20;* Ed F. Max Muller; Delhi; Motilal Banarsidass; 1975
- *Vishnu Dharmasutra,* Maharishi University of Management, Vedic Literature Collection
- *Vishnu Purana, A System of Hindu Mythology and Tradition,* Translated and Ed. by H.H Wilson, Calcutta: Punthi Pustak, 1972
- *Vishnu Purana with commentary of Shridharaswami,* Calcutta: Published by Biharilal Sarkar, 1887
- *Vishnu Purana with commentary of Vishnvachitti,* ed. by Annangacharya, Kanchipuram: Granthamala Karyalaya, 1972
- *Visnudharmottara Purana Vol 1-3,* Dr. Priyabala Shah, Delhi: Parimal Publications, 2002
- *Visnusahasranama by Adyar,* Translated by R.A. Sastry, Chennai, Adyar Library, 1980
- *Vrihad-Devata,* Ed. Rajendralala Mitra, Calcutta: The Baptist Mission Press, 1892
- *Yoga Sutras of Patanjali,* Ed. by Dr. J.R. Ballantyne and Govind Shastri Deb, Calcutta: Susil Gupta (India Ltd), 1952
- *Yajnavalkya Smriti in Anandashrama Sanskrit Series Book 46 Vol 1-2,* Ed. Hari Narayan Apte, Poona: Anandashrama Press, 1903-1904
- *Yagnavalkya Smriti,* Ed by S.S. Setlur, Madras, Brahmavadin Press, 1912
- *Yoga Sutras of Patanjali,* Ed. J.R. Ballantyne and Govind Sastri Deva, Calcutta: Susil Gupta Ltd. 1952

আনুষঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জী

- অক্ষয় কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (২য় খণ্ড),* কলকাতা: সংস্কৃত যন্ত্র, ১২৮৯ (১৮৮২)
- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলার ব্রত,* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৯৯
- অশোক চট্টোপাধ্যায়, *পুরাণ পরিচয়,* কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭
- আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, *গায়ত্রী পরিচয়,* মাধিপুরা: ভাগলপুর, ১৯৩১ সাল (১৯২৪)
- উপেন্দ্রকুমার দাস, *ভারতীয় শক্তি সাধনা (১ম, ২য় খণ্ড),* শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী গবেষণা মুদ্রণালয়, ১৯৬৬
- গিরীন্দ্রশেখর বসু, *পুরাণপ্রবেশ,* কলকাতা: বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ২০০৭
- চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, *হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান,* প্যাপিরাস, কলকাতা: ২০০১
- জয়চন্দ্র বিদ্যালংকার, *ভারতীয় ইতিহাস কি রূপরেখা,* এলাহাবাদ: হিন্দুস্তানি একাডেমি, ১৯৪১
- তাপসী মুখার্জী, *মহাভারত-পুরাণে সাংখ্যদর্শনের উত্তরাধিকার,* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১২
- *বর্ষক্রিয়া কৌমুদী,* কবিকঙ্কনাচার্য গোবিন্দানন্দ বিরচিত, কলমকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত: এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা: ১৯০২
- বাল কৃষ্ণ ভরদ্বাজ, *মহাভারত যুদ্ধ কে আঠারো দিন,* কুরুক্ষেত্র: রজনী প্রকাশন, ১৯৯০
- বাসুদেবশরণ অগ্রবাল, *কলা অউর সংস্কৃতি,* এলাহাবাদ: সাহিত্য ভবন লিমিটেড, ১৯৫২
- বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, *সাংখ্যদর্শনের বিবরণ,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪
- বিপিনবিহারী গুপ্ত, *পুরাতন প্রসঙ্গ,* বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৫৯
- *রামেন্দ্রসুন্দর রচনা সমগ্র,* সম্পাদনা: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, আষাঢ় ১৩৫৬-চৈত্র ১৩৬৩ (১৯৪৯-১৯৫৬)
- *রামেন্দ্রসুন্দর রচনা সমগ্র ২য় খণ্ড,* কলকাতা: গ্রন্থমেলা, ১৩৮৩ (১৯৭৬ খ্রি.)
- যোগীরাজ বসু, *বেদের পরিচয়,* ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা: ১৯৮০
- যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, *পৌরাণিক উপাখ্যান,* কলিকাতা: এম সি সরকার এন্ড সন্স লিমিটেড, ১৩৬১ (বঙ্গাব্দ)
- শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচর্চা,* ড. দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৯৮৮ (১৩৯৫ বঙ্গাব্দ)
- শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, *বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞ,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা: ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ (১৯৮৮ খ্রি.)
- শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, *প্রাচীন ভারতে দণ্ডনীতি ও বিচার পদ্ধতি,* কলকাতা: ১৯৩০
- সম্পাদনা, অমরেন্দ্রনাথ রায়, *বাঙালীর পূজাপার্বণ,* কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫০
- সুখময় ভট্টাচার্য, *মহাভারতের চরিতাবলী,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, আষাঢ় ২০১৪, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬)

- সুখময় ভট্টাচার্য, *রামায়ণের চরিতাবলী,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, আষাঢ় ১৪১৯ (২০১২), প্রথম প্রকাশ ১৩৭৬ (১৯৬৯)
- *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ খণ্ড,* কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬২ (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ)
- *হিন্দু-সর্ব্বস্ব,* সম্পাদনা, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯১৫
- A.A Macdonell and A.B Keith; *Vedic Index of Names and Subjects Vol 1-2,* Delhi: Motilal Banarasidass Publishers Pvt Ltd, 1958
- A.A. Macdonell, *Vedic Mythology,* Delhi: Motilal Banarsidass, 2002 (Strassburg, 1898)
- A.A. Macdonell, *Vedic Mythology,* Strassburg: Verlag Von Karl J Trübner,1897
- A.B. Keith, *The Religion and Philosophy of the Vedas and Upanishads,* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd; 2007
- A. Cunningham, *Report of a Tour in the Punjab in 1978-79,* Archeological Survey of India, 1882
- A.E. Nordenshidd, *The Voyage of the Round Asia and Europe,* New York: Macmillan and Co, 1882
- A.L.Basham, *History and Doctrines of the Ajivikas,* London: Luzac & Company Ltd, 1951
- A.R.Tripathi, *"The Concept of Shudras in Manu Smrti: A Reappraisal"* in Indologica Taurinensia, Online Journal of the International Association of Sanskrit Studies, Vol. 30, 2004
- A.S. Altekar, *State and Govt. in Ancient India,* Banaras: Motilal Banarsidass, 1949
- A. Venkatasubbaiah, *The Kalas,* Madras: The Vasanta Press, 1911
- Abinas Chandra Das, *Rig-Vedic India Vol 1,* Calcutta: University of Calcutta, 1921
- Abinas Chandra Das, *Rgvedic Culture,* Calcutta and Madras: R.Cambray and Co. Publishers and Bookseller, 1925
- Abraham Early, *The First Spring: The Golden Age of India,* New Delhi: Penguin Books India Pvt Ltd, 2011
- Ajaya Mitra Shastri, *India as Seen in the Bṛhatsamhitā of Varāhamihira,* Delhi: Motilal Banarsidass,1969
- Alain Daneilou, *The Myths and Gods of India, Rochester,* Vermont: Inner Traditions International, 1985
- *Albiruni's India (Vol 1-2),* Edward C. Sachau, London: Trubner & Co. 1910
- Albrecht Weber, *The History of Indian Literature* (Translated by John Mann and Theodor Zachariea), London: Trubner& Co.1892
- Alice Cretty, *Gods of Northern Buddhism: Their History,* Iconography and Progressive Evolution through Northern Buddhist Countries, London: Oxford Clarendon Press, 1914
- Alexander Cunningham, *The Ancient Geography of India,* London: Turbner & Co. 1871
- Alf Hiltebeital and Barbara D.Miller, *Hair: Its Power and Meaning in Asian Culture,* New York: State University of New York, 1998
- Alexander Cunningham, *Report of Tours in the Gangetic Provinces from Badaon to Bihar in 1875-76 and 1877-78,* Archeological Survey of India, 2000

- Alois Anton Fuhrer, *The Monumental Antiquities and Inscription: In the North-Western Provinces and Oudh,* Oudh: Government Press, 1891
- Amareswar Thakur, *Hindu Law of Evidence,* Calcutta: University of Calcutta, 1933
- *Ancient India as Described by Megasthanes and Arrian,* Ed by J.W McCrindle, London, Trubner & Co., 1877
- Anukul Agarwal, *Mukund S.Babel, ShreedharMaskey,* Estimating the Impacts and Uncertainty of Climate Change on the Hydrology and Water Resources of Koshi River Basin, Springer International Publishing, Switzerland: 2015
- Assar Muhammad Khan and Muhammad Aslam, *Medicinal Plants of Baluchistan: Project on Introduction of Medicinal Herbs and Spices as Crop,* Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Qarshi Industries (Pvt) Ltd, 2000
- B.C Law, *Ancient Indian Tribes,* Lahore: Punjab Sanskrit Book Depot,1926
- B.C Law, *Geographical Essays Relating to Ancient Geography of India,* Delhi: Bharatiya Publishing House, 1976
- B.C Law, *Geography of Early Buddhism,* London: Kegan Paul. Trench. Trubner & Co. Ltd. 1932
- B.C Law, *Historical Geography of Ancient India,* Lucknow: Uttar Pradesh Hindi Granth Prakashani,1972
- B.C Law, *Tribes in Ancient India,* Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1943
- B.C. Law, *Indological Studies, Vol 1,* Calcutta: The Indian Research Institute, 1950
- B.C.Law, *Panchalas and Their Capital Ahichhatra,* Memoirs of Archeological Survey of India No. 67, Calcutta,1942
- B.R. Ambedkar, *The Untouchables,* New Delhi: Amrit Book Co., 1948
- B.K. Sarkar, *Indian Historical Quarterly,* 1, 1925
- Bal Krishnan, Kurukshetra: *Political and Cultural History,* New Delhi: B.R. Publishing Corporation, 1978
- Baidyanath Saraswati, *The Spectrum of the Sacred,* New Delhi: Cocept Publishing, 1984
- *Balochistan Bibliography of Hamed Baloch,* Karachi: Sayad Hashmi Reference Library, 2006
- Beni Prasad, *State in Ancient India,* Allahabad: The Indian Press Limited, 1928
- Bhagwan Singh Suryavanshi, *Geography of The Mahabharata,* New Delhi: Ramananda Vidya Bhawan, 1986
- Black & A Waldron, *The Modernization of the Inner Asia,* New York: East Gate Back, 1991
- *Bombay Gazetteer Vol 1,* 1896
- Bonnic Hendricks, *Horse Breeding,* Oklahama: University of Oklahama Press, 2007
- Braja Dulal Chattopadhyaya, *A Social History of Early India (Vol-2),* New Delhi: Centre for Studies in Civilization, 2009
- Buddha Prakash, *Social and Political Movements in Ancient Punjab,* Delhi: Motilal Banarsidass, 2008
- Buddhaprakash, *Political and Social Movement in Ancient Punjab,* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd, 2007

- C. Stainland Wake, *Serpent Worship,* London: George Redway, 1888
- C.Sivaramamurti, *The Printer in Ancient India,* Delhi: Avinav Publication, 1978
- C.L. Khanna, *Haryana General Knowledge,* Agra: UpkarPrakashan
- C.P. Khare, *Indian Herbal Remedies,* Springer Science and Business Media, 2004
- Captain F.B.Raper, *Narrative of a Survey for the Purpose of Discovering the Sources of the Ganges in Asiatic Researches, Vol-2,* 1812
- C.V. Vaidya, *Epic India: India As Described in The Mahabharata and The Ramayana,* New Delhi: Asian Educational Services, 2001
- C.V. Vaidya, *History of Medieval India (Vol-1),* Poona: The Oriental Book-Supplying Agency, 1921
- Catherin Benton, *God of Desire,* New York: State University of New York, 2006
- Charles Moreis, *The Aryan Race: Its Origins and Achievements,* New York: The Renaissance Publishing House, 1888
- Chentsalrao, *The Principles of Pravara and Gotra (Edition 2),* Mysore: Government Branch Press,1900
- *Collected Works of R.G. Bhandarkar (Vol 1) in Government Oriental Series,* Ed. Narayan Bapuji Utgikar, Poone: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1933, Cosmo Publications, 2008
- *Collected Works of R.G. Bhandarkar (Vol-4),* Poona: The Bhandarkar Research Institute, 1929

- Dr. B. Puri, *India in the Time of Patanjali,* Bombay: Bhartiya Vidya Bhavan, 1957
- Dr. Raj Kumar, *History of the Chamar Dynasty from 6th Century A.D-12th Century A.D,* Delhi: Kalpaz Publications, 2008
- D.C Sircar, *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India,* Delhi: MotilalBanarsidass Publishers Pvt. Ltd, 1960 (Old edition), 1971
- D.C Sirkar, *The SaktaPithas,* Delhi: Motilal Banarasidass; 2004
- D.C. Sircar, *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India,* Delhi: Motilal Banarsidass Pvt Ltd, 1990
- D.C. Sircar, *The Úākta Pīthas,* Delhi: Motilal Banarsidass, 1948
- D.C. Sircar, *Studies in the Society and Administration of Ancient and Medieval India (Vol 1),* Calcutta: Published by K.L.Mukhopadhyay, 1959
- D.R. Bhandarkar, *The Archeological Remains and Excavations at Nagari,* Archeological Survey of India, Memo no. 4
- D.D. Kosambi, *Myth and Reality,* Bombay: Popular Prakashan, 1962
- D.D. Kosambi, *The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline,* Delhi: Vikash Publishing House Pvt. Ltd, 1972
- D.N. Dhar, Kashmir: A Kaleidoscopic View, New Delhi: Kanishka Publisher, 2005
- D.P. Dubey, Prayaga: *The site of Kumbhamela,* New Delhi: Aryan Books, 2001
- D.R. Bhandarkar, A.B. Gajendragadkar, V.G. Paranjpe, *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute Vol 15-17,* Poona: 1933-1936
- D.R. Bhandarkar, *Some Aspects of Ancient Indian Culture,* Madras: University of Madras, 1940

- D.R.Bhandarkar, *Some Aspects of Ancient Hindu Polity,* Benaras: Benaras Hindu University, 1929
- David Frawley, Shiva: *The Lord of Yoga,* Twin Lake, USA: Lotus Press, 2015
- David Kinsley, *Hindu Goddesses,* London: University of California Press, 1988
- Devendra Hande, Sculptures from Haryana: Iconography and Style, Shimla: *Indian Institute of Advanced Study,* 2006
- Devendra Handa, A.J. Shastri Manmohan, S.Kumar, *Numismatic Studies (Vol-1),* Delhi: Harman Publishing House, 1991
- Devendrakumar Rajaram Patil, *Cultural History from the Vayu Purana,* Delhi: Motilal Banarsidass, 1973
- Diana L. Eck, Banaras: *City of Light,* New York: Alfred A. Knopf, 1982
- Diana L. Eck, *India: A Sacred Geography,* New York: Harmony Books, 2012
- Dilip Kumar Ganguly, *Historical Geography and Dynastic History of Orissa,* Calcutta: Puthi Pustak, 1975
- Dinesh Prasad Saklani, *Ancient Communities of the Himalaya,* New Delhi: Indus Publishing Co, 1998
- Donald Mackenzie, *Indian Myth and Legend,* London: Gresham Publishing Company, 1877
- Doris Srinivasan, *Concept of Cow in the Rigveda,* Delhi: Motilal Banarsidass, 1979
- Durga Prasad Dikshit, *Political History of the Chalukycs of Badami,* Delhi: Abhinav Publications, 1980

- E. Vernon Arnold, *Vedic Metre,* Cambridge University Press, 1905
- E.A.Hopkins, *'The Social and Military Position of the Ruling Caste in India' In Journal of the American Oriental Society, Vol-13,* p. 281-284
- E.B. Havell, *Benares,* London: W.Thacker and Co. 2012
- E.H Bunbury, *A History of Ancient Geography (Vol 1-2),* London: John Murray, 1879
- E.J. Rapson, *Ancient India,* Cambridge University Press, 1914
- E.Washburn Hopkins, *Epic Mythology,* Strassburg: Verlag Von Karl J Trubner, 1915
- E.V. Arnold, *Vedic Metre,* Cambridge: Cambridge University Press, 1905
- Edward Washburn Hopkins, *Epic Mythology,* Strassburg: Verlag Von Karl J. Trubner, 1915
- Ed. A.Taluqdar, *The Sacred Books of the Hindus (Vol 18 Part 2),* New Delhi.
- Ed. Bimal Krishna Matilal, Y. Krishnan, *"The Meaning of Purusartha-s in the Mahabharata"; In Moral Dilemmas in the Mahabharata;* Delhi: 1989
- Ed. Christion Pastch; Acotium Ferox, The Encyclopedia of Psycho-active Plants: Ethnopharmacology and its Applications, Translated by John R. Baker; Roclester, Vermunt; Park Street Press; 2005
- Ed. E.J Rapson, *The Cambridge History of India Vol 1 (Ancient India),* Cambridge University Press, 1922
- Ed. Gaspare Gorresion, *Ramayana: Poema Indiano DI VALMICI (Vol-1),* Paris, 1843
- Ed by, G.K Bera and Bijay S Sahay, *In the Lagoons of the Gangetic Delta,* New Delhi: Mittal Publications, 2010

- Ed. Goel & Bushnai, *Gazetteer of India Haryana, Vol 2,* Haryana Gazetteers Organization, Chandigarh, 2009
- Ed. Hans Bakker, *The History of Sacred Places in India as Reflected in Traditional Literature,* Netherlands: E.J. Brill, 1990
- Ed. Helena Gourko & Robert S. Cohen, *Analogy in Indian Tradition and Western Philosophical Thought,* Boston: Studies in the Philosophy of Science (Vol-243), 2006
- Ed. K. D. Bajpai, *The Geographical Encyclopedia of Ancient and Medieval India,* Varanasi: India Academy, 1967
- Ed by K.V. Sarma, *Vedanga Jyotisa of Lagadha,* New Delhi: Indian National Science Academy, 1985
- Ed. Kosla Vepa, *Astronomical Dating of Events & Select Vignettes from Indian History,* USA: Indic Studies Foundation, 2008
- Ed. R.C. Hazra, *Studies in the UpapuranasVol 1-2,* Calcutta: Sanskrit College, 1958-1963
- Ed. S.G. F Brandon, *The Saviour God,* Manchester University Press, 1963
- Ed. Suresh K. Sharma, R.C. Agarwala, *Kuruksetra in Early Sanskrit Literature & Kuruksetra in Later Sanskrit Literature in Haryana: Past & Present,* Delhi: Mittal Publication, 2005
- Ed. Subodh Kapoor, *The Indian Encyclopedia,* New Delhi: Genesis Publishing Pvt Ltd, 2002
- Ed. T.N. Madan, *Way of Life: Essays in Honour of Louis Dumont,* Delhi: Motilal Banarsidass, 1988 (1982)
- Ed. D.C. Sircar, *The Sakti Cult and Tara,* Kolkata: University of Calcutta,1967
- Ed by V.K. Agnihotri, *Indian History,* New Delhi: Allied Publishers Pvt. Ltd., 2010
- Edward C. Sachau, *Alberuni's India (Vol 1-2),* London: Kegan Paul, Trench, Turbner & Co, 1910
- Edward H. Schafer, *The Golden Peaches of Samarkand,* California: University of California Press, 1963
- Edward Tuite Daln, *Description of Ethnology of Bengal,* Calcutta: Office of Superintendent of Govt Printing, 1872
- Emmie Te Nijenhuis, *Indian Music: History and Structure,* Leiden: E.J.Brill, 1974
- *Epigraphia Indica ,Vol 1,* Ed. Jas Burgess, Calcutta: The Superintendent of Govt. Printing (India), 1892
- *EpigraphiaIndica, Vol VI,* Ed. E. Hultzsch, Calcutta: The Superintendent of Govt. Printing Press, 1901
- *EpigraphiaIndica, Vol I;* Ed. Jas Burges; Calcutta: The Superintendent of Govt. Press, 1892
- F. Max Muller, India: *What can it teach us,* New Delhi: Cosmo Publications, 2003
- F.E. Pargiter, *"Ancient Countries in Eastern India"* in Journal of the (Royal) Asiatic Society of Bengal, Vol 66, Calcutta, 1897
- F.E. Pargiter, *Ancient Indian Historical Tradition,* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt Ltd, 1997 (London, 1922)
- F.S. Growse, Mathura: *A District Memoir,* North Western Provinces and Oudh Govt. Press, 1883

- G. Parrinder, *Avatar and Incarnation,* London: Faber and Faber, 1970
- G.A Jacob, *A Concordance to Principal Upanishads and Bhagavadgita,* Delhi: Motilal Banarsidass, 1963
- G.A. Jacob, *A Concordance to the Principal Upanisads and Bhagavadgita,* Delhi: Motilal Banarasidass, 1963 (old edition), 1999
- G.P. Singh, *Research into the History and Civilization of the Kiraatas,* Delhi: Singhal Print Media, 2008
- G.P. Singh, *Researches into the History and Civilization of the Kiraatas,* Delhi: Gyan Publishing House, 2008
- G.P. Upadhyay, *Brahamanas in Ancient India,* New Delhi: Munshiram Monoharlal Publishers Pvt Ltd, 1979
- G.S Ghurey, *The Scheduled Tribes,* Bombay: Popular Book Report, 1959
- Gujarat State Gazetteers, Vadodara, 1979
- Gustav Oppert, *On The Original Inhabitants of Bharatavarsha or India,* Westminster: Archibald Constable & Co. 1898
- H.A. Rose, *A Glossary of the Tribes and Castes of the Panjab and North-West Frontier Province, (Vol-1,3),* New Delhi: Nirmal Publishers and Distributers, 1997.
- H.C. Raychaudhiri, *Political History of Ancient India,* Calcutta: University of Calcutta, 1972
- H.C. Raychaudhuri, *Studies in Indian Antiquities,* Calcutta: University of Calcutta, 1958
- H.D Griswold, *The Religion of the Ṛgveda,* Oxford University Press, 1923
- H.H Wilson, Macenzie Collection: *A Descriptive Catalogue of the Oriental Manuscripts,* Calcutta: Asiatic Press, 1928
- H.T. Colebrooke, *Miscellaneous Essays (Vol- 2, Edition- 2),* London: Trubner & Co, 1873
- H.L. Chatterjee, *International Law and Interstate Relations in Ancient India,* Calcutta: Mukhopadhyay, 1958
- H.W. Bodewitz, *The Jyotistoma Ritual: Jaiminiya Brahmana I,* Leiden: E.J. Brill, 1990
- Harmut Scharfe, *The State in Indian Tradition,* Leiden: Netherlands, 1989
- Haripriya Rangan, *Of Myths and Movements,* London: Verso, 2000
- Harold Nicolson, *Diplomacy,* London: Oxford University Press, 1942
- Harsh K. Gupta, *Disaster Management,* Hyderabad: Universities Press Private Ltd, 2003
- Haripada Chakraborty, *Vedic India,* Calcutta: Snaskrit Pustak Bhandar, 1981
- Haryana District Gazetteers: *Gurgaoun,* Haryana Gazetteers Organisation, Revenue Department, 1983
- Heinrich Robert Zimmer, *Myths and Symbols in Indian Art and Civilization,* Princeton University Press, 1972
- Heinrich Zimmer, *Altindisches Leben: Die Cultur der Vedischen Arier,* Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1879
- *Hermann Kulke and Dietmar Rothermund,* New York: Routledge, 2004

- *Indian Journal of Marine Sciences, Vol 20,* September 1921
- Indologica Jaipurensia, *Research Journal of the Historical Research Documentation Programme, Jaipur Vol. 1,* 1987
- Iravati Karve, *Hindu Society: An Interpretation,* Pune: Deccan College, 1961
- Izzak Walton, *The Life of Henry Wotton,* Anglican History, Project Canterbury, Retrived 11, January 2015
- J. Gonda, *The Change and Continuity in Indian Religion,* New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd; 1965
- J. Vogel, *Indian Serpent Lore or the Nagas in Hindu Legend and Art,* New Delhi: Prithvi Prakashan, 1926
- J.A.B. Van Buitenen, *The History of Religion, vol. 1,* 1962
- J.A.B Van Buitenen, *"Studies in Samkhya"* in Journal of the *American Oriental Society, Vol 76,* 1957
- J.C. Agarwal and S.P. Agarwal, Uttarakhand: *Past, Present and Future,* New Delhi: Concept Publishing Company, 1995
- J.F. Hewitt, *History and Chronology of Myth-Making Age,* London: James Parker and Co. 1902
- J.G. Knott, *Beyond the Bitter Sea,* California: Dockside Sailing Press, 2014
- J.K. Dodiya, *Critical Perspective of the Ramayana,* New Delhi: Sarup & Sons, 2001
- J.L. Brockington, *Righteous Rama,* Delhi: Oxford University Press, 1984
- J.N. Baneyia, *Development of Hindu Iconography,* Calcutta University Press, 1961
- J.N. Farquhar, *A Primer of Hinduism,* Oxford University Press, 1914
- J.N. Farquhar, *Permanent Lessons of The Geeta,* Oxford University Press, 1912
- J.P. Mittal, *History of Ancient India,* New Delhi: Atlantic, 2006
- J.T Wheeler, *A Short History of India: And of The Frontier States of Afghanistan,* London: Macmillan and Co, 1887
- J.T. Wheeler, *History of India from the Earliest Ages (Vol-2),* London: N. Trubner & Co, 1869
- J.W. Mc Crindle, *Ancient India As Described by Megasthenes and Arrian,* London: Turbner& Co,1877
- J.W. Mc Crindle, *Ancient India as Described by Ptolemy,* London: Trubner & Co, 1884
- Jadunath Sinha, *Indian Psychology, Vol 2,* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd, 1986
- Jan Gonda, *A History of Indian Literature, Vol 1,* Wiesbaden, 1975
- J.Gonda, *The Ritual Functions and Significance of Grasses in the Religion of the Veda,* Amsterdam: North-Holland Publications Co, 1985
- Jasodhara Bagchi, *The Changing Status of Women in West Bengal (1970-2000),* New Delhi: Sage Publications Ltd, 2005
- Jogiraj Basu, *India of the Age of the Brahmanas,* Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar, 1969
- John Dowaon, *A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion,* London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd. 1928
- Jogiraj Basu, *India in the Age of the Brahmanas,* Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar, 1969

- John Gorret, *A Calssical Dictionary of India,* Madras: Higginbotham and Co, 1971
- *Journal of Asiatic Society of Bengal Vol 5,* Calcutta: 1836
- *Journal of Asiatic Society of Bengal Vol 10,* Calcutta: 1841
- *Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol-18,* Calcutta: 1865
- *Journal of Asiatic Society of Bengal Vol 66,* Calcutta: Asiatic Society, 1898
- *Journal of the Asia-Pacific Urban Studies and Affairs (Vol 5),* Asia Pacific Research Center, Hanyang University, 2001
- *Journal of the Bihar and Orissa Research Society Vol 11,* 1934
- *Journal of Bihar Research Society Vol-19,* 1933
- *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society,* January 1861
- *Journal of the Epigraphical Society of India, Vol 5,* Ed. S.H. Ritti, Ajaya Mitra Shastri, Mysore: The Epigraphical Society of India, 1978
- *Journal of Haryana Studies (Vol-21),* Kurukshetra University, 1989
- *Journal of the Royal Asiatic Society (Vol-7),* Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1843
- *Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal (Letters Vol. 1),* Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal, 1936
- *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Vol 15,* London: J.W. Parker and Son, 1852
- K.C. Singhal and Roshan Gupta, *The Ancient History of India (Vedic Period): A New Interpretation,* New Delhi: Atlanta Publishers and Distributors, 2003
- K.Kirshnamoorthy, *Essays in Sanskrit Criticism,* Dharwar, Karnatak University, 1964
- K.P. Jayswal, *Hindu Polity,* Calcutta: Butterworth & Company, 1924
- K.S. Gulia, *Mountains of the Gods: Spiritual Ecology of the Himalayan Region,* New Delhi: Isha Books, 2008
- Kaliprasad Goswami, *Kamakhya Temple: Past and Present,* New Delhi: A.P.H. Publishing Corporation, 1998
- Kaushik Roy, *Hinduism and the Ethics of Warfare in South Asia,* U.S.A: Cambridge University Press, 2012
- Kemeth G. Zysk, *Asceticism and Healing in Ancient India,* Delhi: Motilal Banarsidass Pvt Ltd, 1991
- *Land and People of Indian States and Union Territories,* Gopal. K. Bhargava and SC Bhatt, Delhi: Kalpaz Publications, 2006
- Larson & Bhattacharya, *Encyclopedia of Indian Philosophies (Vol 4),* New Jersey, Princeton University Press, 1987
- *Lice Mckean,* Divine Enterprise, USA, University of Chicago Press, 1996
- Liny Srinivasan, *Desi Words Speaks of the Past,* Bloomington: Author House, 2011
- Louis Renou, *The Destiny of the Veda in India,* New Delhi: Motilal Banarsidass, 1965
- M. Bloomfield, *The Religion of the Veda,* New York & London: The Knicker bocker Press, 1908
- M.Kienholz, *Opium Traders and Their World (Vol-2),* Bloomington: iUniverse, 2008

- M. Malten-Brun, *Universal Geography (Vol-2),* London: Black and Longman, 1822
- M. Krishnamachariar, *History of Classical Sanskrit Literature,* Madras: Tirumalai-Tirupati Devasthanams Press, 1937
- Mahesh Sharma, *Puranic Texts from Kashmir,* Vitasta and the River Ceremonial in Early Medieval India, Los Angeles, SAGE Publications, 2008
- Manohar Lal Bhargava, *The Geography of Rgvedic India,* Lucknow: The Upper India Publishing House LTD, 1964
- Maurice Bloomfield, *A Vedic Concordance,* Delhi: Motilal Banarsidass, 1906
- Max Muller, *A History of Ancient Sanskrit Literature,* London: Williams and Norgate, 1860
- Max Muller, India: *What Can It Teach Us,* New York: John W. Lovell Company,1882
- Michel Hulin, *Samkhya Literature in a History of Indian Literature, Vol 6,* Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1978
- Mircea Eliade, *History of Religious Ideas: From Stone Age to the Abyssinian Mysteries, Vol 1,* University of Chicago Press, 1985
- MithilaSharanPandey, *The Historical Geography and Topography of Bihar,* Delhi: Motilal Banarsidass, 1963
- Moti Chandra, *Geographical and Economic Studies in the Mahabharata: Upayana Parva,* Lucknow: The U.P Historical Society, 1945
- Moti Chandra, *Trade and Trade Routes in Ancient India,* New Delhi: Abhinava Publications, 1977
- *Munshi Indological Felicitation, Volume (Vol 20-21);* Ed. J.H. Dave and H.D. Velankar, Bombay: Bharatiya VidyaBhavan, 1962

- N.C. Bandyopadhyaya, *Development of Hindu Polity and Political Theories,* Calcutta: R. Cambray, 1927
- N.L Dey, *The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India,* New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1971 (1927)
- N.N. Bhattachryya, *The Geographical Dictionary,* Delhi: Munshiram Manoharlal Pvt. Ltd, 1991
- N.N. Misra, *Source Material of Kumaoni History,* UP: Shree Almora Book Depot; 1994
- Nicholas Sutton, *Religions Doctrines in the Mahabharata,* Delhi: Motilal Banarsidass, 2000
- Niccolo Machiavelli, *The Prince,* New York: The Modern Library, 1940

- O.P Bharadwaj, *Ancient Kurushetra: Studies in Historical and Cultural Geography,* New Delhi: Harman Publishing House; 1991
- Om Prakash, *Food and Drinks in Ancient India (From earliest times to 1200 AD),* Delhi: Munshiram Manaharlal, 1961
- *Oriental Historical Manuscripts (Vol 1, 2),* Trans and Ed by W. Taylor, Madras: Charles Josiah Taylor, 1835

- P.Chamaria, *Kailash Manasarovar,* New Delhi: Abhinav Publications, 1996
- P.C.Chakravarti, *The Art of War in Ancient India,* Dhaka: The University of Dhaka, 1941
- P. Sensharma, *Kurukshetra War,* West Bengal: Darbari Udjog, 1975

- P.K Bhattacharyya, *Historical Geography of Madhya Pradesh from Early Records*, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd, 2010 (1977)
- P.Mool, S.R. Bajracharya, S.P.Joshi, *Inventory of Glacial Lakes Outburst Floods*, International Centre for Integrated Mountain Development, 2001
- P.V. Kane, *History of Dharmasastra (Vol-2 Part-2)*, Poona: Bhandarkar, 1941
- P.V. Kane, *History of Dharmasastra (Vol-4)*, Poona: Bhandarkar, 1953
- P.V. Kane, *History of Dharma Sastra (Vol-2)*, Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1941
- P.V. Kane, *History of Dharmasastra, Vol 5*, Poone, Bhandarkar Oriental Research Institute, 1958
- Panchanana Raya, *A Historical Review of Hindu India: 300 BC to 1200 A.D.*, Delhi: IMH Press Pvt. LTd,1939
- Patrick Olivelle, *The Asrama System*, New Delhi: Munsiram Manoharlal Publ. Ltd, 2004 (OUP, 1993)
- Paul Hacker, *'Anviksiki'*. In Wiener Zeitschrift fur die Kundesudund Ostasiems 2 (1958), pp. 54-83, as referred to in *The Encyclopedia of Indian Philosophies, Vol. 4*, Ed: Larson and Bhattacharya, Delhi: Motilal Banarsidass, 1987
- Peter L. Roudik, *The History of the Central Asian Republic*, London: Greenwood Press, 2007
- Priya Vrat Sharma, *Essentials of Ayurveda*, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt Ltd, 1998
- *Proceedings of North-East India History Association*, Shillong Sessio, 1993
- *Proceedings of the Indian History Congress*, Calcutta: Indian History Congress, 1970
- Purnendu Narayan Sinha, *A Study of the Bhagavata Purana*, Benares: Freman & Co. 1901

- R. Spence Hardy, *Manual of Buddhism*, USA: Kessinger Publishing Co, 2003
- R.A. Donkin, *Dragon's Brain Perfume: An Historical Geography of Camhor*, Boston: Brill, 1999
- R.C Majumdar, *The Classical Accounts of India*, Calcutta, Firma K.L. Mukhopadhyay, 1960
- R.C. Majumdar, *The History of Bengal, vol. 1*, Dacca: The University of Dacca, 1943, p. 5, 24, 429
- R.C. Majumdar, A.S. Altekar, *The Vakataka- Gupta Age*, Delhi: Motilal Banarsidass, 1967
- R.C.Hazra, *"The Smriti Chapters in the Puranas"* . *In The Indian Historical Quarterly*, Ed. Narendra Nath Law, Vol 11, 1935
- R.G. Mulgan, *Aristotle's Political Theory*, Oxford University Press, 1977
- R.S. Sharma, *Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India*, Delhi: Motilal Banarsidass, 1959
- Radha Kumud Mukherji, *Hindu Civilization, Vol 1-2*, Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1957

- Raj Bali Pandey, *Hindu Sanskaras,* Banaras: Vikrama Publishing, 1949
- Ramchandra Narayan Dandekar, *Shivram Dattatray Joshi, CASS Studies Vol-3,* Poona: University Press Poona, 1976
- Ram Chandra Jain, *Ethnology of Ancient Bharata,* Chowkhamba: Sanskrit Series Office, 1970
- Ram Sharan Sharma, *Sudras in Ancient India,* Delhi: Motilal Banarsidass, 1958
- Rama Shankar Tripathi, *History of Kanauj,* Delhi: Motilal Banarsidass, 1964
- Rhys Davids, *Psalms of the Early Buddhists,* London: Oxford University Press,1913
- Richard L. Thompson, *The Cosmology of the Bhagavata Purana: Mysteries of the Sacred Universe,* Delhi: Motilal Banrasidass Publishers Pvt Ltd, 2007
- Robert Shafer, *Ethnography of Ancient India,* Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1954
- Romila Thapar, *The Past Before Us,* USA: Harvard University, 2013
- Romila Thapar, *The Penguin History of Early India,* California: University of California Press, 2004

- S. Jayashankar, *Temples of Kasaragod District,* Thiruvananthapuram: Directorate of Census Operations, 2001
- S. Kalyanaraman, *Vedic River Sarasvati and Hindu Civilization,* New Delhi: Aryan Book International, 2008
- S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy, Vol 1,* London: G Allen & Unwin Ltd. 1948
- S.B. Roy, Date of Mahabharata Battle, Gurgaon: Academic Press, 1976
- S.C Bajpai, *Kinnaur in the Himalayas,* New Delhi: Concept Publishing Company, 1981
- S.C. Sircar, *Some Aspects of the Earliest Social History of India,* London: HUMPHREY MILFORD OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1928
- S.G Kantawala; *Kalyana Tirthanka;* January; 1952
- S.G. Talageri; *The Rigveda A Historical Analysis,* New Delhi: Aditya Prakashan, 1994
- S.M. Ali, *The Geography of The Puranas,* New Delhi: People's Publishing House; 1966
- S.N. Nair, *The Holy Himalayas,* Delhi: Pustak Mahal, 2007
- S.N. Dasgupta, *History of Indian Philosophy, vol. 3,* Cambridge University Press, 1961
- S.P. Tewari, *Contributions of Sanskrit Inscriptions to Lexicography,* Delhi: Agam Kala Prakashan, 1987
- S.S Bhawe, *The Soma Hymns of the Ṛgveda: A Fresh Interpretation,* M.S. University Research Series 6, Baroda: 1962
- S.Sandhu, B.K Raina, *Places Names in Kashmir,* New Delhi: Bharatiya Vidya Bhavan, 2000
- S.V. Karandiker, *Hindu Exogamy,* Bombay: D.B. Taraporevala Songs & Co, 1929
- Samarendra Narayan Arya, *History of Pilgrimage in Ancient India (AD 300-1200),* New Delhi: Mushiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd, 2004
- Sarojini Chaturvedi, *A Short History of South India,* New Delhi: Samskriti, 2006
- Sarva Daman Singh, *Ancient Indian Warfare,* Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt Ltd, 1997 (Leiden, 1965)
- Sashi Bhusan Chaudhuri, *Ethnic Settlements in Ancient India (Part 1—Northern India),* Calcutta: General Printers and Publishers Ltd, 1955

- Satis Chandra Vidyabhusana, *A History of Ancient Logic,* Calcutta: University of Calcutta, 1921
- Satish Chandra Banerjee, *Samkhya Philosophy (Samkhya Karika),* Hare Press: Calcutta, 1898
- Satish Chandra Vidyabhusana, *A History of Indian Logic,* Delhi: Motilal Banarsidass, 2002
- Sharad Singh Negi, *Himalayan Rivers, Lakes and Glaciers,* New Delhi: Indus Publishing Company, 2004
- Shashi Bhushan Chaudhuri, *Ethnic Settlements in Ancient India,* Calcutta: General Printers & Publishers Ltd, 1955
- Sir Aurel Stein: *Archeological Explorer,* J. Mirsky; London: University of Chicago Press, 1977
- Sir W.W Hunter, *The Indian Empire,* London: Trubner & Co. Ludgate Hill, 1882
- Subodh Kapoor, *Encyclopaedia of Ancient Indian Geography,* New Delhi: Cosmo Publications, 2002
- Sudama Misra, *Janapada States in Ancient India,* Varanasi: Bharatiya Vidya Prakashan, 1973
- Sudhir Kakar & Kathrina Kakar, *The Indians: Portrait of a People,* Penguin India, New Delhi: 2007
- Sukumari Bhattacharji, *Indian Theogony,* Britain: Cambridge University Press, 1970
- SukumariBhattacharji, *The Literature in the Vedic Age Vol-1,* Calcutta: K.P. Bagchi and Company, 1984
- SukumarSen, *The Great Goddess in Indian Tradition,* Calcutta: Papyrus, 1983
- Suniti Kumar Chatterji, *Kirāta-Jana-Kṛti,* Calcutta: The Asiatic Society, 1988 (1951)
- Surendra Kisor Chakraborty, *A Study of Ancient Indian Numismatics,* Calcutta, 1931
- Susan Whitefield, *The Silk Road (Trade, Travel, War and Faith),* Chicago: The British Library, 2004
- Susheela Raghavan, *Handbook of Spices, Seasoning and Flavourings,* New York: CRC Press, 2007
- T.R.V Murti, *'Rise of the Philosophical Schools' in The Cultural Heritage of India Vol 3,* Ed. Haridas Bhattacharyya, Calcutta: The Ramakrishna Mission Institute of Culture, 1937
- T.R.V Murti, *'The Rise of the Philosophical Schools' In the Cultural Heritage of India Vol 3,* Calcutta: Ramkrishna Mission,1953
- *The World Today Series (2012),* M.W.Shoemaker, Lanham: Stryker-Post Publications, 1970
- *The Imperial Gazetteer of India (Vol 14),* W.W. Hunter, London: Turbner & Co. 1887
- *Theodor Goldstucker,* Panini: His Place in Sanskrit Literature, London: Turbner & Co. 1861

- *Theodor Goldstucker,* Panini: His Place in Sanskrit Literature, London: Turbner & Co. 1861

- *UNODC-Bulletin on Narcotics,* Issue 1-002, 1957 (www.unode.org)
- U.N. Ghoshal, *A History of Indian Political Ideas,* Oxford University Press, [Indian Branch] 1959
- Uma Chakravarty, *Indra and Other Vedic Deities,* New Delhi, D.K. Printworld (P) Ltd. 1997
- Umakanth Thakur, *The Geographical Information in the Skanda Cult,* Mithila: Institute of Post-graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 1979
- Uttar Pradesh District Gazetteers: *Etah,* 1988

- V.G. Rahurkar, *The Seers of Ṛgveda,* Poona: Poona University Press, 1964
- V.M. Apte, *'Political and Legal Institutions' in Vedic Age,* Ed. R.C. Mazumdar, Bombay: Bharatiya Vidya Bhawan,1965
- V.R. Ramchandra Dikshitar, *Hindu Administrative Institutions,* Madras: University of Madras, 1929
- V.R. Ramachandra Dikshitar, *War in Ancient India,* Bombay: Macmillan and Co. Ltd, 1944
- V.S. Agrawala, *India as Known to Panini,* Lucknow: University of Lucknow, 1953
- Vaidya C.V, *Epic India (Vol 18);* New Delhi: Cosmo Publication, 1987
- Vaman Krishna Paranjpe, *Fresh Light on Kâlidâsa'sMeghadûta,* Poona: Kalidasa Sanshodhan Mandal, 1960
- *Vishesvaranand Indological Journal, Vol. 3-4,* Vishesvarananda Vedic Research Institute, 1965

- W. Francis, *Gazetteer of South India (Vol-2),* New Delhi: Mittal Publications, 1989
- W. Norman Brown, *'The Sanctity of the Cow in Hinduism'* In India and Indology: Selected Articles, Delhi: Motilal Banarsidass, 1978
- W.E. Hale, *Asura in Early Vedic Religion,* Delhi: Motilal Banarsidass 1986
- W.J. Spellman, *Political Theory of Ancient India,* Oxford University Press, 1954
- Wendy Domiger O'Flaherty, *Hindu Myths,* New Delhi: Penguin Books India, 1994
- Wolfgang Frisch, Martin Meschede, Ronald Blakey, *Plate Tectonics: Continental Drift and Mountain Building,* Berlin: Springer, 2011

- Y. Krishnan, *The Meaning of Purusartha-s in the Mahabharata".* In Moral Dilemmas in the Mahabharata, Ed. Bimal Krishna Matilal, Delhi: Indian Institute of Advanced Study, 1989
- Yashoda Devi, *History of Andhra Country: 1000 A.D-1500 A.D,* New Delhi: Gyan Publishing House, 1993

জন্ম পাবনা জেলার (এখন বাংলাদেশে)
গোপালপুর গ্রামে, ১৯৫০ সালে। কলকাতায়
প্রবেশ ১৯৫৭ সালে। ভারততত্ত্ববিদ এবং
ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণ বিশেষজ্ঞ।
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের
কাছে গবেষণাকর্মের শিক্ষা, পরমপ্রিয়
অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্যের কাছে
তাঁর গবেষণাকর্মের দীক্ষা।
গুরুদাস কলেজ, কলকাতা থেকে সংস্কৃত রিডার
হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন ২০১০ সালে।
রমাপদ চৌধুরীর প্রেরণায় তাঁর লেখক জীবনের
শুরু বহু বছর আগে। তাঁর প্রথম বই *বাল্মীকির রাম
ও রামায়ণ* প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে। আজ তিনি
বিখ্যাত লেখক। তাঁর লেখালেখি প্রধানত প্রাচীন
ভারতীয় মহাকাব্যগুলির জনপ্রিয় চরিত্র কেন্দ্র করে।
পত্র-পত্রিকায় তিনি কলামও লেখেন।
তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: *মহাভারতের ছয় প্রবীণ*;
কৃষ্ণা, কুন্তি এবং কৌন্তেয়; *মহাভারতের
প্রতিনায়ক*; *মহাভারতের ভারত যুদ্ধ ও কৃষ্ণ*;
দণ্ডনীতি; *মহাভারতের অষ্টাদশী*;
কথা অমৃতসমান প্রভৃতি।
তাঁর অনেক গ্রন্থ ওড়িয়া, অসমিয়া, হিন্দি
এবং ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা
প্রবন্ধসাহিত্যে অবদানের কারণে
'মহাভারতের অষ্টাদশী' গ্রন্থের জন্য
২০১৬ সালে সাহিত্য একাডেমী পুরস্কারে
সম্মানিত হয়েছেন।